৩৩শ বর্ষ] ১৩৬১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

প্রবন্ধ—

কবিতা—

সূচীপত্র

সংগ্রহ—

উদ্ধৃতি—

পল্লীবধূ

চিত্তরঞ্জন রায় অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

কার্ত্তিক, ১৩৬১]

[৩৩শ বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

(স্থাপিত ১৩২৯)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "সেজ বাবুর সঙ্গে ক দিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখ্‌লাম মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজ বাবু বললে—বাবা, ওখানে কি কচ্চ? আমি হেসে বললাম—মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজ বাবু বুঝেছে যে ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে,—বাবা, সরে এস, সরে এস। এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "দেশে গেলাম, রামলালের বাপ (তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর) ভয় পেলে। ভাবলে যার তার বাড়ীতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে ... করে দ্যায়। আমি বেশী দিন থাকতে পারলাম না চলে এলাম।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের মত—সব চৈতন্যময় দ্যাখে। যখন আমি ও দেশে (কামারপুকুরে) রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪।৫ বছর বয়স। পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে—চোপ, আমি ফড়িং ধরবো। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে সে ঘরের ভিতর আছে। বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গ্যাল না। উঁকি মেরে এক একবার দেখ্‌ছে—বিদ্যুৎ, আর বলছে—
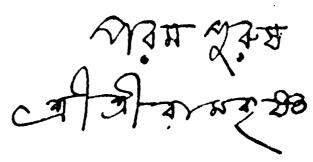
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো কুড়ি

যে মা-মন্ত্র দেবে তাকে মায়ের জন্যে কাঁদতে হবে। শুধু বিশ্বের মায়ের জন্যে নয়, ঘরের মায়ের জন্যে। শুধু ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর জন্যে নয়, সামান্য গর্ভধারিণীর জন্যে। জগৎ ছাড়লেও মাকে ছাড়া যাবে না। সন্ন্যাসী হয়েও যাকে আঁকড়ে থাকতে হবে জপমালার মত। পঞ্চবায়ু, পঞ্চকোষের মত। শুধু তাই নয় নিজেকেও মা হয়ে দেখাতে হবে মাঝে মাঝে। আরো কঠিন কথা, মা-মন্ত্রের দিতে হবে একটি পর্যাপ্ত মূর্তি, একটি শরীরী তর্জমা, একটি শাশ্বতী প্রতিলিপি।

সব পুরোপুরি করে গিয়েছেন ঠাকুর। তাই তো তাঁর মন্ত্র এত প্রাণময়। তার শক্তি এত উজ্জীবনী। তার অর্থ এত গভীরগ।

ঈশ্বরের চেয়েও মায়ের চন্দ্রমণির মুখখানি বেশি সুন্দর দেখেছেন। মায়ের মুখখানি মনে পড়তেই ছুঁড়ে দিলেন গঙ্গামায়ীর হাত, ছেড়ে এলেন বৃন্দাবন। কিসের শ্রীমতীর সাধন শ্রীমতী মাতার কাছে! 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—' একেবারে নাড়া ধরে টান মারে। মা মরে যাবার পর এমন কান্না কাঁদলেন, নির্বিকল্প সন্ন্যাসেও কুলোল না। এমন মা! এমনই মহীয়সী জাবিতাশা! তারপর নিজে রূপ ধরে দেখালেন মা দেখতে কেমন। চুল এলিয়ে বুকভরা স্নেহক্ষীর নিয়ে কোল পেতে বসলেন মাটির উপর। রাখাল দেখল মা বসে আছে। সোজাসুজি কোলের উপর গিয়ে বসল, দুধের ছেলের মত পান করতে লাগল মার স্তন্যসুধা। এই তো না-হয় হল যারা স্বগণ-স্বজন তাদের জন্যে, কিন্তু আর-সকলের কী হবে, তাদের মা কোথায়? শুধু মন্ত্রে, শুধু মুখের কথায় কি সাধ মেটে, না, বুক ভরে? আমাদের একটি মূর্তি চাই, প্রতিমা চাই। প্রমিতা, প্রস্ফুটা প্রতিমা। মন্ত্রের উজ্জ্বল উচ্চারণ। ঘনীভূতা নিয়তস্থিতি।

ঠিক কথা। এই দেখ সেই মন্ত্রের মূর্তি, সান্দ্রীভূতা স্মিতজ্যোৎস্না। বলে প্রতিষ্ঠা করলেন সারদামণিকে। চেয়ে দেখ এই মূর্তির দিকে, ওকে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে কিনা এবং ডাকবার সঙ্গে-সঙ্গে মনে এই আশ্বাস আসে কিনা যে সাড়া পাব। দুর্গদুর্গতিহরা জন্মজলধিতারিণী মা। শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলা সুশুভা। ভবভয়দ্রাবিণী দীনবৎসলা।

রাখালের মত তারকও এসে দেখল ঠাকুর নয়, মা বসে আছেন। কোথায় পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করবে তা নয়, লাজুক শিশুর মত ঠাকুরের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল। কি রে, আমি কে? অমন করলি কেন?

তুমি? তুমি আমার মা। তোমার চাহনিতে সেই নিমন্ত্রণ।

'হ্যাঁ রে, তোকে আগে কোথাও দেখেছি?'

আমি দেখেছিলাম একদিন রাম বাবুর বাড়িতে। সিমলেতে তাঁর বাড়ির কাছেই আমার বাসা। গিয়ে দেখি একঘর লোক, বাইরেও উদ্বেল জনতা। কি যেন দেখতে কি যেন শুনতে সবাই উন্মুখ-উৎসুক। ভিড় ঠেলে গেলাম এগিয়ে। গিয়ে দেখলাম আপনাকে। আহা সে কি মনোহর দর্শন! অমৃত-মহোদধি বসে আছেন শান্ত হয়ে। ভাবারূঢ় অবস্থায়। কন্দর্পকোটিসৌন্দর্য। জগৎগুরুজগন্নাথ। আড়ষ্ট ভাবজড়িত স্বরে বলছেন, "আমি কোথায়?" কে একজন বললে, রামের বাড়িতে। কোন্ রাম? ডাক্তার রাম। তখন ফিরে পেলেন সম্বিৎ।

বলতে লাগলেন সমাধির কথা। কাকে বলে সমাধি? সমাধি কয় রকম? কিসে কেমন অনুভূতি?

সে এক অপূর্ব বর্ণনা।

সমাধি পাঁচ রকম। পিপীলিকা, মৎস্য, কপি, পক্ষী আর তির্যক। কখনো বায়ু ওঠে পিঁপড়ের

মতো শিরশির করে। কখনো ভাবসমুদ্রে আত্মা মাছের মতো খেলা করে। আনন্দে সাঁতার কাটে। কখনো বা পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু পাশ থেকে ঠেলতে থাকে, আমোদ করতে চায়। আমি চুপ করে থাকি, টুঁ শব্দও করি না। কিন্তু নিঃসাড় হয়ে কাঁহাতক থাকা যায়? বানরের মত লম্বা লাফ দিয়ে মহাবায়ু উঠে যায় সহস্রারে। তাই তো, দেখ না, মাঝে মাঝে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। তার পর আবার পাখি হয় মহাবায়ু। এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডালে উড়তে থাকে। যেখানটায় বসে সেখানে যেন আগুন জ্বলে। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয় এমনি উড়ে-উড়ে বেড়ায়। শেষে এসে মাথায় আশ্রয় নেয়। তির্যকও প্রায় তাই। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না, এঁকে-বেঁকে চলে। তারও শেষ লক্ষ্য ঐ মাথা। ঐ কুলকুণ্ডলিনী। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। ঐ কুলকুণ্ডলিনী জাগলেই শেষ সমাধি।

আমরা কি অত সব পারব? মহাবায়ুর সঙ্গে কি আমাদের মহাসাক্ষাৎকার হবে? নিয়ে যাবে সেই প্রস্ফুটিত শতদলের মর্মকোষে?

কেন হবে না? শুধু পুঁথি পড়লে হবে না। শুধু শুকনো চর্বিতচর্বণে হবে না। তাঁকে ডাকলে হবে। তাঁর জন্যে কাঁদলে হবে। তাঁকে ভালোবেসে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হলে হবে।

কান্না কখনো পুরানো হয় না। এর কান্নার সঙ্গে মেলে না ওর কান্না। প্রত্যেকটি কান্না মৌলিক। নিত্য-নতুন।

বিষয়চিন্তাই মনকে দেয় না সমাধিস্থ হতে। আবার বলতে লাগলেন ঠাকুর, সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। কিন্তু মেঘে যদি সূর্য ঢাকা পড়ে তা হলে আর পদ্ম তার দল মেলে না। তেমনি বিষয়মেঘে জ্ঞানসূর্য ঢাকা পড়লে ফোটে না আর ভক্তিকমল।

আরেক রকম সমাধি আছে। যাকে বলে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা।

এও কি যে-সে কথা? মানুষের মন সরষের পুঁটলি। পুঁটলি খুলে সরষে ছড়িয়ে পড়লে ওদের কুড়িয়ে এনে ফের পুঁটলি বাঁধা কি সোজা কথা? একটু মন হয়তো গুটিয়ে এনেছে অমনি কোত্থেকে বিষয়চিন্তা এসে উদয় হল, দিল সব ছত্রখান করে।

সেই নেউলের গল্প জানো না? ল্যাজে ইঁট-বাঁধা নেউল? দেয়ালের গর্তে, তার নিভৃত সমাধির কোটরে আছে দিব্যি আরামে, ঐ ইঁটের টানে বারে বারে বেরিয়ে পড়ে গর্ত থেকে। যতবারই গর্তের মধ্যে স্বস্থানে বসতে যায় আরামে, ইঁটের জোরে ততবারই এসে পড়ে বাইরে। বিষয়-চিন্তাও অমনি। যতই মন ঈশ্বরের পাশটিতে এসে বসতে চায় ততই বিষয়-চিন্তা টেনে বের করে দেয়। ঘটায় যোগভ্রংশ।

উন্মনা-সমাধি কেমন জানো? সেই থিয়েটারের ড্রপ উঠে যাওয়া। দর্শকেরা পরস্পরের সঙ্গে গল্প করছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, অমনি থিয়েটারের পর্দা উঠে গেল। তখন সকলের মন সহসা অভিনিবিষ্ট হল অভিনয়ে। আর নেই তখন বাহ্যদৃষ্টি, বাহ্যচেতনা। যেন উঠে পড়ল মায়ার পর্দা। জেগে উঠল যোগচক্ষু। আবার খানিকক্ষণ পর যখন নেমে এল মায়ার পর্দা, মন আবার বহির্মুখ হয়ে গেল। আবার সুরু হল গালগল্প, বিষয়কথা। যে-কে-সে।

তাই বা মন্দ কি। সংসারী লোকের পক্ষে যত বেশি উন্মনা হওয়া যায়। যত বেশি ঘরে থেকে নিজেকে অনুভব করা যায় বনবাসীর মত।

উন্মনা হতে-হতেই স্থিত-সমাধি হয়ে যাবে। একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলেই স্থিত-সমাধি। সর্বক্ষণই বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, জলের ধারে বসে আছে একটা কাক। পিপাসার্ত, তবু খাচ্ছে না জল। কেন, কি হল? রামকে জিগগেস করলেন লক্ষ্মণ। রাম বললেন, ভাই, এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশ রামনাম করছে। ভাবছে জল খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক হয়ে যায় তাই ঠোঁট দিয়ে জলস্পর্শ করছে না।

নামসুধাই হরণ করছে তার দেহপিপাসা।

সংসারী লোকের সেই একমাত্র উপায়—নাম-জীবিকা। 'হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।'

শুধু তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। তাঁর নাম করো। তাতেই জাগবে কুলকুণ্ডলিনী। জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী, প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী। কুণ্ডলায়িত সাপ ফণা না তুললে কিছুই হবে না। ও জাগলেই চৈতন্য, ও জাগলেই ঈশ্বরদর্শন।

ন্যাংটা বলত গভীর রাত্রে অনাহত শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ শোনবার জন্যে তপস্যা। ওই প্রণবের

ধ্বনি। ঐ ধ্বনি উঠছে ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে, প্রতিধ্বনি জাগছে নাভিমূলে। অনাহত শব্দ ধরে এগুলেই পৌঁছুনো যায় ব্রহ্মের কাছে, যেমন কল্লোল শুনে পৌঁছুনো যায় সমুদ্রে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের মধ্যে আমি—আমি রব উঠছে ততক্ষণ শোনা যাবে না সেই শব্দ দেখা যাবে না সেই শেষশায়ীকে।

মুগ্ধের মত শুনছিল সব তারক আর ভাবছিল এমন ভাগ্য কি হবে যে এই মহাসমাধিস্থ মহাপুরুষের কৃপা আমি পাব?

শুধু কৃপা নয়, কোল দেব তোকে।

রাম বাবু বললেন কাঁধে হাত রেখে, 'এখানে খেয়ে যাবেন চারটি।'

'বাড়িতে বলে আসিনি।'

'তাতে কি?' উড়িয়ে দিলেন রাম বাবু।

একটা অতি তুচ্ছ কথা কিছু নয়। সত্যের ছোট-বড় নেই, তুচ্ছ-উচ্চ নেই, সত্য সবসময়েই সত্য, সর্বাবস্থায় জগৎপ্রদীপ সূর্যের মতই বৃহত্তেজা।

খুঁজতে-খুঁজতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে তারকের এক বন্ধুর বাড়ি, সেই তাকে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে। বড়বাজার থেকে চলতি নৌকোয় চলে এসেছে শনিবার, অফিসের ছুটির পর। বন্ধুর বাড়ি হয়ে ঠাকুরের কাছে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যে।

প্রথমেই টেনে নিলেন কোলে। দুঃখদারিদ্র্য-নাশিনী সর্ববান্ধবরূপিণী মায়ের মত।

আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। ঠাকুর জিগগেস করলেন তারককে, 'তুমি সাকার মানো না নিরাকার?'

'নিরাকারই আমার ভালো লাগে।'

'না রে, শক্তিও মানতে হয়।' বলে ঠাকুর উঠলেন। টলতে-টলতে এগুতে লাগলেন কালী-মন্দিরের দিকে। কেন কে বলবে তারকও তাঁর পিছু-পিছু চলতে লাগল।

প্রতিমা প্রস্তর ছাড়া কিছু নয়, ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে ঘুরে এই শিক্ষাই পেয়েছিল তারক। অথচ, কি আশ্চর্য, এই পাষাণাকারা প্রতিমার কাছে ভাববিভোর হয়ে প্রণাম করছেন ঠাকুর। শুধু শুকনো মাথা নোয়ানো নয়, হৃদয়কে জল করে প্রতিমার পায়ের উপর নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল তারক। সহসা কে যেন বলে উঠল তার মর্মের কানে কানে: 'অত গোঁড়ামি কেন? অত সঙ্কীর্ণতা কিসের? ব্রহ্ম তো ভূমা, সর্বব্যাপী। তাই যদি হয় এই প্রতিমার মধ্যেও তিনি আছেন। সেই বিভুকে প্রস্তরমূর্তিতে প্রণাম করতে দোষ কি?' মাথা নত হয়ে এল তারকের। নীলঘনশ্যামা ভবতারিণীর সামনে সে রাখল তার প্রণিপাত।

ঠাকুর বললেন, 'আজ রাত্রে এখানেই থেকে যাও না।'

কত বড় প্রলোভনের কথা। কিন্তু তারক বললে সহজ স্বরে, 'বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। উঠেছি তার ওখানে। কথা দিয়ে এসেছি ওখানেই থাকব রাত্রে।'

'কথা দিয়ে এসেছ?' ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'এর উপরে আর কথা নেই। ঐ সামান্য একটু কথা রাখাই হচ্ছে তপস্যা। সত্য কথার মত বড় তপস্যা আর নেই কলিতে।'

মন যাকে দিয়েছিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।

মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসে ঠাকুরের কাছে। খালি হাতে নয়, নানা রকম ফল-মিষ্টান্ন নিয়ে। থালা সাজিয়ে। গোলাপজলের গন্ধ ছিটিয়ে। আমি ও-সব কিছু নিতে পারি না। বলছেন ঠাকুর। ওদের অনেক মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। গোলাপজলের গন্ধে কি সেই অপলাপের গন্ধ ঢাকা পড়বে?

সরল ভাবেই বলছেন সব মাড়োয়ারীদের, বোঝাচ্ছেন। 'দেখ ব্যবসা করতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায়ে তেজী-মন্দি আছে, তখন মিথ্যে চালাতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস সাধুদের দিতে নেই। শুদ্ধ জিনিস সত্য জিনিস সাধুদের দেবে। সত্য পথেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার।'

তুমি কী করেছ তপস্যা? কিছু করিনি। শুধু মৌনাবলম্বন করেছি।

তাতেই তোমার সিদ্ধি হয়েছে।

তাতেই?

হ্যাঁ, তার মানে মৌনাবলম্বন করেছিলে, ফলে তুমি মিথ্যে বলোনি। মিথ্যে না বলাটাও এক হিসেবে সত্য বলা।

সকল-সুন্দর-সন্নিবেশ ঠাকুর তাকালেন তারকের দিকে। বললেন, 'বেশ কাল এসো।'

সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্।

একশো একুশ .

কিন্তু কাল কি তার আসবে ইহকালে ?

ঠিক আসবে যদি তিনি কৃপা করেন। যিনি কোল দিয়েছেন তিনি কি করেননি কৃপা ?

পরদিন সন্ধ্যের আগে ঠিক এসে হাজির।

ওরে এসেছিস ? তোর জন্যে মা-কালীর প্রসাদী লুচি-তরকারি রেখে দিয়েছি। কি রে, আজ রাত্রে থাকবি তো এখানে ? সামনের ঐ দখিণের বারান্দায় শুবি, কেমন ? আজ রাতে কেউ এখানে থাকবে না। শুধু তুই আর আমি।

যেন কত কালের চেনা। কত দেশ ঘুরেছেন ওকে সঙ্গে করে। তোর নাম কি, তোর বাপের নাম কি, কোথায় তোর বাড়ি, কিছুর খোঁজ-খবরে দরকার নেই। শুধু তুই এলি আর আমি নিলুম। তুই আর আমি এ দুয়ের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডলীলা। শুধু শিলা নয় রে, লালা। শুধু কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নয়, রাধাকৃষ্ণ।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এক সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। এরা কৃষ্ণ মানে, কিন্তু রাধাবিহীন কৃষ্ণ। এদের মতে রাধা বলে কিছু নেই। খাজাঞ্চির ঘরের কাছে আছে কিন্তু কোনো দেব-মন্দিরেই প্রণাম করতে আসে না। মায়ের মন্দিরে শিবের মন্দিরে তো নয়ই, রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও নয়। সাধুর ইচ্ছে ঠাকুরের ভক্তেরা ওর কাছে এসে সমবেত হয়, শোনে ওর কথাবার্তা। এমনিতে বেশ খাঁটি সাধু, কিন্তু দোষের মধ্যে, শুকনো। সকলে তাকায় ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বললেন, 'হতে পারে ওর ভালো মত, কিন্তু আমার প্রাণের মতো নয়। ভগবানের লীলা চাই।'

লীলা ভুবনপাবনী। মা আর ছেলে। বর আর বধূ। প্রভু আর দাস। বন্ধু আর সখা।

নারদ দ্বারকায় এসে হাজির। ষোলো হাজার স্ত্রী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বাস করছেন তা একবার দেখে যেতে হবে স্বচক্ষে। বিশ্বকর্মার নির্মাণ কৌশলের পরাকাষ্ঠা, কী সুন্দর-সুমহান রাজপুর! নির্ভয়ে প্রবেশ করল নারদ, একেবারে নিভৃত অন্তঃপুরে। গিয়ে দেখল রুক্মিণী রত্নখচিত চামর দিয়ে ব্যজন করছে শ্রীকৃষ্ণকে। নারদকে দেখে উঠে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ, বসবার জন্যে মহার্ঘ আসন দিলেন, নিজের হাতে ধুয়ে দিলেন তার পদযুগ। শুধু তাই নয়, সেই পা-ধোয়া জল রাখলেন নিজের মাথার উপর। বললেন, 'প্রভু, আপনার কোন কাজ সাধন করব বলুন।'

নারদ বললে, 'আর কিছু নয়, যেন আপনার চরণদ্বয়ের ধ্যানে আমার স্মৃতি সতত স্থির থাকে।'

নারদ নিষ্ক্রান্ত হয়ে আরেক মহিষীর ঘরে প্রবেশ করল। গিয়ে দেখল সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীর সঙ্গে পাশা খেলছেন।

নারদকে দেখে তেমনি পদবন্দনা করে জিগগেস করলেন শ্রীকৃষ্ণ, 'প্রভু, আপনার কী প্রিয় সাধন করব ?'

তেমনি এক-এক ঘরে যাচ্ছে নারদ, এক-এক অভিনব দৃশ্য দেখছে। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ শিশু পালন করছেন, কোথাও হোম বা সান্ধ্যবন্দনা করছেন, কোথাও অস্ত্রবিদ্যা শিখছেন, কোথাও অশ্ব হস্ত বা রথপৃষ্ঠে বিচরণ করছেন। কোথাও বা শুয়ে রয়েছেন পর্যঙ্কে, কোথাও বা মন্ত্রীদের সঙ্গে বসেছেন মন্ত্রণায়, কোথাও বা গোদান করছেন ব্রাহ্মণদের। কোথাও স্নান করতে চলেছেন, হাস্যালাপ করছেন প্রিয়ার সঙ্গে, কোথাও বা পুত্রকন্যার বিয়ের আয়োজন করছেন।

নানা ভাবে অবস্থিত। নানা লীলায় উদ্ভিন্ন।

তখন নারদ বললে করজোড়ে, 'হে যোগেশ্বর, আজ দেখলাম আপনার যোগমায়ার প্রভাব। এবার আমাকে অনুমতি করুন, আমি সকল লোকে আপনার ভুবনপাবনী লীলাগান গেয়ে বেড়াই।'

'পুত্র, তুমি মোহগ্রস্ত হয়ো না।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'লোকশিক্ষার জন্যে আমি এরূপ করে থাকি।'

আবার দেখ, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ছেড়ে জলস্পর্শ করে পরমাত্মার ধ্যান কার। অন্ধকারের পরপারে যার বাস। সেই পরমাত্মা।

সেই এক, স্বয়ংজ্যোতি, অনন্য, অব্যয়, নিরস্তকল্মষ ব্রহ্মনামা পুরুষ। উদ্ভব আর বিনাশের মধ্যে যে শক্তি সেই শক্তিতেই যার সত্তা ও আনন্দস্বরূপত্বের উপলব্ধি।

আবার যেমন ধরো নিত্যগোপাল। এত বড় ভক্ত, ঠাকুরের মতে যে পরমহংস অবস্থা পেয়েছে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করছেন তারককে। বলছেন, 'দ্যাখ তারক, নিত্যগোপালের সঙ্গে বেশি মিশিসনে। ওর আলাদা ভাব। ও এখানকার লোক নয়।'

তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলে এই নিত্যগোপাল।

বিয়ে-থা করেনি। বালকস্বভাব। নিয়ত বাস করে ভাবরাজ্যে। ডিমে তা দেওয়া পাখির দৃষ্টির মতো ফ্যালফেলে। ঠাকুর বলেন, পরমহংস অবস্থা। তাই দেখেন গোপালের মত।

গিরিশের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসতে গিয়ে দেখেন আসনের কাছে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। যত বিষয়ব্যাপারের কথা, পরনিন্দা আর পরচর্চা। ইসারায় বললেন কাগজখানা সরিয়ে নিতে। কাগজ সরাবার পর বসলেন আসনে।

সেখানে নিত্যগোপাল এসেছে।

'কি রে, কেমন আছিস?'

'ভালো নেই।' বললে নিত্যগোপাল। 'শরীর খারাপ। ব্যথা।'

'দু-এক গ্রাম নিচে থাকিস।'

'লোক ভালো লাগে না। কত কি বলে, ভয় হয়। আবার জোর করে ভয় কাটিয়ে উঠি।'

'ওই তো হবে। তোর আছে কে?'

'এক তারক আছে। সর্বদা সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। কিন্তু সময়ে-সময়ে ওকেও ভালো লাগে না।'

এত উচ্চভূমিতে আছে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে সঙ্কেতে কথা হয় ঠাকুরের। 'তুই এসেছিস?' অমনি আবার উত্তর দেন নিগূঢ় স্বরে, 'আমিও এসেছি।'

ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের বুক রক্তবর্ণ। কিন্তু ভাব প্রকৃতিভাব। বলরামের বাড়িতে ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের কোলের উপর পা ছড়িয়ে দিলেন ঠাকুর। ঠাকুর সমাধিস্থ, আর নিত্যগোপাল কাঁদতে লাগল অঝোরে।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য, তোর কোনটা ভালো?'

'তুই-ই ভালো।' বললে নিত্যগোপাল।

'তাই তো বলি, চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ চাইলেই তিনি নেই?'

সেই দিন যেই নরেন গান ধরল, 'সমাধি-মন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি,' অমনি ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুরকে বসানো হল আসনে, সামনে ভাতের থালা। সমাধির আবেশ এখনো কাটেনি সম্পূর্ণ, দুই হাতেই ভাত খেতে সুরু করে দিলেন। শেষে খেয়াল হলে বললেন ভবনাথকে, তুই খাইয়ে দে। ভবনাথ খাওয়াতে লাগল। ঠিকমত খাওয়া হল না আজ, বেশির ভাগই পড়ে রইল। বলরাম বললে, নিত্যগোপাল কি পাতে খাবে?

'পাতে? পাতে কেন?' ঠাকুর প্রায় ধমকে উঠলেন।

'সে কি, আপনার পাতে খাবে না?'

নিত্যগোপালও ভাবাবিষ্ট। ঠাকুর এসে বসলেন তার পাশটিতে। যে পাতেই তোকে দিক, তোকে আমি খাইয়ে দি নিজের হাতে। তুই আমার গোপাল।

সেই গোপাল সেন। অনেক দিন হল সেই যে একটি ছোট্ট ছেলে আসত এখানে, এর ভেতর যিনি আছেন সেই মা তার বুকে পা রাখলে, মনে নেই? বললে, তোমার এখনো দেরি আছে, আমি পারছি না থাকতে ঐহিকদের মধ্যে। এই বলে যাই বলে বাড়ি চলে গেল। আহা, আর ফিরে এল না। তার পর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই গোপালই নিত্যগোপাল।

এমন যে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে মিশতে বারণ করলেন তারককে।

'ওরে সেখানে তুই যাস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

বালকের মত সরল মুখে বললে নিত্যগোপাল। 'যাই। নিয়ে যায় মাঝে-মাঝে।'

সে একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক। অপার ভক্তিমতী, ঠাকুরে দত্তচিত্ত। নিত্যগোপালের অপূর্ব ভাবাবস্থা দেখে বড় আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে সন্তানরূপে স্নেহ করে, কখনো কখনো নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে।

'ওরে, সাধু সাবধান!' শাসনবাণী উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। 'বেশি যাসনে, পড়ে যাবি। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয় সাধুকে। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুও ডুবে গিয়ে খাবি খাচ্ছে সেখানে।'

নিত্যগোপালের পরমহংস অবস্থা আর স্ত্রীলোকটিও অশেষ ভক্তিসম্পন্না। তবুও কি অমোঘ শাসন! শাসনবেশে কি করুণা! সাধু সাবধান! কে জানে কখন লৌহগৃহের কোন অসতর্ক ছিদ্রপথে সাপ ঢুকবে! পরমহংস হয়েছ বলেই মনে কোরো না তোমার আর পতন হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, সাধু সাবধান!

সেই নিত্যগোপাল অবধূত হয়েছে। জ্ঞানানন্দ অবধূত। চিতাভস্মভূষোজ্জ্বল দ্বিতীয় মহেশ। পরনে রক্তবাস, হাতে ত্রিশূল, গলায় নাগসূত্র। করে পানপাত্র, মুখে মন্ত্রজাল, বনে-গৃহে সমানুরাগ সন্ন্যাসী।

ঠাকুর তাই ঠিকই বলেছিলেন, ওর ভাব আলাদা। ও এখানকার নয়।

ওরা একডেলে গাছ, আমি পাঁচডেলে। আমার পাঁচফুলের সাজি।

মনের আনন্দে সে রাতে আর ঘুম এল না তারকের। একটি মৃদুনিঠে সুগন্ধের মত উপভোগ করতে লাগল সেই অনিদ্রাটুকুকে।

মাঝরাতে চেয়ে দেখল ঠাকুর দিগম্বর হয়ে ভাবের ঘোরে ঘুরছেন ঘরের মধ্যে আর কি সব বলছেন নিজের মনে। খানিক পরে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়। বলছেন জড়িত স্বরে, ওগো, ঘুমিয়েছ?

ধড়মড় করে উঠে বসল তারক। বললে, 'না তো, ঘুমুইনি।'

'ঘুমোও নি? তবে আমাকে একটু রামনাম শোনাও তো।'

কি ভাগ্য, তারক উঠে বসে রামনাম শোনাতে লাগল।

রাত তিনটে বাজলেই আর ঘুমুতে পারেন না ঠাকুর। এমনিতে ঘুম দু-এক ঘণ্টার বেশি নয়, বাকি সময় যতক্ষণ জীবভূমিতে থাকেন, নাম করেন। যারা থাকে তাঁর কাছাকাছি সকলকে ডেকে তোলেন। ওরে ওঠ, আর কত ঘুমুবি? উঠে এবার ভগবানের নাম কর।

এক-এক দিন খোল-করতাল নিয়ে এসে বাজনা সুরু করে দেন। কীর্তনের ধুম লাগান। তারপর নাচেন ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে। ওরে তোরাও নাচ। লজ্জা কিসের? হরিনামে নৃত্য করবি তাতে আর লজ্জা কি! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। যে হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে পারে না তার জন্ম বৃথা! নাচছেন আর দরদরধারে অশ্রু ঝরছে!

বাক্যে যা বলবে মনে যা ভাববে বুদ্ধি দিয়ে যা নিশ্চয় করবে সবই অর্পণ করবে ঈশ্বরকে। সঙ্কল্প-বিকল্পকারী মনকে নিরোধ করে ভক্তিভরে ভজনা করলেই মিলবে অভয়। সুতরাং স্বীয় প্রিয়ের নাম করো। লজ্জা ত্যাগ করে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করো সংসারে। অনুরাগ উদিত হলেই চিত্ত বিগলিত হবে, কখনো হাসবে, কখনো কাঁদবে, কখনো রোদন-চীৎকার করবে, কখনো বা উন্মাদের মত নৃত্য করবে। বায়ু অগ্নি সরিৎ সমুদ্র দিক-ক্রম আকাশ-নক্ষত্র সমস্ত কিছুকে শ্রীহরির শরীর জেনে অনন্যমনে প্রণাম করবে। যে ভোজন করে তার যেমন প্রতি গ্রাসেই এক সঙ্গে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তেমনি যে ভজনা করে তারও নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরের অনুভব ও বৈরাগ্য এসে পড়ে। "ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ-প্রবোধঃ।" এই ভজনাতেই পরা শান্তি, আর কিছুতে নয়।

[ক্রমশঃ।

ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দ দেব

(সিউড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমের সিদ্ধপুরুষ)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অনেক মানুষ দেখিয়াছি এই ধরণী-তলে,
মানুষ তুমি, কিন্তু তোমায় দেবতা বলা চলে।
সিদ্ধ সাধক, মহাপুরুষ তুমি,
পুণ্যতর করলে পুণ্যভূমি,
দিব্য-জীবন পেলে বুঝি কি তপস্যা ফলে?

সীমা নাহি তোমার ত্যাগের, তোমার তপস্যার,
তিল তুলসী দিয়া তুমি হয়ে গেছ তাঁর।
মূর্ত্ত পুণ্য, হে অমৃতময়,
তাঁহার পরশ পেয়েছ নিশ্চয়,
সম্মুখেতে বইছে তোমার সুধার পারাবার।

তোমার বুকে চলছে জানি সদাই ঝুলন-দোল
তোমার কানে সদাই জাগে সুধাব্ধি-কল্লোল।
পাই যে তোমার নিবিড় আকর্ষণ,
তোমার লাগি মন যে উচাটন,
মাগি তোমার চরণ-রজ, চাহি তোমার কোল।

ফতেনগরের লড়াই

বিক্রমাদিত্য

টেলিগ্রাম হাতে দিয়ে নিউজ-এডিটার বললেন: তৈরী হয়ে নাও, আজ রাতের প্লেনেই রওনা হতে হবে।

খবর এসেছে ফতেনগর থেকে যে, সেখানে অন্তর্বিপ্লব সুরু হয়েছে। এই বিপ্লবের প্রধান নেতা স্বয়ং রাজা, অর্থাৎ কি না, তিনি তাঁর মন্ত্রিবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে রাজা এক বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, প্রজারা নিয়েছে হাতে হাতিয়ার। শোষক মন্ত্রীদের হাত থেকে মুক্তি চাই, এই তাদের দাবী।

মনে হলো রূপকথার কাহিনী। রাজ-অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছে প্রজা, তাই দলে দলে যেয়ে রাজপ্রাসাদ করেছে ঘেরাও।

কিন্তু এ কাহিনী বিংশ শতাব্দীর রূপকথা। এতে আছে আধুনিকতার গন্ধ। এ সংগ্রাম রাজ-বিদ্রোহ নয়; কারণ, স্বয়ং রাজাই করেছেন বিদ্রোহ তাঁর মন্ত্রনাদাতার বিরুদ্ধে।

আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার, সংবাদের জহুরী। খবর সংগ্রহ করা শুধুমাত্র আমার পেশা নয়, নেশাও বটে। আমি ইতিহাস সৃষ্টি করিনে, রচনা করি ইতিহাস।

আমি ঘুরি দেশ-দেশান্তরে খবরের সন্ধানে। রূপার বদলে রূপকথা লিখি। লোকে যা বলে তা জানি, যা বলে না তা লিখি। অবশ্য এই খবরের অন্তে থাকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন অর্থাৎ কি না এ রকম ঘটনা ঘটতে পারতো।

রিপোর্টার আমি, তাই বহু জনের করুণার পাত্র। কেউ কেউ স্নেহ করেন। বীমার প্রতিনিধি ও প্রেস-রিপোর্টার, এই দুই শ্রেণীই বহু জনের কাছে এক পর্য্যায়ভুক্ত। বহু লাঞ্ছনা ভোগ করার পর বীমা-প্রতিনিধি যখন আত্মসম্মানের শেষ মাত্রায় পৌঁছন, তখন তিনি সে স্থান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি রিপোর্টার, লাঞ্ছনা ভোগ থেকে রস আহরণ করি, সংবাদ শুষে নিই।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা আমাদের হিংসে করেন। অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রার কাহিনী শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন: কী সুন্দর জীবন আপনাদের। যদি এমনি একটা……

আমি জানি এর পরে এঁরা কী বলবেন। অর্থাৎ তাঁরা যদি আমাদের মতো রিপোর্টার হ'তেন।

আমি হলপ করে এ কথা বলতে পারি যে, তাহলে তাঁরা এ কথা বলতেন না। কারণ এ জীবনে আনন্দ নেই, আছে কষ্ট, পয়সা নেই, আছে গ্লানি। আজ দীর্ঘ দিন ধরে বহু সহকর্মীকে দেখেছি এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে। অনিদ্রায় বহু রজনী কেটেছে সংবাদের প্রতীক্ষায়, প্রত্যূষে শূন্য হাতে ফিরে আসা, দুর্গম পথ অতিক্রম করা, এ সাংবাদিক-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু কখনো দেখিনি কারো মুখের হাসি ম্লান হ'তে, কখনো নিরুৎসাহ হ'ননি। যখন দেখেছি তাঁদের সফলকাম হতে, হাত বোঝাই করে যখন তাঁরা এনেছেন সংবাদ, তখন অধৈর্য্য পাঠকের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াননি, নীরবে শুনেছিলেন গঞ্জনা।

রিপোর্টার-জীবনের এই এক পরিচ্ছেদ। অপর অংশ, সে কথাই আমার আজ এ কাহিনীর বিষয়বস্তু।

* * * *

রাত দুপুরে গাড়ী এসে জোনপুরে পৌঁছল। বোম্বাই থেকে দিল্লী, তারপর লক্ষ্ণৌ। এই স্থানের দূরত্বকে অতিক্রম করেছি বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থাৎ প্লেনে। বিংশ শতাব্দীর এই বাহনকে তাই মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

শুধু কী তাই? হুকুম দিয়ে নিউজ-এডিটার খালাস হলেন। বাকী ঝক্কী নিজের ঘাড়েই নিতে হলো। অল্প সময়, অথচ তৈরী হয়ে নেওয়া চাই। সাংবাদিক-জীবনের এই চিরন্তন নীতি। যখন হাতে সময় থাকে তখন সংবাদের হয় অভাব, যখন সংবাদ থাকে তখন মেলে না সময়।

তাই দু'ঘন্টা সময় পাবার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম যে, এই কয়েকটি ঘন্টার ব্যতিক্রমে, ফতেনগর-রণাঙ্গনে হয়তো এমন কিছু ঘটবে না যার জন্যে কোন জবাবদিহি দিতে হতে পারে।

ষ্টেশন নিস্তব্ধ। যাত্রীর কোলাহল নেই, নেই কুলীর হাঁক-ডাক। শুধু মাত্র অন্ধকারের বিভীষিকা বিরাজ করছে।

আমার কামরায় সহযাত্রী দু'জন। একজন মাড়োয়ারী, অপর জন বাঙ্গালী। এঁরা দু'জনেই যাবেন রতনপুরে।

মাড়োয়ারী সহযাত্রীটি ব্যবসায়ী। এ কথা জানতে দ্বিধা বা

সংকোচ বোধ করিনি। কারণ ও-জাতের সঙ্গে হিসাব-নিকাশের কথা ছাড়া আর কিছু স্মরণ করা সম্ভব নয়। ব্যবসা ওদের বাপ-দাদার সম্পত্তি। আমার এ অনুমান যে সত্য, এর প্রমাণ অবশ্য পরে পেয়েছিলাম।

সহযাত্রী দু'জনেই গভীর নিদ্রায় অচেতন। তার প্রমাণ পেয়েছিলাম নাকের সিম্ফনি শুনে। সিম্ফনি বলার হেতু আছে। কারণ, দুজনেরই নাসিকাধ্বনি বেশ ভাল করে হচ্ছিলো, একজনেরটা একটু মোটা, অপর জনের বেশ মিহি।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে টের পেলাম যে, আমার এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। অর্থাৎ নিদ্রার ভাণ ও নাসিকাধ্বনি করা এক সূক্ষ্ম আর্ট, যার নিদর্শন ট্রেণভ্রমণে সচরাচর পাওয়া যায়। এতে পারদর্শী হতে হলে থাকা চাই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান।

কামরার নিস্তব্ধতা ভেদ করে এলেন অপর এক সহযাত্রী। অন্ধকারের ঝাপসা আলোয় বয়স আন্দাজ করতে পারলাম না, তবে বুঝতে পারলাম যে, সে আমারই সমবয়সী হবে।

ভদ্রলোক কামরায় উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন: বাপস্, আজ-কাল ট্রেণে যাত্রা করা হচ্ছে নরকে যাওয়া। যাক্, এবার একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুনো যাবে।

নিজের মাল গুছিয়ে নিতে লাগলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ সহযাত্রীদের মধ্যে একজন মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে নিয়ে বললেন: 'বলি যাওয়া হবে কতো দূর?'

বলা বাহুল্য, প্রশ্নকর্ত্তা বাঙ্গালী।

নীরস কণ্ঠেই নবাগত ভদ্রলোক জবাব দিলেন: লড়াইতে। কৃতেনগরে যুদ্ধ লেগেছে, শোনেননি বুঝি? রীতিমতো 'মর্ডান ওয়ার।'

মনে হলো যেন আমার কামরায় বোমা পড়লো। এক ঝটকা দিয়ে সহযাত্রীদের দু'জনেই উঠে বসলেন। তারপর সুরু হলো প্রশ্নবাণ।

ফির লোড়াই, তবতো চান্দিকা বাজার বোহুত চড়া হোগা? মাড়োয়ারী সহযাত্রী প্রশ্ন করেন। অপর জন বলেন: কী বলেন ম'শাই! আবার যুদ্ধ! 'এয়ার রেড' শুরু হয়নি তো?

এক মুহূর্ত্তে আমার কামরা সরগরম হয়ে উঠলো।

আসর জমিয়ে তুললেন এই দুই সহযাত্রী। মাড়োয়ারী একটা সিগারেট বার করে নবাগত ভদ্রলোকটিকে দিলেন। বললেন, একটা সুখটান দিয়ে দিন মোশয়। দিল তাজা হোবে।

বাঙ্গালী সহযাত্রী বের করলেন পানের ডিবা। বললেন: বৌদির হাতের সাজা পান দাদা, খেয়ে দেখুন। আচ্ছা বলুন তো, দার্জ্জিলিং উঠে শত্রুপক্ষ বোমা ফেল্‌তে পারে কিনা? আমি তো ভাবছি এ সময়টা একটা হিল-ষ্টেশনেই কাটাবো। দেখবো কোন শালায় জানে মারে। কী বলেন?

এবার মাড়োয়ারী সহযাত্রীর বিক্রম দেখাবার পালা। জিহ্বা তালুতে ঠেকিয়ে একটা শব্দ করে বলেন: আরে ছোঃ, লোড়াইতে ভাগবেন কেন? মার্কিট গোরম আছে, পয়সা বানিয়ে লিন। বিবিজানকে ভেজিয়ে দিন কাশ্মীর আউর আপ্ রহিয়ে জান মার্কিটে। সোনার দাম বাঢ়বে, লোহা মিলবে না। খতরা আগে বঢ়বে তো গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড আছে কীসের জন্যে। লোটা আউর কম্বল লিয়ে ব্রিফ হাজির হোবেন বিবিজানের কাছে। অপ বঙ্গালী আদমী পোয়সা বনাবার ফিকির জানে না।

পান চিবুতে চিবুতে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। বলেন: আরে কেয়া বক্‌বকাতা। গত লড়াই যব হলো তব তুম সব তো পালায়াথা। ও-সব বিক্রম-টিক্রম হমকো মাত বলো, হাম্ তুমারা মাফিক বহুত সাহসী আদমী দেখা।

মাড়োয়ারী জবাব দেন: আপ কে তো জানেন সাহব। পিছমে লোড়াই যব হলো অম্নি গভরিমিণ্ট হমায় খবর ভেজলো। লোড়াই তো হমি চালালাম।

এই বাগ্‌যুদ্ধে এবার নবাগত সহযাত্রী যোগ দেন। বলেন: শেঠজী আপনি গত যুদ্ধে আর্মিতে ছিলেন বুঝি?

: তোবা, তোবা! কী বলেন সহব। চিত্রিমল থোড়াই লোড়াই করবে। লোড়াই করবে, পোলটন। হামি শালা লোড়াই চালাই।

: বাঃ সে কী রকম। যুদ্ধে আপনি নেই, অথচ লড়াই চালালেন আপনি?

: তাই তো সব্ সে বড়ী বাত্। যব লড়াই সুরু হোলো, ডাক পড়লো চিত্রিমলের। ভেজো মাল। চিনি, ঘি, অড়হরকা কনট্রাক্‌টা মিললো। হমি শালা চিনির জগহ দিলাম সুজি, ঘিকা জগহ চর্ব্বি, আসল চর্ব্বি, আউর অড়হরকা জগহ পাথরকা কংকর।

একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেলো কম্পার্টমেণ্টে। সবাই প্রায় এক সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম: এ তো রীতিমতো রাহাজানি দেখ্‌ছি। গভর্ণমেণ্ট কিছু বললো না।

: চিত্রিমলকে বোলবে এতো হিম্মত আছে কোন শালার। হমি তো মাল ভেজিয়ে দিলাম, আউর ইদিকে হমার সাদা পলটন সব ওহি জগহ থিকে ভাঁগলো। মাল হাতে পড়লো দুষমণের। ওহি শালা সব চীজ খেলো, হলো কলেরা। দুষমণের পলটন হলো সাফ। হমার সাদা পলটন গিয়ে ফির ওহি জগহ দৈখল করলো। গভারিমিণ্ট হলো খুস, রায়বাহাদুর খেতাবভী মিললো, আউর সাথ সাথ কণ্ট্রোকট্। হমি তো পহেলেসে জানতাম যে হমার সাদা পলটন ভাগবে, আউর হমার মাল যাবে দুসমণের হাতে। ইসি লিয়ে তো দিয়ে দিলাম চিনির জগহ সুজি, ঘৈ'র জগহ চর্ব্বি, আউর অড়হরকা জগহ পাথর।

বাঙ্গালী ভদ্রলোক এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মানতে রাজী ন'ন যে সত্যিই গত যুদ্ধে চিত্রিমলেরা লড়াই করেছে। তিনি বাদানুবাদ থেকে নিরস্ত হলেন না।

পরের ষ্টেশনে যখন গাড়ী এসে থাম্‌লো, তখন বক্তাদের কণ্ঠ সপ্তমে উঠেছে। সেই কণ্ঠস্বর শুনে চেকার সাহেব আকৃষ্ট হলেন। তিনি আমাদের কামরায় এলেন।

চেকার সাহেব টিকিট চেক করতে লাগলেন।

আপনার টিকিট? চেকার সাহেব বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কাছে যান।

: এ কি, এ যে দেখছি থার্ড ক্লাশের টিকিট! এটা ইণ্টার ক্লাশ। আপনাকে 'ডিফারেন্স' দিতে হবে।

ভদ্রলোকের কণ্ঠের সেই তেজ এক মুহূর্তে নিবে গেলো। কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। বললেন: কী করবো, স্যর, বড্ডো তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। পরিবারকে উঠিয়ে দিয়েছি পাশের কম্পার্টমেণ্টে। নিজে আর কোথাও জায়গা পেলুম না, তাই উঠে পড়লুম এ কামরায়। এবারটার মতো এক্সকিউজ করে দিন স্যর।

: পারবো না, চেকার সাহেব বলেন। আপ্‌কা টিকিট শেঠজী।

হুজৌর তো ভোগবান আছেন। টিকিট তো হমার সাথ নেই, আছে সাদীলালের কাছে। হমার পার্টনার।

: কোথায় তোমার সাদীলাল?

: ওঃ শালা ইস্ ট্রেণে নহী আস্‌ছে, পোরের ট্রেণে জরুর আস্‌বে।

ও সব ফাঁকিবাজি চলবে না, ভাড়া ফাইন শুদ্ধ দিতে হবে।

: হুজৌর। গাড়ী ছাপড়া ষ্টেশনে এলো, হমি সাদীলালকে দিলাম পোয়সা! বোললাম যা টিকিট খরিদ কোরকে লিয়ে আয়। শালা পোয়সা লিয়ে ভাগলো আউর ইদিকে গাড়ী ছুট্‌লো। হমি জলদি এহি কম্পার্টমেণ্টে চঢ়িয়ে বোসলাম।

: ও সব ফাঁকিবাজী চলবে না। পয়সা বের করুন। কোথায় যাবেন, মজঃফরপুর? দিন, সতেরো টাকা পাঁচ আনা, আর আপনার ছয় টাকা দশ আনা।

শেষের কথাগুলো বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলা।

* * * *

ট্রেণ এসে পৌঁছল লাহেড়িসরাইতে। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। কামরায় আছেন শুধু নবাগত ভদ্রলোকটি। অপর দু'জন মাঝ-রাত্রে নেমে গেছেন।

গাড়ী চলতে সুরু করে দিলো। আমার বার বার মনে হতে লাগলো নিউজ-এডিটারের উপদেশ। তিনি বলে দিয়েছেন যে ফতেনগরের এই সংগ্রাম জবরদস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। আমাদের কাগজের নীতি হবে এই সংগ্রামে মর্‍যাল 'সাপোর্ট' দেয়া। অতএব আমার রিপোর্ট যেন সে দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিস্মিত হয়েছিলাম একটু। এই তো কিছু দিন আগে ফতেনগরের প্রজাবৃন্দের নেতারা এসে দেখা করেছিলেন আমার সম্পাদকের সঙ্গে। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁদের এই সংগ্রাম বহু পুরাতন সংকল্প। তাঁরা এসেছিলেন আমাদের কাগজের মারফৎ দেশের ও দশের কাছে তাঁদের দুরবস্থার কাহিনী ব্যক্ত করতে।

সম্পাদক স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন: অসম্ভব, আমরা তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবো না।

কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এই নীতির পরিবর্তন হলো? এর কারণ বুঝতে পারলাম না। আজও পারিনি।

অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ সর্বপ্রথম জানা গেলো ভোর দশটায়। বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ এসে প্রথমে এই খবর সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জানালেন। তাঁরা বললেন যে, দেশের কংগ্রেস এই সংগ্রামের জন্যে তৈরী হচ্ছে। যদি প্রয়োজন হয় তবে তারা সবাই দেশের জন্যে প্রাণ দেবে। মুক্ত করবে তারা অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দদের প্রধান মন্ত্রীর নাগপাশ থেকে।

এক সাংবাদিক তখন তাদের প্রশ্ন করলেন: তোমরা কী করে লড়বে? তোমাদের কাছে যে কোন হাতিয়ার নেই! তোমরা হচ্ছো নিধিরাম সর্দার, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই।

বিপ্লবী দলের নেতা জবাব দিলেন: ভয় পেও না, নিধিরাম প্রয়োজন হলে বাঁশ দিয়েই লড়বে। তোমাদের দেশের কোন কবি না বাঁশের অজস্র প্রশংসা করে গেছেন। বলেছেন—ঐ মারাত্মক অস্ত্র থাকলে দেশ জয় করা যায়।

বলা বাহুল্য, এই নেতাটি অতি খাঁটি কথাই বলেছিলেন। কারণ ফতেনগরের সমস্ত লড়াই প্রায় বাঁশের সাহায্যেই হয়েছিল। আর যেটুকু ত্রুটী ছিল সেটুকু আমরা সমাধান করেছিলাম, কলমের সাহায্যে।

* * * *

দিল্লীর সাংবাদিক মহলে এই বিপ্লবের খবর যখন পৌঁছল তখন রীতিমতো এক উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। 'আল্পস' রেষ্টুরাণ্টে বসলো বিভিন্ন কাগজের বিশেষ সংবাদদাতাদের বৈঠক।

কৃপানাথ 'হিন্দবার্তার' বিশেষ প্রতিনিধি। বুড়ো মানুষ, জীবনের অনেক কিছু দেখেছেন, তাই তাঁর এ জগৎ সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা আছে। মূল্য আছে তাঁর মতবাদের। একটা লিমন স্কোয়াসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন: ব্যাপারটা তা হলে বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। আমি তো ভেবেছিলুম এ হাঙ্গামা দু-একদিনে থেমে যাবে, বিপ্লবী দলের ফৌজ হয়ে যাবে সাবাড়। কিন্তু এ তো দেখছি, রীতিমতো থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। রামগোপাল ষ্টার-অব-দি-ইভনিং এর সংবাদদাতা। তিনি হেসে বলেন: কী যে বলেন কৃপানাথ সাহেব! এই তো সবেমাত্র সুরু হলো। দেখবেন কো'থাকার জল কোথায় গড়ায়। আমার তো ভয় হয় শেষ পর্য্যন্ত না এই হাঙ্গামার ঢেউ এসে আমাদের দেশে লাগে। ব্যারী ব্রুকসন একটা বিলেতী কাগজের প্রতিনিধি। হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেন, তারপর বলেন, আমি তো অল রেডী বলে দিয়েছি সিচুয়েশান ভেরী ব্যাড। আচ্ছা ব্রাদার, বলতে পারো ফতেনগরের কতো ল্যাটিচুড লঙ্গীচুড।

: টুয়েণ্টি ল্যাটিচুড, এইটি লঙ্গীচুড, জবাব দেন অধীর রায়।

: স্রেফ গাঁজা! এইমাত্র আমি ম্যাপ দেখে এলুম, ওটা হবে এইটি ল্যাটিচুড ও টুয়েণ্টি লঙ্গীচুড, জবাব দেন রামগোপাল।

: মাল টেনে দাদার সুর তো একটু বেসুরো হয়েছে দেখছি। কী রাবিশ বক্‌ছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে তবে আমি ডেসপ্যাচ্ লিখেছি। সে কি মিথ্যে হতে পারে?

রামগোপালকে উদ্দেশ্য করে অধীর রায় জবাব দেন।

ব্যারীর তখন বেশ আমেজ এসেছে। এবার সে বাদানুবাদে যোগ দেয়। বলে: ওসব ল্যাটিচুড লঙ্গীচুডের আমি থোড়াই কেয়ার করি। একটা হলেই হলো। তবে কী জানো, আমি এর চাইতে জবর খবর পেয়েছি। একদম্ টপ সিক্রেট।

কী ব্যাপার? সোৎসাহে সবাই প্রশ্ন করে।

: আজ ভোরে ফতেনগরের এম্বাসীতে গিয়েছিলুম এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করতে।

: তারপর মোলাকাৎ হলো?

: এম্বাসডার স্পষ্ট বলে পাঠালো সে দেখা করবে না।

: বলো কী, ভেরী ব্যাড, বল্লেন কৃপানাথ।

: ইন্‌সালিটিং ও হাইহ্যাণ্ডেড নেস্‌, মন্তব্য করেন রামগোপাল।

: এর একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন দাদা! আমাদের সঙ্গে মামদোবাজী চলবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। উত্তেজনায় অধীর রায় টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করেন।

: কিন্তু আমি ঘাবড়াবার পাত্তর নই, বলতে থাকে ব্যারী। 'এম্বাসডার দেখা করলে না তো বয়েই গেলো। আমি চাঁদু ঘুঘু রিপোর্টার। দু মিনিটের মধ্যে ওর ভালেটের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলুম। পেট থেকে বের করে নিলুম সব কথা।

: কী বললে ও ব্যাটা, সবাই প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করে।

: ব্যাটাকে জিজ্ঞেস করলুম এম্বাসডার সাহেব খানা খেয়েছেন? ব্যাটা জবাব দিলে, না সাহেব। চীৎকার করে বলে উঠে অধীর রায়: ইনডাইজেশন আর কী।

: তোমার মাথা আর মুণ্ডু, বলে রামগোপাল এম্বাসডারের না খাওয়ার মানে হচ্ছে যে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

: অর্থাৎ কিনা খবর বিশেষ খারাপ, কৃপানাথ জবাব দেয়।

: শুধু কী তাই, ব্যারী বলতে থাকে। ভ্যালেট আমায় বললে যে সাহেব কাল অনেক রাত অবধি জেগে ছিলেন।

: হয়তো কোন জরুরী খবরের প্রত্যাশায়, বল্লে অধীর রায়।

: এইবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রামগোপাল বলতে থাকে, যে কাল গভীর রাত্রে ফতেনগর থেকে খবর এসেছে সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ। নইলে আর এম্বাসডার অনর্থক রাত জেগে কাটাবেন কেন? আর আজ ভোরে দুশ্চিন্তায় ব্রেকফাষ্ট খেতে পারেননি।

: আর একটা জব্বর খবর আছে, ব্যারী বলে।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠে: কী?

: বলছি, বলছি, একটু সবুর করো। তবে কী জানো ভায়া, কথা বলতে বলতে গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। একটু ভিজিয়ে নে'য়া দরকার।

: কী খাবে ব্রাদার! হুইস্কি না বিয়র? কী বললে, জিন! তথাস্তু, চার পাঁচ জন মিলে অর্ডার দেয়। জিনের সঙ্গে লাইম ও সোডা মিশিয়ে নেয়, ব্যারী। তার পর চামচ দিয়ে নাড়তে থাকে। গলাটা একটু খাটো করে নিয়ে বলে: খবরটা একদম টপ সিক্রেট ব্রাদার। কাউকে আর বলো না। আমি অল রেডী লণ্ডনে কেবল পাঠিয়েছি। থি হাণ্ড্রেড ওয়ার্ডের ষ্টোরী। ব্যাপার কী জানো? আজ সকালে এম্বাসডার-গিন্নী তার ধোপাকে ডেকে বলেছেন বিকেলের মধ্যে এম্বাসডারের কাপড় চাই। দেরী হলে চলবে না, বিশেষ জরুরী দরকার। ব্যাপার কী বুঝলে?

অহো, আর বলতে হবে না, বলে রামগোপাল। এবার সমস্ত ব্যাপারটা একদম সহজ ও সরল হয়ে গেছে। এতো শীগ্‌গিরই কাপড় চাওয়ার মানে হচ্ছে এম্বাসডার সাহেব আজই কোথায় পগার পার হচ্ছেন।

কৃপানাথ গম্ভীর হয়ে পড়েন। বলেন: দ্যাট মীন্‌স এম্বাসডার হ্যাজ রিকল্‌ড। অর্থাৎ তাকে দেশে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

অধীর জবাব দেয়: বিরাট স্কুপ। ভেরী বিগ ষ্টোরী। আমি চললুম, আর আধ ঘণ্টা বাদে আমার ডাক সংস্করণ প্রেসে যাচ্ছে। দিস নিউজ 'মাষ্ট গো।'

রামগোপাল বলে: আর মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট। 'ষ্টার অব দি ইভনিং'বেডে' যাবে। থ্যাঙ্ক ইউ ব্যারী ফর দি ষ্টোরী।

একই সঙ্গে সবাই আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ দপ্তরে গেলেন।

* * * *

সেদিন বিকেলবেলা 'ষ্টার অব দি ইভনিং'এর প্রথম পাতায় বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক এক খবর বেরুলো। আটচল্লিশ পয়েন্টের ব্যানার। খবরে বলা হোল: আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ফতেনগরের দিল্লীস্থ রাজদূতকে তাহার রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দে'য়া হইয়াছে। ইহাতে আশংকা করা যাইতেছে যে, ফতেনগরের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা জানা গিয়াছে যে, কাল গভীর রাত্রি অবধি রাজদূত জাগিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার গভর্ণমেন্ট হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ পাইয়াছেন।

এই সংবাদ প্রকাশের দু'ঘণ্টা পরে ফতেনগরের রাজদূতাবাস থেকে এ খবরের প্রতিবাদ করা হলো। বলা হলো—রাজদূতের দেশে ফিরে যাবার কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। এই সংবাদের কোন ভিত্তি নেই।

রাজদূতাবাস থেকে প্রচারিত প্রতিবাদ-সংবাদ হাতে নিয়ে রামগোপাল হাসতে হাসতে বললে: স্পেলন্‌ডিড।

একটু বিরক্ত হয়েই অধীর জিজ্ঞেস করে: 'স্পেলন্‌ডিডের আবার কী হলো। এমন একটা ভালো খবর কনট্রাডিক্‌ট্‌ হলো?'

: তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ অধীর। দেখতে পাচ্ছো না এক ঢিলে দুটো খবর পাওয়া গেলো।

: তার মানে? বিস্ময়ে অধীর প্রশ্ন করে।

: অর্থাৎ কিনা, রামগোপাল জবাব দেয়, একটা অরিজিন্যাল ষ্টোরী যে রাজদূতকে ডেকে পাঠানো হয়েছে আর দ্বিতীয় ষ্টোরী হলো—না, তাকে ডেকে পাঠানো হয়নি। এ কি চাট্টিখানি কথা হে, দুটো ষ্টোরী একসঙ্গে পাওয়া।

* * * *

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখছেন?

পেছনে তাকিয়ে দেখি নবাগত ভদ্রলোক। বললেন কাল রাতে আর পরিচয়ের পালা সেরে নিতে পারিনি। যা দুটো লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। তা আমার নাম শৈলেন চৌধুরী, 'দৈনিক হরকরায়' ষ্টাফ-রিপোর্টার। যাচ্ছি বাণীযুগে, ভারতের সীমান্তে। ওখান থেকেই ফতেনগরের যুদ্ধ 'কভার' করবো।'

আমার পরিচয় দিলাম। শৈলেন সে পরিচয়ে খুসীই হলো। বললো: রক্ষে করলেন দাদা। রিপোর্টারের কাজ আমি একদম করিনি বলতে পারেন। কথাটা শুনে বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, সে কী মশায়, রিপোর্টারের কাজে আনকোরা, তবু এলেন এই 'বিপ্লব' কভার করতে? কী ব্যাপার?

সে কী আর ইচ্ছে করে এসেছি ম'শায়। বাধ্য হয়ে এলাম। তবে শুনুন আমার কাহিনী—এ একেবারে অপূর্ব্ব, অতুলনীয়ই বলতে পারেন। [ক্রমশঃ।

দেবেশ দাশ

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

মনে মনে সারা দুপুর গুন্‌গুনিয়ে উঠেছে গানের কথাগুলি। আমার সোনার বাংলা। সোনার বাংলা! তোমায় যে কত ভালবাসি তা বুঝি এই রোদে-পোড়া মরুভূমির দেশে আসার আগে কখনো এমন করে বুঝতে পারিনি।

সিরোহি থেকে মাড়োয়ারের দিকে চলেছি। যত দূর দেখা যায় খালি ধূ-ধূ করছে সমুদ্র। নোণা জলের নয়, নুনের মত গুঁড়ো বালির সমুদ্র। ট্রেণের কাচের শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। এক-একটা দমকা হাওয়া আসছে আর মণ খানেক বালি যেন নতুন প্রাণ পেয়ে আহ্লাদে লুটোপুটি খেয়ে বেড়াচ্ছে। একটা আঁধি ধেয়ে আসছে আর মনে হচ্ছে যে আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যটা বোতল থেকে ছাড়া পেয়ে তেড়ে আসছে। আকাশ-জুড়ে তার আনাগোণা, দীর্ঘশ্বাস, তার আকুলি-ব্যাকুলি।

দিন-দুপুরে এই আঁধি আঁধার করে তুলেছে চার দিক। তার মধ্যে দিয়ে আমাদের ট্রেণ ফোঁস ফোঁস করে গর্জে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী কোন রকমে মরুভূমির গরম মাথায় করে চলেছি। এঁটে বন্ধ-করা দরজা-জানলার মধ্যে দিয়ে খোলাখুলি ঢুকতে পারছে না বলেই বোধ হয় আঁধির দৈত্য বার বার শাপমন্ত্রি দিয়ে আগুনের হল্কা ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

নাঃ। এর চেয়ে কালবৈশাখী অনেক ভাল। আগে মাতালের মত হাওয়া, পাগল-ঝোরার মত হুড়মুড় করে। কালো মেঘ নামে মেঘনাতে। খুসীতে ডগমগ হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে যায় আকাশ। গাছ-পালার ভিতর দিয়ে গোঁ-গোঁ করে জলদ রাগিণী বেজে ওঠে। ডাল-পালা সুর করে তালে তালে নাচন। বাদল হাওয়ায় যদি কোন দৈত্য থাকে সে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যায় না, দিয়ে যায় মুঠি মুঠি ছেঁড়া পাতা-ঝরা ফুলের উপহার। তার পর নামে বরষা। দেহের জ্বালা আর মনের অস্বস্তি ধুয়ে-মুছে দেয়। সদ্য-ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধটুকুও কত ভাল লাগে। তামাম ফরাসী মুলুকের সেন্টের মধ্যে নেই তার তুলনা!

বাংলার কালবৈশাখীর সঙ্গে কি হয় মরুভূমির আঁধির তুলনা?

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল যে, মাড়োয়ারের রাজা মালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায় হেরে যেতে যেতে কোন রকমে কারসাজি করে সামলিয়ে নিয়ে শের শাহ বলেছিলেন—এক মুঠো ভুট্টার জন্য আমি হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাতে বসেছিলাম।

কিন্তু সেই এক মুঠো ভুট্টার দেশের লোকরাই আমাদের সোনার বাংলায় এসে মুঠো মুঠো সোনার সন্ধান পেয়েছেন।

সে সন্ধান আমরা দু' পাতা কেতাব-পড়া মাথার অভিমানে এই দু'শো বছরেও পেলাম না। মা সরস্বতীর রাজহংসটির ঠোঁটের ঠোক্করে চোখ দু'টি প্রায় যায়-যায় বলেই কি দৃষ্টিকাণা হয়ে গেলাম?

তবু—তবু যতই অকেজো হই না কেন, অযোগ্যেরও ভালবাসবার অধিকার আছে। এই অধিকারের সাফাই মনে মনে গাইছিলাম। তার চোটেই বোধ হয় গুন্‌গুনানিটা একটু বেশী জোরে হয়ে গেল হঠাৎ—

আমার সোনার বাংলা…।

সামনে-বসা সঙ্গীর মুখে একটু হাসি খেলে গেল। পরিষ্কার বাংলায় বললেন—নমস্কার, আপনি নিশ্চয়ই বাংলা মুলুক থেকে আসছেন?

বলা বাহুল্য, উনি আসছেন মাড়োয়ার মুলুক থেকে। যেখান থেকে বছর বছর নতুন নতুন লোক ভাগ্যের সন্ধানে বাংলা দেশে যান। যে ধন আমাদের চার পাশেই ছড়ান পড়ে আছে অথচ আমরা খুঁজে পাই না, সেই ধন ওঁরা একেবারে যাকে-বলে পথ থেকে কুড়িয়ে তুলে নেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনায় একটা নতুন কথা তিনি ভাল করে পেড়ে বসলেন। যদি রাজপুতানার ব্যবসায়ীরা বাংলা দেশ ছেঁকে না বসতেন তাহলে আরো অনেক বেশী টাকা বিদেশী বণিকদের হাত দিয়ে বিদেশে চলে যেত। ক্লাইব ষ্ট্রীটের শোষণকে রুখে দেশের টাকা দেশেই—হোক না কেন অবাঙ্গালীর পকেটে—রাখতে সাহায্য করেছে একমাত্র বড়বাজার, বাঙ্গালীর কলেজ ষ্ট্রীট নয়।

ভদ্রলোক শুনতে চাইলেন বাংলার অতীত দিনের সম্পদের কথা—যে সময় তাঁর দেশের লোকরা ভাগ্যের খোঁজে লোটা ও কম্বল মাত্র সম্বল করে দেশের পশ্চিম কোণা থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত দলে দলে চলে আসত না।

ভদ্রলোকের কথাটা খুব মনে ধরল। জাঁকিয়ে বসলাম তাঁকে বাংলা দেশের রূপকথা শোনাতে। বার বার এসেছি এঁর দেশে রাজস্থানী রূপকথার সন্ধানে। তন্ন তন্ন করে দেশটা দেখছি প্রত্যেক বারেই। মনের জানালাটা খোলা রেখেছি, সব সময়ই। যাতে গ্রীষ্মে বাদলে শীতে সর্বদাই সব কিছু দেখতে পাই। রাজপুতদেরই অতিথি হচ্ছি বার বার। বেড়াচ্ছি থাকছি এমন কি স্বপ্নও বোধ হয় দেখছি তাদের সঙ্গে। এমন সময় যদি কেহ বলে,—এবার একটু বলুন আপনার নিজের দেশের কথা, তাহলে মনটা খুসীতে নেচে ওঠে বৈ কি!

না, আমি বাঙ্গালীর লেখা বই থেকে সে সোনার বাংলার পরিচয় দিব না। এমন কি, কোন ভারতীয়ের লেখা থেকেও নয়। নিছক বিদেশী যাঁরা, যাঁদের বাংলা দেশকে ভালবাসার কোন কারণ বা দরকার ছিল না, তাঁদের কথা নিয়েই এদেশের পরিচয় দেব।

বেশী মনোযোগ দিয়ে শুনবার জন্য মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মাথাটা একটু হেলিয়ে বসলেন। তাঁর দু' কানে দুটো বড় বড় হীরে সোনার বাংলার ধনের পরিচয় দিয়ে ঝকমকিয়ে উঠল।

ইউরোপ তখন হিন্দুস্থানের লেখাজোখা নেই, এমন সোনার স্বপ্ন দেখছে। তার আগে ইউরোপ মিশরকেই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর আর বস্ত্র-প্রসবিনী দেশ বলে মনে করত। কিন্তু দু'-দুবার বাংলা দেশকে তন্ন তন্ন করে দেখে বার্নিয়ের স্বীকার করলেন যে, মিশরকে যে সম্মান দেওয়া হয় সেটা আসলে বাংলারই প্রাপ্য।

সত্যি কথা বলতে কি, ফ্রান্স থেকে বার্নিয়েরকে যে ক'টি বিশেষ প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটিতে বাংলা দেশ কত সুন্দর, উর্ব্বর ও ধনী, তার হিসাব চাওয়া হয়েছিল।

তখন বাংলা ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের পনেরোটা সুবার মাত্র একটা সুবা ছিল। তবুও তার ধন ও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি লোকের মুখে মুখে যে ফ্রান্স পর্য্যন্ত পৌঁছিয়েছিল, সেটা নেহাৎ সামান্য কথা নয়।

আজ বাংলা দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষের, চালের র‍্যাশন আর আগুনের মত দামের দিনে কি করে বিশ্বাস করব যে, এই দেশেই এত চাল হত যে, শুধু কাছাকাছির প্রদেশ বলিলেই যে খাওয়াত তা নয়, তা নদী-পথে বিহার আর সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতের শেষ কোণা, এমন কি সিংহল আর ভারত-মহাসাগরে মালদ্বীপে পর্য্যন্ত রীতিমত চালান যেত। আমাদের পূর্বপুরুষরা জাভা বা উত্তর-প্রদেশের চিনির মুখ চেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভোরে বসে থাকত না। তারা চিনি পাঠাত শুধু দাক্ষিণাত্যে বা বোম্বাই অঞ্চলে নয়, সেই সুদূর আরব, পারস্য পর্য্যন্ত।

আর মিঠাই? তার কথা বলতে এই মিঠাইয়ের রাজ্য কলকাতার বুকের ছাতি এখনো ফুলে উঠবে। দক্ষিণ আর পূব-বাংলার মিঠাই নিয়ে পোর্টুগীজরা দেশ-বিদেশে ভারী হাতে রপ্তানী কারবার করত। মধু ছিল একটা বড় চালানী মাল।

আজ আমাদের কপালে যথেষ্ট ভাত জোটে না বলে সরকারী র‍্যাশনে তার বদলে কিছু কিছু আটার বন্দোবস্ত হয়েছে। তাতে আমাদের আপত্তি আর সে আটা খেয়ে পেটের বিপত্তির সীমা নেই। পেট-রোগা বাঙ্গালীর কাঁকরমণি চালই সই, তবু আটা চলবে না। অথচ সে যুগে আমরা শুধু যে প্রচুর গম জন্মাতাম তা নয়, এত চমৎকার আর সস্তা বিস্কুট তৈরী করতাম যে, ইংরেজ, পোর্টুগীজ, ডাচ সব বিদেশী জাহাজেই সে বিস্কুট ভারে ভারে চালান যেত।

আর এবার তৈরী হোন মোগলাই আর খৃষ্টানী খানার জন্য। সেকালের বাবুর্চি জানত যে ফিরিঙ্গি মনিবের জন্য টাকায় মাত্র গোটা কুড়ি পঁচিশ মুর্গী কিনে আনলেই তিনি কেল্লা ফতে বলে খুশীতে নেচে উঠবেন। হাঁস পায়রা ভেড়াও ছিল তেমনি সস্তা। হরেক রকম মাংস নুনে জারক করে নিয়ে বিদেশী জাহাজে চালান দেওয়া হত। তাজা বা নুনে জারান মদেরও চালান হত প্রচুর!

এত সুখ, খেয়ে বেঁচে থাকার সুখ দলে দলে বিদেশী আর মিশেলী জাতের লোকদের বাংলা দেশে টেনে আনত। যার অন্য কোথাও ঠাঁই জুটত না সে-ও এদেশে এসে আশ্রয় পেত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'কে কাঁদে ক্ষুধায়, জননী শুধায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া।'

সব বিদেশী ভ্রমণকারীই লিখেছেন যে, আর কোন দেশে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য এত হরেক রকমের জিনিষ তৈরী হত না। তুলো আর রেশমের জিনিষের জন্য বাংলা শুধু মোগল সাম্রাজ্য বা হিন্দুস্থানের নয়, এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশ, এমন কি ইয়োরোপের ভাণ্ডার ছিল। মোটা ও মিহি, শাদা ও রঙীন সূতী কাপড় এত তৈরী হত যে, তার তুলনা নেই। সে যুগে দুর্গম জাপানে পর্য্যন্ত তা চালান যেত। রেশমী কাপড়-চোপড়েরও সমান সুদিন ছিল বাংলা দেশে। কত প্রচুর রেশমী জিনিস যে নানা দেশে চালান যেত তার কোন হিসাব ছিল না। আর যেমন সুন্দর জিনিষ তেমনি দামেও সস্তা।

সোরা আর অন্যান্য খনিজ জিনিষও খুব ভারী হাতে বিদেশে চালান হয়ে বাংলাকে সোনায় মুড়ে দিত। মোম, গালা, মরিচ এ সবের ত কথাই নেই।

এমন কি আজ যেখানে আলিগড় থেকে মাখন আর বিহার থেকে ঘি না এলে বাঙ্গালীকে ঘি মাখন ছাড়াই জীবন কাটাতে হবে, সেখানে সেই সোনার বাংলায় এত প্রচুর ঘি হত যে সমুদ্র দিয়ে তা চালান করা হত জাহাজ জাহাজ।

ইটালিয়ান ভ্রমণকারী মানুচ্চিও সেই সময়ে ভারতবর্ষে এসে সারা দেশ দেখে বেড়িয়েছিলেন। তিনিও লিখে গেছেন যে, ঢাকার চার দিকে পূর্ব-বাংলায় অসম্ভব রকম পরিমাণে সুন্দর সূতির আর রেশমী কাপড় তৈরী হয় আর ইয়োরোপে ও অন্যান্য দেশে জাহাজে জাহাজে বোঝাই সে সব চালান যায়। পশ্চিম-বাংলায় রাজমহল অঞ্চলেও খুব মিহি কাপড় আর প্রচুর চাল হয়।

দু'শো বছরেরও আগে কলকাতায় বসে "মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকটি ঐতিহাসিক টুকরো" বই লিখেছিলেন, রবার্ট অর্ম। বাংলা দেশে তখন সূতি কাপড় তৈরী ছিল একটা জাতীয় শিল্পকলা। প্রায় প্রত্যেকটি ছেলে, বুড়ো, মেয়ে তাঁত চালাচ্ছে না এমন গ্রাম তখন বাংলা দেশে খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। বিলাসীদের চূড়ামণি মোগল-সম্রাট আর তার বেগম-পরিবারদের জন্য ব্যবহারের সমস্ত কাপড়-চোপড় তৈরী হত ঢাকাতে। এত মিহি বুনন ছিল তাদের যে, ইয়োরোপীয় বা অন্য যে কোন লোকের জন্য যা কাপড় তৈরী হত, তার দশ গুণের চেয়ে বেশী দাম হত তার। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ধারাই চলে এসেছিল।

জগতের আলো নূরজাহান ঢাকাই মসলিনের এত ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর সময় থেকে মোগল বাদশার হারেম আর আমীরদের ঘরে এই কাপড়েরই জোর রেওয়াজ হয়ে গেল। সে যুগের টাকার হিসাবে এক টুকরো দশ হাত লম্বা আর দু হাত প্রস্থ আর ওজনে মাত্র নশো গ্রেণ বা পাঁচ সিক্কা আব-ই-রাওয়ান অর্থাৎ জলের ধারা প্যাটার্ণের মসলিনের দাম হত চারশো টাকা। এ যুগের হিসাবে ধান-চালের দামের নিরিখে অন্ততঃ তিন হাজার টাকা।

সম্রাট আওরঙ্গজেব এক টুকরো জামদানী মসলিন অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন। দাম দিয়েছিলেন তখনকার সময়ে আড়াই শো টাকা।

শেঠজী ততক্ষণে তার মিহি ধুতিখানার খুঁটে আঙুল বুলোচ্ছেন। দেখে আমার সন্দেহ হল যে, হয়ত তিনি বাংলা দেশের শুধু মিহি আর মোলায়েম সম্পদের ইতিহাস শুনতে শুনতে একটু হয়রাণ হয়ে পড়ছেন। তাই এবার অন্য রকমের কথা পাড়লাম।

মনে করবেন না যে, বাংলা শুধু ভাত-কাপড়েরই বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকত। এই দেশ থেকে যে এত সোরা চালান যেত তা কিসের জন্য জানেন? বারুদ তৈরী হবার জন্য। আমরা যদি সোরা না পাঠাতাম, তাহলে যুদ্ধ-বিদ্যায় কোন আধুনিকতা, কোন নতুন আবিষ্কারই সহজ হত না। ইয়োরোপীয়রা ত এদেশে পাট গেড়ে বসল এই বারুদেরই কল্যাণে।

আর যুদ্ধ-জাহাজ? সে-ও এখানেই তৈরী হত। যুদ্ধের জাহাজ আর বাণিজ্যের জাহাজ এখান থেকে হিন্দুস্থানের সর্বত্র, মায় পারস্য, আরব, চীন, দক্ষিণ সাগরে ঘুরে বেড়াত। ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন টমাস বাউরী এদেশে দশ বছর কাটিয়ে তার বঙ্গোপসাগরের চার দিকের দেশগুলির ভূগোল কাহিনীতে সেকথা লিখে গেছেন।

বাঙ্গালীর নৌ-যুদ্ধে বিক্রমের কথা শুধু কাহিনী নয়, ইতিহাসও বটে। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে লিখে গেছেন, কেমন করে বাঙ্গালীর নৌ-বল জৌনপুর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে লড়ে গিয়েছিল।

শেঠজীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। য়্যা, মশায়, আপনারাও লড়াই করতেন না কি?

হেসে তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলাম—বাংলার ইতিহাস আমাদের দেশে ঠিক মত পড়ান হয় না। না হলে সবাই জানতে পারত যে, বাঙ্গালী কোন দিন দিল্লীর কাছে মাথা নীচু করে থাকেনি বেশী দিন। সর্বদাই মাথা উঁচু করে উঠেছে। সব চেয়ে নামকরা মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী তারিখি-ফিরোজশাহীতে এ জন্যেই লিখেছিলেন যে, চতুর আর ওয়াকিবহাল লোকরা লক্ষ্মণাবতীর নাম দিয়েছে বুলঘাকপুর অর্থাৎ লড়াইয়ে সহর। স্বাধীনতার জন্য আবেগ গজায় বাংলা দেশের মাটিতে। তাই দিল্লীতে যে সব সুবাদার পাঠান হত তারা সেখানে গিয়েই বাংলার স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে দাঁড়াত। অন্য উপায় ছিল না। কারণ তা না হলে অন্য লোকরা তাদের হঠিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন।

রাজোয়ারার চেয়ে বাংলা তাহলে কম কিসে? শুধু কর্ণেল টডের মত অতীতকে নতুন করে গড়ে দেখাবার লোক নেই বলে।

কিন্তু লড়াইয়ে আমরা ধর্মযুদ্ধের নীতি মানতাম। সিলভিয়েরা একজন পোর্টুগীজ জলযোদ্ধা। বাংলা দেশ থেকে গুজরাটে যে সব জাহাজ যাচ্ছিল, সেগুলি পথে আটক করে মাঝিমাল্লাদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বেগার খাটাতে চেয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পোর্টুগীজ জলদস্যুরা বিনা ঝঞ্ঝাটে এরকম ভাবে ডাকাতিতে বন্দীদের খুসী মত খাটিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা প্রথম বাধা পেল এই বাঙ্গালীদের কাছে।

আর বাঙ্গালী-সমাজ? তখনকার সভ্য বাঙ্গালী-সমাজ আর বাংলার রাজদরবার পোর্টুগীজদের এজন্য খুব ছোট বলে মনে করত! পৃথিবীর এক কোণায়, হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্যের এক টেরে থাকলেও বাংলায় 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ল' মেনে চলাই রীতি ছিল।

শুধু ধানে নয়, ধনেও ভরা ছিল সোনার বাংলা। আওরঙ্গজেব যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধে ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন তখন বাদশার বিরাট অন্দর-মহলের আর সেনাদলের খরচ চালানর একমাত্র উপায় ছিল বাংলা দেশের টাকা। আঠার শতকের প্রথম চল্লিশ বছর দিল্লীর মসনদ দাঁড়িয়েছিল শুধু বাংলার সোনার বনিয়াদের উপর।

কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে লিখেছিলেন যে, পনের বছর বাংলার সুবেদারী করে শায়েস্তা খান যা টাকা করেছিলেন, পৃথিবীতে আর কোথাও কেউ তেমন করতে পারবে না। তার মোট টাকা তখন ছিল সে-যুগের আটত্রিশ কোটি টাকা, আর দৈনিক আয় ছিল—এমন কিছু নয়—মাত্র দু লাখ টাকা।

শেঠজীর মুখখানা হাঁ হয়ে যাচ্ছে দেখে বলে ফেললাম—না, না, ভয়ের কিছু নেই। শায়েস্তা খানকে হিসেব লুকোতে হয়নি। ইনকাম ট্যাক্স ছিল না সে সোনার যুগে। অবশ্য সিধেটা ভেটটা পাঠাতে হত।

মাসির-উল-উমরা নামে মোগল ওমরাহদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বইয়েতেও এমনি অবিশ্বাস হবার মত ধনরত্নের কথা লেখা আছে।

আওরঙ্গজেবের নাতি বাংলার সুবেদার আজিমকে লেখা বাদশাহী চিঠিতে আছে, কেমন করে বাংলার উদ্বৃত্ত নগদ টাকা আওরঙ্গজেবের কাছে গাড়ী গাড়ী বোঝাই হয়ে চালান যেত। এত টাকার হুণ্ডি দেবে পৃথিবীতে কোন্ শেঠ বা কোন্ ব্যাঙ্ক? তাই সেই রেল-ষ্টীমার-হীন যুগে চালান যেত কাঁচা টাকা গাড়ী গাড়ী বোঝাই।

তার পরে যখন মোগল মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি চলতে লাগল, প্রত্যেক নতুন বাদশাহেরই তখন একমাত্র ভরসা ছিল বাংলা দেশ। বাংলার সোনা যার হাতের মুঠোয় তারই কেল্লা ফতে। ফরোখশায়ার এরই জোরে দিল্লীতে সম্রাট হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের ট্রেণ মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এক মনে চলেছে। ধূ-ধূ করছে শুধু বালি আর শুধু বালি। এমন কি, এদিকে-ওদিকে কাঁটার ঝোপ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। শুধু সোনালী বালি। ভাবতে লাগলাম, যেমন করে বাংলার মাটিতে সোনা বিছান ছিল। কোথায় গেল অত জমান সোনা?

তার উত্তর পেলাম ক্লাইভের জবানবন্দীতে। পার্লামেণ্টে সিলেক্ট কমিটিতে। বাংলায় অসম্ভব লুঠের জন্য আসামী লর্ড ক্লাইভ নিজেকে বাঁচাবার জন্য সাফাই গাইলেন—"পলাশীর জয়ের ফলে আমি কি অবস্থায় পড়লাম তা বিবেচনা করে দেখুন। একজন বড় রাজা আমার মর্জ্জির উপর নির্ভর করছে। আমার পায়ের তলায় একটি মহা ধনী সহর। শুধু আমার সামনে খুলে দেওয়া হল মাটির নীচের তোষাখানা, তার দু'পাশে সোনা আর মণি-মাণিক্য স্তূপ করে রাখা হয়েছে—আমি চললাম তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে। মিষ্টার চেয়ারম্যান, এই মুহূর্ত্তে আমি আমার নিজের সংযমের কথা ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।"

সত্যিই ত। যে সময় টাকায় চার মণ চাল পাওয়া যেত, সে সময় ক্লাইভ হাতিয়ে ছিলেন মাত্র চল্লিশ লাখ টাকা।

পকেটের স্মৃতির রুমালটা চোখ থেকে পকেটে ফিরে যাবার সময় মনে পড়ল ইংরেজ কুঠিয়ালদের রুমালের কারবারের কথা। ওরা একবার বার হাজার রেশমী রুমাল বালেশ্বরে মাত্র সাড়ে তিন টাকায় কিনে নিজেদের দেশে চালান দিয়েছিল।

কিন্তু কোথায় গেল বাংলার সেই রপ্তানী-বাণিজ্য—যাতে ভারে ভারে বিদেশী টাকা আসত এদেশে? যার ফলে বার্টার অর্থাৎ জিনিষের বদলে জিনিষ দিয়ে কেনা-বেচা করার নিয়ম বাংলা থেকে সে যুগে একেবারে উঠে গিয়েছিল?

কোথায় গেল টমাস বাউরীর হিসাবে লেখা চিনি, সূতীর কাপড়, গালা, মধু, মোম, ঘি, তেল, ডাল, রেশম আর চালের জাহাজ-ভরা চালান?

বাংলায় ফলের দোকানে গিয়ে আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে

যায় আজ-কাল। যেমন দাম, তেমনি কম মাল। আর গ্রাম দেশে ত মরশুমের সময় ছাড়া কোন ফল চোখেই পড়ে না। এমন দামের গরম যে ফল জিনিষটা আজ-কাল শুধু কবিতা লিখে হা হুতাশ করবার মত জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি বাংলা দেশের আদি ও অকৃত্রিম ফল কলাকে পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুরী কলা, কলা দেখিয়ে বাজার মাত করে রেখেছে। অথচ বাংলার কলা সম্রাট্ বাবরের সময়েও সব চেয়ে মিঠে বলে নাম ছিল।

এখানে সাড়ে তিন শ' বছর আগেকার একটা ঘটনা বলি। জাহাঙ্গীর আর শাজাহানের সময়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম অঞ্চলে মোগলদের যুদ্ধের ইতিহাস বাহারিস্তান-ই-খাইবি বইতে সোনার বাংলার গ্রামাঞ্চলে মোগল সৈন্যদের তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়ানর কথা আছে। এক দিন রাত্রে এক গ্রামে শাজাহান তার আমীরদের বিশেষ পেয়ার দেখাবার জন্যে কি, উপহার দিলেন তা একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করুন আজ। না, কিছুতেই ঠাহর করতে পারবেন না। বাজী রেখে বলতে পারি।

সিঙ্গাপুরী আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের এঁচোড়ে-পাকা চালানী কাঁচা-পাকা কলা খেতে অভ্যস্ত জিভ নিয়ে ভেবে দেখুন বিলাসী ও শিল্প-রসিকের সেরা সম্রাট শাজাহান তার সভাসদদের অনুগ্রহ করলেন বাদশাহী খানার অংশ থেকে মর্ত্তমান কলা দিয়ে। তার পর মনে পড়ল যে বিশেষ গোলমেলে ওমরাহ শিতাবমানকে তার জন্য বেছে রাখা কলাগুলি দেওয়া হয়নি। সেগুলি মহলে যত্ন করে তুলে রাখা হয়েছিল। ডাক, ডাক, খোজাদের কলাগুলি নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু বেচারারা অনেক ডাক-হাঁকের পর মাত্র দু'টি কলা এনে হাজির করল। ব্যাপার কি?

সুলতান আওরঙ্গজেব অমন কাঁচা সোনার বরণ আর পাকা সৌরভে ভরা মর্ত্তমানের অমৃত লুকিয়ে চাখতে চাখতে আনমনে প্রায় সবগুলিই সাবড়ে দিয়েছেন। অপকর্মটা যে কতখানি হয়েছে তা খেয়ালে এল যখন, মাত্র আর দুটো বাকী আছে।

রাম রাম! ইস্ লিয়ে আপলোগ বঙ্গালমে মর্ত্তমানকো সবড়ি কেলা ভি কহতে হ্যায়।—ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মহা একটা আবিষ্কার করে ফেলার বাহাদুরী অনুভব করতে করতে বলে উঠলেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। উচ্ছ্বাসের চোটে মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলার বদলে একেবারে খাস রাষ্ট্রভাষাই বেরিয়ে এল।

সাবাস শেঠজি, আপনার যে রকম রসবোধ আছে, তাতে আপনার বাংলা দেশে বাস করা সার্থক হয়েছে।

সে কি কথা বললেন সার, আজ-কাল ত অনেক বাঙ্গালী মনে কষ্ট পায় যে, অবাঙ্গালীরা এসে বাংলার ধন সব লুটে-পুটে খাচ্ছে।

শেঠজির কথার মধ্যে কোন জ্বালা ছিল না, কিন্তু মুখে ছিল হাসি।

আমিও হাসি বজায় রেখেই বললাম—তা আর কি করা যায় বলুন? যে দেশে যত ধন-রতন আছে সে দেশেই তত বিদেশীর আমদানী হবে—যদি সেখানকার লোকরা নিজেদের কোট নিজেরা সামলাবার মত হিম্মৎ না রাখে। কই, আপনারা ত সোনার বাংলার যুগে আমাদের ওখানে তেমন পাটা গাড়তে পারেননি। এই ধরুন না, এই সে দিনও পাকিস্তান হবার আগে ঢাকা সহরের কারবারে ত আপনারা জুৎ করতে পারেন নি?

প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে এই। সে কোন জায়গাই খালি রাখতে দেয় না। যেখানে একটু খালি ফাঁক আছে, সেটাকে ভরে ফেলবার জন্য বাইরে থেকে চাপ আসবেই। বিশেষ করে যদি ঘরের লোক অকেজো হয়।

আরো বিশেষ করে যদি সে ঘরে এত কিছু পাওয়ার মত জিনিষ থাকে।

বাংলা দেশ যে শুধু ধনধান্যে-পুষ্পে ভরা ছিল তা নয়, এখানকার মেয়েরা ছিল এত সুন্দরী আর মিষ্টি স্বভাবের যে, যদিও আজ-কাল ইয়োরোপীয়ান মেয়েদের দিকে গোটা পৃথিবী সতৃষ্ণ চোখে তাকায়, সে যুগে অর্থাৎ যখন শাদা রঙের মহিমা শাদা রাজ্যের কল্যাণে এমন ভাবে ফুটে ওঠেনি, তখন ইয়োরোপীয়রাই এই শ্যামল দেশের শ্যামা মেয়েদের অপরূপ রূপসী মনে করত।

সে যুগে পর্টুগীজ, ইংরেজ আর ওলন্দাজদের মধ্যে খুব চলতি একটি কথাই ছিল যে, বাংলা দেশে ঢুকবার একশ'টা পথ আছে, কিন্তু ফিরে যাবার পথ একটিও নেই।

এ কথা তারা বলত, কারণ বাংলা দেশ এত সুখে সহজে আরামে থাকবার দেশ ছিল। কিন্তু এই মরুভূমির দেশে ঢুকে একবার পাঠান সম্রাট শের শাহও ভেবেছিলেন যে, মাড়োয়ার থেকে বেরিয়ে যাবার পথ একটাও নেই। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

ইতিহাসের সেই সত্য কাহিনীটা এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে শোনাতে শোনাতে বাকী পথটুকু শেষ করে দিতে পারলে মন্দ হয় না।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি, এটা হয়ে দাঁড়াল মাড়োয়ারের রাজা মালদেবের সমস্যা। মোগল-পাঠানের টলমলে টালবাহানার মাঝখানে পড়ে নতুন একটা পরিস্থিতি হাজির হল। এত দিন ধরে খুব বিচক্ষণ রাজনীতিকের মত তিনি আস্তে আস্তে মাড়োয়ারের বড় হবার পথ তৈরী করে আসছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, রাজপুতদের মধ্যে এত ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান বিশেষ দেখা যায় না।

পলিটিশিয়ান কথাটাই ব্যবহার করলাম। কারণ, এই কথাটার মধ্যে যতখানি ছল-চাতুরী আর ক্ষুরের মত ধারালো বুদ্ধির ইঙ্গিত আছে, বাংলা প্রতিশব্দ রাজনীতিকের মধ্যে তার এক কণাও নেই। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি তা খুলে বলতে হবে? এই ধরুন, চাণক্য হলেন রাজনীতিক আর কৌটিল্য বলতে বুঝায় পলিটিশিয়ান।

এ-হেন মালদেব চোখের সামনে চিতোরকে বাহাদুর শার হাতে ছারখার হয়ে যেতে দেখলেন। দেখলেন, কেমন করে হুমায়ুন সাপ মারলেন অথচ লাঠিটাও ভাঙ্গতে দিলেন না। থুড়ি, সাপ তাড়ালেন অথচ লাঠিটা চালালেন না পর্য্যন্ত। মনের নোটবুকে সে শিক্ষাটা ভাল করে টুকে রাখলেন মালদেব।

শুকুজীর দিনও ঘনিয়ে এল। এবার সাকরেদের পালা—বিদ্যার দৌড় কত দূর এগিয়েছে তার মহড়া দিতে হবে।

বাংলা বিহারে যখন হুমায়ুন আর শের শাহে লড়াই চলছে, তখন মালদেব নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। তিনি মেবারের পতনের পর মাড়োয়ারকে সব চেয়ে বড় রাজপুত-রাজ্যে দাঁড় করালেন। মাড়বারী চারণ কবির ভাষায় তিনি রাজ্যের চার দিকে আর নতুন জিতে নেওয়া দেশগুলিতে বেশ গুছিয়ে রাঠোর-বংশের বীজ পুততে লাগলেন। রাজপুতদের মধ্যে বংশের টানই সব চেয়ে

বড় টান। তাই শুধু রাঠোরদের মধ্যে থেকেই কমসে কম পঞ্চাশ হাজার সৈন্য তৈরী করে রাখলেন তিনি।

রাজনীতির খেলায় কাল সন্ধ্যের দোস্ত যদি আজ ভোরে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে রাতারাতি সে দুষমণে দাঁড়িয়ে গেছে। ঠিক যেমন করে চৌদ্দ বছর আগে বাবর রাণা সঙ্গের দুষমণ হয়ে গিয়েছিলেন। এত দিন মালদেব মোগল-পাঠানের লড়াইয়ে মোকা পেয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু সে লড়াই বেশী দিন চলল না। হুমায়ুন হেরে রাজপুতানায় পালিয়ে এলেন। কাজেই মালদেব তাকে আবার ঠেকা দিয়ে তুলে ধরে দিল্লীর তখ্‌তে বসাবার প্রস্তাব পাঠালেন।

কিন্তু একেবারে পাকাপাকি ভাবে নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এনে ফেলা ওস্তাদের খেল নয়। শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেলে বেচারী বাদশাহ হুমায়ুনের আর নতুন লোকসান কি হবে? কিন্তু নিজের যে সবই যাবে। কাজেই মালদেব শের শাহের সঙ্গেও সন্ধির কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

এদিকে হুমায়ুনেরও মনে সন্দেহের অন্ত নেই। মালদেব কেন নিজে এসে হাজির হলেন না হুমায়ুনকে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করবার জন্য? কেন শুধু কিছু ফলমূল আর সোনার আশরফি দিয়েই সিধা পাঠান শেষ করলেন? কেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাস্তায় লাল শালু পাততে পাততে এগিয়ে এলেন না?

এদিকে শের শাহের দূতও মাড়োয়ারের রাজসভায় এসে হাজির হয়েছে। তবাকত-ই-আকবরিতে প্রমাণ আছে যে, হুমায়ুনকে বন্দী করে শের শাহের হাতে গছিয়ে দিলে মালদেবকে অনেক কিছু ভেট দেওয়া হবে, এমন আশাও পাঠান সম্রাট দিয়েছিলেন। আর মালদেব নাকি তাতে অরাজীও ছিলেন না।

কিন্তু দেখা গেল যে, খাঁটি রাজপুত মালদেব হুমায়ুনকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও শের শাহের হাতে ধরিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করলেন না।

এদিকে শের শাহ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন মাড়োয়ারের মধ্যে—হয় নিজে হুমায়ুনকে আশ্রয় থেকে বের করে দাও, না হয় পাঠানদেরই সে কাজ করতে দাও। অর্থাৎ লড়ে যাও আমার সঙ্গে।

হুমায়ুনের দূত শেষ পর্য্যন্ত বিনা নোটিশে মালদেবের রাজধানী ছেড়ে সটকে পড়ল। আর মালদেবও যেন মোগলদের পাকড়াবার জন্যই টেনে ঘোড়সোয়ার সৈন্য পাঠালেন। নেহাৎ কম নয়। একেবারে পনের শ'।

কিন্তু হুমায়ুনের মাত্র শত জন সৈন্য এদের মধ্যে যারা বেশী এগিয়ে এসেছিল, তাদের তাক করে তীর ছুড়ল। দু' জন রাজপুত সোয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল একেবারে সেই মরুভূমির বালির উপর। বাকী সবাই মনে হল যেন হার মেনে পালিয়েই গেল।

শের শাহ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ মাড়োয়ারের সঙ্গে লড়াই করার মত অবস্থা তখনো দিল্লীর ছিল না। নিজেরই তখ্‌ত যে টলমলে। আর মালদেবও খুশী হলেন যে, কূটনীতির চালে তিনি শের শাহকে কাৎ করে ফেরৎ পাঠাতে পারলেন।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি একেই বলে—পুব-বাংলায় পাটের কারবারী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খুশী মনে বলে উঠলেন।

না, না, অত খুশী হবার মত ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত হয়নি, শেঠজি! শুনলে কষ্ট পাবেন, কিন্তু আমরা চিরকালই রাজনীতিতে একেবারে নাবালক—প্রতিবাদ করে বসলাম আমি।

মনে পড়ল যে, রাজপুত-বীরদের মুখের শোভা গোঁফ-জোড়াকে যে বীরত্বের নিশানা বলে মনে করা হত। তাই আরো একটা কথা যোগ করে দিলাম—শুধু যে নাবালক তা নয়, জন্ম-মাকুন্দো; গোঁফ-জোড়া কোন দিনই গজাবে না।

এ-হেন টিপ্পনী শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেল শেঠজির। বোধ হয় ভাবলেন যে, যারা রাজনীতিতে এত কাঁচা তারা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের নীতি তৈরী করতেও এত কাঁচা বুদ্ধি দেখাবে যে, তার পাটের রপ্তানীতে পাকা মুনাফা না-ও থাকতে পারে।

যাই হোক, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি? সোজাসুজি শের শাহ কেমন করে চতুরালিতে মালদেবকে কাৎ করেছিলেন, সে কাহিনীতে চলে এলাম।

ঝগড়ার কোন নতুন কারণ গজায়নি। কিন্তু দিল্লীর মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে পর্য্যন্ত রাঠোর মালদেবের রাজত্ব এসে পড়েছে, এটা কি করে সহ্য যায়? কাজেই বছর দেড়েকের মধ্যেই সৈন্য সাজিয়ে শের শাহ মারি ত গণ্ডার, লুঠি ত ভাণ্ডার, এই মন্ত্র জপতে জপতে চললেন মাড়োয়ারে। এত বেশী সৈন্য আর জীবনে কখনো তিনি নিয়ে যাননি কোথাও। কিন্তু রাঠোর যে সব চেয়ে বড় প্রতাপশালী বীর! শুধু যে গণ্ডারের মত সইতে পারে তা নয়; বাঘের মত লড়েও যায়। আর হাতীর পিঠে-চড়া শত্রুরও তোয়াক্কা করে না। রাঠোরের লড়াই না হাতীর লড়াই!

কিন্তু মালদেব আফগান সৈন্যদের এমন বেকায়দা জায়গায় পাকড়াও করলেন যে, শের শাহ প্রমাদ গণলেন। যতই না কেন খান্দাক (আজ-কালকার যুদ্ধের ট্রেঞ্চ) খোরান, রাস্তায় দেওয়াল দাঁড় করান, আর কামান হাতী আর বন্দুক সাজান, রাঠোর ঘোড়সোয়ারদের এঁটে উঠবার তার ক্ষমতা রইল না একটুও। মালদেবের সৈন্য ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার আর শের শাহের আশী হাজার। কিন্তু ঐতিহাসিক বদাউনির ভাষায়—শের শাহ "মূর্খ, শূয়োরের মত স্বভাবের খচ্চর হিন্দুদের" বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যদের এমন ঘোর বিপদে ফেলতে দিতে রাজী হলেন না।

অথচ কোন ফাঁকই নেই পালাবার। এ যে মহা বিপদ হল!

আচ্ছা, নিজের ছায়াকেই ভূত মনে করে যাতে মালদেব পালান, সে কৌশল একটা আঁটা যাক। 'বলং বলং ত বাহুবলম্‌' নয়! 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'—এ যে শাস্ত্রের বচন।

লিখলেন অনেকগুলি জাল চিঠি। যেন মালদেবের সর্দাররাই লিখছেন শের শাহের কাছে। পাঠালেন সেগুলি মালদেবের উকীলের তাঁবুর সামনে। উকীল সেগুলি মাটিতে পড়ে আছে দেখে রাজার কাছে পেশ করলেন। শের শার মতলব হাসিল হল।

মহা সর্বনাশের কথা! এতগুলি সর্দার যদি লড়াইয়ের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে আফগানদের দলে এসে ভিড়ে যায়, তাহলে মালদেব যাবেন কোথায়? পালা পালা, তাঁবু তুলে প্রাণ নিয়ে পালা!

সর্দাররা এসে এই মিথ্যা সন্দেহ ভাঙতে চাইলেন। শপথ করলেন নিজেদের সম্মানের নামে, ভগবানের নামে। কিন্তু হায়!
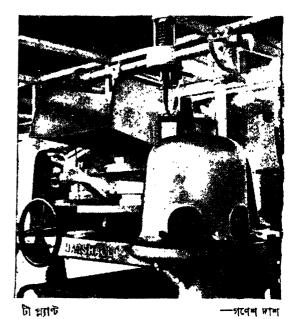
হংসমিথুন —পরিমল গোস্বামী

শীতের সকাল —অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

ফসল —ডি, সোনা

মৌনমুখ
—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

টী প্ল্যান্ট —গণেশ দাশ

কালো ছায়া —কমল ভট্টাচার্য্য

ভাঙ্গা কাচ আর ভাঙ্গা মনে জোড়া লাগে না। মালদেব রাতারাতি যোধপুরে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু পালালেন না জয় চন্দেলা আর তুম্ভ নামে তুজন সর্দার। তাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়ে ইনাম রক্ষা করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। মাত্র বার হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁরা শের শাহের আশী হাজার সৈন্যের উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘোড়া চড়ে শত্রু মারতে খুব জুৎ হচ্ছে না দেখে তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে বর্শা আর তরোয়াল নিয়ে ছুটে চললেন। শের শাহ হুকুম দিলেন, যেন পাঠানরা রাঠোরদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে এগিয়ে না যায়। সেটা আত্মহত্যার সামিল। তাই তাঁর সৈন্যরা সামনা-সামনি তরোয়াল নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করলে তাদেরই গর্দান যাবে।

সামনে এনে দাঁড় করান হল হাতী-চড়া পলটন, কামান-চালান গোলন্দাজ আর পিছনে রইল সারি-সারি খোরাসানী তীরন্দাজ। বার হাজারের একটি রাঠোরও প্রাণ নিয়ে ফিরে গেল না। তাদের দেহ পড়ে রইল সেখানে রাশি-রাশি শত্রুর মৃত-দেহের মাঝখানে। অসংখ্য ঝরা-পাতার মাঝখানে যেমন করে ঝরা-ফুলের রাশি পড়ে থাকে।

আহাম্মক! নেহাতই আহাম্মক! তুশো বছর পরে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবও রাজপুতদের আহাম্মক বলেই নিন্দা করেছিলেন। তিনি তুরাণী সিপাহীদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, ওরা অন্য কোন জাতের চেয়ে বেশী ওস্তাদ লড়াইয়ে। ছল-চাতুরীতে, তুসমণের উপর তেড়ে হামলা করতে ওরা ওস্তাদ। তবে দরকার মত লড়াইয়ের মাঝখানে হঠাৎ লাফিয়ে পড়তেও ওদের কোন দ্বিধা বা লজ্জা হয় না। এই হিসাবে জান দেওয়া-নেওয়ার কারবারে সমান বাহাতুর হলেও ওরা হিন্দুস্থানীদের পাঁচ আহাম্মকীর চেয়ে একশ ধাপ দূরে। হিন্দুস্থানীরা মাথা দিয়ে দেবে কিন্তু নিজেদের কোট ছেড়ে দেবে না। এমনি আহাম্মক!

কিন্তু শের শাহ এই লড়াইয়ের শেষে মৃতদেহের জঙ্গল আর তার উপরে ধূ-ধূ করা মরুভূমির বালি দেখে মাথা নেড়ে বলে উঠেছিলেন যে—এক মুঠো বাজরার জন্য আমি হিন্দুস্থানের বাদশাহী হারাতে বসেছিলাম।

সেই এক মুঠো বাজরার দেশের দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল। আবার সেই সূতীর রুমালটা পকেট থেকে বেরিয়ে এল। রেশমী রুমাল নয়—যে রুমাল তিনশ বছর আগে বাংলা দেশ মাত্র সাড়ে তিন টাকায় বার হাজারখানা দিতে পারত, সে রুমাল নয়। সে কথা ভাবতেই চোখ আরো জ্বালা করতে লাগল। বেরিয়ে এল এক ফোঁটা জল।

সে জলের মধ্যে দিয়ে আবছা একটা ছবি ফুটে উঠল। সত্যিই ত। চোখের জলে কি কিছু ঢেকে দিতে পারে? ঢাকাই মসলিনে কি সম্রাট নন্দিনী জেবউন্নিসার অঙ্গসৌষ্ঠব ঢাকা পড়েছিল? আওরঙ্গজেব ঢাকাই মসলিন পরা আদরিণী মেয়েকে তার বে-আব্রু পোষাকের জন্য বকেছিলেন। উত্তরে জাহানারা তার সম্রাট পিতাকে বলেছিলেন, বাবা, তবু ত আমি মসলিন আট ভাঁজ করে পরে আছি।

না। চোখের জলে ইতিহাসের আত্মীয়তা, ভূগোলের নিকটতা ঢেকে রাখতে পারে না। মোটে পনের শ' মাইলের দূরত্ব বাংলা আর রাজোয়ারাতে। এই ত শ' তুই তিন চার বছর আগেকার কথা। এই মরুভূমির বালির মধ্যে ট্রেনের বদলে জল-ভরা নদীর পাড় দিয়ে নৌকোয় চলেছি। সবুজ সবুজ হরিতে-হিরণে ঢাকা সেই গ্রাম। সেই বটতলা। সেই শিরশিরে বাতাস-বওয়া ধানক্ষেত। সেই মেঘ-ডাকা মেঘে-ঢাকা আকাশ। নদীর এক-একটা বাঁকে সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠছে নতুন দেখা পাড়া, নতুন খোলা গঞ্জ। শিলেট থেকে চলেছি সোনারগাঁও—পনের দিন ধরে নৌকোয়। চলেছি গ্রাম আর ফলের বাগানের সারির মধ্যে দিয়ে। পাড়ে পাড়ে জল তোলার যন্ত্র, ফলের বাগান, ডাইনে-বাঁয়ে হেসে উঠছে গ্রামগুলি। ঠিক যেন স্বদেশে মিশরে নীল নদের উপর দিয়ে চলেছি।

না, না। সে আমি নই, আমি নই। সে সোনার বাংলা দেখবার সৌভাগ্য ত আমার হয়নি? সে দেখেছিল ছ'শো বছরের আগে মিশরের ইবন বতুতা।

পলাতক

শ্রীশান্তি পাল

(তুমি) ও অচিন দ্যাশের বন্ধু মোর।
ভাটির টানে নাও ভাসাইলা,
আমি হইলাম ন্যাশায় ভোর।
বিহান গেল, বৈহাল গেল,
আইল গইন রাতি,
বিন্দু পিয়াস সিন্ধু হইল,
ফ্যাইটা যায় রে ছাতি।

(ছিলাম) জলে আমি, ডালে তুমি,
ক্যামন কইর্যা হইলা চোর।

যাও রে পুবালী বাও গাজির খালের পারে,
এ অভাগীর দুঃখের বার্ত্তা কও রে যাইয়া তারে।
(আমার) ঘরের পথে কাঁটার বার',
ঘাটের তলায় ভাঙন ঘোর।

(তুমি) উজান বাইয়া বামাল ফিরাও—
দেখুম তোমার মনের জোর।
ও রে পলাইনা বন্ধু মোর!

খেয়াল-খাতা

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী সংগৃহীত

ওঠো, নব আলোক চুমি,
জাগো, মাতৃভাষা ও পিতৃভূমি।
—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

তুমি একা নয়, অসংলগ্ন নও, তুমি অপরিমেয় সৃষ্টির একটি বিন্দু। বিন্দু হইলেও অনন্তকে বুকে ধরিয়া তাহারই রূপে রংগে তুমি ফুটিতেছ। তোমার পরিপূর্ণ সার্থকতা ঐখানে। নিছক জড়বাদীর ভ্রান্ত কথায় পথ হারাইও না। জড় বলিয়া কিছু নাই, আপনাতে— সংহত সংকুচিত শিবই জড়রূপ প্রতীয়মান। দেখ, জড়-বিজ্ঞান ও অণুর বুকে অনন্ত রুদ্রকে পাইয়াছে, শুধু এখনও বুঝে নাই—ঐ রুদ্র একাধারে প্রলয়ের বীজ ও সৃষ্টির এবং জীবনের অমৃত।
— শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

Hitch thy Wagon to a Star.
—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হও আলোকের দূত—
তুমি অমৃতের সুত।
—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হরিজনদের উন্নয়নে কে কাজ করবে, যদি তুমি না কর?
—প্রিয়রঞ্জন সেন।

কাটা চোখের সই।
—উপেন্দ্রনাথ গংগোপাধ্যায়।

শীতের পাণ্ডুপত্রের মত তরুর গায়
জরাজর্জর জীবন আমার কম্পমান।
কিশলয়গুলি করে ঝিলমিল ঘেরি আমায়,
নব জীবনের আশ্বাস তারা করিছে দান।
—শ্রীকালিদাস রায়।

তোমার পতাকা যারে দাও,
বহিবারে তারে দাও শকতি।
—শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি,
বিধি মিলাইবে পুরস্কার।
—শ্রীমেঘনাদ সাহা।

মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা।
—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে। যদি শ্রমের মর্য্যাদা বুঝতো তা হ'লে দুঃখ আর থাকতো না।
—প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

জীবনের দুঃখ, শোক, লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি,
মহত্তেরে বৃহত্তেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।
—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

শুনে এ যুগটা অ্যাটমিক্
হাসে মহাকাল ফিক্ ফিক্,
দেখেছে সে কত দম ফেটে মরা
হেন দুদিনের দাম্ভিক।
—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

জীবনের সমস্ত প্রয়াসকে প্রসাদে রূপান্তরিত করো।
—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ভাগ্যবিপর্যয়ের দ্বারা একালের মানুষ নিত্য বিড়ম্বিত। সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্যোগের ভিতর থেকে আপনি মনের শক্তি লাভ করুন, এই আমার কামনা।
—প্রবোধকুমার সান্যাল।

নির্ব্বিকারের ভাষা নাই
সবাকের ভাষাতে মুখোশ
ভাব তাই চিত্ত মাঝে
করিছে আফশোষ।
—বনফুল।

প্রমোদে বিলাসে আর কৌতুক খেলায়,
জীবন কাটায় যারা, বুঝে না ত হায়!
বিধাতার কৃপাবিন্দু এ জীবন প্রাণ,
পরের মংগল করো, করো দেশের কল্যাণ।
—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু।
—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বৃথা জড় করিতেছ হাতের আখর,
কালের খাতায় এর রবে না স্বাক্ষর।
—নরেন্দ্র দেব।

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"
—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সুন্দরের উপাসনা,
সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।
—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'
—তিনি আমাদের বুদ্ধিকে শুভযুক্ত করুন।
— শ্রীসুবোধ ঘোষ।

আমোদ-প্রমোদ কর মাঝে মাঝে ভাই,
জীবনের গুরু-বোঝা হাল্কা করা চাই।
—সুনির্ম্মল বসু।

আধুনিক সংস্কৃত-সাহিত্য

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত-সাহিত্য এক বিচিত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে। সকল দিক দিয়া ইহা সমৃদ্ধ—দেশে-বিদেশে ইহার ব্যাপক সমাদর। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ফলেও দীর্ঘকাল ইহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য হাল্কা ধরণের পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হইত, আর গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রাদেশিক সাহিত্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিত না—তাহাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না। আজও প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্য মুখ্যত: ঐতিহাসিকের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতেছে—সাহিত্য-রসিকের রস-পিপাসা ইহার দ্বারা তেমন শান্ত হইতেছে না। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক সাহিত্যের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা দেশের লোককে যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞান দান করিতেছে। এ জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইবার তেমন কোন প্রয়োজন এখন আর নাই। তাই অধুনারচিত সংস্কৃত গ্রন্থের কোন চাহিদা নাই—ইহার চলতি বাজার-মূল্য কিছু নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত রচনার ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই—এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা বিষয়ে অজস্র সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতেছে। ইহাদের পাঠক-সংখ্যা নগণ্য—সংস্কৃত-রসিক সমাজেও এই সাহিত্যের তেমন কোন আদর নাই—ইহার বিশেষ খোঁজ-খবর সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও রাখেন না। আমরা প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের গৌরব করি—প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করি—আধুনিক সাহিত্যের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হই না। ফলে এই সাহিত্যের কোন বিবরণ এখনও সংকলিত হয় নাই। বস্তুতঃ, ইহার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করাই দুঃসাধ্য। যে সমস্ত বই মুদ্রিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ এগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। লাইব্রেরিতে প্রাচীন পুস্তকই সংগৃহীত হয়। যে সকল পুস্তক মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করে নাই—তাহাদের মধ্যে যেগুলি পুথিশালায় সংরক্ষিত হইয়াছে তাহাদেরও অতি সামান্য অংশের পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বাকী অংশের পরিচয় কত দিনে পাওয়া যাইবে বলা যায় না।

অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই সব গ্রন্থের প্রচার সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ গ্রন্থকারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহলের বাহিরে এই জাতীয় গ্রন্থের সংবাদ পর্যন্ত পৌঁছে না—গ্রন্থকার যাঁহাদিগকে পুস্তক উপহার দেন তাঁহারাও সকলে তাহা পড়িয়া দেখেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক গ্রন্থকার তাঁহার রচিত মুগ্ধবোধের টীকার নকল নেওয়ার জন্য পাঁচ টাকা করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—এই ভাবেও তাঁহার গ্রন্থ কিছু আলোচিত ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থলেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মর্মবিদারক আর কি হইতে পারে? সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ বিভিন্ন সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছে—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আধুনিক লেখকদিগকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ মৃতভাষায় রচিত সাহিত্যের পক্ষে যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব নহে—ইহা যথেষ্ট বিস্ময় ও ততোধিক কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। তবে মরা হাতী লাখ টাকা। তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাই এই প্রবন্ধে আমি তাহার যথাসম্ভব পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব। আমি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের কথা বলিব এবং প্রধানতঃ বাংলা দেশের কথাই আলোচনা করিব।

আধুনিক সংস্কৃত-সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। কেবল বেদ ধর্মশাস্ত্র দর্শন কাব্য প্রভৃতি প্রাচীন বিষয় লইয়াই ইহার কারবার নহে—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ইহার বিচিত্র বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের মধ্যে মৌলিকতার নিদর্শন দুর্লভ—চর্বিতচর্বণ পরানুকরণ বা অনুবাদই এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন গ্রন্থের টীকাটিপ্পনী ও সার সংকলন, দেশ-বিদেশের নূতন ও পুরাতন গ্রন্থের অনুবাদ বা তাৎপর্য অবলম্বন করিয়া এবং অনুকরণ করিয়া লেখা পুস্তক-পুস্তিকা লইয়া এই সাহিত্য গঠিত। প্রথম পর্যায় অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের পুস্তকগুলিই অধিকতর কৌতুককর, অথচ এগুলি মোটেই পরিচিত নয়।

প্রাচীন ধরণের গ্রন্থের মধ্যে এখানে বিশিষ্ট দুই-চারিখানির মাত্র উল্লেখ করিতেছি। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিচন্দ্রালোক বাংলার পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার কয়েক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রঘুনন্দনাদি নিবন্ধকারগণের মত উদ্ধৃত, আলোচিত এবং দরকার মত খণ্ডিত হইয়াছে। কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্নের উদ্ধারচন্দ্রিকা এবং উড়িষ্যার সদাশিব মিশ্রের কল্যাণপদ্মসর্বস্ব বর্তমানে বিশেষ কৌতুক জনক বলিয়া মনে হইবে। পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও যাঁহারা সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করিতেন, তাঁহাদিগকে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ধর্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহারাও যে সমাজে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তাহাই এই দুই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বরনাথ রাও তাঁহার স্বরচিত ধর্মশাস্ত্র বিশ্বেশ্বরস্মৃতি গ্রন্থে বর্তমান প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র অননুমোদিত আচার-ব্যবহারকেও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পিতৃপুরুষের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করাই শ্রাদ্ধ—ব্যভিচার বন্ধ করিতে হইলে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, ইত্যাদি।

খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহায়তায় রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার প্রাণতোষিণী নামে যে বিশাল তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও তান্ত্রিক-সমাজে সুপরিচিত। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় আরও কিছু কিছু গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

এই যুগে কাব্য ও নাটক লিখিয়া অনেকে পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শান্তিপুরের রামনাথ তর্করত্ন, নবদ্বীপের অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন, পাবনার অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় কবিভূষণ, কোটালিপাড়ার মহামহোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাহিরের কবিদের মধ্যে শ্রীমতী ক্ষমা রাওয়ের লেখা—একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লেখার বিষয়বস্তু আধুনিক।

ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী দুরূহ ব্যাকরণকে সাধারণের নিকট সুগম করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। বাংলা ও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাকরণ-কৌমুদীর আদর আজও অব্যাহত রহিয়াছে। ছন্দঃশাস্ত্রে বৃত্তরত্নাবলী নামক গ্রন্থে চিরঞ্জীব ভারাছন্দকেও সংস্কৃতে প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অভিধানে আধুনিক বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির অবতারণা হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এ বিষয়ে অগ্রণী বোধ হয় ১৮১১ সালে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের সহযোগিতায় রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয় রচিত শব্দাম্বুধি। রঘুমণি আরও একখানি অভিধান সংকলন করেন। ইহার নাম শব্দমুক্তামহার্ণব। ইহাই উইলসন্ প্রণীত সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানের মূল। এই প্রসঙ্গে রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম (১৮২২—১৮৫৮) ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাচস্পত্য (১৮৭৩—১৮৮৪) উল্লেখযোগ্য। শব্দকল্পদ্রুম সংস্কৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই পরম আদরের বস্তু।

বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়বস্তু ছাড়া নূতন এবং অভারতীয় বিষয়বস্তু লইয়া কয়েক শত বৎসর পূর্ব হইতেই সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। এই সব গ্রন্থের মধ্যে পারসিক ধর্মগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ প্রাচীনতম। ইহা ছাড়া, সংস্কৃতে লেখা তেলেগু, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ এবং বিভিন্ন ভাষা-গ্রন্থের টীকা এক বিচিত্র জিনিস। সংস্কৃতের সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ই যথোচিত গৌরব ও মর্যাদা লাভ করিতে পারে না—এই ধারণাই সংস্কৃত-সাহিত্যে এই সমস্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রধান কারণ। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খৃষ্টান পাদ্রিগণ বাইবেলের অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন সময়ে এই অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যদের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত পুরাণের ধরণে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টসঙ্গীতা, শ্রীযীশুখৃষ্ট মাহাত্ম্য, শ্রীপৌনচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ রচনায় মুইর সাহেবের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। ইহা ছাড়া, ব্যালেণ্টাইন্ খৃষ্টধর্মরহস্য বিবৃত করিয়া খৃষ্টধর্মকৌমুদী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অন্য নিরপেক্ষ ভাবে দেশীয় লোকের লেখা বইও পাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্বে তারাচরণ চক্রবর্তীর খৃষ্টোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম বোধ হয় ১৮৩১ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস নৃত্তোদস্তোৎস। ঐ নামেই প্রকাশিত ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা হাটনের জ্যামিতির সংস্কৃত অনুবাদ। বিট্‌ঠল শাস্ত্রীর বেকনীয় সূত্রব্যাখ্যান প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেকনের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। ব্যালেণ্টাইনের ন্যায়কৌমুদী আধুনিক বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সমূহের সার সংকলন। কথিত আছে, রাধানাথ শিকদারও ডক্টর টাইটলারের সহযোগিতায় কতকগুলি ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের কোনও বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে রচিত এই জাতীয় আরও দুইখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের নাম প্রত্যক্ষশারীর ও সিদ্ধান্তনিদান। রচয়িতা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গণনাথ সেন। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কতকগুলি মূলতত্ত্ব ইহাদের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। আয়ুর্বেদের ছাত্রগণকে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাই গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য। টোলের ছাত্রগণকে গণিত, ইতিহাস, ভূগোলের গোড়ার কথাগুলি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আরও কতকগুলি গ্রন্থ সম্প্রতি সংকলিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করিবার সুবিধার জন্য—সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতরচনার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। গৌরববোধ ও কৌতূহল—সংস্কৃতকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিবার একটা আকাঙ্ক্ষাও অনেককে সংস্কৃত রচনায় অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। দেশ-বিদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে পরস্পর হাত মিলাইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গিলক্রাইষ্ট ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য ঈশপের গল্প ও এই জাতীয় অন্যান্য গল্পের সংস্কৃত ও বিভিন্ন দেশী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঐ সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বিতর্ক-সভার আয়োজন করা হইত। এইরূপ এক সভায় মিঃ গোয়ান সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ কেরি সাহেব সংস্কৃত ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দুইটিই ছাপা হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্যাপেনার সাহেব জার্মাণ ও গ্রীক কবিদের অনেকগুলি কবিতার স্বকৃত সংস্কৃত অনুবাদ সুভাষিত মালিকা ও যবন শতক নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের এই জাতীয় রচনার মধ্যে সেক্‌স্‌পিয়রের নাটকের গল্পের, তামিল কম্প রামায়ণের, রবীন্দ্রনাথের কবিতার, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার সংস্কৃত অনুবাদ এবং আমাদের দেশের মহাপুরুষদের জীবনবৃত্ত লইয়া রচিত শিখগুরুচরিতামৃত, দয়ানন্দচরিত, তুকারাম-চরিত, সত্যাগ্রহগীতা এবং গান্ধিসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রান্তের লেখকেরা এই সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

আধুনিক ধরণের সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারবৃদ্ধি ও সংস্কৃতকে দেশ-প্রচলিত ভাষা হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া ভারতের নানা প্রান্তে নানা সময়ে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। পত্রিকাগুলির অধিকাংশই স্বল্পায়ু: বেশির ভাগই ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় প্রকাশিত। ইহাদের মূল্য যাহাই হউক না কেন, দেশের পত্রিকার ইতিহাসে ইহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। আমি এখানে কতকগুলি পত্রিকার নাম করিব। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের

উদ্দেশ্যে প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় পত্রিকার মধ্যে প্রত্নকম্রনন্দিনী, ঊষা, পণ্ডিত ও কাব্যমালার নাম করা যাইতে পারে। পাঁচমিশালি বিষয় লইয়া গঠিত পত্রিকার মধ্যে লাহোর হইতে ১৮৭১ সালে বাঙ্গালী পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত বিদ্যোদয় খুব প্রাচীন। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর চলিয়াছিল। সংস্কৃতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা বোধ হয় প্রথমে হয় কাশীতে। এখান হইতে ১৮৯১ সালে মঞ্জুভাষিণী প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই জাতীয় দুইখানি পত্রিকা প্রচলিত আছে। একখানি নাগপুরের সংস্কৃত ভবিতব্য আর একখানি অযোধ্যার সংস্কৃত সাকেত। আগাগোড়া কবিতায় পরিপূর্ণ সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা একটি অপূর্ব বস্তু। ১৯২৬ সালে ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞাপনাদি সমস্ত বিষয়ই কবিতায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে অন্য যে সমস্ত পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বা এখনও হইতেছে, তাহাদের সকলের পূর্ণ পরিচয় সংকলন করা দুঃসাধ্য। যাঁহাদের নাম জানা যায় তাঁহাদের বিবরণ দেওয়ার স্থানও এখানে নাই।

জীবনানন্দ দাশ স্মরণে

জীবনের মৃত্যু শুনি,
শুনি মৃত্যু হোল আনন্দের,
যে আনন্দ ক্লান্ত ছিল,
হাজার বছর পায়ে হেঁটে,

যে তাহারে দিয়েছিল,
শান্তিটুকু শুধু দু' দণ্ডের,
চুল যার কবে কার
অন্ধকার বিদিশার নিশা।

হাজার বছর পরে,
এক সেই বনলতা সেন
যে দিন মরণের সমুদ্র-সফেন,
টেনে নিলো ক্লান্ত আনন্দেরে।

বনলতা, ছিল কি সেখানে ?
হয়তো হতেও পারে,
হয়তো বা নয়
বনলতা আজিও জানে না।

সময়ের সহস্র বছর মাঝে
পারেনি মৃত্যুর হাত
তাহার জীবন-ভালে
এঁকে দিতে জীবনের সমাপ্তি-সঙ্কেত,

শুধু ক্লান্ত মাঝে মাঝে,
আবার বিশ্রাম পরে
পথ চলা সুরু
সবুজ ঘাসের দেশ দারুচিনি-দ্বীপে

ক্লান্ত কবি, জানি না, জানি না
কোথায় তুমি আজ
সিংহল সমুদ্রে কিংবা
অন্ধকারে সেই বিদিশার !—

—ইন্দ্রজিত্

এ পৃথিবী যেন এক আশ্চর্য কোনো নিরবধি সমুদ্র-বিস্তার
গহনাস্ত হতে সূর্যোদয় কী অগাধ !
বিস্ময়-কৌতুক দু' চোখে ঘনায় পিপাসার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গে নীল ঢেউ কানাকানি শোনার
কী সুখ নৌকার গলুয়ের গলায় হাত রেখে। আবার
কখনো বালুকাবেলায় মুঠি মুঠি তুলে
ছুঁড়ে দেওয়া কী উৎসাহে—হৃদয়ের
নিস্তব্ধ কাকলী কেউ বোঝে, বোঝে না অনেক হৃদয়।
হঠাৎ উড়ন্ত চিল : মেঘের গর্জন : দামিনী ভ্রূকুটি হানে
নৌকার টলোমলো : উদ্দাম নীল সমুদ্দুর
সুদূর শূন্যে দুর্ঘটনার কম্পন-কপোতী—
তখন মাঝে মাঝে তোমারেই মনে পড়ে, তোমার
কবিতা : কবিরের প্রজাপতি।
এখানে মৃত্যুর গন্ধ। কথা, তর্ক,
তারই অর্থ বিবাদ গৃহদাহ—
তার পর মনোদহনের পালা শেষে আলস্যের অসীম অকুতোভয়।
তবু মাঝে মাঝে মধ্য রাত্রে জেগে উঠি ঘুম ভেঙে,
আশ্চর্যের লেপ জড়িয়ে—বিছানায়
জ্যোৎস্নাকে দেখি : তুলোর পালকের মত সাদা পায়ের গোড়ালি
তুষারের টুকরো যেন গলে গলে পড়ছে তার হাসি।
তার মাঝে আবো যেন কেউ এসে দাঁড়ায় তখন :
চুলে তার নাসপাতির গন্ধ, চোখে দারুচিনি-দ্বীপের দেয়ালি
সাদা কুয়াসার ওড়নায় জড়ানো দেহ
পাখির নীড়ের মত নরম ঠোঁটের কম্পনে :
'এতদিন কোথায় ছিলেন ?' তার পরে মুখ
শ্রাবস্তীর মৌন কারুকায, আর বুক মৌচাকের মতই নরম ;
সেই ঠোঁটে সাগরের অতল তৃষ্ণা : হয়ত আর সেই বুকে।
সেই তুমি শতজীব—
অমরার সন্ধানী যার মন দু' দণ্ড শান্তির প্রতিদানে।

—পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

উদয়ভানু

গ্রীষ্মের প্রকোপে আমোদর এখন ঈষৎ ক্ষীণকায়। তবুও নদীর বেগ প্রবল, দুই কূলে যেন প্লাবনের ইশারা। জল কোথাও দুরন্ত গতিতে ধাবমান। কোথাও স্থির। কোথাও বা চক্রাকার ঘূর্ণী। নদীর মধ্যস্থলে অথৈ জল। কিনারার কাছাকাছি এক-পাল কালো হাঁস। কখনও জলে ভাসতে থাকে ঐ হংসযূথ, কখনও ঊর্মিমালায় নিশ্চিহ্ন হয় মুহূর্তের মধ্যে। শুভ্র ফেনিল আমোদরের দেহবল্লরীতে যেন কয়েকটি কৃষ্ণতিল। এই আছে এই নেই। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করছেন—কৌতূহলী মনে দেখছেন হংসবিহার। সূর্য্যের আলোয় ডানার কালো পালখ চিকচিকিয়ে ওঠে। তরঙ্গের আঘাতে অস্থির হয়ে থাকে জলচরের ঝাঁক। আমোদরের উভয় তীরে পূর্ব্বে ছিল বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ গ্রাম, নগর, হাট-বাজার। প্রতি গ্রামের সমুখে নদীর তীরে তীরে ছিল কত শত দেবালয়, দেব-দেবীর মন্দির। আমোদরের তীর তখন স্বর্গতুল্য। দুধের মত শুভ্র সুমিষ্ট জল আমোদরের বুকে। আর আজ? বিন্ধ্যবাসিনীর ভাগ্য হয়নি নদীর সেই প্রবল প্রতাপ মহিমময় রূপদর্শনের। সে আজ বহু দিনের কথা!

নদীর অপর তীরের দিগন্ত ছুঁয়ে সুদীর্ঘ এক-পাল সাদা বক উড়ে চলেছে। কোথায় চলেছে কে জানে! মানুষের মধ্যেই একতার অভাব। আকাশচারী পাখীর দল এক-দল হয়ে উড়ছে। আকাশে উড়ন্ত, তবুও ছাড়াছাড়ি নেই। যেন এক সূতোর মালা, সাদা বকফুলের। আকাশ পারাপারের তাড়ায় মালাটি বুঝি কখন ছিন্ন হয়েছে। বকফুলের একটি দীর্ঘ সারি, রেখার আকারে উড়ে যায় শ্বেতপক্ষীর সারি। সেই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। নির্ণিমেষ দৃষ্টি রাজকুমারীর ঘুম-ঘুম চোখে। বাসি কাজলের বিলীয়মান আভাষ। চোখের প্রান্তভাগে, সূক্ষ্ম সুর্মারেখার মতই ভ্রম হয়। বিন্ধ্যবাসিনীর আলুলায়িত কেশরাশি শুষ্ক, রুক্ষ। বর্ষার কালো মেঘ যেন ঈশান-কোণে। নদীতীরের এলোমেলো হাওয়ায় রাশি,রাশি কুন্তল, থেকে থেকে কাঁপছে কিশলয়ের মত।

আমোদরের তীরে আজ শুধু ধ্বংসাবশেষ! বিগত ঐতিহ্যের ভগ্নাংশ! গড়-মান্দারণে গড় নেই!

দেবালয়ের চিহ্ন নেই, আছে শুধু মন্দিরস্তম্ভ। দেব-দেবীর ভগ্নমূর্ত্তি ধূলায় গড়াগড়ি খায়। মানুষের বসতি নেই, দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদ-প্রাচীর। ঘর-বাড়ী কবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তোরণ-মঞ্চ যেমনকার তেমনি আছে। আগাছার ঘন জঙ্গল দেওয়ালের কন্দরে।

—চল্ বৌ, দীঘির জলে স্নান করবি?

শিউরে উঠলেন যেন রাজকুমারী। ভয়ে যেন শিউরে উঠলেন। একেই সরীসৃপের ভয়। সাপের ফোঁস-ফোঁস ধ্বনির মতই কি ফিস-ফিস কথা বলেছিল পরিচারিকা? ব্রাহ্মণকন্যা যশোদা।

চোখ ফিরিয়ে তাকালেন বিন্ধ্যবাসিনী। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে। ঘুম-ঘুম চোখ।

দীঘির নাম আসমান-দীঘি। জমিদার কৃষ্ণরামের প্রথম যৌবনের দিনে এই দীঘির জল ছিল নীল আকাশের মতই স্বচ্ছ। কালে-ভদ্রে জমিদার গড়-মান্দারণে আসতেন। আসমান-দীঘিতে মহাসমারোহে নৌ-বিহার চলতো দিনের পর দিন। নৌকাবিহার না নৌকাবিলাস! দীঘির অধিকাংশ এখন পানা আর শালুকে পরিপূর্ণ। যেন এক কৃষ্ণাঙ্গিনী, সবুজ ওড়নার আবরণে আত্মগোপন করেছে সলজ্জায়। দীঘির এক তীরে আছে সুবৃহৎ পাকা ঘাট। পৈঠাগুলি এখন জীর্ণ-শীর্ণ, পদার্পণে কাঁপতে থাকে বুঝি। ধাপে ধাপে ফাটল ধরেছে। দীঘির তীরে; বন্য বৃক্ষের জটলা।

দীঘির নাম আসমান-দীঘি। আকাশের সঙ্গে যে কি কোথায় যোগাযোগ কে জানে, তবে আমোদরের সঙ্গে নাকি অন্তরে অন্তরে যোগ আছে। বর্ষার দিনে দীঘির কাকচক্ষু জল আমোদরের মতই ঘোলাটে রূপ ধারণ করে। আমোদর থেকে দু'-চারটি কুমীরও তখন ছিটকে আসে দীঘিতে। জমিদার কৃষ্ণরামের নৌবিহারের ময়ূরপঙ্খী দীঘির এক তীরে বাঁধা আছে এখনও। ভগ্নপ্রায় নৌকাটিতে এখন কাক-পক্ষীর বাসা; মাছরাঙ্গা পাখীর মৎস্যশিকারের লক্ষ্যকেন্দ্র। নৌকার পাটাতন চুরি হয়ে গেছে কবে কেউ জানে না। ময়ূরমুখী নৌকার ময়ূরের সূক্ষ্ম চঞ্চু ভোঁতা হয়ে গেছে। বিলাসগৃহের জানলা-কপাট ভেঙ্গে চুরমার।

বিন্ধ্যবাসিনী ক্ষণেক চিন্তিত থেকে বললেন,—তাই চল'। আসমান-দীঘিতে ডুব দিয়ে জ্বালা জুড়াই। নানান ভাবনায় যেন অস্থির হয়ে গাছি আমি।

যশোদার মুখে সহানুভূতির স্নেহস্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে। সে কৃষ্ণরামের মনোনীত, সে আর কি বলবে! চুপচাপ থাকে যশোদা। সকরুণ চোখে তাকিয়ে থাকে।

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—দোষ কি আমার, তুমিই বল' না যশো?

—আমাকে শুধিও না কোন' কথা। তোমার দুখের কথা শুনিও না।

কম্পমান কণ্ঠে কথা বললে পরিচারিকা। বিন্ধ্যবাসিনীর বক্ষে যেন অহোরাত্র হাতুড়ির ঘা পড়ছে। মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না কারও কাছে। বুক ফেটে যায় তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। কুলীনকন্যা, রাজকুমারী থামেন না। বলেন,—আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, ধন-দৌলতের ভাগ কেন ছাড়বে তারা? তোমাদের জমিদারের দাবী অনর্থক নয় কি?

শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যের প্রতি চোখ রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে পরিচারিকা। তার মুখে কোন কথা জোগায় না। যার নুণ খায় তার গুণ না গাইতে পারে, স্পষ্টত তার বিরুদ্ধাচরণ করবে কোন্ সাহসে? কোন লজ্জায়? যশোদা বললে,—বৌ, মনে রাখতে নেই এ সব কথা। ভুলে যেতে দাও। যার কর্ম্ম সেই বুঝবে। কর্ম্মফল আছে না? অন্যায়ের জয় হয় না কোন দিন। আজও হবে না।

—তবে আমার কেন এই শাস্তিভোগ? আমার কি অপরাধ? কেন এই নির্ব্বাসন?

কথা বলতে বলতে দু' চোখ ছলছলিয়ে ওঠে বিন্ধ্যবাসিনীর। প্রখর দিবালোকে হীরকখণ্ডের মতই চোখ দুটি দ্যুতি ছড়ায়। সজল আঁখি নত করলেন তিনি। অসম্মানের লজ্জায়।

পরিচারিকা সাগ্রহে দেখেন গৃহবধূকে। অন্তর্জ্বালায় সে-ও যে জ্বলছে! তুষের আগুন জ্বলছে তারও হৃদয়ে। যশোদা যে একান্তই নিরুপায়! বুকের কষ্ট বুকেই পুষে রাখতে হয়। জিহ্বাগ্রে কত কথাই না আসে, কিন্তু কিসের সঙ্কোচ যেন তার কণ্ঠকে রোধ করে দেয়। যশোদা ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। মূক, বধিরের মত।

ক্রন্দনের বেগ সামলে বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—দয়া-মায়াও কি থাকতে নেই মানুষের? কুলীনের স্ত্রীর মিত্যুই ভাল! চিতায় উঠে তবেই তার শান্তি!

—ছিঃ, এ সব মুখে আনতে নেই বৌ! উতলা হতে নেই মেয়েমানুষকে।

সান্ত্বনা দেওয়ার সুর যশোদার কথায়। সহানুভূতির স্নেহস্নিগ্ধ মুখভঙ্গী।

—আর যে পারিনে! খানিকটে বিষ এনে দাও তুমি আমাকে। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

কথার শেষে পট্টবস্ত্রের অঞ্চলে চেপে চেপে চোখ মুছলেন রাজকুমারী। বাসি কাজলমাখা মৃগনয়ন!

কেউ কোথাও নেই। তবুও ইত-উত দেখলো যশোদা। অশ্রুসিক্ত চোখে বললে,—তার চেয়ে তোমার ভেয়েদের রাজী করাও, যদি কিছু নগদ টাকা হাতছাড়া করে। তাদের জামাইকে দেয়।

অনেক ভাবলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চিন্তাকুল থাকলেন ক্ষণকাল। বললেন,—এখানে কে কোথায় আছে! কাকে বলবো আমি? একবার যদি যেতে পাই সুতনুটীতে, তবে গিয়ে বলতে পারি। চাই কি রাজীও করাতে পারি ভেয়েদের? কিন্তু মুক্তি কোথায়? কে আমাকে যেতে দেবে? প্রহরী মোতায়েন আছে যে ফটকে।

বন্দুকধারী পাঠান প্রহরী!

এ কথার কি জওয়াব দেবে পরিচারিকা, ভেবে পায় না। করুণাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে শুধু। নির্ব্বাক, নিস্পন্দের মত।

আঁচলের আবরণ চোখে। মুখ দেখাতেও বুঝি লজ্জা পান রাজকুমারী। বলেন,—তিনি কেমন আছেন কে জানে? তাঁকে একবার দেখতে বড় সাধ হয়। কত দিন দেখিনি। তাঁর কাছে আমি চক্ষুশূল হতে পারি, তবুও তিনি আমার স্বোয়ামী, তিনি আমার ইষ্টদেব, তিনিই আমার—

মুখের কথা কেড়ে নেয় যশোদা। বলে,—একখানা পত্র লিখে দাও না তাঁকে। হপ্তায় হপ্তায় সাতগাঁ থেকে লোক আসছে, ভাঁড়ারের সামগ্রী নিয়ে। তাদের দিয়ে পাঠিয়ে দেবো'খন। কত খুশী হবেন আমাদের জমিদার।

সপ্তগ্রাম থেকে লোক আসে। আহার্য্য আসে। গোশকটে ভাণ্ডার আসে প্রতি সপ্তাহে।

চাল, ডাল, তৈল, লবণ, ঘৃত আসে। সীতাভোগ আতপ, বাঁকতুলসী আর দাদখানি চাল আসে। কলাই, বিটলী আর সোনামুগ আসে! সর্ষপ তৈল আর সৈন্ধব লবণ, আসে গব্য ঘৃত। গোযানে আসে।

এত কিছুর কি প্রয়োজন বিন্ধ্যবাসিনীর?

তার চেয়ে যদি সামান্যতম বিষ কিংবা হলাহল পাঠাতেন

জমিদার কৃষ্ণরাম! কত কাজে লাগতো কে বলবে! সপ্তগ্রাম থেকে যা যা আসে তার সকল কিছু ব্যয় হয় না। উদ্বৃত্ত থাকে। তাই ভাণ্ডারও পরিপূর্ণ ই থাকে সর্ব্বসময়ে।

রাজকুমারী বলেন,—তাঁর কাছে আমার পত্র কি মূল্য পাবে? হয়তো পাঠ করবেন না, খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেবেন।

তা-ও বটে। বললে যশোদা।

স্বামি-স্ত্রী। পুরুষ আর প্রকৃতি। বৃক্ষ আর লতা।

অভিন্ন সম্পর্কের সুসম্বন্ধ। তবে কেন এই অবহেলা, অপমান, অবিচার? বিন্ধ্যবাসিনী তবুও কেন যে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না কে বলবে? মধ্যে মধ্যে বুকের মাঝে প্রবল বাসনা জাগে, একটি বার যদি দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে। জলভরা চোখ তুলে তাকালে হয়তো সেই অশ্রুজলে তাঁর মনটি সিক্ত হতে পারে।

পুরুষ ত্যাগ করে। ভোগের পর ত্যাগ। নারীর শুধু আকর্ষণ। ঘরণী ঘর করতে চায়। হাতছানি দেয়। ডাকে অন্তরের ডাক।

সত্যিই তাঁকে একটি বার দেখতে ইচ্ছা জাগে বিন্ধ্যবাসিনীর। মধু-জোছনার রাতে শয্যায় একাকিনী হওয়ার দুঃখ কে জানবে? রাত্রির ঘুমঘোরে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, রাজকুমারী চাঁদের আলোয় যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন, তিনি এসেছেন। এসে দাঁড়িয়ে আছেন শিয়রের কাছে। কত রাতে দেখেছেন বিন্ধ্যবাসিনী!

সেই সুগঠিত সবল শরীর। ঈষৎ স্থূলকায়, কিন্তু কিঞ্চিৎ লম্বা ছাঁদের জন্য স্থূল বোধ হয় না। চুলে কোন বিন্যাস নেই, মাথায় শিখা। বর্ণ শুভ্র। পরিধানে লাল চেলীর ধুতি-চাদর। কানে সোনার কুণ্ডল, কণ্ঠে সোনায়-গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হস্তে সোনার ইষ্টকবচ, রূপার বলয়, রত্নাঙ্গুরীয়। বাম হস্তে সোনার তাগা। কোমরে রূপার বিছা। পায়ে শিশু-কাঠের খড়ম। কপালের মধ্যস্থলে চুয়া ও চন্দনের মঙ্গল-তিলক।

জমিদার কৃষ্ণরাম স্বয়ং এসেছেন! রাজকুমারীকে স্বহস্তে মুক্তি দিতে এসেছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর পরম পুরুষকে দেখে প্রসারিত করেছেন শুভ্র বাহুযুগল। আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু—

কাকজ্যোৎস্নার উজ্জ্বল সোনালী আলোয় কি দেখতে কি দেখেছেন রাজকুমারী! দৃষ্টির বিভ্রমে হয়তো ভুল দেখেছেন।

—চল্ বৌ, স্নান সেরে আসি আসমান-দীঘিতে। বেলা আর নেই।

মনে উত্তাপ। মনস্তাপের আগুনে যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে। একটি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভূমি-আসন ত্যাগ করলেন ধীরে ধীরে। বললেন,—যশোদা, আসমান নাম আর শুনিও না আমাকে। দোহাই তোমার।

দোষ করেছে পরিচারিকা। সঙ্কোচ নামে তার দুই চোখে। উচ্চারণ করেছে এমন একটি নাম, যে-নাম কানে তুলতে চান না বিন্ধ্যবাসিনী। আসমানের নাম।

—ক্ষমা কর বৌ! ভুল হয়েছে আমার। সলজ্জায় বললে যশোদা। অপ্রতিভ কণ্ঠে।

আসমান-দীঘির আসমান ছিল মুসলমানী। জমিদার কৃষ্ণরামের প্রথম যৌবনের লীলাসঙ্গিনী সে। চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ মত যে কোন নারীর কানে 'হরিনাম' শুনালে আর গলায় তুলসীর মালা পরালেই সেই নারী বৈষ্ণবী হয়। আসমান ছিল মুসলমানী। তার সঙ্গে একত্রে বসে পানাহার দুষ্য, তাই কৃষ্ণরাম আসমানের কানে হরিনাম বর্ষণ করে-ছিলেন। অকালে নাকি মৃত্যু হয় সেই মুসলমানী বৈষ্ণবীর। কৃষ্ণরামের কোন্ এক প্রতিদ্বন্দ্বী তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল আসমানের দেহ। গভীর নিশীথে ছদ্মবেশে কে প্রবেশ করেছিল আসমানের ঘরে? ক্রোধ আর আক্রোশে পরম নির্দ্দয়ের মত তরোয়াল চালিয়েছিল?

জমিদার কৃষ্ণরাম তখন ছিলেন সপ্তগ্রামে। জমিদারীর প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। আসমানের অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ শুনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন মনে মনে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও হত্যাকারীর সন্ধান মেলেনি।

সেই মুসলমানী বৈষ্ণবীর স্মৃতি অক্ষয় থাকবে। শোকার্ত্ত কৃষ্ণরাম তাই এই দীঘির নাম রাখেন আসমান-দীঘি।

এই নামটি কানে শুনলে আর স্থির থাকতে পারেন না বিন্ধ্যবাসিনী। কেমন যেন জ্বালা ধরে বুকে। অসহ্য এক জ্বালা!

রুক্ষ কেশের রাশি ছড়িয়ে রাজকুমারী দীঘির ঘাটে চললেন। শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে চললেন মন্থর গতিতে। পাছে পাছে চললো যশোদা। প্রহরীর মত। পরিচারিকার হাতে তৈলপাত্র ও গামছা।

যেতে যেতে রাজকুমারী বলেন,—যশো, আমার মাকে বড় দেখতে সাধ হয়। কত দিন মাকে দেখতে পাইনি তার ঠিক নেই। কেমন আছে কে জানে?

—আহা!

বললে যশোদা। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে,—কি করবে বল' বৌ! মন শক্ত কর'। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আজই না হয় আমাদের জমিদার বিরূপ হয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁর কি মনোভাব হয়, কে বলতে পারে?

এ কথার কোন প্রত্যুত্তর দেন না বিন্ধ্যবাসিনী। যেমনকার তেমনি চলেন; ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে। কৃষ্ণরামের এই আবাসগৃহ একেই জরাজীর্ণ, ভগ্নপ্রায়। অপরিচ্ছন্ন। আবর্জ্জনা যেখানে-সেখানে। আগাছা আর জঙ্গল। তদুপরি সরীসৃপের ভয়।

পদশব্দ পেয়ে দীঘির পথের লম্বমান দালানের শেষ প্রান্ত থেকে কয়েকটি তক্ষক ছুটে পালায়। ভয়ে যেন

জড়সড় হয়ে আছেন বিন্ধ্যবাসিনী। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে চলেছেন।

পরিচারিকারাও নয়নগোচর হয় ঐ তক্ষক-পাল।

যশোদা বলে,—কপালে দু'হাত ছুঁইয়ে পেরণাম কর' বৌ। তক্ষক দেখা যায় না যখন-তখন। বাসুকির সহোদর ভাই ঐ তক্ষক। অর্জ্জুনের ছেলে অভিমন্যু, অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিৎ। সেই পরীক্ষিৎ ব্রহ্মহত্যা করেন, তক্ষক তাঁকেই দংশন করেছিল।

বিন্ধ্যবাসিনীর যুক্তকর কপাল স্পর্শ করে। শিউরে শিউরে ওঠেন যেন তিনি। গায়ে কাঁটা দেয়। নিবিষ্টচিত্তে ছিলেন তিনি, সুতানুটীতে ফেলে-আসা মায়ের চিন্তাতে বিভোর হয়ে ছিলেন। তক্ষকের ইতিবৃত্ত শুনে ভয় হয় তাঁর। মৃত্যু-ভয় নয়, দংশন-জ্বালার ভয়। আর কি বিকট ভয়াবহ রূপ ঐ তক্ষকের! কি বিশ্রী!

সুতানুটীর মধ্যাকাশ থেকে সূর্য্য তখন হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে।

গ্রীষ্মের আতিশয্যে কুঠরীতে সিঁদিয়েছেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। হিমশীতল কুঠরী। দিনমণির অগ্নি-আলো প্রবেশের কোন পথ নেই সেখানে। আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। তাই কুঠরীর দেওয়ালে দেওয়াল-গিরি জ্বলছে দিনমানে। রাজপুরীর বিনা অনুমতিতে, রাজা বাহাদুরের অগোচরে কন্যার শুভাশুভ জানতে চেয়ে সামান্য একজন লেঠেলকে সপ্তগ্রামে পাঠিয়েছেন রাজমাতা। সেই কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশঙ্কর। ভাল-মন্দ কথা বলে গেছেন বিলাসবাসিনীকে। কত তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে গেছেন। সেই দুঃখে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন রাজমাতা। সকলের অলক্ষ্যে কাঁদছিলেন উপাধানে মুখ রেখে। চোখ ঢেকে।

দু'জন দাসী ছিল পায়ের দিকে। রাজমাতার পদসেবায় রত ছিল।

অন্য দিন এমন সময়ে বিলাসবাসিনী বলতেন,—দাসী, একটা গল্প শোনা দেখি।

গল্প বলতে হয় দাসীদের। দাসী গল্প বলে আর রাজমাতা শোনেন। কোন কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করেন। থামতে দেন না, যে গল্প বলে তাকে। কোন কোন দিন শুনতে শুনতে কখন নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েন। রাজমাতাকে নিদ্রামগ্ন রেখে পালায় দাসীরা। পদসেবায় ফাঁকি দিয়ে পালায়।

আজও গল্প বলছিল একজন দাসী। দাসী জানে না আজ আর গল্প শোনার মন নেই রাজমাতার। মাতায় পুত্রে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে। ঝগড়া হয়েছে মায়ে-ছেলেয়। এই খানিক আগে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে। অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কথা বলেছেন ছোটকুমার কাশীশঙ্কর। কড়া কড়া অনেক কথা বলে গেছেন।

বিলাসবাসিনী তাই উপাধানে মুখ রেখে, চোখ ঢেকে সকলের অলক্ষ্যে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। বক্ষসুধা পান করিয়ে যাকে লালন পালন করেছেন সেই বলে গেল কিনা আঁকা-বাঁকা কথা! ঘর ব'য়ে অপমান করে গেল!

দাসী বলছিল,—দক্ষমুনি যাগ করলেন, দেবযাগ করলেন, সকল দেব-দেবীকে ডাক পাঠায়ে শঙ্করকে আর ডাকলেন না। বাপ যজ্ঞি করছে শুনে সতী শিবের কাছে গিয়ে বায়না ধরে। শিবঠাকুরের একেই তিন চক্ষু! বিনা আমন্তনে সতী বাপের বাড়ী যেতে চায় দেখে শিবের তিন চোখ বেয়ে আগুন ঠিকরোতে লাগে। সতী বললে, বাপের ঘরে আবার কন্যার আমন্তন কি? শিবঠাকুর আপত্তি করছে দেখে সতী ক্রোধে মুক্তকেশী কালীর করাল কালো রূপ ধারণ করলে। প্রথমে ধরলে শ্মশানকালীর রূপ! শ্মশানে শবের গাদায় বসে থাকে সতী, গলায় মুণ্ডুমালা, রক্ত ঝরছে মুণ্ডুমালা থেকে। বাম হাতের করতলে একটা কাটা মাথা! এক হাতে খড়্গ। দক্ষিণের দু' হাতে অভয় বর। লকলকে জিব থেকে তাজা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সতীর শ্মশানকালী রূপ দেখে শিবঠাকুর ভয়ে মুখ ফেরায়।

বিলাসবাসিনী শুনছেন কি শুনছেন না।

অন্যান্য দিন গল্প শুনতে কত আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলতে বলতে মুহূর্ত্তের জন্য বিরত হলে কত বিরক্ত হন! দাসীদের শ্বাসত্যাগের ফুরসৎ মেলে না। একটি কাহিনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাহিনী বলতে হয়। দেব-দেবীর আখ্যান, রূপকথার কাহিনী, রাজা বাদশার উপাখ্যান, সত্যিকার গল্প—যেদিন যেমন খুশী হয় তেমন শুনতে চান! পদসেবা করতে করতে গল্প বলে দাসী। কোন দিন পলকহীন চোখে, ব্যাকুল-মনে শুনতে থাকেন। কোন দিন গল্পের মধ্যপথেই হয়তো নিদ্রায় অচেতন হন! দিবানিদ্রায়।

আজ ঠিক বোঝা যায় না, রাজমাতা শুনছেন কি শুনছেন না।

উপাধানে মুখ রেখে, চোখ ঢেকে, ফুঁপিয়ে উঠছেন থেকে থেকে। সজল চোখ রাজমাতার, লজ্জায় যেন লুকিয়ে আছেন। দাসীর কথায় কর্ণপাত করছেন না। অভিমানিনীর মত মুখ ফিরিয়ে আছেন যেন। কখনও দর-দর বেগে অশ্রুপাত করেন। কখনও মনে মনে খতিয়ে নেন জামাতার দাবী-দাওয়া। হিসাব করেন। হিসাব কষেন। কি অন্যায় কৃষ্ণরামের! দাবী তাঁর কত!

ছোটকুমার কাশীশঙ্কর বলে গেছেন,—কিছুই পাবে না কেষ্টরাম। এক কপর্দ্দকও নয়! যতক্ষণ আমার তরবারি চালনার শক্তি থাকবে ততক্ষণ সে দুরাচারীকে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েই থাকতে হবে। সম্মুখ যুদ্ধে সে যদি আমাকে পরাস্ত করতে পারে কোন দিন, তবেই তার দাবী স্বীকৃত হবে, নতুবা নয়। ঐ কেষ্টরামকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করবো! ভূগর্ভে প্রোথিত করবো!

কথা বলতে বলতে কুঠরী ত্যাগ করেছেন কাশীশঙ্কর। ক্রোধের আতিশয্যে শরীর তাঁর রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল! তাঁর সজোর কণ্ঠস্বরে কুঠরী গমগম করছিল। যেন এক আগ্নেয়গিরির ধূমানল বিস্ফোরিত হতে দেখছিলেন বিলাসবাসিনী। চোখ দু'টি তাঁর ঝলসে গেছে যেন সেই উত্তাপে। কর্ণকুহরে যেন ঘন ঘন বজ্রপাতের শব্দ পৌঁছেছে।

কৃষ্ণরামের দাবী কি পর্ব্বতপ্রমাণ!

মনে পড়লে যে হৃৎকম্প হয় রাজমাতার! অগ্রে যৌতুক দিতে হবে পঞ্চ সহস্র মোহর! স্বর্গত রাজার সঞ্চিত ও রক্ষিত হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ উপঢৌকন দিতে হবে! তৎসহ এক শত অশ্ব ও বিংশতি হস্তী উপহার চাই! একমাত্র কন্যা রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর মুক্তিলাভের কোন পথই দেখতে পান না রাজমাতা।

তাই নিরুপায়ের মত উপাধানে মুখ রেখে, চোখ ঢেকে অশ্রুপাত করেন অবিরাম।

অত্যাচারক্লিষ্ট মলিন মুখ বিন্ধ্যবাসিনীকে বার বার মনে পড়ে তাঁর। মেয়ের আকুল কণ্ঠের চীৎকার যেন কানে শোনেন অহরহ। জামাই যে বেঁধে রেখেছে তাঁর কন্যাকে। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে দড়া-দড়ির নিষ্ঠুর বন্ধনে!

দাসী আজ আর ফাঁকি দেয় না।

কুঠরীর অভ্যন্তরে অশান্তির ছায়া দেখে, রাজমাতাকে কাতর দেখে, দাসী আজ আর থামে না। পদসেবা করতে করতে দাসী বলছিল,—শ্মশানকালীর রূপ থেকে তারার রূপ ধারণ করেন সতী। নীল বরণ, লোল জিব, করাল বদন। সতীর জটাজুট কেশে সাপের বাসা। পরনে বাঘছাল—

সহসা উন্মাদিনীর মত ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বিলাসবাসিনী।

সজল লাল দীর্ঘ আঁখি মেলে ধরলেন দাসীর দিকে। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,—আমি শুনতে চাই না! দাসী, তুই থামবি কি না বল্?

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ যেন রাজমাতার। কেন কে জানে, হয়তো কন্যার কথা ভেবে ভেবে হঠাৎ ভীত হয়ে পড়েন বিলাসবাসিনী। দক্ষ-কন্যার কাহিনী আর শুনতে চান না। দাসীর মুখ চেপে ধরেন নিজের হাতে। বলেন,—দাসী, তুই থাম্! বিদেয় হ'! বেরিয়ে যা কুঠরী থেকে!

দাসী তো অবাক! রাজমাতার কাণ্ড দেখে প্রায় হতজ্ঞান।

অত-শত বোঝে না দাসী। কোথা থেকে কি হয় কিছু বোঝে না। অপমানের সুরে বিদায় হয়ে যাওয়ার কঠোর নির্দ্দেশ পেয়ে মনের দুঃখে ম্লান মুখে কুঠরী থেকে বেরিয়েই যায় দাসী। কি দোষে যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, বোঝে না কিছুতেই। দক্ষকন্যার কাহিনী বলছিল দাসী, রাজকন্যার কথা তো বলেনি! রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর কাহিনী। দাসী শুধু এইটুকু বুঝেছিল, রাজমাতা দুঃখ পেয়েছেন। মনে ব্যথা পেয়েছেন অসীম। ছোটকুমারের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়েছেন!

কাশীশঙ্কর তেমন মানুষ নন যে কাকেও ব্যথা দেবেন। অন্ততঃ রাজমাতাকে।

নিজের মহলে ফিরে গিয়ে মহলের অন্দরে আর প্রবেশ করতে পারেন না কাশীশঙ্কর। প্রধান তোরণ অতিক্রম করেন কোন মতে। হয়তো অনুশোচনায় কপালে করাঘাত করেন বার দুই। মাতৃচক্ষে কি অশ্রুর চাকচিক্য দেখলেন কাশীশঙ্কর? মা কি তাঁর কাঁদলেন মনোব্যথায়? ধূমায়মান ও প্রজ্জলিত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে বিরতি পড়ে। শান্ত হয় অগ্নিগিরি। দ্রুত পদক্ষেপে আরও কিছু দূর অগ্রসর হন কাশীশঙ্কর। অন্দরের আঙিনায় পৌঁছে এক নিম্ববৃক্ষের ছায়াতলের শিলাসনে বসে পড়েন। দুই হাতের 'পরে রাখেন অবনত মাথা।

বেলা কত হয়েছে, তবুও আজ এখনও ছোটকুমারের দেখা নেই, সেই দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে তোরণ-পথে চোখ রেখে অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন কাশীশঙ্করের ধর্ম্মপত্নী। শ্বেতপ্রস্তরের এক জাফরি-জানলার অন্তরালে ছিলেন মহাশ্বেতা।

প্রথম দর্শনে নিজের চোখ দু'টিকে বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি।

এমন দুর্ভাগ্য হবে কেন যে, কাশীশঙ্কর নিমগাছের ছায়াতলের শিলাসনে এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করতে বসবেন! একি দুর্লক্ষণ!

মহাশ্বেতার দুই নয়নের পল্লব পড়ে না। ঘোর বিস্ময়ে যেন অভিভূতা হন ঐ অবরোধবাসিনী। শ্বাস যেন তাঁর রুদ্ধ হয়ে যায় ক্ষণেকের মধ্যে। জাফরি-জানলায় দেহের ভর রেখে কোন মতে সামলে নেন নিজেকে। এ কোন' ব্যাধি না ব্যথা? মস্তকে হাত কেন মহাশ্বেতার পুরুষ-প্রতিমের!

ধীরে ধীরে আঙিনায় দেখা দিলেন মহাশ্বেতা।

দুগ্ধফেননিভ শুভ্র মসলিন-সাড়ীর অঞ্চল সামলে আঙিনায় পা দিলেন। মহাশ্বেতার পায়ে ঝাঁজর। মুহুর্মুহু ঝঙ্কার তুললো। ঝন-ঝন শব্দ। অন্তরের অঙ্গনে আছে অনাবিল ছায়া। বৃক্ষের সমারোহ এখানে। নিম্ব ও ঝাবুক। নিম আর ঝাউ গাছের শাখায় শাখায় শালিকের কলকাকলী।

মহাশ্বেতার ঝাঁজরের শব্দে এক ঝাঁক শালিক আকাশে উড়ে পালায়, এক ঝাঁক তীরের মত।

—কুমারবাহাদুর!

নম্র ধীর কণ্ঠে ডাকলেন মহাশ্বেতা। মধুমিষ্ট কণ্ঠে।

কাশীশঙ্কর মাথা তুললেন। চোখ তুললেন। মহাশ্বেতার আকর্ণবিস্তৃত চোখে চোখ রাখলেন। পলকহীন রক্তবর্ণ চোখ।

—অসুস্থ?

ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন মহাশ্বেতা! তাঁর পটলাকৃতি চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কপালে অল্প কয়েকটি কুঞ্চিত রেখা, স্খলিত কুন্তলের আড়ালে।

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে থাকেন কাশীশঙ্কর।

বলেন,—না, অসুস্থ নয় রাতরাণী। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত আমি। দ্রুত অশ্বচালনায় ক্লান্ত।

আকাশের বিদ্যুতের মত চমকে উঠলেন যেন মহাশ্বেতা।

নিমেষের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অন্দরে ফিরলেন এক দৌড়ে। পায়ের ঝাঁজর ঝনঝনিয়ে উঠলো। এক সুমিষ্ট রাগের দ্রুত ধ্বনি বেজে উঠলো যেন চকিতের মধ্যে। কোন্ এক বাদ্যযন্ত্রের দ্রুতলয়!

এক ঝাঁক নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক, চড়াই আকাশে উড়লো সেই শব্দে। কাশীশঙ্কর ঐ ধাবমানাকে দেখলেন এক দৃষ্টে। মহাশ্বেতা বিদ্যুৎলতার মত যেন ছুটছেন! বিমুগ্ধ চোখে দেখেন ছোটকুমার। শুভ্র দিনের আলোয় শুভ্র মসলিনের কি অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য! রূপালী জরির অঞ্চল যেন রাশি রাশি রৌপ্যচূর্ণ ছড়ায়।

গ্রীষ্মের খররৌদ্রে অশ্বচালনা করেছেন কাশীশঙ্কর। দ্রুততম বেগে গেছেন। এসেছেন।

কালীঘাটের পথ ধ'রে গিয়েছিলেন গোবিন্দপুরে। ইংরেজের কুঠিতে। ইংরেজের বেতনভুক দেশীয় প্রতিনিধি রামনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তার দেখা পাওয়া গেছে। এক ডাকেই সাড়া দিয়েছে সে। এক ডাকে বেরিয়ে এসেছে কুঠির ভেতর থেকে। রামনারায়ণের পায়া এখন ভারী, তবুও ছোটকুমারকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছে। মান রক্ষা করেছে কাশীশঙ্করের।

বিনিময়ে তৎক্ষণাৎ পেয়েছে মুক্তামালা। লাল মুক্তার মালা। পুরস্কার।

মহাজনের কারবার করবেন ছোটকুমার। ব্যবসা করবেন। এককে একশো করবেন! টাকা খেলিয়ে টাকা করবেন। জলে জল বাঁধবেন। পথ দেখাবে, সহায়তা করবে ঐ রামনারায়ণ শেঠ। শোনা যায়, শেঠ নাকি এখন ইচ্ছা করলে ফকিরকে বাদশা বানাতে পারে। আবার যার আছে ভুরি ভুরি, তাকে রাতারাতি পথের ভিখারীতে পরিণত করতে পারে। কেবলমাত্র রামনারায়ণের যৎকিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারলে বহু লাভ।

কাশীশঙ্করের জাগ্রত চোখে সেই অনাগত দিনের সুখস্বপ্ন। জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখেন।

স্বপ্ন দেখেন, তিনি একজন বিরাট মহাজন হয়েছেন, ব্যবসার বাজারে। লক্ষ লক্ষ টাকা খেলাচ্ছেন। কাঁচা মালের ব্যবসায়। বাজার-দর খতিয়ে মাল ছাড়ছেন, চেপে রাখছেন।

স্বপ্নকে সার্থক করবেন কাশীশঙ্কর। নিমগাছের ছায়ায়, শিলাসনে ব'সে আরেক বার শপথ করলেন মনে মনে। পণ করলেন। সহাস্যে।

সমুদ্রপারে চালান দেওয়ার জন্য, স্বদেশে সরবরাহের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন ইংরেজের। যে যত পারে দাও, খালি জাহাজ দেশে ফিরবে না, জাহাজ-ভর্ত্তি পণ্য চাই। বঙ্গের আর উড়িষ্যার পণ্যদ্রব্য।

লবণের চাঁই আছে? সল্ট্-পিটার? যত দেবে তত নেবো।

লাক্ষা আছে? আছে তামা, শিশা, টিন? শোরা আর হরিতাল আছে? আফিম? যার কাছে যা আছে দাও। যত পারো দাও। দাও, আর সমুচিত মূল্য বুঝে নাও। যব, সুপারী, চিনি, শুকনো আদা আর সরিষার তৈল আছে? ছিটে-ফোঁটা নয়, পূর্ণকুম্ভ চাই। তামাকের পাতা আর মৌচাকের মোম আছে? টোবাকো লীফ্ এণ্ড্ বী-ওয়াক্স্! বড় বেশী দুষ্প্রাপ্য! স্কেয়ার্শ! ভেরী ভেরী স্কেয়ার্শ!

—কুমারবাহাদুর!

মহাশ্বেতার অন্তরের আহ্বান শুনলেন যেন কাশীশঙ্কর। দুই হাতের পরে পুনরায় মাথা রেখেছিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছেন অত্যন্ত। পথশ্রমে যত না ক্লান্ত হয়েছেন ততোধিক উত্তেজিত হয়েছেন। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর সঙ্গে বাক্যদ্বন্দ্ব হওয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিলেন যেন। কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে।

রক্তাভ চোখ মেললেন কাশীশঙ্কর। মহাশ্বেতার ডাকে।

রাণী বললেন,—শুধু পানীয় নয়। দু'চার খণ্ড সন্তানিকা খাও। তোমার এক প্রিয় সুখাদ্য। বেলা এখন অনেক। নাগরঙ্গের পানীয় খাও, পিত্ত নাশ হবে।

কাশীশঙ্কর তৃষ্ণার্ত্ত। ক্ষুধার্ত্তও বটে।

মুখের কাছে আহার দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন ছোটকুমার। পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন। সোনার থালিকায় দুগ্ধশুভ্র সন্তানিকা। কষ্টিপাত্রে নাগরঙ্গের পানীয়।

পাত্র দু'টি শিলাসনে রাখেন মহাশ্বেতা। নামিয়ে রাখেন হাত থেকে।

ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে খুশীর হাসি যেন মোছে না। সত্যিই কাশীশঙ্কর ক্ষুধা বোধ করছেন। সমুখে এমন সুখাদ্যের ডালি দেখে রসনা বুঝি সিক্ত হয় তাঁর।

ব্যাধি নয়, ব্যথাও নয়। কাশীশঙ্করের মুখে হাসি দেখে চিন্তামুক্ত হয়েছেন মহাশ্বেতা।

হৃদয়ের কম্পন এতক্ষণ থেমেছিল যেন। ভয়ে আর ভাবনায়। একটি বুকভরা শ্বাস ফেললেন মহাশ্বেতা। কোথাও যদি কেউ থাকে, দাসী-ভৃত্য লুকিয়ে যদি কেউ দেখে, তাই সলাজে গুণ্ঠন টানলেন সামান্য। মুখ ঢাকলেন। কপালের পরে নেমে-আসা চূর্ণকুন্তল গুণ্ঠনের আবরণ মানতে চায় না। কর্ণভূষার আভা লুকোয় না। চুনী আর পান্নার কান আছে কানে। কুচো মুক্তার ঝারি-দেওয়া ঝুমকো ঝুলছে কান থেকে।

সোনার থালিকা বুঝি উজাড় হয়ে যায়। সন্তানিকা শেষ হয়ে যায় পলকের মধ্যে। সর-ভাজা ফুরিয়ে যায়। ঘিয়ে-ভাজা সর, ছোট-এলাচের দানা ছড়ানো।

—আহা!

অবশেষে পানীয় মুখে তুলেছেন। কষ্টিপাত্র। নাগরঙ্গের

পানীয় সেই গুরুভার পাত্রে। কাশবিনাশক, পিত্তনাশক, অন্তঃকরণের প্রাশস্ত্যকারী নাগরঙ্গ লেবুর সুগন্ধি পানীয়। কিঞ্চিৎমাত্র পান করার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি সহকারে কাশীশঙ্কর বললেন—আহা!

মহাশ্বেতা আরেকটি বুকভরা শ্বাস ফেললেন! আনন্দের ছোঁয়া লাগলো যেন তাঁর মনে।

মহাশ্বেতাও হাসলেন এতক্ষণে! হাসিমুখে শুধোলেন,—কুমারবাহাদুর, যাত্রা সার্থক হয়েছে? যার খোঁজে যাওয়া, দেখা মিলেছে তার?

পানীয়ের পাত্র নিঃশেষ করলেন কাশীশঙ্কর। প্রায় মুহূর্ত্তের মধ্যে।

আকণ্ঠ পান করলেন যেন পরম তৃষ্ণায়। কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসলেন। বললেন,—ঠিক এই ক্ষণেই ব্যক্ত করতে চাই না।

মহাশ্বেতা হেসে হেসে বললেন,—তবুও বল'।

—না। বললেন কাশীশঙ্কর। মুচকি হাসলেন। বললেন,—তুমি যে রাতরাণী, গহন রাত্রে কথা হবে তোমার সহ। দিবালোকে নয়।

অগত্যা আর অনুরোধ করলেন না। হেসে হেসে মেনে নিলেন স্বামীর কথা। কেন কে জানে, রাতরাণী ডাকটি শুনলে গর্ব্বে যেন বুক ফুলে ফুলে ওঠে মহাশ্বেতার। এত মধু বুঝি আর অন্য নামে নেই। এ নামে যে আর কেউ কখনও ডাকলো না! নামে কত মধু!

সলজ্জায় ইদিক-সিদিক দেখতে থাকেন মহাশ্বেতা।

কেউ দেখলো না তো! কেউ শুনলো না তো! সমগ্র পৃথিবীর কাছে গোপন থাক এই নাম, কেউ যেন না জানে। না শোনে কখনও। জানাজানি থাক শুধু দু' জনার মধ্যে। দু'জন সুজনের অন্তরে অন্তরে।

—তোমাকে সত্যকার রাণী করবো রাতরাণী!

কি আনন্দে বলে ফেললেন কাশীশঙ্কর। কোন্ এক সুখের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার ইঙ্গিত দেখলেন তিনি! তারপরই যেন কথাগুলি বলে ফেললেন মুখ ফসকে! কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের তর্জ্জনী দংশন করলেন নিজের। কথাটি ঠিক এই মাত্র বলা যেন উচিত হ'ল না। তবুও কি আনন্দে মনের ভাবটি ব্যক্ত করে দিলেন।

গর্ব্বে উঁচু বুক মহাশ্বেতার। ঠোঁটে যেন অফুরন্ত হাসি! মিশি-মাখানো দাঁতের সারি দেখা যায় থেকে থেকে। গভীর লাল অধরে মৃদু-মন্দ হাসি নাচানাচি করে! কি যেন বলতে চান মহাশ্বেতা। আরও কি যেন শুনতে চান!

বৃক্ষের ছায়া দেখে সূর্য্যের গতি নির্ণয় করেন কাশীশঙ্কর! দিনের গতি লক্ষ্য করেন। বলেন,—স্নানাহারের সময় যে যায়! আমার জন্য তুমি এখনও অভুক্ত আছো রাতরাণী?

নীরব হাসি হাসেন মহাশ্বেতা। তিনি এখনও অভুক্ত, উপোসী, কে বলবে! মুখে তার কোন চিহ্ন নেই! মুখে শুধু অম্লান হাসি। যেন কোন দিন এ হাসি মিলাবে না!

মহাশ্বেতা বললেন,—কুমারবাহাদুর, যাও, স্নানার্থে যাও। আর বিলম্ব নয়। কথা বলতে বলতে তিলেকের জন্য হাসি গোপন করে বললেন,—আমার বুঝি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই?

কৌতুকমিশ্রিত হাসি ফুটলো কাশীশঙ্করের ওষ্ঠপ্রান্তে। এ কথার প্রত্যুত্তর দিলেন না কোন'। মহাশ্বেতার আকর্ণবিস্তৃত চোখে চোখ রেখে হাসলেন মৃদু মৃদু। কেমন এক অজ্ঞেয় রহস্যের হাসি! শিলাসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। বললেন,—আমি বেশ পরিবর্ত্তন করে আসি। স্নান শেষ করে আসি। অতি শীঘ্র ফিরবো। রাতরাণী, আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর তুমি।

কথা বলতে বলতে চললেন কাশীশঙ্কর। দীর্ঘ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে চললেন।

সদর মহলের খাসকামরায় চললেন। বেশভূষা পরিবর্ত্তন করতে হবে। বহুমূল্য রত্নাভরণ, যেখানে-সেখানে ত্যাগ করা যায় কি?

দাস-ভৃত্য সকলেই আছে। খানসামা-তাঁবেদারও আছে।

কিন্তু কারও যে সাহসে কুলায় না কাশীশঙ্করের সম্মুখে আসতে! না ডাকতে আসবে! সাড়া দেবে না ডাকতেই?

গলা ছেড়ে কে এখন ডাক দেয়? কে এখন চীৎকার করে? একেক জনের নাম ধ'রে কে এখন ডাকে? কিন্তু শুধু ডাক দেওয়ার অপেক্ষায় আছে, যত সেবক-ভৃত্য। ডাক শুনলেই আসবে দুড়দাড়িয়ে! পর পর তিনবার কুর্ণিশ করে দাঁড়াবে। ঘুরবে ফিরবে পায়ে-পায়ে। পান আর তামাক ব'য়ে ব'য়ে ফিরবে ফরসি আর নল!

সদরের খাসকামরায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝুলন্ত ছোট ঘড়ি পিটতে থাকেন কাশীশঙ্কর। একবার, দু'বার, তিনবার—

ব্যস, আর ডাকতে হবে না। ঘড়ি পিটতে হবে না আর অযথা।

কাশীশঙ্করের খাস-কামরা মোগলাই বৈঠকখানা বৈ কিছুই নয়। হিন্দুরীতির সঙ্গে ইরাণী রীতি মিশেছে এখানে। দক্ষিণমুখী এই কক্ষের চন্দ্রাতপ থেকে ঝুলছে নানা রঙের বেলোয়ারী ঝাড়। মেঝেয় পারশ্যের রঙীন গালিচা! লতাপাতা ফলফুলের নক্সা-কাটা। দেওয়ালে দেওয়ালে মোগল-চিত্র! বাদ্‌শা আর বেগমের ছবি। এক দেওয়ালের কুলঙ্গীতে কষ্টির লক্ষ্মীমূর্ত্তি। বঙ্গভাস্কর্য্যের এক টুকরো নমুনা। লক্ষ্মীর মুখে যেন হাসি মাখানো।

দক্ষিণ-খোলা ঘর। বৈশাখী দিনের তপ্ত বাতাস আসে বাতায়ন-পথে। আগুনের লেলিহান শিখা যেন অঙ্গে অঙ্গে পরশ বুলায়! কাশীশঙ্কর বললেন,—কামতার, জানালায় কপাট দাও! বদলের পোষাক দাও।

ঘড়ির আওয়াজ শুনে অন্য কেউ আসতে সাহস পায়নি। কামতার খাঁ এসেছে। ছোটকুমারের পেয়ারের খানসামা! ডাক শুনে এসে কক্ষের দ্বারে দাঁড়িয়ে কামতার খাঁ সব প্রথম

পর পর তিনবার কুর্নিশ ঠুকেছে। তার পর কক্ষাভ্যন্তরে এসে দেখা দিয়েছে কুমারকে।

জানালায় কপাট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তদ্বারের অল্প আলোয় ঘরের মধ্যে অরণ্যচারী পশুদের চোখ জ্বলতে থাকলো। আগুনের কতকগুলি বিন্দু, ঠিক অন্ধকারে আকাশের তারার মত জ্বল-জ্বল করে। কক্ষের কোণে কোণে লোলুপ চোখে দাঁড়িয়ে আছে চিতাবাঘ, ভল্লুক আর বন্য মহিষ! শিকার ধরতে ওৎ পেতে আছে যেন!

যৌবনের প্রথম উদ্দামতায় অস্ত্র-সাহায্যে ওদের হত্যা করেছেন কাশীশঙ্কর। এখনও যেন ঐ পাশব চোখে তাই প্রতিহিংসার কুটিল দৃষ্টি। নেহাৎ ওদের হৃদয়ের স্পন্দন নেই তাই রক্ষা! তেজ নেই দেহে, শক্তি আর সামর্থ্য নেই—চর্মের আবরণের ভিতর শুধু খড় আর খড়!

পোষাক-বদল শেষ হতে না হতে ঐ কুলঙ্গীর দিকে অগ্রসর হন কাশীশঙ্কর। মূর্ত্তির পদতলে মাথা রাখেন। চক্ষু মুদিত করেন। কি যে বলেন মনে মনে, কেউ শুনতে পায় না। হাস্যময়ী লক্ষ্মী শুধু হাসেন।

কাশীশঙ্কর মাথা তুলাতেই কাম্‌তার খাঁ বললে,—হুজুর, দরোয়াজায় কে তাই দেখেন।

ব্যগ্রব্যাকুল চোখ ফেরালেন ছোটকুমার। বললেন,—কে?

কাম্‌তার আরেকটি কুর্ণিশ ঠুকে বললে,—রাজাবাহাদুরের দেওয়ান হুজুর!

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো কাশীশঙ্করের। গালিচায় আসীন হয়ে বললেন,—দেওয়ানজী, কি সমাচার? আসেন, ভিত্‌রে আসেন।

দেওয়ানজী কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন,—হুজুরদের গেরস্থালী কথা। এখানে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কাশীশঙ্করের চোখে-মুখে ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায়। বললেন,—কাম্‌তার, বাইরে যাও। ডাকলে আসিও।

দেওয়ানজী ভয়ে কি না কে জানে, কাঁপছেন ঠকঠকিয়ে।

ঘরের মৃত পশুদের জ্বল-জ্বল চোখ দেখে হয়তো কাঁপছেন। ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করেন দেওয়ানজী। যুক্তকরে বলেন,—সাতগাঁ থেকে একজন রমণী এসেছে রাজবাড়ীতে। নাপিতানী বলেই মনে হয়।

কি বলে সে? অধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। বলেন,—কোন' সংবাদ আছে?

—হাঁ কুমারবাহাদুর। বললেন দেওয়ানজী। বললেন,—আমাদের রাজাবাহাদুর সাক্ষাৎ দিয়েছেন ঐ রমণীকে। সে না কি বলছে যে, আমাদের মহামান্যা রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে না কি গড়-মান্দারণে চালান দেওয়া হয়েছে! সেখানে তিনি না কি বন্দিনী হয়ে আছেন?

—সে কি কথা!

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাশীশঙ্কর।

—হাঁ কুমারবাহাদুর! সে তো তাই বলে।

দেওয়ানজী কম্পমান স্বরে কথাগুলি শেষ করে দম ফেললেন।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আপনাদের রাজা সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন? তিনি কি বলেন?

দেওয়ানজী বললেন,—রাজাবাহাদুর কি ঠিক প্রকৃতিস্থ আছেন কুমারবাহাদুর! তিনি এই সংবাদ কুমারবাহাদুরকে জানাতে নির্দ্দেশ করেছেন। লোক মারফৎ নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন।

ভীষণ এক চিন্তায় চিবুক ছুঁলেন কাশীশঙ্কর।

বাঁকা তরোয়ালের মত দুই ভ্রূ আর সরল হয় না। কাশীশঙ্করের দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ হয়। ঘটনা শুনে থমকে যান চকিতের মধ্যে। নিজ মনেই স্বগত করেন,—গড়-মান্দারণে বিন্ধ্যবাসিনী! এ কেমন কথা! তা হবে, তা হবে। গড়-মান্দারণে যে কৃষ্ণরামের ভগ্ন অট্টালিকা আছে এক!

কুলীনশ্রেষ্ঠ জমিদার কৃষ্ণরামের গৃহসংলগ্ন বহু বিশাল আসমান-দীঘির ঘাটের জল চলকে চলকে ওঠে। কাকচক্ষু জল। পানায় পরিপূর্ণ অধিকাংশ দীঘি। জল দৃষ্ট হয় না আপাতচোখে। দীঘির ঘাটের হিমশীতল জল চলকে চলকে ওঠে। আলোড়ন ওঠে জলে।

বর্ষার মেঘের মত রুক্ষ-চুলের বোঝা নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘাটে নেমেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘাটের ধাপে ধাপে শৈবাল। কখন পা পিছলায় ঠিক নেই। আকণ্ঠ জলে নেমেছেন রাজকুমারী। অবগাহন করবেন। মনের জ্বালা, দেহের জ্বালা, জুড়াবেন আসমান-দীঘির শীতল জলে। পরিচারিকা যশোদা বলে,—হ্যাঁ বৌ, চুলে তেল না দিয়েই ডুব দেবে? এসো আমি তেল দিয়ে দিই চুলে। রুখু চুলে কি স্নান হয়?

—না, থাক যশোদা। চুলে আর তেল দেবো না। ইহজন্মে আর নয়।

রাজকুমারীর অভিমানী কথা ভেসে আসে দীঘির জল থেকে। দীঘির জলে সহসা আর এক রাজকুমারীর ছায়া দেখেন বিন্ধ্যবাসিনী। নিজের ছায়া দেখেন, নিজের রূপের ছায়া।

বিতৃষ্ণায় চোখ ফিরালো। রাজকুমারী আর দেখলেন না। অবগাহনের ডুব দিলেন তৎক্ষণাৎ।

আসমান-দীঘির ঘাটের কাজল-কালো জল চলকে চলকে উঠলো। স্থির-গম্ভীর দীঘির জলে তরঙ্গের দোলা!

[ক্রমশঃ।

—প্রচ্ছদ-পট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি নারীমুখের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে।
আলোকচিত্র পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী গৃহীত।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৪

সুধীর তার পকেট থেকে মোটা একটি কাগজের মোড়ক বের করলে—সাদা সুতো দিয়ে বাঁধা। সুতো খুলতে খুলতে বললে : চাটুজ্যেমশাই এইটি আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুতো খুলে খামের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করলে একতাড়া নোট। নোটগুলি সীতারামের হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে : গুণে দেখুন, ছ'হাজার টাকা আছে।

নোটের বাণ্ডিলটা সীতারাম নাড়াচাড়া করতে করতে বললে : টাকাটা এরই মধ্যে পাঠিয়ে দিলে ! চিঠিপত্র কিছু দেয়নি ?

সুধীর বললে : আজ্ঞে না। বললেন, এই ছ' হাজার টাকা দিয়ে এসো আর বোলো, এক্ষুণি আমাকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে, নইলে আমি নিজেই যেতাম।

—আর-কিছু বলেনি ?

—আজ্ঞে না।

সীতারামের মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। মনে হ'লো—কি যেন সে ভাবছে।

সুধীর আবার বললে : গুণে দেখুন।

সীতারাম বললে : ঠিক আছে। গুণতে হবে না।

সুধীর তার হাত দুটি জোড় করে বললে : আজ্ঞে না, আমি তাঁর চাকরি করি, আমার হাত দিয়ে এসেছে টাকাটা, আপনি একবার—

আর কিছু বলবার প্রয়োজন হ'লো না। সীতারাম নোটগুলি গুণে দেখলে। ঠিক আছে।

সুধীর উঠে দাঁড়ালো। বললে : এবার আমি যাই।

সীতারাম অন্যমনস্কের মত বললে : হ্যাঁ যাও।

সুধীর যাবার আগে আবার একবার তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কত কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল। কিন্তু সীতারাম একটি কথাও বললে না। নোটগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

কতক্ষণ সেই রকম ভাবে বসেছিল তার খেয়ালই ছিল না, আরও কতক্ষণ বসে থাকতো কে জানে, হঠাৎ চমক ভাঙলো মালার ডাকে।

—বাবা !

—উঁ।

—মা ডাকছে। ভেতরে এসো।

যাই। বলে সীতারাম নোটের তাড়াটি হাতে নিয়ে উঠে গেল বাড়ীর ভেতর।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করলে : কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

নোটগুলি তার হাতে দিয়ে বললে : নাও রাখো। তোমার সেই ছ'হাজার টাকা দেবু পাঠিয়ে দিয়েছে।

কাঞ্চন বললে : আমি বলেছিলাম না ! ওর কি টাকার অভাব ? এই তো সেদিন নিলে, দ্যাখো—এরই মধ্যে কেমন ফিরিয়ে দিয়ে গেল !

নোটগুলি সিন্দুকে রাখবার জন্যে কাঞ্চন তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল। যাবার সময় হাতের ইসারায় কাছে ডাকলে সীতারামকে।

মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা যায় না, তাই চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে : বিয়ের কথা কিছু বলেনি ?

সীতারাম তখনও চিন্তান্বিত। বললে : না।

বলেই সে চলে যাচ্ছিল অন্য দিকে।

কাঞ্চন বললে : পালাচ্ছো কেন ? শোনো।

সীতারামকে আবার ফিরে দাঁড়াতে হ'লো !—কি বলছো ?

কাঞ্চন সিন্দুক খুললে। বললে : এবার একদিন যাও।

সীতারাম বললে : হুঁ।

—হুঁ নয়, যেতে দোষ কি ?

সীতারাম বললে : যাব। কলকাতা গেছে। ফিরে আসুক।

সিন্দুকের ভেতর টাকাটা রাখতে গিয়ে কাঞ্চনের নজর পড়লো দেবু চাটুজ্যের দেওয়া হ্যাণ্ডনোটটির ওপর। বললে : টাকা ফেরত দিয়ে গেল, আর তুমি যে ওর হ্যাণ্ডনোট ফিরিয়ে দিলে না ?

—সত্যিই তো !

ফেরত দেওয়া উচিত ছিল তার।

এতক্ষণ পরে সীতারাম যেন একটা ছুতো খুঁজে পেলে। দেবু চাটুজ্যের কাছে যাবার ছুতো। হাত বাড়িয়ে বললে : দাও হ্যাণ্ডনোটটা। হাতের কাছে বাইরেই রেখে দিই। ওইটে নিয়েই যাব।

সীতারাম গেলও একদিন, ওই হ্যাণ্ডনোট হাতে নিয়েই।

টাকাটা দেবু চাটুজ্যে যেদিন থেকে ফেরত পাঠিয়েছে সেই দিন থেকেই সীতারাম ছটফট্ করছিল দেবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। কি জানি কেন তার মনের কোণে একটা অজানা সংশয় বাসা বেঁধেছিল।

টাকাটা অবশ্য ফেরত দেবারই কথা। কিন্তু নিজে না এসে তার একটা কর্ম্মচারীকে দিয়ে এত তাড়াতাড়ি টাকাটা ফিরে পাঠিয়ে দিলে কেন? আবার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও তার মনে হ'তে লাগলো, টাকার জন্য একটা রসিদ পর্য্যন্ত নিলে না, এমন কি হ্যাণ্ডনোটটা পর্য্যন্ত ফিরে' চাইলে না সুধীর।

হয়ত বা সবই মিথ্যা, হয়ত বা সবই তার মনের ভুল।

এম্‌নি-সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে সীতারাম যাচ্ছিল দেবু চাটুজ্যের বাড়ীর দিকে। সন্ধ্যে হ'তে তখনও অনেক দেরি। দূরে শ্রেণীবদ্ধ গাছের আড়ালে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দেখা যাচ্ছে। এদিকে কয়লাবোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে যাবার জন্যে ট্রেণের লাইন পাতা। হিঙ্লের ওপারে সীতারাম মুখুজ্যের বাড়ীর দিকটা যেমন ফাঁকা, এদিকটা আবার তেমনি জম্‌জমাট্। কত দেশের কত লোক এসে জড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে নানা রকমের মানুষ এসেছে। মাটির নীচে পাওয়া গেছে অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদ আহরণ করবার জন্যে এসেছে শিখ, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী। এসেছে ইংরেজ, অষ্ট্রেলিয়ান, ইটালিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান। মাটির নীচে কয়লা কাটবার জন্যে এসেছে কোল্, ভিল্, সাঁওতাল, কুর্ম্মি। মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছে সি-পি মাইনার্স।

এই সবের মাঝখানে তাদের সুলতানপুরের একটা দিক গেছে হারিয়ে।

সীতারাম পথ চলছে, এর-ওর মুখের পানে তাকাচ্ছে,—সব অচেনা, সবাই অপরিচিত।

এমন সময় দেখা হয়ে গেল শিবদাস চৌধুরীর সঙ্গে। সুলতানপুরের মাটির মানুষ—শিবু চৌধুরী। ডাক নাম—বুড়ো শিব।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো সীতারাম। দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' বললে: কেমন আছ ভাই?

বুড়ো শিব একগাল হেসে বললে: ভাল। খুব ভাল। আমি তো খারাপ কখনও থাকি না সীতারাম!

সে কথা সত্য। সদানন্দময় এই মানুষটির প্রকৃতি বড় অদ্ভুত! দিবারাত্রি হাসি তার মুখে লেগেই আছে। দুঃখকে সে বড়-একটা আমলই দেয় না। একা মানুষ। পৈতৃক বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি যা আছে তাইতে বেশ ভাল ভাবেই চলে যায়। নিজের কাজ বলতে কিছুই নেই। তাই সব সময়েই দেখা যায় সে পরের কাজ নিয়ে মেতে আছে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চুল পেকেছে, দাঁত ভেঙেছে! গায়ের রং বেশ পরিষ্কার। বুড়ো শিব নামটি তাকে মানিয়েছে ভাল।

সে কথা কেউ যদি তাকে বলে তো সে হেসে হেসে জবাব দেয়: আজ না হয় আমি বুড়ো হয়েছি—বুড়ো শিব নামটা মানানসই হয়ে গেছে, কিন্তু এ-খেতাব আমার আজকের নয়, আমি যখন নিতান্ত ছেলেমানুষ—ইস্কুলে পড়ি, তখন থেকে আমাকে সবাই বুড়ো শিব বলে' ডাকে। বাল্যকালে বৃদ্ধ উপাধি লাভ বড় সহজ কথা নয়। বৃদ্ধ মানে জ্ঞানবৃদ্ধ।

কিন্তু গ্রামের ছেলে-ছোক্‌রারা অন্য কথা বলে।

বলে: অকালে পক্কতা লাভ করেছিল বলে তাকে নাকি এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল। জ্ঞানবৃদ্ধ আর অকালপক্ক দুটো আলাদা কথা!

আলাদাই হোক আর একই হোক, বুড়ো শিবের তাতে কিছু আসে-যায় না। সে হেসে বলে, ভাল, তাই-বা কে পায়!

সে যাই হোক্, বুড়ো শিব সীতারামকে বললে: কত দিন তোমাকে দেখিনি বল তো?

সীতারাম বললে: বাড়ী থেকে বড়-একটা বেরুই না ভাই!

বুড়ো শিব জিজ্ঞাসা করলে: এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে আজ?

সীতারামের মুখ দিয়ে—কেন জানি না, হঠাৎ বেরিয়ে গেল: বেয়াইএর বাড়ী।

বুড়ো শিব চম্‌কে উঠলো। বললে: বেয়াই? মেয়ের বিয়ে কবে দিলে?

সীতারাম হেসে বললে: বিয়ে এখনও দিইনি। দেবো। দেবু চাটুজ্যের ছেলে রঞ্জনের সঙ্গে। কেমন? ভাল হবে না?

বুড়ো শিব বললে: খুব ভাল হবে, নিশ্চয় ভাল হবে। একথা আমি তখনই ভেবেছিলাম।

—কখন?

—হিঙ্লের পুল যখন তুমি তৈরি করলে।

কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। হিঙ্লের পুল যখন সে তৈরি করেছিল বিয়ের কথা তখন হয়নি। তাহ'লেও এর প্রতিবাদ সে করলে না। বুড়ো শিবের মুখের পানে তাকিয়ে সীতারাম হাসতে লাগলো শুধু।

বুড়ো শিব বললে: খুব ভাল করেছো সীতারাম। দেবুর ওই একটি মাত্র ছেলে, তোমারও ওই একটি মাত্র মেয়ে, তাছাড়া দেবু তো আজ-কাল একজন মস্ত বড় লোক। মেয়ে তোমার সুখে থাকবে।

—আশীর্ব্বাদ কর ভাই, তাই যেন থাকে!

সুমুখে দেবু চাটুজ্যের বাড়ী। বুড়ো শিব বললে: তুমি যাও, তাহ'লে আজ আমি আসি। আবার দেখা হবে।

কিন্তু সেদিনের মত যদি হয়?—সীতারাম ভাবলে, গুর্খা দরোয়ান যদি তাকে বাড়ী ঢুকতে না দেয়? আর বুড়ো শিব তা' দেখতে পায়, তাহ'লে তার লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তার চেয়ে কাজ নেই, আজ ফিরে যাওয়াই ভালো।

সীতারাম বললে: অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো, এসো গল্প করি। দেবুর কাছে কাল আসবো।

বুড়ো শিব বললে: না না তা' হয় না। দোরের কাছে এসে ফিরে যাওয়া ভাল নয়। মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না। বেঁচে যদি থাকি, দেখা আবার হবে।

এই বলে সে এক রকম ইচ্ছে করেই পালিয়ে গেল।

পালিয়ে গেল সীতারামকে অকূল পাথারে ফেলে দিয়ে।

ফটকের কাছে গিয়ে সীতারাম এগিয়ে যেতেও পারে না, পিছিয়ে আসতেও পারে না।

এমনি যখন তার অবস্থা, সীতারাম দেখলে, সুধীর তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। সীতারাম বেঁচে গেল।

সুধীর তার কাছে এসে বললে: আসুন।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে: বাবু তোমার ফিরেছেন কলকাতা থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সীতারাম আবার জিজ্ঞাসা করলে: রঞ্জন কোথায়? দেবুর ছেলে?

সুধীর বললে: এইখানেই আছে। বাবুর সঙ্গে সে-ও এসেছে কলকাতা থেকে।

লাল কাঁকর-বিছানো পথের ওপর দিয়ে দু'জনেই এগিয়ে চলেছে। বাড়ীর দিকে। পথের দু'পাশে ফুলের বাগান। গাছে গাছে নানা রকমের ফুল ফুটে রয়েছে।

সীতারাম সেই দিকে তাকিয়ে বললে: আগেকার দিনে আমাদের এই সুলতানপুরে ফুলের গাছ ছিল না। ঠাকুর পুজোর জন্যে ফুল পাওয়া যেতো না।

সুধীর বললে: ফুল আরও অনেক ছিল কাকাবাবু, কাল কোথাকার কোন্ এক রাজা এসেছিলেন কি না, রঞ্জনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে, সেই জন্যে ফুলগুলো তুলে ঘরে ঘরে সব ফুলদানিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সীতারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

সুধীর ভাবলে, বুঝি ফুলের জন্যই তিনি দাঁড়ালেন। বললে: আজ আমি আপনার হাতে কিছু ফুল দিয়ে দেবো। বাড়ী ফেরবার সময় হাতে করে' নিয়ে যাবেন।

কথাটা কিন্তু সীতারাম শুনেও শুনলে না। জিজ্ঞাসা করলে: রাজা এসেছিলেন? কোথাকার রাজা?

সুধীর বললে: তা জানি না।

—রঞ্জনের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে এসেছিলেন?

সুধীর বললে: আজ্ঞে হ্যাঁ। দেনা-পাওনার কথাবার্তা সবই বোধ হয় ঠিক হ'য়ে গেল।—বাবু এইবার মেয়ে দেখতে যাবেন আর অমনি বিয়ের দিন ঠিক করে' আসবেন।

সীতারামের মাথার ভেতরটা কেমন যেন দপ্ দপ্ করছে। কোথাও বসবার জায়গা নেই, নইলে হয়তো বসে পড়তো সেইখানে।

সুধীর কিন্তু হাসতে হাসতে আর-একটা ভারি মজার খবর দিলে। বললে: রঞ্জন আবার এমনি লাজুক ছেলে, রাজাবাবু এখান থেকে যাবার আগে বললেন, ডাকুন রঞ্জনকে, আশীর্ব্বাদটা একেবারে সেরে দিয়েই যাই। কিন্তু কোথায় রঞ্জন? সে তখন পালিয়ে গেছে। এত যে খোঁজাখুঁজি করলে, কোথাও পাওয়া গেল না। ফিরে যখন এলো, রাজাবাবু তখন চলে গেছে। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় ছিলি? রঞ্জন বললে: কয়লা-খাদের নীচে। আমার কাছে কিন্তু চুপি চুপি বললে, লুকিয়ে ছিল আপনাদের সেই মুখুজ্যে-পুকুরে।

কথাগুলো সীতারামের কানে গেল কি না কে জানে! সে তখন তার পকেট থেকে দেবু চাটুজ্যের দেওয়া হ্যাণ্ডনোটটি পকেট থেকে বের করেছে। সুধীরের হাতে সেই হ্যাণ্ডনোটটি দিয়ে বললে: শোনো সুধীর, আজ আর আমি তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করবো না। এই হ্যাণ্ডনোটটি সেদিন তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এইটি দেবুর হাতে দাওগে। আমি আবার আসবো।

এই বলে' আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করে' সীতারাম চলে এলো সেখান থেকে।

সুধীর কিছুই বুঝতে পারলে না। হ্যাণ্ডনোটের কাগজখানি হাতে নিয়ে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে।

[ক্রমশঃ।

ব্যথার দান

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আমায় তুমি আদর ক'রে, নাই বা বুকে রাখলে,—
কমল-আঁখি তুলে' তোমার নাই বা তুমি চাইলে,—
তোমায় আমি ভালবাসি, এই গরবেই ধন্য,
আমার প্রাণের যতেক সুধা রবে তোমার জন্য,
তোমায় ঘিরি' আমার আশা বুনলো মায়াজাল,
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ,—অন্তহীন কাল
কণ্ঠে তোমার গীতঝঙ্কার নাহি যদি ঝরে,
পরশে মোর সুধার উৎস নাহি উৎসরে,—
চরণ-নূপুর তোমার যদি ছন্দে নাহি বাজে,
সাধনা মোর বিফল হ'য়ে মর্ম্ম দহে লাজে,—
(তবু) দিবস-রাতি প্রাণের প্রীতি এই ধারাতেই বইবে,
তোমার মাঝে নিত্য-নূতন পুলক খুঁজে পা'বে।

রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ দর্শন

বিনয়কুমার সরকার

কিছু দিন থেকে এইরূপ ধারণা করা হচ্ছে যে, রামমোহন থেকে গান্ধী পর্য্যন্ত অর্থাৎ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সৃজনশীল ভারত কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা শিক্ষামূলক ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আধুনিক ভারতের সৃষ্টি কেবল এই সকল ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ আছে, এইরূপ ধারণা করা ভুল। জীবনের অন্যান্য দিকে এবং অন্যান্য কৃষ্টির ক্ষেত্রেও ভারতীয় মস্তিষ্ক গত চার-পাঁচ শতাব্দী যাবৎ আত্মনিয়োগ করেছে। এই সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির অবদান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছে এবং আধুনিক মানদণ্ডে বিচার করলেও দেখা যাবে সেগুলি মহান্, মানবীয় ও শিক্ষাপ্রদ। আমরা আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের অবদানের কথা বলছি এবং এ সম্পর্কে আমরা বাঙ্গালী সাধু এবং বর্ত্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ও স্রষ্টা ব'লে জগদ্বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমেই একথা বলে রাখা দরকার যে, রামকৃষ্ণ কালী-সাধক ছিলেন এবং মন্দিরে পুরোহিতের কাজ করাই তাঁর পেশা ছিল। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর খুব কমই ছিল। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান বুঝতেন না, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক অগ্রগতি, শিল্প পুনর্গঠন প্রভৃতি কথাও ভাবতেন না। বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তি বা জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির কোন অর্থই তাঁর জীবনে ছিল না। তবুও তাঁর "কথামৃত" (১৮৮২-৮৬) জীবন্ত সমাজ-দর্শন বলে গণ্য হয়েছে এবং তিনি মানব-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন।

বাংলার কালী-সাধক বা তান্ত্রিকরা সংখ্যায় অগুণ্তি। কিন্তু প্রত্যেক সাধক বা তান্ত্রিকের সঙ্গীত, কথাবার্ত্তা বা পদ্ধতি একরূপ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে প্রকৃত ভক্তের আত্মার প্রতি মনোযোগ, চিন্তা ও কাজে পবিত্রতাই প্রকাশ পেয়েছে এবং ধর্ম্ম-জীবনের বাহ্যিকতা এর মধ্যে স্থান পায়নি। ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে এই প্রত্যক্ষবাদ হিন্দু নৈতিক জীবনের একটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়। আধুনিক তন্ত্রসাধক কালীভক্ত রামকৃষ্ণ তাঁর বাণীতে অন্য সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—"একই চিনি দিয়ে যেমন বিভিন্ন পশু-পক্ষীর মূর্ত্তি গড়া যায়, তেমনি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে ও আকারে আমরা একই মার পুজো করি। যত মত তত পথ। সব পথ দিয়েই তাঁর কাছে পৌঁছান যায়।"

এই কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, বাহ্যিক ব্যাপারে ঔদাসীন্য, অন্যান্য ধর্ম্মমতের উপলব্ধি এক কথায় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে সহিষ্ণুতা প্রাচীন কাল থেকে এখন পর্য্যন্ত চলে এসেছে। এই কারণেই নূতন ধর্ম্মপ্রচারকদের পক্ষে হিন্দুদের অজ্ঞাত বাণীর সাহায্যে হিন্দু ভারতকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন। হাজার রকমের পূজা-পদ্ধতি ও লোকাচার সত্ত্বেও সকল দেবতাই যে একই শক্তির বিকাশ, তা সকলেই জানে।

রামপ্রসাদের প্রত্যক্ষবাদ রামকৃষ্ণও অনুসরণ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই মহাপুরুষ বলেছেন, "সারা পৃথিবী ঘুরে এলেও কোথাও কিছু (প্রকৃত ধর্ম্ম) পাবে না। যা কিছু আছে তা এই এখানে" (বুকের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া)।

সাধারণ লোকের কাছে যে এটা একটা খুব বড় দর্শন, এরূপ ধারণা করলে ভুল হবে। ধর্ম্ম-সংস্কার বা সমাজ-সংস্কার দ্বারা যদি ধর্ম্ম, মূর্ত্তি বা প্রচলিত রীতির আকারের উপর জোর না দিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত ভাবের উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে তবে এইরূপ সংস্কার ভারতে যুগ যুগ ধরে লোক-গাথার মধ্য দিয়ে সাধারণ গ্রাম্য লোকদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে এসেছে। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ হিন্দু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এই সংস্কারের দুইটি আধুনিক রূপ।

সাধারণ মানুষের ভাষায় রামকৃষ্ণদেব এই সাধারণ যুক্তি দেখিয়েছেন—"আমার শক্তি সর্ব্বমুখী। যেমন মাছ কত রকম করে খাই—ঝোল, ভাজা, টক ইত্যাদি। আমি ঈশ্বরকে কেবল ব্রহ্ম বলেই মনে করি না, তাঁকে নানা রূপে নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অনুভব করি।" এই সকল উক্তি থেকে সাধারণ মানব-মনের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব অনুমান করা যায়।

রামকৃষ্ণের বাণী দয়ার রসে সিঞ্চিত। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল। তিনি ছিলেন বাস্তবধর্ম্মী এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁর ছিল। কার পক্ষে কিরূপ পদ্ধতি দরকার তা তিনি এইজন্য নিরূপণ করতে পারতেন। আমরা শুনেছি, "নরকভোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে ভগবানের আরাধনা করা দরকার। এই যে ভয়ে ভক্তি, এটা প্রথম স্তরের লোকদের জন্য। কেউ কেউ মনে করে যে, পাপ সম্বন্ধে অবহিত থাকলেই বুঝি ধর্ম্ম করা হ'ল। তারা ভুলে যায় যে, এটা হ'ল প্রথম ও নিম্নস্তরের আধ্যাত্মিকতা।" তাঁর বিচারে "এর চেয়ে উচ্চ আদর্শ, উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিকতা আছে—যেমন ঈশ্বরকে নিজের বাপ মায়ের মত ভালবাসা।" ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই যে সম্পর্ক এর উপরই রামকৃষ্ণদেব জোর দিয়ে গেছেন। এই সকল ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের কল্পনা করা একটা ভীষণ বৈপ্লবিক ব্যাপার!

রামকৃষ্ণের শিক্ষা ধর্ম্মপ্রাণতা ও সর্ব্বজনীন স্বাধীনতার ভাবে পূর্ণ। তিনি বলেছেন, "তুমি যেমন তোমার ধর্ম্মকে মান, সেইরূপ অপরকেও তার ধর্ম্ম নিয়ে থাকতে দাও।" এই উপদেশ সম্ভবতঃ তার্কিকদের জন্যই। এই পন্থা অবলম্বন ক'রে তাঁর শিষ্যরা নির্ভয়ে এবং বেপরোয়া ভাবে তাঁদের 'চরৈবেতি' পালন করতে পারে। এখানে আমরা এমন একটি দ্বৈতবাদের নীতি পাই যেখানে অপরেরও আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকবে এবং পরস্পরের সুবিধা অনুযায়ী প্রকাশ্য বুদ্ধির লড়াইএর সুযোগ সৃষ্টি করবে।

রামকৃষ্ণের নিকট দ্বিধা করা পাপ, দুর্ব্বলতা পাপ, দীর্ঘসূত্রতা পাপ। বুদ্ধের ন্যায় রামকৃষ্ণ বাংলার তরুণদের মহৎ চিন্তার মূল্য এই কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, "অনেকে বিনয় দেখিয়ে ব'লে থাকেন, 'আমি কীটানুকীট।' যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার

বলে, সে শালা বদ্ধই হ'য়ে যায়। যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।" তিনি বলেছেন, "কখনও হতাশ হয়ো না। নৈরাশ্য তোমার উন্নতির পথে প্রধান শত্রু। মানুষ নিজেকে যা মনে করে তাই হ'য়ে যায়।"

যে বিনয়ে কাপুরুষতা এনে দেয় তিনি তার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনের উপর জোর দিয়েছেন। শক্তি, সাহস ও আশার পথে মনকে চালনা করাই তাঁর ধর্ম্মোপদেশের লক্ষ্য ছিল।

তিনি বলেছেন, "অধীনতাও মনে, স্বাধীনতাও মনে। যদি তুমি বল,—'আমি মুক্ত আত্মা, আমি ঈশ্বরের সন্তান, কে আমাকে বাঁধতে পারে?'—তুমি মুক্ত হবেই।"

রামকৃষ্ণের উপদেশ মনের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি সমাজ-সংস্কার, নৈতিক প্রচারকার্য্য, জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা প্রভৃতি কিছুই বলেননি। তিনি কেবল মনের পরিবর্ত্তন আনতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস, "মনই সব। মনের স্বাধীনতা গেলে তোমারও স্বাধীনতা গেল। মন যদি স্বাধীন হয়, তুমিও স্বাধীন।" কখনও স্কুলে যাননি, এরূপ একজন অশিক্ষিত লোকের মুখে বড় বড় দার্শনিকের মত কথা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত কেন যে নিজেদের অত্যন্ত ছোট মনে ক'রেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। যাঁরা বিদ্রূপ ক'রতে এসেছিলেন তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত মাথা নোয়াতে বাধ্য হ'য়েছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব চাইতেন দৃঢ়সঙ্কল্প। তিনি চেয়েছিলেন, এক দল কঠোর পরিশ্রমী একরোখা তরুণ। তাদের তিনি বলতেন, "বল আমি এই জীবনেই সিদ্ধিলাভ করব। তিন দিনে ভগবান পাব—তাই বা কেন, একবার মাত্র নাম উচ্চারণ ক'রে তাঁকে আমার কাছে টেনে আনব।" রামকৃষ্ণের কাছে ফাঁকা বুলির কোন দাম নেই। "কেবল "শিবোঽহম্", "শিবোঽহম্" ক'রলেই হবে না। মনের মধ্যে তাঁকে ধ্যান ক'রতে ক'রতে নিজেকে ভুলে গিয়ে অন্তরের মধ্যে শিবকে উপলব্ধি ক'রতে হবে। তবে "শিবোঽহম্" বলার সার্থকতা। নইলে তাঁকে উপলব্ধি না ক'রে কেবল মুখে উচ্চারণ ক'রলে কোন লাভ হবে না।" আমাদের বুঝতে হবে যে, ফাঁকা বুলির উপর এই আক্রমণ কেবল হিন্দুদের বিরুদ্ধেই নয়, খৃষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের লোকদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হ'তে পারে।

ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে বক্তৃতা যত ভাল ভাবেই দেওয়া যাক না কেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা যত যুক্তি-তর্ক দিয়েই বোঝান হ'ক না কেন, সংসারী লোকের মনে তার প্রভাব বেশীক্ষণ থাকে না। তার জন্য দৈনন্দিন জীবন-যাপনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী দরকার। সব দেশের লোকে প্রায়ই এই প্রশ্ন ক'রে থাকে যে, কি ক'রে ঈশ্বর ও পৃথিবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। এ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের ব্যবস্থাপত্র এইরূপ—"ছুতোরের বউকে দেখ, সে একসঙ্গে কত কাজ ক'রছে। এক হাতে সে ঢেঁকিতে চিঁড়ের চাল কুটচে, অপর হাতে ছেলেকে মাই দিচ্ছে আবার সেই সঙ্গে ক্রেতার সঙ্গে চালের দর-দস্তুর করছে। এইরূপে তার কাজ অনেক হলেও মনটি পড়ে আছে ঢেঁকির দিকে, পাছে হাতের উপর ঢেঁকি পড়ে হাত ছেঁচে যায়।" তিনি কি বলতে চেয়েছেন এ থেকে বেশ ভালই বোঝা যায়। "এই পৃথিবীতে আমাদের সব কাজ ক'রে যেতে হবে কিন্তু মনটি রাখতে হবে ঈশ্বরের দিকে। সংসার ক'রবে অথচ মাথার কলসী ঠিক থাকবে। এক হাতে ঈশ্বর-পাদপদ্ম ধরে থাক, আর এক হাতে কাজ কর।"

রামকৃষ্ণদেবের বাণী এমন নয় যে, প্রত্যেককে সংসার পরিবার ও সম্পত্তি ছাড়তেই হবে। তাঁর শিষ্যরা সকলেই সন্ন্যাসী, সাধু বা স্বামীজী নন। তিনি গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, উকিল, কেরাণী, চাষী সকলেরই শিক্ষাদাতা। আত্মা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার উপর সর্ব্বদা গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষবাদ ও পার্থিব প্রচেষ্টার প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হ'তে সক্ষম হ'য়েছেন। ব্রহ্ম ও শক্তির সংমিশ্রণের ব্যাপারে রামকৃষ্ণ আমাদের প্রাচীন হিন্দু আদর্শই অনুসরণ ক'রেছেন। এই সংমিশ্রণের শক্তিতেই তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতিকল্পে ভারতের প্রাণ সঞ্চার করেন।

বিশ্ব সংস্কৃতি ও আধুনিক ভারতের অবদানের ছাত্র হিসাবে অন্যতম বিশ্ববিজেতারূপে বিবেকানন্দের প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। বিবেকানন্দের আন্দোলনের শৈশব অবস্থায় বর্ত্তমান লেখক রামকৃষ্ণের ব্রহ্ম-সাধনার অভিজ্ঞতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের লোকদের আত্ম-সংযম, আত্মত্যাগ ও সমাজসেবা যে দেশের জীবন্ত ধর্ম্মে পরিণত হবে তা সঠিক ভাবেই অনুমান ক'রেছিলেন। এই দিক থেকে বিচার ক'রেই বিবেকানন্দকে তরুণ ভারতের কার্লাইল এবং নেপোলিয়ানের মত শক্তিশালী ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিবেকানন্দের বাণী ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ব'লতে হলে মহাভারত হ'য়ে যাবে। তাঁর শরীর ছিল বলিষ্ঠ এবং বেশ ভালই খেতে পারতেন। তিনি শিল্পানুরাগী, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সারা ভারত পর্য্যটন ক'রে প্রত্যেক প্রদেশকে জেনেছিলেন এবং পৃথিবী ভ্রমণও তিনি করেছিলেন। মানুষ চেনবার তীক্ষ্ণ ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং কোন কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না।

তিনি যেমন লিখতেও পারতেন তেমনি বলতেও পারতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। বাংলা সাহিত্যকে তিনি নূতন শক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তিনি ছিলেন গবেষক, অনুবাদক, টীপ্পনিকার ও প্রচারক। হিন্দু শাস্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ ও খৃষ্টান শাস্ত্র সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। প্রাচ্যের শিক্ষা ও আদর্শের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শও তাঁর কম জানা ছিল না।

ধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে তিনি গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর দেশপ্রীতিও ছিল অপরিসীম। তিনি সমাজবাদীও ছিলেন। তাঁর সমাজবাদ মার্ক্সবাদ নয়, ফরাসী সেণ্ট সাইমনের মত একটু রোম্যাণ্টিক। কিম্বা জার্ম্মাণ যুব-আন্দোলনের স্রষ্টা ফিক্‌টের জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের মত। তিনি দরিদ্র-নারায়ণ এই আদর্শ ভারতে চালু করেন। তিনি জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী উভয়ই ছিলেন।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে স্বদেশ ও বিশ্বের জন্য এত কাজ করা অবতার ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ম্মী, ত্যাগী, সাধক, জ্ঞানী ও যোগী হিসাবে তিনি সকলের আদরণীয়। তিনি পুরাপুরি আদর্শবাদী হইলেও বাস্তববাদী এবং প্রত্যক্ষবাদীও ছিলেন।

রামকৃষ্ণকে যদি আমাদের যুগের বুদ্ধ বলে মনে করা হয় তাহলে

বিবেকানন্দকেও প্রাচীন কালের বড় বড় ধর্মপ্রচারকদের যেমন রাহুল, উপালি, আনন্দ, সারিপুত্ত প্রভৃতিদের একজন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ, এই সব শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ প্রচারকদের সকলের সারবস্তু একত্রিত করলে যা হয় তিনি একা তাই ছিলেন। সকলের ব্যক্তিত্ব তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

কিন্তু বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এত কথা বলা সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হ'ল না। তিনি কেবল বেদান্ত বা রামকৃষ্ণ বা হিন্দু ধর্ম বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকই ছিলেন না। হিন্দু আদর্শকে জনপ্রিয় করা, প্রাচীন বা বর্তমান চিন্তাশীল মনীষীদের অনুসরণ করাই তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল না। তাঁর সকল চিন্তাধারা ও কার্য্য-কলাপের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই ব্যক্ত ক'রে গেছেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার ক'রতেন। তিনি নিজের জীবনে যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তাই প্রচার ক'রে গেছেন সাহিত্য ও প্রতিষ্ঠানের মারফত। আধুনিক দার্শনিক হিসাবে তাঁর যথার্থ মূল্য বুঝতে পারা যাবে যদি তাঁকে ডিউই, রাসেল,, ক্রোস, স্প্যাঙ্গার ও বার্গসঁর পাশে রেখে বিচার করা যায়। যে সব পণ্ডিত প্লেটো, অশ্বঘোষ, প্লোটিনাম, নাগার্জ্জুন, একুইনসে, শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্যদের প্রচারিত নীতির ব্যাখ্যা ও প্রচার দ্বারা কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দের তুলনা ক'রলে তাঁর প্রতি অবিচার ও ভুল করা হবে।

বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা (১৮৯৩) আধুনিক দর্শনের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন! সেই বিরাট ধর্ম্ম-মহাসভায় ত্রিশ বৎসর বয়সের এই তরুণ বাঙ্গালী সমগ্র বিশ্বের সমবেত মনীষার সম্মুখীন হয়েছিলেন সমান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। তাঁর বক্তৃতার পর সকলের মনে এই ধারণাই হয়েছিল যে, ইনি যা বললেন তাতে মানুষের কতকগুলি বড় বড় অভাব পূরণের সম্ভাবনা আছে, সমগ্র মানব-সমাজের জন্য তিনি কিছু ক'রতে পারেন। তিনি কেবল বেদান্ত বা হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক হিসাবেই প্রতিভাত হননি, তিনি একজন চিন্তাশীল সৃজনশিল্পিরূপেই গণ্য হয়েছিলেন।

তাহলে বিবেকানন্দের আত্মা কি? তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় তিনি কি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন? পাঁচটি কথায় তার সার মর্ম্ম পাওয়া যাবে। তিনি পাঁচটি শব্দের দ্বারা বিশ্বজয় করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—"Ye divinities on earth, —Sinners?" পৃথিবীর ধর্ম্মযাজকগণ! আপনারা কি পাপী? প্রথম চারটি শব্দ মানুষের আশা আনন্দ, পুরুষত্ব, শক্তি ও স্বাধীনতার বাণী। আর শেষের শ্লেষাত্মক প্রশ্ন দ্বারা তিনি আত্মার অবমাননা, কাপুরুষতা এবং নেতি ও নৈরাশ্যমূলক চিন্তার ধারাকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন। সমগ্র বিশ্ব বিস্মিত হয়ে এই পাঁচটি শব্দের বিস্ফোরণ-শক্তি লক্ষ্য করেছিল। প্রথম চারটি শব্দ তিনি এনেছিলেন প্রাচ্য থেকে আর শেষেরটি প্রতীচ্য থেকে। এগুলি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু বার উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু বিবেকানন্দ যে ভাবে এর প্রয়োগ করলেন, মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসে কখনো তা হয়নি।

বিবেকানন্দের বাণী শক্তির, বিশ্বের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রভুত্বের, গোষ্ঠী ও ব্যষ্টির স্বাধীনতার, কাপুরুষতাকে পূর্ণ করার সাহসের এবং বিশ্ববিজয়ের। যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন যে, পাশ্চাত্য তখন এই সব সমস্যার সমাধান ক'রতে না পেরে নৈরাশ্যের অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। জার্ম্মাণ দার্শনিক নীট্‌সে সে কথা ব্যক্ত ক'রেছিলেন। তিনি বাইবেলে বর্ণিত জীবন-দর্শন অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষ মানবীয় ও আনন্দময় জীবন-দর্শনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ ক'রেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে অকস্মাৎ সেই আনন্দময় জীবন-দর্শন ব্যক্ত হ'ল। ভারতের এক অজ্ঞাত তরুণ সেই বাণী শোনালেন। নীট্‌সে কেবল সমালোচনাই করেছিলেন, কিন্তু পথ দেখালেন বিবেকানন্দ—সকলে তাঁকে বিপ্লবী-গুরু ব'লে মেনে নিলেন!

এই শক্তিবাদ, নৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিজের অবস্থার উপর মানুষের প্রভুত্বের নীতি খুব কম লোকেই প্রচার ক'রেছেন। একজন হলেন জার্ম্মাণ দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যান্ট এবং অপর জন হলেন বিবেকানন্দের সমসাময়িক ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। আর ক'রেছেন আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিরা।

১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত প্রস্তুতি এবং ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যকলাপ—বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনের চাবিকাঠি এই শক্তিযোগের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কার্য্যকলাপ এবং শক্তিযোগেরই প্রকাশ। বিশ্বামিত্র বা প্রসিকিউসের মত তিনি নূতন বিশ্বসৃষ্টি ক'রতে এবং সুখ, স্বাধীনতা, দেবত্ব ও অমরত্বের আগুন ছড়াতে চেয়েছিলেন।

তাঁর কাজের মধ্যে আর একটা বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। সেটা হ'ল ব্যক্তিবিশেষের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং তাদের চিন্তায় ও কাজে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা। বিবেকানন্দ ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে যেতে পারেন কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব বোধ জাগরিত করা। তিনি চেয়েছিলেন এক দল শক্তি উপাসক স্বাধীনচেতা সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর-নারী। যোগ সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন টীকার উদ্দেশ্যই ছিল এইরূপ লোক তৈরী করা—যারা জীবনের সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে বিশ্ববিজয়ে কৃতসঙ্কল্প।

বিবেকানন্দের বাণী হ'ল শক্তিযোগ। ধর্ম্ম, আবহাওয়া, আবাস, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী এক কথায় প্রকৃতির উপরে তিনি মানুষ ও তার ভাগ্যকে স্থাপন করেছেন। ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে বক্তৃতা কালে তিনি ব'লেছিলেন, "মানুষ তত দিনই মানুষ যত দিন সে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করে। প্রকৃতিকে জয় করার জন্যই মানুষের জন্ম তার বশীভূত হওয়ার জন্য নয়।" তাঁর মতানুযায়ী মানব-সমাজের সমগ্র ইতিহাস হ'ল, প্রকৃতির তথাকথিত আইনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম এবং শেষ পর্য্যন্ত মানুষের জয়লাভ। মানুষ তার এই বিরামহীন সংগ্রাম ও চেষ্টা এবং শক্তির বিকাশের দ্বারাই বিদ্যা, কলা, চারু শিল্প, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে।

উপনিষদ ও বেদান্তের বাণীই ছিল তাঁর মুখের কথা। প্রাচীন ভারতের এই সব দার্শনিক তত্ত্ব তাঁর শক্তিবাদ, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রচারে সহায়ক বলেই এই তত্ত্ব তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল।

১৮৯৭ সালে য়ুরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মাদ্রাজে "বেদান্ত ও ভারতীয় জীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা কালে বিবেকানন্দ এই শক্তিবাদ সম্বন্ধে বলেন :—

"শক্তি, উপনিষদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমি এই শক্তির কথাই দেখি"···উপনিষদ বলছেন, শক্তি চাই শক্তি, হে মানুষ, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই অভীঃ এই শব্দটি বারংবার ব্যবহৃত হ'য়েছে। উপনিষদ হল শক্তির খনি। এর মধ্যে এমন শক্তি আছে যা সমগ্র বিশ্বকে নূতন বলে বলীয়ান্ করতে সক্ষম। সকল জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণের দুর্ব্বল, দুঃস্থ ও নিষ্পেষিত মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার, স্বাধীন হবার বাণী শুনায় এই উপনিষদ। স্বাধীনতা—শারীরিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই হ'ল উপনিষদের মূল মন্ত্র। ইহাই পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ যা আত্মার মুক্তির কথা বলে না, স্বাধীনতার কথা বলে। প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হও, দুর্ব্বলতা পরিহার কর।

বিবেকানন্দের দর্শন হল প্রকৃতির বন্ধনের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘোষণা। তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামের নীতি মানুষকে ঐতিহ্যের অত্যাচার, প্রচলিত মত ও আদর্শের বিরুদ্ধে স্থায়ী সৈনিকে পরিণত করে।

প্রকৃতির উপরে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধীয় কথাগুলি তাঁর মাদ্রাজের বক্তৃতায় সুপরিস্ফুট। ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজের বক্তৃতায় তিনি বলেন, "যুগ যুগ ধরে মানুষকে অবনতির নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে যে, তারা কিছুই নয়। বিশ্বের সর্ব্বত্র জনগণকে বলা হয় তারা মানুষ নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা এত ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে যে, তারা পশুর পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। তাদের এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কোন ক্ষমতাই নেই এবং প্রতিদিনই তারা ক্লীবে পরিণত হচ্ছে।" এই ঐতিহ্য, এই ইতিহাস, প্রথা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর, সামাজিক অবিচারের তিনি নিন্দা করেছেন। তাঁর নীতির মধ্যে পরাজিতের মনোবৃত্তির স্থান ছিল না। এই ক্ষয়, অবনতি ও পতনের নীতির বিরুদ্ধে তিনি সাহস শক্তি ও আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা শক্তি চাই, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ। স্নায়ুগুলিকে শক্তিশালী কর। আমরা চাই পেশী—লৌহের ন্যায় ইস্পাতের ন্যায় শক্তিশালী পেশী। আমরা অনেক দিন কেঁদেছি, আর কান্না নয়। এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও।" তিনি প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রভুত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর কথায় বলতে গেলে, "আমরা চাই এমন ধর্ম্ম, এমন মতবাদ, এমন শিক্ষা যা প্রকৃত মানুষ তৈরী করবে।"

বিবেকানন্দ তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ দুর্খিমের 'মানুষ অবস্থার দাস' এই নীতির ধার ধারতেন না। তিনি দুর্খিমের তীব্র সমালোচক গ্যাষ্টন রিচার্ডের মত প্রচলিত মত ও নীতি উল্টে দেবার পক্ষপাতী। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁর মতবাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতবাদের মিল দেখতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ভারতে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনের কাজে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কাজই ছিল তাঁর জীবন এবং বিজ্ঞান ছিল অস্ত্র তিনি দুর্খিমের ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভুত্বের নীতি মানতেন না, তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

বিবেকানন্দের সক্রিয়বাদের মধ্যে আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি'র নীতি দেখতে পাই। তাঁর বিরামহীন সংগ্রাম শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই চির গতিশীল। 'গতি ছাড়া সমৃদ্ধি নাই', 'গতিহীনতা পাপ' এবং 'যার গতি আছে ইন্দ্র তার সখা' প্রভৃতি বৈদিক অনুশাসনের কথা আমরা বিবেকানন্দের জীবনের প্রেরণা ও বিকাশের নীতির মধ্যে দেখতে পাই। থেমে থাকা বিবেকানন্দের কুষ্ঠীতে লেখেনি। তিনি সর্ব্বদাই গতিশীল। তাঁর দর্শন অনুসরণ করতে হলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক আদর্শ থেকে অন্য আদর্শে, এক প্রথা থেকে অন্য প্রথায় বিচরণ করতে হবে। ক্লৈব্যের নীতি দূর ক'রে তিনি মানুষের নব জন্মের, প্রকৃতি ও মানুষের স্থানে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার বাণী শুনিয়েছেন। যারা ঘুরতে পারে তারাই মধু ও সুমিষ্ট ফলের সন্ধান পায়, আর সূর্য্য অবিরাম ঘুরে যাচ্ছে কখনও তার ক্লান্তি আসে না—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই উক্তিই তিনি কার্য্যকরী করতে চেয়েছিলেন। সূর্য্যের অবিরাম গতি দেখেই বৈদিক দার্শনিকগণ 'চরৈবেতি'র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও উদার আদর্শের মধ্যে হিন্দু দর্শনের গতিশীলতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের সৃজনশীল মানুষ, প্রকৃতিজয়ী ব্যক্তিত্ব এবং মানুষের চিরন্তন গতি আধুনিক তত্ত্ববিদ্যারই প্রকাশ। এই জীবনীশক্তির মাধ্যমেই তিনি এক হাতে এসপিনাস ও বার্গসোঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করেন; অন্য দিকে ইটালীয় দার্শনিক বেনেডোটো ক্রোসের হস্ত ধারণ করেন। ক্রোসে চিরনূতন ইতিহাসের নীতির মধ্যেই বাস্তব সত্তার অবস্থিতি, পরিবর্ত্তনই বাস্তব, এই কথা বলেন। এই পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন সৃষ্টি এবং প্রকৃতির উপর মানুষের অবিরাম জয়লাভের নীতিই হল বিবেকানন্দের কথা। এই জন্যই তাঁর নীতিকে আমরা প্রগতিবাদী ওসওয়াল্ড স্পেংলারের নীতির পাশে আসন দিতে পারি। স্পেংলার যুগ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। প্রকৃতিকে জয় করার জন্যই যে মানুষের জন্ম—বিবেকানন্দের এই বাণীই স্পেংলারের মতবাদের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। স্পেংলার বলেছেন, 'বর্ত্তমানে যে অধঃপতন দেখা যাচ্ছে তা রোধ করতে হলে ইম্যানুয়েল ক্যাণ্টের মত লোকের দরকার—যিনি প্রকৃত বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করতে সমর্থ হবেন।' স্পেংলারের 'ক্যাণ্টে ফিরে যাবার' নীতি এবং বিবেকানন্দের 'উপনিষদে ফিরে যাবার নীতি'র মধ্যে সেই একই সুর, একই বাণী—মানুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতি বিজয়, ক্লৈব্যের নীতি ত্যাগ করে প্রকৃত মানুষ তৈরীর দর্শনের কথা ধ্বনিত হচ্ছে।

সৃজনশীল আদর্শবাদই ছিল বিবেকানন্দের মূল কথা। প্রতীচ্য থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বিবেকানন্দ বাংলার তরুণদের কঠোপনিষদে বর্ণিত নচিকেতার কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেন। নচিকেতা বলেছিল, "আমি অনেকের চেয়ে বড়, এবং খুব কম লোকের চেয়ে ছোট এবং কোন বিষয়েই আমি সকলের নীচে নই।" বিবেকানন্দ এই আত্মবিশ্বাসের ধর্ম্ম প্রচার করেছেন। তিনি শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন, মানুষের সৃজনী শক্তি সামাজিক অবস্থার

উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি নীচ দরিদ্রতম ব্যক্তির মধ্যেও নচিকেতার মত উৎসাহ সঞ্চার ক'রতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দের দর্শন মানতে হলে মানুষকে প্রকৃতি ও সামাজিক আবেষ্টনীর উর্দ্ধে উঠতে হবে। তিনি বলেছেন, মানুষের শক্তি, উৎসাহ ও বিশ্বাস দ্বারা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। অথর্ব্ব বেদের মানুষ যেমন বলেছিল, 'পৃথিবীতে আমিই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী এবং সর্ব্বজয়ী', তেমনই বিবেকানন্দ কলিকাতার সেই সভায় বাংলার তরুণদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "আমাদের বিশ্বজয় করতে হবে ; ভারত পৃথিবী জয় করবে। আমার আদর্শ তাই—এর একটুও কম হলে চলবে না। এই আদর্শ খুব বড় বলে মনে হতে পারে, আপনাদের অনেকে বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু একথা সত্য, আমাদের বিশ্বজয় করতেই হবে, নতুবা মৃত্যু বরণ করতে হবে। এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, আমাদের বাইরে যেতে হবে। জীবনের লক্ষণ দেখাতে হবে, নইলে অধঃপতিত হ'য়ে মরতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

বৎসরটি স্মরণীয়। ১৯০৫ সালে ভারতে যে আদর্শ সুনির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে তার সাত আট বছর পূর্ব্বের ১৮৯৭ সালে তিনি এই কথা বলেছিলেন। আজ ১৯৩৬ সালে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে এবং আন্তর্জ্জাতিক মীমাংসা স্থাপনে যে সব প্রতিষ্ঠান সাহায্য ক'রেছে তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বেদান্ত-কেন্দ্রগুলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কেন্দ্রগুলি আমেরিকার নর-নারীর সঙ্গে ভারতের নর-নারীর মৈত্রী সংযোগ স্থাপনে সাহায্য ক'রেছে। সেণ্ট পল যেমন তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র হিসাবে রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানীকে বেছে নিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনই য়ুরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে নিউ ইয়র্ককে বেছে নিয়েছেন। বেদান্ত বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য দূর করবার চেষ্টা ক'রছে এবং বর্ত্তমানে আমেরিকান ও আমাদের দেশবাসীরা একযোগে স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সামাজিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিশ্বশান্তির ভিত্তি দৃঢ়তর করার পক্ষে ইহা এক বিরাট ঐক্যশক্তি ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছে।

বিবেকানন্দ যে আন্দোলন আরম্ভ ক'রেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি। সৌভাগ্য ক্রমে এমন এক দল সহকর্ম্মী ও শিষ্য তাঁর স্থান গ্রহণ ক'রেছেন, যাঁরা তাঁর আরব্ধ কাজ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে চালিয়ে যেতে জানেন। বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এক প্রকার নিষ্ক্রিয় ছিল। আমরা প্রকৃত পক্ষে আমদানীকারক—তাই বা কেন, আমরা ছিলাম ভিক্ষুক। কিন্তু বিবেকানন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি যুগ আরম্ভ হয়েছে যখন ভারতের নর-নারী মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সক্রিয় অংশীদার ও সৃজনশীল সহকর্ম্মী হিসাবে কাজ ক'রছে: তখন থেকে ভারত কেবল আমদানীই করছে না—সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম সকল প্রকার আধুনিক সংস্কৃতির পণ্য রপ্তানীও ক'রছে।

আজ ভারতের ১৪টি কেন্দ্রে কাজে ও কথায় এই শক্তি ও ব্যক্তিত্ববাদ এবং স্বাধীনতার নূতন বাণী প্রচারিত হচ্ছে। এই সব কেন্দ্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় অবস্থিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১২টি কেন্দ্র আছে। ১৯৩২ সালে বুয়েনস এয়াবেস (আর্জেণ্টিনা) থেকে এক আমন্ত্রণ আসে এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক সেখানে একটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছে।

সম্প্রতি য়ুরোপও এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৩৩ সালে জার্ম্মাণীর উইলব্যাডেনে কতিপয় জার্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিতের উদ্যোগে একটি পাঠচক্র স্থাপিত হ'য়েছে। বেলুড় মঠ থেকে স্বামী যতীশ্বরানন্দকে সেখানে কেন্দ্র পরিচালনার জন্য পাঠান হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেদান্তের বাণীর মধ্যে জার্ম্মাণরা তাদের দেশের বিখ্যাত দার্শনিক ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, হেগেল ও সোপেন হাওয়ারের দার্শনিক আদর্শবাদের সুরই খুঁজে পেয়েছে।

১৯৩৪ সালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অব্যক্তানন্দের পরিচালিত পাঠচক্র সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে একথা ঘোষণা করা যেতে পারে যে, এখন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এবং তাঁদের লিখিত পুস্তকের পোল, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই সব কেন্দ্র সমাজসেবার কাজও করে থাকে। যেমন—দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, নৈশ বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, বালিকা নিবাস, বিশ্রাম নিবাস, আতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্ভিক্ষ বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, ঘূর্ণীবাত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সাহায্য।

সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে আজিকার গাঙ্গেয় বদ্বীপের নূতন বৈদান্তিক প্রত্যক্ষবাদ পর্য্যন্ত বিশ্বসভ্যতা ও মানব-সমাজ সেই 'চরৈবেতি'র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে। ইহা পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন ভারতের দিগ্বিজয়ের এবং সকল শ্রেণীর লোককে আত্মার মুক্তিসাধনের ঐতিহ্য—যা বিবেকানন্দ এবং তাঁর পরবর্ত্তী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীরা আধুনিক অবস্থার মধ্যেও অনুসরণ ক'রে চলেছেন এবং এর দ্বারা হিন্দু মানবতা ও আধ্যাত্মিকতা শক্তি প্রচারিত হচ্ছে।

অনুবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

আত্মত্যাগ

পূর্ণ আত্মত্যাগ কি? সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? আত্মত্যাগ অর্থে এই আপাত প্রতীয়মান অহং-এর ত্যাগ, সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার পরিত্যাগ। এই অহঙ্কার ও মমতা পূর্ব্ব কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই অহংত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা নিত্য স্বরূপে, নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ—ইহাই সমুদায় নীতি শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদায় জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে,—অল্লাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাত ভাবে করিয়া থাকে মাত্র। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। ইহা প্রকৃত আত্মা নহে জানিয়া তাহারা এই ত্যাগ-যজ্ঞ আচরণ করুক। এই ব্যবহারিক জীব অসীম জগতের ভিতরে আবদ্ধ। এক্ষণে যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে, তাহা সেই জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাসমাত্র; সেই সর্ব্বস্বরূপ অনন্ত অনলের এক কণা মাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

—বিবেকানন্দ।

অগ্নিযুগের বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা অপ্রকাশিত পত্রাবলী

শান্তিনিকেতন
১৪।৮।৩১

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

"বারীনদা" ৭ই আগষ্টের আপনার পত্র পাইলাম। পত্রের উত্তর দেরিতে দেওয়ায় আপনি কুণ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এ বিষয় কাহাকে দোষ দিতে পারি আমার সে অধিকার নাই।

সেই হাঙ্গেরিয়ান যুগল, উপস্থিত কোথাও যাইবার কথা বলেন না, তাহার সহিত এ বিষয় পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলব। যদি সেরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকে তবে আপনায় পরে জানাবো।

ভালবাসা জানিবেন। এতদিনেও আপনার ভালবাসা ম্লান হয় নাই। কলিকাতায় অল্প সময়ের জন্য, বিজলীর মতই একবার দেখেছিলাম। কিন্তু সব খবরই পাইয়া থাকি।

আমি ভাষায় লিখিতে শিখি নাই তবে মাঝে ২ দু চারটা ছত্র ছেলেদের বুঝাবার জন্য বলে থাকি উহা যদি ছাপাবার যোগ্য হয়, পাঠাব, বুঝে সুঝে ছাপাবেন। তবে ছবির দিক থেকে আপনাদের সাহায্য করতে করতে আমি প্রস্তুত আছি জানিবেন। ইতি

গুণমুগ্ধ
শ্রীনন্দলাল বসু
Santiniketan
Bengal, India

১৩।১১।৩৪
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
৫-এ, আউধ ঘর্বুরী, বারাণসী।
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০।

ভাই বারীন,

তোমার চিঠি পেলাম। মৃণালিনী দেবীকে আমি একখানা 'মন্দির' (কার্ত্তিক মাসের) পাঠিয়েছিলাম। সেটা ডাকে মারা গিয়েছে, দেখছি। আজ একখানা 'মন্দির' অগ্রহায়ণ মাসের তার নামে পাঠাতে ভরসা না পেয়ে, তোমার নামে পাঠালাম। এটা তুমি তাকে দিও।

নিজের কর্ম্মশক্তি একেবারে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে কেবল চুপ করে পড়ে থাকতে ভালো লাগে। অথচ আশ্রম করার দরুণ অনিচ্ছায় নানা কর্ম্মে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কবিতা একেবারে ছাড়িনি, ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু আর ঝোঁক নেই।

কিছুতেই আর কিছুমাত্র ঝোঁক নেই। কেবল নীরবে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। কেবল পুরাতন বন্ধু—যারা চলে গিয়েছে—তাদের কথা মনে করে' আনন্দ হয়। আর কোনো চিন্তায় কোনো আরাম নেই।

১৯৩৪ থেকে আমার diabetes. সময় সময় আহার সংক্ষেপ করে' শুধু দুধে নিয়ে আসতে হয়। ভাত তো বহু কাল খাই না। বর্ত্তমানে রুটী, দুধ, ছানা ও ঝোল পথ্য চলছে। সময় সময় খুব দুর্ব্বল করে' ফেলে, আবার ভালো হই।

তুমি আশা করি আনন্দে রয়েছো; যদিও বিয়ে বন্ধ্যা মানুষের আনন্দ ঠিক কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত।

তোমার কবিতা ছাপা হলে 'মন্দির' পাঠাবো। আমার প্রীতি লও।

তোমাদের
দরবেশ।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
৫-এ, আউধ ঘর্বুরী, বারাণসী।
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫০

প্রীতিভাজনেষু—

অনেক কাল পরে তুমি স্মরণ করছো দেখে খুব আনন্দ হলো; আগের কত কথা মনে হলো।

জটিয়া বাবার সমাধি বাস্তবিক আকর্ষণের বস্তু; স্থানটিও মনোরম। এখানে যে বিজয়কৃষ্ণ মঠ,—সে একটা ক্ষুদ্র বাড়ী। কেবল তাঁর বিরাট মর্ম্মরমূর্ত্তি রয়েছে বলে' এ মঠের একটা মূল্য হয়েছে। কোনো রকমে দিন চলে' যাচ্ছে। কৈ, যাঁকে চাই, তাঁকে তো পাইনে। তাই মনে হয়,—বুঝি চাইনে। চাইলে পেতাম। তবে কী চাই? মান, যশ, টাকা—এ সমস্ত তো চাইনে। তবে কী যে চাই, তাই বুঝতে পারলাম না। যশের ভয়ে লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

ভাই, আশীর্ব্বাদ কর যেন নীরবে পড়ে' থাকতে পারি। শরীর অপটু।

মৃণালিনী দেবীকে এই মাসের 'মন্দির' পাঠিয়ে দিলাম। তোমার কবিতাটী পৌঁছে যাবে। আমার আলিঙ্গন লও।

গুণমুগ্ধ
কিরণচাঁদ দরবেশ

পূর্ণিয়া—১২।১।৪৪

কল্যাণীয় প্রিয়বর

পত্র পেয়ে আনন্দ পেলুম। আনন্দের প্রধান কারণ—বারীন্দ্র সেই পরাশান্তির কোলে স্থান নেবার প্রয়াস পাচ্ছে। এই ত' তোমার মত কথা। এইখানেই তোমার পরিচয়। এ প্রয়াস তোমারি যোগ্য, তুমি তো ভাই "ছোট" প্রাণ নিয়ে জন্মাওনি। 'মহাপ্রাণ' কথাটি সকলের জন্যে নয়, পাছে উপহাস ভাবো, তাই ব্যবহার করলুম না, সেটা মনেই থাকুক। পারের কড়ি খুঁজচো। সেটা 'মন,' সে তোমার মধ্যেই আছে। তাকে ধরলেই ভাণ্ডারদ্বার খুলে যাবে। সে তোমারি অপেক্ষা করে রয়েছে—তোমারি অন্তরে।—বীজ রয়েছে বুকে, ব্যাকুল নয়নজল পেলেই বেরিয়ে ধরা দেয়। হৃদ্‌পিণ্ডমথিত চোখের জলেই সে তুষ্ট। আমার মনে হয়—সেই আমাদের পারের কড়ি। এটা কিন্তু গরীবের কথা ভাই।

সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—অভীষ্ট লাভ করো। এ তোমারি কাজ, তুমিই পারবে।

পত্রে আর কারো সংবাদ নাই কেনো? আমি সকলকেই শুভাশীষ ও ভালবাসা জানাচ্ছি।

আমার সাহিত্যসেবা কেবল সময় কাটানোর জন্যে। ওই আমার মাথা খেলে,—দোটানায় ফেলে ফাঁকি দিলে। দীর্ঘ জীবন কেবল বৃথা শরীর বহন করেই কাটালুম।

মণি বাবুর মঙ্গল কামনা করি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহ-ভারতী
পুরেনি পোঃ
দক্ষিণ ভাগলপুর
২৭শে মার্চ্চ' ৩১

প্রীতিভাজনেষু,

বারীনদা, তোমার চিঠি যেদিন আসে সেদিন আমি ভাগলপুরে। তাই উত্তর দিতে বিলম্ব।

তুমি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ চেয়েছ, কিন্তু তা তো দিতে পারলুম না। বর্তমান পলিটিকস যাঁকে নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার যে প্রকাণ্ড মতভেদ। এতদিন যা' বলে এসেছ—আজ সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার উল্টো গাইতে দেওয়া কি ঠিক হবে? তা ছাড়া আমি এত দূরে—আর খবরে এত পেছিয়ে যে যাই কেন লিখতে যাই—পুরোনো কাসুন্দি হ'য়ে যায়। তাই ঐ কতকটা অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট বিষয় নিয়ে ঐ প্রবন্ধটা দিয়েছিলুম। সম্পাদকীয় হবে না। তবে, অন্য কিছু দেব। সম্প্রতি বিশেষ কাজে ঘন ঘন ভাগলপুরে যেতে হচ্ছে—তাই লেখার কুড়েমি ভেগে গেছে।

তুমি ইনিভারসিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার কাজ পেয়েছ শুনে সুখী হলুন। 'বিজলী' কি তবে চলবে?

আশা করি ভাল আছ। আমাদের দিন চ'লে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গরম পড়ছে। ভালবাসা জেনো। ইতি—

তোমাদের
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গৃহ-ভারতী
পুরেনি পোঃ, দক্ষিণ ভাগলপুর

প্রীতিভাজনেষু, ১১।৮।৩১

বারীনদা, তোমার ১১।৮ এর চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। ইতি-মধ্যে মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় যে ব'য়ে গেল তার হিসেব করার শক্তিও আর নেই। ১২ই জুলাই থেকে ১৪ই আগষ্টের মধ্যে আমার অত্যন্ত নিকট-প্রিয়জনের মধ্যে ৫ জন মারা গেছেন। তার মধ্যে আমার ছোট মেয়েটি একজন।

বছর পাঁচেক আগে দুঃখের সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে এখেনে এসেছি। আসার কারণ আমার স্ত্রীর লেপ্রসি। সেই সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন যিনি আমাদের মনুমা। ভাগলপুর মেয়েস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বি-এ পাশ। তিনি আমার দুঃখে সহানুভূতি ক'রে এসে ছেলেমেয়েদের সকল ভার নিয়েছিলেন। গৃহ-ভারতীর সকল কর্তৃত্ব ছিল তাঁরই হাতে—আমি তাঁর ছিলুম খোকা। তিনিই আমার ছোট মেয়েটিকে জন্মের পর মানুষ করছিলেন। ২৭শে মে এখান থেকে রওনা হয়ে—জুন মাসের মাঝামাঝি কটকে তাঁর মা-বাবাকে দেখতে যান। সেখানে তাঁর ভাইপোটির হয় টাইফয়েড—তাকে সেবা করতে করতে মনুমাও রোগে আক্রান্ত হন। ১২ই গোবা (ভাইপো)-১৭ মনুমা-২৫শে মীরা (তাঁর ভাইঝি) এবং ৩১শে বাচ্চু (আমার ছোট মেয়ে) মারা যায়। ১৪ই আগষ্ট আমাদের ছোট বৌমা (ছোট ভাইএর স্ত্রী) একঘর কাচ্চা-বাচ্চা রেখে চলে গেছেন।

এর মধ্যে মনুমা চলে যাওয়াতে আমাদের গৃহ-ভারতীর প্রদীপ নিভে গেছে। ভারতী চলে গেছেন। আমার উপর সাতটি ছেলেমেয়ের পড়ানর ভার। ১০০ বিঘে জমির চাষ—আরো আরো কত কি,—কি বলবো তোমাকে? কি যে করি কিছুই জানিনে।

লেখা কি আসে? তাই কোন রকমে অনুবাদ দিয়েছি। ক্ষমা ক'রো। লেখা হাত থেকে বের হ'লেই পাঠাবো। আমার চাঁদমুখ যে কি ভীষণ জিনিষ তা যখন দেখবে তখনি ভিরমী যাবে নিশ্চিত। ভালবাসা নিও। —ইতি তোমার সুরেন।

গৃহ-ভারতী
পুরেনি পোঃ দক্ষিণ ভাগলপুর

প্রীতিভাজনেষু, মার্চ্চ, ১১।৩১

বারীনদা, তোমার চিঠি পেয়েছি। টাকার অভাবে 'বিজলী' বন্ধ শুনে এত দূর থেকে দুঃখ করা ভিন্ন আর কিছু সম্বল আমার নেই। বাংলা দেশে ভাল জিনিস অচল। কিন্তু তাই ব'লে ভালর জন্যে চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। শুনেছি নোংরা বইগুলো আজকাল দশ বার হাজার করে কাটে!

তোমার ঠিক অবস্থাটা এত দূর থেকে বুঝে উঠা শক্ত—তার উপর আমি আবার একটু স্থূল বুদ্ধির লোক। চাষবাস ক'রে ওটা যেন আরো মোটা আর ভোঁতা মেরে যাচ্ছে।

তুমি আমার কথা জানিয়েছ। তোমার আত্মীয়তা, আর মনের প্রসন্ন ভাবের জন্য মনে মনে তোমাকে খুবই ভাল লাগল: কিন্তু তোমাকে আহ্বান করার মত শক্তি যে আমার নেই দাদা! প্রকাণ্ড ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘর তুলে আছি। না আছে খাওয়া-দাওয়ার শ্রী, না আছে শোয়া-পরার। একদঙ্গল ছেলে মেয়ে। এর নাম দিয়েছি ভাই "জীপ্‌সী" ক্যাম্প। টাকার অভাব ত' আছেই, তা ছাড়া স্থানাভাব। কোথায় ব'সতে দেব, শুতে দেব তাই জানিনে। অতএব আমার বর্ত্তমান অক্ষমতার জন্যে মার্জ্জনা ক'রো দাদা। যদি কোন দিন সৌভাগ্য হয় ত তোমাকে যেন ঘরে আনতে পারি এই আশীর্ব্বাদ ক'রো।

আশা করি ভাল আছ। আমাদের কুশল। ভালবাসা নিও।

ইতি—

তোমার

সুরেন।

গৃহ-ভারতী

পুরেনি পো:, ভাগলপুর: বিহার

৪ঠা কার্ত্তিক '৩৭

বারীনদা ভাই,

এর আগে একখানা পোষ্টকার্ডে তোমার চিঠি আর দীপালির প্রাপ্তিসংবাদ দিয়েছিলুম, পেয়েছ বোধ হয়।

মাঝে একটু কুপোকাৎ হওয়ায় লেখায় দেরি প'ড়ে গেল। আজ এই সঙ্গে দীপালির সমালোচনা পাঠাচ্চি। সমালোচনাটা বইখানার, কি তোমার তা' ঠিক করে উঠা শক্ত। বইখানার মধ্যে আমি প্রবেশ ক'রে নিজের মতামত প্রকাশ এই জন্যেই করলুম না, যে, আমি যা বলতুম তার চেয়ে পাঠকের হয়ত ঢের বেশী ভাল লাগবে। তোমার এক একটা গল্প ভারি চমৎকার উৎরেছে। মনে হয় সরস্বতীর মুকুটের মাণিক হ'য়ে চিরদিন সাহিত্যকে উজ্জ্বল ক'রে রাখবে। প্রাপ্তি স্বীকার ক'রো। আর লেখার অক্ষমতার জন্যে রাগ ক'রো না। যত্ন ক'রেই লিখেছি।

আশা করি বেহালার মাটি আঁচড়ে নখ খইয়ে ফেল নি। শুধু বুঝি চরকাই দোষ ক'রেছে?

অল্পদিনের মধ্যে ওদিকে যাবার ইচ্ছা আছে। গেলে দেখা করার ইচ্ছা রইল।

ভালবাসা জেনো। ইতি তোমাদের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র
বিজয়কৃষ্ণ ঘোষকে লেখা

Craigmount
Darjeeling
8. 12, 18

প্রিয়বরেষু,—

আপনার চিঠিখানি আমার এই শীতার্ত্ত মনের উপর সাহিত্যের একটুখানি বসন্তের বাতাস বইয়ে আমাকে তাজা করে তুললে। অনেক দিন সাহিত্যচর্চ্চা কিছুই করিনি; সেই জন্যে ঐ ছিটেফোঁটা সাহিত্যরসেই মনটা ভরপুর হয়ে রইল। কেবলই মনে হচ্ছে আপনি আরো খানিকটা লিখলেন না কেন? এর মধ্যে থেমে গেলেন কেন? আপনার চিঠি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যে আপনার মনের আবহাওয়াটি এমন একটি উত্তাপে ভরে রয়েছে যার স্পর্শ এতদূরে আমার এই ঠাণ্ডা মেজাজের উপর পর্য্যন্ত এসে লাগল—আমি যেন একটু আরাম বোধ করলুম। নিশ্চিন্ততার মধ্যে সুখ আছে স্বীকার করি, কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিন্ততা বোধ হয় মৃত্যুরই সামিল। আমার এই নিশ্চিন্ততার তুষার কবর থেকে আজ হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। আপনারা যে-সমস্ত সমস্যার উত্তাপে সজাগ হয়ে রয়েছেন তারই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার একটা তাগিদ যেন ঠেলা দিতে আরম্ভ করেছে।

বাস্তবিক আপনার সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্য ও প্রমথ সাহিত্য নিয়ে আমার একবার বোঝাপড়া করবার ইচ্ছে আছে। সত্য বলতে কি, প্রমথ সাহিত্যকে আপনি কি ভাবে দেখছেন, তা আমি এখনও ঠিক ধরতে পারিনি। এ সম্বন্ধে আপনার মুখের কথা শোনবার আমার বিশেষ ইচ্ছে আছে। একটা বিশেষ সুযোগ খুঁজে এই ইচ্ছা আমার মিটিয়ে নিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদি নাম করতে হয় তাহ'লে প্রমথ সাহিত্যকে আমি খুব বেশী উচু স্থান দিই না। তার প্রধান কারণ প্রমথ সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের তুলনায় আকারে এবং প্রকারে এত ক্ষুদ্র যে তুলনা করা চলে না। তাছাড়া আমার তো মনে হয় কয়েকটি 'মত' মাত্র সজোরে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা ছাড়া প্রমথ সাহিত্য আর বিশেষ কিছু করেনি। সত্যকার সাহিত্যরস যা তা যে প্রমথ সাহিত্যে ভালো রকম জমেছে আমার তা মনে হয় না। তার প্রধান প্রমাণ পাবেন প্রমথ-সাহিত্যের গল্প থেকে। ঐ গল্পগুলি যতটা বুদ্ধিপ্রধান হয়েছে ততটা হৃদয় বা মন-প্রধান হয়নি। অধিকাংশ চরিত্র বুদ্ধির গৌরবে একেবারে ঝক্‌ঝক্ করছে কিন্তু যেখানে বুকের রক্তধারার তালে হৃদয় দুলতে থাকে সেখানটা যেন ফাঁকা। সেই জন্য ঐ সব রচনা খুব কমই human হয়েছে। এবং সেই জন্তেই আমার মনে হয় ওতে সাহিত্যরসেরও অভাব ঘটেছে। তা ছাড়া প্রমথ বাবু খণ্ড-খণ্ড ভাবে সাহিত্যকে যা দান করেছেন তা থেকে এখনো এমন কিছু দেখিনি যেটা হচ্ছে সাহিত্যের "গৌরব" অর্থাৎ যে সৃষ্টিসৌন্দর্য্য মানুষকে শুধু মুগ্ধ করে তা নয়, মানুষকে সেই অনির্ব্বচনীয়তার দিকে তুলে ধরে, যার আনন্দে মানুষ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠে। প্রথম-সাহিত্য বিশেষ করে কেজো সাহিত্য। তার যে প্রয়োজন নেই, তা বলচি না, বরং এখন আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং হয়ত এই সাহিত্য একদিন উচ্চতর সাহিত্যের রসবোধের সহায়তা করবে, কিন্তু তাই বলে একে বড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে একত্রে বসাতে পারি না, তবে আমাদের দেশের সাহিত্যচর্চ্চায় যে অভাব পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রমথ বাবু যে একজন বড় এ কথা না বললে অন্যায় হয়। প্রমথ-সাহিত্য কি দিতে পারবে এখনো তা স্পষ্ট হয়নি, কাজেই এখনও তার সমালোচনার জন্তে অপেক্ষা করতে হবে। আমার তো এই মনে হয়।

কিন্তু কেন হঠাৎ গায়ে পড়ে এই ঝগড়া করতে বসলুম? আপনার কি কথা, কিছুই জানি না, তবু কেন এই হওয়ার সঙ্গে লড়াই বাধালুম? তার কারণ বোধ হয় চিঠির গোড়াতে যা লিখেছি। হঠাৎ আমার মধ্যে উৎসাহের আবির্ভাব। এই উৎসাহের মুখে যা এল, তারই সঙ্গে লড়াই বাধালুম—বাচবিচার করলুম না।

অস্ত্রগুলোকে ভাল করে শাণিয়ে নেবারও অপেক্ষা করলুম না। কাজেই তার ফল যা হ'ল তা এই চিঠিতেই জাজ্বল্য হয়ে রইল। কেবল কতকগুলো আস্ফালন মাত্র। যাক।

আপনি আবার লিখতে সুরু করেছেন শুনে সুখী হলুম। আমার কবে ঐ সুদিন আসবে কে জানে? দু-একটা রচনা আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারবেন। ভারি দুঃখের বিষয় যে আপনার ভারতীতে দেওয়া শেষ প্রবন্ধটি আমি পড়তে পেলুম না। এমন অবস্থায় প্রবন্ধ হাতে এল যখন দু লাইন পড়বার শক্তি আমার নেই। আশা করি কলিকাতায় ফিরে গিয়ে লেখাপড়ায় মন দিতে পারব। আমার গল্পগুলি সমালোচনা করে কোন কাগজে প্রকাশ করবার আপনার ইচ্ছা আছে শুনে আহ্লাদিত হলুম। যদি কখনো সে সমালোচনা প্রকাশ হয় তাহ'লে এই আহ্লাদের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এ কথা না বললে সত্য গোপন করা হয়। আপনার স্নেহের স্পর্শে আমার গল্পগুলি যে আদর ও গরবে ফুলে উঠবে এ কথা বলাই বাহুল্য এবং সে যে আমার আনন্দের সৌভাগ্য তা বলা বাহুল্য। আমার নিজের লেখার দোষ-গুণ আজ পর্য্যন্ত কারো কাছে ভাল করে শুনিনি। আয়নায় নিজের চেহারা দেখা যায়, নিজের লেখার স্বরূপ দেখবার যদি একটা আয়না থাকতো তো বেশ হ'ত। আপনি Sex সম্বন্ধে কি লিখেছেন, কলিকাতায় গিয়ে আমায় পড়তে হবে। অনুগ্রহ করে কাগজগুলোর সন্ধান আমায় দেবেন।

আমি এখানে সপরিবারে আছি, বন্ধু সত্যেনকে আনতে পারিনি। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নড়ানো শক্ত। আমরা ভাল আছি। আশা করি আপনাদের খবর ভালো। এখানে ক্রমেই এত শীত পড়েছে যে তিষ্ঠানো শক্ত হয়ে উঠেছে, দুপুর রৌদ্রে গা দিয়ে বসে আছি, তবু গা এতটুকু গরম হয়নি। কাজেই আগামী শনিবার এই ডিসেম্বর শৈলশিখর ছেড়ে পালাচ্ছি।

আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন। অনেক বাচলতা করেছি, কিছু মনে করবেন না। ১২ই ডিসেম্বর দার্জ্জিলিং মেলে যদি এর উত্তর দিতে পারেন তবে এই ঠিকানায় চিঠি দেবেন—নচেৎ কলিকাতায়। ইতি—

স্বাঃ মণিলাল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
গরিফা, পোঃ ২৪ পরগণা।

ঋষি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা অপ্রকাশিত পত্র

Burdwan, 18 June.

বহুল সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন,

কলা পরিষদের যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে আপনাকে "মাননীয় সভ্য" বলিয়া নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব আমি করি। সকলেই আনন্দের সহিত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। আরও কয়েক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালীকে (কবি হেম বাবু, কবি নবিন বাবু, দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রভৃতি) "মাননীয় সভ্য" করা হইয়াছে। সর্ব্ব সুদ্ধ ছয় জন বাঙ্গালীকে এ সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এর পূর্ব্বে চারি জন বি × × কে উহা দেওয়া হইয়াছিল—মোট দশ জন।

আমাদের পরিষদের কার্য্যকলাপ বাঙ্গালাতেই করা স্থির হইয়াছে। কতগুলি নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা আপনি যথাসময়ে পাইবেন। ত্রৈমাসিক একখানি কাগজ বাহির হইবে বাঙ্গালাতে—তাহাতে আমাদের সভার কার্য্যবিবরণী, পুস্তকের সমালোচনা এবং নূতন প্রবন্ধ আদি প্রকাশিত হইবে। বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে ঐ কাগজ প্রকাশ হইবে।

আপনার একান্ত বশম্বদ
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীহরি

বরিশাল, ২০·৮·৯৫·

শ্রীচরণকমলেষু—

উন্মাদচিকিৎসকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তিনি যাইতে প্রস্তুত আছেন। পূজার ছুটির সময়ে হয়ত পাঠাইতে পারিব। তিনি এখন কোথায় আছেন জানি না, আপনার পত্রের মর্ম্ম তাঁহাকে জানাইয়া পরে লিখিব।

আমার ইতিমধ্যে কয়েক বার জ্বর হইয়াছে। এখন একরূপ আছি ভাল।

(১) বারি ও (২) অবিনাশকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন। মণীন্দ্রের সভায় টাকা না পাঠাইতে পারায় লজ্জিত আছি। শীতকালে পাঁচ টাকা পাঠাইব। ভরসা করি শরীর আছে ভাল। মনের ত কথাই নাই।

প্রণত
শ্রীঅশ্বিনী

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জয়তি

সভাবাজার রাজবাটী
কলিকাতা
২৫শে জ্যৈষ্ঠ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইলাম। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে যে দয়া করিয়া দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন নানা কারণে তাহার উত্তর দিতে না পারায় আমি অতিশয় লজ্জিত আছি ও তন্নিমিত্ত আপনি কোন অপরাধ না লইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব। আপনি যেরূপ আমাকে ভালবাসেন তাহাতে নব উপাধি সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য প্রকাশ তাহায় আপনার উপযুক্তই হইয়াছে।

যোগীন্দ্রবাবুকে (৩) আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন ও মুণীন্দ্র বাবুকে (৪) ও অবিনাশকে (৫) আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। এ বাটীর সকল মঙ্গল জানিবেন।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ

---

(১) রাজনারায়ণের দৌহিত্র বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) ঐ (৩) রাজনারায়ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র (৪) ঐ কনিষ্ঠ পুত্র এবং (৫) ঐ তৃতীয়া কন্যার পুত্র।

ওঁ

(পোষ্ট মার্ক ২৫ আগষ্ট ১৮৯৫)

শনিবার

ভক্তিভাজনেষু,

আপাততঃ আপনাকে দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি পরে অন্যান্য জিজ্ঞাসা করিব। আজিকার এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর কর্ত্তা মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন।

১। আপনি কর্ত্তা মহাশয়ের শ্মশান বৈরাগ্যের পর তাঁহার মনের ভাব তিনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা quotationএর মধ্যে লিখিয়া foot noteএ লিখিয়াছেন "কোন কারণবশত মহর্ষির ঠিক কথাগুলি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।" কর্ত্তা মহাশয় তাঁহার সমস্ত কথা in full জানিতে চাহিয়াছেন এবং তাহা কোথায় আছে, তাহাও লিখিবেন।

২। মেদিনীপুরে কর্ত্তা মহাশয় কবে গিয়াছিলেন?

কর্ত্তা মহাশয়ের আদেশে এই দুইটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইলাম, সত্বর উত্তরদানে বাধিত করিবেন। অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যশোহর

২৬।৬।৯৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার অনুগ্রহলিপি প্রাপ্তে আমাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। আপনার উপদেশগুলি আমার শিরোধার্য্য হইবে এবং আপনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই আমার মত আছে।

আপনার শারীরিক মঙ্গল লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। বৈদ্যনাথ আসিয়া আপনাকে দর্শনের ইচ্ছা থাকিল, কত দূর সফল হয় জানি না। আগামী সংখ্যার পত্রিকা (১) বাহির হইলেই পাঠাইব। যাহা বিবেচনা করেন লিখিয়া জানাইবেন।

বিনীত শ্রীযদুনাথ মজুমদার

৪৫।৩ বেনিয়াটোলা লেন, ১০ই মে, ১৮৯৫

শ্রীচরণেষু,—

যদি আত্মজীবনীর আরও কিছু, কিম্বা আপনার অন্য কোন অপ্রকাশিত লেখা পাই, তাহা হইলে এ মাসেও "দাসীর" কয়েক পৃষ্ঠা সুপাঠ্য হয়।

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। আপনার Religion of love ধীরে ধীরে বিক্রীত হইতেছে; এখনও মুদ্রাঙ্কন ব্যয় উঠে নাই।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী

রামানন্দ

৪৫।৩ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা, ১৫-৫-৯৫

শ্রীচরণেষু—

আপনার প্রেরিত "পশ্চিম ভ্রমণ" পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। "আত্মজীবনী" হইতে আর কিছু না পাইলেও যদি অপর লেখা পাই, তাহা হইলেও চলিবে।

আপনার কুশল প্রার্থনা করি।

স্নেহের

রামানন্দ

(১) হিন্দু পত্রিকা

২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪-৬-৯৫

শ্রীচরণেষু—

জুন মাসের "দাসী" বোধ হয় পাইয়াছেন। যদি "আত্মজীবনী ব্যতীত অপর কোন বাঙ্গালা লেখা থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র দিবেন।

আপনার লেখা প্রথমেই দিতে চাই। যদি খুঁজতে বিশেষ কষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার আগ্রহ সত্ত্বেও লেখা চাহিতে পারি না। এখানে এবার বড় গরম।

স্নেহের রামানন্দ

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয়পূর্ণ নমস্কারা নিবেদনঞ্চ।

আপনার ২৬ বৈশাখের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। পূজ্যপাদ মহাশয়কে আপনার প্রণাম দিয়া পত্রের মর্ম্ম বিদিত করিয়াছি। তিনি এক্ষণে বর্ত্তমান ভাবে সহজ আছেন। অচ্যুতানন্দজী এখানে আসিলে তাঁহাকে পূজ্যপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিব। শান্তিনিকেতন এক্ষণে মেরামত হইতেছে। মেরামত হওয়ার পর আশ্রমধারী গিয়া বসিলে তবে সকল কার্য্য আরম্ভ হইবে। তাহার সম্মুখের খানিকটা পড়ো জমীর দরকার তাহা পাওয়া যাইতেছে না। চন্দ্রনারায়ণ সিংহ মনে করিলে দিতে পারেন। যোগীন্দ্রনাথ বাবু ও অবিনাশকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবেন। আমার ইলা ও পৃথ্বীনাথসহ আমরা ভাল আছি।

আপনার ঘরে চোর ঢুকিয়াছিল। আপনারা জাগিয়া না থাকিলেও না চেঁচাইয়া উঠিলে সবই লইয়া যাইতে পারিত। এই "ম্লেচ্ছ তস্কর সেবিত" পৃথিবীতে আর্য্য ঋষিগণকে এই উৎপাত ভোগ করিতেই হয়। পূর্ব্বের ঋষিরা তখন এই সকল উৎপাত নিবারণের জন্য ঋক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। আপনিও তাহাই করুন। আপনাকে রাত্রির স্তোত্রের মধ্যে একাংশ পাঠাইতেছি। ইহার ঋষি কুশিক। রাত্রিতে শয়নকালে তালার উপর এই তালা লাগাইয়া শুইবেন। ইহা আবশ্যক।

"যাবয়া বৃক্যং ১ বৃকং যবয স্তেনমূর্ম্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব।"

অর্থাৎ—হে রাত্রে! বৃকী আর বৃককে আমাদের হইতে পৃথক কর। আর চোরকে পৃথক কর। তুমি আমাদের পক্ষে সুতরা (ক্ষেমকরী) হও। আমরা সুখে নিদ্রা যাই। ইতি

২৭ বৈশাখ ৫৯

স্নেহাকাঙ্ক্ষিত শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী

সত্যম্

ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। দেবতার আহ্বান দেবতা ইচ্ছা করিলেই সফল হইবে। আমিও ব্যাকুল চিত্তে চরণ দর্শন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

(পোষ্টমার্ক, গিরিধি
১২ সেপ্ট ৯৫)

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

ইন্দুভূষণ রায়

শ্রীশ্রীহরি শরণম্‌

বিহিত সম্মানার্হেষু—

মহাশয়! আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। লিখিত মত একখানি পুস্তকও পাঠাইলাম। চণ্ডী বাবুর ভ্রম প্রদর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য। অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি অনায়াসেই ঐ সকল ভ্রম পরিহার করতঃ শুদ্ধতর পুস্তক প্রচার করিতে সক্ষম হইবেন, কিন্তু কি করিয়া ইহা জানিয়া শুনিয়াও দাদার জীবনী বলিয়া পরিচিত পুস্তকের এতগুলি ভ্রম উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

দাদার ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমার জানা ছিল না। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহার এইমাত্র স্মরণ হয় যে, তিনি ৪।৫ দিবস মাত্র মহাশয়ের নিকট ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। পাঠ লইয়াছিলেন কিনা তাহা তাঁহার স্মরণ হয় নাই।

আর বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার নিকট কয়দিন গিয়াছিলেন ও পাঠ লইয়াছিলেন কিনা তাহাও তাঁহার মনে নাই।

আপনার নিকট দাদা পাঠ লইয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিতে আমি যে কোন রকমে কুণ্ঠিত তাহা মনে করিবেন না। তবে যখন দাদার সহিত এতকাল একত্রে বাস করিয়াও মহাশয়ের নিকট দাদা ইংরাজী পাঠ লইয়াছিলেন, ইহা শুনি নাই, তখন মহাশয়ের নিকট অতি অল্প দিবস মাত্রই পাঠ লওয়া হইয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঠিক কথা। ফলে আমার পুস্তকে যাহা লিখিয়াছি তাহাও ভুল নহে। রাজনারায়ণ গুপ্তের নিকট দাদা অনেকদিন ইংরাজী পাঠ করেন ইহা প্রকৃত। আপনার পত্রের সকল কথা ঠিক পাঠ করিতেও পারি নাই। আপনার নিকট দাদা কয়দিন গিয়াছিলেন বা কি পুস্তক কতটুকু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন জ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। যদি অসুবিধা বিবেচনা না করেন তাহা হইলে ঐ আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিলে নিতান্ত বাধ্য হইব। পরিশেষে আমার কৃত-পুস্তক মহাশয় যে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। ইতি—৪ঠা আশ্বিন ১৩০২ সাল।

বশংবদস্য শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা ২নং নবাবদি ওস্তাগর লেন। ইংরাজী-সংস্কৃত প্রেস।

৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট,
১০ই মার্চ্চ, ১৮৯৪

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে পুস্তক পাঠাইবার জন্য একখানি মাত্র পুস্তক বাঁধান হইয়াছিল। এখনও মলাট ছাপা হয় নাই। আমি পরীক্ষা-কার্য্যে ব্যস্ত আছি। আর ১৬ দিন পরে কার্য্যশেষ হইবে। তখন আপনার আদেশমত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুস্তক প্রেরণ করিব। আশা করি, এই বিলম্বের জন্য ক্ষমা করিবেন। ইনফ্লুয়েঞ্জায় বড় দুর্ব্বল করে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি যেন শীঘ্রই যথাসম্ভব বল লাভ করেন।

স্নেহ ও আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
রামানন্দ।

ওঁ

৩০শে জুলাই ১৮৯৫
মঙ্গলবার

ভক্তিভাজনেষু,

আমি একটু বল পাইয়াছি। আমার ভগ্নীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে—ঈশ্বর যা করেন। আপনার লিখিত কর্ত্তামহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, যদি তত্ত্ববোধিনী ব্যতীত অন্য কোন কাগজে বাহির হয় তাহা হইলে ভালই হয়। আমি আবার বলি যে, যদি ব্রাহ্মসম্পর্ক রহিত কোনও কাগজে প্রকাশ হয়, তবে বড়ই ভাল হয়। যদি অনুমতি করেন, তবে সেইরূপ করি। অনুগ্রহ করিয়া সেইরূপ অনুমতি দান করিয়া বাধিত করিবেন। কর্ত্তামহাশয় আমাকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক material দিয়াছেন, তাহার কতক কতক Leonard's Historyর সহিত মেলে না। কর্ত্তামহাশয় সেইগুলিও দেখিয়া আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন। আমার ইতিহাস লইয়া শীঘ্রই আপনার নিকট উপস্থিত হইব—একটু সুস্থির হইতে পারিলেই হয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছোট গল্প

আজ-কাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট-গল্প বাহির হয় তাহার পনের আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার এতগুলি গল্প বাহির হইয়াছে অথচ একটাও ভালো নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনোটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই, আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোর জবরদস্তির pathos; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনি ধারা একটা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর হোক, মোটেই healthey নয়। ছোট-গল্পের কি দুরবস্থা আজ-কাল...

(রেঙ্গুণ ১০,১০, ১৩৪) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—যুগান্তর—৩রা মাঘ, ১৩৪৪।

বিদ্যাসাগর

ললিত হাজরা

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

"সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখনও নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য; ইহার সন্দেহ নাই।"

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১২ই আশ্বিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শুভ জন্ম দিন। সন ১২২৭ সালের এই শুভ দিনে তাঁহার আবির্ভাব। ইংরাজী ১৮২০ খৃঃ অব্দ। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক অতি দরিদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়।

তাঁহার যখন জন্ম হয় তখন বাংলা দেশে এক নূতন যুগের সূচনা হইতে চলিয়াছে। ইংরাজ শাসক সবেমাত্র ভারতবর্ষে শিকড় গাড়িতে সুরু করিয়াছে। ইংরাজ ব্যবসায়ীর অফিসে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দির কাজ করিয়া বাঙ্গালী ২।৪টি চলনসই ইংরাজী কথা আয়ত্ত করিয়াছে। ইংরাজদের সাহচর্য্যে আসিয়া বাঙ্গালা পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু পরিচিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র বাঙ্গালা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদের প্রগতিশীলতা অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইংরাজ শাসক ভারতবর্ষে তীব্র ভাবে শোষণ চালাইবার মানসে নিজের অজ্ঞাতসারে হউক বা জ্ঞাতসারেই হউক, প্রয়োজনের তাগিদায় ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী সভ্যতার কতকগুলি উপাদান প্রবর্তন করিলেন। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ইংল্যাণ্ডে সংস্কার আন্দোলনের সংবাদ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রগতিশীল ভাবধারা জাগ্রত করে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ভারতবর্ষের নিজস্ব স্বার্থে স্বাধীন অথচ প্রগতিশীল সমাজ সংগঠনের পক্ষে এই নূতন উপাদানগুলি একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে থাকেন। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উপাদানগুলির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য দাবী জানাইলেন। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ক্রমশঃ আস্থা হারাইতে লাগিলেন। হারাইবার কারণও অবশ্য ছিল। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ইংরাজ শাসক শোষণের তাগিদায় ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী সভ্যতার কতকগুলি উপাদান যে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ এই সময়ে হয় সেটাই ছিল প্রগতিশীল। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে রাজনীতি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সমর্থন হিসাবে একটি বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উৎপত্তি হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গতিপথে এই ভাবধারার সূত্রপাত হয়।

ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যখন বুর্জ্জোয়া যুগের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নূতন পথে পদক্ষেপ করিতে সুরু করিয়াছেন, তখন বাংলার সমাজজীবন পঙ্কিল বদ্ধজলার মধ্যে পাক খাইতেছে। অনাচার, শঠতা, নৈতিক অধঃপতন, অশিক্ষা বাংলার সমাজ-জীবনে রাজত্ব করিতেছিল। "সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না।"..."এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত।" "এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ, প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফআকড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ"—পৃঃ ৫৬, ৫৭।

এই পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্রে আবির্ভাব। বর্তমান যুগে বিদ্যাসাগরের ক্রিয়াকলাপের উপর অনেকে গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন কিন্তু যুগের পরিবেশ নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি সে যুগের একজন বিরাট বিপ্লবী। "রিফর্মিষ্ট" (Reformist) বলিলে শুধু অন্যায়ই হইবে না—সত্যের অপলাপ করা হইবে না। বাংলার জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা হিসাবে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গ্রহণ করিতে পারি।

একুশ বৎসর বয়সে বিদ্যাসাগর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ছাত্রজীবনে সমাজের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অন্তরের মধ্যে যে বিদ্রোহ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়াই সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই যুগে যে সব মহাপুরুষ সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ধর্ম সংস্কার ও ধর্মমত প্রচারের মাধ্যমেই করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের পথ কিন্তু ইহার বিপরীত ছিল। ধর্মসংস্কার ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তিনি কোন দিন সমাজ সংস্কারের প্রয়াস পান নাই। সেই যুগের মহাপুরুষদের সহিত বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের পথের পার্থক্য এইখানেই। অবশ্য এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—বিদ্যাসাগর কি ধর্ম মানিতেন না? বিদ্যাসাগর কোন দিনই ধর্মবিরোধী ছিলেন না। ধর্মের নামে যে নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল এবং যে প্রথা ধর্মে রূপান্তরিত হইয়া ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ছিল, তিনি এই ধরণের ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি 'নভোচারী' ছিলেন না। মাটির সহিত যাহার নিবিড়তম সম্পর্ক ছিল তাহার জন্যই তিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। এই বাস্তববোধই তাঁহার জীবন-দর্শনের মূল কথা। বিধবা বিবাহ-আইন-সঙ্গত করিবার এবং পুরুষের বহু বিবাহ নিরোধ করিবার জন্য তাঁহার সংগ্রাম এই কথারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

ছিলেন। জীবনের প্রথম উদ্যম ও আগ্রহ ব্রাহ্ম-সমাজের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। ধর্মমতে দলাদলি ও তাহার মধ্যে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতাবাদের গন্ধ পাইয়া তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন: "নানা প্রকার মতভেদ নিবন্ধন যখন অপ্রিয় সঙ্ঘটন হইতে লাগিল, তখন আর সেই সকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে বিদায় লইলাম। এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা' বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ: ৫৩৮-৩৯)

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তাঁহার গৃহে কোন দিন মূর্তিপূজা হয় নাই। "ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ সাধনের জন্য বিদ্যাসাগরের মাতৃদেবী ব্যতীত কোন পৌরাণিক দেবী-প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—"বিদ্যাসাগর চরিত", পৃ: ১৩) নিজের ধর্মমত অন্যকে গ্রহণ করাইবার মত তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। শিশু-পাঠ্য পুস্তকে ধর্মমত প্রচার তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "বোধোদয়" পুস্তক সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, অনেকে আমার নিকট বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন?" ইহার উত্তরে তিনি একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক। পরের সংস্করণে ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি লিখিলেন: "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।"

মানবতাবাদই ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্মমত। খর্মাটাড়ে সাঁওতাল এবং বর্ধমানের কমলসায়রের নিকটস্থ মুসলমান সন্তানদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ প্রমাণ করিতেছে—বিদ্যাসাগরের সুমহান মানবতাবোধ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালী জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজল-পূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটিই বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে কেবল বাঙালী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।" (অতিভাষণ, স্মরণার্থ সভা, ১৩০২)

জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অতুলনীয়। আমাদের দেশে আজিও অনেকের এই ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, ইংরাজ শাসক এদেশের কল্যাণ কামনায় ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার সহিত পরিচিত করিবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই দেশে ব্যাপক ভাবে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ইংরাজ শাসক স্বেচ্ছায় ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য কিছুই করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় হইতে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত পর্যালোচনা করিলে ইহাই দেখা যায় যে, এই দুই বুর্জোয়া জাতীয় ভাবধারার পথিকৃৎকে শিক্ষার জন্য ইংরাজ শাসকের সহিত কি ভীষণ সংগ্রামই না করিতে হইয়াছে! ইংরাজ শাসক এদেশে রাজকার্যে সুবিধার জন্য কেরাণী প্রস্তুত করিতে যতখানি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ঠিক ততখানিই দিতে চাহিয়াছিলেন। জনশিক্ষার ব্যাপারে ইংরাজ শাসক ইংরাজী বা বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিলেন না। ইংরাজ শাসক সংস্কৃতের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানাইয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্র লিখিলেন। "তিনি সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন ও পাশ্চাত্য শিল্প ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, বিশেষ ক'রে অঙ্ক-দর্শন-রসায়ন-বিদ্যা শারীরবিদ্যা প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানের প্রসারের ব্যবস্থা করার জন্য লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে চিঠি লিখেন। তিনি জানালেন, বৃটিশ জাতির অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করে জাতির সৃজনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইওরোপে যেমন লর্ড বেকনের পূর্বে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল, ভারতেও তেমনি জাতির জ্ঞানান্ধকার ও নৈরাশ্য দূর করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার জায়গায় ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন।" (নরহরি কবিরাজ—"স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা"—পৃ: ৪৬)

বাঙলা দেশে বাংলা শিক্ষা প্রসারের জন্যও বিদ্যাসাগরকে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এই ব্যাপারে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মি: ডব্লিউ গর্ডন ইয়ংকে (W. Gordon Young) সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিবার বাসনা জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রে। পত্রখানি নিম্নরূপ:—

মাননীয় ডব্লিউ, গর্ডন ইয়ং শিক্ষা বিভাগের
ডাইরেক্টর মহাশয় সমীপেষু

১। মহাশয়,

যে গুরুতর কর্তব্যভার এক্ষণে আমার উপর অর্পিত হইয়াছে তাহার সম্পাদনের জন্য অবিরাম মানসিক পরিশ্রম নিবন্ধন আমার স্বাস্থ্য একেবারে এত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে যে, আমি বাধ্য হইয়া আমার এ কর্ম্ম পরিত্যাগ-পত্র মাননীয় লেফটেনেণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করিতেছি।

২। * * * *

৩। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমার স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পুস্তক রচনা ও সঙ্কলন দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত থাকিব। স্বদেশীয় জনসাধারণের সুশিক্ষা লাভ এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহিত যদিও আমার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময়,

সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিব এবং সেই ব্রত জীবনের শেষ দিনে আমার চিতাভস্মে উদ্‌যাপিত হইবে।

৪। আমার এইরূপ গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কারণ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার লোপ ও শিক্ষা প্রণালীর বর্ত্তমান পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাবই প্রধান কারণ। বিভাগীয় কর্ম্মচারী-গণের কর্ত্তব্য কার্য্যের সুসম্পাদনের পক্ষে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ও উপরিতন কর্ম্মচারীর কার্য্যকলাপের সহিত ব্যক্তিগত সহানুভূতি এই দুইটি নিতান্ত আবশ্যক।

৫। * * * *

৬। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমি কেবল এই বলিতে চাই যে, গভর্ণমেণ্টের উপর আমার বুদ্ধি বিবেচনা ও মতামত চাপাইয়া দিবার আমার কোন অধিকার নাই; তথাপি আমি যাঁহাদিগের অধীনে কর্ম্ম করি, তাঁহাদিগের নিকট একথা গোপন করিতে পারি না যে, যে কাজ আমি করিতেছি, তাহাতে আর আমার হৃদয়ের অনুরাগ নাই।……

৭। * * * *

সসম্মান নিবেদন ইতি—
(স্বাঃ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সংস্কৃত কালেজ
৫ই আগষ্ট, ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ

এই পত্রে বিদ্যাসাগর যে সরকারী শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুর হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে সরকারী নীতির সমালোচনামূলক অংশটি বাদ দিয়া অসুস্থতা নিবন্ধন চাকুরী ত্যাগ করিতেছেন মাত্র এই অংশটুকু রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বাংলার এই মহান তেজস্বী পুরুষ যিনি ভাবী বাংলার ভাবী বিপ্লবীদিগকে বিদেশী শাসকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নূতন পথের ইঙ্গিত দিতেছিলেন কোন মতেই তিনি সরকারী শিক্ষানীতির সমালোচনা প্রত্যাহার করিতে রাজী হইলেন না। তিনি ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবকে তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন :—

১৫ই সেপ্টেম্বর
১৮৫৮

মাননীয় এফ্. জে. হ্যালিডে
বঙ্গদেশীয় লেফটেনেণ্ট. গভর্ণর মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমার প্রেরিত কর্ম্মপরিত্যাগ পত্রের যে সকল অংশ আপনার নিকট আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে স্থানগুলি ঐ পত্র হইতে উঠাইয়া দেওয়া আমার বিবেচনায় কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না,……

আমি ত' আপনাকে বহু বার জানাইয়াছি যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থার অধীনে কর্ম্ম-করা আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর ও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ বহু অর্থব্যয় করিয়া যে প্রণালীতে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সে পদ্ধতির প্রতি আমার কোন প্রকার সহানুভূতি নাই। আপনি বেশ অবগত আছেন যে, আমি সর্ব্বদাই আমার কর্ত্তব্যের পথে বাধা পাইতেছি। এতদ্ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে আমার আর অধিক অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা দেখি না এবং একাধিক বার আমাকে অতিক্রম করিয়া অন্যেরা অগ্রসর হইয়াছে।……

(স্বাঃ) "ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।"

বিদ্যাসাগর ইংরাজ শাসকের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কেন? তাহার উত্তর হইল—বিদ্যাসাগর ইংরাজদের এই দেশে মিশনারী মার্কা শিক্ষাপদ্ধতি যে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিবে না তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শিক্ষার জন্য যে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হইবে এবং ফলে অনেকের পক্ষে শিক্ষাজগতে প্রবেশ করা কোন দিনই সম্ভব হইবে না—এই দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি সরকারী শিক্ষানীতির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, সস্তায় বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং শিক্ষাপদ্ধতি সহজ হইবে। এই পথে অগ্রসর হইলে বাংলার দরিদ্র জনসাধারণ অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে না। শিক্ষিত হইয়া তাহারা জাতীয় ভাবধারা প্রচারে সহায়তা করিবে। এই স্থলে ভারতের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলগুলির শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভারতের গণতান্ত্রিক দলগুলির নিকট বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইতে বাধ্য।

বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনে, প্রাইভেট্ কলেজ স্থাপনে ও পথ প্রদর্শনে বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে পাঠকবর্গ মাত্রেই পরিচিত আছেন। এই সম্বন্ধীয় নজীর তুলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় নহে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত। জাতি গঠনের একটি প্রধান ও অপরিহার্য্য অস্ত্র জাতীয় ভাষা। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষাকে সুসংস্কৃত ও পরিমার্জিত করিয়া তাহার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ভাবীকালের নেতৃবৃন্দ জাতিগঠনের জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার মূলে আছে এই মহাশক্তিধর অস্ত্র—বাংলা ভাষা। বাঙ্গালীর হস্তে বিদ্যাসাগরই এই অস্ত্র তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অবদান সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বেই বাংলার গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাংলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জ্জিত সম্পত্তি লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি।" রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন : "এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার জনসন্ স্বরূপ বিদ্যাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন করিতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থ সকলের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। * * * * বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্ম্মাণ ও পরিমার্জ্জন কার্য্য সম্পাদন

করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ আছে।"

সেই যুগে যে জাতীয়তাবাদের অঙ্কুরোদ্গম হইতেছিল তাহাকে সবল শিশুরূপে মানুষ করিবার জন্য "বর্ণপরিচয়" হইতে "সীতার বনবাস" পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের সৃষ্টিগুলি যে আহার্য্য পরিবেশন করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষা ছিল সংস্কৃত শব্দে কণ্টকিত। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত না হইলে তৎকালে বাংলা সাহিত্য পাঠ করা দুঃসাধ্য ছিল। বিদ্যাসাগর নিজ হস্তে সযত্নে এই কণ্টকগুলি উৎপাটিত করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা সংস্কৃতানুরাগিণী। বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা যে সংস্কৃতানুরাগিণী ছিল না—তাহা নহে। কিন্তু তাহার সংস্কার সাধন করিয়া সুমধুর ও সুখপাঠ্য করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন; "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এইরূপ সুমধুর ভাষায় বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"

তাঁহার "বেতাল পঞ্চবিংশতি" বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। এই যুগান্তসৃষ্টিকারী পুস্তক বাংলা সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ভাষার আরও উন্নতি সাধন করেন। মোটের উপর "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র গদ্যের ধারা বাংলা সাহিত্যের সেবকদের নূতন পথের পথিকৃৎ। এই সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "বেতাল পঞ্চবিংশতি"কে বাদ দিয়া বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মন্তব্য: "এক্ষণে যে সুশ্রাব্য সংস্কৃত শব্দসম্বৃষ্টি বাঙ্গালা গদ্য রচনার বিশুদ্ধ রীতি প্রচলিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ই তাহার মূল কারণ, বেতাল পঞ্চবিংশতির পূর্ব্বে ওরূপ প্রকৃতির বাঙ্গালা রচনা ছিল না। বিদ্যাসাগরই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা।" সমালোচনার উর্দ্ধে বলিয়াই মনে করি।

"বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চিন্তা ও শ্রম স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের বিশেষত্ব এই যে, এক দিকে তিনি সীতার বনবাস, শকুন্তলা ও ভ্রান্তিবিলাস রচনা করিয়া ভাষার কোমলতা ও মধুরতার সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এক দিকে বিধবা বিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্রসঙ্গত সমালোচনা গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। আবার আর এক দিকে ১ম ও ২য় ভাগ বর্ণপরিচয়; কথামালা প্রভৃতি রচনা করিয়া শিশুদিগের পাঠোপযোগী সরল গদ্য গ্রন্থ রচনায় অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহার লেখনী এক দিকে বর্ণপরিচয়ের সরলতা অর্জ্জন করিয়াছে, অন্য দিকে বেতালের লালিত্য ও জীবনচরিতের গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দানে সফলতা লাভ করিয়াছে,···সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় এই সারল্য—গাম্ভীর্য্যের বিচিত্র মিলন-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—"বিদ্যাসাগর" —পৃঃ ১৭৮—৭৯)

বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে আর এক নূতন পথ দেখাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কেহই এই দিকে কিছু করিবার কথা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কমা, সেমিকোলন, কোলন, বিরাম, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা চিহ্নগুলি বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগরই প্রবর্ত্তন করেন। "বেতাল পঞ্চবিংশতি'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে এবং "বাংলার ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগে এইগুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত চিহ্ন প্রবর্ত্তন করিয়া বাংলা সাহিত্যকে কতখানি সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেই অবগত আছেন।

বিদ্যাসাগর সর্বসমেত ৫২খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৭খানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং ৫খানি ইংরাজী গ্রন্থ (তন্মধ্যে ইংরাজীতে বিধবা বিবাহ তাঁহার নিজের রচনা, অপরগুলি সংগ্রহ মাত্র)। বাকী ৩০খানি বাংলা গ্রন্থ।

সামন্তবাদী সমাজের এক অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান হইল নারী-নির্য্যাতন। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং তাহার সহিত ব্যবহারে সমাজের মান নির্ণয় করা হয়। ইহাই হইল সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতা অথবা প্রগতিশীলতার মাপকাঠি। সামন্তবাদী যুগে নারীর প্রতি ব্যবহারে সমাজ চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের দেশে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী যুগে নারী-নির্য্যাতনের তিনটি কৌশল ছিল। এই তিনটি যথাক্রমে (১) সতীদাহ, (২) বাল্যবিবাহ এবং (৩) পুরুষের বহু বিবাহ। এই তিনটি অস্ত্রের সাহায্যে নারীজাতির উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথাটি নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। আর বিদ্যাসাগর বৈধব্য, বাল্য বিবাহ এবং পুরুষের বহু বিবাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই তিনটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া তাঁহাকে শুধু প্রাচীনপন্থী ন্যায়রত্ন, স্মৃতিতীর্থদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিতে হয় নাই—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধেও তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার "বহু বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারা প্রবর্ত্তিত বহু বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহু বিবাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনা আমি কর্ত্তব্যানুরোধে করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনক, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।"

অবশ্য ইঁহাদের তীব্র বিরোধিতায় বিদ্যাসাগর একেবারেই ভীত হন নাই। বিরোধিতা যত আসিয়াছিল ততই বিদ্যাসাগর পূর্ণ উদ্যমে স্বকার্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সামাজিক সংস্কারে আমরা বিদ্যাসাগরকে নির্ভীক সংগ্রামী হিসাবে দেখিতে পাই। দেশের ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নবযুগ সৃষ্টিকারী হিসাবে যাঁহারা বড়াই করিতেন, তাঁহারা সর্বতোভাবে বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি আন্দোলনে বিরোধিতা করিয়াছিলেন কিন্তু সামনে যাঁহারা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অবহেলিত হইয়া আসিতেছেন, সেই সাধারণ মানুষ বিদ্যাসাগরকে পরমাত্মীয় বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের তন্তুবায়দের কাপড়ে "বেঁচে থাক

বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" এই গান অঙ্কিত করার মধ্যেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সাধারণ মানুষ বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত "বিধবা বিবাহ" আন্দোলনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতে কার্পণ্য প্রকাশ করে নাই। সেই যুগের দেশের সাধারণ মানুষের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জিত শিক্ষিত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিদ্যাসাগরের জনপ্রিয়তা ও প্রগতিশীলতা অন্যায় বিবেচিত হইলেও কম শ্লাঘার কথা নয়।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বিদ্যাসাগর সুমহান্ মানবতাবাদের অধিকারী ছিলেন। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ কোন দিনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া তাঁহাকে মুসলমান সন্তান, সাঁওতাল সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লইতে দেখিয়াছি। আবার দেখি, ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খুলিয়া সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় হাড়ি ডোম মুচির সন্তানের মাথায় তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতেছেন। গান্ধীজীর বহু পূর্ব্বেই তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন।

সে যুগে এবং বর্ত্তমানেও বহু ধনী ব্যক্তি আছেন যাঁহারা প্রাসাদের বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া নিম্নে চলমান কঙ্কালসারের মিছিল দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ইহাদের উন্নতি বিধানের কথা বলিয়া থাকেন। বাস্তবের সহিত সম্পর্কশূন্য উন্নতি বিধানে অগ্রসর হইয়া বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চলমান মিছিলের প্রতি গালিগালাজ করিয়া থাকেন। তাহাদের এই দরিদ্রপ্রীতি পরোপকার করিবার প্রবৃত্তির মধ্যেই সীমিত থাকে বলিয়াই হতাশা আসে। বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহাদের এই স্থলে পার্থক্য রহিয়াছে।

দেশের শতকরা ৯০ জন যেখানে কৃষক সেখানে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কি ছিল তাহা জানিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা প্রবল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ১৫ই নভেম্বর তারিখে তাঁহারই উদ্যোগে "সোমপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। পরে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপর ইহার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই পত্রিকায় ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

"* * * * বঙ্গদেশে ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহাতে জমিদারদিগের ভূস্বামিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। * * * উক্ত লর্ড (কর্ণওয়ালিস) কৃষকদিগকে উপেক্ষা করিয়া যদি জমিদারদিগের হস্তে সর্ব্বাঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান না করিতেন * * * তিনি যদি জমিদারদিগের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা না দিয়া কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নীলপ্রধান প্রদেশের কৃষকদিগের দুঃসহ দুর্দ্দশা কি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত ?"

যে পত্রিকার তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যাহার তিনি প্রধান পরিচালক ছিলেন—সেই পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁহার মনোভাব প্রকাশিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কৃষকের প্রতি দরদ এবং অত্যাচারী শোষকের প্রতি তাঁহার তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে "নীলদর্পণের" রোগের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার প্রতি রঙ্গমঞ্চের উপর জুতা নিক্ষেপের মধ্যে।

বিদ্যাসাগর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার কর্মজীবনে ভারতবর্ষে রাজনীতি আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে এ দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্বোধন হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারূপে আবির্ভূত না হইলেও বিদ্যাসাগরের স্নেহ হইতে সে যুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঞ্চিত হন নাই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথই তাহার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাঁহার স্নেহে রাজনৈতিক প্রতিভাও লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অবশ্য রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও বিদ্যাসাগর রাজনীতি সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ" গ্রন্থে মীরকাশেমের আখ্যানটি বৃটিশ শাসন বিরোধী স্বজাতীয়তার মনোভাব লইয়া লিখিত।

এই যুগের নবযুগ সৃষ্টিকারীদের বৃটিশ শাসনের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁহাদের উলঙ্গ ইংরাজ প্রশস্তির মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় সমাজ-সংস্কারকদিগের মধ্যে এই চেতনার অভাব দেখা যায় এবং ইহাই ছিল তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী চেতনা সে যুগের সীমাবদ্ধতা ও আত্মবিরোধ হইতে তাঁহাকে অনেক বেশী মুক্ত করিয়াছিল। নবযুগ সৃষ্টিকারীদের সহিত ঠিক এই স্থলেই পার্থক্য ছিল। এই জন্যই তিনি হইয়াছিলেন অনেক বেশী বাস্তববাদী এবং ভাবীকালের প্রগতির পথিকৃৎ।

১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ এই মহাপুরুষ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে ভারতের রাজনৈতিক জীবনের নূতন পর্য্যায় শুরু হইয়াছে। সমাজ সংস্কারের যুগ ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইয়াছে এবং তৎস্থলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। রাজনৈতিক পরিভাষায় ইহাকে আমরা বলিব বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

অদ্বৈত

(ইন্দিরা দেবীর সমাধি-কৃত হিন্দি ভজনের অনুবাদ)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বিন্দু কহিল মহাসিন্ধুরে : "তুমি আমি নহি আন :
তোমার বুকের প্রতি লহরের আমিই নিহিত প্রাণ।
তোমা বিনা আমি জলকণা—ধাই নিঠুর খেয়ালী বায়,
কখনো লুটাই-ধূলায়, উধাও কখনো বা নীলিমায়।"

কঙ্কর বলে মহামহীধরে : "তুমি আমি নহি আন :
গাঁথা রহি যবে অঙ্গে তোমার—বিরাজি নিরভিমান।
তোমা বিনা আমি উপল—নিদয় ঢেউয়ে চলি ভেসে হায় !
কখনো গহন গিরিবাসী আমি—লুটাই কভু ধরায়।"

ভক্ত কহিল ভগবানে : "প্রভু তুমি আমি নহি আন :
ভেদসীমা যবে যায় মুছে—শোভি তোমা মাঝে মহীয়ান্।
তোমা বিনা আমি কিছু নই—খেলে নিয়তি লয়ে আমায় :
তোমার শরণ লভি, নাম জপি' অজেয় এ-বসুধায়।"

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

গত আশ্বিন মাসের মাসিক বসুমতীতে বিজলীর অগ্নিময়ী লেখার ২৮ সংখ্যা অবধি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ১৩২৮ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বিজলীর ২৯ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কাল-বৈশাখীর সেই উন্মাদনাময় সুর—"অত্যাচারের শত বন্ধন ছিঁড়ে দাস এবার প্রভু হবে, 'বন্দী' এবার স্বাধীন হবে—এই এ যুগের বার্ত্তা। যে কালবৈশাখীর গর্জ্জন এত দিন দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল, তা' এইবার আমাদের ঘরের ছাদের উপর দিয়ে বইতে আরম্ভ করেছে। সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার, দাস-সুলভ ভীতি আজ ঘূর্ণীবাত্যার মুখে জীর্ণ পত্রের মত উড়ে যাচ্ছে। মৃতের মধ্যে অমৃত জাগ্রত হয়ে উঠছে।"

কালবৈশাখীর এই খবর শুনে বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা ভাবছেন হয়তো "আমাদের ঘরের ছাদ" অর্থে বাংলা বা ভারতকেই বুঝতে হবে। তখন কিন্তু ১৩২৮ সাল, ইংরাজি জুন মাস—১৯২১ খৃষ্টাব্দ। ভারত তার পরাধীনতার রাষ্ট্রীয় শিকল ছিন্ন করবে তার আরও ২৬ বৎসর বাকি। তখন সিন্‌ফিনদের বিপ্লবী আয়র্লণ্ডে, জগলুল পাশার বিক্ষুব্ধ মিশরে চলছে ক্ষুব্ধ জনতার বিপ্লবী হানা, জার্ম্মাণীর সঙ্গে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ গেছে বেধে, জার্ম্মাণেরা তিন দিক থেকে পোল্যাণ্ডের সীমানার দিকে এগুচ্ছে। বাহিরের কালবৈশাখীর দোলা যে ভারতেরও অলস শয্যা ধূলি-ঝঞ্ঝায় উড়িয়ে বইছে তা'র সন্ধান পাই ২৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় লেখা "শুধরে চল"র মাঝে। সেটির প্রায় সবটুকু উদ্ধৃত না করে পারলাম না।

শুধরে চল।

"দূরে চক্রবালের কোলে কোলে দেশের যুগ-যুগ সঞ্চিত সমস্ত কালিমায় নিবিড় হয়ে থরে থরে যে মেঘ জমে উঠছে, মাঝে মাঝে তার বুক চিরে শত শত বছরের যে গোপন আগুন বিদ্যুতের মত চঞ্চল চমকে ছুটে বেরুচ্ছে—সেই হচ্ছে কালবৈশাখীর পূর্ব্ব-সূচনা।

যাঁরা শুধু জলখেলা ভেবে জীবন-নদে নৌকা ছেড়ে দিয়ে 'মধুরে [illegible] ভেসে যাব [illegible]' মনে করে পাড়ি জমিয়েছেন, তাঁদের দৃষ্টিটাকে আমরা ওই মেঘাড়ম্বরের দিকে ফিরিয়ে এই স্পষ্ট কথাটা বলে দিতে চাই যে, জীবনটাকে যেমন নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়ে দেবার মতলব তাঁরা করেছিলেন, সেটা একেবারে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা আছে।

* * * আমরা সত্যই দেখছি, দৈত্যের মত দুর্নিবার শক্তি নিয়ে প্রবল একটা অমঙ্গল মাথা উঁচু করে উঠছে,—সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা যার দাপট কিছুতেই সইতে পারবে না—যদি না শক্তিমান এমন সব নর-নারী গড়ে ওঠে, যারা ঐ অমঙ্গলকে, ওর সমস্ত কদর্য্যতা, সমস্ত বীভৎসতা নাশ করে শ্রী ফুটিয়ে মঙ্গলে পরিবর্ত্তিত করতে পারে।

আমরা চাই আর না-ই চাই, আমাদের ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক—পরিবর্ত্তন আসবেই। নন্‌-কো অপারেশন সফলই হোক আর বিফলই হোক, কো-অপারেশনে স্বর্গই মিলুক, শিমলা শৈলে নেতাদের সঙ্গে কর্ত্তাদের রফাই হোক বা সাধের পীরিতি একেবারেই চটে যাক—শক্তির একটা স্ফুরণ অনিবার্য্য।

ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে উঠেছে,—তা শুধু আর রাজনীতিক অর্থহীন বাক্‌বিতণ্ডা নয়, তা' হচ্ছে কুম্ভকর্ণের জাগরণ, আপন-ভোলার আত্মদর্শন, বুভুক্ষুর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার অনল উদ্‌গিরণ।

ওই যে চায়ের বাগান খালি করে দলে দলে কুলীরা সব বেরিয়ে পড়েছে, কারখানার কাজ ছেড়ে মজুরেরা মালিকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করছে, জমিদারের অন্যায় দাবী পূর্ণ করবে না বলে কৃষকেরা সব দল বাঁধছে—ও সবেরই মূলে কি নেই একটা অদম্য শক্তির ফেটে ছুটে বার হবার ব্যগ্র আকুলতা? * * * তার পর রাজকোষে অর্থ নাই, প্রজার পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মকর্ত্তৃত্ব নাই—শুধু ঋণ করে চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী গড়েই কি এ অভাব পূর্ণ করা যাবে? * * * মনে করছো, ভয় দেখাচ্ছি, দেশময় অশান্তি ছড়াবার চেষ্টা করছি, অমঙ্গলকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি? না গো, বিজ্ঞ, না।' * * * আমাদের অনেক অপরাধের অনেক অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। * * * তাইতো আজ তাদের সেবা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি। * * * ওগো জমিদার! বাপ-দাদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—ক্ষুধিতের অন্ন ফিরিয়ে দাও। ওগো নামসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ! নীচ বলে যাদের দূরে ঠেলে রেখেছ, ভাই বলে ডেকে তাদের ব্যথা দূর কর। * * * ব্যুরোক্রাসীকে পরামর্শ দেবার জন্য, দেশের কথা ভেবে ভেবে যারা চুল পাকিয়েছে, সেই চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রীর দল আছে, কিন্তু তোমাদের আমরা আর আমাদের তোমরা ছাড়া আর কেউ কোথায়ও নেই! হয়তো বা পতিতপাবনও মুখ ফিরিয়েছেন।"

১৯২১ সালের এই চিত্রের সঙ্গে আজকার কথা মিলিয়ে নাও, অবস্থা প্রায় তথৈব চ, হয়তো আরও মন্দ দাঁড়িয়েছে। চৌষট্টি হাজারীর দল বৃদ্ধি হয়েছে, মাঝে বৃটিশ-সিংহ নাই, ভারত ছেয়ে প্রদেশে প্রদেশে বসেছে কালা আই-সি-এস বি-সি এস চক্র। প্রায়শ্চিত্ত জমিদার ও রাজন্যবর্গ কতকটা করছেন উৎসন্ন হয়ে জমিদারের সেরেস্তা ও গদী হারিয়ে। আপন জনকে কিন্তু এখনও বুকে টেনে নিয়ে আপন করা হয় নাই।

তার পর এ সংখ্যার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য "পণ্ডিচারীর পত্র—" দীর্ঘ দুই কলম অনবদ্য লেখা, পণ্ডিচারী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের কাছে প্রশ্নোত্তরের বিবরণ।

প্র। আপনি যে সত্যের কথা বলছেন সে সত্যের অনুগামী করে কেউ কি সমাজকে রূপ দেয় নাই ?

উ। সমাজকে রূপ দেবার—Mould করবারই চেষ্টা করছে, মানুষকে করেনি। তাই বার বার ব্যর্থ হয়েছে।

প্র। বাহিরের একটা আদর্শ তো চাই ?

উ। আদর্শ মনে মনে থাকলে ফল কি ? আদর্শ তো জীবনে নামা চাই, lifeএ live করা চাই ? তুমি মনে মনে রিপাবলিক ডিমোক্র্যাশী এই সব উচ্চ চিন্তার ভোগ সাজিয়ে বসে আছ আর জীবনে যা রূপ দিচ্ছ তা পশুর জীবন বা অহঙ্কারের কাণা-খোঁড়া জীবন ? বেশ্যার সাজগোজের ও লাবণ্যের মত এ ব্যর্থ মানস কল্পনায় ফল কি ?

প্র। শিক্ষার দ্বারা ক্রমশঃ এ সব আদর্শ ছড়াবে তো ?

উ। সে চেষ্টাও কম হয় নি, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের স্বভাব যাবে কোথা ? ব্রিয়াঁ, মিলেরাঁ আগে গণতান্ত্রিক নেতা ছিল, এখন ক্ষমতা ধন-দৌলত যশ পেয়ে তারা reactionaries হয়ে গেছে। সব নেতারই এই দশা ; সত্য জীবনে রূপ পায় না, কারণ, সত্যের কল্পনা মনে ভাঁজা হয়েছে, সত্য দর্শন হয়নি। শিক্ষা দিতে গিয়ে মূর্খকে তো এই শেখাবে যে, কংগ্রেস পার্লামেন্ট স্বায়ত্ত শাসন ভাল ? সে শিক্ষার ফলে তারা তোমাদের কাজে কেবল সায় দিতে শিখবে, তাদের পূর্ব্বের সেই দৈন্য হীনতায় দাঁড়িয়ে উর্দ্ধমুখে তোমাদের জয়গান করবে, তোমাদের ক'জনার কীর্ত্তিকলাপে Ditto দেবে। তার পরে পোয়া বারো আর কি ! সেই জনসঙ্ঘের কাঁধে ভর করে ক্ষমতার উচ্চ মঞ্চে ওঠবার পর সুবিধা মত তোমার সুর ও বুলি ব্যুরোক্র্যাসীর বুলি হয়ে যাবে। * * * Truth cannot be defined, you must see it and be it. Ideas and ideals only point to the Truth behind them. They are merely its partial aspects,"—সত্য বলে বোঝানো যায় না, তা' দেখতে হয় ও জীবনে হতে হয়। মনের উচ্চ ভাব বা আদর্শ অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঐ পিছনের অমর সত্যকেই দেখায় মাত্র। যে কোন মহৎ আদর্শ ঐ পূর্ণ সত্যের আংশিক বিকাশ ! অখণ্ড সত্য এলে তবে এই সব forms যে যার স্থান অধিকার করে তার আসনে গিয়ে বসে, তখনই সত্যের নামে দলন পেষণ অবিচার অত্যাচার আরম্ভ হয়। মানুষ সাম্য বা equality চালাতে গিয়ে ভোটের ব্যালট-বক্স আবিষ্কার করেছিল, এখন সেই ব্যালট-বক্সই সাম্যের স্থান অধিকার করে বসেছে ! কোথায় সাম্য ! সাম্য ভ্রাতৃভাব ও স্বাধীনতা যে কি, যদি তা' অনুভব realise করা যায় তা' হ'লে তো গোল চুকে যায়। কিন্তু আজও পাশ্চাত্য এ সত্য realise করেনি। কি রিপাবলিক আর কি ডিমোক্র্যাসীতে সব কাজেই দেখবে যে, যে মানুষ সব চেয়ে ধূর্ত্ত ও বুদ্ধিমান তারাই আপন আপন অনুগ্রহীতাদের নিয়ে নিজের নিজেরই আধিপত্য করছে। জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছে। এখন লিবার্টি মানে যে যা' পাও উদরসাৎ কর, সব চেয়ে যে শক্তিমান তার ভাগে অবশ্য বড় ভাগটাই পড়ে যায়। * * * আগে তোমরা অন্তরে স্বাধীন, সম ও ভাই ভাই হও তার পর তার বাহিরে রূপ নেওয়া অনিবার্য্য। * * * Truth is the swallower of formulas—যত বাঁধি বুলি সবকেই সত্য রাহু গ্রাস করে। সত্য এলে শূন্যগর্ভ বাক্য চলে না, তখন নূতন সৃষ্টি আপনিই হয়। * * * You can never found Truth on a lie—সত্যকে এক রাশি মিথ্যার ভিৎ গেড়ে তার ওপর অমন করে কিছুতেই বসাতে পারবে না। * * * ওরা খৃশ্চান আদর্শ পেয়েই এক খৃশ্চান চার্চ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়ে বসলো * * * তলিয়ে দেখলে দেখতে পাবে সে চার্চ আদৌ খৃশ্চান নয়।

প্র। সবাই কি করে পাবে তা বুঝিয়ে দিন।

উ। যদি দু' দশ জন সত্য পেয়ে ইতর সাধারণের ঘাড়ে তা জবরদস্তি সত্ত্ব করে চাপিয়ে দিতে যাও তা' হলে সত্য মারা যাবে। আগে এক শ' জন তা' জীবনে সত্য করে পাও, তার পর এক সহস্র আধারে চারিয়ে দাও। মানুষ তো শুধু খণ্ড মন, খণ্ড প্রাণ, খণ্ড শরীর নয়, তার বিরাট মন বিরাট প্রাণ আছে। এক হাজার মানুষ সত্য পেলে বুঝবে বিরাট বিশ্বমনে একটা শক্তি নেমেছে। * * * শক্তির সহস্র আধার (dynamo) যদি খুব মূর্ত্ত intense হয় তা' হলে সে সত্য সমাজে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা হবে।"

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক গঠনমুখী দিকটা তার সাধনার মাঝে লোকচক্ষুতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ; তাঁর কাজ, গঠন ও সৃষ্টির ধারা লোকচক্ষুর অগোচরে তিনি নিজের যোগ-কৌশলে অব্যাহত ভাবে করে গেছেন—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। আদার ব্যাপারীরা তার খোঁজ রাখে না। প্রতিদিনের আলাপ আলোচনার সান্ধ্য বৈঠকে আমরা বুঝতাম পণ্ডিচারীর ঋষি আর অগ্নিযুগের শ্রীঅরবিন্দে সত্যই কোন পার্থক্য নাই, দুই-ই অগ্নিমুখ গিরিশৃঙ্গ, দুই জনই বিভিন্ন ধারায় সমান ক্রিয়ারত। ভারতের ও জগতের কল্যাণ সাধনার কাজে এই অপূর্ব্ব মানুষটির কখনও বিরাম ছিল না। যোগপথে সূক্ষ্মে ও কারণে অধিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টি করার কৌশলটি আয়ত্ত করে নিতেই তাঁর যা' কয়েক বৎসর বিলম্ব হয়েছিল মাত্র ; যে কয়টি বৎসরকে তাঁর অলক্ষ্যে যোগস্থ কর্ম্মের প্রস্তুতি বলা চলে।

তার পর ২১ সংখ্যা 'বিজলীর' কাজের কথা। এবারকার ১ম দফা 'কাজের কথা'য় শিরোনামা হচ্ছে—"কাজের আগে মানুষ, মানুষের আগে শক্তি চাই"।—"আমরা কোন দুঃসাধ্য সাধনে সাহস করে লেগে থাকতে পারিনে, তার কারণ এদেশের মানুষে শক্তির বড় অভাব। কাজ চাইলে তার আগে কাজের কাজী মানুষ চাই, কিন্তু মানুষ হলেই কাজ হবে না, মানুষের আগে চাই শক্তি। এখন আমরা শক্তি হারিয়ে মুখে শুধু প্রেমের বুলি কপচাই ; এ জাতির বুকে কিন্তু প্রেম শুকিয়ে গেছে। জ্ঞান আমাদের ঐ পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞান অবধি, তাও পাকা নয়, শক্তি কোন গতিকে শাকান্ন খেয়ে পিলে পটকা ছেলে উৎপাদন অবধি, আর আছে নেতা হয়ে সস্তায় স্বদেশ উদ্ধার করা ; এমন করে এ পোড়া দেশ উদ্ধারও হবে না, আমরাও কখনও মানুষ হবো না। দেশে শক্তিসাধনা এলে জ্ঞান ও প্রেম জাগলে কোন্ কালে শক্তির শ্রীপীঠ গড়ে উঠতো, কারণ, ধন-সম্পদ তো তাদেরই ভূষণ, যারা শক্তির সন্তান।

দ্বিতীয় দফা "কাজের কথা"র শিরোনামা হচ্ছে—"কাজ ও অকাজের জ্ঞান"—কাজের জন্য জ্ঞান চাই অগাধ, যারা যারা দল বেঁধে কাজে নামবে তাদের মাঝে ২।১ জন গভীর জ্ঞানের থাকের মানুষ চাই। কাজ করবো বললেই দেশের হিত হয় না, কাজ আর অকাজ বেছে নেবার জ্ঞান চাই। হয়তো এক হাজার গাঁ চুষে বড় কারবার ফাঁদবে আর তার ফলে চাষী মজুরের হাঁটু প্রমাণ ধুতি নেঙটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। গরীব দুঃখী মুটে মজুরের দুঃখে কেঁদে হয়তো তাদের বলে বল পেয়ে, নেতা হতে না হতে তাদের কাঁধে ভর করে তুমিই মাত্র যশের ও ভোগের শিখরে উঠে যাবে, দুঃখী দেশের ভাই নীচে থেকে চিঁ চিঁ করে তোমাকেই অভিশাপ দেবে। জগতে আজ এই প্রলয়ের যুগে কি আদর্শ গড়ছে ভাঙছে ভগবানের রথ কোন্ পথে গড়িয়ে চলেছে তা বোঝবার জ্ঞান যদি ঘটে না থাকে, খুব জাঁকালো অপকাজ করতে পার, কিন্তু আসল কাজ তোমার দ্বারা হবে না। তুমি কাজ করে মরবে আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকবো।

তার পর ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, সন ১৩২৮ ইংরাজি তারিখ ১০ই জুন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিজলীর ৩০ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তার পরিচয় চলছে—

কালবৈশাখী।

মা। তোর জগৎজোড়া ছিন্নমস্তা রূপ কবে সম্বরণ করবি? আপন হাসিমাখা কাটামুণ্ড আপন রাঙা হাতে ধরে কত কাল আপন ছিন্নমুণ্ডের রুধিরধারা এমন করে খাবি বল্ দেখি? এখনও কি সর্ব্বনাশীর আত্মনাশা তৃষ্ণা মেটেনি? এখনও কি মিবারের মাটি "ময় ভুখা হুঁ" ঝঙ্কারে কেঁপে উঠছে? আর কি দুনিয়ায় মানুষ বলে কিছু রাখবি নে? কাটা হাতের কটিবন্ধ করে কাটা মুণ্ডের বৈজয়ন্তী পরে আপন সৃষ্টি আপনি খেয়ে তোর কি সর্ব্বনাশা নব সৃষ্টির সাধ জেগেছে?

এ সংখ্যার প্রধান সম্পাদকীয় লেখা—"এবার ভগবানের সৃষ্টি ভগবান গড়বেন"—আনর্ব্বচনীয় বস্তু। তার পরের লেখা—"আলো ওগো, আলো!" দু'টিই সমান দামী। দু'টি লেখাই মোটের উপর উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

এবার ভগবানের সৃষ্টি ভগবান গড়বেন

মানুষ কখন মরণকে ডরায় না জান? শত নাগপাশের বাঁধনও গরিমাসিদ্ধ হনুমানের মত কোন্ বিশাল মানুষকে বেড়ে পায় না—বেঁধে কখনও দীন করতে পারে না তা' জান? লোকতারণ ব্রত ধরে এ দুনিয়ায় এসে জগতের পাপ-তাপ ভুল-ভ্রান্তি রোগ-শোকের আঁধার কাল-বৈশাখীও কার অসীম ধৈর্য্য অটুট সহিষ্ণুতা টলাতে পারে না তা' কি তোমরা কখনও ভেবে দেখেছ? যার মাঝে জ্ঞান-ঘন শিব আনন্দ-ঘন রূপে স্নিগ্ধ-মগ্ন শান্তির মাঝে জেগেছে—যার সূর্য্য ডুবতে ভুলে চিরতরে অন্তর বাহির সপ্তলোক সোণার ঝলকে আলো করে উঠেছে সেই মানুষ মরণজয়ী, সেই মানুষ বন্ধনের পার ও চিরানন্দশীতল এবার তোমাদের জনে জনে সেই মানুষ হতে হবে। ভারতের আদর্শ—সেই দুর্গম দুস্তর মহতো মহীয়ান্ কাঞ্চনজঙ্ঘা যে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

হয়তো তোমরা বলবে এ বড় কঠিন পথ। কঠিন তো বটেই, সহজ পথে কখনও কেহ মহৎ হয় নাই। এ ভোগসুখময়ী বসুধা যেমন বীরভোগ্যা, মানুষের অন্তরশায়ী সুখ-স্বরূপও তেমনি বলবানের লভ্য, সে অমৃতত্বও বীরভোগ্য। সান্তের মানুষ, গণ্ডীর মানুষ মনের দীন ভয়াতুর মানুষ দূর থেকে আপন অন্তরের স্বর্গ-দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখে আর ভয় পায়। তারা ভাবে, এই মনের দু'কাঠা, ভুঁই চষে যা আনন্দের ও ভোগের ক্ষুদ-কুঁড়া তারা সঞ্চয় করেছে, অত বড় সাগরে বুঝি খেয়াডুবী হয়ে তাদের সে সব হারিয়ে যাবে। এই ভয়ই মৃত্যু; যখনই মানুষের হৃদবিহারী অনন্তের দেবতা একটুখানি কিছু নিয়ে অল্পে তুষ্ট হয়েছে তখনই তার মাঝে মরণ-ভয় দুঃখ-দৈন্য থানা গেড়েছে। তোমরা মহাদেবকে আশুতোষ ভাব, সে তো আশুতোষ নয়; শক্তির যার অবধি নাই, সম্পদের যার শেষ নাই, সে দেবতা জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের মূর্দ্ধা, তার তো আশুতোষ হওয়াই স্বাভাবিক।

তোমরা ভাব সে শান্ত—সে শীতল, নিষ্কামতার সাগর, বুঝি জড়তাই আছে, শক্তি নাই। মন তাই ভাবে, কারণ মন শক্তির অখণ্ড ঘর চেনে না, সে শক্তির বুদ্বুদ,—এই কাজের জঞ্জালকেই চেনে; তাই কাজই তার সাতকাহন। * * * পথের পাশে হা হা দে দে করে সারা দিনে চারটে পয়সা পেলেই তার দীন প্রাণ ভরে যায়, সে ঐ দে দে রবকেই কল্পতরু ভেবে আবার দে-দে করে চেঁচাতে থাকে।

কামনাই কিন্তু হারায়, নিষ্কামই সর্ব্বসিদ্ধি দেয়। যেখানে অঢেল অফুরন্ত কুবেরের ভাণ্ডার সেইখানে নিষ্কাম; যেখান থেকে শক্তি অনন্ত-মুখী হয়ে স্বতঃই লীলাময়ী সেইখানেই বিরাট শান্তি ও মগ্ন ধ্যান। যেখানে আনন্দরূপ ধরে অখণ্ড জগমূর্ত্তিতে বিরাজ করছে সেইখানেই হাজার দ্বন্দ্ব লাখ বিপরীত ভাবের মহা সমন্বয় ঘটে। সেইখানেই রক্তরাঙা প্রলয়ের কোলে সৃষ্টির স্নিগ্ধ নব-উষার সম্ভব হয়।

তোমরা এক ফোঁটা শক্তি পেয়ে নেচো না, ঐ এক ফোঁটা সম্বলও তা' হলে হারিয়ে যাবে। তোমরা মৌমাছির মত এককণা আনন্দ-মধু মুখে করে জগতের ত্রিতাপ জুড়াতে ছুটো না, এত বড় কালানল কি বিন্দুমাত্র বারিপাতে কখন নেভে? তোমাদের অহঙ্কার রূপান্তরিত হয়ে ভাগবত পাদপীঠ হোক, আপন রচনায় আপনি শ্রীভগবান সেখানে নেমে আসুন।"

এই সব অপূর্ব্ব লেখা শ্রীঅরবিন্দের প্রতিদিনের সান্ধ্য বৈঠকের ফেরৎ আমার মগজে বাসা বাঁধতো, আর আমি ঘরে ফিরে এসে তা' মনের অঙ্গন থেকে মণি-মুক্তার মত কুড়িয়ে বিজলীর জন্য লিখে পাঠাতাম। এই নিত্য-নৈমিত্তিক কথোপকথনের একটা ধারাবাহিক রোজনামচা গুজরাটের পুরাণী লিখে সঞ্চয় করে রেখেছে। শুনেছি সে বিবরণ শ্রীম লিখিত কথামৃতের মত সুবদ্ধ ঠিক হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন জ্ঞানের হিমাচল, এত স্ফটিক-শুভ্র জ্ঞানের জ্যোতি জমাট বেঁধে মানুষে রূপ নিতে পারে তা' না দেখলে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত।

এ সংখ্যার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় হচ্ছে—"আলো, ওগো, আলো!" দু' কলম এই দীর্ঘ লেখার চুম্বক যথাসাধ্য দিই উদ্ধৃত করে—"মানুষ এত দিন যে পথ ধরে যেমন করে চলে আসছে, তাতে সামনের কোন জিনিসই ঠিক স্পর্শ করে সে দেখতে পায়নি। * * * সে

শিখেছে গতিই জীবন, তাই সে ছুটে চলেছে বিশেষ কোন আদর্শ সামনে না রেখে। ছুটাছুটি করবার ক্লান্তিতে যখন সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তখনি একটা মানসিক তন্দ্রা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে, আর অমনি সে একটা সনাতনী কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে এক কোণে ঢুলে পড়েছে।

হঠাৎ একদিন জেগে উঠে সে দেখতে পেল যে সমাজের কোথায়ও তার স্থান নেই। টাকার কুমীর আর জমির মালিক মুষ্টিমেয় ক'টি লোক তাকে একেবারে কোণ-ঠাসা করে রেখেছে। রাজা তখনো ছিলেন সমাজপতি। প্রজা প্রতীকার প্রার্থনায় হাত জোড় করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রাজার চোখ দিয়ে কেন যেন আগুনের ফুলকি বার হ'লো—ভয়ে প্রজা দূরে সরে দাঁড়ালো। বার বার সে রাজার দুয়ারে যাওয়া-আসা করতে লাগলো—আর তার প্রার্থিত করুণাবিন্দুর বদলে যতখানি তাচ্ছিল্য নিয়ে সে ঘরে ফিরতে লাগলো প্রতিহিংসার ঠিক ততখানি আগুন তার বুকে জ্বলে উঠলো। একদিন শেষটায় নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বুকের সবটা আগুনই সে বাইরে ছড়িয়ে দিল—আর তাতে রাজা জমিদার সব ছাই হয়ে গেল।

মানুষ ভাবলে—বাঁচা গেল। সে পরম উৎসাহে ডিমোক্র্যাসী গড়তে বসলো। রাজ্যের ইট পাথর জড়ো করে সুদক্ষ কারিগরের সাহায্যে সে আকাশস্পর্শী বিরাট এক মন্দির গড়ে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে ভাবলো—এইটে হচ্ছে তার একেবারে নিজস্ব।

মন্দির গড়বার উত্তেজনার বশে সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো—জেগে চেয়ে দেখলো—মন্দির রক্ষার জন্য যাদের সে পাহারায় নিযুক্ত করেছিল, অপ্রতিহত প্রভাবে তারাই প্রভুত্ব করছে। মানুষের নামে মানুষের শক্তি হরণ করে ঐ ক'জনা মাত্র লোক যত রকমের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচার অবাধে চালিয়ে নিচ্ছে। মানুষ বললো—এমন কথা তো কিছু ছিল না। তোমরা সরে যাও, মানুষকে আর ধোঁকা দিও না।'

মানুষের প্রতিনিধিরা হাসলো, টাকার কুমীর আর কলের মালিক-দের দেখিয়ে বললো,—"আমরা হচ্ছি এখন ঐ ওদেরই লোক। * * * ওদেরই কৃপার কাড়ীতে আমাদের ইমারত উঠছে।" * * * বিস্মিত মানুষের বিস্ময়ের জবাবে তারা বললো, "বন্ধু, ক্ষমতার এই তো রীতি!"

* * * চোর! চোর! সবাই ওরা চোর! ফাঁকি দিয়ে আমার সর্বস্ব লুটে নিয়েই ওদের এত ঠাট! * * * মানুষ আবার গিয়ে ধনীর দুয়ারে হানা দিল, বললো, "সব লুটে খাচ্ছ, আমাদের অংশ দাও।"

ধনী জবাব দিল—"বাঃ রে বাঃ! আমি টাকা জোটাচ্ছি, মাথা খাটাচ্ছি, বুদ্ধির এত মারপ্যাঁচ খেলছি তোমাদের মত আর সব জানোয়ারগুলোকে নিয়মের মাঝে এনে শৃঙ্খলার সঙ্গে চালাচ্ছি—তবেই না হচ্ছে আমার লাভ! সেই লাভের অংশ নিতে তোমরা? সরে পড়, সরে পড় সব—এক কড়িও মিলবে না। * * * ধনিক তাদের দূরে তাড়িয়ে দিল।"

মানুষ তার বুকের ব্যথা কা'কে জানাবে? * * * সে বুঝলো আর পরের মুখপানে চেয়ে শুধু দাবীর আব্দার জানালে চলবে না, নিজের কাজ তার নিজেরই করে নিতে হবে। মানুষ বললো সে আর ডিমোক্র্যাসী চায় না, পার্লামেন্টের প্রচলিত পদ্ধতি একেবারে ভুয়ো, কোনই তার মূল্য নেই। * * * মানুষ তবুও কিছু করে উঠতে পারলো না। সে সোশ্যালিষ্ট হলো, সিণ্ডিক্যালিষ্ট হলো, অটোক্র্যাসী ভেঙে, ডিমোক্র্যাসী দূরে রেখে গড়ে তুললো প্রচণ্ড দৈত্যের মত প্রবল একটা প্লুটোক্র্যাসী—সুখের সন্ধান তবুও তো পেল না।

* * * ভাঙাগড়ায় ক্লান্ত মানুষ যখন চারি দিকে দেখছিল খালি আঁধার আর আঁধার * * * সকল দুঃখের মূল পরবশতা। শাসন হতে মানুষকে চিরতরে মুক্ত করে দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

* * * দুই হাতে মুখ ঢেকে ব্যাকুল কণ্ঠে মানুষ চেঁচিয়ে বললো, "আলো, ওগো, আরও আলো। * * * কিন্তু আজ এই অন্ধকারে আলো ধরে কে তাকে পথ দেখাবে? বাঙালী! তুমিই কি? তবে জ্বাল আলো, ভাল করে অন্তরের মণিদীপটি জ্বালিয়ে ধর। বিশ্বের যুগ-যুগ সঞ্চিত তমিস্রা ঘুচে যাক—মানুষ দেবত্ব লাভ করুক।"

এ ছাড়া এই ৩০ সংখ্যা বিজলীতে খুব সরস ভাষায় "উনপঞ্চাশী" ও "দুনিয়াদারী" লেখা দু'টির পুনরাবৃত্তি আছে। উনপঞ্চাশীতে উপেন ভায়া তাঁর অনবদ্য ব্যঙ্গরসাত্মক ভাষায় গোপালদার নূতন জোটানো কাঁচা, পাকা, ডাঁশা, আধ-পাকা, থসথসে পাকা অনেক রকম শিষ্য ও দু' একটি শিষ্যানীর খবর দিয়েছেন, শ্রীগুরুর নামে সর্বস্ব অর্পণের মাহাত্ম্যকে বিদ্রূপ করেছেন। দুনিয়াদারীর লেখায় প্রাণধনে আর পণ্ডিতজীতে কথোপকথন চলছে মানুষের সুখের বা আনন্দের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া নিয়ে। মানুষের ভগবানকে চাওয়া, তার ঠ্যালায় সংসার মায়া হয়ে যাওয়া, দুশ্চর তপস্যায় মানুষের আত্মনিগ্রহ ইত্যাদির কথা চলছে দুনিয়াদারীর লেখায়।

"শুন বিনোদিনী জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী"

—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা ও তার জন্য সাধনার প্রয়োজনও প্রসঙ্গ ক্রমে এসে পড়ে লেখাটির সমাপ্তি টেনে দিয়েছে। এ সংখ্যার শেষ লেখা "রামধনের স্বর্গযাত্রা"র পূর্ব্বানুবৃত্তি—গ্রাম্য ভাষায় দাদাঠাকুরের সঙ্গে চাষী রামধনের বসালাপ ও তত্ত্ব আলোচনা। এ সংখ্যার কাজের কথা প্রথম দফার শিরোনামা হচ্ছে—"চরকা না তাঁত"···সেই মামুলী বিতর্ক—মিল, না চরকা ও তাঁত?" দ্বিতীয় দফা 'কাজের কথা'র শিরোনামা হচ্ছে—'বৈশ্য কি? এ গঙ্গার মূল কোথায়?' তার আসল কথা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত বৈশ্যের স্বরূপ কথা। একটু উদ্ধৃত করি—"ইংরেজের কেরাণী ভারত, ইংরেজের সেপাই ভারত, ইংরেজের বাবুর্চি বাটলার ভারত, ইংরেজের ধামাধরা জমিদার ভারত, ইংরেজের করপিষ্ট চাষী ভারত টাকা উপায় করা, টাকা রাখা ও টাকা চালানো ভুলে গেছে। সত্যকার বৈশ্য দেশের ধন দেশের জন্য গড়ে, বাড়ায় ও শতহস্তে বিলোয়; সে পশ্চিমী মতে ক্যাপিটালিষ্ট ডাকাত নয়। * * * আজ নতুন যুগে সবার আগে ভারতের রক্তে-মাংসে ভারতের ভাবে ও রঙে ভারতের বৈশ্য আবার গড়, তা' হলে দেশে বাণিজ্যের প্রাণ আপনি ফিরবে। [ক্রমশঃ।

সা হি ত্য
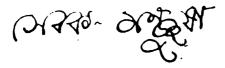
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

সুশীলকুমার বসু—লেখক ও সাংবাদিক। জন্ম—১৩০৮ (আনু)। মৃত্যু—১৩৫২ বঙ্গ ১০ই মাঘ। প্রথম জীবনে অসহযোগ আন্দোলনে ও যুগান্তর দলে, তৎপরে যশোহর জেলায় কৃষক আন্দোলনে যোগদান। সম্পাদক—প্রগতি (সাপ্তাহিক)।

সুশীলকুমার রায়চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নক্ষত্রলোক চেনা, বিজ্ঞান কাহিনী, বিজ্ঞানের নানা কথা।

সূর্যকান্ত আচার্য, মহারাজা—বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল জমিদার। জন্ম—১৮৫২ খৃঃ জানুয়ারি ফরিদপুরের যাজিতপুরে। মৃত্যু—১৯০৮ খৃঃ ২০এ অক্টোবর বৈদ্যনাথধামে। পূর্বনাম—পূর্ণচন্দ্র মজুমদার। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার (ফরিদপুর নিবাসী)। ৭ম বৎসর বয়সে মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদার কালীকান্ত আচার্যের বিধবা পত্নী লক্ষ্মী দেবী কর্তৃক দত্তক গ্রহণ। শিক্ষা—ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসন। ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা। শিক্ষাবিস্তার কল্পে বহু অর্থ দান। ঢাকা কলেজে ছাত্রবৃত্তির জন্য অর্থ দান (১৮৭২), কটন ইনষ্টিটিউটে বহু অর্থ দান (১৮৯২), লণ্ডনের ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউট (১৮৮৭), জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রভৃতি বহু শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বহু দান। 'রায় বাহাদুর' (১৮৮৭), 'রাজা' (১৮৮০), 'রাজা বাহাদুর' (১৮৮৭), 'মহারাজা' (১৮৯৭) উপাধি লাভ। সভাপতি—বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েসন। দেশসেবক, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা, শিকারপ্রিয়। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ইত্যাদি। গ্রন্থ—জমিদারী নিয়ম (১৮৮৯), শিকার-কাহিনী (সম্ভবতঃ এই গ্রন্থই প্রথম শিকারবৃত্তান্তের বাংলা গ্রন্থ, ১৯০২)।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী—চিকিৎসক। জন্ম—১৮৩২ খৃঃ রাধানগরে। মৃত্যু—১৯০৪ খৃঃ ডিসেম্বর মধুপুরে। শিক্ষা—হিন্দু স্কুল, ঢাকা কলেজ (১৮৪৯), মেডিকেল কলেজ (১৮৫১), সিনিয়র ডিপ্লোমা পরীক্ষা (১৮৫৬)। কর্ম—সরকারী চাকুরী, সৈনিক বিভাগ, সৈনিক বিভাগের ব্রিগেড সার্জন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈনিকগণের চিকিৎসা। কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় কর্মত্যাগ ও স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ প্রথমে শ্রীরামপুরে, পরে কলিকাতায়। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার লেখক। সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৭৯), সভাপতি, ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন (১৮৯৪), 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ (১৮৯৮)। গ্রন্থ—গভর্নমেণ্ট ও ভারতীয় প্রজার সম্পর্ক (ইংরেজি ভাষায়, ১৮৯০, ৩০এ সেপ্টেম্বর)।

সূর্যকুমার সোম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শব-সাধনা, মধুমালতী।

সূর্যনারায়ণ ঘোষ—সাময়িক পত্রসেবী। ঢাকা কলেজ ল্যাবরেটরীর সহকারী। সম্পাদক—রামধনু (সাপ্তাহিক, ঢাকা, ১৮৮২)।

সূর্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭৫ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর ২৪-পরগনার অন্তর্গত ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে। পৈত্রিক নিবাস—বর্ধমান জেলায় নাড়ুগ্রামে। শিক্ষা—ব্যারাকপুর গভর্নমেণ্ট স্কুল, বি-এস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। কর্ম—আইন ব্যবসায়, কলিকাতা ছোট আদালত (১৯০২), সভাপতি, বার অ্যাসোসিয়েসন ছোট আদালত, নাড়ুগ্রাম গভর্নমেণ্ট এডেড এম. ই. স্কুল। বাল্যকাল হইতেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। গ্রন্থ—কর্ণাটকুমার (নাটক, ১৩২২), উদ্‌যাপন (উপ, ১৩২৪), পুণ্য প্রতিমা (উপ, ১৩২৪), মন্ত্রদীক্ষা (উপ, ১৩৩০)।

সৈয়দ সোলতান—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে সৈয়দ বংশে। পরাগল খাঁ ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমসাময়িক। বাংলা সাহিত্যে ইনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। গ্রন্থ—নবীবংশ, শবে মেয়েরাজ, হজরত মোহাম্মদ-চরিত, ওফাত-রসুল, ইব্লিসের কিচ্ছা, জ্ঞান-চৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ।

সোমেশচন্দ্র বসু—গণিতজ্ঞ। জন্ম—১২৯৫ বঙ্গ ১৭ই আশ্বিন ঢাকা বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে। পিতা—উমেশচন্দ্র বসু। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ১৯০৩), এফ-এ (ঢাকা জগন্নাথ কলেজ) অনুত্তীর্ণ। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ (১৯০৯), একাউণ্টেন্সিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ। মানসিক গণনা চর্চা (১৯০৭-১৮৮৫)। অভ্যাসের দ্বারা ইনি ১৭০ রাশিকে ১০০ রাশি দ্বারা গুণ করিতে সক্ষম। বর্গমূল, বড় বড় রাশির পঞ্চদশ মূল নির্ণয় মানসিক ২।৩ মিনিটে করার ক্ষমতা লাভ। বিলাত যাত্রা (১৯২২), আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মানসিক অঙ্ক প্রদর্শন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯২৪)। গ্রন্থ—প্রবেশিকা গণিত।

সোহহং স্বামী—ব্যায়ামবীর। পূর্বনাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা—শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম—১৮৫৮ খৃঃ ঢাকা বিক্রমপুরে। মৃত্যু—১৯২৫। ইনি দৈহিক শক্তিতে ও ব্যায়াম-কৌশলে অসাধারণ ছিলেন। শিক্ষা—ঢাকা কলেজ। ত্রিপুরা মহারাজের সহচর। সন্ন্যাস অবলম্বন (১৯১৪), হিমালয়ে ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপনা। 'সোহহং স্বামী' নাম গ্রহণ। চীন ও ব্রহ্মদেশে কয়েক বৎসর বাস। গ্রন্থ—সোহহং গীতা, সোহহং তত্ত্ব, সোহহং সংহিতা, ভগবদ্‌গীতার সমালোচনা, Commonsense, Truth.

সৌদামিনী সিংহ, মার্থা—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। খৃষ্টধর্মাবলম্বিনী। গ্রন্থ—নারীচরিত (১৮৬৫)।

সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিং জেলায় রামগোপালপুরে। গ্রন্থ—বারেন্দ্রব্রাহ্মণ সমাজ।

সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০৬ বঙ্গ ১৭ই আষাঢ় সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত মলুটি গ্রামে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ রচনা। সহ-সম্পাদক—রাঢ়দীপিকা (সাপ্তাহিক)।

সৌরীন্দ্র মজুমদার—সাহিত্যিক। জন্ম—ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত আইর গ্রামে। কর্ম—'যুগান্তর' দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে, ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের কেমিষ্ট। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক।

গ্রন্থ—আকাশ-পাতাল, মহামানব সজ্ঘ, কংসনদীর তীরে। সম্পাদক—লগুড় (বিদ্রূপাত্মক পত্রিকা), মহাভারতী। (মাসিক), সব্যসাচী (মাসিক)।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৮৪ খৃঃ ১ই জানুয়ারি ২৪-পরগনার অন্তর্গত ইছাপুরে (নবাবগঞ্জে)। পিতা—হরিদাস মুখোপাধ্যায়। মাতা—হরসুন্দরী দেবী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ভবানীপুর সুবার্বন স্কুল), এফ-এ (তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজ), বি-এ (জেনারেল এসেবব্লিজ ইনসটিটিউসন), বি-এল (রিপন কলেজ)। কর্ম—আইন ব্যবসায়, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। কিশোর বয়স হইতে সাহিত্য-সাধনা। কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার (১১০৪), 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনায় সহযোগিতা (১১০৭); 'সত্যব্রত শর্মা' ছদ্মনামে 'ভারতীতে' গ্রন্থ সমালোচনা। প্রথম নাট্যগ্রন্থ 'যৎকিঞ্চিৎ' (ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত, ১১০৮)। নানা সাময়িক-পত্রে গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ রচনা এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ : গল্প—শেফালি (১১০১), পরদেশী (১১১০), নির্ঝর (১১১১), পুষ্পক, মৃণাল, পিয়াসী, চাঁদমালা, বৈকালী, মণিদীপ, পুনশ্চ, কঙ্কণা, পরকীয়া, তরুণী, রঙের টেক্কা, যৌবরাজ্য, খাটো ও খোটা, সচকিতা গৃহিণী, নব গায়িকা, সুপর্ণা ; নাট্য—যৎকিঞ্চিৎ (১১০৮), দশচক্র, গ্রহের ফের, দরিয়া, রুমেলা, শেষ বেশ, পঞ্চশর, হাত্তের পাঁচ, লাখটাকা, হারানো রতন, রূপসী, যবনিকার অন্তরালে (কাজরী), মন্দির, ইরাণী ; উপন্যাস—কাজরী, দরদী, সোনার কাঠি, আঁধি, বাবলা, প্রেয়সী, স্ত্রীবুদ্ধি, কালোর আলো, পিয়ারী, মুক্তপাখী, নিরুদ্দেশের যাত্রী, লালফুল, অতঃপর, গরীবের ছেলে, লজ্জাবতী, ছোট পাতা, বহ্নিশিখা, মধুযামিনী, পথের পথিক, নেপথ্যে, মমতা, শাস্তি, লেক রোড, পথ বিজন, যৌবনেরি বন্যাস্রোতে, জীবনস্বপ্ন, পারাবার, চঞ্চল নিশীথে, স্বরূপিণী, দুঃখের বরষায়, নিশীথ-দীপ, বিনোদ হালদার, নিশির ডাক, আলোছায়া (১৩৪০), রাহুগ্রস্ত শশী (১৩৪৬), পাষাণ, অরণ্য, ভবিষ্যৎ, আলোর সুর, ফুটন্ত ফুল, মনের মিল, জীবন-সঙ্গিনী, ভাঙন, সহসা, জীবনসাথী, নিদ্রিত পুরী, চাঁদ উঠেছিল গগনে, গৃহ ও গ্রহ, রাঙামাটির পথ, অঙ্গীকার, মুস্কিল-আসান (১৩৬০), কায়াছায়া, মরু-মায়া, নব বসন্ত, নিশীথিনী (১৩৪০), সহচারিণী, বিহঙ্গিনী, যৌবন-সরসী-নীরে, কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা, এই তো জীবন, মামী ডাক্তার, সহিত্রী, মিস্ রেবা রায়, নারী, স্রোত বহে যায় (১৩৫১), মিলন-শতদল, ভালোবাসা, অকস্মাৎ, কুজ্ঝটিকা, অগ্রবর্তিনী, অপরূপা, সাহসিকা, এই পৃথিবী, মধুমঞ্জরী, একালের মায়া, মুক্তি, করুণা, দেবী, কর্মচক্র ; অনুবাদ—বন্দী (ভিক্টর হুগো), মাতৃঋণ, নবাব (আলফন্সো দোঁদে), অবঞ্চনা (গোর্কী), নৌকা (মোপাসাঁ), অসাধারণ (টুর্গেনিভ), নতুন আলো, অ্যাডভেঞ্চার, রোমান্স ; শিশু সাহিত্য : উপন্যাস—লালকুঠি, পাঠান মুলুকে, মা কালীর খাঁড়া, ছায়া দানব, জঙ্গলী, এক রাত্রি, নিঝুমপুরী, বাঙিয়াৎ চন্দর, আলেয়ার আলো, জলটুঙি, বর্মা মেলং, বর্ষায় যখন বাদল পড়ে, পথ ভোলা পথিক, জঙ্গল বাড়ী, বর্গী ছেলে, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ছোটদের রামায়ণ, অনেক দূরে, পাহাড়িয়া, সর্বেসর্বা, নীল আলো, ছিন্নমস্তার মন্দির, জীবন্ত সমাধি, স্বর্গের সিঁড়ি, যাত্রাজয়া ; ছোটদের অনুবাদ—স্বর্ণনদী, বড়দিনের বন্দনা, ইয়াঙ্কর দেশে, গলিভার, রাজা আর্থারের রথী, থী মাসকেটিয়ার্স, কিং সলোমানস, মাইনস, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, বেনহুর, চাঁদের দেশে, সাগরের তলে, আশী দিনে পৃথিবী, পার্সিয়ুস, আজব দেশ লাপুটা। এতদ্ব্যতীত ছেলে-মেয়েদের বহু গল্প-গ্রন্থ, রোমাঞ্চ উপন্যাস ইনি রচনা করেন। যুগ্ম-সম্পাদক—ভারতী (মাসিক, ১৩২২—১৩৩০)।

স্বর্ণকুমারী দেবী—মহিলা কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৫৫ (আনু) কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে। মৃত্যু—১১৩২ খৃঃ ৩রা জুলাই কালিগঞ্জে। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা—সারদাসুন্দরী দেবী। স্বামী—জানকীনাথ ঘোষাল (বিবাহ ১৮৬৭ খৃঃ ১৭ই নভেম্বর)। শৈশব হইতেই রচনা ও সাহিত্য চর্চা। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্থাপনা—'সখিসমিতি (১২১৩), মহিলা শিক্ষামেলা (১২১৫)। রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসে প্রথম মহিলা প্রতিনিধি (১৮১০ খৃঃ, কলিকাতা)। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রী (১৩৩১, কলিকাতা)। জগত্তারিণী সুবর্ণপদক (১১২৭) লাভ। গ্রন্থ—দীপনির্বাণ (উপ, ১৮৭৬), বসন্ত-উৎসব (গীতিকাব্য, ১৮৭১, ৪ঠা নভেম্বর), ছিন্নমুকুল (উপ, ১৮৭১, ৪ঠা নভেম্বর), মালতী (উপ, ১২৮৬), গাথা (১২৮৭), পৃথিবী (বিজ্ঞান, ১২৮১, আশ্বিন), হুগলীর ইমামবাড়ী (ঐতি-উপ, ১২১৪, পৌষ), স্নেহলতা (উপ, ১২১৬, ১১ মাঘ), বিদ্রোহ (ঐতি-উপ, ১২১৭, ১৫ শ্রাবণ), বিবাহ-উৎসব (নাটক, ১৮১২, ১৩ মে), নব কাহিনী (গল্প, ১৮১২, ১৭ অগষ্ট), কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা (১১০১), ফুলের মালা (উপ, ১৮১৪), কবিতা ও গান (১৩০২), কাহাকে ? (উপ, ১৮১৮, জুলাই), দেবকৌতুক (কাব্যনাট্য, ১১০৬, ১৬ ফেব্রুয়ারী), কনে বদল (প্রহসন, ১৩১৩, বৈশাখ), পাকচক্র (ঐ, ১১১১, ২৮ ফেব্রুয়ারী) রাজকন্যা (নাট্যোপ, ১১১৩, ১৭ এপ্রিল), নিবেদিতা (না, ১১১৭, ৬ এপ্রিল), যুগান্ত (কাব্যনাট্য, ১১১৮, ২০ জানুয়ারি), বিচিত্রা (উপ, ১৩২৭, ১লা বৈশাখ), স্বপ্নবাণী (উপ, ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ), মিলনরাত্রি (উপ, ১৩৩২, জ্যৈষ্ঠ), দিব্যকমল (নাটক, ১১৩০), পাঠ্যপুস্তক—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ (১১১২, ২০ অগষ্ট), বাল্যবিনোদ (১১০২, ২৭ অগষ্ট), আদর্শনীতি (১১০৪, ১৮ সেপ্টেম্বর), কীর্তিকলাপ, প্রথম পাঠ্যব্যাকরণ (১১১০, ১৫ অগষ্ট) বাল্যসুহৃদ, ২ ভাগ (চন্দ্রকুমার ঘোষ সহ, ১১৩০-৩১), সাহিত্য-স্রোত ১ম (১১৩২), বালবোধ ব্যাকরণ (১১৩২), স্বরলিপি পুস্তক—(স্বরলিপিকার ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী) গীতিগুচ্ছ, ১ম (১১২২, ডিসেম্বর), প্রেমগীতি, ২য়। সম্পাদিকা—ভারতী (মাসিক, ১২১১—১৩০১ ; ১৩১৫—১৩২১)।

স্বর্ণপ্রভা সেন—মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী—অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। সম্পাদিকা—শিক্ষা (১৩৪৭, অগ্রহায়ণ)। গ্রন্থ—গোদান (অনুবাদ, প্রিয়রঞ্জন সেন সহ)।

ষ্টুয়ার্ট, ক্যাপ্টেন জেমস—ইংরেজ শিক্ষাব্রতী। মৃত্যু—১৮৫৩ খৃঃ। ইনি বর্দ্ধমান প্রভিন্সিয়েল ব্যাটেলিয়মের অ্যাডজুট্যান্ট। ইঁহারই চেষ্টায় বর্দ্ধমান মিশন গঠিত হয়। বর্দ্ধমানে ইঁহার তত্ত্বাবধানে চার্চ মিশন সোসাইটীর সংস্রবে শিক্ষা বিস্তারের কার্য

আরম্ভ (১৮১৬)। ইনি বহু স্কুল স্থাপনা করেন ও নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া সেগুলি বিতরণ করেন। ইনি বেশ ভাল বাংলা জানিতেন। গ্রন্থ—বর্ণমালা (১৮১৮), উপদেশ কথা (১৮১৭), তমোনাশক (১৮২৮—পরবর্তী সংস্করণ 'তিমির নাশক' নামে)।

স্বর্গজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক ও লেখক। জন্ম—কৃষ্ণনগর নদীয়া। পিতা—রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (আইনজীবী)। ছাত্রজীবন হইতে রাজনীতি ও সংবাদপত্র সেবা। আই-এ পরীক্ষা দিবার পর আইন আন্দোলনে কারাদণ্ডিত (১৯৩০), বি-এ (কৃষ্ণনগর কলেজ), এম-এ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বি-এল (ঐ)। কারা-বরণ (১৯৩২, ১৯৪২)। নদীয়া জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। কৃষ্ণনগর কংগ্রেসের সভাপতি ও নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। 'ফ্রি প্রেস' ও 'ইউনাইটেড প্রেসের' নদীয়া জেলার সংবাদদাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী। সম্পাদক—নদীয়ার কথা (সংবাদপত্র)।

হবিবর রহমান, শেখ—কবি। জন্ম—১৮৯১ খৃঃ এপ্রিল যশোহর জেলার ঘোষপতি গ্রামে। কর্ম—বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগে। 'সাহিত্য-রত্ন' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—কোহিনূর কাব্য, চেতনা, বাঁশরী, পারিজাত, গুলশান, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, আবেহায়াৎ (বাংলা সাহিত্যে গজল গানের প্রথম পুস্তক), পরীর কাহিনী, গুলিস্তাঁ (বঙ্গানুবাদ), বুস্তাঁ (ঐ)।

হবিবুল্লাহ বাহার, মুহম্মদ—রাজনীতিজ্ঞ ও ক্রীড়াকুশলী। জন্ম—১৯০৬ খৃঃ চট্টগ্রাম। পৈত্রিক নিবাস—নোয়াখালি। ইনি পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ মরহুম আবদুল আজিজ, বি-এ'র দৌহিত্র ও লেখিকা বেগম সামসুন্নাহের অগ্রজ। প্রাদেশিক মুস্লিম লীগের সম্পাদক। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাস্থ্যসচিব। গ্রন্থ—পাকিস্তান, ওমর ফারুক, আমীর আলী, কবি ইকবাল, প্রতিধ্বনি, কলম্বোর ভিক্ষু, আজব কথা।

হরকুমার ঠাকুর—গ্রন্থকার। জন্ম—১৭৯৮ খৃঃ পাথুরিয়াঘাটা রাজবংশে। মৃত্যু—১৮৫৮ খৃঃ। পিতা—গোপীমোহন ঠাকুর। ইহার পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইনি তৎকালীন কয়েকটি জনহিতকর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—শিলাচক্রার্থবোধিনী, পুরশ্চরণবোধিনী, হরতত্ত্বদীধিতি।

হরকুমারী দেবী—মহিলা কবি। কালীঘাট-নিবাসিনী। কাব্য গ্রন্থ—বিপ্লাদরিত্রদলনী (১৮৬১)।

হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী—কবি। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বালুচর নামক স্থানে বৈদ্যবংশে। পিতা—হরিনারায়ণ মজুমদার। মাতা—মাতঙ্গিনী। শিক্ষা—মৈমনসিংহ জেলা স্কুল, এনট্রান্স (জামালপুর হাইস্কুল, ১২৯০)। স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে জমীদারী ত্যাগ করিয়া কাশীতে যোগশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণের পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় সম্পত্তি গ্রহণ ও বিবাহাদি করেন। কাব্যগ্রন্থ—দশাননবধ মহাকাব্য (১ম খণ্ড রাবণবধ, ১৩০১, বাকী অংশ—১৩১০)।

হরচন্দ্র ঘোষ—নাট্যকার। জন্ম—১৮১৭ খৃঃ হুগলী বাবুগঞ্জে। মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ ২৪এ নভেম্বর। পিতা—হলধর ঘোষ (হুগলীর কালেকটরীর হেড ক্লার্ক)। আদি নিবাস হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর। শিক্ষা—হুগলী কলেজ (১৮৩৬)। আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ। হুগলী কলেজে অনুবাদের জন্য পুরস্কার লাভ (১৮৭১)। কর্ম—দ্বিতীয় শ্রেণীর আবগারির সুপারিনটেনডেণ্ট (১৮৪৬, বোয়ালিয়া)। প্রথম শ্রেণীর সুপারিনটেনডেণ্ট মালদহ (১৮৪৭)। রেভেনিউ সার্ভের ডেপুটি কালেকটর (বহরমপুর), ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৫৮), অবসর গ্রহণ (১৮৭২)। গ্রন্থ—ভানুমতী-বিলাস (নাটক, ১৮৫৩), কৌরববিয়োগ (না, ১৮৫৮), চারুমুখ চিত্তহরা (না, ১৮৬৪), বারুণীবারণ বা সুরার সঙ্গদোষ (১৮৬৪), রজতগিরিনন্দিনী (না, ১৮৭৪), সপত্নীসরো (১৮৭৫), রাজতপস্বিনী, ১ম (১৮৭৬), শিবাজীর জীবন হইতে উপদেশ সঙ্কলন (১৮৮০)।

হরচন্দ্র চৌধুরী—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৫৩ বঙ্গ ১০ই অগ্রহায়ণ মৈমনসিংহের শেরপুর জমীদার-বংশে। মৃত্যু—১৩০৫ বঙ্গ ১৭ই বৈশাখ। সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠাতা—চারুবার্ত্তা (সাপ্তাহিক, ১৮৮১), চারুমিহির (ঐ, ১৮৯৫)। গ্রন্থ—শেরপুর-বিবরণ, শ্রীবৎসোপাখ্যান, বংশানুচরিত। সম্পাদক—বিদ্যোন্নতিসাধিনী (মাসিক, ১৮৬৫, জুন—শেরপুর বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার মুখপত্র। মৈমনসিংহের ইহাই প্রথম সাময়িক পত্র)।

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদপূর্ণ-চন্দ্রোদয় (মাসিক, ১৮৩৫, ১০ই জুন)।

হরচন্দ্র ভৌমিক—গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা জেলার হাটুরিয়া গ্রামে। কর্ম—মোক্তারি। গ্রন্থ—মর্ত্যে পারিজাত (উপন্যাস)।

হরচন্দ্র রায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—বাঙ্গালা গেজেট (সাপ্তাহিক, ১৮১৮, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র)।

হরধন রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেবযানী, কাদম্বরী, নলদময়ন্তী, পার্থ-পরীক্ষা, রামাবতার, যযাতি ও যোগমায়া।

হরনাথ ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পত্রদলিল শিক্ষা।

হরনাথ বসু—নাট্যকার। নাট্য-গ্রন্থ—বীরপূজা, ময়ূর সিংহাসন, বেহুলা, পাপের পরিণাম; ভক্ত কবীর (কাব্য)।

হরনাথ বিদ্যারত্ন—বৈয়াকরণ ও স্মার্ত্ত-পণ্ডিত। জন্ম—১২৪৩ বঙ্গ চৈত্র পাবনা জেলার উধুলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ মৈত্রবংশে। মৃত্যু—১৩১৪ বঙ্গ শ্রাবণ কাশীধামে। পিতা—অমরনাথ ভট্টাচার্য। মাতা—অলকাসুন্দরী দেবী। শিক্ষা—পাবনা-ভুতিয়া, পুঁটিয়া ও কাশীধামে। কাশীবাস (১২৭০)। গ্রন্থ—বক্তব্যকাব্যরত্ন, ধাতুপদরত্ন, ধাতুরত্নমালা, অভিন্নধাতুরূপরত্ন (১২৮৯-৯৩), পদসুগম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ (১২৯৬), ব্যবস্থারত্নমালা-শুদ্ধিরত্ন, বিশ্বেশ্বরাদি দেবতাস্তোত্ররত্ন তথা কাশীমুক্তিনির্ণয়ম্ (১৩১৩), বিচার-রত্নমালা, তিথিউদ্বাহপ্রায়শ্চিত্তবোধ, শুদ্ধিপত্রাবলী, জন্মাষ্টমী, শ্রবণাদ্বাদশী-ব্যবস্থাবিচার, কাশীমৃতস্য ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ানির্ণয়ম্ (স্মৃতি), শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার (ব্যাকরণ)।

হরনাথ ভঞ্জ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় (১৮৭৫, ১২ই জুলাই)।

হরনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। নিবাস—কৃষ্ণনগর। গ্রন্থ—রহস্য সন্দর্ভ।

হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য—চিকিৎসক। জন্ম—১৯০৪ খৃঃ ঢাকা জেলার পারজোয়ার-নোয়াদ্ধা গ্রামে। পিতা—জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন। মাতা—নিত্যকালী দেবী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ঢাকা উকীল ইনষ্টিটিউসন, ১৯২১), আই-এস-সি (কলিকাতা রিপণ কলেজ, ১৯২৩), এম-বি (কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, ১৯২৯)। সংস্কৃত শিক্ষা—মহামহ' দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের ভাগবতচতুষ্পাঠী (ভবানীপুর)। কর্ম—অধ্যাপক, আর, জি, কর কলেজ (১৯৩০)। সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—চতুঃশ্লোকী ভাগবত (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, ১৩৫৬), মনের কথা (১৩৫৮), A Hand Book of Medical Parasitology for medical practioners & students (১৩৬০)।

হরপ্রসাদ (কর) রায়—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অস্থায়ী পণ্ডিত। গ্রন্থ—পুরুষ পরীক্ষা (বিদ্যাপতি, বঙ্গানুবাদ, ১৮১৫)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাব্রতী। নামান্তর—শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য। জন্ম—১৮৫৩ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর ২৪-পরগনার অন্তর্গত নৈহাটী। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ ১৭ই নভেম্বর। পিতা—রামকমল ন্যায়রত্ন (ভট্টাচার্য)। শিক্ষা—নৈহাটী, কান্দি, ভাটপাড়ার টোলে, এনট্রান্স (সংস্কৃত কলেজ, ১৮৭১), এফ-এ (ঐ, ১৮৭৩), বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৭৬), এম-এ (সংস্কৃত কলেজ, ১৮৭৭)। কর্ম—প্রধান পণ্ডিত, কলিকাতা হেয়ার স্কুল (১৮৭৮), অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ (১৮৭৯), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৮৮৩), বঙ্গীয় রাজসরকারের অনুবাদ বিভাগে সহকারী অনুবাদক (ঐ), বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৮৬-১৮৯৪), সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৯৪), সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০০-১৯০৮), বাঙলা দেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার (ঐ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯২১-১৯২৪), সম্মান ও উপাধিলাভ—শাস্ত্রী (১৮৭৭), মহামহোপাধ্যায় (১৮৯৮), সি-আই-ই (১৯১১), ডি-লিট (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭); নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান (১৮৮৩), অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চের সভাপতি (১৮৮৪), এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব সমিতির সম্পাদক (১৮৮৫), পুথি-সংগ্রহের প্রধান পরিচালক (১৮৯১), সহ সভাপতি (১৯০৬), সভাপতি (১৯১৯-২১), সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সভ্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৮), বুদ্ধিষ্ট টেক্সটস এণ্ড রিসার্চ সোসাইটির সম্পাদক (১৮৯৫), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য (১৮৯৬), সহ-সভাপতি (১৩০৫-৯, ১৩১৮-১৯, ১৩২৩-২৫, ১৩৩১-৩২), সভাপতি (১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬)। পুথি সংগ্রহকার্যে নেপালে গমন (১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০৭, ১৯২২)। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি (বর্ধমান, ১৯১৪, রাধানগর, ১৯২৪), মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯১৮), বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (হেতমপুর, ১৯২০), ভারত হিন্দু সভার সভাপতি (কলিকাতা, ১৯২২), ওরিয়েন্টাল কন্ফারেন্সের সভাপতি (লাহোর, ১৯২৮), ইত্যাদি। ইনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং বহু ভাষাবিদ, জাতিতত্ত্ব ও বৌদ্ধ ইতিহাসে সুপণ্ডিত। সরলতা ইঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য। সহজ ও সরল ভাষাতেই ইনি সাহিত্য সৃষ্টি ও মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বহু রচনা ইনি প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ—ভারত-মহিলা (২য়, সং—১৮৮২), বাল্মীকির জয় (১৮৮১), মেঘদূত (১৯০২), কাঞ্চনমালা (১৯১৫), বেণের মেয়ে (১৯১৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য; পাঠ্যগ্রন্থ—প্রসাদপাঠ, ভারতবর্ষের ইতিহাস: সম্পাদিত গ্রন্থ—শ্রীধর্মমঙ্গল (১৯০৬), বৌদ্ধগান ও দোহা (১৯১৬), কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদিপর্ব (১৯২৮), বিদ্যাপতি প্রণীত কীর্তিলতা (১৯২৪), বৃহদ্ধর্মপুরাণ (১৮৮৮-১৮৯৭), বৃহৎস্বয়ম্ভুপুরাণ (১৮৯৪-১৯০০), সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত (১৯১০), আর্যদেবের চতুঃশতিকা (১৯১৪), আনন্দ-ভট্ট কৃত বল্লালচরিত (১৯০৪), বৌদ্ধন্যায়ের পুথি (১৯১০), অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ কাব্য (১৯১০), নৈনিক শাস্ত্র (১৯১০); ইংরেজি গ্রন্থ—History of India, Malavikagnimitra (১৯০৭), Vernacular literature of Bengal (১৮৯১), Bird's eye view of Sanskrit Literature (১৯১৭), Discovery of living Buddhism in Bengal (১৮৯৭), The study of Sanskrit, The Educative Influence of Sanskrit (১৯১৬), Magadhan Literature (১৯২৩), Lokayata (১৯২৫), Absorption of the Vratyas (১৯২৬), Sanskrit Culture in Modern India (১৯২৮), Catalogue of Palm-leaf and Selected paper mss. belonging to the Darbar Library, Nepal, Vol. 1 & 11 (১৯০৫), A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection under the care of A. S. B. ১ম (১৯১৭), ২য় (১৯২৩), ৩য় (১৯২৫), ৪র্থ (১৯২৩), ৫ম (১৯২৮), ৬ষ্ঠ (১৯৩১), Report on the Search of Sanskrit Mss. (১৮৯৫-১৯১১)।

হরমোহন চূড়ামণি—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—শ্রীরাম শিরোমণি। প্রাধান্যপদ প্রাপ্ত। গ্রন্থ—সামান্য-লক্ষণব্যাখ্যা (টীকা ১৮৬৩)।

হরলাল রায়—শিক্ষাব্রতী। প্রধান শিক্ষক, কলিকাতা হিন্দু স্কুল। নাট্যগ্রন্থ—হেমলতা, রুদ্রপাল, কনকপদ্ম।

হরলাল সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চতুরঙ্গ (১৮৭৫)।

হরিকিশোর রায়চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—প্রজা-স্বত্ববিষয়ক আইন।

হরিকৃষ্ণ মল্লিক—চিকিৎসক। গ্রন্থ—বিষমজ্বরে কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী (১৮৭৩), বেঙ্গলী হোমিওপ্যাথিক সিরিজ (১৮৬৯)।

হরিচরণ দাস—কবি। ইনি অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুতের শিষ্য। গ্রন্থ—অদ্বৈতমঙ্গল।

হরিচরণ দে—কবি। জন্ম—ঢাকা। কবিতামঞ্জরী (ঢাকা, ১৮৬৮)।

[ক্রমশঃ।

দুই শতাব্দী পূর্ব্বে নদী পরিবহনে কৃতিত্ব

শ্রীকালীকিঙ্কর দে

আমাদিগের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরে প্রবহমান নদীকে মানুষের কাজে লাগাইতে বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে। দেশ-বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উদ্দাম নদীর শক্তিকে সংহত করিয়া তাহার দ্বারা মনুষ্য-হিতকর কাজ করাইয়া লইবার জন্য প্রতি প্রদেশেই একাধিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। যদিও কোনও পরিকল্পনার ফল ষোল আনা পাইবার এখনও সময় আসে নাই কিন্তু কোন, কোনটির প্রথম বা দ্বিতীয় পর্ব্ব মত কার্য্য সমাধা হওয়ায় আংশিক সুফল দেখা দিতে সুরু করিয়াছে। নদীর গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার বাড়তি জলধারা অন্য খাতে প্রবাহিত করাইয়া নূতন নূতন অঞ্চলের উন্নতি সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। এই সব পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট ব্যয়ও করিতে হইতেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে নদীর ধারা পরিবর্ত্তন চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। এই বর্ষাকালেই, আসাম ও উত্তরবঙ্গে এইরূপ হইয়াছে। নদীমাতৃক দেশে প্রতি বর্ষাতেই নদীর গতিধারার অল্প-বিস্তর এরূপ পরিবর্ত্তন হয়। মনুষ্যের চেষ্টায়ও এরূপ হয়; এখন ভারতবর্ষে সব প্রদেশেই নদীকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। অতীতে মনুষ্যও যে নদীর ধারা ভিন্ন পথে চালিত করিয়াছেন তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। এখনকার তুলনায় তখনকার সেই সকল পরিকল্পনা একরূপ বিনা ব্যয়েই হইয়াছিল বলা যায়। অন্ততঃ উপকৃত প্রজাবৃন্দকে তাহার জন্য কর গুণিতে হয় নাই। এই পরিকল্পনা কোনও পূর্ত্তবিশারদ দ্বারা পরিকল্পিত হয় নাই, কোনও উপাধিধারী বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ইহার প্রযোজক নহে। তবে তাঁহারা যে বিশেষ ধীসম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ একটি নদী পরিবহন বিস্তার দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৭৪২।৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় বর্গী আক্রমণের সময়ে নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাসস্থ রাজপুরী রক্ষার্থ তাহার পরিখা, এইরূপ এক নদী সাহায্যে জলপূর্ণ করেন, তদীয় সুযোগ্য দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র।

কেবল মাত্র রাজপুরীকে মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই গভীর জলধারা দ্বারা শিবনিবাস প্রাসাদের পাদদেশস্থ পরিখা পূর্ণ করা রঘুনন্দনের উদ্দেশ্য ছিল না। এই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরীকে বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে এই জলধারা বদ্ধসলিলা হইলে চলিত না। রঘুনন্দন শিবনিবাসের সম্মুখে বাণিজ্যতরীপূর্ণ স্রোতবতী বহতা নদীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। শিবনিবাসে এইরূপ নদী বহিয়া আনিতে তিনি সক্ষমও হইয়াছিলেন।

রঘুনন্দন ছিলেন বিশ্বামিত্র গোত্রজ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সন্তান। মধ্যবিত্ত সংসারে তাঁহার জন্ম; পূর্ব্বনিবাস কোন্নগরে, পরে বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাটের নিকটে চাণ্ডুলীগ্রামে। অল্প বয়সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজ্যারোহণের পরেই টাকার তাগিদে ১২ লক্ষ নজরাণার দায়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অবরোধ করিলে, সামান্য কর্ম্মচারী রঘুনন্দনের একমাত্র উদ্যোগে তিনি কারামুক্ত হন। তদবধি তিনি নদীয়ারাজার দেওয়ান; শুধু দেওয়ান নয়—সর্ব্বাধিকারী ক্ষমতা-যুক্ত দেওয়ান। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় নদীয়ারাজার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হইল। রাজপরিবার ও ধনৈশ্বর্য্য রক্ষার জন্য নিভৃত স্থানে রঘুনন্দনেরই পরিকল্পনায় বিশাল নগরী শিবনিবাসের পত্তন হইল। অট্টালিকা সমূহ তদানীন্তন ইউরোপীয় প্রাসাদাদি হইতে কোনও অংশে যে ন্যূন ছিল না তাহা বিশপ হেবার সাহেব বলিয়া গিয়াছেন। ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই শিবনিবাসেই অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ সমাহিত হইল। এবং এই শিবনিবাস নগরীর পাদমূলে ভগীরথের মতই তিনি বহতা নদী আনিয়া দিলেন।

কি ভাবে তিনি ইহা আনিলেন, তাহা জানিতে হইলে যে স্থানে শিবনিবাস পুরীর পত্তন হয়, তাহার ভৌগোলিক অবস্থান ও সন্নিকটস্থ জলধারাগুলির পরিচয় জানা আবশ্যক।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এক সময়ে নসরৎ খাঁ নামক এক দুর্দ্দান্ত দস্যুর অনুসরণে গমন করিয়া মাথাভাঙ্গা, ইছামতী নদীর নিকটে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। দস্যুর এই আবাসস্থানের নাম ছিল নসরৎ খাঁর বেড়। এই স্থানের সুরক্ষিত অবস্থা দেখিয়া রাজা মোহিত হন; এই স্থানকে এক ক্ষুদ্র বদ্ধসলিলা জলধারা প্রায় চতুর্দ্দিকে কঙ্কণাকারে বেষ্টন করিয়া এক উপদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছিল; এই স্থানের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মাথাভাঙ্গা নদী আসিয়া ইছামতীর স্রোতে বাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা কৃষ্ণনগর হইতে ১০।১২ মাইল পূর্ব্বে।

"বর্গীর রাজাও তখন উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ এই নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে সকলে ঐ স্থানটি মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্থানটিকে কঙ্কণাকারে নদী-বেষ্টিত করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুযায়ী এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন......এই কঙ্কণাবেষ্টিত শিবনিবাসেই তিনি মহাসমারোহে অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ সমাধা করেন।"[১]

শিবনিবাস পুরী পত্তনের পরিকল্পনা ও সমাধা যে মহারাজার তদানীন্তন দেওয়ান দ্বারা সম্পাদিত, তাহা আরও জানা যায় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন মহানগরীতে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত শ্রীরাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় বিরচিত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্" পুস্তিকার ৩১ পৃষ্ঠায়......পরে পাত্র (দেওয়ান রঘুনন্দন) বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাজকে সংবাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকল পুরী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপ্রসাদ দিলেন......রাজা শুভক্ষণে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আহ্লাদের সীমা নাই। পুরীর শিবনিবাস, নদীর নাম কঙ্কণা রাখিলেন।

এই নগর বর্গী আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য নগর প্রবেশের একমাত্র দ্বার পূর্ব্বদিকে থাকিল। দ্বারদেশে ও নগরের

১। নদীয়া কাহিনী ৩১০

চতুর্দ্দিকে শত্রুর প্রবেশ রোধার্থ নানা প্রকার কলাকৌশল করিয়া রাখা হইল।...শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণপুর নামে এক গ্রাম পত্তন করেন, তথায় গোয়ালাগণের বসতি করান। (গড় রক্ষার্থে তাহাদের বাস বলিয়া) এক্ষণে তাহারা গড়ো বলিয়া খ্যাত। কিয়ৎ দূরে উত্তর-পূর্ব্বে ইছামতী নদীতীরে এক গঞ্জ স্থাপনা করেন ও তাহার নাম রাখেন কৃষ্ণগঞ্জ।"২

রঘুনন্দন শিবনিবাসের চতুষ্পার্শ্বস্থ বদ্ধ সলিলে যে উপায়ে স্রোতের প্রবাহ আনিতে পারিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতে ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায়:—"পূর্ব দিক হইতে সহস্র হস্ত পরিমিত (½ মাইল) এক খাল কাটিয়া ইছামতী নদীর সহিত ও পশ্চিম দিক হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ (৬ মাইল) আর এক খাল কাটিয়া হাঁসখালির উত্তরে অঞ্জনা নদীর সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইল। এই উভয় নদীর সহিত মিলিত হওয়ায় ঐ জলাশয় প্রবাহ-বিশিষ্ট হইল। কঙ্কণ সদৃশ গোলাকার ছিল বলিয়া রাজা তাহার নাম রাখিলেন কঙ্কণা।"

সুজননাথ মুস্তৌফী তাঁহার 'উলা' নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"কথিত আছে যে, শিবনিবাস দুর্গের বেষ্টনীর গড় জলপূর্ণ করিবার জন্য কৃষ্ণগঞ্জ হইতে শিবনিবাস পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল কাটান হইয়াছিল; আর একটি নালা দ্বারা এই খালের সহিত ইছামতী নদীর সংযোগ ছিল। উহাকে চূর্ণী কহিত। ইছামতীর ক্ষতি করিয়া ক্রমে চূর্ণী প্রবলা হইয়া নদীতে পরিণত হয়।"

এখন অঞ্জনা নদীর ধারার আলোচনা করিলে দেখা যায়—১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের (পূর্ব্বনাম রেউই) নিকট জালাঙ্গী (খড়িয়া) নদী হইতে নিঃসৃত অঞ্জনা নদী ক্ষুদ্রকলেবরা স্বচ্ছসলিলা বেগবতী স্রোতস্বিনী ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ, কৃষ্ণনগর সহরের স্থাপয়িতা মহারাজা রুদ্রের সময়ে ১০৮৭ হিজরি বা ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি মুসলমান সৈনিক জলপথে অঞ্জনা দিয়া যাইবার সময়ে, রাজ-অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রুদ্রের দৌবারিকগণের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ হয়; এবং সেই কারণে মহারাজা পর বৎসরই অঞ্জনার স্রোত রুদ্ধ করিয়া দেন। এই রুদ্ধ নদীই রাজবাড়ীর পশ্চিমে দীর্ঘ দীঘিতে পরিণত হইয়াছে। এখন অঞ্জনা বদ্ধসলিলা, কতকাংশে শুষ্ক কতকাংশে রেখামাত্রে পর্য্যবসিত। কৃষ্ণনগরের পশ্চিম দিকে জালাঙ্গী হইতে নির্গত হইয়া নদীয়া জেলার মধ্যে হাঁসখালি হইয়া প্রবাহিত হইত।

ক্ষিতীশ-বংশাবলী ৮৫ পৃষ্ঠায় এই নদী সম্বন্ধে জানা যায়:—"অঞ্জনা নদী কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া যাত্রাপুর গ্রামের নিকট দ্বিধাবিভক্ত হয়; এক ধারা জয়পুর, জালালপুর, ধর্ম্মদা, বাদকুল্লা প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া, মামজোয়ান হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া আড়ংঘাটা পর্য্যন্ত যায়, অপর ধারা যাত্রাপুর, বেৎনা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের নিকট দিয়া হাঁসখালির সমীপস্থ হয়। তৎপরে দক্ষিণমুখে যাইয়া মামজোয়ানের নিকট পূর্ব্বধারার সহিত মিলিত হয়। মহারাজা রুদ্রের সময়েই অঞ্জনা নদী একরূপ মৃতপ্রায় ছিল, কেবল বর্ষাকালে প্রবাহিত হইত। মামজোয়ানের নিকট দুই ধারা মিলিত হইয়া দক্ষিণ মুখে হরধামের (তখনও হরধামের পত্তন হয় নাই) উত্তর দিয়া চকদহের নিকটে (শিবপুরে) ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে। শিবনিবাস হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত নদীর নাম চূর্ণী।"

অঞ্জনা নদীর এই যে প্রবাহ তাহার আভাস বর্ত্তমান নদীয়া জেলার মানচিত্রেও ধরা পড়ে, অতি ক্ষীণ ভগ্ন-ভগ্ন রেখায়। এই ক্ষীণ রেখা ছিন্নভিন্ন অংশে কৃষ্ণনগর হইতে এক শাখা দক্ষিণ মুখে জয়পুর, হেমৎপুর, জালালপুর, বাদকুল্লা, পাটুলি গিয়া পূর্ব্বমুখে গাঙ্গপোতা পার হইয়া মামজোয়ানে পড়িয়াছে; অপর শাখা যাত্রাপুর হইতে উত্তরমুখে বেরাবেরিয়া পৌছিয়া, তৎপরে পূর্ব্বমুখে ঢাকুরিয়া, ইটাবেরিয়া, বেৎনা দক্ষিণ পাড়া ও হাঁসখালি আসিয়া পরে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হইয়া মামজোয়ানে পূর্ব্বধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে এই মিলিত ধারা আড়ংঘাটা, রাণাঘাট, আনুলিয়া, হরধাম হইয়া চকদহের পশ্চিমে গোঁসাই চর ও শিবপুর মধ্যে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে।

কৃষ্ণনগর হইতে হাঁসখালি পর্য্যন্ত অঞ্জনা নদী অতি ক্ষীণ খণ্ড খণ্ড রেখা মাত্র, কিন্তু হাঁসখালি হইতে ভাগীরথী-সঙ্গম পর্য্যন্ত অঞ্জনার পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা অপেক্ষাকৃত পুষ্ট। শিবনিবাসের গড়খাতে আনীত ইছামতীর ধারা এই পথে বাহিত হইয়া ইহাকে পুষ্ট করিয়াছে। এইরূপে ইছামতীর জল চুরি করার জন্য এই জলধারার নাম চূর্ণী হইয়াছে কি না কে জানে?

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে শিবনিবাস হইতে পূর্ব্বদিকে সহস্র হস্ত পরিমিত খাল দ্বারা ইছামতীর সহিত এবং পশ্চিমে প্রথমে পশ্চিমমুখী এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী প্রায় ৩ ক্রোশ এক খাল কাটিয়া হাঁসখালির নিকট অঞ্জনা নদীর সহিত যোগ করিয়া দেওয়ায় এই খাতে জল প্রবাহিত হইল। নদীয়া জেলার বর্ত্তমান মানচিত্রেও দেখা যায়, শিবনিবাস হইতে ½ মাইল পূর্ব্বে ইছামতী সঙ্গম এবং ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঁসখালি। ইহা হইতে ক্ষীণরেখায় আরও একটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। চূর্ণী নদী মামজোয়ান, আড়ংঘাটা রাণাঘাট হইয়া, রাণাঘাটের দক্ষিণে দয়াবাড়ী হইতে এক ধারা পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখে ঢাকুরিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া (প্রায় ৪ মাইল) আবার উত্তর-পূর্ব্ব মুখে ঘোলা, পাটখালি হইয়া আরও দশ মাইল দূরে ইছামতী নদীতে মিশিয়াছে। আর রাণাঘাটের দক্ষিণে দয়াবাড়ী হইতে চূর্ণীর ধারা দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে আনুলিয়া হরধাম গোঁসাইচর হইয়া প্রায় ১০ মাইল বাহিত হইয়া শিবপুরের নিকট ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। দয়াবাড়ী হইতে পূর্ব্বগামী ইছামুখী পর্য্যন্ত এই ক্ষীণধারা ১৭৭০-৮০ পর্য্যন্ত যে বেগবতী ছিল তাহা রেণেলের ম্যাপ হইতে জানা যায়।

এখন রঘুনন্দনের এই খাল খননের পূর্ব্বে অঞ্জনার গতিপথ বিবেচনা করিলে দেখা যায়, মামজোয়ানের দক্ষিণে এই ধারা আড়ংঘাটা, জাফরনগর রাণাঘাট হইয়া তৎপরে পূর্ব্বদিকে ইছামতী ও অন্য ধারা দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ভাগীরথীতে পড়িত। এবং সম্ভবতঃ এই পূর্ব্বদিকের ইছামতীমুখী ধারাই প্রবলা ছিল। রঘুনন্দনের এই খাল কাটার পর হইতে ক্রমে ক্রমে চূর্ণী প্রবলা হইতে থাকে আর এই পূর্ব্বমুখী অঞ্জনার ধারা ক্ষীণ হইতে থাকে।

১৭৬৪ হইতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে অঙ্কিত রেণেলের মানচিত্র-গুলি আলোচনায় দেখা যায় যে, ভাগীরথীর পশ্চিমে বর্ত্তমান

২। ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত ১০৭,৮

৩। নদীয়া কাহিনী ৩৮৩।

নদীয়া জেলা অঞ্চলের মানচিত্রে অঞ্জনা নদীর নাম দেওয়া না থাকিলেও তাহাতে কৃষ্ণনগর হইতে যাত্রাপুর পার হইয়া ইটাবেরিয়া বেৎনা বাহিয়া অঞ্জনা নদীর ক্ষীণ ধারা হাঁসখালি পর্য্যন্ত চিত্রিত আছে, আবার যাত্রাপুর হইতে ইহার অপর ক্ষীণ ধারা জয়পুর বাদকুল্লা গারুপোতা বাহিয়াও অঙ্কিত রহিয়াছে। রাণাঘাটের দক্ষিণে দয়াবান হইতে পূর্ব্বাভিমুখী ইছামতীমুখী ধারাও চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ ম্যাপে মাথাভাঙ্গা, ইছামতী নদী ও শিবানিবাস নগরী চিহ্নিত থাকিলেও চূর্ণী নদীর অংশটি চিত্রিত নাই। ইহাতে বোঝা যায়, চূর্ণীর এই ধারা তখনও তেমন প্রবলা হয় নাই। কিন্তু চূর্ণীর এই ধারা তখনও বর্ত্তমান ছিল। রেণেল তাহার প্রমাণও রাখিয়া গিয়াছেন। জলঙ্গী সঙ্গম হইতে সাগর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর গতিপথের যে বৃহত্তর মানচিত্র রেণেল আঁকিয়াছেন তাহাতে ভাগীরথী-সঙ্গমের নিকট চূর্ণীনদীর ধারার কিছুটা দর্শিত হইয়াছে এবং নদীটির চূর্ণী নাম তথায় স্পষ্ট লিখিত আছে। উপরিস্থ ধারা তিনি প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া অঙ্কিত করেন নাই। উক্ত ম্যাপ দৃষ্টে চূর্ণীর বিস্তার ভাগীরথীর ⅙ বলিয়া অনুমিত হয়।

এই রঘুনন্দনের কর্ত্তিত খাল দ্বারা চূর্ণী নদী যে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রশস্ততর হইয়া বাণিজ্যতরী বহনোপযোগী হইয়াছিল, তাহা বিশপ হেবারের বিবরণী হইতে জানা যায়।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এবং পরেও, কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার দুইটি মাত্র পথ লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার করিত। একটি ত্রিবেণীর সম্মুখস্থ অধুনা বিলুপ্ত পূর্ব্বমুখী যমুনা নদী বাহিয়া টাকীর নিকট ইছামতীতে পড়িয়া সুন্দরবনের অসংখ্য খাড়ি ও নদী বাহিয়া খুলনা বরিশাল হইয়া ঢাকায়, অপরটি নবদ্বীপের নিকটে জালাঙ্গী নদী উজানে বাহিয়া পদ্মা বাহিয়া ঢাকায়। রেণেলের ম্যাপেও (১৭৭২ খৃঃ) যমুনা নদী প্রশস্ত দেখা যায়।

কৃষ্ণগঞ্জের নিকট হইতে মাথাভাঙ্গা, কুমার ও কালীগঙ্গা বাহিয়া কুষ্টিয়ার নিকটে পদ্মায় পড়িয়া ঢাকায় যাওয়ার পথও সুগম ছিল। কিন্তু ভাগীরথী নদী হইতে কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইবার নাব্য জলপথ ছিল না। এই জলপথের সূচনা হয় চূর্ণী নদী দ্বারা। শিবনিবাস নগর-পরিখা জলপূর্ণ করিতে রঘুনন্দন ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে যে খাল কাটেন তাহাই এই পথকে নাব্য করিতে থাকে।

বাংলা ও আসামের ডিরেক্টর অফ সার্ভেস্, মেজর এফ, সি, হার্ষ্ট সাহেব নদীয়ার নদী সম্বন্ধে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহার নবম অধ্যায়ে, ২৯ ও ৩৪ পৃষ্ঠায় (Interference of hnman agency with the regime of Nadia Rivers) নদীয়া নদীর গতি পরিবর্ত্তনে মানুষের হাত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—For many years, human agency has contributed to affect the life of these rlvers. It secms clear that the tampering with the streams running from the Mathabhanga eastwards, had something to do with the opening up of the Churni.

"বহু কাল ধরিয়া মানুষের খেয়ালের উপর এই সকল নদীর মরা-বাঁচা নির্ভর করিয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব্বগামী ধারায় মানুষের হাত পড়ায় চূর্ণী নদীর সৃষ্টি হইয়াছে।"

Hirst সাহেবের সংলগ্ন মানচিত্রে (ইহা রেণেলের মানচিত্র) মাথাভাঙ্গা ও ইছামতীকে একটি নদীর মতই দেখায়। ইছামতীকে ক্রমশঃ দুর্ব্বলা করিয়া চূর্ণীকে যে প্রবলা করিতেছে, তাহা হার্ষ্ট-এর লেখাতেই প্রকাশ পায়। রঘুনন্দনের খাল কাটাই হার্ষ্ট-এর এই human agency.

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে চূর্ণী নদী ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে স্বল্প সময়ের মধ্যে হেবার সাহেবকে যে কলিকাতা হইতে ঢাকায় পৌছাইয়া দেয় তাহা হেবারের বর্ণনা হইতে জানা যায়।

রেভারেণ্ড এইচ, হেবার তাঁহার Narrative of a journey through the upper Provinces of Iudia, Vol ৪ পুস্তকে ইহা বিবৃত করিয়াছেন। এই পুস্তক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রঘুনন্দন নির্ম্মিত শিবনিবাসের প্রাসাদাদি ও নগর পত্তনেরও বিবরণ দেওয়া আছে। তাহা উল্লেখ না করিয়া যে জলধারা বাহিয়া হেবার গমন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ হেবারের পুস্তকের ৮৩ হইতে ৯১ পৃষ্ঠা হইতে দেওয়া হইতেছে।

ঢাকা গমন উদ্দেশ্যে হেবার সাহেব এক ১৬ দাঁড় ফিনেস (Pinnace) ৪ নৌকায় ১৫, ৬, ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা ছাড়িলেন। সঙ্গে বজরা ও আরও দু'-একটি নৌকা ছিল। সঙ্গে Stowe সাহেব। ব্যারাকপুরে এক রাত্রি কাটাইয়া ১৬, ৬, ১৮২৪ তারিখে ভোর সাড়ে চারটায় নৌকা ছাড়িয়া ঐ দিনই বেলা সাড়ে নয়টায় চন্দননগরে পৌছিলেন। তথায় চন্দননগরের সাহেবদিগের সহিত আরও কিছু উত্তরের জঙ্গলে শিকারাদিতে দিন কাটাইলেন। সেই জঙ্গলে তখন ব্যাঘ্রাদি থাকিত।

১৭ই জুন চন্দননগর ছাড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী, ব্যাণ্ডেল পার হইলেন। এইখানে নদীমধ্যে চর, অপর পার দিয়া পূর্ব্বমুখে যমুনার খাত বাহির হইয়া গিয়াছে।

আরও কিছু দূর উত্তরে গিয়া ডান দিকে অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এক জলস্রোত আসিয়া পড়িয়াছে, হেবার দেখিলেন। মাঝিদের নিকট জানিলেন, ঐ জলধারা মাথাভাঙ্গা ইছামতী হইতে নির্গত হইয়াছে। মাথাভাঙ্গা ইছামতী, জালাঙ্গী নদীর নিকট হইতে বড়গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া সুন্দরবনের মধ্য দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। যে জলধারা তাঁহারা দেখিলেন তাহা শিবপুরের মোহানার নিকটে; বিস্তারে ঐ জলধারা ইংলণ্ডের চেস্‌সায়ারের চেষ্টার সহরের পার্শ্ববর্ত্তী ডি (Dee) নদীর মত (অনুমান ৫০০ ফুট); এই নদীতে বর্ষাকালে বেশ বড় বড় নৌকাও যাতায়াত করিতে পারে। ইহাই কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার হ্রস্বতম জলপথ।

শিবপুর মোহানা হইতে এই জলপথে ১৭ই জুন তারিখে বেলা দেড়টায় প্রবেশ করা হইল। ধীর স্রোতে উত্তর উত্তর-পূর্ব্বমুখে (North East by North) বাহিয়া বেলা সাড়ে পাঁচটায়

৪। Ships have always a vessel called feness or pinnace, I, E. The young one of a ship, that serves for the purpose of going ashore (Author's footnote to Siyar-ul Mutakherin. Vol I, P 353)

রাণাঘাটে পৌঁছিলেন। এই অঞ্চল বসতি-বিরল এবং বড় গাছ এই স্থানে বড় কম। রাণাঘাটে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা নদী-তীরে বাংলার কোনও এক রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলেন।[৫] ইহার নাম (Urdun Kali) উগ্রকালী।

১৮ই জুন তারিখে রাণাঘাট ত্যাগ করা হইল। নদীর খাত প্রশস্ততর ও গভীরতর হইতেছে। যাত্রা প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিমমুখী। রেণেলের ম্যাপের সহিত ইহার সামঞ্জস্য ঘটিতেছে না, ইহার একমাত্র কারণ হইতে পারে যে রেণেলের পরে এই নদীর খাতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। দেশ গাছ-গাছড়ায় পূর্ণ, চতুর্দ্দিকে অজস্র নারিকেল গাছ। বেলা সাড়ে পাঁচটায় শিবনিবাসে পৌঁছিলেন। রেণেলের ম্যাপ হইতে ইহার অবস্থিতি এত বিভিন্ন যে, হেবার মনে করিলেন মাঝিরা ভুল করিয়া শিবনিবাসে পৌঁছিয়াছে, বলিতেছে। রেণেলের নক্সা অনুযায়ী ইহা আরও দক্ষিণে ও নদীর অপর পারে অবস্থিত।

ইহার পরে হেবার শিবনিবাসের ভগ্ন প্রাসাদাদি ও মন্দিরগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কোনটি কনওয়ে দুর্গের মত, কোনটি ক্রেমলিন রাজপ্রাসাদের মত এবং কোনটি বা রোমান সম্রাটের প্রাসাদের মত। এই সকল প্রাসাদ ও নগরী দেওয়ান রঘুনন্দনের পরিকল্পিত।

হেবার ১৯এ জুন তারিখে শিবনিবাস ছাড়িলেন, ক্রমে (Kishenpol) কৃষ্ণপুর বা কৃষ্ণগঞ্জে আসিলেন। নদী এ স্থল হইতে অনেক বেশী চওড়া (মাথাভাঙ্গা নদী), নদীকূল বালুপূর্ণ এবং দুই পার্শ্ব সুদীর্ঘ উলু ও হোগলায় আবৃত (Silky Rushes) নদীর গতি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে। এইরূপে ২০এ জুন তিনি কদমপুরে পৌঁছিলেন। কদমপুরে ১০।১২ সের রুই মাছ বারো আনায় কিনিলেন। ২১এ তারিখে বনিবারিয়া, ২৪এ তিতিবারিয়া, ২৬এ মাতাকুলি ও তিনিবারিয়া হইয়া চন্দনা নদীর পথে ২৯এ তারিখে বড়গঙ্গায় পড়িলেন। মাঝে পথ ভুল করায় পথে দু-একদিন নষ্ট হইল। ইহা হইতে দেখা যায়, কৃষ্ণগঞ্জ ছাড়িয়া মাথাভাঙ্গা, কুমার ও চন্দনা নদীপথে পাংশা গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মায় পড়িলেন। তথা হইতে বড়গঙ্গা বাহিয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন।

হেবারের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শিবনিবাসের অবস্থিতি রেণেলের ম্যাপের সহিত মেলে না। ইহা নদীর ভিন্ন পারে অবস্থিত। বর্ত্তমান মানচিত্রে ও রেণেলের মানচিত্রে শিবনিবাস চূর্ণী নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, হেবার দেখিলেন ইহা জলধারার উত্তর দিকে। শিবনিবাসের সুজন মুস্তাফি অঙ্কিত নক্সা হইতে দেখা যায়, এই নগরীর চতুর্দ্দিকেই জলধারা, উত্তর ও পশ্চিম দিকে চূর্ণী নদী এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে কঙ্কণা হেবার শিবনিবাসের নিকট কঙ্কণার খাত দিয়া যাইতেছিলেন বলিয়া শিবনিবাস জলধারার উত্তরে দৃষ্ট হইয়াছিল। অর্থাৎ ঐ সময়ে কঙ্কণার খাতই প্রবলতর ছিল। এখন কঙ্কণা শুষ্কপ্রায়।

কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হাঁসখালি পর্য্যন্ত ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে খোদিত ক্ষুদ্র খাল, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কিরূপ প্রশস্ততর ও গভীরতর হইয়া ১৬ দাঁড়ের নৌকা পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিত তাহা পাদ্রী হেবারের বিবরণীতে বুঝা যায়। রঘুনন্দন মাত্র ছয় মাইল পথ সামান্য খনন করিয়া, মাথাভাঙ্গা ইছামতীর অবরুদ্ধ রুদ্র শক্তিতে কাজে লাগাইয়া, নদীয়ার নব রাজধানীর কি অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন তাহা কথায় বলা যায় না। ইহাতে যে নূতন নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেবলমাত্র সুদৃঢ় হইয়াছিল তাহা নহে, এক দিকে ঢাকা ও অন্য দিকে কলিকাতা এই দুই বাণিজ্যপ্রধান নগরীর সহিত জলপথে শিবনিবাসের সংযোগ স্থাপন করিয়া তিনি নদীয়ার নূতন রাজধানীর বাণিজ্যের ও সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

স্বল্প আয়াসে, স্বল্পতম ব্যয়ে, তদানীন্তন নদীয়ার শুষ্কতর অংশে জলধারার সাহায্যে জীবনীশক্তি তিনি সঞ্চারিত করিলেন, ভগীরথের মতই অশেষ কল্যাণ বহিয়া আনিলেন।

নদী পরিবহন বিদ্যায় রঘুনন্দনের কৃতিত্ব কম নহে। রঘুনন্দনের সাধনাপূত অঞ্জনা, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গার জলধারার অমৃত সিঞ্চন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া রাজ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল ; আজ সেই ধারা শুষ্কপ্রায়, নদীয়াও তৎকারণে মৃতপ্রায়। নূতন কোনও ভগীরথ আসিয়া, রঘুনন্দনের স্থান অধিকার করিবে কি না বলা যায় না, করিলেও তাঁহার মত লোক-চক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে, ঢাক-ঢোল না বাজাইয়া এতটা কল্যাণ করিতে পারিবে কি না কে জানে ?

নদীয়ার কৃষকগণ রঘুনন্দনের কথা স্মরণ করিয়া এখনও গ্রামে গ্রামে গাহিয়া থাকে—

'শিবনিবাসী, তুল্য কাশী, ধন্য নদী কঙ্কণা।
উপরে বাজে দেবঘড়ি, নীচে বাজে ঠনঠনা।
আ রে রঘুনন্দন।'

৫। এই ভগ্ন রাজপ্রাসাদ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক হরধামে [illegible]ম্মিত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রাণাঘাটের দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে [illegible]ী নদীর উভয় তীরে হরধাম ও আনন্দধাম নামে দুইটি গ্রাম পত্তন [illegible]রেন। হরধামের প্রাসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নির্ম্মাণ করান। ইহা [illegible]তিশয় বৃহৎ ও পরম সুদৃশ্য ছিল (নদীয়া কাহিনী ৩০৬)। [illegible]াগীরথী তীরবর্ত্তী সুখ-সাগর নামক স্থানে যে উগ্রচণ্ডী নামে [illegible]ীমূর্ত্তি বিরাজিতা ছিলেন, তাহা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। [illegible]খ-সাগর গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হওয়ায় বিগ্রহমূর্ত্তি হরধামে আনীত [illegible]ইয়া চিন্ময়ী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরেই রক্ষিত হইয়াছেন। হেবার [illegible] উগ্রচণ্ডী নামক কালীমূর্ত্তির নামে ঐ স্থানের নাম উগ্রকালী [illegible] লইয়াছেন (নদীয়া কাহিনী ৩০৮), তাহাই অপভ্রংশে [illegible]dun Kali হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান। * * * আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই ত তা ধুয়ে-মুছে তাকে কোলে তুলে নিতে হবে। * * * আমার মত মা পেয়েও কি তোমার মায়ের দুঃখ রইল ?

—শ্রীশ্রীমা

শক্তির কণিকা

কৃষ্ণলাল সান্যাল

মনীষী আইনষ্টাইনের বিশ্ববিশ্রুত আপেক্ষিকবাদ (Theory of Relativity) প্রকাশিত হওয়ায় পদার্থবিদ্যা এবং অন্য বহু বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণায় এমন কি, বিজ্ঞান-দর্শনেও বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আইনষ্টাইনের তুল্য অন্য এক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্লাঙ্কও ১৯০০ সালে পদার্থবিদ্যার অন্য এক ক্ষেত্রে অভিনব চিন্তাধারার সূচনা করিয়াছেন।

জড়পদার্থ হইতে তাপ বিকিরণের প্রণালী অনুধাবন কালে তিনি চিন্তারাজ্যের এই নূতন পথের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্তী পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, তাপ বিকিরণ কালে সর্ব্বব্যাপী ঈথরসমুদ্রে আলোকতরঙ্গ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ তরঙ্গ-সমূহ উৎপন্ন হয়। এ সকল দীর্ঘতরঙ্গের প্রতি সেকেণ্ডে স্পন্দন-সংখ্যা আলোক-তরঙ্গের স্পন্দন অপেক্ষা অনেক কম। এরূপ দীর্ঘতরঙ্গের আঘাতে চোখের স্নায়ুতে উত্তেজনা হয় না, সুতরাং ইহাদের দ্বারা দৃষ্টির সহায়তা হয় না। উত্তাপের সকল তরঙ্গগুলিও একই রূপ দৈর্ঘ্যের নহে, কারণ পদার্থের পরমাণুবীণায় মাত্র একটি সুর ঝঙ্কৃত হয় না। সমকালে বিকীর্ণ তাপ বহু প্রকার তরঙ্গশ্রেণী পাওয়া যায়, তাহাদের কতকগুলি সুদীর্ঘ। কতক মধ্যমাকার এবং অন্যগুলি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব।

কোন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ অধিক শক্তি বহন করে সঠিক জানা না থাকায় সে বিষয়ের নির্দ্ধারণ ব্যাপারে প্লাঙ্ক মনোনিবেশ করিলেন। "পরিবাহিত তাপের অধিক পরিমাণ কিরূপ তরঙ্গে থাকে?" তাঁহার এই প্রশ্নের সমাধান দুই স্বতন্ত্র পথে করা যাইতে পারিত।

বহু প্রকার পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন তরঙ্গপুঞ্জে শক্তি বার বার পরিমাপ করিয়া তাহার পরিমাণ কোথায় বেশী, তাহা এই ভাবে সোজাসুজি নির্ণয় করা যাইতে পারে। অথবা সিদ্ধান্ত-গণিতের জটিল সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া শুধু মানসিক পরিশ্রম দ্বারাও ইহার হিসাব করা চলিতে পারে।

বার বার চেষ্টা করিয়া প্লাঙ্ক দেখিলেন, এই দুই ভাবে লব্ধ ফলের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য হইতেছে না বরং তাহাদের নির্দ্দেশগুলি সম্পূর্ণ বিরোধী।

গতিবিজ্ঞানের যে সব সূত্র তিনি ব্যবহার করিতেছিলেন, সে দিনের পণ্ডিতেরা সেগুলিকে নির্ভুল মনে করিয়া বহু তথ্য নিরূপণ কালে তাহাদের প্রয়োগ করিয়া সন্তোষ জনক ফল পাইতেছিলেন। অন্য দিকে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পদ্ধতিতে বহু বিতর্কেও কোন ত্রুটি পাওয়া গেল না এবং প্রত্যেক বার পরীক্ষাতে একই রূপ ফল মিলিতে লাগিল। সুতরাং প্লাঙ্ক স্থির করিলেন যে, ইহা মূল তত্ত্বগত বিরোধ এবং ইহার জটিলতা দূর করিবার জন্য তিনি এক নূতন সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলেন।

তিনি স্থির করিলেন যে, তাপ বিকিরণে শক্তিবহ তরঙ্গশ্রেণী কদাপি এক অবিচ্ছিন্ন নিয়ত ধারায় বিনির্গত ও প্রবাহিত হয় না। অনিয়ত বা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঝাঁক-ঝাঁক তরঙ্গে এক একবারে ক্ষুদ্রতম নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় যেন একটি করিয়া শক্তিকণ বা guantaরূপে ইহার বিকিরণ চলিতেছে। এই সিদ্ধান্ত হইতে ক্রমিক অগ্রসর হইলে গণিতের যে সকল সূত্র পাওয়া যায়, সেগুলি নূতন হিসাবে প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল যে, সরাসরি পরীক্ষা হইতে লব্ধ ফলের সহিত বিরোধ প্রায় মিটিয়া গিয়াছে।

তাঁহার নূতন মতকে তখনকার পণ্ডিতেরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। শক্তির এইরূপ অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণিকাবাদ গতিবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী। সে জন্য প্লাঙ্কের মতকে সমালোচনা, বিরোধ ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছে। অথচ ইহাতে সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী ভাবে সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষামূলক জ্ঞানের যোগসূত্র দেখাইয়া দিতেছে।

প্রথম প্রচারের সময় প্লাঙ্ক নিজেও শক্তির পরমাণুবাদের (atomic constitution of energy) উপর বেশী জোর দেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল যে, পদার্থের আণবিক গঠনে এমন কিছু বৈচিত্র্য আছে যাহাতে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন পুঞ্জ পুঞ্জ তরঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে শক্তিক্ষেপণ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সে অবস্থায় কেহ উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে, শক্তির কণবাদে সিদ্ধান্তের ফলে চিন্তারাজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনিবে এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের দর্শন রচনা করা আর চলিবে না। প্লাঙ্কের পর আইনষ্টাইন বলিলেন, "শক্তি প্রকৃতই পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাপুঞ্জে বিভক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে।" এই ভাবে ধারণাটি অভিনব ও বিস্ময়কর হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের স্বতঃই ধারণা হয় যে, দেশ, কাল, দ্রুতি (spud) প্রভৃতির ন্যায় শক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন, তাহার প্রবাহ নিরবকাশ। যথেচ্ছ বা অতি সূক্ষ্ম ভাবে ইহাদের বৃদ্ধি বা হ্রাসের কল্পনা করিতে মনে কোন বাধা হয় না। এখন হইতে ইহাদের প্রত্যেকটিকে কণ বিভক্তরূপে ধারণ করিতে হইবে, এইরূপ পূর্ব্বাভাস পাওয়া গেল।

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি"

কালের অগ্রগতি হয়ত এক এক স্পন্দনে 'কলা' বা 'কাষ্ঠার' পরিমাণ বা আরও সূক্ষ্ম ভাবে চলিতেছে। দেশকেও এই ভাবে বিন্দুপুঞ্জে বিভক্ত কল্পনা করা যাইতে পারে, বিন্দুগুলির মধ্যে অবকাশ থাকিবেই। গণিতের যুক্তি-তর্কে এ সকল ধারণার স্থান হইলেও আমাদের সহজবোধ ও অনুভূতি ইহার বিরোধী। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানবিদ্‌রা অনুভূতি, সহজবোধ ও আমাদের কল্পনাশক্তির উপর আস্থা রাখেন না।

অপরিবাহক বস্তুতে তড়িৎ-সঞ্চারের সময় বস্তুর উপরিভাগে যেন তরল কিছু পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এরূপ ধারণা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে বলা হয় যে, উহার পৃষ্ঠে তড়িৎ-কণ সমূহ আবির্ভূত হইয়াছে ও তাহাদের সমষ্টিগত ফল বহিঃক্ষেত্রে প্রতিভাত হইতেছে। আণবিক গঠন পরিকল্পনা বা কণাদ ঋষির আদিম কণবাদ কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে জড়পদার্থ হইতে তড়িতের ও শক্তির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইয়াছে। নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে থাকায় অনন্যোপায় হইয়াই বৈজ্ঞানিকরা এইরূপ করিয়াছেন। আলোক তড়িৎ বিষয়ে পরীক্ষায় যে সকল তথ্য পাওয়া গেল, সেগুলিকে শক্তির পরিব্যাপ্তি বিষয়ে প্রচলিত নিয়মে ব্যাখ্যা করা অতিশয় দুরূহ সমস্যা হইয়া উঠিল। এইরূপ অসুবিধায় সেখানে কণবাদ মানিতে হইল।

কয়েকটি বিশেষ বস্তুর উপর আলোকের রশ্মিপাত হইলে তাহাদের পৃষ্ঠ হইতে তড়িৎকণ বা ইলেকট্রন (electton) বিনির্গত হয়। তড়িৎকণগুলির নির্গমন গতিবেগ বস্তুর উপর

আদৌ নির্ভর করে না। অতি তীব্র ও একত্র সমাহৃত রশ্মি ব্যবহার করিলে বস্তু হইতে বিনির্গত তড়িৎ-কণগুলির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাহাদের গতিবেগ পরিবর্তিত না হইয়া ঠিক পূর্ব্বের মতই থাকে। এদিকে লোহিত প্রভৃতি বর্ণের স্থলে নীলবর্ণের আলোক ব্যবহারে—অর্থাৎ হ্রস্ব আলোক-তরঙ্গ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎকণের গতিবেগ প্রভৃত বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার সময় আলোকের বর্ণ একইরূপ নীল রাখিয়া তাহার তীব্রতা যতই হ্রাস করা হউক, তড়িৎকণগুলি পূর্ব্বের মত বর্দ্ধিত গতিতে চলিতে থাকে। অর্থাৎ ব্যবহৃত আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমানর সঙ্গে তড়িৎ-কণের গতিবেগ বাড়ে কিন্তু রশ্মির তীব্রতার ফলে বেগের পরিবর্তন হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই পরীক্ষাগুলি গতিবিজ্ঞান ও শক্তির ব্যাপ্তি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ও প্রচলিত নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

এই পরীক্ষায় আলোকের পরিবর্ত্তে রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করা যাইতে পারে। রঞ্জনরশ্মিতে ঈথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোক-তরঙ্গের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। রঞ্জনরশ্মি ব্যবহারের ফলে যে সকল তড়িৎ-কণ নির্গত হয় সেগুলিও উল্লিখিত নিয়মে অতিবেগে ধাবিত হয়।

কোন দ্রুতগতি তড়িৎ-কণের দ্রুতি (spud) হঠাৎ ব্যাহত হইলে, বাধাপ্রাপ্তির স্থানে রঞ্জনরশ্মির উদ্ভব হয়। ইহা পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষার ঠিক বিপরীত ক্রিয়া। রঞ্জনরশ্মি উৎপাদনের জন্য কোন অবাত নলের এক প্রান্ত হইতে তড়িৎ-কণপুঞ্জকে সবেগে নিক্ষেপ করা এবং নলের অপর প্রান্তে তাহাদের গতিরোধ করা হয়। রুদ্ধগতি তড়িৎ-কণ হইতে রঞ্জনরশ্মি উৎপন্ন হইয়া সংস্পর্শ বিন্দুর চতুর্দ্দিকে গোলকাকারের ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গরূপে বিস্তৃত হইতে থাকে। গতিবিজ্ঞানের নিয়ম এই যে, তরঙ্গের বিস্তৃতির সময় শক্তির পরিমাণ ক্রমশঃ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বণ্টন হওয়ায় ইহার উপরে প্রতি বর্গ এককে শক্তির মাত্রা কমিতে থাকে এবং তরঙ্গটি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়। অথচ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কতক দূর বিস্তারের পর রঞ্জনরশ্মি-তরঙ্গ পূর্ব্বের নিয়মে যত ক্ষীণই হউক না কেন, তাহার এক ভাগ অন্য একটি বস্তুর—বিশেষতঃ ধাতু ফলকের উপর পতিত হইলে সে স্থানে যে তড়িৎ-কণগুলি বিচ্যুত হয় তাহারা ঐ রঞ্জনরশ্মির উৎপাদক তড়িৎ-কণের সমবেগে ধাবিত হইতে থাকে। পূর্ব্বতন বিজ্ঞানবিদের নিকট যেরূপ ঘটনা অলীক ও অবিশ্বাস্য বোধ হইবে পরীক্ষায় সেইরূপ অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর ফল পাওয়া গেল।

রঞ্জনরশ্মি বিষয়ে গবেষক স্যর উইলিয়ম্ ব্র্যাগ লিখিয়াছেন—"কেহ যদি বলে কোন এক শত ফুট উচ্চ মিনার হইতে সাগরের ভিতর একখানি কাঠের তক্তা ফেলিয়া দেওয়ায় জলে যে তরঙ্গমালা দেখা দিল, সেগুলি হাজার মাইল দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অবশেষে অপরিমেয় ক্ষুদ্রাবস্থায় পৌঁছানর পর অন্য এক জাহাজে এমন আঘাত করিল যে, তাহার একখানি তক্তা স্থানচ্যুত হইয়া শত ফুট উচ্চে উৎক্ষিপ্ত হইল। তাহার উদ্ভট কাহিনী বাস্তবে সম্ভবপর না হওয়ায় সকলেই অলীক ও অবিশ্বাস্য বলিবেন।" অথচ রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষাটি ঠিক এইরূপ।

শক্তি নিত্য, ইহার উদ্ভব ও নাশ হয় না। রঞ্জনরশ্মির প্রতি ঈথর-তরঙ্গে উৎপত্তি কালে যে পরিমাণ শক্তি ছিল তাহারও বৃদ্ধি সম্ভব নয়। হাওয়াভরা বেলুনের ব্যাস দ্বিগুণ করিলে তাহার উপরের পরিসর চারিগুণ হয় এবং রঙিন লেখাগুলি সেই অনুপাতে ফিকা হইয়া যায়। বিস্তৃতির ফলে গোলকাকার তরঙ্গের পৃষ্ঠদেশের পরিসর ক্রমশঃ বাড়িলে হিন্দোল জনিত শক্তিও সেই ভাবে কমিতে থাকিবে। শক্তির ক্রমবিভাগ বিষয়ে এ সকল নিয়ম বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অপরিহার্য্য।

প্রথমে কতকগুলি স্বীকার্য্য মানিয়া লইয়া জ্যামিতির আরম্ভ হয়। রঞ্জনরশ্মির ক্ষেত্রে যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, অবাত নলের ভিতরে ধাবমান তড়িৎকণের গতিরোধ হইবার মুহূর্ত্তে সে শক্তির একটি কণিকা বন্দুকের ছররার মত করিয়া নিক্ষেপ করিতেছে, আর সেই কণিকাটি ধাতুফলক পর্য্যন্ত অভগ্ন অবস্থায় পৌঁছিতেছে, তাহা হইলে শক্তির ক্রমাবস্তৃতি নিয়মের শাসন আর থাকে না এবং অসঙ্গতি দোষের কথা আসে না। সুতরাং প্লাঙ্কের শক্তি-কণবাদ স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু আলোক সম্বন্ধে ঈথরতরঙ্গবাদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় নিউটন যুগের জ্যোতিঃ-কণিকাবাদে (conpuscular theory of lighr) ফিরিয়া যাওয়ায় বহু বাধা-বিঘ্ন আছে। আলোক বিষয়ে এমন অনেক সুপ্রমাণিত তথ্য আছে, যাহা জ্যোতিঃকণিকা-বাদে ব্যাখ্যা করা যায় না। সে সব ক্ষেত্রে তরঙ্গবাদ না মানিয়া উপায় নাই।

তরঙ্গরূপে শক্তি সর্ব্বদা ব্যাপ্তি-প্রয়াসী, সুতরাং অনন্ত বিভাজন-সাপেক্ষ। শক্তিকণ বা শক্তিপরমাণু (quente) রূপে ইহা ক্ষুদ্রতম অংশে সমাহৃত এবং অবিভাজ্য। দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানকেও স্ববিরোধী এই দুই সিদ্ধান্তের সমন্বয় করিতে হইয়াছে।

কাছের মানুষ শঙ্কর-দম্পতী

ডালি বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনলুম কুলটীতে উদয়শঙ্কর আসছেন। অনেক দিন আগে বার দুই ওঁদের অপূর্ব্ব নৃত্য দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলুম, আবার এখানে দেখতে পাবো এই ভেবে মনটা খুসী হয়ে উঠল খুব।

একদিন স্বামী এসে বললেন—তিন দিনের জন্য শঙ্কর দম্পতী আমাদেরই অতিথি হচ্ছেন। জগৎবিখ্যাত শিল্পী-যুগলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ পাবো, এই ভেবে আনন্দও যেমন অপরিসীম হ'ল—সেই সঙ্গে মনে একটু অস্বস্তি বা কেমন একটু আশঙ্কাও অনুভব করলুম এই ভেবে যে, কি জানি, বিশ্ব-বন্দিত লোক তাঁরা, তাঁদের যথাযোগ্য আদর-যত্ন করতে পারব কি? শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য হয়তো তাঁরাও কত অসুবিধায় পড়বেন। যাই হোক—আনন্দ-উদ্বেগে চঞ্চল মন নিয়ে প্রতীক্ষিত দিনটির অপেক্ষায় রইলুম।

১৮ই জুন আমার স্বামী চিত্তরঞ্জনে শঙ্কর-দম্পতীকে আনতে গেলেন। গাড়ী এসেছে শুনে ওঁরা বাইরে বলে পাঠালেন একটু অপেক্ষা করতে, তখন জানতেন না যে ইনিই গাড়ী ড্রাইভ করে নিয়ে গেছেন। তার পর যখন গাড়ীতে উঠে আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হ'ল তখন ওঁরা দুজনেই খুব লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

শঙ্কর-দম্পতীর সঙ্গে তাঁদের ছেলে 'আনন্দ' আর একটি পোষ্য ছেলেই বলতে হ'বে—'নানা' এলো। অমলা নেমেই বললেন—'ভারী সুন্দর জায়গায় আপনার বাড়ীটি তো!'

আমাদের বাড়ীটি একেবারে শেষ প্রান্তে। বারান্দায় দাঁড়ালে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়—কোথাও বাধা না পেয়ে। একেবারে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে।

যাই হোক, একেবারে খাবার টেবিলে বসে আলাপ চলে। ইচ্ছে ছিল সকলের খাবার পর আমি খেতে বসবো, কিন্তু উদয়শঙ্কর বললেন—'তা হবে না, এক সঙ্গেই বসতে হ'বে।' তাই বাধ্য হয়ে আমিও বসলুম। শুক্তো, শাকের ঘন্ট দেখে ওঁরা দু'জনেই খুব খুসী হলেন। শঙ্কর বলছিলেন—'যেখানেই যাচ্ছি মাংস-পোলাও খেতে খেতে মুখের স্বাদ খারাপ হয়ে গেছলো।'

ওঁরা যে এত সহজ সরল লোক, আমরা আগে তা কল্পনাও করতে পারিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে গেলুম যে ওঁরা আমাদের সম্মানিত, বিশিষ্ট অতিথি মনে হল যেন কত দিনের পরিচিত বন্ধু তাঁরা!

খাওয়ার পর উদয়শঙ্কর গেলেন বিশ্রাম করতে, অমলা বারান্দায় এসে আমাদের সঙ্গে ঘরোয়া গল্পে যোগ দিলেন। বললেন—'আমার বেশ ইচ্ছে করে কিছু দিন সংসার করি। কাল কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে রান্না করবো। বিয়ের আগে রান্না জিনিসটা মোটে ভাল লাগত না। এখন সময় পাই না বলেই বোধ হয় অতো ভাল লাগে। নাচের পর লোকে যখন বিশ্রাম করে, আমার মনে হয় রান্না করি। যখন প্যারিসে ছিলুম—তখন আমার শাশুড়ী বলতেন অমলা রান্না শেখ, দেখবি পরে অনেক আনন্দ পাবি এতে, তিনি অবশ্য আমার বিয়ে দেখে যাননি।······আমরা যখন মাদ্রাজে থাকি তখন প্রতি পূর্ণিমায় মহাবলীপুরমে চলে যাই। সেখানে গিয়ে নিজে বেশ রান্না-বান্না করি, সঙ্গে গ্রামোফোন থাকে, সারা রাত সেখানে কাটিয়ে পরদিন বাড়ী ফিরি—।

সত্যি কি সুন্দর এঁদের জীবন! শুধু অপরূপ নৃত্যশিল্পে বাইরের জগৎকে আনন্দ দান করেন তা নয়, নিজেদের সহস্র কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও মনের আনন্দটুকু পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখেছেন। সাধারণতঃ গুণীদের সাংসারিক জীবন সার্থক হ'তে দেখা যায় না বহু ক্ষেত্রে, কিন্তু ক'দিনের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কর-দম্পতীর পারিবারিক জীবনের যে মধুরতার পরিচয় পেলুম তাতে নিঃসংশয়ে বুঝেছি—এঁরা শুধু কলা-শিল্পী নন—সার্থক জীবনশিল্পীও।

আমাদের বাড়ীতে অনেক মুরগী আছে। 'নানা', 'আনন্দ' এবং আমার চার বছরের ছোট মেয়ে টুলটু সারা দুপুর মুরগীর ছানাদের পেছন পেছন ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে। আনন্দ খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু মা-বাবার মত ওর নাচে রুচি নেই।—সেটি আছে 'নানা'র, নাচ, গান ও নকল দেখানোয় খুব ওস্তাদ। বয়স অন্দাজ সাত বছর, আনন্দের দশ।

—ঐ দিন বিকেলে অমলা বললেন, 'আপনারা শো'তে আসছেন তো?'

আমাদের আগামী কালের টিকিট আছে শুনে বললেন, 'তাহলে তো আমাদেরও যাবার পয়সা দিতে হয়।' হাসতে হাসতে বলি—'টিকিটের সঙ্গে আর আপনাদের সম্পর্ক কিসের?'

—অমলা ছাড়লেন না—বললেন—'চলুন না আজও, দুদিন দেখলেও খুব বেশী খারাপ লাগবে না।' অগত্যা তা-ই হল।

পরদিন শনিবার প্রথম শো শেস হতে আমরা আনন্দ ও নানাকে নিয়ে বাড়ী চলে এলুম, পথে আনন্দ কারখানার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করছিল, ছেলেটির সব বিষয়ে জানবার বিশেষ আগ্রহ। ছেলে দুটিরই ভারী সুন্দর স্বভাব। ভদ্রতায় মা, বাবারই মতন। ওদের আগে খেতে বসালুম, আমার মেয়েরা কি কারণে দেরী করছিল, আনন্দকে খেতে বলা সত্ত্বেও খেলে না, বললে—'ওরা আসুক তার পর খাবো।' সাধারণতঃ ঐ বয়সের ছেলেদের মধ্যে এ জিনিসটা বড় একটা দেখা যায় না।

সেদিন দ্বিতীয় নাচ শেষ হতে তল্পী-তল্পা গুটিয়ে আসতে উদয়শঙ্করদের অনেক রাত হল—পৌনে একটা। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা খেয়ে নিয়েছেন তো?' বললুম—'সে কি করে হয়, আপনাদের না খাইয়ে খেতে পারি কি?'

—দুজনে তো মহা অপ্রতিভ হয়ে বার বার বলতে লাগলেন, 'ছি, ছি, এত রাত অবধি না খেয়ে বসে আছেন আমাদের জন্য? ভারী খারাপ লাগছে।' যাই হোক, খেতে খেতে অনেক আলোচনা হল,—আমি কথায় কথায় অমলাকে জিজ্ঞেস করছিলুম—ছ্যাঁচড়া খেতে ভালবাসেন কি না। অমলা কিছু বলার আগেই উদয়শঙ্কর বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, ও ছ্যাঁচড়া খুব ভালবাসে।' বলেই নিজেকে দেখালেন—'এই যে এক ছ্যাঁচড়া।' সবাই খুব হেসে উঠলুম, অমলা বললেন—'তা ঠিক, অনেক সাগর সেঁচলে তবে এমন ছ্যাঁচড়া পাওয়া যায়।'—

একটা জিনিস বেশ মজা লাগল—(শঙ্কর-দম্পতী ক্ষমা করবেন) উদয়শঙ্কর অমলাকে 'তুই' বলেন, আর অমলা তাকে—'আপনি'। প্রথম দিনেই শঙ্কর বলেছিলেন—'কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু ওকে 'তুই' বলি। সেই ওর ছোট্ট বেলায় বলে অভ্যেস হয়ে গেছে,

আর ছাড়তে পারিনি, প্যারিসে প্রথম দেখি একটি ছোট ১১ বছরের কালো মেয়ে।' আমার মা ওকে দেখেই ভালবেসে ফেললেন। আমি 'আপনি' বলেই কথা বলছি, শুনে মা বললেন, ও কি রে, ঐটুকু মেয়েকে আবার 'আপনি' বলছিস্ কি?" সেই থেকে একেবারে 'তুই।'

অমলা হেসে বললেন 'উনিও 'তুই' বলা ছাড়তে পারেন নি, আমিও "আপনি" ছাড়তে পারলুম না।'

মিঃ শঙ্কর আবার মাছ বেছে খেতে পারেন না! বিশেষ করে ইলিশ। মাছের কাঁটা অমলাকেই বাছতে হয়। হাসতে হাসতে উদয়শঙ্কর বললেন—'আমি বিয়ের আগে ওকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলুম—খুকী, তুমি মাছের কাঁটা বেছে দিতে পারবে তো?' তাই শুনে অমলা কপট কোপে বললেন—'আহা, কি ভাগ্যি বলেন নি যে খুকী তুমি নাচতে জানো কি?' হাসি-কৌতুকে সে রাতটি আমাদের বেশ কেটেছিল। টেবিল ছেড়ে যখন উঠলুম তখন রাত প্রায় ২॥০ টে।

পরদিন রবিবার—ভোর থেকে দলে দলে লোক আসতে সুরু করল, তখনও ওঁরা বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। সকলের হাতে একটি অটোগ্রাফের খাতা। বেলা ১২॥ টা পর্য্যন্ত লোক-জনের আসা-যাওয়া এবং ছবি তোলার পালা চলল। দুপুরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সারা দিন বাইরের বারান্দায় বসে কত গান, গল্প হ'ল, অমলার গলাটি ভারী মিষ্টি!

এবারে বিদায়ের পালা। আমরা ওঁদের বার্ণপুরে পৌঁছে দিয়ে আসব। গাড়ীর কাছে আমাদের পরিচারক সন্তোষ এসে দাঁড়িয়েছে—উদয়শঙ্কর তাকেও 'আপনি' বলে সম্বোধন করে নমস্কার জানালেন,—একজন মহাসম্মানিত অতিথির কাছে এই আশাতীত ব্যবহার পেয়ে সে একেবারে হতবাক্।

বার্ণপুরের কারখানা দেখবার সময় আমার ছোট মেয়ে টুলটু পড়ে গেল, আমি ধরবার আগেই উদয়শঙ্কর ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন। আমার মুখে কথা সরল না—শুধু মুগ্ধ-বিস্ময়ে ভাবলুম—জগতের সমস্ত কলারসিক যাঁকে গুণমুগ্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয় এই কি সেই বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতিমান উদয়শঙ্কর? তাঁদের রেখে ফেরবার সময় যখন সকলে গাড়ীর কাছে সমবেত হ'য়েছি—মিসেস্ শঙ্কর আমার স্বামীকে বললেন—'গাড়ীর কেরিয়ারটা খুলুন তো, আমার কয়েকটা জিনিস রয়ে গেছে।' ইনি তাড়াতাড়ি কেরিয়ার খুলতেই মিসেস্ শঙ্করের ভাই মিঃ অশোক এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম ও দুটি অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল তার মধ্যে ভরে দিলেন।

ব্যাপারটা এতই চকিতে ঘটলো যে, আমরা বাধা দেবারও অবকাশ পেলুম না। যেন হতবাক্ হয়ে গেলুম। নীরবতা কাটিয়ে আমার স্বামী বললেন—'এতক্ষণ আমাদের কিছুই মনে হয়নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনি formality করলেন।'

মিঃ শঙ্কর জিভ কেটে বললেন—'ছিঃ, ছিঃ, আপনি তা মনেও ভাববেন না। আমি বাচ্ছাদের জন্যে দিয়েছি।'

বাড়ী ফিরে এলুম,—সব যেন খাঁ-খাঁ করছে। মনটা হু-হু করে উঠল। খুব নিকটাত্মীয় এসে চলে গেলে যেমন হয় ঠিক সেই রকম একটা বিচ্ছেদ-ব্যথা।

পরের দিন ফটোগুলো আসতে, আমরা ওঁদের দেবার জন্য আবার বিকেলে বার্ণপুর গেলুম। মিসেস্ শঙ্কর ছুটে এলেন, বললেন—'কি আশ্চর্য্য, আমার মন বলছিল আবার দেখা হ'বেই। একটু আগে আপনাদের কথাই বলাবলি করছিলুম আমরা।' সেদিন উদয়শঙ্করের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করার সুযোগ হল, কুলটীতে অবিরাম লোক আসার জন্যে এটা বিশেষ হ'তো না। স্বামী বললেন—'আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলুম আপনারা হয়তো বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন।'

উদয়শঙ্কর বললেন—'আমি বেশী বেরোতে ভালবাসি না। ঘরে থাকতেই ভাল লাগে বেশী। বিশেষ করে আমার ছেলেটি ও বৌটি যেখানে থাকে সেইখানেই আমার স্বর্গ মনে হয়। তা মাঠেই হোক আর ঘাটেই হোক। অনেকে আছেন ষ্টেজে এসে দাঁড়ান অভিনয়ের পরে—নিজের বিশিষ্টতা আরো প্রকাশ করার জন্য। এ জিনিষটা কিন্তু আমার একেবারে আসে না। নিরিবিলি চুপচাপ থাকতেই বেশী পছন্দ করি।'

আরও নানা বিষয়ে আলোচনা হ'ল। উদয়শঙ্কর দুঃখ করছিলেন—উনি যা চেয়েছিলেন তা হ'ল না। আলমোড়ায় বহু টাকা ব্যয় করে কলাকেন্দ্র খুলেছিলেন—কিন্তু তাকে মনের মতন রূপ দিতে পারলেন না। বলছিলেন—'আমাদের বাঙালীরা খাটা জিনিসটা একেবারে ভুলে গেছে। আমাদের পার্টিতে যে ক'টি মাদ্রাজী আছে, তাদের অদ্ভুত খাটবার ক্ষমতা! তা ছাড়া আমেরিকান বা ইউরোপীয়ানদের তো কথাই নেই।'

ফেরবার সময় অমলা বললেন—'চলুন, বর্দ্ধমান যাচ্ছি—আপনাকে নিয়ে যাই, তার পর টানতে টানতে কলকাতা।' হেসে বললুম—'তাইতো, আপনার স্বামী পুত্র সঙ্গে আছেন, তাই নির্ভাবনা, আর আমি সব ফেলে যাই কি করে?'—উদয়শঙ্কর বললেন—'আপনাদের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে ভারী খুসী হয়েছি। আমার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভগবানকে জানাচ্ছি তিনি আপনাদের সুখে রাখুন, মঙ্গল করুন।' আমার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। ও পথ দিয়ে যদি কখনো যাই, নিশ্চয়ই দেখা করব।' ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিয়ে এলুম।

অমলাশঙ্কর ও লেখিকা

ওঁরা বার্ণপুর থেকে চলে যাবার পর,—হঠাৎ এক জরুরী তার এসে হাজির।—ভয়ে ভয়ে খুলে দেখা গেল মিঃ শঙ্কর আমাদের শুভ ইচ্ছা জানিয়েছেন—আমাদের আতিথেয়তা চিরদিন মনে থাকবে লিখেছেন।

আমরা বাস্তবিক অভিভূত হয়ে পড়লুম। কলকাতায় ফিরে গিয়েও যে আমাদের মনে রাখবেন তা ভাবতে পারিনি। ভদ্রতার তো তুলনাই নেই—কিন্তু অত নাম-যশের সিংহাসনে থেকেও এত সহৃদয়তা এত আন্তরিক সরলতা—এই আত্ম-সর্বস্বতার যুগে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

ওঁদের মধুর আন্তরিকতার গল্প হ'লে কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন—'সারা দুনিয়ায় ওঁরা কত লোকের সঙ্গে মেশেন, এরকম ব্যবহার অভ্যাস হয়ে গেছে।—তা বলে কি আর ফিরে যাবার পর এ সব মনে থাকবে ?'

কিন্তু আমি কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে পারিনি, এত সহজ সুন্দর অন্তরঙ্গ ব্যবহার যে বাহ্যিক, তা কখনো হতে পারে না।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একদিন দুপুরে সেলাই করতে বসেছি—এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা। দরজা খুলেই যাঁদের দেখলুম—তাঁরা আমার বহু-বাঞ্ছিত অতিথি উদয়-দম্পতী।

আমি আনন্দে আর বিস্ময়ে প্রথমটা কথা বলতে পারিনি। শঙ্কর বললেন 'আপনাদের কথা দিয়েছিলুম যে যদি কখনো এই পথ দিয়ে যাই তাহ'লে নিশ্চয়ই দেখা করে যাবো। দেখুন সেই কথা রাখতে এলুম।'

মুখে অনেকেই অনেক কথা বলেন, কিন্তু কাজে প্রমাণ করা অধিকাংশ স্থলেই হ'য়ে ওঠে না, বিশেষতঃ এঁদের মত সদা কর্ম্ম-ব্যস্ত লোকের পক্ষে। এঁদের অনন্যসাধারণ চরিত্রের প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে,—কুলটীতে দু'দিন পর [illegible] প্রদর্শনীর পর রবিবার সকালে অবিশ্রাম জনসমাগমের [illegible] অমলা ক্লান্ত শরীরে বিশ্রাম করছিলেন ঘরের মধ্যে, [illegible] আবার এক দল দেখা করতে এসেছেন। খবর দেওয়া[illegible] অমলার দেরী দেখে উদয়শঙ্কর নিজে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে[illegible] বললেন—'ওঁরা সব আলাপ করতে এসেছেন—একদিন না হয় একটু কমই হ'বে। ইচ্ছে করলেই তো এড়িয়ে যেতে পার[illegible] কিন্তু সেটা এঁদের ভদ্রতা ও হৃদয়বত্তায় বাধলো।' প্রায় আ[illegible] ঘণ্টা অমলা হাসিমুখে আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করলেন তার পর[illegible]

যাই হোক,—বাইরে বেরিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড একখানি টুরি[illegible] 'কার্' মাদ্রাজ থেকে টানা মোটরে কলকাতা যাবার প[illegible] আমাদের মনে করে এই একটু বিরতি। উদয়শঙ্কর নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। ওঁরা এত নিঃশব্দে বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকেছেন, আমি জেগে থেকেও টের পাইনি। অন্য কেউ হলে মোটরের হর্ণ বাজিয়ে, পাড়া সচকিত করে তুলতেন নিশ্চয়। এই সুদীর্ঘ যাত্রায় ওঁরা খুব ক্লান্ত ছিলেন, কলকাতায় পৌঁছুনো দরকারও তাড়াতাড়ি, তাই আর বিশেষ উপরোধ করতে পারলুম না থাকবার জন্য।—মাদ্রাজে তাঁদের কাছে যাবার জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

ক'দিনের পরিচয়ে শঙ্কর-দম্পতী আমাদের মনে যে প্রীতি-স্নিগ্ধ আনন্দের ছবিটি এঁকে গেলেন, তা চিরদিনের সম্পদ হ'য়ে রইল আমাদের জীবনে, জীবনে আর কোন দিন তাঁদের মধুর সঙ্গ লাভের লোভও রইল প্রচ্ছন্ন হ'য়ে।

অতসী একটি নদীর নাম

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

অকাল বার্দ্ধক্য ম্লান জরা-নীল জীর্ণা এক নারীর মতন
পড়ে আছে অতসীর জল!

চক্রবাক চক্রবাকী কোয়েল দোয়েল হড়িয়াল
কে জানে কোথায় গেলো চলে!

সোনার বরণী বধূ ভরা কুম্ভ নিয়ে বুঝি আর
এ পথে চলে না বহু কাল।
পাতার বাঁশীর সুরে এ গাঁয়ের কিশোর রাখাল
সেই যে গিয়েছে চলে বেলা শেষ গোধূলীর রাগে
তারপর ঘরে ঘরে শূন্য বুঝি হয়েছে গোহাল!
তুলসী দোপাটী আর ধানের সোঁদাল গন্ধ নিয়ে
জরা-ম্লান রোগীর মতন
এ পথ কোথায় হ'লো লীন!···

শুনেছি কোথায় দূর সমুদ্রে জোয়ার এলো আজ
ভেঙে পড়ে বনেদী পাথার···
এখানে অতসী সেই জোয়ারে চঞ্চল হ'য়ে কবে
আবার সে গান গাবে—আবার যুবতী নারী হ'বে!
কবে সেই নতুন বধূর গীত, রাখালী বাঁশীর সুর
নবান্নের সংগীতে আবার—
গান গাবে গান গাবে অতসী আমার।

শীরি ও ফরিয়াদ

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরিয়াদের কথা ও প্রেম-পত্র

কত ভালোই বাস্‌ত শীরি তাহার ফরিয়াদে,
ঐ দেখ না, ঝবুকা ভেঙ্গে পড়ে গো তার কাঁধে।
বলে—"মোরে ধরো, ধরো, নইলে গেলাম মারা,
বন্দিনী করেছে মোরে দুরন্ত পাহারা।"
ডিগ্‌বাজী খায় পাগলী বালা, লুফিয়া লয় প্রেমিক।
মুঠায় যেন ফিরে পেল হারানো তার মাণিক।—
ভালোবাসায় শুঁয়া-পোকার বিষের অধিক জ্বালা,
চায় যে যারে না পায় যদি তাহার গাঁথা মালা।

ফরিয়াদের কথা

সঞ্চিত গোলাপী মধু মোদের মৌচাকে ;
আনারকলি সরবতের সাথে পিয়াব তোমাকে।
গোলাপ-জলে করবে সিনান 'শিষ-মহলে' মোর,
এসো রাণি, যাচে প্রাণ তোমার মনচোর।
"ভালো, বাসা"—দু'টি কথার একটি গূঢ় অর্থ,
প্রেম-দলিলের কোণে লেখা ছোট্ট শপথ-সর্ত্ত।
নাইকো মনে কিশোর বেলায় শীরি ওরফে,
কোন্ নামটি সই করিতে 'ফার্সি' হরফে,—
পুষ্পলতায় পত্র-লেখায় ভুল হ'ত না 'নক্ত',—
তোমায় ফিরে পেয়েছে আজ চির-অনুরক্ত।
না পেয়ে তোমাকে শীরি, দেশান্তরী ফকির।
এই দেখ না পাগড়ী-মাঝে তোমারি তস্‌বির।
এঁকেছিনু স্মৃতির পটে প্রথম সে দর্শনেই,
ভালোবাসা পাবার আশা জাগে মনে মনেই।
জান তুমি বাসো ভালো একাঙ্গাটির খুস্‌বো,
অদেয় না রইবে কিছুই,—মন দিয়ে মন তুষব।
প্রেমিকরা ভোলেননি "শীরি-ফরিয়াদে"র বাঁধন,
তারা দু'জন মরুস্থানের মূর্ত্ত রতি-মদন।
পায় তারা সুগন্ধি মিঠে সর্দা ও খরমুজা,
বালির মাঝে তরমুজেরি রক্তে-ভরা কুঁজা।
খায় তারা আখরোট, বাদাম, পেস্তা ও কিস্‌মিস্।
বাজায় বাঁশী, তবলা-তুগি, জলসার মজলিস্।

ফরিয়াদের প্রেম-পত্র

কোন্ সন্ধ্যায় পথ হারায়ে যাই তোমাদের বাড়ী,
পাই না সাড়া, বারে বারে দ্বারের কড়া নাড়ি।
হঠাৎ তুমি কপাট খুলে বল্‌লে,—"কারে চান ?"
কণ্টকিত সারা দেহ, শিহরিল প্রাণ।
কইনু আমি—"বড় পিয়াস, জুড়াও দিয়ে পানি,
চোখে আঁধার, বেরিয়ে যাবার রাস্তাটি না জানি।
পিয়াইলে নিঙ্গাড়িয়া মধুর দ্রাক্ষাসার,
গুচ্ছে গুচ্ছে ফলেছিল নিকুঞ্জে তোমার।
সেই প্রসন্ন মুহূর্ত্তেই, লো অপরাজিতা,
হ'লে গো মোর বরণীয়া প্রেয়সী বাঞ্ছিতা।
দিলে দেখা, ক্ষণপ্রভা, সরলা, কুমারি,—
সেদিন থেকেই জাগে বুকে দুরাশা তোমারি।
স্মিত-মুখী,—উড়ছে হাওয়ায় ফুল-কস্তার ওড়না,
চিত্রিত-বিহঙ্গ-মিথুন,—দুইটি "মাণিক-জোড়" না ?
হানিলে কটাক্ষ যেন গুপ্ত তরবারি,—
সেদিন থেকেই আমার বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী।
মোর তোড়াটি আছে ভরা তোমারি 'মোহরে',
সরম ছাড়, বাড়াও পাণি, দুখ দিও না মোরে।
তালে-তালে বাজাও তোড়া নর্ত্তনে তোমার,
বাজুক পায়ে ফুলের তোড়াও প্রীতির উপহার।
বর্ণ-বিলাসিনী, তন্বী, শৈলে-লালিতা,
সুনীল-হ্রদ-বিহারিণী, লীলায় সুললিতা।
তরণিকা দোলায় জাগ' আশার ভ্রূভঙ্গে,
মর্ম্মরে-গোলাপ-বরণী ভোলাও শ্রী-অঙ্গে।
কমলা-পেস্তা-আপেল-ফলে সাজাও প্রেমের পশরা,
তোমরা "সমর্‌-কন্দ-মোহিনী", দখল কর 'বস্‌রা'।
অতিথি হয় ছদ্মবেশী পরদেশী এক পাখী,
আঁধার সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়ায় নিলে ঘরে ডাকি'।
জানি জানি বন-চিড়িয়া বনেই গাহে গান,
শিকলে বন্দিনী হ'লে ফাটিয়া যায় প্রাণ।
এসো শীরি, তোমায় পেলেই আমি সাহজাদা ;
এবার দোঁহে রাখব সখি, প্রেমেরই মর্য্যাদা।"
শুক ডাকে তার সারিকারে, দেয় না সাড়া নারী,—
নর-নারীর মনের খবর বল্‌তে আমি নারি।
"হের 'সাদি'র যৌতুক এই আরবি সাদা-ঘোড়া,
বসবে মোরে জড়িয়ে ধরে,—পক্ষীরাজে ওড়া।
ধূ-ধূ মরু, পেরিয়ে যাব 'ককেশাসে'র শৃঙ্গ,
উড়িয়ে তুরঙ্গেরই খুরে তুষার-স্ফুলিঙ্গ।......
দেখবে কোথাও 'পাইন্' সারি, 'অর্কিড' ও 'ফার্ণ,'
বনদেবী দেখান পথে 'ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ।'
চির-সবুজ শাখায় বসে প্রেমিক পাখী ডাকে,
পাখার ভাঁজে রঙ-পতাকা লুকিয়ে তারা রাখে।
নামব মোরা উপত্যকায় রূপসীদের দলে,—
দেখো ডালিম-ফুলের পাশেই সোনার আপেল ফলে।

শ্বেত-পাথরের লতা-পাতায় ঝিনুক-চিকণ ফুল,
আসল বলেই মানবে তুমি, ঘটবে চোখের ভুল।
দেখবে স্বপন সেই 'একাধিক-সহস্র-রজনী,'—
কোন্ সুল্‌তান্ রোজ বদলান বাসি-ফুল-সজনী।
('আজব'-সাগর-মুক্তো-গাঁথা সুল্‌তানি সেই আয়না,
মুখ দেখিলে বাঁ-হাত-টিকে ডান হাত দেখায় না।)
রোজ রাতে কে কাহিনী তার রাখত আধেক বাকী?
সেই চতুরাই ভুলিয়েছিল সুল্‌তানি-লাল আঁখি।
ঐ শোনো গায় উর্দ্দু বুলি একজোড়া বুল্‌বুল্,—
'ইউফ্রেটিসের' জল-প্রবাহ বইছে কুলুকুল্।
সেথায় শীরি, দেব তোমায় নতুন 'ইস্তাম্বুল,'—
শীরির নৃত্য ফরিয়াদকে করেছে মশগুল।
"শীরি, ফরিয়াদের শীরি"—ডাক্‌ছে হীরেমন,—
দোঁহার অধর মিলিয়ে দিল ব্যাকুল দু'টি মন।
তখন দূরে বালু ফুঁড়ে' উঠছে মরুর চাঁদ,
অবাক্ হয়ে শীরির পানে তাকায় ফরিয়াদ।
এবারে বাগ্‌-দত্তা বধূ, মিট্‌বে মনের সাধ,—
শীরির হাসি ফরিয়াদকে করেছে উন্মাদ।
তাদের দেখে উঠলো ডেকে দুষ্টু 'কাকাতুয়া'
'চন্দনা' গায় সোহাগ-সুরে শীরির গানের ধুয়া।
ঐ শোনা যায় 'জংলী-পিলু' মায়া-হ্রদের তীরে,
শীরির কণ্ঠ-স্বর-টি তোমার বাঁশরী ঘিরে।

এইখানে সে একলা বসে দেখত চাঁদের রূপ,—
কখন্ ওঠে ভোরের তারা, জাগিত নিশ্চুপ।
উট চলে ঐ ঘণ্টা বাজে, পূর্ণিমার রাত,
আজকে শীরি, পায় গো ফিরি পুতুল-খেলার সাথী।
অচুম্বিতাই ছিল শীরি, অ-লাঞ্ছিতা কলঙ্কে,
বাজে বাঁশী, বসে দোঁহে গজ-দন্তের পালঙ্কে।
নব-বধূর বেণী বেঁধে সাজিয়েছে সখীরা।
বদল করে বধূ-বরে মোতির হারের হীরা।
"তোমার তরেই, এনেছি এই রাঙা ফুলের থোলো,
এস শীরি গরীব-খানায় মনের কুলুপ খোলো।"

দিল্-দরিয়ায় রূপ-দরিয়ার ধারার উপধারা
কারে দেখে 'ওমর-খৈয়াম্' হলেন মাতোয়ারা?
গরবিণী কোন্ রমণী কবির প্রাণেশ্বরী,
হেসেছিলেন মধুর হাসি বরণ-মালা পরি'?
বদলায় আধ-ফোটা কলির নীল-সোনেলা রং,
সবুজ সে খর্জ্জুরের কুঞ্জে গুঞ্জরে সারং।
এক টুকরো রুটির সঙ্গে পেয়ালাটি ভরে'
সিরাজী-মদিরা ধরেন প্রণয়ীর অধরে।
প্রতিদানে দিলেন কবি বসাস্তিয়া গুল্।
এই দুনিয়া 'বেহেস্ত্,' হলো, ফুটলো কুঁড়ি-ফুল।

ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জন-সংখ্যা

শ্রীশিশিরকুমার কর

দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের জন-গণনা অনুযায়ী আমাদের দেশের জন-সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৫,৬৮,৯১,৬২৫ জন। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যথাসর্ব্বস্ব রেখে যারা এ দেশের পথের ধূলায় এসে দাঁড়িয়েছে তাদের অতি অল্প সংখ্যকই এই গণনার মধ্যে এসেছে। এ ছাড়া যারা এই জন-গণনার পর এদেশে এসেছে এবং এখনও আসছে; আর যারা অবস্থার বিপর্য্যয়ের ফলে সিংহল এবং আফ্রিকা থেকে বহু বৎসর পরে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের হিসাব ধরলে কোনরূপ প্রতিবাদের ভয় না করে বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা ৩৬ কোটি।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। সমগ্র পৃথিবীর, অর্থাৎ ৫টি মহাদেশের জন-সংখ্যা ২৪০ কোটি। তার মধ্যে এশিয়ার জন-সংখ্যা হচ্চে ১২৫ কোটি। আর ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা ৩৬ কোটি। ঘন-বসতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২০ কোটি লোক দখল করে আছে ভূপৃষ্ঠের ১০০ ভাগের ৮৬ ভাগ জমি। বাকি অর্দ্ধেক কোনরূপে মাথা গুঁজে আছে অবশিষ্ট ১৪ ভাগ জমিতে। এই শেষ অর্দ্ধেকের মধ্যেও আমাদের স্থান অত্যন্ত নিম্নস্তরে।

ভারতবর্ষের ন্যায় এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশই অত্যন্ত অনগ্রসর। তাই এশিয়ার সমস্ত দেশে জন-সংখ্যা যেমন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে তাহা সত্যই একটি দুরতিক্রম সমস্যা। এ সমস্যা নানা কারণে এদেশে অত্যন্ত কঠোরতম ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতবর্ষের জন-গণের গড় বার্ষিক আয় মাত্র ২৫৫৲ টাকা। অর্থাৎ মাসিক আয় মাত্র ২১।০ এবং দৈনিক আয় মাত্র ।৮/৪ পাই। এতেই বুঝা যাবে এ দেশের জনগণের জীবন-যাত্রার মান কত নীচু। আর এটাও দেখা গেছে, যে দেশে জীবন-যাত্রার মান যত নীচু, সে দেশে জন্মের হার তত বেশী। দ্বিতীয়তঃ, এদেশে জন সংখ্যা যেমন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে—আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ সেই অনুপাতে আদৌ বাড়ছে না। বরং জমির উর্ব্বরা শক্তি দিন দিন কমে আসছে। তার উপরে আছে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ; যথা অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন। তাহা সত্ত্বেও যে ভারত সরকার খাদ্য-শস্য, পাট এবং তুলার উৎপাদনে দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পেরেছেন, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়!

সমগ্র পৃথিবীর জন-সংখ্যা সমষ্টিগত ভাবে প্রতি বৎসর ৭০ ভাগের এক ভাগ করে বেড়ে চলেছে; অর্থাৎ প্রতি ৭০ বৎসরে জন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হচ্চে। ভারতবর্ষের ন্যায় বহু অনগ্রসর দেশের জন-সংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ। সেই সমস্ত দেশে ৭০ বৎসরের যায়গায় ২৬ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে জন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হচ্চে।

কিছু দিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রপুঞ্জ-দপ্তরের পরিসংখ্যান বিভাগ বহু অনুসন্ধানের পর স্থির করেছেন যে, সমস্ত পৃথিবীর জন-সংখ্যা প্রত্যহ ৮৫ হাজার করে বাড়ছে। এ ত হ'ল সাধারণ হিসাব। পূর্ব্বে বলেছি—যে সমস্ত দেশ যত দরিদ্র, যে সমস্ত দেশের জীবন ধারণের মান যত নীচু, যে সমস্ত দেশে শিক্ষার প্রসার যত কম,—সেই সব দেশে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ তত বেশী। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ দেশই এইরূপ অনগ্রসর। তাদের জীবন-যাত্রার মান অত্যন্ত নীচু তাই আমাদের দেশের মত আরও দুই-চারিটি দেশে এই সমস্যা কঠোরতম ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; তা' নীচের হিসাব থেকে কিছুটা প্রতীয়মান হবে।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান

এই দুইটি দেশ একটা কৃত্রিম এবং অপ্রাকৃত বিভাগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। কার্য্যতঃ ইহাদের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক আবেষ্টন, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যা সমস্তই এক। তাই ভারত বিভাগের পূর্ব্বের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর আমাদের দেশের জন-সংখ্যা বেড়েছে ৫০ লক্ষ করে; অর্থাৎ এই ১০ বছরে আমাদের দেশে ৫কোটি লোক বেড়েছে। এই বর্দ্ধিত জন-সংখ্যা ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জন-সংখ্যার সমান। একজন পরিসংখ্যানবিদ এই সমস্যা সম্যক্ উপলব্ধি করানর জন্য বলেছেন—"এক জন আমেরিকান গড়পড়তা যতটুকু যায়গা নিয়ে বাস করে ঠিক ততটুকু জমি নিয়ে বাস করতে চাইলে বর্ত্তমান জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হারে ঠিক ১০০ বছর পরে ভারতবাসীদের জন্য একটা নয়, দুইটা নয়, পাঁচটা সম্পূর্ণ পৃথিবীর দরকার হবে।"

সিংহল

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত দুই বৎসরের মধ্যে এদেশের মৃত্যুর হার হাজার করা ২০'৩ থেকে ১৩'২তে নেমে এসেছে। অথচ এ দেশের জন্মের হার হাজার করা ৪০'২ মৃত্যুর হার আর না কম্‌লেও এই হারে জন-সংখ্যা বাড়লে মাত্র ২৬ বছরের মধ্যে এ দেশের জন-সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। সিংহল সরকার ভারতীয়দের ক্রমে ক্রমে দেশ থেকে সরিয়ে দিয়ে এ সমস্যার একটা সাময়িক সমাধান করেছেন বটে; কিন্তু বাঁচতে হলে এর একটা প্রকৃত সমাধান অতি শীঘ্র তাদের খুঁজে বের করতে হবে।

মিশর

মিশরে জন্মের হার হাজার করা ৪৮'২। মৃত্যুর হার সমান থাকলেও এই হারে জন সংখ্যা বাড়লে মাত্র ৪০ বৎসরে এই দেশের জন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হবে।

তুরস্ক

তুরস্কে জন্মের হার হাজার করা ৫০, অর্থাৎ আমেরিকার জন্ম-হারের দ্বিগুণের চেয়েও অনেক বেশী। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এ দেশের জন-সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৯০ লক্ষে পৌঁছে যাবে।

জাভা

এ দেশের জন-সংখ্যা ১৯৩০ সালে ছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ। যে হারে এ দেশের জন-সংখ্যা বাড়ছে তা'তে আজ থেকে ৪৬ বৎসর পরে এর জন-সংখ্যা হবে ১১ কোটি ৩০ লক্ষ।

জাপান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে জাপান কার্য্যত: আমেরিকার দখলেই আছে। এই ক'বছরে জাপানে মৃত্যুর হার হাজার করা ১৭.২ থেকে ১১.৪ এ নেমেছে। এদেশে জন্মের হার যে হারে বেড়ে চলেছে, তাহাতে মাত্র ৩৩ বৎসরে এর জন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হবে।

আবার নিজের দেশের কথাতেই ফিরে আসা যাক। পূর্ব্বে সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল। তার ফলে ক্রমবর্দ্ধমান জন-সংখ্যায় কিছুটা সমতা সাধিত হ'ত। বর্ত্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে এবং চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই মৃত্যু-সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তাই আমাদের গড় আয়ুষ্কাল ২৭ বছর থেকে কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা সমাধানের দিকে আমরা অতি সামান্য মাত্র অগ্রসর হতে পেরেছি।

কিছু দিন পূর্ব্বে সার গ্ল্যাডুইন জেব রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিরূপে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—"অনগ্রসর দেশগুলির জন-সংখ্যা বৃদ্ধির এই সমস্যার যদি অতি শীঘ্র সমাধান না হয় তাহলে ঐ সমস্ত দেশে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে, নতুবা ষ্টালিন-প্রদর্শিত পথে (Stalinist line) উহার সমাধান হবে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত দেশে কমিউনিজম অর্থাৎ গণস্বাধীনতা হীন সাম্যবাদ বিস্তারলাভ করবে।" এ থেকে হয়ত ধারণা হতে পারে যে, সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু—যেমন আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা—এইরূপ বিরাট সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এইরূপ ধারণার মূলে কোন ভিত্তি নাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এই শ্রেণীর গুরুতর সমস্যার আশু প্রতিকার সম্ভব, যদি দেশবাসীর আন্তরিক দেশপ্রীতি থাকে।

ভারতের জন-সংখ্যার এই ভীতিপ্রদ বৃদ্ধি নিবারিত হতে পারে মাত্র দুইটি উপায়ে। প্রথমত:, দেশবাসীর জীবন ধারণের মান উন্নয়ন করে। পূর্ব্বে বলা হয়েছে—যে দেশে জনগণের জীবনযাত্রার মান যত উঁচু, সে দেশে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ তত কম। এদেশেও দেখা যায় যে, উচ্চ সমৃদ্ধিশালী পরিবারের মধ্যে সন্তান জন্মে অতি কম, বহু করদ ও মিত্র রাজাদের সন্তানের অভাবে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করতে দেখা যেত। তেমনি এ-ও দেখা যায়, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারে—যেখানে প্রায়শ:ই অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হয়—সেখানেই সন্তানের প্রাচুর্য্য। ইহার কারণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের আমোদ, অহ্লাদ এবং চিত্ত বিনোদনের বহু রাস্তা খোলা রয়েছে, কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট ও অভাবপিষ্ট দরিদ্রের সন্তান জন্মান ছাড়া আর কোন আনন্দ বা আমোদের সুযোগ নাই। এই উদ্দেশ্যে বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা এবং বহু নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন। গত ৭ বৎসরে ভারত সরকার তার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আর্থিক সামর্থ্য এবং আমেরিকার অর্থ সাহায্যে এই দিকে যা করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। তাহা সত্ত্বেও এই বিরাট জনগণের জীবনযাত্রার মান সম্যক্ উন্নয়নের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন করতে অন্তত: পক্ষে আর ৫০ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য বশত: তত দিনে জন-সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী বেড়ে যেয়ে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে। তাহা সত্ত্বেও চেষ্টার ত্রুটি করা চলবে না।

এ সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—দেশে শিক্ষা বিস্তার করা—যার ফলে দেশের জনগণ এই সর্ব্বনাশকর সমস্যার সম্যক্ পরিচয় লাভ করে বৈজ্ঞানিক পন্থায় জন্মনিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। দুর্ভাগ্য বশত: উপযুক্ত শিক্ষা ত' দূরের কথা, এখনও এ দেশের জনগণের শতকরা ৯০ জন অর্থাৎ প্রায় ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ লোক সম্পূর্ণ নিরক্ষর। এ দিকেও ভারত সরকার চুপ করে বসে নেই ; বরং যা করেছেন তা' সত্যই প্রশংসনীয়। তথাপি এই বিরাট জনগণকে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক জন্মনিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করার মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে অন্তত: ৩০ থেকে ৪০ বৎসর সময় লেগে যাবে। তত দিনে এ সমস্যা আরও কঠোর হয়ে দাঁড়াবে।

প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে এই যে, উক্ত দুই রাস্তাতেই আমাদের সমান গতিতে অগ্রসর হতে হবে, তাহাতে ফল কম হলেও ক্রমশ: ইহার তীব্রতা কমতে থাকবে এবং অদূর ভবিষ্যতে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে,—বিবিধ শিল্পে বহু লোক নিয়োগ করে—সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু পরিবণ্টন ব্যবস্থা করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতের ন্যায় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন দেশের পক্ষে এইরূপ বহু পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সাম্যবাদের প্রসার নিরোধের জন্য আমেরিকা অনগ্রসর দেশগুলিকে অকৃপণ হস্তে অর্থসাহায্য করছে। সে জন্য আমাদের ন্যায় সেই সমস্ত দেশ আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞ। কেবলমাত্র অন্য দেশের সাহায্যের উপর নির্ভর করে আমাদের ন্যায় বিরাট দেশের ৩৬ কোটি লোকের প্রয়োজনানুরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নয়। এর প্রকৃত সমাধানের পথ উন্মুক্ত হবে সেই দিন—যে দিন দেশবাসী এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার ন্যায়, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে নিজেরাই এই সমস্যা সমাধানের গুরুদায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে।

বিজ্ঞান এ বিষয়ে অবশ্য চুপ করে বসে নেই। কিছু দিন পূর্ব্বে আমেরিকার একটি ঔষধ-প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করেছেন যে, মাত্র ৫জন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা হলে তারা এমন জন্ম-শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করে দিতে রাজী আছেন, যাহা প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির সংস্কার-সম্মত হবে। আমাদের দেশের ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারীর মত সরকারী প্রতিষ্ঠান, যেখানে শ্রীযুত অনিলবরণ বিশ্বাসের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁদেরও এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

স্টেশন

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আজ বিকেল বেলা ভাবছিলুম কাঠের উঁচু সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে। ওপারে সহরতলী, এপারে সহর, এ দুই তটের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে রেল-লাইনের শুকনো তটিনী; তারি ওপর কাঠের সেতুতে দু'পা রেখে দাঁড়িয়ে আমি। সেতু বেয়ে সহরের দিকে নামলেই সহর-সীমান্তবর্তী রেল-ষ্টেশন আর ষ্টেশন রোড। এই রোডের ওপর নতুন ষ্টেশন-মাষ্টারের 'কোয়ার্টার' এই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দেখলেও বেশী দূরে নয়। ত্রৈলোক্য তপাদার রেলের পুরাতন চাকুরে, এই ষ্টেশনে নতুন এসেছেন মাষ্টার হয়ে। অনেক বদ্‌লির পর এই ষ্টেশনেই তাঁর শেষ বদ্‌লি, এখানে ষ্টেশন মাষ্টারির মেয়াদ ফুরোলেই সুরু হবে তাঁর চাকরি থেকে বানপ্রস্থ।

সেই বানপ্রস্থে দূরে প্রস্থান করবার বাসনা নেই তপাদারের, তাই তাঁর বর্ত্তমান 'কোয়ার্টার'এর মুখোমুখি রেল-লাইনের ও-পারে সহরতলীর সীমান্তে যে ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানা, সস্তায় পেয়ে সেইটে কিনে রেখেছেন; চাকুরির শেষ মেয়াদের অন্তে শুধু রেল-লাইন পেরিয়ে সীমান্ত বদল করতে হবে তাঁকে, যদি না তার আগে অন্য কোনো সীমান্ত পেরিয়ে চলে যেতে হয়।

অনেক চেষ্টা করেছি ত্রৈলোক্য তপাদারকে ত্রৈলোক্য তপাদার না ভেবে আর কিছু ভাবতে। ওঁকে কল্পনা করেছি ভাস্কর ভট্টচার্য্যি বলে, কখনো ভেবে নিয়েছি উনি সুবিমল দাশ-গুপ্ত, কখনো দীনেশ চাকলাদার, কখনো বা পুলকেশ রায়-চৌধুরী। মনে মনে আরো অসংখ্য নাম দিয়ে দেখেছি ওঁকে, সেকেলে-একেলে নানান ধরণের। কিন্তু না, মানায় না, মানায় না তাঁকে অন্য কোনো নামে। তাঁকে আগাগোড়া ঘিরে কেমন যেন একটা ত্রৈলোক্য ত্রৈলোক্য ভাব, তাঁর সব কিছু জুড়ে এক অনির্বচনীয় তপাদারত্ব। অমোঘ বিশ্ববিধানের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে ত্রৈলোক্য তপাদারের ত্রৈলোক্য তপাদার না হয়ে উপায় ছিল না। এ বিধান অনায়াসেই সহজ ভাবে মেনে নিয়েছেন তিনি, বিদ্রোহ করেননি, নালিশও রাখেননি মনে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে যেমন নিয়েছিলো, মোটা সুরে গান গেয়ে স্বদেশী যুগের স্বদেশী ভাইরা, তেমনি বাপের দেওয়া মোটা নাম নির্দ্বিধায় মাথায় তুলে নিয়েছেন ত্রৈলোক্য তপাদার। অবচেতন মনে হয়তো আঁরি বের্গসঁর (Henri Bergson) সৃজনশীল বিবর্তনতত্ত্বের সানন্দ আভাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন তিনি। বিশ্ব-বিধানের বাধ্যতার সঙ্গে ৺পিতৃদেবের নামকরণ স্বাধীনতার অপরূপ সমন্বয় লীলায়িত হয়ে উঠেছে সেই অবচেতনায়। পিতৃদেব নেই, তাঁর দেওয়া নাম নিয়ে বেঁচে এখনো ষ্টেশন-মাষ্টারি করছেন ত্রৈলোক্য তপাদার।

নামটা বড়লোকের বৈঠকখানার শো-কেসে সাজানো রেক্সিনে বাঁধাই দামী গ্রন্থাবলীর মতো—ব্যবহার বড় একটা হয় না। ষ্টেশনের কুলী, পয়েণ্টস্‌ম্যানরা বলে মাস্‌টর বাবু, আর অন্য সবাই বলে মাষ্টার মশাই। তিনি ত্রৈলোক্য তপাদার না হয়ে ভজহরি সামন্ত বা আটকড়ি মালাকার হলেও তাই বলতো। ষ্টেশন-মাষ্টারির কাছে নামের মুড়ি-মিছরির সমান দর।

আমি তাঁকে বলিনে মাষ্টার মশাই; ত্রৈলোক্য বাবু থেকে সুরু করে এখন বলি 'ত্রৈলোক্যদা'। ঐ নামে ডেকে জয় করেছি তাঁর হৃদয়। স্বামীজীর "আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ"-এর মতো। আর কেউ তাঁকে ডাকে না তাঁর নামে, ডাকেনি অনেক দিন—শুধু আমি ডাকি: এই একক বিশেষত্বের বোঁটায় ফুটে উঠেছে বিশেষ বন্ধুত্বের ফুল। তাঁর ভেতরকার আধ-ঘুমন্ত ত্রৈলোক্যত্ব আমার ডাকের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে। অনেক দিনের চাকুরি-জীবন জুড়ে তিনি নিজেকে ভেবে এসেছেন অতিকায় রেলগাড়ী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম চাকা। অনেক দিন পর চাকরি-জীবনের প্রায় সীমান্তে এসে আমার আহ্বানের সুরে তাঁর মনে হয়েছে তিনি চাকা নন, ত্রৈলোক্য তপাদার।

আমার কাছে তাঁর হৃদয় তাই অবারিত দ্বার। সেই খোলা দুয়ার দিয়ে সোজা দেখা দিয়েছে তার অন্তরের অন্দর মহল। বাইরের দুনিয়ার ষ্টেশন-মাষ্টার আমার কাছে ধরা দেবার আনন্দেই ধরা দিয়েছেন ত্রৈলোক্য তপাদার বলে। তা নইলে কেমন করে জানতেম তাঁর জীবনের কান্না-হাসির কাহিনী? ষ্টেশনের কুলী থেকে সুরু করে সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টার—'ছোট ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু' থেকে ছাঁটাই হয়ে যাঁর নাম দাঁড়িয়েছে 'ছোট বাবু'তে—সবাই জানে তাঁর স্ত্রী নিঃসন্তানা, চিররুগ্না, প্রায় শয্যাশায়িনী. তবু সবাই দেখে তিনি চিরহাস্যমুখ। সেই হাসিমুখের আড়ালে লুকানো ব্যথার দীর্ঘশ্বাস তারা কেউ কেউ দেখে মনের চোখ দিয়ে, কিন্তু সেই ব্যথার আড়ালে লুকানো আনন্দের আলোটুকু তারা কেউ দেখতে পায় না।

ভেবেছিলেম, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও তপাদার-পত্নীকে আমার একবার দেখে আসা উচিত। কিন্তু তারপর মনে হলো,

একবারও দেখতে না গেলেই আরো বেশী ভদ্রতা করা হবে, বন্ধুত্বের সুযোগে হৃদয়বানত্ব দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোককে বিব্রত করবার অধিকার আমার নেই। জেনেছিলেম, অনেক দিন থেকেই ভদ্র-মহিলার যে কোনো মুহূর্তে হৃদয়ের স্পন্দন চিরতরে থেমে যেতে পারে অথচ থেমে যাচ্ছে না; দেহের দুঃখের সঙ্গে মনের দুঃখ মিলে ঘটিয়েছে মেজাজের তীক্ষ্ণতা আর ব্যবহারের রুক্ষতা: অতিথিকে ঠিক নারায়ণ বলে তিনি না-ও ভাবতে পারেন। নাম-জানা আর নাম-না-জানা অনেক ব্যাধির মন্দির তাঁর রুগ্ন দেহ, নাম-জানা আর নাম-না-জানা অনেক দাওয়াই এ মন্দিরে অনেক ব্যর্থ অর্ঘ্য দিয়েছে। রেল কোম্পানী থেকে পাওয়া ত্রৈলোক্য তপাদারের অনেক অর্থ গেছে এই অর্ঘ্যের পেছনে। বর্ত্তমানে শ্রীমতী তপাদার বিভিন্ন কবচ আর মাদুলীর ভারে আপাদমস্তক ভারাক্রান্তা।

দূর-সম্পর্কীয়া এক বিধবা পিসী থাকেন তপাদারের কাছে; তপাদার-পত্নীর এবং সেই সঙ্গে তপাদারের দুর্বহ জীবনকে সুবহ করে রাখবার সাধনায় যথাসম্ভব সাফল্য লাভ করেছেন তিনি। যথা-সময়ে তিনি বিধবা না হলে তপাদার-দম্পতির কী যে অসুবিধে হতো ভাবতে পারি নে।

রেল কোম্পানীর 'ডিউটি'-তে তপাদার মশাই যেমন অদ্ভুত রকম গোছালো, ডিউটি-বহির্ভূত কথাবার্ত্তায় তেমনি আশ্চর্য্য রকম অগোছালো। গুছিয়ে বলা কথা শুনে শুনে হাঁফিয়ে-ওঠা কানে না-গুছিয়ে বলা কথার কী যে যাদু, বুঝেছি তা মুক্ত-হৃদয়-ত্রৈলোক্য তপাদারের কাছে। এই কাঠের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে, কখনো বা জনবিরল প্লাটফরমে পায়চারির সঙ্গে সঙ্গে আর ফাঁকে-ফাঁকে, তাঁর অতীতের অনেক টুকরো-টুকরো ছবি এঁকেছেন ভোঁতা তুলি দিয়ে ঝাপসা রঙ বুলিয়ে। অনেক ফাঁক থেকে গেছে; বলিনি তাঁকে সে ফাঁক ভরিয়ে দিতে। হয়তো ভরাতেও পারতেন না তিনি। যারা ফাঁক ভরাতে জানে, তারা জানে শুধু ফাঁক ভরাতেই।

যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে "ত্রৈলোক্য তপাদারের জীবনী সংক্ষেপে গুছিয়ে লিখ," তো পারবো না গুছিয়ে লিখতে? জবাব হবে ঝাপসা, ধোঁয়াটে, এলোমেলো। তাঁরও জীবনে হয়েছিলো ঋতুরাজের আবির্ভাব, সবুজ হৃদয়ে লেগেছিলো অবুঝ বসন্তের দোলা। সেই দোলার ঝাপসা স্মৃতি আজো নিঃশেষ হয়ে যায়। ঢং ঢং করে যখন ঘণ্টা পড়ে ষ্টেশনে, পয়েন্টস্‌ম্যান লাইনের ধারে সিগন্যাল নীচু করে দূরের গাড়ীকে জানায় ষ্টেশনের আবাহন, হুস্‌-হুস্‌ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রেল-গাড়ী এসে দাঁড়ায় প্ল্যাটফরম্‌ ঘেঁসে, তখন মাঝে মাঝে এই বর্ত্তমান কল-কোলাহলের আসরে এসে চুপি দিয়ে যায় সুদূর অতীতের সেই বাসন্তী স্মৃতি; বিলিতি বাঁশির মাঝখানে হঠাৎ যেন বাঁশের বাঁশীর মেঠো সুর। কিন্তু সে সুর টেঁকে না ক্ষণিকের মুহূর্তের বেশী, তাতল সৈকতে এক ফোঁটা শিশিরের মতো চট্‌ করে উবে যায়।

জীবনে যখন বসন্ত এলো (তখনো এঁর নাম ছিল ত্রৈলোক্য তপাদার!!!) তখন এক দিন কুমারী ঊষাকে তিনি প্রথম দেখলেন চিড়িয়াখানায়। দেখালেন ঊষার বাবা ব্যোমকেশ বাবু, তপাদারের বড় মামার বিপত্নীক বড় বন্ধু। তপাদারের বাবা স্বর্গীয় হয়েছেন, মা-ও তখন ইহলোকে নেই, বড় মামাই অভিভাবকীয় ভাবনা ভাবতেন ভাগ্নে ত্রৈলোক্যের জন্যে। যৌবন বড় বিস্ময় কাল, কথাটি পড়েছিলেন অনেক পুঁথিতে, আর হয়তো জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও উপলব্ধি করেছিলেন। এই বিষময় কালে উপনীত তাঁর একমাত্র ভাগ্নে যদি পদস্খলন করে বসে, তাহলে স্বর্গীয়া বোনের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে? তাই যথাসময়ে হুঁশিয়ার হয়ে সন্ধান সুরু করলেন বিষঘ্ন বিষমৌষধির। সন্ধান পেতে দেরী হলো না; প্রাণের বন্ধু ব্যোমকেশ বাবুও তখন ঊষার জন্যে অনিরুদ্ধের সন্ধানে ছিলেন। দুই বন্ধু হয়ে গেলেন দুই হবু-বেয়াই। কথা-বিনিময় হতেও দেরী হলো না। বড় মামা দেখেছিলেন ঊষাকে। ব্যোমকেশ বাবু দেখেছিলেন ত্রৈলোক্যকে। এদিকে ভাগ্নে-দায়, ওদিকে কন্যা-দায়।

ভাগ্নের সামনে পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে ওল্টাতে বড় মামা গুরুজনী ঢঙের রসিকতা করে' বললেন, "ভাগ্নে-বৌ আনবার ব্যবস্থা পাকা করে এলুম রে তিলু। এবার শুভদিন দেখা হচ্ছে। খাসা মেয়েটি। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!"

ত্রৈলোক্য অবাক্‌ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো মামার মুখের পানে। মামা ভাবলেন, লজ্জা পেয়েছে লাজুক ভাগ্নে। তা একটু পাবে বই কি, আর পাওয়াই ভালো। বেহায়াপনাটা কিছু নয়। লজ্জা যেমন মেয়েদের ভূষণ, লাজুকতা তেমনি বিয়ের বয়সে ছেলেদের ভূষণ। এ না থাকলে তো সে ছেলেকে বলতে হবে বখাটে, অকাল-কুষ্মাণ্ড।

বললেন, "আমার বন্ধু ব্যোমকেশের একমাত্র মেয়ে—ঊষা। নামটি যেমন মিঠে, মেয়েটিও তেমনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, কোষ্ঠীতে লিখেছে, যে ঘরে সে বৌ হয়ে আসবে সে ঘরে একেবারে—"

ও দিকে ত্রৈলোক্যের বড় মামাতো বড়দা ভোম্বল ডাম্বেল নিয়ে কসরৎ করছিল। সে বাপের কথা শুনে বললে, "রেখে দাও বাবা তোমার কোষ্ঠী।"

কোষ্ঠীর ওপর আর বাপের পছন্দের ওপর আগুন-চটা ভোম্বল। বাপের পছন্দে নিজে না দেখে বিয়ে করে অবধি পস্তাচ্ছে। বৌয়ের কোষ্ঠী ফলেছে কি না খোঁজ করেনি, তার নিজের কোষ্ঠীর ফল দেখে দুনিয়ার সমস্ত কোষ্ঠীওয়ালাদের মাথা ডাম্বেল মেরে ফাটাতে ইচ্ছে হয়েছে তার। বৌ পুরোনো হয়ে সয়ে গেছে: তার ওপর আর রাগ নেই ভোম্বলের, কিন্তু অনুরাগও জাগাতে পারছে না প্রাণে। তাই বাপের ওপর রাগটা যায়নি এখনো; পাছে যায়, এই ভয়ে চেষ্টা করে জীইয়ে রাখে। তা ছাড়া তখন চাকরি করছে ভোম্বল, পাকা চাকরি: বাপকে আর বেকার দিনের মতো পরোয়া করবার দরকার নেই।

মামার পছন্দে বৌদি যেমন এসেছে বৌ-ও পাছে তেমনি আসে, এই ভয়ে ত্রৈলোক্যের রঙীন মন ভয়-ভাবনায় কালো হয়ে উঠলো।

ডাম্বেল-বিশারদ ভোম্বল বললে, "তোমার দেখায় তোমার পছন্দে চলবে না বাবা! যার বৌ হবে সে নিজের চোখে দেখে আসুক। পরের চোখে ঝাল্‌ খাওয়া কিছু নয়। এ বাবা হিঁদুর বিয়ে, এমন নয় যে পছন্দ না হলে বদলানো বা বাতিল চলবে।"

মামা বললেন, "এ মেয়ে না-পছন্দের নয়, না-ই বা হলো

ডানা-কাটা পরী। তা ছাড়া রেলে ব্যোমকেশের ধরবার লোক আছে, জামাই হলে তিলুকে রেলের চাকুরিতে বসিয়ে দিতে পারবে।

ভোম্বল নাছোড়বান্দা। নিজে সে ঠেকে শিখেছে, পিসতুতো ছোটো ভায়ের বেলা তেমনটি হতে দেবে না। "যাকে নিয়ে সারা জীবন ঘর করবে তাকে নিজের চোখে নিজের দায়িত্বে আগে দেখে নিক তিলু।" বললে ভোম্বল জোর গলায়।

"কিন্তু ওঁরা যে বড় গোঁড়া সনাতনপন্থী, ভোম্বল!" বড় মামা বললেন। "বিয়ের আগে ছেলে মেয়েকে দেখবে এ রীতি ওদের চোদ্দ পুরুষে নেই। ওদের আত্মীয়-স্বজন সবাই মারমুখো হয়ে উঠবে। অসম্ভব! ওদের বাড়ীতে বিয়ের আগে তিলুর যাওয়া হতেই পারে না।"

ভোম্বল বললে "বেশ! মেয়ের বাবাকে বলো মেয়েকে অন্য কোথাও দেখাবার বন্দোবস্ত করুন। বলো না কেন, কালই মেয়েকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় আসুন। কোন্‌খানটায় কখন ওরা থাকবেন জেনে আসবে। সেই অনুসারে তিলুও যাবে চিড়িয়াখানায়। জানোয়ার দেখার ছলে মেয়েকে দেখে আসবে।"

মামা অগত্যা বললেন "তা বেশ! মেয়ে কিন্তু বড্ড লাজুক; ব্যোমকেশকে না হয় বলে দেবো, মেয়েকে যেন আগে কিছু জানতে না দেয়।"

ব্যোমকেশের সঙ্গে ঠিক করে এলেন বড় মামা। পরদিন বিকেলের দিকে নির্দ্ধারিত জায়গা আর সময় মতো চিড়িয়াখানায় চলে গেল ত্রৈলোক্য। বক্ষে নিয়ে গেল দুরু-দুরু আশা আর গুরু-গুরু আশংকা, চক্ষে নিয়ে গেল কৌতূহলী তৃষ্ণা; লাজুক ভাগ্নে লজ্জা পাবে বলে সঙ্গে এলেন না মামা—আসতে দিলেও না ভোম্বল। মামা জেনে এসে বলে দিয়েছিলেন কি বেশে আসবে ঊষা চিড়িয়াখানায়, চিনতে যেন কোনো মতেই ভুল না হয় ত্রৈলোক্যর। চিড়িয়াখানায় ঢুকে জায়গা মতো গিয়ে ত্রৈলোক্য দেখতে পেলো ওরা দু'জন আগেই এসে উপস্থিত, ছদ্ম জানোয়ার-দর্শন-মশগুল, মাঝে মাঝেই প্রতীক্ষার পশ্চাদ্‌দৃষ্টি। ব্যোমকেশ বাবুকে আগেই ঝাপসা চেনে ত্রৈলোক্য; তার সঙ্গের মেয়েটিই নিশ্চয় তাঁর মেয়ে ঊষা। পরনে তার নীল শাড়ী, পায়ে লাল চামড়ার অনভ্যস্ত স্যাণ্ডেল, মাথার পেছনে অভ্যস্ত খোঁপায় অনভ্যস্ত ফুলসজ্জা। ত্রৈলোক্যকে আসতে দেখেই মেয়েকে জানোয়ার দেখতে রেখে ব্যোমকেশ বাবু অনতি দূরে গিয়ে বসে রইলেন সবুজ ঘাসের ওপর। বসে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকবার ভাণ করে আড়চোখের দৃষ্টির তীর ছুঁড়তে লাগলেন মেয়ের দিকে আর ভাবী জামাতার দিকে।

দূরাগত ব্যোমকেশ-দৃষ্টি-বাণের অলক্ষ্য খোঁচা অনুভব করে একটু সলজ্জ অস্বস্তি বোধ করছিলো ত্রৈলোক্য। কিন্তু না, লজ্জা করে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এ হলো গিয়ে জীবন-মরণ সমস্যা! ঐ যে পাৎলা মেয়েটি খাঁচার আড়ালের জানোয়ার দেখছে, ওটিকেই তার ঘাড়ে চাপাবার ব্যবস্থা পাকা করে এসেছেন মামা এক রকম। ঘাড় পেতে নেবার আগে বোঝাটিকে শেষ দেখার এই সুযোগ হারালে আর মিলবে না। পাকা ব্যবস্থা কাঁচিয়ে দেবার দরকার হলে এখনো বড়দা ভোম্বলের শরণ নেওয়া যায়, আর গোঁয়ার ভোম্বলকে মামা রীতিমতো ভয়ও করেন। আস্তে আস্তে ঐ খাঁচার জানোয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আশঙ্কার আগাছা এড়িয়ে আশার শীষ উঁকি দিতে লাগলো। ছেলের বেলায় যে ভুল করেছিলেন মামা, ভাগ্নের বেলায় হয়তো সে ভুল করেননি। দেখাই যাক্ না নিজের চোখে। ঊষা নামটি তো খাসা, ভোম্বল-বৌদির সিদ্ধেশ্বরী নামের মতো নয়। ঊষার পেছনে আছে রেলের চাকরি, ওটা পেলে সারা জীবনের জন্যে একটা হিল্লে হয়ে যাবে, মামার অন্ন ধ্বংসাতে হবে না আর। না দেখেই আট আনা প্রেমে পড়ে গেল ত্রৈলোক্য। রোমাণ্টিক গল্পের মতো রঙীন পরিস্থিতি। মেয়েটির অদূরে দাঁড়িয়ে জানোয়ার দেখার ছলে তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখবে মেয়েটিকে; মেয়েটি জানবে না সে-ই তার ভাবী জীবন-দেবতা। রোমাণ্টিক, রোমাণ্টিক, চরম রোমাণ্টিক!

কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে, এক মুহূর্ত্তেই বিতৃষ্ণার্ত্ত হয়ে গেল ত্রৈলোক্য। কোনো মেয়ে বেঁচে থাকতে এমন শ্রীহীনা হতে পারে, এ তার ধারণার দশ মাইলের ভেতরও ছিল না। আপন মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়েও কিছু সুবিধে হলো না। ঊষা নামটাই একটা প্রচণ্ড ধাপ্পা। দাঁড়িয়ে যে আছে তাতে নেই এক ফোঁটা লালিত্য, পুতুল-নাচের পুতুল যেন সূতোয় ঝুলছে, সূতোর ছাড়া পেলেই যেন লুটিয়ে পড়ে যাবে মাটিতে। মেয়েটি একবার তাকালো ত্রৈলোক্যর দিকে, যেন আনমনা চোখের দৃষ্টি বুলোচ্ছে কোনো জানোয়ারের ওপর। অথচ যেন পুতুলের চোখ, প্রাণের স্পন্দন নেই সে চোখে। যৌবন-রঙীন স্বপ্ন এক সেকেণ্ডে ধোঁয়া হয়ে গেল। ভোম্বলদা'র শরণ নিয়ে রেহাই পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, ভাবলে ত্রৈলোক্য। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানা রেলগাড়ী চলে গেল ত্রৈলোক্যর মনের চোখের সম্মুখ দিয়ে হু-হু করে। রেলের চাকরি মিলবে ঊষার বাবার জামাই হলে। আর তা না হলে পেছনে রুষ্ট মামা, সামনে নিষ্করুণ চাকরির বাজার—যেখানে দন্তস্ফুট করার মতো যোগ্যতা নেই ত্রৈলোক্যর দাঁতে। ভোম্বলের ডাম্বেল সেখানে কোনো সুরাহা করে দিতে পারবে না। চাকরি-স্বপ্নের ধমক খেয়ে যৌবন-স্বপ্ন একটু দমে গেল। আরেক বার তাকিয়ে তত খারাপ মনে হলো না ঊষাকে। ত্রৈলোক্য দোষ দিলে নিজের চোখকে, আগে থেকেই বিরূপ ভাব জমিয়ে নিয়ে এসেছে এই অভিযোগ করে। তারপর ভাবলে, বিয়ের আগে মেয়েরা অমন একটু বিশ্রী থাকেই, বিয়ের পর একটু একটু করে সুশ্রী হতে থাকে। ভোম্বল-বৌদিরই তো বিয়ের পর চেহারা অনেক খুলেছে, আগে তো তার দিকে চাওয়াই যেতো না। তা ছাড়া না-ই বা হলেম পুরোপুরি গণেশ ঠাকুর, এমন কিছু কার্ত্তিকটিও নই—ভাবলে ত্রৈলোক্য—আমিই বা নন্দন কাননের ডানাকাটা অপ্সরা আশা করবো কোন্ লজ্জায়?

আবার যেন তাকালো মেয়েটি ত্রৈলোক্যর পানে। এবার সোজাসুজি নয়, ঈষৎ আড়চোখে। ক্ষণিকের এই আড়-দৃষ্টিতে যেন তার কুমারী-হৃদয়ের অনন্ত ব্যাকুলতা চমক দিয়ে গেল। কেমন একটা আধ-আগ্রহী আধ-সলজ্জ ভাব, যেন একটা হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার পুলক-মেশানো ভয়। ঐ একটি চকিত চাহনির চমকে সারা দেহ-মনে শিহরণ জেগে উঠলো ত্রৈলোক্যর। বদলে গেল তার চোখের সুর। মনে হলো ঐ ঊষা বহু দিন ব্যর্থ খোঁজা খুঁজে খুঁজে হয়ে উঠেছিলো ম্রিয়মাণা, রূপহীনা; বহু প্রতীক্ষার পর

তার তৃষিত আঁখির সম্মুখে পেয়েছে তার হৃদয়-দেবতাকে, এবারে বিকশিত হয়ে উঠবে তার সুপ্ত রূপের মঞ্জরী। হৃদয়ের আনন্দ দেয় বাইরের যে রূপ, লাবণ্যের সেই তো সোনার কাঠি।

নিশ্চয় জানে, নিশ্চয় জানে মেয়েটা, সব ব্যাপার নিশ্চয় সে টের পেয়েছে, নিশ্চিত ভাবলে তরুণ ত্রৈলোক্য। মেয়ে জাতটাই বড় চালাক, একটু আভাস, একটু ইঙ্গিত—ব্যাস, অমনি সব-কিছু বুঝে নেয়। হয়তো তাকে বলা হয়েছে সোজা, অথবা আভাসে, আজকের এই চিড়িয়াখানা দর্শনের নিহিত উদ্দেশ্য, অথবা হয়তো হয়নি। বাপের সহসা এই চিড়িয়াখানা-প্রীতির পেছনে আরো কিছু আছে, উষার কাছে এ কথা তবু নিশ্চয় মেঘ-বিরল আকাশের মতো পরিষ্কার। পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়াও ছ নম্বর একটা ইন্দ্রিয় থাকে মেয়েদের, সে হচ্ছে রহস্যভেদের জন্যে বিধাতার বিশেষ দান।

উষা তাকে দেখেছে, চিনেছে, মুগ্ধ হয়েছে, আর তার চরণে হৃদয় সমর্পণ করে ফেলেছে, এ বিষয়ে ত্রৈলোক্যর মনে আর এক ফোঁটা সংশয় রইলো না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে উষার জীবন-দেবতা ভেবে ফেললে ত্রৈলোক্য তপাদার। উষার হাতে বরমাল্য থাকলে তখ্খুনি সে গলা বাড়িয়ে দিত।

কিন্তু বরমাল্য ছিলো না উষার হাতে, আর সেই ক্ষণে জানোয়ার দেখতে তারই পাশে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণী—স্বাস্থ্যোচ্ছলা, সুগঠিতদেহা, ঋজু-দীর্ঘাঙ্গী, ঈষৎ-গৌরী। রেড়ির তেলের মৃদু ছিঁচকাঁদুনির পাশে যেন চোখধাঁধানো ডে-লাইটের উচ্চহাসি-মাখানো আলো; কষ্টিপাথরের পাশে গিনি-সোনা; মন্থরার পাশে ঊর্মিলা; গর্গনের পাশে হেলেন। বেণী যে বয়সে খোঁপায় পরিণত হয়, সেই বয়স মেয়েটির; আর এ বয়সে পা দিয়ে মেয়েরা চকোলেট্ খাওয়াকে ছেলেমানুষি ভাবতে সুরু করে। কিন্তু মেয়েটি জানোয়ার দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নিয়ে নিয়ে যা খাচ্ছিল তা চকোলেট্ বলেই মনে হলো ত্রৈলোক্যর। মুগ্ধ হয়ে গেল ত্রৈলোক্য, মেয়েটির সেই আশ্চর্য্য চকোলেট্ খাওয়া দেখে। অদ্ভুত! অদ্ভুত! এক হাতেই পরম অবলীলায় কাগজের খোসা ছাড়িয়ে ফেলে তার অন্তরের জিনিষটি ধীরে ধীরে মুখে পুরে দিচ্ছে, অথচ সেদিকে তাকাচ্ছে না একটি বার। চোখের চূড়ান্ত অসহযোগ, তবু চকোলেট পৌঁছতে ভুল হচ্ছে না এতটুকু। আর কী সে সুললিত চকোলেট-চর্ব্বণ-ভঙ্গিমা! ত্রৈলোক্য আবার মুগ্ধ হলো। রূপহীনা ছিলো যে উষা, এই মেয়েটি এসে নীরব তুলনার ধাক্কায় তাকে এক নিমেষে কুৎসিত বানিয়ে দিলে ত্রৈলোক্যর যৌবন-স্বপ্ন-মাখা চোখে। রক্তে দোলা লাগলো তার শিরায় শিরায়, দুলে উঠলো চিত্ত। মেয়েটি যেমন সহসা এসেছিলো তেমনি সহসা চলে গেল, ঝলসে রেখে গেল ত্রৈলোক্যর তরুণ দুটি চোখ আর একটি মন। মনে মনে চীৎকার করে বললে ত্রৈলোক্য, "হে ক্ষণিকা, একবার, শুধু একবার ক্ষণিকের তরে ফিরে তাকাও।" কিন্তু একবারও ফিরে তাকালো না মেয়েটি। এখানে যখন
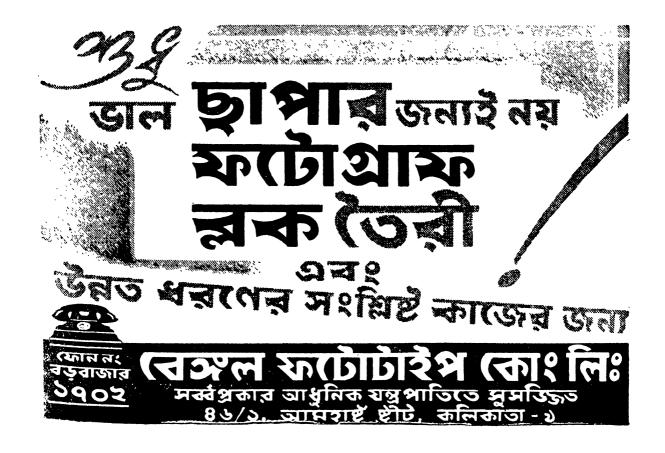
ছিলো তখনও দেখেছে শুধু জানোয়ারকে, ত্রৈলোক্যকে দেখেনি তাকিয়ে।

ত্রৈলোক্যও ধীরে ধীরে পা চালালো উষাকে পিছনে রেখে। মনটা নাম করেছিলো, ঐ মেয়েটি এসে শক্ত সিমেন্টে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে, এক ফোঁটা ঘাসের চিহ্ন নেই সে মনের বুকে, যাতে উষা এসে দন্তস্ফুট করবে।

আবার আরেকটি সহসা-র উদয়। ত্রৈলোক্য শুনলে, "বাবা ত্রৈলোক্য!" তাকালে পিছনে। দেখলে, চিনলে, উষার বাবা ব্যোমকেশ।

ব্যোমকেশ বাবু বললেন, "বাবা ত্রৈলোক্য! তুমি আমার প্রাণের বন্ধুর আপন ভাগ্নে। আমার বড় স্নেহের পাত্র। আমি হলেম তোমার গুরুজন-স্থানীয়। তাই বলি বাবা, বাইরের রূপটাই সব নয় মানুষের, এইটে যেন কখনো ভুলো না।"

এ আক্রমণ অপ্রত্যাশিত। রাত দুপুরের শেয়ার মার্কেটের মতো নীরব রইলো ত্রৈলোক্য। এড়াতে চাইছে, কিন্তু ভদ্রতার না-লেখা আইন বাঁচিয়ে এড়িয়ে যাবার রাস্তা পাচ্ছে না।

আবার বললেন ব্যোমকেশ, "উষা আমার নিজের মেয়ে, জানি আমার মুখে কথাটা ভালো শোনাবে না, তবু বলি—ভগবান ওর ভেতর কী মাধুর্যই যে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন, ভেবে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনে। তুমি আমার আপনার জন বাবা—বন্ধুর ভাগ্নে—তোমায় বলতে বাধা নেই, ওর ভেতরটা যে কি নিখুঁত, কি নিষ্পাপ, কি মধুর, কি সরল, তা তুমি বাইরে থেকে ধারণাও করতে পারবে না।"

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ত্রৈলোক্য। ভয় হলো, মেয়েটি হঠাৎ কখন এদিকেই এসে পড়ে।

ব্যোমকেশ বাবু তার মনের দোলা টের পেয়ে বললেন, "উষা এখন এদিকে আসবে না বাবা, তেমন মেয়েই নয়। তা ছাড়া আমি বলেও দিয়েছি আমি ডেকে না নেয়া পর্যন্ত ঐখানেই জানোয়ার দেখতে থাকবে। মেয়ে আমার মেয়ে তো নয়, যেন ক্যাসাবিয়াংকা। হেঃ হেঃ হেঃ।" ত্রৈলোক্যর মনে হলো বড় মামার হাসির কায়দা নকল করছেন উষার বাবা।

"মেয়েদের বাইরের রূপ, সে যে বড় ঠুনকো বাবা!" বললেন, ব্যোমকেশ বাবু। "আজ যে রূপের রাণী, কাল সে রূপের ভিখারিণী। গোবরপুকুরের তিনকড়ি চাটুয্যের মেয়ে ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী, মেয়ের রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না তিনকড়ির। হলো মায়ের কৃপা। মেয়ে প্রাণে বাঁচলো বটে, কিন্তু সারা মুখ-জুড়ে কালো গভীর বসন্তের ছাপের তলায় রূপ গেল চির-কালের তরে তলিয়ে। ···ধূর্জটি পাকড়াশীর নাম শুনেছো কি না জানি নে; তার মেয়ে সাবিত্রী পাকড়াশী চোখধাঁধানো রূপের জৌলুসে এক ডাকসাইটে বড়লোকের বাগদত্তা পুত্রবধূ হয়ে গেল। বাগদানের দিন তিনেক বাদে হলো ম্যালিগন্যান্ট টাইফয়েড। ভোগালে একুশ দিন, যাবার আগে সারা মাথায় টাক ফেলে দিয়ে চলে গেল। বড়লোকের ছেলেটি বিলেত ভেগে গেল। গিয়ে মেম না কি বিয়ে করলে, তারপর ছেড়ে দাও মেম সায়েব কেঁদে বাঁচি বলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করালে—নগদ অনেকগুলো টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে। সাবিত্রী পাকড়াশী শুনেছি আজো সারা মাথায় কালো রুমাল জড়িয়ে রাখে।···এ ছাড়া হাজার রকম দুর্ঘটনা তো আছেই। তাই বলি, বাইরের রূপের ভরসা কতটুকু? কিন্তু ভেতরের রূপের কোনো মার নেই—মায়ের দয়া বলো, ম্যালেরিয়া-টাইফয়েড-নিউমোনিয়া বলো, দুর্ঘটনা বলো, কিছুই কিছু করতে পারবে না।"

ত্রৈলোক্য বললে "কিন্তু—"

"তারপর ধরো, মেয়েদের বাইরের রূপ ক'দিন? তোমার কাছে বলতে নেই, দু'-চারটি ছেলে-পুলে হতে না হতেই চেহারার সায়রে ডুবুরি নামালেও রূপের খোঁজ মেলে না। বাইরের রূপ আসল ভাঙিয়ে খেতে খেতে ফুরিয়ে যায়। ভেতরের রূপ বেড়ে চলে চক্রবৃদ্ধি সুদে।"

ব্যোমকেশ বাবুকে যেন বলার নেশায় পেয়েছে, বলে চলেছেন অনর্গল।

"ট্রয় পুড়ে ছারখার হয়ে গেল হেলেনের জন্যে।" বলতে লাগলেন তিনি। "অন্তরের রূপ ছিলো না তার, ছিলো শুধু বাইরের রূপ। এই বাইরের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন মেনিলাস্। হায় রে!"

"সেই হেলেন—তোমায় বলতে নেই—প্যারিসের সঙ্গে পালিয়ে গেল! তাই থেকেই হুলুস্থুল কাণ্ড! মেনিলাস্ কি তখন আফশোস করে একবারও বলেনি—'হায়, সুন্দরী বিয়ে না করে কেন সাদাসিধে দেখে বিয়ে করলুম না!···' তারপর ধরো, সুন্দরী মেয়েদের দেমাক। তোমাকে গ্রাহ্যই করবে না; হাজার তাঁবেদারি করেও মন পাবে না, ভক্তি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা। আমার মেজো শালার ভায়রাকে তার সুন্দরী বৌ করে আঙুলের ডগায় নাচিয়ে মারছে কলুর বলদের মতো। বেচারা এক ফোঁটা শান্তি পাচ্ছে না। এ আমার মেজো শালার নিজের মুখে শোনা।"

ত্রৈলোক্যর অমনি মনে পড়ে গেল, একটু আগে দেখা সেই চোখ ধাঁধানো মেয়েটির কথা। এমন কিছু সুন্দরী সে নয়, শুধু উষা পাশে দাঁড়িয়েছিলো বলেই হঠাৎ অতটা চমক লাগাতে পেরেছিল তবু কী দেমাক! ত্রৈলোক্যর দিকে একবার হেলা ভরে চোখ ফেরায়নি সে, যেন তার কাছে জানোয়ারের চাইতে ঢের বেশী তুচ্ছ ত্রৈলোক্য! সেই অপমানের খোঁচার ক্ষতে যে ব্যোমকেশ বাবুর কথার নুণ লেগে জ্বালা ধরে উঠলো। কিন্তু উষা তাকে অপমান দূরে থাক, অসম্মানও করেনি, প্রাণের সারা আবেগ উজাড় করে চেয়েছিলো তার পানে।

"উষা আমার মা-মরা মেয়ে বাবা ত্রৈলোক্য!" বললে ব্যোমকেশ বাবু। বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে এলো তাঁর "বড় অল্প বয়সে মা আমার মাতৃহারা হয়েছে।"

মনের বড় নরম জায়গাটিতে ব্যথার পরশ লাগলো ত্রৈলোক্যর অল্প বয়সে সে-ও মাতৃহারা। মা'র চেহারাও ভালো করে মনে নেই তাঁর। এক নিমেষে জানোয়ার-দর্শন-নিমগ্না উষার ওপর সহানুভূতির একাত্মতা জেগে উঠলো তার প্রাণে। চোখ দুটো উঠলো ছল-ছল করে।

"ওকে মার অভাব ভুলিয়ে রাখবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বাবা ত্রৈলোক্য!" বলতে লাগলেন ব্যোমকেশ বাবু "মা-বাপ দুয়ের ভালোবাসা আমি একা বেসেছি। এ-ও তোমা

আমি বলবো ত্রৈলোক্য, আমি ও মেয়ের ভেতরেই পেয়েছি আমার মাকে। এই বুড়ো ছেলেটাকে মেয়ে আমার কি যত্নই যে করে, সে তোমাকে আর কি বলবো! তাই ওকে একদিন বলেছিলুম, তুই যে দিন স্বামীর ঘর করতে চলে যাবি মা, জানিনে সেদিন তোর এই বুড়ো ছেলের কি অবস্থা হবে। শুনে মেয়ে আমার কি বললে জানো বাবা?"

"কি বললে?" ত্রৈলোক্যর আনমনা আকস্মিক প্রশ্ন।

"বললে, আমি চিরকাল তোমারই কাছে থাকবো বাবা, যাবো না স্বামীর ঘরে। আমি বললেম, দূর পাগলি, তা কি হয়? মেয়েদের সবার বাড়া আপন হলো স্বামী। তোকে তোর স্বামীর পায়ে সঁপে দিয়ে তবে আমার নিশ্চিন্দি, তা নইলে স্বর্গে থেকে তোর মা-ও শান্তি পাবেন না। তোমায় বলতে নেই, ওর মা যে কি সতীলক্ষ্মী ছিলেন তা তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না বাবা! বাইরের রূপ ভগবান তাকে দেননি, কিন্তু অন্তরের রূপে সে আমার সারা জীবন সুধায় ভরে দিয়ে গেছে। আমাদের অফিসের বড়বাবুর স্ত্রীর ছিলো সুন্দরী বলে নাম। বড়বাবু বলতেন, 'তোমায় বলতে নেই ব্যোমকেশ, তোমার বৌঠান্ আমার হাড়-মাস তেলে-ভাজা করে ছাড়ছে। স্ত্রীভাগ্যটা তোমার মতন হলে সুখী হতে পারতুম।' এমনি মায়ের মেয়ে আমার উষা। আমার উষা মাকে তো আমি যার-তার হাতে দিতে পারি নে বাবা! পাত্রটি এমন চাই যার চরিত্র হবে মহৎ, উদার; রুচি হবে মার্জিত; হৃদয় হবে কোমল, নির্মল; বিনয় হবে যার অলংকার, অথচ অভাব থাকবে না আত্মমর্য্যাদা-বোধের; আর সবার ওপর থাকবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যে জীবনে একটা বড় চাকরি করে যাবো। চেহারায়, চাল-চলনে তার থাকবে একটা সুশ্রী শালীনতা, যা দেখবামাত্রই মুগ্ধ না হয়ে থাকা যাবে না। যার গলায় উষার বরমাল্য শোভা পেলে ওর মা স্বর্গ থেকে দেখে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করে পারবে না। এমন পাত্রের জন্য—তোমায় বলতে নেই ত্রৈলোক্য—বিশ্বভুবন খুঁজে বেড়াতেও আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তার দরকার হলো না। যা চেয়েছিলাম তা হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। এখন জানি নে বিধাতার কি ইচ্ছা। জানি নে আমার মা-মরা মেয়েটা এমন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে কি না।"

বলে একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যোমকেশ বাবু। সে দীর্ঘশ্বাস ভেদ করে গেল ত্রৈলোক্য তপাদারের তরুণ মর্মকে। মনে হলো, যেন কোনো করুণ রাগিণীর সকরুণ আবেদনে তার অন্তরাত্মা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাকালে সে উষার দিকে। সে তখনো জানোয়ার দেখছে, দেখা যাচ্ছে না তার মুখ। ত্রৈলোক্য শুনলে তার নিজের কথা। তার ভেতরে এত যোগ্যতা মাথা গুঁজে লুকিয়ে বসে আছে এ তো তার জানা ছিলো না!

খালি মর্য্যাদা কেউ তাকে কোনো দিন দেয়নি! চায়ে-ডোবানো বিস্কুটের মতো ভিজে নরম হয়ে উঠলো ত্রৈলোক্যর মন।

ব্যোমকেশ বাবু বললেন, "একটা কথা তোমায় বলিনি ত্রৈলোক্য—বলা হয় তো ভালোও দেখায় না—মেয়ে আমার গৌরবর্ণ পায়নি বটে, কিন্তু দরদী মন দিয়ে একবার তার মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখেছো বাবা?"

ত্রৈলোক্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, "আজ্ঞে না, তেমন মন দিয়ে দেখিনি।" সত্যিই দেখেনি তেমন মন দিয়ে, একবার চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারার ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গিয়েছিলো চোখ।

ব্যোমকেশ বাবু বললেন, "একবার যদি অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে ওর মুখের পানে তাকিয়ে দেখ ত্রৈলোক্য, তাহলে বুঝতে পারবে ভগবান ওকে গৌরবরণ দেননি, কিন্তু কি দিয়েছেন? এ তো আর ঢেঁকি নয় বাবা, যে অনুরোধে গিলবে। তবু অনুরোধ করি, যাও তুমি একবারটি আমার মা-মরা অভাগী মেয়েটার মুখের পানে ভালো করে তাকিয়ে দেখে এসো। উষা জানোয়ার দেখছে, তুমিও যেন জানোয়ার দেখছো। ওকে আমি এখনো কিছু জানাইনি বাবা! দ্বিধা-সংকোচ কিছু কোরো না তুমি। আমি এই গাছের আড়ালে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি।"

গাছের আড়াল হলেন ব্যোমকেশ বাবু। আবার চলে গেল সেখানে ত্রৈলোক্য, যেখানে তখনো জানোয়ার দেখছে উষা। দাঁড়ালো জানোয়ার দেখবার ছল করে, উষার মুখের দিকে তাকাতেই ছল-ছল করে উঠলো দুটি চোখ। আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! আগের বার তো উষার এ মুখ দেখেনি ত্রৈলোক্য! এবারে উষার মুখে রঙ ধরিয়েছে পশ্চিমাকাশের গোধূলি আলো; সূর্য্য ডুবি-ডুবি করছে অস্তাচলে, ভাবছে যাবার আগে একবার রাঙিয়ে দিয়ে যাই। তা, রাঙিয়ে দিলে বই কি! উষার গোধূলি-রাঙা মুখ দেখে রঙীন্ হয়ে উঠলো ত্রৈলোক্যর মন। কে বলে রূপ নেই উষার? মুগ্ধ হয়ে গেল ত্রৈলোক্য। মনের আড়ালে শুনতে পেলে আগামী রেলগাড়ীর আওয়াজ।

তার পর জীবন-সাগরের নতুন তরঙ্গে এক ভেলায় চড়ে ভেসে পড়লো ত্রৈলোক্য আর উষা। রেলের চাকরিও হলো ব্যোমকেশ-জামাতার। তার পর এ-ষ্টেশন সে-ষ্টেশন বহু ঘুরে অবশেষে তাঁর জীবনের অন্তিম ষ্টেশনে এসেছেন সস্ত্রীক ত্রৈলোক্য তপাদার। এই সুদীর্ঘ কালের ভেতর একটানা দুটি দিনও ভালো যায়নি উষা দেবীর।

"চিড়িয়াখানার সেই গোধূলির তারিখ আমার জীবনের ক্যালেণ্ডারে আজো লাল তারিখ হয়ে আছে।" বলেন ষ্টেশন-মাষ্টার ত্রৈলোক্য তপাদার। জানিনে 'লাল' বলতে উনি 'কালো' বোঝাতে চান কি না।

কাঠের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে মনে পড়ছিলো এই সব কথা, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঢঙে, টুকরো টুকরো করে তপাদারের মুখে শোনা আর মনের নোট-বইতে টুকে রাখা।

* * * *

"কি ভাবছো ধনপতি ভায়া?" পিঠে মৃদু চাপড় খেয়ে শুনতে পেলুম। প্রশ্নকর্তা ষ্টেশন-মাষ্টার ত্রৈলোক্য তপাদার।

বললুম, "ত্রৈলোক্যদা' যে? বৌদি কেমন আছেন?" এক ফোঁটা আগ্রহ ছিলো না জানবার। তবু।

"একটু দড়ি-ছেঁড়া হাওয়া খেতে বেরিয়েছি ধনপতি।" বললেন ত্রৈলোক্যদা'। "দু'দিন বাদে যখন পেন্‌শন্ জোর করেই ঘাড়ে চাপবে তখনকার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি, একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে। নইলে একবারে হঠাৎ পুরো বিশ্রাম সইবে না, হাঁফিয়ে মারা যাবো।"

বিদায়ের ঘণ্টা ঢঙ্ ঢঙিয়ে উঠলো ষ্টেশনে। কান-কাঁদানো বাঁশি বাজিয়ে প্ল্যাটফরম্ ছেড়ে ট্রেণ চলে গেল আমাদের তলা দিয়ে। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দেখা গেল কিছুক্ষণ। আমারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে ষ্টেশনের সর্বাধিনায়ক ত্রৈলোক্য তপাদার—খুশী মত ট্রেণ আটকে রাখতে বা ছেড়ে দিতে পারেন যিনি। কিন্তু খেয়াল-খুশীতে ট্রেণ আটকাননি ছাড়েননি কখনো। ডিউটিতে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ পাণ থেকে এক ফোঁটা চুণ খসান না। চুলচেরা হিসেব।

"এই সেতুর তলা দিয়ে কত ট্রেণ এসেছে, কত ট্রেণ গেছে।" বললেন ত্রৈলোক্যদা'। "আরো কত ট্রেণ আসবে-যাবে। আমরা যখন আর থাকবো না তখনো—"

"তখন এই রেল-লাইনও থাকবে কি না কে জানে ত্রৈলোক্যদা'? ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।"

"মাথা যে আপনি ঘেমে ওঠে হে ধনপতি!" হেসে বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "মালগাড়ী স্বর্গে গেলেও মাল টানে। ষ্টেশন-মাষ্টারী মগজের ভেতর যে হরদম ট্রেণ ছুটছে। কুইনিন্ খেলে যেমন মাথা ভোঁ-ভোঁ করে, এও তেমনি। এইটে আস্তে আস্তে ছাড়াবার চেষ্টা করছি ধনপতি! কিন্তু পারছি নে, আর পারছি নে বলে দুঃখও নেই। বিধাতার ইচ্ছেও নয় যে পারি। তাই তো ঐ বাড়ীখানা আমায় কিনিয়েছেন।"

ষ্টেশনের উল্টো দিকে সহরতলীর সীমান্তে রেল-লাইনের ধারে ছোট্ট বাড়ীখানা। সস্তায় কিনেছেন। কিনেছেন যে এইটে বলেন, সস্তায় কিনেছেন সেটা বলেন না কাউকে। আমি জানি। ঐ বাড়ীর ছাত থেকে আর খোলা জানালা থেকে ট্রেণের যাত্রীদের চেহারা প্রায় স্পষ্ট করে চেনা যায়; ট্রেণের চলার আওয়াজ মৃদু সাড়া জাগায় বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে।

বাড়ীটি ভাড়া দিয়েছেন জানি, খোঁজ করিনি কাকে দিয়েছেন। জাহাজের ব্যাপারীর আদার খবরে দরকার কি? এইটুকু শুধু জেনেছি, যাঁরা ভাড়া নিয়েছেন তাঁরা তিনটি প্রাণী—স্বামী, স্ত্রী আর একটি মাত্র মেয়ে। বাড়ীর আট আনাই তাঁদের পক্ষে প্রচুর: বাকী আট আনায় যখন খুশী তখন এসে থাকতে পারেন পিসী সহ সস্ত্রীক বাড়ীওয়ালা ত্রৈলোক্য তপাদার।

"রেলের চাকরি দেখতে দেখতে অনেক দিন হয়ে গেল ধনপতি!" বললেন ষ্টেশন-মাষ্টার। "চাকরি-রসে মশগুল হয়ে তখন টেরই পাইনি দিন-রাত কোথা দিয়ে যাচ্ছে! দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই খেটে গেছি। কি মনে হয়েছে জানো? মনে হয়েছে আমি কাজ থেকে একটু ছুটি নিলে, কাজে এক ফোঁটা ঢিল্ দিলে তামাম দেশের রেল-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে। তাই টাইমের ওপর ওভারটাইম খেটেছি। জীবন ভুলে রেলের কাজেই মেতে থেকেছি। তোমার বৌদির কথাও ভাবতে বড়ো একটা সময় পাইনি। এখন ভাবলেও অদ্ভুত লাগে ধনপতি!"

বললেম, "অদ্ভুত যাকে ভাবছেন ত্রৈলোক্যদা', তাই তো স্বাভাবিক।"

ত্রৈলোক্যদা' বললেন, "কাজ থেকে যখন শেষ ছুটি নেবো ধনপতি, তখনো রেলগাড়ী এমনি চলবে, ত্রৈলোক্য তপাদার নেই বলে বন্ধ থাকবে না। চলো না একটু সহরতলীর রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে গল্প করা যাক। আজ যেন হঠাৎ গল্পের নেশা জেগেছে প্রাণে।"

এই নেশাটি বরাবরই আমার সব চেয়ে বেশী পছন্দ।

বললেম, "চলুন ত্রৈলোক্যদা'।" কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেম রেল-লাইনের ওপারে সহরতলীর পয়লা রাস্তায়।

নেমেই ত্রৈলোক্য তপাদার বললেন, "তুমি যে আজ এমনি সময়ে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলে ধনপতি, এ যেন বিধাতারই অনুরোধে। বেড়াতে বেরিয়েছি, বিধাতাই সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন তোমাকে। একা বেড়াতে প্রাণ আমার হাঁফিয়ে উঠতো। গোটা জীবনটাই তো প্রায় একা কাটাতে হলো ধনপতি।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস-মার্কা হাসি হাসলেন তিনি। হায় রে জীবনের সেই গোধূলি লগ্ন! হায় রে তার লম্বা জের! পশ্চিমাকাশে গোধূলি রঙের দিকে তাকিয়ে এই দুটি 'হায় রে' পাশাপাশি মনে পড়লো।

একটু যেতেই ত্রৈলোক্য তপাদারের কেনা বাড়ীটার দোতলা থেকে বাইরে উঁকি মেরে এক শ্যামবর্ণ মোটা ভদ্রলোক বললেন, "মাষ্টার মশাই যে। আসুন এক পেয়ালা চা খেয়ে যান। আরে আরে, ধনপতি বাবু না? আসুন আসুন, আপনিও খেয়ে যান এক পেয়ালা।"

ত্রৈলোক্য তপাদারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানতেই তিনি প্রায় কানে কানে বললেন, "বিশ্বম্ভর রায়, শর্ব্বরী রায়ের বাবা। আমার ভাড়াটে। খাসা লোক।"

আবার বিশ্বম্ভর বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল একদিন তাঁকে লেকের ধারে বেড়ানে-ওয়ালা বৃদ্ধদের দলে বেড়াতে দেখেছিলেম বটে; তখন মাথায় ছিলো গান্ধী টুপি, এখন আছে শুধু টাক। আজ মাথায় টুপি নেই বলেই হয়তো চট্ করে চিনতে পারিনি। আশ্চর্য্য! কত সহজেই না মানুষকে না-চেনা যায়!

বললেম, "চলুন না ত্রৈলোক্যদা', উনি যখন এত করে বলছেন। চা খাওয়াও হবে, সেই সঙ্গে আপনার বাড়ীটাও দেখা হবে। যার বাহির দেখেছি তার ভেতরও দেখবো।"

ধাপ্পা, ধাপ্পা, স্রেফ ধাপ্পা। আগ্রহ আমার চায়ের জন্যেও নয়, বাড়ীর ভেতরটা দেখার জন্যেও নয়। আমি চাইছিলেম ৺প্রজ্ঞাপারমিতার সহপাঠিনী শর্ব্বরী রায়কে দেখতে। জলবসন্ত রোগশয্যায় একদা ৺প্রজ্ঞাপারমিতার শুশ্রূষা-ধন্যা হয়েছিলো যে শর্ব্বরী, ইংরাজীর অধ্যাপক শান্তনু সেনের রাত জেগে আপন হাতে তৈরী করা নোট (৺প্রজ্ঞাপারমিতার জন্যে—শুধুই ৺প্রজ্ঞাপারমিতার জন্যে) নিজে এক লাইনও না পড়ে যে শর্ব্বরীকে দিয়ে দিয়েছিলো ৺প্রজ্ঞাপারমিতা। রূপহীনতায় অপরূপা সেই মেঘবর্ণা শর্ব্বরী রায়।

"চলো।" বললেন ষ্টেশন-মাষ্টার ত্রৈলোক্য তপাদার। চললাম। নিজেই নেমে এসে দুয়ার খুলে দিলেন বিশ্বম্ভর রায়। গান্ধী টুপিহীন টেকো মাথা। প্রথমে যে তাঁকে চিনতে পারিনি সেটা টের পেয়েছিলেন, কিন্তু সে জন্যে কোনো অনুযোগের আভাস মাত্র নেই তাঁর মৃদু অভ্যর্থনা-মুখর হাসিতে। বললেন "চলুন একেবারে ছাতে চলে যাই।"

ত্রৈলোক্য তপাদার বললেন "চলুন।" তাঁর নিজের বাড়ীতে আজ ভাড়াটের অতিথি তিনি।

দোতলা থেকে ছাতে উঠবার সিঁড়ির পয়লা ধাপে পা ফেলে বিশ্বম্ভর বাবু হেঁকে বললেন, "ছাতে তিন পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিস্ তো মা শর্ব্বরী, চাঁপার মাকে দিয়ে।"

এক সুখী পরিবারের ছবি!

সব হাঁসিরই একটা ইতিহাস আছে। আমার পরিবারের সকলের মুখের হাঁসিরও একটা বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু এখনকার মতো চিরদিনই এদের স্বাস্থ্য এত ভালো ছিল না।

কয়েক মাস আগেও আমার স্বামী প্রায়ই অসুখে ভুগতেন, যার জন্য তাঁর আয় কমে যেতে লাগলো। তার উপর আমার তিন ছেলে-মেয়ের শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তাদের ওজন কমতে আরম্ভ ক'রেছিল। ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হওয়াতে কথা-বার্ত্তায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি জিজ্ঞাস ক'রলেন, 'মাপ ক'রবেন, কিন্তু আপ-নারা রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ কি করে কেনেন বলুন ত? হয়ত তার থেকেই আপনার পরিবারে অসুস্থতা আসছে।'

তিনি শুনে সন্তুষ্ট হবেন ভেবে আমি বললাম যে আমি সর্ব্বদাই রান্নার জন্য সবচেয়ে ভালো স্নেহপদার্থ খোলা অবস্থায় কিনি। 'যতো ভালো স্নেহপদার্থই হোক', শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'খোলা অবস্থায় থাকলে তাতে সর্ব্বদাই ময়লা হাত লাগতে পারে ও তাতে মশা-মাছি পড়তে পারে আর তা খেয়ে অসুখ ক'রতে পারে।'

তিনি তক্ষুনি আমাকে ডাল্ডা বনস্পতি কিনতে বললেন। তার প্রথম কারণ ডাল্ডা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল আর শীলকরা টিনে সর্ব্বদা বিক্রী হয় বলে তাতে রোগের বীজাণু ঢুকতে পারে না। আর ডাল্ডা বনস্পতির প্রস্তুতকারীরা অতি উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বাজারে বের করেন না। আমি শুনেই বুঝলাম যে শিক্ষয়িত্রী ঠিক কথাই বলছেন। আর আমার পরিবারের সকলেই ডাল্ডায় রান্না খাবার খেয়ে কি খুসী! কারণ ডাল্ডা বনস্পতি সব খাবারের নিজস্ব স্বাদগন্ধ ফুটিয়ে তোলে। শীলকরা টিনে ডাল্ডা বনস্পতি কিনলে আপনি যে তাজা, বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর জিনিস পাচ্ছেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ডাল্ডা বনস্পতিতে রান্না খেয়ে কেমন ক'রে আমার পরিবারের সকলে দিনভোর স্বাস্থ্যের হাসিখুসীতে কাটায় তার প্রমাণস্বরূপ এই ছবিটি আমি কাছে রাখবো। আপনার পরিবারেরও এমন ছবি যদি চান তো ডাল্ডা বনস্পতি দিয়ে সব রান্না করুন। আজই এক টিন কিনুন।

১০, ৫, ২ ১ ও ১/২ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডাল্ডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুন:
দি ডাল্ডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

গাছ মার্কা টিন
দেখে নেবেন

ডাল্ডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো—খরচ কম

HVM, 220-X52 BG

নেপথ্যে শর্ব্বরীর সুকণ্ঠ শোনা গেল "দেবো বাবা!" ছোট্ট দু'টি কথা, অতি সহজ তার ভাবার্থ: ছাতে সে তিন পেয়ালা চা পাঠাবে চাঁপার মাকে দিয়ে। অথচ কী অদ্ভুত তার ব্যঞ্জনা, কি আশ্চর্য্য তার সুরের বেশ! যেন পাকা হাতে তৈরী তানপূরোর নিখুঁত করে সুরে-বাঁধা জুড়ির তার দু'টিতে জোড়া ঝংকার। ছাতে উঠেও কানের পাশে গুঞ্জন করে বেড়াতে লাগলো।

চা পাঠাবে শর্ব্বরী, চাঁপার মা'র হাতে। আমার এইটে বড়ো ভালো লাগে—এই যে বাড়ীর ঝি-কে ঝি-নামে বা ডাক-নামে না ডেকে তার সন্তানের মা বলে ডেকে তার মাতৃত্বকে মর্য্যাদা দেওয়া। এ যেন বলা "ওগো, তুমি যে বাসন মাজো, ঘর ঝাঁট দাও, ফরমাস্ খাটো, দরকার হলে ছাতে চা পর্য্যন্ত দিয়ে যাও, এগুলো বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে তুমি মা।"

কিন্তু একটু পরে একটা ট্রে'র ওপর সাজিয়ে তিন পেয়ালা চা আর তিন প্লেট না'রকেলের তৈরী সন্দেশ নিয়ে যে এলো তাকে মা বলে মনে হলো না। ত্রৈলোক্য বাবু স্নেহ-ছল-ছল স্বরে বললেন, "তুমি নিজেই নিয়ে এলে মা?"

ভালোই হলো। শর্ব্বরীকেই দেখতে চেয়েছিলেম, চাঁপার মাকে নয়।

শর্ব্বরী বললে "হাঁ কাকাবাবু। চাঁপার মা'কে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলুম, চাঁপার কি একটা যেন ব্রত আছে। তা ছাড়া, চা খেয়ে আপনাদের যত আনন্দ, চা খাইয়ে আমাদের আনন্দ তার চেয়ে ঢের বেশী কাকাবাবু!"

ত্রৈলোক্য বাবু ষ্টেশন-মাষ্টারী ভুলে হেসে বললেন, "আনন্দ কি ফিতে বা দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে মাপা যায় রে পাগলী? তবে, এইটে বলতে পারি যে, চা খেয়ে আনন্দ দিতে ত্রৈলোক্য তপাদার কখনো গররাজি নয়, বিশেষ করে সঙ্গে যদি এ-রকম উপাদেয় পদার্থ থাকে।"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন "শর্ব্বরীর নিজের হাতের তৈরী।" তার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এ জিনিষটা বড় ভালবাসত প্রজ্ঞাপারমিতা। এই তো সেদিনও এসে কত খুশী হয়ে খেয়ে গেছে শর্ব্বরীর সঙ্গে। হায় রে! প্রজ্ঞাপারমিতা আজ কোথায়?"

ছাতের ওপর বিছানো মাদুর চেপে বসেছি তখন আমরা তিন জন, আর আমাদের সামনে চায়ের পেয়ালা আর প্লেট নিপুণ হাতে সাজিয়ে দিয়েছে শর্ব্বরী রায়। তার কালো করুণ মুখ আরও করুণ হয়ে উঠলো ৺প্রজ্ঞাপারমিতার কথা মনে পড়ে যাওয়ায়। বোধ করি,উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই কি একটা কাজের অস্ফুট অজুহাতে বিদায় নিয়ে নীচে নেমে গেল শর্ব্বরী—মুখ-জোড়া তার বসন্তের দাগ। মুখের দাগের মতো তার মনের দাগাও বুঝি কোনো দিন মিলাবে না।

"শর্ব্বরীর জল-বসন্তের কি সেবাটাই করেছিল প্রজ্ঞা! ভাবতেও পারা যায় না।" বললেন বিশ্বম্ভর বাবু। "তখন আমরা এ বাড়ীতে ছিলুম না, তাই দেখতে পাননি ত্রৈলোক্য বাবু! আমায় অশেষ ঋণী করে রেখে মেয়েটা অকালে পরপারে চলে গেল।"

ত্রৈলোক্য বাবু বললেন "কার যে কখন কাল, আর কার কখন অকাল, তা তো আর আমাদের মতো ক্ষুদ্র জীবের বুঝবার কথা নয় বিশ্বম্ভর বাবু! দুনিয়াটাকে এমন গোলক-ধাঁধা বানিয়ে রেখেছেন ভগবান, যে যত ভাবা যায় ততই হাবা হয়ে যেতে হয়। তাই তো আজ-কাল আর ভাবি নে, দেখে যাই, শুধু দেখেই যাই।"

আমি বললেম, "৺প্রজ্ঞা দেবীকে দেখবার সুযোগ আমার হয় নি বিশ্বম্ভর বাবু, কিন্তু ওঁর কথা অল্প দিনের ভেতরই অনেক শুনেছি, আর শুনে মুগ্ধ হয়েছি।"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "দেখলে যা হতেন ধনপতি বাবু, মুগ্ধ তার কাছে ছেলে-মানুষ।" তাকালেন ত্রৈলোক্য তপাদারের দিকে। মানে, কি বলেন ত্রৈলোক্য বাবু?

"'মুগ্ধ' বলে সে ভাব বোঝানো আর গোটা চৌবাচ্চার জল এই পেয়ালায় ভরা একই কথা।" বললেন অ-ষ্টেশনমাষ্টারী ভাষায় ত্রৈলোক্য তপাদার। "ওকে দেখেছি আপনার এই বাড়ীতে—আমার বাড়ীতেও বলতে পারেন—ওর জীবনের শেষ প্রান্তে। তখন কেমন করে জানবো এমন হঠাৎ সে চলে যাবে? জানি নে সে নিজে জেনেছিলো কি না; যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। বিশ্বম্ভর বাবু ঠিক বলেছেন ধনপতি! দেখলে যা হতে, মুগ্ধ তার কাছে নাবালক।"

"তাই শর্ব্বরী দেবী'র সঙ্গে ভালো করে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিলো।" বললেম বিশ্বম্ভর বাবুকে। "ওঁর মুখে অনেক কিছু শুনতে পেতেম।"

গোপন কথা বলবার ভঙ্গীতে মুখ এগিয়ে এনে বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "আলাপ করবার মতো অবস্থা নয় এখন শর্ব্বরীর। ওর মনের ভেতর এখন প্রবল দ্বন্দ্ব চলেছে। বাপের হৃদয় দিয়ে ওর হৃদয়ের সেই প্রচণ্ড ঝড়ের আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছি। অথচ বাইরে সে শান্ত, গম্ভীর। এই তো আপনাদের সামনে নিজের হাতে এসে সে চা দিয়ে গেল। ওর অন্তরের ঝড়ের খবর আভাসেও টের পেলেন কি?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললেম, "কই, না তো!"

ত্রৈলোক্য তপাদার শুধালেন, "কেন ওর হৃদয়ে এই ঝড়?"

"কাউকে বলবেন না যেন।" ব'লে বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "শিল্পী কিশোর চৌধুরীর নাম শুনেছেন তো?"

শুনেছেন, ষ্টেশন-মাষ্টার ত্রৈলোক্য তপাদার পর্য্যন্ত শুনেছেন কিশোর চৌধুরীর নাম, দেখেছেন তাঁকে, কথাও কয়েছেন তাঁর সঙ্গে। ষ্টেশন থেকে ঢিল ছুঁড়ে ফেলা যায় তাঁর বাড়ীর প্রাঙ্গণে, যার দক্ষিণে তাঁর ষ্টুডিয়ো। ষ্টেশনের কর্ম্মিবৃন্দ এ বছর থেকে ষ্টেশনের পশ্চিমের মাঠে সামিয়ানা দিয়ে আকাশকে আড়াল করে বাণী-বন্দনা সুরু করেছেন; বন্দনা কমিটির সভাপতি (পদাধিকার বলে) ষ্টেশন-মাষ্টার ত্রৈলোক্য তপাদার! বাণী-বিগ্রহের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন কিশোর চৌধুরী। অনুরোধে ঢেঁকি গেলেননি, আগ্রহের মর্য্যাদা দিয়েছেন হৃদয় ঢেলে। দেশ-বিদেশের খ্যাতিতে আকণ্ঠ ডুবে আছেন বলে তুচ্ছ ষ্টেশনের পুজো-কমিটির অন্তরের আহ্বানকে তুচ্ছ করেননি তিনি। সেই সূত্রে কিশোর চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ত্রৈলোক্য তপাদারের।

অদ্ভুত শিল্পী এই কিশোর চৌধুরী—বয়স অল্প, কিন্তু প্রতিভার সীমা নেই! আর্ট কলেজ থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাশ করে বেরিয়েছে; শোনা গেছে, কলেজের শিক্ষকরাই বলেন,

কিশোরকে যত শিখিয়েছেন তার চেয়ে. কিশোরের কাছে তাঁরা শিখেছেন বেশী। ডিগ্রী পেয়েছে সে, কিন্তু ডিগ্রীর ছাপ পড়েনি তার ছবিতে ; প্রত্যেকটি ছবিতে জ্বল-জ্বল করছে তার প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর। ছবি-প্রদর্শনীতে কিশোরের ছবি গেলে ম্লান হয়ে যায় অন্য শিল্পীর ছবি।

ছবির ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি নেই যাদের অর্থাৎ আমাদের ভাষায় ছবির যারা কিচ্ছু বোঝে না, তারাও কিশোর চৌধুরীর যে ছবি দেখে মুগ্ধ চোখ সহজে ফেরাতে পারে না, ছবির যাঁরা অনেক কিছু বোঝেন, সেই সব ছবি-ব্যাকরণ-বিশারদ পণ্ডিতরাও সেই ছবি দেখে ব্যাকরণসম্মত পণ্ডিতী বাহবা না দিয়ে পারেন না। চিত্র-শিল্পের জগতে বাঘ-ছাগলকে একসঙ্গে এক ঘাটের জল খাইয়েছে শিল্পী কিশোর চৌধুরী!

কিশোরের ছবি প্রদর্শন করে ধন্য হয়েছে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লণ্ডন, প্যারিস, রোম, নিউইয়র্ক, বার্লিন, কোপেন-হেগেনের বহু চিত্র-প্রদর্শনী। কিন্তু কিশোরের অতৃপ্ত হৃদয় আজও হাহাকার করছে, আজ পর্য্যন্ত একটিও ভালো ছবি শিল্প-জগৎকে সে উপহার দিতে পারলে না বলে।

কিশোর চৌধুরীর ব্যাংক অ্যাকাউণ্টে বছরে অনেকগুলো মোটা চেক জমা হয়; সেগুলো আসে রাজা-মহারাজা-নবাব-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, তার আঁকা ছবির বিনিময়ে। বেচবার জন্যে তত লালায়িত নয় কিশোর, কিনবার জন্যে যত লালায়িত এঁরা। কিশোর চৌধুরীর আঁকা ছবি মোটা দামে কিনে বাড়ীতে রাখাটা 'কালচারওয়ালা' অভিজাত বড়লোক মহলে প্রায় আবশ্যিক ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে।

সোজা কথায় অর্থ, যশ আর সম্মান যেন পাল্লা ধরে পায় লুটোতে যাচ্ছে কিশোর চৌধুরীর, কিন্তু কিশোর চৌধুরীর সেদিকে নেই এক ফোঁটা খেয়াল বা আগ্রহ।

বললেম, "কিশোর চৌধুরীর নাম যে না শুনেছে সে না শুনলেও দুনিয়ার কিছু যাবে-আসবে না বিশ্বম্ভর বাবু!"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "এই কিশোর চৌধুরীর সঙ্গেই শর্ব্বরীর বিয়ে সেমি ফাইন্যাল পাকা হয়ে আছে। ফাইন্যাল পাকা হয়ে যায় শর্ব্বরী মত দিলে।"

"অ্যাঁ:!!" বলে অবাক হয়ে রইলেম আমি। কিন্তু এক টুকরো বিস্ময়ের মেঘ দেখলেম না ত্রৈলোক্য তপাদারের মুখের আকাশে। তিনি যেন জানেন এইটেই পরম স্বাভাবিক, আর জানেন মত দেবে শীগ্‌গিরই শর্ব্বরী, ভাববার কিছু নেই। একটি পরম নির্লিপ্ত চুমুক দিলেন চায়ের পেয়ালায়।

মনে পড়ে গেল ত্রৈলোক্য তপাদারের জীবনের সেই গোধূলি লগ্নের কথা। হয়তো তেমনি কোনো লগ্ন এসেছিলো রূপের পূজারী রূপবান কিশোর চৌধুরীর জীবনে, আর সেই লগ্নের
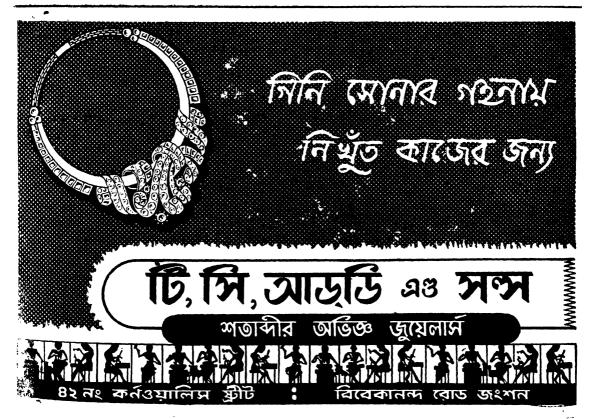
আলোয় ঢেকে গিয়েছিলো শর্ব্বরী রায়ের কালো মুখের কালিমা আর বিগত বসন্তের পিছে-রেখে-যাওয়া পদচিহ্ন।

"আমার এ বিয়েতে পুরো মত আছে, নেই কোনো দ্বিধা, শংকা বা সংকোচ। প্রথম যখন কিশোর আমায় বললে, তখন এই তিনটেই ছিলো বটে, কিন্তু এখন আর নেই।" বললেন বিশ্বম্ভর বাবু। "আমি ষোলো আনা বিশ্বাস করি এ বিয়ে হলে কিশোর সুখী হবে। আর সেইটেই তো বড়ো কথা ; তা নইলে আমার মেয়েটার সারা বাকী জীবনটা যে দুঃখে ভরে উঠবে।"

আমি বললেম, "কিন্তু—"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "হাাঁ, 'কিন্তু' যে একটা আপনার মনে জাগবে, তা আমি জানতুম ধনপতি বাবু! সেটাই জেগেছে শর্ব্বরীর মনেও। আর সেই জন্যেই ওর মনের ভেতরে চলছে দুরন্ত সাইক্লোন। ক্লান্ত হয়ে আসুক সে সাইক্লোন, কমে আসুক তার দাপট, তখন বোঝাতে চেষ্টা করবো শর্ব্বরীকে। এখন ও বুঝতে পারবে না, বোঝাতে গেলেই না-বোঝার বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠবে তার। আশ্চর্য্য রূপ আছে কিশোর চৌধুরীর, রূপোরও কিছু কমতি নেই, সারা ভুবন জুড়ে তার ছবির জয়-জয়কার! ওর গলায় বরণমালা দেবার জন্যে অনেক সুন্দরী বড়লোকের মেয়ে হাত বাড়িয়েই আছে। বলবো কি আপনাকে, ধনপতি বাবু, এগিয়ে আসা অমন অনেক মালা সে সবিনয় দৃঢ়তায় প্রত্যাখ্যান করেছে। শর্ব্বরী ভাবছে, সে কেন আসবে পাণি প্রার্থনা করতে তার মতো কালো মেয়েকে, যার রূপ নেই, নেই কোনো প্রতিভা, আর যার বাপের সম্বল এক রোগা পেনশ্যন্ আর একটা ছোট্ট জীবন-বীমা? শর্ব্বরী ভাবছে হয় তার মাথা খারাপ হয়েছে, না হয় এ তার নির্মম ঠাট্টা। তাই কিশোর যত এগোচ্ছে, শর্ব্বরী ততই পিছিয়ে যাচ্ছে, মত দিতে পারছে না। হাতের সামনে তার এগিয়ে এসেছে অমৃত ফল, এমন আশাতীত অবিশ্বাস্য ভাবে, যে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে ভরসা পাচ্ছে না শর্ব্বরী। তার ভয়, হাত বাড়াতে গেলেই অমৃত ফলটা তাকে উপহাস করে পিছে সরে যাবে, থেকে যাবে শুধু হাত-বাড়ানোর কাঙালপণা।"

দম ফুরিয়ে গিয়ে হাঁফাতে লাগলেন বিশ্বম্ভর বাবু।

আমি বললেম, "শর্ব্বরী দেবীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কোথায় কিশোর চৌধুরীর?"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন "কিশোর চৌধুরীর ছবির প্রদর্শনীতে। দেখতে গিয়েছিলো প্রজ্ঞাপারমিতা, শর্ব্বরীকে নিয়ে। সহপাঠিনীদের ভেতর শর্ব্বরীকেই প্রজ্ঞা ভালোবাসতো সবার চাইতে বেশী।"

"সেখানে শর্ব্বরীকে দেখে মুগ্ধ হলো কিশোর?"

"শর্ব্বরীকে দেখে নয়, প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখে।" বললেন বিশ্বম্ভর বাবু। "সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়—বুঝতে পারতেন যদি প্রজ্ঞাকে একটি বারও দেখতেন আপনি। প্রজ্ঞাপারমিতার স্বপ্নে ছেয়ে গেল তার মন। কিন্তু চলে গেছে প্রজ্ঞা, হারিয়ে গেছে কোন্ অসীমায়। হারিয়ে যাওয়া প্রজ্ঞার স্বপ্ন সে দেখছে শর্ব্বরীতে, যে ছিলো প্রজ্ঞার প্রিয়তমা সখী। প্রজ্ঞাকে দেখে যে রং ধরেছিলো চোখে, আপন চোখের সেই রং শর্ব্বরীর ওপর ফেলে শর্ব্বরীকে দেখেছে কিশোর চৌধুরী। আর দেখে মুগ্ধ হয়েছে। শিল্পীর চোখই আলাদা কি না! আমাদের চোখে যার রূপের বালাই নেই, শিল্পীর চোখে সেই অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। এতে আমি আগে যদি বা সন্দেহ করতুম, কিশোরের মুখে সব শোনার পর এখন আর করিনে।"

ছাত্র যেন বিশ্বম্ভর বাবু, পড়া মুখস্থ বলে ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মাষ্টারের কাছে। তবু খানিকটা ভয় যেন থেকে গেছে, মাষ্টার মশাই জেরা করলেই হয়তো ঠেকে যাবেন।

জেরা করতে মন চাইলো না। রূপের ভক্ত শিল্পী ৺অপরূপার রূপহীনা সখীর বাপকে শ্বশুর বানাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, আর সেই ক্ষ্যাপামি সময়ের ধোপে টিক্‌বে, এই ভেবে তাঁর মনের কুঞ্জে আনন্দের কোকিল গান গেয়ে ওঠে তো উঠুক, আমার কি দরকার তার গান থামিয়ে? ছেলেমানুষ, নিতান্তই ছেলেমানুষ বিশ্বম্ভর বাবু, বলে উঠলো আমার মন। আশ্চর্য্য হবার নেই, জীবনের শেষের সীমান্তে এসে এই তো তাঁর দ্বিতীয় শৈশব।

কিন্তু ছাতের আসরের শেষে নামবার পথে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "এই ঘরে পদার্পণ করুন, একখানা জিনিষের মতো জিনিষ দেখাবো। জুতো বাইরে রেখে আসবেন দয়া করে ; এটা আমার শোবার ঘর কি না!"

ঘরে ঢুকে বিজলী বাতির বোতাম টিপে দিলেন তিনি। অন্ধকারে এলো আলো। ঢুকে গেলেম ভেতরে। দেখালেন, দেয়ালের হুক থেকে ঝুলছে ফ্রেমে-বাঁধানো একটি মেয়ের ছবি। মেয়েটি শর্ব্বরী রায়। একটু আগে ছাতে চা দিয়েছিলেন যিনি, বিশ্বম্ভর-কন্যা হুবহু সেই শর্ব্বরী। একেবারে হুবহু বলে মনে হয়, ভুল হবার যো নেই। ছবির ব্যাকরণ বুঝিনে, কিন্তু এ ছবি দেখে চোখ ফেরাতে মন চট্ করে রাজী হলো না। অথচ এ সেই শর্ব্বরীরই ছবি, যাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে আপত্তি হয়নি।

ত্রৈলোক্য তপাদার বললেন, "ফোটো থেকে এনলার্জ করালেন বুঝি? খাসা হয়েছে।"

জব্দ করা খুশীর হাসি হাসলেন বিশ্বম্ভর বাবু। বললেন, "ফোটো থেকে এনলার্জ কি মশাই? স্রেফ্ মন থেকে হাতে আঁকা। মডেলের মতো সাম্‌নে বসিয়েও নয়। অদ্ভুত! অদ্ভুত! এমন ছবিও যে হতে পারে এ আমি কোনো দিন ভাবতে পারিনি। কিশোর চৌধুরীর মুখের কথায় আমি আগে বিশ্বাস করিনি। ওর হাতে-আঁকা এই ছবি পেয়ে এখন আর অবিশ্বাস করিনে। যার ছবি মনে গাঁথা হয়ে না যায় তার ছবি এমন নিখুঁত করে মন থেকে আঁকা তো সম্ভব নয় ধনপতি বাবু! আচ্ছা, চলুন এবারে। মেয়েটা টের পেলে আবার বড় লজ্জা পাবে।" বলে চট্ করে বোতাম টিপে নিবিয়ে দিলেন ঘরের বাতি।

বিদায় নিয়ে পথে নামলেম আমি আর ত্রৈলোক্য তপাদার। কেমন যেন মাথা ঘুলিয়ে গেল বিশ্বম্ভর রায়ের মুখে কিশোর-শর্ব্বরী প্রসঙ্গ শুনে। কিশোর চৌধুরীর নিজের মুখে না শোনা পর্য্যন্ত মনের দোলা শান্ত হবে না।

আমাকে কিন্তু ভুতে পাওয়ার মতো পেয়েছে ঐ শর্ব্বরীর ছবি অথবা ছবির শর্ব্বরী। চোখের সামনে এখনো জ্বল-জ্বল করছে। রূপ তো নেই শর্ব্বরীর, কিন্তু তবু ওর হুবহু ছবি অমন অপরূপ হলো কি করে? এটেই কি কিশোর চৌধুরীর তুলির যাদু? না কি এ ছবি রঙীন হয়ে উঠেছে তার আপন হৃদয়-মাধুরীর রঙে,

যা সকল বিশ্লেষণের বাইরে? সত্যিই কি কিশোর চৌধুরী শর্ব্বরীর প্রেমে পড়েছে? প্রেমে পড়ে এঁকেছে ছবি, না ছবি এঁকে পড়েছে প্রেমে?

"নারকেলের সন্দেশটা শর্ব্বরী ভালোই তৈরী করে হে ধনপতি!" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "আরো দু-চারটে খাবার ইচ্ছে ছিলো। বুঝলে কি না? ও কি? হঠাৎ অত কি ভাবতে সুরু করলে বলো তো?"

"ভাবছি বিশ্বম্ভর বাবু যা বললেন তার ক' আনা বাদ দেবো, ক' আনা রাখবো।"

"কষে তার চুলচেরা হিসেব দিতে পারবো না ধনপতি, কিন্তু বিশ্বম্ভর বাবুর মনে ভেজাল নেই, এইটে তোমায় বুকে হাত রেখে বলতে পারি। আর আমারও বিশ্বাস, বিশ্বম্ভর বাবুর ভুল হয়নি। প্রজ্ঞাপারমিতা এসেছিলো শর্ব্বরীর জীবনে পরশমণির মতো; সেই পরশমণির পরশ পেয়ে সোনা হয়ে উঠেছে শর্ব্বরী। শর্ব্বরীর ভেতরে শিল্পী কিশোর চৌধুরী দেখেছে সেই সোনার দীপ্তি। আর সেই পরশমণিকেও কিশোর দেখেছিলো—ভাগ্যবান বল্‌বো কিশোরকে। আমিও ভাগ্যবান, ধনপতি। এই বাড়ীতে দেখেছি তাকে, শর্ব্বরীর কাছে অনেক এসেছে প্রজ্ঞা। কি ভালোই সে বাসতো শর্ব্বরীকে! শুনেছি তার কথা, মুগ্ধ হয়েছি তার হাসিতে। আমার সারা জীবনের চোখ ক'দিনের ভেতর সে বদ্‌লে দিয়ে গেল। সত্যিই সে রাঙিয়ে দিয়ে গেল যাবার আগে। তুলনা নেই, তুলনা হতে পারে না প্রজ্ঞাপারমিতার। অস্ত গেছে সে, এই ভেবে অসহায় দুঃখে মন কেঁদে মরে। সূর্য্যের মতো চোখ-ঝলসানো নয়, চাঁদের মতো নয় মিন্‌মিনে। তাই শুধু বলি অস্ত গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা, আর কোন দিন তার উদয় দেখতে পাবো না।"

প্রজ্ঞার পুনরুদয় সম্ভাবনাহীনতার বেদনায় একটা ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ত্রৈলোক্য তপাদারের ষ্টেশন-মাষ্টারী বুক থেকে।

"তাহলে শোনো ধনপতি। আমার জীবনের ব্যথা আনন্দের কথা তোমায় খুলেই বলি।" বল্‌লেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "চাকুরি-জীবনে প্রচুর সুনাম পেয়েছি, ইনামও পেয়েছি। আমার মতো মুখ্যু কোনো দিন ষ্টেশন-মাষ্টার হবে, এ কথা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু হয়েছি। চিড়িয়াখানায় সেই গোধূলির আলো কি খেলা খেললে আমার জীবনে—আমার গোটা বিবাহিত জীবনটাই হয়ে গেল একটানা হাসপাতাল। তাতে একটি মাত্র রোগিণী, চিরশয্যাশায়িনী, একটি দিনের তরেও যার রোগের কামাই নেই, আজ এটা, কাল সেটা লেগেই আছে। মামা বলতেন যৌবন বড় বিষময় কাল। দেখলুম আমার জীবনে সেটা বড় সত্য। আমার জীবনে পুরো যৌবনটা বিষময় হয়েই রইলো—যৌবনের বাসন্তী রূপটুকু থেকে গেল অপরিচয়ের আড়ালেই। মন [illegible] হাহাকার করে, আমার সে আর্ত্তনাদ জীবন-দেবতা শুনতেন কি না জানিনে। জীবন যত বিষিয়ে উঠতে লাগলো [illegible] কাজের ভেতর নিজেকে মিশিয়ে দিতে লাগলুম। টাইম-ওভারটাইম নেই। কাজ, কাজ, কাজ, শুধু কাজ করে [illegible]ছি। ছুটির কল্পনাও সইতে পারিনে। সহকর্মীরা কেউ বল্‌লে পাগল, কেউ বল্‌লে বোকা, আর কেউ কেউ বল্‌লে ঘুঘু লোক। কেউ বুঝলে না আমি দিন রাত নিজের থেকে পালিয়ে ফিরছি কাজের ভিড়ে লুকিয়ে পড়ে। সে যে কি করুণ দুর্বিসহ জীবন, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ধনপতি!"

বললেম "থাক্ ত্রৈলোক্যদা'। যে দুঃখ অতীত হয়ে গেছে তাকে ফের বর্ত্তমানে টেনে এনে অনর্থক—"

ত্রৈলোক্য তপাদার বল্‌লেন, "অনর্থক নয় ধনপতি! গোড়ার গল্প সবটুকু না শুনলে আগার গল্পটুকু তো ঠিক বুঝতে পারবে না ভাই! তাছাড়া অতীতের পানে তাকিয়ে এখন আর দুঃখ পাইনে, চোখ যে আমার বদলে দিয়ে গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা। নিজের অগোচরে যে আলো সে দিয়ে গেছে, সেই আলোয় নতুন করে দেখতে পেয়েছি অতীতকে, নতুন করে দেখছি আমার বর্ত্তমানকে। দুঃখ আমার অনেকখানি হাল্‌কা করে দিয়ে গেছে সে।"

"প্রথম অনুশোচনার ঝাপটা যখন এলো" পুরাতন কাহিনী আবার সুরু করলেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "তখন দেখলুম নিজেকে আর বরাতকে ছাড়া কাউকে দুষতে পারিনে। মামার কথায় নির্ভর করে নয়, নিজের চোখে দেখেই বিয়ে করেছি। মামা বলেছিলেন বটে—যদিও হয়তো ভোম্বলদার ভয়ে, অথবা ভোম্বলদাকে শোনাবার জন্যেই—'মত দেবার আগে আবার ভালো করে ভেবে ছাখ তিলু'। আমার মন অন্য রঙে রঙীন। একটি মা-হারা কুমারী আমার পায়ে প্রাণ-মন লুটিয়ে দিয়েছে, আমি তাকে গ্রহণ করে ধন্য করছি, এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমি বলে-ছিলেম ভাববার কিছু নেই, এ বিয়ে আমি করবোই। ভেবেছিলুম আমার মহত্বে মুগ্ধ হয়ে দেবতার মতো স্বামী পেয়েছে বলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে উনি। কিন্তু দেখলুম সে আমার পরম বোকামি, চরম ভুল। চাকরী-জীবন যেদিন থেকে সুরু হলো, সেদিন থেকে উঁনার অন্তরের চেহারাটা একটু একটু করে প্রকাশ পেতে লাগলো। দেখলুম কৃতজ্ঞ আমার কাছে সে নয়, আমার কৃতজ্ঞতাই সে আশা করে, দাবী করে।

"সে ভাবে আমি যে তাকে পেয়ে ধন্য হয়েছি সে আমার আপন যোগ্যতায় নয়, তার পিতার স্নেহ-দুর্বলতায়। যোগ্যতর পাত্র

পাবার প্রচুর নিশ্চিত সম্ভাবনা। দু'পায়ে হেলায় ঠেলে ফেলে ব্যোমকেশ বাবু তাঁর জামাতা-পদে অভিষিক্ত করেছিলেন আমাকে, শুধু আমি তাঁর প্রিয় বন্ধুর ভাগ্নে বলে। নরম ভেবে পরম নিশ্চিন্ত মনে যাকে গ্রহণ করেছিলুম, দেখা গেল সে দস্তুর মতো গরম, পরমের আভাস মাত্র তাতে নেই। শুধু এই মাত্রই নয়। সময়ে অসময়ে, প্রকারে প্রকারান্তরে আমাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত তোমার বৌদি, যে ওর বাবারই দয়ায় আমার রেলের চাকুরি যে চাকুরি না পেলে দোরে-দোরে ভিখ মেগে বেড়াতে হতো আমাকে। কথাটা সত্যি, আর সেই জন্যেই আরো বেশী করে বিঁধতো আমাকে। আমাকে অপমান করবার জন্যেই এই কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে আমাকে বার বার শোনাতো। আত্মগ্লানিতে এক একবার মনে হতো শ্বশুরের তদ্‌বিরে পাওয়া চাকুরিটাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু তা করি নি কেন জানো ধনপতি ?"

"কেন ত্রৈলোক্যদা' ?"

"কারণ, জানতুম ও চাকুরি গেলে চাকুরি আর আমার জুটবে না। তাই মাথার লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে পারিনি। মন আমার দিনের পর দিন বেশী থেকে আরো বেশী বিষিয়ে উঠতে লাগলো তোমার বৌদির ওপর, আর ততই আমি তাকে এড়িয়ে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম। আর ততই ওর স্বভাব, ওর মেজাজ হয়ে উঠতে লাগলো আরো অসহ্য। এমনি করেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমার যে কি করে কেটেছে তা শুধু আমিই জানি ধনপতি! পৃথিবীতে নারী বলেও যে এমন একটা জাত আছে, যে জাত পুরুষের জীবনে এনে দেয় মাধুর্য্যের পরশ, সে কথা ভুলে থাকবার সে কি মর্ম্মান্তিক প্রয়াস!"

আপন জীবনের গভীর ব্যথার কাহিনী বলায় বোধ করি আছে গভীরতর আনন্দ, আর সেই আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলেন ত্রৈলোক্য তপাদার। এ জোয়ার এখন থেকেই রুখে না দিলে এ কাহিনী রাত দুপুরের আগে শেস হবে না বলে মনে হলো।

বললেম, "ব্যথার কাহিনী থাক ত্রৈলোক্যদা'। ও আমি সইতে পারি নে। প্রজ্ঞাপারমিতার আলোয় নতুন করে কি দেখছেন সেইটে বলুন।"

"এত দিন উষাকে শুধু ঘৃণাই করে এসেছিলুম, রাগই করে এসেছিলুম তার ওপর—আমার জীবনটাকে সে তিক্ত মরুভূমি করে দিয়েছে বলে।" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "আমাকে সে দেয়নি ভালোবাসা, দেয়নি শ্রদ্ধা, দেয়নি আনন্দ। দিয়েছে শুধু ঘৃণা, অমর্য্যাদা, অবহেলা, দুঃখ। তাই প্রতি মুহূর্ত্তে কামনা করেছি তার মৃত্যু হোক, মরে সে আমায় মুক্তি দিয়ে যাক। মনে পড়ে এই সেদিনও এই কামনাই করেছি। তারপর এলো প্রজ্ঞাপারমিতা। একদিন চলে গেল শর্ব্বরীর সঙ্গে, কোথায় জানো ?"

"কোথায় ত্রৈলোক্যদা' ?"

"আমার কোয়ার্টারে হে, কোথায় আবার ?" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "তোমার বৌদিকে দেখতে। একেবারে আমার ধারণার বাইরে। দূর থেকে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে গেলুম আমি, কোনো একটা অজুহাত বানিয়ে বাধা দেবো বলে। নইলে কে জানে, কি বলে অপমান করে প্রজ্ঞাকে তাড়াবে তোমার বৌদি। কিন্তু আমি গিয়ে পৌঁছুবার আগেই তোমার বৌদির ঘরে ঢুকে গেছে প্রজ্ঞা আর শর্ব্বরী। ভয়ে ভয়ে ঢুকে দেখি, ওদের গল্প জমে হয়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ। যে উষা গোটা দুনিয়ার ওপর ক্ষ্যাপা, চেনা-অচেনা কোনো মানুষকে কাছ সইতে পারে না, সে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে হেসে কথা কইছে তার উষাদি' হয়ে। এর আগে কখনো তাকে চোখে দেখেনি প্রজ্ঞা, কিন্তু উষাদি' বলে ডাকার সরটুকুতে অনেক দিনের অন্তরঙ্গতার সুরভি মাখা। প্রজ্ঞার মুখের 'উষাদি' ডাক শুনে আমি জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলুম, উষা নামটা কি অদ্ভুত মধুর, আর উষা বুঝলে দিদি ডাকের মাধুর্য্য! বাইরে তাকিয়ে দেখি গোধূলির রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে বাইরের দুনিয়া। আবার সেই গোধূলি লগ্নে, আর এই লগ্নেও বদ্‌লে গেল জীবনের ধারা।"

"আপনার জীবনের ক্যালেণ্ডারে দু'নম্বর লাল তারিখ ?"

"ঠিক তাই। উষা আর প্রজ্ঞাকে দেখলুম পাশাপাশি—জীবন্ত মৃত্যু আর অমর যৌবন। সীমাহীন নিরাশার পাশে অনন্ত আশার আলো। আমার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠলো চিরবঞ্চিতা উষার কথা ভেবে—জীবনে এই প্রথম। মনে হলো, আজ এই গোধূলি লগ্নে ষ্টেশন-মাষ্টারের কোয়ার্টারে যে বয়স এসেছে প্রজ্ঞাপারমিতার জীবনে, অতীতের সেই গোধূলি লগ্নে চিড়িয়াখানায় উষার বয়স তার চাইতে বেশী দূরে ছিলো না। কিন্তু কোথায় সেই উষা, আর কোথায় এই প্রজ্ঞাপারমিতা! প্রজ্ঞাপারমিতার দিকে তাকিয়ে মনে হলো কি অমূল্য সম্পদ থেকে আজীবন বঞ্চিত থেকে গেল উষা, ভাগ্যহীনা উষা, চিরবঞ্চিতা উষা! বঞ্চিত হতভাগ্য ভাবতুম নিজেকে, কিন্তু সে যে কত বড় বঞ্চিতা, কত বড় হতভাগিনী, এই দু'নম্বর গোধূলি লগ্নে আমায় নীরবে বুঝিয়ে দিয়ে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা, আমার সারা অন্তরে একটা প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিয়ে। শুনলে তুমি হয়তো হাসবে ধনপতি, জীবন ভরে যাকে ঘৃণা করে' যার মৃত্যু-কামনা করে এসেছি, জীবনের সায়াহ্নে এসে তারি জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠলো, যেন নতুন প্রিয়ার প্রেমে পড়লুম নতুন করে।"

না তাকিয়ে পারলেম না ত্রৈলোক্য তপাদারের মুখের দিকে। মনে হলো, ও মুখে কে যেন রোমিও বা মজনুর মুখের ছাপ মেরে রেখে গেছে। ত্রৈলোক্য তপাদার যেন আর ত্রৈলোক্যও নন, তপাদারও নন।

"বদলে গেছে, ভেতরে ভেতরে একেবারে বদলে গেছে ত্রৈলোক্য তপাদার।" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "কিন্তু বাইরে কাউকে জানতে দিইনে। তোমার বৌদিকেও নয় ধনপতি। বেচারা বরাবর আমার ঘৃণা, অনাদর, তাচ্ছিল্যই পেয়ে এসেছে, এখন হঠাৎ প্রেমের হাওয়া টের পেলে ওর দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্রে সইবে না, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই ও মারা যাবে। এই শেষ বয়সে তোমার বৌদি-বিয়োগ আমি সইতে পারবো না ধনপতি! হোক সে অপ্রিয়ংবদা, হোক সে ইনভ্যালিড, তবু সে আমার বেঁচে থাক।"

বাঙালী হিন্দুর উপাধি কত ?

অবাগীশ, আকালি, আক্রাধারী, আটমেল্যা, আড়ৎদার, উপ্থামিনী, ওম।

কংসবণিক, কর-মজুমদার, কর্মী, কাঁড়া, কাটু, কার, কাপুর, কার্বারী, কালসা, কুঁড়, কুণ্ডার, কুণ্ডগ্রামী, কুণ্ডুচৌধুরী, কুড়ল, কুলভী, কুলী, কেনে, কৌলুভ। ক্ষেমা, ক্ষেম।

খড়, খড়িয়া, খাঁটা, খাঁটুয়া, খাওয়াল, খাগাট, খানা, খামপাই, খামিদ, খালুয়া, খেলো, খোড়ই, খোসো।

গত্তি, গাঁতাইৎ, গনাই, গাজর, গাতি, গাল, গুত, গুপ্তবক্সি, গুপ্তবণিক, গুপ্তশর্মা, গুহখাসনবীশ, গুহচৌধুরী, গোরামি।

ঘটপাতর, ঘটম, ঘরুই, ঘাটোয়ারী।

চা, চাইরা, চানক, চানহাম, চারণ, চুম্মারী, চৌকাঠ, চৌবে।

ছত্র, ছত্রা, ছাতাৎ।

জমিদার, জুই।

তলাপাত্র, তেওয়ারি, তেজ, তোষক। থাঁড়া।

দরকার, দলোই, দাশগজেন্দ্র মহাপাত্র, দাশবণিক, দাসর্থী, দাসপাল, দাসময়রা, দত্তমুন্সী, দিয়াসী, দীঘাংগী, দ্বিবেদী, দে-মল্লিক, দেধাড়া, দেদিহিদার, দেয়, দেবচৌধুরী, দেরজানি, দেববর্ধন, দেবমহাশয়, দেবরাজ, দেবরায়মল্ল, দেবসাসিমল্ল, দেবসিংহ, দেবী, দেবসরকার।

ধন, ধাওয়া, ধান্দা, ধীর, ধুকড়ে।

নন্দনী, নন্দীচৌধুরী, নেকড়া, নেক্কে, নেয়ে।

টানটি, টুণ্ডু।

ডাঙ্গালি, ডিহিদার, ডোম, ঢোল।

পঁই, পত্র, পট্টনায়ক, পলুই, প্রধান, পাকখেল, পাকিরা, পাঠক, পাত্তব, পাটনাই, পাড়ুই, পাড়্যা, পান্না, পালমথৈ, পাল দেবভূতি, পাল রায়, পাহাম, পুইলা, পুইতণ্ডী, পুটানন্দা, পুত্তত্ত, পুতিতুণ্ডী, পুরিয়া, পুলাই, পুরী, পেদেশী, পোল্ল্যে।

বনুয়া, বন্দুর, বড়াই, বগী, বদ্ধি, বসু রায়চৌধুরী, বসু মুন্সী, বসু-সর্বাধিকারী, বাঁকড়া, বাউড়ি, বাজপাই, বাজপেয়ী, বাগাল, বাগুলি, বাচস্পতি, বাড়, বাড়ুই, বাস্তকর, বারুই, বালিয়াল, বিশাড়া, বিশাল, বিশ্বাসবর্মণ, বিহারী, বেদী, বেদজ্ঞ, বৈতাল, বৈতালিক, বৈষ্ণবরায়, বোস।

ভবানী, ভাজন, ভালুকখেকো, ভুঞ্জ, ভুঞা।

মই, মচুয়া, মথুর, মন্ত্রী, মণ্ডলরায়, মল, মল্লিক চৌধুরী, মণ্ডলদার, মহলানবীশ, মহাপা, মহিসাল, মাকুড়, মাণ্ডি, মানসিংহ মালখণ্ডী, মাপা, মাপারু, মারা, মাষ্টার, মাহালী, মাহিষ্যদার, মিছির, মিত্রগোস্বামী, মিত্রঠাকুর, মিত্ররায়, মিশ্র, মিশ্রতরফদার, মুচি, মুচিরাম-মালি, মুড়া, মুটশুদ্ধি, মুণ্ডা, মুৎসুতি, মুন্সী, মোট, মেইকাপ, মৈশাল।

যুই। রঙ্গ, রণবাক, রণরাজ, রাউল, রায়কায়েত, রায়গুরিয়া, রায়জুরু, রায়পালিত, রায়বর্ধন, রায়বিশ্বাস, রায়মৌলিক, রায়জানি, রাহারায়, রুজ, রুদ্র।

লট, লতাবৈষ্ণ, লায়েক, লালুয়া, লেকড়ী, লেঙ্কা, লোধ, লোহার।

শঙ্করকর, শাস্তি, শাস্ত্রী, শ্যামচৌধুরী, শীলমল্লিক, শুক্ল, শেঠিয়া, শেঠ। ষৌণ্ড।

সয়েন, সজ্জন, সন্দার, সপ্ততীর্থ, সম্মাদার-চৌধুরী, সর্বজ্ঞ, সংজন, সাউত, সাত্তিক, সাণ্ডে, সান, সান্ধকী, সাধ্য, সামল, সামন্তরায়, সামশ্রমী, সামুই, সায়েগাল, সারে, সারোগী, সাহবণিক শঙ্খনিধি, সাহাচৌধুরী, সাহামণ্ডল, সিংহদেব, স্বী, সুমনু, সুরারকা, সেট তলওয়ার, সুর-চৌধুরী।

হর্ম, হাঁড়া, হাঁসদা, হাণ্ডে, হাণ্ডোল, হালসা, হাণ্ডেল, হুণ্ডে, হেমব্রম, হেমা, হোড়, হোম, হোমচৌধুরী।

(১) সবিতা নাগ, স্কুল রোড, বনগ্রাম, ২৪-পরগণা ; (২) মায়া ভট্টাচার্য, ২৪, হাইয়েট ম্যানসন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, হাওড়া ; (৩) কুমারী দেবযানী গুপ্তা, ৬, রাজা পাড়া লেন, কলি ; (৪) রঞ্জিৎকুমার মিত্র, পাটনা বাজার, মেদিনীপুর ; (৫) সুনীল সরকার, জামুরিয়া কলিয়ারি, চরণপুর, বর্ধমান ; (৬) চিত্তরঞ্জন দাশ, মেদিনীপুর কালেক্টরী, মেদিনীপুর ; (৭) কিরণশঙ্কর সরকার, পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলি—১০ ; (৮) হিমাংশুশেখর দত্ত, হরিডাঙ্গর, পটাশপুর, মেদিনীপুর ; (৯) শান্তিময় ঘোষ, C/o বনমালি ঘোষ, সেলস ট্যাক্স ডিঃ, পোঃ ৩৬০ ক্যাট, হুগলী হাউস ; (১০) সনৎকুমার দাস, রামনাথ ফার্মেসী, পোঃ গঙ্গাজলঘাটী বাঁকুড়া ; (১১) প্রদ্যোতকুমার সী, ডেঙ্গলসা, পোঃ গোবর্ধনপুর ; মেদিনীপুর (১২) পরেশ রায়, রাণীগঞ্জ ; (১৩) নেপালচন্দ্র তারণ, পোঃ কলশিব, লোসাই হিল, আসাম ; (১৪) ভূপতিচরণ পাড়, গড়ময়না, ময়না, মেদিনীপুর ; (১৫) বারিদবরণ পাহাড়ী, দেশবন্ধু মেডিক্যাল হোষ্টেল, কলি—১৪ ; (১৬) খগেন্দ্রকুমার প্রামাণিক, মহিষবাথান, কৃষ্ণপুর, ২৪-পরগণা ; (১৭) উমেশচন্দ্র কংসবণিক, টোঙ্গন গাঁওটি এষ্টেট, ডুমডুমা, আসাম ; (১৮) তারকনাথ সাহা, সারাটি, পোঃ মায়াপুর, হুগলী ; (১৯) শ্রীমতী স্বাগতা মুখোপাধ্যায়, চাকুর, কল্যাণপুর, হাওড়া ; (২০) কালীকৃষ্ণ হাজরা, বড়বড়িয়া, মেদিনীপুর ; (২১) উপেন্দ্রনারায়ণ রায়মৌলিক, বড় জামদা, সিংভূম ; (২২) তরুণকুমার দাশগুপ্ত, শিয়ালদহ হাউস, ১৩৫, অপার সার্কুলার রোড, কলি—১৪ ; (২৩) পিনাকপাণি কুশারী, ৭, নবাব লেন, কলি—৭ ; (২৪) মণীন্দ্রনাথ ভাওয়াল, পি ১৬২, মুদিয়ালী ফার্ষ্ট লেন, কলি—২৪ ; (২৫) রমলা মণ্ডল, কামারমুড়ী, গোদাপিয়াশাল, মেদিনীপুর ; (২৬) অভিজ্ঞামল ঘোষ, কৈকালী, দমদম ফ্যাণ্ট, কলি—২৪ ; (২৭) রণধীরকুমার দে, ব্যাচিল্যার্স মেস, পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান ; (২৮) রবীন্দ্রনাথ বসু-মল্লিক, ১০৯।১৭, হাজরা রোড, কলি—২৬ ; (২৯) গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, ৫৩, হ্যারিসন রোড, কলি ; (৩০) শিবরাম মাজী, মনহরা, আছরা, বর্ধমান ; (৩১) নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ; (৩২) কুমারী গৌরী ভট্টাচার্য, ৪৩, মার্কেট রোড, নয়াদিল্লী ১ ; (৩৩) শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দেবী (কানুনগো), পোঃ নেপুর, মেদিনীপুর ; (৩৪) শ্রীআশারাণী মাইতি, মাগুড়্যা, পোঃ লক্ষ্যা, মহিষাদল, মেদিনীপুর ; (৩৫) কমলেশরঞ্জন সাহা, কাব্যশ্রী, টেপাখোলা, ফরিদপুর ; (৩৬) শ্যামাপ্রসাদ সরকার, C/O পেন এক্সপার্ট, ১৫এ, ইন্দ্র রায় রোড, কলি ; (৩৭) শ্রীমতী মমতা দাশ, ভগবতী দাশ নিবাস, জোড়পাকড়ী, জলপাইগুড়ি ; (৩৮) শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, ১২বি, মোহনবাগান লেন, কলি ৪।

অপমানিতা

শক্তিপদ রাজগুরু

দীর্ঘ পথ মোটরে এসে হাঁফিয়ে উঠেছে উমা। কাঁচা-পাকা রাস্তা, বাসের ঝাঁকানিতে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি যেন তাল পাকিয়ে বমি আসে। চলেছে ত চলেছেই, দু'পাশে বিশাল অর্জুন, শিরীষ আমগাছের ছায়া ভেদ করে ঝকড় ঝকড় করতে করতে গাড়ীখানা ষ্টেশন থেকে ঘণ্টা দেড়েক আসবার পর কে যেন দেখায়—ওই রূপপুর।

দিগন্তের বুকে দেখা রাঢ়-দেশের ঘনসবুজ একটি সীমারেখা, বৈকালের পড়ন্ত রোদে হলদে হয়ে উঠেছে, বাসখানা ক্রমশঃ সহরে ঢুকল। সহর নামে মাত্র, আসলে গণ্ডগ্রাম বলা চলে। কোর্ট-কাছারি সাবডিভিশন জেল হাকিম হাইস্কুল হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, এমনি একটা টিমটিমে কলেজ, সিনেমা-হাউস সব-কিছুই আছে। আর আছে ধূলিধূসর হাড়-কঙ্কাল-বার-করা রাস্তা। আশে-পাশে ভিটেপুরী তাতে জন্মেছে, আশশেওড়া আলকুশী তেলাকচুর ঘনজঙ্গল, সহরের বেশীরই এই, কাছারি পাড়াটাই একটু ভদ্রগোছের।

এই পাড়াতেই গার্লস স্কুল, কয়েক বছর হল ভিৎপত্তন হয়েছে, উমা বোস, বি-এ বি-টি আসছে হেডমিসট্রেস হয়ে।

বাস থেকে নেমে প্যাসেঞ্জারদিগকে দেখেই হেসে ফেলে সে, এদৃশ্য আগে কখনও দেখেনি, চিরকালই সহরে কাটিয়ে এসেছে, তাই অপূর্ব দৃশ্য তার কাছে নোতুনই। গোঁফ চোখের ভ্রূ চুল সবই ধুলোয় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, সন্তর্পণে নিজের মুখ, চোখও মুছে নেয়।

...পরক্ষণেই একটু চিন্তায় পড়ে, এখান থেকে তার স্কুলই বা কত দূর জানে না, মালপত্র রয়েছে, নিয়ে যাবেই বা কিসে? কোন যান-বাহন নাই। সমস্যাটা সমাধান করে দেয় বাস কোম্পানীর একটি লোকই।

"আপনি কি স্কুলে যাবেন?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় উমা।

লোকটা শশব্যস্তে নমস্কার করে চীৎকার সুরু করে।

"এ্যাই মদনা, এঁকে গার্লস স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আয়।"

"অনুমান করে উমা, আগে থেকেই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ তার জন্য এটুকু বলে রেখেছিলেন। বাসখানা তখন সহরের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলেছে ধুলো উড়িয়ে।

বাসাটি সত্যই সুন্দর! ফাঁকা সবুজ মাঠের ধারে সীমানা-ঘেরা নোতুন স্কুলের বাড়ী। পাশে বেশ খানিকটা বাগান, স্কুলের সীমানার মধ্যেই মস্ত একটা বকুল গাছের পাশেই তার এক তলা কোয়ার্টার। পিছন দিকে বয়ে গেছে একটা মেঠো খাল...ওপারে ঘন বাঁশবনে দিনের শেষ আলোটুকু মুছে আসছে...বাতাসে বকুল ফুলের সুবাস—স্তব্ধ পরিবেশে নিজের সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলে যায় উমা।

ঝি কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছে। উমাকে স্নান করে বার হয়ে আসতে দেখে ঝি'টা বলে ওঠে, "ও—মা যাবো কুথাকে? এই অবেলায় আবার করে সাবান মেখে চান করে এলে!"

বিরক্তি চেপে প্রশ্ন করে উমা। "কেন?"

"আবার কেনে? যে ম্যালোয়ারি, দেখো বাছা, আবার বিদেশ-বিভুঁয়ে জ্বর বাধিয়ো না।"

একেবারে তুমি সম্বোধনটা পছন্দ করে না উমা। হোক না বয়সে বড়ো, তবু তার মুখে তুমি শুনতে উমা নারাজ।

চা খেতে খেতে উমা কয়েক মিনিটেই সারা সহরের বেশ খানিকটা খবর পেয়ে যায়। এমন কি, মনোর মায়ের মনোকে বিয়ে দিতে ক'গণ্ডা টাকা কর্জ করতে হয়েছিল, তা পর্য্যন্ত। মনোর মা উবু হয়ে বসে কোথা থেকে এক পানের বাটা বার করেছে।

"পান আমি খাই না।"

—"সে কি? মেয়ে-ছেলে পান খাবে না? এমন সুন্দর রাঙা ঠোঁট যা মানাবে!"

ধমক দিয়ে ওঠে উমা। "কি বাজে বকছ তুমি, যাও দেখগে রান্নার কি হবে।"

ধমক খেয়ে বার হয়ে গেল মনোর মা। নীরবে বিছানায় এলিয়ে পড়ে উমা।

...এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, হঠাৎ চোখ পড়তে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। ওপারের বেণুবন-সীমায় চাঁদ উঠছে। কি তিথি জানে না, সুপ্তিময় ধরিত্রীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে জ্যোছনার প্লাবনধারা। দূর থেকে ভেসে আসে শিয়ালের ডাক। ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া মাথা-গায়ে স্পর্শ বুলায় স্নেহময়ী জননীর মত।

...কলকাতায় এতক্ষণ চৌরঙ্গীর বুকে চলেছে বিচিত্রবেশিনীদের শোভাযাত্রা। তাদের পাড়ার চায়ের দোকানে এতক্ষণ খেলার আলোচনা জমে উঠেছে। মিলিদের বাড়ীতে প্রশান্তর গাড়ী এসে পৌঁছেচে অনেকক্ষণ।

...চিন্তাধারায় কেমন যেন ছেদ পড়ে যায়, প্রশান্ত...লিলি!

জীবনের অতীত পাতাগুলো এলোমেলো বাতাসে উড়ে চলে, বহু বার ভিড় করে এসেছে তার মনে, আজও আসে। যেখানেই যাক, যত দূরেই পালিয়ে বেড়াক না কেন সে...এই যন্ত্রণা থেকে তার রেহাই নাই। কেমন চেনা একটা মিষ্টি সুবাস...কত সন্ধ্যায় বাতাস বার বার ওরা আমন্থর করে দিয়েছে তার জীবনে। এখানে সেই রজনীগন্ধা ফোটে, তেমনি সকরুণ নিবেদনের গন্ধঢালা ওর প্রতিটি পাপড়ি।

...ঘর সে-ও বেঁধেছিল। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেই বিয়ে হয়েছিল তার, পুলকেশ তখন বি-এ পাশ করে কি একটা ছোট চাকরী করছে।

বিয়ের পরদিনই পরিচয় হয় প্রশান্তর সঙ্গে। ছিপছিপে দোহারা

গড়ন। চোখে-মুখে একটা সাবলীল ভাব, কথাগুলোয় ধার না থাক ঝাল আছে। তার হাতে তুলে দেয় একগাদা রজনীগন্ধা। সাদা ফুল আর কুঁড়ি, শ্যামলিমায় কেমন একটা হিমশীতল স্পর্শ। হাসে প্রশান্ত—বড় ব্যাকুল ওর গন্ধ···কি যেন না পাওয়ার ব্যর্থতা ওর বুকে।

লোকটিকে ভাল করে চেয়ে দেখে উমা—হাসে প্রশান্ত "আমাকে ভুল বুঝবেন না কিন্তু—"

পরিচয় করিয়ে দেয় পুলকেশই। "আমার বন্ধু প্রশান্ত সরকার বিরাট ধনী—"

সলজ্জ প্রতিবাদ করে প্রশান্ত "আমার চেয়ে ও যে অনেক বড় ভাগ্যবান—সেটা কিন্তু আরও সত্যি।"

না খেয়েই চলে গেল প্রশান্ত। কি যেন জরুরী একটা কায আছে তার। ব্যাপারটা আর সকলের নজর এড়ালেও উমার চোখ এড়ায়নি। পুলকেশ হেসে হালকা করবার চেষ্টা করে "ও অমনিই খামখেয়ালী—"

"মাঝে মাঝে আসত প্রশান্ত, তাদের ভাড়াটে বাড়ীর সামনে কালো ঝকঝকে মাঝারি গাড়ীখানা পার্ক করে সিঁড়িতে হাসির লহর তুলে আনত প্রশান্ত। পুলকেশ অফিস থেকে এসে বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করত···এম-এ টা দেওয়া যায় কি না চেষ্টা করছে তখন। বলে ওঠে প্রশান্ত—"তুই ত কায গুছিয়ে নিচ্ছিস, ওকে বি-এ টা দিতে দে—"

সামান্য মাইনে, ঠিকে ঝিও রাখবার ক্ষমতা সব সময় হয় না, ব্যাপারটা হালকা করে দেয় প্রশান্ত।

আমার বোনকে একটু পড়াশোনা দেখিয়ে দেবেন, অসুবিধা হয় আমার বোনই না হয় আসবে—গাড়ী ত আছেই; জানেন তো মা আবার এদিকে একটু কনজারভেটিভ, মেয়েকে পড়ানোর জন্যে কোন মেয়েকেই তিনি রাখবেন।"

উমা শেষ পর্য্যন্ত নীলাকে পড়াতেই সুরু করল। মাইনে হিসেবে যা পেল তা আশাই করেনি। ওরা যেন নিছক সাহায্যটা এই ভাবেই করতে চায়। না হলে পঞ্চাশ টাকা কি দেয় কেউ ক্লাশ সেভেনের মেয়েকে পড়াতে! কলেজে ভর্তি হল উমা।

পুলকেশ এটা ঠিক পছন্দ করেনি, স্বামি-স্ত্রীর অভাব-অভিযোগের মাঝেই—বাইরের তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ, তার সম্মানকে কোথায় যেন একটা আঘাত করে। চুপ করেই গেল পুলকেশ। মনের কোণে প্রথম অতৃপ্তি দিনে দিনে জমা হয়ে ক্রমশঃ বেড়ে চলে—উমা সে খেয়াল করেনি।

তার মুখে প্রশান্তদের বাড়ীর গল্প, লীলার কথা—তার মায়ের ভদ্রতা আর কলেজের গল্প, লেকচার। এই নিয়ে সে গড়ে তোলে তার স্বতন্ত্র জগৎ—যেখানে পুলকেশ নিজের অজ্ঞাতেই সরে গেল দূরে।

উনুনে আঁচ দিয়ে উমা পড়তে বসেছে···পুলকেশ অফিস থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে অপেক্ষা করছে চায়ের জন্য। কখন যে আঁচ নেমে গেছে উমা সে খেয়াল করেনি। পুলকেশ অগত্যা দোকানেই গেল চায়ের তেষ্টা মিটোতে।

উমার পরীক্ষা এগিয়ে আসছে···ক'দিন যেতে পারেনি প্রশান্তদের বাড়ী। দুপুর বেলায় প্রশান্তই এল খবর নিতে।

"কি ব্যাপার? মা ত ভাবছেন, শরীর খারাপ হল নাকি?"

উমা হাসে, "না না, মাসীমার যেমন ভাবনা।"

"কিন্তু আমাকে যে নিয়ে যাবার জন্য হুকুম হয়েছে, কি যেন দরকার!"

অগত্যা উমা বেরিয়েই পড়ল। "বেশী দেরী হবে না তো?" হাসে প্রশান্ত "ভয় নাই, কর্ত্তা এসে ঠিকই দেখতে পাবেন আপনাকে।"

পুলকেশ সে দিন অফিসের দুজন বন্ধুকে নিয়ে এসে হাজির হয় একটু পরেই, উমা তখনও ফেরেনি। নীচের ভাড়াটে বুড়ো বলে ওঠে "বৌমা? সে ত সেই ছোকরার গাড়ীতে বার হয়ে গেল—চাবিটা রেখে গেছে।"

পুলকেশের বন্ধু দুটিও একটু বিস্মিত হয়ে মুখ-চাওয়া-চায়ি করে। ছোকরা!

পুলকেশের এটা নজর এড়ায় না—গম্ভীর ভাবে উপরে উঠে বসাল তাঁদিকে। জানলা থেকে দেখা যায় উমা সেজে-গুজে নামছে প্রশান্তর গাড়ী থেকে···হাতে তার এক গাদা ফুল···হাসি-মুখে প্রশান্তকে হাত নেড়ে বিদায় দিল।

মুখ ফিরিয়ে দেখে, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলকেশ। চোখের দৃষ্টি তার কঠিন। এগিয়ে আসে উমা।

"মাসীমা ডেকে পাঠিয়েছিলেন—" যেন কুণ্ঠিত চিত্তে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।

—"থাক। আমার দুটি বন্ধু এসেছেন।"

"পরিচয় করিয়ে দাও?" হালকা করবার চেষ্টা করে উমা।

পুলকেশ আরও ক্ষুব্ধ হয় উমার কাণ্ড দেখে, বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করল উমা বাজার থেকে খাবার আর চা আনিয়ে। এটা আশা করেনি পুলকেশ।

উমা অন্ততঃ নিজে কিছু খাবার করবে তাদের জন্যে—ওর রান্নার প্রশংসাও করেছে অনেক বার ওদের কাছে।

সেই রাত্রের কথা উমার স্মরণে আসে। পরীক্ষার পড়ার চাপের জন্য বেশী হাঙ্গামা করতে পারেনি। পুলকেশ বলে—"বেড়াতে যাবার সময় ত ঠিকই হয়?"

"বেড়াতে কোথায় গেলাম?"

"ওই ত দুপুরে, শুনেছি প্রায়ই যাও।"

চটে ওঠে উমা—"অনেক কিছুই আরও শোন, যার সবটাই মিথ্যে।"

নিজের এই কথার জন্য লজ্জিত হয় পুলকেশও, নিজের চোখে দেখেছে উমার এই পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, সংসারের সব কায করে কলেজ যাওয়া—পড়ানো, তার পর নিজের পড়া।

"এত খাটুনি কি সহ্য হয় এখন?"

পুলকেশ উমার চুলে বিলি কাটছে। বেশ লাগে উমার এই নীরব স্পর্শটুকু। একান্ত আপনার করে পাওয়া দু'জনে দু'জনকে।

"এ বছর না হয় থাক উমা, পরীক্ষা সামনের বছর দেবে।"

"না গো না—আবার সামনের বছর উৎপাত বাড়বে না? যিনি আসছেন তাকে সামলাবে কে?"

কথাটা বলে স্বামীর বুকে নিজের মুখ লুকায় উমা। পুলকেশ বুকে টেনে নেয় উমাকে।

পরীক্ষার কয়েক মাস পরেই এল তার বুকে ছোট্ট ফুলের মত সুন্দর একটি মেয়ে। উমা বলে—"ওর পয়েই ত ডিস্টিংশনে পাশ করলাম।"

"দিদিমণি ও দিদিমণি !"

কার ডাক শুনে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল উমা। মনোর মা ডাকছে।

"ঢেক রাস্তা এসে একেবারে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছ লাগছে, লাও হাত-মুখ ধুয়ে চা টি খেয়ে লাও, রাত অনেক হয়েছে।"

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে উমা, কোথায় কোন অচেনা জায়গায় এসেছে সে! ক্রমশঃ যেন তার চেতনা ফিরে আসে। সেই স্বপ্ন-রাজ্য থেকে নির্বাসিত সে, সেই দিনগুলো আজ পরিণত হয়েছে নিছক স্বপ্নে।

জেগে আছে সেই সাক্ষ্য বহন করে ওই রাতের চাঁদ—রজনীগন্ধার সুবাস—আর দিকহারা নৈশ বাতাস। ধীরে ধীরে উঠল উমা।

মনোর মা একাধারে ঝি, অন্য দিকে স্কুলের কাযও করে। ছোট-বড় মেয়েরা সকলেই তার ধমকে কাঁচু-মাচু। কারা যেন টিফিনের সময় ফুল ছিঁড়েছে—মনোর মা ধমক দিয়ে ওঠে।

"এ্যাই মেয়েরা—"

বড় মেয়েরা ওকে বলে, "এডিসিনাল হেডমিসট্রেস,"

সেদিন নোতুন হেডমিসট্রেসের সম্মানে হাফ-হলিডে হয়ে গেল, উমা অফিসে বসে খাতাপত্র দেখছে, মেয়েরা কলরব করে বার হচ্ছে ক্লাশ থেকে···যেন একগাদা নানারকম পাখী হাজারো খাঁচা থেকে একসঙ্গে ছাড়া পেয়ে আকাশে ডানা মেলেছে। এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে ও ছুটে যায় পথের বাঁকে।

স্কুলটা নীরব হয়ে আসে। ওপাশে টাঙ্গানো একটা বাংলা দেশের মানচিত্র। চোখটা অজ্ঞাতসারেই গিয়ে আটকে যায় কলকাতার উপর।

বহু স্বপ্ন-ভরা কত দিনের নীলাঞ্জন লাগানো মহানগরী। ডালহৌসীস্কোয়ার···মিশন রো···কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আঙ্গুলগুলো ঠুকছে উমা টেবিলের উপর, অভ্যস্ত হাতের নিপুণ স্পর্শে টাইপরাইটারটা অনবরত চলেছে খট—খট—খটা খট···

"বাচ্চাটার জন্য মন পড়ে রয়েছে। পুলকেশ বার হয়েছে অপিসে, তাকেও বার হতে হয়। বাচ্চা থাকে একটি ঝিয়ের তদারকে।

তার চাকরী করাটা বরদাস্ত করেনি পুলকেশ, উমাই জিদ ধরে একার রোজকারে সংসার চলবে কেন? তারপর বাচ্চার খরচ আছে, পাশ করলাম, চাকরী করতে দোষ কি?

আবার সেই প্রশান্ত, সেই তার এক আত্মীয় অপিসে চাকরী ঠিক করে দিল, পুলকেশ নীরবে সহ্য করল এই অপমান।

কিন্তু প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে তার মন বিষিয়ে চলে, কোন দিন অপিস থেকে ফিরে দেখে, উমার তখনও দেখা নাই, বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে, ঝি উনুনে আঁচ দিয়ে কোন রকমে রান্নার ব্যাগার সারতে থাকে। উমা অপিসের কোন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে আটকে গেছে, ফিরতে রাত্রিই হল সেদিন। ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে তুলে নিতে যাবে, বাধা দেয় পুলকেশই "এমন মা ওর না থাকাই ছিল ভালো।"

"—কেন?"

"মাকে কতটুকু পেয়েছে ও বলতে পারো?"

এ অভিযোগ পুলকেশেরও করায় কথা। কিন্তু উমা বোঝাবে কি করে, ওকে যে ওর মনের মত করে সংসার গড়ে তোলবার জন্যই তার এই কঠিন পরিশ্রম। নিজেকে সংসারের ছায়াতল থেকে কাজের হাটে এই মেহনৎ।

পুলকেশের কথার জবাব সে দিল না, চেয়ে রইল নীরবে।

সেদিন প্রশান্ত যেন আকাশ থেকে পড়ে, অফিস হতে বার হচ্ছে, পথে লোকের ভীড়, প্রশান্ত গাড়ীখানা পাশে থামিয়ে দরজাটা খুলে ডাক দেয় "উঠে পড়ুন।"

—"কিন্তু।"

থামিয়ে দেয় উমাকে—"বিশেষ জরুরী দরকার আছে—আসুন।" গাড়ীতে উঠে উমা বলে, "বেশী দেরী করতে পারব না।"

গাড়ীখানা চলেছে রেড রোড ধরে দক্ষিণের দিকে, গাড়ীর সারির সঙ্গে। বৈকালের পড়ন্ত রোদে সবুজ গাছগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে; হুডখোলা গাড়ীখানার হাওয়া বেগে উমার মুখে পরশ বুলায় চূর্ণ অলকদাম, শাড়ীখানা বাতাসের বেগে অশান্ত হয়ে ওঠে। পাশে ড্রাইভ করছে প্রশান্ত।

ষ্টিয়ারিং-হুইলে হাত রেখে গম্ভীর দৃষ্টিতে সে কি যেন ভাবছে।

—"কোথায় চলেছি?"

—"জাহান্নামে নিশ্চয়ই নয়, আপনার উন্নতির জন্যই।"

প্রশান্তর দিকে চাইল উমা, দু'চোখ মেলে ওর মুখে কি যেন অনুসন্ধান করতে থাকে।

ট্রামে করে চলেছে পুলকেশ অপিস-ফেরতা বাড়ীর দিকে। ময়দানের মধ্য দিয়ে বেগে পুলকেশের গাড়ীখানাকে বার হয়ে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটা আজ পরিষ্কার তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেরী হয় না। সারা মন বিজাতীয় ঘৃণায় ভরে ওঠে।

অপিসের কর্ত্তাদের বাড়ীতে প্রশান্তর বেশ দহরম মহরম আছে বলে মনে হয়। তাদের সেকসন-ইনচার্জ্জের পোষ্টটা খালি হচ্ছে, সেইটার জন্যই বলছে প্রশান্ত, স্বপ্ন দেখে উমা—আর সাধারণ কেরাণীগিরি করতে হবে না। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে রয়েছে সে গ্লেজডগ্লাসের বেষ্টনী দেওয়া খাসকামরার মধ্যে। মাঝে মাঝে রিং করছে তার ফোন। পুরানো বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে একটা নোতুন ফ্ল্যাটই নেবে তারা, বাচ্চার জন্য একটা আয়া।

কর্ত্তা বলে ওঠেন, "আচ্ছা আচ্ছা, কাযকর্ম্ম যদি চালাতে পারেন উনি আমি chance দোব। তাছাড়া তোমার মা-ও বলেছেন আমাকে ওর জন্য।"

প্রশান্ত ওকে নিয়ে যখন বার হয়ে এল রাত্রি তখন অনেক। আলিপুর পার্ক রোডের আশে-পাশের পুরোনো গাছগুলো রাতের আঁধারে থমথমে হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—উর্দ্ধ আকাশে ঝিকিমিকি তোলে তারার দল। জনহীন রাস্তাটা দিয়ে মাঝে মাঝে হেডলাইট জ্বেলে তেড়ে ফুঁড়ে বার হয়ে যায় দু'একটা প্রাইভেট গাড়ী—ভেসে আসে তার থেকে ছিটকে পড়া উচ্ছল কামনামদির হাসির শব্দ। উমার চোখের স্বপ্নের নেশা। তার মনটা আজ যেন কেমন উচ্ছল হয়ে ওঠে। নোতুন ফ্ল্যাট, মোটা মাইনে—সব যেন কেমন বদলে আসে তার চোখে···

গাড়ীখানা চলেছে সহর ছাড়িয়ে। জীবনের কাজের ফাঁকে এই আগামী আনন্দটুকু উমাকে আজ হালকা করে তুলেছে।

—"ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসি—"

ঠাকুর-পুকুর ছাড়িয়ে চলেছে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে। শ্রাবণের শেষ···চাঁদের আলোয় দিগন্ত-প্রসারী ধানের ক্ষেত নীরবে শিউরে উঠছে কোন্ পরম আনন্দের স্পর্শে—ওরই ছোঁয়া আজ উমার মনে; প্রশান্তর কপাল থেকে চুলগুলো সরাচ্ছে সে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ, গাড়ীখানা খানিকটে কাৎ হয়ে থেমে পড়ল···চমকে ওঠে উমা—"কি হল?"

গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলে প্রশান্ত, "টায়ারটা গেছে।"

—"উপায়?"

"বাড়তি চাকাও আনিনি—যতক্ষণ না কেউ দয়া করে টেনে নিয়ে যায়, ততক্ষণ এই মধ্যি মাঠে পড়ে থাকতে হবে।"

চমকে ওঠে উমা, এই জনহীন প্রান্তরে রাত্রিবেলায় পড়ে থাকতে হবে? পুলকেশ, খুকু, বাড়ী ঝিটা সকলের কথা মনে পড়ে, ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে রাত দশটা। পুলকেশের কঠিন চাহনি মনে পড়ে, মনে পড়ে পিছনে ফেলে-আসা দীর্ঘ পথ। কান্না আসে তার।

—"কি হবে প্রশান্ত বাবু?"

প্রশান্ত রাস্তার এক পাশে গাড়ীখানাকে ঠেলে সরিয়ে আনতে ব্যস্ত। জবাব দেয়, "ভয় করছে নাকি? কিন্তু কি করবো বলুন?"

উমার অসহায় অবস্থার কথা ওকে বোঝাবে কি করে!

কোন রকমে ট্রাম থেকে নেমে বাড়ীতে পা দিয়ে নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে থাকে পুলকেশ। তার চোখের অন্তরালে দীর্ঘ দিন ধরে এই অভিনয় নিপুণ ভাবে করে আসছে।

ঝিয়ের কথায় ফিরে চাইল, "দুপুর থেকে খুকী কেবল বমি করছে।"

"আমি তার কি করবো?"

ঝি বকুনি খেয়ে থেমে গেল।

নিজের উপরই দুঃখ হয় পুলকেশের। উঠে গেল মেয়েটার কাছে। বিছানার সঙ্গে যেন নেতিয়ে পড়েছে, ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদছে। মায়া হয়, রাগ হয় উমার উপর—মা না শত্রু! রাগের চোটে মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে "তুই মর, এমন মায়ের বুকে আসার চেয়ে তোর মরাই ভালো। শান্তি পাবি।"

বাচ্চাটা আবার খানিকটা বমি করে, ছোট ছোট হাত দুটো মুঠো হয়ে যায় যন্ত্রণায়, কুঁকড়ে ওঠে মুখ, নীল হয়ে আসে সর্ব্বাঙ্গ। থাকতে পারে না পুলকেশ, নিজেই ছুটল ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান।

"মা আছেন?"

পুলকেশের মনে আগুন জ্বলছে, বলে ওঠে, "নেই।"

"হাসপাতালে পাঠালে ভালো হয়, দেরী করবেন না।"

ডাক্তার নিজেই শিশুমঙ্গলে তার এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে দেন। ঝিকে সঙ্গে নিয়ে পুলকেশ নিজেই একটা ট্যাক্সিতে করে বেরিয়ে পড়ল খুকীকে নিয়ে বাসায় তালাচাবি লাগিয়ে। হাসপাতালে ভর্তি করে ওষুধ-পত্র কিনে দিয়ে বেরুতে অনেক দেরী হয়ে গেল। রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে।
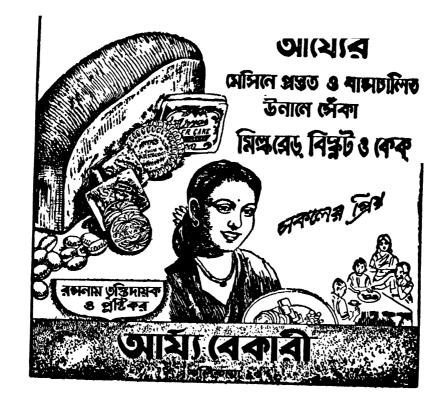
সারা পাড়া নিশুতি, রাস্তার আলোগুলো নীরবতার সাক্ষ্য

দিতে জ্বলছে, চাবি খুলে বাড়ীতে ঢুকল পুলকেশ উমার তখনও দেখা নাই।

সারা দেহে একটা অসহ্য জ্বালা, বাচ্চার অসহায় কান্নাটা তখনও কানে ভেসে ওঠে, অপিস থেকে ফিরে এক কাপ চা-ও পায়নি। কাপড় ছাড়াও হয়ে ওঠেনি।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে নীচে নেমে এল পুলকেশ, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, উমা নেমে এসেছে। বাড়ী ঢুকতে যাবে, বাধা দেয় পুলকেশ। "এ বাড়ীতে আর ঢুকো না।"

"কেন?"

"এর জবাব আমি দোব না। এত দিন আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এসেছো, আর নয়। আজই সব শেষ হয়ে যাক"।

"আমার খুকি—"

সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে পুলকেশের। কঠিন নির্মম মিথ্যে কথাটা বলতেও তার এতটুকু বাধে না।

"সে আর নেই, তুমি—তুমিই তার এই সর্বনাশের জন্য দায়ী, সে-ও গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সব সম্পর্কই মুছে ফেলতে চাই।"

দরজার চৌকাঠ ধরে কোন রকমে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে উমা, দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। দাঁড়াবার ক্ষমতাও তার নাই। পুলকেশ তার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

লজ্জায় দুঃখে অপমানে উমা হারিয়ে ফেলে নিজেকে। প্রশান্তই সে রাত্রে তাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসে।

হাহাকার করে ওঠে সারা মন উমার। খুকীর এ সংবাদ বিশ্বাসই করতে মন চায় না তার। প্রশান্ত খোঁজ আনে, পুলকেশ ও-বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে পরদিনই, সেই সঙ্গে আগেকার চাকরীও, কোথায় রয়েছে কেউ জানে না।

উমা দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে। আজ আবিষ্কার করে এত বড় পৃথিবীতে নিতান্তই সে একা। কোন শান্তি-স্নেহনীড় তার নাই। নিজের হাতেই সে সব ভেঙ্গে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে সে।

...বৈকাল হয়ে গেছে, স্কুল একেবারে জনহীন। আপিসে মনোর মায়ের ডাকে ফিরে চাইল।

এত কায কি করছ দিদিমণি! ওদিকে চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে।

বাসার দিকে রওনা দিল উমা, মনোর মা তখন দ্বারোয়ানকে খিচুড়ী-হিন্দিতে ধমকাচ্ছে।

অপিস বন্ধ করতে নেহি হোগা? খালি খৈনী খায়ে গা?

বৈকালের দিকে সহরের হাসপাতালের লেডী-ডাক্তারও এলেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা। বারান্দায় বসে আলাপ-আলোচনা হল। সেই মফঃস্বল সহরের সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর মধ্যেকার কাহিনী। কোন সাবডেপুটি বউএর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করেন, কোন মুন্সেফবাবু আড়ালে বাঁ হাত পাতেন, কোন হাকিম মেমসাহেবকে নিয়ে সন্ধ্যার পর বেড়াতে বার হন, ইত্যাদি। ভাল লাগে না এ-সব উমার, কিন্তু সে ত জানে না মফঃস্বল সহরের ভাগ্যবিধাতা এঁরাই।

"আজ চলি নমস্কার!"

উমা ওদিকে যেন বিদায় করতে পারলে বাঁচে।

এদের মধ্যে তাকে থাকতে হবে—ভাবতে গেলেই শিউরে ওঠে সে। এর চেয়ে কলকাতার সেই চাকরীই ছিল ভালো। কিন্তু বহু দিন হল ও জীবন পেছনে ফেলে এসেছে!

দুপুরে টিফিনের পর পিরিয়ড উমার 'অফ', বাসার দরজা খুলে এগিয়ে যাবে—হঠাৎ রান্নাঘরের ও-পাশে দেওয়ালের কোণে কা'কে লুকোবার চেষ্টা করতে দেখে এগিয়ে যায়। মনোর মা কোথা থেকে এসে মেয়েটার কোঁকড়ানো চুলের মুঠিটাই ঘপ করে ধরে হিড়-হিড় করে টেনে আনে উমার সামনে। নিজেই সে জেরা করে মেয়েটাকে।

"কি করতে ওখানে লুকিয়েছিলি? রোজই দেখি আমার আচারের বয়েম খালি হয়ে যাচ্ছে, শুকনো কুল দুটো হাঁড়িতে তুলে রাখবো তার যো নাই: ওই—ওই দেখ আর এক আপদ—"

খাটের নীচ থেকে হেঁচড়ে টেনে আর একটা মেয়েকে বার করে। সামনে বড় দিদিমণিকে দেখে সে ত কেঁদেই ফেলে। আগেকার মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে—ডাগর চোখ দুটো দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। বলে সে, লুকোচুরি খেলছিলাম—সত্যি আমরা আচার চুরি করিনি।

দাবড়ায় মনোর মা, ফের মিছে কথা? ওদিকে জানো না দিদিমণি, ওরা এক-একটি ডাকাত!

উমা কোন রকমে হাসি চেপে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে—"তোমার নাম কি? কোন্ ক্লাশে পড়?"

—"মঞ্জু, ক্লাশ ফাইভে পড়ি। ফ্রকের 'বো'টা বাঁধতে থাকে। মাথার চুলগুলোতে লেগেছে দেওয়ালের ঝুল—উমা সেগুলো বেছে দিতে থাকে।

"পড়া কামাই করে লুকোচুরি খেলতে নাই।"

"ক্লাশ আমাদের হচ্ছে না, সাবিত্রীদি' নাই।"

—তাই বলে ডাকাতি করতে হবে? মনোর মা ধমকে ওঠে।

কোন রকমে মনোর মাকে বিদায় করে উমা। মেয়ে দুটো ভাবতেই পারেনি। বড়দিদিমণি এমনি ভাবে কথা বলবে তাদের সঙ্গে। আগেকার দিদিমণি হলে হয়ত বাকী পিরিয়ডগুলো দাঁড় করিয়েই রাখতো।

"চল তোমাদের ক্লাশেই যাই।"

সে পিরিয়ডটা ওদের ক্লাশেই কেটে গেল উমার।

এমনি করে ওদের মধ্যেই তার জীবনের নিঃসঙ্গ দিনগুলো ভরিয়ে নিতে চায় সে। সারাটা দিন বেশ কেটে যায় কোলাহলের মধ্য দিয়ে। বৈকাল থেকে আবার সেই জনহীন প্রকৃতির মাঝে সুরু হয় তার ব্যর্থ জীবনের স্মৃতির জালবোনা।

...সেদিন স্কুলের ছুটির পর মেয়েরা প্রায় সকলেই চলে গেছে। ও-পাশে বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। উমা এগিয়ে যায়—দেখে সেই মেয়েটিই।

"এখনও বাড়ী যাওনি মঞ্জু?"

"দ্বারোয়ান এখনও আসেনি"

ওদের বাড়ীর পাশেই মেঠো খালটা জলে ভরে উঠেছে, বাড়ী থেকে লোক এসে ওকে নিয়ে যায়।

"চল আমার ঘরে বসবে। দ্বারোয়ান এলে ডেকে দোব তোমাকে।"

…মাথার এক-রাশ ঝাকড়া কোঁকড়ানো চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে উমার সঙ্গে এগিয়ে যায় সে।

মনোর মা হালুয়া চা তৈরী করে আনছিল, সঙ্গে মঞ্জুকে দেখে একটু বিস্মিত হয়, মঞ্জুও ওর পুলিশী চাহনিটা ঠিক পছন্দ করে না।

বাধা দেয় উমাই। "আর একটা প্লেটেও আনো।"

বৈকালের পড়ন্ত রোদ জাফরাণী রং হালকা পরশ বুলায় শরতের শীর্ণ শুভ্র মেঘের গায়ে। দিগন্তপ্রসারী সবুজের গালচে পাতা…; আকাশ-বাতাস মুখ বুজে অপেক্ষা করছে, যেন আসমান থেকে নেমে এসে কোন কিন্নর দল গানের জলসা বসাবে।

…মঞ্জু চলে গেছে, একা বসে আছে উমা, সারাটা মনে তার কি যেন আলোড়ন চলেছে। আকাশের পশ্চিম কোলে রং-এর ছড়াছড়ি…দিনের শেষে কাকলীমুখর পাখীর দল ফিরে আসছে কুলায়ে; বিরাট প্রকৃতির মাঝে তার অস্তিত্ব আজ কতটুকু সামান্য! সহরে থাকতে এ দীনতা সে অনুভব করেনি—এখানে এই বিশালতার মাঝে সেই দীনতা প্রকট হয়ে ওঠে।

সেদিন বৈকালে বেড়াতে গেছে সহরের বাইরে কালীতলার দিকে। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে বেশ খানিকটে জায়গা প্রাচীন বট অশথ গাছের প্রহরাঘেরা, চারি পাশে ঘন কল্কে-করবী ফুলের বন। জলপাইগাছের পাতাগুলো লাল হয়ে সবুজের মাঝে বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস করেছে। স্তব্ধ নীরব পরিবেশে একা বসে রয়েছে উমা মন্দিরের ও-পাশে। বকুল ফুলের ম্লান সুবাস ভরে তুলেছে এর আকাশসীমা; কার হাসির শব্দে পিছন ফিরে চাইল।

মঞ্জু ছুটে বেড়াচ্ছে—পিছনে একটি গরদের থান-পরিহিতা প্রৌঢ়া।

—"বড় দিদিমণি?"

—"বেড়াতে এসেছো?"

উমার কথায় মাথা নাড়ে সে—"ওই আমার পিসীমা।"

ভদ্রমহিলাও এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন।—"অনেক কথা … মঞ্জু আপনার সম্বন্ধে। মা-মরা মেয়ে কি না, এতটুকু স্নেহ …লেই খুসী।"

উমা আদর করে মঞ্জুকে—"বড় ভালো মেয়ে ও।"

ফিরতে বেশ একটু দেরীই হয়ে যায় উমার। ওর পিসীমা …লেন না, মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখে বেরিয়ে এল তারা।

"একদিন আসুন না আমাদের বাড়ী?"

হেসে সম্মতি দেয় উমা।

বাসায় ফিরল, মনোর মা গজ-গজ করে, "সিনেমায় গিয়েছিলে, …ডাক্তারদিদি এসে ফিরে গেল।"

উমা ওই চিজটিকে এড়িয়ে চলতে চায়, আলোচনার মধ্যে … সহরের লোকের অন্তঃপুরের কুৎসা শোনানো—দেখা না হয়েছে … হয়েছে।

…পর পর নির্জন বৈকালটা আজ-কাল মন্দ কাটে না উমার। …বাঁধানো চাতালে বসে গল্প করে, সঙ্গে থাকে মঞ্জু। স্নেহ-… মন ওর উমার সান্নিধ্যে এসে যেন কি এক সম্পদের সন্ধান …, মানুষের অন্তর শুধু নিতেই চায় না, সেও তার সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে বিশ্বের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায়—যাকে সে নিজের অন্তরের সম্পদ দিতে পারবে।

উমার নিঃসঙ্গ জীবনে এই খোঁজার বোধ হয় শেষ হয়েছে।

হাসে মনোর মা—"দিদিমণি, বিয়ে থা করে সংসারী হও। সাধ-আহ্লাদ ত আছে?"

চমকে ওঠে উমা, সংসারী! সারা মন হাহাকার করে ওঠে। সবই তার ছিল, কিন্তু কোন্ পাপে সব হারিয়েছে সে? আর তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

স্কুলের মেয়েমহলে—শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যেও মাঝে মাঝে কথা ওঠে উমার এই অহেতুক স্নেহপ্রবণতার। সাবিত্রীদি' বলে, "কে জানে বাবা, সারা বৈকাল কি এত আদর করা হয় ওকে।"

মেয়েরাও মঞ্জুকে ঠাট্টা করে, "তুই ত ফার্স্ট হবিই, বড়দিদিমণির সঙ্গে কত ভাব তোর।"

"কথাটা যে উমার কানেও না আসে তা নয়, সে হাসে মাত্র।

দু'-তিন দিন ধরে মঞ্জুকে ক্লাশে দেখা যায় না—বৈকালের আসরও জমে না উমার। সেদিন ক্লাশের একটি মেয়ের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে—ক'দিন থেকে তার জ্বর।

একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে উমা। সারা মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্কুলের পর বাসায় আর মন বসে না, কাপড় বদলে বার হয়ে পড়ল ওদের বাড়ীর উদ্দেশেই।

নারকেল গাছের প্রহরাঘেরা সাদা দোতলা বাড়ীটা, চারি পাশে কয়েকটা আম, বাতাবী লেবু, সুপারী গাছ ঘন করে তুলেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। গেটের ধারে পাতাবাহারের গাছগুলোয় দিনের আলো মুছে আসছে। এগিয়ে চলে উমা বাড়ীর দিকে।

"আপনি?" পিসীমা ওকে দেখবে কল্পনাও করেননি।

জ্বর শুনলাম—তাই যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়ে, ভাবলাম খবরটা নিয়েই যাই।" কথাটা খানিকটে মিথ্যেই বলল উমা।

উপর থেকে মঞ্জু ওর গলা শুনতে পেয়ে বিছানা থেকে উঠে এগিয়ে আসে! বাধা দেন পিসীমা।

"ধন্যি মেয়ে বা হোক, তিন দিন জ্বর ছাড়েনি, খাসনি কিছুই, আবার ঘরময় দাপাদাপি সুরু করলি?"

উমা তার হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথার রুক্ষ চুল-গুলোতে বিলি কাটতে থাকে।

নীরবে চোখ বুজে তার স্পর্শটুকু অনুভব করে মঞ্জু।

পিসীমা নীচে নেমে যান, মঞ্জু কথা বলে চলেছে—তার স্বর্গগত মায়ের কথা, মাকে মনে পড়ে না—সবটুকুই শোনা তার। কত আদর করতেন তিনি, অসুখ হলে এমনি করেই বোধ হয় শিয়রে বসে জাগত কত বিনিদ্র রজনী। মায়ের জন্য সত্যিই বড় মন-কেমন করে।

আলোটা একটু কমিয়ে দিল উমা। বাইরে দেখা যায় আম-গাছের ফাঁক দিয়ে তারকিনী আকাশ। রাত হয়ে গেছে—মঞ্জুও ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে উঠে বাইরে এল। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলেছে সিঁড়ির পানে—ও-পাশ থেকে কা'কে এগিয়ে আসতে দেখে থামল।

ঘরের ভিতর থেকে আলোর রেখা এসে বারান্দায় পড়ছে,… সামনে সাপ দেখলেও এমনি আৎকে ওঠে না কেউ, মূর্তিটাও তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এক ঝলক আলোতে দেখতে পায়

উমা সামনে তার—পুলকেশ দাঁড়িয়ে। বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে—চুলগুলোতে পাক ধরেছে—এখনও তেমনি দৃঢ়তার ছাপ সারা মুখে।

রাতের বাতাস যেন উন্মাদ হয়ে আছড়ে পড়ছে নারকেল-গাছের মাথায়; কোথায় কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে একটা কালপেঁচা; মাথাটা কেমন ঘুরে যায়,···অন্ধকার হয়ে আসে তারার দ্যুতি,···রেলিংটা ধরে সামলাবার চেষ্টা করে। হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায়,···উপর থেকে নীচে সশব্দে পড়ে গেল তার ব্যাগটা।

পুলকেশ তার জ্ঞানহীন দেহটাকে ধরে ফেলে। শব্দ শুনে পিসীমাও বার হয়ে আসেন···নীচে থেকে উঠে আসছিল লেডী-ডাক্তার; তার চোখে এই দৃশ্যটাও পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

কয়েকটা মুহূর্ত; নিজেকে সামলে নিয়ে চারি দিক চাইতে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে উমার। পুলকেশও সরে দাঁড়াল।

পিসীমা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে উমার দিকে; কেমন যেন তীক্ষ্ণ তিরস্কারের নীরব ভাষা ঝরে পড়ে ওর মুখ থেকে। লেডী-ডাক্তারের ঠোঁটে বাঁকা ধারালো হাসি।

"এখন সুস্থ বোধ করছেন তো?"

উমা কোন কথা বলতে পারে না, নীরবে চোরের মত মাথা নীচু করে নেমে এল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রাস্তায়। নির্জ্জন পথে স্বপ্নের ঘোরে চলেছে সে বাসার দিকে।

ভাববার ক্ষমতাও তার নাই, সমস্ত স্মৃতিশক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে; তারাগুলো জ্বলছে···বাঁশবনের বুকে রাতের বাতাসের লুটোপুটি; তারই মাঝে পথহারা পথিকের মত চলেছে সে।

ক্রমশঃ অনুভব করে, কি সর্বনাশ সে করে এসেছে; পুলকেশ এখানে···আজ বোঝে সে কেন তার সারা মন মঞ্জুকে চেয়েছিল এত আপন করে। যেখানেই যাক, আত্মার আত্মীয় যে চোখ তাকে না চিনুক,—মন-অনুভূতি-সত্তা তাকে খুঁজে নেবেই। এ জগতের—এ জীবনের আপন জনকেই নয়, ফেলে-আসা অতীত কোন জগতের আপন জনকেই অজ্ঞাতসারেই ভালবাসে মানুষ। বিরাট পৃথিবীর পথে পথে কত অজানাকে এক মুহূর্তেই পরম জানা—পরম আত্মীয় বলে মনে হয়। চোখ তাকে চেনেনি···চিনেছে মন-আত্মা। যুগ-যুগান্ত ধরে চলেছে তার এই অন্বেষণ।

মঞ্জু!···তারই রক্তকণিকায় গড়া—অণু-পরমাণুতে সঞ্জীবিত ওই নব কিসলয়। কিন্তু সে ত জানে না উমার পরিচয়? অতি সাধারণ একটি নারীই হয়ে থাকবে সে তার মেয়ের কাছে—এর বেশী আর কি তার পরিচয়?

জীবনের এই বঞ্চনা এই নিদারুণ আঘাত তার বুক দীর্ণ করে দেবে।

অনুভব করে উমা, দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে অশ্রুধারায়, পথ চলবার সামর্থ্য তার নাই, ক্যালভার্টের উপর বসে পড়ে সে।

সহরে পরদিনই যেন ঝড় বয়ে যায়। সকালে ফার্ষ্ট মুনসেফের বাসাতেই ছোটখাটো বৈঠক হয়ে যায় এই নিয়ে। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শীতল বাবু যেন দেশ উদ্ধার করবার একটা কায পেয়ে যান। অভিভাবকদের তরফ থেকে সরকারী উকিল নীরেন বাবু ছোটখাটো লেকচারই দিয়ে বসেন।

"ওকে রাখা কোন মতেই উচিত নয়, গার্লস স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস হয়ে কিনা শেষ কালে···রামোচন্দর।"

স্কুলে সেদিন আসে না উমা। মনোর মায়ের কানেও এসেছে কথাটা। উমা ভাবছে—এ ভাবনার যেন আর শেষ নাই। সারা রাত ঘুমুতে পারেনি। সকালে চা দিয়ে গেছে মনোর মা—তার যেন হুঁসই নাই। এ মরীচিকা কেন এল তার জীবনে? স্মৃতির এই বাস্তব রূপান্তর তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। স্কুল বসে গেছে, ঘণ্টার শব্দ কানে এল। উমার ওঠবার নাম নাই।

স্কুল থেকে ঝি এসে ডাকছে, "কারা যেন দেখা করতে এসেছেন।"

উমা উঠে তৈরী হয়ে বাইরে এল।

একসঙ্গে সহরের এতগুলো পাণ্ডাকে উমা দেখেনি। সকলের মুখেই কেমন একটা কঠোর কাঠিন্য। শীতল বাবুই কথা বলেন, 'কাল রাত্রে পুলক বাবুর ওখানে গিয়েছিলেন?"

উমার সমস্ত শরীর জ্বালা করে ওঠে বিজাতীয় ঘৃণায়, চোখ তুলে চাইল সে। শীতল বাবু রায় দিয়ে চলেছেন "এই সব স্ক্যাণ্ডেল রটলে আপনাকে—"

কথাটায় বাধা দিয়ে ওঠে উমা। "সমস্ত ব্যাপারটা বিকৃত করে আপনাদের কানে ওঠানো হয়েছে—"

—"আমার কথার জবাব দিন?"

শীতল বাবুর কঠিন কণ্ঠস্বরে উমা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। পাশেই কলমটা তুলে নিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যেই চিঠিখানা লিখে তার হাতে দেয়। "এই আমার রেজিগ্‌নেশন লেটার, এ্যাক্‌সেপ্ট করলে বাধিত হবো।"

শীতল বাবু, ফার্ষ্ট মুনসেফ—নীরেন বাবু সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে, তাদের সামনে উঠে বার হয়ে চলে গেল উমা। বারান্দায় মেয়েরা ভিড় জমিয়েছে, তাকে যেতে দেখে সরে গেল। উমা কোন দিকে না চেয়ে বাসায় বসে চুপ করে বসে থাকে। ঘৃণায় সারা দেহ তার রি-রি করছে। মুখের মত জবাব সে দিয়ে আসতে পারল না—এই তার আপশোষ রইল।

সন্ধ্যা আসে, ঝরা-বকুলের কান্নায় ব্যথাতুর হয়ে ওঠে আকাশ, খালের পারে বাঁশবনের মাথায় সন্ধ্যার জোয়ারে ভেসে আসে তারা-ফুল। ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে দেখা যায় বকুলতলার চাতালে দাঁড়িয়ে উমা আর পুলকেশ।

"এই অপমান সহ্য করে চোরের মত চলে যাবে তুমি? সত্য পরিচয় দেবার সাহস তোমার কেন হবে না?"

উমার কণ্ঠ অশ্রুভেজা। "তা হয় না। ছেঁড়া-মালার ছিটকে-পড়া ফুল দেবতার পুজোয় লাগে না।"

—"তোমার মঞ্জুকেও দেখে যাবে না একবার?"

উমার অশ্রু বাধা মানে না। বলে ওঠে সে, "না না, মঞ্জুর আমি কেউ নই। তার মা অনেক দিন আগেই তার কাছে মরে গেছে। সেই স্মৃতি নিয়েই থাকুক, তার স্বপ্ন ভেঙে দিও না। দুঃখই পাবে সে।"

দূরে অন্ধকার ভেদ করে মোটরের হেড-লাইটটা দেখা যায়, সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে যায় উমা, যাবার আগে শেষ বারের মত মাথা নুইয়ে গেল। পুলকেশের পায়ের উপর ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। আজ পুলকেশ অনুভব করে, যে বিক্ষোভ সঞ্চিত ছিল তার মনে, উমা সে কালো দাগ চোখের জলে শুচি-শুভ্র করে গেল।

দূরে রাস্তার বাঁকে গাড়ীর আলো মিশিয়ে গেছে। উমা তখন অনেক দূরে।
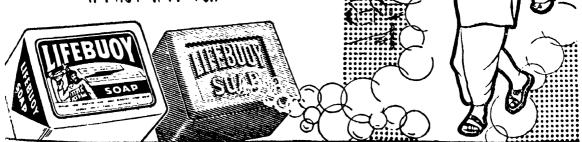
কৃষ্ণ ধর

হাজা-মজা তিতাস। তবুও তার প্রসার কম নয়। বর্ষায় গোমতীর বাঁধ-ভাঙ্গা বানের জল যখন হুমড়ী খেয়ে পড়ে, তিতাসের মরা সাপের মতো বিগতস্রোত দেহটা আক্রোশে তখন ফুলে ফুলে ওঠে। কচুরিপানা, কলমী-লতা আর জঙ্গল আগাছার দঙ্গল বানের টানে ভেসে যায়। তিতাসকে তখন মনে হয়, শিকল-বাঁধা হিংস্র আরণ্যক পশুর মতো। ছাড়া না পেয়ে রুদ্ধ ক্রোধে গুমরে আছাড় খেয়ে মরছে দুই তীরবর্তী নমঃশূদ্র আর জেলেদের গ্রামের নৌকার ঘাটে।

জেলেদের ঘাটে বাঁধা নৌকোগুলো ঢেউয়ে দোল খায়। হাওয়ায় জলের টুকরো ছইয়ের তলায় শব্দ করে ছলাৎ ছল। নিস্তব্ধ দুপুরে নদীর জলের ওপর আনত-শাখা কদম গাছগুলো থেকে ঝির-ঝির করে কদম-ফুলের কেশর ঝরে পড়ে তিতাসের বুকে। ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে অনেক দূর ভেসে যায়।

দৎখলা আর গোকন। মাঝি আর জেলেদের দুটি গ্রাম। তিতাসের দুটি চেহারাই রাজবল্লভের চেনা। রূপচান্দার গায়ের রঙের মতো সাদা চকচকে তিতাসের জলে রাজবল্লভ তার পূর্বপুরুষের ইতিহাসের প্রতিফলন দেখতে পায়। পিতা রাজীবলোচন সেদিন ফরিদপুর থেকে জমিদারের অত্যাচারে ভিটে-মাটি ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল। সেদিনের ইতিহাস রাজবল্লভের অজানা নেই। বাবার মুখে শোনা এই কাহিনী। যখন মনে হয়, শক্ত ইস্পাতের মতো, নৌকোর বৃন্তের সামিল রাজবল্লভের চেহারাটাও কেমন জানি জলে ওঠে।

পিতা রাজীবলোচনের আদিনিবাস বরকুণ্ডা। ফরিদপুর জেলায়। জমিদারের পান্সী বাইতো রাজীবলোচন। শক্ত জোয়ান চেহারা। ওস্তাদ পান্সী-বাইয়ে হিসেবে তল্লাটের সমস্ত লোকের মুখে তার নাম। ময়ূরপঙ্খী পান্সীটার হাল ধরে ছ'ফুট দীর্ঘ দেহটা নিয়ে রাজীবলোচন যখন দাঁড়াতো, নদীর অন্য মাঝি-মাল্লারা সমীহ করে বলতো : তা একখানা গতর বটে রাজীবদা'র।

সময়ে অসময়ে জমিদারের কাছারী থেকে ডাক আসতো। হয়তো খেতেই বসেছে রাজীব, জমিদারের পেয়াদা এসে খবর দিল : কর্তা তোমায় ডাক পাঠাইছেন রাজীবদা'।

মহিম পেয়াদা এসেছে। ঠক করে লাঠির একটা আওয়াজ হলো দাওয়ায়। ভাত মুখে নিয়েই রাজীব জবাব দেয় : আইতাছি মহিম। তুমি যাও। লাঠি কাঁধে করে মহিম চলে যায়। দড়মার বেড়ার আড়ালে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সোনা। রাজীবের স্ত্রী। মহিম চলে যেতেই রাজীব বললে : আর চারডা ভাত দে বৌ! ডাক আইছে। কুনখানে যাওন লাগে ঠিক কি?

ভাত দিয়ে আসে সোনা। মাঝির ঘরে এমন বৌ নাকি আর হয়নি। বছর কুড়ি বয়স। নিটোল দেহ-গড়ন আর অটুট স্বাস্থ্য, সোনার রূপ বিস্ময়কর। শুধু মাঝির ঘরে কেন, পাড়ার বুড়োরা চুপি চুপি বলে, জমিদার-বাড়ীতেও নাকি এমন বউ বড় একটা দেখা যায়নি। রাজীবের স্ত্রী সোনা। রাজীব শোনে আর বাড়ীতে এসে সোনার দিকে তাকায়। সত্যিই সোনা সুন্দরী। নম্র, লাজুক, স্নিগ্ধ স্বভাবের মেয়ে। কথা বলে কম। কিন্তু আজ ভাত দিতে এসে কথা বলল সোনা।

—আমার ডর লাগে।

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম থেকে জাগলো যেন রাজীব।

—ডর! কিয়ার লাইগ্যা ডর? কারে ডর? জবাবে সোনা আস্তে আস্তে যা বলল তার মর্মার্থ এই যে, গত সপ্তাহে রাজীব যখন পান্সীতে জমিদারের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিল, তখন একা বাড়ীতে থাকতে ডর করতো সোনার। একলা বাড়ী। পাড়া-পড়শীদের ঘর অনেকখানি দূরে দূরে। রাত্রিবেলায় দাওয়ায় ধুপ-ধাপ শব্দ। চোর-ডাকাত কতো কী-ই হতে পারে।

সোনার কথা শুনে হাসে রাজীব। বলিষ্ঠকায় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে সে হাসিতে নির্ভয়তার ছাপ। কিন্তু তা ক্ষণিকের। পান্সীতে করে সে যখন দূরে চলে যাবে, তখন সোনা আবার একা। আবার নিস্তব্ধ, ঝিঁ ঝিঁ, একা নিঃসঙ্গ রাত্রি। ভাবতেও শিউরে ওঠে সোনা।

—না মাঝি, তুমি যাইও না। আমার ডর সবে না। সোনা বলে।

—দেখি আমি। তা মাঝির পো আমি, পান্সী না বাইলে খামু কী? পান্সীর হাল ধইর‍্যা বিল হাওর পাড়ি না দিলে মাইনষে তোয়াজ করবো ক্যান? বলতে বলতে গামছাটা কাঁধে ফেলে রাজীব এগিয়ে যায় জমিদার-বাড়ীর দিকে।

কাছারীতে বসেছিলেন জমিদার সূর্য্যনারায়ণ। নমস্কার করে পাশে দাঁড়াতেই রাজীবকে দেখে জমিদার বাবু বললেন: পান্সী তৈরী কর রাজীব। শিকারে যাবো। রোয়দের বিলে নাকি অনেক বালিহাঁস আর স্নাইপ এসে জড়ো হয়েছে। বহু দিন বেরোইনি। এবার বেশ কয় দিন ঘুরেই আসবো। তুই তৈরী হয়ে নে রাজীব।

রাজীবকে নির্দেশ দিয়েই জমিদার বাবু উপরে চলে যাচ্ছিলেন। রাজীব ডাকল : কর্তা।

—কী রে? চটিতে পা গলাতে গলাতে ফিরে তাকালেন জমিদার।

মুখ কাঁচুমাচু করে রাজীব নিবেদন করে : আজ একটু অসুবিধা আছে কর্তা। পরিবার কান্নাকাটি করে।

—অসুবিধা! জমিদার বাবু বিস্ময়ে চৌচির হয়ে গেলেন যেন, পেয়াদা-মাঝির আবার অসুবিধা!

কথা রইল না। দাঁতে দাঁত কামড়ে শক্ত জোয়ান রাজীব এই অর্থশালী কাপুরুষ জমিদারের আদেশই মেনে নিল।

পাঁচ দিন পর শিকারপর্ব শেষ করে ফিরে এল রাজীব। বাড়ীতে পা দিয়েই দেখল, সোনা শুকিয়ে যেন আধখানা হয়ে গেছে। কোলের শিশুটা অনাদরে দাওয়ার এক পাশে কাদা-মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

রাত্রে মাঝির প্রশস্ত বুকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সোনা। রাজীবের অনুপস্থিতিতে জমিদারের ধূর্ত নায়েবের আনা-গোণা। টাকা-পয়সার লোভ। এই দেশে মান-ইজ্জত নিয়ে গরীবের ঘরের বৌদের যেন বাস করা অসম্ভব!

অকস্মাৎ উঠে বসল রাজীব। প্রায়ান্ধকার ঘরটায় কেরোসিনের কুপির মিটমিটে আলোর প্রতিফলনে রাজীবের চোখ দু'টোকে দেখাচ্ছিল প্রতিহিংসা-পরায়ণ বাঘের চোখের মতো।

এর একটা প্রতিবিধান দরকার। ইচ্ছে করলে এখুনি গিয়ে ধূর্ত শেয়াল নরেন্দ্র নায়েবের মাথাটা এক লাঠির ঘায়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারে রাজীব। কিন্তু আগে একবার জমিদারকে বলাই ভাল।

পরদিন বিকেলে পানসীতে বেড়াবার সময় কথাটা বলল রাজীব জমিদার বাবুকে। নরেন্দ্র নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ। জমিদার বাবু ভ্রূ কুঁচকালেন। নরেন্দ্র একটা ধূর্ত শেয়াল। জমিদারের সমস্ত রকম কুকীর্তির জিম্মাদার। প্রথমে আমল দিলেন না জমিদার বাবু।

দ্বিতীয় বার বলল রাজীব।—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করি কর্তা। এমন উৎপাত সইতে পারুম না। একটা ফয়সলা করেন।

—কী বললে? এবার সোজা হয়ে বসলেন জমিদার, ও-সব হিতোপদেশ রাখো হে মাঝি! ছোটলোক ছোট হয়ে থাক। এত বিচার-আচার কিসের?

দাঁতে দাঁত চাপল রাজীব। মনে হলো, পানসীর বৈঠাটা যেন শক্ত হাতের মুঠোর চাপে গুঁড়িয়ে যাবে এক্ষুণি। তখন কিছু হল না।

দু'দিন পর কাছারীতে হৈ-হৈ ব্যাপার। কাল রাত্রে নরেন্দ্র নায়েবকে কে যেন মেরে হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে। কাৎরে এসে পড়েছে নরেন্দ্রর স্ত্রী। বিচার চাই।

জমিদার তেতে আগুন। রাজীবের চাকরী খতম হলো। উল্টে তিনশো টাকা খতে পাওনা দেখানো হলো। না দিলে মাথা গুঁজবার ভিটেটাও যাবে।

ঘাবড়ালো না রাজীব। রাত্রে সোনা আর পাঁচ বছরের রাজবল্লভকে নিয়ে গ্রাম ছাড়লো। এ পোড়া দেশে আর নয়।

এর পরেই তিতাসের তীরে নতুন ডেরা বাঁধা। সে আজ অনেক দিনের ইতিহাস। নৌকাপারানি করতে করতে এ কথাই [illegible]ছিল রাজবল্লভ।

আজ নতুন ভাবনা রাজবল্লভের মনে। লক্ষ্মীকে তার চাই। [illegible] চাই। হোক সে জেলের মেয়ে। আর সে নিজে মাঝি। দু'জনেই তো নদীর মানুষ। তিতাসের মানুষ। দংখলা আর [illegible]। মাঝি আর জেলেদের মধ্যে এই ব্যবধান সে রাখতে [illegible] না। লক্ষ্মীকে তার ঘরে আনতেই হবে।

গোকনের পাশ দিয়ে ব্যাপারীদের নৌকো নিয়ে গঞ্জে যাবার সময় [illegible] সঙ্গে দেখা। কালো বরণ, টিকালো নাক, স্বাস্থ্যে সারা দেহ টল-[illegible]। প্রথম দিনেই লক্ষ্মীকে দেখে ভাল লেগেছিল রাজবল্লভের। বাইশ-[illegible] বছরের তরুণ রাজবল্লভ। এই তো তার ভাল লাগবার বয়স।

দূর থেকে দেখা লক্ষ্মী একদিন আশ্চর্য্য যোগাযোগে কাছে এল। [illegible] গ্রাম শ্রীপুরে যাত্রা শুনবার জন্য নৌকো কেরায়া করল [illegible] থেকে। রাজীবের সেই নৌকোয় যাত্রী হল লক্ষ্মী। [illegible] বছরে তার যৌবন গুঠনবতী কেতকী ফুলের মতো। [illegible] না মেলতেই গন্ধে ম-ম করে চার দিক।

রাজবল্লভ আর চোখ ফেরাতে পারে না। চুপটি করে ছইয়ের এক কোণে বসেছিল লক্ষ্মী আর পাঁচ জন যাত্রীর সঙ্গে। কিন্তু দেখতে ভুল হল না রাজবল্লভের। স্নানের ঘাটে এলোচুল দোলানো লক্ষ্মীর সেই চাউনি ভুলতে পারেনি রাজবল্লভ। বৈঠার আওয়াজে তিতাসে কলধ্বনি ওঠে। হয়তো লক্ষ্মীর কচি বুকেও। শ্রীপুরের ঘাটে নৌকো ভিড়ল। যাত্রীরা নেমে গেল যাত্রা শুনতে। কংসবধ পালা। নৌকো ঘাটে বেঁধে রাজবল্লভও গেল পালা শুনতে। পালা শোনা আর হল না রাজবল্লভের। লক্ষ্মীর দিকেই সারাক্ষণ তাকিয়ে রইল। লক্ষ্মীও তাই। ফিরতি পথে চুপিসাড়ে এক সুযোগে রাজবল্লভ লক্ষ্মীকে বললে, তুমি খুব সুন্দর গো! কথা কও না ক্যান?

অন্ধকার রাস্তায় সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে লক্ষ্মী জবাব দেয়: তুমি কও না ক্যান? লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঘাটের পথটা বেশ দূর। পথ চলতে চলতে অনেক কথাই হয়। সব কথা বলেও বলতে পারে না। পথ শেষ হয়। নদীর ঘাট এসে পড়ে। রাজবল্লভ বুকভরা অতৃপ্তি আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে গলুইয়ে বৈঠা হাতে করে বসে। লক্ষ্মী চুপটি করে বসে গিয়ে ছইয়ের এক কোণে।

সারাটা জল পার হয়। কোনো কথার আর সুযোগ মেলে না। কিন্তু রাজবল্লভ অপেক্ষায় দিন গোণে লক্ষ্মীর জন্য। তিতাসের জলে সেই অপেক্ষমান সরল, সবল মাঝি, তরুণ হৃদয়ের ছায়া পড়ে। কিন্তু জলে তার দাগ পড়ে না। সন্ধ্যা হলে নৌকো নিয়ে একা-একাই রাজবল্লভ তিতাসে ভেসে পড়ে। লক্ষ্মীর নামের পাল দিয়ে বেয়ে বেয়ে অনেক দূর এগিয়ে যায়। যদি বা আচমকা কোনো দিন দেখা হয়ে যায়।

বর্ষায় তিতাসের জলে নবযৌবনের আবেগ। থৈ থৈ করে বন্ধনহারা জলের স্রোত। দংখলা আর গোকনের ব্যবধান জল-প্রবাহে দীর্ঘতর হয়। কলমীলতা আর আগাছার দঙ্গল তৃণ-গুচ্ছের মতো করে ভেসে উধাও হয়ে গেছে। এখন শুধু জল আর জল। সেই জলে পাল তুলে বেপারীর পণ্যবাহী নৌকোগুলো ভেসে ভেসে হাট-গঞ্জে পাড়ি জমায়। রাজবল্লভেরও কেরায়া অনেক বেড়ে গেছে। দু'দণ্ড তামাক খাবারও সময় হয় না।

নৌকা-বাইচের দিন ঘনিয়ে এল। প্রতি বছরেই তিতাসের কালো জলে নৌকা-বাইচের জমায়েৎ হয়। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসে বাইচের নৌকো। তিতাসের জলে প্রতিযোগিতার ঘূর্ণী ওঠে। রাজবল্লভের গ্রাম থেকেও যায় খান দশ নৌকো। বাইচের নৌকো। মাঝিদের দক্ষতার প্রতিযোগিতা হয়। নদীর দু'তীরে দর্শনার্থীদের ভীড় জমে।

রাজবল্লভও এসেছে বাইচে। নৌকা-বাইচের আনন্দ-শিহরণ থেকেও তার বেশি আনন্দ লক্ষ্মীকে দেখা। লক্ষ্মীর উপস্থিতিতে তার সবল, সুঠাম দেহে এক একটা বৈঠার প্রক্ষেপণ আরও যেন সুন্দর, আরও যেন গতিশীল হয়ে ওঠে।

দুপুর একটু গড়িয়ে এল। তিতাসের সাদা বুকে রোদ চিক-চিক করে। ময়ূরপংখী নৌকার জাঙ্গাল এসে জড় হয়েছে। লক্ষ্মীদের গ্রামের মেয়েরাও এসেছে একটি নৌকায়। গ্রামের অন্তঃপুরচারিণী বধূদের কতকগুলো কৌতূহলী চোখের ফাঁকে ফাঁকে

লক্ষ্মীর অবাক-করা চোখের দৃষ্টি বার বার বাইচের নৌকোগুলোকে যেন সাগ্রহে স্পর্শ করে গেল।

বাইচের উন্মাদনায় তিতাস থৈ-থৈ করে। তিতাসের তীরে মানুষদের মনেও তার চঞ্চল প্রেরণা। রাজবল্লভ যে নৌকো করে এসেছিল লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে তা দূর থেকেই ধরা পড়ল। রাজবল্লভও দেখল লক্ষ্মীকে। কিন্তু কথা বলার সুযোগ হয়নি সেদিন দু'জনের।

তিতাসের বুকে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে। আবার মাঝি-মাল্লাদের গানে দিগন্ত চঞ্চল হয়। আবার সুরু হয় পণ্যবাহী নৌকোর আনা-গোনা। শরতের নির্মেঘ আকাশে পেঁজা তুলোর মতো পুঞ্জ-পুঞ্জ পলাতক মেঘের বিচিত্র শূন্য বিচরণভঙ্গি! গাংশালিক আর তিতিরের কিচির-মিচির। রাজবল্লভ ভাবে, এই প্রতীক্ষার, প্রত্যাশার দিন শেষ হবে কবে?

নৌকো বাইতে বাইতে ফিরতি মুখে রাত হয়ে গেল। রাজবল্লভ গিয়েছিল অনেক দূরে, ভৈরব-বাজারের বন্দরে। তালসহরের বাঁকটা পেরিয়ে গোকনের কাছাকাছি আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। লক্ষ্মীদের বাড়ীর ঘাট আর একটু দূরেই। সারা দিনের কর্মক্লান্ত রাজবল্লভের মন আশায় চিক-চিক করে উঠল। যদি আজ দেখা হয়। যদি সে ঘাটে এসে থাকে। কেমন জানি এক দুর্মদ পিপাসা রাজবল্লভকে পেয়ে বসল। লক্ষ্মীকে তার চাই। কোনো বাধাই সে আজ মানবে না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পাখীরা ঘরে ফিরছে। তিতাসের জলে তাদের কুলায়-প্রত্যাশী ছায়া টলমল করছিল। বাঁকটা পেরোতেই জামরুল গাছের শাখার ফাঁক দিয়ে থালার মতো একটা চাঁদ উঠল। রাজবল্লভ গুন্ গুন্ করে গাইছিল—'ওরে সুজন নাইয়া, কোন বা কন্যার দেশে যাও রে সাধের ডিঙ্গা বাইয়্যা।'

রাজবল্লভের গলার স্বর তিতাসের জলে বহু দূর বিস্তৃত হয়ে ভাসছিল। জল নিতে এসে লক্ষ্মী অকস্মাৎ থেমে গেল। বৈঠা চালানোও থেমে গেল রাজবল্লভের। আস্তে আস্তে ভিড়ালো নৌকাটা লক্ষ্মীদের ঘাটে। জল ভরার ছল করে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী।

নৌকাটা কাছে এনে রাজবল্লভ ডাকলে : লক্ষ্মী! আরক্তিম লজ্জাবনতা লক্ষ্মী মুখ তুলল। কী এক দৃষ্টি যেন তার চোখে! জামরুল-শাখার আড়ালে থালার মতো চাঁদটার ছায়া নদীর জলে থর-থর করে কাঁপছিল। সেই কম্পমান নদীবক্ষে লক্ষ্মীর লজ্জানম্র ছায়া এসে মিশল রাজবল্লভের ছায়ার সঙ্গে।

অপেক্ষা করল না রাজবল্লভ। স্বপ্নচালিতার মতো উঠে এল লক্ষ্মী নৌকোয়। এ দুঃসাহসের সঞ্চয় পেলো কোথায় এই তরুণ-তরুণী। দৎখলা আর গোকনের গ্রামবাসীদের কাছে ঘটনাটা যে সময় অজানা থাকবে না, তখন কী হবে এ দু'জনের? ঘরে ফিরে যাবার আর কোনো সুযোগ নেই। জলেই এগিয়ে যেতে হবে। ছইয়ের ভেতরে লক্ষ্মী এসে বসল। রাজবল্লভের দিকে তাকিয়ে দেখল তার প্রশস্ত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে প্রশান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। ভয় কি লক্ষ্মীর?

দ্রুত বেগে ছপাছপ শব্দ করে এগিয়ে গেল নৌকা। গ্রামের প্রান্তে শ্মশানের শেষ সীমানায় রুদ্র কালভৈরবের মন্দিরের ঘাটে। দীর্ঘ প্রলম্বিত জটাজুট বটগাছের ঝুরি নেমে এসেছে তিতাসের জল অবধি। এই পরম নির্জন নৈঃশব্দ্যের রাত্রিতে কালভৈরবের মন্দিরকে প্রেতায়িত বলে মনে হচ্ছিল।

চুপটি করে বসে আছে লক্ষ্মী।

রাজবল্লভ ডাকল : নাম তুমি। পরেই বলল, খাড়ও, আমি কোলে কইর‍্যা নামামু তোমারে।

কোলে নিয়ে লক্ষ্মীকে বুকের সঙ্গে যেন পিষে ফেলল রাজবল্লভ। এই কালভৈরব। পঁচিশ ফুট উঁচু ত্রিনয়ন ভৈরবের বিশাল মূর্তি। রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসাদকামী আজ রাজবল্লভ আর তার লক্ষ্মী। পুরোহিতের সামনে এসে দাঁড়াল রাজবল্লভ। মন্ত্রোচ্চারণ চাই।

জেলে-মাঝির জন্যে আবার মন্ত্রোচ্চারণ! ক্রোধে আতপ্তচক্ষু পুরোহিত যেন ধিক্কার নিয়ে উঠলেন, মেয়ে ভাগিয়ে এনে মন্ত্র চাইছো? ভৈরবের সামনে এই দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দেব আমি পঞ্চানন তর্কতীর্থ?

মিনতি করে রাজবল্লভ : ছান ঠাউর কত্তা। ভাগাইয়া আনি নাই। 'আপনে জিগান মাইয়ারে। আমরা দুই জনে দুই জনরে ছাইড়া থাইকবার পারি না।

পা জড়িয়ে ধরল রাজবল্লভ। খড়মের শব্দ করে দূরে সরে গেলেন তর্কতীর্থ। এবার ছিলা-ছাড়ানো ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল রাজবল্লভ।

বৈঠা-বাওয়া পেশীগুলো উছলে উঠল। ইচ্ছে করলে···না, ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই পারে রাজবল্লভ। যাক, লক্ষ্মী রয়েছে সঙ্গে।

আর কথাটি বলল না রাজবল্লভ। লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল ভৈরবের মন্দিরে। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন তর্কতীর্থ। অন্ত্যজের মন্দির-প্রবেশ! কিন্তু রাজবল্লভ সবল পুরুষ। সে ব্রাহ্মণের কৃপার্থী নয়।

স্তিমিত ঘৃতপ্রদীপের আলোয় জ্বলছে রুদ্রভৈরবের তৃতীয় নয়ন ত্রিকালবিধৃত এই চক্ষুর গভীরে রাজবল্লভ দেখল নির্ভীক প্রশান্তির ছায়া। এ তো সর্বধ্বংসী রুদ্র নয়? এ তো দুঃসাহসীর কালস্পর্শ স্পর্দ্ধার ইঙ্গিতময় প্রতিচ্ছায়া!

—প্রণাম কর লক্ষ্মী!

দুজনে প্রণাম করল। পাদস্পর্শ করে নিল।

লক্ষ্মীকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাজবল্লভ কালভৈরবের মন্দির থেকে। কালভৈরবের পায়ের সিঁদুর নিজের হাতে লক্ষ্মীর সীঁথিতে পরিয়ে দিল রাজবল্লভ।

—চাও আমার দিকে।

লজ্জায় আরক্তিম লক্ষ্মী তাকাল। বুকে জড়িয়ে ধরল রাজবল্লভ এই অনাঘ্রাত-যৌবন মেয়েটাকে। আজ থেকে লক্ষ্মী রাজবল্লভের একার। পৃথিবীর কোনো শক্তিই আর ওকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

নৌকোয় উঠল গিয়ে দু'জনে।

অশ্বত্থের ডালে কর্কশ কণ্ঠে একটা রাককাণা কৌরাল ডেকে উঠল। গলুইয়ে গিয়ে লগি ঠেলে বৈঠা নিয়ে বসল রাজবল্লভ। নৌকা চলল মেঘনার দিকে।

—আমরা অখন যামু কই মাঝি? লক্ষ্মী রাজবল্লভের কোলে মাথা রেখে তারার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলে।

গালে মিষ্টি একটা টোকা দিয়ে রাজবল্লভ বলে : নতুন নদীর চরে ঘর করুম আমরা। নতুন ঘর বান্ধুম। নতুন মাইনষের লগে।

দ্রুতগতিতে স্রোতের টানে এগিয়ে চলল নৌকা। তিতাসের বাঁকে পড়ে রইল দৎখলা আর গোকন। ত্রিনয়ন কালভৈরব স্থিতনয়নে রাত্রি জেগে রইল। দুটি হৃদয়ের প্রাণসূত্র।

একটি সঙ্গীতের মৃত্যু

আশীষ বসু

নবধূর এতখানি উচ্চ কণ্ঠ আশা করেনি কেউ। আগে থেকেই শুনেছিলাম, নতুন বৌদি গান জানেন ভালো। অল বেঙ্গল, অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় বেশ উপরের দিকেই থাকে তাঁর নাম, এ-কথাটাও রটেছিল সাথে সাথে। ন-কাকীমা বিয়ের আগে টিপ্পনী কেটেছিলেন মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে; আর কি, বাড়ীটা তো ক্রমে বাঈজীর আখড়া বানিয়ে তুললে দেখছি সব। মানে মানে সতী, সাবিকে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠতে পারি তো সব দিক রক্ষে। সতী, সাবি ন-কাকীমার বড় আর ছোট মেয়ে, বয়স দশ আর আট।

তবু বিয়ে হল। গান শুনে মোহিত হয়েছিলেন বাবা। কনে দেখতে গিয়ে কনের কণ্ঠ দেখে এসেছিলেন। বাড়ীতে এসে মাকে ডেকে শুধু বললেন, অমন কণ্ঠ যার স্বভাব তার ভাল হবেই বড়বৌ। আমি একেবারে আশীর্ব্বাদ করে এলাম হাতের পান্নার সেই আংটিটা দিয়ে। মায়ের আমার হাতে লাগলও তো ঠিক!

ফুলশয্যার রাতে গানের আসর বসলো হলঘরে। লাল কার্পেটের ওপর কালো জাজিম পাতা হল, জরির কাজ করা। তাকিয়া পড়ল লাল শালু-জড়ানো। ফুলে ফুলময় চার দিক। সর্বত্র থেকে অনুরোধ এল গানের। তানপুরা টেনে নিলেন নতুন বৌদি। তবলচিকে নিষেধ করলেন সঙ্গত করতে।

পুরো পাঁচ মিনিট ধরে শুধু তারে তারে ঘা দিয়ে গেলেন বৌদি। শুধু ঝঙ্কার। শুধু সুর। প্রস্তুতি মাত্র। তার পর মেশালেন কণ্ঠ। একটু একটু করে গ্রাম থেকে গ্রামে। 'ও তোর বসনখানি রাঙ্গাস নে আর যোগী, রাঙ্গিয়ে নে তোর হিয়া, মধুর প্রেমের যোগিয়া রঙ দিয়া। যোগিয়া রঙ দিয়া—' টেনে নিয়ে চললেন বৌদি। অপূর্ব সে কণ্ঠ! কি কাজ গলায়! প্রতিটি মীড়ে মীড়ে কি আকুল বেদনা, কি মর্ম্মান্তিক আকুতি! যোগিয়া রঙ দিয়া সমস্ত মন ভিজিয়ে নাও, বসন তো অনেক ভেজালে। আর কেন? ফিরে ফিরে গাইলেন বৌদি ওই কলিটি অস্থায়ী আর অন্তরায়। বার বার ওই এক কথা।

গান থামলো। সমস্ত হলঘর নির্বাক্। ছোট ঠাকুরদা কোণে বসেছেন, ছেলে-বুড়োদের ভিড় বাঁচিয়ে বলে উঠলেন, বেঁচে থাকো মা, সতীলক্ষ্মী হও। বড় ঠাকুরদা কাপড়ে চোখ মুছলেন। বড় পিসীমা এসে বৌদির চিবুক তুলে দেখলেন, টল-টল করছে মুক্তোর মত দু'ফোঁটা অশ্রু তাঁর চোখে। বললেন, বড় আনন্দ পেলাম মা!

কিন্তু এতখানি উচ্চকণ্ঠ নববধূর! এ বউ সৌভাগ্যবতী হবে তো? বাড়ীর পুরোনো ঝি মতির মা সন্দেহ প্রকাশ করল। সায় দিলেন ন-কাকীমা, বড় কাকীমা, ও বাড়ীর পদ্মপিসী, শ্যামপুকুরের বেয়ান।

বউ-ঝিয়েরা ঘিরে বসলো নববধূকে। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম আমরা ছেলে-ছোকরার দল। এমন গান তুমি কোথায় শিখলে ভাই? মেজ বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার দাদামশাই ছিলেন মস্ত গুণী লোক। সেকালের সব বড় বড় ওস্তাদদের বাড়ীতে ডেকে এনে নিয়মিত চলত তাঁর গানের সাধনা। যা' কিছু শিখেছি সব সেইখান থেকেই, জবাব দিতে দিতে যুক্ত করে প্রণাম করলেন বৌদি।

ন-কাকীমা পাশেই কোথায় ছিলেন। ততক্ষণে আসরে এসে বসেছেন। কিন্তু বাপু, তোমার দাদামশায়ের কিছু কিছু দোষের কথা···, আমতা আমতা করতে লাগলেন ন-কাকীমা।

আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নতুন বৌদি। ফুলের মুকুট খসে পড়ল মাথা থেকে। সকলে সচকিত হয়ে উঠল, করলে কী, করলে কী? আজ রাতে মাথার মুকুট খুলতে আছে নাকি? বধূর তো নিজে নিজে উঠে দাঁড়াবার কথা নয়! মা আসবেন। আশীর্বাদ করবেন। তারপর বৌ-ঝিয়েরা বধূকে নিয়ে যাবে ফুলঘরে। এ বাড়ীর রীত তাই, রেওয়াজ তাই। অন্যথা হয়নি কখন! এ কী কাণ্ড! অমঙ্গল! অমঙ্গল বয়ে এনেছে নতুন বৌ ওর ওই সুমিষ্ট কণ্ঠের আড়ালে। ডাকিনী, তা' না হলে অমন কণ্ঠ হয় গৃহস্থ-বধূর!

নানা অতিথি-অভ্যাগত, আত্মীয়-পরিজনের ভিড়ে তারপর ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেছেন নতুন বৌদি। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের জাহাজে কোন মতে একটি কেবিনে স্থান করে নিয়েছেন নিজের। একে একে তাঁর কথা ভুলে গেছে সকলে। সংসারের চাকায় আর পাঁচ জনের সঙ্গে ঘুরে চলেছেন তিনিও। বিশেষত্ব তাঁকে দেয়নি কেউ, তিনিও দাবী করেননি।

কয়েক মাস বাদে হঠাৎ একদিন কি একটা কাজে সেজদার ঘরে গেছিলাম। খেয়াল বশেই শুধালাম, আর তো আপনাকে কখন গান গাইতে শুনি না বৌদি?

কখন গাই বল ভাই! সংসারের নানা কাজ। কত ঝামেলা, ঝক্কি, বলতে বলতে দম নিলেন বৌদি।

ভাল করে অনেক দিন তাকিয়ে দেখিনি তাঁর পানে। হঠাৎ যেন মনে হল বড় কৃশ হয়ে গেছেন। অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। বৌদি শরীর খারাপ নাকি? জিজ্ঞাসা করলাম।

সে কথার জবাব না দিয়ে বৌদি বললেন, তুমি নাকি গল্প লেখ

ভাই ? কই, কি গল্প লেখ একদিনও তো পড়ালে না ? আমার দাদামশায়…, বলতে বলতে থেমে গেলেন বৌদি। দাদামশায়ের প্রসঙ্গ ঐ বাড়ীতে তিনি আনতে চান না বুঝলাম।

কী, থেমে গেলেন কেন ? বলুন না ?

না থাক ভাই।

কেন ? থাকবেই বা কেন ? এই এত বাড়ীর ভিড়ে আপনার কি মনে হয় যে এমন একটা মানুষও নেই যে দরদী মন নিয়ে শুনতে পারে কিছু ?

না তা বলি না। তবে কথায় কথায় আবার কী কথা ওঠে, বুঝলে না ভাই ?

বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বলুন। অন্ততঃ আমাকে আপনি ওদের দলে ফেলবেন না, লক্ষ্মীটি বৌদি !

আমার দাদামশায় সত্যই ছিলেন দুশ্চরিত্র। অন্ততঃ সকলে তাই বলবে। সারা জীবন ধরে পিতৃপুরুষদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তিনি নিঃশেষে নষ্ট করেছেন তাঁর নানা খেয়ালের পিছনে। গানের সখ ছিল তাঁর। গানের জন্য দু'বার ঘর ছেড়েছেন শুনেছি। একটি মাত্র দুষ্প্রাপ্য ঘরানার আশায় বিবাহ অবধি করেছেন এক মুসলমান ওস্তাদ সাহেবের কন্যাকে। শেষ বয়স অবধি নিয়মিত হাজিরা দিয়েছেন সেই মুসলমান-কন্যার গৃহে। পত্নী জ্ঞানে ব্যবহার করেছেন সর্বদা। দাদামশায় বলতেন, দেখিস না বিজ্ঞানীরা ধনসম্পদ, যৌবন সব পরিত্যাগ করে তার অভিশপ্ত বস্তুটি পাবে বলে। যে কোন কাম্য বস্তুর বিধানই তাই। অনেক না দিলে তুমি তো অনেক আশা করতে পারো না। দাও, সব দিয়ে দাও, আকণ্ঠ ভরে আসবে ভরে আবার। অমন সঙ্গীত-পাগল লোক দেখিনি কখনো…দু'বার একই কথা বললেন বৌদি। থেমে থেমে বললেন। কপালে জমে উঠেছিল স্বেদবিন্দু। আঁচলের অগ্রভাগ দিয়ে মুছলেন। ফের শুরু করলেন, আমাকে ডাকতেন 'মিষ্টিদি' বলে। শেষবার যেদিন দেখা হল সেদিনও বললেন, বড় কষ্টের জিনিষ মা, অনেক আগলে আগলে রাখতে হয়। অপাত্রে কখন সঙ্গীত দিও না মা ! সঙ্গীতের অপমান হবে তাতে। সঙ্গতের প্রয়োজন নেই উচ্চকণ্ঠে। মনের মধ্যে অহরহ যদি সঙ্গীতের আসর বসাতে পারো তো পাবার মত পাবে। সঙ্গীত বড় আনন্দ দেয় মা, কিন্তু বড় কষ্টের পর দেয়। বড় জ্বালা সইয়ে দেয়। বড় জ্বালা সইয়ে দেয় মা ! থেমে গেলেন বৌদি। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা আর কইতে পারলেন না।

আচ্ছা মিষ্টি-বৌদি, তোমার বাবা তো গান-বাজনা এক-দম পছন্দ করতেন না শুনেছি।

মিষ্টি-বৌদি, বা, বেশ নামটিতে তুমি আমাকে ডাকলে তো ভাই ! আমার দাদু দেওয়া নাম। ওঃ, কী জিজ্ঞাসা করছিলে ? বাবার ব্যাপারটা অমনি বটে, কিন্তু তলায় তলায় আমি পরিচয় পেয়েছিলাম, … একজন উঁচু দরের সঙ্গীত-রসিক। কত দিন রাতে মায়ের নজর এড়িয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছেন ছাদে, তারপর বলেছেন, সেই … গা' তো মা ? 'মেরে গিরিধারী গোপাল—'। কত-দিন !

তারপর থেকে মিষ্টি-বৌদি যেন আমার রাত্রি-দিনের সাথী হয়ে … । তাঁর মনের একান্তে যে স্নেহের স্থানটুকু পড়েছিল অবহেলিত … কখন অলক্ষ্যে সেখানে হাত বাড়িয়েছি আমি। পেয়েছিও … ভরে। অনেক, অনেক কিছু।

কথায় কথায় একদিন বৌদি ধরে বসলেন, তোমার সব লেখা-পত্র আনো তো দেখি। তুমি কেমন সব গল্প লেখ পড়ি।

আনতে পারি বৌদি, কিন্তু এক সর্ত্ত, গান শোনাতে হবে।

গান ! গান গেয়ে আর কি হবে ভাই ! এখন ভাবি মাঝে মাঝে, গান না শিখলেই বোধ হয় ভাল করতাম। এই চাকায় চাকায় দিন কটা কাটিয়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি যে আর পারছি না ভাই !

আমি বুঝি বৌদি কোথায় আটকাচ্ছে তোমার।

কিচ্ছু বোঝ না ভাই, কিচ্ছু না। কই আনো তোমার গল্প।

কথা না বাড়িয়ে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখার বোঝা এনে দিলাম তার হাতে।

বিকেলে দেখা হতে বললেন, কি সব গল্প লিখেছ তুমি ! এ সব তো তোমার কথা। তোমার রাজ্যের কথা। ইট, কাঠ, পাথর আর পুতুলের গল্প। একটা মানুষের গল্প লিখতে পারোনি ভাই ?

মানুষের গল্প ! আমার কথা ! কী বলতে চান বৌদি ! তার পর মনে হল, ধরা পড়ে গেছি আমি। সত্যিই তো এতদিন যা' লিখেছি সে সব তো আমারই কথা, আমারই গড়া ইট, কাঠ, পাথর আর পুতুলের কথা। কই মানুষের কথা তো লিখিনি আমি ?

বৌদি শুরু করলেন, তোমার ধারে-কাছে কত মানুষের কত কথা ছড়িয়ে আছে। কত আনন্দ, কত দুঃখ, কত ব্যথার কথায় ভরে আছে চার দিক। সে সব তুমি দেখনি কখন ? তুমি বড় ছেলে-মানুষ। পৃথিবীটাকে কত সোজা চোখে দেখ ! ভালবাসার কথা লিখেছ, জান কা'কে বলে ভালবাসা ? আমরা তো মুখ্যু মেয়েমানুষ, হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমরা তো অনেক লেখাপড়া শিখেছ, বলতে পারো, কাকে বলে ভালবাসা ?

ভালোবাসা ! কাকে বলে ? তা' কি এক কথায় বোঝান যায় না কি ?

পারলে না তো ? আমি জানতাম, তুমি পারবে না। আমি বলছি শোন, ভালবাসা মানে নেশা। কী, আশ্চর্য্য হয়ে গেলে ? হ্যাঁ নেশাই ভালবাসা। মাতাল মদকে যতখানি ভালবাসে পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় ভালবাসা আর নেই। সঙ্গীতকে ভালবাসে সঙ্গীতকার, ছবিকে ভালবাসে শিল্পী, সৃষ্টিকে ভালবাসে স্রষ্টা, একটি মেয়েকে ভালবাসে একটি ছেলে। সব নেশা ঠাকুরপো ! চোখের ঘোর মাত্র।

শুধু নেশা, আর কিছু বলবে না বৌদি।

উঠে গেলেন বৌদি। কে যেন ডাকতে এসেছিল তাকে।

সিঁড়ির মুখে একদিন দেখা আবার বৌদির সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলেন, কই নতুন কিছু লেখনি আর?

লিখতে পারছি না বৌদি! তুমি তো সব গোলমাল করে দিলে।

ঘরে গিয়ে বসলাম সেজদার।

আফিংখোরের সেই গল্প জান ঠাকুরপো? ভগবান এক আফিংখোরের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে এলেন তাকে বর দিতে। কী বর চাও তুমি? আফিংখোরের চোখ তখনও ঢুলু-ঢুলু। বললে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুমি আফিং করে দাও প্রভু! তোমার গল্পও তাই ঠাকুরপো। তোমার চোখে সব সবুজ। ইট, কাঠ, পাথর আর পুতুলের গল্প তাই লেখ তুমি। কিন্তু আমার অনুরোধ ভাই, একটা, অন্ততঃ একটা মানুষের গল্প লেখ তুমি। রক্ত-মাংসের মানুষের গল্প। হাসিকান্নার গল্প। বেদনার গল্প। অশ্রুর গল্প। থেমে গেলেন বৌদি। জুতোর আওয়াজ আসছে কার?

মেজবৌদি, ছোট ভাই এসে খবর দিলে ছুটতে ছুটতে, সেজদা মোটর এ্যাকসিডেণ্ট করেছে। বাবাকে ফোন করা হল। ন-কাকা, মেজ কাকা সব যাচ্ছে মেডিকেল কলেজে। মা তোমায় বলতে বললেন, তুমি যাবে?

না।

না। সে কী? আমি চমকে উঠলাম। সেজদা…কথা জড়িয়ে গেল আমার।

বিদ্যুৎ গতিতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল বাড়ীর এ-কোণ থেকে ও-কোণে। চাকর-বাকরদের মহল থেকে আত্মীয়-স্বজনদের ঘরে ঘরে। সেজদার এ্যাকসিডেণ্টের কথা যত না, বৌদির না যাবার কথা তার চতুর্গুণ। আগেই বলেছি, ও মেয়ের কপাল ভাল না। এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফেরে তবেই ভাল। মা-ও বিরক্ত হলেন খুব। মুখে কিছু বললেন না। সত্যনারায়ণের ফুল আঁচলে বেঁধে ছুটলেন হাসপাতালে।

খানিকক্ষণ বাদেই মিষ্টি-বৌদি ছুটে এসেছেন আমার ঘরে। আমি হতবাক্‌। শ্যামল একহারা চেহারা, গোল মুখের ওপর খোদাই করা মুক্তোবসানো দু'টো চোখ, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, মুখে স্বেদবিন্দু, সেই তেমনি চেহারা। আগের মতই নির্লিপ্ত। একবার ফোন কর না ভাই হসপিটালে, দেখ কেমন আছেন?

আমি খুসী হলাম। এতক্ষণ বসে বসে কত কি ভাবছিলাম। মিষ্টি-বৌদির ওপর কেমন যেন একটা ভাব—। না থাক।

ফোনের সামনে বসে সরকার মশাই। চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বাড়ীর অনেকেই। খবর ভাল নয়।

পায়ে পায়ে উঠে এলাম ওপরে বৌদির ঘরে। বিছানার ওপর বসে আছেন অন্যমনস্ক ভাবে। কি যেন ভাবছেন পিছন ফিরে। আমি ঘরে ঢুকতেই বললেন, কি খবর ঠাকুরপো?

খবর খুব ভাল নয় বৌদি! মাথায় চোট লেগেছে। জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে। জ্ঞান আসেনি এখনো।

বোবা হয়ে গেলেন যেন বৌদি।

কিছু ভয়ের নেই এখুনি, এ কথাও বলেছেন ডাক্তার, আমি একটু বাড়িয়েই বললাম। কোন কথা নেই তবু। আমি ফিরে এলাম আমার ঘরে।

হঠাৎ দোতালা থেকে কিসের একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনে ছুটতে ছুটতে চললাম ফোনের ঘরের দিকে। কোনও খারাপ খবর এল নাকি সেজদার? ফোনের ঘরের কাছে গিয়ে দেখি ইতি-উতি, কেউ নেই কোথাও। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মতির মা। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে রে সব? এরা গেল কোথায়?

ও মা, সেজবৌদি যে গলায় ছুরি চালিয়েছেন! ওপরের ঘরে গিয়ে দেখ না।

গলায় ছুরি…! আমি আর ভাবতে পারলাম না। এ কী করলে বৌদি!

বাথরুম থেকে টেনে বার করা হল সেজবৌদির দেহ। মেজদার ক্ষুর দিয়ে গলায় পর-পর কয়েকটা ঘা দিয়েছে বৌদি। রক্তে রক্তময় চার ধার।

ওদিকে সরকার মশাই ভাল খবর বয়ে এনেছেন, সেজদার জ্ঞান হয়েছে। এখন অনেকটা ভাল আছেন।

তারপর ক'দিন বাড়ীতে সে কি হাঙ্গামা! পুলিশের লোক, উকিল, ব্যারিষ্টার কত ঝামেলা।

একটু একটু করে ঝিমিয়ে পড়ল সব।

বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের জাহাজ একটু টাল খেয়ে সামলে নিয়ে আবার যেমনটি তেমন চলতে লাগল। কেবিনে কেবিনে নতুন যাত্রী এল। সবাই ভুলল একটু একটু করে একটি সঙ্গীতের কথা। শুধু মাঝে মাঝে নতুন কোন গল্প লিখতে শুরু করলে আমার মনে পড়তো মিষ্টি-বৌদির সেই কথাটা, সেই আকুল আবেদনটা, একটা মানুষের গল্প লেখ ঠাকুরপো। রক্ত-মাংসের মানুষের গল্প। হাসি-কান্নার গল্প। বেদনার গল্প। অশ্রুর গল্প।

সৃষ্টি-সুখ

কুমারী অর্ঘ্য বসু

প্রতিদিন আকাশের ঘন নীলিমায় নব নব ছবি
পুনঃ পুনঃ এঁকে এঁকে মুছে ফেলে হায় কোন্‌ মহাকবি?
কারে শিখাইতে, কারে দেখাইতে লেখা—কে রাখে সন্ধান!
বিস্মৃতির অন্ধকারে সব স্মৃতিরেখা মুছে হয় ম্লান।

সাক্ষী রহে নীলাকাশ, যার বক্ষোপরি এত সমারোহ—
সে-ই নত করে মাথা সে কবিরে স্মরি চিরন্তন মোহ
মৌন সাক্ষী আর প্রভাতের রাঙা রবি যার রঙ নিয়া,
সে অজানা কবি রেখে যায় এত ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া!

ভুলে যায় একে একে জগৎ-সংসার কালস্রোতে পড়ি;
তবু কবি আঁকে কত ছবি অনিবার সৃষ্টি-সুখে স্মরি।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা·
টেলিফোন:-৩৪-১৭৬১ গ্রাম ব্রিলিয়ান্টস,

ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ
২০০/২ জি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা·ফোন-পিকে: ৪৪১৬,
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে

কলঙ্কবতী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গল্প লিখতে বসে যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তাহলে গল্প লেখাটা বিড়ম্বনা। গল্প গল্পই। কিন্তু পাঠক-মনে তবু দেখি, অনুভূতির উপকরণে গড়া একটা কাঠামে দানা বাঁধতে থাকে। এ ব্যাপারে পাঠক বোধ হয় লেখকের থেকেও বড় শিল্পী। সেখানেই এসে থামলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যেত। কিন্তু তার পর সেই কাঠামোর ব্যবচ্ছেদ পর্ব শুরু করেন তাঁরা। আগুনের গোলার মত তখন এক-একটা প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। কখনো বলেন, নীতি গেল না? কখনো বলেন, গল্পে বাস্তব কোথায়?

একটা ফুলকে কাদায় এনে ফেলার নাম দুর্নীতি নিশ্চয়ই; কিন্তু কাদার থেকে ফুল তোলার নামও কি তাই? যাই হোক, একখানি পুষ্পচয়নের জন্য আমি এক-রাশ পাঁক ঘাঁটতে রাজি আছি। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটাই একেবারে খাপছাড়া। বলছেন গল্প, অথচ জিজ্ঞাসা করছেন বাস্তব কোথায়? তবু এর জবাবে একবারও বলব না, তোমার খবরের কাগজের প্রতিদিনের খবরের বাইরেও জোরশেও, স্বর্গ-মর্তে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। মোট কথা, গল্পে বিশ্বাস বা সত্যতার দাবী রাখিনে আমি। উল্টে এক-একটা গল্প এমন হয়ে দাঁড়ায় যাতে সত্যের আঁচ লাগলেও মনে ত্রাস সঞ্চার হয়। এবারের গল্পটাকেও যত বেশী গল্প বলে ধরে নেন, তত নিরাপদ ভাবব নিজেকে। অন্যথায় লেখকের কানে তুলো গোঁজা আর পিঠে কুলো বাঁধাই আছে।

আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠতম কথাশিল্পী বলেছেন, অন্তর্দৃষ্টি থাকলে যে কোন মানুষের সঙ্গে দশ মিনিট কথা বললে একটা গল্প পেতে পারো। অভিজ্ঞতার ফলে এর ওপরে আমি আর একটুখানি সংযোজন করতে পারি। অন্তর্দৃষ্টি থাকলে যে কোন জায়গায় দশ মিনিট ঘুরে এলেও একটা গল্প খাড়া করা যায়। কারণ, পরিবেশটাই সব। গল্প তো ড্রইং-রুমে টেবিল-চেয়ারে কলম বাগিয়ে বসেই লেখা যায়। কিন্তু লিখতে বসে যে জন্য মাথা খুঁড়ি, সেটা হল পরিবেশ। নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর আকর্ষণটা আমার সব থেকে বেশী। গল্প সংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়াই নে, ঘুরে বেড়াই বলেই গল্প আসে।

আরাবল্লী পাহাড়টা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত রাজস্থানকে যেন মাঝামাঝি চিরে দিয়ে গেছে। উত্তর-পূর্বে পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রায় টঙের ওপর বসে আছে ভরতপুর। ছোট জায়গা। সকালের ঘুম-ভাঙা চোখে আকাশের দিকে চাইতে গেলে প্রথমেই পাহাড়ের গায়ে দৃষ্টি প্রতিহত হবে। এবারে এখান থেকেই গল্পের যবনিকা উঠছে।

একে-তাকে জিজ্ঞাসা করতে করতে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল। অবশ্য যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি সেই নিশানা বলে দিয়েছে। আমার কাছে সবই নতুন বলে হদিস পেতে সময় লাগছিল। তবু এ জায়গায় ভদ্রলোকটির পরিচিত আছে বোঝা গেল। চার দিকে সুপরিচ্ছন্ন বাগান। মাঝখানের লাল মাটির রাস্তাটা একেবারে বাড়ীর সিঁড়ির গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। গৃহস্বামীর নাম মাধব চতুর্বেদী। আমার পরিচিত নন, কখনো দেখিওনি তাঁকে। আমার বিশেষ একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভরতপুরে এসে শুধু এঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করেননি, সঙ্গে চিঠিও দিয়েছেন। শুনেছি, প্রাক্‌স্বাধীনতায় ষ্টেটের পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন মাধব চতুর্বেদী। এখন অবসর নিয়েছেন।

এ জায়গায় এক দিন থাকব কি সাত দিন, নিজেও জানতুম না। ভালো আস্তানা পেলে আর ভালো লাগলে দিন কতক কাটাতে পারি। নয় ত সেদিনই তল্পি-তল্পা গোটাতে পারি। মোট কথা, অবসরপ্রাপ্ত কোন ভদ্রলোকের ঘাড়ে চেপে বসার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। তবু প্রথমেই এঁর কাছে এলাম, কারণ, স্থানীয় অভিজ্ঞ কারো কাছে জায়গাটা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া দরকার। ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে এত-বড় বাগান-সমন্বিত এমন ছবির মত বাড়ীটার দিকে এগুতে এগুতে অস্বস্তি অনুভব করছি। পরনের খাঁকি ট্রাউজার, ছিটের বুস শার্টের মলিনতা যেন বেশী করে চোখে পড়তে লাগল নিজেরই। কাঁধের খাঁকি ঝোলার মধ্যে যা আছে, তা-ও এমন বাড়িতে চলনসই নয়। যাই থাক, এখানে আর বদলাবই বা কোথায়?

পায়ে পায়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালুম। সিঁড়ির পরে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় এক প্রস্থ টেবিল-চেয়ার পাতা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, চাকর-বাকর যদি কাউকে দেখতে পাই। বারান্দার ওধারের ঘর থেকে এক জন মহিলার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় ঘটল। দুই-এক মুহূর্ত। মহিলা সরে গেলেন। একটু বাদেই তিনি ঘর থেকে বেরুলেন আবার। এবার শাড়ির ওপর গায়ে মাথায় বুকে একটা ঘন আকাশী রঙের ওড়না আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো। শুধু কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত অনাবৃত। ধীর-শান্ত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন, এমন ঢেকে-ঢুকে এলেন, অথচ কোথাও এতটুকু জড়তা আছে বলে মনে হল না। আমার নিজেরই কিছু বলা

উচিত, কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনি স্পষ্টই হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

বললাম। তিনি স্বল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। আমার দিক থেকে আর বাক্‌স্ফুরণ হল না দেখে বললেন, বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

তেমনি শান্ত পায়ে প্রস্থান করলেন আবার। অনুমানে মনে হল ইনি গৃহস্বামিনী। শুধু মুখটুকু দেখে সঠিক বোঝা শক্ত। যৌবন যদি গিয়েও থাকে, যৌবনশ্রী প্রায় অটুট আছে। বারান্দার একটা চেয়ারে বসলাম। অকস্মাৎ কেন জানি ভদ্রলোককে ভাগ্যবান বলে মনে হল। কিন্তু কেন? মহিলার ধীর-শান্ত ঋজু ভাবটুকুই বোধ করি মনে ছাপ ফেলে থাকবে। এমন কমনীয়তার ওপর এত বেশী আব্রু চোখে কি রকম ধাক্কা দেয়। কান, এমন কি গলা পর্য্যন্ত ঢাকা। আবরণের আড়ালে থাকার প্রয়াসের থেকেও সরল নিষেধের ইঙ্গিতটাই যেন বেশী সুস্পষ্ট ঠেকে। ভাবলুম, হয়ত এটাই আভিজাত্য।

মাধব চতুর্ব্বেদী এলেন। নিজের অজ্ঞাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। প্রৌঢ় কিন্তু স্বাস্থ্যদৃপ্ত, সৌম্যদর্শন। পরনে ঢোলা পাঞ্জাবী। নমস্কার জানিয়ে পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে তাঁর হাতে দিলুম। আমায় বসতে আপ্যায়ন করে তিনি নিজেও উপবেশন করলেন। চিঠি পড়ে সকৌতুকে তাকালেন আমার দিকে।

—বেড়াতে এসেছেন?

পরিষ্কার বাংলা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। ঘাড় নাড়লুম। পরে বলেই ফেললাম, আপনি তো সুন্দর বাংলা বলেন দেখছি?

হাসলেন একটু। একটু-আধটু শিখেছি। রাজস্থানে জয়পুর উদয়পুর ছেড়ে ভরতপুরে বেড়াতে এলেন?

—ও সব জায়গা ঘুরেই আসছি।

—ও! এখানে কোথায় উঠেছেন?

বললাম, এই তো সবে আসছি, দেখে-শুনে উঠব কোথাও, হোটেল আছে তো?

একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন তিনি। জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার জিনিসপত্র কোথায় রেখে এলেন?

—কোথাও না। হেসে ঝোলাটা দেখিয়ে দিলুম, সব এতেই আছে, সাজের থেকে শয্যা পর্য্যন্ত।

ঈষৎ বিস্ময়ে তিনি একবার ঝোলাটা এবং একবার আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, বাঙ্গালীরা একটু বাবু-মানুষ শুনেছিলাম, ভারী অন্যায় কথা। আপনি অনুগ্রহ করে এই বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করলে সম্মানিত হব।

এ ধরণের সৌজন্যের সঙ্গে আমি কিছুটা পরিচিত। তাড়াতাড়ি বাধা দিলুম, সে কি কথা, আপনার নিশ্চয় অসুবিধে হবে। আমি বরং...

তিনি একখানা হাত তুলে নিরস্ত করলেন। বললেন, আমার জন্য কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। এত বড় বাড়িটিতে আমরা দুটিমাত্র প্রাণী থাকি। আপনি যে ক'দিন খুশী এখানে থাকবেন। আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন।

কি বলি ভেবে পাচ্ছিলাম না। তিনি একজন ভৃত্যকে আদেশ দিলেন মাইজীকে ডেকে দিতে। ক্ষণকাল পরে সেই মহিলাটিই এলেন আবার। শাড়ীর ওপর তেমনি ওড়না আঁটা। আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। তিনিও সবিনয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেন। আমি ফিরে বসতে উনিও আসন নিলেন। মাধব চতুর্ব্বেদী আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। এবারে অবশ্য হিন্দিতে।...বাঙ্গালী লেখক, আমাদের হেমরাজের বন্ধু—এই হেমরাজের চিঠি—কলকাতা থেকে রাজস্থানে বেড়াতে এসেছেন। এখানে হোটেলের খোঁজ করছিলেন, আমি ওঁকে এখানেই থাকতে অনুরোধ করেছি।

মহিলা শান্ত মুখে জবাব দিলেন, আমরা চেষ্টা করব ওঁর কোন অসুবিধে যাতে না হয়, বা আতিথ্যে ত্রুটি না ঘটে।

চতুর্ব্বেদী বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। আমি এক্ষুণি ওঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আর প্রাতরাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চলে গেলেন। ভারী বিব্রত বোধ করছিলাম। মহিলাটির মধ্যে একটা বিচিত্র রকম অভিব্যক্তি—যাকে বলে পারসনালিটি আছে বটে। কিন্তু ওঁর ও-রকম ঠাণ্ডা ভাবটাও প্রায় অস্বস্তিকর। তাছাড়া, যাঁকে রীতিমত সুন্দরী বলে মনে হয় এবং ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে সে রকম একজন মহিলা আপনার সামনে বসে, অথচ তাঁর দুটি চোখ, নাক, ঠোঁট এবং চিবুকের একটুখানি অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, সেটাই বা কেমন লাগে? তার পরেও চেষ্টা করলে তাঁর ঐ আপাদমস্তকে জড়ানো বসনই যেন আপনাকে চোখ রাঙ্গাবে। কিন্তু ঠিক কি না জানিনে, আমার এ-ও মনে হোলো, মহিলাটিকে তাঁর স্বামীও রীতিমত সমীহ করে চলেন। আমার পরিচয় দেওয়া, অথবা আতিথ্য গ্রহণের খবরটা দেবার সময়েও তাঁর মুখে একটু যেন বিনয় ভাব লক্ষ্য করেছি। মিসেস্ চতুর্ব্বেদী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে তিনি দরাজ গলায় বললেন, বি কোয়াইট এ্যাট হোম, স্যার। চান করবেন? না এই ঠাণ্ডায় আগে চান করে কাজ নেই, সহ্য হবে না। আমি রিটায়ার্ড ম্যান, এমনিতেই সময় কাটে না। তার ওপর আপনি লেখক শুনেছি, আর আপনাকে সহজে ছাড়ি? আপনাদের রবি ঠাকুরের কবিতা বোঝবার জন্যে আমি বাংলা শিখেছিলাম, জানেন?

জোরেই হেসে উঠলেন তিনি। এ রকম শুনলে কার না ভালো লাগে? বললাম, রবি ঠাকুরের কবিতা সব বুঝতে পারেন?

—কই আর পারি! বাংলা শেখার জন্যে আমি অনেক টাকা খরচা করেছি। কিন্তু অনুভূতিটা তো আর পয়সা দিয়ে কেনা যায় না! আপনাকে ধরে-বেঁধে এবারে গোটা কতক লেখা বুঝে নেব।

খুব বিশ্বাস হল না। এ রকম বাংলা কথা যিনি বলেন, তিনি বাংলা লেখা ভালো বোঝেন বলেই আমার ধারণা।

প্রাতরাশ এলো। তার পর থাকবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল আমাকে। সাজানো-গোছানো সুবিন্যস্ত ঘর। কোনো কিছুরই অভাব নেই। দু'খানি কল্যাণী হাতের স্পর্শ সর্বত্র সুপরিস্ফুট। সেদিন কাটল। তার পরদিনও। অসম-বয়স্ক হলেও ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মে গেল। চতুর্বেদী সেই ধরণের মানুষ যিনি সহজে সকল বয়সের সমবয়স্ক হতে পারেন। মস্ত সুবিধে তাঁর গাড়ি আছে। সকালে-বিকেলে সাগ্রহে নিজেই তিনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে লাগলেন। এখানে পাহাড়ে বেড়াবার আকর্ষণটাই সব থেকে বড়। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু এক-একটা রাস্তার মত উঠে গেছে। ধারে ধারে বিশালকায় পাথর। সেখানে বসে গল্প-গুজব করা চলে, পিকনিক করা চলে, আবার সেগুলির ধারে এসে নীচের দিকে তাকালে মাথাও ঘোরে।

গৃহস্বামী দেখলাম শুধু অতিথি-পরায়ণ এবং সদাশয়ই নন, বেশ গুণীও। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় কাব্য আলোচনায় বসে আলোচনায় এবং প্রশ্নে আমাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেললেন। বললাম, আপনাকে কবিতা বোঝাবো কি, আপনার কাছে অনেক বাঙ্গালী অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন। তিনি সহাস্যে জবাব দিলেন, তোমার অস্ত্রটি দেখছি ভালো, এবারে আমার মুখ বন্ধ করলে। গত কাল থেকে উনি আমাকে তুমি বলছেন, আর সেটা আমার বেশ ভালোই লাগছে। তার পর দিন বিকেলে নির্জনে ওরকম একটা পাথরের ওপর দু'জনে বসে আছি। বললাম, মাধবজী, এবারে তো আমাকে যেতে হয়। কাল যাবো ভাবছি।

—কেন, আর ভালো লাগছে না?

—এর পরেও যার ভালো লাগবে না, সে নিতান্তই অমানুষ। যেতে মন সরে না।

—তা হলে আর ক'টা দিন থেকে যাও না। বেড়াতে এসেছ যখন, একদিন যাবেই তো। আর হয়ত দেখাই হবে না।

—কেন, আপনি কি ভরতপুর ছেড়ে নড়েন না?

তিনি ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, কই আর!

এই ক'টা দিনে আমার আর একটা অনুভূতি মনে জাগছে। এত হাসিখুশীর মধ্যেও মানুষটি এক এক সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যেন। মেঘের ওপর যেমন রৌদ্র ওঠে, অনেকটা সেই রকম মনে হয় তখন তাঁকে। আজকের অন্যমনস্কতায় খানিকটা গাম্ভীর্য্যও আছে। এ ক'দিনের মধ্যে মিসেস চতুর্বেদীর সঙ্গে আর চাক্ষুষ সাক্ষাৎও হয়নি। আড়াল থেকে তাঁর যত্নের আভাস পাই মাত্র। আর, সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে এক ঘুমোবার সময় ছাড়া ভদ্রলোকটিও প্রায় সারাক্ষণই আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। সে জন্যে নিজেই বেশ বিব্রত বোধ করতাম। ভদ্রমহিলা হয়তো বা অসন্তুষ্টই হচ্ছেন আমার ওপর। কিন্তু সব মিলিয়ে যে অনুভূতিটা অনুভব করছি সেটা নিজের কাছেই খুব সুস্পষ্ট নয়।

চতুর্বেদী বললেন, এ দিকটায় একটু আধটু ডাকাতের উপদ্রব আছে বলে লোক-চলাচল কম।

এমন শান্ত স্তব্ধ জায়গায় এ রকম সংবাদ আর কার ভালো লাগে! বললাম, তা হলে তো এ দিকটায় না এলেই হত?

চতুর্বেদী হাসলেন। ডাকাতরা বোধ হয় জানে, আমিও খুব কম ডাকাত নই। আজ তবু দু'জন আছি, প্রায়ই তো একাই এসে বসি এখানে।···অত ধারে যেও না, এ দিকটায় সরে এসো—

—কেন, পড়ে যেতে পারি?

—পড়ে যেতে পারো, ঠেলে ফেলেও দিতে পারি। হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসলুম আমিও।—শরীরখানা এ বয়সেও যা রেখেছেন, ঠেলে ফেলার কাজটুকু ধারে না বসলেও স্বচ্ছন্দে পারেন বোধ হয়।

তিনি জবাব দিলেন, এ বয়সের এ শরীরটা মিসেস্ চতুর্বেদীর হাত-যশ, এর পিছনে আমার চেষ্টা নেই কিছু।

সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে নীচের দিকটা দেখলাম একবার। বললাম, একটা সুবিধে আছে, নীচে ওই পাথরের ওপর গিয়ে পড়লে প্রাণ বেরুতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না, সঙ্গে সঙ্গেই হাড় গুঁড়িয়ে আর মাথার খুলি চৌচির হয়ে সব শেষ।

চতুর্বেদী আস্তে আস্তে বললেন, সে রকম দৃশ্য এখানকার লোকে একবার দেখেছে—।

বিস্মিত নেত্রে তাকালাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা, ঠিক ওই জায়গায় এখানকার একজন প্রকাণ্ড আর্টিষ্টকে ও রকম তালগোল পাকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

আমি মনে মনে শিউরে উঠলাম। আমার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে কি ভাবলেন তিনিই জানেন।—আচ্ছা, পরে এক সময় বলব'খন গল্পটা।

—এখনই বলুন না?

—না, এখন ভালো লাগছে না।

তারপর দু'দিন কেটে গেল। আর্টিষ্টের প্রসঙ্গটা তিনিও আর উত্থাপন করলেন না। আমিও ভুলে গেলাম। যাবার আগের দিন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে এঁদের কথাই ভাবছিলাম। বিশেষ করে অদৃশ্যবর্তিনীর কথা।

পরদিন। সন্ধ্যায় গাড়ী। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রতিদিনের মত সেদিনও মাধবজী আমার কাছে এসে বসে পাইপ ধরালেন। হঠাৎ আর্টিষ্টের কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, সেই আর্টিষ্টের গল্পটা তো শোনা হল না মাধবজী?

পাইপ টানতে টানতে তিনি বার কতক আড় চোখে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। পরে আমার দিকে ফিরে হাসি মুখে বললেন, গল্প পরে হবে, বিয়ে তো করোনি শুনেছি, কিন্তু কোন মেয়েকে ভালোবেসেছ কখনো?

এ রকম একটা বেখাপ্পা প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু অম্লান বদনে বললাম, এন্তার—।

—সে কি হে!

—দেখতে ভালো হলেই কেমন যেন ভালোবেসে ফেলি।

দরাজ গলায় হাসলেন তিনি। তারপর সহসা হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন, আমার স্ত্রীটিকে কেমন দেখলে?

বিপদ বুঝুন! ভালো বললে নিজের কলে নিজে আটকাবো! হেসেই জবাব দিলুম, তাঁকে আর দেখলাম কোথায়? আপাদমস্তক তো ঢাকা।

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন মাধবজী। বললেন, ইউ আর এ ...ভার বোয়। একটু থেমে, অনেকটা যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন, একদিন ছিল জানো, যখন আমাদের মেয়েরা ইচ্ছে করে পরপুরুষকে মুখ দেখালেও কলঙ্ক লাগত।

—সে কী! আপনাদের মেয়েরা তো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেতেন।

—দরকার হলে যেত। অন্য সময়ে দেহে অন্য কারো কামনার আঁচ লাগতেও দিত না। আজকের দিনে অবশ্য এ নিয়ম আর নেই, থাকা উচিতও নয়।

—কিন্তু আপনার ঘরেই তো এ নিয়ম মানছেন একজন।

তিনি অন্যমনস্কের মত চেয়ে রইলেন আমার দিকে। হঠাৎ মনে হল, ওই বিস্মৃতিবিলগ্ন ঘনায়ত চোখ দুটিতে যেন একটা ব্যথাতুর ভাব রয়েছে।

একটু বাদে বললেন, আর্টিষ্টের গল্প শুনবে না? এসো।

গল্প শুনতে হলে আবার যেতে হবে কোথায় বুঝলাম না। তিনি আবারও আহ্বান করলেন, এসোই না।

অনুসরণ করলাম। ভিতরে আর কোনো দিন যাইনি। এদিকটা দেখলাম একটা আলাদা মহলের মত। একটা দরজা খুলে দিতে প্রকাণ্ড এক হলের মধ্যে এসে পড়লাম। দেয়ালের গায়ে গায়ে প্রমাণ আয়তনের তৈলচিত্র-সম্ভার। নারী-মূর্তি সব। হাস্যে লাস্যে যৌবন-স্বরূপিণী নগ্ন নারী-মূর্তি সব। কারো দেহে এতটুকু আবরণ নেই।

মাধবজী বললেন, ভালো করে দেখো, লজ্জা কী?

কিন্তু তবু লজ্জা পাচ্ছি। ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা পাচ্ছি। এরই মধ্যে একটি নারী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর ভিন্ন-ভাবখানি বিভিন্ন আলেখ্য টাঙ্গানো। কানের কাছটা গরম হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এঁরা সবাই কি এদেশেরই মেয়ে?

—সবাই।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হলের শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ালুম। মাধবজী সামনের দেয়ালজোড়া তৈলচিত্রটি ইঙ্গিত করে বললেন, দেখো।

এবার নিষ্পলক চোখে স্তব্ধ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সম্পূর্ণ নগ্ন দুটি নারী-পুরুষ। কিন্তু বহুক্ষণ চেয়ে থাকলেও একটুও গ্লানি স্পর্শ করবে না। যেন সহজ সরল শুচিতার প্রতিমূর্তি। লজ্জা, ভয়, গ্লানি বিরহিত প্রথম নারী আর প্রথম পুরুষ। পুরুষটির হাতে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। চোখে-মুখে বিবেক আর সংশয়ের অবিমিশ্র দ্বন্দ্ব। তার নগ্ন জানুতে দু'হাতে ভর করে মাটির ওপর বসে মুখের দিকে চেয়ে আছেন প্রথম নারী। মুখে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনাবিল প্রতীক্ষা। আশ মিটিয়ে দেখতে লাগলাম। তবু দেখে আশ মেটে না। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন একটা আলোড়ন অনুভব করলাম। ওই নারী-মূর্তিটি কি আমি কোথাও দেখেছি? না কি সকল পুরুষেরই মনের তলায় ওরকম একটা মানসী মূর্তি বিরাজ করছে, যাকে দেখলে মনে হয় বুঝি চিনি?

মাধবজী বললেন, এই ছবিখানা দেখবার জন্তেই তোমাকে এখানে এনেছি। আচ্ছা, এবারে এসো।

তাঁকে অনুসরণ করে ঘরে ফিরে এলাম। ফেরবার সময় আর অন্য ছবিগুলোর দিকে তাকাতেও মন সরলো না। মাধবজী আবার আরাম-কেদারায় শরীর ছেড়ে দিয়ে পাইপ ধরালেন। তারপর ধীরে ধীরে যে কাহিনীটি ব্যক্ত করলেন তিনি, শুনতে শুনতে আমার স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে। ভরতপুরের হাওয়ায় নারী-প্রগতি দানা বেঁধে উঠছিল যাঁর জন্তে, তিনি এখানকার ডেপুটি পুলিশ-সুপারের স্ত্রী কমলা দেবী। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটাও যখন এ দেশে ভালো করে চালু হয়নি, তখন স্বামীর সঙ্গে তিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন। অনেক আক্র, অনেক সংস্কার, অনেক ভ্রূকুটি সহজ অবহেলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বনেদি ঘরের মেয়ে, বনেদি ঘরের বউ, অর্থের জোর আছে, তার চেয়েও বেশী আছে রূপের জোর। অনেক কিছুই সহজ ছিল তাঁর পক্ষে। মেয়েদের নিয়েই একটা ক্লাব করেছিলেন প্রথম। কিন্তু তার আনাচে-কানাচে ছেলেদের আনা-গোনা উঁকি-ঝুঁকি দেখে সকলকে অবাক করে দিয়ে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, ছেলেরাও ইচ্ছে করলে ক্লাবে এসে যোগ দিতে পারেন। তাঁর অনুগত স্বামী পর্য্যন্ত প্রথম প্রথম এটা খুব সহজ ভাবে নিতে পারেননি। কমলা দেবী তর্ক করেননি, হেসে বলেছেন, দেখোই না সব রসাতলে যায় কি না। মোট কথা, অভিজাত মহলে ছেলে-মেয়েদের সহজ মেলামেশায় তখন বেশ একটা রোমান্টিক হাওয়া বইছে।

সেই সময়ে এই শিল্পীটিকে আবিষ্কার করলেন তাঁরা, অবশ্য শিল্পী বলে জানতেন না। নির্জ্জন পাহাড়ে বেড়ানোটা তখন খুব বেশী বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ডেপুটি পুলিশ-সুপার যাঁদের সাথী, স্বয়ং পুলিশ-সুপারও যাঁদের অন্তরঙ্গ সাথী, তাঁদের আর ভয়টা কিসের? একদিন যে পাহাড়টিতে মাধবজী এবং আমি গিয়ে বসেছিলাম, পঁচিশ বছর আগে সদলবলে সেখানে অভিযানে এসে তাঁরা দেখেন, লোকটি সেই নির্জ্জন পাথরটিতে আকাশের দিকে চেয়ে একা শুয়ে আছেন। পাশে তাঁর ক্যামেরাটা।

এঁরা যেমন অবাক, লোকটিও তেমনি নারী-পুরুষের বাহিনীটি দেখে হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একাই জয় করলেন এঁদের সকলকে। অমন সরল শিশুসুলভ মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না। জলে-ভেজা দু'টি ডাগর চোখ, শিশিরস্নাত মুখখানি, ঝাঁকড়া চুলে প্রায় বন্য সরলতা, সমগ্র কমনীয়তায় ভোরবেলাকার রূপের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে।

পুলিশ-সুপারই প্রথম জেরা সুরু করলেন, তুমি কে?

—আমি? আমি ডুগার—শোভন ডুগার।

—এখানে কি করছ?

—আকাশ দেখছি।

মেয়েরা কলস্বরে হেসে উঠলেন। কোথায় থাকেন, কি করেন ইত্যাদি জেনে নেবার পর তাঁকে বলা হল, এ ভাবে একা এখানে এসে যে আকাশ দেখা হচ্ছে, ডাকাতের খপ্পরে পড়লে?

তিনি চিন্তিত মুখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, ক্যামেরাটা তাহলে নিশ্চয় যেত।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষরাও হেসে ফেললেন এবার। ফিরতি পথে সঙ্গী একজন বাড়ল। তার আগে শোভন ডুগার অনেকগুলো ছবি তুললেন সকলের।

এই ছবি তোলার ঝোঁক তাঁর কত বেশী সেটা পরে ক্রমশঃ বোঝা গেল। কিন্তু ঝোঁকটা তাঁর মেয়েদের ছবি তোলার প্রতিই। ছ'মাস না যেতে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন সকলেরই। মেয়েরা প্রথম প্রথম ছবি তুলতে দিতে হয় তো বা একটু আধটু আপত্তি করতেন, কিন্তু তাঁদের নেত্রী যখন স্বয়ং হাল ছেড়ে দিলেন, নাও বাপু, এই বসলাম, যেমন করে খুশী, যতক্ষণ খুশী ছবি তোলো,— তখন সঙ্গিনীদেরও আর বাধা থাকল না। যেমন করে খুশী এবং যতক্ষণ খুশী ছবি তুলেও কিন্তু খুশী হতেন না ডুগার। বলতেন, তোমরা মেয়েরা কেউ সহজ 'পোজ' দিতে জানো না, সকলেরই চোখে-মুখে কৃত্রিমতা। মেয়েরা চটতেন, কিন্তু ভালও বাসতেন ওঁকে।

তারপর একদিন দেখা গেল শোভন ডুগার ডুব মেরেছেন। মেয়েরা চিন্তিত হলেন। এবারে সত্যিই কোনো ডাকাতে তাঁকে খতম করে দিল কি না কে জানে? কমলা দেবী উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীকে তাগিদ দিতে লাগলেন, সত্যিই কোনো বিপদ ঘটল কি না অনুসন্ধান করতে।

শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। তখনই শুধু জানা গেল আসলে উনি চিত্রশিল্পী। কিন্তু তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়বস্তু শুনে ঝড়ের আগের স্তব্ধতার মত সবাই স্তব্ধ। শিল্পীর চতুর্দিকে মেয়েদের ফটোগুলো ছড়ানো, তারই থেকে তুলি আর রঙে এক একটা নগ্ন-মূর্তির আবির্ভাব ঘটছে। ফটোর থেকে শুধু মুখ এবং অভিব্যক্তিটুকু তুলে নিচ্ছেন, বাকিটা কল্পনা। অনেকেই এসে জোর করে ষ্টুডিওতে ঢুকলেন, নিজের চোখে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে গেলেন।

মেয়েরা একেবারে বোবা। এমন দেখতে অথচ এত শয়তানী! পুরুষদের বুকে আগুন জ্বলল। বড় বড় অভিজাত ঘরের মেয়েরা সংশ্লিষ্ট, কাজেই আইন-আদালত না করে নিজেরাই তাঁর বিচারের পরামর্শ করলেন। সাদাসিধে বিচার। মর্যাদা বা আত্মসম্মানের হানি ঘটলে এদেশের লোক তখনো অম্লান বদনে বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। নিঃশব্দে তাকে নির্মম বিদায় দেওয়াটাই সাব্যস্ত হল।

স্বামীর মুখ থেকে কমলা দেবী শুনলেন সব। সকলের অজ্ঞাতে তিনি ষ্টুডিওতে এলেন। সাক্ষাৎ হল শোভন ডুগারের সঙ্গে। দেখলেন তাঁর শিল্পচর্চা। ডুগার চুপচাপ বসে আছেন। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন নিরীক্ষণ করে।

—এভাবে জীবনটা হারাতে বসলে?

ডুগার বললেন, জীবন যেতে পারে জানতুম, কিন্তু কাজটা হল না, এই দুঃখ।

—কী কাজ?

—যে কাজের মধ্যে বরাবর বেঁচে থাকতে পারতুম, সে রকম একখানা ছবি।

কমলা দেবী জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ডুগার বললেন, দুটি নারী-পুরুষের মূর্তি আঁকব ভেবেছিলাম, যাদের মধ্যে পাপ ঢোকেনি। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দুটি নারী-পুরুষ। কিন্তু চেয়ে দ্যাখো, তোমাদের মুখ আমি অবিকৃত রেখেছি। অথচ নগ্ন প্রতিকৃতিটি কি বিষম নগ্ন!

কমলা দেবী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, নারী-মূর্তি পেলে, না, কিন্তু তেমন পুরুষ-মূর্তি পেয়েছ?

—তোমাদের চোখ থাকলে সে মূর্তি দেখতে পেতে।

কিন্তু সত্যিই চোখ আছে কমলা দেবীর। দেখেছেনও। শুধু খেয়াল করেননি। আজ খেয়াল করলেন, আর দেখলেন। ধীর শান্ত দুই চোখ মেলে শুধু দেখলেনই।

এর পরে কোথা দিয়ে কি হল কেউ হদিস পেল না। এমন কি কমলা দেবীর স্বামীও না। দেখা গেল, সশস্ত্র দুটি সৈনিক পুরুষ অষ্ট-প্রহর ডুগারের ষ্টুডিও পাহারা দিচ্ছে। পুলিশ-সুপার ছিলেন কমলা দেবীর একান্ত গুণমুগ্ধ—ব্যবস্থাটা তাঁরই। কিন্তু, ডেপুটি পুলিশ-সুপার অর্থাৎ কমলা দেবীর স্বামীর কাছেও তিনি এর কারণ প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, লোকটা এক ধরণের রোগগ্রস্ত, কি হবে তাকে হত্যা করে?

ক্রমশঃ অন্য সকলেরও উত্তাপ প্রশমিত হয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত বিকারগ্রস্ত বলেই ধরে নিলেন তাঁকে। শুধু ভদ্র-সমাজে আর মিশতে না এলেই হল। সমাজে আর মিশতে এলেনও না শোভন ডুগার। পুলিশ-সুপার পাহারা তুলে নিলেন।

কিন্তু কমলা দেবীর মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন এল। তাঁর স্বামী এবং সঙ্গি-সঙ্গিনীরাও অনুভব করলেন সেটা। অনেকটা যেন স্থির হয়ে আসছেন। নিয়মিত ক্লাবে আসেন না, নিয়মিত বাড়ীতেও থাকেন না।

ছ' মাস পরের কথা। শোভন ডুগারকে সবাই ভুলেছে। হঠাৎ একদিন রাষ্ট্র হল, জয়পুরের অত বড় ছবির এগ্‌জিবিশানে প্রথম হয়েছে শোভন ডুগারের একখানা ছবি, সে ছবির নাকি তুলনা নেই। দেশী-বিদেশী শিল্প-গুণভাজনরা বহু হাজার টাকা দাম দিতে চাইলেন ছবিখানার, কিন্তু শিল্পী সেটা বিক্রী করতে অসম্মত।

এখানে আবার একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সেটা আরও বাড়ল ছবিখানা এখানে ফিরে আসার পর। দলে দলে লোক আসতে লাগল দেখতে। প্রথম মানব এবং প্রথম মানবী-মূর্তি। নগ্ন, কিন্তু অপরূপ! এই মানব-মানবীকে এখানকার লোক চেনে। তবু অভিভূত হল, মুগ্ধ হল। রাগতে পারল না। সেদিন যেন সবাই নতুন করে উপলব্ধি করল, কেন মানুষটা মেয়েদের ফটো তোলার জন্য এতখানি ব্যগ্রতা প্রকাশ করত। মনে মনে ভাবল, পাগল শিল্পীর কল্পনাসম্ভারের তুলনা নেই।

মুগ্ধ হলেন না, অভিভূত হলেন না শুধু এক জন। তিনি কমলা দেবীর স্বামী। ডেপুটি-পুলিশ সুপার। শুধু তিনি দেখলেন, শুধু তিনি জানলেন, কোন ফটোগ্রাফ থেকে রূপায়িত হয়নি এই নারী-মূর্তি।

এই পর্যন্ত বলে মাধব চতুর্বেদী থামলেন। আমি নিষ্পন্দের মত বসে আছি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, তার পর কি করলেন ডেপুটি পুলিশ-সুপার?

—ডেপুটি পুলিশ-সুপার শিল্পীকে একদিন কাঁচপোকার মত টেনে নিয়ে এলেন সেই পাহাড়ের ওপর যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেখানে তুমি-আমি গিয়ে বসেছিলাম সেদিন। শিল্পী সত্য গোপন করলেন না। তারপর নির্মম পশুর মত

তিনি দু'হাতে তাঁকে শূন্যে তুলে সেই নিঃসীম অতল কঠিনের বুকে নিক্ষেপ করলেন।

বসে আছি।···বসেই আছি।

মাধবজী এক সময় উঠে গেলেন। বাইরের আলো এক সময় আবছা হয়ে আসতে লাগল। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আমিও উঠলাম। জিনিসপত্রগুলো সব ঝোলার মধ্যে গুছিয়ে প্রস্তুত হলাম।

মাধবজী এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, রেডি?

—হ্যাঁ।

—চলো, ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসি।

তাঁর সঙ্গে বাইরে এসে থামলুম। দ্বিধান্বিত ভাবে বললাম, মিসেস্ চতুর্বেদীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব না?

এক মুহূর্ত ভেবে তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, ওই ও-ঘরে আছেন, দেখা করে এসো, আমি গাড়ীটা বার করি।

তিনি চলে গেলেন। আমি বিপদগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইলাম অল্পক্ষণ। পরে পায়ে পায়ে ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চুপচাপ বসেছিলেন মিসেস্ চতুর্বেদী। আমায় দেখে সচকিতে আলনা থেকে ওড়নাটা টেনে নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর আবৃত করলেন না। ওটা হাতেই রইল। আমি কিছু একটা আভাস পাচ্ছি কি না সঠিক বুঝছি না। পঁচিশটা বছর বাদ দিয়ে দেখা এক মুহূর্তে সহজ নয়। তা ছাড়া বাইরের আলোটা আরও কমেছে। নিঃশব্দে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে ফিরে এলাম।

মাধবজী গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে এসে বলেই ফেললাম, একটা অনুরোধ মাধবজী, ওই ছবিখানা যাবার আগে আর একবার দেখাবেন?

মাধবজী গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন। বললেন, না, তোমার সময় হয়ে গেছে, ওঠো—।

অনামিকা

শান্তিকুমার ঘোষ

তোমাকে খুঁজেছি আমি পৃথিবীর উদ্বাস্তুর ভিড়ে—
পায়ে পায়ে কত দিন দ্রুতযানে রাজধানী-পথে
হয়তো বা কাছাকাছি চুলের গ্রন্থিতে গাঁথা মঞ্জরীর ঘ্রাণে
স্পর্শে স্বাদে বহু দূর ভেসে গেছি চলমান স্রোতে।

সারা দিন শুধু এ কি অঙ্গারের জ্বালা—
চূড়ার তুষারে যেন তীব্র এক আলো,
থেকে থেকে ছুটে আসে মরুভূর হাওয়া—
মুঠি মুঠি ধূলা ওড়ে এখানে-ওখানে।
হঠাৎ দেখেছি তুমি চৌমাথার মোড়ে
খুলেছ ফোয়ারা এক অবিশ্রান্ত বলে—
পাঁচরঙা পায়রারা ঘুরে ঘুরে ওড়ে।
অজস্র চুলের ফণা ঢেকেছে শরীর
অঝোর উত্তাপ থেকে বাঁচিয়ে গোপনে।
দেখি তুমি অনায়াসে কেটে কেটে চলে যাও ভিড়
লোভ-ভয় দুর্বলতা দুই পায়ে দ'লে;
অকাল বর্ষায় ভিজে খিল খিল হাসি,
দোকানে দোকানে ঘুরে কত কাচ-ঘরে
সাজানো খেলনা দেখো চোখ দুটি ভ'রে।

কিন্তু কী ক্লান্তির ছবি সস্ত সেই মুখে—
আহা সে বল্লরী-তনু কত ঝড় রুখে!
ওই কি দয়িতা প্রিয়ে স্থির সেবাব্রতা—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তোলপাড় যন্ত্রণার ভারে
চরম চূড়ায় শুধু নিরুপায় দোলে?

তার চেয়ে সমতল ছেড়ে চলো পাহাড়ের ছায়:
উদ্ভিদ-সবুজ রঙে ভিজিয়ে ব্যথিত চোখ
পাহাড়তলীর ঘরে ঝরণার গান—
নির্ভীক শেরপা-মন মেলে দিই তবে
উদ্দিষ্ট স্বপ্নের করি সহজ নির্মাণ।

তুমি বেগোনিয়া প্রজাপতি-ফুল হাসো অর্কিড-ঘরে।

তোমাকে করাবো স্নান কুয়াশার জ্বরে:
উঠতে খাড়াই-পথে সহসা শিখর
মেঘের ধূসর ছিঁড়ে নীল পিরামিড,
দুধারে সরল গাছ প্যাগোডার মত,
ঠাণ্ডা ঝোরার হাওয়া চোখে-মুখে মেখে
হঠাৎ সামনে হ্রদ—তোমারি হৃদয়।

যদিও জানি না কী যে চাই প্রিয়—আজো ফিরি চুপে চুপে,

আভাসে ইঙ্গিতে তবু ঝলকে বিস্ময়;
তোমাকেই বুঝি পাবো অতি সাধারণ—
পশম-বুনন-রত পার্বতীর রূপে।

বাসব ঠাকুর

দু'-এক মাস হল পার্ক সার্কাসে ফ্ল্যাট-টা ভাড়া নিয়েছিলাম। আমি আসার আগে শুনেছিলাম থাকতো সেখানে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান-পরিবার। আর বাড়ীটা নাকি বেশ কিছু দিন খালি অবস্থায় পড়েও ছিল। এর বেশি আর কিছুই জানতুম না ফ্ল্যাটটার সম্বন্ধে। এক তলা বাড়ী, তিনখানা ঘর, একটু ছোট ছোট হলেও আমার কাজের পক্ষে মন্দ ছিল না।

প্রতি হপ্তায় তিন দিন কয়েক জন বন্ধু আসতেন সন্ধ্যের দিকে তাস খেলার জন্য। প্রথমে খেলা হত ব্রীজ। হার-জিতের সঙ্গে পয়সাকড়ির কোন সম্বন্ধ থাকতো না তখন। পরে বম্বের লোক সুরজ ভাই ঐ আড্ডায় যোগ দিয়ে সুরু করলেন দু'পয়সা পয়েন্টে রামি খেলা। কিন্তু তারপর এক টাকা দু'টাকা পয়েন্ট পর্য্যন্ত খেলা হতে লাগলো। আরো কিছু দিন পর পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী কিষেন সিং আনন্দ এসে ধরিয়ে দিলেন তাস। আমার বৈঠকখানাটি দেখতে দেখতে কখন যে একটি পুরোদস্তুর জুয়ার আড্ডায় পরিণত হয়ে গেছিল আমার তা খেয়ালই হয়নি। তবে সারা দিনের লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ শেষ করে ঐ তাসের আড্ডায় সময়টা গোড়ার দিকে মন্দ কাটতো না।

কিছু দিন যাবার পর আমার ব্যবসায় হ'ল একটা মোটা লোকসান। মাড়ওয়ারি পার্টনার বোধ হয় লোকের মুখে শুনেছিলেন ঐ তাসের আড্ডার কথা। তাই একদিন মিহি সুরে একটু অনুযোগ করলেন, "তাস নিয়ে অত মেতে থাকলে কি ব্যবসা করা চলে?" কাজের ভারটা সমস্ত আমারই উপর থাকায় লোকসানের জন্য দেখতে গেলে দায়ী ছিলাম আমিই, তাই বিনা বাক্যে সব কথাই হজম করতে হল। কিন্তু বন্ধ করতে পারলুম না তাস খেলা। যদিও ব্যবসায় লোকসানের জন্য সব সময় মাথার মধ্যে ব্যবসার কথাই ঘোরে আর তাস খেলার সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, কাযে হয়ে যায় ভুল। শেষে তাসের আড্ডাতেও হেরে গিয়ে লোকসান দিতে হয় অনেক টাকা।

মাড়ওয়ারি পার্টনারের সঙ্গে সেদিন সকালে হয়েছিল বেশ একটু কথা-কাটাকাটি। মন্দা বাজারের কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে শুধু আমার নয়, আরো অনেকেরই ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই সব দিক দিয়ে মেজাজটা ছিল বিগড়ে।

অনেক চেষ্টা করেও খেলার সময় মনটাকে সংযত করতে পারছিলাম না। কেবলই হেরে চলেছি। তাসের টেবিলে নজর রেখে লাভ নেই। সুরজ ভাই ডিল করছে। হয়তো ঐ সময় সে জোচ্চুরি করে, ঐ সময় কিন্তু তার দিকে নজর রেখে তাকে যে ধরবার চেষ্টা করছে এ রকম মনের অবস্থা তখন আমার নয়। তাই সব-কিছুই ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে চেয়ে ছিলাম সামনে নতুন হোয়াইট ওয়াস করা দেয়ালের দিকে। কোন এক আমেরিকান কোম্পানীর পাঠানো প্রায়-বিবস্ত্রা এক যুবতীর ছবি দেয়া ক্যালেণ্ডারটা ঝুলছিল দেয়ালের মাঝখানে। ভাবছিলাম, আমেরিকানরা অশ্লীলতার এত পক্ষপাতী হয় কেন? মনে আসছিল সম্প্রতি পড়া আমেরিকান সাহিত্যে নাম করা দু'-একটা গল্পের বই। এমন সময় নজরে এলো দেয়ালের জায়গায় জায়গায় হোয়াইট ওয়াস ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে পুরোনো রংটা। দেখলাম, এক জায়গায় অস্পষ্ট একটা পেন্সিলের লেখা। চেয়ারে বসে বসে অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম লেখাটা পড়বার কিন্তু পড়া গেল না। লেখাটা যে কি, পড়বার জন্য ক্রমশঃ আমার আগ্রহটা বেড়েই যাচ্ছিল। চলতি পথটা শেষ হলেই উঠে গেলাম দেয়ালের কাছে। হাত দিয়ে চুণটা একটু ঘষতেই পেন্সিলের দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

'ও রো থী' কোন এক খৃশ্চান মেয়ের নাম। আমার আসার আগে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যারা থাকতো তাদেরই কেউ হয়তো লিখে ছিল। হাসি পেল এবং কল্পনায় ভেসে উঠলো কোন এক অজ্ঞাত তরুণীর চিন্তায় বিভোর শীর্ণকায় একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক। আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে কিষেন সিং বলে উঠলো, "ব্যাপার কি হে, সামান্য ক' টাকা হেরেই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লে যে!"

অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এলাম। আমার দান। ভাল করে না ভেবে একটা কার্ড দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু যেন একটা অদৃশ্য শক্তিতে সেটা আমায় না ফেলতে দিয়ে অন্য একটা কার্ড ফেলিয়ে দিলে। জিতে গেলুম সে দানটায়। এবার আমার ডিল করার পালা। সাফল করতে করতে স্পষ্ট অনুভব করলুম আমার হাতে যেন এক নতুন শক্তি এসেছে। তুলে দেখি আশ্চর্য্য রকম ভাল কার্ড পেয়েছি, তাই সাহস করে ব্লাইণ্ড খেলে চললুম। সে দানটাতেও বেশ মোটা লাভ হ'লো। সেদিন খেলা শেষ হলে দেখলুম, অনেকগুলো টাকা জিতেছি।

সবাই চলে গেলে বিছানায় শুয়ে ভাবছিলুম, খেলার শেষের দিকে আমার যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। বহু বার মনে হয়েছে—একটা কার্ড ফেলতে গিয়ে আর একটা কার্ড ফেলেছি। মনে হচ্ছিল আমার হাতটা যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছায় চলেছে। কিন্তু সে কি সম্ভব? নিজের হাত অন্য কারো ইচ্ছায় কি চলতে পারে? অনেক দিন পর আজকে জিতেছি বলে এসব মনে হচ্ছে। তাই ঐ সব বাজে কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়াই উচিত ভেবে আলোটা নিবিয়ে দিলুম।

ঘুম আসছিলো না, তবুও চোখ বুজে ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো

ঘরটা যেন কেমন অস্বাভাবিক একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভরে উঠেছে। চোখটা খুলতেই নজরে এল পায়ের দিকে একটা আবছায়া মানুষের মূর্ত্তি। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠলুম, "কে তুমি?" উত্তর পেলুম, "ভয় পেও না, আমি জর্জ, কিছু দিন আগে আমরা সপরিবারে ছিলাম এখানে।"

বললাম, "কিন্তু এখন এটা আমি ভাড়া নিয়েছি, তোমাদের পরিবারের কেউ-ই এখানে আর থাকে না। তারা যে কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করতে পার এই বাড়ীর মালিককে, তিনি থাকেন বালীগঞ্জে। হয়তো তুমি অনেক দিন পর বিদেশ থেকে আসছো এবং জান না যে এর মধ্যে বাড়ীটা অন্য লোকে ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু নিজের বাড়ীতেও কেউ এমন নিঃশব্দে চোরের মত পাঁচিল টপকে কিংবা ড্রেণের পাইপ বেয়ে আসে না। যাই হোক, মেনে নিচ্ছি তুমি এই বাড়ীর পুরনো ভাড়াটেদের আত্মীয় হও, জানতে না যে তারা আর এখানে থাকে না, তাই এসেছিলে তাদের সঙ্গে এমনি ভাবে একটু রসিকতা করতে। আচ্ছা, এবার তাহলে তুমি এসো।"

কিন্তু আমার কথায় লোকটা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে ড্রেসিং-টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারটায় গিয়ে বসলো, বললে "আমার পক্ষে এখান থেকে যাওয়াটা যে কত অসম্ভব, তা তুমি কি করেই বা জানবে? তবে আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করতে আসিনি, আমি থাকলেই বা তোমার ক্ষতি কি?"

ঘুমটা সম্পূর্ণ কেটে যাচ্ছে দেখে অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলাম। বললাম, "সবই বুঝলাম, কিন্তু এই ছোট ফ্লাটের মধ্যে আমার নিজেরই কুলিয়ে উঠছে না তো 'সাব্‌টেনেণ্ট অথবা বোর্ডার কি করে রাখি বল? দয়া করে তুমি অন্য জায়গা দেখ। আর কিছু মনে কোরো না, আমায় এবার রেহাই দাও, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

তবুও লোকটা যায় না দেখে ভাবলাম নীচের দরজাটা খুলে না দিলে ও যাবেই বা কি করে, আসবার সময় হয়তো ফটকের পাশে পাঁচিলটার এক যায়গা ভাঙ্গা পেয়ে সেটা টপকে এসেছে। তাই বললাম, "চলো দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।" লোকটা তবু চেয়ারটা ছেড়ে উঠবার কোন চেষ্টাও করলে না। শুধু বলে চললো—"আমি এসেছি তোমারই ভালোর জন্য, যা বলি মন দিয়ে শোনো—আগামী কাল তোমার একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ আসবে, যাতে তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে অচল হয়ে যেতেও পারে। এমন কি, তোমার কারখানা হয়তো তুলে দিতে হবে। কিন্তু খবরটি পেয়ে খুব বেশি মুষড়ে যেয়ো না, কাল হচ্ছে শনিবার, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে তৃতীয় রেসে ১১ নম্বর ঘোড়ায় যেখানে যত টাকা পাবে ঢেলে দিও। তাহলে তোমার টাকার অভাব অনেকটা লাঘব হবে।"

ভাবলুম, আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়া গেছে! লোকটা নিশ্চয় একটা পাগল না হলে এত রাত্রে একটা অচেনা লোকের বাড়ীতে পাঁচিল টপকে এসে কেউ কখনো রেশের টিপ দিয়ে যায়! বললাম "রেশে আমি যাই না, তাছাড়া তুমি যা বলছো তা যে ফলবেই তারই বা কি ঠিক আছে? ধরে নিচ্ছি দুঃসংবাদ পাওয়া সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যৎবাণীটা সত্যি কথাই কিন্তু তার পর তিন নম্বর রেসের ১১নম্বর ঘোড়ায় আমার যথাসর্ব্বস্ব রেখে দিয়ে দেখি যদি ঘোড়াটি পেছন দিক থেকে প্রথম হয়েছে তখন তোমায় কি আর দেখতে পাওয়া যাবে?"

লোকটির কণ্ঠস্বরে এবার একটু বেদনার আভাস পাওয়া গেল, সে বললে, "আমায় বিশ্বাস করো, আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি। আজ সন্ধ্যেয় আমি তোমার হাতে ভর না করলে, তুমি যে ভাবে খেলছিলে তাতে অন্তত শ'তিনেক টাকা হেরে বসতে। আজ আমার জন্যই তাসের টেবিলে অতগুলো টাকা জিততে পেরেছিলে।"

লোকটার কথা শুনে এবার সত্যি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমার হাত দিয়ে আর কেউ খেলে যাচ্ছিল বলে আমার যে সন্দেহ ছিল সেটা নেহাৎ ভিত্তিহীন নয়, অবিশ্বাস্য হলেও ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলুম "তুমি আমার হাতে ভর করেছিলে বলছো, শুনেছি সে ত শুধু প্রেতাত্মারাই করে থাকে। তাহলে তুমি কি মানুষ নও?"

"তুমি ঠিকই ধরেছ, আজ দশ বছর হ'ল এই ঘরেই আমি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছি। কিন্তু ভয় পেও না, আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না।"

তবু কথাটা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলুম। এবার বুঝলুম আমি আসার আগে বাড়ীটা কেন এত দিন খালি পড়ে ছিল। ভয়ে এবার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো, এতক্ষণ একটা ভূতের সঙ্গে কথা বলেছি! যাহা হউক, ভাবলুম ওকে চটিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। রেগে যায় যদি তো আমার ঘাড়টি মটকেও তো দিতে পারে? গলাটা শুকিয়ে আসছিল। কথা যেন বেরোতে চায় না, তবু কোন রকমে চেষ্টা করে বললাম "আচ্ছা তুমি যে আমার এত উপকার করছ, এতে তোমার লাভ কি হবে? বরং যদি অত্যাচার উপদ্রব করতে তাহলে হয়তো ভয়ে আমি বাড়ীটা ছেড়ে দিতাম, আর তুমি নিরাপদে একাকী থাকতে পারতে।"

"কিন্তু আমি যে আর থাকতে চাই না এ বাড়ীতে। এ পৃথিবীতে আমার তো আর থাকার কথা নয়? আমি যেতে চাই মৃত্যুর পর মানুষের আসল যে গন্তব্য স্থান সেইখানে। আর তুমিই পারো আমার দেহহীন আত্মাকে এই প্রেতযোনির কষ্টকর অস্তিত্ব থেকে উদ্ধার করতে। তাই তো তোমার কিছু উপকার করে চেষ্টা করছি মনে তোমার বিশ্বাস আনবার।"

বললাম "ওঃ, তা এর জন্য আমার কোনো উপকার করবার দরকার নেই। বলো, কি করলে তোমার আত্মার উদ্ধার হয়, যদি সাধ্যের অতীত না হয়তো নিশ্চয় আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুসিই হ'ব।"

"আমি প্রথমেই বুঝেছিলুম তুমি এক উদার প্রকৃতির লোক, আর তাই তো আশা আছে, তুমি আমায় হতাশ করবে না। তবে বলি শোনো। মৃত্যুর পর আপন আপন কর্ম্মফল অনুসারে মানুষ চলে যায় পরলোকের বিভিন্ন মার্গে, কিন্তু শুধু একটা জিনিষ তাকে মৃত্যুর পরও বেঁধে রাখতে পারে এই পৃথিবীর সঙ্গে—সেটা হচ্ছে আত্মার অতৃপ্ত বাসনা, আর এমনি এক অদম্য অতৃপ্ত বাসনাই আজো আমায় আটকে রেখেছে এই মানুষের জগতে, যেখানে থাকার এখন আর আমার কোন অধিকারই নেই। তাই তোমার মধ্যে দিয়ে যদি সেই বাসনাকে তৃপ্ত করতে পারি তবেই মুক্তি পাবো প্রেতযোনির এই জেলখানার হাত থেকে।"

এতক্ষণে ভয়টা অনেক কেটে গেছিল। সাগ্রহে বলে উঠলুম,

"বল, কি করলে তোমার সেই বাসনার পরিতৃপ্তি হয়, আমি কথা দিচ্ছি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

"তা হলে সব কথাই বলতে হয়, শোনো তবে। আমরা ছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। আমি জুনিয়র কেমব্রিজ পাস করে পার্ক ষ্ট্রীটে একটা ফটোগ্রাফির দোকানে কাজ নিই, বাবা রেলওয়ে সার্ভিস থেকে রিটায়ার করেছিলেন, পেন্‌সন পেতেন। সকলের আয় মিলিয়ে সংসার এক-রকম চলে যেত। ওরোথির সঙ্গে ঐ ফটোগ্রাফের দোকানেই আমার প্রথম আলাপ হয়, আর ত্বজন মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে ও এসেছিল ফোটো তুলতে। প্রথম দেখাতেই আমি তার প্রেমে পড়ি। ওদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। আমরা এন্‌গেজ্‌ও হয়ে যাই। ও তখন পি, জি হস্‌পিটালে নার্সিং শিখতো। ওর ডিউটি শেষ হলে আমরা ত্বজনে এক সঙ্গে বেড়াতে যেতুম আর আমার চোখের সামনে ভাসতো একটা রঙ্গিন ভবিষ্যতের ছবি। কিন্তু এর পরই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং দোকানটা রিকুইজিসন করে নেয় আর্ম্মি থেকে।

"কিছু দিন বেকার অবস্থায় ঘুরে ঠিক করি, আর্ম্মিতে যোগ দেবো কিন্তু নার্ভের কি একটা দোষের জন্য সেখানে আমার স্থান হয় না। ক্রমশঃ পয়সা-কড়িরও অভাব দেখা দেয়। এই সময় লক্ষ্য করি ওরোথির যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। ও মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতেও ভুলে যায়। জিজ্ঞেস করলে নানা রকম অজুহাত দেখায়, যেটা ক্রমশঃ সন্দেহ করতে বাধ্য হই। অবশেষে একদিন ওর হাসপাতালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি, ওর ছুটির সময় অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে রাখি; তাই ও আমায় দেখতে পায় না। আমি পেছনে পেছনে ওর সঙ্গে চলি। চৌরঙ্গির কাছে একজন আমেরিকান সোলজার ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল, ওকে দেখে ওর হাত ধরে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলো। ট্যাক্সি চলল গঙ্গার দিকে, আমিও চললাম পিছু পিছু আর একটা ট্যাক্সিতে। তখতা ঘাটের কাছে ট্যাক্সিটা এক নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে থামে। ড্রাইভারটা নেমে গঙ্গার ধারে পায়চারি করতে থাকে, আর তখন মোটরের মধ্যে ওদের ত্ব'জনের যা কাণ্ড-কারখানা দেখি, তাতে ঘৃণায় লজ্জায় বিষিয়ে ওঠে আমার মন। এই ওরোথি যে আমায় বলতো বিয়ে হবার আগে ওর ঠোঁটে আমার ঠোঁট পর্য্যন্ত ছোঁয়াতে দেবে না, সে কি না এই রকম? তবু মনে হয় বেচারা ছেলেমানুষ বোঝেনি কি করছে। ঐ আমেরিকানটা নিশ্চয় কোন লোভ দেখিয়ে ওকে খারাপ করেছে, তাই আর থাকতে না পেরে ওদের সামনে গিয়ে বলি, ওরোথি এখুনি চলে এসো আমার সঙ্গে, পরে আমি দেখে নেবো ঐ রাস্কেলটাকে, তুমি গিয়ে আমার ট্যাক্সিতে বোসো, কিন্তু ও যেন আমায় চিন্‌তেও পারে না, আর সেই আমেরিকান সোলজারটা তখন তার গার্ল ফ্রেণ্ডকে অপমান করার জন্য লাফিয়ে পড়ে আমার উপর।

"আমাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি মারামারি চলতে থাকে। শেষ কালে ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা এসে আমাদের ছাড়িয়ে দেয়। বাড়ি ফিরে মনে হয়, বেঁচে থাকার উপর আর যেন আমার কোন স্পৃহা নেই। ফোটো ডেভেলপের জন্য খানিকটা পটাসিয়ম সায়ানাইড একবার বাড়ি নিয়ে এসেছিলুম দোকান থেকে; সেটা দেরাজের ভিতর থেকে নিয়ে পুরে দিই মুখের মধ্যে সবটা। তার পর কি হল মনে নেই। কিছুক্ষণ যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখা যায় শুধু ওরোথির উজ্জ্বল মুখখানা, তার পর ধীরে ধীরে ফিরে আসি আবার এই ঘরে। এসে দেখি, আমার শরীরটা একখানা কাঠের বাক্সে পুরে বাবা আর মা খুব কান্নাকাটি করছেন। আশ-পাশের ত্ব'-একজন লোকও এসেছে। কিছুক্ষণ পর সবাই মিলে বাক্সটা একটা কালো গাড়িতে উঠিয়ে দেয়, আর চলে যায় গাড়িটা বাড়ির সামনে থেকে। বুঝতে পারি ওটা আমার কফিন, ওরা নিয়ে গেল গোরোস্থানে। সবাই চলে গেলো, আমি একাই রয়ে গেলাম এই বাড়িতে। আর আশ্চর্য্য, আমার মনের অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি দেখলাম। তখনও পৃথিবীতে ওরোথিই হচ্ছে আমার সব চেয়ে কাম্য বস্তু। দেহটা হারিয়েছি কিন্তু মনের আসক্তি যায়নি। লোকে আমায় দেখতে পায় না। তবে খুব চেষ্টা করলে কারুর কারুর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি। অবশ্য তাতে একটু কষ্ট হয়। আমার মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি এখানে আছি, তাই কোনো কোনো সময় একা এই ঘরে এসে জিজ্ঞেস করতেন 'জর্জ', তোর কোন কষ্ট হচ্ছে বাবা? আমরা তোর জন্য কিছু করতে পারি?' তাই ভাবলাম একদিন ওঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করে বলি সব কথা কিন্তু প্রকাশ হয়ে দেখি মস্ত ভুল করেছি। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। কোন কথাই বলা হল না সে বার। বার বার নিজেকে প্রকাশ করা যায় না। কারণ ওতে আমাদের খুব কষ্ট পেতে হয়। আমার মৃত্যুর কয়েক দিন পর ওরোথি এলো এই বাড়িতে। আমেরিকান লোকটার কাছ থেকে হয়তো সে অনেক টাকা পেতো, দেখি সেদিনও পরেছিল সুন্দর একটা ছাই রংএর ফ্রক, যাতে ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ও এসে আমার জন্য খুবই শোক প্রকাশ করে গেল। সামনের ঘরের দেওয়ালে অনেক যায়গায় ওর নামটা আমি পেন্সিল দিয়ে লিখে রেখেছি, তাই দেখে ও ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলো। বুঝলাম এমন যে হতে পারে মেয়েটা তা ভাবতেও পারেনি আগে। আর আজ সন্ধ্যায় তুমি ঐ লেখাটা পড়ে আমাদের কথা ভেবেছ বলেই তোমার কাছে দেখা দিলাম। যাই হ'ক, তখন আরো বুঝলাম, সত্যি আমায় ও ভালোবাসে, শুধু আমেরিকানটার টাকার মোহে পড়েই আসলে ও খারাপ হয়ে যায়। সেদিন জ্যান্ত লোকদের উপর আমার কি হিংসেই না হচ্ছিল! ভাবলাম বেঁচে থাকলে নিশ্চয় ফিরে পেতাম ওরোথিকে। ভারি আপশোষ হ'ল কিন্তু করবার নেই কিছু। একবার ভেবেছিলুম নিজেকে প্রকাশ করি, কিন্তু মায়ের কাণ্ডটা মনে করে সাহস হ'ল না, সে-ও তো আমায় ভূত বলে ঘৃণা করতে পারে তার চেয়ে থাক। আরো কিছুদিন কেটে গেলে একদিন বাবা এসে মাকে বললেন, আজ সেই আমেরিকানটার সঙ্গে ওরোথি এন্‌গেজ্‌ড হলো। শুনে ক্ষেপে গেলাম। না জানি কি না করেছি সেদিন। তবে সবাই শুনেছিল বাড়িময় অনেক রকম আওয়াজ ইত্যাদি। বাবা একটা পাদ্রিকে এনে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র পড়িয়ে আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেন। ত্বঃখে মন ভরে উঠলো। তবু এখান থেকে যাবার উপায় যে আমার নেই। সেই থেকে আবার চুপ করেই থাকি। কিন্তু বাবা-মা ঐ ঘটনার পর এ-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেকেন্দ্রাবাদে

আমার বোনের কাছে চলে গেলেন। আমি এই পৃথিবী থেকে যেতে পাবরো না জানি, যতক্ষণ না ওরোথিকে পাচ্ছি। আত্মহত্যা করেই বাধিয়েছি এই গণ্ডগোল। বেঁচে থাকলে আজ আমি নিশ্চয় তাকে পেতুম। কারণ, সেই আমেরিকান সোলজারটা তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে এখন নিজের দেশে, তার নাকি সেখানে একটি বউ আর তিন-চারটে ছেলে-মেয়ে আছে। আর পাপ ঘটনার মধ্যে দিয়ে ওরোথি আজ যে ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করতে বাধ্য হয়েছে, আমি তাকে বেশ্যাবৃত্তিই বলবো। প্রেত-লোকের নিয়ম অনুসারে এই বাড়ি ছেড়ে বেরোবার উপায় আমার নেই; আর তাই নিতে চাই তোমার একটু সাহায্য।"

অভিভূতের মত শুনছিলুম তার কথা। বললুম, "বল, আমি কি করতে পারি?"

"তুমিই আজ আনতে পারো আমার মুক্তি, তোমার অল্প বয়স, চেহারা ভালো, বিলেতে গিয়েছিলে বলে তুমি আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে সহজেই মিশতে পারবে। ওরোথি তোমায় দেখে খুব সম্ভব পছন্দ করবে। সে আজ-কাল থাকে রিপণ ষ্ট্রীটের—নং বাড়িতে। তোমাকে তার কাছে গিয়ে প্রেমের ভাণ করে নিয়ে আসতে হবে তাকে এই বাড়িতে, রেশকোর্সে যে টাকা পাবে তার থেকে কিছু টাকা দিলে ওরোথি এখানে আসতে কোনই আপত্তি করবে না। পরে এখানে এসে তুমি যখন প্রেমিকের মতন তাকে উপভোগ করবে আমি তখন তোমার উপর ভর করবো। তাই তোমার সঙ্গে প্রেম করলেও আসলে সে প্রেম করবে আমারই সঙ্গে। আর, একবার তাকে আমার আলিঙ্গনের মধ্যে পেলে জানি আমার সকল বাসনাই চরিতার্থ হবে এবং এই পৃথিবীর বন্ধন থেকে তখনই আমি মুক্ত হয়ে যাবো।"

অবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু সে যে অসম্ভব, কারুর সঙ্গে প্রেমের ভাণ করা আমার দ্বারা হবে না; কারণ,তোমার মতন আমিও এখন একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি। হয়তো তার সঙ্গে শীঘ্রই আমার বিয়েও হবে। তাছাড়া কিছু মনে কোরো না, তোমার প্রেমের বান্ধবী হলেও ওরোথি আজ একটি সাধারণ মহিলা। আর অন্য কোন উপায়ে কি তোমার মুক্তি আনা যায় না?"

"তার শুধু একটিমাত্র উপায় আছে। যদি কোন রকমে ওরোথির মৃত্যু ঘটে তো যেখানেই সে থাক না, তাকে এই প্রেতলোকের [illegible] একবার আসতেই হবে। প্রেতযোনির যদি কেউ সত্যি সত্যি তাকে ভালোবেসে থাকে তো তার কাছেও তাকে যেতে হবে একবার। আর আমি জানি, আমার কাছে এলে আমার এই [illegible] সীম প্রেমে ধুয়ে যাবে তার সমস্ত পাপ এবং দু'জনেই আমরা মুক্তি পেয়ে অমরলোকে যেতে পারবো।"

"বললুম ওরে বাবা, সে যে আরো অসম্ভব। একটি মেয়েকে খুন [illegible] জন্য কলকাতার সহরে এত গুণ্ডা থাকতে সবাইকে ছেড়ে আমার কাছেই এলে! আর ওরোথিকে খুন করলে তুমি না হয় মুক্তি পাবে কিন্তু ফাঁসি হবার পর আমায় এসে যে তোমার জায়গাটি ভরতে হবে, সেটা একবার ভেবে দেখেছ?"

"না না, আমায় ভুল বুঝ না, তাকে খুন করতে তো আমি বলিনি, যদি কোন কারণে তার মৃত্যু হয়···তাহলে···ওঃ, ভোর যে হয়ে এলো, আকাশে শুকতারা দেখা দিয়েছে, মানুষের কাছে আর আমার থাকার উপায় নেই। বিদায়, মিঃ ঠাকুর! বিদায়···"

জর্জের আবছায়া মূর্ত্তিটা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, কেঁকিয়ে ডাকলুম, "জর্জ···উত্তর নেই। কে জানতো অত তাড়াতাড়ি সে মিলিয়ে যাবে! প্রেতলোক সম্বন্ধে আরো দু-একটা কথা জানবার ছিল, তা আর হ'ল না।"

আমার বেয়ারাটার কাছে থাকতো ফটকের দ্বিতীয় চাবিটা, তাই সে এসে চা নিয়ে আমাকে ধাক্কা-ধাক্কি করায় ঘুম ভাঙ্গলো। চা খেতে খেতে মনে পড়লো গত রাত্রের সমস্ত কথা। স্বপ্ন নিশ্চয়। ভূতের সঙ্গে বসে সারা রাত গল্প করেছি এ-ও কি সম্ভব?

একটু পরেই হাজির হল আমার মাড়ওয়ারি পার্টনার ছোটেলাল কামানিয়া। রাত্রিবেলায় জর্জ যেখানে বসেছিল সেই চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললাম ওকে। কিন্তু সে বসলো না, বললে—"আজ আর বসবো না এখুনি আমায় যেতে হবে সলিসিটারের বাড়ি। তোমার জন্য আজ একটা দুঃসংবাদ আছে।" উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কি?"

"এই ব্যবসায় আর আমি টাকা দিতে পারবো না, আমার পার্টনারসিপ তুলে নিচ্ছি। আমার যা এষ্টেট আছে সব বিক্রি করে দাও। হয়তো তোমার উপর একটু অন্যায় করা হ'ল কিন্তু আমার আর কোন উপায় নেই। হরেনের সঙ্গে লেখাপড়া না করে রংএর ব্যবসা যা টাকা দিয়েছিলুম সব সে অস্বীকার করেছে। ও টাকাগুলো জলে গেল, প্রায় এক লাখ। দুনিয়াটাই এমনি। আজ-কাল আর কাউকেই বিশ্বাস নেই।"

এটা ওর অন্যায় অনুরোধ! কারণ কথা ছিল পার্টনারশিপ তুলতে হলে দু'তরফেই তিন মাসের নোটিশ লাগবে। কিন্তু কোনই প্রতিবাদ করলুম না। কালকের ঘটনাটা তাহলে স্বপ্ন নয় সত্যিই ভৌতিক। শুধু বললাম "এটা আমি আগেই জানতুম"

সে বললে, "আচ্ছা লোক যা হ'ক, সব জেনে-শুনেও চুপ

করেছিল। দিন দুই আগেও খবর পেলে অন্তত ২৫,০০০ টাকা বেঁচে যেতো। কিন্তু কি করে তুমি জানলে?"

রাত্রির ঘটনাটা সবই ওকে বললাম। শুনে ও গম্ভীর হয়ে বললে, "আশ্চর্য্য!···যাই হক, রেশে হয়তো পেতেও পারো তাহলে, যা বলেছে সবই মিলে যেতে পারে।"

"বললুম, ক্ষেপেছ, রেশে যাবার ছেলে আমি নই। শেষের দিকটা যদি না ফলে! আর ফলে তো কে তার ক্রীতদাসস্বরূপ ওরোথির প্রেম করতে যাবে? ওরোথির সঙ্গে প্রেম করো আর না করো তোমায় এখন টাকা চাই। টাকাটা পেয়ে নাও তার পর না হয় এবাড়িটা ছেড়ে দিও।"

বললুম—"বাড়িটা ছাড়বার আগেই জর্জ যদি প্রতিশোধস্বরূপ ঘাড়টা আমার মটকে দেয়? তাছাড়া ওটা হচ্ছে তোমার মাড়োয়ারি বুদ্ধি। কারণ আমি যদি কোন প্রতিদান দিতে না পারি তো জর্জের কাছে উপকারটা নেবোই বা কেন? সে হয় না, সময়টি আমার দেখছই তো কি রকম খারাপ! স্পেকুলেসনের মধ্যে না গিয়ে এখন একটু সাবধান হয়ে থাকাই ভালো।"

অনেক যুক্তি দিয়েও আমাকে রাজি করাতে না পেরে ছোটেলাল বিদায় নিলে। দেখছিলাম সন্ধ্যের দিকে হিসেবের খাতা নিয়ে, অংক কষে দেখছিলাম আর ভেবে দেখছিলাম, যদি কোথায় পাওয়া যায় আমার যে ক'হাজার টাকার দরকার। না হলে ব্যবসার দফা তো গয়া। ছোটেলাল সরে গেলে একা এই ব্যবসা কি আমি চালাতে পারি? ঠিক এমনি সময় আবার উদয় হ'ল ছোটেলাল, একটা চেয়ারে বসেই সে বললে, ভেবে দেখলুম হঠাৎ পার্টনার-সিপটা তুলে নিলে অন্যায় হবে, তাই মতটা আবার বদলেছি। আচ্ছা বলতো ক'হাজার টাকা আর আমাদের চাই?"

অবাক হয়ে গেলুম, বেশি টাকা দরকার ছিল না, মাত্র পাঁচ হাজার হলেই এক রকম চালিয়ে নেওয়া যায়। তাই বললাম, "আর পাঁচ হাজার পেলে বাজার খারাপ হলেও আমরা একরকম দাঁড়িয়ে যাবো।" শুনে ছোটেলাল তার পকেট থেকে এক মোটা নোটের তাড়া বার করে গুণতে লাগলো। জিগগ্যেস করলাম, "অত টাকা পেলে কোথায়?" সে হাসতে-হাসতে বললে, "সে খোঁজে তোমার দরকার"? কিন্তু সন্দেহ গেল না, এমন সময় দেখি ওর পাঞ্জাবীর বুকের কাছে ঝুলছে টার্ফক্লাবের ব্যাজটা। নিশ্চয় ও রেশ-কোর্স থেকে আসছে। আর বুঝতে বাকি রইল না। তিন নম্বর রেশের ১১ নম্বর ঘোড়া থেকেই পেয়েছে সে ঐ টাকা। বললাম কি সর্ব্বনাশ, আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়লাম, এখন যদি ওরোথির সঙ্গে প্রেম না করি তাহলে জর্জ হয়তো আমাদের দু'জনারই ঘাড় মটকাবে। চলো চলো, এখুনি বেরোতে হবে এ-বাড়ি থেকে। দেখি কি করা যায়।"

রাস্তায় বেরিয়ে মোটরে উঠে ছোটেলাল মৃদু স্বরে বললে, "তবে তুমি তো আর পাওনি টাকাটা, আমি পেয়েছি। আর আমি যদি তার থেকে তোমাকে কিছু দিই তো জর্জের টিপের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ আর আমারই বা কি সম্বন্ধ? কারণ, আমি পেয়েছি টিপটা তোমার কাছে।"

"বললাম জর্জের টিপ থেকেই ঘুরে-ফিরে টাকাটা এসেছে, কাজেই কথাটা একই দাঁড়ালো। এটা হয়তো মাড়োয়ারি বুদ্ধিতে তোমার মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু ভূতে তো আর তা বুঝবে না, কাজেই ওরোথির সঙ্গে আমাদের দু'জনের একজনকে এখন প্রেমটা করতেই হবে। এক সুন্দরী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে প্রেম করার সম্ভাবনায় ছোটেলাল বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ওর স্ত্রী যদি জানতেও পারে তো সহজেই সে বলতে পারবে যে কর্ত্তব্যের খাতিরেই তাকে অমন কাজ করতে হয়েছে। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কি কখনও আসবে? মনের আনন্দ চেপে ভুঁড়ি দুলিয়ে গম্ভীর ভাবে সে বলে তা যা হয় কিছু একটা করতে হয় তো চলো···"

অনেক খুঁজে খুঁজে—নং রিপণ ষ্ট্রীটে পৌঁছে দেখলাম, জায়গাটা বড় রাস্তার উপর নয়, গলির ভিতর একটা নোংরা বাড়ি। দরজার কাছে এক বুড়িকে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে বার করলাম ওরোথির ঘরটা। কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখি, সে বিছানায় শুয়ে আছে, কাঁধের কাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বুড়িটার কাছে শুনলাম আগের দিন কতকগুলো বিদেশী জাহাজের খালাসি এসেছিল ওর কাছে, তাদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে এক মারামারি হয়, আর ওদের মধ্যে একজন আর একজনকে ছুরি নিয়ে তাড়া করে, সেই ছুরির হাত থেকে লোকটাকে বাঁচাতে গিয়ে ছুরিটা লেগে যায় ওরোথির কাঁধে, তার পর ওরোথি অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সবাই মিলে কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যই সে অজ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু সেই থেকে এখনো ওর জ্ঞান হয়নি। প্রেম করার দুর্ভাবনাটা উড়ে গেল, প্রথমেই মনে হ'ল একজন ডাক্তার ডেকে আনা দরকার। পয়সার অভাবে তখনও কেউ ডাক্তারের ব্যবস্থা করেনি। ছোটেলাল আর আমি গিয়ে তখনি নিয়ে এলাম ডাক্তার সেনকে, তিনি পরীক্ষা করে বললেন বড্ড দেরিতে ডেকেছেন আমায়···এখন সেপ্‌টিক হয়ে গেছে, বলা যায় না কি হবে।"

"ওষুধপত্র কিনে দিয়ে আমরা বাড়ি ফেরাই স্থির করলাম। যাবার সময় বুড়িটার হাতে আরো কিছু টাকা দিয়ে বলে দিলাম যদি রোগীর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় তো সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আমাদের খবর দেয়। টাকা পেয়ে সে খুব খুসি হয়েছিল। তাই সে জানাব বলে প্রতিশ্রুতি দিলে আমরা বেরিয়ে এলাম।"

"কিন্তু গলিটা পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ে মোটরে উঠতে যাবো এমন সময় দেখি, বুড়িটা দৌড়তে দৌড়তে আসছে। সে কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে "আপনারা যাবেন ডাক্তারকে নিয়ে একবার, উপরে চলুন, ওরোথি যেন কি করছে। তাই আবার ফিরে যেতে হল। ডাক্তার সেন নাড়ী ধরে মুখ ভার করে বললেন আর কিছু করবার নেই। উনি এখন চলে গেছেন মানুষের সব চেষ্টার বাইরে।"

অমন সুন্দরী এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা হল না বলে জানি না, ছোটেলালের মনে কোন আপশোষ ছিল কি না। তবে জর্জের কথা মনে পড়লো, ভাবলাম ভগবান বুঝি তার মুক্তির ব্যবস্থা এই ভাবেই করলেন।
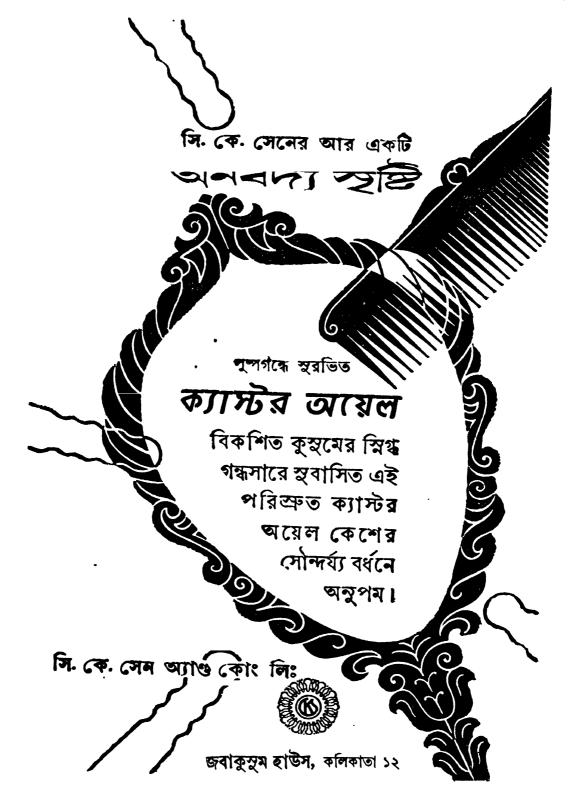
সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

"নেপাল তোমায় দেখে এলাম"

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সুনীলিমা ঘোষ

পরিষ্কার ঝরঝরে এক অপরাহ্ণ ও মধ্যাহ্নের সন্ধিক্ষণে আমরা সবাই সকন্যা মিঃ ও মিসেস্ সেনগুপ্তার সাথে রওনা হলাম তিন মাইল দূরবর্ত্তী ডাঃ দাশগুপ্তের গৃহে তাঁর সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে। কিন্তু তখন কি ছাই জানতাম যে, তিন মাইল এত লম্বা? বার বার সবাইকে বিরক্ত করতে লাগলাম আর কত দূর? পা যে আর চলে না। পথিমধ্যে পড়লো মহাকালের মন্দির, প্রণাম করে দু' পা না যেতেই সুরু হলো দারুণ ঝড়ো শুকনো হাওয়া ও ধূলো। দৌড়ে কিছুটা দূরে আর এক চিকিৎসকের বাড়ী আশ্রয় নিলাম। বাইরে দিনের প্রখর আলোকে ও ভেতরে অন্ধকার ঘুটঘুটে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। ভদ্রলোক এদের পরিচিত—আমাদের দেখে খুসিও হলেন। ছেলেরা বাইরে ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করতে লাগলেন, আমরা গেলাম ডাক্তার-গৃহিণীর সকাশে অন্দরে। গিন্নী খুশি কি দুঃখিত হলেন তা তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে বুঝবার উপায় ছিল না; কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত ভদ্র, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ করে আমাদের বসিয়েই কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে গেলেন নাইতে! বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা আমরা রাস্তায় থাকতেই সুরু হয়েছিল 'সজলঘন বাদল বরিষণ'। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অবিশ্রাম গতিতে চালাতে লাগলো তার বিক্রম। আমরা মুখে আঙুল রেখে সায়লেন্স রক্ষা করতে করতে ভদ্রমহিলার অপরিসীম সময়-জ্ঞান শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করতে লাগলাম। অন্তরের শ্রদ্ধা অন্তরে নিয়েই উঠতে হলো, অনেকটা পথ এখনও বাকি, বৃষ্টিও খানিকটা ধরে এসেছে। ভদ্রলোক বাইরের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করলেন আর একটু অপেক্ষা করতে। এতক্ষণে গৃহিণীর রঙ্গালয়ে প্রবেশ বেশ সুসজ্জিতা হয়ে। নমস্কারান্তে সিঁড়িতে নামলে তেমনি মুখে তিনি বললেন, 'এক কাপ চা খেয়ে গেলে পারতেন।' আমরা অতি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর এ ভদ্রতায় ধন্যবাদ জানিয়ে আবার চলতে সুরু করলাম।

আনন্দের সঙ্গে আশার বাণী শুনছি ঐ যে দেখা যায়, ব্যস্, তারপরই হবে চলার শেষ। কিন্তু একশ' হাত দূরে থাকতেই আবার সুরু হলো ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি! আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ তখন ভেঙ্গে গেছে, আমরাও সেই রাজপথ ধরেই রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি—কুইক্ মার্চ্চ হয়—ফট্ ফট্ খট্ খট্ ত্রাহি মধুসূদন দৌড়। ভাগ্যি কেউ ছিল না রাস্তায় নইলে লবেল হার্ডির সে রেস্ দেখতে টেনসিং সম্বর্দ্ধনার চাইতে ভীড় হতো বেশী, সন্দেহ নেই।

'এই যে আসুন, আসুন। এসো, এসো,' বলে উঠে এলেন দু'জনে—আলাপে, আপ্যায়নে, বহুবিধ রসনা পরিতৃপ্তিকর খাদ্যে দূর করলেন পথকষ্ট। দুজনেই রসিক, অমায়িক কিংস পারসনাল (Kings Persmal Physician) ফিসিসিয়ান, রাজদত্ত গেষ্ট-হাউসে বাস—বেশ পরিচ্ছন্ন গোছানো বাড়ী। ভদ্রলোক অমায়িক, রসিকও বটেন কিন্তু অ—যাকৃগে, অতীতের স্মৃতি সবই মধুর।

স্বয়ম্ভু বালাজু কাছাকাছি—কাজেই এক দিনেই যাওয়া ঠিক হলো ২।৩ ঘর বাঙালীর সাথে ছোট্ট একটু পিকনিকের ব্যবস্থা করে। সঙ্গে একজন বিহারী যুবকও ছিল, বেশ বাংলা বলে, সব কাজেই তার অসীম উৎসাহ। আমরা দলে ছিলাম ১৬ জন—ট্যাক্সি একটা, আমাদের একটু অসুবিধে নেই। আনন্দেই মশগুল, কিন্তু ট্যাক্সির একাধারে চালক ও মালিকের গোল মুখখানা আরো গোল হয়ে উঠলো, রাস্তা যেমন প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয়, নরক দর্শনও না হয়ে যায়। আরো ভয় ছিল, এত লোক দেখে চাকা বা না বাগে ফেটে যায়। যাক্, তেমন কিছু ঘটলো না—নিরাপদে পৌঁছুলাম প্রথমে স্বয়ম্ভু-মন্দিরের পাদদেশে। মোটরের আর রাস্তা নেই, ওপরে উঠতে হবে হেঁটে। প্রথমে খুব উৎসাহ ভরে রেস্ হলো—আমাদের দলের দুই চড়াই পাখী, মিসেস্ সেন ও বৌদি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে আগে আগে চললেন। তবু দমলাম না, ধীরে ধীরে উৎসাহ কমে গেল, ভয় হতে লাগলো পদযুগল না নন্-কোঅপারেসন্ করে বসে। চার দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর—এক জায়গায় খানিকটা বৃষ্টির জমানো জলে হাজার বাঁদরের মেলা, মনে হয় কুম্ভযোগের স্নান পড়েছে। কিছু দূর উঠতেই নজরে পড়লো উঁচুতে মন্দিরের চূড়ায় মস্ত-বড় এক চোখ—ভগবান তথাগত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত লোক ও তাদের অন্তর দেখছেন। 'অতএব হে মানব, সাবধান, সর্ব্ব কুকর্ম্ম থেকে বিরত থেকো, নতুবা নরকদর্শন অনিবার্য্য—নির্ব্বাণ লাভ আর হবে না, বার বার আসতে হবে এ দুঃখের পৃথিবীতে,' এই এর তাৎপর্য্য। এ-সবে তখন মন নেই—অর্দ্ধেক এসে গেছি, নামবার বদলে উঠাই বুদ্ধিমানের কাজ, নইলে কি হতো বলা যায় না।

স্বয়ম্ভুতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। প্রথমে পড়লো বৌদ্ধদের স্তূপ। ছোট্ট নিস্তব্ধ একটু যায়গা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চার দিকে ফুলের গাছ—সব নতুন ঝক্‌ঝক্ করছে—এমন পরিবেশ সহজেই মনকে শান্ত করে। সামনেই ছোট একটি মন্দিরে শ্বেতমর্ম্মরে ভগবান তথাগতের ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি। শুনলাম, কিছু দিন আগে বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বারান্দার দেয়ালে জাপানবাসীর তুলিতে বুদ্ধের ৩।৪ খানা জীবন্ত জীবন-বৃত্তান্তের ফটো। খানিকটা গেলেই আর একটা মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে, যেগুলো রীতিমত পুজো করা হয়। মন্দিরের ওপর তলায় ৭ খানা বড় বড় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে, যদিও তা সনাক্ত-সাপেক্ষ—সামনে বিরাট প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে, শুনলাম, এ প্রদীপ মন্দিরের স্থাপনাকাল থেকে অনির্ব্বাণ ভাবে জ্বলে আসছে। সমস্ত কাটমণ্ডু সহর এখান থেকে দেখা যায়। পাশেই টুণ্ডি খেল বা প্যারেড গ্রাউণ্ড। এই মহাযোগী মহাত্যাগীর চরণে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে নামতে আরম্ভ করলাম শতাধিক সিঁড়ির খাড়াই উৎরাই। মাঝপথে দেখতে পেলাম নেপালীদের ভোজ সুরু হয়েছে কোন উৎসবের—নীচে ফাঁকা যায়গায় শতাব্দী-পূর্ব্বের কালো পাথরে বিরাট মূর্ত্তি, সিংহমূর্ত্তি ও

মাঝারি অর্থাৎ মানুষ-প্রমাণ বহু মূর্ত্তি রয়েছে। এর পরের আকর্ষণ বালাজু।

বালাজুতে কোন মন্দির নেই—কালো পাথরে খোদাই অনন্ত-শয়ানে নারায়ণ খানিকটা জলের ওপর রয়েছেন—মাথায় নেই কোন আচ্ছাদন। এর ইতিহাস হচ্ছে—কাটমণ্ডুতেই ছয় মাইল দূরে কোনো সময়ে লোকে নারায়ণ-মূর্ত্তি পায় ও সেটা সেখানে প্রতিষ্ঠা করে। রাজা যখন সে মূর্ত্তি দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বা দেখে ফিরে আসেন—স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে, রাজা যদি পুনরায় এ নারায়ণ দর্শন করেন তবে তাঁর বিশেষ অনিষ্ট হবে; এ আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি বা সাহস রাজার ছিল না—অথচ নারায়ণ দর্শনেও বঞ্চিত থাকতে পারেন না। কাজেই অনুরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হলো বালাজুতে রাজাকে তৃপ্ত করতে। পাশেই বাঁধানো পুকুরে সযত্নে বক্ষিত মৎস্যকুল পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাদাম, শশার টুকরো ফেলা মাত্র টুপ করে খেয়ে ফেলবার দৃশ্য ছোট ছেলেদের দারুণ উৎসাহ ও আনন্দজনক হলেও আমাদের পক্ষেও কম লোভনীয় ছিল না। বেলা পড়ে এসেছে, ষ্টোভ জ্বালানো হলো, জলের শোঁ শোঁ শব্দ শোনো যাচ্ছিল, পাশে নীচে নামতেই দেখা গেল, ৯টা বড় বড় পাথরের মকরমুখ থেকে পাহাড়ের ফাটল থেকে বার করা জল পড়ছে খুব তোড়ে, জল এনে চা তৈরী হলো, তারপর গোয়ালার নিস্তব্ধ আম্রকুঞ্জের প্রতিচ্ছায়ায় চায়ের সাথে সাথে প্রকৃতির সুধাও পান করতে লাগলাম, এ পরিশ্রান্ত দেহকে উদ্দীপিত করে আনলো উৎসাহ, সেনা পরিতৃপ্ত হলো এর সাথে সামান্য আয়োজন লুচি ও আলুর দমে, মহা উৎসাহভরে খেতে খেতে পরিবেশন করলাম। ফেরবার আয়োজন ব্যর্থ হলো, একটি জীপে ৮।১০ জন জেলে নিয়ে একজন রাজকর্ম্মচারী এলেন। রাজপরিবারের নৈশ ভোজনে মাছ চাই—আমরা কৌতূহলী দর্শক হয়ে এদিক থেকে ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলাম। ক' দিন রসনা এর আস্বাদনে বঞ্চিত ছিল, কাজেই জালবদ্ধ অবস্থায় বড় বড় মৎস্যরাজদের দেখে রসনা সহজেই জলসিক্ত হলো—কিন্তু এর ভাগ পাবার উপায় নেই, যাই হোক্, বঙ্কিম বাবুর 'সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়' এ বাণীর সত্যতা আরেক বার প্রতিপন্ন করে আমার ভ্রাতৃবধূ মৎস্য-রাজের এক বংসকে যথোচিত সম্মান দিয়ে আপন করতলগত করলেন—আমরাও বিজয়গর্ব্বে, স্ফীতবক্ষে মৎস্যপুত্রকে নিয়ে ফিরে এলাম আপন নীড়ে।

এর পরের লক্ষ্য রাণীজঙ্গল। ট্র্যামব্যাসিকে ডান দিকে রেখে হসপিটালের সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। খানিকটা পরই পায়ে-চলা পথের সুরু! উঁচু-নীচু, কোন সময় কারো আঙিনার ভেতর দিয়ে ২৫-৩০ ফিট উঁচুতে রাণীজঙ্গল। আশে-পাশে অনেকটা যায়গায় বসতি নেই—অতি নির্জ্জন। এখানে দেখবার মত কিছুই নেই, চার পাশে বাঁশ-ঝাড়, খানিকটা ফাঁকা ছোট ভাঙ্গা দেওয়াল-ঘেরা যায়গায় বহু পুরনো দু'-একটি সিঁদূর-মাখানো মূর্ত্তি—কার বোঝা অসাধ্য। ফুল ও সিঁদূর দেখে বোঝা গেল, নেপাল-রমণীরা নিয়মিত তাঁদের পুজোপচার চড়িয়ে যায় এখনো। শোনা যায়, বহুদিন আগে রাণীরা সব আসতেন এখানে লুকোচুরি খেলতে—স্থান অনুকূল হলেও এর কতটা সত্য ও কতটা রাণীনামযুক্ত বলে

নিউ রোড —প্রধান রাজপথ

ত্রিচন্দ্র কলেজ

রাজপ্রাসাদ —নারায়ণ

বাইশ ধারা

কল্পনা প্রসূত বলা কঠিন। এখানে বসে বহুদিন পূর্ব্বের ক্রীড়ারত রাণীদের হাসির জলতরঙ্গ-ধ্বনি শত চেষ্টাতেও অনুভবে আনা যায় না কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন নিঝুম সন্ধ্যায় বাঁশের ঝাড়ের হাওয়ার পরশ হৃদয়ে যে দোলা লাগায় সে দোলা ভয়ের—বাঁশের পাতার প্রতিটি শন্-শন্ শব্দ জাগিয়ে দিতে লাগলো শরীরের প্রতিটি লোমকূপ। এ-হেন পরিবেশে মনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে যে কথা মুখে প্রকাশ হয় তাই হলো, ভয়ের গল্প, ভূতের গল্প।

মিসেস্ সেনগুপ্তা সুরু করলেন, আমার ছোট্ট বেলাকার বান্ধবী থাকতো আসামে, স্বামী ও এক বছরের ছোট্ট ছেলেকে নিয়েই তার ছোট সংসার। স্বামী বড় চাকুরে—প্রায়ই টুর করতে হয়—নিজের চাকরীর সম্মান রক্ষা করে আছে—গাড়ী, ড্রাইভার, নেপালী চাকর ও বহু দিনের পুরনো বাপের বাড়ীর থেকে আনা স্ত্রীর ছোট্টবেলাকার পরিচারিকা, স্বামী টুরে গেলেন আশে-পাশেই কোথাও, বলে গেলেন ফিরবেন দু'দিনের ভেতর কিন্তু কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই এলেন ফিরে। তালা-আঁটা দরজা ও মোটরশূন্য গ্যারেজ দেখে ভাবলেন, স্ত্রী কোথাও গেছে—অপেক্ষা করতে লাগলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাইরে অপেক্ষারত নিরীহ নেপালী বালক কোন হদিসই দিতে পারলো না। ক্রুদ্ধ স্বামী তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, সেফ ইত্যাদি হাঁ করানো—প্রতিবেশীরা আগেই এসেছিলেন, এর পর পুলিস এলো, এটা ওটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুরনো কাপড়ের পেটরায় রক্তাক্ত কাপড়ে জড়ানো শিশুর মৃতদেহ ধপাস করে পড়লো—ভদ্রলোক মূর্চ্ছিত হলেন। অনেক অনুসন্ধানে দূর জঙ্গল থেকে ভদ্রমহিলার মৃতদেহও বার করা হলো। কিন্তু মাতৃসমা পরিচারিকা ছুরিচালিকা হলো কেন? কেন হলো তার এ রক্তলোলুপতা? তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। লোভ, প্রলোভনে কি মানুষের মনুষ্যত্বও হারিয়ে যায়? কে দেবে তার উত্তর? কিন্তু অপরাধীদের আর ধরা গেল না।

ঘুরে এ্যামব্যাসির মেন গেট দিয়ে ঢুকলাম গাঢ় সন্ধ্যার অন্ধকারে, বড় বড় ন্যাসপাতি গাছ ও জোয়ার-ভুট্টার ক্ষেতকে এক একটা প্রেতের মতই লাগছিলো। মিসেস্ ঘোষ ডাকঘরের পাশের ঘর দেখিয়ে বললেন, এখানে এক সাহেব অফিসার থাকতেন, এটা ছিল তাঁর অফিস, সকাল-বিকাল হর্স রাইডিং ছিল তাঁর নেশা, এটাই হলো তাঁর কাল, একদিন হঠাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে খাদে পড়ে গিয়ে হলো তাঁর মৃত্যু। কিন্তু পরলোকের পারে গিয়েও তিনি তাঁর নেশা ছাড়েননি। তাই রোজ রাত ১২টার পর খট্-খট্ করে ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেন তার দলিল দস্তাবেজ। তখন রাত ১২টাও বাজেনি—রাস্তা একেবারে নির্জ্জনও নয়, আমরাও দলে বেশ ভারী ছিলাম, তবু মনে হলো, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হার্ট-বিটিংস শুনতে পাচ্ছি, সে শব্দ হয়ত বা ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দকেও হার মানিয়ে দেয়। শুনলাম, তার পর থেকে ওখানে কেউ duty দিতে পারে না, সাহেব তাকে গলা টিপে মারে। রাতের অন্ধকারে চার দিকের আবহাওয়ায় এমনিতেই মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে থাকে, তার ওপর এমন হৃদয়গ্রাহী গল্প, কাজেই সাহেবকে আর নিজ হাতে কষ্ট করতে হয় না—নিজের হার্ট-বিটিংসকে ঘোড়ার খুরের শব্দভ্রমে প্রথমে গোঁ গোঁ তার পর সে ও ঘোড়ার পিঠের সোওয়ারী। দু-তিন জনের এ অবস্থা ঘটবার পর গভর্ণমেণ্ট ঘরে তালা লাগিয়ে দিলেন—লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ঘরের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিশ্বাস রুদ্ধ করে আওড়াতে লাগলাম—"ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি"······কিন্তু তাতেও সোয়াস্তি নেই, ভয় হতে লাগলো। সাহেব-ভূত কালা আদমীর বাৎসল্যের এ ধৃষ্টতা সহ্য করতে না পেরে সাতটাতে নেমে এসেই না ঘাড় মটকে দেয়।

নীলকণ্ঠ বেশ কয়েক ফিট উঁচুতে, মোটরের রাস্তার ওপর দিয়ে ছোট ছোট জলের ধারা নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। কোন কোন জায়গায় সে ধারাকে বেঁধে বসানো হয়েছে ছোট আটা বা তেলের কল। তা ছাড়া এমন কিছু দর্শনীয় বস্তু নেই। কিছুটা দূর থাকতেই গাড়ী থামলো—খানিকটা উঁচু টিলারের ওপর চারদিকে ছোট ছোট ঘর দিয়ে ঘেরা—তীর্থযাত্রীদের বাসোদ্দেশে তৈরী। মাঝখানে চার দিকে দেওয়াল-দেওয়া ছোট পুকুর, জল হয়ত খুব গভীর নয়। তার ওপর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী একাদশ ফণা সর্পকুণ্ডল-পরিবেষ্টিত অনন্ত শয়ানে কালো পাথরের পদ্মলোচন নারায়ণ। ঠিক এমনি মূর্ত্তি বালাজুতে থাকলেও বিরাটত্বে বা শিল্প-চাতুর্য্যে সে মূর্ত্তি এর সমকক্ষ নয়। জানা নেই, ঠিক কত বছর আগে কোন ভাস্কর তার সমস্ত সাধনা দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছিল তার সৃষ্টিকে—ঠিক কত যুগ আগে কেনই বা এর সমাধি, আবার কত যুগ পরে কৃষকের হলকর্ষণের সময় এর আবির্ভাব তা-ও জানা নেই সঠিক ভাবে। এ মূর্ত্তি শুধু ভক্তিরসে আপ্লুত করে না মনকে, ভয়ে রোমাঞ্চিতও করে, কিছুটা এর সজীবতা, বিরাটত্বে ও চার পাশের নির্জ্জন আবহাওয়ার জন্যও বটে। নির্জ্জন মধ্যাহ্নের সূর্য্যদেবের প্রখরতায় অশ্বত্থের ছায়ায়, লোকালয় হতে দূরে মাঝে মাঝে অশ্বত্থের পাতার শোঁ-শোঁ শব্দ আর বিহগের দু-একটা ডাক এ যায়গার নির্জ্জনতা বাড়িয়েই চলে। মহাদেবকেই আমরা নীলকণ্ঠ বলে জানি—নেপালে গিয়ে নারায়ণও নীলকণ্ঠ হলেন কেন জানা নেই। যা হোক্, শুনলাম বহু বার এর ওপর আচ্ছাদন দেবার চেষ্টা হয়েছে যার চিহ্নও বর্ত্তমান; কিন্তু সে প্রচেষ্টা হয়েছে বার বার ব্যর্থ। তাঁরই সৃষ্ট প্রকৃতির দান তিনি উপভোগ করছেন পরমানন্দে—মহাকাশের শ্যামল নীল ছায়ার নীচে তাঁর শয়ন, শিশির করছে তাঁর সেবা, নিদাঘের রুক্ষ আবহাওয়ায় অশ্বত্থের ছায়া ও সুনির্ম্মল বাতাস তাঁর অঙ্গ সুশীতল করছে, প্রথম উষার অরুণের আলো করছে তাঁর আনন আরক্তিম, তাঁর বিদায়-বেলায় সন্ধ্যা স্নিগ্ধ করছে তাঁর তপ্ত দেহকে, মুগ্ধ করছে চন্দ্রমার জ্যোৎস্না, তারার সলজ্জ মিটি মিটি চাহনি, তিনি পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়েন, পাখীর ডাকে জাগেন। সাধ্য কি মানুষের এত আয়োজনের?

ওখান থেকে নেমে এলাম রাস্তায়। পথে দুধারে ধানের চারা তোলা হচ্ছে নতুন করে লাগাবার জন্য। অধিকাংশই যুবতী, লম্বা হাতা জামা, সাড়ী কোমরে বেশ আঁট করে জড়ানো, খোঁপায় ফুল, গলায় পুঁতির মালা ও কানের দশ জোড়া রিং দুলিয়ে আঁ···আঁ··· আঁ···গানের সুরে লীলায়িত ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিচ্ছে ধানের আঁটি—আরও খানিক দূরে সুরু হয়েছে ভোজ। সামনে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে ছোট পাহাড়ী নদী। সবাই বসলাম স্রোতে

মাঝে ছোটখাট পর্ব্বত প্রমাণ পাথরের ওপর—জলের শোঁ-শোঁ কল-কল ছল-ছল শব্দের সঙ্গে ভেসে উঠলো 'পাহাড়ের পরে পাথরের ঘরে আমার জনম-স্থান, বিজনে যেথা বায়ু বয়ে যায় গাহিয়া বিজন গান।' বায়ুর সে প্রেমসঙ্গীত নদীর বুকে দোলা দিয়ে যায় আর দেয় দোলা কবির মনে, সে ভাষা বোঝবার শক্তি আমাদের নেই—আমরা শুধু উপভোগ করতে পারি নদীর উচ্ছসিত বক্ষের আনন্দ-মধুর কলধ্বনি—তার প্রাণের ভাষা নয়। ফটো তোলা হলো—নেমে যখন মোটরের কাছে এলাম প্রচণ্ড তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সামনে ৪।৫টি ১০।১২ বছরের ছেলে খেলা করছিল, তাদের কাছে কাতর কণ্ঠে নিবেদন জানানো হলো 'ল, দিক্ক ?' কলকণ্ঠে হেসে পালিয়ে গেল তারা আমাদের নিরাশ করে। খানিক পরেই আমাদের উৎফুল্ল করে ঘটিভরা জল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। তৃপ্ত হয়ে পয়সা দিতে গেলে আশ্চর্য্য হয়ে যা বললো তার মর্ম্মার্থ এই—'তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিয়েছি, তার জন্য পয়সা কেন ?'

এখানকার আরো দুটো আকর্ষণ হচ্ছে জল সরবরাহ পদ্ধতি ও রোপ্‌ওয়ে (Ropeway), পাহাড়ের স্বচ্ছ জলধারাকে under groundএ আবদ্ধ রেখে পরিষ্কার করে তার পর সরবরাহ করা হয় নল দিয়ে সমস্ত সহরে। উড়োজাহাজ বা মানুষের কাঁধে জিনিষ আনলেও যে দেশ প্রায় সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল, তাকে প্রচুর আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। মানুষের কাঁধে চেপে আসতে সময় লাগে প্রচুর, আর ব্যোমযানে সময় সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্য বৃদ্ধি হয় সেই অনুপাতে—সময়, মূল্য ও শ্রম সংক্ষিপ্ত করতে এ রোপ ওয়ের সৃষ্টি। দুটো মোটা তারে লাগানো আছে ভিন্নমুখী তিন-কোণা বহু পাত্র, তাতে ভরে ভরে দিন-রাত একটাতে হচ্ছে আমদানী, অন্যটাতে রপ্তানী। ডাল, মসলা থেকে সুরু করে পাথর পর্য্যন্ত চলাচল করে এতে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে পাত্র যায় উল্টে, জিনিষের হয় স্বস্থানে পতন। বিজলীতেই এর চলন।

দেখবার আরো অনেক কিছু আছে—যথা সুন্দরীচল, পশুপতিনাথের গুরুর ভাতগাত্তর আশ্রম—সুন্দরীচলে আছে ঝরণা, সে দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত—আর আশ্রম পুণ্যের জন্য প্রবাদ, এ আশ্রম দর্শন না করলে পশুপতিনাথ দর্শনের পুণ্য নেই।

একদিন বাজারে গেলাম। প্রশস্ত, সুদৃশ্য মেইন রোড। বৃটিশ ও ভারতীয় দূতাবাসের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে পথ, দু'ধারে ইণ্ডিয়ান অফিসারদের কোয়ার্টার্স। খানিকটা এগুলে ব্যায়নটধারী গুর্খা পাহারা দিচ্ছে নিজ নিজ ব্যারাকের গেট। এই হচ্ছে ব্যারাকের শেষ সীমানা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

ফুল সাজানো

কল্যাণী দত্ত

প্রাচীন কাল হতে আজ অবধিও সৌখীন মহিলাগণের নিকট ফুল চির আদরের সামগ্রী। ধনীর প্রাসাদ এবং দরিদ্রের কুটীর, সহরের চাকচিক্যময় পরিবেশ এবং পল্লীর নিভৃত শান্ত আবেষ্টনী ; সকল জায়গায় স্থান লাভের যোগ্যতায় ফুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেশ এবং জাতিভেদে মানুষের রুচির বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু ফুল সকল দেশের সকল জাতির নিকট সমান প্রিয়।

জাপানী মহিলাগণ ফুল অত্যন্ত পছন্দ করেন। ফুল ব্যতিরেকে গৃহসজ্জা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। সামান্য উপকরণে অতি সুন্দর ভাবে ঘর-বাড়ী সাজাতে জাপানী মেয়েদের তুলনা নেই। তাঁদের গৃহসজ্জার মাঝে ফুল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। ফুল সাজানোকে জাপানী মেয়েরা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় বলে মনে করেন। আমাদের দেশে ধনীগৃহ ছাড়া গৃহসজ্জার মাঝে ফুলদানীতে টাটকা ফুলের দেখা পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু এক গোছা ফুল একটি ঘরকে যত সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তুলতে পারে, যা অতি মূল্যবান আসবাব-পত্রের দ্বারাও সম্ভব হয় না। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে, ফুল সাজানোর জন্য বেশ দামী পুষ্পাধারের প্রয়োজন। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আজ-কাল বাজারে সস্তা দামে নানা প্রকার কাচের ফুলদানি মেলে এবং আরও সস্তায় মাটির ফুলদানি পাওয়া যায়। এই রকম ফুলদানিতেও গোলাপ, ডালিয়া বা রজনীগন্ধার গুচ্ছ সাজিয়ে রাখলে ঘরের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। তবে উপরোক্ত ফুলগুলি দামী মনে হলে সাধারণ গাঁদা বা মালতী ইত্যাদি সহজপ্রাপ্য ফুল-পাতার গুচ্ছ দিয়েও ফুলদানি সাজান যায়। ফুল বেশী দিন তাজা অবস্থায় রাখতে হলে প্রত্যহ ফুলদানির জল বদলাতে হবে এবং গোলাপ বা রজনীগন্ধা ফুল থাকলে তার ডাঁটা তেরছা ভাবে কেটে দিতে হবে। আপনার শোবার ঘরের শয্যার পাশে একটি চৌকির উপর একটি রঙীন কাচের বাটি বা প্লেটে কিছু বেল, চাঁপা, চামেলী বা বকুল ফুল রেখে দিন ; ফুলের সুবাস আপনার সারা দিনের ক্লান্তি দূর করবে এবং সুনিদ্রার পরশ বুলিয়ে দেবে। আপনার খাবার ঘরটির পরিবেশ মাধুর্য্যময় করে তুলতে হলেও কাচের প্লেটে কয়েকটি সুগন্ধি পুষ্প রেখে দেবেন কিংবা খাবার টেবিলে একটি নীল রঙের কাচের বাটি বা প্লেটে প্রস্ফুটিত একটি বড় আকারের রক্তপদ্ম রেখে দিলে খাবার-টেবিলের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি করবে বলে মনে করি। শুধু পদ্মফুল ছাড়া আর সকল ফুল ক্রয় করবার জন্য অর্থ ব্যয়ও করতে হবে না ; যদি আপনার বাড়ীর মধ্যে এক ফালি খালি জমি থাকে। নাহলে বারান্দা বা বাড়ীর ছাদে টব রেখে তাতে মাটি ফেলে যুঁই, বেল, গোলাপ, গাঁদা, রজনীগন্ধা, স্থলপদ্ম ইত্যাদি ফুলের গাছ লাগান যেতে পারে। একটু যত্ন নিলেই গাছগুলি হতে অজস্র ফুল পাওয়া যাবে, তাতে আপনার প্রয়োজন মিটবে বলে আশা করা যায়। অনেকে ফুলদানিতে রঙীন কাগজের ফুলও সাজিয়ে থাকেন। কিন্তু কাগজের কৃত্রিম ফুলের চেয়ে টাটকা ফুলের মাধুর্য্য অনেক বেশী, আর ফুলের সুগন্ধও কার না ভাল লাগে? কাজেই ফুল সাজানোর জন্য সব সময়েই টাটকা ফুল ব্যবহার করা উচিত।

"চাষীর সুখ কোথায় ?"

মণিকা দত্ত

আমার হাতে এবার কেমন ফসল ফলেছে,
তাই সকলে আদর করে লক্ষ্মী বলেছে,
আমরা চাষা চাষ করি ভাই পেটে ক্ষুধা নিয়ে,
তবু যে গো দুঃখ লুকাই মধুর হাসি দিয়ে,
সোনার দেশে সোনার ফসল মোদের হাতে ফলে,
আমরা সুখী চাষী জাতি চাষ করি এই জলে,
সবার মুখের অন্ন ফলে মোদের হাত দিয়ে
আমরা তাতে সুখী জে'ন দেশের মুখ চেয়ে,
তোমরা ধনী বোঝ না হায় কিসে কে হয় সুখী,
তোমরা ভাব চাষীরা সব হয় যে চিরদুখী,
ভুল বুঝেছ "ধনীবাবু" আমরা সুখী চাষী,
তোমার মুখে অন্ন দিতে আমরা ভালবাসি,
আমরা সুখী মাটি কেটে ধানটি করে রোপণ,
তোমরা সুখী "খাজনা দেওয়া" ধনটি করে গোপন,
হায় হে ধনী, জান নাকি আমরা সুখী চাষী,
তোমরা ভাব টাকার তরে আমরা মাটি চষি,

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

১৬ অক্টোবর। তারিখটার নিচে দাগ দিয়ে রাখবার মতো। গ্রামে যাচ্ছি—খাঁটি চীন যেখানে দেখতে পাবো। সেদিন অবধি দুঃখী সর্বসম্বলহীন—আজকে কত হাসি সেই সব মানুষের মুখে। কোন্ ম্যাজিকে এসব হয়, গাঁয়ে গিয়ে তার যদি কিছু হদিস পাই।

বাসে চড়ে ছুটেছি প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে। সঙ্গে মোটর-কারও যাচ্ছে—তদ্‌গর্ভে রবিশঙ্কর মহারাজ ইত্যাদি। আমার গাঁয়ের বাড়ি ষ্টেশন থেকে বিশ মাইল। বাসে যেতে হয়। সেই গাড়ি যাওয়ার স্ফূর্তি হঠাৎ লাগছে মনে। পিকিন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, খোলামেলার মধ্যে সেটা মালুম পাচ্ছি। শহর সরে গিয়ে দু-ধারে মাঠ এখন। মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে ছোটখাট গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। অলস চোখে চেয়ে চেয়ে বাংলা দেশ বলে দিব্যি ভাবা যেতো, খামোকা এক এক পাহাড় উদয় হয়ে ভাবনা চুরমার করে দিয়ে যাচ্ছে।

রাজপথ ছেড়ে ডাইনে বাঁকলাম। এ-ও কিছু নিন্দের নয়—আগের পথের তুলনায় কতকটা সরু। তার পরে মেটে রাস্তায় এসে পড়েছি, মালুম হচ্ছে। একটা নালা মতন জায়গা, উপরে পাথর ঢালা। বাস ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা—প্রণিধান করে দেখতে ড্রাইভার নেমে পড়ল। আমরাও নেমেছি।

উঠে পড়ুন, বেশ চলে যাবে—

কিন্তু একবার যখন মাটিতে পা ঠেকিয়েছি, কার কত ক্ষমতা আমার ঐ খোপে নিয়ে তুলবে! প্রাণ এমন ফেল্‌না নয় হে বাপু, নতুন চীনে যা দেখে যাচ্ছি, দেশের ভাই ব্রাদারদের কাছে তাই নিয়ে আসর জমাতে হবে না?

হেঁটে চললাম খুচরো খুচরো দল হয়ে। স্লুইস-গেট—খালের জল ক্ষেতে সরবরাহ হয় তার ব্যবস্থা। গাঁয়ের জলনিকাশ হয় এই খাল-পথে। বাঁধা-পুলের উপর দাঁড়িয়ে আবর্তিত জলধারা দেখলাম খানিক। মাছ মারছে বুঝি ওদিকে—কিন্তু অনেকটা দূর, বেরসিক সঙ্গীরা অত উজান ঠেলতে রাজি নন। মনোবাসনা অগত্যা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ—বেশ পরিচ্ছন্ন কিন্তু। পাশাপাশি গোটা কয়েক ডোবার ধার দিয়ে যাচ্ছি। অগভীর স্বচ্ছ জল—তলা অবধি দেখা যায়। তলায় কাঁকর জমেছে, অজস্র লাল মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। যে লাল মাছ কাচের বোয়েমে পুরে আপনারা বৈঠকখানার শোভা বাড়ান, [illegible] খানা-ডোবা ভরতি সেই মাছে।

তারপর জনালয়ের মধ্যে। ঘরবাড়ির গা ঘেঁসে চলেছি। দু-মিনিটে রাস্তার মোহানা অথবা কোন এক সদর জায়গা হলেই দেখতে পাচ্ছি, ব্লাকবোর্ড টাঙানো। তাতে অজস্র চীনা হরপ। প্রশ্ন করে অবগত হওয়া গেল, গ্রামের যাবতীয় খবরাখবর। এবং কৃষক সমিতি ও অপরাপর সমিতির নির্দেশনামা। যত্র-তত্র শান্তি-কপোতের ছবি—অতএব পিকিনে যে সম্মেলন সেরে এলাম তার যাবতীয় বার্তা পৌঁছে গেছে গাঁয়ে। মানুষের ছবিও বিস্তর লটকানো। অবোধ্য হিজিবিজিতে পরিচয় রয়েছে—পড়তে না পারলেও চেহারা দেখে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, সাধারণ চাষাভুষোর কেউ। সকলের নজরের সামনে ঐ মূর্তি টাঙিয়ে দিয়েছে কেন হে?

কৃষক বীর—

শুনলেন? লাঙল ছাড়া জীবনে যারা হাতিয়ার ধরে নি, তাদের নামে লেজুড় লাগিয়ে দিয়েছে—'বীর'!

আপনি আমি হাসছি বটে, কিন্তু কৃষক বীরের ভারি ইজ্জত সমাজের মধ্যে, লড়াই-জেতা সেনাপতিও বোধ হয় অত খাতির পান না। কি না, জমিতে উনি দেড়া ফসল ফলিয়েছেন। শুধুমাত্র ছবিতেই শোধ নয়—যাও দিন কতক আরামের প্রাসাদে কাটিয়ে এসো। রাজা মহারাজারা সখ করে বানিয়ে অনুপম সজ্জায় সাজিয়েছে—আজ সেখানে গদির উপর ঠ্যাং তুলে উবু হয়ে বসে দাবা খেলছে মাঠের লাঙল-ঠেলা চাষী, খনির কালিঝুলি-মাখা শ্রমিক।

গাঁয়ের নামটা কি যেন বললে?

কাওবিতিয়েং—

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। পিকিন থেকে দোভাষী সঙ্গে এসেছে। ইংরেজি বানানে সে লিখে দিল—Kaobeitieng. গ্রামের মণ্ডল দলের মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের নাম সু-চিং (Tsu ching)—ভদ্রলোক নিতান্তই হাল আমলে মণ্ডল হয়েছেন, দাঁত-উঁচু চুল-খাটো নিতান্তই গ্রাম্য চেহারা। এক দঙ্গল মেয়ে আর ছেলে এসেছে অভ্যর্থনা করতে। ছোট ছোট ঢোলক বাজাচ্ছে মেয়েরা—যে রকম ঢোলক নিয়ে আমাদের বাচ্চারা খেলা করে। ঢোলকের সঙ্গে কত্তাল—রাক্ষুসে কত্তাল, বড় বগি থালার সাইজ। তারা আমরা মিলে দস্তুর মতন মিছিল হয়েছে।

নিয়ে বসাল জুনিয়ার মিডল্ ইস্কুলের বাড়িতে। বড় হল—হলের লাগোয়া ঘর। তার পর উঠান। উঠানের ওদিকে আরও তিনটে ঘর পাশাপাশি; ইস্কুল বসেছে ওদিকটায়। আগে দেবস্থান ছিল গোটা বাড়িটাই। পুরানো বাড়ি আগাগোড়া মেরামত হয়েছে এখন, কাচের জানলা বসেছে। মাও-র ছবি সামনের দেয়ালে। টানা-টেবিলের দু-ধারে আমরা বসেছি, খানাপিনা ও আলাপ-সালাপ হচ্ছে। মহিলা-সমিতির নেত্রী শ্রীমতী জো এসেছেন, তিনিও দরিদ্র চাষী-ঘরের মেয়ে। মেয়েদের এমন সম্ভাবনার কথা তিনি কি ভাবতে পেরে-ছিলেন ক'টা বছর আগে?

মণ্ডল মশায় বক্তৃতা পড়ছেন, দোভাষী ইংরেজি করে যাচ্ছে। আমি পাশে বসে টুকছি। জবর এক বই লিখব চীন সম্পর্কে, এটা কেমন চাউর হয়ে গেছে। দোভাষী থেমে থেমে বলে, তাকিয়ে দেখে ঠিক মতো আমি টুকতে পারছি কিনা।

৬৫৩ ঘর বসতি এ গ্রামে, মোটমাট ৩০১২ জন মানুষ। আবাদি জমির পরিমাণ ৫৭৫৬ মো। জন-প্রতি মোটামুটি ২ মো হিসাবে পাচ্ছে এখন (৬ মো= ১ একর)। ভূমি-সংস্কারের আগে ২২টা জমিদার ছিল—২০৮৮ মো জমি তাদের দখলে। জমিদার-পরিবারের প্রতিজনের জমির গড় পরিমাণ ৩৩ মো। ৩০১ ঘর গরিব-চাষী ও ক্ষেত-মজুর ছিল—তাদের প্রতি জনের গড় জমি ·৭৬ মো। মধ্যবিত্ত কৃষক ১৭৬ ঘর, তাদের প্রত্যেকের ৩·৩ মো। তাহলে হিসাবে দেখতে পাচ্ছেন, গরিব-চাষী ও ক্ষেত-মজুরের জমির ৪৪ গুণ হল জমিদার-পরিবারের প্রতি জনের জমি।

কি অত্যাচার করত যে জমিদারগুলো! যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাও পাকে-চক্রে তারা দখল করেছিল। এর মধ্যে আট জন ভারি জবরদস্ত—তাদের নাম হয়েছিল আট মুগুর (Eight Hammers)। এক জমিদার ম্যাং-আউং (Mang-Aung) কত নারীর যে সর্বনাশ করেছে—ভূমি-সংস্কারের অল্প কিছু দিন আগেও এক কৃষক-বধূকে ধরে নিয়ে গেল। কি হল মেয়েটার, আর কোন খোঁজ হয়নি।

নতুন চীনের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভূমি-সংস্কার। জমিদার উৎখাত করলাম, জমি বাজেয়াপ্ত করে চাষীদের দেওয়া হল। গ্রাম-জীবনের চেহারা বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কত কাল থেকে, বলুন তো, জমির জন্য ক্ষুধাতুর হয়ে আছি আমরা?

গাঁয়ে কৃষক-সমিতি হল, সভ্য প্রায় ছ'শ। কিছু কর্মী এলো বাইরে থেকে। জমিদারদের বিরুদ্ধে এরাই সব ব্যবস্থা করল। তারা কি অল্পে ছেড়েছে? নানান রকম কায়দা-কৌশল, দল ভাঙাভাঙি। তার পরে জমি, বাড়তি মজুত ফসল, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করবার পর জমিদারেরা সায়েস্তা হল। বাইশের মধ্যে বারোটি জমিদার-পরিবার আছে এখনো গাঁয়ে, তারা লোক খারাপ নয়, বেশি শয়তানি বজ্জাতি করেনি ভূমি-সংস্কারের সময়। এখন দশের এক জন হয়ে আছে তারা। জন-প্রতি ২·২ মো জমি পেয়েছে। তবে বাপু গায়ে-গতরে খাটতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো, মজুর-কিষাণ খাটাও। কিন্তু পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাজনা আদায় আর প্রজাপাটকের উপর হুমকি দেওয়া চলবে না। জমিদার ছাড়া ১১ ঘর ধনী চাষী আছে—তারা জন-প্রতি পেয়েছে ২·৭ মো। ১৭৩ ঘর মধ্যবিত্ত চাষী—তাদের প্রতি জনের জমি ৩·৩ মো। আর গরিব চাষী ও ক্ষেত-মজুর হল ৪১০ ঘর—তাদের প্রতি জন জমি পেলো ১·২৫ মো হিসাবে। অত্যাচারী জমিদারদের জমির সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল মোট ২৪০ খানা ঘর, ৪টা চাষের পশু, ৩টা বড় গাড়ি আর ১২৫ দফা আসবাবপত্র। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি তার কতক পেয়েছে, বাদ-বাকি বিলি করে দেওয়া হয়েছে চাষীদের মধ্যে। এক মেয়ে-জমিদার আছে—ওয়া-চাউ (Wa-chow)। ভূমি-সংস্কারের পর নিজেই সে চাষবাস করে। ফূর্তিতে আছে, দশ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে গেছে একেবারে।

নতুন চেহারা গ্রামের। সেদিনের মুক্ত দেহ ভূমিদাসেরা নেই। আজ তারা বলিষ্ঠ মানুষ—রাজনৈতিক চেতনা হয়েছে তাদের, শিক্ষা পাচ্ছে। চাষবাস সম্পর্কীয় শিক্ষাই প্রধানত। সরকার গেল বছর ৫১১ লক্ষ মিলিয়ন ইয়ুয়ান, চাষীদের ধার দিয়েছে পশু ও যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য। উৎপন্ন খুব বাড়ছে এই ভাবে। ১৯৫০ সালে উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ ৯৪৪৩ পিকো (১ পিকো —১৩৩ পাউণ্ড); ১৯৪৯-এর তুলনায় ২৩·৮ শতক বেশি। আর ঠিক হয়েছে, এই ১৯৫২ সালে ওটা ১১৫১২ পিকোয় তুলতে হবে। সরকারের খুব নজর এদিকে। লাভও আছে। খাজনা টাকায় নয়, উৎপন্ন জিনিষের শতকরা ১৩ভাগ। উৎপন্ন বাড়লে খাজনাও বেড়ে যাবে। ৩২টা কুয়া আছে গ্রামে; ১১টা জলচাকি। পশুর সংখ্যা বেড়েছে—৮৪ থেকে ৯৬। গাড়ি ৪৯ থেকে ৮১। তিনটে স্প্রে আনা হয়েছে জমিতে জল দেবার জন্য, তিনটে নতুন ধরণের লাঙল।

৪২টা মিউচুয়্যাল এইড টিম (Mutual Aid Team) আছে। বস্তুটা কি বুঝলেন? ধরুন, এক বাড়ির জমি আছে ১৪মো, খাটনির মানুষ ৩ জন। আর এক বাড়ির জমি ১২ মো, খাটনির মানুষ ১০ জন। দু'বাড়ির ২৬ মো জমি ১৩ জনে মিলে-মিশে চাষ করল, ফসল তুলল এক খামারে। তারপর ফসল সমান ভাগ করে নিল। ওদের জমি বেশি, মানুষ কম। এদের মানুষ বেশি, জমি কম—তারই হারাহারি করে নেওয়া হল। পদ্ধতিটা হল মোটের উপর এই।

মানুষ সুখী সচ্ছল,—খুব খরচপত্র করছে। ষোলটা পরিবার নতুন ঘর বেঁধেছে মোট ৭০ খানা। তার মধ্যে ১৬ খানা নিতান্তই সখের ঘর। নববর্ষের দিন সেরা উৎসব এখানে: সেদিন একটু ময়দা খাবার জন্য সকলে আঁকুপাকু করত, কিন্তু সঙ্গতিতে কুলিয়ে উঠতে পারত না। এখন মাসে দশ-বারো দিন তারা ময়দা খায়। আগে এক প্রস্থ কোট-পাজামায় বছর কাবার হত, এখন শীতের গরমের আলাদা আলাদা পোশাক। আর উৎসবের দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তো চক্ষু কপালে উঠবে—নিষিদ্ধ শহরের কবরখানা ফুড়ে সেকালের রাজারাণীরা যেন গাঁয়ের ভিতর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনটে বছর আগে একমুঠো ভাত পেলে যারা বর্তে যেতো, সেই চাষার ছেলেমেয়ের হাতে ঘড়ি এখন, পকেটে ফাউন্টেন-পেন।

সমবায়-দোকান হয়েছে, গাঁয়ের মানুষ টাকা দিয়ে সভ্য হতে পারে। লাভের বখরা পাবে। জিনিষপত্র ওখানে অন্য জায়গার চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ সস্তা। ২৭০ রকম জিনিষ পাওয়া যায় ওখানে।

আগেও প্রাইমারি ইস্কুল ছিল। কুয়োমিনটাং আমলের ছাত্র সংখ্যা ২৩৪, এখন ৫৩৯-এ উঠেছে। নতুন মিডল ইস্কুল হয়েছে—তাতে ২৯০ জন ছাত্র। বেশির ভাগ ছেলেই সরকারি বৃত্তি পায়। চাষীদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়ানোর জন্য ইস্কুল হয়েছে—৩৫০ জন পড়ছে এখন সেখানে। সংক্ষিপ্ত উপায়ে কম সময়ে চীনা ভাষা শিখবার কায়দা বেরিয়েছে, সেই ভাবে শেখানো হয়। সাংস্কৃতিক-ভবন দেখতে পাবেন। থিয়েটারের দল হয়েছে অবসর-বিনোদনের জন্য। ভূমি সংস্কারের সময়টা ছুটো পালাগান বড্ড সমাদর

পেয়েছিল—'সাদা চুলের মেয়ে' আর 'লাল পাতার নদী' (Red-leaf River)।

স্বাস্থ্যের খুব নজর এখন চাষীদের। ৬১৩টা ইঁদুর মেরেছে এ বছর ; মাছি মেরেছে ৩৭০০০ (জাল পেতে মাছি মারে, এর জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় গ্রাম-সমিতি থেকে)। হাসপাতাল হয়েছে ১৯৫০ অব্দে। আর নতুন পদ্ধতির সূতিকাগার। শান্তি-আন্দোলন খুব চালু হয়েছে গ্রামের ভিতর। লড়াই করব না, শান্তি চাই আমরা মনে দেহে বাক্যে। ১১২৫ জন সই করেছে শান্তির প্রতিজ্ঞাপত্রে, ২৬৫ লক্ষ ইয়ুয়ান চাঁদা উঠেছে। যে ভাবে উন্নতি হচ্ছে—প্রত্যাশা করছি, দু-এক বছরের মধ্যে ট্রাক্টর আসবে, মিলিত ভাবে চাষ করব আমরা।

দেশে ফিরে আপনাদের চাষীদের কাছে আমাদের কথা বলবেন, আমাদের ভালবাসা জানাবেন। ভারত-চীন এক হোক, শান্তি সুদীর্ঘজীবী হোক !

বক্তৃতা পড়া শেষ হল। সকলে কানে শুনছেন, আর হাতে-মুখে চালিয়ে যাচ্ছেন সমান তালে। আমি অভাগা পিছিয়ে পড়েছি, কলমই চালিয়েছি এতক্ষণ বোকার মতো। যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি মুখবিবরে ফেলে উঠে পড়লাম। দু-জন চার-জনে এক এক দল হয়ে চলেছি। মুখের কথায় শুনিনে বাছাধন, স্বচক্ষে দেখব। একটা ভাত টিপে হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতের গতিক বোঝা যায়—একটা গ্রাম থেকেই চীনের গ্রাম-জীবনের আন্দাজ পেয়ে যাবো।

কড়া রোদ। আর পথও আমাদের দশখানা গাঁয়ের যেমন হয়ে থাকে। কখনো আ'লের উপর চলেছি, কখনো শুকনো পুকুরের খোলে। এর ঘর-কানাচ, ওর সদর-উঠান পেরিয়ে চলেছি। তার পর, যা থাকে কপালে, ঢুকে পড়া গেল এক বাড়ির ভিতরে।

তিন দিকে তিনটে ঘর, মাঝে উঠোন। উঠোনে মরাই। আর এক প্রান্তে গাড়ি পড়ে রয়েছে—খচ্চরে টানে এ গাড়ি। শোবার ঘরে বেমক্কা রকমের উঁচু খাট, খাটের উপর মাদুর পাতা। খাটের নিচে হরেক জিনিষপত্র। দুটো ডিপ্লোমা টাঙানো ঘরের দেয়ালে—দুই ছেলে গ্রাজুয়েট হয়েছে। বসুন ঐ খাটের উপরে উঠে, বিশ্রাম করে যান।

খাটে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, কসরৎ করতে হবে। সে না হয় দেখা যেতো, কিন্তু সময় কোথা ? এক নিশ্বাসে সাত-কাণ্ড রামায়ণ পড়ার মতন অত বড় গ্রাম বিকালের মধ্যে দেখা শেষ করে বেরিয়ে পড়তে হবে।

প্রাইমারি ইস্কুল। ইস্কুলের বড় ঘরটা মেরামত হচ্ছে। হেড মাষ্টারকে নিয়ে বারাণ্ডায় বসা গেল খবরাখবর নিতে। ১১টা ক্লাস, ১৬ জন মাষ্টার। আগে ছিল ৬টা ক্লাস, ১০ জন মাষ্টার। ছাত্র অনেক বেড়েছে—তাদের শতকরা ৯২ জন আসে চাষী-শ্রমিকের বাড়ি থেকে। পড়া শেষ হতে আগে ছ-বছর লাগত ; নতুন পদ্ধতিতে এখন পাঁচ বছরে হবে। শিখবেও অনেক বেশি। মাষ্টার মশায়দের মাইনে ও সামাজিক ইজ্জত বেড়ে গেছে। কাজকর্মেও তাঁরা অধিক মনোযোগী হয়েছেন।

আগে ছেলেদের মারধোর করা হত, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়েছি আমরা। ছেলেদের মন জাগাতে চাই, ইচ্ছে করে তারা বেশি শিখবে। পড়ানোর বিষয় হল—চীনা ভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, গান, ছবি-আঁকা, দেহ-চর্চা…

ছোট ছোট ছেলেরা উঠানে বেরিয়ে পড়েছে, গান করছে নেচে নেচে। কে আর বলুন ভদ্র হয়ে বসে বসে তথ্য কুড়োবে হেন অবস্থায়? খাতা বন্ধ করে আমরা উঠলাম। তারা দত্ত আর পাণিগ্রাহী পুরোপুরি মেতে গেছেন ছেলেদের হুল্লোড়ে। কি আনন্দ, কি আনন্দ!

ঢের হয়েছে গো! ঘরে এসে খাবে এবার তোমরা। ছোট ছোট চেয়ার আর ডেস্ক, ছোট মানুষদের মাপসই খাওয়ার পাত্র।

অনেকক্ষণ থেকে চেঁচামেচি শুনছি, বহু লোকের বচসা। ধ্বক করে আমার ছেলেবয়সের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। জমির জোর-দখল নিয়ে খুব দাঙ্গা হত সে আমলে। চষা ক্ষেতে এক একটা মাটির চাই টেনে নিয়ে বসেছে মরদগুলা—তেল-চকচকে রাঙা লাঠি সামনে শোয়ানো। ওদিকে উঁচু ডাঙার খেজুর তলাতেও আছে আর একটা দল। বাগ্‌যুদ্ধে গোড়ায় মেজাজ গরম করে নিতে হয়। এ দল বলছে, ও দল জবাব দিচ্ছে। গলা চড়ে উঠছে ক্রমশ। তার পর উত্তর-প্রত্যুত্তর নয়, আকাশভেদী চিৎকার। এবং ছুটে এসে যে যাকে পাচ্ছে, পিটছে দমাদম। মুহূর্তে রক্তগঙ্গা। চীনেও নাকি সেই ব্যাপার?

অবশেষে অকুস্থানে এসে পৌঁছলাম। পুরানো বাড়ির ভিতর সৈন্যেরা বিচরণ করছে। হুঙ্কার তাদেরই। ভয়াবহ বটে, কিন্তু কেমন যেন সুর পাওয়া যায় চিৎকারের মধ্যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলে ঠেকে না।

তাই বটে! শিক্ষা-ব্যাপার এ জায়গাতেও। বিশ্রামের জন্য সৈন্যদের দিনকতক গাঁয়ে পাঠিয়েছে। নিরক্ষর অনেকেই—আর এখন এমন দিনকাল, পেটে দু-কলম বিদ্যে না থাকলে জনসমাজে মুখ দেখানো দায়। বিশ্রামের কয়েকটা দিন তাড়াতাড়ি তাই যথাসম্ভব লেখাপড়া শিখে নিচ্ছে। কলহ বলে মালুম হচ্ছিল, ওটা হল পাঠাভ্যাস। লড়নেওয়ালা মানুষ—আপনার-আমার ন্যায় সাবু-বার্লি-খাওয়া নিরীহ ভদ্রজন নয়, পাঠ-চর্চার বিক্রমে তাই কিছু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

আরও এগিয়ে একটা খুব বড় বাড়ির বড় হলে এসে উঠলাম। জমিদার-বাড়ি ছিল, জমিদার ফৌত হয়ে যাবার পর সংস্কৃতি-ভবন। মিস্ত্রি-মজুর খাটছে—বাড়ির ভাঙচুর চলছে, দু-একটা ঘর তোলবারও প্রয়োজন হবে এর পর। গ্রামে গ্রামে এমনি হচ্ছে, চাষীদের শুধু খাওয়া-পরা নয়, মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে।

দেয়ালে রকমারি পোষ্টার, তার মধ্যে আনকোরা নতুন ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে টক্ টক্ করে। লাইব্রেরি—সাড়ে চার হাজার বই—বেশির ভাগ চাষবাস সম্পর্কে। শ' দুই লোক পড়াশুনা করে রোজ এসে। এ ছাড়া শিক্ষণ-বিভাগ আছে, চারটে ম্যাজিক-লণ্ঠন—স্লাইডের সাহায্যে নিয়মিত শিক্ষাদান হয় নানা বিষয়ে। চারটে ড্রামের দল, প্রতি দলের পঁচিশটা করে ঢোলক। কাজের শেষে গ্রামের মানুষ ঢোলক বাজিয়ে আমোদ-ফূর্তি করে, সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন প্রোগ্রাম। তাদেরই একটা দল সম্বর্ধনা করেছিল আমাদের। বায়স্কোপ দেখানো হয় শান্তি ও দেশ-পরিগঠন সম্পর্কে।

ব্ল্যাকবোর্ডে নানান হাতের অনেকগুলো লেখা। দরজার ঠিক সামনে রেখে দিয়েছে, ঢুকেই যাতে পয়লা নজর পড়ে। কি হে বাপু এগুলো?

নতুন যারা লিখতে শিখল, তাদের নাম সই। নিরক্ষরতা তাড়াবেই। নতুন কায়দা বেরিয়েছে—রোজ দু-ঘণ্টা পড়ে তিন মাসে মোটামুটি ভাষা শেখা যায়। যাদের শেখা হয়ে গেল, তারাই মাষ্টার হয়েছে এখন—পরের দলকে শেখাবে।

সাংস্কৃতিক ভবন গ্রামের মধ্যে আরও তিনটে আছে। সেগুলো শাখা, মূলকেন্দ্র হল এটা। আগে জমিদার-বাড়ি ছিল। জমিদার ফৌত হবার পর ১৯৫০ অব্দে এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয়েছে।

ভিন্ন পাড়ায় এসেছি। এক তরুণী পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল চেহারা, পোশাকও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে বেশি রকম ফিটফাট। এতক্ষণ ধরে কত মেয়েকে দেখলাম, এ জন একেবারে গোত্রছাড়া। হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে। কথা বুঝতে পারব না, দোভাষীকে হাত নেড়ে তাই কাছে ডাকল। কাছেই বাড়ি, বেশি পথ নয়—ভারতীয় বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে একটু বসাতে চায়।

তা সে দাবি আছে তার বটে। মস্ত বড় কুলীন—ভলাণ্টিয়ার হয়ে তার স্বামী ও এক ভাই কোরিয়ায় লড়াই করছে। যারা মুক্তিসৈন্যের দলে ছিল, দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে কিম্বা কোরিয়ার যুদ্ধে গেছে—তাদের মতন ইজ্জত নতুন-চীনে আর কারো নয়। স্বামী আর ভাইকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েও মেয়েটা তাই অমন হাসছে। আচার জাতীয় জিনিষ বানিয়ে রেখেছে ফ্রণ্টে পাঠাবে বলে। আর পুঁটলি বেঁধে রেখেছে শীতের কাপড়। বোন আর ছেলেটাকে নিয়ে সংসারধর্ম করে। আহা, কী ছেলে! এই আমি লিখতে বসে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। লাল পাজামা-পরা, দু-গালে লাল রং-মাখা, কপালে রাঙা ফোঁটা। অমন সাজে কেন সাজিয়েছে, জানি না। চার বছরের তো ছেলে—আমাদের এতটুকু সমীহ করে না বিদেশী বলে। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে। গান ধরেছে—গানে কি বলছে হে? একটুখানি শুনে নিয়ে দোভাষী ইংরেজিতে মানে বাতলে দিল—'প্রাচী মহান (East is great)'। তখন দু-হাত উদ্যত করে বীররসের আর এক গান। অর্থ? 'দেশ রক্ষা করতে ইয়েলু নদী পার হবো আমি—(I shall cross the Yelu river to defend the Country)'। বাপরে বাপ, শত্রুর আর রক্ষে নেই তুমি যখন ইয়েলু পার হচ্ছ!

গান বন্ধ হঠাৎ, গায়ক বেঁকে বসেছে। কি হল গো? তোমরা হাসছ, গাইব না—কিছুতে গাইব না আর আমি।

বিস্তর সাধ্যসাধনায় মান ভাঙল। মুখ গম্ভীর করে শুনছি আমরা। সে আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, হাস্যলেশ আছে কিনা কোন মুখের উপর। খুশি হয়ে তার পর ঐ কথাগুলোই গাইল বার কয়েক।

তখন মুশকিল, কিছুতে ছাড়বে না আমাদের সঙ্গ। কই যাবে খোকা? যাবে যেখানে আমরা নিয়ে যাবো? ইণ্ডিয়ায় যাবে? মা'টিও তেমনি—ছেলে গুটগুট করে চলল, হাসছে সে

সকৌতুকে। চলেছে ছেলে কখনো আগে আগে, কখনো পিছনে। সমবায়-দোকান অবধি এসেছি, তখনো সঙ্গে আছে। রোদে ঘাম ফুটেছে সোনা মুখে। দোভাষীকে বললাম, আর নয়—জোরজার করে দিয়ে এসো এঁকে বাড়ি পৌঁছে। পাবগু মা খালি হাসে—ছেলে যদি সত্যি সত্যি ইয়েলু নদী পার হয়ে রণাঙ্গনে চলে যায়, তখনো বোধ করি হাসবে অমনি। ঝাপটে ধরবে না।

সমবায়-দোকানে যখন এসে পড়েছি, কয়েকটা জিনিষের দর-দাম নেওয়া যাক। তারিখটা স্মরণে রাখবেন—১৬ অক্টোবর, ১৯৫২।

চাল—	১৩৫০	ইয়ুয়ান	প্রতি	ক্যাটি
গম—	১৭০০	„	„	„
চিনাবাদাম—	২০৪০	„	„	„
শূকর-মাংস—	৫০০০	„	„	„
মুরগির মাংস—	৮৮০০	„	„	„
ডিম—	৩০০	ইয়ুয়ান	প্রত্যেকটি।	

দোকানের প্রতিষ্ঠা ১৯৫০ অব্দে ৩১৫ জন সভ্য নিয়ে। সভ্য-সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ১৪৭৬। খাদ্যশস্যের মাসিক বিক্রি আগে ছিল ৪০০ ক্যাটির মতো; এখন বিক্রি ধরুন প্রায় ৮০০০। গোড়ার দিকে দৈনিক বিক্রি হত ৬-৭ লক্ষ ইয়ুয়ান; এখন তার দশ গুণ। প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায় এখানে, সভ্যদের অন্য কোথাও যেতে হয় না। দামও শতকরা ৫ ভাগ সস্তা।

চলুন, চলুন—ঢের হয়েছে। পরের আতিথ্যে চর্ব্যচোষ্য দেদার চালিয়েছি, দোকানে ঘোরাঘুরির গরজ কি আমাদের?

সুবোধ বন্দ্যো বললেন, জমিদারি কেড়ে নিয়েছেন—তাদেরই এক বাড়ি নিয়ে চলুন মশায়। আলাপ-সালাপ করে বুঝি, মনোভাবটা কি রকম।

প্রোগ্রামে এটা ছিল না। সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠতে ওঁরা বলেন, হাসপাতাল দেখতে যেতে হবে, তাঁদের বলে রাখা হয়েছে। তার উপর এটা চড়ালে খেতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

তাই তো চাই। উদর অবকাশ পাবে, আপনাদের আয়োজন একেবারে বরবাদ হবে না।

মাঝারি গোছের এক জমিদার বাড়ি পথে পড়ল, সদলবলে ঢুকে গেলাম। বাড়ি দেখে সম্ভ্রম হয় না, জমিদার না হয়েও এ হেন বাড়ি আমাদের অনেকেরই। গিন্নি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। বয়স হয়েছে, বলিরেখায় চিত্রিত মুখ।

ঘরে নিয়ে বসালেন। একটু জলটল খেয়ে যেতে হবে—দাঁড়ান, সেই ব্যবস্থা করি। আগে তো জানিনে যে আসবেন আপনারা?

আমরা আপত্তি জানিয়ে বললাম, বেলা হয়ে গেছে—ও সব ভাবে যাবেন না। দুটো একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে। দেশে ফিরলে সকলে জিজ্ঞাসা করবে কিনা—

গিন্নি হেসে বলেন, গিয়ে নিন্দেমন্দ করবেন তো, দুপুর বেলা শুকনো মুখে খানিক বকবক করে চলে এলাম—

কিছু না, কিছু না। আপনি ঠাণ্ডা হয়ে বসুন দিকি একটু।—

বসলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন তিনি। মুখ-ভরা সহজ নিঃসঙ্কোচ হাসি।

জমিদারি গিয়ে নিশ্চয় খুব খারাপ লাগে আপনার?

মোটেই নয়। বেশ ভাল আছি আগেকার চেয়ে।

চমক লাগল। এ কি এ-কথা বিশ্বাস হবার কথা? জবাবটা দোভাষী ইংরেজিতে তর্জমা করে দিল, তারই কারসাজি নাকি? কিম্বা এমনও হতে পারে, আমাদের ইংরেজি প্রশ্ন চীনাতে উল্টো ভাবে বুঝিয়েছে গিন্নিকে।

আবার এ-ও হতে পারে, গিন্নিই একদিনের উটকো লোকের কাছে মনের দুয়োর খুলছেন না, সেরে সামলে বুঝে-সমঝে বলছেন। বিশেষ করে আধা-সরকারি অতিথি যখন আমরা। কিন্তু মুখের কথা নিয়ে যা-ই ভাবুন, মুখের উপরে ঐ যে হাসি খেলছে—ওটা জাল বলি কেমন করে? হেসে হেসে গিন্নি বলছেন, দিব্যি আছি। জমিদারির বিস্তর হাঙ্গামা, প্রজারা পয়সা-কড়ি দিতে চায় না, দশের শত্তুর হয়ে থাকতে হয়। জান বেরিয়ে যায় ঠাটবাট বজায় রেখে চলতে। বেঁচেছি এখন। বৃহৎ সংসার পুষতে হত, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে একুশ জন, তার উপরে ঝি-চাকর। জমিদারি খতম হবার পর পরগাছারা সরে পড়েছে। ছেলে বউ আর আমি—তিন জনের সংসার এখন। ছেলেও আবার পিকিনে থাকে, সেখানে কাজ করে। আগে হবার জো ছিল না—জমিদার-বাড়ির ছেলে। খেটে খাবে, সে ভারি অপমানের ব্যাপার। আগে ১০২ মো জমি ছিল, এখন সেখানে পেয়েছি ৭ মো। তার মধ্যে ২ মো জায়গায় পুকুর, বাদবাকি চাষের জমি। নিজেই চাষবাস দেখি। তাতে যে খুব কষ্ট হয়, তা মনে করবেন না। মিউচুয়াল এইড টিম—খাটাখাটুনি কম।

ওখান থেকে হাসপাতালে। এ-ও আর এক জমিদার-বাড়ি। সেই আট মুগুরের একজন—গাঁ-ঘর ছেড়ে সরে পড়েছেন। হাসপাতাল খোলা হয় ১৯৪৫ অব্দে অন্য এক বাড়িতে, তখন এক ডাক্তার—চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের ওষুধ। চাষীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত রোগমুক্তির জন্য। এখনো—গাঁয়ের প্রতিষ্ঠান তো—এমন-কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয়। তিন জন ডাক্তার, দুই জন সহকারী, চার জন নার্স। ওষুধ তিন শ' দফার মতন। দুটো ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন কুড়িখানার উপর। সত্তর-আশী জন রোগী রোজ আসে চিকিৎসার বাবদে, সর্দি, জ্বর বেশির ভাগ।

দুপুর গড়িয়ে এলো। ফিরে চললাম প্রথম যেখানটায় উঠেছিলাম। দুপুরের খাওয়াও ওখানে। লম্বা টেবিল পড়েছে সারি সারি, স্তূপাকার আয়োজন। আর পল্লী-অঞ্চলের নির্ভেজাল মাল—পানের সময় নাকি গলা দিয়ে আগুন নামে। অধম অরসিক—গুণাগুণ শুনেই আসছি শুধু। গেলাস থেকে একটু ঢেলে জলন্ত কাঠি নিক্ষেপ করলাম। দপ করে জ্বলে উঠল। [ক্রমশ।

যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার। (দেহত্যাগের পাঁচ দিন পূর্বে জনৈক মহিলা-ভক্তকে কথিত)।

—শ্রীশ্রীমা।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

মিসেস মোরেল ছেলেকে লিখলেন, 'হ্যাঁ, লুইসার ফটো দেখে চমক লাগে, ওর চেহারার মধ্যে বাস্তবিকই আকর্ষণের বস্তু আছে। কিন্তু ওর রুচির আমি তারিফ করতে পারলুম না। তার ভালবাসার পাত্রের হাত দিয়ে এই ফটো তারই মায়ের কাছে পাঠানো কি ওর উচিত হয়েছে? আর এই যখন প্রথম। ওর কাঁধের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু প্রথমবারেই এতখানি খোলা কাঁধ দেখতে পাব, এমন আশা আমি একেবারেই করিনি।'

বাইরের বসবার ঘরে একটা ছোট আলমারীর উপর ফটোখানা রাখা হয়েছিল। মোরেল সেটা দেখতে পেয়ে তার পুরু আঙুলের ফাঁকে ফটোখানাকে তুলে নিয়ে এ ঘরে এল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি আবার কে?'

মিসেস মোরেল বললেন, 'ওই যে গো, যে মেয়েটির সঙ্গে উইলিয়ম আজ-কাল চলা-ফেরা করছে।'

—'ও! তা বেশ, চমৎকার চেহারার জলুস, কিন্তু মেয়েটিকে পেলে খুব যে ওর ভাল হবে তা ত' মনে হচ্ছে না। মেয়েটি কাদের?'

—'ওর নাম লুইসা। ওয়েষ্টার্ণ বাড়ির মেয়ে।'

—'মেয়েটি অভিনয় করে নাকি?'

—'তা কেন হবে? ওরা ভদ্র ঘর, ও ভদ্রবংশের মেয়ে।'

—'কখনোই নয়!' ফটোটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মোরেল বলে উঠল, 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ও ভদ্রঘরের মেয়ে নয়। টাকা-পয়সা খরচ ক'রে ওরা ভদ্র সেজে থাকে।'

—'বাজে ব'কো না। টাকা-পয়সা ওর কোথায়? থাকে ত' বুড়ি মাসীর কাছে, বুড়িকে আবার দু' চোখে দেখতে পারে না, যা পায় তার কাছ থেকে তাই দিয়েই কায়ক্লেশে চলে।'

ফটোটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে মোরেল বললে, 'হুঁ। তা'হলে অমন মেয়ের পেছনে দৌড়নো ওর পক্ষে বোকামি ছাড়া আর কি!'...

মায়ের চিঠির উত্তরে উইলিয়ম লিখলে, 'ফটোটা তোমার ভাল লাগেনি জেনে দুঃখিত হলুম। তোমার চোখে ওটা খারাপ লাগবে এ আমি পাঠাবার সময় ভাবতেই পারিনি। যাক্, 'জিপ'কে আমি বলেছি তোমার খুঁতখুঁতে রুচির কথা, ও তোমাকে আর একখানা ফটো পাঠাবে। আশা করি এ ফটোখানা আগের ফটোখানার চেয়ে ভাল লাগবে তোমার। ও ত' সদাসর্ব্বদাই ফটো তোলাচ্ছে। ফটোওয়ালারা বিনি পয়সায় ওর ফটো তুলে দিতে আসে, ওর অনুমতি পেলে বর্ত্তে যায়।'

দিন কয়েকের মধ্যেই নতুন ফটো এসে পৌঁছে গেল। তার সঙ্গে এল মেয়েটির কাছ থেকে ছোট্ট একখানি চিঠি—চিঠির ভাষা পড়ে হাসি পায়। এবার মেয়েটির পরনে কালো সাটিনের তৈরি সান্ধ্য-পোষাক, ছোট উঁচু জামার হাতা থেকে লম্বা আর কালো লেস সুন্দর দু'টি হাতের উপর দিয়ে এলিয়ে পড়েছে।

মিসেস মোরেল পরিহাসের সুরে বললেন, 'মেয়েটা যেন কী— ও কি সান্ধ্য-পোষাক ছাড়া আর কিছু পরে না নাকি? বাব্বাঃ, এর পরও যদি আমি মুগ্ধ না হয়ে উঠি, তবে সেটা আমারই দোষ!'

পল বললে, 'তোমার, মা, কিছুতেই মন ওঠে না। কেন ওই যে প্রথম ফটোটা, যাতে কাঁধ দুটো খোলা ছিল, সেটা ত' বেশ সুন্দর লাগে আমার কাছে?'

'তাই নাকি?' মা বললেন, 'আমার কিন্তু লাগে না।'

সোমবার সকালে পল ছ'টার সময় উঠল। আজ থেকে কাজে যেতে হবে। ওয়েষ্টকোটের পকেটে সীজন-টিকিটখানা রয়েছে। এই টিকিট কেনা নিয়ে কত মন-কষাকষি হয়ে গেল। টিকিটখানার উপর হলদে ডোরা-টানা—দেখতে ভাল লাগে। মা তার দুপুর-বেলার খাবার তৈরি করে একটা ছোট ঝুড়ির মধ্যে ভরে রেখে-ছিলেন। পৌনে সাতটায় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল—স'সাতটায় ট্রেন ধরবার জন্যে। মিসেস মোরেল সদর দোর অবধি তাকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

চমৎকার সকালটি! বাতাস ফুর-ফুর করে বইছে, তার দোলা লেগে অ্যাশ গাছ থেকে ছোট, সবুজ ফলগুলো আস্তে আস্তে ঝরে পড়ছে বাড়ির আঙিনায়। সারা উপত্যকা জুড়ে একটা কালো কুয়াশার চকমকে পর্দ্দা, পাকা ফসলের শীষগুলো মাঝে মাঝে ঝিকমিক করে উঠছে। মিনটনের কয়লার খনি থেকে কালো ধোঁয়া এসে তাড়াতাড়ি এই কুয়াশার মধ্যে যাচ্ছে মিলিয়ে। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটা আসছে। পল একবার চেয়ে দেখল অ্যালডার্সলির উঁচু বন পেরিয়ে দূরের মাঠগুলোর দিকে। মাঠগুলো যেন সকালবেলার আবছা আলোকে ঝলমল করছে। বাড়ির ও-তল্লাটের উপর এমন গভীর মমতা, এমন দুর্নিবার টান আর কোন দিন সে অনুভব করেনি।

মুখে হাসি এনে পল বললে, 'সুপ্রভাত, মা!' কিন্তু মনে মনে কিছুতেই সে খুশি হয়ে উঠতে পারছিল না।

মা-ও ছেলেকে সুপ্রভাত জানালেন, তাঁর সুরে উৎসাহ আর

…দ মাখানো। সাদা চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে অনেকক্ষণ অবধি খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দেখলেন, ছেলে চলেছে …গুলো পেরিয়ে। তার আঁটসাঁট ছোট দেহটুকুতে প্রাণের উচ্ছলতা, জীবনের প্রাচুর্য্য।

ছেলের অপস্রিয়মান মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মা ভাবলেন, যদি ওর মনের উৎসাহ বজায় থাকে তা'হলে ও পারবে, জীবনে উন্নতি করতে ওর বেগ পেতে হবে না।

আবার উইলিয়মের কথা মনে এল। সে হলে বেড়া ডিঙিয়ে যেত, পল-এর মতন পাশ কাটিয়ে ঘুরে যেত না। উইলিয়ম এখন লণ্ডনে, বেশ ভালই করছে সে। পলও আজ থেকে নটিংহাম-এ কাজ করবে। আজ থেকে তাঁর দুটি ছেলেরই জীবন প্রতিষ্ঠা হ'ল। মনে মনে ভাবলেন লণ্ডন আর নটিংহাম, এই দুটি শিল্পকেন্দ্রে যেন দু'জন প্রতিনিধি পাঠালেন তিনি—তাঁর জন্যেই যেন ওরা কাজ করবে, তিনি যা চাইবেন তাই ওরা এনে দেবে। তাঁর থেকেই ওদের জন্ম, তাঁর জীবনের অংশ ওরা, তাদের কৃতিত্বে তাঁর নিজেরও যেন অংশ রয়েছে। সে দিন সারা সকালটা তিনি শুধু পলের কথা ভেবেই কাটিয়ে দিলেন।

আটটার সময় জর্ডন কোম্পানীর অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে পল …তলায় উঠল। উঠে অসহায়ের মত সামনের বিশাল আলমারীটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে লাগল কেউ তাকে ডেকে নেয় কি না। এখনো কাজ সুরু হয়নি। কাউণ্টারের উপর … ধুলোর পর্দা, তখনো পরিষ্কার করা হয়নি। সবে দু'জন লোক এসেছে—তারা এক কোণে দাঁড়িয়ে কোট খুলে শার্টের হাতা গুটোতে গুটোতে গল্প করছিল। আটটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। বোঝা গেল, সময়মত হন্তদন্ত হয়ে আসার নিয়ম এখানে নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল কেরাণী দুটির গল্প শুনতে লাগল। হঠাৎ একটা কাশির শব্দে পল চেয়ে দেখল, ঘরের অন্য কোণে অফিস-ঘরে একটি বুড়ো, আধ-মরা কেরাণী দাঁড়িয়ে চিঠি খুলছে। লোকটির মাথায় লাল আর সবুজ কাজ-করা কালো ভেলভেটের টুপি। পল অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু …র কাছে কেউ এল না। অল্প বয়সের একটি কেরাণী সেই বুড়ো লোকটির কাছে গিয়ে হেসে হেসে চেঁচিয়ে প্রাতঃপ্রণাম জানাল। বোঝা গেল, বুড়ো কেরাণীটি বদ্ধ কালা। তারপর সে আবার ফিরে এল তার নিজের কাউণ্টারে। এবার পলের দিকে তার … পড়ল। বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে? তুমিই কি সেই … ছেলেটি নাকি?'

পল বলল, 'হ্যাঁ।'

—'হুঁ। কি নাম তোমার?'

—'পল মোরেল।'

—'পল মোরেল? তা বেশ, ওদিক দিয়ে ঘুরে চলে এসো।'

চার পাশে সাজানো কাউণ্টার—ঠিক একটা সমকোণ ক্ষেত্রের মত। কেরাণীটির পেছনে কাউণ্টারগুলোর মাঝ দিয়ে পল গিয়ে ভেতরে ঢুকল। দোতলার এই ঘরখানার ঠিক মাঝখানটিতে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত, তার মধ্যে দিয়ে লিফট্‌ ওঠা-নামা করে, আর উপর থেকে আলো এসে পড়ে নীচে। উপরের দিকেও ঠিক সমান আকারের একটা গর্ত্ত, তার উপর-তলায় রেলিং দিয়ে ঘেরা কতকগুলো কলকব্জা। সব চেয়ে উপরে কাচের ছাদ, তাই দিয়ে নীচের তিনটি তলায় যা কিছু আলো আসে। ফলে সব চেয়ে নীচের তলাটি প্রায় রাত্রির মত অন্ধকার, আর তার উপরে দোতলাতেও বেশ অন্ধকার জমে থাকে। জর্ডন কোম্পানীর কারখানা উপরের তেতলায়, তৈরি মালের গুদাম-ঘর, আর নীচ-তলাটায় অন্য জিনিসপত্র রাখবার জায়গা। বাড়িটা অতি পুরাতন ও অস্বাস্থ্যকর।

কেরাণীটি পলকে সঙ্গে নিয়ে একটা অতি অন্ধকার খুপ্‌রির মধ্যে গিয়ে ঢুকল। বললে, 'এই হ'ল তোমার কাজের জায়গা। তুমি থাকবে প্যাপলওয়ার্থের অধীনে। প্যাপলওয়ার্থ হ'ল গিয়ে তোমার উপরওয়ালা। সে এখনো আসেনি, সাড়ে আটটার আগে সে কোন দিনই আসে না। তুমি যদি কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে চাও, তবে ওই যে মিঃ মেলিঙ, ওঁর কাছ থেকে চিঠিগুলো নিয়ে আসতে পারো।'

মিঃ মেলিঙ অফিস-ঘরের সেই বুড়ো, আধ-মরা কেরাণীটি।

পল বললে, 'সেই ভালো।'

—'এই পেরেকটাতে তোমার টুপি টাঙিয়ে রাখতে পারো। আর এই তোমার খাতাপত্র। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ এক্ষুণি এসে যাবেন।'

ছোকরা কেরাণীটি লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি কাঠের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে দূরে চলে গেল।
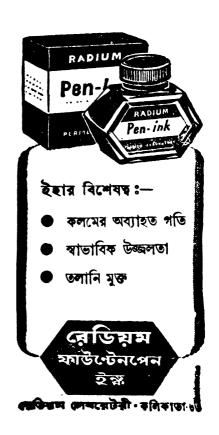
দু'-এক মিনিট পল বসে রইল। তার পর উঠে গিয়ে অফিস-ঘরের দরজায় দাঁড়াল। বুড়ো কেরাণীটি চশমার আড়াল দিয়ে চেয়ে দেখল তার দিকে। বেশ মোলায়েম করে বললে, 'সুপ্রভাত, ও-ঘরের চিঠিপত্র নিতে এসেছ বুঝি, টমাস্ ?'

বুড়ো তাকে 'টমাস' বলে ডাকবে, পলের এটা মনঃপূত হ'ল না। চুপ্ চাপ চিঠিগুলো নিয়ে সে আবার গিয়ে বসলো তার অন্ধকার খুপরিতে। একটা উঁচু টুলে বসে সে চিঠিগুলো পড়তে লাগল। অনেক চিঠির হাতের লেখা পড়া তার সাধ্যের বাইরে, সেগুলো রেখে দিল এক পাশে।

ন'টা বাজতে তখন কুড়ি মিনিট বাকী, মিঃ প্যাপলওয়ার্থ হজমী গুলি চুষতে চুষতে এসে দেখা দিলেন। তখন অফিসের অন্ত সব লোক কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। লোকটিকে দেখতে রোগা আর ফ্যাকাসে। নাকের ডগাটি অতিরিক্ত লাল। চলন-বলনে কেমন একটা চটপটে খটমটে ভাব। পোষাকে রুচির পরিচয় আছে, কিন্তু কেমন অতিরিক্ত আঁটসাঁট। লোকটির বয়স প্রায় ছত্রিশ। বেশ কেতাদুরস্ত, চালাক-চতুর, দেখলে মনে হয় বেশ দিলদরিয়া লোক, কিন্তু ওকে ঠিক শ্রদ্ধা বা সম্মান করা চলে না।

তিনি এসেই বললেন, 'তুমিই আমার নতুন মানুষ ?'

পল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

—'চিঠিপত্রগুলো এনেছ ?'

—'হ্যাঁ।'

—'চিঠির নকল নিয়েছ ?'

—'না।'

—'তবে এসো, পরিষ্কার হয়ে নিয়ে কাজ-কর্ম্ম সুরু করা যাক। কোট বদলেছ ?'

—'না।'

—'একটা পুরনো কোট এখানে এনে রেখে দেবে। হজমী গুলিটি চিবিয়ে খেতে খেতে মিঃ প্যাপলওয়ার্থ বললেন। তার পর বড় আলমারীটার পেছনে অন্ধকার জায়গাটুকুতে চলে গেলেন তিনি। সেখান থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন কোট ছেড়ে সার্টের হাতা গুটিয়ে এসেছেন। পল দেখল তার হাত সরু আর লোমে ভর্ত্তি। আবার এদিকে এসে কোট পরলেন তিনি। লোকটি ভারী রোগা, পল দেখলে তাঁর প্যাণ্টালুনের পেছনটা ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। একটা টুল টেনে এনে তিনি পলের পাশে এসে বসলেন। পলকে বললেন, 'বসো তুমি।'

পল বসলো।

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ একেবারে তার গা ঘেঁষে বসেছেন। চিঠিগুলো হাতে নিয়ে একটা লম্বা খাতা টেনে বার করলেন তিনি। খাতাটা খুলে একটা কলম তুলে নিলেন হাতে, বললেন, 'শোন। এই চিঠিগুলোর নকল এই খাতাটার মধ্যে লিখে নিতে হবে।'

কথাটা বলে তিনি দু'বার নিঃশ্বাস নিলেন, কিছুক্ষণ হজমী গুলিটাকে চুষলেন, তার পর একটা চিঠির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে এবং নিমগ্ন চিত্তে সুন্দর, টানা হাতের লেখায় চিঠির নকলটুকু করে নিলেন। তার পর পলের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'দেখলে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'পারবে ত' ঠিক মত করতে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ, বেশ, একবার দেখি তা'হলে।' টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি। পল কলমটাকে হাতে তুলে নিলে। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চিঠি নকল করার কাজটা পলের বেশ ভালই লাগলো। কিন্তু অতি কষ্টে আস্তে আস্তে সে লিখতে লাগলো—তার সেই বিশ্রী হাতের লেখায়। তিনটে চিঠি শেষ ক'রে সে সবে চতুর্থ চিঠিটা ধরেছে, আর মনে মনে নিজেই নিজের কাজকে তারিফ করছে, এমন সময় মিঃ প্যাপলওয়ার্থ ফিরে এলেন। বললেন, 'এই যে। কেমন হচ্ছে ? শেষ হয়ে গেল সব ?' বলেই পলের কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তিনি দেখতে লাগলেন। এক নজরে দেখেই ঠাট্টা করে বললেন, 'চমৎকার ! কী খাশা তোমার হস্তাক্ষর ! আর মোটে তিনখানা ! আমার ত' কবে শেষ হয়ে যেত। যাকগে, নম্বর দিয়ে রেখো। হ্যাঁ, লিখে যাও, লিখে যাও।....'

পল আস্তে আস্তে লিখে যেতে লাগল। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ এটা-ওটা ক'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ কানের কাছে একটা তীব্র কর্কশ শব্দ শুনে পল চমকে উঠলো। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ এদিকে এলেন, এসে একটা চোঙের মধ্যে থেকে একটা নল বার ক'রে, আশ্চর্য্য রকম কড়া আর মাতব্বরি গলায় বললেন, 'কে ?'

নলটার মুখ থেকে যেটুকু শোনা গেল, তাতে পলের মনে হ'ল কোন মেয়ের গলা। পল এর আগে আর কখনো এই ভাবে নলের মধ্যে দিয়ে কথা বলা দেখেনি। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ আবার নলের মধ্যে মেজাজ দেখিয়ে বললেন, 'তা বেশ। তোমার পুরোন গলতি কাজ কিছু করে ফেল না কেন ?'

আবার মেয়েদের সরু গলা শোনা গেল, সুন্দর গলা, রাগ করে কি যেন বলছে।

—'তোমার বক্-বক শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার আমার সময় নেই।' বলে মিঃ প্যাপলওয়ার্থ নলটিকে রেখে দিলেন চোঙের মধ্যে। পলকে বললেন, 'শোন হে, ছোকরা ! ওই 'পলী' অর্ডারের জন্যে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও না কেন ? আর নয় ত' সরে এসো।' ব'লে নিজেই খাতাটা নিয়ে লিখতে সুরু করলেন। পলের ক্ষোভের সীমা রইল না। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ তাড়াতাড়ি লিখে যেতে লাগলেন, সুন্দর তাঁর হাতের লেখায়। লেখা হয়ে গেলে কয়েকটা লম্বা হলদে কাগজের ফালিতে আজকের ফরমায়েসী সব মালের নাম তিনি লিখে ফেললেন কারখানার মেয়েদের জন্যে। এই 'অর্ডার' অনুসারে তারা কাজ করবে।

কাজ সেরে ফেলতে ফেলতে মিঃ প্যাপলওয়ার্থ পলকে বললেন, 'দেখে নাও, কি ক'রে এ সব করতে হয়।' পল দেখলো হলদে কাগজগুলোর উপর তার উপরওয়ালা পা, কোমর, গোড়ালি ইত্যাদির অদ্ভুত সব ছবি এঁকে যাচ্ছেন আর সংক্ষেপে কাজের নির্দ্দেশ লিখে দিচ্ছেন। তারপর তিনি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'....হলদে কাগজের তাড়া হাতে নিয়ে মিঃ প্যাপলওয়ার্থ ছুটলেন। একটা দরজার মধ্যে দিয়ে ঢুকে কয়েক সিঁড়ি নেমে তাঁরা এসে হাজির হলেন একটা অন্ধকার ঘরে। ঘরটা মাটি থেকে নীচে, সেখানে গ্যাসের বাতি জ্বলছিল। জিনিসপত্র রাখবার, ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে ঘর পার হয়ে তাঁরা লম্বা একটা অন্ধকার

...বের মধ্যে এলেন। সেখান থেকে তাঁরা এলেন ছোট নিভৃত একখানা ঘরে। ঘরটি খুব উঁচু নয়—বড়ো দালানের সঙ্গে আলাদা করে লাগানো। লাল সার্জ্জের ব্লাউস-পরা একটি বেঁটে মত মেয়েছেলে ঐ ঘরে বসেছিল। তার কাল চুল মাথার উপর জড়ানো। দেখেই মনে হয় মেয়েটি খুব মেজাজী।

ঘরে ঢুকে প্যাপলওয়ার্থ বললেন, 'এই নাও।'

'এতক্ষণে এই নাও করতে এলেন?' পলী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এদিকে মেয়েগুলো প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে আছে। ভেবে দেখুন ত' কতটা সময় নষ্ট হ'ল?'

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ বললেন, 'হয়েছে, তুমি গিয়ে কাজ করতে দাও ত,' বাজে ব'কে সময় নষ্ট করো না। এতক্ষণ ত' বসেছিলে, ...ন, সব ঠিকঠাক ক'রে ত' রাখতে পারতে।'

পলীর কাল চোখ দুটো যেন রাগে ঝলসে উঠল। সে বললে, '...র হয়ে গেছে। শনিবারেই সব সেরে রেখেছি আমরা।'

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ ঠাট্টা করে মুখে একটা আওয়াজ করলেন। বললেন, 'এই যে তোমাদের নতুন ছেলেটি। আগের ছেলেটির ত' মাথা খেয়েছিলে। দেখো, এটিকেও যেন নষ্ট করো না।'

—'হ্যাঁ, নষ্ট করো না! আমরা যেন ছেলেদের নষ্ট করবার জন্যেই আছি আর কি। আপনার সঙ্গে থেকে থেকে ওরা বড্ড ভালোমানুষ বনে যায় যখন, তখন একটু-আধটু নষ্ট হওয়া যে দরকার হয় ওদের।

প্যাপলওয়ার্থ রুষ্ট হয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন 'কাজের সময় কথা বলো না।'

পলী তার মাথা খাড়া করে সগৌরবে চলে গেল। বললে, 'কাজের সময় ত' অনেক আগেই হয়েছিল।' তার চেহারা বেশী লম্বা নয়, কিন্তু খুব সোজা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

জানালার নীচে একটা বেঞ্চের উপর দুটো গোলাকার যন্ত্র। ছোট দরজাটার ওপাশে আর একটা লম্বা ঘর, সেখানে আরও ছ'টা ক... কয়েকটি মেয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে গল্প করছিল। সবার গায়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় আর সাদা 'এপ্রন'।

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ ওদের বললেন, 'তোমাদের কি বাজে বকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই?'

একটি সুন্দরী মেয়ে হেসে জবাব দিলে, 'আছে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা।'

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ বললেন, 'হয়েছে, এবার হাত চালিয়ে কাজ করো ত'।' তারপর পলকে বললেন, 'এস হে ছোকরা! এখনকার রাস্তা ত' চিনেই গেলে, এখন কতবারই না তোমাকে আসতে হবে এদিকে।'

...ওয়ালার পিছু পিছু পল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। এবার তাকে ...কটা হিসাব মেলাবার আর মালের ফর্দ্দ তৈরি করবার কাজ দেওয়া হ'ল। ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে তার জঘন্য লেখায় সে আস্তে আস্তে লিখে নিতে লাগল হিসেবগুলো। একটু পরেই মিঃ জর্ডন তাঁর কাচের তৈরি অফিস-ঘর থেকে গটমট করে বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন ঠিক পলের পেছনে। মহা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো পলের। হঠাৎ একটা লাল আর মোটা আঙুল এসে পড়লো যে ফর্দ্দটা সে ভরতি করছিল তারই উপর।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মিঃ জর্ডন পেছন থেকে বিরক্তির সুরে বললেন, 'মিষ্টার জে· এ· বেটস্—আবার এস্কোয়ার কী ক'রে হ'ল?'

পল তার বিশ্রী লেখাগুলোর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো, আবার কি হ'ল!

—'এই বুঝি তোমার বিদ্যে? এর বেশী কিছু শেখায়নি ওরা তোমাকে? কাউকে 'মিষ্টার' লিখলে, তাকে আর 'এস্কোয়ার' লেখা যায় না। দুটো কিছুতেই এক সঙ্গে হতে পারে না।'

পল ভেবেছিল দুটো জিনিস এক সঙ্গে লিখলে বেশী সম্মান দেখানো হবে। এবার খুব শিক্ষা হ'ল। একটু ইতস্ততঃ করল সে। তারপর কলম তুলে নিয়ে নামের আগে 'মিষ্টার'টা কেটে দিল। তখন তার হাত কাঁপছে।

হঠাৎ মিঃ জর্ডন মালের ফর্দ্দটা তার হাত থেকে টেনে নিলেন। বললেন, 'নতুন ক'রে তৈরি করো আর একটা। ভদ্রলোকের কাছে এটা পাঠানো যায় নাকি?' বলে রাগে গজ-গজ করতে করতে নীল ফর্দ্দটা ছিঁড়ে ফেললেন।

পলের কান দুটো রাগে, লজ্জায় ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। সে আবার লিখতে সুরু করলে। মিষ্টার জর্ডন তার পেছনে দাঁড়িয়ে নজর রাখলেন তার লেখার দিকে।

—'ইস্কুলগুলোতে কী শেখায় আজ-কাল? এর চেয়ে ভাল লেখা তোমার দেখাতে হবে। ছেলেপুলেগুলো আজ-কাল কী যে মাথামুণ্ডু শিখছে—শুধু কবিতা আওড়ানো আর বেহালা বাজানো—বাস্।···দেখছেন ওর লেখা?' শেষের প্রশ্নটা হ'ল মিঃ প্যাপলওয়ার্থের উদ্দেশে।

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ বিশেষ কিছু জোর না দিয়ে শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, বড্ড কাঁচা, নয়?'

মিঃ জর্ডন একবার নাসিকাধ্বনি করলেন মাত্র। সেটা শুনতে খুব মন্দ শোনাল না। পল দেখলে, তার মনিব যতই হাউমাউ করুন না কেন, কামড়াবার স্বভাব ওঁর নেই। গালমন্দ করতে অবশ্য কসুর করেন না কাউকে, তাঁর ভাষাও খুব শিষ্টাচারসম্মত নয়, কিন্তু অফিসের লোকদের কাজে ত্রুটি ধরা কিম্বা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে খিটমিট করার মত দৌরাত্ম্য ভদ্রলোকের স্বভাবে নেই। তাঁর চেহারা যে মোটেই মালিক কিম্বা কর্ত্তার মত নয়, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, এবং সচেতন বলেই প্রথম ব্যবহারে কর্ত্তৃত্ব ফুটিয়ে তুলবার জন্যে তিনি এত ব্যগ্র, যাতে সবাই তাঁকে সমীহ করে চলে এবং নিজের অবস্থা বুঝে কাজ করতে পারে।

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নামটা কি যেন, বলো ত'?'

—'পল মোরেল।'

ছোট ছেলেরা নিজের নাম বলতে গিয়ে এত মুস্কিলে পড়ে যায় কেন, এর কি কোন কারণ আছে?

—'ও, পল মোরেল? আচ্ছা, তুমি তা'হলে ঐ সব কাগজ-পত্রের উপর দিয়ে পল-মোরেল-গিরি করতে থাকো—তারপর দেখা যাবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত

তুলি ও রঙ

জর্জ-মাইকেল

গায়ের জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মোদক, কাজ সুরু হয়।

"কিন্তু খদ্দেরদের পথ আট্‌কে যাবে যে।"

"খদ্দের চুলোয় যাক্। আমি এখন বিষয় খুঁজে পেয়েছি।" ওদের অধিকাংশ মোদককে রীতিমত জানে। মার্বেল-বসানো টেবলের ওপর উঠে দাঁড়াতে কেউ বাধা দেয় না। চোখ দিয়ে Canting-এর পরিমাপ করে মোদক।

হারিকট-রুজ বললে, "সিসৃটিনের কথা মনে রেখো।" মোদকের মধ্যে সে দেখছে মাইকেল এঞ্জেলো, এই নোঙরা অপরিচ্ছন্ন ঘরের ও শহরের পরিধি পার হয়ে তার মন চলে স্বর্ণালোকিত রোমের পথে—সেই পথে ওরা দু'জনে হাত-ধরাধরি করে ঘুরেছে, মনে হয়েছে স্বর্গরাজ্য করায়ত্ত।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সারা দেওয়ালটি ভয়ংকর অথচ চমৎকার রেখাঙ্কনে ভরিয়ে তুললো—তার অধিকাংশ আবার রোসালি বেচারী পরদিন মুছে ফেলে। এক ভীষণ রূপক চিত্রের পরিকল্পনা করেছে মোদক,—গোলাপি রঙের নগ্ন রাণীমূর্তি,—নগ্ন পা হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের মত বিস্তারিত, এক স্ফটিক কিউবের গায়ে আঁকা রাজকীয় লাম্পট্যলীলার প্রতিচ্ছবি, আর সেই দিকে চলেছে ভিক্ষু রমণীদের করুণ শোভাযাত্রা। চন্দ্রাতপ উৎসবের সজ্জায় সজ্জিত—একের ভিতর আর অসংখ্য কিউব (চতুষ্কোণ), আর একটি গোলাপ ফুল।

অনেক দিন ধরে এক কাজ নিয়ে থাকার মত চতুরতা মোদকের নেই,—তাই এক মাস ধরে রোসালির রেস্তোরাঁর ছবি আঁকার কাজে সময় না কাটিয়ে মাত্র এক দিনেই সব কাজ করে, বিনিময়ে এক দিনের অন্ন মাত্র পেল; তার পর এক বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে মোদকের মাখামাখি আছে এই সংবাদ রোসালির জানা থাকায় দু'বার ধারও দিল, এবং পরে তিন বেলা আহারের বিনিময়ে একটি করে ক্যান্‌ভাস কিন্‌লো।

কিন্তু দিবা-রাত্র মাতাল হয়ে মোদক খদ্দেরদের সঙ্গে হয় কলহ করত, নয় লাতিন কবিতা আবৃত্তি করত, ফলে রোসালি ৎবরোৎসকীকে অনুরোধ করে মোদককে নিয়ে যেতে বললো। ওর রান্নাঘরের কানাচে এত দিনে মোদকের আঁকা খান তিরিশেক ক্যান্‌ভাস্ জমেছে, এবং সেগুলি যে একদিন শুধু উনুন ধরানোর কাজেই লাগবে এ বিষয়ে রোসালি নিঃসন্দেহ।

সেগুলি অধিকাংশই রোসালির গ্রাহকদের পোর্টরেট, তারাও এই ছবি নিতে চায় না, কারণ, মোদক নিজের খেয়াল মত তাঁদের নাক, মুখ, গলা বিকৃত করেছে, কিংবা সেই তাদের আসল মূর্তি। আর চোখ সে কিছুতেই আঁকবে না। চোখগুলি নাকি অতি নির্বোধ ধরণের, তাই সেই অংশগুলি গ্রীক প্রতিমূর্তির ধরণে শূন্য রেখে শুধু নীল রঙ দেয়।

মাঝে মাঝে হারিকট এবং ৎবরোৎসকীর কাছ থেকে পালিয়ে মোদক দু'-চার দিন কোথায় কাটিয়ে আসে। এদিকে হারিকটের অবস্থা তার পাতলা কালো পোষাকের ভিতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, সে বেচারী থানায় থানায় সন্ধান করে মোদককে পথের ধারে খুঁজে পায়, পায়ে জুতা নেই, গায়ে কোর্তা নেই, এমন কি সার্টও নেই, শুধু ভাঙা মদের বোতল আঁকড়ে পড়ে আছে।

ঘরেও আটকানো যায় না। তাহ'লে জানলা গলিয়ে পালায়। ৎবরোৎসকীর অর্থ-সামর্থ্য কম, তবু সে ওদের পুষতে রাজী; এমন কি ঘরভাড়াটাও দিতে চায়, কিন্তু মোদক বা হারিকটের হাতে এক কপর্দকও দিতে চায় না। হারিকটের হাতে পয়সা দিয়ে মোদক তখনই তা কেড়ে নেবে, তার জন্য কোনো জবরদস্তির প্রয়োজন হবে না।

হারিকট কাজ করতে খুসী মনেই রাজী, কিন্তু ভবিষ্য-র‍্যাফায়েলকে পেটে নিয়ে বন্দিনী হতে বাসনা তার নেই। প্রতিদিন সে লুভ্রিরে প্রার্থনা করতে যায় কিংবা মোদক যাদের শিল্পকর্ম পছন্দ করে সেই সব শিল্পীদের ছবির গ্যালারীতে বেড়াতে যায়। বুলভার্দ আরাগোয় জ্যারাগাস্, রুলেক্‌রেকে গয়েরিন্ কিংবা ভালো মেজাজ থাকলে সঙ্গীতরসিক, ব্যায়ামকুশলী, শিল্পী নউদিনের ষ্টুডিয়োতে যেত।

বুলভার্দ ম'পারনাশের ছোট্ট প্রাচীন দ্রব্যাদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক সময় কাটিয়ে দিত। তার মনে হত লা ত্রিনিটা দ্য সোনটির সামনে ভিয়া কনডোটির বিশাল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে,—এই দোকানের সামনেই মোদক সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকত। লা রোতন্দের মার্কিণ মেয়েরা যেমন বৈক্রান্ত মণিখচিত ইয়ারিং পরে বা স্পেনীয় চিরুণী, প্রাচীন রূপার সুদৃশ্য দ্রব্যাদি পুরাতন আঙটি বা ব্রুচ। এখনকার সব শিল্পীই ১৮৮০র উৎকট অলঙ্কারের মোহে আচ্ছন্ন। তাদের বাল্যজীবনে এই শিল্পাদর্শ মনকে নাড়া দিয়েছে, এখন আবার তারই মাধুরীতে মন ভরেছে। যেন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সতেজ, শুভ্র বস্তু, কোনো শিল্পীয় জটিলতা নেই।

উৎরো সবে জার্মাণী এবং রাশিয়া পরিভ্রমণ করে ফিরেছে। মোদক এবং হারিকট এক সন্ধ্যায় তার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

একুশ

উৎরো কিকেমপাকের মাথায় তথাকথিত 'পুস্‌কিন' কোণাওলা টুপী, চোখে নীল কাচের চশমা, কারণ সে ভাস্কর, রঙের দ্বারা বিকৃত জগৎ সে দেখতে চায় না, ভ্রূর ওপর আর একটা চশমা, দুটি মাত্র চোখ থাকা নির্বুদ্ধিতা, তৃতীয় নয়ন থাকা উচিত।

উৎরোর এক দিকের নাকে লাল রঙ মাখা, অন্যটিতে হলুদ রঙ। কোটটার পিছন দিকটা সামনে করে পরা। কেন পরবে না? নিশ্চয়ই, কেন নয়!

উৎরো এক মহৎ চরিত্র। আরকিপেংকোর মত সে-ও কিয়েতে জন্মেছে। রীতিসঙ্গত পথ ও ভঙ্গিমা ত্যাগ করে সেই প্রথম সরে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি জাড্‌কিন বা লাউরেন্সের যারা বারো বছর ধরে রীতি-বাঁধা গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরোবার চেষ্টা করছেন উৎরো তাদের ছাড়িয়ে গেছেন।

বার্লিন থেকে ফিরে এসেছেন উৎরো,—সেখানে বোর্ড আর প্লাষ্টারের ঘর তৈরী করছিলেন। যাঁরা বাঁধা-ধরা ধরণের বাড়িতে

বাস করতে চান না, নূতন পরিবেশ খুঁজছে, তাদের জন্য পিরামিডাকৃতি, আঁকাবাঁকা, সার্কাসের ধরণে, রেলপথের দৃশ্য-শোভিত ঘর বানিয়ে দিয়েছেন উৎরো। যুদ্ধোত্তর কালের নামকরণ হয়েছে—"অদ্ভুত সংমিশ্রণ", সেই যুগের মানুষের কাছে এই কাজের প্রশংসা হয়েছে।

অতি সাধারণ কর্ম সাধারণ ভাবে সম্পন্ন করা তার পক্ষে অসহনীয়। নিজের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, সাধারণ বস্তু তিনি সাধারণ কর্মে ব্যবহার করতেন না। চেয়ার তিনি অপছন্দ করেন, স্নানের ঘরে তিনি আহার করেন আর প্রস্রাব-পাত্রে তিন দিন স্যুপ রান্না করলেন।

মোদকের দিকে অবহেলার ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে বললেন: "আমি তোমার আঁকা ক্যানভাস্ দেখেছি। ঐ সব জড়বুদ্ধি আহাম্মকদের তোমার ছবি অনেক সজীব। কিন্তু তুমি এখনও নাকের কাছে চোখ আঁকছ আর নাক আঁকছ ঠিক মুখের মাঝখানে। এখন থেকে নাকের গণ্ডী ছাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করো। যদি পায়ের আঙুলের বদলে সেখানে দশটি নাক এঁকে দাও, কি দোষ হবে? আর দশই বা কেন? তোমার সৃজনী-শক্তি নেই? এখনও কি দেবত্বের ঠেক্কে আছো? একটা নিজস্ব অভিব্যক্তিবাদের পরিচয় দাও, আর সবাই একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চল্‌তি ছন্দের আকর্ষণ থেকে হয় মুক্ত হ'বার চেষ্টা করো, নয় ছবি আঁকা ছেড়ে দাও। আমার এই বাঁধা-ধরা ছন্দ দেখে হাসি পায়। যখন আরো নতুন ছন্দ খুঁজে পাবে তখনই তোমার মুক্তি।"

রু ভার্শিনজেট্রয়ের এক ষ্টুডিয়োতে ওরা এসেছে,—উৎরো কিকেমপাক ওদের সঙ্গে এসেছে—হাতে চারটি ছাতা,—এর ভিতরই আছে ওর সব জিনিষপত্র।

পমেরেনিয়ার সৈনিকের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ালো দরজার প্রান্তে এসে—তার পর ঘোষণা করলো:

"চমৎকার! আমাদের সব বন্দোবস্ত করতে হবে।"

প্রথম ছাতার ভেতর থেকে বেরোল একটা ছোট্ট রোগা কালো বিড়াল, তার কানগুলি ছুরি দিয়ে কেটে অলঙ্করণ করা হয়েছে, সেটিকে সযত্নে সেল্‌ফে তুলে রাখা হ'ল। ভয়ে, আতঙ্কে, কুঁকড়ে বসে রইলো বেরালটা।

তার পর কারবেষ্টিত দুটি বনেট নিয়ে উৎরো তাতে দুটি পা প্রবেশ করিয়ে দিল।

তিন জনে মিলে নোণা হেরিং মাছে ভোজন সমাধা করল। উৎরো মাছগুলি দান করলো, রাতের জন্য একটা মাথা গোঁজা জায়গা তাকে দিতে হবে। সেদিন সকালে এসেছে, এখন তার পকেটে একটি আধলাও নেই।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ঘুমুতে থাকে উৎরো।

উৎরো কিকেমপাক বলে: "তোমাদের এই পোড়া আস্তানায় যদি আমায় রাতে থাকতে দাও তা হ'লে লা রোতন্দে লাঞ্চের জন্য তোমাদের নিয়ে যেতে পারি।"

অক্টোবর মাসে এই প্রথম বৃষ্টি নামলো। সূচের মত তীক্ষ্ণ,—তুষার-গলানো শীতল বৃষ্টিকণা গায়ে বিঁধছে।

মোদক হাস্‌লো। উৎরো গম্ভীর গলায় বলে ওঠে: "আমার জন্যে একটা ক্যানভাসে রঙ চড়াও, আর্টিষ্টের জন্য আঁকো নতুন ছবি।"

আর্টিষ্ট কথাটি এমন অবজ্ঞা ভরে উচ্চারণ করলো উৎরোকিকেম-পাক যেমনটি রোমাণ্টিসিষ্টরা করে থাকে 'বুর্জোয়া' কথাটি উচ্চারণ কালে।

হারিকট প্রশ্ন করে, "একেবারে সোজা বিক্রী করবেন, কি বলেন?"

"বিক্রী! কি বিক্রী? তার অর্থ কি?" চেঁচিয়ে উঠলো উৎরো কিকেমপাক।

হারিকট মোদককে ছবি আঁকার সরঞ্জাম এগিয়ে দেয়।

উৎরো কিকেমপাক বলে: "কি কাণ্ড! এখনও ক্যান্‌ভাসে ছবি আঁকতে হয়? এখনও রঙ আর তুলি দিয়ে আঁকবে ছবি?"

মোদক এক অবর্ণনীয় বস্তু আঁকলো, দু'-এক আঁচড়েই মনে হল যেন এনামেলে আগুনের লেলিহান-শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

উৎরো বল্‌লো: "চলে এসো।"

লা রোতন্দের তিন তলায় একটা নতুন ভোজনশালা খোলা হয়েছে। এখানকার আসনের মূল্য শিল্পীদের পক্ষে অনেক বেশী। তবে এই জায়গাটিতে ছবিব্যবসায়ী, ভ্রমণকারীর দল ও এই অঞ্চলের ফরাসীদের ভীড়ে বোঝাই।

প্রবল বর্ষণের মধ্যে ওরা লা রোতন্দে এসে পৌঁছল, উৎরো সোজা ওপরে নিয়ে চল্‌লো ওদের।

জানলার ধারে একটা টেবল নিয়ে ওরা সবাই বস্‌লো, ওদের সার্ট, পাতলা জামা কাপড় ভিজে গায়ে লেপ্‌টে রইল।

উৎরো লাঞ্চের হুকুম দিল, কফি আর ডেসার্ট দিয়েই প্রথম পর্ব সুরু হল, তার পর এই ভাবে পিছিয়ে সর্বশেষে গোড়ার পর্বে পৌঁছল; সেই সঙ্গে তিন রকম মদ্যও পরিবেশিত হ'ল।

বিনা প্রশ্নে বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রব্যাদি পরিবেশিত হ'ল, কারণ

এখানকার কর্মচারীরা শিল্পীদের উদ্ভট খেয়ালে এক রকম অভ্যস্ত। কেউ ব্লাউজ পরে, অথচ পকেট প্রচুর টাকাও থাকে।

হারিকট কজের মনে মনে ভয় ছিল হয়ত উংরো একটা ছল-ছুতো ক'রে সরে পড়বে, কিন্তু ক্ষিধেও পেয়েছে প্রচুর, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে খেয়ে যেতে লাগলো।

আহারপর্বের মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ-কর্তা উংরো কাগজের তোয়ালেগুলি চতুষ্কোণ করে কেটে তাতে একটি করে সংখ্যা লিখল।

মাংস পরিবেশিত হওয়ার পর প্রতিটি টেবলে গিয়ে এই সংখ্যাগুলি বিতরণ করে এল। বলল, "বর্তমান কালের জীবিত শিল্পিগণের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম, খেয়ালের বশে আজ তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি এইখানে নীলাম করবেন। আপনারা টিকিট কিনতে গররাজি হবেন না। এই স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবেন না, কয়েকটা টাকার বিনিময়ে একখানি অমূল্য ছবি পেয়ে যাবেন, সমালোচকদের মতে দু'-এক বছরের মধ্যে—'

ম্যানেজার এগিয়ে এসে বলে ওঠে—"এ সব কি হচ্ছে?"

লোকটিকে কাছে টেনে উংরো কিকেমপাক বললে—"ভায়া হে, বেশী কথা বলো না, যদি নিজের মঙ্গল চাও, আমাদের সাহায্য করো। এর মধ্যেই আমরা চার কোর্স লাঞ্চ আর তিন রকমের মদ্য পান করেছি, পকেটে একটি আধলাও নেই কারো কাছে,—এখন যদি সদভাবে এ সবের দাম পেতে হয় তাহ'লে তুমি নিজেও টিকেট কেনো এবং বিক্রী করো। আমার সঙ্গে এসো, আমার কথা সমর্থন করার ভাণ করো, আর বেশী হাঙ্গাম বাড়িয়ো না ভাই, আমাকে শেষটায় ঠাণ্ডা স্যুপ খেতে হবে।"

একজন বিদেশী পর্যটক শেষ পর্যন্ত মোদক্রর আঁকা ক্যানভ্যাসটি পেলেন—কিন্তু সেটি টেবলেই রেখে গেলেন। ওয়েটার তার পাওনা টিপ হিসাবে সেটা গ্রহণ করলো।

কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ওরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রু ভার্সিনজোটোরীতে গিয়ে পৌছল। উংরো কিকেমপাক মোদক্রকে আর একটা ক্যানভাস্ তৈরী করতে বলেছে, সেটা ডিনারের সময় অন্য হোটেলে নীলাম করা হবে।

মোদক্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। এখন উংরো কিকেমপাক তার নিজস্ব রুচি অনুসারে ষ্টুডিয়ো-ঘরের অলঙ্করণ সুরু করল। ডিস্গুলো মাটিতে নামালো, রঙের পাত্রগুলিতে সুতো বেঁধে সেগুলি ঘরের মটকায় ঝোলালো, এক পাশে কিছু উচ্ছিষ্ট পড়েছিল সেইগুলি ষ্টোভে চড়ালো, তারপর যেন পাগলের খেয়ালে জানলার সমস্ত কাচ-ভাঙার উদ্যোগ করলো। কারণ, জল-ঝড়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা নাকি অতি সাধারণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক, কারণ পৃথিবীর সবাই ত' এই কর্ম সহজেই করতে পারে।

দেয়াল থেকে একটা কাঠের খণ্ড তুলে একে একে সব কাচের শার্সীগুলি ভাঙলো উংরো।

হারিকট কজ এতক্ষণ কিছু বলেনি, নীরবে সব দেখছিল, কারণ উংরো একজন মৌলিক চিন্তানায়ক এবং স্বামীর বন্ধু—এইবার কিন্তু সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

উংরো বাধা পেয়ে ক্ষেপে ওঠে, ওকে অপমানিত করে, এই সব প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি অনুগ্রহ করে যে উংরো করুণা প্রদর্শন করছে এ তাদের মহা সৌভাগ্য! যাই হোক, করুণা পরবশ হয়ে উংরো সেই সব শার্সীহীন জানলায় তার শতছিন্ন ছাতার কাপড় ঝুলিয়ে দিল।

"তোমার দেখছি লজিকে বিশ্বাস! বেশ এই ছাতার কাপড় তোমাকে রোদ, জল, ঝড় থেকে রক্ষা করুক।"

মোদক্র যখন ঘুম ভেঙ্গে উঠলো তখন হারিকট মিথ্যা বললো। কারণ, দু'জনে এখনই ঘুষোঘুষি করবে সেটাও তেমন ভালো কথা নয়। বলল, বজ্রাঘাতে এই সব ক্ষতি হয়ে গেল।

সবাই নীচে নেমে এল। পুরুষ দু'জনের বেশ শীত করছিল, ফলে এক নোংরা শুঁড়িখানায় গিয়ে দুজনেই আবার মদ টেনে এল। টাকা ছিল না কারো কাছে, তাই মোদক্র জামাটা সেখানে খুলে দিয়ে সারা পথ দৌড়ে এসেছে,—বৃষ্টির জল ছুরির ফলার মত গায়ে বিঁধছে।

হারিকট-কজ আগুন জ্বালিয়ে ঘরটা গরম রাখার চেষ্টা করতে থাকে আর উংরো এক কোণ থেকে পরিহাস-বর্ষণ করে চলে।

সারা রাত ধরে মোদক্রর গায়ে ফোয়ারার মত বৃষ্টির জল ঝরে পড়লো।

[ক্রমশঃ।

জীবনানন্দের নামে

কল্যাণকুমার দাশ-গুপ্ত

হয়তো হারালো স্বপ্ন, স্বপ্নচারী কবিতার মন।
তা হ'লে? তা হ'লে কেন ছায়া-আঁকা জারুলের বনে।
এখনো কাকলি তোলে নীলকণ্ঠ শালিখ-খঞ্জন?
তা'হলে এখনো কেন ইন্দ্রনীল নিঃসঙ্গ গগনে
শাদা হাঁস ডানা মেলে? কিংবা চাঁপা-করবীর বুকে
স্বর্গের শিশির-কণা প্রতি রাত্রে স্নেহের উত্তাপে
এখনো ঘুমায় কেন? কেন স্নিগ্ধ স্বপ্ন-ঘন সুখে
নদীর কাজল কোলে হিজলের ছায়াকন্যা কাঁপে?

তুমি তাই কিছুতেই হারাতে পারো না। কখনো না।
যদিও আপাত চোখে তুমি নেই, তবু স্থির জানি
তুমি আছ বৃহত্তরে, বৃহত্তর ব্রতের প্রার্থনা
এখন তোমার সুরু, স্বপ্নের সূর্যের আশীর্বাণী
আনন্দিত প্রাণ হবে, প্রাণকল্যাণের ব্রত নিয়ে
আলো হবে একদিন আনন্দের সমস্ত সমিধ-ই,
সেদিন আসবে তুমি, আপাতত তোমাকে চিনিয়ে
আজো আছে পাখী, ফুল, শিশির তোমার প্রতিনিধি।

মাসিক বসুমতী
কার্ত্তিক, ১৩৬১

চিন্তিতা
—শীতাংশু ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত

ঋতুবৃত্ত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

সকলেই জানেন, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—বৎসরের এই ছ'টি কালের নাম ছ'টি ঋতু এবং এরা কেউই চিরস্থায়ী নয়। কেন? এরা সকলেই গতিশীল। ঋতুশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাজন অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি হ'তে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋ ধাতুর অর্থ গমন করা। তার উত্তরে তুক্ প্রত্যয় করে কর্ত্তৃবাচ্যে ঋতুশব্দ নিষ্পন্ন হ'য়েছে। তবে গতিশীল হ'লেও গ্রহ, নক্ষত্র, মরুৎ, পৃথ্বীর মত সদাগতি নয় এরা কেউই। মধ্যে মধ্যে বাস করার জন্য এদের একটি আশ্রয় আছে। কার্য্যোপলক্ষে পৃথিবীতে এসে অস্থায়ী ভাবে বাস করার জন্য যে আশ্রয়টি এরা অধিকার করে, তার নাম বৎসর। বস্ ধাতুর অর্থ বাস করা। তার উত্তরে সরন্ প্রত্যয় ক'রে অধিকরণে বৎসর শব্দ সিদ্ধ হ'য়েছে, প্রত্যেক ঋতু তাতে বাস ক'রে ব'লেই। প্রতি গতিশীল ঋতুই দ্বাদশ-মাসাত্মক এই বৎসরে কর্মোপলক্ষে এসে দু' মাস ক'রে থেকে চলে যায়।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিগ্রর্ন্থ মতে,—

'ব্রাহ্মং দিব্যং তথা পিত্র্যং প্রাজাপত্যং গুরোস্তথা।
সৌরং চ সাবনং চান্দ্রমার্ক্ষমানানি বৈ নব।'

এই প্রমাণানুসারে নয় প্রকার বর্ষমানের মধ্যে সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র, সাবন ও বার্হস্পত্য মানই পৃথিবীতে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

সূর্য্যকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ কর'তে সূক্ষ্ম গণনায় তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন পনের দণ্ড, একত্রিশ পল একত্রিশ বিপল ও চব্বিশ অনুপল—ইংরাজি হিসাবে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ছ'ঘণ্টা লাগে। এই পরিমিত সময়টিকে ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বঙ্গপ্রদেশে এবং ইয়োরোপের সর্ব্বত্র সৌর বৎসর নামে বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে।

দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের মেষাদি দ্বাদশরাশিভোগ্য কালের নাম সংবৎসর। বৃহস্পতির দ্বাদশরাশি ভোগ্য কালের নাম পরিবৎসর। এই উভয় বৎসরই তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনে পূর্ণ হয়।

এক সূর্য্যোদয় হ'তে অপর সূর্য্যোদয় পর্যন্ত সময়কে সবন বলে। এইরূপ ত্রিশটি সবন দিনভর মাসের দ্বাদশ মাসে অর্থাৎ তিন শ' ষাট দিনে যে বৎসর হয় তার নাম সাবন বা ইদাবৎসর। আরব দেশে এবং সর্বস্থানের মুসলমানগণের মধ্যে এই বৎসর প্রচলিত আছে।

কৃষ্ণ প্রতিপদ হ'তে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাতাশটি নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত ত্রিশটি তিথি ঘটিত দ্বাদশ চান্দ্রমাসে গণিত বৎসরের নাম অনুবৎসর, অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৎসরগুলির মধ্যে অণু বা অল্প। এ-ও পূর্ণ হয় তিন শ' ষাট দিনে। বঙ্গ ভিন্ন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই অনুবৎসর মানিত হয়।

পূর্বে সর্বত্রই প্রধানতঃ চান্দ্র মাসেরই ব্যবহার ছিল। এখন বঙ্গে প্রধান ভাবে সৌরমাস ব্যবহৃত হ'লেও চান্দ্রমাসের নামানুসারেই সৌরমাসের নামকরণ প্রথা চ'লে আসছে। যথা—যে চান্দ্রমাসে সাধারণতঃ বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, তাকে চান্দ্র বৈশাখ বলে। যে চান্দ্রমাসে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অথবা তার অব্যবহিত পূর্ব বা পর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় তাকে চান্দ্র জ্যৈষ্ঠ বলে। এই ভাবে 'নক্ষত্রনাম্না মাসাস্ত জ্ঞেয়াঃ পর্বান্তযোগতঃ।' অর্থাৎ নক্ষত্রের নামানুসারে সকল মাসেরই নাম হ'য়েছে জানতে হবে।

এইরূপ নানা দেশে নানা নামধারী বৎসরই ঋতুগণের বাসাশ্রয়। বৎসরে যখনই যে ঋতু পৃথিবীতে নিজ নির্দিষ্ট কার্য করতে এসে বাস করে, তখনি ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনা তাঁর সৃষ্টিপালিকা ত্রিগুণা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম তাকে সাদরে বরণ ক'রে, প্রজাহিতার্থ তাকে সক্রিয় ক'রে, জনপ্রিয় ক'রে তোলবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকে। ষড়্ ঋতু এবং এরাই নির্গুণ আত্মাপ্রকৃতি বা প্রধানের বিকৃতি সগুণা প্রকৃতির রাষ্ট্রীয় বিধান পরিষদ। এদের সহায় ক'রেই গুণময়ী প্রকৃতি সংসারে সর্বদা বিরামবিহীন হ'য়ে সর্ব প্রকারে ক্রিয়মাণা হ'য়ে আছেন জগৎসৃষ্টির উদ্ভব কাল হ'তে।

পাছে আমরা সে কথা ভুলে যাই, সেই জন্য সর্বকারণ-কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন্দ্রমধুর স্বরে সরস্বতী নামাভিধাবা অনুষ্টুপ্ ছন্দে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পার্থরথে সারথিরূপে আজও গান ক'রছেন,—

'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।'
'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।'

অর্থাৎ প্রকৃতিই সর্বপ্রকারে সর্বক্রিয়মাণা, যে এ দেখে আত্মাকে অর্থাৎ তার অন্তরবাসী আমাকে দর্শন করে সেই সম্যগ্‌দর্শী। প্রকৃতি তার সত্ত্ব রজঃ-তমগুণ দ্বারাই সর্বপ্রকারে সর্বকর্ম ক'রছে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে আমিই সকল কর্মের কর্তা। অর্থটি একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। গৃহপতির গৃহ নির্মাণের কারণ তিনি হ'লেও, গৃহকারক যেমন তাঁর নিযুক্ত মিস্ত্রি-মজুরেরা—তেমনি ভগবানের সৃষ্টি-ক্রিয়ার কর্ত্রী হ'চ্ছেন তাঁর ঈক্ষণচঞ্চলা সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণময়ী প্রকৃতি। তিনি সৃষ্টিক্রিয়ার কারণ কেবল।

গ্রীষ্ম

প্রকৃতির বিধান পরিষদের অন্যতম সহকারী গ্রীষ্ম নামক আমাদের বৎসরের প্রথম ঋতু আমাদের দেশে শুভাগমন করেছেন, অগ্নিসংজ্ঞক মেষ রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান জন্য পুণ্যশ্লোক সৌর বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসেই আজ। সৌর জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত দুটি মাস ইনি আমাদের নব বৎসরে বাস ক'রবেন।

অতি প্রত্যূষেই এঁর পূর্ব সহধর্মী বসন্ত ঋতু এঁকে তাঁর কৃত কর্মগুলি বুঝিয়ে দিয়ে দু'মাসের জন্য নিবসিত বৎসর ত্যাগ ক'রে দশ মাস বিশ্রাম ভোগার্থ আমাদের দেশ থেকে চ'লে যাবার সঙ্গে

সঙ্গেই সে বৎসরও অতীতে প্রস্থিত হ'য়েছে। বসন্ত এবং গ্রীষ্মের বিদায়-মিলনের সন্ধিক্ষণ পুষ্পগন্ধমধুর সমীরণে, কুলায়-পরিহারী নীলাম্বরবিহারী বিহগপুঞ্জের কাকলিস্বনে, প্রভাত-ভানুর অরুণ কিরণে যেরূপ সুলক্ষণ সূচনা ক'রেছে আজ, তাতে আশা হয় এঁর এবারকার কার্য্যকাল ভাল ভাবেই অতীত হবে আমাদের দেশে।

অনেকে শুনি এঁকে পছন্দ করেন না, এঁর গ্রীষ্ম, উষ্ণ, নিদাঘ প্রভৃতি নাম শুনে। মধ্যাহ্নে মার্ত্তণ্ডদেব যখন প্রখর করে চরাচরকে প্রতপ্ত করে, তখন তাঁকে ইনি আকাশের মাঝখান থেকে একটু স'রে যেতে ব'লতে পারেন না ব'লে। কিন্তু, কেন যে ইনি তাঁকে তা বলেন না, তা একটু স্থির হ'য়ে ভাবলেই বুঝতে পারা যায়।

কর্ত্তব্যে অবহেলা করাটা আজ-কাল সর্বত্র প্রায় সকলের স্বভাব-সিদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মাতা-পিতার প্রতি পুত্রের, পুত্রের প্রতি মাতা-পিতার; শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের; প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর; ধনিকের প্রতি শ্রমিকের, শ্রমিকের প্রতি ধনিকের; প্রজাপালের প্রতি প্রজার, প্রজার প্রতি প্রজাপালের;—এইরূপ প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ত্তব্যপালনে উদাস ভাবের আবহাওয়ায় দৃষ্টিদুষ্ট হওয়ায় কারুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শনে অনেকেই হৃষ্ট হ'তে পারছেন না। কিন্তু, আমাদের চিরপরিচিত কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গ্রীষ্ম ঋতুটি জানেন এঁর পূর্ব সহযোগীটির কার্যকালে প্রতি বৎসরেই বিসুখ বিসূচিকা এবং তাঁর নিজ নামধেয় একটি মারাত্মক ব্যাধির বীজাণু আমাদের দেশের জলে, বাতাসে, মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিহিত থাকে। তাই কর্মভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি বিনাশের জন্য এঁরই ইচ্ছাক্রমে এঁর সহকর্মী মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড কিরণে চরাচরকে প্রতপ্ত করেন, আমাদেরই নিশ্চিন্ত নিরাময় জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে। সারা পৃথিবীর রস গ্রহণ করান তাঁকে দিয়ে, রাজকর্তৃক আমাদের নিকট হ'তে আদত্ত রাজকরের মত আমাদেরই হিতার্থে তা সময়ে ব্যয় করবার জন্য।

গ্রীষ্ম-ঋতু ভাল নয়, বড় কষ্টপ্রদ—আবাল্য মুখে মুখে শ্রুত এ কথাগুলির প্রতিধ্বনি না ক'রে এঁর কার্যাবলী নিরীক্ষণ ক'রলে সকলেই বুঝতে পারবেন কিরূপ অদ্ভুতকর্মা ইনি। সূর্যকে দিয়ে যখন সমস্ত নদী-নালা-কূপ-সরোবরের, এমন কি মাটিরও সমস্ত রস শোষণ করান, তখনই প্রস্তরের মত কঠিন নীরস মৃত্তিকাপূর্ণ আরাম, উপবন, বনানীকে বেল, যুথিকা, চামেলী, মল্লিকা, মালতী, মাধবী, চম্পক, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধাদি বিবিধ গন্ধসরস সুকোমল পুষ্পরাজিতে সুরভিমধুর করেন। আম, জাম, লিচু, কাঁটাল প্রভৃতি রসনা-তৃপ্তিকর নানাবিধ উপাদেয় ফল—যা কোন ঋতুর কাছে কোন দিন পাই না আমরা, সেই সকলে ফলোদ্যান বন পরিপূর্ণ করেন, শীতল বায়ু সঞ্চালনে প্রভাতে প্রদোষে সকলের প্রাণারাম ক'রে।

আবহমান কালের ধর্মপ্রাণ আমাদের দেশবাসী অনেকেই বিষ্ণুভক্ত গ্রীষ্ম-ঋতুর পুণ্যচরিত্র অনুশীলন করতে চান না অধুনা, তাঁর অনেক সময় তিনি ধর্মকার্যে অপব্যয় করেন মনে ক'রে। সম্ভবতঃ তাঁরা বিস্মৃত হ'য়ে গেছেন আমাদের দেশের মহাকবি-কাব্য—

"অনিত্যানি শরীরাণি বৈভবং নৈব শাশ্বতম্।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ।"

পার্থিব সুখবিধান চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংগ্রহ যে আমাদের সকলের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় তা জেনেই ইনি পুণ্য বৈশাখে প্রকৃতির কর্মচারিরূপে কার্য করতে আসেন আমাদের দেশে। উগ্রতপা ঋষির মত, দিবসের দুই প্রহরাধিক কাল ঘর্মাক্ত কলেবরে, প্রায়শঃ অপরাহ্নকালে কালবৈশাখী নামক মেঘ-ঝড়-বৃষ্টিতে অধীর ক'রে রাত্রিকে স্নিগ্ধ সুশীতল ক'রে, মায়ের মত সকলকে সুখসুপ্ত ক'রে রাখেন। স্বয়মাগতা স্বাচ্ছন্দ্য শান্তিলাভে মানুষের কর্মশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, ধর্মপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে যায়, সেই জন্যই মানবমিত্র গ্রীষ্মঋতু রুদ্ররূপে আমাদের মাঝে এসে আমাদেরই ভদ্রের জন্য যে কঠোরতার মধ্যে ফেলে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগের শিক্ষা দেন তা আমরা বুঝতে পারি না।

ইনি মানুষকে এত ভালবাসেন যে, এঁর নিবসিত বৎসরের বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ ক'রলে এঁর শুভেচ্ছায় জাতক সুলক্ষণ-যুক্ত, পুণ্যবান, গুণবান, বলবান, দেবদ্বিজভক্ত, কামী, সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের জাতক প্রবাসপ্রিয়, দীর্ঘসূত্রী, ক্ষমাশীল, চঞ্চলচিত্ত, বিদ্যাজনিত খ্যাতিযুক্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

বৈশাখ মাসে প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে চার দণ্ড সময় মধ্যে সকলে স্নান ক'রলে, ব্রহ্মচর্য পালন ক'রলে, সকাল বিকাল সন্ধ্যায় শ্রীবিষ্ণুর পূজা ক'রলে পরম হৃষ্ট হ'য়ে তাদের বহিরন্তরের তাপ প্রশমিত করবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন ইনি। কিন্তু আমরা এঁর অভিপ্রেত কার্য করি না ব'লেই এঁর প্রসাদকে প্রমাদরূপে গ্রহণ ক'রে স্বস্তিহারা হই।

নিরাকারবাদীদের চক্ষেও ইনি কখনো ঘননীলাম্বরে, কখনো জলঝরা জলদমালায়, কখনো সৌরভামোদিত কুসুমিত কাননবেলায়, কখনো বাত্যাবিচালিত পুঞ্জীকৃত ঘূর্ণিধূলায় ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন ক'রে তাঁর দিব্যপ্রভায় তাঁদের হৃদয়-আকাশ প্রদীপ্ত করেন।

যে জগন্নাথকে সারা বৎসরের মধ্যে কোন ঋতু স্নান করাতে পারেন না, তিনি স্বেচ্ছায় স্নান করেন এঁর ভক্তিতে, এঁর কার্যকালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিনে।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জওহরলালজীর চীন-ভ্রমণ—

চীন ভ্রমণ শেষ করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার চীন পরিদর্শন শুধু একটা ঐতিহাসিক ঘটনাই নয়, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা একটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চীন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গত ১৫ই অক্টোবর নয়া দিল্লী হইতে তিনি রওনা হন এবং রেঙ্গুণ, ভিয়েনটিয়ান (লাওস) এবং হ্যানয় হইয়া তিনি ১৮ই অক্টোবর ক্যাণ্টনে পৌছেন। তিনি চীনের রাজধানী পিকিংয়ে পৌছেন ১৯শে অক্টোবর। চীন পরিদর্শন শেষ করিয়া ৩০শে অক্টোবর তিনি স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন এবং সাইগন হইয়া ২রা নবেম্বর (১৯৫৪) ভারতে পৌছেন। গত জুন মাসে (১৯৫৪) চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত আগমনের রিটার্ণ ভিজিট হিসাবে জওহরলালজী চীনে গিয়াছিলেন, একথা বলিলে তাঁহার চীন ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য অকথিত-ই থাকিয়া যায়। বিভিন্ন মিশন চীন ভ্রমণ করিয়া চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। পিকিংয়ে যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আছেন তাঁহার অফিসের মারফৎ ভারত গবর্ণমেণ্ট চীনের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া থাকেন। জওহরলালজী স্বয়ং চীনে যাওয়ায় চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই তিনি চীনে গিয়াছিলেন এ কথাও ঠিক নয়। তিনি চীনে যে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহাতে শুধু নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বা সামাজিকতা রক্ষার ব্যাপার ছিল না।

গত জুন মাসে নয়া দিল্লীতে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু উভয়েই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শান্তিরক্ষার জন্য পাঁচটি নীতি সম্পর্কে একমত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে সরকারী নীতির ব্যাপারে জওহরলালজীর মত মিঃ চৌ-এন-লাই চীনের রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা নহেন। তাঁহার উপরে আরও তিন জন নেতা রহিয়াছেন। মিঃ মাও-সে তুং, মিঃ চু-তে এবং মিঃ লিউ সাও চু এই তিন জনকে লইয়া কম্যুনিষ্ট চীনের বৃহৎ নেতৃত্ব গঠিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই চীনের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতি নির্দ্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। চীনের এই বৃহৎ নেতৃত্বের সহিত ইতিপূর্ব্বে জওহরলালজীর আর আলাপ হয় নাই। তাঁহাদের সহিত সামাজিকতা রক্ষার আলাপ করিবার জন্যই তিনি চীনে যান নাই। নয়া দিল্লী হইতে ভারত ও চীনের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের মতৈক্যের ভিত্তিতে ঘোষিত পঞ্চনীতিকে কার্য্যকরী করিবার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া মতের ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যেই জওহরলালজী চীনে গিয়াছিলেন। এই নীতিপঞ্চকের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির পরস্পর পাশা-পাশি অবস্থান, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং তাহার সার্ব্বভৌমত্বকে মানিয়া চলার কথাই এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির শাসকশ্রেণী এবং গবর্ণমেণ্ট সমূহ কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট দেশের সহাবস্থানকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কম্যুনিষ্ট সম্পর্কে তাঁহাদের এই ভয়ের কারণ কি, তাহা অবশ্যই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক।

এ সম্পর্কে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) লোকসভায় জওহরলালজী যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে স্মরণ করা আবশ্যক। এই বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট দেশগুলি সম্পর্কে ভয় হইতে 'সিয়াটো' চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই ভয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যক চীনার অবস্থান এবং ঐ সকল দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির ভূমিকা এবং এই সকল দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি-গুলির মারফৎ কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহ 'Sub rosa' (গোপনে) কি করিতে পারেন তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। তাঁহার উল্লিখিত উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির শাসকশ্রেণীর মন হইতে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহ সম্পর্কে এই ভয় দূর করিতে না পারিলে সহাবস্থান নীতি কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। এই ভয় দূর করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীনের শাসকবর্গের সহিত আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই জওহরলালজী চীনে গিয়াছিলেন। তাঁহার চীন ভ্রমণ সম্পর্কে যে-সকল বিবরণ সাংবাদিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করার, বিমান-ঘাঁটিতে, ককটেল পার্টিতে নেহরুজীর বক্তৃতার, মিঃ চৌ-এন-লাইয়ের বক্তৃতার কথা বিস্তৃতভাবে প্রদান করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনের বৃহৎ নেতৃত্বের সহিত যে-সকল রাজনৈতিক আলোচনা অর্থাৎ কম্যুনিজম ভীতি দূর করার উপায় সম্পর্কে যে-সকল আলোচনা হইয়াছে সে-গুলি অবশ্যই

গোপনীয় বিষয়। এই সকল আলোচনায় সাংবাদিকদের প্রবেশ অধিকার ছিল না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ সম্পর্কে কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তিও সম্পাদিত হয় নাই। কাজেই যুক্ত ঘোষণারও কোন প্রয়োজন হয় নাই। সাংবাদিক-সম্মেলনে জওহরলালজী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, আলোচনার ফল তাঁহার কাছে সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হইয়াছে।

পিকিং হইতে ২১শে অক্টোবর (১৯৫৪) তারিখে প্রেরিত সংবাদে দেখা যায়, জওহরলালজী ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার পিকিংয়ে পৌছিবার পর চীনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার তিন দফা আলোচনা হইয়াছে। কম্যুনিজম সম্পর্কে এশিয়াবাসীদের ভীতিই ছিল এই তিনটি বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। (ষ্টেটস্‌ম্যান, ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪)। পিকিং হইতে ২৩শে অক্টোবর তারিখে প্রেরিত সংবাদে দেখা যায়, ঐ দিন সন্ধ্যায় মিঃ মাও সে তুংয়ের সহিত দুই ঘণ্টা আলোচনা হওয়ার পর চীনা নেতৃবৃন্দের সহিত জওহরলালজীর রাজনৈতিক আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। (ষ্টেটস্‌ম্যান, ২৩শে অক্টোবর)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পিকিংয়ে পৌছিবার পর চীনা নেতাদের সহিত রাজনৈতিক আলোচনাতেই জওহরলালজীর প্রথম পাঁচ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার চীনের শিল্পাঞ্চল প্রভৃতি দেখিবার পালা আরম্ভ হয়। এই পাঁচ দিনের রাজনৈতিক আলোচনায় কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুই জানা যায় না। সাংবাদিক-সম্মেলনে জওহরলালজী যাহা বলিয়াছেন, তাঁহাকে যে-সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়াছেন তাহা হইতে আলোচনার বিষয় অনুমান করা কঠিন নয়। ২২শে অক্টোবর ভারতীয় সাংবাদিকদিগকে তিনি বলেন যে, সুনির্দ্দিষ্ট সমস্যাগুলি সম্পর্কে কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়া তাঁহার আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল না। যেখানে যাহা কিছু সন্দেহ ও ভয় আছে তাহা হ্রাস করাই ছিল আলোচনার উদ্দেশ্য। চীনা গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার প্রভাব দ্বারা তাঁহাদের নীতিকে নরমপন্থী করিয়া পৃথিবীর কতগুলি দেশের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন কি না, জওহরলালজীকে এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি উল্লিখিত মন্তব্য করেন, কিন্তু প্রশ্নটির একদেশদর্শী স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বলেন যে, পৃথিবীকে চীনের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় করিয়া তুলিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন বলিলেই ঠিক হয়। তাঁহার এই উক্তির বিশেষত্ব এই যে, কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির যেমন ভীতি রহিয়াছে, তেমনি হয়ত উহা অপেক্ষাও গুরুতর ভয় চীনের মনে সৃষ্টি হইয়াছে কোরিয়া ও ফরমোসার ব্যাপারে—সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে তাহার প্রাপ্য আসন না দিয়া তাহার আশঙ্কা ও ভয়কে আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

চীনা নেতৃবৃন্দের সহিত জওহরলালজীর বৈঠকে কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির ভয়ের কারণ ও তাহা দূর করিবার উপায় সম্পর্কেই শুধু আলোচিত হয় নাই, কোরিয়া সমস্যা, ফরমোসা সমস্যা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন দানের সমস্যাও আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার ফলাফল নেহরুজীর কাছে সন্তোষজনক হইলেও চীনা নেতাদের কাছে সন্তোষজনক হইয়াছে কি না তাহা জানা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, আলোচনার ফলাফল কি হইয়াছে তাহাও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজম সম্পর্কে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং নেপালের ভয়ের কারণ কি সে-গুলি অবশ্যই জওহরলালজী চীনা কম্যুনিষ্ট নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং সহ-অবস্থানের জন্য তাঁহাদের নিকট কি প্রত্যাশা করা হইতেছে তাহাও নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন। চীনা কম্যুনিষ্ট নেতারা অবশ্যই বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তব্য শুনিয়াছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কি আশ্বাস তাঁহারা নেহরুজীকে দিয়াছেন তাহা হয়ত ফল দেখিয়াই আমাদের জানিতে হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, চীনা কম্যুনিষ্টরা ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করার কোন প্রমাণ নাই। নেপালের অশান্ত অবস্থার জন্য চীনা কম্যুনিষ্টরা দায়ী, তাহারও কোন প্রমাণ আছে বলিয়া জানা যায় না। ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্ট সমস্যা অপেক্ষা দারুল ইসলাম দলের সমস্যাই গুরুতর। কম্যুনিজমের মত ইসলামও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় দারুল ইসলামের কার্য্যকলাপের জন্য আন্তর্জ্জাতিক ইসলামকে কেহ-ই দায়ী করে না। ব্রহ্মদেশের আকিয়াবকে মুসলিম রাষ্ট্ররূপে পৃথক করিয়া পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ অপেক্ষা উহার গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ, আকিয়াবকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস চলিতেছে। অথচ উহার জন্য কোন দুশ্চিন্তা কাহারও দেখা যায় না। থাইল্যাণ্ড তো চিরবিদ্রোহের দেশ বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু সেখানে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপের কথা শোনা যায় না। থাইল্যাণ্ডে বহু চীনা আছে সত্য, কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই বিত্তশালী ব্যবসায়ী। তাহাদের আনুগত্য চিয়াং কাইশেকের প্রতি হওয়াই স্বাভাবিক। কম্যুনিষ্ট সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও কম্যুনিজম নিরোধের জন্য থাইল্যাণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগ দিয়াছে এবং সিয়াটো চুক্তিরও সে একজন সদস্য। মালয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদিগকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আসলে উহা কম্যুনিষ্ট সমস্যা নয়, উহা স্বাধীনতার সমস্যা। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে চীনা কম্যুনিষ্ট নেতারা কি আশ্বাস দিয়াছেন? তাঁহারা কি এই সকল কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন? যদি না করেন, তাহা হইলে ঐ সকল দেশের সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে বলিলেই তাহারা তাহা যে মানিবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? চীনের কম্যুনিষ্ট নেতারা কি উপায়ে কম্যুনিজম ভীতি দূর করিবার আশ্বাস নেহরুজীকে দিয়াছেন, তাহা জানিতে আগ্রহ হওয়া খুব স্বাভাবিক?

জওহরলালজী যেমন অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির কম্যুনিজম ভীতির কথা চীনের কম্যুনিষ্ট নেতাদের কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, তেমনি কম্যুনিষ্ট চীনের নেতারাও যে চীনের নিরাপত্তার প্রশ্ন নেহরুজীর নিকট উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহারা

নিশ্চয়ই জওহরলালজীকে জানাইয়াছেন যে, যত দিন কোরিয়া এবং ফরমোসা চীন আক্রমণের ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে এবং জাপানে চীনের প্রতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস চলিবে তত দিন চীন নিজকে নিরাপদ মনে করিতে পারিবে না। জওহরলালজী তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া নিশ্চয়ই উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য তিনি কি বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি নিশ্চয়ই সশস্ত্র সংঘর্ষ যাহাতে বাধিয়া না উঠে সে-সম্পর্কে সতর্ক হইয়া চলিবার অনুরোধ করিয়াছেন এবং এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন-কষাকষির ভাব কিছু হ্রাস পাইলে শান্তিপূর্ণ পথেই মীমাংসা সম্ভব হইবে। তাঁহার এই আশ্বাসে কম্যুনিষ্ট চীনের নেতারা কতখানি আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছেন তাহা বলা কঠিন। সাইগনে জওহরলালজীর অভ্যর্থনার সময় 'নেহরুর সহ-অবস্থান নীতি নিপাত যাউক' ধ্বনি এবং ঐ ধ্বনি সম্বলিত পুস্তিকা ও পোষ্টার দ্বারা সম্মানিত অতিথির প্রতি যে অসৌজন্য প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মার্কিণ তাঁবেদার দেশের মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। হুকুম মাফিকই যে এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সহাবস্থান নীতির বিরুদ্ধে যে কিরূপ প্রবল বাধা রহিয়াছে উহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দিল্লীর পালাম বিমানঘাঁটিতে জওহরলালজী পৌঁছিলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সিয়াটো এবং অন্যান্য ব্যাপার সত্ত্বেও আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা এখন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য ফরমোসা যে এখনও বিপজ্জনক হইয়াই রহিয়াছে তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হইতে ভারত ও চীনের মধ্যে তীব্র মতভেদ হওয়ার সংবাদ প্রচার করা হয়। নেহরুজী উহা ভিত্তিহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও নেহরুজীর চীন ভ্রমণ সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ, নেহরুজীর চীন সফরের ফলে ভারত সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার চীন ভ্রমণের উদ্দেশ্য যে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির শাসকবর্গের মন হইতে কম্যুনিজম ভীতি দূর করা, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কম্যুনিজম ভীতি দূর করিতে হইলে কম্যুনিজমকে তাহার বর্ত্তমান চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। সুতরাং জওহরলালজী কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দিয়াছেন বলিয়া চীনে যান নাই। তাঁহার চীন ভ্রমণের উদ্দেশ্য কম্যুনিজমকে তাহার বর্তমান সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা, এই সত্য নাকি মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং জওহরলালজী উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে মূলতঃ কোন তফাৎ নাই বলিয়াই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তফাৎ শুধু পন্থার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা কম্যুনিজমকে তাহার বর্তমান সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চায়, আর জওহরলালজী উহা সম্পন্ন করিতে চান আলাপ-আলোচনার পথে। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের ভাবত্বের প্রতি মনোভাবের এই পরিবর্ত্তনের কথা কূটনৈতিক পথে নিশ্চয়ই জওহরলালজীর নিকটে পৌঁছিয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সহিতই তিনি কথা বলিতে পারিয়াছেন।

পাকিস্তানে সঙ্কটের ঝড়—

পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ কর্তৃক গত ২৪শে অক্টোবর (১৯৫৪) সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং গণপরিষদ বাতিল করাকে একটা 'কুপ ডি আতাত' বলিলে একটুও ভুল বলা হয় না। পাক গণপরিষদ বাতিল করায় মুসলিম লীগের একটা অংশ যেমন খুসী হইয়াছে তেমনি খুসী হইয়াছেন পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যুক্ত ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ। পরস্পর-বিরোধী কারণে যে তাঁহারা খুসী হইয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, পাক গণপরিষদ বাতিল করাকে ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে মারার মত বলিয়াই সাধারণের দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে মারিলেও ষাঁড়ের বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ দেখা যায় না। গত ২রা এপ্রিল (১৯৫৪) পূর্ব্ববঙ্গের যুক্ত ফ্রণ্ট পার্লামেণ্টারী দলের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব হীন গণপরিষদ বাতিল করার দাবী করা হয়। পাক গণপরিষদ যে পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ২রা এপ্রিলের দাবীই প্রায় সাত মাস পরে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল পূরণ করিয়াছেন ভাবিয়া যদি তাঁহারা আনন্দিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ প্রাক্তন যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার দুই জন সদস্য এবং প্রাক্তন আইন-সভার কয়েক জন সদস্য গণপরিষদ বাতিল করার জন্য গবর্ণর জেনারেলকে মুবারকবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের উল্লিখিত দাবীর পর নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। মুসলিম লীগপন্থীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের মুসলিম লীগের একটা অংশও গণপরিষদের বিরোধী। তাঁহাদের বিরোধিতার কারণ পাক গণপরিষদে বাঙ্গালীর প্রাধান্য। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী। কাজেই পাকিস্তানে বাঙ্গালীর আধিপত্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে তাহার জন্য সমগ্র পশ্চিম-পাকিস্তান লইয়া একটি আঞ্চলিক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যাঁহারা এই আঞ্চলিক ইউনিট চাহেন তাঁহাদের মধ্যে মালিক ফিরোজ খাঁ নূন, মমতাজ দৌলতনা, মিঃ খুরো, সর্দ্দার আবদুর রসীদ এবং মিঃ গুরমণির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম-পাকিস্তানের লীগপন্থীদের মধ্যে যাঁহারা গণ-পরিষদের বিরোধী তাঁহারাও গবর্ণর জেনারেলের এই কাজে খুসী হইয়াছেন। কিন্তু যে অবস্থায় এবং যে-ভাবে গণ-পরিষদ বাতিল করা এবং মহম্মদ আলী মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করা হইয়াছে তাহার আশঙ্কা-জনক পরিণাম উপেক্ষার বিষয় নহে।

পাক গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ প্রাক্তন সিভিল সার্ভেণ্ট। তিনি পাক গণ-পরিষদ বাতিল করিবার জন্য এমন একটি সময় বাছিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহার এই কাজকে গণতন্ত্র

বিরোধী বলিয়া অভিহিত করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই কাজকে একক গবর্ণর জেনারেলের 'কুপ ডি' আতাত' বলিলে ভুল বলা হইবে। তাঁহার এই 'কুপ ডি' আতাতে' একটিও গুলী বর্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে তিনি তাঁহার পক্ষে পাইয়াছিলেন। বিলাতের 'এক্সপ্রেস' পত্রিকার করাচীস্থিত সংবাদদাতা নয়া দিল্লীতে আসিয়া এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার যে-সংবাদ প্রেরণ করেন তাহাতে বলা হইয়াছে: "One man coup at gun point : Army supports iron rulers !" পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী যে-বিমানে ২৩শে অক্টোবর (১৯৫৪) রাত্রে করাচীতে পৌছেন ঐ বিমানে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেঃ আয়ুব খান্, লণ্ডনস্থ পাক হাই কমিশনার মিঃ ইস্পাহানী এবং পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণর মেজর জেঃ ইস্কান্দার মির্জ্জা। বিমানঘাঁটি হইতে মিঃ মহম্মদ আলীকে সোজা গবর্ণর জেনারেলের বাসভবনে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। তিনি তখন প্রধান সেনাপতি, মেজর জেঃ ইস্কান্দার মির্জ্জা এবং মিঃ ইস্পাহানীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। এই আলাপেই সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করা হয়। অতঃপর তিনি মিঃ আলীকে আহ্বান করিয়া হয় তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হওয়া না হয় গ্রেফ্‌তার হওয়া, এই বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মিঃ আলী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য লইয়া ফিরিয়াছেন। কাজেই মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের মনে কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না করিয়া কাজ করিতে হইলে মিঃ আলীকেই প্রধান মন্ত্রী রাখা দরকার। মিঃ আলী গবর্ণর জেনারেলের প্রস্তাবেই রাজী হন। গবর্ণর জেনারেলের নির্দ্দেশ অনুসারে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভায় প্রধান সেনাপতি জেঃ আয়ুব খান এবং মেজর জেঃ ইস্কান্দার মির্জ্জা স্থান পাইয়াছেন। কার্য্যতঃ এই ব্যবস্থা মন্ত্রিসভার আবরণে আবৃত সামরিক শাসন ছাড়া আর কিছুই নয়। কালক্রমে যে নগ্ন সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

গবর্ণর জেনারেল তাঁহার পক্ষে সমগ্র সিভিল সার্ভিসকেও পাইয়াছেন। সিভিল সার্ভিসে পাঞ্জাবীদেরই প্রাধান্য। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীরা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। পাকিস্তানে বাঙ্গালীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা বিপদের আশঙ্কা করেন। কাজেই তাঁহারা গবর্ণর জেনারেলের কাজেই সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, গবর্ণর জেনারেলের জরুরী অবস্থা ঘোষণায় আইনের ধারা বা উপধারা কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হওয়ার পূর্ব্বে মিঃ মহম্মদ আলী গণপরিষদে এক বিল উত্থাপন করিয়া গবর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন গবর্ণর জেনারেল তাঁহাদের উপরেই মরণ আঘাত হানিয়াছেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে মিঃ আলী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ২৫শে ডিসেম্বর মধ্যে নূতন শাসনতন্ত্র পাশ হইয়া যাইবে এবং কায়েদ-ই-আজমের জন্মবার্ষিকী দিবসে পাকিস্তানে ইসলামী রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হইবে। গবর্ণর জেনারেলের এক আঘাতে তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতি খতম হইয়া গেল। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে গণপরিষদ সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন। ইসলামী দৃষ্টিতে একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহারও বোধ হয় সার্ব্বভৌম ক্ষমতা নাই। গবর্ণর জেনারেলের পাক গণপরিষদ বাতিল করা কি ইসলামী নীতি অনুযায়ীই হইয়াছে?

পুনর্গঠিত মহম্মদ আলী মন্ত্রিসভায় ডাঃ খান সাহেবকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে মন্ত্রিসভার সামরিক রূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতের কংগ্রেসী শাসকবর্গ এবং সীমান্ত গান্ধী—খান্ আবদুল গফ্‌ফর খানের মধ্যে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। ভারতীয় কংগ্রেসী শাসকবর্গের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাহার ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেবকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, গবর্ণর জেনারেল গণপরিষদ বাতিল করায় তিনি অসুখী হন নাই। পশ্চিম-পাকিস্তান লইয়া একটি আঞ্চলিক ইউনিটের অনুকূলেই তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, একাধিক কারণেই কাশ্মীরের পশ্চিম-পাকিস্তানে যোগ দেওয়া আবশ্যক। অহিংস মনোভাব হইতে প্রদত্ত হইলে মার্কিণ সামরিক সাহায্যেও তাঁহার আপত্তি নাই।

পাক গণপরিষদ বাতিল করিয়া গবর্ণর জেনারেল ঘোষণা করিয়াছেন, যথাসম্ভব শীঘ্র সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। রাজনৈতিক ভাষায় 'যথাসম্ভব শীঘ্র' কথাটা অর্থহীন স্তোকবাক্য মাত্র। কবে

সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, সে-কথা কাহারও অনুমান করার উপায় নাই। ইতিমধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণরী শাসনের অবসান হইয়া ফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছু নাই। মির্জ্জা ইস্কান্দার বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা গবর্ণরী শাসনে বেশ সুখে আছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকে এইরূপ সুখে রাখিবার ব্যবস্থা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। পাকিস্তান যে মধ্যপ্রাচীর ইসলামী রাষ্ট্রগুলির পথেই চলিতে সুরু করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিযোগিতার ফলেই পাকিস্তানে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে পাকিস্তানের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ভিড়িয়া পড়া বৃটেন পছন্দ করে নাই। পাকিস্তানের এই চাঞ্চল্যকর ব্যাপারে বৃটেনের মনোভাবটা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ যেন, সাম্রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে! কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তির আলিঙ্গনে পাকিস্তান আবদ্ধই রহিয়াছে। তবে গবর্ণর জেনারেলের এই 'কুপ' হইতে মার্কিণ শাসকবর্গ বুঝিয়াছেন যে, এক মিঃ মহম্মদ আলীর উপর ভরসা করিলেও শুধু চলিবে না।

মিশরের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা—

গত ২৬শে অক্টোবর (১৯৫৪) রাত্রে মিশরের প্রধান মন্ত্রী কর্ণেল জামাল আবদুল নাসের যখন আলেকজান্দ্রিয়ার এক জনসভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। মামুদ আবদুল লতিফ নামক ২০ বৎসর বয়স্ক এক যুবক তাঁহার প্রতি অটোমেটিক পিস্তল হইতে আট বার গুলী বর্ষণ করে। কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থায়ই রক্ষা পাইয়াছেন। মিশরে সামরিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিবার ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। মধ্যপ্রাচীর ইসলামী রাষ্ট্রগুলির অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, ইহাতে নূতনত্বও নাই। মধ্যপ্রাচীর বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে যে-সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলির উল্লেখ করিবার এখানে স্থানাভাব। ১৯৪৮ সালে মিশরের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী নোকরাশি পাশাকে হত্যা করা হয়, এ কথা এই প্রসঙ্গে মনে না পড়িয়া পারে না। কর্ণেল নাসেরকে হত্যা করিতে চেষ্টার মূলে কি রহস্য রহিয়াছে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আততায়ী মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের একজন সদস্য বলিয়া প্রকাশ। এই প্রতিষ্ঠানটি একটি রাজনৈতিক ধর্ম্মীয় দল। এই বৎসরের প্রথম ভাগে এই দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

ভ্রাতৃসঙ্ঘই মিশরের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের একমাত্র বিরোধী দল ছিল। এই হত্যার চেষ্টার পর দলটিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র নাজিব ছাড়া সামরিক কাউন্সিলের সকল নেতাকেই হত্যা করার জন্য নাকি এই দল এক পরিকল্পনা করিয়াছিল। কর্ণেল নাসেরকে হত্যার চেষ্টা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মিশরে সামরিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কর্ণেল নাসেরের বিপ্লবের ধ্বনি সত্ত্বেও জন-গণের আর্থিক দুর্গতি পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। রাজনৈতিক রেষারেষি, অবিশ্বাস ও আশঙ্কা গোপনে প্রধূমায়িত হইতেছে। আবার কবে মিশরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে-সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সাহায্য সামরিক কর্ত্তৃত্বকেই শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রশ্ন—

দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত ভারতীয় বংশোদ্ভবদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে গত ৪ঠা নবেম্বর (১৯৫৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ-আফ্রিকাকে সরাসরি নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাইবার অনুরোধ করিয়া যে-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন মূল্য আছে এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। এই প্রস্তাবটি গত ২৮শে অক্টোবর (১৯৫৪) বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত হয় এবং বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত উক্ত প্রস্তাবই সাধারণ পরিষদ অনুমোদন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল আর্জ্জেণ্টিনা, ব্রাজিল, কোষ্টারিকা কিউবা, ইকুয়াডর, এল্ সালভার, হাইটি এবং হণ্ডুরাস এই আটটি লাটিন আমেরিকার রাষ্ট্র। এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমিশন সাধারণ পরিষদের বিগত অধিবেশনে প্রথম রিপোর্ট প্রদান করেন। ঐ রিপোর্টে বর্ণবৈষম্য নীতির জন্য ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকার বিপদের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করা হয়। গত ডিসেম্বরে (১৯৫৩) কমিশনকে পুনর্নিয়োগ করা হয়। সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে কমিশন তাঁহাদের সর্ব্বসম্মত দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টেও বর্ণবিভেদ নীতির জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীর বিপদের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত ভারতীয় বংশোদ্ভবদের সমস্যা লইয়া ১৯৪৬ সাল হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু কোন ফল এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ১৯৫০ সালে ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যে এক সম্মেলনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সম্মেলনের পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্য নীতি অধিকতর তীব্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে এই সম্মেলন আর হইতে পারে নাই। ১৯৫২ সালেও সাধারণ পরিষদ কতকটা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অনুরূপ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট বরাবরই সাধারণ পরিষদকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন এবং এই ব্যাপারে বৃটেন ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টকেই সমর্থন করিয়া আসিতেছে।

মার্কিণ-কংগ্রেসের মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন—

গত ৩রা নবেম্বর (১৯৫৪) মার্কিণ-কংগ্রেসের যে মধ্যবর্ত্তী কালীন নির্ব্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ উভয় পরিষদেই ডিমোক্রাটিক দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের বৎসর ১৯৫২ সালে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দল ২১৯টি এবং ডিমোক্রাটিক দল ২১৫টি আসন দখল করিতে পারিয়াছিল। এই নির্ব্বাচনে ডিমোক্রাটিক দল

২৩২টি এবং রিপাবলিকান দল ২০৩টি আসন পাইয়াছে। সিনেটে রিপাবলিকান দলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৬ এবং ডিমোক্রাটিক দলের সংখ্যা ৪৭ হইয়াছে। স্বতন্ত্র সদস্য একজন। উভয় পরিষদেই ডিমোক্রাটিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা আর রহিল না। এবারের মধ্যবর্ত্তী কালীন মার্কিণ-কংগ্রেসের নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সাধারণতঃ-ই মধ্যবর্ত্তী কালীন নির্ব্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারেন না। মধ্যবর্ত্তী কালীন নির্ব্বাচন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের শাসন পরিচালন সম্পর্কে ভোটারদিগকে তাহাদের মনোভাব প্রকাশের সুযোগ দিয়া থাকে। উহা ইহার একটা বিশেষ সার্থকতা।

ডিমোক্রাটিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতিতে কোন পরিবর্ত্তনও সূচিত হইতেছে না। পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে ডিমোক্রাটিক দল ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। এই নির্ব্বাচনে পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্ন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করা হয় নাই। সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যাপারের প্রশ্ন লইয়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পুঁজিপতিদের প্রতি রিপাবলিকান দলের টান ডিমোক্রাটিক দল অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রিপাবলিকান দলের শাসনের সময়ই ১৯২৯ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে পণ্যমূল্য হ্রাস এবং বেকার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা দিয়াছে তাহাতে ১৯২৯ সালের কথা ভোটারদের মনে পড়িবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। ডিমোক্রাটিক দল উহারই সুযোগ লইয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে এই নির্ব্বাচনে প্রভাব বিস্তার না করিলেও পরোক্ষ ভাবে যে করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নির্ব্বাচনের সময় কোরিয়া-যুদ্ধ এবং এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীদিগকে লড়াইয়ে লাগাইয়া দেওয়ার যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে ভোটারদের মনে যে-আশার সঞ্চার হইয়াছিল কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হইয়াছে বটে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের উক্তিতে যে-ভাবে কোরিয়া যুদ্ধ শেষ হইবে বলিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল সে-ভাবে হয় নাই। এশিয়ায় মার্কিণ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য গত দুই বৎসরের মধ্যে আইসেনহাওয়ার এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীদিগকে লড়াইয়ে লাগাইয়া দিতে পারেন নাই। বরং ইন্দোচীনে যে-ভাবে যুদ্ধবিরতি হইয়াছে তাহাতে এই যুদ্ধবিরতি কম্যুনিজমের জয় বলিয়াই আমেরিকাবাসীর কাছে প্রতিভাত হইয়াছে। এইগুলির প্রতিক্রিয়া নির্ব্বাচনের উপর একেবারেই প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ কথা বলা যায় না। ডিমোক্রাটিক দল এবং রিপালিকান দলের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য না থাকায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। ডিমোক্রাটিক দল তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হইয়াছেন। বিগত কংগ্রেসেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার নিজের দলের একটা বৃহৎ অংশের বিরোধিতার সম্মুখে তাঁহাকে ডিমোক্রাটিক দলের ভোটের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে।

আলজিরিয়ায় বিদ্রোহীদের তৎপরতা—

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কঠোর নিপীড়ন সত্বেও আলজিরিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন ধ্বংস হয় নাই। আন্দোলন অনেক দিন স্তিমিত অবস্থায় থাকার পর গত ১লা নবেম্বর আবার আকস্মিক ভাবে আন্দোলনকারীদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ আরম্ভ হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মরক্কো ও টিনিসিয়া সম্পর্কে আলোচনা আসন্ন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাঁহাদের ভারতীয় উপনিবেশও ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আলজিরিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। বিদ্রোহীরা পূর্ব্ব-আলজিরিয়ায় ফরাসী শাসনকেন্দ্র অরেস অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় দুই শত হইতে আড়াই শত টিউনিশিয় সন্ত্রাসবাদী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আলজিরিয়ার বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করে। অরেসের অবস্থা আয়ত্তে আনিতে ফরাসী সরকারকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে।

ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের তৎপরতা হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে পাঁচ ছয় শত বিদ্রোহী রহিয়াছে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে হইলে সময় তো লাগিবেই, অধিকন্তু আরও বেশী পরিমাণ সৈন্যের প্রয়োজন হইবে। বিদ্রোহীদের গত ১লা নবেম্বরের হঠাৎ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, একযোগে বাটনা, বিসক্রা এবং খেনচেলা অবরোধ এবং সমস্ত চলাচল ব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি তৈয়ার করা। তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। টেলিফোনের তার কাটিবার পূর্ব্বেই অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপের কথা জানিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফ্রান্স কার্য্যতঃ মার্কিণ উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। এদিকে তাহার যে-টুকু সাম্রাজ্য আছে তাহা মরণ-কামড় দিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

উপাখ্যান

শংকর চট্টোপাধ্যায়

দেখেছি মন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোর বেলায়
মেতেছি তবু মত্ত যত খেলায়
শামুক যত শিশিরে হাঁটে অবাক ভোরে দেখি
ভেবেছি সব মিথ্যা আর মেকি
গুণেছি তবু দিনের জমা, খরচ কত গেল
কিছু কি আর মনের মত হল ?

প্লাবন এলো মনের সব বন্ধ-খিল খুলে
তুমি কি কিছু মনের মিল পেলে
তবুও ভোরে সাজাও মন প্রেমের চুণিপান্নায়
আমার মন ভরুক যত কান্নায়।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

মোগল-যুগের ভারত

[ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরে বাংলা দেশে দু'বার এসেছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলা দেশের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী বণিকরা তখন বাংলা দেশে ঘাঁটি তৈরী করছেন এবং মোগল শাসনের বনিয়াদ ক্রমেই শিথিল হয়ে ভেঙে পড়ছে। এই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, পরবর্তী পরিবর্তনের ধারা সঠিকভাবে বোঝা কঠিন। বার্নিয়েরের প্রায় তিন শ' বছর আগে ইবন বতুতা বাংলা দেশে এসেছিলেন এবং বাংলা দেশের সুন্দর বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। বার্নিয়েরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত হ'লেও, সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য তিনি পরিবেশন ক'রে গেছেন।

—অনুবাদক]

বাংলা দেশের সম্পদ প্রসঙ্গে

যুগে যুগে বিভিন্ন লেখকরা মিশর দেশকে চিরকাল সোনার দেশ ব'লে গেছেন। ফল ফুল ফসলে ভরা এ রকম দেশ নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এখনও অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাঁরা মনে করেন, মিশরের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এ রকম দেশ কোথাও নেই। কিন্তু বাংলা দেশে দু'বার বেড়াতে এসে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি, তাতে আমার মনে হয় যে মিশর সম্বন্ধে এতদিন যা বলা হয়েছে, সেটা বাংলা দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাংলা দেশে ধান চাল এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে আশপাশের এবং দূরের অনেক দেশে ধান চালান দেওয়া হয় এখান থেকে। গঙ্গানদীর উপর দিয়ে নৌকাভরা ধান চালান যায় পাটনায় এবং সমুদ্রপথে যায় দক্ষিণভারতের বিভিন্ন বন্দরে, মুসলিপত্তমে ও করোম্যাণ্ডাল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে। বিদেশেও ধান চালান যায় বাংলা দেশ থেকে, প্রধানত সিংহলে ও মালদ্বীপে। ধান ছাড়াও বাংলা দেশে চিনি পাওয়া যায় প্রচুর এবং গোলকুণ্ডা কর্ণাট প্রদেশে এই চিনি চালান যায়। বাইরে আরব, মেসোপোতামিয়া, ও পারস্য দেশ পর্যন্ত বাংলার চিনি রপ্তানি করা হয়। বাংলা দেশে নানা রকমের মিষ্টান্নও তৈরী হয়। মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যের জন্য বাংলা দেশ বিখ্যাত। বাংলা দেশের যে-সব অঞ্চলে পর্তুগীজরা বসতি গ'ড়ে তুলেছে, নানা রকমের মিষ্টান্নের প্রচলন সেই সব অঞ্চলেই খুব বেশী দেখা যায়। তার একটা কারণ হ'ল পর্তুগীজরা খুব ভাল মিষ্টান্ন তৈরী করতে পারে, খুব সুদক্ষ ময়রা তারা। শুধু তাই নয়, মিষ্টান্নের ব্যবসা তাদের অন্যতম ব্যবসা। এ ছাড়া লেবু, আম, আনারস প্রভৃতি ফলেরও ব্যবসা করে তারা(১)।

বাংলা দেশের আহার্যের প্রাচুর্য

বাংলা দেশে অবশ্য মিশরের মতন গম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এটা বাংলা দেশের প্রাকৃতিক দৈন্যের পরিচয় নয়। খুব বেশী গম বাংলা দেশে উৎপন্ন না হবার কারণ হ'ল, বাঙালীরা গম তেমন পছন্দ করে না, গম তাদের প্রধান খাদ্যশস্যও নয়। বাঙালীরা

---

(১) পর্তুগীজরা যে ভাল মিষ্টান্ন তৈরী করতে পারত এবং মিষ্টান্নের ব্যবসা করত, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এ ছাড়া, আমাদের দেশের অধিকাংশ ফল-ফুলের কথাও আমরা পর্তুগীজরা আসার আগে জানতাম না। এ সম্বন্ধে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "History of Bengal" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৬৮ পৃষ্ঠা) যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :

"It is seldom realised that many of our common flowers and fruits were totally unknown before the Portuguese came. 'The noxious weed that brings solace' to many and now forms a staple product of Rangpur was brought by the Portuguese, as was the common article of food, Potato—which is relished by princes and peasants alike. Tobacco and Potato came from North America. From Brazil they brought Cashewnut, which goes by the name of Hijli Badam, because it thrives so well in the sandy soil of the Hijli littoral....We are indebted to the Portuguese for Kamranga which finds so much favour with our children. To this list may be added Peyara, which found an appreciative poet in Monmohan Basu. The little Krishnakali that cheers our countryside in its yellow, red and white is another gift of the once dreaded Feringi."

ভাত খায়, তাই ধানের চাষই বেশী হয় বাংলায়। তাহ'লেও গম যে একেবারেই হয় না, তা নয়। যা হয় তাই যথেষ্ট। গম দিয়ে দেশী কারিগররা যে সব বিস্কুট তৈরী করে, ইংরেজ ডাচ ও পর্তুগীজ নাবিক ও ব্যবসায়ীরা জাহাজে তাই তৃপ্তি ক'রে খায়।(২) তিন চার রকমের তরী-তরকারী, ভাত মাখন ইত্যাদিই হ'ল বাঙালীদের প্রধান খাদ্য এবং খুব সামান্য মূল্যেই এই সব খাদ্য পাওয়া যায়। এক টাকায় কুড়িটার বেশী মুর্গী কিনতে পাওয়া যায়। হাঁসও খুব সস্তা। ছাগল ভেড়ার তো অভাব নেই। শুয়োরের দাম এত সস্তা যে পর্তুগীজরা বাংলা দেশে প্রধানত শুয়োরের মাংস খেয়েই বেঁচে থাকে। এই শুয়োরের মাংসই নুণে জারিয়ে ইংরেজ ও ডাচরা জাহাজের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। নানা রকমের মাছ এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বাংলা দেশে যে তা ব'লে শেষ করা যায় না। এক কথায় বলা যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব নেই বাংলা দেশে। প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যের এই প্রাচুর্যের জন্যই পর্তুগীজ ও অন্যান্য খৃষ্টানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বসতিকেন্দ্র থেকে ডাচদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এসে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা দেশে আস্তানা গেড়ে বসেছে। অনেক খৃষ্টান গির্জা আছে বাংলা দেশে এবং খৃষ্টানদের স্বাধীন ধর্মানুষ্ঠানে কোন বাধা নেই কোথাও। জেসুইট ও অগষ্টিন্ ধর্মযাজকদের মুখে শুনেছি যে কেবল হুগলীতেই নাকি আট নয় হাজার খৃষ্টানের বাস এবং বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে মোট খৃষ্টানের সংখ্যা হ'ল হাজার পঁচিশ। বাংলা দেশের প্রতি খৃষ্টানদের এই বিশেষ প্রীতির অন্যতম কারণ হ'ল, বাংলার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাঙালী মেয়েদের কোমল প্রকৃতি। এই জন্য পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টানদের মধ্যে একটা প্রবাদ চালু আছে যে বাংলা দেশে আসার দরজা আছে একশ'টা, কিন্তু যাবার দরজা একটিও নেই। অর্থাৎ বাংলা দেশে আসার আকর্ষণ আছে অনেক এবং একবার এলে আর ছেড়ে যাওয়া যায় না।

বাংলা দেশের প্রতি বিদেশীদের আকর্ষণের কারণ

বাংলা দেশের প্রতি বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ হ'ল, বাংলায় পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য বেশী। বাণিজ্যের উপযোগী এত রকমের সুন্দর সুন্দর পণ্য আর কোথাও উৎপন্ন হয় ব'লে মনে হয় না। চিনির কথাতো আগেই বলেছি এবং চিনির ব্যবসায়ের কথাও উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া, তুলো ও রেশমের এত রকমের জিনিস তৈরী হয় বাংলায় এবং এত প্রচুর পরিমাণে যে এই বাংলা দেশকে হিন্দুস্থানের কাপড়চোপড়ের প্রধান আড়ৎ বললে ভুল হয় না। শুধু হিন্দুস্থানের বা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, প্রতিবেশী সমস্ত দেশের এবং ইয়োরোপেরও কাপড়চোপড়ের আড়ৎ হ'ল বাংলা দেশ। সরু মোটা, সাদা রঙিন্, নানারকমের তাঁতের কাপড় তৈরী হয় বাংলায়। তাঁতের কাপড়ের এ রকম প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আমি কোথাও কখনও দেখিনি। দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। ডাচরা এই সব কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জাপানে ও ইয়োরোপে চালান দেয়। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা এবং দেশীয় বণিকরাও প্রধানত এই কাপড়ের ব্যবসায়ই করে। তাঁতের কাপড়ের মতন সিল্কের কাপড়ও প্রচুর তৈরী হয় এবং তার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। সিল্কের কাপড়ও বাংলা দেশ থেকে সব জায়গায় চালান যায়, লাহোরে কাবুলে এবং ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে। পারস্য সিরিয়া সৈয়দ বা বৈরুটের সিল্কের মতন বাংলা দেশের সিল্ক খুব সূক্ষ্ম না হলেও, এত সুলভ মূল্যে সিল্ক কোথাও পাওয়া যায় না।

দেশের অভিজ্ঞ লোকদের মুখে শুনেছি, বাংলার তন্তুবায়দের প্রতি যদি আর একটু যত্ন নেওয়া হ'ত এবং তাহাদের দিকে নজর দেওয়া হ'ত, তাহ'লে অনেক সস্তায় আরও অনেক ভাল ভাল তাঁতের রেশমের কাপড় তারা তৈরী করতে পারত।(৩) ডাচদের কাশীমবাজারের রেশমকুঠিতে সাত-আটশ' তাঁতি কাজ করে শুনেছি। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদেরও এরকম অনেক কুঠি আছে বাংলা দেশে।

বাংলা দেশে সোরাও (Saltpetre) উৎপন্ন হয় প্রচুর। পাটনা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সোরা আমদানিও করা হয়।(৪) গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা ক'রে সোরা চালান দেওয়ার সুবিধা খুব এবং বিদেশী বণিকরা এই ভাবে সোরা হিন্দুস্থানের নানা অঞ্চলে চালান দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া বাংলা দেশে গালা, মরিচ, অফিম, মোম প্রভৃতি নানারকমের ব্যবসায়ের জিনিস পাওয়া যায়। মাখনও প্রচুর পরিমাণে বাংলা দেশে পাওয়া যায়। কিন্তু এত বড় বড় মাটির পাত্রে ঘি মাখন থাকে যে বাইরে চালান দেওয়া কষ্টকর। তবু সমুদ্রপথে বাইরে যথেষ্ট মাখন চালান দেওয়া হয়।(৫)

---

(২) এক সময় আমাদের বাংলা দেশে যে যথেষ্ট দেশী বেকারী ছিল এবং বাঙালী কারিগররা (প্রধানত মুসলমান) যে নানা রকমের পাঁউরুটি বিস্কুট তৈরী করত, বার্নিয়ের তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে গেছেন। বিস্কুটগুলোকে বার্নিয়ের "Sea-biscuits" বলেছেন, তার কারণ তিনি জাহাজের ফিরিঙ্গী নাবিকদের এই দেশী বিস্কুট খুব বেশী খেতে দেখেছিলেন। তাই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে বিস্কুটগুলো বোধ হয় সমুদ্রযাত্রীদের জন্যই তৈরী হয়।

(৩) বাংলা দেশের রেশমের কাপড়ের সুলভতা এবং বাঙালী তন্তুবায়দের প্রতি দেশের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সম্বন্ধে বার্নিয়েরের অভিমত প্রণিধান যোগ্য হলেও বাংলার রেশমের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয় ব'লে মনে হয়। এ সম্বন্ধে "History of the Cotton Manufacture of Dacca District" এবং যতীন্দ্রমোহন রায়ের "ঢাকার ইতিহাস" গ্রন্থে যে বিবরণ আছে তা পঠিতব্য।

(৪) ইংরেজ, ডাচ ও পর্তুগীজদের একাধিক সোরার কারখানা ছিল ছাপরা জেলায়।

(৫) ঘি মাখনের ব্যবসা ভারতের অন্যতম ব্যবসা। তার মধ্যে বাংলা দেশের ভূমিকাও প্রধান। ভারতের এই ঘি'য়ের ব্যবসার প্রাধান্যের কথা বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের এই হিসেব থেকে :

বাংলার জলবায়ু

বিদেশীদের কাছে বাংলা দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া বা জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না। বিশেষ ক'রে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল খুবই অস্বাস্থ্যকর ছিল। ডাচ ও ইংরেজরা যখন প্রথম বাংলা দেশে আসে তখন তাদের মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশী। আমি একবার বালাসোরের বন্দরে দু'টি বৃটিশ জাহাজকে অবস্থান করতে দেখেছিলাম। প্রায় এক বছর কাল জাহাজ দু'টি বন্দরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ হল্যাণ্ডের সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছিল ব'লে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন উপায় ছিল না। এক বছর পরে যখন জাহাজ দু'টির দেশে ফিরে যাবার সময় হ'ল তখন দেখা গেল যে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার মতন লোকজন বা নাবিক-লস্কর নেই। জাহাজের অধিকাংশ নাবিক-লস্করই অসুখে ভুগে মারা গেছে। কিছুকাল পরে অবশ্য ডাচ ও ইংরেজরা আরও সাবধানে থাকতে আরম্ভ করে, এবং অসুখ-বিসুখের প্রাবল্যও ক'মে যায়। জাহাজের কাপ্তেনরা লক্ষ্য রাখেন যাতে জাহাজের লস্কর নাবিকরা বেশী সুরাপান না করে, এবং এদেশীয় নারীর সংস্পর্শে আসতে না পারে। তাতে কিছুটা রোগব্যাধির উপদ্রব ক'মে যায়। সুরা সম্বন্ধে বলা যায় যে ক্যানারি বা গ্রেভ বা শিরাজ জাতীয় সুরা খারাপ জলবায়ুতে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে মন্দ নয়, পরিমিত পানে ক্ষতি হয় না। সুতরাং একটু হিসেব করে সংযত হয়ে চললেই স্বাস্থ্যহানির কোন কারণ ঘটতে পারে বলে আমার মনে হয় না। মৃত্যুর হারও অনেক পরিমাণে ক'মে যেতে পারে। বুলেপঞ্জ নামে এক জাতীয় দেশী মদ আছে যা গুড় থেকে তৈরী হয় এবং এদেশী লোক লেবু জল ইত্যাদি মিশিয়ে পান করে। আস্বাদ খুব ভাল, পানীয় হিসেবেও মনোরম, কিন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকর স্বাস্থ্যের পক্ষে।(৬)

তিন মাসের হিসেব (এপ্রিল-জুন)

	১৮৮৯	১৮৯০	১৮৯১
পরিমাণ (পাউণ্ড)	৪৬১,৫৮১	৬১১,২৫৪	৫৩০,৫৪৩
মূল্য (টাকা)	১,৬৯,১০৫	২,২৬,৯৭০	২,০০,১১৭

উনবিংশ শতাব্দীতে ঘি'য়ের ব্যবসা বাংলা দেশে যে কি রকম চলত, তা পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির ঘি'য়ের ব্যবসার কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। তাঁর জীবনচরিত থেকে এই ব্যবসায়ের কথা উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :

"১৮৫২ খৃঃ অব্দে তর্কবাচস্পতি মহাশয় বীরভূমে প্রত্যেক বিঘায় দুই আনা কর ধার্য্য করিয়া দশ হাজার বিঘা জঙ্গলভূমি চাষ করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষিকার্য্যোপযোগী পাঁচ শত গরু ক্রয় করেন। যে সকল গাভী ক্রয় করিতেন, তাহাদের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হইত, তাহা কলিকাতায় আনাইয়া বিক্রীত হইত। তৎকালে রেলের পথ হয় নাই, সুতরাং মুটের দ্বারা ঐ ঘৃত কলিকাতায় আনাইতেন। উক্ত কার্য্যের অধ্যক্ষ হারাধন পাল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন।" (শ্রীশম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন : তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত : ১৩০০ সাল : পৃষ্ঠা ২৪)।

[এর পর বার্নিয়ের বাংলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নদ-নদী খাল-বিল ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের কথা বর্ণনা করেছেন।(৭)]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

(৬) 'বুলেপঞ্জ' কথাটি মনে হয়, দু'টি কথার বিচিত্র সংমিশ্রণ এবং বার্নিয়ের তাকে দেশী মদের নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। "Bowl" ও "Punch" এই কথা দু'টির পরিণতি হয়েছে বুলেপঞ্জে। H. Meredith Parker নামে জনৈক সিভিলিয়ান (নিম্নবঙ্গে সুপরিচিত) "Bole-Ponjis containing the tale of the Bucaneer : A Bottle of Red Ink : The Decline and Fall of Ghosts, and other Ingredients, 2 volo"—নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন ১৮৫২ সালে। দেশী মদের গুণগান অবশ্য আরও অনেক বিদেশী পর্যটক ক'রে গেছেন। ওভিংটন (Ovington) তাঁর "A Voyage to Surattiee in the year 1686 (London, 1696)" গ্রন্থে লিখেছেন বাংলা দেশের দেশী মদ সম্বন্ধে : "Bengal is a much stronger spirit than that of Goa, though both are made use of by the Europeans in making punch."

(৭) বার্নিয়েব ও তাভার্নিয়েরের (Tavcrniar) বাংলা দেশের বিবরণের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। খাদ্যশস্য বা পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সম্বন্ধে বার্নিয়ের যা বলেছেন, প্রায় একই ভাষায় দেখা যায় যে তাভার্নিয়েরও তাই বলেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য তাভার্নিয়েরের বর্ণনা কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হ'ল :

বাংলা দেশের চিনি-প্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের : "Further, it (Bengale) also abounds in Sugar, so that it fnrnishes with it the Kingdoms of Golkonda and Karnater."..(Taverniar, Vol II. P 140)

বাংলা দেশের তুলা ও রেশম প্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের : "As to the commodities of great value, and which draw the Commerce of Strangers thither (to Bengale) I know not whether there be a Country in the world that affords more and greater variety : for besides Sugar...there is store of cottons and silks, that it may be said that Bengale is as 't were the general magazinc thereof, not only for Indostan...but also for all the circumjacent Kingdoms and for Europe itself." (Taverniar, Vol II, P 140 f.)

বাংলা দেশের মাখন-প্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের : "Butter is to be had there in so great plently."...(Taveaniar, Vol I1, P, 141)

বিদেশীদের আকর্ষণ প্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের : "In a word, Bengale is a country abounding in all things ; and it is for this very reason that so many Portugueses, Mesticks and other Chirstians are fled thithes :..." (Vol I1, P. 140)

মাধুর্য্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য—
উৎসব আনন্দের দিনগুলিতে প্রত্যেকেরই মন খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে। এমন দিনে আপনিও আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন ক্যালকেমিকোর বিশিষ্ট প্রসাধন সামগ্রী-গুলির সহায়তায়।
মলয় চন্দন সাবান
ব্যবহারে শরীর স্নিগ্ধ ও অন্তর পবিত্র করে। চন্দনের শুচি সুগন্ধে চিত্ত প্রসন্ন হয়।
ক্যাস্টরল
মনোমদ সুরভি-সম্পৃক্ত ক্যাস্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন হয়ে ওঠে ও মধুর সুগন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল থাকে।
লাবণি স্নো
মুখশ্রীর লাবণ্য বৃদ্ধি করে; কোমল কপোলতল শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাত্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহারে মুখশ্রী স্নিগ্ধ থাকে।
রেণুকা ফেস পাউডার
সৌরভসিক্ত রূপচূর্ণ। মুখে ব্যব-হারে আকর্ষণীয় স্নিগ্ধতা আনে। সুগন্ধি রেণুকা ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহারে শরীর ও মন স্নিগ্ধ হয়।
কান্তা
চিত্তাকর্ষক অনুপম সুরভি নির্যাস। রুমালে ও বেশবাসে ব্যবহার করলে নরনারীর চিত্ত মধুর সুগন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে।
CASTOROL
CASTOR OIL
La Sonny

কলরব, চিৎকার তারস্বরে আর্তনাদ! কি হল, কি হয়েছে? তবে কি জাহাজে বোম্বেটে পড়েছে? বায়স্কোপে যে রকম দেখি, বোম্বেটেরা দু'হাতে দুই পিস্তল, দু'পাটি দাঁতে ছোরা কামড়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ আক্রমণ করে? তার পর হঠাৎ কানের পর্দা ফাটিয়ে এক ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ—বারুদ-গোদামে আগুন লেগে সেটা ফেটে গিয়েছে। তারই আগুন জাহাজের দড়া-দড়ি পাল-মাস্তুলে লেগে গিয়ে সমস্ত জাহাজ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নাঃ! স্বপ্ন। বাঁচলুম। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। চোখ মেলতে দেখি, কেবিনের সব কটা আলো জ্বলছে আর সামনে দাঁড়িয়ে পল আর পার্সি। পল দাঁড়িয়ে আছে সত্যি কিন্তু পার্সিটা জুলু না হটেনটট, কি যেন এক বিকট আফ্রিকান নৃত্য জুড়েছে—আফ্রিকান-ই হবে, কারণ ঐ মহাদেশেরই গা ঘেঁষে তো এখন আমরা যাচ্ছি।

তা আফ্রিকার হটেনটটিয় মার্তণ্ড-তাণ্ডব নৃত্যই হোক আর ইয়োরোপীয় মাৎস্থর্কা কিম্বা ল্যামবেথ-উয়োক্-ই হোক—আমি অবশ্য এ দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখতে পাইনে, সঙ্গীতে তো আদৌ না—পার্সি এ সময়ে আমার কেবিনে এসে বিন্-নোটিশে নাচ জুড়বে কেন?

নাঃ, নাচ নয়। বেচারী উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করছে আর যে কাতর রোদন জানাচ্ছে সেটার 'সামারি' করলে দাঁড়ায়;—

'হায়, হায়, সব কিছু সাড়ে-সর্বনাশ হয়ে গেল, স্যর! আপনি এখনো অকাতরে নাক ডাকাচ্ছেন। আমার জীবন বিফল হল, পলের জীবনও বৃথায় গেল। জাহাজ রাতারাতি ডুবসাঁতার কেটে জিবুটি বন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। সবাই জামা-কাপড় পরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে পারে নামবার জন্য তৈরী, আর আপনি,—হায়, হায়!'

(এ বইখানার যদি ফিল্‌ম্ হয় তবে এ স্থলে 'অশ্রুবর্ষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস')

আমি চোখ বন্ধ করলুম দেখে পার্সি এবারে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সৈয়দ মুজতবা আলী

আমি শান্ত কণ্ঠে শুধালুম, 'জাহাজ যদি জিবুটি পৌঁছে গিয়ে থাকে তবে এখনো এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পারছি কেন?'

পার্সি অসহিষ্ণুতা চাপবার চেষ্টা করে বললে, 'এঞ্জিন বন্ধ করা, না-করা তো এক মিনিটের ব্যাপার।'

আমি বললুম, 'নৌ-ভ্রমণে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বলে, এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পরও জাহাজ থেকে নামতে নামতে ঘণ্টা দু'য়েক কেটে যায়।'

পল এই প্রথম মুখ খুললে; বললে, 'বন্দর যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'দার্জিলিঙ থেকে গৌরীশঙ্করের চুড়োটা স্পষ্ট দেখা যায়, তাই বলে কি সেখানে দশ মিনিটে পৌঁছন যায়?'

তার পর বললুম, 'কিন্তু এ সব কুতর্ক। আমি হাতে-নাতে আমার বক্তব্য প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

তার পর অতি ধীরে-সুস্থে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলুম। পল আমার কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছে কিন্তু পার্সি তখনো ব্যস্ত-সমস্ত। আমাকে তাড়া লাগাতে গিয়ে দাড়ি কামানোর বুরুশটা এগিয়ে দিতে গিয়ে তুলে ধরে দাঁতের বুরুশ—ঐটে দিয়ে গাল ঘষলে মুখপোড়া হনুমান হতে কতক্ষণ—টাই ভেবে সামনে ধরে ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধটা। তার পর চা-রুটি, মাখন-আণ্ডাতে অপূর্ব এক ঘ্যাঁট বানিয়ে আমার সামনে ধরে চতুর্দিকে ঘোরপাক খেতে লাগল—বাড়ীতে জিনিসপত্র বাঁধাই-ছাঁদাই করার সময় পাপিটা যে রকম এর পা' ওর পা'র ভিতর দিয়ে ঘোরপাক খায় এবং বাড়িশুদ্ধ লোককে চটিয়ে তোলে।

শেষটায় গতিক দেখে আমিও একটু তাড়াহুড়ো করে সদলবলে ডেকে এলুম।

উপরে তখন আর সবাই অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে তাস পাশা, গালগল্পে ফিরে গিয়েছে।

পল চোখে দুরবীণ লাগিয়ে বললে, 'কই, স্যর, বন্দর কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ধূ-ধূ করছে মরুভূমি আর টিনের বাক্সের মত কয়েক সার একঘেয়ে বাড়ি।'

আমি বললুম, 'এর-ই নাম জিবুটি বন্দর।'

'ঐ মরুভূমিতে দেখবার মত আছে কি?'

'কিচ্ছু না। তবে কি জানো, ভিন্‌দেশ পরদেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অত-শত বাছবিচার করতে নেই—বিশেষতঃ এই অল্প বয়সে। চিড়িয়াখানায় যখন ঢুকেছ, তখন বাঘ-সিংগি দেখার সঙ্গে সঙ্গে খাটাশটাও দেখা নেওয়াই ভালো। আর কে জানে, কোন্ মোড় ঘুরতে কোন্ এক অপ্রত্যাশিত জিনিস বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না? মোকামে পৌঁছনর পর না হয় জমা-খরচ করা যাবে, কোনটা ভালো লাগলো আর কোনটা লাগল না।'

জাহাজ থেকে তড়-তড় করে সিঁড়ি ভেঙে ডাঙায় নামা যায় পৃথিবীর ভালো ভালো বন্দরেই। এখানে তাই পারে যেতে হল মোটর লঞ্চে করে। জিবুটির চেয়েও নিকৃষ্ট বন্দর

খেলার ছলে —রমেশচন্দ্র দত্ত

কুতুব মিনার —তরুণ চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়িয়া —জে, আর, সেনগুপ্ত

ছায়ালোক —বজলে হোসেন

আকাশ-জল মাটি —সুবলচন্দ্র দে

শীতের সকাল —সৌরেন মুনসী

শিবম —নিখিলকুমার চট্টোপাধ্যা

পৃথিবীতে হয়ত আছে কিন্তু আমার দেখার মধ্যে ঐটেই সব চেয়ে অপ্রিয়দর্শন ও বৈচিত্র্যহীন বন্দর। মরুভূমির প্রত্যন্ত-ভূমিতে বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে একমাত্র রাজ্যবিস্তারের লোভে। এবং এ মরুভূমিকে কোনো প্রকারের শ্যামলিমা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জেনেই কেউ কোনো দিন কণামাত্র চেষ্টা করেনি একে একটুখানি আরামদায়ক করার।

ডাঙা থেকে সোজা চলে গিয়েছে একটা ধুলায় ভর্তি রাস্তা বন্দরের চৌক বা ঠিক মাঝখানে। তার পর সেখান থেকে এদিকে ওদিকে দু-চারটি রাস্তা গিয়েছে বটে কিন্তু বড় রাস্তাটা দেখার পর ও-সব গলিতে ঢোকার প্রবৃত্তি সুস্থলোকের হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তার দুদিকে সাদা চুণকাম করা বাড়িগুলো এমনি মুখ গুমসো করে দাঁড়িয়ে আছে যে,বাড়ির বাসিন্দারাও বোধ করি এ-সব বাড়িতে ঢোকার সময় দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুকনো ঢোক গেলে কিম্বা বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকে নেয়। ছোট গলির মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি, মাটির তৈরী দেয়াল-ছাদের ছোট ছোট ঘর, না, ঘর নয়, গহ্বর কিম্বা গুহাও বলতে পারো। বৃষ্টি এদেশে এতই ছিটেফোঁটা হয় যে, ছাত গলে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর থাকলেই বা কি, এদেশে তো আর ঘাস-পাতা গজায় না যে তাই দিয়ে চাল বানাবে?

এর-ই ভিতরে মানুষ থাকে, মা ছেলেকে ভালোবাসে, ভাই ভাইকে স্নেহ করে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই হয়!

কিন্তু আমি এত আশ্চর্য হচ্ছি কেন? আমি কি কখনো গলির খিঞ্জি বস্তির ভিতর ঢুকিনি—কলকাতায়? সেখানে দেখিনি কী দৈন্য, কী দুর্দশা! তবে আজ এখানে আশ্চর্য হচ্ছি কেন? বোধ হয় বিদেশে এ জিনিস প্রত্যাশা করিনি বলে কিম্বা দেশের দৈন্য দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বলে বিদেশে তার অন্য রূপ দেখে চমকে উঠলুম।

এই খানেই মহামানব এবং হীনপ্রাণে পার্থক্য! মহাপুরুষরা দৈন্য দেখে কখনো অভ্যস্ত হন না। কখনো বলেন না, এ তো সর্বত্রই হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। দৈন্য তাঁদের সব সময়ই গভীর পীড়া দেয়—যদিও আমরা অনেক সময় তাঁদের চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারিনে। তার পর একদিন তাঁরা সুযোগ পান, যে সুযোগের প্রতীক্ষায় তাঁরা বছরের পর বছর প্রহর গুণছিলেন, কিম্বা যে সুযোগ তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আপন হাতে গড়ে তুলছিলেন, এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী,
গিরিদরী-তলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে
সেই মত বাহিরিলে; বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা॥"

তাই যখন হঠাৎ একদিন এক অরবিন্দ ঘোষ, এক চিত্তরঞ্জন দাশ এসে আমাদের মাঝখানে দেখা দেন তখন আমাদের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আজন্ম, আশৈশব, অনটনমুক্ত বিলাসে জীবন যাপন করে হঠাৎ একদিন তাঁরা সব কিছু বিসর্জন করে গিয়ে দাঁড়ান গরীব দুঃখী, আতুর অভাজনের মাঝখানে। যে দৈন্য দেখে ভিতরে ভিতরে গভীর বেদনা পেতেন, সে দৈন্য ঘুচাতে গিয়ে তাঁরা তখন পান গভীরতর বেদনা। কিন্তু সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই হবে।

"—তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো। জয় তব জয়।"

কিন্তু এত সব কথা তোমাদের শোনাচ্ছি কেন? তার কারণ গত রাত্রে জাহাজে বসে বসে আফ্রিকা মহাদেশ এবং বিশেষ করে যে সোমালি দেশের ভিতর জিবুটি বন্দর অবস্থিত তারই কথা ভাবছিলুম বলে। এবং এই সোমালিদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচাবার জন্য যে একটি লোক বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল তার কথা বার বার মনে পড়ছিল বলে।

ইয়োরোপীয় বর্বরতার চুড়ান্ত বিকাশ দেখতে হলে পড়তে হয় আফ্রিকার ইতিহাস—ইংরেজ-শাসিত ভারতের ইতিহাস তার তুলনায় নগণ্য।

পোর্তুগীজ, ইংরেজ, জর্মণ, ফরাসী বেলজিয়ান—কত বলবো—ইয়োরোপীয় বহু জাত, কম-জাত, বজ্জাৎ এই আফ্রিকায় একদিন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের বর্বর পাশবিক ক্ষুধা নিয়ে, শকুনের পাল যে রকম মরা গরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুল বললুম; শকুনিদের উপর অবিচার করা হল, কারণ তারা তো জ্যান্ত পশুর উপর কখনো ঝাঁপ দেয় না। এই ইয়োরোপীয়রা এসে হেঁকে ধরলো সোমালি, নীগ্র, বান্টু, হটেনটটদের। তাদের হাতে-পায়ে বেঁধে মুর্গী লাদাই ঝাঁকার মত জাহাজ-ভর্তি করে নিয়ে গেল আমেরিকায়। কত লক্ষ নীগ্রো দাস যে তখন অসহ্য যন্ত্রণায় মারা গেল তার নিদারুণ করুণ-বর্ণনা পাবে 'আন্‌কল টমস্ ক্যাবিন' পুস্তকে—বইখানা পড়ে দেখো। ইংরিজি ভালো বুঝতে না পারলে বাঙলা অনুবাদ 'টম্ কাকার কুটির' পড়লেই হবে—আমি ছেলেবেলায় বাঙলাতেই পড়েছিলুম।

আর আফ্রিকার ভিতরে যা করলে তার ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ কঙ্গো সম্বন্ধে একখানা বই লিখে এমনই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন যে তাঁর মত দুঃসাহসী না হলে ঐ সম্বন্ধে কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায় না। আর লিখলেই বা কি, প্রকাশক পাবে না। প্রকাশক পেলেই বা কি? কাগজে কাগজে বেরুবে তার বিরুদ্ধে রূঢ় মন্তব্য, অশ্লীল সমালোচনা। তখন

আর কোনো পুস্তক-বিক্রেতা তোমার বই আর দোকানে রাখবে না। তবু জেনে রাখা ভালো, এমন মহাজনও আছেন যাঁরা এ সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বই লেখেন, ছাপান, প্রকাশ করেন এবং লোকে সে সব পড়ে বলে দেশে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্ট হয়।

সোমালি দেশের উপর রাজত্ব করতে এসেছিল বিস্তর জাত: তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল ফরাসী, ইংরেজ, ও ইতালীয়।

বৃটিশ সোমালি দেশে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুহম্মদ বিন আব্দুল্লা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। নিরস্ত্র কিম্বা ভাঙাচোরা বন্দুক আর তীর-ধনুকে সজ্জিত সোমালিরা তাঁর চতুর্দিকে এসে জড়ো হল অসীম সাহস নিয়ে ইয়োরোপীয় কামান মেশিন গানের বিপক্ষে। এদিকে ইতালীয় এবং বৃটিশে সোমালি দেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মারামারি, ওদিকে কিন্তু দুই দলই এক হয়ে গেলেন মোল্লা মুহম্মদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য।

দুই পক্ষেরই বিস্তর হার-জিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোল্লাই ইয়োরোপীয়দের খেদিয়ে খেদিয়ে লাল-দরিয়ার পার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। তখন ইংরেজ সোমালিদের উপর রাজত্ব করার আশা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রপারে দুর্গ বানিয়ে তার-ই ভিতর বসে রইল লাল-দরিয়ার বন্দরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

সারা সোমালি দেশে জয়ধ্বনি জেগে উঠল—সোমালি স্বাধীন। তখন ইংরেজ তাঁকে নাম দিল, 'ম্যাড্ মোল্লা' অর্থাৎ 'পাগলা মোল্লা,' আমাদের গাঁধীকে যে রকম একদিন নাম দিয়েছিল, 'নেকেড্ ফকীর' অর্থাৎ 'উলঙ্গ ফকীর'। হেরে যাওয়ার পর মুখ ভ্যাংচানো ছাড়া করবার কি থাকে, বলো?

কিন্তু হায়, খুব বেশী বৎসর গেল না। ১৯১৪—১৮র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপীয়রা অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা মেরে মানুষকে কাবু করার কৌশল শিখে গিয়েছে। তাই দিয়ে যখন আবার তারা হানা দিলে তখন মোল্লাকে সে সময়কার মত পরাজয় স্বীকার করে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল ভিন্ দেশে।

মোল্লা সেই অনাদৃত অবহেলায় আবার সাধনা করতে লাগলেন স্বাধীনতা জয়ের নূতন সন্ধানে। কিন্তু হায়, দীর্ঘ বাইশ বৎসরের কঠিন যুদ্ধ, নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভেঙে গিয়েছে। শেষ পরাজয়ের এক বৎসর পর, যে-ভগবানের নাম স্মরণ করে বাইশ বৎসর পূর্বে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমেছিলেন তাঁরই নাম স্মরণ করে সেই লোকে চলে গেলেন যেখানে খুব সম্ভব সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব নেই।

এই যে জিবুটি বন্দরে বসে বসে চোখের সামনে ডাগড়া লম্বা জোয়ান সোমালিদের দেখছি, তারাও নাকি তখন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল।

বীরের কাহিনী থেকে আমরা উৎসাহ সঞ্চয় করবো, তা হলে আমি এ দুঃখের কাহিনী তুললুম কেন? তার কারণ বুঝিয়ে বলার পূর্বে একটি কথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই।

'ফরাসীরা বড় খারাপ,' 'ইংরেজ চোরের জাত' এ রকম কথার কোনো অর্থ হয় না। ভারতবর্ষে বিস্তর পকেট-মার আছে, তাই বলে কেউ যদি গাল দেয় 'ভারতবাসীরা পকেট-মার' তা হলে অধর্মের কথা হয়। 'ইংরেজ জাত অত্যাচারী' এ-কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

তাই যখন অধর্ম অরাজকতা দেখি, তখন সংযম বর্জন করে তদ্দণ্ডেই অস্ত্রধারণ করা অনুচিত। বহু জাত বহু বার করে দেখেছে, কোনো ফল হয়নি; হিংসা আর রক্তপাত শুধু বেড়েই গিয়েছে।

তাই মহাত্মাজী অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। অহিংসা দিয়ে হিংসা জয় করতে হবে। এর চেয়ে মহৎ শিক্ষা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষ যদি তাই দিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সংগ্রাম, লুণ্ঠন-শোষণ রুদ্ধ করতে পারে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সে সর্বসভ্য জাতি বলে গণ্য হবে।

এই শেষ কথা—সব চেয়ে বড় কথা;—

আমাদের যেন রাজ্যলোভ না হয়। এদের অন্যায় আচরণ দেখে আমরা যেন সতর্ক হই। আমরা দু'শ বৎসর ধরে পরাধীন ছিলুম। পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি।

[ক্রমশঃ।

যাদুবল

(ইংলণ্ডের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

শহর থেকে অনেকখানি দূরে মস্ত বন—গাছে গাছে ঢাকা। তার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে আঁকা-বাঁকা সরু পথ। সে পথ দিয়ে লোক-জন বড় যায়-আসে না। একদিন দুপুরবেলা সেই নির্জন পথ দিয়ে আসতে দেখা গেল সৈনিকের পোষাক-পরা একটি লোককে। হাতে তরোয়াল, পিঠে ঝোলা, মাথায় টুপি আর গায়ে সৈনিকের পোষাক। যুদ্ধ শেষে সে দেশে ফিরে যাচ্ছে—সঙ্গে লোকজন কেউ নেই।

বনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সে দেখতে পেলো রাস্তার এক ধারে একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এক থুবথুরে বুড়ী। তাকে ইসারায় ডাকতে সে সরে এলো রাস্তার পাশে। বুড়ীটা দেখতে কী ভয়ানক! মাথার চুলগুলো শণের মত সাদা, গাল দুটো তুবড়ে মুখের ভেতর ঢুকে গিয়েছে—চোখ দুটোতে ঘোলাটে দৃষ্টি—হাতের আঙুলগুলো যেন খ্যাংরাকাটি—আর গলার আওয়াজ কী খনখনে!

বুড়ী বললে, 'বাছা, আমার একটা কাজ করে দেবে?'

সৈনিক তার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে

নিলো। মানুষের এমন বিদ্‌ঘুটে চেহারা হয়? অন্য দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'কী কাজ বলো?'

বুড়ী বললে—'ওই যে দূরে পাকুড় গাছটা দেখতে পাচ্ছো। তাতে চড়লেই দেখতে পাবে মাথার দিকে ওর গায়ে মস্ত একটা গর্ত্ত। সেই গর্ত্ত ধরে সোজা নীচে নেমে যাবে। ওর তলায় আমি একটা ছোট বাক্স ফেলে এসেছি। সেই বাক্সটা যদি আমায় এনে দাও তবে আমার খুব উপকার করা হবে।'

তারপর গলার স্বর যতদূর সম্ভব নীচু আর মোলায়েম করে বুড়ী বললে, 'মনে করো না তোমায় আমি অমনি অমনি উপকার করতে বলছি। যেখানটায় আমি যেতে বলছি সেখানে অজস্র ধনরত্ন রয়েছে। তুমি যদি রাজী হও ত' কী করে অনেক ধন-দৌলতের মালিক হতে পাবো তুমি, তার উপায় আমি বলে দিতে পারি।'

সৈনিকের কুতূহল হলো। ধনদৌলত কে না চায়? তাছাড়া যুদ্ধ তার জীবনের বৃত্তি। বিপদকে ভয় করলে চলবে কেন? থাক বিপদ—ভয়ে পিছিয়ে যাবার পাত্র নয় সে।

সৈনিক বললে, 'হ্যাঁ, রাজী। কী করতে হবে বল?'

বুড়ী বললে, 'কোটরের তলায় দেখতে পাবে একটা গুহা—তার গায়ে একটা দরজা। দরজা দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে দেখবে মাঝামাঝি জায়গায় একটা কাঠের সিন্দুক। তার ওপর বসে রয়েছে কালো প্রকাণ্ড একটা কুকুর। কিন্তু ভয় পেয়ো না। এই এক টুকরো কাপড় দিচ্ছি তোমায়। কুকুরটাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে এই কাপড়ের টুকরোয় বসিয়ে দিয়ো। কোন কথাটি বলবে না তোমায়। তখন সিন্দুকের ডালা খুলে দেখতে পাবে ঘড়া ঘড়া তামার পয়সা। যত পাবো নিয়ে আসবে—সব তোমার। আরও যদি চাও, তবে দেখতে পাবে গুহার অন্য ধারে আরও একটা দরজা। তার ভেতর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে আরও একটা সিন্দুক। তার ওপরেও একটা কুকুর। তাকেও আমার দেওয়া এই কাপড়ের টুকরোখানার ওপর বসিয়ে দিয়ো। সিন্দুক খুলে দেখতে পাবে অগুণতি রূপো-ভর্ত্তি ঘড়া। যত খুসী নিয়ে আসবে। আর তাতে যদি খুসী না হও তাহলে আরও এগিয়ে যাবে ডানদিকের দেয়াল ধরে। তাতে আরও একটা দরজা। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে মস্ত একটা কাঠের বাক্স। তার ওপর ঝাঁকড়া লোমওয়ালা লালচোখ একটা প্রকাণ্ড কুকুর দেখতে পাবে। তাকেও এই কাপড়ের টুকরোখানার ওপর বসিয়ে দিয়ো। টুঁ শব্দটি করবে না। তার পর বাক্সের ডালা খুলে দেখতে পাবে মোহর-ভর্ত্তি ঘড়া, যতো চাই তুলে নেবে দু' হাতে। রাজার মত ঐশ্বর্য হবে তোমার। তারপর আবার গাছের কোটর বেয়ে ওপরে চলে এসো; কিন্তু খবরদার, আমার ফেলে-আসা সেই ছোট বাক্সটি আনতে ভুলো না যেন।'

সৈনিক তখন তার পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে গাছে চড়তে আরম্ভ করলো। খানিক দূর উঠে দেখতে পেলো গাছের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা কোটর। কোমরে দড়ি বেঁধে তর-তর করে কোটর বেয়ে সে নেমে পড়লো নীচে। কী অন্ধকার আর ভাপ্‌সা। তবু নির্ভয়ে সে নীচে নেমে যেতে লাগলো। খানিক পরে পায়ের তলায় মাটি ঠেকলো। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! অন্ধকার ত আর নেই—দিনের আলোর মতই সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐ তো একটা দরজা। দরজার দিকে এগিয়ে গেলো—একটু ঠেলে দিতেই ভেজানো দরজা খুলে গেল। আর ঐ তো মস্ত একটা সিন্দুক। আর তার ওপর বসে প্রকাণ্ড একটা কুকুর। সৈনিক একটুও ভয় পেলো না—আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে কুকুরের পিঠ চাপড়াতে লাগলো। তার পর তাকে তুলে ধরে বুড়ীর দেওয়া কাপড়ের টুকরায় তাকে মেঝের ওপর বসিয়ে দিলো। কুকুরটা একেবারে চুপ। তখন আস্তে আস্তে সিন্দুকের ডালা তুলে মুঠো মুঠো করে যতো পারে তামার পয়সায় পকেট ভর্ত্তি করলো।

এর পর দু'নম্বর দরজা। সেখানেও পাহারাদার কুকুরটাকে বুড়ীর কথামত শান্ত করে সিন্দুক থেকে তুলে নিল রাশি রাশি রূপো। এর পর তৃতীয় দরজা দিয়ে ঢুকলো, যে ঘরে সোনাভর্ত্তি সিন্দুক ছিল তাতে। এখানকার পাহারাদার কুকুরও কোন বাধা দিলো না। সিন্দুক খুলে দেখতে পেলো ঘড়া ঘড়া মোহর। চোখ ঝলসে যায়। কিন্তু নেবে কী করে অত মোহর? তামায় আর রূপোয় পকেট ভর্ত্তি। তখন পকেট থেকে তামা আর রূপো সব ফেলে দিয়ে সেগুলো যতদূর পারে মোহর দিয়ে ভর্ত্তি করে নিলো। সিন্দুকের কাছেই দেখতে পেলো ছোট চকচকে একটা কাঠের বাক্স—বুড়ী এরই কথা বলেছিল। কাঠের বাক্সটাকেও সঙ্গে নিয়ে দড়ি বেয়ে বেয়ে আবার গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো সৈনিক।

বেরিয়ে আসা মাত্র বুড়ী চাইলো তার কাঠের বাক্স। কিন্তু বুড়ীর হাবভাব তার ভালো লাগলো না। তার মনে হলো, এ বুড়ী ডাইনী ছাড়া আর কিছু নয়। বাক্স ফিরে পেলেই সে অনিষ্ট করার ক্ষমতা ফিরে পাবে। তাই বুড়ীকে বাক্স না দিয়ে সৈনিক হন-হন করে রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। বুড়ী পেছন থেকে কতো ডাকলো। সে ফিরেও তাকালো না।

শহরের কাছাকাছি এসে সে হোটেল-ঘর ভাড়া নিল। এখন সে অনেক ধন-রত্নের মালিক। কিছু দিনের মধ্যেই শহরে সুন্দর বাড়ী তৈরী করে তাতে উঠে এলো। দু-চার বছর বেশ আনন্দে আর প্রাচুর্য্যে কেটে গেল। তার পর একদিন ধন-রত্ন শেষ করে সে আবার নিঃস্ব হয়ে পড়লো। অতো বড় বাড়ী; কিন্তু তাতে লোক-জন, দাস-দাসী আর নেই—সবগুলো ঘরে আলো জ্বলে না। একদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বসে সে তার অদৃষ্টের কথা ভাবছে। এমনি সময় হঠাৎ বুড়ীর সেই চকচকে বাক্সটির কথা তার মনে পড়লো। এত দিনের মধ্যে একবারও তার মনে পড়েনি। আজ মনে পড়া মাত্র সে ছুটে গিয়ে আলমারীর এক কোণ থেকে বাক্সটি বার করলো। তার ডালা খুলে দেখতে পেলো একটা মাত্র কাঠি ছাড়া আর কিছু নেই তাতে। চাবিটা বার করে বাক্সের গায়ে ঠুকে দিতেই কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো। সেই পাহারাদার কুকুর যে এক নম্বর ঘরে কাঠের সিন্দুকের ওপর বসেছিল, সে এসে হাজির। সে তো অবাক। যা হোক বুদ্ধি করে কুকুরকে সে বললে, 'আমার পয়সাগুলো সব নিয়ে এসো এই মুহূর্তে।'

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা বেরিয়ে গেলো। খানিক পরেই ফিরে এলো পয়সা-ভর্ত্তি সবগুলো ঘড়া নিয়ে। তার পর বাক্সের গায়ে দু'বার কাঠি ঠুকে দিতেই রূপোর বাক্সের পাহারাদার কুকুর, তিন বার ঠুকে

দিতেই সোনার বাক্সের পাহারাদার কুকুর এসে হাজির। তাদের দিয়ে সৈনিক গুহার ধন-দৌলত নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলো। এবার রাজার চেয়েও সে ধনী।

সে-দেশের যিনি রাজা, তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। মেয়ে জন্মাবার কিছু কাল পরেই গণক মেয়েকে দেখে বলেছিল যে, এর সঙ্গে একজন সৈনিকের বিয়ে হবে। রাজা ত শুনেই রেগে আগুন। তিনি অত বড় রাজ্যের রাজা; আর তাঁরই মেয়ের বিয়ে হবে কিনা সামান্য এক সৈনিকের সঙ্গে? গণকের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করার জন্য রাজা মেয়েকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না হুকুম জারী করা হলো। চার ধারে কড়া পাহারা। এদিকে সেই সৈনিক রাজকন্যার কথা শুনেছে। তার ভারী ইচ্ছে হলো রাজকন্যাকে দেখতে। তার পক্ষে এ কাজ আর শক্ত কী? একদিন রাত দুপুরে রাজকন্যা যখন ঘুমুচ্ছেন তখন সৈনিকের কথামত ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরদের মধ্যে একটি গিয়ে ঘুমে অচৈতন্য রাজকন্যাকে পিঠে করে সৈনিকের বাড়ী এনে হাজির করলো। আবার ঘুম ভাঙবার আগেই রাজকন্যাকে আবার পৌঁছে দেওয়া হলো তার কক্ষে। কিন্তু কথাটা জানাজানি হয়ে গেল।

পরদিন রাজার আদেশে সৈনিককে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। হুকুম হলো, তার পর দিন সকালে তার প্রাণদণ্ড হবে। রাত শেষ হতে না হতেই কারারক্ষীরা এসে হাজির। বন্দীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে রাজারাণী দুজনেই হাজির। পাত্রমিত্র কর্ম্মচারীদের ত কথাই নেই। মঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে বন্দীকে ফাঁসির দড়ি পরানো হবে এমন সময় রাজার কাছে সে শেষ প্রার্থনা হিসেবে ধূমপানের অনুমতি চাইলো। রাজা অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সে তার কাঠের বাক্স বার করে তাতে তার কাঠি ঠুকে দিলো—একবার, দুবার, তিন বার। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মত তেজীয়ান তিন কুকুর এসে হাজির। সৈনিক কুকুরদের লেলিয়ে দিল জনতার ওপর। চার ধারে হুলস্থুল পড়ে গেল—কে কার আগে পালাবে—হৈ হৈ কাণ্ড! কিছু লোক মারাও গেল—রাজা পর্য্যন্ত রেহাই পেলেন না···ছুটতে না পেরে ভয়েই তিনি মারা গেলেন। দু'চার মুহূর্তে বধ্যভূমি ফাঁকা হয়ে গেল। সৈনিক তখন বন্দিনী রাজকন্যাকে আনিয়ে নিলেন। সেদিনই বিকেল বেলা রাজধানীর গণ্যমান্য লোকদের এক সভা ডাকা হলো। সকলেই সৈনিক পুরুষকে তাদের নতুন রাজা বলে মেনে নিল। তাদের সম্মতি নিয়ে নতুন রাজা রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন—গণকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো। রাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

রাজা-রাণী পরম সুখে রাজত্ব করেন। কিন্তু এখনও ছোট চকচকে সেই কাঠের বাক্সটির দিকে যখন তাদের চোখ পড়ে তখন কৃতজ্ঞতায় তাদের চোখ-মুখ চক-চক করে ওঠে।

রাজার ব্যামো!

মিনতি দেবী

রাজ্য জুড়ে ব্যস্ত সবাই কম্পিত-প্রায় বক্ষে—
ক্ষণেক তরেও নিদ্রা আজি নেই রে কারো চক্ষে,
দু'দিন যাবৎ রাজা মশা'র ব্যামো হোল মস্ত—
মন্ত্রী-প্রজা তাই তো কাঁদে উদয় থেকে অস্ত;
অবিরত গড়গড়িয়ে ভাসিয়ে দিয়ে গণ্ড
সর্দি ঝরে নাক দিয়ে তাঁর—থামে না এক দণ্ড!

বন্ধ আবার করতে গিয়ে রাজার নাকে সর্দি
ঘামিয়ে মাথা হাঁপিয়ে ওঠে পক্ককেশ বদ্যি;
জড়ি-বুটী-তাবিজ-কবচ—হারলো সবই শেষটায়—
ফল তো কিছু-ই ফললো নাকো তাদের সকল চেষ্টায়।
রাজা বলেন, "খুব হয়েছে—এ নয় তোদের কাজ যে,
ডাকো তাকে বদ্যি আছে ভিন্ যে রাজার রাজ্যে—।"

শেষ না হতে রাজার কথা বদ্যিরে সেই আনতে
প্যায়দা-সেপাই ছুটলো বেগে দেশের নানা প্রান্তে;
বদ্যি এসে বললে হেসে, "ভয়ের কিছুই নেই তো,
ঠাণ্ডা লাগার সর্দি কেবল—দেখছি ব্যাপার এই তো!
বুকের ওপর মালিশ লাগান্ দু'দিন গরম তৈলে,
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না সর্দি কিছু রইলে।"

রাজা বলেন, "ঠকিয়ে যাবে—মোর কাছে নেই তার জো—
মালিশ করে-ই সারবে ব্যামো?—এতই সোজা কার্য্য?
করলো অসুখ নাকের ভেতর—জানলো এদেশ সুদ্ধ—
বুকের ওপর করছ মালিশ—আচ্ছা আকাট বুদ্ধ!
সর্দি হবে আমার যদি বুকে-ই শুধু মাত্র
ঝরছে কেন নাক দিয়ে জল সকল দিবা-রাত্র?"

নিয়ে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বিত্তবান ধনসম্পদ সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন, চড়া দরে ঐ সব সুরক্ষিত জমি কিনে বাসিন্দা হতে থাকেন, যাঁরা অসহায় দিনমজুরী ভিন্ন এখানে জীবিকার স্থান নাই—কোন রকমে মাথা গুঁজে বসবার স্থান পেলে, পরে জীবিকার ব্যবস্থা করবার আশা রাখে, তারা নিরুপায় হয়ে দলবদ্ধ ভাবে ঐ সব পতিত জমির উপর সদ্য সদ্য পর্ণশালা রচনা করে এক একটা ছোট-খাটো কলোনী বা উপনিবেশ গড়ে তোলে। এমন ক্ষিপ্রতা ও সিদ্ধ হস্তে উদ্বাস্তুদের এই বাস্তু নির্মাণের কাজ নানা দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে, খবর পেয়ে জমির মালিক জমির চেহারার পরিবর্তন দেখেই অবাক হয়ে যান। এমন কি, সহরের নানা স্থানে বনিয়াদী ধনীরাও এমন অনেক জমি ফেলে রেখে আসছেন বংশানুক্রমে, স্বত্বহানির ভয়ে প্রজাবিলিও করেন না, জমি থেকে কোন রকম ফসলও উৎপন্ন হয় না, শুধু পড়েই আছে—সে সব জমিও দেখতে দেখতে উদ্বাস্তু-পরিবারে পরিপূর্ণ হতে থাকে। মালিকদের মধ্যে যাঁরা সহৃদয় ও বিবেচক, তাঁরা বাস্তুহারা দুর্ভাগাদের প্রতি সদয় হয়ে প্রজা স্বীকার করে নিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক মালিক উগ্রমূর্ত্তি ধরে জমি থেকে তাদের উৎখাত করতে তৎপর হলেন। ফলে বাধল সংঘর্ষ, হানাহানি, পুলিশ তদন্ত, ধরপাকড়। এর ফলে এই শ্রেণীর আধুনিক বড়লোক নামে পরিচিত সম্প্রদায়—যাঁরা সদ্য সদ্য আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন—শুধু বাস্তুহারা নয়, বস্তির বাসিন্দাদের প্রতিও এমনি বিরূপ যে, কোন দরিদ্রকেই সহ্য করতে পারেন না, ভিখারীরা এঁদের মহল্লার ত্রিসীমায় ঘেঁসতেও পারে না, দুঃস্থ দুর্গত বেকারগণ প্রার্থনা জানাতে এলে—কথা না শুনেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়, এমন কি ফিরিওয়ালারা পর্যন্ত এঁদের বাড়ীতে প্রবেশ করবার পথ পায় না।

[উপন্যাস] শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

পূর্বোক্ত ঘটনার পর—পর্যায়ক্রমে বিভ্রান্ত ও বিত্রস্ত বৃটিশ শাসকদের প্রমাদসৃষ্ট পঞ্চাশের মর্মন্তুদ মন্বন্তর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি, মুসলিম-লীগপন্থীদের প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম জনিত সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং দেশনায়কদের নিরুপায় সিদ্ধান্ত-প্রসূত আপোষের তরবারি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তবর্তী দুটি অংশকে পাকিস্তানে পরিণত করিয়া তথাকথিত স্বাধীনতাও অর্জিত হইয়াছে। এতগুলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ একটি দ্বাদশবার্ষিকী যুগের সীমা-রেখা বেশী কিছু নয়—শত-বার্ষিকী একটা যুগ বা শতাব্দীর মধ্যে এতগুলি ভাগ্য-বিপর্যয়কারী ঘটনাবাজির বিস্ময়কর সমাগতি কোন দেশে কখনো সম্ভবপর হয়নি বলেই সুধীসমাজের ধারণা।

মহা অনর্থকর এই একটি মাত্র বিপ্লবী-যুগের পরিক্রমার মধ্যে এক দিকে যেমন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘনিয়ে উঠে লক্ষ লক্ষ গৃহ-সংসার তছনছ করে দিয়েছে, অসংখ্য নর-নারী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বর্ষের পর বর্ষব্যাপী হাহাকারে দেশের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—পক্ষান্তরেও তেমনি যুগপূর্বে অপরিচিত, অখ্যাত, বিশিষ্ট সমাজে অপাংক্তেয় বৃহৎ একটি শ্রেণী সময়োপযোগী যোগাড়-যন্ত্রের সাহায্যে লব্ধ সুযোগ, রীতিমত সাহস, কূট বুদ্ধি ও দেশের মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির সুপারিসে দেখতে দেখতে এমন একটি আধুনিক অভিজাতশ্রেণীর স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন, তাঁদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি জাঁকজমক এখন সবার আলোচ্য ত বটেই, ব্যবসায়-জগতেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বসেছেন। সাধারণ সমাজ এই শ্রেণীর হঠাৎ-বড়লোকদের লক্ষ্য করে নাক-মুখ কুঁচকে বলে—আঙুল ফুলে কি কলাগাছ হয়েছে? যাদের উদ্দেশে এ-সব বলা, তারা কারও কথার তোয়াক্কা রাখে না বা সাধারণ স্তরের জীবগুলিকে মানুষ বলেই মনে করে না এবং এঁদের প্রতি পূর্বোক্ত ধনীদের বিরাগের অন্ত নেই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে—ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সহর ও সহরতলিতে প্রচুর পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে অস্থায়ী ভাবে প্রাচীর ঘিরে ফেলে রাখেন। এদিকে দেশ ভাগ ও পাকিস্তান কায়েম হবার পর কাতারে কাতারে যে সব দুর্ভাগ্য বাঙালী-পরিবার পিতৃপুরুষের ভিটা, প্রতিষ্ঠিত সংসার, আওলাত ভরা জমিজেরাৎ সব ত্যাগ করে জাতিধর্ম রক্ষার টানে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন উদ্বাস্তু আখ্যা

কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সেন্‌ট্রাল এভিনিউ নামে সুবৃহৎ ও প্রশস্ত রাস্তাটিকে উত্তরাংশে সম্প্রসারিত করে ঐ অঞ্চলের স্বর্গত বিশিষ্ট অধিবাসীদের নামানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে যে সব খণ্ড এভিনিউ গড়ে তুলেছেন, তারই একটা বৃহৎ অংশে তথাকথিত কতকগুলি আধুনিক অর্থপতি একই রকমের আধুনিক পরিকল্পনায় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার বাহার তুলে যেন নিজেদের একটা কলোনীর পত্তন করেছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে সহর অঞ্চলে এঁদের না ছিল কোন প্রতিষ্ঠা, কিম্বা পরিচয় দেবার মত কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। কেহ করতেন দালালী, কেহ বা মালপত্রের আড়তদারী, সারা দেশের পণ্যবহুল মোকামগুলিতে ঘোরাঘুরি করে কেউ হয়ত পণ্যের সন্ধান এনে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধকালে কলকাতা মহানগরী যখন সরবরাহের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে এঁদের চাহিদার সঙ্গে অদৃষ্টের পথ খুলে যায়। মফঃস্বলের ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ উপরওয়ালাদিগকে

রেকর্ড বানিয়ে চালের বাজারে ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে এঁরা আর্থিক জগতের মুদ্রাস্ফীতির যে ভাবে সমাধানে প্রবৃত্ত হলেন, দেশবাসী তার ফলে যে সর্বনাশের সম্মুখীন হোক না কেন, এঁদের অবস্থা কিন্তু একেবারেই ফিরে গেল—প্রত্যেকেই এঁরা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে পণ্য-জগতের উপর মাতব্বরী করতে লাগলেন।

বছর বারো আগে যে বগলাপদ সমদ্দারকে হরগৌরীপুর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সকালে বিকালে প্রায়ই সুখদুঃখের সাথী প্রতিবেশী পশুপতি হালদারের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্পগুজব করতে দেখা যেত, তার পর কলকাতার কর্মস্থান থেকে আহ্বান আসায়—সেই বছরেই রথযাত্রার স্মরণীয় দিনে স্ত্রী সাবিত্রী দেবী এবং দুই শিশুকন্যা দেবী ও রমাকে নিয়ে সাশ্রুলোচনে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যিনি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, কলকাতায় গেলেও গ্রামের মায়া কখনো কাটাবেন না, মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসবেন, খোঁজ-খবর নেবেন, বাস্তু ভিটে যেখানে রেখে যাচ্ছেন, আসতেই হবে।

গ্রামের সকলেও তাই ভেবেছিলেন—সপরিবারে সহরে গেলেও সমদ্দার গাঁয়ের মায়া কাটাতে পারবেন না। বিশেষ করে, পশুপতি হালদারের সঙ্গে তাঁর যে রকম মাখামাখি হৃদ্যতা, সমদ্দারের স্ত্রী সাবিত্রী ঠাকরুণ যে রকম গ্রাম-অন্ত প্রাণ, আর—তাঁদের দেবী মেয়ে দু' বছর বয়স থেকেই হরগৌরীতলায় নীলের পুজোর দিনে পশুপতির ছেলের গলায় মালা দিয়ে যে ভাবে 'কুটো-বাঁধা' হয়ে আছে, তাতে করে এ গ্রামে তাদের ফিরতেই হবে।

কিন্তু কাল-চক্রের এমনি গতি, বগলার প্রতিশ্রুতি এবং গ্রামবাসীদের প্রত্যাশা—কোনটিই এ পর্যন্ত সার্থক হয়নি। কলকাতায় গিয়ে বগলাপদ মাস কয়েক প্রিয় বন্ধু পশুপতির সঙ্গে চিঠি পত্রে আলাপ বজায় রেখেছিল, কিন্তু তার পর সে পাঠও বন্ধ হয়ে যায়। সেই অবস্থায় পশুপতির ঘন ঘন পত্রাঘাতে বিরক্ত হয়ে এই মর্মে এক মোক্ষম পত্র দেন যে—কলকাতার অবস্থা তোমরা বুঝবে না—অর্থ এখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, সবাই ব্যস্ত আয়ত্তে আনতে। সে জন্য অনন্যকর্মা হয়ে এরই সাধনা করতে হবে। কখন কোথায় থাকব, কোন্ পথে পাড়ি দেব—কিছুই স্থির নেই। কাজেই এখন আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। বারোটা বছর ধরে চলবে এই সাধনা, তার পর ছুটি। তুমিও ভায়া অনন্যকর্মা হয়ে ছেলেটিকে মানুষ কর—উচ্চশিক্ষা দিয়ে কৃতবিদ্য করে তোল। বারো বছর পরেই আমরা একসঙ্গে বসে আবার করব বোঝাপড়া।

এই হলো বগলাপদর কথা ও কাহিনী—হরগৌরী গ্রাম, তার বাসিন্দাগণ, প্রিয় বন্ধু পশুপতি এবং নিজের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে।

কলকাতার যে পণ্য-প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বগলাপদ সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যাঁর সাদর আহ্বান তাঁকে সপরিবার কলকাতায় এনে স্থায়িভাবে বসবাসে বাধ্য করে, তিনি হচ্ছেন সরকারের প্রধান সরবরাহকার ব্যবসায়ী অরবিন্দ রায়। ইতিমধ্যেই ইনি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়েছেন, তার উপর সুবর্ণ সুযোগ এসেছে সরকার কর্তৃক প্রধান সরবরাহকার মনোনীত হওয়ায়। নিত্যানন্দ চৌধুরী নামে আর এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সঙ্গে অরবিন্দ রায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল ব্যবসায়ের দিক দিয়ে। এঁরা উভয়েই বুঝেছিলেন, ব্যবসায়ের ব্যাপারে যে অভাবনীয় সুযোগ এসেছে, মফঃস্বলের বিভিন্ন মোকাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ বগলাপদর সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেই সূত্রেই বগলাপদকে সাদর আহ্বান এবং তাহার স্থিতি সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা করা হয়, সে-ও অভাবনীয় বললে অত্যুক্তি হয় না।

সহরের অন্যত্র বসবাসে পাছে অসুবিধা হয়, সেজন্য বিডন স্ট্রীটের উপর একখানি ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্র বাড়ীতে সপরিবার বগলাপদর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন অরবিন্দ রায়। ঘরগুলি মোটামুটি রকমে সাজানো, ঘরে ঘরে বিজলীর আলো, পাখা। বসবার ঘরে টেবিল, চেয়ার, র‍্যাক, এক পাশে একটি রেডিও সেট। এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই আনন্দে অভিভূত হবার কথা। রাণী ত আলো জেলে, পাখা খুলে, রেডিওর গান-বাজনা শুনে আহ্লাদে আটখানা—কি যে করবে, ভেবে পায় না। ছুটে গিয়ে একবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে—সত্যি বাবা, কি মজার সহর এই কলকাতা—আরো আগে কেন আমাদের আননি ?

সাবিত্রী দেবী সহাস্যে বলেন : পাগলীর কথা শোন !

হঠাৎ দেবীর দিকে তার নজর পড়ে। সে এই সময় বারান্দার রেলিংটি ধরে নির্বাক্ দৃষ্টিতে রাস্তার পানে তাকিয়েছিল। রাণী ছুটে গিয়ে তার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল : তুই কি রকম মেয়ে দিদিভাই—ঐ সব দেখে আহ্লাদ করলিনি ! এখানে একাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রাস্তার পানে তাকিয়ে আছিস্ ? কি ভাবছিস বল ত ?

ম্লান মুখখানি ফিরিয়ে রাণীর বিহসিত মুখের উপর নিজের

বিষণ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেবী বলল: ভাবছি, ললিতদা' যদি সঙ্গে আসত, এ সব দেখত, তাহলে সত্যিই আহ্লাদ হোত।

বলতে বলতে দেবীর চোখ দুটি স্ফীত হয়ে উঠল। রাণী সঙ্গে সঙ্গে মুখখানার একটা ভঙ্গি করে ঝাঁঝিয়ে উঠল: তুই কি দিনকের দিন খুকি হচ্ছিস্ দিদি? এখানে তোর ললিতদা' আসবে কেন? আহা! সেই জন্যে রাস্তার পানে তাকিয়ে দরদ দেখানো হচ্ছে মেয়ের!

ঘরের ভিতর থেকে বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে রাণী?

রাণী গলার স্বর আরো একটু চড়িয়ে দিয়ে বলল: তোমার সোহাগী মেয়ের কলকাতা ভালো লাগছে না—ওঁর ললিতদা' সঙ্গে আসেননি ব'লে।

কথাটা শুনেই স্বামি-স্ত্রী পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। সাবিত্রী দেবী জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন: ওকে নিয়েই আমার ভাবনা, সারা পথটা মুখ বুজিয়ে এসেছে, একটু হাসি কোথাও ফোটেনি—শেষে না হেদিয়ে অসুখ-বিসুখ করে বসে।

বগলাপদ মুখে ঈষৎ উপেক্ষার ভাব ফুটিয়ে বললেন: সব ঠিক হয়ে যাবে দু'দিনে। সামনেই বিডন পার্ক, কত রকমের খেলার ব্যবস্থা, কত বড় বড় ঘরের ছেলে-মেয়েরা সব আসে। দেখবে তখন, গাঁয়ের কথা সব ভুলেই গেছে।

কিন্তু পুরো একটি মাস কলকাতায় থেকেও যখন দেবীর মনের অবস্থা ফিরল না, বিডন উদ্যানে বালক-বালিকাদের জন্ম খেলা-ধুলা ও দৌড়-ঝাঁপের নানা রকম বিচিত্র ব্যবস্থা দেখেও, সে যখন রাণীর মত পুর্ণোৎসাহে যোগ দিতে পারল না, কেবলই ললিতদা'র কথা তার মনে পড়ে; ছেলেদের লাফালাফি দেখে দেবী যখন প্রশংসা না করে বলে ওঠে—ললিতদা' ওর চেয়েও জোরে লাফ দিয়ে গাছের ডাল ধরত! আসত এখানে সে। এমনি সব কথা খেলাধুলার মাঠেও শুনে ছোট বোন রাণী ভাবে—দিদির কি ললিতদা'র জন্যে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে গেল! এ কি রকম মেয়ে বাবা!

দিদির সব কথা রাণী বাড়ী গিয়ে মাকে বলে, সেই সঙ্গে অনুরোধ করে—তোমার মেয়েকে যদি খুসি দেখতে চাও, তাহলে ললিতদা'কে আনাও মা এখানে—সেখানকার মত খেলাঘর পেতে খেলুক ওরা।

মা ধমক দিয়ে বলেন; তুই থাম ত! প্রথম প্রথম অমন হয়, তার পর সামলে নেয়। ওর মনে যে কত দরদ, তুই তার কি বুঝবি?

এই সময় বগলাপদ চৌরঙ্গীর একটা বড় ষ্টুডিও থেকে দুই মেয়ের কয়েক সেট ফটো তুলিয়ে আনলেন। দেশেই রাণীর কাছে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন, কলকাতা থেকে ভালো ফটো তাদের আনাবেন। কথাটা দেবী শুনতে পায় এবং সে-ও আবদার ধরে—আমাকে একখানা আলাদা ফটো দিও বাবা—আমি এক জনকে দেব।

সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন বগলাপদ। একসঙ্গে দুই বোন হাতধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, তা ছাড়া তারা একা একা উপবিষ্টা—দুই ধরণের দুই প্রস্থ ছবি। প্রত্যেক প্রস্থ তিনখানি করে তারা পেয়েছে। দেবীর মনে পড়ে যায়—ললিতদা'কে সে কথা দিয়ে এসেছে, তার একখানি ফটো পাঠিয়ে দেবে। নিজের ফটো-খানি নিয়ে সে বগলাপদর ঘরে এসে তাঁর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। কাজ করতে করতে চোখ তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কি মা—কিছু বলবে?

নিজের ফটোখানি শক্ত কাগজে প্যাক-করা অবস্থায় পিতার টেবিলের উপর রেখে দেবী বলল: এখানা আমি ললিতদা'র কাছে পাঠাতে চাই বাবা!

কন্যার মুখের পানে তাকিয়ে বগলাপদ বললেন; বেশ ত মা, আমি দেব পাঠিয়ে; ঠিক সময়েই তুমি এখানা এনেছ, আমি তোমার জেঠামণিকেই এখন চিঠি লিখছি।

দেবী অমনি খপ করে আহ্লাদে অনুরোধ করে বসল: তাহলে ঐ চিঠিতে লিখে দাও বাবা, ললিতদা' যেন আমাকে চিঠি লেখে।

কন্যার বিকসিত মুখের পানে চেয়ে বগলাপদও সহাস্যে বললেন: এই কথা! আচ্ছা মা, এখনি লিখে দিচ্ছি।

চিঠি ও ফটোর প্যাকেট সেই দিনই হরগৌরীপুরে পোষ্ট করা হলো। [ক্রমশ:।

আজ তুমি কাছে এসো

অতন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমি তো এসেছি সখি জয় করে কঠিন বৈশাখ
চণ্ডাল সূর্যের ক্রোধে রুদ্রবাহু ছড়িয়েছি ধান—
ঈশানের বজ্র-মেঘে ভুলেছি তো মাটির আহ্বানে
শ্রাবণের অশ্রুজলে শুনিয়েছি আশ্বিনের গান।

আজ তুমি কাছে এসো, আজ আমি তোমাকেই চাই
তোমার অমর প্রেম স্বপ্ন হয়ে আমাকে জড়াক—
আজ তুমি গান গাও, এক-বুক জ্যোছনার গান
আমার মাটির ঘর আজ শুধু আমাকে ভুলাক।

তার পর চলে যাবো খুশিয়াল স্নেহের আহ্বানে
আমার সোনার মাঠে শরতের সন্ধ্যাকে জড়িয়ে—
মাতাল হাওয়ার সুরে মোহ-মুগ্ধ নিবিড় হৃদয়
চলে যাবো কত দূর শ্যামলিম আলপথ দিয়ে···

তোমার চুড়ির শব্দে চোখ তুলে দাঁড়াবো যখন
তোমাকে জড়াবে স্নেহে এক ঝাঁক কমলাভ ঢেউ—
কী খুশি, খুশির দোলা আমাকে পাগল করে দেবে
কী করে বোঝাই বলো, সেই খুশি জানবে না কেউ।

আশ্চর্য স্বপ্নের সুরে তার পর ফিরে আসি ঘরে
মাঠের হৃদয় থেকে তুলে আনি সবুজের গান—
সে গানের বৃষ্টি হোক্ আমাদের রাত্রিকে ঘিরে
আমরা অবাক হই, প্রেমাতুর পারাবত-প্রাণ।
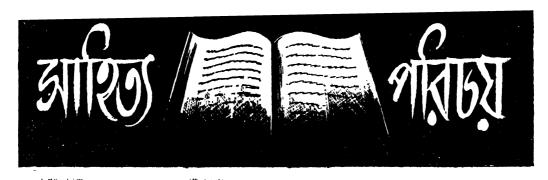
শারদীয় সাহিত্য

বাংলার সাহিত্য-জগতে 'শারদীয়' উৎসব একটা বিশেষ উপলক্ষ্য। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিচিত্র অঙ্গসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞাপনের ভীড় ঠেলে কিছু সৎসাহিত্যও পরিবেশিত হয়। প্রতিষ্ঠাবান এবং নবীন সাহিত্যিকরা সকলেই বছরের এই বিশেষ সময়টিতে তাঁদের নূতন রচনা উপহার দেন। এই শারদীয় সাহিত্য ফসল অনুসারেই চলতি বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় পৌঁছানো যায়। বহুপ্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক ব্যতীত খ্যাত-অখ্যাত, স্বল্প-প্রচারিত এমন কি সুদূর পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাও আমাদের হস্তগত হয়েছে। সকল দিক বিবেচনা করে বিচার করলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আজ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তা অপূর্ব সম্ভাবনাময় এবং আশাজনক। একথা অবশ্য সত্য যে, অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনার জ্যোতি অনেক নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, তবু সেই স্তিমিত রশ্মির ভিতরও কিছু স্ফুরণের আছে। শরৎকালের মেঘের মত ইদানীং বিত্তবিহীন রচনায় দীপ্তি আছে, বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আছে, তাঁদের উপহাস করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। সকল পত্র-পত্রিকায় কিছু ভালো গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সব জড়িয়ে একটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল।

প্রকৃতপক্ষে ছোট গল্পই শারদীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বাংলা দেশের প্রকাশকরা আজো ছোট গল্পের বই জনপ্রিয় করে তুলতে পারেননি, অথচ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব তার ছোট গল্পে। সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, শুধু মাত্র তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটি আজো তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। অসংখ্য গল্প অজস্র পত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে, এই বিপুল সাহিত্যসম্ভার এক নিঃশ্বাসে পাঠ করে মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই আমরা গত সংখ্যায় এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিনি। স্থানও অতি সীমাবদ্ধ, তাই আমাদের বিচারে যে গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, বর্ণমালা অনুসারে লেখক-লেখিকার নামের পাশে সেই লেখা ও পত্রিকার নাম নীচে প্রকাশ করা হ'ল। পাঠক-পাঠিকারা আমাদের সঙ্গে সর্বত্র একমত হ'বেন এ আশা করা অন্যায়, তবু আমরা নিম্নলিখিত ছোট গল্পগুলি সংগ্রহ করে তাঁদের পাঠ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে পারি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, (পাপ—বসুমতী, প্রাসাদ-শিখর—দেশ) অন্নদাশঙ্কর রায় (কতকালের চেনা—দেশ, কেচ্ছা—গল্পভারতী), অমলা দেবী (মহামৃত্যু—উত্তরা), অমিয়ভূষণ মজুমদার (শাদা মাকড়সা—ক্রান্তি), অমরেন্দ্র ঘোষ (পথিক বন্ধু—শনিবারের চিঠি), আশাপূর্ণা দেবী (আর একদিন—বর্ষবাণী), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (হেডমাষ্টার—ইন্দ্রধনু), দক্ষিণা বসু (মুখোস,—গল্পভারতী), দেবেশ দাস (বৌদি—বসুমতী), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (দর্পণ—বসুমতী ; ইন্দু মিঞার মুরগী—মুখপত্র), নরেন্দ্র মিত্র, (সন্ধান—নূতন সাহিত্য, কন্যা—দেশ), নবেন্দু ঘোষ (দেবতার জন্মকাহিনী—নূতন সাহিত্য), ননী ভৌমিক (ছবি—চতুষ্কোণ), পরশুরাম (তিলোত্তমা—যুগান্তর), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (শঙ্কর—যুগান্তর), প্রেমেন্দ্র মিত্র (দাতা—মঞ্জরী), পরিমল গোস্বামী (যমরাজ ও কাঠুরে—যুগান্তর), প্রাণতোষ ঘটক—(রোদনভরা এ বসন্ত,—যুগান্তর), প্রতিভা বসু (একটি ছোট উপাখ্যান—পূর্বাশা), বনফুল, (ভদ্রলোক—যুগান্তর), বারীন দাস (জুডি ফিসারের কাহিনী—বসুমতী), বাণী রায় (সাতটি রাত্রি,—অচল পত্র), বিভূতি মুখোপাধ্যায় (টনসিল—যুগান্তর), ভবানী মুখোপাধ্যায় (জননী—বসুমতী, নূতন-নায়িকা,—গল্পভারতী, বাতায়ন—ক্রান্তি), মনোজ বসু (চোর—বসুমতী, বিনোদ লাট—যুগান্তর), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (হাসপাতাল—যুগান্তর, চিন্তাজ্বর—বসুমতী), মুজতবা আলী (লোনামিঠা—দেশ), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (অপূর্ব পূজা—বসুমতী), রঞ্জন (লেখক—শনিবারের চিঠি), রামপদ মুখোপাধ্যায় (একা—বসুমতী), শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাল বলয়—দেশ), সুবোধ ঘোষ (শ্মশানচাপা—আনন্দবাজার), সন্তোষ ঘোষ (ছায়াঘর—দেশ), সমরেশ বসু (পশারিণী—পরিচয়), সতীনাথ ভাদুড়ি (ডাকাতের মা—যুগান্তর), সুনীল ঘোষ (মাননীয়া অতিথি—চতুষ্কোণ), সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (চাকরী—বসুমতী), সুলেখা সান্যাল (গাজন সন্ন্যাসী—স্বাধীনতা), সুশীল জানা (অধর মাঝি—স্বাধীনতা), সোমেন্দ্রনাথ রায় (ঘর-বাতি—অচল পত্র)।

প্রতিটি গল্পের গুণাগুণ বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন, আমরা বিষয়-বৈচিত্র্য, নূতন অঙ্গিক, প্রয়োগভঙ্গী এবং মূল বক্তব্যের নূতনত্ব অনুসারেই গল্পগুলি নির্বাচন করেছি।

প্রবন্ধ এবং কবিতাদির কথাও এই মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আনন্দিত হতাম, কিন্তু স্থানাভাব হেতু তা সম্ভব হল না। তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

ইতিহাসের বিনষ্ট উপাদান

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ সম্প্রতি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রাদেশিক প্রতিনিধি-মণ্ডলীর এক সভায় প্রকাশ করেছেন যে, কংগ্রেসী আন্দোলন সংক্রান্ত গুপ্ত কাগজ-পত্র তদানীন্তন সরকার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দেই নষ্ট করে ফেলেছেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত পক্ষে জুন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইংরাজের ভারত ত্যাগের বাসনা প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভবিষ্যৎ জ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ কর্মচারীরা ছায়া পূর্বগামিনী বুঝে "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" নীতি অবলম্বন করেছিলেন। দুষ্ট জনে অবশ্য এর ভিতর অন্য অনেক প্রকার কারসাজির কথা কানাকানি করে। এই সংবাদ আর একবার প্রকাশিত হয় তখন কিন্তু সে প্রশ্ন ধামা-চাপা পড়ে, নেতৃবৃন্দও তাদৃশ সচেতন ছিলেন না। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাংলা দেশের তরফ থেকে বলেছেন যে, জনৈক বাঙালী অফিসারের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশীয় দলিল-দস্তাবেজ কোনো উপায়ে সংরক্ষণ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু ৪২-এর আন্দোলনের ইতিহাস নয়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের রক্তাক্ত দিনগুলির কথা দিয়ে সেই ইতিহাসের সুরু আর নেতাজী সুভাসচন্দ্রের ইম্ফল অভিযানে তার সমাপ্তি। আর আছে ১৯০৩ থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত অসংখ্য বীরের আত্মদানের ইতিহাস, অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক অধ্যায়। ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত অসংখ্য জননীর চোখের জল আজও শুকায়নি, বহু সতী রমণীর সাঁথির সিঁদুর মুছে গেছে, সেই ইতিহাসই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস। অগ্নিযুগের শেষ পর্য্যায়ের অন্যতম নায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এই ইতিহাস রচনার ভারপ্রাপ্ত প্রধান। আশা করি, বাংলা দেশের ঐতিহাসিক উপাদান যথাযথ সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

পুনর্মুদ্রণের উপযোগী বাংলা বই

আমরা কিছু কাল পূর্বে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য অথচ পুনর্মুদ্রণের যোগ্য বাংলা বই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলাম। এই সব গ্রন্থ অতি দ্রুতগতিতে লুপ্ত হওয়ার অবস্থা হয়েছে। কয়েকটি প্রাচীন পাঠাগারে কিছু বই আছে কিন্তু যত্নাভাবে সেগুলি নষ্ট হওয়ার বেশী বিলম্ব নেই। আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি, কয়েকটি ক্ষেত্রে কপিরাইট আইনের জন্য অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই সব কপিরাইটভোগী প্রকাশকরা সেই গামলার কুকুরের নীতিতে বিশ্বাসী। নিজেরাও কিছু করবেন না, প্রাণ ধরে অপরের হাতেও বই ছাড়বেন না। কারণ, যদি পরে অন্য কারো লাভ হয়। প্রকাশকদের যে সংযুক্ত সমিতি আছে নৈতিক চাপ দিয়ে তাঁরা কিছু সাহায্য করতে পারেন না কি? আমরা এই সংখ্যায় কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থের নাম ও লেখকের নাম নিয়ে দিলাম :—সঙ্গীতরত্নাকর—রামনিধি গুপ্ত। বাংলার ইতিহাস—রামগতি ন্যায়রত্ন। সাহিত্যরত্নাবলী। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতার একাল ও সেকালের ইতিহাস—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর-চরিত—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদনের অন্তর্জীবন—শশাঙ্কমোহন সেন। বঙ্গের বাইরে বাঙালী—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ। বাংলা অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ। বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। সক্রেটিস—রজনী গুহ। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকা। সঙ্গীতসার সংগ্রহ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ভারতকোষ—রাজকৃষ্ণ রায়। ভারতমহিলা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বেণের মেয়ে—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। মহারাজ নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন। টমকাকার কুটির—চণ্ডীচরণ সেন। বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার। মহম্মদের জীবনকথা—কৃষ্ণকুমার মিত্র। সমসাময়িক ভারত—যোগেন্দ্র সমাদ্দার। গুপ্তরত্ন উদ্ধার বা প্রাচীন কবি সংগ্রহ—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাচরণ সান্ন্যাল। পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত। গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ। অন্ধকূপহত্যা—মুজিবর রহমন। বাউল সঙ্গীত—সতীশচন্দ্র মজুমদার। ঝিলে-জঙ্গলে শীকার—কুমুদনাথ চৌধুরী।

হিন্দী শব্দকোষ প্রকাশ প্রচেষ্টা

নয়া দিল্লীতে একখানি হিন্দী শব্দকোষ প্রকাশনের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। ডা: সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই বিরাট কর্মটি সম্পাদন করা হবে। রাষ্ট্রভাষার কোনও অভিধান নেই, একথা বোধ হয় অনেকের জানা নেই। শব্দকোষে আহার ও ওষুধ দুই পাওয়া যাবে। আমরা চুপি চুপি একটা পরামর্শ দিচ্ছি, বাংলা শব্দকোষ হিন্দীতে অনুবাদ করলেই অনেক সহজে কাজ মিটবে।

নোবেল পুরস্কার এবং হেমিংওয়ে

আমাদের বাংলা দেশের সংবাদপত্রওলাদের একটা ব্যাধি আছে যে, কোনও সংবাদের উপযুক্ত গুরুত্ব বিবেচনা না করেই তাঁরা নাচানাচি সুরু করেন। পাকিস্থানের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করে সম্পাদকীয় রচনা করেন, নোবেল পুরস্কার রামকে না দান করে শ্যামকে কেন দেওয়া হল, সে প্রশ্নও ওঠে। অনেকটা সেই পুরাতন দিনের সম্পাদকীয় মন্তব্য "আমরা তখনই জার্মাণীকে বলিয়াছিলাম, এখন জার্মাণী বুঝিতেছে আমাদের কথা শুনিলেই ভালো হইত ইত্যাদি" এই বছর আমেরিকার লেখক আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর এই জাতীয় প্রশ্ন বাংলার কোনো কোনো সংবাদপত্রে লক্ষ্য করা গেল! নোবেল পুরস্কার বিতরণের ওপর যখন সমগ্র পৃথিবীর লোকের কোনো হাত নেই, একটি সীমাবদ্ধ কমিটির খেয়ালখুসীই যেখানে গুণাগুণ বিচার করার চূড়ান্ত অধিকারী, তখন সেই বিষয়ে আলোচনা করাও বৃথা। একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নাই যে, এই সব পুরস্কার রাজনীতির পঙ্কিল আবহাওয়ামুক্ত নয়, তাই ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে পালা করে পুরস্কার দেওয়া হয়, শান্তির পুরস্কার শিকায় উঠানো থাকে, মনের মত লোকের জন্য। সুতরাং আজকের দিনে এই জাতীয় আন্তর্জাতিক পুরস্কারের শূন্যগর্ভতা ও স্বরূপ প্রকাশের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। তবু এইবার আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে পুরস্কার

দেওয়ার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আছে বৈ কি ? ৫৫ বছরের সাহিত্যিক আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে পনের বছর আগে 'ফর হুম দি বেল টলস' নামক স্প্যানীশ গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত গ্রন্থের জন্ম অভিনন্দিত হ'ন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি রচনা করেন "এ ফেয়ারওয়েল টু আমস"। টলষ্টয়ের ভঙ্গীতে যুদ্ধ এবং তার ভয়ঙ্করত্ব সুনিপুণ রচনা-কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন হেমিংওয়ে। হেমিংওয়ে তাঁর যে ছোট উপন্যাসটির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন.তার নাম "দি ওল্ড-ম্যান এ্যাণ্ড্ দি সি"। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি মহৎ (Epic) উপন্যাসের দাবী রাখে এবং হয়ত হেমিংওয়ের মহত্তম ভবিষ্যৎ উপন্যাসের ভূমিকা মাত্র। "দি ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দি সি" উপন্যাসের বৃদ্ধ ধীবর সমগ্র নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতীক।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বিচিত্র কাহিনী

অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ একজন সুরসিক গল্পকার। মজলিসী গল্পে তিনি আসর অতি সহজে জমিয়ে তুলতে পারেন। এত দিন যে সব কথা ও কাহিনী মুখে মুখে বলতেন এইবার সাহিত্যের আসরে তা পরিবেশন করলেন। কাহিনীগুলি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ এবং রসাত্মক। 'মাষ্টার মশায়,' 'টেলিফোন বিভ্রাট,' 'সভাপতির বিপদ,' 'শিকারে বিপত্তি,' 'মৃতের সহিত সাক্ষাৎ' প্রভৃতি গল্পগুলি সত্যই বিচিত্র এবং কৌতুকপ্রদ। মূলতঃ শিশুদের জন্য লিখিত হলেও গল্পগুলি বয়স্কদের কাছেও সমান আদর লাভ করবে। 'ছলনার রূপকথা' গল্পটির মেজাজ বিভিন্ন এবং আঙ্গিকে নূতনত্ব আছে। এই গ্রন্থে 'পথচারী' বা 'যাযাবর' বা বিনয় মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীও সংযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটি অলঙ্করণে কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটির প্রকাশক এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সনস্, মূল্য দুই টাকা।

প্রেম ও মৃত্যু

শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় অবস্থানের সময় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ... দিনে "Love and Death" এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। মহাভারতের রুরু এবং প্রিয়ংবদার কাহিনী এই কাব্যের উপজীব্য। এই কাহিনীটি রসসাহিত্যের এক চমৎকার নিদর্শন! এই কাব্যের মূল কথা, প্রেমের কাছে মৃত্যুর পরাজয়। রুরু তার প্রিয়তমাকে প্রেতলোক থেকে এনেছেন মাটির ধরণীতে নিজের আয়ুর অর্ধভাগ মৃত্যুদেবতাকে দান করে। পরবর্তী কালে শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে এই ভাব পূর্ণতা লাভ করেছে। এই ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীপৃথ্বী সিংহ নাহার। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ এই অনুবাদের প্রশংসা করেছিলেন। গ্রন্থটির প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

কল্লোল যুগের অন্যতম নায়ক ও কুশলী কথাশিল্পী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস-গ্রন্থাবলী সাহিত্য-জগতের একটি বিশেষ ঘটনা। শৈলজানন্দের সাহিত্যকীর্তি সর্বজন-স্বীকৃত। তাঁর 'খরস্রোতা', 'রায় চৌধুরী', 'ছায়াছবি', 'গঙ্গাযমুনা', 'সতীনকাঁটা', 'অরুণোদয়' 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা', 'কয়লাকুঠি' প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসগুলি এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে। শৈলজানন্দের অন্যান্য উপন্যাস এবং ছায়াছবির গল্পাবলীও বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন চলছে। এই বিরাট গ্রন্থটির মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা, প্রকাশক, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনচরিত

মহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর পবিত্র জীবনকথা এত দিনে প্রকাশিত হল। শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনদর্শন ও বাণী ভারতীয় ঋষি ও মহাপুরুষদের প্রচারিত শাশ্বত মান্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। জনসাধারণের কাছে সেই মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছেন শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনের পক্ষে শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত। বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন রেবাতটে সাধনা করেছিলেন মহারাজ বালানন্দ, পরে দেওঘরে রামনিবাস আশ্রমে তাঁর লীলা প্রকট হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর উত্তর সাধক হিসাবে শ্রীমোহনানন্দ মহারাজকে নির্বাচিত করেন, তিনিই বর্তমানে আশ্রমের প্রধান সেবাইত। এই গ্রন্থে এই দুই মহারাজের জীবনকথা ভক্তি সহকারে ব্যক্ত করেছেন শ্রীমতী আশালতা সিংহ। গ্রন্থটিতে ১৬ খানি সুমুদ্রিত চিত্র আছে। মূল্য সাড়ে চার টাকা মাত্র।

বিচিত্র রূপিণী

সরস সাহিত্যকার হিসাবে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন অনাবশ্যক। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ রচনার নিজস্ব কলা-কৌশলে শিবরামের দোসর নাই। সাহিত্যে শিব্রামি ঢঙের আজ পর্যন্ত অনুকরণ করাও সম্ভব হয়নি। মূলতঃ শিশু এবং কিশোর-চিত্তের উপযোগী কাহিনী রচনা করলেও শিবরাম চক্রবর্তীর রচনা ছেলে-বুড়া সকলেরই কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। 'বিচিত্র রূপিণী' শিবরাম চক্রবর্তীর বড়দের জন্য লেখা সরস কাহিনী। 'বরের মাসি কনের পিসি', 'সাকলা-পাকলা', 'সখী-সংবাদ', 'শালু মামীর রাঁধুনি', 'স্বয়ম্বরবরা', 'ডালু মাসির ঝি' প্রভৃতি বিভিন্ন কাহিনী পাঠ করে অতি-বড় গম্ভীর ব্যক্তির পক্ষেও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হবে। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটির প্রকাশক—নিউ এজ পাব্লিশার্স লিমিটেড, দাম—দু' টাকা আট আনা মাত্র।

বিপ্লবী জীবন

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী—একদা বাংলা বিপ্লব-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন। লেখক তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীর শেষে প্রশ্ন করেছেন—"সেদিন স্বাধীনতাই ছিল চরম ও পরম লক্ষ্য —আর সব ছিল গৌণ। আজ তার জন্য দুঃখ করি না, কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে—যা পেলাম তাই কি চেয়েছিলাম?"—আজ বাংলার অসংখ্য বিপ্লবীর মুখেই এই প্রশ্ন শুনি, মন তাঁদের হতাশায় ভেঙে পড়েছে। কল্পিত কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর এই বিপ্লব-সাধনার ইতিহাস বিপ্লবী লেখক অসাধারণ সংযম ও নিষ্ঠার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির প্রকাশক—নমামি প্রকাশ মন্দির—মূল্য দু'টাকা বারো আনা মাত্র।

নাচ-গান-বাজনা

A. I. R সঙ্গীত-সম্মেলন

রেডিও মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হল হরেক রকমের অনুষ্ঠান। চিড়িয়াখানা থেকে শিশুদের জন্য প্রচার করা হল বাঘের আর সিংহের ডাক, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতার মধ্যে বিলে করে ডিবেট, প্রত্যহ আড়াই ঘণ্টা করে অধিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, নতুন নতুন গাইয়ে-বাজিয়ের অনুসন্ধান, বেশী করে নাটক, আরও কত কি। সঙ্গীত-সম্মেলনের আসর বসলো দিল্লীতে। রেডিও মাসে সঙ্গীত-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করা যথাযথই হয়েছে। সারা ভারত খুঁজে খুঁজে শিল্পীদেরও এনেছেন দেখলাম। কিন্তু প্রতি প্রদেশের প্রতিই পক্ষপাতশূন্য ভাবে স্থান করে দেওয়া হয়েছে কি? প্রসঙ্গ ক্রমে বলতে পারি, বাংলার বহু গাইয়ে-বাজিয়ে যাঁদের খ্যাতির পরিমাণ কোন অংশেই যাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন করে এলেন তাঁদের চেয়ে কম নয়, এমন সব গুণীজনের জায়গা হয়নি। কেন হয়নি জায়গা? সঙ্গীত-সম্মেলন বিভিন্ন প্রাদেশিক লোকসঙ্গীতগুলির জন্য কি বন্দোবস্ত ছিল? বাংলার নিজস্ব গান সমূহ সারি, জারি, ভাটিয়ালী ইত্যাদি, নজরুল অতুলপ্রসাদের গান কি স্থান পেয়েছে? শ্যামাসঙ্গীত, কীর্ত্তন এ সব? টপ্পা, মনসা, চণ্ডী, আগমনী, নবমীর গান? আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের পুত্র আলি আকবরের স্বরোদ, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত, তারাপদ চক্রবর্তীর কণ্ঠসঙ্গীত, পান্নালাল ঘোষের বাঁশী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বীণ, মুস্তাক আলী খাঁয়ের সুরবাহার আমরা সবিশেষ উপভোগ করেছি সত্য কিন্তু এখানেই কি রেডিও মাসে তাঁদের কর্ত্তব্যের ইতি হল?

শিশু-নর্ত্তকীদের ভবিষ্যৎ কি?

সংবাদপত্রে সভা-সমিতির স্তম্ভের পাশে তিন কি চার ইঞ্চি জায়গা জুড়ে কোন নৃত্যরতা আট কি দশ, বড় জোর বার বছর বয়সের মেয়ের ছবি দেখেছেন আপনি? দেখেছেন নিশ্চয়ই। প্রায়ই দেখে থাকেন। শালোয়ার-কামিজ পরা সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। নাচেও হয়ত মেয়েটি ভালই। গুরুজনদের কেউ রীতিমত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী রেখে নাচও শিখিয়ে থাকেন এদের। পাড়ার বিজয়া সম্মিলনীতে, অন্য পাড়ার জলসায়, ক্লাব কি স্কুলের পারিতোষিক বিতরণী সভায় নাচতেও দেখা যায় এদের। কিন্তু সেই মেয়ের বয়স যেই সতেরো-আঠারো হল তার পিতা-মাতা বা অন্যান্য গুরুজনেরা তাকে পাত্রস্থ করলেন। পাত্রস্থ অবশ্য তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন কিন্তু সেই মেয়েটি অর্থাৎ যে মেয়েটির মধ্যে একজন বিখ্যাত নাচিয়ে হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা ছিল পুরোমাত্রায়, সেই নাচিয়ে মেয়েটির সমস্ত ভবিষ্যৎটি কি নষ্ট হল না সঙ্গে সঙ্গে? কেবলমাত্র সুপাত্র অন্বেষণেই কি নাচ শেখার জন্য অর্থব্যয়, পরিশ্রম? শেষ অবধি কি হল তার পরিণাম? অবশ্য তাবলে সবাইকেই যে ইসাডোরা ডানকান কি পাভলোভা হতে হবে তা বলছি না। তবুও যাদের মধ্যে প্রতিভা আছে, বিয়ের পরেও তারা যদি নাচের অনুশীলন করেন তো ক্ষতি কোথায়?

বাঙলার বাইরে বাঙলার গান

আপনি সংবাদ রাখেন কি না জানি না, বাংলা দেশে আমরা যখন মহল, বাজী, আরপার, জাল, আনারকলি ইত্যাদি ছবির গানের মহড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি ঠিক তখুনি বাংলার বাইরে অবাঙ্গালীরাই বিশেষ করে বাংলার গায়ক হেমন্তকুমার, শচীন দেববর্মণ, সুচিত্রা মিত্রের গান শোনবার

সদারঙ্গ সঙ্গীত-সমাজের বার্ষিক অনুষ্ঠানের ছায়াছবি

ওস্তাদ আলী আকবর খান —হীরা বাঈ বরদেকার

—ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান —তারাপদ চক্রবর্তী ও তদীয় পুত্র

জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আমরা বাংলা দেশে লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাইহার থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের ডেকে আনছি অথচ ঘরের কাছের বাঙ্গালী গাইয়েদের স্থান দিচ্ছি না। একেই বলে গেঁয়ো যোগীর ভিখ্ মেলে না। আমাদের জাতির পক্ষে এ অতি লজ্জার ব্যাপার! অবিলম্বে বাংলার সঙ্গীতশিল্পীদের বাংলা দেশে জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। হিন্দী সঙ্গীতশিল্পীর অত্যন্ত লঘুস্তরের গ্রামোফোন রেকর্ড লক্ষ লক্ষ টাকা বাংলার জনসাধারণের কাছ থেকে লুঠে নিয়ে যাচ্ছে, সম্মান নিয়ে যাচ্ছেন ভিন্ন প্রদেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা অথচ বাংলা দেশে বাঙ্গালী গায়ক-গায়িকার রেকর্ড বিক্রি হয় না! এই শীতের মরসুমে বাংলা দেশে যে-সব সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি হবার তোড়জোড় হচ্ছে তার কর্তৃপক্ষদের আমরা এ বিষয়টিতে নজর দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাংলা দেশে বাদ্যযন্ত্র-বাজিয়ে হ্রাস পাচ্ছে

কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রও বাংলা দেশে কখনো অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকেনি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, গত কয়েক বছরের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র-বাজিয়েদের সংখ্যা বাংলা দেশ থেকে ক্রমেই যেন কমে আসছে। কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আধুনিক গানেরই প্রচলন অধিকতর হয়েছে। সহজসাধ্য বিষয়বস্তুর উপর লোকের আকর্ষণ থাকবেই, বিশেষ তা যদি আবার অতি অল্পকালের মধ্যে খ্যাতি ও অর্থ বয়ে আনে। কাজেও হচ্ছে তাই; বাংলার ঘরে ঘরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আধুনিক গান ক্ষীণ-কণ্ঠীগণ পরিবেশন করে চলেছেন। অর্থও হয়ত পাচ্ছেন কিন্তু স্থায়িভাবে কোন কিছু? নিজেই কি শিল্পী পরিতৃপ্ত হচ্ছেন এতে? গীটার বাজানোর রেওয়াজ হঠাৎ বাংলায় কিছু দিন তীব্র হয়ে উঠল। এ যন্ত্রটি শুনতে মিষ্ট হলে কি হবে, এতে দখল আনতে সবিশেষ যত্নের ও সাধনার প্রয়োজন। গীটারে দু'-একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর কি বড় জোর দু'-একটা রাগ বাজালেই হল না। এ ছাড়া সেতার, স্বরোদ, বেহালা, বীণা, খোল, মৃদঙ্গ পাখোয়াজ আরও কত রকমের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এতে খ্যাতি সময়সাপেক্ষ। পরিশ্রমও প্রচুর। সাধনা করতে হবে বিস্তর। শিল্পী বাঙ্গালী কখনই তো তার জন্য শিল্পকে পরিত্যাগ করেননি? আজই বা নতুন রবিশঙ্কর, আলি আকবরেরা আসবে আসবেন না কেন?

কলকাতায় সঙ্গীত-নৃত্য বিদ্যালয়

কলকাতায় প্রতি রোড, ষ্ট্রীট খুঁজলে আপনি কি কি পাবেন? একটি মুদীর দোকান? একটি ড্রাই-ক্লিনিং? সেলুন? রেঁস্তোরা? পাবেন বই কি। আরও অনেক কিছু পাবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাবেন একটি সঙ্গীতনৃত্য বিদ্যালয়। আপনার মেয়েটির কণ্ঠ ভাল, তাল-মান বজায় রেখে অল্প বয়সেই গাইতে পারে, নাচের সম্বন্ধে কিছু কাণ্ডজ্ঞানও আছে। বয়স ধরে নিলাম পনেরো, যোল কি বড় জোর সতেরো। পাড়ার স্কুল। বিশেষ কিছু না ভেবেই একদিন ভাল দিন-ক্ষণ দেখে মেয়েটিকে সেই নৃত্যসঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানি গানের খাতা (মলাট-দেওয়া একসার সাইজ বুক) হাতে করে আপনার কন্যা নিয়মিত হাজিরাও দিতে লাগলেন সেখানে। কিন্তু সেখানে

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা কি করেন? দু'-একজন বড় বড় নামকরা গাইয়ে-বাজিয়ের নাম প্রায় সব স্কুলের লিষ্টেই দেখে থাকবেন। তাঁরা সত্যি সত্যি আসেন কি? না পাড়ারই কোন সমীরদা,' শ্যামলদা' সামান্য কিছু সঙ্গীতের রসদ নিয়ে আসলে অন্য উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীত-বিদ্যালয়গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন? রাতের অন্ধকারে কার হাত ধরে মেয়ে বাড়ি ফিরে আসছে, তা জানেন কি? এই সঙ্গীত-নৃত্য বিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরে কি ঘটছে তার কিছু-কিছু কথা আমাদের কানে প্রায়ই এসেছে। সরকারের পুলিশ বিভাগের কাছে এ বিষয়ে আমাদের নিবেদন যে, গুণ্ডাদমনের আগে সমাজের বিকৃত দিকগুলির প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান করে ভদ্রবেশী দুশ্চরিত্র এই সব লোকগুলিকে এবং এদের পশ্চাতে যে সব অসৎ ধনী ব্যক্তিরাও রয়েছেন তাঁদের বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা অচিরে করুন। আন-রেজিষ্টার্ড কোন সঙ্গীতনৃত্য বিদ্যালয়কে তাঁরা কলকাতায় থাকতে না দিলেই অনেকখানি উপকার পাবেন কলকাতার নাগরিকবৃন্দ। প্রতি তিন মাস অন্তর এই সব বিদ্যালয়ে কি কি কাজ করা হল আর হল না, তার চেক-টেকিং করেন কে? ম্যানেজিং কমিটী বলে কিছু আছে কি তাদের? হিসাব-নিকাশ পরীক্ষক? এক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি সঙ্গীতনৃত্য বিদ্যালয় সম্পর্কেই আমাদের এ বক্তব্য তা নয় কিন্তু অনেক নামী এবং কম-নামী বিদ্যালয় সম্পর্কে নানা অভিযোগ প্রত্যহই এখানে এসে জমা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা রইল। চুড়িদার আর্দ্দির পাঞ্জাবী, সেনগুপ্তর ধুতি, জে-জির স্যাণ্ডাল পরিহিত হংস সদৃশ চেহারাযুক্ত ব্যাক ব্রাসকরা কামানো ঘাড় অমুকদা' তমুকদা'রা সময়ে সাবধান হোন!

স্বাধীন ভারতে সঙ্গীতের প্রসার

কয়েক বছরেরই ব্যাপার হবে, সারা ভারত জুড়েই হঠাৎ কেমন যেন একটা সঙ্গীতের আবহাওয়া গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। নানা প্রকার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সভা, সম্মেলন, জলসা খুবই বেড়ে গেছে সংখ্যায়। একমাত্র কলকাতাতেই আমরা যতদূর জানি, বিজয়ার পর এ বছর প্রায় শতাধিক নাচ-গান-বাজনার জলসা হতে দেখা গেছে। নাচ-গানের স্কুল খোলা হয়েছে প্রচুর। শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে দিন-দিনই। সম্মেলনে রাত থাকতে টিকিট কেনবার আশায় ইট মাথায় দিয়ে রাস্তায় শুয়ে থাকতেও জনসাধারণকে দেখা যাচ্ছে। কোনও প্রকার মন্তব্য না করেই আমরা এর ভবিষ্যৎ কি হয়, তাই দেখে যাচ্ছি।

যদু ভট্ট সম্পর্কে দু'টি পত্র

ভারতীয় সঙ্গীত-জগতে বিষ্ণুপুরের অবদান অনস্বীকার্য্য। প্রাচীন মল্লরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহ দানে বহু গুণী জ্ঞানী সঙ্গীতজ্ঞের সাধনায় বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতধারা এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য অর্জনে স্বর্গীয় যদু ভট্টের অবদান অসামান্য। তৎকালীন প্রচলিত বিষ্ণুপুরী ধারার সহিত ভারতের বিভিন্ন ঘরাণা, বিভিন্ন ঢংয়ের সামঞ্জস্য সাধন পূর্ব্বক যে নিজস্ব ধারা ও গায়েকী তিনি প্রচলন করেন তাহা অপূর্ব্ব! তৎকালে তাঁহার নাম শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র পশ্চিম-ভারতেও বিখ্যাত হয়। অথচ বিষ্ণুপুরবাসী আমরা শুধু তাঁহার নামই শুনি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। বিষ্ণুপুরের কৃতী সন্তান, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গত ১৩৬১ সালের আষাঢ় সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে স্বর্গীয় যদু ভট্টের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই অসামান্য প্রতিভাধরের স্বরচিত মনোমোহনকারী সঙ্গীতের ন্যায় তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনও অভিনব। এই অমর গায়কের জীবনী ছায়াচিত্রে সন্নিবিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে—ইহা সুসংবাদ! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা ও তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে বঙ্গভারতী সমৃদ্ধা হইবেন। এই গুরু দায়িত্ব বহন করিবার যোগ্যতা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আছে। তিনি এই বিষয়ে উদ্যোগী হইলে বিশেষ সুখী হইব।

শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

মাসিক বসুমতী আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'যদু ভট্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে (৪৮১-১১ পৃঃ) লিখেছেন,—'রঙ্গনাথ' ভণিতাযুক্ত গান 'যদু ভট্টের'। কিন্তু ভাদ্র সংখ্যায় তিনি বাহার-তেওরার যে গানটিং স্বরলিপি দিয়েছেন তার মধ্যে 'রঙ্গনাথ' ভণিতা থাকা সত্ত্বেও—'বৈজু বাওরার একটি গানের স্বরলিপি—(৭৩৮—৩৯ পৃঃ) এইরূপ উল্লেখ দেখছি। সঙ্গীতটি বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত সঙ্গীত-মঞ্জরী থেকে উদ্ধৃত বলা হয়েছে। এখন জিজ্ঞাস্য—ঐ গানটির রচয়িতা কে, বৈজু-বাওরা না —যদু ভট্ট? আমরা বৈজু বাওরার রচিত গানে বৈজু বাওরার ভণিতা পেয়েছি এবং যদু ভট্টের গানে রঙ্গনাথ ভণিতাও দেখেছি। সহসা আজ উক্ত গানে রঙ্গনাথের ভণিতা এল কেন বুঝি না। সেজন্য অনুরোধ, রমেশ বাবুকে জানিয়ে বা আপনি যদি ব্যাপারটা জানেন, তাহলে সমস্যাটি পূরণ করে দেবেন। রমেশ বাবু যদু ভট্ট প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন, তাঁর (যদু ভট্টের) রচিত অমূল্য সঙ্গীতগুলি আলোচনা ও প্রচারের সময় এসেছে। বাঙ্গলার সঙ্গীত-সমাজের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য রয়েছে। এ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা যেন সচেতন থাকি। আমাদের আশঙ্কা, এই কর্ত্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে রমেশ বাবু একটু ভুল করে ফেলেছেন কিম্বা সম্পাদনের বা উক্ত সঙ্গীত-মঞ্জরীর ভ্রমপূর্ণ মুদ্রণ জন্য 'রঙ্গনাথের' স্থলে বৈজু বাওরার নাম চিহ্নিত হয়ে গেছে। আমাদের এ সন্দেহ নিরসন করলে বিশেষ অনুগৃহীত হব। নমস্কার জানবেন।

বিনীত—
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তানসেনের একটি গান

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি

মালকোশ,—ঝাঁপতাল

ধ্রুপদ

গঙ্গা শোহে শীষ মহাদেব জগদীশ
যোগিগণ ধ্যানমে পাবত দরশন।
সুন্দর বদন পর কোটি সুরজ জোত ধর
বয়ল বাহন অঙ্গ ভস্ম বিলেপন।
সেলী বাঘাম্বর শ্রবণ কুণ্ডল ঔর
গর রুণ্ডমাল নাগ শোহাবন।
তানসেনকে প্রভু অপনী কৃপা কীজে
গৌরীকে নাথ তুম শম্ভু নারায়ণ।

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
সা -া | সমা -া মা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা -া মা | মজ্ঞা মা | দা ণা দা | মা মা | জ্ঞা সা সা |
গ ০ ঙ্গা০ ০ শো হে০ ০০ শী ০ ষ ম০ হা দে ০ ব জ গ দী০ ০ শ

২ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
সা -া | সা ণ্দ্া ণ্া | সা মা | মা মা জ্ঞা | মা দা | ণা দা মা | মজ্ঞা মা | জ্ঞা সা -া ||
যো ০ গি গ০ ণ ধ্যা ০ ন মে ০ পা ০ ০ ব ত দ০ র শ ন ন

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মজ্ঞা -া | মা ণদা -ণা | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | র্সণা র্সা | র্মা র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্মা | র্জ্ঞ র্সা র্সা |
সু ০ ০ ন্দ র০ ব দ ন প র ০ কো০ টি সূ র জ জো ০ ত ধ র

২´ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১
র্সা র্সা | র্সা ণা দা | ণা দা | মা জ্ঞা জ্ঞা | মা ণদা | ণা দা মা | মজ্ঞা মা | জ্ঞা সা -া ||
ব য় ল: বা ০ হ ন অ ০ ঙ্গ ভ ০ ০ স্ম বি লে০ ০ প ন ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মা -া | মা -া মা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা মা -া | মজ্ঞা মা | ণদা দা ণা | দা মা | জ্ঞা সা সা |
সে ০ লী ০ বা ঘা০ ০০ ম্ব র ০ শ্র০ ব ণ০ কু ০ ণ্ড ল ঔ ০ র

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
সা সা | ণ্া দ্া ণ্া | সা মা | মা জ্ঞা -া | মা ণদা | র্সা ণদা দমা | মজ্ঞা মা | জ্ঞা সা -া ||
গ র রু ০ ণ্ড মা ০ ল ০ ০ না ০০ ০ গ০ শো০ হা০ ০ ব ন ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মজ্ঞা মা | ণদা ণদা ণা | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা | সর্মা -া র্মা | মর্জ্ঞা র্মা | র্জ্ঞা র্সা র্সা
তা০ ০ ন০ ০০ সে ন কে প্র ভু ০ অ প নী ০ কৃ পা০ ০ কী ০ জে

২´ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১
দর্সা -া | র্সা -া র্সা | ণদা ণা | দা মা মা | মজ্ঞা মা | দা ণা দা | মজ্ঞা মা | জ্ঞা সা -া ||
গৌ ০ রী ০ কে না০ ০ থ তু ম শ০ ০ ম্ভু ০ না রা০ ০ য় ণ ০

দোকানের লাগোয়া বইয়ের দোকান

বইয়ের দোকানের নানা প্রকার উন্নতি করবার জন্য আমরা ইতিপূর্বে অন্যত্র অনেক কিছু লিখেছি। এবারে খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অন্য দোকানের লাগোয়া বইয়ের দোকান কলকাতায় অন্যান্য দেশের মতই দেখা যাচ্ছে। অন্য দোকানের সঙ্গে লাগোয়া দোকান হিসেবে এ-যাবৎ আমরা পান-সিগারেটের দোকান, খুব ছোট ষ্টেশনারী দোকান, ফুলের ও ফলের দোকান ইত্যাদি দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। চৌরঙ্গী ও ধর্মতলা অঞ্চলে অবশ্য অনেক দিন থেকেই খুব কম সংখ্যায় লাগোয়া বইয়ের দোকান ছিল। কিন্তু সে সব দোকানকে প্রায়ই বইয়ের দোকান না বলে ম্যাগাজিন বিক্রীর স্থান বললেই যথাযথ হয়। দু'-একটি দোকানে কিছু বিদেশী কম দামের পুস্তকের সুলভ (পকেট-বুক সাইজ) সংস্করণ পাওয়া যে যেত না তা নয়। কিন্তু এখন উত্তর ও দক্ষিণ-কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেও এ জিনিসটিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এই প্রথা খুবই সময়োপযোগী। অল্প খরচে (এস্টাবলিশ-মেণ্ট) এই সব দোকান খুব কম লাভ রেখেই জনসাধারণের জ্ঞানের চাহিদা মেটাতে পারবেন। এই প্রথাটি ব্যাপকতর হোক, এই আমাদের অনুরোধ।
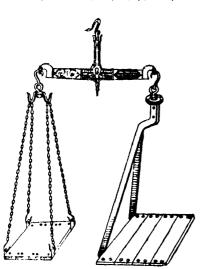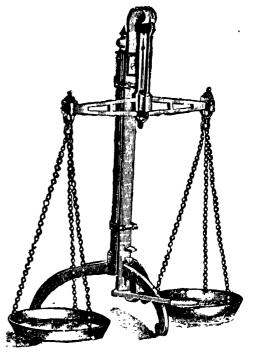
সাধারণ কাঁটা—নানান্ সাইজের আছে। নানা কাজের জন্য। দাম ও হরেক রকমের।

নিক্তি—সোনারূপার দোকানের ব্যবহারের জন্য দাম ষাট টাকা থেকে পঁয়ষট্টি টাকা।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

উপদেশ বলে ভাববেন না কথাটিকে। আর এ-ও ভাববেন না যে, সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র ফাঁকা কথা বলে আপনাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছি আমরা। আসলে সমস্যাটিকে সমস্যা বলে মেনে নিয়েই তার জন্য কিছু প্র্যাকটিক্যাল রেমিডির কথাই চিন্তা করছি আমরা। কিছু আলোকপাত করতে পারলেই কাজ হল বলে জানব। সমস্যাটি বেকার-সমস্যা। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে নাম-লেখানো বেকারের সংখ্যা কয়েক লক্ষ গত বছরের কেন্দ্রীয় সরকারী হিসেবে তা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট হাজার গ্র্যাজুয়েট ও দু'-আড়াই লক্ষ ম্যাট্রিক পাশ যুবক রয়েছেন। এ ছাড়াও এমন বহু বেকার নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা লজ্জায় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যেতে পারেননি। অনেকে জানেনই না কি ফাংশান এর। পল্লীগ্রামে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের প্রসার নেই কিন্তু বেকার আছে; অথচ সব চেয়ে দুঃখের কথা, এর দশ ভাগের এক ভাগ লোকেরও বছরে চাকরী জুটছে না। তাহলে? চাকরী না থাকলে তো সরকার চাকরী তৈরী করতে পারেন না? সুতরাং এ সমস্যার সমাধান হবে কি করে? দেশে নানা প্রকার প্রজেক্ট, স্কীম বাড়লেও তাতে দশ লক্ষ লোকের চিরকালের জন্য পাকা চাকরী হবে না। সকলকেই আজ কিছু কিছু ব্যবসায়ে নামতে হবে, বিশেষ করে বাঙ্গালীকে। পাঁচ শো টাকা হাতে করে পশ্চিমা বাঙলা দেশে এসে লক্ষ টাকা কামিয়ে ফেলতে পারে, আর বাঙ্গালী তা পারবে না কেন?

মফঃস্বল সহরে ছোট ছোট এজেন্সী বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিতে পারেন, ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা করে জমিজমা নিয়ে পল্লীগ্রামে শাক-সব্জী, মাছ, ধান, রবিশস্যের ব্যবসা করতে পারেন, আমদানী-রপ্তানীর কাজ, অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ ইত্যাদিও করে দেখতে পারেন। এতে মূলধন প্রারম্ভিক হিসেবে কমই লাগবে। লোকসান হবার ভয়ও কম। যাই করুন, বাড়ীতে বসে থেকে সরকারের কাছ থেকে কেবলমাত্র 'চাকরী-চাকরী' আশা করলে ভবিষ্যতে আপনাকেই পস্তাতে হবে। এমন অনেককে জানি, যাঁরা পাঁচশো হাজার টাকা সিকিউরিটি রেখেও চাকরী করতে রাজী থাকেন, তবু স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে রাজী নন; আমরা তাঁদের উদ্দেশ্যেই বলছি, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

ডাকযোগে বা ভি, পি প্রথায় ব্যবসা

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একদিন হঠাৎ বোম্বাইয়ের এক পুস্তক-প্রতিষ্ঠান থেকে একটি পত্র এসে হাজির। (কি করে তাঁরা ঠিকানা পেলেন জানি না) 'রীডার্স ডাইজেষ্ট' যদি আপনি কম দামে অর্থাৎ মাসিক এক টাকা করে কিনতে চান তো পত্র লিখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাথের ফর্মটি ভর্ত্তি করে পাঠান। পাঠালাম। দেড় টাকার বই এক টাকায় পেলে কার না ইচ্ছা করে পয়সা বাঁচাতে? দিন পনেরো বাদে সেই কোম্পানী থেকে একখানি মোড়ক এল ভি, পি করে। ভেতরে আছে এক মাসের একখানি রীডার্স ডাইজেষ্ট, ওপরে দাম লেখা আছে বারো টাকা চার আনা। এক মাসের বই হাতে নিয়ে সারা বছরের দাম সাধারণ লোক কি হঠাৎ ছেড়ে দিতে চাইবে, বলুন আপনিই? ব্যবসা পরিচালনায় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর এখানেই অভাব। ভি, পি তে ব্যবসা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই চালু আছে। কিন্তু একমাত্র এই ভারতবর্ষেই বোধ হয় এত 'চারশ বিশ' কোম্পানী এই ভি, পিতে জনসাধারণের পরিশ্রমলব্ধ টাকা ঠকিয়ে নেন। এমনটি আর কোথাও নেই। আপনি কাগজে দেখলেন পাঁচ টাকায় ক্যামেরা। সঙ্গে তিন শিশি মাথার তেল বিনা মূল্যে। ঠিকানা—অমৃতসর, জলন্ধর বা অমনি দূরে কোথাও। অর্ডার পাঠালে ক্যামেরার মত একটি বস্তু ও হোমিওপ্যাথিক শিশির তেল এল বটে কিন্তু হাতে না উঠবে ছবি এবং সে তেল না মাখা যাবে মাথায়। এই অসাধু ব্যবসায়ীদের ফলেই ভি, পি প্রথায় ও ডাকযোগে ব্যবসা এদেশে জোরদার হচ্ছে না। পাঁচ টাকা উদ্ধারের আশায় পঞ্চাশ টাকা খরচ করে অমৃতসর আপনি যাবেন না। সরকার এদিকে নজর দিলে তাঁদেরই আয় বাড়ত। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হত।

নববর্ষে ব্যবসায়ীদের দেওয়ালপঞ্জী

ধর ব্রাদার্সের তৈরী ছবির কাজকরা নববর্ষের ক্যালেণ্ডারের কথা আপনাদের আশা করি মনে আছে। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আর সব-কিছুর সঙ্গে সঙ্গে কাগজও দুষ্প্রাপ্য হল এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নতুন বছরে ক্যালেণ্ডার করাই বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। এখন আবার ভাল কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে। দামও কিছু কমেছে। নভেম্বর মাস চলছে। আগামী মাসের গোড়া থেকেই ক্যালেণ্ডার ছাপার কাজ শুরু হবে অনেকের। এই সময়ে আমরা বিশেষ করে একটি বিষয়ে এই সব কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হল ক্যালেণ্ডারের জন্য ছবির কথা। অনেক ভাল ভাল আর্টিষ্টের আঁকা ছবি কম মূল্যেই পাওয়া সম্ভব। বিকৃত শালীনতার সীমা লঙ্ঘিত ছবিসহ ক্যালেণ্ডারগুলি যেন কেউ প্রকাশ না করেন। কারণ, দেশে বিদেশে বাঙলার কালচার বয়ে নিয়ে যাবে এগুলি। সেখানকার লোকেরা যেন ভারতীয় ব্যবসাদারগণের রুচির প্রশংসা করেন। ছাপা যেন উন্নত ধরণের হয়। ভুল-ত্রুটি না থাকে। পরিণামে ব্যবসায়ে সুফলই পাওয়া যাবে এতে। বিজ্ঞাপন দেওয়ারও কাজ হবে।

ফ্যাশানের বালাই নেই—রঙের বিচিত্রতা

'বাংলা দেশের মেয়েদের পোষাকের ফ্যাশানের বালাই নেই'। আমাদের এ লেখা পড়ে কয়েক জন পাঠিকা আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, সারা ভারতে আজ ড্রেস করে শাড়ী পরার রীতি প্রচলিত থাকায় বাঙালী মেয়ের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে না। কাপড় কেনায় বা কাপড় পরার ঢংয়ে, কিন্তু রঙের বিচিত্রতায়? আমরাও স্বীকার করছি রঙের বিচিত্রতা আছে বাঙালী মেয়ের পোষাকে। বহু বিদেশী নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে তা স্বীকার করে গেছেন সেখানকার পত্রিকাগুলির মারফৎ, আমরা তা জেনেছি। রঙের বিচিত্রতা আছে বাঙালী মেয়ের পোষাকে এবং সারা ভারতে আছে একমাত্র বাঙ্গালী মেয়েরই তা। পশ্চিমাঞ্চলে দেখেছি, অধিকাংশ মেয়েকেই ডিপ কালারের শাড়ী পরতে। খুব সম্ভব

শীতের পোষাক কেমন-চাই ?

গ্যাভাডিন, সার্জ্জ, ফ্লানেল, ট্রপিকাল, ওর্সটেড, টুইড, ব্লেজার, কটস্উল ইত্যাদি রকমারি নাম শীতের পোষাক তৈরী করতে গিয়ে আপনি শুনতে পাবেন দরজীর দোকানে। পঞ্চাশ-ষাট টাকা গজ থেকে শুরু করে দু'টাকা বার আনা অবধি দামও হরেক রকমের। তা সে দাম যাই হোক, জিনিষের তফাৎ, দামের কম-বেশী থাকবেই চিরকাল, আমাদের কথা হল, শীতকালে বাঙালী কি পোষাক তৈরী করে পরবে? আমেরিকানদের মত ঢোলা ট্রাউজারের সঙ্গে জ্যাকেট কি জার্কিনস? কোট-প্যান্ট? ওপেন-ব্রেষ্ট কোট না প্রিন্সকোট? মাড়োয়ারীদের মত লঙকোট? পুলওভার? ওভারকোট? কি পরবে সেই মান্ধাতার আমলের মত শাল-আলোয়ান, বালাপোষ? আজকের দিনে শাল, আলোয়ান, বালাপোষ কি সার্জ্জের চুড়িদার পাঞ্জাবী পরে ট্রামে-বাসে ঝুলে ঝুলে কাক-পক্ষীর মত পথ চলা সম্ভব হয় না। কোট-প্যান্ট বিদেশাগত বলে কেউ কেউ আজো করতে পারেন অবজ্ঞা। আর তা ছাড়া একটি স্যুট বানাতে দক্ষিণা দিতে হয় শতাধিক টাকা। সেটাও ভাববার কথা বটে! তাহলে শীতের মরসুমে কি হবে বাঙালীর পোষাক? শুধু মাত্র জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েই এটি আমরা ছেড়ে দিলাম।

কাঁটা-নিক্তি

বাঁদরের পিষ্টক ভক্ষণের গল্প তো আপনার আমার সকলেরই জানা রয়েছে। হিসেব-নিকেশে মাপ করবার যন্ত্রপাতি না থাকলে গরমিল হবেই, এ তো জানা কথা। এবারে প্রকাশিত চিত্রসমূহ বহু-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান গিরিশচন্দ্র ঘোষের। উল্লিখিত মূল্যও ওঁদেরই। এই প্রতিষ্ঠান প্রাচীন এবং এঁদের দ্রব্যগুণের সুনাম ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়িয়েছে। বাংলা দেশের ব্যবসা-জগতে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাঁটা-নিক্তি ছাড়া কাজ চলে না। প্রতিষ্ঠানটি আরও দীর্ঘজীবী হোক এবং উন্নতি করুক, আমাদের এই প্রার্থনা।

ধুলার আধিক্যে কাপড় শীঘ্র শীঘ্র নোংরা হবার ভয়েই। কিন্তু বাঙ্গালী পল্লীকন্যার ডুরে শাড়ীতে যে রঙের বৈচিত্র্য আছে তা প্রশংসনীয়। বনেগালি, শান্তিপুর, দেবীপুর, চন্দননগর প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁতের শাড়ীও (যা পরার রেওয়াজ আজ-কাল বাঙালী মেয়েদের মধ্যে খুব বেশী) প্রশংসা পাবার আশা রাখে। মেয়েদের রঙ্গীন পোষাক পরার বিচিত্রতায় জাপান, ফরাসী, ইত্যাদি দেশে রীতিমত গবেষণা হয়। এদেশও যেন স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অম্লান থাকে।

ছাপা শাড়ীর ডিজাইন

ছাপা শাড়ীর প্রচলন বাংলা দেশে খুব বেশী দিন হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই তা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দামে সস্তা, মনোহারিত্বে অভিনব এবং বর্ণ বৈষম্য থাকায় শাড়ীগুলি স্কুল-কলেজের মেয়ে থেকে শুরু করে গৃহস্থ বধূর সকলেরই কাম্য। প্রিণ্টিং ওয়ার্কসও আজ-কাল কলকাতার মত বড় সহরে, মফঃস্বলের ছোট ছোট সহর-গঞ্জে গজিয়ে উঠেছে, উঠছে এবং ভবিষ্যতে উঠবেও। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, এই সব ছাপা শাড়ীর ডিজাইনগুলি সম্পর্কে। চীৎপুরের দোকানের তৈরী বহু বার ব্যবহার করা ক্ষয়ে যাওয়া ব্লক সমূহ সস্তা দরে প্রায়ই কিনে আনেন এই সব প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের মালিকেরা। বা যদি সেই কারখানার মুসলমান মিস্ত্রীর (প্রায়ই মুসলমান হয়) কিছু ছবিটবি বা ডিজাইন আঁকার এলেম্ থাকে তো তাকে দিয়েই যেন-তেন-প্রকারেণ আঁকার কাজটা সেরে ফেলা হয়। ব্লক তৈরীর ব্যাপারেও যত্ন নেওয়া হয় না মোটেই। কাপড় কেটে শুকনো এবং ছাপার পর শুকোবার সেই পুরাতন পদ্ধতি বাঁশে বেঁধে রদ্দুরে। এই শিল্পটি যখন উন্নতির মুখে তখন আর্টিষ্টকে দিয়ে পরিকল্পনা করিয়ে ভাল ব্লক ম্যানুফ্যাকচারার্সদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রুচিমাফিক জিনিষ যদি বাজারে এঁরা ছাড়তে পারেন তো ব্যবসায়ে মঙ্গলই হবে তাঁদের।

অপরাধী বুঝ যে যথায়

(অপ্রকাশিত)

৺মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

রামকৃষ্ণ-পদাশ্রয়ে সাধনা চলিত যা'র
গৃহ-ধর্ম আচরি সংসারে,
একটি কথার তরে নীরবে সে গেল চ'লে
কোনো কথা নাহি বলি কা'রে।
কত দিন কত রাত অশনি ও ঝঞ্ঝাবাত—
কত ভাবে গিয়াছে চলিয়া,
যাতনায় অ-যাতনা বেদনায় অ-বেদনা—
থাকিত সে অসহ্য সহিয়া।
আজ সে দ্যুলোক-বাসে দেবতার হাসি হাসে—
কত ক্ষমা সে হাসি-ধারায়,
দানিলে মর্য্যাদা ভানে অপরাধ কোন্‌খানে
অপরাধী বুঝ যে যথায়।

চলচ্চিত্রের নব পর্যায় 'গৃহ প্রবেশ'

পথিক।

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে কিছুদিন হলো একটা প্রচণ্ড রকমের নাড়া লেগেছে। মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবন মন্ত্রে মুমূর্ষু শিল্পের পুনরুজ্জীবন এই দশকের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

বেশী দিনের কথা নয়, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দুরবস্থা দেখে বড় হতাশ হয়েছিলাম। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করেও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে এতটুকু আলোর নিশানা দেখিনি। ভেবেছিলাম, এই মহান ঐতিহ্যের বুঝি এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো। বাংলা শিল্পের যাঁরা ধারক ও বাহক—তাঁদের অনেকেই তখন বোম্বাইয়ে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বিমল রায় ও অজয় কর এর নাম।

তারপর হঠাৎ নাড়া লাগলো। হতাশার মুহ্যমান জড়তাকে ঝাড়া দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সেই অবস্থার চরম পরিণতি ঘটলো যখন বাংলার অজয় কর আবার বাংলা দেশে ফিরে এলেন।

বাংলার শিল্পে চলচ্চিত্র শিল্পী অজয় করের, পরিচালক অজয় কর রূপে আবির্ভাব এক বিরাট বিস্ময়। এর একমাত্র তুলনা মেলে বিমল রায়ের ক্ষেত্রে। অজয় করের 'অনন্যা' তাঁর অনন্য সৃষ্টি, 'বামুনের মেয়ে' তার প্রতিভার জলন্ত স্বাক্ষর। 'মেজদিদি'র অসামান্য সাফল্য আজও রূপকথার মতো দর্শক সমাজের মুখে মুখে। কিন্তু তা' আমাদের এতটুকুও বিস্মিত করেনি। অসামান্য হলেও অজয় কর স্বচ্ছন্দে সেই অসামান্যতা অর্জন করেছেন। কিন্তু অজয় করের 'জিঘাংসা' বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রজগতকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। সুধীজন একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন 'জিঘাংসা' ভারতীয় চিত্রশিল্পের [illegible]। সেই 'জিঘাংসা'র স্রষ্টা অজয় কর আবার বাংলা দেশে ফিরে এসেছেন। নব চিত্রভারতীর 'গৃহ প্রবেশ' তাঁর নব পর্যায়ের নব অবদান।

এ কথা মানতেই হবে—কাহিনী, কলাকৌশল এবং অভিনয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় 'গৃহ প্রবেশ' কথাচিত্রে সাধিত হয়েছে। অন্ততঃ [illegible] দেখলে সন্দেহের বাষ্পটুকুও থাকে না। শুরু থেকে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। উৎকর্ণ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে শেষ পর্যন্ত দেখতে হয়।

মনে হচ্ছে 'গৃহ প্রবেশ'এর সাফল্য অবশ্যম্ভাবী এবং অবধারিত।

সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রধান তিনটি কারণ ধরা পড়ে। প্রথম কাহিনীর সৌষ্ঠব; দ্বিতীয় পরিচালনা এবং কলাকৌশল; আর তৃতীয় অভিনয় সম্পদ। আখ্যান-ভাগে কোথাও কোন ফাঁক নেই। জম্‌জমাট—হৃদয়াবেগে টইটম্বুর। নাটকের গতি-স্বাচ্ছন্দ বিশেষ লক্ষ্যণীয়। অকারণ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কোথাও মনকে পীড়া দেয় না। কাহিনীকার কানাই বসুর রসজ্ঞান অনস্বীকার্য। তেমনি অপূর্ব অজয় করের গল্প বলার মুন্সীয়ানা। অজয় কর এই চিত্রের পরিচালক, এটাই পরিচালনা প্রসঙ্গে প্রথম ও শেষ কথা। অপরাপর মন্তব্য বাহুল্যমাত্র। চিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রগ্রহণ-কৌশল ও পদ্ধতি, তাঁর শিক্ষক অজয় করেরই অনুগামী। পর্দার ওপর ছবি পড়লে মনটা খুশীতে ঝলমল করে ওঠে। তেমনি প্রশংসনীয় বাণী দত্তের শব্দগ্রহণ, কার্তিক বসুর শিল্প নির্দেশ ও দুলাল দত্তের সম্পাদনা।

মুকুল রায় এই চিত্রের সুরকার। বোম্বাই প্রদেশে তিনি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। বাংলা দেশে নতুন হ'লেও তাঁর সুর সংযোজনা দেখে মনে হচ্ছে বাংলা দেশ থেকে যদি রাইবড়াল, দেববর্মণ এঁরা বোম্বাইতে গিয়ে আস্তানা গাড়তে পারেন, তবে আমরাই বা বোম্বাইয়ের মুকুল রায়কে বাংলা দেশে ধরে রাখবো না কেন?

ভারত বিখ্যাত গীতা রায় ও 'পরিণীতা'র "চল রাধে রাণী"-খ্যাত মান্না দে, তাঁদের কণ্ঠ-সঙ্গীতে চিত্রটিকে এমন একটি পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেছেন যে, নিছক ভাষায় সেটা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

এই চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিল্পিগোষ্ঠীর সমাবেশ। সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোঃ, অপর্ণা, তুলসী চক্রঃ, হরিমোহন বসু, নৃপতি, আশা দেবী—বাংলা ছবিতে এত বিরাট শিল্পী-সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। প্রতিটি চরিত্র পর্দায় এমন নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে, যে শিল্পীর অভিনয় প্রতিভার সঙ্গে পরিচালকের পরিচালন সংযমের সমন্বয় না ঘটলে এমন রসোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টি হয় না। এই সঙ্গে পরিচালক অজয় কর দু'টি নতুন শিশু শিল্পী আমদানী করেছেন—সার্দ্ধ চতুর্থ বর্ষীয় মিঠু ও সপ্তম বর্ষীয়া জলী।

এ চিত্রের পরিবেশক কিনেমা এক্সচেঞ্জ—বাংলা চিত্রের পরিবেশন ক্ষেত্রে এঁদের সুনাম অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু। অজয় করের 'জিঘাংসা'ও এঁরাই পরিবেশন করেছিলেন। এঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবারকার মত বক্তব্য শেষ করছি।

অজয় কর পরিচালিত নব চিত্রভারতীর 'গৃহ প্রবেশ' কথাচিত্রের একটি রোমান্টিক দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার।

রামলীলায় উদয়শঙ্কর

রামলীলা বলতে সচরাচর বাঙালীর সামনে যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা হল বস্তীর মাঝে হিন্দুস্থানী পাড়ায় হাতে-আঁকা একটা সিন কোনও বটগাছের এধার থেকে ওধার অবধি টাঙিয়ে (সে সিন হয়ত হনুমানজীর লঙ্কাদহন পর্বের, নয় ত রামসীতার বনগমনের) সামনে ক'খানা তক্তা আড়াআড়ি ভাবে বসিয়ে তারই ওপর রামায়ণ উপাখ্যানের পাঁয়তাড়া কষা। উদয়শঙ্কর বাঙালীর সেই ধারণাকে নিশ্চয়ই পরিবর্তন করিয়েছেন। রামায়ণের উপাখ্যানের মধ্যেও যে নাটক আছে, তাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্টের কাজে লাগিয়েছেন। সবশুদ্ধ পঁয়ত্রিশটি দৃশ্যে উদয়শঙ্করের রামলীলা বিভক্ত। এক শ' জন শিল্পী। জোরালো আলোর সামনে পোষাক-আষাক পরে সামনে পর্দা রেখে অভিনয় করে গেলেন। পর্দার অপর পারে দর্শকবৃন্দ। খোলামাঠে এ জিনিষ জমেছেও ভাল। আর তাছাড়া রামায়ণের কাহিনী সকলেরই জানা থাকায় দর্শকগণের পক্ষে কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নাই। 'রামলীলা' নামটি পরিবর্তন না করায় উদয়শঙ্করকে আমরা দুঃসাহসীই বলব। শুধু রামলীলাই নয় অন্যান্য পালাসমূহও এভাবে পর্দায় প্রতিফলিত করে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করলে আমাদের বিশ্বাস, জনসাধারণ তা-ও নেবে। তাতে করে উদয়শঙ্করের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকতে পারবে।

Children's Theatre—its future

সম্প্রতি দিল্লীতে চিলড্রেনস্ থিয়েটারের সভা, নাটক, জলসা ইত্যাদি হয়ে গেল। চাচা নেহরু থেকে শুরু করে দিল্লীর সাধারণ জনসাধারণ অবধি এদের ক্রিয়াকলাপ দেখে খুসী হয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিলড্রেনস্ থিয়েটার যে এত বড় 'শো' অর্গানাইজ করতে পারবেন তা আমরাও ভাবিনি। দিল্লীর পর চিলড্রেনস থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি, তা আমরা এখন জানতে পারিনি। যাই হোক, এই শিশু-অভিনেতাদের ভবিষ্যৎ কি, সে সম্পর্কেই আমাদের বক্তব্য। এই সব শিশু-অভিনেতাদের রীতিমত অভিনয় শেখাবার জন্য কোনও প্রকারের ইনষ্টিটিউট খোলবার প্রোগ্রাম এঁদের আছে কি? অভিনয় আজও আমাদের দেশের শিক্ষিত অভিজাত মহলে খুব বেশী প্রচলিত হয়নি। আজও তার সমাজে খুব চল্ নেই। এ সব কথাও ভাববার বটে! অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এমন এক শ্রেণীর সমাজ আছে যাঁরা স্বীকার করতেই রাজী নন। পুত্র-কন্যার বিবাহাদির কাজ তো সেখানে এক প্রকার অসম্ভবই। সব দিক বিবেচনা করে, প্রখর দৃষ্টি দিয়ে তবেই এই চিলড্রেনস থিয়েটারকে যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কতকগুলি শিশুর মাথায় অনর্থক ডেঁপোমী ঢুকিয়ে দিয়ে এঁরা যেন তাদের পরিত্যাগ না করেন।

সঙ্গীত-নাটক-একাডেমী—পশ্চিমবঙ্গে

সঙ্গীত-নাটক-একাডেমী বিশেষ করে এর পশ্চিমবঙ্গের শাখাটির প্রতি একাধিক বার আমরা নানা মন্তব্য করেছি। চোখে আঙুল দিয়ে যাকে দেখিয়ে দেওয়া বলে ঠিক তেমনি করে বহু প্যারা লিখে লিখে তাদের কি করণীয় তা জানাবার চেষ্টা করেছি। অথচ কোনও ফল হয়নি। কানে তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধে চারশো, পাঁচশো, হাজারী মনসবদারেরা 'স্কাই ক্র্যাপার' আলো করে দপ্তর খুলে সব বসে আছেন, কিন্তু কাজ? কাজে কতখানি এগিয়েছেন তাঁরা? ভারতবর্ষের অন্যান্য সব প্রদেশের সঙ্গীত-নাটক-একাডেমী কি ভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় তা কি খবর রাখেন না? নিশ্চয়ই রাখেন, এ আশা আমরা করি এবং তাঁর কাছেই আমরা জানাচ্ছি, এ বিষয়টিতে অচিরে তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করুন। যেন বিচারে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে না থাকে।

ছায়াছবি নির্ম্মাণের জন্য যৌথ প্রতিষ্ঠান

এমন একদিন ছিল এবং এখনও হয়ত কিছু কিছু তা আছে, যখন ছবি তুলতেন প্রোডিউসার নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি। তিনি পরিচালক ঠিক করতেন। পরিচালক ঠিক করতেন অভিনেতা অভিনেত্রী, ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ক্যামেরাম্যান ইত্যাদি নানা টেকনিশিয়ান। ছবির রাজত্বে আজ প্রডিউসার গত। ছবি একালে তুলছেন ডিষ্ট্রিবিউটার্সরাই। নামে হয়ত আছেন একজন প্রযোজক। আসলে অধিকাংশ টাকাই ডিষ্ট্রিবিউটার্সের। ছবির এমন দিন আসতেও খুব দেরী নেই, যখন বাঙলায় ছবি তুলবেন এক্সহিবিটার্সরাই অর্থাৎ সিনেমা কোম্পানীর মালিকগণই হবেন ছবির মালিক। ছবির এই ক্রাইসিসে কিন্তু আমাদের চিত্রজগতের চাঁইদের কোন মাথাব্যথা নেই। আজও শ্রীমতী পিকচার্স, প্রণতি প্রডাকসন্স ইত্যাদি কেন আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করছেন আমরা বুঝছি না। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির পরিমাণ কিছু কালের জন্য কমিয়ে ছায়াছবির জন্য যৌথ প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাঙলায় আজ একান্ত ভাবে দরকার। প্রডিউসার তিন চার জন একত্রে বেশী টাকা খরচা করে ভাল ছবি তুলুন। ছবির সামগ্রিক উন্নতি হবে তাতে। লোকসানের ভয় থাকলে ব্যক্তিগত ক্ষতি কম হবে। যাই হোক, দশে মিলি কাজ করলে হার-জিতে লজ্জার কিছু থাকবে না।

বাঙলা ছবিতে রুচির বিকার

বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবিকে আমরা এত দিন গাল দিয়ে এসেছি প্রাণপণে, এবার কিন্তু আর গাল নয়, একেবারে 'টোটো' নকল করছি আমরা। কিন্তু নকল করতে গেলে হবে কি, বাংলা দেশের অভিনেত্রীদের বোম্বাইয়ের মত সে গ্ল্যামার কই? স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য? তাই বাংলা দেশে অভিনেত্রীগণের দেহের অন্যান্য অংশ আবৃত করে বিশেষ একটি স্থানকে 'প্রমিনেণ্ট' করে দেখানোর রেওয়াজ আজ-কাল অনেক ছবিতে দেখতে পাচ্ছি। কোন একটি অবহেলিত মুহূর্ত্তে আঁচল খসে পড়ায় আপত্তি নেই আমাদের কিন্তু দর্শক-সাধারণ বোকা নন, তাঁরা জানেন, বত্রিশ বৎসর বয়স্কা অভিনেত্রীর বাজারের কোন দোকানে ব্রেসিয়ার পাওয়া যায় অজানা নেই। সুতরাং সকলই নকল হল। আমাদের মনে হয়, সব কিছু ঢাকা-ঢাকি থাকলেই আকর্ষণীয় হত বেশী। দোজ আনসিন্ আর বেট র।

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের কাছে প্রার্থনা

বাংলা দেশে নাটক নেই। নাট্যকার নেই। রঙ্গমঞ্চও আছে কি না সন্দেহ! 'শ্যামলী'র আড়াই শত রজনী অভিনয় যদি না হত তাহলে আমাদের মনে হয় এত দিন ষ্টারের বাড়ীটিতে সরকারী কোন অফিস বসত না হয় সিনেমায় পরিবর্তিত হত ওটি। রঙমহলের সংস্কার হত কি? মিনার্ভায় চুণকাম? হয়ত হত, হয়ত হত না! কিন্তু সত্যি সত্যিই শিশির বাবু, আপনার কাছে আজ আমাদের জিজ্ঞাসা—এই বয়সে বাংলা দেশে নাটকের এই ক্রাইসিস মেটানোতে আপনার কি কিছুই করবার নেই? আবার একবার কলম হাতে আপনি বসুন না? শুরু করুন নতুন কোন পালা। বাংলা দেশ যে মরেনি তা প্রমাণ করে দিন। আপনাকে এ প্রার্থনা জানাবো না তো কাকে বলবো বলুন?

ষোড়শী

অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ ছবি। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দেখে খুসী হয়েছি।

ষোড়শী অর্থাৎ বারো বছর আগে বিয়ে করে কলকাতায় ফেলে-আসা জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর গৃহিণী, সংসারত্যাগী মা চণ্ডীর ভৈরবী। দেখা হল জমিদারী পরিদর্শন করতে গিয়ে হঠাৎ। পেয়াদায় ষোড়শীকে ধরে জীবানন্দের ঘরে রেখে গেল। জমিদার মশাই তখন এ্যালকহলের রসে জর্জ্জরিত। পেটের পীড়ায় বিড়ম্বিত। ষোড়শীর হাত থেকেই খেতে হল মর্ফিয়া সাময়িক ব্যথা হ্রাসের জন্য। পরের দিন সকালে জমিদার মশাই আবিষ্কার করলেন তাঁর স্ত্রীকে। গ্রামের লোক ষোড়শীকে আর ভৈরবী রাখতে রাজী নয়। এক রাত্রি জমিদার-গৃহবাস হয়েছে তার। তারপর একটা টাগ অব ওয়ার। পরে মৃত্যুপথযাত্রী জমিদার চৌধুরী (গ্রামের লোকেরই লাঠির ঘায়ে) স্বীকার করলেন সকলের সামনে অলকা মানে ষোড়শী তাঁরই বিবাহিতা পত্নী। শরৎচন্দ্রের এই গল্পটির মধ্যে দু'টি প্রধান চরিত্র ষোড়শী ও জীবানন্দ। নামভূমিকায় দীপ্তি রায় সময়েই যে ভাল অভিনয় করেছেন একথা বলব না। তবে তাঁর হাঁটাচলা, কথা, ব্যবহারে বেশ একটা ভৈরবীমূলক ভাব দেখতে পেয়েছি। জমিদারের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস 'প্রফুল্ল' ছবির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। দেওয়াল-গিরি হাতে করে ষোড়শীকে মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে দেখতে যাওয়ার দৃশ্য বহুদিন মনে থাকবে। কিন্তু ওই টুকুই। আর কোথাও এতটুকুও বিশিষ্টতা দেখতে পাইনি। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে গ্রাম্য মেয়ে অথচ সহরে বধূর বেশে মানিয়েছিল চমৎকার! অভিনয়ও মন্দ নয়। প্রভাত বাবু যেন অনেকটা মুখস্থ করে ক্লাসের পড়া বলে যাচ্ছিলেন। কমল মিত্র, তুলসী লাহিড়ীর দলটির অভিনয় মনে দাগ দিতে পারল না। অভিনয়ের পর আসা যাক পরিচালনার কথায়। পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মশাই শরৎচন্দ্রের পুস্তকের উপর সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন চিত্রনাট্য করানোর, তা বোঝা যায়। কিন্তু দেওয়ালগিরি হাতে মাতাল অবস্থায় যদি জীবানন্দ চিনতে পারতেন অলকাকে তো ছবিটার 'রিপিট ভ্যালু' হত ওই একটি দৃশ্যের জন্যই! এটুকু কি করা যেত না? সেট, সিন বা আউটডোর কাজেরও কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়ল। ফটোগ্রাফীর কাজ খারাপ নয়। মোটামুটি ছবিটি দর্শকগণকে আনন্দ দিতে পারবে বলেই আমাদের মনে হয়।

গৃহ-প্রবেশ

হাসির ছবি হিসেবে মন্দ নয়। ফটোগ্রাফীর কাজ আশানুরূপ হয়নি। গীতা রায় আর মান্না দেব গান অল্পেই শেষ।

গল্প বলে বিশেষ কিছু নেই। নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ হবে। নিমন্ত্রণ করা হল লিষ্ট করে। নতুন বাড়ী তৈরী করার সময় তদারক করার কাজে এসে তবলায় চাঁটি মারতে বসলেন উত্তমকুমার। সুচিত্রা সেনকে (পাশের টিনের ঘরের বাসিন্দা) নৃত্য শেখাতে। তার পর যা হয়, ভালবাসা। রাগ, অভিমান, কথা-কাটাকাটি। নিমন্ত্রণের লিষ্টে বাদ গেল তারাই। উত্তমকুমার ক্ষমা চাইলেন।

শ্রীবিশ্বভারতীর 'মিনার'এ শীলা রামানী ও বীণা রায়

মলিনা দেবী (বৌদি) সুচিত্রাকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজে টিনের ঘরে এসে গৃহপ্রবেশের কাজে সাহায্য করার জন্য। মঞ্জু দে, জহর গাঙ্গুলীর ও উত্তমকুমারের ভগিনী, এলেন। এর মধ্যে হারিয়ে গেল চাবী। বাড়ীতে এসেছেন একজন অনাহুত। তিনিই কী? না, না ভুলে বাড়ীর কর্তা জহর বাবুই তাঁর গাঁটে রেখেছেন সেটি। তার পর ভেলা গৃহপ্রবেশ। অর্থাৎ সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার এসে দাদাকে (জহর বাবু) প্রণাম। সানাইয়ের আওয়াজ। ছবি শেষ। অভিনয়ের মধ্যে সত্যি সত্যি মনে ছাপ দিয়ে যেতে পেরেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (যদিও সমস্ত ছবিটি এঁকে বাদ দিলেও চলত) মহাশয়। সারাক্ষণ ধরে দর্শকগণকে হাসির খোরাক জুগিয়েছেন তিনি। মলিনা দেবী এই শ্রেণীর অভিনয়ে স্পেশ্যালিষ্ট। উত্তম ও সুচিত্রা সেন কেউই উল্লেখযোগ্য নন। তবু সুচিত্রা সেনকে মানিয়ে গেছে প্রায় সব জায়গায় (শুধু ওই বড় বড় কথাগুলো বরদাস্ত করতে পারিনি) মোটামুটি। উত্তমকুমারের অভিনয় অবশ্য স্থানে স্থানে খুবই স্বাভাবিক হয়েছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে কথা এ ছবিটিতে তিনি খুব কমই (মুদ্রাদোষ কি?) বলেছেন। অজয় বাবুর কাছ থেকে ফটোগ্রাফী খুবই ভাল পাব ভেবেছিলাম কিন্তু নিরাশ হয়েছি অনেকাংশে। উল্লেখযোগ্য কিছু তো চোখে পড়ল না। পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় যথাযথ হয়েছে। বিকাশ রায় একঘেয়ে। সে যাই হোক, হাসির ছবি হিসেবে এ ছবি ভালই হয়েছে বলব। গীতা রায় ও মান্না দের নাম করে দর্শকগণকে ডেকে আরও দু-একখানি গান শোনালে কি তা বাজেটে আসতো না পরিচালকের? আর সব-কিছু যেমনটি হয়।

টকির টুকিটাকি

বিজলী আলোর মালায় সাজানো এই শহরখানা সত্যিই একঘেয়ে হ'য়ে পড়েছে। তাই ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে এখন মহড়া চলছে "সাঁঝের প্রদীপ" জ্বালবার। শ্রীলেখা পিকচার্স সুধাংশু মুখার্জ্জীর পরিচালনায় শীঘ্রই প্রদীপকে আনবেন শহরে। উত্তম, সুচিত্রা, ধীরাজ, মলিনা, ছবি, ছায়া দেবী প্রভৃতি শিল্পীরা প্রদীপ সাজাবার ভার নিয়েছেন। আড়াল থেকে সঙ্গীত পরিবেশনার ভার নিয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জ্জী, গায়ত্রী বসু আর সুরকার মানবেন্দ্র মুখার্জ্জী স্বয়ং।

আগে আর পরে। আগে হয়ে গেল "মরণের পরে", এইবার হবে কিন্তু "মরণের আগে"। দু' তরফের খবর রাখার বাস্তবিকই প্রয়োজন। হিমালয়ান আর্ট প্রোডিওসার্স এর প্রচেষ্টা সাধু বলতে হবে। এদের সাহায্য করার জন্য নামকরা শিল্পীরাই সদলবলে এগিয়ে এসেছেন যেমন ধীরাজ, মলিনা, প্রণতি, সাবিত্রী, শোভা, নমিতা, আশু, জহর প্রভৃতি।

ভিনায়ক প্রোডাকসন্স "জ্যোতিষী" কে ক্যালকাটা মুভীটোনে এনে ফেলেছেন ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য। যে সব শিল্পীদের ভাগ্য ইতিমধ্যে পরীক্ষা হয়েই গেছে তাঁরাই আবার পরীক্ষা দিতে এসেছেন ফ্লোরে। সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়, সুপ্রভা মুখার্জ্জী, দীপক মুখার্জ্জী, প্রশান্তকুমার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরাই পরীক্ষার্থী।

বসন্ত চৌধুরী আর ভারতী দেবী নায়ক-নায়িকা সেজে এবার "রাজপথ" এ এসে দাঁড়িয়েছেন। নতুন "রাজপথ" এখন শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োর মধ্যে গঠনপথে। কনষ্ট্রাকসান পরিচালনা করছেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। মলিনা দেবী, শোভা সেন প্রভৃতি আন্দাজ শ' খানেক চিত্রতারকাদের এই পথে আনা হ'য়েছে। দেখা যাক্ "রাজপথ" কেমন হয়।

জি, বি, প্রোডাকসন্স এবার "মেজ জামাই" কে শহরের লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করাবার আয়োজন শেষ কোরে ফেলেছেন। জামাই কিন্তু একলা পরিচয় দিতে আসবেন না। গুরুদাস, সাধন সরকার, সতু, মতিলাল, আশু বোস, সন্ধ্যা, তপতী, গীতশ্রী প্রভৃতির মধ্যেই "মেজ জামাই" থাকবেন।

"গোধূলি"র ছবি তোলা হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। পরিচালনায় রয়েছেন কার্তিক চ্যাটার্জ্জী। ছবিখানিকে সুন্দর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দীপ্তি রায়, সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী, মলিনা, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। আনুষঙ্গিক গানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চ্যাটার্জ্জী। ছবিখানি শহরে পরিবেশনার ভার নিয়েছেন অরোরা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

"রাণী রাসমণি"র জীবন কাহিনী চিত্রে রূপায়িত করছেন পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ। সব-কিছু ব্যবস্থার ভার পড়েছে সমর ঘোষের উপর। বালিকা রাসমণির রূপ দিচ্ছেন শিখারাণী বাগ। সুটিং চলছে রীতিমত ভাবেই রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে।

নামকরা লোকেদের জীবনী অবলম্বনে ছবি তোলার যেন হিড়িক পড়ে গেছে। পরিচালক নীরেন লাহিড়ী বিগত যুগের গুণী সঙ্গীতশিল্পী "যদু ভট্ট"র জীবন কাহিনী অবলম্বনে ছবি তুলছেন এবার। প্রায় বিশ জন শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পীকে নামিয়েছেন আসরে সুরকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। আশা করা যায়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মুখর হ'য়ে উঠবে ছবিখানা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জ্জী

"মহাপ্রস্থানের পথে" ছায়াচিত্রেই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ —বললেন একান্ত বিনম্র ভাবে কুশলী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জ্জী। আধুনিক যুগে যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে চিত্রজগতে আসছেন—এঁর ভাল-মন্দ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এঁদের কি ধারণা, এ জানবো ও জানাবো বলেই শ্রীমতী অরুন্ধতীর সঙ্গে আমার এবারকার সাক্ষাৎকার। তিনি বাঙ্গালার একটি শিক্ষিত অভিজাত-পরিবারের মেয়ে, শান্তিনিকেতনেই তাঁর বেশীর ভাগ পড়াশুনো। সেখানকার সংস্কৃতির ছাপ তাঁর কথায় ও প্রতিটি কাজে পরিস্ফুট। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পড়াশুনো করেছেন। এদিক থেকে তাঁর চিত্রজগতে অবতরণ উল্লেখযোগ্য স্বীকার ক'রতেই হ'বে।

আমি যে দিন শ্রীমতী অরুন্ধতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে গেলুম, গিয়েই দেখি, তিনি স্যুটিং সেরে সবে গৃহে ফিরেছেন। দেখলুম তিনি বেশ উৎফুল্ল, কাজে তাঁর এতটুকু ক্লান্তি বোধ নেই। আমি এসে পৌঁছে গেছি এখবর পেয়েই তিনি একটু দেরী ক'রলেন না। এসে সরাসরি বসলেন তাঁর ড্রইংরুমে—তার পরই সুরু হ'লো চলচ্চিত্র সংক্রান্ত

আমাদের আলাপ-আলোচনা। আমি কতকগুলো বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানতে চাইলুম, তিনি দিয়ে চললেন উত্তর বেশ চট্‌পট্।

কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে শ্রীমতী অরুন্ধতী প্রথমেই বললেন, আমি খুব বেশী ছবিতে অভিনয় করিনি—মাত্র দু'খানা ছবিতে। এর ভিতর অবিশ্যি দু'খানা ছবিতে অভিনয় ক'রে আমি যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছি। এ দু'খানি ছবির একটি হচ্ছে "মহাপ্রস্থানের পথে" যা'তে আমার প্রথম অভিনয় রাণীর চরিত্রে, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে "নদ ও নদী"—এ'র অনুশীলার ভূমিকায়। দু'খানাতেই দু'ধরণের চরিত্র ছিল বলে আমার ভাল লেগেছে।

ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবো, এ ধরণের মনোভাব আমার কোন দিনই ছিল না। প্রেরণা বা উৎসাহও তেমন কিছু আসেনি কোন দিক থেকে। তবে একটা জিনিষ ছিল অভিনয়ের প্রতি অনুরাগ। আর একটা জিনিষ, বরাবরই আমি গান গাইতে ভালবাসি। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনোর সঙ্গে গান গাইবার অভ্যাস আমার ছিল। এ ভাবে আত্মবিশ্লেষণ ক'রলেন শ্রীমতী অরুন্ধতী, আমি যখন প্রশ্ন করলুম তাঁকে একটি। তিনি এখানেই থামলেন না; চলচ্চিত্র জগতে কি ভাবে তিনি এলেন বলতে যেয়ে স্পষ্টই বললেন—এ লাইনে আসবার উৎসাহ বা প্রেরণা বলতে যদি কিছু আমি পেয়ে থাকি সে হচ্ছে "মহাপ্রস্থানের পথের" মাধ্যমে নিউ থিয়েটার্সে'র সঙ্গে যোগাযোগ। তার পর থেকেই আমি শিল্পি-জীবন বরণ করে নিয়েছি। এ লাইনে এসে আমার রুচি বা চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু এই মাত্র পার্থক্য ঘটেছে—পূর্ব্বে গৃহে যতটা সময় দিতে পারতুম এখন ততটা পারিনে।

শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জ্জী

বিশেষ কোন "হবি" আছে কি না জানতে চাইলে শ্রীমতী অরুন্ধতী সহাস্য বদনে বললেন—দৈনন্দিন জীবনে 'হবি' কোন্‌টা আমি ঠিক বুঝি না। তবে এই মাত্র বল্‌বো বই পড়ায় আমার সখ আছে। আর গান গাওয়া, সে আমার নিত্য সহচর। তবে এ গুলোকে আমি "হবি" বলতে চাইনে। আমার নানা দেশের পুতুল সংগ্রহের অভ্যাস আছে। এটাকে 'হবি'র পর্য্যায়ে ধরতে পারেন, আর ব'লতে পারেন আমার দেশ-বিদেশের মুদ্রা সংগ্রহের অভ্যাসটাও একটা 'হবি'।

আমার অপর একটি প্রশ্নে শ্রীমতী অরুন্ধতী বললেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আমি পড়ে থাকি, তার ভেতর দৈনিকগুলো তো আছেই। সাময়িক পত্রের ভেতরে "মাসিক বসুমতী," "স্পোর্টস্ এণ্ড প্যাষ্টাইম্‌স্" "দেশ" এরূপ কয়েকটি কাগজ আমি পড়ি এবং পড়তে ভালবাসি। অপর দিকে গীতা থেকে আরম্ভ করে সব রকম মূল্যবান গ্রন্থই আমি পড়ে থাকি শুধু "Crime Story" গুলো পড়তে ভালবাসি না। কলেজ-জীবনে গল্প ও কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল, এখন বলতে গেলে একেবারেই লিখি না। খেলা-ধূ'লোর মধ্যে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা দেখতে আমার ভাল লাগে। আর সকল খেলা দেখতেও আমি যে উৎসাহ পাইনে তা নয়, তবে কোন খেলাতেই আমি কখনও অংশ গ্রহণ করিনি। পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে আমি খুব হালকা পোষাক কখনই পছন্দ করিনে। স্থান কাল বিবেচনায় পোষাকেরও তারতম্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পোষাকের ব্যাপারে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে হ'বে। নিজের রুচির পরিচয় যেন পোষাকে থাকে তা যত সাধারণই হোক, যত অনাড়ম্বরই হোক।

চলচ্চিত্র-জগতে আসতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণ থাকতেই হ'বে, জিজ্ঞেস করলুম আমি। ধীর ভাবে শ্রীমতী অরুন্ধতী বললেন, সব থেকে বড় প্রয়োজন অভিনয়-জ্ঞান। এর সঙ্গে থাকা চাই শিল্পগত গ্রহণ-ক্ষমতা, সুকণ্ঠ, সচেতন বোধ ও সপ্রতিভ ভাব। শিল্পিজীবনে কোনটাই অতিরিক্ত নয়—শিক্ষা যত বেশী হবে শিল্পীর আত্মবিশ্বাসও বাড়বে সে পরিমাণেই।

এ প্রসঙ্গটি টেনে নিয়ে আরও বললেন, চলচ্চিত্রে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যত বেশী আসবে ততই এ শিল্পের উন্নতি হ'বে, আবহাওয়ার দিক থেকে তো বটেই। সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও আমি এ'কে খুব উচ্চ স্থানে দিই। আমার মতে অন্যান্য শিল্পের যে স্থান এ শিল্পের স্থানও একই রূপে। পরন্তু এ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে অন্যান্য শিল্পের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এখন এ লোকশিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম।

এ ভাবে আলোচনা যখন এগিয়ে গেল তখন আমি শ্রীমতী অরুন্ধতী ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চান, জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম। অল্প দু' একটি কথায় তিনি জানালেন—প্রথম—জীবন আমার কেটেছে শিক্ষা ও গান-বাজনার মধ্য দিয়ে। আমি যখন এম, এ, পড়ছি তখন আমার বিয়ে হয়। বি'য়ে হবার পরও শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আমার ঝোঁক কাটেনি। ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মসূচী সম্পর্কে এইমাত্র বলতে পারি। যত দিন চলচ্চিত্র শিল্পের সাধনা সম্ভব হবে, তত দিন এ লাইনে থাকতেই আমার ইচ্ছা। দূর ভবিষ্যতের কথা এখনই বলা যায় না।

জন্মদিবস উপলক্ষে ভাবিয়া দেখিলে

"প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার জন্মদিবস উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বাণীতে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের ভালবাসা ও প্রীতির চেয়ে তাঁহার নিকট অধিকতর কাম্য আর কিছুই নাই। ইহা যে প্রধান মন্ত্রীর যোগ্য কথা, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ভালবাসা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধি করে, তাঁহার এ কথাও খুবই সত্য। তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবাসীকে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিবার জন্য তাঁহারা যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা সার্থক করিবার জন্য যেন এই ভালবাসার শক্তি ব্যবহৃত হয়। তাঁহার এই আশাও যে অতি মহতী আশা, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভালবাসার এই শক্তিকে দেশবাসীকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিবার কাজে নিয়োগ করিবার দায়িত্ব শাসকবর্গের। এই দায়িত্ব কতখানি তাঁহারা প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই দেশবাসীর গভীর প্রীতি ও ভালবাসা কতখানি তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাহার পরিমাপ করিতে হইবে। 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও'—এই ধরণের ব্যবস্থা দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ করা কোন দিনই সম্ভব হইবে না। স্বাধীনতার সাত বৎসরে ভারতবাসী তাঁহার স্বপ্নের ভারতের দিকে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহা নেহরুজী তাঁহার জন্মদিবস উপলক্ষে ভাবিয়া দেখিলে সত্যকারের পরিচয় পাইতেন।"

—দৈনিক বসুমতী

বাঙলা ও বিহার

"১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক্ প্রদেশে পরিণত হয়—আর তখনি বাঙ্গলার কতকগুলি ও উত্তর প্রদেশের কিছুটা অংশ লইয়া বিহারের সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী, মৈথিলী, ভোজপুরী ও আদিবাসী, সব গিয়া পড়ে বিহারের আওতায়। কংগ্রেস ইংরেজের এই কৃত্রিম ব্যবস্থাপনাকে অনুমোদন করেন নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেই তাঁহারা ইহার প্রতিকার করিবেন, বার বার এই আশ্বাসবাক্য শুনাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দেশের শাসনভার পাওয়ার পর এই পুরানো অব্যবস্থার প্রতিকার ত করিলেনই না, উড়িয়া ভাষা-ভাষী খরসোয়ান ও সেরাইকেল্লা রাজ্য দুইটি পর্য্যন্ত বিহারের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতেই মানভূম, সিংভূমে বাঙালীদের উপর দমন ও পীড়ন সুরু হইয়াছে এবং বাংলা ও উড়িষ্যার দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য সরকারী বেসরকারী সকল মহলই সমান তৎপর হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্যেই বিষয়টির সমাধান হওয়া উচিত এবং তাহা হইবে বলিয়াই, প্রধান মন্ত্রী সর্বভারতীয়তার ভিত্তিতে ফজলে আলি কমিশন গঠন করিয়াছেন। আর কমিশন যাহাতে অবাধে ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিতে পারেন, তজ্জন্যই অন্তর্বর্তীকালে আন্দোলন, হট্টগোল, সমালোচনা প্রভৃতি না করার জন্য সমস্ত প্রাদেশিক ইউনিটকে নেহরুজী আদেশ করিয়াছেন। কার্য্যকালে দেখিতেছি, এ আদেশে বিহার আদৌ কর্ণপাত ত করেই নাই, বরং এক দিকে বাঙ্গালার বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার করিতেছে, অন্য দিকে অনুচিত উক্তি করিয়া, সর্বভারতীয় ঐক্য ও সৌভ্রাত্রের ক্ষতিসাধনেই অগ্রণী হইয়াছে। ভাষাভিত্তিক কমিশনের কাজ ইহাতে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইবে—দুই সহোদর-প্রদেশের মধ্যেও বৃথা সম্পর্ক তিক্ততার সৃষ্টি করিবে আমরা আশা করি, প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে তিনি বিহারী নেতৃবৃন্দের অনুতভাষী রসনা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সমুচিত ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন। বাঙ্গালা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়, ঝগড়া চায় না—কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যাকে নিঃশব্দে পরিপাক করিবে না।"

—যুগান্তর।

শিক্ষকের বৃত্তি

"মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের এবং সাধারণ ভাবে শিক্ষক-সমাজেরই প্রতি 'সমবেদনা' প্রকাশের অথবা 'উদারতা' প্রকাশের যে মনোভাব লইয়া প্রায়ই সরকারী ও বেসরকারী বিবৃতির প্রকাশ ও প্রচার হইয়া থাকে, সেই মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে আন্তরিকতারই অভাব প্রমাণিত করে। বিষয়টি শিক্ষক-সমাজের প্রতি করুণা প্রকাশের প্রশ্ন নহে, সুবিচারের প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞদিগের এই রিপোর্টের বহু বক্তব্যের মধ্যে একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, শিক্ষকদিগের সম্পর্কে সুবিচার প্রদর্শনের নীতির প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। করুণা নহে, উদারতাও নহে, শিক্ষকদিগের প্রতি সঙ্গত এবং সুবিচারসম্মত কর্তব্য পালনের প্রয়োজন সম্বন্ধে উক্ত রিপোর্ট ভারত সরকারকে অবহিত করিয়াছে। শিক্ষকদিগের জীবিকার আর্থিক অসঙ্গতির দুঃখকে কোন প্রকারের বৃত্তিগত পবিত্রতার নীতি এবং আদর্শের দোহাই দিয়া চাপা দিবার আগ্রহ কোন কোন আদর্শবাদীর বিবৃতি ব্যক্ত হইতে আমরা দেখিয়াছি। বিশেষজ্ঞদিগের রিপোর্টে ইহার নিন্দা করা হইয়াছে। আমরা ইতঃপূর্বে বহু বার বহু প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তির নিন্দা করিয়া সরকারী প্রধানদিগকে এবং কোন কোন বেসরকারী আদর্শবাদী

হিতৈষীকে স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি যে, শিক্ষকের বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার দোহাই দিয়া শিক্ষকের অর্থনৈতিক দীনতার প্রশ্নকে তুচ্ছ করা হৃদয়হীন পরিহাসের বিলাস মাত্র। সরকারী ও বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে জনসেবায় ও জনশিক্ষার বিষয়ে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর বৃত্তিই পবিত্র। শিক্ষকগণ বৃত্তির অর্থকারিতা সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া 'গুরু' রূপে প্রাচীন ভারতের তপোবন আদর্শের রীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন, এইরূপ আশা করা বাতুলতা। কারণ বর্তমান জাতীয় জীবনের কোন কর্মের ক্ষেত্রেই তপোবন আদর্শের চিহ্ন নাই। কালের নিয়মে পরিবর্তনে ও প্রয়োজনে শিক্ষকতাও বৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বৃত্তির গুরুত্ব বুঝিয়াই বৃত্তির অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ দল সুপারিশ করিয়াছেন, শিক্ষকদিগের শিক্ষিতত্বের মান অনুসারে তাঁহাদিগের বৃত্তির আর্থিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শিক্ষিতদের জন্য কর্মী যে পরিমাণ বেতন ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়া থাকেন, শিক্ষকদিগকে তাঁহাদিগের শিক্ষিতত্বের মান অনুসারে অনুরূপ বেতন ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে হইবে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভারতের মালয়-নীতি

"মালয়ের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বংশোদ্ভূত গণপতি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়া অমর ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা এক চিত্র। অপর চিত্র হইল, মালয়ে বৃটেনের হিংস্রতম যুদ্ধে ভারত সরকারের নীতি, যাহা কার্য্যত: বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সহায়তা করে। সিঙ্গাপুরস্থিত বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ক্রমে ভারত সরকার রীতিমত মালয়ে জঙ্গল-লড়াইর তাঁবু সরবরাহ করিয়া যাইতেছেন। বৃটিশ বন্ধুতার ঐতিহ্য বহন করিয়া চলার জন্য ভারত সরকারের এই নীতি যে ভারতবাসীর কতখানি ঘৃণার বস্তু, কংগ্রেসী শাসকেরা তাহাও জানেন। দেশবাসীর তুমুল বিক্ষোভের ফলেই তাঁহারা ভারত মারফৎ মালয়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুধু অস্ত্র নয়, যুদ্ধের কোন সাজ-সরঞ্জামই ভারত হইতে মালয়ে না যায়, ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা এবং দাবী তাহাই। ইন্দোচীনের যুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সকল সাজ-সরঞ্জাম প্রেরণই ভারত সরকার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন! তবে মালয় সম্পর্কে ভারত সরকারের পৃথক নীতি হইবে কেন এবং কেনই-বা বৃটিশ বন্ধুতার ঐতিহ্য বহনকারী এই নীতিকে ভারতের নর-নারী সহ্য করিয়া চলিবেন?"

—স্বাধীনতা

কল্যাণীর বাড়ী

"কল্যাণীতে সরকারের খরচে বাড়ী তৈরির জন্য ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই সব বাড়ী মধ্যবিত্তদের জন্য তৈরি হইলে কল্যাণীর ভুয়া স্কীম বাঁচাইবার চেষ্টায় আবার এতগুলি টাকা জলে দেওয়া হইতেছে। প্রথমত: এই সব বাড়ী কয়দিন টিকিবে? পণ্ডিত জহরলালের জন্য তৈরি বাড়ীতেই যদি এক পশলাতে জল পড়ে তো এগুলিতে কি হইবে? একটা মাঠের মাঝখানে বাড়ী তুলিয়া তাহাকে সহর বলিয়া অভিহিত করিলেই উহা সহর হইয়া যায় না। উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট ভুবনেশ্বর সহর গড়িতে গিয়া কম জব্দ হন নাই। যেখানে লোকের জীবিকার উপায় নাই সেখানে কেহ থাকিতে পারে না। দুই ঘণ্টার রাস্তা দূরে থাকিয়া এবং দৈনিক দুই টাকা রেল ভাড়া দিয়া কলিকাতায় যাহাদের কাজ, তাহারাও সেখানে থাকিতে পারে না। কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার লোভ দেখাইয়াও কুল মিলিবে না। ঐ টাকায় নিকটবর্তী ছোট সহরগুলিতে রাস্তা, জল এবং আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিলেই বরং সুফল হইত। সহর আপনি গড়িয়া উঠিত।"

—যুগবাণী।

ডাকবাক্স নেই?

"দয়ানগর অঞ্চলের যে সকল অধিবাসী এই মিউনিসিপ্যালিটির নাগরিক, তাঁহাদিগকে পৌর জীবনের একটা বড় রকমের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহা বর্তমান সভ্যযুগে যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে লজ্জার কথা। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তাঁহাদিগকেও পত্রাদি লিখিতে হয় কিন্তু পত্রাদি ডাকে দেওয়ার জন্য সিকি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হয় খাগড়া, নয় কাশিমবাজার ওয়ার্ডে অবস্থিত নিকটতম ডাকবাক্সে পত্রাদি ফেলিতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের যে অসুবিধা হয় তাহার প্রতি কর্তৃপক্ষ একটু সদয় হইলেই তাহা দূর হইতে পারে। ইহার প্রতীকারে দয়ানগরের মধ্যস্থলে একটি ডাকবাক্সের ব্যবস্থা করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

অধম-তারণ না অধম-তাড়ন?

"সম্প্রতি বর্গাদার আইন পাশ হওয়ার পর আক্ষরিক অতি বুদ্ধিমানেরা তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বুদ্ধি-ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হইতে সুরু করিয়া ভাবী মামলার বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিলেন। চাষারাও যাঁহারা "যার বাপের ঠিক নাই তার বাপের ঠিক নাই" এই প্রবাদের গুরুত্ব বোধ করেন, তাঁহারা যে সর্ত্তে বা কড়ারে জমি আবাদ করিতে লইয়াছিলেন, সেই অঙ্গীকার বজায় রাখিয়া নির্বিরোধে জমি আবাদ করিয়া জোতদারের সঙ্গে পূর্ব্ব-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যের মতলবপূর্ণ কৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে পদাঘাত করিয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতেছেন। মতলববাজ মামলাজীবী বা বদবুদ্ধির সয়তান নিজেদের "উদরং পরিপূরয়েৎ" মন্ত্রে দীক্ষিত ফন্দীবাজদের ধাপ্পায় বর্গাদার আইনের সুবিধা লইতে গিয়া যে সব বর্গাদার ফৌজদারী আইনের ধারায় পড়িয়া নয়নধারায় বুক ভিজাইয়া ফেলিতেছেন, তাঁহাদের দশা দেখিয়া কষ্ট হয়। জোতদারদের আর্থিক অবস্থা বর্গাদারদের অপেক্ষা শতকরা নিরানব্বই জনেরই স্বচ্ছল। বর্গাদারকে মামলায় নামিয়ে অধিকাংশকেই এক আদালতেই হাল গরু বিক্রয় করিতে বাধ্য করা যায়। শতকরা একজনকে ঠেলিয়া হাইকোর্টে লইয়া গেলে সে মামলা বরাবর জিতিলেও কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষুকে পরিণত হইবে। কংগ্রেস সরকার বর্গাদারদের মত অধম শ্রেণীর কৃষিজীবীদের সুবিধার জন্য আইন করিয়া উৎসাহী মামলাজীবীদের খপ্পরে পড়িবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ জোতদার ও বর্গাদারের সংঘর্ষে মাঠের ধান মাঠেই পড়িয়া নষ্ট হইবে। মামলার পর মামলার উদ্ভব হইলে যাহাদের তারণ করিবার উদ্দেশে আইন, তাহাদেরই তাড়ন ছাড়া আর কিছুই হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ

সিউড়ী বিজলী আলো

"সিউড়ী ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বর্তৃত্ব সরকার গ্রহণ করিতেছেন, এ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। দীপান্বিতার দিন সহরের বড় রাস্তা ষ্টেশন-রোড যেন নিষ্প্রদীপের মহড়া চলিতেছিল। কালীপূজার দিন এবং তৎপর দিনও ষ্টেশন-রোড সোনাতোড় পাড়ার রাস্তা ছিল অন্ধকারে আবৃত। সংবাদ লইলে কোম্পানীর লোকে বলে রাস্তার আলোর পোষ্টগুলি দুষ্টবুদ্ধি ছোকরার দল নাড়া দিয়া যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দেয় ও বালব নষ্ট হইয়া যাওয়ায় রাস্তায় আলো জ্বলে নাই। শাল বল্লার পুরাতন পোষ্টে রুই লাগিয়া ও জলে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে, সামান্য ঝড় বাতাসেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। দীর্ঘ কয়েক বৎসরের মধ্যে এই পোষ্টগুলি পরিবর্ত্তন করা হইল না, এ অবস্থা আর কত দিন চলিবে?" —বীরভূম বাণী।

রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

"রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটীর ইলেকশন এই বৎসরেই অনুষ্ঠিত হইবে এবং আগামী বৎসর হইতে নূতন নির্ব্বাচিত কমিশনারগণ এই পৌরসভার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রাথমিক ভোটার-তালিকা পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং গত ২১শে তাহার আপত্তির শুনানিও শেষ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বহু ভোটারের নাম এই তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে (অবশ্য যোগ্য ব্যক্তিদের গাফিলতিতেই ইহা হইয়াছে)। যাঁহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে তাঁহারা যেন জেলাশাসক মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়া তালিকাভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশে এই পৌরসভার নির্ব্বাচন বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেও এ বিষয়ে সজাগ নহি, নাগরিকতা বোধের অভাব আমাদের আছে। কিন্তু রাণাঘাটে যে করদাতৃ-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারাও কি সজাগ নন? তাঁহাদের উচিত ছিল "ভোটার-তালিকা"র অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য যথোচিত প্রচার করা এবং সকলকে সচেতন করিয়া তোলা। যাই হো'ক, মন্দের ভাল হিসাবে এখনও যদি তাঁহারা ইহা করেন তবে তাঁহাদের নিজেদের এবং সকলের পক্ষেই মঙ্গল।" —বার্ত্তাবহ (রাণাঘাট)

চুরি-ডাকাতির প্রতিকার চাই

"আদরপাড়া চুরি, চুরির প্রচেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। রাস্তাঘাটের অব্যবস্থা, বহু অঞ্চল একান্ত জঙ্গলাকীর্ণ রাখিতে দেওয়া এবং রাস্তায় আলোদানের অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ইত্যাদি, সমাজদ্রোহিগণকে উৎসাহিত করিতেছে বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস। গত মঙ্গলবার রাত্রিতে শ্রীঅসিত দত্তের ঘরে সিঁদ কাটিয়া চোর প্রবেশ করে এবং একরূপ প্রকাশ—গহনাপত্র সমেত মূল্যবান বহু জিনিষ চোর লইয়া পলায়ন করিয়াছে। একই রাত্রিতে শ্রীসুরেশ সাহার বাড়ীতেও চুরির চেষ্টা করা হয় কিন্তু ঘরের লোক শব্দ পাইয়া জাগিয়া যাওয়ায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুলিশের নিয়মিত টহলদারী এখানে অত্যাবশ্যক।" —জনমত পত্রিকা (জলপাইগুড়ি)

টুঁ শব্দটি নাই?

"রবিবারে ডাকঘরে ছুটি দিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্মীদের প্রতি করুণ-হৃদয় হইয়াছেন সত্য, কিন্তু দেশবাসীর অসুবিধাই বাড়াইয়াছেন। রেলওয়ে, ট্রাম, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, খবরের কাগজ—নাগরিক জীবনের এই সব অপরিহার্য্য প্রয়োজনগুলিকে অব্যাহত রাখাই কর্ত্তব্য। ছুটির দিনে বেতন দিলে অধিকাংশ কর্ম্মচারীই উল্লসিত হইবে—জানিতে পারিয়াছি। দেশবাসী কেমন যেন বিহ্বল, নতুবা অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাদের মুখে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই কেন?" —পল্লীবাসী (কালনা)।

শোক-সংবাদ

দেবেন্দ্রনাথ দে

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ হুইপ এবং উপ-মন্ত্রী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে গত ১লা নভেম্বর সোমবার সকালে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণনগর শান্তিপুর রাস্তায় এক শোচনীয় মোটর-দুর্ঘটনায় আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে'র বয়স ৪১ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা পত্নী ও দুইটি নাবালক পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহার মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের একজন শক্তিশালী কংগ্রেস-সেবীর অভাব হইল। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান করুন।

জীবনানন্দ দাশ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কবি জীবনানন্দ দাশ গত ২২শে অক্টোবর শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে দেশপ্রিয় পার্কের সংলগ্ন রাস্তায় ট্রামের ধাক্কায় গুরুতররূপে আহত হন—শেষ পর্য্যন্ত এই আঘাতই তাঁহার জীবনান্তের কারণ হয়। মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে কবি জীবনানন্দ পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন, ইহা যেমন নিদারুণ দুঃখের কথা, তেমনি শোচনীয় আঘাত! রবীন্দ্রযুগের শেষ পর্ব্বে বাংলা দেশে যে নবীন কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক দল দেখা দিয়াছিলেন জীবনানন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। জীবনানন্দ ছিলেন শান্তিপ্রিয়, নির্বিরোধী, বন্ধুবৎসল ও স্বল্পভাষী। ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করার পর সিটী কলেজে তিনি প্রথম অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে তিনি দিল্লীতে, বাগেরহাটে ও বরিশালেও কিছু কাল অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৩৩৬ সালে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" প্রকাশের পর প্রকৃত পক্ষে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সমাদর পাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "মহাপৃথিবী" 'সাতটি তারার তিমির' এবং সম্প্রতি একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভীরু অভিসার

—মণিপদ দাশ (শান্তিনিকেতন) অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

অগ্রহায়ণ, ১৩৬১]

[৩৩শ বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

(স্থাপিত ১৩২৯)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। 'যে সমন্বয় করেছে সেই লোক। অনেকেই এক ঘেয়ে। কিন্তু আমি দেখি সব এক। শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্ত মত সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। তাঁরই নানা রূপ। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা—সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। বেদে বলেছে—ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তন্ত্রে বলেছে—ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব, পুরাণে বলেছে—ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "সেজ বাবুর সঙ্গে ক'দিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজ বাবু বললে—বাবা, ওখানে কি কচ্চ? আমি হেসে বললাম,—মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজ বাবু বুঝেছে যে ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে,—বাবা, ওখানে কি কচ্চ? আমি হেসে বললাম—মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজ বাবু বুঝেছে যে ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে,—বাবা, সরে এস, সরে এস। এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "দেশে গেলাম, রামলালের বাপ (তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর) ভয় পেলে। ভাবলে যার তার বাড়ীতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার করে দ্যায়। আমি বেশী দিন থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।"

নরসিংহ নাড়িয়াল

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সেকালে সমাজ-বন্ধন সুদূরপ্রসারী ও সুদৃঢ় ছিল এবং যাঁহাদের প্রতিভা ও কর্মশক্তি সমাজের ব্যবস্থায় ও কল্যাণে প্রযুক্ত হইত, তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। এইরূপ একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তির বিচিত্র উপাধি-বিশিষ্ট নাম "নরসিংহ নাড়িয়াল"। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য যাঁহাদের দ্বারা প্রধানতঃ মণ্ডিত হইয়াছে তিনি তাঁহাদের অন্যতম—তাঁহার একটি সামাজিক ঘটনা হইতে পাঁচ-ছয় শত বৎসর ধরিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে "কাপ" নামক এক পৃথক্ শ্রেণী-বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই নাম অন্য কোন সমাজে প্রচলিত নাই। ঘটনাটি বহু গ্রন্থে বহু বার প্রকাশিত হইয়াছে—আমরা সংক্ষেপে প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিতেছি। বারেন্দ্র শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রে গাঞি-সংখ্যা ২৪—তন্মধ্যে একটি হইল "নাউড়ী" (পাঠান্তর লাড়ুলী, লাউড়ী, লাউল ইত্যাদি)। কান্যকুব্জ হইতে প্রথমাগত গৌতমের অধস্তন ১৬ কি ১৭ পুরুষ "আরু ওঝা" হইতে এই গাঞি সৃষ্টি হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে গাঞি-সৃষ্টি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। আরু ওঝার অধস্তন অষ্টম পুরুষ নরসিংহ শ্রোত্রিয় ছিলেন। তিনি বিখ্যাত কুলীন মধু মৈত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন—এ সম্বন্ধে যে অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা কত দূর সত্য, বলা কঠিন। আমরা মূল গ্রন্থ হইতে ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি—"মধুয়াই মৈত্র নরসিংহ নাড়ুয়ালে একাবর্ত্ত করিয়া নাড়ুয়ালের কন্যা গ্রহণ।...আমুয়াই অর্জ্জুনাই দুই পুত্র পিতাক উপেক্ষা করিয়া অনন্তবাঙ্গাল ওঝাং ক (রণ) করেন। তাহার পর মধুয়াই মৈত্র আমুয়াই অর্জুনাই দুই পুত্রেক উপেক্ষা করিয়া ভোজনে উপকার লন ধিক্রাই বা (গ. ছি)২, করণে উপকার লন শুয়াই বা (গ. ছি)২।" (কর্ত্তা শ্রোত্রিয়ের কল্প)। পিতা-পুত্রের এই সংঘর্ষ কালে উপেক্ষিত ও সমাজে নিগৃহীত পুত্রদ্বয় প্রথম "কাপ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এ জাতীয় সামাজিক ঘটনার স্মারক তদানীন্তন একটি "তরজা" উদ্ধৃত হইল :—

কেহ বোলে কর্ত্তা কেহ বোলে কাপ।
কেহ বোলে বেটা কেহ বোলে বাপ।

নরসিংহের নাম বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সামাজিক কীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল এবং তাঁহার বংশধর কলিযুগ-পাবনাবতার অদ্বৈতাচার্য্যের সম্পর্কেও তাঁহার নাম স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছে।

হঠাৎ ৪১২ গৌরাঙ্গাব্দে ঈশান নাগর রচিত "অদ্বৈতপ্রকাশ" মুদ্রিত হইলে তাহার একটি পয়ার নরসিংহকে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্ত্তিতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়া ধরিল এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী মুগ্ধ চিত্তে তাহা আবৃত্তি করিয়া অপূর্ব্ব গৌরব অনুভব করিতে লাগিল :—

যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা।

রাজা গণেশের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের মূলে একজন নাড়িয়াল শ্রোত্রিয় ছিলেন—কথাটা ঘুণাক্ষরেও বারেন্দ্র-সমাজে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে জানা ছিল না। ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় অদ্বৈতপ্রকাশের প্রামাণ্যবিচার বিস্তৃত ভাবে করিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ ৪৩৩-৬৫)। ইহা "আধুনিক জনের রচনা" বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি কেহ খণ্ডন করেন নাই—কিন্তু আলোচ্য পয়ারটিতে যে একটি রুচিকর খপুষ্প অনেক ঐতিহাসিককেও বিভ্রান্ত করিতেছে, এখনও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। উক্ত পয়ারের পরেই "যাঁর কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি" পঙ্‌ক্তিতে নরসিংহের চিরন্তন সামাজিক কীর্ত্তি খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু নরসিংহের কন্যাবিবাহ ও রাজা গণেশের রাজত্বের মধ্যে কালব্যবধান ছিল প্রায় ১০০ বৎসর—অর্থাৎ নরসিংহ কোন প্রকারেই রাজা গণেশের মন্ত্রী হইতে পারেন না। আমরা সংক্ষেপে তাহার প্রমাণাবলী উপস্থাপিত করিতেছি।

(১) বারেন্দ্র শ্রেণীর সমাজমালানুসারে মৈত্রবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজস্থান হইল মধ্যগ্রাম—"সমাজমুখ্যো মধ্যগ্রামঃ, তত্র কুলীন-কৃতবিশ্রামঃ।" মধু মৈত্র এই স্থানের শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন এবং তাঁহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ বংশাবলী, করণ, ব্যাখ্যা, কল্প, ছিটা প্রভৃতি নানাবিধ রচনার মধ্যে সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য ছিল। ১২৯২ সালে কুচবিহারের জজ (রায় বাহাদুর) যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই সকল বিলুপ্যমান রচনা সংগ্রহ করিয়া "কুলশাস্ত্রদীপিকা" মুদ্রিত করেন। মধু মৈত্রের একটি ধারা এই (ঐ, ২য় সংস্করণ, পৃ ৩৭) :—মধুয়াই—রক্ষিতাই—লক্ষ্মীধর—বিভাই (এক স্থলে সামাজিক অর্থে তাঁহাকে "গৌড়ের রাজা" বলা হইয়াছে)—শূলপাণি। লাহিড়ীবংশে "নরপতি মহামিশ্র" নামে একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন, অমুদ্রিত বহুতর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে আমরা তাঁহার ১৭টি কুলসম্বন্ধের বর্ণনা পাইয়াছি—তন্মধ্যে দুইটি হইল এই শূলপাণি মৈত্রের সহিত। মহামিশ্রের সর্ব্বশেষ সম্বন্ধ হইল শূলপাণির ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের সহিত—"মাজগ্রামের ত্রৈলোক্যনাথের কুশে মহামিশ্র লাহিড়ীর গঙ্গালাভ," এই বচন বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থে পাওয়া যায়। মহামিশ্রের পুত্রই মহানৈয়ায়িক প্রগল্ভাচার্য্য (বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চ্চা, পৃ ২৫৪-৫৭)। আমরা মহামিশ্রের জন্ম ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ধরিয়াছি (ঐ, ২৫৭ পৃ)। তাঁহাকে সমকালীন ধরিলেও মধু মৈত্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক বশতঃ তাঁহার সহিত মধু মৈত্রের ও তৎসম্পর্কিত নরসিংহ নাড়িয়ালের ব্যবধান হয় ন্যূনপক্ষে ১০০ বৎসর।

(২) অদ্বৈতাচার্য্যের পিতাকে অদ্বৈতপ্রকাশে "নৃসিংহসন্ততি" ও "সেই বংশ উদ্দীপক" বলা হইয়াছে—নৃসিংহের পুত্র স্পষ্ট বলা হয় নাই। অথচ ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতের জন্ম হইলে রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব তাঁহার পিতামহ দ্বারাই সম্ভাবিত হয়, কোন ঊর্দ্ধতন পুরুষ দ্বারা নহে। এই গুরুতর সমস্যার সমাধান অদ্বৈতপ্রকাশের অনুসরণ করিয়া "বাল্যলীলাসূত্র" নামক গ্রন্থে দুঃসাহসের সহিত কল্পিত হইয়াছে—ইহারও প্রামাণ্য বিচার ডাঃ মজুমদার করিয়াছেন (পৃঃ ৪৭৩-৮০)। ইহার প্রথম সর্গে অদ্বৈতের বংশপরিচয় আমূল প্রদত্ত হইয়াছে। সমস্ত মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে ভরদ্বাজ গোত্রে আদিপুরুষের নাম লিখিত আছে "গৌতম"—কিন্তু এই

গ্রন্থানুসারে গৌতমের পিতা শ্রীহর্ষই প্রথম গৌড়ে আসেন এবং রাঢ়ে যাইয়া "কুকার্য্যভাক্" সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করেন। পরে কনৌজ হইতে গৌতম বারেন্দ্রে আসেন। পুরুষ গণনার পার্থক্য দূর করিতে ৬।৭ পুরুষের নাম যথেচ্ছ বাদ দিয়া আক্ক ওঝাকে গৌতম হইতে দশম পুরুষ করা হইল। আক্কর পৌত্র শ্রীপতি দত্ত "চকার গ্রন্থং স্মৃতিসারমেকং"। অদ্বৈতের পিতামহই গণেশমন্ত্রী নৃসিংহ এবং নৃসিংহের তুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিদ্যাধর ও শকটারি। কুলশাস্ত্র-দীপিকায় "নাউড়িয়াল" বংশের বিবরণ (২য় সং, পৃঃ ২৬২-৬৫) মুদ্রিত না হইলে উদ্ধৃত গ্রন্থের জাজল্যমান কৃত্রিমতা সম্পূর্ণ ধরা পড়িত না। নরসিংহের তুই পক্ষে সাত পুত্র ছিল এবং পাঁচ পুত্রেরই ধারা দীর্ঘকাল বিদ্যমান ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যাধর, তৎপুত্র ছকড়ি (যাঁহাকে শকটারিরূপে নরসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কল্পনা করা হইয়াছে !!), তৎপুত্র কুবের আচার্য্য (যাঁহার "তর্কপঞ্চানন" উপাধি সম্পূর্ণরূপে অমূলক), তৎপুত্র অদ্বৈতাচার্য্য। অদ্বৈতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ কোন প্রকারেই গণেশের সমকালীন হইতে পারেন না। বংশবর্ণনা স্থলে বহু প্রসিদ্ধ লেখক তত্তদ্‌বংশীয়দের গৃহে রক্ষিত তালিকা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রামাণ্য বিচারে এই সকল তালিকার কোনই মূল্য নাই—আমরা বহু স্থলে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। অদ্বৈতবংশের একটি তালিকায় (Dacca Review, March 1913) নরসিংহের ঊর্দ্ধতন ৪ পুরুষের নাম ও উপাধি সম্পূর্ণ কৃত্রিম (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ৪৭১)। বারেন্দ্র-বংশের তালিকা কুলপঞ্জীর পুথিও তদনুযায়ী কুলশাস্ত্রদীপিকার সহিত না মিলিলে প্রামাণিক হইতে পারে না।

(৩) পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দের লোক ধরা হইত (নগেন বসু—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃঃ ৪৮)। মধু মৈত্র উদয়নের ২১ পুরুষ পরবর্ত্তী—সুতরাং এখন আর উদয়নকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পরে টানিয়া আনা যায় না। মৈথিল স্মার্ত্ত চণ্ডেশ্বরের 'রাজনীতিরত্নাকর' গ্রন্থে কুল্লু কভট্টের নাম আবিষ্কৃত হওয়ায় কুল্লূক ও তাঁহার সমকালীন উদয়নের অভ্যুদয়-কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে ১২৫০-১৩০০ খৃঃ অবধারিত হয়। কুলগ্রন্থে কালনির্ণয়ের অসংখ্য সূত্র লিপিবদ্ধ আছে। তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উদয়নাদির ও মধু মৈত্রাদির কালগণনায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু অমৃতের স্থলে লবণাক্ত জলের ন্যায় প্রামাণিক কুলগ্রন্থের স্থলে কৃত্রিম রচনায় তৃপ্তিবোধ করা এখন একটি মারাত্মক রোগ বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে।

চাই

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হোক নগণ্য তুচ্ছ ক্ষুদ্র ম্লান,—
আমি চাই শুধু মহালক্ষ্মীর দান।
যে দান স্নেহের, যে দানে রয়েছে
অফুরন্তের ছাপ,
কণার পিয়াসী আমি চাহি না'ক
বৃহৎ কাঠার মাপ।
তাঁহার প্রসাদী শুষ্ক পুষ্প
সে নির্ম্মাল্য মোর,
চাহি না'ক আমি কুবেরের দেওয়া
হেম-চম্পক ডোর।
সুধা-সাগরের শীকর ভিখারী আমি,—
লবণাম্বুর মুক্তার চেয়ে দামী।

অঙ্গার হোক তাহাও গৌরবের
বিভূতি সে শত রাজসূয় যজ্ঞের।
ধূলি হোক তাও পরম যতনে
আমি শিরে লই তুলি'
পরশ দিয়েছে তাহাতে তাঁহার
চরণের অঙ্গুলি।
সেই সঙ্গীতই পরমানন্দে
করি আমি উপভোগ
রাঙা চরণের মঞ্জীর সাথে
রয়েছে যাহার যোগ।
কত অদ্ভুত শক্তি তাঁহার জানি—
আমার পুতুলে দেবত্ব দেন আনি।

যাহা গাই, গাই আমি যে তাঁহার গীতি,
অনুভব করি তাঁহার উপস্থিতি।
দুখ-তুখ নয় বেদনার চেয়ে—
আনন্দ পাই তাতে,
যেই জানি আমি করুণাময়ীর
পরশ রয়েছে তাতে।
রয়েছে অভাব, আছে অনটন,
শুষ্ক রুক্ষ দেহ,—
আমি দেখি গায়ে গড়ায়ে পড়িছে
মোর জননীর স্নেহ।
অহঙ্কারেই রই যে আত্মহারা—
মহালক্ষ্মীর তনয় লক্ষ্মীছাড়া।

মায়ের আলোকে ভুবন গিয়াছে ভরি।
আমি খেলা করি মাটির প্রদীপ গড়ি।
চাতকের মত চাহি মনে মনে
বিন্দু-ফটিক জল,
আকাশ ঢাকিয়া মেঘ জমে আসে
আঁখি করে ছল ছল।
গন্ধ চাহিব ? নন্দন বন—
খুলে দেয় সব দ্বার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছোঁড়ে পুষ্পপরাগ
সুবাসিত মন্দার।
স্নেহময়ী বড় দয়াময়ী মোর মা যে,
চাই আমি বটে—চাওয়া কি আমার সাজে ?

জনৈক ইংরেজ যোগীর এভারেষ্ট অভিযান!

শ্রীঅসিত মৈত্র

হিলারী-হান্ট-তেনজিং এর দলের এভারেষ্ট অভিযানের (!) কিছু দিন পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন নানা পত্র-পত্রিকায় এক কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ দেখা যায় যে, এক দল ভারতীয় যোগী যোগ-মহিমা প্রচার মানসে, আধুনিক সমস্ত বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই নগ্ন দেহে এভারেষ্ট অভিযানের উদ্যম করছেন।

অবশ্য এই ভারতীয় যোগীদের পরবর্ত্তী কার্য্য-কলাপের আর কোনও সংবাদই পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই ব্যাপারের একটু পূর্ব্ব-ইতিহাস আছে। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে একজন সাহেব, তিনি আমাদের দেশেরই যোগবিদ্যা শিখে, যোগ-বিভূতি বলে এভারেষ্ট অভিযানের চেষ্টা করেছিলেন (অবশ্য ইনি কাপড়-চোপড় পরেই উঠেছিলেন, নগ্ন দেহে নয়) এ কথা হয়ত অনেকেই জানেন না।

এভারেষ্ট অভিযানের ইতিহাসে ইনিই একমাত্র একক অভিযাত্রী। যদিও তিনি শেষ পর্য্যন্ত একটুর জন্য ঠিক এভারেষ্টের চূড়ায় পৌছাতে পারেন নি তা' হলেও তাঁর অসীম সাহস, অপূর্ব্ব কষ্টসহন-ক্ষমতা এবং মহান্ আত্মবলিদানের জন্য পৃথিবীর মানুষ চিরকাল তাঁকে বিশ্বের সেই সকল বরণীয়, অমর মনীষীদের সমতুল্য ও সমগোত্রীয় বলে স্মরণ করবে। যাঁরা যুগে যুগে দধীচির মত নিজেদের দগ্ধ করে মানুষকে প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা জয় করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং অমৃতময় পথের সন্ধান দিয়েছেন, জ্ঞানালোকে মানুষের হৃদয়ের তমিস্রা দূর করেছেন এবং যার ফলে মানব-সভ্যতা এগিয়ে চলেছে।

এই সাহেব-যোগী একজন ইংরাজ, নাম তাঁর ক্যাপ্টেন মরিস্ উইলসন্। ইংলণ্ডের ব্রাডফোর্ডে তাঁর বাড়ী। তিনি বৃটিশ স্থলসৈন্য বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং রণাঙ্গনে তাঁর বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ মিলিটারী পদক প্রভৃতি লাভ করেছিলেন। সমরাঙ্গনে থাকতে থাকতেই এবং বিশেষতঃ যুদ্ধের পরের কতকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর মন প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র এবং যোগ-বিদ্যার দিকে বিশেষ করে ঝুঁকে পড়ে। তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন এবং বিশেষ করে যোগবিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগের উপবাসের দ্বারা এবং ক্রিয়াকলাপের দ্বারা দৈহিক প্রবৃত্তি এবং বৃত্তি সকল নিরোধের যে সকল প্রক্রিয়া সমূহ আছে তা' নিয়মিত অভ্যাস করতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি দেখতে পেলেন যে, যৌগিক ক্রিয়াবলে দীর্ঘকাল উপবাসেও আর তাঁর কোনও ক্লেশ হয় না। এই উপবাসে এবং আরও অন্যান্য যৌগিক ক্রিয়াকলাপে কৃতকার্য্যতা তাঁর মনে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল করে দেয় যে, একজন যোগী পর্ব্বতারোহী যিনি যোগবলে দৈহিক ক্ষুৎপিপাসা জয় করতে পেরেছেন এবং শীত-তাপে অভেদ্য হয়েছেন তাঁরই বড় বড় অভিযাত্রী দল অপেক্ষাও বিরাট বিরাট পর্ব্বত অভিযানে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বেশী।

তাঁর মনে যেই এ ধারণা বদ্ধমূল হল, তখনই তিনি এভারেষ্ট অভিযানে মন দিলেন এবং তার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিনি যোগশাস্ত্র আরও গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। আরও কঠোরতর উপবাস ও তপশ্চর্য্যায় মন নিয়োগ করলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি শুধু খেজুর ও অন্যান্য ফল-মূলে জীবন ধারণ করতে অভ্যাস করতে লাগলেন, আর অবসর সময়ে এভারেষ্টের বিষয় অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এইরূপ ব্রত, উপবাসাদি এবং কঠোর যৌগিক তপস্যার পর ১৯৩৩ সালের একদিন এক রৌদ্র-ঝলমল সোনালী দিনে তিনি মনস্থ করলেন যে, এইবার তিনি অভিযানের জন্য উপযুক্ত হয়েছেন।

তিনি একটি এরোপ্লেন কিনলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, এরোপ্লেনে করে এভারেষ্টের পাদদেশে যাবেন এবং সেখানে পৌছে এভারেষ্টের চূড়ায় উঠবেন। তিনি এরোপ্লেন চালাবার পাঠ নিয়মিত নিতে লাগলেন এবং অবশেষে চালকের লাইসেন্সও পেলেন। এইরূপে আরও কিছু দিন বিমান চালনা অভ্যাসের পর তিনি এইবার পাড়ি দিতে মনস্থ করলেন।

* * * *

বিলাতে থাকতেই উইলসন্ খবর পেলেন যে, নেপাল গভর্ণমেণ্ট তাঁকে এভারেষ্ট অভিযানের অনুমতি দেবেন না; সুতরাং তিনি নেপাল গভর্ণমেণ্টকে কিছু জানাইবেন না মনস্থ করলেন।

তিনি রটিয়ে দিলেন যে, তিনি অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন। কিন্তু অবশেষে ঘটনাচক্রে সত্য ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং খবরের কাগজে এই নিয়ে হৈ-চৈ সুরু হয়ে যায়। গভর্ণমেণ্টের বড় বড় মাতব্বর অফিসাররা তাঁর কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া সুরু করলেন এবং তাঁরা তাঁকে এই অভিযানে নিবৃত্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে, এ রকম অভিযান আত্মহত্যারই নামান্তর! কিন্তু উইলসন্‌কে কিছুতেই দমান গেল না—ভড়কান গেল না। হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর বিমান নিয়ে কায়রোর পথে পাড়ি জমালেন। কিন্তু এখানে এসেই তিনি এক বাধার সম্মুখীন হলেন। তিনি পারস্যের উপর দিয়ে উড়ে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখানে পৌছেই শুনলেন যে, সে অনুমতি হঠাৎ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি হঠাৎ পারস্য উপসাগরকূলস্থ বেরিনে উড়ে গেলেন। বেরিন থেকে তিনি বেলুচিস্থানের গদর অভিমুখে যাত্রা করেন—যাত্রার সময় তাঁর বিমানের পেট্রল-ট্যাঙ্কে মাত্র ৩০ মাইল উড়বার মত পেট্রল ছিল, আবার যাবার পথ ছিল বেশীর ভাগ সমুদ্রের উপর দিয়েই! যাই হোক, কোন রকমে তিনি গদর এসে পৌছালেন। যখন রাত্রি শেষে এরোড্রোমে এসে নামলেন তখন ট্যাঙ্কে আর এক ফোঁটাও পেট্রল নেই—একেবারে শূন্য! এর পর তিনি করাচী যাত্রা করেন। করাচী পৌছেও আর এক বিপদ! এখানে কেহই তাঁকে পেট্রল দিতে চায় না। অথচ পেট্রল একদম ফুরিয়ে গেছে এবং মাইল-খানেক পথও আর চলা যাবে না। অবশেষে, অনেক কষ্টে তিনি এই বিপদ অতিক্রম করে এলাহাবাদ পৌছান। এখানে এসেও সেই বিপদ, কেহই তাঁকে পেট্রল দিতে চায় না। তিনি বেশ বুঝতে

পারলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁর পিছনে লেগে আছে এবং প্রতি পদেই তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু উইলসনও সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন···তিনি পেট্রল যোগাড়ের নানা ফন্দি-ফিকির করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন কৃতকার্য্য হলেন এবং পূর্ণিয়া অভিমুখে পাড়ি দিলেন।

উইলসনের প্লেন এখানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং প্রবল বর্ষা না নামা অবধি তাঁর প্লেন সরকারী কর্ম্মচারীরা আটক করে রাখে। এখানে তিনি তিন সপ্তাহ আটক থাকেন। অবশেষে একদিন জোর বর্ষা নামল এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁর প্লেন ছেড়ে দিল। কেন না তারা নিশ্চিন্ত যে, এই প্রবল বর্ষায় এবং এইরূপ দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কেহই প্লেনচালাতে সাহস করবে না। কিন্তু তারা এখানে ভুল করেছিল—তারা উইলসনকে চিনত না। তিনি আবার তাঁর বিমানের ট্যাঙ্ক পেট্রলে পূর্ণ করলেন এবং বললেন যে, তিনি আর মাত্র দার্জ্জিলিং অবধি যাবেন। কিন্তু ষ্টার্ট দিতে গিয়ে দেখলেন, বিমানের ইঞ্জিন আর চলে না। তিনি ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যার কিছুই জানতেন না, সুতরাং মুস্কিলে পড়লেন। আর পূর্ণিয়া এই রকম জায়গা যে, একজনও বিমান-মিস্ত্রী পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেবার লোক ন'ন। তাঁর বিমানে বিমান-ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যার একখানি বই ছিল, তিনি অর্দ্ধেক দিন-ব্যাপী বসে বসে সেই বইটা পড়লেন এবং তার পর কাজে লেগে গেলেন। অবশেষে তাঁর অধ্যবসায় জয়ী হোল, বিমান-ইঞ্জিন চলা সুরু করল—তিনি লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করলেন। লক্ষ্ণৌ অভিমুখে ঘণ্টা খানেক উড়বার পরই প্রবল বর্ষণ সুরু হোল। অবিরাম প্রবল বারিপাতের ফলে চতুর্দ্দিক অত্যন্ত ঝাপসা দেখাচ্ছিল—সুতরাং তিনি বাধ্য হয়ে নিকটস্থ এক পোলো খেলার মাঠে অবতরণ করলেন। এখানে এসে তিনি প্লেন পরিত্যাগ করেন এবং ট্রেনে দার্জ্জিলিং পৌছান। এখানে এসেও তাঁর নিস্তার নেই—একটার পর একটা বাধা আসতে থাকেই।

সরকারী কর্ম্মচারীরা বলেন, তিনি মোটেই এই অভিযান আরম্ভ করতে পারবেন না এবং তাঁকে কোনও সাহায্যও দেওয়া হবে না। সকলেই তাঁকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বললেন—নিরুৎসাহ করতে লাগলেন। এমন কি, পৃথিবীর সংবাদপত্র সমূহ একযোগে তাঁকে এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিতে লাগলো। কিন্তু উইলসনকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না, বরঞ্চ তিনি তাঁর সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে আরও অধিকতর কৃতসঙ্কল্প হলেন। এবং তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, যে ব্যক্তি যোগ-বলে লঘুপদ এবং দ্রুতগতি বেগসম্পন্ন হয়েছেন তাঁরই এভারেষ্ট জয়ের আশা সুনিশ্চিত। এই বলে তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন যে, দক্ষিণ-মেরু অভিযানে বৃহত্তর সাজে সজ্জিত ক্যাপ্টেন স্কটের চেয়ে অপেক্ষা লঘুবিহারী আমুণ্ডসেনই জয়ী হয়েছিলেন।

তখন ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাস। হঠাৎ একদিন তিনি কাউকে কিছু না বলে, নিঃশব্দে এবং গোপন ভাবে, কুলীর ছদ্মবেশে দার্জ্জিলিং থেকে পায়ে হেঁটে সরে পড়লেন। সঙ্গে নিলেন মাত্র তিন জন নেপালী কুলী। বড় বড় এভারেষ্ট অভিযানকারী দলের আয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন কিছুই নয়—সেই সব বড় বড় দলে অনেক সময় এক শত কি তার বেশী কুলীও থাকে।

তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনবরত পথ চলে চলে তিনি হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতের অন্তর্গত রংবাক মঠে এসে পৌছলেন। এই মঠ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং বিগত দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এভারেষ্ট অভিযানকারীরা এখান থেকেই এভারেষ্ট অভিমুখে যাত্রা সুরু করত।

উইলসন্ খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাঁর সাথে কেবল খেজুর, ফল-মূল এবং কিছু নিরামিষ আহার্য্য-সামগ্রী নিয়েছিলেন। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর সাথে কোন দড়ি নেননি—কিন্তু দড়ি ছাড়া অন্য কোনও পর্ব্বতারোহী পাহাড়ে উঠতে সাহসই করে না। এবং পর্ব্বতারোহণে দড়ি অপরিহার্য্য তালিকাভুক্ত।

যোগবলে তিনি সত্যিই দ্রুতগতি বেগসম্পন্ন হয়েছিলেন। মঠে পৌছাতে অন্যান্য অভিযাত্রী দলের যে সময় লাগে তিনি তার থেকে অর্দ্ধেকেরও কম সময়ে মঠে পৌছান। এখানে মাত্র এক দিন থেকে তিনি আবার যাত্রা সুরু করেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর তিন জন কুলী সহ অবিরাম ভীষণ হিমপ্রবাহের ভিতর দিয়ে, অবিরাম বড় বড় বরফের চাই ভেঙ্গে পড়ার ভিতর দিয়ে, ভীষণ তুষারপাতের ভিতর দিয়ে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গের কোণ ঘেঁসে যাওয়া 'ক্ষুরস্য ধারাবং' সঙ্কীর্ণ, বিপদসঙ্কুল এবং পিচ্ছিল পথরেখা ধরে অবিরাম চলে চলে আরও ৭,০০০ ফিট উচ্চতায় পৌছান। শীঘ্রই তিনি "নর্থকোল" বলে পরিচিত পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশে এলেন। এ জায়গা থেকেই এই বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবধি সমস্ত অভিযানকারীর দল এভারেষ্ট চূড়ায় উঠবার চেষ্টা করত। এই "নর্থকোল" পর্ব্বতরাজির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তুষার-মৌলি পর্ব্বতশৃঙ্গ। এর মাথা বেয়ে এভারেষ্ট-চূড়ায় পৌছবার একটি অতি দুর্গম, সঙ্কীর্ণ পথ আছে। কিন্তু এই "নর্থ কোলের" মাথায় উঠা পরম দুঃসাহসিক, দুঃসাধ্য এবং ভীষণ বিপদসঙ্কুল কার্য্য'। এইখানে এসে কুলীরা আর তাঁর সাথে অগ্রসর হতে রাজী হয় না। তিনি তাদের অনেক বোঝালেন, লোভ দেখালেন, কিন্তু তারা আর কিছুতেই যেতে রাজী হয় না। এইখান থেকেই তাঁর একেবারে একক যাত্রা! অবশেষে তিনি একাকীই যাত্রা করেন। কুলীরা তাঁর জন্য পনেরো দিন এখানে অপেক্ষা করতে রাজী হোল। উইলসন্ হিসেব করে দেখলেন, পর্ব্বতের চূড়ায় উঠতে আর বড় জোর দিন তিনেক লাগবে এবং এখানে ফিরতেও আর দিন তিনেক। সুতরাং, তিনি কুলীদের বললেন, দিন ছয়েকের মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন।

১৯৩৪, ১৭ই মে, তারিখে উইলসন্ এই দুর্গম, বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা সুরু করলেন এবং সঙ্গে নিলেন সামান্য কিছু রুটি, খেজুর, পরিজ, ছোট্ট একটি তাঁবু, একটা ক্যামেরা, এভারেষ্টের ফটো তুলবার জন্য যদি তিনি পৌছান সেখানে এবং একটি ইউনিয়ন জ্যাক্।

কুলীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, তিনি আস্তে আস্তে উচ্চ পর্ব্বতগাত্র বেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর আর তাঁকে তারা দেখতে পেল না।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে তারা তন্ন তন্ন করে এভারেষ্টের চূড়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো, যদি বা এই মহান বীর

পর্ব্বতারোহীর দর্শন পায় কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। এই রকম করে করে চতুর্থ দিন, পঞ্চম দিন, এমন কি ষষ্ঠ দিনও কেটে গেল, তবু তিনি ফিরে আসেন না। তবু তারা অপেক্ষা করতে লাগলো, কেন না উইলসনের ধৈর্য্য, কষ্টক্ষমতা এবং অপূর্ব্ব পর্ব্বতারোহণ পারদর্শিতায় তাদের অপূর্ব্ব বিশ্বাস।

এইরূপে সময় বয়ে যায়, ক্রমে ক্রমে দশ দিন, পনেরো দিন কেটে গেল—কিন্তু তাঁকে আর দেখা যায় না। পনেরো দিন কেটে গেল, কুলীরা এখন অনায়াসেই ঘরে ফিরে যেতে পারে—কেন না, তারা উইলসন্‌কে পনেরো দিন সময়ই দিয়েছিল; সুতরাং নৈতিক বাধা আর কিছু নেই। কিন্তু তবু তারা ফেরে না, তারা অপেক্ষা করতে লাগল—আশা করতে থাকে, হয়ত এখনও একদিন তিনি ফিরে আসবেন। তারা আরও জানত যে, পূর্ব্বের অভিযানকারী দল সমূহ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এভারেষ্টের চূড়ায় উঠবার পথে ফেলে গেছে, সুতরাং উইলসন স্বল্প খাদ্য লওয়া সত্ত্বেও খাদ্যাভাবে মারা পড়বেন না। কিন্তু এক মাস অপেক্ষা করবার পরও যখন উইলসন্‌কে পাওয়া গেল না তখন তারা নিরাশ হয়ে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে নীচে মঠে নেমে আসে।

কত দূর এই বীর একক পর্ব্বতারোহী এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কি হয়েছিল? এর পরের ইতিহাস বড়ই করুণ। পরে এক অভিযানকারী দলের দ্বারা তাঁর মৃতদেহ এভারেষ্ট চূড়ার মাত্র ৩,০০০ ফিট্ নীচে আবিষ্কৃত হয়েছিল। উইলসন্ কোনও আধুনিক, বৈজ্ঞানিক, সাজ-সরঞ্জাম না নিয়ে যে এতটা উচ্চে উঠেছিলেন সেইটা সত্যিই কি পৃথিবীর ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নয়?

তিনি অনাহারে মারা যাননি। কেন না, পূর্ব্বের অভিযাত্রী দলের পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রবল তুষার-ঝটিকায় তাঁর তাঁবু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায় এবং সম্ভবতঃ তিনি ভীষণ ঠাণ্ডা এবং তুষারপাতের ফলে মারা যান।

তাঁর এই উদ্যম কি আত্মহত্যারই নামান্তর? ভাবতে গেলে প্রায় সেইরূপই মনে হয় বটে। এটা কি অসম্ভব ব্যাপার? আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের সাধারণ জ্ঞান তাই বলে অবশ্য। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, মরিস উইলসন্ সাধারণের থেকে একটু অন্য রকম ছিলেন। যদি একাকী কেহ এভারেষ্ট জয় করতে পারতেন, তবে তিনিই সব চেয়ে যোগ্যতম ছিলেন।

এর ফলাফল যাহাই হোক না কেন, এই রকম বীরত্বব্যঞ্জক উদ্যম আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে এবং এই সব বীর পুরুষদের কাছে আমাদের মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে।

মরুযাত্রী

[কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত স্মরণে]

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মরু-পৃথিবীর আলো
সেই পথিকের চোখে লেগেছিলো ভালো।
বুক-ভরা তার বহ্নি-দহন দগ্ধ করেনি বিশ্ব-ভুবন,
মাঝে মাঝে ধূ-ধূ মরীচিকা হয়ে পথে শুধু চম্‌কালো।

তাই সে চেয়েছে চির-বৈশাখী প্রাণ,
মহাসূর্য্যেরো কান পেতে শোনে যে-বৈশাখের গান।
শান্তধারায় মেঘ-মঞ্জীর স্নিগ্ধ করেনি তপ্ত শরীর;
শিশির-কণায় সে-প্রাণ শুনেছে আগুনেরই আহ্বান।

কবির বিধাতা মানুষের দাসখৎ
পেয়ে খুশী হয়, তাই বুজ্‌রুকি—নিঃস্বের কসরৎ!
মরু-পথিকের বিদ্রোহী মন ভেবেছে, দুখেই বিশ্ব-সৃজন;
নিরুপায় দুখে দগ্ধ লোহার প্রতিবাদ—তারই পথ।

অন্তরে মরুমায়া
আগুন জেলেছে, নীল-নিশান্তে আনেনি তরুর ছায়া।
রুদ্র-রুদ্রের তৃতীয় নয়ন করে যে প্রেমের মদন-দহন;
প্রমীথিয়ুসের প্রেরিত পাবন অগ্নি কি হীন-কায়া!

সে-পথিক আজো চলে
খুঁজে মরুপথ—শ্যাম বাংলায়—যে-বুকে আগুন জ্বলে;
যে-বুকে কালের নিঠুর নেহাই শ্বাসটুকু নিতে দেয় না রেহাই,
আশা-রোশনাই আঁকড়িয়ে যারা দিন গুণে তিথি পলে।

অবনীন্দ্র-চরিতম্
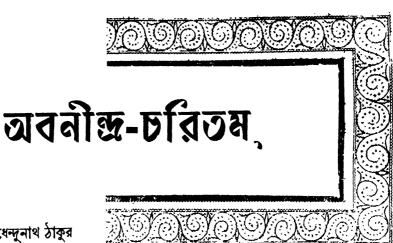
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

কথামুখ

সকাল থেকেই মনটি বড় প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে। অথচ কেন যে,···কোথা থেকে যে,···নার্সিসাস ফুলের মত, ভিন্নলোকের স্মৃতিবাহী একটি মিষ্টি গন্ধ ভেসে এসে লাগছে আমার নাকে, আকাশ-বাতাস করছে বিহ্বল···বুঝে উঠতে পারছি না। একটি যেন অকারণ হাসি চলকে বেড়াচ্ছে অন্তরিক্ষের আলোকে, নিক্কণ উঠছে পৃথিবীর নূপুরে, অনুমান যেন হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রত্যক্ষ।

প্রফুল্লতার রেখাভঙ্গি হচ্ছে ঋজু এবং ঊর্দ্ধগতি। সব সময়েই ৯০ ডিগ্রী। তাই মনে হচ্ছে, আমার মনটাও যেন তার কল্পকায়া ছেড়ে সোজা ঊর্দ্ধে উঠছে উপরে। দেখতে দেখতে ছেড়ে চলে গেল পিশাচলোক—যেখানে রাজনীতি আর অর্থশাস্ত্রের নিত্য চলে লোকশংসী কূট অনর্থবাদ; ছেড়ে চলে গেল গুহ্যকলোক—যেখানে কৃপণ কুবেরের দল বিশ্বের সমস্ত নিধি লুণ্ঠন ক'রে পুনর্বার লুকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত, কাউকে দেবার নামটি পর্যন্ত করে না,—পিচিণ্ডিল স্থূলবক্ষ সঞ্চয় এবং উপচয় যাদের একমাত্র সুবৃত্তি; পৌঁছে গেল গন্ধর্বলোক,···যেখানে······

এমন একটি সুষমাবরী সকালে, বিচিত্র নয়, গন্ধর্বলোকে পৌঁছানো। তাই ভারী মিষ্টি লাগছে গন্ধর্বের কথা ভাবতে। ভাবছি আর আমার চতুর্দ্দিকে আমি যেন কেবল দেখছি, স্বচ্ছবর্ণের চিত্রচ্ছটা, আরোচমান রূপের প্রগতিমান বিগ্রহ, গীতরসের নৃত্যনির্ঝর ধ্বনি-প্রবাহ।

আজ-কালকার মানুষের জগৎ বড় গোলমেলে হয়ে গেছে। অকাণ্ড রকমের একটা দরকষাকষির ঝগড়া চলেছে সর্বত্র। বুঝে উঠতে পারছি না এত দরকষাকষিই বা কেন, যখন স্তর বলে আর কিছু নেই, ছোট-বড় সবাই যখন সমতালের বেদামী পুতুল। ঘর্ম-শোষণ মূল্যনীতি দিয়ে যদি সব কিছুরই পরিমাপ করতে হয় তাহলে গোলমালটা তো আরো বেড়েই যাবে। মূল্য যাঁরা নির্দ্ধারণ করছেন, তাঁদের মূল্যই বা নির্দ্ধারণ করবে কে? উত্তর পাব জানি,—গণকল্যাণদেবতা। যদি তাই-ই হয়, তাহলে এই অশরীরী গণদেবতটিরই বা স্থান কোথায়? দেহধর্মের যদি মূল্যই হয় এতো, তাহলে, মানস-চর্মমধু-র মূল্যই বা হয় কত? যাক্ ও সব কথা ভেবে আর মন কালিয়ে লাভ নেই। কিন্তু, পশ্চাতু, আমার মগজের মধ্যে যে স্থির ধারণা জন্মে যাচ্ছে, ঐ গণদৈবতটিও গন্ধর্বলোকের একটি বাসিন্দা। সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে, উপাসনীয় হয়ে, অনুমেয় হয়ে তিনি বসে রয়েছেন। আহা, তাঁর যে কত মূল্য হবে কে জানে! কেউ হয়ত তাঁর পায়ে উজাড় করে দেবে সর্বস্ব, আবার কেউ বা হয়ত বলবে···মূল্য দেব কি, তাঁর কাছ থেকেই আমরা নেব। কিন্তু ভারত-সংসারের আজ কিম্ভূত দুর্ভাগ্য! রাজনীতি এবং অর্থনীতির মাধ্যমে যাঁরা নিজেদের শক্তি করছেন স্ফীত, যাঁরা পিশাচ এবং গুহ্যকলোকের প্রভু, তাঁরা আজ-কাল এমন ভাবে নিজেদের প্রচার-চক্কর করছেন, যেন তাঁরাই এক একটি গন্ধর্ব···সর্ববিদ্যাবিশারদ বিদ্যাধর। কিন্তু একটি ছোট্ট কথা তাঁরা ভুলে যান, চাবীকাঠি হস্তগত করলেই, রত্নকোষের অন্তর্লীন সাতরাজারধন এক মানিক পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হওয়াটি যায় না।

খেয়ালের বীণায় এই পর্যন্ত আলাপ তুলেছি, স্বরলিপি লিখেছি, এমন সময় বন্ধুবর শ্রীমান দেখি, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ময়দানের উপর দিয়ে আসছে। শিস দিতে দিতে মাঝপথে দাঁড়াল, চান্‌কা থেকে এণ্টরহিনামের একটি শোণগুচ্ছ তুলে নিয়ে জহর-পিরাণে পরাল; তারপরেই হাস্য-সীমন্তিত মুখে হাঁকল—

"মেজাজ যে বড় খুসী-খুসী দেখছি, কি ব্যাপার!"

নিরুপায়, পেন্সিল রেখে খাতা বন্ধ করি। কিন্তু বন্ধ খাতা তুলে নেয় শ্রীমান, বিনাবাক্যে পড়ে ফেলে উপর্যুক্ত লিখন। তার পরে টেবিলের উপর সেটিকে রেখে দিয়ে, শালখানি দেহশিথিল ক'রে বলে—

"মেজাজের আজ যে দেখছি বড় জ্যোতিঃস্নাত ভাব? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না হে? সাকার মানুষগুলোকে বাদ দিয়ে একেবারে নিরাকার গন্ধর্ববিদ্যাধরদের নিয়ে টানাটানি করতে লাগবে না কি? কাব্য-রচনার জন্যে কি পৃথিবীতে দুর্লভ হয়ে উঠল মনুষ্য?"

আ।—সত্যিই যদি বল্‌তে হয়, বর্ত্তমানে, বাংলা দেশে যে সব তিরো দপ্‌দপিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের নিয়ে, তাঁদের পরিবেশ নিয়ে, নির্মল কাব্য রচনা করা—অচল। ছবি খুঁজে পাচ্ছি না হে।

রূপ-নয়ন দিয়ে প্রথমে তো ছবিখানা দেখব, তবে তো লিখব। বাংলা দেশে এখন ছবি কই? কারই বা ছবি লিখি বল?

শ্রী।—অবাক্ করলে, এই ক' বছরের মধ্যে বাংলা দেশে কী বিপর্যয়টাই না ঘটে যাচ্ছে, তা নিয়ে,—তার উত্থান নিয়ে, তার পতন নিয়ে…অনেক কিছুই তো…

আ।—লেখা যায়। এবং লেখাও হচ্ছে। প্রেস ও জার্নালিজম্ যা রচনা করছেন তা ইতিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে না। সে ইতিবৃত্ত অদ্যাপি ভাস্করের বা ঈর্ষার বা রৌদ্রের ছবিও হয়ে ওঠেনি, সাহিত্য তো দূরের কথা। ওগুলোতে এখন ওয়াশ দিতে হবে, অনেক মুছতে হবে, অনেক পুঁছতে হবে, তার পরে কাচ দিয়ে বাঁধিয়ে ছবি বানাতে হবে।

শ্রী।—(চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে)—তা ভাই, তুমি যে এই গন্ধর্বলোকে উড়তে উড়তে চলেছ, সেখানে কি ভাবছ নিজেকেই নায়ক বানাবে নাকি? ও ভাবনা…রেখে দাও ঐ ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটের জন্যে। গন্ধর্বকে যদি রূপনয়নে সাক্ষাৎ দেখতেই না পেলে, তাহলে তার ছবি আঁকবেই বা কেমন করে? তুমি কোনো বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, কিন্নর—দেখেছ-টেখেছ না কি?

আ।—যখন কথাটাই পাড়লে তখন একটু ভেবেই বলি। এই ধরাধামে—হ্যাঁ, দু'-একটি বিদ্যাধর গন্ধর্ব যে না দেখেছি, তা তো মনে হচ্ছে না!

শ্রীমান। সত্যিই দেখেছ নাকি?

আ।—আমাদের দেশে যখন মনুষ্যগণ ব্রহ্ম-স্বরূপ, আত্মা-স্বরূপ হংস-স্বরূপ হতে পারেন, এবং লাখ লাখ লোক যদি তাঁদের মানে, পুজো করে, তখন আমার পক্ষে দু-একটি গন্ধর্ব-স্বরূপের সঙ্গে পরিচয়-ঘটা কি এমনই একটা অসম্ভব ব্যাপার? ব্রহ্মাদি-স্বরূপরাই যেখানে করতালি খান, সেখানে মনুষ্যমূর্ত্তি গন্ধর্ব যে ভোগ-প্রসাদের অভাবে দুর্ভোগে অখ্যাত হয়ে মরবেন সে আর আশ্চর্যি কি? তাই তাঁদের নিয়েই ভাবছি। তবে এক কথা, গন্ধর্বদের চেনা বড় দুষ্কর। দু'একশ বছর পরে হঠাৎ কোনো রিসার্চ ষ্টুডেণ্ট, তাদের উদ্ধার করে বসে—রামের অহল্যার মত। মুস্কিল কোথায় জানো, এই গন্ধর্বেরা সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। না অর্থরাজ্যে, না মোক্ষরাজ্যে। তাঁরা কেবল সঙ্কল্পময় কামের হেমাকৃণ রাজ্যের সুর শুনিয়ে যান।

শ্রীমান। বলে চল হে, বলে চল, থাম্‌লে কেন?

আ।—তোমার কাছে যে বলতেই হবে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে একটা কথা। আমি তাঁকে যে চোখে দেখেছি, যে প্রাণে নিয়েছি—যাকে বলে মদ্‌দৃষ্টম্—তাই কিন্তু তোমাকে শুনতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে থাকব তাঁর সঙ্গে। ঐখানেই তো মজা। তা না হলে,—আমি, হ্যাঁ এই আমি,—দেখলুম তাঁকে কেমন করে? আমার মধ্যে আমিটাও হয়ত বলার ছলে প্রবল হয়ে উঠবে, তখন শুধু ক্ষমা কোরো। আমি-হীন প্রকাশ নেই, আমি-হীন উপাসনা হয় না।

এমন সময় গন্ধবল্লীর বাঁকানো শাখাটির উপর একজোড়া বুলবুলি পাখী এসে বসল। রাঙা ভুঁড়ির নাচন দেখিয়ে শ্রীমানকে হাসাল। দ্ব্যর্থ হাস্যে শ্রীমান বললে—

"ওরাও শুনতে এল বোধ হয়, তোমার গন্ধর্বলোকের কথা।"

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠি। বলি—"পক্ষীরাই তো গন্ধর্বদের চিনবে। তবে বলি শোনো গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে।"

প্রথম উচ্ছ্বাস

আমার গন্ধর্ব বিশ্বের রসিকজনবিদিত।

তাঁর নাম—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁর কথা দিগ্বধূদের জিজ্ঞাসা কোরো;—পূর্ব-পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকলেই জানে।

উপমা হেন অলঙ্কারের সিন্দুকে আমি প্রবেশ করতে চাই না, কারণ তাঁর দেহগাত্রে যথাস্থানে নিজেদেরি পরায় অলঙ্কার,—আপনা হতেই, ধন্য হ'য়ে।

কিন্তু আমি যখন তাঁকে জানলুম, তখন মাত্র আমার পক্ষোদ্ভেদ হয়েছে। কলেজে ঢুকেছি। চাক্ষুষ জানা নয়; তাঁর লেখা বই কিছু পড়েছি, ছাপা ছবি কিছু দেখেছি; এইমাত্র জানা। এমন সময় আমার সেজ মামা এলেন বিলেত থেকে পাশ করে। ভারতবর্ষের প্রথম A. R. C. A. ভাস্কর। জেনিংস্, অবনীন্দ্রনাথ, আর প্রফেসার ল্যান্টেরীর তিনি ছাত্র। শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরী। আমাদের বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। মস্ত একটা হৈচৈ, হৈহৈ পড়ে গেল আমাদের বৃহৎ সংসারে। হুজ্জুকের হায়রাণিটা যখন থামল তখন দেখি, বদলে গেছে আমাদের বাড়ীর বায়ুমণ্ডল। পিতৃদেবের হুকুমে, রাজমিস্ত্রিদের উষা আর কর্ণিকের কারসাজিতে, একের পর এক গড়ে উঠছে ভাস্কর্যের কারুকক্ষ (Studio) টিন টিন প্যারিস প্লাসটার আসছে, ঘড়াঞ্চি তৈরী হচ্ছে, হরিমোহন কুমোর শাদা দাড়ি নেড়ে শাদা মাটি মাখছে, আর আমরা বাল-খিল্যখিল্যদের দল অবাক্ হয়ে দেখছি—মূর্ত্তির পর মনুষ্যের মূর্ত্তি, জানা মনিষ্যির মূর্ত্তি ঠিকঠিক গড়ে চলেছেন মামা। এই আবহাওয়াতে থেকে non-Conducting metal হয়ে বাস্তব্য করা অসম্ভব। আমাদের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক্ কারেণ্ট খেলে গেল। আমি আর আমার মেজো বোন লুকিয়ে পড়ার ঘরের পাশের সিঁড়ির তিনটি ধাপের উপর "কলাভবন" (1925) খুলে বসলুম, মামা দিতে লাগলেন পাঠ।

এই সময়ে মামার কাছে গল্প শুনতে শুনতে, বাংলা দেশের সেরা আর্টিষ্ট অবনীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ালেন। চমক-খাবার ব্যাপার নয় কি, যখন শুনতে হোলো—ইউরোপের সেরা সেরা আর্টিষ্টদের ছাঁদে তৈলচিত্র আঁকতে আঁকতে অবন ঠাকুর নাকি শেষে স্বদেশের ঐতিহ্য উদ্ধারের জন্য ছুরি দিয়ে কেঁড়ে ফেলেছেন, পুড়িয়ে ফেলেছেন নিজের হাতে-আঁকা বড় বড় দামী ক্যানভাস!…

মেজো বোন বলত—"আচ্ছা, মামা, উনি বড্ড রাগী লোক, না?"

মামা বলতেন—"রাগী হবেন কেন রে? বড় মানী লোক গুরুদেব।"

মেজো বোন।—বড্ড স্বদেশী, না? সাহেবদের গুর্খা ওঁকে ধরেছিল?

মামা।—তবেই হয়েছে। গুরুদেবকে ধরবে কে? গুরুদেবের

মহামিত্র হচ্ছেন E. B. Havell সাহেব। তিনিই চকচকিয়ে নিজেই এলেন গুরুদেবকে সাধতে। হ্যাভেল সাহেব বিগড়িয়ে দিলেন গুরুদেবের মাথা, আবার গুরুদেব বিগড়িয়ে দিলেন হ্যাভেল সাহেবের মাথা। মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেল হ্যাভেল সাহেব আর তাঁতে; শেষে দেখা গেল, হ্যাভেল সাহেব প্রিন্সিপাল হয়ে আছেন, আর গ্রেপ্তার হয়ে অবন ঠাকুর হয়ে গেছেন ভাইসপ্রিন্সিপাল। আর তার পরে তোড়ে আবার আঁকা চলল জলের রঙের ছবি। গভর্ণমেন্টের আর্ট-ইস্কুল কাঁপতে লাগল। আর সে সব ছবি যে কী সুন্দর, তোদের বোঝাই কেমন করে। আসবে আসবে, এখানেই আসবে দু'-দশখানা আসল ছবি। original দেখবি পরে।

এই ধাঁচের কথার জ্বালানি কাঠে আমাদের শিলীভূত মোহ আগুনের মত জ্বলে উঠতো বটে, কিন্তু উপায় নেই। কেন যে আমরা নিরুপায়, সে কথা পরে বলছি। তার আগেই, তাঁর সম্বন্ধে একটি দিনের শোনা কাহিনী বলেই ফেলি; সানাই বাজাচ্ছে আমার কানে। তর সইছে না। আমাকে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল সেই গল্প—সেই গুরু-শিষ্যের গল্প।

এখন হয়েছে কি, ৬নং বাড়ীর ছোট কর্তা ক্ষেপে উঠেছেন। জাপান থেকে ব্যারন ওকাকুরা, টাইকোয়ান প্রভৃতি এসেছেন ভারতবর্ষে, বৌদ্ধশিল্পের লীলা-নিকেতন ভারতবর্ষে, ধর্মযাত্রায়। তাঁরা এসে হাজির,—ছবি শিখতে—অবন ঠাকুরের কাছে। কারণ, সাহেবদের তৈলচিত্র ও রবিবর্মার যুগে, ভারতীয় শুদ্ধ শিল্পকলার একমাত্র চর্চ্চা হয় নাকি ঐ জোড়াসাঁকোর ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে। ব্যারন ওকাকুরা জাপানের একজন প্রসিদ্ধ মনীষী রূপবিৎ; টাইকোয়ান তখন উদীয়মান আর্টিষ্ট। ছবি-শিক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল অবন ঠাকুরের কাছে। তখনকার দিনে অনেক সৌখীন লোকের বাড়ীতে বিদেশী Gardener রাখা হত। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণবাবুর (গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ছিল গাছ-গাছালি মালঞ্চের সখ। তাঁদের বাগানে তখন নিযুক্ত ছিল এক জাপানী মালী। সে বেচারী স্বভাবত: এই বিসদৃশ কাণ্ড দেখে চকচকিয়ে গিয়েছিল; কারণ, ব্যারন ওকাকুরা—আপেল ফলের মত যাঁর টুকটুকে নরম নরম চেহারা,—যাঁর পায়ের দিকে নজর-ফেলা ছাড়া মুখের দিকে দৃষ্টি তোলার সাহস হয় না জাপানী মালীর—তিনি কিনা, আশ্চর্য্য, এই বাড়ীর ছোট বাবুর কাছে ছবি আঁকতে শিখছেন, ভারতীয় শিল্পের শিক্ষা জানবার জন্যে রামায়ণ পড়ছেন, মহাভারত ওল্টাচ্ছেন, আর রামায়ণ মহাভারত থেকে পরের পর ছবি এঁকে চলেছেন? প্রাণে আঘাত লাগলে যা হয়, তাই তার হোলো। সে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। কিছু দিন যেতে না যেতেই একদিন তার ম্লান মুখ হঠাৎ আনন্দ আর ধরে না। উল্টে গেছে, আশ্চর্য্য। বাবু ঠাকুর অবন ঠাকুর শিষ্যের মত,···শিখছেন বসে···টাইকোয়ান আর ওকাকুরার কাছে! এঁরাও ওঁদের শিষ্য, ওঁরাও এঁদের শিষ্য, আর এঁরাও ওঁদের গুরু, ওঁরাও এঁদের গুরু। মালঞ্চ থেকে ফুল তুলে, এক প্রকাণ্ড তোড়া বেঁধে, মাঝখানের ফুলদানীতে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে, রেখে যায় নির্ব্বাক্ জাপানী মালী।

এই কাহিনী শুনে এতো ভাল লেগেছিল সেদিন, যে কী আর বলি। তুমি শেখাও আমাকে কেমন করে সিল্কের উপর বাঁশের পাতা আঁকতে হয় জাপানী ফ্ল্যাট ব্রাশের নিবিড় দুটি সুখটানে; আর আমি শেখাই তোমাকে আমাদের অজন্তা, আমাদের মৌর্য-গুপ্ত পিরিয়াড, মথুরার শিল্পভাষা। সত্যিই, গুরু-শিষ্যের এই সহজ ষষ্ঠীতৎপুরুষ এতো মিষ্টি, অথচ এতো অসামান্য! এই রকমের সংস্কৃতির, এই রকমের মিলনের মণিমালাই মণিবন্ধে বেঁধে দেওয়া উচিত শান্তিকামী প্রতিদেশের। এই মিলনের গভীরতা যে কত শুভ, কত সুখময় হতে পারে, তার পরিচয় পেলুম যখন শুনলুম;—টাইকোয়ানের "রাসলীলা" ছবিটির অঙ্কন ব্যাপার নিয়ে। সে গল্পটিও বড় দরদদার। আশা করি "রূপম্" পত্রিকায় এই 'রাসলীলা'র প্রিন্ট অনেকেই দেখেছেন। স্ফটিকপ্রভা ওড়না দুলিয়ে মেঘের রাজত্বে যেন চলেছে সেই নাচ। যাঁরা টাইকোয়ানের অঙ্কনপটুত্ব নিরীক্ষণ করছিলেন তাঁরা হায় হায় করে উঠলেন সমাপ্তির আনন্দে। কিন্তু টাইকোয়ান নীরব। শেষে বললে—"শেষ হয়নি।" সকলেই মাথা চুলকিয়ে বলেন—"এইবার দেখছি, বেশী করতে গিয়ে খারাপ করেই বসবে।" কিন্তু টাইকোয়ান বলে, "না, শেষ হয়নি।" নীচের ঘরে ষ্টুডিয়োতে বসে বসে টাইকোয়ান ভাবে,—কী যেন হয়নি। দিন গেল, রাত গেল, ছবি আর শেষ হয় না। টাইকোয়ানের তুলি বন্ধ। শেষে দোতলায় পৌঁছল অবনীন্দ্রের কাছে। ব্যথা জানালে। অবন বাবু ঘুরে ফিরে দেখলেন প্রকাণ্ড ছবিটি। শেষে অন্য ঘরে তাঁকে ডেকে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে টাইকোয়ানের কানে কী যেন বললেন। হঠাৎ যেন রোদের সোনা এসে লাগল টাইকোয়ানের মেঘের মত মুখে। ছুটে চলে গেল। তার পরে সারা রাত দরজা বন্ধ করে, চলল তার চিত্রণ-সাধনা। সকাল বেলায় দেখা গেল, ফুলের তারা ফুটিয়ে দিয়েছে ছবিতে। শরতের পূর্ণিমা রাত্রে ফুলের না ছড়াছড়ি হ'লে জমবে কেমন ক'রে রাসের নাচ? ছবি হোলো কমপ্লিট। টাইকোয়ান বললে—

"এ ছবি আপনার, আপনি এর শেষ উদ্ধার না করে দিলে, এ ছবি আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হোতো। এ ছবি আপনার। বিদায়ের সময়। এটি উপহার,—আপনাকে নিতেই হবে।"

তার পরে কেটে গেল দশ বছর। ছবি আলো করে আছে ঘর। ১৯১৮ সাল। একদিন জোড়াসাঁকোর তীর্থে এলেন জাপানী ম্যাগনেট, মিট্সুইভুষণ কাইজার "মিষ্টার সেণ্ডা"। তিনি তো ছবি দেখে পাগল! দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে, দেশের অত বড় আর্টিষ্টের হাতে-আঁকা এই অপূর্ব বস্তু। সাধ্য-সাধনা করে আদায় করলেন সেই ছবিটি। তার পরেই হঠাৎ এল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার এক প্রণামী চেক। দেখুন ত!

এই রকমের গল্প শুনতে শুনতে কার না মাথা বিগড়ে যায়? আমাদেরও গেল। কিন্তু ঐ যা বলছিলুম, আমরা তখন নিরুপায়, মনের অনলে দগ্ধে মরা ছাড়া অন্য গতি নেই।

মাঝখানে একটা কথা বলে রাখি :

ক্রমশঃ।
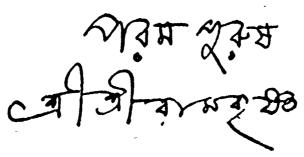
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো বাইশ

শিখে রাখ, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। সামনে মাতাল, তাকে ধর্মকথা বলতে গেলে হয়তো কামড়ে দেবে। বরং তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতা, খুড়ো বলে ডাক, হয়তো তোকে আদর করে বসবে। দেখবি, শুনবি, বলবি নে। অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে সহ্য করা ভালো। তুই কি কারু দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে তোর শাসনে শোধন হবে? যিনি শাসন করবার ঠিক করবেন। তুই বিচারের ভালো-মন্দ কী বুঝিস? আর শোন, তৈরি অন্ন ছাড়বি নে কখনো। যদি ডাল-ভাত জুটে থাকে তাই খেয়ে নে, পোলাওএর আশা করবি নে। কাঠের মালা আর ঘেঁটু ফুল পেয়েছিস তাই দিয়ে সেরে নে শিবপূজো। কবে জবাফুল আর স্ফটিকের মালা পাবি তারই জন্যে বসে থাকবি পথ চেয়ে?

ভক্ত হবি, তাই বলে বোকা হবি? তোর হক ছাড়বি, স্বত্ব খোয়াবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিল কিনা দেখে নিবি যাচাই করে। আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবি নি।

মোট কথা, সরল হবি, উদার হবি, বিশ্বাসী হবি। তাই বলে বোকাবাঁদর হবি না। কাছাখোলা, আলা-ভোলা, নেলাখেপা হবি না।

'অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল হয়, উদার হয়। সরল না হলে পাওয়া যায় না ঈশ্বরকে। সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।' বললেন ঠাকুর।

আর শোন, কান্না পেলেই কাঁদবি।

বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে বালকের মত রামলালের কাছে বসে কাঁদছেন ঠাকুর: 'আমি একটু খাঁটি দুধ খাব। কালীবাড়িতে যে দুধ খাই তাতে স্বাদগন্ধ নেই। বড় সাধ শাদাশাদা ধোবোধোবো মেটো-মেটো গন্ধ এমন একটু খাঁটি দুধ খাই। একটু খাওয়াতে পারিস রামনেলো? বাজারে কি গয়লা-বাড়িতে গিয়ে দেখ দেখি মেলে কিনা।

ঘুরে এল রামলাল। হাত খালি। দুধের বিন্দুবিসর্গও কোথাও নেই।

তবে কি হবে? পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর।

এ দিকে বলরামের স্ত্রী তাঁর গৃহে বসে দুধ জ্বাল দিচ্ছেন আর কাঁদছেন। যোগেন-মা কাছে বসে, তাকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'দেখ দিদি, এমন দুধ, প্রাণ ভরে ভগবানকে খাওয়াতে পারলুম না। এ দিয়ে কেবল বাড়ির লোকের পেটপূজো হবে। এক কাজ করবি দিদি? যাবি দক্ষিণেশ্বর?'

যোগেন-মা তো স্তম্ভিত।

'রাত হয়ে এসেছে কেউ টের পাবে না। চল খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়ি। প্রাণ বড় উচাটন হয়েছে, ঠাকুরকে একটু খাইয়ে আসি খাঁটি দুধ। তুই যদি সঙ্গে যাস—যাবি?'

'যাব।'

আধসেরটাক দুধ নিলে একটা ঘটিতে করে। বাটি ঢাকা দিয়ে গামছা জড়ালে। তার পর গাঢাকা দিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর। সেই একরাজ্যের পথ। তাও কিনা পায়ে হেঁটে!

সমস্ত বন্ধনবেষ্টনী লঙ্ঘন করে এ সেই ডাক। এ ডাক নিরবধি, এ ডাক পৃথিবী ছাড়িয়ে।

ঠাকুরের ঘরে ঢুকল এসে দু'জন। হাতে গামছা-বাঁধা ঘটি।

পুলকিত হলেন ঠাকুর। শুধোলেন, 'তোমরা দুধ এনেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বিকেল থেকেই মনে হচ্ছে একটু ধোবোধোবো

মেটোমেটো খাঁটি দুধ খাই। তাই নিয়ে এসেছ তোমরা—'

যেন নন্দরাণীর সামনে গোপাল, তেমনি ভাবে দুধ খেলেন ঠাকুর। পরে পরিহাস করে বললেন, 'তোমরা কুলের কুলবধূ, এত রাতে যে আমার কাছকে এলে তা তোমরা আমার হাতে দড়ি দেবে নাকি?' বলে হাসতে লাগলেন।

রামলালকে বললেন একটা গাড়ি নিয়ে আসতে। গাড়ি এলে বললেন, 'বলরামকে চুপি চুপি বলবি এরা আমার কাছকে এসেছিল, যেন রাগ না করে।'

কিন্তু রাগ করছে হরিবল্লভ। বলরামের খুড়তুতো ভাই, কটকের সরকারী উকিল। অধিকন্তু রায়বাহাদুর।

নানা কথা কানে ঢুকেছে। নানা বিরুদ্ধ কথা। তুমি যাচ্ছ তো যাও, তুমি মাতামাতি করছো তো করো, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের ওখানে পাঠাও কেন? ওদের কি মাথাব্যথা?

বলরামের এক উত্তর। 'তুমি ভাই একবার তাঁকে দেখে যাও স্বচক্ষে।'

তাই এসেছে হরিবল্লভ। তাকে দেখি আর না দেখি তোমাকে এবার কটকে টেনে নিয়ে যাব। এই ম[illegible]তার প্রভাব থেকে মুক্ত করব তোমাকে।

বলরামের বাড়ি ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা'। বলরামের অন্নই ঠাকুরের শুদ্ধান্ন। বলরামের সমস্ত পরিবার এক সুরে বাঁধা। এক মন্ত্রে উদ্দীপিত। স্বামী-স্ত্রী থেকে সুরু করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ঠাকুরে প্রেরিত, ঠাকুরে ভাবিত, ঠাকুরে নিমজ্জিত।

স্বভাবে কৃপণ কিন্তু সাধুসেবায় বদান্য। বলেন, সাধুসেবা ছাড়া আত্মীয়পোষণ মানে ভূত-ভোজন। আত্মীয়-স্বজনের পাল্লায় পড়ে ছোট মেয়ে কৃষ্ণময়ীর বিয়েতে অনেক খরচ করে ফেলেছেন তাই সারাদিন আছেন ভারি বিমর্ষ হয়ে। একটা সাধুভোজন হল [illegible] অথচ এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল জলের মত। [illegible] কারণে এত অপচয়।

এমন সময় দৈবযোগে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত যোগীন [illegible] উপস্থিত।

বলরামের আনন্দ তখন দেখে কে। ব্যাকুল হয়ে [illegible] দু হাত চেপে ধরল বলরাম। বললে, 'গৃহীর [illegible]হে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বারণ। জানি। [illegible] ভাই তুমি যদি দয়া করে অন্তত একটা মিষ্টিও খাও আমার সব সার্থক হবে। তখন এত ব্যয় আর আমার অপব্যয় বলে মনে হবে না।'

তা কি করে হয়! যোগীন মুখ ফেরাল।

কান্নার কাছে কার নিস্তার আছে! বাপই গলবেন, আর এ তো তাঁর সন্তান।

বলরামের কাতরতায় নরম হল যোগীন। নিল একটা মিষ্টি। মুখে দিল। অমনি সমস্ত মধুর হয়ে গেল বলরামের। যা মনে হয়েছিল ক্ষয় তাই মনে হল আনন্দ। যা মনে হয়েছিল অপব্যয় তাই ঐশ্বর্য-উল্লাস।

কৃষ্ণময়ীর খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শ্বশুরঘর করতে যাবার সময় গাড়িতে উঠেছে গয়নার বাক্স সঙ্গে নিয়ে নয়, ঠাকুরপূজোর বাক্সটিকে কাঁখে করে। ঠাকুরের নিত্যপূজার ছবিখানি আর জপের মালাগাছি রয়েছে সে বাক্সটিতে। সেই তার ইহজীবনের পাথেয়, পরজীবনের ভাণ্ডার।

ঠাকুর বললেন, 'আহা দেখেছ, কৃষ্ণময়ীর চোখ দুটি ঠিক ভগবতীর মত।'

বলরামের শাশুড়িও কম যায় না। ঠাকুর প্রণাম করে-করে কপালে কড়া পড়িয়ে ছেড়েছে। পুত্র বাবুরামকে অর্পণ করে দিয়েছে ঠাকুরের পদসেবায়। পরিপূর্ণ চিত্তে।

'যমে নিলে যতটা শোক না হয় তার চেয়ে বেশি হয় ছেলে সংসারবিরাগী হলে।' বললেন ঠাকুর।

কিন্তু বাবুরামের মা মূর্তিমতী প্রশান্তি।

বলরামের অসুখ করেছে, তার পায়ে হাত বুলোচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'রুগীকে আমি ছুঁতে পারি না, রোগের যাতনায় ভগবানকে ভুলে থাকে বলে। কিন্তু বলরামের কথা আলাদা। রোগের মধ্যেও ওর মন ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন।'

ভাইয়েদের উপর জমিদারির ভার তুলে দিয়েছে। বাঁধাবরাদ্দ মাসোয়ারা নিয়েই সে খুশি। কিন্তু সে-টাকায় ইদানি যেন সঙ্কুলান হচ্ছে না। তা নিয়ে একদিন আক্ষেপ করল বলরাম। নরেন কাছে ছিল, বলে উঠল, 'নিজের বিষয় নিজে দেখলেই তো হোত। বেশ থাকতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।'

কথাটা যেন মর্মে লাগল এসে বলরামের। বললে, 'নরেন বাবু, গড অলমাইটি। আপনার কথা ফিরিয়ে নিন। প্রভু আর তাঁর সন্তানদের সেবা করছি আমি। আমি কি করে বিষয়ী হব?'

সেই বলরামকে ফেরাতে এসেছে হরিবল্লভ।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর তখন অসুস্থ, একদিন এসেছে বলরাম। মুখখানি চিন্তাম্লান। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কি হয়েছে? কিসের এত ভাবনা?'

বলরাম বললে যা বলবার।

'কি রকম লোক তোমার এই ভাইটি?'

'এমনিতে ভালো। ঈশ্বরবিশ্বাসী। দোষের মধ্যে এই, শুধু ঈশ্বর নয়, যা শোনে তাই বিশ্বাস করে বসে।'

'তা করুক। একদিন এখানে আনতে পারো?'

'জানি না আসবে কিনা। এত সব বাজে কথা শুনেছে আপনার সম্বন্ধে, বোধ হয় চাইবে না আসতে।'

'তা হলে এক কাজ করো। গিরিশকে ডাকো।'

এল গিরিশ। কি ব্যাপার? হরিবল্লভ? হরিবল্লভ বোস? বা, ও আর আমি যে একসঙ্গে পড়েছি। আমি ঠিক ওকে নিয়ে আসতে পারব।

পরদিনই টেনে নিয়ে এল গিরিশ।

'ঐ দেখ আমি বলেছিলাম না, কেমন শিশুর মত সরল দেখতে।' হরিবল্লভের দিকে তাকিয়ে ভাবাকুল স্বরে বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'যার হৃদয় ভক্তিতে ভরপুর নয় তার কি অমন চোখ হতে পারে?' তার পর হরিবল্লভকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন। 'ভেবেছিলুম কটকের সরকারী উকিল কত না জানি তোমার চোটপাট, কিন্তু এখন দেখছি বিনম্র, অকিঞ্চন—'

ঠাকুরকে অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করল হরিবল্লভ। এ কার সম্বন্ধে শুনেছিল সে? এ কে পীযূষপুঞ্জদৃষ্টি কোমল পাত্রপবিত্র মধুমঙ্গলপ্রিয়!

'শুধু তাই নয়, আমার আত্মীয় আপনি। বলরাম যখন আত্মীয়। কি বলেন?'

ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল হরিবল্লভ। বললে, 'আপনার দয়া।'

গলে গেল সমস্ত কাঠিন্য। উড়ে গেল সমস্ত বিমুখতা। এই করুণাঘনের কাছে বসতে ইচ্ছে হল ঘন হয়ে।

'মেয়েরাও পায়ের ধুলো নেয়। তা ভাবি, তিনিই এক রূপে আছেন ভিতরে—এ প্রণাম তাঁর, আর কারু নয়!'

'না, আপনি তো সাধু।' বললে হরিবল্লভ, 'আপনাকে সকলে প্রণাম করবে তাতে দোষ কি!'

হরিবল্লভের দোষদৃষ্টি ঘুচে গেল মুহূর্তে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি কি! সে ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ কপিল কেউ এলে হোত। আমি রেণুর রেণু।' তাকালেন হরিবল্লভের দিকে। 'আপনি আবার আসবেন।'

'আপনি বলছেন কেন?'

'বেশ, আবার এসো।'

'বলতে হবে কেন, নিজের টানেই আসব।'

'বলরাম অনেক দুঃখ করে। মনে হল একদিন যাই, গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়। পাছে বলো, একে কে আনলে?'

বড় লজ্জিত হল হরিবল্লভ। যেন ধরা পড়ে গেছে। পাশ কাটাবার চেষ্টায় বললে, 'ও সব কথা কে বলেছে? আপনি কিছু ভাববেন না।'

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপায় নেই, পথও নেই। একেবারে ঢেলে দিতে হবে পায়ের উপর। নৈবেদ্য করে দিতে হবে দেহ-মন।

বড়লোক বলেই তো এটুকু অহঙ্কার। ঈশ্বরকৃপা না থাকলে খুব বড়লোকও অপদার্থ হয়ে যায়। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জ্জুন আর পারল না গাণ্ডীব তুলতে।

যাবার আগে ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিতে গেল হরিবল্লভ। ঠাকুর পা গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়বার পাত্র নয়। আর সে ছাড়বে না এ প্রাণজীবনকে। জোর করে টেনে নিল দু পা। ধুলো নিল ললাটে।

নীরোগ নির্মল হয়ে গেল। জীবনের চক্রাবর্তের মধ্যে খুঁজে পেল ধ্রুব বিন্দু।

এসেছিল বলরামকে নিয়ে যেতে, নিজেই বাঁধা পড়ল। ঐ যে বাপ বলেছিল নেশাখোর ছেলেকে, কি মধু যে পাস ঐ মদে কে জানে। ছেলে বলেছিল, একটু খেয়েই দেখ না। বাপ খেল, দেখি কি ব্যাপার। খেয়ে উঠে ছেলেকে বলল, ও তুমি ছাড়ো বাপু, আমি আর ছাড়ছিনে। সেই অবস্থা।

হরিবল্লভ চলে গেলে পর বললেন ঠাকুর, 'কেমন ভক্তি দেখেছ! নইলে জোর করে পায়ের ধুলো নেয়!'

পরে মাষ্টারকে বললেন চুপি চুপি, 'সেই যে তোমায় বলেছিলাম না ভাবে দেখলাম দুজন লোক। একজন ডাক্তার, মহেন্দ্র ডাক্তার, আরেক জন এই লোক, এই হরিবল্লভ। তাই দেখ এসেছে।'

আবার এসেছে।

এবার নিচে মাটির উপর বসে ঠাকুরকে পাখা করছে হরিবল্লভ।

কিন্তু হরীশের সর্ববিসর্জন। সব ছেড়ে-ছুড়ে ডেরা নিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। বলে, 'উপায় নেই, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। নইলে টাকা দেবে না ব্যাঙ্ক।'

মহিমাচরণ বেদান্তচর্চ্চা জ্ঞানচর্চ্চা করে, হরীশ রাগভক্তির আখড়াধারী।

'জ্ঞান কি জানিস?' ঠাকুর বোঝাচ্ছেন হরীশকে। 'স্বস্বরূপকে জানা। মায়াই দেয় না জানতে। যেন সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে, সেই মাটিটা ফেলে দেওয়া। ঐ মাটিটাই মায়া।'

'আর রাগ ভক্তি?'

'যেমন একটা পোড়োবাড়ির বন-জঙ্গল কাটতে-কাটতে নলবসানো ফোয়ারা পেয়ে যাওয়া। মাটি সুরকি ঢাকা ছিল, যাই ঢাকা সরে গেল ফর ফর করে জল উঠতে সুরু করলে।'

প্রকৃতি ভাব হরীশের, মেয়ের কাপড় পরে শোয়। অথচ নিজের স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে এসেছে।

ঠাকুর তাকে বলছেন, 'ওরে যা না একবার বাড়ি। তোর বউ খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাঁদে। একবারটি তাকে দেখা দিয়ে এলে কি হয়?'

মুখ গোঁজ করে বসে থাকে হরীশ। কানে আঙুল দেয় মনে-মনে।

'কচি মেয়েটাকে একটু দয়া করতে পারিস নে? দয়া কি সাধুর গুণ নয়? ওরে তাকে যদি একটু বোঝাস সে ঠিক বুঝবে।'

দয়া দেখাতে গিয়ে দায়ে পড়ে যাই আর কি। চোখের জল দেখে ফের ব্যাধের জালে জড়িয়ে পড়ি। ঠাকুর কি আমাকে পরীক্ষা করছেন?

একশো তেইশ

'ভয় কি রে? আমি আছি।' তারককেও তাই বলছেন ঠাকুর। 'স্ত্রী যত দিন বেঁচে থাকবে তাকে খোশোনা করতে হবে বৈ কি। একটু ধৈর্য ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। মাঝে-মাঝে যাবি বাড়িতে, যেমন-যেমন বলে দেব তেমন-তেমনটি করবি। দেখবি স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

রাখালকেও পাঠিয়েছি অমনি তার স্ত্রীর কাছে।

ভয় কিসের? আমি আছি।

দুস্তর সমুদ্রে আমিই দীপস্তম্ভ। বিপথ-বিপদের অন্ধকারে আমিই অরুণোদয়। নিদারুণ নৈস্ফল্যের মধ্যে আমিই মঙ্গলস্বরূপ। যদি কিছু থাকে এ বিশ্বলোকে, যদি কোনো শ্রী—সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোনো শৃঙ্খলা—তবে আমি আছি।

আফিসে কাজ করত তারক, ছেড়ে দিল। আর যখন রাখালের বেলায় কথা উঠল তাকে চাকরিতে বসিয়ে আবদ্ধ করবে তখন ঠাকুরকে এসে জানাতেই ঠাকুর বললেন, 'খবরদার, ঈশ্বরের জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস এ বরং শুনব তবু কারুর দাসত্ব করছিস চাকরি করছিস, এ কথা যেন না শুনি।'

কিন্তু নিরঞ্জনের বেলায় অন্য কথা। কেন হবে না? সেও চাকরি করছে বটে, কিন্তু মা'র ভরণ-পোষণের জন্যে।

'মার জন্যে কর্ম করে, তাতে দোষ নাই।' বলছেন ঠাকুর। 'আহা, মা! মা ব্রহ্মময়ীস্বরূপা!'

মা নেমে আয়, নেমে আয়। একদিন হঠাৎ তারকের বুকে পা রাখলেন ঠাকুর। মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে বলতে লাগলেন, নেমে আয় মা, নেমে আয়। যেমন রাখালের জিভ টেনে ধরে সাঙ্কেতিক মন্ত্র এঁকে দিয়েছিলেন তেমনি তারকের জিভে নখাগ্র দিয়ে লিখে দিলেন বীজমন্ত্র। কুণ্ডলী-পাকানো সাপ হেলে-দুলে উঠল। করল ফণাবিস্তার।

কেমন ভাবে শুবি? ভক্ত সন্তানদের শেখাচ্ছেন ঠাকুর: 'প্রথমটা চিৎ হয়ে শুবি। ভাববি মা কালী দাঁড়িয়ে আছে, বুকের উপর। এই ভাবে মায়ের ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বি। দেখবি সুস্বপ্ন হবে।'

রাত দুপুরে উঠে পড়েছেন কখন। ওরে তারক, আমাকে একটু গোপালনাম শোনা তো! নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।

যদি কাউকে না পান, দারোয়ানকে ডাকিয়ে আনেন। আমাকে একটু রামনাম শোনাও দারোয়ানজী। শুধু নাম। সীতারাম। জীবনের সমস্ত শীতে যে আরাম সেই সীতারাম।

তারকের সময়-সময় ইচ্ছে হয় ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদে। কেন কাঁদবে? তা জানে না। দুঃখে না আনন্দে, তাও না। দুঃখের আনন্দে না আনন্দের দুঃখে, তা বা কে বলবে? এমনি অহেতুক কাঁদব। সব চেয়ে বড় কথা, কাঁদতে ভালো লাগবে।

একদিন সত্যি-সত্যি বকুলতলার কাছে পোস্তার উপর বসে খুব খানিকটা কাঁদল তারক।

'ওরে ওরে ছাখ তো, তারক কোথায় গেল?

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কান্না ঠিক তাঁর কানে গেছে। আর, অমনি চঞ্চল হয়েছেন।

ডাকিয়ে আনলেন তারককে। কাছে বসালেন। বললেন, 'কাঁদছিস? খুব ভালো কথা। ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।'

কাঁদতে-কাঁদতে ধ্যান, তন্ময়তা। কান্নাতেই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ।

ধ্যান হত গিয়ে এঁড়েদর বিষ্ণুর। ধ্যানে কাঠ মেরে যেত। সবাই ধাক্কা মারছে, তবু নিঃসাড়। কত ডাকাডাকি, বিষ্টু, ও বিষ্টু কোথায় কে! নাকের নিচে হাত রাখো, নিশ্বাসের রেখা নেই। তখন সবাই খবর দিতে ছুটল ঠাকুরকে। ঠাকুর একটু ছুঁয়েছেন কি, বিষ্ণু চোখ মেলেছে। সূর্য্যের স্পর্শে জেগেছে অরবিন্দ।

ছোকরা বয়েস, ইস্কুলে পড়ে। এরই মধ্যে এত!

ঠাকুর বললেন, 'পূর্বজন্মের সংস্কার। গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছে একজন। আরাধনা করছে শবের উপর বসে। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নানা রকম বিভীষিকা দেখছে। শেষকালে মূর্তিমান বিভীষিকা বাঘ তাকে ধরে নিয়ে গেল। আরেক জন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে বসেছিল। সে ভাবলে এই ফাঁকে একটু শবসাধন করেনি। পূজার সমস্ত উপকরণ তৈরি, আচমন করে একটু বসে পড়ি শবের উপর। যেই ও-কথা মনে এল তর তর করে নেমে এল গাছ থেকে। আচমন করে শবের উপর বসে জপ করতে লাগল। একটু জপ করতে না করতেই ভগবতী আবির্ভূত হলেন। বললেন, প্রসন্ন হয়েছি, বর নাও। তখন সে লোক বললে, মা, এ কী কাণ্ড! ঐ লোকটা অত খেটে-পিটে অত আয়োজন করে তোমার সাধন করছিল, তোমার দয়া হল না, আর আমি ওর ছাড়া-আসনে বসে কি একটু জপ করলুম আর অমনি আমাকে দর্শন দিলে! ভগবতী তখন হাসিমুখে বললেন, বাছা, তুমি কি জন্মান্তরের কথা কিছু জানো? তুমি কত জন্ম আমার জন্যে তপস্যা করেছ তা কি তোমার মনে আছে? এই একটু শুধু বাকি ছিল, আজ এই দণ্ডে তা পূরণ হয়ে যেতেই আমার দর্শন পেলে। এখন বলো কি বর পছন্দ?'

সেই বিষ্ণু গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শুনে অবধি ঠাকুরের মন খুব বিষণ্ণ। বললেন, 'অনেক দিনই বলত আমাকে সংসার ভালো লাগে না। পশ্চিমে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল, সারা দিন এখানে-সেখানে মাঠে-নির্জনে পাহাড়ে-বনে বসে শুধু ধ্যান করত। আমাকে বলেছে কত ঈশ্বরীয় রূপ সে দর্শন করে। বোধ হয় এই শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক করা ছিল, বাকিটুকু সেরে নিল এ-জন্মে, এই কটি অল্প বছরের মধ্যে।'

'কিন্তু আত্মহত্যা শুনে ভয় হয়।' বললে একজন ভক্ত।

'আত্মহত্যা মহাপাপ। ফিরে ফিরে আসতে হবে সংসারে আর জ্বলতে হবে দাবাগ্নিতে। তবে যদি কেউ ঈশ্বর-দর্শন করে দেহত্যাগ করে স্বেচ্ছায়, তবে তাতে আর দোষ নেই। তাকে বলে না আত্মহত্যা। যখন একবার সোনার প্রতিমা ঢালাই হয়ে যায় মাটির ছাঁচে, তখন মাটির ছাঁচ ভেঙে ফেললে আর দোষ কি।'

আত্মহত্যা কি রকম জানো? জেল থেকে কয়েদী পালানো। জেল থেকে পালিয়ে কয়েদীর রেহাই নেই, এক সময় না এক সময় সে ধরা পড়বেই। তখন তার দ্বিগুণ খাটনি। প্রথম, তার প্রথম মেয়াদের বাকি অংশ; দ্বিতীয়, জেল-পালানোর জন্য অতিরিক্ত দণ্ড। তাই আত্মহত্যা অর্থ দ্বিগুণ কারাবাস।

ওরে এবার তোরা ভিক্ষেয় বেরো। ঠাকুর ডাকছেন তাঁর ভক্ত-সন্তানদের। ওরে কাঁধে ঝুলি নে, নগ্ন পায়ে ফের গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে। নীরবে নম্রমুখে গিয়ে দাঁড়া। যাতে তোকে দেখলেই বুঝতে পারে তুই দীনহীন, তুই ভিক্ষুক—

ভিক্ষেয় বেরুব?

হ্যাঁ, অভিমান নাশ করতে হবে, নির্মূল করতে হবে। নত হতে হবে প্রত্যেকের সামনে। পায়ের নিচে মাটির ঢেলার মত অহঙ্কারকে ধুলো করে দিতে হবে। দ্বারে-দ্বারে নিষেধ, দ্বারে-দ্বারে প্রত্যাখ্যান তবু অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে চিত্তের প্রসন্নতা। চতুর্দিকে নৈরাশ, তবু তার উর্দ্ধে জাগ্রত রাখতে হবে নিষ্ঠার জয়নিশান। ওরে ভিক্ষেয় বেরো। অহমিকাকে কুহেলিকার মত উড়িয়ে দে। জীবনের দৈন্যের গহ্বরকে গভীর করে তোল। ভিক্ষার সুধায় ভরে তোল সেই বিগ্রহের পাত্র।

সব চেয়ে সহজ কে? ঈশ্বর। দুঃখ কি? অসন্তোষ। সুখ কি? আত্মবোধের যে শান্তি। শত্রু কে? গুরুবাক্যে সংশয়। প্রেয়সী কে?

দীনে করুণা ও সজ্জনে মৈত্রী। শোভা কি? নিস্পৃহতা। তৃপ্তি কি? সর্বসঙ্গবিরতি। কামধেনু কি? অনঘা শ্রদ্ধা।

বলরামের সঙ্গে রাখাল বৃন্দাবনে গিয়েছে। শরীর টিকছে না কলকাতায়। যদি বৃন্দাবনে গিয়ে ভালো হয়, আনন্দে থাকে।

ওমা, সেই বৃন্দাবনে গিয়ে ফের রাখালের অসুখ করেছে।

'কি হবে!' ঝরঝর করে বালকের মতো কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। 'ওরে ও যে সতিাই ব্রজের রাখাল। যদি ওর নিজের জায়গা পেয়ে আর ফিরে না আসে। যদি স্বস্থানে শরীর রাখে!'

রেজেষ্ট্রি করে চিঠি পাঠানো হল কিন্তু উত্তর নেই।

মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। পরিত্রাণ-পরায়ণা ভক্তাভীষ্টকরী শিবকরী বিশ্বেশ্বরীর কাছে। মা, আমার রাখালকে ফিরিয়ে দে। ও আমার গোপাল, ও আমার নিত্যসঙ্গ। আমার হাড়ের হাড়। আমার নয়নের নয়ন।

রাখালের চিঠি এসেছে। লিখেছে মাষ্টারকে। লিখেছে এ বড় ভালো জায়গা। লিখেছে, এখানে ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করছে—

শুনে ঠাকুরের আনন্দ দেখে কে। তার জন্যে চণ্ডীর কাছে মানসিক করেছিলুম। সে যে বাড়িঘর ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল। তাকে আমিই তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগের যে তখনো বাকি ছিল! আহা, কি লিখেছে দেখ! ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করছে। লিখবেই তো। ওর যে সাকারের ঘর।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে পিতৃগৃহে গিয়ে উঠেছে রাখাল। ঠাকুরের অভিমান নেই। বললেন, 'রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে।'

'আপনার সামনে একটি ব্রহ্মচক্র রচনা করে সাধনা করি এ আমার ইচ্ছে।' একদিন বললে মহিমাচরণ।

বেশ তো। রাজি হলেন ঠাকুর।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রে রচিত হল সেই ব্রহ্মচক্র। মাষ্টার কিশোরী আর রাখাল বসেছে সেই চক্রে। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু গঙ্গার ছলছলানি যা একটু শোনা যাচ্ছে। আর ঝিল্লির অন্ধগুঞ্জন। মহিমাচরণ সবাইকে বললে ধ্যানস্থ হতে। ছোট খাটটিতে বসে একদৃষ্টে সব দেখছেন ঠাকুর।

ধ্যান সুরু হতে না হতেই রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত। ঠাকুর নেমে এসে রাখালের বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। শোনাতে লাগলেন মার নাম।

ব্রহ্মচক্রে বসে রাখালই ব্রহ্মানন্দ।

'রাখালকে দিয়ে মা কত কি দেখালেন। ওরে সব কথা বলতে নেই, বলতে বারণ।'

তোমাকে জানি আমার সাধ্য কি! আনন্দে যে তুমি আমার কাছে একটু ধরা দিয়েছ এতেই আমি তোমার আপন হয়ে গেছি। আমার শরীরে এই যে বহমানা প্রাণধারা এ তো তোমারই নামজপমালা।

[ক্রমশঃ।

এবার যখন

অতন্দ্র ভট্টাচার্য

তোমার হাতের নিকানো উঠোন পাকা ফসলের গন্ধে
সুদূর বনের সুরের পাখীরে আনলো যখন ডেকে—
খুশি-ঝিল্‌মিল্ মুগ্ধ-কামনা ছড়িয়ে শিশির ঘাসে
আমিও এলাম রৌদ্রছায়ায় তোমার মুখটি এঁকে।

সংসার-খুশি বাজালো যখন তোমাকে বাঁশির সুরে
মুখখানি ভরে ছড়িয়ে রেখেছে হাসি-হাসি রোদ্দুর—
নিবিড় নীড়ের স্নেহ-মমতায় গৃহিণীর সিংহাসনে
দেখে যাবো বলে আমিও এলাম পেরিয়ে অনেক দূর।

আমি যে দেখেছি সুখে থাকবার ছোট্ট মধুর স্বপ্ন
হাহাকার তুলে হারিয়ে গিয়েছে হিংসার কালো ঝড়ে—
আমি যে দেখেছি তোমার ভুবন কান্নায় এলোমেলো,
নিরন্ন দিন কী যন্ত্রণায় জ্বলেছে প্রহরে প্রহরে!

তোমার দুয়ারে এবার যখন সকালের পাখী এলো
ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় রাঙালো তোমার ছবি,
সুরবতী বলো, এমন দিনেতে কী করে থাকবো দূরে
দূরে থেকে কুলের কবিতা থাকতে পারে কি কবি

কুরী-দম্পতির নিকট প্রেরিত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদবাহী টেলিগ্রাম-পত্র

১৪ই নভেম্বর, ১৯০৩

মসিঁয়ে ও ম্যাদাম কুরী,

সম্মান-পুরঃসর টেলিগ্রাম যোগে আপনাদের জানাইতেছি যে, বেকেরেল রশ্মি সম্বন্ধে আপনাদের সম্মিলিত ও অনন্যসাধারণ গবেষণার মর্যাদাস্বরূপ এই বৎসরের পদার্থবিদ্যার নোবেল প্রাইজের অর্ধেক আপনাদের দেওয়ার জন্য ১২ই নভেম্বরের অধিবেশনে সুইডিশ একাডেমী অব সায়েন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

পুরস্কার বিতরণের ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত সমূহ ১০ই ডিসেম্বরের আনুষ্ঠানিক সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে রক্ষা করা হইবে—এবং ঐ তারিখে ঐগুলি প্রকাশ করা হইবে। এবং সেই অধিবেশনে ডিপ্লোমা ও স্বর্ণপদক সমূহও বিতরণ করা হইবে।

এই অধিবেশনে নিজেরা উপস্থিত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিবার জন্য একাডেমী অব সায়েন্সের পক্ষ হইতে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ করিতেছি।

নোবেল ফাউণ্ডেশনের কার্যবিধির ৯ ধারা অনুসারে এই অধিবেশনের ৬ মাসের মধ্যে যে গবেষণার জন্য আপনাদের পুরস্কার দেওয়া হইল, সেই গবেষণার বিষয়ে ষ্টকহলমে প্রকাশ্য বক্তৃতা দেওয়া আপনাদের প্রয়োজন। ব্যবস্থা পছন্দ হইলে উল্লিখিত সময়ে যদি আপনারা ষ্টকহলমে আসেন, তাহা হইলে অধিবেশনের অব্যবহিত কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের এই দায়িত্ব পালন করা সন্দেহাতীত-রূপে খুবই সুবিধা জনক হইবে।

ষ্টকহলমে আপনাদের দেখিবার পরম সৌভাগ্য একাডেমী আশা করেন। মসিঁয়ে ও ম্যাদামের কাছে বিনীত আবেদন, আপনারা আমার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি।

ভবদীয়,

অধ্যাপক অরিভিল্লিয়াস,

সেক্রেটারী, একাডেমী অব সায়েন্স।

প্যারে কুরীর উত্তর

১১শে নভেম্বর, ১৯০৩।

মিঃ সেক্রেটারী,

পদার্থবিদ্যার জন্য নোবেল প্রাইজের অর্ধেক দিয়া আমাদের যে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা ষ্টকহলমের একাডেমী অব সায়েন্সের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমাদের বিনীত আবেদন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁহাদের জানাইবেন।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখের আনুষ্ঠানিক অধিবেশনের জন্য সুইডেনে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসুবিধা জনক।

এখানে আমাদের প্রত্যেকের উপর যে অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত আছে, তাহা বিশেষ ভাবে বিপর্যস্ত না করিয়া আমরা ঐ সময়ে যাইতে পারিব না। যদিও বা ঐ অধিবেশনে যাই, আমরা সামান্য সময়ই থাকিতে পারিব এবং সুইডেনের বিজ্ঞানীদের সহিত পরিচিত হইবার সামান্য সময়ই পাইব।

পরিশেষে, ম্যাদাম কুরী এই গ্রীষ্মে অসুস্থ হইয়াছিলেন, এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নাই।

আমি আপনাকে বলিতে চাই যে, আমাদের যাওয়ার এই সময়টি এবং বক্তৃতা দেওয়া পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত রাখুন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ঈষ্টারের সময় ষ্টকহলমে যাইতে পারি, অথবা জুনের মধ্যভাগে হইলে আরও সুবিধা জনক হয়।

মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি—

প্যারে কুরী

জোয়ান অফ আর্কের চিঠি

[ফ্রান্সের এক দরিদ্র পিতা-মাতার ঘরে জন্মেছিল একটি মেয়ে। ডমরেমির জমিতে চাষ করে চলত তাদের গরীব সংসার। ইংরেজের অত্যাচারে ফ্রান্স তখন জর্জরিত। দেশের বড়ো বড়ো শেঠ আর বীরেরা সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তোলবার কথা ভাবতেন, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শক্তির কাছে এক-এক করে তাদের

সারা দেশের জমি যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তার প্রতিরোধ সাধন করবার ক্ষমতাই যেন তাদের দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

সতেরো বছরের মেয়ে জোয়ান তার গাঁয়ের গীর্জায় গিয়ে দেবতার ধ্যান করত। কেঁদে ভাসিয়ে দিত বুক। দেশের দুর্দশার কাহিনী তারও কানে নিয়ে পৌঁছত আর প্রাণের ঠাকুরের কাছে সে পৌঁছে দিত সেই বেদনার কথা। বলত, দেশের বীরেরা যদি না পারেন ত আমার এই কোমল অঙ্গে তুমি একবার আবির্ভূত হও দেবতা! দৈবশক্তিতে বলশালী হয়ে আমি একাই এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করব মাতৃভূমিকে। সেই অলৌকিক শক্তি পেয়েও ছিল কিশোরী জোয়ান অফ আর্ক। যে মেয়ে গোয়ালে গরু দুইত, জমি চষত আর সেলাই নিয়ে কাটাত দিন, ভগবানের কৃপা পেয়ে সেই মেয়ে এ কালেও অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করালে! জোয়ানের নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যেরা অমিত বিক্রমে ইংরেজদের আক্রমণ করল। দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেই নবীন কিশোরীর সম্মুখীন হতে এদের সঞ্চার হোল ইংরেজ-শিবিরে। অর্লিয়ার উদ্ধার সাধন জোয়ানের জীবনের এক পরম সিদ্ধি। বুঝি বা সমগ্র ফরাসী দেশের।

কিন্তু অবশেষে জোয়ান বন্দিনী হল ইংরেজের হাতে। ডাইনী বলে ইংরেজরা এই ঈশ্বর-প্রেরিত মেয়েকে আগুনে পুড়িয়ে মারল। ইংরেজ জাতির ইতিহাসে অনেক কলঙ্কের দাগ লেগেছে। জোয়ানকে হত্যা করা সেই অধ্যায়ের চরম কলঙ্কের উদাহরণ। দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সপ্তম চার্লস তাকেই ধরিয়ে দিলে, যাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল জোয়ান। আগুনে তার দেহ ঝলসে যাবার আগে জনতা তার দেহ নিয়ে পিশাচের খেলা খেলল। তারপর তার দেহভস্ম ভাসিয়ে দিলে সেইন নদীজলে, পাছে তার পূত দেহাবশেষ ফ্রান্সের কোন জমিতে পড়ে নূতন কোন জোয়ানের জন্ম সম্ভব করে।

অর্লিয়ার দরজায় পৌঁছে ইংরেজের কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছিল জোয়ান। আত্মসমর্পণের জন্য দাবী করেছিল কিশোরী উদ্ধত ইংরেজ সম্রাটকে।]

(১৪২৯)

ইংলণ্ডের সম্রাট, বেডফোর্ডের ডিউক যিনি নিজেকে ফরাসী দেশের রিজেন্ট মনে করেন, উইলিয়াম পোল, সাফোকের আর্ল, জন ট্যালবোট এবং টমাস, আপনারা যারা ডিউকের সমরাধিনায়ক বলে পরিচিত, আপনাদের সকলকে উদ্দেশ করে আমি এই পত্র লিখছি।

স্বর্গের রাজরাজেশ্বর, তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করুন। এই দেশের যে সকল নগর জনপদ আপনারা শক্তির দম্ভে পদ-দলিত করে অধীন করেছেন, সেই সকল নগরের কর্তৃত্ব আপনারা আমার হাতে দান করুন, কারণ আমি দেবতার আদেশপত্র নিয়ে এসেছি আমার সঙ্গে। ফ্রান্সের রাজছত্রকে পুনরুদ্ধার করে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই ঈশ্বর এই কিশোরীর শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন। সম্রাটের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতেও আমি সম্মত আছি। যদি অঙ্গীকার করেন যে সসৈন্যে ফ্রান্সের ভূখণ্ড ত্যাগ করে যাবেন, এই দেশ থেকে যা অপহরণ করেছেন তা প্রত্যর্পণ করবেন আর তোমরাও বিনা প্রতিবাদে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করো। আমি ঈশ্বরের নাম করে বলছি, তোমরা যদি তা না করো, তবে অতি শীঘ্রই সেই কিশোরীকে তোমরা সম্মুখ ভাগে দেখতে পাবে। তার পর এক মহা সর্বনাশের সম্মুখীন হবে তোমরা।

ইংলণ্ডের মহামান্য সম্রাট যদি আমার নির্দেশ মত কার্য না করেন, তবে ফ্রান্সের সমর-অধিনায়িকা হিসাবে, এ দেশের যেখানে যখন আমি ইংরেজ সৈন্য বা সেনাপতির সাক্ষাৎ পাবো তাকে স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলক ভাবে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করব। যদি তারা আমার আদেশ না মান্য করে, তাদের হত্যা করতেও আমি দ্বিধা করব না। ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই আমার এই অভিযান। অন্যায়কে শাসন দিয়ে নিবৃত্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে তিনি। কিন্তু তারা যদি আমার ইচ্ছামত কাজ করে, তবে আমার করুণা ও দাক্ষিণ্য অকপটে বর্ষিত হবে তাদের উপর। এ কথা বিশ্বাস করবেন মহামান্য সম্রাট যে ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন যে, এই দেশের উপর রাজ অধিকার চার্লসের। ইংলণ্ডেশ্বরকে এ দেশ পরিত্যাগ করতেই হবে। চার্লসই সপারিষদ সসম্মানে প্যারিসে রাজছত্র-তলে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

ঈশ্বরের এই বাণীতে যদি আপনার প্রত্যয় না হয়, যদি বিশ্বাস স্থাপনা করতে না পারেন একটি কোমলাঙ্গী কিশোরীর পত্রপ্রেরিত সতর্কবাণীতে, তবে রণক্ষেত্রে বা অন্যত্র যেখানে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে সেখানেই চরম আঘাত দেবো আমি আপনাকে। এমন পরাজয় ঘটবে আপনার, এমন অসম্মান বর্ষিত হবে আপনার শিরে, যা সহস্র বর্ষের ইতিহাসে কোন শত্রুকে কোন দিন দেয় নি ফরাসী দেশ। ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে এবং আমার দেশের সৈন্যদের তাঁর নিজের বলে বলীয়ান করে দিয়েছেন। আমাদের হাতে আপনার পরিত্রাণ নেই। সুতরাং এখনও সাবধান! বিলম্ব না করে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন।

মাননীয় ডিউক মহোদয়, নিজের চরম সর্বনাশ আহ্বান করে আনবেন না। নিজের বিনাশ সাধন করবেন না। আমার সঙ্গে আসুন। যোগ দিন সেই মহান ব্রত সাধনে। খৃষ্টধর্মের পবিত্র কর্মে সানন্দে সংযুক্ত হোন আমার সঙ্গে। অর্লিয় নগরীর শান্তিভঙ্গ করবেন না। সন্ধিতে মিলিত হতে অগ্রসর হয়ে আসুন। এ আবেদন ও সতর্কবাণী যদি অস্বীকার করেন, ত জানবেন যে আপনার নিয়তি আপনাকে চরম দুঃখ দুর্দশার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

শেখভের চিঠি

[ছোট গল্পের যাদুকর হিসাবে শেখভের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে সর্বকালের নর-নারীর মনে। পেশা ছিল তাঁর ডাক্তারী। সাহিত্যে এলেন কিছু পরে। গল্প লিখলেন যখন পাঠকের মন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ভাবলে, এ কে লোক। জীবনের অন্দরমহল অবধি যার নখদর্পণে? নাটকগুলি রচনা করেছেন, সর্বকালের জীবন-দর্শন যার প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে আছে। একবার এক বন্ধু তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, গল্প লেখার টেকনিক কি তাঁর। উত্তরে হাসলেন লেখক। তার পর টেবিল থেকে ছাইদানিটি তুলে নিলেন হাতে। বললেন, কাল এসো। 'ছাইদানি' বলে একটা গল্প শুনিয়ে দোবো তোমাকে। এমনি ধারা লেখক ছিলেন শেখভ। গল্প যাঁর কাছে

আসত। অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতো যাঁকে গল্পের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হোত না। কিন্তু তাই বলে জীবনকে খুব গভীর ভাবে জানবার প্রতি ঔদাসীন্য ছিল না তাঁর। কিন্তু সে কৃতিত্ব বোধ করি টলষ্টয়ের বেশী। তিনিই শেখভের মধ্যে এক সচেতন জীবন-শিল্পীকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন। টলষ্টয় দুঃখ করে বলতেন যে, ডাক্তারী বিদ্যার চক্রকারী প্রণালীতে মন অভ্যস্ত না হলে, শেখভ আরো অনেক বড়ো সাহিত্যিক হতে পারতেন। গর্কীও ছিলেন পরম মিত্র। এই দু'জন যুগস্রষ্টার মধ্যে শেখভের প্রতিভার কোন সময়ে নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। 'দি সী গাল' নাটকখানি প্রথম অভিনয়ের সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু তার পরের নাটকগুলিও 'দি সী গাল' নাটকই পরে মস্কো আর্ট থিয়েটারে প্রযোজিত হয়ে বিপুল সমাদর লাভ করেছিল। চিঠিপত্রের মধ্যে চিরকালই পরিহাস মিশিয়ে লিখতেন শেখভ। প্রথম জীবনের গল্প-প্রবন্ধেও এই পরিহাসের সুর ছিল বরাবর। নিজের ভাইকে উদ্দেশ করে লেখা এই চিঠিখানিতে শেখভের রচনার সব ক'টি বৈশিষ্ট্যই পুরোমাত্রায় বজায় আছে। সেইটুকুই বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়।]

মস্কো, ১৮৮৬

বহু বার তুমি আমাকে চিঠিতে লিখে জানিয়েছ, মুখে অনুযোগ করেছ যে লোকে ঠিক তোমায় বুঝতে পারে না। এ রকম অনুযোগ আমি কখনো নিউটন বা গ্যয়েটেকে করতে শুনিনি। যীশুখৃষ্ট বলতেন বটে যে, লোকে তাকে ঠিক বুঝলে না। কিন্তু তিনি সে কথা নিজের সম্বন্ধে বলতেন না, বলতেন এই জন্যে যে তাঁর প্রচারিত তত্ত্বকথা সে যুগের বহু লোক সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি। সে ছিল তাঁর অন্তর্বেদনা। কিন্তু তোমায় লোকে খুব ভাল ভাবেই বোঝে। তুমি যদি নিজেকে না বুঝতে পারো, সে দোষ লোকের নয়। সে দোষ তোমার নিজের।

তোমার নিজের ভাই ও বন্ধু হিসাবে আমি তোমাকে বুঝি। সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমার অনুভূতিকে বোধ করতে পারি। এ কথা তুমি বিশ্বাস করো। তোমার যে সকল চারিত্রিক গুণ, তা আমার অত্যন্ত গভীর ভাবে জানা। সে সকল গুণপণাকে আমি শ্রদ্ধা করি। পরম সম্পদ বলে মনে করি। যদি আমার এই কথার সত্যাসত্যের পরীক্ষা চাও, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই জানবে। অত্যন্ত কোমল তোমার মন। উদার তোমার মন। পরার্থে তুমি শেষ কপর্দকটি অবধি দান করে দিতে পারো, তা আমি ভালো ভাবেই জানি। তোমার মনে ঘৃণা-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। সরলচিত্ত মানুষ তুমি। জীবে প্রেম তোমার জীবনের সহজ বৃত্তি। মানুষকে বিশ্বাস করাই তোমার স্বভাব। অন্যায় বা খল-কপটতা তোমার সহজসাধ্য নয়। এ ছাড়াও আর একটি অনুগ্রহ তুমি পেয়েছ উপর থেকে। সেটি ঈশ্বরের দান। প্রতিভার আশীর্বাদ। অমন প্রতিভা সাধারণ মানব সমাজ থেকে তোমাকে বহু উর্ধে তুলে রেখেছে। বিশ লক্ষেও অমন প্রতিভা একজনের থাকে না। তুমি শিল্পী। তোমার শিল্পি-প্রতিভা তোমাকে অমর্ত্য আসন দিয়েছে। দেবেও। তুমি সংসারে যাই করো, লোকে তোমার প্রতিভাকে সম্মান জানাতে কার্পণ্য করবে না। 'প্রতিভাশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের ভালো-মন্দ জনসাধারণের বিচারের অতীত বস্তু।

দোষের মধ্যে তোমার একটি। সেই দোষেই তোমার শরীর মনের যত অশান্তি। তোমার কর্মে ও চিন্তায় শালীনতার অভাব। আমাদের জীবন কতকগুলি সর্তসাপেক্ষ তা তোমার অজানা নয়। শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করার জন্য মানুষের কিছুটা শালীনতার প্রয়োজন আছে জীবনে। প্রতিভার অধিকারী তুমি, স্বভাবতঃই বিদগ্ধ সমাজে চলাফেরা করার সুযোগ পাও, কিন্তু তাদের সঙ্গে স্থিতিবান হতে পারো না তুমি। বারংবার তুমি ছিটকে এসে পড়ো অত্যন্ত বিসদৃশ সমাজে।

আমার মতে কালচার্ড লোকেদের অন্ততঃ পক্ষে এই ক'টি গুণপণা থাকার দরকার।

১। মানুষের ব্যক্তিত্বকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা সহৃদয় হন, অপরের প্রতি হন সহনশীল। অন্য কোন মানুষকে দুঃখ দেওয়া যেমন তাদের ধারণার অগোচর, তেমনি গোলমাল করা বা অতিথিকে অপ্রস্তুত করাও তাঁদের স্বভাব ও সজ্জনতার অতীত।

২। সজ্জন লোক কেবল ভিক্ষুক বা মূক প্রাণীর প্রতি দয়া দেখান না। মানুষের দৃষ্টির অগোচর যে সব দুঃখ বেদনা, তাদের প্রতিও তাঁর দরদ কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইয়ের পরীক্ষার ফি জমা দিতে বা মায়ের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ কিনে দিতে তাঁদের ভুল হয় না।

৩। অন্যের সম্পত্তির উপর তাঁদের অবহেলা থাকে না। সুতরাং ধার শোধ দেওয়া তাঁরা কর্তব্য মনে করেন।

৪। মিথ্যা বা ধাপ্পাকে তাঁরা আগুনের মতই ভয় করেন। অতি সামান্য ব্যাপারেও তাঁরা মিথ্যা ভাষণে রাজী হন না। মিথ্যা কথা শ্রোতার কানে পীড়া দেয়। শ্রোতার মনে বক্তার উপর বিরাগ জন্মায়। ঘরে বাইরে তাদের আচরণে সামঞ্জস্যের অভাব থাকে না। গরীব বন্ধুর কাছে তাঁদের ব্যবহার অসম্মানসূচক হয় না কখনো। প্রগলভতাকে ঘৃণা করেন তাঁরা মনে মনে। অন্যের কানে ব্যক্তিগত সংবাদের জয়ঢাক বাজান না তাঁরা। বরং নিঃশব্দ শ্রোতার ভূমিকায় তাঁরা ভালো অভিনয় করেন।

৫। নিজের দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে তাঁরা অন্য লোকের হৃদয়-তন্ত্রীতে সমবেদনার মূর্চ্ছনা জাগাতে চান না। অন্যে তাঁকে ভুল বুঝছে বা যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে না, এ কথা বলে তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা অন্যের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে ভালবাসেন না।

৬। মিথ্যা দর্প তাঁদের বাক্যে বা মজ্জায় প্রকট নয়। এ[illegible] আনার পরোপকার করে ষোলো আনার কৃতিত্ব দাবী করা তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। যাঁরা সত্যিকার প্রতিভাবান তাঁরা বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করেন না। জনতার মধ্যে থেকেও তাঁরা অন্তরালে রাখ[illegible] ভালবাসেন নিজেদের। জানোই ত, শূন্য কলসেই শব্দ হয় বেশী।

৭। নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখেন বলেই, [illegible] প্রতিভার স্ফুরণের পথে তারা নারী, সুরা আর অহমিকা[illegible] পরিহার করে চলেন। প্রতিভার গর্বই তাঁদের জীবন-প[illegible] একমাত্র পাথেয়।

৮। মনের মণিকোঠায় এক সৌন্দর্য-চেতনাকে বিকশিত ক[illegible] তুলতে চান তাঁরা। নারীকে কেবল লালসা চরিতার্থ কর[illegible] উপকরণ হিসাবে চিন্তা করেন না তাঁরা। তার মধ্যে অন্য কিছু আবিষ্কার করার সাধনা সত্যিকার জীবন-শিল্পীর।

পৃথিবীর সকল কালচার্ড লোকের বৈশিষ্ট্যই হোল এই স[illegible]

কালচার্ড হওয়ার মানে পিকউইক ভোপার পড়া বা কাউন্টের ছ'পাতা মুখস্থ করা নয়। এ কথা জেনে রাখা তোমার প্রয়োজন।

রাত্রি-দিন অমানুষিক পরিশ্রম করা দরকার তোমার। নিরন্তর ঘোষণার পথ ভিন্ন সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যেকটি মুহূর্তকে ফলপ্রসূ করাই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। পড়ো—আরো বেশী করে পড়ো—

অহমিকা ত্যাগ করো। ত্রিশের কোঠায় বয়স গিয়ে পৌঁছল। আর ত ছেলেমানুষ নও তুমি?

তোমার কাছে এই আমার প্রত্যাশা। শুধু আমার নয়, আমাদের সকলেরই।　　ইতি।

শেরিডনের পত্র

[ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাতনামা বক্তা ও রাজনীতিবিদ্ শেরিডনের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। থিয়েটার-মালিকানা ছিল তাঁর অর্থ উপার্জনের অন্যতম উপায়। সেই থিয়েটার ব্যবসায়ে বড়ো বড়ো লোকসান খেয়ে অবশেষে চরম টানাটানির মধ্যে পড়েন শেরিডন। তখন পাওনাদারদের অত্যাচার ও জেলের ভয় তাঁর মাথার ভিতর অশান্তির আগুন জ্বেলে দেয়। আসন্ন মৃত্যুর কথাও ভাবছিলেন তিনি; তখন কিন্তু শমনের চেয়ে বেশী ভয় ছিল পাওনাদারের আর জেল-হাজতের অসম্মান। মৃত্যুর মাস দু'মাস আগে বন্ধু ও দার্শনিক স্যামুয়েল রাজার্সকে এই মিনতিপূর্ণ চিঠিখানি লেখেন শেরিডন। এর ফলে গভীর লজ্জা থেকে উদ্ধারও পেয়ে যান। কিন্তু সে মাত্র দু'টি মাসের জন্য। তারপরই আর এক জগত থেকে ডাক আসে তাঁর যেখান থেকে ফেরার পথ জানে না মানুষ। শেষ দুটি মাস বন্ধুর অনুকম্পায় অনেকখানি নিশ্চিন্তে কালযাপন করেছিলেন তিনি।

বাগ্মী বার্ক বা রাজনীতিবিদ নেতা পিটের চেয়ে কম সম্মান পেতেন তিনি বেঁচে থাকতে। মৃত্যুর পর এই দরিদ্র মানুষটি ওয়েস্ট মিনিষ্টার গীর্জায় এক সম্মানিত বিশ্রাম লাভ করেছেন। তাঁর দেশের লোক তাঁকে কতখানি সমাদর করত মনে মনে, এই ঘটনা তারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।]

১৫ই মে, ১৮১৬

একশ' পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে আমার বর্তমান অবস্থার সকল [illegible] কাটিয়া যাইবে আশা করি। আমি এখন একান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। [illegible] দেউলিয়া অবস্থায় দিনযাপন করিতেছি। সামনের এক [illegible] মধ্যে নাটকগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিতে পারিব আশা করিতেছি। তাহা সম্ভব হইলে ভাগ্যচক্র আবার [illegible] অনুকূলে ঘুরিয়া আসিবে।

আমার ঘরের কার্পেট তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য শাসাইয়াছে পাওনাদাররা। তোমার বন্ধুপত্নীর ঘরে হামলা করিয়া আমাকে [illegible] ধরিয়া লইয়া যাইতে চায়। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া [illegible], এই চরম বিপদের মুখে একবার আসিয়া বন্ধুর পার্শ্বে [illegible] একবার আসিয়া আশ্বাস দিয়া যাও।

চার্লস ল্যাম্বের পত্র

[ইংরেজ সাহিত্যিক চার্লস ল্যাম্বের নাম জানেন না এমন ইংরেজী পাঠক আমাদের দেশে নেই। সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে তিনি অমরত্ব অর্জন করে গেছেন। কিন্তু লেখকের পারিবারিক জীবন ছিল বড়ো দুঃখের। পাগলামি তাদের পারিবারিক রোগ। ল্যাম্বের পিতা এবং মাতা দু'জনেই ছিলেন অস্থিরচিত্ত মানুষ। ল্যাম্ব অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী কোন উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হননি, কিন্তু তাঁরও জীবনে মাঝে মাঝে এক অহেতুক অস্থিরতা আসত। কিছু কাল এক উন্মাদ-আশ্রমে তাঁরও দিন কেটেছিল। সে কথা কবিবন্ধু কোলরিজকে পরম বেদনার সঙ্গে লিখেছিলেন ল্যাম্ব। এই দু'জনের মধ্যে পত্র মারফৎ এক অন্তঃসলিলা প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত হত, যার অমৃত দু'টি মানুষের চিত্তকেই অশেষ তৃপ্তিদান করতে পারত।

ল্যাম্বের বোন তার এক অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছুরি দিয়ে তার মাকে হত্যা করে। সেই দৃশ্য চাক্ষুষ দেখে লেখকের মনের মধ্যে যে প্রবল ধাক্কা লাগে, তা সামলে নিয়ে বন্ধুকে চিঠি লিখতে তার পাঁচ দিন সময় লেগেছিল। এই সময়ের ব্যবধানটুকুই ইঙ্গিত দেয় যে কত বড়ো শক পেয়েছিলেন তিনি এই মর্মান্তিক ঘটনায়। কোল'রিজ এই পত্রের উত্তরে যে চিঠি লেখেন ল্যাম্বকে তার মধ্যে অপরিসীম স্নেহের সঙ্গে একটি গভীর ভগবদ্ বিশ্বাসের প্রেরণা ছিল, যার অমর্ত্য আবেদন অস্থির চিত্ত ল্যাম্বের মনে পরম সান্ত্বনার স্পর্শ দিয়েছিল।]

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯৬

প্রিয় বন্ধু—

আমাদের পরিবারে যে মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তার সংবাদ ইতিমধ্যেই কোন বন্ধুর বা সংবাদপত্র মারফৎ পাইয়া থাকিবে। আমি তাহার সংক্ষেপিত বৃত্তান্ত জানাইতেছি। আমার ভগিনী উন্মত্ততার বিকারে মাতৃহন্ত্রী হইয়াছে। আমি যখন অকুস্থলে পৌঁছিয়াছিলাম তখন শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার হাত হইতে ছুরিটি ছিনাইয়া লইবার অবসর পাইয়াছিলাম আমি। এই মাত্র। বর্তমানে সে মানসিক চিকিৎসালয়ে যাইবার প্রতীক্ষায় এক উন্মাদাগারে আটক রহিয়াছে। ঈশ্বরের অপরিসীম করুণা যে আমার বুদ্ধি বিবেচনার কোন বিকার ঘটে নাই। আহার-নিদ্রায় আমার কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। বিচারবুদ্ধিও আমার আচ্ছন্ন হয় নাই। বাবাও সামান্য আহত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে সেবা-যত্ন করার দায়িত্ব পড়িয়াছে আমার উপর। সে সকল কর্তব্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিবার মত মানসিক স্থৈর্য যে আমার আজো অটুট আছে, তাহাও ঈশ্বরের অকৃপণ করুণা। আমাকে তুমি পত্র দিবে বন্ধু! এ অবস্থায় আমার বড়ো প্রয়োজন ভগবদ্ভক্তির। তুমি আমাকে তাহাতে উদ্বুদ্ধ কর, ইহাই আমার একান্ত কামনা। যা হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ আমি সহ্য করিতে পারি না। অতীতকে তুমি তোমার পত্রে জিয়াইয়া তুলিও না। অনাগত দিন-রাত্রির প্রেরণা দাও তুমি আমার হৃদয়ে।

আমার এখানে আসিয়া আমায় সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিও না। তাহা করিতে আমি তোমায় নিষেধ করিতেছি। তুমি আসিলেও আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, ইহা নিশ্চিত জানিও। আমি এখন আমার ঈশ্বরের সান্নিধ্যে রহিয়াছি, যিনি তোমার আমার, জগৎ সংসারের সকল নর-নারীর কল্যাণ সাধনায় সতত আত্মসমাহিত। তিনি তোমার ও তোমার পরিবারের সবিশেষ মঙ্গল করুন। চিঠির উত্তর দিও।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

খাওয়ার পরে আবার বেরুলাম। বসে থাকব না, যতটুকু সময় আছে ঘুরে ঘুরে দেখি। ঠিক যেন আমাদেরই এক গ্রাম। সদর রাস্তা ধরে চলেছি। মেটে রাস্তা, দু-ধারে পগার। এধারে ওধারে টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ি। কুয়োর জল তুলছে খচ্চর দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। মানুষজন আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ায়। এমন চেহারার একদল কৃষ্ণমূর্তি গাঁয়ের পথে ঘোরাঘুরি করছে, দেখবার বস্তুই বটে।

এক প্রান্তে নিরিবিলি একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে—এই যে বলা হয়, ভিখারি নেই মোটে এ দেশে—শতছিন্ন পোশাক-পরা বুড়োমানুষটা কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটা সরে গেল, অদূরে এক বাড়ির উঠানে গিয়ে উঠল। সেখান থেকেও অমনি তাকাচ্ছে। কিন্তু পরদেশে বাড়ির উঠান অবধি হামলা দিয়ে দয়া দেখাতে সাহসে কুলায় না। হাজার দুই ইউয়ান দোভাষির হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, দিয়ে এসো লোকটাকে—

দোভাষি বলে, সেকেলে গেঁয়ো মানুষ—ধরণধারণ ওদের এই রকম। বিদেশি বলে কৌতূহলী হয়ে দেখছে তোমাদের। তাই একেবারে ভিখারি ভেবে বসেছ? টাকাকড়ি চায় না, দিলে নেবেও না—খানিকটা অপমান করা হবে শুধু।

বেলা পড়ে আসে। চলো ফিরে সেই ইস্কুলবাড়ি—আমাদের আড্ডাখানায়। ঘুরে-ফিরে সবাই ওখানে এসে জুটবেন, ওখান থেকে পিকিনে রওনা।

তুমুল বাদ্যভাণ্ড সেই ইস্কুলবাড়ির উঠানে। দূর থেকে আওয়াজ পাচ্ছি। গাঁয়ে ঢুকবার মুখে ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখেছিলাম—তারা সব এসে জুটেছে। শুধু বাজনা নয়, বাজনার সঙ্গে নাচ। নাচছে ওরাই শুধু নয়, ভারতীয়দের ধরে ধরে নাচে নামাচ্ছে। ঘন-বিন্যস্ত গাছের ছায়া, আধপুকুর গোছের জলাভূমি—তারই পাশে আসন্ন সন্ধ্যায় সে কি বিষম হুল্লোড়! সন্তর্পণে এক গাছের তলে দাঁড়াই। শনির দৃষ্টি তবু এড়ায় না—

এই যে, আসুন, নেমে পড়ুন—কোঁচার কাপড় গুঁজে দিই কোমরে, অর্থাৎ নামতোই নির্ঘাৎ। নেমে পড়লামও বটে, আসরে নয়—পগার লাফিয়ে একেবারে রাস্তার উপর! হনহন করে চলেছি—দৌড়নো বললেও আপত্তি করব না। বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর আমাদের বাস রয়েছে, তার খোপে ঢুকে পড়ে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলি। তার পর সকলে এসে পড়লে বাস ছেড়ে দিল।

পিকিন ছাড়তে হবে দু-এক দিনের মধ্যে, দেখা-শুনোর যা-কিছু তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নাও। প্রত্নপণ্ডিত চেং-চেন-টোলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। নিষিদ্ধ-শহরের এলাকার মধ্যে লেখক-সংঘ—সেইখানে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অদূরে পে-হাই পার্ক, পরিবেশ অতি চমৎকার! জায়গাটুকুকে বলে গোল-শহর (Round City)। একলা আমি গিয়েছি, সঙ্গে এক দোভাষি। এসে অবধি চেং মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করছি, অতীত কালের মধ্যে অতিস্বচ্ছন্দ তাঁর পাদচারণা। ভারত চীনের দুয়ানা সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তর নতুন কথা শোনা গেল তাঁর মুখে।

পে-হাই পার্কের সামনে ন্যাশন্যাল পিকিন লাইব্রেরি। তেরো শতকের তৈরি মূর্তি এদিকে-ওদিকে—নানা রকম সমুদ্র জন্তু, ড্রাগন, কাচ, ঘোড়া স্বস্তিক। বৃষ্টি হচ্ছিল টিপটিপ করে। প্রশস্ত আসন তাড়াতাড়ি পার হয়ে লাইব্রেরি-বাড়িতে উঠে পড়লাম।

পুরানো ধাঁচে তৈরি নতুন বাড়ি। বিশাল চীন দেশে একাল সেকালের বিস্তর লাইব্রেরি আছে, তার মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। একতলা দোতলা তেতলা ঘুরে বেড়াচ্ছি—উঁচু ঘর যেমন, তেমনি আছে নিচু খোপ। সিঁড়ি দিয়ে কখনো উপরে উঠছি, নেমে যাচ্ছি আবার অন্য দিক দিয়ে। বই আর বই আর বই। আর বই পড়বার এবং বই-পুঁথি থেকে টুকে নেবার মানুষ। অত বড় বাড়ি—লাইব্রেরির লোকজন ও পড়ুয়ায় হাজারের বেশি বই কম হবে না। কিন্তু নিঃশব্দ চারিদিক—এক সুঁচ পড়লে তার আওয়াজ পাবেন।

গ্রন্থাগারিক এঘর-ওঘর দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের তোয়াজ বড্ড বেশি। আলমারিতে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বিরাজ করছেন: ডেস্কের মধ্যেও শুয়ে আছেন অনেকে। এদেরই মধ্যে এক তাজ্জব দেখতে পেলাম। একটা জায়গা এসে গ্রন্থাগারিক মৃদু মৃদু হাসছেন আমার দিকে চেয়ে, আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন ডেস্কের কাচের দিকে: কি ব্যাপার? এক পুঁথির বয়স লেখা আছে হাজার খানেক বছর। পুঁথিখানা—তাইতো। মালুম হচ্ছে যেন বাংলা হরফে লেখা। প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। দোভাষী তখন একটু দূরে, ইসারায় কাছে ডাকি। তার কাছে জেনে নিয়ে নিঃসংশয় হই। তাই বটে! এই পুঁথি আমার বাংলা দেশ ছেড়ে হিমালয় লঙ্ঘন করে, দিগ্‌ব্যাপ্ত মরু দুস্তর নদী অগণন জনপদ পার হয়ে রহস্যাকীর্ণ প্রাচীন পিকিন নগরীতে হাজার বছর সম্মানের আসন নিয়ে আছে।

দোভাষি জিজ্ঞাসা করে, পড়তে পারো? পড়ো দিকি কি আছে এই পুঁথিতে লেখা?

রাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ক্রমশ এই লাইব্রেরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ ছ-শ' বছর বয়স হয়ে দাঁড়াল। মাঞ্চু রাজাদের তাড়ানো হল উনিশ শ' এগারোয়। পরের বছর লাইব্রেরির এই নামে এই জায়গায় পত্তন।

ঝড়-ঝাপটা অনেক গেছে এর উপর দিয়ে। উনিশ শ' অব্দে পিকিন লুঠপাট করল—অনেক বই পুড়িয়ে দিল, বিস্তর খোয়া গেল সেই সময়টা। আরও অনেক বার এমনি হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা মোটামুটি এখন পাঁচ লাখে দাঁড়িয়েছে। পাঁচটা বিভাগ আলাদা আলাদা কাজ তাদের। এক দল বই কেনে ও জোগাড় করে। আর এক দল জোগাড় করে দুষ্প্রাপ্য বই; ঐ সব বইয়ের সযত্ন রক্ষণ-ভারও এদের উপর; ভিতরের মালামাল নিয়ে আলোচনা ও গবেষণাও কাজ এদের। এক দলের কাজ ক্যাটলগ তৈরি—বইয়ের শ্রেণী বিভাগ করে পাঠকদের সামনে যতদূর সম্ভব পরিচয় উপস্থাপিত করা। আর এক দল রিডিং-রুমে পাঠকদের বই পড়ানোর বিলি-ব্যবস্থা করে; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমান পাঠাগারের বন্দোবস্ত এদের; তা ছাড়া নানা বিষয়ের রকমারি বক্তৃতা ও বইয়ের প্রদর্শনী। কিছু দিন থেকে একটা বিশেষ বিভাগ হয়েছে—সোভিয়েট লাইব্রেরি; আলাদা তার রিডিং রুম। সোভিয়েট বই আর সাময়িক পত্রাদির বিশেষ চাহিদা ইদানীং; অসংখ্য বই চীনা ভাষায় তর্জমা হচ্ছে।

চীনের নবজন্ম থেকে দেদার বই কেনা হচ্ছে লাইব্রেরিতে—সাবেক আমলের অনেক গুণ। আর এক ব্যবস্থা হয়েছে—বই ধার দেওয়া ধার নেওয়া। এক দেশকে ধরুন দশ হাজার বই ধার দিলাম, আনলাম সেখান থেকে ঐ পরিমাণ। পড়া শেষ হয়ে গেলে ফেরত হল। অনেক জায়গার সঙ্গে এই লেনদেন চলছে।

এগজিবসন ঘুরে ঘুরে দেখছি। হাড় ও কচ্ছপের খোলার উপর লেখা—বই না কি বলবেন তাকে? বয়স হল খৃষ্টপূর্ব তেরো শ' থেকে এক শ'। কাঠের উপর লেখা বুদ্ধের নানা উপদেশ —৪৮ থেকে ১৫০ খৃষ্টাব্দ বয়স। আগে যে পুঁথির কথা বললাম, তা ছাড়া আরও বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি আসে। ১৫০০ অব্দের আগের কাগজ। কাঠে আঁকা বহু বিচিত্র ছবি। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যা এক লাখ চল্লিশ হাজার।

একটা প্রকাণ্ড পাঠাগার, সর্বসাধারণ সেখানে বসে সাধারণ বই পড়ে। আর দুটো পাঠাগার বিজ্ঞান আর কারিগরি বই পড়ার জন্য। আরও দুটো নতুন হল বানানো হচ্ছে—একটায় একজিবিসন ঘরের মতন করে সাজানো হবে, আর একটা হবে বাচ্চা ছেলেদের পড়ার ঘর। শুধু বই পড়া নয়, নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা পাঠাগারে লেখক ও গুণী-জ্ঞানীরা পাঠকদের সামনে হাজির হয়ে মোলাকাত করেন। চিঠিপত্রে খবরা খবর জানানো হয় বহু লোকে নানান রকম প্রশ্ন করে চিঠি লেখে পণ্ডিত জনের সঙ্গে পরামর্শ করে তার জবাব দেওয়া হয়। বই ধার দেওয়া হয় অন্যান্য লাইব্রেরিতে—পিকিন ও আশে-পাশে সাত শ' তেত্রিশটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এমনি লেনদেনের ব্যবস্থা আছে। সর্বব্যাপ্ত শিক্ষা প্রচেষ্টায় লাইব্রেরিও এমনি ভাবে দায়িত্ব বহন করে আসছে।

দূতাবাসে চায়ের নিমন্ত্রণ ভারতীয়দের। তা বলে তরল চা শুধু মাত্র নয়—লুচি-তরকারি ইত্যাদি নির্ভেজাল ভারতীয় খাদ্য। সেই পরাঙ্গপের বাড়ি মুখ বদল হয়েছিল, আর আজ। আকণ্ঠ ঠেসে দুর্ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে নিলাম। এর পরে যে ক'টা দিন পিকিনে ছিলাম, ঐ স্বাদ যেন জিভে জড়িয়ে রইল।

বিকালে এই, সন্ধ্যার পর আবার এক দফা ভারী ভোজ। আহা, চলে যাবেন যে ক'টা দিন পরে। ধকলটা কিছু বেশিই হবে, খেয়ে নিন কষ্টেসৃষ্টে কি আর হবে! মাসাবধি ধরে যাঁদের খাচ্ছি, তাঁরাই আবার আলাদা করে নিমন্ত্রণ করলেন। এবং ঐ পিকিন হোটেলেই—নিচের তলার খানাঘরে। প্রতি রকম ভোজ্য বস্তুই মজুত থাকে প্রতিদিনের খানা টেবিলে—নতুন আর কি আসবে এর উপরে? নতুন এই হল, বিশেষ নিমন্ত্রণের নাম করে যাবতীয় বিশিষ্টেরা আজ আমাদের সঙ্গে খাচ্ছেন।

বড়দের বাদ দিয়ে চার জনে আমরা একটেরে আলাদা ভাবে ছোট এক টেবিলে বসেছি। তিন জন আমরা ভারতীয়—আর এক প্রৌঢ়া চীনা মহিলা এসে বসলেন। নিতান্ত সাদা-মাঠা পোষাক, মাথার চুলগুলো অবধি পরিপাটি ভাবে গোছানো নয়। ইংরেজি ভালই বলেন, তা হ'লে দোভাষি করে নি কেন এঁকে? ওদেশের বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ উঠল—তার মধ্যে ডাক্তারির ফোড়ন শুনে মালুম হল, ঐ বিদ্যা কিছু কিছু জানা আছে। তা সে যাই হোক, ভারি ফুর্তিবাজ মহিলা, অবিরত হাসিরহস্য করছেন, বয়সের তুলনায় অতি চপল। হিন্দুস্থান আর চীনের অধিবাসী ভাই ভাই—এই মর্মে কয়েক দিন থেকে বলাবলি হচ্ছে—'হিন্দিচিনি ভাই ভাই'। মহিলাটি ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে সকলের চেয়ে উঁচু গলায় সেই বুলি ছাড়ছেন। আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন এ-কথায় ও-কথায়।

সরল আর আমুদে স্বভাবের বলে মহিলাটিকে ভুলতে পারি নি। এই মাস পাঁচ-ছয় তাঁকে কলকাতায় দেখে চমকে উঠলাম। চীনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসেছেন, সর্বত্র সম্বর্ধনার সমারোহ। নলিনীরঞ্জন সরকারের 'রঞ্জনী' বাড়িটা এখন কলকাতার চীনা দূতাবাস। ঐখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সম্বর্ধনা ব্যাপারে। হলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কনসাল-জেনারেল অভ্যর্থনা করছেন, পাশে দাঁড়িয়ে সেই মহিলাটি। আমায় দেখে হেসে উঠলেন পিকিনের সেই ভোজের আসরের মতোই। বললেন, একেবারে নাম ধরে বলে উঠলেন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল বোস। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে বললেন, ব্যানার্জি, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। তার পরে ভিতরে গিয়ে মহিলাটি বসলেন আমাদের গভর্ণর ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। খাতির দেখে সন্দেহ হল। সাধারণ এক ডাক্তার কিম্বা নার্স ভেবেছিলাম—ওরে বাবা, খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইনিই যে! বিলাতে বিস্তর দিন কাঠ-খড় পুড়িয়ে ডাক্তারি শিখেছেন, কিন্তু সহজসারল্য ও রামরসিকতার উপর বিলাতি পলস্তারা পড়ে নি।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় ছিলেন, তাজ্জব ব্যাপারটা শোনালাম, তাঁকে। সামান্য মানুষ সেই কবে চীনে গিয়েছিলাম —আর কত রকম দায় ঝক্কি ওঁদের উপর—অথচ নামটা অবধি মনে করে রেখেছেন।

সুনীতিকুমার বললেন, সাহিত্যিক মানুষ—তার উপর পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। তাই হয়তো মনে রয়ে গেছে—

কিন্তু বিজয় বাড়ুয্যে। তাঁকেও তো ভোলেননি—

অসাধারণ স্মরণশক্তি অতএব মহিলার। আশু মুখুজ্যে মশায়ের এমনি ছিল। যাকে একবার দেখতেন, কখনো তাকে ভুলতেন না।

হবে তাই। স্মরণশক্তির আরও পরিচয় অচিরে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে বসে বললাম, পিকিনে এক টেবিলে খেয়েছিলাম আমরা। আর বলেছিলাম 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই—'

ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে মাননীয় মন্ত্রী বললেন, খুব মনে আছে। কিন্তু 'ভাই-ভাই' তো নয় 'বাই-বাই'। তাঁর ভাঙা উচ্চারণে 'ভাই-ভাই' কথাটা 'বাই-বাই'তে দাঁড়িয়েছিল, এত দিন পরে ঠিক তদনুযায়ী সংশোধন করে দিলেন।

এই দেখুন, গল্পে গল্পে কোথায় এসে পড়েছি। এমন করলে চীনের গল্প কবে আর শেষ হবে? ওঁরা ধরেছেন, চলে যাচ্ছ তো—কি রকম দেখলে, বলে যাও একটু আমাদের রেডিয়োয়। জন আষ্টেককে বাছাই করা হয়েছে বক্তৃতার জন্য। রেকর্ড করে নেবে, যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে হোটেলে। সুবোধ বন্দ্যোর উপর ভার—তিনি সকলকে ডেকে ডুকে বক্তৃতা করাবেন এবং যথারীতি দক্ষিণাও দেওয়া হবে বক্তৃতার জন্য।

তবে এই ঠোঁট বন্ধ মশায়। এত আদর যত্ন, ডাইনে বাঁয়ে ভালবাসার উপহার—এর উপরেও টাকার কথা! ভাবেন কি বলুন তো আমাদের।

কড়া হয়ে বসায় দক্ষিণা শেষ অবধি মকুব হয়ে গেল। বক্তৃতা সেরে তাড়াতাড়ি এক পাক বাজার ঢুঁড়ে আসব। আমার সেই পাকিস্তানের কনিষ্ঠ হলের মধ্যে ধরে বসলেন, অবেলায় কোথায় ছুটছেন দাদা?

ব্লেড ফুরিয়ে গেছে। আজকের ক্ষৌরকর্ম হয়নি। ব্লেডের এখানে সৃষ্টিছাড়া দর—একটা-দুটো তবু না কিনে উপায় নেই।

চক্ষু কপালে তুলে ইলিয়াস বলেন, কি সর্বনাশ, নিজে দাড়ি কামান নাকি আপনি?

হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন আমায়। হলের অপর প্রান্তে অনেকগুলো ঘর, দোভাষিরা বসা ওঠা করে—ওদিকটায় যাওয়ার খেয়াল হয়নি কোন দিন। তারই এক খোপের সামনে গিয়ে ইলিয়াস দাড়ি চাঁচার ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাপা ফরমে সই মেরে দিল তাঁর হাতে। পিছনে আর একটা ঘর—সেলুন। চেয়ারে বসিয়ে দিল—সে চেয়ার কখনো কাত হচ্ছে, কখনো শুয়ে পড়ছে। এমনি করে নানান ভাবে শুইয়ে বসিয়ে বিশ মিনিট ধরে ক্ষৌরকর্ম করল, তা-বড় তা-বড় অপারেশনেও বোধ করি এত ঘোর-প্যাঁচের প্রয়োজন হয় না।

হায় রে, পিকিনে পা দেওয়ার পরেই এই ইলিয়াসকে আমি পাঠ দিয়েছিলাম। ভায়া আমার বিস্তর লায়েক হয়েছে ইতিমধ্যে, অগ্রজকে অনেক পিছনে ফেলে গেছে।

সেই দুপুরে আর এক ব্যাপার। শ্রীমতী কোটনিশকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে—আগে-পিছে খেয়ে নেবেন না, এক সঙ্গে খাবো সকলে। ডাক্তার কোটনিসের পরিচয় দিতে হবে না নিশ্চয়। যুদ্ধের আমলে নেতাজি-নেহরুর উদ্যোগে ভারত থেকে দুর্গত চীনে মেডিকাল মিশন গিয়েছিল, কোটনিশ সেই দলে ছিলেন। 'ডাক্তার কোটনিশ কা অমর কাহিনী'—সিনেমা-ছবিতেও দেখেছেন অনেকে? সেই মেয়েটি, যিনি কোটনিশের আমৃত্যু কর্মের সাথী—এবং জীবন-সঙ্গিনীও হয়েছিলেন। এখন আর শ্রীমতী কোটনিশ বলা চলে না তাঁকে, এক চীনা ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। এটা আদৌ দোষাবহ নয় ওঁদের সমাজে। শ্রীমতী এখন পিকিনেই থাকেন একটা ইস্কুলের স্বাস্থ্য-পরীক্ষকরূপে। আমাদের মধ্যে যে ক'জন মারাঠি, হঠাৎ তাঁরা অনুষ্ঠানের মাতব্বর হয়ে উঠেছেন। আগে বুঝতে পারিনি, তারপর মালুম হল, কোটনিশ জাতে মারাঠি ছিলেন, অতএব বাড়ির বউ দেখে আসছে, এমনি একটা ভাব।

শ্রীমতীর বয়স হয়েছে, প্রৌঢ়ত্বে এসে গেছেন। যে সব মিষ্টি রোমান্সের কাহিনী শোনা গেছে, এ চেহারার সঙ্গে তা যেন খাপ খায় না। ছেলেটি খাসা, বছর দশ-বারো বয়স, চেহারায় ভারতীয় আমেজ আছে, নামেরও অর্থ হল 'চীন-ভারত'। বললাম দেশে যাবে খোকা? চলো না আমাদের সঙ্গে।—লাজুক মুখে সে ঘাড় নাড়ে, উঁহু—এখন নয়। ওর মা-ও বললেন, যাবে বই কি; নিশ্চয় যাবে। আর একটু বড় হোক। কোটনিশের সাহস ও কর্মনিষ্ঠার অনেক গল্প করলেন শ্রীমতী।

মাও-তুন জাঁদরেল উপন্যাসিক, প্রায় আমাদের শরৎ চাটুয্যে মশায়ের সমতুল্য। হাস্য মুখ, সদালাপী ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন কোন উপন্যাস ধরেছেন? হেসে উনি ঘাড় নাড়েন উঁহু—আর ওসব হবে না। কবি এমি-সিও পাশ থেকে ফোড়ন কাটেন, সে কি! ধরেছেন বই কি চীনের তাবৎ নরনারী বালবৃদ্ধ নিয়ে জীবন্ত উপন্যাস। হেন উপন্যাস পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিক লিখেছেন, জানি নে।

মাও-তুন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী—চীনের মহানায়কদের একজন। সেই কথাটাই বলে দেওয়া হল আর কি!

বলে না দিলে বোঝবার জো নেই, এই চেহারা চাল-চলনের মানুষ হলেন একজন মাননীয় মন্ত্রী। বলে দিলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত। ফেডারেশন অব চাইনিস রাইটার্সের সভাপতি। খুব ব্যস্ত আজকে—তাঁতের মাকুর মতন ছোটাছুটি করছেন। বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক—অভ্যাগতদের বসবার জায়গা দেখিয়ে আবার বাইরের সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াচ্ছেন সকলের অভ্যর্থনার জন্য। ওরই মধ্যে খাতাটা বাড়িয়ে দিলাম—সই মেরে দিন তো একটা। স্মৃতি থাকবে, চিঠিপত্র লিখব। চীনায় ও ইংরেজিতে নাম লিখে দিলেন।

লেখক ও শিল্পীদের সমাবেশ। বড় কিছু নয়, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা। সাঁইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধিদের মাঝ থেকে সাহিত্য-শিল্পে ছিটগ্রস্তদের বাছাই করে ডাকা হয়েছে। আর চীনা গুণীরা তো আছেনই।

লোক বেশি, অতএব জাত হিসাব করে কয়েকটা টেবিলে ভাগ হওয়া গেল। জাত মানে—এঁরা লেখেন, ওঁরা আঁকেন, ওঁরা থিয়েটার করেন ইত্যাদি। মাও-তুং অতএব আমাদের টেবিলে। তিনি বলছেন, আমাদের চীন জাতি বড় শান্তিপ্রিয়। কখনো তারা পরের রাজ্যে হামলা নিয়ে পড়েনি। আমাদেরই উপর পড়েছে অন্য লোকে। শান্তির বাণী আজকের নয়, খুব পুরানো আমলের গুণী-জ্ঞানীদের লেখার মধ্যেও এই শান্তির কথা। 'যা তুমি নিজে চাও না, অন্যকে তা কক্ষনো দিও না'—লড়াই সম্পর্কে কনফুসিয়াস এই

লছেন। কনফুসিয়াসের সমসাময়িক দার্শনিক মোতিও যুদ্ধের ...ম বিরুদ্ধে। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করতে বলেছেন, কিন্তু প...দেশ আক্রমণ কদাপি নয়। চীনের এক প্রাচীন প্রবাদ—যুদ্ধ ...ল আগুন, এ নিয়ে খেলা কোরো না, সব ঠাঁই ছড়িয়ে যাবে। বারুদের প্রথম আবিষ্কার হল আমাদের দেশে, কিন্তু সে বস্তু আমরা আগ্নেয়াস্ত্রে ভবিনি, বাজি বানিয়ে লোকের নয়ন বিমোহন করেছি—

আমি এর মধ্যে ফোঁস করে উঠলাম একবার। হ্যাঁ মশায়, নিজের দেশ তো কাহন খানেক বলছেন—আমাদের ভারত? আমাদের সৈন্যবাহিনী দেশের সীমানার বাইরে কবে পা বাড়িয়েছে ...ন তো? গিয়েছেন দেশ-বিদেশে সাধু-সন্ত জ্ঞানী-গুণীরা—

হ্যাঁ ঠিক কথাই। হাজার হাজার মাইল জোড়া দুই দেশের সীমানা। ইতিহাসে তবু হানাহানির একটা দৃষ্টান্ত নেই। আজকের দিনে শুধু মাত্র চীন-ভারত নয়—যে বন্ধুরা সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সকলের দেশের ঐকান্তিক কামনা হল শান্তি। মাতৃভূমিকে ...বাসি—তাকে সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধ করে তুলব শান্তি ও আনন্দের মধ্য ...। সকল শ্রেণীর শিল্পীরা এখানে উপস্থিত—এক সাধারণ ...শা আছে আমাদের। হয়তো এই প্রথম বার আমাদের ...দেখা, মুখোমুখি এসে বসা—কিন্তু সুদীর্ঘ কাল প্রতি জনেই আমরা একটি প্রত্যাশা মনের মধ্যে লালন করছি—পৃথিবীর ...বিচ্ছিন্ন শান্তি। সকলের মনের কথা ঐ একটি মাত্র। এই ...নাই আমাদের সকল সাহিত্যের তন্তুবাহী চলবে। এই ...রে পরও আমি আশা করি, আমাদের মিলন শেষ হবে না—...পরের কাছে পরিচিত থাকব আমরা সকলে, যাতে পৃথিবীর ...র সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দিন দিন নিবিড়তর হয়। চীনা ...শিল্পী তোমাদের স্বাস্থ্য-শ্রী ও সাফল্য কামনা করছি···

তারপর নিচু গলায় নানারকম গল্পগুজব চলছে আমাদের। ...চলছে—থাক, কথা দিয়েছি ও সবের পরিচয় দিয়ে লোভ ...বব না আপনাদের। জায়গা বদলা বদলি হচ্ছে পাশাপাশি ...পরিচয় নেবো বলে। কত জায়গার কত মানুষ—...কানায় খাতা ভরে যায়। চিঠি লেখালেখি চলে যেন বরাবর। ..., নিশ্চয়। সেদিন আন্তরিক ভাবেই স্থির করেছিলাম, আমরা দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু চিঠি আমাদের মন ...ক এক করে বেঁধে রাখবে। কিন্তু ঠিকানা মতো একখানাও ...লিখি নি আজ অবধি। তিন-চারটে চিঠি এসেছে, তারও ...দেওয়া হয়নি।

...লেখকেরা রয়্যালটি পান ওখানে দশ থেকে পনের পার্সেন্ট। শুধুমাত্র বই লিখে চলে না, অন্য কিছু করতে হয়। আমার দেশের লেখকের অবস্থা এর চেয়ে ভালো বই মন্দ নয়। ভাষা নিয়ে খুব পায়তারা চলত—নানা বৈচিত্র্য ও বর্ণবাহুল্য। ...পালে এখন সে ঝোঁক কেটেছে। সাদামাঠা ভাষায় লিখছেন ...রা, জনগণের সঙ্গে তার সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ...ছে, বইয়ের কাটতিও হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ...র সাথে জনসাধারণের মুখের ভাষাও উন্নতি হচ্ছে।

...ম্য ভাষাতেও বই লেখা হচ্ছে, কিন্তু তার সংখ্যা অত্যন্ত ... একেবারে এক গেঁয়ো চাষী এক আশ্চর্য উপন্যাস লিখেছেন ...কররাজ্যে'। নতুন-চীন গড়ে উঠবার পর 'এই ধরুন বছর দুই-তিন মাত্র উন্নত সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়েছেন। পুরানো ইতিহাস নিয়েও নবযুগের উপন্যাস হয়েছে। আর লেখা হচ্ছে, হাসি মস্করায় ঠাসা গল্প রসের বই। এ সব জিনিষের খুব চাহিদা। নাটকের নামে চীনা মানুষ চিরকাল পাগল। অভিনয় কিম্বা সিনেমার ছবি দেখবার জন্য লোকে বিশ মাইল বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গররাজি নয়, সারারাত্রি হয়তো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে বসে আছে। তাই বিস্তর নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনয়ও হচ্ছে সুপ্রচুর। ধর্ম নিয়ে লোকের মাথাব্যথা, হাল ফিল তাই ধর্মের বই বড় একটা বেরুচ্ছে না।

যেমন বড় চীন দেশ, ভাষাও তেমনি তার শতেক রকম। সব ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কতকগুলো ভাষার অক্ষর পর্যন্ত নেই, নতুন করে তাদের অক্ষর বানানো হচ্ছে। চীনা ছাড়া প্রধান ভাষা হল মাঙ্গোলিয়ান, তিব্বতী এবং আরো দু-তিনটি। চীনাটা সব অঞ্চলেই শিখানো হচ্ছে—তিন হাজার বছরের এই সুপ্রাচীন ভাষা বহু কোটিকে জাতীয়তার বাঁধনে একত্র বেঁধেছে।

জীবনের সত্য পরিচয় নেবার জন্য লেখকেরা অনেক সময় চাষী শ্রমিক কিম্বা সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে থাকেন। শুধুই দর্শক হিসাবে নয়, তাদেরই একজন হয়ে কিছুকালের মতো।

চো-লি-বাউ (ঐ) উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছেন। শহরের আত্মীয়জন ছেড়ে দীর্ঘকাল অজ পাড়াগাঁয়ে পড়েছিলেন ঐ বই লেখার জন্য। আর একজন লেখক—শ্রীযুত রোবিও বলতে লাগলেন, বিস্তর দিন ইংলণ্ডে থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছিলাম। কিন্তু অমন শিক্ষা পেলাম দেশে ফিরে চাষা ভুষার মধ্যে বসবাস করে। তাদের সঙ্গে জল তুলছি, বীজ বুনছি। জীবন বুঝতে হলে কাজ কর্ম দেখাই শুধু নয়, তাদের মনের অন্দি সন্ধিতে বিচরণ করতে হবে। নইলে চাষী তার জমির সম্পর্কে গরু বাছুর সম্পর্কে চাষের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যা ভাবে, কখনো তা জীবন্ত হয়ে ফুটবে না তোমার বইয়ে। তারা যখন জানবে, নিতান্তই তুমি আপন লোক, তখনই মন খুলবে তোমার মাঝে।

আমার কয়েকটা বন্ধু আছেন—ঘরে থাকলে কি হবে, তামাম দুনিয়া নখদর্পণে—নিয়ে বসে আছেন। বার বার তাঁরা বলেছিলেন, গিয়ে লাভটা কি হবে? সাজানো-গোছানো কয়েকটা জিনিষ দেখিয়ে দেবে বই তো নয়। কিন্তু এসে দেখলাম তাজ্জব। কিছুতে ছাড়ে না, নানান অজুহাতে আটকে আটকে রাখে। এদ্দিন তো ছিলে কনফারেন্সের তালে—থাকো আর দুটো পাঁচটা দিন, স্থির হয়ে একটু আলাপ আলোচনা করি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে যেমন রেওয়াজ ছিল, ছেলে বয়সে দেখেছি। আত্মীয় কুটুম্ব এলে তাকে যেতে দেবে না—ছাতা সারছে, জুতো সারছে। সবজান্তা মানুষদের কথা সত্যি হলে তো কাজকর্ম তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক' পত্রপাঠ নমস্কার জানাবে খুঁত চোখে পড়বার আগে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে চারশ' মানুষ—বেছে বেছে দুনিয়ার যত গবেট নিয়ে গেছে এটা হতে পারে না, দু-পাঁচজন বুদ্ধিওয়ালা লোকও থাকতে পারে তা হলে এটা কি রকম ব্যাপার বলুন দিকি?

যাই হোক, ছাড় পেয়েছি অবশেষে। যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে। এ-দল যাচ্ছে, ও-দল যাচ্ছে। নিচের হলে এই পর্বত-প্রমাণ মনি জমেছে,—গাড়ি ভরতি সেগুলো রওনা হয়ে গেল আবার এসে এসে জমছে। হোটেল ফাঁকা হয়ে গেছে, খানা-ঘরে তেমন আর ভিড় নেই।

গা ছড়িয়ে অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে আছি। কোন কাজ নেই, কেউ ডেকে তুলবে না। তার পরে উঠে যথা ইচ্ছা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের ভারত-দলের খানিকটা আজ সন্ধ্যায় আরও উত্তরে মুকডেনের অঞ্চলে চললেন। আর ষোল জন আমরা কাল ভোরে সাংহাই মুখো উড়ব। ডক্টর কিচলুর চিকিৎসার ব্যাপার আছে, ক'দিন পরে রেলে চড়ে সোজা তিনি ক্যাণ্টনে গিয়ে পৌছবেন।

ষ্টেশনে গেলাম সন্ধ্যাবেলা মুকডেন যাত্রীদের বিদায় দিতে। স্পেশ্যাল গাড়ি, ঘন সবুজ রং। অতি সম্প্রতি বানিয়েছে এসব গাড়ি—ঝকমক করছে। দুটো করে শয্যা প্রতি কামরায়—উপরে আর নিচে, দামি পর্দা ঝোলানো, বসবার চেয়ার-টেবিল, কম জায়গার মধ্যে আরামের সকল রকম আয়োজন। জাতীয় সৈন্য-বাহিনী ষ্টেশনে ঢুকল বিদায় দিতে, এক পাশে আলাদা হয়ে দাঁড়াল, আয়ার দিচ্ছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। জনারণ্য, গলায় লাল রুমাল জড়ানো পায়োনিয়ার দল—বেশির ভাগ মেয়ে। কি মনোরম স্বাস্থ্য, কি হাসি! হাতে কুসুমগুচ্ছ। আমরা আবার ফিরে আসব, সেজন্য প্লাটফরমে ঢোকবার সময় নীল ব্যাজ পরিয়ে দিল। পিকিনের তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরা এসেছেন, তাঁদের বুকেও ঐ নীল ব্যাজ। আভিজাত্য নেই, পদ-প্রতিষ্ঠার অভিমানে আলাদা হবার চেষ্টা নেই কোন রকম। সরল, উদার, অমায়িক। উল্লাস-চিৎকারে কান পাতা যায় না। আর কাওবিতিয়াং গাঁয়ে যে রকম দেখেছিলাম, তেমনি ঢোল কত্তাল এনে বাজাচ্ছে ষ্টেশনে। গভীর আলিঙ্গনে এ ওকে বুকে চেপে ধরছে। কত ভালবাসা এক মানুষ ও আর মানুষের মধ্যে! দেখ দেখে তাজ্জব লাগে, চোখের কোণে জল এসে যায়।

ফিরবার সময় কি কাণ্ড। বাচ্চা মেয়ে এক দল আগমন করল। একটু-আধটু হাত মলে দিয়ে সরে পড়ল—আমার হাত চেপে ধরেছে তুলতুলে হাতটুকুন দিয়ে। আর নানা দিক দিয়ে অমনি ঘিরে ফেলেছে। ভয়াবহ ব্যাপার, পুরোপুরি বন্দী। জড়িয়ে পড়েছে গায়ে গায়ে—নাচছে, নাচতে নাচতে এগিয়ে নিয়ে চলল আমায়। আমাকেও একটু-আধটু পা ফেলতে হয়। হাসবেন না, এমন নির্মল অমায়িকতার দাবড়ি খেলেন না তো কখনো—ঐ অবস্থায় পড়লে আপনারা আরও বেশি নাচতেন কলের পুতুলের মতন। ছপ করে হঠাৎ জোরালো আলো জ্বলে উঠল ঠিক সামনে। চোখ বুঁজিয়ে গেছে, কিছু আর দেখতে পাচ্ছি নে। ঘর ঘর আওয়াজ—কি সর্বনাশ, মোভি ক্যামেরায় ছবি তুলে নিচ্ছে যে! এই এক দোভাষি এগিয়ে এলেন করুণাপরবশ হয়ে। মেয়েগুলো শুধালে, আকারে ইঙ্গিতে বুঝতে পারলাম,—কোন দেশের এই ব্যক্তি? ইন্দু। আমি ভারত থেকে এসেচি, সে পরিচয় নর্তন-কুর্দন অন্তে শান্তি হয়ে যাবার পর। ভারত হোক কিম্বা মেস্কো আবসিনিয়াই হোক, ওদের কাছে একই কথা। অচেনা বলে ভয় ডর নেই, মানুষ হলেই হল। হামেশাই যে মোলাকাত হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে, ভাবখানা এই প্রকার। বাচ্চাদের ওরা এমনি ভাবে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা দিচ্ছে।

পিছন দিক থেকে কাঁধের উপর হঠাৎ এক ভারি হাত এসে পড়ল। আরে, সেই-ল্যাং-ল্যাং যে! ভারিক্কি কেউ নই—কিন্তু ছোকরাদের মতন গলাগলি হয়ে ফিরছি। দোভাষিকে দেখা যাচ্ছে না, দরকারও নেই—কথা বলে কি হবে? মিটিমিটি হাসছি এ ওর দিকে তাকিয়ে।

[ক্রমশঃ।

রূপ

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

এপার নদী ওপার নদী মধ্যিখানে দ্বীপ
দ্বীপ নয় গো সদ্য-ফোটা নীপ
নদী নয় গো রূপসরসীর জল
সোনার বরণ কন্যা তুমি করছো টলোমল!
কন্যা—দুলছো ছলোছল।

কোথায় গো সে চম্পানদী চম্পাফুলের দ্বীপ
সেই দ্বীপেতে চম্পাবরণ টিপ
পরে মেয়ে—সোনার মেয়ে রূপকাহিনী গড়ে
সেই মেয়েটি এই গেরামে আসলো কেমন করে?
মেয়ে মন নিয়েছো হ'রে
এখন কি হবে উপায়—আমার কি হ'বে উপায়?
আমার ঘরে থাকাই দায়!

লক্ষ্মী নদীর দক্ষিণাতে পদ্মফুলির গাঁয়
শ্বেত বলাকা সাঁতার খেলে আকাশ-কিনারায়
মেয়ে—শ্বেত বলাকার মত
তুমি উড়ছো ইতস্ততঃ
তোমার চরণ-কমল যেন ছোঁয় না ভূমিতল
তুমি স্বপ্ন-শতদল!

স্বপ্ন-শতদল গো তুমি আকাশী রামধনু
তুমি—হৃদয়-মোহন বেণু!

লক্ষ্মী নদীর দক্ষিণাতে পদ্মফুলির গাঁয়
শ্বেত বলাকা সাঁতার খেলে আকাশ-কিনারায়
সেই গেরামে সোনার মেয়ে শ্বেত বলাকার মত
তুমি উড়ছো ইতস্ততঃ—
সোনার বরণ চম্পাবতী করছো টলোমল
কন্যা—দুলছো ছলোছল—
আমি মন হারিয়ে গেছু!!

উদয়ভানু

ফটকে কতগুলি পাহারা! বারুদভর্ত্তি সঙ্গীন তাদের হাতে। তাদেরও চোখে পড়লো না? গাদা-বন্দুকের বারুদ ফুরিয়ে গেছে কি?

বিনা অনুমতিতে, বিনা পরিচিতিতে যদি কোন কেউ রাজগৃহে প্রবেশ করে এবং ততঃপর যদি তেমন কোন নির্ভরযোগ্য কারণ দর্শাতে না পারে—তাকে তোমরা বন্দুক দাগতে পারো—এই কঠোরতম নির্দেশ স্বয়ং রাজা বাহাদুরের। গদীপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই এক গোপন দরবারে, রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর অনুমোদন করেছিলেন এই আদেশ-আজ্ঞা। যাঁর মাথায় কিরীট, সেই মুকুটধারীর মাথার মূল্য কত? অবারিত দ্বারপথে আসে যদি কোন' হত্যাকারী, গুপ্তঘাতক! কোন' ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক ছদ্মবেশে [illegible] যদি দেখে যায় রাজপ্রাসাদের অলি-গলি; অন্দর আর বাহির। এই সুবিশাল রাজগৃহের অ্যানাটমিটা যদি কেউ মনোমুকুরে এঁকে নিয়ে যায়? রাজবাড়ীর গোপন মানচিত্র, চোখে পড়ে যদি কোন' দুর্জ্জনের?

ফটকে কতগুলি পাহারাদার! কতগুলি সশস্ত্র রক্ষাকর্ত্তা [illegible] রাজতোরণের! কতগুলি পাঠান প্রহরী! তাদের [illegible] বারুদ বুঝি ফুরিয়েছে!

লাল শালুর চাপকান। সাদা মলমলের চুড়িদার পায়জামা। মাথায় গোলাপী আদ্দির পাগড়ীতে রাজ-[illegible]। পায়ে নাগরা। হাতে হাতে গাদা-বন্দুক। [illegible] তোরণরক্ষীর কেউ দেখলো না?

কাশীশঙ্কর সজোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—ঐ নাপতিনীকে [illegible]রে প্রবেশের অনুমতি দান করলে কে দেওয়ানজী?

[illegible] প্রকোষ্ঠ। কাশীশঙ্করের দক্ষিণমুখী বৈঠকখানা [illegible] সুদীর্ঘ। তেমনই উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। কক্ষশীর্ষ বহু উচ্চে। কাশীশঙ্করের কথার প্রতিধ্বনি উঠলো রুদ্ধবাতায়ন, প্রায়ান্ধকার কক্ষে! কেমন যেন গর্জ্জে গর্জ্জে কথাগুলি বললেন তিনি। চিন্তা-গম্ভীর কণ্ঠে।

একেই চোখে আঁধার দেখেন দেওয়ান। আর দেখেন বন্যজন্তুর জ্বল্-জ্বলে চোখ। মরা জানোয়ার, তবুও কি করালকুটিল দৃষ্টি! প্রতিহিংসার ছায়া যেন পাশব চোখে।

বক্ষে বল সঞ্চয় করে দেওয়ান বললেন,—আমি সঠিক অবগত নই কুমার বাহাদুর!

আবার সেই তর্জ্জন-গর্জ্জন। আবার সেই প্রতিধ্বনি!

কাশীশঙ্কর বলেন,—দেওয়ানজী, এই কর্ত্তব্য আপনার। রাজপুরীতে কে আসে না আসে আপনি যদি অবগত না থাকেন, তবে এ তো আপনারই কর্ত্তব্যহীনতার পরিচয়! আপনি অবগত নন, এ কথা কি সম্পূর্ণ সত্য?

কথা বলতে গিয়ে আর বলতে পারে না দেওয়ান।

তালু শুকিয়ে যায় হয়তো। টাকরা শুকিয়ে যায় ভয়ের আতিশয্যে। অস্পষ্ট সুরে বললেন,—হাঁ কুমার বাহাদুর, আমি মিথ্যা বলি নাই। মনে হয় নাপতিনী—

কথা বলতে বলতে কথা থেমে যায়। কেমন থমকে থেমে যায় দেওয়ান, কথার মধ্যপথে।

—মনে হয় নাপতিনী—

দেওয়ানের অসম্পূর্ণ কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন কাশীশঙ্কর। প্রশ্নের সুরে।

ভীতিকাতর ও কম্পিত কণ্ঠ দেওয়ানের। কোন রকমে সাহসে বুক বেঁধে বললেন,—মনে হয়, নাপতিনী সপ্তগ্রামের জমিদারের নামোল্লেখ করায় তাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ফটকের রক্ষী।

নীরব-গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করলেন কাশীশঙ্কর। চিবুক স্পর্শ করলেন নিজের। চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটলো মুখভঙ্গীতে। বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত

নিশ্চুপ থেকে বললেন,—এখনও পর্য্যন্ত আমার স্নানাহার চুকাতে পারি নাই! সাতগাঁওয়ের ঐ নাপতিনী যেন রাজমাতার সমীপে না যায়। সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীর এই নির্ব্বাসনদণ্ড তাঁর সহ্য হবে না। শ্রবণ মাত্রে হয়তো মূর্চ্ছাগ্রস্ত হবেন। হাঁ, আপনাদের রাজার সহ সাক্ষাৎ হবে বৈকালে। তৎপূর্ব্বে নয়।

—ঠিক কথা। যথার্থই বলেছেন কুমার বাহাদুর! আমিও যাই, সেই মত ব্যবস্থা করি। কুমার বাহাদুর যদি অনুমতি দেন আমি প্রস্থান করি।

দেওয়ান এক নিশ্বাসে কথা ক'টি শেষ করলেন। যেন মুখস্থ বলে গেলেন।

কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছেন কাশীশঙ্কর। চিবুক স্পর্শ করে আছেন তো আছেনই। দেওয়ানের কথাগুলি শুনেছেন কি শোনেননি, বোঝা যায় না। কক্ষময় ছড়িয়ে আছে বন্যপশু—বাঘ, ভল্লুক, বন্যমহিষ। ওদের দৃষ্টির মতই প্রতিহিংসার চাউনি ফুটেছে কাশীশঙ্করের আয়ত দুই চোখে। কার প্রতি ক্রোধ, কার তরে প্রতিহিংসা! তাকে যদি একবার হাতের নাগালে পেতেন! হয়তো নকল নখরের সাহায্যে তার বক্ষ বিদীর্ণ করতেন। টুঁটি কামড়ে ধরতেন!

কিন্তু এখন কোথায় পাবেন জমিদার কৃষ্ণরামকে?

শিকার কখনও স্বেচ্ছায় শিকারীর হাতে ধরা দেয়! জীবিতাবস্থায়!

ভাবনার রঙীন জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় থেকে থেকে। ছোটকুমারের চিন্তায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না, তবু ছেদ পড়ে। কাশীশঙ্কর বললেন,—আর বৃথা কালক্ষেপ নয়। আপনি এই মুহূর্ত্তে যান, সেই মত ব্যবস্থা করুন। নাপতিনী যেন মাতৃদেবীর মহলে প্রবেশ করতে না পারে। বিলাসবাসিনী সামান্য কারণে বড় অস্থির হন, সাবধান!

মুক্তির আনন্দে দেওয়ান যেন স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। চকিতের মধ্যে দ্বারের বাহিরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যেন এক সুখস্বপ্ন! একটি সুমিষ্ট সঙ্গীত! এক রঙ-লাগা মনের রঙীন কল্পচিন্তা!

স্বপ্নের মধু-রাতে যদি বারে বারে তন্দ্রাভঙ্গ হয়! গানের যদি তাল কেটে যায়! ক্ষণে ক্ষণে যদি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মানসচিন্তা! মনে মনে বিরক্ত হন কাশীশঙ্কর।

যেন শুক্লারাতের জ্যোৎস্নালোকিত সোনালী আকাশ,—কালো মেঘের শ্যামছায়ায় বারে বারে বিলীন হয়ে যায় দৃষ্টির অন্তরালে। অনাগত ভবিষ্য-দিনের ছায়া; ছায়াছবি—মরমতুলিকায় যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে!

অতীতের নাকি কোন রূপই নেই।

মহাকালের নির্ম্মম শোষণে অতীত নিশ্চিহ্ন। ফুরিয়ে-যাওয়া অতীত শুধু নিরাশার, শুধু অনুশোচনার। আর কত আনন্দের মঙ্গল-আলো বহন করে আনে সেই অনাগত! আনে কত আশা আর আশ্বাস! তমসাচ্ছন্ন অতীত যেন দেউলিয়া; আর ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ।

কাশীশঙ্করের মনের মণিকোঠায় আশার প্রদীপখানি সদাই জলছে। না-আসা দিনের কত কথাই না মনে জাগে তাঁর! জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখেন। কত আশার স্বপ্ন কাশীশঙ্করের!

স্বপ্নে দেখেন, তিনি একজন বিরাট মহাজন হয়েছেন ব্যবসার বাজারে।

লক্ষ লক্ষ টাকা খেলিয়ে চলেছেন নিজ হাতে। বাজার দর খতিয়ে খতিয়ে মাল ছাড়ছেন, চেপে রাখছেন। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।

বুড়ো শিবের বাজার আছে গোবিন্দপুরের কাছাকাছি, গঙ্গার তীরে, রাজ্যের যতেক পণ্য বিকিকিনি হয় সেখানে। উৎপাদকের হাত থেকে মাল চলে যায় মহাজনের হাতে। মহাজনের কবল থেকে পাইকারদের হাতে। সেখান থেকে খুচরা-বিক্রেতাদের কাছে। মধ্যগ বা দালাল শুধু দালালি ভোগ করে। কিছু না ঢেলেই ঘরে তোলে কত শত টাকা!

বুড়ো শিবের বাজার থেকে কেউ মাল ঘরে তোলে, কেউ দূরে পাঠায়। নিকাশ-ঘর থেকে মাল চালান হয়ে যায় নৌকা আর জাহাজে। যায় দেশে আর বিদেশে। শহর থেকে দূরের গ্রামে যায়। বাজারে আসে উৎপাদকের নিয়োজিত জন; আসে দালাল আর মহাজন। পাইকার আর খুচরা ব্যবসায়ী আসে। ক্লিয়ারিং হাউস কখনও পরিপূর্ণ, কখনও শূন্য থাকে।

কাশীশঙ্করের মনের চিন্তা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা যেন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় একেক ঘটনায়। মনে মনে বিরক্ত হন তিনি। চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে যায়। যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়! গানের যেন তাল কেটে যায় বারে বারে।

ঘরে তিনি একা। যেন নীরব নিথর। সাড়া-শব্দ নেই কোন।

কৃষ্ণরামের অমানুষিকতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন ছোটকুমার। বজ্রের মত কঠোর যাঁর মন আর দেহ, তিনিও যেন কথঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন দেওয়ানের অপ্রত্যাশিত কথায়।

—কাম্‌তার খাঁ!

উচ্চকণ্ঠে ডাক ছাড়লেন কাশীশঙ্কর। ঘরে প্রতিধ্বনি ভাসলো তাঁর উদাত্ত আহ্বানের।

ঘরে সিঁদিয়ে উপরি উপরি তিনবার কুর্ণিশ ঠুকলো অর্দ্ধ-আনত কাম্‌তার খাঁ। বললে,—হুজুর, বেয়াদপি মাফ করবেন। আমি এখানেই আছি হুজুর, আপনার ডাক শুনেই হাজিরা দিয়েছি। কসুর মাফ করবেন।

কাম্‌তার খাঁ বলশালী ব্যক্তি। যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমন প্রস্থে।

যেন এক অতিমানব, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ-সমাজে এসে পড়েছে। কাম্‌তারের বুকের ছাতি প্রায় দশ বিঘত।

বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এত যার বলবিক্রম, সে যেন মূষিক-প্রায় হয়ে গেছে সসম্ভ্রমে। সিংহের কাছে যেন মূষিকপুঙ্গব।

ঘরের ফরাসে পায়চারী করতে থাকেন কাশীশঙ্কর। কেমন যেন হতাশ পদক্ষেপ !

তাঁর পদাঘাতে ফরাসের লতা-পাতা-ফুল বুঝি পিষ্ট হয়ে যায় ! ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত যান আর আসেন। সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। দেওয়ানজীর কথা শুনে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

সওদাগরী ময়ূরপঙ্খীতে পাল তুলে দিয়ে বাণিজ্যযাত্রা, স্বদেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়ে পণ্যবিনিময়ে রাশি রাশি অর্থলাভ, লক্ষ্মীলাভ—দেওয়ানের কথায় কাশীশঙ্করের হাসি-হাসি মুখ শান্ত হয়ে যায়। অর্থগৃধ্নু কৃষ্ণরাম কি মানুষ ! কি বর্ব্বর !

দাঁতে দাঁত চাপলেন কাশীশঙ্কর। তাঁর বিশাল বক্ষের কোথায় যেন ব্যথার আঘাত পড়েছে, বুকে জ্বালা ধরেছে। ক্রোধ আর আক্রোশে জ্বলছেন। গড়-মান্দারণের কোন্ এক পাষাণপুরীতে বিন্ধ্যবাসিনী, কত কষ্ট আর কত যন্ত্রণা ভোগ করছে কে জানে? কেঁদে কেঁদে ভাসছে হয়তো আঁখি-সলিলে !

কুলের অসম্মান। একই দেহশোণিতের নির্দ্দয় অবমাননা। হাতের মুঠো কঠোর কঠিন হয়। ক্রোধ আর আক্রোশে ফুলতে থাকেন কাশীশঙ্কর। ভূমিতে নিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে, পদচারণা থামিয়ে উদাসনম্র কণ্ঠে ডাকলেন,—কামতার খাঁ !

সাড়া দেয় না কামতার। দেখা দেয় শুধু।

কুমার বাহাদুরের সমুখে দাঁড়িয়ে সাড়া দেবে কোন্ সাহসে ! কাশীশঙ্কর দ্বার-প্রান্তে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। দেখেন, কামতার খাঁ কুর্ণিশ ঠুকছে। এক মুক্তদ্বারের মুক্ত আলোয় দেখা দেয়। কুর্ণিশ শেষ হয়ে যায়, তবু অবনত মাথা তোলে না। এতই সম্ভ্রম !

তেমনই উদাস-গম্ভীর সুরে কাশীশঙ্কর বলেন,—গন্ধ দাও স্নানঘরে। কেশতৈল দাও। গা মোছার গামছা দাও। জলে চন্দনচূর্ণ দাও।

কামতার খাঁর মুখে হাসির রেখা। অকৃত্রিম হাসির রেখা। শব্দহীন হাসির সঙ্গে কামতার বলে,—বিলকুল ঠিক আছে হুজুর ! মেহেরবাণি ক'রে এখন আপনি গোসলখানায় গেলেই দেখবেন যে বিলকুল ঠিকঠাক।

কাশীশঙ্কর শুনলেন কি শুনলেন না। মনে হয়, কথায় কর্ণপাত করলেন না। অন্যমনা হয়ে থাকলেন। দৃষ্টিহীন চোখে হতচকিত দৃষ্টি ফুটেছে। বাক্য যেন হারিয়ে গেছে। সহসা কথা বললেন, আপন মনেই, —কুলীনকন্যার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করেন। এ কি কথা বলেন কাশীশঙ্কর? জিহ্বা দংশন করলেন। কত স্নেহের, কত আদরের, কত যতনের রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী ! সহোদরার সরল-সুন্দর মুখচ্ছবি চক্ষুপথে ভেসে ওঠে বুঝি। সেই সদাহাস্যময়ী বিন্ধ্যবাসিনী হয়তো সেই যক্ষপুরীতে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল !

কাশীশঙ্করের বিশাল বক্ষের কোথায় যেন ব্যথার আঘাত লাগে।

রুদ্ধ ঘরে হঠাৎ যেন ঝড় বইতে থাকে। টানাপাখা টানতে থাকে কে কোথায় থেকে। ক্রোধ আর উত্তেজনায় উদ্বিগ্ন কাশীশঙ্কর তবুও দর-দর ঘামতে থাকেন। আঁটসাঁট পোষাক ছিল দেহে, মাথায় ছিল উষ্ণীষ, তাই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। কপালে স্বেদবিন্দু, হীরার কুচির মত জ্বল-জ্বল করে।

—সুপ্রভাত ! তোমার যে সাক্ষাৎই মেলে না কুমার বাহাদুর !

কে এক বয়োবৃদ্ধের কাঁপা-কাঁপা কথা শুনলেন কাশীশঙ্কর। দুয়ার পানে তাকিয়ে দেখলেন। সসম্ভ্রমে অগ্রসর হলেন সে দিকে।

আগন্তুকের পদদ্বয়ে হস্ত স্পর্শ করলেন। বললেন,—লালা-ভাই, চরণাশীর্ব্বাদ দিন। আমার গোবিন্দপুর যাত্রা সফলকাম হওয়ার পুরস্কার দিন।

—জয় হোক ! জয় হোক !

বৃহৎ প্রকোষ্ঠে অশীতিপর বৃদ্ধের কম্পিতকণ্ঠ রণরণিয়ে ওঠে। উপবীতসহ হাত কাশীশঙ্করের কপালে রাখলেন তিনি। বললেন,—নিশ্চিত জয় হবে। তবে, আমি সামান্য জন, আমার আশীষে কি ফল হবে? আমিই যে তোমার দয়ার প্রত্যাশায় থাকি কুমার বাহাদুর !

দুই বলবাহুর আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন কাশীশঙ্কর ঐ বৃদ্ধকে। বক্ষে জড়িত রেখে বললেন,—লালা-ভাই, তুমি সামান্য নও, তুমি অসামান্য, তুমি মহৎ, তোমার অন্তর প্রশস্ত, তোমার আশীষ যে আমার নিকট জয়টীকা ! তা কি তোমার অজ্ঞাত ?

লালা-ভাই দন্তহীন মাড়ি বের করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। শিশুর মত হাসি। কাশীশঙ্করের বক্ষলগ্ন হয়ে সহাস্যে বললেন,—তবে আমার প্রতি তোমার এই অবিচারের কারণ কি কুমার বাহাদুর? আমার মৃত্যু হোক, এই কি তোমার অভিপ্রায় ?

শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন কাশীশঙ্কর। বাহুপাশ শিথিল করলেন। বললেন,—এমন কথা কেন লালা-ভাই ? তোমার অনুমান সর্ব্বৈব মিথ্যা। তোমাকে যে এক তিল না হেরিলে, শত যুগ মনে হয় ! কেন এই অভিযোগ ?

লালা-ভাইয়ের মুখের হাসি মিলায় না। শিশুর মত সহজ সরল হাসি হেসে বললেন,—আমার দৈনন্দিন প্রাপ্য আরক থেকে তবে আমি কেন বঞ্চিত হই ? আমার কি অপরাধ ?

হো-হো শব্দে হাসলেন কাশীশঙ্কর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন যেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত হাসির পর বললেন,—লালা-ভাই, আমিই নিষেধ করেছি যেন তোমাকে এত

ঘন ঘন আরক পানীয় না দেয়। তুমি কি বিস্মৃত হও যে, তোমার শরীরে পূর্ব্বের মত আর সেই জোর নাই? তুমি এখন প্রায় অক্ষম। তদুপরি যদি তুমি আরক-পানের মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত কর, তবে তো বিপদের আশঙ্কা আছে!

লালা-ভাইয়ের মুখাকৃতির ঈষৎ পরিবর্ত্তন হয়। বিষাদ নামে মুখে। বার্দ্ধক্য-ভরা দুই চোখ যেন ছলছলিয়ে ওঠে। বলেন,—পরপারের যাত্রী আমি, আমার আবার বিপদ কি? মৃত্যু যার সুনিশ্চিত তার জন্য—

—লালা-ভাই! ধমকে উঠলো কাশীশঙ্কর। বললেন,—অযথা অর্থহীন প্রলাপ বকেন কেন?

ছোটকুমারের সশব্দ কণ্ঠে চমকে ওঠেন যেন বৃদ্ধ। বলেন,—মানুষ বাল্যে পিতার অধীনে থাকে, যৌবনে স্ত্রীর অধীনে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র-পৌত্রাদির অধীনে। আমার তো এ সকল বালাই নাই। ত্রিভুবনে তুমি ব্যতীত কেউ আমার আপন নাই। তোমার অবিচারে আমি কোথা যাই এই বুড়া বয়সে? আরক বিনা যে আমার চলে না কুমার বাহাদুর!

কাশীশঙ্কর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেন হঠাৎ। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন,—লালা-ভাই, আমার মন আজ অস্থির। তোমার আরক-পানের চিন্তা আমার মনোমধ্যে নাই। এই ক্ষণে জ্ঞাত হলাম, সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীকে গড়-মান্দারণে চালান পাঠিয়েছে জমিদার কৃষ্ণরাম।

কোটর থেকে নেত্রগোলক ঠেলে যেন বেরিয়ে আসে বৃদ্ধের। বিস্ময়চকিত হয়ে বলেন,—যাই বল ছোটকুমার, এই জগৎ মনুষ্য-সাম্রাজ্য! দেবতার বিধান, শাস্ত্রের অভিমতের কোন মূল্য নাই মানবের পৃথিবীতে। তুমি দেখিও, মানুষই যত প্রকার কু-কর্ম্মের কারক হবে। তজ্জন্য বিচলিত হওয়ার অর্থ কি?

কাশীশঙ্করের বিশাল বক্ষের কন্দরের কোণায় যেন ব্যথার বীণা ঝনঝনিয়ে ওঠে। দূর, বহুদূর গড়-মান্দারণের পাষাণ-পুরীর অন্তর থেকে কোন্ এক নির্য্যাতিতার ক্রন্দন যেন হাওয়ায় ভেসে আসে! কাশীশঙ্কর যেন কানে শোনেন, কার তীব্র করুণ রোদনধ্বনি এই রাজভবনের আশে-পাশে প্রতি-ধ্বনিত হয় থেকে থেকে।

ছোটকুমারকে নিস্তব্ধ দেখে লালা-ভাই পুনরায় বললেন,—শাস্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর তুল্য। তোমাদের জামাতা জমিদার কৃষ্ণরামের জাতিনাশ হওয়ায় সমস্ত স্বত্ব নাশ হয়েছে। আমি ভালই জানি, কৃষ্ণরাম আজ নয়, বহু কাল পূর্ব্বেই পতিত হয়েছে। স্ত্রীজাতির মধ্যে সে হিন্দু-মুসলমানের তফাৎ দেখে না। তবু, আমাদের রাজকুমারীর প্রতি এই নির্য্যাতন কেন?

দুই হাতের দশ নখর যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বক্ষ স্ফীত হয়।

কা'কে যেন সম্মুখে পেতে চান কাশীশঙ্কর। কার যেন বুক চিরে ফেলতে চান নখর সাহায্যে। সেই বিদীর্ণ বক্ষ থেকে উপড়াতে চান তার হৃৎপিণ্ড! দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,—কৃষ্ণরাম আমাদের পৈতৃক ধন-সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করতে চায়। আমাদিগের পক্ষ থেকে অসম্মতি শুনেই হয়তো এই নৃশংস কার্য্যে লিপ্ত হয়েছে।

লালা-ভাই আরেক মুহূর্ত্ত থাকলেন না সেখানে। ঐ ন্যুব্জ-কুব্জ বৃদ্ধ দারুণ মনঃকষ্ট বুকে বহন করে নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেলেন। এক মুক্ত দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হলেন। কাশীশঙ্কর দেখলেন, দুগ্ধ-শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত লালা-ভাই, অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না আর। ছল-ছল চক্ষে বিদায় নিলেন তৎক্ষণাৎ।

কেমন যেন অসহায়ের মত চীৎকার করলেন কাশীশঙ্কর। ডাকলেন উচ্চ কণ্ঠে,—লালা-ভাই, যাও কোথা? তুমি আমাদিগের পিতৃবন্ধু, একটা সৎপরামর্শ দিয়ে যাও এ-হেন বিপদে!

কত অধিক বয়স, তবুও এখনও বর্ণ তাঁর অম্লান। শুভ্র গৌরবর্ণ।

ফুরফুরে সাদা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় সাদা মলমলের তাজ-টুপী। গায়ে কাশী-রেশমের ঝলঝলে জোব্বা। তসরবস্ত্র, পায়জামার মত মালকোঁচা দিয়ে পরেছেন লালা-ভাই। ছেঁচা পান খেয়েছেন কোন্ সকালে, তারই রক্তিমা অধরে।

লালা-ভাই বিদায় নিলেন!

কাশীশঙ্করও ত্যাগ করলেন বৈঠকখানা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে তিনিও চললেন। কামতার খাঁ অনুসরণ করলো শুধু কপালে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে।

কক্ষের বাহিরে বেরিয়ে কাশীশঙ্কর প্রাঙ্গণ-শেষের অন্দর-প্রান্তে চোখ মেললেন।

গৃহশীর্ষের দিকমুক্ত হাওয়াখানায় কুমারের ব্যগ্র-দৃষ্টি থমকালো। কে ঐ হাওয়াখানায়? আকাশচারী পরী না'কি! নয়তো কোন সুন্দরী উপদেবতা হয়তো, আকাশে ডানা মেলে উড়ে উড়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে হাওয়াখানায় আশ্রয় চেয়েছে। হাওয়াঘরের ওপারে বৈশাখের স্বচ্ছ নীল আকাশ। মুক্তমধুর বাতাসে অপ্সরীর কেশের রাশি উড়ছে।

প্রথমে স্বচোখের দৃষ্টিকে বিশ্বাস হয় না কাশীশঙ্করের।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চিনতে পারেন যেন আকাশের পরীকে।

—রাতরাণী!

মুখের আগল ভেঙ্গে কথা উচ্চারিত হয়। একটি মাত্র শব্দ।

—আমার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই?

কাশীশঙ্করের মনে পড়লো, তাঁর সহধর্ম্মিণী মহাশ্বেতা এখনও উপবাসী, অভুক্ত। ক্ষুধায় কাতর হয়তো। তৃষ্ণায় আকুল।

কুমারের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হ'তে দেখে, প্রতীক্ষায় থেকে থেকে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অধীর হয়ে উঠেছেন কুমার-পত্নী ঐ হাওয়া-ঘরে। সেখান থেকে দেখা যায় সদর-বৈঠক। দেখা যায়

যদি রাতরাণীর রাতের রাজাকে! কি এমন গুরুতর কায এখন তাঁর!

আরেক পল কালক্ষেপ নয়। ব্যস্তপদে কুমার চললেন গোসলে। কামতার খাঁ-ও চললো, সেলাম ঠুকতে ঠুকতে, পেছন পেছন।

মহাশ্বেতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সত্যিই নেই। তাঁর অভিযোগ মিথ্যা। একেই ব্রাহ্মণের ঘর। চাকর-চাকরাণী দ্বারা ব্রাহ্মণের গৃহে বিশেষ কি-ই বা সুবিধা! পাকের ঘরে শূদ্রের জল অচল, পূজার ঘরেও অব্যবহার্য্য। মহাশ্বেতা নিজে পাক করেন, পূজার ব্যবস্থাদি করেন। তার পর আছে নিজের শিবপূজা, ইষ্টমন্ত্র জপ;—বেলা তৃতীয় প্রহর নাগাদ শালগ্রামশিলার ভোগ। স্বয়ং নারায়ণ উপোসী থাকবেন, প'ড়ে থাকবেন অস্নাত অবস্থায়, শয়নের দেরী হয়ে যাবে তাঁর—আর মহাশ্বেতা হেসে-খেলে দিন কাটাবেন!

আহার শেষেও এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের যো নেই।

সাংসারিক আয়-ব্যয় দেখতে হয় মহাশ্বেতাকে। আরও কত কি করতে হয়!

টাকার সুদ আসল আদায়ের চেষ্টা করতে হয়! রাইয়তের কাছে খাজানা আদায় আর তার সরঞ্জাম খরচা দেখতে হয়। খামার জমিতে বর্গাদার পত্তন ক'রে বিছন দিতে হয়। বর্গাদারী শস্য-ফসলের ভাগ বুঝে নিতে হয়। অতিথি অভ্যাগত কুলজ্ঞদের যথোচিত অভ্যর্থনা জানাতে হয়।

কাজের অবসর মিললে, পাঠ দিতে হয় মহাশ্বেতার দশম বর্ষীয়া নিজ কন্যাকে! এক ফুটফুটে মেয়ে বনলতাকে!

বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় আছে মহাশ্বেতার। ফলা আর বানানের সঙ্গে! কলাপ আর ব্যাকরণের সঙ্গে! সাহিত্যের সঙ্গে! বৈষ্ণবী সাহিত্য!

মনের মানুষকে দেখতে পেয়ে, হৃদয়ের চোখে দেখতে পেয়ে কিছু বা স্থির হন মহাশ্বেতা। চার চোখ এক হ'তে লজ্জা ভুলে দুই বাহু মেলে ইশারায় ডাক দিয়েছিলেন কুমার বাহাদুরকে। লজ্জা ভুলেছিলেন ক্ষণেক তরে।

এই ভরা দুপুরে কে আর দেখবে, কাকপক্ষী ছাড়া!

—মা গো, তুমি কোথায়?

হাওয়া-ঘরে এক ঝলক মিষ্টি হাওয়ার মত যেন কোথা থেকে উড়ে এলো বনলতা। বললে,—আমি তো খুঁজে খুঁজেই সারা!

—আহা, বাছা আমার!

কন্যাকে বুকে জড়ালেন মহাশ্বেতা। হাসিভরা মুখে বনলতার কপালে চুমুর টিপ পরিয়ে দিলেন কথার শেষে।

বনলতার অভিমানী মুখ। ঐ ফুটফুটে মুখে আবার গাম্ভীর্য্য। কাজলপরা চোখে দুঃখের ছায়া! বনলতা অভিমানের সুরে কথা বলে। বলে,—মা গো, দাসীকে তুমি শাস্তি দাও।

—কেন রে বন'? কি করলে দাসী?

ব্যগ্রব্যাকুল প্রশ্ন করলেন মহাশ্বেতা। বনলতাকে আরও কাছে টেনে নিলেন। চিবুক তুলে ধরলেন মেয়ের।

বনলতা বলে,—দাসী যে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়!

—সে কি কথা! বললেন মহাশ্বেতা। বললেন,—ঘুম পাড়িয়ে দেয়, ভালই তো করে দাসী। ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা।

মায়ের বুকে ভয়ে মুখ লুকায় মেয়ে।

দু' হাতে মায়ের মুখ চেপে ধরে। বলে,—আর ব'ল না, ব'ল না। আমি তবে যাই, ঘুমিয়ে পড়ি?

আর সম্মতির অপেক্ষা নয়, পরনের খাটো লাল-পাড় সূতির শাড়ীর আঁচল গোঁজে বনলতা। চোখে চেপে এক দৌড়ে পালায় হাওয়া-ঘর থেকে! ভূত পিশাচ যদি কোথাও থেকে ঢেলা-ফেলা ছোঁড়ে! তাই কোথাও অপেক্ষা নয়, একেবারে নিজের সাজানো শয্যায় চলে যায়।

বনলতার পায়ের রূপার তোড়ার ঝন-ঝন শব্দ কোথায় মিলিয়ে যায় হাওয়া-ঘরের মুক্ত বাতাসে। মহাশ্বেতাও ত্যাগ করেন হাওয়াখানা! কেমন এক ক্ষুণ্ণ মন নিয়ে।

কেনই বা এমন অসময়ে রাজা বাহাদুরের দেওয়ান এলেন আর গেলেন! হাওয়া-ঘর থেকে স্তম্ভের অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে মহাশ্বেতা যে দেখলেন! কুমার বাহাদুরের স্নান এবং আহারের সময়ে, এমন অসময়ে কেন দেওয়ানজীর আগমন! রাজ-গৃহের কোন দুঃ-সংবাদ নেই তো!

রাজা বাহাদুর কাশীশঙ্করের রাজ-আদেশ, তবুও ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন দেওয়ান।

কোন' ওজর-আপত্তি চললো না। কোন জবাব-কৈফিয়ৎ টিকলো না। শুনলেন না কাশীশঙ্কর। নাপতিনীর কথা শুনতে শুনতে অধীর, চঞ্চল হ'তে থাকেন। সপ্তগ্রামেরই একজন নারী! সাতগাঁওয়ের জমিদার কৃষ্ণরামের কীর্ত্তি-কলাপ শুনিয়েছে! ব্যথা আর বিস্ময়ে কেমন যেন অস্থির হন ক্রমেই। সহোদরার নির্য্যাতন আর নির্ব্বাসনের করুণ কাহিনী শুনে জড় তুল্য হয়ে যান। দীর্ঘ দুই চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়!

দরবার শেষ ক'রে কালীশঙ্কর অন্দরের খাস-কামরায় বসে জিরান দেন খানিক। রূপার কেদারায় ব'সে ফরসিতে তামাক খান। অম্বুরির গন্ধ ভুর-ভুর করে রাজ-অন্দরে! আহারের আসনে যাওয়ার আগে তামাকের সুখসেবন চলে।

আসব না আরক পান করেছেন রাজা বাহাদুর! স্পিরিট! নির্জ্জলা চুয়ানো মদ। রূপার কেদারায় আসীন নেশাচ্ছন্ন কালীশঙ্কর! লাল ভেলভেটের পা-দানে দুই পা। বামহাতের মুঠিতে রূপালী তারের ফরসি-নলের সোনার নল-মুখ! একটি হাঙরমুখ!

খাস-কামরার দ্বারে বাতায়নে খসখসের পর্দ্দা।

পিচকারীর জলে কে যেন সিক্ত করে দিয়ে যায়। ঝুলন্ত খসখস থেকে শিশিরবিন্দু পড়তে থাকে ঝিরি-ঝিরি।

টানাপাখার হাওয়া হয় যেন শীতের দেশের! কে বলবে বাহিরে রুদ্রবৈশাখের তাণ্ডব চলেছে! বাতাসে আগুনের ঝলসানি। প্রচণ্ড সূর্য্য, আকাশের পশ্চিম-প্রান্তে প্রায়।

দ্বারে আলো ফুটলো। ঘরে আলো ছড়ালো, চক্ষের নিমেষে! দুয়ারের খসখস কে সরালো! সাড়া না দিয়ে কে প্রবেশ করলো! কার এত দুঃসাহস যে ঘরের তমসা বিনষ্ট করে!

—কণ্ৎ? কে?

রাজা বাহাদুর বললেন হঠাৎ ক্রোধের-সুরে। দৃষ্টি না ফিরিয়েই। ঘরের কড়িকাঠ থেকে নেমে-আসা ঝুলানো বেলোয়ারী কাচের ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে। কালীশঙ্কর নেশায় কাতর এখন, দেখলেও হয়তো চিনতেন না রক্তরাঙা চোখে।

—সাড়া কৈ? কে?

আবার গর্জ্জন করলেন রাজা বাহাদুর। বেলোয়ারী লণ্ঠনের কাচের জল-ফোঁটার সারি, ঠুং ঠাং বেজে উঠলো যেন রাজার কণ্ঠনিনাদে।

দেওয়ালের সোনা-রূপার সৈন্যসামন্ত আর অশ্বারোহী যেন চমকে উঠলো!

—সর্ব্বমঙ্গলা!

হাতের চুড়ির রিণিঝিনি শুনে চিনেছিলেন হয়তো কালীশঙ্কর। অনুমান সত্য না মিথ্যা তারই পরীক্ষায় রক্তিম চোখ ফেরালেন। মেজরাণীকে দেখে তবেই ক্রোধ পড়ে।

চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সাড়া নেই দেখে রাজা বাহাদুর ঠাওরেছিলেন অন্য রকম। ভেবেছিলেন হয়তো কোন গুপ্তঘাতক, চুপিসাড়ে এসে তরবারির একটি আঘাতে যদি গণ্ড উড়িয়ে মুণ্ডপাত করে!

—সাতগাঁ হ'তে এক নাপতিনী রাজপুরীতে এসে হাজির হয়েছে।

রাজাকে নেশায় টইটম্বুর দেখে আর কাছে অগ্রসর হন না সর্ব্বমঙ্গলা। করমচার মত চোখ দেখে। কিছু দূরের ব্যবধানে থেকে কথা বলেন।

কালীশঙ্করের কাণে কথা পৌঁছে না। একটিও কথা নয়।

নির্জ্জলা স্পিরিটে বুঝি জ্বলিয়ে দিয়েছে সেন্স-অরগান! ইন্দ্রিয়স্থান!

কথা কাণে যায় না। রাজা বাহাদুর ভরানয়নে দেখেন,—সর্ব্বমঙ্গলার নবঘন-মেঘনীল রঙের ঢাকাই শাড়ীর আঁচল, উড়ছে টানাপাখার ঘন ঘন হাওয়ায়। কোঁকড়ানো কেশের খসা-কুন্তল দুলছে। মেজরাণীর চঞ্চলতায় ফরাস-ঢাকা ঘরের অল্প আলো-অন্ধকারে নাকচাবির হীরা জৌলুস তুলছে। সর্ব্বমঙ্গলার অধর তাম্বুললাল। মুখমধ্যে পানের খিলি। এক গাল পান হয়তো।

ভয়ে ভয়ে সর্ব্বমঙ্গলা আবার ডাকলেন,—রাজা বাহাদুর!

একেই স্বল্পভাষী রাণী। বড় একটা কথাই বলেন না। তবুও তাঁর কথায় যেন বীণার ঝঙ্কার তোলে।

বঙ্কিম গ্রীবায় বিমুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে কালীশঙ্কর মুখ থেকে মুখ-নল সরিয়ে বলেন,—মেজরাণী, কিছু বক্তব্য আছে? তুমি এত বিমর্ষ কেন? শরীর-গতিক শুভ নয় না কি?

রাজার করমচার মত রক্তরাঙা চোখ দেখে সর্ব্বমঙ্গলা ভীষণ ভয় পান। মাত্রাতিরিক্ত যদি কিছু ক'রে বসেন রাজা বাহাদুর? কোন নির্লজ্জ উক্তি করেন যদি তামাসার ছলে? কিংবা যদি দিনমানে, এই মুক্তদ্বার ঘরে, সর্ব্বমঙ্গলার হাতখানি ধ'রে টানেন?

লজ্জা, ভয় আর সঙ্কোচে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় রাণীকে। আনত চোখে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয়। বিশুষ্ক কণ্ঠে রাণী কথা বলেন, মেঘনীল শাড়ীর প্রান্ত আঙুলে পাকাতে পাকাতে। বলেন,—রাজা বাহাদুর, সাতগাঁ থেকে এক নাপতিনী এসে রাজ-অন্দরে যে হাজির হয়েছে!

কালীশঙ্কর প্রায় জড়িতকণ্ঠে শুধোলেন,—কেন? কি প্রয়োজনে? কি বলে নাপতিনী?

বিমর্ষ সুর রাণীর কথায়। রাণী বললেন,—ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীকে যে ঠাকুরজামাই গড়-মান্দারণে চালান করেছে। গড়-মান্দারণের এক ভগ্নগৃহে বন্দিনী হয়ে আছে!

নেশার প্রাবল্যে নিমীলিত আঁখি রাজার।

সেই চোখ সহসা বৃহৎ হয়। বিস্ফারিত হয়। বিস্ময়ে!

হাত থেকে বুঝি খ'সে পড়ে যায় রূপার তার-জড়ানো ফরসি-নল। সোনার হাঙর-মুখ দেওয়া সটকা। অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে ভ্রূ পাকিয়ে রাজা বাহাদুর বললেন,—ফ্যাসাদ বটে! কেষ্টরাম তো আচ্ছা জ্বালানে লোক! কোথায়, সাতগাঁর নাপতিনী কৈ?

—আছে সে অন্দরের নীচের তলায়। দাসীদের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে। মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলার শঙ্কা ও সঙ্কোচমিশানো কথার স্বর। কেমন যেন ভয়ার্ত্ত। বলেন,—সাক্ষাৎ দেবেন নাপতিনীকে? তাকে কি ডাকাবো রাজা বাহাদুর?

নির্জ্জলা স্পিরিটে অকেজো হয়েছে বুঝি জ্ঞানেন্দ্রিয়! বোধ-শক্তি আর নেই না কি! নির্জ্জীবের মত চাউনি কেন রাজার দুই চোখে? কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় চকিতের মধ্যে, বৃহৎ চোখের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি! নার্ভ-গ্রন্থি কি আলগা হয়েছে? কেন এত সজোর শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন? স্বরযন্ত্র কি বিকল না কি? লারিংক্স? শ্বাসপথ বন্ধ?

কথার কোন উত্তর না পেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেজরাণী ভয়ে ভয়ে বলেন,—তবে আমি নাপতিনীকে ডাকাই রাজাবাহাদুর?

—হাঁ-আ-আ, এই মুহূর্ত্তে ডাকাও। নাপতিনীর বক্তব্য শুনে তবেই আহারে বসবো।

বহু কষ্টে নিজেকে সামলে সামলে, বহু কষ্টে যেন কথা ক'টি ব্যক্ত করলেন কালীশঙ্কর। বুকে হাত চেপে চেপে কথা বললেন অনেক চেষ্টায়।

কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে হ'তে আড়নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষে রাণী দেখলেন, রাজার মুখমুকুরে যেন কষ্টের কুঞ্চনরেখা।

বক্ষে হাত কেন রাজা বাহাদুরের ? কোথায় কষ্ট ! কিসের এত মনঃকষ্ট ? শুভ্র মুখ রক্তাভ যে !

কালীশঙ্করের ফুসফুস কি জ্বলছে ? স্পিলিন আর কিডনী দুটোয় কি দংশনের ব্যথা ধরছে থেকে থেকে ? বুক আর প্লীহায় স্পিরিটের প্রতিক্রিয়া ফললো না কি এত দিনে, এত ক্ষণে ?

—নাপতিনী হাজির রাজা বাহাদুর !

পুনঃপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরলেন সর্ব্বমঙ্গলা। দুয়ারের ঝুলানো-খসখস সরিয়ে দাঁড়ালেন মর্ম্মরমূর্ত্তির মত।

বড় বড় লাল চোখ ফিরালেন রাজা বাহাদুর। নেশায় কাতর থমকানো চাউনি। রাজা দেখলেন, যেন এক রঙ্গমঞ্চের যবনিকা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক রূপবতী নটীনর্ত্তকী,—যার অধর ঘন লাল। ডালিম-রাঙা। তার নাসিকাপ্রান্তের কি এক রত্নে শুভ্র দ্যুতি !

জানুর 'পরে খসে-পড়া সটকা, খুঁজে খুঁজে ফের মুখে তুললেন কালীশঙ্কর। সোনার হাঙর-মুখ দাঁতে ধরলেন। কোথায় কোন্ অন্তরালে লুকিয়ে থেকে আলবোলা বোল বললো। রাজা বাহাদুরের মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে ধোঁয়ার জাল বিস্তার করলো।

সামান্যা নাপতিনী, তাকে আর চোখে দেখে না। কে এক পরস্ত্রী, দেখতে নেই তাকে। উচিত নয়। তাই কড়িকাঠে চোখ তুললেন রাজা বাহাদুর। লাল ভেলভেটের পা-দানে ভাল ক'রে পা ছড়ালেন।

ভিজে খসখস আর অম্বুরি তামাকের কেমন এক মোহমাখা খুশবু ছড়ায় টানাপাখার জোরালো হাওয়ার নকল ঝড়ে !

কড়িকাঠে চোখ তুলেই বললেন কালীশঙ্কর,—কও সর্ব্বমঙ্গলা, নাপতিনীকে কও, আসল কাহিনীটা বিবৃত করুক। আমি শুনি।

আরও যেন কেউ কেউ ঘরে সিঁদোলো। অলঙ্কারের মৃদুমন্দ আওয়াজ পেয়ে এক লহমায় দেখে নেন কালীশঙ্কর। কড়িকাঠের চোখ কড়িকাঠেই ফিরিয়ে নেন তক্ষুণি। পরস্ত্রী, যদি চোখ প'ড়ে যায় !

আকাশী-রঙ ফাঁপা কাচের বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠনে সূক্ষ্ম চিত্র-বিচিত্র। কাচের কারুকাজ। আঙ্গুরপাতা আর ফলের স্তবক। ঘরের আলো-আঁধারে ঐ আকাশী নীলিমার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে-থাকা তারা উঁকি দেয় যেন।

ব্যগ্র-ব্যস্ত মনের দুঃখের কৌতূহল, পুষে আর রাখতে পারলেন না রাণী মায়েরা। রাজা বাহাদুরের খাস-খামরায় একে একে সিঁদিয়েছেন আরও দুই রাণী। পাটরাণী আর ছোট রাণী। উমারাণী, সর্ব্বজয়া। আর সর্ব্বমঙ্গলা তো সামনেই। খসখস সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নটীনর্ত্তকীর মত। নাপতিনীকে ডাকতে গিয়ে খেয়ে এসেছেন শুধু [illegible] কয়েকটি তাম্বুলমিশানো পানের খিলি। মৃদু মৃদু চর্ব্বণ করছেন। শুধু অধর থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

নাপতিনীর কথায় নাকেকান্নার সুর। নাপতিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে,—রাজামশাই, রাজামশাই, কি আর আমি কই ! আপনাদের রাজকন্যের দুখের কথা ব্যক্ত করতে চোখ দু'টা জলে ভ'রে যায়। তেনাকে আমাদের জমিদার কি না বিভূঁয়ে চালান করে দিলেন !

—কোথায় বিন্ধ্যবাসিনী ? ঠিক এইক্ষণে কোথায় তার অবস্থিতি ?

সাগ্রহে শুধোলেন রাজা বাহাদুর। প্রশ্নের পর রুদ্ধশ্বাসে ব'সে থাকলেন উত্তরের অপেক্ষায়।

—রাজামশাই, রাজামশাই, কি আর আমি কই ! নাপতিনী যেন কেঁদে কেঁদে কথা কয়। বলে,—রাজকুমারী আছেন, বেঁচে জীইয়ে আছেন কোন' প্রকারে।

—কুত্র ? কোথায় ?

অধীর আগ্রহের সঙ্গে কালীশঙ্কর চীৎকার করলেন।

হঠাৎ সপ্তমে-ওঠা কণ্ঠধ্বনি শুনে হয়তো চমকে উঠলো নাপতিনী। বললে, ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় বললে,—রাজামশাই, তেনাকে তো গড়-মান্দারণে রাখছেন আমাদের জমিদার, বলেন কেন আর !

—সেথায় কে আছে ?

কথার শেষে রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করলেন রাজা। সুর নামিয়ে কথা বললেন।

—কেউ নাই রাজামশাই ! আছে এক দাসী। সঙ্গে গেছে রাজকুমারীর। আর আছে না কি এক পাঠান প্রহরী। ফটকে মোতায়েন থাকে দিন নেই রাত্তির নেই।

নাপতিনী বাষ্পরুদ্ধ সুরে যেন কথা বলে। সাদা থানের একগলা গুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কথা বলে কান্নার সুরে।

—বিন্ধ্যবাসিনীর অপরাধ ?

নাপতিনী যেন কাঁদে আর বলে,—রাজামশাই, অপরাধ আর কি ! আমাদের জমিদার যা দাবী করেন তা না পেয়ে এই কঠোর সাজা দিয়েছেন সেই মাটির মেয়েটিকে, আহা ! অপরাধের কি জানবে আপনাদের রাজকুমারী ? ফুলের মত মেয়ে তিনি।

সপ্তগ্রামের একজন নারীর মুখে সাতগাঁয়ের জমিদারের কীর্ত্তিকলাপ শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে রাজা বাহাদুর বললেন,—উমারাণী, দেওয়ানকে পাঠানো হোক অম্বুজের কাছে। এ দুঃখের বোঝা আমি একা কেন বই ? নাপতিনী যাক, অন্দরে যাক। অধিক আর কি শুনাবে সে !

উমারাণীর ঢলঢল মুখে বিষাদ-কালিমা যেন !

সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর মুখভাব ঈষৎ গম্ভীর, আঁখির কোণে যেন বিস্ময়ের আবেশ। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ। তাঁর প্রতি অঙ্গে রত্নাভরণ-পারিপাট্য। সদ্যঃস্নাতা রাণীর পৃষ্ঠে আলুলায়িত ও তৈল-চিকণ কেশের রাশি। প্রায় জানু স্পর্শ করেছে এলো কেশের শেষ।

ঠিক মূর্ত্তিমতীর মতই দাঁড়িয়েছিলেন রাজমহিষী উমারাণী। রাজ-আজ্ঞা কাণে পৌঁছতে হতজ্ঞান ফিরে পান যেন। অপ্রস্তুতের লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে কক্ষের বাইরে চলে গেলেন। তাঁর হস্তচালনায় হাতের হীরকমণ্ডিত বালা জল-জল করলো। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে উঁকি দিলো নাকের নথ। নথে একটি দোদুল্য লালাভ মুক্তা। নথের নোলক।

রাজার নির্দ্দেশ পেয়ে দেওয়ানজী আপত্তি জানায়। বলেন,—এই অসময়ে কুমার বাহাদুরকে মিথ্যা আহ্বান কেন? তাঁর এখন স্নানাহারের সময়। আমার সাহসে কুলায় না যে তাঁকে ডাকি!

তা হোক। কালীশঙ্করের মুখ থেকে যখন বাক্য খসেছে তখন আর অন্য কারও কথা টিঁকবে না। রাজা বাহাদুরের যা কথা তাই কায। মুখের কথা নয়, যেন জবান।

দেওয়ানজীর অনুমানও মিথ্যা হয় না।

কুমার বাহাদুর সকল বৃত্তান্ত শুনেও গোসলে গেলেন স্নানার্থে। হাওয়াখানায় প্রতীক্ষমানা মহাশ্বেতাকে দেখেছেন! মহাশ্বেতা এখনও যে এক বিন্দু জলপান পর্য্যন্ত করেননি। এত বেলা, তবুও রাজরাণী উপোসী, অভুক্ত। আর কাশীশঙ্কর কি এতই নিদয়-নিঠুর যে আর অন্য কাজে কালবিলম্ব করবেন?

তাই ফিরে আসেন দেওয়ান। বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন ক্ষুণ্ণ মনে। সহোদরার প্রতি কাশীশঙ্কর বিরূপ নয় কোন দিনই। তিনিও আন্তরিক স্নেহ করেন বিন্ধ্যবাসিনীকে। বিন্দুর দুঃখে বজ্রসম কঠোর কুমার বাহাদুরেরও অন্তর সিক্ত হয়। কুমারের সুবিশাল বক্ষের কোথায় যেন, থেকে থেকে ব্যথার বীণা বাজতে থাকে!

কিন্তু উপায় কি? এক কথায় কি মিটবে এই সমস্যা? আর সমস্যা শান্তিতে মিটিয়ে নেওয়ার মানুষ কি সেই দোর্দ্দণ্ড, দুরাচারী কৃষ্ণরাম? সেই কৌলীন্যের মুকুটমণি? সেই ব্যভিচারী জমিদার?

তবে কেন রাজকুমারীর অপূর্ব্ব সুন্দর মুখচ্ছবি, এত বার বার কেন কাশীশঙ্করের স্মৃতিপটে জাগরূক হয়! তার আকুল ক্রন্দন যেন কানে বাজে যখন-তখন! তবু, তবু কোন' উপায় যেন খুঁজে মেলে না কোন মতেই! গড়মান্দারণের বন-জঙ্গলময় পাষাণপুরী থেকে কোন্ উপায়ে উদ্ধার করা যায় নির্ব্বাসিতা ও বন্দিনী রাজকন্যাকে?

ফটকে আছে বন্দুকধারী পাঠান প্রহরী। কে ধুলো দেবে তার চোখে, যতক্ষণ তার হাতে আছে বারুদঠাসা গাদা-বন্দুক?

আসমানদীঘিতে ডুব দিয়ে কি জ্বালা জুড়ায় বিন্ধ্যবাসিনীর! তাঁর মনের উত্তাপ, দেহের জ্বালা! অবগাহন স্নানেও দুর্ভাবনার অবসান হয় না! আসমানদীঘির জল আবার নিথর, নিষ্কম্প হয়ে যায়। কাকচক্ষু জল!

ভিজে কেশের রাশি রাজকন্যার পিঠে।

বিনা তেলের রুক্ষ কেশের রাশি ছড়িয়ে প্রাচীরহীন এক ছাদে বসেছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। সদ্যঃস্নাতার পরিধানে লাল-পাড় গরদ-শাড়ী। সীমন্তে টাটকা সিন্দুর-রেখা। ছাদে বসে চুল শুকাতে থাকেন আর নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকেন—সমুখে প্রবহমান আমোদরের পানে! রৌদ্রকিরণে আমোদরের স্বচ্ছসলিল চিকচিকিয়ে ওঠে।

ছাদের এক দিকে গাছ-গাছড়ার অবাধ্য শাখা, যেন বাহু মেলেছে। ছায়া সৃষ্টি করেছে, ছাদের এক কিনারায়। কয়েকটি কাঠবিড়ালী বৃক্ষশাখা থেকে নেমেছে ছাদের 'পরে। জামরুল ফুল পড়েছে যে ছাদের এক প্রান্তে! যেন পুষ্পবর্ষণ হয়েছে।

জামরুল-ফুলের সুবাস ভাসছে বাতাসে। ফুলের গন্ধে যেন কি এক লোভানি! কাঠবিড়ালীর ভিড় হয়েছে তাই।

সহসা চোখ পড়লো রাজকুমারীর।

সমুখে আমোদরের তীরে, এক সুদর্শন পুরুষকে দেখলেন যেন। নধরকান্তি, শুভ্রবর্ণ এক যুবাপুরুষ! স্নানার্থেই হয়তো আমোদরের উত্তপ্ত বালিয়াড়ি তীর ধ'রে এগিয়ে চলেন। পট্টবস্ত্র পরনে। বক্ষে উপবীত। মস্তকে দীর্ঘ শিখা।

মনুষ্যের মুখ দেখা যায় না যেখানে, সেখানে কা'কে দেখলেন বিন্ধ্যবাসিনী! কে ঐ অপরিচিত ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ তাঁর দুই হাতে কী যেন ধারণ করে আছেন। প্রখর সূর্য্যালোক, তবুও হাতে এক খণ্ড লাল শালু ব্যতীত কিছুই চোখে পড়ে না!

দেখে দেখে বিমুগ্ধা হন বিন্ধ্যবাসিনী।

কেমন এক আবেগে, কিসের এক আবেশে উঠে পড়লেন রাজকুমারী। যদি চোখাচোখি হয় সেই লজ্জায় ত্বরায় ছাদ ত্যাগ করলেন!

ব্রাহ্মণের হাতে নারায়ণ। নদীর তীরের কুড়িয়ে-পাওয়া এক কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রামশিলা। বৈশাখের খর তাপে আমোদরের স্নিগ্ধবারিতে স্নান হবে পাষাণ-মূর্ত্তির।

—কে ঐ ব্রাহ্মণ!

বিন্ধ্যবাসিনী ছাদ ত্যাগ করেন বটে, তবে তাঁর মনের আর চোখের উগ্র কৌতূহল মিটে না। আর একটি বার কি দেখা যায় না? মাত্র আর একবার?
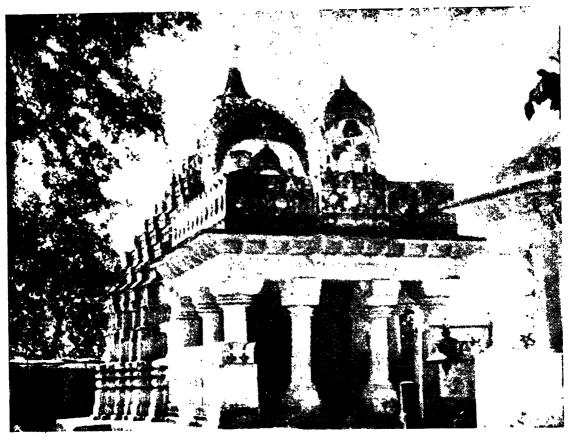
[ক্রমশঃ।

...নগরের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির, মহম্মদ ঘোরী লুণ্ঠিত —অজিত মিশ্র

সাঁচীস্তূপ

—আর, এন, ভট্টাচার্য্য

কাজের ফাঁকে

—কে, ডি, মুখোপাধ্যায়

দি-খুশী —মুহম্মদ গনি

বালি ব্রীজ থেকে দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দির —জয়দেব দত্ত
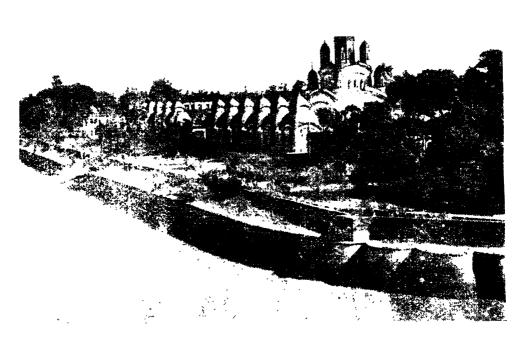
শ্রীযুক্তা ইলা পাল-চৌধুরী, এম, পি

সেবা—ভারতীয় নারীর যা সহজাত ধর্ম্ম, শ্রীযুক্তা ইলা পাল-চৌধুরী আবাল্য সেই ধর্ম্মেরই একজন শ্রেষ্ঠ পূজারিণী। আর্ত্ত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ, এরই ভেতর বহু দুর্য্যোগ মুহূর্ত্তে প্রকাশ পেয়েছে। অভিজাত পরিবারের মেয়ে ও বধূ হ'য়েও সাধারণের সেবায় তিনি যে ভাবে এগিয়ে এসেছেন, যতখানি প্রাণের মমত্ব দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছেন মানুষকে, এমনটি বড় দেখা যায় না।

শ্রীযুক্তা পাল-চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রথম মুহূর্ত্তেই তিনি যে কতখানি মানবদরদী, এটাই তাঁর ভাবে ও ভাষণে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। তিনি বললেন—আমি মানুষকে ভালবাসি ও ভালবাসতে চাই। মানুষ সে যে-কোন শ্রেণীরই হোক না কেন, আমার ভাল লাগে। চণ্ডীদাসের মহাবাণী—'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই' এ'র মূল্য আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি।

এই নিরহঙ্কার, সদালাপী ও স্নেহশীলা মহিলা জন্মগ্রহণ করেন ক'লকাতা মহানগরীর বুকে ১৯০৮ সালে। পিতা স্বগত বিজয়কৃষ্ণ বসু ছিলেন তৎকালে আলীপুর জু-'গার্ডেন' এর (চিড়িয়াখানা) সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। জোড়াসাঁকোর ঐ বসু-পরিবারটি বহুকাল পূর্ব্ব থেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠা নিয়ে চলছিল। শৈশব কাল কাটে শ্রীযুক্তা পাল-চৌধুরীর পিতার সান্নিধ্যে আলীপুর জু-গার্ডেনে। পিতার সঙ্গে সঙ্গে থেকে পশুপক্ষীকে ভালবাসবার মন তাঁর গড়ে উঠে এবং সে থেকেই পরে মানুষের প্রতিও তাঁর গভীর ভালবাসা উৎসারিত হয়।

ডায়মণ্ড হারবার রোডে সে কালে সেণ্টটিরিনা নামে একটি মিশনারী স্কুল ছিল। শ্রীযুক্তা পাল-চৌধুরী এখান থেকেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুধু স্কুলের পড়াই নয়, বাড়ীতেও ছিল তাঁর প্রচুর পড়াশুনোর তাগিদ। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ কালিদাস নাগ ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। বে'র পরেও তাঁর শিক্ষার আগ্রহ কিছু মাত্র দমিত হয়েছে দেখা যায়নি। পরন্তু স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যেয়ে তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং বিশেষ পারদর্শিতাও লাভ করেন এ দুটি ভাষায়। নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তিনি ভারতের সর্ব্বত্র এবং ইউরোপীয় দেশ সমূহে ব্যাপক পরিভ্রমণ করেন।

কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে শ্রীযুক্তা পাল-চৌধুরী বরাবরই নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক যখন এলো, তখন তাঁর তরুণ মনেও আন্দোলন দেখা দিল অনেকটা আপনা থেকেই। সে সময়ে তিনি মিশনারী স্কুলে প'ড়ছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যাপারে কতগুলো ধরা-বাঁধা নিয়ম মেনে চ'লতে হতো সেখানে। কিন্তু স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি সে সকল নিয়ম ভাঙ্গতেও ইতস্ততঃ করলেন না—জুতো ছেড়ে, বিলেতী পোষাক ছেড়ে তিনি ধরলেন খদ্দর, স্বদেশী শাড়ী পরা। খালি পায়ে নিতান্ত সাধারণ বেশে চললো তাঁর স্কুল যাতায়াত। মিশনারী কর্ত্তৃপক্ষ এ'তে যে আপত্তি তোলেননি তা নয়, কিন্তু তাঁদের বাধা-নিষেধ সবই ব্যর্থ হয়। গার্ল গাইডে কাজ ক'রবার সময়ও তিনি স্বদেশীর আকর্ষণে শাড়ী পরেই কাজ ক'রেছেন। তখনকার দিনে এটা বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে কম বীরত্বপণা ছিল না।

শ্রীযুক্তা পাল-চৌধুরীর বিবাহিত জীবনেও সমাজ ও স্বদেশসেবার সুযোগ হারান নি। বে'র পর রাণাঘাটের বিখ্যাত জমিদার

শ্রীযুক্তা ইলা পাল-চৌধুরী

পাল-চৌধুরী পরিবারে যখন তিনি গেলেন, দেখলেন সেখানেও জাতীয়তার ভাব পুরাদস্তুর বিদ্যমান। তাঁর পরমপূজ্য শ্বশুর বিপ্রদাস পাল-চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত স্বদেশী-ভাবাপন্ন। তাঁর স্বামী স্বর্গত অমিয় পাল-চৌধুরীও তাঁকে সমাজসেবা ও জাতীয়তার কাজে উৎসাহ দান করেছেন বরাবরই। গত মহাযুদ্ধের সময় কলকাতার উপর যখন বোমা বর্ষিত হয়, সে সময় খিদিরপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্তা পাল-চৌধুরী নিজের জীবন বিপন্ন করেও দুর্গত মানুষের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনগুলোতেও তাঁর দরদী মন চুপ করে থাকতে পারে নি। মৃত্যুমুখী, ক্ষুধার্ত অসহায় নর-নারীর ব্যাকুল ক্রন্দনে অস্থির হ'য়ে তিনি তাঁদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দেশের বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীযুক্তা পাল-চৌধুরী আজও পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট। নিখিল ভারত মহিলা-সম্মেলন, অল্প আলো নিকেতন, গার্ল গাইড, কংগ্রেস সেবাদল, নারীশিক্ষা-সমিতি, মহিলা-সমিতি। রেড ক্রস, বয়েজ স্কাউট, ডাক ও তার কর্ম্মচারী ইউনিয়ন (নবদ্বীপ) প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত তাঁর প্রত্যক্ষ ও নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। কংগ্রেসের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য এবং কংগ্রেসের মনোনয়ন নিয়েই তিনি ১৯৫৩ সালে নবদ্বীপ কেন্দ্র হ'তে বিপুল ভোটাধিক্যে পার্লামেণ্টের সদস্যা নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তাঁর সম্মুখে এখনও প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র রয়েছে। তাঁর জীবন সর্ব্বতোভাবে সফল ও সার্থক হবে, এ নিঃসন্দেহ।

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও স্বদেশসেবী]

সরকারী চাকরির মোহ যাঁকে আটকে রাখতে পারে নি—স্বদেশের আহ্বানে আই, সি, এস হ'তে যেয়েও যিনি আই, সি, এস পদের লোভ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং স্বদেশ-সেবাকেই যিনি করে নিলেন জীবনের আদর্শ মূল মন্ত্র, এমন এক জন মহাপ্রাণ ও কর্ম্মী লোক হলেন অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অগ্রগতি ও প্রতিষ্ঠার পথে কত ঝড়-ঝাপ্টা, বাধা-বিপত্তিই না তিনি পেয়েছেন কিন্তু সত্যিকারের প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতি যাঁর ভিতর রয়েছে তাঁকে আটকে রাখবে কে? ক্ষিতীশপ্রসাদের পথ আগলে রাখাও কা'রো সাধ্য হয়নি। আজ তিনি শিক্ষা ও দেশসেবার ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৮৯৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই বাসভবনে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন তাঁর মায়ের পিতামহ। স্বভাবতঃই জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তে এ ঐতিহাসিক

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গৃহ ও পরিবেশের প্রভাব তাঁর উপর পড়ে। তাঁর সমগ্র ছাত্র-জীবন সাফল্য ও গৌরবের একটি খণ্ড ইতিহাস। ১৯১৩ সালে মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজে আই, এস, সি পড়তে সুরু করেন। এ পরীক্ষাতেও তাঁর অপূর্ব্ব মেধাশক্তি ও কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় এবং তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান না থাকায় তিনি তার পর এসে ভর্ত্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এস, সি ক্লাসে। ১৯১৭ সালে বি, এস, সি পরীক্ষাতেও পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এম, এস, সি পড়ছেন, তাঁর পিতা আগ্রহ প্রকাশ করলেন তিনি আই, সি, এস হন। পিতার নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্র তিনি এম, এস, সি পরীক্ষা না দিয়াই রওনা হয়ে গেলেন বিলেতে। আই, সি, এস পরীক্ষার ফি-ও জমা দিবার জন্য উদ্যোগী হ'লেন। কিন্তু এ সময় মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এ দেশকে ছাপিয়ে সাগরের ওপারে যেয়েও ধাক্কা দেয়। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের স্বাদেশিক মন সহসা আন্দোলিত হয়ে উঠলো, আই, সি, এস পরীক্ষা দিয়ে বিদেশী সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী হওয়া তিনি সমীচীন মনে করলেন না। তার পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং সেখান থেকে সসম্মানে এম, এস, সি ডিগ্রিতে ভূষিত হন। নৃতত্ত্ব বিষয়ে তিনি যে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন, তাতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত হন এবং তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিতেও মনস্থ করেন কিন্তু এ ডক্টরেট পেতে হ'লে নিয়মানুযায়ী শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে ৩ বৎসর কেমব্রিজে থাকতে হয়। আর্থিক প্রশ্ন এ সময়ে তাঁর মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কেমব্রিজ কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি যে ডক্টরেটের উপযুক্ত তা জানিয়েও দিলেন। কোন দিক থেকেই যখন সহায়তা জুটলো না, তিনি বাধ্য হ'য়ে ফিরে এলেন স্বদেশে ১৯২৩ সালে তাঁর প্রাপ্য ডক্টরেট উপাধি না নিয়েই। আসবার পূর্ব্বে তিনি কিছু কালের জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের অধ্যাপকের কাজ করেন।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কর্ম্মজীবনও নানা দিক থেকে সাফল্যময়। বিলাত থেকে ফিরে তিনি প্রথমে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের লেকচারার পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। প্রায় এক বৎসর কাল এ ভাবে চললো, তার পর ডাক এলো তাঁর কাছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের। দেশবন্ধুরই অভিপ্রায় অনুসারে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসারের পদ গ্রহণ করলেন, সে ১৯২৪ সালের কথা। এডুকেশন অফিসার হিসেবে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন, তা মহানগরীর উন্নয়নের ইতিহাসে জলন্ত হয়ে আছে। তাঁর সময়েই এবং তাঁরই মহৎ প্রচেষ্টায় কলকাতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের এ দায়িত্বশীল পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত রয়েছেন এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা ও তথ্য আবিষ্কার করিয়া অর্জ্জন করেছেন দেশ-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জ্জাতিক নৃতত্ত্ব-সম্মেলন সমূহেও তিনি বহু বার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের অবদান সামান্য নয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর কলেজের বন্ধু। ওটেন সাহেবের যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিতাড়িত হন সে ঘটনার সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিক চিন্তা ও আলোচনায় তিনি ছিলেন সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী। বৃটিশ আমলের পুলিশের লাঠি ও কারাদণ্ড থেকে তিনিও রেহাই পান নি। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সহিত সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সালে ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে যে প্রাদেশিক ছাত্র-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালার কৃষিজীবী, শ্রমিক ও উপজাতি সম্পর্কে তদন্ত করে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। নৃতত্ত্ব বিষয়েও তাঁর বহু অমূল্য গ্রন্থাদি রয়েছে।

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ ১৯৫২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য আছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য, বিজ্ঞান-পরিষদের ফেলো এবং বিদ্যাসাগর কলেজের গভর্ণিংবডির একজন সভ্য। ১৯২৭ সালে কলকাতা পণ্ডিত-সমাজের পক্ষ থেকে তিনি সার্ব্বভৌম উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি এখনও বিপুল কর্ম্মক্ষম। দেশ ও জাতির তাঁর কাছ থেকে আরও বহু পাবার আছে—এ বিশ্বাস আমরা রাখবো।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

[বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত-শিক্ষাব্রতী]

ইনি এমন একজন লোক, যাঁর সমগ্র জীবনটাই সংস্কৃত-সাধনার এক বিরাট ইতিহাস! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী—সত্যিই পাণ্ডিত্যের সকল গুণই এঁর ভিতর পরিস্ফুট রয়েছে। আড়ম্বরে নির্লিপ্ত, প্রচারে বিমুখ—শুধু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, জ্ঞান সঞ্চয় ও জ্ঞান বিতরণ—জীবনব্যাপী এই চলেছে। ইনি নিজেই যেন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যাঁকে কেন্দ্র করে চলেছে সংস্কৃত শাস্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন চর্চ্চা।

সে আজ থেকে ৮০ বৎসর আগেকার কথা—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন বাঙ্গালার সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম জিলার পটীয়া থানার অন্তর্গত দ্বারকা গ্রামে। একটু বয়ঃক্রম হতেই তাঁর পড়া-শুনা আরম্ভ হয়। পড়া-শুনোর প্রথম অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি নিজেই বলছেন—সে যুগটা ছিল বিদ্যোৎসাহিতার যুগ। বিদ্যাচর্চ্চার জন্যেই ঘর ছাড়তে হয়েছে আমাকেও অল্প বয়সে। পিতৃদেব আমায় গাঁয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করেন প্রথমটায় কিন্তু কিছু দিন বাদেই তিনি (পিতৃদেব) ডেকে বললেন সস্নেহে, তুমি আর বাংলা পড়বে না, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের টোলে সংস্কৃত পড়তে যাও। এ থেকেই সুরু হয় আমার সংস্কৃতের চর্চ্চা। এর পর সুদীর্ঘ বহু বৎসর অতীত হয়ে গেল কিন্তু সংস্কৃত চর্চ্চা আজও থামেনি।

পিতৃ-নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শিরোধার্য্য ক'রে যুবক ঈশ্বরচন্দ্র সে দিন বেরিয়ে পড়েছিলেন ঘর থেকে সংস্কৃত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করবার, এ সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। যেখানেই যত দূরত্ব ও দুর্গম যাত্রাই হোক না কেন, পঠনের উত্তম সুযোগ সন্ধান পাওয়া মাত্র ছুটে গিয়েছেন তিনি। এ ভাবে ব্যাকরণ, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের পরীক্ষায় অপূর্ব্ব মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হন এবং বৃত্তি ও পুরস্কারাদি লাভ করেন। তাঁর পিতৃদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তাই তাঁরও এ শাস্ত্রে অধিকার থাকা উচিত, এ ভেবে নিয়েছিলেন তিনি গোড়া থেকেই। পরবর্ত্তী জীবনে সুযোগ এলো, তখন এ শাস্ত্র অধ্যয়নেও তিনি কিছু মাত্র পিছ-পা হ'লেন না। একটির পর একটিতে সাফল্য অর্জ্জন করে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে নতুন কিছু শিখবার জন্য প্রতি বারই ছিল তাঁর প্রস্তুতি। দেখতে দেখতে এ জ্ঞানসাধক সাঙ্খ্যরত্ন, সাঙ্খ্যসাগর, বেদান্ততীর্থ, ন্যায়তীর্থ, দর্শনতীর্থ, সাঙ্খ্যতীর্থ এ সকল উপাধিতে বিভূষিত হ'য়ে সুধী ও বিদ্বজ্জন সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করলেন।

ষড়্‌দর্শন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার মর্য্যাদার স্বরূপে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শুধু দর্শনতীর্থ উপাধিই পেলেন না—তাঁকে শাস্ত্রী উপাধিতেও ভূষিত করা হ'লো। তাঁকে শাস্ত্রী উপাধি দেওয়ার ব্যাপারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আট জন প্রখ্যাত মহামহোপাধ্যায়—যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অগ্রণী হন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরও তাঁকে এই উপাধি

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

দানে আন্তরিক অনুমোদন ছিল। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল যাবৎ পণ্ডিত শাস্ত্রী ভারতের প্রধান প্রধান সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরীক্ষক, প্রশ্নকর্ত্তা কিম্বা অন্য কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা প্রচারের দুরন্ত প্রেরণায় তিনি নিজেই দর্শন-বিদ্যালয় নামে একটি অবৈতনিক সংস্কৃত টোল বা চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি নিয়মিত ভাবে ও একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানলিপ্সু ছাত্র ও ছাত্রীদের ব্যাকরণ, কাব্য, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, মীমাংসা, জ্যোতিষ, উপনিষদ, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের আর একটি বিরাট অবদান তাঁর গ্রন্থ রচনা। সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন দিকে তিনি যে কত মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ রচনা জাতির জন্যে এরই ভেতর প্রণয়ন করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও তাঁর মৌলিক প্রবন্ধাদিতে সমৃদ্ধ হ'য়ে আসছে। অশীতি বর্ষ অতিক্রম করলেও এ জ্ঞানতপস্বী সংস্কৃত সাধনায় একই ভাবে নিমগ্ন। এ শাস্ত্রটি যেন তাঁর প্রাণ-বায়ু, জীবনের একমাত্র আরাধ্য সামগ্রী। এ জন্য দেশে ও দেশের বাহিরে সংস্কৃত চর্চ্চা ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রসারের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ গুলোর সঙ্গে বরাবর তাঁর নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান। তিনি নিখিল ভারত পণ্ডিত মহামণ্ডলম্ ও নিখিল ভারত চতুষ্পাঠী-পরিষদের অবৈতনিক সম্পাদক। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে বহু কাল ধরে। এ প্রতিষ্ঠানের কাজকে তিনি জীবনের পবিত্র ব্রত ব'লে মেনে নিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর যে স্বাক্ষর তা নিশ্চয়ই অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ডাঃ এম, এন, বসু

[আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ]

তখন তাঁর যুবা বয়স কিন্তু সঙ্কল্প দুর্ব্বার। পরিবারে আর সব রয়েছে ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, উকিল, তিনি স্থির করে নিলেন এক জন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্ হবেন। শুধু স্থির করা নয়, এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাগর-পারে পাড়িও দিয়েছিলেন সেই বয়সেই তিনি বাড়ীর বা আত্মীয়-স্বজন কাউকে একরূপ না জানিয়ে। অচিরেই তাঁর সঙ্কল্পে ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটলো। ফিরে এলেন তিনি যশস্বী হয়ে—চিকিৎসা-শাস্ত্রের তখনকার দিনের দুর্লভ এম, বি, সি, এম ডিগ্রি নিয়ে।

সে দিনের এই প্রতিশ্রুতিশীল ও কৃতী যুবক আর কেউ নয়, কলিকাতার আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ এম, এন, বসু (ডাঃ মণীন্দ্র নাথ বসু)। ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নড়াইলে। তাঁর পিতা উপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন তখনকার দিনের এক জন সাব-জজ এবং তাঁর মাতা ছিলেন নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার রতন রায়ের পৌত্রী। নড়াইলের বাংলা স্কুলে তিনি প্রথম পড়তে আরম্ভ করেন। সেখান থেকে এসে ভর্ত্তি হলেন তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর স্কুলে। এ সময়ে বিদ্যাসাগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় ভক্ত শ্রীম (নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)। এ স্কুল থেকে তিনি ভর্ত্তি হলেন গিয়ে কলকাতারই হেয়ার স্কুলে এবং সেখান থেকেই ১৮৯০ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সসম্মানে। এর পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছেন তখনই চিকিৎসাবিদ্ হ'বার জন্য তাঁর মনে প্রচণ্ড তাগিদ আসে। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পড়া ছেড়ে দিয়ে সরাসরি ভর্ত্তি হ'লেন কল্‌কাতা মেডিকেল কলেজে ১৮৯৪ সালে।

ডাঃ এম, এন বসু

ডাঃ বসু মাত্র দু'বছর অধ্যয়ন করলেন মেডিকেল কলেজে। কিন্তু এরই মাঝে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য বিলাত যাবেন বলে তিনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। তাই এখানে ডিগ্রি না নিয়েই এবং আপন-জন কাউকে প্রায় না জানিয়েই জাহাজে চড়ে বসলেন একদিন, গিয়ে উপস্থিত হ'লেন ইংলণ্ডে এবং ভর্ত্তি হলেন এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। ১৯০১ সালে এ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম, বি, সি, এম ডিগ্রী লাভ ক'রলেন। তার পরও দুই বৎসর তিনি লণ্ডনে অবস্থান করেন এবং "রয়েল কর্ণওয়েল ইনকার মারি" ও "অপথেলমিক হস্‌পিটালে" রেসিডেণ্ট সার্জ্জন হিসেবে নিজকে নিযুক্ত রাখেন।

বিদেশ থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান আহরণ করে ডাঃ বসু ফিরে আসেন স্বদেশে ১৯০৩ সালে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়লো তাঁর আর, জি, কর মেডিকেল কলেজে (তৎকালীন ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল)। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্বর্গত ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের (আর, জি, কর) অনুরোধ ও আগ্রহে "এনাটমিক" অধ্যাপকের দায়িত্ব ভার তিনি

গ্রহণ করলেন। নিজের অসাধারণ যোগ্যতার বলে তিনি পরে এ কলেজের অধ্যক্ষ-পদ অলংকৃত করেন। এবং ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত দায়িত্বশীল পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে।

ডাঃ বসুর যে সময়ে ছাত্রজীবন, তখন তাঁর এমন অনেক সহপাঠী ছিলেন যাঁরা পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, চারুচন্দ্র দত্ত, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ। ডাঃ দ্বারিকনাথ মিত্র, সার প্রভাস মিত্র, সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র,—এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর সতীর্থ ও বন্ধু। শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক, দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল, "সন্ধ্যা"সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গেও তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও কংগ্রেসের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা বরাবরই। কংগ্রেসের প্রথম যুগে তাঁদের বাড়ীটি ছিল কংগ্রেস সংগঠনের একটি প্রধান কেন্দ্র। মহাত্মা গান্ধী, গোখলে, মিসেস এ্যানি বেশান্ত প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এ বসু-পরিবারের অতিথি হ'য়েছেন কল্‌কাতায়।

শ্রীবসু তাঁর কর্ম্মদীপ্ত সাফল্যময় জীবনে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব মেডিসিনের ডীন এবং ফেলো পদে বহু দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটির সহ-সভাপতি, নার্সিং কাউন্সিলের সদস্য, আর, জি, মেডিকেল কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টি প্রভৃতি নানা দায়িত্ব-বহুল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা আছেন। খেলা-ধূলা সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট আগ্রহশীল। ১৮৮৯ সালে তাঁদের গৃহেই মোহন বাগান ক্লাবের পত্তন হয়। তিনি নিজেও একজন এ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা—সদস্য এবং বর্ত্তমানে ইহার সভাপতি। চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি বহু মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এখন তাঁর অবসর জীবন সত্য এবং বয়সেও প্রবীণ, অথচ দেশের মঙ্গলের জন্ত তাঁর প্রাণে প্রবল আগ্রহ রয়েছে, এটাই লক্ষ্যণীয়।

সূর্য-প্রার্থনা

চিত্ত সিংহ

পল্লব-মুখর ডালে, তৃণাঙ্কুর-মুখরিত মাঠে
বর্ণ-দীপ্ত আলোকের লক্ষ শিখা দু' হাতে ছড়ায়ে
সে প্রত্যহ চলে, নীলিম-আকাশ-সীমা ছুঁয়ে।
সম্মুখে উদার মাঠে, তার প্রসারিত মহাবাহু,
প্রাণের নিবিড় গানে, মাটির গভীরে দেয় নাড়া ;
চঞ্চল-ধমনী বুকে দ্রুত আনে রক্তের জোয়ার
আবেগে মুখর করে তোলে।
জানি না কি জানে সে—
কি করে যে ছুটে যায়, ক্লান্তিহীন চলায় চলায়
উদার দৃষ্টির সুরে, দিক দিক মুখরিত করে
উজ্জ্বল দিগন্ত হতে, অনুজ্জ্বল-অস্তাচল-পথে।
অবাক-বিস্ময়ে দেখি, প্রত্যহের তার পরিক্রমা,
তবুও বুঝি না আমি, কি করে সে আসে এক পথে
প্রতিটি প্রত্যহ ; উদয়-দিগন্তে আলো ফেলে।
আশ্চর্য আবেগে সে, অসম্ভব করে সম্ভব,
এক রূপে রোজ এসে, নানা রূপে মুগ্ধ করে মন,
কি করে এ-সব করে সে ?
কত দিন আমিও করেছি চেষ্টা, তার মতো—
এক সাজে সেজে ; চেয়েছি লাগাতে রঙ ; অন্য মনে;
অন্য বহু মনে। বার বার ব্যর্থতার গ্লানি,
পরাজয় লিখা, লিখে দিয়ে গেছে।
তাই তো এখন বসে ভাবি, কি করে সে একরূপী ;
বহুরূপী সাজে ? কি করে সে এক আলো-রঙে—
মুখরিত করে দেয় মন ?
কি করে জানি না সে,
কি করে সে, রাঙায় এমন ?

শরৎ-স্মৃতির টুকি-টাকি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস-গুপ্ত এক জন প্রবীণ এবং পণ্ডিত লোক। তিনি আইন ব্যবসায়ী। কংগ্রেসের এক জন খাঁটি কর্মী হিসেবে তিনি দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ লেক্‌চারার'। তিনি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা এক বছরের ছোট; এখন তাঁর বয়স ৭৬ বছর। কিন্তু এই বয়সেও তাঁর কর্মশক্তি অটুট রয়েচে। বছর দুই তিন আগে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বোধ হয় তিনি কিছু লিখছিলেন। ঐ সময় তিনি 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক ছিলেন। শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঐ সময় দেবানন্দপুরে যে উৎসব-সভা হোয়েছিল, তাতে তিনি সভাপতি ছিলেন। ঐ সময় আমার কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা তিনি জানতে চেয়েছিলেন। আমার মনে হয়, আমি সে বিষয়ে সাধ্য মত কিছু কিছু তাঁকে বোলেছিলাম। দেবানন্দপুরের সভায় সভাপতিত্ব কোরে এসে তিনি আমায় বললেন—"শরৎচন্দ্রের সত্যিকার জন্মদিন-সভা দেবানন্দপুরেই হয় এবং যা দেখে এলুম, তাতে বুঝলুম, ওখানেই হওয়া উচিত। কোলকাতায় যে-সব সভা হয়, তাতে প্রাণ থাকে না, তাকে 'বিলাস' বলা যেতে পারে। দেবানন্দপুরে তাঁর জন্মদিন উৎসবের ভেতর থাকে—সত্যিকার প্রীতি এবং প্রাণ।" সম্প্রতি দু'-দশ দিন আগেও, হেমেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হোল। সেদিনও অনেক লোকের সাক্ষাতে ঐ কথারই তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন।

লোক হিসেবে, হেমেন্দ্র বাবু অতি অমায়িক লোক। তিনি এক জন বড় ভক্ত। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম। শরৎচন্দ্রও হেমেন্দ্র বাবুর মিষ্ট ব্যবহারের জন্যে তাঁকে ভালবাসতেন। হেমেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলতেন। কবে—মেদনিপুর না কোথায়, কংগ্রেসের কাজে হেমেন্দ্র বাবু গিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্রও গিয়েছিলেন। সেখানে হেমেন্দ্র বাবুর খাবার প্রসঙ্গে বললেন—"অত বয়সেও উনি ঘন-ঘন খেতে পারতেন এবং খেয়ে হজমও করতে পারতেন। থিয়েটার, নাটক, অভিনয়াদির দিকে হেমেন বাবুর ঝোঁক আমাদেরই মত এবং এই বয়সেও"—ইত্যাদি। —যাক্। হেমেন্দ্র বাবু আমাকে দেখলেই 'ছোট শরৎ বাবু' বোলে বরাবরই সম্বোধন কোরে থাকেন। অবশ্য আরও কেউ-কেউ আমাকে ঐ কথা বলেই সম্বোধন করতেন। বসুমতী অফিসের 'ডাক্তার বাবু' নামে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিও আমাকে 'ছোট শরৎচন্দ্র' বলতেন। এতে কিন্তু আমি মনে-মনে খুবই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হতুম। এটা আমার মোটেই ভাল লাগতো না। হয়ত কোন দিন সকালের দিকে হেমেন্দ্র বাবুর বাসায় গিয়েছি; বৈঠকখানায় অনেক ভদ্রলোক বসে আছেন: আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে 'ছোট শরৎ বাবু' বোলে অভ্যর্থনা করলেন এবং উপস্থিত ভদ্র লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন—"আপনারা সকলে বলুন ত, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ওঁর চেহারার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে কি না?" সকলেই তাঁর কথা সমর্থন করতেন। এতে কিন্তু একটা অস্বস্তি আমার মনের একাংশে এসে আঘাত করতো। আঘাতের কারণটা এই যে, এক শ্রেণীর কিছু লোক আছেন, যাঁরা বলবেন—"ওঃ! বাহাদুরী নিচ্চেন! চেহারাতে শরৎচন্দ্রের মত দেখতে নিজেকে, এই কথা বোলে এবং সকলকে তা শুনিয়ে বড়াই করা হচ্চে।" কিন্তু দোহাই তাঁদের, বাহাদুরী নেবার বা বড়াই করবার বিন্দুমাত্র মতলব আমার নেই—বিশেষতঃ এই বয়সে। তা'ছাড়া, লোকের বলা না-বলার ওপর আমার ত কোন হাত নেই। হেমেন্দ্র বাবু বা অন্য সকলে দূরের কথা, শরৎচন্দ্র নিজেও যে তাই বলতেন। তিনি আবার শুধু চেহারার সৌসাদৃশ্য নয়, আরো অনেক কিছু বলতেন। সে গুলোকে অস্বীকার করাও যায় না। শরৎচন্দ্রের গ্রাম দেবানন্দপুরে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কেটেছে, রামেশ্বরপুরে। হুগলী জেলার এই গ্রাম দু'টি একই অঞ্চলে অবস্থিত। সুতরাং দু'জনের ভেতর সমান পল্লী-প্রীতি। তাঁর শেষ বয়সের কয়েকটা দিন বাদ দিলে, দু'জনেই চিরকাল দরিদ্র। দু'জনেই কখনো অর্থাদির কোন মূল্য দিইনি, দিয়েছি মনুষ্যত্বের। হাতে যখন পয়সা পেতুম, এলোপাতাড়ি তা খরচ করে ফেলতুম, যখন পেতুম না, তখন হাত গুটিয়ে নুলো জগন্নাথের মত বোসে থাকতুম। তার পর, দুজনেরই স্বভাব—ধনবানের কাছ থেকে দূরে বসে থাকা। কোন কিছু কাজ নেবার জন্য ধনীদের তোষামোদ করা, দু জনেরই স্বভাব-বিরুদ্ধ। চাষা-ভূষো, মুটে-মজুর, অর্থাৎ যাদের লোকে ছোট লোক বলে ঘৃণা করে, তাদেরই সঙ্গে মিশতে, কথা কইতে, গল্প করতে দু'জনেই ভালবাসতুম। চীনা বাদাম ভাজা কিম্বা অন্য কিছু প্রকাশ্য রাস্তার ধারের গাছতলায় বোসে খেতে কেউই দ্বিধাবোধ করতুম না। শেষের দিকটায় শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে একটু সজাগ হোয়েছিলেন; সেটা সহরে এসে বাস করার ফলে বোধ হয়। কিন্তু তবুও, সহরের নকল উদ্ধতা, সুখ ও বিলাস আমাদের দু'জনকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। দু'জনেই সেকালের পল্লী আবহাওয়ার মানুষ, সুতরাং পল্লীর ভাবেই অনুপ্রাণিত। দু'জনেই এক কালে গান-বাজনা, থিয়েটার আড্ডা-আসর নিয়ে কাটিয়েছি। দু'জনেরই জীবনে বহু বিষয়ে বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা। দু'জনেরই সৌন্দর্যজ্ঞান এবং সৌন্দর্যপ্রীতি অসীম। রুচি দু'জনেরই এক রকমের। সুতরাং শরৎচন্দ্র নিজেও, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্যের কথা বলতেন, তা'ও ত ঠেলে রাখতে পারি না। আমার মনে হয়, উপরোক্ত কারণগুলার জন্যই তিনি আমাকে একটু পছন্দ করতেন ও ভালবাসতেন। এর সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, ঐ কারণেই তিনি তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে প্রকাশ্য সভা আহ্বান কোরে আমাকে নিজ হাতে ধান দূর্বা মাঙ্গলিক দিয়ে অভিনন্দিত করে যান। আমি এর কিছুই আগে জানতে পারিনি। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মশায় একদিন হঠাৎ এই খবরটা আমাকে শোনালেন। আমি আশ্চর্য হোয়ে ভাবতে লাগলুম—'আমাকে শরৎচন্দ্র এর বিন্দুমাত্র না জানিয়ে....' যাই হোক, কবিশেখরকে জিজ্ঞাসা করলুম—"এত উপযুক্ত লোক থাকতে আমাকে কেন?" তিনি বললেন, "যে কারণেই

হোক তিনি আপনাকে খুব পছন্দ করেন, তাই এই আয়োজন করচেন।" যাক; অভিনন্দনের কথা আমি পরে যথাস্থানে বলবো। এখন আর একটা কথা বলি।

কথাটা এই যে, 'শরৎ-স্মৃতির টুকি-টাকি' যা আজ এই টালীগঞ্জ-সাপুরে বসে লিখচি, যদি 'শরৎচন্দ্র' আর কিছু দিন বেঁচে থাকতেন, তাহোলে এ লেখা লিখতুম দেবানন্দপুরে বোসে। এবং সেখান থেকেই এটা মাসে মাসে 'বসুমতী-সম্পাদকে'র কাছে পাঠাতে হোত। কারণ—আমরা উভয়ে বাকী জীবনটা দেবানন্দপুরে বাস করবো, তার ব্যবস্থা তিনি মনে মনে সব ঠিক কোরে ফেলেছিলেন। এমন 'প্ল্যানে' সেখানে বাড়ী করা হবে, যার এক অংশে তিনি থাকবেন, অপরাংশে থাকবো আমি। দুই অংশের মধ্যস্থলে থাকবে বৈঠকখানা। দু'জনে চা খাব, তামাক খাব আর গল্প-গুজবে দিন কাটাবো। গ্রামের যুবকদের নিয়ে লাইব্রেরী খোলা হবে, ক্লাব বসানো যাবে। সকলকে নিয়ে হরিসভার সৃষ্টি করা হবে; তাতে কীর্তন গান হবে,।—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর পৈতৃক পুরানো বাড়ীর কাছেই নতুন জমি খরিদ কোরে এই বাড়ী করা হবে, কারণ তাঁর পৈতৃক বাটীতে 'চক্কোত্তি মশাই' না কি নামে এক ভদ্রলোক বহু কাল থেকে বাস কোরে আছেন, তিনি শরৎচন্দ্রকে কোন সময় দেখলেই মনে মনে ভীত হোয়ে পড়তেন, পাছে শরৎচন্দ্র তাঁর পৈতৃক বাটী পুনরধিকার করে বসেন। কিন্তু 'শরৎচন্দ্র' তাঁকে অভয় দিতেন—'যদি কখনো এখানে এসে বাস করি, ত নতুন বাড়ী তৈরী কোরে বাস করবো; আপনার কোনও ভয় নেই।' বোধ হয় 'শ্রীকান্তের' কোন এক স্থানে এ-কথাটার উল্লেখ আছে। এ কথাটা শরৎচন্দ্র আলাদা ভাবে আমায় বোলেছিলেন, কিংবা 'শ্রীকান্তে' যা পোড়েছিলুম, সেইটাই মনের মধ্যে জেগে আছে, তা ঠিক বলতে পারি না।

তিনি বেঁচে থাকলে, দেবানন্দপুরে থাকা ঠিকই হোত এবং ভালো ভাবেই হোত, কিন্তু আমাদের জীবনের ধারা, তার পুরানো খাতে বোধ হয় বোয়ে যেত না। যে খাতে তাঁর কর্মগুরু রাজেন মজুমদারের (ইন্দ্রনাথ) ধারা বোয়েচে, যে খাতে তাঁর এক সহোদরের ধারা বোয়েচে; ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা যে ধারা আমাদের দু'জনের অন্তরে গোপনে প্রবাহিত ছিল, সেই খাতে আমাদের জীবনের ধারা প্রবাহিত হোত বলে মনে হয়। মনে হয় কেন, নিশ্চয়ই হোত। দেবানন্দপুরের সে-বাড়ী সন্ন্যাসীর আশ্রমে পরিণত হোত।

একটা কথা তিনি আমাকে বরাবর খুব জোর দিয়ে বোলেছেন। 'জোর দিয়ে' কথাটা এই জন্যে বললুম যে, অনেক সময় অনেক কথা তিনি হাল্‌কা ভাবে বলতেন, সে সবের ভেতর তেমন গুরুত্ব থাকতো না। সে গুলো—যাকে বলে—ফাঁকা কথা। আর কতকগুলো কথা বলতেন, যার ভেতর থাকতো সত্যকার নিষ্ঠা আর গভীরতা। তাঁর কথায় এই তারতম্য বুঝতে আমি অভ্যস্থ হোয়ে গিছলুম। তিনি আমাকে বলতেন—"যে কাগজে লিখবে, বরাবর সেইখানাই ধরে থাকবে। একবার এ-কাগজ, ও-কাগজ—এরকম কোরো না।" তাই, তিনি যেমন বরাবর—'ভারতবর্ষে'ই লিখে এসেছেন, আমিও তেমনি 'মাসিক বসুমতী'তে লিখে এসেছি। তবে ফাঁকে-ফোঁকে অন্য কাগজে তিনি যেমন লিখেছেন, আমিও তেমনি লিখেছি। কোন দৈনিক কাগজে তিনি নিজেও কখনো লেখেন নি, আমাকেও কখনো লিখতে' দেননি। তার ফলে, সেই কাগজের দিক থেকে একটা বড় রকমের আঘাত এক সময়ে আমার ওপর এসে পড়েছে। যাক—সে সব কথা। যদি আবশ্যক বুঝি, পরে বলবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে 'অনারারি ডক্টরেট,' উপাধি দেবার অভিপ্রায়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এলে, তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তির জন্যে, আমরা 'রসচক্রে'র এক স্বতন্ত্র বৈঠক বসিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করি। 'রসচক্রের' এই বৈঠক বসে—বনহুগলীতে—শিল্পী-অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী মশায়ের বাগান-বাড়ীতে। সে দিনের সেই বৈঠকে বহু সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীর সমাবেশ হোয়েছিল। সকলের ফটোও তোলা হোয়েছিল। শরৎচন্দ্র ও আমি তাতে পাশা-পাশি বোসেছিলাম। আমার কিন্তু ঠিক মনে নেই যে আমরা দু'জন পাশা-পাশি বোসেছিলুম। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মশায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাধেশ রায় সেদিন আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর মুখেই আমি শুনলুম—"শরৎচন্দ্র ও আপনি পাশা-পাশি বসেছিলেন।" অবশ্য আমার কাছেও ঐ ফটো একখানা থাকবার কথা, কিন্তু নেই। আমার নিজেরই ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ফটো বোধ হয় দু-শো-খানা ছিল। আরো অনেক কিছুই ছিল। হঠাৎ একদিন এই বিশাল ধরণীর রাজাধিরাজ অপূর্ব করুণায় সামনে এসে দাঁড়ালেন; তখন ওই সবের পুঁটলি ফেলে রেখে তাঁর পায়ের কাছে ছুটে এসে দাঁড়ালুম। সারা জীবনের লোকসানী খাতা-লেখার ঐখানেই কষি টেনে দিলুম। যাক,—যা বলছিলুম; রাধেশ বললেন—"আমার কাছে যে ফটোটা আছে, ওর একটা কপি আপনাকে দিয়ে যাব।" যদি তিনি দিয়ে যান ত 'টুকি-টাকি'র কোন একটা পাতায় সেই 'কাপি'র 'কাপি' আমিও দিতে পারবো।

সেদিনকার অভিনন্দন-সভায়, শরৎচন্দ্র আসবার অনেক আগেই আমরা অনেকেই গিয়ে পড়েছিলুম। দোতালায় একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরের মধ্যে একঘর লোক নানারকম আলাপ-আলোচনা করচেন; আমি চুপ করে একটি ধারে বসে আছি। কোন সভা-সমিতি-বৈঠকে গিয়ে একটি ধারে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। এর কারণ, আমার মূর্খতা এবং জ্ঞান-বিদ্যাহীনতা। সাহিত্য, কবিত্ব প্রভৃতিতে আমি যে একেবারেই আনাড়ী, এটা সকলে বুঝে নিয়েছিলেন। সুতরাং যোগ্য নই বোলে, যোগ দিতে না পাবায় আমি একটি ধারে নীরবে বোসে থাকবার অধিকার পেতুম। যাই হোক, কিছু পরেই শরৎচন্দ্র এলেন। কিছু সময় উপস্থিত কারো-কারো সঙ্গে কিছু কথা ক'য়ে, আমার দিকে চেয়ে ইসারা করলেন। আমি উঠে নীচে নেমে এলুম; পেছন-পেছন তিনিও এলেন এবং বাগানের মধ্যে, এ-পথ সে-পথ ঘুরে, এক নির্জন পুষ্করিণীর পাড়ে ঘাসের ওপর দু'জনে বসলুম। দু'-পাঁচটা এ-কথা সে-কথার পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু কথা হোল। ভাল কথাই হোল। যদিও 'সাহিত্যে দুর্নীতি'র সূত্রে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা তিক্ততার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওপর আমাদের দু'জনার শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা ছিল অসীম। কবির জন্যে আমাদের বুক গর্বে ভরা ছিল। সৎ-মা, সতীন-পো, বৈমাত্র ভাই—এ সব নিয়েও কিছু কথা ঐ দিন তাঁর সঙ্গে ঐ পুকুরপাড়ে বসে হোয়েছিলো। আমি

বলেছিলাম যে, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মধ্যে বরং প্রীতি ভালবাসার ভাব কোথাও কোথাও দেখা যায়, কিন্তু সৎমা-সতীনপোর সম্পর্কটা একেবারেই তিক্ত আর বিষাক্ত। সেই রামায়ণের যুগ থেকে এ জিনিসটা সমানে চলে আসচে। শরৎচন্দ্র বললেন—"ও জিনিসটা যাতে আর না চলে, তার চেষ্টা করতে হবে ত?"

"এই বিষাক্ত ভাবটা যে সৎ-মাদের রক্ত-মাংসে মিশে গেছে। দু'-একটা গল্প-উপন্যাস পড়িয়ে, তাঁদের মন থেকে এ বিষ উঠিয়ে ফেলতে পারা যায়? বৃথা চেষ্টা।" 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর কথা পাড়লুম; বললুম—"গোকুলের সৎ-ভাইয়ের ওপর ঐ রকম সাংঘাতিক প্রীতি-ভালবাসা—এটা না হয় চলতে পারে; কারণ মনস্তত্ত্বের অন্ত একটা দিক্ দিয়ে দেখলে, 'গোকুল' ঠিকই সৃষ্ট হয়েচে। তা ছাড়া, পুরুষের মন সাধারণতঃ খুব বেশী সঙ্কীর্ণ হয় না। কিন্তু 'ভবানী' কি আমাদের সমাজে মেলে? অবশ্য মিললে ভালই হোত; কিন্তু সংসার আমাদের এখনো স্বর্গ হোয়ে ত ওঠে নি দাদা!"

শরৎচন্দ্র মনে মনে বুঝলেন, সে জন্যে কোন জবাব না দিয়ে চুপ কোরেই রইলেন।

এদিকে, আমরা দু'জনে কোথায় গেলুম, কোথায় গিয়ে বসলুম বা কি করচি দেখবার জন্যে, দু'-পাঁচ জন নীচে নেমে এসে আমাদের খোঁজ করতে লাগলেন এবং দূর থেকে আমাদের দু'জনকে পুকুর-পাড়ে বসে থাকতে দেখে আবার চলে গেলেন। ঘণ্টা খানেক পরে আমরা আবার ওপরের সেই ঘরে এসে বসলুম। আমার বোধ হয়, সেদিনকার সেই বৈঠকে, শরৎচন্দ্র, এক জায়গায় বন্দুক দিয়ে সাপ-মারার একটা গল্প বেশ জমিয়েছিলেন। গল্পটা এই রকম:—

'শরৎচন্দ্র তখন গ্রামে থাকেন; সম্ভবতঃ সামতাবেড়ে। একদিন বিকালের দিকে শুনলেন, পাড়ার একজনদের শোবার ঘরের মধ্যে বিরাট এক গোখরো সাপ আড্ডা নিয়েচে, কিছুতেই বেরুচ্চে না। সুতরাং কেউ আর ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারচে না। অনেক লোক জড় হোয়েচে, কিন্তু কেউ-ই কোন উপায় করতে পারচে না। এদিকে অপরাহ্ন ক্রমেই সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে আসতে লাগলো। আর খানিক পরেই অন্ধকার হোয়ে আসবে। তখন আর সে ঘরে কেউ ঢুকতে পাবে না। অথচ ঐ একখানি মাত্র তাঁদের শোবার ঘর। মহা মুস্কিল! কি উপায় হয়! দুর্ভাবনা আর আতঙ্কে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এমন সময়, খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্দুকটা হাতে নিয়ে সেখানে এলেন। সকলকে তিনি খুব সাহস দিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'-চার জনকে নিয়ে, তিনি খুব সাবধানে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন, সর্প মহারাজ কড়িকাঠের একটা ফাঁকে আশ্রয় নিয়েচেন। সকলের পায়ের শব্দে ও গোলমালে সে স্থান ত্যাগ কোরে, দেওয়াল বেয়ে নীচের দিকে আসতে লাগলো। বহু কালের পুরানো ঘর। তার ওপর, বালি ধরানো নয়; তার ফলে, দেওয়ালের গায়ে অনেক জায়গায় ফাঁক আর ফাটল। সাপটা দেওয়াল বেয়ে এদিক-ওদিক করতে লাগলো। শেষ কালে সুড়-সুড় কোরে একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ইয়া লম্বা সাপ! কুলোর মত চক্কোর! ভয়ে ত সব আড়ষ্ট! দেয়ালের গর্তটার মধ্যে সাপটার ঢোকাতে, সকলের ভয় আর ভাবনা আরও বেড়ে গেল। গর্ত থেকে মহারাজ না বেরোলে, কার সাধ্য রাত্রে ও-ঘরে কেউ ঢোকে বা শোয়! তিনি কিন্তু দিব্যি সেই ফাটলের ভেতর ঢুকেই রইলেন। বাইরে থেকে কতই খোঁচা-খুঁচি করা হোল, কিন্তু সাপের কোন সাড়া-শব্দই আর পাওয়া গেল না। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসচে। সকলে মহা চিন্তায় ও সমস্যায় পড়লো। তখন শরৎচন্দ্র বন্দুকে টোটা পুরে, সেই ফাটলের মুখে, বন্দুকের নলের মুখটা রেখে—দিলেন ঘোড়া টিপে—দুড়ুম্! সঙ্গে-সঙ্গেই ঝলকে-ঝলকে তাজা রক্ত ফাটলের মুখে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখন বাইরের যত লোক সব ভীড় কোরে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার পর······তার পর আর কি: সেই মরা-সাপকে তখন খুঁচিয়ে টেনে বার করা হোল—ইয়া প্রকাণ্ড এক গোখরো!'

সেদিন সেখানে বোসে এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিনি। দু'-এক দিন পরে শরৎচন্দ্রকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলুম—"গল্পটা কি সত্যি?"

"তোমার কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয়—মিথ্যে।"

একটু হাসির সঙ্গে ইসারায় তিনি জানালেন যে, তাই······ অর্থাৎ মিথ্যে। এই সূত্রে তিনি বললেন—"স্থান ও সময় বিশেষে একটু-আধটু মিথ্যে বলতে হয়; তাতে কোন দোষ হয় না। কারো না তিল মাত্র ক্ষতি হয়, অথচ একটুখানি সকলে আনন্দ পাওয়া যায়, তেমন একটু-আধটু মিথ্যা বলতে কোন পাপ নেই। তবে, গল্পটা একেবারে মিথ্যে নয়, একটু সত্যি আছে; সাপটা সত্যি, আর তাকে মেরে ফেলাটাও সত্যি; তবে—বন্দুক আর গোখরো—এ দুটো মিথ্যে। সেটা ছিল মস্ত বড় একটা 'ঢ্যামনা' সাপ।"

আমি যতদূর জানি, কোন গুরু বিষয়ে শরৎচন্দ্র কখনো মিথ্যা বলবেন না। যাতে অপরের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হোতে পারে, তেমন মিথ্যা তিনি কখনই বলতেন না। সত্যও যেখানে অপ্রীতিকর হয়, সেখানে তিনি কিছুই না বোলে চুপ কোরে থাকতেন। এ অভ্যাসটা ছিল আমাদের দু'জনের মধ্যেই। আগেই বোলেচি, শরৎচন্দ্রে ও আমাতে অনেক বিষয়ে মিল ছিল, কিন্তু দুটো বড় বিষয়ে ঘোর অমিল ছিল। একটা হোচ্চে—সাহিত্যে তিনি যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি আমি ছিলুম একেবারে গণ্ডমূর্খ, আনাড়ী। আর দুই হোচ্চে,—তাঁর মন ছিল অত্যন্ত উদার, আর আমার—ঠিক বিপরীত, যে 'শনিবারের চিঠি' তাঁকে সুবিধে পেলে আক্রমণ করতে ছাড়তো না, সেই 'শনিবারের চিঠি'র তিনি প্রশংসাই করতেন; বলতেন—"সমালোচনা-সাহিত্যের এই রকমই একখানা কাগজের দরকার ছিল।" মুখে তিনি যাই বলুন না কেন, আসলে 'শনিবারের চিঠি'কে তিনি ভালবাসতেন। গোড়ার দিকে, 'শনিবারের চিঠি'র প্রশংসা কোরে এবং সে জন্যে সজনী বাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আমিও কয়েকখানা চিঠিও দিয়েছিলুম। সজনী বাবুও খুব খুসী হোয়ে তার জবাব দিয়েছিলেন। সজনী বাবু তখন থেকেই বরাবর আমাকে ভালবাসেন। এই যে সত্যকে স্বীকার করবার সৎসাহস—এটা শরৎচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েচি।

একদিন শরৎচন্দ্র সেকালের 'কবির লড়াই'য়ের কথা পাড়লেন; বললেন—অশ্লীলতাটা বাদ দিলে, জিনিসটা ভারি সুন্দর ছিলো; উপভোগ করবার মত। য়্যান্টনী সাহেব, ভোলা ময়রা এরা

আবার যদি ফিরে আসে, মন্দ হয় না। 'কবি-গানে'র ব্যাপার সব জানো ত?"

"জানি বই কি:—'আমি সে-ভোলানাথ নই'···"

"হ্যাঁ;···আমি ময়রা ভোলা, * * * বাগবাজারেরই।"

'কবির গান,' 'হাফ-আখড়াই,' 'তরজা' প্রভৃতি শরৎচন্দ্র খুবই যে ভালবাসতেন, তা স্পষ্টই বোঝা যেত। আরও দু'-একবার তাঁর মুখে 'কবির' গান সম্বন্ধে শুনেছিলুম। একবার বরানগরের দিক থেকে তাঁর গাড়ীতে আসছিলুম। আমাদের সঙ্গে কবি কালিদাস রায় মশায়ও ছিলেন, মনে হয়। সেদিনও শরৎচন্দ্র এই সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

আমার লিখিত, 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'জমা-খরচ' নামে গল্পটা নাটকাকারে 'বেতারে' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় এত সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয় যে, পর পর দশ-বারো রাত্রি ধরে সমানে ধরে অভিনয় চলে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করতেন—নেপেন মজুমদার। রঞ্জিৎ রায় 'পতিতুণ্ডি'র ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আমার ওই 'জমা-খরচ' পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটী অভিনয় করেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাতে 'পুরোহিত'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এর পরে ঐ 'জমা-খরচ' 'মিনার্ভার' কর্তৃপক্ষরা মঞ্চস্থ করেন। তখন আমার কাছে একটা প্রস্তাব আসে যে, আমি নিজে যদি কোন একটা বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করি, তাহোলে তাঁদের টিকিট বিক্রী কিছু বেশী হয়। এতে আমি রাজি হই। কিন্তু শরৎচন্দ্র এ কথা শুনেই অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং কিছুতেই আমাকে পাবলিক ষ্টেজে নামতে দিলেন না। আরও একজন ঘোর আপত্তি জানালেন। তিনি 'বসুমতী'র স্বর্গীয় মুখুজ্যে মশায়। সুতরাং আমার আর নামা হোল না। আশ্চর্যের কথা এই যে, যে শরৎচন্দ্র এক কালে বহু বার সখের থিয়েটারে নেমেছেন ও ঐ জিনিসটাতে যাঁর প্রবল একটা প্রীতি ও আকর্ষণ ছিল, তিনি—এখন সেই বিষয়েই আমাকে প্রবল বাধাদান করলেন। আগেই বলেছি, যৌবনে তাঁর গান-বাজনা এবং সখের থিয়েটারে খুব ঝোঁক ছিল এবং অনেক বারই তিনি অভিনয় করেছেন। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কত পরিবর্তনই না হয়! তাহোলেও অন্তরে তাঁর এ বিষয়ে আনুরক্তি পূর্বের মতই ছিল। এই অভ্যাস এ কথনো সমূলে যায় না। আমার এই ৭৩ বছর বয়সেও ও জিনিষটা যায়নি। শরীর যদি রাজি হয়, তা হোলে এ বয়সেও ষ্টেজে নেমে আমি ভাল ভাবেই অভিনয় করতে পারি এবং নাম দিতেও পারি। এটা আমার বৃথা গর্ব নয়। এ বয়সে যে-পথের পথিক আমি সে-পথ মান-অভিমানের বাইরে, লজ্জা-ভয়ের বাইরে, গর্ব-অহঙ্কারের বাইরে।

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ আফিং খেতেন। কি পরিমাণে খেতেন তা আমি জানি না। আমাকেও তিনি আফিং ধরিয়ে গেছেন। বোজ কোমরের দিকে আমার কোমরে একটা ব্যথা হোত; তার জন্যে ঐ সময়টা সোজা হোয়ে বসতে পারতুম না। ওই সময়টা ঐ জন্যে লিখতেও পারতুম না। শরৎচন্দ্র একদিন একটুখানি আফিং দিয়ে বললেন—"খেয়ে ফেল, ব্যথাটা আর হবে না।" আমি বললুম—ব্যথাটা হয়ত না হোতে পারে, কিন্তু আফিংয়ের অভ্যাস হোয়ে যাবে যে।" তিনি বললেন—"হলেই বা; এ বয়সে আফিং ত তোমার ভালই করবে। তা ছাড়া, আফিং যখন 'ধরবে'—তখন লেখার কি রকম ভাব আসে দেখতে পাবে।" সুতরাং রোজই খেতে লাগলুম। পাঁচ সাত দিন ধোরে একটু করে আফিং শরৎচন্দ্রের ওখান থেকেই পেলুম; তার পর চার আনা ওজনের—অর্থাৎ সিকি তোলা—আফিং আট আনা দিয়ে কিনে এনে খেতে লাগলুম। সেই আফিং আজ পর্যন্ত চলচে। এখন মাত্রাও যেমন বেড়েচে, আফিংয়ের দামও তেমনি বেড়েচে। এখন আফিং আট টাকা সাড়ে আট টাকা ভরি। হয় ত শরৎচন্দ্র সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ম মত একটু কোরে আফিং খেতেন; কিন্তু অনিয়মেও যখন-তখন একটু কোরে খেতেন। এটা আর কেউ বুঝতে পারতো না, আমি পারতুম। তাঁর জামার পকেটে ছোট ছোট গুলিপাকানো আফিং থাকতো। কোন জায়গায় যেতে-আসতে গাড়ীর মধ্যে, এলাচের দানার মত সেই একটা বড়ি টুক্ কোরে গালে ফেলে দিতেন। এটা আমি অনেক বার দেখেচি। বন-হুগলীতে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের বিয়েতে শরৎচন্দ্র ও আমি নিমন্ত্রণে গেছলুম। সেখানে বোসে কোনও একজনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে শরৎচন্দ্র পকেটে হাত দিলেন ও কি-একটা বার কোরে টুক্ কোরে মুখে ফেলে দিলেন। আমি বুঝতে পারলুম—আফিং। সেদিন শরৎচন্দ্রের ওপর আমার বেশ-একটু রাগ হোয়েছিল। রাগের কারণটা এই যে, আমি চারু বাবুর ওখানেই খাব বলে ঠিক করে-ছিলুম। সেজন্যে বাড়ীতে আমার রাত্রের খাবার রাখতে বারণ কোরে গেছলুম। ওখানে খাবার দ্রব্যের আয়োজনটাও খুব ভাল হোয়েছিল। খিদেও পেয়েছিলো খুব। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জন্যেই খাওয়া হোল না। যখন খাবার ডাক পড়লো, তখন শরৎচন্দ্র বললেন—"আমি খাব না, আমার শরীরটা অসুস্থ।" তিনি খেলেন না, সুতরাং আমার শরীর সুস্থ থাকাতেও খাওয়া হোল না। বাধ্য হোয়ে আমাকেও বলতে হোল—"আমারও শরীর অসুস্থ, খাব না।" আসলে কিন্তু শরৎচন্দ্রের শরীর খুবই সুস্থ ছিল, নইলে অত দূর—শুধু 'হুগলী' নয়, 'বনহুগলী'তে যেতেন না। বরানগর ছাড়িয়ে তবে বন-হুগলী। যাক, কি আর করা যাবে! তাঁর পাল্লায় পড়ে সে-রাত্তিরটা আমার অনাহারেই কাটলো।*

[ক্রমশঃ।

* গত ভাদ্র সংখ্যা 'টুকি-টাকি'র শেষ পৃষ্ঠায়, ছাপাখানার গোলমালে দু'-একটা ভুল থেকে গেছে, সেজন্য আমি খুব দুঃখিত। (১) ৮১৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে ২২ পংক্তির পর, এই লেখাটুকু ছাড় হয়েচে—'ক'দিন শরৎচন্দ্রের ওখানে যেতে পারিনি; আমার একটি ছেলেকে একখানা চিঠি দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলুম।' (২) 'শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত' নামের 'গুপ্ত' কথাটা ছাড় পড়েচে। (৩) শরৎচন্দ্র যে উপন্যাসখানার প্রথম পরিচ্ছেদ লেখেন, তার নাম দিয়েছিলেন—'বাড়ীর কর্তা' এবং উহা বার হোয়েছিল, কাশীর 'প্রবাস-জ্যোতি' নামে একখানা কাগজে। বারোয়ারী উপন্যাসরূপে 'রসচক্র' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'উত্তরা' পত্রিকায়।

—লেখক।

সংস্কৃতির সঙ্কটে

শচীন মিত্র

যুগে যুগে মানুষ সংস্কৃতির সূর্য্যস্নাত রূপে মুগ্ধ হয়েছে, আকৃষ্ট হয়েছে—আবিষ্ট হয়েছে। সংস্কৃতির শ্যামলিমায় অবগাহন করে মানুষ স্নিগ্ধ হতে চেয়েছে, সভ্যতার প্রেরণা থেকেই এই সাংস্কৃতিক ধারা উৎসারিত। মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাধারা বিশেষ কোনো ভৌগোলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে ওঠে কিন্তু কোনো স্থান ও কালে তা সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকে না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের সংঘাত অপরিহার্য্য। এই সংঘাতের ফলেই মানুষের চিন্তাধারা ও সত্যসাধনা নতুন গতিপথের সন্ধান ক'রে নেয়। সত্যসন্ধানী মানুষের মন বন্দী প্রমিথিউসের মতোই আলোকের দূত। এই আলোকের তপস্যা দেশে দেশে যুগে যুগে বহু সাধক ক'রে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগৎ সেই তপঃসাধনারই উত্তরাধিকারী। একে রক্ষা করা কিংবা বিনাশ করা এ যুগের মানুষেরই দায়িত্ব। এ্যাকশনই সংস্কৃতির মূল বস্তু। কৃষ্টি শব্দের উৎপত্তি কর্ষণ থেকে। ইংরেজী কালচার কথাও তাই। মানুষের চিন্তার জমিকে কর্ষণ ক'রেই কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতির উদ্ভব। এই কর্ষণের দায়িত্ব বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের উপর ন্যস্ত। কিন্তু এদের পক্ষেও নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করা সম্ভব নয়। বিশেষ যুগে বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্যে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তারই প্রয়োজনে সংস্কৃতির রূপ ও সংজ্ঞা আবর্তিত হয়। যাঁরা মনে করেন যে, শিল্প ও সাহিত্য মনোলোকের জিনিষ, সংস্কৃতির উদ্ভবও শুধু চিন্তারাজ্যের সীমারেখায়, তাঁরা মানব-ইতিহাসে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে অস্বীকার করেন। এর বিশদ আলোচনায় না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে, শুধু সংস্কৃতি সাধনার ইতিহাসই নয়, সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধোত্তর যুগের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সাধনার ইতিহাস পর্য্যালোচনার মাধ্যমে এই সত্যের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

গত মহাযুদ্ধে ইউরোপের সংস্কৃতি জগতে নাৎসীবাদের যে সর্বনাশা আক্রমণ সুরু হয়েছিল তার সর্বপ্রথম বলি হয়েছিল জার্মাণী ও ইতালী। নাৎসীবাদ মানব-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বড় শত্রু। নাৎসীবাদ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদেরই চরম রূপ। তবুও ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এর বিরোধ লাগল এই কারণে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্থান উচ্চে কিন্তু নাৎসীবাদে মুষ্টিমেয় শাসক-পরিচালিত রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব ও বিরোধী চিন্তাধারা বলি প্রদত্ত। নাৎসী-শাসিত জার্মাণীতেও যারা ভিন্ন ধারার সাংস্কৃতিক ও মানবচিন্তার উজ্জীবনের সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যে টমাসম্যান ও বিজ্ঞানে আইনষ্টাইন স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, এঁরা দু'জনেই নাৎসী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হ'য়েছিলেন। টমাসম্যান ব্যক্তিবাদী সাহিত্যিক সন্দেহ নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকারে তিনি বিশ্বাসী বলেই নাৎসীবাদের সর্বনাশা আক্রমণ থেকে তিনি শিল্প ও সাহিত্যকে রক্ষা করবার সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন। টমাসম্যান বিংশ শতাব্দীর জার্মাণীর পক্ষ থেকে বৃহত্তর মানবতার পক্ষে কথা ব'লেছেন। তিনি শান্তিবাদী কিন্তু কবরের শান্তিতে তিনি বিশ্বাসী নন। ম্যানের সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র আছে, কিন্তু সমাজ-সচেতনার প্রতি তিনি বিমুখ নন। মানুষের আত্যন্তিক মূল্যবোধে তাঁর সাহিত্য সাধনা জার্মাণীর নয়া সংস্কৃতিকে 'হেরেনভোক' বা আর্য্যামির জাতিবৈরিতা থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্ব-মানবতার অনন্ত-বিস্তৃত দিগন্তে মিলিত ক'রেছে। জার্মাণীর প্রাণ-সত্তাকে এদের মত শিল্পী ও সাহিত্যিকরাই পুনরুজ্জীবনে সহায়তা ক'রেছেন।

আইনষ্টাইনের নামোল্লেখ ক'রেছি এই কারণে যে, তিনি যে বিজ্ঞান সাধনা ক'রেছেন তা মানবজ্ঞানকে শুধু মাত্র থিওরির সীমাতেই আবদ্ধ রাখেননি। আইনষ্টাইন বিজ্ঞানকে মানুষের মুক্তির ব্রতে নিয়োজিত ক'রেছেন। আর তাঁর মতো একজন ব্যক্তি যখন বিশ্বসভ্যতাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ধ্বংসকার্য্য থেকে রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠতে দেখি, তখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও কিছু আশা করবার থাকে। স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হলেও আইনষ্টাইন জার্মাণ সংস্কৃতিরই সৃষ্টি, তিনি জার্মাণ সংস্কৃতির ধারকও বটেন।

ফরাসী দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইউরোপে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও অনুধাবনযোগ্য ঘটনা। ফ্রান্স ইউরোপের কবিবক্তার উৎস স্থল। ফরাসী দেশ বিপ্লবের দেশ, শিল্পের দেশ, সাহিত্যের দেশ। প্যারীর যখন পতন হয় তখন ফরাসী দেশের দু'জন দিক্‌পাল ভাববিপ্লবী রোমা রোঁলা ও আঁদ্রে জিদ জীবিত ছিলেন। রোঁলা বিশ্বপথের তীর্থযাত্রী। রোঁলার সাহিত্য শুধু ফরাসী দেশের নহে, সমগ্র ইউরোপের প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত। জাঁ ক্রিস্তফ্ রোঁলার মানসদূত। তিনি বিশ্বপথিক। বিশ্ব-সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা এখানে এসে যেন ধ্যানমৌন হৃদয়-সমুদ্রে এসে স্থিতিলাভ করেছে। এই প্রাণাবেগের তুলনা মেলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই। আঁদ্রে জিদ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সাহিত্যিক। জিদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তিমানসের বিশ্লেষণে তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত। যৌন সম্পর্ক বিষয়ে এবং সামাজিক নিয়ম বর্জ্জনের বিরুদ্ধে জিদের দুঃসাহসিক ভাববিলাস এক কালে ব্যক্তিসর্ব্বস্ব বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিলো। জিদের শিল্পে কারুকার্য্য আছে, কিন্তু কোনো মহৎ বেদনার স্পর্শ তাতে নেই। জীবনের কোন সর্বাঙ্গীন স্বীকৃতি সেখানে অনুপস্থিত। অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর ঘোষণা আছে। কিন্তু সে বিদ্রোহ ব্যক্তি-মানসের অরাজকতায় হতাশা ও অবসাদে বিষণ্ণ। অথচ ভাবতে বিস্ময় লাগে, এই জিদের কণ্ঠে একদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অবিচলিত আস্থা আর আশ্বাসের বাণী শোনা গিয়েছিলো। সোভিয়েট রাষ্ট্রে মানুষের ভবিষ্যতের যে প্রতিশ্রুতিতে নূতন আশার সৃষ্টি হ'য়েছে, আঁদ্রে জিদ তার একজন উৎসাহী অংশীদার ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মোহে তিনি সোভিয়েটের সামাজিক কল্যাণের মহান্ পরীক্ষাকে গ্রহণ ক'রতে পারেন নি। ফরাসী দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নূতন রূপ নেয়, নাৎসী-অধিকৃত প্যারী শহরে প্রতিরোধের সাহিত্য সৃষ্টিতে। এই প্রতিরোধের সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম কয়েক জন বিশিষ্ট অগ্রণী ব্যক্তি হ'লেন লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, জাঁ পল সার্ত্র, কেমু প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। আরাগঁ ফ্রান্সের বিপ্লবাত্মার বাণীমূর্ত্তি। আরাগঁর ব্যক্তিত্বে যোদ্ধা

ও শিল্পীর সমন্বয় ঘটেছে। তিনি দেখেছেন, প্যারীর পতনের মধ্যে মানুষের জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ ধূলিসাৎ হ'য়ে গিয়েছে। তাই তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নী এলসার প্রেমে ফ্রান্সের নব-জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। এলুয়ার আরাগোঁর সমধর্মী, তিনিও প্রতিরোধের কবি—কিন্তু তিনি আরও লিরিকধর্মী—আরও হৃদয়-বেদনা-বিদ্ধ তাঁর কবিতা। এলুয়ার বলেন, মানবের সামগ্রিক কল্যাণই শিল্পীর সৃষ্টি-সার্থকতা; ব্যক্তি-সর্বস্বতা শিল্পের আদর্শ বিরোধী। জাঁ পল সার্ত্র নাৎসী-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনেরই শিল্পী। কিন্তু সংগ্রামীর চেতনায় তিনি সেই প্রাণসত্তাকে অনির্বাণ দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ক'রে রাখতে পারেন নি। তাই যুদ্ধাবসানে তিনি এক নেতিবাচক রহস্যাবৃত অস্তিত্ববাদের কূর্মবৃত্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন মানুষের এই জীবন ধারণ, এই চিন্তাধারা সবই irrational, অযৌক্তিক। এই অযৌক্তিকতা থেকে মানুষের মুক্তি নিহিত অস্তিত্বের শোধনে, আত্মার মুক্তি। সার্ত্র-র লেখাগুলোও তাই এই রহস্যাবৃত চিত্তবৃত্তিরই উপাসক। বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই।

ফরাসী দেশের চিত্রকলায় আরেক জন শিল্পী যুগান্তর এনেছেন—পাবলো পিকাসো। পিকাসো সাধারণ মানুষের শিল্পী নন। কিন্তু তিনি শতাব্দীর শিল্পী। তিনিও সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসী-বিরোধী। পিকাসোর শিল্পকর্মে বিংশ শতাব্দীর সংশয় আর প্রতীক্ষার এরূপ রঙে আর তুলিতে উজ্জ্বলতা লাভ ক'রেছে। দা ভিঞ্চি কিংবা মাইকেল এঞ্জেলোর পর এমন মৌলিক প্রতিভাধর শিল্পি-দের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে নি।

ইতালীর ইতিহাস ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাস। রোমান যুগ থেকেই ইতালী ও পরবর্তী যুগে গ্রীস ইউরোপীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই ইতালীই শেষ কালে জন্ম দিল ফ্যাসিজমের। ফ্যাসিবাদ ইতালীকে মোহাচ্ছন্ন করল, কিন্তু তার সত্যকে গোপন ক'রে রাখতে পারল না। ইতালীতে এ যুগেই জন্মেছেন লুইজি-পিরানদেল্লো, গ্রাৎসিয়া দিলোদা। পিরানদেল্লোর গল্পে মানব-জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার সত্য সার্থক হয়ে উঠেছে অসীম মমতায়। এর গল্প পড়তে পড়তে শরৎচন্দ্রকে মনে পড়ে, আমাদের বাঙ্গলা দেশের মানুষকে মনে পড়ে। ফ্যাসিবাদের যুগে ইতালীর সাহিত্যিকরা রূপকাশ্রয়ী সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছেন। ইতালীর সংস্কৃতি আজ কৃষককে কেন্দ্র ক'রে জনজীবনের অংশীদার হ'য়ে উঠেছে। ইতালী কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষকের বেদনাই ইতালীর সাহিত্যের প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। যাঁরা ইতালীয় ছবি 'দি থিফ' কিংবা 'মিরাকল অব মিলান' দেখেছেন কিংবা দেখেছেন 'বিটার রাইস' তাঁরা ইতালীয় সংস্কৃতির বর্তমান রূপ উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। এ সংস্কৃতি দরিদ্র, নিবিত্ত ভূমিহীন কৃষক, নিরন্ন শ্রমিকদের বেদনাময় অশ্রুসজল কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। [illegible] খেতে তাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যারা ধান বোনে তাদের জন্য আজ ইটালীতে অন্ন জোটে না, যে বেকার যুবকের জীবনের স্বপ্ন আর আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাজের ত্রুটির চাপে ধ্বংস হ'তে চলেছে, ইতালীয় শিল্পে ও সাহিত্যে আজ তাদের বাণীই কথা ক'য়ে উঠেছে। এ জন্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় মানুষ আশান্বিত।

আমেরিকার সাহিত্য-জগতে কৃতী শিল্পীর অভাব নেই। পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' একদা মহাচীনের বেদনাভার পৃথিবীর সমক্ষে তুলে ধরেছিলো। কিন্তু 'গুড আর্থে'র ঐতিহ্য মার্কিণ শিল্পীরা বেশী দিন রক্ষা ক'রতে পারে নি। ষ্টাইনবেকের 'গ্রেপস অফ রথ' (grapes of wrath) উপন্যাসে মানবতার বিচিত্র রূপ তুলে ধরা হয়েছে সেরূপ সংসাহিত্যও আজ আমেরিকায় খুব বেশী নেই। হাওয়ার্ড ফাষ্ট এর ব্যতিক্রম। যুদ্ধের উন্মাদনায় আজকের মার্কিণ সংস্কৃতি যখন বিশ্ব সাম্রাজ্যের ক্ষুধায় উচ্চকিত রবে দিগন্ত কম্পিত করে তুলেছে, সে সময়ে হাওয়ার্ড ফাষ্টের মতো ব্যক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক।

ফাষ্ট মানবতার শিল্পী, শান্তিসমৃদ্ধ সমানাধিকারের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর রূপকার। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই, নির্য্যাতিত নিগ্রোজাতির মর্মবেদনার কাহিনী। ফাষ্ট আমেরিকার জনগণের বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন, তাদের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। যে দেশে পার্ল বাক্, ষ্টাইনবেক্ ও হাওয়ার্ড ফাষ্টের মতো শিল্পী জন্মেছেন সে দেশ সম্পর্কে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। সাময়িক পথ-বিচ্যুতির পর দেশের জনতা আবার উদ্ধার করবে আব্রাহাম লিঙ্কন, জেফারসনের বাণীকে।

ইউরোপে স্পেনের শিল্পসাধনা স্বতন্ত্র। স্পেন বহু নির্য্যাতন ভোগ করেছে। রাজা আলফাঁসোকে সিংহাসনচ্যুত করে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত শাসন যেদিন কায়েম হ'লো সেদিন স্পেনের শিল্প ও সাহিত্য নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন হ'লো। বহ্নি-হৃদয় কবি গার্সিয়া লোরকা স্পেনের নির্য্যাতিত মানুষের বাণীকে ভাষা দিয়েছেন। ফ্যাসিস্ত বর্বরদের হাতে তিনি প্রাণ দিলেন কিন্তু তাঁর কাব্য রইল অমর হ'য়ে। নির্বাসিত কবি পাবলো নেরুদা লাতিন আমেরিকা থেকে লিখলেন লোরকার উদ্দেশ্যে:

> If I would weep for fear in a lonely house,
> If I could tear my eyes out and devour them
> I would do it, for your voice of morning
> orange trees
> And for your poetry that emerges uttering
> cries.

স্পেনের বেদনা-বিক্ষুব্ধ হৃদয় নেরুদার কাব্যে প্রাণস্পন্দনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সে ভাষায় অগ্নি ঝরছে, সহস্র মানুষের অশ্রু সেখানে বাণীরূপে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলছেন:

> Generals traitors
> Look at my dead house
> Look at shattered spain.
> Yet from each dead house springs
> burning metal
> In place of flowers
> From every dead child
> Springs a rifle with eyes
> From every wrong
> Bullets are born,

মানব-সংস্কৃতির আরেক মহাপরীক্ষা চলেছে সোভিয়েট দেশে। যে দেশে মানবতার নূতন মূল্যবোধ স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে। গত মহাযুদ্ধে রাশিয়ার আত্মদানের মধ্য দিয়ে মানুষের ভবিষ্যতের যে নূতন প্রত্যয় সুপ্রতিষ্ঠিত, রুশ সাহিত্যের বর্তমান ইতিহাসে তার স্বাক্ষর বর্তমান। যুদ্ধকালীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অমর উপন্যাস রচনা করেছেন ইলিয়া এরেনবুর্গ 'প্যারীর পতন' আর 'ঝড়'। সোভিয়েট সাহিত্যের বর্তমান সুর শান্তির সঙ্গীত। রণ-বিক্ষত সোভিয়েটের জনগণের একমাত্র আশা শান্তির প্রতিষ্ঠা মানব-মৈত্রী ও বিশ্বসৌভ্রাত্র।

বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা, সোভিয়েট সাহিত্যে চিন্তার কোনো স্বাধীনতা নাই, কোনো বৈচিত্র্য নাই। সবই যেন একই ছাঁচে ঢালা। এ ধরণের নিন্দাবাদের প্রত্যুত্তর পেতে হ'লে যুদ্ধোত্তর সোভিয়েট সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। সোভিয়েট কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলার সর্বক্ষেত্রেই Socialist Realism বা সমাজবাদী বাস্তবতা প্রতিফলিত। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে রিয়লিজম্ তার উৎস স্থূল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ভাববিলাসীদের মনলোকে। এই রিয়লিজম্ রোমাণ্টিকতারই অন্য পীঠ। এতে যে মানুষ উপস্থিত তারা মনলোকের দ্বিধা ও সংশয়ে বিপর্য্যস্ত, তাদের বেদনায় গভীরতা হয়তো আছে কিন্তু সমাজ-চৈতন্যকে স্পর্শ করবার উদারতা তাদের নেই। এ প্রসঙ্গে ভাণ্ডা ভাসিলিভেস্কার 'প্রেম' ও আলেক্সান্দার ফাদিয়েভের ষ্টালিন প্রাইজ-প্রাপ্ত উপন্যাস 'ইয়ং গার্ড' এর কথা উল্লেখ করছি। নর-নারীর প্রেম ও দেশপ্রেম এই দুইটি জিনিষই যে একাত্ম হয়ে মানুষকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী থেকে বৃহত্তর মানবতায় নিজেকে উন্নীত করতে পারে, সোভিয়েট ও সোভিয়েট-অনুসৃত অন্যান্য পূর্ব-ইউরোপের দেশ সমূহের নূতন সাহিত্যে তাঁর পরিচয় মেলে। সমাজবাদী বাস্তবতা আর সাহিত্যিক বাস্তবতায় পার্থক্য অনেক। লেনিন ও গোর্কি সাহিত্যে এই নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না ; তেমনি শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনার ক্যাটালগ বা ফটোগ্রাফ তুলে ধরলেই রিয়লিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে পারে না। সাহিত্যিক কর্মীকেও সমাজ-বিপ্লবে তার অবদান দিতে হবে। এই অবদান তখনই সর্বজনগ্রাহ্য হ'তে পারে যখন তাঁর সৃষ্টি সমাজ-চেতনামূলক বাস্তবতায় মানব জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত ক'রে তুলতে পারে। সমাজবাদী রাষ্ট্রের চিন্তাধারা ও মানস প্রবৃত্তি ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ হ'তে ভিন্ন হ'তে বাধ্য। ধনবাদী রাষ্ট্রে সাহিত্যের নাম করে অবাধে যৌন বিকৃতির উৎসাহ দেওয়া চলে ; কাল্পনিক চরিত্রের সমাজবিরোধী চিন্তাকে সহনীয় ক'রে তুলে তাকে নায়কের সম্মানিত আসন দেওয়া চলে। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে আজ তাই সাহিত্য-জগতে চরম স্বেচ্ছাচারের পরিচয় সর্ব্বত্র। এতে সমাজ-মানসের বিকলাঙ্গ ও গলিত ব্যাধিদুষ্ট রূপটিই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই যদি সাহিত্যিক বৈচিত্র্য হয়, তাহলে এ বৈচিত্র্যের ভবিষ্যৎ কি, সে সম্পর্কে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। ডি, এইচ, লরেন্স এই যুগটাকে উল্লেখ করেছিলেন 'সর্বনাশের যুগ' হিসেবে। লেডী চ্যাটার্লীর প্রেম বইয়ে এই সর্বনাশের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট।

বস্তুতঃ, এই সর্বনাশ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ; সমাজবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোতে এই ব্যাধির প্রবেশ চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ। তাই সমাজবাদী রাষ্ট্রে নূতন সমাজ-চেতনার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে মানবিক হৃদয়-স্পর্শে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ক'রে তোলা হচ্ছে। একেই নাম দেওয়া হয়েছে সমাজবাদী বাস্তববাদ বা socialist realism. এই বাস্তবতার রূপ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানতে হ'লে ইলিয়া এরেনবুর্গের সাম্প্রতিক একটি রচনা পঠিতব্য। [দ্রঃ নূতন সাহিত্য মাসিক পত্রিকা এই বছরের কোন এক সংখ্যা]।

চীনের নূতন সাহিত্যের ধর্ম ও সমাজবাদী বাস্তববাদেরই প্রতিফলন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত চীনে যত উপন্যাস ও ছোট গল্প রচিত হ'য়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই চীনের তৎকালীন অবস্থা ও শেষ পর্য্যন্ত বর্তমান যুগের স্থায়িত্ব লাভ সম্পর্কে গভীর সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। নয়াচীনের সংস্কৃতি-সচিব মাও তুং নূতন যুগের চীনা লেখকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন : অতীতের কথা ভেবে এবং ভবিষ্যতের কোনো রঙীন কল্পনায় ভাবপ্রবণ হ'য়ে পড়বেন না। সত্যকে যাচাই করে, বিশ্লেষণ করে প্রকাশের দায়িত্ব আপনাদের। চীন আজ একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জাতি। ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য যে কোনো আদেশ এই আশাবাদী নবজাগ্রত জাতির জনসাধারণ দৃঢ় সঙ্কল্পে কর্মে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। শুধু শিল্পীরাই নন, তরুণ সম্প্রদায়ও এই আদেশ শ্লোগানের মত পালন করছেন। তিং লিং, চ্যাং তিয়েন ই, লাও সাও, সিয়াং সুন, আই চিং, চৌ ইয়াং প্রভৃতি কবি, লেখক ও ঔপন্যাসিকদের রচনায় এই অগ্রগতির সংকেত সুস্পষ্ট। চীনা সাহিত্যের যে স্বরধর্মিতা ও প্রকাশ-সংযম তা এই নবযুগের লেখকদের রচনায় পরম নিষ্ঠায় রক্ষিত হয়েছে। তিং লিং-এর লিরিক ও হৃদয়ের উষ্ণ অনুভূতি, তিয়েন ই-র সংবেদনশীল সহৃদয় মন, 'সিয়াং সুনে'র দেশপ্রেমের বহ্নি বর্তমান চীনা সাহিত্যকে অপূর্ব সুরবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে। চীনা সাহিত্যের এই নবজাগৃতির পথিকৃৎ সু সুন। সমাজবাদী বাস্তবতার ভিত্তিতে তিনি রচনা করেছেন 'পাগলের রোজনামচা'। এতে তিনি নয়াচীনের সাহিত্যিকদের দায়িত্ব নিজের ভাষায় বলেছেন : চীনের পরিবার প্রথা এবং গতানুগতিক নৈতিক আদর্শের বিপর্য্যয়ের পরিণামের কথাই আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি।

চীনের নূতন যুগের সাহিত্যিকরা এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও তার আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে মহাচীনের নূতন মানুষের সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। নূতন চীনের অভ্যুদয়ে তার সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য্য।

মৃত্যুজয়ী দিনের ইতিহাস রচনায় শিল্পীদের এই দৃঢ়প্রত্যয়ী অভিযানে সাধারণ মানুষের সম্ভাবনাময় জীবনের জয় প্রতিষ্ঠার প্রদীপ্ত আশ্বাস—জীবনের পরিচয়ে প্রতিরোধের উত্তাপ। ব্যক্তির জীবন, সমাজ-জীবন এক কথায় যুগজীবনের নিত্য আবর্ত্তন প্রতিফলিত এই সাহিত্য-ইতিহাস-স্রোতস্বিনীর কল-কল্লোলে মুখরিত। সমাজের প্রাণশক্তিগুলির (Elemental Forces)—স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, বিশ্বাস, সাম্য ও শান্তি—উন্মোচনে আজিকার সাহিত্য সমৃদ্ধ। অগ্রসরমান যুগের শিল্পীর সৃজনী শক্তির লীলাচাঞ্চল্যের এইটাই মর্ম কথা।

ফতেনগরের লড়াই

বিক্রমাদিত্য

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

দুপুর বেলা।

'দৈনিক হরকরা'র নিউজ-এডিটার সাধন বাবু গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন। গালে হাত না দিয়ে যদি মাথায় হাত দিয়ে বসতেন, তা হ'লেও অন্যায় কিছু হতো না। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ 'দৈনিক সমাচার' হরকরার 'মেয়েদের কথা' বিভাগ নিয়ে কতকগুলো অশোভন মন্তব্য করেছে।

'দৈনিক সমাচার' লিখেছে: আমরা জানিতে চাই দৈনিক হরকরার মেয়েদের কথার প্রকৃত লেখক কে? ইহা কী সত্য যে, জনৈক পুরুষ 'মেয়েদের কথা' বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকেন? পাঠকগণ, আপনারা দেখুন, 'দৈনিক হরকরা' কী ভেজাল জিনিষ মেয়ে-মহলে চালাইতেছেন।'

'দৈনিক সমাচারের' এই মন্তব্য পড়ে সাধন বাবু একটু মুষড়ে পড়েছেন। কারণ, সমাচারের এই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে নারী মহল থেকে বহু প্রতিবাদ এসেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে খবর এসেছে যে পাড়ায়-পাড়ায় এই নিয়ে মেয়ে মহলে জল্পনা শুরু হয়ে গেছে। 'দৈনিক হরকরা'র প্রবঞ্চনা আর নাকি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না! অবলা জাতির প্রতি এই অসহায় উৎপীড়নের প্রতিকার চাই। আরো কতো কী?

এমনি সময়ে 'হরকরার' চীফ, সব-এডিটার প্রিয়ব্রত বাবু ঘরে ঢুকলেন।

: আজকের কাগজটা পড়েছেন প্রিয়ব্রত বাবু? সাধন বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

: কাগজ তো আমি পড়ি না স্যর—প্রিণ্টার তারাপদ বাবুই পড়েন। আমি নিউজগুলো এডিট করি। শুধু কর্ম্মখালি কলমটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই,—প্রিয়ব্রত বাবু জবাব দেন।

: আরে না: না:, আজকের সমাচার পড়ে দেখুন। কী বাস্তা লিখেছে আমাদের সম্বন্ধে। বলেছে 'হরকরার' মেয়েদের কথা, বিভাগ পুরুষেরা চালায় কেন?

সাধন বাবুর কথা শুনে প্রিয়ব্রত বাবু হাসলেন। তার পর বললেন: স্যর, 'মেয়েদের কথা' আমরা লিখবো না তো কারা লিখবে? আরে, মেয়েরা কী দৈনিক সংবাদপত্রে আর তাদের মনের আসল কথা খুলে লিখবে? মেয়েদের মনের কথা পুরুষেরা বলে আসছে চিরকাল এবং লিখবেও চিরকাল।

প্রিয়ব্রত বাবুর এই অকাট্য যুক্তির প্রতিবাদে সাধন বাবুর আর ব'লবার কিছু নেই। শুধু বললেন: আচ্ছা কর্পোরেশনের রিপোর্টটা পড়ে দেখেছেন? ছি: ছি:, 'অসহ্য' বানানকে দন্ত্য স না লিখে, মূর্দ্ধণ্য ষ লিখেছেন।

ঐখানেই তো মজা স্যর! বানান শুদ্ধ করে লিখলে কী আর ঐ কর্পোরেশনের কর্ত্তারা কোন প্রতিকার করতেন? ঐ রিপোর্ট পড়েও দেখতেন না। আর পাঠকদের কথা ছেড়ে দিন। ওরা কর্পোরেশনের নাম শুনলেই কাগজের পাতা উলটিয়ে নেন। এবার ঐ বানান ভুলের জন্যেই সবাইকে এই রিপোর্ট পড়তে হবে। আর কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের এই অসহ্য অবস্থার একটা হিল্লে করতে হবে। বানান ভুল করে রিপোর্ট প্রকাশ করার ঐ তো বাহাদুরী।

তার পর একটু গলার স্বর নামিয়ে বললেন: স্যর, মোদ্দা কথাটা শুনেছেন? দৈনিক সমাচার নাকি স্বামী খলিফানন্দের 'শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের সংঘর্ষের দরুণ পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য্যে'র উপর একটা লম্বা বিবৃতি ছাপাচ্ছে। কালই নাকি 'ফ্রন্ট পেজে' ডবল কলমে ছাপবে। এই খবরটা যদি ওরা বের করে স্যর, তা হ'লে কিন্তু বিরাট ইমকুপ হবে।

কথাটা যে ধ্রুব সত্যি, এ সাধন বাবু বিলক্ষণ জানেন। কারণ, কোন এক সময়ে তিনি ঐ দৈনিক সমাচার-দপ্তরেই কাজ করতেন। কিন্তু সামান্য এক কারণে কাগজের মালিক ব্রজানন্দ বাবুর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। ব্রজানন্দ বাবুর গুরু স্বামী খলিফানন্দ 'ধর্ম্ম ও নারী' সম্বন্ধেও একটা তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতি প্রথম পাতায় প্রকাশ না হয়ে তৃতীয় পাতায় ছাপা হয়েছিল। শোনা যায়, গুরুদেব নাকি এতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বিবৃতিতে জোর না দেওয়াতে 'নারী মহলে' তাঁর প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর ধারণা যে, মেয়েরা প্রথম পাতার পর কাগজ খুলে দেখেন না। আর ঐ প্রথম পাতার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন শুধু মাত্র উনুন ধরাবার সময় বা দুধ জ্বাল দেবার সময়। অতএব এই বিবৃতি তৃতীয় পাতায় ছাপা হ'বার দরুণ নারী মহলে যে এ নিয়ে কোন আন্দোলন হবে না, এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য ও অভিযোগ।

ব্রজানন্দ বাবু তাঁর গুরুদেবের প্রতি এই তাচ্ছিল্য ভাব সহ্য করলেন না। সাধন বাবুর কৈফিয়ৎ তলব করলেন। অবশেষে সাধন বাবু চাকুরীটি খোয়ালেন।

সাধন বাবুর দুর্য্যোগের কথা, 'দৈনিক হরকরার' মালিক পতিতপাবন বাবুর গুরুদেব স্বামী জিবিদানন্দের কানে পৌঁছল। গুরুদেবেরই আদেশে সাধন বাবু 'হরকরায়' নিউজ এডিটার পদে বহাল হলেন।

স্বামী জিবিদানন্দের সাধন বাবুকে 'হরকরায়' নিযুক্ত করার একটা গৌণ কারণ ছিল। 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' স্বামী জিবিদানন্দের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বামী খলিফানন্দ। কিছু দিন আগে স্বামী জিবিদানন্দ ঠিক করেছিলেন যে, তিনি একটা অনাথ-আশ্রম বানাবেন। কথাটা লোকপরম্পরায় বেশ জানাজানি হয়ে গেলো। ব্যস, আর যায় কোথায়! স্বামী খলিফানন্দের প্ররোচনায় দৈনিক সমাচার 'ইহা কী সত্য' কলামে লিখলো: 'অনাথ-আশ্রমের নামে যে ফাণ্ড করা হয়েছে সে টাকা যায় কোথায়? বলি, হাতীপুরের বাগানবাড়ীটি কার? ওখানে স্বামী জিবিদানন্দ এত ঘন-ঘন যাতায়াত করেন কেন? রাত দুপুরে ওখান থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ পাওয়া যায়? ওটা কার ঘুঙুর?'

দৈনিক সমাচারে এই সংবাদ বের হবার সঙ্গে সঙ্গে অনাথ-আশ্রমের জন্যে চাঁদা বন্ধ হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, যাঁরা চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁরা উকীলের নোটীশ পাঠালেন।

শুধু মাত্র এই একটি কারণে স্বামী জিবিদানন্দ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামী খলিফানন্দের উপর চটে যাননি। রাগ করার আর একটি কারণ ছিল। স্বামী জিবিদানন্দের ধারণা যে, তার যে নারী মহলে প্রতিপত্তি হয়নি, তার মূলে আছেন স্বামী খলিফানন্দ। জিবিদানন্দের শিষ্যার সংখ্যা খুবই কম।

এই সব কারণে স্বামী জিবিদানন্দ চাইছিলেন স্বামী খলিফানন্দকে জব্দ করতে। জব্দ করার সমস্ত কল-কৌশলই তাঁর জানা আছে। তিনি কী আর স্বামী খলিফানন্দের বাল্য জীবনী জানেন না? স্বামী খলিফানন্দ কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, এ তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে; আর শুধু কি তাই? তিনি কী জানেন না যে স্বামী খলিফানন্দ পাশের বাড়ীর···

থাকগে, তিনি আর এই সব কুৎসিত কথা নিয়ে ঘাঁটাতে চান না। তবে তিনি ঠিক করেছেন যে, তিনি তাঁর আত্মস্মৃতিতে খলিফানন্দের সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে দেবেন। এই 'আত্মস্মৃতি' শীগগিরই দৈনিক হরকরায় কিস্তিতে প্রকাশ হবে। তিনি জানেন যে, সাধন বাবু একজন উঁচুদরের লেখক। অতএব এ কাজে তাঁর সাহায্য বিলক্ষণ দরকার হবে। অতএব তিনি সাধন বাবুকে দৈনিক হরকরায় নিয়ে এলেন।

সাধন বাবুর 'দৈনিক হরকরা'য় চাকুরী পাবার এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আজ প্রিয়ব্রত বাবুর মুখে স্বামী খলিফানন্দের কথা শুনে তাঁর এই সমস্ত পুরানো কথা মনে হতে লাগলো।

কিন্তু তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো রিপোর্টার উমাকান্তের চীৎকারে।

: হৈ-রৈ ব্যাপার স্যর! ফতেনগরে লড়াই। রাজা বিদ্রোহ করেছে প্রজাদের বিরুদ্ধে—বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে উমাকান্ত সাধন বাবুর ঘরে ঢুকলো।

: রাজা বিদ্রোহ করেছে প্রজাদের বিরুদ্ধে! বলেন কী ম'শাই! তাজ্জব কাণ্ড! না, প্রজা বিদ্রোহ করেছে রাজার বিরুদ্ধে—প্রিয়ব্রত বাবু মন্তব্য করলেন।

: ঐটে তো 'চেক আপ' করিনি। এক্ষুণি 'চেক আপ' করে নিচ্ছি স্যর—বলেই ঝটকা দিয়ে উমাকান্ত বেরিয়ে গেলো। একটু বাদে ফিরে এসে বললো; ঠিক বলেছেন। প্রজারাই বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু কী হৈ-রৈ কাণ্ড, ট্যাঙ্ক, লাঠি-সোটা, বন্দুক, আরো কতো কী?

"Men and women both sexes are fighting"

উমাকান্তর কথা শুনে প্রিয়ব্রত বাবু আবার একটু বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন: বলেন কী?

Men and women both sexes are fighting!

এটা আবার কী ব্যাপার উমাকান্ত বাবু?

হেঁ, হেঁ, এইটেই তো মজার ব্যাপার। চিরকাল ত 'সব-এডিটিরি' করে এলেন—রিপোর্টারী ত আর কখনও করেননি? 'কলার ফুল ডেসপ্যাচের' কী মর্ম্ম বুঝবেন? ঐ জিনিষটা হলো আমাদের মনোপলি। তার পর সাধন বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন; বুঝলেন স্যর, সেদিন আমার একটা চমৎকার রিপোর্ট 'ডেস্ক' একদম নষ্ট করে দিয়েছে। নিউজ-রুমের যদি একটু 'নিউজমেনস্' থাকত তা হ'লে অমন চমৎকার রিপোর্টটা নষ্ট হতো না।

সাধন বাবু অবশ্য উমাকান্তর কথায় নজর দিলেন না। শুধু বললেন; লড়াই তা হলে লাগলো।

এবারও উমাকান্ত জবাব দিলে। বললে; লাগলো মানে, একদম হানড্রেড ইয়ার্স অব ওয়ার।

এবার প্রিয়ব্রত বাবুর বলবার পালা। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, উমাকান্ত বাবু, এই ফতেনগরটা কোথায়?

: এই রে সেরেছে! ওই আসল জিনিষটাই তো দেখিনি। নিউজ এজেন্সীর খবর 'ক্রীডে' আসছিল—তাড়াহুড়ায় দেখা হয়নি! যাই চট্ করে দেখে আসিগে—বলেই উমাকান্ত চলে গেলো।

খানিকটা চুপ করে সাধন বাবু বললেন: প্রিয়ব্রত বাবু ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো দাঁড়াচ্ছে দেখছি।

: ঘোরালো মানে? 'সিচুয়েশান সিরিয়াস' আমি বলি কী এ খবর দিয়ে একটা স্পেশাল এডিশন বের করলে হয় না?

: ঠিক বলেছেন। চলুন লড়াইর খবরটা কর্ত্তাকে দিইগে। উনি তো দপ্তরেই আছেন।

সাধন বাবু ও প্রিয়ব্রত বাবু কাগজের মালিক পতিতপাবন বাবুর কাছে গেলেন।

* * * *

'দৈনিক হরকরা'র একমাত্র মালিক পতিতপাবন বাবু দপ্তরে তাঁর নিজের ঘরে বসে ঘুমুচ্ছিলেন। এই দিবানিদ্রার একটি গৌণ কারণ আছে। সংবাদপত্র-জগতে পতিতপাবন বাবু বেশ জাঁদরেল লোক হলেও তাঁর নিজ অন্তঃপুরে কোন মর্য্যাদাই ছিল না। অবশ্য নিজ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার কোন চিন্তাই তিনি করেননি। অন্তত, করবার চেষ্টা করেননি। কারণ, পতিতপাবনের পত্নী সুভাষিণী দেবী কলহেতে এতো সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, এ জন্যে দৈনিক সমাচার থেকে পতিতপাবন বাবুকে বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল।

একবার সাপ্তাহিক 'কর্কট' পতিতপাবন বাবুর নিঃসহায় অবস্থার উল্লেখ করে বলেছিলেন—যিনি নিজের স্ত্রীকে কনট্রোল করতে

পারেন না, তিনি কোন্ কারণে চালের কন্ট্রোলের প্রতিবাদ করেন? শুধু কী তাই? 'কর্কট' পতিতপাবন বাবুকে কোন্ কোন্ দিন দুর্গতি, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল, কোন্ কোন্ দিন তাঁকে অভুক্ত থাকতে হয়েছিল, তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছিল।

কর্কটের জবাব পতিতপাবন বাবু বা তার কাগজ দেননি। স্বয়ং পতিতপাবন-গৃহিণী দিয়েছিলেন। তাও পত্রে নয় ছত্রে, অর্থাৎ ছাতার সাহায্যে। আর শুধু কি তাই? সুভাসিণী দেবী কর্কট-সম্পাদককে 'দাম্পত্য কলহ' সম্বন্ধে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'বার সাথে সাথে সারা দেশে এক বিশেষ আলোড়ন পড়ে যায় এবং বহু প্রবীণ দম্পতি এই প্রবন্ধ পড়ে তাদের কলহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আর এক ঘটনা ঘটেছিল এক জনসভায়। সভাপতি পতিতপাবন বাবু। হঠাৎ কী এক কারণে সভায় একটু চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং সভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের দল হিম-সিম খেয়ে গেলো। ব্যস্, আর কথা নেই। বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন পতিতপাবন-গৃহিণী। মুহূর্তে জনতা শান্ত হয়ে গেলো! এমন কি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের কান্না বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু আজ কয়েক দিন যাবৎ পতিতপাবন বাবু ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। এই ঝগড়াটা অবশ্যি এক তরফাই বলা যেতে পারে; কারণ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার সাহস পতিতপাবন বাবুর নেই।

এই কলহের মূল কারণ সুভাসিণী দেবীর ভ্রাতা বুটলো। বহু দিন ধরে বুটলো বেশ বহাল তবিয়তেই ভগিনীপতির অন্ন ধ্বংস করছিলেন। ছোট-খাটো দুই-একটা সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রও এ বিষয়ে পতিতপাবন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গেই পতিতপাবন বাবু বুটলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু আলোচনা বেশী দূর এগোয়নি। কারণ, প্রসঙ্গ উত্থাপন হওয়া মাত্র সুভাসিণী দেবী গালে হাত দিয়ে বললেন: কী বললে? বুটলো কাজ করবে! কাজ করতে করতে ছেলেটা মরে যাক্ আর কী! বালাই যাট, আমি থাকতে ওর কাজ করার কী দরকার?

বুটলোর অবশ্য এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। থাকবার কোন কারণও ছিল না; কারণ, সে ছিল থিয়েটার-ভক্ত এবং বন্ধু মহলে উদীয়মান অভিনেতা বলে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। সময়-সময় বোনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু-একটা নাটকও মঞ্চস্থ করে।

এই সব সৌখীন নাটকের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে একবার 'দৈনিক সমাচার' লিখলে: বাংলা দেশের এই সিনেমা-নাটকের [illegible] কারণ কী, তাহা কী দেশবাসী জানেন? নাটকের [illegible]তির কারণ বুটলো।

'সমাচারের' এই তীব্র মন্তব্য পতিতপাবন বাবুর কানে পৌছল। [illegible] গৃহিণীকে এ'কথাটা জানালেন। এই ব্যাপার নিয়ে গত [illegible]তে স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। রাগ করে স্ত্রী চেঞ্জে [illegible] গেছেন। অবশ্য, যাওয়ার সংকল্প অনেক দিন ধরেই ছিল কিন্তু [illegible] মেলেনি। এই ঝগড়া হবার পর সুবিধে হয়ে গেলো।

আজ পতিতপাবন বাবুও স্ত্রীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে দপ্তরে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলেন।

এমনি সময়ে নিউজ-এডিটার সাধন বাবু ও চীফ সব-এডিটর প্রিয়ব্রত বাবু তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

* * * *

: লড়াই! বলেন কী? প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলেন পতিতপাবন বাবু।

: হ্যাঁ স্যর, ট্যাঙ্ক, কামান, গোলা-বারুদ, প্লেন, আরো কতো কী? দেখে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধটা বেশ জম-জমাট হবে—সাধন বাবু বললেন।

: একেবারে হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব ওয়ার, বলেন প্রিয়ব্রত বাবু।

: কোন 'স্পেশাল এডিশন' বের করবো কী? আস্তে-আস্তে সাধন বাবু কথাটা পাড়লেন।

: বের করবো মানে? বের করেননি এখনও? কী যে করেন আপনারা! সমাচারের স্পেশাল-এডিশন এতক্ষণে হয়ত রাস্তায় হকারেরা বিক্রী করছে—পতিতপাবন বাবু বেশ রুক্ষস্বরেই বললেন।

: আপনার আদেশ না পেলে কী করে করি স্যর!

গত বার দেশনেতা বিজয়কেতু সমাদ্দারের মরবার ছয় ঘণ্টা আগে ওর মৃত্যু-খবর দিয়ে স্পেশাল-এডিশন বের করে কী হাঙ্গামাই না পোহাতে হয়েছিল! আমাদের স্পেশাল-এডিশন পড়বার জন্যে লোকটা সে যাত্রা টিকে গেলো।

সাধন বাবুর কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। বিজয়কেতু সমাদ্দারের মৃত্যু-খবর 'কভার' করেছিল 'গরম খবর' নিউজ-এজেন্সী। খবরটা ছিল 'সুপার ক্লাস'।

Deshbhakti Bijoy ketu Samaddar died here to day. আর সেই খবরের উপরে ছিল এম্বার্গো—**Not to be Published or Broadcast before he dies**—দৈনিক হরকরা এম্বার্গো লক্ষ্য করে নি। বিজয়কেতু সমাদ্দারের মৃত্যু-খবর দিয়ে বিশেষ সংখ্যা বাজারে বেরিয়ে গেলো।

রোগশয্যায় বসে বসে বিজয়কেতু 'স্পেশাল-এডিশন' পড়লেন। তার পর হেসে ছেলেকে ডেকে বললেন: ওরে দেখে আয় তো আমার জন্যে ময়দানে কোন শোকসভার আয়োজন হয়েছে কি না?

ছেলে এসে জানালে যে শোকসভার কোন আয়োজন এখনও হয়নি।

বিজয়কেতু ছেলেকে বললেন: ওরে, হরকরাকে বলে দে, শোক-সভার আয়োজন না হলে আমি অক্কা পাচ্ছিনে।

বিজয়কেতুর মৃত্যুর স্কুপটা দৈনিক সমাচার 'মিস' করেছিল। তাই বিশেষ সংখ্যা বের করতে প্রায় ছয় ঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল। বড়ো-বড়ো হেড লাইন দিয়ে তারা বিশেষ সংখ্যা বের করলে। লিখলে: দেশভক্তি বিজয়কেতুর মৃত্যুতে দেশে গভীর শোকের ছায়া। হাজার-হাজার নর-নারীর শ্মশানঘাটে স্মৃতি-তর্পণ।

এ খবরটাও বিজয়কেতুর কাণে গেলো। পড়ে খুশীই হয়েছেন বোঝা গেলো। বললেন: না—এবার দেখতে পাচ্ছি যে দেশবাসী সত্যিই আমায় ভালবাসে। আর নয়, এবার কাগজওয়ালাদের কথা রাখতে হবে।

'দেশভক্তি বিজয়কেতু শেষ-নিঃশ্বাস ফেললেন।'

আজ পতিতপাবন বাবুকে সাধন বাবু আবার সেই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সত্যিই তো, লোকটা বেঁচে থাকতে হরকরা এতো পাব্লিসিটি দিলে, আর মরবার সময় 'হরকরার' কথা না রেখে 'সমাচারের' কথা রাখলে! ঘোর অন্যায়।

কিন্তু পতিতপাবন বাবু দমবার পাত্তর ন'ন। 'সমাচারের' কাছে তিনি হার মানতে রাজী ন'ন। বললেন: কে দিয়েছে খবরটা?

'গরম খবর' নিউজ এজেন্সী—সাধন বাবু জবাব দেন।

আর দেরী নয়। এক্ষুণিই স্পেশাল-এডিশন বের করে দিন। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে বেশ একটা কড়া সম্পাদকীয়। রমণী বাবু কোথায়? ডাকুন না তাকে?

হরকরার সম্পাদক রমণী বাবু, কোন দিনই তিনি ঝামেলার পক্ষপাতী ন'ন। সাধন বাবুর উপর কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে খালাস। দিনে শুধু মাত্র একটা সম্পাদকীয় লেখেন। তা-ও লিখতে কষ্ট হয় না। আর বিশেষ করে বিদেশী খবর হলে তো কথাই নেই। কারণ, তাঁর সম্পাদকীয়র প্রথম প্যারাগ্রাফে থাকে 'লণ্ডন টাইড' কাগজের সম্পাদকীয়র প্রথম প্যারাগ্রাফের অনুবাদ। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে থাকে লণ্ডন হারিকেন এক্সপ্রেসের সম্পাদকীয়'র অনুবাদ। তৃতীয় প্যারাগ্রাফে থাকে 'পিপলস ওয়ার্কার' কাগজের শেষ প্যারাগ্রাফ।

এই ভাবে সম্পাদকীয় লেখা রমণী বাবু বিশেষ ভাবে পছন্দ করেন। কারণ তিনি বলেন যে, প্রথম প্যারাগ্রাফে থাকবে নিরপেক্ষ মতবাদ, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে থাকবে রক্ষণশীল দলের মতবাদ এবং শেষ প্যারাগ্রাফে থাকবে গরম-গরম বামপন্থী বুলি। দেশের জন্যে, জনসাধারণের জন্যে। এই ধরণের সম্পাদকীয় নাকি জনসাধারণ বিশেষ পছন্দ করে।

আর দিশী খবর হলে তো তার উপর সম্পাদকীয় লিখতে কোন বালাই নেই। শুধু বিলেতি সম্পাদকীয়গুলোকে একটু 'রিটাচ' করে দিশী ধাঁচে লিখলেই হলো। এই তো সেদিন শরণার্থীদের উপর একটা কড়া সম্পাদকীয় তাঁকে লিখতে হয়েছে। 'প্যাপ্যাল' দেশে শরণার্থীদের নিয়ে যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে, তারই উপর 'লণ্ডন টাইড' যে সম্পাদকীয় লিখছে তিনি তারই উপর ভিত্তি করে এই সম্পাদকীয় লিখেছেন। লোকপরম্পরায় তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর এই সম্পাদকীয় সবারই খুব মনোমত হয়েছে। এমন কি, দেশের সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অবশ্য রমণী বাবুর সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া আর একটা বাই আছে। সেইটি হলো ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া। আগাথা ক্রিষ্টি, বনান ডয়েল, এডগার ওয়ালেস, কিরীটি রায় তাঁর মুখস্থ। আজ বসে বসে তিনি 'মোহন সিরিজের' বার্লিনে মোহন পড়ছিলেন।

এমনি সময় চাপরাশী এসে খবর দিলে যে, 'পতিতপাবন বাবু তাঁকে ডাকছেন।

* * *

: রমণী বাবু, ভীষণ কাণ্ড—পতিতপাবন বাবু বলেন।

মোহনের বেশ তখনও রমণী বাবুর কাটেনি। কাজেই তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলেন, কী হলো স্যর, মোহন ধরা পড়েছে কী?

রমণী বাবুর ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার বাই পতিতপাবন বাবু জানেন। তাই একটু রেগে গেলেন। বললেন: আপনি এখনও ঐ ছাই-পাঁশগুলো পড়ছেন? কী যে করেন আপনি!

রমণী বাবু ইতিমধ্যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও একটু লজ্জা বোধ করলেন।

পতিতপাবন বাবু বলতে লাগলেন: না, আপনাকে দিয়ে কিস্যু হবে না। সাধন বাবু, আপনি কাগজ-পেনসিল নিয়ে আসুন। আজকের সম্পাদকীয় আমি নিজেই লিখবো।

পতিতপাবন বাবুর এই সর্ব্বপ্রথম সম্পাদকীয় লেখা। সম্পাদকীয় বললে ভুল হ'বে, এই তাঁর সর্ব্বপ্রথম কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসা। বিবাহিত জীবনেও তাঁকে কোন দিন প্রেম-পত্রাদি লিখতে হয় নি, কারণ প্রেমপত্রে সুভাষিণী দেবীর আদৌ বিশ্বাস ছিল না।

পতিতপাবন বাবু বলতে থাকেন, সাধন বাবু, টুকে নে'ন।

•••আবার লড়াই! এ তো লড়াই নয়, এ তো রীতিমত জেহাদ—

তার পর রমণী বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন: রমণী বাবু, আমাদের কাগজের পলিসি কী?

মালিকের প্রশ্ন শুনে রমণী বাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। পলিসিটা যে কী সেটা রমণী বাবুও ঠিক জানেন না। কারণ, বিদেশী সংবাদ দেখে তাকে দৈনন্দিন পলিসি ঠিক করতে হয়। তাই একটু আমৃতা আমৃতা করে বললেন: উইক পলিসি এ্যাট হোম, ষ্ট্রং ফরেইন্ পলিসি।

: তা হ'লে ফতেনগরটা কোথায়? দেশে না বিদেশে? সাধন বাবু, ফতেনগর দিশী না বিদেশী—

সাধন বাবুর হয়ে চট্‌পট্ জবাব দিলেন প্রিয়ব্রত বাবু। বললেন: ফতেনগরটা যে কোথায় সেটা এখনও গরম খবর নিউজ এজেন্সী জানায় নি। আমি বলি কী, কড়া-নরম সুর মিলিয়ে বেশ একটা কিছু লিখলেই হবে।

: ঠিক বলেছেন প্রিয়ব্রত বাবু! আচ্ছা লিখুন, সাধন বাবু—যুদ্ধ চাই নে। চাই শান্তি। আচ্ছা 'শান্তি' বানান কী রমণী বাবু?

: স্থায়ী শান্তি চাইলে তালব্য শ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী 'শান্তি' হলে স হলেই চলবে। কিন্তু ঐ শান্তি বানান নিয়েই জগতে বড়ো ঝামেলা চলছে স্যর! ঐ বানান-সমস্যা সমাধান না হওয়া অবধি এই জগতে আর শান্তি ফিরে আসবে না। আমি বলি কী, ঐ শান্তি শব্দের বদলে অন্য কিছু একটা লিখলেই চলবে। বরং লিখতে পারি•••

যুদ্ধ চাইনে—চাই দুর্বৃত্তের দমন।

'বার্লিনে মোহন' বইতে রমণী বাবু পড়ছিলেন যে, মোহন দুর্বৃত্ত দমনে বের হয়েছেন। এমনি ভাবে যে এই শব্দটা ব্যবহার করতে পারবেন, এটা তিনি আশা করেননি। কিন্তু যথোপযুক্ত শব্দের ব্যবহার করতে পেরে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন।

ঠিক কথা। চাই দুর্বৃত্তের দমন•••আচ্ছা, বাকী কথাগুলো আপনিই লিখে দিন। রমণী বাবু, কিন্তু দেখবেন সম্পাদকীয় যেন বেশ জোরালো হয়।

: সে কথা আপনি চিন্তা করবেন না। এমনি জোরালো প্রবন্ধ লিখবো যে, লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। এই তো কাল 'হারিকেন এক্সপ্রেসে' তৃতীয় মহাসংগ্রামের উপর বেশ জুৎসই সম্পাদকীয় লিখেছে। তারই উপর ভিত্তি করে লিখবো।

অনেক ক্ষণ ধরে সাধন বাবু মনিব-সম্পাদকের কথা শুনছিলেন। কোন মন্তব্য করেননি। এবার বললেন; একটা কথা আছে স্যর! লড়াই বাধলো। ফ্রন্টে কাউকে এই লড়াই রিপোর্ট করতে পাঠালে হয় না?

: মানে ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে War correspondent সংশোধন করে বলেন প্রিয়ব্রত বাবু।

রমণী বাবু মাত্র সেদিন ভোরে আগাথা ক্রিষ্টির এক বইতে যুদ্ধের সময় গুপ্তচরদের তৎপরতা সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়েছেন। শুধু তাই নয়। এই মাত্র তিনি পড়ছিলেন যে মোহন বার্লিনে গিয়ে 'এ্যাটম বোমার' গোপন তথ্য বের করবার কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে। তার কাগজেও ফতেনগরে গুপ্তচরদের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ করতে তিনি ইচ্ছুক। এই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদই একমাত্র ছাপা যায়। এখন রমণী বাবু ভাবলেন যে, ফ্রন্টে একজন সংবাদদাতা পাঠান যুক্তিসঙ্গতই হবে। সায় দিয়ে বললেন: 'দ্যাটস্ রাইট। উই মাষ্ট হ্যাভ এ রিপোর্টার এ্যাট ফ্রন্ট।' আমি বলি কী প্রিয়ব্রত বাবু বা উমাকান্তকে পাঠান হোক। কথাটা বলেই রমণী বাবু উৎকণ্ঠার সঙ্গে পতিতপাবন বাবুর মুখের দিকে উত্তরের জন্য তাকিয়ে রইলেন।

এবার পতিতপাবন বাবুর ভাববার পালা। কথাটা মন্দো বলেননি সাধন। ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট পাঠিয়ে তিনি দৈনিক সংবাদপত্রকে এক হাত দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো টাকা। একটা লোক পাঠাতে যে অনেক খরচ। আচ্ছা এমন কিছু করলে হয় না, টাকাও খরচ হলো অথচ ঘরের টাকা ঘরেই রইলো।

দি আইডিয়া। বুটলোকে পাঠালে কেমন হয়? কিন্তু ওকে পাঠানো ঠিক হবে কী? যদি গিন্নী আপত্তি করেন? আপত্তি করবার সুযোগ পাবে কখন? গিন্নী তো চেঞ্জে গেছেন। বুটলোর একটা হিল্লে হয়ে যাবে আর ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে।

: কথাটা মন্দো বলেননি আপনারা। কিন্তু আমি বলছিলাম কী, এ লড়াইতে ইয়ং ব্লাড পাঠান দরকার। কী বলেন রমণী বাবু! এ ছাড়া ধরুণ উমাকান্ত প্রিয়ব্রত বাবুর পরিবার আছে। চিঠির কথা তো বলা যায় না। ধরুণ যদি অঘটন ঘটে। না, রমণী বাবু, এ সব লড়াইর ব্যাপার ছেলে-ছোকরার কাজ। আমার শালা বুটলোকে জানেন তো। খাসা কবিতা লেখে। আমি বলি কী, ঐ রিপোর্টার হয়ে যাক ফ্রন্টে। সাধন বাবু, ওকে আমি পাঠিয়ে দেবো খন আপনার কাছে। কাজ কর্ম্ম সব বুঝিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, টাকা-পয়সার জন্যে চিন্তে করবেন না।

পতিতপাবন বাবুর কথা শুনে প্রিয়ব্রত বাবুর মুখটা শুকনো হয়ে যায়। বড়ো আশা করেছিলেন যে ফ্রন্টে যেতে পারবেন। 'ডেস্কে' বসে আর কপি 'এডিট' করতে ভালো লাগে না। ছুত্তোর ছাই! মালিকের শালার মুণ্ডুপাত করতে করতে প্রিয়ব্রত বাবু বেরিয়ে গেলেন।

* * * *

একটু বাদে মনিবের ঘরে সাধন বাবুর আবার তলব হলো।

পতিতপাবন বাবু জিজ্ঞেস করলেন: কদ্দুর হলো, আপনার স্পেশাল-এডিশনের? বিকেল চারটা যে বাজে, এখনও কাগজ 'বেড়ে' দেননি। কী যে করেন আপনারা।

না স্যর, বেশী বাকী নেই। সাধন বাবু জবাব দেন।

: দেখে-শুনে দিয়েছেন তো? প্রথম পাতায় বেশ বড়ো করে ছাপবেন কিন্তু। ঐ যে আপনাদের ইয়ে কী বলে···বেশ বড়ো-বড়ো অক্ষরে ছাপা। বলুন না রমণী বাবু, ওগুলো কী বলে—

রমণী বাবু সামনেই বসে ছিলেন। কিন্তু তিনি জবাব দেবার আগেই সাধন বাবু বললেন; ব্যানার হেড লাইনের কথা বলছেন তো স্যর! ও সব তৈরী। কিস্সু ভাববেন না, দেখবেন আমাদের স্পেশাল-এডিশন হু-হু করে বিকিয়ে যাবে।

সাধন বাবুর জবাব শুনে পতিতপাবন বাবু খুসীই হন, বলেন: হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যানারগুলো বেশ জমকালো করে দেবেন। দেখলে যেন সবার তাক লেগে যায়। আর সবুজ কালিতে দেবেন কিন্তু। মনে নেই গতবার 'সমাচার' নাট্যসম্রাজ্ঞী বিদ্যুৎলতার মৃত্যুতে 'লাল কালিতে' ব্যানার দিয়েছিল? তারপর, কী লিখলেন ব্যানারে। 'ফতেনগরে সংগ্রাম শুরু'—জবাব দেন সাধন বাবু।

: না, না আর একটু গরম-গরম ব্যানার দিন, যাতে চা'য়ের সঙ্গে খবরটা পড়তে-পড়তে সবাই বেশ তাজা হয়ে ওঠে। একটু যুৎসই ব্যানার দিন না, রমণী বাবু!

রমণী বাবু তখন বিভোর হয়ে ভাবছিলেন দস্যু মোহনের কথা। এতোক্ষণে মোহন হয়তো বার্লিনের সীমান্তে এসে পৌঁছেচে। আর একটু বাদে সে হয়তো হিটলারের সঙ্গে মোলাকাৎ করবে। এমনি সময় পতিতপাবন বাবুর ডাকে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো। বললেন: ব্যানার হেড লাইনের কথা বলছেন স্যর!

নিশ্চয়, খুব জবরদস্ত ব্যানার দিন সাধন বাবু, যাতে পাঠক উত্তেজিত হয়ে উঠে। আচ্ছা, লিখুন ব্যানার হেড লাইন······"ফতেনগরে লোমহর্ষক লড়াই!"

[ক্রমশঃ।

যদি ভাল-মন্দ সকল কর্মের হাত থেকে রেহাই পেতে চাও তাহ'লে ভগবানের নাম, জপ, পূজা, পাঠ কর। সব সময় সদসৎ বিচার কর। শুভ কর্ম অশুভ কর্মকে দাবিয়ে দেয়, জড় নষ্ট করতে পারে না। এক ভগবানের নামেই জীবের শুভাশুভ কর্মের নাশ হয়ে মন পরিষ্কার হয়; তখন ভেতরের সত্য বস্তু জানা যায়।

—শ্রীশ্রীমা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

দেবেশ দাশ

রাজকন্যাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় তুলে নিয়ে উল্কার মত বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন রাজকুমার।

রাক্ষসের দল বড় বড় মূলোর মত দাঁত আর থামের মত হাত নিয়ে 'হাউ মাউ খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ' করে তেড়ে এল রাজকন্যা আর রাজপুত্তুরকে ধরবার জন্য। পথে হল ভীষণ যুদ্ধ কিন্তু ওদের ধরতে পারবে কে?

রাজকন্যার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ আর তেমনি স্বয়ংবর করে নেওয়া বরের উপর টান! আর রাজপুত্তুর? তাঁর বীরত্বের সামনে যে দাঁড়াতে পারে সে এখনো মায়ের পেটে। আর তার উপর রাজপুত্তুর করেছেন ধনুকভাঙা পণ—রাজকন্যাকে রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করবেনই। কাজেই শত্রুরা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

যদি পেরে উঠত, তাহলে ঠাকুমার ঝুলির গল্পই হত না। শীতের ভর-সন্ধ্যেয় ঢুলু-ঢুলু চোখে ঠাকুমার লেপের তলায় রেড়ীর তেলের বাতির আঁধারে খোকামণির গল্প শোনাটাই মাটি হত তাহলে। কাজেই রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে হবেই। রাজপুত্তুরকে রাক্ষসদের হারাতে হবেই।

এ ত আর বাংলা সিনেমার গল্প নয় যে, নায়ক-নায়িকার মধ্যে অন্তত একজনকে—আর দুজনকে হলেই আরো ভাল—চিতার আগুনে শুতে হবেই। সঙ্গে সঙ্গে তার ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরোবে গলা-ফাটানো সুরে পিলে-চমকানো, থড়ি, হৃদয়-গলানো গান। যতক্ষণ তা না হচ্ছে গল্প শেষ হতেই পারে না।

কিন্তু ঠাকুমার লেপের তলায় গরমাগরম আরামে এমন ধারা বেয়াড়া উপসংহারে গল্প চলবে না। রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনবে রাজপুত্তুর। রাক্ষসরা লড়াইয়ে হেরে যাবে আর আকাশ থেকে হবে পুষ্পবৃষ্টি পক্ষীরাজের মাথায়। তবেই না নিশ্চিন্দি আরামে ঠাকুমার কোল ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়বে খোকামণি।

কিন্তু অন্তত একবার—
আমার গল্প ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।

এমন একটা সুবিধাজনক উপসংহার হল না। নটে গাছটি বিষ-মাখানো কাঁটা-গাছ হয়ে নতুন করে গজাল, উত্তুরে হাওয়ায় তার কাঁটা সোঁ-সোঁ করে ছুটে এসে চার ধারে ছড়িয়ে পড়ল। আর সব জায়গাটা বিষের জ্বালায় জ্বলে গেল। রাজপুত্তুর আর রাজকন্যা দু'জনেই মারা গেল রাক্ষসের হাতে। রাজ্য গেল ছারখারে।

পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী ঠিক সেই রূপকথারই গল্পের মত রোমাঞ্চকর। সেই কাহিনীর মতই শুধু রাক্ষস সৈন্যদের হারিয়ে রাজপুত্তুর রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে বসবাস করতেন, যদি রাজকন্যার বাবা উত্তর থেকে শত্তুরের কাঁটা আমদানী না করতেন। কাজেই "এর পর তারা চিরকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল" এমন একটা আনন্দের পরিণতি তাদের কপালে ঘটল না।

অজয়মেরু অর্থাৎ অজমের সহরের সব চেয়ে বড় বীর ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। সোমেশ্বর চৌহানের রাজধানী ছিল আজমীঢ়ে আর অনঙ্গপাল তোমরের ছিল দিল্লীতে। কনৌজে সে সময় রাজা ছিলেন বিজয়পাল। বিজয়পাল দিল্লী আক্রমণ করলে অনঙ্গপাল সোমেশ্বরের সহায়তা চেয়ে পাঠালেন। দুজনে মিলে সে সময়কার উত্তর-ভারতের সব চেয়ে বড় অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা বিজয়পালের হাত থেকে দিল্লী রক্ষা করলেন।

তার পর পৃথিবীর ইতিহাসে সব সময় যা হয়ে এসেছে তাই হল। অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহের শান্তি হল বিবাহে। অপুত্রক অনঙ্গপালের দুই মেয়ে ছিল। একজনের বিয়ে হল সোমেশ্বরের সঙ্গে আর ছোট জনেরও বিয়ে দেওয়া হল বিজয়পালের সঙ্গে। আগেকার দিনে বিয়ের মন্ত্র না হলে সন্ধির মন্ত্রণা ঠিক মত জমত না।

কাজেই বিজয়পালকে ঠিক মত ঠাণ্ডা করবার জন্য একটি মেয়ে তার হাতে সঁপে দিতে হল।

কাজে কাজেই পৃথ্বীরাজ আর জয়চাঁদ দুই ভায়রা ভাইয়ের ছেলে। সম্পর্কটা যখন এত কাছের, হিংসা-জ্বালা বেশী হতেই হবে। না হলে যে হিন্দুস্থানের হাওয়ার মান থাকে না।

তার উপর জয়চাঁদ বড় রাজ্যটার অধিকারী হলেও পৃথ্বীরাজই ছিলেন অনঙ্গপালের প্রিয়। আবার পৃথ্বীরাজকেই তিনি দিল্লীর রাজপাট দিয়ে গেলেন। এমনিতেই জয়চাঁদের মনে জমা ছিল অনেক অসন্তোষ। এবারে আগুনে পড়ল ঘিয়ের আহুতি।

পূর্বপুরুষের সেই ধারাটা কি আমরা এখনো ছাড়তে পেরেছি? এখনো যে আমরা সব সইতে পারি, পারি না শুধু আত্মীয়-স্বজনের উন্নতি।

জয়চাঁদও পারেননি। পৃথ্বীরাজের মত সুপুরুষ আর বীরপুরুষ রাজোয়ারাতে নাকি আর কখনো কেহ হননি। তাঁর সারাটা জীবন ছিল বীরত্বের এক গাছা জয়মালা। পৃথিবীতে শিভ্যালরী যত দিন থাকবে, পৃথ্বীরাজের নামও থাকবে তত দিন। বীরগাথায় চৌহানদের আসন খুব উঁচু। কিন্তু সবার উপরের সিংহাসন পৃথ্বীরাজের।

চারণদের গানে গানে তার বহু কাহিনী আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। তার রসিকতা, জীবনকে শিল্পীর মত উপভোগ করা, আর মরণকে বীরের মত বরণ করা চারণদের বহু গানের মাল-মশলা জুগিয়েছে। তাঁর সময়কার প্রত্যেক রাজার সভাতেই হত তাঁর গান। প্রতি বীরের মনে ছিল সে জন্য হিংসা। প্রতি রাজকন্যার নয়নে তাঁর স্বপ্ন। ইহলোকে রূপকথার রাজপুত্র যদি কেহ হয়ে থাকেন, তিনি হচ্ছেন পৃথ্বীরাজ।

সেই রূপকথার রাজপুত্রের গলায় স্বয়ংবর-সভায় মালা পরিয়ে দিলেন তাঁর সব চেয়ে বড় শত্রু রাজা জয়চাঁদের মেয়ে সংযুক্তা।

আগুন জ্বলে উঠল সমস্ত উত্তর-ভারতে। জ্বলে উঠল জয়চাঁদের মনে। এমন কি, স্বয়ংবর-সভায় নিমন্ত্রিত আর সংযুক্তার প্রত্যাখ্যাত

সব রাজাদের মনে। সে আগুনের লেলিহান শিখায় ধরা পড়ল সমস্ত দেশের স্বাধীন হিন্দু রাজ্যগুলি; একে একে—রাজোয়ারা থেকে বাংলা পর্য্যন্ত।

দিল্লী ও আজমীঢ় দুইয়েরই রাজা আর এত নাম-যশের অধিকারী পৃথ্বীরাজের সমৃদ্ধিতে জয়চাঁদের হিংসার অন্ত ছিল না। তাই নিজেকে একচ্ছত্র রাজা বলে স্বীকার করিয়ে নিবার জন্য জয়চাঁদ রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কোন রাজা যদি সে যজ্ঞে এসে হাজির হতে দ্বিধা বোধ করেন, সে দ্বিধাকে দূর করবার জন্য দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল রাজকন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর।

সেই সংযুক্তা, যাঁর রূপের বর্ণনা হচ্ছে যে—

কুণ্টিল কেস সুদেস পৌন পরিচিয়ত পিক্ক সদ।
কমল গন্ধ, বয়-সন্ধ, হংসগতি চলত মন্দ মন্দ।
সেত বস্ত্র সোহৈ সরীর, নখ স্বাতি-বুন্দ জস।
ভ্রমর ভবহিঁ ভুল্লহিঁ সুভাব, মকরন্দ বাস রস।
নয়ন নিরখি সুখ পায় সুক যহ সুদিব্য মূরতি রচিয়।
উমাপ্রসাদ হর হেরিয়ত মিলতি রাজ প্রথিরাজ জিয়।

কুঞ্চিত কেশে সুন্দর মোতির (অর্থান্তরে, ফুলের) মালা গাঁথা রয়েছে দেখা যাচ্ছে; কোকিলের মত মিষ্টি তাঁর স্বর; পদ্মের গন্ধ তাঁর গায়ে। বয়ঃসন্ধি হয়েছে তাঁর। তিনি হংসগতিতে ধীরে ধীরে যাচ্ছেন। শ্বেত বস্ত্র গায়ে শোভা পাচ্ছে। নখ মুক্তার মত চক-চক করছে। ভ্রমর তাঁর অধরামৃতরস ও পদ্মগন্ধের জন্য ভুল করে তাঁর দিকে গুঞ্জরণ করছে। এ রকম রূপের ছটা দেখে শুকপাখী খুব আনন্দিত হল আর ভাবল যে, এমন অলৌকিক রূপসম্পন্ন মূর্ত্তি যখন সৃষ্টি হয়েছে, হরগৌরীর প্রসাদ চাচ্ছি, যেন রাজা পৃথ্বীরাজকে ইনি স্বামীরূপে পান।

হিন্দী ভাষার আদিকবি ও মহাকবি রাজস্থানী চান্দ বরদাইয়ের 'পৃথ্বীরাজ রাসো' মহাকাব্যে এ রকম রসাল বর্ণনায় অনেক জায়গাতেই শুক সারী ডাকিনী-যোগিনী বা নানা রকম অলৌকিক প্রাণী প্রভৃতির মুখ দিয়ে কথা বলান হয়েছে। রাসো মহাকাব্যে সংস্কৃত ছাড়া আরবী ফারসী কথাও অনেক আছে আর রাজস্থানী চলিত ভাষার ত কথাই নেই। প্রাচীন হিন্দী রচনার প্রথম পরিচয় আমরা পাই চাঁদের লেখনীতে। তিনি জন্মেছিলেন লাহোরে আর মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর বহু আলাপ-পরিচয় ও যাতায়াত ছিল। পৃথ্বীরাজের তিনি সভাকবি ও অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ ছিলেন। প্রাচীন বাংলা [illegible] ভাষার সঙ্গে প্রাচীন রাসো মহাকাব্যের ভাষার মিল ও সাদৃশ্য যে কতখানি তা কাউকে দেখিয়ে দিতে হবে না। শুধু বানানের সামান্য তফাৎটুকুর পর্দা তুলে পড়ে দেখলেই বুঝা যাবে। প্রাচীন হিন্দীর জায়গায় জায়গায় দরকার মত সর বদলে শ, জর বদলে য, নর বদলে ণ আর ঈ চিহ্নের বদলে হ্রস্ব পিড়ে নিলেই কথার মানে বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

পদ্মিনী নারীর যে সব শাস্ত্র মত চিহ্ন থাকবার কথা তার সবই সংযুক্তা (রাসোর ভাষায় সংযোগিতা) ছিল। পৃথ্বীরাজও কম ছিলেন না। "কেমন বীর মূরতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা" রবীন্দ্রনাথের এই কথার সার্থকতা পাওয়া যায় পৃথ্বীরাজের বর্ণনায়।

সম্ভরি-নরেস সোমেসপুত দেবত্ব রূপ অবতার ধুত।
সামন্ত সুর সব্বে অপার ভুজান ভীম জিমি সার ভার।
জিহি পকরি সাহ সাহাবদ্দীন তিহুঁ বের করিয় পানীপ হীন।
সিংগিণি সুসদ্দ গুনি চঢ়ি জঞ্জীর চুক্কই ন সবদ বেধংত তীর।
বলি বৈন করণ জিমি দান পান সত সহস সীল হরিচন্দ সমান।
সাহস সুকম্প বিক্রম জু বীর দানব সুমও অবতার ধীর।
দস চ্যারজানি সব কলা ভূপ কন্দ্রপ্প জান অবতার রূপ।

সম্বর দেশের রাজা সোমেশ্বরের পুত্রের দেবতার অবতারের মত রূপ। যেন কোন দেবতা অবতারের রূপ নিয়ে নেমে এসেছেন। তার বীর সামন্তের লেখাজোখা নেই। তার বাহু খুব জোরালো আর লোহার মত ভারী। তিনি তিন বার শাহাবুদ্দিন বাদশাকে (শাহাবুদ্দিন ঘোরীকে) যুদ্ধে বন্দী করেছিলেন এবং পরাজিত করে শ্রীহীন করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পশুপক্ষীর আওয়াজ শুনেই শব্দভেদী বাণে তাদের বিদ্ধ করতে পারতেন। কথা দিয়ে কথা রাখতে তিনি বলিরাজার মত ছিলেন, কর্ণের মত ছিলেন দাতা আর শীলতায় ছিলেন সহস্র হরিশ্চন্দ্রের মত। ধীর আর বীর তার মধ্যে সাহস শুভকর্ম ও পরাক্রম এত ছিল যে উন্মত্ত দানবের অবতার বলে মনে হত। চৌদ্দ বিদ্যা ও সব কলা তার জানা ছিল। সাক্ষাৎ কামদেবের অবতার বলে মনে হত।

এই যে পৃথ্বরাজ (রাসোর ভাষায় প্রথিরাজ) যিনি

"সহস-কিরণ ঝলহল কমল রতি সমীপবর বিন্দ"

তার সুখ্যাতি শুনে রাজকন্যার সমস্ত অঙ্গে রোমাঞ্চের তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল।

চাঁদ কবির আদি হিন্দী মহাকাব্য পড়তে পড়তে আদি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর কথায় এসে মুরজমন্দ্রে কাণে বাজতে লাগল—

ঘোরীর সঙ্গে ছিল নলগোলা (প্রাচীন চিত্র)

সুনন প্রবন প্রথিবাজ জস উগংগ বাল বিধি অংগ।
তন মন চিত চহুঁয়ান পব বস্যো সুতবহ রংগ।

সংযুক্তার তনু মন ও চিত্ত প্রেমতরঙ্গে চৌহানের প্রতি আসক্ত হয়ে গেল। কিন্তু চৌহান কোথায়?

তিনি স্বয়ংবর-সভায় এলেন না। তাঁকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যে রাজারা আসবেন তাঁদের জয়চাঁদকে রাজচক্রবর্তী বলে মেনে নিতে হবে। দিল্লীর অধীশ্বর বাদশারা পরের যুগে জগদীশ্বর বলে নিজেদের ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু দ্বাদশ শতকে তখনো সে সম্মান দিল্লীর হয় নি। অবশ্য মহাভারতের সময় থেকেই ইন্দ্রপ্রস্থ অঞ্চলের গুরুত্ব সবাই বুঝতে আরম্ভ করেছিল। যুধিষ্ঠিরও এ জন্যই এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। অবশ্য তখনো 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' একথা মানবার মত অবস্থা হয় নি।

রাগ করে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে একটা ছোট কাজের ভার দিলেন এই রাজসূয় যজ্ঞে। কাজেই তিনি আসেন কি করে? এদিকে জয়চাঁদ অনুপস্থিত রাজার একটা সোনার মূর্ত্তি তৈরী করে সভার দরজায় দরোয়ানের জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন!

বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের দরজা পাহারা দিচ্ছিলেন যে মহারাজা তাঁর সোনার মূর্ত্তি পাহারা দিতে লাগল কনৌজের রাজার রাজসূয় যজ্ঞের সভার দরজায়।

রাজকন্যা কাকে দেবেন মালা?

কত স্বয়ংবর-সভার কথাই না কাব্যে পাওয়া যায়। দময়ন্তী নলকে ভাল বেসেছিলেন। কিন্তু বরণমালা পরাতে এসে দেখলেন, দেবতারা নলের ছদ্মবেশ ধারণ করে বসে আছেন। নিজের বুদ্ধি আর ভালবাসার জোরে তিনি আসল প্রেমিককে খুঁজে বের করলেন। দেবতাদের দল তাকে ঠকাতে পারল না। সীতা বা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে কোন মার-প্যাঁচ ছিল না। কারণ যিনি ধনুর্ভঙ্গ করতে পারবেন তিনিই সীতাকে পাবেন। যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন দ্রৌপদী তাঁকেই দেবেন বরণমালা। কিন্তু সীতা বা দ্রৌপদী কা'কেও ত পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে চোখে না দেখা এমন কি গরহাজির প্রিয়কে বরণ করতে হয়নি?

অপেক্ষাকৃত একালের সাধারণ রক্ত-মাংসের মানবী সংযুক্তাকে সেই বড় কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হল। মন যাকে চায় তাকে পাওয়ার নেই কোন উপায়। না আছেন তিনি উপস্থিত, না পারবেন তিনি উপস্থিত হতে, তাকেই বরণ করা হয়েছে এ খবর পেয়ে। এমন কি তিনি যে স্বয়ংবরা সংযুক্তাকে গ্রহণ করতে চাইবেন কি না তা পর্য্যন্ত জানা নেই। যদি বা চান, বিপদ ও শত্রুতা ত কম হবে না তাতে?

একালিনী তরুণীরা বাপ-মায়ের অবাঞ্ছিত জনের প্রেমে পড়ে সেকালের স্বয়ংবর প্রথার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে করে যে, হায়, হঠাৎ যদি কোন মন্ত্রবলে স্বয়ংবর, গন্ধর্ব বিয়ে, রাক্ষস বিয়ে, এসব সুন্দর সুন্দর প্রাচীন প্রথাগুলি ফিরে আসত, তাহলে কত সমস্যাই না সহজে মিটে যেত। কিন্তু সে পথেও যে কত বাধা, সে কমলেও যে কত কণ্টক, তা একবার একালিনী প্রেমিকারা বিবেচনা করে দেখুন।

আর প্রেমিকদের দিকটাও ভুললে চলবে না। একালে আইন জিনিষটা অত্যন্ত বেদরদী। তাকে বাঁচিয়ে না চললে বিরহ যাপন করতে হবে সরকারী রামগিরিতে, সে কথা হামেশা মনে করে পা টিপে টিপে প্রেমের পথে এগোতে হয়।

হলপ করে প্রত্যেক সুরসিকা পাঠিকা বলে দেবেন যে, এ রকম অবস্থায় কোন একালিনী অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত প্রেমিকের গলায় মালা দেবার জন্য ব্যাকুল হলেও সাধারণতঃ হাতে-কলমে নিজেকে ধরা দেবেন না। শেলী আর রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে, মেট্রো নিউ এম্পায়ারের পর্দায় নিজের মনের ছবি দেখে সন্ধ্যার পর লেকের পাড়ে নির্জ্জনে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়ে ফেলে বাড়ী ফিরে কোন মতে দু'মুঠো খেয়ে নেবেন। বড় জোর পাতে ইলিশ মাছের পাতুরীটা অনাদরে পড়ে থাকতে পারে।

কিন্তু রূপকথার নয়, ইতিহাসের সংযুক্তা খাঁটি রাজপুতানী। সভা-ভর্ত্তি রাজাদের বিস্ময় ও রাজচক্রবর্ত্তী বাপের বিদ্বেষ পুরোপুরি অবহেলা করে তিনি এগিয়ে চললেন। রাজসভার সব উপস্থিত রাজাদের বংশ, রূপ ও গুণ বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন কবি। সে সব কানে না তুলেই চললেন দুয়ারের দিকে। হয়ত পিতা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হয়ত দুয়ারের কাছে গ্যালারীতে বসা উপরাজ ও সামন্ত রাজারা তাদেরই কারো কপালে, থুড়ি গলায়, মালা এসে পৌঁছাবে—এই আশায় মাথা হেলিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু রাজকন্যাকে কেহ বাধা দিতে এলো না। মনেও হয়ত কারো হয় নি বাধা দেবার কথা—এমনি আকস্মিক ব্যাপার একটা হল।

দুয়ার পর্য্যন্ত এসে সংযুক্তা চৌসর অর্থাৎ জয়মালা দিলেন দারোয়ান ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা পৃথ্বীরাজের স্বর্ণমূর্ত্তির গলায়। এক রামায়ণে সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি নিয়ে রামের যজ্ঞ করার কথা আছে। কিন্তু সেখানেও রাম ও সীতায় পরস্পরে ছিল প্রেম, ছিল দাম্পত্য সম্বন্ধ, ছিল ধর্মের বন্ধন। কিন্তু সংযুক্তার বেলায় ছিল শুধু পূর্ব্বরাগের বেহিসাবী বেপরোয়া প্রেম। সংসারে যার কোন স্বীকার নেই।

কিন্তু হায়, হৃদয়ের বন্ধন যে সব চেয়ে বড় বন্ধন। মন্ত্র দিয়ে যার হয় না হিসাব, মন্ত্রণা দিয়ে হয় না যাচাই আর আইন বা সমাজ দিয়ে হয় না বিচার।

সংযুক্তা বললেন,—দেশ, জাতি ও গুণের বিচারে যে রাজা বরণীয়, তাঁকে আমি এই বরণ করলাম। চৌহানরাজ সোমেশ্বর পৃথ্বীরাজ যার বরনাম, মনে মনে বিচার করে আমি তার গলায় গান্ধর্ব মতে জয়মালা দিলাম। তিনি আমায় গ্রহণ করুন।

জয়চাঁদ চটে-মটে লাল। কোন রকমে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন,—বাছা, তুমি ভুল করেছ। আবার রাজাদের মধ্যে ফিরে এসে নিজের বর বেছে নাও। প্রথম বার স্বয়ংবর ঠিক হয় নি।

আবার ফিরে সমস্ত রাজাদের সম্বোধন করে খুব পরিষ্কার ভাবে রাজকন্যা বললেন,—"আপনারা সবাই বিচার করুন, বল যশ ও গুণে যিনি শ্রেষ্ঠ, জাতিতে যিনি উত্তম, দেশ, পিতা, পিতামহ প্রভৃতি যাঁর উৎকৃষ্ট, তাঁর পরম নাম আমি গ্রহণ করলাম। দেবতারা জেনে রাখুন। আমি আবার তাঁর পাশে যাচ্ছি। সবার সম্মুখে তাঁর প্রশস্ত কণ্ঠে আবার মালা দিচ্ছি।"

আপত্তি করে জয়চাঁদ হেঁকে বললেন,—"বৎসে, তোমার ঠিক

মত পতি বরণ করা হল না। আবার তুমি রাজাদের মধ্যে ঘুরে এসে স্বামী বেছে নাও।"

তৃতীয় বার রাজকন্যা সেই স্বর্ণমূর্তির কাছেই ফিরে এলেন।

তৃতীয় বার কবির দল সব উপস্থিত রাজাদের বংশ আর গুণাগুণ একে একে ব্যাখ্যান করে যেতে লাগলেন।

রাজারা সংযুক্তার এই বরমালা পৃথ্বীরাজের গলায় দু'দু'বার দেওয়াকে খুব হিংসার চোখে দেখেছিলেন। তবু তাঁরা মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন যে, রাজকন্যার হৃদয়ে পৃথ্বীরাজই খুব গভীর আসন পেয়েছেন। এ দিকে সমস্ত লোকের চোখের সামনে সংযুক্তা চৌহানের সুঠাম কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন বরণমালা আর এমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর স্বর্ণমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন ইন্দ্রাণী শচী ইন্দ্রকে উৎকণ্ঠ হয়ে দেখছেন।

আর জয়চাঁদ? তিনি না বারণ করতে পারলেন, না মেয়ের হাত টেনে আটকাতে পারলেন। রাগে গর-গর করতে করতে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় মুখ নীচু করে অলক্ষিতে গিয়ে অন্তঃপুরে মুখ লুকোলেন। ঘোষণা করেছিলেন যে, কন্যা স্বয়ংবরা হবে। সে নিজে বেছে নিয়েছে বর পিতার শত্রুকে, রাজসূয় যজ্ঞসভার দ্বারপালকে। নিজের প্রতিজ্ঞায় রাজা বাঁধা হয়ে আছেন। বাধা দিতে পারেন না; প্রত্যাদেশ করাও সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয়-ধর্মে বাধবে। রাঠোর যে ক্ষত্রিয়কুলের চূড়া বলে দাবী করে।

শেষ পর্য্যন্ত তিনি গঙ্গার তীরে একটা বাড়ীতে মেয়েকে নির্বাসনে পাঠালেন। সহস্র দাসী তাঁকে ঘিরে পাহারা দিতে লাগল। রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে রইলেন।

সবাই জানে যে, এ সংসারে প্রিন্স এডোয়ার্ডরাই মিসেস সিম্পসনদের জন্য সমাজ, সম্পদ, রাজপাট ছেড়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড মাথায় তুলে নেন। আমানুল্লারাই রাণীর জন্য রাজত্ব ছেড়ে রাজগদীতে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশী হয়ে যান। কিন্তু একজন রাজকন্যা যে প্রেমের প্রতিদান পাবেন কি না, তা না জেনেই যে কোন রাজার রাণী হওয়ার আশা ছেড়ে শুধু সম্পদ ত্যাগ নয়, স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন, সে সংবাদ ইতিহাস মনে রাখলেও আমরা মনে রাখি না।

এদিকে পৃথ্বীরাজের কানে খবর পৌঁছান মাত্র তাঁর শিভ্যালরী-বোধ জেগে উঠল। তিনি সব সামন্তদের ডাকিয়ে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। কনৌজে গিয়ে স্বয়ংবৃতা বধূকে উদ্ধার করে আনা উচিত তা কি হবে না, সে বিচার করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ বোধ করলেন একটা ব্যথা, একটা এমন ব্যথা তিনি আগে যা টের পান নি। এক সাহসিকা তরুণীর নীরব প্রীতি। ঘন বনের অন্ধকারে একটি না-পাওয়া গোলাপের সুরভি আর সৌন্দর্য্য! মনের মধ্যে অনুভব করলেন—

লগ্‌গি বান অনুরাগ উর
মনমথ প্রেরি বসন্ত।
সহৈ নৃপতি অয়্যৈ (অক্ষৈ —অক্ষয়) ন কহুঁ
খেদে রিদয় অসন্ত।

খেদে অর্থাৎ প্রেম-বেদনায় হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠল; কামদেবের নবীন বসন্তের বাণ অনুরাগ ফুটিয়ে দিল তাতে।

কিন্তু অভিন্নহৃদয় কবি চাঁদ এসে বাধা দিলেন। বললেন যে, এতে মহা অশুভ হবে। রাজা তবুও কনৌজ যেতে চাইলেন, কিন্তু সামন্তরা সবাই এই বিবাদের মধ্যে যাওয়ার বিপক্ষে মত দিয়ে সভা ভঙ্গ করে চলে গেলেন। তার পর রাজা শিকারে গেলেন, শিবমন্দিরে গেলেন, অন্য দিকে মন ফেরাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু হায়! হৃদয় যে মানে না।

শেষ পর্য্যন্ত রাজা যখন আবার কবিকে নিজের ইচ্ছা জানালেন, তখন কবি বললেন যে, গেলে ছদ্মবেশেই যাওয়া উচিত হবে। কিন্তু পৃথ্বীরাজ বীর; তিনি কি যাবেন চোরের মত, না বীরের মত? বরণ করে রেখেছেন তাঁকে যে বন্দিনী বধূ, তাঁকে উদ্ধার করে আনতে কি চোরের মত যাওয়া যায়? তিনি চুপ করে রইলেন।

সামন্তরাও তাঁকে বরণ করলেন। দিনের পর দিন যায়। যাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সেই মানা করে।

এদিকে রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে আছেন।

এক বছর পরে আবার বসন্ত ফিরে এল। রাজা আবার কনৌজ যাবার কথা তুললে এবার নূতন রাজমন্ত্রী বললেন যে, ছদ্মবেশে নয়, সময়োচিত বীরবেশেই রাজার কনৌজ যাওয়া ঠিক হবে। এমন ভাবে যেতে হবে যেন সমস্ত সৈন্য সঙ্গে গিয়ে যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হয়। একজন অমাত্য অবশ্য বাধা দিয়ে বললেন যে এটা ঠিক হবে না, কারণ, শাহাবুদ্দিন ঘোরী নিকটেই আছে আঘাত হানবার জন্য।

চৈত্র মাসে পৃথ্বীরাজ চললেন সসৈন্যে কনৌজের দিকে।

কনৌজের কাছে এসে তিনি সৈনাদের পিছনে রেখে শুধু চাঁদ কবিকে সঙ্গে নিয়ে ধনী বিদেশী যুবকের বেশে সহরে পৌছালেন। যেখানে সংযুক্তা নজরবন্দী ছিলেন, সেখানে গিয়ে আত্মপরিচয় দিবার আগেই কিন্তু কনৌজের সৈন্যদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদের তুমুল লড়াই হল।

এদিকে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে জানালা থেকে দেখতে পেলেন। তাঁরও রাজকুমারীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল।

সুনি সুন্দরী বর বজ্জন চল্লী।
খিন অলপহ তুলয়হ মুখ ঝল্লী।
দেখি রত্তি সংযোগি সু ভল্লী।
ফুলি বাহ মুখ কুমুদহ কল্লী।

দু'জনেই আকুল অবশ-চিত্ত হয়ে গেলেন।

রাজকন্যা জানালা থেকে সরে এসে ছবির ঘরে গিয়ে নীচে দাড়ান ছদ্মবেশীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের ছবি মিলিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে এই সেই—সেই অদেখা অপরিচিত বর যার মূর্তির গলায় তিনি মালা দিয়েছেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখপদ্মের শোভা অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল—

হিয় কম্প বিকম্প বিপপ্প পথং। মনু মত্ত বিরাজত কামরথং।
কল কম্পিত কম্প কপোল সুভং। অলকাবলি পানি উচন্ত উচং।

লজ্জায় পুলকে অরুণবর্ণা রাজকন্যা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে দাসীকে দিয়ে এই বিদেশীকে আরো যাচাই করে নিলেন। তারপর তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, এখনি "গাঁঠ বন্ধন" অর্থাৎ শুভকর্ম সম্পন্ন হয়ে যাক।

সখীরা ভাবল যে, যাদের মধ্যে আগে থেকেই মন-বিনিময়

এমন কি প্রকাশ্যে স্বয়ংবর হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে নূতন করে বিয়ের প্রয়োজন কি ?

তবু ক্ষত্রিয় আচারে দু'জনে গান্ধর্ব মতে বিয়ে হল। বিয়ের পর রাজা বললেন রাজকন্যাকে, তবে এবার দিল্লী চল। সে প্রস্তাবে ক্ষণমাত্র রাজকন্যার দ্বিধা হল। সেই দ্বিধা যা প্রত্যেক কুমারীর প্রথম বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যাবার আগে হয়। বনবালিকা, আশ্রমপালিতা শকুন্তলার পর্য্যন্ত স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে যে দ্বিধা হয়েছিল। মন যেতে চায় আর চরণ চলতে চায় না।

এদিকে ভোরবেলা পৃথ্বীরাজের দলের লোকরা এসে খবর দিল যে আর দেরী করলে চলবে না ; এখনি সৈন্যদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হবে। না হলে সমূহ বিপদ্। পৃথ্বীরাজকে রওনা হতে দেখে সংযুক্তার খুব কষ্ট হল। কিন্তু উপায় কি ? বিবাহ-রাত্রির পরই যে আসে কালরাত্রি।

এঁদের দু'জনের জীবনে সুখ খুব অল্প সময়ের জন্যই এসেছিল। দিল্লী ফিরে গিয়ে শাহাবুদ্দিন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে যাবার আগে পর্য্যন্ত অল্প সময়ে এরা যা সুখ ও শান্তিতে সময় কাটাতে পেরেছিলেন, তা চিরকাল নবদম্পতীদের স্বপ্ন হয়ে থাকবে। কবি চাঁদ বলেন যে, সংযুক্তা যেন সমুদ্র আর পৃথ্বীরাজ যেন হংস হয়ে সুখের সপ্তম স্বর্গে বিরাজ করেছিলেন।

এদিকে জয়চাঁদের সৈন্যদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হল। রাত্রিতে চাঁদ কবি যেখানে ছিলেন, সেখানে দুজনে এসে পরদিন ভোরে দিল্লী যাবার জন্য তৈরী হলেন।

কিন্তু রাজা কি বীরত্বের কীর্ত্তিতে মুগ্ধা স্বয়ংবৃতা বধূকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবেন চোরের মত ?

ইংরেজীতে বলে 'নন বাট দি ব্রেভ ডিসার্ভস্ দি ফেয়ার'। সাহসীরা ছাড়া কেউ সুন্দরী লাভের যোগ্য নয়।

তাই যাত্রার সময় পৃথ্বীরাজ কবি চাঁদকে পাঠালেন জয়চাঁদের কাছে। বলে পাঠালেন যে, এবার আমি তোমার কন্যাকে বিয়ে করেছি আর দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি।

চাঁদ বাধা দিলেন। বললেন,—আশা তোমার পূর্ণ হয়েছে' ঘরে ফিরে চল। শত্রুতা বাড়িয়ে কি হবে ?

কিন্তু রাজপুত রাজনীতি বুঝে না।

পৃথ্বীরাজ জোর করে চাঁদ কবিকে পাঠালেন জয়চাঁদের কাছে। বলে পাঠালেন,—আমি চোর নই। সিংহের গহ্বর থেকে সিংহের কন্যাকে নিয়ে চললাম, এই জানিয়ে যাচ্ছি। যার সাহস ও শক্তি থাকে, আমায় বাধা দিতে পার।

কবি এসে জয়চাঁদের সভায় নিবেদন করলে,—দিল্লীশ্বরী মহারাণী সংযুক্তা আপন স্বামীর সঙ্গে নিজের ঘরে যাচ্ছেন এবং আপন পিতার আশীর্বাদের অপেক্ষা করছেন।

আর যায় কোথা ? নিজের মেয়ের স্বয়ংবরে মনের ব্যথার সীমা ছিল না রাজার। তবু সেটাকে অল্পবয়সী মেয়ের ছেলেমানুষী বলে কোন রকমে সহ্য করা যেত। আর এ যে ব্যথার উপর অপমান ! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। রেগে রাজা হুকুম দিলেন সব সৈন্য-সামন্তদের, যে যেমন করে পার পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তাকে জীবন্ত ধরে আনো। জীবন্তে ওদের আনা চাই।

সংযুক্তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পৃথ্বীরাজ বায়ুবেগে নিজের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কনৌজ থেকে দিল্লীর পথে ঘোর যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে খুব বড় অংশ নিল জয়চাঁদের মুসলমান সৈন্যরা।

মুসলমান ? হ্যাঁ। মুসলমান সৈন্য ও মুসলমান মীর অর্থাৎ আমীররা।

মত্ত মীর জম সম সবীর।
জই রুক্যৌ নৃপ অগ্গা।

তারা পৃথ্বীরাজকে ঘিরে ফেলল ; মহা যুদ্ধ হল তাদের সঙ্গে।

রাজ রুক্যে অরী।
সিংহ রোহং পরী।
খগ্গরং খোলিয়ং।
বীর সা বোলিয়ং।

শাহাবুদ্দিন ঘোরীর দিল্লী বিজয়ের অনেক আগে থেকেই হিন্দু রাজারা তাতার সৈন্য ও সেনাপতি নিজেদের দলে মাইনে করে রাখতে আরম্ভ করেছিলেন। তারা নিজেদের ও বিদেশী স্বধর্মীদের সুবিধা হবে বলে হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঝগড়া জিইয়ে রাখতে সহায়তা করত। তাদেরই সুবিধা নিয়ে বার বার মুসলমান আক্রমণকারীরা হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে ও লুঠপাট করতে সাহস পেত। কিন্তু জেগে যারা ঘুমাত তাদের চোখ কখনো খোলে নি।

পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তা বিজয়ীর বেশে দিল্লী ফিরে এলেন।

চাঁদ কবি এখানে আরও একটি কাহিনী লিখেছেন, যার উল্লেখ অন্য কোন বইয়ে নেই। কিন্তু রাজপুত চরিত্রের একটা বড় গুণ শরণাগত রক্ষার একটা সুন্দর উদাহরণ হিসাবে সে কাহিনীটির দাম আছে। শাহাবুদ্দিন ঘোরী নিজের এক পাঠান-সর্দারের প্রেমিকার প্রতি মুগ্ধ হলেন। বিপদ বুঝতে পেরে সর্দার প্রেমিকাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজের আশ্রয়ে পালিয়ে এল। ঘোরী তাদের ফিরিয়ে দিবার জন্য দাবী করলেও পৃথ্বীরাজ যারা তাঁর কাছে শরণ নিয়েছে তাদের বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। ফলে ঘোরী কয়েক বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করলেন কিন্তু প্রত্যেক বারই পৃথ্বীরাজ তাকে হারিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। ঘোরীর মনে পরাজয়ের অপমানের সঙ্গে প্রেমিকাকে ফিরে না পাওয়ার বেদনা মিশে রইল।

গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনায় প্রমাণ হয়েছে যে, শাহাবুদ্দিন ঘোরী ছয় বারের বার ভারত আক্রমণের সময় যুদ্ধে জেতেন। তার আগে প্রায় প্রত্যেক বারই তিনি হেরে যান এবং দিল্লীর হিন্দু রাজা দু'বার তাকে বন্দী করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দু'বারই রায় পিথৌরা রাজপুতের চরিত্রগত উদ্ধত বীর ধর্ম্মের অহঙ্কারে তাকে মুক্ত করে দেন।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে ঘোরীর শেষ বার পরাজয়ের বর্ণনা প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের তবাকত-ই-নাসিরিতে খুব ভাল করে দেওয়া আছে। পৃথ্বীরাজের একজন সেনাপতি গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঘোরী রায়ের মুখে বর্শা ঢুকিয়ে দেন আর তার দুটো দাঁত ফেলে দেন। এদিকে রায়ের তরোয়ালের আঘাতে ঘোরীর হাতে এমন অসহ্য চোট লাগে যে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। নিরুৎসাহ হয়ে মুসলমান সৈন্যরা সব

পালিয়ে যায় আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বর্শা দিয়ে খাটিয়া বানিয়ে তার উপর ঘোরীকে শুইয়ে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ বাঁচায়।

পরের বছরই ঘোরী আবার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন। তার এক লক্ষ কুড়ি হাজার ঘোড়সোয়ারের সঙ্গে জম্মু আর কনৌজের হিন্দুরাও যোগ দিল। (প্রমাণ—তবাকত-ই-নাসিরি ও আকবর-নামা)। শুধু তাই নয়। পৃথ্বীরাজের নিজের একজন বড় সামন্তও সুলতানের দলে এসে ভিড়ল।

পৃথ্বীরাজের দলে যোগ দিলেন চিতোরের রাণা (তখন নাম ছিল রাওল) সমর সিংহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মেবারী বংশ মুসলমানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গেছে। পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি সমরসি (সমর সিংহ) সত্য সত্যই একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাদেবের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাজ্য শাসন করতেন। সমস্ত রাজসিক ঐশ্বর্য্য ছেড়ে ভোগবিলাস ছেড়ে স্থির বুদ্ধি ও অতুলনীয় সাহস ও স্থিরতা নিয়ে রাজ্য চালাতেন। শুধু পদ্মবীজের মালা তাঁর গলায় শোভা পেত। মাথায় ছিল শিবের মত জটা আর সবাই তাঁকে যোগীন্দ্র বলে ডাকত। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে বহু সম্পদ্ তিনি নিজের প্রাপ্য হিসাবে পেতে পারতেন। কিন্তু সে সবই তিনি সৈন্যদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

পবিত্র কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে তারাইন (= নারায়ণ = তিরৌরি) গ্রামে তিন দিন ধরে যুদ্ধ হল। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উত্তরা যেমন ভাবে অভিমন্যুকে রণসাজে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও সংযুক্তা তেমনি করে বীর পতিকে সাজিয়ে দিলেন। যে হাত দুটি দিয়ে তাঁর স্বর্ণপ্রতিমাতে মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন পিতার শত্রুতা উপেক্ষা করে, সেই সোনার বরণ করকমল দিয়ে শত্রুকে মারবার জন্য তাঁর কোমরে তরোয়াল বেঁধে দিলেন। বিদায় দিলেন এই বলে যে, তুমি চৌহানসূর্য্য, তুমি এ জীবনে যশ আর সুখ দুই-ই যেমন ভাবে পেয়ালা ভরে পান করেছ, তেমন আর কেহ করেনি।

গীতার কথা মনে করিয়ে স্বামীকে সংযুক্তা বললেন, জীবন হচ্ছে একটি পুরানো বস্ত্র; এখন যদি তাকে ফেলেই যেতে হয়, তাতে ক্ষতি কি? বীরের মত মৃত্যুই হচ্ছে অমরতা।

বলতে বলতে সংযুক্তার হাত স্বামীর কোমরবন্ধ থেকে অতর্কিতে সরে গেল। তার গণ্ডারের চামড়ার বর্মের আঙটাগুলিকে চাঁপার ফুলের মত অঙ্গুলিগুলি আর খুঁজে পেল না। চাঁদের ভাষায় ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী যেমন করে হঠাৎ একটা মোহর পেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তেমন ভাবে সংযুক্তার আঁখিতারা দুটি চৌহানের মুখচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষে, অপলকে।

এ দিকে যুদ্ধভেরী বেজে উঠেছে ঘোর গর্জনে। এ কি শুধু যুদ্ধের, না মৃত্যুরও আহ্বান? সংযুক্তার বুঝতে ভুল হল না এ বাজনা কিসের আবাহন!

পৃথ্বীরাজ চলে গেলেন। সৈন্যদের সবার সামনে গিয়ে হাতীতে চড়ে এগিয়ে গেলেন। সে সমসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান নিজামি তাজুল মাসির বইতে লিখে গেছেন যে "কাকের মত মুখ নিয়ে হিন্দুরা হাতীর পিঠে চড়ে শাদা জয়ঢাক (অথবা শঙ্খ?)·

বাজাতে লাগল; যেন নীল পাহাড়ের মুখ থেকে খর বেগে আলকাৎরার নদী বয়ে যাচ্ছে।" *

পৃথ্বীরাজ অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। চাঁদের ভাষায়—

বজ্রপাত নিরঘাত। ধরনি কৈ অম্বর তুটিয়।
দধিয়া দধি কিয় মথন। মন্দ্বি গিররাজ আছুটিয়।

প্রাচীন বাংলা কবিতার ভাষা মনে রাখলে অর্থ বুঝতে কষ্ট হবে না।

উটিরাজ পৃথ্বীরাজ বাগ মনৌ লজ্জ বীর নট।
কড়ত তেগ মন বেগ লগত মনৌ বীজু ঝট ঘট।
থাকি রহে সুর কৌতিগ গগন রগন মগন ভই শোন ধর।
হদি হরষি বীর জগগে হুলসি হুরেউ রংগ নবরও বর।

পৃথ্বীরাজ ঘোড়ায় উঠে এমন ভাবে লাগাম নিয়ে ঘোড়া চালালেন যেন কোন বীর অভিনয় করছে। মানসের মত বেগে স্বচ্ছন্দে তরোয়াল খুলে চালাতে লাগলেন; যেন মেঘঘটার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই কৌতুক দেখে আকাশে সূর্য্য থেমে গেল। রক্তে পৃথিবী লাল হয়ে গেল। বীরদের হৃদয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়ে উঠল আর তাজা রক্তের রঙ্গ তাদের অঙ্গে স্ফুরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু ঘোরীর সঙ্গে ছিল "নলগোলা" (চাঁদের ভাষায়) অর্থাৎ বন্দুক। কাজেই যুদ্ধের ফলাফল অনেকটা ওতেই স্থির হয়ে গেল।

এদিকে পৃথ্বীরাজ বিদায় নেবার পরই সংযুক্তার শুকনো চোখে গড়িয়ে এল এক ফোঁটা জল। মনে মনে তিনি বললেন, আমি সূর্য্যলোকে আবার তার দেখা পাব; কিন্তু যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) আর নয়। প্রতিজ্ঞা করলেন যে স্বামীর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু জল খেয়ে জীবন ধারণ করবেন। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে স্বামীর পরাজয় বন্দিদশা ও হত্যার খবর পেয়ে তিনি চিতার আগুনে আত্মদান করলেন।

---

* কবি আমীর খুসরোও হিন্দুদের কা কা ডাক দেওয়া কাক বলে বর্ণনা করেছেন।

এ সংসারে শুধু খারাপ ভবিষ্যৎবাণীগুলিই সম্ভবতঃ সত্য হয়। ভালগুলি কেমন যেন ফলতে চায় না। যোগিনীপুরে রাজকন্যার রাজপুত্রের সঙ্গে কখন আর দেখা ত হল না। কিন্তু সূর্য্যলোকে হয়েছে কি?

হাসান নিজামি বলেন যে, যুদ্ধজয়ের পর ঘোরী আজমীঢ় দখল করে মূর্ত্তিপূজার মন্দির ও ভিত্তিগুলি ভেঙে ফেলে সেখানে মসজিদ ও মক্তব বসান। আজমীঢ়ের রায়কে প্রথমে শুধু বন্দী করে রাখা হয়েছিল; কিন্তু তার শত্রুভাব কমেনি দেখে পৃথ্বীরাজের হত্যার হুকুম দেওয়া হয়। "সেই পরিত্যক্ত হতভাগ্যের দেহ থেকে মাথা হীরের মত তরোয়াল দিয়ে খসিয়ে ফেলা হল।" মিনহাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পৃথ্বীরাজকে "নরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।"

চাঁদ কবি কিন্তু অন্য কথা বলেন। তিনি ছিলেন পৃথ্বীরাজের "লঙ্গোটিয়া মিত্র" অর্থাৎ জন্মকাল থেকে বন্ধু। তাঁর বন্দিদশা কবির সহ্য হল না। চোখের সামনে দেখলেন সংযুক্তার জহরব্রত, আজমীঢ়ের পতন ও আরো বহু অসহায় অত্যাচার। তাই তিনি পৃথ্বীরাজকে অনুসরণ করে গজনী পর্য্যন্ত গেলেন। সেখানে ঘোরীকে সন্তুষ্ট করে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা করলেন ও তাঁকে নিয়ে শব্দভেদী বাণ ছুড়িয়ে ঘোরীকে মারালেন। পরে কাটারী দিয়ে পরস্পরকে হত্যা করে শত্রুর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন।

এই অংশটুকু ঐতিহাসিক না হতে পারে, কারণ চাঁদ কবি ত নিজে হিন্দুস্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘটনা লেখেননি। কিন্তু কাব্যের দৃষ্টিতে এমনি একটা পরিণতি স্বাভাবিক হত।

সাংসারিক সত্যই ত একমাত্র সত্য নয়। তার বাইরে ও উপরে অনেক সত্য, অনেক সত্যের চেয়ে বড় তথ্য বিরাজ করে। সমস্ত জীবনের অমৃতে সরস হয়ে ওঠে। সেই সত্যই আজমীঢ়ের রায় পিথৌরার জীবনে এনে দিয়েছিলেন সংযুক্তা। সেই সত্যই তিনি মরণকে দিয়ে গিয়েছেন জীবনমাধুরী দিয়ে ভরিয়ে।

তাই ইতিহাসের নিষ্ঠুর আলোতেও ঝলমল করে শোভা পাচ্ছেন এই রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যা।

[ক্রমশঃ।

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিলযুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
প্রকৃত সৌন্দর্য্য
ফুটিয়ে তুলতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিলংযুক্ত একমাত্র সাবান
Rexona
BLENDED WITH CADYL
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
RP. 123A-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিজলীর ৩০ সংখ্যা অবধি পরিচয় গত কার্ত্তিক সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে শেষ হয়েছে। অগ্নিযুগের যুগান্তরের পর আমরা কালাপানি থেকে ফিরে এসে বিজলীর মাধ্যমে কি কি কাজ করেছি, বিজলীর পরিচয়ে এই ব্যর্থ কংগ্রেসী যুগের বাঙালী তা' পাবেন। বিজলী ইংরাজ রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর ইতিহাস রচনা করেছে। ৩১ সংখ্যা বিজলীর "কালবৈশাখী"তে ছিল—"এবার কালী তোমায় খাব। এই তত্ত্ব ভুলে গিয়ে এ সন্তান জাতি মহাকালের মুখে নিঃশেষ হয়ে এলো। শক্তির সন্তান যে শক্তি বিনা বাঁচে না, ছেলে-খেকো মায়ের আমরা যে মা-খেকো ছেলে। কবে কোন্ যুগে সাধন-সমরে মায়ের দ্বিভূজা ষড়ভূজা অষ্টভূজা দশভূজা এমনি কত দশমহাবিদ্যা রূপ একে একে উদরস্থ করেছি বলেই এই হাজার হাজার বছরের কালচক্রে আমরা আজও গুঁড়ো হয়ে যাই নি।" কালবৈশাখীর খবরগুলি ছিল আয়র্লণ্ডের নির্ব্বাচনের খবর, আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে একটা মীমাংসার কথায় লয়েড জর্জ্জের বাসনা ও ডি ভ্যালেরার কড়া জবাব, কামাল পাশার প্যারি যাত্রার খবর, অশান্ত জার্ম্মাণীর সংবাদ, বড় লাট রিডিংএর ইউরোপীয়ান দলের হাতে আত্মসমর্পণের খবর দিয়ে ডিমোক্র্যাট কাগজের হুমকি।

এ সংখ্যার ১ম সম্পাদকীয় হচ্ছে—"নর-নারায়ণ"। তখন শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় অতিমানস শক্তির অবতরণে দেব-মানবতার আবির্ভাবের জন্য দুশ্চর তপস্যায় রত। আমরা বিজলী-অফিস থেকে পণ্ডিচারীতে তাঁর কাছে গিয়ে আছি আলোর সন্ধানে। এই লেখায় সেই সত্যেরই আঁচ রয়েছে ছত্রে ছত্রে। "নর-নারায়ণ" থেকে কিছু উদ্ধৃত করি—"এই নূতন যুগের নূতন মন্ত্র হচ্ছে—ভগবান হও, ভগবান হও realise, realise"; তাই মানুষের অন্তর বাহির আজ পূর্ণ প্রকাশের সাড়ায় এমন করে সচেতন হয়ে উঠেছে। এবার চতুর্দ্দশ ভুবন আলো করা সোণার রঙের সূর্য্য বুঝি উঠবে, আদিত্যবর্ণ সেই দিব্যপুরুষ ঘটে ঘটে বুঝি উদয় হবেন, তাই মহতী প্রেরণার রঙিন স্বপ্নে মানুষের হৃদয় মন প্রাণ উষায় উষায় উষাময়।

"যারা কাজের পাগল তারা এ সত্য এখনও বোঝে নি, যারা হৃদয়ের স্নেহ মমতা ভক্তিরসের পাগল, তারা নেশার ঠ্যালায় চক্ষু মুদেই চলেছে: যারা মন বুদ্ধির গম্ভীর মানুষ তারা কর্ত্তা হবার সুখের লালসায় এ সত্যে এখনও সায় দেয় নাই। অহঙ্কারে ভরা দীন মানুষ বড় লোভী, সে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়েও লোভেই এতখানি দীন হচ্ছে * * * ছোট মন ও প্রাণের দোকানদারী—এই দু' পয়সার মোড়লী তার বড়ই প্রিয়।

"তাই যখন মানুষের আধার কতকটা শুদ্ধ হবার পর উপরের আনন্দ ও শক্তির দুয়ার খুলে মানুষ সাত্ত্বিক মনে ধনী হয় তখনও ঐ অহঙ্কারের লোভ তাকে পুরো শিশু পেতে দেয় না। সে চায় ভগবানের চাপরাস পেয়ে ভগবানের নামে রাজত্ব করবে, ভগবানের নায়েব হয়ে ভগবানের জমিদারী চালাবে। এই থেকে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি * * * সত্ত্বের অহংকারে অহঙ্কারী কর্ম্মী ভগবানকে মানে কিন্তু চায় না। ভগবানকে চাইতে তার বড় ভয়, কারণ, পাথরের স্তম্ভ ফেটে নৃসিংহরূপে সে মহাশক্তি বেরুলে তার লোভের দুনিয়াদারী যে আর থাকে না। ভগবান যদি নিজের আসনে ষড়ৈশ্বর্য্য নিয়ে বসেন তাহলে যে তাকে মরতে হয়, জীব নিবিড় নিষ্কামের ভরপুর শক্তিতে জুড়িয়ে যে স্বর্ণসিংহাসন রচনা করে, ভগবান যে একমাত্র তাইতেই রাজ-রাজেশ্বর হয়ে বসেন।

"* * * মানুষ আর মানুষ থাকবে না, ঘটে ঘটে চক্রে চক্রে জাতিতে জাতিতে ভগবান হয়ে যাবে!"

গত ১৩২৮ সালে বিজলী এই সম্বাদ দিয়েছিল আর আজ ৩২ বৎসর আরও কেটে গিয়ে ১৩৬১ সাল চলছে। দ্বাদশ যুগ নিয়ে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত! জাতির—মানব পরিবারের—বিশ্ব-জগতের গঠন কি এমন চারটিখানি কথা? নব জন্মের দুরন্ত গর্ভবেদনা নাই? খাঁটি সোনা কত আগুনে কত খাদ পুড়িয়ে তবে আত্মপ্রকাশ করে তার ঝলমলে হৈম শোভায়? বৃটিশ শক্তির অপসারণের পাও সাত বৎসর রাজনীতিক হিসাবে মুক্ত ভারত কতখানি পাগল কর্ম্মে কি চূড়ান্ত ব্যর্থতার মাঝে কাটাল! এ সবই কি নিষ্ফল? এরও কি প্রয়োজন ও সার্থকতা ছিল না? মানুষ ভগবান হচ্ছে, ভারত কলায় কলায় ধীরে ধীরে অন্তরের অমল ধবল জ্যোতিতে ভরে উঠছে। আবার তোমাদের দুয়ারে নর-নারায়ণের ডাক এলো বলে—প্রস্তুত হও, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।

তার পর ৩১ সংখ্যা বিজলীতে ছিল পরে পরে 'মফঃস্বলের চিঠি,' উপেনের লেখা 'উনপঞ্চাশী,' 'দুনিয়াদারী', পাঁচ মিশেলীর খবর ইত্যাদি। এই কয়টি লেখার মধ্যে উপেনের উনপঞ্চাশীই অনবদ্য প্রাণকাড়া লেখা। অম্লমধুর ঐ লেখা না উদ্ধৃত করে পারা কঠিন, তাই দু'চার ছত্র বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের শোনাই। —"মেজে-ঘসে রূপ আর ধরে-বেঁধে প্রেম—এটা নাকি হবার জো নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এত বড় মিথ্যে কথা দুনিয়ায় খুব কমই পাচার হয়েছে। মেজে ঘষে যদি রূপ না ফুটতো তা হলে তো আমাদের থিয়েটারগুলো এত দিন অচল হয়ে যেতো। এই দেখ না আমাদের ক্ষেন্দী সুন্দরীকে। ইনি পান আলুচেরা চোখ দু'টিতে সুরমা লাগিয়ে, চুলগুলি ফুলিয়ে দিয়ে

কপালের পরিমাণ ঢেকে ফেলে কালো জোঁকের মত ঠোঁট দু'খানিতে তরল আলতা লাগিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়াল, তখন দুর্ব্বাসার দশ হাজার বছরের তপস্যা ভেঙে যাবার জোগাড় হয়ে যায়। অরূপের মধ্যে রূপ ফোটানো—এই ত সৃষ্টির গোড়ার কথা।

"আর তার পর ধরে বেঁধে প্রেম। হয় না বলছো? বলি জাহাঙ্গীর বাদশা যখন নূরজাহান বিবিকে বর্দ্ধমান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন তখন ব্যাপারটা যে খুব ননভাওলেন্ট গোছের হয়নি এ কথা ইতিহাসেও লেখে। বেগম সাহেব যে প্রথমটা চোটে একেবারে আগুন হয়ে তাঁর সতীত্ব সপ্রমাণ করেছিলেন, এ প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু তিন দিন যেতে না যেতে রাগের লালটুকু যে প্রেমের গোলাপীতে পরিণত হয়েছিল একথা তো আর অস্বীকার করবার জো নাই! ম্যাদামারা ভাল মানুষ স্বামীর স্ত্রী হয় দজ্জাল; আর দস্যি জবরদস্ত স্বামীর স্ত্রী হয় একেবারে মেনি বেরালটির মত পতিব্রতা—কেন বল দেখি? * * * স্বামী যেখানে মডারেট, স্ত্রী সেখানে একেবারে সাফ্রেজিট।

"রাজনীতিতেও যেমন দু'টো রাস্তা, মডারেট আর এক্সট্রিমিষ্ট, প্রেমনীতিতেও ঠিক তাই। এ কালের মডারেট প্রেমিকেরা আধুনিক চুলে সীঁথি কেটে প্রেমিকার পানে কাতর দৃষ্টি হানতে হানতে কবিতার খাতা বোঝাই করেন। আর সে কালের এক্সট্রিমিষ্ট প্রেমিকেরা বিড়াল যেমন করে ইঁদুর ধরে তেমনি করে প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পগার পার হতেন। ছিঁচ-কাঁদুনে প্রেমের চেয়ে যে মিলিটারী প্রেমটা জমতো ভাল তার সাক্ষী ইতিহাস আর পুরাণ।

* * * *

"রাজনীতির দিকেও চেয়ে দেখ না। সেখানেও প্রেম আদায় করবার মত্ত হচ্ছে জবরদস্তি। ওয়াশিংটন যদি কাঁদুনি গেয়ে বলতেন যে আমেরিকাকে স্বাধীন করে না দিলে তিনি মনের দুঃখে সাত রাত্রি উপবাস করে মারা যাবেন, না হয় গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তা'হলে আজ আমেরিকার দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদতো। আজ যে ইংরাজ আমেরিকার সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্যে এত ব্যস্ত, তার মূলে আছে ঐ ওয়াশিংটনী ডাণ্ডা। তাল বুঝে ঐ ডাণ্ডা লাগাতে পারলে নবদ্বার ভেদ করে প্রেমের প্রবাহ ছুটবেই ছুটবে।

"আরে দাদা, প্রেমনীতি রাজনীতির কথা কি বলছো? গুঁতোর চোটে ভগবান পর্য্যন্ত প্রেম করতে রাজী হয়ে পড়েন। মিত্র ভাবে সাত জন্মে আর শত্রু ভাবে তিন জন্মে মুক্তি হয় এটা হিঁদুর ছেলে হয়ে কেউ অস্বীকার করবার জো নেই। * * আমাদের হারু গয়লা কি করে তিন দিনে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছিল তা' শোননি বুঝি? তবে শোন বলি—

"বৈশাখ মাসের রোদে সারা দিন বাঁকে করে দুধ বয়ে সন্ধ্যার সময় হারু বাড়ী ফিরে দেখলো যে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বউ চলে গেছে বাপের বাড়ী। উনুনে আগুনটি পর্য্যন্ত পড়েনি। লোকে বলে গয়লার ছেলের আশী বছরের আগে বুদ্ধি খোলে না; কিন্তু পেটের জ্বালায় হারুর তখনই জ্ঞান ফুটে উঠলো। সে দিব্য চোখে দেখতে পেল যে সংসারটা একেবারে মরুভূমি। বৈরাগ্য জাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেদ না পড়েই বুঝতে পারলো যে 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। কাঁধে একটা গামছা ফেলে বাঁকটা হাতে করে সে সন্ন্যাসী হবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। চলতে চলতে এক শিবমন্দিরে এসে সে রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দিল। তার পর দিন হাজার হাজার লোক শিবের মাথায় জল দিতে এলো। কত চাল কলা সন্দেশ এসে স্তূপাকার হয়ে পড়লো। কিন্তু গয়লার পোর খোঁজ-খবর কেউ আর করলো না। একে বৈরাগ্য তার ওপর দু'দিন অনাহার; কাজেই হারুর মেজাজটা ক্রমেই চড়ে উঠতে লাগলো। তার পর দিন সকাল বেলা সে গামছাখানি কোমরে বেঁধে বাঁক গাছটি হাতে নিয়ে একেবারে চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়ালো। যেই যাত্রী আসে, অমনি দে ধনাধন মার ধনাধন। যাত্রীরা তো প্রাণ নিয়ে যে যে দিকে পারলো ছুট দিলো। এ দিকে বৈশাখ মাসের দিন, শিবের মাথায় এক ফোঁটাও জল পড়েনি। তিনি ষাঁড়কে বললেন, 'বাবা, ষাঁড়, দেখ তো ব্যাপারখানা কি?' ষাঁড় খুঁজতে খুঁজতে চৌমাথার মোড়ে এসে গয়লার কীর্ত্তি দেখে ত চটে লাল। কিন্তু যেই শিং নেড়ে তেড়ে যাওয়া অমনি বাঁক-পেটা খেয়ে উৰ্দ্ধপুচ্ছ হয়ে দৌড়। রিপোর্ট পেয়ে শিব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাবা ঠাকুর তো একেবারে ক্ষেপে যাবার জোগাড়; করেন কি? আস্তে আস্তে উঠে নিজেই হারুর কাছে এসে হাজির হয়ে বললেন—'বৎস! তুমি কি কি বর চাও? তোমার ওপর তুষ্ট হয়েছি। তোমার বুদ্ধি যে রকম ক্ষুরধার দেখছি, তুমি রাজনীতির চর্চ্চা করলে একটা বড় দরের পেট্রিয়ট হতে পারতে।' হারু বললো, 'বড় দরের পেটেল মেটেল আমি হতে চাইনে; আমি চাই রোজ একপেট ভাত আর তিন ছিলিম গাঁজা।' শিব 'তথাস্তু' বলে অন্তর্দ্ধান হলেন আর হারুও বাঁক কাঁধে করে মন্দিরে ফিরে এলো। সেই অবধি শিব ঠাকুর তাঁর সেবায়েৎকে স্বপ্ন দিয়ে বরাদ্দ করে দিয়েছেন যে তাঁর ভোগ হবার আগে হারুর ভোগ হবে।"

তার পর রামধনের স্বর্গযাত্রা দিয়ে এ সংখ্যার পরিসমাপ্তি। "কাজের কথা"য় এবার ছিল জীবনে আনন্দের অভাবের কথা—আনন্দ আর সৃষ্টিই কাজের প্রাণ।

৩২ সংখ্যা বিজলী প্রকাশিত হয় ২৪ সে জুন, ১৯২১ সালে। এই সংখ্যার "কালবৈশাখী" বড় চমৎকার—তাতে ছিল—"এতদিন ভারতে যে কালীর নৃত্য চলছিল সে তামসী ক্ষয়রূপা কালী; শুধু ভারত কেন সমস্ত এসিয়া নানা রকমে নড়ে চড়ে কেবল নিত্যই তিল তিল করে মরছিল। মা আমার রাজসী শক্তি শিখা হয়ে ইউরোপ থেকে এই মহাদেশকে রক্তশোষণে খাচ্ছিলেন। এ মরণ বড় বিষম মরণ, যে মরণে জাতির দেহ প্রাণ মন সব বিনাশের কোলে গুটিয়ে যায়—শক্তি যায়, জ্ঞান যায়, আনন্দ যায়; ভৈরবের প্রলয় বিষাণ বাজবে বলে—রাজস মরণের সার্থক তালে শক্তিস্ফুরণ হবে বলে প্রথমে এই তামসী মরণের শ্মশান রচনা।

কালবৈশাখীর এ রুদ্র তরুণ লীলা খবরেও প্রকাশ! আয়র্লণ্ডে বেলফাষ্টে বোমা নিয়ে পিস্তল চালিয়ে পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা, ঘুমন্ত মানুষকে টেনে এনে গুলী করে খুন, কাভানের এক দল সশস্ত্র লোকের দ্বারা ৮০ বছরের এক পাদরী হত্যা ও গৃহদাহ। নির্ব্বাচনে সিনফিনরা না যোগ দেওয়ায় ইউনিয়নিষ্ট ২৪ জনের আসন

লাভ। সিনফিনদের দ্বারা বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন ও আলষ্টার ব্যাঙ্কের চেক বর্জ্জন। কায়রোর দাঙ্গায় ইহুদি হত্যা! গ্রীক নৌবহর দ্বারা কামাল পাশার বন্দরগুলি অবরোধ। দেখা যায় ঐ অঞ্চলে সর্ব্বত্র উত্তেজনা ও বৈপ্লবিক দমকা হাওয়া বইছে।

৩২ সংখ্যার বিজলীর ১ম সম্পাদকীয় লেখার শিরোনামা ছিল—"এবার ফিরাও মোরে'। তার মর্ম্মকথা কিছু উদ্ধৃতির দ্বারা প্রকাশ করি। "আজ সমাজের নিগূঢ়তম অন্তর থেকে ধ্বনি উঠুক—'এবার ফিরাও মোরে।' ফিরাও সকল প্রকার মিথ্যা থেকে, সহস্র প্রকার ভণ্ডামী থেকে, রাশি রাশি কঙ্কালের পূজা থেকে।

"আজ আমরা খোলা চোখে স্পষ্টই দেখছি সমস্ত বিশ্বটা সমাজের সামনে এসে পড়েছে।—সে বিশ্বের হাজার দিকের হাজার শক্তি সমাজের হাজার দিকে ঘা দিতে সুরু করেছে—সেই আঘাতে সমাজের কোনখানে ভেঙেছে; কোনখানে ছিদ্র হয়েছে; কোনখানে টোল খেয়েছে। কিন্তু সে ভাঙা সে ছিদ্র সে টোলখাওয়া আমরা স্বীকার করতে চাইনি—এ স্বীকার না করা বিশ্বকেই স্বীকার না করা। এর ফল বিশ্বের আঘাতকেই বড় করে তোলা, অমঙ্গলময় করে তোলা, বিশ্বের অন্তরে অন্তরে যে অমৃত-প্রবাহ আছে তা' থেকে বঞ্চিত হওয়া।

"মহৎকে আমরা ভুলে গেছি, তাই বৃহৎকে আমাদের ভয়;—অন্তরের যে শক্তিতে মানুষ সপ্ত সিন্ধুর তরঙ্গমালার আপনার প্রাণের স্পন্দনেরই পরিচয় পায় সেই শক্তি আমাদের নেই—তাই সমস্ত জগৎকে বাইরে রাখার যে ব্যবস্থা তাকেই আমরা কল্যাণ দিয়ে মণ্ডিত করে রেখেছি। যে জাত একদিন সৌর জগতের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রকে পৃথিবীর আত্মীয় বলে জেনেছিল সে জাতের সঙ্গে আজ এই পৃথিবীরই অন্যান্য দেশ ও জাতি অনাত্মীয় হয়ে উঠলো। বিশ্ব-মানবের বৃহৎ স্বপ্ন আমাদের কাছে অশুচির মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিল।

"* * * ইউরোপের কাছ থেকে আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ পাওয়া যেন আমাদের দৃষ্টিকেও কুয়াসাচ্ছন্ন করে না দেয়। বিশ্বের ওপরে তার প্রভুভাবকে ধিক্কার দিতে গিয়ে যেন বিশ্বমানবের প্রতি তার দাস্য ভাবকেও অস্বীকার না করে বসি।

"* * * এমন একদিন ছিল যেদিন আমরা বাইরের সারা জগৎকে ম্লেচ্ছ আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রশংসায় আপনাহারা হয়েছিলুম। ওর ফলে আমাদের যা' কিছু উন্নতি হয়েছিল সে হচ্ছে টিকির ও । * * * অল্পে সন্তুষ্টি আত্মঘাতী হবারই আরম্ভের সূচনা।"

"এই সংখ্যার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় লেখার শিরোনামা ছিল—"বিজলীর স্বরাজ"।—তার আসল কথা হচ্ছে—বিজলীর বলবার সব চেয়ে বড় কথা "স্বরাজ"। * * * শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বড় নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই বড়। যেখানে মানুষ মুক্তি পেয়েছে,—প্রাণের বলে, মনের বলে, বুদ্ধির বলে আর অন্তরের ভাগবত শক্তিতে যেখানে মানুষ দশ হস্তে নতুন কালচার নতুন সভ্যতা নতুন দেবত্ব ও মহত্ব গড়ছে, সেইখানেই দেশ সত্য, সত্য স্বাধীনতা। সেই মানুষ সূর্য্যবংশী রাজার জাতি।

"* * * মানুষের ঠ্যাঙার গড়া স্বরাজ, মতের গড়া দলাদলির রাজপাট অনেক হয়েছে। * * * আমরা তাই সংকল্প করেছি আমরা দেশ-মায়ের অন্ততঃ এক হাজার ছেলে মেয়ে সাধন বলে জুড়িয়ে শীতল হব আর সেই অহংকার-হীন শান্ত আসনে ভগবান তাঁর বড়ৈশ্বর্য্য নিয়ে নামবেন। * * * তখন সে * * * ভাগবত স্বরাজে মানুষ দাসও থাকবে না, প্রভুও থাকবে না * * * তোমাদের এত লোভের রাজনৈতিক মুক্তি সেই মুকুটের একটিমাত্র হিরা। এমন লক্ষ হিরা চুনী পান্নায় সে দিন সিংহাসন ঝলমল করবে। * * * যদি অহঙ্কারীই হবে তবে নরনারায়ণ হয়ে নতুন জগৎরচা ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী অহঙ্কার নিয়ে স্বরাজ গড়তে নামো।" সে হচ্ছে ১৯২১ এর পরিকল্পনা—ত্রিশ বত্রিশ বৎসর আগের কথা। এত দিন মানবী মন প্রাণ অহঙ্কার ক্ষয় করতে লাগলো, উত্তপ্ত আসন শীতল হলো। এইবার আবার ঘুরে আসছে সেই ভাগবতী আহ্বান—মহাকালের পাঞ্চজন্য শঙ্খের কম্বুনিনাদ। রক্তপঙ্কিল রণশ্রান্ত ধরিত্রীর বুকে কি নন্দনকানন রচনা করা হয় একটু অপেক্ষা করে দেখো।"

তার পর এ সংখ্যা বিজলীতে উপেনের মুখরোচক "উনপঞ্চাশী" আছে, কুলীদের কথা আছে, সাধনা ও অন্নচিন্তা আছে, 'মফঃস্বলের চিঠি'র মারফৎ সমাজ-সংস্কার আছে। সংখ্যাটির শেষ হয়েছে, 'কাজের কথা'য়—সন্তানের শক্তিতে 'মা অচলা' ও 'সন্তানেই মায়ের সত্তা' এই দু'টি লেখা দিয়ে। সে দু'টি উদ্ধৃত করে এ সংখ্যার পরিচয় শেষ করি।

কাজের কথা

সন্তানের শক্তিতে মা অচলা

বোধ হয় চেষ্টা চরিত্র করে দেশকে রাজনৈতিক হিসাবে উদ্ধার করা তবু যায় কিন্তু দেশকে তিল তিল করে গড়া বড় কঠিন। লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মত দেশলক্ষ্মীও সদাই চঞ্চল। সন্তান হীনবল ও অশক্ত হলে মা আমার অমনি মনের দুঃখে মুখ ফিরিয়ে বসেন, যে দিকে বরদা সর্ব্বার্থদায়িনী মায়ের কল্যাণ মুখ ফিরে যায় সেই দিক থেকে মানুষ জয়মুকুট মাথায় পরে এসে মায়ের মাটিতে সিংহাসন গেড়ে বসে। তাই বলি সন্তানের পক্ষে সব কাজের বড় কাজ হলো মাকে চেনা। ত্রিশ কোটি জাগা ছেলের জননী যে কি রকম অনুপম বস্তু তা যে ধারণা করতে পাবে তার আধারে জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের পদ্ম পট পট করে খুলে যায়; তার সৃষ্টির অন্ত থাকে না। মাকে চেনো—জ্ঞানে বুদ্ধিতে সামর্থ্যে আগে মাকে চেনো; তার পর সন্তানের মাটি আলো করে জগদ্ধাত্রী মা আমার জাগবেন। মাকে অচলা করতে হলে তোমার শক্তি ও জ্ঞান অক্ষয় হওয়া চাই।

কাজের কথা

সন্তানেই মায়ের সত্তা

সন্তান যদি না থাকে তা' হলে মা বলে কোন বস্তুই খুঁজে পাবে না। সন্তান আছে তা হলেই তো মা আছে। তোমরা সন্তান হতে শেখো, দেখবে তোমাদেরই জ্ঞানময় শক্তিময় জীবন্ত সত্তায় মাও তোমাদের মূর্ত্ত হয়ে রয়েছেন। ত্রিশ কোটি অনেক দূরের কথা, শুধু দশ সহস্র সন্তান বেঁচে ওঠো, তখন দেখবে সে মুষ্টিমেয় সন্তানসেনা জগদ্বিজয়ী। একজন মহম্মদ একজন বুদ্ধ জগতকে ভেঙে গড়ে, আকবর ও অশোকের রাজসিংহাসন রচে নেবার বল মানুষকে দিয়ে যায়। তোমরা এক শ' জন পরাশক্তি ধরে নরনারায়ণ রূপ গ্রহণ কর, তার ফলে যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল জগতে

উদ্ভাসিত করবে, তার কিরণ সহস্র শতাব্দীতেও নির্বাণ হবে না। মায়ের রূপ অনন্ত বিভূতিময়, তুমি যত বড় ও যত মহীয়ান্ হবে, মা তোমার তত জগৎপূজ্যা হবে ; সন্তানেই মায়ের সত্তা, সন্তানেই মায়ের গৌরব, সন্তানেই মাতৃত্বের জয়।

৩৩ সংখ্যা বিজলী প্রকাশিত হয় ১৭ই আষাঢ়, সন ১৩২৮, ইংরাজি ১লা জুলাই, ১৯২১। এ সংখ্যার কালবৈশাখীতে রয়েছে—দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে, আর্ত্তত্রাণের নামে কত নামেই না লোকে শক্তিকে ডেকে জগৎ সংহারে নামিয়েছে। শক্তির নেশায় পাগল হয়ে ডাকলেই যে মায়ের জীবনাশা খড়্গ চমকে ওঠে, তা' যে তারা বোঝে না, তাই কেবলই তারা শিবকে ছেড়ে শক্তিকে চায়। এবার মা তোর একপেশো রূপ সম্বরণ কর, পদতলের ঐ শিবের ইঙ্গিতে এবার পূর্ণ রূপে ভাগবতী শক্তি হয়ে প্রকাশ হ'। আমরা দেখি একবার তোর রক্তরাঙা খড়্গের মাঝে কত বরাভয় লুকানো আছে।"

কালবৈশাখী যে সর্ব্বত্র বইছে তার প্রতিপাদক খবর সিনফিনদের আয়র্লণ্ডে খুনখারাপী সন্ত্রাসবাদী কাণ্ড ঘটছে তাই সংগ্রহ করে বিজলী পরিবেশন করেছে। একটা এইরূপ খবরে আছে—আমেরিকার শ্রমজীবী-সঙ্ঘে একটা প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে, যে, আমেরিকায় জাপানী বা অন্যান্য এশিয়বাসীকে আসতে দেওয়া না হয়। কাক সকলের মাংস খায় কিন্তু কেউ কাকের মাংস খেতে গেলেই কাক কা-কা করে চেঁচিয়ে দুনিয়া মাৎ করে। এ সংখ্যার প্রধান দু'টি লেখা—"নবীন" ও "ত্যাগ না ভোগ ?"

প্রথমটিতে নবীনের আহ্বানের কথা, তাহাকে সমস্ত অনুরাগ দিয়া অভিনন্দিত করিয়া লইবার কথা আছে—যদি আমরা আপনাকে, সমাজকে, জাতিকে দেশকে বাঁচাতে ও জাগাতে চাই। * * * যুগে যুগে আমরা কঙ্কালকে আমাদের সমস্ত উৎসাহ দিয়ে আগলে বসে থাকবার ব্যবস্থা করে এসেছি। * * * যারা স্থাণুত্বের মাঝে অমৃত দেখতে পায় তাদের জন্যে এই সৃষ্টি হয় নি, তাদের জন্যে মাতা ধরিত্রীর অসীম অনুরাগ রূপ রস বর্ণ গন্ধের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সৃজন করে চলবে না।" এই সুরে সুরে সমস্ত লেখাটি ভরা।

"ত্যাগ না ভোগ ?" লেখায় আছে—"বাহিরের জগতের দিকে নত চক্ষে দেখলে কেবলই এই বিশ্ব-সূর্য্য বা অহঙ্কারকে দেখা যায়। কিন্তু চক্ষু যদি ঊর্দ্ধতারক হয়, মন বুদ্ধি যদি একবার আপনার অন্তরে ফিরে চায়, তা'হলে তখনই নর আপনাকে দেখতে পায়। ঊর্দ্ধে ভগবান মহাসূর্য্য হয়ে লক্ষ কোটি জগৎ কুক্ষিগত করে চির উদিত রয়েছেন, আর জগতে যেন চন্দ্রমণ্ডল হয়ে তাঁর সমস্ত জ্যোতি ধারণ করে আছে এই নর। তাই ভগবানের সেই জীবভূতা পরা প্রকৃতিই হচ্ছে এই মানুষ।

"* * এই জড় আধারেও তুমি আমি অসীম—Infinite at every point। * * * অন্তরের আনন্দ জ্ঞান ও শক্তির দুয়ার খুলতে খুলতে সে ঐশ্বর্য্য যদি অনাবরণ হয়ে খুলে যায় তখনই কেবল ত্যাগ ভোগের দ্বন্দ্ব ঘোচে। * * * সূর্য্য উঠলে যেমন সব মাণিক চকমক করে ওঠে, বড় সত্য—পূর্ণ সত্য জাগলে তেমনি সব ছোট সত্যই সার্থক হয়। ভোগ যদি তোমায়

বাঁধে তাহ'লে তোমার অন্তরের নারায়ণকে পাবে না, ত্যাগ যদি তোমায় বাঁধে তা'হলেও সে মুক্তির দেবতাকে পাবে না। অনন্ত নিজে না হলে অনন্তকে সে ভোগ করা যায় না।"

এ সংখ্যার উনপঞ্চাশী পণ্ডিতাবীর কোন সাধকের দর্শন ও অনুভূতি অবলম্বনে লেখা। যথাসাধ্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করি—"দু'জনে মুখোমুখি করে খানিকক্ষণ চুপচাপ! ঘরখানার জমাট স্তব্ধ নীরবতা যেন জমাট হয়ে বুকে চেপে বসতে লাগল। মাথার ভিতর ফট করে আওয়াজ হলো—পণ্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"ঐ দ্যাখ।"

"অনন্ত আকাশ। দূরে মেঘের মাথায় আলো। দূরে দিক্‌চক্রবালের সঙ্গে মেশা শুভ্র শৃঙ্গের মাথায় কোটি সূর্য্যপ্রভ জ্যোতি!

"আলো ফেটে নামলেন এক দিব্যরূপধারিণী, ঐ জ্যোতির রেখা অন্ধকার ভেদ করে তাঁর মাথার উপর এসে পড়লো, সেই রেখা ধরে খরস্রোত-তাড়িতা নারীর মত সে দিব্যচারিণী উর্দ্ধে ভেসে চললো। আকাশের তারাগুলো দেবতাদের চক্ষুর মত আনন্দে বিস্ময়ে ঝিকমিক হয়ে সেই অদ্ভুত রমণীর দিকে চেয়ে রইলো।

"অকস্মাৎ সেই নীচের অতলস্পর্শ অন্ধকারের বুকে হা হা করে একটা আর্ত্তনাদ উঠলো। দেখতে দেখতে সেই অন্ধকারের গায়ে অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি এসে জমাট হয়ে দাঁড়ালো। সবাই ঐ দিব্যচারিণীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগলো—"আরে ফেরো, ফেরো, পাগল হলে নাকি?" সেই অগণিত ছায়ামূর্ত্তির মাঝে তিন জনকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আবক্ষ-বিলম্বিত শ্মশ্রুধারী মুণ্ডিত-শির মোল্লা, একজন গৈরিকধারী রুদ্রাক্ষধারী মুণ্ডিতকেশ সন্ন্যাসী, আর একজনের শান্ত ধ্যানস্তিমিত নয়ন, করুণার্দ্র মুখশ্রী। তিন জনেই বললেন, "ও রূপ রেখা, সৃষ্টির যা বাহিরে তাকে কখনও সৃষ্টির মধ্যে টেনে আনা যায় না"। সন্ন্যাসী বললেন, "ভুল, ও সব ভুল। আমরা মন্দিরের উপর মন্দির গড়ে জীবনদেবতাকে দূর থেকে দূরতর করে রেখেছি। তুমি পাগল, তাই মনে কর সেই দেবতাকে নামিয়ে এনে মানুষের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা এত দিন ধরে সিঁড়ি গড়ে রেখেছি,—সব মাটি হলে, সব মাটি হবে।"

আকাশচারিণী সেই জ্যোতির্মণ্ডিত পর্ব্বতের দিকে চেয়ে দেখলেন—তাই তো! এ ত পর্ব্বত নয়, এ যে মন্দিরের উপর মন্দির, তার উপর মন্দির-স্তূপ। তিনি তবু দমে গেলেন না। কিরণধারা ধরে জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ভগবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হাসতে হাসতে ভগবান জীবনদেবতা বললেন—ওদের এত সাধের কারিগরী সব মাটি হবে? তা' উপায় নেই। এবার বুঝি আমায় নামতে হবে। তুমি আমার জ্যোতি নিয়ে ঐ অতলস্পর্শ অন্ধকারের মাঝে গিয়ে দাঁড়াও।"

"অন্ধকার গুহা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি পিঁপড়ার মত এসে আকাশচারিণীর হাতের স্বর্ণদ্যুতি টুকরা টুকরা করে মুখে মুখে নিয়ে চলে গেল। আবার জমাট অন্ধকার। কাতর কণ্ঠে নারী ডেকে বললেন—"আর কেন ঠাকুর! আমায় এখান থেকে উদ্ধার কর।" জীবনদেবতা একটি হৈম ত্রিকোণ দেখিয়ে বললেন, "অখণ্ড সত্যের এই স্বর্ণ-ত্রিকোণ নিয়ে যাও। যুগে যুগে আমার জ্যোতি গেছে, লোকে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে খেয়ে নিজেদের অন্ধকারে নিজেরা ডুবেছে। তখন সেই সোনার ত্রিকোণ এনে আকাশচারিণী অন্ধ গহ্বরে রাখলেন। চারি দিকে অসংখ্য জনতা এসে লম্বা সরু এক সিঁড়ি তৈরী করে ঐ ত্রিকোণের উপর উঠবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলো।"

পণ্ডিতজী দু'জনের চটকা ভাঙলে ব্যাখ্যা করে বললেন, "ঐ আকাশচারিণী ভারতের আত্মা। মহম্মদ, শঙ্কর, বুদ্ধ তিন জনে নতুন উদ্যম থেকে তাঁকে বিরত করতে চাইছিলেন।

তা' হলে এর শেষ কোথায়?

পণ্ডিতজী। মানুষের পরম বস্তু হওয়ায়।

তারপর এ সংখ্যার কাজের কথা—

কাজের শিল্পী ও মজুর

ভারতকে নূতন করে গড়বার উপযোগী জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে এসেছে এমন বড় কর্ম্মী কতকগুলি না হ'লে ক্ষুদে ক্ষুদে কর্ম্মীদের সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য, এলোমেলো এ বহুসৃষ্টির লক্ষ্যহারা লক্ষ্মীছাড়া দশা আর কাটতে চায় না। আমরা শুধু স্বদেশী কাপড় বুনলেই ভারতের বাণিজ্য প্রাণ পাবে না; কারণ কাপড় বুনে, বিরাট লোহালক্কড়ী কারখানা গড়ে রেল তার চালিয়ে য়ুরোপ তার বাণিজ্যকে যে পথে প্রাণ ও রূপ দিয়েছিল সেই একপেশে কলো সৃষ্টির চাপে গরীব অন্ন বিনা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিনা উচ্ছন্নে যাবার দাখিল হয়েছে। * * * তাকে নতুন যুগের নতুন আলোয় নতুন করে প্রাণ দেবার মহাজ্ঞানী কর্ম্মী চাই। জীবনের প্রতি অঙ্গে ব্রহ্মার মানসপুত্র নতুন স্রষ্টা চাই। তারা এসে সত্যের দৃঢ় ভিত দেবে, আদর্শের নতুন নক্সা দেবে, তার পর সহস্র ক্ষুদে কর্ম্মী তাই ভারতের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা রূপে ফলিয়ে তুলবে।"

ভারতের কর্ম্ম ও কর্ম্মী

আমাদের সেই হলো কর্ম্ম যা ঋগ্বেদের ঋষির ভারতকে, বুদ্ধ অশোকের একচ্ছত্র ভারতকে আবার নতুন আলোয় নতুন জ্ঞানে নতুন করে গড়বে। এ যুগের তারাই হলো কর্ম্মী যারা সূর্য্যবংশী আর্য্য, জ্ঞানসূর্য্য আনন্দসূর্য্য সোনার সত্তায় সমস্ত সত্তা উদ্ভাসিত করে যাদের অন্তর উদয়াচলে নিত্য উদিত। এসো ভাই, অর্জ্জুনের পাঞ্চজন্য শঙ্খ মুখে তুলে বাজাবার মানুষ আজ কে আছ? শিবধনু ভঙ্গ করে জগচ্ছক্তিকে আপন করবার শক্তিধর পুরুষ আজ কে আছ? এ মরণপূত দুঃখবহ্নিপূত ভারতে অমৃতের অধিকারী আজ দেবপুত্র তোমরা কে আছ? কলহের মানুষ, রাগের মানুষ, দৈন্যের মানুষ, পরাণুকরণের মানুষ এ দেশের কি করবে? তোমরা ছিলে না বলেই তো ভারতের সূর্য্য এত দিন ওঠে নি! আজ যুগযুগান্ত পরে কালসিন্ধু সন্তরণ করে ভারতকে জাগাবার সত্য আবার এসেছে, তাই আবার অমৃতের পুত্রগণের ডাক পড়েছে, তাদের কর্ম্মক্ষেত্র ভারত তাদের চরণস্পর্শ কামনায় টলে উঠেছে।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
টেলিফোন:-৩৪-১৭৬১ · গ্রাম ব্রিলিয়াণ্টস
ব্রাঞ্চ বালিগঞ্জ
২০০/২/জি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা·ফোন-পিকে:৪৪৬৬.
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে

প্রফুল্ল রায়

ইলসা। খড়্গের মত ধারালো জলতরঙ্গ। ঘোলা জলের ঢেউ খল-খল করে বাজে আচক্রবাল বিস্তারে। গম্ভীর রাত্রে আচম্‌কা মনে হয়, জিনলোকের সুপ্তিশয্যা থেকে কোটি কোটি প্রেতাত্মা জেগে উঠে মাতলা হাসি হাসতে হাসতে পারের জেলে-কৃষাণের জীবন্ত জনপদগুলোকে অপমৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছে। ধমনীর ওপর এক ঝলক রক্ত চলকে ওঠে আতঙ্কে।

সেই ইলসা। ঢেউয়ের মুকুটে চড়িয়ে একমাল্লাই ইল্‌সা-ডিঙিগুলোকে বেপরোয়া উল্লাসে ছুঁয়ে দেয় মেঘের সামিয়ানা-টাঙানো আকাশে, তার পরেই মোচার খোলার মত টেনে নিয়ে আসে নিজের থবদাবায়।

ইল্‌সা-ডিঙিটার সামনের গলুইএ বসে তিরিশ হাত জলের অতল গর্ভে কাসেম ছড়িয়ে দিয়েছে জালটা। হাতের সতর্ক মুঠোতে দড়ির খোট্ ধরা রয়েছে। তিরিশ হাত জলের অতলান্তে একটি অনিবার্য সংকেত; দড়িটায় স্পর্শ করেছে ইল্‌সার রূপালী ফসল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মসৃণ নিয়মে দড়িটাকে টেনে দেবে কাসেম। জালের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে ইল্‌সার গভীর পাতালে। তিরিশ হাত জলের অতলে, স্বাধীন বিচরণের সাম্রাজ্য থেকে বন্দী হয়ে কাসেমের ডিঙিতে উঠে আকাশ-প্রণাম করবে চাঁদের মত রূপালী ইলিশ। জালের খোট-ধরা মুঠোতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে কেন্দ্রিত করে বসে আছে কাসেম।

টিপ-টিপ ক'রে ইল্‌সেগুঁড়ি ঝরে খইএর মত ফুটে উঠছে নদীতে। আকাশের পটভূমিতে অপরাজিতার মত স্তবকে স্তবকে মেঘ জমেছে। শেষ ক্ষেপটা নৌকার ওপর তুলে ডোবার নীচে প্রসন্ন চোখে তাকালো কাসেম। নাঃ, বিশ কুড়ির মত ইলিশ পড়েছে আজ। পাইকারের নৌকায় তুলে দিলে তিরিশ-চল্লিশটা টাকা আজ মিলবেই। জালটা গুটিয়ে পাটাতনের নীচে রেখে দিল কাসেম। আজ আর মাছ ধরবে না। তার পরে গুন্-গুন্ করে একটি আবিষ্ট নেশার গান ধরল পুলকিত গলায়—

> ওগো, আমার আহ্লাদের স্বামী,
> শ্বশুর বাড়ী যাইতে চাই কো নাইয়র দিবা নি ?
> এই ধর গো তুমি আমার চাবীর ছোরানি।
> তুমি আমার ট্যাকা-পয়সা সিকি দোয়ানি।
> ওগো, আমার আহ্লাদের স্বামী।

গানের রেশটা উজানী ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল দূরান্তর ক্রান্তিরেখার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গেই কাছের ইল্‌সা-ডিঙিটা থেকে একটা উদ্দাম রসিকতা ভেসে এলো; "কে রে কাসমা না কি ? একটা বউর লেইগ্যা মনটা বুঝি ফাকুর ফুকুর করে ?"

নিবন্ত গলায় কাসেম বলল; "আমি কি সোয়ামীর গান গাই না কি ? আমি গাই বউর বুকের পোড়ানির গান।"

"হ, হ, আমরা বেবাকই বুঝি। তুই যা শয়তান! বউর নাম কইর‍্যা তুই নিজের বুকের পোড়ানি কমাইস।"

গানের সুর থামিয়ে দিয়ে চুপ-চাপ বসে রইল কাসেম। দূরের নৌকা থেকে আবারও সেই উদ্দাম গলাটা ভেসে এলো; "কি রে ঘরে যাবি না ? আইজ কোন গঞ্জের পাইকাররে মাছ দিবি ?"

"ইনামগঞ্জের।"

"ক্যান অতখানি গাঙ পাড়ি দেওনের কোন্ কাম ? যে মেঘ জমছে, ডরে বুকের লৌ (রক্ত) পানি হইয়া যায়। এই মামুদপুরে মাছ বেইচ্যা ঘরে গিয়া কাথা মুড়ি দিয়া ঘুম লাগা। গাঙের গতিক আইজ ভালো না কিন্তুক।"

অন্তরঙ্গ গলায় সতর্ক করে দিল পাশের নৌকার ইলসা-মাঝি।

"না, না, ইনামগঞ্জ থিকা বৌঠাইনের লেইগ্যা একখান থান কাপর নিতে লাগব। মামুদপুরে থান পাওয়া যায় না। সেই লেইগ্যা যাওন।"

"ওঃ, সেই হিন্দু বিধবা মাগীটা! মাথাটা বুঝি চাবাইয়া খাইছে তোর! পেত্নীটারে খেদাইয়া একটা বউ ঘরে আন।"

পয়গম্বরের গলায় হাবসী উচ্চারণের মত উদাত্ত ভঙ্গিতে একটা পবিত্র পরামর্শ ভেসে এলো।

"অমুন কথা মুখে আনাও গুনাহ।" কাসেমের গলায় নির্বাপিত প্রত্যুত্তর।

"তবে গোরে যা হারামজাদা জিন। ভাগীদার মইর‍্যা গেছে, তার বউরে তা বইল্যা পুষতে হইব—এই কথা কোন্ কোরাণে লিখা আছে ? তুই কি তার লগে নিকাহ বসবি ?"

"ছিঃ ছিঃ, কি যে কও ফরিদ চাচা!"

একটা তীক্ষ্ণ অপরাধ বোধে ব্রহ্মতালুর মধ্যে রও বিঘূর্ণিত হ'তে লাগল কাসেমের।

ততক্ষণে পাশের নৌকাটা দূরতর ব্যবধান রচনা করতে করতে বিন্দুর মত মিলিয়ে গিয়েছে মামুদপুরের দিকে।

সামনের গলুইটা থেকে পেছনের গলুইর দিকে একবার তাকালো কাসেম। আর সঙ্গে সঙ্গেই ইল্‌সার ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া একটা দমকা বাতাসের মত বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা হু-হু করে উঠল। তিন মাস আগেও ঐ গলুইতে হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বসত জলধর। তার এই ইলসা মাছ ধরার ভাগীদার সে। আজ সেখানে কাঁটাল কাঠের বৈঠাটাই আড়কাঠের সঙ্গে বেঁধে ডিঙির দিকনির্দেশ নির্ভুল রাখে কাসেম; আর সামনের গলুইতে বসে ইল্‌সা-জাল বায়।

হালের গলুইতে এসে বসল কাসেম। বৈঠাটা আড়কাঠ থেকে খুলে নিয়ে আকাশের দিকে নজরটা একবার ছড়িয়ে দিল। মলথড়ি ফুলের মত মেঘের স্তবক থেকে সন্ধ্যার ঘন ছায়াভাস নেমে এসেছে,

বেলা-শেষের সূর্য্যের ওপর অন্ধকার গুঠনের যবনিকা টেনে দিয়েছে কেউ। ঢেউএর নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে ছল-ছল করে ইনামগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলেছে কাসেমের একমাল্লাই জেলে-ডিঙিটা।

আচমকা ইলসার অবাবিত বাতাসের অশ্রান্ত আকুলতায় জীবনের পাণ্ডুলিপিটা এলোমেলো হয়ে দু'বছর আগের একটা অধ্যায় চোখের সামনে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। পদ্মাপারের মানুষ কাসেম। যাযাবর কোন ডিঙিটায় ভাসতে ভাসতে কেমন ক'রে যে ইলসার পারে জলধরের চৌচালা ঘরখানায় নোঙর ফেলেছিল—তা একটা অবাস্তব স্বপ্নের মত অসত্য মনে হয়। এখানে এসেই তার বেবাজিয়া জীবনে প্রথম যতিচিহ্ন, প্রথম জন্মান্তর। তার পর জলধর আর জলধরের বৌর মায়ামধুর স্নেহ তার অস্থির পদচারণায় প্রথম বিশ্রান্তির কাছি পরালো। একসঙ্গে তারা খড়্‌গধার ইলসায় বের হ'ত রুপালী ফসলের তল্লাসে। সেই জলধর—সাত দিনের জ্বরে চোখ দুটো পাকা ধানের রঙের মত হলদে হ'তে হ'তে একদিন বিছানার মধ্যে নিথর হ'য়ে গেল; শরীরের সমস্ত উত্তাপ সরে গিয়ে একটা অর্থময় শীতলতা নেমে এলো। সব চেয়ে বড় সত্যটা একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মত জলধরের বৌর মর্ম্মবিদারী চীৎকারের মধ্যে পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছিল। জলধরের ওপর মৃত্যুর নির্ম্মম একটা সমাপ্তি-রেখা টেনে দিয়েছে।

তার কয়েক দিন পর কাসেম বলেছিল: "তোমার কোন কুটুম-বাটুম আছে বৌ-ঠাইন, সেখানে যাইবা?"

"কোন কালে আমার কেউ নাই ঠাকুরপো! আমি আর যামু কই? আমারে দুইট্যা লবণ-ভাত তুমি দিতে পারবা না? সোয়ামীর ভিটা ছাইড়্যা যামু আর কোন্ খানে?"

জলধরের বৌর বিবর্ণ চোখের তারায় সেদিন ছিল একটা অসহায় প্রার্থনা। "অমুন কথা কইও না বৌ-ঠাইন! আমার গুনাহ লাগে। আমি ভাবতে আছি, আমি মুসলমান, তুমি হিন্দু। মাইনষে কইব কি?"

"মাইনষের কওনেরে আমি ডরাই না, ঠাকুরপো! তোমারে [illegible] আমার ছোট্ট ভাইএর লাহান দেখি।"

সেই থেকে জলধরের বৌ আর কাসেম পাশাপাশি দু'খানা [illegible] ঘরের প্রীতিমুগ্ধ আয়তনে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেদের।

ইতিমধ্যে নৌকাটা ইনামগঞ্জের বন্দরে এসে পড়েছে। দূর থেকে মাঝিদের ডিঙিতে লাল লাল 'ইম্‌লি' পাখীর মালার মত রাশি রাশি আলোর লেখা দেখা যাচ্ছে।

ইলিস মাছ পাইকারের গাছি নৌকায় তুলে, বৌঠাইনের একখানা থান কাপড় আর তিনপাসারী পানকাইজ ধান নিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত্রির পরমায়ু ত্রিযামা পেরিয়ে গেল। চার দিকের আকন্দ-বৈঁচির ঘুমন্ত অরণ্যবেষ্টনে জোনাকীর দীপ্তি, আটকিরা-ঝোপের অন্তরাল থেকে ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁদের একটানা অকৃত্রিম ঐক্যতান ভেসে আসছে।

বৃষ্টিস্নিগ্ধ উঠান থেকে কাসেম ডাকল, "বৌঠাইন, বৌঠাইন"—

ঘরের ঐ ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো জলধরের বৌ। হাতের কুপীর আলো থেকে কনকপদ্মের মত শিখা বিকীর্ণ হ'চ্ছে তার নির্ঘুম আঁখিতারায়।

কাসেম বলল, "এখনও ঘুমাও নাই বৌঠাইন?"

"না, ঘরের পুরুষ মানুষ রইল বাইরে। আমি মাগী খাইয়া খাইয়া শরীলে (শরীরে) রস কইর‍্যা বুঝি ঘুমামু? অমুন আহ্লাদের মুখে ছালি পড়ুক। আস, আস খাইবা আস। এত দেরী করলা ক্যান?"

ইনামগঞ্জে গেছিলাম। তোমার কাপড় নাই—এই খব। এইট্যা কিনতে গেছিলাম। আর এই ট্যাকাগুলান্ রাখ। আইজ বিস্তর মাছ পড়ছিল জালে।" কোমরের গোপন গ্রন্থি থেকে অনেকগুলো কাঁচা টাকা আর থানখানা জলধরের বৌর হাতে ঢেলে দিল কাসেম।

"তোমারে সেই কথা কইল কে? আমার কাপড় আছে আস্তা দুখান। এমুন কাম আর কইরো না।"

বিব্রত গাম্ভীর্য্যের আবরণ নেমে এলো জলধরের বৌর মুখের ওপর।

"তোমার যে কত আস্তা কাপড় আছে, তা আমার জানা আছে। শিলাই কইর‍্যা পুরান কাপড়খান পরতে আছ আইজ এক মাস। আমার চৌখ আছে বৌঠাইন! আমি অন্ধ না! আমি যা খুশী করুম।" অভিমানের নিবিড় রেশ আসন্ন বর্ষণের প্রতীক্ষায় থম্ থম্ করতে লাগল কাসেমের গলায়।

এবারে ফিক ক'রে হেসে ফেলল জলধরের বৌ; "আইচ্ছা, খুব কত্তা-পুরুষ হইছ একেবারে! এইবার থিকা যা খুশী কইর‍্যো। আমি কিছু কইতে যামু না। এখন খাইতে আস, রাইত পোহাইয়া আইল যে!"

"হ তাই করুম। তুমি কোন কথা কইতে পারব না। আমি না আইল্যা যদি জলধরদাদায় আইজ আইন্যা দিত! একদিন তুমি আমারে ছোট ভাই কইছিলা—মনে নাই? আমার মা-বাপের কথা মনে নাই! আছিলাম এক বেবাজিয়া (বেদে) বহরের মাঝি। তোমার কাছে মায় সোহাগ পাইছি পরথম। অমুন কথা আর কইবা না।"

কান্নার মত একটা ঘনকম্পিত অনুভূতি তখনও আঠার মত জড়িয়ে রয়েছে কাসেমের গলায়।

এক মুহূর্ত্তে সেই কান্নাটা সংক্রামিত হয়ে গেল জলধরের বৌর গলায়।

"আর কইও না ঠাকুরপো! তুমি আমার মার প্যাটের ভাই এক দিকে, আর এক দিকে প্যাটের পোলা। তোমারে এট্টু ঠাট্টা করছিলাম। তা-ও বোঝ না!"

মাটির সানকিতে রাঙা বোরো চালের ভাত আর ইলিস মাছের সর্ষে-পাতরি সাজিয়ে কাসেমের সুমুখে এগিয়ে দিল জলধরের বৌ। দু'-এক গ্রাস ভাত মুখে দেবার পরেই জলধরের বৌ বলল; "একটা কথা কমু ঠাকুরপো?"

"কও।" কদম্বরেণুর মত গোঁফদাড়িতে আকীর্ণ মুখখানা তুলে ধরল কাসেম।

"আমার কথা রাখলে তবে কই কথাটা।"

"তোমার কথা রাখুম না, এই একটা কথা হইল!"

দুর্বিনীত অভিমানে ভাতের সানকি থেকে হাতখানা কোলের ওপর গুটিয়ে আনল কাসেম।

"আমি রহিম খোন্দকারের মাইয়াটারে দেখছি, বড় সোন্দর

দেখতে। তোমার পাশে খাসা মানাইব। তোমার হইয়া আমি কথা দিয়া দিছি। পাচ কুড়ি ট্যাকা বউ-পণ লাগব।”

রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে সামনে এগিয়ে এলো জলধরের বৌ।

“না, না বউঠাইন! এখন সাদির ল্যাঠা থাউক। আর অত ট্যাকা দিমু কোথা থিকা বউ-পণের লেইগ্যা?”

কাসেমের উদার আকাশের মত দৃষ্টিতে বিস্ময়ের হালকা হালকা মেঘসঞ্চার।

“ট্যাকার লেইগ্যা তোমার ভাবতে হইব না। আমি মুন্সীবাড়ী ভারা ভাইন্যা (ধান ভেনে) ট্যাকার জোগাড় রাখছি। তুমি মত দিলেই হয়। বেরাজী হইও না। আমি একটা টুকটুকা বইন চাই। একলগে কাম করুম, একলগে হাসুম, একলগে গলা জড়াইয়া কান্দুম।” জলধরের বৌর গলায় আকুলিত প্রার্থনা চকিত হয়ে উঠল।

বউ! তেইশ বছরের রোমাঞ্চিত কেলীতরঙ্গের মধ্য দিয়ে একটা অনাস্বাদিত শিহরণ ব’য়ে গেল কাসেমের। একটা বেনামী পুলকের অনুভূতিতে ধমনীর ওপর রক্তে ঝলক লাগল আচমকা। ইলসার নির্ধারিত পটভূমিতে আজ প্রথম সন্ধ্যায় বউর মোহকামনার স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিল পাশের নৌকার মাঝি।

নিবিড় গলার নিশ্চুপ স্বরে কাসেম বলল, “কোন্ একটা পেত্নীর বাচ্চারে ধইর‍্যা আনবা—তোমার যত কথা বউঠাইন”—

আচমকা কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল। নিরুৎসাহ গলায় জলধরের বৌ বলল, “না, না, সাদি তোমারে করতেই হইব। তোমারে-আমারে লইয়া পাচ জনে মন্দ কয়।”

“কি কইল্যা!”

দূরের আকাশ থেকে দু’জনের ব্যবধানের ভূমিতে একটা বজ্র এসে বিদীর্ণ হ’ল যেন।

বাকী রাত্রিটুকু সন্নিহিত ঘরের মাচায় বিছানো জীর্ণ শয্যার ওপর বিনিদ্র চোখের প্রহর গুণে চলল কাসেম আর জলধরের বৌ।

মাঝ রাত থেকে ঝম-ঝম নূপুর বাজিয়ে বৃষ্টির উর্ব্বশী-নাচ সুরু হয়েছে। ঘরের চালের ফাঁক দিয়ে বর্ষণ-প্লাবিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায় এক টুকরো। দূরের মাতলা ইলসার গর্জ্জিত ফোঁসানি ভেসে আসে। দু’জনেই দু’জনের নির্ঘুম থাকার পরিষ্কার সংকেত পাচ্ছে।

আচমকা জলধরের বৌ বলল, “ঠাকুরপো!”

“কি?” একটা গম্ভীর উত্তর ভেসে এলো বেড়ার ও-পাশ থেকে। “দরজাটা খুইল্যা কাথাখান নাও। বড় জবর কাল (শীত) পড়েছে। শ্যাসে আবার অসুখ-বিসুখ করতে পারে।”

ঝাঁপ খুলে কাঁথা হাতে বাইরে বেরিয়ে এলো জলধরের বৌ। পাশের ঘরের ঝাঁপ খোলার শব্দ ভেসে আসে।

তিমির পিঠের মত কালো আকাশের ওপর সপাং করে বিদ্যুতের চাবুক চমকাল একবার।

হো হো করে বৃষ্টি-তুফানের আবহ বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেসে উঠল কাসেম। “আমরা গাঙের পোকা বউঠাইন। এট্ট কালে (শীতে) অসুখ ব্যারাম হইব আমাগো!”

তার হাসিটা ইলসার দমকা বাতাসে মুছে গেল সহসা। খানিকটা সময়ের বিরতি-চিহ্ন। দু’জনের মাঝখানে খানিকটা অন্ধকার অর্থহীন নীরবতায় স্থির হয়ে রয়েছে।

ফিস-ফিস গলায় জলধরের বৌ বলল, “সারা রাইত বিছানায় উস্‌পাস্‌ করছ। ঘুমাও নাই এক দণ্ড—ক্যান ঠাকুরপো?”

আশ্চর্য্য সংযত গলা কাসেমের, “তুমিও তো ঘুমাও নাই বৌঠাইন, কি ভাবতে আছিলা? দাদার কথা?”

সহসা কাসেমের সমস্ত শরীরে বর্ষাস্পন্দিত মেঘনার একটা চকিত দোলন লাগল। নীচু হয়ে জলধরের বৌর পা দু’খানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে; “বৌ ঠাইন, সত্য কথা কও। তুমি আমারে সন্দ কর? তবে আমি আইজই যামু গিয়া;—”

দুখানা হাতের স্নিগ্ধ বেষ্টনে কাসেমকে পায়ের আশ্রয় থেকে টেনে তুলল জলধরের বৌ, “ছিঃ, অমুন কথা আমার মনেও আসে নাই কোন দিন, তুমি আমার ছোট ভাই। তবে মাইন্‌ষে কয়—তুমি সাদিটা কইর‍্যা ফেলাও। আমি বউ পণের ট্যাকা দিমু।”

“ও, এইর লেইগ্যা বুঝি আমারে না জানাইয়া মুন্সীবাড়ী ভারা ভাইন্যা (ধান ভেনে) ট্যাকা কামাইছ? বেশ, তোমার কথা আমি রাখুম। তবে আমার মাথার কিরা আর কখনও ধান ভানতে যাইবা না। আমি মরলে পরে যাইও।” গাঢ় গলার পিষ্ট কান্না ছড়িয়ে বলল কাসেম।

অন্ধকারের পটভূমিতে একটা দ্রোণফুলের মত জলধরের বৌর হাসিটা ফিক করে ফুটে উঠল; “হইচে, হইচে। এইবার ঘরে গিয়া শোও। এই নাও কাথাখান—মুড়ি দিয়া শুইও।”

“আর মস্করা কইরো না। কাথা দেওনের নাম কইর‍্যা নিজের জিদখান বজায় রাখলা। তুমি যা চতুর—এখন আর শুমু না। এইবার নদীতে যাই। আইজ বিস্তর মাছ পড়ব; মনে লয়।”

দিক্‌বাত্তিরে কাঁথা দেবার ভূমিকার নেপথ্যলোকে যে অর্থটি আত্মগোপন ক’রে ছিল, তা পরিষ্কার ধরে ফেলেছিল কাসেম।

বউএর নাম ফুলমন। জলধরের বৌ নিজের বেসর, বনফুল আর পৈছা সাজিয়ে দিল তার সারা দেহে। নাচের বিঘূর্ণিত ছন্দে যখন তখন ঘুরপাক খায় সে ঝম ঝম মল বাজিয়ে।

কবুতরের বুকের মত নরম ঠোঁট দুটিতে পানের রক্তরাগ। সেই পানরাঙানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মধু ঝরাবার যে প্রত্যাশা ছিল জলধরের বৌর, তার বদলে ফিন্‌কি দিয়ে কালনাগিনীর বিষ বেরিয়ে এলো এখানে আসার ষোলটা প্রহর পেরিয়ে যাবার পরই।

পাইকারের নৌকায় মাছ দিয়ে দশটা কাঁচা টাকা মিলেছিল। সেই টাকাটা জলধরের বৌর হাতে যেই মাত্র অনেক দিনের ম[illegible] অভ্যাসে গুঁজে দিল কাসেম; ঠিক তখনই চোখের মণিদুটো ভুরু[illegible] ধনু পার করে আসমানে তুলে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল [illegible] “আগো আমার বাজান! কোন নিঃবইংশ্যার লগে আমা[illegible] সাদি দিছিলা গো বাজান! ড্যাকরা হিন্দু বিধবা মাগীর ল[illegible] মবরৎ ক’রে গো বাজান—”

বয়রা বাঁশের মাচায় একটা শরাহত ভাল্লুকের মত গড়া[illegible] লাগল ফুলমন।

কাসেম আর জলধরের বৌ বজ্রাহত দৃষ্টিতে পরস্পরের দি[illegible] নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

এক সময় রুদ্ধবাক গলায় বলল জলধরের বৌ, “এইবার থি[illegible] বউর হাতেই ট্যাকা দিও ঠাকুরপো। সত্য কথাই তো আমি [illegible]

মাগী, অলক্ষ্মী। বৌ মানুষ—ঘরের লক্ষ্মী। তার হাতেই দিও ঠাকুরপো।"

শান্তিনিবিড় পৃথিবীর যে আকাশটাকে রামধনুর স্বপ্নমায়ার রঙে রঙে প্লাবিত করে দেবার কোমল বাসনা ছিল তাদের; সেই আকাশে প্রথম কালবৈশাখীর সঞ্চারে একটা অনিবার্য অশুভের সংকেত সূচিত হচ্ছে। সে কালবৈশাখী ফুলমন।

জলধরের বৌ ঘরের ভেতর এসে কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপ টেনে দিল; আর কাসেম ইল্সার দিকে আবার ক্লান্তমন্থর শরীরটাকে বয়ে বয়ে নিয়ে গেল। বড় বিস্বাদ, বড় অপ্রত্যাশিত ঠেকছে আজকের এই সকালটা। প্রসন্ন রোদের সোনা আচম্কা মেঘের ছায়াপাতে যেন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

বর্ষার বীতবর্ষণ আকাশের মত থম-থম করে কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় তিন চাঙাড়ি ইলিস মাছ এনে উঠানে নামাল কাসেম, তার পর ডাক দেয়, "অ বউঠাইন, অ বৌ—তোমরা সব বাইরে আস।"

ত্রস্ত পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে এলো জলধরের বৌ। ফুলমন সস্তা দামের আয়নার সামনে সমস্ত মুখখানা অমানবিক ভঙ্গিতে দুলিয়ে দুলিয়ে সুর্মার সতর্ক রেখা আঁকছিল চোখের কোলে। কাসেমের ডাকটা কানের গুহাপথে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত গলায় চীৎকার ক'রে উঠল: "ক্যা, হইচে কী ড্যাকরার? পিরীতের নাগরীই তো রইছে। তার কানে কইলেই হইব।" ফুলমনের শ্যামলা ভুঁইচাঁপার মত অকলঙ্ক মুখখানার মধ্যে এমন একখানা ক্ষুর-শাণিত জিভের অস্তিত্ব কোথায় ছিল, সাদির আগে কাসেম কী জলধরের বৌ কেউ তা আবিষ্কার করতে পারেনি। কাসেম বলল: "বউঠাইন, এইগুলান দিয়া লবণ-ইলিস কইর‍্যা কইলকাতায় চালান দিলে ভাল কারবার হইব; পয়সাও আসব ভালই। তুমি আর বউ মাছ কাইট্যা লবণ মাখাইয়া রাখ।" নিথর গলায় জলধরের বউ বলল: "বউ পোলাপান মানুষ; আমিই একলা কাইট্যা লবণ দিয়া রাইখ্যা রাখুম। তুমি হাতমুখ ধুইয়্যা ভাত খাইবা আস ঠাকুরপো!"

একটু সময় নীরবতার যতিচিহ্নের মত কেটে গেল। তার পর কাসেম প্রখর অভিযোগের গলায় বলল: "কী বউই আইন্যা দিলা বৌঠাইন! আমি তখন কত বার না করলাম—এইবার ঠেলা সামলাও।"

"চুপ কর, বউ আবার শুনতে পাইব। পোলাপান মানুষ—একটু সোহাগ-আহ্লাদ কইরো।"

রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে ফুলমনকে নিবিড় আলিঙ্গনের বেষ্টনে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলো কাসেম। অতিকায় একটা ঘাই-লো মাছের মত প্রচণ্ড ঝটকায় বিছানার আর এক প্রান্তে সরে গেল ফুলমন। সামনের ইল্সা থেকে সারেঙ্গীর সুরের মত ঢেউএর কান্না ভেসে আসছে সোঁ সোঁ ক'রে, হিজল-সুপারীর পাতায় পাতায় বাতাসের অশ্রান্ত মর্মর। কাসেম আকুলিত গলায় বলল: "অমুন করিস না বউ, বৌঠাইন আমাগো কত ভালবাসে। বেবাজিয়া নৌকার মাঝি আছিলাম আমি। পদ্মার ঐ দূর দ্যাশ থিকা ইল্সায় আইলাম। জলধর দাদায় আশ্রয় দিল—বৌঠাইন মায়ের লাখান বুকে নিল। অমুন কথা বউঠাইনরে কইস না।"

"বুকে নিল। সোহাগ কইর‍্যা নাগরেরে বুকে নিল। ওঃ, সেইর লেইগ্যা বুঝি ট্যাকা আইন্যা ওর হাতে দিস ড্যাকরা। ওর হাতে মধু আছে, ওর হাতের ভাতে মধু আছে। যা, যা ওর ঘরে যা—দ্যাখ গিয়া তোর গায়ের গোন্ধ না পাইলে আবার সারা রাইত ঘুম আসব না।"

খিক খিক করে সারা দেহ-মন্থন-করা জিনলোকের হাসি হেসে উঠল ফুলমন।

বিস্রস্ত গলায় কাসেম বলল, "চুপ চুপ! বৌঠাইনে আবার শুনতে পাইব।"

"শুনতে পাইব, তো আমার কি? শোনানের লেইগ্যাই তো কই।"

এইবার চুপ না করলে বরুত্তরের লাখান গলাটা ছিঁড়া ফেলামু—হারামজাদী কাছিমের ছাও শুওর।"

কাসেমের গলাটা একটা ভয়ানক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিল।

"চুপ করুম কার ডরে! নিঃবইংশ্যা, ড্যাকরা, আল্লার অরুচি—ওগো বাজান! তোমার মনে এই আছিল! ট্যাকার লেইগ্যা এই ছিনালের বাচ্চার লগে দিছিলা আমার সাদি গো বাজান!"

বিনিয়ে বিনিয়ে আনুনাসিক গলায় স্বর-লয়ে কান্নার ঢেউ ছড়াতে লাগল ফুলমন।

অনেকটা সময় দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়ে নির্মম সংযমে নিজের উত্তেজনাটাকে বাঁধ দিয়ে রাখল কাসেম: তার পর এক সময় ফুলমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেক দিনের অসহ্য আর বন্দী ক্রোধটা কীল-চড় আর অবিশ্রাম লাথির মধ্যে মুক্তি পেয়ে আছড়ে পড়তে লাগল ফুলমনের সারা দেহে।

ফুলমনের কথাগুলো শুনতে শুনতে পাশের ঘরে বিধ্বস্ত অনুভূতি নিয়ে নিশ্চুপ পড়ে ছিল জলধরের বৌ। এবার সে দানা-পাওয়া গলায় চীৎকার করে উঠল; "কী ক'র কী ক'র ঠাকুরপো! মাইয়া মানুষের গায়ে হাত তুলতে সরম লাগে না?"

ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়ালো কাসেম; "কি বিজাত বউ যে আইন্যা দিছ বউঠাইন! সব তোমার দোষ, সব তোমার দোষ। এক মুহূর্ত্তও আর ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয় না। কাছিমের ছাওটা ঘরের মধ্যে যেন বিষ মাখাইয়া দিছে।"

বিশৃঙ্খল পদসঞ্চারে ইল্সার দিকে চলে গেল কাসেম।

মাছের চাঙাড়িগুলো উঠানের এক কিনারায় পড়ে রয়েছে; একটা উগ্র আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে।

খানিকটা সময় স্তব্ধ থেকে কুপী জ্বালিয়ে বঁটা নিয়ে বসল জলধরের বৌ। সন্ধ্যারাত্রিরে কুমারবাড়ী থেকে অনেকগুলো নতুন হাঁড়ি এনে দিয়েছিল কাসেম। মাছ কেটে কেটে হাঁড়ি ভর্ত্তি করে নুণ জারিয়ে রাখতে লাগল জলধরের বৌ।

পোহাতি রাতে কাসেম ফিরে এলো আবার। ব্যস্ত গলায় বলল; "বউঠাইন, তোমারে কইতে ভুইল্যা গেছি। লবণ-মাছের চালান পাঠাইতে হইব আইজ সকালেই। শয়তানের ছাওটা গণ্ডগোল কইরা দিছে।"

"তোমার ব্যস্ত না হইলেও চলব। তোমার মাছ কাইট্যা আমি গুছাইয়া রাখছি। এই লইয়্যা যাও ঠাকুরপো।"

লঘু-মৃদু হাসল জলধরের বৌ।

অসীম কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো জলোচ্ছ্বাসে ঝাপসা হয়ে গেল কাসেমের।

সকাল বেলা বয়রা বাঁশের মাচার ওপর থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলো ফুলমন। সমস্ত মুখখানায় রক্তের ছোপ ছোপ স্বাক্ষর। কাসেমের হাত পা ফুলমনের দেহের ওপর প্রলয় নাচ নেচেছে কাল রাত্রে।

ইতিমধ্যে গাঙের ঘাট থেকে গোটা কয়েক ডুব দিয়ে বিনিদ্র রাত্রির সমস্ত ক্লেদ ধুয়ে এসেছে জলধরের বৌ; ফুলমনের মুখের ওপর আহত দৃষ্টিটা পড়তেই আর্তনাদ করে উঠল, "ঠাকুরপোর রাগ উঠলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আয়, আয় বউ, আমি তোরে গান্দার পাতা বাইট্যা দেই, মুখে লাগা।"

একটা আলাদ গোক্ষুরের ল্যাজে যেন খোঁচা লেগেছে বরঞ্চ, সাঁ ক'রে ফণা তুলে দাঁড়ালো ফুলমন, "হারামজাদী, কালামুখী বেউশ্যের আবার পীরিত উথলাইয়া উঠছে। আমার লগে কথা কইবি না। তুই যেইখানে থাকবি, আমি সেইখানে নাই।"

"এই কী সব্বনাইশ্যা কথা কইস বৌ!"

গলাটা বিস্ময়ের কান্নায় রুদ্ধবাক্ হয়ে রইল জলধরের বৌর।

"সত্য কথা! তুই নামবি এই বাড়ী থিকা, না হয় আমিই এখন বাজানের বাড়ীতে যামু গিয়া।"

"আমি গেলে গিয়া তুই খুশী হইস বৌ? তোগো কাজিয়া বিবাদ যাইব গিয়া?"

চোখের আকাশে যে বর্ষণ এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল, এবারে তা ঝরে ঝরে সমস্ত মুখখানা ভাসিয়ে দিল জলধরের বৌর!

"নিশ্চয়; আমার সোয়ামীর কাচা মুড়াটা চিবাইছিস এতদিন, এইবার আমারে এটু চিবাইতে দে লো নটীর ছাও।"

ফুলমনের গলায় আলাদ গোক্ষুরের ফনাটা ঘন ঘন আন্দোলিত হতে লাগল।

"বেশ আমি যাইতে আছি গিয়া। আমার কে আছে—আমারে কে কি কইব? তুই ঘরের বউ, তুই সোয়ামীর ঘর থিকা নাইম্যা গেলে নিন্দা হইব, মাইনষে মোন্দ কইব।"

"হ হ, তাই যা তুই। মাগী রাঢ়ী বেউশ্যে।"

এক সময় সামনের মুলিবাঁশ-ঝোপের ছায়ামেদুর যে পথটা কুমারীর অকলঙ্ক সাঁথির মত নিরাভরণ রেখায় এঁকে বেঁকে মুন্সী-বাড়ীর দিকে চলে গিয়েছে, সেই পথটার বাঁকেই অদৃশ্য হ'য়ে গেল জলধরের বৌ।

ঘরের ভেতর এসে ঝাঁপটা প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ ক'রে দিল ফুলমন। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচা বাঁশের জানালার ওপর ভেসে উঠল দু'টো কামনামুগ্ধ চোখ।

উচ্ছ্বসিত গলায় ফুলমন বলল; তুই আইছিস্ রুস্তম। কয়টা দিন হারামজাদা জিনের লগে শুইয়া আমার ঘুম হয় নাই। বাজানটা যা চশমখোর, ট্যাকার লেইগ্যা সাদি দিল এই বখিলটার লগে।"

"তোরে কয় দিন দেখি না! তুই একটা খবরও দিস্ না। মাইয়া লোক যখন যেই মরদের গন্ধ পায়, তখন তার কথাই কয়।"

"অমুন কথা কইস না রুস্তইম্যা। আমি তেমুন মাগী না। কিন্তুক কী রকম, ঐ বিধবা মাগীটা অষ্টপহর তাকে তাকে থাকে। হ্যাষে তোর আমার ব্যাপার জাইন্যা ঐ মরদার কাছে কইলে, আমার পিঠের বাকলা তুইল্যা ফেলাইত।"

"তা হইলে উপায়?"

একটা অথৈ আশঙ্কার সমুদ্রে যেন নিরুপায় হয়ে হাবুডুবু খেতে লাগল রুস্তম। "ডর নাই, মাগীরে কাইজ্যা কইর্যা খেদাইছি। এইবার ঘর বান্ধনের ব্যবস্থা কর; আমি আর থাকুম না, এইখানে একদিনও।"

ফিক্ ক'রে আশ্বাসের হাসির প্রশ্রয় ছড়ালো ফুলমন।

"বেশ, ট্যাকা দে তিন কুড়ি।"

"নে।" ভাঙা কাঠের বাক্স থেকে টাকা বের করে রুস্তমের হাতে ঢেলে দিল ফুলমন; "এইবার যা। আবার আসিস রাইতে।"

"ঘরে তোর কাছে শুইতে দিবি তো?"

ইলিস মাছের রূপালী আঁসের মত চক-চক করতে লাগল রুস্তমের কদর্য চোখ দুটো।

"যা ভাগ এখন, আসিস তো রাইতে। মরদটা না থাকলে—"

ফুলমনের সমস্ত দেহটাকে আর একবার দৃষ্টিভোজ ক'রে চলে গেল রুস্তম।

সূর্যের আকাশ থেকে রাশি রাশি সোনালী রোদের বন্যা এসে পড়েছে ইলসা-পারের মাটিতে। সাদা সাদা রেণু ছিটানো মানকচুর অরণ্যে সোঁতা খালটা পান্নার কণার মত ঝিল-মিল করছে।

আনন্দিত পদক্ষেপে বৃষ্টিকোমল মাটিতে এসে পুলকিত গলায় ডাকল কাসেম, "বউঠাইন, অ বউঠাইন—"

পাকের ঘরে আজ সর্বপ্রথম আবির্ভাব হয়েছে ফুলমনের; ডালের উগ্র সম্বরা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো সে। প্রসন্ন হাসির অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল; "আস ঘরে আস—"

দৃষ্টিটা বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে এনে অস্থির গলায় কাসেম বলল, "বউঠাইন কই? আইজ তার লবণ-ইলিসে এক কুড়ি পাচ ট্যাকা লাভ হইচে। কই গেল বউঠাইন? তার লেইগ্যা আর তোমার লেইগ্যা কাপড় আনছি নয়া।"

"কই দেখি কাপড়?" ব্যগ্র কৌতূহলে উঠানের পরিসরে নেমে এলো ফুলমন।

"বউঠাইন কই?" কাসেমের গলায় কঠিনতম জিজ্ঞাসা।

"রাঢ়ী মাগীরে খেদাইয়া দিছি।" নির্লিপ্ত জবাব ভেসে এলো ফুলমনের।

"খেদাইয়া দিছ!" কাসেমের সমস্ত ভঙ্গিমার ঘনীভূত আর্তনাদটা গলা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো।

"খেদাইয়া দিছি। হিঁদু মাগীর লগে কোন পীরিত?"

"তবে আইজ যে লবণ-ইলিসের বায়না লইয়া আইলাম একশ রাইঙ (হাড়ি); সেই সব বানাইয়া দিব কে? তুই তো বাদশাজাদী; সূর্য্য পরতে কাইট্যা যায় বেলা তিন পহর!"

তার আমি জানি কি? ওগো বাজান—নিঃবইংশ্যা আমারে দিয়া বলদের লাঙ্গল খাটানের লেইগ্যা সাদি করেছে গো বাজান! তুমি আমারে এই ড্যাকরার লগে দিছিলা সাদি গো বাজান।" ফুলমন কাঁসর-পেটানো গলায় বিনাতে সুরু করল।

সামনের সূর্য্যদীপিত পটভূমিটা যেন অন্ধকারের অতলতায় নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো দুটো হাতের ঢাকনায় আবৃত করে উঠানের ওপর বসে পড়ল কাসেম; "খেদাইয়া দিলা—খেদাইয়া দিলা বউঠাইন্‌রে"—

একটু পরেই গাব-মাদারের রোদ-ঝলমল ছায়ার জাফরী-কাটা পথটা ধরে মুন্সীদের ঢেঁকী-ঘরটার কাছে এসে দাঁড়ালো কাসেম। ঢেঁকী-ঘরটার সন্নিহিত একখানা ভাঙা একচালা। অনেক দিনের ঝড়-বর্ষণের শরাঘাতে হেলে রয়েছে এক দিকে; মাটির দেওয়াল ঝরে গিয়ে বাঁশের খুঁটির কঙ্কাল আত্মপ্রকাশ করেছে।

ইতিমধ্যে মেঝেটা পরিচ্ছন্ন করে নিকিয়ে নিয়েছে জলধরের বৌ। ভাঙা ইটের টুকরো দিয়ে উনুন রচনা করেছে।

কাসেম কান্নাপ্লাবিত গলায় বলল, "ঘরে লও বৌঠাইন। এইখানে আসছ; মানুষে আমারে মন্দ কইব।"

"না, ঠাকুরপো! আমি তোমার উপুর গোসা হইয়া আসি নাই। তোমরা সুখে-শান্তিতে ঘর-গৃহস্থী কর; আমি দূর থিকা দেখি।"

জলধরের বৌর গলায় তীব্র অভিমানের উত্তাপটুকু স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরিয়ে এলো।

"তুমি যাইবা না তবে? আমি তোমার পর বইল্যা খেদাইয়া দিলা!"

"নাঃ, আমি গেলেই আবার তোমার সংসারে আগুন লাগব। বৌ আমারে চায় না। তুমি ঘরে যাও ঠাকুরপো!"

"বৌরে আমি খেদাইয়া দেই। তবু তুমি লও।"

"তুমি কেমুনতর সোয়ামী, চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী কইর‍্যা যারে সাদি কইর‍্যা আনলা—তারে খেদাইতে চাও? যাও, বেলা নাইম্যা গেছে। খাইতে যাও।" জলধরের বৌর গলাটা তীক্ষ্ণ ধমকে উচ্চকিত হয়ে উঠল।

"বেশ, কিন্তুক আইজ আবার লবণ-ইলিসের বায়না দিছে। ফুলবিবি হো সুর্ম্মা আর গন্ধ তেল ছাড়া কিছুই ধরে না। আমার কেউ নাই এই দুনিয়ায়—থাকলে কি আর অমুন কইর‍্যা ফেলাইয়া যাইতে পারত?" কাসেম ডোরা-কাটা লুঙ্গির প্রান্তে অশ্রুকম্পিত চোখ মুছতে মুছতে সেই বনছায়ার গোরোচনা-আঁকা পথটা দিয়ে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

"ঠাকুরপো!"

ডান হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করে চীৎকার করে উঠতে চাইল জলধরের বৌ। কিন্তু ভারী পাথরের মত কান্নার অবরোধ সরিয়ে স্বরটা আত্মপ্রকাশ করতে পারল না।

সারা দিন আর উনুনের চিতা জ্বালেনি জলধরের বৌ। মুন্সীদের পান ছেনে একচালা ঘরখানায় এসে নতুন আখাটাকে ভেঙে ফেলল। তার পর উৎসুক-ব্যাকুল চোখ দুটো সতর্ক ভাবে পথের ওপর স্থির রেখে একটা অতি পরিচিত পদধ্বনি শুনবার জন্য চৌকাঠের ওপর বসে রইল। কিন্তু নাঃ, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চাঁদটা পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। ত্রিযামা-পথিক শিয়ালের গলায় অনেকগুলো প্রহর ঘোষিত হয়ে গেল। তন্দ্রার আচ্ছন্নতা ছত্রখান করে মাঝে মাঝে ঝরাপাতায় ওপর দিয়ে ভাম-খাটাসের শোভাযাত্রা চলে গেল। ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছে জলধরের বৌ।

ততক্ষণে আসন্ন প্রভাতের আবছায়া আলোর ছোপ পড়েছে পুবালি দিগ্‌বলয়ে। হাতের পাতা দিয়ে চোখ দুটো ঘসে ঘসে উঠে দাঁড়ালো জলধরের বৌ।

কাসেম হয়ত তার তন্দ্রার অবসরেই মখমল-মৃদু পদক্ষেপে এ পথ দিয়ে চলে গিয়েছে; সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো মথিত করে অশ্রুধারা নেমে আসতে চাইল জলধরের বৌর।

ইতিমধ্যে কখন যে মুন্সীবাড়ীর ছোট কর্ত্তা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল ছিল না। পাশ ফিরতেই নজরে পড়ল ছোট কর্ত্তার চোখজোড়া তার বিস্রস্ত থানের বাতায়ন দিয়ে শরীরের অনাবৃত চামড়ার ওপর সড়কির আঘাতের মত কাঁপিয়ে পড়েছে। ত্রস্তে কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে ভীতি-চকিত গলায় জলধরের বৌ বলল; "আপনে এইখানে ছোট কর্ত্তা?"

"এই তোমার এট্টু খবর-বার্ত্তা নিতে আইলাম। এই একচালা ঘরখানে থাকতে ডর লাগে না তো বাইতে?"

"না। ডরের কি আছে, আমার কি-ই বা আছে?"

ছোট কর্ত্তা বৈষ্ণব। সমস্ত শরীরে শ্রীকৃষ্ণের চন্দন-পদচিহ্ন; পাতলা নিমার নিচে তুলসীর মালার আধ্যাত্মিক ঘোষণা; চোখে প্রসন্ন গোপিনীদৃষ্টি। হাতের জপের মালায় উত্তেজনার ঝড়।

আপাততঃ তিনি কৃষ্ণভাবে ভাবিত; "না, কইলেই হইল? তোমার যে কি আছে; কি আর নাই, তা কি তুমি জান সুন্দরী! কত সাপ-খোপ, বদমানুষ আছে। তাগো হাত থিকা বাচাইতে হইব না কৃষ্ণের জীবেরে। নারায়ণ, নারায়ণ। তোমার কিছু ডর নাই। এই জায়গাটা বেশ নিরালা—রাত্রে আইস্যা তোমার লগে কৃষ্ণকথা কওয়া যাইব। নারায়ণ, নারায়ণ—"রহস্যময় হেসে সামনের হেউলি ঝোপটার আড়াল দিয়ে মিশিয়ে গেলেন ছোট কর্ত্তা, অনেক দূর থেকে তাঁর অমৃতনির্ঝর কণ্ঠ ভেসে এলো কয়েক কলি গানের সঙ্গে—

কৃষ্ণের যতেক লীলা,
সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ······

কাণের ওপর একটা শঙ্খচূড় সাপের ছোবল পড়ল যেন। শিউরে উঠল জলধরের বউ।

সারা রাত ক্ষ্যাপা নদীতে ইলসা জাল বেয়ে অপরিসীম ক্লান্তির অবসাদে শরীরটা যেন ভেঙে ছত্রখান হয়ে গিয়েছে কাসেমের।

বাড়ীর উঠানের ওপর আসতে আসতে মাথার ওপর সূর্যটা তির্যক্ ভাবে লম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল; পায়ের নীচের ছায়াটা হ্রস্বতম হয়ে এসেছে। উঠানের ওপর পা দিয়েই শরীরের সমস্ত রক্ত ফেনিয়ে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে আবর্ত্তিত হ'তে লাগল কাসেমের।

নিরাবৃত বারান্দার ওপর রুস্তমের অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে ধরা রয়েছে ফুলমন। কি সে করতে পারে? হাতের ধারালো ছেন্‌দা-খানা দুজনের গলার ওপর বসিয়ে একেবারে সহমরণে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া পুরুষের মত বীর্য্যবান কাজ আর কী আছে? অথবা নিজের

ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে নাকি দা-টা ? সমস্ত চিন্তা ইন্দ্রিয়কোষগুলো থেকে এক মুহূর্তে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল কাসেমের।

আর বারান্দার ওপর থেকে রুস্তম আর ফুলমন একসঙ্গেই ভূত-দর্শনের পুলকিত শিহরণ অনুভব করল।

কয়েকটা নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে রইল তিন জোড়া বজ্রপ্রহত চোখের নিষ্পলক আয়নায়।

তার পর পুরুষের পলায়নের স্বাভাবিক প্রেরণায় রুস্তম ফুলমনকে বারান্দার ওপর আছড়ে ফেলে একটা জ্যা-মুক্ত তীরের মত সাঁ ক'রে বাইরে অরণ্যের খোরথায় মিলিয়ে গেল।

গন্ধসাবান-মাখা ফুরফুরে দেহটা থেকে ধুলোর কণাগুলো ঝেড়ে উঠে বসেছে ফুলমন।

কাসেমের গলাটা ডোরাকাটা বাঘের মত গর্জ্জন ক'রে উঠল এই প্রথম। "ও কে ? ও আসে ক্যান্ ?"

প্রথমে বক্তুপাবার মধ্যে ভয়ের একটা আকস্মিক ছায়াপাত ঘটেছিল। এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিল ফুলমন ; "ও আসে ক্যান্, ওরে জিগাইও শরীরে তেল থাকলে ! তুমি যাও ক্যান্ ঐ রাঢ়ী মাগীর বিছানায় ?"

"সাবধান সুমুন্দির ঝি, তোরে আইজ কোতল করুম।"

কাসেম হাতের ছেনদা-খানা ছুঁড়ে মারার আগেই তৎপরতার সঙ্গে ঘরে ঢুকে ঝাঁপটা চক্ষের পলকে টেনে দিল ফুলমন। আর সেই ঝাঁপের ওপর দা-খানা এসে আছড়ে পড়ল।

উঠান থেকে আবারও গর্জ্জন করে উঠল কাসেম ; "তোরে আমি শ্যাষ করুম আইজ, তবে আমি শেখের ছাও। ঐ কাছিমের বাচ্চাটারে আইন্যা একলগে তোগো দুইটারে ইল্‌সা মাছের লাঘান কুচি কুচি করুম।"

ঘরের ভেতর থেকে আনুনাসিক ব্যঙ্গের অপমান ভেসে এলো ; "তোর লাঘান কত ডাকুরা দেখলাম রে নিঃবইংশ্যা ! আমারে কাটব, আয় আগে তোর মাথা লামাইয়া দিই। রুস্তইম্যা তো আসবই, একশ' ফির আসব। পারলে তুই তারে বান্ধিস, তবে বুঝুন এক বাপের বেটা তুই !"

আহত পৌরুষের দাবদাহে চোখের মণি দুটো ফেটে যেন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে, মনে হ'ল কাসেমের।

অনুপায় আক্রোশে উঠানের দিকে একবার তাকালো সে। কয়েক দিন আগে এক কিনারায় লবণ-ইলিস করার জন্য কয়েক কুড়ি মাছ এনে রেখেছিল কাসেম। নগণ্য অবজ্ঞায় সেগুলো তেমনি পড়ে পড়ে পচছে ; একটা উগ্র দুর্গন্ধ বাতাসের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। দেখতে দেখতে কয়েক বিন্দু অশ্রু চোখের কোল বেয়ে লবণাক্ত আস্বাদের সঙ্গে ঠোঁটের ওপর এসে প'ড়ল কাসেমের। আর সঙ্গে সঙ্গেই চেতনার বিধ্বস্ত কোণে কোণে একখানা মুখ টলমল করে ভেসে উঠল। জলধরের বৌ। বৌঠাইন !

পেশীগুলো কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। শিথিল পদসঞ্চারে বাইরে বেরিয়ে গেল কাসেম।

আবার তিন খণ্ড ইট তুলে এনে উনুন পেতে এক পাতিল ভাত ফুটিয়ে নিয়েছে জলধরের বৌ।

এখন সন্ধ্যা। আম আর গাবপাতার প্রচ্ছটপটে রাত্রির শিলালিপি ; মাঝে মাঝে জোনাকীর সবুজ প্রদীপ জ্বলছে মিট-মিট ক'রে। টিনের কুপীটা থেকে ধোঁয়ামাখা লাল শিখাটা ছড়িয়ে পড়েছে অষ্টবক্র ঘরখানার আয়তনে।

মনের মধ্য দিয়ে ডুব-সাঁতারের মত একটা আতঙ্ক পিছলে পিছলে গেল। একটু পরেই আবির্ভাব হবে ছোট কর্তার। এই ভাঙা ঘরের পাল্লাবিহীন আয়তনে অকলঙ্ক চরিত্রের নিরাপত্তা কোথায় ? সে কি ফিরে যাবে কাসেমের কাছেই ? কিন্তু ফুলমনের জিভ থেকেও গরল ঝরে যে !

আচম্‌কা আত্মমগ্ন ভাবনাটা ছত্রখান হয়ে গেল। শুক্‌নো ঝরা-পাতার ওপর পদধ্বনি। প্রথমে চমকে উঠেছিল জলধরের বৌ। ছোট কর্ত্তা নয় তো ! নাঃ, টলতে টলতে মাতালের মত মেঝের ওপর এসে আছড়ে পড়ল কাসেম। সারা দিন পেটের মধ্যে ক্ষুধার বাসুকি ফণা ঝাপটিয়েছে ; চেতনার পর্দ্দায় ফুলমন আর রুস্তমের বেআইনি আলিঙ্গনের যুগল-মূর্ত্তি বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

দু' হাত ধরে কাসেমের নির্জীব দেহটা তুলে বসাল জলধরের বৌ ; ব্যস্ত গলায় বলল : "কি হইচে ভাই, অসুখ ব্যারাম না তো !"

"না, বৌঠাইন !"

"সারা দিনে খাইছ ? কাজিয়া করছ বৌর লগে ?"

জলধরের বৌর গলায় অবিরাম প্রশ্নের বিশৃঙ্খলা।

"কি বউ যে দিছিলা বউঠাইন ! ক্যান তুমি আমার লগে এই শত্রুতা করলা ? ক্যান ? আমি তোমার কাছে কী দোষ করছিলাম ? সেই জবাব নিতে আইছি। ছাও জবাব দাও।"

কাসেমের দু'চোখ বেয়ে প্লাবন নেমে এলো।

"তোমার জবাব ছাওনের আগে আমার জবাব ছাও তো আগে। সারা দিনে প্যাটে দানা পড়ছে একটাও ? সত্য কইবা ঠাকুরপো !"

গলার ওপর দিয়ে ইল্‌সার একটা ঢেউ ছল ছল করে বয়ে গেল জলধরের বৌর। আর মাথাটা গোঁজ করে নিরুত্তর বসে রইল কাসেম। "তবে আগে ভাত খাইয়া লও।"

হাত দুটো অঞ্জলির মধ্যে মুঠো ক'রে একখানা মাটির সানকির সামনে কাসেমকে বসিয়ে দিল জলধরের বৌ। তার পর পাতিল থেকে রাঙা আউশের মোটা মোটা ভাতগুলো ছড়িয়ে দিতে লাগল পাতের ওপর।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল ; এখন আমের পাতা থেকে টুপ টুপ করে জলের বিন্দু ঝরছে।

এক গ্রাস সবে মাত্র মুখে তুলেছে কাসেম ; আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা।

ঘরের পৈঠার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ছোট কর্ত্তা। তাঁর চোখ দুটো তুলসী-বনের বাঘের মত জ্বলছে ধক ধক করে। ঝকঝকে ছুরির ফলার মত দাঁতগুলো বিকাশ ক'রে চতুষ্পদের ভঙ্গিতে খিঁচিয়ে উঠল ছোট কর্ত্তা, "তাই কই নাগরখান কে ? শ্যাষে শেখের হাতে ইজ্জৎ ছাও হিন্দুর বউ হইয়া ! এই সব পাপ কাম এইখানে এই কৃষ্ণের রাজত্বে চলব না। কলি কাল পড়ছে বইল্যা যা খুশী করবা মনে ভাইবো না।"

"কি ক'ন আপনে ? কাসেম আমার ছোট ভাই।"

জলধরের বৌর গলায় ব্যাকুল আবেদন।

"ছোট ভাই বাইতে আইস্যা বিছানায় থাকে বুঝি! দিনে খবর লয় না!" আচমকা চীৎকার করে উঠলেন ছোট কর্ত্তা। হরি, যুগেশ হবেন, সব লাঠি লইয়া আস—গেরামে পাপ রাখুম না। নারায়ণ, নারায়ণ—চক্ষের নিমেষে আটকিরাব জঙ্গল দলিত করে লাঠি বল্লম নিয়ে শিকারের উত্তেজনায় ছুটে এলো যোগেশরা।

ছোট কর্ত্তা বৈষ্ণবীয় নির্দ্দেশ দান করলেন, "কিছু মনে কইরো না জলধরের বৌ, সব কৃষ্ণের ইচ্ছা, যুগেশ"—

মুহূর্ত্তে দু খানা লাঠি শূন্যে আন্দোলিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাসেমের ওপর। চড়াৎ করে খুলিটা ফেটে খানিকটা রক্ত চলকে এসে পড়ল সাদা সাদা ভাতের ওপর।

"ওঃ বাজান!"

কপালের ওপর হাতখানা চাপা দিয়ে সানকিটার ওপর আছড়ে পড়ল কাসেম।

"হায় ভগবান! তোমার মনে এই আছিল—সারাদিনের না-খাওয়া মানুষ"—জলধরের বৌর বুকফাটা আর্ত্তনাদটা কুণ্ডলিত হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল। মূর্চ্ছিত হ'য়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল জলধরের বৌ।

কৃষ্ণের ইচ্ছায় এইমাত্র যে কর্ম্মটি হ'ল, সেই রক্তাক্ত বীরকীর্ত্তির দিকে তাকিয়ে একবার প্রসন্ন গলায় নাম-কীর্ত্তন করলেন ছোট কর্ত্তা। "নারায়ণ, নারায়ণ"—

এত আনন্দের মধ্যেও একটা অমসৃণ ভাবনা ময়না কাঁটার মত চেতনায় খচ-খচ করতে লাগল। যবনের সঙ্গে কি করে পীরিত হ'ল মাগীটার? সবই তাঁর ইচ্ছা। মনে মনে ছোট কর্ত্তা একবার জপ করে নিলেন; "কৃষ্ণ পদে রাখ রে মন, সব জনমের ধন।"

দিগ্বিজয় সমাপ্ত ক'রে বাহিনী নিয়ে একটু পরেই অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন ছোট কর্ত্তা।

চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি কাসেমের, কপাল ফেটে ভিরমি লেগেছিল। ছোট কর্ত্তারা বীর কর্ম্ম সমাপ্ত করে চলে যাবার পরই উঠে বসল কাসেম। পাশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে জলধরের বৌ। কাসেম ডাকল, "বৌঠাইন, বৌঠাইন"—

কিন্তু জলধরের বৌ'র দেহটা স্থির নিস্পন্দ। কুপীর লালাভ আলোতে চোখের মণি দুটো নিথর হয়ে রয়েছে। এক পাশে ভাতের হাঁড়িটা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে রয়েছে—চার দিকে রাশি রাশি ভাত ইতস্ততঃ ছড়ানো।

একটা নতুন পাতিল থেকে জল নিয়ে জলধরের বৌ'র মুখে ঝাপটা দিতে লাগল কাসেম।

এক সময় বিস্ফারিত চোখের মণি দুটো নড়ে উঠল জলধরের বৌ'র; গলার ধুক্ ধুক্ স্পন্দনে জীবনের মৃদু লক্ষণ, "ঠাকুরপো।"

"তোমার মনে এই আছিল বৌঠাইন, তোমার মনে এই আছিল"—

জলধরের বৌ'র শিয়র থেকে উঠে আম-সুপারীর গহন অরণ্যপথ ধরে ছুটতে সুরু করল কাসেম।

"ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—আমি কিছুই জানতাম না এইর—" একটা করুণ আর্ত্তনাদ যেন কাসেমের পদধ্বনি অনুসরণ করতে করতে একটা অপূর্ব্ব মিনতির রেশ নিয়ে গড়িয়ে আসতে লাগল পেছন দিক থেকে।

সারাটা রাত ইল্‌সার পার দিয়ে শ্মশান-কবর ডিঙিয়ে গতচেতন মাতালের মত ঘুরপাক খেয়ে বেড়াল কাসেম। রাশি রাশি রক্ত-মালতীর মত আলো জ্বালিয়ে ইলিস-ডিঙিগুলো রূপালী ফসলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ আর ইল্‌সার জলতরঙ্গ তাকে হাতছানি দিল না। একটা নির্জ্জন বিবরে জীবনের ক্ষতক্লেদ লেহন করবার জন্য নিরিবিলি অবসর খুঁজেছে সে; কিন্তু শরীরের সমস্ত রক্ত মাথার মধ্যে জমা হয়ে বিঘূর্ণিত হচ্ছে। আর সেই রক্তকেন্দ্র থেকে উল্কাপিণ্ডের মত ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছে কতকগুলো মুখ—ফুলমন, বৌঠাইন, মুন্সীদের ছোটকর্ত্তা—দিবা-রাত্তিরে কাঁটালতা, ঝোপ-জঙ্গলে আছাড় খেতে খেতে অবসন্ন চরণসঞ্চারে বাড়ীর উঠানে পা দিল কাসেম; তার পর মৃত গলায় ডাকল, "বৌ, অ বৌ—দুয়ার খোল্।"

দরজার পাল্লা খোলা রয়েছে। সে দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা কেমন যেন চমকে উঠল কাসেমের।

একটা বিরাট লাফে উঠান থেকে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল কাসেম। মাচার ওপর জীর্ণ বিছানায় কেউ নেই।

চেতনার মধ্যে একটা বিদ্যুতের চমক বয়ে গেল যেন। ত্রস্তে ভাঙা কাঠের বাক্সটার কাছে চলে এলো কাসেম। ডালাটা খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের সমস্ত রক্ত সরে বিবর্ণ হয়ে গেল। কয়েক কুড়ি টাকা এনে রেখেছিল কাসেম, তার মধ্যে একটি অচল কড়িও অবশিষ্ট নেই।

সেখান থেকে একটা অগ্নিমুখী হাউইর মত সরে এলো পশ্চিমের বাঁশের খুঁটিটার দিকে। ফুকর করে করে কয়েক কুড়ি কাঁচা টাকা রেখেছিল, বাঁশ খুঁটিটা দু খণ্ড হ'য়ে পড়ে রয়েছে।

ফুলমনের সঙ্গে সেই অপরিচিত লোকটার অশোভন আলিঙ্গনের অর্থটা এতক্ষণে স্বচ্ছ আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে এসেছে কাসেমের কাছে। ফুলমন পালিয়ে গিয়েছে। ঘরের অভিশপ্ত পরিবেষ্টন থেকে বাইরের বারান্দায় এসে বসল কাসেম। শরীরের জোড়গুলো যেন শিথিল হয়ে আসছে। দুটো হাতের আবরণে মুখটা ঢেকে একটা বজ্রপ্রহৃত মানুষের মত বসে রইল কাসেম। উঠান থেকে কয়েক দিন আগে এনে রাখা পচা ইলিস মাছের তীক্ষ্ণ দুর্গন্ধটা বাতাসে বাতাসে বিষ ছড়াতে লাগল।

এক সময় পূবের ক্রান্তিরেখায় সূর্য সঞ্চারিত হ'ল। রোদের একটা সোনালী রেখা এসে স্থির হ'য়ে জ্বলছে কাসেমের কপালের রক্তচিহ্নে।

আরক্ত চোখ দুটো তুলে চারি দিকে একবার তাকাল কাসেম। পচা মাছের দুর্গন্ধ, উঠানের আবর্জ্জনা, কাকের মুখে মুখে চলে-আসা মাছের কাঁটা আর থম-থম নির্জ্জনতায় আগামী গোরস্থানের ভয়াবহ ইঙ্গিত!

বিক্ষত স্নায়ুগুলোর মধ্যে কালকের রাত্রিটাকে একবার ধরবার চেষ্টা করল কাসেম। একটা আতঙ্কময় দুঃস্বপ্নের মত সেটা বার বার ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে চেতনা থেকে।

উঠানের ওপর এসে দাঁড়ালো মুন্সীদের ছোকরা গোমস্তা গোকুল, "কাসেম ভাই, তোমার বউঠাইনে একবার যাইতে কইছে"—

"যাও, যাও। আমার বউঠাইন আবার কে? হিন্দু কখনও মুসলমানের আপন হয়? যাও, যাও"—

হাঁটু দু'টোর অবরোধে মুখখানা আবার গোপন করল কাসেম। একটা বন্দী কান্নার আবেগ ঢেউএর মত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সমস্ত দেহের ওপর।

গোকুল বলল, "বেশ না আস, না আসবা। বৌঠাইনে দুইটা ট্যাকা চাইছে। নৌকার ভাড়া লাগব। কেরায়া ভাড়া কইর‍্যা দিছি; পদ্মার পারে তার কোন মাসীবাড়ী যাইব না কী?"

চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো কাসেম, "কোন চুলায় তার কোন কুটুম আছে রইল্যা তো জানি না। কই সে?"

"খালের ঘাটে কেরায়া নৌকায় রইছে।"

চীৎকার করে উঠল কাসেম। "আমারে আগে কও নাই ক্যান, কেরায়া করণের আগে আমারে একবার খবর দিতে পার নাই? দ্যাখতাম, কেমুন যাইতে পারে আমারে ফেলাইয়া। চল, চল।" ইলসার কাইতানের মত হু-হু করে খালের ঘাটে ছুটে এলো কাসেম। কেরায়া নৌকার ছইএর গুণ্ঠন থেকে জলধরের বৌর সাদা থানের আঁচল দেখা যায়।

নৌকার গলুইটা চেপে ধরল কাসেম। "বৌঠাইন"—গলা থেকে ভাবী কান্না বেরুল তার।

"না, ঠাকুরপো! আমার লেইগ্যা তোমার কষ্টের শ্যাষ নাই। বদনামের শ্যাষ নাই। কাইল আমার লেইগ্যাই মাইর খাইলা। আমারে দুইটা ট্যাকা দ্যাও। আমি যাই গিয়া।"

জলধরের বৌর গলাটাও ঘনমন্থর।

"তুমি আমারে ফেলাইয়া যাইতে পারবা?"

"বউ রইছে। তারে লইয়া সুখে ঘর কর ঠাকুরপো! রাজা হও।" একটা উত্তরঙ্গ কান্নার উৎক্ষেপকে দমন করে নিল জলধরের বৌ।

"জান বৌঠাইন, ঐ কাছিমের ছাওটা কাইল একজনের লগে টাকাপয়সা বেবাক লইয়া ভাগছে। এইর পরেও তুমি আমারে ফেলাইয়া যাইবা?" অশ্রুঝরা চোখের করুণার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাসেম।

"তোমার বউ পরপুরুষের লগে ভাগছে!" ছইএর অন্তরাল থেকে একটা চমকিত কণ্ঠ ভেসে এলো।

"হ, ভালই হইচে। আপদটা ভাগছে। না হইলে কী তোমারে [illegible] ফিরা? ঘরে মাছ পচতে আছে। একেবারে গোরস্থানের মত হইয়া গেছে সব। আস, ঘরে চল। এখন তুমি না থাকলে, আমি মইর‍্যাই যামু।" বর্ষার ইলসার মত দু'চোখ বেয়ে বন্যা [illegible] কাসেমের।

এতক্ষণ রোধ করে রাখবার পরে জলধরের বৌর কান্নাও সমস্ত [illegible] হু-হু করে নেমে এলো ছইএর ভেতর।

মাঝি ব্যস্ত গলায় বলল, "বেলা হইয়া গেল ভুফার, এখন [illegible] না ছাড়লে, রাইত ভোর হইয়া যাইব পদ্মার পারে যাইতে।"

[illegible] আর পুলক-জড়ানো অপূর্ব্ব অনুভূতির গলায় কাসেম [illegible] "আমার আর রাইত ভোর করতে লাগব না মাঝি! বৌঠাইনের যাওয়া হইব না। আমারে ফেলাইয়া কী বৌঠাইন যাইতে পারে?"

একটি চাষীর মেয়ে

[পূর্বানুবৃত্তি]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কি অদৃষ্টের পরিহাস? অথবা এই তামাসার নামই জীবন?

দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, বড়ই এখন অসময়। কাজ নেই বলে গোবিন্দের একার নয়, সকলের অবস্থাই কাহিল। নিজেকে এবং অন্য যাদের বাঁচিয়ে রাখার দায় আগে থেকেই ঘাড়ে চাপানোই ছিল, সে দায় পালন করতেই প্রাণান্ত। কোন মতে মরণ ঠেকিয়ে চলার প্রাণপণ চেষ্টা।

নতুন দায়, তাই সাধ করে নেওয়া যায় না। এবং রেবতীকে বিয়ে করা মানেই তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়টা গোবিন্দের কাঁধে চাপা।

গোবিন্দ পিছিয়ে দিয়েছে বিয়ের দিন—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। কে জানে, কবে শেষ হবে এই আকাল আর তার বেকারির দুর্ভোগ—কবে তার বিয়ে করার সামর্থ্য ফিরে আসবে!

অত বড় মেয়েকে আইবুড়ো রেখে এ ভাবে অপেক্ষা করায় যদি তারা রাজী না থাকে, অন্য কোন পাত্রে তাকে সমর্পণ করা হোক।

মধু প্রায় ক্ষেপে যায়, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলে, শালার বেটা শালা, ছ্যাঁচড়ামি পেয়েছিস্? অ্যাদ্দিন ধরে ইয়ার্কি দিয়ে, চাদ্দিকে কেচ্ছা রটিয়ে, আজ বলছিস বিয়ে করবি না? তোর বাবা বিয়ে করবে, নইলে তোকে খুন করব।

গোবিন্দের বাবা রেবতীকে বিয়ে করলে যে কুৎসিত রকম কেলেঙ্কারির ব্যাপার হবে, রাগের মাথায় সেটা খেয়াল থাকে না বলে মুখে বলতেও বাধে না। এবং বলতে বলতে রোখ আরও চড়ে যাওয়ায় সত্যই সে হঠাৎ মোটা বাঁশের গোড়াটা কুড়িয়ে নিয়ে গোবিন্দের মাথা ফাটিয়ে দিতে যায়। অর্জুন, পরেশ খ্যাঁদা, দিগম্বরেরা তাকে জোর করে ধরে না রাখলে সত্যই খুনোখুনি ব্যাপার দাঁড়াত। এরকম রাগের সময় ওই কাদা-মাখা বাঁশের গদা গোবিন্দের মাথায় বসিয়ে দিলে তাকে আর বাঁচতে হত না।

অর্জ্জুন মধুকে ঠেকিয়ে রাখলেও নিজে রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ঠিক কথাই তো, এটা তোমার কেমন বিবেচনা গোবিন্দ?

বুড়ো যোগীরাজ কাসতে কাসতে কফ তুলে যেন ধিক্কার দেওয়ার থুতু ফেলে বলে, ছি ছি, তুই এমন নচ্ছার গোবিন্দ! ও মেয়াকে কেউ বিয়া করবে? তোর সাথেই ঠিক ঠিক বিয়া বসবে জানে বলেই না দশ জনা চুপ মেরে আছে। হাসাহাসি করুক আর যাই করুক, কেচ্ছা রটেনি। তোর সাথে বিয়ে বসবে না খপর রটলে টি টি পড়ে যাবে না চাদ্দিকে?

গোবিন্দ বিশেষ ঘাবড়েছে মনে হয় না।

মুখ তুলে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সে অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করে বলে, কথাটা তোমরা বুঝছনি কেন? আসল কথাটা ধরবে নি—

মধু গর্জ্জন করে উঠলে যোগীরাজ বেগে-মেগে তাকে ধমক দিয়ে বলে, তুই একটু থাম দিকি বাবা? মানুষটা কি বলতে চায় শুনতে

দে ? মস্ত তুই বীরপুরুষ, আজ বাদে কালই নয় ওকে খুন করে ফাঁসি যাস !

গুড়ের কারবারী প্রৌঢ় ঘনরাম সায় দিয়ে বলে, ঠিক কথা। বড় তুই তেড়িবেড়ি করিস মধু। একটা মীমাংসা করে দিতে মোদের ডেকে এনেছিস, ঠাণ্ডা মাথায় কথাবার্তা কইতে দে !

বলে ঘনরাম বিশেষ ধরণে একটু হাসে—সত্যই হাসে।

বলে, বোকা রাম, খুন করে ফাঁসি যাওয়া এতই সহজ ভেবেছিস ? এবেলা ডাণ্ডা মেরে এক জনাকে খুন করলাম, ওবেলা দিব্যি আরামে ফাঁসি গিয়ে ব্যাপার চুকিয়ে দিলাম ? তুই একেবারে গোমুখ্যু !

রসিক মানুষ বলে ঘনরামের খ্যাতি আছে। লোকে বলে, গুড়ের কারবার করতে করতে যোয়ান কালেই মাথায় টাক পড়ে যাওয়ায় তার এত রস—সর্ব্বত্র সব অবস্থায় সে এমন লাগসই রসিকতা করতে পারে।

পঞ্চায়েত নয়, কয়েক জনকে বলে-কয়ে সঙ্গে নিয়ে মধু তার ঘরে হানা দিয়েছে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধমক ধামক দিয়ে ভয় দেখিয়ে যদি একটা নিষ্পত্তি করা যায়, এই আশায়।

যোগীরাজ ঘনরাম এরা সব আছে, গোবিন্দ কিন্তু অর্জ্জুনের দিকে চেয়ে তার বক্তব্য বলে যায়।

বলে, একবার বলেছি, বিয়ে বসতে সাধ নেই ? এক পায়ে খাড়া নই ? খামতা নেই তো করব কি বলো ? মোর ঘরের মানুষ উপোস দিয়ে ক'দিনে মরবে, নিজে ক'দিনে মরব, ওই চিন্তা নিয়ে আছি। পরের ঘরের একটা মেয়াকে ঘরে এনে উপোস করিয়ে মেরে ফেলার মানে হয় ?

সবাই চুপ করে থাকে। মধু পর্য্যন্ত যেন খানিকটা ঝিমিয়ে যায়, শান্ত হয়ে যায়।

গোবিন্দ বলে, তাই বলছিলাম কি, আজ রাতেই বিয়াটা চুকিয়ে দাও, আপত্তি নেই। তবে কিনা, আগে থেকে মানতে হবে—যদ্দিন না খাওয়াবার সাধ্যি হয়, বৌ ঘরে আনব নি।

মধু মুখ খুলতে গিয়ে যোগীরাজের গাঁটা খেয়ে চুপ হয়ে যায়।

পিচঢালা সরকারী সদর সড়কের ওপাশে লোনা জলের পলিমাখা শস্যহীন শূন্য কুৎসিত ক্ষেতের দিকে চেয়ে গোবিন্দ বলে, কিম্বা এক কাজ কর। মোর দিন চলার একটা ব্যবস্থা করে দাও। বৌ ঘরে এলেও কোন মতে শুধু বেঁচে-বর্ত্তে রইব—তাতেই হবে।

যোগীরাজ আবার কেসে কফ তুলে বলে, অ !

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করে, লাট মাঠের ধানও পাসনি ?

গোবিন্দ বলে, লাট মাঠের জমির ধার ধারি ?

ঘনরাম রসিকতা করে বলে, লাট মাঠে জমি থাকলেই বা কি হত ! লাটের মাঠের ধান লাটের বাড়ী চালান যায়।

গোবিন্দকে বাগাতে পারে না।

একটা মীমাংসায় এসে অগত্যা তারা সেদিনের মত বিদায় নেয়।

মধুকে ধরে-বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হয় না, সে শান্ত ভাবে স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে চুপচাপ উঠে যায়।

অবস্থা সবারই জানা আছে। যে মানুষটা দিন গুণছে সপরিবারে না খেয়ে মরতে কত দিন লাগবে, তাকে কি জোর গলায় বলা যায় যে মরা-বাঁচার হিসাব তুচ্ছ করেও মেয়েটাকে তার অবিলম্বে বিয়ে করতে হবে—যে হেতু বিয়ে পিছিয়ে গেলে কেচ্ছা রটবে মেয়েটার নামে।

গোবিন্দের একটা কথা সবার মনে দাগ কেটেছে। শুধু নিজের বা ঘরের লোকের মরণ-বাঁচনের হিসাবটাই সে ধরেনি।

একটা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলার যে কোন মানে হয় না, এ হিসাবটাও সে কষেছে।

সত্যই তো। মা-বোনকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে কথা বাদ যাক, নিজেকে খেয়ে-পরে বাঁচিয়ে রাখার উপায় পর্য্যন্ত যার হাত-ছাড়া হয়ে গেছে—তার পক্ষে বিয়ে করে বৌ ঘরে আনা শুধু বোকামি হবে না, দোষ হবে, মহাপাপ হবে।

ফিরে যাবার পথে নিজের নিজের ঘরের দিকে যাবার জন্য ছাড়াছাড়ি হবার আগে অর্জ্জুন মধুকে বলে, বেশ তো, ওর কথাটাই মেনে নাও না বুক ঠুকে ? যদ্দিন না সামলে-সুমলে উঠতে পারে, বোনকে তুমি পুষবে, কথা দিয়ে বিয়েটা চুকিয়ে দাও। কাজের মানুষ, তেজী মানুষ—দু'-চার ছ'মাসে সামলে নেবে ঠিক।

মধু ব্যঙ্গ করে জবাব দেয়, মোর কাজ কি বাবা কাজের মানুষে, তেজী মানুষে ? ঝকমারি করেছি—করেছি, উপায় তো নাই। এ পাট আরও টানতে বলো ? এই নাক-কাণ মললাম, এবার চুকিয়ে দেবই দেব।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সত্যই সে নিজের নাক-কাণ মলে। বলে, আজকেই পুরুত মশায়ের বাড়ী গিয়ে দিন-ক্ষণ ঠিক করে আসব। দু'-পাঁচ দিনের মধ্যে বিয়ের শুভ দিন না থাকে, দু'-দশ টাকা প্রাচিত্তিরে খরচা করে হারামজাদিকে পার করে দেব।

সকলেই দাঁড়িয়ে যায়।

মধুর এটা পাগলামি। কিন্তু পাগলামিও তো আকাশে গজায় না ? কেউ কোন পাগলামি সুরু করলে তার মানেও তো যথাসাধ্য বুঝতে হবে ?

যোগীরাজ জিজ্ঞাসা করে, কার কাছে পার করবি ভাবছিল মধু ? কে তোর বোনকে নেবে ?

মধু উগ্র আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, মদন নেবে।

ঘনরাম রসিকতা ভুলে গিয়ে গম্ভীর আওয়াজে বলে, মদ গাঁজা খায়, এদিক ওদিক যায়—

মধু চীৎকার করে বলে, খাক মদ গাঁজা। যাক এদিক ওদিক। বৌকে তো খাওয়াবে পরাবে, ঘরে রাখবে। হারামজাদির নাম কেচ্ছা রটুক যাই হোক—মদন রাজী আছে। দিব্যি গালছি—সাত দিনের মধ্যে ওর সাথে মাগীটার বিয়া দিয়ে এ ঝঞ্ঝাট যদি না শেষ করি—মানবো যে মোর সাত গণ্ডা বাপ ছিল। একটা বাপের ছেলে নই, গণ্ডা গণ্ডা বাপ মোকে জন্ম দিয়েছিল।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল। পুর্ণিমা তিথি অবশ্য মাত্র দু'দিন আগে গত হয়েছে, আজও প্রায় আস্ত চাঁদই আকাশে উঠবে।

যতই বেসামাল হয়ে যাক, মুখে যতই আস্ফালন করুক মোড়ের মাথায় এসে সবাই যে তাকে ছেড়ে নিজের নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার উপক্রম করছে, এটা মধু টের পায়। চেঁচিয়ে

বলে, মোকে একা ফেলে যেওনি। যা করব সবাই মোরা মিলে মিশে করব—একলাটি কিছু করব বলেছি?

অর্জ্জুন বলে, রাস্তায় তোকে একলা ফেলে কে চলে যাচ্ছে রে মধু? পাগল হয়েছিস্?

আবার মধু বোনকে আনতে খামারবাড়ী যায়।

ফাঁস করে না যে মদনের সঙ্গে রেবতীর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক করেই সে এসেছে: দিন দশেক পরের শুভ লগ্নেই বিয়ে হবে জানিয়ে কিছু টাকাও নিয়েছে মদনের কাছ থেকে।

কন্যাপণ হিসাবে নয়—ঋণ হিসাবে। নগদ টাকায় কন্যাপণ নেওয়া সমাজের বিধানে তাদের বংশে অতিশয় নিষিদ্ধ কাজ।

পাত্রপক্ষের কাছ থেকে ধান পাট গাই বলদ তামা পিতলের বাসন কোসন ইত্যাদি যথাসাধ্য আদায় করতে পারে, কিন্তু নগদ পয়সা নেওয়া চলবে না।

সোনা-রূপাও নিতে পারে। কিন্তু সেটা নিতে পারবে বিয়ে চুকে যাবার পর মেয়ের গায়ের বাড়তি গয়নার হিসাবে। বিয়ের আগে নয়। দশজনের সামনে স্থির হবে পাত্রপক্ষ সোনা বা রূপার কত ওজনের কি কি গয়না দিয়ে বিয়ের রাতে পাত্রীর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করবে এবং বিয়ের পর মেয়ে স্বামীর ঘরে যাবার সময় ঠিক কোন কোন গয়না তার বাপ ভাই নিজেদের হেফাজতে রেখে দিলে কেউ কথাটি বলবে না।

মধুকে খইএর মোয়া, নারকেলি তক্তি, মুগের মণ্ডার সঙ্গে গরম গরম বেগুন ভাজা আর আটার পরোটা খেতে দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়।

সে এসেই হম্বিতম্বি অর্থাৎ অকারণে গলা চড়িয়ে চেঁচামেচি করে কথা বলতে সুরু করেছিল—বড় ভাই বোনকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এটা যেন খুব অন্যায় কাজ, সোরগোল তুলে হৈ-চৈ হাঙ্গামা না বাধিয়ে কাজটা করা যাবে না।

গোবর্দ্ধন মধুর জন্য বিশেষ ভাবে তামাক সেজে নিজেই এনেছিল, দু' তিন বার বাড়িয়ে দেওয়ার পরেও মধু হুঁকো নিতে রাজী হয়নি। রেবতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার চড়া গলার তিরস্কার শুনেছিল।

গিরি এসে দড়াম করে ভারি পিঁড়িটা পেতে দেয়, মাজা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল দেয়।

তার পর পিতলের থালায় ওই সব মিঠাই মণ্ডা গরম পরোটা এনে দিয়ে বলে, খেয়ে নিয়ে কথা কইলে দোষ আছে কি?

অগত্যা মধুকে গলা থামাতে হয়।

মোয়া তক্তি মণ্ডাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গরম বেগুন ভাজা দিয়ে ঘিয়ে-ভাজা গরম পরোটা খেতে সুরু করার সঙ্গে তার মাথাটাও ঘুরতে সুরু করে।

তার তো জানা ছিল না যে, আগের দিন গিরির বড় মামা একমাত্র ভাগ্নীকে প্রথম মেয়ের বিয়েতে নিয়ে যাবার কথা বলতে এসেছিল এবং বহু দিন ভাগ্নীর কোন খোঁজ-খবর না রাখার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এই সব খাবার ঘি আটা ইত্যাদির সঙ্গে একখানা লালপেড়ে নতুন শাড়ীও উপহার এনেছিল।

গিরির মামার অবস্থা ভাল। লালপেড়ে নতুন শাড়ী পরে এমন সব খাবার দিয়ে গিরি তাকে সমাদর করলে মাথা ঘুরে যাবে বৈ কি মধুর!

মধু খায়, রেবতী গিরির সঙ্গেই আড়ালে সরে যায়।

গিরি বলে, তোকে নিয়ে কি জ্বালাই যে মোর হল রে! কি মন করেছিস বল, যাবি তো?

রেবতী বলে, না। মোকে খেদাস নে মামী, যাবার আগে এখানে বিষ খেয়ে মরব। গাঁয়ে কি করে মুখ দেখাব বল? ঘরে গঞ্জনা, বাইরে টিটকারি—

রেবতী কেঁদে ফেলে।

গিরি নতুন শাড়ীর আঁচলে নাক ঝেড়ে বলে, তা তো বুঝলাম, মানুষটাকে বলব কি? মোরও যে তোর গলায় কিছু বলার মুখ নেই আর!

রেবতী বলে, তোমায় কিছু বলতে হবে নি কো। যা বলার আমি বলব।

গিরি বলে, পাগল হয়েছিস্? ও-সব চলে না সংসারে। তোর কথা কানে তুলবে ভাবিস? দশ জনকে ডেকে হল্লা করবে, না যেতে চাইলে তোকে মেরে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে। বিয়ে ঠিকঠাক করে বোনকে নিতে এয়েছে—ইবারে কে কি বলবে বল্, কে কি করবে বল্?

রেবতীকে মন স্থির করার সময় দেবার জন্যই গিরি ব্যস্ত ভাবে আরেকটা পরোটা ভাজে, গরম পরোটা মধুর পাতে তুলে দিতে যায়।

সেই ফাঁকে গোয়ালের পাশ দিয়ে রেবতী বেরিয়ে পড়ে। গোঁসাইদের পুকুর ঘুরে মণ্ডলদের আমবাগান পেরিয়ে রাস্তায় নেমে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করে মহেশের বাড়ীর দিকে।

কি করবে কিছুই জানা নেই। মহেশের সঙ্গে আগে একটু পরামর্শ করা যাক।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

এস্‌রাজী অবনীন্দ্রনাথ ?

"বাড়িতে অনেক দিন অবধি সঙ্গীত-চর্চ্চা করেছি। রাধিকা গোঁসাই নিয়মমত আসত। শ্যামসুন্দরও এসে যোগ দিলে। রোজ জলসা হ'ত বাড়িতে; রবিকাকা গান করতেন, আমি তাঁর সঙ্গে তখন ব'সে তাঁর গানের সুর মিলিয়ে এস্‌রাজ বাজাতুম।"

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিনু আর চিনু

সুরুচি সেনগুপ্তা

১

মিনু তার মাকে ভোলেনি। অনেক দিন অসুখে ভুগে ভুগে এক দিন যখন তার মা খাটের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন সকলে মিলে মাকে একটা দড়ির খাটে শুইয়ে, ফুল চন্দন আর আলতা-সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, মিনু তা জানে না। মিনুর বয়স তখন পাঁচ বছর। তার আশা ছিল, মা আবার ফিরে আসবে, কিন্তু আসেনি। সে দিন বাড়ীর সবাই কেঁদেছিল, তাদের সঙ্গে সঙ্গে কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল মিনু! তার মাকে ওরা কোথায় নিয়ে রেখে এলো, কেন সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো না, মা কবে ফিরে আসবে, তার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয়নি। সে দিনের কথা মনে হ'লে মিনুর এখনো কান্না পায়।

তার কিছু দিন পরেই ওদের সংসারে বউ হ'য়ে এসেছিল বনলতা। সকলে ব'লেছিল মিনুর মা আবার ফিরে এসেছে। মিনু অবিশ্যি বুঝতে পেরেছিল যে এ তার মা নয়, তবু বনলতাকে পেয়ে সে খুসি হ'য়েছিল। তার মায়ের মতই বনলতা রঙিন আর ডুরে শাড়ী পরে, তেমনি সিঁথিতে আর কপালে সিঁদুর পরে। মিনুর বেশ মনে আছে যে, তার মা বনলতার মতই হাতে এক গোছা ক'রে সরু চুড়ি আর লিচু-কাটা বালা, গলায় বিছে হার, আর কানে লাল পাথর-বসানো দুটো বড় সোনার ফুল পরত। তার মায়ের মত বনলতা সংসারের কাজ-কর্ম করে। দোষ পেলে ঝি-চাকরকে বকে, হেসে কথা কয় বাবার সঙ্গে। বনলতার সবই মিনুর মায়ের মতন, তবু সে মিনুর মা নয়! মিনুর মায়ের মতই বনলতা সময় মত মিনুকে স্নান করিয়ে খেতে দেয়, বিকেলে জামা-কাপড় পরিয়ে চুল আঁচড়িয়ে বেড়াতে পাঠিয়ে দেয় পার্কে। তবু মিনু ভুলতে পারে না যে, এ তার মা নয়, তার মাকে খাটে শুইয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে কোথায় যেন ওরা রেখে এসেছে।

মিনুকে বনলতা প্রয়োজন মত যত্ন করে। কিন্তু সে আদর-যত্নে মিনুর মন তৃপ্ত হয় না। মাতৃহীনা মিনু বনলতার মনের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে, কিন্তু আশ্রয় সে পায় না। মমত্বহীন কতকগুলি বাঁধা-ধরা শুষ্ক যত্ন তার মনকে স্পর্শ কর'তে পারে না। তবু বনলতাকে দেখলেই মিনুর মাকে মনে পড়ে, মিনু তাকে ভালোবাসে।

মায়ের অসুখের সময় মিনুর দিদিমা এসেছিলেন মেয়ের সেবা-যত্ন করতে। দিদিমার ওই একটিই সন্তান, সে সন্তানটিকেও চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিয়ে তার সংসার আঁকড়ে ধরেই তাঁকে প'ড়ে থাকতে হ'ল। ঘরে আর কোনো আত্মীয়া ছিল না, সন্তপ্ত জামাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার সম্মুখে দুটি ভাতই বা কে ধ'রে দেয়, শিশু মেয়ে মিনুকেই বা কে মানুষ করে তোলে! প্রবল শোকেও তাই তিনি চোখের জল মুছে জামাতা আর দৌহিত্রীর সেবায় কাটিয়ে দিলেন একটি বছর। তারপর জামাইকে অনেক বুঝিয়ে নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে বনলতাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যে চ'লে গেছে, সে তো আর ফিরবে না, কিন্তু তরুণ বয়সে জামাতা শশাঙ্কর যে ঘর ভেঙেছে, সে ঘর যদি তিনি বেঁধে দিয়ে না যান, তবে তার জীবনও ছন্নছাড়া হ'য়ে থাকবে, মিনুই বা আশ্রয় পাবে কোথায়? তাঁর তো ওপারের ডাক আসতে বেশী দেরী নেই?

মা ফিরে এসেছে শুনে খুসিতে উচ্ছল হ'য়ে মিনু ছুটে গিয়েছিল, তার পর দিদিমার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বলেছিল দিদিমা, আমার মা?

মিনুর চুলের উপর শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল ঝ'রে পড়েছিল, তার পর অকম্পিত কণ্ঠে দিদিমা বলেছিলেন, 'মাকে তো তোমার ঠিক মনে নেই মিনু, ইনিই তোমার মা।' তাই মিনু মা বলে ধরা দিতে গিয়েছিল সৎমার কাছে, কিন্তু বনলতার অন্তরের রুদ্ধ আগল সে খুলতে পারেনি, স্থান নিতে হয়েছিল তার অন্তরের বাইরেই। তবু বনলতাকে পেয়ে মিনুর আনন্দের সীমা নেই, বনলতাকে সে ভালোবাসে।

তার পর চিনুকে কোলে পেয়ে বনলতার সেই বাঁধা-ধরা যত্নেও শিথিলতা দেখা দেয়। ছোট্ট বোনটিকে মিনু খুব ভালোবাসে, কিন্তু বোনকে পেয়ে মা যে আর তার দিকে ফিরে তাকায় না, সময় মত স্নান ক'রে মা গেলে শাসন করে না, আগের মত কাছে ডেকে চুল বেঁধে দেয় না, তাতে মিনুর ভারী দুঃখ হয়, কিন্তু তার সব চেয়ে বেশী দুঃখ হয়, বোনকে আদর করতে গেলে নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে মা যখন তাকে দূরে সরিয়ে দেয় তখন। একটিও ছোট ভাই-বোন নেই ব'লে মিনুর মনে বড় দুঃখ ছিল, হিমা, সীমাদের ছোট ভাই-বোনগুলিকে নিয়ে সে কত আদর করেছে, কিন্তু এখন সে তার নিজের বোনটিকে নিয়ে একটু আদর করতে পারে না! বোনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা যখন নাইতে যান, তখন চুপি চুপি গিয়ে সে ছোট বোনটির কপালে চুমু দেয়, নরম নরম হাত দুখানি নিয়ে নিজের গালের উপর রাখে, নরম রেশমের মত চুলগুলির ছোঁয়া যে তার কি ভালোই লাগে! ঘুম ভেঙে বোনটিও ওর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসে, অবোধ্য ভাষায় যে সব কথা বলে, সেগুলো যে 'দিদি' ছাড়া আর কিছু নয়, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হয়।

মিনুর মনে ব্যথা লাগবে এই আশঙ্কায় শশাঙ্ক প্রথমে চিনুকে কোলে নিতে অথবা আদর করতে দ্বিধা বোধ করত। স্বামীর আদর-মমতা যে একমাত্র মিনুকে কেন্দ্র করেই, তার মেয়ে যে এ সংসারে অনাবশ্যক, এ কথা নিয়ে বনলতা যখন-তখন স্বামীকে খোঁটা দেয়। মিনু সব বোঝে। বনলতার বিরক্তি ছাড়াও বাবা যে বোনকে কোলে নিয়ে আদর করেন না, এতেও সে মনে আঘাত পায়। ...তাকে ভালোবাসে না বলে তার মনে মনে কত দুঃখ, বাবা তাকে

না বাসলে বোনও তো তেমনি দুঃখ পাবে! জোর ক'রে মিনু চিনুকে বাবার কোলে উঠিয়ে দেয়, না নিলে অভিমান করে বাবার সঙ্গে। বোনের জন্য সে অখণ্ড পিতৃস্নেহও বেঁটে দেয় সমান ভাবে।

এর পর ছোট বলে শশাঙ্ক বেশী আদর করে চিনুকেই। যে আদর মিনু স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিয়েছিল, সেই আদরের আশায় সে এখন ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মা বাবা দু'জনের মনোযোগই এখন চিনুর দিকে, মিনু যেন এত বড় হ'য়ে গেছে যে, তার দিকে কারো আর একটু মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই বেদনা প্রকাশের ভাষা সেই ছোট মেয়েটির নেই, আর প্রকাশ করতে তার অভিমানেও বাধে। তাই এটা-ওটা নিয়ে নিরর্থক বায়না ক'রে কাঁদে সে, নানা ভাবে তার ক্ষুব্ধ প্রাণের বেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু তার মনের কথা কেউ বোঝে না; "এত বড় মেয়ের এই অহেতুক বায়না আর কান্না-কাটির জন্য সকলেই বিরক্ত হয়। অতিরিক্ত আদরে মেয়েটার মাথের নষ্ট হ'তে চলেছে ভেবে বাপ তাকে কঠোর শাসন করে।

দিদিমা শুধু বুঝতে পারেন এ কান্না কিসের, যখন-তখন এত [illegible] তার কিসের জন্য। মিনুর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও প্রাণ [illegible], মা-বাপের কঠোর শাসন দেখে তাঁর বুক ফেটে যায়, মিনুকে [illegible] চেপে ধ'রে বলেন, 'কি হয়েছিল রে মিনু? অমন ক'রে কাঁদ্‌ [illegible] কেন?' বক্ষলগ্না নাতনীর বেদনা তিনি নিজের বুকে অনুভব করেন।

এক দিন তিনি জামাতাকে বলেন, 'এখন তো মিনুর মা [illegible], আর তো আমার এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন নেই [illegible]। নবদ্বীপ গিয়ে নবদ্বীপচন্দ্রের পায়ের তলায় একটু স্থান পাই কি না দেখি।'

শশাঙ্ক বলে, 'নবদ্বীপচন্দ্র কি একমাত্র নবদ্বীপেই আটকে ব'সে [illegible] নাকি? এখানে কি নেই? আপনি চলে গেলে মিনুকে দেখবে কে? ওর মা কি বাচ্চাটাকেই সাম্‌লাবে, না সংসার দেখবে, না মিনুর ঝক্কি পোয়াবে?'

বনলতা বলে, 'মিনুকে ছেড়ে কি আপনি থাক্‌তে পারবেন? [illegible] না। আদর দিয়ে দিয়ে ওকে যে আবদেরে ক'রে [illegible], ওকে সাম্‌লানো আমার সাধ্য নয়।'

দিদিমা বোঝেন, ওরা যা' বলে সত্যি, তিনি মিনুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না, সত্যি তিনি বড় আদর দিয়ে ওকে বড় করেছেন! কিন্তু কেন এত আদর দিয়েছেন, সে কথা তো কেউ [illegible] না!

২

মিনু বড় হ'য়ে উঠেছে। সে এখন স্কুলে যায়। চিনুও বড় [illegible]। কিন্তু বনলতা মিনুর সঙ্গে চিনুকে মিশতে [illegible]; সর্ব্বদাই দু'বোনের মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টির দিকে [illegible] দৃষ্টি। মিনুর সঙ্গিনীরা কত দিন ভাই-বোনদের সঙ্গে [illegible] স্কুলে যায়, মিনুরও মনে সাধ হয় যে, তার ছোট বোনকেও নিজে হাতে সাজিয়ে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। দিদির সঙ্গে যাবার জন্য চিনুও কান্নাকাটি করে, কিন্তু কঠোর ভাবে বনলতা তাকে শাসন করে। আরেকটু বড় হ'লে বনলতা তাকে অন্য একটা স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেয়। শশাঙ্ক বলে, 'দু'বোন এক স্কুলে গেলেই তো ভাল হ'ত।'

বনলতা বলে, 'আদর দিয়ে দিয়ে বড়টিকে তোমরা যা বানিয়েছ, চিনুকে কি তাই কর্‌তে চাও নাকি? ওর সঙ্গে থাক্‌লে তো ওর মতই হ'য়ে উঠ্‌বে, সে আমি হ'তে দেব না।'

দু'বোনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য বনলতার যত চেষ্টাই থাকুক না কেন, মিনু আর চিনু দু'বোনের মধ্যে গভীর প্রীতি ও সৌহার্দ জন্মেছিল। বনলতার সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে দু'বোনকে নিয়ে যে ক্ষুদ্র একটি জগৎ গ'ড়ে উঠ্‌ল, তার মধ্যে বনলতার স্থান ছিল না।

শশাঙ্কর একখানা দোকান ছিল, তার আয় প্রচুর না হ'লেও সংসারে অভাব ছিল না। বাড়ীখানাও তিনি কিছু দিন আগে কিনে নিয়েছেন। শশাঙ্কর অবর্ত্তমানে বনলতাই এ বাড়ী আর দোকানের অধিকারিণী হবে, এই মর্ম্মে স্বামীকে দিয়ে সে একটা উইল করিয়ে নিয়েছিল। শুনে দিদিমা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন, একটিও কথা বলেননি।

মিনু যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে, তখন হঠাৎ শশাঙ্ক পীড়িত হ'য়ে পড়ে, রোগ তেমন প্রবল না হ'লেও দীর্ঘ দিন তাকে শয্যাশায়ী হ'য়ে থাক্‌তে হয়। মালিকের তত্ত্বাবধানের অভাবে দোকানের আয় কমে আসে, তার উপর চিকিৎসার অপরিমিত ব্যয়ের জন্য দেনাও হয় প্রচুর! কিছু দিন রোগভোগের পর রোগ প্রবল হ'য়ে ওঠে; শশাঙ্কর যখন মৃত্যু হ'ল, তখন দেনার দায়ে তার দোকান ও বাড়ী দুই-ই বিক্রী হ'য়ে গেছে। সেদিনও এমনি এক ঘোলাটে সন্ধ্যায় এমনি করেই খাটে শুইয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে মিনুর মাকে ওরা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, মনের মধ্যে অস্পষ্ট হ'য়ে এলেও সে কথা মিনু ভুলে যায়নি। সে দিন সে ছোট ছিল, তাই আশা করেছিল মা আবার ফিরে আসবে, তবু সে দিন কী কান্নাটাই সে কেঁদেছিল! কিন্তু আজ সে বড় হ'য়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা হ'য়েছে তার। মার মতন ক'রে যখন ওরা বাবাকেও সাজিয়ে নিয়ে চ'লে গেল, তখন সে বুঝেছিল এ বিদায় চির-বিদায়। বাবা আর ফিরে আসবেন না। তবু সে অধীর না হ'য়ে নিজেকে সংযত রেখেছিল, সেদিনের মত বিহ্বল হ'য়ে পড়েনি। চিনু ছেলেমানুষ, সে কিছু বোঝে না, সে তো কাঁদবেই। অবুঝ ছোট বোনটিকে এই দুঃখের দিনে সে ছাড়া আর

কে ভুলিয়ে রাখবে? কেঁদে-কেটে মা পড়ে আছেন মাটিতে, মা-হারা মিনুকে বাপ-হারা হ'তে দেখে শোকে পাথর হ'য়ে গেছেন দিদিমা; মিনু ছাড়া এঁদের দেখবে কে? কে সান্ত্বনা দেবে?

এর পর সংসারে অভাবের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। বাড়ীখানা কিছু-দিন আগেই বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল, তবু ক্রেতা দয়া ক'রে এত দিন মুমূর্ষ রোগীকে উঠিয়ে দেয়নি। এখন তাদের সে বাড়ী ছেড়ে ছোট একখানা বাড়ীতে উঠে যেতে হ'ল।

বনলতা বলে, 'ইস্কুলের বড্ড বেশী খরচ, চিনুর নামটা না হয় কাটিয়ে দিই। কি বলিস্ মিনু? বাড়ীতে তোর কাছেই পড়তে পারবে।

ব্যস্ত হয়ে মিনু বলে, 'না মা, চিনুকে কখ্খনো স্কুল ছাড়িয়ো না, বরং বামুন-চাকর উঠিয়ে দাও। কী-ই বা কাজ, সকলে হাতে হাতে করে ফেললে কারো কষ্ট হবে না। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আমি চাক্‌রী ক'রব, তখন তোমাদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না।'

'এইটুকু বয়সেই তুই চাকরী ক'রবি মিনু?'

বনলতার চোখ ছল্ ছল্ করে, মিনুরও চোখে জল আসে। বলে, 'কি করব মা, চিনুকে তো মানুষ ক'রতে হবে? তুমি ভেবো না মা, আমি চাকরী ক'রব, দিদিমার একটা মাসহারা আছে, চ'লে যাবে এক রকম করে।'

সুখের দিনে বনলতা যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, দুঃখের দিনে আজ সেই-ই একান্ত আপন হ'য়ে উঠেছে।

ম্যাট্রিক পাশ ক'রে অফিসে চাকরী নিয়ে মিনু সংসারের হাল ধরে। দিদিমার যেন কোনো কষ্ট না হয়, অভাবের আঁচ যেন মার গায়ে না লাগে, যেন কোনো বিষয়ে কোনো ত্রুটি না হয়, এই-ই হ'ল তার তপস্যা।

দিদিমা কি ভাবলেন আর ভগবান এ কি ক'রলেন? মিনুর আশ্রয়ের জন্য তিনি মেয়ের সাজানো সংসার বিলিয়ে দিলেন অন্যের হাতে, কিন্তু আজ সমস্ত সংসার মিনুকেই আশ্রয় ক'রেছে। সেই ছোট মেয়ে মিনু আজ প্রবীণার মত সমস্ত সংসারের ভার তুলে নিয়েছে নিজের মাথায়। এই তরুণ বয়সেই খেলা-ধূলা হাসি-গল্প সব ঘুচিয়ে দিয়ে সংসারের দৈন্য-দারিদ্র ও দুশ্চিন্তায় নিজেকে সে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। নিয়তিকে কেউ রোধ ক'রতে পারে না সত্য, তবু মিনুর এই অবস্থার জন্য দিদিমা নিজেকেই দায়ী করেন। নিজের হাতে-গড়া মিনুর এই ত্যাগের মহিমায় তিনি নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করেন, তবু এইটুকু বয়সেই সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমোদ-আহ্লাদে বঞ্চিত হ'য়ে সে যে এক ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবন বরণ ক'রে নিয়েছে, তা-ও তিনি সহ্য ক'রতে পারেন না। মাঝে মাঝে অনুযোগ ক'রে বলেন, 'সারা দিন খাটুনির পর কি এতটা পথ হেঁটে আসা যায়? একখানা রিক্‌সা ভাড়া ক'রে এলেই তো পারিস মিনু? অফিসের পর মেয়ে পড়ানোটা কি না নিলেই চলত না রে? গরম গরম ডাল-ভাত গিলে কোন্ সকালে তোকে বেরুতে হয় মিনু, তোর জন্য এক কৌটো মাখন এনে রাখিস নে কেন?'

কাঁধের দু'পাশে গড়িয়ে-পড়া বিনুণি দুটোকে পিঠের উপর ছুঁড়ে দিয়ে মিনু বলে, 'দিদিমার যে কথা! গাড়ী চড়বার, মাখন খাবার পয়সা কোথায় পাব? একটা কেন, সময় পাইনে, নয়তো আরো দুটো টিউশান করা উচিত। দেখছ না, সংসারে কত অভাব? তুমি আর মা নিরামিষ খাও, এক কৌটা দুধ তোমাদের জোটে না; চিনু দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছে, টাকার জন্য ওকে একটা ভালো ডাক্তার দেখাতেও পারছি নে।'

সংসারের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য মিনু উদ্‌গ্রীব। কিন্তু দিদিমার প্রাণ কি চায়, তা তো সে বোঝে না!

এর পর আর কেউ না বুঝলেও দিদিমা বুঝতে পারেন যে, মিনুর মুখের উপর আনন্দের একটা দ্যুতি নেমে এসেছে, সে যেন একটু চঞ্চল, একটু বিহ্বল হ'য়ে প'ড়েছে। কোন এক সুখস্বপ্নের ছায়া ভেসে উঠেছে ওর কালো চোখের তারায়। সে যখন-তখন এসে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে, অকারণে হাসে, কখনো দু' কোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে তার চোখ দিয়ে। একদিন তিনি বক্ষলগ্না নাতনীর মুখখানা তুলে ধ'রে বলেন, 'কি হ'য়েছে রে মিনু? কি বলতে চাস্ তুই আমাকে?'

লজ্জারাঙা মুখখানা মিনু আরো নিবিড় ভাবে গুঁজে দেয় দিদিমার বুকের মধ্যে। দিদিমা বলেন, 'দিদিমার কাছে তোর এত লজ্জা কিসের রে? স্পর্শমণির স্পর্শ পেয়ে মন যদি তোর সোনা হ'য়ে উঠে থাকে'—

নিজের গাল দিয়ে মিনু দিদিমার ঠোঁট দুটো বন্ধ ক'রে দেয়। 'দিদিমা! দিদিমা!' তার কণ্ঠ যেন হাসি-কান্নায় থর্ থর্ ক'রে কাঁপে। কতক্ষণ কেটে যায় এই ভাবে—অকথিত ভাষায় দিদিমার মর্ম্ম স্পর্শ করে নাতনীর মর্ম্মবাণী।

চোখ মুছে দিদিমা বলেন, 'একদিন তাকে এনে দেখা মিনু!'

সহসা মিনু বলে, 'দিদিমা, তুমি রাগ করবে না তো?'

'রাগ করব কি রে? তপস্যা ভেঙ্গে যোগীশ্বর আজ প্রার্থী হ'য়ে আমার উমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আমার কত আনন্দের দিন!'

'কিন্তু দিদিমা, সে কিন্তু বামুন নয়—তুমি হয়তো আপত্তি ক'রবে, সেই-ই আমার ভয়।'

'তুই তাকে ভালোবাসিস্ তো? তাকে পেলে সুখী হবি তুই?'

লজ্জায় মাথা নামায় মিনু। 'তুমি কি সে কথা বুঝতে পারছ না দিদিমা?'

'তুই সুখী হবি, তার চেয়ে আমার জাত বড় হ'ল রে? কী বোকা মেয়ে তুই, এমন কথা তুই ভাবলি কি করে? তাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আয় মিনু! আমি একটু দেখি।'

'কিন্তু মা যদি রাগ করেন?'

'সন্তানের সুখে মা কি কখনো রাগ করে রে পাগ্‌লি? পেটে তার ছেলে হয়নি, সেই-ই হবে তার ছেলে। তুই অত ভাবিস্‌নে মিনু। কাল ওকে নিয়ে আয় আমার কাছে। কোথায় থাকে ছেলেটি?'

'আমাদের অফিসের বড় অফিসার, পাঁচ-ছ' বছর বিলেতে থেকে বছর খানেক হল দেশে ফিরেছেন।'

ধুতী-পাঞ্জাবী প'রে এসে মা-দিদিমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে চিত্র। তার সুকুমার দেহকান্তি আর শান্ত-সৌম্য মুখের দিকে চেয়ে দিদিমা তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর চলে যান, আর দীর্ঘ দিন পরে স্বর্গগতা কন্যাকে স্মরণ ক'রে অশ্রুপাত করেন।

মিনুকে ডেকে বনলতা বলে, 'চিত্রকে তুমি বিয়ে করতে চাও মিনু?'

নত মস্তকে মিনু সম্মতি জানায়। বনলতা বলে, 'পাত্র হিসেবে চিত্র খুবই উপযুক্ত, তুমি হয়তো সুখী হবে। কিন্তু বামুনের মেয়ে হ'য়ে তুমি কায়েতের ছেলেকে বিয়ে ক'রবে কেমন করে?'

শান্ত দৃষ্টি তুলে মিনু বলে, 'জাত টাই কি সব চেয়ে বড় মা?'

'সমাজে বাস্ ক'রতে হ'লে নিশ্চয়ই তাই। এর পর কি আর আমি চিনুকে বামুনে বিয়ে দিতে পারব? তা' ছাড়া বিয়ের পরেও কি তুমি চাকরী ক'রবে?'

'না—সেটা সম্ভব হবে না।'

'তবে চিনুকে নিয়ে কি আমি পথে দাঁড়াব?'

বিস্মিত হ'য়ে মিনু বলে, 'কেন মা? উনি তোমাদের সব ভার গ্রহণ ক'রতেই প্রস্তুত হ'য়েছেন।'

'এখন প্রস্তুত হ'লেও কিছু দিন পর তার মনের পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। সে তখন আমাদের আশ্রিত অনুগৃহীত ব'লেই মনে ক'রবে। মেয়ে নিয়ে জামাইয়ের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে আমি পারব না। তার চেয়ে মেয়ের হাত ধ'রে বরং ভিক্ষে ক'রে খাব।'

'চিনুকে আমি দুঃখ দেব, এ কথা তুমি কেমন ক'রে ভাবলে মা? মেয়ে আর জামাইকে তুমি পৃথক ভাবছ কেন?'

'মেয়ে আর জামাই সম্পূর্ণ পৃথক্ ব'লেই পৃথক্ ভাবছি। জামাইয়ের অনুগ্রহের দান নেওয়ার চেয়ে মেয়ের হাত ধ'রে ভিক্ষে করে খাওয়াও ভালো।'

চিত্র ব্যাকুল হ'য়ে এসে বলে, 'মা, আমি হাত জোড় ক'রে আপনার অনুমতি ভিক্ষে ক'রতে এসেছি। মেয়ের উপার্জ্জনে যদি আপনার অধিকার থাকে, তবে জামাইয়ের উপার্জ্জনেই বা থাকবে না কেন?'

বনলতা বলে, 'ও সব কথা শুনতে ভালো, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বড় অপমানের, বড় লজ্জার। তা' ছাড়া অসবর্ণ বিয়েতে আমার মত নেই। মিনুর বাবাও এ বিয়ে সমর্থন করেননি কোনো দিন। বেঁচে থাকলে এখনো ক'রতেন না।'

চিত্র বলে, 'মিনুর দিকে চেয়ে আপনি সমস্ত দ্বিধা দূর করুন মা! অতিরিক্ত খাটুনিতে দিন দিন ওর শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, কিন্তু ওর ই প্রচণ্ড আত্মসম্মান জ্ঞান সে তো আপনি জানেন, কোনো উপায়েই ওকে কোনো রকম সাহায্য করবার আমার সাধ্য নেই। ওকে আমি যত দূর জানি, আপনার আর দিদিমার অমতে ও বিয়েতে সম্মতি দেবে না। ওর জীবনটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।'

আমার যা' বলবার আমি বলেছি বলেই বনলতা ঘর ছেড়ে চলে যায়। চকিতে চিত্র একবার মিনুর মুখের দিকে তাকায়—কি একটা আতঙ্কে তার বলিষ্ঠ অন্তরও থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে।

৩

মিনু জীবনের কোন্ পথ বেছে নিয়েছে, বুঝতে না পেরে দিদিমা সকরুণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকান। মিনুর অনমনীয় শান্ত মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি অধিকতর শঙ্কিতা হ'য়ে ওঠেন। সে দৃষ্টিতে না আছে অনুযোগ, না আছে অভিযোগ, না আছে ক্ষোভ, না আছে আনন্দ! আশা-নিরাশার অতীত সে গভীর দৃষ্টি যেন দিদিমার অন্তরে গিয়ে বজ্রের মত আঘাত করে। মিনুর একটানা জীবনে কোথাও যেন ঝড় ওঠেনি, বজ্রপাত হয়নি কোনো দিন!

মাঝে মাঝে তিনি কেঁদে বলেন, মনে তোর কি আছে মিনু আমাকে তুই খুলে বল, আমি আর সইতে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে মিনু হয়তো হাসে, নয়তো কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে। তার নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনো আভাসই তার দৃঢ় নির্ব্বাক্ ওষ্ঠাধরকে অতিক্রম করতে পারে না। তবে কি মিনু নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত ক'রে চলেছে?

কিন্তু যাকে ঘরে নিয়ে এসে মিনুর মাতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, মিনুর মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশু-হৃদয়কে প্রলুব্ধ ক'রেছিলেন, তাকেই উপেক্ষা করতে আজ তিনি কেমন ক'রে মিনুকে উৎসাহিত করবেন? কিন্তু মিনু তো এখন বড় হয়েছে। দিদিমা অথবা মার উপদেশ বা অনুমতি ব্যতীতও তো সে তার জীবনের শুভ পথ নির্ব্বাচন করে নিতে পারে। মানুষ অথবা আইন কেউই তো তাকে বাধা দিতে পারে না! কিন্তু বার বার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরেও সে একটি আশ্বাস বাক্য কুড়িয়ে নিতে পারল না।

চিত্র বলে, 'হঠাৎ এ খেয়াল কেন মিনু? তুমি নাকি এ অফিসের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য অফিসে চলে যাচ্ছ? নতুন অফিসে গেলে তুমি অনেক অসুবিধেয় পড়বে।'

'কিন্তু'—

'কি বলতে চাও আমি বুঝেছি। আমাকে ভোলবার জন্য আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাও। কিন্তু তার কি সত্যি প্রয়োজন আছে মিনু?'

মিনু একটু ম্লান হাসে, সেই এক ঝলক হাসির সঙ্গে যেন শত ধারায় অশ্রু ঝ'রে পড়ে।

এর পর চিত্র বদ্‌লি হ'য়ে বাংলা দেশ ছেড়ে চ'লে যায়। যাবার আগে অফিসে মিনুর অনেক সুবিধে ক'রে দিয়ে যায়। এই সময় দিদিমাও চ'লে যান সেই দেশে, যে দেশে গেলে মানুষ একেবারে সুখ-দুঃখের অতীত হ'য়ে যায়।

সমস্ত আঘাতই মিনু স্থির ভাবে সহ্য করে, কিন্তু এই নির্ব্বাক্-রুদ্ধ সহ্যশক্তির প্রতিক্রিয়ায় তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

রুগ্ন দেহ নিয়েও মিনু রাত-দিন খাটে, মা-বোনকে একটুও কষ্ট পেতে দেয় না। চিনুকে আদর ক'রে মাঝে মাঝে বলে, 'তুই কত দিনে বড় হ'য়ে সংসারের ভার নিবি চিনু? কবে আমার ছুটি হবে! আমি যে আর পারিনে রে।'

দিদিমার মৃত্যুতে দিদি দুঃখ পেয়েছে, এ কথা চিনু বোঝে, তা' ছাড়া আর একটা কি ঘটনা দিদিকে প্রচণ্ড আঘাত ক'রেছে সে কথা সে স্পষ্ট ভাবে বোঝে না। কেউ তাকে বুঝতে দেয়ও না। দিদির ম্লান মুখের দিকে চেয়ে সে ব্যথা পায়। বলে, 'ছুটি চাইছ কেন দিদি? শরীর বেশী খারাপ হয়েছে; মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

চিনু ম্যাট্রিক পাশ করে। বনলতা বলে, 'চিনুর আর প'ড়ে কাজ নেই, এবার চাকরী করুক। তোর শরীর ভালো নয় মিনু, চিনু কিছু রোজগার কর'লে তোর খাটুনি একটু কমবে।'

মাকে শাসন ক'রে মিনু বলে, 'ওর পড়াশুনায় তুমি বাধা দিয়ো না মা, ওর যত দূর ইচ্ছে পড়ুক। আমার নিজের পড়া বন্ধ হ'য়েছিল সংসারের জন্য; সে লোকসান আমি ওকে দিয়ে পুষিয়ে নেব।'

ক্রমে চিনু বি, এ পাশ ক'রে এম, এ পড়তে যায়। সেই সময় সহসা চিনু একদিন মিনুকে বলে, তার সহপাঠিনী চন্দ্রার ভাই লালা কাপুরচাঁদকে সে ভালোবাসে, তাকেই সে বিয়ে ক'রবে। তাদের দেশ পাঞ্জাব, কিন্তু ব্যবসা উপলক্ষে তারা বহু কাল বাংলা দেশে আছে।

একবার প্রবল ভাবে'ধ্বক্' করে উঠেই মিনুর বুকের আলোড়ন শান্ত হ'য়ে আসে। বোনের চোখের উপর চোখ রেখে সে বলে, 'সত্যি তাকে তুই ভালোবাসিস্ চিনু? সুখী হবি তাকে পেলে?'

বলেই সে দু' হাতে বোনকে জড়িয়ে ধরে, তার ব্রীড়াকম্পিত বক্ষের ভীরু-স্পন্দন অনুভব করে নিজের বক্ষ দিয়ে।

'মাকে বলা হয়েছে চিনু? দিদির বুকের উপর থেকে এক ঝট্‌কায় মাথা তুলে নেয় চিনু।

'না দিদি, মাকে কিছু বলবার দরকার নেই।'

মিনুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 'মাকে ব'লবিনে, এ কি বলছিস চিনু? মাকে না জানিয়েই তুই বিয়ে করবি নাকি?'

'কিন্তু মা যদি বাধা দেন?

'কখ্‌খনো না—তুই দেখে নিস্—'

'তবে তোমার বেলায় বাধা দিয়ে তোমাকে এত দুঃখ দিলেন কেন শুনি? দিদি, তখন আমি ছোট ছিলাম, সব কথা ভালো ক'রে বুঝিনি, তোমরাও বুঝতে দাওনি। কিন্তু এখন বুঝি, কত বড় অবিচার তিনি তোমার উপর করেছেন। আমাকেও হয়তো বাধা দেবেন—'

মিনু হেসে বলে, 'আগেই এত ব্যস্ত হ'চ্ছিস্ কেন রে পাগলি? এখন তাঁর মনের পরিবর্ত্তনও তো হ'তে পারে? কোনো ভয় নেই, মাকে আমি ব'লে-ক'য়ে রাজি করাব। তোকে দুঃখ পেতে দেব না আমি।'

দিদির গলা জড়িয়ে ধরে চিনু বলে, 'তবে তোমার বেলায় রাজি করাতে পারলে না কেন দিদি? এমন করে জীবনটাকে কেন অপচয় ক'রে ফেল্‌লে?' ব'লতে ব'লতেই চিনু কেঁদে ফেলে।

মিনু হাসে। 'চিনু, তুই বড্ড ছেলেমানুষ এখনো, কিছুই বুঝতে পারিস নে। যাক্ সে কথা, ছেলেটি বেশ ভালো তো? সব কথা আমাকে বল, নিয়ে চল আমাকে একদিন, দেখে আসি আমি।'

দেখে-শুনে খুসি হয় মিনু, বোনকে আশ্বাস দেয় বার বার, সে যেন নিশ্চিন্ত থাকে মিনুর উপর সব ভার দিয়ে।

কয়েক দিন পর সহসা একদিন চিনু য়ুনিভারসিটি থেকে ফিরে আসে না, আসে তার চিঠি। মিনুকে সে লিখেছে যে মিনু গোপন করলেও চিনু জানতে পেরেছে যে পাঞ্জাবীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে মা একেবারে অস্বীকৃত হ'য়েছেন। তাই কাপুরচাঁদকে বিয়ে ক'রে সে আজ পাঞ্জাব চলে যাচ্ছে। দিদি তাকে ক্ষমা করবে সে জানে, মা হয়তো করবেন না। কিন্তু এ ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না।

বজ্রাহতা বনলতাকে মিনু বলে, 'চিনুকে তো আমরা হারাতে পারব না মা, তুমি তাকে ক্ষমা কর।'

একটা তপ্ত নিশ্বাস ফেলে বনলতা বলে, 'এ জীবনে হয়তো ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু চিত্র এখন কোথায় আছে রে মিনু?'

'অনেক দূরে—লণ্ডনে।'

'সে কবে দেশে ফিরে আসবে মিনু?'

'কেন মা?'

'চিনু যা' করেছে এ ভালোই করেছে মিনু, পেটে ধরিনি ব'লে তোর উপর যে অবিচার আমি করেছি, মেয়ে হয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছে সে। চিত্র কবে দেশে ফিরবে মা? তার হাতে তোকে তুলে দিয়ে দু'চোখ যে দিকে চায় চলে যাব।'

'কিন্তু মা, তিনি তাঁর মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁদের চোখের জল অগ্রাহ্য করতে না পেরে তিনি গত মাসে বিয়ে করে সস্ত্রীক লণ্ডন চলে গেছেন।'

'কেন তোকে না জানিয়ে সে এমন কাজ করল মিনু?'

মিনু একখানা চিঠি তুলে দেয় বনলতার হাতে, দু'মাস আগে চিত্র লিখেছে, তোমার মার জন্য তুমি আত্মহত্যা করেছ, আমার মার জন্য আমিও আত্মহত্যা করতে চলেছি মিনু! এখনো কি তোমার মনের পরিবর্ত্তন হয়নি?'

বনলতা চিঠিখানা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'এর উত্তরে তুমি কি লিখেছিলে?'

'লিখেছিলাম—না।—'

'সর্ব্বনাশ! কার উপর অভিমান করে তুই এমন রত্ন হাতে পেয়েও বিসর্জ্জন দিলি? আমি স্বতন্ত্র করতে চাইলেও তোরা তো একই বাপের রক্তে জন্মেছিস্'—

এত দিন পর' বনলতা আজ গভীর স্নেহে মিনুকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

দিশি ও বিলেতী সুর

"য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্র ভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।"

—রবীন্দ্রনাথ।

রণজিৎকুমার সেন

কি একটা মামলার ব্যাপার নিয়ে স্বদেশরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। স্বদেশরঞ্জন হালদার। ব্যারিষ্টারী প্রাক্‌টিশ থেকে তখন সবে মাত্র জজ হ'য়েছেন। আমি তখন কেবল নতুন ওকালতিতে ঢুকেছি। আলাপ ক্রমে ঘনীভূত হ'লো। দেখলাম—সাধারণত: উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টাররা যে ভাষায় কথা বলেন, স্বদেশরঞ্জন তার একটা স্পষ্ট ব্যতিক্রম। কথার মধ্যে শব্দের লালিত্য আছে, যুক্তির মধ্যে আছে সুরের বিস্তার। ভালো লাগলো। এমন আন্তরিকতা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্লভ; দুর্লভ হৃদয়ের সংস্পর্শ স্বভাবত:ই তাই হৃদয়কে দোলা দিল। ইচ্ছে ছিল—জজিয়তিতে যোগ না দিলে কিছু কাল তাঁর এ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসাবে কাজ ক'রে বার-লাইব্রেরীতে অন্তত: নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নেবো। কিন্তু তা আর হ'লো না। না হ'লেও স্বদেশরঞ্জন সহৃদয় ব্যক্তি; নিয়মিত তাঁর সান্নিধ্য লাভে বিঘ্ন ঘটলো না। ক্রমে জানলাম—শুধু বিচক্ষণ আইনজ্ঞই নন স্বদেশরঞ্জন, বিচক্ষণ সাহিত্যিকও বটে। দীর্ঘ কাল তিনি বহুতর রচনা দিয়ে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল ক'রেছেন; প্রকাশকেরা তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ ক'রেছে: গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত। কোনো গ্রন্থের সংস্করণের পর সংস্করণ কেটে গেছে। নানা উপঢৌকন এসেছে নানা দিক থেকে। ভাগ্যবান পুরুষ স্বদেশরঞ্জন; শুধু লক্ষ্মীরই বরপুত্র নন, বাণীরও বরপুত্র তিনি।

কলেজ-জীবন থেকে আমার নিজেরও কিছু কিছু সাহিত্যপ্রীতি ছিল। শুনে স্বদেশরঞ্জনকে ক্রমে আরও ভালো লাগলো। প্রথম যে দিন মামলার ব্যাপার নিয়ে তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, দরজা থেকেই বিদায় নিয়ে আসতে হয়েছিল। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে নিজে থেকেই তিনি তাঁর ভিতর মহলে ডেকে নিয়ে কুশন-আঁটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন ব'সতে, তার পর নিজে তাঁর রিভলভিং চেয়ারে ব'সে চায়ের কাপ মুখের সামনে উঁচিয়ে ধ'রে আন্তরিকতার সুর টেনে আনলেন জিহ্বায়: 'জীবনের অনেকগুলি বছর একটানা সাহিত্যিকতা ক'রে কাটিয়েছি, এখন তো এক রকম রিটায়েরিংয়েরই সময় হ'য়ে এলো, ভাবছি—এবারে সে সম্পর্কে একটা-কিছু কম্পাইল্ ক'রে তবে লেখালেখির কাজ থেকে ছুটি নেবো।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ব'ললাম, 'ছুটি কি সত্যিই নিতে পারবেন? এত কাল এজলাসে দাঁড়িয়ে আইন প্রকাশ ক'রেছেন মুখে, এবার থেকে যে কলম চালিয়ে অর্ডার লিখতে হবে। সুতরাং কলম আর বন্ধ ক'রতে পারছেন কোথায়?'

শুনে সোচ্ছ্বাসে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন স্বদেশরঞ্জন, বললেন, 'বাঃ, বেশ তো বলেছেন। ইউ উড বি এ গুড প্রাক্‌টিশনার। ছুটি দেখছি আমি সত্যিই পাবো না। কি বিশ্রী ভাবেই যে সারা জীবন কলম চালাতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি, এখন রীতিমত ক্রণিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর রেমিশনও নেই, রেমিডিও নেই।'

সসম্ভ্রমেই বললাম, 'না থাকাটাই তো ভালো। যে কাজের পিছনে আনন্দ আছে, সে কাজ ক'রে যে জীবনেরই উৎকর্ষতা বাড়ে!'

সঙ্গে সঙ্গে এক রকম উচ্চকিত কণ্ঠেই উচ্চারণ ক'রলেন স্বদেশরঞ্জন: 'জীবন? হাউ ফ্যানি!' অলক্ষ্যে কেমন একটা গাম্ভীর্য্যে সারা মুখখানি তাঁর ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। ব'ললেন, 'চিরকাল মিথ্যার জাল বুনে কি কখনও জীবনের উৎকর্ষতা বাড়ে—না বাড়তে পারে? প্রাক্‌টিশনার হিসেবে আইন আর সাহিত্য নিয়ে চিরকাল তো আমরা কেবল মিথ্যের বেসাতি করেই গেলাম। মিথ্যে ক'রে বানিয়ে গল্প না সাজাতে পারলে যেমন পাঠক খুসী হয়নি, মিথ্যে ক'রে তেমনি মামলা না সাজাতে পারলে কোনো মোকদ্দমা জেতা যায়নি।'

অকস্মাৎ স্বদেশরঞ্জনের সেই গাম্ভীর্য্যের অন্তরাল থেকে একটা উদ্‌গত হাসি ফেটে প'ড়ে সারা কক্ষ গম্-গম্ ক'রে উঠলো। ব'ললেন, 'জীবনের হয়ত সত্যিই একটা অর্থ ছিল, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে সে অর্থ ঠাঁই পেলো না।'

উত্তর দিতে গিয়ে এবারে ভাষা হারিয়ে ফেল্‌লাম। বুঝতে পারলুম না—কথাটা উল্লেখ ক'রে স্বদেশরঞ্জন কি বোঝাতে চাইলেন। তবু বুঝতেই চেষ্টা করলাম, না বোঝাটা আমার মতো উৎসাহী তরুণ আইনজ্ঞের পক্ষে অপরাধ। কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে উঠে এবারে বিদায় নিতেই যাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে কক্ষের এক কোণে রক্ষিত টেলিফোনটা অকস্মাৎ সজোরে বেজে উঠতেই ত্রস্তে উঠে গেলেন স্বদেশরঞ্জন। অনুকূল পরিবেশ বলে বিদায় পেতে তাই দেরী হ'লো না। ফোনটাও হয়ত কিছু-একটা কনফিডেন্সিয়াল হ'য়ে থাকবে। দু'হাত কপালে স্পর্শ ক'রে ব'ললেন, 'খুসী হ'লাম আলাপ ক'রে; সময় সুযোগ ক'রে আসবেন মাঝে মাঝে, গল্প করা যাবে।'

ব'ললাম, 'আসবো।' সেই সঙ্গে স্বদেশরঞ্জনের অযাচিত আপ্যায়নের জন্য কিছুটা কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে এলাম মনে মনে। অবস্থায় ধনী, বয়সে প্রাচীন, স্বভাবে উদার, এমন মানুষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাতে লজ্জা নেই।

ইতিমধ্যে আর একদিন গিয়ে উপস্থিত হ'লাম স্বদেশরঞ্জনের দরজায়। সে দিনও অভ্যর্থনায় সেই একই আন্তরিকতা। ব'ললাম, 'আপনার সেদিনের মন্তব্য সম্পর্কে আমার কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা খট্‌কা থেকে গেছে। মিথ্যে ক'রে বানিয়ে গল্প ব'ললে কোনো কালেই কোনো পাঠক খুসী হ'তে পারে না, বিশেষত: আজকের যুগে। তা ছাড়া মানুষের কল্পনাশক্তিও অনেকাংশে বস্তুনিষ্ঠ তো বটেই। যেখানে তা নয়, সেখানে বুঝতে হবে—লেখকের নিজের আত্মতৃপ্তি ছাড়া তার রচনার কাণাকড়িও মূল্য নেই।'

কথা শুনে এতক্ষণ মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন স্বদেশরঞ্জন। হাসতে হাসতেই ব'ললেন, 'লেখার পিছনে লেখকের আত্মতৃপ্তিটাও

আছে বৈ কি! যেখানে তা নেই, সেখানে বুঝতে হবে—লেখক তার নিজেকে দিতে পারেনি। এই দেওয়াটাই হচ্ছে বাস্তবতার লক্ষণ। লেখক নিজেও যখন সামাজিক জীব, তখন তার রচনার মধ্যে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে সমাজের প্রতিফলন ঘটবেই। কোথাও তা রোমাণ্টিক, কোথাও বা তা মেটিরিয়ালিষ্টিক্। রোমান্স ছেড়ে নিছক বাস্তব যা—তা সংবাদপত্রের খবর ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভাবের সঙ্গে বস্তু না মিললে শিল্প হয় না। আর্ট আর ইণ্ডাষ্ট্রির পার্থক্যই হ'লো এই, অথচ ও-দু'টোর প্রতিশব্দ শিল্পই।'

ব'ললাম, 'তবে যে ব্যবহারিক জগতে জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না—তার মানে কি?'

সহসা স্বদেশরঞ্জনের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির উপর দিয়ে একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়া নেমে এলো। বললেন, 'যখন দেখি রূঢ় বাস্তবতার নামে মানুষ আজ সর্ব্ব দিকে ক্ষেপে উঠেছে, হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি ব'লে এখানে কোনো প্রশ্নই নেই, তখন জীবনের অর্থ সম্পর্কে খানিকটা সংশয় উপস্থিত হয় বৈ কি!'

এবারে কেন যেন জবাবে কিছু-একটাও আর বলতে পারলুম না।

স্বদেশরঞ্জন নীরবে চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবলের ড্রয়ার থেকে চাবি বার ক'রে নিয়ে তাঁর বইয়ের আলমারি খুলে একগাদা বই টেনে বার ক'রলেন। তার পর পুনরায় চেয়ারে এসে ব'সে এক-একখানি ক'রে বই আমার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে ব'ললেন, 'এক কালে অনেকগুলো বই লিখেছিলাম, আপনারা তখন অপেক্ষাকৃত ছোট; খ্যাতি-প্রতিপত্তিও কম পাইনি এক দিন। আজ দিন-কালের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এযুগের মানুষ আজ বড় বেশী রাষ্ট্রজ্ঞ হ'য়ে অতীতের রসজ্ঞদের ভুলতে ব'সেছে। ষ্টাইলও পাল্টাচ্ছে, রচনারীতিও পাল্টাচ্ছে, তার সাথে সাথে বিষয়বস্তুরও ধারা বদলে যাচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই, ডিনামিসিটি ছাড়া দেশ কখনও প্রগতির পথে এগোয় না। কিন্তু এ যুগের প্রগতির পথ যারা একদিন বুকের রক্তে আর চোখের জলে ধুয়ে মসৃণ ক'রে দিয়েছিল, তাদের নিয়ে এ যুগের শিল্পীরা যেখানে শুধু বিরুদ্ধ মতই পোষণ ক'রে থাকেন, দুঃখ হয় সেইখানেই। মহাকালের বিচার ভিন্নও কালের একটা ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্মকে যারা অস্বীকার করে, তারা অতি বড় প্রগতিবাদী হ'য়েও দেশের আত্মারই অপমান করে না কি?'

ইতিমধ্যে খানসামা এসে একখানি প্লেটের উপর খামের একখানি চিঠি রেখে গেল। কথা থামিয়ে খামের মুখ খুলে চিঠিখানি মেলে ধরলেন তিনি চোখের সামনে, তার পর বার কয়েক সলিলকির [illegible] ব'ললেন, 'এক যুগ পরে আবার আমাকে তবে তোমার মনে [illegible] হিরণ?'

[illegible] কি না ভাবচি, অকস্মাৎ আবার তাঁর স্বাভাবিক [illegible]তার মধ্যে ফিরে এলেন স্বদেশরঞ্জন, ব'ললেন, 'কি ব'লতে [illegible] কি সব ব'লছিলাম না? আসলে ব্যাপার কি জানেন? [illegible] ভাঁড়ের গল্প থেকে শরৎচন্দ্রের গল্প পর্য্যন্ত সকলের গল্পই [illegible] গল্প, না বানালে গল্প হয় না, হয় কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞানের [illegible]। তাই ঠিক ক'রেছি, লোক-ভুলোনো ভূতুড়ে [illegible] আর না ক'রে এবার থেকে ল সম্পর্কেই শুধু গবেষণা ক'[illegible]: তাতে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ লোকের চোখে আইন ধরা প'ড়বে।'

ক্রমেই বিস্ময় বোধ ক'রছিলাম স্বদেশরঞ্জন সম্পর্কে, জবাব না দিয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে।

থেমে স্বদেশরঞ্জন বললেন, 'বানানো হলেও নিজের রচনা সম্পর্কে লেখক মাত্রেরই দুর্ব্বলতা থাকে। মাঝে মাঝে বইগুলো নিয়ে যখন পৃষ্ঠা উল্টাই, বেশ লাগে তখন অতীতের এক একটা খণ্ড স্মৃতি রোমন্থন ক'রে বেড়াতে। আসলে অতীত নিয়েই তো মানুষ বাঁচে, ভবিষ্যৎ যে তার কাছে অজানা রহস্যে ঢাকা। সেই ঢাকা যে মুহূর্ত্তে খুলে যায়, তার পরমুহূর্ত্তেই আবার সে অতীতের ঐশ্বর্য্য হ'য়ে দাঁড়ায়। এই বইগুলো আমার সেই অতীতের ঐশ্বর্য্য। নিয়ে যান, প'ড়ে দেখবেন, সত্যিই কিছু পাওয়া যায় কি না এই থেকে!'

মনে মনে লজ্জা বোধ করলাম এই ভেবে যে, আজ পর্য্যন্ত একখানি বইও ছুঁয়ে দেখিনি স্বদেশরঞ্জনের। মাথা তুলে তাই সহজ ভাবে ব'সতে পারছিলাম না তাঁর সামনে। সলজ্জ কণ্ঠেই বললাম, 'আপনার বইগুলো সম্পর্কে আমি একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখে কাগজে প্রকাশের ইচ্ছে রাখি। জানি না কতখানি কৃতকার্য্য হ'তে পারবো, তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে বাধা কি?'

মনে মনে বোধ করি এবারে অনেকখানি খুসীই হ'লেন স্বদেশরঞ্জন। বললেন, 'কোন্ কাগজে ছাপবেন? কোনো কাগজ এমন কোনো প্রবন্ধ ছাপবে ব'লে তো আমার মনে হয় না! তারা বর্ত্তমানের চাহিদা মেটাবে—না অতীতের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস নিয়ে জাবর কাটবে?'

বললাম, 'সে দায়িত্ব না-হয় আমার উপরেই খানিকটা ছেড়ে দিলেন, এই নিয়ে আপনাকে তো আর লজ্জায় প'ড়তে হবে না?'

কথা না ব'লে এবারে নীরবে নিজের দু' হাতের তেলো এক ক'রে অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ ঘষলেন, তার পর বেয়ারায় উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, 'এদিকে দু' কাপ ওভাল্‌টিন দিয়ে যেয়ো রামদীন!'

মনে মনে ওভাল্‌টিনের স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছে থাকলেও বিনয় প্রকাশ ক'রে বললাম, 'এখন আবার ও-সবের কি দরকার ছিল? বেলাও তো কম হ'লো না, উঠলেই ভালো ছিল নাকি এখন?'

—'উঠবেনই তো! ওভাল্‌টিন খেতে খেতে তবু দু' দণ্ড না হয় আপনার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা করি!' থেমে স্বদেশরঞ্জন বললেন, 'কোথাও কারুর সঙ্গে প্রাণ খুলে দু'টো আলোচনা করা ইদানীং
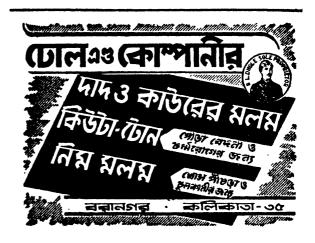
এক রকম বন্ধই হ'য়েছে। কমার্শিয়াল যুগে মানুষ আজ-কাল বড় মেকানাইজড্ হ'য়ে প'ড়েছে। আমাদের প্রথম জীবনে এমনটা ছিল না।'

বললাম, 'যুগধর্ম্মকে ঠেকিয়ে রাখবেন কি ক'রে? যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও পাল্টায়। আসলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার যত দিন পরিবর্ত্তন না হচ্ছে, তত দিন এ আক্ষেপ ঘুচবার নয়।'

বুঝতে পারছিলাম—এ আলোচনা স্বদেশরঞ্জনের কাছে আদৌ সুখকর হচ্ছে না, তবু কথার পৃষ্ঠেই কথা এসে গেল। ইতিমধ্যে বেয়ারা রামদীন এসে টেবলে ওভালটিন আর ক্রিমক্রেকার রেখে যাওয়ায় আলোচনার গতি তবু যা হোক্ কিছু-একটা ভিন্ন পথ ধ'রলো।

কাপে চুমুক দিয়ে স্বদেশরঞ্জন বললেন, 'সমাজ-ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করলেন, সেই বিষয়বস্তু নিয়েই আমি একদিন রচনা ক'রেছিলাম আমার 'কালনেমি' নাটক। ষ্টেজেও কয়েক নাইট হ'য়েছিল। পসার না হোক পজিশন বেড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তার পর আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পারলৌকিক আত্মা নিয়ে তখন কিছু চর্চ্চা করেছিলাম। দেখলাম—ইম্‌মর্টালিটি অব্ সোল নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন একখানি উপন্যাসই লেখা চলে, লিখলাম 'সপ্তসর্গ।' এক একখানি করে বই বেছে বেছে আমার হাতে তুলে দিতে লাগলেন স্বদেশরঞ্জন। সারা মুখখানি তখন তাঁর কেমন একটা দীপ্ত বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কণ্ঠে তেমনি এতটুকুও জড়তা নেই; কোন্ বই কোন্ ভাব থেকে লেখা—তার একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিয়ে দিয়ে সমগ্র স্বদেশ-সাহিত্যের একটা নাতিদীর্ঘ ভূমিকা তুলে ধরলেন তিনি আমার কাছে।

ওভালটিন কখন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্যই ছিল না এতক্ষণ; আর একবার কাপে চুমুক দিতে গিয়ে নিজেই লজ্জিত হ'লাম। সেটুকু কোনো ভাবে সামলে নিয়ে বললাম, 'পড়বো, নিশ্চয়ই পড়বো আমি, পড়ে অবিশ্যিই আমি বইগুলো সম্পর্কে কাগজে আলোচনা করবো।'

এবারে আর কথা না বলে কেমন একটা কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্বদেশরঞ্জন।

ব'ললাম, 'এখন উঠি, গিয়ে আবার মক্কেলদের নিয়ে পড়তে হবে।'

—'রাইট্-ও, দ্যাটস্ দি প্রেভিশন।' বলে দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে আমাকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানালেন স্বদেশরঞ্জন।

মানুষের প্রতি মানুষের প্রসন্নতা বাড়লে যা হয়। ওকালতিতে ভালো পসার হচ্ছিল না। হবে কেমন ক'রে? কম্পিটিশনের বাজার, আমার মতো উকিল ক'লকাতার পথে ঘাটে। তার মধ্যে পসার জমিয়ে বসা সহজ নয়। সম্প্রতি স্বদেশরঞ্জন তাঁর এজলাসে প্রাকৃটিশের সুযোগ ক'রে দিয়ে আমাকে বাঁচালেন। এভাবে আমাকে তাঁর সাহায্য করার কথা ছিল না, পেয়ে এবারে বর্ত্তে গেলাম।—তাঁর বইগুলো পড়তে নিয়ে দেখলাম, বেশী দূর এগোনো যায় না—যেমন যায় না আজকের যুগে দীনবন্ধু কিম্বা রামগতির রচনায়। চোখ বার বার কণ্টকিত হয়, মন বার বার হোঁচট খায়। বুঝতে বাকী রইল না—কেন এ কালের সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় স্বদেশ-সাহিত্য অচল! আজ দীনবন্ধু আর রামগতি বেঁচে থাকলে তাঁরাও অচল হ'তেন। কিন্তু তাঁদের ভাব, তাঁদের আদর্শ? তা এ বাংলার কৃষ্টিকে আজও আলোকোজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। স্বদেশ-রঞ্জনের সারা জীবনের সাহিত্যেও আলোর সেই ঔজ্জ্বল্য অনুপস্থিত নয়। তাকে আবিষ্কার ক'রতে হয়। ক'দিন ধ'রে কেমন ক'রে যেন একটা আবিষ্কারের মোহই পেয়ে ব'সলো। প'ড়লাম, বার বার ক'রে প'ড়লাম তাঁর গ্রন্থগুলি। তার পর দুঃসাহসের উপর ভর ক'রেই এক সময় কলম ধ'রলাম। পুরনো এক বন্ধু বছর কয়েক ধ'রে একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনা করছিল। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যায় গিয়ে তার ঘরে আড্ডা জমাতাম। গিয়ে প্রস্তাব ক'রতেই খানিকটা উন্নাসিকতা প্রকাশ ক'রে ব'সলো সে, ব'ললো, 'শরৎ রবীন্দ্র বঙ্কিম বিদ্যাসাগর ফেলে শেষ পর্য্যন্ত স্বদেশরঞ্জন! কার্স্ আনটু ইউ।'

ব'ললাম, 'মণি সন্ধান যদি উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে, তবে তা পাঁক থেকেও উদ্ধার করা যায়। তা নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রবার কিছু নেই। লেখাটা তোমাকে ছাপতে হবে। এতে মডার্নিজম সম্পর্কেও অনেক কথা রয়েছে।'

এবারে খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রলো বন্ধুটি, তার পর মুখে মৃদু হাসি টেনে বললো, 'ব্যাপার কি, মেয়েকে এবারে তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে সংসারমুক্ত হ'তে চান নাকি হালদার সাহেব?'

—'মেয়ে, মেয়ে কোথায়?' বিস্ময়ের কণ্ঠেই ব'ললাম, 'এত কাল ধ'রে যাতায়াত করছি, স্বদেশরঞ্জনের কোনো মেয়ে আছে ব'লে তো কই জানি না!'

সম্পাদক-বন্ধু ব'ললো, 'যাতায়াত যখন র'য়েছে, তখন জানার দিন ফুরিয়ে যায়নি। হাইকোর্টের জজ যদি শ্বশুর হয়, তবে আর তোমাকে পায় কে? দু'দিন পরে তুমিও ব্যারিষ্টার হ'য়ে নতুন গ্রীফ নিয়ে ব'সতে পারবে।'

কথাটা পুরোপুরি ঠাট্টা হ'লেও মনে যেন কেমন একটা চমক লাগলো। স্বদেশরঞ্জন আমাকে স্নেহ করেন সন্দেহ নেই, সেই স্নেহের সূত্রে তাঁর এজলাসে আমাকে প্রাকৃটিশেরও অনেকখানি সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। তার পিছনে তাঁর কন্যা সম্পর্কে সত্যিই কি তবে কিছু একটা সূক্ষ্ম ইচ্ছা র'য়েছে? অথচ আদৌ তাঁর কোনো কন্যা আছে কি না, সে সম্পর্কে সংশয় আমার এখনও কম নয়। ইচ্ছে ছিল বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করি: 'স্বদেশরঞ্জনের সংসার সম্পর্কে তুমি এত ওয়াকিবহাল হ'লে কি ক'রে?' কিন্তু মুখে এসেও কথাটা বেধে গেল। তাই ব'লে কৌতূহল কিন্তু নিবৃত্তি হ'লো না। স্বদেশরঞ্জনকে শ্রদ্ধা করি ব'লেই তাঁর সম্পর্কে সব কিছু জানতে ইচ্ছে হয়। সেই ইচ্ছে নিয়েই সম্পাদক-বন্ধুটির সামনে থেকে এক সময় উঠে এলাম।

বলা বাহুল্য যে, যথাসময়েই তার পত্রিকায় আমার সমালোচনা প্রবন্ধটি আত্মপ্রকাশ ক'রলো। স্বদেশ-সাহিত্যের স্বাদেশিকতার দিকটিই বিশেষ ভাবে প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ ক'রেছিলাম। প'ড়ে স্বদেশরঞ্জন আত্মপ্রসাদের ভাবাবেগে দু'বাহুর মধ্যে আমাকে সস্নেহে আকর্ষণ ক'রলেন। এত দিন যে সম্বোধন 'আপনি'র উত্তুঙ্গ শিখরে বিরাজ ক'রছিল, অকস্মাৎ তা 'তুমি'র উপলখণ্ডে নেমে এলো। ব'ললেন, 'তুমি আজ একটা মস্ত-বড় বিস্ময়কর কাজ ক'রে আমাকে চমকে দিলে বৈদ্যনাথ! তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাই, বুঝতে পারছি না।'

বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললাম, 'ও-কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না স্যার! সাহিত্যকে ভালোবাসি বলেই সে সম্পর্কে যেখানে যেটুকু দরকার, করতে চেষ্টা করি। কিন্তু নিজের অক্ষমতা কোথাও আত্মতৃপ্তি আনতে দেয় না।'

একটু কাল থেমে স্বদেশরঞ্জন বললেন, 'লেখা সম্পর্কে লেখকের চিরকালই অতৃপ্তি থেকে যায়। এই অতৃপ্তিই তার মধ্যে আনে বৈচিত্র্য। আত্মতৃপ্তি ঘটলে বোধ করি একটা লেখাতেই লেখক ফুরিয়ে যেতো, বহুতর রচনা আর তার দ্বারা সম্ভব হতো না।'

কথাটা মূল্যবান সন্দেহ নেই। তাই উত্তর দিতে পারলুম না। বললাম, 'একটা নিবেদন ছিল। আপনার নিজের জীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন, তবে তৃপ্তি পেতাম।'

এবারে কেমন একটা আকস্মিক উচ্ছ্বাসে স্বদেশরঞ্জনের কণ্ঠ সহসা উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো: 'মাই লাইফ? হোয়াট এ ফানি থিং! আমার লাইফে তো তৃপ্তি পাবার মতো কিছু নেই বৈদ্যনাথ! চেষ্টা করেও জীবনে মনীষী হ'তে পারিনি, সে সাধও নেই। কি শুনতে চাও আমার জীবনের?'

বললাম, 'কোন ঘটনাকে প্রচ্ছন্ন না রেখে সব কিছু। আমার ভবিষ্যৎ সাহিত্য প্রয়াসে তা হয়ত কোনো দিন কিছু একটা কাজেও আসতে পারে।'—দু'চোখে প্রকাণ্ড একটা কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে তাকালাম স্বদেশরঞ্জনের মুখের দিকে।

দেখতে দেখতে স্বদেশরঞ্জনের মুখখানি কেমন একটা শান্ত গাম্ভীর্য্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বললেন, 'জীবনে আজ তুমিই শুধু এ প্রশ্ন করলে বৈদ্যনাথ! কোনো দিন আমার জীবন সম্পর্কে কারুর কৌতূহলও হয়নি, জানতেও পারেনি কিছু। এমন কি আমার মেয়ে ললিতা পর্য্যন্ত নয়।'

ললিতা! বাঃ, ভারী মিষ্টি নাম তো! সম্পাদক-বন্ধুটির মুখে যার অস্তিত্বের শুধু ইঙ্গিতটাই পেয়েছিলাম, স্বদেশরঞ্জনের মুখে এবারে তার নামের পরিচয় পেয়ে খুসী হলাম। শিল্প-সাহিত্য আর ললিত-কলা নিয়ে সারা জীবন যিনি সাধনা করলেন, তিনিই তো দিতে পাবেন একমাত্র এই নাম। বললাম, 'এটা আমার ধৃষ্টতা জানি, তবু যাঁর সাহিত্য প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছি, তাঁর জীবনী সম্পর্কেও কৌতূহল জাগে বৈ কি! বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—তাঁদের সম্পর্কেও যে জনগণের এই একই কৌতূহল!'

ম্লান হেসে স্বদেশরঞ্জন বললেন, 'ছিঃ, ও ভাবে কথাটা উল্লেখ ক'রো না বৈদ্যনাথ, ওতে পাপ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর নমস্যদের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর এই কিঙ্করের নাম উচ্চারণ করলে তাঁদের শুধু অপমানই করা হবে, আমার গৌরব কিছু বাড়বে না। একটু বোসো, ললিতাকে আমি তোমার সমালোচনাটা পড়তে দিয়ে আসি। মেয়েটা আবার এত বেশী লাজুক যে, কারুর সামনে বড় একটা বেরোতে চায় না।'

কাগজখানি হাতে ক'রে অন্দর মহলের দিকেই উঠে গেলেন স্বদেশরঞ্জন, কিন্তু ফিরে আসতেও দেরী করলেন না। এসে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'শোনো বৈদ্যনাথ, না লুকিয়ে সবটাই তোমাকে বলি। আমার মা ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত নর্ত্তকী। রাজপ্রমুখদের সভা-পরিষদ থেকে প্রচুর উপঢৌকন পেতেন তিনি। কিন্তু আমি জন্মে অবধি কোন দিন আমার বাবাকে দেখিনি। সংসার ব'লতে আমি আর মা। আমার জ্ঞান হ'য়ে অবধি মাকে অবিশ্যি আমি কোনো দিন কোথাও গিয়ে নাচতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। আমাকে কোলে পেয়ে মা তাঁর অতীতের বিষয়-কর্ম্ম সবই ত্যাগ ক'রেছিলেন। ধীরে ধীরে আমি লেখাপড়া শিখে বড় হ'তে লাগলাম। মনের মধ্যে বাবার সম্পর্কে একটা কৌতূহল আগাগোড়াই ছিল। একদিন জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'মা, আমার বাবা কোথায়?' জবাব না দিয়ে নীরবে মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কৌতূহল আরও তীব্র হ'লো। কিন্তু মার দিক থেকে একেবারেই সাড়া নেই। পরে বি-এ পাশ ক'রে সব ঘটনাই একে একে শুনলাম। অভয় হালদার ব'লে একটি লোক প্রায়ই মার কাছে আসতেন। সমাদর পেতেন তিনি মার কাছে। তাঁরই ঔরসে আমার জন্ম। তুমি বিস্মিত হ'চ্ছো বৈদ্যনাথ, তাই না?'

বিস্ময়ের সঙ্গেই এতক্ষণ স্বদেশরঞ্জনের কথাগুলি শুনছিলাম, ব'ললাম, 'না, আপনি বলুন।'

কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রেই পুনরায় বলতে আরম্ভ ক'রলেন তিনি: 'কিন্তু আমার জন্মমুহূর্ত্ত থেকে আর তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেননি। ঠিকানা অবিশ্যি একটা তাঁর ছিল, সেই ঠিকানায় গিয়ে মা খোঁজ নিয়ে জান্‌লেন—এমন কোনো অভয় হালদার কোনো দিনই সেখানে থাকেননি। পরে অনেক যায়গায় খোঁজ নিয়েছেন মা, কিন্তু কোনোখানেই আর তাঁর দেখা মেলেনি। ফেরারী হ'য়ে তিনি তত দিনে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছেন। আসলে ওটা যে তাঁর জাল-নাম, বুঝতে এতটুকুও বাকী রইল না। আমার নিজের চরিত্র থেকে বস্তুতঃ আমি এটুকু অনুমান ক'রতে পারি যে, অভয় হালদারই যদি আমার যথার্থ পিতা হ'য়ে থাকবেন, তবে নামের উপর এমন একটা কলঙ্ক আরোপ ক'রে ভীরু কাপুরুষের মতো কখনও তিনি পালিয়ে যেতে পারতেন না। তবু তাঁর পদবীটা কিন্তু ঠিকই বহাল রয়ে গেল। মার মুখ থেকে যখন ঘটনাটা জান্‌তে পারলুম, তখন কেবল এক ফোঁটা চোখের জলই শুধু আমার প'ড়েছিল, কথা ব'লতে পারিনি। কেউ কখনও বাবার কথা জিজ্ঞেস ক'রলে মা ব'লতেন, পল্টনে গিয়ে যোগ দিয়ে তিনি হঠাৎ এ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু আসলে তা নয়।'

আমাকে দু'বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে মা ব'ললেন, 'আজ তুই বড় হ'য়েছিস, পাশ ক'রে ডিগ্রী পেয়েছিস, সব কিছু বুঝতে শিখেছিস বাবা! আমার অর্থের অভাব নেই খোকা, বিলেতে গিয়ে তোকে আই সি এস্ হ'য়ে আসতে হবে। তোর বাবার মতো যারা ভণ্ড প্রতারক সমাজের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে র'য়েছে, তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে তোর আইন দিয়ে। আমি জানি, একমাত্র তুই ই পারবি সে কাজ ক'রতে।' ব'লতে গিয়ে মার চোখ দু'টি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। মার পা স্পর্শ ক'রে সেদিনই সেই অঙ্গীকার গ্রহণ ক'রলাম। বিলেতে গেলাম আই, সি, এসের জন্যে, কিন্তু লাক্ ফেবার ক'রলো না, হর্স রাইডিং-এ ফেইলিওর হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে এলাম। মা অবিশ্যি বেশী দিন আর সংসারে রইলেন না, কিছু দিন কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে প'ড়ে থেকে সেখানেই দেহ রাখলেন। আজন্ম পিতৃহীন হ'য়ে যে দুঃখ পাইনি, মার মৃত্যুতে সেই দুঃখ এসেই আমার সমস্ত মজ্জাকে পিষে

দিয়ে গেল! বি, এ ক্লাস থেকেই আমার সাহিত্য সাধনা চ'লছিল। কিছুদিন প্রাকটিশ ছেড়ে সাহিত্যের মধ্যে আত্মগোপন ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম। দেখলাম—নিঃসঙ্গ জীবন ক্রমেই কেমন দুর্বিষহ হ'য়ে উঠছে। ঘরে আনলাম তখন ললিতার মাকে। তারপর আমাদের দু'জনের সংসারে ললিতা এসে তিন জন হ'লো।'

'তার পরের ইতিহাসটা ব'য়ে চ'লেছে সাম্প্রতিক কালের দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে। একটা দারুণ অস্থিরতা নিয়েই চিরটা কাল কাটালাম। কিন্তু আজও আমি সেই ফেরারী অভয় হালদারকে খুঁজে বার ক'রতে নিবৃত্ত হইনি। এজ্‌লাসে যখনই গিয়ে রায় দিতে বসি, লক্ষ্য করি প্রত্যেকটি বাদী আর প্রতিবাদীর মধ্যে সেই অভয় হালদারকে। পরশুরামের মতই এক একবার আমার লেখনী-কুঠার অধীর আবেগে উদ্যত হ'য়ে ওঠে। মার কাছে যে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ, সে কি কখনও ভুলতে পারি বৈদ্যনাথ?'

থেমে কেমন একটা ব্যর্থতার হাসি হাসলেন স্বদেশরঞ্জন।

শুনতে শুনতে এতক্ষণ অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম। অমন মায়ের সন্তান ব'লেই বুঝি এত বড় বিরাট বনস্পতি হ'য়ে উঠতে পেরেছেন স্বদেশরঞ্জন! তাঁর জন্ম-ইতিহাস শুনে এতটুকুও ঘৃণা এলো না তাঁর উপর, বরং প্রথম দিনের মতই একটা অপরিসীম শ্রদ্ধা হৃদয়ের পদ্মপত্রে টলমল্ ক'রতে লাগলো। ইচ্ছে হ'লো, বলি যে এত দীর্ঘ কালের ব্যবধানে অভয় হালদারের আজ আর সংসারে বেঁচে থাকবার কথা নয়, কিন্তু পারলুম না। সেই মুহূর্তেই পাশের দরজা ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালো একটি চম্পক-যৌবনা। ললিতা। হাতে তার ট্রেতে সাজানো নানা খাবার। রামদীন আজ একেবারেই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে এখানে। নেপথ্যচারিণীর চকিত উপস্থিতি বুঝি আজ আর কোনো লজ্জাই রাখেনি তার। স্বদেশরঞ্জনই উপযাচক হ'য়ে আলাপ করিয়ে দিলেন। অবাক হ'য়ে লক্ষ্য ক'রলাম তার মুখশ্রী। এত রূপও কি আছে পৃথিবীতে? এ যে 'সপ্তস্বর্গ' আর 'কালনেমি'র স্রষ্টাকে ছাপিয়ে সৃষ্টি আপন মাধুর্য্যেই লাবণ্যময়ী হ'য়ে উঠেছে! 'সপ্তস্বর্গ' আর 'কালনেমি'র ঐতিহ্য নিয়ে সমালোচনা লেখা যায়, কিন্তু ললিতার ঐতিহ্যের মধ্যে শুধু মুগ্ধ ভ্রমরের মতো ডুবে থাকাই চলে, আলোচনা করা চলে না। এমন সৃষ্টিকে যিনি রচনা ক'রেছেন, তিনি যে কত বড় শিল্পী, কল্পনা করা যায় না। একে একে ট্রের খাবার শেষ ক'রে সেই কল্পনাতীত রূপ-স্রষ্টার উদ্দেশে শেষ নমস্কার নিবেদন ক'রে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরের প্রকৃতি তখন জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত।

উপহার

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

তোমাকে আমি কি দেব বল কি দিই উপহার?
দিনের শেষ হাসি যে দেব—সে হাসি বিধবার
মিলিয়ে গেল সন্ধ্যাঘন উপোসী বন্দরে,
হারা-শিশুর মায়ের মতো রাতের অবসরে
ভোরের পাখি পাখায় আনে হাওয়ার হাহাকার—
এমন দিনে কি দেব বল, কি দিই উপহার?

ভেবেছি ভোরে ভৈরবীর শান্ত শিহরণ
স্বরোদে বেঁধে প্রাণের গান তোমাকে শোনাবই,
হায় রে সুরে বাসুকি নাচে, ত্রাসের ভাঙা মন
ছোবলে নিল, হায় রে ভোর সে ভৈরবী কই?

স্বপ্ন ছিল সাগরে ডুবে রত্ন এনে দেব,
সাগর ভেবে এলাম তীরে—সাগর সে তো নয়—
অন্তহীন অপার স্নেহ তোমারি সে হৃদয়,
তোমার ধন আমার ব'লে কেমন ক'রে নেব!

আমার ছোট হৃদয়-নদী নিঙড়ে প্রেমধারা
তোমাকে দেব—হায় অকালে সে নদী মরুহারা।

ধূসর ধূ ধূ হৃদয়-নদী নদীর মরা-বুকে
আশার তরী আসে না ভেসে ভাঁটির টানে টানে,
হংসদূত হয়তো পথ ভুলেছে বহু দুখে
মেঘের সাথে মিতালি ক'রে উধাও অভিমানে।

তোমার হিয়া হাজার ঢেউয়ে অথৈ পারাবার
তুমিই তবে একটি ঢেউ দেবে কি উপহার?

আমাকে দাও একটি ঢেউ তোমার হৃদয়ের,
আমার ছোট হৃদয়-নদী ছাপিয়ে দুই কূল
উঠুক জেগে; নদীর বাঁকে নতুন স্বপনের
আসুক ভেসে প্রথম স্রোতে প্রথম ঝরা-ফুল,
সে ফুলে যদি আগুন জ্বলে ফাগুন জ্বালাবার—
সে দিন তবে সে ফুল দেব তোমাকে উপহার।

ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষা-কারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
ভারতে প্রস্তুত
L. 248-X52 BG

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

দিল্লীর কোন বাঙ্গালী আমার বন্ধু শ্যামলকে কোন দিন গম্ভীর হতে দেখেছেন? শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে সুকান্ত ভট্চাযের জন্মবার্ষিকী করে, লোদী রোড থেকে পাহাড়গঞ্জ অবধি বাঙ্গালী-বাড়ীতে রোগীর কাছে জাগপরি দিয়ে আর কালী-বাড়ীর ভলান্টিয়ারী করে, শুনেছি ওর নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত ফুরসৎ মিলতো না।

দিনের পর দিন তাকে চাকরীর উমেদারী করতে দেখেছি—নিজের জন্য নয়, এ পাড়ার সীতানাথ চক্কোত্তি, ও পাড়ার পঞ্চানন মিত্তির, সে পাড়ার বাসুদেব বসুদের জন্য। আমরা মাঝে মাঝে ওর গ্রন্থিবিহীন বেকার-জীবন নিয়ে প্রসঙ্গ তুললেই বলতো, 'আরে অত ভাবছিস কেন? স্বাধীন একবার হোকই না দেশ, দেখবি তখোন কোন্ জওয়ান্টা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়? কাজের ঠ্যালায় তখোন নিঃশ্বেস ফেলার ফুরসৎটুকু পাব না। স্বাধীন হয়ে একবার প্ল্যানড্ ভাবে দেশটাকে বসতে দে ত আগে?'

স্বাধীনতা এলো। তার পর এ প্রসঙ্গে কেউ ওকে নিয়ে নেহাৎ মজা ওড়াতে গেলে বলতো—'বেকার কে নয়? তোদের ভিতর কটা ছোকরার 'car' আছে শুনি?'

প্রতিটি মুহূর্তে ওকে দেখেছি নব-ঘন যৌবনের প্রাচুর্যে প্রাণবান্। দিল্লীতে ডুরাণ্ড খেলায় সে বার একা চেঁচিয়েই শ্যামল ইষ্ট বেঙ্গলকে জিতিয়ে দিল। সে খবর দিল্লীর বাঙ্গালীদের কে না জানে?

সেই শ্যামল আজ গম্ভীর!

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো ভায়া? খবর কি? মুখটা হঠাৎ হাঁড়ি-পানা করে বসে কেন? ফোর্থ টেষ্টে তোমার ইণ্ডিয়া ত হারতে হারতে বরুণ দেবতার বরে কোন গতিকে ড্র রেখে বাঁচলো।'

অন্য দিন হলে শ্যামল তক্ষুণি তার জাজমেন্ট দিয়ে বলতো,—'তাদের নিয়ারেষ্ট ল্যাম্প-পোষ্টে ফাঁসি দেব।'

আজ কিছুই বলল না।

ওর হাসি-ভরা মুখে দেখলাম পরিষ্কার ফুটে রয়েছে গ্লানির কালিমা।

বেগতিক দেখে আমি ধীরে ধীরে কেটে পড়লাম। পরদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়ীতে হাজির হলাম। শুনলাম, শ্যামল তার ওপরের ঘরে। গিয়ে দেখি, দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে তক্তপোষের ওপর বসে শ্রীমান্ উদাস ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুণছে।

বললাম, 'কি হে শ্যামল, তোমাকে হঠাৎ কোন্ ভূতে ধরলো? হৃদয়-টিদয় নিয়ে খেল শুরু করোনি ত ব্রাদার? ও সবের কাছ দিয়েও ঘেঁষো না—প্রেম-ট্রেম ভয়ানক ডেঞ্জারাস্ রোগ। একবার ফেঁসেছো কি ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই—এর জাল বিস্তৃত একেবারে ইনফিনিটিসিম্যাল্।'

—কখোন এলে?

আমার একটা কথাও ওর কানে পৌঁছোয়নি।

—রমলাকে মনে আছে তোর মণি?

বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু সে ত এক যুগ আগের কথা। বছর দশেক আগেকার সি আটাশের সেই কোঁকড়া চুলওয়ালা চশমা-পরা আমাদের সেই রমলা না?'

—হ্যাঁ, তার কথাই ভাবছি। আমার ডায়াগ্‌নোসিস্ তাহলে নিতান্ত ভুল নয়। বললাম, 'ব্যাপারটা একটু খুলেই বল্ দেখি'—

রমলা!

প্রতিদিন শেষ রাতে মেয়েটা ঘুম ভাঙ্গিয়ে গলা সাধতে বসে। হোক না সে যতই মিষ্টি, ঢুলু-ঢুলু চোখে পরীক্ষের পড়া তৈরীর সময়ে এ উপদ্রবে কার না মেজাজ বিগড়ে যায়?

দিদিকে বললাম, 'দেখ দিদি, পাড়ার ও-সব ওস্তাদী-টোস্তাদী যদি না থামাতে পার ত' বল আমি হস্টেলে বন্দোবস্ত করি।'

দিদি বললেন, 'ওকে তুমিও ত ডেকে বারণ করে দিতে পার?'

পাশের বাড়ীর নতুন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মেয়ে রমলা। ব[illegible] আদরের মেয়ে। তা যাই বল, গলাটা কিন্তু ভারী মিষ্টি!

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গার অভ্যাসটা কিন্তু গেল না। প্রতিদিন ঠিক ঐ সময়টাতেই কোন্ পরিচিত কণ্ঠ যেন আমার হৃদয়-দুয়ার খুলি মরমে প্রবেশ করে আকুল করিয়া তোলে প্রাণ।

রমলা তার গানের সব চেয়ে বড় সমঝদার পেলো আমাতে—ঠিক যেমন নিবারণ চক্কোত্তি পেয়েছিল লাবণ্যতে। আমি তা[illegible] গ্রহণের আমন্ত্রণও পেলাম। কিন্তু বল মণি, প্রেম নিয়ে কি আইডিয়ালিস্‌ম্ করা চলে? বেকার অপদার্থ আমি, তাকে নিয়ে কি করবো? ঘরে যখন ফুলদানি নেই তখন গোলাপ, ক্রিসেন্থামাম, অরকিড, এমারিলিস্, গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাগুলো গাছেই থাক্ না কেন? সেগুলো ছিঁড়ে ফেলায় লাভ কি?

শ্যামলের দীর্ঘনিঃশ্বাস অনুভব করলাম।

—বছর তিন চার পরে ভদ্রলোককে যমুনার ঘাটে রেখে ওরা যে কোথায় চলে গেল জানি না। ওদের সাথে দেখা করার সাহস আমার ছিল'না। এক ছত্র চিঠির প্রণামের আড়ালে রমলার অন্তর-পরশ অনুভব করলাম। তার পর তার কোন খবর পাইনি—দশটা বসন্ত গেছে কেটে।

কনট প্লেসে সে দিন তার সাথে হঠাৎ দেখা। আমাকে ঠিক চিনলো। ঠিকানাটা হাতে দিয়ে বলল, 'চিনে আসতে পারবে ত?'

বললাম, 'রোশো, রোশো। মাথাটা কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি ঢোঁক গিলেনি। কি বললে?—বাজার সীতারাম। কুচা পাতিরাম। মহল্লা ইমলি। গলি ল্যাশওয়ান্। ঠিক ঠিক। তার পর?'

—তার ভিতর থেকে আমাকে খুঁজে বার করতে হবে রমলার নম্বর-বিহীন বাড়ী। রাস্তাটার নাম শুনেছি অনেক বার। দিল্লীর অলি-গলির বৃদ্ধ পিতামহ। বাজার সীতারামের প্রতিটি পাথরের গায়ে নাকি লেগে রয়েছে রহস্যের স্পর্শ। হাজার বছরের পুরোনো বাড়ীও রয়েছে ও গলিতে একাধিক। এখন রমলাকে এর ভিতর থেকে খুঁজে বার করতে পারলে হয়। না পাই রহস্যের পরশের ভাগটা ত রয়েইছে। জুম্মা মসজিদের পিছনে যে ফোয়ারাটা দেখেছিস তার বাঁ দিকের সরু গলিটাই বাজার সীতারাম। অনেক দিন দেখেছি। ভিতরে ঢুকিনি কখনও।

বললাম, 'জায়গাটার প্রসিদ্ধি ত মোগল যুগের অনেক আগে থেকেই জানি। ওখানে জেরুজালেমের পুরোনো ডোম্ অব দি রকের ভঙ্গিমায় গড়া ফিরোজ তুগলকের প্রধান মন্ত্রী খান্-ই-জাহান্ তেলেঙ্গানীর কবর কালো মসজিদ্ আছে না রে?'

বললো, 'হ্যাঁ। ফ্যাচোর ফ্যাচোর করে বিরক্ত করিস না। শুধু শুনে যা।'

বললাম, 'বেশ।'

—বাজার সীতারামের ভিতর কুচা পাতিরাম ত পেলাম। এখন বাকী শুধু তস্য গলি মহল্লা ইমলি আর গলি ল্যাশওয়ান। ও হলেই আমার সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক কম্‌প্লিট।

পথ দেখানো ত দূরের কথা, কাছে ডাকতেই ছোট ছেলে-মেয়েগুলো বেমালুম শুড়ুক করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে। ছেলেধরা ঠাওরাল নাকি? অবিচিত্র নয়—নাফা আর মুকসান ছাড়া এ গলির বাসিন্দা দুনিয়ার আর কি জানে? বেঘোরে শেষ-কালে প্রাণটা না খোয়াতে হয়!

চক্কর কাটতে কাটতে যখন আমার দুশো চল্লিশ মিনিটের পরিশ্রম-সুন্দর গলি ল্যাশওয়ান্ উঁকি মারলো, আন্দাজ করলাম তখন সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন। স্নান শেষ করে ভিজে চুলে গঙ্গবস্ত্র পিশিমা সেখানে সূর্য-প্রণাম করতে গেলে, সে প্রণাম ছোট ছোট ইটে-গাঁথা বাড়ীগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়েই ফিরে আসবে। এটা সূর্যদেবের নিষিদ্ধ এলাকা! কলকাতার সারপেন্টাইন লেনে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে নিলেও আমার এ খুবখুঁটি গলির হাঁটু স্পর্শ করতে পারে কি সন্দেহ।

এতদিন ধরে বনবাস করে থেকে এমন ভাবে বরণ করলে রমলা? মুখ দিয়ে ফোঁস বেরিয়ে গেল।

ওর দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মুখখানা যেন একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। বস্তুত সেই বাবা আদমের যুগের টলায়মান ছোট ইটের চারি দিকের দেয়ালগুলো আমায় ভেঙচি কেটে যেন বলতে লাগলো, 'রে বেহায়া দুর, আজ যে এত স্নেহের ঘটা? এত দিন ছিলি কোথায়? জানিস কি তোর প্রশ্ন কত অশোভন, কত অবান্তর?'

লালপেড়ে শাড়ী পরে চতুর্দশী দুরন্ত রমলা জীবনের দুরন্তপণা চিরতরে বিসর্জন দিয়ে সদ্য-বিধবার আঁচল ধরে চিত্রগুপ্তের খাতায় একজনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে চলে যাচ্ছে। অতি পরিচিত অতি আপন বেদনাবিধুর একখানা মুখ পলকের জন্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

—তবু ভাগ্যিস্ চট করে পেয়ে গেলাম বাড়ীটা। মাসে মাত্তর ছ' টাকা ভাড়ায় এত বড় শহরে এর চেয়ে ভাল বাড়ী কে আর আমার জন্যে আগ্‌লে রয়েছে বল? তা যাই বল শ্যামলদা' বেশ আছি কিন্তু। শেষ রাতে গলা সাধতে বসলে চোখ পাকিয়ে এখানে কেউ শাসাতে আসে না—

ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো দুষ্টুমী-ভরা চোখ দুটোর সাথে মিলে ফিক্-ফিক্ করে হেসে উঠলো।

—তোমার খবর এখানে বসেই পাই। শরীর কেমন আছে? দিন-রাত কেবল ভূতের বেগার খেটে মরো—শরীরটাকে একটুখানি দয়া গ্র্যান্ট করতে পারো না?

বললাম, 'হুঁ! ভেবে দেখবো।'

—পাড়ার সব বাঙ্গালী ঘরগুলোই ত আগের মতন আছে। তাই না? আমাদের বকুল, বেলাদি', ইলা ওরা ত গান শিখছিল। এখনও শিখছে ত? পেলু, টুলু, মনু ওরা নিশ্চয়ই এখন কলেজে পড়ছে? নমুর খবর কি? একতারা হাতে মঙ্গলবারের বুড়ো বাঙ্গালী বৈরাগীটা বেঁচে আছে? তার কীর্ত্তন মা'র বড় ভাল লাগতো। সিঁড়ি ভেঙ্গে বুড়ো ওপরে উঠতে পারে আজ-কাল?

তাল-বেতালের প্রশ্নকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। জবাবেরও তর সইছিল না। বাধা দিলাম না, কৈশোরের কতকগুলো স্নেহমাখা চলে-যাওয়া দিন পলকের জন্য ওর দিকে ফিরে চাইছে। আমার জবাবের জায়গা সেখানে কোথায়?

—কত লোভ হয় জানো শ্যামলদা'? তোমাদের পাড়ায় যেতে পারিনে। গেলেই ত চলে না? আমি কি জানি না ওরা আমাকে কত ঘৃণার চোখে দেখে! মরুক গিয়ে।

খাবারের প্লেটটা সাজিয়ে আসন পেতে আমাকে নির্দেশ দিল 'বস।'

অতি দীন আয়োজন। অতি পবিত্র! অতি মহান্! অতি সুন্দর—ও যে নারী—অন্নপূর্ণার প্রতিচ্ছবি।

ওর অন্তরের স্নিগ্ধ আলোতে সমস্ত পরিপার্শ্বটা একটা নতুন

সৌন্দর্যে মহিমান্বিত হয়ে আমার সামনে ধরা দিল। ক্ষীণ টলায়মান বস্তীর মাঝে দারিদ্র-কালিমার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আমি তপঃক্লিষ্ট জ্যোতিষ্মান্ ছটো স্নিগ্ধ চোখ স্পষ্ট অনুভব করলাম। দুনিয়াতে দুটো স্নেহের কথা বলার এই অপদার্থটা ছাড়া ওর কেউ আছে কি না জানি না। পাছে একটা শূন্যতা এসে মুহূর্তে এই সুন্দর পরিবেষ্টনীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ কেড়ে নেয় সেই ভয়ে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেও সাহস পেলাম না।

আমি কি জানি না, এই আসন পাতার পেছনে জীবনের কত বড় একটা শূন্যতা ওকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে? আমি কি জানি না, একদিন এই মেয়ে এলো চুলে শিব পুজো শেষ করে হাতে-গড়া মাটির শিবের কাছে কি বর চেয়েছিল? কিন্তু হতভাগী কি পেলো?

—দেখো ত শ্যামলদা' চিনতে পারো কি না? কোত্থেকে একটা ভাঙ্গা তানপুরা এনে সামনে ধরলো।

হাত খরচের একটা একটা করে জমানো টাকায় একদিন ঐ তানপুরা আমিই কিনে দিয়েছি—আমাদের পূর্বরাগের একমাত্র চিহ্ন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা আর বাজাও না রমলা? একেবারে ভেঙে গেছে? সারিয়ে আনবো?'

—না, শ্যামলদা'! ওটা আর বাজাই নে। যাদের এখানে বসে গান শোনাতে হয় তারা ও গান বোঝে না। তা ছাড়া ওটা অনেক পবিত্র—ওদের সামনে কি বার করা যায়?

—জানিস মণি, সবই যেন কি রকম কি রকম ঠেকছিল। এদিকে রাত হয়ে আসছিল অনেক। ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম।

স্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'দাঁড়াও।'

গলবস্ত্র হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো—রমলার অশ্রু-শীতল কপোল অনুভব করলাম।

কিছুক্ষণ নির্বাক্ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলছিলে?'

ওর গলা কেঁপে উঠলো। বললো, 'হ্যাঁ। বলছিলাম, তুমি আর, তুমি আর আমার কাছে এসো না। ভাল লোক আমার কাছে কেউ আসে না। যাকে আমার জীবনের সব ভালবাসা দিয়ে বসে আছি তাকে আমি মরে গেলেও কেলেঙ্কারীর ভাগী হতে দেব না।'

রমলার কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল।

বেকার-জীবনে প্রেম শুধু ব্যর্থ বেদন' [কলরব-মুখরিত এ বিরাট বিশ্বেও তার স্থান কোথায়?

ধীরে ধীরে হতভাগা অপারগ আমি বস্তী থেকে বেরিয়ে এলাম।

ঘড়ির কাঁটা

দিলীপ দে-চৌধুরী

ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে—
হাজার বছর, লক্ষ বছর হায় রে মাথা খুঁড়ছে!
বন্দী সময় কাঁদছে—
মিনিট দিয়ে, ঘণ্টা দিয়ে কালের সেতু বাঁধছে!
টিক্-টিক্-টিক্ অষ্ট প্রহর
নেই কো বিরাম, নেই অবসর
দুলছে—সদাই দুলছে—
রুদ্ধ রোষে ফুলছে!
রাত্রি নামে, দিন চলে যায়
ফুল ঝরে ফুল ফোটে শাখায়—
বর্ষা কাটে; বসন্ত দিন
বাজায় হঠাৎ দিগন্তে বীণ—
পাগলা হাওয়ায় ঝট্ পট্ পট্
পাখীর পাখা উড়ছে—
ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে!

ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে—
দণ্ড-পলে
যাচ্ছে গলে
মোমের মতন
ঠায় অনুখন
আয়ুর শিখা পুড়ছে—
ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে!

মাধুর্যমণ্ডিত সৌন্দর্য—
উৎসব আনন্দের দিনগুলিতে প্রত্যেকেরই মন খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে। এমন দিনে আপনিও আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন ক্যালকেমিকোর বিশিষ্ট প্রসাধন সামগ্রী-গুলির সহায়তায়।
মলয় চন্দন সাবান
ব্যবহারে শরীর স্নিগ্ধ ও অন্তর পবিত্র করে। চন্দনের শুচি সুগন্ধে চিত্ত প্রসন্ন হয়।
ক্যাস্টরল
মনোমদ সুরভি-সম্পৃক্ত ক্যাস্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন হয়ে ওঠে ও মধুর সুগন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল থাকে।
লাবণি স্নো
মুখশ্রীর লাবণ্য বৃদ্ধি করে; কোমল কপোলতল শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাত্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহারে মুখশ্রী স্নিগ্ধ থাকে।
রেণুকা ফেস পাউডার
সৌরভসিক্ত রূপচূর্ণ। মুখে ব্যবহারে আকর্ষণীয় স্নিগ্ধতা আনে। সুগন্ধি রেণুকা ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহারে শরীর ও মন স্নিগ্ধ হয়।
কান্তা
চিত্তাকর্ষক অনুপম সুরভি নির্যাস। রুমালে ও বেশবাসে ব্যবহার করলে নরনারীর চিত্ত মধুর সুগন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে।
CASTOROL
CASTOR OIL
La bonny
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

[উপন্যাস] শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁচলে চোখ দুটি মুছে দিয়ে বল্লেন: খেলা ত হোত, হঠাৎ কলকাতা থেকে 'তার' আসতেই আজ রথের দিনই ওদের যেতে হলো। দেবীরও কি কম দুঃখু মনে, মাকে বল্লে—আমি সইমার কাছে থাকব। যেমন সেই মেয়ে, তুইও তেমনি। দু দিন মন কেমন করবে, তার পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

কর্তা পশুপতি সব শুনে বলেন—এখন থেকে লেখাপড়ায় মন নিবিষ্ট কর দেখি, তাহলে আর দেবীর জন্যে মন কেমন করবে না। অনেক কবিতা ত কণ্ঠস্থ করেছিস্, সেইগুলো পড়—

কিন্তু পড়তে বসলেও দেবীর কথা মনের মধ্যে আরও স্পষ্ট করে যেন ফুটে ওঠে। এই বয়সেই ললিত বাবার কাছে সংস্কৃত ও বাঙলা কবিতা অনেক শিখেছিল—শিশুদের মনে সেগুলি বেশ আনন্দ যোগায়। দেবী আবদার ধরে—কবিতা পড় ললিতদা', তোমার মুখে কবিতা আমার শুনতে বড্ডো ভালো লাগে।

অমনি ললিত বাবার আবৃত্তির অনুকরণে কবিতা বলতে থাকে—

যা রাকা শশীশোভনা গতঘনা সা যামিনী—যামিনী।

যা নারী পতিরতা গুণযুতা সা কামিনী—কামিনী।

মুখখানি প্রফুল্ল করে দেবী পুনরায় অনুরোধ করে, সেই কুঁদুলির কবিতাটি বলো ললিতদা'! ললিতও পরক্ষণে আবৃত্তি করে—

'খোকামণি মায়ের গলার মাদুলি।
খোকামনির বৌটি হ'ল কুঁদুলি।
কুঁদুলিকে খোকা বাবু কোণে দিলেন ঠেসে,
কুঁদুলিকে নিয়ে গেল খ্যাকশিয়ালি এসে।'

যাবার সময় দেবী যে ফটোখানি ললিতকে দিয়ে যায়, তাকেই সাথী করে সে খেলা ও পড়া চালাতে চায়। কিন্তু ছবির মুখ-চোখ বিবর্ণ হওয়ায় স্পষ্ট চেনা যায় না, তথাপি ললিত তার প্রখর কল্পনার আলো ফুটিয়ে ছবিখানিকে জাগিয়ে তুলে আলাপ জমাতে থাকে। কত প্রশ্ন, কত কথা, কত সব আলোচনা!

প্রশ্ন করে—ওখানে গিয়ে কেমন আছ? আমার জন্যে মন কেমন করে? না—কলকাতা সহরের অনেক কিছু দেখে ভুলে গেছ আমাকে? আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি। এই দেখ না—তুমি আমার মুখে কবিতা শুনতে ভালবাস বলে, কবিতা পড়ছি। মনে হচ্ছে, তুমি এই ছবির মধ্যে বসে সব শুনছ। কিন্তু কি বিশ্রী হয়ে গেছে তোমার ছবিখানা—আমি বলেই চিনতে পারি।

ছবিখানা নিয়ে সেই পরিচিত খেলাঘরেও হাজির হয়েছিল ললিত। কিন্তু এক খণ্ড পিচবোর্ডের উপর আঁটা একটা ছবিকে খেলুড়ে করে খেলাঘরে ললিতের খেলবার প্রচেষ্টা দেখে রাধা ত হেসেই খুন! সে তখনি চাকে ঘা দেয়, অমনি চার দিক থেকে ছেলেমেয়ের দল এসে ললিতকে ছেঁকে ধরে, তার কাণ্ড দেখে কেউ কেউ হেসে লুটোপুটি খায়, কেউ বা ছড়া কেটে খোঁটা দেয়।

৭

ও দিকে ললিতের মুখের হাসি, মনের উল্লাস, খেলার উৎসাহ সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে হরগৌরীপুর গ্রাম ছেড়ে দেবীদের চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। সে দিন নিজের হাতে তৈরী খেলাঘরের রথখানির পাশে দাঁড়িয়ে ঠায় একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল দেবীর পানে—এক একবার পিছনে ফিরে ফিরে বড় সাধের রথখানার পানেও তাকাচ্ছিল—যে পর্যন্ত না সে গাড়ীতে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটু পরেই রাধা ছুটে এসে বলে: বাবা—বাবা! ধন্যি ছেলে যা হোক; এখন হলো ত? আমি জানি যে—ওরা চলেছে কলকাতায়, সেখানে কি রথের ভাবনা? বয়ে গেছে তোমার রথখানা নিয়ে আর একটা পুঁটলি বাড়াতে! এখন এসো, আমরাই দুজনে—

কথাগুলি বলতে বলতে রাধা আরো উৎসাহে ললিতের একখানা হাত চেপে ধরবার জন্যে এগুতে থাকে, কিন্তু খরদৃষ্টিতে একটি বার তার দিকে চেয়ে উপেক্ষার ভঙ্গিতে—'ধ্যেৎ' বলে সে বাড়ীর দিকে ছুটে পালায়। সে সময় তার মনে হতে থাকে—রাজ্যের দুঃখ, নিরাশা, বিরাগ, বিরক্তি, লজ্জা সবগুলোই তাকে যেন চেপে ধরতে আসছে, সে এখন মুখখানা লোকচক্ষুর অগোচরে লুকাতে পারলে বুঝি নিষ্কৃতি পায়।

বাড়ীতে সেঁধুতেই মায়ের সঙ্গে চোখোচোখী হবা মাত্র মা চমকে উঠে ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: কি হয়েছে রে, এমন করে ফুলকোমুখী হয়ে এলি কেন—দেখি গা?

ছেলের গণ্ডে গণ্ড রেখে মা গায়ের তাপ পরীক্ষা করতে যান, ছেলে কিন্তু তার আগে মায়ের বুকের মধ্যে মুখখানা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। কান্নার ধরণ দেখেই মায়ের মন টন-টন করে ওঠে, বুঝতে তখন বাধে না—কিসের জন্যে কোন্ দুঃখে ছেলের এই কান্না! দু' হাতে কোলে চেপে ধরে সান্ত্বনার স্বরে প্রবোধ দিতে থাকেন—ও মা, তাই বল—দেবীর জন্যে মন কেমন করছে? কিন্তু তাই বলে অমন করে কাঁদে রে বোকা ছেলে? ওরা কলকাতায় গেছে—আবার আসবে, আবার খেলবি দুজনে।

ছেলে তখন ফোঁফাতে ফোঁফাতে বলে—বড্ডো মন কেমন কোরছে মা—দেবীর জন্যে। অত করে রথ বানালুম দুজনে খেলব বলে—

কথা আর শেষ হয় না—আটকে যায় চোখের জলে। মা

এক তরুণী সে সময় খেলাঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি সব শুনে হাসিমুখে একটা উপমা দিলেন—আহা-হা, এতে কি হয়েছে যে তোরা এমন করে হাসাহাসি করছিস্? শুনিস্ নি—সীতা বিহনে রামচন্দ্র সোনার সীতে গড়িয়ে যজ্ঞি করতে বসেছিলেন, আর আমাদের ললিতরাম দেবীর বদলে দেবীর ফটো এনে তার সঙ্গে খেলতে বসেছে।

এ ভাবে সবার চোখে পড়ায়, আর নানা রকম কথা শুনে ললিত এর পর খেলার পাট একবারে ছেড়ে দিয়ে পড়া নিয়েই পড়ল। তার পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করলে আর কেউ সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে না; কাজেই নিশ্চিন্ত মনে সে এখানে তার সাথীটিকে নিয়ে কবিতা পাঠে মেতে ওঠে।

কোন দিন বা একাই অসময়ে হরগৌরী-মন্দিরে গিয়ে গৌরী-পীঠের সামনে ধর্ণা দিয়ে পড়ে—নির্জন মন্দিরের পীঠভূমিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলে—'আমার দেবীকে এনে দাও ঠাকুর, তাকে ছেড়ে আমি যে আর থাকতে পারছি না, বড্ডো মন কেমন করছে। তুমি ত সব জানো ঠাকুর!' প্রার্থনার পর ঠাকুরের চরণামৃত নিজের মুখে দেয়, সর্বাঙ্গে মাখে, সঙ্গের ফটোখানিও বাদ পড়ে না—চরণামৃতের পুণ্য পরশ পায়।

দেবীকে সঙ্গে করে বন-জঙ্গলে যেখানে যেখানে ঘুরত, মাটি থেকে লাফিয়ে যে সব গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠে পড়ত, সে গাছগুলোর কাছে গিয়ে তার কি কান্না! আজ সে একা এসেছে, সঙ্গে দেবী নেই; থাকলে আজও সে গাছে উঠে দেবীকে অবাক করে দিত। ফটোখানার দিকে চেয়ে বলে—'তুমি কোন কর্মের নও, বাজে।'

কিন্তু দিন কয়েক পরে পশুপতি পুত্রকে ডেকে ডাকঘর থেকে পাওয়া একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন: এই নে, দেবী পাঠিয়েছে—তার নূতন ফটো। ফটোখানি তার হাতে দিয়ে তিনি বগলাপদর চিঠি নিয়ে পড়লেন। এ চিঠির সুর যেন কেমন একটু ভিন্ন রকমের। তাঁকে এখন মফঃস্বলের নানা মোকামে ঘুরতে হবে। মালিকরা বলেছেন—যে মওকা এসেছে, ভাগ্য ফিরে যাবে। তাঁদের ইচ্ছা যে, আমরা সবাই ওঁদের মতই আধুনিক হই। কলকাতার মজা হচ্ছে, সব সময় নাক উঁচু করে থাকা চাই, আমরা গরীব—সেকালে চালে চলতে অভ্যস্ত, এমনি আভাস দিলে আর ওদের দলে মিশবার উপায় থাকবে না, আমাদের গেঁয়ো ভূত ভেবে হেনস্তা করবে। কাজেই আমরাও বাইরের চাল বাড়িয়ে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলিছি। এ জন্যে নিজেদের হাল-চাল, বাড়ীর আদব-কায়দা সব কিছুই বাড়াতে হয়েছে। মেয়ে দুটোকে রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়ে তৈরী করতে হবে। তুমিও ভায়া ছেলের লেখাপড়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। দেবী এখানে এসে খুশি নয়, সে ললিতের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে—সর্বদাই তার মুখে ললিতদা'র নাম। হালে ওদের ফটো তোলানো হয়েছে, দেবী তার ভাগ থেকে একখানা ফটো ললিতকে পাঠাচ্ছে। তুমি তাকে দিও। মাঝে মাঝে ওখানকার খবর দিও, তবে আমাদের খবর যদি সময় মত বা একবারেই না পাও ত রাগ কর না যেন, বুঝবে যে—কাজের ভীড়ে আমরা সাড়া দিতে পারছি না। বছর কতক এই ভাবেই কাটবে।

বন্ধু বগলাপদ কলকাতায় গিয়েই যে গ্রাম্য পরিবেশের কথা সব ভুলে গিয়ে সহুরে সভ্যতায় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরই স্বহস্তে লেখা পত্রে তা' জ্ঞাত হয়ে পশুপতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পল্লীসভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষণশীল রূপে দুই বন্ধুর সুনাম ছিল। বগলাপদই চণ্ডীমণ্ডপের বৈঠকে বসে কত দিন কলকাতার তরুণ-তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অভিভাবকদের তাতে উপেক্ষার প্রসঙ্গ তুলে কঠোর সমালোচনা করেছেন; অথচ, এখন কলকাতাবাসী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পূর্ব-মনোভাবের কি বিস্ময়কর পরিবর্তন! এ অবস্থায় তিনি নীরব না থেকে পত্রে লিখিত প্রত্যেক কথাটির খণ্ডন করে এক দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র লিখে উপসংহারে নির্দেশ দিলেন—পল্লীসমাজে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আমরা যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত, তাকে ত্যাগ না করেও কলকাতায় থাকা যায়। অন্যে যাই করুক, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হয়ে যতই বাড়াবাড়ি করুক, তুমি-আমি কখনই তার সমর্থন করতে পারি না। আমার এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট মনে করি।

বগলাপদ বন্ধু পশুপতির পত্রখানি স্ত্রীর সামনেই খুলে পাঠ করেন। সুলোচনা দেবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লেন—শুনলে ত, প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুর মতই তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন। তুমি ওঁর কথাগুলো ভাল করে ভাবো।

বগলাপদ তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দেন—আমি যদি ঐ গ্রামে থাকতাম, আমার মুখ দিয়েও এই সব কথা বেরুত, শুনে গাঁয়ের লোক ধন্য ধন্য করত। কিন্তু কাল যে এগিয়ে চলেছে, গ্রামের সভ্যতা সংস্কৃতি পিছিয়ে আছে, এ কথা কে ওঁদের বোঝাবে বল? পুরোনো সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে আধুনিক যুগের হাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না।

পশুপতি যদি কলকাতার পরিবেশ উপলব্ধি করে বগলাপদর সঙ্কল্পটি সময়োপযোগী বলে সমর্থন করতেন, তাহলে সব গোল মিটে যেত; কিন্তু পত্রে প্রতিবাদ করে অযাচিত নির্দেশ দেওয়ায় বগলাপদ এতই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন যে, এ পত্রের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন না।

এই ঘটনার পর প্রায় একই সঙ্গে দুই বাড়ীতে দুরারোগ্য ব্যাধি দারুণ বিপত্তি উপস্থিত করল। গভীর রাত্রে দেবী হঠাৎ চীৎকার করে ওঠল: ললিতদা'! দেখ, দেখ আমি পড়ে যাচ্ছি গাছ থেকে—ধর, ধর, শীগগির ধরো—

দেবীর চীৎকারে পাশ থেকে রাণী ধড়মড় করে উঠে বসল, পাশের ঘর থেকে বাবা ও মা ছুটে আসেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সকলেই দেখেন যে, বিছানার উপর বসে দেবী ঠক্-ঠক করে কাঁপছে; তার চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখন আর মুখে কথা নেই, দৃষ্টি উদাস!

মা গায়ে হাত দিয়ে শিউরে উঠে বললেন: ও মা, গা যে পুড়ে যাচ্ছে—নাড়ীটা দেখ ত!

বগলাপদ কন্যার হাতখানি তুলে নাড়ী পরীক্ষা করেই বুঝলেন প্রবল জ্বর, তারই ঝোঁকে চেঁচিয়ে উঠেছে।

মা বুঝলেন, মেয়েটা হোঁদিয়ে জ্বর করে বসেছে; প্রাথমিক শুশ্রূষার পর মা কন্যাকে নিয়ে পড়েন, ঘুম পাড়াতে চেষ্টা পান। মেয়ে কিন্তু ঘুমের মুখে মাঝে মাঝে ললিতদা'কে ডেকে আবার

জোর করে বিছানায় উঠে বসে; ললিতকে উদ্দেশ করে অসংলগ্ন কথা সব বলতে থাকে—রথখানা রেখে দিও ললিতদা', আমি ফিরে গিয়ে নেব!···ভারি দুষ্টু হয়েছ তুমি—আমাকে আর কবিতা শোনাও না!···রাধির সঙ্গে কথা বলবে না তুমি—আমি ওর সঙ্গে আড়ি দিয়েছি!···এমনি কত কথা। এক একবার আচ্ছন্নের মত হয়ে চুপ করে, তার পর সেটা ভেঙে গেলেই ঐ ভাবে চীৎকার! অবশিষ্ট রাতটুকু সবারই অস্বস্তিতে কাটে!

সকালেই ডাক্তার ডাকা হলো—পাশ-করা নামী ডাক্তার। তিনি দেখে বললেন: ভোগাবে, জ্বরটা সোজা নয়। তবে এখনই কিছু বলা যায় না।

জ্বর ওঠা-নামা করতে থাকে, ডাক্তারের চিকিৎসাও চলে। নানা ভাবে রোগ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়; তার আড়ম্বর দেখে সুলোচনা দেবী শিউরে ওঠেন। দিন কয়েক পরেই ডাক্তার জানালেন—টাইফয়েড, সেই সঙ্গে মেনেনজাইটিসের আশঙ্কাও আছে।

মেয়ের এই অসুখের মধ্যেই বগলাপদকে কর্মস্থানে ছুটতে হলো। জরুরী প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার। তাঁর মুরুব্বীরা অভয় দিয়ে বললেন: রোগের চিকিৎসা ত আর আপনি করছেন না, তবে আপনার কিসের ভয়? ডাক্তারের ওপর সব ভার দেওয়া হয়েছে—দায়িত্ব এখন ওঁর। আপনি কাজে লেগে পড়ুন।

কাজেই বগলাপদকে কাজে নামতে হয়। কয়েক দিনের কাজেই বুঝতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে সৌভাগ্যলক্ষ্মী সত্যই ঝাঁপি হাতে করে বসে আছেন—ঝাঁপির মধ্যে অফুরন্ত সম্পদ! আনন্দে উৎসাহে তাঁর চোখ-মুখ চক-মক করে ওঠে।

ও দিকে হরগৌরীপুর গ্রামে দেবীর তাজা ছবিখানি পেয়ে ললিত আনন্দে আটখানা! তার সঙ্গে আলাপ করে, পড়ার ঘরে তাকে ডেস্কের উপর বসিয়ে তার প্রিয় কবিতাখানি পড়ে শোনায়, তার পর মায়ের কাছে গিয়ে নানা ভাবে আবদার করতে থাকে। প্রথম প্রথম পুত্রের এই সব চাপল্যে পশুপতি বিশেষ আপত্তি করেননি, কিন্তু ইদানীং তিনি শক্ত হয়ে ওঠেন। ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন: ঢের হয়েছে, আর দেবী দেবী করে তার ছবি নিয়ে ঢং করে বেড়াতে হবে না, পড়াশোনায় মন দে।

ললিত গিয়ে মাকে ধরল, তাঁর কাছে আবদার তুলল: বাবার কথা শুনলে মা, আমি কি পড়ি না? কিন্তু দেবীর ছবি থাকলে কি দোষ হবে বল ত? আমি যে মনে করি—দেবী আমার পড়া সব শুনছে!

মা বললেন: আচ্ছা, আমি ওঁকে বলব'খন। তুমি কিন্তু বাবা, যার তার সামনে দেবী দেবী ক'র না। দেবীর ছবি ত পেয়েছ—কাছে রেখে মন দিয়ে পড়বে। তাহলে উনিও কিছু বলবেন না।

এর পরই একদিন হঠাৎ অনুপমা দেবী জ্বরে পড়লেন। ক'দিন ধরেই তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না, কিন্তু দেহের ভিতরে যে জ্বরের বীজাণু ছড়িয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেননি। ব্যাধি যে দিন প্রবল হয়ে ধরা দিল, তখন আর তাঁর উত্থানশক্তি নেই। এ অবস্থায় বাড়ীর প্রাচীনা পরিচারিকা এবং পুত্র ললিতকে নিয়ে পশুপতি স্ত্রীর পরিচর্যা ও সংসারের কাজকর্ম কোন রকমে চালাতে লাগলেন। পড়াশোনার পাট সেরেই ললিত মায়ের বিছানায় এসে বসে, অকাতরে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে; তারই মাঝে বলে—দেবী এখানে থাকলে সে-ও তোমার কত সেবা করত—নয় মা? মা কথাটার সমর্থন করে বলেন—করতই ত, সে ত জানে—বড় হ'লে তোর সঙ্গে তার বিয়ে হবে, ছেলে-বৌ দুজনেই ত মায়ের সেবা করে।

হঠাৎ ললিত কি ভেবে বলে উঠল: কাকাবাবুরা দেবীকে রেখে গেলেই ভাল করতেন মা, দেবী কি যেতে চেয়েছিল? ওঁরা জোর করে নিয়ে গেলেন।

মা জবাব দিলেন: ওঁদেরও মেয়ে ত, ছেড়ে গেলে মন কেমন করত না? বেশ ত, তুমি আর একটু বড় হও, লেখাপড়া শেখ, আমি খুব তাড়াতাড়ি তোদের দুজনের হাত এক করে দেব—তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না, আর বৌ হলেই দেবী এ-বাড়ীতে থাকবে।

মায়ের এ কথাগুলি ললিতের ভারি মিষ্টি লাগল। মুখখানা প্রফুল্ল করে স্থিরদৃষ্টিতে সে মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইল। একটু পরে আস্তে আস্তে বলল: এ সব কথা যেন বাবাকে বল না মা!

মা ছেলের মুখের পানে চেয়ে মনে মনে ভাবেন, খেলাঘরের খেলা থেকে এই বয়সেই খেলার সাথীটিকে কী ভালোই বেসেছে এ ছেলে! তার পর, এ ত নেহাৎ বাজেও নয়, তাঁরা দুই সই হর-গৌরীর মন্দিরে কথা দিয়েছেন; সে হিসেবে দেবী বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে, আর তিনিও কথা দিয়ে রেখেছেন—সে কথা ফেরাবার নয়। তিনি বেঁচে থাকতে এর নড়-চড় হতে দেবেন না কখনো।

তখনো নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন মন্দ ধারণার উৎপত্তি হয় নি। কিছুদিন পরেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অনুপমা দেবীর অসুখ সারবার দিকে না এসে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়াতে গ্রামের ডাক্তার পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। পশুপতিও লক্ষ্য করেছিলেন, অসুখটি সহজ নয়, ডাক্তারও সম্ভবতঃ রোগকে কায়দা করতে পারছেন না। শেষে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সদর থেকে হাসপাতালের নামকরা ডাক্তারকে মোটা ফী দিয়ে আনানো হলো। গ্রামের ডাক্তার যে সন্দেহ করেছিলেন, তাই সত্য বলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—টাইফয়েড, সেই সঙ্গে নিউমোনিয়া! পশুপতি স্ত্রীর চিকিৎসায় কার্পণ্য করলেন না; খুব ঘটা করেই সপ্তাহ খানেক চিকিৎসা চলল, তার পর সে আয়োজন এক দিন সহসা বাধা প্রাপ্ত হলো—চিকিৎসকদিগকে চমৎকৃত করে অনুপমা দেবীর পবিত্র আত্মা ভোরের দিকে সকলকে মুক্তি দিয়ে দিব্য ধামে চলে গেল। ইদানীং তাঁর কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। এই অবস্থাতেই স্বামীকে এক সময় কাছে ডেকে দুটি কথা শুধু বলেন—দেবীর সঙ্গে ললিতের বিয়ে দিও, কিছুতেই এর যেন অন্যথা না হয়।

অনুপমা দেবীর মৃত্যুর পর পশুপতির সংসার একবারে অন্ধকার হয়ে গেল। ললিতকে মাতৃশোকে সান্ত্বনা দিয়ে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল। এক পরিচারিকা ছাড়া বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নেই, কে তাকে সান্ত্বনা দেয়? পাড়ার মেয়েরা এসে তাকে বোঝান, দেখা-শোনা করেন। দেবীর জন্যে মন কেমন করলে মা তাকে বোঝাতেন, সান্ত্বনা দিতেন, এখন সেই মা-ও তাকে ছেড়ে চলে গেলেন! কি করে সে এ-বাড়ীতে থাকবে?

শ্রাদ্ধ-শান্তির পর পশুপতি অনেক ভেবে-চিন্তে ললিতকে স্থানান্তরে পাঠাবার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল যে,

ছেলেকে বেনারসে রেখে হিন্দু ইউনিভারসিটি থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেবেন। কাশীতে তাঁর এক পরিচিত অধ্যাপক-বন্ধু ছিলেন, তাঁর সঙ্গে লিখালিখি করে সাব্যস্ত হলো যে, ললিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্কুল-বিভাগেই এখন পড়বে, সেখানকার বোর্ডিংএ থাকবে, তবে সংস্কৃত শিক্ষার দিকে কর্তৃপক্ষ যাতে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, সে ব্যবস্থাও করা হবে। এই বয়সেই এখানে ললিত পিতার কাছে সংস্কৃত পাঠে অভ্যস্ত হয়েছিল। ললিতের আসক্তি দেখে তিনি খুব প্রসন্নও ছিলেন। সুতরাং কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তাকে সংস্কৃতে পণ্ডিত হতে হবে, এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। বন্ধু অধ্যাপক সে ভার নিতে সম্মত হন। এর পর এক শুভদিনে ললিতকে উচ্চশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠিয়ে দিয়ে পশুপতি নিশ্চিন্ত হলেন।

কলকাতায় দেবী প্রায় ৬২ দিন এক নাগাড়ে রোগভোগের পর কোন প্রকারে সেরে উঠল বটে, কিন্তু এই ভীষণ প্রকৃতির ব্যাধির প্রকোপে সে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলল। মা ও রাণী সর্বক্ষণ তার রোগশয্যা-পার্শ্বে থাকায় একেবারে অপরিচিতার সামিল না হলেও আর কাউকেই সে স্মৃতিপথে আনতে পারে না। এমন কি বগলাপদ এই ব্যাধির সময় প্রায়ই বাহিরে থাকতেন বলে তাঁকেও প্রথম প্রথম সে চিনতে পারেনি। অনেক কষ্টে পরে সে বাবাকে উপলব্ধি করতে সমর্থা হয়। ডাক্তার বলেন—এমন হয়, কিন্তু ভয় নেই, এরও ব্যবস্থা আছে; যাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়—কিছু কিছু মানসিক চিকিৎসা করালেই ঠিক হয়ে যাবে। একটা দিক দিয়ে বগলাপদ আশ্বস্ত হন যে, দেশের কথা—বিশেষ করে ললিত ছোকরার কথাও দেবী একবারে ভুলে গেছে। আর, তাঁরা সবাই জেনেছেন যে, দেবীর এই অসুখের মূল হচ্ছে ললিত, তার জন্যে হেদিয়ে উঠতেই তো এই কঠিন রোগে পড়েছিল। এখন ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি খুব শক্ত হয়েই সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, দেশ বা ললিত সম্পর্কে কোন কথাই যেন দেবীর সামনে তোলা না হয়। দেবীর অবস্থা উপলব্ধি করে সকলেই বগলাপদর কথা মেনে নিতে বাধ্য হন।

দেবী অসুখে পড়ায় রাণী শিক্ষার দিকে অনেকটা এগিয়ে পড়ে। আরোগ্য লাভের পরেও ডাক্তারের নির্দেশে দেবীর পড়াশোনা দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকে। কিছু কাল পরে সুলোচনা দেবী বলেন—রাণী যেমন বাহিরে পড়ছে পড়ুক, তুই আমার কাছে বাড়ীতে পড়বি দেবী। আমি তোকে এমন সব বই পড়াব, যাতে সত্যকার শিক্ষা হবে।

দেবী মায়ের কথা মেনে নিয়ে তাঁরই কাছে পড়ে। ভাল ভাল বাঙলা বই, রামায়ণ, মহাভারত দেবীর পাঠ্য। দিদির বই আর পড়া দেখে রাণী হাসে। কিন্তু দেবী তাতে গ্রাহ্য করে না এবং মা বা বইএর প্রতি সে শ্রদ্ধা হারায় না।

এই ভাবে বছরের পর বছর অতীত হয়ে যায়। প্রতিভাময়ী ছাত্রীরূপে রাণী প্রত্যেকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে এখন এম-এ পড়ে। দেবীর পড়া মায়ের কাছে চললেও বছর কয়েক আগে থেকেই পিতার আগ্রহে রাণীর কাছে তাকে বাড়ীতেই ইংরাজী পড়তে হয়। দেবীকে ইংরেজী পড়িয়ে শিক্ষিতা করে তোলবার মূলে বিশেষ একটা কারণও আছে।

বগলাপদ অধুনা বোগলা সাহেব নামে পরিচিত। এখন আর তিনি বিডন ষ্ট্রীটের ভাড়াবাড়ীর অধিবাসী নন। সেন্ট্রাল এভিনিউর যে অংশে আধুনিক শিল্পপতি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অভিনব আবাস-ভবন নির্মিত হয়েছে, তারই মধ্যে চক্ষুচমৎকারী প্রাসাদোপম "বোগলা-ভিলা" নামে বাড়ীখানি প্রথমেই সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সপরিবার তিনি এই বাড়ীতে এখন বসবাস করেন। বাড়ীর দেউড়ীতে গুরখা দ্বারবান, ভিতরে লন, পিছনে উদ্যান। সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম। চার দিকে লোকজন গিস্‌গিস্ করছে। সে দিনের বালিকা দেবী ও রাণী এখন অনুপম লাবণ্যময়ী তরুণী। রাণী এখনো তেমনি চঞ্চলা; নিত্যই কলেজ থেকে এসেই রুল-বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে তার পোষা পায়রাগুলোকে তাদের ঘর থেকে বাইরে এনে উড়িয়ে দেয় দূরবর্তিনী বান্ধবীদের উদ্দেশে; এইটিই তার এখনকার বড় আগ্রহের খেলা। দেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট বোনের ছেলেমানুষী খেলা দেখে। কিন্তু একদিন তাকেও রাণীর একান্ত অনুরোধে এই খেলায় নামতে হলো, তারপর এই খেলা থেকেই তার জীবনে আর এক ঘটনার সূত্রপাত হলো।

[ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

"নেপাল তোমায় দেখে এলাম"

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সুনীলিমা ঘোষ

সব জিনিষই পাওয়া যায় বাজারে, টাকা exchange থেকে চাল, ডাল, মুগ, তেল, ঘি, মিষ্টি, চালানী আম, কোন কোন দিন সামান্য মাছ, পুতির মালা, সাড়ী, খেলনা ইত্যাদি। ইণ্ডিয়ান কারেন্সির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশীর ভাগ জিনিষের দর ওঠা-নামা করে। বড় বড় দোকানে ইণ্ডিয়ান কারেন্সিও চলে। পথের পারের বাড়ীগুলো বহু পুরনো, তাদের জানলা-দরজা ও রেলিংএ বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা ও তার খোপে অজস্র পায়রার বাস, সামান্য শব্দেই তারা ডানা ফটফটিয়ে আকাশের বুকে আশ্রয় নেয় ক্ষণকালের জন্য। সব্জী বেশীর ভাগ বিক্রি হয় রাস্তার দু'ধারে, খানিক দূর দূর লোক বসে তার বেসাতী নিয়ে খোলা রাস্তাতে, না হয় ছোট ছাউনির নীচে, অনেক সময় ক্ষেত থেকে তুলে পছন্দানুযায়ী তুলে আনে ক্রেতা, আবার বাড়ীতেও বয়ে আনে কৃষক।

সামান্য এক মাস—ত্রিশ দিন আমার কাটমণ্ডুতে বাস। কতটুকু চেনা যায়, কতটুকু দেখা যায় এত সামান্য সময়ে, ধারণাই বা হয় কতটুকু? Political view নিয়ে আসিনি, আসিনি ভাল-মন্দ দোষগুণ বিচারের দৃষ্টি নিয়ে, শুধু চোখে পড়েছে অতি সরল, বিশ্বাসী, অতিথিবৎসল সাধারণ নেপালবাসীকে। যেখানে নেই কোন মধ্যম শ্রেণীর (middle class) অবস্থিতি; এক হয় রাণা না হয় নিতান্ত গরীব প্রজা। একজনের বাস ক্রোশব্যাপী অট্টালিকায় আরেক জনের ভাঙ্গা কুঁড়েতে। এ কুঁড়ে নিজেদেরই মাটি কেটে ইট বানিয়ে অবসর সময়ে স্বামী, স্ত্রী, পরিবারের মিলিত সৃষ্টি। এদের প্রায় সব বাড়ীই এক ধরণের, তাতে থাকে তিনটে তলা—নীচের তলায় হাঁস মুরগী, গরু, ছাগলের বাস, মধ্যের তলায় থাকে নিজেরা, সব ওপরের খুপরীতে হয় রান্না। খুপরী এজন্য যে, এতে ভাল ভাবে দাঁড়ানো যায় না। ক্রেতা এসে দাঁড়ালে রন্ধনরতা কৃষকগৃহিণী ছোট্ট জানলা দিয়ে মুখ বার করে খোঁজ নেয় প্রয়োজনের। এদের নিরাড়ম্বর জীবন-যাত্রায় বাহুল্য নেই, আছে প্রয়োজনীয়তা—বিলাসিতা নেই শুধু এক যায়গা ছাড়া, ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক নেপালী রমণীকে দেখেছি কেশকে ফুলসজ্জিত করতে। প্রত্যেকের বাড়ীতেই আছে কিছু না কিছু ফুলের গাছ—ভাঙ্গা বাড়ী হলেও দেখা যায় তার কার্নিস থেকে ঝুলছে ফুলের টব। কিন্তু এত ফুলপ্রীতি থাকলেও ফুলের সৌন্দর্য্যকে নিজেদের জীবনে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেনি সাধারণ নেপালবাসী। এরা বড্ড বেশী নোংরা, যেমন ঘর-বাড়ী, তেমনি জামা-কাপড়, বাড়ীর পাশের ছোট্ট গলি। অতি সাধারণ ভারতবাসী গরীব হলেও যেমন নিকানো থাকে তার ভিটে উঠোন, ঝকঝকে আঙিনা, পরিষ্কার লেপাপোছা ছোট্ট ঘর, তাদের শুকনো গোয়ালে নিত্য ধুনো যেমন মনকে স্নিগ্ধ করে, করে মনকে স্পর্শ, তেমনি পালাই পালাই ভাব হয় কৃষকের গৃহে মুহূর্ত্তের অবস্থানেও। রাজপথ ও প্রধান রাস্তাগুলো খুবই প্রশস্ত ও পরিষ্কার কিন্তু গলিতে পা দেওয়া দুঃসাধ্য। যেমন বর্ষার কাদা তেমন সর্ব্বপ্রকার জিনিষই পাওয়া যায় এখানে, এমন নোংরা।
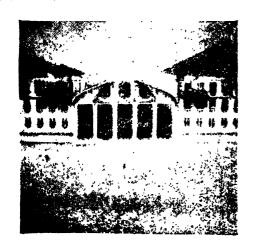
শিক্ষাতে এরা বড় পেছনে পড়ে আছে। শিক্ষিতের হার খুবই সামান্য। খুব অল্প সংখ্যক ডিগ্রীধারী আছে সমগ্র নেপালে। নেপাল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েও তার নিজস্ব কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এখানকার স্কুল ও কলেজ। সমগ্র নেপালে ১৩টি স্কুল আছে, তার ভেতর ৯টি কাটমণ্ডুতেই অবস্থিত। কলেজ ৩টি, দুটি ছেলেদের ও ১টি মেয়েদের।

এখানে চাষ পদ্ধতি অতি আশ্চর্য্য জনক। এরা লাঙ্গল বা অন্য কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে না চাষে। বাঁকানো কোদালে হাত দিয়ে সারা দিন কেটে চলে পাহাড়ি মাটি। এদের চাষ দেখলেই বোঝা যায় কত পরিশ্রমী ওরা। প্রবাদ, গরু ও লাঙ্গল দিয়ে চাষ করলে সোনার ফসল মাঠে দোলা দেবার পরিবর্ত্তে আবির্ভাব হয় বিষধর সর্পের। মনে হয়, পাহাড়ের ওপর ছোট জমিতে গরু দিয়ে চাষ করবার অসুবিধে থেকেই এ প্রবাদের সৃষ্টি। দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ঘন সবুজ ঝকঝকে থাক থাক কার্পেট বিছানো রয়েছে। সামনে গেলে দেখা যায় পাহাড়ের গা কেটে হয়েছে চাষ ও শস্যরোপণ। জলসেচ ব্যবস্থাও চমৎকার, ওপর থেকে বর্ষার ছোট ঝরণা বা নদীর ধারা সব চাইতে ওপরের জমিতে ফেলা হয়েছে, তারপর তার প্রয়োজন শেষ হয়ে পড়ছে নীচেরটায় তারপর আরো নীচে···আরো নীচে, অবশ্য কেবল মাত্র বর্ষায়ই এমন ব্যবস্থা সম্ভব, সর্ব্ব ঋতুতে নয়। জলভরা ক্ষেতে সবুজ চারার আঁটি মেয়ে-পুরুষ মিলিত ভাবে বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুড়ে দেবার দৃশ্য উপভোগ্য। মিলিত ভাবেই এরা কাজ করে জমিতে।

সিংহদ্বার

পুজোপচারও এদের অনাড়ম্বর। পথের পাশের অজস্র ফুলের এক থোকা ফুল, শীতের দেশের নানা ফলন্ত গাছের কিছু ফল, সিঁদুর, চাল একটা ছোট থালায় সাজিয়ে পরম ভক্তিভরে পুজো করে নেপাল-রমণী। অশ্বত্থ গাছকে এরা খুব বেশী মানে ও পুজো করে। অসুখ করলে চিকিৎসার পরিবর্ত্তে পুজো ও ভূতের কৃপাদৃষ্টি কল্পনা করে ঝাড়-ফুঁকই বেশী চলে। পথ চলতে চলতে পথের পাশের বহু সিঁদুর-লেপা বড় বড় অশ্বত্থ গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

মোষের মাথা ও কোলাভরা ভেজানো চিঁড়ে দিয়ে উল্লসিত নেপালী পরমানন্দে ভোজ সাঙ্গ করে উপভোগ করে বিবাহ অনুষ্ঠান।

এদের দুটো জাত প্রধান, ব্রাহ্মণ ও ছত্রি। ব্রাহ্মণের ভেতর নেওয়ার, ছত্রিদের মধ্যে গুরুং, মগর, বোরাথকি ও মঙ্গল জাতীয় থুলং ও কিরাতের বাস। এরা বেশীর ভাগই হিন্দু, তবে বেশ কিছু বৌদ্ধও আছে।

এখানে এক টাকায় হয় ১০০ পয়সা অর্থাৎ ২৫ আনা। ১ পয়সা, ২ পয়সা, ৫ পয়সা, ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা ও টাকার coin হয়। ২৫তে হয় এক সুকা ও ৫০ পয়সায় এক মহর। এখানে এক আনার কোন coin নেই।

আমার নেপাল ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে ফিরবার অত্যন্ত জরুরী ডাক এলো বোনের বিয়ে উপলক্ষে, বাকি মাত্র আট দিন। আবহাওয়ার জন্য প্লেন চলাচল বন্ধ, একটি মাত্র পথ খোলা—যে পথের বাহন একমাত্র ডাণ্ডি। এ বিরাট দেহ মাত্র চার জনে হরিবোল ধ্বনিতে মুখরিত করে বয়ে নিয়ে চলেছে এ দৃশ্য কল্পনায়ও যে উঠেছি আঁৎকে—হত-ভাগাদের জন্য হয়েছে অনুকম্পা। সর্ব্বনাশ! তখন কি জানতাম সজ্ঞানে এ উপভোগ করতে হবে! ডাণ্ডি নামের বস্তুর এখানে এসেই প্রথম পরিচয়। শুনলাম, চার জন কুলীতে বয়ে নিয়ে যায়। পা থাকে ওপর দিকে, মাথা নীচে—পাহাড় আরোহণ সম্বন্ধেও কোন সঠিক ধারণা নেই—তাই আবার কল্পনায় দেখতে লাগলাম, দেই দেই করে কুলীরা সোজা চলেছে কাঁধে অর্দ্ধমৃত আমাকে বয়ে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে—বর্ষার এ সুরুতে পিছল পথে হঠাৎ পদস্খলন আর এক দম পপাত চূড়ো থেকে পাহাড়ের পদতলে। হে পশুপতিনাথ! রক্ষা করো! কিন্তু তিনি হয়তো তখন অন্য ভক্তের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন, তাই এবারে আর আমায় রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন না। যাওয়া ঠিক হ'লো—Land Route এই। আমি ও আমার ভ্রাতৃবধূ দুজনে তাদের দুই পুত্র নিয়ে যাবো, আমাদের সঙ্গী ও রক্ষক হিসেবে চললেন মিঃ দত্ত।

28th June বর্ষার প্রথম সুরু—ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে! রোরুদ্যমানা কান্ধী দাঁড়িয়ে রইলো আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে। সেদিন আকাশ বেশ মেঘ-মেদুর। আকাশের অবস্থা দেখে নতুন পথে চলার যে আশঙ্কিত অনুভূতি তা যেন বেড়েই গেল। শোনা ছিল, এ পথে যাত্রীরা প্রায়ই যাওয়া-আসা করে, বিপদ-আপদ বড় একটা হয় না।

আমরা ডাক-মোটরে রওনা হলাম নেপালের ভারতীয় দূতাবাস ভবন থেকে সকাল সাড়ে চারটায়—ঠিক তখন প্রথম উষার স্পর্শে দোলা লাগলো লাজনম্র অবগুণ্ঠিতা পাপড়ির বুকে, অবগুণ্ঠন মুক্ত করে ধীরে ধীরে চাইলো সে, আনন্দে কোকিল গেয়ে উঠলো কুহু-কুহু, ঘাড় বাঁকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠলো প্রাতি প্রহরের প্রহরী—কুক্কুরু-কু···বাজারের দোকানের ঝাঁপি একটা দুটো করে খুলছে, কেউ পথের ধার থেকে জল তুলছে, কেউ হাই তুলে এসে বসলো দাওয়ায়। কেউ করছে ঝাড়-পোঁছ, মুরগীগুলো খুঁটে খাচ্ছে এদিকে-ওদিকে, প্যাক্-প্যাক্ করে খাবারের সন্ধান করছে হাঁস, মরাল গ্রীবা বাঁকিয়ে হেলে-দুলে চলেছে রাজার চালে, হাঁসের রাজা।

এক মাসের মধুময় স্মৃতিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি সামনে, ছেড়ে চলেছি অনাত্মীয়ের কোল, বৃহত্তর আনন্দের সন্ধানে পরম আত্মীয়ের স্নেহক্রোড়ে, কিন্তু তেমন আনন্দ পাচ্ছি কই—এদের জন্য কেন চোখে আসছে জল ভরে—মনে পড়লো প্রথম দিনের প্রথম অনুভূতি। প্লেন এসে থামলো, বন্ধ চোখ খুলে দেখলাম সব যাত্রী নেমে গেছে, বসে আছি শুধু আমরা—তাকিয়ে দেখলাম দাদা এসেছেন, নামলাম, দু' একজন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, কিন্তু এত চুপ কেন সবাই? এরা কি সবাই বোবা

দড়ির পুল
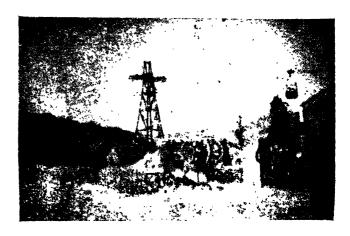
টুনডি খাল—প্যারেড গ্রাউণ্ড

নাকি? কত লোক কিন্তু কই একটু তো বোঝা যায় না? ডাক-মোটরে এসে বসলাম—ওদের সঙ্গে এসেছে ডুই কাম্পি বা মেড সারভেণ্ট। আসতেই অংক, উঃ কি সব বললে বুঝলাম না। জল চাইলে বৌদি আনিয়ে দিলো, পাকযন্ত্রের বড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে করুণ কণ্ঠে তাম্বুল প্রার্থনা করলে শুনলাম, এখানে ও জিনিষ সাধনার বস্তু—মেলে না। চার দিকে তাকিয়ে কোন কিছুকেই যেন নিজের বলে গ্রহণ করতে পারলাম না। ভাবলাম, ভগবান এ কোন অনাত্মীয়দের ভেতর এনে ফেললে—আর আজ? কত প্রভেদ!

বাজার ছাড়িয়ে চলে এসেছি। দূরে পাহাড়ের থাকে থাকে গাঢ় সবুজ গালিচায় এসে পড়ছে অরুণের সোনার কিরণ। বৃষ্টি একটু জোরে আসতে দরজা বন্ধ করে দিলাম। নেপাল! আমার মত তোমারও কি এ বিদায়-অশ্রু? বদ্ধ গাড়ীতেই থানকোট পৌঁছুলাম। সময় তখন প্রায় ৫টা।

থানকোট থেকে অনেকেই পদব্রজে রওনা দেয় আর যারা তাতে অসমর্থ তাদের জন্যই এ ডাণ্ডি। থানকোট থেকে ভীমফেরী পর্য্যন্ত যতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে চলতে হয় (প্রায় ২২ মাইল) ততটা রাস্তা পার করে দেবার জন্য ডাণ্ডি-প্রতি ২৫৲—৫০৲ দাবী করে অবস্থা ও আবহাওয়া বিশেষে, পারিশ্রমিক দিতে হয় নেপালী মুদ্রায়। ভারতীয় মুদ্রার সঙ্গে নেপালী মুদ্রার বিনিময়-মূল্য তখন ছিল ভারতীয় ১০০৲—নেপালী ১৬০৲ টাকার সমান। প্রতি ডাণ্ডি ২৫৲ হিসেবে তিনখানা ও মালবাহনের জন্য ৬টি কুলী—সব মিলিয়ে আমাদের সাথে ছিল ১৮।১৯ কুলীর একটি বাহিনী। ওদের কাছে মাল বুঝিয়ে দিয়ে পাশেই একটা চায়ের দোকানে বসলাম। যেমন নোংরা, তেমনি লক্ষ লক্ষ মাছি চার দিকে ভন্ ভন্ করে উড়ছে। অপরিষ্কার একই কাচের গ্লাসে কুলী বাবু সব পরমানন্দে করছে চা পান। গ্লাসের চায়ের সাথে মুখেও যে কত মাছি যাচ্ছে ঠিক নেই—ছাঁকনি বা গ্লাস নামাবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের মত তার ভেতর মাছি গিয়ে পড়ছে। আমাদের বসে থাকাই সহ্য হচ্ছিল না, খাবার কথা কল্পনার বাইরে। দাদা আমাদের সমানে অভয় মন্ত্র দিচ্ছেন, 'এই তো ক'দিন হলো আমি এসেছি, হেঁটেই, ডাণ্ডিতেও নয়—এত চমৎকার দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারব না, মানুষ কত এ্যাডভ্যাঞ্চার করে, এ্যাডভ্যাঞ্চারের এমন সুযোগ তোমার জীবনে আর আসবে কি? টাকা খরচ করেও এমন দৃশ্য কোথাও দেখতে পাবে না। নাগরদোলায় দুলতে দুলতে চার দিকের দৃশ্য দেখবে, এতে ভয়ের কি আছে?' অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দাদাকে প্রণাম করে ডাণ্ডিতে উঠলাম। হেইও করে চার জোয়ানে ডাণ্ডি কাঁধে তুললে ভয়ে চোখ বন্ধ করে শক্ত হয়ে রইলাম। চোখ খুললাম যখন দেখলাম তালে তালে জোরে জোরে এগিয়ে চলেছে কুলীরা—পেছনে দাদা তাকিয়ে আছেন সজল চোখে, সামনে চন্দ্রগিরির প্রায় ১০০০ ফিট উঁচু চড়াই। আমার ডাণ্ডি প্রথম, মধ্যে ছেলে ও শেষে বৌদি ও ছেলে, সর্ব্বশেষে ধীরে ধীরে পাহাড়ী পথে অনভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসছেন মিঃ দত্ত। পথ দারুণ পিছল হলেও তেমন ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না—দুধারে ছোট ছোট কুঁড়ে, তেমনি দৈনন্দিন চাঞ্চল্য লেগেছে অরুণোদয়ের সাথে সাথে। আকাশ মেঘলা থাকায় বেশ ঠাণ্ডা ছিল।

মিনিট ১৫ চলার পর একটা ছোট নেপালী পুলিস-ষ্টেশন পড়লো। এই ১৫ মিনিটে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিলো, নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখানে পুলিস-ষ্টেশনের একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন—পুলিস-ষ্টেশন বলতে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে এটা তার ধার-কাছ দিয়েও যায় না। মাঝারি আকারের একটি ঘর এবং তার আসবাবপত্র বলতে সর্ব্বসাকুল্যে একখানি চারপাই আর তারই ওপর দু'জন মাঝবয়সী নেপালী হুঁকো হাতে বসে আছে অতি সাধারণ পোষাকে—উর্দ্দি বা সিপাহীর বিশেষ পোষাকের কোন বালাই নেই। তাদের কাছে ভারতীয় দূতাবাসের ইংরেজীতে লেখা ছাড়পত্র দিলে তারা ওটা মিঃ দত্তকেই পড়তে বললো। কারণ, ইংরেজী অক্ষর পরিচয় তাদের হয়তো ছিল না। বড় বড় অক্ষরে আমাদের নাম ও আমরা কোথা থেকে আসছি লিখে নিলো। এদের কার্য্যকলাপ গুরুত্বহীন, তবু উপস্থিতির প্রয়োজন হচ্ছে নেপাল-আগন্তুককে বুঝিয়ে দেওয়া যে নেপাল একটা স্বাধীন রাষ্ট্র এবং সেখানে আগমন ও নির্গমন অবাধ নয়।

এদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আবার চলার সুরু। সোজা ওপরে উঠতে থাকি। এর পর প্রায় ঘণ্টা খানেক চলা আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও থানকোট থেকে আনা কুলীদের জন্য বিশেষ রকম তৈরী সিগারেট ওদের মধ্যে বিতরণ। আরো খানিক চলার পর আমরা মেঘের রাজ্যে প্রবেশ করলাম। হাল্কা সাদা ভারী কুয়াশার মত মেঘ চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে মেঘ থেকেছে বহু দূরে—সে এখন হাতের মুঠোর ভেতর—ভারী আনন্দ হচ্ছিল। পাহাড়ের একটা বাঁকের কাছে এসে ক্লান্ত কুলীরা ডাণ্ডি নামালো, পরিশ্রান্ত মিঃ দত্ত আগেই বসে পড়েছিলেন, আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। কুলীরা যে যার মত ধূমপান করতে লাগলো। এক দিকে উঠে গেছে অভ্রভেদী পর্ব্বত, অন্য দিকে অতলনীয় খাদ, মাঝে অসমান পাথরের টুকরোর তিন চার হাত চওড়া পিচ্ছিল পথ। একটা হুস্ হুস্ শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু দেখার উপায় ছিল না কিছুই, টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো, খানিক পরেই দলে দলে রক্তাক্ত মোষের আবির্ভাব হলো—কালো কালো মোষের নাক, মুখ, চোখ, খুর, শরীর বেয়ে চাকা চাকা লাল রক্ত পড়ছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! জানা গেল পাহাড়ী জোঁক ধরেছে, বহু দূর থেকে নিয়ে আসছে অভুক্ত এ দলকে; চার দিকের লোভনীয় কচি কচি ঘাস-পাতাতে তাদের শত্রু লুকিয়ে আছে জেনেও লোভ সম্বরণ করতে পারে নাই বলেই ওদের এ দুর্দ্দশা। চার দিকের পাহাড়ের গায়ে ও রাস্তায় চাকা চাকা রক্তে ওদের চিহ্ন রেখে ওরা এগিয়ে গেল। আমরা বার বার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত শরীর পরীক্ষা করতে লাগলাম। এমনি সময় বৌদি চিৎকার করে উঠলো, ওর ও ওর ছেলের কাপড়ে দুটো জোঁক—কুলীরা তো আমাদের ও দেখে হেসেই অস্থির—যেন ভারী এক মজার ব্যাপার!

আরো কিছু নামতেই পড়লো একটা বাজার চিৎলং। সঙ্গে আনা খাবারে ভোজনপর্ব্ব সাঙ্গ করা হলো। শুনলাম, এখানে কলেরায় বহু লোক মারা গেছে। আমরা একটি পরিত্যক্ত হোটেলে বসেছিলাম—বেশ পরিষ্কার বারান্দায় উনোন করা, তাতে খানিকটা ছাইও পড়ে আছে। পাশে একটা বেঞ্চ, সঙ্গে বড়

দুটো ঘর কিন্তু লোকজন নেই। উল্টো দিকে সারি সারি অনেকগুলো হোটেল, খাবার ও চা দুই-ই মেলে, তবে ভদ্রলোকের খাবার উপযুক্ত নয়। মাঝখানে পাথরের সিংহমুখ থেকে গল-গল করে ঠাণ্ডা জল পড়ছে। তার থেকে জল আকণ্ঠ পান করে খানিক বিশ্রামের পর আবার চলার সুরু—তখন বেলা ১০টা।

এবার মিঃ দত্তকে অনুরোধ করলাম, 'আমরা তো এতটা বেশ মজা করে এলাম, এবার আপনি খানিকটা উঠুন আমরা হাঁটি।' ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে উত্তর দিলেন, 'আমি আমার এ বিরাট বপু নিয়ে উঠলে কুলীরাই বা চলতে পারবে কেন, আর আপনারা হেঁটে গেলে লোকেই বা বলবে কি? আমার তো হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে।' ভাল যে লাগছিলো না তার ভারী পদক্ষেপ, রাঙা চোখ ও হাসির বদলে হাসির বিকৃতি দেখেই বোঝা গেল। কিন্তু উপায় নেই। আমাদের সঙ্গে একটি নেপালী ছেলে ও দু'তিন জন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক খানকোট থেকে রওনা হয়েছিলেন বাজারে, তাদের সঙ্গে আবার দেখা হলো—দত্ত তাদের সঙ্গ নিলেন। ওদের দেখে কিন্তু মনেই হলো না যে, ওদের কিছুমাত্র কষ্ট হচ্ছে—দিব্যি ছড়ি দিয়ে চার দিকের গাছপালা ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলেছে।

এর পর রাস্তা মোটামুটি বেশ সমতল, চার দিকে ঘেরা উঁচু-নীচু ছোট-বড় পাহাড়। মাঝখানে সবুজ ক্ষেত, সেই কানে হাত দিয়ে গান ও লীলায়িত ভঙ্গীতে ধানের আঁটি ছুড়ে দেওয়া—সেই সুর ও ছন্দ—চার দিকের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, এমনি দৃশ্য দেখলে কবির কণ্ঠে আপনা থেকেই সুর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে; শিল্পীর তুলির স্পর্শে সাদা কাগজও হয়ে ওঠে জীবন্ত। কিন্তু আমাদের স্থান ও কাল কোনটাই কবিত্বের উপযোগী ছিল না। কুলীদের নিশ্বাস বেশ ভারী হয়ে উঠেছে, বুকে কাঁধে জমে উঠেছে লাল হয়ে রক্ত। মিসেস সাহার উদ্ধত কণ্ঠও সময় সময় পরম সাধনার বস্তু মনে-প্রাণে উপলব্ধি করছিলাম কিন্তু কোন অলৌকিক উপায়েও আমার বিপুলাঙ্গ ক্ষীণাঙ্গতে রূপান্তরিত হবার আশঙ্কা ছিল না। মনে হয়, হঠযোগ আবিষ্কর্তা কোন দিন নেপালী কুলীর নাগরদোলায় দুলেই এ অভ্যাস সুরু করেন—কিন্তু আমার যে সে অভ্যাসও নেই—কাজেই নিশ্বাস টেনে ঠিক হয়ে বসলাম হিমালয়ের কোলে এসে হঠাৎ যোগাভ্যাস করবার বাসনায়—কুলীরা প্রতিবাদ করলো 'মাঈজী, ঠিক সে বৈঠো।' আবেদন জানালাম—'হেরা সে উতার দেও ম্যায় পায়দল চলুঙ্গি।' মহা খুসি হয়ে ওরা আমায় নামিয়ে দিল, বৌদির ডাণ্ডিও এসে গেছে, সেও নামলো আমার দেখাদেখি—পা টান করে আমরা সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলাম—ছোট ছেলেকে দিলাম কুলীদের কোলে। ওরা মহানন্দে উর্দ্ধশ্বাসে ছেলে ও ডাণ্ডি নিয়ে নিমেষে উধাও হলো। ছোট ছোট

চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে আমরা এগিয়ে চললাম। এর আগে অসীম নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে এসেছি, পাখীর কাকলীও তেমন শুনি নাই কিন্তু এবারে শোনা যাচ্ছে গম্‌-গম্‌ শোঁ-শোঁ আওয়াজ। এক দিকে জোয়ারের ক্ষেত অন্য দিকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট গভীর খাদ। দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে ভীমনাদে পাহাড়ের স্নেহধারা তুষারের বিন্দু ছুটে চলছে চিত্তবোল উত্তরোল সিন্ধুর ডাকে। নীচে পাহাড়ী নদী—পাহাড়ের বুকে পা দিয়ে পাথরের টুকরো বুকে নিয়ে চলেছে ছুটে। নদীর গভীরতা কিছুই নয় কিন্তু স্রোত ও চলমান পাথরের নুড়ির টুকরোতে পা রেখে চলা অসাধ্য। কিছু দূরে নদীর ওপর দুধারে পাহাড়ের গায়ে মোটা তার দিয়ে বসানো ঝোলানো সেতু। এমনি আরো ৫.৬ খানা পুল আমরা পার হয়েছি সব মিলিয়ে।

দু'-তিন মাইল চলে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পথের পাশের কলের থেকে জল খেয়ে বেশ করে মাথা ধুয়ে নিলাম সবাই—আবার সেই 'পাল্কী চলে দুলকি তালে, চার বেহারা মন্দ তারা, সামনে হেঁকে চলকো বেঁকে।'

দুপুর একটার সময় সৌসাগরি পাহাড়ের উৎরাই মাঝপথে পড়লো কুলীখানা। নামে কুলীখানা হলেও সমস্ত রাস্তার মধ্যে এখানেই কিছু খাবার ব্যবস্থা আছে, তা সে বাবুই হোক্‌ আর কুলীই হোক্‌। এখানে দু-একটি মাঝারি ধরণের হোটেল আছে, যেখানে টেবিল-চেয়ারে বসে ডাল, ভাত, তরকারী বেশ পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায়। থাকবার ব্যবস্থাও আছে —চার দিকে দেওয়ালে লাগানো ছোট ছোট খাটিয়ায় ধবধবে বিছানা পাতা ও পাতলা কাপড়ের মশারি টাঙ্গানো এ দুপুরেও, হয়তো মাছির উপদ্রবের জন্যই।

ভোজন-পর্ব সাঙ্গ করে রওনা দিলাম কুলীদের খোঁজে—ওরা ওদের আলাদা হোটেলে খেতে গিয়েছিল। চার দিকে 'শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায় চপল চামরী পুচ্ছলীলায়, সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।' এর ভেতর কালো করে বৃষ্টি আসলো বেশ জোরে। নিরাপদে দাঁড়াবার যায়গাও ছিল না। সুযোগ বুঝে কুলীরা বেঁকে বসলো এমন দুর্য্যোগে আমরা যাবো না। ওদের আচরণে আমরা রীতিমত ভীত হয়ে পড়লাম। পথের মধ্যিখানে এই দুর্য্যোগে ভদ্রলোক-শূন্য জায়গায় ওরা যদি সত্যি না যায় কি উপায় হবে? সন্ধ্যার ভেতর ভীমফেরীতেই বা পৌঁছাবো কি করে? মিঃ দত্ত বহু তোষামোদের পর ২৲ টাকা করে বকশিস্‌ কবুল করে আমাদের সমস্ত খাবার ও পকেট শূন্য করে সিগারেট বিতরণ করলে ওরা খুসি হয়ে খানিকটা করে সস্তা মদ গিলে সিটারেটে লম্বা টান দিলো। এমনি করেই ওরা ঝোপ বুঝে কোপ মারে। মৌজ করে ধূমপান শেষ করে আবার ছুটে চললো আমাদের কাঁধে নিয়ে সেই দুর্য্যোগে।

এবারেও আমরা দত্তকে অনুরোধ করলাম ডাণ্ডিতে উঠবার জন্য কিন্তু পূর্ব্বের মতই তিনি কষ্ট হাসি হেসে এড়িয়ে গেলেন। ভদ্রলোক রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সর্ব্বোপরি বৃষ্টি ও পিচ্ছিল-পথে কিছুতেই কুলীদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছিলেন না। জোর করে ভারী পদক্ষেপ খানিকটা দূর চলেই পথের পাশে ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। কুলীদের কাছ থেকে একটা ছাড় নিয়ে জোর করে তার হাতে গুঁজে দিলেও—তিনি আমাদের কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে রাজ হলেন না। শক্ত-সমর্থ জোয়ান হয়েও তিনি কেন বৃদ্ধের অবলম্বন গ্রহণ করবেন? আমি পথপ্রদর্শক হলে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' শাস্ত্রের নির্দ্দেশে যষ্টি গ্রহণ করলেন।

কখনও জঙ্গল, কখনও গুহার মত জায়গার ভেতর দিয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে চলতে চলতে অনাগত বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রইলাম। কোন সময় আমাদের ডাণ্ডি বহু দূরে এগিয়ে এসেছে। বহুক্ষণ কেবলমাত্র কুলীর ভরসায় অপেক্ষা করেও আর কারো দেখা নেই। 'সাথ সে চলো' এ নির্দ্দেশ বা অনুরোধেও হাসি ছাড়া কার্য্যত কোন লাভ নেই। কোন কোন যায়গায় দু'হাত চওড়া অসমতল আলগা পিছল পাথরে পা পিছলে ডাণ্ডিসহ বেশ খানিকটা নেমে আসলাম, পাশে তাকালে মনে হয়, শূন্য দিয়ে দুলে চলেছি, নীচে বহু দূরের অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলভরা খাদে তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

এই ভাবে সৌসাপানিগরির চূড়ায় আবার সবাই একসঙ্গে হলাম। এখানকার হোটেলে চা পানান্তে আবার যাত্রা হলো সুরু। এবার ঠিক হলো, মিঃ দত্তের সিভলরিতে আমি ও বৌদি গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে এগুবো। পথের মাঝে এখানে-ওখানে দেখলাম, ঝকঝকে পেতলের জলপূর্ণ ফুল দেওয়া কলসী রাখা রয়েছে পথিকের মঙ্গল কামনায়, দেখলাম ৪ মণ মাড়োয়ারীর বিরাট দেহ ৮ কুলীতে বহু কষ্টে টেনে নিয়ে চলেছে, অপেক্ষাকৃত রুগ্ন বা হীন অবস্থার যারা তারা চলেছে কুলীর পেছনে বসানো ঝাঁকায়। আরো চলেছে এক একটা সম্পূর্ণ মোটর, পেট্রলের ৫০০।১০০০ গ্যালনের পিপে, Rope way-র জন্য বিরাট মোটা তার, একশ' থেকে পাঁচশ' কুলীর কাঁধে চেপে—কেউ কেউ পান, আম, কাঠের বোঝা নিয়ে চলেছে দু' আনা লাভের আশায়, না দেখলে বিশ্বাস হয় না কি ভীষণ পরিশ্রমী এ নেপালী কুলীরা। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের এ মাল বইতে কষ্ট হয় না?' উত্তর দিল 'না বইলে খাবো কি!' সত্যি তো খাবে কি! চাষের জমি নেই, কলকারখানা নেই, জীবিকা নির্ব্বাহের দ্বিতীয় কোন পথ—এ ছাড়া উপায় কি? কোথায় থাকে স্ত্রী-পুত্র, কোথায় বাড়ি-ঘর, সপ্তাহান্তে একদিন মিলন হয় সবার সাথে। রীতিমত কাজ মিললেই সে মিলন হয় সুখের। ভীমফেরী থেকে ফিরবার পথে যেটুকু ভাড়া পায় তাই ওদের লাভ; নতুবা সেই জল-ঝড়, পাহাড় ভেঙ্গে শূন্য পকেটে ডাণ্ডি কাঁধে ফিরে আসতে হয়। এই করেই ওদের কর্ম্মজীবনের সুরু, এই করেই হঠাৎ অকালমৃত্যু, কষ্ট হলেও উপায় নেই। বললে 'মাঈজী, বকশিস্‌ দিও, তবেই আমরা খুশি।'

সৌসাপানিগিরির উৎরাই পথে কিছুটা পথ নামলেই আমরা নেপালী শুল্ক বিভাগে উপস্থিত হলাম। পাসপোর্ট দেখানো হ'লে বাক্স-পেটরা খুলে খুলে দু'খানা বেণারসী শাড়ী বার করে বললে, এ দু'খানা একেবারে আনকোরা নতুন, অতএব হে পান্থ, 'ফেল কা' নেও শাড়ী', বলা বাহুল্য এটুকু উহ্য। আমরাও দমবার পাত্রী নই, শাড়ী খুলে দেখিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম, আমরা এ সাড়ী রোজ পার না, কাজেই বেশ কয়েক বছর পরলেও নয়া বলেই মালুম হয়,

তা ছাড়া এত বোকা'ও আমরা নিশ্চয়ই নই যে, ভারতের থেকে এক মাসের জন্য এখানে এসে সেখানকার জিনিষই চার গুণ দাম দিয়ে কিনবো আর সর্ব্বোপরি এ জিনিষ এখানে আদৌ মিলবে কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আরো জানিয়ে দিলাম, আমরা 'লিগেসন' অর্থাৎ এ্যামব্যাসি থেকে আসছি। যাহোক্, এর পর আমাদের ছেড়ে দিলে। আমাদের উৎরাই পথের সবে সুরু। পর্ব্বত আরোহণ থেকে পর্ব্বত অবতরণ বহু কষ্টসাধ্য, মনে হয়, পদদ্বয়ের শিরা-উপশিরা মাংসপেশী সব ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বহু দূরে দেখা দিল উপত্যকা ভীমফেরী—কিন্তু ও যেন ক্রমেই সরে যাচ্ছে। কুলীদের চাঞ্চল্য দেখা দিল, আবার তারা নব উদ্দীপনায় ছুটে চললো—সারা দিনের ক্লান্ত মধুর স্মৃতি নিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় ভীমফেরী উপত্যকায় এক ধর্ম্মশালার দরজায় এসে কুলীরা তাদের ডাণ্ডি নামালো। বকশিস্ ও ভাড়ায় ওদের খুশির সাথে বিদায় করে আমরা বহু কষ্টে দোতলার একটি কক্ষে আশ্রয় নিলাম। সামনের হোটেলের নেপালী মালিক এলেন, বেশ ভাল বাংলা জানেন। আমাদের অসমর্থ জেনে লোক দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। ধর্ম্মশালার লোক এসে ঘর পরিষ্কার করে একটা বাতি দিয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে খানিকটা শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম শয্যায়।

পরদিন স্নান-খাওয়া সেরে ডাক-মোটরে রওনা দিলাম আমলকীগঞ্জ উদ্দেশ্যে। পথে দেখলাম, দুটো বড় বড় মোষ আগুন দিয়ে ঝলসাচ্ছে—ছোট ছেলে-মেয়েরা গামলা-বাটি ভরে তার রক্ত নিয়ে চলেছে। ডেলিকেট ডিস্ তৈরী করতে।

গাড়ী ছুটলো ভীমবেগে নদীর নিশানা ধরে পাহাড়কাটা স্বল্প-পরিসর রাস্তা দিয়ে। কিছু দূর গিয়ে থামলো। ভীমফেরী থেকে আমলকীগঞ্জ যাবার সম্ভবত: দ্বিতীয়-কোন যান-বাহনের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং '১৫ জন বসিবেক' নির্দ্দেশ থাকলেও কম করেও তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ জনকে বসিয়ে ছাড়ে। দমবন্ধ করা ভীড়ে আমরা বসেছি প্রথম সারিতে—ঠিক এমনি সময় ব্যাটারি সর্ট হয়ে লাগলো মোটরে আগুন। এতক্ষণ মুখ ঘোরাবার যায়গাও ছিল না; এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কারো মাথায় পা দিয়ে কারো ঘাড়ে চেপে কোন দিকে লক্ষ্য না করেই গাড়ী ফাঁক হয়ে গেল—আমরাও নাটকীয় ভাবে অবতরণ করলাম। তেমন কিছু হলো না।—আবার সেই ভীমবেগ—মাইলের পর মাইল ধু-ধু ফাঁকা যায়গায় অথবা পার্ব্বত্য জঙ্গলের মাঝখানে পাথরের পর পাথর বসিয়ে তৈরী ছোট্ট কুঁড়ে—ছাগল তাড়িয়ে চলেছে বুড়ী অথবা শিশু—জীবনের আশীটা বছর ও এমনি কাটিয়ে দিয়েছে, আবার তার পাশেই তারই পুনরাবৃত্তি—man is a social animal এবং তাও সুখী! মাঝে পড়লো একটা ট্যানেল। পথের প্রায় শেষে দেখলাম, পাহাড় কেটে চওড়া সমান রাস্তা তৈরী হচ্ছে কাটমণ্ডু পর্য্যন্ত।

আমলকীগঞ্জ রেলে চেপে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এটি নেপাল গভর্ণমেন্টের নিজস্ব রেলপথ—যেমন ছোট্ট এ গাড়ী তেমনি এর গতি। বেলা একটায় হিমালয়ের তড়াই অঞ্চল দিয়ে ঝুকঝুক করে গাড়ী এঁকে-বেঁকে চললো, মাঝে প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই মুণ নিয়ে পুরিয়া-করা প্রচুর জাম বিক্রি হচ্ছিল। বিকেল চারটায় পৌঁছলাম সমাস্তপুর, এখান থেকেই আমাদের ভারতীয় রেলপথের সুরু ও নেপাল-সীমার ইতি। পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য-সম্ভারে পার্ব্বত্য পথের শ্রান্তিকর কিন্তু উদ্দীপনাময় স্মৃতি হৃদয়ে নিয়ে ভারতীয় ট্রেনে চড়লাম।

কাটমণ্ডু নেপালের আনন, কাটমণ্ডু নেপালের হৃদয়, হৃদয়ের বিকাশ শরীরে—নাই বা দেখলাম নেপালের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নাই বা দেখলাম তার প্রতি শিরা-উপশিরা—হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করাই কি তার পূর্ণতাকে অনুভব করা নয়?—কাটমণ্ডুর সৌন্দর্য্যকে দর্শন করাই আমার পূর্ণ নেপালের সৌন্দর্য্য দর্শন।

নেপাল! আমি তোমায় দেখতে আসিনি—এসেছিলাম প্রকৃতির উগ্রতাকে পরিহার করে প্রকৃতিরই আশ্রয়ে তোমার কোলে শান্তি পেতে, সান্ত্বনা নিতে—এক মাস—ত্রিশ দিন তোমার সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছে, লাভ করেছি শান্তি, পেয়েছি সান্ত্বনা। আমি তোমাকে দেখাতেও বসিনি—কিন্তু কোন ভাল জিনিষই একলা তেমন উপভোগ্য হয় না—বর্ষার সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ ঘরে রোমহর্ষক কাহিনী থেকে উপভোগ্য কিছুই নয় কিন্তু সে কি একা?

রবি ঠাকুরের অনুভূতি আমার নেই, তাই তাঁর চীন রাশিয়ার অন্তর দেখবার মত তোমার অন্তর আমি দেখতে পাইনি, যাযাবরের এক 'দৃষ্টিপাতে' দিল্লীকে খুঁটিয়ে দেখবার মত দৃষ্টিও আমার নেই, নেহেরুর ভারতকে আবিষ্কারের মত ক্ষমতা নেই আমার, নেই মধুসূদনের মত বাণীকে তুষ্ট করে বাণীর আশীষ লাভের ক্ষমতা, তুমি আমার মত নগণ্যের কাছে সাধারণ ভাবেই ধরা দিয়েছ, আমিও সাধারণ ভাবেই তোমায় হৃদয়ে নিয়ে আরও পাঁচ জনকে দেখাবার চেষ্টা করলাম মাত্র। রিপোর্টারের জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি যাইনি, যাইনি প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। তাই আমার এ রচনায় হয়তো আছে ভুল, ত্রুটিরও সীমা নেই, সেটুকু তুমি ক্ষমা করো।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমতী সুধীরা বসু

তারা সাতটি ভাই, একসঙ্গে এক বাড়ীতে, একই রকম পরিবেশে বড় হয়ে উঠ্ছে। যেন একগাছ আলো-করা এক রাশ ফুল! চেহারাগুলিও তাদের ফুলের মতই সুন্দর, ঠিক যেন সাত ভাই চম্পা, তবে বোন তাদের চারটি। স্বাস্থ্যবান, মেধাবী, বুদ্ধিমান ছেলে সব, কিন্তু তাদের দুষ্টুমীরও অন্ত নেই। কোথায় আম-গাছে আম, কোথায় কামরাঙা, কুল, পেয়ারা সারা দুপুর রোদে বাগান তোলপাড় করে তাই খোঁজা হচ্ছে। বাগানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, সোজা ফটক পর্যন্ত গিয়েছে; সেই রাস্তার দুধারে দুটো বড় পুকুর, এই দুরন্ত খোকার দল যখন-তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই পুকুরে। জলে পড়ে আর ওঠবার নাম করে না, কত রকম সাঁতার কাটে, তাদের এই দাপাদাপিতে নিস্তব্ধ বাগান গম্‌-গম্ করে, শেষ কালে যখন তাদের বাবা লাঠি হাতে নিয়ে তেড়ে আসেন, তখন চটপট উঠে পড়ে যে যে দিকে পারে ছুট মারে। এই রকম করে দিন কাটে, তাদের দৌরাত্ম্যে পাড়া-প্রাতবেশীরা অস্থির; কিন্তু তবুও তারা এই খোকাদের ভালবাসে, কারণ দুষ্টুমীতে যতই পটু হোক্ না কেন, তারা কখনও কারুর অনিষ্ট করে না, সকলের ওপরেই তাদের মায়া-মমতা। তাদের বাবা,

মাকেও তারা খুব ভালবাসে আবার ভয়ও করে। কিন্তু তা বললে কি হবে, তারা তো ছোট ছেলে, পাড়ার আর পাঁচটা দুষ্টু ছেলের পাল্লায় পড়ে তাদের দুষ্টুমীর বহরটাও মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। বালক-বাহিনীর এক দিনের একটা দুষ্টুমীর গল্প বললেই সেটা বোঝা যাবে।

এটা অনেক দিন আগেকার কথা কিনা, তখন কলকাতায় কিছু কিছু স্কুল কলেজ হলেও সহরের বাইরে তখনও পাঠশালার চল উঠে যায়নি। এই খোকাদের বাড়ীর ফটক ছিল বাড়ী থেকে অনেক দূরে, মাঝখানে সাতটা পুকুরওলা প্রকাণ্ড বাগান। ফটকের দু'ধারে দু'টো ঘর ছিল, তার একটাতে বসত ছোট একটা পাঠশালা। খোকারা দুই তিন ভাই ও বোন মিলে সেই পাঠশালায় যেত পড়তে। খোকারা পড়াশুনায় ভাল হলেও গুরুমশায়ের চড়-চাপড় কানমলাটা যে একেবারে না খেতে হত তা নয়। একদিন বোধ হয় কানমলার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, সেই জন্য তারা ঠিক করল গুরুমশাইকে একটু জব্দ করতে হবে। অন্য পোড়োরাও তাতে রাজী হল এবং সব পরামর্শ করে ঠিক হয়ে গেল।

প্রত্যেক দিন সকালবেলা পড়োরা সব আগে গিয়ে পাঠশালা-ঘরে গুরুমশায়ের বসবার জন্যে আসন পেতে, দরজা জানলা খুলে দিয়ে, নিজেরা সারবন্দী হয়ে বসে গুরুমশায়ের জন্য অপেক্ষা করত। সেদিনও সব তেমনি বসে আছে কখন গুরুমশাই আসবেন। যথাসময়ে গুরুমশাই এলেন এবং ঘরে ঢুকে যেমন সেই আসনের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন অমনি আসন হড়কে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়ে ঘুরে পড়লেন। তার পরে অনেক কষ্টে বেচারী উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন, তাঁর পরনের কাপড়খানিতে চটকানো কালো জামের রসে বিশ্রী রকম ছোপ ধরে গিয়েছে।

এই খোকার দল সেদিন করেছিল কি, গুরুমশায়ের বসবার জন্য আসন পেতে তার তলায় গোটাকতক পাকা কালো জাম রেখে দিয়েছিল, গুরুমশাই সোজা এসে যেই সেই আসনের ওপরে দাঁড়ালেন অমনি আসন পিছলে আছাড় খেলেন। আসন গেল ছিটকে বেরিয়ে, আর দেহের চাপে কালো জামগুলো গেল চটকে। গুরুমশাইয়ের সন্দেহ হল খোকারাই এই ব্যাপারের সর্দ্দার; কারণ, অমন সুপুষ্ট রসে ভরা কালো জাম খোকাদেরই বাগানের গাছের। তার পর কি ব্যাপার হল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে গুরুমশাই গিয়ে খোকাদের বাবার কাছে নালিশ করলেন, এবং বাবার হাতে সেদিন তাদের কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল না।

ক্রমে খোকারা বড় হয়ে উঠল, পাঠশালার পড়া তাদের শেষ হল। তারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিন্দু মেট্রোপলিটন স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হল। তখন বিদ্যাসাগর মশাই নিজে স্কুলে পড়াতেন, তিনি এদের ক্লাশেও পড়াতেন ও এই খোকাদের খুব স্নেহ করতেন। আগেই বলেছি, তারা খুব মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিল, এখন উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়ে তারা প্রতি বছরই ক্লাশে প্রথম হতে লাগল। বাড়ীতে কিন্তু দুষ্টুমী করা বিশেষ কিছু কমল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা তাদের মধ্যে দুই ভাই, মেজো ও সেজো ভাই, পরদিনের স্কুলের পড়া তৈরী করতে করতে ঠিক করে ফেলল যে, তারা দুজনে হাতে লিখে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পত্রিকার কি নাম হবে, কে তাতে লিখবে, এ সব নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নেই, তারা শুধু দুজনে মিলেই তাতে লিখবে ও তখনি লেখাও আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম প্রবন্ধটি লেখা হবে ভূতের বিষয়ে। ভূত কয় প্রকার, তাদের বাসস্থান কোথায়! শ্যাওড়া গাছে, অশ্বত্থ গাছে, নিম গাছে কি কি জাতীয় ভূতের বাস! ভূতের কার্য্য কি, উপকারিতা ও অপকারিতাই বা কি! তাহাদের আহার, বিহার, রুচি ব্যবহারই বা কিরূপ ইত্যাদি—প্রকাণ্ড বড় এক প্রবন্ধ লেখা হয়ে গেল। এবং সব শেষে একটি শ্লোক লিখে তার সমাপ্তি হল। খোকারা তখন সংস্কৃতও একটু একটু শিখছে কিনা। অতএব বাংলা ও সংস্কৃত মিলিয়ে এই অপূর্ব্ব শ্লোকটি রচিত হল—

> ব্রহ্মদৈত্য, শঙ্খচূর্ণী, ভূতপুত্রা আবাগস্ত
> যামোদস্ত ভূতপুত্রা, ডাকিনী প্রেতিনী তথা।
> কন্ধকাটা, জলেডোবা গলেদড়ি বিবাহারী
> এতানি বহুনামানি ভূতানি চ—

এই পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে, এমন সময়ে লেখাতে প্রচণ্ড বাধা পড়ল। আগে লিখতে ভুলে গিয়েছি যে, এদের পরের ছোট ভাইটি অনেকক্ষণ থেকে এদের কাগজ, পেন্সিল নিয়ে টানাটানি করে বিরক্ত করছিল, কারণ দাদাদের ব্যবহৃত সব জিনিষই তার কাছে লোভনীয়। এখন এই শ্লোক রচনার সঙ্গীন মুহূর্ত্তে দাদাদের আর ধৈর্য্য রইল না, সজোরে দিলে তাকে এক চড় বসিয়ে। সে-ও অমনি দাদাদের দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে ভ্যাঁ করে তারস্বরে কেঁদে উঠল। পাশের ঘর থেকে বাবা তেড়ে এলেন, সন্ধ্যাবেলা পড়াশুনা না করে মারামারি! কিন্তু ততক্ষণে দুই ভাই অন্য দরজা দিয়ে পালিয়ে একেবারে তাদের দিদিমার আঁচলের তলায় লুকিয়েছে। বাবা ঘরে ঢুকে দেখলেন, দুজনে পালিয়েছে এবং ছোট ভাইটি আঙুল চুষতে চুষতে দরজার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

উত্তর কালে এই সব খোকারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে সমাজের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। এঁদের বাবা ছিলেন ৺নীলমণি দে; তিনি ছিলেন তৎকালে প্রসিদ্ধ কিশোরীচাঁদ মিত্রের জামাতা, এবং "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামে ইংরাজি কাগজ সম্পাদনা করতেন। এই সাতটি খোকা তাঁরই উপযুক্ত ও কৃতী সন্তান ছিলেন।

স্বর্গত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পুষ্প দেবী

মনে পড়ে, ১৩৪৭ সালে আমার পিতৃদেব স্বর্গত রায় বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন বহরমপুরে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়ে যান, তখন বাবার চিঠির মধ্যে কবিকেও প্রণাম জানিয়ে দু' লাইন চিঠি দিয়েছিলাম; ফিরে এল তাঁর আশীর্বাদ। তখন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বই অনুপূর্ব্বা বেরিয়েছে। তার ওপরে সুন্দর হস্তাক্ষরে এই কবিতাটি লেখা :—

"দূর হতে অদেখারে পাঠালে মা অর্ঘ্য
পুষ্প-সুরভি মাখা অম্লান দূর্ব্বা,
দেখা যদি নাহি হয় তবু নহ পর গো
বিজয়া-আশীষ সহ লহ অনুপূর্ব্বা।"

দৈনিক কাগজে তাঁর মরুশিখা মরীচিকা বইগুলির উল্লেখ আছে, কিন্তু অনুপূর্ব্বার কথা নেই। ঐ বইখানি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি চয়ন করে গাঁথা পুষ্পমাল্য। ঐ বইটির ভূমিকা যিনি পড়েছেন তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন। এর পরে ১৩৪৮ সালে বাবাকে হারালুম। ঐ সময় কবি আমায় একখানি ৬ পৃষ্ঠা চিঠি লেখেন, সে যে কী মর্ম্মস্পর্শী ভাষা, যিনি না পড়েছেন তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমার পিতৃদেবের জীবন-আলেখ্য "পুণ্য কাহিনী"তে বহু মনীষীদের লেখার মধ্যে সে লেখাটিও অমর হয়ে আছে।

নিজের ঢাক নিজে বাজানোর স্বভাব তাঁর ছিল না, কাজেই তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য যশও তিনি পাননি। তাঁর লেখা "গঙ্গাস্তোত্র" "শরশয্যায় ভীষ্ম" "শিবস্তোত্র" পাঠককে দিব্যচক্ষু দান করে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব ও নিজস্ব ভাব দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তাঁর তেজস্বী লেখনীর অতুলনীয় দানে বাংলা ভাষা যে সমৃদ্ধ হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। ভাবলে অবাক হতে হয়, মানুষটি লোহা-পেটা ইনজিনিয়ার ছিলেন। সেই হাতেই ভাষার বন্যা ছুটে চলেছে সুরের বৈচিত্রে মানুষকে মুগ্ধ ক'রে।

আজ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তখন বাবা ও কবি দু'জনেই কৃষ্ণনগরে চাকরী সূত্রে ছিলেন। কিন্তু দু'জন দু'বিভাগে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। আর তিনি যে কবি সে কথা তখন তো কেউ-ই জানতো না। একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় বাবা নাকি খ'ড়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন—তখন কবির বাড়ী থেকে অপূর্ব্ব সুরলহরী তাঁকে আকৃষ্ট করে। হয়ত অনেকেই এখনো জানেন না। কবি যতীন সেনগুপ্ত অতি সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। সেদিন দারুণ বর্ষা-আকাশে মেঘ জলে ভরে থম-থম করছে। গানটি শুনে বাবা আশ্চর্য্য হলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের যুগ। কই, গানটি তো তিনি শুনেছেন বলে মনে পড়ে না? গানটির পদ হচ্ছে

"কার অভিমানে এমন ফাগুনে ঘনাল বরষা আজি।"

বাবা শুনেছিলেন একজন অবিবাহিত ইনজিনিয়ার ঐ বাড়ীতে বাস করেন। গানটি কার লেখা জানার আগ্রহে বাবা তাঁর বাড়ী যান ও গায়কই লেখক জেনে তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। এই তল পরিচয়ের সূত্র। মৃত্যুর প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে সিদ্ধির ঘোড়াবাঁধ থেকে লেখা। আমার কন্যা তাঁকে যে ভাইফোঁটার প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল কবিতাটি তারই উত্তর।

তপু!

কবিতার সাথে কলহ করিয়া বাংলা ছাড়িনু দিদি,
সিদ্ধির ঘোড়া বাঁধে এ বুড়ার অন্ন মাপায় বিধি।
সেইখানে এল তোমার কোমল আঙুলের ভাইফোঁটা
পাথরে কপাল পরশিল যেন রাঙা শিউলির বোঁটা।
নিষ্কণ্টক করিল যে ঠাঁই কালের দীর্ঘ ঝাঁটা
আবার কি সেই যমের দুয়ারে ছড়াবে নূতন কাঁটা?
জবার জোয়ারে জীবন-দেউলে গলে এ কাদার গাঁথনি।
তবু দূর হোতে দাদুর আশীষ ধর গো না-দেখা নাতনী।

১১।১২।৫৩ দাদু শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আর তাঁর চিঠি পাইনি। কে জানতো এই-ই তাঁর শেষ চিঠি হবে আমার কাছে? যখন আমার বাবার মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে তাঁর জন্মতিথি উৎসব প্রথম আরম্ভ হয়, তখন কবিকে এই বিষয়ে একটি কবিতা লিখতে অনুরোধ জানাই। তার উত্তরে আমায় তিনি লিখেছিলেন :—

জীবনে তো দুই জনে ছিনু দূরে দূরে,
তোমার অন্তর শুধু এ অন্তর জুড়ে;
ছিল চিরদিন বন্ধু আজো তাই আছে
দূরের হইয়া তবু আছ কাছে কাছে।
হয়তো পথের বাঁকে পাব অকস্মাৎ
কলহাস্য-মুখরিত প্রসন্ন সাক্ষাৎ।
যেমনি পেয়েছি বারে বারে সে আশায়
মোর শেষ দিনগুলি আসে আর যায়।
মৃত্যু লভি মোর কাছে হলে মৃত্যুহীন
এ অন্তরে প্রতিদিনই তব জন্মদিন।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী

শ্রীআভা চট্টোপাধ্যায়

শত বর্ষের উৎসব-মাঝে শতদল সম ফুটি'
সারদা, বরদা, অন্নদা মা গো শত আবরণ টুটি'
বাঙ্গালী-নারীর হৃদয় মথিয়া অমৃত-ঝারি হাতে,
উঠিলে জননি সাধনার বাণী জ্ঞানের আলোক সাথে।
রামকৃষ্ণের ঘরণী যে তুমি, সাধু-সন্ন্যাসীর মাতা!
সংসারী জন রাতুল চরণ হৃদয়ে বেখেছে পাতা,
দেশ-বিদেশের অর্ঘ্য আসিয়া চরণে লুটায় তব
নিবেদিতারে আপন করিয়া দিয়াছ চেতনা নব।
সতী-শিরোমণি বধূর শ্রেষ্ঠা কত মধু কর দান
অযুত ভকত-ভ্রমরের দল চরণামৃত করে পান।
দেবীর আসরে বসিয়াছ মা গো! আঁধারে দেখাও পথ,
স্মরণ মনন করিলে তোমার পূরে ধ্রুব মনোরথ;
ভারতের তুমি সীতা-সাবিত্রী অরুন্ধতী দেবী
বিবেকানন্দের পরমা প্রকৃতি! চরণ-যুগল সেবি'
সরল ভাষায় শাশ্বত বাণী প্রচার করিলে জীবে
বিষয়-জ্বালার করি অবসান আশ্রয় দিলে শিবে!
সংসারের আশা, মায়া, ভালবাসা স্বীকার করিয়া সবি'
ভব-ভয় নাশি' অভয় বারতা জ্যোতি দেয়, যেন রবি।
নয়নের কোণে দ্যুতি অমরার মর জনে দেয় আলো,
করুণাধারা নির্ঝর সম মন্দির-মঠে ঢালো;
নানা ধর্ম্মের মর্ম্ম উজাড় করিয়া দেখালে ঐক্য
এক সুর সদা বাজিছে মহান্ প্রকাশিতে নারে বাক্য
উপলব্ধির মাঝে দেয় ধরা অনুসরণের লাগি'
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাশে মহান্ সত্য জাগি
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্ম বিরাজে সারা জীবনের পুঁজি
অন্ধ নয়ন কোথা পাবে তুমি? মর অবিশ্বাসে খুঁজি।
মা' বলিয়া ডাকো আশ্রয় মা গো স্বীকার কর গো তাঁরে
সারদেশ্বরী জগজ্জননী ঠাকুর বরিল যাঁরে!
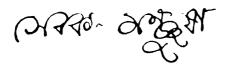
সা হি ত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি ও অভিধানকার। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গ ১০ই আষাঢ় মাতুলালয়ে রামনারায়ণপুরে। পৈত্রিক নিবাস—বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত যশাইকাটি গ্রামে। পিতা—নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—বিভিন্ন স্কুলে, বাদুড়িয়া লণ্ডন মিশনারী স্কুলে প্রবেশিকা (জেনারেল এসেমব্লিজ), এফ-এ (বিদ্যাসাগর কলেজ), বি-এ ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কর্ম—শিক্ষকতা, যশাইকাটি হাই স্কুল, নাড়াজোল রাজবাটীর গৃহ-শিক্ষক, প্রধান পণ্ডিত, কলিকাতা টাউন স্কুল, কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের রাজশাহী পাতিশরের সুপারিনটেনডেণ্ট পদে (কালিগ্রামে), প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক, বিশ্বভারতী (১৩০৯-১৩৩৯)। 'সরোজিনী পদক' লাভ (বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪)। গ্রন্থ—বঙ্গীয় শব্দকোষ ৫ খণ্ড (১৩১২—১৩৫২), রবীন্দ্রনাথের কথা, সংস্কৃত-প্রবেশ, ৩ খণ্ড, ব্যাকরণ-কৌমুদী, শব্দানুশাসন, পালিপ্রবেশ, Hints on Sanskrit composition & tr nslation.

হরিচরণ গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছায়। গ্রন্থ—কাহিনী।

হরিচরণ বন্ধু—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—হরিভক্তিতত্ত্ব (বহরমপুর, সয়দাবাদ)।

হরি দত্ত (কানা হরি দত্ত)—পদকর্তা। জন্ম—১১শ-১২শ শতাব্দী। এ পর্যন্ত জ্ঞাত বাঙালী কবিবর্গের মধ্যে মনসা চরিত্রের আদি স্রষ্টা। ইঁহার কয়েকটি পদ মৈমনসিংহের দিঘপাইৎ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পদাবলী গ্রন্থ—মনসামঙ্গল (মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে রচিত)।

হরিদাস কুমার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—An Easy Arithmatic, ২ খণ্ড (১৮৬৭)।

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়—জ্যোতির্বিদ্ ও সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৯৬ বঙ্গ। মৃত্যু—১৩৫৬ বঙ্গ ১ই কার্তিক হুগলী জেলার অন্তর্গত শেওড়াফুলি। পিতা—সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠাতা—বৈদ্যবাটী ইয়ংমেন অ্যাসোসিয়েসন। সুলেখক, সুচিকিৎসক ও জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। সম্পাদক—বন্দনা (মাসিক পত্র)।

হরিদাস গোস্বামী—গ্রন্থকার। মধ্য-ভারতের ভূপাল প্রবাসী। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া চরিত।

হরিদাস তর্কাচার্য—স্মার্ত পণ্ডিত। ইনি স্মৃতি-টীকাকার অচ্যুত চক্রবর্তীর পিতা। গ্রন্থ—শ্রাদ্ধনির্ণয়, অশৌচানিবন্ধঃ, সংস্কারহারাবলী।

হরিদাস দত্ত—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—দৈনিক চন্দ্রিকা।

হরিদাস পালিত—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান জেলার কুড়মূল নামক গ্রামে। কর্ম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। গ্রন্থ—আদ্যের গম্ভীরা, বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম, চাঙ্কেলী, গণশা, সোনার দেশ।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—কল্পনা (মাসিক, ১২৮৭-১২৯৪), সুধাকর (পাক্ষিক, ১২৮৪)।

হরিদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৩১৩ বঙ্গ ২১এ আশ্বিন ২৪-পরগনার ভাটপাড়ায় (মাতুলালয়ে)। পিতা—অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাতা তুলসী দেবী। পৈত্রিক নিবাস—নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর মহকুমার অধীন সওডাঙ্গা গ্রামে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, ১৯২৫) কলিকাতায় আই-এ পাঠকালে সাহিত্য-চর্চা, নদীয়া জেলার আইন-আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার কালে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ (১৯৩০, ১৯৩২)। নানা সাময়িকপত্রে গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতির লেখক। গ্রন্থ—অন্নদা-স্মৃতি (জীবনী), অচিন প্রিয়া (উপ)। সম্পাদক—বাঙ্গালীর বাংলা (সাপ্তাহিক, ১৩৪২)।

হরিদাস মোদক—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। শিক্ষা—বি-এ। গ্রন্থ—Methode de Traduction et de Language.

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (ভট্টাচার্য)—মহাভারতের অনুবাদক ও টীকাকার। জন্ম—১২৮৩ বঙ্গ ৭ই কার্তিক ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার মধ্যবর্তী ঊনশিয়া গ্রামে। পিতা—গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। মাতা—বিধুমুখী দেবী। শিক্ষা—প্রধানতঃ পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি এবং পিতার নিকট; বিভিন্ন পণ্ডিতগণের নিকট ন্যায়, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা। কর্ম—অধ্যাপনা, আর্যবিদ্যালয় কোটালিপাড়া (১৩১২), মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচর রাজবাড়ীর দ্বারপণ্ডিত, ত্রিবলহাটির রাজবাড়ীর দ্বারপণ্ডিত; তথায় 'হরিদাস চতুষ্পাঠী' স্থাপনা। কলিকাতায় আগমন (১৩৩৬), মহাভারতের বিরাট টীকা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি রচনা। "ব্যাকরণতীর্থ", 'কাব্যতীর্থ', 'স্মৃতিতীর্থ' 'শব্দাচার্য' (আর্য শিক্ষা সমিতি), 'সাংখ্যরত্ন', 'পুরাণ-শাস্ত্রী' ও 'সিদ্ধান্তবাগীশ' (ঢাকা সারস্বত সমাজ), 'মহোপদেশক' (কাশী ভারততীর্থ মহামণ্ডল), 'মহামহোপাধ্যায়' (গভর্ণমেণ্ট), 'মহাকবি' (পণ্ডিত মহামণ্ডল), 'ভারতাচার্য' (পুরাণ পরিষদ) প্রভৃতি উপাধিলাভ। গ্রন্থ—স্মৃতিচিন্তামণি ব্যবস্থা-গ্রন্থ, রুক্মিণীহরণ মহাকাব্য, বিরাজ-সরোজিনী নাটিকা, বঙ্গীয় প্রতাপ নাটক প্রতাপাদিত্য চরিত্র, মিবার প্রতাপ নাটক প্রতাপসিংহ চরিত্র, বিয়োগবৈভব খণ্ডকাব্য, যুধিষ্ঠিরের সময়, বিধবার অনুকল্প; টীকা গ্রন্থ (বঙ্গানুবাদ সহ)—উত্তররামচরিত, মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতীমাধব, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী পূর্বার্ধ, সাহিত্যদর্পণ, মেঘদূত (হিন্দী অনুবাদ সহ), কুমারসম্ভব (ঐ), রঘুবংশ (ঐ), অভিজ্ঞান-শকুন্তল, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, মুদ্রারাক্ষস, মহাভারত।

হরিদাস হালদার—গ্রন্থকার। কর্মের পথে, গোবর গণেশের গবেষণা, মদন পেয়াদা, বক্রেশ্বরের বেয়াকুবি।

হরিদেব শাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভারতের শিক্ষিতা মহিলা।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। মৃত্যু—১৮১০ খৃঃ। পিতা—গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন। কর্ম—ন্যায়াধ্যাপক, মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ। মূলাজোড়ের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া (১৮৮৪) নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপনা। গ্রন্থ—শক্তিবাদ-টীকা (১৮৮৪), মুক্তিবাদ-টীকা (১৮৮৭), ন্যায়তত্ত্ব প্রবোধিনী (১৮৮৭), গৌতম সূত্রের টীকা

হরিনাথ দে—বহু ভাষাবিদ্। জন্ম—১৮৭৮ খৃঃ ১৪ই আগষ্ট ২৪ পরগনার অন্তর্গত আড়িয়াদহ (দক্ষিণেশ্বর)। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ ৩১এ আগষ্ট। পিতা—রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর (মধ্য প্রদেশের আইনজীবী)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৯২), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৯৪), বি-এ (ঐ), এম-এ (ঐ, লাটিন ভাষায়)। ষ্টেট স্কলারশিপ লইয়া বিলাত গমন। দ্বিতীয় বারে আই-সি-এস পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সিংহলে যুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্তি। এই সময় ইনি গ্রীক, আরবী, হিব্রু, ফরাসী, জর্মাণী, ইতালী, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্ম—অধ্যাপক, ঢাকা গভর্নমেণ্ট কলেজ, আই ই-এস পদপ্রাপ্তি। ইনি ১৪টি ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, অধ্যক্ষ, হুগলী কলেজ, লাইব্রেরিয়ান ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী। ইনি জীবনে প্রায় লক্ষ টাকার বৃত্তি পান। ইঁহার পুস্তকাগারে প্রায় ৬০ হাজার টাকা মূল্যের মূল্যবান পুস্তক ছিল। ইনি সর্বসমেত ৩৪টি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। বহু পুঁথির অনুবাদ করেন। গ্রন্থ—Golden Treasuryর অর্থপুস্তক, Boswel's Life of Johnson's note book, শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ। চীন ভাষায় লিখিত নাগার্জুনীয়ম্ ও তাঙ্গোর পুঁথির অনুবাদ।

হরিনাথ মজুমদার—কবি ও সাময়িক পত্রসেবী। জন্ম—১৮৩৩ খৃঃ নদীয়া জেলায় কুমারখালি গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৬ খৃঃ। পিতা—হলধর মজুমদার। শিক্ষা—কুমারখালি ইংরেজি স্কুল। স্থাপনা—কুমারখালি বাংলা পাঠশালা (১৮৫৪, ১৭ই জানুয়ারী), বালিকা বিদ্যালয়, মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্র (১৮৭৩)। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য-সাধনা। কর্ম—কুমারখালির বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ইনি 'কাঙ্গাল হরিনাথ' এবং 'ফিকিরচাঁদ ফকির' নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা (মাসিক সমাচারপত্র, ১৮৬৩, এপ্রিল)। গ্রন্থ—বিজয়বসন্ত (১৮৫৯), পদ্মপুণ্ডরীক (১৮৬২), চারুচরিত্র (১৮৬৩), কবিতাকৌমুদী (১৮৬৬), বিজয়া (পাঁচালী, ১৮৬৯, ফেব্রুয়ারী), কবিকল্প (১৮৭০), অক্রূর-সংবাদ (গীতাভিনয়, ১৮৭৩, এপ্রিল), সাবিত্রী নাটিকা (১৮৭৪), চিত্তচপলা (উপ, ১৮৭৬, এপ্রিল), একলব্যের অধ্যবসায় (পাঠ্য, ১২৮১), ভাবোচ্ছ্বাস (নাটক, ১২৯১ এর পরে), কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী (১২৯৩—১৩০০), ব্রহ্মাণ্ডবেদ, ৬ খণ্ড (১২৯৩—১৩০২), কৃষ্ণকালী লীলা (পাঁচালী, ১২৯৯ (, অধ্যাত্ম আগমনী (১৩০২), আগমনী (১২৯২ এর পর), পরমার্থগাথা (ঐ), মাতৃমহিমা (১৩০৪)।

হরিনাথ মহামহোপাধ্যায়—স্মার্ত্তপণ্ডিত। গ্রন্থ—স্মৃতিসার।

হরিনারায়ণ গোস্বামী—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—হিন্দুধর্ম-চন্দ্রোদয় (মাসিক, ১৮৪৭, এপ্রিল)।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—সারসংগ্রহ (মাসিক, ১২৯৪)।

হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গর্ভিনীবান্ধব (১৮৭৫), ব্যবস্থামালা (১৮৭৩)।

হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—[illegible] (মাসিক, চুঁচুড়া ১২৮১)।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—গৃহী সখা (মাসিক, ১২৯৫), বিংশ শতাব্দী (১৩০৬)।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—গীতিনাট্যকার। জন্ম—১২৭৮ বঙ্গ হাওড়া জেলার অন্তর্গত কল্যাণপুর। মৃত্যু—১৯২৮ খৃঃ। পিতা—প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—কলিকাতা ও হুগলী নর্ম্যাল স্কুল। গ্রন্থ—(গীতাভিনয়) প্রবীর পতন, দাতাকর্ণ, কালকেতু, মতীবারণ, কালাপাহাড়, নলদময়ন্তী, পদ্মিনী, তুলসীদাস, ব্রহ্মতেজ, সংজ্ঞার স্বয়ম্বর, প্রহ্লাদচরিত্র, শুকদেবচরিত, ভৃগুচরিত, তারা, দীনবন্ধু, চাণক্য, রাণী জয়মতী, নীলকণ্ঠ, অনর্ক, অন্নপূর্ণা, যদুবংশ ধ্বংস, তুর্গাসুর, লবণ সংহার, রগড়, কৃষ্ণচরিত্র, জয়দেব, রামনির্বাসন, অতিথি সৎকার, শ্রীগৌরাঙ্গ, মেঘনাদ, জয়লক্ষ্মী, ভক্তের ভগবান, ক্ষণাদেবী; সম্পাদিত—মেঘদূতম্, রঘুবংশম্, উত্তররামচরিতম্, দশকুমারচরিতম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, শিশুপালবধম্, কুমারসম্ভবম্, কিরাতার্জুনীয়ম্, মুদ্রারাক্ষসম্, শ্রীমদ্ভাগবতম্, উপনিষদ।

হরিপদ মুখোপাধ্যায়—নাট্যকার। জন্ম—১৮৮৮ খৃঃ ২৪-পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর (খাঁটরো) গ্রামে। মৃত্যু—১৯৪৭ খৃঃ ১লা এপ্রিল হাওড়ায়। শিক্ষা—বি-এস-সি (স্কটিস চার্চ কলেজ) বি-এল। কর্ম—শিক্ষকতা হিন্দু স্কুল, আইন ব্যবসায়, আলিপুর, বনগ্রাম ও হাওড়া। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—রাণী দুর্গাবতী (১৩১৬; কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত, ১৩১৬, ১০ই পৌষ), দধীচি (দৃশ্যকাব্য, ১৩১৯)।

হরিপ্রভা তাকেদা—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নামান্তর—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। [বিজ্ঞানানন্দ দ্রষ্টব্য]।

হরিপ্রসন্ন সেন—কবিরাজ। সম্পাদক—আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী (১৮৮৫)।

হরিপ্রসাদ মল্লিক—সাহিত্যসেবী। যু-সম্পাদক—হিতবাণী (১৩২৪)।

হরিবল্লভ দাস—গ্রন্থকার। নামান্তর—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। জন্ম—১৬৬৫ খৃঃ নদীয়ার দেবগ্রামে। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৃন্দাবনবাসী। গ্রন্থ—ঐশ্বর্যকাদম্বিনী, মাধুর্যকাদম্বিনী, স্বপ্নবিলাসামৃত, গৌরাঙ্গলীলামৃত, চমৎকারচন্দ্রিকা, শ্রীমদ্ভাগবত (টীকা), শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (টীকা), অলঙ্কারকৌস্তভ (টীকা), বিদগ্ধমাধব (টীকা)।

হরিমোহন গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সন্ন্যাসী উপাখ্যান (১৮৫৯), মহাকাব্য (অনুবাদ, ১৮৭১), নারীকণ্ঠমালা (১৮৭২) অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদ (১৮৫৩)।

হরিমোহন প্রামাণিক—কবি ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১২৩৩ বঙ্গ ৫ই পৌষ, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুর গ্রামে। মৃত্যু—১২৮০ বঙ্গ ৪ঠা ভাদ্র শান্তিপুরে। পিতা—রাধামাধব প্রামাণিক। শিক্ষা—বাল্যে পিতার নিকট ইংরেজি, সংস্কৃত ও পার্সী ও যৌবনে উক্ত তিন ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ইউরোপের ও ভারতবর্ষের বহু ভাষা শিক্ষা করেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধর্মচিন্তা ইঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। গ্রন্থ—সংস্কৃত কোকিলদূত (কাব্য, ১২৭০), ভারতবর্ষীয় কবিদিগের

সময়-নিরূপণ (১২৭২-৭৮), কমলা-করুণাবিলাস (নাটক, ঐ), An Address to Young Bengal.

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—বিলাপমালা।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৮৬০ খৃঃ ১লা আগষ্ট ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগরের অদূরবর্তী রাহুতা গ্রামে। মৃত্যু—। ইনি সংস্কৃত, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী। পিতা—বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। মাতা—ভবসুন্দরী দেবী। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কর্ম—এলাহাবাদে কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে (১৮৭৮-৭৯)। অতঃপর সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া সোমপ্রকাশের ভার গ্রহণ। পুনরায় সরকারী রাজস্ব ও কৃষি বিভাগে কর্ম (১৮৮২)। গ্রন্থ—মুকুট-উদ্ধার (মহাকাব্য), অদৃষ্ট-বিজয় (ঐ), জীবন-সঙ্গীত (কাব্য), প্রণয়-প্রতিমা (না), যোগিনী (উপ), কমলাদেবী (ঐ), জীবনতারা (ঐ)।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—A Descriptive Geography of Bengal (১৮৭০), An Elementary Geography of India (১৮৬৮), কবি-চরিত ১ম (১৮৬৯)।

হরিমোহন রায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—স্বদেশ-সংস্কারক (মাসিক, ১৮২৯)। গ্রন্থ—গাথাবলি (পদ্যনীতি, ১২৮৭)।

হরিরঞ্জন ঘোষাল—ইতিহাসজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৩১৭ বঙ্গ, তুমকায়। পিতা—সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল (ভক্তিবিনোদ)। শিক্ষা—এম-এ (১১৩৪), বি-এল (১১৩৭), ডি-লিট (পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১৪৭)। কর্ম—অধ্যাপক, মিথিলা কলেজ, দ্বারভাঙ্গা (১১৪০-৪৪), বিহার বিশ্ববিদ্যালয় মজঃফরপুর। সভ্য—বিহার রিসার্চ সোসাইটি ও বিহার রিজিওন্যাল রেকর্ডস সার্ভে কমিটি। গ্রন্থ—ভারত ইতিহাস প্রবেশিকা (হিন্দী), Economic Transition in the Bengal Presidency.

হরিরাম তর্কবাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর প্রথমে। ইনি তৎকালে ন্যায়ের সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—অনুমিতিবিচার, সপ্তপদার্থনিরূপণ ব্যাখ্যা, রত্নকোষ, আচার্য্যমতরহস্য, মঙ্গলবাদ, বিষয়তাবাদ, নবীনমতবিচার, অনুমিতিপরামর্শবাদবৃদ্ধি, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-বোধবিচার, নব্যধর্ম ভাবচ্ছেদকতা, প্রত্যাসক্তিবিচার, সামগ্রীপ্রতিবাধ্য প্রতিবন্ধ ভাববিচার।

হরিরাম তর্কালঙ্কার—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—অনুমিতি-পরামর্শহেতুহেতুমদ্ভাববিচার।

হরিলাল চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ব্রাহ্মণ-ইতিহাস, বৈষ্ণব-দর্শন, পূজাপদ্ধতি, দীক্ষাপ্রণালী, শ্রীশ্রীপদরত্নমালা, বৈষ্ণব ইতিহাস।

হরিশঙ্কর দত্ত—কবি। গ্রন্থ—ময়ূরভঞ্জোপাখ্যান (ঐতিকাব্য, ১৩০৮)।

হরিশচন্দ্র কবিরত্ন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রঘুবংশ (সম্পাদক, ১৮৬৯)।

হরিশচন্দ্র নিয়োগী—কবি। ইঁহার অনেক খণ্ডকবিতা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থ—বিনোদমালা (১৩০৫), মালতীমালা (১৩০৬), প্রীতি-উপহার।

হরিশচন্দ্র মিত্র—কবি ও সাময়িক পত্রসেবী। জন্ম—হুগলী। মৃত্যু—১৮৭২ খৃঃ ঢাকা। ইনি কর্মোপলক্ষে সর্বদা ঢাকাতেই থাকিতেন। গ্রন্থ—কবিরহস্য (ঢাকা, ১৮৭২), নির্বাসিতা সীতা (১৮৭১), কবিতাকৌমুদী (১৮৭০), পদ্যকৌমুদী, কবিতাবলী, বিধবা বঙ্গাঙ্গনা (ঢাকা), বীর বাক্যাবলী, The Student's friend (ঢাকা, ১৮৬৯), চারু কবিতা। পরিচালক—মিত্রপ্রকাশ (মাসিক)। সম্পাদক—কবিতাকুসুমাঞ্জলি (ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্র, ১৮৬০, মে), অবকাশরঞ্জিনী (মাসিক, ১৮৬২, সেপ্টেম্বর), ঢাকা দর্পণ (সাপ্তাহিক, ১৮৬৩, জুলাই), কাব্যপ্রকাশ (ঢাকা, ১৮৬৪, জানুয়ারি), হিন্দুহিতৈষিণী (সাপ্তাহিক, ১৮৬৫, এপ্রিল)।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক। জন্ম—১৮২৪ খৃঃ এপ্রিল ভবানীপুরে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৮৬০ খৃঃ ১৬ই জুন। পিতা—রামধন মুখোপাধ্যায়। মাতা—রুক্মিণী দেবী। শিক্ষা—ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুল। কর্ম—তুলা এণ্ড কোম্পানীর বিল লেখক (১৮৩৮), মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসে (১৮৪৮), সহকারী মিলিটারী অডিটার। চাকুরীকালীন অবসর সময়ে বিদ্যাচর্চা, রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চা করিতেন এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশ করিতেন। হিন্দু প্রেট্রিয়টের সহিত সংশ্লিষ্ট। 'বিধবা-বিবাহের' পক্ষে (১৮৫৬), সিপাহী বিদ্রোহে (১৮৫৭) এবং নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে (১৮৬০) ইনি লেখনীর দ্বারা বঙ্গবাসীদিগকে উদবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভ্য (১৮৫২)। সম্পাদক—হিন্দু পেট্রিয়ট (সাপ্তাহিক, ১৮৫৩-৬০)।

হরিশচন্দ্র শর্মা—চিকিৎসক ও সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—অণুবীক্ষণ (মাসিক, বহুবাজার, ১২৮২)।

হরিশচন্দ্র সরকার—কবি। গ্রন্থ—দুঃখিনী (কবিতা, ১৮৭৮)।

হরিশচন্দ্র সাহু—কবি ও সমালোচক। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ বারানসী ধামে। মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ। পিতা—গোপালচন্দ্র সাহু। ইনি উত্তর-ভারতে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি 'ভারতেন্দু' উপাধি লাভ করেন। গ্রন্থ—সুন্দরী তিলক, প্রসিদ্ধ মহাত্মাকা জীবন চরিত, কবিবচন সুধা। সম্পাদক—হরিশচন্দ্রিকা।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। জন্ম—১২৬৯ বঙ্গ ভাদ্র খিদিরপুর ভূকৈলাসে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ৭ই বৈশাখ। পিতা—গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আদিনিবাস—শান্তিপুর, তৎপরে কলিকাতা, খিদিরপুর, বেহালা (১৮৮৬)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হেয়ার স্কুল)। ডফটন কলেজ, সিটি কলেজ। কর্ম—গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিসে। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যানুরাগী এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহার বহু গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ, নাটক, জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ—পঙ্কপুষ্প, মতিমহল, শীষমহল (১৩১৬), নূরমহল (১৩২০), রঙ্গমহলরহস্য (১৩২১), হারেম-কাহিনী (১৩২২), স্বর্ণপ্রতিমা (১৩২৪), শাহজাদা খসরু (১৩২৫), রূপের বালাই (১৩২৫), মরণের পরে (১৩২৬), নীলাবেগম (১৩২৬), চারুদত্ত (১৩২৬), পান্নার প্রতিশোধ (১৩২৬),

অপরাধিনী (১৩২৮), সফল স্বপ্ন (১৩২৯), সয়তানের দান (১৩৩২), রূপের মূল্য, কঙ্কণচোর, সতীলক্ষ্মী, ছায়াচিত্র, কমলার অদৃষ্ট, মৃত্যুপ্রহেলিকা, লাল চিঠি, লাল পলটন, কলিকাতা—সেকালের ও একালের (১৯১৫), দেওয়ানা (১৩২৭), রূপের মোহ (১৩২৯), রঙ্গমহল (১৩০৫), সতীর সিন্দুর (১৩২৭) ; নাটক—আকবরের স্বপ্ন (১৩১৭), বঙ্গে বিক্রম, মায়া, ঔরঙ্গজেব।

হরিহর চট্টোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—যমুনা (মাসিক, ১২৯৬)।

হরিহর চট্টোপাধ্যায়—পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। ইঁহার পুত্র রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য। গ্রন্থ—সময়-প্রদীপ।

হরিহর শাস্ত্রী—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—(আনু) ১২৯৬ বঙ্গ। মৃত্যু—১৩৩৮। অধ্যাপক, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—তর্ক-সংগ্রহ, তর্ক-সংগ্রহ-দীপিকা, ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ন্যায়লীলাবতী (টীকা সহ), প্রবন্ধ-পঞ্চক।

হরিহর শেঠ—দানশীল, বিদ্যোৎসাহী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৫ বঙ্গ ২৮এ অগ্রহায়ণ চন্দননগর পালপাড়ার বিখ্যাত শেঠ-বংশে। পিতা—নিত্যগোপাল শেঠ। মাতা—কৃষ্ণভাবিনী। শিক্ষা—সেণ্ট মেরীজ ইনসটিটিউসন (চন্দননগর), হুগলী কলেজিয়েট স্কুল, হুগলী কলেজ, রিপন কলেজ। কর্ম—ব্যবসায়। স্থাপনা—চন্দননগরে নিত্যগোপাল অবৈতনিক বিদ্যালয়। অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দির (১ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে), তারকদাসী কল্যাণ-সদন, নিত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির (পাঠাগার ও টাউন হল), শম্ভুনাথ সেবাশ্রম (দাতব্য চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা)। সভাপতি, কলিকাতা আয়রণ মার্চেণ্টস অ্যাসোসিয়েসন, সুহৃদ সমিতি, চন্দননগর পুস্তকাগার, রবীন্দ্র মানস, ডাঃ শীতলপ্রসাদ ঘোষ আদর্শ বিদ্যালয়। মেয়র, চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটি, চন্দননগর শাসন পরিষদের ও পৌর সভার প্রথম সভাপতি (১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট) ; সহ-সভাপতি, ক্যালকাটা হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটি, হুগলী ডিষ্ট্রিষ্ট লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসন, হুগলী সাহিত্য পরিষদ, কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির। এতদ্ব্যতীত বাঙলা দেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সম্মানলাভ—Officer d' Academic (ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ১৯২৬), 'Chevalier d la Legion d' honur' (ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত, ১৯৩৪), 'Officer de t'instruction publique' (ঐ, ১৯৩৫), 'বিদ্যাবিনোদ' 'কৃতীনিধি' (বিশ্বমানব মহামণ্ডল, নদীয়া, ১৩২৯), 'সাহিত্যভূষণ' (সারস্বত মহামণ্ডল, ১৩৩৫), 'শিক্ষাবন্ধু' (১৩৪৫), 'দেশশ্রী' (১৩৪৭)। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ১২।১৩ বৎসর বয়সে 'সখা' এবং মাদ্রাজের 'প্রগ্রেস' কাগজে ধাঁধা লিখিতে আরম্ভ করেন। ২২ বৎসর বয়সে ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'অভিশাপ' প্রকাশিত হয়। ছাত্রাবস্থা হইতে ইঁহার [illegible], ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতিতে প্রায় ৩০০ শতাধিক রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে [illegible]শিত হয়। শিক্ষাবিস্তারে, সাহিত্য-সাধনায়, লোকহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ইনি বহু লক্ষ টাকা দান করেন। গ্রন্থ—অভিশাপ (উপন্যাস, ১৩১৫), প্রমাদ (প্রবন্ধ, ১৩১৬), অদ্ভুত গুপ্তলিপি ও অমৃতে গরল (১৩১৬), প্রতিভা (নাটক, ১৩২৮), স্রোতের ঢেউ (চিন্তাকণা, ১৩২৯), ঘরের কথা (প্রবন্ধ, ১৩৩১), পুরাতনী (১৩৩৪), কলিকাতা পরিচয় (১৩৪১), মুক্তিসাধনায় চন্দননগর (১৩৫৭), প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (কথায় ও চিত্রে, ১৩৫৯)।

হরিহরানন্দ ব্রহ্মচারী—গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা। ঢাকা ব্রহ্মচারী স্কুলের অন্যতম উদ্যোক্তা। গ্রন্থ—দিব্যজ্ঞান বা নীতিকাব্য (১৯০১)।

হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৮৯৮ খৃঃ। পিতা—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি সুপ্রসিদ্ধা সরোজিনী নাইডুর অগ্রজ। শিক্ষা—হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য। ইংরেজী কবিতা, নাটক, চিত্রকাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত। সারা ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ এবং চিত্রজগতের বহু অভিজ্ঞতা লাভ। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য। ইংরেজি বহু কবিতা ও গ্রন্থ রচনা। কাব্যগ্রন্থ—Feast of Youth, Perfume of Earth, Grey Clouds.

হরেকৃষ্ণ পট্টনায়ক—সাংবাদিক ও দেশকর্মী। জন্ম—১২৯৭ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলায় পাঁশকুড়ায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (পাঁশকুড়া হাই স্কুল)। ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান ও দেশসেবায় আত্মনিয়োগ। প্রতিষ্ঠাতা—পট্টগ্রাম, পট্টভারতী প্রেস, 'প্রলাপ' সাপ্তাহিক পত্র। গান্ধী বিদ্যাপীঠ, পরমেশ্বর বামা পাঠশালা। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। সম্পাদক—প্রলাপ পত্রিকা।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বৈষ্ণব পণ্ডিত। জন্ম—১২৯৬ বঙ্গ ২৫ চৈত্র বীরভূম জেলায় কর্মিতা গ্রামে। নিজ অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে বৈষ্ণব সাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ রচনা গ্রন্থ—বীরভূম বিবরণ ; সম্পাদিত গ্রন্থ—কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলী (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ)।

হরেন্দ্রকুমার মজুমদার—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—ছাত্র (মাসিক, ১৩০৩, অগ্রহায়ণ)।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা জেলার সাভার নামক স্থানে। শিক্ষা—বি, এ। গ্রন্থ—আদর্শ নারী-চরিত, জীবন-লহরী।

হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার ও ব্যবহারজীবী। জন্ম—১৮৮৯ খৃঃ ৩রা এপ্রিল ফরিদপুর জেলায়। মৃত্যু—১৯৫২ খৃঃ ২০এ নভেম্বর কলিকাতায়। পিতা—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ফরিদপুর), এফ্-এ, ও বি-এ অনার্স সহ (রাজশাহী পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার), এম-এ (কলিকাতা), বি-এল (ঐ, স্বর্ণ পদক-প্রাপ্ত)। কর্ম—প্রথমে আইন ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট ; প্রাদেশিক বিচার বিভাগে। অবসর গ্রহণ (১৯৪৩)। বহু আইনগ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—Indian Limitation Act (১৯১৭), Indian Evidence Act (১৯১৯), Bengal Tenancy Act (১৯১৮), Bengal Regulation (১৯১৮), Civil Procedure Code (১৯১৯), Criminal Pro. Code (১৯২০), Penal Code (১৯২০), Indian Registration Act (১৯২৪), India's New Constitutions (১৯৪১), Assam Tenancy Act (১৯৪৩), Assam Revenue Act

(১৯৪৪), Qs. & Ans. on Indian Constitution. এতদ্ব্যতীত Students Companion Series নামে ১৪খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও প্রদেশপাল। জন্ম—১৮৭৭ খৃঃ ৩রা অক্টোবর কলিকাতার এক খৃষ্টান-পরিবারে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (রিপন কলেজিয়েট স্কুল, ১৮৯৩), এফ্-এ (রিপন কলেজ, ১৮৯৫), বি-এ, এম-এ (১৮৯৮)। কর্ম—শিক্ষক, সিটি কলেজিয়েট স্কুল, অধ্যাপক, বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজ, অধ্যক্ষ, (ঐ, কিছুদিন), অধ্যাপক, সিটি কলেজ (১১০০—১৯১৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৫), পি-এইচ-ডি (কলি. বিশ্ব, ১৯১৮, ইংরেজিতে ১ম পি, এইচ-ডি); ইনসপেক্টর অব কলেজেস (১৯১৯—৩৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অফ ইংলিশ, অবসর গ্রহণ ১৯৪১। কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লির ভাইস প্রেসিডেণ্ট (১৯৪৭), বাংলা আইন-সভার সদস্য (১৯৩৭—১৯৪২), সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ানস (দুই বার), মাইনরিটি সাব কমিটির চেয়ারম্যান (১৯৪৭-৪৮)। শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা দান। পশ্চিম বাংলার প্রদেশ-পাল (১৯৫১, ১লা নভেম্বর), বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রাজনীতি ও ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ—Indians in British Industries, Congress and the Masses, He follows Christ, why Prohibition ? Hemp-drug in India, Opium and its Prohibition.

হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—গ্রন্থকার। কুচবিহার নিবাসী। গ্রন্থ—The Coachbihar State and its Land revenue (কুচবিহার, ১৯০৩)।

হলধর সেন—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। সম্পাদক—চিকিৎসা-রত্নাকর (মাসিক পত্র, ১৮৫৩, নভেম্বর)।

হলায়ুধ ভট্ট—বঙ্গীয় স্মার্তপণ্ডিত। জন্ম—১০-১১শ শতাব্দীর প্রথম পাদে চট্টোপাধ্যায় বংশে। পিতা—ধনঞ্জয়। মাতা—উজ্জ্বলা। প্রথম বয়সে লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত, পরে ধর্মাধ্যক্ষ। গ্রন্থ—ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, দ্বিজনয়ন।

হাফিজল হাসান, মৌলভী মুহম্মদ—বঙ্গীয় মুসলমান গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত, সুধাকর পঞ্জিকা (১৩৩৭)।

হামিদ আলি—মুসলমান কবি। জন্ম—১৮৭৪ খৃঃ চট্টগ্রাম জেলায় রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে। আর্বী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। কর্ম—সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলভী। গ্রন্থ—জয়নালোদ্ধার, কাসেম বধ, কবিতাকুঞ্জ, ভ্রাতৃবিলাপ, সোহরাব বধ কাব্য।

হামিদুল্লা—প্রাচীন কবি। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—ভেলুয়া-সুন্দরী (কাব্য)।

হারাণচন্দ্র কাব্যতীর্থ—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—চণ্ডিল (১৩৩৪—৫)।

হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—An Important Historical Discovery of an inscription in the Rajbari at Dinajpur (রাজারামপুর, ১৮৭২)।

হারাণচন্দ্র চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শেরপুর বিবরণ (মৈমনসিংহ, ১৮৭২)।

হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—বঙ্গবার্তাবহ (পাক্ষিক, ১৮৫৫, মে)। গ্রন্থ—History of Asia (১৮৬৮)।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত—গ্রন্থকার। জন্ম—২৪-পরগনায় অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে। গ্রন্থ—সাহিত্যসাধনা (১৯৩১), ভক্তের ভগবান, বঙ্গের শেষ বীর, চিত্রাগৌরী, জ্যোতির্ময়, দুলালী, প্রতিভা-সুন্দরী, বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গসাহিত্য। কামিনীকাঞ্চন, মন্ত্রের সাধন, ফুলের বাগান, প্রেম ও শান্তি, রামকৃষ্ণ-শান্তিশতক, রাণী ভবানী, সেক্সপীয়ার। সম্পাদক—কর্ণধার (মাসিক, ১২৯৪-৯৬)।

হারাণচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। অনূদিত গ্রন্থ—ললিত কাহিনী, ৬ খণ্ড (১৮৭১)।

হারাণচন্দ্র রাহা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রণচণ্ডী (উপ, ১৮৭৬), সরলা (উপ, ১৮৭৬)।

হারাণশশী দে—গন্থকার। গ্রন্থ—লবঙ্গলতা (উপ, ১৩০২), রাণী মৃণালিনী (১৩০৬), প্রভাবতী বা আমার বিবাহ।

হারাধন বক্সী—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—লড়াইয়ের নূতন কায়দা, ঈশোপনিষদ্, Towards Transcedence, A Preface to Brahma-sutra, Krishna-Karmham.

হারাধন বিদ্যারত্ন—কবিরাজ। গ্রন্থ—বসন্তরোগের নিদান ও চিকিৎসা (১৮৬৮), নিদানপরিশিষ্টম্ (১৮৬৩)।

হারাধন রায়—গীতিনাট্যকার। গীতিনাট্য গ্রন্থ—পরাশর, যোগমায়া, রাম অবতার, যযাতি, দেবযানী, নলদময়ন্তী, পার্থ-পরীক্ষা, তাম্রধ্বজ, ধর্মের জয়, কাদম্বরী।

হারানন্দ শর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রামায়ণ (১৮৬৮)।

হাসান আলি—সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—ঢাকা জেলায়। মৃত্যু—১৭৮৬ খৃঃ। অতি অল্প কালের মধ্যেই সঙ্গীতকলায় পারদর্শিতা লাভ। মহীশূরের টিপুসুলতানের সভার সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—মুকরিহ অল্-কুলুব (ফার্সী ভাষায়, ১৭৮৫)।

হিতলাল মিশ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রামগীতা (অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গানুবাদ, ১৮৬২)।

হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গীতিকার। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বংশে। মৃত্যু—১৯০৮ খৃঃ। পিতা—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন। 'সঙ্গীতানন্দ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ। গ্রন্থ—হিত গ্রন্থাবলী।

হিরণ্ময়ী দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ। মৃত্যু—১৯২৫ খৃঃ ১৩ই জুলাই। পিতা—জানকীনাথ ঘোষাল। মাতা—স্বর্ণকুমারী দেবী। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনার উন্মেষ হয়। গদ্য ও পদ্য বহু রচনা ভারতী, পথিক, সখায় প্রকাশিত হয়। প্রথম রচনা—'ভাইবোনের দোলনা' (সখা, ১৮৮৩)। সখি-সমিতির কর্মকর্ত্রী। যুগ্ম-সম্পাদিকা—ভারতী (মাসিক, ১৩০২-৪)।

হিমাংশুপ্রকাশ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ছেলেদের কাদম্বরী।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতী
অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

মা ও ছেলে
—অন্নদা মুন্সী অঙ্কিত

সোনালী ধান

শ্রীকামিনীকুমার রায়

ধান উষ্ণ এবং স্বল্প উষ্ণমণ্ডলের সর্বপ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের ইহা প্রধান খাদ্য-শস্য। ভারত এবং পাকিস্তানেরও অর্ধেকের অধিক অধিবাসী চাউলের উপর নির্ভর করে।

সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক ধান এসিয়াতে জন্মে; আবার এই ৯০ ভাগের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৭০ ভাগই উৎপন্ন হয় চীন, ভারতবর্ষ (পাকিস্তান সহ) ও জাপানে। অথচ লোকসংখ্যার আধিক্য হেতু এই তিনটি প্রধান চাউল উৎপাদক দেশকে স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অন্য দেশ হইতে প্রচুর চাউল আমদানী করিতে হয়। রপ্তানীকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড প্রধান।

ধান্য উৎপাদনের দিক দিয়া চীন, ভারত, পাকিস্তান ও জাপান পৃথিবীর মধ্যে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২১ ভাগ এবং পাকিস্তানের ৮ ভাগ। ভারতে মোট আবাদী জমির শতকরা ২৮ ভাগ (কিঞ্চিদধিক) ধান-চাষে নিয়োজিত।

মৌসুমী অঞ্চল ধান চাষের প্রধান কেন্দ্র। ধান পলিময় বা কাদামাটিযুক্ত ভূমিতে ভাল জন্মে; স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। ধানগাছের উপযুক্ত পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন অধিক উত্তাপ, তেমনি যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। কৃষিবচনেও আছে,—'দিনে রোদ রাতে জল, তবে বাড়ে ধানের বল।' কিন্তু ধান পাকিয়া উঠিবার সময় হইতে সংগ্রহ-কাল পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক ও উষ্ণ না থাকিলে ফলন ভাল হয় না। ধানের চাষ-আবাদের জন্য বহু সংখ্যক সুলভ শ্রমিকেরও একান্ত আবশ্যক। ভারতের (পাকিস্তান সহ) বহু স্থানেরই মৃত্তিকা, জল-বায়ু এবং জনবল ধান চাষের অনুকূল। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ ধান উৎপাদনে প্রধান। বোম্বাই রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে, পশ্চিম-পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশেও ধান উৎপন্ন হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ ধান এক বঙ্গদেশেই উৎপন্ন হইত; কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে বাংলার ধান উৎপাদনকারী প্রধান জেলাগুলি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ব্রহ্মদেশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া ওঠায় ধান্য উৎপাদনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। 'ভারত বিভাগের ফলে সমগ্র ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ লোক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী, কিন্তু ধান চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ লোকবণ্টনের অনুপাতে স্বল্প। অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপন্ন ধানের মাত্র শতকরা ৬১ ভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হয়। আসাম, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে উৎপন্ন ধানের কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিলেও মাদ্রাজ, বিহার, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে ধানের ঘাটতি পড়ে এবং প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলির সমস্ত উদ্বৃত্ত চাউল শেষোক্ত ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত হইলেও চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প হয়। সুতরাং সমস্ত পতিত জমিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে এই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে।' (ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল—শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ধান উৎপন্ন হয়,—আউশ, আমন, বোরো। আউশ বর্ষাকালের, আমন হেমন্তকালের এবং বোরো গ্রীষ্মকালের ফসল। ইহাদের মধ্যে আমন ধানই সর্বোত্তম এবং ইহার ফলনও সর্বাধিক। বাংলার পল্লীকবি গাহিয়াছেন,—'আগন মাসে বাঙ্গা ধান জমীনে ফলে সোনা।' সন্তোষকুমার শেঠ মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গে চালতত্ত্ব' গ্রন্থে ধান-চাল সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাংলা দেশের সকল জেলাতে সকল রকম ধানের যে বহু বিস্তৃত আবাদ হইয়া থাকে, তাহা নহে। ধানের যে সকল বিভিন্ন নাম আছে, তাহার শ্রেণীভেদ করিবার জন্য একমাত্র স্থানীয় অভিজ্ঞ কৃষক ব্যতীত আর কাহারও করিবার ক্ষমতা নাই। অভিজ্ঞ কৃষকেরা বলে যে, এক এক জমির এমন গুণ আছে যে, সেই সেই জমি ভিন্ন ঐ সকল ধান অন্য কোন জমিতে জন্মিতে পারে না বা জন্মিলে সেই জমির ফসলের ন্যায় ফসল হয় না। এমনও এক এক ধান আছে যে, তাহা বরাবর এক স্থানের এক খণ্ড বিশেষ ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রের বাহিরে এক হাত দূরে অন্য ক্ষেত্রে আবাদ করিলে আর তেমন ফসল হয় না।' উক্ত তিন শ্রেণীর ধানেরই বীজ বপন এবং চারা রোপণ করা চলে। ইহাদের প্রত্যেকের অন্তর্গত যে কত নামের কত প্রকার ধান আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তদুপরি একই ধানের এক এক অঞ্চলে এক এক নাম,—এইরূপও দেখা যায়। তবে ইহাও সত্য যে, এক জাতির ধান হইলেও ভূপ্রকৃতি এবং জল-বায়ুর গুণে বিভিন্ন স্থানে উহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে কিছুটা তারতম্য ঘটে। ভারতে এক 'আন্তর্জাতিক কৃষি-প্রদর্শনী'তে দশ হাজার রকম ধানের নাম পাওয়া গিয়াছিল এবং চার হাজার রকম ধানের নমুনা প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল।'

বাঙ্গালী তাহার প্রিয় সোনার ধানের কত অদ্ভুত সুন্দর বিচিত্র নামই না রাখিয়াছে! বলিতে গেলে বলিয়া শেষ করা যাইবে না, তবু এখানে বিচিত্র রকমের কয়েকটি নাম উপস্থিত করা হইল:—নেয়ালি, নাগরা, ভাসামাণিক, কলমা,—কলমার আবার কত জাত,—দুধকলমা, জটাকলমা, কার্তিক কলমা, মাণিক কলমা, ভূত কলমা, কালভূত কলমা, নয়ান কলমা, কাল আচিল কলমা,; বালাম, দাদখানি, বাঁশমতি, বাঁশফুল, ছাঁচি মউল, কলমকাটি, উড়শাল, হাতীকান, বাদশাভোগ, বাদশাপছন্দ, হরকালী, রাজমহল, লক্ষ্মীকাজল, সুধাভোগ, গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, সোনামুখী, গৃহিণীপাগলা, রাণীপাগলা, রাঁধুনীপাগলা, মহীপাল, হাতীশাল, মাণিকমুক্তা, মুক্তাহার, গজমুক্ত, খেজুরছড়ি, পায়রাউড়ি, পিঁপড়াসারি, লতামৌ, বেনাফুলি, বেগুনবীচি, হাতীদাঁত, লোহাডাং, রূপশাল, বাঁশগজাল, শিয়ালরাজা, বাঘানেপা, বংশীরাজ, আকাশমণি, সীতালক্ষ্মী, সূর্যমণি, সোনাগাজি, সিন্দুরকৌটা, সিন্দুরমুখী, হরিরাজ, চিনিসাগর, লালকর, দুধসর, বুঁচি, বিরই, বেতো, চেঙা, যাঠি, রাঙ্গি, রাইমণি, আঁধারকালী, সমুদ্রফেনা, সমুদ্রবালি, মধুমালতী, মাণিকশোভা, কনকচুর, কালজিরা, চামরমণি, বাঁকতুলসী,

কাটাবিভোগ, কর্পূরকাটি, খাসকামাণি, বাঁকচুর, গৌরাঙ্গশাল, বক্কেশ্বর, রাজকিশোর, রূপনারায়ণ, জনকরায়, হাতী, নারিকেলফুল, পাটেশ্বরী, পারিজাত, সজনী, শঙ্খমুখী, স্বর্ণখড়গ, সুন্দরী, চরণজী, আশ্রমশাল, গন্ধমাধব, গন্ধমালতী, জামাইভোগ, জামাইনাড়ু, সুলতানচাঁপা, তুলসীমালা, তুলসীহস্তা, গঙ্গাজল, পদ্মকেশরী, শ্যামলী, কালিন্দী, বারুণী, লীলাবতী, চন্দনচূড়া, যাত্রামুকুট, লক্ষ্মীদীঘা, কৌতুকমণি, পক্ষীরাজ, হনুমানজটা, কালমাণিক, সোনাদীঘা, সন্ধ্যামণি ইত্যাদি।

ধানের চাষ-আবাদ প্রথম কোন্ যুগে কোথায় হইয়াছিল, তাহা সঠিক বলা যায় না। কেহ বলেন, 'খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে চীনদেশে এবং অপেক্ষাকৃত পরে ভারতে ও পারস্যে ধান্যের চাষ আরম্ভ হয়। তৎপরে ইজিপ্ট এবং সুদূর পশ্চিম স্থান সমূহে বিস্তৃতি লাভ করে।' কেহ বলেন, 'বৈদিক যুগে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই ধান্য পরিচিত ছিল না। সেখান হইতে চীন দেশেই উহার চাষ প্রথম প্রবর্তিত হয়। খৃষ্টের জন্মের ২৮০০ বৎসর পূর্বে চীন সম্রাট বিয়ান ধান্যোৎসব প্রথা প্রবর্তন করেন। ঐ উৎসবে সর্বপ্রথম স্বয়ং সম্রাট স্বহস্তে এক বিশিষ্ট প্রকার ধান্য-বীজ বপন করেন এবং তৎপর সম্রাটের চারি পুত্রও অন্য চারি প্রকার ধান্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। * * তৎকাল হইতেই চীন দেশের প্রায় সর্বত্রই ধান্যের চাষ চলিতেছে।' ক্ষেত্রব্রতের এক 'ব্রতকথা'য়ও এক কাঠুরিয়াকে রাজার বাড়ী হইতে বীজধান সংগ্রহ করিতে দেখিতে পাই।

মনে হয়, বনের ফল-ফুলের ন্যায় ধানও তৃণাদির সৃষ্টির প্রথম হইতেই নানা দেশে বিনা চাষ-আবাদে আপনা হইতেই জন্মিত, এখনো যেমন অনেক স্থলে জন্মে। অনেক ব্রতে বিনা চাষের এই ধান আবশ্যক হয় এবং অনেক খুঁজিয়া আনিতে হয়। ময়মনসিংহে জলাভূমিতে 'ঝরার ধান' নামে এক প্রকার ধান হয়, উহার জন্য চাষ-আবাদের প্রয়োজন হয় না। আগুন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে মানুষ হয়তো বাঁদর বা পাখীর ন্যায়ই এরূপ সহজলভ্য ধান হইতে চাল খুঁটিয়া খুঁটিয়া বা অন্য ভাবে বাহির করিয়া খাইত। আগুন আবিষ্কৃত হইবার পরও তাহারা বহু দিন ভাত রাঁধিতে শিখে নাই, ফল-মূলসহ আতপ চাল এবং খৈ খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিত। আর্যরা অগ্নিতে লাজ নিক্ষেপ করিয়া লাজ-হোম করিতেন, শুভকার্যে লাজ ছড়াইলেন এবং লাজ বর্ষণ করিতে করিতে মৃতদেহ শ্মশানঘাটে লইয়া যাইতেন। দেবতার উদ্দেশে আতপ-চালের নৈবেদ্য এবং মৃতের উদ্দেশে আতপের পিণ্ড দিতেন। ইহার কারণ এই যে, ভাতেরও অনেক পূর্বে আরাঁধা চাল এবং খৈকেই তাঁহারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহাই তাঁহাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য ছিল, তাই দেবতাকেও তাঁহারা তাঁহাদের এই প্রধান খাদ্য দিয়া তৃপ্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের অনুরূপ আচরণের ভিতর দিয়া আর্যদের সেই ভাতপূর্ব যুগের স্মৃতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মনে হয়, ভাত আবিষ্কারের পর হইতেই অযত্নজাত ধানের যত্ন ও আবাদ আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে অনুকূল মৃত্তিকা ও জল-বায়ুর মধ্যে দেশে দেশে উহার চাষ-আবাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ভারতের অর্ধেক অধিবাসী গমভোক্তা বটে; কিন্তু বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য ধান; ইহা তাহার বৎসরের সর্বপ্রধান ফসলও বটে। এই ধান শুধু তাহার জীবন রক্ষাই করে না, অন্য বিবিধ প্রয়োজনের লাগিদও মিটায়। গ্রাসাচ্ছাদনের পর উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করিয়া সে বহু খরচ-পত্রেরও সংকুলান করে। যে বৎসর ইহার ফলন ভাল হয় না, অজন্মা ঘটে, সে বৎসর গৃহস্থের আর দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। এই ধান নির্বিঘ্নে আশানুরূপ সংগ্রহ এবং গোলাজাত করিতে পারিলেই তাহার শান্তি-স্বস্তি এবং দশের দেশেরও কান্তি পুষ্টি। উদরের জ্বালাই তো মানুষের বড় জ্বালা! বাঙ্গালী এই জ্বালা নিবৃত্ত করে এক মুষ্টি ভাত খাইয়া। উপকরণ সে চায় না, চায় শুধু এক মুষ্টি ভাত। ভাত না খাইলে সে বাঁচে না। ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের কথা, 'বার কাইট্যা আকালের' কথা আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি; এই সে দিনের ১৩৫০ সালের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মূর্তিও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ভাতের অভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী কীট-পতঙ্গের মতো প্রাণ হারাইয়াছে। দেশে ধান দুর্লভ হইলে বাঙ্গালী চারদিক অন্ধকার দেখে। প্রাণের দায়ে স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিয়া দেয়, নতুবা তাহাদিগকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে ফেলিয়া পলাইয়া যায়, আত্মহত্যা করে, ক্রীতদাস হয়। জল-বায়ু যেমন জীবের জীবন, ধানও তেমনি বাঙ্গালীর জীবনস্বরূপ। কিন্তু ইহার ফলনের জন্য এই বিজ্ঞানের যুগেও তাহাকে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হয়; প্রকৃতি আবার প্রায়ই ধান-চাষীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অথবা জলপ্লাবনে তাহার সোনার ফসল বিনষ্ট করিয়া দেয়। অতীতে বাঙ্গালী বহু বার এই চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছে এবং এখনো প্রায়ই হইয়া থাকে। দরদী পল্লীকবির রচনায় তাহাদের সেই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণের আর্তনাদ মূর্ত হইয়া রহিয়াছে।

এখানে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' হইতে অতীত কালের দুর্ভিক্ষ-দিনের দুইটি চিত্র উপস্থাপিত করিতেছি। জলপ্লাবনে সোনার ধান সব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। টাকায় ৬/ মণ ধান (দেড় আড়া), তাহাও কিনিবার পয়সা নাই, লোকে ভাবিয়া 'কূল-কিনারা পাইতেছে না:—

"মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে শিরে দিয়ে হাত।
সারা বছরের লাগ্যা গেছে হবের ভাত।
টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল।
কি দিয়া পালিব মায় কোলের ছাওয়াল।"

এমনি আর এক আকালের দিনে পরমাত্মীয় মাতুল এক মণ দশ সের (পাঁচ কাঠা) ধান লইয়া স্নেহের ভাগিনেয় 'কেনারাম'কে বিক্রয় করিয়া দেয়। চন্দ্রাবতীর 'দস্যু কেনারামের পালায়' তাহা মূর্ত হইয়া আছে:—

"গরু বাছুর বেচিয়া খাইল খাইল হালিধান (বীজধান)।
স্ত্রী পুত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমান।
পরমাদ ভাবিল মাতুল কেমনে বাঁচে প্রাণ।
কেনারামে বেচল লইয়া পাঁচ কাঠা (এক মণ দশ সের) ধান।

এক মুষ্টি ভাতের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণ যায়! বাংলার ভূপ্রকৃতি এবং জল-বায়ুই বাঙ্গালীকে 'ভেতো' করিয়াছে। পলিমাটির

দেশ বাংলা ধান-চাষের পক্ষে যেমন উপযোগী, গমের পক্ষে তেমন নহে। রেশনের যুগে ১০।১২ বৎসর গম খাইয়াও বাঙ্গালী তাহা ধাতস্থ করিতে পারে নাই। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই নদীমাতৃক ও দেবমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসীরা 'ভেতো' হইয়াছে। এজন্য তাহাদের লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই।

সে-কালে দেশে অর্থের বড় অভাব ছিল, কিন্তু জিনিষ-পত্রের তেমন অভাব ছিল না। তখন বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল, অর্থাভাবে এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যাইত। বিনিময়ের ক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান ছিল সর্বপ্রধান। গৃহস্থরা ধানের বিনিময়ে বস্ত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিত। কুমার মাটির হাঁড়ি-কলসী লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইত, সে-সকল জিনিষ দ্বারে দ্বারে উজাড় করিয়া দিয়া সে ধান লইয়া বাড়ী ফিরিত। মৎস্যজীবিনীরাও গৃহস্থের নিকট মৎস্য বিক্রয় করিয়া মূল্য লইত ধান। নিভৃত পল্লীগ্রামে এখনো এইরূপ বিনিময়-প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ভৃত্যের বেতনাদিও তখন ধান্য দ্বারা প্রদত্ত হইত। কুমার এবং গ্রহাচার্যরা দেব-দেবীর প্রতিমা গড়িত, গৃহস্থ তাহাদিগকে বৎসরে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিত। ধোপা, নাপিত, মালী—তাহারাও তাহাদের বৃত্তির জন্য গৃহস্থ হইতে ধান পাইত। অনেক ক্ষেত্রে অবস্থাপন্নরা ধানের পরিবর্তে উপযুক্ত পরিমাণ ধানের জমিই ঐ সকল বৃত্তিধারীদিগকে পুরুষানুক্রমে দান করিয়া রাখিতেন। বস্তুতঃ, রাজস্ব আদায় বা এইরূপ কোন গুরুতর কার্য ব্যতীত তখন নগদ টাকার বড় প্রয়োজন হইত না; এই টাকাও আবার প্রায়ই ধান্য বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইত। অন্তর্বাণিজ্যেও তখন ধান-চালের বিশেষ স্থান ছিল; বাংলার ধান-চাউল এক সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে সিংহলে, মালয়ে রপ্তানী হইত। এই ধান-চালের ব্যবসা করিয়া বাঙ্গালী তখন সোনার থালে ভাত খাইত। ইহার মধ্যে কল্পনা-বিলাস অল্পই আছে; সোনার বাংলার সোনার ফসল ছিল ধান। —'পাইক্যা আইছে শাইলের ধান সোনার ফসল।' গোয়ালভরা গোরু, গোলাভরা ধান এবং পুকুরভরা মাছ—এক কালে বাঙ্গালীর ঐশ্বর্যের পরিচায়ক ছিল। অন্য কোন ফসলকে বাঙ্গালী লক্ষ্মী বলে না, কিন্তু ধানকে লক্ষ্মী বলা হয়; ধানের, ধানছড়ার সে পূজা করে। জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ধান্য বপন, রোপণ, ছেদন, সংগ্রহ, স্থাপন ইত্যাদি কত ব্যাপারে সে কত রকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। পঞ্জিকায় এই সকল কৃত্যের শুভদিন নির্দিষ্ট আছে। প্রথম যে দিন সে জমিতে চাষ দেয়, লাঙ্গল জোয়াল গোরু এবং ভূমিকে, ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সে যথারীতি পূজা করে; ফলার অগ্রভাগ সোনা দিয়া ঘষে। প্রথম বীজবপন কালেও তিন মুষ্টি বীজ সোনার জলে ধোয়; সোনালী ধানের সে স্বপ্ন দেখে, সোনার স্পর্শে সোনার ধানে তাহার ক্ষেত-খামার ছাইয়া যাক্—দেবতার কাছে এই সে প্রার্থনা করে।

স্ত্রীলোক অন্তঃসত্ত্বা হইলে যেমন তাহাকে 'সাধভক্ষণ' করানো হয়, ধানের গর্ভেও শীষের উদ্গম হইলে বাঙ্গালী গন্ধাদি দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করে। ময়মনসিংহে দেখিয়াছি, আশ্বিনের সংক্রান্তিতে কৃষক-গৃহস্থরা আমের পাতায় সুগন্ধি মশলা মাখাইয়া ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে তাহা পাঁকাটির মাথায় করিয়া গুঁজিয়া দিয়া আসে, বলে,—

'আশ্বিন যায় কার্তিক আসে সকল শস্যের গর্ভ বসে,
রামের হাতের 'গুমা' ধান হইস তিন দুনা।'

দেখিতে দেখিতে ধান, আমন ধান পাকিয়া উঠে; এই ধান বাড়ীতে আসিলে গৃহস্থ মনে করে, লক্ষ্মী গৃহগত হইল। তাই ইহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিবার প্রস্তুতি চলে পূর্ব হইতেই; এই সময় কৃষিজীবী পল্লীবাসীরা তাহাদের জীর্ণ পুরাতন ঘর-দুয়ার সংস্কারে মনোযোগী হয়; খুঁটি, বেড়া, ছাউনি সব নাড়িয়া ঝাড়িয়া নূতন করিয়া লয়. উগার, মাচা, মরাই, গোলা, গোচালা (খড় নাড়া রাখিবার ঘর) সব নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। উঠান, আঙ্গিনা, খামার আবর্জ্জনামুক্ত ও মার্জিত হইয়া তক্ তক্ করিতে থাকে। তারপর এক শুভদিনে আরম্ভ হয় ধান-কাটা ও সংগ্রহের মহানন্দময় পালা। পঞ্জিকায় 'ধান্যচ্ছেদনের' শুভদিন নির্দিষ্ট থাকে। সেই দিন গৃহস্থ স্নান করিয়া, উপবাস থাকিয়া, নূতন কাপড় পরিয়া কাস্তে হাতে মাঠে যায় এবং এক মুষ্টি (গোছা) ধান কাটিয়া লইয়া, তাহা মাথায় করিয়া ঘরে ফিরে এবং সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া, প্রণাম করিয়া ঘরের কোথাও বিশেষ স্থানে তুলিয়া রাখে। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও প্রথম দিন ধান কাটিবার সময় কৃষকেরা পাঁচটি 'বাতা' গাছের অগ্রভাগ লইয়া ক্ষেতে যায় এবং পাঁচটি ধানের শীষ কাটিয়া লইয়া সেই পাঁচটি ডগার সঙ্গে সেগুলি কাপড়ে জড়াইয়া, মাথায় করিয়া ঘরে ফিরে। পল্লীগীতিতেও কৃষকের এই চিত্রটি ধরা পড়িয়াছে :—

'পাকুগাছি বাতার ডুগল (অগ্রভাগ) হাতেতে লইয়া।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।'

কৃষকের তখন এতটুকু অবসর থাকে না, সোনালী ধানে মাঠ ছাইয়া আছে; কত যত্নের কত প্রতীক্ষার সে ধান! দলে দলে কৃষক সে-ধান কাটিয়া, আঁটি আঁটি বাঁধিয়া বাড়ী আনে; খলায়-খামারে ফেলিয়া গোরু দ্বারা মাড়াইয়া অথবা লোক দ্বারা আছড়াইয়া ধান গাছ হইতে ধান সংগ্রহ করে, খড়-বিচালি পৃথক করিয়া লয়। একজন মুসলমান কৃষাণীর মুখ দিয়া পল্লীকবি কৃষকদের সেই সময়কার আনন্দমুখর ব্যস্ততার রূপটি কত সংক্ষেপে কত সুন্দর করিয়াই না বর্ণনা করিয়াছেন।—

"লক্ষ্মী না আগণ মাসে বাওয়ার দাওয়া মাড়ি*।
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাড়ি।
দুইজনে বইস্যা পরে ধান দেই উনা।
টাইল † ভরা ধান খাই করি বেচা-কিনা।"

অগ্রহায়ণ মাসটা লক্ষ্মীমাস, তখন বাঙ্গালীর ঘরে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়। যাহার ক্ষেত-খামার নাই, সে-ও যাহার আছে তাহার নিকট চাহিয়া দুই মুষ্টি পায়। তখন হয়তো সারা পল্লী-বাংলায় কেহ কোনও দিন অভুক্ত থাকে না।

---

* ধান-কাটা এবং গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ধানগাছ হইতে ধান পৃথক করা।

† ডোল, ধান মজুত রাখিবার আধার।

"সেই ত কার্তিক গেল আগণ আইল।
পাকা ধানে সরু শস্যে পৃথিবী ভরিল॥
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া।
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া॥
জয়াদি জোকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া-পিঠা করে॥
পায়েস খিচুড়ি রান্ধে দেবের পারণ।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ॥"

উদ্ধৃত গীতাংশটিতে বাঙ্গালীর আমন ধানের বিজয় উৎসব ঘোষিত হইতেছে। পৃথিবীর সকল জাতিই তাহাদের প্রধান খাদ্যশস্য গৃহগত হইলে এইরূপ উৎসব করিয়া থাকে, ভোজন-বিলাসে মত্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের একটি ছড়ায় আছে,—

'অগ্রাণে নবান্ন হয় নতুন ধান কেটে।
পৌষ মাসে বাউনী বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে॥'

নূতন ফলমূল, শস্য যাহাই হউক না, প্রথমে ভগবানে নিবেদন না করিয়া কোনও নিষ্ঠাবান হিন্দু তাহা গ্রহণ করেন না। 'নবান্নে' নূতন আতপ চালের (আমনের) একটি সোপকরণ ভোজ্য দেবতা, গৃহ-দেবতা এবং স্বর্গীয় পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া পরে গৃহকর্ত্রী পরিবারস্থ সকলকে তাহা প্রসাদরূপে বাঁটিয়া দেন এবং নিজে গ্রহণ করেন। ঘৃত, মধু, কাঁচা দুধ, ফল, মূল, কলা, নূতন গুড় ইত্যাদির সংমিশ্রণে নৈবেদ্যটি বেশ সুস্বাদু হইয়া উঠে। কোথাও এই দিন এইরূপ আমান্নের নৈবেদ্য ছাড়াও পরমান্ন এবং অন্য বিবিধ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। 'নবান্ন'র পর হিন্দু-গৃহিণীরা বিশেষ বিশেষ দিনে ক্ষেত্রব্রত, লক্ষ্মীব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

আমন ধান গৃহগত হইলে বাংলার সর্বত্র হিন্দু রমণীরা শস্য ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করিয়া অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষে কোনও শনিবারে (মতান্তরে বৃহস্পতিবারে) ক্ষেত্র-দেবতার ব্রত করিয়া থাকেন। এই ব্রতের আচার-পদ্ধতি এবং 'ব্রতকথা' সর্বত্র এক নহে এবং ক্ষেত্র-দেবতার ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও মতভেদ আছে। পশ্চিম-বাংলায় এবং পূর্ব-বাংলার বহু স্থানে ক্ষেত্র-ব্রত শস্যক্ষেত্রের তথা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ব্রত; অনেকে ইহাকে লক্ষ্মীদেবীরই রূপান্তর মনে করেন। পক্ষান্তরে, ময়মনসিংহ জেলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে ক্ষেত্র-দেবতাকে ক্ষেত্রঠাকুর রূপে পূজা-অর্চনা করা হয়। তাঁহারা বারজন সহোদর, বার ভাই। ক্ষেত্রব্রত সে-অঞ্চলে এই বার-ভাই ক্ষেত্রঠাকুরদেরই ব্রত। অনেকের ধারণা, সূর্যই ক্ষেত্রঠাকুর। রৌদ্র ও জল ছাড়া কোন শস্যই, বিশেষতঃ ধান উৎপন্ন হইতে পারে না এবং রৌদ্র-জলের উৎপত্তি সূর্য হইতেই; সূর্য উর্বরাশক্তির দেবতা। যাহা হউক, ক্ষেত্রদেবতা লক্ষ্মী, সূর্য অথবা অন্য কোনও দেব বা দেবী যাহাই হউন না কেন, ক্ষেত্রব্রত যে নূতন ধান্য সংগ্রহের ও গোলাজাত করিবার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নূতন ধানের তৈয়ারী খই, চিঁড়া, গুঁড়া, চালভাজা, চিতই পিঠা ইত্যাদি এই ব্রতের প্রধান উপকরণ। ক্ষেত্রব্রত ছাড়া কেহ কেহ এই সময়ে পৃথক্‌ভাবে লক্ষ্মীব্রতও করেন। এই উভয় অনুষ্ঠানই কৃষি-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। ক্ষেত্রব্রতের একটি ব্রতকথায় বনজঙ্গল কাটিয়া ভূমি উন্নয়ন ও চাষ-আবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ধান কাটা ও সংগ্রহ, ধানের কেনা-বেচা, গ্রাম-নগরের পত্তন প্রভৃতির একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। এক সময়ে সমগ্র দেশ যে বন-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং লোকে অযত্নজাত ফলমূল, শস্য ইত্যাদি খাইয়া, পশু-পাখী শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত, কাঠুরিয়ার ক্ষেত-খামার করার এবং ক্ষেত্রদেবতার বরে তাহার রাজা হওয়ার মধ্যে এই ঐতিহাসিক তথ্যই তো নিহিত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের গৃহিণীরা পৌষ মাসে আমন ধান গোলাজাত হইলে 'আওনি বাওনি' অনুষ্ঠান করেন। ধান পাকিয়া উঠিলে গৃহস্থ কোনও এক শুভ দিনে আপনার ক্ষেত হইতে এক মুঠ ধান কাটিয়া আনে এবং নূতন বস্ত্রখণ্ডে তাহা জড়াইয়া ঘরের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব দিন গৃহিণীরা সেই ধানগাছ কয়টি পূজা করিয়া এক একটি শীষ বাক্স সিন্দুক, খাট-চৌকি, গোলা, গোশালা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দেন এবং বলেন :—

'আওনি বাওনি চাওনি।
তিন দিন পিঠা খাওনি॥
তিন দিন না কোথা যেও।
ঘরে বসে পিঠা খেও॥'

* * * *

অনেকে এই ছড়াটির এইরূপ অর্থ করেন,—'আওনি' লক্ষ্মীর আগমন, 'বাওনি' লক্ষ্মীর বন্ধন বা স্থিতি, আর 'চাওনি' তাঁহার নিকট প্রার্থনা। ধান্যরূপ লক্ষ্মী গৃহে আসিয়াছেন, এখন নিশ্চিন্ত মনে কয় দিন বিশ্রাম কর এবং ভোজন-বিলাসে মত্ত হও। বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী ধানের শীষের অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্পর্শে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, সর্বত্র পরিপূর্ণতা বিরাজ করুক, এইরূপ মনোভাব হইতেই হয়তো 'বাওনি' বাঁধার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

পৌষ পার্বণ বা পিঠা পরবের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্য হইতেই যে বাঙ্গালীর এই পার্বণ বা ভোজন-বিলাসের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ভাণ্ডারের পরিপূর্ণতা মানুষকে দেয় অবকাশ, অবকাশ দেয় অপ্রয়োজনের আনন্দ। পৌষপার্বণ বাঙ্গালীর ঘরে সেই অপ্রয়োজনের আনন্দই বহন করিয়া আনে। তখন পল্লীগ্রামে ঘরে ঘরে পিঠা পায়স এবং নূতন তণ্ডুলের অন্য বিবিধ উপাদেয় আহার্য প্রস্তুতের ধুম পড়িয়া যায়। গৃহিণীরা মেয়ে, বউ, নাতনী সকলকে লইয়া ঢেঁকিতে চাল কুটিতে লাগিয়া যান, অথবা তাহা শিল-নোড়ায় বাটিয়া লন, পিঠা তৈয়ার করেন,—কত রকমের উপকরণ,—আয়োজন-উদ্যোগ। দুধ, ক্ষীর, নারিকেল, নলেন গুড়, আখের রস, রাঙ্গা-আলু—কত কি উপকরণ! পুলি, পোয়া, পাটিসাপটা, চুষি, রসবড়া, চিতই—নাম জানা না-জানা কত কি পিঠা! পিঠা মানুষ বছরের আরো অনেক দিন খাইতে পারে, খায়। কিন্তু তাহাতে নূতনের মোহ থাকে না, নূতনের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রাণ-মন মাতিয়া উঠে না। পৌষ পার্বণের পিঠা নূতন ধানের নূতন চালের পিঠা! সকলের ক্রিয়া-যোগে একই সময়ে সকলের ঘরে ঘরে এই ধান আসে। কত দিনের কত প্রতীক্ষার, কত যত্ন ও পরিশ্রমের ফল এই সোনার ফসল! লাঙ্গলের ফলার

রেখে রেখে কৃষক দেখে এই সোনালী ধানের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন যখন তাহার বাস্তবে পরিণত হয়, তখন স্বভাবতঃই সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-বান্ধব, সহকর্মী সকলের মধ্যে সে সেই আনন্দ ছড়াইয়া দিতে চায়। 'পৌষ-পার্বণে' বাঙ্গালীর আনন্দের সেই উচ্ছলতাই রূপ পরিগ্রহ করে।

যাহার চাষবাস নাই, সে-ও ধানের সময়ে যাহার আছে, তাহার কাছে চাহিয়া দুই মুষ্টি পায়, প্রাচুর্য তখন গৃহস্থকে স্বভাবতঃই উদার-ভাবাপন্ন করিয়া তোলে। সংসার-বিমুখ বালকদেরও তখন আনন্দোল্লাসের সীমা থাকে না। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে তাহারা 'বাঘাইর বয়াত' গায়, 'কুলাই ঠাকুরের' ছড়া আবৃত্তি করিয়া ধান-চাল সংগ্রহ করে; 'পৌষালী'র আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। এই সকল উৎসব-অনুষ্ঠান যে হেমন্তের নূতন ধানকে কেন্দ্র করিয়া, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

অনেক ছড়াতেই দেখা যায়, বালকেরা লক্ষ্মীদেবীর নিকট গৃহস্থের জন্য গোলাভরা ধান-চাল প্রার্থনা করিতেছে। যেমন বরিশালে 'কুলাই ঠাকুরের পূজা-উৎসবে' বালকেরা গায়,—

"আইড়াবে আইড়াবে।—
আইলাম রে স্মরণে
লক্ষ্মীদেবী বরণে
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর
ধান-চাউলে গোলা ভর
ধান না দিয়া দিলেন কড়ি
তাতে হইল সোণার নড়ি
সোণার নড়ি রূপার পাশা
পাঁচ খাটালে (ঘরের মেজে) টাকার ছালা
একটি টাকা পাই রে
বানিয়া (সেকরা) বাড়ী যাই রে
বানিয়া বাড়ী কত জন
কুলাই রে দিবে কত ধন
ঠাকুর কুলাই ভো।"

বালকেরা এইরূপে ছড়া আবৃত্তি করিয়া ধান-চাল সংগ্রহ করে এবং একদিন, সাধারণতঃ পৌষ-সংক্রান্তি-দিন ব্যাঘ্র-দেবতার পূজা এবং বন-ভোজনের ব্যবস্থা করে। আজ-কাল স্বাভাবিক কারণেই বহু অঞ্চলে ব্যাঘ্র-দেবতার পূজা-উৎসব এবং ছড়া-পাঠ ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তৎসংশ্লিষ্ট ভোজের ধারাটি কিঞ্চিৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াও মৃদু গতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

পরিশেষে আমি বাংলার কৃষককুল যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে কিরূপ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, তথা ধানের চাষ-আবাদ করিয়া আসিতেছে, তৎসম্পর্কে দুই-চারিটি কথা বলিব। পূর্ববঙ্গের সংগৃহীত কয়েকটি কৃষি বিষয়ক শব্দের আলোচনার ভিতর দিয়াই আমি তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। পশ্চিমবঙ্গের, তথা ভাগীরথী অঞ্চলের কৃষকদের অনুসৃত পদ্ধতির সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের এই সকল পদ্ধতির নিশ্চয়ই অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। তথাপি আলোচ্যমান শব্দগুলি হইতে বাংলার অন্ততঃ তিন কোটি লোকের কৃষি-পদ্ধতির সঙ্গে এদেশীয়দের কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটিতে পারে। বলা বাহুল্য, এইরূপ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য চলিতে থাকিলে বাংলাকে তাহার প্রধান খাদ্যশস্যের জন্য চিরকালই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। আশার কথা, ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন।

কয়েকটি কৃষি-বিষয়ক শব্দ

গোপীনা—হালের দুইটি গোরু ক্রয় করার মতো অবস্থা অনেক কৃষকেরই নাই; এইরূপ দুই জন কৃষকের প্রত্যেকেরই বলদ যদি একটি থাকে এবং তাহারা একজন অপরজনের গোরু ধার করিয়া লইয়া চাষ-আবাদ করে, তবে তাহাদের এইরূপ কৃষিকাজকে 'গোপীনা হাল বাওয়া' বলা হয়।

বদ্‌লি—'বদ্‌লি' অর্থে আমরা বুঝি Substitute,—এক জনের স্থানে যে অপর জন অস্থায়িভাবে কাজ করে। এক কর্মস্থান হইতে অন্য কর্মস্থানে নিয়োগ করাকেও 'বদ্‌লি' বলা হয়। কিন্তু কৃষি-বিষয়ক 'বদ্‌লি' শব্দের অর্থ অন্য। কৃষিকাজ এমনি যে, উহা একা এক জনে কখনো সম্পন্ন করিতে পারে না। এজন্য যেখানে কৃষাণ একা বা তাহার নিজের খাটিবার লোক কম, অথচ চাকর-বাকর (দিন মজুর) রাখিবারও অর্থ সংস্থান নাই, সেখানে সে সমযোগ্যতা-সম্পন্ন অপর কয়েক জনের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়; এই সঙ্ঘের প্রত্যেকে প্রত্যেককে এক-একদিন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করে; ইহাতে যে-কাজ একার পক্ষে করা সম্ভব হইত না, তাহা অনায়াসেই যথাসময়ে সম্পন্ন হয়। কৃষিকাজে আবার সময়ানুবর্তী না হইলে সুফল পাওয়া যায় না, সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। যেমন একটা ধানক্ষেত ঘাসে ছাইয়া গিয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই নিড়াইতে না পারিলে 'জুত' বা 'জো' চলিয়া যাইবে, গাছগুলি আর বাড়িবে না। কৃষাণ যদি একা নিড়াইতে বসে, এই কাজে বহু দিন চলিয়া যাইবে, শ্রমের ফলও আশানুরূপ পাইবে না; অথচ দিনমজুর খাটাইবার তাহার সামর্থ্য নাই। এমতাবস্থায়ই সে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আর পাঁচ জনের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্য লইয়া নিজের কাজ যথাসময়ে শেষ করিয়া লয় এবং সেই পাঁচ জনকে পাঁচ দিন খাটিয়া দেয়। ইহারই নাম 'বদ্‌লি প্রথা'। এই প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। দশ পাঁচ জন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধু সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কৃষিকাজে যদি পরস্পর পরস্পরকে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য না করিত, তাহা হইলে নিঃসম্বল কৃষকদের জীবন আরো দুর্বহ হইয়া উঠিত।

বর্গাদার—যে-কৃষক অন্যের জমিতে চাষ-আবাদ করিয়া পারিশ্রমিক হিসাবে উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট একটা অংশ পায়, তাহাকে বর্গাদার, ভাগচাষী, আধিদার প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

মাগ্‌নি কাম্‌লা—এমন অনেক কৃষাণ আছে—যাহাদের লোকবল নাই, আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজে খাটিয়া অপরকে খাটাইবারও সামর্থ্য নাই, আছে শুধু ধনবল। কিন্তু অর্থব্যয় করিয়াও অনেক সময় ফসলের 'জুত' মতো 'জন' পাওয়া যায় না। তখন অগোণে জরুরি কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবার জন্য কৃষককে 'মাগ্‌নি কাম্‌লা'র শরণাপন্ন হইতে হয়। তাহার অনুরোধ ক্রমে পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন বিশ-ত্রিশ জন মিলিয়া আসিয়া দুই-একদিনেই অত্যাবশ্যক কাজ শেষ করিয়া দেয়; এজন্য তাহাদিগকে একবেলা মাত্র ভূরিভোজন করানো হয়। কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া শুধু ভোজে আপ্যায়িত হইয়া যাহারা প্রতিবেশীকে

কৃষি-কার্যাদিতে ঐরূপে সাহায্য করে, তাহাদিগকে পূর্ব ময়মনসিংহে 'মাগ্‌নি কাম্‌লা' বলা হয়। কাম্‌লা—শ্রমিক, মজুর, ঘর-দরজা বা চাষবাসের কাজ-জানা লোক।

হামুর—বৃহৎ ভূমিখণ্ড এক জনের পক্ষে এক হালে চাষ করা কঠিন হইয়া পড়ে; এ অবস্থায় চার-পাঁচ জন চাষী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের হাল-গোরুর সাহায্যে পরস্পরের ক্ষেত-খোলা চাষ-আবাদ করিয়া থাকে। এইরূপ প্রথাকে 'হামুর চাষ' বা 'হামুরে চাষ' বলা হয়। ইহাও একরূপ 'বদ্‌লি-প্রথা।'

জিরাতি—কৃষাণের অভাবে অনেক সময় অনেক গ্রামের জমি পতিত থাকিবার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় এক গ্রামের জমি যদি অন্য গ্রামের লোক আসিয়া চাষ-আবাদের জন্য পত্তন নেয়, তবে তাহাকে 'জিরাতি চাষ' বলা হয়।

টংক—কোনও জমির কোনও মরসুমের সমস্ত ফসলই বর্গাদারকে দেওয়ার সর্তে তাহার নিকট হইতে অগ্রিম নগদ টাকা লওয়াকে 'টংক প্রথা' বলা হয়।

সইয়া—অনেক সময় জমির মালিক জমিতে কম-বেশী যে-পরিমাণ ফসলই উৎপন্ন হউক না কেন, বৎসরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দিতে হইবে—এই সর্তে বর্গাদারকে জমি চাষ-আবাদের অধিকার দিয়া থাকে। এই প্রথাকে 'সইয়া' পত্তন বা 'চুক্তিবর্গা' বলা হয়।

উধারি—বর্গাদারের শৈথিল্যে ফসলের কোনরূপ ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য জমির মালিক যদি বর্গাদারের নিকট হইতে কিছু টাকা অগ্রিম লয়, তাহা হইলে সেই টাকাকে 'উধারি' বলা হয়।

দায়শোধী—জমির কয়েক বৎসরের ফসল সুদ মধ্যে কাটা যাইবে, এই সর্তে টাকা কর্জ করাকে 'দায়শোধী' প্রথা বলে। কর্জ শোধ করিতে না পারিলে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে জমি উত্তমর্ণের হইয়া যায়।

এইরূপে অতীতে কত কৃষক যে ভূমিহীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইন্দ্রপ্রস্থ

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী

ইন্দ্রপ্রস্থ চলে দুর্দম রথে,
শত মিনারের চূর্ণ ছড়ানো পথে।
শত নিশীথের স্বপ্ন সম্ভাবনাতে,
পোড়া মাটী কাঁদে তীব্র উন্মাদনাতে।

কাঁটা ক্যারফুল, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো জমি,
ফাটলে রন্ধ্রে সহস্র-শত "মমী",
প্রেতভূমি আর শুষ্ক কাষ্ঠ শমী।

ভগ্ন প্রাকারে সন্ধ্যা-রবির আলো,
বনবাবুলের ঝিল্‌মিল্‌ ছায়া কালো;
মন-দেয়া-নেয়া মানাবে এখানে ভালো।

মরু-বালুকায় নীল আকন্দ ফুল;
মৃত্যু-গোধূলি-দেশের আঁধার ভুল,
প্রহেলিকাময় আলেয়ার সমতুল।

সমাধি-শিখানে নাচে খঞ্জন পাখী,
আশার মুকুল ফসলে ভরিল নাকি?
জীবনে প্রণয় মরণে বাঁধিল রাখী!

পায়ের তলাতে কত পুরাতন মাটী!
সতর্ক পদে চলিয়াছি কোথা হাঁটি!
কিছুই কিছু না; এই মৃত্তিকা খাঁটি।

দিনের আলোক সন্ধ্যা কবরী পটে,
ঘনায় আঁধার নির্জন মরুতটে,
সমাধি-আগারে নীরব ইসারা রটে।

অশরীরী আর ছায়ামূর্ত্তিরা যত,
তারার আলোকে রবে বন্দনা-রত,
ঊর্দ্ধমুখীন্‌ প্রদীপ-শিখার মত।

জীবনে যে আশা দহিল অনল সম,
যে দুখ তিমির ঘিরিল নিবিড়তম,
মৃত্যু কি তার অবসান নির্মম?

ফণি-মনসার ঝোপে-ঝাড়ে মরে ঘুরে,
কার প্রেতাত্মা নিশীথে ভগ্নপুরে?
রৌশন-আরা, রাজিয়া বেগম আছে আর কত দূরে?

আজি এ গভীর নিশীথ-বেলায়,
কে পাষাণপুরে অশ্রু ফেলায়!
ডেকে আনো তারে লোকের মেলায়।

চিত্ত-ব্যাকুল দুর্লভ ভাবি যারে,
কালপথে ফেলি অবহেলনায় তারে;
কাঞ্চন ফেলে কাচ বেঁধে আনি ভুল করি আপনারে।

দীর্ঘশ্বাসের নাই কোন প্রয়োজন।
এই ত জীবন; এত কেন আয়োজন?
কেন রিক্ততা, কেন তিক্ততা আত্ম-বিসর্জন?

মনেরে নীরবে বুঝায়ে ব'লো:
সহজ, সরল, সে পথে চ'লো,
যে পথে বেদনা, বিরস বিরূপ সে পথ দু'পায়ে দ'লো।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

১৯০৭

নিজের উইল হিসাবে ১৯০৬ সনের ১৮ই জুলাই যে চিঠিখানা নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখেছিলেন, তাতে ছিল, 'আমার সব চেয়ে বড় স্বপ্ন হল ভারত-শিল্পের পুনরভ্যুদয়। প্রাচীন শিল্প উজ্জীবিত হলেই ভারতবর্ষ আবার একটা শক্তিশালী জাতি হয়ে উঠবে...' বুদ্ধগয়া থেকে ফেরবার পর নিবেদিতা প্রায়ই অখণ্ড ভারতের কথা বলতেন; ন্যাশনালিজমের শিক্ষাকে গণশিক্ষায় সঞ্চারিত করবার জন্য 'অখণ্ড ভারত' কথাটা একটা প্রতীকের মত ব্যবহার করতেন। বারাণসী কংগ্রেসের পর সাঁচী উজ্জয়িনী চিতোর আগ্রায় যে ক'দিন ছিলেন, আনন্দে তাঁর চোখের জল পড়েছে। এক দিন এক জঙ্গলে বসে সারা রাত কেবল রাণী পদ্মিনীর ধ্যানে কাটালেন, সেই পতিব্রতা হিন্দু তরুণী—আট শ' বছর আগে চিতোর দুর্গে জহর-ব্রত পালন করে যে মেয়ে 'প্রাণের চেয়ে মান বড়' এ সত্যকে রূপ দিয়ে গিয়েছিল!

আধুনিক শিক্ষিতেরা এই সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিকে নেহাত অবজ্ঞার চোখে দেখে। অথচ নিবেদিতার কাছে ঐগুলোই ভারত-সংস্কৃতির শৈশব-স্বপ্ন! জাপানীরা যে-কোনও শিল্পকীর্তিকেই ভালবাসে,—যত্নে ছাঁটা একটি গাছ, অথবা ভাবের বাহন অদ্ভুত গড়নের একটা বাঁশের সাঁকো, কি পাথরের দীপাধার বসানো একটা গলি, সব তাতেই ওরা আনন্দ পায়। জাপমনের এই কলারসিকতা নিবেদিতাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। ওকাকুরা তাঁকে জাপানী চরিত্রের এই দিকটা চিনিয়ে দেন,—তেমনি স্বামীজি চিনিয়ে দিয়েছিলেন গঙ্গার কলতান আর এই দেশের মাটিকে। প্রায়ই স্বামীজি বলতেন; 'শিল্পকলার সৌন্দর্য আর মহিমা যে না ধরতে পারে, সে কখনও সত্যিকারের ধর্মপিপাসু হতে পারে না।'

নিবেদিতা যখন এই শিল্পসাধনার কথা তুলতেন, লোকে হেসে উড়িয়ে দিত। ভাবত, উনি বুঝি নিতান্তই রূপায়ণের কথা বলছেন। তাঁর সন্ন্যাসী গুরু-ভাইরাও তাঁর এই ভাবনার ধার ধারতেন না। হায় রে! তিনি যা দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন কেউ তা দেখল না। ভারত-শিল্পে যে সুষম ছন্দ আর রেখাবিন্যাসের নৈপুণ্য তিনি দেখলেন তা অফলা হয়েই রইল। বাগবাজারের সেকেলে বাড়ির ছাঁদও সুন্দর দেখেন উনি, নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান-ভবনগুলো ওঁর চোখে লাগে না, উনি ফটো তোলেন ভাঙা দেউলের! লোকে ভাবে বাড়াবাড়ি। শোনা যায়, ১৯০২ সনে বরোদায় যখন গিয়েছিলেন, একটা কালীমন্দির দেখে 'কী সুন্দর' বলে নিবেদিতা হাত জোড় করলেন; তার পর কলেজবাড়ি দেখে বলে উঠেছিলেন, 'মা গো কী কুৎসিত!' গাইকোয়াড় অরবিন্দ ঘোষকে শুধান, 'পাগল নাকি ভদ্রমহিলা?' দেশের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে ইংরেজের ঠাট্টা-বিদ্রূপে ভড়কে গিয়ে হিন্দুও সে দিন ও-সবে খুঁত দেখতে শিখেছিল, নিবেদিতাকে তাই সবাই পৌত্তলিক বলে দুষতে লাগল। নিবেদিতা দেখতেন একটা মূর্তির পিছনে যে গভীর ব্যঞ্জনা আছে সেইটি। সেইটি না বুঝতে পেরে ভারত-শিল্পের প্রাণকে হিন্দু নষ্ট করে ফেলছিল।

সে সময় কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ই. বি হ্যাভেল নামে একজন ইংরেজ। এক তাঁর কাছেই নিবেদিতা যা-কিছু সাড়া আর সমর্থন পেলেন। এক দল প্রতিভাবান ছাত্র তখন হ্যাভেলের তাঁবে ছিল। কিন্তু তাদের শেখান হচ্ছিল গ্রীক প্লাষ্টার মডেলের অনুকরণ। দেখে নিবেদিতা তো থ। হ্যাভেল বলেন, 'আমি আঁকতে কি রং ফলাতে শেখাই, কিন্তু কাউকে শিল্পী কি গুণী করে তুলতে তো পারি না।'...

'অপদার্থ তুমি! আমি কিন্তু পারি! দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, বংশগৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভাবী কালের স্বপ্ন আর ঐন্দ্রচেতনার তরে উদ্দাম ব্যাকুলতা, ব্যস! আর কিছুর দরকার নাই! শিল্পে বিজ্ঞানে ধর্মে বীর্যের এমন জোয়ার আসবে যে তাঁকে রোখে কে?'

হ্যাভেল ওঁকে নিজের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ দের মধ্যে একজন। অবনীন্দ্র যত ছবিই আঁকেন, নিবেদিতা বাতিল করে দেন। তিন মাস পরে একখানা ছবি আনলেন, এবার সেটি নিবেদিতার মনে ধরল। বললেন, 'এখানা মস্ত রেখাচিত্র হয়েছে, আমার মেয়েরা নানা অলঙ্করণ দিয়ে এ থেকে একটা পতাকা তৈরি করবে।' যে-দেশ যাত্রা-পালা সং ইত্যাদিতে মজা পায়, ধুমধাম করে বিয়েতে শোভাযাত্রা বার করে, পাল-পার্বণে নাচ-গানের এত রেওয়াজ যে-দেশে,—নিবেদিতার মতে সে-দেশে তো ঐতিহাসিক ঘটনাকে রূপ দেওয়ার সব মাল-মসলাই মজুত রয়েছে। প্যারিসের প্রখ্যাত শিল্পী প্যুভি দ্য শাভান্ যেমন তাঁর আর্যরুচি নিয়ে আশ্চর্য সব ভিত্তিচিত্র এঁকে স্বদেশের আইন, শৃঙ্খলা আর আভিজাত্যকে অমর করে যাচ্ছেন, ভারতীয় শিল্পী তা পারবে না কেন? শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রধানত: যে-সব প্রবন্ধ নিবেদিতা লিখেছিলেন—দ্য শাভানের 'প্যারির প্রহরায় সেঁৎ জেনেভিয়েভ' বা রোদাঁর 'শক্তি'-র ব্যাখ্যা দেওয়াই ছিল সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য। তার পর ইটালির প্রাচীন যুগের আর রেনেসাঁসের ছবিগুলো ছাপিয়ে বের করলেন, ওদের বিশ্বজনীন আবেদনের ব্যাখ্যা দিলেন সেই সঙ্গে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিল্পের যে-সব শিল্প রূপায়ণের রহস্য হিন্দু-মনের কাছে দুর্বোধ, বেছে বেছে সেইগুলিরই বিস্তারিত ভাষ্য লিখলেন। ভারত-শিল্পও অরসিক পশ্চিমবাসীর কাছে কিম্ভূতকিমাকার লাগে। নিবেদিতার শিল্পব্যাখ্যায় এদেশের মাটিতে অনেক সার্থক কল্পনার বীজ উপ্ত হল। মনীষীরা তা ধরতে পারলেন এবং তাদের

কল্যাণে হিন্দু নতুন করে তার শিল্পসম্পদের মূল্য বুঝল, তাৎপর্য খুঁজে পেল। ইলোরা আর অজন্তার ভিত্তিচিত্রের কথা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। বিদেশীরা তুলনা-মূলক আলোচনা করতে গিয়েই ওগুলোর যা উল্লেখ করতেন। নিবেদিতার লেখায় অজন্তা চিত্রকলার মাধ্যমেই অখণ্ড ভারতের কল্পনাটি মূর্ত হল। ১৯০৯ সনে ইংল্যাণ্ড থেকে মিস হেরিংহাম অজন্তার ভিত্তিচিত্র নকল করতে এসেছিলেন। নিবেদিতার ব্যবস্থায় হ্যাভেলের জন কয়েক ছাত্রও সে-সময় অজন্তা চিত্রাবলী নকল করতে যান। সে-দলে অসিত হালদার আর নন্দলাল বসুও ছিলেন। তাঁদের নকল করা ছবি এখনও ভারতেই আছে।

নিবেদিতার শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধগুলো সাধারণতঃ মডার্ণ-রিভিউতে ছাপা হত। জগদীশ বোসের মারফতে এই নতুন মাসিকটির সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়। মডার্ণ-রিভিউর সম্পাদক রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী ছিলেন এলাহাবাদের এক অধ্যাপক—সাহিত্য বিষয়ে খুব উৎসাহী আর সাহিত্যিক সহযোগী যোগাড় করতে ওস্তাদ। জগদীশ বোসকে প্রবন্ধ দেবার জন্য জ্বালিয়ে তুলতে তিনি বলেন, 'আমার নিজের কোনও লেখা নাই, তবে নিবেদিতার সঙ্গে কথা বলে দেখব।'

দীর্ঘ পত্রালাপের পর রামানন্দ ও নিবেদিতার দেখা হল। দু'জনের বেশ ভাবও হয়ে গেল। বয়স ওঁদের প্রায় একই হবে। রামানন্দের হুঁশিয়ারি আর নিবেদিতার বে-পরোয়া স্বভাবে জুড়ি মিলেছিল ভাল। 'আমি চেষ্টা করব যাতে প্রবন্ধের অভাবে আপনার ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখতে।' কথা রেখেও ছিলেন নিবেদিতা। বন্ধুদের দিয়ে প্রবন্ধ লেখাতেন, নিজে বাছাই করে দিতেন তার থেকে। আর নাম না দিয়ে নানা বিষয়ে একনাগাড়ে 'নোটস্' লিখে দিতেন নিজে। তাঁর রাজনীতিক প্রবন্ধগুলোর সুর প্রায়ই খুব চড়া আর কর্কশ হত। সেগুলো ইচ্ছামত কাট-ছাঁট করবারও অনুমতি দিয়েছিলেন চ্যাটার্জ্জীকে। আরেকটা কাজ ছিল—চ্যাটার্জীকে পাশ্চাত্য সাংবাদিকতার কৌশল শেখানো।

একবার তাঁর অসুস্থতার জন্য দীর্ঘ কাল নিবেদিতাকে তাঁর জায়গায় কাজ করতে হয়েছিল। নবীন সাহিত্যিক ও শিল্পীমহলে 'মডার্ণ রিভিউ' একটা সাড়া জাগাল। 'মডার্ণ রিভিউ'র দৌলতে শিল্প-জগতে অনেক গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটল। বোঝা গেল, হিন্দুর জীবনযাত্রায় একটা নতুন ভাবের জোয়ার আসছে। অত্যন্ত বিচক্ষণতা আর প্রশংসার্হ মাত্রাজ্ঞান নিয়ে এই অগ্নিযুগের বিপ্লবের মধ্যে রামানন্দ কাজ করতেন। নিবেদিতার উৎসাহে বাধা না দিয়েও সব সময় তাঁকে উনি সংযত রাখতেন। দেখতেন, একা নিবেদিতা দশভূজার মত ভাঙছেন, গড়ছেন—এক দিকে শিকড়-শুদ্ধ আগাছা ওপড়াচ্ছেন, আর এক দিকে ছড়াচ্ছেন নতুন-নতুন ভাবের বীজ। দুঃখের ভারে সারা দেশ নুয়ে পড়েছে, তারই মাঝে মূর্তিমতী শক্তির মত দেবাবিষ্টা হয়ে নিবেদিতা এগিয়ে চলেছেন।

নিবেদিতা নিয়ে এসেছিলেন মুক্তির বাণী। অথচ কেউ জানত না, এই সর্বাঙ্গীন মুক্তির সম্বন্ধে নিবেদিতা কতখানি সচেতন। মন্ত্রকে জীবনে রূপ দিতে গিয়ে অসংখ্য বাঁধন তাঁকে ছিঁড়তে হয়েছিল,—যেমন মুক্তি দিয়েছিলেন পরকে, তেমনি নিজেকেও।

এইবার চির সাধের একটা কর্তব্য শেষ করলেন। চারটি বছর ধরে তার ভাবনা মর্মের গহনে সুপ্ত ছিল। লিখলেন—'মাই মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম'—স্বামীজির জীবনের কয়েক পাতা—তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অনেক বার কাজটা হাতে নিয়েও আবার রেখে দিয়েছেন। স্বামীজির মহাপ্রয়াণের পর মিস ম্যাকলয়েড নিবেদিতাকে তাঁর গুরুর জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা কথাটা গায়ে না মেখে বলেছিলেন, 'হয়তো লিখব, এখন না! ক'দিন সবুর করা যাক না! তাঁর জীবনী লিখতে হলে ভাব ও ভাষা অনাড়ম্বর এবং স্বচ্ছ হওয়া চাই, ভারতবর্ষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করা চাই তার মধ্যে'···তখনকার মত স্বামীজির চিঠি কাগজ-পত্র বই কবিতা ইত্যাদি সব উপাদান সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত রইলেন নিবেদিতা।

দু'টি বছর চলে গেল। লিখতে কখনও কখনও চেষ্টা করতেন, কিন্তু কাজটা বড় শক্ত। লিখতে গিয়ে চোখে জল আসে কেবল। অথচ স্বামীজির জীবনীতে ব্যক্তি-বিশেষের ভাবনা-বেদনা তো মুখ্য নয়। বুঝলেন, এ-জীবনী লেখার সামর্থ্য তাঁর নাই। নিজের অক্ষমতাকে নত হয়ে মেনে নিলেন নিবেদিতা, গুরুর পায়েই এ-দায় সঁপে দিয়ে লেখার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। হৃদয়কে আগে আয়নার মত স্বচ্ছ করতে হবে, তবে না গুরুর প্রতিচ্ছবি যথাযথ ফুটে উঠবে তার মাঝে। অসুখ থেকে উঠে নিবেদিতা আবার এ কাজে হাত দিলেন। নতুন পথে ছুটল তাঁর ভাবনা, গুরু যেন পাশ থেকে সব নির্দেশ যুগিয়ে দিতে লাগলেন। গুরুই দিশারী—নিবেদিতার

দিক থেকে এখন এইটি মেনে নেবার ওয়াস্তা শুধু। ভাব আর রূপ এক হয়ে গেল। যা লিখছেন সে সম্বন্ধে নিবেদিতা এত নিঃসংশয় ছিলেন যে, বলতেন, 'বাক্‌সিদ্ধ হয়ে গেছি—যা লিখছি তাই যেন বাণী হয়ে ফুটছে।'

প্রবুদ্ধ ভারতে প্রথম অধ্যায়গুলো ছাপা হয়—১৯০৬ সনে। বাঙালী বিবেকানন্দকে জানে অবতার বলে কিন্তু নিবেদিতা ফুটিয়ে তুললেন মানুষ বিবেকানন্দকে। সরল সহজ উদারচেতা পুরুষ, রামচন্দ্রের মতই গুহক চণ্ডাল আর বনের বানরের মিতা, সবার কাছে প্রাণ খোলা, নিজের মহত্ত্ব বা দুর্বলতা কিছুই গোপন করেন না কারও কাছে। এ-বিবেকানন্দকে কেউ চিনত না। স্বামীজির এই মানবতাই যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল। নিজের অধ্যাত্ম অনুভবের মণিকোঠায় নিয়ে গেলেন পাঠকদের,—তাঁর মর্মস্পর্শী অমায়িকতায় চোখে তাদের জল এল। এ-জীবনী পড়তে পড়তে প্রাণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, দেশপ্রেমিক মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে মানুষ।

উৎসর্গ-পত্রে নিবেদিতা শুধু লিখলেন, 'বন্দে মাতরম্‌'! এইটুকু সেবার অধিকার যে পেলেন, তারই জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তের এই নম্র স্বীকৃতি মাত্র!

'শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে'—অহরহ এই তাঁর প্রার্থনা। কোনও কিছুর দিকে দৃক্‌পাত নাই। জানতেন, সরকার তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারে, কিন্তু নিবেদিতা ভ্রূক্ষেপও করতেন না। অসুখের পর থেকে বাগবাজারে যেতেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য। তখনকার দিনে শহরের বাইরে দমদমের বাসাটাই নিরাপদ ছিল।

১৯০৭ সনে নরমপন্থী আর জাতীয়তাবাদীদের বিরোধ আরও বাড়ল। ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসে মত-দ্বৈধ প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হল। উত্তেজনায় অধীর সবাই। ওদিকে সরকার পক্ষ খোলাখুলি দমননীতি ঘোষণা করল। তারপর চলল সরকারী চাকুরে আর অধ্যাপকদের ছাঁটাই। কেউ রেহাই পেল না। স্বদেশীতে যোগ দিলেই জেলের জন্য তৈরী থাকতে হবে।

বিনা বিচারে লাজপৎ রায়, অজিত সিংহ, কৃষ্ণ মিত্র এবং আর ছ'জন বাঙালীর নির্বাসন হল। মাদ্রাজে স্বদেশী প্রচার করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল গ্রেপ্তার হলেন। দেশে আগুন লেগে গেল, মনে হল প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেবে এবার। ইউরোপীয়ানরা ভয়ত্রস্ত হয়ে উঠল। সেই বারই মে মাসে প্রথম বোমা ফাটল।

আক্রমণ আর তার পাল্টা জবাবে দমননীতি এত আচম্বিতে শুরু হয়ে গেল যে, প্রথমে বোঝাই গেল না ব্যাপার কি! কয়েদীর স্রোতে জেল টইটুম্বুর। তাদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করা হত, রাখা হত ছাগল-ভেড়ার মত গাদাগাদি করে। সেই অবস্থায় তারা অরবিন্দ ঘোষের বাণী আওড়াত, 'উৎসর্গের লগ্ন এসেছে,—এসেছে তাঁর বেদিতলে প্রাণবলির পুণ্য অবসর। প্রণাম করি দেবতাকে, দেশের জন্য দুঃখ সইতে আমাকেই যে ডাক দিলেন তিনি! এ আনন্দ কোথায় রাখি, ধন্য আমি!'

তাদের সঙ্গে নিবেদিতাও সমানে ভুগতে লাগলেন। জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আগাগোড়া তিনি এমন ভাবেই জড়িত যে, তাঁর কাজ-কর্মকে তাদের থেকে পৃথ করে দেখা অসম্ভব। দমদম কি বাগবাজার যেখানেই থাকুন, তাঁর বাসাটি পলাতকদের আস্তানা—সেখানে তাদের জন্য খাবার, টাকা পয়সা, পালাবার জন্য পথের মানচিত্র, সবই মজুত থাকত।

আলষ্টারের বনে-জঙ্গলে কাস্তে আর বন্দুক ঘাড়ে পিতৃ-পিতামহেরা যে খেলা খেলেছেন, নিবেদিতাও তেমনি আগুন নিয়ে খেলা করছিলেন। মুরারিপুকুর রোডের রসায়নাগারে যে-বোমা তৈরি চলছিল, নিবেদিতা সে-কাণ্ড থেকে আলগোছ থাকেননি। বারীন ঘোষের বন্ধুদের তো সমানেই সাহায্য করে চলছিলেন। বিস্ফোরক তৈরির কৌশল শিখতে হেমচন্দ্র দাসকে পাঠানো হয় ফ্রান্সে। তিনি ফিরে আসবার আগেই, অনেকগুলো বিপজ্জনক এক্সপেরিমেণ্টের পরে উল্লাসকর দত্ত কোনও রকমে মেলানাইট তৈরির কায়দাটা বার করে ফেললেন। এই সময় ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়ার ত্রয়োদশ খণ্ডে বোমা তৈরীর পূর্ণ বিবরণ দেওয়া থাকত। বিপ্লব আন্দোলনের পর থেকে ওটা বাদ দেওয়া হয়।

এই সব রসায়ন-রসিকদের গোপনে প্রেসিডেন্সী কলেজ-ল্যাবরেটরীতে পাঠাতে নিবেদিতা দ্বিধা করতেন না। জগদীশ বসু আর প্রফুল্ল রায় ছিলেন ওখানকার অধ্যাপক—দুজনেরই ল্যাবরেটরিতে সহকারী দরকার হত। অবশ্য দু'জনের কেউ-ই নিবেদিতার দুঃসাহসের খবর রাখতেন না। প্রফুল্ল রায়কে ভাবুক স্বভাবের লোক বলেই সবাই জানত, প্রায়ই কোনও কিছুর খেয়াল থাকত না তাঁর। ভাল মানুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল, গরিবানা চালে দিন কাটিয়ে, আয়ের বেশির ভাগটা দান করতেন অভাবগ্রস্তদের। রোজ সন্ধ্যায় কার্জন পার্কে বসে বন্ধুদের নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প-গুজবে কাটাতেন। ফেরবার পথে নিজের ল্যাবরেটরীতে ঘুরে যেতেন এক পাক। জানতেন, উৎসাহী কয়েকটি ছাত্র সহকারীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। কাউকে কিছু প্রশ্ন করতেন না। একটা ফ্যাসাদ যা দেখতেন—ওরা বড় বেশী অ্যাসিড খরচ করে। ছেলেরা চলে যাবার পর প্রায়ই উনিই সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতেন, ব্ল্যাকবোর্ডটা ভাল করে মুছে সাফ করতেন। কিন্তু কখনও কোনও মন্তব্য করতেন না। এজন্য নিবেদিতা যে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞই ছিলেন!

এই সব ছাত্রেরা নিবেদিতাকে দেবীর মত পূজা করত। সে-বছর স্বামীজির জন্মবার্ষিকীতে তারা তাঁকে নিয়ে বেলুড়ে গেল। স্বামীজির জন্মতিথিটি তখন ছাত্র আর গরীব-দুঃখীদের উৎসব-বিশেষ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ গঙ্গার ধারে জটলা করে, যে-ঘরে স্বামীজি দেহত্যাগ করেন, সবাই সে-ঘরে চললেন। নিবেদিতাকে উপরের বারান্দায় দেখেই ময়দানের লোক মহাকলরবে সম্বর্ধনা জানাল, 'কিছু বলুন, কিছু বলুন আমাদের'—চীৎকার করে সবাই।

বন্ধুদের দিকে ফিরে নিবেদিতা শুধ'ন, 'বলব?' আলিসার ধারে এগিয়ে এসেছেন কথা কইবার জন্য, হঠাৎ একটি ছেলে সতর্ক করে দেয়, 'কিছু বলবেন না, শুধু আশীর্বাদ করুন ওদের।'

বুঝে নিলেন নিবেদিতা। লোকের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে পুলিস রয়েছে। ছাত্রদের মন রেখে নিবেদিতা যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে উঁচু গলায় বললেন, 'ওয়াহ গুরুকী ফতহ্'। সদ্য উপহার

দেওয়া ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলেন সামনে। জনতা প্রতিধ্বনি করে ওঠে, 'ওয়াহ গুরুকী ফতহ!'

নিবেদিতাকে বাঁচাতে ভুপেন্দ্রনাথ বেশী সতর্ক হয়ে কাজ করতেন। কিছুদিন পরে যুগান্তরের সম্পাদক হিসাবে তিনি গ্রেপ্তার হওয়াতে নিবেদিতা যে কী দুঃখই পেলেন! আদালতে ছুটে গিয়ে শুনলেন দশ-হাজার টাকার জামিন লাগবে! ভূপেন্দ্রনাথের বন্ধুরা টাকা যোগাড়ের ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন, নিবেদিতা তাদের বললেন, 'ব্যাঙ্কে আমার ঐ পরিমাণ টাকাই আছে, সবটা তোমরা নাও! আমি ভিক্ষা করে ও-টাকাটা পূরণ করব!' দেশে বিপ্লব সৃষ্টির অভিযোগে বন্দীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হল। নিবেদিতা লিখলেন, বীরের মত হাসি-মুখে সমস্ত ব্যাপারটা ও গ্রহণ করেছে। চোখের দৃষ্টি একটুও ম্লান হয়নি, মাথা উঁচু করে সাজা মেনে নিয়েছে। কেবল বলেছে, "ব্যাপারটা ভদ্রলোকের পক্ষে নেহাৎ অপ্রীতিকর…' (১৯০৭ সনের ২০শে জুলাই-এর চিঠি) প্রায়ই নিবেদিতা ওঁকে বলতেন, 'ভূপেন, মনে রেখ তুমি দেশমাতৃকার, আর কারও নয়। দেশপ্রেম যেন থুইও না কোনও মতেই। সংসার করো না, তুমি দেশের সকলের…কিন্তু বড় কঠিন এত!'

যুগান্তরের অন্যান্য কর্মীরাও কয়েদ হলেন। তাদের জন্যও নিবেদিতাকে অনেক কিছু করতে হল। কয়েক জন ধনী বন্ধুর চাঁদায় নিবেদিতা একটা গোপন তহবিল ফেঁদেছিলেন। ঐ তহবিল থেকে পুলিস আর প্রহরীদের ঘুষও খাওয়াতেন। বন্দীদের নিরাশ্রয় স্ত্রী-পুত্র পরিবারদের দেখে কান্না আসত নিবেদিতার। তাদের ভরণ-পোষণের ভার নিয়ে নিজে তাদের দেখা-শোনা করতেন।

ভূপেন্দ্রনাথকে খালাস করবার জন্য নিবেদিতা প্রকাশ্যেই চেষ্টা করেছিলেন। তাতে সরকারের চোখে তিনি দাগী হয়ে গেলেন। এদেশ ছাড়তে হবে তাঁকে। জাতীয়তাবাদীরা মিনতি করল, নিবেদিতা স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যান যেন। তাতে বাইরে থেকেও ভারতের সেবা চালাতে পারবেন। কিছুদিন ধরে নিবেদিতা চেষ্টায় ছিলেন মিসেস বুলের ইউরোপ-যাত্রার কাছাকাছিই যেন জগদীশ বসু প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তাঁর পাওনা ছুটিটা পেয়ে যান। উনি তাদের সঙ্গে যাবেন। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে নিবেদিতা বসু-পরিবারকেই আগে রওনা করিয়ে দিলেন। সবার নজর এড়িয়ে উনি যাবেন ওঁদের পিছু পিছু।

এ দিকে গোখলের নিজেরও বিপদের সম্ভাবনা। সতর্ক করে দেবার জন্য নিবেদিতা তাঁকে লেখেন, 'মনে হয় তোমাকে আসামী দেখলে খুশী হতাম।'

১৫ই আগষ্ট নিবেদিতা রওনা হলেন। একটু আগেই চলে যেতে হল। খবর পেয়েছিলেন বুটানিতে ছুটি কাটিয়ে ক্রপটকিন সস্ত্রীক লণ্ডনে ফিরে আসছেন। সেখানে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করবার বন্দোবস্ত হয়েছে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

কল্পনার প্রতি

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনা তব হাত দুটি দিয়ে মনের কাপড় খোল
কল্পনা তব মনের জড়তা একেবারেই ভোল
কল্পনা তুমি ও পরম পদে জানাও প্রাণের নতি
কল্পনা তুমি মুগ্ধ নয়নে দেখ গো আমার প্রতি
কল্পনা তুমি হাতখানি তব রাখ গো আমার হাতে
কল্পনা তুমি ছায়ারাণী হ'য়ে চল মোর সাথে সাথে
কল্পনা তব রক্তিম গালে পড়ুক দু' ফোঁটা জল
কল্পনা তব মধুর হাসিটি জাগাক প্রাণেতে বল
কল্পনা তব বুকের মাধুরী ঝরুক এ জীবন-মাঝে
কল্পনা তব মধুসঙ্গীত শুনি যেন প্রতি সাঁঝে
কল্পনা তব আলতা-মাখানো ও দু'টি চরণ চিন্
কল্পনা তাহা সজোরে সরাক পথের যতেক তৃণ
কল্পনা এ কি—এখনো—
কল্পনা তুমি দিলে না তোমার মনের খাতার দাম—
কল্পনা চোখ চেয়ে দেখ সেথা খুঁজে পাবে মোর নাম।

প্রমথনাথ বসু

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত গরুমহিষানীর লৌহের খনি সম্বন্ধে বিহারের প্রসিদ্ধ কোবিদ, সাংবাদিক ও রাজনীতিক ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন :—

"বড় ব্যাপারের সহিত ছোট ব্যাপারের তুলনা করিলে বলা যায়—যে আমেরিগো ভেসাপুসীর (Amerigo Vespucci) নামে আমেরিকা মহাদেশ অভিহিত, তিনি যেমন ঐ মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বসু মহাশয় তেমনই এই লৌহখনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ মহাদেশের অবস্থিতি আমেরিগো (এবং তাঁহার কয় বৎসর পূর্ব্বে কলম্বাস) য়ুরোপীয়দিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন ; আর—ময়ূরভঞ্জের এই অংশে পূর্ব্ব হইতেই স্থানীয় লোহাররা লৌহ গলাইয়া সংস্কৃত করিলেও বসু মহাশয় প্রথম তাহার বিষয় শিল্পপতিদিগের গোচর করিয়াছিলেন। তিনি যদি তাহা না করিতেন, তবে আজ জমশেদপুরে—ভারতের সর্ব্বপ্রধান কারখানা টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানা হইত না।

"There would have been no Tata Iron and Steel Company's works at Jamshedpur, the graatest industrial concern in India of to-day."

এই কার্যের গৌরব যাঁহার সেই প্রমথনাথ বসু ১২৬২ বঙ্গাব্দের ৩০শে বৈশাখ (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে) ২৪ পরগণা জিলার যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী গোবরডাঙ্গার সন্নিকটস্থ গৈপুর গ্রামের অধিবাসী বসু-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনও বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম বিরলবসতি ও হতশ্রী হয় নাই। বাঙ্গালীর তখন আকাঙ্ক্ষা ছিল—অঋণী ও অপ্রবাসী হইবে। তখন বাঙ্গালীর অভাব অল্প ছিল, সম্পদও অল্প ছিল না।

গৈপুর বসুবংশের বংশপতি নরহরি বসু প্রথমে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে কোন কারণে এক শত বিঘা জমী নিষ্কর হিসাবে পাইয়া ঐ গ্রামে বাস করিতে থাকেন। প্রমথনাথের পিতামহ নবকৃষ্ণ বসু কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করিতেন। তখন গৈপুরে বসু-পরিবারের ধান্যপূর্ণ গোলা, দুগ্ধবতী গাভীতে পূর্ণ গোশালা, মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণী ও ফলের বাগান ; চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসবাদি উৎসব ; পরিবারের প্রবীণ ও তরুণদিগের জন্য স্বতন্ত্র বৈঠকখানা। প্রমথনাথের পিতা তারাপ্রসন্ন ইংরেজীতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং জল-দারোগার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সদরপুরের মিত্র-পরিবারের দুহিতা শশিমুখীকে বিবাহ করেন।

প্রমথনাথ পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান—প্রথম পুত্র। তাঁহারা ছয় ভ্রাতা ও তিন ভগিনী।

তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে প্রমথনাথ প্রথমে গৈপুরের পার্শ্ববর্ত্তী খাঁটুরা গ্রামের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ করেন এবং নবম বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে নীত হইয়া ইংরেজী শিক্ষারম্ভ করেন। শৈশবাবধি তিনি মেধাবী ও অধ্যয়নে শ্রমশীল ছিলেন। তখন প্রথমে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা যেমন দ্রুত তেমনই দৃঢ়ভিত্তি হইত। তখন শিক্ষাও ব্যয়সাধ্য ছিল না—অনেক বিদ্যালয়ে এক জন মাত্র শিক্ষক থাকিতেন ; যে সকল ছাত্র অধ্যয়নে অধিক অগ্রসর হইত, তাহারাই অন্য ছাত্রদিগকে পড়াইত। এই প্রথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। মাদ্রাজের অনাথ বালকাশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জর্জ্জ এণ্ড্রু বেল ইহা লক্ষ্য করিয়া আশ্রমে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশ স্কটল্যাণ্ডে যাইয়া জ্ঞানের দ্রুত ও প্রকৃত বিস্তারের জন্য তথায় বিদ্যালয়ে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। ফলে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তথায় ১২,০০০ বিদ্যালয়ে এই প্রথায় শিক্ষাদান হইতেছিল। তথায় ইহাকে "Madras" or "Monitorial System" বলা হইত।

কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয়ে তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়েন, তখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর। তৎকালীন নিয়মে কোন ছাত্রকে ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ঐ পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইত না ; সেই জন্য প্রমথনাথকে পরবৎসর পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে তিনি গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

যে এক বৎসর তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি বাঙ্গালায় কয়েকটি কবিতা রচনা করেন এবং কয়টি "আকাশ কুসুম" নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

প্রাথমিক পরীক্ষায় সাফল্য লাভের অল্প দিন পরেই প্রমথনাথের ভাগ্যে দারুণ শোকের কারণ ঘটে—পিতামহ নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শ্মশানে তাঁহার শব ভস্মীভূত হয়, ইহা নবকৃষ্ণের বাসনা ছিল। প্রমথনাথ সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়া নবদ্বীপে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করেন। সামাজিক আচার সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ শ্রদ্ধার পরিচয় তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধেও দেখা গিয়াছিল। বিদেশ হইতে শিক্ষালাভান্তে সরকারী চাকরী লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে যখন (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে) বিখ্যাত কর্ম্মী রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথমা কন্যা কমলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তখন তিনি "সিভিল ম্যারেজ" আইন অনুসারে বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎকালীন হিন্দু সমাজ তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া স্বীকার না করিলেও তিনি আপনাকে হিন্দু মনে করিতেন এবং উক্ত আইনে বিবাহ জন্য যে বলিতে হয়—বিবাহার্থী হিন্দু নহেন, তাহা বলিতে তিনি অস্বীকার করেন। অথচ বিদেশ হইতে ফিরিয়া তিনি "প্রায়শ্চিত্ত" করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—কারণ, তিনি মনে করিতেন, তিনি বিদ্যার্থী হইয়া বিদেশে যাইয়া পাপ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কেশবচন্দ্র-পরিচালিত প্রার্থনা-সভায়ও যোগ দিতেন।

প্রমথনাথ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তখনও এ দেশে কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যক ব্যবস্থা হয় নাই—এমন কি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয় নাই। কলিকাতাতেও অধিকাংশ কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ ছিল না এবং সেই

জন্যই ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-শিক্ষাগারে ছাত্রদিগের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের অভাব দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রমথনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি রসায়নে পাঠ গ্রহণ করেন। তাহার বহু দিন পরে, এ দেশে বাঙ্গালায় রসায়ন শিক্ষার পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া সে অভাব দূর করিবার জন্য সরকার বরদাপ্রসাদ ঘোষের দ্বারা রস্কোর রসায়ন সম্বন্ধীয় প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই বরদাপ্রসাদের অগ্রজ মোক্ষদাপ্রসাদ কৃষ্ণনগরে প্রমথনাথের সতীর্থ ছিলেন।

এই সময় সমগ্র ভারতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভ প্রয়াসী ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষালাভার্থ প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে বৃত্তি "গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি" নামে অভিহিত ছিল। জন বর্থউইক গিলক্রাইষ্ট নামক এক জন য়ুরোপীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তারী চাকরী লইয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখনও হিন্দুস্থানী ভাষা পদ্ধতিবদ্ধ হয় নাই। তিনি তাহা পদ্ধতিবদ্ধ ভাষায় পরিণত করেন এবং হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সঙ্কলন করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতায় তাঁহার নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। সেই বৃত্তি লইয়া কৃতী ভারতীয় ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষালাভ-জন্য বিদেশে যাইতেন। প্রমথনাথ এই বৃত্তি লইয়া বিদেশে শিক্ষা-লাভার্থ যাইবার চেষ্টা করিবেন, স্থির করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট একজামিনেশন ইন আর্টস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তির জন্য পরীক্ষার্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। বৃত্তিলাভ ব্যতীত বিদেশে যাইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য আবশ্যক অর্থ-সংস্থান তাঁহার ছিল না—হয়ত স্বজনগণ তাহাতে সম্মত হইতেন না।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রমথনাথ উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে গুণানুসারে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং কলিকাতায় যাইয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি, এ, পড়িতে থাকেন। তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের জন্য বি, এস-সি, পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির জন্য গৃহীত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, প্রমথনাথ সমগ্র ভারতের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। অধ্যাপক লা ফন্ট্ বলিয়াছিলেন—মনোযোগ দিলে প্রমথনাথ যে কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন।

বৃত্তি পাইয়া প্রমথনাথ ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজন করিলেন। তখন সাগর-পারে যাওয়া যেমন সহজসাধ্য ছিল না, তেমনই সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের আপত্তিকর ছিল। জ্ঞানান্বেষণে বদ্ধপরিকর প্রমথনাথ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অধ্যয়নশীল ও পরিশ্রমী ছিলেন; এই জন্য পরীক্ষার পর পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে লাগিলেন! ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এম, বি-র প্রথম বিজ্ঞান পরীক্ষা ও বি, এস সি-র প্রথম পরীক্ষা—এই যুক্ত পরীক্ষায় প্রাণিতত্ত্বে চতুর্থ ও উদ্ভিদতত্ত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূতত্ত্বে তৃতীয় এবং উদ্ভিদতত্ত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি, এস-সি উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "রয়াল স্কুল অব মাইনসের" ভূতত্ত্ব, প্রস্তরীভূত কঙ্কালতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও পদার্থ-বিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিষয়দ্বয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হইলে প্রমথনাথ ভারতে শিক্ষা বিভাগে বা ভূতত্ত্ব বিভাগে সরকারী চাকরীর জন্য ভারত-সচিবের নিকট আবেদন করিলেন বটে, কিন্তু ঐ সকল উচ্চ পদে তখন ভারতীয়ের নিয়োগ ইংরেজ সরকারের প্রীতিপ্রদ ছিল না—সে সকল পদ কেবল শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য।

প্রমথনাথ ব্যর্থকাম হইলেন বটে, কিন্তু নিরাশ হইলেন না। তিনি যে বৃত্তি লইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্তিকাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ও অন্যান্য পরীক্ষার ছাত্রদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। বোধ হয়, এই সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু দিন তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

পরিশ্রমী প্রমথনাথ সময়ের অপব্যয় করিতেন না। এই সময়ে তিনি বৃটিশ মিউজিয়মে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতেন এবং ইংলণ্ডের পত্রের জন্য হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু-সভ্যতা ও হিন্দু-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিতেন—অর্থার্জ্জনের প্রয়োজনেও বটে, বিদেশীদিগের নিকট স্বীয় দেশের ও সমাজের সভ্যতার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিবার জন্যও বটে। সে সময় এই কার্য্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ,

প্রমথনাথ বসু

মেকলে প্রমুখ ইংরেজ লেখকদিগের চেষ্টায় য়ুরোপে লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যই নহে—ভারতীয়গণ বর্ব্বর। ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ে সেই মত এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতে আগমন করেন, তখন কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার কবিতায় তাঁহার উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,
তোমার (ই) শিল্প, তোমার আচার ;
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত
ভারতের আহা ! কি রয়েছে আর ?"

আর যে স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে বিদেশীদিগকে বলিয়াছিলেন—

"বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা ; ভারতেরও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

তিনি তখনও বালক। সেই সময় প্রমথনাথ ভারতের শাসক-শোষক সম্প্রদায়ের দেশে স্বদেশের সভ্যতার, সংস্কৃতির ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ধাতুগত স্বদেশপ্রীতির ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচায়ক।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে—ছাত্রাবস্থায় প্রমথনাথ ইটালীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসে ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাইয়া তাহার জন্য পুরস্কার লাভ করেন।

প্রমথনাথের যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারত-সচিব তাঁহাকে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগে পরিদর্শকের পদ প্রদান করেন। ফ্রান্স ও ইটালী দেশদ্বয় পরিদর্শন করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৩ বৎসর ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া কাজ করেন। নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ সরকারী চাকরী ত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ, তিনি আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত ছিলেন না। ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ লিখিয়াছেন—ভূতত্ত্ব বিভাগে প্রমথনাথের কার্য্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতে বড় লাট তখন ঐ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে তাঁহার নিয়োগের দাবী উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজ সরকার এক জন য়ুরোপীয়কে তাহা প্রদান করেন। ভারতীয় বলিয়া তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায়—প্রতিবাদে প্রমথনাথ পদত্যাগ করেন। যাঁহাকে ঐ পদ প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি টমাশ হল্যাণ্ড। এই ব্যক্তি পরে কেন্দ্রী সরকারের উচ্চ পদ পাইয়া সার টমাশ হল্যাণ্ড হইয়াছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমর-সরঞ্জাম সরবরাহ বিভাগে দারুণ দুর্নীতি প্রকাশ পাওয়ায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কিন্তু অপরাধের জন্য অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

চাকরীর সময় তাঁহাকে কার্য্যব্যপদেশে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ-ভারত, দার্জ্জিলিং, সিকিম, ব্রহ্মদেশ ও আসাম—নানা স্থানে দুর্গম পার্ব্বত্য স্থানে, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমিতে যাইয়া ভূগর্ভস্থ সম্পদের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে তিনি কোথাও কয়লার, কোথাও তাম্রের, কোথাও ম্যাঙ্গানিজের, কোথাও বা লৌহের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আসামে যে ভূগর্ভে পেট্রল আছে, তাহার সন্ধান তিনিই সর্ব্বাগ্রে দিয়াছিলেন।

তিনি যখন অনুসন্ধান কার্য্যে যাইতেন, তখন কি ভাবে তাঁহাকে থাকিতে হইত, তাহার বিবরণ তাঁহার প্রথমা কন্যা—শ্রীমতী সুষমা সেন—একটি প্রবন্ধে দিয়াছেন। নভেম্বর হইতে এপ্রিল, এই ৬ মাস প্রমথনাথ অনুসন্ধান কার্য্যে গমন করিতেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। সন্তানদিগের মধ্যে যাহারা শিশু—কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে মাতামহীর নিকট রাখিয়া স্নেহশীল পিতামাতা অন্য সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। একবার তিনি যখন মধ্যভারতে গমন করেন, তখন স্বামী, স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বপৃষ্ঠে পথ অতিক্রম করিতেন আর দ্বিতীয় পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা ঝুড়ীতে কুলীর পৃষ্ঠে বাহিত হইতেন। যে স্থানে জঙ্গলের মধ্যে তাম্বু খাটাইয়া থাকিতে হইত তথায়—হিংস্র জন্তুর ভয়ে রাত্রিকালে তাম্বুর চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিতে হইত। মধ্যে মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের ও নেকড়ে বাঘের গর্জ্জন শুনা যাইত। প্রমথনাথ বন্দুক কাছে রাখিতেন। তিনি কখন কখন পশু শীকার করিতেন ; কখন পক্ষী শীকার করিতেন না। একবার তিনি কার্য্যব্যপদেশে ব্রহ্মে (ব্রহ্ম তখন ভারতের অংশ ছিল) গমন করেন এবং তথায় সপরিবারে এক বাঙ্গালী বন্ধুর আতিথ্য স্বীকার করেন।

এই সকল কার্য্যের মধ্যেও তিনি কখন সাহিত্য চর্চ্চায় শিথিলপ্রযত্ন হয়েন নাই। তিনি যেমন বৈজ্ঞানিক, তেমনই ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ রচনা করিতেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে যদুনাথ মজুমদারের চেষ্টায় যশোহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন হয়। সেই অধিবেশনে প্রমথনাথ বিজ্ঞান-শাখার সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার The Illusions of India গ্রন্থ কেবল প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ভারতের সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের বিষয় বিবৃত হইল। আমার সহিত পরিচয় হইলে, আমার খুল্লপিতামহের পুত্র যে তাঁহার সতীর্থ ছিলেন, তাহা বলিয়া তিনি আমাকে ঐ পুস্তকের একখানি উপহার দেন—লিখিয়া দিয়াছিলেন—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
আশীর্ব্বাদ সহ উপহার।
যশোহর শ্রীপ্রমথনাথ বসু।
৭ই বৈশাখ, ১৩২৩ সাল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। এই সূত্রে প্রমথনাথের সহিত ঐ কলেজের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়—তাঁহারা এ দেশে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাঁহাদিগের সেই আলোচনায় আর এক জন বাঙ্গালী যোগ দিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত। এই আলোচনার ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঙ্গালায় বিদ্যার্থিগণকে শিল্প শিক্ষাদানের জন্য "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট" স্থাপিত হয়। তখনও জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী চাকরীতে ছিলেন। তারকনাথ প্রতিষ্ঠানটির জন্য বহু অর্থ প্রদান করেন। প্রমথনাথ এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯০৬—১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)। এই প্রতিষ্ঠানই নানা

বিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান "যাদবপুর কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনলজী"তে পরিণত হয়। প্রমথনাথ প্রায় ১৩ বৎসর ইহার রেকটর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ ভারতীয় শিল্প সমিতির (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসোসিয়েশনের) প্রথম সম্পাদক হয়েন এবং ঐ বৎসরই "বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্সে" সভাপতি পদে বৃত হয়েন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

প্রমথনাথ কেবল উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াই শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েন নাই। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করেন—লাভের জন্য বা আশায় নহে, পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য—ক্ষতি স্বীকার অগ্রাহ্য করিয়া। তাহাই, বোধ হয়, এ দেশে বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রথম সাবান-শিল্পের কারখানা। তাহার পরে—স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় ডক্টর নীলরতন সরকার ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী জাপানী বিশেষজ্ঞ লইয়া সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে এ দেশে কেবল ঢাকায় পুরাতন পদ্ধতিতে "ভীড়ে সাবান" প্রস্তুত হইত কিন্তু তাহাতে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আসানসোলে একটি কয়লার খনি ভাড়া লইয়া গবেষণা-কার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ যখন সরকারী চাকরী ত্যাগ করেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও ময়ূরভঞ্জ সামন্তরাজ্যের রাজা। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের আয়তন ৪,২৪৩ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ। রাজ্যে খনিজ সম্পদের বাহুল্য ব্যতীত অভাব ছিল না; কিন্তু সে সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না—কেবল শালগাছ বিক্রয় করিয়া রাজ্যের রাজস্ব-বৃদ্ধি হইত। শ্রীরামচন্দ্র ইংরেজীতে সুশিক্ষিত ও প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি যখন বালক তখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা—একই প্রদেশভুক্ত ছিল এবং তিনি কলিকাতায় কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের উন্নতি সাধন জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং সে জন্য উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি যেই অবগত হইলেন, প্রমথনাথের মত এক জন অভিজ্ঞ বাঙ্গালী সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন, তখনই রাজ্যের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য তাঁহাকে লইবার ব্যবস্থা করিলেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের নবভাগ্যোদয় হইল। প্রমথনাথ গরুমহিষানীতে উৎকৃষ্ট লৌহের সন্ধান পাইলেন এবং সে বিষয় "জিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার" বিবরণে প্রকাশ করিলেন। কয়লার খনির সান্নিধ্যে তেমন উৎকৃষ্ট লৌহের খনি ভারতে আর কোথাও নাই।

এক জন ভারতীয় এই আবিষ্কার করিয়া দেশের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা তাঁহাদিগের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। সেই জন্য কোন কোন লেখক সেই আবিষ্কারের গৌরবে প্রমথনাথকে বঞ্চিত করিয়া তাহা আমেরিকার বৈজ্ঞানিক-দিগকে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন জমশেদপুরে প্রমথনাথের আবক্ষমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমবেত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে ভারত সরকারের "জিয়লজিক্যাল সার্ভের" প্রধান কর্ম্মচারী সার লুই ফারমোর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সার লুই বলেন:—

"বসু মহাশয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গরুমহিষানীর লৌহসম্পদে আবিষ্কার করেন এবং সেই আবিষ্কার-ফলে জমশেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়। উপযুক্ত সময়ে বসু মহাশয় ইহা আবিষ্কার করায় এই কারখানা কাজ করিবার পক্ষে ভুল স্থানে স্থাপিত হওয়া নিবারিত হইয়াছিল। সে জন্য টাটা কোম্পানী সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। আমার মনে হয়, জমশেদপুরের কেন্দ্রস্থলে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সঙ্গত হইয়াছে; কারণ, তিনি ভূগর্ভে উৎকৃষ্ট লৌহ আবিষ্কৃত করাতেই এই স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল।"

সেই অনুষ্ঠানে টাটাদিগের প্রধান প্রতিনিধি সার আরদেশীর দালাল সভায় সার লুই ফারমোরের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"বসু মহাশয়ের আবিষ্কার না হইলে আজ জমশেদপুরের এই কারখানা কয়লার খনিবহুল স্থান হইতে ও কলিকাতা বন্দর হইতে আরও দূরে প্রতিষ্ঠিত হইত।"

এই সকল উক্তির পরে এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, বসু মহাশয়ের আবিষ্কার-ফলেই এ দেশে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের সর্ব্বপ্রধান কারখানা কাজ করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারখানা যদি কয়লার খনি ও বন্দর হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হইত, তবে উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইত এবং অন্যত্র এত উৎকৃষ্ট লৌহও পাওয়া যাইত না।

প্রমথনাথ যখন উপযুক্ত লৌহ ভূগর্ভে কোথায় আছে, তাহার সন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় নব ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী নাসরবানজী টাটা আধুনিক পদ্ধতিতে বহুল পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য উপকরণ সরবরাহের সমস্যার সমাধান সন্ধান করিতেছিলেন। প্রমথনাথ তাহা জানিতেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া স্বীয় আবিষ্কারের বিষয় টাটা মহাশয়ের গোচর করেন। মণি-কাঞ্চন যোগ হয়।

প্রমথনাথ বৈজ্ঞানিক—তাঁহার লক্ষ্য, বিজ্ঞান যেন ধ্বংসের ও মৃত্যুর রথে সংযুক্ত না হইয়া দেশের ও মানব-সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। জমশেদজী টাটা কর্ম্মপ্রাণ। বিদেশী শাসকদিগের অবলম্বিত নীতির ফলে নির্ব্বাপিতবহুশিল্প ভারতবর্ষ কৃষি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের জন্য আর্ত্তনাদ করিলেও অনেকের পক্ষেই তাহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" পশে নাই; ভারতে ধনীরা অনেকেই বিনা আয়াসে ধনবৃদ্ধি করিতেই অভিলাষী ছিলেন—ঐশ্বর্য্যের দায়িত্ব উপলব্ধিতে তাঁহাদিগের সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত হইত না। যে মুষ্টিমেয় ভারতীয় দেশের শিল্পের জন্য আর্ত্তনাদ শুনিয়া চঞ্চল হইয়াছিলেন, জমশেদজী তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রাজা মহারাজার কার্য্যের গুরুত্ব অপেক্ষা শিল্পপতির কার্য্যের গুরুত্ব যেমন অধিক তাঁহাদিগের তুলনায় শিল্পপতির গৌরবও তেমনই অধিক। তিনি দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রমথনাথের পত্র যখন তাঁহার হস্তগত হয়, তখন

তাঁহার পক্ষ হইতে মধ্যভাবতে ভূগর্ভে লৌহের সন্ধান চলিতেছে। বসু মহাশয় লিখিলেন, তিনি পরীক্ষাফলে বুঝিয়াছেন, মধ্যপ্রদেশের ভূগর্ভে যে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা কার্য্যোপযোগী নহে; সে কথা তিনি সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগের পত্রে লিখিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে তিনি যে লৌহের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যোপযোগী—বিশেষ তাহা কয়লার খনির সান্নিধ্যে অবস্থিত। প্রমথনাথের পত্র পাইবার অল্প দিন পরে—১৯০৪ খৃষ্টাব্দে—জমশেদজী টাটার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ পিতার আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ময়ূরভঞ্জ দরবারের সহিত প্রাথমিক ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। শাকলাতওয়ালা প্রতিনিধিদিগের অন্যতম ছিলেন। ইনিই পরে কম্যুনিষ্টদিগের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আর এক জন প্রতিনিধির নাম বাদশা। তিনি যখন অধ্যাপকের কাজ করিতেছিলেন, তখনই জমশেদজী তাঁহাকে আপনার সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন; তিনি টাটাদিগের কার্য্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সঙ্গে পেরিণ নামক আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বোধ হয়, রাশিয়া হইতে বিশেষজ্ঞ শেলকার্ককেও আনা হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা টাটাদিগের সহিত তাঁহার পক্ষ হইতে সব ব্যবস্থা করিবার ভার প্রমথনাথকে দিলেন। তিনি যে স্থান কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, তথায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার অন্যতম হইবে, এই বিশ্বাস প্রমথনাথের ছিল। ভাবতে ও ঐ স্থানে কারখানা স্থাপিত হয় সে দিকে যেমন, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের স্বার্থের দিকেও তেমনই লক্ষ্য রাখিয়া প্রমথনাথ কাজ করিতে লাগিলেন। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প এ দেশে নূতন, সেই জন্য পেরিণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি রাজ্যের মুনাফা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে রাজ্যের যেমন লাভ হইল, টাটাদিগেরও তেমনই সুবিধা হইল। টাটা লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে আজ সিংহভূমির দুইখানি নগণ্য গ্রাম কর্ম্মকোলাহল-মুখরিত বিরাট নগরে পরিণত হইয়াছে—একটিতে টাটানগর রেল-ষ্টেশন ও অপরটিতে জমশেদপুর কারখানা স্থাপিত হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।

প্রমথনাথের এই অসাধারণ কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ লিখিয়াছেন—যখন বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় ও তাহার প্রয়োগে নব ভারতের অবদানের ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর নাম অঙ্কশাস্ত্রে মনীষী শ্রীনিবাসন রামানুজের, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর, পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্কার জন্য নোবেল পুরস্কারের অধিকারী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণের, রসায়ন-শাস্ত্রে বিস্ময়কর কার্য্যকারী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ও শান্তিস্বরূপ ভাট-নগরের এবং ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে রয়াল সোসাইটীর সদস্যপদে বৃত ভাবার নামের সহিত একসঙ্গে লিখিত হইবে।

ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রমথনাথ ব্যতীত আর যে সকল বৈজ্ঞানিকের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের ফল যত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী হউক না কেন, প্রমথনাথের কার্য্য তাঁহাদিগের কার্য্য অপেক্ষাও প্রত্যক্ষীভূত।

এই প্রসঙ্গে আমরা দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম—টাটা কোম্পানীর সহিত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের যে বন্দোবস্ত করিয়া প্রমথনাথ গরুমহিষানীর লৌহ ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন, সেজন্য তিনি রাজ্যের নিকট হইতে যেমন, কোম্পানীর নিকট হইতেও তেমনই প্রভূত অর্থ পারিশ্রমিক ও পুরস্কার হিসাবে লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই—রাজ্যের অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যদি পুরস্কার লইতেন তবে শেষ বয়সে—অবসর গ্রহণ করিবার পরে—অর্থের প্রাচুর্য্যাভাব হেতু তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু সে সব অসুবিধা তিনি গ্রাহ্যই করেন নাই। তিনি নির্লোভ ও সন্তোষ-সাধনা-সিদ্ধ ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় প্রমথনাথের চরিত্রের এক দিক যেমন সপ্রকাশ, নিম্নে যে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহাতে তেমনই তাহার আর এক দিক সুপ্রকাশ। তিনি অন্যায় সহ্য করিতেন না। অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি সরকারী চাকরী ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তেমনই যখন টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর প্রথম প্রচারিত বিজ্ঞাপনে তিনি দেখেন, লিখিত হইয়াছে, জমশেদজী টাটা যে অনুসন্ধান-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই (গরু-মহিষানীতে) কয়লার খনির সান্নিধ্যে উৎকৃষ্ট লৌহের আবিষ্কার হইয়াছে, তখনই সেই অযথার্থ উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাঁহার পত্র পাইয়া বাদশা (১৯০৭ খৃষ্টাব্দ, ৩রা জুলাই) প্রমথনাথকে লিখেন—তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন (আবিষ্কার তাঁহার) তাহাই সত্য; শেষ বিজ্ঞাপন প্রচার কালে সে বিষয় মনে রাখা হইবে; ব্যবসাগত বিজ্ঞাপনে সর্ব্বত্র সকলের সম্বন্ধে প্রাপ্য কার্য্যের গৌরব উল্লেখ করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু যাহাতে একের প্রাপ্য অন্যের বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এমন কথা বলা অসঙ্গত। যে বিরাট আবিষ্কারে টাটা লৌহ ও ইস্পাত-কারখানার ভিত্তি তাহার গৌরব প্রমথনাথের।

কত অল্প বয়সে প্রমথনাথের প্রতিভা তাঁহাকে সুধী-সমাজে পরিচিত ও সমাদৃত করিয়াছিল, তাহার পরিচয়-প্রসঙ্গে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীতে তাঁহার সম্মানের উল্লেখ করা যায়। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উহার শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে স্মারক পুস্তকে উহার কৃত কার্য্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়, প্রমথনাথ তাহার বিজ্ঞান বিভাগের পরিচয় লিখিবার ভার পাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন—সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্র; প্রত্নতত্ত্ব; ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্য্যের পরিচয় লিখেন ডক্টর হোর্ণলে, আর বিজ্ঞান বিভাগের কার্য্যের বিবরণ রচনা করেন—প্রমথনাথ বসু। তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ; কারণ, রাজেন্দ্রলালের জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, হোর্ণলের জন্ম—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে, প্রমথনাথের জন্ম ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকরী লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাহার তিন বৎসর পরেই যে তাঁহাকে এই কার্য্যভার প্রদান করা হয়, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, সুধীসমাজ তখনই তাঁহার যোগ্যতার আদর করিয়াছেন। আরও ৫০ বৎসর পরে—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যে উৎসব হয়, তখনও

তিনি জীবিত ছিলেন। সেই বৎসর (২৭শে এপ্রিল) ৮০ বৎসর বয়সে প্রমথনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হয়। তাঁহার চারি পুত্র ও পঞ্চ কন্যার মধ্যে দুই পুত্র ও পঞ্চ কন্যা তখন জীবিত ছিলেন। তাঁহার পত্নী তখন অসুস্থ।

প্রমথনাথ স্বীয় চরিত্রে বৈজ্ঞানিকের ও দার্শনিকের সমন্বয় করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দুই পুত্রের মৃত্যুশোক ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দার্শনিকোচিত স্থৈর্য্য সহকারে শোক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল—সংবাদ শুনিয়া প্রমথনাথের বৃদ্ধা জননী পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে আসিলে প্রমথনাথই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন,—"মা, শোক করিয়া লাভ কি? প্রত্যেক সংসারেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। অধীর হইলে চলিবে কেন?" দ্বিতীয় পুত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলে সংবাদ পাইয়া তিনি কেবল বলিয়াছিলেন—"অলোকও আমাদের ছেড়ে চলে গেল!"

প্রমথনাথ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং সেই জন্য দেশের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। তিনি "স্বদেশী আন্দোলন" প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং মনে করিতেন, আমরা বিদেশীদিগের অনুকরণে অনেক অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যয় বাড়াইয়াছি—অভাব সঙ্কুচিত করিয়া সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিলে আমরা স্বদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক মূলধন সঞ্চয় করিতে পারিব।

আমাদিগের দেশে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও অভাব সৃষ্টি কত [illegible] হইয়াছে, তাহা টমাশ মনরোর উক্তি বিবেচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মনরো ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সেনাদলে প্রবেশ করিয়া [illegible] আসিয়া মাদ্রাজের গভর্ণর হইয়া (১৮২০ খৃষ্টাব্দ) ১৮২৭ [illegible] এ দেশেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার [illegible] অভিজ্ঞতাফলে বলিয়াছিলেন—ভারতে বিদেশী পণ্য [illegible] সুবিধা হইবে না; কারণ, এ দেশের লোকের অভাব অতি [illegible]—তাহারা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে; এবং তাহাদিগের [illegible]—ব্যবহার্য্য দ্রব্য তাহারাই উৎপন্ন করে। কিন্তু [illegible] বৎসরে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—ভারতে বিদেশী [illegible] ব্যবহার কত অধিক হইয়াছিল! প্রমথনাথ দেশবাসীকে [illegible] তাহাদিগের সরল জীবনযাত্রার ফলে ফিরিয়া যাইতে [illegible]ছিলেন।

প্রমথনাথ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান যে মানুষের দাস [illegible] মানুষকে দাস করে, ইহা তিনি অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা [illegible]। বিদেশে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া তিনি [illegible] জন্য আতঙ্কিত হইতেন।

তিনি স্বদেশবাসীকে আপনার বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিতে নিষেধ [illegible]। শিল্পপ্রধান দেশসমূহে মানুষের নৈতিক অবনতি তাঁহাকে [illegible] করিত। তিনি প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন, কোন দেশ [illegible] অন্য দেশের সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণ করিলে [illegible] নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প ধ্বংসের পথে পরিচালিত [illegible] তিনি তাঁহার "সভ্যতার যুগসমূহ" গ্রন্থে ইহা [illegible]ইয়াছিলেন এবং "নব ভারতের ভ্রান্তি" গ্রন্থে ভারতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেশের নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ উন্নতি বিধানে তাঁহার দান যেমন অসাধারণ, দেশকে ভ্রান্ত পথ ত্যাগে প্ররোচিত করিতে তাঁহার অবদানও তেমনই উল্লেখযোগ্য।

প্রমথনাথের লেখনীপ্রসূত পুস্তকের সংখ্যা অল্প নহে এবং সকল পুস্তকই গবেষণা ও চিন্তার পরিচায়ক। তাঁহার তিন খণ্ডে লিখিত "বৃটিশ শাসনে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রেরও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহার "সভ্যতার যুগসমূহ" গ্রন্থের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। "নব ভারতের ভ্রান্তি" পুস্তকের কথাও বলা হইয়াছে। এই সকল ব্যতীত বহু পত্রে তাঁহার বৈজ্ঞানিক, শিল্পবিষয়ক ও অন্যান্য বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ইংরেজীতে তাঁহার লিখিত আর কয়খানি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য যথা—Survival of Hindu Civilisation, Some Present-day Superstitions, The Root Cause of the Great War. বাঙ্গালাতেও তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

প্রমথনাথ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়াছেন, প্রমথনাথের পরিবারস্থদিগের জীবনে সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে সঙ্গীতের প্রভাব অল্প ছিল না।

প্রমথনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক দুইটি কথা তাঁহার ভাগিনেয় প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র বিবৃত করিয়াছেন।—

(১) তিনি তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থানে কোন আত্মীয়কে প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি বলিয়াছিলেন—"charity begins at home. যে আমার গৃহে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালে, তাহাকে এ টাকা না দিলে অন্যায় হইবে।" পূর্ব্বপুরুষের ভিটা তীর্থস্থান মনে না করিলে কেহ এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না।

(২) পরিণত বয়সে তিনি কৃষিকার্য্যে ও গোপালনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রতিদিন কিছু সময় বাগান পরিদর্শনে ও গোসেবার ব্যবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। এক দিন এক জন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—ঐ সব কাজ তাঁহার নেশা—উহাতে লাভ কিছুই হয় না, অথচ ব্যয় হয়। তিনি ঐ সময় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রযুক্ত করিলে অর্থলাভ করিতে পারেন। শুনিয়া প্রমথনাথ বলিয়াছিলেন "আমার অল্প পরিমাণ মানসিক শান্তি—প্রভূত অর্থ অপেক্ষা মূল্যবান।"

প্রমথনাথ একাধারে বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও স্বদেশভক্ত ছিলেন। তিনি স্বীয় সমাজের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া সংশোধনের পথনির্দ্দেশ করিতেন, স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে সচেষ্ট ছিলেন; তিনি সাহিত্য-সেবায় অক্লান্তকর্মী ছিলেন এবং শিক্ষায় ও প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক ছিলেন। দীর্ঘ জীবন তিনি অনলস ভাবে কাজ করিয়া স্বদেশের—স্বদেশবাসীর সর্ব্ববিধ সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাবিষয়ক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের ব্রত উদ্‌যাপনে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

একটা টুলের উপর বসে প'ড়ে মিঃ প্যাপলওয়ার্থ লিখতে সুরু করলেন। পেছনের দরজা দিয়ে একটি মেয়ে এসে টেবিলের উপর নতুন-তৈরী কতকগুলো টানা-ব্যাণ্ডেজ রেখে চলে গেল। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ জিনিসটা তুলে নিয়ে, 'অর্ডারের' হলদে কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, তারপর এক পাশে রেখে দিলেন। এর পর তুলে নিলেন একটা কাঁচা মাংসের মত লালচে রঙের 'পা'। সব ক'টি জিনিস মিলিয়ে দেখে, আবার এক-জোড়া অর্ডার তিনি লিখলেন। পলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চললেন যে দরজা দিয়ে মেয়েটা এসেছিল সেই দরজার পথে। নীচের দিকে এক সারি কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। তার নীচে একটা ঘর, তার দু'ধারে জানালা। অন্য পাশে দু'টি মেয়ে নীচু হয়ে বসে জানালার আলোতে সেলাই করে চলেছে। গুন-গুন করে তারা এক সঙ্গে গাইছে, 'নীল দুটি ছোট মেয়ে।' দরজা খোলার শব্দ পেয়ে তারা ফিরে তাকাল। দেখলে, প্যাপলওয়ার্থ আর পল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তাদের গান বন্ধ হয়ে গেল।

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ বললেন, 'এত কাঁউ-মাউ কেন? লোকে ভাববে, আমরা যেন কতকগুলো বেড়াল পুষেছি।'

একটি মেয়ের পিঠে কুঁজ, সে একটা উঁচু টুলের উপর বসেছিল। তার লম্বা আর ভোঁতা মুখ প্যাপলওয়ার্থের দিকে ফিরিয়ে সে চাপা গলায় বললে, 'তা'হলে ওগুলো সব হুলো বেড়াল।'

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ পলের সামনে নিজের গুরুত্ব জাহির করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কোন ফল হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনি এলেন যে ঘরে, সে ঘরে তৈরী জিনিস শেষ বারের মত দেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই কুঁজওয়ালা মেয়েটি সেই ঘরেই বসেছিল। তার নাম ফ্যানী। উঁচু টুলের উপর ওর দেহটাকে লাগছিল অদ্ভুত রকমের ছোট। তার শরীরের তুলনায় ঘন বাদামী রঙের চুল-সুদ্ধ মাথাটাকে দেখাচ্ছিল প্রকাণ্ড বড়ো। ওর ফ্যাকাশে আর বিষণ্ণ মুখখানাকেও ভীষণ বড়ো বলে মনে হচ্ছিল। পরনে একটা কাশ্মীরী সালের পোষাক, পোষাকটার রঙ সবুজ আর কালোর মাঝামাঝি। জামার চুড়িদার হাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে মণিবন্ধ দুটি—সরু আর চ্যাপটা। একটু ধড়-মড় করে উঠে সে তার হাতের কাজটা টেবিলের উপর রাখল। হাঁটু বাঁধবার একটা ব্যাণ্ডেজে কি যেন একটু ত্রুটি ছিল. মিঃ প্যাপলওয়ার্থ সেইটে তাকে দেখালেন।

ফ্যানী বললে, 'আমাকে দোষ দিতে এসেছেন কেন? এ ত' আমার দোষ নয়?' বলতে বলতে তার গালে লালচে আভা দেখা দিল।

—'তোমার দোষ ত' আমি বলিনি। যা বলছি শুনবে কি না?' মিঃ প্যাপলওয়ার্থ সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন।

—'আমার দোষ ত' বলছেন না, কিন্তু ঠারে-ঠোরে দোষটা ত' চাপাচ্ছেন আমার ঘাড়েই।' কুঁজওয়ালা মেয়েটি প্রায় কেঁদে ফেললে। তারপর তার উপরওয়ালার হাত থেকে ব্যাণ্ডেজটা টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ক'রে দিচ্ছি আমি, তাই বলে মেজাজ দেখাতে আসবেন না কিন্তু।'

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। বললেন, 'এই যে তোমাদের নতুন ছেলেটি'...

ফ্যানী অল্প একটু হেসে পলের দিকে চেয়ে বললে, 'ও!'

—'হ্যাঁ দেখো, তোমরা সবাই মিলে এখন ওর মাথাটি খেয়ো না যেন।'

ফ্যানীর আবার রাগ হ'ল। সে বললে, 'মাথা খাবার জন্যেই আমাদের জন্ম আর কি!'

মিঃ প্যাপলওয়ার্থ পলকে ডাকলেন। বললেন, 'চলে এসো, এবার।'

একটি মেয়ে বলে উঠল, 'আবার এসো, ভাই!'

একটা চাপা-হাসির তরঙ্গ ব'য়ে গেল। পল একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। লজ্জায় মুখ রাঙা ক'রে সে বেরিয়ে গেল।

দিন যেন আর শেষ হতে চায় না। সকাল বেলার দিকে সারাক্ষণ অফিসের সব লোক আসছে মিঃ প্যাপলওয়ার্থের সঙ্গে গল্পসল্প করতে, তাদের আসার যেন আর শেষ নেই! পল হয় লিখছে, নয় ত' দুপুরের ডাকে পাঠাবার জন্যে পুলিন্দা বাঁধতে শিখছে। একটা যখন বাজল, কিম্বা তারও মিনিট পনেরো আগে, মিঃ প্যাপলওয়ার্থ গাড়ি ধরবার জন্যে উধাও হলেন—শহরের উপকণ্ঠেই তাঁর বাসা। পলের ভারী একা-একা বোধ হতে লাগল। একটার সময় খাবারের ঝুড়িটা নীচে নিয়ে গিয়ে সেই অন্ধকার মাল-গুদামের মধ্যে একা বসে তাড়াতাড়ি খাবারটুকু খেয়ে নিল সে, তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল। পথের মুক্ত আলোতে, বাইরের অবাধ মুক্তিতে এসে তার মনের অস্বস্তি কেটে গেল, কত কিছু করবার কথা সে কল্পনা করতে লাগল মনে মনে। কিন্তু দুটো বাজতেই আবার সেই প্রকাণ্ড ঘরটির এক অন্ধকার কোণে এসে ঠাঁই নিতে হ'ল তাকে। কারখানার মেয়েগুলো নানা মন্তব্য করতে করতে দল বেঁধে তার পাশ ঘেঁষে চলে গেল। এরা সব কম মাইনের মেয়ে; উপর তলায় কোমরের ব্যাণ্ডেজ কিম্বা নকল হাত-পা তৈরীর ভারী কাজে এদের খাটতে হয়। পল বসে বসে ভাবতে লাগল, কখন মিঃ প্যাপলওয়ার্থ ফিরে আসবেন। কি করতে

হবে কিছুই তার জানা নেই, একা একা বসে সে 'অর্ডারি' মালের চলনে কাগজ নিয়ে তার উপর হিজিবিজি কাটতে লাগল। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ এলেন তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিটের সময়। এর পর পলের পাশে বসে সারাক্ষণ তিনি খোস-গল্প করে গেলেন; পল যেন তাঁর সমশ্রেণীর লোক, মর্য্যাদার দিক দিয়ে ত' বটেই, এমন কি বয়সের দিক দিয়েও!

বিকেল বেলা বিশেষ কিছু কাজ থাকে না। শুধু সপ্তাহের শেষে যখন হিসাব-নিকাশ তৈরী করতে হয় তখন কাজের চাপ খানিকটা বেড়ে যায়। পাঁচটার সময় অফিসের সব লোক নীচের তলায় গিয়ে জড়ো হয়—ওই অন্ধকার গুহার মধ্যে খটখটে টেবিলে বসে চা খায়; খোলা, ময়লা পাত্র থেকে রুটি-মাখন নিয়ে খায়; ওদের খাওয়ার মধ্যে যেমন ব্যস্ততা আর অসভ্যতা, ওদের কথা আর গল্পের মধ্যেও তেমনি। এরাই যখন উপর তলায় থাকে তখন কেমন হাসিখুশি, কেমন খোলা মন নিয়ে কথা বলে। নীচের তলায় এসে এই অন্ধকার, এই পুরোন টেবিলে বসে খাওয়া, এর ছোঁয়া যেন লাগে ওদের মনে।

চা-খাওয়ার পর গ্যাসের আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তখন এখানকার কাজ আরও জমে ওঠে। সন্ধ্যার ডাকটাই বড়ো ডাক, তাতে মাল পাঠাতে হয়। কারখানা থেকে সদ্য তৈরি হয়ে আসা পায়জামাটা পলের কাছে গরম লাগে। ওটা ভাঁজ করে, ঠিকানা লিখে, ফর্দ্দ মিলিয়ে সব ক'টি পুলিন্দা ওজন করে পলকে পাঠাতে হয়। চারি দিকে অনেকগুলো গলার আওয়াজ ভেসে আসে, ডেকে ডেকে ওজন মেলাচ্ছে তারা। কত টাইপ খটাখট শব্দ, কত দড়ি ছেঁড়ার পটাস্ পটাস্ আওয়াজ। তারপর ডাকটিকিট আনতে যেতে হয় মিঃ মেলিঙের কাছে। অবশেষে ডাকঘরকরা তার থলে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে হাজির হয়। সে চলে গেলে আবার ঢিলেমি দেখা দেয় কাজে। পল তার খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে আটটা কুড়ি মিনিটের ট্রেন ধরবার জন্যে ষ্টেশনের দিকে ছোটে। কারখানার দিন নিরেট বারোটি ঘণ্টার কাজ দিয়ে ঠাসা।

বাড়িতে মা অপেক্ষা করে থাকেন ওর জন্যে। মনের মধ্যে কত রকমের ভাবনা ভাঙে আর গড়ে। ষ্টেশনে পৌঁছেও বাড়ির পথে অনেকটা হাঁটতে হয়, কাজেই বাড়ি যেতে যেতে ন'টা বেজে আরও প্রায় কুড়ি মিনিট। সকাল বেলা আবার সাতটা না বাজতেই বেরিয়ে পড়তে হয় বাড়ি থেকে। ওর স্বাস্থ্যের জন্যেই মায়ের যা-কিছু ভাবনা। কিন্তু তাঁর নিজের শরীরের উপর দিয়েই কি ধকলটা কম যায়, তবে ছেলেদের কেন তিনি এই ঝুঁকিটুকু নিতে বাধা দেবেন? সব কিছুই মেনে নিতে হয় জীবনে, এই শিক্ষাটুকু ওরা পাক। সুতরাং পল জর্ডন-এর অফিসে কাজ করে যেতে লাগল। তবে আলো-বাতাসের অভাবে আর এই সারা দিনের খাটুনিতে শরীরের দিক দিয়ে তার বেশ ক্ষতি হতে লাগল।

পল বাড়িতে যখন এল, তখন ক্লান্তিতে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। মা চেয়ে দেখলেন ওর দিকে, বেশ খুশি বলেই মনে হ'ল। মায়ের দুশ্চিন্তার বোঝা খানিকটা কমল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল রে?'

—'ভারী মজার মা!' পল জবাবে বললে, 'কাজ ত' কিছুই নয় আর লোকগুলিও খুব চমৎকার!'

—'তা'হলে ঠিক তোর মনের মত হয়েছে ত'?'

—'হ্যাঁ মা, শুধু আমার হাতের লেখার নিন্দে করে সবাই। তবে মিঃ প্যাপলওয়ার্থ—যিনি আমার উপরওয়ালা—তিনি মিঃ জর্ডনকে বললেন, 'এ ঠিক চলবে। তুমি একদিন আমাকে দেখতে যেয়ো কিন্তু। সত্যিই খুব ভাল লাগবে তোমার।'

কিছুদিনের মধ্যেই জর্ডনের দোকান তার ভাল লেগে গেল। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ ত' যেন বহুদিনের পুরোন বন্ধু, অনেকটা এক গেলাসের ইয়ার বললেই চলে; তার মধ্যে কপটতা ব'লে কিছু নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য তার মেজাজ চড়ে যায়, সেদিন ঘন ঘন হজমিগুলী চুষতে থাকেন তিনি। তখনও কিন্তু কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলেন না। অনেক লোক আছে, নিজের খারাপ মেজাজের জন্য অন্যকে মনঃকষ্ট না দিয়ে নিজেরাই তারা কষ্ট পায়। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ সেই জাতের লোক।

হয়ত ডেকে বললেন, 'কী হে, এখনো হ'ল না? সারা মাসটাকেই যে রোববার বানিয়ে তুললে দেখছি!' কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার সেই পুরোন হাসিখুশি ভাব, রঙ্গ করে বলছেন, 'কালকে আমার ইয়র্কশায়ারের টেরিয়ার জাতের মাদী কুকুরটাকে নিয়ে আসব।'

পল বলত, 'ইয়র্কশায়ারের টেরিয়ার কী?'

—'তাও জান না, ইয়র্কশায়ারের টেরিয়ার কা'কে বলে তাও তুমি জান না!' বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে থাকতেন তিনি পলের মুখের দিকে।

—'ও, সেই পুঁচকে কুকুর, রেশমের মত লোম, গায়ের রঙ রূপোর মত শাদা আর মর্চ্চে-পড়া লোহার মত লাল?'

—'তাই বটে, তাই বটে। দেখবে, একটি রত্ন! এখনি ওর পাঁচ পাউণ্ড দামের বাচ্চা হয়েছে, আর ওর নিজের দামই হবে সাত পাউণ্ডের বেশী। ওজন আর কী—কুড়ি আউন্সও হবে না!'

পরের দিন সারমেয়-তনয়া এসে হাজির হলেন। এক রত্তি এক কুকুর, দেখলে মায়া লাগে, যেন অষ্টপ্রহর ভয়ে কাঁপছে। ওর জন্যে পলের একটুও দরদ নেই। ওটা যেন একটা ভেজা ন্যাকড়া, কোন দিনই যা আর শুকবে না। এধার থেকে একটা লোক কুকুরটাকে ডাকলে, ডেকে বাজে রসিকতা করতে লাগল। কিন্তু মিঃ প্যাপলওয়ার্থ পলের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন। চুপি চুপি ওদের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

মিঃ জর্ডন আর একদিন এলেন পলকে দেখতে। সেদিন একটি মাত্র খুঁত তিনি খুঁজে বার করলেন, পল কলমটাকে রেখেছিল কাউণ্টারের উপর।

'ওহে, কলমটাকে কানে গোঁজ, নইলে কেরাণী সাজবে কী করে?—কানে গুঁজে রাখো।'

আর একদিন বললেন, 'ওহে ছোকরা, কাঁধটাকে সোজা রাখতে পারো না? এসো আমার সঙ্গে।' ব'লে তাকে অফিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে টাইট-বেল্ট পরিয়ে দিলেন, যাতে সে বুক আর কাঁধ সোজা রেখে চলতে পারে।

কিন্তু পলের সব চেয়ে ভাল লাগল মেয়েদের। পুরুষরা সবাই কেমন শাদামাটা ধরে বুদ্ধি কিছু কম। পল ওদের সবাইকে ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে আগ্রহের উষ্ণতা বড়ো থাকত না। পলী ব'লে যে মেয়েটি নীচের তলায় কাজের

তদারক করে বেড়াত, সে একদিন দেখল, পল একা-একা নীচের অন্ধকার কুটরীতে বসে খাবার খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, তার নিজের ষ্টোভে (নিজস্ব একটা ছোট ষ্টোভ তার ছিল) ওকে কিছু বেঁধে দেবে কিনা। পরদিন পলের মা তাকে দিয়ে একটা গরম করবার মত প্লেট পাঠিয়ে দিলেন। পল প্লেটখানা নিয়ে গেল পলীর ঘরে। ঘরখানা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, দেখে আরাম পাওয়া যায়। তারপর আস্তে আস্তে এমন হয়ে দাঁড়াল, রোজই ওরা দু'জনে এক সঙ্গে বসে খাবার খেত। সকাল বেলা আটটার সময় এসে পল খাবারের ঝুড়িটি নিয়ে রাখত পলীর ঘরে, একটার সময় নীচে নেমে এসে দেখত খাবার তৈরী।

পল এখনও মাথায় খুব লম্বা হয়ে ওঠেনি। আগের মতই ফ্যাকাসে চেহারা, মাথায় ঘন বাদামী রঙের চুল, নাক মুখ খুব কাটা-কাটা নয়, মুখের হাঁটুকু যথেষ্ট বড়ো। পলী যেন একটি ছোট পাখী। পল মাঝে মাঝে ওকে আদর করে ডাকত 'বুলবুলি' বলে। এমনিতে পল খুব শান্ত-শিষ্ট, কিন্তু পলীর সাথে গল্প করতে বসে বাড়ির কথা বলেই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। ওর গল্প শুনতে সব মেয়েদেরই ভালো লাগত। ওকে ঘিরে তারা বসত, পল বসত একটা বেঞ্চির উপর, তারপর ওদের দিকে হাসিমুখে ঝুঁকে পড়ে গল্প জমাত। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ পলকে একটি অদ্ভুত ক্ষুদে জীব বলে মনে করত, এমনিতে এত গম্ভীর, অথচ গল্প বলবার সময় এমন হাসিখুশি—মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে ওর শালীনতার অভাব নেই। মেয়েরা সবাই ওকে ভালবাসত, আর সে ত' মনে মনে মেয়েদের তুলনাই খুঁজে পেত না। পলী যেন তার একান্ত আপন, সে যেন পলীর ঘরের লোক। তাছাড়া ওই লাল চুলওয়ালা মেয়েটো 'কনি' যার নাম, মুখখানা তার যেন আপেলের কুঁড়ির মত সুন্দর, গলার সুরে যেন মম্মরধ্বনি, সে ত' দেবীর দেশের মেয়ে; তার পরনে যদিও একটা অতি-সাধারণ কালো রঙের ফ্রক। পলের মনের কোন গোপন তারে সে যেন ঝঙ্কার জাগিয়ে যেত।

পল ওকে বলত, 'তুমি যখন বসে বসে সুতো গুটোও, আমার মনে হয় যেন তুমি চরকাতে সুতো কেটে চলেছ। তুমি যেন সেই স্বপনপুরের রূপকুমারী! পারলে আমি তোমার ছবি আঁকতুম।'

মেয়েটি একটু লজ্জা পেত ওর কথা শুনে, আড়চোখে একবার চাইত ওর দিকে। একদিন পল ওর একখানা ছবি আঁকল, ছবিখানা তার বড় আদরের। চরকার সামনে টুলের উপর 'কনি' বসে আছে, তার লাল চুল এলিয়ে পড়েছে পুরোন কাল জামাটার উপর। লাল ঠোঁট দুটি চাপা, যেন নিবিষ্ট মনে কি ভাবছে। বসে বসে সে লাল সুতো গুটিয়ে রাখছে।

'লুই' ব'লে মেয়েটি দেখতে সুন্দরী এবং সাহসিকা। কোমর দুলিয়ে সে যখন পলের পাশ দিয়ে যেত, পল রহস্য করে কথা বলত তার সঙ্গে।

'এমা' মেয়েটি সাদাসিধে। বয়স একটু বেশী আর ভারী সদয়। পলের কোন কাজে লাগতে পারলে সে খুশি হ'ত। পলও তাকে বঞ্চিত রাখত না। হয়ত গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কলে ছুঁচ লাগাও কি ক'রে?'

—'যাও, কাজের সময় বিরক্ত করো না।'

—'শিখিয়ে দাও না। আমার জানা দরকার।'

মেয়েটি তার কাজ করে যেতে লাগল। বললে, 'কত জিনি[illegible] তোমার জানা দরকার!'

—'বেশ, তবে বলো, কি ক'রে কলে ছুঁচ পরাতে হয়।'

—'আঃ, ছেলেটা জ্বালিয়ে মারল দেখছি। নাও, দেখো কি ক'রে হয়।'

পল নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ কোথায় একটা শিস্ দেওয়ার মত আওয়াজ হ'ল। একটু পরেই পলী এসে উপস্থিত। চড়া-গলায় বললে, 'মিঃ প্যাপলওয়ার্থ জানতে চাইলেন, তুমি আর কতক্ষণ নীচের তলায় মেয়েদের সঙ্গে রঙ্গ করে বেড়াবে?'

পল তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটত উপর তলায়। 'এমা'ও সামলে নিত নিজেকে। বলত, 'আমি ত' বলিনি ওকে কলকব্জা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে।'...

ছুটোর সময় সব মেয়েরা যখন আবার ফিরে আসত, তখন পল দৌড়ে যেত উপরতলায় 'ফ্যানী'র কাছে। ফ্যানী সেই কুঁজওয়ালা মেয়েটি, তার কাজ হ'ল জিনিসপত্র শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখে দেওয়া। মিঃ প্যাপলওয়ার্থ কোন দিনই তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিটের আগে আসেন না। তিনি এসে প্রায়ই দেখতেন, পল ফ্যানীর পাশে বসে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে, কিম্বা ছবি আঁকছে, অথবা ওদের গানের সঙ্গে সুর ক'রে গান গেয়ে চলেছে।

মাঝে মাঝে একটু ইতস্ততঃ করে ফ্যানীও গান করতে সুরু করত। একটু চাপা হলেও তার গলার সুর ছিল খুবই মিষ্টি। সবাই তখন যোগ দিত তার গানে, গান ভালো করে জমে উঠত। মেয়েদের নিয়ে দল বেঁধে ঘরে বসতে পল আর আগের মত বিব্রত বোধ করত না।

গান থামলে ফ্যানী বলত, 'আমার গান শুনে নিশ্চয়ই হাসছ।'

—'অহেতুক এই বিনয় কেন?' একটা মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

একদিন 'কনি'র লাল চুল নিয়ে কথা হচ্ছিল। এমা বললে, 'আমার মনে হয় ফ্যানীর চুল ওর চেয়েও সুন্দর।'

ফ্যানী মুখ-চোখ লাল করে বললে, 'ঠাট্টা হচ্ছে? এমনি বোকা পেয়েছ আমায়?'

—'না, না সত্যি।—আচ্ছা পল, তুমিই কেন বলো না।'

পল বললে, 'তোমার চুলে রঙের বাহার আছে। মাটির মত পাঁশুটে রঙ, তবু ঝিকমিক করছে। যেন এঁদো পুকুরের জল।'

একটা মেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বললে, '[illegible] সাজ্ঘাতিক উপমা!'

ফ্যানী বললে, 'তোমাদের সমালোচনার চোটে আমার [illegible] উপায় নেই।'

'এমা' আগ্রহ দেখিয়ে বললে, 'সত্যি, পল, তোমার এঁকে রাখা উচিত। এমন চমৎকার! চুলটা মেলে দাও না ফ্যানী, পল যদি এঁকে নেয়।'

ইচ্ছে থাকলেও ফ্যানী কিছুতেই রাজী হ'ল না।

তখন পল বললে, 'তবে আমিই খুলে দিচ্ছি, কিন্তু।'

ফ্যানী বললে, 'করো, যা তোমার খুশি।'

অতি সন্তর্পণে পল পিনগুলো খুলে নিল। খুলে দিতেই মেটে রঙের চুলের রাশি ফ্যানীর উঁচু পিঠের উপর দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

—'কী চমৎকার!' পল মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল। মেয়েরা চেয়ে

রাতের ফোয়ারা

—তরেণ ঘোষ

উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন

—সুশীলকুমার রায়

বাঁশের সাঁকো

—বিষ্ণুপদ মিত্র

দুই আর মিষ্টি মুখ

—শ্যামল দত্ত

—বিমল ঘো
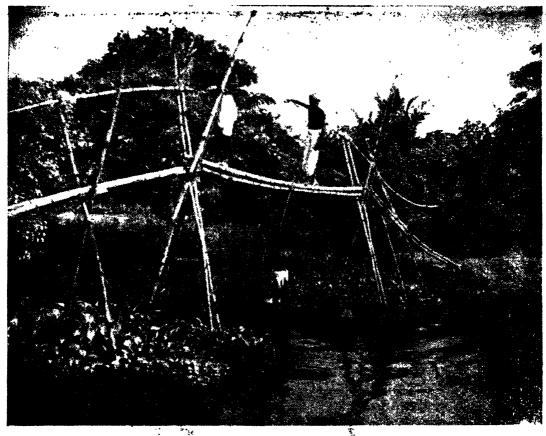
প্রথম চিত্রটি রাজা দ্বিতীয় লুই নির্ম্মিত ভারতীয় কারিগর ও ভারতীয় মালপত্রে নির্ম্মিত ও মসজিদের নকলে তৈরী ধূমপানাগার। ইংলণ্ডের এই মন্দিরটির অভ্যন্তরে আছে ধূমপানের প্রচুর ভারতীয় উপকরণ। রাজা স্বয়ং এই মন্দিরে ধূমপান করতেন। দ্বিতীয় চিত্রটি বালক শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির একটি নকল। কাঁচা সোনার রঙের কি এক প্রস্তরে এক হিন্দু এই মূর্ত্তি তৈরী করেন। এটি লুইয়ের রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। আলোকচিত্র শ্রীইবু চট্টোপাধ্যায় (ইংলণ্ড) গৃহীত।

মাছ ধরা, জ্যোৎস্না রাতে —রাম নন্দী
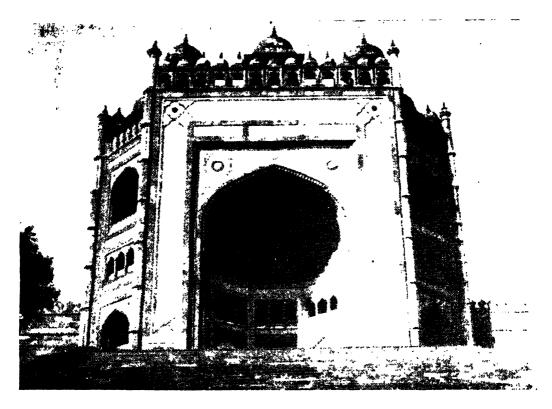
বুলান্দ দরওয়াজা (ফতেপুর সিক্রি) —দীনেশচন্দ্র বসু

শাঁখা চাই, চাই শাঁখা— —শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

রয়েছে। পল ওর চুলের জট ছাড়িয়ে দিতে লাগল। চুলের গন্ধ টেনে বললে, 'বাব্বাঃ, এ চুলের দাম যদি কয়েক পাউণ্ড না হয় ত' কী বলেছি!'···

ফ্যানী রহস্য করে বললে, 'ম'রে যাবার সময় চুলগুলো আমি তোমাকেই দিয়ে যাব।' কথাটা ঠাট্টা হলেও ঠিক ঠাট্টার মত শোনাল না।

ফ্যানীর পিঠে কুঁজ, পা দু'টি অতিরিক্ত লম্বা। একটি মেয়ে বলে উঠল, 'অন্য মেয়েরা যখন চুল শুকোয় তখন যেমন দেখায়, তোমাকেও ত' চুল মেলে বসে থাকলে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে।'

ফ্যানী বেচারার মনে খুব সহজেই আঘাত লাগে, সব সময়ে তার ধারণা, সবাই তাকে হেয় ভাবে দেখে। পলী কিন্তু খুব সহজ, কাঠখোট্টা ধরণের মেয়ে। তারা দু'জনে দুই দপ্তরে কাজ করে, দপ্তর দুটির মধ্যে মোটেই বনিবনা নেই। পল প্রায়ই এসে দেখতে পেত, ফ্যানী কাঁদছে। ফ্যানীর সব দুঃখের কাহিনী তার শুনতে হ'ত, ফ্যানীর হয়ে পলীর কাছে গিয়ে কথাও বলতে হ'ত তার।

এই ভাবে বেশ আরামেই সময় কাটতে লাগল। কারখানার আলো বাড়ির একটু একটু ছোঁয়া পাওয়া যেত। কাউকে জোর করে কাজ করানো কিম্বা বাধ্য করে ছুটোছুটি করানো, এ সব এখানে ছিল না। ডাকের সময় যখন সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠত, তখন পলের বেশ মজাই লাগত। কারখানার সব লোক তখন মিলে-মিশে কাজ করত। সঙ্গের কেরাণীদের কাজ দেখত পল মুগ্ধ হয়ে। ভাবত, কাজই এদের জীবন, অন্ততঃ এইটুকু সময়ের জন্যে কাজের বাইরে এদের আর কোন অস্তিত্ব নেই। মেয়েদের বেলায় কিন্তু অন্য রকম। কাজের মধ্যে ওদের আসল রূপটি ধরা পড়ে না, ওরা যখন কাজ করে তখন ওদের মধ্যেকার আসল মেয়েটি যেন বাইরে কোথায় প্রতীক্ষা করে থাকে।

ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফেরবার সময় পল চেয়ে চেয়ে দেখত দূরে পাহাড়ের উপরে এধারে-ওধারে ছড়ানো শহরের বাতিগুলি, নীচের সমতল জায়গাটায় সব বাড়ির আলো একসঙ্গে মিশে একটা প্রকাণ্ড দীপ্তির সৃষ্টি করেছে। সুখী মনে হ'ত তার নিজেকে—জীবনকে মনে হ'ত সমৃদ্ধিমান। একটু পরে চোখে পড়ত বুল-ওয়েলের আলোর রাশি, ঝ'রে-পড়া তারার ওরা যেন অজস্র পাপড়ি। আরও দূরে কারখানার উনুনের লাল আভা, মেঘের মধ্যে উষ্ণ নিঃশ্বাসের মত উড়ে বেড়াচ্ছে।

ষ্টেশন থেকে বাড়ি যেতে আরও দু' মাইল পথ তাকে হাঁটতে হ'ত। পথে পড়ত, দুটো খাড়া পাহাড়ের চড়াই আর দুটো ছোট পাহাড়ের উৎরাই। প্রায়ই সে খুব শ্রান্ত হয়ে পড়ত, পাহাড়ে উঠতে উঠতে সে গুণতে থাকত আর কতগুলো বাতি পার হয়ে তাকে যেতে হবে। অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ের উপর থেকে সে চেয়ে দেখত, পাঁচ মাইল দূর অবধি গ্রামগুলি যেন ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলন্ত জীবন্ত পদার্থের মত জ্বলছে। বহু দূরের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে কোন গ্রামের উজ্জ্বল আভা উঁকি দিত। নীচের সমতল প্রদেশের অন্ধকার শূন্যতাকে ভেদ করে মাঝে মাঝে রেলের গাড়ি ছুটে যেত—দক্ষিণে লণ্ডনের দিকে, কিম্বা উত্তরে স্কটল্যাণ্ডের দিকে। গাড়িগুলি যখন গর্জ্জন করে ছুটে যেত, তখন মনে হ'ত অন্ধকারের বুকে কে যেন সোজাসুজি ঢিল ছুঁড়ছে। তাদের হুস্-হুস্ শব্দের প্রতিধ্বনি জাগত সারা উপত্যকায়। তারপর গাড়িখানা চলে গেলে শূন্য উপত্যকার বুকে শহর আর গ্রামের বাতিগুলো নীরবে মিট্-মিট্ করে জ্বলতে থাকত।

দূরের অন্ধকারের দিকে চাইতে চাইতে পল এসে বাড়ি পৌঁছে যেত। বাড়ির কোণেও জমাট হয়ে আছে গাঢ় অন্ধকার। অ্যাশ-গাছটাকে এখন মনে হ'ত কত দিনের পরিচিত বন্ধু। বাড়ি ঢুকতেই মা হাসিমুখে উঠে দাঁড়াতেন। পল তার আট শিলিং সগর্বে টেবিলটার উপর রাখত। বলত, 'খরচের অনেক সাহায্য হবে, না মা?' প্রশ্নটা ক'রে সে করুণ-চোখে চেয়ে থাকত মায়ের দিকে।

মা বলতেন, 'কী-ই' বা বাঁচবে? তোমার টিকিট, জলখাবার এ-সবের খরচ বাদ দিয়ে কতই বা থাকবে?' তারপর মায়ের কাছে সে সারা দিনের সব ছোটখাট ঘটনার হিসেব খুলে বসত। রোজ রাত্রেই মায়ের কাছে এসে নিজের সব খবর সে বলত, আরব্য-রজনীর মত অফুরন্ত তার গল্প। শুনতে শুনতে মায়ের মন কানায় কানায় ভরে উঠত—মনে হ'ত, এ যেন তাঁর নিজেরই জীবনের ঘটনা।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য অনুদিত

ওগো ভালবাসা

সেখ বাগবুল ইসলাম

আমি যেন কোন নিদাঘ-দগ্ধ পিয়াসা-কাতর পাখী,
ডানা দু'টো মেলে, উড়ে যাই ভেসে নির্জন দূর-দেশে।
বুকে আমার বহ্নির জ্বালা লোর-ভরা জোড়া আঁখি,
কি যেন হারায়ে খুঁজে ফিরি একা নিঃসীম আকাশে ভেসে।

ও গো ভালবাসা কথা কও তুমি, জাগো তুমি আঁখি খুলে,
পীযূষধারায় ভিজাও আমার যাত্রার কালো পথ।
স্বপ্নের রঙে সাজাও আবার জীবনের জয়রথ,
প্রভাতের সম আলো হয়ে এসো অন্তরে দুলে-দুলে।

কেটে গেছে কত রঙিন লগ্ন, কত নিশি, কত ক্ষণ,
কিসের আশায় তুমি তাও জানো, আমি জানি না কো তার।
ফাঁকি দিই শুধু নিজেকে মস্ত, বুঝে বোঝে না কো মন,
এ পার ও পার, কিছু পাই না কো, তবু খুঁজি আজো কার।

বাঙলা দেশে সঙ্গীত-সম্মেলন না জলসা ?

শীতের মরসুমে বাঙলায় গানের সম্মেলন বসছে। কলকাতার সদারং, তানসেন হয়ে গেল, অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স কাদের ভাড়া করেছেন নামধাম সহ (অবশ্য খ্যাতনামা বিশেষ কাউকে দেখলাম না সেখানে) তা জানিয়েছেন। আরও এদিক ওদিক থেকে ছোট-খাট সম্মেলন-জলসার কথা শুনছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে আসছে এবং খোলাখুলিই তা বলব আজ। হিন্দী খেয়াল, ঠুংরি, গজল (উর্দু), টপ্পা, ধ্রুপদ, দাদরা, কাওয়ালি এই সব। কিন্তু সবেরই মিডিয়ম হিন্দী। কেন খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুংরি কি বাংলা ভাষায় নেই ? না তা আসরে পরিবেশনযোগ্য নয় ? কোন্ কারণে সম্মেলনে এমনি ভাবে বাঙলাকে অপাংক্তেয় করা হচ্ছে শুনি ? অনেককে বলতে শুনেছি বাংলা ভাষায় এ-সব জিনিস জমে না। অনেকে বলেন, গ্রামার মানেন যাঁরা তাঁরা বাংলায় গাইতে চান না। কেন, তা কোন গুণী ব্যক্তি যথার্থ ভাবে বুঝিয়ে বলবেন ? অপূর্ব কাব্য সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলার গানকে রাগ সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করুন, বাংলার সঙ্গীতশিল্পীদের কাছে আমাদের এই নিবেদন। সঙ্গীত-সম্মেলনের কর্তাব্যক্তিগণও সে বিষয়ে নজর দিন।

এখানে আমরা সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ও, সি, গাঙ্গুলী (সেই বিখ্যাত জন কি !) মহাশয়ের লেখা একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"But the Conferenees' in our city deliberately avoid any theoretical or historical discussious and never make any attempts to lead the way to the development of our Music. Most of our experts, who claim to be descendants of one or other of the gharwanas or family traditions of the Moghul Period, live comfortably in the belief that in Indian mnsic no development can or should be expected nor can there be and change in the traditions handed down from the remote past. Without a thorough groundgui in the theoretical knowledge of our music, no improvemens or development to meet the needs or the new age can be effected." টীকা নিষ্প্রয়োজন।

আকাশবাণীর সম্প্রসারণ

সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া রেডিও একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। এই পরিকল্পনার ফলে উপকৃত হবেন প্রায় ২' কোটি ভারতবাসী। ব্যয় হবে সাড়ে তিন কোটি টাকা। কি কি করা হবে, মোটামুটি তার একটা খসড়াও পেশ করেছেন কর্তৃপক্ষ। কুড়ি কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন দুটি প্রেরকযন্ত্র স্থাপিত হবে নয়া দিল্লীতে এবং একটি করে আজমীড়ে, কোচিনে আর পাটনায়। গৌহাটি আর কটক কেন্দ্রে বসবে দশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার একটি করে। সিমলায় একটি আড়াই কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার বসবে, এ কথাও শোনা গেছে। ফলে ত্রিশ হাজার বর্গ-মাইল স্থান অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আওতায় এসে পড়বে। মিডিয়াম ওয়েভের মারফৎ সঙ্গীত, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করা যাবে এখানে। আরও নানান পরিকল্পনা আছে এঁদের। কিন্তু কোথাও বাংলার সম্বন্ধে কোনও কথা তো নেই ! কোনও আশ্বাস ! কলকাতায় ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে সম্প্রতি এ কথা সত্য, কিন্তু অন্যান্য অনেক কিছু সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে এই ষ্টেশনটিতে।

টক্স ডিপার্টমেন্ট, ড্রামা সেক্সন, আবহাওয়া· সঙ্গীত পরিচালনার ব্যবস্থা, ঘোষকের বিকৃত (মেয়েলী মেয়েলী প্রায়ই) কণ্ঠস্বর অনেক কিছু পরিবর্তন করা দরকার। পরে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

বিনা টিকিটের শ্রোতা—Protest !

পয়সা খরচ না করেই মজা উপভোগ করবার মত এক শ্রেণীর ব্যক্তি সমাজে সর্বদাই আছেন। খেলার মাঠে র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে পুলিশের ঘোড়ার পদাঘাত সহ্য করে, বেটন খেয়েও (যেদিন যথেষ্ট টিকিট পাওয়া সম্ভব এমন দিনেও) বিনা পয়সায় খেলা দেখেন অনেকে। দশ টাকার নোট পকেটে করে ট্রাম-বাসে ওঠেন (সব সময়েই খুচরা পয়সার অভাবে এ ভাববেন না) এবং কলহ করতে করতে (কেন ভাঙ্গানী পাওয়া যাবে না মশাই?) প্রায়ই গন্তব্য-স্থলের কাছাকাছি এসে নেমে যান। কলকাতার সহরে প্রত্যহ এ আমরা দেখছি। সম্প্রতি কলকাতার সঙ্গীত-সম্মেলনগুলিতে বাইরে মাইক দেওয়ার ফলে হলের ভিতরের চেয়ে বাইরেই ভীড় দেখা যাচ্ছে বেশী। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়। এমন দিন আসলেও আসতে পারে, যখন সম্মেলনের সামনে পানের দোকান বরাবর গাড়ী ভিড়িয়ে ভিতরে বসে·গান শুনবেন অনেকে। এঁদের মধ্যে থাকবেন বহু ধনী, গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি পর্যন্ত, ইতর-বিশেষদের কথা বাদ দিয়ে বলছি! এখনই সম্মেলনে যথেষ্ট টিকিট বিক্রি হচ্ছে না শুনছি। সামান্য জন কয়েক লোক গোলমাল করতে পারে এই ভয়েই কি বাইরে মাইক রাখার বন্দোবস্ত? তাহলে হাজার হাজার টাকা খরচা করে ভারতের প্রান্ত প্রান্ত ঘুরে যে সমস্ত আর্টিষ্টকে জোগাড় করে আনলেন উদ্যোক্তারা তাঁদের সে খরচা উঠবে কি করে? অবিলম্বে বাইরে মাইক রাখার ব্যাপারটির একটি সমাধান হওয়া প্রয়োজন। বরং আমাদের মনে হয়, ভিতরের সমস্ত আসন পূর্ণ হলে তবেই যদি বাইরে মাইক লাগানো হয় তো দু'দিকই এক সাথে রক্ষা করা যেতে পারে।

বাঙলা গানে ইতালীয় প্রভাব

বাঙলা গানে বিশেষ করে আধুনিক গাইয়েদের কণ্ঠে হঠাৎ বিদেশী সুর শুনে আমরা একটু হকচকিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে এটির এত বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে যে, কিঞ্চিৎ ভৎর্সনার প্রয়োজন এঁদের। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গানে বিদেশ থেকে সুর আমদানী করার বিপক্ষে ছিলেন না বড় একটা কখনও। সঙ্গীতের উন্নতি বিধানে বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করবার কথাও আমরা এর আগে বলেছি কিন্তু সুরের বাড়াবাড়ি দেখে এখন আমাদের দু'-চারটি কথা বলতেই হচ্ছে। বাঙলায় হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সতীনাথ ইত্যাদি জনপ্রিয় [illegible]দের গানেও ইতালীয় প্রভাব স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। সুরের ওঠা-নামার দ্রুততায় বাদ্যযন্ত্রের চাপে গানের বাণী প্রায়ই চাপা পড়ে যায় এঁদের। বিদেশী সুর গ্রহণ করলে তা [illegible]। শ্রোতারাও হয়ত মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শোনেন। কণ্ঠে কণ্ঠে কিছু দিন ঘোরেও তা কিন্তু এতে করে বাঙলার সংস্কৃতির অপমান করা হয় না কি? বিদেশী সিমফনি (কেবলমাত্র বিদেশী [illegible]) আমরা বাংলা গানে শুনতে চাই না। আংশিক ভাবে গ্রহণ করে বাঙলার ছাঁচে ঢেলে নিয়ে যদি তা কেউ পরিবেশন করতে পারেন তো উত্তম, না হলে তাঁদের কেরামতীই শুনব আমরা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইতালীয় সঙ্গীতধারা আমরা বহু দিন থেকে অনুকরণ করছি। বাঙলায় একদা প্রচলিত ইটালীয়ান ঝিঁঝিট'ও কোন দিন জনপ্রিয় হয়নি।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কবির রচনা পাঠ

কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সব সময়েই সব-কিছু যে খারাপ বলা, খারাপ করা হচ্ছে, কুৎসিত গলায় গান হচ্ছে, সুর-তাল-মান ঠিক থাকছে না, অভিনয় যাচ্ছেতাই হচ্ছে, প্রোগ্রাম এ্যাসিষ্টেন্টরা ফাঁকি দিচ্ছেন, নতুনত্ব নেই, এমন কোনও বদ্ধ ধারণার প্রশ্রয় আমরা কস্মিন্ কালেও দিই না। মাঝে মাঝে ভাল জিনিষের বন্দোবস্তও তাঁরা করেন বই কি! নিন্দুকেরা অবশ্য হাক্সলী সাহেবের সেই বিশ্ববিখ্যাত উপমাটির কথা পাড়বেন। বলবেন, একটি টাইপরাইটারে একটি হনুমানকে টুল পেতে বসিয়ে দাও। লক্ষ বার ভুল সেন্টেন্স টাইপ করতে করতে একটা শুদ্ধ সেন্টেন্সও সে টাইপ করে ফেলতে পারে। আমরা অবশ্য তা বলব না। কবির রচনা পাঠের কথা একটি অতি উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু যে ভদ্র-মহিলাকে (আমরা শ্রীমতী বাগচীর কথাই কি বলছি?) এই রচনা পাঠ করবার জন্য দেওয়া হয় মধ্যে মধ্যে, আমাদের সন্দেহ আছে তিনি রেডিওর অডিসন টেষ্টে (অনেকের কাছেই তো

শুনেছি এটি একটি তরাবহ ব্যাপার। আই এ এস হওয়ার চেয়েও নাকি!) পাশ করলেন কি করে? উদ্দেশ্য যখন সাধু তখন সঠিক লোক নির্বাচনে এ অক্ষমতা কেন?

অনুরোধের আসরের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি

অনুরোধের আসরে সত্যি সত্যি অনুরোধ কেউ করেন, কি করেন না, তা আর আমাদের জানবার উপায় নেই। মনে হয়, আগে আগে যাঁরা রেডিও-ষ্টেশনে বসে রবিবারের দুপুরে রেকর্ড বাজাতেন, কয়েক জন মার্কা-মারা শিল্পীর (বন্ধুত্ব সূত্রে!) ব্যক্তিগত অনুরোধে বেছে বেছে তাঁদেরই গান বাজাতেন, সত্যি কিনা জানি না! অর্থাৎ এটা পাবলিকের অনুরোধের আসর নয়। মুষ্টিমেয় কয়েক জন শিল্পীর অনুরোধের আসর! অনুরোধের আসরে যে কোনও রেকর্ডই বাজানো হোক না কেন, এটি যে শ্রোতাদের মধ্যে খুব বেশী প্রিয় তা সকলেই স্বীকার করবেন। বর্তমানে মধ্যে মধ্যে যে ভদ্রমহিলা (আগেকার সেই বিভীষণ সদৃশ কণ্ঠের ভদ্রলোককে বিদায় দিয়েছেন বলে রেডিওর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিচ্ছি) কার গানের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে সে কথা প্রচার করে থাকেন তাঁর কণ্ঠটি মিষ্ট, উচ্চারণ স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর। সব শেষে বক্তব্য, ভাল কিছু বেতার কর্তৃপক্ষ করলে আমরা যে প্রশংসাও করি তা তাঁরা দেখুন। কেবল মাত্র তরুণ, সতীনাথ, উৎপলা, ধনঞ্জয়ের রেকর্ড ভঙ্গ প্রতি সপ্তাহে না করে আরও হাজার গায়ককে যদি পরিবেশন করা যায় তাতে খুশী হওয়ার কারণ আছে! সম্প্রতি হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সূর্য্য অস্ত হো গয়া' গানে রেডিওর ব্যতিক্রম দেখলাম।

রবীন্দ্র, অতুল, রজনী ব্যতীত কেউ নেই বেতারে?

রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের কি রজনীকান্তের গানের প্রতি কোনও অবিচার না করেই একথা আমরা বলছি যে, বাংলা দেশে এই তিন জন ছাড়াও আরও অনেক কবি যে অনেক গান রচনা করে গেছেন তাঁদের গানও মধ্যে মধ্যে পরিবেশন করুন বেতার। দ্বিজেন্দ্রলাল, রঙ্গলাল, নজরুল, প্রভৃতির গানও বাজুক কিছু বেশী করে। মধ্যে মধ্যে জলসার মত করে প্রাচীন কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ এঁদের গানের আসরও বসান না এঁরা। প্রাচীন কবীরা জনপ্রিয় হবেন আবার। বেতার শ্রোতাগণও মুখ পাল্টাতে পারবেন মধ্যে মধ্যে। দোহাই, রবীন্দ্র-অতুল-রজনীকান্তকে বাজিয়ে বাজিয়ে এমন অকালে মেরে ফেলবেন না! যাই করুন, নতুনত্বের সন্ধান করুন। বেতার-কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন করুন। অফিসিয়াল কায়দা-কানুন, টাই-কোট-প্যান্ট, ফাইল রেখে গানের আসরের পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

●

ভ্রম-সংশোধন

বিগত ভাদ্র সংখ্যার মাসিক বসুমতীর নাচ-গান-বাজনায় ভ্রমবশতঃ যদু ভট্টের স্বরলিপিসহ একটি গান বৈজু বাওরার নামে প্রকাশিত হয়েছে, এজন্য আমরা দুঃখিত।

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ন'টি অধিবেশনে রক্সী চিত্রগৃহে নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হবে। এবারে যাঁরা যোগদান করবেন বলে আশা করা যায়, তাঁদের নামের তালিকায় আছেন—পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীঅনন্তমনোহর যোশী, পণ্ডিত ডি ভি পালুসকর, ওস্তাদ মুস্তাক্বিদ নিয়াজী, ওস্তাদ সারাফৎ হোসেন খান, পণ্ডিত বালজী চতুর্বেদী, শ্রীযুক্তা কেশরীবাঈ কেরকর, শ্রীযুক্তা গাঙ্গুবাই হাঙ্গল, শ্রীমতী কৌশল্যা মঞ্জেশকর, ডাঃ সুমতি মুতাতকর প্রভৃতি। যন্ত্রে ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খান, ওস্তাদ ইম্‌রাৎ হোসেন খান, গজানন্দ যোশী, পণ্ডিত ভি জি যোগ, শ্রীআনোখেলাল মিশ্র, ওস্তাদ হাবিবুদ্দিন খান, ওস্তাদ মজিদ খান, শ্রীযশোবন্ত রাও, শ্রীদত্তারাম, শ্রীমতী সরণরাণী, মিয়া বিসমিল্লা ও সম্প্রদায় প্রভৃতি। নৃত্যে—তাঞ্জোর ভগিনীবৃন্দ, শ্রীমতী আশাজিকা, শ্রীমতী রোহিণী ভাটে। এ ছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পীও আছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি থাকবেন ডাঃ বি ভি কেশকার এবং উদ্বোধন করবেন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী সি পি রঙ্গস্বামী আয়ার, আলাউদ্দীন সঙ্গীত-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪ই থেকে ১৭ই জানুয়ারী। এতে অংশ গ্রহণ করবেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান, ওস্তাদ আলি আকবর খান, পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান, কণ্ঠে মহারাজ, কিষেণ মহারাজ প্রভৃতি। একটি আসরে ওস্তাদ আলাউদ্দীন সপরিবারে পুত্র, কন্যা এবং জামাতা সহ অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানা গেল। চলতি বড়ো সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির মধ্যে সব চেয়ে পুরনো মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত-সম্মেলনের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হবে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর এবং চলবে ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত। সুখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মোহিনীমোহন মিশ্রের পুত্র মুরারিমোহন তরুণ বয়সেই পরলোক গমন করেন কিন্তু স্বল্প জীবন কালেই তিনি সারা ভারতে অসাধারণ গুণী বলে খ্যাতি অর্জন করেন। মুরারিমোহনের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। এবারকার সম্মেলনের বিবরণী দান সম্পর্কে গত শনিবার অনুষ্ঠান-উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেন। সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রী রায়চৌধুরী বলেন যে, সম্মেলন দ্বারা লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার হতে পারে। তিনি বলেন, কাঠামো ঠিক রেখে নতুন নতুন ছন্দ সৃষ্টি করে শিল্পীরা শোনাতে পারেন, যেমন করছেন রবিশঙ্কর, আলি আকবর প্রভৃতি। কর্ণাটি ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সংমিশ্রণ দেখানো যেতে পারে। ডাঃ কেশকরের মতো সমঝদার ব্যক্তিও এই সব বাঙলা গানের প্রশংসা করেন এবং বাঙলা দেশে তার প্রচলনের

জন্ম বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে, ডাঃ কেশকরের গানের অন্যতম গুরু ছিলেন হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। সম্মেলন-উদ্যোক্তারা জানান যে, শ্রোতাদের কাছ থেকে চাহিদা উঠলে তারা সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ বাঙলা গান প্রবর্তন করতে সম্মত আছেন। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে এ পর্যন্ত যাঁরা যোগদান করবেন বলে জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হীরাবাঈ বরোদেকর, সরস্বতীবাঈ রাণে, ওস্তাদ আলি আকবর খান, পণ্ডিত পটবর্ধন এবং স্থানীয় খ্যাতিমান শিল্পিবৃন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর শুভ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় এক সর্বভারতীয় মহিলা সঙ্গীত-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আসমুদ্র হিমাচল থেকে আসছেন বহু গুণী মহিলা সঙ্গীতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা শিল্পীদের মধ্যে এই নিখিল ভারত মহিলা সঙ্গীত-সম্মেলনে নৃত্যে, কণ্ঠ-সঙ্গীতে ও যন্ত্রসঙ্গীতে শ্রীযুক্তা উত্তরা দেবী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, ইরা সেনগুপ্তা, বাণী দাশগুপ্তা, মীরা ঘোষ দস্তিদার,, কুমারী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, হেনা বর্মণ, দীপ্তি রায়, আরতি লাহা রায়, রেণুকা সাহা, মায়া মিত্র, কল্যাণী রায়, দীপিকা দাস, মঞ্জুলিকা দাস, কুমারী শ্রীজাতা ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মায়া গঙ্গোপাধ্যায়, ইতু ভট্টাচার্য্য, মণিমালা শীল, নমিতা মুখোপাধ্যায়, অচলা শীল, সাবিত্রী ভট্টাচার্য্য, ধীরা দত্ত প্রভৃতি। এই সম্মেলনের নৃত্যানুষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মীরাবাঈ নৃত্য-নাট্য। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার এর রচয়িত্রী আর ভজন গানগুলোর সুরারোপও করেছেন তিনি। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী (ভাদুড়ী) বি-এ, এই নৃত্যনাট্যের নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং তিনিই এই অনুষ্ঠানের নৃত্য রচনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। এঁর সঙ্গে থাকবেন, গীতা ঘোষ, ইরা ঘোষ, দীপালী দত্ত, ভারতী ঘোষ ও শ্রীজাতা ভট্টাচার্য্য। এই সঙ্গীত-সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৪ বৎসরের অনুর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাদের একটি সঙ্গীত-সম্মেলনের এবং একটি সর্বভাষার রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। সঙ্গীত-সম্মেলন এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব বহনের ভার পড়েছে, সঙ্গীত-সম্মেলন সাব-কমিটির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বিজন ঘোষ দস্তিদার ও শ্রীযুক্তা দীপালী নাগের ওপর। উক্ত সম্মেলনে বাঙলার বাইরে থেকে বাঙালী মহিলা শিল্পী যোগদান করছেন ডেরাডুনের শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদের কুমারী শান্তি চক্রবর্ত্তী, পাটনার সুবিখ্যাত মালবিকা রায় ও কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলংএর কুমারী শিশিরকণা দে প্রভৃতি। কলকাতায় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের নামে যেমন একটি স্মৃতিসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে তেমনি ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁয়ের নামেও অপর একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবদুল করিমের স্মৃতি পালনের জন্য এই বাবদে কলকাতায় একটি সঙ্গীত-জলসার আয়োজন হয়েছে। অংশ গ্রহণ করছেন বড় গোলাম আলি খাঁ, আলি আকবর খাঁ, ইত্যাদি আরও অনেকে।

তানসেনের একটি গান

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি

কাফী—ত্রিতাল

ভজন

ঘর আও সজন মিঠ বোলা
তেরে বেখাতর সব কছু ছোড়া কাজর তেল তমোলা।
জো নহীঁ আবে রৈন বিহাবে ছিন মাসা ছিন তোলা,
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর কর ধর রহে কপোলা॥

০ ১ ২´ ৩

মধা পা | মা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা রা রা | মা -া পা -া | -া -া মধা পা |
ঘ র আ ০ ও স জ ন মি ঠ বো ০ লা ০ ০ ০ ঘ র

০ ১ ২´ ৩ ০

মা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রসা রা মা মা | ণা মা পা -া | -া -া { মা মা | পা ধা ণা র্সা |
আ ০ ও স জ০ ন মি ঠ বো ০ লা ০ ০ ০ { তে রে বে ০ খা ০

২´ ৩ ০ ১

ণা ধা ণধা পা | মা পা মা পা | মা -া } -া -া | ণা -া ধা পা | মা পা মা মা |
ত র স ব ক ছু ছো ০ ড়া ০ } ০ ০ কা ০ জ র তে ০ ল ত

২ ৩

রমা রমা পধা মপা | মজ্ঞা রা ||
মো০ ০০ ০০ ০ লা ০

০ ১ ২´ ৩ ০

{ মা পা না না | না -া না -া | র্সা -া র্সা র্সা | ণধা নর্সা র্সা -া | ধা ণা র্রা -া |
{ জো ০ ন হী আ ০ বে ০ রৈ ০ ন বি হা০ ০০ বে ০ ছি ন মা ০

১ ২´ ৩ ০ ১

মজ্ঞা -া র্রা র্সা | ধণা র্সর্রা নার্সা | ণা -া ধা -া } | মা -া পধা ণর্সা | ণধা পা ধা ধা |
সা ০ ছি না তো০ ০০ ০০ লা ০ ০ ০ } মী ০ রা০ ০০ কে০ ০ প্র ভু

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩

ণা ণা ণা ণা | ণধা পা ধা পা | রা মা মা মা | পা পা -া পা | মপা মপা ধা মপা | মজ্ঞা রা ||
গি রি ধ র না০ ০ গ র ক র ধ র র হে ০ ক পো০ ০০ ০ ০ লা ০

তান

২´ ৩

১। রমা পধা ণর্সা ণধা | পমা পমা ||
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ ২´ ৩

২। সরা জ্ঞমা পধা ণধা | পমা ধপা মজ্ঞা রস | রমা পধা র্সা ণধা | পমা পমা ||
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০

কাফী—সম্পূর্ণ জাতি, গা ও নি কোমল—
আরোহী—সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা,
অবরোহী—র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
বাদী—প, সংবাদী—র। সময়—রাত্রি।

কাফীতে গা ও নি কোমল ব্যবহার হয় কিন্তু গানে ও রাগ বিস্তারে দুই গান্ধারও দুই নিখদ প্রায় প্রয়োগ করা হয়। যথা:—স র জ্ঞ ম প ধ ণ র্স ন র্স ণ ধ প গ ম প জ্ঞ র স।

এক সুখী পরিবারের ছবি!

সব হাঁসিরই একটা ইতিহাস আছে। আমার পরিবারের সকলের মুখের হাঁসিরও একটা বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু এখনকার মতো চিরদিনই এদের স্বাস্থ্য এত ভালো ছিল না।

কয়েক মাস আগেও আমার স্বামী প্রায়ই অসুখে ভুগতেন, যার জন্য তাঁর আয় কমে যেতে লাগলো। তার উপর আমার তিন ছেলে-মেয়ের শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তাদের ওজন কমতে আরম্ভ ক'রেছিল। ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হওয়াতে কথা-বার্তায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি জিজ্ঞাস ক'রলেন, 'মাপ ক'রবেন, কিন্তু আপনারা রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ কি করে কেনেন বলুন ত? হয়ত তার থেকেই আপনার পরিবারে অসুস্থতা আসছে।'

তিনি শুনে সন্তুষ্ট হবেন ভেবে আমি বললাম যে আমি সর্ব্বদাই রান্নার জন্য সবচেয়ে ভালো স্নেহপদার্থ খোলা অবস্থায় কিনি। 'যতো ভালো স্নেহপদার্থই হোক', শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'খোলা অবস্থায় থাকলে তাতে সর্ব্বদাই ময়লা হাত লাগতে পারে ও তাতে মশা-মাছি পড়তে পারে আর তা খেয়ে অসুখ ক'রতে পারে।'

তিনি তখুনি আমাকে ডাল্‌ডা বনস্পতি কিনতে বললেন। তার প্রথম কারণ ডাল্‌ডা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল আর শীলকরা টিনে সর্ব্বদা বিক্রী হয় বলে তাতে রোগের বীজাণু ঢুকতে পারে না। আর ডাল্‌ডা বনস্পতির প্রস্তুতকারীরা অতি উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বাজারে বের করেন না। আমি শুনেই বুঝলাম যে শিক্ষয়িত্রী ঠিক কথাই বলছেন। আর আমার পরিবারের সকলেই ডাল্‌ডায় রান্না খাবার খেয়ে কি খুসী! কারণ ডাল্‌ডা বনস্পতি সব খাবারের নিজস্ব স্বাদগন্ধ ফুটিয়ে তোলে। শীলকরা টিনে ডাল্‌ডা বনস্পতি কিনলে আপনি যে তাজা, বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর জিনিস পাচ্ছেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ডাল্‌ডা বনস্পতিতে রান্না খেয়ে কেমন ক'রে আমার পরিবারের সকলে দিনভোর স্বাস্থ্যের হাসিখুসীতে কাটায় তার প্রমাণস্বরূপ এই ছবিটি আমি কাছে রাখবো। আপনার পরিবারেরও এমন ছবি যদি চান তো ডাল্‌ডা বনস্পতি দিয়ে সব রান্না করুন। আজই এক টিন কিনুন।

১০, ৫, ২ ১ ও ১/২ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডাল্‌ডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুন:
দি ডাল্‌ডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

গাছ মার্কা টিন দেখে নেবেন

রাঁধতে ভালো—খরচ কম

HVM. 220-X52 BG

চিত্র ও বিচিত্র

নীলকণ্ঠ

বহু সময়ে আমার মনে হয়েছে, নোতুন দিল্লী পুরনো দিল্লীর মত কলকাতাকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর-কলকাতা এবং দক্ষিণ-কলকাতায়। চেহারায় চরিত্রে এবং পারিপার্শ্বিকে দু' কলকাতায় মিল সামান্যই। গরমিল আকাশ-পাতাল। দক্ষিণ-কলকাতার লোক উত্তর-কলকাতায় গেলে হাঁফিয়ে ওঠে। উত্তর-কলকাতার লোক তেমনি দক্ষিণ-কলকাতায় এলে মনে করে বিদেশ বিভুঁয়ে কোথাও এসে উঠেছে।

উত্তর-কলকাতা ঘিঞ্জি। ঠাস বুনোন। মার্জিন কম। বাড়ীগুলি কোন কালের, কেউ জানে না। পরিবারের যে যেখানে আছে সবাই মিলে থাকে এক জায়গায়। মাসী-পিসী-মামাতো-জ্যাঠতুতো ভাই, গাঁয়ের বুড়ো-লোক, দারোয়ান, ঝি, চাকর, সরকার মশাই, এক পাল বাচ্চার মাষ্টার মশাই খাওয়া-থাকার বিনিময়ে। তার মধ্যে হেঁসেল, বাই-হেঁসেল, মেজো বাবুর চাকর, ছোট কর্তার ঝি সব আছে।

কিন্তু দক্ষিণ-কলকাতা ভেতর-বাইরে আশে-পাশে সব ফাঁকা। একদম ন্যাড়া। ঢাউস বাড়ী ত দূরের কথা, একই বাড়ীকে ভেঙ্গে-চুরে ফ্ল্যাট সিষ্টেমে ভাড়া দেওয়া। স্বামি-স্ত্রী, একটি ফিনফিনে মেয়ে এবং একজন রাজকাপুর বলতে অজ্ঞান ছেলে। ঠাকুর এবং চাকর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড। একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী এবং ভাড়া-করা রেফ্রিজারেটর। দুই-ই অবশ্য বাজারে বাকী রাখবার মত একটি ভালো চাকরী থাকলে তবেই।

এই দুই পোলের, দিন-রাত্তিরের সাদা-কালোর ফারাক যে দু'কলকাতায় তার একটি মাত্র মিল যে জায়গায় তার নাম ন্যাঙ্গুভেলী। ন্যাঙ্গুভেলী—যৌবনের রঙ্গভূমি, বার্ধক্যের বারাণসী, দরিদ্র বাঙালী, মূর্খ বাঙালী, মুচি বাঙালী, মুর্দফরাস বাঙ্গালীরা সবাই এখানে ভাই-ভাই। এখানেই সত্যিকারের শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হোল লীন। একসঙ্গে কুরুক্ষেত্র ও শ্রীক্ষেত্র।

পৃথিবীর সাহিত্যিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এমন লেখক এযুগে বাংলা দেশ মাত্র দু'জনকে জন্ম দিয়েছে। একজন রবীন্দ্রনাথ। অপর জন শরৎচন্দ্র। বাকী বাঙালী লেখকরা ফিল আপ দি গ্যাপস মাত্র। অথচ আশ্চর্য, ঐ দু'জনের লেখাতেই ন্যাঙ্গুভেলী অনুপস্থিত। সেই সঙ্গে সমস্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমস্যাই। এ কথা অবশ্য ঠিকই যে ন্যাঙ্গুভেলীর স্বর্ণযুগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালীন।

সাহেবদের ক্লাব। মোসাহেবদের গ্র্যাণ্ড, ফির্পো, গ্রেট ইষ্টার্ণ আর মধ্যবিত্ত বাঙালীর হল ন্যাঙ্গুভেলী। ডবল হাফ চায়ের ওপর এখানে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলেও বলবার কেউ নেই। ক্রেডিট চট করে ডিসক্রেডিটে রূপান্তরিত হয় না। ক্বচিৎ নীল শাড়ীর আগমন ঝুলে পড়া তর্কের মাঝখানে নোতুন করে টেম্পো আনে। পৃথিবীর সব সংবাদ সব দুঃসংবাদ, সব কিছুর আখড়া—রয়টার এ, পি, ইউ পি, নিউস রীল, টেলিগ্রাফ কম্বাইণ্ড হল ন্যাঙ্গুভেলী।

সরকারী নয়, ভারত সরকারের বে-সরকারী গেজেট এই ন্যাঙ্গুভেলী। ন্যাঙ্গুভেলীর খবর মানে খবর কাগজের ভাষায় From hightly reliable source.

আকাশে যত তারা, মানুষের মাথায় যত চুল, অলিতে গলিতে যত ফিল্ম ষ্টার, কলকাতার রাস্তায় তত ন্যাঙ্গুভেলী। অর্থাৎ অগুন্তি। এবং সত্যিকারের মহাশ্মশান হোল ন্যাঙ্গুভেলী—এর উনুন কখনও নেবে না। এখানে চা খাবার জন্যে ঢোকা, বসা কিন্তু আড্ডা দেবার জন্যে। চায়ের সঙ্গে বড় জোর দু'খানা টোষ্ট। কিন্তু টোষ্ট নিন আর নাই নিন, এক কাপ চায়ের পর আর অর্ডার নাই দিন, বয় এসে আপনাকে তাড়া দেবে না, বিলের ভয় দেখাবে না। আপনি আড্ডা দিন যতক্ষণ ইচ্ছে, যার সঙ্গে ইচ্ছে। আপনি গান গা'ন, নাচুন, হাসুন, কাঁদুন, ঝগড়া করুন, কেউ বলবার নেই, কারুর বলবার কিছু নেই। কারণ ট্রেনের ডেলী প্যাসেঞ্জারের মত, আপনি ন্যাঙ্গুভেলীর ডেলি কাষ্টমার।

ভ্যারাইটি এনটারটেনমেণ্ট বলে কলকাতায় যে বিচিত্রানুষ্ঠানগুলি এপাড়ায়-সেপাড়ায় হয়ে থাকে সেগুলিতে না থাকে ভ্যারাইটি, না থাকে এনটারটেনমেণ্ট। একই গায়কের একই গান, একই ক্যারিকেচরিষ্টের কৌতুকের নামে মুখ-ভ্যাংচানো। জলসার নামে কলকাতার বিভিন্ন পল্লীকে এগুলি পেয়ে বসছে ক্রমশঃ। মাইকের ধার-করা গলায় পাড়া-পড়শীর নিদ্রাভঙ্গ, আশে-পাশের সকলের পেছনে তারস্বরে ধাওয়া। ওর শ্রোতারা আট থেকে আশী বছর পর্যন্ত সবাই কাণ্ডজ্ঞানহীন। সিনেমায় যে গান জনপ্রিয় হয়েছে যে গায়ক অথবা গায়িকার কণ্ঠস্বরে, জনপ্রিয় হয়ে তারপর প'চে গেছে, সেই গানই জলসা থেকে জলসায় পিণ্ড না পাওয়া প্রেতের মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আপত্তি নেই এই কাণ্ডজ্ঞানহীন শ্রোতাদের সেই গান হাজার বারের বার গাইতে বলায়। বরং সেই বিশেষ গানটিই না গাইলে শ্রোতারা বেখুসী।

মুশকিল হচ্ছে, কলেরায় সবাইকে ধরলে সহরে এপিডেমিকের ঘোষণাপত্রটুকু অন্তত বেরোয় এক সময়ে। তার জন্যে ইনজেকশনের ব্যবস্থারও ভয় দেখানো হয়। বসন্তের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে ঘালাবার জন্যে জানানো হয় আহ্বান। প্লেগ বন্ধ করবার সরকারী অফিস আছে। নেই শুধু কালচারের নামে মানুষের রুচিবোধের ওপর এই ভ্যারাইটি এনটারটেনমেণ্ট মারফৎ বলাৎকারের বিরুদ্ধে কিছু বলবার।

কিন্তু ন্যাঙ্গুভেলীতে? সেখানে ভ্যারাইটি এনটারটেমমেণ্টের ঘোষণা নেই, তবে যার চোখ-কাণ খোলা আছে, বাধা নেই এই বিনা ঘোষণার বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দিতে। সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অবধি এখানে বিরাম বিহীন বিচিত্রা।

এই মাত্র ন্যাঙ্গুভেলীর কোণের চারটে চেয়ার যারা দখল করলে তাদের আসন অনেকটা অলিখিত হলেও reserved। তারা আসবেই। তাদের অর্ডারও বয়ের জানা। বিলের জন্যেও রোজ নয়, ঠিক করে তাগাদা দিতে হবে তা জানা মালিকের। তারা চার জনই কলেজের ছাত্র। একজন ট্রেডের কি ব্যারিষ্টর বাবার

একমাত্র ছেলে। সেই মুরুব্বী, বাকী তিন জন মধ্যবিত্ত ঘরের। এই একজন যখন কবিতা লেখে তখন বাকী তিন জনকে মুগ্ধ হতে হয়। এই একজন যখন প্রেমে পড়ে তখন বাকী তিন জনকে বলতেই হয় যে প্রেমে পড়ার জন্তে যাকে দরকার সেই মেয়েটি তাই আজ তাদের দেখে হেসে চলে গেল। ব্যস! অন্ত দিন টোষ্টে শেষ হয়, আজ অমলেটে গড়াল।

কিন্তু না, আর নয়। রিভলভিং ষ্টেজের দ্রুত পট পরিবর্তনে নাটক জমেছে অন্ত দিকে। ইষ্টবেঙ্গল না মোহনবাগান? টেবিল ভেঙ্গে যেতে পারে, চেয়ার উল্টে যেতে পারে, পনেরো বছরের বন্ধুত্ব এই মুহূর্তে মুখও দেখতে না চাওয়ার প্রতিজ্ঞায় পর্যবসিত হলো বলে, শুধু ভাঙ্গতে পারে না এই তর্ক। সে সময়েও যদি এদের দেখতেন, ত' অবাক হতেন। চোখে-মুখে অমন তেজ বুঝি বিবেকানন্দেরও ছিলো না।

বাঙ্গালী স্পোর্টসে পিছিয়ে পড়েও, আনস্পোর্টসম্যান হয় নি। অন্ত প্রদেশের দিকে তাকালেই তা মালুম হয়। কেন্দ্রের সঙ্গে এদের সমান ভাব শুধু এক জায়গায়, বাঙলা দেশ যেন না জিতে যায়। বাংলা দেশের অফিসে দ্রাবিড় ষ্টেনো, পোষ্ট অফিসেও বড় বড় পোষ্টে অবাঙ্গালীর সাদর আমন্ত্রণ, বাংলা দেশের বাস চালিয়ে এসেছে এত কাল পাঞ্জাবীরা পরনে শুধু মাত্র লম্বা সার্ট এবং মুখে টিকিট বাবু সম্বল করে। মাড়োয়ার আর গুজরাট-ওরা ঘিরে ধরেছে কলকাতাকে সাঁড়াশী আক্রমণে দু'দিক থেকে, বাড়ীর পর বাড়ী করে এগিয়ে আসতে আসতে, কিন্তু এ সব কী কথা বলছি? এ-সব বললেই ত বাঙালী বড় কম্যুন্যাল। তাই থাক।

সত্যি সত্যি ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান এই সেদিনকার, কিন্তু এই তর্ক যেন চিরকালের। শূদ্র বা বৈশ্য-কায়স্থ এবং বেচারা ব্রাহ্মণের ভেদাভেদ ত আছেই। তার ওপর এই হতভাগা দেশে আবার ঘটি আর বাঙাল। এ-জাত যদি না মরে ত অন্যরা বাঁচে কী করে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানসিক অমিল আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেচে সেখানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দিকে প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনোভাব যেন বেশ হয়েছে। কিন্তু বেশ হওয়ার এই আবেশ আর বেশি দিন নয়। শরীর থেকে হাত কাটা গেলে সেটা হাতের যত বড় ক্ষতি, শরীরের ট্রাজেডী তার চেয়ে কম নয়, শরীর মাঝে মাঝে তা ভুলতে চাইলেও কথাটা খাঁটি সত্যি। ... পশ্চিমবঙ্গ সেই ট্রাজেডী বিস্মৃত হলে যে উপায়ে পূর্ববঙ্গ আজ পাকিস্তান, সেই অপূর্ব উপায়েই পশ্চিমবঙ্গও এক দিন মুছে যাবে। ...বঙ্গ-বরবাদ বাঙলা দেশের তালপুকুরে সত্যি সত্যি ঘটি ডোবা ... হবে, সময়ের নির্দেশ না থাকলে। কিন্তু সে-কথাও থাক।

এবারে স্যাঙ্গুভেলীর আরো ভেতরে ঢোকা যাক। যেমন এয়ার-...শাণ্ড না হলে আজ আর সিনেমা-হাউস জমানো শক্ত, ...নি 'কেবিন' না হলে স্যাঙ্গুভেলী সকল কালেই অচল।

হাসপাতালও হয়ত এ দেশে কেবিন না হলে চলে যায়, ... স্যাঙ্গুভেলী নৈব নৈব চ। এখনও এখানে মেয়েদের নিয়ে ... জায়গায় বসতে কোথায় বাধে! কলেজের কিংবা আপিসের ...মী অথবা সহকর্মী, মেয়ে হলে, তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে ...রা চলবে না, তার বাড়ীতেও আপনি অস্পৃশ্য। তাই স্যাঙ্গুভেলীর কেবিন, অল্প ভীড় সিনেমা-হল, পর্দা-ঢাকা রিক্সা মেয়েদের সঙ্গে মেশা যত দিন না সহজ হচ্ছে, তত দিন সেই যথা পূর্বং তথা পরং।

স্যাঙ্গুভেলীর তাই সব চেয়ে দুর্নিবার আকর্ষণের কেন্দ্র হচ্ছে তার পর্দা-ঢাকা কুঠুরী, যার নাম কেবিন, ইংরেজি না জানলেও সবাই জানে যার মানে। কেবিনের বাইরে যারা বসে তারা অস্থির; ভেতরে কী হচ্ছে? ভেতরে কিছুই হচ্ছে না, দুটি তরুণ-তরুণী গল্প করছে, স্বপ্ন দেখছে কিংবা তাদের বন্ধুত্বের ওপর টানছে বিচ্ছেদের ব্যাপার সাধারণ অভিমানে, সামান্ত কারণে।

কিন্তু স্যাঙ্গুভেলীর সবাই কিছু সেই দিকে চেয়ে নেই। তাদের চোখ এইমাত্র গিয়ে পড়েছে সন্ত-প্রবেশ-করা কোন প্লে-ব্যাক সিংগারের ওপর অথবা সিনেমায় ভাঁড়ামোর রোলে সুপরিচিত কোনও কমিক-এ্যাকটরের দিকে। প্রথম প্রথম ফিস ফিস হয়, চাপা গুঞ্জন, এখন সবাই জেনে গেছে, এ-স্যাঙ্গুভেলীতে এসে অমুক-অমুককে দেখা যায়, শোনা যায় তাদের কথা, আওয়াজ পাওয়া যায় হাসির।

তার পর অনুরাগীর দল পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করে বেড়ায় সেই হঠাৎ দর্শনের ওপর রং-চড়ানো বিস্ময়ের পসরা। গিয়ে বলে জানিস অমুকদা আমাকে বলেছে পরের বইতে নামিয়ে দেবে, আমার চেহারা নাকি সিনেমার জন্তে আইডিয়েল। যে বলছে সে মিথ্যেই বলছে, যারা শুনছে তারাও জানে নির্ভেজাল মিথ্যে এ-কথা, তবুও শুনে ঈর্ষ্যান্বিত হতে হয়, বলতে হয়: সত্যি?—তা হলে ত তুই মেরে দিয়েছিস!—বোস! বোস! সিগারেট ছাড় দিকি একটা।

কিন্তু এইমাত্র স্যাঙ্গুভেলীতে ঢুকে এক কোণে বসে যিনি বুদ্ধদেবের জগতকে কৃপা করবার মত হাসি হাসছেন, মিটি মিটি' কে তিনি? তাকে আপনি চিনবেন না। না চিনবারই কথা। তিনি ত ফুটবল অথবা ফিলম অথবা মিনিষ্টার নন: তিনি হলেন সব চেয়ে বেশি-বিক্রী বইএর লেখক। জীবনকে দেখতে এসেছেন এই স্যাঙ্গুভেলীতে।

হাসবেন না কথাটা শুনে।

সত্যিই পাবলিশারের দোকান, নিজের পরিবার এবং স্যাঙ্গুভেলীর পরিচিত কোন—এই হল এ দেশের লেখকের অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র সম্বল।

অথচ পৃথিবীর লেখকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে জগৎ-পারাবারের তীরে। মরু দেশ থেকে মরা দেশ। টগবগে মার্কিণী জীবন থেকে মুমূর্ষু, অর্দ্ধমৃত, জীবন্মৃত, যতটুকু জীবিত তার চেয়ে মৃত্যুভীত মানুষদের মধ্যে। খুঁজছে গল্প, নাটক, উপন্যাস। বন্দরে বন্দরে বাঁধছে জাহাজ, খালাসীর কাছে খোঁজ নিচ্ছে মহৎ উপন্যাসের উপকরণের। মাছের পেট চিরে বার করছে মানুষের মনের কথা, সেই হীরায় পান্নায় হাসিতে কান্নায় মেশানো আংটিটি, দুষ্মন্তের দান শকুন্তলার আঙুলে, জলের অতলে হারিয়ে গেছিলো সেই কবে!

স্যাঙ্গুভেলীর প্রধান আকর্ষণ একটু আগে বলেছি: কেবিন। এখন সে-কথা প্রত্যাহার করছি। স্যাঙ্গুভেলীর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ তার মালিক। একটি টাইপ। চেহারায় এবং চরিত্রে। একই খাবার মালিকের নির্দেশে আজ আফগানি কাটলেট; কাল রাশিয়ান

স্পেশাল। হোটেলের ম্যানেজার সাজে-পোষাকে, কথার-কায়দায় যতখানি কেতাদুরস্ত, স্যাঙ্গুভেলীর মালিক সেই পরিমাণে প্রাগৈতিহাসিক। পয়সা কামানোর দিকে কড়া নজর রাখতে গিয়ে দাড়ি কামানো স্থগিত আছে। গায়ে গরম কালে ফতুয়া,—শীতে জহর কোট।

স্বয়ং শ্রীভগবানকে যত দিকে চোখ রাখতে হয় তাঁর সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে,—স্যাঙ্গুভেলীর মালিকের দৃষ্টিপাত তার চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ, আরো সুদূরপ্রসারী।

কে মোগলাই পরটার সঙ্গে কাউ ভাজী বেশি পেয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে খদ্দের বিদেয় হতে না হতেই বয়কে ওয়ার্ণিং। কার বাকী রাখার হিসেব মাত্রা ছাড়াচ্ছে, সে সম্বন্ধে তাকে হেসে ওয়াকিবহাল করা। কোন খদ্দের খাবার ব্যাপারে কমপ্লেন করেছে তার সামনেই বয়কে ডেকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতা: তোমাদের জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। যাও, বাবুর প্লেট বদলে দাও। ওর জন্যে বিল কোর না। বক্তৃতায় বাবু বিগলিত। ওদিকে পকেট আরো গলে যাবার ব্যবস্থা যে পাকা হল যে নিয়ে বাবুর চিন্তা নেই। এখন থেকে তার মৌখিক বিজ্ঞাপনের যাত্রা আরম্ভ: এমন দোকান আর হয় না।

দোকানের বাইরেও মালিক চোখ ফেরাচ্ছে মাঝে মাঝে। কোন খদ্দের অনেক বাকী ফেলবার পর অনেক দিন আর এদিকে ঢুকছে না, তাকে রাস্তায় দেখতে পেলেই চীৎকার: আমাদের ভুলে গেলেন স্যর?

কিন্তু ভোলা যে যায় না, কখনো দাদু কখন দাদা-ডাকা এই স্যাঙ্গুভেলীর মালিককে। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

স্যাঙ্গুভেলীর সেই মালিক যিনি এই মুহূর্তে অগ্নিশর্মা, তিনি কাকে দেখে তার পরেই আইসক্রীম। হাসির পাল্লা খুলে গিয়ে কাণ অবধি ঠেকেছে। উঠে দাঁড়িয়েছেন ব্যস্ত হয়ে, হাঁক দিচ্ছেন বয়কে; এই না হলে স্যাঙ্গুভেলীর মালিক হওয়া অসম্ভব। কে এলে দাম চাওয়ার প্রশ্ন দূরের কথা, খাতির করার বহর কার খ্যাতির অনুযায়ী হবে সেই হল স্যাঙ্গুভেলী চালাতে পারার সিক্রেট। কে কোথা থেকে আসছে সেইটে জানাই স্যাঙ্গুভেলী চালাতে সব চেয়ে বড় জানা। এড টু সিওর সাকসেস।

কিন্তু এহ বাহ্য। দেশ বলতে যেমন শুধু হাজার হাজার মাইল জায়গা মাত্র নয়; দেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষই হল আসলে দেশ, তেমনি স্যাঙ্গুভেলী মানে শুধু খাবার নয়, কেবিন নয়, মালিক নয়, স্যাঙ্গুভেলীর পরিচয় তার বিচিত্র খদ্দেরে। এ-পৃথিবী নাকি বিচিত্র জায়গা, কিন্তু তারও চেয়ে বিচিত্র নাকি মানুষের মন। কিন্তু যিনি এই কথা বলেছিলেন তিনি স্যাঙ্গুভেলীতে ঢুকলে আরো বিচিত্রর খবর পেতেন অনায়াসেই, পেতেন শুধু একবার চোখ বুলিয়েই, প্রথম লক্ষ্যেই লক্ষ্যভেদ করতে যদি পারতেন ত দেখতেন যে সব মানুষই যদিও কিছু না কিছুর খদ্দের, কিন্তু সব খদ্দেরই কিছু মানুষ নয়।

মানুষ মাত্রেরই মন থাকে, কিন্তু এমন খদ্দের যথেষ্ট আসে স্যাঙ্গুভেলীতে, যাদের শুধু পেট আছে। তাদের মন শুধু খুঁজে পাওয়া যাবে ওজনে। শুধু খেয়ে যাচ্ছে। যা খুসী। যত খুসী। আবার খদ্দের আছে যারা বিশেষ একটি ডিস খাবার জন্যে আসে বিশেষ স্যাঙ্গুভেলীতে। খদ্দের আছে যে সাত বছর ধরে ঠিক একই সময়ে আসছে, এক কাপ চা খাচ্ছে, দুটি সিগরেট, হিসের করা—খেয়ে চলে যাচ্ছে। এর ব্যতিক্রম নেই, পরিবর্তন নেই। কলেজের ছেলে-ছোকরা ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে প্রৌঢ় এসে বসেছে এক। বাড়ীতে তার অনেক কাচ্চা-বাচ্চা। সেখানে ভালো-মন্দ কিছু খেতে গেলে অনেক খরচা। এখানে একটি টাকা খরচ করে খেয়ে যায় একা। খেতে খেতে কোথায় খোঁচা লাগছে তার। মনে পড়ছে বৌএর মুখ, বৌ আর এক পাল বাচ্চার। কিন্তু উপায় নেই। সকাল সাড়ে ৯টায় আপিসের খোঁয়াড়ে ঢুকে আর ছটার পর বেরিয়ে প্রচণ্ড ক্ষিধে পায়। প্রচণ্ড ক্ষিধে অথচ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই প্রচণ্ড অভাব। তখন আর নীতিবোধ থাকে না। স্বার্থপর হতেই হয়। জঠরের আগুন নেবাবার ফায়ার ব্রিগেড যে ঘণ্টা দিলেই সব সময় আসে না।

সেই স্যাঙ্গুভেলীতে খেতে এসেছে একদিন এক কাবুলী। চারজনের খাওয়া খেয়েছে একা। তারপর দাম দিতে গিয়ে ক্যাশ শর্ট। পাগড়ী খুলে, পিরেন খুলে, জুতোর তলা থেকে পয়সা বার করে সব পয়সা মিলিয়েও দু'টাকা কম।

আমি সামনে বসে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ওপর কাবুলীর এত দিনের অত্যাচারের শোধ তুলবো কিনা ভাবছি। ভাবছি এই প্রথম কাবুলীর কাছে ধার না নিয়ে, কাবুলীকে ধার দিলে কেমন হয়?

কিন্তু হল না। কাবুলী বললে মালিককে, সঙ্গে লোক দিন। কাছেই থাকি। গাড়ী থেকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।

মালিক বয়দের না পাঠিয়ে পাঠালেন ম্যানেজারকে। ম্যানেজার মানে অল্পবয়সী এক অল্পশিক্ষিত ভদ্রতনয়। মালিক না থাকলে মালিকের চেয়ারে বসে।

আধ-ঘণ্টা বাদে ছেলেটি ফিরে এলো কাঁদ-কাঁদ চোখে। কী হল? টাকা?—মালিকের মর্মান্তিক প্রশ্ন।

মাইনে থেকে কেটে নেবেন, ছেলেটি জানায়।

কেন?

তখন ছেলেটি বললে। আস্তে আস্তে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, রাস্তায় যেতে যেতে কাবুলী নাকি তার বাড়ীর অবস্থা জিজ্ঞেস করে করে সব জেনে নিয়েছে। এমন কি দুশো টাকার অভাবে দেশে তার বোনের বিয়ে আটকে আছে, সে-খবরও। তার পর ঘরে নিয়ে গিয়ে সেই কাবুলী কখন নাকি ছেলেটিকে ধার গছিয়ে দিয়েছে। প্রথম মাসের সুদ থেকে দু'টাকা না কেটে মালিককে বলেছে দিতে।

সেই থেকে সব কাবুলী আমার প্রণম্য। প্রাতঃস্মরণীয়। মহাজন!

[ক্রমশঃ।

তুলি ও রঙ

জর্জ-মাইকেল

বাইশ

"চলো, লা রোতন্দে গিয়ে শরীরটা তাতিয়ে নেওয়া যাক। সার্টের তলায় কিছু কাগজ গুঁজে দাও। দারোয়ান লোকটা ভালো, অনুগ্রহ করে আমাকে এই পুরানো খবরের কাগজটা দিয়েছে।"

তখন সকাল দশটা। কাফে ঘর এর ভেতর জন-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে। এরা একবার এসে বসলে আর সহজে উঠবে না চেয়ার ছেড়ে।

শীতকাল আর কারো কাছে না হলেও অন্ততঃ শিল্পী এবং ভাস্করদের কাছে বড় দুঃসময়। আলো আসে অনেক দেরীতে আর অন্ধকার নামে অতি তাড়াতাড়ি। শীতকালে কাজ করা কঠিন। কয়েক ঘণ্টা ধরে ষ্টুডিয়ো-কক্ষ উত্তপ্ত রাখাও ব্যয়বহুল। তার চেয়ে বরং এ রকম দুখচেটে ঘর মার্কিণী মহিলাদের কাছে ভাড়া দিয়ে বন্ধুজনের সঙ্গে কাফের উষ্ণ আবহাওয়ায় কাটানো ভালো।

লা রোতন্দে বেশ সময় কাটে, এক কাপ কফি ক্রীম আর

প্রস্তরস্তম্ভের নারীমূর্তি (১৯১৪) —মদিলিয়ানী কৃত

এক টুকুরো রুটি নিয়ে সারা দিন একটা জায়গা আঁকড়ে বসে থাকা যায়, সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র পড়ো, সারা কামরা জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ের যে আলোচনা চলে তা শোনো, মাথায় পাগড়ি পরে ধর্মরাজ বকের মত দাঁড়িয়ে আছে, জানলার ধারে গোলাপি, ধূসর আর কমলা রঙের সার্ট পরে এক দল দিনেমার জমিয়ে বসেছে, ষ্টোভের কাছ ঘেঁসে বসেছে বিভিন্ন দলে বিভক্ত রাশিয়ান দল, প্রধানতঃ এরা দুটি দল, এক দলকে কফির দামটাও ধার করতে হয়, অন্য দলকে হয় না। আর এক দল আছে তারা আর সবাইকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, তারা হয়ত মুদ্রাকরদের দালাল, কিংবা ব্যবস্থাপক (ইমপ্রেসারিও) বা একাডেমী-খ্যাত দাবা-খেলিয়ে। স্বপ্নময় বা তর্কপ্রবণ ইহুদীর দল বসে আছে, মনে হয় তাদের মুখে হতাশার ভাব দেখা যাবে, কিন্তু সে মুখে আছে আশা আর আনন্দের অভিব্যক্তি।

পথ চলতে চলতে শোনা যাবে অন্তহীন অজস্র আলোচনা—

"আর্টের লক্ষ্য কি—"

"আর্টের কোনো লক্ষ্য না থাকাই উচিত—"

বিকৃত অর্থকারীরা কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন—"

"উন্মাদরা দেখে—"

"মহামানবরা দেখেন—"

"শিল্পী যা কিছু আঁকেন সে তাঁরই আত্ম-প্রতিকৃতি।"

"এই যে 'গোল্ডেন সেক্সন,' ধরো র‍্যাফায়েল যদি জানতেন।

"স্ত্রীলোকের উরু আঁকতে মাথা ঘামাতে হয় না কাউকে—"

"আমরা প্যারীতে সমগ্র বিশ্বের বীজ এনেছি,—বিশ্ববীজ বপনের মহোৎসবের আয়োজন করেছি—"

"বুলভার্দের অন্ধ প্রাদেশিকরা এখানে কি যে কাণ্ড ঘটছে তা দেখবে না।"

"তার পর একদিন হঠাৎ এইখানেই এক মহাপ্রতিভার আবির্ভাব ঘটবে। দারিদ্র্যের বাত্যাতাড়িত সারা পৃথিবী থেকে আনা উর্ব্বর বীজ একদিন পত্রপুষ্পে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।"

"শীঘ্রই এক নবীন কবির আবির্ভাব ঘটবে, বীক্যারণের রূপালি কাগজ ভেঙে চুরে সে মাথা তুলে দাঁড়াবে, আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহ যেমন সব কিছু জ্বালিয়ে, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই প্রতিভাও তেমনই পুরাতন সব কিছু ধ্বংস করে সুদৃঢ়, উজ্জ্বল, এবং সুসংহত শক্তির সঞ্চার করবে, আনবে নতুন প্রাণ, নতুন চেতনা, তার সামনে কেউ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।"

"ফরাসী ভাষা থেকে পদপ্রকরণ বা যতিচিহ্ন তুলে সহজ ও সরল করেছে কারা, বিদেশীরাই। এপোলিনেয়ার ছিলেন পোল, সেনড্রাবস ছিলেন সুইস্।

"ক্যাটালানরা জারজ, ওদের সভ্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে ক্যাসাটিসিয়ানদের।"

"ইহুদীরা যদি গোষ্ঠীভুক্ত হত, তা হলে তারা আজ সারা পৃথিবীর অধিপতি বলে প্রতিষ্ঠিত হ'ত, ১৯১৪-র ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর ঘটতো না। রাশিয়ানরা সব দোষ ঐ ইহুদীদের কাঁধে চাপিয়েছে। ঐ জন্যই ত' ওরা সেমিটেস-বিরোধী।"

"ইম্প্রেসনিজমও জন্মাত না। কারণ এই ত' প্রতিক্রিয়া, কিউবিজম হল ইম্প্রেসনিজমের বংশধর।"

"শিল্পী বেরলিনে ত' সারা রাত ট্যাক্সী চালায়, দিনের বেলায় প্রাণভরে যা খুসী আঁকবে এই তার খেয়াল।"

"আচ্ছা এখানে এলে বাইরের জগতের যা কিছু সব যেন একশ বছরের প্রাচীন বা নীরস এবং স্বাদহীন মনে হয় কেন বলো ত'?"

"ম' পারনাশ ত্যাগ করলে একটা গৃহ-বিরহ ভাব মনে জাগে, যেমনটা ঘটে যুদ্ধের সময়,—এখানে জীবনের যে একটা অবিরাম স্পন্দন সে যে আর কোথাও নেই—এর কারণ' এখানে কত কি সৃষ্টি হচ্ছে—কি সূক্ষ্ম! কি মনোহর! এর বাইরে যেন তার সমাপ্তি ঘটে।

"হ্যাঁ ঐ ইংরেজ ডিউকের স্কটল্যাণ্ডের বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। টেবলের ধারে আমার সেই নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার একটি সিংহাসন সদৃশ বস্তু রয়েছে। টেবলের পরিবেশক সর্বপ্রথম সেইখানেই পরিবেশন সুরু করে। এমন কি, ডিউক যদি স্বয়ং হাজির না থাকেন তাহ'লেও এই ব্যবস্থা, তারপর পরিবারের বড় ছেলে, তারপর জননী। জ্যেষ্ঠা কন্যারও নিজস্ব টেবল আছে, লেডী পোপের মত এক গির্জামার্কা চেয়ারে তাঁকে বসতে হয়। আমার আসন হল শেষের দিকে পনের জনের পর। মেরী ষ্টুয়ার্টের আমলের এক বিছানায় সব জামা-কাপড় পরেই আমাকে শুতে হ'ল, কারণ প্রভাতে গৃহস্থালীর দাসী-চাকরেরা এসে সব পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করবে। আমার সব পোষাক ত' একেবারে ছেঁড়া নেকড়া আর লিনেন—'

"আমাকে ভাই সকাল ন'টা পর্য্যন্ত কাজ করতে হয়, কারণ আমার অনেক টাকার প্রয়োজন, পোষাক চাই, জুতা চাই; এখন এখানে শীত; কিন্তু এখন তাঁত বসানোর প্রয়োজন।"

"এখানকার কোন জন নিজের কাজের উপযোগী যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারে? দরিদ্র ভাস্করের কথা একবার ভাবো, তাকে শ্বেত-পাথর কিনতে হবে! মাথায় একটা শিল্পবস্তুর চিন্তা জাগলো,—তারপর তা ধোঁয়া হয়ে গেল, পাথর থান হয়তো এসে পৌঁছালো, যদি অবশ্য একান্তই আসে থান আর তা ছুঁতে সাহস হয় না। তখন প্রেরণা লাভের জন্য বসে থাকো। প্রথম যখন আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল তখনকার মত ভাঙ্গ করে ঘরের কোণে দাঁড়াও।"

"শুধু রোমাণ্টিক বইগুলোয় মডেলরা এমন কথা বলে যা শুনলে চমকে উঠতে হয়। প্রকৃত জীবনে কিন্তু মডেলরা এক একটি সঙ। আনা, লক্ষ্মীটি, চুপ করো, তোমার মুখ থেকে হেরিং-এর গন্ধ বেরোচ্ছে।"

"যে সব লোকের ধারণা শিল্প-পতিদের মাথায় কিছু নেই—"

"আমেরিকা যাবে? যে অবস্থায় যাবে তার চাইতেও খারাপ অবস্থায় ফিরতে হ'বে। যদি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা থাকে তাহ'লে ভালোই, আর যারা উদীয়মান তাদের জায়গা ও নয়—"

রাশিয়ানদের কথা:

"ফ্রান্সের যদি ঠাণ্ডা লাগে তাহ'লে সারা পৃথিবী হাঁচে—"

"শক্তির দ্বারা চিন্তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।"

"আমরাই শক্তি।"

"সেটা ন্যায়সঙ্গত নয়।"

"কিন্তু বিচারের চাইতেও বড় কথা আছে। সম্মানের চাইতেও বড়ো জিনিষ আছে, আদর্শের চাইতেও বড়ো জিনিষ আছে, সে হ'ল সর্বকালের যা আদর্শ তাই—"

কয়েকটা ঠিকা টেবল আছে। পাতলা ওভার কোট, ছিন্ন মফলার আর মাথায় হ্যাট পরে তার চার পাশে ভিড় করে জমেছে; নোভরা স্যাটিনের স্বর্গীয় নীল চোখ—স্বর্গের পশুর চোখ যেন। মোটা কাঁপা নাক, মোটা সারা বার্ণহাডের মত একটি স্ত্রীলোক, পায়ে ছেঁড়া জুতা আর সেলাই-করা মোজা, পরশু দিন একজন সুইডিস্ মহিলা এসেছেন, পরনে বার্লিনের যাযাবরী ধরণের পোষাক, গীট্যার করসেটের মত পোষাকের কোমরটা কালো, কাঁধের কাছে ভাসমান রিবণ; তার পর মেক্সিকো শহরের "Excelsior" পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা মেরিনাস্; পাজামা-পরা কয়েক জন লোক; কাঠের মানুষ; পোষ্ট দেওয়ার ফাঁকে উঠে আসা মডেল, যেন রপ, পস্কিন, লুত্রেক্ প্রভৃতির ছবির বিষয়বস্তু,—পরনে সামান্য পোষাক, ছবির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পোষাকই সঙ্গে আছে; এই স্ত্রীলোকটি এসেছে মাথায় এক প্রকাণ্ড ষ্ট্র হ্যাট চড়িয়ে, তাতে একটা বেগুনি রঙের রিবণ, বুকে গোলাপ ফুল গোঁজা; আর অনেকে পৈভা, লা গুলু, কিংবা সাধারণ ম' পারনাশীয় ভঙ্গীতে পেরর্ডিয়াতের মত এসেছে, তাদের মাথায় চুল "হাঁসের লেজে"র ভঙ্গীতে বব্ করে ছাঁটা, এই ধরণটাই প্যারীর উচ্চ সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলারা এবং সারা পৃথিবীর মেয়েরা নকল করেছিল।

এই সব মানুষগুলো কথা বলে, আড্ডা দেয়, ঘুমোয়, ধূমপান করে, হাই তোলে, কাশে—বিশেষ করে ভীষণ ভাবে কাশতে পারে।

বোজা পরাপনা (১৯১৫) —মদিলিয়ানী কৃত (তেলরঙ ও পেনসিল)

বামন ডাক্তারটা যেন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে—"সবাই বিকৃত ফুস্‌ফুস্‌ নিয়ে ভুগছে।"

লোকটার ভুতুড়ে চরিত্র। ছোট্ট আকৃতি, অনেকটা যেন অস্বাভাবিক শাদারঙের এ্যালবাইনো জন্তু। কোটরে প্রবিষ্ট চোখ দুটি যেন সেই শাদা মুখের ভিতর দুটি গোলাপি কূপের মত জ্বলছে। যুদ্ধের ঠিক আগে লোকটা দন্তচিকিৎসক হয়েছে।

আগে ছিল ভ্রষ্টাবিষ্ট কবি, সহসা দন্তরোগে ভীষণ আগ্রহশীল হয়ে উঠলো, দাঁতের ব্যাপারে উগ্র অনুরাগ, প্যালেট্ আর গাম নিয়ে ব্যস্ত। ভাস্করদের ঐ সব দ্রব্য দিয়ে সাজাতো, যেমনভাবে মানুষ আংটি বা মণি ধারণ করে। থাকতো বেশ মজায়। যুদ্ধের সময় একই সঙ্গে ট্রেঞ্চে কাটিয়েছিল আরেক ভদ্রলোক, তিনি বলতেন কি ভাবে ও ক্রস্ আদায় করেছিল তার ইতিহাস।

প্রতি বার আক্রমণের পরই ও বেরিয়ে গিয়ে কিছু উপহার সংগ্রহ করে আনতো। বক্তা গোপনে ওর কার্য্য-কলাপের ওপর নজর রেখে এক রাত্রে আবিষ্কার করলেন ওর আসল কীর্তির উৎস। ফরসেপ্ সঙ্গে নিয়ে সেই দন্তচিকিৎসক পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চের কাদায় লুকিয়ে পড়ে থাকতো, তার পর চুপি চুপি প্রতিটি মৃত সৈনিকের দাঁত সকৌশলে তুলে ফেলত। তার পর সাবধানে সেগুলি নিজের থলিতে তুলে রাখতো। শত্রুর দাঁত—

বক্তা বলতে বলতে শিউরে উঠলেন, একটি বিশেষ বর্জনীয় ঘটনা বলছিলেন—হঠাৎ সেদিন সাপের মত ক্রুর ভঙ্গীতে ওর মুখের পানে তাকিয়ে ডাক্তার বলেছিল—

"আপনার দাঁতগুলি চমৎকার, একবার দেখান না—"

চার বছরব্যাপী যুদ্ধের হাহাকারের ভেতর লোকটা কয়েক হাজার দাঁত সংগ্রহ করেছিল—আর তাইতেই অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছে। মৃত্যু পারনাশের এই সাথীদের পরিচর্য্যায় তাই ওর সযত্ন আগ্রহ।

তাই সেদিন মোদকুল্লোর শুকনো কাসির আওয়াজ পেয়ে ডাক্তার তাকে বল্লো—"বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো—"

হারিকট রুজ বল্ল—"না, যাবে না,—এখানকার চেয়ে বাড়িতে আরো ঠাণ্ডা।"

"তাহ'লে হাসপাতালে যাও।"

মোদকু উঠে দাঁড়ালো,—মুখখানা ছায়ের মত শাদা।

"সীন নদী আছে, দুফায়েল,—আফ তালিয়েন—কিন্তু হাসপাতাল কভি নেহি—"

"সেখানে কিন্তু সবাই আরামে থাকে—"

"আর বিরক্তির সীমা থাকে না—"

"তার পর মারা যায়।"

তিন দিন পরে কিন্তু হারিকট রুজ এই বামন ডাক্তারের কাছেই ছুটে এলো। মোদকুর গা আগুনের মত গরম,—গাত্রচর্ম শুকনো। ডাক্তার বললে—এখনই শিল্পীকে নিয়ে গিয়ে ভাগিরার্ডের পাশে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল, ব্যারাকবাড়ির চাইতেও ভালো।

তেইশ

উংরোকিকেনপাক্, মোদকুর অব্যবহৃত কয়েকটি বোর্ড এবং কিছু রঙ দিয়ে এক স্বয়ংক্রিয় চাকর জাতীয় জীব আঁকলো, তার চার হাত, একটি মাত্র পা, দেহের মাঝখানে পিরামিডাকৃতি মাথা। এ্যাভিন্যু মনটেনের এক খেয়ালী রাশিয়ান মহিলাকে এই ছবিটি সে বিক্রী করলো,—শিল্পীদের উদ্ভট খেয়ালের নূতন ধারার ছবির তিনি ভক্ত। তার পর উংরো এক সম্ভ্রান্তঘরের ফরাসী মহিলার সংসারে ভাঁড় হিসাবে ঢুকে পড়লো—তারাও খেয়ালী জীব।

প্রথমটা হাসপাতালের শুভ্রতায় মুগ্ধ হয়েছিল মোদকু।—কেউই সুখ-সুবিধার ব্যাপারে উদাসীন নয়। শুভ্র সুন্দর চাদর, সারা ঘরটির একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রী, শিল্পীর চোখে ভালোই লেগেছিল,—শিল্পীর চিত্ত জয় করেছিল এই পরিচ্ছন্ন পরিপাট্য। দুঃখী নিঃসম্বল মানুষদের লোকে যে চোখে দেখে ষ্টাফ ডাক্তারবৃন্দ সেই ধরণের উদাসীন ভঙ্গীতে ত' তার দিকে তাকায় না! গোড়া থেকেই মোদকুর মেজাজটা ভালো না থাকলেও উদ্দাম প্রকৃতির ছোট নার্সটিও মোদকুল্লোকে আদর-যত্ন করতো।

কিছু কালের মধ্যেই মোদকু একটা কিছুর শারীরিক অভাব অনুভব করতে লাগলো। আতঙ্কিত হয়ে সে বুঝলো এ দ্রব্যটি হল 'মদ্য'—মদ্যের অভাবই তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। সে ভাবলো—'ব্যাপারটি সুবিধার নয়।' কারণ তখনো তার মনে প্রচুর দম্ভ ও গর্বের ভাব ছিল। পাতলা ঘুমের ভিতর সে স্বপ্ন দেখে আবার হারিকট-রুজের সঙ্গে সদ্য-অলঙ্কৃত ষ্টুডিয়ো-ঘরে আবার তারা বাস করছে, ধীরে ধীরে তাকে মোহমুক্ত করে তাদের সদ্যোজাত সন্তানকে যথাসম্ভব সুন্দর ভাবে লালন করছে। কিন্তু তার ঘুম ভেঙে যায়,—চার পাশে তাকিয়ে কাকে খোঁজে,—অদৃষ্টের পরিহাসে যার ভিতর একদিন অনাগত বিধাতার সৃষ্টি করেছিল-যে-ঘৃণিত প্রাণী সেই দেবতাকে বধ করেছে, যেন সেই রাক্ষসী তার মুখের-পানে তাকিয়ে আছে—হায় রে! কেন সেই খুনে স্ত্রীলোকটাকে সে দিন পথের ধারে ও হত্যা করেনি? এখন অনুতাপ করতে হবে।

আবার ঘুমায় মোদকু। আবার মোদকু আর হারিকট সোনা দিয়ে মোড়া এক বিচিত্র দেশে নির্বাসিত হয়ে পৌঁছেছে, সব কিছু স্বর্ণময়, সবুজ, আর গোলাপি,—কয়েকটি বিরল মুহূর্তে এই স্বর্ণরাজ্যে ওরা বাস করেছিল। ওদের সঙ্গে ভৃত্য বা বন্ধু-হিসাবে হাজির হয়েছে ডেস্‌পারো……

কাশলো মোদকু। তার মনে হচ্ছে জ্বরে যেন তার সারা অঙ্গ পুড়ছে, ছোট্ট সেই অপ্সরাটি তাকে একটু সুধা এনে দিল,—পান করতে হবে। হারিকট রুজ যখন ওকে দেখতে এল তখনো মোদকু ঘুমিয়ে আছে, হারিকট তাকে জাগায় না। দুটি ঘণ্টা তার পাশে চুপ করে বসে রইলো—স্বর্গের পরীর মত মুখে হাসি নিয়ে ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

৭বরোসকীর বাড়ি ফিরে গেল হারিকট। যেখানে মাঝে মাঝে আহার ও আশ্রয় পাওয়া যায়, এখন এমন ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে যে বিপদমুক্ত হয়ে ঐ ভার্সিনজেট্রিয় ফেরা কঠিন! কিংবা লা রোতন্দে ফিরে সঙ্গীদের সঙ্গে বসে কাটানো যেতে পারে। সেখানে খারিস দশরার শোনা তার আত্মজীবনী তার পিতামহ পাঞ্জাবের এক ওলন্দাজ কারখানার সিপাহীদের প্রধান সেনাপতি বা অফিসার কমাণ্ডিং ছিলেন। কাশ্মীর থেকে সেখানে এসেছিলেন।

অনুবাদঃ ভবানী মুখোপাধ্যায়।
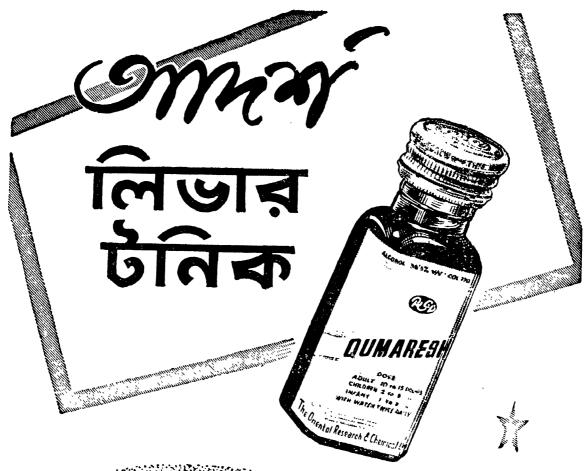
আদর্শ
লিভার
টনিক
QUMARESH
The Oriental Research & Chemical Ltd
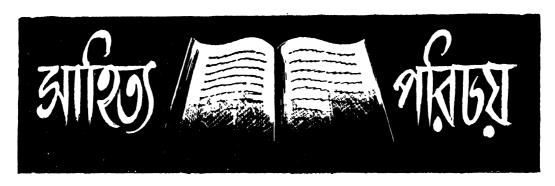
বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, তাহাতে বাঙালীকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সায় দিতে হয়েছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণে বিরাট বঙ্গকে হ্রাস করে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বাঙালী হাসিমুখে গ্রহণ করেছে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনে বাঙালী আর বাংলার কংগ্রেসের কণ্ঠস্বর সহসা এমন ম্রিয়মাণ কেন? অতুল্য ঘোষ মহাশয় এবং তাঁর সহকর্মীরা এমন নীরব কেন? কংগ্রেসী হাইকমাণ্ডকে বিরক্ত করে তাঁরা হয়ত ব্যক্তিগত আখেরটা নষ্ট করতে চান না, তাই সীমানা কমিশনের আগমনে বাংলা দেশে কোনো উদ্যোগ আয়োজন নেই, ওদিকে প্রতিবেশী প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ সিং, কৃষ্ণবল্লভ সহায়, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি ধুরন্ধরবৃন্দ কোমর বেঁধে আস্ফালন সুরু করেছেন, কয়েক জন বিভীষণ-মার্কা বাঙালীও বোধ করি প্রাণের দায়ে বা পেটের দায়ে সেই সুরে সুর মেশাচ্ছেন। এই বিষয়ে বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ যে ভাবে পরিশ্রম করছেন তার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদ-ভাজন। অতুল্য ঘোষ মহাশয় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক স্মারকপত্র পেশ করেছেন। সহযোগী "যুগবাণী" পত্রিকার নির্ভীক স্মারকলিপিও বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু বঙ্গদেশীয় "সর্বাধিক প্রচারিত" দৈনিক পত্রগুলি এক রকম নীরব। ইনষ্টিট্যুট অব এপলায়েড ষ্টাটিস্‌টিকস্‌ এই সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর কাছে যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন তাতে অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে বিহারে এবং বিশেষতঃ বিহার-বঙ্গ সীমান্ত এলাকায় বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হিন্দীভাষার সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে, তার অসঙ্গতি ও যুক্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। আজ ঘরে-বাইরে বাংলা ভাষাকে বধ করার প্রয়াস চলছে,—এই দুঃসময়ে বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিক-বৃন্দের কি কোনো কর্তব্য নেই? এখনও সময় আছে, যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিদ্রিত থাকেন তাহলে এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণের অধিকার সাহিত্যিকবৃন্দের। বাংলা সাহিত্যের হাটে অনেক সময় অনেক সাহিত্য-কর্ণধার দেখা যায়,—তাঁরাও কি কোনও রহস্যময় কারণে পর্দার আড়ালে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন? ধীরে ধীরে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব নষ্ট করার জন্য আজ সর্বত্র যে আন্দোলন চলেছে, সেই আন্দোলনকে ব্যর্থ করার সময় যদি আজও না হয়, তবে কবে আর হবে? আমরা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে আবেদন ও অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাংলার বাইরে বাঙালীর সংস্কৃতি

বাংলা দেশের বাহিরেও যে একটা জগৎ আছে, সে কথা আমরা যেন ভুলতে বসেছি। আমরা ক্রমশঃ এমন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছি যে, অপরের দিকে তাকাবার অবসর আমাদের অতি অল্প। এ দিকে নবজাগ্রত ভারতে আজ বিরাট সংগঠন চলেছে, জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে সকল প্রদেশ বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করেছে, সেই প্রতিযোগিতায় বাঙালী কেবলই পিছু হটছে। ভারতের সর্বত্র অসংখ্য শিক্ষিত বাঙালী বাস করেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বাঙালী মাতৃভাষার প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী বটে, কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে যথাযোগ্য সংযোগ না থাকায় তাঁরা বঙ্গদেশের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ন'ন। বঙ্গদেশের বাইরে তাই শুধু বৎসরান্তে একবার সম্মেলন করে আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। নিয়মিত ভাবে বঙ্গদেশের বিরাট সাহিত্য-সম্ভারকে প্রবাসী বাঙালী এবং অ-বাঙালী মহলে প্রচারের প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশী।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ আজ অনেক বেশী। ভারতের বাইরে তাই ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারের প্রয়োজন ও বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সম্প্রতি যাঁরা য়ুরোপখণ্ড ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছেন, তাঁরাও এই কথার সমর্থন করছেন। বাংলা সাহিত্যের বিরাট বৈভব সম্পর্কে কেউই তেমন কিছু জানেন না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গ্রন্থাবলী যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অনূদিত হয়েছিল তা আর বাজারে চালু নেই,—শরৎচন্দ্রের সামান্য কয়েকটি রচনা অনূদিত হলেও বাইরে তার কোনও চিহ্ন নেই। কয়েক জন বাঙালী লেখকের ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ সম্প্রতি বিশেষ সমাদর লাভ করেছে, কিন্তু দেখা গেছে, মূল বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর মান অপেক্ষা সেগুলি অনেক নিকৃষ্ট রচনা। এই কারণে আজ বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গভাষায় রচিত সৎ-সাহিত্য প্রচারের প্রয়োজন সর্বাধিক। বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শক্তিশালী প্রকাশন প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সাহিত্যিকবৃন্দ যদি লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে সামান্য চেষ্টা করেন, তাহ'লে একটা জাতীয় কর্তব্য পালন করা হবে। প্রকাশকদের আগ্রহ লক্ষ্য করলে আমরা এই বিষয়ে পরে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রকাশের ব্যবস্থা করব।

মৌলিক বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা হ্রাস

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মাসের পর মাস কেবল অনুবাদ-সাহিত্য কিংবা শুধু রম্য রচনা (যার আর কোনও নাম দেওয়া যায় না) প্রকাশিত হচ্ছে। অনুবাদ কর্ম অবশ্যই নিন্দনীয় নয়,—বিশ্ব-জগতের সাহিত্যের সঙ্গে মাতৃভাষার

মাধ্যমে পরিচয় লাভ করা বিশেষ ভাগ্যের কথা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনুবাদক যথোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেন না, কোনো কিছু অনুবাদ করতে হ'লে দুটি ভাষায় গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। মূল গ্রন্থের রূপকল্প ও মূল ভাবধারা ব্যাহত না করে—ভাষান্তরিত করাই হ'ল শক্তিমান অনুবাদকের কাজ। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে অনেকেই বহু সুপরিচিত। বহু সুযোগ্য ব্যক্তি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং এখনও করে থাকেন, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য যে, বর্তমানে অনেক অযোগ্য ব্যক্তিও এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। অল্প রয়্যালটির বিনিময়ে এই গ্রন্থগুলি অতি সহজে পাওয়া যায়, মূল লেখকের খ্যাতি অনুসারে গ্রন্থের চাহিদাও হয়; তাই আজ-কাল হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা প্রকাশকমণ্ডলী শুধু অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করছেন, প্রবীণ লেখকদের লেখনী স্তব্ধ, তাঁদের অনেকেই শুধু স্মৃতির রোমন্থন করছেন,—অপেক্ষাকৃত যাঁরা নবীন তাঁরা এক বা দুইখানি গ্রন্থের খ্যাতিতে এমনই বিভোর হয়ে থাকেন যে, তাঁদের কাছে ঘেঁষা প্রকাশকদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে, সাধারণ মানুষের ত' কথাই নেই। কয়েক জন জনপ্রিয় লেখককে আবার শক্তিশালী প্রকাশকরা মোটা টাকা দাদন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন,—দেনাশোধের লেখা লেখকরা যেন অবহেলা ভরে ডান হাতে লিখতে পারেন না, তাই সে সব অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় বাম হস্তের রচনা। উদ্যোগী প্রকাশকরা মৌলিক সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশে বিমুখ, কদাচিৎ দু-একখানি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখি, কিন্তু সেই সব প্রকাশকদের কৌলীন্যের অভাব থাকায় তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তাদৃশ চাহিদা হয় না। ফলে তাঁরা হাল্‌কা এবং চটুল বই খুঁজে বেড়ান। আর শেষ পর্যন্ত অধমতারণ রম্য-রচনা ত' আছেই, কিছু স্থূলরস, প্রচলিত-অপ্রচলিত কয়েকটি কথা, প্রগল্‌ভ ভঙ্গী আর পদ্ধতি প্রকরণহীন এলোমেলো রচনাই ইদানীং রম্য-রচনা নামে পরিবেশিত হচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষায় মৌলিক সদ্‌গ্রন্থ (এমন কি নাটক, নভেল বা গল্প-গ্রন্থ) প্রভৃতির প্রকাশ-সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এই বিষয়ে শুধু সাহিত্যিক নয়, প্রকাশকদেরও দায়িত্ব আছে, তাঁরা ইচ্ছা করলে শাদাকে কালো এবং কালোকে লাল করতে পারেন, আজ-কাল পঙ্গুও তাঁদের কৃপায় গিরি লঙ্ঘন করে।

ছোটদের বার্ষিক পত্র

বছরও অনেকগুলি ছোটদের বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং যথারীতি সেই সব বিরাটাকৃতি গ্রন্থে করুণ গল্প, বড় গল্প, রস-রচনা, হাসির গল্প, রহস্য-গল্প, অরণ্য-গল্প, সামাজিক গল্প, পৌরাণিক গল্প, শুধু গল্প, গোয়েন্দা কাহিনী, পরী কাহিনী, রূপকথা, শীকার-কথা, জীবনী, ইতিহাস প্রভৃতি ঠাসা আছে। কোন্ বয়সের ছেলেদের জন্য যে এইগুলি লিখিত তা রচনাদি পাঠ করে বোঝা শক্ত, তবে মনে হয়, পনের থেকে পঁচাত্তর সব বয়সের লোকই এই সব বার্ষিক শিশু-সাহিত্য পাঠের যোগ্য। [illegible] একটি এই জাতীয় শিশু বার্ষিক পত্রিকায়, জনৈক অতি-[illegible] প্রবীণ লেখকের রচনা থেকে নিম্নলিখিত লাইন ক'টি [illegible] আমাদের পাঠক সমাজে পেশ করছি—

"রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তী গোপিকা-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিবলাল (ষণ্ড) শোভমান হ'লেন। ক্ষণকাল পরে তিনি মাঠ ত্যাগ করে সবেগে চললেন, সমস্ত গরু অভিসারিকা হয়ে তাঁর অনুগমন করল।...তিনশ' গরু যদি স্বেচ্ছায় একটি ষাঁড়ের সঙ্গে ইলোপ করে তবে তাদের রোধ করবে কে?"

এখন শিশুপুত্রকে রাসমণ্ডল, গোপিকা, অভিসারিকা এবং ইলোপ কথাটির অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করুন, তিনশো গরু কেনই বা একটি ষাঁড়ের পিছনে ছুটলো তার ব্যাখ্যা করুন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, অধিকাংশ বার্ষিক শিশু-সাহিত্যের পাতায় পাতায় এই ধরণের দায়িত্বহীন রচনা ছড়ানো আছে—যাঁরা শিশুসাহিত্যের বেসাতি করে লাভবান হচ্ছেন তাঁদের কিঞ্চিৎ ধর্মজ্ঞানের প্রয়োজন। শিশুদের কাঁচা মাথাটা চর্বণের নানাবিধ কল আছে, তাঁরাও কি শেষটায় সেই দলে ভীড়ে পড়বেন?

খবরাখবর

এই বছর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের (যার নতুন নামকরণ হয়েছে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন) বাৎসরিক বৈঠক বসবে লক্ষ্ণৌ শহরে। মূল সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বর্মা থেকে এই উপলক্ষে এসেছেন, বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের মধ্যে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এবং গোপাল হালদার মহাশয় নির্বাচিত হয়েছেন। এই সম্মেলনে সাহিত্য, সমাজ এবং সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিশুসাহিত্য, মহিলা রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত এবং চারু শিল্পকলা শাখার অধিবেশন হবে। ইহা ব্যতীত "ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য" সম্পর্কে একটি বিশেষ শাখার অধিবেশন হবে।...খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু সম্প্রতি রাশিয়া ঘুরে স্বদেশে ফিরেছেন, এর পূর্বে তিনি চীন দেশে গিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত বসুর পূর্বে স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং ভবানী ভট্টাচার্য্য রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর রাশিয়া ভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী শীঘ্রই মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হ'বে।...ইংরাজ কবি এবং সমালোচক ষ্টীফেন স্পেণ্ডার তাঁর স্বল্পস্থায়ী কলিকাতা ভ্রমণে দিনে গড়ে পাঁচ থেকে সাতটি বক্তৃতা করেছেন, এবং তাঁর স্বরচিত 'Express' কবিতাটি সর্বত্র আবৃত্তি করেছেন। বলা বাহুল্য, ঐ কবিতাটি এ দেশে পাঠ্যতালিকাভুক্ত।...ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের Le Chair et la Sang নামক তৃতীয় উপন্যাসটি এত দিনে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করলেন জেরার্ড হপকিন্স, ইংরাজী সংস্করণের নাম "Flesh and Blood"...বিশ্বজগতের শিল্প বিষয়ে বৈপ্লবিক সমন্বয় করেছেন আঁদ্রে ম্যালরো। তাঁর নূতন গ্রন্থ The voice of silence এ গ্রন্থটির দাম পাঁচ পাউণ্ড...কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট লাভ করলেন কবি ও সমালোচক অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

ভগিনী নিবেদিতার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Master as I saw him"—এর বাংলা অনুবাদ এত দিনে প্রকাশিত হ'ল। শিক্ষিত

বাঙালী মাত্রেই এই গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত, স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ এত দিনে এই মূল্যবান গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের আর একটি রত্ন সংযোজিত করলেন। ১৩২২ আষাঢ় থেকে ১৩২৪ চৈত্র পর্যন্ত "উদ্বোধনে" এই অনুবাদ যখন প্রকাশিত হয় তখন সর্বত্র বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়, এত দিনে সেই গুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থে স্বামিজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। ভক্ত এবং সাহিত্য-রসিক সকলের কাছেই এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করবে। এই বিরাট গ্রন্থটির দাম মাত্র চার টাকা, প্রকাশক—উদ্বোধন কার্য্যালয় কলিকাতা—৩

একে তিন, তিনে এক

"ছিরপদ, ছিরিকণ্ঠ ছিরি অভিলাস, একে তিন তিনে এক ভিন গাঁয়ে বাস।" শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এই গল্পগুলি রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা সর্বোচ্চ শিখরে, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের তিনি একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। "একে তিন তিনে এক," "কনকলতা" "বড় রাজা ছোট রাজার গল্প," "দেয়ালা," "মহামাস তৈল," "ভোম্বল দাসের কৈলাস যাত্রা," "রতা শেয়ালের কথা," "ধরা পড়া," "বাতাপি রাক্ষস," "রামধারী" প্রভৃতি গল্প এবং তৎসংলগ্ন ছড়াগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত হবে। গল্পগুলি ছোট বড়ো সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। শিল্পী অজিত গুপ্ত গ্রন্থটির অলঙ্করণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থটির প্রকাশক মেসার্স এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স।—দাম তিন টাকা মাত্র।

রামপদ গ্রন্থাবলী

কবি মোহিতলাল একবার বলেছিলেন, "শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ধ্বংসোন্মুখ রাঢ়ের বিগতশ্রী পল্লীর চিত্র রচনায় যে-দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসনের দাবী করিতে পারেন। মধ্যবিত্ত 'বাঙালীর জীবনকথা, স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশ, পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত নিরাভরণা বঙ্গ জননীর তুলসীমঞ্চ আর শ্যামস্নিগ্ধ পল্লীর রূপকথা রামপদ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর উপজীব্য। সম্প্রতি তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। এই গ্রন্থাবলীতে তাঁর শাশ্বত পিপাসা, প্রমত্ত পৃথিবী, মায়াজাল, সুনয়নীর মৃত্যু, সংশোধন, ক্ষত, প্রতিবিম্ব, জোয়ার-ভাঁটা, নূতন জগতে, ভয় প্রভৃতি দশখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে। বিশেষতঃ "শাশ্বত পিপাসা" এবং "মায়া জাল" "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশের সময় সাহিত্যিক মহলে বিশেষ সাড়া পড়ে। এই মূল্যবান গ্রন্থরাজির মূল্য মাত্র তিন টাকা।

কাশবনের কন্যা

পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট লেখক আবুল কালাম সামসুদ্দিনের 'শাহের বাণু' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। ইতিমধ্যে তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। 'কাশবনের কন্যা' নামক প্রেমের রসমধুর জীবন-আলেখ্য সামসুদ্দিনের নবতম প্রকাশিত উপন্যাস হলেও, লেখকের এইটি প্রথম রচিত উপন্যাস। প্রথম রচনা হলেও সামসুদ্দিন সাহেবের রচনায় কাঁচা হাতের ছাপ নাই। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে সংলাপ অনেক স্থলে অত্যন্ত মধুর মনে হয়। পল্লী বাংলার গানগুলিও বেশ লাগে। মনসব আর শিকদারকে ভুলতে "কাশবনের কন্যা"র পাঠকদের সময় লাগবে। কাব্যধর্মী ভাষায় আবুলকাসেম সামসুদ্দিন "কাশবনের কন্যা" রচনা করেছেন—এ এক নূতন ধারা। গ্রন্থটির প্রকাশক ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার ঢাকা, মূল্য—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক

বাংলার পাঠক-সমাজ স্বভাবতঃই বড় অকৃতজ্ঞ। বিগত কালও যাঁদের রচনা আমাদের জীবনের আনন্দ-বেদনাময় মুহূর্ত্তগুলিকে উজ্জ্বল-মধুর করে তুলেছে তাঁদের আমরা মন থেকে মুছে ফেলেছি। সাংবাদিক রমেন চৌধুরী রচিত বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক (১ম পর্ব) তাই বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। স্বর্ণকুমারী, সারদাসুন্দরী, জ্ঞানদানন্দিনী, প্রসন্নময়ী, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রায়, মোক্ষদায়িনী, হিরণ্ময়ী, প্রিয়ম্বদা, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, সুকুমারী দত্ত, লীলা দেবী, নীরদমোহিনী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অনুরূপা দেবী, গিরিবালা দেবী ও জ্যোতির্ময়ী দেবী 'এই উনিশ জন মহিলা লেখিকার জীবনকথা ও সাহিত্য-কীর্তির পরিচয় লেখক সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন। দৈনিক বসুমতীর সাহিত্য বিভাগে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ কালে এই প্রবন্ধগুলি পাঠক-চিত্তে কৌতূহল সঞ্চার করেছিল। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। এই বিশিষ্ট গ্রন্থটির প্রকাশক বি সেন এ্যাণ্ড কোম্পানী, দাম তিন টাকা আট আনা মাত্র।

লেডীরম

পুলকেশ দে সরকার চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধকার হিসাবেই সুপরিচিত। কিছু কাল পূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'লেডীরম' নানা কারণে একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। রম্যরচনার ভীড়ে ইদানীং সাহিত্যের জাতি বিচার করা কঠিন হয়ে উঠেছে,—'লেডীরম'কে কেউ কেউ রম্য রচনা শ্রেণীভুক্ত করেছেন লক্ষ্য করেছি। আসলে কিন্তু 'লেডীরম' চাকচিক্যময় বর্তমান সমাজের নিখুঁত আলেখ্য, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ রঙের কয়েকটি আঁচড়ে তিনি স্বাধীনতার পরবর্তী কালীন বাংলার মেকী সমাজের চরিত্র চিত্রণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'লেডীরমে'র পাতায় পাতায় অনেক সুপরিচিত মূর্তি ভীড় করে হাজির হয়েছেন। এই সুমুদ্রিত এবং কাপড়ের মলাট-যুক্ত গ্রন্থটির দাম মাত্র তিন টাকা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

সম্প্রতি আরো কয়েকটি ভালো উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। স্থানাভাব বশতঃ সব'গুলির বিস্তৃত পরিচয় এবং সব গ্রন্থগুলির উল্লেখ সম্ভব নয়, কয়েকটি সুনির্বাচিত সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে দীপক চৌধুরীর 'শঙ্খবিষ' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রণজিৎ সেনের 'রাধা' করুণ-মধুর উপন্যাস,—এই দুটি উপন্যাসই ছায়াচিত্রে রূপায়িত হবে। আর একখানি উপন্যাস নবীন লেখক প্রফুল্ল রায়ের 'নূতন দিন', পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের পট-ভূমিকায় রচিত বলিষ্ঠ কাহিনী। প্রথম উপন্যাসেই লেখকের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকারোক্তি—

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম শেষ হইবার প্রাক্কালেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য জার্ম্মাণ অস্ত্র-শস্ত্র মজুত করিয়া রাখিতে ফিল্ডমার্শাল মণ্টগোমারীকে বিশেষ গোপন নির্দ্দেশ দেওয়ার যে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি গত ২৩শে নবেম্বর (১৯৫৪) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল করিয়াছেন, পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসে উপকারী মিত্রশক্তির প্রতি এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্ত বোধ হয় খুবই বিরল। আমরা এখানে তাঁহার এই স্বীকারোক্তির নিজের ভাষাটি অবিকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিজের নির্ব্বাচকমণ্ডলী উডফোর্ডে তাঁহার জন্মসপ্তাহ উপলক্ষে ২৩শে নবেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল বলেন :

"Even before the war had ended and while the Germans were surrendring by hundreds of thousands and our streets were crowed with cheering people, I telegraphed to Lord Montgomery directing him to be careful, In collecting the German arms, to stock them so that they could easily be issued again to the German soldiers whom we should have to work with, if the Soviet advance continued." অর্থাৎ 'যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই জার্ম্মাণরা যখন হাজারে হাজারে আত্মসমর্পণ করিতেছিল এবং আমাদের রাজপথগুলি জনতার উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় আমি জার্ম্মাণ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও মজুত করিয়া রাখা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া লর্ড মণ্টগোমারীকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। কেন না, সোভিয়েট সৈন্যরা আরও অগ্রসর হইতে থাকিলে উহা রোধ করিবার জন্য জার্ম্মাণ সৈন্যদিগকে ঐ সকল অস্ত্র পুনরায় দেওয়া হইবে।'

শুধু লর্ড মণ্টগোমারীকেই নয়, জেনারেল আইসেন-হাওয়ারকেও তিনি যে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। ঐ টেলিগ্রামে জার্ম্মাণ বিমানবহর বা অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস না করিবার জন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, ঐগুলির বিশেষ প্রয়োজন কোন দিন তাঁহাদের ঘটিতে পারে।

পরে অবশ্য চার্চ্চিল তাঁহার এই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন। ১লা ডিসেম্বর (১৯৫৪) তারিখে কমন্স সভায় তিনি বলেন যে, সম্ভবতঃ ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর নিকট ঐ টেলিগ্রাম তিনি আদৌ প্রেরণ করেন নাই। তিনি বলেন, "উডফোর্ডে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর নিকটেই শুধু ঐ টেলিগ্রাম পাঠাই নাই, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম সম্পর্কে আমার পুস্তকের ষষ্ঠ ভল্যুমে উহা আমি উদ্ধৃত-ও করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ পুস্তকে ঐ টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয় নাই।" কমন্স সভাকে তিনি ইহাও জানান যে, সরকারী কাগজপত্র বিশেষ ভাবে তল্লাস করিয়া ঐ টেলিগ্রামের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তবে আরও তল্লাস করা হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে তল্লাস করিয়াও ঐ টেলিগ্রামখানি পাওয়া না গেলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। হয়ত বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলকে বিব্রত না করিবার জন্য ঐ টেলিগ্রামখানি নিঃশব্দে উধাও হইয়াছে। ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী কিন্তু চার্চ্চিলের নিকট হইতে ঐ টেলিগ্রাম পাওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সময় তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছিলেন। 'টাইমস্' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার নিকট তিনি বলেন, 'ঐ টেলিগ্রাম আমি পাইয়াছিলাম, ইহা সত্য। কিন্তু কি করা হইয়াছে, সে-সম্পর্কে আমি কিছুই বলিতেছি না।' একজন সৈনিক হিসাবে তিনি যে ঐ আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালীন জেনারেল

আইসেন-হাওয়ার বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। সুপ্রীম কমাণ্ডার থাকার সময় তিনি চার্চ্চিলের নিকট হইতে ঐরূপ নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন কি না, সে-সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা উল্লেখযোগ্য। এ-সম্পর্কে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করা হইয়াছে কি না, তাহাও প্রকাশ নাই।

চার্চ্চিল অত্যন্ত গর্ব্বের সঙ্গেই উডফোর্ডের সভায় উল্লিখিত স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই স্বীকারোক্তিতে সভার জনগণ তো বটেই—সমস্ত বৃটিশ সংবাদপত্র এবং সমগ্র বৃটিশ জনগণ চার্চ্চিলের দূরদর্শিতার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা তো হয়ই নাই, বরং বিপরীত ফল ফলিয়াছে। উডফোর্ডের সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রক্ষণশীল এবং সোভিয়েট-বিরোধী, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু তাঁহারাও চার্চ্চিলের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সভায় 'শেম্ শেম্' ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এই গোপন তথ্য প্রকাশ করার কারণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। চার্চ্চিল সগর্ব্বে উত্তর দিয়েছিলেন: "I am giving you the story straightly and bluntly so that you may see for yourself how wisely you are being led." অর্থাৎ 'আপনারা কিরূপ বিজ্ঞ নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই খোলাখুলী এবং স্পষ্ট ভাষায় এই বিষয়টি আমি আপনাদিগকে জানাইয়াছি।' চার্চ্চিলের স্বীকারোক্তি বৃটিশ সংবাদপত্র-জগতেও তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। গোঁড়া রক্ষণশীল পত্রিকা 'টাইমস' পর্য্যন্ত ২৫শে নবেম্বর (১৯৫৪) তারিখের সংখ্যায় 'Why' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চার্চ্চিলের ধারণাটাকে অবাস্তব (unrealistic) এবং অবিবেচনা, প্রসূত (unwise) বলিয়া অভিহিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'What on earth made him say it?' বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহের সমালোচনাগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িলে মনে হয়, জার্ম্মাণ সৈন্য দ্বারা জার্ম্মাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ঐগুলি মজুত করিয়া রাখার নির্দ্দেশে তাঁহারা যত না অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বেশী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ঐ গোপন নির্দ্দেশটি চার্চ্চিল প্রকাশ করিয়া দেওয়ায়। বিশেষতঃ, প্রকাশ করিবার সময়টিও অত্যন্ত অ-সময়োচিত হইয়াছে, ইহা-ই তাহাদের অসন্তোষের প্রধান কারণ।

চার্চ্চিল তাঁহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিলেও, গোপন টেলিগ্রামখানি খুঁজিয়া পাওয়া না গেলেও তিনি যে টেলিগ্রাম করিয়া উক্ত নির্দ্দেশ ফিঃ মাঃ মণ্টগোমারীকে দিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। স্বয়ং মণ্টগোমারীও ঐ টেলিগ্রাম পাওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন। বিব্রত চার্চ্চিলকে আরও অধিকতর বিব্রত না করিবার জন্য তিনিও শেষ পর্য্যন্ত ঐ উক্তি প্রত্যাহার করিবেন কিনা তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চার্চ্চিলের এই স্বীকারোক্তির মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক এবং সোভিয়েট রাশিয়া উভয় দলেরই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে বিপুল রক্তক্ষয়কারী ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত মিত্রশক্তি এবং উপকারী বন্ধু রাশিয়ার প্রতি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতাও কৃতঘ্নতার যে কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা খুবই অপ্রত্যাশিত মনে করিবার কোন কারণ নাই। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে পর্য্যাপ্ত সাহায্য করা হইতেছে না, যুদ্ধের সময়েও সে সম্পর্কে কাণাঘুষা সংবাদ কিছু না কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। সে-সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কোন্ সময়ে এবং কিরূপ অবস্থায় চার্চ্চিল ঐ গোপন টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জার্ম্মাণী যখন পশ্চাৎ অপসরণ সুরু করিল, তখন হইতেই বুঝা গেল, হিটলারের রাশিয়া দখলের সম্ভাবনা আর নাই। তার পর আরম্ভ হইল তিন দিক হইতে রুশবাহিনীর জার্ম্মাণীর দিকে অগ্রগতি। ১৯৪৩ সালের যুদ্ধের বিবরণ এখানে দিবার স্থান নাই। ১৯৪৪ সালের প্রথম কয়েক মাসেই বুঝা গেল—রাশিয়ার নিকট জার্ম্মাণীর বিপুল পরাজয় অনিবার্য্য। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে রাশিয়ার হাতে জার্ম্মাণীর পরাজয় যখন সুনিশ্চিত, সেই সময় সমগ্র জার্ম্মাণী যাহাতে রাশিয়ার দখলে চলিয়া না যায় সেই জন্য ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ফ্রান্সের নরমাণ্ডী উপকূলে অবতরণ করে। এই ভাবে বহুকথিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন বা সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খোলা হইল। কিন্তু এই দ্বিতীয় রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ প্রতিরোধ তেমন প্রবল হয় নাই। মিত্র পক্ষীয় বাহিনী মাত্র ৭৫ ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। তথাপি ১৯৪৪ সালে ডিসেম্বর মাসে মিত্র পক্ষীয় বাহিনী যখন জার্ম্মাণ-সীমান্তে পৌছিল, তখন জার্ম্মাণ আক্রমণ এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহাদের পক্ষে ব্যূহ রক্ষা করা সম্ভব হইল না। এই অবস্থায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল ৬ই জানুয়ারী (১৯৪৫) তারিখে মিঃ ষ্টালিনের নিকট এক টেলিগ্রাম করিয়া 'আরডেনেসে' (Ardennes) জার্ম্মাণ সৈন্যের চাপ হ্রাস করিবার জন্য ভিসচুলা রণাঙ্গনে বা অন্যত্র রাশিয়ার আক্রমণ প্রশস্ততর করিয়া তুলিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। চার্চ্চিল লিখিয়াছিলেন, "You know from your own experience how very anxious the position is when a very broad front has to be defended after temporary loss of the initiative......I shall be grateful if you can tell me whether we can count upon a major Russian offensive on the Vistula front or else-where during January." মঃ ষ্ট্যালিন ৭ই জানুয়ারী (১৯৪৫) এই টেলিগ্রামের উত্তর দেন। তাহাতে শীতকালে ব্যাপক অভিযানের আয়োজন করার অসুবিধার কথা উল্লেখ করিলেও তিনি চার্চ্চিলকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, রাশিয়ার মিত্রবর্গের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া জানুয়ারীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্ব্বেই (not later than second half of January) মধ্য রণাঙ্গনে ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করা আরম্ভ হইবে। এই টেলিগ্রামের উত্তরে চার্চ্চিল ষ্ট্যালিনকে ৯ই জানুয়ারী লিখিয়াছিলেন: "I am most grateful to you for your thrilling massage. May good fortune rest upon your noble venture,"।

উহার তিন দিন পরেই ১৫০ ডিভিশন রুশসৈন্য ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করে। এই আক্রমণ এত প্রবল হইয়াছিল যে, কয়েক দিনের মধ্যেই জার্ম্মাণী বহু সংখ্যক সৈন্য পশ্চিম রণাঙ্গন

হইতে সরাইয়া পূর্ব্ব রণাঙ্গনে আনিতে বাধ্য হয় এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্র বাহিনীর উপর জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস পায়। ইহা মণ্টগোমারীর নিকট চার্চ্চিলের উল্লিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইবার প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বের কথা। অতঃপর চার্চ্চিল ষ্ট্যালিনের নিকট আর একটি টেলিগ্রামে এই বিপুল আক্রমণের জন্য অন্তরের অন্তস্থল হইতে (from the bottom of heart) ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ মাস পরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ সৈন্যদের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য জার্ম্মাণ অস্ত্রশস্ত্র মজুত করিয়া রাখিবার জন্য মণ্টগোমারীকে নির্দ্দেশ দেওয়া কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। চার্চ্চিল যে তাঁহার নির্দ্দেশের অনুকূলে যুক্তি দেন নাই, তাহা নয়। তিনি বলিয়াছেন, "জয়গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া ষ্টালিন ভাবিয়াছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর উপর তিনি রাশিয়া ও কুম্যুনিজমের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবেন।" কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে কথাটা আদৌ সত্য নয়। কারণ, জার্ম্মাণীতে কোথায় পৌঁছিয়া রুশ সৈন্য আর অগ্রসর হইবে না, কয়েক মাস পূর্ব্বেই সে-সম্পর্কে রাশিয়া মিত্রপক্ষের সহিত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল। রাশিয়া এই চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিল। মণ্টগোমারীকে নির্দ্দেশ দেওয়ার পূর্ব্বে এবং পরে তিনি নিজেই সে কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন। বরং সমগ্র ইউরোপে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায় বৃটেনের ছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

রডলফ হেস হিটলারের নির্দ্দেশে ইংলণ্ডে অবতরণ করিয়াছিলেন কি না, না, তিনি শুধু হিটলারের জ্ঞাতসারে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের সময় বৃটেনকে জার্ম্মাণীর পক্ষে পাওয়ার ব্যবস্থা করা। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই বটে। কিন্তু মিত্র শক্তিবর্গের নিকট রাশিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য পাইতেছে না, একথা রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরেও উঠিয়াছিল। রাশিয়ার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত সাহায্য চার্চ্চিল রাশিয়ায় পাঠাইতে দেন নাই, এমন কথাও কি উঠে নাই? এ সম্পর্কে শেরউডের লিখিত 'Roosevelt And Hopkins' নামক গ্রন্থে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৪০টি এ-২০ বোম্বার যখন রাশিয়ায় প্রেরিত হইতেছিল, তখন ঐগুলি চার্চ্চিলের অনুরোধে বৃটেনকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর এক দফা সাহায্য (PQ19) প্রেরণ চার্চ্চিলের অনুরোধেই বাতিল করা হয়। চার্চ্চিলের অনুরোধে রাজী হইয়া রুজভেল্ট তাঁহাকে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, "he did not feel that Stalin should be notified of this rough blow' to his hopes any sooner than was absolutely necessary." ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ষ্টালিনগ্রাডে জার্ম্মাণীর সহিত রাশিয়ার জীবন-মরণের সংগ্রাম চলিতেছিল। সামরিক সাহায্যের কথার পরেই সেকেণ্ড ফ্রন্ট বা দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। চার্চ্চিলের আপত্তির জন্যই ১৯৪২ সালে তো দূরের কথা ১৯৪৩ সালেও এমন কি ১৯৪৪ সালের প্রথমার্দ্ধেও ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয় নাই। ইহার মূলে কি উদ্দেশ্য ছিল, সে-সম্বন্ধে ঐ সময়েই লোকের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল। রিবেনট্রপ মনে করিয়াছিলেন, রাশিয়াকে পরাজিত করিতে আট সপ্তাহ লাগিবে। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ধরিয়া লইয়াছিলেন, চারি হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ার পতন হইবে। সেই আশা পূর্ণ না হইলেও পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে যুদ্ধের তীব্রতা দেখিয়া তাঁহারা এই আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, প্রবল রুশ-জার্ম্মাণ সংগ্রামে রাশিয়া পরাজিত হইবে এবং রণক্লান্ত জার্ম্মাণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তখন সমগ্র ইউরোপে অবাধে বৃটেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্যই রাশিয়ার উপর হইতে যুদ্ধের চাপ হ্রাস করিবার জন্য ১৯৪৪ সালের জুনের পূর্ব্বে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয় নাই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? বোধ হয় ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে রাশিয়ায় যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফিরিস্তি লর্ড-সভায় পেশ করিবার সময় লর্ড বেভার ব্রুক বলিয়াছিলেন, "রাশিয়ার বিজয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে, এ কথা একমাত্র নির্ব্বোধেরাই বলিয়া থাকে।" এইরূপ নির্ব্বোধ ইংলণ্ডে কেহ কি সত্যই ছিল না? লর্ড বেভার ব্রুক যথাসম্ভব শীঘ্র দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাতে চার্চ্চিল বিব্রত বোধ না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে রাশিয়ার বিজয়কে বিপজ্জনক মনে করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উডফোর্ডের বক্তৃতায় চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "কিন্তু বিখ্যাত লোকদের মধ্যে আমিই এ কথা প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, সোভিয়েট সাম্যবাদকে রোধ করিবার জন্য জার্ম্মাণীকে আমাদের দলে আনিতে হইবে।" গোয়েবলস্ এক সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, চার্চ্চিলের উক্তির মধ্যে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। গোয়েবলস্ বলিয়াছিলেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গকে

এক দিন তাহাদের মৈত্রী ভিক্ষা করিতেই হইবে। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী আজ ফলিতেছে।

চার্চ্চিল যখন ঐ টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন, তখন বৃটিশ শ্রমিক নেতা মিঃ এট্‌লী ও মিঃ মরিসন চার্চ্চিল, মন্ত্রিসভার সদস্য। চার্চ্চিল তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া, না, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগকে জানাইয়া এই টেলিগ্রাম করা হইয়া থাকিলে, তাঁহারা তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন কি? মিঃ এট্‌লী এবং মিঃ মরিসনের নিকট হইতে এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু চার্চ্চিলের উডফোর্ডের বক্তৃতা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গকে অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রাশিয়ার আছে।

মস্কো সম্মেলন—

গত ২৯শে নবেম্বর (১৯৫৪) হইতে মস্কোতে চারি দিনব্যাপী রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের সাতটি কম্যুনিষ্ট দেশের যে ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার জন্য রাশিয়া ইউরোপের ২৩টি দেশ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। ১৩ই নবেম্বর (১৯৫৪) তারিখে রাশিয়া এই আমন্ত্রণ করে। ইন্দোচীন সম্পর্কে জেনেভা-সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর রাশিয়া প্রথমে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয়ের সম্মেলনের জন্য প্রস্তাব করে। অতঃপর এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গত ২৩শে অক্টোবর (১৯৫৪) আর একটি প্রস্তাব রাশিয়া কর্তৃক উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবে রাশিয়া জানায় যে, নির্ব্বাচন দ্বারা জার্ম্মাণীর ঐক্যসাধন এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি-সম্পাদন বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয়ের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হইবে। এই সম্মেলনে সর্ব্ব ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলন আহ্বানের বিষয়ও আলোচিত হইবে, ইহাও রাশিয়া প্রস্তাব করে। ইহার পর গত ১৩ই নবেম্বর রাশিয়া মস্কোতে ২৯শে নবেম্বর তারিখে সর্ব্ব-ইউরোপীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য ইউরোপের ২৩টি রাষ্ট্র এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে পৃথক্ ভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তবে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলে রাশিয়া আপত্তি করিবে না, পর্য্যবেক্ষক মহল এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। পর্য্যবেক্ষকরূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীনকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার এই সর্ব্ব 'ইউরোপীয় নিরাপত্তা-সম্মেলনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। তাহারা যে এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে, সে-সম্বন্ধে বোধ হয় রাশিয়ারও কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই এই সম্মেলন রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং আলবানিয়া—এই আটটি কম্যুনিষ্ট দেশের সম্মেলনে পর্য্যবসিত হয়। এই সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে পত্র দেয়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর ইউরোপীয় সমস্যা সম্পর্কে রাশিয়ার সহিত আলোচনা করিতে তাঁহারা রাজী আছেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্যই পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য লণ্ডনে ও প্যারীতে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, এ কথা স্মরণ করিলে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের উল্লিখিত পত্রের তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জা করিবে, আর রাশিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে, ইহা বোধ হয় পশ্চিমী শক্তিবর্গও প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু রাশিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিবার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিল, একথা বলিবার উপায় নাই। কারণ, রাশিয়া ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রকেই আমন্ত্রণ করিয়াছিল। অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলি যখন আসিল না, এক পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র-সজ্জিত করিতে যখন তাহারা দৃঢ় পরিকর, এই অবস্থায় কম্যুনিষ্ট দেশগুলি আত্মরক্ষার আয়োজন করিবে, ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মস্কোতে যে-দিন এই সম্মেলন আরম্ভ হয়, সেই দিন চিকাগোতে এক বক্তৃতায় মিঃ ডালেস বলেন, "প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া, তদনুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিয়া এবং আক্রমণকারী নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে, মিত্র শক্তিবর্গকে এই আশ্বাস দিয়া আমরা শান্তির জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাজ করিতে পারি বলিয়াই আমি মনে করি।" রাশিয়ার সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইতেছেন। মস্কোতেও চারি দিনব্যাপী সম্মেলনের পর ২রা ডিসেম্বর (১৯৫৪) কম্যুনিষ্ট শক্তিবর্গ একই সামরিক পরিচালনাধীনে নিজ নিজ সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্য এক যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা যে পশ্চিম-ইউরোপের সামরিক প্রস্তুতির প্রতিক্রিয়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিম ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার অনুরূপভাবে এই রক্ষা ব্যবস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ভাবে পরস্পর সশস্ত্র হইয়া ইউরোপে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলি পাশাপাশি অবস্থান করিবে। এই রূপ সশস্ত্র সহাবস্থান সহাবস্থান-নীতির এক নূতন রূপ বটে। সশস্ত্র যুদ্ধ উহার পরিণতি। সহাবস্থানের বিকল্প যুদ্ধ। কিন্তু সশস্ত্র সহাবস্থানের পরিণামও ভিন্ন হইবে না।

চিয়াং-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি—

সম্প্রতি ফরমোসা সম্পর্কে চিয়াং কাইশেকের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক নিরাপত্তা-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। গত ১লা ডিসেম্বর (১৯৫৪) ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই চুক্তির সর্ত্তাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মিঃ ডালেস কম্যুনিষ্ট চীনকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, এই নূতন চুক্তির সম্ভাব্য ফল হইবে—ফরমোসা আক্রান্ত হইলে চীনকে আক্রমণ করা হইবে। তিনি শুধু এইটুকু অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণের অর্থ ইহা নয় যে, পরমাণু-বোমা বর্ষণের সহিত ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। কিন্তু চীনকে আক্রমণ করা হইলে উহা সীমাবদ্ধ থাকিবে কিরূপে, তাহা তিনি কিছুই বলেন নাই। তবে তিনি এই টুকু বলিয়াছেন যে, ফরমোসা ও পেস্কাডোরেস দ্বীপই শুধু চিয়াং-মার্কিণ 'নিরাপত্তা-চুক্তির মধ্যে পড়িয়াছে। কুময়, আচন প্রভৃতি চীনের উপকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলি এই চুক্তির আওতার মধ্যে পড়ে নাই। কিন্তু ফরমোসা আক্রমণের ভূমিকাস্বরূপ যদি এই দ্বীপগুলি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে চিয়াং

কাইশেকের সহিত এইরূপ চুক্তি করিতে পারে, তাহা সিয়াটো চুক্তি সম্পাদনের সময়ই চীন গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-কোরিয়া ও জাপানের সহিত মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা চুক্তি পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছে। অতঃপর সিয়াটোচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি চিয়াং কাইশেকের সহিতও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হইল। অতঃপর সবগুলি চুক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার আয়োজন করা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

চিয়াং-মার্কিণচুক্তি সম্পাদনের পূর্ব্বে বৃটেনকে এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা হয় নাই, ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চুক্তির সর্ত্তাবলী স্থির হওয়ার পথ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে এই আশ্বাস দিয়াছে যে, এই চুক্তি শুধু আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় চিয়াং কাইশেকের পক্ষে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করার পক্ষে কোন বাধা হইবে না, এমন কথাও আমরা শুনিয়াছি। তাহা হইলে বলিতে হয়, চিয়াংকাইশেকের চীন আক্রমণ 'আক্রমণ' নয়, কিন্তু চীন তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ফরমোসা দখল করিতে চেষ্টা করিলেই উহা 'আক্রমণ' বলিয়া গণ্য হইবে। চিয়াং যদি তাঁহার দখলী ছোট ছোট দ্বীপগুলি হইতে চীনের মূল ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায় এবং উহা প্রতিরোধের জন্য চীন প্রতি-আক্রমণ করে, তাহা হইলে উহাকেই ফরমোসা দখলের ভূমিকা সাব্যস্ত করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীন আক্রমণ করিতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় নয়। ফরমোসা চিয়াংয়ের দখলে থাকা যে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, একথা জওহরলালজীও স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ফরমোসাকে আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের হাতে অর্পণ করিবার জন্য ভারত এক প্রস্তাব করিয়াছে। পরে জানা গেল, উহার মূলে কোন সত্য নাই। কিন্তু এক সংবাদে প্রকাশ, চীনে আটক ১১ জন মার্কিণ বৈমানিক ও ৩ জন সাধারণ মার্কিণ নাগরিক মোট ১৩ জন মার্কিণ নাগরিকের মুক্তির জন্য জওহরলালজী হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহাদিগকে গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে আটক রাখা হইয়াছে। তাহাদিগকে মুক্তি না দিলে চীন সম্পর্কে নৌ-অবরোধের যে হুমকী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই সকল ঘটনা বিবেচনা করিলে সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা যে খুবই বিপজ্জনক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মার্শাল টিটোর সফর—

আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইবার পূর্ব্বেই যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৫৪) ভারতে আসিয়া পৌঁছিবেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ভ্রমণের জন্য তিনি গত ২৯শে নবেম্বর বেলগ্রেড হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এই ভ্রমণ উপলক্ষে প্রায় দুই মাস কাল তিনি তাঁহার দেশের বাহিরে থাকিবেন। কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে প্রায় দুই মাস কাল ভ্রমণের জন্য রাষ্ট্রের বাহিরে থাকার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং তাঁহার এই ভ্রমণ যে নিছক ভ্রমণ নয়, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। তাঁহার এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের তালিকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, ৫ জন কেবিনেট-মন্ত্রী, টিটোর সেক্রেটারী-জেনারেল এবং সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীর তিন জন সিনিয়র অফিসার তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার এতগুলি প্রধান নেতাদের প্রেসিডেণ্ট টিটোর সঙ্গে আসা যুগোশ্লাভিয়ার আভ্যন্তরীণ সুদৃঢ় নিরাপত্তাই শুধু সূচিত করে না, তাঁহার সফরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও জানিবার আগ্রহ জন্মে। নয়াদিল্লীতে জওহরলালজীর সহিত কি কি বিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন, তাহা নাকি স্থির করা হয় নাই। তবে চীন ভ্রমণের ফলে জওহরলালজীর চীন সম্পর্কে তাঁহার কি ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে চাহিবেন, অনেকে এইরূপ মনে করেন। সম্প্রতি টিটোও সহাবস্থান নীতির সমর্থক হইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই নেহরুজীর অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হওয়ার ইচ্ছা হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

রাশিয়ার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পশ্চিমী শক্তিবর্গ যুগোশ্লাভিয়াকে গ্রহণ করিলেও উহা যে কম্যুনিষ্ট দেশে সে-কথা তাঁহারা ভুলিতে পারে না। টিটো অবশ্য যথাসম্ভব পশ্চিমী শক্তিবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যুগোশ্লাভিয়াকে জোর করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের কোলে ঠেলিয়া দেওয়া যে ঠিক হয় নাই, রাশিয়াও অনেক বিলম্বে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে রুশ মনোভাবের পরিবর্ত্তন সম্প্রতি দেখা যাইতেছে। ইউরোপে সহাবস্থান নীতি সম্পর্কে প্রেঃ টিটো জওহরলালজীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে চান বলিয়া অনেকে মনে করেন। তথাপি তাঁহার এই সুদীর্ঘ সফরের রহস্য বুঝিয়া উঠা সহজ নয়।

যোশিদার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ—

জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ যোশিদা তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যগণসহ গত ৭ই ডিসেম্বর (১৯৫৪) পদত্যাগ করিয়াছেন এবং নব গঠিত গণতান্ত্রিক দলের (রক্ষণশীল) নেতা মিঃ হাতোয়ামা প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাইয়া সমাজতন্ত্রীরা মিঃ হাতোয়ামাকে সমর্থন করেন। নূতন গবর্ণমেণ্ট তদারকী গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কিছুই হইবে না। মিঃ যোশিদার বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মিঃ যোশিদার লিবারেল দলের ৩৫ জন সদস্য দল ত্যাগ করিয়া নবগঠিত ডিমোক্রাটিক দলে যোগ দান করায় জাপ পার্লামেণ্টে বিরোধীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৩ জন। নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াই দলের অন্যান্য নেতাদের পরামর্শে তিনি পদত্যাগ করেন। নূতন প্রধান মন্ত্রীই লিবারেল দলের স্রষ্টা। যুদ্ধকালীন কার্য্যকলাপের জন্য জেঃ ম্যাকআর্থার যদি তাঁহাকে অপসারিত না করিতেন, তবে তিনিই প্রধান মন্ত্রী হইতেন।

মিঃ যোশিদা প্রায় সাত বৎসর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শুধু মার্কিণ নীতিই কার্য্যকরী করেন নাই, তিনি ছিলেন একজন স্বৈরশাসক। এই সাত বৎসরে তাঁহার মন্ত্রিসভায় প্রায় এক শত সদস্যকে তিনি বরখাস্ত করিয়াছেন। জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক দুর্গতি তিনি রোধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পতনে জাপানের অধিকাংশ লোকেই যে সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নূতন প্রধান মন্ত্রী জাপানকে অস্ত্রসজ্জিত করার পক্ষপাতী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গঠিত শান্তি-শাসনতন্ত্রের তিনি বিরোধী। তিনি কম্যুনিষ্ট-বিরোধী হইলেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে তিনি কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকা সমর্থন করেন না। কিন্তু মার্কিণ প্রভাবাধীন থাকিয়া কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্ত্তন করা সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করেন না।

জেনারেল নাজিবের পতন—

জেনারেল মহম্মদ নাজিবকে গত ১৪ই নবেম্বর (১৯৫৪) মিশরের প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ,—প্রধান মন্ত্রী কর্ণেল নাসেরের গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করার জন্য মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের ষড়যন্ত্রের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কর্ণেল নাসেরের আততায়ী লতিফের বিচারের সময় জেঃ নাজিবের নাম উল্লিখিত হয় এবং মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের সহিত তাঁহার সংস্রবের গুজব ছড়াইয়া পড়ে। দুই জন সাক্ষীও বলে যে, কর্ণেল নাসের এবং অন্যান্য নেতাদের হত্যার এবং অতঃপর সাধারণ অভ্যুত্থানের যে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, তাহাতে জেঃ নাজিবের সমর্থন চাওয়ার কথা ছিল। মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সদস্য ইউসুফ তালাতকে গ্রেফতার করা হইলে সে বলে যে, মন্ত্রীদের হত্যার পর জেঃ নাজিবের হাতে শাসনভার অর্পণ করা হইত।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৪) কর্ণেল নাসের প্রেঃ নাজিবকে অপসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কার চাপে তাঁহাকে আবার গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এবার তাঁহার যে পতন হইল, তাহা হইতে তাঁহার উত্থানের আর সম্ভাবনা নাই। গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫৪) মিশরে আর একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। এই ষড়যন্ত্র কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র বলিয়া কথিত।

মিশরে বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দলের কোন বালাই রাখা হয় নাই। মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘকেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। সৈন্যদের মধ্যে অনেক কম্যুনিষ্ট, ওয়াফদী এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য আছে বলিয়া কথিত। ওয়াফদী ও কম্যুনিষ্টদিগকে পূর্ব্বেই অপসারিত করা হইয়াছে। ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে-সকল সদস্য সৈন্য বিভাগে আছে, তাহাদিগকে সম্প্রতি অপসারিত করা হইয়াছে। মিশরে কর্ণেল নাসেরের সামরিক শাসন যে এখন নিরঙ্কুশ হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিশরের জনগণের মূল সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা নাই।

পরলোকে মঃ ভিসিনস্কী—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে রুশ প্রতিনিধি দলের নেতা মঃ আন্দ্রেই ইয়ানুয়ারিয়েভিচ ভিসিনস্কী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২২শে নবেম্বর নিউইয়র্কে মারা গিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট নেতাদের সমস্ত কাজকেই যাঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের (কম্যুনিষ্ট নেতাদের) মৃত্যুর মধ্যেও একটা না একটা মতলবের সন্ধান করিবেন। ভিয়েনা কংগ্রেসের সময় জনৈক বিশিষ্ট রুশ রাষ্ট্রদূতের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাউণ্ট মেটারনিক বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "What was his real intention ?" অর্থাৎ হঠাৎ মরিয়া যাওয়ার মূলে তাঁহার আসল মতলবটা কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাশিয়া কম্যুনিষ্ট হওয়ার বহু আগেও ১৮১৫ সালেও রুশ কূটনীতিবিদদের সমস্ত কার্য্যকলাপই সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত।

মঃ ভিসিনস্কীর আকস্মিক মৃত্যুর মূলে কোন মতলবের সন্ধান কেহ করিয়াছেন কিনা, জানা যায় না। কিন্তু তিনি যে একজন বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ এবং ভাল 'ডিবেটার' ছিলেন, একথা অনস্বীকার্য্য। রাশিয়ার রাজনীতিতেও তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০৫ সালে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি মলটভের স্থলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাশিয়া একজন বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ হারাইল।

বর্ত্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে ফতেপুর সিক্রির তোরণ-গাত্রের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। চিত্রটি

[illegible]

তিন রাজপুত্রের গল্প

(স্পেন দেশের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

এক রাজা আর তার তিন ছেলে। রাজার অনেক বয়স হয়েছে—তাকে দেখে মনে হয় বেশি দিন আর পরমায়ু নেই। কিন্তু মরবার আর কার সাধ হয়? তাই রাজার ইচ্ছে আরও অনেক কাল বেঁচে থাকেন। কিন্তু মনের সঙ্গে শরীর পাল্লা দিতে পারবে কেন?

একদিন রাজা অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। ডাক্তার-বদ্যি-হকিমে রাজপ্রাসাদ ভর্তি হয়ে গেল। কতো রকমের ওষুধই রাজাকে খাওয়ানো হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। রাজার শরীর ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে এলো। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিলেন।

রাজবাড়ীর সবাইর মন খারাপ—বিশেষ করে রাজকুমারদের। একদিন তিন ভাই রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় তাদের সঙ্গে খুব বুড়ো গোছের এক ভদ্রলোকের দেখা। তিনি নিজেই এগিয়ে এসে তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। কথায় কথায় রাজার অসুখের খবর জানতে পেরে তিনি কুমারদের বললেন যে, তারা যদি মন্ত্রপূত সঞ্জীবনী জল এনে রাজাকে খাইয়ে দিতে পারে তবেই রাজার অসুখ সেরে যাবে—নইলে আর কিছুতে নয়।

বুড়োর কথা শুনে কুমারদের কুতূহল হল। তারা সেই মন্ত্রপূত জল কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চাইলে বুড়ো তাদের বললেন—'সে দেশ ত কাছে নয় বাছা; অনেক দূরে—এখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেলে অনেক রাজ্য পেরিয়ে তবে সে দেশে পৌছুতে পারবে। কিন্তু পথে অ—নেক বিপদ—এমন কি, সন্ধান করতে গিয়ে প্রাণও যেতে পারে।'

বুড়োর কথা শুনে রাজপুত্রেরা একসঙ্গে বলে উঠলো—সে জল তারা যেমন করে হোক্ আনবেই—তাতে প্রাণ যায় যাক্।

পরদিন সকাল বেলা বড় রাজকুমার ঘোড়াশাল থেকে সব চেয়ে বড় ঘোড়াটি বেছে নিয়ে তার পিঠে চেপে বসলেন। পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে সমানে এগিয়ে চলেচেন—মুহূর্তের জন্যেও চলার বিরাম নেই। তিন দিন তিন রাত্তির ক্রমাগত চলার পর তিনি পাহাড়-ঘেরা একটা সুন্দর উপত্যকায় এসে পৌছুলেন। সুন্দর সুন্দর ফল আর ফুলের রকমারী গাছ। চার দিকে যেন সবুজ ঘাসের মখমল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সামনেই ছোট একটা খাল। রাজপুত্র চার দিক তাকিয়ে খাল পার হতে যাবেন, এমন সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো শাদা চুল-দাড়ী-ওয়ালা, লম্বা সবুজ রঙের টুপী মাথায়, টুকটুকে লাল পোষাক-পরা দেড়-হাত লম্বা এক বামন। রাজপুত্রকে ডেকে বামন জিজ্ঞেস করলো—'ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে জানতে পারি কি?' রাজপুত্র মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকালেন। তার পর কোন কথার জবাব না দিয়ে যেই তিনি এগিয়ে যেতে চাইলেন তক্ষুণি দেখতে পেলেন, বামন মন্ত্র বলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে—আর সঙ্গে সঙ্গে দূরের পাহাড়গুলো যেন চারধার থেকে এসে তাকে চেপে ধরছে। এগিয়ে যাবার আর কোন উপায় নেই। রাজপুত্র সেই পাহাড়-দুর্গে বন্দী হলেন।

এদিকে বড় রাজপুত্র ফিরে আসচেন না দেখে মেজো রাজকুমার একদিন মন্ত্রপূত জলের সন্ধানে রওনা হলেন। পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে তিনিও এলেন সেই পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায়। তাঁর সঙ্গেও দেখা হলো সেই বামনের। বামন তাঁকেও গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনিও বামনের কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে করলেন না। বামনকে ধমক দিয়ে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াতে বলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর দাদার মতোই পাহাড়-দুর্গে বন্দী হয়ে রইলেন।

অনেক দিন হয়ে গেল। দাদারা কেউ ফিরে এলেন না। অথচ রাজার অবস্থাও দিন দিন খারাপ হয়ে চলেছে। এ অবস্থায় ছোট রাজকুমার আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। একদিন সবাইর অনুমতি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তিনিও বেরিয়ে পড়লেন সঞ্জীবনী জলের সন্ধানে। একই পশ্চিমমুখো পথ। অনেকখানি যাবার পর তিনিও পাহাড়ের কোলে সেই উপত্যকায় হাজির হলেন। খালের ধারে ঝোপের পাশে তাঁর সঙ্গেও দেখা হলো বামনের। বামন তাঁর কাছেও গন্তব্যস্থানের কথা জানতে চাইলো। রাজকুমার তার কথা শুনে ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। তার পর মিষ্টি হেসে তাকে বললেন, 'আমার বাবার খুব অসুখ—ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে রোগমুক্ত করতে পাচ্ছেন না। একজনের কাছে শুনেছি যদি সঞ্জীবনী জল এনে তাঁকে পান করানো যায়, তাহলে তিনি নিরাময় হবেন। তাই সে জলের সন্ধানে চলেছি। কিন্তু কোথায় সে জল পাওয়া যাবে জানি না। আপনি যদি দয়া করে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারেন তাহলে বড়ই কৃতজ্ঞ হই।'

রাজকুমারের কথায় বামন খুব খুসী হলো। বললে—'সঞ্জীবনী জল? তার আর ভাবনা কী? বড় ভালো ছেলে তুমি। তুমি নিশ্চয়ই সন্ধান পাবে। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই কালো পাথরে তৈরী একটা মস্ত প্রাসাদ দেখতে পাবে। তার সদর দরজা খোলাই আছে। এই ধর, তোমাকে এই কাঠিটা আর দু' টুকরো রুটি দিচ্ছি। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা উত্তর দিকে গেলে প্রাসাদের দরজায় পৌছুবে। সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু তোমার যে কাঠিটা দিলুম, আস্তে আস্তে ঘা দিলেই দরজা খুলে যাবে। দরজার পড়েই সিঁড়ি। সিঁড়ির দু' পাশে দুটো প্রকাণ্ড সিংহ পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। যে দু'টুকরো রুটি দিলুম তাই ওদের খেতে দিয়ো। তাহলে তোমায় কিছু করবে না। নির্ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাবে। সেখানে গেলেই মন্ত্রপূত জলের সন্ধান পাবে। কিন্তু সাবধান দেরী করো না। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বাজবার আগেই বেরিয়ে আসতে হবে তোমায়—নইলে জন্মের মত বন্দী হয়ে থাকতে হবে।'

রাজকুমার বামনকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। ঘণ্টা দুয়েক পরেই তার চোখের সামনে ভেসে

উঠলো—কালো পাথরে তৈরী মস্ত এক প্রাসাদ। আনন্দে আর আশায় কেঁপে উঠলো তাঁর বুক। প্রাসাদের বাইরে ঘোড়াটাকে একটা গাছের তলায় বেঁধে কাঠি আর রুটি হাতে এগিয়ে গেলেন রাজকুমার। ফটক খোলাই ছিল। একটু এগিয়ে যেতেই সামনে দেখতে পেলেন প্রাসাদে ঢুকবার দরজা। কাঠি দিয়ে আস্তে ঘা দিতেই বন্ধ দরজা খুলে গেল। সামনে চওড়া সিঁড়ি। কিন্তু দু'পাশে দুটো প্রকাণ্ড সিংহ। তাড়াতাড়ি রুটির টুকরো দুটো তাদের সামনে ফেলে দিয়ে রাজপুত্র নির্ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে গেলেন।

সামনেই প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘর। তার মাঝখানে সোনার পালঙ্কে বসে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক রাজকন্যা! রাজকন্যা তাঁকে দেখেই এগিয়ে এলেন। বললেন—'তুমি এসেছো। এবার তা হ'লে আমি মুক্তি পাবো।' যেন কত কালের চেনা। রাজকন্যা বললেন, 'জানো, এক দুষ্ট যাদুকর আমাকে এখানে বন্দী করে রেখে দিয়েছে। তবে রাজপুত্র যেদিন আমায় নিতে আসবেন সেদিনই তার যাদুর প্রভাব কেটে যাবে। কত দিন কেটে গেল—কতো আশায় আমি দিন গুণচি—কিন্তু কই রাজপুত্র? কেউ ত এলো না। আজ ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন—তুমি এসেছো। তাই মনে হচ্ছে এবার আমি মুক্তি পাবো।'

রাজপুত্র বললেন—'তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে তিনি খুসীই হবেন। তবে আপাততঃ তিনি সঞ্জীবনী জলের সন্ধানে এসেচেন। সন্ধান পেলেই জল নিয়ে তিনি এখুনি রাজ্যে ফিরে যাবেন। আর দেরী করা চলবে না। তার বাবা সেরে উঠলেই তিনি ফিরে এসে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন।

রাজকন্যা আর কি করেন? তিনি তাঁকে জলের উৎস দেখিয়ে দিলেন। রাজপুত্র বোতল-ভর্ত্তি জল নিয়ে রাজকন্যার কাছে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেয় নিয়ে যে পথে এসেছিলেন সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

তার পর ঘোড়ার পিঠে চড়তে আর কতক্ষণ! জোর কদমে এগিয়ে রাজপুত্র কিছুক্ষণের মধ্যে সেই উপত্যকায় হাজির হলেন। হাসিমুখে বামন তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো, তাঁর বীরত্বের সুখ্যাতি করলো। রাজপুত্রও তাকে ধন্যবাদ জানালেন। তার সাহায্য না পেলে ত জলের সন্ধান তিনি পেতেন না! কথায় কথায় রাজপুত্র জানতে পারলেন যে, বামনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অপরাধে তার দাদারা পাহাড়ে বন্দী হয়ে রয়েছেন। অনেক করে অনুরোধ করার পর বামন তাদের মুক্ত করে দিলো। তিন ভাই এক সঙ্গে রাজধানীর পথে ফিরে চললেন।

দাদারা বয়সে বড় হলে কী হবে? আসলে তারা ভয়ানক হিংসুটে। ছোট ভাই-এর সাফল্যে তাদের ভারী হিংসে হলো। রাজধানীতে পৌছুবার আগেই তারা চালাকি করে ছোট ভাই-এর বোতলের সবটুকু জল নিজেদের বোতলে ঢেলে নিয়ে তাতে একটা সাধারণ কূয়োর জল ভর্ত্তি করে রাখলো। ছোট ভাই এর কিছুই জানতে পারে নি।

রাজধানীতে পৌছেই ছোট রাজকুমার সবার আগে ছুটে গেল রাজার ঘরে। বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢেলে তা রাজাকে পান করতে দিল। রাজা ত অনেকখানি আশা নিয়ে জল খেলেন। কিন্তু কই, কিছুই ত হলো না। বরং আগের চেয়েও খারাপ বোধ হতে লাগলো তাঁর। ব্যাপার দেখে ছোটর ওপর সবাই খুব খাপ্পা হয়ে উঠলো। এমন সময় বড় দু'ভাই তাদের বোতল থেকে জল ঢেলে রাজাকে খেতে দিল। কী আশ্চর্য্য! এদের দেওয়া জল পান করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন যাদুবলে রাজার অসুখ সেরে গেল। সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। সবাইর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বড় দু' ভাইকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। ব্যাপার দেখে ছোট রাজকুমারের ত চক্ষুস্থির! কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। কে বিশ্বাস করবে তার কথা? মনের দুঃখে সে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে এলো।

এদিকে তিন ভাই যখন একসঙ্গে বাড়ী ফিরে আসছিল তখন ছোট ভাই তার দাদাদের কাছে তার অভিজ্ঞতার সব কথাই খুলে বলেছিল—প্রাসাদের বন্দিনী রাজকন্যার কথাও বাদ দেয়নি। এবার বড় দু'ভাই রাজকন্যাকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

এদিকে রাজকন্যা দিন গুণচেন কবে রাজপুত্র আসবে। তাকে উপযুক্ত ভাবে অভ্যর্থনা করার জন্য সব রকম আয়োজন করলেন তিনি। প্রাসাদের সামনের রাস্তা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হলো। প্রাসাদবাসীদের ডেকে হুকুম দিলেন, যে রাজপুত্র সোনা-মোড়ানো এই রাস্তা দিয়ে সোজা ঘোড়ায় চেপে আসবেন তাকেই যেন প্রাসাদদ্বার খুলে দেওয়া হয়। দিন যায়। সপ্তাহ যায়। মাস যায়। কিন্তু কোথায় রাজপুত্র? একদিন প্রাসাদের অদূরে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসতে দেখা গেলো এক রাজপুত্রকে। প্রাসাদ-রক্ষীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ঘোড়সওয়ার রাজপুত্রই বটে, কিন্তু কই ইনি ত সোনামোড়ানো রাস্তা দিয়ে এলেন না! সোনার রাস্তাকে এক পাশে রেখে তার ধার ঘেঁষে এগিয়ে এলেন তিনি। রাজকন্যার হুকুম তামিল করা হলো। প্রাসাদদ্বার খুলে দেওয়া হলো না। আগন্তুক ফিরে গেলেন।

দু'দিন পর আর একজন রাজপুত্র এলেন। কিন্তু কই, ইনিও ত সোজাসুজি সোনা-মোড়ানো রাস্তায় উঠলেন না? কাজেই এঁর জন্যেও প্রাসাদদ্বার খোলা হলো না। পরদিন আরও একজন অশ্বারোহী এলেন। কী প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া চালিয়ে আসচেন, ঝড়ের মত বেগ—কোন দিকে হুঁস নেই। হাওয়ার বেগে তাঁর মাথার চুল অবিন্যস্ত—ক্লান্ত দেহ ঘোড়ার গায়ে ঘাম দেখা দিয়েচে—তবু গতির বেগ বেড়েই চলেছে। সোনাবাঁধানো রাস্তা দেখেও থামলেন না এক মুহূর্ত্ত—সোজা তার বুকের ওপর ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে এলেন একেবারে প্রাসাদের দরজায়!

মুহূর্ত্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রাজকন্যা। তাঁর দীর্ঘকালের প্রতীক্ষা সার্থক হয়েচে—রাজপুত্র ফিরে এসেচেন। পরদিন রাজকন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র রাজধানীতে রওনা হলেন। এবার রাজার কাছে তার সব কথা একে একে খুলে বললেন। রাজা সব শুনে গভীর স্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার পর যথাসময়ে তিনি রাজকন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন। সারা রাজ্য জুড়ে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। সবাই আনন্দে মেতে উঠলো। এই উৎসব-মুখর রাজধানীতে কেবল দুটি প্রাণীকে দেখা গেল না। বড় আর মেজো রাজকুমার। উৎসবের রাত্রিতে সবার অলক্ষ্যে তারা যে রাজপ্রাসাদ থেকে বার হয়ে গেলেন, আর ফিরে এলেন না।

বাজী মাৎ

সুকৃতি বক্সী

সকলেই একবার দিনটাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করল—না। আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়, পয়লা জুন! তবে এ-কাণ্ডের অর্থ? সকলে তো বেবাক অবাক। রাগও কম হয়নি। সত্যি কি বিচিত্র যাদু ও যাদুকরের দেশ এই ভারতবর্ষ!

তাহলে সুরু থেকেই শোনানো যাক—

মাত্র দিন পনের আগে, আজব সহর কলকাতাকে তাজ্জব বানিয়ে দেবার জন্য তিব্বত থেকে এক অদ্ভুত যাদুকর আসছেন—এই বার্তা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে খেলা কেউ কোন দিন দেখেনি, যা কেউ কল্পনাই করতে পারে না, যা অন্য কোন যাদুকর কোন দিন পারেননি, পারেন না, পারবেনও না—এমনি এক অত্যাশ্চর্য খেলা দেখাবেন তিনি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুকররা তাঁর কাছে ছাতু! বিশ্বের সেরা যাদুকর পি, সি, সরকার ষ্টেজ থেকে মাত্র মহিলা সমেত মোটর গাড়ী অদৃশ্য করেন—ফুঃ। এই তিব্বতী যাদুকর যে খেলা দেখাবেন তার কাছে ও খেলা একেবারে ছেলেমানুষ, ফুঃ! তিনি সকল দর্শকদেরই হল থেকে অদৃশ্য করবেন—এই একটি মাত্র খেলা দেখাবেন। কলকাতার প্রত্যেক দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এই রকম সব প্রচার হতে লাগল। খবরের কাগজে এমন প্রচার দেখে কলকাতা সহরের ও বাইরের সব লোক তো ট্যারা। অলিতে-গলিতে, গাড়ীতে-বাড়ীতে সর্বত্র তিব্বতী যাদুকরের আলোচনা। লোকের মনে কৌতূহলের কূল নেই, এ্যাঃ, হল থেকে দর্শক অদৃশ্য-করণ! কিয়া তাজ্জব কি বাত্!

যাদুখেলা দেখানো হবে পয়লা জুন, সহরের এক সেরা হলে। টিকিটের মূল্য ভারি চড়া—একশ' টাকা, পঞ্চাশ টাকা, পঁচিশ টাকা। ব্যাস্, তার নিচে নেই। তাতেই 'শো' এর সাত দিন আগে সব টিকিট শেষ। অজস্র লোক উদ্যোক্তাদের অনুরোধ জানালো আরও কয়েক দিন কয়েকটা 'শো' এর ব্যবস্থা করবার জন্য। কিন্তু তারা জানালেন উপায় নেই। তিব্বতী যাদুকর ঐ দিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আসবেন। একটি 'শো' শেষ করে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটবেন। দাঁড়াবার সময় তাঁর নেই—সারা পৃথিবীব্যাপী তাঁর 'কল'। সুতরাং বিপুল লোককে বিফল হতে হোলো।

আজই পয়লা জুন। আজই তিব্বতী যাদুকর কল্পনাতীত অত্যাশ্চর্য তাঁর খেলাটি দেখাবেন। হলে তিল ধারণের স্থান নেই। বাইরে হলের সামনে মাইক-এর এ্যাম্প্লিফায়ার দেওয়া হয়েছে। সহস্র দর্শক কান খাড়া করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এদেশে যখন টিলিভিসন নেই তখন কান দিয়ে ম্যাজিক দেখা ছাড়া আর কি গতি আছে, আছে গোলাম হোসেন?

যথাসময়ে সুরুর ঘণ্টা পড়ল। সরে গেল কালো পর্দা। ষ্টেজের মধ্যে নীল আলো। তার মধ্যে আবছা আলোয় যাদুকর এগিয়ে এলেন। দর্শকদের লক্ষ্য করে মাইকে মুখ রেখে বললেন, এক্ষুণি আমাদের খেলা সুরু হবে। তার আগে ক'টা কথা বলা দরকার। প্রথমেই বলে নিই, আপনারা ভয় পাবেন না, চেঁচামেচি করবেন না। আপনাদের অদৃশ্য করা হলেও আপনাদের আহত করা বা একেবারে পটল তোলানো হবে না। খেলাটি একটু সময় নেবে। আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আবারও বলি, ভয় পাবেন না কেউ। এক্ষুণি আমাদের খেলা হবে সুরু। নমস্কার। পরক্ষণেই পর্দা পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর পর্দা আবার উঠলো। লাল আলোয় দেখা গেল, তিব্বতী যাদুকর স-সজ্জায় বসে আছেন। সামনে ধূমায়িত ধুনচি, দু'পাশে দুটো মড়ার খুলি। আর একটা পাত্রে কিছুটা জল। যাদুকর মন্ত্র পড়ে চললেন। আর মাঝে মাঝে সামনে সেই মন্ত্রপূত জলের ছিটে দিতে লাগলেন।

দম বন্ধ করে দর্শকরা বসে রয়েছেন নট নড়ন-চড়ন। সকলের ভয় হচ্ছে, এই বুঝি উধাও হন তাঁরা! অন্ধকারে নিজেদের দেখবার উপায় নেই, বোঝবার উপায় নেই। অনেকের এমনও সন্দেহ হোল—হয়ত আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি নিজে বুঝতে পারছি না। সন্দেহ বশে কেউ হয়তো পাশের লোকটাকে জড়িয়ে ধরছে, পরক্ষণেই লজ্জায় লাল হচ্ছে। অনেকে আবার ভয়ে ভয়ে পাশের লোকের গায়ে গায়ে এঁটে বসেছে। সমস্ত লোক ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে অস্থির আবেগে হয়ে উঠছে চঞ্চল।

এমনি ভাবে ঘণ্টা দু'য়েক কেটে গেল। যাদুকর একই ভাবে মন্তর পড়ে চলেছে। দর্শকরা বার বার অধৈর্য্য হয়ে পড়ছে আবার সামলে নিচ্ছে। এমনি ভাবে আরও সময় কাটল। কিন্তু আর সয় না। দু'-একজন দর্শক চেঁচামেচি সুরু করে দিল। তবুও যাদুকর নিরুত্তর। সে সমানে মন্তর পড়ে চলেছে। দর্শকদের মধ্যে একজন লামা ছিলেন। সকলে তাঁকে পাঠালেন—শুনে আসুন তো মশাই কি বিড়-বিড় করছে, আপনারই তো ভাষা।

লামাটি ফিরে এসে যা জানালেন, তাতে দর্শকদের ধৈর্য্যের বাঁধ আর সইল না—যাদুকরের মন্ত্রের এক অক্ষরও নাকি তিব্বতী নয়, আজে-বাজে যা ইচ্ছে তাই বকছে। তেড়ে তাঁরা উঠে গেলেন ষ্টেজে। জানতে চ'াইলেন—ব্যাপার কি বল? ভয়ে ভড়কে গেল সেই লামাবেশী যাদুকর। মারের ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, আমি কিছুই জানি না। রাস্তায় ভিক্ষে করছিলাম, ওরা পাঁচটা টাকা দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসে এই পোষাক পরিয়ে এই সব করতে বললে। সত্যি ভগবানের দিব্যি বলছি বাবুরা, আমি কিছুই জানি না। আপনারা অনেকেই অফিসের পথে রোজ আমাকে ভিক্ষে করতে দেখেছেন।

সকলে দেখল তাই বটে। পেন্ট আর পোষাকে বেমালুম চেহারা পাল্টে গেছে। অতঃপর সকলে উদ্যোক্তাদের আর তিব্বতী যাদুকর বলে পরিচিত ব্যক্তিটিকে খুঁজতে লাগল। সকলে রাগে আক্রোশে একেবারে নেকড়ে বাঘ হয়ে রয়েছে। একবার ঐ ব্যাটাদের পেলে হয়, সকলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে ওদের। কিন্তু কোথায় তারা! হলের বা ষ্টেজের কোথাও তারা নেই। দর্শক অদৃশ্য করবার নামে নিজেরাই অদৃশ্য হোল যে! আজ তো পয়লা এপ্রিল নয় যে 'এপ্রিল ফুল' করবে। আজ যে পয়লা জুন! সকলের মনে খুন চেপে গেল। ওদের জন্যে হন্যে হোয়ে সকলে সরোষে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। একবার ওদের টিকিটি দেখতে পেলে হয়!

এদিকে হয়েছে কি—উদ্যোক্তারা তো সহজেই উধাও। কিন্তু তিব্বতী যাদুকর বলে পরিচিত লোকটি তো সহজে পালাতে পারে না! তাই সকলের চোখে ধূলো দিয়ে বেরুতে বেশ দেরী হয়েছিলো। বেরিয়ে এরা সকলে একসাথে এক মোটর গাড়ীতে লম্বা ছুট মারছিল। দূর থেকে ফেলে-আসা হলের প্রতি তাকিয়ে দেখল, ভয়াবহ দৃশ্য! বুঝতে পারল—সকল দর্শক ব্যাপারটা জানতে পেরে রাগে ভীম বেগে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এরা তো দুর্ভাবনায় ভেঙ্গে পড়ল—ঐ উত্তেজিত জনতা যদি কোন রকমে এই গাড়ীর খবর জানতে পারে বা এক্ষুণি পুলিশে খবর দেয় তবে তো হাওড়া ষ্টেশনে পৌছবার আগে হাজতে পৌছুতে হবে। এখন তবে কি হবে! এতদূর এগিয়ে ভরাডুবি হবে? শেষে কি ধনে মারতে এসে প্রাণে মারা যাবে? ভয়ে একেবারে চুপ্‌সে গেল এরা!

এমন সময় তিব্বতী যাদুকর কি ভেবে গাড়ী-চালককে বলল, গাড়ী হলে ফিরাও।

আর সকলে আঁত্‌কে উঠলো—সে কি! মেরে যে একেবারে তুবড়ে দেবে! ছাতু করে দেবে! তোমার মাথা খারাপ হোল না কি?

যাদুকর শান্ত কণ্ঠে বললে, দেখই না, কি করি। একেবারে বাজী মাৎ।

তবুও কারও ভয় গেল না—বাজী মাৎ না একেবারে কুপোকাৎ!

হলের সামনে অগুণতি মারমুখো দর্শক। যাদুকরেরা রাস্তা ঘুরে হলের পেছন দিক দিয়ে লুকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। ভয়ে সকলে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে। যাদুকরের প্রাণে এতটুকু ভয় নেই। সে সদর্পে মাইক-এর কাছে এসে ঘোষণা করলে,—"হে দর্শক ভদ্রমহোদয়গণ, সাফল্যের সহিত এইখানেই আমার খেলা শেষ হইল—হল হইতে সকল দর্শকই এখন অদৃশ্য। ম্যাজিক ইস্‌ নাথিং বাট ট্রিক্‌স্। আচ্ছা নমস্কার!"

বাইরে উত্তেজিত দর্শকবৃন্দ যেন অদৃশ্য হাতে কানমোলা খেয়ে বোবা হোয়ে গেল। যারা এতক্ষণ রাগে টগবগ করে ফুটছিলো, এখন তারা বোকা বনে 'থ' হয়ে গেল। এমনি অদ্ভুত ভাবে বাজী মাৎ করে যাদুকর বীরদর্পে বেবাকবোকা দর্শকদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবোল্‌-তাবোল্‌

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ইটিং তরে
মিটিং করে
চিটিংবাজের দল,
চিপ্‌টে ডিম
কিপ্‌টে ভীম
লিপ্‌টে বানায় কল।

হ্যাংলা যারা
ক্যাংলা তারা,
প্যাংলা যতই হোক্‌:
কুশ্রী হ'লে—
সুশ্রী বলে—
উশ্রী দেশের লোক।
চোরের সাজা
পোরের খাজা,
ভোরের-আইন্‌ বলে;
অল্প শোকের
কল্প লোকের
গল্প মজায় চলে।

মানব কাজ
দানব-রাজ
আণব বোমা ভাঙ্গে;
কংস মামা
অংস নামা
হংস ছাড়ে গাঙে।
ইঁদুর দেখে
সিঁদুর মেখে
বিদুর রাজা ভয়ে:
পাত্‌লো জাল,
গাঁথলো ঢাল,
মাত্‌লো দেশ জয়ে।

ব্যাপার বুঝে
ব্যাপার গুঁজে—
খ্যাপার মত তাই:
বানিয়ে ছড়া,
মানিয়ে ত্বরা,
জানিয়ে দিনু ভাই।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালী

বাঙালী ব্যবসা করতে জানে না, এ কথা ঠিক নয়। ইতিহাস সে কথা বলবে না, বলবে না গত তিন-চারশো বছরের খতিয়ান। চন্দ্র সওদাগর কি শ্রীমন্ত সওদাগরের কথা না হয় বাদই দিলাম, লাগে টাকা দেবেন গৌরী সেন। তিনিও না হয় রইলেন আদি সপ্তগ্রামের ভাঙ্গা ইট, কাঠ, পাথরের মাঝে সমাধিস্থ হয়ে কিন্তু কোম্পানীর আমলের বাঙলা দেশ থেকে শুরু করে আজ অবধি যে সমস্ত বাঙালী-পরিবার ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড় হয়েছেন তাঁদের কথাও কি বলবো না? বলবো, দফায় দফায় বলবো। মা লক্ষ্মীর পূজারী বাঙালী ব্যবসাদারদের কথা বলবো না তো কাদের কথা বলবো?

শীতের প্রসাধন ক্রীম, গ্লিসারিন দেশী

একটু সকাল সকালই শীত এসে গেল এবার। গরম স্যুট, চাদর, শাল-আলোয়ান, লেপ বেরিয়ে পড়েছে প্রায় প্রতি গৃহস্থ-পরিবারেই। আমাদের বাঙলা দেশে গ্রীষ্মে কোনও প্রসাধনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে না। গরমে শরীর থেকে যে পরিমাণ ঘাম বেরোয়, তাতেই শরীরের রোমকূপের মধ্যস্থিত সমস্ত ময়লা বেরিয়ে আসে। পরে সাবান মেখে স্নান করে ফেললেই যথেষ্ট তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু শীতকালে স্বাস্থ্যের খাতিরেই এদেশে প্রসাধনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তৈলাক্ত কোন কিছু স্নানের আগে ও পরে মাখা বিশেষ দরকার। অনেকেই এ সময়ে স্নানের আগে গায়ে সরিষার তেল মাখা অভ্যাস করে থাকেন। স্নানের পরে গ্লিসারিন বা ক্রীম আলতো করে। প্রথম শীতে মুখের কর্কশ ভাব, ঠোঁট-ফাটা দূর করবার জন্য অনেককে নাভিতে সরিষার তেল লাগাতে দেখেছি, দেখেছি মুসুরীর ডাল-বাটা কি দুধের সর ইত্যাদি লাগিয়ে বসে থাকতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু ত্বকের কমনীয়তা ফিরিয়ে আনতে আজকের এই স্কাই ক্র্যাপার, ফ্লাইং সসার, হাইড্রোজেন বোমার যুগে মুসুরীর ডাল কি সরিষার তেল বড্ড বেশী সেকেলে নয় কি? দেশী নানা প্রকার ক্রীম যা দামে কম অথচ কাজে মোটেই অক্ষম নয় তা কিনে আপনি ব্যবহার করতে পারেন নিশ্চিন্ত মনে। এই প্রসঙ্গে আমরা পণ্ডস্, ডিয়ারবর্ণ, হেজলিন, সন্ধ্যা, ওটিন ক্যামিক্যাল ইত্যাদির কথাও আপনাদের মনে করিয়ে দিলাম।

অল্প খরচের ব্যবসায় বেকারী ঘুচবে

চাকরী, চাকরী না করে ব্যবসা-বাণিজ্য করার দিকে নজর দিতে বলায় আমাদের বহু পাঠক-পাঠিকা পত্রযোগে বা কেউ কেউ স্বয়ং এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে নানারূপ আলোচনা করে গেছেন। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই কথা পাঁচশো কি হাজার টাকা মূলধন নিয়ে আজ এই বিশ্বজোড়া মন্দার দিনে কি ব্যবসা করতে পারি বলুন? অনেক ভারী ভারী ব্যবসাদারেই আজ কারবার গুটিয়ে নেবার কথা যখন চিন্তা করছেন তখন নতুন করে?···এ বিষয়ে আমাদের কথা হল যে, ভারী ভারী ব্যবসাদারদের খরচপত্র ভারী ভারী। সে সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নতুন নতুন ব্যবসার কথা চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা একজন পশ্চিমাকে দেখুন। দেশ থেকে যখন এল হাতে একটি লোটা, কাঁধে কম্বল ছাড়া কিছু নেই। এখানেরই কোনও কলকারখানায় বা কারও বাড়ীতে চাকরী নিল। মাইনে ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একটি মহিষ কি গরু কিনেছে সে। দাদন দিচ্ছে টাকা চড়া সুদে। এমন কি কখনো কখনো বাড়ীর মালিককেই টাকা ধার দেয় দরওয়ান। তার পর কি হল তা আর বলবার দরকার নেই। পাঁচশো বা হাজার টাকা কিছু কম নয়। দুধের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। ব্যবসাদার সাধু হলে তো কথাই নেই। তা ছাড়া পল্লী অঞ্চলে জায়গা লিজ নিয়ে তরী তরকারী ধান চাষ, মাছের কারবার ইত্যাদি করা চলে। বাইরে ছোট ছোট শিল্প যেমন গেঞ্জী, মোজার কল (দাম কম), সিল্ক, ছাপা সাড়ী, দড়ি দড়া, চামড়া, মাদুর বোনার কারখানা বিড়ির ফ্যাক্টরী ইত্যাদি কম টাকায় হতে পারে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের এজেন্সী কলকাতা ছাড়া অন্যান্য সহরে বা গ্রামে আপনি নিতে পারেন। কাজ দেখাতে পারলে ক্রমে এ-সবে উন্নতি লাভ করা সহজ। একেবারেই বার্মাশেলের কাছ থেকে তেলের পাম্প চাইতে গেলে অবশ্য টাকার দরকার হবে বেশী। তাই আমাদের মনে হয় কম টাকাতে যে সব এজেন্সী নেওয়া সম্ভব তা

করাই ভাল। তাতে রিস্ক কম। আবার আমরা একই কথা বলছি যাই করুন না কেন, ঘরে বসে থেকে নিজের শক্তি অবহেলায় নষ্ট হয়ে যেতে দেবেন না।

ভি, পি, প্রথায়, পোষ্ট অফিসের সুবিধা কত

ভ্যালুপেয়েবল বাই পোষ্ট অর্থাৎ সংক্ষেপে যা হল ভি, পি, পি, তার অর্থ, কায়দা-কানুন, মাশুলের হার ইত্যাদি জানা নেই অনেকেরই। অনেকে শুধু জানেন ভি, পি বলে পোষ্ট অফিসে একটা বস্তু আছে শুধুমাত্র মাসিক, সাপ্তাহিক কি দৈনিক পত্র-পত্রিকাদি (এখানেই এ কথাটির প্রচার হয় বেশী) ডাকযোগে পাঠাবার জন্য। না, না, আরও একটা জিনিষ দেখে আপনি ভি, পির কথা জানতে পারবেন। সেটি হল পঞ্জিকা। পি, এম বাগচী, গুপ্তপ্রেস কি সে যে কোন পঞ্জিকাই হোক, লাহোর, অমৃতসর, জলন্ধর, বোম্বাই, পুণা, পুরানো দিল্লীর (অর্থাৎ বেঘাতে যেতে আসতেই যাট-সত্তর টাকা বেরিয়ে যাবে) কোনও প্রতিষ্ঠানের বশীকরণ কবচ, (সিঙ্গিল, ডবল্‌ কি ট্রিবল্‌ ক্ষমতাসম্পন্ন, দামও হরেক রকম হবে) মাতুলী, গ্রহশান্তির আংটি, ম্যাজিক কিংবা কোনও ওষুধ (প্রায়ই স্বপ্নে পাওয়া), পাঁচ টাকায় ক্যামেরা (তিনটি একসঙ্গে অর্ডার দিলে এক শিশি মাথার তেল ফ্রি), আরও কত কি! সে সব তো আছেই, থাকবেও হয়ত। কিন্তু আমরা দোষ দেব পোষ্টাফিসের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের। অন্যান্য দেশে পোষ্টাফিসই ব্যবসা পরিচালনা করেন ধরতে গেলে। ধরুন ৺তারকেশ্বর ষ্টেশনে নেমে ছোট রেলে (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে) করে কোনও ষ্টেশনে নেমে তিন মাইল পথ হাঁটলে তবে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী। কলকাতার ধর্মতলা ষ্ট্রীটের কোনও পোষাকের দোকান থেকে তিনি কিনবেন একখানি গরম গায়ের চাদর। দাম হবে ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে। কিন্তু এই ত্রিশ টাকা দামের চাদর কিনতে আসতে তাঁকে কত রেলভাড়া, বাসভাড়া, পথখরচা করতে হবে হিসাব করুন। কিন্তু ভি পিতে ডাকে নিলে ঘরে বসে (কলকাতায় আজ-কাল যা এ্যাকসিডেণ্ট হচ্ছে!) তিনি তা পেতেন। খরচও কম হত। খুব হিসেবী লোক বলতে পারেন, পাঁচটা দ্রব্য দেখে তো নেওয়া যেত না তাতে। আমরা বলব, কেন নয়? আগে চিঠি লিখলে 'স্যাম্পেল' পাঠাবার বন্দোবস্ত যদি রাখেন দোকানের মালিকরা তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়। পোষ্টাফিসের আয়বৃদ্ধি কত হবে তা কর্তাব্যক্তিগণ চিন্তা করুন। অবিলম্বে এ বিষয়টির জন্য সরকারের একটি প্রচার বিভাগ খোলা দরকার। পোষ্টাফিসে কত সুবিধা আছে জনসাধারণকে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করাবার দায়িত্ব কার? ডিরেক্ট মেল, সার্কুলার ইত্যাদি প্রথা এদেশের ব্যবসায়িগণ এখুনি গ্রহণ করুন।

আমাদের অতি পরিচিত কয়েকটি ফেস্‌ ক্রীম

অতি পরিচিত কয়েকটি ফেস্‌ ক্রীমের আধারের প্রতিলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। যথা পণ্ড্‌স্‌ (মূল্য ১।॰ ও ।৶॰), ওটিন (১।৵॰), ডিয়ারবর্ণ (২৸॰), ডায়ানা (১৵॰, ৸৵, ।৵॰), বেঙ্গল কেমিকাল (১।॰), হেজলিন (১৸॰), হিমানী (১৴॰), সন্ধ্যা (।৶॰ ও ১৲)। বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতাদের সুবিধার জন্য ক্রীমের মূল্যের এই তারতম্য সত্যিই প্রশংসনীয়।

কুটির-শিল্প—কি কি তৈরী হয়? অনেকেই জানেন না।

কুটির-শিল্প বলতে কি বোঝায়, কি কি জিনিষ ঠিক কুটির-শিল্পের সাহায্যে তৈরী হয় তা হয়ত আজও জানে না অনেকেই। কুটির-শিল্পের তৈরী জিনিষের মধ্যে এমন অনেক জিনিষের নাম অনেকে করে বসতে পারেন যা কলেই তৈরী হয় এখন। এ সম্পর্কে দোষটা অবশ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার নয়, যতখানি তার চেয়েও সহস্র গুণে বেশী সরকারের প্রচার দপ্তরের। শুধু মাত্র কুটির-শিল্পের প্রচারের জন্যই সরকার একটি সংস্থা রেখেছেন। কিন্তু কি কাজ তাঁদের? জনসাধারণকে কুটির-শিল্প সম্বন্ধে পরিচিত করানো নিশ্চয়ই। কিন্তু কাজে কতটুকু হয় আপনারাই বিবেচনা করুন। কুটির-শিল্প বিশেষ করে বাঙলায় আজও যা মরি মরি করে টিকে রয়েছে তাও প্রায় শতাধিক হবে। মাটির তৈরী গেলাস, বাসনপত্র, খেলনা, নানাপ্রকার মূর্ত্তি (আজকাল অনেক জায়গায় ছাঁচে ঢালা হচ্ছে), মাদুর, দড়ি, বেতের চেয়ার, মোড়া ইত্যাদি, শোলার সাজ, গামছা বা সুতী অন্যান্য দ্রব্য, কাঁসা বা পিতলের কাজ কিছু কিছু, ধামা, কুলো, চুবড়ী, শণের দ্রব্য, নারিকেলের ছোবড়ার তৈরী জিনিষপত্র ইত্যাদি কত নাম করব! সরকারের প্রচার-দপ্তর থেকে এই সব কুটির-শিল্পগুলিকে রক্ষা করবার জন্য কি বন্দোবস্ত করা হচ্ছে জানতে পারলে আমরা খুসী হতাম। লোককে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যাদির গুণাগুণ বোঝাবার বন্দোবস্ত? না সবই শুধু 'শো'?

স্রেফ দেশী পুতুলের দোকান চাই চৌরঙ্গী অঞ্চলে

পুতুল। পুতুল শুধু আপনার বাড়ীর বাচ্চাদেরই প্রিয়, একথা ভাববেন না। তেমন তেমন পুতুল হলে তা প্রিয় হয়ে উঠতে পারে আপনার আমার সকলেরই। পুতুল সংগ্রহ করা ও আলমারী ভরে সাজিয়ে রাখার অভ্যাস এ্যালবাম ভরে ছবি কি ডাকটিকিট রাখার চেয়ে কোন মতেই কম নয় অন্যান্য দেশে। বিদেশের কথায় কাজ কি, এ দেশেও বিয়ের কনেকে বাপের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যাবার কালে পুতুলের বাক্স কোলে করে (বিয়েটিকে মোটেই গৌরীদান ভাববেন না। কনের বয়স ষোলো, সতেরো কি আঠারোও হতে পারে তখন) কাঁদতে কাঁদতে গাড়ীতে উঠতে দেখেছি। আর তাদেরই বা দোষ কি? ও বয়সে অন্যান্য দেশে মেয়েদের 'কিড' বলে। সে যাই হোক, বিদেশীদের কাছে বাংলার পুতুলের কদর আছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে অনেক বিদেশীকে বাংলা পুতুল খুঁজতে দেখেছি (যেমন আমরা জয়পুর কি আগ্রায় গিয়ে পাথরের জিনিষ চাই) সবিশেষ আগ্রহ নিয়ে। অথচ কলকাতার বিশেষত্ব (চৌরঙ্গী অঞ্চলে) দোকানে নেই কৃষ্ণনগর-শান্তিপুরের দেশী পটুয়ার তৈরী কোন জিনিষ। আলুর, মোমের আর প্লাষ্টিকের পুতুলে ছেয়ে গেছে দেশ। তাই আমরা বলছি, কেবল মাত্র চৌরঙ্গী অঞ্চলেই স্রেফ দেশী পুতুলের দোকান চাই একটি। ব্যবসায়িগণ কেউ এগিয়ে আসবেন এদিকে?

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের প্রচার

সরকারী প্রচার-দপ্তরের প্রতি আরও অভিযোগ আছে আমাদের। বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে মোটেই পিছিয়ে নেই কোনও দিনই। সরকারী প্রচার-দপ্তর থেকে সেই শিল্পগুলিকে পশ্চিম বাঙ্গলার বাইরে বিশেষ করে অবাঙ্গালীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলবার কোনও চেষ্টা দেখছি না কেন? কাশ্মীর সরকার যদি দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরে সরকারী সেলস এম্পোরিয়ম খুলতে পারেন তো পশ্চিম বাংলার সরকার কেন তা খুলতে পারবেন না শ্রীনগরে? বাংলার মুর্শিদাবাদের কাঁসা, পিতলের বাসন, সিল্ক, মেদিনীপুরের মাদুর, হুগলীর তাঁতের ধুতি-শাড়ী, কৃষ্ণনগরের পুতুল, মাটির মূর্ত্তি এসব নিয়ে প্রচার-দপ্তর পশ্চিম বাঙ্গলার বাইরের বড় বড় সহরে অনায়াসে দোকান খুলতে পারেন, তাতে সরকারী আয় বাড়বে, দেশের দরিদ্র তাঁতী, পটুয়ার পরনে কাপড়, পেটে ভাত জুটবে এবং আমরাও প্রচার-দপ্তরের মহিমা কীর্ত্তন করতে পিছপাও হব না। তা না করে শুধু কমিশন, কমিটি তৈরী করে, সভা-সমিতি করে, লিটারেচার-প্যাম্পলেট বুকলেট ছেপে, জার্ণাল বার করে আসলে কাজ কিছুই হবে না। চাষী-মজুরের আবেদন-নিবেদন সরকারী দপ্তরে লাল ফিতের ফাইলে বাঁধাই পড়ে থাকবে। সবেধন নীলমণি কলকাতার সেলস্ এম্পোরিয়মটিরও অবস্থা খুব ভাল নয়, একথাও আমরা শুনছি। বিক্রি পত্র নেই। আর এ হলে থাকবেই বা কি করে বলুন?

নিউ মার্কেটের সংস্কার

আমাদের আবেদনে কি কাজ হল তাহলে এত দিনে? দু'মাস আগে আমরা কলকাতার এই মার্কেটটির সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছিলাম। গত ২৬শে নভেম্বরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিউ মার্কেটের ষ্টল-ওলাদের সভায় যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তা এখানে তুলে দিচ্ছি:

"Boards displaying fair prices of each commodity will henceforth be hung up before the stalls in Hog Market. This was decided at a meeting of the stallholders of Hog Market under the Chairmanship of Mr. J. L. Saha, councillor. The meeting also decided to constitute a courtesy board to deal with the customers."

দোকানের সামনে শুধু মূল্য-তালিকা টাঙালেই চলবে না, আরও বক্তব্য আছে আমাদের। মার্কেটটির সংস্কারে আরও অনেক কিছু করা এখনও প্রয়োজন। মার্কেটটির একটি মানচিত্র ঢোকবার গেটের কাছে কাছে টাঙিয়ে রাখা দরকার। দু'-চার জন গাইড রাখতে দোষ কী? এক এক সারিতে এক এক দ্রব্যের দোকান? কোনও দোকানদার কোনও ক্রেতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে কি বিদেশীদের কাছ থেকে বেশী দাম নিলে (সম্প্রতি Statesmanএ এক বিদেশী ভদ্রমহিলা এমনি একটি অভিযোগ করেছিলেন মনে হচ্ছে যেন) অভিযোগ কোথায় করা যাবে মার্কেটের সমস্ত প্রমিনেন্ট জায়গায় বোর্ড প্রেস করে তা লিখে দেওয়া দরকার। মার্কেটের কর্ত্তৃপক্ষদের এজন্য আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং অচিরে অন্যান্য বক্তব্যগুলিকেও কাজে লাগাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ
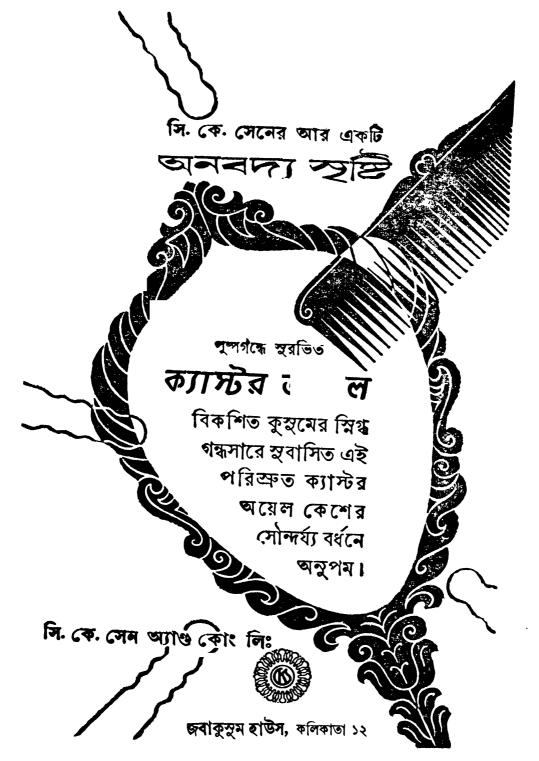
[অনুবাদ]

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাংলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার আগে মনে রাখা দরকার যে রাজমহল থেকে সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত প্রায় তিনশ' মাইল লম্বা গঙ্গার উভয় তীর সে দেশের শোভাবর্ধন করছে। এর মধ্যে অসংখ্য খাল আছে, যা পণ্যদ্রব্যের চলাচলের সুবিধার জন্য এবং জলপ্রবাহের জন্য সুদূর অতীত কালে কাটা হয়েছে।(১) মানুষের দৈহিক মেহনতের এ এক অপূর্ব ভারতীয় নিদর্শন! এই সব খালের দুই দিকে সারিবদ্ধ নগর ও গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে। লোকজনের বসতিও যথেষ্ট আছে। তারই মধ্যে মধ্যে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত, আখক্ষেত, ফসলক্ষেত, নানারকমের সব্জীবাগান, সরষে ও তিলের ক্ষেত, আর দু'তিন ফুট উঁচু তুঁতগাছের সারি, রেশমী গুটীপোকার খাদ্যের জন্য বিরাজ করছে। কিন্তু বাংলা দেশের সবচেয়ে লোভনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হ'ল, গঙ্গার দুই তীরের মধ্যবর্তী ছোট ছোট দ্বীপগুলি। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যেতে দু'-সাতদিনও লেগে যায় অনেক সময়। ছোট বড় নানাকারের দ্বীপ সব, কিন্তু একটি বিশেষত্ব সকলেরই আছে। এমন শস্যশ্যামলা উর্বরা দ্বীপ সচরাচর দেখা যায় না। প্রত্যেকটি দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে ঘেরা, তার মধ্যে নানারকমের ফলের গাছ, আনারসের বাগান। হাজার হাজার আঁকাবাঁকা খাল নালা তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে, কতদূরে যে তা বলা যায় না, একেবারে দৃষ্টির অন্তরালে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন দ্বীপের মধ্যে গাছের বাঁকানো তোরণ-শ্রেণী দিয়ে সাজানো আঁকাবাঁকা পথ সব।

(১) বার্নিয়ের যে সব কাটা খালের কথা এখানে বলেছেন, তার অধিকাংশই অবশ্য কাটা খাল নয়। নদ-নদীর প্রাচুর্য দেখে এবং তার পাশের বাঁধগুলো দেখে বার্নিয়েরের মনে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে নদীগুলি মানুষের মেহনতে কাটা খাল ছাড়া কিছু নয়। আসলে বার্নিয়ের যাকে খাল বলেছেন তার অধিকাংশই হ'ল নদী।

মোগল-যুগের ভারত

মগদস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী

সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক দ্বীপ এখন প্রায় জনবসতিশূন্য হয়ে গেছে। প্রধানতঃ আরাকানের জলদস্যু বা বোম্বেটেদের অত্যাচারে এই সব দ্বীপ ছেড়ে লোকজন পালিয়ে গেছে (২)। এখন এই দ্বীপগুলি দেখলে মনেই হয় না যে এক কালে এখানে লোকালয়

(২) বার্নিয়ের এর পূর্বেও মগদস্যুদের লুণ্ঠনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন (মাসিক বসুমতী: ১৩৬০ সনের বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার যে কতদূর পর্যন্ত চরমে উঠেছিল এবং বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পর্যন্ত যে কি ভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন বংশের (প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ) কুলজী থেকে তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সব সংগ্রহ করেছেন (প্রবাসী: চৈত্র ১৩৫৩)। বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারও দেখা যায়, মঘের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পায়নি। মঘের এই দৌরাত্ম্যের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে 'মঘদোষ' বলা হয়। কুলপঞ্জীতে এই মঘদোষের বিবরণের মধ্যে ঘটকরা অজ্ঞাতসারে বহু করুণ ঘটনা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপকরণ অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিভিন্ন কুলপঞ্জী (হাতেলেখা) থেকে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এগুলি যদি উদ্ধার না করতেন, তাহ'লে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক অধ্যায়ের কথা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারতাম না।

কুলগ্রন্থ থেকে মঘদৌরাত্ম্যের কয়েকটি বিবরণ উল্লেখ করছি:
(ক) 'বন্দ্যঘটী' অর্থাৎ ব্যানার্জি বংশের একটি বিখ্যাত শাখা "সাগরাদিয়া" নামে পরিচিত। এই শাখার জহ্নু প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন। তাঁর এক পৌত্র (বলভদ্রের পুত্র) শ্রীপতির নাম ধ্রুবানন্দ তাঁর "মহাবংশাবলী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শ্রীপতি ১৫০০ সনে জীবিত ছিলেন। তাঁর এক প্রপৌত্র রামচন্দ্রের কুলবিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়: "ততো বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কন্যা মঘেন নীতা সর্বনাশাদ্ধানিঃ।" এই ঘটনা আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৬০০-১৬৫০ সাল) ঘটে। রামচন্দ্রের বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। কুলাবস্থান থেকে মনে হয়, নদীয়া যশোহর অঞ্চলেই তাঁর বাস ছিল।

(খ) উক্ত রামচন্দ্রের এক ভাইয়ের নাম রাঘব। তিনিও ঐ একই অঞ্চলের বাসিন্দা ব'লে মনে হয়। তাঁর আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থ চাঁদ সদ্বংশে বিবাহ করেন। কিন্তু—"চাঁদস্য পিতৃভদ্রকা[illegible] মুং যাদবেন্দ্র রায়স্য কন্যাবিবাহ অত্র সাধুঃ, পশ্চাৎ মঘেন নীতা।" তাঁর বাকি চার ভাইকেও মঘ দস্যুরা ধ'রে নিয়ে যায়—"চাঁদ বিনোদ রাজারাম যদু মধু মঘেন নীতাঃ।" কেবল তাই নয়, তাঁর তিন ভগ্নীকেও মঘেরা নিয়ে যায়—"ততঃ স্বরূপা-মণিরূপা-কর্পূরমঞ্জরী এতাঃ কন্যাঃ মঘেন নীতা সর্বনাশাদ্ধানিঃ।"

(গ) খড়দহ মেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন ভগীরথপুত্র শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে লিখিত আছে; "কৃষ্ণচরণ ফিরাঙ্গি অপবাদর বিক্রমপুর কাঁটালতলি গ্রামে।" কৃষ্ণচরণের [illegible] রামদেব সম্বন্ধে লেখা আছে: "রামদেবস্য ফারাঙ্গিতে নী[illegible]

ছিল। ধূ-ধূ করছে জনমানবশূন্য গ্রামের পর গ্রাম। মানুষ নেই, বন্য জন্তুর উপদ্রব বেড়েছে তার বদলে। এক সময় যেখানে মানুষের বসবাস ছিল, এখন সেখানে হরিণ শুয়োর আর বন্যকুক্কুট চ'রে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে। তারই আকর্ষণে বাঘেরও আনাগোনা আছে সেখানে। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে অনেক সময় বাঘগুলো সাঁতার দিয়ে চ'লে যায়। গঙ্গার উপর সাধারণত ছোট ছোট নৌকায় ক'রে চ'লে বেড়াতে হয়। এ ছাড়া নদীপথে চলাচলের আর অন্য কোন যান নেই। নৌকা থেকে এই সব দ্বীপের যে কোন স্থানে অবতরণ করার বিপদ আছে অনেক। তার কারণ, স্থানগুলি নিরাপদ নয়। রাত্রিবেলা নৌকা কোন গাছের ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে, তীর থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। তা না হ'লে রাতের ঝোঁকে নৌকার যে কোন আরোহীকে বাঘে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে। এরকম দুর্ঘটনা প্রায় ঘ'টে থাকে। রাতে তীরে নৌকা নোঙর ক'রে আরোহীরা যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, তখন বাঘ এসে সন্তর্পণে ঢোকে নৌকার ভিতর এবং শিকার ধ'রে নিয়ে চ'লে যায়। এ-অঞ্চলের মাঝিমাল্লাদের মুখে এ রকম কাহিনী অনেক শোনা যায়।

পিপ্‌লি বন্দর থেকে হুগলীর পথে বানিয়ের

পিপলি বন্দর (৩) থেকে হুগলী পর্যন্ত আমার নৌকাযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা এইবারে বর্ণনা করব। এই সব দ্বীপ ও ছোট ছোট অসংখ্য খাল-নালার ভিতর দিয়ে, পিপলি থেকে নদীপথে নৌকায় ক'রে আমার হুগলী পৌঁছতে প্রায় নয় দিন লেগেছিল। সেই নৌকাযাত্রার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে আছে আজও। এমন কোন দিন যায়নি, যেদিন নতুন কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিনি। হয় কোন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা, অথবা দুঃসাহসিক কোন ঘটনা, একটা-না-একটা কিছু ঘটেছে। যে-নৌকায় আমি যাত্রা করেছিলাম সেটি একখানি সাতদাঁড়যুক্ত নৌকা। পিপলি থেকে বেরিয়ে যখন আমরা প্রায় দশ বারো মাইল জলপথ পার হয়ে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়েছি, উপকূল ধ'রে, তখন এই সব দ্বীপ গুলোর দিকে যেতে যেতে দেখলাম, বড় বড় রুইমাছের মতন মাছের ঝাঁক তাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছে জলের মধ্যে এক জাতীয় তিমি মাছ। মাছগুলোর কাছাকাছি নৌকা নিয়ে যেতে বললাম মাঝিদের। কাছে গিয়ে মনে হ'ল, মাছগুলো যেন মরার মতন প্রায় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। দু'চারটে মাছ মন্থরগতিতে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে, আর বাকিগুলো যেন দিশাহারা ও বিহ্বল হয়ে প্রাণপণ লড়াই করছে আত্মরক্ষার জন্য। আমরা হাত দিয়েই প্রায় গোটা চব্বিশ মাছ ধরলাম এবং দেখলাম, মাছগুলোর মুখ দিয়ে ব্লাডারের মতন রক্তাভ একরকম কি যেন বেরিয়ে আসছে। আমার মনে হ'ল, এই ব্লাডারের সাহায্যেই বোধ হয় মাছগুলো ভেসে বেড়ায়, ডুবে যায় না। কিন্তু তাহ'লেও এগুলো এই ভাবে মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে কেন বুঝতে পারলাম না। ডলফিন বা তিমিমাছের তাড়া খেয়ে ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করতে গিয়ে হয়ত এই ব্লাডারটা মুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং রক্তাভ হয়েছে। কথাটা অন্তত শতাধিক নাবিক ও মাঝির কাছে বলেছি এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেছি। অনেকেই আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি। একজন ডাচ নাবিক মাত্র আমাকে বলেছিল যে বড় নৌকা ক'রে চীনের উপকূল দিয়ে যেতে যেতে সে এই রকম মাছ দেখেছে এবং ঠিক আমাদেরই মতন হাত দিয়ে অনেক মাছ ধরেছে।

পরদিন, বেলা প'ড়ে গেল, আমাদের নৌকা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ধীরে ধীরে ভিড়ল। এমন একটি স্থান আমরা নোঙর করার জন্য বেছে নিলাম যেখানে বাঘের উপদ্রব বিশেষ নেই। সেইখানে নেমে আমরা সেদিনের মতন (রাতে) বিশ্রাম নেবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। তীরে নেমে প্রথমে আগুন জ্বালানো হ'ল। তার পর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বললাম, আমার খাবার জন্য গোটা দুই মুর্গী আর কয়েকটা মাছ তৈরী করতে। তাই দিয়ে বেশ ভাল ভাবেই

...সম্পর্ক।" বামদেব নিঃসন্তান ছিলেন। একটি গ্রন্থে কৃষ্ণচরণ নামে একটি কারিকা উদ্ধৃত হয়েছে—

"কৃষ্ণচরণ বন্দ্যবর, পাইয়া ফিরিঙ্গি ডর
কাঁঠালতলা করি পরিত্যাগ।"

(৩) পিপ্‌লি বা পিপ্‌লিপত্তন্ বলে পরিচিত। একদা উড়িষ্যার উপকূলে, সুবর্ণরেখা নদী থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে, বিখ্যাত বন্দর ছিল। ১৬৩৪ সালে ইংরেজরা এখানে পর্তুগীজদের তীর বন্দরে একটি নতুন কুঠি স্থাপন করেছিল বাণিজ্যের জন্য। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য অনেক বন্দরের মতন পিপলি-বন্দরেরও পতন হয়। এখানেই বানিয়ের পূর্বোল্লিখিত ইংরেজদের বাণিজ্যপোত দেখেছিলেন।

সান্ধ্য-ভোজন শেষ করা গেল। মাছগুলোর স্বাদ খুব চমৎকার। তারপর আবার নৌকায় উঠে মাঝিদের বললাম, রাত পর্যন্ত নৌকা বাইতে। রাতের অন্ধকারে খালের আঁকাবাঁকা পথ চিনে নৌকা চালানো খুবই কঠিন। যে-কোন সময় পথ হারিয়ে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। সুতরাং বড় খাল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারের আগে বেরিয়ে এসে আমরা একটা ছোট খালের মধ্যে ঢুকে রাত কাটাবার সঙ্কল্প করলাম। একটি বড় গাছের মোটা ডালে নৌকাটি বাঁধা হ'ল শক্ত ক'রে। তীর থেকে অনেকটা দূরে নৌকা সরিয়ে রাখা হ'ল, বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য। রাতে ব'সে আছি নৌকায়, চারি দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময় প্রকৃতির এক বিচিত্র রূপ আমার নজরে প'ড়ল। দিল্লীতে থাকাকালীন এরকম দৃশ্য বার দুই দেখেছিলাম, মনে আছে। দেখলাম, চাঁদের রামধনু। নৌকার সঙ্গীদের সব ঘুম থেকে ডেকে তুললাম দেখাবার জন্য। সকলেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমার নৌকায় দু'জন পর্তুগীজ নাবিক ছিল। এক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমি তাদের আমার নৌকায় স্থান দিয়েছিলাম। সব চেয়ে বেশী বিস্মিত হয়ে গেল সেই পর্তুগীজ নাবিক দু'জন। তারা বলল যে এরকম রামধনু তারা এর আগে আর কখনও কোথাও দেখেনি এবং কারও কাছে শোনেও নি রাতের এই রামধনুর কথা।

তৃতীয় দিন আমরা খালের মধ্যে এক রকম পথ হারিয়ে প্রায় নিখোঁজ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলাম বলা চলে। কাছাকাছি দ্বীপে কয়েক জন পর্তুগীজ লবণ তৈরীর কাজ করত। তারাই আমাদের সে-যাত্রা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। তারা না থাকলে আমাদের পক্ষে পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। সেই রাতে আবার আমরা একটি ছোট খালের মধ্যে নৌকা ভিড়ালাম। আমার পর্তুগীজ সঙ্গীরা তার আগের দিন ঐ রকম বিচিত্র দৃশ্য দেখে সেই রাতে আর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে নি। আকাশের দিকে চেয়ে জেগে ছিল তারা। ঘুম থেকে সে-রাতে তারা আমাকে ডেকে তুলল, আবার ঐ রামধনুর দৃশ্য দেখাবার জন্য। ঠিক সে দিনের রামধনুর মতনই সুন্দর ও মনোহর। কোন আলোকমণ্ডল বা তারকামণ্ডলকে যে আমি ভুল ক'রে রামধনু বলছি তা নয়। বর্ষাকালে দিল্লীতে সে রকম তারকামণ্ডল আমি আকাশ আলোকিত করতে বহু বার দেখেছি। কিন্তু সাধারণত সেগুলি অনেক উঁচুতে দেখা যায়। পর পর তিন চার রাত ধ'রে আমি দেখেছি এবং মধ্যে মধ্যে দ্বিগুণ আকারেও দেখেছি। কিন্তু আমি যে আলোকমণ্ডলের কথা বলছি তা চন্দ্রকে ঘিরে বৃত্তাকারে উদ্ভাসিত নয়। চাঁদের বিপরীত দিকে, ঠিক দিনের আলোর রামধনুর মতন উদ্ভাসিত। যখনই রাতের এই রামধনু দেখেছি তখনই দেখেছি চাঁদ রয়েছে পশ্চিমে, আর ঐ আলোকমণ্ডল পূবে। চাঁদ মনে হয় পূর্ণিমার চাঁদ। তা না হ'লে ঐ রকম আলোকরেখা বিচ্ছুরিত হয়ে রামধনুর আকার ধারণ করত না। আলো যে খুব উজ্জ্বল সাদা তা নয়। নানা রঙের ছটা তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায়। সুতরাং আমি প্রাচীনদের চাইতে অনেক বেশী ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ দার্শনিক আরিস্ততেলের মতে, তাঁর আগের যুগের লোক কেউ চাঁদের রামধনু চোখে দেখে নি কোন দিন।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা আবার বড় খাল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট খালের মধ্যে ঢুকলাম নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। সেই রাতটি একটি স্মরণীয় রাত। হঠাৎ যেন চারিদিক স্তব্ধ হয়ে গেল মনে হ'ল। পরিপার্শ্ব থমথমে হয়ে উঠলো। হাওয়ার কোন চিহ্ন দেখা যায় না, অনুভবও করা যায় না। বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন আমাদের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কষ্ট হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমে বাতাস বেশ গরম হয়ে উঠলো। চারি দিকের ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি পোকাগুলো এমন ভাবে জ্বলছিল যে মনে হচ্ছিল যেন বনে আগুন ধ'রে গেছে। তারই মধ্যে আবার সত্যই আগুনের মতন কি যেন দপ দপ ক'রে জ্বলে উঠছিল। দূরে গভীর বনের মধ্যে যেন আগুনের শিখা দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে নিভে যাচ্ছে। মাঝিরা বেশ ভীত হয়ে উঠলো দেখলাম। তাদের বিশ্বাস, এসব বনের ভূতপ্রেতের অপকৌশল ছাড়া কিছু নয়। আগুনের এই বিচিত্র লীলার মধ্যে দু'টি দৃশ্যের কথা আমার বেশ মনে আছে। একটি গোলাকার—বলের মতন আগুন, আর একটি প্রজ্বলিত বৃক্ষের মতন দেখতে। মিনিট পনের জ্ব'লে উঠে নিভে গেল।

পঞ্চম রাত্রিটি সব চেয়ে বিপজ্জনক ও মারাত্মক হয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে প'ড়েছিলাম আমরা। এমন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল হঠাৎ যে আমরা গাছপালার মধ্যে নিরাপদে থেকেও, এবং আমাদের নৌকা বেশ শক্ত ক'রে বাঁধা থাকলেও, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল যেন আমরা ছিটকে গিয়ে বড় খালের মধ্যে প'ড়ে কোথায় তলিয়ে যাব। তাই যেতামও, কারণ নৌকাদড়ি ঝড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ আমাদের মাথায়, কতকটা প্রাণের দায়ে, বুদ্ধি খেলে গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ (আমি ও আমার দু'জন পর্তুগীজ সঙ্গী) গাছের ডাল প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে ঝুলতে লাগলাম। প্রায় দু'ঘণ্টা এই ভাবে ঝুলে রইলাম ডাল ধ'রে। প্রবল বেগে ঝড় বইতে লাগল। আমার ভারতীয় মাঝিরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল। কেউ আমরা কারও দিকে চেয়ে দেখবার সুযোগ পাইনি। গাছের ডাল ধ'রে ঝড়ের মধ্যে যখন আমরা ঝুলে ছিলাম, তখন আমাদের রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। কল্ কল্ ক'রে অঝোরে বর্ষণ হচ্ছিল এবং এমন সশব্দে চারি দিক আলোকিত ক'রে বজ্রপাত হচ্ছিল যে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি মাথায় পড়বে। এই ভাবে সে-রাত আমাদের কাটল। কোন রকমে আমরা বেঁচে গেলাম।

বাকি পথটা আমাদের ভালই কেটেছিল, বেশ আরামে। ন' দিনের দিন আমরা হুগলী (Ogouly) পৌঁছলাম। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, গঙ্গার উভয় তীরের মনোরম দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে সেই দিকে। নৌকা গঙ্গার বুকে ভেসে চলল। হুগলী পৌঁছলাম। আমার বাক্স পেঁটরা, জামা-কাপড় সব ভিজে গেছে তখন। মুর্গীগুলো ম'রে গেছে, মাছের অবস্থাও তথৈবচ এবং বিস্কুটগুলো সব জলে ভিজে ফুলে উঠেছে।

সমাপ্ত

বাংলা ছায়াছবির সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন

বাংলা ছায়াছবির বিজ্ঞাপন বলতে আমরা শুধু সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনাদির কথাই বলছি না শোকার্ড, বাইরের, ওয়াল এ্যাডভার্টাইজমেন্ট, পোষ্টার, হোর্ডিং, বুকলেট, লিটারেচার (বাংলা ছবিতে খুব কম) এমন কি 'প্রেস শো'র (আগে যার নাম ছিল ট্রেড শো) নিমন্ত্রণপত্র অবধি। সব কিছুর মধ্যেই আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব। প্রথমে সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনই ধরা যাক। কত দূর এগিয়েছি আমরা? গোল করে ডজন খানেক চিত্রতারকার মুখ পাশাপাশি গাদাগাদি করে, অত্যন্ত কম দামে কাঁচা শিল্পীর তৈরী লেটারিং মারফৎ ছবির নাম, শরৎচন্দ্রের বইয়ে ঘটা করে বাঁ কোণে লেখকের চাদর গায়ে জড়ানো ছবি! আইডিয়া নেই, ম্যাটারের সঙ্গে স্পেসের এ্যাডজাষ্টমেন্ট নেই, ড্রইং অতি কাঁচা, রিডিং ম্যাটার অত্যন্ত পুওর, ডিসপ্লে যাচ্ছেতাই। হালে একটা নতুন কায়দা দেখা যাচ্ছে, সংবাদপত্র সমূহের প্রকাশিত সমালোচনা বিজ্ঞাপনের কাজে লাগে না। তাও মোটেই বুদ্ধিমানের মত নয়। বিদেশী গাদা গাদা পত্র-পত্রিকা পাশেই পড়ে রয়েছে। প্রতিদিন কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ নিয়ে তারা এক্সপেরিমেন্ট করছে। অথচ আমরা খালি আঙুল কামড়াচ্ছি আর ভাবছি কটা ছবি ডেকে উঠল এক হপ্তা মাত্র চলে। পোষ্টারে জোড়ায়-জোড়ায় (সুচিত্রা সেন আর উত্তমকুমারের কথা বলছি আমরা) ছবি, একটি চিত্রের প্রচারে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। পোষ্টারে শুধু '৭' লেখা বা '?' চিহ্ন দেওয়ার কথাও স্মরণ হচ্ছে হয়ত আপনাদের। এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু করার রয়েছে আমাদের। বিদ্যাপতি, উল্টো রথ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ৭নং বাংলো, পথিক, চাঁপাডাঙ্গার বৌ, অন্নপূর্ণার মন্দির, মনের ময়ূর ইত্যাদি কয়েকটি ছবির বিজ্ঞাপন সত্যিই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। [illegible] দেওয়ালেও সেই শরৎচন্দ্র, (যাঁকে প্রথম দর্শনে ছবির [illegible] মনে হয়)। অধিক নাই বললাম। মহরৎ বা চিত্রউদ্বোধনের নিমন্ত্রণ-পত্রে কোথাও কোন বিশেষত্ব নেই। বিশেষত্ব নেই বুকলেট, প্যাম্পলেট কি লিটারেচার রচনায়। শুধু মাত্র [illegible] স্মরণ করিয়ে দিয়ে যথাযোগ্য কাজ দেখবার আশায় আমরা রইলাম। অবশ্য যে-দেশের ছায়াছবির প্রচার দপ্তরের ভার এখনও কর্তৃপক্ষের শালা-ভগিনীপতিদের হাতে দেওয়া হয়, সে দেশের ছবির বিজ্ঞাপন কি হতে পারে তা পাঠক-পাঠিকাই আন্দাজ করুন না!

কলকাতায় তাড়কা নৃত্য

কি একটা কাগজে যেন ছবি দেখলাম, মীনা সোবে (?) বম্বেরই কে একজন মোটাসোটা (নামটা বলব?) অভিনেতাকে কাঁধে [illegible] প্যাভিলিয়নে রেখে আসছেন। সুমিত্রা দেবী ব্যাট করছেন [illegible] তাঁর শাড়ী মাঠের হাওয়ায় বিপথগামী। আরও অনেক জনের অনেক কথা কানে এসেছে। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, খোলা মাঠে বাংলার মহান শিক্ষাব্রতী ও দাতাকর্ণ গভর্ণরকে সামনে রেখে কলকাতাতেই (গুণ্ডা দমন আইনের স্পেশাল অফিসার তখন কলকাতার বাইরে ছিলেন কি না জানতে চাইছেন?) ঘটে গেছে [illegible]। অবশ্য সবই সৎ উদ্দেশ্যে। ক্রিকেট খেলানো উপলক্ষ্য মাত্র। [illegible] জন্য টাকা তোলাই ছিল লক্ষ্য। খুব ভাল কথা, ক্রিকেট খেলার বন্দোবস্ত না করে বোম্বাইয়ের চিত্রতারকারা যদি অনুগ্রহ করে কলকাতার পথে পথে (সঙ্গে অবশ্য প্যাকার্ড, সানবিম
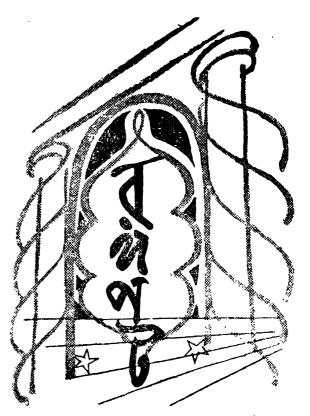
ইত্যাদি থাকত, সরবৎ, আইসক্রিম, মিঠে পান, চা-স্যাণ্ডউইচ এবং সংবাদপত্র রিপোর্টারের ক্যামেরা) চাঁদার খাতা হাতে করে ঘুরতেন তাতে কি কাজ অনেক অনেক বেশী হত না? অবশ্য তাতে ভয়ও ছিল। একদিন হয়ত কলকাতার সমস্ত ট্রাম-বাস অনেক বন্ধ হয়ে যেত। অফিসে বাবুরা অনুপস্থিত হতেন (মানে ট্রাম-বাস না থাকলে যাবেন কি করে?) না হয়। তবু টাকা উঠত। এবং হয়ত উঠত লক্ষাধিকই। আমরাও কলম চালাতে পারতুম না। যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। পরের বারে আবার কোনও এমনি ধারা চ্যারিটির মজাটা কি হয়, তাই দেখবার অপেক্ষায় আমরা রইলাম। বাঙলার গভর্ণরকে আমরা কিন্তু অন্যান্য সহযোগীর মত আদপেই দোষারোপ করবো না, কারণ ডক্টর মুখার্জী কখনও কা'কেও কাঁধে তুলতে বা শাড়ী ওড়াতে বলেননি। মূর্খ অভিনেতা, অভিনেত্রী আর গণ্ডমূর্খ দর্শকদের কথা তাঁর জানবার কথাও নয়।

সঙ্গীতমুখর ছায়াচিত্রের বাহুল্য

বাংলা দেশের চিত্রপরিচালকদের স্কন্ধে যখন যে আইডিয়া ভর করে তখন তাঁরা তার আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়েন, একথা আমরা আগেই বলেছি। 'ঢুলি' চিত্র কিছু পয়সা দিয়েছে তো তোল 'জয়দেব'। 'জয়দেব' তোলা হচ্ছে তো তোল 'যদু ভট্ট'। সঙ্গীতবহুল চিত্র তৈরী করবার হিড়িক পড়েছে আজ-কাল। পরিচালকেরা ভেবেছেন, জনসাধারণ গানের ছবি পছন্দ করেন। একথা অবশ্য সত্যিই। হিন্দী বহু চিত্র কেবলমাত্র সঙ্গীতের ফলেই বক্স অফিস-হিট করেছে। মহল, আর পার, বাজী, জাল, আনারকলি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঢুলিও তাই হয়েছে। কিন্তু আমাদের কথা হোল, পরিচালকগণের এ অনুকরণ-স্পৃহা কেন? নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি খরচা করে সকলেই

নতুন নতুন পথে পয়সা যোগাড় করুন। সঙ্গীত-বহুল ছায়াচিত্রগুলি প্রায়ই জলসায় পরিণত হয়। গল্পের কোন মাথামুণ্ড নেই। চোখ বুজে ছবি দেখে যাওয়া চলে। বরং শুনে যাওয়া চলে একথাই বলা যায়। স্থানে অস্থানে গান লাগিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী আমরা নই। বরং এমন সব গাইয়ে ব্যক্তি যাঁদের জীবনে ড্রামা আছে, সেই সব ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে গল্প তৈরী করে কোনও ছবি তুললে তা উৎকৃষ্ট হোত। গল্পের দিকেই বেশী ঝোঁক (প্রসঙ্গ ক্রমে 'কবি' চিত্রের নাম করলাম) দিয়ে সঙ্গীতকে দ্বিতীয় প্রাধান্য দিলেই কাজ বেশী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর যাই করুন, নিছক অনুকরণসর্বস্ব হবেন না, এই অনুরোধ। অবশ্য শুধু জীবনী-ছবি হিসাবে আমাদের দেশে যে ক'টি নাম করবার মত, তন্মধ্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীমধুসূদন, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বৈজু বাওরা, যদু ভট্ট, মীরাবাঈ ছবিগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা আমরা স্বীকারই করি না। স্রেফ স্রেফ গানের জোরে বাজারে চালু হলেও এই জীবনী-ছবিগুলি সত্যিই জীবনী হয়নি, আর তা হলে ছবি হয়েছে কি না আপনারাই বিচার করুন। ছবিতে শুধু গান বাজালে তো চলবে না পরিচালক-ভাইরা !

নাট্যমঞ্চের বিজ্ঞাপন

নাট্যমঞ্চের বিজ্ঞাপন বলতে অবশ্য আজও কিছু গড়ে উঠেনি। বরং নাট্যমঞ্চের অধুনা-প্রকাশিত বিজ্ঞাপন (?) গুলিকে রঙ্গালয়-সংবাদ বলাই উচিত। এক কলম চার ইঞ্চি জায়গায় (আজ-কাল রঙমহল ও ষ্টার মাঝে মাঝে দু' কলমী বিজ্ঞাপনও দিচ্ছেন) শিশির ভাদুড়ী থেকে অপর্ণা দেবী অবধি ঠেলাঠেলি করে বর্তমান, নাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক রয়েছেন, দিন-ক্ষণ তারিখ আর প্রবেশ-দক্ষিণার হার আছে এবং আছে সাইনবোর্ড পেণ্টার কি রঙ্গালয়ের বাইরের দেওয়ালে ছবি আঁকেন যিনি তাঁর কৃত লেটারিং সহ নাটকের নামও। কি করে আর বাঙলায় নাটকের সুদিন আসবে বলুন ?

বাঙলা ছায়াছবি বনাম বাঙলা সাহিত্য

যে কোন দেশেই ছায়াছবি সর্বদা সাহিত্যের সঙ্গে তাল রেখে চলে। হেমিংওয়ে, জোনস্ ও-দেশের চিত্র-পরিচালকদের নজর এড়িয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু কী বিচিত্র এই দেশ! এখানে সিনেমা-শিল্প সাহিত্য থেকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে থাকে সর্বদা। বাংলা দেশের চিত্র-কাহিনীর সুরুতে ছিলেন চণ্ডীদাস (কিছু দিন আগেও রামী-চণ্ডীদাস হয়ে গেল না ?) আজও আছেন শরৎচন্দ্র। না ঠিক শরৎচন্দ্র বললেও ভুল হয়। বাংলা দেশের চিত্রশিল্প আরও একটু এগিয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রবোধ সান্যাল। ব্যস্ ! পরিচালক-সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। তার পর আর নেই। তবু একথা বললে খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হবে না যে, শরৎচন্দ্রই এখন বাঙলার চিত্রজগতে পঙ্করভের আসরে কল্কে পাচ্ছেন। তার মানেই নয় কি আমাদের সিনেমা-শিল্প পঞ্চাশ বছর···। আবার আরও পঞ্চাশ বছর বাদে আমরাই হয়ত দেখব (যদি পরমায়ু থাকে অবশ্য) অচিন্ত্যকুমার, শরদিন্দু, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় রায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, নরেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, পরশুরাম, বুদ্ধদেব, বনফুল, থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় এবং আরও হাজার একজনকে তাঁরা স্থান দিয়েছেন অনুগ্রহ করে। কল্পনা করতে পারি, মুখ বিকৃত করে কোন চিত্র-পরিচালক সেদিন তার এ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে বলছেন, মাই ডিয়ার ওয়াটসন্, ইট হাড টু বি গিভন্ এ চান্স।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য, বইয়ের বাজারের মাৎ হওয়া উপন্যাসকে ছবির জন্য বাছলেই সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না।

Children's Little Theatre প্রসঙ্গে

গত মাসে চিলড্রেন্স লিটল্ থিয়েটার সম্পর্কে আমরা যা যা লিখেছিলাম লিটল্ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তার প্রতি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করিয়েছেন। এক দীর্ঘ পত্রে এঁরা জানিয়েছেন সমিতির কার্য্যকলাপ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ইত্যাদি। তাঁদের পত্র থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি, 'শিশুরংমহল আজ তিন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র কিণ্ডারগার্টেন ও নীচু ক্লাসের শিশুদের জন্যই এ ব্যবস্থা। ১১ বছর বয়সের ওপর কোন শিশু এতে সভ্য বা সভ্যা হতে পারে না। শিশু রংমহলের affiliation শুধু স্কুলরাই পায়। মোট ২২টি স্কুল এখন এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছে।···শিশুদের জন্য School-Room Rhymes তৈরী করে সুরে সাজিয়ে টীচারদের কাছে স্কুলে পাঠানো হয়···একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদের। শিশুরংমহল ১১ বছরের শিশুকে আনন্দটুকু দেবারই চেষ্টা করছে।···ভালবাসার চোখ দিয়ে দেখবেন। ভালবাসার মার মারবেন। মায়ের মার—দারোগার নয়।··· শোধরাবার চেষ্টা করব। বহুল প্রচারিত মাসিক বসুমতীর পাতায় অবিচার না হয় এই অনুরোধ। লিটল্ থিয়েটারের বর্তমান কাজ সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ আগেও আমরা করিনি, এখনও করছি না। আমরা শুধু বলেছি ভবিষ্যতে এঁরা যেন শিশুগুলিকে পরিত্যাগ না করেন মধ্য পথে। শিশুরংমহলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের কাজের জন্য এবং আশা করছি উত্তরোত্তর সুনামের সঙ্গে আরও অধিক কাজ করে যাবেন তাঁরা। আমাদের পূর্ব্বের মন্তব্য যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাতে মোরা খুসী।

নিউ থিয়েটার্সের 'ব্রেইনট্রাষ্ট' কে বা কারা ?

তা আমার আপনার সকলেরই নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা হয়। আশ্চর্য্য ! গত সাত-আট বছরের মধ্যে নিউ থিয়েটার্স বাঙালীকে এমন কোন ভাল ছবি উপহার দিতে পারেন নি যা আমরা অনেক দিন মনে করে রাখতে পারি। পয়সাও দেয়নি কোনও ছবি। মেয়াদও সপ্তাহের গণ্ডী পেরিয়ে মাসে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি কখনো। একমাত্র বোধ হয় 'মহাপ্রস্থানের পথে' (যতদূর আমরা শুনেছি) কিছু পয়সা দিয়েছে নিউ থিয়েটার্সকে। হঠাৎ কেন এ অবনতি? কেউ হয়ত বলতে পারেন, নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ যা খুসী তাই করতে পারেন। কিন্তু আমরা বলব, তা নয়। নিউ থিয়েটার্সের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। বাঙালী জাতির কৃষ্টির ধারক এ। এর পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোটা বাঙলার স্বার্থ। আইনের চোখে মালিক হয়ত এর হতে পারেন ব্যক্তিবিশেষ। কিন্তু এর ভাল-মন্দে অংশ আছে আমাদেরও।

তাই শ্রীবীরেন সরকার মহাশয়ের কাছে আমাদের নিবেদন, সেই পূর্ব্বের মতই সব দিকে তিনি নজর দিন। বিশ-বাইশ বছর আগে একদা যে অমিত সাহস, শক্তি, অধ্যবসায়ের পসরা নিয়ে তিনি এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আজ বাংলা ছায়াছবির সঙ্কটের দিনে তিনি আবার হাল ধরুন। ঢেলে সাজান নিউ থিয়েটার্সের পরিচালকগোষ্ঠীকে, শিল্পীদের এবং সঙ্গে সঙ্গে রূপ দিন আরও সব-কিছুর। আর একটি কথা তাঁকে সবিনয়ে জানাই, ছবির জন্য আপনাদের সেই পূর্ব্বের মত সর্ব্বগুণ-সমন্বিত ছবি নির্ম্মাণ করুন। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে নিজেকে ভুলে গিয়ে ছবি যেন তৈরী না করেন। আমাদের এই বক্তব্য এন, টি থেকে গৃহীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চিত্রসমূহের জন্য নয়।

আমাদের পরিচালকদের শিক্ষা-দীক্ষা

আজকের দিনে বাংলা ছবির মান যে অনেক নীচুতে নেমে গেছে, তার জন্য অনেকখানি দায়ী নয় কি সিনেমা পরিচালকদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা? আমাদের দেশে প্রোডিউসার যোগাড় করতে পারলেই পরিচালক হওয়া যায়। ওদেশের কলম্বিয়া, প্যারামাউণ্ট, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী কি মেট্রো গোল্ডেন মায়ারের একজন পরিচালকের সঙ্গে এদেশের বর্ত্তমান···। রামোঃ। অত দূর না গিয়ে এখানকারই নীতিন বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, অমর মল্লিক, মধু বসু, বিমল রায়, বেণু লাহিড়ী, হেম চন্দ্র, কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় বা নরেশ মিত্রর মত পরিচালক আর হচ্ছে না কেন তাই ভাবছি। আপনি কি জানেন, সামান্য কিছুদিন কোনও চিত্র পরিচালকের সাকরেদী করে ফাইন্যান্সার বাগানোটাই হল এদেশে পরিচালক হওয়ার ক্রাইটেরিয়ান্? ছবির শুধু মাত্র নেগেটিভ অবধি তুলতেই কতখানি জ্ঞানের প্রয়োজন! তার পর তার প্রিণ্ট, মার্কেট-ষ্টাডি, সেন্সর, ইনকাম ট্যাক্স, এ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স, এডিটিং আরও কত কি! ডিষ্ট্রিবিউটার্সের সঙ্গে বন্দোবস্ত, হাউস প্রটেকসান মানীর ভাগবাটোয়ারা, বিজ্ঞাপন এসবও রয়েছে। অথচ যে সমস্ত পরিচালক সাধ্য-সাধনা করে, প্রচুর পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা সহ আজও বাংলায় রয়েছেন উত্তর কালে সিনেমা-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কোন দায়িত্বই যেন তাঁরা নিতে চান না। আমরা তো তাঁদের জানালাম, দেখি তাঁরা এর কি ব্যবস্থা করেন।

জয়দেব—ছবিটির হিন্দী সংস্করণ আশাপ্রদ

গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব। বাংলার আকাশ-বাতাস একদিন ভরে উঠেছিল তাঁর গানে। মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা-কাঁসরের আওয়াজ, চামরের শব্দকে অতিক্রম করে বাঙ্গালীর প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছিল খোল, করতাল আর একতারার শব্দে। সেই মানুষ জয়দেব। তারই চিত্ররূপ দেখে এলাম। চিত্রকাহিনী অত্যন্ত লঘু করে রচনা করা হয়েছে। স্রেফ ভুলে ভর্তি! সাধক কবির জীবনের মিরাকলস্ বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকেই বর্ণনা করা হয়েছে সবিস্তারে। কবির কাব্যমন চাপা পড়ে গেছে। আড়ালে রয়ে গেছে কাব্যজীবন। সাধনার স্তরে স্তরে সিদ্ধি দেখানো হয়নি। মুস্কিলের কথা হল এই যে, জয়দেবের জীবনী সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীকার দেখলাম কাহিনীর 'অথেনটিসিটি' নিয়ে মাথা ঘামাননি মোটেই। যাত্রার দলের সখীর মত চেহারাওয়ালা বালক কৃষ্ণকে যত্র-তত্র নিয়ে গেছেন। যা খুসী তাই করিয়েছেন এবং ফলে সমস্ত চিত্রকাহিনীটি একটি রূপকথার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত ছবিটির মধ্যে আউটডোর সুটিঙের কাজ প্রায় নেই বললেই হয়। সমুদ্র ও পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের শটগুলি অবশ্য নেওয়া হয়েছে ভাল করেই এবং তার সুসন্নিবেশও ঘটেছে। অথচ ছবিটিতে বহু স্কোপ ছিল আউটডোরের। উৎপলা দেবীর গানগুলিই ভাল লাগল। গীতগোবিন্দের পাঠ স্থানে স্থানে ভাল লাগল না। অন্যান্য সঙ্গীতের মধ্যে রতন মিশ্রের গানটি খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছে। পাতা ফেলার দৃশ্যটি এবং পাতা গজাবার ব্যাপারটি হিন্দী ছবির দর্শকগণ যে নেবেন তা বাজী রেখে বলতে পারি। সেই কারণেই বলছি জয়দেবের হিন্দীরূপ হওয়া প্রয়োজন। অসিতবরণ আর কত দিন 'চণ্ডীদাস' মার্কা ছবিতে অভিনয় করে চালাবেন? রবীন বাবুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে চেহারায় বেশ একটা 'বৈষ্ণব-বৈষ্ণব' ভাব আনা হয়েছে। সব চেয়ে ভাল লেগেছে অনুভা গুপ্তের অভিনয়। সহজ, সাবলীল তাঁর প্রকাশভঙ্গী! এতটুকু দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। কান্না আছে, হাসি আছে, অভিমান আছে। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলেছেন তিনি। একটা 'টাইপ' চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। আর উল্লেখযোগ্য কেউ নেই। শব্দগ্রহণ স্থানে স্থানে খুবই নিকৃষ্ট ধরণের হয়েছে। মুখ নড়ে গেছে অথচ সাউণ্ড করা হয়নি এমন দু'-একটি জায়গাও চোখে পড়েছে। আলোক চিত্রগ্রহণে বাংলা চিত্রজগতের যেন অবনতি ঘটছে দিনকে দিন। সেট ইত্যাদিতেও কোনও রকমের অভিনবত্ব চোখে পড়ল না।

যদু ভট্ট—দু'ডজন নানা ধরণের গানের উপর ছবিখানা ফাউ পাচ্ছেন

'যদু ভট্ট' এমন একজন সঙ্গীতজ্ঞের জীবনী যার মধ্যে শুধু সঙ্গীতই নেই, আছে জীবন, নাটক, এবং সব চেয়ে বেশী আছে এ্যাডভেঞ্চার। তাই এ ছবি সার্থক হোতে বাধ্য। এবং কাজেও হয়েছে তাই। বিষ্ণুপুরের মান ভারতের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল যদুনাথ মাত্র পনেরো বছর বয়সে কাশীর গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে গুরুর গুরু পরমগুরুর পাদস্পর্শ করে। তার পর চলল তার সাধনা। আজ দিল্লী, কাল আগ্রা, পরশু লক্ষ্ণৌ। কিন্তু কোনও ওস্তাদই তাকে হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীত শেখাতে রাজী হল না। হঠাৎই আকস্মিক ভাবে দেখা হল দিল্লীর রতনবাঈয়ের সঙ্গে। তার পর তাঁরই চেষ্টায় সে আশ্রয় পেল আলীবকস খাঁ সায়েবের কাছে। সেখান থেকে ঝিন্নন বাঈ। একে একে সমস্ত সঙ্গীতে পারদর্শী হল যদুনাথ। এদিকে কাশীর মহাসঙ্গীত সম্মেলন (যেখান থেকে এক দিন নাগরা ছোঁড়া হয়েছিল যদুকে) এল আবার দীর্ঘ সাত বছর পরে। যদু গান গাইবে না সেখানে। ওস্তাদ আলীবকসের পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী সে। প্রায়শ্চিত্ত। ঝিন্নন তার ভালবাসার জোরে যদুকে ফেরালো কিন্তু নিজে আর ফিরল না। যদুকে ঘাতকের ছুরির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে পিঠ পেতে নিজে তা নিল সে। তার পর ঝিন্ননকে হারিয়ে যদু হয়ে উঠল পাগল। এমনি করে একটু একটু করে নিবে গেল যদুর জীবন-দীপ। দোষ-ত্রুটি যা চোখে পড়েছে সে সব কথা না বলে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী যে অনেক অনেক দিন পর একখানা ভাল ছবি তুলেছেন সে কথাই বলি। কাহিনী সামান্য ভুল থাকলেও বেশ ভেবে-চিন্তে গড়া হয়েছে। কাষ্টিংও হয়েছে মোটামুটি ভালই। তবে সব চেয়ে ভাল হয়েছে সেটিঙের কাজ। আমরা তাকে আগ্রার ফতেপুর সিক্রিতে আউটডোর তুলতে দেখে এসেছি। ক্যামেরার কাজ কিন্তু স্থানে স্থানে খুবই খারাপ হয়েছে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয় এ ছবিটিতেও অনুভা গুপ্তারই। 'কবি', 'রত্নদীপ' ইত্যাদি ছবির অনুভা গুপ্তার কথাই আবার নতুন করে মনে পড়ছিল। অন্য সকলে নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন যেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে সুরু করে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় অবধি স্থান পেয়েছেন এতে। প্রথম দিকের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতগুলি এবং কাশীর সম্মেলনে যদুর গানই ভাল লাগল সব চেয়ে বেশী। 'সুন্দর হে সুন্দর' গানখানি বাদ দিলেই ভাল হত। অন্যান্য সব-কিছুই মোটামুটি মন্দ হয়নি বলতে পারি। শুধু ছবির বিজ্ঞাপন ছাড়া।

টকির টুকিটাকি

আদম্-ইভের যুগেই "নিষিদ্ধ ফল"এর প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। মহেশ্বরী চিত্র-মন্দির স্থানীয় ষ্টুডিওর মধ্যে এবার সেই বিচিত্র ফল নাকি হাতে পেয়েছেন। সম্ভবতঃ আদিম যুগ আবার বুঝি শুরু হোল ষ্টুডিও থেকেই। "নিষিদ্ধ ফল" কার্য্যসিদ্ধিতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার কার্য্যকলাপগুলি ছবিতে রূপায়িত করায় সাহায্য কোরেছেন—জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, রাণীবালা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শিল্পীরা।

গোকুলের "মদনমোহন"কে নিয়ে বীরেন ভদ্র প্রেমে বিভোর হ'য়ে পড়েছেন। তত্ত্বকথা শোনাবার জন্য খুব ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন তিনি। নিখুঁত ভাবে তত্ত্বকথা পারবেশনের সব কিছু দায়িত্ব নিয়েছেন কানাইলাল দত্ত। তাঁকে সাহায্য করছেন—ছবি, পাহাড়ী, নীতিশ, মিহির, অনুপকুমার, মলিনা, নমিতা, সবিতা প্রভৃতি শিল্পীরা। পরিচালনার ভার নিয়েছেন অমল বসু।

"পথের শেষে"র চিত্র তুলছেন এস, বি, প্রোডাকসন্স। পরিচালনায় আছেন অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জী। "পথের শেষে"র শেষ পর্য্যন্ত পথ চলে এসেন—ছবি, বিকাশ, বসন্ত, সুনন্দা, সাবিত্রী, মঞ্জু দে, সুপ্রভা প্রভৃতি শিল্পীরা। চিত্রখানি শীঘ্রই পরিবেশন কোরবেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

ইষ্টার্ণ ষ্টুডিওর মধ্যে পি, এ, পিকচার্সের "প্রজাপতির অফিস"-এর গঠনকার্য্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। 'যান্ত্রিক ইউনিট' পরিচালনা কোরছেন অফিসের নির্ম্মাণকার্য্য। নাম-করা প্রায় তেরো জন শিল্পী এই কাজে হাত লাগিয়েছেন। প্ল্যানটির মধ্যে লেখা-জোখার দায়িত্ব বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের।

"কালিন্দী"র চর নিয়ে সে হাঙ্গামা হোল, শেষ পর্য্যন্ত ছবির পর্দায় দেখতে হবে সেই চিত্র। জমিদারী বজায় রাখতে জমিদারদের অত্যাচার সহ্য কোরে প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকা সম্ভবপর হবে কি না, সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পরিচালক নরেশ মিত্রের উপর। দর্শকদের প্রাণে প্রেরণা দিতে এগিয়ে এসেছেন মলিনা, দীপ্তি, অনুভা, সরযূবালা, নরেশ মিত্র, কমল মিত্র, বিকাশ, সবিতা চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি।

"পাহাড়তলীর বাঁশী"র সুর এবার শহরের প্রেক্ষাগৃহে আরামদায়ক চেয়ারে বসে শোনা যাবে। এই বাঁশীর মনের কথা না জেনে বলা কঠিন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল শ্রীরাধার নাম। "পাহাড়তলীর বাঁশী"তে যে কার নাম লেখা, রূপালী পর্দ্দা ভেদ কোরে কানের পর্দায় না আসা পর্য্যন্ত অনুমান করা যাবে না। মৃভী প্রোডিউসার্সের প্রযোজনায় ষ্টুডিওর মধ্যেই এখনও বাঁশী বাজানোর রিহার্স্যাল চলছে।

কানন দেবী এবার "দেবত্র" ছবিতে হাত দিয়েছেন। শহরে উপহার দেবার আগেই দেবতাকে উৎসর্গ কোরে দিয়েছেন ছবিখানি। প্রসাদ বিতরণের প্রতীক্ষায় রয়েছে জনসাধারণ। কানন দেবী, অর্দ্ধেন্দু, উত্তমকুমার, শিপ্রা, সবিতা, স্বাগতা, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি নামকরা শিল্পীরাই ছবিখানির মধ্যে স্থান পেয়েছেন, ভাগ্যবান নিঃসন্দেহ। নারায়ণ পিকচার্স শহরে প্রসাদ বিতরণের ভার নিয়েছেন।

"ক্ষুধিত পাষাণ" কে শহরের লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরবার জন্য পরিচালক পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায় ইষ্টার্ণ টকীজ, ষ্টুডিওতে যথেষ্ট পরিশ্রম কোরছেন। কমলা কলা-মন্দিরের এই পাষাণের আত্মকথা রূপায়িত কোরেছেন প্রীতিধারা, সমীরকুমার, জীবন গাঙ্গুলী, জীবেন বসু প্রভৃতি শিল্পীরা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীবিকাশ রায়

দেখলেই মনে হয়, এঁর শিল্পগত প্রাণ র'য়েছে, অত্যন্ত সজাগ ও সজীব। এ প্রাণের কাছাকাছি যখন গেলুম সেদিন, তখন অনেক কিছুরই সন্ধান মিললো তাঁর কাছ থেকে। মাত্র বছর কয়েক আগের কথা বিকাশ রায়কে আমরা দেখতে পেয়েছি রূপালি পর্দ্দায় কিন্তু এরই ভেতর চিত্রজগতে তিনি যে একটা পাকাপাকি আসন করে নিয়েছেন, এ'তে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে আবার বলতে হবে, তাঁর শিল্পগত প্রাণ আছে বলেই এ চরম সাফল্য।

বিকাশ বাবুর বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে যেতেই দেখলুম, তিনি আগে থেকেই আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। শিল্পিসুলভ সৌজন্য সহকারে তিনি আমায় নিয়ে বসালেন তাঁর সুন্দর ড্রইং-রুমখানিতে। দু'-চার কথার পরেই আমাদের ভেতর চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হলো। আমি প্রশ্ন করে চললাম, তিনি দিয়ে চললেন উত্তর।

আমার প্রশ্ন শুনে বিকাশ বাবু ধীরে ধীরে বলতে থাকেন 'অভিযাত্রী' ছবিতেই আমি প্রথম অবতীর্ণ হই, সে অবশ্য ১১৪৬ সালে। তার পর থেকে অনেক ছবিতেই অভিনয় ক'রবার সুযোগ পেয়েছি বিভিন্ন ভূমিকায়, কিন্তু এটুকু বলবো "রত্নদীপ" ছবিতে রাখালের চরিত্রে রূপ দান ক'রে আমি সব চেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি।

এ লাইনে কেন এলুম জিজ্ঞেস করছেন? বিকাশ বাবু বলে চলেন, সত্যিই যদি ব'লতে হয়, বলবো পয়সার জন্যে। কিন্তু

শ্রীবিকাশ রায়

এসে যখন পড়লুম তখন পয়সার চেয়ে বড় হ'য়ে দাঁড়ালো শিল্পানুরাগ। মনের ভেতর এত কাল যে শিল্পপ্রেরণা লুকিয়ে ছিল তা জেগে উঠলো সুযোগ পেয়ে। আরো একটা জিনিষ আমার খাপ খেয়েছে এখানে—আমার উপর কোন মালিক নেই, আমিই আমার মালিক। এ লাইনে আসতে আপত্তি বোধ করিনি কখনও, কারণ 'Career' যেখানে গঠন চলবে সেখানে যেতে আর আপত্তি কিসের?

দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর ফিরিস্তি চাইলে শ্রী রায় বললেন বেশ খোলাখুলি ভাবে—অন্যান্য দশ জন থেকে আমি পৃথক্ মানুষ নই। আমারও স্নান, খাওয়া ইত্যাদি কাজ নিত্যই রয়েছে। স্যুটিং-এর দিনে বাড়ী থাকা চলে না এবং এক বার বেরুলে কখন যে ফেরা যাবে সে সময় অনির্দ্দিষ্ট। এ দিনগুলোতে বাড়ীর কাজ কর্ম্ম ইচ্ছে থাকলেও করার উপায় নেই। আজ-কাল ছবি প্রযোজনা করতে গিয়ে সময় আরও একেবারেই পাইনে। বিশেষ 'হবি' ব'লতে আমার আছে বই পড়া। মাসিক পত্র-পত্রিকা ব'লতে তেমন কিছু পাবি না। বই পড়ার ব্যাপারে অবিশ্যি আমি সর্ব্বভুক। সব বই পড়তেই ভালবাসি, তার ভেতর বিশেষ করে নাটক।

গল্প-কবিতা লেখার এক কালে অভ্যাস ছিল, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছে। রেডিওর জন্যে আমি কখন কখন নাটকও লিখেছি। খেলাধূলোর সখের ভেতর ক্রিকেট খেলাটাই আমার দেখতে ভাল লাগে।

পোষাক পরিচ্ছদের রুচি সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো, বিকাশ বাবু বলে চললেন, পরিধেয় যতটা সাদা-সিদে হয় ততই ভাল বলে আমি মনে করি। সাধারণতঃ ধুতি-পাঞ্জাবীই আমি পরে থাকি আজ-কাল। শীতের দিনে গরম প্যাণ্ট, জামা না পরে উপায় কি?

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি উপাদান অত্যাবশ্যক জানতে চাইলুম আমি। স্মিত হাস্যে শ্রীরায় জবাব দিলেন, চলচ্চিত্র জগতে আসতে হলে প্রথমেই চাই বরাত, দ্বিতীয় হচ্ছে সামান্য অভিনয়-ক্ষমতা। বাঙ্গালা দেশে অভিনয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এক দিনেই দক্ষ অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়া যায় না। অথচ অভিনয় শিখবার সুযোগের অভাবে নোতুন প্রতিভা এলাইনে কম আসছে।

শ্রীবিকাশ রায় এখানেই থামলেন না। উত্তরটিকে টেনে নিয়ে আবও বললেন,—অভিনয়ে যদি কুশলতা অর্জ্জন ক'রতে হয় যে চরিত্রে অভিনয়ের ডাক থাকবে তা'তে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যেতে হ'বে। যেখানে তা সম্ভব হয় সেখানেই শিল্পীর সার্থকতা ও সাফল্য। অপর দিকে ভাল ছবি তৈরীর জন্য সর্ব্বাগ্রে যেটি প্রয়োজন সে হচ্ছে ভাল গল্প। তার পর বড় কথা, চাই গুণী ও রসজ্ঞ পরিচালক।

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? এ প্রশ্নটি যখন আমি তুলে ধ'রলুম বিকাশ বাবুর কাছে; অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তিনি উত্তর করলেন—তার স্থান যথেষ্ট উঁচুতে হওয়া উচিত। পূর্ব্বে যাত্রা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু আজ আর তা নেই। এখন চলচ্চিত্রই লোক-শিক্ষার একটা প্রধান মাধ্যম। এর ভেতর দিয়ে দেশের রাজনৈতিক চেতনাও জাগিয়ে তোলা সম্ভব। অবশ্য এ দায়িত্ব সরকারের।

আমার সর্ব্বশেষ প্রশ্ন—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চান?—বিকাশ বাবু তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বললেন—প্রথম জীবনে লেখাপড়া করেছি—আইন পাশ করে ওকালতীও করেছি। তার পর কত জায়গায়ই তো চাকরি করলুম—এখন এসেছি এ লাইনে।

দর্শক-সাধারণ যত দিন আমার অভিনয় ভালবাসবে তত দিন এ লাইনেই থাকবো, আমার সঙ্কল্প। শিল্পী বিকাশ রায়, অভিনেতা বিকাশ রায় যদি মরে গেল, তবে আমার বেঁচে থাকা অপ্রয়োজনীয়। আমি মরে যাবার পরেও সকলের মনেই আমি থাকি এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা।

ক্ষুদ্র ও মহৎ

কুমারী রেখা দেবী

মাটীর প্রদীপ জ্বলে, পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদয়—
যার ফলে এক কালে সব স্থান আলোকিত হয়।
প্রদীপের শিখা কাঁপে বাতাসের পরশ লাগিয়া,
ভয় নাই ভয় নাই বলে চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া!

তোমার ভিতরে আছে প্রচ্ছন্ন সে বিরাট আলোক,
আপনারে বিরাট ভাবিয়া সংবরণ কর ক্ষুদ্র শোক!
ক্ষুদ্র অস্তিত্বের গ্লানি আপনার ক্ষুদ্র চিন্তা ফল,
প্রসারিত বিরাট চিন্তায় মন হয় বিরাট সবল!

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেহেরুর প্রাইভেট সেকটারের জয়

"পণ্ডিত জওহরলাল এই দুইয়ের এক খিচুড়ী পাকাইয়া মিশ্র অর্থনীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে টাকাটা দিবে রাষ্ট্র, খাটাইবে ধনিক। টাকা যদি জলে যায় তো রাষ্ট্রের গেল, দেশের লোকের ক্ষতি হইল। লাভ যদি না-ও হয়, তবু ধনিকের ক্ষতি নাই। কারণ টাকা নাড়াচাড়া করিলে তাহার খানিকটা পকেটে টানিয়া আনিবার সহস্র ছিদ্র তাহার জানা আছে। লোকসান যদি হয়, তবে রাষ্ট্র তাহা মিটাইবে, কিন্তু লোকসানের দায়িত্ব যাহার সেই ধনিক তাহার পারিশ্রমিক ঠিক আদায় করিয়া লইবে। এই মিশ্র অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত নামে কথিত ধনিক-পরিচালিত কারবারে লাভ-লোকসানের দায়িত্ব, টাকা আনিবার দায়িত্ব, যথার্থ ভাবে প্রতিষ্ঠান চালাইবার দায়িত্ব, কোন দায়িত্বই ধনিকের নাই। শুধু নিঃস্বার্থ ভাবে কিছু টাকা পকেটস্থ করিয়া লওয়াই তাহার একান্ত কাম্য। এই অপূর্ব্ব অর্থনীতি জওহরলালজীর আবিষ্কার এবং তাঁহার সুযোগ্য দুই দক্ষিণ ও বাম হস্ত শ্রীদেশমুখ ও শ্রীকৃষ্ণমাচারী বিশ্বের এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করিবার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু দেশের লোক কুলাইতেছে না। বিদেশের ধনিককুলও এই পরমাশ্চর্য্যের খবর পাইয়া ভারতে আসিয়া ভীড় করিতেছে এবং আমাদের পার্লামেন্টের এই ত্রিমূর্ত্তির সামনে চামচ তুলিয়া ধরিতেছে। ইঁহারা মুখে বলিতেছেন পাবলিক সেকটার চাই, কিন্তু আসলে শিল্প-প্রসারের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেকটারের কাছে নতি স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। যে অর্থনীতি তাঁহারা চালু করিয়াছেন, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও কল্পনা করিতে পারে নাই। দায়িত্ব আছে ক্ষমতা নাই, সে ছিল নবাব; ক্ষমতা আছে দায়িত্ব নাই, সে ছিল কোম্পানী,…আর এদের বেলায় ক্ষমতা আছে দায়িত্ব নাই, টাকা দেয় গৌরী সেন, লোকসান পরের, লাভটা আমার। পার্লামেন্টের চেম্বারে শ্রীদেশমুখের ভাষণ ও তাঁহার চারি পাশে ধনিককুলের গুঞ্জন শুনিয়া মনে হইল, কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলিয়া লাভ নাই, নব-সোস্যালিষ্ট জওহর রাজ্যে প্রাইভেট সেকটারের বড় জোর ভাল।"

—দৈনিক বসুমতী।

বিহারে অপপ্রচার

"এইরূপ প্রচারকার্য্য জামতাড়া সম্মেলনে প্রথম শোনা গেল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা প্রথম নহে। গোপন-সঞ্চারী পথে এইরূপ অপপ্রচারের অভিযান অনেক দিন আগে হইতেই চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সন্নিহিত বিহারস্থ বাঙ্গলাভাষী অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবী অকাট্য যুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া বিহার সরকার গোপন পথে এই দাবীর মূলে আঘাত হানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিহারের মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গভুক্তি ঘটিলে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের যে কি নিদারুণ দুর্দশা ঘটিবে তাহারই মিথ্যা বর্ণনা গোপন প্রচারে পরিচালিত হইয়াছে। প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা যায়, এখন মোটামুটি ছয় সাতটি বিষয় লইয়া এই অপপ্রচার চলিতেছে:—(১) এই সকল অঞ্চল পশ্চিম-বাঙ্গলায় আসিলে সমস্ত জমিজমা উদ্বাস্তুরা পাইবে, বাড়ী-ঘর-দুয়ার তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। (২) মানভূমের অধিবাসীদের মানভূম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে; (৩) আদিবাসী মাহাতো, কুর্মী, হরিজন প্রভৃতিদিগের আরও দুরবস্থা ঘটিবে, বাঙ্গলার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীরা ইহাদের আরও শোষণ করিবে; (৪) স্থানীয় লোক আর কোন চাকরী পাইবে না বা কাজকর্মের সুযোগ পাইবে না; (৫) শিক্ষায়তন, হাসপাতাল প্রভৃতিতেও অনুরূপ অবস্থা ঘটিবে, স্থানীয় লোকেদের কোন স্থান মিলিবে না; (৬) গোটা পশ্চিম-বাঙ্গলার মধ্যে এই সকল অঞ্চল অবহেলিত হইয়াই পড়িয়া থাকিবে, কোন উন্নতি হইবে না; (৭) পশ্চিম-বাঙ্গলার ভূমির ব্যবস্থায় এই সকল অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; পশ্চিম-বাঙ্গলায় প্রস্তাব হইয়াছে, ফসলের চার আনা পর্য্যন্ত খাজনা ধার্য্য হইতে পারে; মানভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই হারে খাজনা দিতে প্রজাদিগের বিশেষ কষ্ট হইবে, তাহা ছাড়া এখানকার বিশেষ আইনগুলিও উঠিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত মন্তব্যগুলি সর্বৈব অপপ্রচার।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

কাটজুর অপরাধ নিবারক আইন

"সরকারী কর্মচারী ও পদস্থ ব্যক্তিদের মানহানির মামলা সরকারী মামলা হিসাবে গণ্য করিয়া তাঁহাদের মামলার সমুদয় ব্যয় সরকারী তহবিল হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা ফৌজদারী কার্যবিধির সংশোধন প্রসঙ্গে ডাঃ কাটজু ইতিপূর্বেই করাইয়া লইয়াছেন। উহা মুখ্যতঃ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইবে। অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী বা মন্ত্রীদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনার মুখ বন্ধ করার জন্য উহা রচিত হইয়াছে। এখন আবার আদালতে প্রমাণযোগ্য অপরাধের কারণ না পাইলেও কেবলমাত্র সন্দেহ ক্রমেই বিনাবিচারে যখন তখন যে কোন লোককে আটক রাখার ব্যবস্থা আরও তিন বৎসর চালু রাখিতে গিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার হরণের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা হইবে। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে, কিংবা দুর্বৃত্ত দমনে সরকার

যে সকল বিশেষ ক্ষমতা হাতে লইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উঠে নাই, কারণ উহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং কর্মপদ্ধতিও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কিন্তু যে আইন রাজনৈতিক বিরুদ্ধ দলের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে এবং কার্যতঃ তাহা হইয়াছেও, বিশেষতঃ যাহার অপব্যবহার অসম্ভব নহে, সে আইনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর প্রতিবাদ থাকিবেই।" —যুগান্তর।

কংগ্রেসের সশস্ত্র নির্ব্বাচন-অভিযান

"কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করার উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। কিন্তু জনসাধারণ যাহাদের গদিচ্যুত করিয়াছে নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া তাহাদের পুনরায় গদিতে বসাইবার জন্য রাষ্ট্রশক্তির এ রকম প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ প্রয়োগ ইতিপূর্ব্বে কমই দেখা গিয়াছে। অন্ধ্রের আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসীরা কি পন্থা অনুসরণ করিবে এই ঘটনা তাহারই ইঙ্গিত। জনসাধারণের সমর্থন হারাইয়া ভোটে জিতিবার জন্য ক্রমেই তাহারা আরও প্রকাশ্য ও বেপরোয়া ভাবে রাষ্ট্রশক্তিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিবে, গর্গেয়-পুরমের মত আরও বহু স্থানে নিজেদের বেসরকারী গুণ্ডাদল ও সরকারী পুলিসের বন্দুকের সাহায্যে বিরোধীপক্ষকে দমন ও পরাস্ত করার চেষ্টায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। এই পথ সুগম করার জন্যই যে অন্ধ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতনের পর বিরোধী পক্ষকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ না দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা হইয়াছে একথা আজ আর বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্ধ্রের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে শাসন ক্ষমতা হারাইবার ভয় কংগ্রেসীদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা জানে, এই রাজ্যে তাহারা গদি হারাইলে সারা ভারতে কংগ্রেসী নাগপাশ ছিন্ন হইবার দিন আরও আগাইয়া আসিবে। তাই গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির সমস্ত মুখোশ ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহারা নগ্ন সন্ত্রাসের সাহায্যে ক্ষমতা দখলে রাখার উন্মত্ত চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসীদের এই ক্ষিপ্ততা তাহাদের দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা সকল প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার ও আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। উন্মাদ মাত্রই সমাজের পক্ষে উপদ্রব-বিশেষ। কিন্তু সেই উন্মাদের হাতে যখন বন্দুক থাকে তখন সে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কংগ্রেসীরাও আজ বন্দুকধারী উন্মাদের মত সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে নিরাপদ করার জন্যই আজ এই উন্মাদদের সংযত করা প্রয়োজন। গর্গেয়পুরমের ঘটনা হইতে সমস্ত গণতন্ত্রকামীকে এই শিক্ষাই লইতে হইবে।"—স্বাধীনতা।

স্রেফ ষ্টান্ট

"শকুন্তলা নাটক অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন জহরলাল। চা খাওয়ার ইচ্ছা হইল। গেলেন রেস্তোরাঁয়। পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন পয়সা নাই। পাশে ছিলেন কাটজু। তাঁহার নিকট চাহিলেন। তাঁহারও পকেট শূন্য। তখন একজন কর্ম্মচারীর নিকট পয়সা ধার করিয়া চায়ের দাম দিলেন। এই সংবাদ কাগজে ফলাও করিয়া প্রকাশ করিবার কারণ কি? ইহাই কি লোককে জানানো হইতেছে যে জহরলাল এবং কাটজু বিনা পয়সার চা খান না, অন্ততঃ অন্য কেহ তাঁহাদের পয়সাটা দিয়া দেন?" —যুগবাণী।

নেতৃবৃন্দের দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে

"নেতৃবৃন্দের দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে সকল শক্তি একতাবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নেতৃস্থানাভিষিক্ত করিয়াছিল, একমাত্র তাহারাই আজ আবার এ দুর্য্যোগ কাটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু পার্টি ফাণ্ডের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া এবং স্বার্থসন্ধী চাটুকারদের তোষামোদে স্ফীতকায় হইয়া ইঁহারা আজ এই সকল ভূতপূর্ব্ব সহকর্মীদের নানা ভাবে শাসাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রাচীন কালে গ্রীকগণ বলিত—ভগবান যাহাদের মারিতে চান, তাহাদিগকে আগে তিনি উন্মাদ করিয়া দেন। ক্ষণিকের ক্ষমতায় উন্মত্ত এই নেতৃবৃন্দের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় স্বয়ং ভগবানই বোধ হয় ইঁহাদিগের নেতৃত্বের অবসান ঘটাইতে চান। এবং সেই জন্যই বোধ হয় এইরূপ হইল! এবং সেই জন্যই বোধ হয়—যে সকল রাজনীতিক ও অরাজনীতিক শক্তি সংঘবদ্ধ হইয়া ইঁহাদিগকে নেতার পদে আসীন করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া ইঁহারা নিজেদের ধ্বংসের পন্থা নিজেরাই প্রস্তুত করিতেছেন। আর ফিরিবার সময় আছে কি না বলা বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু নেতৃবৃন্দ শেষ চেষ্টা এখনও করিয়া দেখিতে পারেন। বাঙালীর সম্পদে, বাঙালীর শক্তিতে, বাঙালীর শৌর্য্যে, বাঙালীর বীর্য্যে বাঙলা দেশ গঠনের ব্রত দুষ্কর হইলেও সেই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। নেতৃবৃন্দ এই দুঃসাধ্য ব্রতের শপথ গ্রহণ করিলে বাংলাদেশ হয়ত এখনও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারে। কালের ঘণ্টা বাজিয়া যাইবার পর সমস্ত আফশোসই বৃথা হইবে; এবং এই নেতৃবৃন্দ সুবর্ণ সুযোগ হাতে পাইয়া শুধু যে তাহাকে হারাইলেন তাহা নহে, এই কয় বৎসরে বাঙালী জাতিকে যে পরিমাণে পিছাইয়া দিলেন,—মহাকালের অধীশ্বর কখনও তাহাকে ক্ষমা করিবেন না।"

—নিশানা (কলিকাতা)।

নেতা ও অভিনেতা

"অভিনেতাদের অভিনয় কিয়ৎক্ষণের জন্য। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। থিয়েটারে অভিনেতাদের ব্যাপার সম্যক্ অবগত নহি। গ্রামে যাত্রার অভিনয় সময় যাহাকে দেখিয়াছি যক্ষরাজ কুবের সাজিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের ধনরত্নের কর্ত্তা সাজিয়া কত দেমাক ও বক্তৃতা করিয়া সবকে চমৎকৃত করিলেন, দলের ম্যানেজারের নিকট কাতরকণ্ঠে পরদিন প্রাতঃকালেই বলিতে শুনিয়াছি—বাবু /০ এক আনার মুড়িতে কিছুই হয় না, এই এক আনাকে ছয় পয়সা করে দয়া করে, নইলে খিদেয় বড় কষ্ট হয়। নেতা বাহাদুরদের মধ্যে দেখা গিয়েছে—গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যাঁহারা পৃথক পৃথক বিভাগের মন্ত্রী হইয়া লোকের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া নির্ব্বাচনে কাৎ হইয়া গদী হারাইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ মূলগায়েনের শ্রীপদ ধারণ করিয়া পদ লাভ করিয়াছেন, আর যাঁহারা ফ্যা ফ্যা করিয়া বেকারের দলে নাম লিখাইতে বাধ্য হইলেন, তাঁহাদের দশা যাত্রার দলের কুবেরের মতই। দেশের শাসন ও শৃঙ্খলার জন্য নেতানামধারী যাঁহারা আইনসভার সদস্য হইয়াছেন, তাঁহারাও যেমন দায়িত্ব ও স্থায়িত্বহীন তেমনি তাঁহাদের তৈরী আইনও স্থায়িত্বহীন। মানুষের তৈরী আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রহসন দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা ও নিয়ন্তা ভগবানের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্থায়ী পদ্ধতি স্মরণ

করিয়া কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন যে "চিরশৃঙ্খলা" গান লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠকগণকে শুনাইবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

হিন্দীভাষার বাধ্যবাধকতা

"হিন্দীভাষা তথা রাষ্ট্রভাষা প্রচারক রথীদের সর্ব্বাগ্রে হিন্দীভাষার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হওয়া উচিত কারণ যে ভাষা বাক্য বিন্যাসে সাহিত্য প্রাচুর্য্য লাভ না করে বা বা মৌলিক কাব্য ও বিজ্ঞান কলার পরিভাষা সৃষ্টি করিতে না পারে তাহার উপর সাধারণতঃ কেহ আকৃষ্ট হয় না। ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ অমরনাথ ঝা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বোম্বাই প্রাদেশিক হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে উৎসাহী হিন্দী প্রচারকদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা আছে, প্রত্যেক ভাষাতেই বৃহৎ ও বিভিন্ন সাহিত্য রচিত হইয়াছে। এইসব ভাষা ও সাহিত্য হিন্দীভাষীদের ঠিক সেইরূপ নিষ্ঠায় অনুশীলন করা উচিত। ডাঃ ঝা বলিয়াছেন দুঃখের বিষয় হিন্দীভাষীরা অন্যের উপর আপন ভাষা চাপাইতে যতটা ব্যস্ত অন্যের ভাষা না শিখিতেও ঠিক ততটাই উদাসীন। এই কারণেই তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতেছে, তাহারা মনে করিতেছে যে হিন্দী প্রচার করা সমস্ত প্রাদেশিক মাতৃভাষা নিধন করিয়া আসল ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত। ডাঃ ঝা আরও বলিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যান্ত আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত এবং অনিচ্ছুক জনসাধারণকে জবরদস্তি করিয়া হিন্দী শিখাইবার নীতি তিনি পছন্দ করেন না। বিহার সরকার ঝার উপদেশগুলি অনুসরণ করিয়া যদি রাজ্যের বাংলাভাষীদের মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন ও বাংলা ভাষাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে হিন্দী ভাষায় এমনই বুৎপত্তি অর্জ্জন করিবে যে হিন্দীভাষীরা তাহাতে একদিন ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবেন।"

—নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি

"শিক্ষা, দীক্ষায় উজ্জ্বল যুবক আজ বাঁচিবার মত পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত সক্ষম যুবকও আজ অর্থ উপার্জ্জনের উপায় না পাইয়া বেকার জীবন যাপন করিতেছে। এই যে অবস্থা ইহার জন্য কি কেবল ইহারাই দোষী? দোষ দেওয়া যাইত যদি সরকারী কর্ম্মে নিয়োগের আহ্বানে ইহারা সাড়া না দিত। কিন্তু সে কোন একটি পদের চাকুরীর জন্য হাজার জন প্রার্থী ঝাঁপাইয়া পড়ে। তথাপি আমরা যদি বলি ইহারা কর্ম্মে অনিচ্ছুক তবে তাহা সত্যের অপলাপ মাত্র। সরকার ইচ্ছা করিলেই দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার মোড় ফিরাইতে পারেন। পশ্চিম-বাঙ্গালা আজ আয়তনে ছোট কিন্তু ইহার অর্থ ও জনসংখ্যা ক্ষুদ্রের পর্য্যায়ে পড়ে না। কিন্তু এক অতি বিচিত্র অবস্থায় ইহার অর্থনীতির চাবি কাঠি নিজ দেশের হাতে নাই। দেশে অর্থের লেন-দেন আছে কিন্তু অর্থ নাই। কারণ মানুষ দরিদ্র। জনশক্তির অসীম অপচয়ে তাহা দেশের কাজে লাগিতেছে না। দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে জনশক্তি নিঃশেষ হইতেছে। সরকার সতর্ক ও সচেষ্ট হইলে এই অবস্থার মধ্যেও

দেশের চেহারা বদলাইয়া দিতে পারিতেন। ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহা লাভজনক তাহা যদি সরকারী চেষ্টায় লোকসমাজের কারবারে দাঁড়ায় তবেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত গলদ কোথায়। ইহারই সুযোগ অপরে ষোল আনা এই দেশে গ্রহণ করিতেছে এবং দেশের লোক দারিদ্র্যে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। ইহা অতি সহজ বিষয়। দেশের প্রতি সামান্য চোখ মেলিয়া চাহিলেই প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিলে দেশ ও দেশবাসীর প্রতি দৃষ্টি সহজে পড়ে না। তাই বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনা হীন একটা হট্টগোলের পথে দেশের অর্থনীতি চলিয়াছে যাহার সহিত দেশের সাধারণ জীবনযাত্রার সম্বন্ধ ও সংযোগ নাই। এই অর্থ নীতি বজায় রাখিয়া কোন কল্যাণই দেশে সম্ভবপর নহে।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শাসকশ্রেণীর সদুদ্দেশ্য !

"জমির খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্নে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়নকর আইনের খসড়াও স্মরণ রাখিতে হইবে। একমাত্র বিরোধী দলগুলির বিরতি হীন বিরোধিতার ফলেই ইহা এখনও আইন হইতে পারে নাই। আইন-সভার আগামী অধিবেশনে ইহা আসিবে। এই আইন অনুযায়ী, রাস্তা, ক্যানেল, স্কুল এমন কি সরকারী ক্লাব পরিচালনার খরচ পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী জমির উপর উসুল হইবে। শহরের অধিবাসীদেরও নিস্তার নাই। প্রতি বৎসর উন্নয়ন লেভী এবং এককালীন থোক ক্যাপিট্যাল লেভী আদায় হইবে। ক্যানেলের ক্ষেত্রে একর-প্রতি ১০৲ টাকা ও এককালীন কয়েক কিস্তিতে বিঘা-প্রতি ৫০৲ টাকা ধরা হইয়াছে। অবশ্য আইনে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, সরকারী হাকিমরা মন্ত্রিমণ্ডলীর নির্দ্দেশে যেমন ইচ্ছা করিতে পারিবেন। খাজনার ক্ষেত্রেও যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই, আদালতের কোনও অধিকার থাকিবে না। ইহার সঙ্গে স্মরণ রাখুন, নেহরু-বিধান সরকারের মার্কিণ উপদেষ্টা বার্ণ ষ্টাইনের সুপারিশ, বিশেষ করিয়া তাঁহার দুইটি টিপ্পনী উল্লেখযোগ্য। প্রথম—ফসলের মূল্যের অনুপাতে দেশের সমস্ত চাষীর ব্যয় বৃদ্ধি দেখা চলিবে না। দ্বিতীয় নূতন ক্যানেল বা অন্য কাজের জন্য যেরূপ কর আদায় হইবে, পুরাতন ক্যানেল, রাস্তা ইত্যাদিও সেইরূপ ভাবে এখন তৈয়ারী করিতে গেলে কিরূপ খরচ হইতে পারে তাহা হিসাব করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে কর আদায় করিতে হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং শাসকশ্রেণীর এই সব 'সদুদ্দেশ্য' বুঝিয়াই জনসাধারণকে আগামী দিনের আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্তকে বুঝিতে হইবে—তাঁহার শূন্য ভাণ্ডারে প্রসারিত হস্ত কাহার? দরিদ্রতর দেশবাসীর কিংবা দেশী বিদেশী শাসক শ্রেণীর?" নূতন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র

"মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক দলাদলি তীব্র। মেদিনীপুরের মুকুটহীন সম্রাট দেশপ্রাণ শাসমলের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নেতা আজ কোন দলেই নাই। তাই শত্রু পক্ষের সুবিধা হইয়াছে প্রচুর। খাল, বাঁধ, রাস্তা ঋণের দরখাস্তের মিথ্যা স্তোক বাক্যে অজ্ঞ জনগণের নিকট হইতে টীপ সহি সংগ্রহ করিয়া কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইতেছে। উড়িষ্যায় যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া টীপ দিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নানা মিথ্যা প্রচার প্রলোভন ও ঘুষ চলিতেছে। উড়িষ্যা সরকার সক্রিয় ভাবে এই আন্দোলনকে সাহায্য ও সমর্থন করিয়া আসিতেছে। অপর দিকে বিহারের অন্তর্গত আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী সীমান্ত ধলভূম এলাকায় পঞ্চায়েতী প্রথায় বাঙালীদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন অত্যাচার চালাইয়া "নাজী" সরকারের অত্যাচারকেও হার মানাইয়াছে। জনগণ সন্ত্রস্ত। নৈতিক মেরুদণ্ড চুরমার হইয়া গিয়াছে। মানভূমের লোকসেবক-সঙ্ঘের প্রভাবে সেখানের জনগণের সত্য ভাষণের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস রহিয়াছে কিন্তু ধলভূমে তাহার অভাব দেখা যায়। তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙালা, এই কথা বলিতেও তাঁহাদের অনেকেই অন্ধকারের সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ান। মহকুমার মধ্যে উড়িষ্যা সরকারের ষড়যন্ত্র মহকুমার বাহিরেই বিহার সরকারের অত্যাচার আমরা দৈনন্দিন শুনিয়া আসিতেছি। সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া পশ্চিম বাংলার ন্যায্য দাবী যাহাতে রক্ষা পায় তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে ও অগ্রণী হইতে দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছি। সমস্ত দলাদলি ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিলেই এই সকল অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘুচিবে।" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

জমিদারী উচ্ছেদের পর

"বাংলার জমিদারী উচ্ছেদ, সারা ভারতের জমিদারী উচ্ছেদের সহিত এক মাপকাটিতে যাচাই করা চলে না। কংগ্রেসী ষ্টীম-রোলারের কল্যাণে সারা ভারতের অনুসৃত-নীতির যূপকাষ্ঠে বাংলার জমিদারগণকে বধ করা হইল। এই তথাকথিত মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের মধ্যে যে কত সহস্র অভাগা পথের ভিখারী হইয়া সন ১৩৬২ সালের বৈশাখ হইতে স্বাধীন বঙ্গে একটা ভারতে আইন-সৃষ্ট উদ্বাস্তু হইয়া পড়িলেন সে কথা বোধ হয় ভূমি-সংস্কারে অত্যুৎসাহী সরকার চিন্তাও করিলেন না বা তাঁহাদের সে চিন্তা করিবার ক্ষমতাও নাই। এক শত বিঘার উপর ভূমি দখলকারী মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট রিটার্ণ গ্রহণ করা শেষ হইয়াছে, এই বার এক শত বিঘার উপর জোতদারবৃন্দের এবং কোর্ফাদারগণের উপরও নোটিশ জারী হইবে। বড় আশা করিয়া দেশ জমিদারী উচ্ছেদ চাহিয়াছিল। প্রজাগণের জমির খাজনা বিঘা প্রতি গড়ে চারি আনা হইতে দুই টাকা দেওয়াই তাহাদের পক্ষে কষ্টকর। ভবিষ্যতে সরকারী রাজস্বের ভবিষ্যৎ আভাসে তাহারা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। নিষ্কর ভূ-সম্পত্তির খাজনা ধার্য্য হইবে। সরকারী ক্যানেল-কর ইউনিয়ন বোর্ড রেট, মিউনিসিপ্যাল রেটও আদায়যোগ্য থাকিবে। আজ সরকারী আইনে এই আমূল ভূমি-সংস্কার অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিবৃন্দ চাহেন কি না তাহাই এক মূল সমস্যা ও প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ জনমতের বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপেক্ষার বস্তু নহে। যাহা দেশবাসীর অন্তরের কাম্য নহে, শুধু সারা ভারতের কোন অনুসৃত নীতি ধরিয়া বিবিধ আইন প্রণয়ন করিয়া দেশের বা জাতির উন্নতি বিধান করিতেছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ যে সর্ব্বস্থলে জাতির বা জাতীয়তার উন্নতি বিধায়ক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতের মধ্যে বাংলার একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং বাঙ্গালী ভারতের যে একটা পৃথক জাতি, ইহাও যদি আজিও আমাদের শাসকবর্গ না বুঝিয়া থাকেন তবে আর কি বলিব?" —রাঢ়দীপিকা (রামপুরহাট)।

তরুণ বাঙালী অধ্যাপকের সম্মান লাভ

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য এম, এস, সি গত ১৬ই অক্টোবর বোম্বাই হইতে জলপথে পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে ভূতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও প্রথম বিভাগে অনার্স সহ বি, এস্, সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া ১৯৪৯ সালে ভূতত্ত্বে এম্, এস্, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ইনি এই বৎসর পশ্চিম-জার্ম্মাণ সরকার প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ইনি ক্লাউষ্টেলে Institute of mining-এ গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রীডার শ্রীকেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের জামাতা। আমরা তাঁহার গবেষণার সাফল্য কামনা করি।

শোক-সংবাদ

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রবিবার ১২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর কিরণদা'র জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের শেষভাগে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যাঁহারা সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, শ্রীকিরণচন্দ্র মুখার্জি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি মাণিকতলা বোমার মামলার আসামী, পরবর্ত্তী কালে উদ্বোধনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে খ্যাত স্বর্গত দেবব্রত বসুর সংস্পর্শে আসেন। কিরণচন্দ্র বন্দে মাতরম, যুগান্তর, সন্ধ্যা ও নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সহকারী ছিলেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথের সহিত তিনি যুগান্তর পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় পরবর্ত্তী কালে স্বামী নিরালম্ব নামে পরিচিত যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিরণচন্দ্রই প্রথমে বোমা প্রস্তুত প্রণালী যুগান্তর কাগজে প্রকাশ করেন। 'পন্থা' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশের জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আত্মগোপন করিয়া থাকা কালে বালুরঘাটে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী তাঁহাকে গ্রেপ্তার না করা পর্য্যন্ত তিনি গুপ্তদলের কাজে স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তীকে সাহায্য করেন। পরে তাঁহাকে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুযায়ী আটক করিয়া মেদিনীপুর জেল, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল ও হাজারীবাগ জেলে রাখা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর সারভেণ্ট পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করায় তিনি পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে সাহায্য করেন। পরে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গত কুন্তল চক্রবর্তী ও চারু ঘোষ এবং শ্রীজীবনলাল চাটার্জির সহিত তিনি দৌলতপুর সত্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীনাথ সাহা স্যার চার্লস টেগার্ট-এর পরিবর্তে ভ্রম বশতঃ আর্নেষ্ট ডে-কে হত্যা করিলে ১৯২৪ সালে শ্রীঅরুণ গুহ, সতীশ চক্রবর্তী ও অন্যান্যের সহিত তাঁহাকে পুনরায় ৩ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁহাকে বহিষ্কার করা হয় এবং তিনি বিশাখাপত্তনমে অবস্থান করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইলে তিনি পুনরায় দৌলতপুর আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পূর্ব পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে দেউলী বন্দী-শিবিরে রাখা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি সরস্বতী লাইব্রেরীর ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৫ সালে মুক্তিলাভের পর যুবকদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রজ্ঞানন্দ পাঠগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রদেশে রাজনৈতিক মহলে তিনি 'কিরণ-দা' নামেই পরিচিত ছিলেন।

গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী

১৮৯১ সালে এলাহাবাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। শ্রীবাজপেয়ী ১৯২১ সালে কূটনীতিক-রূপে দেখা দেন। ১৯২১-২২ সালে তিনি লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স ও ওয়াশিংটনে অস্ত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারীরূপে কাজ করেন। ভারত সরকার ১৯৩০-৩১ সালে লণ্ডন গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। বিভিন্ন সম্মেলনে বৃটিশ অভিমত যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করায় ১৯৩৫-৩৬ সালে এবং ১৯৪০-৪১ সালে বড়লাটের শাসন পরিষদে তাঁহাকে গ্রহণ করা হয়। তিনি বৃটিশ সরকারের কিরূপ আস্থাভাজন হইয়াছিলেন তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্বাসন সংস্থায় তাঁহাকে ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগে। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি ওয়াশিংটনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও এজেন্ট জেনারেল নিযুক্ত হন। ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলে শ্রীবাজপেয়ী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের দাবীর কথা বলিতে থাকেন। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে সেক্রেটারী-জেনারেল থাকার সময়ে তিনি ১৯৪৮-৪৯ সালে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিরোধ পেশ করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ও ১৯৫১ সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টারূপে গিয়াছিলেন। ১৯৪৯ সালে ভারত সার্বভৌম সমাজতন্ত্র ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিলে শ্রীবাজপেয়ীর উপর বৃটিশ কাঠামোর অবসান ঘটাইয়া ভারতকে কমনওয়েলথের সদস্যরূপে রাখিবার সূত্র উদ্ভাবনের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। ১৯৫২ সালে তিনি শ্রীমহারাজ সিংহের স্থলে বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ বম্বেতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়

বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট জমিদার অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উত্তরপাড়াস্থ বাসভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা মুখার্জ্জী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে শিল্পিমনের প্রতিভার উন্মেষ হয়। তিনি একজন সুদক্ষ আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন এবং তাঁহার গৃহীত চিত্র ক্যালকাটা ফটোগ্রাফি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিত্র প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি বিজড়িত উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের কিউরেটর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরপাড়ার বহু জনহিতকর সংস্থার সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, ৩ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতিনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ জে, পি, শ্রীবাস্তব

সুবিখ্যাত শিল্পপতি ও সংসদ-সদস্য ডাঃ জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ২১শে অগ্রহায়ণ শেষ রাত্রি ৪টা ১০ মিনিটে লক্ষ্ণৌয়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি তদানীন্তন বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। গত দুই মাস যাবৎ তিনি উচ্চ রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। ডাঃ শ্রীবাস্তব-এর পত্নী, দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা বর্ত্তমান।

শঙ্করীতোষ ঘটক

চন্দননগর-খ্যাত স্বর্গত সন্তোষকুমার ঘটক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশঙ্করীতোষ ঘটক ২রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভোর ৫-৩০ মিনিটে ১৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল। পরিচিত লৌহ-ব্যবসায়ী মহলে পরলোকগত ঘটক সদালাপ, অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতির

দ্বারা সকলকে আকৃষ্ট করিতেন। কলিকাতার বিখ্যাত লৌহ প্রতিষ্ঠান কে সি ঘটক এণ্ড সন্স লিমিটেড, কুসুমিকা আয়রণ ওয়ার্কস লিমিটেড, কুসুমিকা কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড, ঘটক প্রপার্টিজ কোম্পানী লিমিটেড এবং জ্যোতি টকীজ (চন্দননগর) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অন্যতম ডিরেক্টর।

মহারাণী লীলা দেবী

ময়মনসিংহের স্বগত মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের বিধবা পত্নী মহারাণী লীলা দেবী তাঁহার ৩নং আলীপুর পার্ক প্লেসস্থিত কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে লীলা দেবীর বয়ঃক্রম ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুই পুত্র শ্রীসুধাংশু আচার্য ও শ্রীস্নেহাংশু আচার্য বার-এ্যাট্-ল এবং তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীস্নেহাংশু আচার্য তাঁহার মাতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিই মহারাণীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

আমরা এই সকল মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৈল চিত্র)

মুখশ্রী

—অরবিন্দ দত্ত অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

পৌষ, ১৩৬১]

[৩৩শ বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

(স্থাপিত ১৩২৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "তাঁর বিষয়ে কে বিচার করে বুঝ্‌বে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য কি বুঝ্‌বে? তাঁর কাৰ্য্যই বা কি বুঝতে পারবে? তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে, কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না। শুধু বিচার কল্লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধন না কল্লে, তপস্যা না কল্লে, তাঁকে পাওয়া যায় না। 'ষড়দর্শনে দর্শন মেলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে'।"

"তাঁকে দর্শন কত্তে হলে সাধন চাই। বিচার করে শাস্ত্র পড়ে তাঁকে জানা যায় না। তাঁর কাছে যেতে হবে। যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' শুন্‌তে পাবে। যতক্ষণ ঈশ্বর থেকে দূরে ততক্ষণ কেবল কোলাহল। তাঁর কাছে গেলে তিনি কি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারবে। সমুদ্র দূর হতে হু হু শব্দ কচ্চে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্চে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্চে, দেখ্‌তে পাবে।"

"তাঁর বিষয় জান্‌তে গেলে সাধন চাই। সাগরের জল পান কল্লে তবে তাতে লবণ আছে বুঝ্‌তে পারা যায়। কৰ্ম্ম চাই তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখ্‌লাম। দেখি একজন লোক পানা ঠেলে জল নিচ্চে, আর জল হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে— জল স্ফটিকের মত। যেন দেখালে যে, পানা না ঠেল্লে জল দেখা যায় না। সচ্চিদানন্দ পানাতে ঢাকা। তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন, কিছু জান্‌তে দেন না। কামিনীকাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে, সেই তাঁকে দেখ্‌তে পায়। তাঁকে দর্শনের পর, বিচারশাস্ত্র সায়েন্স সব খড় কুটো বোধ হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম প্রসঙ্গ

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

২২শে অগ্রহায়ণ, ১২৯১···

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঋষি বঙ্কিমের জীবনেও চির-স্মরণীয়।

শোভাবাজার, বেনেটোলার ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেনের বাড়িতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বছর দেড়েক পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন অধর। সে দিন থেকেই অধর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। কলকাতায় ভক্তদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এসেই উৎসব···কথামৃত···কীর্তন। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অনেকেই। এসেছেন সাহিত্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। তিনিও ডেপুটি। অধরের বিশেষ বন্ধু। জনসাধারণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখনও তেমন প্রচারিত না হলেও, তখনকার ইণ্ডিয়ান মিরর, ধর্মতত্ত্ব, সুলভ সমাচার, সংবাদ-প্রভাকর, প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করে শিক্ষিত সমাজের অনেকেই জেনেছেন। বঙ্কিমও জেনেছেন। এসেই বঙ্কিমচন্দ্র অধরকে বললেন, "ওঁর কথা কাগজে পড়েছি, লোকের মুখেও শুনেছি। আজ ওঁর নিজের মুখেই শুনবো। ওঁকে বুঝতে চেষ্টা করবো। তুমিই আজ এ মহা সুযোগ দিলে।"

আসরে বসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—এ পাশে রাখাল ও পাশে নিত্য নিরঞ্জন। সামনে বসেছেন অধর, বঙ্কিম, ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল—ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক। চতুর্দিকে অতিথি অভ্যাগত জন। কথামৃতপিপাসু ভক্তগণ। বঙ্কিমের হাটুতে হাত রেখে, শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে অধর সসম্ভ্রমে বললেন, "ইনি আমার বন্ধু বঙ্কিম চাটুয্যে। আপনাকেই দর্শন করতে এসেছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক অনেক বই লিখেছেন। উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, জীবনী—অনেক ভাল ভাল বই।"

চোখ বুজে "বঙ্কিম" বলেই বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কার হাতে পড়ে বেঁকলে গা?"

বঙ্কিমচন্দ্রও মৃদু হেসে বললেন, "হাতে নয়, বেঁকেছি ইংরেজের বুটের ঠোকরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ও সব ভাবি নি। বঙ্কিম শুনেই মনে পড়লো বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের কথা। শ্রীকৃষ্ণ বেঁকেছিলেন প্রেমে। ভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমে কৃষ্ণের মনের জড়তা ঘুচলো, দেহের কাঠিন্য কোমল হলো—অনেকে বলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম। নবনী-কোমল তনু। নয়ন-মোহন।"

"কালো কেন? দেখতে মানুষের মতো এইটুকু কেন?" বঙ্কিম সাগ্রহে বললেন, "জানিনে তো। বলুন, শুনি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "অনেক দূরে, তাই। যতক্ষণ দূরে ততক্ষণ কালো। এইটুকু। সমুদ্রের জল দেখছো নীল। নীল-ই কি? কাছে যাও, হাতে তুলে দেখ। নীল নয়। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো। দূরে থেকে সূর্য্য এতটুকু। কাছে যাও—বিরাট, অনন্ত। ভগবানও তেমনি। দেখলে জানা যায়, কালো নয়, এইটুকুও নয়। জ্যোতির্ময় বিরাট পুরুষ। এ চোখে দেখা যায় না। সমাধিতে দেখা যায়। সাধন চাই। ভালোবাসা চাই। প্রেমে বেঁকে যাওয়া চাই। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বোধাতীত ভাব, তদগত চোখ, তন্মনস্ক মন—তখন সমাধি। তখন দর্শন, শ্রবণ, আনন্দ।" সবাই আগ্রহে শুনছিলেন। বঙ্কিমও।

ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ বলছিলেন, "কি জানো, জ্ঞানের অভাবেই এই বহুরূপের মরীচিকা। আসলে ভেদ নেই। যতক্ষণ ভেদজ্ঞান ততক্ষণ 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান। ততক্ষণ নাম রূপ পরিচয়। এ-ও মিথ্যা নয়! অনিত্য। এ-ও তাঁরই খেলা। তাঁরই লীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ। বিরাট পুরুষ। শ্রীরাধা তাঁরই শক্তি। তাঁরই আত্মপ্রকাশ প্রকৃতি। জলের তরল ভাব। প্রকাশানন্দের উচ্ছ্বাস। দুটো নয়। একই। অভেদ···অভিন্ন।"

বঙ্কিম বললেন, "মশায়, ধর্মপ্রচার করেন না কেন? এ সব কথা সকলেরই শোনা দরকার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, "প্রচার? ধর্মপ্রচার? অহঙ্কারের চরম। মানুষ কতটুকু? জানেই বা কতটুকু? প্রচার করেন স্বয়ং ভগবান। তাই তিনি গড়েছেন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারা, জ্যোতির্মণ্ডল। ধর্মপ্রচার করা মানে তো ভগবানকে প্রকাশ করা। সোজা কথা? তাঁকে জানলে তবেই না প্রকাশ করবে? আবার তিনি কৃপা করে জানতে না দিলে জানাও যায় না। ভগবান নিজেই সে লোক বেছে নেন। নিজেই কৃপা করে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন তাকে চাপরাশ পরিয়ে বলেন, 'এবার বলগে যা।' চাপরাশ ছাড়া, বলতে যাও, কেউ মানে না, মনেও রাখে না। সব ফাঁকা আওয়াজ। চাপরাশ চাই। চাপরাশ পেতে সাধন-ভজন চাই। আগে তাঁকে জানা চাই। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা। তাঁকে জানলে সবই জানা যায়। তখন বলা যায়। প্রকাশ করা যায়। প্রচার করা যায়। নইলে নয়। নিজেই যে জানে না সে আবার অপরকে কি জানাবে? নিজেই শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে!"

শ্রদ্ধাবনত শিরে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে বঙ্কিম একাগ্র চিত্তে ভাবছিলেন,—সত্যই তো, ধর্মপ্রচারক পত্রিকা লিখেছেন—"তাঁদের নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহু দিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই"···(ধর্ম্ম-প্রচারক—৬-৮-১৮৮৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমের দিকে একটু এগিয়ে বসে বললেন, "হ্যাঁ গা বাবু, তুমি তো অনেক পড়েছো, অনেক লিখছো। আমি কিছুই পড়িনি, মুখ্যু। মা যা বলান বলি। আমায় বল তো মানুষের কর্তব্য কি? শ্রেয়: কি? কি তার সঙ্গে যাবে মরার পরেও? জন্মান্তর মান তো?"

বঙ্কিম মাথা তুলে বললেন, "জন্মান্তর? আছে না কি?"

"নেই? বল কি গা? জন্মান্তর নেই? আত্মজ্ঞান লাভের পর অবশ্য আর পুনর্জন্ম হয় না। তার আর জন্মান্তর হয় না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান না হয়, ঈশ্বরকে জানা না হয়, ততক্ষণ বারংবার তাকে এ জগতে ফিরে আসতেই হবে। অব্যাহতি নেই। এদেরই জন্য জন্মান্তর। তত্ত্বজ্ঞান যাঁর পূর্ণ হয়েছে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না। সিদ্ধ ধানের আর অঙ্কুর গজায় না।

তেমনি মানুষও যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, মানে সাধনার ফলে পুর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। মায়ার খেলায় তাঁদের আর প্রয়োজন হয় না। তাঁরা আর এ খেলা খেলতে পারেন না, খেলুড়েদের সঙ্গে মিশতেও পারেন না।"

বঙ্কিম শুধালেন, "কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওঁরা কাম-কাঞ্চনাসক্তি থেকে মুক্ত যে। ওতে আর ওঁদের মনই বসে না। এখানকার খেলা তো কাম-কাঞ্চন নিয়েই।" বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষণকাল নীরবে থেকে বললেন, "কেশবও (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) ঠিক এই কথাই বলেছিল, জন্মান্তর আছে না কি? তাকে বলেছিলাম, কুমোরেরা মাটির হাঁড়ি রোদে শুকাতে দেয়। তার মধ্যে পাকা হাঁড়িও থাকে, কাঁচাও থাকে। ওখান দিয়ে গরু-টরু চলে গেলে ওগুলো কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা যে কটা ভাঙ্গে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়। ও আর কাজে লাগে না। কাঁচা যেগুলো ভাঙ্গে, কুমোর তাদের আবার লয়। নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়। আবার নতুন হাঁড়ি তৈরী করে, হাটে পাঠায়। এও তেমনি। যতক্ষণ না পেকেছে, মানে যতক্ষণ জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে পাকা না হয়েছে ততক্ষণ নিস্তার নেই। আবার চাকে, আবার হাটে। জন্মান্তর থেকে মুক্তি তখন যখন পেকেছো, মানে ঈশ্বরকে জেনেছো—মানে পুর্ণজ্ঞান লাভ করেছো। পুর্ণজ্ঞান মানে মায়াতীত জ্ঞান। আত্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান।"

উপস্থিত এক ভক্ত প্রশ্ন করলেন, "তখন আর তাঁরা এ জগতে থাকেন না?"

"থাকেন কেউ কেউ। ঈশ্বরই তাঁদের রাখেন।"

"কেন? তাঁদের দিয়ে এখানকার খেলা চলে না, বললেন।"

"ঈশ্বর তাঁদের রাখেন, লোকশিক্ষার জন্য। তাঁরই কাজের [illegible] ওই প্রচারের জন্য। যেমন ছিলেন, শুকদেব, নারদ, বুদ্ধ, [illegible] লোকশিক্ষা, লোককল্যাণ, সত্যপ্রচারের জন্য।" বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমের দিকে ফিরে শুধালেন, "তা হলে বল বঙ্কিম, [illegible] কর্তব্য কি? তোমার কি মনে হয়?"

সবাই বঙ্কিমের দিকে তাকালেন। কি বলেন বঙ্কিম—[illegible] চোখে জিজ্ঞাসা। শক্তিমান প্রতিভা তো! স্রষ্টা···দ্রষ্টা··· আনন্দমঠের ঋষি বঙ্কিম!

জ্ঞান প্রকাশের আগ্রহ সম্পূর্ণ চেপে রেখে, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই এই শাশ্বত জিজ্ঞাসার উত্তর শুনতে বঙ্কিম সহাস্যে বললেন, "আহার [illegible] শয়ন এখন বলেই তো আমার মনে হয়।"

কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে বঙ্কিমের [illegible] শুনে অনেকেই বিস্মিত হলেন। অধর সভয়ে মাথা [illegible]লেন। দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন ধ্বনি সবলে চেপে রেখে, বঙ্কিম [illegible] সহাস্যে শুধালেন, "তাই নয় কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "ছি ছি ছি—তুমি জ্ঞানী হয়ে [illegible] বলছো! যা কর তাই বলছো। মূলো খেলে ঢেকুরে [illegible] গন্ধই ওঠে—রসুন খেলে রসুনের গন্ধ বেরোয়। [illegible] না বলবে আর! ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করলে তবে না [illegible] বলা যায়। সাধন-ভজন ছাড়া শুধু বই পড়া জ্ঞানে [illegible] জানবে? বিবেক-বৈরাগ্য না এলে কি-ই বা বুঝবে? [illegible] জ্ঞান কি জ্ঞান গা? এ সব অজ্ঞান। মোহ।"

সবাই চুপ। নিঃশ্বাসেরও শব্দ নীরব। অন্তরের চরম জিজ্ঞাসা কণ্ঠে, অনুসন্ধানী চোখে বঙ্কিম তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। শুনতে ব্যাকুল···উৎকর্ণ হয়েছিলেন—কি বলেন এই স্বভাব-জ্ঞানী দেব-মানব!

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "অনেকেই ভাবে, সব সময় ঈশ্বর-ফীশ্বর খুঁজে বেড়ানো পাগলামো। এরা বে-হেড। ভাবে, আমরাই তো বেশ আছি; খাই দাই মজা লুটি। খুব চালাক। কাকও খুব চালাক। খুব চতুর। সকাল-সন্ধ্যা ছটফট করে বেড়ায়—কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে। খুঁজছে কোথায় গু, পচা গলা···"—স্তব্ধ মুগ্ধ বঙ্কিমের জানু স্পর্শ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আর—"

বঙ্কিমের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। শিরায় শিরায় যেন একটা উত্তাপ-প্রবাহ ছুটে গেল। বঙ্কিম অধীর আগ্রহে শুধালেন, "আর?"

"যারা ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করে, যারা কাম-কাঞ্চনাসক্তির কবল থেকে মুক্ত হতে অবিরাম ব্যাকুল প্রাণে কাঁদে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ-সম্ভোগ লালসা ছেড়ে ঈশ্বরের শরণাগত হয়, তারাই যথার্থ জ্ঞানান্বেষী। তাদের স্বভাব হাঁসের মতো। দুধে জল মিশিয়ে দাও, জল থেকে দুধটুকু বার করে খাবে। জলটা খাবে না। এ জ্ঞান ঈশ্বরই দেন। যে যে রকমটি চায়, তাকে তিনি ঠিক তাই দেন। মানুষের কর্তব্য এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা। ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া। দেখতে সাধনা করা। এই জ্ঞানই পরা-জ্ঞান। বিজ্ঞান। মানে বিশেষ জ্ঞান। আর সবই অপরা-জ্ঞান। মানে অজ্ঞান। অবিদ্যা।" বলে শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমের জানু স্পর্শ করে সস্নেহে শুধালেন, "তুমি চটে যাচ্ছো গা বাবু?"

বঙ্কিম হাত জুড়ে বললেন, "আজ্ঞে না, আপনি বলুন। আরও বলুন। মিষ্টি কথা আমি অনেক শুনেছি—আজ আমি শিখতে এসেছি।"

ভাব-মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাম-কাঞ্চনেই ডুবে রয়েছে সংসার। ও সব মায়া। মায়াই ঈশ্বরকে আমাদের চোখের আড়াল করে রাখে। আত্মজ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি ছাড়া এ থেকে অব্যাহতি নেই। মনের পশুভাব বিনাশ করতে না পারলে জ্ঞানের আনন্দ লাভ করা যায় না।"

বঙ্কিম শুধালেন, "তবে কি সংসার ত্যাগ করতে হবে?"

"ত্যাগ করবে কেন? সংসারেই থাক। আসক্তি ত্যাগ কর। কাম-কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করে থাক। সংসার তাঁরই গড়া। এ-ও তাঁরই লীলা। তাঁকেই স্মরণ করে চল। বড় লোকেদের বাড়ীর ঝিয়ের মতো। মনিবের ছেলে-মেয়েকে আদর করে বলে, 'আমার খোকন, আমার যাদু'—মনে কিন্তু জানে ওর কেউ নয়। ওর বাড়িও এখানে নয়। তেমনি। সংসারে থেকে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী ত্যাগী। তখন আর সে লোকালয়ে থাকে না। যারা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ-ত্যাগ করে বনে যায় তারা তো ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করবেই। করবে বলেই তো বেরিয়েছে। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার ত্যাগ করেছে। যারা এদের ত্যাগ না করেও গৃহীর কর্তব্য পালন করে ত্যাগীর মতো অনাসক্ত মনে ঈশ্বর স্মরণ করতে পারে, তারাই তো বীর। তাদের প্রতিই ঈশ্বরের কৃপা সব চেয়ে

বেশী। কামাসক্তির জন্য কাঞ্চনাসক্তি। টাকা-কড়ির মোহে মানুষের মন ছোট হয়ে যায়। ভগবানকে ভুলে যায়। টাকা-পয়সায় বাড়ি গাড়ী লোক-মান্য লাভ হয়। ভগবানকে পাওয়া যায় না। ও দুটোই মায়া। মায়ার প্রভাবেই মোহ। মোহে বুদ্ধিনাশ—তাতেই বিনাশ।"

বঙ্কিম বললেন, "কিন্তু টাকা-পয়সা না থাকলেও চলে না তো। চারটে পয়সা থাকলে তবে না একটা গরীবকে সাহায্য করা যায়। টাকা না থাকলে ইচ্ছা থাকলেও কারও দুঃখে দয়া করা যায় না, দান করা যায় না। দান করা পরোপকার—এ সবও ত্যাগ করতে বলেছেন কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ মুচকি হেসে বললেন, "দান দয়া পরোপকার—মানুষের সাধ্য কি তা করে। পারে না। বলাও বৃথাই বড়াই করা। দম্ভ। অহঙ্কার"

বঙ্কিম শুধালেন, "করে না মানুষ? পারে না?"

দৃঢ় কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "করে না' পারেও না। দান দয়া পরোপকার সবই জগদীশ্বর ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। তাঁরই ইচ্ছায় হয়। যাঁর সৃষ্টি তিনিই রক্ষা করেন। যখন ইচ্ছা বিনাশও করেন। খাওয়া-পরার জন্য সংসারীর উপায় করা প্রয়োজন। অবর্তমানে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য সঞ্চয়ও প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধেই তা করবে। সঞ্চয় করে না পক্ষী আর দরবেশ। সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী। সংসারী তা নয়। সে উপায় করবে না বলছি না তো। সৎপথে সদুদ্দেশ্যে উপায় করবে। আসক্ত হবে না। সব কিছুই কর্তব্যবোধে অনাসক্ত হয়ে করবে। ফলাফল ভালো-মন্দ ভগবানের পায়েই সমর্পণ করবে। ভাববে, 'তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,' 'তিনিই প্রভু, আমি দাস।' 'তিনিই ঘর, আমি ঘরণী'। একেই বলে নিষ্কাম কর্ম। যে নিষ্কাম হয়ে দান করে, দয়া করে, পরোপকার করে সে নিজেরই উপকার করে। শুধু মানুষেই নয়, জীব, জন্তু কীট, পতঙ্গ সকলের মধ্যেই ঈশ্বর অধ্যস্ত রয়েছেন। সবার মধ্যে তিনি রয়েছেন বলেই সেবা দয়া দান পরোপকার তাঁরই সেবা। তাঁরই কাজ। কর্তব্য পালন। অনাসক্ত হয়ে এ ভাবে কাজ করাকেই গীতা বলেন কর্মযোগ। ভগবানকে জানার এও একটা পথ। কিন্তু শক্ত পথ। খুব শক্ত। মূলে তাঁরই ইচ্ছা, তাঁরই দয়া। তাঁর সৃষ্টি রক্ষার জন্য তাঁরই ব্যাকুলতা। তুমি দয়ালু হও বা না হও কেউ না কেউ হবে। যে বাঁচবার তাকে কেউ না কেউ বাঁচাবেই। তাঁর কাজ আটকায় না। তিনিই করান, মানুষ করে। তিনিই বলান, মানুষ বলে।" বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃত-মধুর কণ্ঠে গাইলেন—

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"—

"তাই বলি বঙ্কিম, মানুষের কর্তব্য তিনিই সর্বশক্তিমান বোধে তাঁরই শরণাগত হওয়া। ব্যাকুল হয়ে তাঁকেই ডাকা। যে তাঁকে পেয়েছে, সে সবই পেয়েছে—কি আর চাইবে তখন? জগতে একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য শাশ্বত আনন্দময়। তাকে পাওয়াই সব কিছু পাওয়া।···কেউ কেউ বলেন, পুঁথি পুরাণ না পড়লে ঈশ্বরকে বুঝাও যায় না, জানাও যায় না। তাঁরা বলেন, আগে জগৎ বুঝবে তবে না জগদীশ্বরকে বুঝবে। তুমি কি বল বঙ্কিম? কাকে জানবে আগে? সৃষ্টিকে না স্রষ্টাকে? জগৎকে না জগন্নাথকে? লীলাকে না লীলাময়কে?"

বঙ্কিম বললেন, "যাকেই আগে জানা প্রয়োজন হোক, জানতে বুঝতে হলেই যোগ্য জ্ঞান চাই। জ্ঞানার্জন করতে হলে শাস্ত্রগ্রন্থ পুঁথি পুরাণ পড়া প্রয়োজন বই কি?"

"তোমাদের ওই এক কথা। আমি বুঝি, ঈশ্বর আগে তারপর আর সব! তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা। তাঁকে ডাকলে, একমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হলে, তাঁরই কৃপায় জ্ঞান-সূর্য্যোদয় হয়। তখন আর অজ্ঞান-অন্ধকার থাকে না। দীপটি জ্বললে হাজার বছরের অন্ধকার ভরা ঘর মুহূর্তে আলোকিত হয়। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হলেন। রামায়ণ লিখলেন। জ্ঞান কোথায় পেলেন? বই পড়ে? না তো। পেলেন ধ্যানে। কার ধ্যান? রামের। পরমব্রহ্ম রাম। তাঁরই নাম জপ করবেন তো? তাও নয়। জপের আঁখর হলো 'মরা'। রামকে জানতে, রামের লীলা বুঝতে, রামায়ণকার জপ করলেন—'মরা'। কি ওর মানে? 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। 'ম' আগে 'রা' পরে। 'ম'কে জানলেই 'রা'কেও বুঝা যায়। এক জানলেই সব জানা হয়। একেরই দ'ম। একের পিঠে পঞ্চাশটা শূন্য বসাও, অনেক হলো। এক বাদ দাও, শূন্যই শুধু থাকলো। ওই এককে আগে জানো। যা কিছু চাই, তাঁরই' কাছে চাও। তোমার চাওয়া আন্তরিক হলে নিশ্চয়ই তিনি দেবেন। দেবেন-ই, এ বিশ্বাস থাকা চাই। অটল বিশ্বাস। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর'—মানা চাই। সরল মনে মানা চাই। যার বিশ্বাস নেই তার ভক্তি নেই। যার ভক্তি নেই —তার ভালোবাসা নেই। ভালোবাসা নেই তো ভগবানও নেই। একান্ত ভালোবাসাতেই তিনি ধরা দেন। ভগবান ভক্তাধীন। অবিশ্বাসী থেকে তিনি অনেক দূরে। অবিশ্বাসই অন্ধকার—অজ্ঞান। জ্ঞান চাও তো চাই ভগবানের ক্ষমতায় বিশ্বাস—ভগবানের জন্য অনুরাগ। হনুমানকে না মানো তার বিশ্বাসটুকু মানো। রাধাকে না চাও তার অনুরাগটুকু নাও।" বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ভক্ত ত্রৈলোক্যকে বললেন. —"একটা গাও না গা—গাও।"

ত্রৈলোক্য দল-বল নিয়েই এসেছিলেন। ইঙ্গিত মাত্রেই বেজে উঠলো মৃদঙ্গ মন্দিরা। মধুর-কণ্ঠ ত্রৈলোক্য সুর ধরলেন। ভক্তের কণ্ঠে অনুরাগের উচ্ছ্বাস। ছন্দে ছন্দে ভাবের তরঙ্গ। জমে উঠলো। ভাবাবেগে গায়ক বাদক শ্রোতা সবাই উঠে দাঁড়ালেন—শ্রীরামকৃষ্ণও। আঁখর দিতে দিতে নাচতে লাগলেন—চতুর্দিকে ভিড়—নাচতে নাচতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। স্থাণুর মতো অটল। মুদ্রিত চক্ষু। অধরে মৃদু হাসি—যেন কি দেখে আনন্দে বিভোর। আননে প্রশান্ত তৃপ্তির আলো, উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তের মুদ্রায় যেন কোন্ অদৃশ্য প্রেমাস্পদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ!

ভিড় ঠেলে অতি কষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে এগিয়ে এলেন বঙ্কিম। সমাধিস্থ ভাব কখনও দেখেননি বঙ্কিম! শুনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ ভাব-সমাধি হয় সংবাদপত্রাদি পাঠেও জেনেছেন। আজ দেখলেন। আজ এত কাছে, দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের অনির্বচনীয়

জ্যোতির্ময় সমাধিস্থ রূপ প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমের আত্ম-সচেতন মন যেন এক অপূর্ব আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো।

গান থামলো। প্রেমাশ্রু-সজল চোখে সকলেই নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মকল্যাণ প্রার্থনা জানিয়ে ধীরে ধীরে যে যার স্থানে বসলেন। ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়ে চতুর্দিকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, "ভক্ত ভাগবত ভগবান—জ্ঞানী যোগী ভক্ত সব সব···সবারই চরণে নমস্কার। বারংবার বহু বার নমস্কার।"

বিমুগ্ধ বঙ্কিম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘেঁষে বসে হাত জুড়ে বিনীত নম্র কণ্ঠে বললেন, "কৃপা করে বলুন, কি উপায়ে প্রাণে ভক্তি আসে—আসে বিশ্বাস ভালোবাসা অনুরাগ!"

সস্নেহে বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে বচনাতীত বাৎসল্য-মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "বলেছি তো, অবোধ শিশুর সারল্য চাই। প্রাণে সন্তানের দাবী চাই। শিশু যেমন মায়ের জন্য কাঁদে তেমনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে ভগবানকে পাওয়া যায়। ডুবে যাও। উপরে ভাসলে কি পাবে বল? গভীরে ডুবে যাও। জলের গভীরে রয়েছে রত্ন···রাশি রাশি অঠেল রত্ন মণি মাণিক্য। চাও তো ডুবে যাও।"

বঙ্কিম বললেন, "ফাতনায় বাঁধা তো আমরা, ডুবতে পারি নে যে!"

"পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। কিসের ফাত্‌না, কিসের বন্ধন? কৃপাময় তিনি। তাঁর নাম নাও। নাম আর নামী অভেদ। নাম নাও, নামে ডুবে যাও। যাই কেন না চাও তাই পাবে।" বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্নর-কণ্ঠে গাইতে লাগলেন:—

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম-রত্ন-ধন।
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।
ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌ জন।
কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব রে গুরুর শ্রীচরণ।

কোনো এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুকে

নির্ম্মলকান্তি চক্রবর্তী

জীবনের দিকে ফিরে ফিরে আজ দেখি;—
যতখানি তার পিছে চলে গেল
আর ফিরে আসবে কি!
বহু দিন আর বহু রাত আর বহু অতন্দ্র ক্ষণে
সবার জীবনে জীবন মিশিয়ে
বেঁচেছি পরাণ পণে।
সে বাঁচায় ছিল অনেক আশার
আকাশের মত নীল
স্বচ্ছতা, আর ছিল রঙ্‌ ঝিল্‌মিল্‌
সবুজ পরাণ;—কানায় কানায় ভরা,
হাসিতে খুসিতে টল্‌মল্‌ ছিল
সে দিন আমার ধরা।
তার পরে আজ জানিনে কেমন করে
সে জীবন কোথা দৃষ্টি-সীমার
বাইরে গিয়েছে সরে,
এখন কেবল হু-হু করে হাওয়া।
ধূ-ধূ করা বালুরাশি শুষ্ক দিনের শূন্যতা দিয়ে
জীবন ফেলছে গ্রাসি';
এ-দিকে ও-দিকে কোথাও দেখি না
সবুজ-সম্ভাবনা।
নীরব নিথর জগতে কেবল
মৃত দিনগুলি গোণা,
জীবনের দামে কেনা জীবনের রুজি,
এইটুকু শুধু বাকী আছে;—আর
বাকী কিছু নেই বুঝি?
কখনো বা ভাবি,—এ শুধু আমার
পাগলামী, খাম্‌-খেয়ালী।
অথবা কেবল বড়-কথা ভরা,
অথবা শুধুই হেঁয়ালী।

কিন্তু জানিস্‌! আমি তো একা নয়,—
আমরা যে দলে লক্ষে লক্ষে আছি—
রসচোষা আর কাঠফাটা এই
মাটিটার কাছাকাছি।
এই মাটিটায় বুক দিয়ে আর
কান পেতে তুই শোন্‌,—
শুনতে পাবৃবি কোটি মানুষের অশ্রুত ক্রন্দন।
এদেরও জগত এক কালে ছিল
হাসিতে-খুসিতে ভরা,
এদের বুকের সবুজে হয়েছে
হরিৎ,—ধূসর ধরা।
সেই বুকে আজ ওঠে হাহাকার,
ওঠে রাতে আর দিনে,
অন্নদাতারা অন্ন খুঁটছে ফুটপাথে ডাষ্টবিনে।
মাথার ওপরে চালা নেই, আর
পায়ের তলায় মাটি।
তবুও আমরা মানুষ,
আমরা জীবনের পথ হাঁটি।

* * *

এখানে এখন শীতের দুপুরে
আতপ্ত রোদ নামে।
বহু দূর ওই নীল আকাশের
চেয়ে থাকি ডান্‌-বামে।
উড়ে চলে যায় চিল—
ডানায় ডানায় ঢেউ খেলে যায়
কাঁচা রোদ ঝিল্‌মিল।
ভরে যায় দুই চোখ,—
ভুলে যাই যেন ক্ষণেকের তরে
বহু নিরাশার শোক।

পৃথিবী মধুর! সত্যি,—জানিস্‌
এটা বিধাতার দান!
এরেও আবিল করে দিল ওরা—
নর-রূপী শয়তান!
ওই—ওরা, যারা চট্‌কলে পাটকলে
মনুষ্যত্ব আর মানুষেরে
রোজ দুই পায়ে দলে।
ভুলতে পারি না ভাই,
পিঁপড়েটাকেও সৃষ্টি করতে
"আল্লা"—একটা চাই!—
সেই আল্লার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি
"মানুষ"এর মত প্রাণী,
ডাষ্টবিন্‌ থেকে ভাত খুঁটে খায়—
হায় রে,—এ রাজধানী!

* * *

আর লিখব না,—থাক। বোধ হয়
তোর ভাল লাগছে না।
সাম্যবাদের গন্ধ আসছে, ঠিক যেন চেনা-চেনা।
ঠিক না?—বুঝেছি।
অথচ জানিস্‌?—বিস্ময় লাগে এই,
আমি কোন দিন জীবনে কখনো
কম্যুনিষ্ট দলে নেই।
তবুও কেন যেন ভাবনা এম্‌নি ধারা
বহু আনমনে ক্ষণে আমাকেও
করেছে আত্মহারা —
আমারি মতন এই পৃথিবীর
আরও বহু-কোটি লোক
এমনি করেই ভাবছে,—মেলছে
বিস্মিত দুই চোখ!

বিনয়ের রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণ

শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ

বৈদেশিক দুঃ-শাসনের নিষ্পেষণে ও তীব্র কশাঘাতের মর্ম্ম-বেদনায় এবং অবাধ শোষণে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত, ক্লেশ-জর্জ্জর, দুঃখপীড়িত ধ্বংসোন্মুখ বঞ্চিত জাতির শাসন-সংযত কঠের অব্যক্ত মর্ম্মান্তিক বেদনায় অধীর হইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সব শক্তিধর অগ্নিশিশু শৃঙ্খলিত.ভারতের স্বৈর শাসনের অবসান করিয়া নবীন প্রগতিশীল এক অত্যুজ্জ্বল ভারত গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নে উন্মাদ হইয়া প্রাণ-বহ্নির প্রচণ্ড শক্তিতে অগ্নি-নলিকার গর্জ্জনে ভারতের মুক্তি আনয়নের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প লইয়া দুশ্চর সাধনায় যে সব রক্তক্ষয়ী বীর—অস্থিপঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া দিয়া রক্তস্বাক্ষরে বিশ্বের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, বিপ্লবী বিনয় বসু স্বাধীনতা-যজ্ঞে তাঁহাদের অন্যতম আহুতি।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর শহীদ-তীর্থ বঙ্গভূমির বৈপ্লবিক ইতিহাসে তাহারই পুনরাবর্ত্তিত একটি স্মরণীয় দিবস। এই দিনটিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রাচ্যের শাসন-কেন্দ্র কলিকাতার রাইটার্স্ বিল্ডিংস্এ খণ্ড-যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া যে আশ্চর্য্য সাহসিকতার পরিচয় বিনয় দিয়া গিয়াছেন, বিপ্লববাদের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে; দধীচির রুধির-সিক্ত অস্থির লেখনীতে যে দিন ভারতবর্ষের মুক্তির ইতিহাস রচিত হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার দুঃসাধ্য তপস্যার জীবনালেখ্য ও জীবনেতিহাস একটি মূল্যবান অধ্যায়ের সাক্ষ্য-স্বরূপ; আত্মবিস্মৃত তমসাচ্ছন্ন জাতির মহা ঘুমঘোর ভাঙ্গারই ইতিহাস; আত্মোৎসর্গের এমন মহান্ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

১৯৩০এর ২৯শে আগষ্টের কথা, বিনয় তখন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিকের ছাত্র; সুগঠিত, প্রিয়দর্শন, বলিষ্ঠ দেহ, খেলাধুলায় অত্যন্ত পারদর্শী। সমগ্র ভারতবর্ষে এই সময় আইন অমান্য. লবণ সত্যাগ্রহ ও পিকেটিং চলিতেছে; বাঙ্গলায় তখন নৃশংসতাপূর্ণ হিংস্র পুলিশী চণ্ডনীতির দুঃসহ অত্যাচার চরম পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে; দেশময় প্রবল উত্তেজনা। নবাবপুরে মদের দোকানে পিকেটিং চলিবার সময় পুলিশ-সুপার স্বেচ্ছাসেবকদের উপর নির্ম্মম ভাবে লাঠি-চার্জ্জ করিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই সময় ধর্ম্মঘট করিতেছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে পিকেটিং চলিতেছে; কুখ্যাত পুলিশ-সুপার হড্‌সন্ সাহেব সেখানেও পাঠান সৈন্য দ্বারা লাঠি-চার্জ্জ করাইলেন; লাঠির নির্ম্মম আঘাতে সেখানেই অজিত ভট্টাচার্য্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বীরের শয্যা রচনা করিলেন। বিনয় ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্এর সদস্য; বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকে হড্‌সনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

বিনয় অগ্নি-নলিকার মুখে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের বজ্রাদপি সুকঠোর ও দুর্জ্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ঠিক এই পটভূমির পরিস্থিতিতে বাঙ্গলার তদানীন্তন পুলিশ-ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হড্‌সনএর সমভিব্যাহারে মিটফোর্ড হাসপাতালে জনৈক রুগ্ন পুলিশ-কর্ম্মচারীকে দেখিতে যাইয়া বারান্দায় সিভিল সার্জ্জনের সহিত আলাপ-আলোচনায় রত ছিলেন; বিনয় বেলা নয় ঘটিকার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে জনাকীর্ণ হাসপাতালের বারান্দায় লোম্যান সাহেবকে রিভলবারের গুলীতে হত্যা করিয়া হড্‌সনকে গুরুতর ভাবে আহত করেন। সকলে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত। কোন সাড়া-শব্দ নাই; নীরব, নিস্তব্ধ চারি দিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা. গুলীর ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। বিনয় শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজের মাথার খুলি নিজেই উড়াইয়া দিবার জন্য মাথার খুলি লক্ষ্য করিয়া ট্রিগার টানিলেন; সব কয়টি গুলী নিঃশেষ হইয়া গেল কিন্তু খুলিতে বিদ্ধ হইল না। হাসপাতালের কন্‌ট্রাক্টর বিনয়কে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল; বিনয়ের সবল বাহুর কঠিন মুষ্ট্যাঘাতে সে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; বিনয় বিস্ময়কর ভাবে হাসপাতালের দেয়াল টপ্‌কাইয়া অন্তর্ধান হইলেন। তার পর এই বিদ্রোহী বীরকে ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর ঐতিহাসিক অলিন্দ-যুদ্ধে আবির্ভূত হইতে দেখা যাইবে।

বিনয়ের ২৯শে আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ণ নয় ঘটিকায় শহীদি ঐতিহ্য ভূমি বুড়িগঙ্গার তীরস্থ মিটফোর্ড হাসপাতালের বারান্দা হইতে সর্পিল গতিতে, দীর্ঘ পদক্ষেপে, দ্রুত তালে প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসের গতিপথে নূতন নূতন উপাদান সৃষ্টির ঐতিহ্য সংযোজনা করিয়া যে কণ্টকাস্তীর্ণ যাত্রা সুরু হইল, ৮ই ডিসেম্বরের দ্বিপ্রহরে মুক্তির আদি তীর্থস্থান ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর দ্বিতলের বারান্দা-যুদ্ধে তাহা সমাপ্তির পূর্ব্ব-সূচনা হইয়া ১৩ই ডিসেম্বর হাসপাতালে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

বিনয়কে ধরিবার জন্য লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হইল; প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার ফটো টাঙ্গাইয়া রাখা হইল, মেডিকেল মেসগুলিতে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী চলিল। বিনয় ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া ঢাকা হইতে কলিকাতা আসার পথে ষ্টেশন সমূহে তাঁহার ফটো ঝুলিতে দেখিলেন, কলিকাতার নানা স্থানে কিছু দিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পরে,

বিনয় বেলেঘাটায় আশ্রয় লন; পুলিশ তাঁহার সন্ধান পাইয়াছে জানিতে পারিয়া যে দিন তিনি বেলেঘাটা ত্যাগ করিলেন, সেই দিনই রাত্রিতে পুলিশ মহোল্লাসে বেলেঘাটাতে তল্লাসী চালাইয়া চরম নিরুৎসাহে ফিরিয়া যায়। এই সময় সুভাষচন্দ্র বিনয়কে বিদেশে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন কিন্তু বিনয় স্বদেশের মাটি ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে সম্মত হইলেন না।

এই সময় কলিকাতায় বিনয়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন বাদল গুপ্ত (সুধীর) ও দীনেশ গুপ্ত। বাদল বিক্রমপুর হইতে পুলিশের ওয়ারেণ্ট ফাঁকি দিয়া, সি-আই-ডি-র সতর্ক শ্যেন দৃষ্টির প্রহরা তুচ্ছ করিয়া, ছদ্মবেশে কলিকাতায় চলিয়া আসেন; দীনেশ মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক দলের সংগঠক ছিলেন; সেই সময় মেদিনীপুরে মিঃ পেডি, বার্জ ও ডগলাস্ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়; অনেকানেক বিপ্লবী দীনেশের নিকট হইতে মন্ত্রগুপ্তির দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লবীত্রয় বিনয়-বাদল-দীনেশ সকলেই ছিলেন "বি-ভী"র অফিসার এবং তিন জনই বিক্রমপুরের পাশাপাশি তিনটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। যথায়,—

"শহীদের শোণিতধারা, আর দধীচির অস্থিমজ্জা যত;
ধূলিরূপে তাহে রয়েছে মিশ্রিত।"

এর পর ৮ই ডিসেম্বর; বিপ্লবিগণ সকলেই আত্মগোপনকারী; দীর্ঘকাল অনিশ্চিতাবস্থায় অজ্ঞাতবাসে নিষ্ক্রিয় ভাবে না থাকিয়া, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুকেন্দ্র এবং স্বৈরশাসন ও শোষণের প্রধান আড্ডা রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণ করিয়া শত্রুকুল নিধন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। মহানগরীর বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর বেপরোয়া তরুণত্রয়ের যোগাযোগ ঘটিল পাইপ রোডে বেলা একটার সময়; বিনয়ের বৈপ্লবিক নেতৃত্বে তাঁহারা ট্যাক্সিযোগে রাইটার্স-বিল্ডিংস্-এর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন, বৈপ্লবিক ইতিহাসের বিস্ময়কর অধ্যায় সৃষ্টি করিতে। মূল্যবান ইউরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত স্বাস্থ্যবান সুদর্শন তিনটি যুবক রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর দ্বিতল আক্রমণ করিলেন; বিনয় দৃপ্ত কণ্ঠে জেল-ইন্সপেক্টর-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন্‌কে বলিলেন,—"Pray for your God, your last hour is come, Colonel."

যুগপৎ মহা বিপ্লবীত্রয়ের অগ্নি-নলিকা গর্জ্জিয়া উঠিল, সিম্পসন্ মেঝেতে লুটাইয়া পড়িলেন; •সেক্রেটারী টায়নাম জুডিসিয়াল সেক্রেটারী নেলসন্ প্রমুখ আই, সি, এস-পুঙ্গবগণ বিদ্রোহীদের নিক্ষিপ্ত গুলীতে গুরুতর ভাবে আহত হইলেন। বীর যোদ্ধাগণ দ্বিতলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল কক্ষেই হানা দেন; হোমমেম্বার প্রেন্সিস সাহেব আলমারীর অন্তরালে লুকাইয়া জীবন রক্ষা করিলেন; মিঃ জন্‌সন্ Rain water pipe বাহিয়া নীচে নামিয়া পলায়ন করিলেন। কেহ কেহ প্রাণের ভয়ে ফাইল-পত্র র‍্যাকের পিছনে, কেহ কেহ পড়ি কি মরি হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিয়া শার্দ্দুল-তাড়িত মেষপালের মত ভীত-ত্রাস-সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়নপর। দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশ আই, সি, এস্-পুঙ্গবদের সে দিনের সে দৃশ্য বড়ই করুণ ও উপভোগ্য; তাঁহাদিগকে পশুর মতই ভীত ও কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আক্রমণের অত্যল্প কাল পরেই পুলিশ-ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ক্রেগ; পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ড; ডিপুটি কমিশনার মিঃ গর্ডন প্রমুখের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে; আরম্ভ হইল ঐতিহাসিক যুদ্ধ; ক্রেগ সাহেব প্রাণরক্ষায় ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া আড়াল হইতে গুলী চালনা করিলেন কিন্তু গুলী ছুটিল না একটিও, টেগার্ড ও গর্ডন প্রাণ ভয়ে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করিতে লাগিলেন; হামাগুড়ি দিয়া রাইফেলধারী সার্জ্জেণ্ট বাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ দল বারান্দায় বীর যোদ্ধাদের সহিত গুলী-বিনিময় করিতে লাগিল; বিদ্রোহীত্রয় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়া কক্ষে কক্ষে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিলেন। আই, সি, এস্ অফিসারগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন; বীর যোদ্ধাত্রয়ের গুলী নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, তবু পলায়নের কোন প্রচেষ্টা নাই; শত্রুহস্তে বন্দী না হইবার জন্য সকলের সহিতই পটাসিয়াম সায়নাইড ছিল; বিনয়ের আদেশে সকলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সেই বিষ পান করিলেন।

বাদল যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরের শেষ শয্যা রচনা করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বিনয় ও দীনেশ উপরন্তু নিজেদের মাথার খুলি উড়াইয়া দিবার জন্য নিজ নিজ মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইলেন কিন্তু তথাপি তাঁহারা জীবিত রহিলেন।

বিনয় হাসপাতালে মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া মস্তকের ক্ষতে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া ঘা সেপটিক করিয়া ১৩ই ডিসেম্বর বীরের মৃত্যু বরণ করিলেন; নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়; উদ্বেল জনতাকে পুলিশ নির্ম্মম ভাবে লাঠি-চার্জ্জ করিয়াও 'শব-শোকযাত্রানুগমনে বাধা দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। বিপ্লবীদের গুপ্ত ইস্তাহারে প্রকাশিত হইল,—"Benoy's blood beckons—for more blood." দীনেশ আরোগ্য লাভ করিলেন, আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে ১৩৩১ সালের ৮ই জুলাইর ঊষার অরুণোদয়ে ফাঁসীর মঞ্চে দীনেশ হাসিমুখে জীবনের জয়গান গাহিয়া গেলেন। ট্রাইবিউনেলের সভাপতি মিঃ গার্লিক দীনেশের ফাঁসীর আদেশ দেন কিন্তু বিপ্লবীদের ক্ষমাহীন ক্রোধাগ্নি হইতে তিনি রক্ষা পাইলেন না। শেষের সে দিন তাঁহার নিকট অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উপস্থিত হইল। তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইতেই দুঃসাহসিক কানাই ভট্টাচার্য্য '৩১এর ২৮শে জুলাই গার্লিককে বিচারকের আসনেই দণ্ডদান করিয়া আর্সেনিক খাইয়া শহীদের অমর জীবন লাভ করিলেন।

রাইটার্স 'বিল্ডিংস্-এ বাঙ্গালীর শৌর্য্য, বীর্য্য ও বীরত্বের পরিচায়ক এই দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধকে Statesman পত্রিকা "Veranda-Battle" ও "Secretariat Raid" নামে তৎকালে অভিহিত করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ভারতের বিদ্রোহের ইতিহাসে বাঙ্গালীর এই মহান্ অবদান্ ও বীরত্ব চিরকাল একটি Landmark স্বরূপ হইয়া থাকিবে।

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা;
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হ'বে হারা?"

বিনয় অনন্যসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক, তাঁহার সাংগঠনিক প্রতিভা ও মনীষার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে; তাঁহার বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি স্বাধীন বুদ্ধি-দীপ্ত মনের নিজস্ব একটি জীবন দর্শনের প্রতিভা ও দীপ্ত মনীষা পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহা

তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন। অগ্নিযুগের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রূপে বিপ্লবী যুগের মহাস্ফুলিঙ্গস্বরূপ দেববল-সম্পন্ন এই মহা বিপ্লবী অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। মাতৃ-বন্ধনোন্মোচন প্রয়াসী বীর হৃদয় এই দধীচির গোপন ফল্গুধারা সন্ধানের কাহিনী; শৌর্য্য, বীর্য্য ও দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামের অপূর্ব্ব ঘটনা, তাঁহার চারিত্রিক আদর্শ জাতির প্রাণে নব আশা আকাঙ্ক্ষার জ্বলন্ত বিশ্বাস জন্মাইয়া বিরাট কর্ম্ম-চাঞ্চল্য ও নূতন যুগের অভ্যুদয়ের আশা জাগাইয়া তুলিয়াছে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর যুদ্ধে বিনয় আগ্নেয়-গিরির উত্তপ্ত বহ্নি অন্তরে বহন করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্বে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া বৈপ্লবিক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের সংযোজনা করিয়াছেন এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে রক্তের স্বাক্ষর রাখিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনয়ের বৈপ্লবিক কর্ম্ম-কীর্ত্তি আজ আধুনিক ইতিহাসের এক অতি পুরাতন অধ্যায় বটে, তথাপি পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; জাতীয় জীবনকে উহা উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া নব চেতনার সঞ্চার করিবে, তাঁহার জীবন মানব-স্বভাবের ব্যতিক্রম এক অতি বিস্ময়কর পরিণতি। আজিকার বিভ্রান্ত বাঙ্গলার পক্ষে—সর্ব্ব কালের স্মরণীয় মুক্তিসংগ্রামের সে ইতিহাস জানিয়া রাখা অপরিহার্য্য, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙ্গালী যুবকের আত্মাহুতির ইতিহাসই স্বাধীনতার ইতিহাস; বাঙ্গালীর প্রাণ-বহ্নির যে প্রচণ্ড শক্তি দেশব্যাপী যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি ভারতের গণ-মানসে যে প্রবল সাড়া জাগাইয়াছিল, তাহার ফেনশীর্ষ তরঙ্গাঘাত শেষ পর্য্যন্ত চলমান শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহাই বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের শাশ্বত ইতিহাস।

ভারতের স্বাধীনতা বাঙ্গালীর রক্তদানেরই অবদান; স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশ যেন ইহা বিস্মৃত হইতেছে। বিনা রক্তপাতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে, ইহাই আজ সমগ্র দেশকে বুঝাইবার প্রয়াস চলিতেছে; কিন্তু ইহা শুধু মিথ্যা ভাষণেই পরিপূর্ণ নহে, পরন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে অগণিত নর-নারী বুকের রক্ত দান করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মহান্ অবদানের ও আত্মাহুতির প্রতি ইহা অতি ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতাও বটে!

বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শহীদি ঐতিহ্য-ভূমি বাঙ্গলার শহীদদের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবার জন্য বাঙ্গলার বুকে সর্ব্ব প্রথমেই অহিংস কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু জনগণ আজ দধীচিদের অস্থিদানের মধ্যেই দেবত্বের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

ছবি ঃ গান

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

মনের সবুজ ঘাসে এক ফোঁটা শিশিরের স্মৃতি,
দিগন্তের এক কোণে দিনান্তের ফেলে-যাওয়া ছবি,
সকলের অগোচর নির্জ্জন নামহীন বীথি :
মেঘের আঁচলে ঢাকা জ্যোতিহীন নির্নিমেষ রবি।
এই নিয়ে আজকের হৃদয়ের ছবি হোক্ আঁকা।
না হয় নাই বা পেলে সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল বলাকা।
সহসা নিঃশেষ হোল রজনীগন্ধার মধুখরা,
বাতাসে ছড়াল স্তব্ধ ভ্রমরের নিঃসীম বেদনা।
হারানো সুরের স্বপ্নে মানস-রাগের জাল গড়া,
বসন্ত-যৌবন এল, তবু পাখী হারাল চেতনা।
এই নিয়ে আজকের এ প্রহরে সুরু হোক্ গান।
ফাল্গুনে না হয় হোল কোকিলের কণ্ঠ-অবসান।
আকাশের ফুলবনে তারাফুল ঝড়ে গেল ঝরি,
হৃদয়ের আঙিনায় শেফালিকা চ্যুত বৃন্ত হ'তে।
ঝরা ফুলে শূন্য পাত্র দুই হাতে লও পূর্ণ করি,
অভিমানে ভাসায়ো না চঞ্চলা তটিনীর স্রোতে।
এই নিয়ে আজ হোক্ হৃদয়ের মালাখানি গাঁথা।
না হয় নাই বা নিলে অমলিন পারিজাত-পাতা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
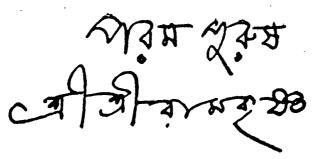
একশো চব্বিশ

'একটা চিল একটা মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছে, আর-সব চিল তাকে তাড়া করল, ঠোকরাতে লাগল।' বলছেন ঠাকুর। 'মহাযন্ত্রণা। তখন চিল করলে কি। মাছটা ফেলে দিলে মুখ থেকে। ব্যস নিশ্চিন্দি। তখন তার মহানিস্তার।'

অতএব চিল তোমার গুরু। তার থেকে শিখবে অপরিগ্রহ। শিখবে অকিঞ্চনতা।

'গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়।' বললেন ঠাকুর। 'বাণলিঙ্গ শিব খুঁজছিল একজন। কোথায় পাবে কে জানে। তখন একজন বলে দিল, অমুক নদীর ধারে যাও, অমুক গাছ দেখতে পাবে সেখানে। সেই গাছের কাছে দেখতে পাবে ঘুরণি-জল। সেই জলে গিয়ে ডুব দাও, পাবে বাণলিঙ্গ। তাই বলি, সন্ধান নিয়ে ডোবো।'

প্রথম গুরু, পৃথিবী।

কী শিখবে পৃথিবীর কাছ থেকে? আপন ব্রতে অচল থাকবার বুদ্ধি। কত উৎপাতে আক্রান্ত হচ্ছে তবু অবিচল। আর শিখবে ক্ষমা। সহিষ্ণুতা।

দ্বিতীয় গুরু, বৃক্ষ।

কী শিখবে বৃক্ষের কাছ থেকে? পরার্থে জীবন-ধারণ। কেটে ফেললেও কিছু বলে না, রৌদ্রে শীর্ণ-শুষ্ক হয়ে গেলেও জল চায় না। 'তরু যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু পানি না মাগয়।' অস্নেহে-অসেবায়ও ফলধারণ করে, আর যারা স্নেহ-সেবা করেনি, তাদেরই জন্যে করে সেই ফলোৎসর্গ।

তৃতীয় গুরু, বায়ু।

গন্ধ বহন করে কিন্তু লিপ্ত হয় না। তেমনি বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়েও বাক্য ও বুদ্ধিকে অবিকৃত রাখব। শিখব অনাসক্তি।

চতুর্থ, আকাশ।

অনন্ত হয়েও সামান্য ঘটের মধ্যে এসে ঢুকেছে। ব্যাপ্ত হয়ে আছে মেঘে অথচ মেঘ তাকে ছুঁতে পাচ্ছে না। তেমনি আত্মা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও অস্পৃষ্ট। তেমনি আকাশের মত অসঙ্গ হও।

তার পর, জল।

কী শিখবে জলের থেকে? স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা, মধুরতা। জল যেমন নির্মল করে, তুমিও তেমনি দর্শন, স্পর্শন ও কীর্তন দ্বারা বিশ্বভুবন পবিত্র করো।

ষষ্ঠ গুরু, অগ্নি।

কাঠের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন, অব্যক্ত, নিগূঢ়। প্রতি কণা কাঠে প্রতি কণা অগ্নি। তেমনি সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বর গুপ্তরূপে অনুস্যূত। প্রদীপ্ত হলেই অগ্নি সমস্ত মালিন্য দগ্ধ করে অথচ সেই মালিন্য স্পর্শে নিজে কলুষিত হয় না। তেমনি তুমিও তেজে ও তপস্যায় প্রদীপ্ত হও, যারই সেবা পাওনা কেন, পাপমলে লিপ্ত হয়ো না। আগুনের নিজের কোনো উৎপত্তি বিনাশ নেই। উৎপত্তি বিনাশ শিখার, আগুনের নয়।

পরের গুরু, চন্দ্র।

হ্রাস বৃদ্ধি হয় কার? চন্দ্রকলার, চন্দ্রের নয়। তেমনি জেনে রাখো যা কিছু জন্ম মৃত্যু সব দেহের, আত্মার নয়।

চন্দ্র গুরু হলে সূর্যও গুরু।

কী শিখবে সূর্যের থেকে? আত্মা যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, সেই তত্ত্ব। পাত্রে জল আছে, তার উপরে পড়েছে সূর্য্যকিরণ। জল-পাত্রের আকারভেদে সূর্যকিরণকে ভিন্ন-ভিন্ন সূর্যরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে সূর্য, এক, অনন্য। তেমনি উপাধি ভেদে আত্মাকে ভিন্ন-ভিন্ন আত্মা বলে মনে হয়। আসলে আত্মা এক, দ্বিতীয়রহিত। আরো কিছু শেখবার আছে সূর্যের কাছে। সূর্য পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে, আবার পৃথিবীকেই প্রত্যর্পণ করে। তুমিও তেমনি বিষয় গ্রহণ করে যথাকালে অর্থীদের বিতরণ করো।

নবম গুরু, কপোত।

কপোতের কাছ থেকে শিখবে অতি স্নেহ বা আসক্তি বর্জন। কী হয়েছিল শোনো। এক কপোত কপোতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে বাসা বাঁধল বৃক্ষচূড়ে। স্বাধীন বিচরণের আনন্দ আর রইল না। কালক্রমে সন্তান হল কতগুলি। সংসারবাসের এই বা কম আনন্দ কি! এই সুখস্পর্শ মধুর কূজন, এই অঙ্গচেষ্টা। এক দিন আহারের খোঁজে গিয়েছে দুজনে। শাবকগুলি মাটির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় এক দুরন্ত ব্যাধ এসে উপস্থিত। জাল ফেলে সহজেই ধরে ফেললে বাচ্চাগুলোকে। মা মায়ামুগ্ধা কপোতী উড়ে এসে দেখে, সর্বনাশ। রোদন করতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে নিজেও সেই জালের মধ্যে আটকা পড়ল। কপোত এসে দেখল, স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই চলে যাচ্ছে তাকে ফেলে। এ সব স্নেহ-পুত্তলীদের ছেড়ে কি করে থাকব বৃক্ষ-নীড়ে, আর কেনই বা থাকব? এই বিবেচনা করে সে নিজের থেকেই ঢুকল গিয়ে জালের মধ্যে। ব্যাধ তো সিদ্ধকাম। এক জালে এতগুলো পাখি ধরতে পারবে, এ তার কল্পনার অতীত। অত্যাসক্তির জন্যেই কপোত কপোতীর এই ছিন্নদশা। সুতরাং স্নেহপ্রসঙ্গে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না।

তার পর, অজগর।

অজগর কী করে? যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীরমাত্র নির্বাহ করে। যদি কিছু নাও জোটে, নিশ্চেষ্ট হয়ে ধৈর্য ধরে পড়ে থাকে। তেমনি অজগরকে দেখে সর্বারম্ভ পরিত্যাগী হও।

তার পর চেয়ে দেখ সমুদ্রের দিকে।

প্রসন্ন, গম্ভীর, দুর্বিগাহ্য ও দুরত্যয়। তেমনি হবে সমুদ্রের মত। আর কী? বর্ষায় জলাগমে স্ফীত হয় না, গ্রীষ্মে জলাভাবে শুষ্ক হয় না। তেমনি নিরভিমান, তেমনি নিত্যসরস চিরপরিপূর্ণ থেকো।

দ্বাদশ গুরু, পতঙ্গ।

কামমূঢ় হয়ো না। আগুনে মুগ্ধ হয়ে পুড়ে মরে পতঙ্গ, তেমনি বস্ত্রাভরণ-সজ্জিত নারী দেখে উড়ে পড়ো না। বিরত থাকো। দৃঢ়ব্রত, বৃহদ্‌ব্রত হও।

ত্রয়োদশ, মধুকর।

ছোট-বড় নামা-অনামা সকল ফুল থেকেই ভ্রমর মধু আহরণ করে। তেমনি ছোট-বড় মানী-অমানী সকলের কাছ থেকেই সার সংগ্রহ করবে। আর কী শিখবে? শিখবে সঞ্চয়নিবৃত্তি। মৌমাছি যে মধু সঞ্চয় করে, অন্যে এসে কেড়ে-ধরে নিয়ে যায়। তেমনি কৃপণের ধন যায় সেয়ানের পেটে।

আরেক গুরু, হাতি।

করিণীর অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্যে গর্তে পড়ে বাঁধা পড়ে। সুতরাং যে সন্ন্যাসী, সে দারময়ী যুবতি-মূর্তিকেও ছোঁবে না পা দিয়ে।

পরের গুরু, হরিণ।

হরিণ ধরা পড়ে ব্যাধের গীতে আকৃষ্ট হয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গও নারীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে আটকা পড়েছিল সংসারে। সুতরাং নৃত্যগীত সেবা করবে না।

তার পরে মৎস্য।

রসে জিতে সর্বং জিতং। রসনা জয় করতে পারলেই সর্বজয়ী হলে। আমিষযুক্ত বড়িশ দিয়েই মাছ ধরে। সুতরাং সর্ব অর্থে রসনাকে সংযত করো।

আরেক গুরু, পিঙ্গলা।

বিদেহনগরের গণিকা এই পিঙ্গলা। এক দিন বেশভূষা ক'রে প্রণয়ীর আশায় অপেক্ষা করছে গৃহদ্বারে। এ এলো না, ও নিশ্চয়ই আসবে, এমনি ভাবছে পথচারীদের লক্ষ্য করে। এক বার ঘরে ঢোকে, আবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আশা-নিরাশায় দুলছে এমনি সারাক্ষণ। প্রায় মধ্যরাতও বুঝি কেটে যায়। তখন মনে নির্বেদ এল পিঙ্গলার। ছিঃ ছিঃ, নিজ দেহ বিক্রয় করে অন্য দেহ থেকে রতি আর বিত্ত আশা করছি। যিনি সর্বদা সমীপস্থ, যিনি রতিপ্রদ বিত্তপ্রদ, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে দুঃখ-ভয়-শোক-মোহের আকর তুচ্ছ দেহকে ভজনা করছি। না, এ অপমান সহনাতীত। সর্বদেহীর যিনি সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ আর আত্মা, তাঁর নিকট দেহ বিক্রয় করে লক্ষ্মীর মত তাঁর সঙ্গেই আমি রমণ করব। এখন যেহেতু কামনাভঙ্গজনিত নৈরাশ্য আমার মনে এসেছে, ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হয়েছেন। অতএব বিষয়সঙ্গহেতু যে দুরাশা তা ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নিলাম। শান্তি পেল পিঙ্গলা। শয্যায় গিয়ে সুখে ঘুমিয়ে পড়ল। আশাই দুঃখের কারণ, আশা ত্যাগই পরম সুখ।

অষ্টাদশ গুরু, বালক। অজ্ঞ বালক।

মান নেই অপমান নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, লজ্জা-ঘৃণা-ভয় কিছু নেই। বালকের কাছ থেকে শেখ আত্মক্রীড়ত্ব। আত্মক্রীড় হয়ে সংসারে অবস্থান করো।

অন্য গুরু, কুমারী।

হাতে কয়েক গাছি কঙ্কণ, ঘরে বসে ধান কুটছে কুমারী। মৃদু-মৃদু শব্দ হচ্ছে কঙ্কণের। বাইরে উৎকর্ণ পথিক দাঁড়িয়ে পড়েছে কঙ্কণের শব্দে। নিশ্চয়ই এ কোনো কুমারীর গৃহকাজ, তারই হাত দুটির নড়াচড়া। কঙ্কণনিক্কণে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে ফেলেছে। তখন কী করে কুমারী! দুগাছি রেখে বাকি কঙ্কণ খুলে নিল হাত থেকে। সে কি, এখনো একটু-একটু শব্দ হচ্ছে যে। দেয়ালের বাইরে এখনো লোকে কাণ খাড়া করে আছে। তখন আরো একগাছি খুলে ফেলল। মোটে একগাছি রাখল তার মণিবন্ধে। আর শব্দ নেই। সেই এক কঙ্কণ ন্যায় একাকী থাকো। কুমারীর থেকে শেখ সঙ্গরাহিত্য।

পরের গুরু, শরনির্মাতা।

শরনির্মাতা যখন এক মনে শর সরল করে, তখন সমুখ দিয়ে ভেরীঘোষ সহ রাজাও যদি চলে যায়, টের পাবে না। তেমনি মনকে এক বস্তুতে, সার বস্তুতে যুক্ত করো।

তার পর, সর্প।

পরকৃত গর্তে বাস করে সাপ। একা ঘুরে বেড়ায়। সাপের থেকে শেখ অনিকেতনতা।

উর্ণনাভ আরেক গুরু।

কী করে মাকড়সা? নিজের হৃদয় থেকে মুখ দিয়ে সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তার করে। সেই জালের মধ্যেই বাস করে, বিহার করে। আবার শেষ কালে নিজেই গ্রাস করে সেই জাল। তবে এই শেখ মাকড়সা থেকে যে, ঈশ্বরই সৃষ্টি করছেন, স্থিতি করছেন, আবার সংহারও করছেন।

আরেক গুরু, কীট।

এমন কীট আছে যে অন্য কীট কর্তৃক ধৃত হয়ে নীত হয় তার বিবরে। তখন ভয়ে-ভয়ে সে আততায়ী কীটের ধ্যান করতে-করতে তারই আকার প্রাপ্ত হয়। তেমনি তন্ময় হয়ে ভগবানের ধ্যান করো। তাঁর সারূপ্য লাভ হয়ে যাবে।

শেষ গুরু, শ্রেষ্ঠ গুরু তোমার নিজের দেহ।

নিজের দেহ? হ্যাঁ, এর সাহায্যেই সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করছ। বড় বিচিত্র-চরিত্র এই গুরু। একে একটু বেশি সেবা করলেই নিয়ে যায় অধঃপাতে। একে শুধু প্রাণমাত্র ধারণের উপযোগী ভোগ দাও, তোমাকে জ্ঞানবৈরাগ্য দেবে। আর কী দেখছ? দেখছ পরিবার বিস্তার করছে দেহ, সে পরিবার-পালনের জন্যে কত ক্লেশ কষ্ট, শেষে বৃক্ষের মত দেহান্তরের বীজ সৃষ্টি করে নিজেকে নাশ করছে।

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানছে তেমনি মনকে টানছে নানা শক্তি, নানা ইন্দ্রিয়। সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে সমচিত্ত হও।

শুধু এক জনের কাছ থেকে নয়, বহু জনের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে যেটুকু পারো, জ্ঞানকণা কুড়িয়ে নাও।

তদ্‌গতান্তরাত্মা হও। যাকে ঠাকুর বলেন, 'ডাইলিউট হয়ে যাও।'

নাটমন্দিরে একা-একা পাইচারি করছেন ঠাকুর। যেমন সিংহ অরণ্যে একা থাকতে ভালোবাসে তেমনি। নিঃসঙ্গানন্দ।

শশধর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখলে, ডাইলিউট হয়ে গেছে। কেমন বিনয়ী। আর সব কথা লয়।'

যে আসল পণ্ডিত সে সব কথাই নেবে। যখন যেটুকু পায়, যেখান থেকেই পাক। কোনো গোঁড়ামি নেই, এই পাত্র ধরে আছি যেখান থেকে পারো দাও আমাকে স্নিগ্ধ হবার শরণাগত হবার মন্ত্র।

কিন্তু যাই বলো, শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? কিছু তপস্যার দরকার। কিছু সাধ্য সাধনার।

তবে জ্ঞান হলে কী হয়? ঠাকুর বললেন শশধরকে দেখে। 'প্রথম চিহ্ন, শান্ত। দ্বিতীয়, অভিমানশূন্য। দেখ না শশধরের দুই চিহ্নই আছে।'

দেরি করে এসেছে বলে ঠাকুর রসিকতা করছেন, 'আমরা সকলে বাসর শয্যা জেগে বসে আছি। বর কখন আসবে।'

ঠাকুরকে প্রণাম করে বসল শশধর। জিগগেস করল, 'আর কী লক্ষণ জ্ঞানীর?'

'আরো লক্ষণ আছে।' বলছেন ঠাকুর। 'সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে, যেমন লেকচার দেবার সময় সিংহতুল্য। আবার স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসিকশেখর।'

সবাই হেসে উঠল।

শশধর জিগগেস করলে, কিরূপ ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায়?'

'আমার বাপু জ্বলন্ত ভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস। ভক্তি তো তিন রকম। সাত্ত্বিক ভক্তি, সব সময়ে গোপন রাখে নিজেকে। হয়তো মশারির মধ্যে বসে ধ্যান

করে কেউ টেরও পায় না। আর রাজসিক ভক্তি—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত। ষোড়শ উপচারে পুজো করে, পরদ পরে বসে গিয়ে ঠাকুর ঘরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তো, মাঝে মাঝে আবার একটি করে সোনার রুদ্রাক্ষ।'

'আর তামসিক?'

'যাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি।' বলতে-বলতে ঠাকুরের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগায় ভয় নেই, মুখে কেবল মারো, কাটো, লোটো। উন্মত্ত হুঙ্কার, হর হর ব্যোম ব্যোম। মনে খুব জোর। খুব বিশ্বাস। এক বার নাম করেছি, আমার আবার পাপ।'

এই তমোগুণেই ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের কাছে জোর করো। রোক করো। তিনি তো পর নন, আপনার লোক, আমার সব কিছু। তাঁর কাছে আবার ঢাকব কি, লুকোব কি। তিনিই তো আমাকে ভক্ত করে দীপ্ত করলেন। আমার লজ্জাহরণ করলেন। তাই নির্লজ্জের মতো ধরব এবার আঁকড়ে। আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই।

দেখ আবার এই তমোগুণই পরের ভালোর জন্যে প্রয়োগ করা যায়। যে বৈদ্য শুধু রুগীর নাড়ী টিপে 'ওষুধ খেয়ো হে' বলে চলে যায়, রুগী খেল কি না খেল খোঁজ নেয় না, সে অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য রুগীকে ওষুধ খেতে বোঝায় অনেক করে, মিষ্টি কথায় বলে, 'ওহে ওষুধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে, লক্ষ্মীটি খাও, এই দেখ আমি ওষুধ মেড়ে দিচ্ছি', সে মধ্যম বৈদ্য। আর উত্তম বৈদ্য কে? রুগী কোনোমতেই খেল না দেখে যে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয়। 'কি, খাবে না কি, জোর করে জবরদস্তি করে খাইয়ে দেব।' এটা হল বৈদ্যের তমোগুণ। এতে রুগীর মঙ্গল, বৈদ্যেরও সাফল্য।

'তেমনি ভক্তির তমঃ। যেন ডাকাতপড়া ভাব। তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ! আমি যেমনই ছেলে হই তুমি আমার আপন মা, তোমাকে দেখা দিতেই হবে।' বলে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন ঠাকুর:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি,
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপানাদি বিনাশি নারী,
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
ওমা, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

ঠাকুর গাইছেন আর তাই শুনে কাঁদছে শশধর। পাণ্ডিত্যের তুষারপিণ্ড গলে গিয়েছে। ডাইলিউট হয়ে গিয়েছে।

একশো পঁচিশ

তবে এক গল্প শোনো।

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে সুন্দর একটি বাগান করেছে। নানারকমের গাছ, ফুলে-ফলে ভরা। সেদিন হল কি, একটা কার গরু বাগানে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে পড়েই, বলা-কওয়া নেই, খেতে সুরু করে দিয়েছে গাছপাছালি। দেখতে পেয়ে বামুন তো রেগে টং। হাতের কাছে ছিল এক আস্ত-মস্ত লাঠি, তাই দিয়ে গরুর মাথায় মারলে এক ঘা। সেই ঘা এত প্রচণ্ড হল যে গরুটা মরে গেল তক্ষুনি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বামুন। গোহত্যা করে ফেললুম। হিন্দু হয়ে? এ পাপের কি আর চারা আছে? তখন তার মনে পড়ল বেদান্তে আছে, চোখের কর্তা সূর্য, কাণের কর্তা পবন, হাতের কর্তা ইন্দ্র। ঠিকই তো, বামুন লাফিয়ে উঠল, এ গোহত্যা তো আমি করিনি, ইন্দ্র করেছে। যে হেতু ইন্দ্রের শক্তিতে হাত চালিত হয়েছে, এ গোহত্যার জন্যে দায়ী ইন্দ্র। মন খাঁটি করলে বামুন। ফলে গোহত্যার পাপ তার শরীরে ঢুকতে পেল না, মনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল। মন বললে, এ পাপ আমার নয়, ইন্দ্রের। আমাকে কেন, তাকে গিয়ে ধরো। পাপ তখুনি ছুটল ইন্দ্রকে ধরতে। ব্যাপার শুনে ইন্দ্র তো অবাক। বললে, রোসো, আগে বামুনের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি। মানুষের রূপ ধরে ইন্দ্র তখন এল সেই বাগানে। ফুল-ফল লতাপাতা দেখে মন খুলে খুব প্রশংসা করতে লাগল। বামুনকে শুনিয়ে-শুনিয়ে। মশাই, বলতে পারেন এ বাগানখানি কার? জিগগেস করল বামুনকে। আজ্ঞে, এটি আমার করা। এ সব গাছপালা আমি পুঁতেছি। আসুন না, ভালো করে দেখুন না ঘুরে-টুরে। ইন্দ্র ঢুকল বাগানের মধ্যে। যেন কতই সব দেখছে এমনি ভান করতে-করতে অন্যমনস্কের মত সে জায়গাটায় এসে উপস্থিত হ'ল যেখানে সদ্য মৃত গরুটা পড়ে আছে। রাম, রাম, এ কি, এখানে

গোহত্যা করলে কে! বামুন মহা ফাঁপরে পড়ল। এতক্ষণ সব আমি করেছি, সব আমার করা, বলে খুব বরফট্টাই করছিল, এখন মাথা চুলকোতে লাগল। তখন ইন্দ্র নিজরূপ ধরলে, বললে, তবে রে ভণ্ড, বাগানের যা কিছু ভালো সব তুমি করেছ আর গোহত্যাটিই কেবল আমি করেছি! বটে? নে তোর গোহত্যার পাপ। আর যায় কোথা, পাপ এসে ঢুকে পড়ল ব্রাহ্মণের শরীরে। তাই বলি, যা করেন সব তিনি—এই বলে নিজেকে ঠকিও না। নিজের বেলায় ভালোটি আর মন্দটি ভগবানের ঘাড়ে। ওটি চলবে না। ভালোমন্দ সব তাঁকে অর্পণ করে ভালোমন্দের ওপারে চলে যাও।

জ্ঞেয় বস্তু কি?

সুখদুঃখরহিত ঈশ্বরই জ্ঞেয়।

সুখদুঃখরহিত কোন বস্তু আছে, থাকতে পারে?

পারে। শীত আর গ্রীষ্মের সন্ধিস্থলে কি আছে? এমন একটি অনির্বচনীয় অবস্থা, যা শীতলও নয়, উষ্ণও নয়। যদি শৈত্যোষ্ণতাহীন বস্তু থাকা সম্ভব, তা হলে সুখদুঃখবিহীন বস্তুর অস্তিত্বও মানতে হবে।

অমৃত সরকার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের ছেলে। সে অবতার মানে না।

'তাতে দোষ কি?' ঠাকুর বললেন স্নেহহাস্যে। 'ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার বলেও যদি বিশ্বাস করো, ঠকবে না। দুটি জিনিস শুধু দরকার, সে দুটি থাকলেই হল। সে দুটির একটি হচ্ছে বিশ্বাস, আরেকটি শরণাগতি। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন, এ বিশ্বাস করা কি সোজা? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরতে পারে? তাই কথা হচ্ছে—যে পথে যাও, যদি আন্তরিক হও, ঠিক-ঠিক মিলে যাবে অমৃত। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও, সমান মিষ্টি।'

আবার সাকারবাদীদের মতে একটি-দুটি দেবতা নয়, তেত্রিশ কোটি।

হলই বা। কলকাতা শহরে হাজার-হাজার ডাক-বাক্স। বড় পোষ্টাফিসেই ফেল, আর ছোট ঐ ডাক-বাক্সেই ফেল, ঠিকানা যদি ঠিক-ঠিক লেখা থাকে, যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছুবে।

একটি ডাক পাঠাও তাঁকে, তোমার পায়ে পড়ি। পাঠিয়ে একবারটি দেখ ঠিক পৌঁছয় কিনা।

'তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।' ডাক্তারকে বললেন ঠাকুর।

'সে তো আপনার চেলা।'

'আমার কোনো শালা চেলা নেই।' ঠাকুর হাসলেন। 'আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। আমিও ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। চাঁদামামা সকলের মামা।'

একটি যুবক ঠাকুরকে এসে জিগগেস করলে, 'মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি তবু মাঝে মাঝে মনে কুচিন্তা এসে পড়ে।'

'আসুক না।' ঠাকুর নিশ্চিন্তের মত বললেন। 'কেন এল তাই বসে-বসে ভাবতে যাওয়া কেন? শরীরের ধর্মে আসে, আসবে। তাই বলে মাথা ঘামাবিনে। মাথা না ঘামালেই মাথা তুলতে পারবে না কাম। তা ছাড়া তোকে বলে দি, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

'কিন্তু মনের ও ভাবটা যাবে কি করে?'

'হরিনামে। হরিনামের বন্যায় ভেসে যাবে সব আবর্জনা।'

যোগীনেরও সেই জিজ্ঞাসা। কাম যায় কিসে? শুধু হরিনামে যাবে—এ সে মানতে রাজী নয়। কত লোকই তো হরি-হরি করছে, কারুরই তো যাওয়ার নমুনা দেখছি না। পঞ্চবটীতে এক হঠযোগী এসেছে, তার সঙ্গ করল। যদি কিছু আসন-প্রাণায়ামের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দিয়ে দমন করা যায় শত্রুকে। ঠাকুর তাকে ধরে ফেললেন। হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললেন নিজের ঘরের দিকে। 'তুমি আমার দিকে না গিয়ে এদিকে এসেছ, তাই না? তোকে শোন, বলি, ওদিকে যাসনি। ও সব হঠযোগ শিখলে ও করলে মন শরীরের উপরেই পড়ে থাকবে সর্বক্ষণ, যাবে না ঈশ্বরের দিকে। আমি তোকে যা বলেছি, সেই পথই ঠিক পথ। হরিনামের পথ। হরিনামের শব্দেই উড়ে যাবে পাপ-পাখি।'

নিজেকেই তবু বেশি বুদ্ধিমান বলে যোগীনের ধারণা। ভাবলে—এ সব ঠাকুরের অভিমানের কথা। পাছে তাঁকে ছেড়ে আর কারু কাছে যাই, সেই ভয়েই অমনি একটা ফাঁকা উপদেশ দিয়েছেন। শেষকালে মনে কি ভাব এল, ঠাকুরের কথামতই দেখি না করে। লেগে গেল হরিনামের মহোৎসবে। ঠাকুরের কী অশেষ কৃপা, কয়েকদিনের মধ্যেই ফল পেল প্রত্যক্ষ।

কিন্তু কামক্রোধ ঈশ্বর দিয়েছেন কিসের জন্যে ?

'মহৎ লোক তৈরি করবেন বলে।' বললেন ঠাকুর। 'মন্দ না থাকলে ভালোর মাহাত্ম্য কি! অন্ধকার না থাকলে আলোর দাম কে দেয়! সীতা বললেন, রাম, অযোধ্যায় সব যদি সুন্দর অট্টালিকা হত তো বেশ হত! অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা আর পুরানো। রাম বললেন, সব বাড়িই যদি সুন্দর হয়, নিখুঁত হয়, তো মিস্ত্রিরা করবে কি।

থাক মন্দ, থাক পাপ, থাক কামক্রোধ। শুধু সংযম করো, সাবধান হও। কত রোগের থেকে সাবধান হচ্ছ, সম্ভোগের জন্যেই কত অভ্যাস করছ সংযম। এও তেমনি। আর ঈশ্বরের চেয়ে বড় সম্ভোগ আর কি আছে।

'দেখ না এই হনুমানের দিকে চেয়ে। ক্রোধ করে লঙ্কা পোড়ালো, শেষে মনে পড়ল, এই রে, অশোক-বনে যে সীতা আছেন। তখন ছটফট করতে লাগল।'

তাই তো বলি রাশ টানো।

মদনকে দগ্ধ করলে শিব। মুগ্ধ করলে কৃষ্ণ। শিব মদনদহন। আর কৃষ্ণ মদনমোহন!

দাক্ষিণাত্য বেড়াবার সময় রামচন্দ্র ঠিক করলেন চাতুর্মাস্য করবেন। চাতুর্মাস্য কাটাবার জন্যে একটি পাহাড় মনোনীত করলেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে একটি শিবমন্দির। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, মন্দিরে যাও। শিবের অনুমতি নিয়ে এস। মন্দিরে গিয়ে শিবকে লক্ষ্মণ জানাল তাদের প্রার্থনা। শিব কিছুই বললেন না, শুধু অন্য মূর্তি ধারণ করলেন। অন্য মূর্তি মানে অদ্ভুত এক নৃত্যমূর্তি। নিজ লিঙ্গ নিজের মুখে পুরে নৃত্য করছেন। লক্ষ্মণ ফিরে এল রামের কাছে। তাঁকে বললে সব আগাগোড়া। শুনে রাম উৎফুল্ল হলেন। লক্ষ্মণ বললে, বুঝলুম না কিছু। রাম বললেন, শিব অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ঐ মূর্তির মাধ্যমে বলছেন, লিঙ্গ আর জিহ্বা সংযম করে যেখানে খুশি সেখানে থাকো। রসনা আর বাসনাকে যদি এক সঙ্গে বন্দী করতে পারে তা হলেই অভয় লাভ।

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড রোদে ঠাকুর এসেছেন বলরাম-মন্দিরে। বললেন, 'বলেছি তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু বড় ধুপ।'

ভক্তেরা হাওয়া করতে লাগল ঠাকুরকে। সেবা করবে না সুধাদ্রব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে বুঝতে পারছে না। পাখার ছন্দ ভুল হয়ে যাচ্ছে।

'ছোট-নরেন আর বাবুরামের জন্যে এলাম।' মাষ্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর; 'পূর্ণকে কেন আনলেন না ?'

'সভায় আসতে ভয় পায়।' বললে মাষ্টার।

'ভয় ?'

'হ্যাঁ, পাছে আপনি পাঁচ জনের সামনে সুখ্যাত করে বসেন, সব লোক জানাজানি হয়—'

'বা, এ তো বেশ কথা।' ঠাকুর বললেন অন্য মনস্কের মত: 'কে জানে কখন কি বলে ফেলি। যদি বলে ফেলি তো আর বলব না। আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছ ? ভাব-টাব হয় ?'

'কই বাইরে তো কিছু দেখতে পাই না।'

কি করে পাবে ? তার আকার আলাদা। বাইরে তো তার ফটবে না ভাব।'

'হাঁ, আমিও তাকে সেদিন বলছিলুম আপনার সেই কথাটা।' মাষ্টার বললে প্রফুল্ল মুখে।

"কোন কথাটা ?'

'সেই যে বলেছিলেন, সায়র দীঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবায় নামলে তোলপাড় হয়ে যায়।'

'শুধু তাই নয়, পাড়ের উপর জল উপচে পড়ে।' ঠাকুর জুড়ে দিলেন আরেকটু। 'কিন্তু, তা ছাড়া, দেখেছ ? ছেলেটার আর সব লক্ষণ ভালো।'

'হ্যাঁ', মাষ্টার সায় দিল: 'চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে সমুখে।'

'চোখ শুধু উজ্জ্বল হলেই হয় না। এ অন্য জাতের চোখ। আচ্ছা,' ঠাকুর আরেকটু অন্তরঙ্গ হলেন: 'তোমায় কিছু বলেছে ?'

'কি বিষয় ?'

'এই এখানকার সঙ্গে দেখা হবার পর কিছু হয়েছে তার ?'

'হ্যাঁ, বলছে, ঈশ্বর-চিন্তা করতে গেলে, আপনার নাম করতে গেলে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, গায়ে রোমাঞ্চ হয়।'

'বা, তবে আর কি।' যেন মুক্ত হাওয়ার শান্তি পেলেন ঠাকুর।

কতক্ষণ পরে মাষ্টার আবার বললে, 'সে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে—'

'কে ? কে দাঁড়িয়ে আছে ?' চমকে উঠলেন ঠাকুর।

'পূর্ণ।'

'কোথায় ? দরজার দিকে উৎসুক হয়ে তাকালেন ঠাকুর। উঠি-উঠি করতে লাগলেন।

'এখানে নয়, হয়তো তার বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।' বললে মাষ্টার, 'আমাদের কাউকে যদি যেতে দেখে রাস্তা দিয়ে অমনি ছুটে আসবে, প্রণাম করে পালাবে।'

'আহা, আহা'—ভাবে তন্ময় হলেন ঠাকুর। 'ও একটা বিরাট আধার। তা না হলে ওর জন্যে জপ করিয়ে নিলে গা ?'

সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকাল। ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ গো, পূর্ণর জন্যে বীজমন্ত্র জপ করেছি।'

বিরাট আধার, কিন্তু পূর্ণর বয়েস মোটে তেরো। বিদ্যাসাগর-ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ঠাকুরের কাছে যে আসে, এ বাড়ির লোক পছন্দ করে না একদম। তাই লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে এক-আধটু, মাষ্টারমশায়ের ছায়ায়-ছায়ায়। সবাই সন্ত্রস্ত, কে কখন টের পায়। সকলের চেয়ে ভয় বেশি মাষ্টার-মশায়ের, কেন না বাড়ির লোক জানতে পেলে তাকেই দায়ী করবে সর্বাগ্রে। পূর্ণর আসা কোনো ভক্তের আসা নয়, এমনি কোনো এক পথভোলা পথের ছেলের ঢুকে পড়া। সব সময়ে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা।

এতই যখন ভয়, তখন ও ছেলেকে পথ দেখানোর কি দরকার !

আমি পথ দেখাব ? ও নিজেই পথের ঠিকানা [illegible] এসেছে। কে ওকে বলেছে ঠিকানা কে বলবে !

কানের কাছে মুখ এনে ঠাকুরও বলছেন চুপি-চুপি, 'সে সব করো ? যা সেদিন বলে দিয়েছিলাম ?'

পূর্ণ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, করি।

'স্বপনে কিছু দেখ ? আগুন, মশালের আলো, [illegible] মেয়ে, শ্মশানমশান ? এ সব দেখা বড় ভালো। দেখ ?'

পূর্ণ হাসল এক মুখ। বললে, 'আপনাকে দেখি।'

'তা হলেই হল।'

দেখারও দরকার নেই। শুধু টানটুকু থাকলেই হল। তুমি তো আয়-আয় করছই, আমিই শুধু যাই-যাই করছি না। তুমি যদি কারণরূপে আছ, এবার তারণরূপে এস। তোমার রূপ সর্বপ্রত্যক্ষভূত হোক। তোমার চরণতরী আশ্রয় করতে দাও। তোমার চরণতরী আশ্রয় করে ভবাব্ধিকে যেন গোষ্পদ জ্ঞান করতে পারি।

'তোমার উন্নতি হবে।' পূর্ণকে বললেন শেষ কথা : 'আমার উপর তোমার টান তো আছে।'

কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। তুমি জোয়ারের জল হয়ে সেই কাছিতে টান দাও। আমি যেন তোমার দিকে মুখ ফেরাতে পারি। আমার হাল না থাক পাল না থাক, তবু তুমি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো। তুমি হও আমার স্রোতের টান। সব-ভাসানো সব-ডুবানোর টান।

ঠাকুরের তখন অসুখ। পূর্ণ চিঠি লিখেছে ঠাকুরকে। কি লিখেছে পড়ো তো !

'আমার খুব আনন্দ হয়।' কে একজন পড়ে শোনাল পূর্ণর চিঠি : 'এত আনন্দ যে মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না।'

'আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে।' অসুখের কষ্টকে নিমেষে উড়িয়ে দিলেন : 'আহা, দেখি দেখি চিঠিখানা।'

চিঠিখানি নিলেন হাতে করে। মুড়ে টিপে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না। কিন্তু এর চিঠি বেশ ভালো চিঠি। ধরতে পারি হাতের মধ্যে। ধরতে পারি বুকের উপর।'

তোমার এই আকাশব্যাপিনী জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্র, লিপিটি কবে ধরতে পারব হাতের মুঠোয়। কবে বা ধরতে পারব বুকের উপর !

[ক্রমশঃ।

ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

[ভারতের প্রধান বিচারপতি]

কর্ম্ম-প্রতিভা, চরিত্রবল ও সুষ্ঠু জ্ঞান—এ তিনের সমন্বয় সাধারণত: দেখা যায় না, কিন্তু যে মানুষের জীবনেই এ মহামিলন ঘটেছে তিনিই সার্থক, সুন্দর ও বরেণ্য। এমন একজন অনন্যসাধারণ মানুষই হচ্ছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি, বাঙ্গালার সুসন্তান স্বনামধন্য ডা: বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়। নানা দিকে তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির বিকাশ ঘটেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের তিনি মূর্ত্ত প্রতীক। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার এবং আর্য্যকৃষ্টি সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁহার মানুষ মন সর্ব্বদাই সচেতন ও ব্যাকুল। আইনের ছাত্র হিসেবে আপন যোগ্যতাবলে তিনি যেমন প্রতিটি পরীক্ষাতেই স্বর্ণপদক লাভ করে এসেছেন, ভারতের আইন-জগতে আজ যে তিনি মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ আসন পেয়েছেন, এও তেমনি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর বিচারশীল প্রাণ এবং মানুষ-প্রাণ দুই-ই বুঝি এক হ'য়ে গেছে।

১৮৯১ সালে হুগলী সহরে ডা: বিজনকুমারের জন্ম হয়। তাঁর পূজ্যপাদ পিতা স্বর্গত: রাখালদাস মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তাঁর প্রভাব বাল্যবয়সেই ডা: মুখোপাধ্যায়ের উপর বিশেষ ভাবে পড়ে। মাতা শরৎকুমারী দেবীর চারিত্রিক বলও পুত্রের জীবন গঠনে কম সহায়তা করেনি। হুগলীতে স্কুল ও কলেজের পড়া কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করে তিনি চলে আসেন ক'লকাতায় এবং উচ্চ শিক্ষা বিশেষ করে আইন শিক্ষায় ব্রতী হন। ক্রমে তিনি ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষা এবং এল-এল-বি, এল-এল-এম ও ডক্টর অফ ল পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সফলকাম হন ও প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন।

ডা: বিজনকুমারের কর্ম্ম-জীবনের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯১৪ সাল থেকে। এ সময়েই তিনি ক'লকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তিনি তাঁর সাফল্য সম্পর্কে খুব বেশী আশান্বিত ছিলেন না। এ'র পশ্চাতে অবশ্য কতকগুলো অনিবার্য্য কারণ ছিল। বন্ধু-বান্ধব সহায় সম্বল বলতে সে সময় তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না। প্রধানত: এজন্যই তিনি ক'লকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে তেমন উৎসাহ পাননি। সে সময় পাটনা হাইকোর্ট সবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। তিনি সঙ্কল্প ক'রলেন—কলকাতা ছেড়ে পাটনা যেয়েই আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ ক'রবেন। যাওয়া প্রায় স্থিরও হ'য়ে গেল—এমনি মুহূর্ত্তে কলকাতা আইন-কলেজ থেকে আহ্বান এলো তাঁর কাছে "লেকচারার" পদ গ্রহণের জন্য। এ অধ্যাপনার কাজ পেয়েই তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল—তিনি কলকাতাতেই র'য়ে গেলেন এবং হাইকোর্টেও নোতুন উৎসাহে আইন ব্যবসায় করে চললেন নিয়মিত। আইন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, প্রতিভা ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বিশেষ 'করে আইনের বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা এতই অসাধারণ ছিল যে, অল্প দিন মধ্যেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পসার যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। হাইকোর্টের আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনায় তৎকালে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাধিক প্রতিপত্তিশালী আইনজীবী। আইন-জগতে প্রথম থেকেই তাঁর বহু মৌলিক অবদান রয়েছে, যার মূল্য আজকের দিনে এতটুকু কমেনি।

শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

বিচক্ষণ আইনবিদ্ হিসেবে যখন ডা: বিজনকুমারের প্রতিভা ছড়িয়ে 'পড়লো তখন সরকারও তাঁর মর্য্যাদা না দিয়ে পারলেন না। তিনি ১৯৩৪ সালে ক'লকাতা হাইকোর্টে জুনিয়ার গভর্ণমেন্ট প্লীডার এবং ১৯৩৬ সালে সিনিয়র গভর্ণমেন্ট প্লীডার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ১৯৩৬ সালেরই শেষ দিকে তিনি নিযুক্ত হলেন ক'লকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। এ আসন অলঙ্কৃত করে তিনি সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিভূ হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মানুষ বিজনকুমার যে কত বড়, বিচারক বিজনকুমার তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আইনবিদ্ হওয়ার চেয়ে যথাযথ আইন প্রয়োগেই

যে বড় কথা, এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি নিজ জীবনে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাছে—"আইন একটা means to an end, বিচারের উপায় মাত্র।"

এ ভাবে দেশ ও জাতির প্রভূত সম্মানে ভূষিত হয়ে ডাঃ বিজনকুমার ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টেই বিচারকের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অনন্যসাধারণ বিচার-ক্ষমতায় ভারত সরকার অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ভারতের তৎকালীন ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। এখানেও তাঁর অসামান্য বিচারশক্তি, কর্ম্ম-প্রতিভা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রমাণিত হ'লো অল্পদিন মধ্যেই। ফেডারেল কোর্ট সুপ্রিম-কোর্টে রূপান্তরিত হওয়ার পরও তিনি সেখানকার বিচারপতির দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ভারতের প্রধান বিচার-পতির আসন অলঙ্কৃত ক'রেছেন তিনি। শুধু বাঙ্গালা বা বাঙ্গালী নয়, সমগ্র ভারত ও ভারতবাসীর আজ তিনি বিশের গৌরবস্থল।

ডক্টর বিজনকুমার দেশের বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য কয়েকটি সংস্থার দায়িত্বসম্পন্ন পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি আইন শাস্ত্রের কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। তাঁর ন্যায় প্রচারবিমুখ অমায়িক ও মধুর-স্বভাব মানুষ যে কোন দেশেই বিরল। রাঢ়ীশ্রেণীর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি যেমন জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, আচার ও নিষ্ঠার দিক হ'তে ব্রাহ্মণের সে পরিচয় প্রতি ক্ষেত্রেই অম্লান রেখেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অতুলনীয়।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটা দুঃখের দিক—তাঁর বয়স যখন মাত্র ২১ বৎসর, তখনই তাঁর সুযোগ্যা পত্নী পরলোক গমন করেন একমাত্র শিশু পুত্র রেখে। সে থেকে আজ অবধি তিনি বিপত্নীক জীবন যাপন ক'রছেন।

ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি যে, সমাজ ও জাতির মুখোজ্জ্বল ক'রবেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ-নেতৃত্বে ভারতীয় বিচারের মান যে আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা লাভ করবে, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যে সকল মন্তব্য করেছেন, তা সংক্ষেপে এ স্থানে সন্নিবেশিত করা হ'লো। তাঁর সম্পর্কে দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণের যে কত উচ্চ ধারণা ও শ্রদ্ধা, এ থেকেই তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

ক্যালকাটা উইকলি নোট্স্ পত্রিকা ১৯৫৪ সালের ১ই ডিসেম্বর তারিখে বিচারপতি মুখার্জী সম্বন্ধে লিখেছেন, "বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জী বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারক। মানবিক হৃদয়াবেগের গভীরতায় সত্যই তিনি মহৎ। তাই সহজাত উপলব্ধিতে অতি স্বাভাবিক ভাবেই তিনি প্রত্যেক মামলার সঠিক রায় দিতে পারেন।" ১৯৪৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ঐ একই পত্রিকা লিখেছিলেন, "বিচারপতি মুখার্জীর অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান, ঘটনা ও আইন সম্পর্কে দ্রুত ও সুস্পষ্ট অবহিতি, বিচারকোচিত মেজাজ, নম্র প্রকৃতি ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারকে পরিণত করেছিল। তিনি ভারতের আদর্শ ন্যায়াধীশের মূর্ত প্রতীক।" ১৯৫৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছেন, "বিচারপতি মুখার্জীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম ভূষণে ভূষিত করেছে।" তিনি মাসিক বসুমতীর অন্যতম বিচক্ষণ পাঠক।

ডক্টর কুলেশচন্দ্র কর

[ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক]

বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ডক্টর কুলেশচন্দ্র করের নাম স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। বিজ্ঞানকেই তিনি মেনে নিয়েছেন জীবনের সর্বস্ব ও চরম প্রাপ্তি হিসেবে। সেই কবে তাঁর সাধনা আরম্ভ হ'য়েছে—একের পর এক সাফল্যও লাভ হ'লো, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁর উদ্যমে এতটুকু ভাটা পড়েনি। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতের তিনি সত্যই এক বিশিষ্ট প্রতিভা।

ডক্টর করের জন্ম হয় ১৮৯৯ সালে মানভূমের বড়বাজার নামে একটি ছোট্ট সহরে এক সম্ভ্রান্ত যৌথ পরিবারে। তাঁর পিতা [illegible]চরণ কর ছিলেন একজন সাবজজ। অতি কৈশোরেই তিনি (ডাঃ কর) পিতৃহারা হন এবং নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হ'লেন। তখন তিনি মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতেও তিনি সেদিন দমিত হন নি। আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুর্বার সঙ্কল্প নিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে তিনি এগিয়ে চললেন। আগামী দিনে যিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে পরিচিত হ'বেন, তরুণ-বয়সেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন।

তার পরেই ডক্টর কর বিজ্ঞান নিয়ে কলেজে পড়াশুনো আরম্ভ করলেন। বি, এস, সি পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেন এবং জুবিলি "স্কলার শিপ"এর অধিকারী হন। এই বৃত্তি পাওয়ার ফলে সাংসারিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তাঁর উচ্চতর শিক্ষার পথ প্রশস্ত হ'লো অনেকটা। অসাধারণ মেধাবী ডক্টর কর বি, এস, সি পাস করার পরেই গবেষণা করতে থাকেন স্বাধীন ভাবে। তাঁর গবেষণা প্রসূত তিনটি মৌলিক প্রবন্ধ তখনই জার্মানী ও আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

কুলেশচন্দ্র কর

বিজ্ঞানের সাধনাকে জীবনের আদর্শ-হিসেবে গ্রহণ করে ডক্টর কুলেশচন্দ্র অগ্রসর হ'লেন আরও উচ্চতর শিক্ষার পথে। এম, এস, সি পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে তিনি লাভ করলেন স্বর্ণপদক ও প্রচুর মর্য্যাদা। সাংসারিক অসচ্ছলতা দূরীকরণের ব্যাকুলতা তাঁর সঙ্গে বরাবরই ছিল। তাই এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েই তিনি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ ক'রলেন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে। কিন্তু চাকুরী-জীবনের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা ব্যাহত হয়নি। অদম্য জ্ঞান স্পৃহা নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে গবেষণা করে চললেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়ে। তিন বছরের মধ্যেই তিনি ডি, এস, সি ডিগ্রিতে ভূষিত হ'লেন—তাঁর গবেষণা মূলক প্রবন্ধটি (থিসিস) বিচারক-মণ্ডলীর কাছে উচ্চ প্রশংসিত হ'লো।

ডি, এস, সি উপাধি লাভের পরেই ডাঃ করের আহ্বান আসে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য। তিনি সে পদের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রলেন এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করলেন বিজ্ঞান চর্চ্চায়। বর্ত্তমানে তিনি এ কলেজেরই পদার্থ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। তাঁর পথ নির্দ্দেশ পেয়ে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণায় সাফল্য লাভ ও উচ্চ উপাধি লাভ করেছেন ও করছেন।

ডক্টর কুলেশচন্দ্র কিছু দিন হ'লো "ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অফ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স" নামে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক 'ম্যাগাজিন' প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টায় আরও কয়েক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদের সাহায্য ও সহায়তা রয়েছে। এরই মাঝে বহু গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এ ম্যাগাজিনে। "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ এ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হওয়ার পর শুধু এখানেই নয়, বহির্বিশ্বেও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। দীর্ঘ দিনের গবেষণার পর ডক্টর কর 'ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল মেকানিক্স' (Statistical Mechanics) নামে একটি বহু মূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁরই নিজস্ব আবিষ্কৃত নতুন 'ওয়েভ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স থিওরি' (Wave Statistics Theory) এতে বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ডক্টর করের অবদান যে কত অসামান্য, তা শুধু আজকের দিনের মানুষই নয়, আগামী দিনের মানুষের কাছেও স্বীকৃতি পাবে, এ নিঃসন্দেহ। মাসিক বসুমতীর তিনি একজন গুণগ্রাহী পাঠক।

ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ)

বিদ্যা যে বিনয় দান করে, এ কথায় সন্দেহ আপনার থাকবে না, যদি আপনার দেখা হয় ডক্টর ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সুযোগ্য পুত্র তিনি। নিজেই বললেন, দর্শন আমার জীবনের ধ্যান, জ্ঞান এবং তা আমি পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে। আমার বড় দাদাও এ বিষয়ে আমাকে কম সাহায্য করেন নি। ছাত্র-জীবনে যে কয়েকজন মহাপুরুষ ব্যক্তির ঋণ আমি জীবনে ভুলতে পারব না, সর্বাগ্রে তাঁদের নাম করি। যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, অনন্তচরণ তর্কতীর্থ এবং পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য। আমার পিতার কাজ ছিল ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের ফাণ্ডামেণ্টাল ইডিওলজি সমূহ যে এক, তাই প্রমাণ করা। আমার কাজও প্রথম জীবনে ছিল তাই। আমি যে দর্শনের ছাত্র হিসেবে কাজে যোগ দেব, এটা হঠাৎ কিছু নয়। সমস্তটাই বরং 'প্ল্যানড়' বলা চলে।

১৯১১ সালে ১৭ই আগষ্ট শ্রীরামপুরে তাঁর জন্ম। শিক্ষা শুরু হল সেখানকার স্কুলেই। প্রথমে বল্লভপুর এম, ই, এবং পরে ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউসন। হুগলী কলেজ থেকে আই, এ আর বি, এ পাশ করলেন যথাক্রমে১৯৩০ সালে আর ১৯৩২ সালে। আই-এতে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বি, এতে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম-শ্রেণীতে প্রথম। এম, এ পাশ করলেন ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। আবার প্রথম-শ্রেণীতে প্রথম। প্রত্যেকটি পেপারে সবচেয়ে বেশী নম্বর তাঁর। এর পর চাকরী-জীবন সুরু হল। প্রথমে বিদ্যাসাগর কলেজ। সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে সংস্কৃত কলেজে। এখনও তিনি সেই কাজই করে চলেছেন। পি, আর, এস হলেন ১৯৪৪ সালে এবং পি, এচ, ডি ১৯৪৫শে। ১৯৫১তে পুনরায় ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসে মেটাফিজিকস্‌ ও লজিক শাখার সভাপতি হিসেবে বাঙ্গালী জাতির তিনি সুনাম বর্দ্ধন করে এসেছেন।

কালিদাস ভট্টাচার্য্য

ইংরেজ বলে, দেয়ার ইজ এ টনিক ইন এ চ্যালেঞ্জিং পার্সোনালিটি। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল যে, টনিক যদি কিছু থাকে তো সে ডক্টর ভট্টাচার্য্যের কথায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পাবেন কি না জানি না, কিন্তু আনন্দ পাবেন তাঁর কথা শুনে।

জিজ্ঞাসা করলাম, বিজ্ঞান ক্রমে দর্শনের পথেই এগিয়ে চলেছে একথা আমরা জেমস্ জীনস, এডিংটন, রাদারফোর্ড ইত্যাদির লেখার মধ্যে পেয়েছি। এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ?

না, তা ঠিক নয়। বিজ্ঞান আর দর্শনের যাত্রাপথ ভিন্ন। বিজ্ঞান সবকিছুর সিদ্ধান্ত করছে ফরমূলায় ফেলে। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ দর্শনের কাজ আরও অনেক ওপরে। দর্শনের বিচারে অর্দ্ধবোধি, মনন এবং সম্পূর্ণ বোধি—এই তিন ধাপ রয়েছে। বিজ্ঞান মনন অবধি গ্রহণ করেছে এবং তার মধ্যেও অর্দ্ধবোধি বা ... ইনটিউসন কি হাফ রিয়ালিজমনের কথাকে বাদ দিয়েই। বিজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে যে পথে এগুচ্ছে, তাকে হঠাৎ দর্শনের পথ বলেই ভ্রম হতে পারে অবশ্য কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে তা বলতে পারব না।

পরের প্রসঙ্গে এলাম। দর্শনের রিভাইবাল সম্পর্কে। দর্শনের

প্র্যাকটিকাল দিক নিয়ে কথা পাড়লাম। আগামী দিনের দর্শন কি পথ ধরে এগুতে পারলে তার জয়যাত্রা সফল হবে, সুরু হল সেই আলোচনা।

ডক্টর ভট্টাচার্য্য অবিচলিত। ঘড়ির কাঁটায় এগারোটা বেজে গেছে। প্রায় দুঘণ্টা নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি তবুও। তিনি বলে চললেন, বিজ্ঞান বিশেষ করে যান্ত্রিক-বিজ্ঞান 'হিউম্যান টাচ'কে অস্বীকার করতে চাইছে সর্বদা। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষের প্রয়োজন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে সৃষ্টির কাজে। কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, এমন কি ডেমোক্রেসীতেও রাষ্ট্রে এই 'হিউম্যান টাচ' যেন কমে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। এর কুফল ফলতে বাধ্য। এবং কাজেও হচ্ছে তাই। গত বিশ্বমহাযুদ্ধের পর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, মানুষকে বাদ দিয়ে কোন সভ্যতাই বড় হতে পারে না। মানুষের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে সমগ্র মানব-সভ্যতার ক্ষতিই করা হচ্ছে। তাই প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যে সর্বত্রই একটা রিভ্যাইবাল অব রিলিয়জন দেখতে পাচ্ছেন। মানুষ অন্ধ হয়ে পথ খুঁজছে। কেউ রামকৃষ্ণ, কেউ অরবিন্দ, কেউ এ-মঠ, কেউ সে আশ্রম। এই হচ্ছে উপযুক্ত সময় দর্শনকে মানুষের কাজে লাগানো। এখনি প্র্যাকটিক্যাল ফিলজফির কাজ হওয়া দরকার। টাইম, স্পেস আর ম্যাটারকে শুধুমাত্র ফরমূলা দিয়ে এষ্টাব্লিশ না করে রিয়ালিজেশনের স্কোপকে ফুটিয়ে তোলা দরকার, আর সেই হচ্ছে এখন আমার সামনে কাজ।

এ ছাড়াও শৈবতন্ত্র, অদ্বৈত-বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায় ইত্যাদির কাজও তাঁর রয়েছে। এসব কাজে সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত রিসার্চ ষ্টুডেণ্টদের তিনি নিজের কাছে রেখে কাজ করাচ্ছেন কলেজে।

সাধারণ সখ একদা ছিল তাঁর বাগানের কাজকর্ম করা। আজ আর সখ বলতে কিছু নেই। একটু হেসে বললেন, একটা সখ আজও আছে, সেটা হল ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন নতুন স্কুল খোলার। স্বগ্রাম শ্রীরামপুরে তিনি অনেক স্কুলের সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত।

মাত্র তেতাল্লিশ বছর তাঁর বয়স। দেশকে একাজে এগিয়ে নিয়ে যাবার অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাঁর। মাসিক বসুমতী না কি তাঁকে প্রচুর তৃপ্তি দান করে।

ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জী

[ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দন্তচিকিৎসক]

এ একটি কঠোর সংগ্রামজীবন—এ সংগ্রাম দিয়েছেন ইনি অভাবের বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেওয়া নয় শুধু, অটুট মনোবল, অদম্য উৎসাহ এবং দৃঢ় আত্ম বিশ্বাসের বলে সংগ্রামে জয়ীও হ'য়েছেন তিনি সুনিশ্চিত। তাই সেদিনের সংগ্রামী বঙ্কিম মুখার্জ্জীকে আজ আমরা বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ, স্বনাম-ধন্য ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জী হিসেবে পেয়েছি।

ডাঃ মুখার্জ্জী আজ দেশের একজন শ্রেষ্ঠ দন্ত-চিকিৎসক। কিন্তু এ অবস্থায় উন্নীত হ'তে তাঁকে কী কৃচ্ছ্রসাধন ক'রতে হ'য়েছে, সে এক ইতিহাস। ১৯০১ সালে হুগলী জেলার কোন্নগরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এ পরিবারটি বরাবরই বিদ্যানুরাগী ছিল কিন্তু অভাব ও দারিদ্র্য এঁদের অগ্রগতির পথে কম বাধা সৃষ্টি করেনি। এরই মধ্য দিয়ে বালক বঙ্কিমের জীবনযাত্রা সুরু হ'লো। শিক্ষা লাভের জন্য প্রথম থেকেই তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। ১৯১৭ সালে কোন্নগর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি প্রথম বিভাগে। তার পর উত্তরপাড়া কলেজ থেকে তিনি আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং ভর্তি হলেন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমান আর, জি কর মেডিকেল কলেজ) চিকিৎসা বিদ্ হবেন বলে।

কারমাইকেল কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেনীতে যখন পড়ছেন সে সময় ডাঃ মুখার্জ্জী ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটা বিপদের [illegible]লেন! বাড়ীথেকে চলে এসে তিনি চৌরঙ্গী "ওয়াই, এম, [illegible]"তে কাজ নিলেন একটি গ্রন্থাগারিক হিসেবে। দিনের বেলায় [illegible] চলতো এবং রাত্রিতে চলতো তাঁর পড়াশুনো, বাড়ীথেকে কোন প্রকার সাহায্য নেওয়া তখন তাঁর বন্ধ ছিল। ডাক্তারী পড়বার সময় তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সক্রিয় শুভেচ্ছা লাভ। এ সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জ্জীর নিজেরই উক্তি—"বাড়ী থেকে চলে এ'সে নিজের চেষ্টাতেই পড়া শুনো চ'লতে থাকে। কারমাইকেলে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি তখন, এনাটমির বই কিনবো সামর্থ্য হ'লো না। শুনলুম ডাঃ রায় (ডাঃ বিধানচন্দ্র) অসহায় ছাত্রদের পুঁথি পুস্তক প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য ক'রছেন। তাঁর কাছে যেয়ে আমার কথা জানালুম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একখানি চিঠি দিয়ে একটি বই এর দোকানে পাঠিয়ে দিলেন আমায়। দোকানে যেয়ে পত্রখানি দিতেই দেখলুম আমার চাওয়া এনাটমির বই আমার হাতে।"

কারমাইকেল কলেজ থেকে ডাঃ মুখার্জ্জী শেষের দিকে

বঙ্কিম মুখার্জ্জী

ট্রান্সফার (Transfer) নিয়ে চলে আসেন ক'লকাতা মেডিকেল কলেজে। মেডিকেল কলেজে যখন পড়ছেন, সে সময় তিনি প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হন। এ কারণে ক্রমাগত দু বছর তাঁর পড়াশুনো বন্ধ থাকে। এরপর আবার মেডিকেল কলেজেই তিনি পড়তে থাকেন এবং এল, এম, এফ পরীক্ষায় পাস করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই হাউস সার্জ্জেন হন। পরে তিনি এ হাসপাতালে রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন হিসেবেও বেশ কিছু কাল কাজ করেন।

১৯৩৩ সাল—ডাঃ মুখার্জ্জী সঙ্কল্প ক'রলেন বিলেত যাবেন দন্ত-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ হ'য়ে আসবার জন্য। কিন্তু যাবেন এমন প্রচুর সম্বল তখনও তাঁর নেই। অধ্যাপক নির্ম্মল বসুর সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব পরিচিতি ছিল। তিনি বিলেত যাবার জন্য ব্যাকুল, অধ্যাপক বসু একথা জানতে পেরে তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। সে অর্থ এবং নিজের সঞ্চিত সামান্য অর্থ নিয়ে তিনি বিলেত রওনা হয়ে যান।

এখানে পড়তে এসেও তাঁকে একটি চাকরী খুঁজে নিতে হ'লো—রাত্রিতে তিনি চাকরী করতেন, দিনের বেলায় করতেন পড়াশুনো। এরূপ অধ্যবসায়ের পুরস্কারস্বরূপ বিলেত থেকে এল, ডি, এস, আর, সি, এস ডিগ্রীতে ভূষিত হ'য়ে তিনি ফিরে আসেন ক'লকাতায় ১৯৩৭ সালে। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি কিছুকাল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হাসপাতালে হাউস-সার্জ্জেন হিসেবে কাজ করেন। কলকাতা এসে প্রথমে তিনি ক'লকাতা মেডিকেল কলেজে ক্লিনিকেল টিউটার হিসেবে যোগদান করেন এবং তারপর উক্ত কলেজ হাসপাতালের দন্ত-বিভাগের সহকারী ভিজিটিং সার্জ্জেন হন। তিনি এভাবে বিশেষ সুনামের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বৎসর মেডিকেল কলেজে কাটান। ১৯৪৮ সালে তরুণ চিকিৎসাবিদ্‌দের উৎসাহ ও সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি অবসর গ্রহণ করেন মেডিকেল কলেজ থেকে।

মেডিকেল কলেজ ছেড়ে ডাঃ মুখার্জ্জী স্বাধীনভাবে চিকিৎসায় ব্রতী হন ক'লকাতা মহানগরীতে। আজ পর্য্যন্ত দন্তের জটিল ব্যাধিগ্রস্ত কত লোক যে নিরাময় হয়েছে তাঁর সুপটু হাতে, তার ইয়ত্তা নেই। মহাত্মা গান্ধী, চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, আসফ আলি, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ বাঙ্গালা ও ভারতের বহু বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর কাছে চিকিৎসিত হ'য়েছেন এবং এখনও সেরূপ অনেকেই হচ্ছেন। দন্ত-বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি এখন দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে। ১৯৫২ সালে লণ্ডনে যে বিশ্ব-দন্ত-চিকিৎসক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৩৯ সালে ক'লকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাঃ মুখার্জ্জী যখন দন্ত-বিভাগে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত, সে সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকারের অন্যতম নায়ক শ্রীলোকনাথ বলকে হাতকড়া অবস্থায় চিকিৎসার্থ এ হাসপাতালে পুলিশ-প্রহরাধীনে নিয়ে আসা হয়। ডাঃ মুখার্জ্জির স্বাদেশিক প্রাণ এ'টি সহ্য করতে পারলে না। তিনি দাবী জানালেন চিকিৎসা ক'রবার আগে পুলিশকে এঁর হ'তকড়া খুলে দিতেই হ'বে। তাঁর দাবীর কাছে তদানীন্তন বিদেশী সরকারকে হার মানতে হ'লো—শ্রীবলকে মুক্ত অবস্থায় চিকিৎসা ক'রবার অধিকার তিনি আদায় করলেন। সেদিনে এ ঘটনার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সরকার আইন করতে বাধ্য হলেন—চিকিৎসাধীন কোন রাজবন্দীরই হাত-কড়া থাকতে পারবে না।

ডাঃ মুখার্জ্জী বর্ত্তমানে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাঙ্গালা ও ভারতের বিভিন্ন দন্ত-চিকিৎসা সংস্থার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি নিখিল ভারত দন্ত-চিকিৎসা-পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ দন্ত-চিকিৎসা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি প্রভৃতির সক্রিয় সদস্য। পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণরের তিনি অবৈতনিক দন্ত-চিকিৎসক। তিনি এখনও প্রচুর কর্ম্মক্ষম এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিযুক্ত। যুব-সমাজ যদি তাঁর উদ্যম-প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়কে আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ ক'রে জীবন সংগঠনে ব্রতী হন, তবে সাফল্য নিশ্চিত। প্রতি মাসের মাসিক বসুমতী না পড়লে তাঁর না কি মাস কাটে না।

উদয়ভানু

পুরীর হাওয়া বদল হয়ে যায়! কেমন এক থমথমে আবহাওয়া রাজ-অন্দরের! অব্যাহত সুখ যেখানে সেখানে এখন অশান্তির স্রোত প্রবাহমান! অর্থলালসায় অন্ধ কৃষ্ণরামের হাতে যেন রাজগৃহের সুখ আর শান্তি নির্ভর করে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কৃষ্ণরামের পর্ব্বতমান দাবী শিশুর চাঁদ-চাওয়ার মতই অযৌক্তিক মনে হয়, তবুও তাঁরই হাতে জীয়ন-কাঠি, রক্ষাকবচ! কোন্ অতল জলের অজানা গহ্বরে যে কৃষ্ণরাম লুকিয়েছেন মরণ-ভোমরার কৌটা, তাঁর চাহিদা না মিটলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে শুধু মাত্র বাহুবলে সকল কিছুর সমাধা হয় না, বুদ্ধিবলে হয়। বুদ্ধি যার বল তার। সরাসরি প্রস্তাবে যখন ফল পাওয়া গেল না, তখন কৌশল অবলম্বন করেন জমিদার কৃষ্ণরাম। বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। যেখানে ব্যথা সেখানে আঘাত করেন। কুটিলকৌশলের প্রচণ্ড আঘাত। নবাবের বাঙলা, সম্রাটের রাজত্ব বাঙলা দেশ! জমিদার কৃষ্ণরাম কি ঘরোয়া বিবাদে নেমে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন! তদুপরি রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর যখন নবাবের অন্যতম বিশিষ্ট প্রিয়পাত্র, দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বরের অনুগ্রহভাজন! কৃষ্ণরামের লোকবল নেই বললেই হয়। কয়েকটি মাত্র গাদা-বন্দুক আর জনপঞ্চাশেক পাঠান প্রহরী সম্বল মাত্র। জমিদারীর পাইক-পেয়াদা সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার সহায়ক হতে পারে, যুদ্ধনীতির কি জানবে! জমিদারের যত দাপট জমিদারীর চৌহদ্দীতে সীমানির্দ্দিষ্ট, তার বাইরে নয়। যত কারিজুরি নিজের এলাকায় চলবে, অন্যত্র নয়। তাই কৃষ্ণরাম কৌশল প্রয়োগ ক'রেছেন। চাল চেলেছেন একটা।

আছে অনেক। একাধিক আছে। তাদেরই একজনকে, কাদের যেন দুঃখের আর কষ্টের আঘাত হানতেই, পাঠিয়ে দিয়েছেন মান্দারণের সেই জনহীন ও অরণ্য-সঙ্কুল ভাঙ্গা-দেউলে। অনেক আছে কৃষ্ণরামের, প্রয়োজনের অতিরিক্তই আছে। একজনের অভাব তো অনেক আয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র অপব্যয়েরই সামিল—যাতে কিছুই যায় আসে না।

যে অনাহারী তার কাছেই এক গ্রাস অন্নের বহু মূল্য। আর যার উদর পরিপূর্ণ, অতিভোজনে যে ক্লান্ত, সে কখনও বোঝে না, বোঝে না এক মুঠা ধানে কত চাল হয়।

আজকের দ্বিপ্রাহরিক সন্ধ্যা সারতে পূজা-ঘরে আর যেতে পারেননি রাজাবাহাদুর। নিরালা খাস-কামরার কেদারায় বসে বসেই সেরে নিয়েছেন দ্বিসন্ধ্যার জপ-আহ্নিক। শুদ্ধিমন্ত্র উচ্চারণে আসনশুদ্ধি ক'রে নিয়ে, নিজেকে শুদ্ধ করে, মনে মনে শেষ করেছেন গায়ত্রী-জপ।

সন্ধ্যা শেষ হ'তেই কয়েক বার গলা-খাকরানির পর ডাক দিয়েছেন, হাতের পাশে যত্নে-রাখা পেতলের ঘণ্টা তুলে বাজিয়ে বাজিয়ে ডাক দিয়েছেন। সহসা রাজ-অন্দরকে চমকে দিয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা বেজে উঠতেই অন্তঃপুরবাসিনীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন!

নিমেষের মধ্যে কোথা থেকে যেন এক ঝলক আলোর মত এসে পড়লেন রাজমহিষী উমারাণী। খসখসের ভিজে পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন ভয়ে ভয়ে। একেই নাপতিনী দুঃসংবাদ পৌঁছে দিয়ে গেছে রাজার কানে। সেই দুঃখবেদনের অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন সহোদরকে, তিনিও সাড়া দিলেন না, এলেনই না। রাজাবাহাদুরের কষ্টকাতর ডাক অমান্য করলেন!

নিদাঘ-দিনের তপন-তপ্ত এক ঝলক রৌদ্র-রশ্মি দেখলেন যেন কালীশঙ্কর। কয়েক মুহূর্ত নীরব তাকিয়ে রাজমহিষী স্নিগ্ধ কোমলকণ্ঠে বললেন,—রাজাবাহাদুর, আপনার আহার্য্য প্রস্তুত। নির্দেশ পাই তো আসন পাতিগে।

কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন রাজাবাহাদুর। শুধু

মুখাকৃতিতে নয়, তাঁর কথাতেও জড়তা প্রকাশ পায়। দু একবার গলা-খাঁকরে বললেন,—হাঁ, আমিও ক্ষুধার্ত্ত।

—আপনি গ্রাস তোলেন। সবই প্রস্তুত। আসন পাতার কাজও তাই।

মিষ্টি মিষ্টি কণ্ঠ উমারাণীর। না অতি উচ্চ, না অতি নিম্ন কণ্ঠস্বর। কথার শেষে কক্ষ ত্যাগ করলেন অতি দ্রুত। হয়তো অন্দরে ছুটলেন। রাজাবাহাদুর আহারে আসছেন, তাই হয়তো কথাটি শোনাতে ছুটলেন।

রাজা-বাদশার ক্ষুধা! কত অধিক কে জানে! কত আয়োজন, কত উপকরণ।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ। দেব-দ্বিজের পূজা করেন। ভিন্ন গোত্রের হাতের রন্ধন স্পর্শ করেন না। রন্ধনশালায় কাজ করতে হয়, রাণীমায়েদের। রাজরাণী হ'লে কি হয়, উনুনের ধারে গিয়ে বসতে হয়। পরম পবিত্র দেহ-মনে পাক করতে হয় নানাবিধ সামগ্রী।

অনেক আশা আর অনেক আনন্দ মনে পুষে, অতি কষ্টের অগ্নিতাপ সহ্য করতে হয়। পাকঘর তো নয়, রন্ধনশালা তো নয়, যেন অগ্নিকুণ্ড! বৈশাখী গ্রীষ্মে আগ্নেয়গিরির মতই রূপ ধারণ করে রসুইশালা। ঘেমে নেয়ে ওঠেন রাণীমায়েরা।

তার পর, স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী কর্পূর সৌরভ-মুখী নয়নাভিরামা মন্দস্মিতা; অর্থাৎ, স্নান করি, সুন্দরী শোভন বস্ত্র পরি, সুচারু নূতন ধূপগন্ধে অঙ্গ ভরি, কর্পূর সৌরভ মুখে অনঙ্গ বিভোল্ ও মৃদু মৃদু মধুরহাসিনী রূপে পরিবেশিকার কাজ করতে হয়। নৃপপরিবেশিকার কাজ।

আসনে প্রাঙমুখো ভোক্তোপরিশেদ্বাপ্যুদঙমুখঃ।

অর্থে, পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিবে আসনে। কাষ্ঠ-পিঁড়ার উত্তরমুখ আসনে বসতে বসতে রাজাবাহাদুর গলা-খাকরানির শব্দ করলেন কয়েকবার। কেমন এক শুষ্ক বিষণ্ণ সুরে বললেন,—আহারে স্পৃহা নাই, তথাপি ক্ষুধাও আছে।

কথা বলতে বলতে রাজাবাহাদুর তাঁর কণ্ঠে ঝুলানো সুগন্ধি ফুলের মালায় হাতের পরশ দেন। গোলাপী গোলাপের কণ্ঠহার। চাঞ্চল্যে দুলছে।

পিঁড়ায় আসন লওয়ার আগে ফুলের মালা পরেছেন রাজা। চরণ ধৌত করেছেন। শুক্ল বস্ত্র পরেছেন।

রাজার স্বগত উক্তিতে আহার-কক্ষ যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। তবুও কত ধীরে ধীরে কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছে। এত পরিশ্রমের এত আয়োজন কি তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে! রাজা যদি মুখে কিছু না তোলেন! স্বাদ না পান, এত উপকরণের! রাণীমায়েরাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠলেন।

—এ তো সামান্য আয়োজন! রাজাবাহাদুর, আপনার মন আজ চঞ্চল, ধীরে সুস্থে আহার করুন।

মধুমিষ্ট কণ্ঠে কথা বললেন রাজমহিষী। স্নিগ্ধকোমল ভঙ্গিমায়।

কথায় যেন কর্ণপাত করেন না কালীশঙ্কর। রাঙা দুই চোখের শূন্য দৃষ্টিতে দেখেন সমুখের আহার্য্য-সামগ্রী—নৃপতি-ভোজন-যোগ্য রজতের থালে শোভা পায়। রজতের থাল যেন এক গোলাকার দর্পণ, এমনই স্বচ্ছ! যেন আকাশের সূর্য্য!

প্রশস্ত, নির্ম্মল ও মনোহর থালের মধ্যভাগে অন্নের চূড়া। দাইল ঘৃত মাংস শাক পিষ্টকান্ন মৎস্য ভোক্তার দক্ষিণে। সূপ আদি দ্রব্য সর্ব্ব দুগ্ধ পেয় জল প্রভৃতি চোষ্য লেহ্য আহার বামভাগে! মধ্যে দুই পংক্তিতে পক্কান্ন, পায়স ও দধি, ইক্ষু গুড়।

আহারের উপকরণ ব'হে আনতে ভারী হয়েছিলেন সর্ব্বজয়া। ভারবাহকের কাজ করেছিলেন। রন্ধনশালা থেকে আহার-ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন কাঁধে ভার চাপিয়ে।

আহারে বসেই আহার্য্য মুখে তোলেন না রাজাবাহাদুর। আচমন করেন। গণ্ডুষের মন্ত্র বলেন, রাঙা দুই চোখ বন্ধ করেন। নেশার ঘোরে কি না জানি না, পৃথিবীর যতেক অভুক্তকে খাদ্যার্ঘ্য নিবেদন করেন, মনে মনে।

রজতের থালে নিজের মুখের প্রতিচ্ছায়া দেখতে দেখতে কার মুখ যেন দেখতে পেয়েছেন রাজাবাহাদুর। না কি মনোদর্পণে দেখতে পেয়েছেন কার এক মুখচ্ছবি!

সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীর মুখখানি দেখলেন কি কালীশঙ্কর—সেও কি এখনও অভুক্ত। গড় মান্দারণের এক ভগ্ন অট্টালিকায় রাজকুমারী কি এখনও অনাহারে আছে!

ফুলের মালায় হাতের পরশ লাগে। রাজাবাহাদুরের বুকের পিঞ্জর থেকে থেকে মোচড় দেয়, মনোবেদনায়। মনের চোখে কাকে দেখলেন যে, কোন্ এক নিকটতমার চাঁদমুখ!

রজতের থালের মধ্যভাগে পীতবর্ণ মিষ্টি অন্ন। শাকপাক। প্রলেহ আর দাইল পাক কাঞ্চনপাত্রে। ঘণ্টপাক। নানাবিধ মৎস্য প্রকরণ—দমপোক্তা, কাবাব মাহী, জেরবিরিয়ান মাহী। মাংসের তাহিরী, হরীসা আর ছাগমুণ্ড। শর্করকন্দও মুদ্গ পিষ্টক। সারপায়স। ক্ষীরের আম্রগোলক। মালপুয়া। মিষ্টপুরিকা। পানিফলের টিকরশাহি। কাঁচা আমের চাটনি। ভাপাদধি।

কেমন যেন অন্যমনে আহার করেন কালীশঙ্কর। মধ্যে মধ্যে গলা-খাকরানির শব্দ করেন আর আহার্য্য মুখে তোলেন। উমারাণী সম্মুখে ব'সে হাতপাখার বাতাস দেন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন সর্ব্বজয়া। সাগ্রহে লক্ষ্য করেন রাজার আহারের রীতি। একেক গ্রস্থ আহারের শেষে হস্ত প্রক্ষালন করেন কালীশঙ্কর। ছিলিমচি ধরেন মেজরাণী, রাজার হাতে জল ঢালেন। অবসর পেলেই মুখভর্ত্তি তাম্বূল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করেন। সর্ব্বমঙ্গলার নাসিকা-প্রান্তের ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড চিকচিকিয়ে ওঠে তাঁর আপন চাঞ্চল্যে।

—রাজাবাহাদুর! আজ আমার ডাক পড়লো না কেন?

কার কথা শুনে রাঙা চোখ তুললেন কালীশঙ্কর। দুয়োরে দণ্ডায়মানা নারী-মূর্ত্তিকে দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ দেখে দেখে যেন চিনতে পারলেন। কয়েকবার গলা-খাঁকরে বললেন,—আয় শিবানী। তুই আসিস্ না কেন? প্রত্যহ কি তোকে ডাকতে হবে না কি?

শিবানীকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়লেন দুই রাণী। উমারাণী ও সর্ব্বজয়া বিব্রত বোধ করলেন। শিবানীর মুখের কোন অর্গল নেই—কি বলতে সে যে কি বলবে কে জানে! হয়তো রাজার আহারে বাধা পড়বে। আসন ত্যাগ করবেন কালীশঙ্কর—তখন কারও অনুরোধ টিকবে না।

রাজাবাহাদুরের আসনের কাছাকাছি বসে শিবানী। ভিজে এলো কেশের বোঝা সামলায়। চুলের রাশি জড়িয়ে এলো খোঁপা তৈরী করে দুই হাত মাথায় তুলে। খোঁপা জড়াতে জড়াতে বলে,—আর যেন পারি না চুলের বোঝা বইতে! কেটে ফেলাবো একদিন!

বিমর্ষ হাসি হাসলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—ছিঃ শিবানী, ও কথা বলতে নাই।

রজতের থাল আর কাঞ্চনপাত্রগুলি দেখলো শিবানী। বললে,—রাজাবাহাদুর, তোমার আহারে বুঝি আজ রুচি নাই? পাতের ভাত যেমনকার তেমনি তো প'ড়ে আছে!

—রুচি নাই, তবে ক্ষুধা আছে। ক্ষীণ হেসে বললেন রাজাবাহাদুর। সস্নেহে বললেন,—তোর কি কিছু খাওয়ার সাধ আছে?

খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো শিবানী। হেসে যেন গড়িয়ে পড়লো রাজার কথা শুনে। আহার-কক্ষে কে যেন রাশি রাশি মুক্তা ছড়িয়ে দেয়, এমনই হাসির শব্দ। হাসতে হাসতেই বললে,—খাওয়ার আর সাধ থাকবে না? আছে বৈকি! তার আগে একটা বিয়ার সাধ আছে। তোমরা তো কিছুই করলে না! একটা পাত্র পর্য্যন্ত দেখলে না! আমি শ্বশুর-ঘর করবো না?

কেমন যেন চিন্তাকুল দৃষ্টি ফুটলো কালীশঙ্করের রাঙা চোখে। দুই রাণী শিবানীর কথা আর হাসির ধরণ দেখে শিউরে শিউরে উঠলেন। রাজাবাহাদুর ভেবে ভেবে বললেন,—তুই যে কুলীন-ঘরের মেয়ে! কুলীনকন্যের পাত্র পাওয়া বড়ই দুর্লভ যে!

—তবে আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও না কেন?

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় শিবানী। চাপা সুরে কথাগুলি বলে। কেমন যেন দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—তুই এত অধীর হ'স কেন? তবে চেষ্টার ত্রুটি নাই জানবি। ফুল ফুটলেই বিয়া হবে তোর। ভাবিস্ কেন?

আবার সেই খিল খিল হাসি। হাসতে হাসতেই শিবানী বললে,—কুড়ির কোঠায় পা পড়েছে, আর কবে ফুল ফুটবে। একটি কাঞ্চনপাত্র ঠেলে দিলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—শিবানী, তুই খা। মালপুয়াখান তুই খেয়ে নে।

ভিখারিণীর মতই হাত পাতলো শিবানী। দুই হাত পাতলো। বললে,—দাও রাজাবাহাদুর, তোমার প্রসাদই দাও, খাই। ক্ষুধায় আমি জ্বলছি। বেলা কত হয়েছে তা জানো!

এ কথায় কর্ণপাত করলেন না রাজাবাহাদুর। খেতে খেতে বললেন,—বিয়া তো করতে চাস্, বিয়ার দুঃখুটা কি তুই জানিস?

—বিয়ার আবার দুঃখু কি? বিয়া তো সুখের! মেয়ে-জাতের কাছে শ্বশুরঘরই তো স্বর্গ, ইহকাল পরকাল।

মুখে মালপুয়া পুরে কথা বললে শিবানী। দংশন করতে করতে বললে।

মুখের আহার্য্য গলাধঃকরণের পর কালীশঙ্কর নিম্নকণ্ঠে বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীর বিয়া তো ভাল ঘরেই দেওয়া হয়। কত কষ্টে বিন্দু আছে তাতো শুনলি তুই!

রহস্যময় হাসির সঙ্গে শিবানী বলে,—শুনি নাই। জানতেও চাই না। বিন্দু দিদির এই অবস্থা, সে তো আমারই কষ্টে। আমার পানে ফিরেও দেখলে না কেউ। সেই পাপের শাস্তি এখন পোহাও।

বলে কি শিবানী! যা মুখে আসে তাই যে বলে!

তার কথা আর কথার ভঙ্গী শুনে লজ্জা পান দুই রাণী। উমারাণী ও সর্ব্বজয়া, থেকে থেকে বিচলিত হন। ভয় পান, শিবানীর দুঃসাহসের কথা শুনে। তবুও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। বাধা দিতে পারেন না। নিষেধও করতে পারেন না।

মৃদু মৃদু হাসলেন রাজাবাহাদুর। সহজ, সরল হাসি। হাসি চেপে কি যেন বলতে চাইলেন, অথচ বলতে পারলেন না। শুধু বললেন,—ঈশ্বর জানেন।

কথার শেষে একবার দেখলেন চোখ ফিরিয়ে। দেখলেন শিবানীকে। কি অপূর্ব্ব রূপ তার! দুধের মত দেহবরণ। নিটোল মুখ! মোমের গড়ন যেন দেহের। পরিপূর্ণ যৌবন!

গাছভরা ফুল যেন। বৃথাই ফুটেছে। দেবতার পূজায় লাগে না। অবহেলায় ঝ'রে যায় ফুলের পাপড়ি। হাওয়ায় উড়ে যায়—মাটিতে মিশে যায়।

শিবানীর কথায় সহসা ব্যথাভরা সুর শোনা যায়। শিবানী বললে,—আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও রাজাবাহাদুর। তোমাদের রাধানগরের মন্দিরে থাকবো আমি সেবাদাসীর মত।

—কি যে তুই বলিস্। বললেন কালীশঙ্কর। ক্ষণেকের জন্য আহারে বিরতি দিয়ে বললেন,—অন্যায় কথা বলিস্ কেন?

শিবানী বললে,—অন্যায় কথা নয় রাজাবাহাদুর। আমি কারও সংসারের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না। কথা বলতে বলতে উমারাণীর দিকে তাকায়। বলে,—বল' না বড়রাণী, তুমিই বল' না, আমার কথা কিছু অন্যায় বলা হয়?

নীরব থাকেন উমারাণী। হাঁ কিংবা না কিছুই বলেন না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

স্বল্পভাষিণী সর্ব্বজয়া, পান চিবানো থামিয়ে, আর থাকতে না পেরে বললেন,—দেখ শিবানী, কথা কওয়ার একটা স্থান-কাল থাকে। সব কথা কি সকল সময়ে বলা যায়? রাজাবাহাদুর আহারে বসেছেন, এখন এ সব কথা বলে না। বলা উচিত নয়।

সর্ব্বজয়ার প্রতি দৃকপাত করলো শিবানী। ব্যথায় কাতর দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললে,—রাজাবাহাদুরকে পাই কখন যে মনের কথাগুলো বলবো? এই আহারের সময়টুকুই তাঁকে যা অন্দরে পাওয়া যায়। আমার একটা হিল্লে ক'রে দাও তোমরা, কোন' কথাটি আর বলতে আসবো না। কখনও নয়।

—তবুও রাজা যখন আহারে বসেছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে না বললেও চলে। সর্ব্বজয়া কথাগুলি বললেন নম্র-গম্ভীর কণ্ঠে।

অকৃত্রিম হাসির সঙ্গে শিবানী বলে,—তোমার আর ভাবনাটা কি বল' মেজরাণী! রাজরাণী হয়ে উড়ে এসে তো জুড়ে বসেছো! বুঝবে কি আমার মনের কষ্টটা!

এত দুঃখেও হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর। সহজ, সরল হাসি। সহাস্যে বললেন,—ঠিক কথা কয়েছিস্ শিবানী! এতক্ষণে একটা কথার মত কথা তুই বললি বটে!

আহার-কক্ষ অন্ন-ব্যঞ্জনের সুগন্ধে টইটম্বুর। কত দূরে ভেসে যায় মসলার গন্ধ।

রাজগৃহ। দিকে দিকে সশস্ত্র প্রহরী। তবুও তাদের চোখ ফাঁকিয়ে কোথা থেকে যে রাজ-অন্দরে উড়ে আসে সামান্য একেকটি মাছি।

হাতের কাজ ভুলে পরস্পরের কথার আদান-প্রদান শুনছিলেন উমারাণী। তাঁর হাতের হাত-পাখা স্তব্ধ হয়েছিল।

রজতের থালের কাছাকাছি মাছি উড়তে দেখে কালীশঙ্কর বললেন,—হাত-পাখা দেখেই মক্ষিকা পালায় না। পাখা যে চালনা করতে হয়!

অসম্ভব অপ্রস্তুত হন উমারাণী। লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দেয়। রাজার কৌতুক-কথা শেষ হওয়া মাত্র পুনরায় পাখা চালাতে শুরু করেন। সলজ্জায়। পরস্পরের কথা শুনে হাতের কাজ ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

শিবানীর কথায় বোধ করি অপমান বোধ করেন সর্ব্বজয়া। শিবানীর কথার ইঙ্গিতে! মেজরাণীর চোখে না তাম্বূলরক্ত ওষ্ঠাগ্রে যেন ক্রোধের না অভিমানের আভাস ফোটে। একেই তিনি অল্পভাষিণী, আরও যেন গম্ভীর হয়ে যান।

জলের পাত্র তোলেন রাজাবাহাদুর। পরিপূর্ণ এক পাত্র জলপানের পর, বারকয়েক গলা-খাকরে বললেন,—ইতি আহারপর্ব্ব।

এমন সময়ে কোথা থেকে কার কণ্ঠ-নিনাদ শোনা যায়। কে যেন কাকে ডাক দেয় গর্জ্জনের স্বরে। রাজ-অন্দর মুখরিত হয়ে ওঠে সেই কণ্ঠধ্বনিতে।

—বড়বধূরাণী কোথায় গো!

কার ডাক শুনে উমারাণী তাঁর অসংযত বসন ঠিকঠাক করেন। গুণ্ঠন কপালের 'পরে টেনে দেন। কোন্ এক পুরুষ-কণ্ঠ শুনেছেন।

—কে ডাকে!

হাতের পাত্র নামিয়ে রেখে শুধোলেন রাজাবাহাদুর।

—ছোটকুমার ডাকলেন কি?

নিজেকেই যেন প্রশ্নটি করলেন, ফিসফিসিয়ে বললেন রাজমহিষী।

—তোমাদের রাজাবাহাদুর কৈ, কোথায়?

আবার সেই কণ্ঠনিনাদ। ঘুমন্ত রাজপুরী জেগে উঠলো যেন। কেঁপে ওঠলো।

আহার-পর্ব্ব যখন শেষ হয়েছে তখন আর বৃথা অপেক্ষা কেন! এই ডাকাডাকির ফাঁকে, সর্ব্বজয়া কখন নিঃশব্দে বেরিয়ে যান। যেন ঠিক ছায়ার মত হঠাৎ স'রে গেলেন আহার-কক্ষ থেকে।

—কাশীশঙ্কর কথা বলে না?

রাজাবাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন প্রথমাকে। রাজা দুই চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে। কুঞ্চিত ললাটে।

রাজমহিষী বললেন,—হাঁ, তাই তো মনে হয়। আমি যাই, তাঁকে ডাকি গিয়ে। তিনি কত খোজাখুঁজি করবেন কারও দেখা না পেয়ে। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রাণী।

—তাই যাও। সম্মতির সুরে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—শিবানী, হস্ত-প্রক্ষালনের জল দেও। কথার শেষে ছিলিমচির 'পরে প্রসারিত করলেন উচ্ছিষ্ট হাত।

নলমুখ ঝারি থেকে জল ঢালতে ঢালতে শিবানী ফিস-ফিস বলে,—রাজাবাহাদুর, তুমি আমার একটা উপায় করে দাও। রাধানগরে পাঠিয়ে দাও, বেশ থাকবো আমি সেখানে। রাজমায়ের সিন্দুকে আমার গয়নাপত্র আছে, দিয়ে দাও আমাকে। আর কিছু চাই না আমি।

লাল দুই চোখে রাজাবাহাদুর দেখলেন শিবানীর আপাদ-মস্তক। কি যেন লক্ষ্য করলেন, যা কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। যাকে স্নেহের চোখে দেখতেই অভ্যাস, তার দেহে দেখলেন যৌবন টলোমলো। এই প্রথম যেন রাজার দৃষ্টিপথে পড়লো। চোখ নামিয়ে কালীশঙ্কর বললেন,—রাধানগরে বাস করতে পারবি না তুই। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা তোকে রাখবে না। জাত-জন্ম খোয়াবি?

কথা শুনে অবাক মানে শিবানী। হাঁ হয়ে যায়। হতভম্বের মত ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। এমনি তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে,—আমার আবার জাত-জন্ম! আজও জানি না কে আমার জন্মদাতা পিতা, কার গর্ভে আমার জন্ম!

রাজাবাহাদুরের মত জনও এ কথায় ঈষৎ যেন বিচলিত হয়ে ওঠেন। লজ্জা না সঙ্কোচের ছায়া নামে যেন তাঁর

[৫১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

(মোহিতলাল মজুমদারের অপ্রকাশিত পত্রাবলী)

[কলিকাতা হিন্দু-স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৺সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের নিকট লিখিত।]

Bagnan P. o.
(Howrah)
29. 10. 45.

১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার পত্র পাইয়াছি—আমার ৺বিজয়ার প্রণাম জানিবেন। আপনার স্নেহ আমি ভুলি নাই।

এবার যে কারণে এবং যে বিষয়ে আপনি এই পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝিতেছি আপনি বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন; মাতৃভাষার প্রতি আপনার এই অনুরাগ এবং ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য আপনার এই উৎকণ্ঠা—আপনার মত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। 'ধার্ম্মিক' বলিলাম এই জন্য যে, মানুষের জন্মগত কয়েকটি ঋণ আছে—পিতৃ-ঋণের মত জাতি-ঋণও একটি ঋণ; জাতির কল্যাণ সাধন করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, যে না করে সে অধার্ম্মিক। ভাষাকে নানা অনাচার হইতে রক্ষা না করিলে জাতির ভাবজীবন, মনোজীবন এমন কি অধ্যাত্মজীবনও বিপন্ন হয়—জাতি আত্মভ্রষ্ট হয়। এ জন্য সকল জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির এই বিষয়েও একটা দায়িত্ব আছে। আপনার যে সে দায়িত্ব-বোধ থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আপনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাষার যে স্বৈরাচার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অন্তত: বিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা দিয়াছে। তার পর, ঐ স্বৈরাচারের মাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে আপনার প্রদর্শিত ঐ ভ্রমগুলি অতিশয় 'Innocent' বা 'Innocuous' বলা যায়; আপনি এত দিন Ripvan Winkle-এর আরামে বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়াছেন—সে নিদ্রা না ভাঙ্গিলেই ভাল হইত। যেটুকু ভাঙ্গিয়াছে তাহাতেই আপনি এত বিচলিত হইয়াছেন। আমি আজ বিশ বৎসর প্রায় নিঃসঙ্গ ও একক ভাবে সে যুদ্ধ করিয়াছি, তার পর এখন প্রায় হতাশ হইয়া রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়াছি। আপনি কয়েকটি ব্যাকরণ দোষ দেখিয়াই এত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ব্যাকরণ দোষ ত কিছুই নয়—ভাষারই জাতি নাশ হইয়াছে। ব্যাকরণ দোষ মূর্খতার লক্ষণ, তাহা সংশোধন করাও সম্ভব, কিন্তু ভাষার মূল রীতি পদ্ধতি এবং যাহা তাহার প্রাণ সেই Idiom-আধুনিক সর্ব্বসংস্কার মুক্তির পতাকাধারী মুক্তি-ফৌজের দল প্রায় শেষ করিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ অনেক-গত বিশ বৎসরের বা ততোধিক কালের শিক্ষা এবং শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত নব-নব সাহিত্যিক ধারা ইহার জন্য প্রধানত: দায়ী। আপনি একটা নিতান্তই বাহ্য লক্ষণ দেখিয়াছেন—ভিতরে দৃষ্টি করিলে আপনি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক হইয়া যাইবেন।

আপনি যে কয়েকটি ব্যাকরণ ঘটিত দুষ্ট প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে আমি যে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, ইহাতে আপনার সন্দেহের কারণ কি থাকিতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই আমার রচনার সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমাকে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। সাহিত্যিক অরাজকতার বিরুদ্ধে আমি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নির্ম্মম ভাবে লেখনী চালনা করিয়াছি—এবং বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যধর্ম্ম বা খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমি যে দীর্ঘ তপস্যা করিয়াছি—আমার জীবন তাহাতেই সার্থক অথবা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি, শুধুই ব্যাকরণ নয়, সাহিত্যের ধর্ম্ম, মর্ম্ম ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ সমস্যার চিন্তা একই কালে করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পুন:পুন: বলিতে হইয়াছে যে, ভাষাই সাহিত্যের আদি, মধ্য ও শেষ; ব্যাকরণ তাহার প্রাথমিক শাসন বিধি মাত্র; সব চেয়ে বড় যাহা তাহা ভাষার Genius বা 'স্বধর্ম্ম,' এবং সেই স্বধর্ম্ম ভাষায় শব্দযোজনা ও বাক্য-গঠন রীতিতেই প্রকাশ পায়; শুধু তাহাই নয়, শব্দগুলির ব্যবহারও 'বাংলা' হওয়া চাই। ব্যাকরণ শিক্ষা দিবেন স্কুলের শিক্ষক—সেটা খব দুরূহ কর্ম্ম নয়; কিন্তু যদি ভাষার সেই স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধিনাশ হয়, তবে তাহা নিবারণ করা যে কত দু:সাধ্য, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি।

আপনি ব্যাকরণ দোষ দেখাইয়াছেন—কিন্তু ব্যাকরণ জ্ঞান ত পরের কথা, বর্ণজ্ঞানও যে লোপ পাইতে বসিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় যে নূতন বানান-বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে 'ক্ষ'

অক্ষরটিও বাংলা শব্দ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে—'ক্ষেত'না লিখিয়া 'খেত' লিখিতে হইবে ; ইহার ফল এই হইয়াছে যে, 'আকাঙ্ক্ষা'ও আর 'ক্ষ'কে বরদাস্ত করে না—'আকাঙ্খা' হইয়াছে। কোন আইন বা কোন যুক্তির বালাই আর নাই। 'মৌন' বিশেষণরূপে ব্যবহার শরৎচন্দ্রই প্রথমে করেন নাই—রবীন্দ্রনাথের বহু আর্য প্রয়োগের এইটি একটি notorious উদাহরণ। কবিতার ভাষা যে গদ্যে সংক্রামিত হয় তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের আধুনিক সাহিত্যে আছে—বাঙ্গালীর বিদ্যায় ও সংস্কারে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বরং গদ্য কাব্যগন্ধী হইলেই তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। আমি পূর্ববঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়াও 'সাথে' শব্দটিকে শিষ্ট ভাষা হইতে বহিষ্কার করিতে পারি নাই। উহা যে একটি 'archaism' এবং কবিতায় ব্যবহৃত হইলেও শিষ্ট প্রয়োগ নয় ; কেবল নিম্নশ্রেণীর কথা ভাষায় এখনও বাঁচিয়া আছে —একথা কিছুতেই বুঝাইতে পারি নাই। 'আপ্রাণ' যে একটা অনাবশ্যক neologism—উহার অর্থও অসম্পূর্ণ, ইহা কেহ শুনিবে না 'ছোটদের' বা 'ছোটবেলা' যে খাঁটি বাংলা idiom নয়—'ছেলেদের' এবং 'ছেলেবেলা'ই যে বাংলা রীতি তাহা কেহ মানিবে না। বহু দৃষ্টান্ত আছে—শব্দের অর্থও বিকৃত হইতেছে, 'যোগাযোগ' কথাটি সাধারণ 'যোগ' বা সম্বন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, অথচ উহার বিশেষ অর্থ—Combination of circumstances, অথবা আরও ঠিক অর্থ 'সুবিধা জনক সংঘটন'। 'আওতা' একটি অতিশয় খাঁটি বাংলা বুলি, ইহার অর্থ—বৃক্ষলতার বৃদ্ধিনাশক Shade ; কিন্তু এখন অর্থ হইয়াছে "বৃদ্ধিকারক influence"! ভাষাকে এইরূপ নষ্ট করিতেছে কাহারা এবং কি কারণে, তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। ভাষার Idiomই ভাষার প্রাণ—ভাগীরথীতীরের ভাষায় যে অপূর্ব্ব ইডিয়ম-সম্পদ ছিল তাহারই বলে এত শীঘ্র বাংলা ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ; আজ সেই Idiom নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

আমি জানি, ভাষাকে রক্ষা করিবার যে সকল উপায় আছে, আমাদের শিক্ষাযন্ত্র সে উপায় কখনও করিবে না—কারণ আমাদের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নয় ; বাংলা ভাষাও সাহিত্য—সেই শিক্ষার সহায়ে গড়িয়া উঠে নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বাঁচিয়া উঠিয়াছিল—অর্থাৎ 'because of'নয়, 'in spite of'। কিন্তু এ সাহিত্যের কোন শাসন-পরিষৎ এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; তাই যখন, সমগ্র জাতি শিক্ষাহীন ও ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহার পরিবারে ও সমাজে যেমন নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তেমনই তাহার মনোজীবনের দেহ যে ভাষা, তাহাতেও নানা দুষ্ট ব্রণ ও বিস্ফোটক দেখা দিতেছে। আপনার উৎকণ্ঠা যাহা লইয়া তাহা অপেক্ষা আরও গভীর নৈরাশ্য জনক লক্ষণ আমাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য স্কুলে ও কলেজে যাহারা পড়াইয়া থাকেন তাঁহারা যে কেমন শিক্ষক তাহাও আমি জানি। এইজন্য আমি একদা একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলাম—যাহাতে ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের উপকার হয়, কিন্তু সেই পুস্তক এখনও সর্ব্বত্র পাঠ্য করাইতে পারি নাই। আপনি যদি না দেখিয়া থাকেন আমার প্রকাশককে আপনার ঠিকানায় এক খণ্ড পাঠাইতে বলিব। ম্যাট্রিক শ্রেণীর জন্য একখানি কবিতা সংগ্রহ আমি ইহার সম্পাদনায় এবং কবিতাগুলিকে অবলম্বন বা উপলক্ষ্য করিয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষা দানে, যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এ চেষ্টাও নিষ্ফল—এরূপ পরিশ্রমের মূল্য বা প্রয়োজন কে বুঝিবে?

সর্ব্বশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। আপনি আমার ভাষার একটি দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর ব্যাকরণ-দোষ আমার ভাষায় আছে। আমি 'কিন্তু-তথাপি' ঐরূপ যুগ্ম শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু ঐরূপ ব্যবহার খাঁটি ব্যাকরণ-সম্মত হইলেও ভাবার্থের স্পষ্টতা-সাধক কি না? ইংরাজিতেও "But Still —"ঐরূপ শব্দযোজনা কি নিন্দনীয়? ব্যাকরণের শাসন শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু তাহার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত,—ভাষার একমাত্র ধর্ম্ম ভাবপ্রকাশ ; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যস্রষ্টা যাঁহারা তাঁহারা ব্যাকরণকে ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়াই ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে মুক্ত রাখিয়াছেন, ইহা আপনিও জানেন।

আপনার শারীরিক কুশল প্রার্থনা করি। মাঝে মাঝে সংবাদ পাইলে সুখী হইব।

শ্রদ্ধাবনত শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২

Bagnan P. O.
Howrah.
12. 3. 46.

পূজনীয়েষু—

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু নানা কারণে উত্তর দিতে বড় বিলম্ব হইল। আপনার বয়স হইয়াছে, স্বাস্থ্য ভাল থাকিবার কথা নয়, তবু ভগবানের কৃপায় আপনাদের মত মানুষ দীর্ঘজীবী না হইলে, দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য। আমি এই বয়সে স্বাস্থ্য হারাইয়া প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। অথচ আমার কাজ এখনও কিছুই করা হইল না—'the little done and the vast undone'-এর দুঃখ রহিয়া গেল।

আমার উপর আপনার স্নেহের অধিকার ত আছেই, তা ছাড়াও যেন আরও কিছু আছে ; কারণ আমিও আপনাকে পরমাত্মীয়ের মতই স্মরণ করিয়া থাকি, বোধ হয় ইহা জন্মান্তরীণ কোন সম্বন্ধ। আপনি আমাকে যখন শুধুই স্নেহ নয় শ্রদ্ধাও করিয়াছিলেন তখন আমার ভবিষ্যৎ আমারও অজ্ঞাত ; কিন্তু আপনি তখনই চিনিয়াছিলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? আপনারা যে যুগ ও generationএর মানুষ আমিও তাহারই একটি শেষ product ; যুগান্তরের এই বন্যা স্রোতে আমাকে বহু সাধনায় দৃঢ় ও স্থির থাকিতে হইয়াছে—নূতনের আঘাতে পুরাতনকে আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইয়াছে। যুগ-সন্ধিস্থলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে যাহা সহিতে হইয়াছে, আপনাদিগকে তাহা সহিতে হয় নাই। আমাকে হইতে হইয়াছে—Interpreter between the two : তাই অনেক বিষয়ে আপনার সহিত মতভেদ বা দৃষ্টির পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, তথাপি আমি যে মূলে আপনাদেরই সহধর্ম্মী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না।

আপনি আপনার পত্রে বানান সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন তাহা আপনার মত পণ্ডিত জনের উপযুক্ত, ভাষা ও সাহিত্যের

মূলনীতি যাঁহারা অক্ষত রাখিতে চান, এবং জানেন যে, তাহা না হইলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধঃপতন অনিবার্য্য—তাঁহারাই আপনার সহিত একমত হইবেন। কিন্তু আপনি Ripvan Winkle হইয়া আছেন—ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। ১৯০৯ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে New Regulations-এর প্রবর্ত্তন হয় তাহাতেই এ জাতির শিক্ষার সমাধি হয়; তারপর গত generation ধরিয়া বাংলা দেশে শিক্ষা বা সংস্কৃতির কেনে বালাই আর নাই। আপনি ভাষার বিশুদ্ধির জন্ম ব্যাকুল হইয়াছেন কিন্তু জাতির চরিত্র ও ধর্ম্মই যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিদ্বানের সংখ্যা যেমন অতিশয় অল্প, তেমনই সেই বিদ্বানেরাও ধর্ম্মহীন হইয়া অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছে; ভাষা বা সাহিত্য যাহার বাহন ও আধার, জাতির সেই মানস-জীবন ও অধ্যাত্মজীবন যে একেবারে ভস্ম হইয়া গিয়াছে আপনি এ সকল কিছুই অবগত নহেন। ঘরে আগুন লাগিলে মানুষ তাহার শাল-দোশালার কথা ভাবে না—সুপ্ত সন্তানগুলিকেই বাঁচাইবার জন্ম সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে। তেমনই বাঙ্গালীর আত্মাই অতিশয় হীন দুর্ব্বল কলুষিত হইয়াছে—এ যুগে তাহাকে সুস্থ করাই প্রধান কর্ত্তব্য—যে দুর্নীতি ও মিথ্যা তাহার মনকে আক্রমণ ও অধিকার ও করিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে, ভাষা ও সাহিত্য কিছুই বাঁচিবে না। আমি সাহিত্যের আলোচনা ব্যপদেশে তাহার সমগ্র চিন্তা-পদ্ধতির সংশোধন করিতে যাই যে পরিশ্রম করিয়াছি আজও তাহা সকলে বুঝিতে পারেন নাই। সাহিত্যই আমার সেই সাধনার ক্ষেত্র হইলেও, আমি "New Philosophy of life"কে, প্রাচীন ও আধুনিকদের সাক্ষ্য প্রমাণে খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার জ্ঞান ও শক্তি অল্প—কিন্তু তাহাই সম্বল করিয়া আমি যে উদ্যম করিয়াছি—বোধ হয় সেইজন্যই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। কারণ আমার শক্তি চালনা অতিরিক্ত হওয়ায় আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আপনি বোধ হয় আমার সকল পুস্তক—অন্ততঃ প্রধানগুলিও পাঠ করেন নাই; তা ছাড়া, বহু আলোচনা ও বাদ-বিতর্ক মাসিকের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে।

এই কাজ করিবার জন্ম আমাকে নূতন মতবাদগুলিকে হজম করিতে হইয়াছে। আমাদের কালে Literary Criticism বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহা খুবই সংকীর্ণ এবং undeveloped অবস্থায় ছিল। বিংশ শতাব্দীতে (য়ুরোপে) ঐ Literary Criticism—মানুষের প্রায় সর্ব্ব—বিস্তার সঙ্গমস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সাহিত্যের অর্থ ও মনুষ্য-জীবনের অর্থ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একে ত সাহিত্য আর জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়—সর্ব্বমানবের আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়স্বরূপ হইয়াছে, তার উপর কাব্য-জিজ্ঞাসা বা সাহিত্য সমালোচনা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার স্তরে উন্নীত হইয়াছে। কাব্যরস ব্রহ্মাস্বাদসহোদর মাত্র নয়—তাহা একটা বিশিষ্ট 'জ্ঞানযোগ'ও বটে। অতএব আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় কোন্ সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের দেশে কিছু সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সাহিত্যের সমালোচনা—নূতন যুগের জীবনদর্শন বা জীবন-জিজ্ঞাসার উপযোগী সাহিত্যবিচার আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, অথচ পশ্চিম হইতে নানা মতবাদের প্রতিধ্বনি ও আস্ফালনে, আমাদের সেই পুরাতন, অর্থাৎ মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য—সেই সাহিত্যের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। আমি এই সাহিত্যিক আত্মহত্যা নিবারণের জন্য আজীবন লেখনী ধারণ করিয়াছি। আমি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস বা বিস্মৃত কবিগণের রচনা উদ্ধার, কিম্বা যাহা আপনিই স্বভাবের নিয়মেই মরিয়া গিয়াছে সেই সকল অপরিপুষ্ট এবং classical শ্রী-সৌষ্ঠবহীন কাব্য-সাহিত্যকে সাহিত্যের এই উন্নত ও উচ্চতর আদর্শের যুগে তুলিয়া ধরা প্রভৃতি কাজ কেন যে করিতে পারি নাই, এবং সে প্রবৃত্তিও আমার নাই, তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। তাহা যদি করিতাম তবে আমার শক্তির অপচয় হইত—সে কাজ করিবার বহু লোক আছেও; আমি ব্রাহ্মণের কাজই করিতে পারি, শূদ্রের কাজ আমার নয়। আমার প্রধান কাজ বাংলা সাহিত্যকে কৌলীন্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা—আধুনিক বাঙালী-সন্তান যেন তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে কোন লজ্জা বা অগৌরব বোধ না করে। যাহা একেবারে প্রথম শ্রেণীর যাহা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই তাহার চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বাংলা সাহিত্য ইংরেজী যুগেই সাবালক হইয়াছে, তাহার গ্রাম্যতা দোষ ঘুচিয়াছে। সেই গ্রাম্যতার সংস্কার আমাদের জাতিগত রসপিপাসার—অর্থাৎ আমাদের রক্তে এখনও আছে। কিন্তু তাহাকে লইয়া World's Republic of Letters-এ গৌরব করিবার কিছুই নাই। তথাপি খাঁটি বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ বাঙালীর সাহিত্যও বাঙালী জাতির আলোচনার যোগ্য, এবং তাহা রক্ষা করাও এক কারণে আবশ্যক। কিন্তু আমি তাহার উপযুক্ত নহি সে কাজ অপরে করিবে।

আপনাকে আমার 'কাব্য মঞ্জুষা' এক খণ্ড পাঠাইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আপনি সামান্য যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝিলাম, আপনার গভীরতর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ, আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম আপনিই এই পুস্তকখানির অভিপ্রায় এবং ইহার মূল্য সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। ঐ পুস্তক যে বাংলা কবিতার authology নয়, ছাত্রপাঠ্য নিম্ন standard-এর একখানি বই এবং তজ্জন্য সরকারী নিয়মাবলী যথাসাধ্য লঙ্ঘন না করিয়া আমি ছাত্রগণের সাহিত্যশিক্ষা, ভাষাশিক্ষা ও একটা 'সীমা' পর্য্যন্ত কাব্য-রসবোধ—এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা পুস্তকের মুখবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছি, তৎসত্ত্বেও আপনি তাহা মঞ্জুর করেন নাই। আমি যে এত পরিশ্রম করিলাম, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে—হইবারই কথা, কেন না, স্কুলে বা কলেজে সাহিত্যশিক্ষার ব্যবস্থা ত নাই-ই বরং বাধাই যথেষ্ট আছে। বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন যে পদ্ধতিতে যে সকল পণ্ডিতের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর নাই। আমি একদা এই কথা ভাবিয়াই, কোন প্রকাশকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে একখানি 'কবিতা সংগ্রহ' সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছিলাম, এবং এই তথা-কথিত পাঠ্যপুস্তকের মারফতে আমি সেই দুর্ভাগা ছাত্রগণকে সাহিত্য-শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাংলার ইদানীন্তন পাঠ্য-পুস্তক

ঐ পুস্তকের মত পুস্তক যে আর নাই ইহা আমি housetop হইতে উচ্চস্বরে বলিতে পারি। কবিতার নির্ব্বাচন ও সজ্জা যতদূর সম্ভব আমার অভিপ্রায়ের উপযোগী করিয়া (authologyর আদর্শে নয়) আমি যে 'উন্মোচনী' রচনা করিয়াছি, তাহার প্রতি পৃষ্ঠার প্রতি ছত্র এবং প্রতি অক্ষর না পড়িলে, আমার ঐ পুস্তকের মূল্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। আপনি কি আর একবার তাহা করিবেন? আশা করি আপনি উপস্থিত কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানিবেন। শ্রীমান পৃথ্বীশকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন।

স্নেহার্থী

শ্রীমোহিতলাল।

পুঃ নিঃ—পৃথ্বীশকে বলিবেন আমি রামতনু অধ্যাপক পদের জন্য কোন চেষ্টা করি নাই—দরখাস্তও করি নাই। গুজব মিথ্যা।

বাগনান

(৩) ১৪ জুলাই, ১৯৪৬

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ লিপি অনেক দিন হইল পাইয়াছি, কিন্তু এ যাবৎ উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত আছি। আমার স্বাস্থ্য যেরূপ ভাঙ্গিয়াছে তাহাতে আরোগ্য লাভের আশা করি না; Chronic Bronchitis এবং Blood pressure এর কোন চিকিৎসা নাই, তথাপি পৈতৃক জীবনীশক্তি বোধ হয় কিছু অধিক মাত্রায় পাইয়াছিলাম; সেই পিতৃশক্তির বলে এখনও টিঁকিয়া আছি এবং এমনই রোগযন্ত্রনা সহ্য করিয়া এখনও কিছু কাজ করিতে পারিব, তবে আর বেশি দিন বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। এই অবস্থাতেই জীবিকার চিন্তা করিতে হয়, সাহিত্য-কর্ম্মকে জীবিকা-কর্ম্ম কখনও করি নাই, এখন তাহাই করিতে হইতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখজনক বলিয়া মনে করি। আমার সাহিত্যিক-ব্রত এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে—অনেক কাজ বাকী, সেও একটা বড় দুর্ভাবনা।

শ্রীমান্ পৃথ্বীশকে একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছিলাম; অনেক দিন আগে তাহার এক চিঠি পাইয়াছিলাম, তাহার উত্তরে ঐ কথাটি বাদ পড়িয়াছিল। তাহাকে বলিবেন, আমি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির রামতনু চেয়ারের প্রার্থী হইয়াছিলাম এ সংবাদ মিথ্যা, আমি ঐ পদের জন্য কোন চেষ্টা বা চিন্তা করি নাই। অতএব, আমি যে ঐ পদ পাই নাই, তাহাতে তাহার দুঃখিত হইবার কারণ নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আমার পত্রে ও সাক্ষাতে খুব খোলাখুলি আলোচনা হইয়াছে; য়ুনিভার্সিটি আমার মনোভাব তিনি জানেন, আমি উহার পাপাচার সম্বন্ধে তাহাকে কিছুই বলিতে বাকী রাখি নাই; অতএব উহার মধ্যে আমাকে লইবার কোন কথাই হইতে পারে না। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান নয়, উহা যে একটি রাজনৈতিক Power-House ইহা তিনিও জানেন, তিনি নিজে Educationist নহেন Politician তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে শ্রদ্ধা করেন, তাই অনুরূপে য়ুনিভার্সিটি আমাকে সম্মান করিয়া থাকে Ph. D ও P. R. S-এর Thesis আমাকে পাঠায়। আরও কিছু যথাসাধ্য করিয়া থাকে। ইহার অধিক তাহার সাধ্যাতীত। পৃথ্বীশকে ইহা বলিবেন।

আমার একখানি নব প্রকাশিত পুস্তক আপনাকে শীঘ্র উপহার পাঠাইব, নাম—'বাংলার নবযুগ'। বইখানি সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগিবে, ভাষার ব্যাকরণ দোষ বহু স্থলে আছে, আশা করি তাহা পীড়াদায়ক হইবে না। 'আশ্চর্য্য' শব্দটির বিশেষরূপে ব্যবহার বাংলা রীতি হইয়া উঠিয়াছে, এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে—এখন আর উহাকে সংশোধন করা যাইবে না। Usage যে Grammar কে অগ্রাহ্য করে, তাহা আপনিও জানেন; কেবল ইহাই বিচার্য্য যে কোন একটি ঐরূপ ব্যবহার সত্যই Usage-পদবাচ্য কি না। আপনি আপনার পত্রে ভাষাঘটিত যে সকল অনাচারের জন্য বিস্ময় ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন—সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে আপনাকে লিখিয়াছি; তথাপি আপনার দুঃখ আপনি ভুলিতে পারেন না। আমি নিত্য যে সকল নূতন লেখকের গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বা উপহারস্বরূপ পাই, তাহা পাঠ করিলে আপনি বোধ হয় আর কোন অভিযোগ করিতেন না। বাঙালীর শিক্ষা প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া যেরূপ অধঃপাতে গিয়াছে; তাহাতে উহার অধিক কি আশা করিতে পারেন? শিক্ষক বা পরীক্ষক কেহ আর ঐ সকল ত্রুটি গ্রাহ্য করে না—শিক্ষকদিগের বিদ্যাও ঠিক ঐ ওজনের। যাহাদের চরিত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, জীবনের কোথাও সত্যনিষ্ঠা নাই, তাহারা ভাষা বা সাহিত্যের শুচিতা রক্ষা করিবে কেন? জাতি-হিসাবে আমাদের মৃত্যু আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে। 'অবদান' ও 'অবচেতন'—এ দুইটির গোত্র এক নয়। 'অবদান' একটি fashionable শব্দ, কিন্তু 'অবচেতন' শব্দটি বাংলা অনুবাদ। মূর্খের হাতে তাহার প্রয়োগ হাস্যকর হইতে পারে, কিন্তু শব্দটি নিরপরাধ। 'অবদান' অর্থ, ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গমূলক কোন কীর্ত্তি; বাংলায় ঐ অর্থের degradation হইয়াছে।

আজ এই পর্য্যন্ত। আপনার কুশল সংবাদ দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

স্নেহার্থী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

অবনীন্দ্র-চরিতম
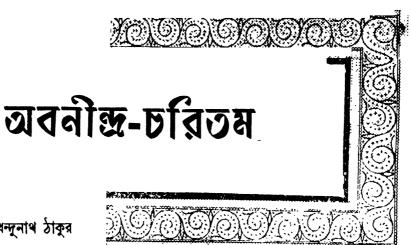
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

এই জাপান ও ভারতের আর্টিষ্ট-সম্মিলন থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করল এক বিচিত্র অঙ্কন-পদ্ধতি। "পদ্ধতি" শব্দটির উপর ঝোঁক দিয়েই আমি বলছি। নতুন ফুলে নতুন ভ্রমরের মত নতুন গান শোনাতে শোনাতে বাংলার চিত্র-রাজ্যে এই যে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল জাপানী-অঙ্কন-পদ্ধতি, ভারতবর্ষ তাকে স্বীকার করে নেয়নি। এই সাংস্কৃতিক অ-স্বীকরণের মূলে রয়েছেন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ণ নবত্বের দাবী নিয়ে, বিশ্বের দিকে চোখ-ওল্‌টানো এক রসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এই নবাগত জাপানী পদ্ধতির মোহিনী প্রথমেই গ্রাস করে ফেলেছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। গগন ঠাকুরের মধ্যে ভাবপ্রবণ শালীনতা বা মৌলিকতা ছিল অত্যন্ত বেশী। তিনি ওকাকুরার তুলি থেকে হুবহু তুলে নেন সেই পদ্ধতি। আর কি অপূর্ব ছবিই না বেরতে থাকে তাঁর তুলি থেকে! তাঁর রীতি, তাঁর চিন্তার ধারা যেন একেবারে মিলে-মিশে এক হয়ে গেল ফুজিয়ামার তুষারগিরি-নদীর নীরে। সে সব ছবি দেখলে কেউ ভুলেও বলবে না যে এ ছবি জাপানী-বন্ধুর নয়। সেই ছবিগুলির উপরে যেন লগ্ন হয়ে আছে জাপানের ট্রেডমার্ক। পূর্ব-পর্যায়ে, এমনি অঙ্কন-পটুত্ব ছিল শ্রীগগনেন্দ্রনাথের! রবি-দার জীবনস্মৃতিতে গগনঠাকুরের ঐ হেন অনেকগুলি কৃষ্ণ-শুভ্র চিত্র মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। যে কোন জাপানী বড় আর্টিষ্টের ছবির সঙ্গে সেগুলির তুলনা দেওয়া চলে। অন্তরিক্ষের (Space) সেই অপূর্ব বিস্তার, সেই বাতাস-খেলা মূর্ত্তির প্রবাহ, পরদার পর পরদায় রশ্মির সেই পরিক্রমা,—সেই ছবিগুলিতে লক্ষ্য করা তো যায়ই, অধিকন্তু সেগুলিতে আমরা ভাব-রূপের নবাক্বণিত ব্যঞ্জনায় দেখতে পাই অতি-সাধারণকেও; যেমন—

সকাল বেলায় প্যারাপিটের উপর রোদ পোয়াতে বসেছে কলকাতার কাকের পলিটিক্যাল সভা,

নারিকেল গাছের ঝাঁকড়া চুলের শিখরে হাসতে হাসতে বেলফুলের মালা পরাচ্ছে দুষ্টু চাঁদের জ্যোৎস্না,

কালো কপাটের ধারে দাঁড়িয়ে, দূরে চোখ মেলে চেয়ে আছে অন্দরের শুভ্রবসনা,—নিঃসঙ্গ আকাশের উদাস স্বচ্ছতায়। ইত্যাদি।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথে এ ধরণের কিছু ঘটল না। গগনেন্দ্রনাথকে পেয়ে বস্‌ল পদ্ধতি-সমেত জাপানী ভাবধারা; কিন্তু অবন ঠাকুরে ঘট্‌লো উল্টো ফল। যে মানুষ ঈক্ষণ করেছেন,—ভারত চিত্র-সংস্কৃতির ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না ইউরোপীয় চিত্রণ-পদ্ধতি, —তিনি কেমন ক'রে অনায়াসে স্বীকার নেবেন জাপানিক রূপাভি-যান? এবং তিনি তা পারলেন না; গ্রহণ করতে পারলেন না জাপানী-চিত্র-চার্মিক রূপাঙ্গভেদ। সুগৃহস্থের মত তিনি দিলেন জাপানকে সম্ভ্রান্ত আতিথ্যের সমাদর, এবং দ্বিধাহীন গুণ-গ্রহণীয়তা। "ভারত-শিল্প" শীর্ষক পুস্তিকাটিতে তিনি এই সম্বন্ধে যে দু'-চার ছত্র লিখেছেন, তা পড়ে শোনাই;—শোনো।

"জগতে মূর্ত্তি-শিল্পে আমার দেশ একটি মাত্র মূর্ত্তি রাখিয়া গেছে সেটি হচ্ছে বুদ্ধদেবের ধ্যান-মূর্ত্তি;—ইহার তুলনা নাই, ইহার জোড়া নাই। যে স্তরে এই বুদ্ধমূর্ত্তির আসন, গ্রীক মূর্ত্তি-শিল্প, তাহার সমস্ত নৈপুণ্য সমস্ত সৌন্দর্য লইয়া শিল্পের সেই স্তরে আসিয়া পৌঁছে নাই।

…"জাপানের শিল্পকে আমরা ইহার ভিতর আনিতে পারি না, কারণ এখনও তাহার উঠিবার মুখ।

…"এই গ্রীকমূর্ত্তির সঙ্গে আর্যাবর্ত্তের বুদ্ধ কিংবা বিষ্ণু অথবা কোন একটি ধ্যানমূর্ত্তি জুড়িয়া দাও এবং পার তো জাপানের নারামন্দির হইতে এক বোধিসত্ত্ব আনিয়া বসাও, দেখিবে তিনেতেই এক ধ্যানের প্রভাব।"

…"মোট কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ—আর্যাবর্ত্তের শিল্পীর কর্ত্তব্য—চাক্ষুষ সমস্ত পদার্থ এবং বাস্তব জগৎ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কেবল ধ্যানের দ্বারা হৃদয়পটে যে মূর্ত্তির উদয় হয়, তাহাই প্রকাশ করিতে যত্ন করা।

গ্রীক শিল্পীর মতে বাস্তব জগতের ও চাক্ষুষ পদার্থ সকলের সুন্দর অংশ একত্র করিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের একটা-একটা প্রতিমা খাড়া করাই শিল্পের চরম উৎকর্ষ।

জাপানী শিল্পীর কাছে—সুন্দর অসুন্দর, স্বর্গ মর্ত্ত্য, সকলি সমান। গোচর-অগোচর সমস্ত পদার্থের মর্ম-গ্রহণ কর এবং সেই মর্মকথা সহজে সুসংযতভাবে, পরিষ্কার-রূপে প্রকাশ কর।

পৃথিবীর তিনটা মহাদেশে তিন বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিল্পের এই তিন আদর্শ তিনটি বিজয়স্তম্ভের মত আজিও বিদ্যমান। হঠাৎ দেখিলে তিনটা শিল্পই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বোধ হয়, কিন্তু গোড়া

কথা তিনেই এক। সেই মানস-প্রতিমা ও ধ্যানের প্রভাব তিনের ভিতরেই "ফল্গুনদীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন আছে।" (পিঃ। ২১-৫৭)

অতএব দেখা যাচ্ছে,—গগনেন্দ্রনাথে যেমন প্রাথমিক প্রত্যক্ষ প্রকাশ পেল রূপের (জাপানিক) পক্ষপাতিত্ব, অবনীন্দ্রনাথে তেমনি পরোক্ষ প্রকাশ পেল গুণের পক্ষপাতিত্ব। ঐ পদ্ধতির গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিকেই ঢলে পড়ল তাঁর মন। এবং সেই গুণের সূক্ষ্ম বিচার ও experiment এর মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কর্ত্তা হলেন এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির—সেটিকে আজ-কাল আমরা বলে থাকি অবনীন্দ্র-নাথের wash system। বলাই বাহুল্য, জাপানিক ও আবনৈন্দ্রিক wash পদ্ধতি এক নয়, পৃথক এদের ধাম। পরপর্যায়ে, শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বীকার করে নিয়েছিলেন এই নবতম wash-system এবং অসামান্য প্রতিভার স্বকীয়তায় তিনিও আবিষ্কারক হয়েছিলেন এক অনিন্দ্য চিত্ররূপের—যা জগতে,—বৈশেষিকতায় নিগূঢ়। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দেশে, রসিক ছবিকার-সমাজে, ভ্রান্ত ধারণা দেখতে পাই।

চিত্রাঙ্কন-শিক্ষা-সময়ে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে যেটুকু আমি জেনেছিলুম, পরবর্ত্তী উচ্ছ্বাসে প্রসঙ্গতঃ সেটি আমি লিপিবদ্ধ করব। রেখার পারিপাট্য আর wash এর মোজেইক! ইত্যাদি। এখন এই পর্য্যন্ত। শুধু বলা রইল,—অবন ঠাকুরের তুলিতে জাপানী ছবি বেরোয়নি। যাক্—যা বলছিলুম।

আমাদের মগজে তখন ভারত-চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে রাই কুড়িয়ে বেলের অবস্থা। ঘরে গড়া হচ্ছে মূর্ত্তি, মনে গড়া হচ্ছে মূর্ত্তি, কিন্তু যিনি আমাদের মনের মত মূর্ত্তি গড়েন, তাঁর সঙ্গে তো দেখা নেই। এমন সময়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত আমাদের নিভৃত "কলাভবনে" যোগ দিলেন এক বিচিত্র পুরুষ।

কোন্ পাহাড় থেকে ঝরতে থাকে ঝরণার জল জানি না, কিন্তু সেই জলই নিম্নাভিমুখী স্নেহপ্রবণতায় সৃষ্টি করে চলে ধ্বনি-ঝঙ্কারিণী নদী। গন্ধর্ব-বাজিত পাহাড়ের মত সেই প্রাণ-সুন্দর পুরুষের মুখে তখনকার দিনে যে উৎসাহ পেয়েছিলুম, এবং যে ছোট একটি ঘটনা শুনে ব্যস্ত হয়েছিলুম সেটিও, শ্রীমান্, তোমাকে বলে রাখি। এই গল্পের সমষ্টিই উদ্দীপন-বিভাবের মত কাজ করেছিল আমাদের চিত্ররসে সেকালে। ৺ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে তোমরা সকলেই জানো। বঙ্গ অঞ্চলে সার্থক সঙ্গীতের বিনষ্টির পথে বৃহৎ-বাধার মত একদা দাঁড়িয়েছিলেন এই অতি-অমায়িক ভদ্র পুরুষ-পর্বত। তিনি ছিলেন আমার পিতৃদেবের হৃদয়ের বন্ধন-বন্ধু, সহোদরের মত; এবং তিনি ছিলেন আমার মামার চার-ইয়ারীদের মধ্যে অন্যতম। আমরা "কলাভবন" খুলতেই তাঁর আগ্রহ অতি সহজ ভাবেই বেড়ে যায়। কলাভবনের তিনধাপী সিঁড়ির প্রান্তে দক্ষিণের বারান্দায় একটি শ্বেতপাথরের তক্তাপোষের উপর রচিত হয় তাঁর আসন। ভারত-সঙ্গীতের যিনি শুদ্ধ সমাবর্ত্তন করছেন, কারুকলাবিদ্যাও তাঁর এলাকায়, নিশ্চয়; কাজেই, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্, আমাদের ছবি-শিক্ষার administrative ভার পড়ল তাঁর হাতে। whatman Paper আর needle Brush তিনিই একদিন নিয়ে এলেন আমাদের ভবনে। আর নিয়ে এলেন Le Fancএর প্যাস্‌টেল বাক্স। রোম-লণ্ডন-ফেরৎ artist আমার ছোট-ঠাকুর্দ্দার তিরোধানের তিন যুগ পরে ভূপেন কাকাই নিয়ে এলেন ছবি-শিক্ষার সংগ্রাম আমাদের বাড়ীতে। আমার হাতে তুলে দিলেন তুলি। এই সব খেয়ালের খোসবু-দার খেলা চলছে কিন্তু, আমাদের গৃহশিক্ষকদের কড়ারাশ বা অনুমতির বাইরে। দূর দিয়ে বাবা কেবল মুচ্‌কি হেসে চলে যান। ভূপেন কাকাই একদিন শ্রীহিরণ্ময় রায় চৌধুরীকে বললেন—

"ওহে হীরু, কি বাওয়া, white clay নিয়ে নিজে কাজ কর, বেশ কর, কিন্তু এরা তো মাটি ঘাঁট্‌তে পাববে না। এদের ধাতে নেই। তোমার ঐ ষ্টুডিয়োতে এরা অচল। তুমি ওদের anatomy শেখাও, কিন্তু ওদের জন্যে আমার একজন রঙীন্ গুরুর দরকার।"

আর যায় কোথায়! মামা হেঁকে বস্‌লেন—তাঁর গুরুদেব শ্রীঅবন ঠাকুরের নাম। ভূপেন কাকাও তৎক্ষণাৎ দিলেন Ditto। কিন্তু...ঘণ্টি পরাবে কে? সমাজের ভীষণ বাধা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে মিলনের পথে। বিধবা-বিবাহ আর Club কোন্দল! সামাজিক কলহের বায়ুস্তান পাহাড়ে তখন ঘুড়ি উড়ছে। বড়-বাড়ী ছোট-বাড়ীর মধ্যে মুখদর্শন-প্রসঙ্গ নেই। সব বুঝি ভেস্তে যায়। কিন্তু ভূপেন কাকা সাংঘাতিক লোক। গোঁড়া কায়স্থ হ'লে হবে কি, যা তিনি ধরেন তা তিনি করেন। তিনি রায় দিলেন—

"ছবির ক্ষেত্রে, বিদ্যার ক্ষেত্রে, সামাজিকতা অচল। যিনি গুরু,—তিনি সর্ব-ক্ষেত্রের, তিনি সর্ব-সমাজের।"

মামা বললেন—ভূপ, এ যে অসম্ভব...!"

—সেই অসম্ভবের রাজ্যে বাস করবার সময়ে শ্রীভূপেন ঘোষের মুখে শুনেছিলুম একটি ললিত-লবঙ্গ-লতা কাহিনী। আমার বেশ মনে আছে—

"কী বলিস্ হীরু। ঐ অবন ঠাকুর ছাড়া আমি তো রঙীন্ মানুষ খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু পোটো নয়, একেবারে নাটুকে। রবিঠাকুর ভাষার মানুষ, ভাবের কবি, কিন্তু, কি বাওয়া, তাঁকে Execute করেছে কে? ঐ অবন ঠাকুর। বলি, "ফাল্গুনী", "অচলায়তন" প্লেটা দাঁড় করাল কে? ঐ অবন ঠাকুর। ফাল্গুনীর রাজা পাকা চুল দেখিয়ে চলে গেলেন, তারপরে যখন পর্দ্দা সরিয়ে দিলে, তখন দেখি অরু ঠাকুরের ছেলে অজিন ঠাকুর,...না, আশা-মুকুল...কে এক ফুটফুটে ছেলে দুলছে মালঞ্চের দোলনায়; সেই Scene, সেই রং আমি কোনো দিন ভুলব না, জানিস্।"

বলেই, প্রকাণ্ড রূপোর পানের কৌটো থেকে মিঠে পান মুখে পুরে, (আর, আমাদেরও দিয়ে) বলতে লাগলেন—

"মাইকেলী-গিরীশ-ঘোষের যুগে ওটা একটা দুর্দ্দান্ত ষ্টেজের কল্পনা রাজার একগাছি পাকা চুল যেন দোলনার দোলানিতে, অভিনয়ের দাপটে, কলপ মাখতে ছুটেছে গ্রীনরুমে বাসন্তী-পূর্ণিমায়। আর সেই বৈরাগ্য-বারিধি! "আত্মহংস লক্ষ্য ছিল বলে ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।"—ঐ রঙীন্ মুরুক্ষু গুরুটিকেই আনতে হবে, বাওয়া, আমাদের এই বিল্পের আঁতুড়ঘরে। দুটো কলাগাছ, একটা পাতকুয়ো, পিছনে একটু হাল্কা নীল সবুজে রঙ এঁকেই একেবারে মাৎ করে দিলে! ছবিটি...বাওয়া...।"

মামা। কিন্তু ম্যাও ধরবে কে?

হ্ন। সেজদাকে (শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর) আমি সাম্‌লে নেব। তোর হাতে রইল কিন্তু উদ্যোগপর্ব্ব, আর কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

আমরা, ছেলেরা, তখন আধেক শুনি আধেক বুঝি···রসের কথা। কিন্তু রসের মধু বড় গুরুপাক। গুরুজনদের ঠারঠোর হাসি-মস্করার মাধ্যমে আমাদের জীবনে যে কী এক নবীন নাটকের সৃষ্টি হতে চলেছে, তখন আমরা বুঝিনি। আমরা ওঁদের "বাওয়া" শুনেই তখন আত্মহারা। ভূপেন কাকাও গোড়ে গোড় দিয়েছেন! তিনি গুণীলোক, বড় সহজ নন। অদ্যকার বাংলা দেশেও সঙ্গীত-ঘরের একমাত্র অশরীরী মালিক হয়ে রয়েছেন তিনি;—সেই নিভৃত-তপস্বী মৎস্য-মাংসহীন শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।

বাংলা দেশের একটা বদনাম আছে। এখানকার মানুষ পাশের ঘরের মানুষকে চেনে না, দলাদলি করে। তাই বোধ হয় ঐ প্রবাদ "গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না,"—এখন সচল। কিন্তু আশ্চর্য্য! তদানীন্তন বাংলা দেশের সামাজিক কৌলীন্য অদ্ভুত প্রগতি-ধার্মিকতায় চিনে নিয়েছিল তদানীং-হেয় পিরালি-সমাজের ঐ চিত্র-ভাস্করকে, বৃটিশ-সংস্কৃতি-বিদ্রোহী অবনীন্দ্রনাথকে, ভারত-বোধায়নের নব-নন্দনকে, ঐ গৃহ-প্রান্তের বেতসনিকুঞ্জিত রস-নদীকে।

তাই আমাদের মনের কিশোর-সন্ধি মঞ্জুষায় তখন বাসা বেঁধে এসেছিলেন—ঐ রঙীন মানুষটি। ভূপেন্দ্রের দেখা ঐ রঙদার গন্ধর্ব।

যখনকার কথা বলছি, তখন আমাদের উদ্বেজনায় ইন্ধন জুগিয়েছিলেন আর একটি মানুষ। Personal ব্যাপার হলেও বলে রাখি। তিনি আমার গৃহপণ্ডিত ৺যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য। বাংলা ভাষার সার্থক নিদর্শনস্বরূপে তিনিই আমার হাতে এনে দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের একটু ক্ষুদ্র পুস্তক। নাম তার "ভারত-শিল্প"।

আমার এই পণ্ডিত মশাইটি ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। 'পণ্ডিত' বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, তিনি তৎবোধের ছিলেন বাইরে। পণ্ডিতরা সাধারণতঃ ছাত্রকে পড়াতে আরম্ভ করেন ব্যাকরণ, কিন্তু এই পণ্ডিতটি আমাকে পড়াতে আরম্ভ করলেন, "রঘুবংশ" গোড়াতেই। বলতেন—কট্‌কটি ব্যাকরণ সারা জীবন তো পড়বেই ছেলেরা, নিস্তার নেই;—তাই গোড়া থেকেই রসের অভিজ্ঞতা ধাঁ করে সেঁদিয়ে দেব ওদের মাথায়। এই-হেন নস্য-স্ফীত পণ্ডিতটি আমার হাতে এনে দিয়েছিলেন ঐ "ভারত-শিল্প"। দীর্ঘ সুগোল দেহ, বর্ণ স্বর্ণ-কপিশ; কিন্তু মুখটি গম্ভীর-জলে রসিক। প্রশস্ত ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ ব্যাতত হলেই মুখাম্ভোজে বাণী-বরনৃত্যতির দেশ; আর সঙ্কুচিত করলেই, মুখখানি যেন প্রজ্ঞার বহ্নি জ্বলজ্বল সিদ্ধ মহাবীর-পাত্র। তাঁর হাত থেকে এই পুস্তিকাটি লাভ করে একটি মায়ারি ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল আমার মধ্যে। তার কারণ আছে। ঐ সময়ে আমার প্রধান শিক্ষক শ্রীশশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের নিষেধ ছিল আমাদের অপাঠ্য পুস্তক পাঠের। "অপাঠ্য" মানে syllabus বহির্ভূত—হেন পুস্তক, অতএব হেয়। পণ্ডিত মহাশয় কোন্‌ দুঃসাহসে যে ঐ "ভারত-শিল্পের" মত অপাঠ্য পুস্তক আমার সান্নিধ্যে এনেছিলেন বুঝতে পারিনি; তবে আশু ভবিষ্যৎ যে সুফলপ্রদ হবে না তা বুঝেছিলুম। এবং তাই,—(অপাঠ্য পুস্তকের পঠন-মোহ কাটানো সর্বকালেই দুষ্কর)—আমি দিবা দ্বিপ্রহরে চিলছাদের নহবৎখানায় গোপনে বসে পাঠ করতুম সেটিকে। রূপকথার বই না হলেও আকাশ-খোলা চিলছাদে ঐ ছোট্ট বইখানি আমাকে এক নতুন রূপ-কথাই শোনালো; পাল্টিয়ে দিল চোখের মুখ। "ভারত-শিল্পে"র শিল্প-কথা আমি জানলেম না কিছুই, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই প্রথম এল জিয়োগ্রাফীহীন বেদনা-বোধ আমার কিশোর চেতনার মধ্যে। এই ভারতবর্ষ যেন—

"একই দেবতা, তাঁহারই যে এই ত্রিমূর্ত্তি এ যে তিনই এক, একই তিন, কেহ কাহারও কাছে ঋণী নয়; এ কথা ইউরোপকে বোঝানো শক্ত; যে দেশের শিল্পী এখনও ধ্যানমূর্ত্তি গড়ে, সেই দেশের লোকই বুঝিয়াছে।"

(পিঃ ৫৮)

বইখানির বুঝিনি তখন অনেক কিছু, কিন্তু শ্রীমান, এইটুকু বুঝেছিলুম—খাঁটি কথা লিখেছে খাঁটি একটা প্রাণ। পণ্ডিত-মহাশয় চমকিয়ে উঠেছিলেন যখন প্রশ্ন করেছিলুম "কালো বৌ আর মেম বৌ এ তফাৎ কি!" তিনি হেসে দাঁড়িয়ে উঠে ঝপাৎ করে টেবিলের উপর থেকে বইখানিকে তুলে নিলেন, পাতা উল্টিয়ে বললেন—"পড়েছিস্ দেখছি! কী সহজ ভাষা দেখ, দিকি। একেবারে আদিভাষার সঙ্গে মিল! 'উত্তম'—'মধ্যম'—'অধম'—ছাঁকা কঠোপনিষদ্। ঐ তিন। পড়্, পড়্।

কোথা থেকে আসে এবং কোন প্রক্রিয়ায় হয় জানা নেই, কিন্তু অঙ্কুর ফুটে ওঠে বীজে;—বোধ হয় অগ্নিমারুতির আশ্বস্ত আশীর্বাদে। ঐ তুচ্ছ অথচ প্রাচ্ছ বইখানি আমাকে শীতের বিছানার মধ্যে বালাপোষের মত জড়িয়ে ধরেছিল, এবং তার ফলে, হোলো কি জানো? সেই বয়সে, আমি তখন সতের কি আঠারো বছরের জোয়ান্···ইঁচড়ে পাকলুম—অর্থাৎ, আমি ভালবাসতে শিখলুম "কলা-বৌ"কে।

ভারতশিল্পের এই "কলাবৌ"এর মধ্যে "কালোবৌ" ও "মেমবৌ" দুয়েরি রয়েছে স্থান। কিন্তু শ্রীমান্, আজ নিভৃতে বলি, ঐ বিশেষণ দুটি "কালো"টিকেও জানতুম, "মেম"-টিকেও জানতুম, কিন্তু মূল গায়েন ঐ "বৌ", ঐ রূপের ঝিয়ারীটিকে তখন পাইনি। একদিন না একদিন তার স্বপ্ন দেখা সুরু হয় সকলের জীবনে। সেই স্বপ্নালোক নিয়ে এসেছিল ঐ বই।

"ভারত-শিল্প"—নামা ঐ বইখানি ভারতবর্ষের প্রত্যেক শিল্প-শ্রমিকের পড়া উচিত। দুর্গাপূজার বোধনের মত আশা করি কাজ করবে ঐ dissertation, হিরণ্যমার্জ্জিত ঐ প্রাণীন্ নিবেদন খানি; আশা করি বিশোধিত করবে শোভন ছাত্রের নিবেদিত মন। খাঁটি ঘিয়েই হোম হয়।

একে একে সমস্ত বাধাই কেটে যেতে লাগল;—রাহুগ্রাসের মত চন্দ্রের। কিন্তু বিরোধের শেষ ফাঁড়াটিই কাটিয়ে দিলেন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে। আশু মুখুয্যে মহাশয় (পরিচয় প্রয়োজন হীন)—তাঁকে সেধেছেন "বাগেশ্বরী" lectures deliver করতে; এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা) চলেছেন তাঁর প্রবন্ধাবলী পাঠ ক'রতে। রন্ধনপটীয়সী স্থবিরা দাদুমা, নাকে আঙুল লটকিয়ে মেয়ে মজলিসে রব তুললেন "ওরে, শুনেছিস কি

আনন্দ রে, আমাদের নাটুকে অবু, এবার পণ্ডিত ব'লে বাংলায় চোল্লো। সত্যি, ওর মা রতন-গর্ভা।"

অতএব, একদা প্রাতঃকালে বুকের পাটার উপর গরদের বুটিদার চাদরের গ্রন্থি বেঁধে আমাদের পড়ার গৃহে উদয় হলেন আমার সেজ মামা, শ্রীহিরণ্ময় রায়-চৌধুরী। বললেন—

"ভালো করে চুল আঁচড়িয়ে, চ, আমার সঙ্গে। নে নে···দেরী করিসনি।"

"কোথায় যাবো? ঘোড়াগুলো যে এখন দানা খাচ্ছে।"

"গাড়ীর দরকার নেই। যেখানে যাবি, সেখানে পায়ে হেঁটেই যেতে হয়।"

বিস্ময়-সম্বল প্রবোধের মধ্যে দিয়ে বললুম—

"কিন্তু···বাবা···।"

"বাবা জানেন; তুই চল্‌তো এখন।"

তখনকার জমানায়, পোষাক-পরিচ্ছদের একটি বিশেষ রীতি ছিল বঙ্গ-সমাজের প্রতি-পরিবারে। কিন্তু তার দৌলত গায়ে চড়াবার অবকাশ হল না আমার। সেই সময়টুকুর মত, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, আমার ভিতরকার চঞ্চল মূঢ়তা। Automaton-এর মত,—

চরণদ্বয় পরেছিল—ঠন্‌ঠনের কালো চটি,

অধোঅঙ্গ পরেছিল—কালাপাড় মোটা ধুতি,

ঊর্দ্ধাঙ্গ পরেছিল—রেশমের বোতাম-দেওয়া কলারদার চায়না —কোট,

এবং উত্তমাঙ্গ পরেছিল—কৌতুকান্বিত ঔৎসুক্যের এবং অনাগত ভবিষ্যতের মত আশাআকাঙ্ক্ষার সম্ভ্রম-সনাথ এক অলক্ষ্য শিরতাজ।

মনে আছে মামা বলেছিলেন—

"শিষ্য হতে চলেছিস। ড্রয়িং বোর্ডটা নে, আর একটা পেন্সিল।"

আর মনে আছে,—মেজোবোন্‌কে; সে যেতে পারলো না। সে শুধু আমার হাতে গোল করে লাল সুতো দিয়ে বেঁধে, এগিয়ে দিয়েছিল Whatman Paper-এর একটি শুভ্র Scroll। বলেছিল—

"আহা, যাচ্ছেন দেখ না; যেনো ভিখিরীর ছেলে। কাগজটা নাও। আঁকবে কিসে ছোটদা?

গুরুগৃহে যাবার আগে আমার চোখ দেখেছিল—

জলভরা দুটি রাঙা চোখ।

ঠাকুরঘরে প্রণাম করে, এবং যাঁদের কথা এই উচ্ছ্বাসে বর্ণিত হোলো তাঁদের প্রণাম করে, অগ্রসর হয়ে গেল আমার দক্ষিণমুখী কিশোর চরণ। [ক্রমশঃ।

তবু ভালো লাগে

শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথের গানে আজি তৃপ্ত কান
তবু ভালো লাগে আজো নিধু-দাশু-শ্রীধরের গান।
কতই বিলাস হর্ম্মে ভরি আছে এই রাজধানী,
তবু ভালো লাগে সেই তকতকে বেঁশো ঘরখানি
পাঁশ-ঢিপি বাঁশঝাড় কলাবনে ঘেরা
চারি পাশে রাঙচিতা বেড়া।

কত নব নব বেশে হেরিলাম নাগরীর দল,
লজ্জার বদলে সজ্জা যাদের সম্বল,
তবু ভালো লাগে সেই নিষ্ঠাবতী কুলের ললনা
মাতৃ-মমতায় স্নেহে করুণায় সজল-নয়না,
যাহাদের অঙ্গে কোন নাই আভরণ
ধরণীরে ধন্য করে শুধু লাক্ষা-রঞ্জিত চরণ।

রজনী দিবস আজি হইয়াছে বিদ্যুৎ আলোকে
আলোর ছটার শিল্প হেরি আজি চমকিত চোখে,
তবু ভালো লাগে সেই দীপখানি তুলসীর তলে,
সাঁঝে যাহা মিটি-মিটি মিঠি-মিঠি জ্বলে।
আজিকে কত না যানে করি আরোহণ
তবু ভালো লাগে সেই গঙ্গাবক্ষে নৌকায় ভ্রমণ।

কত শাল-দোশালায় মুড়ায়েছি আমার শরীর
তবু ভালো লাগে সেই কাঁথাখানি মোর জননীর
সূচি-শিল্পে কুসুমিত শুচি।
অমার্জ্জিত অনুন্নত হায় মোর রুচি,
গৃহে কত সুখ-মঞ্চ কত আস্তরণ,
তবু ভালো লাগে সেই দীঘি-পাড়ে দূর্বার আসন।

ভূরিভোজে সুখাদ্য কত না
তৃপ্ত করিয়াছে মোর লোলুপ রসনা
তবুও মোচার ঘণ্ট ভালবাসি আমি
শচী মা-র রান্না যাহা শ্রীরঙ্গম স্বামী
ভুলেননি যতি হ'য়ে, চৈতন্যের সাথে
ঘটাল যা পরিচয় স্বামীজির প্রথম সাক্ষাতে।

শুনি নাকি হইয়াছি অধিকারী বিশ্ব-সভ্যতার,
বাঙ্গালী আমি যে তাহা ভুলিবার কি আছে উপায়?
ভুলিতে পারিনি আমি তা'ত
এ সভ্য সমাজ-মাঝে তাই আমি আজি অবজ্ঞাত।

ব্যারাকপুর, গান্ধীঘাটের প্রবেশ-তোরণ —বিজয় ঘোষ

জি. পি. ও
—ক্ষিতীন্দ্রনাথ সরকার

এক মনে —বিশু চক্রবর্তী

প্রিয় ও প্রিয়া

—বি, ঘোষ

—তৃপ্তিশেখর দস্তরায়

লক্ষ্ণৌ রেল ষ্টেশন —ব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ

মাদ্রিদের পথে, বুল্ রিং-এর সম্মুখে বন্ধুদ্বয় ও লেখক।
এই সংখ্যার 'টোরোস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পুজারিণী —গীতা সরকার

—বিভাস মিত্র

শীতের হিমানী —রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গণ্ডারের কবলে—আফ্রিকায়

লীন এলেন

কালো গণ্ডার যে দৃষ্টি-সুখকর নয় সে কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু যারা জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাদের কাছে এই জাতীয় গণ্ডারের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। বিশেষ করে যাঁরা গণ্ডারের দেশে বাস করেন, কালো গণ্ডারের দ্বিধাহীন এবং সরল জীবনধারা তাঁদের আকৃষ্ট করবেই।

আমার মনে হয়, গণ্ডারের সব চেয়ে বিস্ময়কর বাহ্যিক বৈশিষ্ট হচ্ছে তার দৈর্ঘ। সিংহ মহিষ এমন কি হাতীও আধুনিক জগতে বে-মানান মনে হয় না, কিন্তু গণ্ডারের দিকে তাকালেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতি বৃহদাকার সরীসৃপের কথা মনে পড়ে।

কালো গণ্ডারের বাসভূমি আফ্রিকায়। সুদান থেকে রোডেশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই তার দেখা পাবেন। অবশ্য পঞ্চাশ বছর আগে যত গণ্ডার ছিল আজ আর তত নেই ; তবে এখনও জনবিরল এলাকাগুলিতে গণ্ডার খুব দুর্লভ জন্তু নয়। গণ্ডারের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন হয় জল, ঘাস এবং সূর্যালোক নিবারক ছায়া। তার বাসস্থানের ১৫ মাইলের মধ্যে এই সব জিনিষ চাই ; কারণ সে দৈনিক এই ১৫ মাইলের মধ্যেই হাঁটা-চলা করে। অন্যান্য জীব-জন্তুর তুলনায় গণ্ডারের প্রয়োজন যে অতি সামান্য সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। গণ্ডার যদি এই খানা-পিনা পায় এবং মানুষের দ্বারা বিব্রত না হয় তাহলে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলে তার সংখ্যা। মুরুলাণ্ড উপকূলের ঘন ঝোপ থেকে সুরু করে কেনিয়ার ১২ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে সর্বত্রই গণ্ডার দেখতে পাবেন অজস্র। জঙ্গল, জলা, ঝোপ, সমতল ভূমি, তপ্ত আধা-মরুভূমি—কোথায় যে গণ্ডার নেই তা বলা যায় না। একমাত্র যে দেশে জল নেই এবং যে দেশে বৃষ্টি অত্যধিক সেখানে সে [illegible] পাবে না।

কালো গণ্ডারের দুটো খড়্গ থাকে নাকের উপর। পেছনের [illegible] সাধারণতঃ হয় ক্ষুদ্র, মোটা উদ্ধত অংশের মত। কখনও [illegible] সমভূজী ত্রিকোণের আকার গ্রহণ করে। সামনের [illegible] লম্বা এবং বড়। এক এক গণ্ডারের খড়্গ এক এক [illegible]। কারোটা খুব বড় আবার কারোটা তত বড় নয়। [illegible] এই তারতম্যের কারণ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। [illegible] দৈহিক গঠনের সঙ্গে খড়্গের আকারের কোন সম্পর্ক [illegible] কারণ, দেখা গেছে খুব বড় গণ্ডারের খড়্গটা হয়ত ১২ [illegible] কম আবার ঠিক সেই রকম অপর একটি গণ্ডারের [illegible] হয়ত ৩ ফিট লম্বা। অতি বৃহৎ খড়্গযুক্ত যে সমস্ত [illegible] আজ পর্যন্ত ধরা পড়েছে, তারা বেশীর ভাগই মাদী [illegible]। অতি চমৎকার ছুঁচালো খড়্গ তাদের। গণ্ডারের [illegible]র জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কারণ এই খড়্গ দিয়েই [illegible] কিছু অপকর্ম করে। আবার এই খড়্গের জন্যই তাকে [illegible] দিতে হয়। কারণ শিকারীর লোভ এই খড়্গের উপর। [illegible] অস্ত্র হিসাবে খড়্গের যে কি শক্তি সেটা অনুমান করা [illegible] নয়। প্রাপ্তবয়স্ক একটি গণ্ডারের ওজন এক থেকে দুই [illegible] যখন সে কাউকে আক্রমণ করে তখন সে সেকেণ্ডে কয়েক উড়ন গজ গতিতে ছোটে। কাজেই সেই শক্তি এবং গতি নিয়ে যাকে সে আক্রমণ করবে তার অবস্থা কি দাঁড়াবে সহজেই বোঝা যায়। তুকতাকে বিশ্বাসী এক দল লোকের কাছে গণ্ডারের খড়্গ বিশেষ মূল্যবান। এই খড়্গ মৃগের শাখা-শৃঙ্গের মত শক্ত জিনিষ নয়। অসংখ্য লোম সদৃশ আঁশ জমাট করে যেন এটা তৈরী হয়েছে। ছুরি দিয়ে অসীম ধৈর্য্যের সহিত একটা একটা করে আঁশ বার করলে দেখা যাবে খড়্গের আর কোন অস্তিত্ব নেই। প্রাচ্যে এই খড়্গের খুব চাহিদা। সেখানে এটাকে একটা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু বলে মনে করা হয়। বহুকাল যাবৎ পূর্ব-আফ্রিকায় গণ্ডারের খড়্গের বে-আইনী ব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। সরকারের অনুমতি ছাড়া গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ। তাই দুষ্কৃতিকারীরা বে-আইনী ভাবে গণ্ডার শিকার করে গোপনে গোপনে তার খড়্গ চালান দেয় বিভিন্ন সহরে।

গণ্ডারের চামড়াও খুব মূল্যবান। এই চামড়া দিয়ে টেবলের ঢাকনী এবং চাবুক হয়। আগেকার দিনে সোমালীরা এই চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরী করত। এখন বৃটিশ সোমালীল্যাণ্ডে গণ্ডার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। স্থানীয় লোকের অবশ্য ধারণা যে এখনও একটি গণ্ডার আছে তাদের দেশে। তাকে অনুসন্ধান করার অনেক চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সফল হয়নি।

গণ্ডারের মাংস যদিও খুব শক্ত এবং কঠোর, তবু এক শ্রেণীর আদিম অধিবাসীর কাছে এটা খুব প্রিয় খাদ্য। একবার আমরা উত্তর-পূর্ব উগাণ্ডায় এক শিকারে গিয়ে দুটো গণ্ডার মেরেছিলাম। সঙ্গের কুলীরা প্রাণ ভরে তার মাংস খেলো এবং মাথায় চাপিয়ে নিয়ে এল তার দ্বিগুণ। তাদের ইচ্ছে ছিল দুটো গণ্ডারকেই টেনে নিয়ে আসবে ক্যাম্পে। সেটা সম্ভবও ছিল না, আর আমাদেরও আপত্তি ছিল। ফলে বেচারীরা দুঃখিত হয়েছিল।

গণ্ডারের ঘ্রাণশক্তি প্রচণ্ড, শ্রবণশক্তিও প্রখর কিন্তু দৃষ্টিশক্তি অতিশয় ক্ষীণ। সেই কারণেই এরা অতি সহজেই মানুষের কাছে বিপন্ন হয়। এর চোখের দৃষ্টি কত দূর পর্যন্ত যায় সেটা সঠিক বলা মুস্কিল, তবে একথা বলা যায় যে, গণ্ডারের ৫০ গজ দূরে যদি কোন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে গণ্ডার নিস্পৃহ উদাসীন্যে তাকে দেখতে পাবে মাত্র। আর সেই লোক যদি নিশ্চল হয়ে কোন গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে গণ্ডার তাকে লক্ষ্যও করবে না। এক বার পূর্ব আফ্রিকায় এক নামকরা শিকারীর সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিলাম। তাঁর সখ ছিল গুঁড়ি মেরে মেরে গণ্ডারের পেছনে গিয়ে তার পিঠের চামড়ায় খড়ি দিয়ে নিজের নাম স্বাক্ষর করবেন। ভদ্রলোকের এই ইচ্ছা কখনও পূরণ হয়নি। কারণ অন্যান্য বন্য জীব-জন্তুর মত গণ্ডারেরও একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা তার বোধি (instinct)।

কালো গণ্ডারের ক্রুর নৃশংসতা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায় বটে, তবে অধিকাংশ গণ্ডারই শান্তিপ্রিয় নির্বিবাদী কিন্তু দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং বোকামীর জন্য তারা অনেক সময়ই হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। গণ্ডার যদি বাতাসে কোন অস্বাভাবিক গন্ধ পায় বা

অস্বাভাবিক শব্দ শোনে, তাহলে আর কালবিলম্ব না করে সে স্থান ত্যাগ করে ; কিন্তু দেখা গেছে যে সরে পড়বার সময় যার গন্ধ সে পেয়েছিল বোকার মত তার সামনে গিয়েই হাজির হয়েছে। তখন সেই লোকটাও মনে করে যে গণ্ডারটি তাকে আক্রমণ করেছে। গণ্ডারের দেশে হাঁটা-চলা করবার সময় এ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। আবার যদি কেউ গণ্ডারের খুব কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন গণ্ডারের মধ্যে কৌতূহলও সঞ্চার হতে পারে। সে আরও এগিয়ে গিয়ে জিনিষটা ভাল করে দেখতে চায়। তখন সেই লোক স্বভাবতঃই মনে করে যে, গণ্ডার তাকে আক্রমণ করতে আসছে।

সাধারণতঃ গণ্ডার কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড়ে আসে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় এরা পিছু ফিরেও আক্রমণ করতে পারে। একবার আমার এক বন্ধু গণ্ডারের সামনে পড়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় দম হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু গণ্ডারটা আসলে তাকে তাড়া করেনি। তাই রাগে পেয়েও কোন ক্ষতি করেনি।

ক্ষতি করবার ইচ্ছা না থাকলেও গণ্ডার অনেক সময় ভীষণ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করে। শিকারের মোট-ঘাট ঘোড়া এবং খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে হয়ত আপনি চলেছেন বনের পথ ধরে। হঠাৎ ঘোড়া এবং খচ্চরগুলো গণ্ডারের গন্ধ পেল। আর যাবে কোথায়, তখন যে কে কোন দিকে ছুটবে তার ঠিক নেই। আর মোট-ঘাটের যা অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করতে পারেন। একবার আমরা এক দল মোষের পেছু নিয়ে বনের মধ্যে চলেছি, এমন সময় বাছুর সহ এক মাদী গণ্ডার এসে হাজির আমাদের পথে। বাছুর সহ বিপন্ন মাদী গণ্ডার দেখে আমার করুণা হল। তাকে আর শিকার করতে চাইলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম এক গাছে। গণ্ডার ছুটো ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বটে, তবে আমাদের মোষ শিকারেরও ইতি হল।

গণ্ডাররা পানাহার করে রাত্রে আর ঘুমোতে যায় সকালে। আবার ঘুম ভাঙ্গে সন্ধ্যার আগে। তখন সে দস্তুর মত তৃষ্ণার্ত। ঘুম থেকে উঠে আগে যায় জল খেতে। গণ্ডারদের শোবার জায়গাটা বেশ মজার। তারা মাটি সরিয়ে একটা ছোট-খাট গর্তের মত করে নেয়। যেখানে ঠাণ্ডা বাতাস বয়, গণ্ডাররা সেখানে থাকতে ভালবাসে এবং ওদের শোবার জায়গাটা সাধারণতঃ গাছের ছায়ায় তৈরী করা হয়। এক একটা গণ্ডারের অনেকগুলো করে শোবার জায়গা। যখন তার যেটায় খুশী তখন সেটায় গা এলিয়ে দেয়। অন্যান্য জীবজন্তুর থাকবার জায়গা সাধারণতঃ বেশ পরিষ্কার হয়। গণ্ডারদের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো।

গণ্ডারের আকার এবং শক্তি প্রচণ্ড হলেও আদিবাসীরা তাদের আদিম অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে গণ্ডার ধ্বংসের অনেক কল-কৌশল আবিষ্কার করেছে। মামাইরা বর্শা দিয়ে গণ্ডার মারে। অন্য উপজাতিরা গণ্ডারকে ফাঁদে ফেলে, খানা কেটে হত্যা করে। আদিবাসীরা গণ্ডার শিকারের সময় প্রথম বর্শা মারে তার পায়ে, যাতে সে আর চলতে না পারে। তার পর দল বেঁধে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে জন্তুটিকে। তুর্কানা উপজাতিরা গণ্ডার ধরার এক রকম ফাঁদ তৈরী করে। দড়ি-দড়া লতা-পাতা দিয়ে একটা সাইকেলের চাকার মত জিনিষ বানিয়ে সেটা গণ্ডারের রাস্তায় পেতে দেওয়া হয়। গণ্ডার তার মধ্যে পা দেওয়া মাত্র সবাই মিলে টেনে সেটায় গণ্ডারের পায়ে সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে দেয়। গণ্ডার তখন আর জোরে হাঁটতে পারে না। কারণ, সেই ফাঁসের সঙ্গে একখানা বড় কাঠের গুঁড়ি আটকানো থাকে। অতঃপর সেই গণ্ডারটিকে ধ্বংস করা হয়। এম্বু এবং ওয়াকাম্বা উপজাতের লোকেরা বিষাক্ত তীর দিয়ে গণ্ডার মারে। এই তীর চালানো হয় গণ্ডারের সব চেয়ে নরম অংশে। তবে এই তীর খেয়ে গণ্ডার তৎক্ষণাৎ মারা যায় না। ধীরে ধীরে অনেক দিন বাদে মারা যায়।

এবার শুনুন একটা মজার কাহিনী। বিয়ের পর বউকে নিয়ে গেছি আফ্রিকার জঙ্গলে "হনিমুন" করতে। ছোট নদীর ধারে কাঁটা ঝোপের পাশে আমাদের তাঁবু। দ্বিতীয় রাত্রে সবে মাত্র বিছানায় শুয়েছি আর ঠিক সেই সময় আমার এক অনুচর এসে বলল ক্যাম্পে গণ্ডার এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে সাজ-পোষাক পরে ভারী রাইফেল হাতে বাইরে এসে দেখি, চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে চারি দিক। সেই আলোয় দেখলাম গণ্ডার একটা নয় দুটো। ঠিক আমাদের ক্যাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা হুস-হুস শব্দ করছে। আমাদের গুলী করার ইচ্ছে ছিল না। আমার অনুচর গণ্ডার দুটোর দিকে জ্বলন্ত মশাল নিক্ষেপ করতেই তারা গজরাতে গজরাতে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বউকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম যে ভয় কেটে গেছে। কিন্তু বউ যেখান থেকে আমার কথায় সাড়া দিল, সেটা তো মাটি নয় ঊর্দ্ধ আকাশ। আমি তো তাজ্জব! বউ আকাশে উঠল কি করে? তার পর সবই বুঝলাম। আমার আর্দালীকে আমি আগেই বলে রেখেছিলাম যে, আমরা যখন কোন বিপজ্জনক জীবজন্তুর কবলে পড়ব তখন তার একমাত্র কাজ হচ্ছে আমার বউকে কোন লম্বা গাছের মাথায় তুলে দেওয়া। আর্দালী সেই আদেশই পালন করেছে। এদিকে বউ বেচারীর যা দুরবস্থা তা আর বলে কাজ নেই। যে গাছে তাকে তোলা হয়েছিল সেটা কাঁটায় ভরা। কাজেই তার অবস্থাটা আপনারাই অনুমান করে নিন।

গণ্ডারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আর একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। ভোর সাড়ে চারটায় আমি আর এক শিকারী বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছি বন-মহিষের খোঁজে। মোষ পেলাম না, পেলাম এক সিংহ [illegible] তাকেও মারতে পারিনি। সারা দিন ঘুরে ঘুরে ভীষণ ক্লান্ত। খিদেও পেয়েছে খুব। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। আকাশে চাঁদ উঠল। তখন আমরা ফেরার পথ ধরলাম। আমাদের সঙ্গে দুজন আর্দালী আছে। গল্প করতে করতে চলছি আমরা। হঠাৎ একটা [illegible] গজ পরিমাণ পরিষ্কার জায়গায় এসে গুরু-গম্ভীর নাকডাকানি শুনতে পেলাম। আমাদের পথ চলাও গেল বন্ধ হয়ে। আর্দালীরা তাড়াতাড়ি হাল্কা রাইফেলের বদলে ভারী রাইফেল তুলে দিল আমাদের হাতে। সামনেই দেখি, তিন গণ্ডারের এক পরিবার — কর্তা-গিন্নী এবং তাদের বাচ্চা। তারা আমাদের থেকে ৬০ গজ দূর দিয়ে পেছু পেছু চলেছে। আমাদের দেখে তারাও থামল। কিন্তু তার পরই সুরু করল আবার তাদের যাত্রা। আমরা ভাবলাম, আপদ চুকেছে ; কারণ আমাদের আবার গণ্ডার শিকারের লাইসেন্স ছিল না। কিন্তু আমাদের অনুমান ভুল। দু'পা এগিয়েই [illegible]

গণ্ডারটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাটা নিশ্চয়ই বাতাসে আমাদের গন্ধ পেয়েছিল। তার পর এক বার ভীষণ নাক ডাকানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সিং বাগিয়ে সোজা ছুটে এল আমাদের দিকে। ইতিমধ্যে তার গিন্নী এবং বাচ্চা যে কখন কেটে পড়েছে, আমরা টেরও পাইনি। গণ্ডারটা যেমনি ছুটে আসা আর সঙ্গে সঙ্গে চারটে রাইফেল গর্জে উঠল একসঙ্গে। তার পর আরও কয়েক রাউণ্ড। দেখলাম, সেই বিশাল জানোয়ার ভীষণ ধুলো ওড়াতে ওড়াতে আমাদের সামনেই পড়েছে। তার পর গোঙাতে গোঙাতে সে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল। দেখলাম, একটা বুলেট গণ্ডারের বক্ষ ভেদ করে গেছে এবং একমাত্র সেইটাই যে তার পতন এবং মৃত্যুর কারণ, তাও বুঝতে কষ্ট হল না। পর দিন সকালে তার শিং এবং চামড়া নিতে গিয়ে দেখি, হায়েনারা মরা গণ্ডারের চামড়া এবং লেজটা সাবড়ে দিয়েছে। গণ্ডারের ঐ দুটি অঙ্গ ছাড়া আর কোথাও তাদের দন্তস্ফুট করবার উপায় নেই। গণ্ডার ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। জঙ্গলে গণ্ডারের শত্রুদের মধ্যে সিংহ অন্যতম। গণ্ডারের বাচ্চা যদি তার মা-বাবার কাছে ছাড়া হয় তাহলে সিংহের হাতে তার রেহাই নেই। তবে প্রাপ্তবয়স্ক গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই করে জেতার ক্ষমতা সিংহের নেই। বড় গণ্ডারকে ঘায়েল করতে পারে একমাত্র কুমীর। একবার আমি গণ্ডার-কুমীর লড়াইয়ের একটা ছবি দেখেছিলাম। তাতে কুমীর সেই গণ্ডারটাকে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ফোটোগ্রাফটা অনেক দূর থেকে তোলা বলে কিছুটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল বটে, তবে এ রকম একটা ঐতিহাসিক লড়াইয়ের ফোটো তুলতে পারা কম কৃতিত্ব নয়। ঘটনাটা ঘটে টেনা নদীতে।

বিখ্যাত শিকারী এবং ফটোগ্রাফার মিঃ ম্যাক্সওয়েল একবার একটি মাদী গণ্ডার মেরেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মদ্দা গণ্ডারটা সেখানে এসে হাজির হয় এবং প্রিয়ার কাছে প্রেম সম্ভাষণে কোন সাড়া না পেয়ে রেগে তার খড়্গের সাহায্যে সেই বিরাট শবটাকে টুকরো করে দেয়। এত গুঁতোগুতির পরও কিন্তু মৃত গণ্ডারের চামড়া ফুটো হয়নি। কারণ গণ্ডারের বাইরের চামড়া অন্ততঃ এক ইঞ্চি পুরু।

এবার আমি একটা গণ্ডার-সিংহের লড়াইয়ের কাহিনী বলে আলোচনা শেষ করব।

একবার খবর পেলাম যে, আমাদের ক্যাম্পের কাছে এক পর্বতের পাদদেশে একজোড়া সিংহ দেখা গেছে সকাল ন'টায়। সিংহ শিকারের জন্য সন্ধ্যার দু'ঘণ্টা আগে আমি বেরিয়ে পড়ি। সিংহ ঠিক কোথায় আছে জানা ছিল না বলে আমি ঐ পর্বতের পাদদেশ থেকে ৪ শত গজ দূরে এক জায়গায় আস্তানা গাড়লাম। আমার ঠিক সামনেই ছোট ছোট ঘাসওয়ালা এক খণ্ড ফাঁকা জমি। হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে দেখি, এক গণ্ডার-দম্পতি এসে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শিশুপুত্রসহ। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তাদের। হঠাৎ মনে হল তারা যেন ভয় পেয়ে চমকে গেছে এবং মাদী গণ্ডার তার বাচ্চাটাকে খোলা জায়গার মাঝখানে এনে দাঁড় করালো। পুরুষ গণ্ডারটা মাথা তুলে লেজ নাড়তে নাড়তে পাহাড়ের দিকে সন্ধানী চোখে তাকাতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাসের জঙ্গল সরিয়ে দেখা দিল সিংহ দুটি, সে যে কি ভীষণ অপরূপ দৃশ্য তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সিংহী তার নিতম্বে ভর দিয়ে দূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল এবং তার থেকে ৩০ গজ দূরে সিংহ শিকারের দিকে নজর রেখে চক্কর মারতে লাগলো ডাইনে বাঁয়ে। সিংহ-দম্পতির নজর বাচ্চা গণ্ডারটার ওপর। কিন্তু তাকে মা-বাপের কাছছাড়া না করতে পারলে বাগে আনা অসম্ভব। কিন্তু গণ্ডার-দম্পতিও সিংহদের চেনে। তারাও বাচ্চাকে নিয়ে ছোট ঘাসের জমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজি নয়। কারণ খোলা জায়গায় তারা সিংহের গতিবিধি স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারবে, অন্যত্র সেটা সম্ভব হবে না। সিংহের কুড়ি গজের মধ্যে পুরুষ গণ্ডারটাও সিংহের পদচারণার সঙ্গে তাল রেখে আগু-পিছু পদচারণা করতে লাগল—সিংহ যাতে তার সঙ্গে মোকাবিলা না করে তার পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। সে দৃশ্য জীবনে ভোলবার নয়। অদূরে মা গণ্ডার তার বাচ্চাটাকে ঘিরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বর্গীয় সে মাতৃত্ব। এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ দু'বার সিংহটা কিছুটা এগিয়ে আসতে পেরেছিল। গণ্ডারও ছেড়ে কথা বলেনি। সে-ও ধীর পদক্ষেপে খড়্গ বাগিয়ে এগিয়ে গেল। সংঘর্ষ বাধে বাধে, ঠিক সেই সময় সিংহ পেছু হটল। আবার সুরু হ'ল দুই পক্ষের গম্ভীর পদচারণা।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমারও ফেরবার তাড়া। শেষ বারের মত দুই বীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম গণ্ডার ক্রমশঃই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে। সে জানে, রাত হলে সিংহেরই বেশী সুবিধা।

জানি না সেই লড়াইয়ে কে জিতেছিল। যখন সূর্যের আলো নিবে গেল, তখন ক্যাম্পে ফেরার পথে আমি অনুমান করতে লাগলাম যে এতক্ষণে সিংহী সুযোগ বুঝে তার স্বামীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে। তার ঝোলা-ঝোলা পেট আর ভেলভেট-নরম থাবার ছাপ পড়ছে বালি আর ঘাসের উপর। তারপর এক ভয়াবহ শক্তিপরীক্ষা!

অনুবাদক—সুনীল ঘোষ

গান

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান,
আমি গাই গান।

—রবীন্দ্রনাথ।

টো রো স

শ্রীরাধাভূষণ বসু
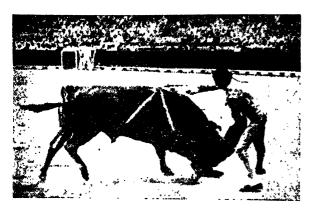
টোরোস্ কথাটি স্প্যানিশ—এটির অর্থ হলো বুল-ফাইট (Bull fight) অর্থাৎ ষাঁড়ের লড়াই। কিন্তু ষাঁড়ের লড়াই বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি, তা হলো দুটি ষাঁড়ের মধ্যে লড়াই। টোরোস্ মানে সে রকম ষাঁড়ের লড়াই নয়…এটির মানে ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই। এবং এই লড়াইতে হয় মানুষ না হয় ষাঁড় এক পক্ষ জয় লাভ করে।

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রায় সর্ব্বত্র এই টোরোস্ বা ষাঁড়ের লড়াইএর প্রচলন ছিল। এটি একটি বিশেষ রকম স্পোর্ট বা ক্রীড়া বলে গণ্য হত—টোরোস্ ক্রীড়ার জন্য বিশেষ রকম 'ষ্টেডিয়াম্' (stadium) অথবা ক্রীড়াভূমি তৈরী করা হতো এবং হাজার হাজার লোক দেখতে আসতো। ইউরোপের মধ্যে স্পেনেই টোরোস্ খেলার প্রচলন ছিল খুব—এবং ইউরোপের অন্য সকল দেশে এ খেলা এখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেলেও—স্পেনে এটি এখন বহুল পরিমাণে প্রচলিত। এমন কি, টোরোস্ হলো স্পেনের জাতীয় খেলা; যেমন আমাদের ফুটবল। স্পেন হতে টোরোস্ খেলাটি মধ্য এবং দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত হয় এবং বহু দিন পর্য্যন্ত সেখানে সমাদৃতও হতো। কিন্তু এই খেলার শেষ দৃশ্যটির বীভৎসতা অথবা মর্ম্মান্তিকতার জন্যই বোধ হয় এখন ঐ সকল দেশে টোরোস্ একেবারে নিষিদ্ধ। স্পেনে এখনও এটি যথেষ্ট সমাদৃত হয় এবং এটি স্পেনের জাতীয় ক্রীড়া—টোরোস্ বললেই এখন একমাত্র স্পেনকেই বুঝায়।

স্পেনের সর্ব্বত্রই টোরোস্ ক্রীড়া অল্পবিস্তর খেলা হয়…তার মধ্যে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ (Madrid) এবং বিখ্যাত সহর বার্সিলোনার (Bercelona) টোরোস্ খেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয়।

আমরা মধ্যে মধ্যে চলচ্চিত্রে এই টোরোস্ খেলার দৃশ্য দেখে থাকি—কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ খেলাটি দেখানো হয় না…অন্ততঃ আমি দেখিনি। আমরা সাধারণতঃ যা দেখে থাকি, তা হলো সমস্ত খেলাটির প্রথম বা দ্বিতীয় অঙ্ক…তা দেখে টোরোস্ খেলার সম্পূর্ণ ধারণা করা অসম্ভব।

টোরোস্ ক্রীড়া সম্বন্ধে বহু দিন হতেই নানা রকম বর্ণনা শুনে আসছি এবং মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ফিল্মের নিউজ রীলে টোরোসের কিছু নমুনাও দেখেছি—কিন্তু তা অতি সামান্য। এই শোনা এবং দেখা থেকে টোরোস্ ক্রীড়াটি যে আসলে কি এবং আরম্ভ হতে শেষ পর্য্যন্ত কি পরিণতি, সে সম্বন্ধে বহু দিন থেকেই যথেষ্ট কৌতূহল ছিল।
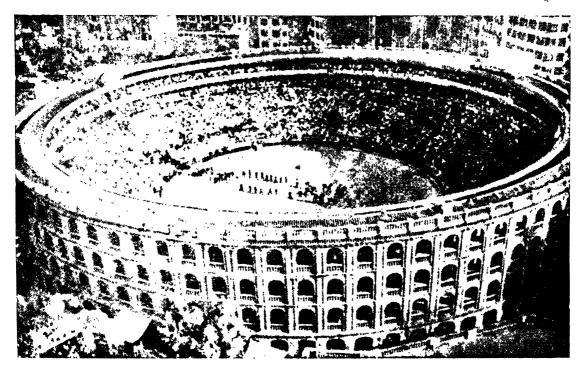
টোরোস্ খেলার দিনে "বুল্‌স্ রিং" (বা ষ্টেডিয়ম্) এর দৃশ্য—ভিতরে অশ্বারোহিগণ মাদ্রিদের মেয়র ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে সম্মান দেখাইতেছে ক্রীড়ার পূর্ব্বে

তাই যখন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে আট-দশ দিন কাটলো তখন এই টোরোস্ ক্রীড়াটি আদ্যোপান্ত চাক্ষুষ দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

আমাদের হোটেলটি ইংলিশ-স্পিকিং (English speaking) অর্থাৎ সেখানকার লোকেরা ইংরাজীতে কথা বলতে ও বুঝতে পারেন। কিন্তু ইংলিশ-স্পিকিং শুনে আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই—কারণ, যাঁদের ইউরোপের কন্টিনেন্টের ইংলিশ-স্পিকিং হোটেল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন, এই ইংলিশ-স্পিকিংএর দৌড় কত দূর! আবার তাঁদের মধ্যে (Little) লিত্‌ল ইংলিশ-স্পিকিংও আছেন। যাই হোক, 'লিতল' এবং 'বিগ' ইংলিশ ও আকারে ইঙ্গিতে হোটেলের যুবক ম্যানেজারটির নিকট হতে টোরোস্ ক্রীড়াটির আদ্যোপান্ত বর্ণনা এবং Stadium বা ক্রীড়াভূমির (অথবা বধ্যভূমির) অবস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে টোরোস্ দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম।

সিনোরিটা সহাস্য বদনে জানালেন যে, দেখব বললেই দেখা যায় না—তার জন্য চাই পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুতি অর্থাৎ কি না অগ্রিম টিকিট কিনে সীট রিজার্ভ করা। সঙ্গে আছেন শ্রীমতী গৃহিণী এবং অগ্রজপত্নী। অর্থাৎ সোজা কথায় বৌদি। তাঁরাও যেতে ইচ্ছা করলেন। সিনোরিটার শরণাপন্ন হলাম। বৌদি আবার অনুরোধ করে বসলেন সীট যেন ক্রীড়াভূমির একেবারে সন্নিকট হয়—যাতে সমস্ত খেলাটি পূর্ণাঙ্গ ভাবে দেখা যায়। সিনোরিটা তিন খানা টিকিট সংগ্রহ করে আনলেন—দর্শনী হলো প্রতি-টিকিট ত্রিশ 'পেসিতা' অর্থাৎ প্রায় তিন টাকা বারো আনা। সীটগুলি ভাল হলেও একেবারে সামনে—অর্থাৎ প্রথম সারিতে

টোরেরোদ্বয় আনুষ্ঠানিক পোষাকে খেলার জন্য প্রস্তুত
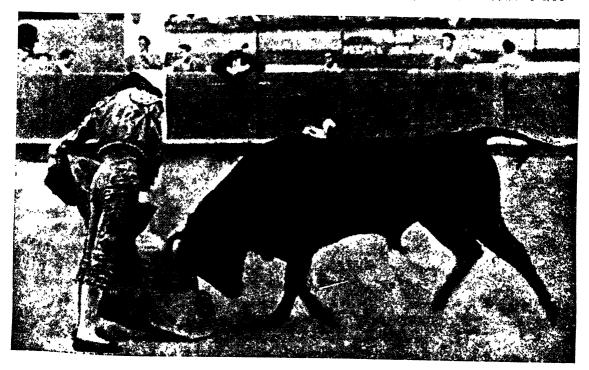
প্রথম দৃশ্য—বৃষকে যুদ্ধে আবাহন—কাঁধের উপর শাদা সুতা লক্ষ্যস্থল নির্দ্দেশ করে

হয়নি বলে বৌদি একটু অনুযোগ করলেন, পরে অবশ্য খুসী হয়েছিলেন।

বেলা প্রায় তিনটার সময়ে আমরা বাসে করে রওনা হলাম—মাদ্রিদের উপকণ্ঠস্থিত 'আল্‌কালা' নামক স্থানে "প্লাজা 'টোরোস্‌" এর উদ্দেশ্যে—এই "প্লাজা টোরোস" হলো টোরোস্‌ ক্রীড়া প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ ষ্টেডিয়াম বা ক্রীড়াভূমি। যথাসময়ে "প্লাজা টোরোস্‌" পৌঁছানো গেল এটি একটি সুবৃহৎ ষ্টেডিয়াম···গঠনশিল্পও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষ্টেডিয়ামের বাইরে জনতার সমাবেশ লক্ষ্য করার মত।

আমাদের দেশে ফুটবল খেলার মাঠের বাহিরে খেলার ফলাফলের ওপর বেটিং (Betting) অথবা জুয়াখেলার মত "প্লাজা টোরোসেও" দেখলাম বেটিং চলেছে। দেখে মনে হলো মানুষের ক্রিয়াকলাপ, দেশ, কাল, পাত্রের প্রভেদ বোধ হয় রাখে না। খেলার মাঠে 'বেটিং' এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচলিত···তা ফুটবল খেলা বা ঘোড়দৌড়ই হোক বা টোরোস্‌ই হোক।

নির্দ্ধারিত গেটে দ্বাররক্ষীর কাছে টিকিট দেখিয়ে ষ্টেডিয়ামের ভিতর প্রবেশ করা গেল এবং টিকিটের নম্বর মত আসনও মিলল। আসন বললে ভুল হয়, স্থান বলাই উচিত—কারণ, ষ্টেডিয়ামে দর্শকদের বসার বেঞ্চ জাতীয় পাকা গাঁথুনী সবই সিমেন্ট কংক্রীটের···কাঠের বেঞ্চও নয়। প্রস্তরাসনে বসে আরাম করে টোরোস্‌ ক্রীড়া দেখা সকলের বোধ হয় অভ্যাস নেই। সেজন্য দেখলাম আরাম করে বসে দেখার জন্য ছোট ছোট গদী ভাড়া দেওয়া হচ্ছে ষ্টেডিয়ামের তরফ থেকে—আমরাও তিনটি গদী ভাড়া নিলাম···দর্শনী দিতে হলো গদী-পিছু চার 'পেসিতা' অর্থাৎ আট আনা। তবু তো আরাম করে উপভোগ করা যাবে। ষ্টেডিয়ামটি আকারে গোল এবং সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বসার স্থান আছে। তার মধ্যে একটা অংশ 'রিজার্ভ' করা থাকে—বিশেষ বিশেষ মাননীয় দর্শকদের জন্য যেমন মাদ্রিদ সহরের মেয়র তিনি বা তাঁর প্রতিনিধি না উপস্থিত থাক্‌লে তো খেলা আরম্ভই হবে না। তাঁদের আসন অবশ্য আমাদের মত প্রস্তরাসন নয়, বরং বেশ জমকালো ও সাড়ম্বরে সাজানো দেখলাম

আমরা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল···কয়েক শত জোড়া চোখের দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ বুঝলাম—কারণ হলো আমার সঙ্গিনীদ্বয়। স্পেনের সর্ব্বত্রই এঁরা দু'জন স্থানীয় লোকের কৌতূহলের কারণ হয়েছেন···বিশেষ করে তাঁদের শ্রী অঙ্গের আচ্ছাদন "ভারতীয় শাড়ী" স্পেনে ভারতীয় মহিলা খুব কমই গিয়ে থাকেন—সেজন্য তাঁদের বেশ-বাস সম্বন্ধে স্প্যানিশ নর-নারীর কৌতূহল যথেষ্ট। সঙ্গিনী দু'জনের প্রতি আঙুল দেখিয়ে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে নানা রকম আলোচনায় ব্যস্ত। মধ্যে দু'-একবার "পাকিস্তান" কথাটি কানে এলো। বক্তাকে লক্ষ্য করে তাঁর ভুল সংশোধন করে "ইণ্ডিয়া" বলতে হয়েছিল। এ-রকম অভিজ্ঞতা স্পেনে বহু বারই হয়েছিল এবং বক্তার ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলাম এ রকম হওয়ার একমাত্র কারণ স্পেনে ভারতবর্ষের কোনও রাজদূত, বাণিজ্য দপ্তর, বা সরকারী প্রচার বিভাগ কিছুই নেই। এক কথায় বলতে গেলে স্পেন ও ভারতের মধ্যে কোনও প্রকার কূটনৈতিক অথবা বাণিজ্যিক সম্বন্ধই নেই এখনও পর্য্যন্ত। সুতরাং ভারত সম্বন্ধে ও-দেশের লোকেরা কিছুই জানেন না। অথচ পাকিস্তান থেকে বাণিজ্য-মিশন সরকারী দপ্তর প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। স্পেন ও পাকিস্তানের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টাও চলেছে। সুতরাং স্পেনে পাকিস্তান বেশ পরিচিত দেখলাম।

ঠিক চারটের সময়ে খেলা সুরু হলো—প্রথমে মিনিট কয়েক একটু ভূমিকা হলো···যেমন সেদিনের খেলোয়াড়দের অশ্বপৃষ্ঠে ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ এবং প্রধান দর্শক মাদ্রিদের মেয়রকে সাড়ম্বরে অভিবাদন জানানো। এই খেলোয়াড়গণের নাম "টোরেরো" (Torero) ভূমিকা শেষ হ'তেই দেখি, প্রথম খেলোয়াড় বেশ বড় এক টুকরা ঘন লাল রংয়ের কাপড় (Muleta) নিয়ে ক্রীড়াভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান। এবং বুলপেন (Bullpen) অর্থাৎ বিশেষ ভাবে প্রস্তুত একটি 'গেট' (Gate) এর ঝাঁপ খুলে দিতেই একটি ঘন কৃষ্ণবর্ণের বলবান্‌ ষাঁড়ের প্রচণ্ড বেগে ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ। এই ষাঁড়টি ইউরোপীয় এবং এই জাতীয় ষাঁড়ের সঙ্গে আমাদের দেশের ষাঁড়ের কিছু প্রভেদ আছে। সকলেই জানেন, মহিষ অথবা গরু রাঙা কাপড় দেখলে একেবারে ক্ষেপে যায়। সুতরাং বলা বাহুল্য, এই ষাঁড়টিও ক্রীড়াভূমির মধ্যস্থলে একটি লোককে রাঙা কাপড় হাতে দণ্ডায়মান দেখে ভীম বেগে সেই দিকে ছুটে গেল ···আমরা দম বন্ধ করে দেখছি···ঐ লোকটির আর রক্ষা নাই কিন্তু নিমেষের মধ্যেই টোরেরো অতি কৌশলে ষাঁড়ের লক্ষ্যস্থল হতে একটু সরে এলো। ফলে ষাঁড়টি রাঙা কাপড়ের উপর শিং দিয়ে গুঁতিয়ে এগিয়ে গেল। খেলার এই অংশটুকুকে 'কেপ ওয়ার্ক' (Cape work) বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত দর্শক-মণ্ডলীর হাত-তালিতে ষ্টেডিয়াম মুখর হয়ে উঠলো। আমরাও করতালিতে "টোরেরো"কে উৎসাহিত করলাম। টোরেরো ক্রীড়াভূমির এক কোণ হতে এবার তার রাঙা কাপড় বার বার হেলিয়ে দুলিয়ে ষাঁড়টির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো—ষাঁড়টিও আবার সেই দিক লক্ষ্য করে প্রবল বেগে তেড়ে গেল। এবং টোরেরো আগের মত কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে সরে গেল। আবার ঘন ঘন করতালি। সকলে বোধ হয় জানেন, বাঘ, ষাঁড় অথবা সাপ লক্ষ্য একবার ঠিক করলে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট পথে "চার্জ্জ" (Charge) বা তাড়না করে না। সুতরাং তাদের লক্ষ্য থেকে একটু সরে এলে লক্ষ্য বস্তু তাদের নাগালের বাইরে যায়। সুতরাং ঐ ক্রীড়া-ভূমিতে টোরেরো ষাঁড়ের এই বিশেষত্বের সুযোগ নিয়ে বার বার তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে থাকে—যার ফলে ষাঁড়টি একেবারে ক্ষেপে ওঠে এবং অত বড় ক্রীড়াভূমিতে বার বার প্রচণ্ড বেগে ছুটোছুটি করার জন্য বেশ পরিশ্রান্তও হয়ে পড়ে—ষাঁড়টির ঘন ঘন সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ও মুখের সাদা ফেনা দেখে মনে হয় তার যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয়ে এসেছে। ষাঁড়টির কাঁধের ওপরে ঘন কালো লোমের মধ্যে দেখলাম, এক স্থানে এক টুকরা শাদা সুতো বাঁধা—তার কারণ প্রথমে বুঝতে পারিনি—পরে জেনেছিলাম, ষাঁড়ের দেহের মধ্যে ঐ অংশটি অত্যন্ত ভাইট্যাল (Vital) অর্থাৎ আঘাত করার পক্ষে ঐ অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। পুনঃপুনঃ এই ভাবে ব্যর্থ হয়ে ষাঁড়টি যখন ঘন ঘন শ্বাস এবং মুখ দিয়ে

ফেনা ফেলতে থাকে তখন টোরেরো রাঙা কাপড় তার সহকারীকে দিয়ে দু'হাতে দুটি বিশেষ রকমের তীর নিয়ে আবার ক্রীড়াভূমির মাঝখানে গিয়ে ষাঁড়কে আহ্বান করে। পরিশ্রান্ত ষাঁড় আবার তার শত্রুকে লক্ষ্য করে তেড়ে আসে। সেই সময়ে সামনের দিক হতে দুটি 'ব্যাণ্ডারিলাস্' (Banderillas) অথবা এক রকম তীর ঐ সাদা সূতা-বাঁধা অংশে জোরে গেঁথে দিতে হয়। এই কাজে অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন এবং খেলার এই অংশটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ষাঁড় তেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক লক্ষ্য স্থলে তীর দু'টি বিঁধিয়ে না দিতে পারলে অনেক সময় ষাঁড় টোরেরোকে আক্রমণ করে শিং দিয়ে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে···অনেক সময় টোরেরো মারাও যায়।

যাই হোক, আমাদের টোরেরোটি বেশ ওস্তাদ দেখলাম। কয়েক বার সাফল্যের সঙ্গে কেপওয়ার্ক দেখিয়ে টোরেরো বাহাদুর প্রথম চেষ্টাতেই দু'টি "ব্যাণ্ডারিলাস্" লক্ষ্য স্থলে বিঁধিয়ে দিল··· সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে করতালি। আমরা একটু বিমর্ষ বোধ করলাম। তীর বেঁধানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রক্ত ষাঁড়টির কাঁধ থেকে গা বেয়ে পড়ছিল এবং তা দেখে খেলাটিকে কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর মনে হলো। যদিও খেলার নিষ্ঠুরতার চরম দৃশ্য তখনও বাকী।

অতঃপর ষাঁড়টি তীরবিদ্ধ অবস্থায় সারা মাঠ ছুটোছুটি করতে লাগলো। টোরেরোও ইতিমধ্যে পূর্ব্বেকার রাঙা কাপড় ও একটি ধারাল তলোয়ার হাতে তাকে আহ্বান করতে লাগলো। আবার সেই প্রথম অঙ্কের পুনরাবৃত্তি। এই ভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে ষাঁড়টি বেশ দুর্ব্বল হয়ে আসে এবং অত পরিশ্রম ও রক্তপাতের জন্য তার জীবনীশক্তিও কমে যায়। এই অবস্থায় টোরেরো হাতের রাঙা কাপড় সহকারীকে দিয়ে কেবল মাত্র তলোয়ার হাতে ষাঁড়কে শেষ আহ্বান জানালো। ষাঁড়টিও যথেষ্ট বেগে টোরেরোর প্রতি তাড়া করে যাওয়া মাত্রই টোরেরো তার হাতের তলোয়ারখানি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তীরবিদ্ধ অংশে আমূল বসিয়ে দিল। ষাঁড়টির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে তলোয়ার তার পিঠ থেকে পেট পর্য্যন্ত প্রবেশ করাতে ষাঁড়টি মুখ দিয়ে কিছু রক্ত তুলে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টাকার থলি, চকোলেট প্রভৃতি বহু উপহার টোরেরোকে লক্ষ্য করে মাঠের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো···হাততালি তো প্রায় কানে তালা লাগিয়ে দেয়। মেয়র সাহেবও উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্য বদনে হাত তুলে অভিনন্দন জানালেন টোরেরোকে। একটি খেলার যবনিকা পড়লো।

ষাঁড়টির ঐ ভাবে মৃত্যুতে আমরা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীর উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে উঠতে পারিনি—একটু পরেই দু'টি খচ্চরে-টানা এক রকম ঠেলা-গাড়ীর মত যান এসে মৃত ষাঁড়টিকে ক্রীড়াভূমির বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে প্রায় দশ মিনিট ইণ্টারভাল্ (Interval) বা বিরাম থাকে। সেই সময়ে আমরা তিন জনে সমস্ত ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করে মনে যথেষ্ট দুঃখই পেয়েছিলাম এবং একটি নিরীহ ষাঁড়কে ঐ ভাবে কৃত্রিম উপায়ে বার বার উত্তেজিত করে আহত করে তার শারীরিক শক্তিক্ষয় হয়ে যাওয়ার পরে তাকে ঐ রকম নৃশংস ভাবে মেরে ফেলার মধ্যে স্পোর্টস্ কতটুকু থাকতে পারে, বুঝতে পারিনি। তার ওপর ষাঁড়টি একক—তার কোন সহকারী নেই—অথচ ওদিকে টোরেরোকে সাহায্য করার জন্য অন্ততঃ চার-পাঁচজন করে সহকারী বা সাহায্যকারী থাকে—তা ছাড়া ষাঁড়ের তাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে দম ফুরিয়ে গেলে বা হাঁফ ধরলে ত্বরিতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ষ্টেডিয়ামের চার দিকে অল্প অল্প দূরে বিশেষ ভাবে তৈরী আশ্রয়স্থল আছে। ক্রীড়াভূমি হতে সেখানে সহজেই প্রবেশ করা যায়, এবং একবার ভিতরে গেলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ রকম অবস্থায় ষাঁড় বেচারী সম্পূর্ণ অসহায় স্বীকার করতে হবে এবং একটি অসহায় নিরীহ জীবকে ও রকম নৃশংস ভাবে মেরে ফেলার মধ্যে বাহাদুরী কি আছে বুঝলাম না।

একটু পরেই বিউগল্ (Bugle) জাতীয় বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রাউণ্ড (Round) বা দফার সূচনা ঘোষিত হলো। একটু পরেই আবার প্রথম রাউণ্ডের পুনরাবৃত্তি। এবারের টোরেরোটি বিশেষ দক্ষ বলে মনে হলো না—কেপওয়ার্কে সাধারণ সাফল্য দেখালেও 'ব্যাণ্ডারিলাস্' বেঁধানোর কাজে সে বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে লাগলো এবং প্রথম দুটি তীরের মধ্যে একটি সামান্য গেঁথেছিল এবং বাকীটি মাটিতে পড়ে গেল। তার সহকারীর কাছ হতে আর এক প্রস্থ দুটি তীর নিয়ে অনেক চেষ্টা করার পরে অবশ্য ঐ দুটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল—ফলে এই ষাঁড় বেচারী তিনটা তীর বিদ্ধ হয়েই সারা মাঠ ছুটোছুটি করছিল এবং তার জন্য তার ক্ষতস্থান হ'তে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল। নিকষ কালো রংএর উপর গাঢ় লাল রক্তের ধারা এক বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। এই ষাঁড়টির জীবনীশক্তি পূর্ব্বেকারটির অপেক্ষা বোধ হয় বেশী ছিল—কারণ, সেই অবস্থাতেই সে টোরেরোকে এমন আক্রমণ করল যে, টোরেরোর দু' হাত হতে রাঙা কাপড় ও তলোয়ার খসে পড়লো এবং সেও মাঠের মধ্যে একেবারে ধরাশায়ী হলো। সারা ষ্টেডিয়ামের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল এবং সকলেরই চোখে-মুখে "কি হয়" "কি হয়" অবস্থার ভাব দেখলাম। পলক ফেলতে না ফেলতেই পূর্ব্ব-বর্ণিত বিশেষ রকম আশ্রয়স্থল হতে আর একটি টোরেরো রাঙা কাপড় ও তলোয়ার হাতে মাঠের আর এক দিকে গিয়ে ষাঁড়টিকে আহ্বান জানালো। সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়টিও প্রথম টোরেরোকে ফেলে দ্বিতীয়টির দিকে 'চার্জ্জ' করলো—ইতিমধ্যে দু'জন সহকারী এসে প্রথম টোরেরোকে ধরাধরি করে আশ্রয়স্থলে নিয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় টোরেরোই খেলা দেখাতে লাগলো। এবং পূর্ব্বেকার অপেক্ষা বেশী সময় ধরে এই তৃতীয় দৃশ্য চলতে লাগলো। শেষে সুযোগ বুঝে টোরেরো তলোয়ারটি ষাঁড়ের দেহে তীরবিদ্ধ অংশে আমূল বসিয়ে দিল—কিন্তু এই ষাঁড়টি প্রথম ষাঁড় অপেক্ষা বলবান হওয়ায় সেই অবস্থায়ই সারা মাঠে একবার শেষ দৌড়াদৌড়ির চেষ্টা করতে লাগল। ফলে, তার মুখ হতে ফোয়ারার মত নির্গত রক্তের ধারা সারা মাঠময় ছড়িয়ে পড়ল—এবং প্রথম শ্রেণীতে সমাসীন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই পোষাক পরিচ্ছদ রক্তাক্ত হয়ে গেল। বীভৎসতার ওপর বীভৎসতা—অল্পক্ষণ পরেই ষাঁড়টি মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টোরেরো ষাঁড়ের দেহ হতে তলোয়ারটি টেনে বের করে সেই রক্তমাখা তলোয়ার হাতে মাঠে দাঁড়িয়ে সকলকে অভিবাদন করল এবং আবার সেই বীর-পূজার পুনরাবৃত্তি!

দর্শকরা খুবই আনন্দিত দেখলাম। অনেকে টফি, লজেঞ্চ, চোকোনা, আইসক্রীম খেতে লাগলেন। আমাদের যেন গা-বমি

বোধ হচ্ছিল এবং আর থাকতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমরা উঠে আসার উপক্রম করতেই দর্শকদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখলাম। একজন 'নিজুল' ইংলিশে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, সবে মাত্র দ্বিতীয় রাউণ্ড খেলা শেষ হলো—আরো তিন রাউণ্ড খেলা বাকী এবং আমাদের ভাল লাগবে···ইত্যাদি। আমরা অত্যন্ত বিনয় সহকারে ধন্যবাদ জানিয়ে ষ্টেডিয়াম থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে লাগলাম—ষ্টেডিয়াম থেকে বাইরে আসার মুখে দেখি, এক বৃদ্ধ আমেরিকান-দম্পতিও আমাদের পিছনে পিছনে আসছেন। ভদ্রলোকটি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, এই আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা কি না? উত্তরে "হ্যাঁ" বলাতে মহিলাটি বলে উঠলেন তাঁদেরও এই প্রথম পরিচয় 'টোরোস' খেলার সঙ্গে—এবং এই খেলার বীভৎস দৃশ্য উপভোগ করার মত মানসিক ধৈর্য্য তাঁদের নেই। একটু হেসে তাঁদের কথায় সায় দিয়ে বাইরে এসে 'মেট্রো' অর্থাৎ আণ্ডার গ্রাউণ্ড (Underground) ট্রেনে করে হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলে অত শীঘ্র ফিরতে দেখে, ইংলিশ-স্পিকিং ম্যানেজারের তো চক্ষু স্থির! আমাদের কৌতুহলী দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা টোরোস খেলার ষ্টেডিয়াম ঠিক চিনে যেতে পেরেছি কি না? উত্তরে আমরা জানালাম যে সবই ঠিক আছে—তবে ঐ খেলার দুটি রাউণ্ড দেখার পরে আমাদের নার্ভাস ব্রেকডাউন (Nervous Breakdown) অর্থাৎ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দিয়েছে; সুতরাং আরও তিন রাউণ্ড খেলা না দেখেই চলে এলাম। তিনি বিশেষ খুসী হননি—তা তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম—কিন্তু 'ভিন্নরুচির্হি মনুষ্যাঃ'। তাঁকে বার বার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলের লাউঞ্জে এসে একটা পত্রিকা নিয়ে বসলাম। কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ডের ষাঁড়টির মুখ হতে নির্গত রক্তের ফোয়ারার দৃশ্য বার বার চোখের সামনে ভাসাতে লাগল। এবং পত্রিকাখানি আধ ঘণ্টা ধরে ওল্টাবার পরেও তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না। আজও···এত দিন পরেও এই দৃশ্যটি প্রায়ই আমাকে অভিভূত করে ফেলে।

যাই হোক্—একটু পরে লাউঞ্জে একজন বয়স্ক আমেরিকান্ ভদ্রলোক এলেন এবং আমাদের কাছেই একটি সোফায় বসলেন—তিনিও ঐ হোটেলের বাসিন্দা এবং আমরা যখন টোরোস্ দেখে ফিরে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিলাম—তখন তাঁকেও সেখানে দেখেছিলাম। চোখাচোখী হতেই "গুড ইভনিং" জানালাম। তিনিও প্রত্যভিবাদন করে নড়ে-চড়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা সেদিন বিকালে বোধ হয় টোরোস খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। উত্তরে 'হ্যাঁ' বলাতে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগলো?" আমি সংক্ষেপে সমস্ত খেলাটির বীভৎসতার ওপর একটু বিশেষত্ব আরোপ করে, ঐ রকম খেলায় বাহাদুরী কি থাকতে পারে-তাই জানালাম।

ভদ্রলোক দমে যাওয়ার পাত্র নয়—টোরোস খেলার বিশেষত্ব বা স্পোর্টিংসের দিকটা প্রমাণ করার জন্য নানা রকম কথা বলতে লাগলেন···কিন্তু আমি তা সমর্থন করতে পারলাম না। এবং বললাম, এ জাতীয় তথাকথিত স্পোর্টসের সঙ্গে পরিচয় আমাদের নেই বলেই এর বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে পারছি না বরং এর কুৎসিততাই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। ভদ্রলোকের দেখলাম কিছু পড়াশোনা আছে—হঠাৎ বলে উঠলেন, "টোরোস কি সতীদাহ অপেক্ষাও বীভৎস বা মর্ম্মন্তুদ?"

আমরা তো অবাক্—দেখছি আমাদের দেশের পুরোনো রীতি-নীতি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। কিন্তু দম্‌লাম না—বললাম, "সতীদাহ অত্যন্ত নৃশংস প্রথা ছিল নিঃসন্দেহ এবং সেই জন্যই তার বিলোপ সাধন হয়েছে একশো বছরেরও ওপর আগে।"

তিনি হেসে উত্তর করলেন—"তবুও একজন অসহায় জীবন্ত মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুড়িয়ে মারার চেয়ে একটা পশুকে খেলাচ্ছলে মেরে ফেলা অনেকাংশে কম নৃশংসতার চিহ্ন। সতীদাহ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও প্রচলিত ছিল—টোরোস এখনও থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?"

বেশী কথা-কাটাকাটি বা তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না—ধন্যবাদ জানিয়ে শুধু বললাম, "হয়তো"।

পুনরাগমনায়

জ্যোতির্ম্ময়ী রায়

এক ধাপ কায়ক্লেশে অতিক্রম করি,
পাঁচ ধাপ পরক্ষণে পিছাইয়া পড়ি।
এই মত কত দিনে তব গৃহদ্বারে,
পঁহুছিব 'প্রিয়তম' কহ তা আমারে।
শম্বুকের গতি যেন, যতিচ্ছেদ তবু—
দানিও না, —নিরন্তর আগাইও প্রভু।
আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তি লভিবারে আশ,
উপলব্ধি, ভক্তি নাই —ব্যর্থই প্রয়াস।

নিবেদনের নৈবেদ্যে আনন্দানুভূতি—
তিল নাই, নাহি চিত্তে আকুল-আকুতি।
বেলা শেষ হয়ে এল সুর খোঁজা শুরু!
গানের অন্তরে প্রাণ দেবে কবে গুরু?
সেই সে পরম মন্ত্র অন্বেষণ তরে,
চরম জীবন্ত নাম লেখো রক্তাক্ষরে।
সেই সে সুবর্ণ-বর্ণ অনল যেমন,
সপ্তাশ্ববাহিত সৌরকরের মতন।

তীব্র দীপ্ত শুভ্র শুভ সেই রং মাখি'
জাগুক জনমি পুন মোর দুটি আঁখি।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৫

সীতারাম বাড়ী গেল না। বৃথাই পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি।

আকাশে চাঁদ ছিল। পথে প্রান্তরে চাঁদের আলো ছিল।

নীল নির্মেঘ শরতের আকাশ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

সীতারামের মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন গরম হয়ে উঠেছে। তার ওপর ঠাণ্ডা হাওয়া মন্দ লাগছে না।

এ সময় একজন সঙ্গী পেলে মন্দ হ'তো না।

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলে সে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো শিবের বাড়ীর দরজায়। ডাকলে: বুড়ো শিব! বুড়ো শিব বাড়ী আছো?

—কে?

বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তারিণী। বুড়ো শিবের বাপের আমলের বুড়ো চাকর। যেমন লম্বা, তেমনি রোগা। মাথায় মুখে কোথাও এতটুকু চুলের নামগন্ধ নেই। চোখে চশমা। বাঁধানো দাঁত।

দেখবামাত্র সীতারামকে চিনতে পেরেছে ঠিক। বললে: আসুন আসুন বাবু, কত দিন পরে দেখলাম আপনাকে। কেমন আছেন?

সীতারাম বললে: ভাল। তোমার বাবু কোথায়?

তারিণী বললে: বাবু বেরিয়েছেন। আসুন আপনি ভেতরে বসবেন আসুন।

সীতারাম বললে: না বসবো না। আমি এমনিই এসেছিলাম।

এই বলে সীতারাম যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। বুড়ো শিব এখনও বাড়ী ফেরেনি।

সুলতানপুরে তার বন্ধু-বান্ধব আরও যে নেই তা নয়, কিন্তু যে জন্য আজ তার বন্ধুর প্রয়োজন, সে রকম কোনও দরদী বন্ধুর কথা তার মনে পড়লো না।

সীতারাম বাড়ী ফিরে এলো।

দূর থেকে মনে হ'লো যেন তার বাড়ীর সুমুখে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ীখানা দেবু চাটুজ্যের গাড়ী। সীতারামের মনের ওপর দিয়ে যেন এক ঝলক খুশীর হাওয়া বয়ে গেল। দেবুর সঙ্গে দেখা না করে সে ভালই করেছে। দেবুকে ছুটে আসতে হয়েছে তার বাড়ীর দরজায়।

গাড়ীর ভেতর বসেছিল সুধীর একা।

সীতারামকে দেখেই সুধীর তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লো।

সীতারাম বললে: দেবু কি আমাদের বাইরের ঘরে বসেছে?

সুধীর বললে: আজ্ঞে না, চাটুজ্যে মশাই আসেননি। আমাকে বললেন, গাড়ী নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি, মুখুজ্যেকে ধরে নিয়ে এসো। আপনি উঠুন গাড়ীতে।

সীতারামের মুখে একটু হাসি দেখা গেল। সুধীরের কথাগুলো শুনতে তার মন্দ লাগছিল না। তাই আর একবার শুনতে চাইলে। বললে: কি বললে দেবু? বললে, মুখুজ্যেকে ধরে নিয়ে এসো?

সুধীর বললে: আজ্ঞে হ্যাঁ। বললেন, মুখুজ্যে রাগ করেছে।

সীতারাম অন্যমনস্কের মত গাড়ীটা নাড়াচাড়া করছিল আর ভাবছিল কি জবাব দেবে।

সুধীর কিন্তু তখনও থামেনি। বললে: আমি মিছেমিছি বকুনি খেলুম। বললেন, ও-সব কথা তুমি বলতে গেলে কেন?

—কি-সব কথা? সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে।

সুধীর বললে: সেই যে—আপনাকে বললাম—রঞ্জনের বিয়ের কথা, সেই যে-সেই বাজার কথা•••চলুন। উঠুন গাড়ীতে।

সীতারাম দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলে। বললে: না।

সুধীর যেন একটু বিস্মিত হ'লো। বললে: যাবেন না? কাকাবাবু?

সীতারাম বললে: না।

সুধীর বললে: এই গাড়ীতেই যাবেন আবার এই গাড়ীতেই ফিরে আসবেন। আমি পৌঁছে দিয়ে যাব।

সীতারাম বললে: আমি রাজাও নই, মহারাজাও নই, আজ কাল পায়ে হেঁটেই যাওয়া-আসা করি, মোটরকারের দরকার হয় না।

সুধীর বললে: আপনি রাগ করেছেন কাকাবাবু?

—হ্যাঁ, তা একটু করেছি।

সুধীর দেখলে, এ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বললে: তাহ'লে আমি যাই কাকাবাবু। বলেই হেঁট হ'য়ে সীতারামের পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করে গাড়ীতে উঠে বসলো। হাত বাড়িয়ে গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে আবার বললে: আমি চললাম কাকাবাবু!

সীতারাম বললে: যাও।

—চাটুজ্যে মশাই জিজ্ঞাসা করলে কি বলবো?

—যা সত্যি তাই বলবে। বলবে—সীতারাম মুখুজ্যে এলো না।

ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়েছে। সীতারাম ফিরে দাঁড়ালো। বললে: আর একটা কথা তুমি বলতে পারো দেবু চাটুজ্যেকে। তার যদি টাকার দরকার হয় তো আসতে বোলো। টাকা আমি দেবো।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল। বলতে পারলে না। জ্যোৎস্নার আলোয় সুধীর স্পষ্ট দেখতে পেলে নীচের ঠোঁটটা তার কাঁপছে।

সে আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করলে না। ড্রাইভারকে বললে: চল।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল। দেবু চাটুজ্যের নতুন গাড়ী চাঁদের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সীতারাম তার লোহার ফটকটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে টাল সামলে নিলে।

সারাটা রাত সীতারাম তার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে। ছি ছি, দেবু চাটুজ্যের ওপর রাগ করা তার উচিত হয়নি। কি অপরাধ সে করেছে? তার প্রয়োজন ছিল টাকার। এসেছিল ধার চাইতে। দু' হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল। ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ের কথা বলেছিল। রাখতে পারেনি।

হয়ত'-বা কোনও রাজা মহারাজা প্রচুর টাকা দেবে বলেছে। রাজকন্যা আসবে তার পুত্রবধূ হয়ে। ছেলে হবে রাজার জামাই। এ ক্ষেত্রে সামান্য একটা মুখের কথা দেবু যদি রাখতে না পারে, তার দোষ দেওয়া যায় না।

দেবু টাকার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। তার চাই টাকা!

টাকা ধার চাইতে এসে টাকার জন্য যে-কথা সে বলেছিল, আবার টাকার জন্যই সে-কথা সে রাখতে পারলে না।

সীতারাম ভাবলে, এর জন্য দেবুকে সে একটি কথাও বলবে না। তার দুর্ভাগ্যের বোঝা সে নিজেই বহন করবে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে তার দেরি হয়ে গেল।

মুখ-হাত ধুয়ে বসতেই মালা চা দিয়ে গেল।

কাঞ্চন বললে: উঠতে এত দেরি করলে যে?

সীতারাম বললে: এমনিই। তুলে দিলে না কেন?

—ভাবলুম শরীর খারাপ।

মালা বললে: বুড়ো শিব এসেছিল বাবা!

সীতারামের মনে পড়লো কাল সন্ধ্যার কথা। বললে: আমাকে তুলে দেওয়া উচিত ছিল।

মালা বললে: গিয়েছিলাম তুলতে, মা বারণ করলে।

সীতারামের মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলো।

কাঞ্চন বললে: এক্ষুণি আসবে বলে গেছে। তুমি চা খাও।

সীতারামের চা খাওয়া তখন শেষ হয়েছে কি হয়নি, এমন সময় কাঞ্চন বলে উঠলো: ওই এলো বোধ হয়।

সীতারাম ছুটে বাইরের ঘরে গিয়ে ডাকলে, বুড়ো শিব!

কিন্তু ডেকেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেছে, আর বুড়ো শিবের বদলে চেয়ারে বসে বসে হাসছে দেবু চাটুজ্যে।

সীতারাম কিছু বলবার আগেই দেবু বলে উঠলো, রাগ করেছো?

সীতারাম বললে: করেছিলাম। কিন্তু এখন আর রাগ নেই।

দেবু হো-হো করে হেসে উঠলো।—বল কি মুখুজ্যে, এরই মধ্যে রাগটা পড়ে' গেল?

সীতারাম বললে: হ্যাঁ ভাই। কাল যখন শুনলাম—আমাকে কথা দিয়ে কোন্ এক রাজার বাড়ীতে রঞ্জনের বিয়ের সম্বন্ধ করছো রাগ তখন করেছিলাম। তার পর ভেবে দেখলাম—

কথাটা দেবু তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে: কি ভাবলে?

—ভাবলাম, তুমি এখন ছুটেছো টাকার পেছনে। টাকা তোমার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমি তোমার সে প্রয়োজন মেটাতে পারবো না। রাজার ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে তোমার সে প্রয়োজন যদি মেটে—

দেবু বললে: ঠিক ধরেছো। শোনো তবে আসল ব্যাপারটা। এই রাজার কাছ থেকে ধার নিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। শেষে কথায় কথায় কথা উঠলো—রাজার একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়ের সঙ্গে রঞ্জনের যদি বিয়ে দিই, টাকা আমাকে ফেরত দিতে হবে না। তবে মেয়ে আমি এখনও দেখিনি। মেয়ে যদি দেখতে শুনতে ভাল না হয় তাহ'লে বিয়ে আমি দেবো না।

সীতারাম বললে: ভাল।

দেবু বললে: তবে এই কথাটা তোমাকে আমি এখনও বলে রাখছি, এইখানেই যদি রঞ্জনের বিয়ে আমাকে দিতে হয়, তোমার মেয়ের বিয়ের সমস্ত খরচ আমি দেবো।

এতক্ষণ পরে সীতারাম যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। বললে: তুমি আজ ওঠো দেবু, আমার মন-মেজাজ ভাল নয়।

দেবু অবাক্ হয়ে গেল তার এই কথা শুনে। বললে: তবে যে বললে, রাগ তোমার পড়ে গেছে?

সীতারাম বললে: অরক্ষণীয়া মেয়ে যার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, সব সময় তার মাথার ঠিক থাকে না দেবু!

দেবু আর যাই হোক, নির্ব্বোধ নয়। সীতারামের মানসিক অবস্থার এই পরিবর্ত্তনের হেতুটা যে কি, বুঝতে তার দেরি হ'লো

না। বললে: আমার কথাটা তুমি ও রকম ভাবে নেবে জানলে, আমি কখনই তোমার মেয়ের বিয়ের খরচের কথাটা তুলতাম না, অন্ততঃ সে কথা বলবার স্পর্দ্ধা আমার হ'তো না। হ'লো শুধু দুটো কারণে। প্রথম কারণ—তোমাকে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারছি না বলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, তাই কি করে তোমার উপকার করবো সেই কথাটাই ভাবছি দিন-রাত। দ্বিতীয় কারণ—একই গ্রামে পাশাপাশি আমরা বাস করেছি অনেক দিন। তোমাকে আমার খুব বেশি অনাত্মীয় বলে মনে হয় না। যাক্, আজ চললাম।

বলেই দেবু উঠে দাঁড়ালো। সীতারামের একখানা হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে: অপরাধ করে থাকি তো ক্ষমা কোরো।

এই বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, সীতারাম বললে: শোনো।

দেবুকে ফিরে দাঁড়াতে হ'লো।

সীতারাম বললে: এতই যদি আমার উপকার করবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তোমার, তো দয়া করে শুধু একটি কাজ কোরো। তোমার ছেলেকে বারণ করে দিও আমার মেয়ের কাছে আসতে।

দেবু যেন চম্‌কে উঠলো। বললে: সে আবার কি রকম কথা!

সীতারাম বললে: খুব সত্যি কথা।

দেবু বললে: আমার ছেলে?

—হ্যাঁ, তোমার ছেলে রঞ্জন।

—সে আসে তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে? তোমার বাড়ীতে?

—না, আমার বাড়ীতে আসে না। আসে আমাদের মুখুজ্যে-পুকুরে।

দেবু বললে: আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।

সীতারাম বললে: বিশ্বাস কর। আমি নিজে দেখেছি।

দেবু এবার বেশ জোর করেই বললে: আমার ছেলেকে আমি চিনি মুখুজ্যে! লজ্জায় সে মুখ তুলে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না।

সীতারাম বললে: ভাল। তাহ'লে আমি মিথ্যা কথা বলছি।

দেবু চাটুজ্যে দু'পা এগিয়ে এলো। বললে: সত্য-মিথ্যা আমি জানি না মুখুজ্যে, তবে এই কথা আমি বলে গেলাম—আমার ছেলে রঞ্জনকে এবার যদি তুমি দেখতে পাও তোমার মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে এসে দেখা করছে বা কথা বলছে, তাহ'লে যেমন খুশী সেই-রকম শাস্তি তুমি তাকে দিতে পার।

ছেলের নামে এই অপবাদ—অন্য কারও মুখ থেকে শুনলে দেবু বোধ করি তাকে হেসেই উড়িয়ে দিত কিন্তু সীতারাম মুখুজ্যের কথাটাকে সে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারলে না।

অগ্রাহ্যও করতে পারলে না। মুখ বুজে সহ্য করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। গলার আওয়াজটা তার অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে চড়তে চড়তে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো যে, কাঞ্চন তার হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে দাঁড়ালো দোরের আড়ালে।

দেবু চাটুজ্যে তখনও বলে চলেছে: মুখে কিছু বলতে না পারো, বন্দুক তো আছে বাড়ীতে, তাই তুমি দিও চালিয়ে। আমি একটি কথাও বলবো না। বাস্, আর আমার কিছু বলবার নেই চলি।

দেবু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সীতারাম তার পিছু পিছু ফটক পর্য্যন্ত এগিয়েও গেল না, জবাবে একটি কথাও বললে না, চেয়ারের ওপর হাত রেখে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইলো। দেখলে, দেবুর গাড়ী নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তার সুমুখ দিয়ে। পেছনে গৃহিণীর স্বরকণ্ঠ শোনা গেল: বেয়াই তোমার এলো আর চলে গেল, এক পেয়ালা চা-ও খেতে বললে না? অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিল কেন? কি বলছিল?

সীতারাম বললে: ওর টাকা চাই!

কথাটা সে কাঞ্চনকে বলেনি। এমনিই বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। কাঞ্চন ভাবলে বুঝি সে তারই কথার জবাব দিলে। বললে: ও, তাই বুঝি ফেরত দিলে ছ' হাজার টাকা?

বলতে বলতে কাঞ্চন ঘরে ঢুকলো।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই তৎক্ষণাৎ তাকে বেরিয়ে যেতে হ'লো।

দোরের কাছে তখন এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো শিব।

—রোজই কি তুমি এত বেলায় ঘুম থেকে ওঠো সীতারাম?

এতক্ষণ পরে সীতারামের যেন জ্ঞান ফিরে এলো। বললে: না।

বুড়ো শিব বললে: আমি আর একবার এসেছিলাম। তোমার মেয়ে বললে, বাবা ঘুমোচ্ছে।

সীতারাম বললে: জানি।

বুড়ো শিব একটা চেয়ারের ওপর বসলো। বললে: মেয়েটি তোমার চমৎকার দেখতে—প্রতিমার মত সুন্দরী। দেবুর ছেলের সঙ্গে মানাবে ভালো। দেবু চাটুজ্যের গাড়ীটা দেখলুম যে—পেরিয়ে গেল পুলের ওপর দিয়ে। এই দিকে গিয়েছিল বোধ হয় কোথাও।

সীতারাম বললে: এইখানেই এসেছিল।

বুড়ো শিব বললে: ভাল, ভাল! বেয়াই-এর বাড়ী—সক্কালবেলা—ভাল। কাল রাত্রে তুমি যখন বেইবাড়ী-ফেরত আমার বাড়ীতে গিয়েছিলে, তারিণীর মুখে শুনে আমি তক্ষুণি বুঝতে পেরেছিলাম—সংবাদ শুভ। তারপর—কবে দিন স্থির হলো বল।

সীতারাম এতক্ষণ বসেছিল মাথা হেঁট করে। এইবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালে বুড়ো শিবের মুখের পানে। তারপর ম্লান একটুখানি হেসে বললে: হ'লো না।

বুড়ো শিব চীৎকার করে উঠলো।—হলো না মানে?

সীতারাম বললে: হ'লো না মানে হ'লো না। বিয়েটা ভেঙ্গে গেল।

বুড়ো শিব তার শীর্ণ শুভ্র হাত দিয়ে সাদা মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপর সজোরে এক চড় মেরে বললে: কখ্‌খনো না। এ বিয়ে ভাঙতে পারে না, এই আমি বলে দিলাম।

সীতারামের মুখে আবার একটুখানি ম্লান হাসি দেখা গেল।

বুড়ো শিব বললে: হাসছো? হাসো। কিন্তু দ্যাখো, এ-বিয়ে যদি না হবার হ'তো তাহলে প্রথম যখন এ-খবরটা শুনলাম তোমার মুখ থেকে, তখনই আমার মন সেটাকে গ্রহণ করতো না। আমার জীবনে এ-রকম হয়, আমি অনেক বার লক্ষ্য করেছি।

এই কথা বলে বুড়ো শিব তার চোখ দুটো বন্ধ করলে। মনে হ'লো—ধ্যানস্থ হ'য়ে কি যেন সে ভাবছে।

কিছুক্ষণ পরেই চোখ খুলে বললে: তুমি ভেবো না সীতারাম! আমার মন বলছে—এ-বিয়ে হবে। ডাকো তোমার মেয়েকে। কই রে! কি নাম তোমার মেয়ের?

সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

সব কাজেই আছে ছুটী। শুনি, ইহুদিদের ইতিহাসে না কি ঈশ্বরও ছুটী নিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টির শেষে! একদিন বসে শুধু দেখলেন তাঁর সমস্ত সৃজন। সবাই পায় অবসর। শিশুর দীর্ঘ অবসর মাতৃ-অঙ্কে, যুবকের অবসর প্রেমিকার কুঞ্জে, ব্যবসায়ীর অবসর তার কোষাগারে, বৃদ্ধের অবসর তার ধর্মচিন্তায়। সবার-ই আছে অবসর। অবসর ছাড়া কর্ম্ম আনে ক্ষয়, কর্ম্ম ছাড়া অবসর আনে জড়তা। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। প্রথমেই মনে পড়ে আমার হৃদযন্ত্রটিকে—চলেছে, চলেছে একই সুরে, একই ভঙ্গীতে। তবেই তো আমি থাকি বেঁচে। এ-কে অবসর দিতে চাওয়া মানে নিজের চির অবসর গ্রহণ। তবে চিকিৎসক হয়তো বোলবেন এ যন্ত্রটিরও আছে অবসর—সে অবসর আসে আমার নিদ্রার বিশ্রামে। কিন্তু এর চলা তো হয় না বন্ধ—চলেছে, চলেছে, চলেছে। রক্তের প্রবাহ আমার ধমনীতে চলেছেই।

পৃথিবীর চলার কী অবসর আছে, কোথায় পৃথিবীর ছুটী? ৩৬৫ দিনের কী ৩৬৫ দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর তার নাই? প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বা হিমে এ চলার বিরতি কোথায়? চলেছে, চলেছে, চলেছে। আর আমাদের দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন আসছে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর শীত, শীতের পর বসন্ত আসছে, আসছে কত নানা ফুল-ফল পত্র-পুষ্প-সম্ভারে। আমরা ভাবি এ তো আমাদের পাওনা, আসবেই তো! সূর্য্য চন্দ্র অপরাপর গ্রহ নক্ষত্র এ বিরাট বিশ্বে চলেছে অবিশ্রান্ত, কোথায় এদের অবসর, ছুটী? কিন্তু আমাদের ধরার এই বিশ্রামহীন গতি এনেছে কী তার ক্ষয়? আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবনে আমরা দেখি না তো বার্দ্ধক্যের কোন চিহ্ন—"ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা।" পাঁচশ' শত, লক্ষ বৎসর না কি এ'র আয়ুর পরিমাপ।

চন্দ্রের সেই ফুটফুটে হাসিটি নক্ষত্ররাজির সেই শিশু-নয়নের জ্বলজ্বলে চাউনি, তপনদেবের সেই বিরামহীন আলো, উত্তাপ, যাকে "প্রজানাং প্রাণ" (প্রাণিগণের চেতনা জাগায় ও বাঁচিয়ে রাখে) বলে ঋষিরা আখ্যাত কোরেছেন—কারুরও তো এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের কর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায় না কোন ছুটীর ফিরিস্তি, ছোট কি বড়। কল্পনা যতই সূক্ষ্ম কী সবল হউক না কেন, পৃথিবীর এই লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী আয়ুর পরিধিতে তার নিজের বা তার প্রাণীদের হৃদযন্ত্রের কোন ছুটির তালিকা বা বিবরণ না দেখে হয় চমকিত ও আতঙ্কিত। এ কী ভৌতিক বা দৈবিক প্রহেলিকা? প্রকৃতির নিয়মের কর্ম্মবিরতির, ব্যতিক্রম?

বিস্ময়ান্বিত হবার কথা বটে, কিন্তু কোথায় সে বিস্ময় ও বিহ্বলতা? এ যেন একটা সামান্য নৈসর্গিক ঘটনা! বিস্মিত হওয়া তো অজ্ঞানতার লক্ষণ—গম্ভীর ভাবে থাকতে হবে আমাদের জ্ঞানের অচল প্রতিষ্ঠায়। যেন আমরা গভীর সাগর জ্ঞানের 'আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং'। বিস্মিত হোতে পারা তো একটা মহান আশীর্ব্বাদ বিধাতার, যে যত বিস্মিত হয় সে তত চঞ্চল হয়ে ধাবমান হয় তাঁরই চরণে, তার বিস্ময়ের সমাধান করতে।

আবার আছে কী কোন বিশ্রাম, কোন ছুটী মানুষের হৃদয়ের ইতিহাসে? যেমন নাই কোন অবসর তার হৃদযন্ত্রটার, তার ভালবাসার ইতিহাসেও কী আছে কোন বিশ্রাম? ভালবাসার থাকে না কোন বিরতি। সে ত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আমাদের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রেম, সে ত্যাগের থাকে কী কোন ছুটী কোন সময়ে? মার ভালবাসার কী কোন বিরাম থাকে? যে মা শুধু শিশুটিকে ভালবেসেই চান ছুটী, চান অব্যাহতি তাঁর মাতৃ-কর্ত্তব্যের ও চেতনার—তিনি তো মাতৃত্বের ইতিহাসে পান না কোন স্থান? যে পত্নী তাঁর যৌবনের স্বামী ও বার্দ্ধক্যের স্বামীকে একই ঐকান্তিকতার সাথে ভালবাসতে না পারেন, চান ছুটী ও বিরাম। তিনি তো প্রেমের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখতে পান না তাঁর নাম? লক্ষ্মণের কী অবসর ছিল কোথায়ও তার ভ্রাতৃ-প্রেমের দীর্ঘ ইতিহাসে? কী অনুরাগ, কী বিশ্বাস, কী সেবা! কোথায়ও কী ছিল কোন ফাঁক মুহূর্ত্তেরও? ভ্রাতৃ-প্রেমের চির-চৈতন্য! গুড়াকেশ! হনুমানের অবিচলিত ভক্তির স্রোতে ছিল কী কোথায়ও ভাঁটা? এ যেন চির পূর্ণচন্দ্রে আলোকিত ও উচ্ছ্বসিত ভক্তি-বন্যা! এ যে অফুরন্ত শ্রদ্ধা সীমাহীন সমুদ্রকেও উল্লঙ্ঘন করে! কোথায় ছিল সে ভক্তির ছুটী? এ অসামান্য বীর সূর্য্যদেবের গতিও করলেন রোধ, নিজের প্রেমের অবিশ্রান্ত ও অফুরন্ত গতির শক্তিতে!

কোথায় ছুটী, কোথায় অবসর সত্যের, সুন্দরের, শিবের? যাঁরা দেখেছেন সে সত্য, সে সুন্দর, পেয়েছেন সে শিবের স্পর্শ, তাঁরা জানেন, এই অবসর শূন্যতার রহস্য! কিসের অবসর, কোথায় অবসর! যা' সত্য তা' কী হোতে পারে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মিথ্যা? যা সত্য, সুন্দর, শিব তা যে নিত্য সদা জাগ্রত। তার নাই অবকাশ, নাই তন্দ্রা; "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাম্"।

সীতারাম বললে: মালা!

বুড়ো শিব হাঁক দিলে: মালা! মালা!

মালা এসে দাঁড়ালো এ-দিকের দরজায়।

বুড়ো শিব বললে, বুড়ো শিবকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দাও মা! অনেক দিন পরে এসেছি তোমাদের বাড়ী। কিছু না খেয়ে উঠবো না।

'আনছি।' বলে হাসতে হাসতে মালা চলে গেল বাড়ীর ভেতর। কিছুক্ষণ পরে আবার তেমনি হাসতে হাসতে ফিরে এলো। বললে: মা বললে, আপনি তো সেই বুড়ো চাকরটার রান্না খান রোজ, আজ আপনাকে এইখানে খেয়ে যেতে হবে। বাবা, শিবুজ্যেঠাকে ছেড়ে দিয়ো না।

বুড়ো শিব হো-হো করে হেসে উঠলো। মুখে একটিও দাঁত নেই। আনন্দে চোখ দুটি ছোট হয়ে এসেছে। নিতান্ত ছেলে-মানুষের মত বড় পবিত্র, বড় সুন্দর তার সে হাসি!

বললে: দেখেছো সীতারাম, একেই বলে নারী। আমাদের দেশের মেয়েরা খাওয়াতে বড় ভালবাসে।

তার সম্মতির অপেক্ষায় মালা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

বুড়ো শিব বললে: তাই খাব মা, তোমার মাকে বলগে যাও

মালা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে কিসের যেন একটা গোলমাল উঠলো। ব্যাপার কি দেখবার জন্য সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

মানবেন্দ্র পাল

ঘোলা জল ঘূরপাক খেতে খেতে চলেছে। গর্জে উঠছে দামোদর। ধূ-ধূ করছে এপার-ওপার। সাদা ফেনা গড়িয়ে আসছে। এখুনি হয়তো হড়কা আসবে। হুড়মুড় করে জলের তোড় আছড়ে পড়বে—হাওয়ার বল্কা ভেসে উঠবে—ঘূরপাক খাবে জল ঘূর্ণিচাকার মতো।

তবু যেতে হবে!

সপ্তাহে একটি দিন শনিবার,—বিধাতার কৃপণ মুঠির এক কণা করুণা।

দামোদর পার হয়ে বাস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয় পাঁচ মাইল। মাথা গুঁজে দাঁড়াতে হয়। নিচু ছাদ।

কণ্ডাক্টার হাঁকে—বাব্‌রোক্! বাব্‌রোক্ নামবেন!

যাত্রী কেউ কেউ নামে। তার পর হাঁটাপথ,—তাও দেড় ক্রোশ বটে!

তবু শনিবার। সামনে রবিবারের অভ্যর্থনা।

কাঁধে ঝুলি, হাতে স্যুটকেশ। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে রবারের জুতো পায়ে কাদা বাঁচিয়ে পথ হাঁটে রবি।

বাড়ি আসতেই এত কষ্ট, যাওয়ার কষ্ট কল্পনা করা যায় না। রবিবার রাত তিনটেতে বেরোতে হবে। চারি দিকে ঘন অন্ধকার। এক হাতে টর্চ আর এক হাতে ছাতা। বর্ষার রাতে টিপ, টিপ, বৃষ্টি পড়ে—অন্ধকারে আমলকী গাছের পাতা যেন ভারী হয়ে ওঠে।

এমনি করে পাকা দেড় ক্রোশ। তার পর বাস। তার পর নৌকো। দামোদর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য ওঠে। আশা হয়, হয়তো ফার্ষ্ট লোকালটা ধরা যাবে বর্ধমান থেকে।

এত কষ্ট, তবু বাড়ি যাওয়া চাই প্রত্যেকটি শনিবার! একটা শনিবার বাদ মানেই—বাদ গেল তার জীবনের একটা ঘটনাবহুল অঙ্ক—রোমাঞ্চ-লাগা শনিবারের রাত—রবিবারের নির্জন দ্বিপ্রহর।

বাড়ির কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারে রবি। না, সে তো জানলায় নেই? জানলা বন্ধ। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। টিনের চাল বেয়ে এখনো জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। নীচের মান-পাতার ঝোপে শব্দ হচ্ছে টপ টপ।

জোরে জোরে পা ফেলে রবি বাড়ি ঢোকে। প্রথমেই তাকায় নিজের ঘরের দিকে। শেকল তোলা। পরক্ষণেই ফিরে তাকায় রান্নাঘরের পানে—ওই তো ও!

উঠোনটা জলে-কাদায় একসা হয়ে গিয়েছে। বারান্দার এক কোণে একটা টুলের ওপর দু'পা তুলে বসে বসে তামাক খাচ্ছেন—বিপিন চক্কোত্তী। রোগা, পাঁজরা-বেরকরা চেহারা। গলায় মোটা ধবধবে পৈতে।

বুড়ো চক্কোত্তী কেসে বললেন—রবু এলি? বাবাঃ যা দুযোগ! ও বৌমা—

বৌমা সাড়া দিল না—

একটু ক্ষুণ্ণ হল—বিপিন চক্কোত্তী নয়, রবি চক্রবর্তী। রাগ হল। অভিমান হল। ফিরে তাকালো না আর। সোজা ঢুকল নিজের ঘরে। আল্‌নার ওপর ঝুলিয়ে দিলে ঝুলিটা। স্যুটকেশটা রাখলে এক পাশে। আস্তে আস্তে খুলে দিলে জানলা দুটো। টুপ টুপ করে দু ফোঁটা জল পড়ল কাঠ বেয়ে। এক ফোঁটা পড়ল বিছানার ওপরে।

গরিবের সংসার। খাট নেই, পালংক নেই; তবু বড়ো লোভনীয় মাটির ওপর দেওয়াল ঘেঁসে নীল চাদর-পাতা ওই বিছানাটা। বালিশের ওয়াড়গুলো যেন আজই কেচেছে রাণী। ধবধব করছে। লোভ সামলানো দায়। তখনই শুয়ে পড়ে রবি। ইচ্ছে করেই মাথার বালিশটা বুকে টেনে নেয়। পাশবালিশটা দেয় পায়ের নীচে।

কতক্ষণ কেটে যায়। আশ্চর্য! রাণী তো এক বারও এল না! একটু খোঁজও নিল না?

টিক্ টিক্ করে টাইমপীস সময় গুণে যায়। ঘরের ভেতর অন্ধকার জমে ওঠে। জানলা দিয়ে যেন ভেসে আসে কালো রাত-বাদলা বাতাসের সঙ্গে। পেছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকে।

হায় রে এই জন্যেই এত কষ্ট! শনিবারের এই সন্ধ্যেটুকু—এ কি একলা মুখ বুজে থাকার জন্যে?

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল যেন। চমকে উঠে বসল—রাণী আসছে চা নিয়ে।

না, রাণী তো নয়?

—এ কী অন্ধকারে চুপটি করে?

—বেলা!

—চিনতে পারছ না?

—এ কী! এখনো—

—দাঁড়াও, আলোটা আগে আনি। ও বৌদি—আঃ পারিনে বাপু! ধরো তো চা টা।

রবি উঠে এগিয়ে আসে।

—উঁহু, ওটা আড়াল আমার। ধরো কাপটা আর ডিসটা।

ছুটে বেলা রান্নাঘরে চলে যায়। একটু পরে আসে হ্যারিকেন নিয়ে।

—ও বৌদি, চিমনিটা পরিষ্কারও করনি? তা আর চিমনি পরিষ্কার করবার সময় কোথায়? সারা দুপুর তো ঘর গোছাতে আর বিছানা পাততেই কাটিয়েছ।

বাইরে অন্ধকারে এক পাশে টুলের ওপর বসে বৃদ্ধ চক্কোত্তী কাসলেন এক বার।

জিভ কেটে বেলা এসে ঢুকল রবির ঘরে। অনেকক্ষণ রবি তাকিয়ে রইল বেলার পানে। বেলার চোখে কাজল ঝিলিক দিয়ে উঠল হ্যারিকেনের ঘোলাটে আলোয়।

—কী দেখছ অমনি করে?

—কার যেন বিয়ে হবার কথা ছিল? আমি ভেবেছিলাম—

—দূর, বিয়ে কোথায়! দেখে যাবার কথা ছিল।

—যাই হোক, দেখে যে যাবে সে কি আর না নিয়ে ফিরবে?

—ফিরলো তো।

—কেন পছন্দ হল না?

—পছন্দ হয়েছিল বলেই তো না নিয়ে ফিরল। বললে, অগ্নিশিখা রাখব কোথায়?

রবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বেলা হাসল,—কী, দুঃখু হল?

— না, দুর্ভাবনা কাটল।

বেলা হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল।

—নাও, চা যে জুড়িয়ে গেল!

—কিন্তু তোর বৌদির ব্যাপারটা কি?

বেলা চোখ টিপে হাসল,—তাই তো! দাঁড়াও, বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু—বৌদিই যে আমায় পাঠিয়ে দিলে।

—তবে বস।

হ্যাঁ রে, এখানে খুব বৃষ্টি হয়েছে না?

বেলা মাটির ওপর ধুপ করে বসে পড়ে বললে,—খু-ব বৃষ্টি। কিন্তু আজ রাত্রে এক ফোঁটাও পড়বে না; সে গুড়ে বালি।

—না পড়াই ভালো। যা ভিজেছি আজ! বৃষ্টিতে ঘেন্না ধরে গেছে।

বেলা হাসল,—তাই না কি?

আচ্ছা, আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি আনিয়ে দিতে পারি, তুমি কী দেবে বলো? জানো, আমি মন্তর জানি?

—বৃষ্টি চাচ্ছে কে?

—বৃষ্টি চাচ্ছে তারাই, যারা এক সপ্তাহ পর দারুণ বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ি আসে—যাদের মন একলা ঘরে কিছুতেই টেকে না,—যারা রাগে দুঃখে একজনের অত কষ্ট করে পাতা বিছানা লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ও কী হচ্ছে? চাদরটা যে গেল! বৌদি আজ—

—একটা কথা—যাক্ তোকে বলব না। তুই বড়ো ছেলেমানুষ।

একটু যেন অভিমান হল বেলার।

বললে—এ কথাটা মনেও তো থাকে না কখনো।

রবি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমনি সময়ে বাইরে একটা আলো দুলে উঠল।

বেলার ভাই এল। বললে—দিদি, বাড়ি চ।

—যাই। আজ চলি রবিদা'!

—কাল—

—কাল আসব? চটবে না তো মনে মনে?

—এর আগে কি কোনো দিন চটেছি?

হেসে উঠল বেলা।—সে সব দিনের কথা ভুলে যাও। ফের মনে করেছ কি—

কিল দেখিয়ে বেলা পালালো।

—বৌদি যাচ্ছি।

আশ্চর্য রাণী!

খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরালো রবি।

একটা কথাও বললে না! একেবারে অস্তিত্বটাই ভুলে গেল নাকি! খাবার সময় যেন চেনেই না এমনি ভাবে পরিবেশন। —আর দুটো ভাত? একটু ঝোল? চোখে চোখে একবার তাকালোও না? শুধু কর্তব্য পালন। হাতে জল ঢেলে দিল—সেও যেন কেমন পর পর। সুপুরি দিল, তাও হাত না ছুঁয়ে!

চোখে ঘুম ঢুলে আসে। কিন্তু আজ তো ঘুম না। আজ যে রাত জাগা। আজ যে অনেক আশা নিয়ে এসেছে। এর আগে দুটো সপ্তাহই দেখেছে ওকে অসুস্থ। কী সুন্দর শরীর! কোথা থেকে ঢুকল জ্বর। জ্বর আর জ্বর। ফোঁপরা করে দিলে!

এ সপ্তাহে আর যাই হোক, জ্বর নেই। মনটা খুসি খুসি। মনে হল যেন সেজেছে আজ। চোখে কাজল—পায়ে আলতা। জলে-কাদায় আলতা নষ্ট হয়েছে। তা হোক। তবু আজকের পরা।

কিন্তু ধরা দেয় না কেন?

শব্দ হল। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিল বোধ হয়, আসছে।

ঘুমের ভাণ করে উপুড় হয়ে পড়ে রইল রবি। ওপাশের ঘরে বাবার নাক ডাকছে। রাণী এসে আস্তে আস্তে দরজায় খিল লাগালে। হ্যারিকেনের দম কমিয়ে দিল। তারপর পা মুছে বসল বিছানায়।

আর কি চুপ করে থাকা যায়? কাঁটা দিয়ে উঠছে যে সারা গা। শির-শির করছে রক্তের স্রোত। রবি উঠে বসে।

দুষ্টুমির হাসি হাসে রাণী,—কি, ঘুমোওনি?

—ঘুমিয়ে পড়লেই খুব খুসি হতে, না?

—তাই কি বলেছি?

—তোমার আর কি, সাত সমুদ্দর তেরো নদী পার হয়ে তো আর বাড়ী আসতে হয় না। তোমরা রাজরাণী। আমরা ছুটে আসব তোমাদের মন্দিরে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে।

—রাগ করছ?

নাঃ রাগ করব কেন? ভাবছিলাম, ঘুমিয়ে পড়লেই হত।

রবি আবার শুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সরে বসে রাণী। আস্তে আস্তে হাত বুলায় ওর চুলে।

—তুমি বড়ো দুষ্টু!

—আমি !

—হ্যাঁ গো।

—কেন ?

—কেন ? হেসে উঠল রাণী। হঠাৎ নজরে পড়ল বিছানার অবস্থা।

বললে—কী করেছ বিছানাটা ? অত করে ঝেড়ে-ঝুড়ে পাতলাম দুপুর বেলা—

রবি বললে—যা কিছু সুন্দর তাকে তছনছ করেই আনন্দ।

—কি রকম ?

—এই যেমন তোমার মুখটা এত সুন্দর—এত সুন্দর সেজেছ—সেই জন্যেই—

মুখখানা জোর করে নিজের বুকের মধ্যে চেপে নিল রবি।

—ছাড়ো, ছাড়ো—চুল গেল ! টিপটা—

জোরে হেসে উঠল রবি। রাণী হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরলে। বললে—চু-প ! বাবা ঘুমোচ্ছেন।

—কিন্তু এ কী ! চমকে ওঠে রবি। তোমার গা যে গরম !

রবির কোলে মাথা রেখে অন্ধকারে ফ্যাকাশে হাসি হাসল রাণী।

—হ্যাঁ, ও কাল-শত্তুর আমার গা ছেড়ে নড়বে না।

বেলার বিয়ে হয়ে গেলেই ভালো হত। ও-রাক্ষুসী যে কতকাল গিলবে কে জানে ? সত্যিই ও আগুনের শিখা। লক্-লক্ ক'রে সর্বাঙ্গ বেয়ে লতিয়ে লতিয়ে ওঠে। ছেঁকা দেয়, পোড়ায় না।

সে সব বেশ কিছু কাল আগের কথা। এখন সেটা অতীত। কিন্তু একেবারে গত নয়, জের চলেছে। যেমন গত কালের সঙ্গে আজকের। একটা রাত মাঝখানে ব্যবধান রেখেছে বটে, কিন্তু এ পাশের সূর্যোদয় আর ওপারের সূর্যাস্ত রাঙা আলোয় সব ব্যবধান লোপ করে দিয়েছে যে !

একই পাড়া—পশ্চিম পাড়া। কাছাকাছি দুই বাড়ি। কাটোয়ার এক গ্রাম থেকে যখন প্রথম এল ওরা, তখন বেলা কোলের শিশু।

ছোট্ট বেলা বড় হল। চোখের সামনেই বড় হল সে। কিন্তু বড় কথা সেটা নয়। বড় কথা এই যে, ওই বেলা একদিন ধরে ফেলল—

—রবি দা ! আর্তস্বরে ছিট্‌কে সরে দাঁড়ালো বেলা—

—আমি কি ভুল করলাম বেলা ?

সেদিনও টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেদিনও জোনাকী জ্বলছিল আমলকী গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

বেলা সেদিন জানলার ধার ঘেঁষে বসেছিল একা। কী বিশ্বাসে পাশে বসতে বলেছিল রবিকে ?

—একটা গান শোনাও না ?

—গান ! গান তো পারি না। বরঞ্চ গল্প বলি।

—কিসের গল্প, রাজপুত্তুরের ? রক্ষে করো।

—না আমারই গল্প।

—তোমার লেখা ?

—না, না, মানুষের জীবনে কি সত্যিকার গল্প নেই ? আজকের এই সন্ধ্যে নিয়ে কি গল্প লেখা চলে না ? কোনো গল্পলেখকের জীবনে কি এমনি কোনো সন্ধ্যা আসেনি !…

—ছি ছি রবিদা', এ কী করলে !

—আমি কি খুব অপরাধের কাজ করেছি ?

—করতে পারনি, করতে গিয়েছিলে। তোমাদের বিশ্বাস করাও পাপ।

—আমাকে তোমার সেই পাপের একটা অংশ দাও না ?

—পারবে নিতে ?

—কেন পারব না ?

—জান, আমার বাবা কে ছিল ? ভুবন মুখুজ্জে নয়, রতন সরকার। কাটোয়ার ছোটো দারোগা।

শিউরে উঠল রবি

—কে বললে ?

—দিদিমা গাল দিচ্ছিলেন একদিন মা কে। মা তো তাই মরল বিষ খেয়ে।

—এ্যাঁ ! চুপ চুপ !

—কেন চুপ করব রবিদা' ?

—একথা কি আর কেউ জানে ?

—না। এক তুমি জানলে।

—কেন জানালি ? জানাজানি হলে তোর সঙ্গে যে কেউ সম্পর্ক রাখবে না।

চক্‌চকে একটা হাসি ঝলকে উঠল বেলার ঠোঁটে। বললে—চলো, আলো ধরছি। বাড়ি যেতে হবে না ? বর্ষা-বাদলের রাত ! হ্যাঁ, আর শোনো। তুমি বিয়ে করো তাড়াতাড়ি। ভয় নেই, এ কথা বৌদিকে বলব না

আবার শনিবার আসে। আবার শেষ আষাঢ়ের দামোদর রুখে দাঁড়ায়। মাঝ-নদীতে দু'দিকের খেয়া নৌকোর যাত্রী পরস্পরকে সজাগ করে দেয়—হুঁশিয়ার !

রবির কপালে চিন্তার রেখা। নিজের জন্যে নয়—রাণীর জন্যে। রাণী আবার বিছানা নিয়েছে।

বাড়ি এসে পৌঁছল যখন তখন সন্ধ্যে উৎরে গিয়েছে। আজ আর ঘরে শেকল তোলা নেই। ভেতরে হ্যারিকেনের ম্লান আলো। রাণী কাঁদছে।

রান্নাঘরের উঠোনে কার ছায়া পড়ল ! বেলা। বেলা রান্নাঘর থেকে দুধ গরম করে নিয়ে আসছে।

—রবি দা' এসেছ ?

—তোর বৌদি কেমন ?

—ভালো-মন্দর আমি কি বুঝি ?

রবি ঘরে গিয়ে ঢোকে। হাঁটু গেড়ে বসে রাণীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। কপালে হাত বুলায়।

—রাণী !

স্তিমিত দৃষ্টি মেলে রাণী চায়।

—তুমি এসেছ ?

—হ্যাঁ রাণী ! কিন্তু—

—খু-ব বৃষ্টি না ?

—হ্যাঁ।

—দামোদরে জল খুব ?

—হ্যাঁ, নৌকো করেই তো এলাম।

বাণী চুপ করল।

—কিন্তু তোমার কী হল?

ম্লান হাসি ফুটে উঠল বাণীর মুখে।

—কিছু না তো!

—আমি বুঝেছি। পেটে ছেলেটা এসেই তোমার কাল হল। ও-ও বাঁচল না, তোমাকেও মারল।

সত্যি, তখন যদি তোমায় একটু বিশ্রাম দিতে পারতাম, ভালো খাওয়াতে পারতাম, তাহলে হয়তো আজ তোমার স্বাস্থ্যের এ দশা—

বাণী আস্তে আস্তে রবির হাতের ওপর হাত রাখল। মুখটা ফিরিয়ে নিল, যেন লুকিয়ে নিতে চাইল একটা দীর্ঘনিশ্বাস।

মনে মনে হাসল রবি—ছেলের কথা শুনেই এত দুঃখ! তা-ও তো চেহারা ধরেনি—শুধু একটা পিণ্ড।

কখন বেলা এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে।

—হাত-মুখ ধুয়ে নাও রবিদা'। আমি চা করি।

বেলা চলে গেল।

একটু পরে দরজায় শেকল বেজে উঠল। রান্নাঘর থেকেই বেলা উত্তর দিল—যাই।

উঠোনে একটা আলো জ্বলে উঠল। বেলার ভাই এসেছে।

—দিদি, বাড়ি চ।

—চল্ যাচ্ছি। শোনো রবিদা'।

রবি এগিয়ে আসে।

—কী করছ তুমি? বৌদির পানে তাকিয়ে দেখেছ কি অবস্থা হয়েছে! একেবারে কাগজের মতো ফ্যাকাশে!

—কিন্তু করি কি?

—কলকাতায় নিয়ে যাও না। তোমার তো এত দিনের চেনা কলকাতা।

একটু হাসল রবি।

—হ্যাঁ, রাস্তা ঘাট অনেক দিনের চেনা, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—গরিবের কাছে রাস্তা চেনাটাই বড়ো কিছু নয়। যেটা বড়ো সেটা যে সাধ্যের বাইরে।

বেলা কোনো উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে চলে গেল।

এই বেলা যদি আজ না থাকত!

যদি না থাকত তবে বাণীর এ দুঃসময়ে কে দেখত এমনি করে ছোটো বোনটির মতো?

তবু—তবু মনে হয় রবির, ও যেন না থাকলেই ভালো হত। কী জানি কেন ওকে দেখলেই মনের ভেতরে এখনো কেমন করে ওঠে। আজ আর কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলে না কিছুই, কিন্তু হঠাৎ দেখা হলে দু'জনেই যেন লজ্জা পায়। চমকে যেন পালাতে চায় বেলা এখনো।

মনে মনে ভাবে রবি—কী তার অপরাধ?

ঠিক এই প্রশ্নটিই যেন আঁচ করে নেয় বেলা। কপালের ওপর কালো কাচপোকার টিপটা চক্-চক্ করে ওঠে,—চক্-চক্ করে ওঠে কালো চোখ—ঠোঁট কাঁপে রাগে, অভিমানে; হয়তো আশংকার সঙ্গে মৃদু রোমাঞ্চেরও আঁচ আছে।

নির্জনে হঠাৎ রবিকে সামনে দেখলেই ও যেন কেমন কুঁকড়ে যায়। দু' হাত বুকের কাছে গুটিয়ে ত্রস্ত হয়ে দরজার পানে এগিয়ে যায়। নালিশের সুরে মৃদু কণ্ঠে ডাকে—বৌদি—

রবি মাথা নিচু করে সরে যায়।

কিন্তু সেদিন—আর এক দিনের কথা। তখনো বেলার বৌদি আসেনি। তাই বোধ হয় তার আত্মরক্ষার উপায় ছিল না কিছু।

একদিন যে দুরন্ত কামনা অপমানিত হয়েছিল, অতর্কিতে রবি তার প্রতিশোধ নিলে।

নিলে আর কই—নিতে পারল না।

বাড়িতে কেউ নেই। বেলা আর কত হবে। সাড়া না দিয়েই রবি ঢুকল ঘরে। ঘরে তো বেলা নেই। গেল কোথায়?

—বেলা!

ঠাকুর-ঘর থেকে সাড়া এল,—বসুন, যাচ্ছি।

সেই মুহূর্তে রবির সর্বাঙ্গে রক্ত টলমল্ করে উঠল,—পঁচিশ বছর বয়েসের দুরন্ত কামনা।

অপেক্ষা করল না। সোজা ঢুকল ঠাকুরঘরে।

আঁতকে উঠল বেলা। সর্বনাশ!

এগিয়ে আসছে রবি। ওর চোখের দিকে তাকালে মনের খবর পেতে দেরি হয় না। বুঝল বেলা, সে দিনের অতৃপ্তি আজ পুরোমাত্রায় মিটিয়ে নেবে। তবু শেষ চেষ্টা—

—একটু দাঁড়াও।

—না।

—শোনো, আমি জোড় হাত করছি, এখন নয়। লক্ষ্মীটি এখন নয়। আজ সত্যনারায়ণ। স্নান করে এসেছি—পুজোর ফুল হাতে ছি ছি, তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই?

একটু পেছিয়ে পড়ল রবি। তবু হাসল, বললে,—আমার তো ধর্ম্মজ্ঞান নেই। কিন্তু তোমার কি কোনো জ্ঞানই নেই? কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা? তুমি কি এখনো বোঝ না আমায়? বোঝ না, কি চাই? তবে বারে বারে ফেরাও কেন?

হাতে ছিল ফুল। তাই ছুড়ে মারল বেলা মৃদু হেসে,—যাও পালাও শীগগির।

—না পালাব না। পালাব বলে কি এসেছি?

আবার ভয় পেয়ে পেছোয় বেলা।

—না না, কর কী! ছুঁয়ো না। আমি তবে মরব বলে দিচ্ছি। জান আমি কোন্ মায়ের মেয়ে?

—তবে আমিও যাব না। এই বসলাম।

—কী সব্বনাশ! এক্ষুণি কাকা আসবেন, পুরুতমশাই আসবেন। ছি ছি, তুমি যাও, ছেলেমানুষী কোরো না।

—তবে কথা দাও।

—কিসের কথা?

—তবে আমায় ফেরাবে না?

—কী চাও কি?

—তাও স্পষ্ট করে বলতে হবে?

—শুনি না?

—একটুক্ষণ তোমায় একলা পেতে।

—কী সাহস!

—যদি না দাও, জোর করে নেব।

—রক্ষে করো, আমি কথা দিচ্ছি, একদিন তোমার কথা রাখবো।

—আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করো?

—না, আমি পারব না। ওই—পুকুরপাড়ে সাদা ছাতা দেখা যাচ্ছে। শীগগির পালাও।

—গা ছুঁয়ে দিব্যি করো।

—এই নাও—এই নাও! দিব্যি করলাম। হল তো?

কিন্তু কেবল একদিন। তারপর যদি আর কোনো দিন এমন করতে আস তো মরব পুকুরে ডুবে, মনে রেখো।

সে প্রতিজ্ঞা এখনো রাখেনি বেলা।

পরপর কত দিন কাটল। রাণী এল বৌ হয়ে, তাও তো বছর ঘুরতে চলল। তবু কি কাঠের আগুন সহজে নেবে? ধোঁয়ার তলায় তলায় এক এক কণা আগুন জ্বলে ধিকি-ধিকি। প্রেমের উত্তাপ ঠিক লাগে বেলার গায়ে। তাই কি এখনোও এড়িয়ে চলে? হঠাৎ দেখলে চমকে ওঠে—পিছিয়ে যায়—পালিয়ে বেড়ায়?

পরের সপ্তাহে আসা হল না। সে শনিবার আটকে গেল অফিসের কাজে। অবশ্য চিঠি পেয়েছে এর মধ্যে, রাণী একটু ভালো আছে। ভালো আর কি, এত দুর্বল যে উঠতে পারে না। তবু ওই সুসংবাদটুকুই দূর প্রবাসে সান্ত্বনা বই কি!

পরের শনিবারে রবি গেল। বাড়ির কাছে আসতেই বুক দুরু-দুরু করে। কী জানি কী-এক অনিশ্চিত ভয়। জানলাটা বন্ধ কেন? আজ তো বৃষ্টি পড়েনি? পাড়াটাই বা এত চুপচাপ কেন?

রবি তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকল। ঢুকেই ডাকল—রাণী!

একটা কালো বেড়াল লেজ ফুলিয়ে সামনে দিয়ে চলে গেল।

খড়ম পায়ে খট্‌-খট্‌ করতে করতে এগিয়ে এলেন বিপিন চক্রবর্তী।

—রবু এলি?

—রাণী কেমন আছে?

টিকি উল্টে বিপিন চক্রবর্তী বললেন—সেই রকমই। কখনো একটু কম, কখনো বেশি। যাক্, এসে পড়েছিস বড়ো চিন্তায় ছিলাম।

হঠাৎ যেন একটা ভারী পাথর নেমে গেল বুক থেকে। দ্রুত পায়ে ঢুকল ঘরে—রাণী!

ম্লান হাসি ফুটে উঠল রাণীর মুখে।

—আমি তোমারই কথা ভাবছিলাম। ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল।

হাসল রবি—কী ভাগ্যি!

—শুনেছ?

—কী?

—বেলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

—বিয়ে হয়ে গিয়েছে! কবে? কোথায়?

—বিয়ে হয়েছে আজ ক'দিন হল ঠিক মনে করতে পারছি না। গত বুধবারে। সেই যারা দেখতে এসেছিল তারাই রাজী হল।

এক মুহূর্তে রবির মুখটা কেমন মিইয়ে গেল। আলো ছিল না সামনে। নইলে রাণীর দুর্বল দৃষ্টিতেও হয়তো ধরা পড়ত।

বুকটা খচ-খচ করে উঠল;—বেলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে!

ফিরে এল রবি কলকাতায়। সেখানেও সুস্থির হতে পারল না। এ কী ব্যর্থতা—এ কী বঞ্চনা! সে ছিল এত দিন কাছে কাছে নাগালের মধ্যে, মনে পড়েনি তখন, সে অকস্মাৎ চলে যেতে পারে উপেক্ষার হাসি হেসে!

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে কপালে। দু'পাশের শিরা দপ্‌ দপ্‌ করে। বেলা তাকে ঠকিয়ে গেল! তার দেহ স্পর্শ করে যে দিব্যি একদিন সে করেছিল, আজ স্বচ্ছন্দে সে কথা দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে গেল!

হয়তো সে কোনো দিনই কথা রাখত না। কোনো মেয়েই ভেবে-চিন্তে কোনো পুরুষের দুরভিলাষে প্রশ্রয় দেয় না। সে সংস্কার তাদের রক্তে রক্তে মিশে আছে যে!

প্রেম ভিক্ষা চাইলে মেলে না, আনন্দের অধিকার কেড়ে নিতে হয় মেয়েদের কাছ থেকে। ওরা যে কাড়ার অত্যাচারটুকুই চায়। ঝড় যখন লতাকে নুইয়ে দেয়, তখনই সে অনুভব করে লতা। সেইখানেই লতার আনন্দ।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে দু'খানা মুখ পাশাপাশি। একটা—সেই পুজোর ঘরে—কাকুতি ভরা মিনতি; আর একটা নববধূর। বিজয়িনীর অহংকার!

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় রবির। ছি ছি, কী দীনতাই সে দেখিয়েছে একদিন! পৌরুষের সে কী নির্লজ্জ অপমৃত্যু! আর কি এ মুখ দেখানো যাবে বেলাকে?

আজ কালরাত্রির পর পঞ্চম রাত্রি। বেলার লজ্জা ভেঙেছে। আজ নিঃসংকোচ অভ্যর্থনা করবে তার পরম পুরুষকে।

রবির শিরায় শিরায় সহসা রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ল। মনে মনে হাসল,—তোমার সংসারে আমিও আগুন জ্বালছি। তোমার মৃত্যুবাণ যে তুমিই একদিন আমার হাতে তুলে দিয়েছ!

পাঁচটা মাস কেটে গেল।

—কাদার ওপর দিয়ে হিঁচড়ে-টানা একটা দীর্ঘ সময়।

রবির হাতটা নিজের মুঠোয় টানবার চেষ্টা করে মিনমিন করে রাণী বললে—আর কটা দিন, নাই বা গেলে কলকাতায়। আমার চেয়ে কি তোমার চাকরী বড়ো?

কপালের ওপর হাত বুলিয়ে দেয় রবি।

—তাই কি যেতে পারি! তোমার চেয়ে বড়ো এ জীবনে আমার আর কি আছে? তুমি ভালো হয়ে ওঠো, তোমার সংসার তুমি আবার নিজের হাতে সাজিয়ে তোলো, এর চেয়ে বেশি কামনা আমার তো নেই।

রাণী দু' চোখ বুজে রইল।

—রাণী, তোমার নামে কালীঘাটে এবার পুজো দেব? যদি—

হঠাৎ শিউরে উঠল রাণী। দুর্বল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—না—না—না—

—আচ্ছা, না হয় নাই হল। তা অমন করে উঠছ কেন? এ কী রাণী! অমন কাঁপছ কেন?

—না, পুজো দিও না আমার জন্যে, কিছুতেই না। আমি মরব।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে নেয় রাণী।

—সেদিন অত করে বললাম, পারলে না ?

—কবে ?

—কবে! ভুলে গেছ ?

রাণীর চোখ দুটো সহসা কেমন হয়ে উঠল।

—মনে পড়ছে না? সেই যখন ছেলেটা তিন মাস আমার পেটে ? সেই যে মায়ের পুজোর ফুল দিয়ে মাদুলির কথা বলেছিলাম ?

হু হু করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল রাণীর দুই শুকনো গাল বেয়ে।

—রাণী, আমার সে ভুল ক্ষমা করনি ?

ফুঁপিয়ে উঠল রাণী,—জানি, জানি, তখন যে তোমার অফিসের বড় কাজ ছিল। তাই তো সময় পাওনি।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো রবি।

—আর একবার ডাক্তারকে ডাকি।

মনে হল, আজ যেন কেমন হয়ে পড়েছে রাণী।

ডাক্তার এল।

বললে, নাড়ী ভালো নয়। বড় দুর্বল। কিন্তু—

—কিন্তু কি ? খুলে বলুন।

পাশের ঘর থেকে রাণী চেঁচিয়ে উঠল—শুনছ ? শুনছ ?

ছুটে গেল রবি।

তখন শীতের সন্ধ্যে। আম-কাঁটালের পাতায় পাতায় শীতের অন্ধকার তখন দানা বাঁধছে। ঝাউগাছের পাতার মধ্যে একটা উত্তুরে হাওয়া থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। শেয়াল ডাকছে এখানে ওখানে, বোসেদের খিড়কির পুকুরের ওপারের ঝোপটায়।

—ওগো, তুমি কোথায় ?

—এই তো আমি।

না না তুমি কে ? তুমি নও। সে কোথায় ?

—কে ? কাকে খুঁজছ ?

—ওই যে গো—

—কে বলো তো ?

—ওই যে রবি—রবি—

—আমিই তো সে।

—তুমি নও, চক্কোত্তীদের রবি।

—আমিই তো চক্কোত্তীদের রবি। রাণী, এই যে আমি।

একবার ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে রাণী তাকালো। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে যেন!

—কী হল রাণী, শোও শোও।

—ওগো, আমার বড্ড ভয় করছে যে!

—কেন ? কিসের ভয় ?

—ঘোষেদের ছোটো ছেলেটা কলেরা হয়ে মরে গিয়েছিল না ?

—সে তো অনেক দিন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে পোড়ায়নি। বৃষ্টি পড়ছিল বলে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল।

ওগো, ছেলেটা যে বড্ড কাঁদছে! ওই—ও-ই শোনো!

রবি রাণীর মাথাটা ধীরে ধীরে কোলে তুলে নেয়। —রাণী কী সব বলছ ?

—বড় ভয় পাচ্ছি গো, বড় ভয়। তুমি আমার কাছ থেকে যেও না।

—না না, এই তো আমি রয়েছি রাণী!

—তবু যে ভয় করছে!

—আচ্ছা, দাঁড়াও। এই আমার পৈতে। এই পৈতে দিয়ে তোমার গায়ে মন্ত্র পড়ে দিচ্ছি, কেউ কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। নাও, ঘুমোও।

রাণী কথা বললে না। রবির কোলে মাথাটা হেলিয়ে দিলে।

রাণী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত তিনটের সময় যখন কোল থেকে রাণীর মাথাটা বালিশে রাখল, তখন ঘরে অনেক লোকের ভিড়।

ডাক্তার এগিয়ে এসে রবির পিঠে হাত রাখলে। বললে—রবি! বাকি কাজ আমরা এখন সেরে নিই; তুমি একটু সরে দাঁড়াও। তুমি তো অবুঝ নও।

রবি উঠতে পারল না। সেইখানেই বসে রইল। তাকিয়ে রইল রাণীর মুখের পানে,—এই মুখই একদিন অপূর্ব শোভায় ভরে থাকত।

রাণী মারা গেল। বেলা এল তার তিন মাস পর, মাত্র এক দিনের জন্যে।

বেলা মুখ দেখাতে পারে না লজ্জায়, চোখের জলে ভাসে।

—বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সব স্বাধীনতাই চলে যায় রবিদা', এটুকু বুঝে আমায় ক্ষমা কোরো।

রবি তার কোনো উত্তর দেয়নি।

—এ কি! বৌদির ছবিটা গেল কোথায় ? ওঁর হাতের সেই সেলাই-করা ময়ূর—পাড়ের পর্দা ?

হাসল রবি। বললে—সব ফেলে দিয়েছি।

—ফেলে দিয়েছ!

বিপিন চক্রবর্ত্তী বারান্দায় বসে ছিলেন। বলে উঠলেন, —হ্যাঁ রে মা, সব ফেলে দিয়েছে হতভাগা ? আমার বৌমা বলে যে কেউ কোনো দিন ছিল, আজ আর তা বুঝবার এতটুক উপায় রাখেনি। থামলেন বিপিন চক্রবর্ত্তী। কলকের আগুনে দু'বার সন্তর্পণে ফুঁ দিলেন। তারপর হাসির ছলে বললেন,—ওরে বোকা, ভুলব বললেই কি ভোলা যায় ?

পরের দিন দুপুর বেলা।

কেউ কোথাও নেই। বুড়ো চক্রবর্ত্তী গেছে ওপাড়ায় দাবা খেলতে। সমস্ত বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে যেন। বাইরে শেষ চৈত্রের রোদ। বোল-ধরা আমগাছের ডালে কোকিলের একটানা ডাক—কুহু—কুহু!

রবি ঘুমিয়ে পড়েছে।

আস্তে আস্তে বেলা এসে ঢুকল ঘরে। বসল ওর মাথার কাছে। তার পর ধীরে ধীরে রবির চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

চমকে জেগে উঠল রবি।

মৃদু হাসল বেলা,—আমি।

নতুন একটা তাঁতের লাল শাড়ি পরেছে। কপালে বড় করে সিঁদুরের কোঁটা। চোখে কাজল।

উঠে বসল রবি।

—কী, অসময়ে ?

—চলে যাচ্ছি, দেখা করতে এলাম।

—আজই যেতে হবে ?

—কী করি, ওখানে যে আমায় নইলে এক দণ্ড চলে না।

হাসল রবি।

—এরই মধ্যে বেশ সংসার পেতে বসেছিস্ না ?

মুখ নিচু করল বেলা।

—হ্যাঁ রে, তোর বর কেমন হল, দেখালি না ?

সহসা বেলা দু'হাত দিয়ে রবির হাত দু'টো জড়িয়ে ধরল। মুখে কী একটা আবেশ! কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন টলমল করে উঠল। গলার স্বর কাঁপল।

—জান রবিদা', ঠিক তোমার মতো মানুষ। একেবারে তোমার মতো দেখতে।

কত রাত্রে চাঁদের আলোয় ওর মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। সত্যি, এই গা ছুঁয়ে বলছি, চমকে উঠি, তুমি এলে কোথা থেকে কোন্ মন্তরে এত দূরে একেবারে আমার ঘরে!

অনেক কাল আগের এমনি একটা চেনা স্পর্শের কথা মনে পড়ল। হাতটা সরিয়ে নিয়ে রবি উঠে দাঁড়ালো। বললে—বেলা এলি। আর দেরি করিসনে। পাল্কীতে যাবি তো ?

—হ্যাঁ।

—একটু থামল বেলা।

—আর একটা কথা।

—কী বল্ ?

বেলা হঠাৎ বলতে পারল না।

—কী, চুপ করে রইলি ?

মুখটা লজ্জায় রাঙিয়ে গিয়েছে। তবু বললে,—তুমি তো কলকাতায় থাক, যদি দয়া করে ওর হয়ে আমার একটি কাজ করে দাও।

—কী ?

—মা বলছিলেন, কালীঘাটে যদি কেউ আমার নামে পুজো দিয়ে আসে—

একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন রবির জিভে এসেছিল। কিন্তু আচমকা সন্ত্রস্ত হয়ে সামলে নিল। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল।

—এই একটা টাকা। যদি কিছু বেশি লাগে, তুমিই দিও। তুমি তো পর নও ?

একটা পুরনো রুপোর টাকা আঁচল থেকে খুলে বেলা রবির পায়ের কাছে রাখল। তারপর গড় হয়ে প্রণাম করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

—চললাম।

স্থাণুর মত রবি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। মনে পড়ল, রাণীর অমনি একটি দিনের কথা। অকারণে রাণীও তাকে একদিন প্রণাম করেছিল। তবে সে প্রণাম বিদায়ের নয়।

ধীরে ধীরে টাকাটা তুলে নিল রবি। পুরনো আমলের ভারী রুপোর টাকা। গায়ে তার সিঁদুর-মাখা।

হঠাৎ কী মনে পড়ল; এগিয়ে গেল দেরাজের দিকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ডালাটা খুললে। তিন মাস আগে রাণী খুলেছিল। তিন মাসের বন্ধ দেরাজ হঠাৎ আজ আলোর স্পর্শে চমকে উঠল যেন!

না, সিঁদুরকৌটাটা এখনো রয়েছে। ওটা ফেলে দেবার কথা রবির মনে পড়েনি।

টাইম-পিস

প্রভাকর মাঝি

আমার টাইম-পিস দিন-রাত চলে টিক্ টিক্,
চলতে পারি না সাথে বলি তাই থামতে খানিক।
এম্‌নি রুটিন বেঁধে মেপে মেপে পথ চলা যায় ?
বীজগণিতের ছকে জীবনকে বাঁধতে ও চায়।
চলছে চলছে শুধু একটানা সকাল দুপুর,
একটু বিরতি নেই, এক কৌটা আবেগ-মধুর।
যখুনি ডুবতে চাই চুপে চুপে মনের ভেতরে,
গোছগাছ ভাবনাকে তখুনি সে গোলমাল করে।

একঘেয়ে কাজে তার একবারও করবে না ভুল,
দেখবে না বনে বনে হাসি-খুসি ফুটলো বকুল ?
চিক্ চিক্‌'করে আহা, ঘাসে ঘাসে চিকণ শিশির,
গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ থেকে মুঠো মুঠো রুচে আবির!
রুটির লড়াই চলে পৃথিবীতে সকল সময়,
টিক্ টিক্ করে শুধু বলবে তা,—আর কিছু নয় ?
মন কি ঘড়ির মতো চায় শুধু কাজ কাজ,
জাগবে না আলোড়ন ঘুমন্ত হৃদয়ের মাঝ ?

কাটলো আঁচড় কবে মনে এক মালবিকা রায়,
আমার টাইম-পিস্ বলবে না সে কথা আমায় ?

ষ্টীফেন স্পেণ্ডারের কাব্যের পটভূমি

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

১৯২৯ সাল। ষ্টীফেন স্পেণ্ডার তখন কুড়ি বছরের যুবক। এই সময় প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা নিয়ে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ তাঁর হাতে এলো। এতে Edmund Blunder, Henry Williamson, Robert Graves এবং আরও কয়েক জন তাঁদের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে ষ্টীফেন স্পেণ্ডার যেন এক গোপন পৃথিবীর সন্ধান পেলেন। দশ বছর আগের অপেক্ষাকৃত প্রবীণেরা প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

আজ ১৯৩০ সালের ২৪ বছর পরে এক নতুন তরুণ দলের আবির্ভাব হয়েছে। এঁদের কাছে ১৯৩০ সাল যত দূরে স্পেণ্ডারের কাছে ১৯১১ সাল ছিলো ঠিক তেমনি। সত্যি কথা বলতে কি, তরুণ স্পেণ্ডারের যুগের চেয়ে আজকের যুগের পার্থক্য অনেক বেশি। কারণ, শুধু দশ বছরের শান্তিই নয়, ছয় বছরের যুদ্ধ এবং কয়েক বছরের যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পাশ্চাত্য রণাংগন এক ধ্বংসাত্মক চিত্রের প্রতিরূপ। ট্রেঞ্চ, যুদ্ধবিধ্বস্ত রণাংগন, ক্ষতবিক্ষত সৈন্য—এই সমস্তই হলো তার শীর্ণ রূপ। আজকের তরুণদের সামনে ১৯৩০ সাল সম্পর্কে এই রকম কোন চিত্র জাগরুক নেই। তাঁরা শুধু জানেন, সে সময়ে নতুন এক সাহিত্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিলো, যার গতি ছিলো মূলত: সামাজিক বাস্তবতা ও ফ্যাশানের কম্যুনিজমের দিকে।

"সাহিত্যিক আন্দোলন ও গতিভংগীর বর্ণনা দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু শক্ত হচ্ছে, কি করে সেই বুদ্ধিজীবী আন্দোলন কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তি থেকে সমাজে এই পরিব্যাপ্তি অনেকটা মহিলাদের পোষাকের ফ্যাশান পরিবর্তনের মতই কৌতুকাবহ।" Wilfried owen এবং Siegfried Sassoon-এর 'War Poetry'-র চেয়ে ১৯৩০ সালের কবিরা আরও বেশি সমাজ সচেতন ছিলেন। আর এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে, এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁরা কাব্য রচনা করতে বসেছেন।

"Consider this and in our time
As the hawk sees it or the helmeted airman.
The clouds rift suddenly—look there
At cigarette end smouldering on a border···"

১৯৩০ সালে একথা লিখেছিলেন ডব্লু, এইচ, অডেন। এখানে 'Smouldering cigarette-end' বলতে তিনি সামাজিক অবস্থাকেই বুঝিয়েছেন। সমস্ত মধ্যবিত্ত সমাজকে ধ্বংস করতে যেন বোমায় আগুন দেওয়া হয়েছে। এই ধ্বংসের সূচনা অডেন আরও অনেক জায়গায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তারুণ্যের শেষে তিনি তখন বলেছিলেন :

"Seekers after happiness, all who follow
The convolutions of your simple wish,
It is later than you think···"

১৯৩০ সালের সূচনায় স্পেণ্ডার ও অডেনের মত তরুণ লেখকদের দৃষ্টিভংগী এই ধ্বংসের চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলো। তাঁরা লিখেছিলেন : "The handsome and diseased youngsters in this England of ours where nobody is well." বলা বাহুল্য, এ ধরণের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। পুরাতন যুগের অবসান আসন্ন, তাঁরা পাশ্চাত্যের পতন ও ক্ষয় নির্বিকার চিত্তে উদাসীন ভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁরা কোন পক্ষেই যোগদান করেননি। না প্রাচীন যুগে, না বিপ্লবাত্মক শক্তিতে, যা পুরাতন যুগকে ধ্বংস করে নতুন যুগকে সৃষ্টি করছিলো। তাঁরা এই মানব সভ্যতার সংকটকে নব দৃষ্টিভংগী দিয়ে অবলোকন করছিলেন। তাঁদের নিজেদের ভাষায় as the hawk sees it or the helmeted airman.

এই যে ধ্বংসের চিন্তা ব্যক্তি-মানসকে আচ্ছন্ন করেছিলো তা হলো ১৯২০ সালের স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু ১৯৩০ সালে যে পরিবর্তন দেখা দিলো তা সম্পূর্ণ নতুন উপাদান হয়ে ইংরাজী কাব্যে রূপ নিলো। একে মূলত: আমরা "আবেদন" আখ্যা দিতে পারি। ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক অবনতি ও তজ্জনিত বেকার সমস্যা, ১৯৩৩ সালের পর ফ্যাসিজিমের আক্রমণে ও অত্যাচারে জর্জরিত ইহুদি সম্প্রদায় সমবেত ভাবে সম স্বরে তখনকার কাব্যে প্রকাশের জন্যে যেন আবেদন জানাচ্ছিলো। এ সমস্ত ঘটনা যে শুধু ১৯৩০ সালের ইংরাজী কাব্যেই ঘটেছিলো তা নয়, পৃথিবীর আরও বহু দেশের সাহিত্যেই ঘটেছে। অত্যাচারিতের আর্তনাদ ও প্রতিবাদের এই রূপই ঠিক এমনি ভাবেই কোলরিজ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, বার্নস, শেলী ও বাইরনের মধ্যেও বহু বছর আগেই রূপ গ্রহণ করেছিলো।

সাহিত্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এই "আবেদন" এক সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক আশার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ১৯২০ সালের সমাজ সম্বন্ধে চরম মন্তব্য করেছেন T. S. Eliot তাঁর Waste Land কাব্যগ্রন্থে। সেখানে আশার চিহ্নমাত্র নেই :

"Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal."

এ কথা স্বীকার করে নিতেই হয় যে, শোষক ও শোষিত, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, সকলেই পাশ্চাত্যের পতনকে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মতো অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নিয়েছিলেন। সে যুগের কবিদের কাজ হলো এই বিশ্বাসহীনতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। তাঁরা সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক দিকে থাকলো ধার্মিক, সভ্য এবং গণতান্ত্রিক মানুষ, আর অন্য দিকে থাকলো দুর্মদ, অসভ্য অত্যাচারীর দল। সভ্যতার সঞ্জীবনী জাগাতে এ যেন এক নতুন অভিযান। এলিয়টের 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ। এই নব আশার প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ যা Andre Malraux প্রমুখ সাহিত্যিকদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিলো, তা কতকগুলি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। মানুষ নব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে ফ্যাসিজিমকে পরাজিত করবে এবং যত দিন সম্ভব তত দিন বেকার ও যুদ্ধকে নবপ্রচেষ্টায় সমাধান করে ফেলবে! কিন্তু যে দৃষ্টিভংগী জীবনে ও ইতিহাসে ঘটনার মতই বাস্তব, তা সাহিত্যে এসে আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো। আজকের দিনে এই আন্দোলনকে আমরা জন কয়েক লেখকের খামখেয়ালী বলে উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে সাহিত্যিক আন্দোলন নয়, ঐতিহাসিক ঘটনাই জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে। নতুন ঘটনাই নব দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলে এবং তা যখন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তখনই তার নাম হয় 'আন্দোলন।'

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সময়ে যখন কাব্য সক্রিয় ও রাজনৈতিক হয়ে ওঠে তখন মূল কাব্যজগতের পক্ষে তা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দিকে, কাব্যে সামাজিক পরিবর্তনের কোন ছাপ না-ও পড়তে পারে। কাব্যের রাজ্যে এই দ্বিবিধ অবস্থা বহু বার ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বা এলিজাবেথান যুগে যখন রাজনৈতিক অভিজাততন্ত্র সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন তখন কাব্য সেই যুগের প্রচলিত চিন্তাধারাকেই রূপ দেয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় কবিদের কণ্ঠস্বর প্রোপাগাণ্ডা ও রাষ্ট্রের লৌহপেষণে স্তব্ধ হয়ে যায়। সে সময় কাব্যিক বিবেক বোধ তখনই রাজনীতি সচেতন হয় যখন সমাজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার হয়, অথবা সভ্যতাকে রক্ষা ও রূপান্তরের দায়িত্ব এসে পড়ে। মিল্টনের সময় ইংরেজ রোমাণ্টিক অথবা ১৯৩০ সালে এই রকম ঘটনা-সংস্থান হয়েছিলো। সে সময় কবিরা এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন ও তাঁদের সমসাময়িকদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, 'খুব বেশি দেরী হবার আগেই সভ্যতাকে বাঁচানো প্রয়োজন।' এই রকম ঐতিহাসিক ঘটনা সমাবেশ খুবই দুর্লভ এবং এমনও হতে পারে যে অস্ত্রের প্রতিযোগিতার যে নতুন যুগে আমরা প্রবেশ করেছি সেখানে এ প্রয়োজন না-ও দেখা দিতে পারে।

সামাজিক আশাকে কাব্যে প্রতিফলিত করা যেমন এক দিকে ক্ষতিকর, অপর দিকে তেমনি উপকারীও বটে। যখন কাব্যতার সমকালীন বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে দৈনন্দিন পৃথিবী থেকে নৈতিক, ধর্মীয় বা দার্শনিক সত্যকে আদর্শ বলে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে, তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্তর্নিহিত সত্য কিছু পরিমাণে সাময়িক সত্যের ওপর পরনির্ভর হয়ে পড়ে। এই সময়ই পদে পদে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর কাব্য। তাঁদের দর্শন-কাব্য থেকে পৃথক করে আলোচনা করা সম্ভব এবং কিছু পরিমাণে তাঁদের কাব্যের মধ্যে তাঁদের বিপ্লবাত্মক ও 'প্যান্থেয়িষ্টিক' ভাবাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ১৯৩০ সালের কবিরাও ঠিক এই ভাবেই পৃথিবীকে যুদ্ধ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁদের কাব্যকে 'হিউম্যানিজিমের' ওপর নির্ভরশীল করেছিলেন। কাজেই গণতন্ত্রের সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হওয়ার পর যে পরিবেশে সেই যুগে কাব্য-রচনা সম্ভব হয়েছিলো তা এখন বর্তমান নেই। আর সেই জন্যেই নীতিগত ভাবে তার দর্শনও তখনকার ঘটনার ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তরুণ কবিরা, যাঁরা ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁরা অসীম সাহসের সংগে এবং বলতে কি, হাসিমুখেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক অসন্তোষ ও আসন্ন যুদ্ধের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কয়েক জন সম্পাদক ও সমালোচকের প্রচেষ্টাতেই এক নতুন সাহিত্য গড়ে উঠলো। তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থেই New বা 'নতুন'—এই কথাটাই খুব বেশি ব্যবহৃত হতে লাগলো। New Signatures, New Writing, New Country, New Verse, এই অল্প কয়েকটি নামই যথেষ্ট। Michael Roberts, John Lehmann ও Geoffrey Grigson হচ্ছেন উল্লেখযোগ্য সম্পাদকগোষ্ঠী, এঁরা সকলেই কবি। এঁরা এমন এক আন্দোলনের জন্ম দিলেন যা ক্রমশঃই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ইতিমধ্যে থিয়েটারেও এক নতুন আন্দোলন গড়ে উঠেছে। Rufert Doone হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। Auden ও Isherwood-এর শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপ রসের নাটকগুলিও থিয়েটারেই অভিনীত হতে থাকলো।

কাব্যে ও সাহিত্যে এই নব আন্দোলনকে প্রবীণেরা প্রথমে নবউষা বলে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু অচিরেই তাঁদের সে মতের পরিবর্তন হয়। বৃদ্ধ-বিশুদ্ধবাদী রাজনীতিবিরোধী লেখকেরা নতুন লেখক সম্প্রদায়কে সাহিত্য ক্ষেত্রে বেপরোয়া, অদ্ভুত ষ্টাইলের জন্মদাতা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে রাজনীতির আমদানীকারক বলে কঠোর সমালোচনা করতে লাগলেন। এ ধরণের সমালোচনা কিছুটা সত্যি এবং কিছুটা ভুল ধারণাকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ কথা সত্য যে, বৃদ্ধ লেখকদের মধ্যে ফর্ষ্টার ও ভার্জিনিয়া উল্ফ, অপেক্ষাকৃত তরুণ দলের মধ্যে Evelyn Waugh, Aldous Huxley, Raymond Mortimer, David Garnett ও Cyril Connolly যে বিশিষ্ট সাহিত্যভংগী আবিষ্কার করেছিলেন তা এই শতাব্দীর পরবর্তী যুগে কেউই তাঁদের সমকক্ষ হতে পারেননি। ১৯৩০ সালের পর থেকেই সাহিত্যভংগীর বেশ অবনতি হয়েছে এবং ঐ সমস্ত প্রবীণ লেখকদের সাহিত্যভংগীর সৌন্দর্য পরবর্তী যুগের আবেগ ও দ্বন্দ্বসংকুল সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৯৩০ সালে ভার্জিনিয়া উল্ফ Letter to a Young Poet-এ তরুণ-কবিদের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তরুণ-কবিদের সমালোচনা তাঁদের প্রতি অবিচার করারই সামিল। তাঁরা না কি প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছেন, এই ছিলো তাঁর অভিযোগ। এর চেয়ে আরও বড় কথা হলো এই যে, তাঁরা তাঁদের কাব্য-প্রেরণা হিসেবে বেকারত্ব, সামাজিক বিচার ও বিশ্বশান্তি ইত্যাদি বেছে নিয়েছেন। তাঁর ভর্ৎসনার কারণও ছিলো তাই। কিন্তু এই বিরূপ সমালোচনার সবটুকু দায়িত্ব তরুণ-কবিদের ওপর ছিলো না। এর সব চেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে অডেন, স্পেণ্ডার ও ডে-লুইস্‌কে একই গোষ্ঠীভুক্ত করা। এঁরা আজ ইংরাজী কাব্যে Trioতে পরিণত হয়েছেন। অথচ সব চেয়ে মজার কথা এই যে, অডেন ও ডে-লুইসের সংগে স্পেণ্ডারের ১৯৩০ সালে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভেনিসে P. E. N. ক্লাবের এক সভায় এঁদের সাক্ষাৎ হয়।

যাই হোক, ১৯৩০ সালের কবিদের কাব্যের মধ্যে এক সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে। তাঁরা একই প্রভাব, ঘটনার আবর্ত একই প্রতিক্রিয়া, একই কারণকে সমর্থন ও ঘটনার আত্মীয়তার সৃষ্টিতে সকলেই এক নব কাব্যের ও নব আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই এলিয়েটের The Waste Land-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন যা সমস্ত যুগকে ধরে নাড়া দিয়েছে ও স্পেণ্ডার সহ সমস্ত তরুণ কবিরা অডেনের মত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব দ্বারা চালিত হয়েছেন। এরই মধ্যে আধুনিক ইংরাজী কাব্যে স্পেণ্ডারের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের যুগে স্পেণ্ডারকে বাদ দিয়ে আধুনিক ইংরাজী কাব্যের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

পূর্ব্ববঙ্গ কোন্ পথে ?

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ইংরেজের বিদায় কালীন চক্রান্তের জন্যই হোক, আর জিন্না সাহেবের সাম্প্রদায়িক জেদের জন্যই হোক, ভারতের বক্ষে ছুরি চালাইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরু বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান যখন আসিয়াছে তখন থাকিবেও। উহাকে অস্বীকার করা চলিবে না। সুতরাং দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করি আর নাই করি—পূর্ব্ববঙ্গের অনেক মুসলমান বিশ্বাস করেন না—আমরা মনে করিলাম যে, পৃথক্ রাষ্ট্র পাইয়া পাকিস্তানীরা খাইয়া-পরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে—তা করুক। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গে থাকিতে ভরসা পাইতেছে না। যেখানে মুসলমানদের মেজাজ তত ভালো নয়—সেখানকার হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছে। আর যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা কোন মন্দ ব্যবহার করিতেছে না সে সব গ্রামে হিন্দুরা কোনরূপ প্রকারে টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহাদের মনে শান্তি নাই।

তাহার প্রধান কারণ—পাকিস্তান আজ-কাল মোল্লাতন্ত্রের দ্বারা অধিকৃত। এই মোল্লাতন্ত্র গদিতে তাঁহাদের আসন কায়েম রাখিবার জন্য এক অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। মোল্লাতন্ত্র এক দিকে দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন আর ভারতের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা অপবাদ দিয়া নিজের দাবি করিয়া পাকিস্তানের মিঞা ভাইদের মন ভাঙাইতেছেন।

তাঁহাদের মোল্লাতন্ত্রের মূল নীতি অনুসারে হিন্দুদের সব রকমে নির্যাতন চলিতেছে। তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ব্যবসা থেকে বঞ্চিত হইয়া বেকার হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানের অবস্থা যে ভালো হইয়েছে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বরং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা কখনও কখনও যায়-যায় বলিয়া শুনিতে পাই। যেখানে চালের মণ সাত-আট টাকা এবং ইলিশ মাছের দর আশাতীত সুলভ, পাটের মণ কখনও কখনও দশ টাকায় নামিয়া আসে, তখন কৃষকের দুঃখের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মাল চলাচল অব্যাহত থাকিলে এইরূপ কখনই হইতে পারিত না। ইহাতে উভয় বঙ্গেই দুঃখের কলরব শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদের মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মোন্মাদকতা আছে ও তার ফলে যে একতা দৃষ্ট হয়, তাহারই জন্য উহারা এত কষ্ট সহ্য করিতেছে। আশা এই যে, কিছু দিন পরে এই দুঃখ-কষ্টের লাঘব হইবে।

এই আট বৎসরেও পাকিস্তানের সংবিধান বা Constitution রচিত হইতে পারে নাই। সংবিধান রচিত হইলে ভিতরের লোক বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের কতখানি অধিকার এবং কোথায় তাহার সীমা। বাহিরের লোক জানিতে পারিত যে, কিরূপ ভাবে উহাদের রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হইবে এবং তদনুসারে তাহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত। এখন শুনিতেছি, সংবিধান রচিত হইবার পথে। কিন্তু সে-ও ঐ মোল্লাতন্ত্র কর্তৃক উদ্ভাবিত। এখন করাচীতে লীগপন্থীরাই শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। এখন কথা এই, পূর্ব্ববঙ্গ লীগপন্থীদের তাড়াইয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তানও তাহার সহিত হাত মিলাইতে চাহিতেছে। অতএব এই লীগপন্থী রচিত সংবিধান কতটা সমর্থন পাইবে তাহা বলা যায় না। লীগের মাতব্বর খুরো সাহেব উহাদের দল ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছেন। অতঃপর কি হইবে ?

পূর্ব্ববঙ্গের আর একটি বেদনা এই যে, দুরন্ত অবহেলা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গকে পাঞ্জাবী বেশ পরাইতে চাহিতেছে। আম জনসাধারণকে উর্দ্দুতে লায়েক করিয়া আরবীতে কোরাণ-শরিফ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু রাজ্য জয় করা বা লাভ করা যত সোজা, সংস্কৃতিকে আমূল পরিবর্ত্তিত করা তত সহজ নয়। ইচ্ছা করিলেই রাতারাতি একটা জাতির কৃষ্টি বা সংস্কৃতিকে বদলানো যায় না। মহম্মদ শহীদুল্লাহ একজন কৃতবিদ্য লোক। তাঁহার মত লোক হিন্দু সমাজ বা মুসলমান সমাজে বিরল। তিনি দেখিতেছি শেষটা "বিদ্যাপতি শতক" নামে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। এই যদি হয় পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা, তাহা হইলে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রামপ্রসাদকে বাদ দিয়া উহারা দেশের আধ্যাত্মিক কাঠামো কত দূর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ? ভারতের গোটা কতক সিনেমা বয়কট করিয়া বা পাঠ্য-পুস্তকে আজে-বাজে কথা ঢুকাইয়া একটা দেশের সংস্কৃতির ঝোঁক পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের নির্ব্বাচনে লীগকে পরাজিত করিয়া 'যুক্তফ্রণ্ট' ক্ষমতার অধিকারী হইলেন, কিন্তু মোল্লাতন্ত্র তাঁহাদিগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখিতে পারিল না। যুক্তফ্রণ্টের নেতা মৌলবী ফজলুল হক লীগওয়ালাদের মতে কি ততখানি মুসলমান ছিলেন না ? পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দু ও মুসলমান লইয়া গঠিত। ইহাতে যদি দুই পক্ষকে রাজী করিয়া তিনি রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন, তাঁহাকে কি সে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল না ? ফজলুল হক কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া অনেক খাতির দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য শাসন কালে সে সমস্ত কথা তিনি রাখিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দুরা আমাকে ভালবাসে, আমি কি তাদের নিষেধ করিব যে আমাকে ভালবাসিও না।" ফজলুল হককে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান-সম্প্রদায় পীরের মত খাতির করে। হিন্দুরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসে। পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি রক্ষা কল্পে এই রকম লোকের হস্তেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার ভার দেওয়া উচিত ছিল। এখন আতাউর রহমন পূর্ব্ববঙ্গের নেতা হইলে কি সে বাসনা পূর্ণ হইবে ? মিষ্টার এইচ, এস, সুরাবর্দ্দী ও মৌলানা ভাষাণির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফজলুল হক মাথা নাড়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, তিনি যুক্তফ্রণ্টের নেতৃত্ব ছাড়েন নাই। সুতরাং একটা বোঝাপড়া কিছু হইবে। মহম্মদ আলি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী থাকুন আর না থাকুন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি ক্রমাগত ভুল পথেই চলিতেছেন। কিন্তু লীগ শাসনের কালে যুক্তবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী-সাহেব কলিকাতায় যে কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটাইলেন, তাহার পরেও কি তাঁহাকে আবার প্রধান মন্ত্রী করিতে সাধ আছে ? খাজা নাজিমুদ্দিনকে অন্যায় ভাবে প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে সরানো হইয়াছিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আবার তাঁহাকে সেই গদীতে বসাইতে হইবে ?

আঁরি মাতিস

প্রদ্যোৎ গুহ

পঁচাশী বৎসর বয়সে ফ্রান্সের নীস সহরে আঁরি মাতিস লোকান্তরিত হয়েছেন। আজকের রাজনীতি-সংক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সংবাদপত্রের কাছে এ খবরের তুলনায় যে-কোন রাষ্ট্র-নায়কের প্রলাপোক্তির সংবাদ-মূল্য বেশি। কাজেই চার-পাঁচ লাইনের একটি শোক-বার্তায় এই সংবাদ খবরের কাগজের এক কোণে মুখ লুকিয়ে থেকেছে। এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। টাকা-[illegible]-পাইয়ের হিসাবে-বাঁধা পৃথিবীতে শিল্পী এর চেয়ে বেশি মর্যাদা কবেই বা পেয়েছে!

কিন্তু সে যাই হোক, খবরের কাগজে মুখ লুকিয়ে থাকা এই [illegible] দুনিয়ার শিল্প-রসিক-সমাজের কাছে একটি নিদারুণ [illegible]বাদ!

অবশ্য, পঁচাশী বছর বয়সে লোকান্তরিত হওয়াকে অকালমৃত্যু [illegible] যায় না। তবু আক্ষেপ থেকে যায় এই কারণে যে, যে বয়সে [illegible] ব্যবস্থা তখনও মাতিস নতুন পরীক্ষা-নীরিক্ষায় মেতে-[illegible] তাঁর প্রতিভা এবং শিল্পিমনও ছিল সজীব ও সতেজ। [illegible] রসিক-সমাজের তাঁর কাছে আরও প্রত্যাশা ছিল। [illegible] থেকে যায়, সে প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকে গেল।

মৃত্যু সব সময়ই শোকাবহ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোকটা দ্বিগুণ [illegible] এই কারণে যে, মাতিসের মৃত্যুতে রামধনু-রঙা বিচিত্র এক [illegible] পৃথিবীর প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল রসিক জনের কাছে—[illegible] চিরতরেই।

একজন কলাসমালোচক মাতিস সম্পর্কে বলেছেন, "His art [illegible] ancestors around the world". এক হিসাবে কথাটা [illegible]। বহু দেশ ঘুরেছিলেন মাতিস—বিশেষ করে প্রাচ্য দেশ। [illegible] করেছিলেন ও-সব দেশের শিল্পরীতি। বলতে কি, [illegible] দেশের চিত্রকলার অনেকখানি প্রভাব দেখা যায় মাতিসের [illegible]। এই কারণেই ইওরোপের অন্য যে কোন শিল্পীর রচনার [illegible] মাতিসের রচনার সঙ্গে এ দেশের শিল্প-রসিক অনেক বেশি [illegible] অনুভব করেন। শিল্পকলার অবশ্য জাত নেই—তবু [illegible] অভ্যস্ত করতে সময় দরকার হয় বই কি!

মাতিসের শিল্প-রচনায় ছিল চৈনিক ব্রাশের কাজের বলিষ্ঠতা, [illegible] মিনিয়েচারের সূক্ষ্মতা আর ইম্প্রেশনিজমের বর্ণাঢ্যতা। [illegible], প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের রূপরীতির এক অপূর্ব সমন্বয় [illegible] মাতিসের শিল্পকলায়। ফরাসী চিত্রশিল্পী তাই একই সঙ্গে [illegible] অর্জন করেছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের।

শিল্পের রাজ্যে মাতিসের প্রবেশ একটা আকস্মিক ঘটনা! [illegible] নিজেই বলেছেন, ছেলেবেলায় চিত্রকলার প্রতি তাঁর কোন [illegible] ছিল না। এমন কি, কোন চিত্রশালায় যাবার ইচ্ছাও [illegible] কোন দিন।

[illegible] বছর বয়সে মাতিস একবার গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন। [illegible] পরও অনেক কাল তাঁকে বিছানায় বন্দী থাকতে হয়েছিল। [illegible] মায়ের ছবি আঁকার সখ ছিল। অবসর সময়ে রঙ-তুলি নিয়ে চীনেমাটির বাসনে লতা-ফুল-পাতার নক্সা তুলতেন তিনি। মা-ই এ-সময়কার একঘেয়েমী কাটাবার জন্য মাতিসকে এক বাক্স রঙ এবং কিছু আঁকার সরঞ্জাম কিনে দেন। এই রঙ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মাতিস এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকের সন্ধান পেলেন। মাতিস সে-সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "মনে হল যেন স্বর্গলোকে পৌঁছে গেলাম। এখানে আমি মুক্ত। এখানে শান্তি।"

এই মুক্তি এবং শান্তির সাধনাই মাতিস আজীবন করে গেছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পিকার্ডির এক শস্য-ব্যবসায়ীর ঘরে মাতিস জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনোয় খুব মনোযোগী না হলেও বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি মোটের উপর ভালো ভাবেই পাশ করে ১৮৯০ সালে আইন পড়তে প্যারীতে আসেন মাতিস। কিন্তু আইনের পড়া তাঁর কাছে নিতান্ত একঘেয়ে মনে হল। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন লুভ্‌র প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রশালায়।

এ দিকে মাতিসের বাবার একান্ত ইচ্ছা, ছেলে আইনের ব্যবসা করুক। কিন্তু ছেলে তখন রসলোকের হাতছানিতে মন্ত্রমুগ্ধ। বাবা ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন এক উকিলের মুহুরীর কাজে। ছেলে গোপনে ভর্তি হলেন এক আর্ট-স্কুলে। কিছু কাল শিল্পচর্চা আর আইন-চর্চা একই সঙ্গে চলল। সকালে, আপিসে যাবার আগে শিল্পের পাঠ নিতে লাগলেন মাতিস নিয়মিত।

শেষে ছেলের অগ্রহাতিশয্যের কাছে বাবাকেই হার মানতে হল। আইনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কলাদেবীকেই বরণ করলেন মাতিস।

১৮৯২ সালে মাতিস ফ্রান্সের বিখ্যাত কলাবিদ্যালয় আকাদেমী জুলিয়াঁতে ভর্তি হন। এক বছর পরে ইকোল দ'বিউ-আর্টস এ যোগ দেন এবং গুস্তাভ মারোর কাছে কলবিদ্যা শিখতে থাকেন। এই গুস্তাভ মারোর প্রভাব মাতিসের উপর খুব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

মারো নিজে খুব বড় শিল্পী না হলেও শিল্প-শিক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি ছিলেন। শিল্প সম্পর্কে মারোর মতামতও ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক। শিল্পী কোন বিশিষ্ট রীতি বা আঙ্গিক, এমন কি বিষয়বস্তুর দাসত্ব করবে না—মারোর কাছ থেকেই মাতিস এই মতে প্রথম দীক্ষা লাভ করেন। এ থেকে অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন, মাতিস প্রচলিত প্রথায় শিল্পের অ-আ-ক-খ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন। পরবর্তী কালে মাতিস বরং তাঁর ছাত্রদের বলতেন, "দড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে হলে প্রথমে মাটির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে শিখতে হয়।" নিজেও অসীম অধ্যবসায়ে মাটির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াবার সাধনা করেছিলেন মাতিস।

প্রথম দিকে মাতিস প্রচলিত পন্থারই অনুবর্তী ছিলেন। প্রচলিত রীতির শিল্পী হিসাবে অল্প-স্বল্প নামও হয়েছিল তাঁর। ১৮৯৬ সালে মাতিসের চারখানা ছবি প্রদর্শনীতেও স্থান লাভ করেছিল। এই সময়ই তিনি চুমিয়ে, দেগা, লুত্রেক প্রভৃতি

ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পীদের ছবি দেখেন এবং তাঁদের রঙের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হন। এর পর কিছু দিন চলল ইম্প্রেশনিষ্ট-রীতিতে শিল্প সাধনা। এই পর্বে মাতিস সাফল্যও অর্জন করেছিলেন প্রচুর। বলতে কি, তাঁর ইম্প্রেশনিষ্ট রীতিতে আঁকা ছবিগুলি কলা-সমালোচকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। মাতিস নিজে কিন্তু এতে খুসি হতে পারেন নি। শেষে একদিন ইম্প্রেশনিষ্ট রীতির একঘেয়েমী তাঁর কাছে এতটা অসহ্য মনে হল যে, একটা সদ্য-সমাপ্ত "ষ্টিল-লাইফ" তিনি ছিঁড়ে ফেললেন কুচি-কুচি করে। বললেন, "আমাকে বা আমার ভাবনাকে রূপায়িত করতে পারেনি এ ছবি।"

যা দেখেছি তার যথাযথ রূপায়ণ নয়—দেখে আমার যা মনে হল, কল্পনার সেই সাত রঙের বর্ণচ্ছটাকেও রঙে রেখায় ধরে রাখার সাধনাই হল মাতিসের সাধনা। ছবি তো শুধুই পটে লিখা প্রাকৃতি নয়—কল্পনার সপ্ত বর্ণে রঞ্জিত সত্য। তাই বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এখানে তুচ্ছ, সত্য হল রঙ এবং রেখার ব্যঞ্জনা। প্রকৃতির সামনে একটা আয়না তুলে ধরে কি লাভ? বাতিল হল ইম্প্রেশনিষ্ট রীতি, (যদিও তার বর্ণাঢ্যতা স্থায়ী ছাপ রেখে গেল মাতিসের শিল্পকলায়) শুরু হল নতুনের সাধনা। কিন্তু নতুনকে সহজে স্বীকৃতি দেয় না এই পৃথিবী। ছবি বিক্রী হল না মাতিসের। জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে ১৯০০ সালে প্যারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অলঙ্করণের কাজ নিতে হল তাঁকে। এই সময়ই তিনি প্রথম বিশুদ্ধ রঙের ব্যবহার করতে শুরু করেন।

পরবর্তী বৎসরে ভলামিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মাতিসের। তার পরের বছর মাতিস, ভলামিঙ্ক, বোনার্ড প্রমুখের সহযোগিতায় একটি নতুন শিল্পিচক্র গড়ে তোলেন। ১৯০৫ সালে এদের প্রথম প্রদর্শনী আয়োজিত হতেই ফ্রান্সের কলারসিক মহলে তুমুল সোরগোল পড়ে গেল। সমালোচকেরা তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করলেন, কতগুলি অর্বাচীনের হাতে পড়ে শিল্পকলা রসাতলে গেল। কেউ কেউ খাপ্পা হয়ে বললেন, "মাতিসের ছবি মদ্যপানের চেয়েও অনিষ্টকর।" এক সমালোচক তো ক্ষিপ্ত হয়ে এঁদের নামকরণ করলেন—Les Fauves, অর্থাৎ বন্যপশু। মাতিসগোষ্ঠী কিন্তু এতে ভেঙে পড়লেন না। বরং এই ক্ষিপ্ত আক্রমণকে প্রসন্ন মনে উপহার বলেই গ্রহণ করলেন, নিজেদের চিহ্নিত করলেন Fauvist নামে।

পাঠকেরা হয়ত কৌতূহলী হবেন, মাতিসদের সম্পর্কে কলা-সমালোচকদের এবংবিধ বিরাগের হেতু কি? সমালোচকদের বিরাগের কারণ এই যে, মাতিস এবং তার বন্ধুরা বস্তুরূপের যথাযথ অনুসরণ তো করেনই নি—এমন কি রঙের ব্যবহারেও যথেচ্ছাচার করেছেন। সোনালী রঙের মেয়ে, মাথায় সবুজ চুল, কালো রঙের গাছ,—এমনি ধারা সব ছবি। অনভ্যস্ত সমালোচকদের চোখে এ সবকে পাগলামী বলেই মনে হয়েছিল, আর তাই একে ছবি বলে চালাবার চেষ্টায় এঁরা খড়্গহস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

নতুনের প্রয়াসী মাতিসকে অবশ্য বিরোধিতা অনেক সহ্য করতে হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সংগ্রাম করে তবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালের আগে এমন কি ফরাসী দেশও তাঁকে অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেনি।

কিন্তু এ-সব সমালোচনা এবং বিরূপ মনোভাবকে কোন দিনই গ্রাহ্য করেননি মাতিস। সৌন্দর্য সৃষ্টিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সৌন্দর্য সৃষ্টির তাগিদেই যেমন তিনি নতুন নতুন রীতি গ্রহণ করেছেন, তেমনি বর্জনও করেছেন। যে Fauaism নিয়ে এত হট্টগোল তাকেও তিনি জীর্ণ বসনের ন্যায় একদিন পরিত্যাগ করেছিলেন।

১৯০৬ সালে মাতিস একটি শিল্প শিক্ষার স্কুল খোলেন। তখনও সমালোচকদের আক্রমণ পুরোদমে চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রের অভাব হল না।

১৯০৭ সালে বৃটেনে তাঁর একটি প্রদর্শনী হয়। পরবর্তী বৎসরে "লা গ্রান্দে রেভু" নামে একটি প্রবন্ধ এবং 'শিল্পীর রোজনামচা" প্রকাশ করেন। এই দুটি লেখায় মাতিস তাঁর নিজের শিল্পরীতি ব্যাখ্যা করেন। এই সময়ই পিকাসোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং পিকাসো ও মাতিস বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বন্ধুত্ব তাঁদের আজীবন স্থায়ী হয়েছিল, যদিও তাঁদের কেউ একে অপরের শিল্পরীতি দ্বারা কখনও প্রভাবিত হননি।

১৯১১-১৩ সালে মাতিস মরক্কো ভ্রমণ করেন। আফ্রিকান দৃশ্যপটের সারল্য তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। অতঃপর তিনি চিত্রকলায় সারল্যের প্রয়াসী হন। অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বর্জন করে ছন্দ এবং ডিজাইনের উপর প্রাধান্য দেন। মাতিসের রঙের প্রয়োগেও ছিল একটা অদ্ভুত সারল্য। আলো এবং ছায়ার সমন্বয় করে ঘনত্ব দেখাবার প্রয়াসী তিনি ছিলেন না। বিশুদ্ধ 'ফ্লাট' রঙের ব্যঞ্জনাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

মাতিসকে বলা হয় রঙের যাদুকর। সত্যি, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রঙের একটা আনন্দময় পরিমণ্ডল তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর চিত্রকলায়। তাঁর রঙের প্রয়োগে ছিল একটা শিশুসুলভ স্বতঃস্ফূর্ততা। কিন্তু এ স্বতঃস্ফূর্ততা সযত্ন সাধনারই ফল। মাতিস বলেছেন: "শৈশবের সারল্যকে রক্ষায় বাধাটাই হচ্ছে আসল কথা। পড়াশুনো করুন, শিখুন, কিন্তু সেই সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখুন আদিম সারল্য। মদ্যপায়ীর যেমন থাকে পানাকাঙ্ক্ষা, প্রেমিকের মধ্যে প্রেম—তেমনি এ সারল্যও হওয়া চাই সহজাত।"

বহু সাধনার মধ্য দিয়ে শিশুর সরল রূপদৃষ্টিকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই বিচিত্র এক রামধনু-রঙা রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন মাতিস।

মাতিস বাস্তববাদী শিল্পী না হলেও, শিল্পগত ভাবাদর্শের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সুস্থ, সানন্দ মানবতাবাদের অনুগামী। জীবনের আনন্দই ছিল তাঁর শিল্পের মূল প্রেরণা। মাতিস তাঁর একাধিক ছবির নামকরণ করেছিলেন—'জীবনের আনন্দ'। এই নামের একটি ছবি মস্কোর একটি আর্ট গ্যালারীতে আছে এবং তা একাধিক সোবিয়েত পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

মাতিস ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী, আর তাই অসুন্দরের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। তাই শেষ জীবনে তিনি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন, ষ্টকহলমে শান্তির আবেদনে স্বাক্ষর করেছিলেন।

জীবনের পূজারী মাতিস দীর্ঘ কাল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন। ১৯৪১ সালে তিনি দুরারোগ্য আন্ত্রিক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন। তখন ডাক্তাররা বলেছিলেন তাঁর জীবনের মেয়াদ বড় জোর

আর ছ' বৎসর। কিন্তু ডাক্তারদের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে তার পর আরও চৌদ্দ বছর বেঁচেছিলেন তিনি।

১৯৪৩ সালে তাঁর দেহে একটি অস্ত্রোপচার হয়। এ সময়ে একটি মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করেছিল। মেয়েটি পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে মাতিস দক্ষিণ-ফ্রান্সের একটি ছোট গীর্জার অলংকরণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন। এই গীর্জার ঘষা-কাচের জানালার ডিজাইন করে দিয়েছিলেন নানা রঙ-বেরঙের কাগজের টুকরো বিচিত্র প্যাটার্ণে জুড়ে জুড়ে।

এর পর মাতিসকে প্রায়ই দেখা যেত বিছানার উপর কাঁচি আর রঙ-বেরঙের কাগজ নিয়ে বসেছেন। আর অসীম অধ্যবসায়ে কাগজের টুকরোগুলি জুড়ে জুড়ে রচনা করেছেন বিচিত্র ছন্দোময় সব প্যাটার্ণ। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সহাস্যে মুখে জবাব দিতেন, 'এই কাজকে পাথর কুঁদে ভাস্কর্য রচনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—মাইকেল এঞ্জেলো পাথর কুঁদে যা রচনা করেছেন—একে তারই রঙীন সংস্করণ বলা যায়। এ তোল আমার সারা জীবনের সাধনার ফল।' জনৈক সমালোচক মাতিসের এই উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, পরিহাসচ্ছলে বলা হলেও কথাগুলি উড়িয়ে দেবার মত নয়। সত্যি, এই কাগজকাটা ছবিগুলি মাতিসের অনন্যসাধারণ রচনা।

শেষ জীবনে মাতিস প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। কিন্তু তবু তাঁর জীবনের আনন্দ স্তিমিত হয়নি। তাঁর শিল্প রচনায় পড়েনি পাণ্ডুর ছায়া।

মাতিসের মৃত্যুতে যে রামধনু-রঙা পৃথিবীকে আমরা হারালুম—তা কি আর কোন দিন ফিরে পাব?

প্রস্তুতি

টি, এস্ এলিয়ট্

শীতের সায়াহ্ন নামে
সহরের অলিতে-গলিতে,
বারান্দার ভাঙ্গা, খোলা ভিতে
রসুই-ঘরের ধোঁয়া জমে।
ঘড়িতে বেজেছে ছ'টা।
ধোঁয়া-ঢাকা দিবসের দগ্ধ-দিনান্তটা।
অকস্মাৎ বৃষ্টি নামে, এলোমেলো ঝড়,
উড়ে যায় ঝরা-পাতা, কাটি-কুটি, খড়;
দমকা-ঝাপট বাধা পায়
সার্শির ভাঙ্গা-বুকে, চিমনীর গায়।
পথের একান্তে, এক কোণে,
ভাপ-ঝরা হেটো ঘোড়া খুর দাপে নিরালা, নির্জনে,
ফুটপাতে সারি সারি আলোগুলো জ্বলে সেই ক্ষণে।

সকাল সম্বিৎ ফিরে পায়
কাদা-পায়ে ভীড়-করা কফির আড্ডায়।
ভোরের বাতাসে
বাসি-মদে উবে-যাওয়া গন্ধটুকু ভাসে!
আর যারা নিশাচরী আসে পায়-পায়
সময়ের নিঃশব্দ ছায়ায়,
পানপায়ী সে-ভীড়ের উন্মত্ত খেয়ালে
ছায়ারা জটলা করে বিচিত্রিত বর্ণের দেয়ালে।

নরম কম্বলে দিয়ে ঢাকা,
চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে প্রতীক্ষায় থাকা;
তোমার তন্দ্রালু মনে—
রাতের পর্দায় ক্ষণে ক্ষণে—
আত্মার কদর্য-রূপ
কড়ির কোণায় ফেলে ছায়া অপরূপ।

ধীরে ধীরে পৃথিবীর চেতনা এলে ফিরে,
আলোর নিঃশব্দ গতি সার্শির শিয়রে:
চড়াইয়ের আনাগোনা নলের ফোকরে:
তোমার চেতনা-লুপ্ত পথের সে-ছবি
পথেই বিস্মৃতি তার সবই।
বিছানার ধারে ব'সে কাগজের দলা নিয়ে ছোঁড়া
অথবা মলিন হাতে হলুদ গোড়ালি দুটো মোড়া।

আত্মা তার পাখা মেলে উদার আকাশে,
নগরের পারে যে-আকাশ— দিক্‌চক্রে মেশে;
অথবা দিনের শেষ-সময়ের ছায়ে
প্রতি-পলে দ'লে যায় অতিক্রম্য পায়ে।
তাম্রকূট-সেবী, খর্ব জনতার ভীড়—
সন্ধ্যার সংবাদ-পত্র,—দুই চোখে চিড়
বিতর্কিত প্রামাণ্যের।
আঁধার-পথের
পরম অধৈর্য যেন পৃথিবীর চৈতন্য ফেরাতে।
এই-সব ছায়া ঘিরে রচি' কত অতৃপ্ত আগ্রহ,
এক উপলব্ধি জাগে:
চিত্তবৃত্তি সাধু, তবু অনন্ত নিগ্রহ।

কিছু না!!!
মুখখানা মুছে ফেলে হাতের তালুতে হাসো জোরে-জোরে,
কক্ষনে-বুড়ির মত ঘুরে-মরা, জ্বালানীর শুষ্ক-বোঝা বেঁধে
প্রত্যহের পৃথিবীর চাকখানা ঘোরে।

অনুবাদক—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বস্তু-শক্তি

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

যে বস্তুর যোগাযোগে আপন শক্তির প্রকাশ,—সেই বস্তুটিকে সাধন বলে জানতে হবে,বুঝতে হবে—তবেই বস্তুতে নিহিত সর্ব শক্তিকে আপনার আয়ত্ত করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বস্তুটিকে 'মিডিয়াম' করে যাঁরা সাধনমার্গে যাবার চেষ্টা করেন, তাঁরাই পাবেন অভীষ্ট পথে পৌছুতে। কারণ, বস্তুকে 'মিডিয়াম' করে যখনই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'বেন তখনই জ্ঞান-কৌতূহল এরূপ ভাবে সৃষ্ট হয় যে বস্তুর আভ্যন্তরীণ শক্তি-প্রবাহে কি এমন রহস্যময় অণু-পরমাণু নিহিত আছে। বস্তুর শক্তি অনুভব আর বস্তুর শক্তি দিব্যদর্শন লাভ করা ঠিক একই জিনিষ নয়। অনুভব, দর্শনের বনিয়াদ। যে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে অনুভব করে, দর্শনের বনিয়াদ তার তেমনি ভাবে গড়ে ওঠে।

খাবার গ্রহণ করি, কেন না খিদে অনুভব করি—নিদ্রা যাই, কারণ নিদ্রা পায়, তাই। ভোগ করি, কারণ প্রাণ চায়। জাগতিক এরূপ কত চাহিদা আমাদের মনে অহরহ উদয় হয়—অনুভব করি আর তার নিবৃত্তি করার শুধু চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু সত্যি করে ক'জন বলতে পারবেন—এই যে আমাদের আহার-নিদ্রা ভোগ-সম্ভোগ ইত্যাদির তাগিদ আসে—সবই কি প্রয়োজনের তাগিদে আসে আর প্রয়োজন বোধেই কি তা গ্রহণ করি?—জানি, বলতে আপনারা অনেকেই উন্মুখ যে, প্রাণে অনুভব করি, তাই গ্রহণ করি। কিন্তু আমি আপনাদের যুক্তির সাথে একমত নই। কারণ, আপনাদের অনুভবে দর্শন-বিজ্ঞানের অভাব, তাই পবিত্র অনুভূতিতে বিকৃত উপভোগই আসে।

শক্তি আপনার আছে, তাই বিকৃত উপভোগের পরিণাম তখনও উপলব্ধি করতে পারেন না—পারবেন, যখন ক্রমশঃ জীবনী-শক্তি হ্রাস পেয়ে আসবে; আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঘুম, ভোগ এবং বিশ্রাম ইত্যাদির চাহিদা যখন অসময়ে অনুভূত হয়, কর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত আপনার মধ্যে সংযম-স্পৃহা জাগতে পারে না। কাজেই চাহিদার ওপর যদি আপন বিচারশক্তি প্রয়োগ করা যায়—তবেই চাহিদার স্বরূপ দর্শন পাওয়া যায়, আর সেই দর্শন-বিজ্ঞানই রোগ, শোক, ভুল-ভ্রান্তির মুক্তির সন্ধান দেয়—; এই অভিজ্ঞতাই চাহিদাযুক্ত বস্তুটিকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করার ইচ্ছাশক্তি জাগায়।

সব-রকম চাহিদাই যদি প্রয়োজন মত ছোট হত তাহলে মানুষের জীবনীশক্তিতে এত শীঘ্র সন্ধ্যার আহ্বান আসতো না।

চাহিদা অন্তরের কামনা। মানুষ যদি অন্তরের আবেগকে কবিতার ছন্দে, শিল্প-রহস্যে, সঙ্গীতের ভাবময় সুরে পরিস্ফুট করে আপন দর্শন, আপন শ্রুতির গোচরে আনতে সক্ষম হ'ন—তবে কেন অন্তর-প্রকৃতি অন্তর-আত্মায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার মহিমা দর্শনে অক্ষম হন? তার একমাত্র কারণ, আমার মনে হয় আমরা বস্তু মাহাত্ম্যজ্ঞানে বঞ্চিত! তবে বস্তুর সংস্পর্শে যতটুকু উন্নতি, অবনতি হয় তা সবই মনের অবচেতন স্তরের প্রকৃতি। যেমন একই ছাঁচে সোনাও ঢালা যায় আবার কাদাও ঢালতে পারা যায়।

ব্যায়ামী ব্যায়াম করে ব্যায়ামাগারে; সত্যিকার কিসের আকর্ষণে, সে তা উপলব্ধি করতে পারে না। ব্যায়ামী ভাবে, ব্যায়াম করে শরীর ভাল করার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তাই এসেছি। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে কেন এমন অনেক ব্যায়ামব্রতী আছেন, যাঁরা আশানুরূপ উপকার না পেয়ে ব্যায়ামে ইস্তফা দেন বা একই সময়ে ব্যায়াম সুরু করে এক জনের দেহ, সুন্দর, সুশ্রী ও ঋজুময় হ'য়ে উঠল, আর অপর জন সে-ই থেকে গেল—এই রহস্য উদ্ঘাটনে কৌতূহলও আজ-কালকার ব্যায়ামীদের মধ্যে দেখা যায় না। আচ্ছা আপনার যে দুর্ব্বল দেহ-মন নিয়ে ব্যায়ামাগারে এলেন, দু-চার বছর বাদে কে আপনাকে এই সুন্দর, সুঠাম দেহ-লাভের অধিকার দিল? হয়ত বলবেন ব্যায়াম-শিক্ষক, বা একাগ্রতা অথবা আমার নিয়মানুবর্ত্তিতা। সবই স্বীকার করি, কিন্তু আপনার একাগ্রতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা কোথায় সীমাবদ্ধ ছিল? দেহ-মনে না ব্যায়ামাগারে? অনেকেই বলবেন, ব্যায়ামাগারে। কিন্তু আপনার নিয়মানুবর্ত্তিতা বা একাগ্রতার মাপকাঠি কি ঐ ক্ষুদ্র একটি কোণে? মোটেই তা নয়। সাধারণ ব্যায়ামাচারী বা কর্ম্মীর দৃষ্টি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর আস্থাস্থ হ'য়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন বলেই ব্যায়ামের আত্মদর্শন লাভে বঞ্চিত হন।

ব্যায়ামাগারে এসে এই দুর্ব্বল রুগ্ন দেহের রূপান্তর ঘটল কেমন করে? লোহায় গড়া নিরেট ডাম্বেল বারবেল,—এ সবের মধ্যে কি কিছু সজীবতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? যায় না, তথাপি এই বস্তুতে আমার মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম বলেই ত ঐ বস্তুর নিহিত শক্তির অণু-পরমাণু ক্রমে ক্রমে সজীব রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং আপনার এই পবিত্র সুষমাময় দেহ রূপান্তরের জন্য, এবার বলুন ত কে দায়ী? দায়ী বস্তু ও তার অন্তর্দর্শন এবং সেই কর্ম্মীকেই বলা হয় সিদ্ধ-কর্ম্মী, সিদ্ধ সাধক। এই সাধন-বলেই মানুষ অচেতন পদার্থে নিহিত শক্তির পরম বীজের দর্শন পায় এবং সেই বীজ দেহভূমিতে বপন করে সুফল লাভ করে।

তাই জগতের প্রতি কর্ম্মকেন্দ্রে নিজেকে নিঃসংশয়ে বিলিয়ে দেবার জন্যই প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন শরীর-বস্তুকে উপলব্ধি করা! শরীর-বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারলে তার উৎকর্ষের উপকরণাদির প্রতি দৃষ্টি আপনা হ'তেই পড়ে, সেই দৃষ্টিই [illegible] দর্শন।

ব্যায়ামীরা ব্যায়াম করে শরীরের উৎকর্ষতা হয়ত লাভ করেন, কিন্তু সেই উৎকর্ষতার মাঝে সবার অন্তরের কৃতজ্ঞতা থাকে না। তারা ভাবে না—আমার কর্ম্মে, আমার প্রবৃত্তিতে, আমার ধর্ম্মে [illegible] আমার ইচ্ছাশক্তিতে, তপঃশক্তি, ক্ষাত্রতেজ বিদ্যমান;—"লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবো না"—এই দৃঢ়তার অভাব তাদের মাঝে অনুভূত হয়। কর্ম্মে সিদ্ধকাম হ'বার পূর্ব্বে পরীক্ষামূলক ভাবে বিভ্রান্ত ভাবের সৃষ্টি [illegible]; সে ক্ষেত্রে যদি সাধক ভেবে নেয় যে, সে ভাবের বিগ্রহ, তবে চলার পথে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই মূল ভাবকে অন্তরের মধ্যে অনুস্যূত করে রাখাই হল প্রকৃত ভাবুকের লক্ষণ। [illegible] বদলে অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে এক সূত্রে বহুল ভাবনা-চিন্তাকে সংগ্রথিত করে রাখা হয়। পতঞ্জলি বলেছেন—"এক সময়ে চোভয়ানবধারণম্" মানে এক সময়ে দুটি জিনিষের ওপর [illegible] নিবেশ হয় না; তাই নিষেধ আছে যে, ব্যায়াম কালে মনের [illegible] অবস্থার যেন না প্রকাশ পায়। তাতে ব্যায়াম কালে যে [illegible] প্রয়োগ হয় শক্তি আহরণ করতে,—তার বহুলাংশ দেহ-[illegible] আঘাত হেনে ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটায় আর তারই ফলে এক দল ব্যায়ামীর, ব্যায়ামের পরে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়।

প্রকৃতির কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রকৃতি কবি মাত্রেরই আরাধ্যা ও তাহার প্রধান কারণ, সাধারণ কবি-বিশ্বাসে প্রকৃতি সৌন্দর্য মাধুর্যেরই প্রতিমূর্তি। এ-বিষয়ে যে-সকল কবির ব্যতিক্রম বা স্বাতন্ত্র্যের কথা আমরা উল্লেখ করি তাহা তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য যে তাঁহারা প্রকৃতির অবিমিশ্র সৌন্দর্যময়ী এবং মাধুর্যময়ী মূর্তি না দেখিয়া কখনও কখনও তাহার 'রক্তাক্ত দন্ত-নখর'কেও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পিছনেও রহিয়াছে একটি সাধারণ বিশ্বাস—সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যেও এই 'রক্তাক্ত-দন্ত-নখর'-বিশিষ্ট রূপবৈচিত্র্য প্রকৃতির সাময়িক মূর্তিভেদ মাত্র—যেন কল্যাণী স্নেহময়ী জননীর সাময়িক রোষকষায়িত মূর্তি। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যতত্ত্বের পিছনে অনেক কবির আর একটি গভীর বিশ্বাসও সক্রিয়, তাহা হইল এই, সৌন্দর্য আসলে আর কিছুই নয়, তাহা বস্তুদেহে অনন্তের আভাস। এই অনন্তের আভাস প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য রূপেই [illegible] গেল, মানুষের ভিতরে তাহা আসিয়া রূপান্তরিত হইল [illegible] সহিত প্রেমে। মানুষের সহিত প্রকৃতির যে যোগ [illegible] তাই শুধু সৌন্দর্যের সম্বন্ধে নয়,—যেহেতু সৌন্দর্যের পরিণতি [illegible]—সেই কারণেই প্রেমের পরিপুষ্টি আবার সৌন্দর্যে; মানুষের [illegible] লীলা-পরিপুষ্টি তাই আবার প্রকৃতির সৌন্দর্যর শত [illegible]। মানুষ তাই প্রকৃতিকে স্বীয় সৌন্দর্য মহিমায় [illegible] করিয়াও ছন্দে, রঙে, রেখায় বন্দনা করিয়াছে,—আবার [illegible] ক্ষণে তাহাকে তাহার প্রেমলীলায় সখিত্বের স্থান দিয়া [illegible] করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্যাকর্ষণ, [illegible] তাহার প্রেমাকর্ষণ; সকল কবির মধ্যেই—বিশেষ করিয়া [illegible]—প্রকৃতির এই সৌন্দর্যাকর্ষণ এবং প্রেমাকর্ষণের ভিতরে [illegible] একটা উদ্দামতা। কিন্তু কবি হিসাবে এ-ক্ষেত্রেও [illegible]নাথের সকলই তদ্‌-বিপরীত। তাহাও আবার যৌবনেই [illegible] বেশি। প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ যে আদৌ [illegible] তাহা নহে, কিন্তু যতখানি ছিল অচেতনে আকর্ষণ [illegible]খানি ছিল সংশয়ের সচেতন বিকর্ষণ। কবির এই [illegible] মাথা জুড়িয়া ছিল,—প্রকৃতির ভিতরে নিয়ম-বিধান [illegible] সৌন্দর্য বেশি নয়,—অনিয়ম-অবিচার, রূক্ষতা-নির্মমতা, [illegible]তাই তাহার আসল সত্য। বিধান, সুষমা, শোভা, [illegible] যেটুকু ভাণ রহিয়াছে তাহা শুধু 'টোপ' গিলাইয়া [illegible] পরাভূত করিবার জন্ম, সেখানে কবিমনের বিদ্রোহ [illegible] হইয়া ওঠে। একটি যুবক যদি একটি যুবতী নারীর [illegible] একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করে,—অথচ [illegible] সম্বন্ধে যদি তাহার মনের মধ্যে একটা অবিশ্বাস দানা [illegible] তখন সেই অজ্ঞাত আকর্ষণের ফল যেমন রূপান্তরিত [illegible] সচেতন বিদ্বেষে, কবি যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রকৃতি [illegible] সত্যই কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাই দেখি—

> নীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
> গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল!
> ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব কবি,
> সমস্তসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
> তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়;
> সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
> ... ...
> দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
> তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
> বজ্রে যে জনা মরে,
> নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ্‌, সে বংশে কে বা করে?
> ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
> মলয় ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে!
>
> (দুখবাদী, মরুশিখা)

এই দুনিয়ার পিছনে যদি কেহ মালিক থাকিয়া থাকেন তবে কবির মতে তিনি বিশ্বের লাভ-লোকসান-ব্যবসায়ে হাত দিয়া একা বসিয়া 'রাতের খাতায়' দুঃখের জের টানিতেছেন। সকল জমা-খরচের কৈফিয়ৎ লিখিয়াও অনেক 'ফাজিল' থাকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ অনেক কিছুরই কোনও কৈফিয়ৎ মিলিতেছে না। এই ভিতরকার ঘাটতি ও ক্ষতিপূরণ যত বেশি হইতেছে,—ততই বিজ্ঞাপনের চটক বাড়িতেছে—প্রকৃতি হইল সেই বিজ্ঞাপন। মানুষ যে চালাক হইয়া উঠিতেছে—যত বিজ্ঞাপনের চটক বাড়িতেছে ততই যে চিত্তের সংশয় আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কবি বলিতেছেন, প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনা না করিয়া 'খ্যাতি' বজায় থাকিতে থাকিতেই একদিন সুযোগ বুঝিয়া 'প্রলয়ের লাল বাতি' জ্বালিয়া দেওয়া ভাল। এই অন্ধ প্রকৃতি মানুষকে কোন্‌ সৌন্দর্যে ভুলাইবে, কোন্‌ জ্ঞানেই বা জ্ঞানী করিয়া তুলিবে?—

> মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
> সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ! (ঐ)

যুগে যুগে মানুষ এই প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে লাভ হইয়াছে কতটুকু? সত্যের সন্ধান কিছুই পাওয়া যায় নাই,—চাটুবাক্যের মিথ্যা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে রঙে রেখায় কথায় ছন্দে। মানুষ তাহাকে যত ভালোবাসি বলিয়া আদিখ্যেতা করিতেছে ছলনাময়ী তত দূরে সরিয়া ক্রূর হাসি হাসিতেছে।—

> দুরন্ত মন মানে না শাসন, দুঃশাসনের মত
> রহস্যময়ী প্রকৃতির ঐ বসন টানিতে রত।
> জানি জানি জানি, মানি মানি মানি,—পঞ্চপতির সতী
> অফুরান্‌ তব মায়া-আবরণে আবৃতা ভাগ্যবতী।
> যত টানি তার বাস,—
> জীবনাঙ্গনে পুঞ্জিয়া উঠে রঙা মিথ্যার রাশ।
>
> (ছুটি, মরুমায়া)

প্রকৃতির প্রতি এই সন্দেহ এবং বিদ্বেষ যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্য-জীবনের প্রথমার্ধে রীতিমতন চরমপন্থী করিয়া তুলিয়াছিল

মনে হয় তাঁহার নিজের অন্তরের মধ্যে একটা নিত্য জ্বালাকর ক্ষত কোথাও ছিল—মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই ক্ষতকে প্রকৃতির সর্বত্র সর্ব বিষয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রচলিত রোম্যাণ্টিকবাদ যেমন একদিকে প্রকৃতিকে সর্বাঙ্গ-মোহিনী এবং সর্বাংশে কল্যাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার অন্তহীন রহস্যে বিভোর থাকাটাকেই পরমা স্থিতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথ তেমনই স্থানে স্থানে তদ্বিপরীত আদর্শে প্রকৃতির যাহা কিছু সকল হইতেই সুন্দর, মধুর এবং কল্যাণের অস্বীকৃতিকেই শ্রেয় বলিয়া বড় গলায় প্রচার করিয়াছেন। ফলে রোম্যাণ্টিক ভাবালুতার মধ্যে যেমন একটা একতরফা নেশা থাকে, যতীন্দ্রনাথের রোম্যাণ্টিক-বিরোধী অন্তর্দ্বলনের মধ্যেও ঠিক অপর প্রান্তীয় একতরফা ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। মধুর পানীয়েই সর্বদা মাতাল করে না, অন্তর্দাহী আসবের মধ্যেও সেই মত্ততার সম-সম্ভাবনা থাকিতে পারে; যতীন্দ্রনাথের কবিতার স্থানে স্থানে তাহারই প্রমাণ রহিয়াছে। সেই জন্যই জগতের যেখানে যেটুকু কোমলতা যেটুকু মধুরের আবেশ রহিয়াছে তাহাকেও দগ্ধচিত্তে গভীরতর সত্য অন্তর্দাহ এবং ক্রন্দনেরই সমধিক প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এ যেন—

এমনি বন্ধু ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি।
(কবির কাব্য, মরুশিখা)

আমরা বহির্বিশ্বের যেদিকে যেদিকে তাকাইয়া প্রেম-সৌন্দর্যের কমনীয় লীলা দেখিতে পাই ইহার সকলের ভিতরেই চলিতেছে সেই পাঁচ ভোলে আসল সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা।

মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন,—বনে বনে শিখী নাচে;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখি জল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জ্বালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে।
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে,
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তব-গুঞ্জন তুলে।
মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি ধরিতে চায়। (ঐ)

বহু কবিতায় একই ছন্দে একই ঢঙে এই জাতীয় বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু প্রচলিত কবিধর্ম হইতে এই যে ধর্মান্তর তাহা শুধু একটা দাবদাহের একটানা ধুয়া রূপেই দেখা দেয় নাই,—এই বিপরীত কবিধর্ম নিজেকে বহু স্থানে প্রকাশ করিয়াছে আশ্চর্য বলিষ্ঠতায় এবং দুঃসাহসিকতায়। তাহার ফলে তাঁহার কবিতার মাঝে মাঝে প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যেই যাহা পাইয়াছি তাহা যথার্থই দুর্লভ বস্তু। প্রথাসিদ্ধ পথকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে কবি প্রকৃতির যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা বাংলো-সাহিত্যের সমতল-ভূমিতে প্রবাহিত একটানা ধারার মধ্যে একটি উপলব্যাহত উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই বর্ণনার সহিত তৎকালীন দুঃখজর্জর, ব্যাধি-ক্লিষ্ট, ক্ষুধাতুর এবং ক্ষতাতুর মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের একটা নিগূঢ় সংযোগ রহিয়াছে। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। সূর্যের বর্ণনায় এক স্থানে বলা হইয়াছে—

যত বেলা উঠে তপনের ফুটে বহিবন্তর দাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাহ।
দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি' মৃত্যু-শয়ন রক্ত বমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
(কবির কাব্য, মরুশিখা)

যে কবি আকাশের সূর্যের এই বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার মনে বাঙলা দেশের কাদামাটির জমিনের উপরকার আর একটি চিত্র নিশ্চয়ই লুকাইয়াছিল—তাহা হইল একটি প্রতিশ্রুতিবান্ পৌরুষ জীবন—দেহে তাহার ব্যাধির তাপ, অন্তরে দারিদ্র্য ও অপমানের জ্বালা; গৃহে তাহার প্রেমময়ী কমলিনী—সে তাহার অস্তিত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুর আশ্রয় এই জীবনটির প্রতি অপলক করুণ দৃষ্টি স্থির করিয়া আছে; ব্যর্থ হইয়া যায় জীবন—ছেঁড়া কাঁথায় রক্তবমন করিয়া সকল জ্বালার অবসান। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই—মৃত্যুর পরে জাগে স্তুতির কলগুঞ্জন—অবমাননার গায়ত্রী—অন্ধকারের স্তব্ধতা সেখানে একমাত্র সুহৃদ্। বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনসূর্যকে এমন করিয়া আকাশে তুলিয়া ধরিতে ইহার পূর্বে আর কখনও দেখি নাই।

ভক্ত-সাধিকা মীরাবাঈয়ের একটি ভজন শুনিয়াছিলাম,—সেখানে নিজেকে তিনি একটি বাঁশের বাঁশীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি গিরিধারীলালের নিকট বলিতেছেন,—"আমি বংশে ছিলাম (বংশরূপে ছিলাম, অপর দিকে বড় বংশের—বড় কুলের মেয়ে ছিলাম), সেখান হইতে উৎপাটিত করিয়া তুমি আমাকে আঘাতে আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, দুঃখের আগুনে ভিতরের (অন্তরের) যাহা কিছু সব পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়াছ; বেদনার সপ্তছিদ্রে জীবনকে নিজের মতন গড়িয়া লইয়াছ; কিন্তু হে গিরিধারীলাল—আজ সে সকল কথা সকল বেদনাই ভুলিয়া যাইতেছি—যখন দেখিতেছি, এ সবের দ্বারাই আমি লাভ করিয়াছি তোমার অধরস্পর্শ—আর সেই অধরের স্পর্শে—তুমি আমার ভিতরে সঞ্চারিত করিতেছ যে শ্বাস—আমার বেদনার সপ্তছিদ্র হইতে সে আজ সপ্তসুরে বাজিয়া উঠিতেছে।" ভক্তের দৃষ্টিতে, বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে দুঃখ-বেদনাময় বিপর্যস্ত জীবনের এ এক অপূর্ব বর্ণনা! রবীন্দ্রনাথও এই সুরে সুর মিশাইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনার আর সব আশটুকুই আছে,—কিন্তু সেই বিশ্বাসটুক নাই—তাহা হইলে কি রূপান্তর ঘটে তাহা দেখিতে পাইতেছি যতীন্দ্রনাথের এই কবিতায়। বিশ্বাস—সে ত বিশ্বাস মাত্রই—সে ত সত্যের সঙ্গে অভিন্ন নয়—এক রকম প্রবৃত্তিরই একটা রূপান্তর। সেই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করিয়া যে স্বপ্ন-সৌধ রচনা করিয়াছি সেখানে সেই হইতে বিশ্বাস সরিয়া গেলে সবই যে লণ্ডভণ্ড। তখন যাহাকে মনে করিয়াছিলাম শান্তিসৌধ তাহাই যে দেখা দেয় আত্ম-প্রবঞ্চনার স্তূপরূপে, সবই দেখা দেয় প্রকাণ্ড একটা ফাঁকি রূপে :—

বেণুকুঞ্জের বেণু,—
পেয়েছে রে আজ বংশীধারীর ফুল্ল অধর-রেণু।
ধ্বনির পীড়ন বাজে বেণু-হৃদে বিম্ব-ওষ্ঠ-পুটে,
বক্ষক্ষতের সাত মুখে তার সুরের রক্ত ওঠে!
অস্তশিখর ভেসে যায় সুরে, ছিটে লাগে নীলাকাশে
ফুটে' উঠে তারা; লুটে বনান্ত উহু উহু কুহুভাষে!

বেণুর বুকের আর্তধ্বনি চাপি চাঁপা-অঙ্গুলে,
বংশীধারীর বাঁশীর আলাপে বিশ্বের মন ভুলে।
(বীণা-বেণু, মরুশিখা)

মানুষের বুকের আর্তনাদকে চম্পকবর্ণের তত্ত্বে তত্ত্বে চাপা দিয়া বংশীধারীর ভুবনমোহন সুরের তারিফে দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে।

'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বরাবর তাকে ধ্বনিত করে তুলছে—কিন্তু তার নূতন শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেই রকম—তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই। ···আজ এই বোবা সন্ধ্যা প্রকৃতির এই যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনেছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।—ওই রকম খুব বড় করেই বলতে চায়, ওই রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়,—কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে।" শ্রাবণ-সন্ধ্যার সুর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার সুর। কবি যতীন্দ্রনাথের নিকট এই শ্রাবণ-সন্ধ্যার সুরটি কি সুর!—

আজি ওই ঝর ঝর চিরন্ত নির্ঝর,
দূর দুরান্তে ঝরে সঘনে;
অন্ধ অনন্তের ক্রন্দন ছন্দের
সান্ত্বনা গান ওঠে গগনে!
(শাওনরাতি, মরুমায়া)

শ্রাবণ-রাত্রের যে 'দেয়ার' গুরু-গুরু গর্জন তাহাকে কবিগুরু বাল্মীকি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু কবি বহু উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কবি যতীন্দ্রনাথের নিকট পাইলাম এমন একটি উপমা, যে জাতীয় উপমা অন্যত্র কোথাও দেখি নাই,—

কান পেতে শোনো দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জে শাবক-হারা বাঘিনী? (ঐ)

অন্ধকার রাত্রির আকাশের নিবিড় অরণ্যে কালো কালো মেঘগুলি যেন শাবক-হারা ক্ষিপ্তা বাঘিনীর ন্যায় গর্জন করিয়া ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! আর সেই মেঘের গায়ে ক্ষণে ক্ষণে জাগে যে বিদ্যুৎ-ঝলক তাহাও তাহার মনে জাগাইয়া তুলিতেছে কোনও প্রেমের কথা নয়, কোনও মালিকার কথা নয়, ক্রূর বক্র নাগিনীরই কথা!—

ও কোন্ বেদিনী মেয়ে অমন কাঁচুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী! (ঐ)

বর্ষশেষের শেষ রজনীর বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন,—
নিদারুণ দাহে জ্বলি' সারা দিন কালিয় নাগের কুটিল বিষে,
গভীর রাত্রে মৃত্যুর ঢুল ঢুলে চৈত্রের একত্রিশে।
(বৈশাখ, সায়ং)
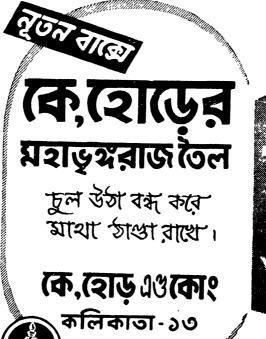
ভাদ্রের অন্ধকার সন্ধ্যাকে কবি 'ভাদ্রবধূ'র মতন কাঁদাইয়াছেন—'সারাদিন কেঁদে' ভাদ্রবধূর এখনও আনন ভার;'—ইহার ভিতরে তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই; কিন্তু বর্ষাশেষে শরতের সুনীল আকাশও কবির মনে কোনও আনন্দোচ্ছল হাসিমুখের—কোনও আশা-আনন্দের বার্তা বহন করিতে পারে নাই,—সেখানেও ঝড়-তুফান, জাহাজ-ডুবি,—সেখানেও সবই দীর্ণ, জীর্ণ, ছিন্ন, ভিন্ন!

কালনিশীথের গগনার্ণবে
তুফান উঠিল খুবই,
হ'য়ে গেল বুঝি বর্ষার শেষ—
মেঘের জাহাজ-ডুবি!
দীর্ণ তাহার পাঁজরার কুচো,
জীর্ণ টুকরো হাল,
সারা রজনীর বজ্রাক্ষত
ছিন্ন-ভিন্ন পাল।
(শরৎ আকাশে, মরুমায়া)

আমি পূর্বে বলিয়াছি, প্রকৃতির দিক হইতে অচেতন আকর্ষণ যতীন্দ্রনাথের মনে সচেতন বিকর্ষণ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আমার মনে হয়, আকর্ষণটা কাজ করিত তাঁহার কবিমনের উপর,—কিন্তু কবিমন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রকাশ লাভ করিতে পারিত না, হৃদয়বাক্যকে খানিকটা বুদ্ধিরাজ্যের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতে হইয়াছে,—বিকর্ষণের তীব্রতা তাপরূপে ক্ষরিত হইত তর্কবুদ্ধির তপ্ত কটাহ হইতে। তাই প্রথম হইতেই আমার একটা সন্দেহ, প্রকৃতির প্রতি যতীন্দ্রনাথের যে বিরূপতা এবং অবিশ্বাস তাহার উপরে কবির সচেতন মনের প্রভাব অনেকখানি। স্থানে স্থানে যতীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহা কবিচিত্তের একটা সচেতন প্রতিক্রিয়ার মতনই দেখা দিয়াছে। সৌন্দর্য্যবাদী এবং আশাবাদী রবীন্দ্রনাথই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া যতীন্দ্রনাথের এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে প্রকৃতি বিষয়ক রবীন্দ্রনাথেরই কতকগুলি কবিতার প্রতিক্রিয়ারূপে। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ বৈশাখ কবিতায় কবি বৈশাখের ধূলায় ধূসর রুক্ষ তপঃক্লিষ্ট একটি ভৈরব মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার রুদ্র তপস্যার খানিকটা বর্ণনা করিয়াই কবি বলিয়াছেন,—

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হ'য়ে, যাক্ চলি' গ্রাম হ'তে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

এই কবিতাকে স্মরণ করিয়া সমজাতীয় ছন্দে এবং ভাষায় যতীন্দ্রনাথ 'শীত' সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন,—

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি' শবাসন,
সাধিতেছ প্রলয়-সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী? (মরীচিকা)

কিন্তু এই রুদ্র সন্ন্যাসীর সে শব সাধনা তাহার শেষে কোনও শান্তিপাঠ নাই—এ তপস্যার পূর্ণাহুতি সর্বধ্বংসী লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখায়—

কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ—
যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সম্ভার,
হে মহাঋত্বিক্?
কবে তব একটি ফুৎকারে, এই ঘন ধূমপুঞ্জ ছেদি'
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্রভেদী?
দহনান্তে রবে প'ড়ে চির হাহাকার, করি' ভস্মসার
নিত্য নৈমিত্তিক!
কত দিনে যজ্ঞে তব দিবে পূর্ণাহুতি হে মহাঋত্বিক্! (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের শরৎ-বন্দনায় বলিয়াছেন,—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে;
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে!

তাহারই পাশে পাইতেছি যতীন্দ্রনাথের কবিতা—

আজ কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা-ডোবাতে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক আর,
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি
শরৎকালের প্রভাতে।

যতীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

পারে না বহিতে লোক জ্বরভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর,
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে। (শরৎ, মরুশিখা)

ইহাকে কি বলিব? রবীন্দ্রনাথের কবিতার লঘু 'প্যারডি'? অনেকে ঠিক সে কথাটিতে রাজি হইবেন না। তাঁহারা বলিবেন, আজন্ম ধনীর দুলাল শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশের মধ্যে অথবা শিলাইদহের বোটে বসিয়া যে বঙ্গের শরতের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের দেখা বা ভাব-কল্পনায় ধৃত বাঙলার শরতেরই রূপ। কিন্তু এদো পুকুর খানা-ডোবাতে ভরা দরিদ্রা, রোগক্লিষ্টা দুঃখিনী বাঙলার যে আর একটি বিধুর মূর্তি রহিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের চোখে বা কল্পনায় ধরা পড়ে নাই, সেই বাস্তব মূর্তি ধরা পড়িয়াছে বর্তমান বাঙলার সত্যকার শরৎ-কালীন পল্লীজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কবির চোখে। আমি ইহাকে বিশুদ্ধ 'প্যারডি'র লঘুতাও দান করিতে চাই না, বাস্তবধর্মিতার মর্যাদাও দান করিতে চাহি না, আমি ইহাকে বলিব কবিচিত্তের একটা সচেতন প্রতিক্রিয়া। ঠিক সেই এক

প্রতিক্রিয়া এই একই 'মরুশিখা' কবিতা-গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রসিদ্ধ গঙ্গা-স্তোত্র—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !
শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনী ধূসরতরঙ্গভঙ্গে।

প্রভৃতি পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যতীন্দ্রনাথের গঙ্গা-স্তোত্রে—

চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে !
কুলু-কুলু কল-কল প্রবাহিত আঁখিজল
দেব-মানবের একসঙ্গে !

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

নারদ-কীর্তন-পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মাকমণ্ডলু উচ্ছ্বসি ধূর্জটি জটিল জটাপর ঝরিয়া।
অম্বর হইতে সমশতধারে জ্যোতিঃপ্রপাততিমিরে,
নামিলে ধরায় হিমাচলমূলে, মিশিলে সাগরসঙ্গে !

যতীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ইহার সবই মিথ্যা, আসল সত্য হইল,—

বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ, আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বহি তাই শতধারা ধরণীতে ঝরিল।
হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী,
যুগে যুগে নরনারী -অফুরাণ- আঁখিবারি পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলার ভরাশ্রাবণের বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা-নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহার একটু পরেই এই ভরাশ্রাবণে গ্রামের নদীটির ভিতরে এক অজানা নেয়ে চেনা-অচেনার রহস্য গায়ে মাখিয়া ভরাপালের সোনার তরী ভাসাইয়া দূর হইতে গান গাহিতে গাহিতে আসিবে এবং সোনার ধান লইয়া চলিয়া যাইবে ; কবি যতীন্দ্রনাথও ঠিক এই ছন্দেই বাঙলার ভরা শ্রাবণের বর্ণনা করিয়াছেন ; সেই মেঘে ঢাকিয়া যাওয়া নির্জন গ্রামখানিতে কোনও অজানাদেশের গান-গাওয়া সোনার তরী ভাসিয়া আসে নাই,—নিঃস্ব বিধবা পাঁচীর একমাত্র ছেলে অনেকদিন ব্যাধিতে ভুগিয়া বহু অনাহার এবং কদাহারের পর আজ দুইটি ভাত-পথ্য করিবার ব্যবস্থায় ছিল,—সে এই ঘনবর্ষার মধ্যে ছাইকুড়ের ভিতর হইতে একটি মান খুঁড়িয়া আনিবার চেষ্টায় ছিল—সেখানে তাহাকে সাপে কাটিয়াছে ; সুতরাং

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপর্য্যরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ !
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ?

(দুঃখের পার, মরুমায়া)

পূর্বে বলিয়াছি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা সাধারণতঃ দুই রকমের হইতে পারে, হয় প্রকৃতিকে যতটা সম্ভব নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সেই মহিমাকে ব্যঞ্জিত করিয়া তোলা, নতুবা মানুষের জীবনের সঙ্গে তাহাকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া লইয়া জীবনের সত্যই তাহার ভিতরে প্রতিফলিত করিয়া তোলা। কবি যতীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনকে ভুলিয়া কোনও দিনই কিছু ভাবিতে পারেন নাই—আর এই সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই—তাহার দুঃখের জীবনকেই তিনি সব চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। প্রকৃতি মানুষের আরাধ্যা—প্রকৃতি মানুষকে শিক্ষা দিবে—এই সব অন্ধ স্তাবকতার কথা যতীন্দ্রনাথ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সে সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কি বা ?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রিদিবা।

(দুখবাদী, মরুশিখা)

প্রকৃতির মধ্যে যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে তবে তাহা হইল জীবন সংগ্রামে ছলে-বলে কৌশলে দুর্বলকে ছাপিয়া মারিয়া—সমূলে ধ্বংস করিয়া প্রবলের আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই প্রকৃতিকেই আমরা বলি পরম-সত্যের ছায়ামূর্তি ; দুর্বলের প্রতি নিরন্তর প্রবলের এই যে অত্যাচার ইহাই যদি ছায়ার মূল তাৎপর্য হয় তবে এই ছায়ার পিছনে যে পরম সত্যের কায়া রহিয়াছে তাহা ত আরও চমৎকার !

ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়াও চমৎকার ! (ঐ)

'বন্ধু'

শ্রীরণধীরকুমার দে

বন্ধু খুঁজিয়া ফিরি দেশে দেশে নিতি—
পাই না কাহারে আপনার মনোমত ;
আজিকে বন্ধু কালি দিয়ে যায় ক্ষত,
খল হৃদি সব ক্রূর তাহাদের রীতি।
বিদ্যাপুচ্ছ মুখে বড় বড় নীতি,
অমায়িক হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত ;

বন্ধু ভাবিয়া হরষিত যবে চিত—
বাক্য-বিষবাণ অন্তরে আনে ভীতি।
ভেবে মরি তাই বন্ধু কোথায় পাই—
স্বর্গ মর্ত অথবা সে রসাতল,
খুঁজে খুঁজে আমি জেনেছি আজিকে সার—
ত্রিভুবনে কারো বন্ধু কেহই নাই ;

আমি, তুমি, সে, এ তিন পুরুষই খল
স্বার্থপরতা ছাড়া নাই কিছু আর।

হাবিলদার স্বরূপ সিংকে ভুলিনি

ব্রায়েন হেমস্

হাবিলদার স্বরূপ সিংয়ের কথা আপনি শোনেননি, আর আমি বেশ জানি তার কথা আপনি পরে আর শুনতে পাবেনও না। দীর্ঘ ছ' বছর সে সেনা-বিভাগে ছিল কিন্তু তার ভাগ্যে কোন সম্মান-পদক জোটেনি। কেউ তাকে মনে করে রাখেনি, মনে করে রাখবার মত কোন বিশেষ সামরিক গুণও তার ছিল না।

হাবিলদারদের চির-পরিচিত তিনটি উল্কি কাঁধে নিয়ে সে গোড়াতেই আমার কাছে চাকরী করতে আসেনি। উনিশ শো তেতাল্লিশের প্রথম দিকে এক দিন সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্টের প্লেট হাতে যখন তাকে দেখলাম তখন তার জামার হাতায় মাত্র একটি উল্কির চিহ্নই বর্তমান এবং কি কারণে তা সে পেয়েছিল জানি না। খাকীর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ সার্ট পরনে নেহাৎ ভালমানুষটির মত চেহারা, উঁচু হয়ে দাঁড়ালে বড় জোর ফিট পাঁচেক হবে, নেহাতই অসামরিক চাহনা, বিরাট এক ভারী বুট পায়ে কোন ক্রমে যেন ঠেকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

আমার কোম্পানী কমাণ্ডার, পরের নিন্দা করাই যার ছিল একমাত্র স্বভাব, তাকেও কখনো স্বরূপ সিংয়ের বিরুদ্ধে একথা বলতে শুনিনি যে কোনও কারণে কখনো স্বরূপ সিংকে কেউ রাগতে দেখেছে।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, স্বরূপ সিংয়ের বাইশ ইঞ্চি বুকের ছাতিকে কেউ হিংসার চোখে দেখবে না, কিন্তু তার কঙ্কালসার চেহারায় একমাত্র বিশেষত্ব ছিল তার বিরাট মাথা আর সেই মাথায় ততোধিক বিরাট হেলমেট। আর একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি সেটা হল তার খাওয়া। তিন বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম কখনো তাকে এতটুকু কম খেতে দেখিনি। মাথাটির বর্ণনা কি ঠিক দিতে পারবো? ম্যাটিন গাছের গুঁড়ি থেকে যেন খুব যত্নে আস্তে আস্তে কেটে খুঁদে বার করা হয়েছে সেটিকে যেটি দেখলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি, মাইকেল এঞ্জেলো পুলকিত হতেন। আর তার হ্যাট! সেটিও অপূর্ব! চৌকো বড়-সড়, দেখলেই আপনার এডোয়ার্ডিয়ান যুগের ছবিতে দেখা কোন ভদ্রমহিলার টুপির কথা মনে পড়বে। মোট কথা, স্বরূপ সিংয়ের মত তার হ্যাটটিকেও কোন ক্রমেই সামরিক পর্য্যায়ভুক্ত বলা চলে না। তবুও নতুন অবস্থায় এই বিচিত্র হ্যাটটিকে আপনি কোন ক্রমে সহ্য করতে পারবেন কিন্তু দীর্ঘ তিন বছরের যাবতীয় ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে এর ওপর দিয়ে, ভারতবর্ষের অসহ্য রৌদ্রতাপ আর কালের অকালের বৃষ্টি, বার্মার জঙ্গলের যাবতীয় কিছু স্বরূপ সিং কাটিয়ে দিয়েছে এটি মাথায় দিয়ে এবং তার পর আমি যত বারই তাকে বলেছি নানা ভাবে টুপিটি পরিবর্তনের জন্যে নানা কায়দায় সব সময়ই সে তা' এড়িয়ে গেছে। অবশ্য এ কথাও আমার মনে হয়েছে যে, স্বরূপ সিংকে বাদ দিয়ে টুপিটি এবং টুপিটি বাদ দিয়ে স্বরূপ সিং দুটি দৃশ্যই বিসদৃশ। বড় জোর দু'বার কি তিন বার হবে আমি স্বরূপ সিংকে খালি মাথায় দেখেছি, তখন তাকে কেমন যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া মতনই মনে হয়েছে। এ থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, স্বরূপ আর তার হ্যাটটি একই সঙ্গে জন্মেছে আর পাশাপাশি বড় হয়েছে।

সামরিক বিভাগে স্বরূপের কাজ ছিল প্যারাসুট প্যাক করা। পাশে টুপিটি খুলে রেখে একটি তাঁবুর মধ্যে বসে একমনে সে নিজের কাজ করে যেত। এ অবস্থায় তাকে আমি কয়েক বার দেখেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়েছে Millais-এর পৃথিবী-খ্যাত ছবি 'স্যার ওয়ালটার র‍্যালের ছেলেবেলার' নাবিকটির কথা। তাকে এ অবস্থায় দেখলে আপনারও তাই মনে পড়বে। তাঁবুতে আমাকেই সঙ্কুচিত হয়ে ঢুকতে হত। অল্পবয়েসী কোন মেয়ে চান করছে এমনি অবস্থায় হঠাৎ যদি কেউ বাথরুমে ঢুকে পড়েন তাহলে সে যেমনি করে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে, আমাকে দেখে স্বরূপ সিংয়েরও সেই অবস্থা হোত এবং সেই অবস্থায় এমন অসহায় ভাবে সে তাকিয়ে থাকতো যা নেহাতই অসামরিক।

বিদ্যে-বুদ্ধি নেহাতই সামান্য, তবু স্বরূপই ছিল তার র‍্যাঙ্কের একমাত্র পড়িয়ে লোক। মনে পড়ছে এক সন্ধ্যার কথা। ইম্ফলের কাছে কোনও সামরিক এরোড্রাম জাপানীরা ঘিরে ফেলেছে। বাইরে তুমুল লড়াই চলছে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে দেখি স্বরূপ সিং একমনে একটি বই পড়ে চলেছে, লাল রেক্সিনে মোড়া বৃহদাকার লর্ড রবার্টের আত্ম-জীবনী, 'ভারতে একচল্লিশ বছর।' আমার ভারী মজা লাগলো ব্যাপারটায়। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সময় পেলেই স্বরূপ মোটা মোটা বইগুলিকে ব্যাগ থেকে বার করে আনে আর পড়ে। কথাটি শুনে ভারী ভাল লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভাইসরয়ের কমিশনের জন্য কেন আবেদন কর না তুমি স্বরূপ?'

কথাটা শুনে সে ঘাবড়ে গেল। সে ঘাবড়ানো যদি আপনি দেখতেন তো নিশ্চয়ই আপনার ভিক্টোরীয় যুগের কোন গৃহদাসীর কথা মনে পড়তো যে জন্ম থেকেই জেনে নিয়েছে তার প্রভুর বাড়ীতে কাজ করাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ডেমোক্রেসী তার ধারণার বাইরে, নিজের জীবন না যাওয়া অবধি প্রভুর বাড়ীর কুটোটিও সে সরাতে দেবে না। তার উন্নতির প্রয়োজন নেই, সে যা তাতেই সে সন্তুষ্ট। 'কিন্তু স্যর, আমি যে ম্যাট্রিক অবধিও 'পড়িনি।'—স্বরূপ সিং জবাব দিল এবং তার পরেই শুরু করল সেই সব পুরোনো কথা, বাড়ী থেকে অল্প বয়সে চলে আসার জন্য দুঃখ, লেখা-পড়া শিখে একটি অন্ধকার-প্রায় অফিসে অর্দ্ধশিক্ষিত কেরাণীর চাকরীর সখ যে তার নেই তা নয় তবে তা' হোল না বলে সে খুব দুঃখিতও নয়।

উনিশশো চুয়াল্লিশের গোড়ার দিকে জাপানীরা যখন আরাকান সীমান্ত পার হয়ে এলো তখন স্বভাবতঃই আমরা খুব ব্যস্ত আমাদের সৈন্যদের গড়পড়তা বয়েস ক্রমেই কমে যাচ্ছে। মা খুব ছেলেমানুষরাই এখন বেশী আসছে। এর মধ্যে স্বরূপের ম চৌত্রিশ বয়সের একজন বয়স্ক হাবিলদার পেয়ে আমার কাজের বিশেষ সুবিধাই হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তার ব্যবহার অপূর্ব! ম্যালেরিয়া তাকে কখনো কাবু করতে পারেনি, দিনের পর দিন সে প্যারেডে এসেছে, মাইলের পর মাইল পিঠে সব চেয়ে বেশী বোঝা নিয়ে সে পথ চলেছে। তিন মাস ধরে সে কী কষ্ট না গেছে! আমাদের সৈন্যসংখ্যা একশো পঁচিশ থেকে মাত্র বারো জনে গিয়ে ঠেকলো, অফিসার আট থেকে দুই। তবু যে আমার সৈন্যদের মধ্যে কোন রকম নৈরাশ্য আসেনি, বিদ্রোহ করবার ইচ্ছে আসেনি তার জন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য হাবিলদার

স্বরূপ সিংয়ের। জন্মদাতা পিতার মত তার স্নেহ সব সময়ই আগলে আগলে নিয়ে বেড়িয়েছে। সৈন্যদের যার বাড়ী থেকে চিঠি আসেনি এক মাস তার জন্য চিঠির তাগাদা পাঠিয়েছে কে? রোগশয্যায় মাথার কাছটিতে সাগুর মগ হাতে বসে কে? যুদ্ধক্ষেত্রে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বলতে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কে? স্বরূপ সিং। মৃত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি পাঠানো, সান্ত্বনা দিয়ে দিয়ে তার নিত্য কাজ। যাদের অক্ষর পরিচয় নেই তাদের চিঠি কে লিখে দেবে? কেন স্বরূপ সিং রয়েছে।

সব চেয়ে মজার ব্যাপারটির কথা এইবার বলি। একবার স্বরূপ সিং জাপানী গুপ্তচর বলে সীমান্তের কাছে ধরা পড়ল বৃটিশ মিলিটারী পুলিশের কাছে। সাধারণ কাপড়-চোপড়ে সীমান্ত বরাবর সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার অসামরিক চাহনী আর মজাদার কথাবার্তায় সন্দেহান্বিত হয়ে মিলিটারী পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্য খোঁজ-খবর করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

আরও একটা কথা মনে পড়ছে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। আমাদের পাশের বারুদের গুদাম-ঘরে হঠাৎ কি কারণে যেন আগুন লাগলো। বিরাট বিস্ফোরণ সঙ্গে সঙ্গে। জিনিসপত্র সব সরাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, আমার ককার স্প্যানিয়েলটি পালিয়েছে। তখন আর কোন কিছু করবার উপায় নেই। আমাদের সকলেরই যে যার প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত অবস্থা। ঠিক দু'দিন পরে যখন সব গোলমাল প্রায় মিটে এসেছে তখন দেখি, কুকুরটির গলার বকলেশ ধরে স্বরূপ সিং আমার তাঁবুতে এসে হাজির। এই দু'দিন সে কিছু খায়নি। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে কুকুর খুঁজেছে, চোখ অনিদ্রায় লাল, পেটে অন্ন নেই। এই-ই স্বরূপ সিংয়ের সত্যিকার পরিচয়। ভারতীয়রা সাধারণতঃ কুকুর পছন্দ করেন না। স্বরূপ সিংও তা' করে না। তবু ও-কুকুরটা যে আমার এটাই যথেষ্ট, আর এ জন্যই তার এই পরিশ্রম।

সামরিক আদব-কায়দা আমাকে আর স্বরূপ সিংকে অনেক তফাতে সরিয়ে রেখেছিল। কালো আর সাদা চামড়ায়, হিন্দু আর খৃষ্টানে অনেকখানি তফাৎ করা ছিল সেখানে। কিন্তু তবু আমি আরও বছরের পর বছর তোমার সঙ্গে কাজ করতে রাজী আছি স্বরূপ। কারণ, তুমি সত্যিই সৎলোক এবং সৎলোক বলতে যতখানি বোঝায় তুমি ততখানিই।

দীর্ঘ তিন বছর যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা দু'জনে কাজ করে গেছি। আমি জানি, এ কথা আমি বলছি শুনলে তুমি খুবই কষ্ট পাবে যে, আমি তোমার সঙ্গে সব সময় হয়তো ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারিনি। আমি হয়তো সত্যি পারিনি স্বরূপ, সত্যি পারিনি।

অনুবাদক—আশীষ বসু।

শ্রীমতী লিজেল্ রেম

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

পশ্চিমে দু'বছর

'খোকা'র সঙ্গে অবিশ্রাম কাজ করতে করতে দুটি বছর নিবেদিতাকে থাকতে হয়েছিল পশ্চিমে। জাহাজে উঠে নিবেদিতার মনে হল একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন যেন,— দারুণ একটা ব্যর্থতা চাপা ছিল সে-দুঃস্বপ্নের আড়ালে। সাগর পাড়ি দেওয়ার আঠারোটা দিনই ঐ ভাবে কাটল। জেনোয়ায় পৌঁছে নিবেদিতা আবার স্বস্থ হলেন।

ইউরোপে পা দিয়েই বুঝলেন, দেশের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেছে। বিলাস-ব্যসনের বে-দরদী আড়ম্বরেই মানুষের জীবন কাটছে, শুধু উত্তাল বর্তমানটার সম্বন্ধেই তারা সচেতন। 'কেন ফিরে এলাম?' নিজেকে শুধ'ন নিবেদিতা। উত্তর খুঁজে পান না।

সোজা লণ্ডনে চলে গেলেন। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েড তখন সেখানে আছেন। নিবেদিতার থাকবার ব্যবস্থা তাঁরাই করবেন। বসুদের আসবার কথা ক' সপ্তাহ পরে, তাঁরাও নিবেদিতার সঙ্গে থাকবেন। অবস্থা অনুকূল যখন, গুছিয়ে বসতে দেরি হবে না। নিবেদিতার ইচ্ছা, খাস লণ্ডনে ভারতের পক্ষ থেকে একটা সংবাদ সরবরাহ-কেন্দ্র খুলবেন।

এই উদ্দেশ্যে ক্লাপ-হ্যাম দমনে সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা সাজানো বাড়ি ভাড়া করলেন। মাত্র ক'দিন হল এস. কে. র‍্যাটক্লিফও ফিরেছেন, একেবারে কাছেই তাঁর বাসা। নিবেদিতাকে তিনি সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। র‍্যাটক্লিফের সাহায্যের দাম আছে, কেন না, ও-দেশের 'লিবারেল প্রেসের' সঙ্গে তাঁর খুব মাখামাখি।

শহরে গেলেই নিবেদিতা সেণ্ট জেমস কোর্ট, ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে এক বার নামতেন, মিসেস বুলের বিরাট বাড়িখানা ওখানেই। কখনও বা কোনও পুরনো আইরিশ বন্ধুর সঙ্গে কি প্রিন্স ক্রপট্কিনের সঙ্গে দু'-তিন দিন মফঃস্বলে কাটিয়ে আসতেন। কিন্তু এই শহর-পালানোর কথাটা কিছুতেই কারও কাছে ফাঁস করতেন না।

কলকাতায় লড়াই চালানোর পর লণ্ডনে এসে নিবেদিতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। ইংরেজের আশ্চর্য্য চরিত্র শত্রু হিসাবেও ইংরেজ মহৎ। নিবেদিতার স্পষ্টবাদিতা তারা পছন্দ করে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্নের ঝড় তুলে দেয়।

১৯০৭-৮ সনের শীতে লেডি স্যাণ্ডউইচের সেলুনের প্রধান আকর্ষণ হলেন নিবেদিতা। লণ্ডনের অভিজাত সমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে প... এক দিন তাঁর ... বাজারের বিস্তারি... কথা বললেন, ... কালতে একটা আবৃত্তি করেছিলেন। রাশিয়া... দূতাবাসে উড়িষ্যা ভ্রম... কথা বললেন যেদিন, সেদিন কি লোকের ভীড়! ডাচেস অব অ্যালবানি অপ্রত্যাশিত ভাবে এমনি একটা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। তার পর থেকে সম্পন্ন ইংরেজ-সমাজ নিবেদিতাকে আপন করে নিল। মেয়েরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলে, ঈর্ষা করে তাঁর অবাধ স্বাধীনতায়; তাঁর যুক্তির সশ্লেষ নৈপুণ্যে পুরুষের চিত্ত প্রসন্ন হয়, হাউস অব কমন্সের কার্য্যসূচিতে যখনই কোনও ভারতীয় সমস্যা থাকে, নিবেদিতার তখন অবারিত দ্বার। এক মুহূ... তাঁর অবসর নাই।

র‍্যাটক্লিফ আর 'এম্পায়ার' পত্রিকার কর্তার সহায়তায় নিবেদিতা আবার সাংবাদিকতার কাজে নামলেন। পরিষদের সাধারণ সম্মেলন থেকেই খবরাখবর যোগাড় করতেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোতে কলিকাতাবাসী বৃটেনের ভারতীয় নীতির ব্যাখ্যা পেত,—আর সম্পাদকীয়তে থাকত বাংলার সমস্যা। এই সঙ্গে 'বাংলার জীবনধারা' পর্য্যায়ে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য কতকগুলো প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাতে স্বাক্ষর ছিল 'নীলাম'। উইলফ্রেড সীওয়েন ব্লাণ্ট "মিশরের ঘটনাবলী" সদ্য ছেপে বার করেছেন, তিনি আন্দোলন তুললেন, ইংল্যাণ্ড ভারতীয় ব্যাপারে মাথা গলানো ছাড়ুক। এঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ভারত ছাড়বার অল্প ক'দিন আগে বৃটিশ লেবার পার্টির নেতা কেয়ার হার্ডির সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয়। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক নেতার কাছে পত্রাকারে হার্ডি যে-সব বিবৃতি পাঠাতেন, তাই নিয়ে রক্ষণশীল দলের কাগজে কাগজে তুমুল কোলাহল শুরু হয়। নিবেদিতা অপর পক্ষের হয়ে ব... বলবার দায় নিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রতি-আক্রমণের অপেক্ষায় রইলেন

কেয়ার হার্ডি লণ্ডনে ফিরে এলে কয়েক জন ভারতী... জাতীয়তাবাদীকে নিয়ে নিবেদিতা তাঁকে স্বাগত জানালেন। নিবেদিতার মত এই ভারতীয়রাও 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাস' বানিয়েছেন, পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য লণ্ডনেই একটা সমি... গড়েছেন ওঁরা। এ-ব্যবস্থার সত্যই তখন প্রয়োজন ছিল; কেন না কাগজে ভারত সম্বন্ধে ভয়াবহ সব সংবাদ বার হচ্ছিল। বাংলা... শহরে-শহরে খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বোমা ফাটানো, সেই সঙ্গে ব্যাপ... ধরপাকড় আর নির্বিচারে ফাঁসী দেওয়া চলেছে। ১৯০৮ সনে... জুলাইয়ে তিলককে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হল। ... কি যে হল, দু'মাস পরে কেউ আর খবর পেল না। ব্রহ্মদেশে কোনও দুর্গেই আটকে রাখা হল, না পাঠানো হল আন্দামানে?

এদিকে লণ্ডনবাসী ভারত-বন্ধুরা রুষ্ট হয়ে উঠলেন। হা... অব কমন্সে নানা গুজব রটতে লাগল; ক্যাক্সটন-হলে বসল প্রতি... সভা। নিরঙ্কুশ অত্যাচার যে জাতীয়তাবাদীদের পিষে মারবে এতে আর সন্দেহ নাই।

'নিউজ পেপার অ্যাক্টে' সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, এ খবর যখন এল, নিবেদিতা রাগে কাঁপতে লাগলেন। হাঁক দিলেন, 'ওরা বিদেশে চলে যাক।' এইবার নিবেদিতা বুঝতে পারলেন লণ্ডনে তাঁর কি কাজ। ইউরোপে, ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় যে-সব ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে তাঁকে। আর নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলি আবার গোপনে ছাপিয়ে বিতরণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। নানান ছুতা দেখাবার চেষ্টা করলেও তাঁর ভ্রমণ-সূচী দেখেই তাঁর আসল কাজের আভাস পাওয়া যায়। যেমন, ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বরে নববিবাহিত ভাইকে দেখতে নিবেদিতা আয়র্ল্যাণ্ডে গেলেন, আর ঠিক সেই সময়েই আইরিশ স্বাতন্ত্র্যবাদী সাংবাদিকরা ও ডালী সম্পাদকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রস্তাব আনলেন।

মিসেস বুলও বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে এ-যাত্রায় আয়র্ল্যাণ্ডে গিয়ে নিবেদিতার যেন নতুন করে চোখ খুলে গেল। পনর বছর পরে আবার জন্মভূমিতে এসেছেন। দেশের মাটিকে চুম্বন করে হাত বুলোন যে-মাটিতে, গাছপালাগুলোকে আদর করেন—সেই আইভি-লতা আর ঝোপঝাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে জমে রয়েছে রাতের কুয়াশা! বাত্যাজীর্ণ ধ্বংসস্তূপ আর সাগর-শীকরে নিবেদিতার মনে পড়ে ওদেশী কৃষকের জীবন-সংগ্রাম, চোখে পড়ে খৃষ্ট-পূর্ব এক আর্য-সংস্কৃতির নিদর্শন। মাঠে কর্মরত কৃষকের সঙ্গে কথা বলবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন, শোনেন আয়র্ল্যাণ্ডকে নিয়ে কী গর্ব তাদের, স্বাধীনতা লাভের কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা! তাদের তেজোদৃপ্ত কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে ভারতের জন্য চোখে জল আসে তাঁর। হায় রে! এদেশের তুলনায় ওদেশের প্রস্তুতি কতটুকু! তাঁর আক্ষেপ দেখে ভাইয়ের মনে যে ঈর্ষার একটা কাঁটা ফোটে। দিদির অন্তরে আয়র্ল্যাণ্ডের স্থান অধিকার করেছে ভারতবর্ষ!

আয়র্ল্যাণ্ড থেকে নিবেদিতা আমেরিকা চললেন। মিসেস বুল সুযোগ করে দিতে নিবেদিতা আর ইতস্ততঃ করলেন না, সত্বরে রওনা হলেন বন্ধুদের সঙ্গে।

আমেরিকায় গিয়ে শুধু সাংবাদিকের দায় নয়, মিসেস বুলের সাহায্যে যে সব হিন্দু ছেলে ওখানে পড়ছে, নিবেদিতাকে নিতে হল তাদের মায়ের স্থান। গত এক বছরে রাজনীতিক নির্বাসিতেরাও দলে জুটেছেন। জেল-ফেরৎ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের মধ্যে ছিলেন। ছাত্র, শিক্ষানবীশ শ্রমিক সবাই একটা-না-একটা কাজ শিখে নিচ্ছে। বরাদ্দ টাকা দু'দিনেই ফুঁকে দিয়ে এরা এখন নানান ভাবে অর্থ ও সাহায্যের প্রত্যাশী। ভিক্ষা করে জোগাড় করতে হবে অনেক কিছু। পলাতক রাজবন্দীদের আস্তানার জন্য ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে নিবেদিতার একটা বাড়ি কেনবার মতলব ছিল। যে তিন মাস কেমব্রিজে মিসেস বুলের বাড়িতে ছিলেন এই সব কাজেই তাঁর সারা ক্ষণ কাটত। ক্রিষ্টমাসে আবার তাঁর বন্ধুরা জড়ো হলেন ওখানে। নিবেদিতা তাঁদের বাইবেল পড়ে শোনালেন, 'ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুয়িজম' থেকে শোনালেন শিবের জন্মকাহিনী।

বাল্টিমোর বোষ্টন আর নিউইয়র্কে ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, টেলিগ্রাম এল ইংল্যাণ্ড থেকে। মুমূর্ষু মায়ের শয্যাপার্শ্বে ডাক পড়েছে। তখনই নিবেদিতা আমেরিকা ছাড়লেন।

হোয়ার্ফ ডেলে বার্লিতে বোনের বাড়ি। সময় থাকতেই নিবেদিতা পৌঁছলেন গিয়ে। রোগিণী তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলেন—জীবনদেবতার সান্নিধ্যে একটি হাসির আভা ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। জানতেন মেয়ে আসবেই। যাঁর পায়ে সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন, শেষ মুহূর্তে নিবেদিতাকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতেন না। কামনা-বাসনা সব বিসর্জন দিয়ে যেন রুদ্ধশ্বাসে নিস্পন্দ দেহে অপেক্ষায় ছিলেন মা···তাঁর মার্গারেট আসার আগেই পাছে এতটুকু বিক্ষোভ জীবনের দীপ নিবে যায়! মেয়ের করোষ্ণ স্পর্শ অনুভব করবেন মৃত্যুশীতল হাত দু'খানিতে, হৃদয়ে হৃদয় রেখে খুলে দেবেন অন্তরের দ্বার। দেখা হল। অমৃতের দূত তখন হংসশুভ্র পক্ষ বিস্তার করে ধীরে নেমে আসছেন।

'মা গো! তোমার চোখের আলোয় যে দেবতার হৃদয়কে দেখছি আজ!'

'আর তুই? তুই যে আমার কাছে তাঁর করুণার নিশ্চিত আশ্বাস।'

'অমৃতলোকে ভূমিষ্ঠ হতে চলেছ মা, মৃত্যু তো একটা নবজন্ম শুধু। আমার প্রার্থনা আর ভালবাসা তোমার সঙ্গী হ'ক সে-রহস্যলোকে।'

অমৃত প্রাণের প্রশান্ত অনুভবে ঘর যেন ভরে উঠল, মৃত্যুর বিভীষিকা কোথায় মিলিয়ে গেল। নিবেদিতা দেখছেন, গুরু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পথের দিশা দেখিয়ে দিচ্ছেন—আনন্দে তাঁর দু'চোখ বেয়ে ধারা নামল।

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে জীবনীশক্তি। বুঝতে পেরে মেরী নোবল দেবতার অন্তিম প্রসাদ চেয়ে পাঠালেন—মেয়েদের সঙ্গে একত্রে গ্রহণ করবেন 'ব্রেড অব লাইফ' আর 'ব্লাড অব রিডেম্পশান'।*

গ্রামের যাজক এসে সাদা চাদর বিছিয়ে পেয়ালা ভরলেন, ভাঙলেন রুটিখানা। অর্ঘ্য-নিবেদনের একটা আশ্চর্য আনন্দ অনুভব করলেন নিবেদিতা, অন্তরাত্মা যেন নিঃশেষে লুটিয়ে দিল আপনাকে। 'গুরু আমার, ঠাকুর আমার! আমার সব যেন তোমারই মন্ত্র হয়ে ওঠে···'

আগের রাত্রে এই যাজকের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করেছিলেন নিবেদিতা। তিনি যীশুর নামে তাঁকে বিশেষ করে আশীর্বাদ জানাতেই নিবেদিতা সে আশীষ মাথা পেতে নিলেন। †

* শেষ নৈশভোজনের সময় খৃষ্ট এক টুকরা রুটি ভেঙে শিষ্যদের দিয়ে বলেছিলেন, 'নাও, খাও, এই আমার দেহ', তেমনি একপাত্র মদ দিয়ে বলেছিলেন, 'এই আমার রক্ত'। ক্রিশ্চানেরা বিশ্বাস করেন, ও-রুটি আর মদ খেয়ে শিষ্যদের খৃষ্টের সঙ্গে একাত্মতা ঘটেছিল। এরই অনুকরণে ক্রিশ্চান-সমাজে যে সাযুজ্যের অনুষ্ঠান এখনও করা হয়, এখানে তার কথা বলা হচ্ছে।

† নিবেদিতা ক্রিশ্চানচার্চের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন কি না এ নিয়ে অনেক বারই কথা উঠেছে। ১৯১১ সনে স্বামী নির্মলানন্দকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'নিবেদিতার হিন্দুধর্ম গ্রহণ নিয়ে কিছু বলুন।' স্বামী নির্মলানন্দ বললেন, 'তার মানে? স্বামীজি তাঁকে আরও বড়দরের ক্রিশ্চান করে তুলেছিলেন। নিবেদিতা স্বধর্মনিরত থেকেই মহীয়সী। তাঁর মানবপ্রেম নিয়ে ভারতের সেবা করে গেছেন তিনি, এইমাত্র।'

একটা অন্তরস্পর্শী নীরবতা থম থম করে। তারই মধ্যে নিঃশব্দে মৃত্যু-লগ্নটি এগিয়ে এল। অন্তরের আলো দিয়ে মৃত্যুশায়িনী তাকে বরণ করে নিলেন। মহাঘুমে মা ঢলে পড়ছেন, নিবেদিতা জপ করে চলেন, 'ওঁ হরি ওম'। হঠাৎ অনুভব করলেন, মর্মের শেষ বন্ধনটি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। মায়ের মাটির খাঁচাটা সামনে পড়ে রয়েছে,—ভগ্নাবশেষ, শুধু একমুঠো ধুলো! মায়ের পরে শৈশবের যে-ভালবাসা লুকিয়ে ছিল বুকে, তা যেন নিঃশেষে ঝরে পড়ল, ঐ মৃতদেহকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরল। দূরে দাঁড়িয়ে যেন বহুক্ষণ সে-ভালবাসার পানে চেয়ে রইলেন। প্রার্থনার গুঞ্জন উঠছে বাতাসে। একটা গভীর সোয়াস্তি অনুভব করেন নিবেদিতা। এই বিদেহ মাতৃস্নেহ তাঁকে নিয়ত ঘিরে থাকবে। শ্মশানভস্ম হতে জেগে উঠছে অমর প্রাণ, প্রসারিত বাহু দিয়ে নিবেদিতা স্বাগত জানাল তাকে। 'হে শিব! 'হে প্রসন্ন, সঞ্জীবিত কর সার্থক কর এই পরম পাওয়াকে। মরণের মহাতীর্থে আচ্ছন্ন হয়ে এল আমার চেতনা…'

অতীতের স্মৃতি নিয়ে বাড়ির সব্বাইয়ের সঙ্গে কাটল কিছু দিন। বসুদের অপেক্ষায় ছিলেন, এপ্রিলে ওঁরা আমেরিকা হতে ফিরলেন। দু'জনেই অসুস্থ, নিবেদিতাকে তাঁদের দরকার। স্থির হল জুলাইয়ে ভারতে ফেরা হবে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিবেদিতা ভারতের কাজই করলেন। লণ্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা আর প্যারিসে এস, আর রানের অধিনায়কত্বে পলাতক রাজদ্রোহীরা একজোট হয়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় কয়েক মাস আগেই নানান শহরে হিন্দু জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো বেরুতে শুরু করেছিল, লণ্ডন ও প্যারিসে 'দি ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট,' বার্লিনে 'তলওয়ার', জেনেভায় 'বন্দে মাতরম্'! মিসেস কামা নামে একটি পার্সী মহিলাও প্যারিসে অনেক কাজ করেছিলেন।

জাহাজ ধরবার কয়েক সপ্তাহ আগে আচার্য্য বসু হ্বীসবাডেনের স্নানাগারগুলো দেখতে চললেন। কাজেই নিবেদিতা শেষবারের মত বার্লিন পর্যন্ত ঘুরে আসবার ছুতা পেয়ে গেলেন। জাহাজ ধরতে হবে মার্সাইয়ে। পথে যাত্রীরা জেনেভায় থামলেন। সেখানেই বন্দে মাতরমের অফিসে নিবেদিতা জানতে পারলেন, লণ্ডনে একজন হিন্দু কর্ণেল উইলি কার্জনকে হত্যা করেছে। আকাশ-বাতাস থম-থম করছে। বিপদের আশংকা সর্বত্র।

এই সঙ্কটের মধ্যে নিবেদিতা ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। কি আছে কপালে জানেন না; কিন্তু ভারতের পুণ্যভূমিতে পা দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। তারই তাগিদে উৎসর্গের বেদিমূলে নিবেদিতা এগিয়ে এলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শেষ সংগ্রাম

একটা ছদ্মনাম নিয়ে নিবেদিতা বোম্বাইয়ে নামলেন। ১৯০৯ সন, জুলাইয়ের মাঝামাঝি তখন।

প্রথম শ্রেণীর ডেকে দাঁড়িয়ে যে সুবেশা মহিলাটি জাহাজের বন্দরে ভিড়া দেখছিলেন, তাঁকে বোধ হয় কেউ-ই নিবেদিতা মনে করবে না। আনকোরা নতুন ফ্যাশানের বেশ-ভূষা, পালক লাগানো মস্ত সাদা হ্যাট আর নিখুঁত কাট-ছাঁটের গাউন পরে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তিনি জাহাজের সিঁড়িতে যাত্রীদের হুড়োহুড়ি দেখছেন।

বন্ধুরা লিখেছিলেন, 'পুলিশ কিন্তু তুমি এখানকার মাটিতে পা দিলেই তোমায় গ্রেপ্তার করবে।' কাজেই মিসেস মার্গট সতর্ক হয়ে এসেছেন। বম্বে থেকে কলকাতা পর্যন্ত এলেন রিজার্ভ কামরায়, তার মধ্যে কোনও ন্যাশনালিষ্টকে কেউ খুঁজতে আসবে না নিশ্চয়। সঙ্গে আবার ইংরেজ পর্যটকদের খিদমতগার এক বেয়ারা। কলকাতা পৌছবার আগে এক্সপ্রেস ছেড়ে নিবেদিতা একটা প্যাসেঞ্জার ধরলেন। তাঁর রাজধানীতে পৌছনটা একেবারেই কারও নজরে পড়ল না। বসু-দম্পতি অন্য পথে ভারতে আসছিলেন।

বাগবাজারেও নিবেদিতা তিন সপ্তাহেরও বেশি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পারলেন। স্কুলের সিষ্টারদের যাওয়া-আসার 'পরে যারা নজর রাখে সেই পুলিশও নিবেদিতা সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ দেখাল না। দেবমাতা নামে স্বামীজির একটি আমেরিকান শিষ্যা ক্রিষ্টিনের সাহায্য করতে এসেছিলেন। পুলিশ তাঁকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আপনি কি সিষ্টার নিবেদিতা?' 'না'। এ ছাড়া সিষ্টার বলতে এক ক্রিষ্টিন, কাজেই আর কোনও গোলমাল হল না। নিবেদিতার ফ্যাশান-দুরস্ত সাজ-পোষাকেই কারও মনে কোনও সন্দেহ জাগল না। তিনি নির্বিবাদে শহরে ঘোরাফেরা করে পুরাতন কর্মকেন্দ্রগুলির সঙ্গে আবার যোগ স্থাপন করলেন।

আলিপুর মামলার পর দু'মাস চলে গেছে। সমগ্র বিপ্লব-আন্দোলনটাকে এক ঘায়ে গুঁড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা ওটা। বিচার চলেছিল পাঁচ মাস ধরে। এই সময় সরকারের দমননীতির প্রকোপে সারা বাংলা ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

কত বাড়িতে খানাতল্লাসি হল, গ্রামের পর গ্রামে চলল পুলিশের হানা। পাল্টা জবাবে যেখানে-সেখানে বোমা ফাটতে লাগল। সারা বাংলা তেতে উঠল।

১৯০৮ সনের মে মাসে 'আলিপুর ষড়যন্ত্র' ধরা পড়ে। মুরারিপুকুর রোডে মাণিকতলার বাগান বারীন্দ্র ঘোষদের পারিবারিক সম্পত্তি। ওইখানে বিপ্লবী দলের টাকাকড়ি, বইপত্র, অস্ত্রশস্ত্র বোমা আর প্যারিস ও আমেরিকায় ছাপান বাণ্ডিল-বাণ্ডিল প্রচার পত্র পাওয়া গেল,—ওদের প্রধান ঘাঁটি ওটা। চৌদ্দ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। সরকার নানারকম সুলুক-সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল; তাই জালে মাছ উঠল অনেক। তারপর আরও ব্যাপক ভাবে খোঁজ-খবর শুরু হল।

তবুও এ-ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে সবশুদ্ধ গোটাকয়েক পাকা খবর মাত্র পাওয়া গেল। সশস্ত্র বিপ্লব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—বিহারের দেওঘর মজঃফরপুর পর্যন্ত। ১৯০৮-এর এপ্রিলে মজঃফরপুরে প্রধান বিচারপতির বাড়ির সামনে বোমা ফাটে—দুটি মেয়ে মারা পড়ে তাতে। যাঁরা ধরা পড়েছিলেন তাঁরা কেউ হাতে-কলমে কেউ-বা মনে-প্রাণে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত। তাঁদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হল এমন অবিচলিত চিত্তে তাঁরা তা সহ্য করলেন যে, ইংরেজ পক্ষ ভড়কে গেল। রাজবন্দীদের চিত্তের দৃঢ়তা নষ্ট করবার

জন্য কর্তৃপক্ষ সব রকম বুদ্ধি খেলিয়ে দেখলেন। কিন্তু ওঁরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। কেবল নরেন গোঁসাই নামে একটি ছেলে শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে বন্ধুদের ত্যাগ করল। গোপনে হাতিয়ার যোগানো হল,—কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বোস জেলের মধ্যেই গোঁসাইকে খুন করলেন।

বিপ্লবীদের একেবারে শেষ করে ফেলবার জন্য শত্রুপক্ষ বদ্ধপরিকর। তাদের হীনবল করবার জন্য অভিযুক্তেরাও সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন—আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ চাইলেন তাঁরা। এ অধিকার সরকার তাঁদের দিতে বাধ্য। ফলে বিচারের পালা চলল দীর্ঘ দিন ধ'রে, প্রায়ই সমস্ত কাণ্ডটার খেই হারিয়ে যেতে লাগল—কেন না, প্রমাণ-পত্র সব পরস্পর-বিরুদ্ধ। ১৯০৮ থেকে ১৯০৯ সনের শীতকালের মধ্যে শুনানী হয় ত্রিশ দফা।

নিবেদিতা এসে শুনলেন, তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু বারীনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। বিচারকেরা তাঁকে ষড়যন্ত্রের অন্যতম কর্তা ঠাউরেছিলেন। জেলায় জেলায় মুক্তির বাণী প্রচার করে উৎসাহী ছেলেদের নিয়ে তিনিই একটা তরুণবাহিনী গড়ে তুলেছেন। তারা দেশপ্রেম নিয়মানুবর্ত্তিতা আর আত্মবিলোপের মন্ত্রে দীক্ষিত, জীবন দিতে প্রস্তুত। যুগান্তর ও অন্যান্য গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা আর দেশময় অস্ত্র সরবরাহ করবার অপরাধগুলো আনুষঙ্গিক, কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য তাঁর স্বেচ্ছাদত্ত স্বীকারোক্তি। নিজের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক প্রমাণ দাখিল করলেন নিজেই। বললেন ষড়যন্ত্রের উদ্দীপনা পরিকল্পনা এবং পরিচালনা সব-কিছুর মূলে তিনিই। বারীন্দ্র ঘোষ ইংলণ্ডে জন্মেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ নাগরিক হিসাবে তাঁর বিচার হবে, এ প্রস্তাব তিনি বীরের মত প্রত্যাখ্যান করেন। এক বৎসর পরে বারীন্দ্র ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড হয়। চৌদ্দ বৎসর আন্দামানে থাকবার পর বারীন্দ্র ছাড়া পান।

বিচারাধীন চৌত্রিশ জনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পনের জনের কঠিন শাস্তি হল। এক বৎসর কারাবাস করে অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া পেলেন। 'বন্দে মাতরমে'র প্রাক্তন সম্পাদকের পক্ষ সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ তিনি সুকৌশলে ফরিয়াদী পক্ষের ছিদ্রগুলি উদ্‌ঘাটিত করলেন এবং আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির অসঙ্গতি দেখিয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি উপস্থাপিত করলেন।

এমন সময় নিবেদিতা ফিরে এলেন। তাঁর অধিকাংশ বন্ধুরা উধাও হয়েছেন। তিলক * বিহারী দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং আরও অনেকে দ্বীপান্তরিত হয়ে জেলে বা কোনও দুর্গে রাজদণ্ড ভোগ করছেন। কয়েক জন লুকিয়েছেন ঘন অরণ্যে, তাড়া খেয়ে দূর হতে দূরান্তরে চলে যাচ্ছেন। নেতাদের অভাবে সমস্তটা আন্দোলন ঝিমিয়ে আসছে বুঝতে পেরে নিবেদিতার চোখে জল আসে।

পলাতক রাজবন্দীদের আশ্রয় দিচ্ছে এই সন্দেহে বেলুড় মঠকেও সরকারী হুমকি সইতে হল। দেবব্রত বোস আর শচীন্দ্রনাথ ছিলেন দুই নামজাদা বিপ্লবী, ওঁদের মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। গুজব রটল, আলিপুর মামলার পর ওঁরা মঠের ব্রহ্মচারী হয়েছেন। সরকার পক্ষ তেতে উঠে প্রায় 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে মঠের সীমানা ঘিরে পুলিশ-বাহিনী মোতায়েন করলেন। ১৯১২ সন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা কায়েম ছিল।

অবস্থা সত্যিই সঙ্কুল হয়ে উঠেছিল। যে সব বিপ্লবীরা ধরা পড়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই পরনে যে গেরুয়া ছিল এটা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই সন্ন্যাসীদের সংশয়ের চোখে দেখা হত। তাছাড়া এটাও জানা কথা যে, সাধারণে এই বিদ্রোহীদের আত্মত্যাগটাকে সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগের সন্ধান বলেই মনে করত, পরিব্রাজকের পরিচ্ছদে সাজিয়ে সরকারের অনধিগম্য দেবদেউলে বা মঠে মন্দিরে তাদের রেখে দিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দু'-দুবার মঠের ছেলেদের ও তাঁর প্রতিষ্ঠানটির সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে হয়েছে। মঠে যারা নবাগত তাদের দায়িত্ব যে কত গুরুতর, সে সম্বন্ধে একা তিনিই সচেতন ছিলেন। পুলিশের হুমকিতে কান দিলেন না তিনি, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য মঠের নিয়ম-কানুন আরও কড়া করলেন। কোন বাইরের লোকের মঠে প্রবেশাধিকার রইল না। সেবাব্রত ছাড়া সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সব রকম বাইরের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। নিবেদিতা ফিরে এসেছেন এ খবর রটতেই ব্রহ্মানন্দ কলকাতার দৈনিকগুলোতে কর্মজীবনে নিবেদিতার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আবার একটা বিবৃতি দিলেন।

নিবেদিতা এসে দেখলেন, অরবিন্দ একেবারে বদলে গেছেন। শীর্ণ মুখের মধ্যে অন্তর্ভেদী চোখ দুটি শুধু জ্বল-জ্বল করছে। যেদিন তিনি ছাড়া পেলেন স্কুলটিকে পত্রে পুষ্পে সাজিয়ে সেদিনটি নিবেদিতা পুণ্যতিথি হিসাবে পালন করলেন।

কারাগারে একটা দিব্যদর্শনের পর অরবিন্দ যেন অপ্রধৃষ্য শক্তির অধিকারী হয়েছেন মনে হল। বিচারাধীন অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখতেন না, সর্বত্র দেখতেন সেই সচ্চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ পুরুষোত্তমকে—তিনিই কারাধ্যক্ষ, তিনিই বিচারক, আবার তিনিই কয়েদী!

তাঁর এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন,—'...গোলমাল আর হট্টগোলের মধ্যেও বিবিক্ত ও নিস্তব্ধ থেকে যোগের অনুশীলন করা অভ্যাস করেছিলাম এই সময়।...এর আগে কিংবা এর পরেও আমার সাধনা পুঁথির নির্দেশে চলেনি, তার ভিত্তি ছিল অন্তরের স্বত-উৎসারিত অনুভব। জেলে গীতা ও উপনিষদ কাছে ছিল, আমি গীতোক্ত যোগাভ্যাস আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম। কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হলে সমাধানের জন্য কখনও কখনও গীতার আশ্রয় নিতাম—প্রায়ই তার থেকে সাহায্য বা জবাব পেয়ে যেতাম...জেলে নির্জন ধ্যানের মধ্যে অবিশ্রাম বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনেছি এবং তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেছি—এক পক্ষকাল আমার সঙ্গে কথা কয়েছিলেন তিনি।'*

---

* মহারাষ্ট্র পত্রিকার সম্পাদক প্রতি সপ্তাহে তিলককে দেখতে জেলে যেতেন। তাঁর মধ্যস্থতায় বন্দী তিলকের সঙ্গে নিবেদিতা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

* ১৯৪৬ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর পবিত্রকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের চিঠি—'নিবেদিতা'র প্রথম ফরাসী সংস্করণ সম্পর্কে। চিঠিখানি ১৯৪৮ সনে 'শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (পৃঃ ৪৪)।

কারামুক্ত অরবিন্দ এসে দেখলেন তাঁর অনুবর্তীরা সবাই নিরুদ্যম, দলে ভাঙন ধরেছে। নিবেদিতা প্রমুখ জন কয়েক সহচর নিয়ে আবার দেশকে ডাক দিলেন অরবিন্দ···ঝিমিয়ে-পড়া সমাজের বুকে আবার দেশহিতৈষণার আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চাইলেন। এবার তাঁর সাধনা হল কর্মযোগীর।

ইংরেজীতে 'কর্মযোগিন' আর বাংলায় 'ধর্ম' নামে দুটি পত্রিকা বার করেছিলেন এই সময়। দুটি পত্রিকারই আদর্শ মহান, কিন্তু সুর বেশ চড়া। ১৯০৯ সনের ১৯শে জুন 'কর্মযোগিন' প্রকাশিত হয়। প্রথম ওতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য এই ভাবে ঘোষণা করা হয়—'দেশের জীবনস্রোত একদিন বিপুল খাতে একই লক্ষ্যে প্রবাহিত হত। দীর্ঘদিন হল সে-স্রোত সহস্র সঙ্কীর্ণ এবং অগভীর ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দুটি প্রধান ধারা আজ ধর্ম আর রাজনীতির খাতে বইছে বটে, কিন্তু তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন আজও···জাতীয় শক্তির উৎস অনেক। অতীতেরই হক আর বর্তমানেরই হক, আমরা তার সবগুলি নিয়েই আলোচনা করব,—তাদের সর্বজনবোধ্য করবার চেষ্টা করব, জীবনে তাদের নামিয়ে আনব। নিষ্ক্রিয় নয়, শক্তির সক্রিয় রূপ দেখতে চাই, শুধুই তাকে আগলে রাখা নয়, চাই তার উচ্ছলন···'

স্বদেশী আন্দোলনের অর্থ রাজনীতি ঘটিত আলোচনা বাংলায় জাতীয়তাবাদীদের নতুন সংগঠন, বিরোধী দলের কার্য্যকলাপ আর দেশান্তরী 'ন্যাশনালিষ্ট' এবং 'নির্বাসিত'দের খবরাখবর থাকত কর্মযোগিনে। নিবেদিতার প্রবন্ধগুলো সহজেই চেনা যেত। সেই সঙ্গে থাকত অরবিন্দের অধ্যাত্ম উপদেশাবলী। ইতিমধ্যেই তিনি ঋষি শ্রীঅরবিন্দরূপে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু তখনও তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, ভাবী শিষ্যদের কাছে গুরুরূপে প্রতিভাত হননি তখনও। নিবেদিতার কাছে তিনি নবজীবনের মূর্ত প্রতীক, ভারতের পুরাতন মাটিতে উদ্ভিন্ন নবযুগের অঙ্কুর। তাঁর গুরু দেশকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন শ্রীঅরবিন্দ তারই যুক্তিসিদ্ধ ফলশ্রুতি। বিবেকানন্দের সাধন-সংবেগ খরস্রোত হল তাঁর জীবনে। অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবতার মত পূজা করতেন, বলতেন, 'লোকে তাঁকে পাগল বলবে। অশিক্ষিত আপাতদৃষ্টি অসভ্য বর্বর একটা লোক, পরান্নে জীবন ধারণ করে যে বেঁচে থাকত, তাকে কি না ঈশ্বর পাঠালেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে—প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের জন্য! যারা শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটমণি, পাশ্চাত্যের সব কিছু আত্মসাৎ করেছে তারা এই বৈরাগীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল! মুক্তির অভিযান শুরু হল সেদিন থেকে, সূচনা হল ভারত উদ্ধারের···' * 'কাজ শেষ হওয়া দূরে থাক এখনও কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। বিবেকানন্দ যে-দায় মাথায় নিয়ে কাজে নেমেছিলেন যা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আজও, তা বাস্তবে রূপ ধরেনি···'†

ধ্যানে যে-দেবাদেশ পেয়েছিলেন, যে-সম্পদ অর্জন করেছিলেন, স্পষ্টভাষায় অথচ যুক্তির ভিত্তিতে অরবিন্দ তা সবার সামনে তুলে ধরলেন। দুটি যুগের সন্ধি হল সে-অনুভূতির মাধ্যমে। এর প্রয়োজন ছিল।

অরবিন্দ বললেন, "এই সময় ঈশ্বরের দিকে মন ফিরল যখন, তখন তাঁর 'পরে আমার বিশ্বাস ছিল না বললেই চলে···কারাগারে নিঃসঙ্গতায় তাঁকে বললাম, 'জানি না কি আমায় করতে হবে, কেমন করেই বা করতে হবে। আমায় আদেশ কর তুমি···' এল তাঁর বাণী, 'এ দেশকে তুলে ধরতে হবে, সেই কাজে সাহায্য করবার ভার দিয়েছি তোমায়···আমার বাণী প্রচার করবে বলে এ দেশকে বড় করে তুলছি আমি। শক্তি সঞ্চার করেছি জনগণের অন্তরে। দীর্ঘকাল ধরে এ অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি রচেছি আমি। এবার সময় হয়েছে। আমিই পূর্ণতার পথে পরিচালিত করব এ-দেশকে···" (উত্তরপাড়ার ভাষণ)

এ-অভ্যুত্থানের প্রথম পর্বে এল স্বামীজির বজ্রনির্ঘোষ—'হে ভারত, ওঠ, জাগ!' নিবেদিতার মনে হত এখনও সে-কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন যেন। এই সঞ্জীবন আহ্বান আবারও ধ্বনিত হল, তবে ভিন্ন ভাবে। পরিস্থিতি বদলে গেছে, তাই সাধনারও বদল হয়েছে। কিন্তু তার প্রভাব এখনও সেই একই। এবার নতুন দাবি তাঁর। দেশের প্রতিটি মানুষকে সাধক হতে হবে, যিনি জীবে-জীবে অধিষ্ঠিত হয়ে 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব' সেই অদ্বিতীয় গূঢ় পুরুষকে প্রকাশিত করতে হবে এই আধারে, অমূর্তকে মূর্ত করতে হবে সমষ্টি-চেতনায়।

অরবিন্দ তখন তাঁর পূর্ণযোগ ব্যাখ্যার ভিত্তি গড়ছেন, মানুষের অন্তর্গূঢ় বিশ্বরূপকে ফুটিয়ে তুলছেন। এই সময় তাঁর নজর পড়ল ট্রান্সভালে। আর একটি তরুণ সেখানে শত শত ভারতবাসীকে নিয়ে অহিংস অসহযোগের মহড়া দিচ্ছেন। তিনি গান্ধী। সমষ্টি চেতনার জাগরণের একটা সূচনা ধীরে ধীরে এখানে-ওখানে দেখা দিচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ কি এমনি কোনও একটা আন্দোলনের পুরোধা হবেন? না, তাঁর কাজ স্বতন্ত্র? নিবেদিতা তাঁকে চিনেছিলেন। প্রাচীন আচার্য্যদের উত্তরপুরুষ তিনি। যোগচেতনার গঙ্গোত্রী হতে চিৎশক্তির মুক্তধারাকে বইয়ে দেবেন তিনি সবার জন্য। আলিপুরের কারাকাল হতেই অরবিন্দ আর ক্ষাত্রবীর নন, তিনি যোগী।

কর্মযোগিন্ উনচল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত বার হয়। উনচল্লিশের সংখ্যা ছাপাখানা থেকে বেরুতেই খবর এল আবার ধর-পাকড় শুরু হয়েছে, পত্রিকা চালানো মুশকিল হবে। অরবিন্দের ধরণ ধারণে সরকার পক্ষ বিশেষ অসন্তুষ্ট। কলেজ স্ট্রীটে সুকুমার মিত্রের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ তখন কিছুদিনের মত আস্তানা নিয়েছেন। সেখানে তাঁর অনুগত দেশভক্তেরা জমায়েত হতেন, তাঁদের উপরেও সরকার খুব খুশী নন। নিবেদিতা প্রায়ই যেতেন ওখানে, নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলত। অরবিন্দ তাঁর উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষার কথা বলতেন, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে শুনতেন সবাই।

যোগীনমার বাগানে একদিন নিবেদিতাকে এসে জানালেন, সরকার অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসনে পাঠাবার মতলব করছেন। একজনের মারফৎ আর একজনকে খবর দেওয়া-নেওয়া চলার এমনি ব্যবস্থা ছিল। নিবেদিতা তখনই অরবিন্দকে খবর দিলেন। নিবেদিতা কখন কি ভাবে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে-কাহিনীর রকমফের আছে। আমরা নিবেদিতার নিজের মুখে বলা ঘটনাটাই দিলাম। সরকারের আশংকা দূর করবার জন্য

---

* শ্রীঅরবিন্দের ভাষণ হতে পৃঃ ১৮।

† কর্মযোগিন ১৯০৯

অরবিন্দ কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ এমন কতকগুলো কারণ ঘটল যে, অরবিন্দের স্থানত্যাগ করা দরকার হয়ে পড়ল। দেবতার আদেশে তিনি চলে গেলেন, সে-আদেশ অমান্য করা তাঁর সাধ্য ছিল না।

যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি করে অরবিন্দ নিবেদিতাকে 'কর্মযোগিন' সম্পাদনা করতে অনুরোধ জানিয়ে যান। সত্যিই অরবিন্দ চলে গেছেন জানতে পেরে নিবেদিতা বহুক্ষণ নিজের মধ্যে তলিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের সামনেই স্বদেশী-আন্দোলন দিন দিন মন্দা হয়ে আসছে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে তাঁকে। অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটল, আবারও তাঁকে আরেক জনের আরব্ধ কাজ শেষ করতে হবে। একই ধরণের কাজ, তেমনি করেই শক্তি খাটাতে হবে। তবে এবারকার কাজের মেয়াদ কম। গুরুর স্বপ্ন ছিল ভারতের মুক্তি, ওই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান দায়। দশটি বছর ধরে যে মহাভারতের পত্তন হচ্ছিল নিবেদিতার কাছে এই তার শেষ পর্ব। যা হওয়ার হয়ে গেল। 'হরি ওঁ তৎসৎ'···নিবেদিতা তো যন্ত্র মাত্র। কিন্তু বিকালে গণেন মহারাজের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে চোখে জল এল তাঁর। গঙ্গার বুকে হাজারো তারার ঝিকিমিকি যেন অগণিত আশার আলো। নিবেদিতা বেশ বুঝলেন আজ যে-পরাজয়ের গ্লানি সইতে হল তাঁকে, একদিন—হয়তো কুড়ি বছরের মধ্যেই সেই আপাতদৃষ্ট ব্যর্থতা হতেই দেখা দেবে জয়শ্রী।

'কর্মযোগিনে'র শেষ সংখ্যাগুলো বেরুল সম্পূর্ণ নিবেদিতার নিজের দায়িত্বে। স্বামীজির ভাষণ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হত। তার মধ্যে নিবেদিতা নিজের লেখা প্রবন্ধ অরবিন্দ ঘোষের নাম দিয়ে জুড়ে দিতেন। 'কর্মযোগীর আদর্শ' প্রবন্ধটার শেষ দু' অধ্যায়ও তাঁর লেখা—যোগী অরবিন্দের ভাবধারার যথাযথ সঙ্কলন ওতে। অথচ কেউ সন্দেহমাত্র করেনি। ১৯১০ সনের ১২ই মার্চ কর্মযোগিনের ছাব্বিশের সংখ্যায় নিবেদিতা তাঁর 'মর্মবাণী' প্রকাশ করেন। প্রার্থনাকারে লেখা এই নিবন্ধটি আসলে নিবেদিতার চরম পত্র—রাজনৈতিক জীবন পরিহারের সংকল্প। একদিন তাঁর চেলাদের জন্য স্বাধীন ভারতের পতাকার নক্‌সা এঁকেছিলেন—লাল জমির উপর ক্রসের আকারে সাজানো সোনালী দুটি বজ্র। সেই সময় এই চরম পত্রটি লেখা—

'আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড এবং অবিনশ্বর। এক আবাস এক আকৃতি আর এক সম্প্রীতি হতেই জাতীয় ঐক্যের উদ্ভব হয়।'

'বেদ-উপনিষদের মন্ত্রবাণীতে যে শক্তির লীলা, বিশ্বের ধর্মে ও রাষ্ট্রে যাঁর খেলা, বিদ্বানের বিদ্যায় এবং ঋষির ধ্যানে যাঁর প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি, সেই শক্তিই আজ আমাদের বুকে জেগে উঠেছেন। তাঁর নাম আজ "জাতীয়তা"।'

'আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান ভারতের মূল রয়েছে প্রাচীন ভারতের গভীরে, সম্মুখে তার গৌরবোজ্জ্বল ভাবী কাল।'

'হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে-মূর্তিতে ইচ্ছা দেখা দাও! আমায় তোমার করে নাও!'

—নিবেদিতা।

নিবেদিতা শক্ত হাতে হাল ধরলেও অরবিন্দ ঘোষের অনুপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করে সবাই, গুজব রটে, তিনি রাজবন্দী হয়েছেন, কিংবা বিদেশে গেছেন সাহায্যের সন্ধানে। সঙ্গীদের ফেলে গেছেন, কত বদলিয়েছেন বলে তাঁকে দুষতে লাগল কেউ কেউ। কর্মযোগিনের শেষ সংখ্যার ঠিক আগের সংখ্যাটিতে এই চমক-লাগানো ঘোষণাটি বার করলেন নিবেদিতা:—

'শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কলকাতা হতে অন্তর্ধান করেছেন এবং তিব্বতের সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গে তাঁর মোলাকাত চলছে—স্থানীয় প্রেস হতে এ খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। আমরা নিজেরাই এই রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে অজ্ঞ। বস্তুতঃ, শ্রীঅরবিন্দ আমাদেরই মাঝে আছেন। কুথুমী বা অন্য কোনও মহর্ষির সঙ্গে তিনি যদি সূক্ষ্মলোকের কোনও কারবার ফেঁদেই থাকেন, সে-খবর তাঁর অন্যান্য কোষের জানবার কথা নয়। তবে সাধনার জন্য কিছু দিন তিনি নির্বিঘ্নে এবং নিভৃতে থাকতে চান, আর এই জন্যই তাঁর ঠিকানা এখন গোপন রাখা হবে। আমাদের জনৈক সহযোগী অপরিসীম কল্পনা বলে যে অদ্ভুত গুজবটি রটিয়েছেন তার ভিত্তি শুধু এইটুকু। আর এই একই কারণে তিনি আর সাংবাদিকের কর্তব্যে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। "ধর্ম" পত্রিকাটির ভার অন্য লোকের হাতে দেওয়া হয়েছে···'

২রা এপ্রিল কর্মযোগিনের আর একটা সংখ্যা বার হল। এক সপ্তাহ পরে নিবেদিতা খবর পেলেন অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। জন কয়েক অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর অন্য পথে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলেছেন। পরদিন নিবেদিতা স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে দেশনেতার আসল ঠিকানাটা ইংরেজী কাগজওয়ালাদের জানিয়ে দিলেন।

নিবেদিতার কাজ শেষ। নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা দায় পুরোপুরি তিনি পালন করেছেন। কিন্তু আচমকা কে যেন তাঁর কর্মশক্তি কেড়ে নিল! হঠাৎ এত দুর্বল বোধ করতে লাগলেন যে, নিজে থেকে কিছু ভাববার ক্ষমতা আর তাঁর রইল না। মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়লেন নিবেদিতা, যে-বোঝা তাঁর কাঁধে মা চাপিয়েছিলেন তাঁর পায়েই সে-বোঝা নামিয়ে রাখলেন এত দিনে।

অধ্যাত্মশক্তির সহায়ে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলবার বিরাট ব্রত নিয়ে অরবিন্দ চলে গেলেন। নিবেদিতা পড়ে রইলেন একা। গুরু বলেছিলেন, 'মার্গট, "চরৈবেতি"···সব সময় মনে রেখ। এক দিন পরা শান্তি আর মুক্তির অধিকারী হবে তুমি···আর ভারতের সাধনা হবে জয়যুক্ত···'

গুরুর 'পরে সব ফেলে দিয়ে একা বসে রইলেন নিবেদিতা।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

ঋগ্বেদের দেব-দেবী

মৈত্রেয়ী দেবী

"আর্য"

"আর্য" নামটির মধ্যে একদা আমাদের পূর্ব-পুরুষরা তাঁদের কীর্ত্তি ও মহিমার দ্বারা এমন গৌরবযুক্ত করেছেন যে, আজ বহু সহস্র বৎসর পার হয়েও মানুষের কাছে তার ক্ষয় হয়নি। আত্মগৌরব সকলেই করে থাকে, মনের স্বভাবের এ একটি সাধারণ ধর্ম। 'অহং' কোথাও স্বীয় জীবদেহকে কেন্দ্র করে, কোথাও বা জাতি ও গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আপন গৌরব প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু সে অহংকার স্থায়ী হবার নয়, যদি না তার মূলে কোনো সত্য থাকে। এক সময়ে "আর্য" কথাটি যে গৌরব অর্জন করেছিল মানুষ তা আজও ভুলতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের মহিমার উচ্চ শিখরে উঠেও দুর্দ্ধর্ষ হিটলার সেই মহিমার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। এবং পরাজিত লাঞ্ছিত দরিদ্র ভারতবর্ষ সর্বস্ব হারিয়েও সেই গর্বটুকু আঁকড়ে ধরে ছিল। কবি তাই পরিহাস করে লিখেছেন, 'ঘরেতে বসে গর্ব কর পূর্ব-পুরুষের আর্য-তেজ দর্প ভরে পৃথ্বী থর থর।' "আর্য" যেন শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। অথচ এই "আর্য" শব্দটির সে রকম একটা গৌরবান্বিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নেই। "অর্য" বা "আর্য" অর্থ কৃষি-ব্যবসায়ী। অর্থাৎ সামান্য চাষা। "ঋ" ধাতুর অর্থ চাষ করা। কৃষিরত প্রাচীন এই নরগোষ্ঠী নিজেদের আর্য বলতেন। তাঁরা যজ্ঞ করতেন। নানা অনুষ্ঠানে পূর্ণ এই যজ্ঞ তাঁদের জীবন ও কর্মের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল, এবং যজ্ঞ-বিরত অন্যান্য জাতিদের তাই "অনার্য" বা দস্যু বলতেন।

ভাষাতত্ত্ব ও নানা প্রমাণ থেকে পণ্ডিতরা মনে করেন, প্রাচীন কালে যে জাতি আর্য বা কৃষক নাম ধারণ করেছিলেন, তাঁরা নানা দেশে গিয়ে গ্রীক ল্যাটিন, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পৃথক হয়ে যান। কেউ কেউ মনে করেন, আর্য জাতির যে এক শাখা তুরাণীয় নামে খ্যাত, তাঁরা মেষপালক যাযাবর ছিলেন। এবং এক জায়গায় কৃষিকার্যে আবদ্ধ হয়ে না থেকে, তৃণভূমির সন্ধানে নূতন নূতন দেশে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। ত্বরিত গতির গৌরবেই হয়ত তাঁদের তুরাণীয় নাম হয়ে থাকবে।

আর্য জাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে অতি দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়লেন 'কিন্তু যেখানেই তাঁরা যান, আর্য নামের পরিচয় ছাড়লেন না। ইরাণ আর্মেনিয়া ককেশাসের আইরণ, গ্রীসের উত্তরে আরিয় জার্মাণদের মধ্যে আরিয়াই এবং আয়রল্যাণ্ড প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আর্য নামের স্মরণ-চিহ্ন আছে। ভারতবর্ষে ইন্দোএরিয়ান বা হিন্দু আর্য ও এই জাতির একটি প্রধান শাখা। হিন্দু আর্যের প্রাধান্য এই কারণে বলা যায়, কারণ তাঁদের বা আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ "বেদ" এই আদিম আর্য-জীবনের সব চেয়ে পুরাতন কাহিনীর ইতিহাস। ইরাণীয়দের ধর্মগ্রন্থ "আভেস্তা"ও বেদের মতই আর্যদের আদিমতম বৃত্তান্ত। উপরোক্ত নামগুলি থেকে বোঝা যায়, ঐ জাতি এত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বার পূর্বেই এত গৌরব অর্জন করেছিল যে, এই জাতিপ্রীতি জীবনের অতি গভীর সত্যরূপে তাঁরা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যতই ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ঘটুক, স্থান-কালের পরিবর্তনে আচার-ব্যবহার সংস্কার ও মতের বিরাট পার্থক্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র ও আকৃতির, মানব-সমাজ সৃষ্ট হোক, তবু আর্যগৌরব তাঁরা ভুলতে পারেন নি। আজ-কালকার দেশপ্রেম বা জাতীয়তা যেমন একটি ভূখণ্ডকে আশ্রয় করে প্রবল হয়ে ওঠে, আর্য জাতির মূল ভাবটি তার চেয়েও গভীর। দেশ-ধর্ম আচার-ব্যবহার সব যখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তখনও আর্য তার বিগত ইতিহাসের স্মরণ-চিহ্ন গৌরবে ধারণ করেছে। 'আর্যত্ব' তাই কোনো জাতি-বিশেষের সংস্কার-ধর্ম বা নৃতত্ত্বের একটি বিশেষ প্রমাণের উপর বসে নেই।

আসলে মনুষ্যত্বের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রতীকরূপে ঐ জাতির বংশধর এবং অতিমাত্রায় বর্ণসঙ্কর বংশধরের মনে "আর্য" নামটি একটি স্থায়ী আসন নিয়েছিল।

যে কর্মকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করেছেন, সেই কর্মে সমানধর্মা সকলেই "আর্য" ও অন্যরা "অনার্য" এই সরল অর্থ ভারতবর্ষের ধর্ম-শাস্ত্রে পরিষ্কার করে বার বার বলা হয়েছে। এবং সকল কর্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম হচ্ছে যজ্ঞ। যে সমস্ত দেব-দেবীদের উদ্দেশে এই প্রাচীন আর্য জাতি যজ্ঞ করতেন, তাঁদের সম্বন্ধে নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে যে যে দেবতার স্তব করা হয়েছে, একে একে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি। এই দেবতারা অনেকেই প্রাচীন আর্য জাতিরও উপাস্য ছিলেন, অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বে বা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বার পূর্বেই আর্যদের দেবতা হয়েছিলেন। ইরাণীয় আর্যদের শাস্ত্রগ্রন্থেও তাই তাদের উল্লেখ ও স্তব পাওয়া যায়। আদিম ইরাণীয়দের পূজ্য দেবতা ভারতীয়দের মতই সূর্য চন্দ্র অগ্নি ইত্যাদি।

ঋগ্‌বেদের কবিতাগুলির এক একটিকে এক একটি ঋক্ বলা হয়। ঋক্ শব্দের একটি অর্থ—স্তুতি। এই ঋক্‌গুলি স্তবগান। প্রকৃতির যা কিছু বিস্ময়কর, যা কিছু সুন্দর সে সমস্তই দেবমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে সেই সরল অনুসন্ধানী মানব জাতির শিশু-মনে দেখা দিত, তাঁরা স্তব করতেন। ভারতবর্ষে পৌঁছবার পূর্বে আদিম আর্য জাতি তাঁদের উপাস্যকে দেব বা অসুর, এই দুই নামেই স্তব করতেন, "হে বরুণ, তোমায় নমস্কার করি। তোমার ক্রোধ দূর হউক। হে অসুর, হে প্রচেতঃ, হে রাজন্, আমাদের এই যজ্ঞে বাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।"

—(অনুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্ত)

পণ্ডিতদের অনুমান, আদিম আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বে কোনও কারণে বিবাদ করায় দুটি দলের সৃষ্টি হয়। বিবাদের কারণ সম্বন্ধেও অনুমান এই যে, "সোম" নামে এক উদ্ভিদের রস আর্যদের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। এই পাতার রস যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত। এক দল এই রস মাদক অবস্থায় পান করার পক্ষপাতী ও অন্য দল তাজা ব্যবহার করতে চান। খুব সম্ভব এই কারণেই বিবাদ বাধে ও দুটি দলের সৃষ্টি হয়। এই বিবাদের ফলে মাদক-সোমপায়ীরা বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। দুই দলের এই বিবাদ ও যুদ্ধই দেবাসুরের যুদ্ধ। এবং চিরদিনের সমস্ত যুদ্ধের মতো এ-ও মতামতের যুদ্ধ। অতএব এক দল অন্য দলের উপাস্য শক্তিরও নিন্দা করতে লাগলেন। যদিও উভয়

দলই অগ্নি বরুণ মিত্র যম প্রভৃতিরই স্তব করতেন, তবু ইরাণীয় 'অহুর' অর্থাৎ 'অসুর' ভারতবর্ষীয়ের কাছে নিন্দনীয় ও ভারতবর্ষের 'দেব' ইরাণীয় আর্যদের কাছে শত্রু ও পাপমতি। "দেব" ও "অসুর" এই সাধারণ নাম দুটিই পরস্পরের কাছে নিন্দিত হত, কিন্তু অগ্নি বরুণ বা মিত্র নয়। অগ্নিই 'অতর' নামে ইরাণীয় আর্যের কাছেও 'অগ্নি' রূপে ভারতবর্ষে পূজিত হলেন। অগ্নি সূর্য বায়ু বৃত্রঘ্ন সোম মিত্র বরুণ উভয় আর্য শাখারই পূজ্য। কোনও এক সময়ে যে অসুর নামটি নিন্দনীয় ছিল না, তার প্রমাণ ঋগ্বেদেই আছে, সেখানে কোনও কোনও স্থলে আরাধ্য দেবকে অসুর বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু ইরাণীয় আর্য শাখার কাছে 'দেব' সর্বদাই শত্রু ও পাপমতি (evil spirit)—"হে জরাথস্ত্র! যখন তুমি একত্রে পলায়নপর পৌত্তলিক ও তস্কর দেবগণকে আক্রমণ করিবে তখন সেই উচ্চার্য শব্দ উচ্চারণ করিও —দেবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, দেব-উপাসকগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।" (আবেস্থা)

আদিম আর্যদের কাছে "অসুর" কথাটি পরম শক্তিবাচক ও দেব কথাটি বিশ্বের নানা শক্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত দেবতারূপে ব্যবহৃত হত। ক্রমে জরাথস্ত্র অসুর কথাটি জগতের প্রভু ও ঈশ্বরের নামে ব্যবহার করেন। জগতে দুইটি শক্তির লীলা—একটি সৎ, অন্যটি অসৎ—ভাল ও মন্দ, পুণ্য ও পাপ—এই দুই-এর সংঘাতে আমরা দেখতে পাই, সেই বিরোধই দেবাসুরের বিরোধ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আর্যদের এক শাখা "দেব" শব্দটিকে সৎ ও মঙ্গলের প্রতীক-রূপে ও "অসুর"কে তৎ বিপরীত ভাবে মনে করেন, ও অন্য শাখাটি আবার "দেব"কেই নিন্দনীয় ও আহুর আজদা অর্থাৎ (wise Lord) জ্ঞানী প্রভু ভাবে বিশ্বদেবের আরাধনা করেন। এ ঘটনা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।

এই সব নানা ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেন যে, এক দল যাযাবর আর্য শাখা, যারা যজ্ঞে পশুবলি দিত এবং মাদক-সোমপায়ী ছিল তারাই দেবপূজারী এবং তারাই বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল। দেব ও অসুরের নিত্য দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের এই ভিতরের রহস্য। এই সোমই অমৃত, যাতে অসুরেরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। সোমের স্তবগানে ঋগ্বেদ পূর্ণ হয়ে আছে। ইরাণীয় শাস্ত্রে এই সোমকে বলেছে "হওমা"।

দেবাসুরের বিরোধের কারণ ও ফলাফল যাই হোক, দেবপূজক যে আর্যজাতির পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তাঁরা কোনো ক্রমেই যাযাবর পশুপালক বা কৃষক মাত্র ছিলেন না। তাঁরা রথারূঢ় হয়ে যুদ্ধ করতে যেতেন, সে রথ কারুকার্য খচিত স্বর্ণমণ্ডিত ও বিচিত্ররূপে সুশোভিত থাকত। তাঁরা বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশে যাত্রা করতেন, সমুদ্রযাত্রায় ভীত ছিলেন না। কেনা-বেচায় মুদ্রার প্রচলন ছিল। রাজারা আমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষিত গজবাহিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। সুবর্ণ তনুত্রাণ যোদ্ধার বক্ষলগ্ন থাকত। লৌহনির্মিত নগর ও প্রস্তর-নির্মিত সুরক্ষিত নগর তৈরী হয়েছিল। শত স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা ছিল। তাঁদের এই সমস্ত সাংসারিক পরিচয় ও আশা-আকাঙ্খার সংবাদ সবই ঋকগুলির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এবং তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেই অতি প্রাচীন কালেই একটি সঙ্ঘবদ্ধ উন্নত ও কর্মময় সমাজ-জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঋগ্বেদের সময় নিয়ে এখানে আলোচনা করা চলবে না। কারণ, সে সম্বন্ধে মতভেদের ও তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই, তবুও নিতান্ত কম পক্ষে ছয় হাজার বছর ধরা যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখনকার মানব-চিত্ত অনেক অংশেই আজকের চেয়ে পৃথক ছিল না। তাঁদের বিবাদ বিরোধ ঈর্ষা দ্বেষ সপত্নী-নির্যাতন পাশা-খেলার নেশা সবই ছিল। তবু যেন অনেকটা বৃহৎ অংশ মর্ত্যের আবহাওয়া ছাড়িয়ে উর্দ্ধমুখী হয়েছিল। অধিকাংশ ঋকগুলি মনে করায় যেন সেই সরল চিত্ত দীর্ঘদেহ অসুর বলশালী ঋষিরা আকাশে তাঁদের নীল চক্ষুর জিজ্ঞাসা উত্থিত করে খুঁজে ফিরতেন বিশ্বের রহস্য। এই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডিত নীলাকাশ, এই মরুৎ-ব্যোমের লীলা, এই বজ্র-বিদ্যুতের শক্তিরূপ তাঁদের কাছে পরম বিস্ময়ের আধার ছিল। "ঐ যে ঋক্ষগণ যাহারা উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয় দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়—"?

—(অনুবাদ, রমেশ দত্ত)

উপরে উদ্ধৃত ঋকটির মধ্যে একটি অতি পুরাতন তথ্য আছে। অনেকেই নিশ্চয় নক্ষত্রখচিত মহাশূন্যে এই পরম জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত সপ্তর্ষিদের দেখে মনে করেছেন, এদের Great Bear বলে কেন? ভল্লুকের সঙ্গে সাদৃশ্য কোথায়? পণ্ডিতেরা মনে করেন, ঋক্ষ শব্দের দুটি অর্থ, ভল্লুক ও নক্ষত্র। তার মধ্যে ভল্লুক অর্থই ইউরোপে প্রচলিত হয়ে ঋক্ষ থেকেই গ্রীক আর্কটস্ (Arktos) ও ল্যাটিন উর্সা (Ursa) হয়েছে। ভারতের উত্তরাংশ থেকে অর্থাৎ আর্যদের প্রথম বাসভূমি থেকে, উজ্জ্বল সপ্তর্ষি নক্ষত্র খুবই প্রকাশিত ও স্পষ্ট ছিল এবং তিন চার হাজার বছর আগে সপ্তর্ষি ধ্রুবতারার আরো নিকটে ছিল; তাই তাদের অস্তগমন হয়ত লক্ষ্য হত না। সেই জন্যই এই বিশেষ প্রশ্ন "দিবাযোগে উহারা কোথায় চলিয়া যায়?" তাই পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলার মনে করেন, এই কারণে ঋক্ষ অর্থে বিশেষ ভাবে সপ্তর্ষিদের উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমে লোকে ঋক্ষ শব্দের নক্ষত্র অর্থটি ভুলে গেল ও যে সপ্তর্ষিকে ঋক্ষ বলত, তাকে ভল্লুক বলল। একটি অর্থের গোলমালেই—তাই সপ্তর্ষি ভল্লুকে পরিণত হয়েছেন।

[ক্রমশঃ।
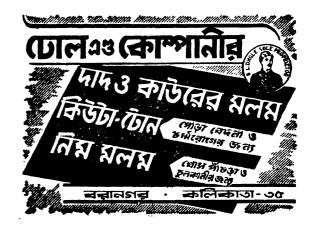
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেবেশ দাশ

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা হচ্ছিল।

বাঙ্গালী যখনি বাংলা দেশের বাইরে গিয়েছে বাংলার নিজস্ব শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। নতুন দেশের মানুষকে বন্ধু করে নিয়েছে, তাদের শুনিয়েছে নতুন কথা, দেখিয়েছে নতুনের স্বপ্ন। এ দেশে সবার আগে পশ্চিমের আলো পাওয়ার ফলে যে সুবিধা বাঙ্গালী পেয়েছে, তা নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে একা ভোগ করে নি, একা তার মজাটুকু লুটে নেয়নি। মনের সম্পদে সে মনোপলি বসায় নি।

মেধাবী বন্ধুরা এই প্রবাসী বাঙ্গালীর অনেক ভাল গুণের কথা বলছিলেন। নিজের দেশের লোকের গুণকীর্তন কার না শুনতে ভাল লাগে? বিশেষ করে এমন দূর মরুভূমির দেশে যেখানে বাঙ্গালী প্রায় নেই বললেই চলে। সেই কাজে কোন্ কালে বাংলা দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাঙ্গালীর নিজের সম্বন্ধে সচেতন ভাবকে পেরিয়ে এসেছি। নতুন ভারতের পটভূমিকায় নিজেকে আগে বাঙ্গালী না আগে ভারতীয়, কি মনে করা ঠিক হবে তা মনে মনে যাচাই করে দেখি। এমন একটা সময়ে রাজপুত নতুন বন্ধুরা আমায় ভাল করেই বাঙ্গালীত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুললেন। ভিতরে ভিতরে বুকের ছাতি কয়েক ইঞ্চি যেন বেড়ে গেল।

আপনারও নিশ্চয়ই যাচ্ছে।

কারুই বা না যেত? যাদের এত ছিল তাদের প্রত্যেকেরই এ রকম হবার কথা।

উদয়পুরের এক নামকরা বাঙ্গালী-বাড়ীতে বিয়ে। বন্ধুদের মনে হল, আমায় আজ সন্ধ্যায় তারা সেই অপরিচিত হলেও বাঙ্গালী, বিয়েবাড়ীতে নেমন্তন্ন ছাড়াই নিয়ে গেলে সন্ধ্যাটা সব চেয়ে ভাল কাটবে। চেনা না হয় না-ই আছে। ওঁরা তাতে কোন বাধা খুঁজে পেলেন না। আমিও পেলাম না। প্রবাসে নিয়মও যেমন নেই, এটিকেটের বালাইও তেমনি নেই। রাজস্থানে এসে বড় হয়েছেন বহু বাঙ্গালী, কিন্তু তাঁদের মধ্যে উদয়পুরের শ্রদ্ধেয় চ্যাটার্জি মশায়ের কথা লোকে খুব বেশী জানে না। বিশেষতঃ বাংলা দেশে। তারই একটা গল্প এঁরা বললেন। শুধু গল্প নয়, 'ফেবল' অর্থাৎ নীতিকথার গল্প। আমরা এ কালে রোদে গলে গিয়ে, বাদলায় ছাতা মেরে, শীতে জবুথবু হয়ে যাবার ভয়ে বাংলা দেশের বাইরে কোথাও একটি পা-ও নড়তে [illegible] আবহাওয়ার মধ্যে ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করে চিড়ের মত চ্যাপ্টা হয়েই থাকব। তবু বেপরোয়া হয়ে ঘরের বাইরে পা ফেলতে ভরসা পাই না বরাতের সঙ্গে খালি হাতে লড়ে যাবার মত বুকের পাটা নেই আর। ভুলে গেছি যে, এই মাত্র বছর পঞ্চাশ আগেও আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার দল সারা দেশ চষে বেড়িয়েছেন। নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিয়েছেন। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন নি, সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। সেই বাঙ্গালীর গল্প, সে ত শুধু গল্প নয়, সে হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের বচন। সুবচন।

চ্যাটার্জি মশায় ত এলেন উদয়পুরে রাজ-সরকারে বড় কাজ নিয়ে। সে কাজটি তিনি পেয়েছিলেন বাঙ্গালীর বিদ্যা আর বুদ্ধির জোরে। কিন্তু বাঙ্গালীর আয়েসী স্বভাব যাবে কোথায়? মহারাণা ফতে সিংহ যে সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়সেও সেই মরু-দেশের গরমে দুপুরে রোদ্দুর মাথায় নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে রোজ বুনো শুয়োর আর পাগলা হাতী শিকারে বেরোন, সে ব্যাপারটা চ্যাটার্জি মশায় ভাল করে তলিয়ে দেখলেন না। গরমের দিনে মাত্র একটু আরামে কাজ করবার জন্য অফিস-কামরার দরজায়— ডেজার্ট কুলার নয়, এয়ার কণ্ডিশনের মেশিন নয়—মাত্র একটি সামান্য খসখসের টাটি লাগিয়ে নিলেন।

দুপুরে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বের হবার সময় দূর থেকে ফতে সিংহ ব্যাপারটা এক নজরে দেখে নিলেন শুধু।

পরের দিন ঠিক দুপুরে মহারাণার কাছ থেকে এত্তেলা এল। ঠিক দুপুরে—রাজস্থানের রোদ যখন মাঘের শীতেও মাথার চাঁদি ফাটায়। কিন্তু মহারাণার দেখা দেবার সময় হল না। অত্যন্ত ব্যস্ত তিনি অন্যান্য কাজে। চ্যাটার্জি মশায় রইলেন সেই গরমের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে। বিকেল হয়ে এল, এমন সময় জানলেন যে, আজ আর মহারাণার সময় হবে না।

এমনি করে পরের দিন আবার তলব পড়ল ঠিক দুপুরে। এমনি করেই বাইরে গরমে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবু ভেট মিলল না। ফিরে এলেন ভদ্রলোক। ওদিকে অফিস-কামরার দরজায় খসখসের বেড়া মনের সুখে ঠাণ্ডা ছড়াচ্ছে।

আবার তার পরের দিন।

তারও পরের দিন।

শেষ পর্য্যন্ত চ্যাটার্জি মশায় তাঁর দু'একজন ঘনিষ্ঠ মেধাবী বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ব্যাপারটা কি মশায়? রোজই মহারাণা তলব করেন ঠিক দুপুরে, ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখেন বাইরে, সেই বিকেল পর্যন্ত কিন্তু দেখা করেন না। আবার তার পরের দিন তেমনি করে ডাকেন কাজের জন্য অথচ কাজটা হচ্ছে না। কি যে এমন জরুরী কাজটা তারও কোন হদিস পাওয়া গেল না। বড় ঘোলাটে ব্যাপারই বটে!

সব সাফ হয়ে গেল যখন—একজন বন্ধু মাথা ঠাণ্ডা করে আবিষ্কার করলেন যে, সব অনর্থ হচ্ছে ওই খসখসের পর্দা। যেখানে সবাই, মায় মহারাণা পর্য্যন্ত, রাজপুতানার গরম মাথায় করে বেমালুম কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে কি না নতুন এসেই এই ভদ্রলোক আয়েসের বন্দোবস্ত করতে সুরু করেছেন? যারা নিজের মাথাটা দুষমণের মাথার মতই সস্তা মনে করে লড়াই করতে এগিয়ে যায় তাদের মধ্যে এ রকম আয়েসের আমদানী হলেই জাতটা গিয়েছে আর কি

চোখ ফুটল চাটুয্যে মশায়ের। সর্দার প্রভাস চ্যাটার্জি এর পর থেকে সব রাজপুতের সঙ্গে সমান তালে কষ্ট সইতে অভ্যাস করে নিলেন। যেখানে মহারাণা নিজে কষ্ট সইতে পারেন, সমস্তটা দেশ যেখানে কষ্ট সইতে পারে, সেখানে আমি নরম মাটির দেশে, গঙ্গার গা-জুড়োনো বাতাসে মানুষ হয়েছি বলেই সেখানকার আয়েস আমদানী করতে চাইলে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব কেন?

এই শিক্ষাই প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরবের ইতিহাসে প্রথম পাঠ। সবার সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে নিজের হক দখল করতে হবে। সেই শিক্ষার সঙ্গে বইয়ের আর বুদ্ধির শিক্ষা মিলিয়ে প্রভাস চ্যাটার্জি মশায় উদয়পুরের মিনিষ্টার পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে আজ বিয়ের উৎসবে মেবারী গণ্যমান্য সবাই নেমন্তন্নে চলেছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্বে আর সম্মানে নিজের বুকটিও ভরে উঠল।

প্রবাসী বাঙ্গালী থেকে প্রবাসী রাজপুতের কথা এসে গেল। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারকে ওঁরা প্রবাসী রাজপুত বলে মানতে রাজী নন। কারণ, ওঁরা প্রবাসী নয়, বিশ্ববাসী আর রাজপুত বলতে এঁরা যা বোঝেন, ব্যবসাদার বলতে তা না কি বোঝায় না। বন্ধুদের মতে প্রবাসী রাজপুতের নমুনা হলেন মহবৎ খান্।

মহবৎ খান্ ছিলেন খাঁটি মেবারী। রাণা প্রতাপের বড় ভাই সাগর সিংহের ছেলে মহীপৎ। বাপের মতই তিনি দেশকে ছেড়েছিলেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তাই তিনি ধর্ম্মও ছেড়েছিলেন, আর দেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তবে তাঁর বীরত্ব যে শুধু রাজপুতের বিরুদ্ধেই প্রমাণ হয়েছিল তা নয়, স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীরকে—আর তার চেয়ে বড় তথা,—বাদশা-বেগম নূরজাহানকে পর্য্যন্ত তিনি বন্দী করে রেখেছিলেন। আর শুধু রাজপুত সৈন্যের সাহায্যেই এমন একটা অসম্ভব কাজ করতে পেরেছিলেন। মহবৎ খান্‌কে নিয়ে রাজপুত কবি আর বীরদের বড়াইয়ের অন্ত নেই!

সম্মুখ-যুদ্ধে হেরে রাণা প্রতাপ ত আরাবলীর জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে লড়াই চালাতে লাগলেন। এ দিকে মেবারকে বশে রাখা যায় কি করে? তাই তার বড় ভাই সাগরকে জাহাঙ্গীর চিতোরে রাণা বলে খাড়া করিয়ে দিলেন। সাত বছর ধরে মোগল সৈন্যরা তাকে ঠেকা দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে রাখল কিন্তু কোন মেবারীই এল না তাঁকে রাণা বলে স্বীকার করতে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ভাইপো রাণা অমর সিংহের কাছে চিতোর সঁপে দিয়ে যাঁর ধন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে, মোগল দরবারে ফিরে গেলেন। সেখানে বাদশার সামনে খোলা দরবারে নিজের বুকে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করলেন বিনা যুদ্ধে চিতোর ছেড়ে দিয়ে, আর মনিবের প্রতি নেমক-হারামীর প্রায়শ্চিত্ত করলেন প্রাণ দিয়ে।

তাঁরই ছেলে মহবৎ খান্। মোগল ইতিহাসে সব চেয়ে নজরে পড়ে এঁর কাহিনী, এঁর বুকের পাটা আর মাথার কৌশল। মহবৎ মানে হচ্ছে প্রেম। মহবতের জীবনী হচ্ছে একজন সিপাইয়ের স্বপ্ন।

যুদ্ধে বীরত্ব দেখানটা এঁর পক্ষে বড় কথা নয়। তেমন বীরত্ব ত আরও অনেকেই দেখিয়েছেন। আর সঙ্গে তেমন ভাল সৈন্য দল থাকলে ভাল সেনাপতির পক্ষে যুদ্ধজেতাও সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু মহবতের বাহাদুরী হচ্ছে বুদ্ধির লড়াইয়ে। নূরজাহান, যাঁর চোখের চাহনীতে খেলত লাখো তরোয়ালের ঝিলিক, যাঁর পায়ের তলায় ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর আর হাতের মুঠোয় ছিলেন শাহজাদা খুরম, সেই নূরজাহানের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই, কৌশলের মারপ্যাচ।

মোগল-দরবারের এই লড়াইয়ে মহবতের বাহাদুরীর দৌড় কতখানি ছিল তা বুঝতে গেলে আগে খোদ নূরজাহানকেই বুঝতে হবে। শত্রু যে কতখানি বড়, তা বিচার না করলে বীরত্বের ওজন ঠিক বুঝা যায় না। নেপোলিয়নের মত শত্রু না হলে কি আর ডিউক অব ওয়েলিংটনের অত নাম-ডাক হত?

আগ্রার প্রাসাদে নওরোজের উৎসবে মেয়েরা সবাই মেতে উঠেছে। ফুলের মত সুন্দর একটি ছোট্ট মেয়েও সেখানে ছিল। কিন্তু একটু আড়ালে, এক কোণায়। তরুণ শাহজাদা সেলিম এসে তার হাতে দুটো পায়রা জমা দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন সাবধানে রাখতে। যেন উড়ে না যায়।

ফিরে এসে সেলিম দেখলেন যে, মেয়েটির হাতে শুধু একটি পায়রা। দ্বিতীয়টি ছাড়া পেয়ে ছাদে বসে আছে। কি করবে, বাচ্ছা মেয়ে। দুটো পায়রাকে ছোট্ট হাতে সামলাতে পারেনি।

চটে-মটে লাল হয়ে সেলিম বলে উঠলেন,—বোকা কোথাকার, কি করে ছেড়ে দিলে পায়রাটাকে?

আরও লাল হয়ে ছোট্ট মেয়েটি ঠোঁট ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিল,—তবে এই দেখুন শাহজাদা!

বলেই না দিল হাত দুটি খুলে বাকী পায়রাটিকে ছেড়ে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচে পায়রা তার সাথীর কাছে উড়ে চলে গেল।

কবির মন নিয়ে কাহিনীকার লিখেছেন যে, তখনি যুবরাজ সেলিম তার মনের সাথী খুঁজে পেলেন।

অবশ্য রোম্যান্সের মাল-মশলা নূরজাহানের বছর পঞ্চাশ পর থেকেই দানা বেঁধে ওঠে। শের আফগানকে খুন করে তার বিধবা মেহেরকে বাল্য আর কৈশোরের প্রেমিকা মেহেরকে হারেমে নিয়ে আসার কাহিনী সমসাময়িক কারো লেখাতেই নেই। মুসলমান বা বিদেশী খৃষ্টান সে সময়কার কোন লোকই এ ঘটনা লেখেননি। তর্কের খাতিরে বলতে পারেন যে, দরবারের ঐতিহাসিক মোতোমেদ খান, কামখার হুসেনি আর লোহারি নূরজাহানের সতীন-পুত্র আর মহাশত্রু শাহজাহানের হুকুমে ইতিহাস লিখলেও বাদশার পারিবারিক কুৎসাকে ঢেকে গিয়েছেন। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটকেরা কত অকথ্য কেচ্ছাই না লিখে গিয়েছেন! নূরজাহানের প্রথম জীবন, শের আফগানের সঙ্গে বিয়ে, শেরের অপঘাত মৃত্যু, পরে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিয়ে, জাহাঙ্গীরের উপর অসীম সব কথাই বড় প্রেমসে তাঁরা লিখেছেন, কাজেই সত্য ঘটনা হলে মেহেরকে পাবার জন্য শের আফগানকে খুন করানর কথাটা যে তাঁরা লিখবার লোভ সামলাতে পারতেন, তা মনে হয় না।

আসল কথা হচ্ছে যে, হকিন্‌স্, সার টমাস রো, এডোয়ার্ড টেরী এঁরা জাহাঙ্গীরের দরবারে এত অবাধে আসা-যাওয়ার অধিকার

পেয়েছিলেন যে এমন একটা মুখরোচক ব্যাপার তাঁদের অজানা থাকতে পারত না। উইলিয়াম ফিঞ্চ, পিয়েত্রো ডেলা ভাল্লে এ দু'জনও ওই সময় এদেশে ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঝাঁকে ঝাঁকে বিলেতে লেখা চিঠিতে মোগল দরবারের অনেক মজাদার ঘটনার বর্ণনা আছে। কেন থাকবে না শুধু মেহেরকে পাবার মতলবে শের আফগানকে হত্যা করার কথাটা ?

যাই হোক, শেষ কালে মহম্মদ সাদিক তাব্রেজী, কাফি খাঁ এঁরা দারুণ রঙ-চঙ দিয়ে এই রোম্যান্সটাকে সাজিয়েছিলেন। এ সব থেকে নূরজাহানের জাহাঙ্গীরের উপর যে কি অসীম প্রভাব ছিল তা খুব ভাল করেই প্রমাণ হয়। এ-হেন নূরজাহানের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে যে রাজপুত মোগল-দরবারে থেকেই লড়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহবৎ খান।

আমি কিন্তু রাজোয়ারাতে এসে রাজপুত চারণদের কবিতাতে এই প্রেমকাহিনী সম্বন্ধে কি পাওয়া যায়, তার দিকেই বেশী নজর দিলাম।

মরুভূমির মাঝখানে পালোধি নামে একটি ছোট জায়গীরে চারণদের খ্যাতা অর্থাৎ কবিতাতে এই কাহিনী পাওয়া যায়। আমরা যে রসাল বাল্যপ্রেম থেকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হওয়ার যে কাহিনী জানি, তার মোটামুটি সবটাই এতে আছে। মায় নূরজাহানের যুবরাজ খুরমের উপর নেক-নজর পর্য্যন্ত। কবি সুরযমলের 'বংশভাস্ক'র বইয়েতেও নূরজাহানের কাহিনী আছে।

যদি আপনারা তেড়ে শুধোন যে, এ-সব কবিতার কতখানি সত্যি, আমি শুধু করজোড়ে নিবেদন করব যে, আমি ইতিহাসের পাণ্ডাও নই, পণ্ডিতও নই। আমার অত-শত বিচারে কাজ কি বলুন ত ? আমি শুধু মোগলের কাহিনী রাজপুতের লেখা কবিতায় খুঁজে পেয়েছি বলেই খুসী হয়ে আছি।

বাকী দায়িত্ব ঐতিহাসিকের।

মোট কথা, দেখা গেল যে তত দিনে মেহেরের বাবা দরবারে খুব বড় ওমরাহ হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। ভাই-ও নেহাৎ কেউ-কেটা ব্যক্তি নয়। তবু শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহেরকে দেখা গেল জাহাঙ্গীরের হারেমে। সেখানে তিনি ছুঁচের কাজ করে, তুলি দিয়ে রঙীন নক্‌শা এঁকে কোন রকমে নিজের খরচা চালান। বাদশার সঙ্গে কোন ভাব বা দেখা-সাক্ষাৎ নেই পুরোপুরি চারটি বছর ধরে। কেউ কারো খবরও করেন না কখনো। কেমনতরো প্রেম হল এটা ?

তা বুঝতে পারা গেল বসন্তকালে। নওরোজের সময় সবাই যখন ফূর্ত্তিতে মেতে উঠেছে তখনো মেহের সাদাসিধে কাপড় পরে বাঁদীদের মাঝখানে বসে কাজ করছেন। বাদশা দেখে থমকিয়ে দাঁড়ালেন। অবাক্ হয়ে গেলেন।

শুধোলেন,—মেয়েদের মধ্যে যে সূর্য্য, সেই মেহের আর বাঁদীদের মধ্যে এ রকম তফাৎ কেন ?

চার দিকে জমকালো পোষাক পরে বাঁদীরা দাঁড়িয়ে আছে। রঙীন বিজলী বাতিগুলির মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে আটপৌরে সাদা-কাপড়ে-ঢাকা সূর্য্য বুকে হাত রেখে জবাব দিল,—বাঁদীরা যাদের সেবা করে তাদেরই মর্জি মাফিক থাকে। এরা আমার বাঁদী। তাই যত দূর আমার ক্ষমতায় কুলোয় আমি ওদের সাজাই-গোছাই। কিন্তু শাহানশাহ, আমি নিজে যার বাঁদী তার খুসী মতই ত আমায় থাকতে হবে, নিজের খেয়াল অনুসারে নয়।

এই কথাবার্ত্তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে লাভ কি ? শুধু এটুকু আমি বলব যে, মেহেরের এই উত্তরের আন্তরিকতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় তারই রচনা-করা কবিতা—যা লাহোরে তার কবরের উপর আছে :—

দীন আমি। জ্বালিয়ো না মোর সমাধিতে
কোন দীপ পতঙ্গেরে পুড়াইয়া দিতে ;
দিয়ো না কুসুম মোর কবর উপরে
পাছে বুলবুল আসি' সুখে গান করে।

রূপসী মেহের শুধু শিল্পী নন, কবিও বটে। এবং খুব উঁচু দরের রোম্যান্টিক কবি ছিলেন। মাখফি অর্থাৎ অপ্রকাশ বা পর্দানসীন এই ছদ্মনামে তিনি দিওয়ান-ই-মাখফি (পর্দানসীনের গীতি কবিতা) লিখেছিলেন। (অবশ্য মাখফি এই ছদ্মনামে আরো কয়েক জন মোগল রাজকন্যার কবিতাও পাওয়া গেছে)। আর একজন ছদ্মনামা লোক, ঐতিহাসিক কাফি খাঁর মুন্তাখাব-উল-লুবাব বইয়েও নূরজাহানের কয়েকটি কবিতা তুলে দেওয়া আছে।

মেহের বাদশাহের কাছে বিচার চাইলেন—
তুরা নেহ তাকমে লাল অস্ত বরবকাই হরির
সুদা অস্ত কতরে খুন মিনুনতে গরে বাঁ গির
দিল বাস্তুরৎ নেদেহম্ তা সুদাহ শিরৎমালুম
বন্দে ইস্কম ওয়ে হপ্তা দো দো মিল্লৎ মালুম

ফারসীতে লেখা এই মনগলানো কবিতার বাংলা অনুবাদে এই রকম দাঁড়াবে :—

তোমার রেশমী জামার বোতামে দেখিনু যে লাল মণি
পীড়িতের খুন চাহিছে বিচার এই আমি মনে গণি ;
আমি যে তোমারে দিয়েছি হৃদয়,—
সে শুধু তোমার মুখ হেরি নয়
আমি যে প্রেমের পূজারী—যদিও শত নীতিকথা জানি।

শুধু এই নয়। তার পরে তিনি কি বলেছিলেন বা ভেবেছিলেন, তাও মেহের কবিতায় লিখে গিয়েছেন :—

শেষের সে দিনে মোল্লারা ভয় করে ;
দিয়ো নাক' ভয় আমার এ অন্তরে
বিরহের দায়
তোমা হ'তে হায়—
কাটায়েছি কাল সে ভয়ের ভিতরে।

মনের মানুষটি একবার দেখার পরেই জীবনের মনিব হয়ে দেখা দিলেন।

এত প্রতাপ আর কোন রাজমহিষীর কখনো হয়নি। ইতিহাসে এর তুলনা নেই।

নূরজাহান যে শুধু জাহাঙ্গীরকে জয় করলেন তা নয়। সব ওমরাহরা রইলেন তাঁর পায়ের তলায়। মুখের কথাটি, চোখের ইশারাটির অপেক্ষায়। যদিও জাহাঙ্গীরের নূরজাহানের প্রতি ছেলেবেলায় ভালবাসার কথা বা তাকে যেমন করেই হোক, পাবার জন্য শের আফগানকে খুন করানর কথা কোন সমসাময়িক বইয়ে লেখেনি, যদিও সে কাহিনী তাদের দু'পুরুষ পরে প্রথম লেখা হয়ে

ইতিহাসের মধ্যে পর্য্যন্ত লতায়-পাতায় বেড়ে উঠেছিল এটা ঠিক যে, সে নূরজাহানের প্রতাপের কোন তুলনা ছিল না। যখন যাকে খুসী, যখন খুসী নিজের ক্ষমতা পুরোপুরি বজায় রাখবার জন্য তাকে নামিয়েছেন আর উঠিয়েছেন। এমন কি, সুবিধা হবে বলে নিজের সৎছেলে আর ভাইঝি-জামাই আর সব চেয়ে উপযুক্ত শাহজাদা খুরমের (শাজাহানের) সঙ্গেও যে একটি গোপন মিষ্টি সম্পর্ক তৈরী করেছিলেন সে কথা ইংরেজ রাজদূত সার টমাস রো লিখে গেছেন। শাহজাহান নাকি "তাঁর পিতার নারীমণ্ডলীর মধ্যে হৃদয় হারিয়ে ছিলেন। নূরমহল (তখনো তিনি নূরজাহান পরে রাণী বেগম এই নামগুলি পাননি) ইংরেজী ফ্যাসানের ঘোড়ার গাড়ীতে শাজাহানের সঙ্গে দেখা করে বিদায় দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন মুক্তো হীরে মণিতে ভরা একটা পোষাক, আর বদলে নিয়েছিলেন অন্য সব কাজ থেকে সরিয়ে তাঁর মন।"

তাই তার পরের দিন শাজাহানের দৃঢ় মুখটি হয়েছিল বড় চঞ্চল। ইংরেজ রাজদূত সে মুখে দেখলেন অনেক না-বলা কাহিনী, অসহ বেদনা। হৃদয় আমার হারালো, হারালো।

আর জাহাঙ্গীরের ?

তিনি কি শুধু নূরজাহানের রাজ্য চালাবার আর লোক খাটাবার বুদ্ধি বেশী আছে বলেই তাঁর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে তাঁকে একেশ্বরী করে দিয়েছিলেন ?

না। তা নয়। তাঁকে যে কতখানি ভালবাসতেন, সব মিলিয়ে দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে চমৎকার একটা গল্প আছে। নূরজাহান রাণী হয়েই তাঁর সতীন সুরাসুন্দরীর হাত থেকে জাহাঙ্গীরকে বাঁচাতে চাইলেন। বাদশারাণী, এই শুধু ন' পেয়ালাতেই রাজী—যদি রাণী বেগম নিজের হাতে সেগুলি হাতে তুলে দেন। রাণী বেগম অবশ্যই রাজী হলেন আর মদ ভোলাবার জন্য পান-ব্যঞ্জনার বন্দোবস্ত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে কি শানায় ?

মুর্গী-মুসল্লমের বদলে গাছপাঁঠার তরকারীতে কি চলে ? আছেন আপনি রাজী পাতে সাজান ইলিশ মাছের পাতুরী ছেড়ে দিয়ে কুচো চিংড়ীর চচ্চড়ি দিয়েই ভাতটুকু সাবড়ে নিতে ?

কিন্তু রাণী বেগম ন' পেয়ালার বেশী এক পেয়ালাও দেবেন না। যতই কাকুতি মিনতি, জেদাজেদিই করুন না কেন বাদশা। শেষ পর্য্যন্ত চটে-মটে নূরজাহানের হাত পাকড়িয়ে তিনি খামচাখামচি সুরু করে দিলেন। পাল্টা জবাব দিলেন রাণী কিল ঘুষি চালিয়ে। খাস কামরায় এমনতরো হল্লা শুনে বাজনদাররা শুরু করে দিল কান্নাকাটি, ছুড়তে লাগল হাত-পা আর ছিঁড়তে আরম্ভ করল নিজেদের চুল, কাপড় চোপড়। ছুটে বেরিয়ে এলেন বাদশা আর তাঁর বেগম ব্যাপার দেখবার জন্য। ওরা বুদ্ধি করেই এমন কাণ্ড-কারখানা লাগিয়ে দিয়েছিল। এ ছাড়া যে স্বামিস্ত্রীর মারামারি থামাবার আর কোন উপায়ই ছিল না।

মারামারি ত থামল, কিন্তু রাণীর মান ভাঙ্গবে কিসে ? গোসাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রইলেন শুয়ে। মুখদর্শন পর্য্যন্ত করবেন না বাদশার, যদি না তিনি রাণীর পা ছুঁয়ে মাপ চান।

তোবা তোবা ! 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।' তাঁকে ছুঁতে হবে একজন মানুষের পা ! হোক না তা পৃথিবী-আলো-করা চরণকমল ?

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই মঝু গাত॥

কিন্তু নূরজাহানই বা কম কিসে ? রইলেন তিনি গোসা-ঘরে ঘুমে। থাকো তুমি বাদশা, তোমার বাদশাহী নিয়ে।

শেষ পর্য্যন্ত জটিলা-কুটিলার দলই বুদ্ধি বাৎলাল। অভিমানের সাপও মরবে অথচ সম্মানের লাঠিও ভাঙ্গবে না। জাহাঙ্গীর যদি ওপরে ঝুলবারান্দায় এসে দাড়ান তাঁর ছায়া এসে পড়বে নীচের বাগানে। নূরজাহান যদিও নীচে এসে দাঁড়াবেন তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়বে ওই ছায়া। ভুলিয়ে ভালিয়ে রাণীকে আনা হল বাগানে। জাহাঙ্গীর নিজের ছায়া তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে দিয়ে বললেন—দেখ, দেখ, আমার হিয়া তোমার পায়ের তলায় এসে লুটোচ্ছে।

এমন যে নূরজাহান—যিনি সবাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন তিনিও বাগে আনতে পারলেন না একজন রাজপুত বীরকে। মুসলমান হয়ে মহবৎ নাম নিলে কি হবে, মেবারের মহারাণার সৈন্যদের লড়াইয়ে লণ্ডভণ্ড করে পাহাড়ে জঙ্গলে ভাগিয়ে দিলে কি হবে, রাজপুত ত বটে ! তাই মোগল-দরবারেও তাঁর মাথা নোয়ান নি কখনো। এমন কি নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য যে মামুলী হুকুম নিতে হত বাদশার কাছ থেকে, তা পর্য্যন্ত নেননি। রাগে হিংসায় জলছিল সব ওমরাহরা। এমন একটা অজুহাত পেয়ে তারা নির্দোষ জামাই বেচারাকেই হাত ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে সবার সামনে বেদম পেটাল আর কয়েদে পুরে রাখল। মহবতের দেওয়া সব যৌতুক গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে। তুই দোষ না করে থাকিস, তোর শ্বশুর করেছে।

নূরজাহানের নিজের ভাই, সবার সেরা ওমরাহ আসফ খাঁ ছিলেন এই দলের সর্দার।

কিন্তু তাতে কি ভড়কিয়ে গেলেন রাজপুত মহবৎ খাঁ ? তা কি সম্ভব ? মহীপৎ সিংহের কেশর কি বেড়ালের ল্যাজের মত গুটিয়ে আসবে ব্যাপার সঙ্গীন হয়ে উঠেছে দেখে ?

কভি নেহি। জান কবুল, তবু মান যাবে না।

কাশ্মীর-ফেরৎ জাহাঙ্গীর চলেছেন কাবুলে। প্রায় সব সৈন্য, আমীর ওমরাহ, ধনরত্ন ঝিলম পার হয়ে গেছে। বাকী শুধু বাদশার নিজের পরিবার স্বজন আর কিছু চাকর-বাকর। এমন সময় ভোর বেলা মহবতের দু' হাজার রাজপুত ঘোড়সোয়ার নদীর পুল বন্ধ করে দাঁড়াল। দরবারের ঐতিহাসিক মোতামেদ খান ইকবাল নামকা বইয়ে লিখেছেন যে, এমন চুপিসাড়ে কাজ হাসিল হয়ে গেল যে, হামামে বসে বাদশা টেরও পেলেন না যে কি ঘটে গেল। খোজাদের কাছে খবর পেয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, দুয়ারে প্রস্তুত পালকী। আর জোড় হাত করে সামনে দাঁড়িয়ে মহবৎ খাঁ হুজুরে আর্জি পেশ করছেন যে, আসফ খাঁ প্রভৃতিরা তাকে নেহাৎই বেইজ্জত করে মেরে ফেলবে এই ভয়ে বান্দার বান্দা মহবৎ সাহস করে শাহানশার পায়ের তলায় নিজেকে এনে হাজির করেছে। গোস্তাকি মাপ না হলে জাঁহাপনা তার গর্দান নিতে পারেন।

শুধু তাই নয়। মহবৎ আগে নিবেদন করলেন যে, তার পরে ঘোড়ায় চড়ে জাঁহাপনাকে বাইরে খেলতে যেতে হবে মহবতের সঙ্গে। যাতে সবাই বুঝতে পারে যে এমন বেয়াদবি কাজ শুধু বাদশার

হুকুমেই করা হয়েছে। তিনি নিজেই এই সব বেইমান নেমকহারাম আসফ খান কোম্পানীর হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখতে চান।

বে-কায়দায় পড়ে জাহাঙ্গীর শিকারে যাবার পোষাক পরবার জন্য তাঁবুতে যেতে চাইলেন। একবার নূরজাহানের সঙ্গে কথা কওয়াও ত দরকার। কিন্তু মহবৎ তাতে রাজী হলেন না। কি আর করা যায়?

পড়েছি মোগলের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

এদিকে সেই ডামাডোলের মধ্যেই ছদ্মবেশে নূরজাহান উধাও হয়ে গেলেন নদীর ওপারে, যেখানে সবাই জমা হয়ে আছে। তাদের জড়ো করলেন লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু পুলটা যে রাজপুতদের দখলে। আর বাদশাও রাজপুতদের কবলে।

মহবৎ শুধু বেপরোয়া বীর নন। তিনি একাধারে চাণক্য আর চন্দ্রগুপ্ত দুই-ই। তাই দেখাতে চান যে, বাদশা নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তার আশ্রয়ে এসে উঠেছেন। ঠিক যেমন ভাবে এক কালে বৃটিশরা দেখাতে চাইত যে, তাদের আশ্রয়ে স্বাধীনতাটুকু বাঁচাবার জন্যই কালা আদমীরা যেচে এসে তাদের অধীন হয়ে থাকতে চাইছে। লড়াই হলে সে ভোল্ ত বজায় থাকে না। কাজেই জাহাঙ্গীরের হাতের মোহর-মারা আঙটি পাঠান হল ওপারে লড়াই না করার জন্য। এদিকে পুলটাও রাজপুতরা পুড়িয়ে শেষ করে দিল।

লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে মোগলদের। ওরা ভোরবেলা নদী পার হয়ে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। সবার সামনে রাণী বেগম নূরজাহান—হাতীর পিঠে বসে, কোলে তার পেয়ারের নাতনী। সে লড়াইয়ে মহবতের কৌশলে আর সাহসে রাজপুতরা মোগলদের পদে পদে হারিয়ে হঠিয়ে দিল। ভয়ে যখন মোগলের হাতী রণসাজে গভীর জলে ভাসতে সুরু করল, তখন রাজপুতের ঘোড়া জলে তল পাচ্ছে না দেখে তরোয়াল হাতে রাজপুতরা সাঁতরে তেড়ে গেল। নূরজাহানের নাতনীর হাতে এসে বিঁধল রাজপুতের তীর। কিন্তু তিনি নিজে ঘাবড়ালেন না একটুও। বসে রইলেন বিনা আয়াসে—যেন দিল্লীর গোলাপবাগে জলের ফোয়ারার পাশে বসে দিলরুবা বাজাচ্ছেন।

হেরে প্রাণ নিয়ে পালালেন আসফ খাঁ আর শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়লেন। রাজপুত তাকে প্রাণে মারল না। কিন্তু নূরজাহান যাবেন কোথায়? নিজে যেচে এসে বন্দী হয়ে রইলেন মহবতের আওতায়।

সমস্তটা দেশ এখন মহবতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। নামে বাদশা রইলেন জাহাঙ্গীর, কিন্তু কলকাঠি নাড়েন মহবৎ। তিনি ভাবলেন, দেশকে বুঝতে দিতে হবে যে সবই ঠিক মত আগেকার মতই চলছে। তাই কাবুল যাত্রাটা আবার শুরু হল।

এবার আরম্ভ হল খেলা চতুরে চতুরে। মহবৎ নালিশ করলেন যে, রাজ্যে সুশাসন হচ্ছিল না ঠিক মত। একজন মেয়ে লোকের নামে আর হুকুমে রাজ্য চালান—সেটাও বড় খারাপ দেখায়। কিন্তু বান্দা নিজে সত্যি সত্যিই বান্দা। বিশ্বাস না হয়, জাঁহাপনা, এই তুলে দিলাম আমার খোলা তরোয়াল আর এই পেতে দিলাম আমার খালি মাথা।

ছি ছি! তামাম হিন্দুস্থানের শাহানশাহ কি এমন ভুল কখনো করতে পারেন? লোক তিনি চেনেন খুব ভাল করেই। হাত ধরে তুলে নিলেন হাঁটু-গেড়ে-বসা মহবৎকে। অভয় দিলেন পুরোপুরি। কৃতজ্ঞতা জানালেন রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এত সদুপদেশ দেওয়ার জন্য। নিজের ভালমানুষীর আরও হাতে হাতে প্রমাণ দিলেন, নূরজাহানকে নিজের সঙ্গে একসঙ্গে নজরবন্দী হয়ে থাকার জন্য হুকুম দিয়ে।

খুশী হয়ে মহবৎ দিলেন প্রকাণ্ড এক ভোজ। তিন দিন ধরে চলল ফূর্ত্তি হৈ-হল্লা। সব আমীর-ওমরাহরা দেখে গেল মহবতের প্রতাপ, বাদশার সঙ্গে খাতির। রাণী বেগম নিজের হাতে তাকে দিলেন অনেক খেলাত, ঘোষণা করলেন সবার সামনে যে, দুনিয়াতে মহবতের মত এত পেয়ারের আর বিশ্বাসী ওমরাহ কেউ নেই। হয় নি আর হতে পারেও না। সম্ভবত হওয়া উচিতও হবে না।

সেই দুর্দান্ত ঠাণ্ডা কাবুলে এসে রাজপুতদের মাথা হয়ে উঠল দুরন্ত গরম। মনে মনে মোগল আফগানরা এমনিতেই রাজপুতদের উপর চটে ছিল। এখন আবার তাদের খারাপ ব্যবহারের জন্য নালিশ করতে গেলে যেতে হয় মহবতের দুয়ারে! এ যে একেবারে অসহ্য ব্যাপার!

এ দিকে জাহাঙ্গীর সময় পেলেই ইনিয়ে-বিনিয়ে মহবৎকে বলতেন যে, নূরজাহানের আর তার ভাই বেরাদরদের দাপট নিজের কখনো সহ্য হত না। মহবৎ তাকে বাঁচিয়েছেন এমন একটা দুরবস্থা থেকে। শুধু তাই নয়। মহবৎকেই তিনি বিশ্বাস করেন পুরোপুরি। আর কাউকে নয়।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

না হয়ে উপায় কি? জাহাঙ্গীর যে একদিন নিজে হাতেই ফারমান সই করে দিলেন যে রাণী বেগমের গর্দান নেওয়া হোক। কারণ, তিনি গোপনে গোপনে মহবৎকে দেখতে পারেন না আর খালি ষড়যন্ত্র করে বেড়ান। মহবৎ সেই ফারমান নিয়ে হাজির হলেন নূরজাহানের কাছে।

রাণী বেগমের প্রাণদণ্ড? রাণী বিশ্বাস করলেন। অবশ্য মোগল রাজত্বে সবই সম্ভব। তিনি মরতে তৈরী আছেন। তবে একবার স্বামীকে শেষ দেখা দেখে যাবেন। যে হাতে অনেক কিছু তিনি পেয়েছেন সে হাতে শেষ একটি চুমু দিয়ে যাবেন।

মহাবীর মহবৎ ত এতে আপত্তি করতে পারেন না? স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসে রয়ে গেলেন পাকাপাকি ভাবে। মৃত্যু-পরোয়ানার কথা সবাই ভূলে গেল। তরোয়ালের ধাঁধান খেলা দেখা অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়ল না যে মাকড়সার জাল তার নিজেরই চার দিকে বোনা হচ্ছে।

তবু মাঝে মাঝে জাহাঙ্গীর মহবৎকে সাবধান করে দিতে লাগলেন যে, নূরজাহানকে বিশ্বাস করা যায় না। আর আসফ খানের বেটার (ভবিষ্যতে শায়েস্তা খান্) বৌ ত একটা খুন-খারাপিরই চেষ্টা করছে।

মহবতের তাঁবে মহা সুখে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে কাটাতে জাহাঙ্গীর প্রায় রোজই শিকারে যেতে লাগলেন। যেতে লাগলেন পীরদের কাছে, দরগা মসজিদে। রাজপুত পাহারাদাররা সঙ্গে যায়। তাতে আর কি হয়েছে?

এদিকে আফগানরা বড় শয়তান আর হিন্দু রাজপুতদের দু'চোখে দেখতে পারে না বলে বাদশার মোগল সৈন্য আরও বাড়াতে হল। বাদশার চার দিকে বেশী সৈন্য পাহারাদার থাকলে লোকে পাঁচটা মন্দ কথা বলতে পারে। কাজেই রাজপুতের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দিতে হল। তাছাড়া এদিকে-সেদিকে নূরজাহানের চররা আরও ঘুরে বেড়াতে লাগল। নিছক দেশ দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই অবশ্য। কাবুল কান্দাহার মুলতান এ-সব অতি সুন্দর জায়গা।

কাবুল থেকে ফেরার পথে একদিন বাদশার খেয়াল হল ঘোড়সোয়ার সৈন্যদের দেখবেন। কিছু না, শুধু সার দিয়ে দু' লাইনে তারা দাঁড়াবে যত দূর লাইন চলে আর বাদশা তাদের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবেন। খবর পাঠালেন মহবৎকে যে, তার নিজের আসার দরকার নেই। নিশ্চয়ই তার সুশাসনে যেখানে বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খাচ্ছে সেখানে সেনাপতির সব সময়ই বাদশার কাছে থাকার দরকার হয় না। তা ছাড়া পুরোনো সৈন্য আর নতুন সৈন্যরা এক সঙ্গে লাইন বেঁধে দাঁড়ালে ঝগড়াঝাটি, এমন কি খুনখারাবিও হতে পারে। কাজেই শুধু নতুন সৈন্যদেরই আজ দেখতে যাবেন বাদশা। মহবৎ খাঁ ততক্ষণে তাঁবু গুটিয়ে সে দিনকার মার্চ'টা শুরু করে দিতে পারেন।

তাই করলেন মহবৎ খাঁ। এ দিকে জাহাঙ্গীর নতুন সৈন্যদের লাইনের মাঝখানে পৌছান মাত্রই তারা ওর চার দিকে ঘিরে দাঁড়াল। রাজপুতরা হতভম্ব হয়ে আলাদা পড়ে রইল।

পাশার দানে মহবৎ হেরে গেলেন বটে কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। তাকে নূরজাহান দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহী সৎছেলে শাহজাদা খুরমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। কিন্তু রাজপুতের ছেলে মহবৎ রাজপুত মায়ের ছেলে খুরমের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার দিল্লীর উপর ক্ষমতা খাটাবার পথ করে নিলেন। শেষ পর্য্যন্ত খুরম বাদশা শাজাহান হয়ে বসলেন আর মহবৎ খাঁ আজমীরে তার প্রতিনিধি আর সব চেয়ে বড় সেনাপতি হয়ে রইলেন।

আজকের দিনেও রাজপুতরা মহবৎ খানের স্মৃতিকে প্রবাসী রাজপুত বীরের স্মৃতি বলে পূজা করে। হোন্ না তিনি ধর্ম্মে মুসলমান, বীরধর্ম্মে তিনি রাজপুত। তাই প্রভুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মারেন নি, শত্রুকে কবলে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। লড়তে গিয়েছেন প্রভুর আদেশে কাবুল পর্য্যন্ত, মরতে ফিরে এসেছেন রাজস্থানেই। বিপদে যখন সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন আশ্রয় নিয়েছেন মেবারের পাহাড়ে, হাতে হাত মিলিয়েছেন মেবারে শরণ-পাওয়া শাহজাদা খুরমের সঙ্গে। সত্যিই বীরত্বের জাঁকজমকে ভরা মোগল দরবারেও মহবতের মত এমন রূপকথার সেনাপতি আর পাওয়া যায় না। শুধু বীরত্বে নয়, মহত্বেও।

যার কাছে বুদ্ধির লড়াইয়ে তিনি হেরে গিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের একেশ্বর কর্ত্তৃত্ব হারিয়েছিলেন সেই নূরজাহানের পতনের দিনে তাঁর কোন অনিষ্টের চেষ্টা করেন নি। নূরজাহানের জগতের আলো যেন হঠাৎ এক ফুঁয়ে নিবে গিয়ে মিলিয়ে গেল। তার জন্য দুঃখ করল না কেউ, ফেলল না একটা দীর্ঘশ্বাস। অস্তগামী সূর্য্যের পূজা করা ত সংসারের নিয়ম নয়। কবি হসরৎ শেরোয়াণী বড় দুঃখে তাঁর কবরের উপর কবিতা লিখেছেন,—

> জিসকি পাবোসি কি করতে আর্জু গুল হায় তা।
> খুশকৃকাঁটো কা পড়া ছায় ধের উসকি পর।
> শেজ পর ফুলোঁ কি শো তি থি কভি কভি যো নাজনী।
> হায় উশকি কবর পর এক পণ্ডখড়ী তক ভি নহী।
> বিকচ কুসুমও স্পর্শ করিতে পারেনি যাহার চরণে
> সে পরী-কবরে কণ্টকরাশি ঘেরিয়াছে আজ মরণে।
> যে রাজকন্যা-শয়ন রচিত শুধু গোলাপের শয্যা
> তার সমাধিতে শুষ্ক পত্র নাহি আজ এ কি লজ্জা।

মনে পড়ল সে কথা। ভাবলাম যে, সেই ক্ষমাহীন শত্রুতার যুগে শোধ-প্রতিশোধের যুগ মহবৎ খাঁ শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়েও কেমন পরম উদাসীন রইলেন নূরজাহানের প্রতি।

মেবারী বন্ধুরা উল্লাস করে বললেন মহবতের কাহিনী। তারিফ করলেন তার বুদ্ধির, বাহাদুরীর, বীরত্বের। একজন প্রবাসী রাজপুত বিধর্মী শত্রুর দরবারে কত প্রভাব খাটিয়ে গিয়েছিলেন। বলতে বলতে ওদের বুক ভরে উঠল, মন খুসী হয়ে গেল।

আমারও তাই। রাজপুত চারণরা মহবতের কথা অনর্থক এত বড় করে গায়নি। তিনি এত বড় বীর ছিলেন যে রাজপুত না হয়ে যান না—এই বোধ হয় ছিল চারণদের মনের কথা। তাই তাঁরা ওকে মহারাণা প্রতাপের ভাই সাগর সিংহের ছেলে মহীপৎ বানিয়ে ছেড়েছিলেন। টডও সেই কাহিনীই তার বইয়ে লিখেছেন। অন্য পক্ষে মাসির-উল-উমরা নামে মোগল দরবারের ওমরাহদের সম্বন্ধে যে প্রামাণিক জীবনীর বই আছে তাতে লেখে যে, মহবৎ খান হচ্ছে ইরাণের শিরাজ সহরের লোক। আসল নাম তার ছিল জামানা বেগ আর রাজপুতদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল শুধু রাজপুত সৈন্য নিয়ে লড়াই করার মধ্যে দিয়ে।

সে যাই হোক। আমি ত ইতিহাস লিখতে বসিনি রাজোয়ারাতে এসে। মেবারীদের মত আমারও চোখে মহবৎ রাজপুতই বটে। পুরোপুরি, নির্ভেজাল, নিঃসন্দেহ। যার বীরত্বে আছে চমক আর জীবনে আছে রোম্যান্স সেই রাজপুত।

[ক্রমশঃ।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

"আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে—বাংলা সঙ্গীতের বিশেষতঃ আমার সঙ্গীতের বিকাশ ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় হয়নি। আমার আধুনিক গানকে সঙ্গীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও না, আপত্তি কি?"

—রবীন্দ্রনাথ।

নজরুল সাহিত্যে নারী

শ্রীশিপ্রা দত্ত

অসময়ে মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেছে বলেই—আজ আমরা সেই সূর্য্যের দীপ্তির কথা ভুলে যেতে পারি না। তাই ২৫শে মে অগ্নিযুগের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে দেশবাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। যদিও আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর 'অগ্নিবীণা'র ঝঙ্কার; তাঁর প্রতিভার মুখে পড়েছে পাথর চাপা। খিলাফৎ আন্দোলনের দিনে আবির্ভাব হয়েছিল নজরুলের। তিনি ছিলেন নূতনের পথপ্রদর্শক। তাই বাঁশীতে তাঁর ধ্বনিত হয়েছিল নূতন সুর। অতীতের জীর্ণ পুরাতন সংস্কারকে ভেঙ্গে—তারই উপর বিদ্রোহের কাঠামোতে নূতন সৃষ্টির অপূর্ব্ব স্বপ্ন গড়ে গেছেন নজরুল। ধ্বংসের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা—রাত্রির কুহেলিকার মধ্যেই দেখেছিলেন অনাগত উষার অরুণরশ্মি-রেখার চিহ্ন। অর্দ্ধসুপ্ত বাঙ্গালীকে তিনি তাঁর গানে কবিতায় জাগিয়ে তুলেছিলেন। সাম্যবাদী নজরুলের বিদ্রোহের গান, ভাববিলাসী বাঙ্গালীর হৃদয়-কন্দরে নাড়া দিয়েছিল। তাই তাঁর স্পর্শকাতর কবিচিত্তকে বাঙ্গালী মাত্রই ভাল না বেসে পারেনি।

নজরুল সাহিত্যে নারী একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। এটা তাঁর প্রতিভার মৌলিকতার একটা নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যাকাশে একমাত্র শরৎচন্দ্র ব্যতীত নারীর ব্যথা, নারীর দুঃখ এমন করে কেও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেনি। নজরুল নারীর বিভিন্ন রূপে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে অঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, বারাঙ্গনা—সকলেই। বাঁশীতে তাঁর নারীর জন্য বেজে উঠেছে সমবেদনার সুর। কোমলে কঠোরে এক অপূর্ব্ব রূপ দেখি আমরা নজরুল সাহিত্যের নারীর মধ্যে। এটাই নজরুল কাব্যের অভিনব সৃষ্টি। নারীর প্রতি অপরিসীম মমত্ব বোধই তাঁর বিশেষত্ব।

বিদ্রোহী কবির "নারী" কবিতাটি তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও তাঁর অনন্যসাধারণ চিন্তাধারার পরিচায়ক। নারীকে তিনি দিয়েছেন পূর্ণ মর্য্যাদা। পুরুষকে তিনি নারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেননি। পরন্তু বিশ্বের শান্তি সৌন্দর্য্য-বিধানে পুরুষের অপেক্ষা নারীর দানই বেশী—একথা তিনি তাঁর সুললিত কণ্ঠে গেয়ে গেছেন—

"পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এনেছে মরুতৃষা লয়ে...নারী যোগায়েছে মধু।"

জগতের ইতিহাস যে পুরুষের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে—বিদ্রোহী কবি তা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন—

"কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সীঁথির সিন্দুর লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কে বা?

অনাদি অনন্ত কাল ধরে জগতের ইতিহাস পুরুষের কীর্তি গাথা গেয়ে চলেছে। সত্যানুসন্ধান করে দেখা যায়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে-সব পুরুষের নাম আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—তাদের পশ্চাতে আছে নারীর ত্যাগ, প্রেরণা ও উৎসাহ। কিন্তু নারীর এই আত্মত্যাগ, তার নিঃস্বার্থ গোপন সেবার মহান্ দৃষ্টান্ত কালের স্রোতে গেছে ভেসে। নারীর সাহচর্য্য ব্যতীত যে জগৎ সৃষ্টি সম্ভবপর নয়—তার প্রেরণা, শক্তি, প্রেম, স্নেহ, মায়া, মমতায় সিঞ্চিত না হ'য়ে পুরুষের কীর্তিলাভ অসম্ভব—এই প্রাঞ্জল সত্যটি যুগ যুগ ধ'রে পুরুষ অস্বীকার করে এসেছে। পরন্তু পুরুষ তার আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে নারীর প'রে, আধিপত্য ও শাসনের নামে পুরুষ অন্যায়, অবিচারের চাকার তলে নিষ্পেষণ করেছে নারীকে, সংবেদনশীল কবি এর শোচনীয় পরিণতির কথা চিন্তা করে জগতের এই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে সাবধানী বাণী দিয়ে গেছেন—

"যুগের ধর্ম্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।"

নজরুল নারীর মহান্ ত্যাগ, সেবা ও ক্ষমার পার্শ্বে অকৃতজ্ঞ, স্বার্থান্বেষী, নির্ম্মম পুরুষের রূপ প্রকটিত করেছেন—

"লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।

* * * *

অদ্ভুত রূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে করে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ!
তিনি নর-অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার!"

এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিদ্রোহী কবি দেখিয়েছেন নারীর প্রতি ইতিহাসের অবিচার। পুরুষের রচিত ইতিহাসে নারী ম্লান হ'য়ে গেছে। অথচ দুনিয়াবাসী এত কাল ধ'রে এই অপূর্ণ ইতিহাসকেই গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু আজ কবির এই উদ্ধত অভিযোগ অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধা কারও নেই। কবি শুধু অভিযোগই করেননি; তিনি নারীদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য দিয়েছেন প্রেরণা—

"হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ।
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন যেথা যত আভরণ।"

কবির এই অমর বাণী আজ অন্তঃপুরে পৌঁছিয়েছে, তাই জেগে উঠেছে বাংলার ললনাগণ। এ তো তাঁর বাণী নয়—এ যেন রণ তূর্য্য। যখনই তিনি দেখেছেন কোনও মেয়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে—তখনই তিনি নারীত্বের জয়গানে মুখর হ'য়ে উঠেছেন।

ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এত কাল যারা নারীকে অন্তঃপুরের

স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল—তাদের উদ্দেশ্যে কবি বিদ্রোহের ভেরী বাজিয়ে বলেছেন—

"বলে না কোরাণ, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারো মাস।
হাদিস কোরাণ ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
জানে নাক' তারা কোরাণের বাণী—সমান নর ও নারী।"

কেবল মাত্র নারীদের জন্যই বিদ্রোহী কবির বীণা অনুরণিত হয়নি। তিনি বারাঙ্গনাদেরও জয়গান গেয়েছেন—তাঁর 'বারাঙ্গনা' কবিতাতে। এই ক্ষেত্রে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সমাজের এই পতিতাদের প্রতি তাঁরই দৃষ্টি সর্বাগ্রে পড়েছিল। তিনিই প্রথম দেখিয়ে গেছেন—সুযোগ ও সুবিধা পেলে এরাও আবার নিজেদের সংশোধন করতে পারে। তাই তাঁর সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে 'শ্রীকান্তে'র অন্নদাদিদি, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী, 'চন্দ্রনাথের' সুলোচনা প্রমুখ নারীদের জন্য। তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন, পুরুষের সৃজিত সমাজে এই সব অনুতাপানলদগ্ধ হতভাগ্য নারীদের জন্য নেই কোন স্থান। পুরুষের পাপের শাস্তি বহন করে নারী। সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষকে দেয় নিষ্কৃতি—নারীকে দেয় শাস্তি। এটাই তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই—তাঁর সাহিত্যে এরাই পেয়েছে প্রধান স্থান। তাই তিনি পতিতার লেখক বলে অভিহিত হয়েছিলেন। নজরুলকে শরৎচন্দ্রের অনুসারী বলা যেতে পারে। তিনিও তেমনি বারাঙ্গনাদের স্বপক্ষে বলেছেন—

"শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোনো গ্লানি।
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।"

তিনি পুরাণ-কাহিনী হ'তে বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে —সেই কালে বহু ভ্রষ্টা নারী বা বারাঙ্গনার সন্তান আজও বীরত্ব ও কীর্তিতে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি বলেছেন—একবার পদস্খলন হ'লেই সমাজ তাকে কেন স্থান দেবে না? পুরুষের পদস্খলনে দোষ নেই। কিন্তু নারীর প্রতি কেন এত নির্মম ব্যবস্থা? পাপের কলঙ্ক বা কালিমা চিহ্নিত করে না পুরুষকে। অনুতাপানলে দগ্ধ হ'লেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই কেন নারীর জন্য? এটাই তার সমাজের প্রতি জিজ্ঞাস্য। নারীর প্রতি নির্মম আচরণ নজরুলকে করেছিল ক্ষুব্ধ। তিনিও শরৎচন্দ্রের মত উপলব্ধি করেছিলেন যে—সমাজের চোখে যারা পতিতা, তাদের কেউ কেউ মনুষ্যত্বের পরিমাপে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ মানদণ্ড ছাপিয়ে যেতে পারে। সমাজের এই একটি সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে নজরুল এদের দেবীর আসনে বসান নাই। বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে এদের তিনি দেখেছেন—গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন এদের দুঃখ, ব্যথা—তাই তাঁর পৌরুষ কণ্ঠে এদের সমবেদনায় ধ্বনিত হ'য়েছে—

"তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি;
আমাদেরই মত খ্যাতি যশ মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।—"

নারীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "কবিরাণী"তে। এখানে তিনি বলেছেন, তাঁর প্রেয়সী তাঁকে ভালবাসে বলেই তিনি সত্যিকারের কবি হ'তে পেরেছেন। তাঁর প্রেয়সীর মধ্যেই তিনি তাঁর কবি-সত্তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন—

"তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।
* * * *
তুমি ভালবাসো ব'লে ভালবাসে সবাই?

এর মধ্য দিয়ে কবি দেখাতে চেয়েছেন নারীর প্রেম পুরুষকে কত মহীয়ান্ করে তোলে—পুরুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়।

"আপন জেনে হাত বাড়ালো—
আকাশ-বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলায় সন্ধ্যা-তারা পুবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালবাসো ব'লে ভালবাসে সবাই?

এইখানে দেখি, কবি তাঁর প্রেয়সীর ভালবাসার সঙ্গে নিখিল ভালবাসার অভিন্নতা অনুভব করেছেন।

"অ-নামিকা"তে কবির প্রেয়সীকে নিখিল প্রণয়িনী-রূপে দেখিয়েছেন। এই কবিতাতে কবি দেখাতে চেয়েছেন দেহাতীত প্রেমের আদর্শকে। মানবীয় প্রেম অনন্ত প্রেমের শান্ত প্রকাশ। এই অখণ্ড অনন্ত প্রেমকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর প্রেয়সীর মধ্যে। শাশ্বত প্রেমের স্বরূপ তিনি তাই দেখাতে চেয়েছেন—তাঁর এই কবিতায়। প্রেম ও সৌন্দর্য্য যেখানে বিরাজ করে—সেখানে আসে না কখনও জরা, বার্দ্ধক্য। তাই বিশ্ব-প্রণয়িনী অনন্তযৌবনা। কবিও তাঁর প্রণয়িনীর মধ্যে দেখেছেন সেই অনন্তযৌবনকে। নজরুল তাই অনন্তযৌবনা তাঁর প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"তুমি নহ নিবে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি,—"

জন্ম-জন্মান্তর ধরি 'লোকে লোকান্তরে তোমা' করেছি আরতি।

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, অবিনশ্বর—তার মধ্যেই কবি দেখেছেন—তাঁর বিশ্ব-প্রিয়তমাকে পরিব্যাপ্ত রূপে। জগতের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যেই দেখেছেন তিনি নারীর বিশেষ রূপকে। কবি তাঁর প্রেয়সীর মধ্যে পেয়েছিলেন চির সত্য ও চির সুন্দরের সন্ধান। তাই তাকে তিনি নিখিল প্রণয়িনীরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁকে তিনি দেখেছেন গোপনচারিণী-রূপে ও বিশ্বের আধার-ভূতা-রূপে। সেই গোপন প্রিয়ার উদ্দেশে তিনি গেয়েছেন তাঁর 'গোপন প্রিয়া'য়—

"তোমায় পেলে থামত বাঁশী,
আসত মরণ সর্বনাশী।
পাইনি ক' তাই ভ'রে আছে আমার বুকের কোলে।"

বাস্তবিকই পাওয়ার মধ্যেই চাওয়ার মৃত্যু ঘটে। যতক্ষণ আমাদের ঈপ্সিত বস্তু আমাদের অধিকারের বাইরে থাকে—ততক্ষণই তাকে পাওয়ার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। আলেয়ার মত অনুক্ষণ আমরা তাকে আয়ত্তাধীনে আনবার জন্য ছুটে বেড়াই। কিন্তু সে যখন ধরা পড়ে—তখনই পরিপূর্ণরূপে নিঃশেষ হ'য়ে যায়

—তার সব 'চরম' বা সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য। পাওয়ার মধ্যেই যদি চাওয়ার সমস্ত আনন্দ-রস নিঃশেষ হ'য়ে না যেতো—তবে এই বিশ্বজগত নিশ্চল হয়ে পড়'ত। কিন্তু পাওয়ার মধ্যেই চাওয়ার অবসান হয় না বলেই—আরও কিছু নূতন জিনিষ পাওয়ার জন্য মন তখন আবার ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। পুরাতন এই বিশ্বজগতকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায়—কিন্তু নূতন এসে তাকে স্থানচ্যুত করে। তাই অহর্নিশি চলছে দ্বন্দ্ব নূতন ও পুরাতনের মধ্যে। সৃষ্টির মূলে এই গতিশীলতাই অনন্ত কাল হ'তে চলে আসছে। এই গতিশীলতা বন্ধ যে দিন হ'বে—পৃথিবীও সে দিন হবে ধ্বংস। তাই তো পুরাতনের সমাধির ওপর গড়ে ওঠে নূতনের সাম্রাজ্য। মৃত্যুর মধ্যে থাকে সৃষ্টির গোপন ব্যথা, জন্ম-মৃত্যু, ধ্বংস ও সৃষ্টি এই নিয়েই চলেছে আমাদের এই বিশ্বজগৎ। এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন নজরুল।

নজরুল সাহিত্যে আমরা দেখি নারীকে—কল্যাণময়ী জননী, পতিব্রতা স্ত্রী, স্নেহময়ী ভগিনী, বিলাসসঙ্গিনী বারাঙ্গনারূপে। নারীর প্রেমের প্রতি আছে কবির গভীর শ্রদ্ধা। তাই তিনি তাঁর প্রেয়সীকে নিখিল প্রণয়িনীর অংশরূপে দেখেছেন বা কল্পনা করেছেন। নারীর প্রেম, কবিকে দিয়েছে প্রেরণা ও উৎসাহ—তার সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে সুন্দর, নির্মল রূপে। তাই জীবনের মধ্যাহ্নেই তাঁর সায়াহ্নের কালো ছায়া নেমে আসাতেও—নারী জাতি তাকে ভুলে নাই। তাঁর উদ্দেশ্যে তারা জানায় গভীর শ্রদ্ধা।

কদলী

শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

গত আশ্বিন মাসের মাসিক 'বসুমতী'তে "কদলী" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে ভারী ভালো লাগল।

সত্যই অপরূপ ফল এই কদলী। তা কি অপক্ব আর কি সুপক্ব। অপক্ব অর্থাৎ কাঁচাকলাও তরকারি হিসেবে খেতে মন্দ নয়। সুক্ত ও রোগীর ঝোলের ত অপরিহার্য্য অঙ্গ। আবার নিরামিষাশীদের মোগলাই-খানার স্বাদও দিতে পারে এই কাঁচকলা। সামান্য হিং দিয়ে রান্না কাঁচকলার কোপ্তা, কাটলেট, গুলিকাবাব অতি সুস্বাদু খেতে হয়। "কাঁচকলা খাও" বলে গাল দেওয়া হলেও কাঁচকলা নেহাৎ ফেল্না নয়। কিন্তু আমার এই লেখা শুধু কদলী-প্রশস্তি নয়, কদলী বৃক্ষ-প্রশস্তিও বটে।

ভেবে দেখুন, কলাগাছও তার ফল অপেক্ষা কোন অংশে কম যায় না। তার এমন কোন অংশ নেই, যা মানুষের প্রয়োজনীয় নয়। প্রথমেই ধরুণ মোচা; কলার ফুল। তার থেকে কলার কাঁদি বার হয়ে গেলে মোচা কেটে নিন। আবার গর্ভমোচা হলে ত কথাই নেই, চমৎকার তরকারি। ঘণ্ট, ডালনা থেকে সুরু করে চপ কাটলেট যা রাঁধুন তাই সুখাদ্য। তারপর কলা পাকলে কাঁদি কেটে এনে ঘরে রাখুন। ঠাকুর-দেবতাকে দিন, নিজেরা খান, পাড়ার লোককে দান করুন। ইহকাল পরকালের কাজ হবে। দেবতা গণদেবতা খুসী থাকবেন।

এর পর পাতা। নেমন্তন্ন বাড়ীর অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বাংলার হিন্দু-মুসলমান একে সমান ভাবে ব্যবহার করেন। কেউ বা উল্টো করে কেউ বা সোজা করে। মুসলমানেরা শুনেছি কলাপাতার উল্টো পিঠে খান। আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগলেও স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালোই বোধ হয়। কলাপাতার সোজা দিকে পাখীরা নানা রকমে ময়লা করে রাখে। কিন্তু উল্টো দিকে সে সম্ভাবনা অনেক কম। অবশ্য ব্যবহারের আগে ভালো করে ধুয়ে নিলে আর কোনও দোষ থাকে না। বাস্তবিক নেমন্তন্ন বাড়ীতে কলাপাতায় না খেলে নেমন্তন্ন খাওয়ার অর্দ্ধেক আনন্দই যেন নষ্ট হয়ে যায়।

সামিয়ানার নীচে অথবা হোগলা-ছাদের তলায় পঞ্চাশ-ষাট খানা কলাপাতা পড়েছে। সবাই বসে গেলেন খেতে। কোমরে গামছা বেঁধে অথবা আর একটু বেশী ভব্য হলে তোয়ালে বেঁধে ছেলের দল ছুটোছুটি করে এর পাতা মাড়িয়ে ওর গেলাশ ফেলে দিয়ে পরিবেশন করছে। কর্ত্তাদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে চার দিকে নজর দিচ্ছেন, "ওরে এ পাতে দুটি মাছ দিয়ে যা ও পাতে একটু মাংস"। নিমন্ত্রিতের দল সুপ্-সাপ্ শব্দে কুপ-কাপ খেয়ে চলেছেন। তারপর এল দই-মিষ্টির পালা।

ততক্ষণে পেট বেশ ভরে গিয়েছে। "আর পারব না, আর খাব না" করতে করতে দু'-চার হাতা দই পাতে পড়ে গেল, চার-পাঁচটা মিষ্টি। হাত নেড়ে মানা করতে গিয়ে হাতের ওপরেই কিছু বা দই পড়ে গেছে।

কি করবেন, এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে গেরস্তের অপচয় ত করা যায় না। তাই হাত চেটে নিয়ে পাতের দই-সন্দেশে মনোনিবেশ করলেন।

হাপুস্-হুপুস্ শব্দে হাত চেটে, পাত চেটে তিন দিনের খাদ্য এক দিনে খেয়ে হেউ-হেউ করে ঢেকুর তুলতে তুলতে খাওয়া শেষ করলেন।

কোথায় লাগে এর কাছে সাহেবী খানার রীতি!

সেখানে সভ্য-ভব্য হয়ে চেয়ার-টেবিলে খাওয়ার ব্যবস্থা। দামী কাচের বাসন, কাঁটা-চামচ ইত্যাদি। মিহি সুরে গুঞ্জন করে কথা বলবেন। খেতে গিয়ে মুখে একটু শব্দ হবে না, হাতে একটু দাগ লাগবে না, আধখানা চপ্, সিকিখানা ওমলেট খেয়ে বলবেন, "উঃ, বড্ড পেট ভরে গেছে।" তার পর বাড়ী এসে পেট ভরে খেয়ে চিত্ত এবং পিত্ত উভয়কে ঠাণ্ডা করবেন। দূর'দূর, ঐ কি আমাদের হাতচাটা পাতচাটা ভেতো বাঙ্গালীর পোষায়?

এই ত গেল কলাপাতায় নেমন্তন্ন খাওয়ার কথা। তা ছাড়া বাড়ীতেও দেখুন, চাকরের অসুখ, নয় ত ঝি পালিয়েছে, যা আজ-কাল আকৃচার হচ্ছে। তখন কলাপাতা কি উপকারে না লাগে। বাসন মাজার হাঙ্গাম অনেক কম হয়। পেট ভরে খেয়ে তখন বাসন মাজা যে কি হাঙ্গাম তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কলাপাতায় খেয়ে, পাতা মুড়ে সটান ফেলে দিয়ে আসুন নিশ্চিন্ত।

পাতাপর্ব্ব শেষ হ'ল, এবারে গাছ। কলা পেকে গেলে কাঁদি কেটে নিলেন, কলাও পেলেন, এবারে গাছটি কাটুন। ভেতরে দেখুন

খাসা থোড়। ছেঁচকি, ঘণ্ট, দুধ থোড়, খাড়া, বড়ি, থোড় কত রকম খেতে চান? বাড়ীতে নিরামিষাশী কেউ থাকলে তাঁর সেদিন মুখ বদলাবার উপকরণ জুটল।

আবার কলার ভেলাও খুব উপকারে লাগে। বর্ষাকালে নদী-প্রধান দেশে বাড়ীতে বাড়ীতে কলার ভেলা বড় কাজ দেয়। বিশেষ করে আমরা জলপাইগুড়ি জেলার লোক; বর্ষাকালে প্রাণ হাতে নিয়ে বাস করি। আমাদের বন্যার দুরবস্থার কথা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং কলার ভেলার উপকারিতা খুব বুঝি। বর্ষাকালে মাসের মধ্যে তিন বার করে তিস্তার কাদাগোলা 'বেনোজল' বিনা নোটিশে এবং বিনা অনুমতিতে বাড়ীর মধ্যে হুড় করে ঢুকে পড়ে। তার পর বাড়তে বাড়তে উঠোন, আঙ্গিনা ভরে গিয়ে বারান্দা বা ঘরের কানায় কানায় এসে ঠেকল। অবশ্য বেশী করুণা হলে ঘরে-দোরেও ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে। যাই হোক, তখন কলার ভেলাই একমাত্র বাহন এ-ঘর ও-ঘর করার। কারণ, বাড়ীর উঠোনে কোমর অথবা বুক-জল। স্বল্প-পরিসর জায়গায় নৌকা চলাচল করা যাবে না। তখন কলার ভেলাই একমাত্র সম্বল। কয়েকটি কলাগাছ সমান মাপে কেটে দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে একটি চৌকো বা সামান্য লম্বা একটি তক্তার মত তৈরী করা হয়। তাকেই বলে ভেলা। মন্দ লাগে না ভাবতে, ভেলায় করে এ-ঘর ও-ঘর করে জিনিষ-পত্র সব সম্ভব মত উঁচু জায়গায় তোলা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সব শোবার ঘরে এনে রাখা হচ্ছে। জল আরও বেড়ে গেলে যাতায়াত ত আর সম্ভব হবে না? দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার মধ্যেও বেশ একটা বৈচিত্র্য আনে। অবশ্য ভালো ভাবে ভেলা চালাতে না জানলে উল্টে পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, ভেলা উল্টে পড়ে গিয়ে বেশ খানিকটা নাকানি-চোবানি খেয়ে কাদা-জলে স্নান করে, অন্য লোকের হাসির খোরাক এবং নিজে বিরক্তের একশেষ হয়ে ঐ ভেলাতে উঠেই ঘরে এসে ঠেক্‌লেন।

অবশ্য জল যদি অল্প থাকে তবেই। নইলে হাসির খোরাক না জুগিয়ে ত্রাসের কারণই হবেন। আবার ভেলার সাহায্যে এ-বাড়ী ও-বাড়ীও করা যায়। অভিজ্ঞ কাণ্ডারী হলে নদী পারাপারও করা চলে। কথিত আছে যে, সতী বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে এই ভেলায় চড়েই নদী বেয়ে গিয়েছিলেন স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে।

শুধু জীবন নয়, মরণেও কলাগাছের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। প্রথম দফাতেই, প্রেতান্ন দিতে শ্মশানে প্রয়োজন হবে তার খোলার। দ্বিতীয় দফায় তার পত্রে ও ফলে হবিষ্যের ব্যবস্থা; তৃতীয় দফায় শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডদান হবে সেই কলার খোলায়, তার পর চরম

দফায়, "গয়া-গঙ্গা-গদাধর-হরি" উচ্চারণ করে প্রেতকে বৈতরণী পারে পৌঁছে দিতে কলার খোলার বাহনই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আবার এই কলাগাছের ছাল পুড়িয়ে সোডার মত কাপড় কাচার ক্ষার তৈরী হয়। ধোপাদের কাপড়-জামা পরিষ্কারের কাজে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এই কলার বাসনায় আগুন দেওয়ার কথা, একটি ধোপার মেয়ের মুখে শুনেই বিখ্যাত জমিদার লালাবাবু নিজের বিষয়-বাসনায় আগুন দিয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যান।

তার পর আজ-কাল বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে কলাগাছের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে গেছে। কলাগাছের কেঁাসা বা আঁশ বার করে তার থেকে নকল সিল্কের সুতো তৈরী হয়। বাজারে চালু সস্তার সিল্কের শাড়ী, পিস্ সব কলা গাছের কেঁসো থেকে তৈরী বলে শোনা যায়।

এ ত গেল কলাগাছের বিভিন্ন অংশের মহিমা কীর্ত্তন। তার পর হিন্দুদের যাবতীয় শুভ কর্ম্মে কলাগাছের প্রয়োজন। অন্নপ্রাশন থেকে সুরু করে পৈতেয়, বিয়ের সময় বাড়ীর দরজায় শুভ চিহ্নস্বরূপ কলাগাছ পুতে 'মঙ্গলঘট' বসানো হয়। পৈতের সময় অধিবাসের স্নান হয় এই কলাতলায়। বিয়ের সময়ের কথা ত বলাই বাহুল্য। চার দিকে চারটি কলাগাছ পুতে তারই ভেতরে হবে 'গায়ে হলুদ' দেওয়া থেকে সুরু করে স্ত্রী-আচার সম্প্রদান, মায় বাসি বিয়ের শেষে 'দিক্ প্রদক্ষিণ' পর্য্যন্ত। অবশ্য দেশাচার ভেদে নিয়মের একটু এ-ধার ও-ধার হয় কিন্তু কলাগাছের দরকার ঠিকই হয়।

তারপর পূজার উৎসবেও কলাগাছের চাহিদা বড় কম নয়। দেওয়ালীর রাত্রে বাড়ীর সামনে কলাগাছ লাগিয়ে তার উপর বাঁশের চ্যাচাড়ি সাজিয়ে রকমারী কেয়ারী করে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। পাড়ার লোকে ধন্যি ধন্যি করবে। নিজেরাও দেখে খুসী হবেন। মফঃস্বল সহরে এই দেওয়ালীর রাত্রে মাড়োয়ারী পটীতে ও বাজারে কলাগাছের সারিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে এমন সুন্দর সাজান হয় যে তাই দেখতেই সহর ভেঙ্গে লোক আসে।

তাই বলছিলাম জীবনে, মরণে, সুখে, দুঃখে, উৎসবে, ব্যসনে এই কলাগাছের সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই দেবীরূপেও তাঁকে আমরা পূজা করি। কলা-বউ না হলে দুর্গাপূজাও সম্পূর্ণ হয় না। নতুন লালপেড়ে সাড়ী পরে একগলা ঘোমটা টেনে 'কলা-বউটি' সেজে আবহমান কাল থেকে গণেশের স্ত্রীরূপে মা দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আমাদের পূজা পেয়ে আসছেন।

সেখানে 'তিনি সিংহবাহিনী, অসুরদলনী শাশুড়ীর শান্ত-শিষ্ট লজ্জাশীলা পুত্রবধূ। তাঁর এই রূপ কল্পনা করে অতীতের কোনও দরদী কবি ভারী মজার একটি গান লিখেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর লেখা অজস্র গান আজ বাংলা দেশের গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করে রেখেছে, তাঁরও ছেলেবেলায় প্রিয় ছিল সেই গানটি :—

"গণেশের মা, কলা-বউকে জ্বালা দিও না,
তার একটি মোচা ফললে পরে, অনেক হবে ছানা-পোনা।"

ইন্দ্রাণী

মিতা দাস

ইন্দ্রাণীর চিঠি এসেছে—

অজয় সারা রাত ঘুমতে পারেনি—চোখের কোণে ক্লান্তির কালো ছায়া ; দুর্ভাবনায় মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। একটা পরাজয়ের গ্লানি তাকে বিঁধছে। অজয় খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে—পুরোনো গৃহসজ্জাগুলি অতি পরিচিত—এমন কি তার নিজ হাতে গড়া বাগান—তা-ও মনে হচ্ছে এক ঘেয়ে। বাস্তবিক যে জীবনে বৈচিত্র্য নেই সে জীবন তো মৃত্যু!

সবই অজয় পেয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী, সমাজে প্রতিষ্ঠা, জীবনের কানায় কানায় তার সুখ—কোন মধু থেকে সে বঞ্চিত নয়। কিন্তু তবুও কেন তার ঘটল এই চিত্ত-বৈকল্য? ঘুম থেকে এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়াতে স্ত্রী অশোকা সত্যিই অবাক হয়ে গেছে।

"শরীর ভাল ত?"—জিজ্ঞেস কোরল স্বামীকে।

হুঁ—ভালই, বলে অজয় চলল তার লাইব্রেরী-ঘরের দিকে। 'বাঁচলুম' বলে অশোকা গেল চায়ের যোগাড়ে।

তিন পুরুষের ব্যারিষ্টার অজয়দের পরিবার, অনেক কথা মনে পড়ল তার ঘরে ঢুকে। অজয়ের মনে পড়ল, একই সঙ্গে অজয় আর ইন্দ্রাণী বেড়ে উঠেছিল—যেন এক বিরাট বাগানের দুটি চারা গাছ—

ইন্দ্রাণী দু' বছর বয়সে মা হারিয়ে এল অজয়ের আশ্রয়ে। অজয়ের মা চারুশীলা দেবী হাত বাড়িয়ে নিলেন শিশুকে। ইন্দ্রাণীর দাদামশাই চারুশীলা দেবীর বাপের বাড়ির দেওয়ান।—সেই সম্পর্কে ইন্দ্রাণী পেল আশ্রয়—আর বিধাতা পুরুষ হয়তো সেই দিনই—তৈরী করলেন ইন্দ্রাণীর ভাগ্য।

অজয় আর ইন্দ্রাণী জানত মিলন তাদের হবেই—সেইটি সত্য—সেইটি নির্ভুল—কেন না, এই সত্যের মধ্যে অলীকতার কোন দাগ নেই। কিন্তু ঘটল ছন্দপতন—তখন ইন্দ্রাণী আই এ পড়ছে আর অজয় ব্যারিষ্টার হতে বিলেতে গেছে। চারুশীলা দেবী মারা গেলেন ক্যানসারে—সতের বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন—হয়তো শান্তি তিনি পেলেন।

ইন্দ্রাণী আবার দ্বিতীয় বার মাতৃহীনা হোল। সে কি করবে—কোথায় যাবে—এই সংসারে তার কি অধিকার আছে? অজয় বিলেতে। সে-ও আজ-কাল চিঠিপত্র কম লেখে। ইন্দ্রাণী জানতে চাইল অজয়ের কাছে—সে কোথায় থাকবে। অজয় লিখল, "তোমার

নামে মা যে টাকা উইল করে গেছেন সেটা নিয়ে তোমার মামার কাছে। যাও পড়া ছেড় না, আমি ফিরে এলে ব্যবস্থা হবে।"

ইন্দ্রাণীর মনে আঘাত লাগল, উইল সে নিল না। নিঃসম্বল অবস্থায় ফিরে এল সে আপন জনের কাছে—যেখানে আছে তার দাবী। অনেক কথাই আজ তার মনে পড়ছে। স্বপ্নের মত মনে পড়ে তার অজয়দের সংসার—মনে পড়ছে মা চারুশীলা দেবীর অগাধ স্নেহ।

সুখে-দুঃখে মানুষের দিন যায়, ইন্দ্রাণী মামার কাছেই আছে। গরীব মামা, ভাগ্নীকে সাধ্য মত যত্ন করেন। ইন্দ্রাণী বি, এ পাশ করল।

অজয় দেশে ফিরে এসেছে। ইন্দ্রাণী শুধু জানতে পারল অজয় বিলেতেই একটি বাঙ্গালী মেয়েকে বিয়ে করেছে। ইন্দ্রাণী ভাগ্যকে দোষ দিল না, ভাবল, এই ত মানুষের ইতিহাস! এর মাঝখান দিয়েই চলতে হবে।

দশ বছর পরে।

হঠাৎ একদিন অজয় চিঠি পেল ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে। ইন্দ্রাণী লিখেছে, "ভাগ্যকে আমি অন্বেষণ করিনি, বুদ্ধিকে আমি বিভ্রান্ত করিনি। তাই তোমার শান্তিময় জীবনে এসে অশান্তি আমি ঘটাইনি। নিজেকে পলে পলে ক্ষয় করেছি—কিন্তু তার জন্য আমি নালিশ জানাচ্ছি না তোমাকে। বিধি আমি মানি, বিধি মানুষকে দান করে, আবার তা ছিনিয়ে নেয়। আমি মাতৃহীনা মেয়ে পেয়েছিলাম মা চারুশীলাকে; আর পেয়েছিলাম তোমার মত সখা। মানুষ মাত্রই দুর্ব্বল। তাই তোমার দিক থেকে যখন পেলুম অবজ্ঞা—আমি ব্যথা পেলাম, অভিমান হ'ল—ভেবেছিলাম হয়তো অভিমান ভাঙতে তুমি আসবে—কিন্তু এলে না। যাক্, এই দশ বছরে আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ভারতবর্ষের অনেক তীর্থে আমি ঘুরে এসেছি কিন্তু শান্তি পেলাম না।

"স্কুলে চাকরী করে যে টাকা জমিয়েছিলাম—তা দু' বছর তীর্থ-ভ্রমণে ফুরিয়ে এসেছে—পুঁজি আজ শূন্য, কিছু টাকা ভিক্ষে দিও।

"আমি বর্ত্তমানে পুরীতে আছি। সামনের সপ্তাহে আমাদের আশ্রম থেকে এক দল কন্যাকুমারিকার পথে যাত্রা করছেন—আমি তাঁদের সঙ্গী হতে চাই।"

অজয় ভাবছে, একবার সে নিজেই পুরী যাবে কি? কিন্তু কি নিয়ে সে দাঁড়াবে ইন্দ্রাণীর কাছে? নির্ম্মম এক অসহায়তায় অজয়ের হৃদয়-মনের সমস্ত অনুভূতি খণ্ডিত।

অপরাধী সে, মুখের সামনে দাঁড়াবার সাহস তার নেই—কিন্তু সেই দিনই অজয় ইন্দ্রাণীর পুরীর আশ্রমের ঠিকানায় টাকা পাঠাল; অজয় চিঠিতে লিখল্—

"ইন্দ্রাণী! আমাকে ক্ষমা কর—তোমার সামনে দাঁড়াতে আমি ভরসা পাই না। যদি আজ্ঞা কর একবার তোমার সাথে দেখা করতে চাই।"

ইন্দ্রাণী জবাবে লিখল: "সখা, যারা আপন, তারাই যায় দূরে চলে। যারা প্রিয় তারাই দেয় দুঃখ। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ব্যথায় রঙ্গীন, বিরহে ভরা, তাই সে দুর্লভ—আমাকেও তুমি সে দুর্লভের মূল্য দিতে দাও। অজয়, আমি দুর্ব্বল, ঘরের ভেতরে আমাকে আর ডেক না, পথই আমার বন্ধু। হোক্ পথ দুর্গম, তবুও আমার পথেই চলতে হবে, নিজের প্রতি উচ্চারণ করতে হবে আশার বাণী।"

কদলী

শ্রীমতী অংশুমতী দেবী

(১৩৬১ সালের আশ্বিন মাসের বসুমতীতে 'কদলী' পড়ে একটা গল্প মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছে শোনা)

এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক মেয়ে। মেয়েটির এক সওদাগরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। মেয়েটির স্বামী বাণিজ্যে গেছেন একবার।

কি একটা যোগ উপলক্ষে সকলে গঙ্গাস্নান করছেন, রাজকন্যাও গেছেন। রাজকন্যা জলে নামতে অন্য মেয়েরা কেউ জলে ভরসা করে নামলে না, তীরে দাঁড়িয়ে রইলো। একটি চাষার মেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জলে নেমে পড়লো। রাজকন্যা রোষকটাক্ষে তাকে দেখে নিলেন; তারপর আপন মনে এই কথাগুলি বললেন,—

"জল জল গঙ্গাজল সোয়ামী ভাল সদাগর
নারীর মধ্যে সফলা ফলের মধ্যে কমলা।"

সেই কথা শুনে চাষার মেয়েটি তাঁকে শুনিয়ে এই কথাটি বল্লে,

"জল ভাল ভাসা সোয়ামী ভাল চাষা
নারীর মধ্যে হেতুলী ফলের মধ্যে কদলী।"

রাজকন্যা বাপের কাছে কেঁদে পড়লেন, "চাষার মেয়ে আমায় অপমান করেছে।" তক্ষুণি পাইক ছুটলো চাষার মেয়েকে ধরে আনতে।

"আমার মেয়েকে কি বলেছিস?"

চাষার মেয়ে বললো, "ওঁকে আমি কিছুই বলিনি, উনি আমায় দেখে একটি স্বগতোক্তি করেছেন আমিও তাই করেছি। উনি বলেছেন, সওদাগর সোয়ামী ভাল, কমলা ভাল। আমার মতে চাষা সোয়ামী হলে একসঙ্গে খাটি-খুটি, একসঙ্গেই আমোদ-আহ্লাদ করি, ছাড়াছাড়ি নেই, এক পয়সায় দশ-বারোটা কলা কিনে সকলে ভাগ করে খাই। এক পয়সায় একটা কমলা কিনে একজনে খেয়ে কি হবে? সোয়ামী যদি আট-দশ মাস বিদেশেই রইলো তো সুখ কি? আর গঙ্গাজল তো ঘোলা আর সফলা নারীর চেয়ে একটি দুটি সন্তান হওয়াই ভালো।"

রাজসভার পণ্ডিতেরা বললেন, "চাষার মেয়ের কথাই ঠিক।" রাজকন্যা মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শুভেন্দু ঘোষ

বছর দশেক বয়সের একটি মেয়ে জানলায় বসে পা দুলিয়ে সুর করে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। পরের কল্যাণ করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য। বুড়ো হতে চললাম, আজও নিজের জীবনের কী যে লক্ষ্য তা নির্ণয় করতে পারিনি; তাই চোখ তুলে মেয়েটার দিকে চেয়ে নিলাম। নাঃ, এ পাঠ সে মুখস্থ করলেও পরীক্ষা শেষ হতে না-হতেই ভুলে যাবে,—ইস্কুলের পরীক্ষা, জীবনের নয়—সে পরীক্ষা শেষ হলে তো এ-শিক্ষার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। ভাগ্যিস্, এ-পাঠ ঐ দশ বছরের মেয়েটা ভুলে যাবে। না বুঝে কণ্ঠস্থ করা সময় ও মনঃশক্তির অপব্যবহার হতে পারে; সামান্য বুঝে এ-পাঠ গ্রহণ করা যে মারাত্মক—এই সব ভাল ভাল হিত কথাও। মেয়েটার যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত চাণক্য শ্লোক পড়া বলে যত বিষ্ণে-দিগ্‌গজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এইটুকুই সান্ত্বনা! বলিহারি সেই পণ্ডিতের, যিনি দশ-এগারো বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্যে এমন পাঠ রচনা করেছেন! আমাদের পরম ভাগ্য যে, এই 'দার্শনিকদের দেশে'ও শিষ্যরূপে এখনো মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেনি,—সবজান্তা পণ্ডিতরা যদি আরও কিছুকাল আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন তাহলে সেদিনও হয়তো খুব দূরে নয়। আমাদের পরম ভাগ্য যে, শিশুরা এখনো জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; রোগ না হলে কেউ স্বাস্থ্যের কথা ভাবে না, জীবনে শ্রান্তি না এলে কেউ জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে মাথা ঘামায় না। ভীমরতি-ধরা পণ্ডিতরা জীবনের লক্ষ্য নিয়ে থাকুন, ছোট ছেলে-মেয়েদের তা নিয়ে ভাবিয়ে তুলবার এ অপচেষ্টা কেন? এ যে নিষ্ঠুর মূঢ়তা, ক্ষমাহীন পাপ!

গ্রাম্ভারি চালে জীবন সম্বন্ধে বড় বড় গাল-ভরা কথা ব'লে যতই হাততালি মিলুক, সরল সত্য জানা বা প্রকাশ করা পেশাদার পণ্ডিতদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাদের কারবার হচ্ছে বাজার-চলতি সত্য নিয়ে, যা সত্যের মত দেখতে হলেও বড়-জোর অর্দ্ধ-সত্য। পরের কল্যাণ করা মানব-জীবনের লক্ষ্য—এই কথাটা কি সত্য? ধোপে টেকে কি? এ ধরণের বড় কথার বিচার করা যায় বহু ভাবে। পরহিত করাটাকে সাধারণ মানুষ লক্ষ্য বলে যদি বা মুখে মানে, কাজে মানে না। আদর্শ হিসাবেও কথাটা স্বীকার্য্য নয়। হিন্দুদর্শন পরা মুক্তিকে জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করেছে—পরহিত সে লক্ষ্যে পৌছুবার জোর সহায়ক হতে পারে; তার বেশী নয়। তা ছাড়া, কার কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ, নিঃসংশয়ে নির্দেশ করবে কে? কম্যুনিষ্টরা বলেন, ধনিক প্রথা উচ্ছেদ করলে শুধু শ্রমিকদের নয়, ধনিকদেরও—শ্রেণীগত ভাবে না হলেও ব্যক্তিগত ভাবে—কল্যাণ হবে, ধনিকরা তা মানেন না; অর্থাৎ কার কিসে কল্যাণ সে সম্বন্ধে মতভেদের প্রচুর অবকাশ আছে। যুক্তির সাহায্যে কল্যাণ-নির্দেশ সম্ভব বটে, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধির কাছে যুক্তির প্রায়ই ক্ষেত্রে পরাজয় ঘটে—প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ স্বার্থবুদ্ধির উর্দ্ধে উঠে যুক্তির আলোয় পথ দেখে নিতে পারে না। আত্মিক ও মানসিক বিকাশের ভেদ অনুযায়ী মতের ভেদ, জীবন-দর্শনের ভেদ, তার উদারতা সঙ্কীর্ণতা নির্ণীত হয়। স্বার্থভেদের জন্যে দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ ও মতভেদ আজকের বিরোধ-সংকুল বিশ্বে তো হামেশাই চোখে পড়ে। যুক্তিকে মোচড় দিয়ে বিকৃত করার জন্যে অবচেতন মনের সংস্কার তো আছেই। অর্দ্ধসত্যকে মানুষ এই সংস্কার বশেই খুব আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই উক্তিটার মত প্রত্যেকটা বড় কথা নানা দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করা চলে; কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করে কয় জন? করতে পারেই বা কয় জন?

ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে লেখা পাঠ্য পুস্তকে প্রায়ই হিতকথায় ছড়াছড়ি থাকে, বিশেষ করে 'নীতি'-কথার। সুকুমার মতি বালক-বালিকাদের মনে নীতিকথা একটা কোনো মতে গুঁজে দিতে পারলে উত্তর জীবনে তারা আদর্শ নর-নারী হয়ে উঠবে—এই ধারণার দরুণ এই প্রথাটা বহুদিন হতে চলে আসছে। হিত কথা গিলিয়ে তাদের কোনো প্রকার পুষ্টি হয় কি না, এ দেশের শিশুদের শিক্ষার ভার যাঁদের উপর তাঁরা কোনো দিন ভেবে দেখেছেন, বা পরখ করেছেন ব'লে বিশ্বাস হয় না। আমার তো সন্দেহ হয়, দেশে স্বাধীন চিন্তার প্রসার রোধ করার জন্যে এখনও, হয়তো বা কর্ত্তাদের চেতনার অগোচরে, বড় কথার গুরুভার চাপিয়ে শিশুমনের সহজ বিকাশে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

'বড় কথা'র রঙীন্ ধারায় যুক্তির চোখ বুজিয়ে দিয়ে 'মেকী' সত্য চালানো হয়, শিশুদের চোখ নষ্ট করা হয়।

নীতি-কথায় রঙের বা রসের বালাই নাই। তা চিবিয়ে, গিলে, কোনো রকমে পুষ্টি হয় এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। 'সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না'—এ কথা কেতাব বা কারো মুখ থেকে শিখে কোনো ছেলে, কোনো মেয়ে তা পালন করেছে? তারা স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবে, সত্যের উপর কল্পনার রঙ চড়াবে, মজা দেখবে, 'কেমন ঠকাবে,' নিজেদের প্রাণপ্রাচুর্য্যে কত কী করবে। এই তো ভাল, সত্য তারা সহজ ভাবেই বলে। তারা 'মরা' সত্যের বোঝা ঘাড়ে বয়ে বেড়াবে কেন? আবার, ভয় দেখিয়ে—লোভ দেখিয়ে শিশুদের হিত করার চেষ্টাও দেখা যায়। 'মিথ্যে বললে পাপ হয়,—মানুষ নরকে যায়'। "পড়াশোনা করে যে, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে।" ভয় দেখিয়ে অকাজ হয় দেখেছি; লোভ দেখিয়ে কী হয় জানি না।

মনে পড়ে, সেকালে গ্রামের মেলাতে নানা রকম পট বিক্রী হত। দেব-দেবীর ছবি, কত তীর্থের ছবি, আর সেগুলোর সঙ্গে নরকের বিচিত্র ছবি। কী যেন পাপ করাতে একজনের মাথা করাৎ দিয়ে চেরা হচ্ছে, এক জনকে আগুনের উপর ঝলসে মারা হচ্ছে, আর এক জনের জন্যে হয়েছে শূলের ব্যবস্থা। বীভৎস সব দৃশ্য, সেগুলো দেখে ভয়ে রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সেগুলো দেখে কোন পাপ থেকে কখনও নিবৃত্ত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। যদি হতাম তাহলেও নিজেকে কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিতাম; কোনো মতে পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আত্মপ্রসাদ বোধ করতাম না। কারণ, ভয়ই হচ্ছে পাপ—ওটা মনের একটা রোগ; শিশুকে ভয় দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার মনে রোগ সঞ্চার

করা একটা নির্মম মূঢ়তা মাত্র। যা মানুষকে ভয় দেখায়, তার মনকে সঙ্কুচিত করে, তা সত্য হতে পারে না।

সময় নাই, অসময় নাই, যখন-তখন হিত-উপদেশ কথার সার্থকতা সম্বন্ধে আমি তো গভীর সন্দেহ পোষণ করি। হিতোপদেশকদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, জীবনের তুমি কী জানো?—কতটুকু জানো? নিজের জীবনের অতি সামান্য অংশও তোমার জানা নাই। সাধারণ ভাবে মানব-জীবন সম্বন্ধে অন্যকে হুঁসিয়ার করতে যাওয়া তোমার কি অধিকার, বাপু? তোমার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা যদি থাকে, কোনো মোহ না রেখে সে সম্বন্ধে তুমি যদি বিচার করে থাকো আর সেই নির্মোহ বিচার থেকে আনন্দ পেয়ে থাকো, সে অভিজ্ঞতা যদি রস-রূপ লাভ করে থাকে, তবে তা নিঃসংকোচে খুলে ধরতে পারো, তাতে লোকে লাভবান্ হলেও হতে পারে; অন্ততঃ খুশী হয়ে তোমার উপদেশ শুনবে। বাঁধা-ধরা সমাজ-চলতি নীতি কথা—যা নিজের জীবন-কটাহে জারিত করো নাই—তা আওড়ে লোককে বিরক্ত কোরো না। অন্যেরও এ-সব জানা সম্ভব, তাদেরও বিচার-বুদ্ধি কিছু কিছু আছে।

গালভরা বড় বড় হিত কথা বলার পিছনে নানা মৎলব থাকতে পারে। প্রথমতঃ, সস্তায় পরোপকারের পুণ্য লাভ। তা ছাড়া, লোকসমাজে কিছু প্রতিষ্ঠাও পাওয়া যায় হিত কথা ছড়িয়ে। ও-গুলো বরং নিরীহ মৎলব। এর চেয়ে ভয়ানক হচ্ছে হিত কথার ধূম্রজাল রচনা করে তার আড়ালে স্বার্থসাধন—সে-স্বার্থ ব্যক্তিগত হোক বা শ্রেণীগত হোক। যেমন, গান্ধীজীর রাজনীতি ক্ষেত্রে 'অহিংসা' প্রচারের মূলে ছিল, দেশময় বৈপ্লবিক অসন্তোষকে একটা নিয়ম-তান্ত্রিক পথে চালিয়ে দেওয়া। ভাল লোকের মুখেও হিত কথা সন্দেহাতীত নয়—বরং তাদেরই মুখের হিত কথা গভীর ভাবে বিচার না করে গ্রহণ করা উচিত নয়। হিত কথা ধাপ্পাবাজদের হাতে একটা অস্ত্র।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার!
অন্ধ-কারার বন্ধ টুটিছে
নবযুগ খোলে দ্বার
ঝলকে দামিনী প্রলয়-অশনি
গর্জ্জিছে অনিবার।
বাজে দুন্দুভি টুটে শৃঙ্খল,
বিশ্বের হিয়া হ'ল চঞ্চল,
জাগে নির্জ্জিত পতিতের দল;
অমৃতের সাথে যুঝিতে গরল
ছাড়িতেছে হুঙ্কার।
হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার!
হেরি পশুপাশে মানুষের অপমান,
ধরায় ধূলিতে নামিয়াছে ভগবান,
নব-ত্রিবেণীতে করাতে মুক্তিস্নান;
ভাগ্যের হাতে ঘুচাতে অসম্মান,
মুছে নিতে পাপভার।
হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার!
যত আলস্য দাস্যবৃত্তি ভাগে,
ধনপতি শোয়, গণপতি আজি জাগে,
খনি ও ক্ষেত্র ভ'রেছে উষার ফাগে,
অসুর হস্তে সুর-তনয়ের যাগে,
শঙ্কা নাহিক আর।
রাজ-সভাতলে যে বীণা বেজেছে
গেছে তার ছিঁড়ে তার।
হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার!

বিজয়িনী

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

হে পরমা সুন্দরি!
জানি না কি ব'লে তোমায় বন্দনা করি।
যুবা এক সুকুমার মতি, বলিষ্ঠ কর্মঠ প্রাণোচ্ছল অতি
ফুটেছিল শ্রেষ্ঠতম প্রাণ-শাখা হ'তে,—
তোমার উদ্দাম যৌবনের স্রোতে
অকস্মাৎ খসায়ে সে পবিত্র কুসুম দিলে তাকে মরণের ঘুম।
কলাবতী, কোন সুখে হাস্যমুখে
সাজাইয়া সর্বনাশা রূপের পসরা,
সংসার-অনভিজ্ঞে ভুলাইলে ত্বরা?
ওগো বিজয়িনী, তোমার বিলাসে—
সর্ব-শক্তি-উদ্দীপনা-আশে
চূর্ণ করি, ধ্বংস করি, কলুষিত করি প্রাণ-বায়ু
হরণ করিল তার আয়ু।
আত্মার মৃত্যু হ'লো, সৌন্দর্য হ'লো ধিক্‌কৃত,
চরিত্র হ'লো বিকৃত,
জেনো এর পরিণামে, বাঁচিবার মতো তার শক্তি যদি থাকে
শত শত রমণীর শত্রুরূপে গড়িলে তাহাকে।
আপাততঃ তব এই অভিনব মিটাইতে ক্ষণিকের সাধ
রূপের নেশায় তাকে করিয়া উন্মাদ
অকস্মাৎ নিক্ষেপ করিলে তাকে নভ-চ্যুত তারকার মতো,
পরাগ-লাবণ্য-মাখা পবিত্র আত্মায় হ'য়ে ক্ষত-বিক্ষত
হতাশার অতল তলে ডুবে গেল নিষ্পাপ তরুণের প্রাণ;—
এই-ছিল বিধির বিধান!
হাসি পায় ফেলিতেও দীর্ঘশ্বাস প্রকৃতির এ কী পরিহাস—
তবু বহু তরুণের চিত্ত-মন্দিরে তুমি সৌন্দর্য-দেবীর রূপে
নিত্য আরতি পাও প্রণয়ের ধূপে।

কোট

নীহার গঙ্গোপাধ্যায়
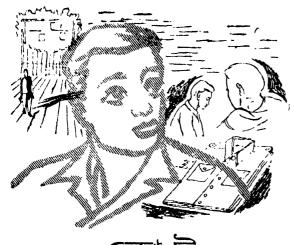
নিরালায় বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছিলো সুব্রত, কি করে জব্দ করা যায়,—জব্দ করা যায় ঐ চাকরটাকে! কথাটা শুনে চম্‌কে উঠেছেন তো?—চমৎকাবার কথাই! এক মাস টেনে কাজ করিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেখিয়ে বিদায় করলেই তো যথেষ্ট, এর জন্য চোখ কপালে তুলে ধোঁয়া ছেড়ে চোখে ধোঁয়া দেখার কি কোন মানে হয়? কিন্তু হয়, কেন জানেন, এখানে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। চাকর যদি ঠিক চাকর-মার্কা হয় তাকে নিয়ে কি আর কোন গোল বাধে? মুস্কিল, মনিব-মার্কা চাকর নিয়ে পাশাপাশি বসে থাকলে ভৃত্যে আর কর্ত্তায় যদি তফাৎ না বোঝায় রাগে চোখে জল আসে না কার? হ্যাঁ, চাকর বটে ঐ নেপালদের! কালো, রোগা লিক্‌লিকে চেহারা, মাথার চুল ইঞ্চিখানেকেরও কম ছাঁটা, হাঁটুর ওপর কাপড়, মুখে সর্ব্বদাই কেমন একটা বোকা-বোকা হাসির ভাব, কারণে-অকারণে কান প্যাঁচাও, গাঁট্টা কষাও, মুখ ভ্যাংচাও বেঁকে দাঁড়াবার সাহস আছে? চেহারায়, স্বভাবে ঠিক চাকরের মত চাকর। আর ইনি, মানে আমাদেরটি,—এতো পরিষ্কার যে রোজ নাইবার সময় জামা-কাপড়ে সাবান ঘসা হয়, গরম জলের কেটলির চাপে জামা ইস্ত্রি করা হয়, মাইনের অর্দ্ধেক বোধ হয় জামা-কাপড় কিনতে আর সাফ করতেই চলে যায় বাবুর! কি কুক্ষণেই যে বাবা ওকে স্থান দিয়েছিলেন বাড়ীতে, আজ পর্য্যন্ত একটা ফাঁকিও ধরতে পারলাম না কাজের, যে ছুতো ধরে তাড়াবো। বাবা 'ভীম নাগ' ছাড়া সন্দেশ খান না কিন্তু মোড়ের মাথায় ঐ দোকানটায় বেশ জানি, 'ভীমনাগ' হার মানায় এমন জিনিষ তৈরী করে, তবু কি জল, কি রোদ ঐ 'ভীম নাগ' থেকেই ওর সন্দেশ আনা চাই! সেদিন দুপুরে ডেকে বললুম,—"ঢ্যাখ, আমার একটু কাজ আছে, আজ তোকে দিয়ে বাবার মিষ্টির জন্যে অত দূর যেতে হবে না, ঐ মোড়ের মাথার দোকান থেকে এনে দে, কিছু ধরতে পারবেন না।" তা এমন ভাবে তাকালো আমার দিকে যে, কথাটা বলে আমিই অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম!

দাদা 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট' ছাড়া সিগারেট খান্ না, আমার হাত-খরচ মাসে দশ টাকা, কাজেই ওই 'কাঁচিতে'ই কাজ চালাতে হয়। সেদিন টিন্‌টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দেখে রেখেছিলুম, একটু চোখের আড়াল করে এমন জায়গায়, যে একদিন কেন সাত দিন ঝাড়া-মোছা না করলেও কেউ দেখতে যেত না সেখানে। ও মা, একটি, একটি করে জিনিষ পরিষ্কার কোরে সেটাকে টেনে বার করে দাদার হাতে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি! মাকড়সা টিক্‌টিকিগুলো অবধি বোধ হয় ওকে গাল দেয়, ওর ঝুল ঝাড়ার জ্বালায় কোথায় একটু স্থিতি হয়ে বসবার উপায় নেই ওদের!

আচ্ছা, এবার সুব্রতর রাগের কারণটা খুলেই বলি একটু। সেদিন দুপুরে ভগিনী লিলির বান্ধবী মিলি ঘুরছিলো কতকগুলো চ্যারিটি শোর টিকিট চারাতে চার দিকে। ভয়ে সুব্রত খিল এঁটেছিলো দোরে, ঘুমোবার ভাণ কোরে। আর না এঁটেই বা করে কি? জ্বালাতন হয়েছে লোক ঐ চ্যারিটি ভ্যারাইটি শোর জ্বালায় আজ কাল। জনকয়েক ছেলে কি মেয়ে এক জায়গায় মিললেই উদ্ভট একটা যা'হোক কিছু নাম লাগিয়ে নানা রকম ক্লাব গড়ে উঠবে, আর ক্লাব হলেই তার জন-হিতকর একটা কিছু করা দরকার, কাজেই তারা পাড়ার নটেগাছটি লাগাবার কাজেও নানা রকম চ্যারিটি শো'র বন্দোবস্ত করে বাহবা নেয়! (অবশ্য টাকাগুলি যথাস্থানে পৌঁছায় কি না জানা খুবই দুঃসাধ্য) আর টিকিট গছাতে এসে এমন সব বক্তৃতা,—মনে হয় এক একজন পরোপকারের জন্য দরকার হলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতেও পিছপা নন্। তারপর আছে সর্ব্বজনীন শ্যামাপূজা, শীতলাপূজা লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজার (বলা বাহুল্য পূজাটা গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য আলোর ভেল্কি ও গানের তুবড়ি ছোটান) প্রতিযোগিতা! সুতরাং দোরে খিল আঁটাতে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না তাকে। বেশ একটু ঘুমের আমেজ এসেছিলো,—দুম্, দুম, দোর পিটানোর শব্দে চকিত হলো সুব্রত। নাঃ, পরিত্রাণের কোন আশাই নেই, লিলির মত অমন একটি বিভীষণ থাকতে ঘরে। "দিন-দুপুরে কি এত ঘুম তোমার দাদা, যে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও সাড়া মেলে না?" বোনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বিরক্ত, বিব্রত সুব্রত সশব্দে দরজার খিল খুলে আড়চোখে দেখে নিল একবার সঙ্গে কেউ আছে কি না। লিলিকে একা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লো সে। "হঠাৎ অত চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করছিস্ কেন? হোল কি তোর?"

"তোমাদের ঐ বাবু-মুখো, মিন্‌মিনে চাকরটিকে তাড়াতে হবে বাবাকে বলে।"—ঝাঁঝালো সুরে জানায় লিলি।

"কেন, রাত দিন ফ্যাচ-ফ্যাচ করি তার ওপর বলে তো আমারই বদনাম! তোমাদের আবার সে করলো কি?"

"বলছি, দম নিতে দাও একটু—" ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে লিলি।—"মিলিকে জান তো? আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড?"

"হ্যাঁ, নাম শুনেছি তোমার মুখে অনেক বার।"

"অত্যন্ত কাজের আর পরোপকারী মেয়ে। ওদের 'কচি কিশলয়' ক্লাবের মেয়েরা উদ্বাস্তুদের জন্য একটা 'চ্যারিটি ভ্যারাইটী শো'র বন্দোবস্ত করেছে। দু'খানা টিকিট এনেছিলো সে তোমাদের দু'ভায়ের জন্য। এ সময় তুমি রোজ পড়ার ঘরে থাকো তাই ঠেলে দিলাম ওকে তোমার ঘরের দিকে, সঙ্গে আর গেলাম না; কারণ, তোমার ধারণা আমিই মন্ত্রণা দিয়ে যত রাজ্যের চাঁদা আদায় করাই তোমার কাছ থেকে। প্রথমে ও তো কিছুতেই যাবে না,—"না, ভাই, শুনেছি তোর দাদা বা রাগী, যদি বকেন কি রাগারাগি করেন, তার চেয়ে টিকিট

দু'খানা তোর কাছে রেখে যাই, টাকাটা তুই স্কুলে নিয়ে আসিস কাল।" "না না, দাদা এমনিতে খুব ভালো রে। তুই টিকিটখানা দিয়ে বরং একটা প্রণাম ঠুকে দিস তাহলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।—ঠাট্টা করে এই কথা বলে আমি বড়দার সন্ধানে ওদিকে চলে গেলাম। মিনিট খানেকের ভেতর দেখি চোখ-মুখ লাল কোরে, কাঁদো-কাঁদো মুখে মিলি বেরুচ্ছে। ছুটে গেলাম, কি ফ্যাসাদ বাধলো কে জানে, জানি তো তোমার স্বভাব, চ্যারিটির 'চ' ও তোমার ধাতে সহ্য হয় না।"

"অত ভণিতা না করে চটপট্ ব্যাপারটা কি তাই বল্ না ছাই।" —বিরক্ত ভাবে ধমক দেয় সুব্রত।

"বল্‌ছি দাদা, রাগ কর কেন? আমায় দেখে তো মিলি একেবারে ফেটে পড়লো,—" টিকিট নেয়ার ইচ্ছে ছিলো না বললেই হোতো, এমন কোরে চাকর দিয়ে অপমান করাবার কি মানে লিলি!" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন কোরলাম, "তুই বল্‌ছিস্ কি মিলি! তোকে অপমান করাবো আমি? তোর জন্য দাদাদের কাছে কত মিথ্যে বলেছি তা জানিস?" "যাও, যাও, আর সাধু সাজতে হবে না—" ছুটে বেরিয়ে গেল সে একেবারে সদর দরজায়। তার পর কি ব্যাপার জানতে তোমার ঘরে ঢুকে দেখি, তুমি নেই, ফাঁক পেয়ে টেবিল গুছোচ্চেন বলাইচন্দ্র। তার ধপধপে সার্টের পকেটে লাল টুক্‌টুকে টিকিটখানা নজরে পড়ায় ব্যাপার কতকটা আন্দাজে এল। জিজ্ঞাসা করলাম "দাদা কোথায়? টিকিটখানা তোকে রাখতে দিলো কেন, দে, আমায় দে, রেখে দি।"

"না, ওখানা পাঁচ টাকা দিয়ে আমিই রেখেছি।" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "চালাকি রেখে কি হয়েছে বল শীগগির।"

"আজ্ঞে আপনার বন্ধু বললেন, বাস্তহারা অভাগাদের সকলেরই কিছু সাহায্য করা উচিত, এখানে কি কিছু পাব না? আর সাহায্য আমরা অমনি চাইছি না, এই চ্যারিটি শোর টিকিটের বদলে পাঁচটি টাকা সাহায্য চাইছি।" আজ সকালেই মাইনে পেয়েছিলাম টাকা পকেটে ছিলো, নিলাম একটা টিকিট পাঁচ টাকা দিয়ে।"

ধমক দিয়ে উঠলাম আমি, "চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি, আমার বন্ধু টিকিট বেচার লোক পেল না, গেছে তোমার কাছে!"

"না না, সে কি কথা, আমার কাছে কেন আসবেন, এসেছিলেন ছোট দাদাবাবুর খোঁজে নিশ্চয়, না হলে টাকাটা দিতেই অমন টিপ করে প্রণাম ঠুকতেন না আমায়!"

আমি রাগে চেঁচিয়ে উঠলুম,—"কি,—তোমার পায়ে হাত দিয়েছে, তবুও তুমি তোমার পরিচয় দাওনি?"

"প্রথমে কি কোরে বুঝবো বলুন?—তবে পায়ে হাত দিতেই বুঝতে পেরেছি, আর সরে গিয়ে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিয়েছি, পায়ের ধুলো মাথায় ওঠার আগেই। তারপর তাঁর মুখের যা অবস্থা, দেখে মায়া হচ্ছিলো,—আহা, ভদ্রলোকের মেয়ে ছোটলোকের পায় হাত দিলেন!"

আমি রেগে বললাম, "বেশ, যা হবার হয়েছে, এখন টিকিটখানা দাও, দাদাকে দিই, তোমার টাকা তোমায় আমরা ফেরত দিচ্ছি।"—তাতে কি জবাব দিলো জান? একটু হেসে বললো, "দানের জিনিষ ফেরত নিলে পরজন্মে কুকুর হবো যে দিদিমণি" —এর পর মিটিয়ে মিটিয়ে আরও হয়তো বক্তৃতা ঝাড়তো আমি চলে না এলে। এখন এর একটা বিহিত তোমায় কোরতে হবে দাদা! মিলিকে অপমান করেও হয়নি, ওর এখন তোমার পাশে এক সঙ্গে 'শো' দেখার সাধ হয়েছে, বাড়ীতে বসতে পায় না তো তোমার সামনে চেয়ারে।"

"তা বসে বস্‌বে, বাইরে কে কার অত পরিচয় জানতে যাচ্ছে বল্? আর আমার তো টিকিট নেয়া হলই না, বড়দা ওসব কেয়ার করে না, নেহাত ভালো মানুষ!"

"বড়দার সেদিন অন্য কোথায় এনগেজমেন্ট, যাবে না, তোমায়ই নিতে হবে ওখানা। আর মিলির এ অপমানের শোধ তোমায়ই নিতে হবে দাদা, ওকে তাড়িয়ে বাড়ী থেকে।"

বাবা মা'র যা আদুরে চাকর, ওকে তাড়ানো কি চাট্টিখানি কথা, অনেক প্যাঁচ কষে তবে উপায় ঠাওরাতে হবে।"—চিন্তিত সুরে উত্তর দেয় সুব্রত।

"সে আমি জানি না, উপায় তোমায় বার কোরতেই হবে যে করে হোক—" আবদারের সুরে মাথার ঝাঁকি দিয়ে চলে যায় লিলি।

২

একটা বিখ্যাত সিনেমা-হল ভাড়া কোরে সে-দিনের চ্যারিটি শো'র বন্দোবস্ত হয়েছিলো কচি-কিশলয়-সংসদের। দরজায় কার্ড দেখাতেই খাতির কোরে একটি ছেলে তাকে সিট্ দেখিয়ে দিয়ে গেল। দেশীয় রীতি অনুসারে লিখিত সময় বহুক্ষণ অতীত হলেও 'শো' এখনও আরম্ভ হয়নি। প্রেক্ষাগৃহের চারি পাশে বার বার নানা ভাবে চোখ বুলিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করছিলো সুব্রত। এমন সময় সচকিত হয়ে উঠলো সে—বলাই না?—তার সামনের সিটে কয়েকটি আসন বাদ দিয়ে বসে রয়েছে। মনিবের সামনে চেয়ারে বসে 'শো' দেখতে আসা হয়েছে, রাগে জ্বলে উঠলো সুব্রত। করেন তো লোকের বাড়ী চাকরগিরি, জামা-কাপড় আর চুলের বাহার দেখলে মনে হয় নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি! কিন্তু দস্তুর মত টিকিট নিয়ে ঢুকেছে, তাড়াবার ইচ্ছে থাকলেই তাড়ানো যায় না তো আর।—ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে সুব্রত।—'শো' আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টা খানেক কেটে গেছে, হঠাৎ চমৎকার একটা প্ল্যান এসে যায় মাথায়। সামনে ঝুঁকে বলাই-এর পিঠে একটা আঙুল রাখতেই ফিরে চায় সে।

"হুজুর দাদাবাবু! আমি মার কাছে ছুটি করে এসেছি।"

ফিস-ফিস কোরে সুব্রত বলে,—"সেজন্য নয়, তোর টিকিটখানা দেখি একটু দরকার আছে।" টিকিট নিয়ে সোজা চলে যায় সে চেকারের কাছে। দুজনে কি কথা হোল বলা যায় না, হঠাৎ টিকিট-চেকার বলাইয়ের কাছে এসে তার টিকিট দেখতে চাইলো।

"গেটে তো আপনি আমার টিকিট দেখেছেন স্যর!"

"না, তোমার টিকিট চেক করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। —দেখি দেখি বার কর শীগগির টিকিটখানা।"

"বলাই কিছু বলবার আগেই একটি ছেলে রুখে উঠলো— "কি মশাই, শো'র মাঝখানে এসে বিরক্ত কোরছেন? আর পাঁচ টাকা দিয়ে যে ভদ্রলোক"—

বাধা দিয়ে চেকারটি বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলো—"উনি ভদ্রলোক নন বলেই ওঁর টিকিট চেক কোরতে আসা। মনিব, চাকর একসঙ্গে টিকিট কেটে কোন ফাংসানে আসে শুনেছেন কখনও?"

বলাই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, ধীর পায়ে সুব্রতর সামনে এগিয়ে বলে, "থিয়েটার আমি আর দেখব না দাদাবাবু, কিন্তু জোচ্চুরী যে করিনি আমি সেটা ওদের বুঝিয়ে দিতে চাই।— দেবেন কি টিকিটখানা একবার?"

"কি ফাজলামো হচ্ছে, যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে"—ধমক দিয়ে ওঠে সুব্রত।

বলাই আর কোনো উত্তর করে না, অদ্ভুত এক হাসি হেসে, তার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে চলে যায় হল ছেড়ে। সে হাসি অন্তরের অন্তস্থল ভেদ কোরে যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়, এর চেয়ে চেঁচামেচি কোরে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন কোরলেও এতটা অস্বস্তি বোধ কোরত না সুব্রত!

এর পর কিছুই যেন উপভোগ কোরতে পারছে না সুব্রত। কোন রকমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ী ফিরে সটান শোবার ঘরে চলে যায় সে, খেতে ডাকতে এসে বাড়ীর লোক ধমক খেয়ে ফিরে গেল। মা চিন্তিত মুখে খবর নিতে এলেন, "একেবারে উপোস দিচ্ছিস কেন, কি হয়েছে তোর সুবো?"

"মাথা তুলতে পারছি না মা, কপালের যন্ত্রণায়, কিছু খেলে এখনি বমি হয়ে যাবে।"

"তা'হলে অন্য কিছু খেয়ে দরকার নেই, গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি শুধু।"

কিছুক্ষণ পরে পায়ের শব্দে চেয়ে দেখে সুব্রত, বলাই আসছে দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে। দুধটা এক নিশ্বাসে শেষ কোরে, আড়চোখে সে বলাইয়ের মুখের ব্যঞ্জনা বুঝতে চেষ্টা করে। না, সে মুখে অভিমান, অভিযোগের চিহ্ন মাত্র নেই, তাহলে নিজের অন্যায় বুঝতে পেরেছে লোকটা।—কেমন যেন করুণা হয়, গ্লাসটা দিয়ে নরম, মিষ্টি সুরে বলে সুব্রত—"গাধার মত চলে এলি কেন, মজা করার জন্য টিকিটটা রেখেছিলুম একটু।"

"না, দাদাবাবু, মনিব-চাকরে ঠাট্টা চলে না কখনও।"—শান্ত সুরে জবাব দেয় বলাই।

কানটা ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে সুব্রতর, কথাটা বলে ফেলে নিজের কানেই কেমন বেসুরো শোনায় যেন। "ঠাট্টা চলে না, বুঝিস্ তো সব, তবে মনিবের সঙ্গে সমান আসনে বসতে গেছলি কোন্ লজ্জায়, বল, বলতেই হবে তোকে" গর্জ্জন কোরে ওঠে সুব্রত।

"বাড়ীতে যতক্ষণ আপনার কাজ কোরবো চাকর, তা ব'লে বাইরে গেলেও আমার গায়ে ছাপ মারা থাকবে কি চাকর বলে যে"—

"যাও বেরিয়ে যাও, বাক্যবাগীশ কোথাকার"—বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুব্রত।

৩

এর পর ক'দিন ধরে রুদ্ধ রোষে ছটফট কোরেছে সুব্রত। আকাশে থুথু ছুড়তে গিয়ে নিজের মুখই ময়লা হোল, মহাশূন্য নির্ব্বিকার উদারতায় অকলঙ্ক রয়ে গেল!

মহাপুজার ক'দিন মাত্র বাকি; সকলে জামা-কাপড়ের ফর্দ্দ কোরছে বসে একটা ঘরে, সে দিকে চেয়ে চমৎকার একটা প্ল্যান মাথায় আসে বলাইকে জব্দ করার। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললো সুব্রত সে-ঘরে, মা-বাবার উদ্দেশ্যে। এক রাশ সিল্ক ও জর্জ্জেটের মাঝখানে বসে লিলি শাড়ী বাছতে ঘেমে উঠছিলো। ফ্রক ছেড়ে সেই বছরই সবে শাড়ী ধরেছে সে, কাজেই কোন্টা ছেড়ে কোন্টা নেবে স্থির কোরতে না পেরে সবগুলোর গায়েই এক একবার হাত বুলোচ্ছিলো বেচারী। পূজার আনন্দে বলাইকে তাড়ানোর কথা আর তার মনেই ছিল না; তা ছাড়া দাদার গম্ভীর ভাব দেখে একদিন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরতেও ভরসা হয়নি। আজ তাকে প্রফুল্ল মনে দেখে সাহস পেয়ে, একটা লাল টকটকে, জরীর কল্কা দেয়া জর্জ্জেট মেলে ধরে লিলি, "আমি তো কিছুই ঠিক কোরতে পারছি না, তোমার পছন্দ আছে, দেখ না শাড়ীখানা কেমন দাদা!"

বসে বলে সুব্রত, "না বাপু, মেয়েদের শাড়ী-গয়নার ভেতর আমি নেই,—নে না, যেটা তোর পছন্দ।"—তার পর সামনে-রাখা সরু নীল ডোরা-কাটা কাপড়ের একটা সার্ট নাড়া-চাড়া কোরতে কোরতে বলে,—"মা, এবার পুজোয় বলাইকে সার্ট না দিয়ে বেয়ারা-কোট দিলে কেমন হয়?"

"অনেক বাড়ীতে দেয় বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের গরম দেশে ও-রকম কোট পরে কাজ করা বড় অসুবিধাকর, শীতকালে অবশ্য আলাদা।"

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে পিতা অমরনাথ বললেন, "তা ছাড়া ওতে একটু খরচও বেশী পড়ে।"

"কিন্তু এ্যারিষ্টোক্রেসিও যে অনেক বাড়ে বাবা! আর তা ছাড়া বাইরের লোক এসে অনবরত ভুল কোরবে ঘরের ছেলেতে আর চাকরে, সেটাই কি ঠিক?"

মা রমা একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। ছেলের কথায় বিরক্তিতে তাঁর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। গম্ভীর ভাবে বললেন, "নিশ্চয়ই মানুষ হিসাবে তাহলে তোমাতে আর বলাইয়ে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই, সেই জন্যই লোক ভুল করে। আর বিশেষ কিছু ব্যক্তিত্বই যদি থাকে ওর কি হবে তা পোষাক দিয়ে ঢেকে? থাক্ না ও বাড়ীর ছেলের মতই। জানিস, ছোটবেলায় আমরা কখনও বয়সে বড় ঝি-চাকরদের নাম ধরে ডাকি নি,—আর এতেই তোরা লজ্জা পাচ্ছিস? আমার মনে হয়, ওরকম কাজের, সৎ ও নরম স্বভাব লোক একজন বাড়ীতে থাকা গর্ব্বের কথা।"

অমরনাথ কিন্তু অতটা ভাবপ্রবণতার দিকে গেলেন না, ছেলের কথা তাঁর মনে লেগেছিলো; সুতরাং বলাইএর সার্ট বাতিল হয়ে কোটের ফরমাস হয়ে গেল। সুব্রত খুশী মনে তিন দিন পরে আজ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো।

* * * *

ষষ্ঠীর দিন অমরনাথ ধপ্‌ধপে জিনের, চক্‌চকে পিতলের বোতাম-লাগানো একটি বেয়ারা-কোট ও ধুতি বলাইএর হাতে দিলেন, —"নে, এবার একটা কোটই দিলাম তোকে। খরচ একটু বেশী পড়লো, তা হোক। বোতামগুলো ব্রাসো দিয়ে সাফ রাখিস, সোনার মত ঝক্‌মক্ কোরবে।"

একটু ইতস্ততঃ কোরে সঙ্কুচিত সুরে বলাই বলে, "মাপ কোরবেন বাবু, ও কোট আমি পরতে পারব না।"

"তার মানে? মনিব আদর কোরে একটা জিনিষ দিচ্ছি, সে জিনিষ তুমি পরবে না, কি বলছো তুমি?"

"মাপ কোরবেন হুজুর।"

"কিন্তু কেন, সেটা বল?"

"ওটা পোরলে নিজেকে বড় ছোট মনে হবে; দাসত্বের ছাপ—"

বাধা দিয়ে হা হা কোরে হেসে ওঠেন অমরনাথ। "কোন্ লাট সাহেবের নাতি তুমি যে বেয়ারা কোট পোরলে মান যাবে তোমার? নে, নে, পাগলামী করিস্নে—" ফট্ ফট্ কোরে চটির আওয়াজ তুলে চলে যান অমরনাথ।

দশমীর দিন সকলেই নতুন কাপড়-জামা পরে সাধ্যানুযায়ী বেশভূষা করেছে। এই দিনটিই বোধ হয় বাঙ্গালীর জীবনে সব চেয়ে আনন্দের দিন। মান, অভিমান, বিদ্বেষ ভুলে পরিচিত সকলের সঙ্গেই সে প্রীতি-সম্ভাষণ কোরছে। অমরনাথ পাড়ার ভেতর বেশ অবস্থাপন্ন, সন্ধ্যা থেকেই তাঁর বাড়ী আজ বন্ধু-বান্ধবের কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠেছে।

নতুন ধুতি ও পুরানো একটি সার্ট পরে বলাই ঘোরাফেরা করছিলো। অমরনাথ ডেকে বললেন, "ওহে বলাইচন্দ্র, আজ বাড়ীতে অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব আসবে; নতুন কোটটা পরে থাক, পুরোনো সার্টটা এখনও ছাড়নি কেন?"

বলাই মাথা নিচু কোরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"কি, চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন সং-এর মতন, বেবার শ্বশুরবাড়ীর এখনি সব এসে পড়বে, কোটটা পরে দাঁড়াওগে যাও গেটে।"

"হুজুর, আমার জামা ছেঁড়া নয়, আর সাফ্ও আছে, এ গায়ে থাকলে এমন কি দোষ হয়েছে?"

"তা' হোলে ওটা তুমি নেবে না? টাকা খরচ কোরে কিনলুম আমি।"

"আজ্ঞে, আগে জানলে বারণ কোরতুম আমি।"

"কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বেরিয়ে যাও তুমি, কাজ কোরতে হবে না।"

গোলমাল শুনে রমা বেরিয়ে এলেন, "কি হোল কি, অত গোল কিসের?"

"ব্যাটার স্পর্দ্ধা দেখ না, কোট পরবে না, পাছে চাকর বলে লোক চিনতে পারে। আরে অত যদি মান তো লোকের বাড়ী কাজ কোরতে আসা কেন?—গেলেই পারতে কোর্টে জজগিরি কোরতে।"

"হুজুর, চাকরী কোরলেই চাকর, যার যেমন যোগ্যতা সে তেমন কাজ করবে।"

বলাই-এর কথার কোথায় যেন একটু খোঁচা ছিল, রাগ কোরতে গিয়েও সামলে নেন অমরনাথ, "হুঁ, কথা শিখেছ খুব দেখছি। কোন সাম্যবাদী কমিউনিষ্টের সলা-পরামর্শ পাচ্ছ নাকি? যোগ্যতা অনুসারে কাজ আর কাজ অনুসারে পোষাক,—এটা বুঝছ না কেন?"

মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে থাকে বলাই, ভিতরে কিসের যেন দ্বন্দ্ব চোলছে, মুখ ফুটে বলতে পারে না। রমার সে দিকে চেয়ে মায়া হয়, অমরনাথের দিকে চেয়ে বলেন, "আজ যা গরম পড়েছে, তোমার ও গলাবন্ধ কোট আজ নাই বা পোরল—"

বলাই বাধা দিয়ে বলে, "না, মা, গরমের জন্য নয়।"

"শুনলে তো, তুমি আবার ওর হোয়ে এসেছ ওকালতী কোরতে!—আরে কল্যাণ যে, এস, এস—সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ়ের সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অমরনাথ। ওঃ। কত কাল পরে দেখা, প্রায় দশ বছর না?"

"হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি। এত কাল তো বাইরে বাইরেই ঘুরেছি। দিন কয়েকের জন্য এখানে এসেছি মাঝে মাঝে, তা দেখা করবার সুযোগ-সুবিধা আর হয়ে ওঠেনি। ও কি বৌদি, মা-বেটায় অমন মুখ গম্ভীর কোরে দাঁড়িয়ে কেন?"

অমরনাথের মুখ কালো হয়ে ওঠে, ধমক দিয়ে বলাইয়ের দিকে চেয়ে বলেন, "হাঁদার মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, দু'খানা চেয়ার নিয়ে আসবি তো বসবার ঘর থেকে?"

বলাই তাড়াতাড়ি চলে যায় আদেশ পালন কোরতে।

রমা একটু হেসে কল্যাণের দিকে চেয়ে বলেন, "ওটি আমাদের ছেলে নয়, এখানে কাজ করে।"

আশ্চর্য্য হয়ে যান কল্যাণ, "সে কি, ওটি তোমাদের চাকর? দেখে তো বোঝবার যো নেই, সুন্দর বুদ্ধির ছাপ মুখে, আর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নও খুব।"

বলাই চেয়ার এনে দিলে আদেশের সুরে বলেন অমরনাথ, "কোটটা গায়ে দিয়ে তুমি বাইরে একটু দাঁড়াওগে, কেউ এলে ভেতরে খবর দেবে।"

কিন্তু গেটে না দাঁড়িয়ে বলাই যে গেট পার হয়ে চলে গেল, সে খবর অমরনাথ পেলেন অনেক পরে, আহারাদির পর গা, হাত, পা টেপার জন্য তার খোঁজ করাতে। আশ্চর্য্য হলেন, অদ্ভুত জেদ তো লোকটার!

রমা অশ্রুসজল চোখ বার বার আঁচলে ঘষতে লাগলেন, সামান্য একটা খেয়ালের জন্য অমন একটা কাজের লোককে হারাতে হোল!

আর গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে সুব্রত ভাবছিলো, "জব্দ হোল কে? বলাই, না সে নিজে?
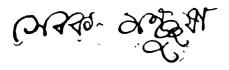
সাহিত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। গ্রন্থ—চিতোরের যুদ্ধ (ঐতিহাসিক কাব্য)। সম্পাদক—মিত্রোদয় (মাসিক, পটলডাঙ্গা, ১২৮৩ বঙ্গ)।

হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—নবপত্রিকা (মাসিক, ১৮৬৭, নভেম্বর)।

হীরালাল ঘোষ—কবি। গ্রন্থ—কাব্যকানন (১৮৭৪)।

হীরালাল দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—A dramatic writing on Tabacco consumers of the kali yuga (১৮৭০)।

হীরালাল দত্ত—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—স্বামিগৃহ, ঘরকন্না, বঙ্গবধূ, রত্নোদ্ধার।

হীরালাল ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—যশোহর জেলার মল্লিকপুর। গ্রন্থ—যশোহর খুলনার ইতিহাস।

হীরালাল হালদার—দার্শনিক। গ্রন্থ—Hegelianism and Human Personality (১৯১০), Neo-Hegelianism (লণ্ডন, ১৯২৭)।

হীরালাল রাহা—কবি। গ্রন্থ—পুবসম্ভব (কাব্য, ১৮৮৭)।

হীরানন্দ শাস্ত্রী—ইতিহাসজ্ঞ। গ্রন্থ—The Bagela Dynesty of Rewah (কলি, ১৯২৫), Bhasha and the Authorship of the thirteen Trivandrum plays (১৯২৬), The origin & cult of Tara (১৯২৫)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আইনজীবী। জন্ম—১৮৬৮ খৃঃ ১১ই জানুয়ারি কলিকাতা চোরবাগানে বিখ্যাত দত্ত-পরিবারে। মৃত্যু—১৯৪২ খৃঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। পিতা—দ্বারিকানাথ দত্ত। শিক্ষা—এনট্রান্স (মেট্রোপলিটান ইনসটিটিউট ১৮৮৩), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, বৃত্তিলাভ), বি-এ (ঐ, ১৮৮৮, তিনটি বিষয়ে অনার্সে ১ম স্থান ও ২টি সুবর্ণ পদক লাভ), এম-এ (ঐ, ১৮৮৯, ১ম স্থান), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ (১৮৯৩), বি-এল (১৮৯৩), এর্টনীসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৯৪)। কর্ম—হাইকোর্টে এটর্নীরূপে আইন-ব্যবসায় (১৮৯৪, এপ্রিল)। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাহিত্য, দর্শন, সমাজ-সেবার প্রতি অনুরাগ। বহু শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, যাদবপুর। সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক (১৩০৪-৫), সহকারী সভাপতি (১৩২১-৫), সভাপতি (১৩৪৫-৬), ধনাধ্যক্ষ (১৩০৬-১০, ১৩১৪-২২), জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক, পরে সহ-সভাপতি। বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতির (Theosophical Society) সভাপতি। আন্তর্জাতিক তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির সহকারী সভাপতি। এ্যানি বেসান্তের শিষ্য। বহু সম্মেলনে সভাপতিত্ব, তন্মধ্যে—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, ঢাকা (১৩২৪), চন্দননগর (১৩৪৩), বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী (কলিকাতা ও কাঁটালপাড়ায়, ১৯৩৮), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার রজত-জয়ন্তী সম্মেলন (১৯৩৮), রংপুর শাখার বাৎসরিক সম্মেলন (১৯৩৮), রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী সভা (টাউন হল, ১৯৪২)। সম্মান লাভ—'বেদান্তরত্ন' উপাধি (কাশী), রামপ্রাণ স্বর্ণপদক (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), জগত্তারিণী সুবর্ণপদক (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০), কমলা লেকচারার (১৯৪০)। ইনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্‌ ও বাগ্মী ছিলেন। গ্রন্থ—গীতায় ঈশ্বরবাদ (১৩১২, শ্রাবণ), Philosophy of Gods (১৯০৬), উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব (১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ), জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব (১৩২৩), বেদান্ত-পরিচয় (১৩৩১, ফাল্গুন), কর্মবাদ ও জন্মান্তর (১৩৩২), অবতার-তত্ত্ব (১৩৩৫), বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা (১৩৪৩), যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ (১৩৪৩), রাসলীলা (১৩৪৫, শ্রাবণ), প্রেমধর্ম (১৩৪৫, ফাল্গুন), Theosophical Gleanings (১৯৩৮), সাংখ্যপরিচয় (১৩৪৬, বৈশাখ), দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৪৭, বৈশাখ), বুদ্ধি ও বোধি (১৯৪০), Indian Culture (কমলা লেকচার, ১৯৪১), উপনিষদে জড় ও জীবতত্ত্ব (১৩৫১, ফাল্গুন); মেঘদূত কাব্যের পদ্যানুবাদ (১৩৪৫, শ্রাবণ), নবীনচন্দ্র সেনের রঙ্গমতী নাট্যকৃত (১৩৩৬, পৌষ), শিক্ষা না সেবা (জে, কৃষ্ণমূর্তির 'At the feet of the Masters' গ্রন্থের অনুবাদ, ১৯১২)।

হীরেন্দ্রনাথ পাল—গ্রন্থকার। নিবাস—২৪-পরগনার অন্তর্গত বেলঘরিয়ায়। গ্রন্থ—ভক্তাঞ্জলি (গীত)।

হুমায়ুন কবীর—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৯০৬ খৃঃ ২২এ ফেব্রুয়ারি। শিক্ষা—এম-এ (কলিকাতা বিশ্ব ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়)। কর্ম—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয় ভারতের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর সচিব। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা। কাব্যগ্রন্থ—পদ্মা, স্বপ্নসাধ, সাথী; উপন্যাস—নদী ও নারী (১৩৫৮)।

হৃদয়নাথ দাস—সাময়িক পত্রসেবী। জন্ম—মেদিনীপুরের বল্লভপুর গ্রামে। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, হার্ডিঞ্জ স্কুল, মেদিনীপুর। সম্পাদক—মেদিনীপুর সমাচার (পাক্ষিক, ১৮৭৭, ১লা জানুয়ারি, ৬ মাস পরে উহা 'মেদিনী' নামে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়)।

হৃদয়রাম দাস—ধর্মপ্রচারক। নামান্তর—হেদোরাম দাস। জন্ম—মেদিনীপুরের গোপীনাথপুরে। 'মাণিক-কালী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। গ্রন্থ—আগমন পুরাণ (১৯শ শতাব্দী, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় মিশ্রিত)।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যালঙ্কার—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—জ্যোতিষসার সংগ্রহ।

হৃষীকেশ রক্ষিত—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—চন্দননগর। শিক্ষা—এম-এসসি ডি-এসসি। গ্রন্থ—Investigation on the propagation of wireless waves with particular reference to the Inosphere in Bengal.

হৃষীকেশ শাস্ত্রী—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৪৪ খৃঃ ভাটপাড়ায়। মৃত্যু—১৯১৩ খৃঃ ভাটপাড়ায়। শিক্ষা—কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি অধ্যয়ন; লাহোরে গমন (১৮৭০), তথায় "শাস্ত্রী"

উপাধিলাভ (লাহোর ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ)। কর্ম—সংস্কৃতাধ্যাপক, লাহোর ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ, সহকারী রেজিষ্টার, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। লণ্ডন ওরিয়েণ্ট্যাল সংস্কৃত পরিষদ, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সভ্য। গ্রন্থ—(বঙ্গানুবাদ) শাণ্ডিল্যসূত্র, মেঘদূত (সটীক পদ্যানুবাদ), সুপদ্ম ব্যাকরণের টীকা, তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব। সম্পাদক—বিদ্যোদয় (সংস্কৃত মাসিক পত্র)।

হেমচন্দ্র আচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার উখ্তি গ্রামে। গ্রন্থ—মুহম্মদ চরিত।

হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ। সম্পাদক—আয়ুর্বেদ হিতৈষিণী পত্রিকা (১৩১৮)।

হেমচন্দ্র গোস্বামী—সাহিত্যসেবী। জন্ম—আসাম প্রদেশে। সম্পাদক—অরুণ (শিশু মাসিক, ১৯১৬)।

হেমচন্দ্র ঘোষ—কবি। শিক্ষা—বি-এল। আইনজীবী। গ্রন্থ—শরশয্যা (কাব্য)।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো—দেশকর্মী ও বিপ্লবী। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার রাধানগরে। মৃত্যু—১৯৫১, ৮ই এপ্রিল। পিতা—ক্ষেত্রমোহন দাস কানুনগো। কর্ম—জমিদার ও চিত্রশিল্পী। বৈপ্লবিক কারণে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্মানী (১৯০৬) ভ্রমণ। বাঙলার অগ্নিযুগের প্রথম বোমা-প্রস্তুতকারী। বিখ্যাত মানিকতলার বোমার মামলায় বন্দী এবং দীর্ঘ দিন আন্দামান দ্বীপে অন্তরীণ (১৯০৮)। মুক্তি (১৯২০) গ্রন্থ—বাংলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা (১৯২৮), অনাগত সুদিনের তরে (১৯৪৫)।

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৭৮ খৃঃ ৭ই জুলাই মৈমনসিংহের টাঙ্গাইল সব ডিভিসনের টেরকিগ্রামে। মৃত্যু ১৯৩৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারি। পিতা—রাজীবলোচন দাশগুপ্ত। মাতা—স্বর্ণময়ী দেবী। শিক্ষা—এম-এ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯০০ খৃঃ, সুবর্ণপদক প্রাপ্ত)। কর্ম—অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্যাকালটি অব সায়ান্স, পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং ইন সায়ান্সের বোর্ড অফ জওগ্রাফীর সভ্য। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের পরিচালন সমিতির সভ্য, বিজ্ঞান ভূ-বিদ্যাশাখার সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি। ইংরেজি ও বাংলা বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। গ্রন্থ—A Record of 50 Years Progress in Indian Pre-mesozoic Palaeontology, Determinative Mineralogy.

হেমচন্দ্র নাগ—সাংবাদিক। জন্ম—১৮৮১ খৃঃ মৈমনসিংহ জেলার আকুটিয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯৫৩ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল কলিকাতায়। সম্পাদক—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (১৯৩৭), বেঙ্গলী, সন্ধ্যা।

হেমচন্দ্র নাগ—কবি। কাব্যগ্রন্থ—মানসসন্তোষিণী (২য় সং, ১৩০১), অভাগা বিলাপ (১২৮৬)।

হেমচন্দ্র বক্সী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯৮ বঙ্গ ঢাকা-বিক্রমপুরে। পিতা—উমাচরণ বক্সী। কর্ম—শিক্ষকতা, ব্যবসায়। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—মৃণাল (উপ), বাংলার বাঘ (স্তর আশুতোষের জীবনী), বিদেশী পৌরাণিকী, লালা লাজপৎ রায়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ ১৭ই এপ্রিল হুগলী গুলিটা রাজবলহাট গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯০৩ খৃঃ ২৪এ মে খিদিরপুরে। পিতা—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈত্রিক নিবাস—উত্তরপাড়া (হুগলী)। শিক্ষা—জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা (হিন্দু স্কুল, ১৮৫৫), সিনিয়র বৃত্তি (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৫৭), এন্‌ট্রান্স (উত্তরপাড়া স্কুল, ১৮৫৭), বি-এ (১৮৫৯), এল-এল (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৬১), বি-এল (ঐ, ১৮৬৬)। কর্ম—প্রথমে শিক্ষকতা, পরে মিলিটারী একাউণ্টসের কেরাণী (১৮৫৯), প্রধান শিক্ষক, ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল, মুন্সেফ (১৮৬২), আইন-ব্যবসায়, হাইকোর্ট (১৮৬১), প্রধান সরকারী উকীল (১৮৯০, ১লা এপ্রিল)। অন্ধত্ব প্রাপ্তি (১৮৯৭)। গ্রন্থ—চিন্তা-তরঙ্গিণী (১৮৬১), নিদর্শনতত্ত্ব (Watson's Law of Evidence-এর অনুবাদ, ১৮৬২), বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪), নলিনীবসন্ত নাটক (১৮৬৮, ১৪ই সেপ্টেম্বর), কবিতাবলী ১ম (১৮৭০, ২১এ নভেম্বর), ২য় (১৮৮০, ১লা জানুয়ারি), বক্তৃতা (১৮৭২), বৃত্রসংহার ১ম (কাব্য, ১৮৭৫, ১৪ই জানুয়ারি), ২য় (১৮৭৭, ১৫ই সেপ্টেম্বর), ভারত-শিক্ষা (১৮৭৫, ১৫ই ডিসেম্বর), আশা-কানন (১৮৭৬, ৩০এ মে), ছায়াময়ী (১৮৮০, ১৫ই জানুয়ারি), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২, ২২এ ডিসেম্বর), হুতোম প্যাঁচার গান (১২৯১), নাকে খৎ (১৮৮৫), ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব (১৮৮৭, ১২ই ফেব্রুয়ারি), রোমিও জুলিয়েট (১৮৯৫, ২০এ জুলাই), চিত্তবিকাশ (১৮৯৮, ২২এ ডিসেম্বর), Life of Srikrisna (১৮৫৭), Brahmo Theism in India (১৮৬৯, ৭ই এপ্রিল)।

হেমচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মিলন কানন (১৮৮২)।

হেমচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। গ্রন্থ—রাণীকুঞ্জ (প্রবন্ধ)।

হেমচন্দ্র বাগচী—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১১ বঙ্গ আশ্বিন নদীয়ার গোকুল নগর অন্তর্গত বেগেগ্রামে। শিক্ষা—এম-এ। গ্রন্থ—তীর্থপথে (কাব্য), দীপান্বিতা (ঐ), মানস বিরহ (ঐ), অনির্বাণ (উপ), তপনকুমারের অভিযান (কিশোর), কবি-কিশোর, মায়াপ্রদীপ (ঐ)। সম্পাদক—বৈশ্বানর (১৩৪১)।

হেমচন্দ্র বাগচী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—যুগাবতার গান্ধী।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য—অনুবাদক। গ্রন্থ—রামায়ণ (গদ্যানুবাদ, ৭ খণ্ড, ১৮৮৬)।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কণা (কাব্য, ১৩১৮), মানব প্রকৃতি, মহাপ্রস্থান, ইঙ্গিত।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাজব্যবস্থা (জমীদারী সংক্রান্ত ফৌজদারী আইন, শ্রীরামপুর ১৮৫০)।

হেমচন্দ্র মৈত্র—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংসারতত্ত্ব (বরাহনগর পালপাড়া, মাসিক, ১৩০৫ মাঘ)।

হেমচন্দ্র রায়—কবি। শিক্ষা—এম-এ। 'কবিভূষণ' উপাধি লাভ। কর্ম—অধ্যাপনা। গ্রন্থ—যূথিকা, হলদিঘাটের যুদ্ধ, রুক্মিণীহরণম্।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী—কবি। গ্রন্থ—মহাশোক (ক, ১৩০৪)।

হেমচন্দ্র সরকার—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর। এম-এ। গ্রন্থ—মাতা ও পুত্র (উপ), বিবিধ প্রবন্ধ।

হেমদাকান্ত চৌধুরী—আইনজীবী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৯৩ বঙ্গ রাজশাহী জেলার কাশিমপুরে। শিক্ষা—হিন্দু স্কুল, এম-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বি-এল (বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ)। প্রতিষ্ঠাতা ও আদি সম্পাদক—নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, টিচার্স জার্নাল, শিক্ষা ও সাহিত্য, বারেন্দ্র পত্রিকা। গ্রন্থ—পুরীর চিঠি, রূপার ঘড়ি, ঘুমের গল্প, সমর মিলন (নাটক), একালের কুরুক্ষেত্র। সহ-সম্পাদক—বসুমতী (ইংরেজি), দেশদর্পণ।

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৩১২ বঙ্গ ১৩ই কার্ত্তিক ২৪-পরগনার অন্তর্গত বরাহনগর আলমবাজারে। পিতা—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থা হইতেই কবিতা ও গল্প রচনা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। 'কবিকঙ্কণ' উপাধি (কলিকাতা দর্শন বিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৩৪৮) লাভ। সভাপতি—শশিপদ ইনসটিটিউশন। পরিচালক—ভোরের আলো (পত্রিকা), ব্যারাকপুর (পত্রিকা)। গ্রন্থ—দুঃখের সংসার।

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। যুগ্ম সম্পাদক—আশা (১৩০১-১১)।

হেমন্তকুমার সরকার—সাংবাদিক। গ্রন্থ—সুভাষের সঙ্গে বার বৎসর, দেশবন্ধু স্মৃতি।

হেমন্তকুমারী চৌধুরী—মহিলা সাহিত্যিক। পিতা—নবীনচন্দ্র রায়। সম্পাদিকা—অন্তঃপুর (১৩০৭-১০)।

হেমন্তকুমারী দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী—রাজচন্দ্র চৌধুরী। সম্পাদিকা—সুগৃহিণী (শিলং, মাসিক, ১২৯৪)।

হেমন্তবালা দত্ত—মহিলা কবি। জন্ম—চট্টগ্রাম। কাব্যগ্রন্থ—মাধবী, শিশির (১৩১৭)।

হেমলতা ঠাকুর—মহিলা সাহিত্যিক। মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের মহিলা শাখার সভানেত্রী (১১৩৮)। সম্পাদিকা—বঙ্গলক্ষ্মী (১৩৩৪-৩৫)।

হেমলতা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—নেপালে বঙ্গনারী, সমাজ বা দেশাচার (না), নব পল্লবলতিকা।

হেমলতা দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। পিতা—আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। সম্পাদিকা—মুকুল (মাসিক, ১৩০৭)। গ্রন্থ—শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত।

হেমলতা দেবী—মহিলা সম্পাদিকা। সম্পাদিকা—প্রেম ও জীবন (মাসিক, ১৩১১)।

হেমলতা রায়—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—কুম্ভমেলা সাধুসঙ্গ, কৈলাসপতি, মহাতাপস।

হেমাঙ্গিনী সর্বাধিকারী—মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী—আনন্দকুমার সর্বাধিকারী। গ্রন্থ—মাতার উপদেশ (১৮৮১), মনোরমা ১৮৭৮, জুলাই।

হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য—শিশু সাহিত্যিক। জন্ম—১২৯৬ বঙ্গ ২০এ জ্যৈষ্ঠ মৈমনসিংহের অন্তর্গত বাড়ুরী নেত্রকোনার। শিক্ষা—এম-এ। কর্ম—অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ। গ্রন্থ—অতীতের কথা, ৩ খণ্ড, গাছপালার গল্প, জীব-জগৎ, সপ্তবৈচিত্র্য, নাগরদোলা, মা ও খুকু, খুকুর ছড়া, নবান্ন, বিজ্ঞান-মুকুল, বিজ্ঞান পাঠ, বিজ্ঞান বিকাশ, বিজ্ঞানের কথা। সম্পাদক—বার্ষিক শিশুসাথী।

হেমেন্দ্রকুমার রায়—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৮৮ খৃঃ কলিকাতায়। পিতা—রাধিকানাথ রায়। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাহিত্য সাধনা। প্রথম রচনা মাসিক 'বসুধা'য়—ছোট গল্প (১৯০৩)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সাহিত্য ও চারুকলা সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, সমালোচনা, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি প্রকাশ। 'ভারতী', 'সঙ্কল্প.' 'মর্মবাণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। নানা শ্রেণীর প্রায় দেড় শত গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—উপন্যাস—আলেয়ার আলো, জলের আল্পনা, কালবৈশাখী, পায়ের ধূলো, ঝড়ের যাত্রী, বেনোজল, পদ্মকাঁটা, ফুলশয্যা, পরীর প্রেম, রসকলি, মণিকাঞ্চন, পথের মেয়ে, মণি মালিনীর গলি, পঞ্চশরের কীর্তি; গল্প—পসরা, সিঁদুরচুবড়ী, মধুপর্ক, মালাচন্দন, শুক্তার প্রেম; নাটক—প্রেমের প্রেমারা, ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ; কাব্যগ্রন্থ—যৌবনের গান, স্বর-লেখা, ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ; বিবিধ—সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, নব যৌবনের কুঞ্জবনে, বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, যাঁদের দেখেছি, ২ ভাগ, যাঁদের দেখছি; কিশোর সাহিত্য—ছুটির ঘণ্টা, যখের ধন, আবার যখের ধন, অদৃশ্য মানুষ, আজব দেশে অমলা, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর, গল্পের মায়াপুরী, অমানুষিক মানুষ, যাদের নামে সবাই ভয় পায়, দেবদূতের মর্ত্যে আগমন, সন্ধ্যার পরে সাবধান ইত্যাদি। বাংলা কিশোর সাহিত্যে ঘটনাবহুল উপন্যাস 'যখের ধন', ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পঞ্চনদীর তীরে' ও গোয়েন্দা কাহিনী 'জয়ন্তের কীর্তি' রচনা করিয়া নূতন ধারার প্রবর্তন। সম্পাদক—রঙমশাল (মাসিক), নাচঘর (সাপ্তাহিক, '১৩৩১) ছন্দা (সাহিত্য ও ললিতকলা), শিশির (সাপ্তাহিক)।

হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত—গ্রন্থকার। সহ-সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৩১৪—১৯২১), গ্রন্থ—গিরীশ প্রতিভা, দেশবন্ধু স্মৃতি, Indian Stage.

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৪ খৃঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশে। মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থ—মাঘোৎসব (১৮৬৬)।

হেমেন্দ্রনাথ দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—ঢাকা। সম্পাদক—সেবক (১৩০৪), সোপান (১৩১৭)।

হেমেন্দ্রনাথ দত্ত—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৮৯১ খৃঃ চট্টগ্রামে। আইনজীবী। বিভিন্ন পত্রিকার লেখক। প্রতিষ্ঠাতা—ক্যালকাটা কর্মাসিয়াল ব্যাঙ্ক। সহ-সম্পাদক—চট্টগ্রাম বার ম্যাগাজিন, সম্পাদক—মেদিনীপুরবাসী (মাসিক, ১৩৪৫)।

হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—সতীর মন্দির, স্ত্রীর অধিকার।

হেমেন্দ্রনাথ সিংহ—গ্রন্থকার। জন্ম—বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে বিখ্যাত জমীদার বংশে। শিক্ষা—বি-এ। কর্ম—ময়ূরভঞ্জের করঞ্জিয়া মহকুমার সবডিভিসনাল অফিসার (১৮৯৫), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর। ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের কথা ইনিই (১৮৯৭—৯৮) প্রথম উল্লেখ করেন যাহার ফলে টাটা লৌহখনির উৎপত্তি। গ্রন্থ—প্রেম, আমি, হৃদয় ও মনের ভাষা, জীবন, নির্বাণ।

[ক্রমশঃ।

অশ্বারোহিণী (স্কেচ)
—ইউজিন ডেলাক্রোয়া অঙ্কিত

মাসিক বসুমতী
পৌষ, ১৩৬১

পানিয়া ভরণে (স্কেচ)
—ইউজিন ডেলাক্রোয়া অঙ্কিত

কামমোহিতা
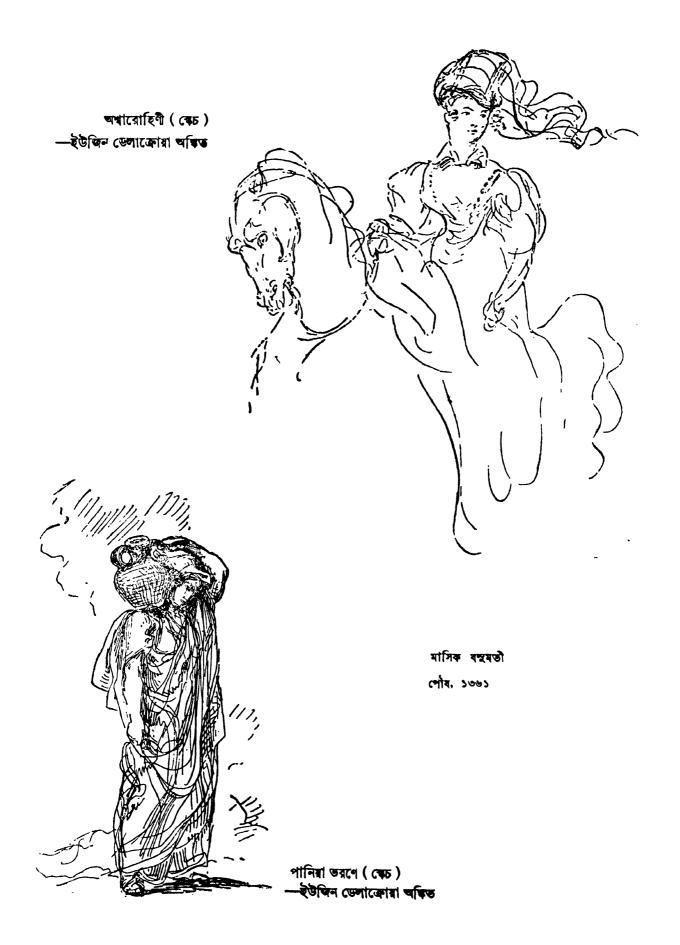
ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক

[ফরাসী সাহিত্যিক ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক ১৯৫২ সালে নোবেল কমিটি কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন। এ-যাবৎ মারিয়াকের রচনার সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটবার সুযোগ হয়নি। সম্প্রতি তাঁর উপন্যাসের বাঙলা তর্জমা'র অনুমতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে। বাঙালী পাঠক-সাধারণের সঙ্গে মারিয়াকের অপূর্ব রচনার পরিচয় করিয়ে দেবার এবার সুযোগ ঘটল।

পরিণত বয়সে সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করলেও মারিয়াকের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস দীর্ঘ। যৌবনে কাব্য-কাননে ফিরেছিলেন বটে, কাব্যলক্ষ্মীর বর লাভ করতে পারেননি। কিন্তু মারিয়াকের সমস্ত উপন্যাসের বিন্যাসে ইতস্ততঃ ছড়ানো কাব্যময়তা মনকে হঠাৎ যাদু করে। সংযত শিল্পী মারিয়াকের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের পটভূমিকা বোর্দো, যেখানে তাঁর জন্ম। মানুষের দেহ ও মনকে এমন অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে গ্রন্থন করার শক্তি এ যুগে অন্য কোন সাহিত্যিকের আছে কি না সন্দেহ। অল্প কথায় ও স্বল্প ভূমিকায় তাঁর রচনার নাটকীয়তাকে বিস্তার করতে পারেন বলেই মারিয়াকের উপন্যাস পড়ার সময় পাঠককে মনোযোগী থাকতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিপর্যস্ত ফরাসী জাতির প্রতি মারিয়াকের বাণী তাঁর সাহিত্যিক প্রেরণা ও আদর্শের অবিচল নিষ্ঠাকেই উজ্জ্বল করেছে। ফরাসী সাহিত্যের সৃজনী প্রতিভার অবিনশ্বরতার উপর তাঁর প্রত্যয়ের অন্ত নেই। সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্যেই জাতি আবার পূর্ণ জাগ্রত হবে, এ আশ্বাস বড়ো কম নয়।—স]

'আজ দু'বার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলে তুমি।'

শুনে অসহিষ্ণু দোলা দিয়ে এক দিকের কাঁধটা একটু উঁচু করলে মেরী।

ঠিক মুখ ফেরায়নি। না না, ঠিক মুখ ফেরান যাকে বলে তাই করেছিলে নাকি?'

কথা হচ্ছিল মায়ের সঙ্গে মেয়ের গভর্ণেসের।

এমন সময় বেজে উঠল গীর্জার ঘণ্টা। মেয়ের মায়ের প্রশ্নের জবাব দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল গভর্ণেস আগাথা। ঘরে ফেরা অনেক পরিবারের সঙ্গে মেরীর মা-বাবাও মিলে-মিশে এগিয়ে আসছিলেন। কারুর সঙ্গেই খুব মাথামাখি গলাগলি নেই এদের। তবে মুখের মিষ্টি হাসিটি ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে সকলের জন্যে। বলাবলি করে উপাসনার শেষে জুলিয়া দুবের্গে যেমন মুখের ভাবটি নিয়ে বেরিয়ে আসেন গীর্জা থেকে তেমন আর কেউ নেই এ সহরে।

কার সঙ্গে কতটুকু ওজন মেপে কথা বলতে হয়, কা'কে কতখানি আপ্যায়িত করতে হয় তার চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানে না। কিন্তু সে ঐ অবধি। সব মাপা-জোপা।

ছিমছাম গড়নের মেয়েমানুষ। ঐ বয়সের অন্য মেয়েদের তুলনায় স্ফীত উদরের আয়তনটি একটু বড়ো বলে মহিলাকে বেশ রাণী-রাণী দেখায়। তা নিয়েও এখানে কানাকানি হয়। পেটের ভিতর কি জন্মাচ্ছে কে জানে?

—'ও মা, মাদাম মঁজি হাত নেড়ে ডাকছেন আমাদের দেখো না'—বললে মেরী।

—'চলে আয়'—দাঁতে দাঁত পিষে নীচু হয়ে হিস্-হিস্ শব্দ করলেন মা—'ওরা আর্বিবাদের সঙ্গে রয়েছে। আর্বিবাদের সঙ্গে আলাপ করার মোটে অভিরুচি নেই আমার।'

মাথার ওপর জ্বলন্ত ঝাঁ-ঝাঁ-রোদ্দুর। এরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল।

কত যুগ ধরে নিজের ভার বয়ে বয়ে ধনুকের মত বেঁকে নুয়ে পড়েছে বাড়ীটা। রাস্তার ধারে বাড়ী। জানলা-শার্সি বন্ধ। যেন এখনি শত্রু আক্রমণ করবে, এই ভয়ে ঘর ঘর সন্ত্রস্ত লোকজন। হুড়মুড় করে হুমড়ি খাওয়ার আসন্ন সম্ভাবনায় গায়ে গায়ে যেন জড়িয়ে আছে বাড়ীগুলো। ছড়ান ময়লার গাদায় চারি পাশে মাছিদের অবিরাম ভনভনানি চলেছে। সদর রাস্তায় সবার চোখের ওপর তিনটে কুকুর মিলে একটা মেয়ে-কুকুরের গা শুঁকে শুঁকে ফিরছে। মেয়ে-কুকুরটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোন হুঁসই নেই।

অনেক পথ ভেঙে তারা ছায়াশীতল পথে এসে পৌঁছল। রোদের গনগনে চুল্লীর ভিতর দিয়ে আসার পর এই স্নিগ্ধ শীতল ছায়া যেন দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে হতে লাগল। ময়রার দোকান ছাড়া আর সব দোকানের ঝাঁপ ফেলা।

রবিবারে মেরীর বাঁধা-বরাদ্দ মিষ্টি খাওয়া। 'খেতে বসেই মেয়ের অমনি মিষ্টির থালার দিকে চোখ'—মায়ের নিয়মিত বকুনি মনে পড়ল মেরীর। কিন্তু আজ আর নয়। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটল।

—'পা চালিয়ে চল মেরী, থামিসনি। আগাথা বরং কিনে নিয়ে যাবে খ'ন। আর্বিবারা যদি দেখে আমরা ময়রার দোকানে ঢুকেছি তাহলে মাছির মত ছেঁকে ধরবে আমাদের। আগাথা, যদি কিছু মনে না কর আমরা এগোই। তুমি মিঠাই কিনে পিছনে এস।'

আগাথা এদের দল-ছাড়া হয়ে বিচ্ছিন্ন হল। কাঁল্লাঁদের ঘরের মেয়ে সে। তবু মাদামকে খুশী করতে পারার আগ্রহ তার কিছুমাত্র

"যেমন সাদা—তেমন বিশুদ্ধ—
লাক্স টয়লেট সাবান—
কি সরের মতো সুগন্ধি ফেনা এর।"

লাক্স টয়লেট সাবান এত সাদা হবার কারণ কি ? কারণ ইহা তৈরী ক'রতে কেবল সবচেয়ে বিশুদ্ধ তেল ব্যবহার করা হয়। "এক লাক্স টয়লেট সাবানেই আমার সৌন্দর্য্য প্রসাধন সম্পূর্ণ হয়" বনানী চৌধুরী বলেন। "এর সরের মতো সক্রিয় ফেনা লোমকূপের ভেতর পর্য্যন্ত গিয়ে পরিষ্কার ক'রে আমার ত্বককে রেশমের মতো কোমল, ও নির্ম্মল করে দে'য়। রোজ লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করে আপনার মুখশ্রী সুন্দর রাখুন। এর সুগন্ধও আপনার খুব ভালো লাগবে।"

সুখবর !

নতুন
বড় সাইজ
সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য
এখন পাওয়া যাচ্ছে
আজই কিনে দেখুন।

"...সেইজন্যই ত আমি আরও পরিষ্কার ও ঝরঝরে মুখশ্রীর জন্য লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর নির্ভর করি!"

★ চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান ★

LTS. 427-X52 BG

কম নয়। মাদাম যখনই আগাথাকে কিছু করতে বলেন,—যতই মাইনে-করা লোক হোক না কেন—সে যে কাঁব্লাঁদের ঘরের মেয়ে এ কথাটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না। বংশমর্যাদায় আগাথা তার চেয়ে অনেক বড়। এ চিন্তায় মনে যতই আত্মতৃপ্তি হোক না কেন, একটু অনুকম্পাও হয় মেয়েটার প্রতি।

আগাথার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন পরিপাটি জামার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসা হাড়-জিরজিরে গলা, পাতলা চুল। তাকিয়ে দেখেন তার পাতলা জামার দিকে—শরীরের কোন কিছুকেই যা ঢেকে রাখতে পারেনি। হোক না পাখীর মত হাড়গিলে মেয়েটা। কিন্তু বংশ-কৌলীন্য যাবে কোথায়? সে কি কম জিনিষ নাকি?

শেষ অবধি বাড়ীর হলঘরে এসে উঠল সবাই। এ ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালে নোনা-লাগা। এক তলায় সারি সারি অনেকগুলি অফিস-ঘর। মেরীর বাবা আঁর্মা দ্যুবের্ণে তেজারতী ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে সেগুলি খালিই পড়ে আছে। মেরীর মা বলেন—'ঘরগুলো রয়েছে—ওঁর কোন একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে। ভগবানের অশেষ করুণা, মেরীর বাবার হাতে যা আছে তাতে ওঁর রোজগারের জন্যে কোন কাজ করার দরকার নেই।'

বেশ চলেছিল স্বল্প পুঁজির কাজ-কারবার। দিনে দিনে আয়ের অঙ্ক স্ফীত হয়ে উঠছিল। কোথা থেকে যে এসে জুটল ঐ সুদের অফিসের বিরাট হাঙ্গরগুলো। সুদ-আসলের নিস্তরঙ্গ জলে ঘটিয়ে দিল বিপর্যয়। কাজ-কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেন মেরীর বাবা। স্বামী যে ঐ সুদের অফিসের খপ্পরে পড়ে উদরসাৎ হয়ে যায়নি এই একটি মাত্র কারণে স্বামীর বৈষয়িক বুদ্ধির উপর মাদামের অবিচল নিষ্ঠা।

সিঁড়িটা চির-অন্ধকার। কিন্তু সিঁড়ির চাতাল থেকে দোতলার ঘরগুলোর দিকে যেতে দুপুরের চোখ-ধাঁধান রোদ থেকে হঠাৎ ছায়ায় আসার মতই মনে হয়। ঘরের ভেতর আবছা আবছা শুধু চোখে পড়ে বিছানার সাদা চাদরগুলো। অবশ্য এ অন্ধকারে অসুবিধে কিছু নেই। এখানকার মানুষ সব পেঁচার মত। মা মেয়ে বড় ছোট সবারই এ অন্ধকার গা সওয়া। দোর্থেতে যারা থাকে সূর্যের আলো আর মাছির সঙ্গে তাদের চিরদিনের আড়াআড়ি। ও সব বাইরের। বাড়ীর ভেতর তাদের কোন অধিকার নেই। বসন্ত কালের পর থেকেই এ সহরের বাড়ীতে বাড়ীতে লোকে আধা-অন্ধকারের রাজ্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেয়।

ড্রয়িংরুমের মধ্যে মস্ত একটি চেয়ারে আরাম করে চেপে বসেছিলেন মেরীর বাবা। তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত একটি রশ্মি-শর জানালার কাচ দিয়ে এসে পড়েছে তাঁর মাথায়। সেই আলোর রেখা-পথে অগণিত উজ্জ্বল ধূলিকণার নৃত্যলীলা চলেছে অবিরাম।

—'আজ উপাসনা শেষ হতে বেশ দেরী হয়েছে দেখছি।'

—'নিজে গেলে কিন্তু এত বেলা হয়েছে বুঝতে পারতে না।'

একটু আগে মেয়ে যেমন কাঁধ নাড়া দিয়েছিল এখন তিনিও তেমনি এক দিকের কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে উঁচু করলেন। এখুনি যা হোক একটা কিছু কথা পাড়তে হবে। না বললে মেরীর মা তার চিরকেলে পুরোনো প্রসঙ্গ অবতারণা করে বসবে। সেই এক প্যানপ্যানানি। কে যে কখন মরবে তার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। এই ধর না কেন মাংসওয়ালার কথা। লোকটা আচার্য্য মশাইকে বলেই রেখেছিল যে, ঠিক সময়টিতে সে ডেকে পাঠাবে তাঁকে। কি তা' করার, আর তর সইল না। এক-বোঝা পাপ নিয়ে সরে যেতে হল লোকটিকে পৃথিবী থেকে।

এই সব কথা ভেবেই মেরীর বাবা তাড়াতাড়ি জানতে চাইলেন, গীর্জায় খুব ভিড় হয়েছিল কি না।

বাপের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে গিয়ে বসেছে মেয়ে। মেরীর মা আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে সযত্নে টুপি ও কেশপাশ থেকে পিন খুলতে ব্যস্ত।

—'বললে তোমার বিশ্বাস হবে না—গীর্জা থেকে আমরা বেরিয়ে আসার সময় দেখি কি মঁসিয়া আর্বিবাদের সঙ্গে আলাপে উন্মত্ত। উপায় ছিল না ওদের চেনা না দিয়ে। নমস্কার জানাতে হল। সে যে কী বিরক্তিকর ব্যাপার! আর্বিবারা নিশ্চয় ভাবলে যে, আমরা বুঝি ওদের খুব খাতির করে নমস্কার করলাম।'

—'ময়রার দোকানে ভাল কিছু পেলে নাকি?'

—'ঐ আর্বিবাদের ভয়ে ঢুকিনি সেখানে। আগাথা আচার নিয়ে আসবে।'

—'আজ তোমার কি হবে মা?'—খেতে বসে মিষ্টি না পেলে তোমার যে মুখে অন্ন রুচবে না।' মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আশ্চর্য নরম হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

—ওর কথা আর বলো না। আজ উপাসনার সময় দু' দু'বার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল তোমার মেয়ে।'

মেরীর দুই চোখের তটে অশ্রু ছলছল করে উঠল। বললে—'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ মা, যেন গীর্জায় পিছন ফিরে তাকান কী একটা মস্ত অপরাধ।'

—'আমার সঙ্গে আর ভণ্ড ভালোমানুষী করতে হবে না। অমন করে বিশেষ কারুর দিকে তাকানোর মানে কি, তা বোঝবার ঢের বয়েস হয়েছে তোমার। এ নিয়ে যে এতক্ষণ টী-টী পড়ে গেছে চারি দিকে সে আমি খুব ভালই বুঝতে পারছি।'

—'সে ছিল সেখানে?'

মেরীর বাবার কথা লুফে নিয়ে মা রাগত স্বরে বললেন—'ছিল না আবার? ছিল বই কি। প্রাণের বন্ধু প্লাসাদের ছেলেটাও সঙ্গে ছিল যথারীতি।'

বাবা মার কথা শুনে এতক্ষণ মেরী জানলার কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সার্সির কাচে কপাল চেপে দাঁড়িয়ে দেখছিল নিজের মুখের তামাটে প্রতিবিম্ব। মায়ের তিরস্কারে কান্নায় ভেঙে পড়ল অভিমানিনী। ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

'হল ত?' রাগে গর-গর করতে লাগলেন মেরীর বাবা—'আজকে খাওয়ার দফা শেষ। আজকে চিংড়ি মাছ এসেছে জান ত, চিংড়ি মাছ খেতে কত ভালবাসে তোমার মেয়ে?'

—'চিংড়ি মাছ তোমার পেটের পক্ষে কত খারাপ সে ত মনেই রাখ না।'

—'তিলকে তাল করা তোমার চিরদিনের স্বভাব। মেয়েটাকে কি নাস্তানাবুদ করে কাঁদালে মিছিমিছি।'

—'মিছিমিছি? এটা সামান্য ব্যাপার ভাব বুঝি তুমি?'

—'হাজার হোক ও সার্লোদের ঘরের ছেলে। আর এই সময়টা ডাঃ সার্লোর সঙ্গে সেই ডিলটা শেষ হব হব হয়েছে। ঐ জমি আর বাড়ীটা সস্তায়—'

—'কিছুতে না। আমি বেঁচে থাকতে সে কিছুতে হতে দেব না। কখনো না—কিছুতে না—'

হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকল আগাথা। আচার নিয়ে এসেছে বাজার থেকে। আধো-অন্ধকার ঘরে বাদাম তেলের গন্ধ এসে নাকে লাগল। মেরীর বাবা চেয়ার থেকে উঠে নিজে প্যাকেটটা নিলেন ওর হাত থেকে।

—'মেরী কোথায়?'

—'নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।' বললেন মা—'গীর্জায় দু'বার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল সে কথা ওর বাপাকে বলে দিয়েছি বলে বাপ-সোহাগীর মান হয়েছে।'

মেরীকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল আগাথা কিন্তু বাধা দিলেন মেরীর বাবা। বললেন—'দরকার নেই এখন ডেকে। বরং খেতে বসে পড়াই ভাল। মেয়ের মেজাজ শান্ত হতে এখন এক যুগ। ততক্ষণে মাংস ওদিকে গলে বসে থাকবে।'

—'ওঁর তৈরী করতেও ত একটু দেরী আছে।'

—'তা হোক বাপু। মাংস হতে হতে চিংড়ি মাছ নিয়ে বসে পড়া যাক তো ততক্ষণ।'

২

মেরীর ঘর আর ছাত। মাঝে নীচু একটা চিলেকোঠা। গীর্জায় যাবার আগে ঘরের জানলা দিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল সে। শার্সিগুলো খেলা করছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রঙ জ্বলে-যাওয়া পুরোনো টালির ঘরগুলো। তাদের মাথার উপর দিয়ে আরো দূরে তাকালে চোখে পড়ে, বহুদূরে গিরিশ্রেণী। নির্বাত আগুনের হল্‌কায় বসে বসে ঝিমোচ্ছে। মস্‌লিনের জামাটা গা থেকে খুলে ফেললে মেরী। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, সব ফেলে দিয়ে অর্ধনগ্ন শরীরে এলিয়ে পড়ে বিছানায়। নিজের দুঃখ নিয়ে নিরিবিলি নিঃসঙ্গ দু'দণ্ড কাটায়। একটু পরেই বালিশে মুখ গুঁজে বিপর্যস্ত পাগলিনীর মত অঝোর অশ্রুতে ভেঙে পড়ল মেরী। শার্সির কাচের ওপর একটা ভোমরা মাথা ঠুকে ফিরছে। যেন বাইরের নিস্তরঙ্গ নীলাভ সমুদ্রের একটি মাত্র চঞ্চল দ্যুতি। বিছানার উপর অর্ধনগ্ন ঐ যে কিশোরী বাঁধভাঙা কান্নায় ভাঙছিল তার শরীরে রমণীয় বরণীয় পূর্ণতা এসে পড়েছে তা দেখবার মানুষ কই সংসারে! তার বেদনায় একটু মমতা দেখায় এমন একটি মানুষ নেই কোথাও। ঘরের দেয়ালে কাগজের বেগুনী ফুলগুলো কত দিন ধরে যে এই ঘরের অলঙ্কার হয়ে আছে, তা বোধ হয় কারো মনে নেই। এই যে সহর—এখান থেকে যৌবন চির নির্বাসিত। কোন নিষ্ঠুর নিয়তি বুঝি এখানকার বসন্ত-রস নিঙড়ে নিয়ে চলে গেছে চিরদিনের মত। যৌবনের দেখা পাবে না তুমি পথ-প্রান্তরে-লোকালয়ে—কোথাও। এই ঘরের পালঙ্কটি যেন অনন্ত কালের স্রোতহীন বদ্ধ জলের উপর ভাসা রুদ্ধগতি তরণী। এ পরিবেশে প্রাণ নেই—যৌবন নেই—মাধুরী নেই। আছে শুধু ফুঁপিয়ে-ওঠা মনের দীর্ঘশ্বাস।

ভেজা বালিসে ঠোঁট চেপে মেয়েটি অস্ফুট নাম ধরে ডাকে—গিল্‌স, গিল্‌স, গিল্‌স। তিনটি বার তার দেখা পেয়েছে সে এত দিনে। বনভোজনে একবার। আর দু'বার লেরো নদীর ঘাটে। আহা, সেই দু'বারই দেখার মত দেখা হয়েছিল। নিকোলাসের সঙ্গে ঘাটে নাইতে এসেছিল সে। সোনালী চামড়ার উপর জলবিন্দুগুলি রোদ্দুর লেগে ঝক-ঝক করছিল। মানুষটি যেন গায়ে সোনার ছিটে লাগা নেকড়ে বাঘ। তার পাশে নিকোলাস স্যাঁতস্যেঁতে নোঙরা। গিল্‌স তাকে চেঁচিয়ে সাড়া দিয়ে বলেছিল, পোষাক বদলে আসা অবধি অপেক্ষা করতে। একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস। গিল্‌স বলেছিল, ও ঘর জাগছে দাঁড়িয়ে। আগাথা এসে যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। যা ঘটছে আশে-পাশে সে যেন কিছু দেখেও দেখছে না। আবার দেখা হবার কথা হয়েছিল দু'জনের। সেই দুটি ঘণ্টা সময়। মনের পেয়ালায় তার উপচে পড়েছিল অমৃত। আর একবার সেই মাধুরী সে যৌবনপাত্রে ভরে নিয়ে আকণ্ঠ পান করবে। যত মূল্যই লাগুক, তা দিতে কৃপণতা করবে না মেরী।

কিন্তু সে? সে কি এমন করে নিঃসঙ্গতার বেদনা ভোগ করছে? ভাবলে মেরী। তিন বছর গীর্জায় যেত না। এই ক' দিন ধরে যেতে সুরু করেছে আবার। সে শুধু তাকে দেখবার লোভে। শেষ বার যখন দেখা হয় সে ত বলেছিল যে মাদাম আগাথা তাদের দু'জনের সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন। বলেছিল যে, নিকোলাসকে মনে মনে ভালবাসে আগাথা। কথা শুনলে মনে হয় যেন মাদামের মত মেয়ে মানুষ কোন পুরুষকে কখনো ভালো বাসতে পারে না। যতই নরম নরম চাউনি দিক, ওরকম মেয়ের মনের ভিতর কি হচ্ছে তা কেউ বলতে পারে না। তা যদি না হবে তবে এখন এক রকম আর পরমুহূর্তে আর এক রকম—এ সব ওলট-পালট কথাবার্তা কেন বলে মাদাম? ইচ্ছে হল ত এমন ভাব দেখালে যেন তার সবটুকু মধু—সবটুকু প্রীতি। তা নয়ত আসলে ও বুড়ী হোল বিষাক্ত মাকড়সা। ঘাসের আড়ালে হিলহিলে সাপ। দেখলে মনে হয় যেন ওর বুকের ভেতর কুরে কুরে খাচ্ছে কি। হয়ত বা ক্যানসার পোষা আছে শরীরে। অমন মেয়েমানুষ যদি পৃথিবী থেকে সরে পড়ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচত মেরী। না, না। তখুনি শিউরে উঠল মেরীর কিশোরী মন। ভারী খারাপ চিন্তা করছে ত সে। আগাথা মরে যাক্‌—তা সে চায় না। কিছুতেই চায় না। এমনি, রহস্য করে ওকথা ভাবছিল। ভগবান, তুমি কৃপা করে ওকে বাঁচিয়ে রাখ। আগাথাকে মরতে দিও না তুমি।

তাহলে সংসার-সমুদ্রে তাকে একা ভাসতে হবে। কর্ণধার থাকবে না যে তাকে নিরাপদে তীরে তুলে দিতে।

৩

যার কথা ভেবে একটি অর্ধনগ্ন মেয়ে পরনের সাজ ফেলে একলা বিছানায় শুয়ে অঝোর কান্নায় ঝরিয়ে দিচ্ছিল নিজেকে, সে ছেলেটি তখন বন্ধু নিকোলাসের বাড়ীতে খাওয়ার টেবিলের ধারে আরাম করে বসে। বছর তেইশ বয়স ছেলেটির। সাজে-শরীরে কোথাও তেমন কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। তেইশ বছরের অন্য সব ছেলেদের মত নিতান্তই আটপৌরে। তার যা কিছু রূপ গুণ জৌলুষ, সব একটি বয়ঃসন্ধিকালের মেয়ের চোখে। আর বন্ধু নিকোলাসের কাছে। বন্ধুর মা-ও ছেলেটিকে ভালবাসেন

—তবে তাঁর মতামতের কে-ই বা দাম দিচ্ছে! তিনি জানেন এখানকার সমাজের একটি মূল্যবান ভালো ছেলে হল গিলস্। জেনারেল কাউন্সিলের মেম্বার, নামকরা ডাক্তার যার বাপ। তেমন ছেলে যে তাঁর নিকোলাসের বন্ধু—এ বড়ো কম তৃপ্তি নয় মায়ের। সেই গিলস তাঁর বাড়ীতে তাঁর হাতের রান্না খেতে রাজী হয় এ কি কম গৌরবের! আর শুধু তাই? সব রান্নার কত তারিফ করে সে। মাংসের গ্রীল দু'বার করে চেয়ে নিয়ে বলে যে, এমন সুস্বাদু উপাদেয় রান্না সে জীবনে খায়নি।

'না বাবা গিলস্, এ তোমার মন রাখা কথার কথা। বাড়ীতে মা'র কাছে এর চেয়ে কত ভালো জিনিষ তুমি রোজ খাও। ভালো না হোক, অন্তত: এর চেয়ে নীরেস যে নয় তা আমি জোর করে বলতে পারি। আমাদের'উনি অবশ্য বেঁচে থাকতে বলতেন যে, বড় লোকেরা যে সবাই আমাদের চেয়ে ভালো রান্না করে, ভালো জিনিষ খায় তা নয়।'

মায়ের এই ধরণের কথায় নিকোলাস নিশ্চয়ই লজ্জিত বিব্রত বোধ করে, প্রথম প্রথম ভাবত গিলস্। কিন্তু সে ভুল তার অনেক দিন ভেঙেছে। বন্ধু তার মা-গত প্রাণ। মায়ের কোন দোষ দুর্বলতা তার চোখেই পড়ে না। এই ঘরে তাদের খাওয়া শোওয়া দুই হয়। অন্ধকার স্যাঁতস্যেঁতে ঘর। জীবনে কখনো রোদ ঢোকে না। কাচের জারের নীচে একটা ঘড়ি আর দেয়ালে রঙীন লিথোছবি বহুকালের সাক্ষী এদের সংসারের। তবু এই শ্রীহীন সামান্য ঘরটি নিকোলাসের লেখা কবিতায় কেমন অসামান্য পবিত্র হয়ে ওঠে; প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিষ বাক্যহীন প্রাণময়তায় যেমন সজীব মুখর হয়ে ওঠে, তেমনি তার বৃদ্ধা জননীও তরুণ কবির চোখে সামান্য নারী হতে অনন্যা হয়ে ওঠেন। স্নিগ্ধ কারুণ্যের আভায় তাঁকে মনে হয় যেন অমর্ত্যবাসিনী দেবী।

আর বন্ধুর চোখে গিলস্ হল এ পৃথিবীর সব তারুণ্যের, সব সুষমার জীবনের সব ভঙ্গুরতার মূর্তিমান প্রতীক। পৃথিবীর এই অপস্রিয়মান আশ্চর্যময়তার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে নিকোলাস। মনে তার কোন ক্ষোভ থাকে না। চেয়ে থাকে সব-কিছুর দিকে, যাদের উপর কালের ক্ষয়ক্ষতি-লাঞ্ছনার দাগ পড়েছে। বন্ধুকে সে ভালোবাসে। এই খাওয়ার টেবিলে বসে তার মন জানে না কি দিয়ে উদরপূর্তি করছে সে। মা কি বলছেন সে-কথার কি জবাব দিচ্ছে গিলস। কিছুই তার কানে যায় না। শুধু এই পুলকিত আনন্দে তার মন নিবদ্ধ হয়ে থাকে যে গিলস আছে তার বাড়ীতে। আছে তার অতি কাছাকাছি। এই কাছে থাকার একটি মুহূর্তের আনন্দও সে বৃথা যেতে দিতে চায় না। গিলসের বন্ধুত্ব তার ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাঁর অপার করুণা যে গিলসের সান্নিধ্য তার ঘরে, তার প্রাণে, তার জীবনে দূরপ্রসারী আয়ুর প্রতিটি পলাতকা মুহূর্তে। গিলসের ভালবাসা তার প্রাণকে, কালকে আচ্ছন্ন করে আছে—থাকবেও। প্যারিসের সমাজে তাদের দেখা ঘটে কদাচিৎ। কচিৎ যখন সাক্ষাৎ হয় তাতে মনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না।

প্যারিসে নিকোলাস থাকে লিসেতে। আর দিনভোর লেকচার নিয়ে ব্যস্ত থাকে গিলস। সেখানে সে অন্য লোকের। অনেক অনেক লোকের। সেখানে বেশী করে তাকে পায় না নিকোলাস। এতে কোন দুঃখ থাকে না, তার না পাওয়াই ভাল। সংসারে যাকে সে সর্বাধিক ভালবাসে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই তার পক্ষে মঙ্গল। বিরহের নিঃসঙ্গ আসঙ্গে প্রিয়জনকে সব থেকে বেশী করে পায় মানুষ, এ তার দৃঢ় বিশ্বাস।

ছুটির সময় দু'জনে আসে ডোর্থেতে। তখন বন্ধুকে বড়ো আপন করে পায় নিকোলাস, যদিও গিলসের মুখে লেগে থাকে শুধু মেরীর কথা। গিলস বলে মেরীকে সে কত ভালবাসে। তার তেইশ বছরের জীবনের সর্বোজ্জ্বল তারকা মেরী। নিকোলাস যে মন দিয়ে শুনছে তার কথা এই তার যথেষ্ট। সে ভিন্ন আর কারো কাছে মেরীর কথা এমন করে বলতে পারে না গিলস। নিকোলাসের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ তাই তার কাছে অরুচিকর বোধ হয় না কোন মতেই।

এখন খাওয়ার টেবিলে বসেও গিলসের মন মেরীর কথায় ফিরে ফিরে যেতে চায়। নিকোলাসের মা রান্নাঘরে খাবার ঘরে বারে বারে আনাগোণা করছেন—সেই ফাঁকে ফাঁকে কথাটা পাড়ছে গিলস।

'দু'বার আজ মাথা ফিরিয়ে দেখেছিল না?'

'দু' বার কেন তিন বার ত!'

'তুমি দেখেছিলে, তিন বার? কিন্তু ঐ মেয়েটাও সেই সঙ্গে দেখছিল আমাদের দিকে। আমি ত ভেবেছিলাম তোমার মুখ রাঙা হয়ে উঠবে।'

'আঃ গিলস্! দোহাই তোমার, মাদাম আগাথার কথা পেড়ো না তুমি এ সময়।'

—'বাঃ—সে যদি তোমায় ভালবেসে ঘুরে ঘুরে দেখে, সে বুঝি আমার দোষ হল?'

'তোরা ওকে 'গালিগাই' বলিস কেন রে?'—মা ওদের মুখের কথা কেড়ে নেন।

দুই হাতে মুখ চাপা দিয়ে বসল নিকোলাস।

'জানিস গিলস্, ছুটি ফুরোলে শুধু আমার একটি মাত্র সান্ত্বনা থাকে যে ঐ মেয়ের কাছ থেকে অন্তত: কয়েক শ' মাইল দূরে পালিয়ে যেতে পারব আমি। অন্তত: যখন তখন অনাহূতের মত বাধা হয়ে এসে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে না। তুই জানিস, ঐ ও—রীতিমত আমার ঘরে হামলা করে।'

'—তা হোক। তুই না আমার কাছে অঙ্গীকার করেছিলি যে তার সঙ্গে কখনো মনোমালিন্য করবি না! ওই আমাদের একমাত্র ভরসা জানিস। মেরীর আর আমার বিনি সুতোর বাঁধন। ও যদি তোর নির্জন নিরিবিলির রস হানি করে আর তুই কবিস আমাদের, তা'হলে আমরা দুটি প্রাণী ত নিরুপায়।'

—'কি যা-তা বলিস তুই?'

বন্ধুকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে তোলার আনন্দে গিলসের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মা বললেন—'তোরা দু'জনে কার কথা বলাবলি করছিস রে?'

মস্ত ডিসে করে বিরাট পরিমাণ মিষ্টি নিয়ে এসেছেন মা। ডোর্থের লোকের নামে নিন্দে যে ভরপেট খাওয়ার পরেও মিষ্টি পেলে এরা ছাড়ে না। এখানকার মানুষ তারও রীতিমত সদগতি করে তবে টেবিল ছেড়ে ওঠে।

'মাদাম আগাথার কথা হচ্ছিল।'

'বুঝলাম'—গিলসের কথার এক অক্ষর জবাব দিলেন মা।

মুখে ভণ্ড ভালোমানুষী এনে গিলস বললে—'আপনার কেমন লাগে তাকে? ভালো লাগে না?'

'আসে এখানে। এসে পড়ে যখন তখন। এমন ভাব যেন এটা আমাদের নিজেদের বাড়ী নয়। রাস্তার যে-সে লোকের জন্তে আমরা হোটেলের দরজা অবারিত খুলে রেখেছি। আমার সঙ্গে কথাবার্তা নেই, সোজা হুট হুট করে একেবারে নিকোলাসের ঘরে গিয়ে উঠল—কোন ভয়-ভ্রূক্ষেপ নেই মেয়েটার। কিছুই আশ্চর্য নেই। হয়ত আমার ছেলের ওপর মেয়েটার কোন নজর আছে।'

এক মুখ আতঙ্ক নিয়ে নিকোলাস বললে—'তুমি চুপ কর মা—ওকথা বাদ দাও।'

'গত বারই আমি ওকে একটু শিক্ষা মতন দিয়ে দিয়েছি। মানে মেয়েটাকে এমন ভাবে আঁতে ঘা দিয়ে বলেছি যে প্রাণ থাকতে আর তাকে নিকোলাসের ঘরে যাবার সিঁড়ি ভাঙতে হবে না।'

গিলস তবু গম্ভীর হয়ে বলে—'কিন্তু ও ত যে-সে মেয়ে নয়। কাঁউন্টদের ঘরের মেয়ে—রীতিমত কাউণ্ট ছিলেন ওর বাবা।'

'তা আবার নয়। নিজের মেয়েকে রোজগার করতে পাঠিয়ে যে বলে যে মেয়ের রোজগার জমিয়ে তাকে স্বাধীন করে দেবে—সে যে কত দরের কাউণ্ট তা আর আমার বুঝতে বাকী নেই। আর কাজের ঘটাই বা কত? ওদের ঘরে আগাথা কি ইজ্জতের কাজ করে, সেও আমরা সবাই জানি।'

তুমি চুপ করো মা! চোখ বন্ধ করে মাকে মিনতি করে নিকোলাস।—মা যখন এই ধরণের কথা বলেন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে না সে।

মনে মনে খুব খুসী হয় গিলস। তবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—'আহা, অভিমানিনী গালিগাই।'

মা মুখ ফিরিয়ে বলেন—'গালিগাই কে?'

—'আপনি ত জানেন আগাথার বিয়ে হয়েছিল একজন ব্যারণের সঙ্গে।'

—'বিয়ের রাত্তিরেই ত বর ওকে ফেলে পালিয়েছিল। হাঁ হাঁ—মনে পড়েছে। ব্যারণের ঠাকুমার অঙ্গীকার ছিল যে, নাতি বিয়ে করলে তবে কুড়ি লাখ টাকার সম্পত্তির-অধিকারী হবে। বিয়ে ঠিক হল, সম্পত্তির কাগজ-পত্তর সেই দিনই নিজের নামে লিখিয়ে নিলে ঠাকুরমার কাছে। সন্ধ্যাবেলা যখন কনেবৌ সাজ করতে আড়াল হল, সেই যে সরে পড়ল আর ও বৌয়ের মুখ দেখলে না—'

'যা বলেছেন সত্যি?' গিলস অবাক চোখে চাইলে।

বন্ধুর দিকে চাইলে নিকোলাস। দৃষ্টিতে তার বিষণ্ণ বেদনা। ভর্ৎসনার সুর বাজল তার কথায়।

—'মা যা বলছেন, এ সব কথা তুমি ত নিজেও জান। এ সব ত নতুন কিছু নয়।'

মিষ্টির ডিস থেকে চোখ তুললেন মা। তার দিকে তাকালে প্রথম নজরে পড়ে তাঁর তীক্ষ্ণ নাসা। চশমার পিছনে চোখের মণি দুটি চকচক করে উঠল তাঁর। বললেন—'আর তোমার সে লোক একাও সরে পড়েনি।'

—'তবে?—শুচিবায়ুগ্রস্ত পণ্ডিতের মত আশঙ্কিত কণ্ঠে বললে গিলস—'সঙ্গে ছিল কে?'

আগের মতই প্রতিবাদের কণ্ঠে বললে নিকোলাস—'কেন মিথ্যে মায়ের মুখ থেকে তুমি ঐ সব নোংরা কথা বলিয়ে নিচ্ছ ভাই? এ তোমার মোটেই শোভন হচ্ছে না।'

'অল্পবয়সী কোন মেয়েমানুষ নিয়ে নয় অবশ্য।'

গিলস সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বন্ধুর প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে সে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বললে—'তবে কা'কে নিয়ে গিয়েছিল?'

'সে কথা যদি না জান ত আমার মুখ থেকে নাই বা শুনলে তুমি।'

বৃদ্ধার গলার স্বরে এতক্ষণে চেতনা হ'ল গিলসের যে শোভনতার সীমা অতিক্রম করে সে অনেক দূর অনধিকার অগ্রসর হয়ে এসেছে।

জানলার শার্সি তুলে দেখলেন মা। সূর্য অস্তরাল হয়েছে। ঝড় আসন্ন আকাশে' গীর্জার ঘণ্টাধ্বনিতে সান্ধ্য ভজনের আহ্বান রণিত হচ্ছে আকাশ-মৃত্তিকায়। বাইরে ছোটদের পদধ্বনির ঐক্যতান উঠেছে। লঘু কণ্ঠের কোলাহল শোনা যাচ্ছে ঘরের ভিতর থেকে। আর পনেরো মিনিট পরে ঐ সব ছোট ছোট হাতে ধর্মপুস্তকের পৃষ্ঠা অবারিত হবে। ভগবানের মহিমা কীর্তনে লাতিন গান উঠবে কচি কচি কণ্ঠে অর্গানের সুর সমন্বয়ে। কিন্তু সে পবিত্র লাতিন গানের একটি বর্ণও মর্মবোধ্য হবে না তাদের।

তা না হোক। মন্ত্র ত আর মুখের কথা নয়। মন্ত্র হোল হৃদয়ের মুখর স্তব। তাই সে প্রশ্ন তখন অনাবশ্যক মনে হবে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

জর্জ-মাইকেল

পঞ্চদশ শতাব্দীর এক সম্ভ্রান্ত বনেদী বংশে খারিসের খাতায় জন্ম, তাঁর বাবা ছিলেন যবদ্বীপের একজন ধনী কৃষি-ব্যব- ী। খারিস ক্লাপারিয়েড বীক্ষণাগারের একজন রাশিয়ান ছাত্রীকে াহ করেছিল, কিন্তু একদিন এক যাদুঘরে রক্ষিত সুইডিস ছবি খ সহসা তার মনে হ'ল যেন দিব্যদৃষ্টিতে ওর পূর্বপুরুষদের সব দেখতে ল। না শিখেই ও সুইডিস ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো, ানো স্ক্যানড্যানেভিয় বই অনুবাদ ক'রে কিছু কিছু পায়— :নর পর দিন সমাধিস্থ হয়ে অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে সুইডিস্, রাশিয়ান, তার, হিন্দু প্রভৃতি প্রায় ছশো অবতারের জীবন ওর কাছে ঘাটিত হয়ে যায় এক সময়। তাদের ইতিহাস ও একটি ইংরেজী ময়িক পত্রিকায় লিখবে।

এই হোটেলে খারিস আর হারিকট-রুজ উভয়ে একটি জিনিষের :ম দিয়ে পরস্পরে ভাগাভাগি করে খাবে স্থির করেছে ; দুধ আর ফর সঙ্গে এক টুকরা পাউরুটি। ফকির খারিস কফিটা পান বে, গরম দুধ খাবে হারিকট—তাতে উভয় পক্ষেরই উপকার।

স্তম্ভমূলে নারীমূর্তি (১১১৪) —মদিলিহানী অঙ্কিত

পূর্ণ সদিচ্ছা রয়েছে, সেই লোকটি ওর সামনেই টেবলের উপরে দছে, কিন্তু ওর কোনো কিছুই এই হিন্দু ভদ্রলোকটি গ্রহণ রবে না। আরও হাজার হাজার ভারতীয়ের সঙ্গে এই হিন্দুটি এক রাট বিপ্লব পরিকল্পনা করছেন। এই বিপ্লবীরা বার্লিনস্থ কার্য্যালয় াকে কিছু অর্থ সাহায্য পেয়েছেন, একটা গুপ্ত ইস্তাহার বিতরণ রার ব্যবস্থা হয়েছে। শীঘ্রই লণ্ডনে একটা অফিস খোলা হবে স্থির হয়েছে। তিনি গান্ধীজীকে জানেন, গান্ধীজী স্বয়ং নাকি তাঁকে এই কর্ম্মে দীক্ষা দান করেছেন। সপ্তাহে অনিয়মিত ভাবে প্রায় দশ ফ্রাঁ পেয়ে থাকেন, তাতেই তাঁর আহারাদি চালিয়ে নেন। এই সঙ্গীটি যখন কথা বলছিলেন তখন খারিস অন্য দিকে তাকিয়েছিল, কারণ পুলিশের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেই সে থাকতে চায়—পুলিশ খারিসকে পারীর জনবহুল পথেও ঐ রকম পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেয়।

হারিকট-রুজ কয়েকটি রাশিয়ান মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার ফলে বেদনাদায়ক আঘাত পেল। যে কোনও ইংরাজ মহিলা অবশ্য হারিকটের এই আলাপাচার সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করতো, কিন্তু এই সব ঝড়ো কাকের দল শুধু নিজেদের রাষ্ট্রের কথাটুকুই শোনাতে চায়, তার বেশী কিছু নয়। ওদের মধ্যে একজন স্মোলেনস্ক ইনষ্টিট্যুটের সদস্য ছিলেন। কর্ণেল বা তাঁর চেয়ে অধিকতর মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির কন্যা না হলে সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারতো না। মেয়েটির বাবা রাজকীয় রক্ষী দলের জেনারেল ছিলেন। বিপ্লবের সময় এই মেয়েটি 'থার্ড ইণ্টারনেশানেলের' শিক্ষালয়ের পরিদর্শক ছিল, পরে রাংগেলের সনা দলের সঙ্গে কনস্টানটিনেপোলে পালিয়ে যায়। Isle of 'rincess এ তাকে রাখা হয়, সেখানে সে মধুর কণ্ঠে ইংরাজদের ধ্যে এক ভীষণ প্রচার-কর্ম শুরু করে। তারপর আবার রাশিয়ায় ফিরে যায়। পূর্বে তার প্রেমের প্রতি অনুরাগ ছিল না, এখন াবায়ের প্রেমে সে পাগল। কিন্তু বড়ই বিচিত্র তার অবস্থা। বহু ৃত মানুষ তাকে দেখতে হয়েছে,—দু' বছর ধরে প্রতি দিনই গুলীবিদ্ধ অবস্থায় মরার আতঙ্কে তার দিন কেটেছে। মূর্খ সৈনিকদের ষ্টেনোগ্রাফার বা শ্রুতিলেখক হিসাবে প্রতিদিন সে আসল বক্তব্যের ভ্রান্তরূপ প্রচার করেছে,—এত বার এত দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যে আসলে সে যে কোন্ দলের সমর্থক তা কেউ বলতে পারে না। সপ্তাহে দু' তিন বার সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। কোমল থেকে কোমলতর হয়ে পড়ে, জ্বলন্ত বিছানায় শুয়ে জ্বলে মরার মত তার সারা অঙ্গ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়—তারপর সহসা কঠিন হয়ে ওঠে।

এখন প্রতিদিনকার বাস্তব রূপ যেন তার ওপর প্রতিশোধ নেয় —ক্ষয়রোগে মারা যাবে তবু সে আর কারো নির্দেশে চলবে না এই স্থির করেছে।

হারিকট-রুজ ওর কাছ থেকে দূরে থাকে—কারণ এখন আর বিষাদ-মাখানো কাহিনী সে শুনতে চায় না। হাতের কাছে যা কিছু বই পায় হারিকট সব পড়ে—ফ্রয়েড, জাঁ ককতো, সব।

মোদক একটু করে সুস্থ হচ্ছে। নার্সের সঙ্গে অনেক গল্প করে। নার্স শুনেছে ও একজন শিল্পী। একখানা ছবি ওকে উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে মোদক। নার্স ওর জন্যে

হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এইখানে বসে ছবি আঁকার অনুমতি সংগ্রহ করেছে। ৎবরৌসকী আর হারিকট-রুজ ওর জন্য ক্যান্‌ভাস আর রঙের বাক্স পাঠিয়ে দিয়েছে। শুকনো দেয়ালগুলিতে ম্লান রঙের ছবি আঁক্‌লো,—বাগান, তার গেট, ফুল সবই যেন ম্লান। নার্স মুখ বিকৃত করলো, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল রঙ হয়ত তার ভালো লাগতো। অতঃপর—ফেটে পড়লো মোদক্ল ;

"বিষয়বস্তুটাই আসল না রঙের গুণাগুণ, আলো, অনুপাত এই সব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে ? বিষয়বস্তু ! যা চোখে দেখা যায় শিল্পী তাই আঁকে। আমাকে, আমার শিল্পিসত্তাকে এই হাসপাতালের বাইরে কোনো আনন্দময় পরিবেশে নিয়ে চলো। ছবির বিক্রেতা, ক্রেতা সবাই চম্‌কে গেছে, দৃশ্যপটের যেখানে চাহিদা সেখানে আমরা তাদের দিচ্ছি ভয়ঙ্কর শিল্পাঞ্চলের চিত্র, গাছগুলি যেন কর্দমাক্ত আকাশের গায়ে আঁকা বিশ্রী লতাগুল্ম, আর অন্তর্দৃশ্যের জন্য দিই পচা কাঠের তৈরী রান্নাঘরের আসবাব। বস্তুৎ আচ্ছা, বর্তমান কাল, বর্তমান শতাব্দী যখন আমাদের কুষ্ঠগ্রস্ত অঞ্চলের আবর্জনা সংগ্রাহকের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে যখন আগামীকালের জন্য আমরা এই স্মারকটুকু রেখে যাব—আর আমরাই শুধু বেঁচে থাকবো। আমাদের শিল্পসাধনাই অক্ষুন্ন হয়ে থাকবে। এই যুগের পক্ষে যা যোগ্য সেই দরের শিল্পীই জন্মগ্রহণ করেছে, আর যে জীবনের আমরা অধিকারী তার উপযুক্ত বিষয়বস্তুই আমরা নির্বাচিত করেছি। রেনেসাঁর যুগে শিল্পীদের চোখের সামনে ছিল রাজপ্রাসাদ, ভেলভেট, সূর্যালোক। আর আজ, একবার গিয়ে দেখে এসো কি রকম ঘরে উৎরিলো থাকে, কি কুৎসিত আবাসগৃহের আশ্রয়ে সে আছে, পিক্‌পাস থেকে ফন্টেনের কি সব নোংরা তৃতীয় শ্রেণীর কদর্য হোটেলে সে পানাহার করে, সুতরাং কেন সে রোগা মানুষ, আর মাছি বসা দেওয়াল আঁকে, কেন সে কেবল আঁকে খানাখন্দওলা পথ আর বিরক্তিজনক পরিবেশ।"

নার্সটি মাথা নাড়লো।

"আচ্ছা, সুন্দর কোনো কিছুর কথা আপনার মনে পড়ে না ? রোম—আপনি রোমে গিয়েছেন ?"

মোদক্লর মুখে রক্তাভ আভা খেলে যায়।

সে নার্সকে বলে ;—"কুইক্‌, কুইক্‌, তাড়াতাড়ি আমার তুলি আর রঙ নিয়ে এসো। শুধু দারিদ্র্যের ছবি আঁকার অর্থ প্রকৃতিবাদের উচ্ছিষ্ট সেবন সেই যেন "বেতনের পূর্বদিনের বৈরাগ্য,"—আমি দরিদ্র নই, আমি দেখেছি, রোম দেখেছি,—কুইক্‌ !"

যে উজ্জ্বল স্বপ্ন এত দিন তার মনের গহনে সঙ্গোপনে ধরে রেখেছিল এই সর্বপ্রথম তাকে ক্যান্‌ভাসে রূপায়িত করতে সে উদ্যোগী হ'ল।

কিন্তু তুলি হাতে পেয়ে তার সারা দেহে নিদারুণ শূন্যতার অসহ্য বেদনা তীব্র ভাবে অনুভূত হ'ল। মোদক্ল "কইনাগ" মদ্য পান করতে চায়।

নার্সটি ভয় পায়, মোদক্ল এখন আর তেমন অসুস্থ নয়। নার্স যখন মোদক্লর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হ'তে দেখল সে রাগে ক্ষেপে উঠলো।

"আমি কাজ করতে চাই তাই একটু মদ চেয়েছি, এটা তোমার বোঝা উচিত। ছবি আঁকতে হলে আগুন চাই, সত্যি ! আমি স্বীকার করছি আপনাকে জ্বালাতে হবে ঐ যে পাশের বেডে কসাইদের ছেলে শুয়ে আছে ওর প্রয়োজন নেই মদের, বিশেষ করে যদি ওদের ক্ষতি হয়,—বুঝলে আমার চৌকদারণী—ওদের বহুমূল্য জীবন বাঁচাতে হবে, তার জন্যই ওরা ব্যস্ত। কিন্তু আমার জীবনের ওপর যা কিছু সেই তার দাম…"

সুতরাং কি এসে যায় যদি আয়ুর অংশে কিছু কম পড়ে, কারণ সেই মুহূর্তে হয়ত একটা মাষ্টারপীস্‌ এঁকে ফেলা যাবে !

যাই হোক,—ঐ রঙের বাক্সের ভার্ণিসেও ত' এ্যালকোহল আছে, মোদক্ল তাই পান করবে—

ওর এই ভীতি প্রদর্শনে এবং যুক্তিতে নতি স্বীকারের ভাণ করলো নার্স। ওর জন্য একটু মদ্য সংগ্রহ করে আনলো, কোনো প্রতিজ্ঞার বশে নয়,—মোদক্ল অতি সুশ্রী, মেয়েটি তা নয়, বাকী রোগীরা হয় বুড়ো নয় বিশ্রী। অসুখের মোদক্লর শারীরিক সৌন্দর্য সূক্ষ্মতর হয়েছে, দেহে পাণ্ডুর জ্যোতি, গায়ের জলপাই বর্ণ যেন স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, আর তার ফলে চোখের তারা আর মাথার চুল আরো কালো দেখাচ্ছে।

কিন্তু ক্ষেপে গিয়ে যা কিছু এঁকেছিল সব নষ্ট করলো মোদক্ল। যাই হোক, আকাশের গায়ে চমৎকার গোলাপি রঙ ধরালো, এমনটি আর কখনও সে আঁকেনি, এমন কি সেই যখন রাজকন্যার কাছ থেকে ফিরত আশাভরা সোনালি সকালে, তখনো এমন কিছু সে আঁকেনি। যখন মোদক্ল ঘুমিয়ে পড়তো তখনই শুধু তার সেই অসম্পূর্ণ অথচ সুন্দর ছবি লুকিয়ে ফেলা হত।

একদিন ক্যানভাসের প্রান্তে মোদক্ল "লা ত্রিনিতা দ মনতি"র একাংশ আঁকার চেষ্টা করছিলো,—পাতাভরা পামগাছ, নীল আকাশের গায়ে গোলাপী তোরণ,—গোলাপের গায়ে সে স্বর্গীয় দ্যুতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। সারা রোম এখন তার চোখের ওপর ভাসছে,—জানলা দিয়ে হাসপাতালের বাগানের হট হাউসের দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো—তার পর পুনরায় নিজের হাতে আঁকা অপূর্ব বর্ণ-সঙ্গতির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—"আঃ, ওরে গাছের দল ! আমি বসন্তের জন্য দিলাম !"

কিন্তু এই জন্য দিলাম কথাটিতেই গোল বাধলো। সহসা মোদক্লর মনে পড়ে রোমের বুকে কি দুঃসাহসিক স্বপ্নে সৃষ্টি হয়েছিল,—তারপর পারীর বুকে বসে একদিন দেবতার অপমৃত্যু।

মোদক্লর অসুখের ভীষণ পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

অবশেষে অনেক দিন পরে এক প্রভাতে তাকে সুস্থ ঘোষণা করে হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। দোরগোড়ায় হারিকট-রুজ আর বরৌসকী প্রতীক্ষা করছিল, ওরা ওকে রু-ভার্সিনজেট্রিয়ের ষ্টুডিয়োতে নিয়ে যেতে চায়, ষ্টুডিয়োটা এত দিনে বাসযোগ্য হয়েছে, জানলার ভাঙা কাচের পরিবর্তে এখন পিচবোর্ড আঁটা হয়েছে।

মোদক্ল আবার জীবন দর্শন করতে চায় ; সর্বপ্রথম একবার লা রোতন্দে যেতে চায়।

পথ চলতে হারিকট-রুজ পোষাকঢাকা তার স্ফীত অবয়বের পরিবর্তিত আকারের দিকে মোদক্লর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বৃথাই চেষ্টা করলো। মোদক্লর মন অন্য কোথাও বিচরণ করছে।

চব্বিশ

লা রোতন্দে মোদক্লকে আসতে দেখে এক একটি দল আরো ঘেঁষে বস্‌লো, মোদক্লকে বস্‌তে দেবে না। প্রত্যেকে স্ব স্ব গ্লাস হাতে নিয়ে বসে রইলো।

ওরিৎস্‌, ‘হেডেন, যাডকিনে, প্রাক্‌স্‌, লিওপোল্ড লেভী এবং ব্লারিণ প্রভৃতি এক জায়গায় জোট পাকিয়ে বসেছিল, মোদক্ল সেই দলে ভিড়ে পড়ল। ওরা মোদক্লকে অভ্যর্থনা জানায়, আপ্যায়ন করে। মোদক্ল উন্মাদের মত মদ্যপান করে।

ৎবরোসকির কোনো কথাই ও কানে তুলছে না। আমষ্টার-ডামে তরুণ শিল্পীদের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, ৎবরোসকী তার জন্য ছবি সংগ্রহ করছে।

কয়েক দিন আগে বুলভার্দে রোমোমফের সঙ্গে বরোসকরী দেখা হয়েছিল। রোমোমফ মূল্যবান ফার গায়ে দিয়েছে, কিন্তু গত বছর সকলেই দেখেছে আর সকলের মত সে-ও লা রোতন্দে কফি ক্রীম খেয়ে দিন কাটিয়েছে।

আমষ্টারডামে গিয়ে এক ওলন্দাজ সওদাগরের সঙ্গে রোমোমফের দেখা হয়েছিল, ভদ্রলোক এক সময় লা রোতন্দে কাটিয়েছেন, কালভারষ্ট্রাটে তাঁর আবাস-গৃহে কয়েকটি উজ্জ্বল প্যারিসীয় মুহূর্ত ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু অলংকরণের ব্যবস্থা করলেন। কয়েকটি ক্যান্‌ভাস্‌ কিনে গৃহকোণ সজ্জিত করলেন, ফিকে নীল রঙের পটভূমির ওপর বেগুনি রঙের পোষাক-পরা একটি মেয়ের ছবি আঁকা হ'ল, বেয়াড়া ভাবে বাঁকিয়ে ধরে বেহালা বাজাচ্ছেন— এই শিল্পী শুধু আদিম যুগের ছবির নকল করতে পারতেন। সোনালি পোষাকপরা মহিলা, গম্ভীর আকৃতির একটি যুবক যেন কান্নার উপক্রম করছে—পরময় নানা রকমের ছবি; কিন্তু একা একা পরিবেশ সৃষ্টি কবার ক্ষমতা তার নেই, তার জন্য আসল মানুষ চাই। জার্মাণী বা ইংলণ্ড থেকে যারা ক্যান্‌ভাস্‌ সংগ্রহে আসে তাদের নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। রোমোমফ একটা ফন্দী বাৎলিয়ে দেয়। আমষ্টারডামে একটা রোতন্দে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাবে। রোমোমফ কিছু আগাম টাকা নিয়ে এসে ৎবরোসকীকে পাকড়াও করেছে, কারণ আধুনিক শিল্পীদের সম্পর্কে সে স্বয়ং বিশেষ কিছুই জানে না। বোরো বা মাদাম ৎবরোসকী বা আর কেউ ইচ্ছা করলে আমষ্টারডামে ওর সঙ্গে যেতে পারে। ওলন্দাজ সওদাগর পুনরায় লা রোতন্দের স্পর্শ পেলে খুসী হবেন!

আইডিয়াটা মন্দ নয়, কারণ ছবি-ব্যবসায়ীরা যাকে বলে কিউবিষ্টম্যানিয়া একেবারে চূড়ান্ত শিখরে।

এমন কি প্যারীতেও বুর্জোয়ারা ফাট্‌কাবাজী হিসাবে কিউবিষ্ট ছবি কিনছে, ছবি যত দুর্বোধ্য, ততই দাঁও মাফিক বিক্রী করার সুবিধা। এমন কি পুলিসের বড় কর্তাও সুবিধা পেয়ে নীলামে কয়েকটি ক্যান্‌ভাস্‌ কিনেছেন। জামারোণের একজন অতি বিদগ্ধ বন্ধু মাসিক বেতনে প্রায় অর্ধ ডজন শিল্পী নিযুক্ত করেছেন। পথের ফেরীওয়ালা, এমন কি চিনে-বাদামওয়ালারা পর্য্যন্ত আফতালিয়েনের মত আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার স্বপ্ন দেখে। আফতালিয়েনও এক কালে সিল্কের মোজা গেঞ্জী ফেরী করে বেড়াত। এখন সে এই ব্যবসা ছেড়ে চোরের মত গোপনে রু লাফায়েত্তের এক কাফেতে গিয়ে আড্ডা জমায়, এই কাফে হ'ল মুক্তাব্যবসায়ীদের সম্মিলন ক্ষেত্র।

তার কাফের ওয়েটারবৃন্দ: দ্যু ডোম, ল পারনাশ, লা রোতন্দে প্রভৃতি কাফের পরিচারকবৃন্দ খানিকটা স্বেচ্ছায় শিল্পীদের আহার্য বাবদ হোটেলের পাওনা বাকী রাখতে সাহায্য করে। তারা যা খেতে চায় তাই দিয়ে উৎসাহ বাড়ায়। হ্যাম মিশ্রিত বাঁধাকপি আর সসেজ দিয়ে লোভ দেখায়। এই সব টেবলে এই ওয়েটারবৃন্দই একদা পিকাসো, দেরাইন প্রভৃতিকে খাদ্য পরিবেশন করেছে। এখন তাদের ছবি দশ, বিশ, এমন কি চল্লিশ হাজার ফ্রাঁতে বিক্রী হচ্ছে। শিল্পী আর ওয়েটারে নিম্নলিখিত সংলাপ শোনা যায়:

"তোমার কাছে আমার দুশো পঞ্চাশ ফ্রাঁ ধার হয়েছে, আমি তোমার টাকা মারবো না,—আরো শ' দেড়েক দাও, ছবিটা তোমাকেই দিয়ে দেব।"

"গত কাল যেটা দেখেছিলাম, সেইটাই আমার পছন্দ। অনেকটা সীজানের ধরণের হয়েছিল।"

"আহা! তার দাম আরো বেশী।"

আর ওয়েটার এই ছবি নিয়ে এক ঘড়িওলাকে পাঁচশো ফ্রাঁ দামে বেচে দিল। শিল্পীকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে আরো তিনশো ফ্রাঁ দিতে চায়, নতুন একখানা ছবি চাই, সেটা ভালো দাম পাওয়ার আশায় ধরে রাখবে।

এই ভাবে একটা চোরা-বাজারও গড়ে উঠতে থাকে। তিন বা চার জন ব্যক্তি কোনো এক বিশেষ শিল্পীর জন্য বাজার তৈরী করবেন, আর ওয়েটার, হোটেল-মালিক, যত সব ঝড়্‌তি-পড়্‌তির দল এখন এই ভরা শীতের মাঝে, শিল্পীদের প্রতিভা এবং দারিদ্র্যের সুযোগে মুনাফা শীকারে ব্যস্ত।

মোদক্ল অতিশয় বিরক্ত হয়ে আছে, সে আর ছবি আঁকবে না।

ৎবরোৎ সেই ছোট্ট মেয়েটির যে ছবিটা একদিন ওরা রু ভেডিনের নাপিতকে দিয়েছিল এখন তার অবিশ্বাস্য রকমের দাম উঠছে।

মোদক্ল মদ্যপান করে,—তার পর ক্ষেপে ওঠে, যাকে সামনে পায় তাকে ধরে অপমান করে।

"ওরা তেরলিকোকোর ছবি বিক্রী করছে। নীল মলম আর টুথপেষ্ট আঁকা ছবি তাও বিক্রী হচ্ছে!"

রোমোমফ আর ৎবরো গোটা চল্লিশেক ক্যানভাস সংগ্রহ করল, কিছুর দাম দিল, কিছু ধারে নিল; তার পর একদিন যাত্রা স্থির করলো। সেই রাত্রে মোদক্ল আর হারিকট গারে দ্যু নরদে ওদের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ৎবরো ওঁর কাঁধে একটা ওভারকোট চাপাবার চেষ্টা করায় মোদক্ল সেটা বার বার একগুঁয়েমি করে প্রত্যাখ্যান করলো।

"আমি ত' এখন ভালো আছি।"

বৃষ্টি পড়ছিল,—ওরা একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে ষ্টেশনে চললো।

ট্রেণ ছাড়বার ঠিক আগে বরো মোদক্লর হাতে প্রদর্শনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা গুঁজে দিল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

ফতেনগরের লড়াই
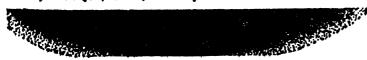
বিক্রমাদিত্য

'দৈনিক হরকরা'র ঠিক উল্টো দিকেই দৈনিক সমাচারের দপ্তর।

দিনের বেলায় সমাচারের দপ্তর প্রায়ই নিস্তব্ধ থাকে। রাত্রে সজাগ হয়ে ওঠে।

দপ্তরের সামনে বসে থাকে একটি দরোয়ান। তার একমাত্র কাজ 'হরকরা' দপ্তরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। ঐ দপ্তরে কারা এলো-গেলো। বহু দিন সংবাদপত্র-দপ্তরে কাজ করে দরোয়ানজীর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে। লোক দেখলেই বুলতে পারে যে তার আগমনের কী কারণ। এরা খবর ছাপাতে এসেছে না এনেছে!

যারা হতাশ হয়ে 'দৈনিক হরকরা' দপ্তর থেকে বেরোয় দরোয়ানজী যেচেই তাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়। উদ্দেশ্য 'হরকরার' দপ্তরের ভেতরের খবর বের করে নেয়া।

* * * *

আজ দপ্তরে বসে সমাচারের কর্ত্তা ব্রজানন্দ বাবু তাঁর কাগজ পড়ছিলেন এবং হরকরার সাথে মিলিয়ে দেখছিলেন যে কি কি খবর তার কাগজ পায়নি। হঠাৎ একটা খবর পড়তে পড়তে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। তলব করলেন প্রুফ রীডার নৃত্যহরি বাবুকে।

নৃত্যহরি বাবু এই দপ্তরের পুরানো কর্ম্মচারী। কিন্তু আজ কয়েক মাস যাবৎ তাঁর মন প্রসন্ন নেই। কারণ, বহু তদ্বির করেও তিনি মনিবের কাছ থেকে তাঁর মাইনে বাড়াতে পারেননি।

এ কি নৃত্যহরি বাবু, আজকের 'সমাচার' পড়েছেন? নৃত্যহরি বাবু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজানন্দ বাবু প্রশ্ন করলেন।

নৃত্যহরি বাবু স্পষ্ট বক্তা, তিনি জবাব দিলেন—'সমাচার' আমি পড়ি নে স্যর!

বলেন কি? কাজ করেন 'সমাচারে', অথচ কাগজ পড়েন না —বিস্মিত হয়েই ব্রজানন্দ বাবু এ প্রশ্ন করলেন।

নৃত্যহরি অবিচলিত হয়েই জবাব দেন—না স্যর, আমি রোজ 'হরকরা' পড়ি। গিন্নী বলেন, তোমাদের 'সমাচারের' মুখে আগুন। পোড়ারমুখো কাগজ আজ পর্য্যন্ত দুটো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারলে না, ও কাগজ পড়ে কি হবে? আর শুধু কি তাই স্যর! 'হরকরার' নারীর কথা একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কলম। মেয়ে মহল নিয়ে অমন চমৎকার আলোচনা আজ পর্য্যন্ত কেউ করতে পারলে না। ঐ কলমটা পড়লে আমার বড্ড ঘুম পায়। তাই তো ডাক্তার ওষুধ না খেয়ে ঐ কলমটি রোজ পড়তে বলেছেন। আর আমার গিন্নীও ঐ 'কলম' বেশ পছন্দ করেন। পরশু দিন ওখান থেকে একটি রান্না করার পদ্ধতিও লিখে নিয়েছেন। মুর্গীর সন্দেশ।

নৃত্যহরির জবাব শুনে ব্রজানন্দ বাবু স্তম্ভিত হলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁর দপ্তরের কোন কর্ম্মচারীর বলবার সাহস হয়নি যে, 'সমাচারে'র চাইতে 'হরকরা' উৎকৃষ্ট কাগজ। কিন্তু নৃত্যহরির কথাগুলি হজম করা ছাড়া উপায় নেই। কস করে হয়তো 'সমাচারে'র কাজ ছেড়ে দিয়ে 'হরকরায়' চলে যাবে। তবু প্রশ্ন করলেন—'সমাচার' পড়েন না তো কাজ করেন কি করে?

কাজ করে প্রসন্ন স্যর, আমি তদারক করি।

এর পরে আর বলবার কিছু নেই। তবু কণ্ঠে একটু শ্লেষ মিশিয়ে ব্রজানন্দ বাবু বললেন:—বেশ, বেশ, আজকের 'সমাচারের' তিন নম্বরের পাতার সেই 'বাসে চাপা পড়িয়া পথিকের মৃত্যু' খবরটা পড়ুন। কী ঘটেছে আর আপনি কী ছেপেছেন। এই দেখুন, লেখা আছে; 'অতঃপর মৃতদেহ রিকসায় করিয়া স্বর্গে লইয়া যাওয়া হইলো।' ছি! ছি! নৃত্যহরি বাবু, ওটা 'স্বর্গে' নয়, ওটা 'মর্গে' হবে। আমাদের কাগজে এই রকম মারাত্মক ভুল দেখলে কী দৈনিক হরকরা আর আস্ত রাখবে?

মনিবের কথায় নৃত্যহরি বাবু অবিচলিত রইলেন। জবাব দিলেন: কী করবো স্যর! মাইনে পাই পঞ্চাশ টাকা, তাও গত দু'মাস পুরো মাইনেটা পাইনি। এ টাকায় কী আর মৃতদেহ ট্যাকসীতে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া চলে, এতে রিক্সাই ভালো।

রেগে কাঁই হয়ে উঠলেন ব্রজানন্দ বাবু। কিন্তু কোন কিছু বলার আগেই ঘরে হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন 'সমাচারের সম্পাদক' খগেন বাবু।

স্যর হৈ-রৈ কাণ্ড! এই মাত্র খবর পেলুম দৈনিক হরকরা স্পেশাল বের করছে।

কী হলো আবার? জিজ্ঞেস করলেন ব্রজানন্দ বাবু।

: এ কী চাট্টিখানি কথা স্যর! এমন চাঞ্চল্যকর কাহিনী এ আমলে শোনা যায়নি……

আহা খুলেই বলুন না। ব্যাপারটা কী? ব্রজানন্দ বাবু এবার বেশ উৎকণ্ঠিত হয়েই এ প্রশ্ন করলেন।

স্যর, লড়াই। আবার সুরু হলো রক্তের স্রোত।

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগলো বুঝি ?

: না স্যর ! এবার তার চাইতে বড়ো। এবার ফতেনগরেই লড়াই বেধেছে। কিন্তু স্যর, আমি হলপ করেই বলতে পারি, এ সংগ্রাম অতি শীগ্‌গিরি সমস্ত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে—খগেন বাবু বেশ জোর দিয়েই বললেম।

খগেন বাবুর কথা শুনে ব্রজানন্দ বাবু একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। প্রথমটায় কিছু বললেন না। তার পর শুধু সংক্ষেপে বললেন : হুম্। মনিবকে চিন্তা করতে দেখে খগেন বাবু একটু আমতা-আমতা করে বললেন : আমি বলছিলুম কী স্যর, হরকরা তো স্পেশাল এডিশন বের করছে। আমাদেরও একটা বিশেষ সংখ্যা বের করলে হয় না ?

: আলবাৎ। এক্ষুণিই বের করুন।

: আমার আর একটা প্ল্যান ছিল স্যর ! আমাদের কাগজের প্রথম পাতায় স্বামী জিবিদানন্দের একটি বাণী ছাপানো দরকার। মানে, এই যুদ্ধ ক'দিন চলবে, কে জিতবে, কে হারবে, এই নিয়ে একটা ফোর কাষ্ট।'

: ঠিক বলেছেন খগেন বাবু ! আমি এক্ষুণি গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি। প্রথম পাতায় এর ফোটো দিয়ে আমরা তাঁর বাণী ছাপবো—জবাব দিলেন ব্রজানন্দ বাবু। খগেন বাবুর প্ল্যানটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে। তার পর একটু ভেবে বললেন : কোন রংএর কালিতে ব্যানার হেড লাইন দিচ্ছেন। গত বার হরকরা নাট্যসম্রাজ্ঞী বিদ্যুৎলতার মৃত্যুতে 'কাল কালিতে' ছেপেছিল, আমি জোর গলায় বলতে পারি, এবার হলদে কালির ব্যানার দেবে। আপনি এবার লাল রংয়ের ব্যানার দিন।

* * * *

দু'কাগজের স্পেশাল এডিশন বেরুবার পর স্বামী খলিলানন্দ পতিতপাবন বাবুকে টেলিফোন করলেন।

এটা কী ভালো। করলে হে পতিতপাবন ! কাগজ বের করবার আগে আমায়ও তো একবার স্মরণ করলে পারতে। 'সমাচার' কিবে শালার বাণী কাগজের প্রথম পাতায় ছেপে বসে আছে। আমিও তো ঐ রকম একটা কিছু বলতে পারতুম।

কথাটা ভেবে দেখলেন পতিতপাবন বাবু। মন্দো বলেন নি স্বামী খলিলানন্দ। কাগজের প্রথম পাতায় লড়াই সম্বন্ধে গুরুজীর মন্তব্য থাকলে কাগজের কাটতি কতো বেড়ে যেতো এ কী তিনি আর জানেন না ? কিন্তু এখন আর ভুল শোধবাবার উপায় নেই। সমস্ত কথাটা ভেবে পতিতপাবন বাবুর সাধন বাবুর উপর রাগ হ'তে লাগলো। সত্যি সাধন বাবুর ভুলের জন্তেই তাকে গুরুদেবের কথা শুনতে হলো। না, কালকেই তাকে দপ্তরে গিয়ে এর একটা বিহিত করতে হবে।

* * * *

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে এসে পতিতপাবন বাবু শ্যালক বুটলোর [illegible] করলেন।

বুটলো থিয়েটারে যাবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিলো, কোন [illegible]র থিয়েটারে নয়, তাদের মন দে'য়া-নেয়া' ক্লবের থিয়েটারে। [illegible] ড্রেস রিহার্সাল হবে। তাই একটু সাজগোজ করে [illegible] হচ্ছে। 'সাজাহান' মঞ্চস্থ করা হবে, বুটলো নিয়েছে জাহানারার পার্ট। প্রথমটায় সবাই বুটলোর এ পার্ট নিয়ে আপত্তি করেছিল, কারণ বুটলো লম্বায় ছয় ফুট, বুকের ছাতি আটত্রিশ ইঞ্চি হবে—ওজন প্রায় তিন মণ। কিন্তু এতো বাধা থাকা সত্ত্বেও বুটলোর কণ্ঠস্বর যে হুবহু জাহানারার মতো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমন বিশাল আকৃতি থেকে যে এই রকম মিহি কণ্ঠস্বর বেরুতে পারে এ বুটলোকে না দেখলে পর বিশ্বাস হয় না।

জাহানারার পার্ট বুটলোর কণ্ঠস্থ। কিন্তু কিছুতেই তার ঐ পার্টের ফিলিংস আসছে না। তাই আজ কয়েক দিন হলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে অভিনয় মক্‌সো করছে। এমনি সময়ে পতিতপাবন বাবু ঘরে ঢুকলেন। বুটলো কী কচ্ছি'স ?

না: না: কিছু না। ভাবছিলাম একটু বেড়িয়ে আসি গে। ঐ ময়দানে স্বামী খলিলানন্দ 'নারীর উপর ধর্ম্মের প্রভাব' সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন।

ভগিনীপতির কাছে বুটলো থিয়েটারের কথাটা চেপে গেলো। ভগিনীপতিকে তার বড্ডো ভয়। বিশেষ করে থিয়েটারের নাম শুনলে পতিতপাবন বাবু যে আস্তো রাখবেন না, এ বুটলো বিলক্ষণ জানে, তাই একটু বানিয়ে সে জবাব দেয়।

হুম্। বক্তৃতা শুনে দরকার নেই। আমার দপ্তরে যা। তোর জন্তে একটা কাজ ঠিক করেছি। রিপোর্টারের কাজ। রমণী বাবু বা সাধন বাবুর সঙ্গে দেখা করগে। তোকে লড়াইতে যেতে হবে। রিপোর্ট করতে।

ভগিনীপতির কথা শুনে বুটলো স্তম্ভিত। তাই ক্ষীণ স্বরে বললো : লড়াইতে ?

হ্যাঁ লড়াইতে—এক্ষুণি যা, রমণী বাবু ওরা তোর জন্তে দেরী করছে।

পতিতপাবন বাবু ভাবলেন যে স্ত্রী ফিরে আসার আগেই বুটলোর রণাঙ্গনে পাঠান প্রয়োজন। নইলে রণাঙ্গনক্ষেত্র হয় তো তার বাড়ীতেই হইবে।

বুটলোর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এই সময়ে তার পক্ষে ক'লকাতা ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। সমস্ত থিয়েটারের সাকসেস্ 'জাহানারা' ওরফে বুটলোর উপরই নির্ভর করছে। এই সময়ে তার ক'লকাতা থেকে অনুপস্থিতি মানেই থিয়েটার পণ্ড হয়ে যাওয়া।

ভগিনীপতির কথাটা ভেবে দেখলে বুটলো। এ প্রস্তাবে রাজী হওয়ার অনেক বিপদ আছে। দিদি নেই, এ সময়ে হাতখরচের জন্তে ভগিনীপতির কাছেই তাকে হাত পাততে হয়। অতএব দিদির অবর্ত্তমানে ভগিনীপতিকে চটানো সমীচীন হবে না। কিন্তু লড়াইতে যাওয়া ! অসম্ভব !

হঠাৎ বুটলোর মাথায় যেন একটা 'প্ল্যান' এসে গেলো। ভি আইডিয়া !

বুটলো 'মন নেয়া', ক্লাবের উদ্দেশে রওনা হলো।

* * * *

বুটলোর প্রতি তার ভগিনীপতির আদেশ শুনে মন দেয়া-নেয়া, ক্লাবে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠলো।

শম্ভু বুটলোর সাকরেদ। বললে : হ্যাঁরে বুটলো, তুই চলে গেলে আমাদের 'ক্লব' যে বিধবা হবে।

'বিজনের বাড়ীতেই থিয়েটারের রিহার্সাল হয়। সে বলে উঠলো : বললেই হলো। 'জাহানারাকে' আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অতো সহজ ব্যাপার নয়। পুলিসে খবর দেবো।

জ্যোতিষ বললে : হ্যাঁরে বুটলো, তোর দিদিকে খবর দে না। উনি এলে আর তোকে হয়তো লড়াইতে যেতে হবে না।

বুটলোর মাথায় কিন্তু এ-সব কথা যাচ্ছিলো না। কারণ, সে ভাবছিল কী করে ফতেনগরে যাওয়া এড়ানো যায়।

এ-জন্যে তাকে সাহায্য নিতে হবে ক্লাবের সাহিত্যিক—শৈলেনের কাছ থেকে। বলতে গেলে শৈলেনই এ দলের নেতা। তার পরামর্শ বিনা কোন কাজই এখানে হয় না। এ মহলে শৈলেন, শৈল বলে পরিচিত।

শৈল এক সময়ে কোন এক অখ্যাতনামা কাগজের সহকারী-সম্পাদক ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সর্বপ্রথম "ইহা কী সত্য" কলমে সেই কাগজে শুরু হয়। তখন দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার হিড়িক চলছে। প্রতিদিন "ইহা কী সত্য" কলমে লাট বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী, ও সরকারী দপ্তরের বড়ো-বড়ো অফিসারদের গোপন কথোপকথন প্রকাশিত হতে লাগলো।

সরকারেরও বলবার কিছু যো নেই। কারণ, এই গোপন কথোপকথনের পরে লেখা আছে; "আমরা জানিতে চাই, ইহা কী সত্য ?"

অতি অল্প দিনের মধ্যেই 'ইহা কী সত্য' কলমের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলো।

কাগজের কাটতি যখন ঊর্দ্ধমুখে তখন একদিন ভোরবেলায় দপ্তরে গিয়ে শৈল দেখতে পেলো যে, দপ্তরের দরজা বন্ধ। দ্বার-প্রান্তে লেখা আছে : 'কাগজ লাটে উঠিল। ইহা কী সত্য ?'

এর পরে শৈল বেশ কয়েকটা দিন বেকার ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুভ-মুহূর্ত্তে তার বুটলোর সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই থেকে সে বুটলোর গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে।

* * * *

আজ বুটলো বসে ভাবছিল যে, এই বিপদ থেকে তাকে একমাত্র উদ্ধার করতে পারে শৈল। ভগিনীপতি যে কেন তাকে রিপোর্টার করতে চাইছেন, এটা বুটলোর বোধগম্য হলো না।

একটু বাদে ক্লাবে শৈল এসে উপস্থিত। বুটলোর চেহারা দেখে তো সে অবাক ! বলে : এ কী রে বুটলো তোর হলো কী ?

লড়াই, শৈলদা, লড়াই। ভগিনীপতি আদেশ দিয়েছেন তার কাগজের রিপোর্টার হয়ে ফতেনগরের লড়াইতে যেতে হবে।

: বড্ডো দুঃসংবাদ ! এ সময়ে তোর কোথাও যাওয়া চলে না।

: আমিও তো তাই বলি। তবে কী জানো শৈলদা, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে—বুটলো বলতে থাকে।

শোন, তোমার খবরের কাগজের অভিজ্ঞতা আছে। আমি বলছিলুম, আমার হয়ে তুমিই ফতেনগরে চলে যাও। আমি একটা দিন এখানেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো। আর ফতেনগরে কে যাচাই করতে যাবে যে তুমিই বুটলো নও ? মানে ইয়ে কিনা, তুমি জাল রিপোর্টার হয়ে এসেছো।

কথাটা ভেবে দেখলে শৈল। প্রস্তাবটা মন্দো দেয়নি বুটলো, কে জানবে বিদেশে যে সে সত্যিই বুটলো নয়। আর এই শহরে একটানা থাকতে থাকতে তার ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। কয়েকটা দিন ফতেনগরে কাটিয়ে এলে মন্দো হয় না। হাতেও বেশ কয়েকটা পয়সা আসবে। জায়গাও দেখা হয়ে যাবে। এ দলে দু'পাখী।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। বললে : ঠিক বলেছিস্ রে বুটলো। আমিই যাবো তোর হয়ে লড়াইতে।

* * *

সেদিন রাত্রেই বুটলো গেল দৈনিক-হরকরা-দপ্তরে। এডিটার—নিউজ এডিটারের সঙ্গে দেখা করে তাদের উপদেশ নিতে। তারপর এসে শৈলকে সমস্ত গুছিয়ে বলবে এই তার মৎলব।

* * *

কর্ত্তার আদেশেই রমণী বাবুকে দপ্তরে থাকতে হয়েছিল। সাধারণতঃ তিনি সন্ধ্যার পর অফিসে থাকেন না। অন্ধকারে বাড়ী ফিরতে তার গা ছমছম্ করে। এই সময়েই ডিটেকটিভ কাহিনী দস্যু লুং চাং এর কাহিনীগুলি মনে হয় ! অতএব সাধারণতঃ তিনি সাঁঝের প্রদীপ জ্বলবার আগেই বাড়ী ফিরে আসেন।

কিন্তু আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে বুটলো দপ্তরে আসতে পারে। ফতেনগরের লড়াইটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার, এটা সম্পাদক হিসেবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বুটলোর সঙ্গে কী ভাবে আলোচনা শুরু করবেন, রমণী বাবু সেইটে ভাবছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি তরুণদের সঙ্গে বৃদ্ধের আলোচনা নিয়ে এক গভীর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : হে দেশবাসিগণ, তোমরা তরুণদের কচি মনে আঘাত দিও না। তা হ'লে তারা শুকিয়ে যাবে। তাদের কাছে চিত্রতারকাদের নিন্দে করো না, কারণ তারা মুষড়ে পড়বে...

কিন্তু আজ বুটলোর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তার সমস্ত কথা যেন গুলিয়ে গেলো।

একটু বাদে বুটলো এসে উপস্থিত। রমণী বাবু সাদরে আপ্যায়ন করে বললেন : হেঁ, হেঁ, বসুন। বুটলো বসলো বেশ !

খানিকটা সময় চুপচাপ কেটে গেলো। রমণী বাবুই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন : তৈরী হয়ে নি'ন। কালকেই রওনা হতে হবে ফতেনগরে। আপনি নিশ্চয় জানেন ফতেনগরটা কোথায় ?

: না ; বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বুটলো জবাব দেয়।

: আমি ভেবেছিলুম আপনি হয়তো জানেন। সত্যি কথা বলছি আপনাকে, কাউকে যেন বলবেন না। এ দপ্তরে কেউ জানে না এই জায়গাটা কোথায়। চার দিকে লোক পাঠিয়েছি জায়গাটার খোঁজ করতে। মায় জিওল্যাজিকাল সার্ভে অবধি।

: তাহলে যাবো কী করে ? বুটলো যেন এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা পথ খুঁজে পায়।

: আহা, সে জন্যে চিন্তা করবেন না, জায়গা আমরা খুঁজে বা' করবো। আর না পেলে বয়েই গেলো। সেই বেয়াল্লিশ সালে 'সমাচার' কী করেছিল জানেন, আবিশিনিয়া থেকে প্যারী দখলের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী লিখলে। বেড়ে লিখেছিল ম'শায়। পাব্লিক তো থ'। এমনি মনমাতানো নিউজ নাকি বিংশ শতাব্দীতে কেউ পড়েনি।"

আবার বেশ খানিকক্ষণ চুপ-চাপ।

রমণী বাবু বললেন ; একটু চা আনতে বলি, কী বলেন ?

: আপত্তি নেই ।

একটু বাদে দু' কাপ চা এলো। চাপরাসীকে চা হাতে করে দপ্তরে ঢুকতে দেখে সমস্ত রিপোর্টার মহলে গুঞ্জন উঠলো। একজন আর একজনকে বললে : নিশ্চয় কোন মেয়ে এসেছে।

: দ্বিতীয় রিপোর্টার জবাব দেয়—আরে না, না, ডিসপেপসিয়ার কোন রুগী নিশ্চয় এসেছে। নইলে, আজকাল কেউ চা খায়! ছোঃ।

ইতিমধ্যে রমণী বাবু বুটলোর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আলাপ তেমন জুৎসই হলো না।

রমণী বাবু প্রশ্ন করলেন : এর আগে কখনো রিপোর্টারী করেছেন ?

বুটলো বেশী কথা বলতে রাজী নয়। সে শুধু সংক্ষেপে জবাব দিলে, না।

: এক্সলেণ্ট। আর ভাববার দরকার নেই, ম'শায় কালই রওনা হয়ে পড়ুন।

: কিন্তু কী করে করবো ? রিপোর্টারীর যে কিছুই জানিনে।

: ঐ তো মজার ব্যাপার ম'শায়। জানেন, একবার আমি এক ইস্কুলের অঙ্কের মাষ্টার হয়েছিলুম। চাকুরী নেবার সময় হেড মাষ্টার ম'শায় আমায় ডেকে বললেন : রমণী বাবু, আপনাকে অঙ্ক কষাতে হবে। আমি তো অবাক, ম্যাট্রিকে তিন তিনবার এই যোগ-বিয়োগ কষতে গিয়ে ফেল করলুম। তাই হেড মাষ্টার ম'শায়কে নিবেদন করে বললুম, আজ্ঞে ঐ বিষয়টা আমায় পড়াতে দেবেন না। অঙ্কে আমি একদম কাঁচা। হেড মাষ্টার ম'শায় হেসে কী বললেন জানেন ? বললেন, রমণী বাবু ভয় পাবেন না। এই আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। ইংরাজীর এ, বি, সি, ডিও জানতুম না। তারপর যেই এই ইস্কুলে ছাত্রদের পড়াতে শুরু করলুম তক্ষুণি সব শিখে গেলুম। মায় গ্রামার অবধি।

আপনি আজ থেকেই ছাত্রদের অঙ্ক কষাতে লেগে যান, দেখবেন দু'দিনেই সব শিখে যাবেন।

ইস্কুলে ছাত্রেরা কী আর কোন কিছু শেখে ম'শায়, মাষ্টারেরাই শেখে।

রমণী বললেন : অবাক কাণ্ড ম'শায়। হেড মাষ্টার ম'শায়ের কথা দিব্যি ফলে গেলো। ছাত্ররা অঙ্ক শিখলো না বটে, আমি শিখলুম। তাই বলছি বুটলো বাবু, রিপোর্টারী করতে করতে সব শিখে যাবেন।

একটু চুপ করে রমণী বাবু বললেন, শুনুন, ভয় পাবার কিসসু নেই। এই পাশের ঘরে সাধন বাবু বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন গে। উনি 'ওয়ার কভারেজের' টেকনিক সব বলে দেবেন।

বুটলো চেয়ার ছেড়ে উঠলো।

রমণী বাবু বললেন : শুনুন আর একটা কথা। ফ্রণ্টে যাবার বেশ কিছু ডিটেকটিভ বই নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে 'হারকুল পয়রেটের' কাহিনী। ওর মধ্যে এমনি কয়েকটা কায়দা-কানুন আছে যা এই লড়াইর সময় বড্ডো কাজে লাগবে। চমৎকার বই—

ডিটেকটিভ বই পড়ার উপদেশ দিতে পারলে, রমণী বাবু থামতে চান না। কিন্তু হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত শেষ হয়ে গিয়েছে। না, আর দেরী করা যায় না। আজ যে বইটা তিনি পড়েছেন সেখানে রাত্রির অভিযানের উপর একটি অধ্যায় আছে। সে কথা মনে হলে তার গা শিউরে উঠে। রমণী বাবু উঠে দাঁড়ালেন। তার পর বললেন : ওয়েল উইস ইউ দি বেষ্ট অব লাক্।"

বুটলো এবার নিউজ এডিটার সাধন বাবুর ঘরে ঢুকলো।

*　　*　　*　　*

সাধন বাবু তখন 'কেসরুমে' গিয়েছিলেন, ফোরম্যানের সঙ্গে আলোচনা করতে। কিন্তু তার টেবিলের চার-পাশে বসে ছিল রিপোর্টার—সাব এডিটারের দল।

বুটলো ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে, চীফ সব-এডিটার প্রিয়ব্রত বাবু বললেন—আপনিই বুটলো বাবু ?

ঘাড় নেড়ে বুটলো জবাব দেয় হ্যাঁ।

রিপোর্টার ব্যোমকেশ বললে : মানে আপনিই হলেন গিয়ে পতিতপাবন বাবুর ব্রাদার ইন-ল।

আবার ঘাড় নাড়ে বুটলো।

বেড়ে চান্স পেয়ে গেলেন ম'শায়। 'ওয়ার কভারেজ' তো চাট্টিখানি কথা নয়, আমরা তো ভেবেছিলুম 'ষ্টাফের' কেউ যাবে—একটু নিরাশের কণ্ঠ নিয়ে সব-এডিটার প্রীতি বাবু বলেন।

কিন্তু আমি তো কখনো লড়াই দেখিনি। রিপোর্ট করবো কী ?—বুটলো জবাব দেয়। ঘরের মধ্যে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠে গেলো। এ কথার মানে তাদের বিলক্ষণ জানা আছে। কোন একটা বড়ো রিপোর্টিংএর কাজ পাবার আগেই সবাই

অনভিজ্ঞতার ভণিতা করে। সহকর্মী রিপোর্টারদের ধোকা দেবার ঐ তো হলো কায়দা-কানুন। এ কী তাদের জানা নেই?

রিপোর্ট আপনি থোড়াই করবেন। আসল কথা কী জানেন? এই রকম "এসাইনমেণ্ট" পেলে বেশ ফায়দা আছে। অবশ্যি আপনি না গেলে আমিই যেতুম—প্রিয়ব্রত বাবু উত্তর দিলেন।

'ফায়দা'! বিস্মিত হয়ে বুটলো প্রশ্ন করে। এবার ব্যোমকেশের উত্তর দেবার পালা। আরে ম'শায়, ঐ তো হচ্ছে মজার ব্যাপার। কায়দা মানে, এই সব 'এসাইনমেণ্টের' টি-এ বিলের কথা বলছেন প্রিয়ব্রত বাবু।

আমি তো যাবো লড়াই করতে ম'শায়, টি-এ বিল করতে নয়, বুটলো বলে।

আলবাৎ যাবেন টি-এ বিল বানাতে। সবাই করে ম'শায়। ডানকার্কে যুদ্ধে "গরম খবর" নিউজ এজেন্সীর চটক বাবু কী করেছিলেন জানেন? চার-চারটা টাইপ রাইটারের বিল করেছিলেন।

: কী করে?

: সৈন্যদের সঙ্গে 'ল্যাণ্ড' করার সময় বললে, মেসিন হারিয়ে গেছে। তার পর শহর দখল করার সময় আর এক মেসিনের বিল বানালে। সেই মেসিন আবার পালিয়ে আসার সময় হারিয়ে গেলো। এলো তিন নম্বর মেসিন। তার পর আবার শহর দখল করতে গিয়ে আর এক মেসিন কিনলে—ব্যোমকেশ বলে।

: আমি কিন্তু এর চাইতে মজার ব্যাপার জানি, ব্যোমকেশ বাবু! প্রীতি বাবু বলতে থাকেন—"রিপোর্টার হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি, লড়াইর সময় কী করেছিল জানেন? বিল করলে—টু—যাতায়াত খরচ তিনশো টাকা।

সমস্ত ঘরে একটা আর্তনাদ উঠলো। ব্যোমকেশ বললে: সে কী ব্যাপার প্রীতি বাবু! জায়গার নাম উল্লেখ করলেন না, আর বিল বানালে 'ড্যাস টু ড্যাস'—যাতায়াত খরচ তিনশো টাকা! আশ্চর্য্য!

: তা নয়তো কী মশায়! হৈ-চৈ কী কম ঘুঘু ছেলে! বিলের তলায় কী লিখে দিয়েছিল জানেন? 'ফর সিকিউরিটি রিজনস্' মানে 'সামরিক নিরাপত্তার' জন্যে জায়গার নাম উল্লেখ করা গেলো না। অডিট ব্যাটা কিসসু বলতে পারলে না। সুড়-সুড় করে বিলটি পাশ করে দিলে।

: যা বলেছেন প্রীতি বাবু। লড়াই করতে যাওয়া মানেই 'প্রফিট'। আমি একবার চটক বাবুর বিল দেখেছিলাম। কী করেছিল জানেন? মরুভূমি পার হ'বার জন্যে কোম্পানী থেকে একটা উটের দাম আদায় করেছিল।

বুটলো এতোক্ষণ এদের কথাবার্তা শুনছিল। কোন প্রশ্ন করেনি। এবার কিছু না বলে পারলে না। কারণ, এদের কথাবার্তা সবই যেন সাঙ্কেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে। তাই বেপরোয়া হয়ে প্রশ্ন করলে: দেখুন আপনাদের এই 'প্রফিট' কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না। কথাটা যদি একটু পরিষ্কার করে বলেন, তা হ'লে একটু সুবিধে হয়।

ব্যোমকেশ জবাব দিলে: বলছি, কিন্তু দেখবেন পতিতপাবন বাবুকে যেন এর কিছু বলবেন না! আচ্ছা ধরুন, আপনি ফ্রণ্টে গিয়ে আপনার বান্ধবীর জন্যে চকোলেট বা কিছু পাঠালেন—বিলে লিখবেন, এণ্টারটেনমেণ্ট বাবদ পঞ্চাশ টাকা। কাউকে যদি ফুলের তোড়া পাঠাবার ইচ্ছে হলো—অমনি লিখবেন, খবর সংগ্রহ বাবদ পনেরো টাকা, সিনেমায় যাবার ইচ্ছে হলো—'বক্সে' গিয়ে বসবেন। লিখবেন, 'কনভেয়েন্স ফর স্পেশাল ইণ্টারভিউ' পঁচিশ টাকা। বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে যাবার এই তো মজা—

ব্যোমকেশের কথা শেষ হবার আগেই সাধন বাবু ঘরে ঢুকলেন। বুটলোকে দেখে বললেন: আরে আপনার জন্যেই তো এতোক্ষণ বসে আছি। ফতেনগরে রওনা হয়ে যান কালই। 'দৈনিক সমাচার' হয়তো তাদের রিপোর্টার এতোক্ষণে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সাধন বাবু এবার বুটলোকে কয়েকটা উপদেশ দিলেন। বললেন: দেখবেন, 'হরকরার' মান-ইজ্জত আপনার উপরই নির্ভর করছে। ঐ 'সমাচারের' রিপোর্টারের উপর খুব কড়া নজর রাখবেন। প্রতিদ্বন্দী কাগজ কিনা। ঐ ব্যাটা যদি বলে ষ্টেশনে যাচ্ছে, তবে বুঝবেন 'ষ্টোরী ফাইল' করতে ডাকঘরে যাচ্ছে। আর যদি বলে ডাকঘরে যাচ্ছে তবে বুঝবেন ইষ্টিশানে যাচ্ছে, নিশ্চয় কোন বড়ো নেতা আসছে। এ লাইনে কাউকে বিশ্বেস করবেন না—কাউকে নয়। বেশ, তা'হলে কাল সকালের ট্রেণেই রওনা হয়ে পড়ুন।

আরো গোটা কয়েক উপদেশ নিয়ে বুটলো সোজা শৈলর বাড়ীতে চলে এলো। শৈলকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে বললে: দাদা, সমস্ত মান-ইজ্জত তোমারই উপর নির্ভর করছে। এ যাত্রা রক্ষে করো। আজ থেকে তুমি বুটলো, আমি শৈলেন। টাকা পয়সার জন্যে চিন্তা করো না। 'হরকরা' দপ্তরে যা শুনতে পেলাম এই ধরণের রিপোর্টিং নাকি রীতিমতো 'প্রফিটেবল বিজনেস।'

* * * *

সেদিন রাত্রেই 'সমাচার' দপ্তরে খবর গেলো যে হরকরা ফতেনগরে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। ব্রজানন্দ বাবু খবরটা শুনতে পেয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। টেক্কা মেরে দিলে 'হরকরা' তার উপর। উফ, একজন বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাবার কী খরচা তা কি তিনি জানেন না? আলবাৎ জানেন।

প্রশ্ন করলেন খগেন বাবু—: ব্যাপারটা শুনেছেন স্যর?

: কোন ব্যাপার?

: হরকরা নাকি পতিতপাবন বাবুর শালাকে ফ্রণ্টে রিপোর্ট করতে পাঠাচ্ছে?

: কী বললে? কাকে পাঠিয়েছে? বুটলোকে? ঐ যে বখাটে ছোঁড়া। বাবরী চুল রাখে আর সিনেমায় 'ঘ্যাংগো' করে। ও আবার রিপোর্ট করবে কী হে!

: ঐ তো সব চাইতে গোলমালের বিষয় স্যর! হয়তো ভুল করে দশটা গ্রাম দখল হয়েছে বলে 'ডেসপ্যাচ' পাঠাবে সরকারের রিপোর্টার হলে স্যর, ভয় পাবার কিছু ছিল না—খগেন বাবু মন্তব্য করেন।

: তাই তো হে, বড়ো ভাববার বিষয়! কী করা যায় বলো দিকিনি? কথাটা সত্যিই চিন্তার বিষয়। ফতেনগরে একটা বিশেষ সংবাদদাতা পাঠানোর যে কতো ঝামেলা।

: আচ্ছা স্যর, একবার গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করলে হয় না? উনি হয়তো একটা উপায় বাৎলে দিতে পারেন।

ঠিক বলেছো, চল যাই।

ওরা দুজনে স্বামী জিবিদানন্দের বাড়ীতে গেলেন। [ক্রমশঃ।

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিল্‌যুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
প্রকৃত সৌন্দর্য্য
ফুটিয়ে তুলতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
BLENDED WITH CADYL
Rexona
BLENDED WITH CADYL

ষাট টাকায় রেডিও তৈরী

কত কম দামে রেডিও তৈরী করা যায়, গত কয়েক বছর তারই যেন এক প্রতিযোগিতা চলেছে। এইচ, এম, ভি, ফিলিপস, জি, ই, সি থেকে শুরু করে আই, আর, পি, মার্ফি অবধি কেউ পিছিয়ে নেই তাতে। কিন্তু সকলকে যেন ছাড়িয়ে গিয়ে এল, সি, সাহা এ্যাণ্ড কোম্পানী ঘোষণা করেছেন, ষাট টাকায় তাঁরা একটি রেডিও দেবেন। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড নয় একেবারে আনকোরা নতুন। বাড়ীতে শখ করে বসিয়ে রাখবার নয়, বাজবেও। আওয়াজ কমবে বাড়বে। ব্যাণ্ড পালটানো চলবে। সুইচ রয়েছে, অফ অন করা যাবে। তবে লোকাল সেট। এখানে বসে কলকাতা ছাড়া ধরা চলবে না। আমরা কম টাকায় দেশের জনসাধারণকে এই ভাবে রেডিও কেনবার সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। অন্যান্যদেরও অনুরোধ জানাচ্ছি, ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে কম টাকায় রেডিও যত তৈরী হবে জনসাধারণের কেনার পক্ষে তত সুবিধে। রেডিওর যা পার্টস ভালব, ক্রিষ্টাল, রিসিভার, এ্যামপ্লিফায়ার, কণ্ডেন্সার ইত্যাদির কিছু কিছু অংশ ভারতেই আজ-কাল তৈরী হচ্ছে। দাম কষে দেখলে ষাট টাকায় আজ আর একটি 'লোকাল সেট' দেওয়া অসম্ভব নয়। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য বলছি, পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকায় ঘরে বসে রেডিও নিজেরাই কি করে বানাতে পারবেন ক্রমে সেকথাও বলব। সবিস্তারে ছবি দিয়ে দাম সমেতই জানাতে পারব।

Classical গানে যেন খাদ না পড়ে!

আমরা বলছি না। কারণ আমরা জানি, তা পড়ে নি, কোনও কালে পড়বেও না। অখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের সভাপতি না কে যেন সেদিন বলেছেন এ কথা। বলেছেন বেশ দৃঢ় ভাবে, ক্ল্যাসিক্যাল গানে যেন খাদ না পড়ে। আমরা তাঁকে অভয় দিচ্ছি, তা পড়বে না। আজও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশিষ্ট বিকাশ সমূহ অর্থাৎ 'ঘরাণা' গুলি ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আপনি সে ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে যেতে পারবেন না সহজে। যদু ভট্ট নয়, সবাই যে শোনবামাত্র কণ্ঠস্থ করে নেবেন। ফৈয়জ খাঁয়ের ঘরাণা শেখার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ। ঘরাণার উপযুক্ত ধারক যদি বংশ মধ্যেই না জন্মগ্রহণ করে তো সে ঘরাণার মৃত্যু হতে পারে কিন্তু অন্য বংশসম্ভূত কেউ তা শিখতে পারেন না। এই সিক্রেসী যেখানে আজও, সঙ্গীতের চেয়ে বংশ-পরম্পরায় খ্যাতি অর্জ্জনের স্পৃহা অধিক, সেখানে আর ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতে খাদ পড়বার ভয় কোথায়? সঙ্গীতকাররা এ সম্পর্কে 'লিবারেল' না হলে সত্যিকারের সঙ্গীত-সাধক, শিল্পীর জন্ম সম্ভব হবে কি করে? অথচ কয়েক জন 'হামবাগ' চিরকালই চেঁচিয়ে মরছেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেন ভেজাল না ঢোকে।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের বন্ধ দুয়োর ভেদ করে ভেজাল প্রবেশ করবে কোন্ পথে?

বাঙলা গীত ও পল্লী গীত—বেতারে

পল্লীগীত বলতে আপনি আমি সাধারণ শ্রোতা হিসেবে কি বুঝব? বিশেষ করে যা প্রচারিত হয় কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সকালে, দুপুরে (পল্লীগীতের উপযুক্ত সময়ই বটে), সন্ধ্যায় বা রাত্রে। শ্যাম, রাধা, সখী, চাঁদ, যমুনা। বিষয়বস্তু এই মাত্র। তাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা সুরে, বিভিন্ন ঢংয়ে গাওয়াই কি পল্লীগীত নাকি! শ্যাম আর রাধার প্রেম, অভিসার, বিরহ কি চাঁদের শোভা, যমুনার জল (বাঙালী শতকরা নব্বই জনই যে জলের চেহারা দেখেননি) তাই নিয়েই হবে বাঙ্গালার পল্লীগীত? বাংলার পল্লীর যে আসল গান ফসল কাটার, ফসল বোনার, মাঝির ভাটিয়ালী গান, কবিগান, তরজা, ঝুমুর, গম্ভীরা, আগমনী, নবমী, নবান্ন, মঙ্গল ঠাকুরের গান, ইতুর গান, মনসার গান, রয়ানী পাঁচালীর গান এই সব নিয়েই কি নয় বাঙলার পল্লীগীত? তাহ'লে শুধু মাত্র যমুনা-পুলিনে চন্দ্রালোক রাধাশ্যামের লীলাখেলাই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের লক্ষ্য কেন?

মহিলা মহলে শুধু ঘুমপাড়ানী ছড়া

মহিলা মহল। শুধু মাত্র মহিলাদের জন্তই এ অনুষ্ঠান। দুপুরের রান্নাবান্নার কাজ, ঘর-সংসারের নানা হাঙ্গামা মিটিয়ে কর্তার আফিসের কোটের পকেটে ডিবে ভরে পান সেজে দিয়ে, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গা এলিয়ে ওপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরী থেকে কাল সন্ধ্যায় আনা বেশ মোটা-সোটা সাইজের নভেলটি (উপন্যাস কথাটার বড় চলন নেই এখনো) সামনে রেখে তাকিয়া ঠেস দিয়ে রেডিওর চাবী খুললেন আপনি। কি শুনতে পাবেন? গড়-গড় করে কেউ একজন স্বাধীন ভারতে নারীশিক্ষার প্রসার, নারীদের দায়িত্ব, সহ-শিক্ষার সুফল-কুফল কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপারটা সংক্ষেপে বোঝাতে লেগে গেছেন। তারপরই পটলের শিককাবাব, আলুর দো-পেঁয়াজী, চিংড়ীর রসমালাই। আধ সের ছানা, এক পোয়া আলু, একটু গরমমশলা, এক ছটাক ভাল ঘি (বাজারে পাওয়া যাবে কি?) যোগাড় করুন। তেলে ঘি-মাখানো ছানাটা ছাড়ুন, বেশ কিমা-কিমা মতন হয়েছে? আলু সিদ্ধর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সময় হয়ে গেছে। অতএব সব শিকেয় তুলে রাখুন। আবার আগামী সপ্তাহে মোলাকাৎ হবে। এবার শুনুন হেমন্তকুমারের সেই গানখানা। কার্পেট বোনা শিখবেন? চিঠির ঝাঁপি খুলি। ব্যস! শেষ হয়ে গেল মহিলা মহল এবং শেষ করে আপনার কষ্টার্জ্জিত (তাই ছাড়া আর কি!) দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম মুহূর্ত্তটিকেও। রেডিওর মহিলা মহলে আর শিশুমহলে, বিদ্যার্থীমণ্ডলে আর মজদুর-মণ্ডলীতে সর্বত্রই তো সেই ঘুমপাড়ানী ছড়ার পরিবেশনই চলছে। কর্তাদের নজর কবে পড়বে এ দিকে?

বীণা কত রকমের?

এক, দুই, তিন, চার কি বড় জোর আট-দশ রকমের কি বলুন? কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ নয়। ভারতীয় এই বাদ্যযন্ত্রটির কথা প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় বহু পুঁথির মধ্যেই পাওয়া গেছে। সেকালে বহু প্রকারের বীণার প্রচলন ছিল। তাদের নামও যেমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত, চেহারাও আন্দাজ করুন কেমন হবে? নারদীয় 'পঞ্চম কণ্ডিকা' শুরু হয়েছে 'দারবী' আর 'গাত্রবীণা'র প্রসঙ্গ নিয়ে। গাত্রবীণার ব্যবহার ছিল সামগানে।

> দারবী গাত্রবীণা চ দ্বে বীণে গানজাতিষু।
> সামিকী গাত্রবীণা তু তস্যাঃ শৃণুত লক্ষণম্।
> গাত্রবীণা তু সা প্রোক্তা যস্যাং গায়ন্তি সামগাঃ।
> স্বরব্যঞ্জনসংযুক্তা অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠরঞ্জিতা।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'চিত্রা' ও 'বিপঞ্চী' এই দুটি বীণার কথা পাওয়া গেছে। চিত্রা বীণার সাত তার। বিপঞ্চীর ন'টি।

'সঙ্গীতমকরন্দ' নামক গ্রন্থে প্রায় উনিশ রকমের বীণার উল্লেখ রয়েছে। কচ্ছপী, কুব্জিকা, চিত্রা, বহন্তী, পরিবাদিনী, জয়া, ঘোষবতী, জ্যেষ্ঠা, নকুলী, মহতী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, কূর্মী, রাবণী সারস্বতী, কিন্নরী, সৌরন্ধ্রী, ঘোষকা।

শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে এগারো রকম বীণার নাম করেছেন।

> তত্রোদাস্বেকতন্ত্রী স্যান্নকুলশ্চ ত্রিতন্ত্রিকা।
> চিত্রা বীণা বিপঞ্চী চ ততঃ স্যান্মত্তকোকিলা।
> আলাপিনী কিন্নরী চ পিনাকীসংজ্ঞিতা পরা।
> নিঃশঙ্কবীণেত্যাত্মাশ্চ শার্ঙ্গদেবেন কীর্তিতাঃ।

অর্থাৎ একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রিকা, চিত্রা, নকুল, বীণা, বিপঞ্চী, আলাপনী, কিন্নরী, মত্তকোকিলা, নিঃশঙ্কবীণা, পিনাকী।

এ ছাড়াও 'যামলতন্ত্র', 'উড্ডীশমহামন্ত্রোদয়' ইত্যাদি গ্রন্থে আরও বহু প্রকারের বীণার নাম পাওয়া যায়।

ভারতীয় স্বর বিভাগ

স্বর কত রকমের, এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন—বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ, অপধ্বান্ত এই সাত স্বর। এ ছাড়াও প্রেঙ্খ, নমন, কর্ষণ, বিনত, অত্যুৎক্রম, সম্প্রসারণ, অভিনিহিত, প্রাশ্লিষ্ট, ক্ষাত্য, ক্ষৈপ্র, পাদবৃত্ত তৈরবন্ধন, তিরোবিরাম আরও কত রকমের কত স্বরের কথা যে প্রাচীন পুঁথিগুলিতে লেখা রয়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। সেই সব স্বরের নানা উদাহরণ, বিস্তার ইত্যাদির কথাও আছে। মোটামুটি ভাবে আজও ভারতীয় যে কয়েকটি স্বরের পরিচয় পাওয়া যায় তা এসেছে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের অংশ হয়ে।

উদাত্ত	অনুদাত্ত	স্বরিত
নিষাদ, গান্ধার	ঋষভ, ধৈবত	ষড়্জ, মধ্যম, পঞ্চম

ভারতবর্ষ থেকে চীনে সঙ্গীত

একুশ জন বিদ্যার্থী একদা হিমালয়ের দুরূহ পর্বতসঙ্কুল বন্ধুর উপত্যকা পেরিয়ে বাংলার দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে চেয়েছিল। কিন্তু এসে পৌঁছেছিল মাত্র দু'জন। এ কথা বলছে ইতিহাস কিন্তু আপনি জানেন কি, ইতিহাস একথাও বলছে যে, সেদিন শুধু ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন কি তর্কশাস্ত্রেরই আদান-প্রদান হয়নি' ভারত থেকে চীনে চলাচল হয়েছিল সঙ্গীতেরও। চীনের রাজধানী পিকিঙের ষ্টেটস্ লাইব্রেরীতে যে সত্তর হাজার ভারতীয় পুঁথি রয়েছে তার মধ্যে অনুসন্ধান করলে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে পুঁথিরও সন্ধান মিলবে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের চুলচেরা বিচারেও আমাদের এ আশা ব্যর্থ হবে না। উভয় দেশের স্বরকল্পনা, পর্দা, রাগ-রাগিণী স্বর-সঙ্গতি ও স্বরপ্রকৃতি এবং বাদ্যযন্ত্রাদির তুলনামূলক বিচারেও ঐ একই কথা প্রতিফলিত হবে। চীনা পাঁচটি স্বরের নাম কুঙ, সাঙ, চি, য়ু, কিয়ো। এগুলিকে ভারতীয় ঢংয়ে ফেললে,—

Notes	Kung	Shang	Chiao	Chih	Yu
Cardinal Points	North	East	Center	West	South
Planets	Mercury	Jupiter	Saturn	Venus	Mars
Elements	Wood	Water	Earth	Metal	Fire
Colours	Black	Violet	Yellow	White	Red

এই পাঁচটি স্বরে সৃষ্ট পর্দা (Scale), Kung (do), Shang (re), Chiao (mi), Chih (sol), Yu (la), Kung (do) পাশ্চাত্য ও ভারতীয় স্বরের তুলনায়,

I	Kung	(C)—	(Sa)—	1	= 81/81
II	Chi	(G)—	(Pa)—	3/2	= 81/54
III	Shang	(D)—	(Re)—	9/8	= 81/72
IV	Yu	(A+)—	(Dha+)—	27/16	= 81/48
V	Kyo	(E+)—	(Ga)+		= 81/64

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী যেমন ষড়জকে কেন্দ্র করে চলে চীনা-সঙ্গীতেও তাই।

চীনেও শব্দের প্রকৃতিগত ভেদ আট রকমের। যথা—(১) চামড়ার শব্দ, (২) পাথরের শব্দ, (৩) ধাতুদ্রব্যের শব্দ, (৪) পশমী সুতার শব্দ, (৫) কাঠের শব্দ, (৬) বাঁশের শব্দ, (৭) লাউ-কুমড়া জলের শব্দ ও (৮) পোড়ামাটির শব্দ। জাতীয় বাদ্য: য়ু-সিও (বাঁশী), হৈ-টৌ (শঙ্খ), চাঙ (ঘণ্টা), লো (গঙ), পো (করতাল), লা-পা (বড় শিঙা), সোণ (ক্লারিওনেট) ইত্যাদি।

এর পরও অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ আছে কি?

আমার কথা (১)

মালবিকা রায়

লক্ষ্ণৌএ আমার জন্ম—১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে। ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতময় পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়েছি, বহু গুণী সঙ্গীতজ্ঞের গান-বাজনা শুনবার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক পরিবারে, সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি যে স্বাভাবিক অনুরাগ নিয়ে আমি জন্মেছিলাম তা যথানিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'বার পথে কোনো অন্তরায় ছিল না।

আমার মনে পড়ে না, কবে আমি আমার সঙ্গীত-শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করি। নিতান্ত শিশুকাল থেকেই আমার সঙ্গীত-সাধনার শুরু—আমার জ্ঞানোন্মেষের আগে থেকে। আমি আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেছি। তিনি ৺পণ্ডিত ভাতখণ্ডের শিষ্য এবং ৺ভাতখণ্ডেজীর ভাবধারার প্রকৃত অনুগামী হলেও বর্তমান "ভাতখণ্ডে সঙ্গীত-পদ্ধতি" বলতে যা বোঝায় তার থেকে তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁর কাছে আমি বিশেষ রূপে আলাপ, ধামার ও খেয়াল শিখেছি, ঠুংরী তিনি আমায় পরে শিখিয়েছেন। এ ছাড়া আমার স্বরচিত সুরের ভজনগুলিও আমার গাইতে ভালোই লাগে। খেয়ালও কিছু রচনা করেছি—এবং সেগুলি রেডিওতে ও জলসায় পরিবেশনও করেছি।

আগ্রা ঘরাণার গায়কীর সঙ্গে আমাদের গায়কীর মিল আছে। আগ্রা ঘরাণার কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনাও (গান) পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। আমি ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে শিল্পিরূপে প্রথম বাইরে গাইতে আরম্ভ করি,—তখন আমার ১৫ বৎসর বয়েস। ১৯৪৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত আমি পাটনা বেতার কেন্দ্রের 'নিয়মিত-শিল্পী' হিসাবে সঙ্গীত-পরিবেশন করছি। ১৯৫২ সালে Madrs Music Academyর সঙ্গীত-সম্মেলনে আমার গান সমাদৃত হয়। এ বছর (September—54) কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সুরসভা অনুষ্ঠানে এবং "ঝঙ্কার" সঙ্গীত চক্রে আমার গান সকলের প্রশংসা অর্জন করে। সম্প্রতি যে নিখিল সঙ্গীত-সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় তাতেও আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কলিকাতা ও পাটনা ছাড়া লক্ষ্ণৌ, বম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে আমি সঙ্গীত পরিবেশন করেছি। এ ছাড়া ত্রিচি, বিজয়ওয়াদা, ধারওয়ার ও নাগপুর বেতার কেন্দ্র থেকে আমার Studio record প্রায়ই বাজানো হয়। ছোট-বড় নানা জলসাতে গান করেছি—কলিকাতা, পাটনা, বম্বে ও দিল্লীতে

ধ্রুপদ গান *

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি

তিলককামোদ—ঝাঁপতাল

কৌন রূপ বনে হো রাজাধিরাজ
আজু নৈন নিরখি রঙ্গনাথ গাবে।
ত্যজি অগুরু চন্দন বিভূতি অঙ্গ ভূখন
জটা মকুট কৈসী বনি আবে।
কৈসো মুখ মণ্ডল ঝলস শ্রুতি কুণ্ডল
ভই চন্দ্র ভাল মৃগ ছাল পাবে।
বরজি বর অম্বর, পহন বাঘাম্বর
শীষ পর গঙ্গাধর ধরসি ধাবে॥ যদু ভট্ট (রঙ্গনাথ)

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
সা -া সা | রা পমা | পা -া পধা | মা পা | রগা রপা মা | পাঃ রঃ | সা -া ন্‌া | সসা রসা |
কৌ ০ ন রূ ০০ প ০ ব০ নে ০ হো০ ০০ ০ রা ০ জা ০ ধি রা০ ০০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
রা -া -া | প্‌া প্‌া | ন্‌া -া ন্‌া | সা সা | সা রা রা | রা পা | পা মা গা | রগা -া ||
জা ০ ০ আ জু নৈ ০ ন নি র খি র ঙ্গ না ০ থ গা ০ বে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
{ মা পা | পা না না | র্সা -া | র্সা র্সা -া | র্সা র্রা | র্সা ণা ধা | পা র্রর্সা | র্রা র্রা -া } |
{ ত্য জি অ গু রু চ ০ ন্দ ন ০ বি ভূ তি অ ঙ্গ ভূ ০০ খ ন ০ }

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
না না | র্সা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সর্সা র্রা র্রর্সা | ণা ধা | পধা মা পা | রগা -া ||
জ টা ম কু ট কৈ ০ সী০ ০ ব০ নি ০ আ০ ০ ০ বে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
{ মা পা | পা না না | র্সা -া | র্সা র্সা -া | র্সা র্রা | র্সা ণা ধা | পা র্রর্সা | র্রা র্রা -া } |
{ কৈ ০ সো মু খ ম ০ ণ্ড ল ০ ঝ ল স শ্রু তি কু ০০ ণ্ড ল ০ }

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
না না | র্সা -া র্সা | র্সর্সা র্রা | র্সা ণা ধা | পা ধা | পা মা গা | রগা -া ||
ভ ই চ ০ ন্দ্র ভা০ ০ ল মৃ গ ছা ০ ল পা ০ বে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মা পা | পা না না | র্সা -া | র্সা র্সা -া | র্সা র্রা | র্সা ণা ধা | পা র্রর্সা | র্রা র্রা -া |
ব র জি ব র অ ০ ম্ব র ০ প হ ন বা ০ ঘা ০০ ম্ব র ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
না -া | না র্সা র্সা | র্সর্সা র্রা | র্সা ণা ধা | পা ধা | পা মা গা | রগা -া ||
শী ০ ষ প র গ০ ০ ঙ্গা ধ র ধ র সি ধা ০ বে ০

* সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' হইতে গৃহীত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত "মধুরূপে বিরাজো" গানটি এই গানের অনুকরণে রচিত।

এ বছরেও শীতের মরশুমে কলকাতায় গানের আসর জমে উঠেছিল বেশ ভালই। তবে জলসার আয়োজন ক'রে প্রায় অধিকাংশ উদ্যোগের নামই দেওয়া হয়েছে 'কনফারেন্স'। আগামী বর্ষ থেকে কেউ কেউ কনফারেন্স নাম পাল্টে জলসা বা এই ধরণের কোন নাম দেবেন, আশ্বাস দিয়েছেন। কলকাতার শহরতলীর অর্থাৎ চেৎলার মুরারি মিশ্র স্মৃতি-সম্মেলনের ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। উৎসবের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন, যথাক্রমে—বীরেন্দ্র-কিশোর রায়-চৌধুরী ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। পুরস্কার বিতরণ করেন মহারাণী সুনীতি ঠাকুর। জলসায় অংশ গ্রহণ করেন সুচিত্রা মিত্র, রাধারাণী, মঞ্জু গুপ্ত, তারাপদ চক্রবর্ত্তী, গাঙ্গুবাঈ নাঙ্গল, কৃষ্ণদাস ঘোষ, গিরীন চক্রবর্ত্তী, পট্টবর্দ্ধন, দবীর খাঁ, শান্তাপ্রসাদ, দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত, পালুশকর, সরস্বতী রাণে, ভি. জি. যোগ, মিঞা বিশমিল্লা ইত্যাদি। ডোভার লেনের জলসায় আবার গত বছরের মত তারাপদ চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল। জলসার কর্ত্তা-ব্যক্তিরা বাঙালীর সম্মান নষ্ট ক'রে অবাঙালীর জন্যই নাকি ব্যস্ত ছিলেন। ইণ্টালী কালচারাল কনফারেন্সও চমৎকার সমন্বয় করেছেন সঙ্গীত-শিল্পীদের। এঁদের ছায়াচিত্র যোগে রাগ-রাগিণীর পরিচয় প্রদান অভিনব হয়েছে। অংশ গ্রহণ করেন—অমর ভট্টাচার্য্য, পান্নালাল ঘোষ, রামনাথ মিশ্র, রবিশঙ্কর, তারাপদ, সরাফৎ হোসেন, ভি. বালসারা, আনোখেলাল, হীরাবাঈ, নানকু মিশ্র। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে বসে বহুক্ষণ স্বরোদ বাজিয়েছেন। আলী আকবরের বহু দিনের এই ইচ্ছা নাকি এত দিনে ফলপ্রসূ হয়েছে। বালীতে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের সপ্তম বর্ষীয় অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় স্থানলাভ করেছেন, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, মীরারাণী ঘোষাল, শেফালী মজুমদার, জয়া দাস, মৃত্তশ্রী দাস, কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। নগর-সঙ্কীর্ত্তনের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। আশার কথা, কোন কোন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কলকাতা ও তার আশ-পাশের অঞ্চলে এই নগর-সঙ্কীর্ত্তন আবার বেশ জাঁকিয়ে উঠছে। এ বছরে বেহালার হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার অনুষ্ঠানটি সত্যিই উল্লেখযোগ্য। পাথুরিয়া-ঘাটার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁর পিতৃদেব ৺ভূপেন্দ্রকুমার ঘোষের স্মৃতি পালন করেন তাঁরই স্বগৃহে। ভারত-খ্যাত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। গত ২৬শে ডিসেম্বর সুরতঙ্গমের এক অনুষ্ঠান ৬৫ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স-এ হয়ে গেছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীসাবিত্রী ঘোষ ও শ্রীগুরু মন মিত্র যথাক্রমে স্বর্গত শিল্পী হিমাংশু দত্ত ও সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী মশায়ের গান পরিবেশন করেন। এই ধরণের স্মৃতি পালনের বহু মূল্য আছে। আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত-সম্মেলনে ভারতের বিখ্যাত সংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা এই সম্মেলনীর বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। মাত্র এক বছরের ভেতর প্রতিষ্ঠানটি এই রকম রূপ পেয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। গত ১৭ই ডিসেম্বর লেক অঞ্চলের "চক্র-বৈঠকে" এবং ১১শে ডিসেম্বর "রবিবাসরে", ভারত-বিখ্যাত শিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিগুরুর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গান গেয়ে শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি যথাক্রমে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী অঙ্গের রবীন্দ্র সঙ্গীত গা'ন। বৈচিত্র্যযোগে গানগুলিকে মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করেন। উক্ত গানের মূল হিন্দী গানও কয়েকটি পরিবেশন করেন। শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র ও শ্রীসুবোধ নন্দী মৃদঙ্গ ও তবলা সঙ্গত করেন। গত সংখ্যায় প্রকাশিত মীরাবাঈয়ের একটি ভজন গানের স্বরলিপিতে ভুল ক্রমে মিঞা তানসেনের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

ভাতখণ্ডে সঙ্গীত-শিক্ষা পদ্ধতি

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

আজ-কাল প্রায় সর্বত্রই স্বর্গীয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত পদ্ধতিতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন (ঘরোয়ানার) শিল্পীর বিরূপাত্মক মন্তব্য শুনিয়া মনে হইয়াছে যে, এই পদ্ধতির উপপত্তি (Theory) বা ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগসম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণা নাই। মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে গত পাঁচ-ছয় শতাব্দী পূর্ব হইতে ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখা যায়—অথচ সঙ্গীতশাস্ত্র প্রচলিত সঙ্গীতের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পূর্বলিখিত গ্রন্থের সঙ্কলন মাত্র হওয়াতে শিক্ষিত সঙ্গীতবিদগণের পক্ষে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্বর্গীয় সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রচুর অর্থব্যয়ে এবং অনেক গুণীর সহযোগে প্রচলিত সঙ্গীতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন কিন্তু তৎকালে বহু হস্তলিখিত পুঁথি অজ্ঞাত ছিল বলিয়া তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রচেষ্টালব্ধ ফল পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে দেখা যায়। রাগসঙ্গীতকে 'বিদ্যা'র পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার ও অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবার উপযুক্ত পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের কৃতিত্বের জন্য ভাতখণ্ডেজীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও সঙ্গীত, স্বার্থান্বেষী ও অশিক্ষিত ওস্তাদগণের পৈতৃক সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত। ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই জানেন কি, অমানুষিক কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করিয়া এবং কি দুঃসহ মনঃপীড়া সহ্য করিয়া এই সব ওস্তাদগণের নিকট হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত। ভাতখণ্ডেজী ইঁহাদের হস্ত হইতে সঙ্গীতকে উদ্ধার করিয়া শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীতের প্রচলন করিবার জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার

কার্য্যে তিনি চতুর্দ্দিক হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির এবং রাজন্যবর্গের সহায়তা লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় সঙ্গীত রাজদরবারেই পরিপুষ্ট, তাই তিনি প্রত্যেক রাজদরবারের গায়কগণের গান স্বরলিপি করিয়া তাঁহার "ক্রমিক পুস্তকে" পাঠ্যক্রমানুসারে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ওস্তাদগণকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহাকে এই কয়েক সহস্র গান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাঁহার ও আমাদের পূজ্যপাদ গুরু শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজঙ্কারের অসাধারণ স্বরজ্ঞান। ওস্তাদ গাহিয়া চলিয়াছেন—ইঁহারা দুই জনে কাগজ-পেন্সিল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; গান সমাপ্ত হইলে ওস্তাদকে তৎক্ষণাৎ গাহিয়া শুনাইয়া কোন ক্রটী হইয়া থাকিলে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। ওস্তাদগণ অশিক্ষিত এবং শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার জন্য এই গানগুলিতে কোথাও কোথাও রাগরূপ এবং ভাষার অপভ্রংশতা পরিলক্ষিত হয়। ভাতখণ্ডেজী লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্গণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে এবং শাস্ত্রকারগণের সমসাময়িক ব্যবহারিক সঙ্গীত সম্বন্ধে অজ্ঞতায় এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখে সঙ্গীত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কাজেই এই বিপর্য্যয়ের হস্ত হইতে সঙ্গীতকে রক্ষা করিতে হইলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। কারণ, সঙ্গীত পরিবর্ত্তনশীল ও অগ্রগামী। সঙ্গীতে দেশ, কাল, রুচি ভেদে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, শাস্ত্রেও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ না করিলে শাস্ত্র কেবল মাত্র বিধি-নিয়মের বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। কখনও বা শ্রোতার রুচিবৈচিত্রে, কখনও বা গায়কের স্বেচ্ছাচারে রাগরূপ বিকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা ছাড়াও ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য খুব বেশী, সঙ্গীতকে প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম্মের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির সঙ্গে একত্রিত ভাবে গ্রথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল—ভাতখণ্ডেজীই প্রথম প্রমাণ করেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত প্রাচীন কালের সেই মার্গ-সঙ্গীত বা মন্ত্রগীতি রত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের সময়েই (১৩ শতকে) লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে সঙ্গীত আমরা চারি দিকে শুনি বা গাহি সে সকল রাগে পরিণত দেশী সঙ্গীত, মার্গের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। সাধারণ লোকের সুখ দুঃখ, বিরহ প্রেম ইত্যাদি বিষয় লইয়াই এই সঙ্গীত সৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য মার্গরাগের কিছু কিছু নিয়ম ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা (দেশী সঙ্গীত) মানবসৃষ্ট এবং মানবের মনোরঞ্জনের জন্য মানব দ্বারা প্রযুক্ত। দেশী লোকসঙ্গীত হইতে কি প্রকারে রাগরূপ গঠিত হইয়াছে তাহা দেখিবার এবং প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা গুরুশিষ্যে (ভাতখণ্ডেজী ও রতন জঙ্কারজী) রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চাষী, মাঝি, গাড়োয়ান মজদুর ইত্যাদির গান সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভাতখণ্ডেজীই প্রথম নাট্যশাস্ত্র ও রত্নাকরের শ্রুতি দ্বারা স্বর স্থাপনার প্রচেষ্টায় অসাফল্য প্রমাণ করেন। শ্রুতির নির্দ্দিষ্ট কোন 'মাপ' হয় না। কারণ কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া পাঁচ জনে পাঁচ প্রকারের সপ্তকের সৃষ্টি করিবেন। ভরতের বা শার্ঙ্গদেবের নির্দ্দেশিত উপায়ে স্বর স্থাপনা করিতে হইলে ভিন্ন অভিজ্ঞতায় ভিন্ন সপ্তক গঠিত হইবার সম্ভাবনা। পাঁচ জন বীণকারকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বসাইয়া শ্রবণের সহায়তায় শ্রুতি স্থির করিয়া সপ্তক গঠন করিতে দিলে প্রত্যেক যন্ত্রীর স্বর-সপ্তক ভিন্ন হইবে। তিনিই প্রথম রাগবিবোধে বর্ণিত সোমনাথের শুদ্ধ স্বরসপ্তক 'মুখারী' ও পারিজাতে বর্ণিত অহোবল পণ্ডিতের শুদ্ধস্বর সপ্তক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 'কাফি' ঠাটের অনুরূপ প্রমাণ করিয়া—"রাগবিবোধপ্রবেশিকা" ও 'পারিজাত-প্রবেশিকা' নামক দুইখানি টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার লিখিত অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে (১) 'অভিনব রাগমঞ্জরী,' (২) লক্ষ্য সঙ্গীত শাস্ত্র, (৩) A short Historical Survey of the Music of upper India, (৪) A comparative study of some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th, 18th centuries, এবং "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি" (মারাঠী) অথবা "ভারত খণ্ডে সঙ্গীত শাস্ত্র" (হিন্দী) নামক লক্ষ্য সঙ্গীত শাস্ত্রের টীকা (৪ খণ্ড) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া তিনি সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে হস্তলিখিত পুঁথি বা মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত সঙ্গীতের রূপ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় বহু হস্তলিখিত পুঁথি মুদ্রিত হইয়া আজ সর্ব্বসাধারণের পাঠের উপযুক্ত হইয়াছে। তাঁহারই চেষ্টা এবং উদ্যোগের ফলে আজ-কাল প্রায় সর্বত্রই সঙ্গীত পারিষদের বৈঠক সঙ্গীতের (কন্‌ফারেন্স) অনুষ্ঠিত ও দেশের শ্রেষ্ঠ গুণিগণের একত্র সম্মিলন হইতেছে। "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি" (মারাঠী) নামক গ্রন্থের চারি খণ্ডে তিনি যাবতীয় সঙ্গীত পুস্তকের আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতের বিশুদ্ধ রাগরূপ নির্দ্দিষ্ট (standardised) করিয়া দিয়াছেন। হৃদয়নারায়ণ দেবের 'হৃদয় প্রকাশ' ও অহোবলের 'সঙ্গীতপারিজাত' গ্রন্থে তিনিই প্রথমে তারের দৈর্ঘ্যের উপরে স্বর স্থাপনার সন্ধান প্রাপ্ত হন। যে কোন সঙ্গীত পদ্ধতির শুদ্ধ স্বর কোনগুলি সা হইতে রে কত উচ্চ (রে হইতে গা, গা হইতে মা) ইহা না জানিতে পারিলে পুস্তকে বর্ণিত রাগ গাহিবার চেষ্টা করা বৃথা। দেশের বিখ্যাত ওস্তাদগণের সঙ্গীতও শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ক্রটিপূর্ণ থাকিতে পারে। কারণ, তাঁহাদের ঘরোয়ানায় বিদ্যা। ইহাদের স্বাভাবিক উত্তম কণ্ঠস্বর, পিতা বা পিতামহের কাছে শিক্ষা নেওয়া প্রত্যেকটি গান অন্ততঃ সহস্র বার গাহিয়া অভ্যাস করা। কাজেই অত্যন্ত মধুরও উচ্চ প্রতীকের সন্দেহ নাই—কিন্তু রাগরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে ও স্বেচ্ছাচারে বিকৃত হওয়া সম্ভব। গত পাঁচ ছয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া যত শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে (উত্তর ও দক্ষিণ দুই পদ্ধতিতেই) প্রত্যেকের স্বরস্থান, রাগরূপ ইত্যাদি এবং দেশভেদে একই রাগের রূপের অসমতা—ইত্যাদি বিশদ ভাবে 'সঙ্গীতপদ্ধতিতে' তিনি আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাগের শাস্ত্রোক্ত নিয়ম, স্বরস্বরূপ ও স্বরবিস্তার, সমপ্রকৃতিক বা সমস্বরিক রাগের পার্থক্য, বিস্তৃত ভাবে এই চারি-খণ্ডে আলোচনা করা হইয়াছে। স্বর্গীয় ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গীতশাস্ত্রে বর্ণিত কোন বিষয়ের আলোচনা কেহ করিতে চাহিলে আমরা বা আমি নিজে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিব।

[ক্রমশঃ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর্থার বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। ভারী তড়বড়ে আর অসাবধান ছেলে, যা খুসী তাই করতে যায়, অনেকটা ঠিক তার বাপের মত। পড়াশোনার উপর ভারী বিরাগ, কাজ করতে বললে হা-হুতাসের সীমা থাকে না, কোন মতে দায় সেরে পালিয়ে যায়, গিয়ে জোটে তার খেলার দলে।

ওর চেহারা এখনও এ বাড়ির মধ্যে সকলের সেরা। দেহটি সুগঠিত, চলন-বলনে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাণের প্রাচুর্য্য ওর সারা দেহ জুড়ে। ঘন বাদামী রঙের চুল, কাঁচা সোনার মত রঙ, গাঢ় নীল চোখ দু'টিতে সুদীর্ঘ পল্লব, সবার উপরে তার মধুর স্বভাব এবং মাঝে মাঝে রেগে আগুন হয়ে ওঠা—এই সব কিছু মিলিয়ে এ বাড়ির সবার কাছেই সে ছিল পরম আদরের। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওর মতি-গতি কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে চট্ করে চটে ওঠে, অথচ চটার হয়ত কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। সব সময়েই কেমন অপ্রসন্ন ভাব, কথা বলতে গেলেই মনের ঝাঁঝ বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

মাকে সে ভালবাসত। মা এই ছেলেকে নিয়ে মাঝে মাঝে ভারী মুস্কিলে পড়ে যেতেন। সে ত' নিজের কথা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যখন ওর খেলাধূলা করবার ইচ্ছে, তখন কেউ যদি বারণ করে, সে তার মা-ই হোন না কেন, তক্ষুণি তার রাগ উঠে যায়। আবার যখনই কোন মুস্কিলের মধ্যে পড়ে, তখন মায়ের কাছে গিয়ে অনবরত ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকে।

কোন্ মাষ্টার নাকি ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না, তাই নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ। মা বললেন, 'অমন করিস কেন? যা তোর ভাল লাগে না, পারলে তুই পালটে নিস। আর যেখানে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই, সেখানে সয়ে যাওয়াই ত' ভালো।'

আগে সে বাবাকে ভালবাসত, আর বাপ ত' ওকে রীতিমত মাথায় করেই রাখত। এখন বাপের উপরও ওর একান্ত বিরাগ। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মোরেলের দেহ যেন আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল। আগে কত সুন্দর ছিল শরীরের গড়ন, চলা-ফেরার মধ্যে ছিল সহজ ভাব, এখন যেন দিন দিন ওর দেহ কুঁকড়ে যাচ্ছে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি দূরে থাক, কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে তার দেহ, দেখে করুণা জাগে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে হীনতা আর তুচ্ছতার ছাপ। এই চিমসে বুড়ো যখন ওকে শাসাত, কিম্বা কোন কিছু কাজ করতে বলত, তখন আর্থারের মেজাজ সপ্তমে চ'ড়ে যেত। তা ছাড়া মোরেলের স্বভাব দিন দিন আরও জঘন্য হয়ে উঠছিল, অনেক সময় তার চাল-চলন দেখে রীতিমত বিরক্তি লাগত। ছেলে-মেয়েরা তখন বড় হয়ে উঠছে, শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেবার মুখে বাপের এই জঘন্য ব্যবহার তাদের কোমল মনে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিত। খনির নীচে মজুরদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, ঠিক তেমনিই চাল-চলন সে বাড়িতেও দেখাতে চাইত।

অনেক সময় বাপের উপর বিরক্ত হয়ে আর্থার লাফিয়ে উঠে চলে যেত বাড়ির বাইরে। 'কী জঘন্য আপদ' সে চীৎকার করে বলত। আর ছেলেমেয়েরা যতই ঘৃণা করত ওকে, মোরেল ততই আরো বেশী বিরক্ত করত তাদের। এ যেন তার একটা মহা আনন্দ। ছেলে-মেয়েদের রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার মধ্যে সে এক ধরণের আনন্দ লাভ করত। ওদেরও বয়স তখন চৌদ্দ কিম্বা পনেরো—সহজে রেগে ওঠবারই সময় এটা। আর আর্থারের ত' কথাই নেই। তার যখন চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স, তখন তার বাপের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেহ আর মন দুই-ই ভেঙে পড়েছে; কাজেই বাপের উপর আর্থারের বিরাগই হ'ল সব চেয়ে বেশী।

এক এক সময় মোরেল বুঝতে পারত, ছেলে-মেয়েরা তাকে কী চোখে দেখে। গলা চড়িয়ে সে বলত, 'আমি ত' বাড়ির জন্যে খেটে খেটে মলাম। কিন্তু যতই কেন না করি ওদের জন্যে, ওরা ত' আমাকে মনে করে শেয়াল-কুকুরের মত।—আমিও বলে রাখছি, বাবা, দেখে নেব—এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না!'

মোরেল যদি এ ভাবে শাসনের সুরে কথা না বলত, কিম্বা সে যতটা করে ব'লে মনে করে, ততটুকু যদি সে বাস্তবিকই করত, তা'হলে তার জন্যে কিছু অন্ততঃ করুণার উদ্রেক হ'ত বাড়ির লোকদের মনে। আজ-কাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই বাপের খিটিমিটি লাগত। মোরেল কিছুতেই তার জঘন্য স্বভাব ছাড়তে পারত না, কেবলমাত্র নিজের বাহাদুরী দেখাবার জন্যেই সে এমন ব্যবহার করত ওদের সঙ্গে। আর ছেলেমেয়েরাও ওকে দু'চোখে দেখতে পারত না। শেষ পর্য্যন্ত আর্থার এমন বদমেজাজী আর অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠল যে, মা তাকে নটিংহামেই তাঁর এক বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। এখানকার পড়া শেষ করে নটিংহামের গ্রামার-স্কুলে পড়বার জন্যে সে একটা বৃত্তি পেয়েছিল। সপ্তাহের শেষে একবার শুধু সে বাড়ি আসত।

অ্যানি বোর্ড-স্কুলে পড়ায়, মাইনে সপ্তাহে চার শিলিং করে। তবে এবার পরীক্ষায় পাশ করেছে, কিছুদিনের মধ্যেই ওর মাইনে হবে পনেরো শিলিং। তখন যদি বাড়িতে টাকা-পয়সার টানাটানি একটু কমে।

মিসেস মোরেল এখন পলের উপরেই একান্ত নির্ভর করে

রয়েছেন। পল ভাল মানুষ, সে চমক লাগিয়ে দিতে জানে না। তার ছবি আঁকার সখ এখনও আছে, আর মায়ের দিকে তার পুরোন টান একটুও কমেনি। তার সব কাজই মায়ের দিকে চেয়ে। সন্ধ্যাবেলা পল কখন আসবে, মা অপেক্ষা করে থাকেন। বাড়ি এলেই তাঁর সারা দিনের সব ভাবনা উজাড় করে বলেন ছেলের কাছে, যা কিছু ঘটেছে এতক্ষণ বাড়িতে তার ফিরিস্তি দিতে বসেন। পল মায়ের কাছে বসে অসীম আগ্রহে তাঁর কথা শোনে। ওদের দু'জনার জীবন যেন একই প্রাণের দুটি অংশ।

উইলিয়ম এখন তার কৃষ্ণকুন্তলা প্রণয়িনীর কাছে বিবাহের বাগ্‌দান করেছে। বাগ্‌দানের চিহ্ন হিসাবে আট গিনি দামের একটা আংটি কিনে দিয়েছে তাকে। দাম শুনে যেন গল্প-কথা ব'লে মনে হয়—ছেলেমেয়েরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। মোরেল বললে, 'আট গিনি, হুঁ! বোকা আর কাকে বলে! ও থেকে আমাকে যদি কিছু দিত, তা'হলে খরচটা একটু সার্থক হ'ত ওর।'

মিসেস মোরেল ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে দেবে? কেন, তোমাকে কেন দেবে?'

তাঁর মনে পড়ল, মোরেল বিয়ের আগে তাঁকে কোন আংটি পর্য্যন্ত দেয়নি। তিনি ভাবলেন, উইলিয়ম বোকা হতে পারে, কিন্তু তোমার মত মন ওর ছোট নয়।

আজ-কাল উইলিয়ম শুধু লিখত, কবে তার বাগ্‌দত্তা বধূকে নিয়ে সে কোন নাচের জলসায় গেছে, কেমন চমৎকার সাজ-পোষাক সে পরে গিয়েছিল, ইত্যাদি। অথবা তারা দু'জনে কেমন মজা করে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, তারই গল্প।

মেয়েটিকে তার সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে আসতে চায় সে। মা লিখলেন, বড়দিনে আসতে পারো।

এবার উইলিয়ম যখন এলো, তখন তার সঙ্গে একটি মাননীয়া অতিথি, কিন্তু এবার আর বাড়ির কারু জন্যে কোন উপহার নেই। মিসেস মোরেল রাত্রির খাবার তৈরী করে রেখেছিলেন। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। উইলিয়ম এসে ঘরে ঢুকল।

'এই যে মা!' তাড়াতাড়ি মাকে চুমু খেয়েই, উইলিয়ম তার সঙ্গের সুন্দরী, তন্বী মেয়েটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'এই হ'ল জিপ।'

মেয়েটি লম্বা, দেখতে সুন্দরী। পরনে শাদা আর কাল চেকের লোমওয়ালা জামা। এগিয়ে গিয়ে মিস ওয়েষ্টার্ণ হাত বাড়াল, অল্প একটু হাসল, দাঁতগুলো সামান্য দেখা গেল মাত্র। কথায় জোর দিয়ে মেয়েটি বললে, 'কেমন আছেন, মিসেস মোরেল?'

মিসেস মোরেল বললেন, 'নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে তোমার?'

—'না, না, দুপুরের খাবার আমরা ট্রেনে খেয়ে এসেছি। এই—আমার হাতের দস্তানা-জোড়া গেল কোথায়?'

উইলিয়ম তাড়াতাড়ি ওর দিকে চাইলে। আজ-কাল উইলিয়ম বেশ বড়োসড়ো হয়ে উঠেছে, দেহের মধ্যে এসেছে পৌরুষের কাঠিন্য। বললে, 'আমি কী করে জানব!'

—'বাস, তবে হারিয়েছি। রাগ করো না যেন।'

উইলিয়মের মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলল না। মেয়েটি রান্নাঘরের চারিদিক চাইতে লাগল। ছোট ঘর, লতা-পাতায় সাজান, ছবিগুলোর পেছনে ফুল-পাতা দিয়ে রাখা হয়েছে, আসবাবের মধ্যে গুটিকয় কাঠের চেয়ার আর ছোট একটি টেবিল—সব মিলে তার কাছে কেমন অদ্ভুত লাগছে।

মোরেল এসে ঘরে ঢুকল।

—'এই যে, বাবা!' উইলিয়ম এগিয়ে গেল।

—'এই যে। তুমি তা'হলে আমাদের মনে করে এলে?'

হাতে হাত মেলাল দু'জনে। উইলিয়ম সঙ্গের মেয়েটিকে পরিচয় করিয়ে দিলে বাপের সঙ্গে। আগের মতই ক্ষীণ হাসি হাসলে মেয়েটি—দাঁতের ঝিলিকটুকু শুধু নজরে পড়ল। বললে, 'কেমন আছেন, মিষ্টার মোরেল?'

মোরেল গম্ভীর মুখে মাথা ঝুঁকে বললে, 'ভালো। তুমিও ভাল আছ, আশা করি। নিজের বাড়ির মতই থাকবে এখানে।'

—'ধন্যবাদ!' মেয়েটি বললে। মোরেলের কথাবার্ত্তার ধরণে সে একটু মজা পেয়েছে বলে মনে হ'ল।

মিসেস মোরেল মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি উপরে যাবে কি এখন?'

—'যদি আপনাদের কিছু অসুবিধে না হয়।'

—'না না, অসুবিধা কি। অ্যানি নিয়ে যাবে'খন তোমাকে। ওয়াল্টার, তুমি ওর বাক্সটা নিয়ে এসো।'

—'হ্যাঁ, আর সাজ-পোষাক বদলাতে যেন একটি ঘণ্টা কাটিয়ো না।' উইলিয়ম তার ভাবী বধূকে শাসিয়ে বলল।

অ্যানি একটা পেতলের বাতিদান নিয়ে আগে আগে গেল, পেছনে মেয়েটি। অ্যানি যেন লজ্জিত হচ্ছে এমন উঁচুদরের একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে। সামনের শোবার ঘরখানা তার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরখানা ছোট, মোমবাতির আলোতে ঘরের ঠাণ্ডা একেবারেই দূর হয়নি। খনি-মজুরদের বাড়িতে শোবার ঘরে আগুন জ্বালাবার রীতি নেই, কারু অসুখ-বিসুখ হলে সে আলাদা কথা।

অ্যানি বললে, 'বাক্সটা খুলে দেব?'

—'ভারী ভাল হয় তা'হলে।'

অ্যানি পরিচারিকার কাজ করে দিতে লাগল। গরম জল আনবার জন্যে ছুটে গেল নীচে।

উইলিয়ম তার মাকে বললে, 'এমন যাতায়াতের কষ্ট, আর এত ভিড় হয়েছিল গাড়িতে, তাতেই ও যেন অনেকটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে!'

মা বললেন, 'কী দেব ওকে?'

—'কিছুর দরকার নেই। এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আগেকার সেই উষ্ণতাটুকু যেন আর নেই। কোথায় সুর কেটে গেছে। আধ ঘণ্টা পর মিস্ ওয়েষ্টার্ণ নীচে নেমে এল। পরনে ঘন লাল রঙের পোশাক, সাধারণ খনিমজুরের রান্নাঘরে এমন চমক লাগানো পোশাক যেন মানায় না।

দেখতে পেয়ে উইলিয়ম বললে, 'পোশাক বদলাবার দরকার নেই বলে দিয়েছিলুম না?'

'যাও।' বলে তার সেই মৃদু-মধুর হাসি হেসে সে চাইল মিসেস মোরেলের দিকে। বললে, 'দেখুন ত', ও আমার পেছনে কেন সব সময় লেগে থাকে?'

'তাই নাকি?' মিসেস মোরেল বললেন, 'এমন করা ত' ওর উচিত নয়!'

'নয়-ই ত'।'

মা বললেন, 'তোমার নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগছে। আগুনের কাছে এসে বসো।'

মোরেল তার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। 'এসো, এসো, এদিকে এসে বসো।' মহা ব্যস্ত হয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

উইলিয়ম বললে, 'না, বাবা, চেয়ারে তুমি বসো। জিপ্, তুমি গিয়ে সোফাটার উপর বসো।'

'না, না।' মোরেল ব্যস্ত হয়ে বললে, 'চেয়ারটাই সব চাইতে গরম। এসো গো, মিস্ ওয়েষ্টার্ণ, তুমি এই চেয়ারখানাতেই এসে বসো।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' বলে মিস্ ওয়েষ্টার্ণ মোরেলের চেয়ারে গিয়ে বসল। সম্মানের আসন এটি। আগুনের এত কাছে বসে সমস্তটা তাপ যেন তার শরীরে প্রবেশ ক'রে তাকে কাঁপিয়ে তুলল।

উইলিয়মের দিকে মুখ তুলে সে বললে, 'ওগো আমাকে একটা রুমাল এনে দেবে?' কথা বলার ভঙ্গীতে এমন নিবিড় অন্তরঙ্গতার সুর, যেন তারা দু'জনেই শুধু ঘরে রয়েছে, অন্য কেউ আর সেখানে নেই। কাজেই ঘরে আর যারা ছিল, তাদের মনে হতে লাগল এখানে না থাকাই ছিল ভালো। আশেপাশে আর যারা রয়েছে তারাও যে মানুষ, এই সামান্য বোধটুকুও যেন মেয়েটির নেই। আপাততঃ তার কাছে এরা যেন সব জীববিশেষ মাত্র।

উইলিয়ম চোখ-ইসারা করল।

এমন বাড়িতে এসে মিস্ ওয়েষ্টার্ণ মনে মনে ভাবত সে অনেক উঁচুদরের লোক, দয়া করে এই সব ইতর প্রাণীর কাছে এসেছে বই ত' নয়। এরা, এই শ্রমজীবীর দল, তার চোখে কৃপা আর পরিহাসের পাত্র। এদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা কি তার পক্ষে সম্ভব?

অ্যানি বললে, রুমাল 'আমি এনে দিচ্ছি।'

মিস্ ওয়েষ্টার্ণ তার কথায় ভ্রূক্ষেপও করল না। যেন কোন চাকরাণী কথা বলছে। কিন্তু রুমালটা নিয়ে অ্যানি নীচে ফিরে এলে অতি সুন্দর করে তাকে একটি ধন্যবাদ দিতে ভুলল না।

বসে বসে সে গল্প করতে লাগল—দুপুর বেলা ট্রেনে খাবার কথা, খাওয়াটা যে তেমন ভালো হয় নি—সেই সব কথা। তারপর লণ্ডনের কথা, সেখানকার নাচের জলসার গল্প। বাস্তবিক এ বাড়িতে এসে তার একটু কেমন-কেমন লাগছিল, মনের অস্বস্তি ঢাকবার জন্যেই অনর্গল সে কথা বলে যেতে লাগল। মোরেল তার কড়া তামাক টানতে টানতে এই লণ্ডন-ফেরতা মেয়েটির গালগল্প শুনতে লাগল। মিসেস্ মোরেল আজ তাঁর সব চেয়ে সেরা কালো রেশমের ব্লাউজটি পরেছিলেন, তিনিও শান্ত ভাবে সংক্ষেপে অনেকটা সংক্ষেপে জবাব দিয়ে যেতে লাগলেন। ছেলেমেয়ে তিনটি চুপচাপ বসেছিল, তাদের মনে জাগছিল সম্ভ্রম। এই মিস্ ওয়েষ্টার্ণ মেয়েটি যেন রাজকন্যা! বাড়ির সব চেয়ে সেরা জিনিসগুলো আজ ওরই জন্যে—সব চেয়ে ভালো পেয়ালা, সব চেয়ে ভালো চামচ, সব চেয়ে সুন্দর টেবিলক্লথ, সবার সেরা কফির পাত্র। ওর নিশ্চয়ই আজ চমৎকার লাগছে, ছেলেমেয়েরা ভাবল। মিস ওয়েষ্টার্ণ-এর শুধু অদ্ভুত লাগছিল। কী ধরণের লোক এরা, এদের সঙ্গে কেমন করে চলতে হয়, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছিল না। উইলিয়ম মাঝে মাঝে রহস্য ক'রে কথা বলছিল, কোথায় যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল তার।

দশটা যখন বাজে, উইলিয়ম বললে, 'জিপ, তোমার শরীর ক্লান্ত লাগছে না?'

—'হ্যাঁ গো।' ঘাড় কাত ক'রে সেই একান্ত অন্তরঙ্গ সুরে মেয়েটি বললে, 'মা, আমি ওর ঘরের মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে আসি।'

মা বললেন, 'এসো।'

মিস্ ওয়েষ্টার্ণ দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মিসেস মোরেলের দিকে। বললে, 'শুভ রাত্রি, মিসেস মোরেল।'

পল উনুনের কাছে বসে একটা বীয়ার রাখবার পাথরের বোতলে নল থেকে জল ভরছিল। অ্যানি একটা পুরোন ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে বোতলটাকে জড়িয়ে রাখল, তারপর মাকে চুম্বন করে রাত্রের মত বিদায় নিলে। বাড়ি আজ ভর্ত্তি, কাজেই তাকে আজ ওই মেয়েটির সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে।

মিসেস মোরেল অ্যানিকে বললেন, 'একটু দাঁড়া।' অ্যানি গরম জলের বোতলটা হাতে নিয়ে বসে বসে নাড়া-চাড়া করতে লাগল। মিস ওয়েষ্টার্ণ সবার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করল। তার এই ভদ্রাতাতিশয্য এ বাড়ির লোকের কাছে অস্বস্তিকর। তারপর উইলিয়মের পেছনে পেছনে সে উপরে উঠে গেল।...মিনিট পাঁচেক পর উইলিয়ম নেমে এল। তার মন আজ ভাল নেই, কিন্তু অস্বস্তির কারণটুকুও বোঝা যাচ্ছে না। কারু সঙ্গেই সে বেশী কথা বলল না। তারপর সবাই শুয়ে পড়লে, ঘরে রইল শুধু সে আর তার মা। এবার উইলিয়ম উনুনের সামনে গিয়ে সেই পুরোন দিনের মত পা ফাঁক ক'রে দাঁড়াল, একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'কী মা?'

'কী, বাবা!'

মা বসে ছিলেন দোলা-চেয়ারটায়। ছেলের জন্যে তিনি যেন একটু নীচু হয়ে গেছেন, একটু যেন আঘাত পেয়েছেন মনে।

—'ওকে ভাল লাগল তোমার?'

মা আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'এখনও লজ্জা পাচ্ছে মা—অভ্যাস নেই ত'। ওর মাসীর বাড়ি আর এ বাড়িতে এত তফাৎ, তুমি ত' বোঝ।'

'বুঝি বই কি। ওর পক্ষে খুবই মুস্কিল হবে।'

'হচ্ছে ত'।' হঠাৎ ভ্রূভঙ্গী করে বলল, 'কিন্তু ওর ওই বড়-মানুষী ন্যাকামিগুলো যদি ও ছাড়তে পারত।'

—'প্রথমটাতে অমন বেখাপ্পা লাগে। পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

—'তাই হবে।' মায়ের প্রতি উইলিয়মের মন কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। কিন্তু তার কপাল থেকে দুশ্চিন্তার চিহ্ন একেবারে ঘুচল না। সে বললে, 'জানো মা, ও তোমার মত নয়। একেবারেই নয়। একটু স্থির হয়ে বসে দু'দণ্ড ভাবতে পারে না।'

—'কতই বা ওর বয়স?'

—'তা বটে। আর ওর জীবনটাও বড্ড দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে গেছে। ছেলেবেলায় মা মারা গেলেন, তখন থেকে মাসীর কাছে। মাসীকে ত' দু'চোখে দেখতে পারে না। ওর বাবাও ছিলেন বাউণ্ডুলে। কারু কাছ থেকেই ও একটু স্নেহ-ভালবাসা পায়নি।

—'তাই নাকি? তা'হলে ওর সব ক্ষয়-ক্ষতি তোমাকেই পুষিয়ে দিতে হবে।'

—'হ্যাঁ, সেই জন্যেই ওর অনেক কিছু সহ্য করে নিতে হয়।'

—'অর্থাৎ?'

—'তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। ধর, ওকে যখন একেবারেই হালকা মনে হয়, তখন মনে মনে ভাবি ওর মনের গভীর দিকটাকে জাগাবার জন্যে কেউ ত' কখনো চেষ্টা করেনি।··· আর আমাকে ও ভয়ঙ্কর রকম ভালবাসে।'

—'সেটা সহজেই চোখে পড়ে।'

—'কিন্তু কি জান মা, ওরা অন্য জাতের লোক। ওর যারা সঙ্গী সাথী, আপন লোক, তাদের রীতি নীতি আমাদের চেয়ে একেবারে আলাদা।'

—'অত তাড়াতাড়ি কাউকে বিচার করতে যেতে নেই।' মিসেস মোরেল বললেন। কিন্তু তবু যেন উইলিয়মের মনের অস্বস্তি ঘুচল না।

তা'হলেও পরদিন সকাল বেলা উইলিয়ম সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সিঁড়ির উপর বসে ডেকে বলল, 'কী গো, উঠেছ নাকি?'

'—হ্যাঁ।' ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটির উত্তর এল।

—'খৃষ্টমাসের উৎসব আজ।' উইলিয়ম জোরে চেঁচিয়ে বলল।

শোবার ঘর থেকে ভেসে এল ওর মধুর হাসির শব্দ, টুন টুন ক'রে ঘরময় বেজে উঠল। কিন্তু আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু ওর নেমে আসবার নাম নেই। অ্যানিকে দেখতে পেয়ে উইলিয়ম জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, ও যখন সাড়া দিয়েছিল তখন সত্যিই উঠেছিল নাকি ঘুম থেকে?'

—'হ্যাঁ, উঠেছিল ত'।'

একটু অপেক্ষা করে, উইলিয়ম আবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ডেকে বলল, 'নতুন বছরের শুভকামনা জানাচ্ছি।'

—'ধন্যবাদ গো, ধন্যবাদ!' অনেক দূর থেকে মেয়েটির হাসিতে উছলে-ওঠা গলার সুর ভেসে এল।

—'কিন্তু একটু জলদি করো।' মিনতি ক'রে উইলিয়ম বললে।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটল, উইলিয়ম তবু অপেক্ষাই করছে। মোরেল রোজই ছ'টারও আগে ওঠে, সে ঘড়ির দিকে তাকাল। বললে, 'ভারী অদ্ভুত ত'!'

বাড়ির সবাই সকাল বেলার খাবার খেয়ে নিয়েছে, একা উইলিয়ম বাদে। আবার সে সিঁড়ির নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

'তোমার খাবার কি উপরে নিয়ে যাব নাকি?' একটু বিরক্তি দেখিয়ে উইলিয়ম বলল ডেকে। উত্তরে মেয়েটি শুধু হেসে উঠল আবার। এত সময় লাগছে ওর সাজসজ্জা করতে, বাড়ির সবাই ভাবল কী অপরূপ কিছুই না জানি দেখবে। অবশেষে মেয়েটির আসার সময় হ'ল। ব্লাউস আর স্কার্ট ওকে মানিয়েছে বেশ!

'এতটা সময় তোমার লাগল শুধু সাজগোজ করতে?' উইলিয়ম প্রশ্ন করল।

—যাও, কী যে বলো!···আচ্ছা, মিসেস মোরেল, আপনিই বলুন ত' ও কথা জিজ্ঞাসা করা যায় নাকি।'

এখানে এসে মিস্ ওয়েষ্টার্ণ দেখাতে সুরু করল যেন সে কত সম্ভ্রান্ত বংশের মাননীয়া মহিলা। দু'জনে তারা যখন গির্জেয় যেত,—উইলিয়মের গায়ে ফ্রক কোট আর সিল্কের টুপি, আর মিস্ ওয়েষ্টার্ণ-এর নিজের পরনে লণ্ডনের তৈরী লোমওয়ালা জামা,—তখন পল, অ্যানি, আর আর্থার অবাক-বিস্ময়ে ভাবত, এবার বুঝি রাস্তার সব লোক ওদের দেখে সম্ভ্রমে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। মোরেল তার রবিবারের কোটটা পরে দূর থেকে দেখে ভাবত, ওরা যেন রাজপুত্র আর রাজকুমারী, আর সে যেন ওদের জন্মদাতা পিতা।

আসলে এত অভিজাত ও নয়। গত এক বছর ধরে লণ্ডনেরই কোন একটা অফিসে সেক্রেটারী কিম্বা কেরানীর কাজ করছিল ও। কিন্তু মোরেলদের সামনে ও রাণীগিরির ভাণ করত। বসে বসে অ্যানি আর পলকে নানা হুকুম করত, যেন ওরা তার চাকর। মিসেস মোরেলের সঙ্গে সে সমানে সমানে চলতে চাইত, আর মোরেলকে দেখত কৃপার চোখে। কিন্তু দু'-একদিন পর থেকেই তার সুর বদলাতে আরম্ভ করল।

বেড়াবার সময় উইলিয়মের ইচ্ছে পল আর অ্যানি ওদের সঙ্গে যায়। এর চেয়ে ঢের বেশী মজা হয় তা'হলে। আর পল্ ত' মনে-প্রাণে 'জিপসি'র ভক্ত। এত বেশী ভক্ত যে তার জন্যে অনেক সময় মায়ের মনোবেদনার কারণ হতে হয় তাকে।

দু'দিনের দিন লিলি যখন বললে, 'এই অ্যানি, আমার গলাবন্ধটা কোথায় রেখেছ?' উইলিয়ম বলে উঠল, 'শোবার ঘরেই ত' রেখে এসেছ; জেনে-শুনে অ্যানিকে বলছ কেন?'

মহা বিরক্ত হয়ে মুখ চুণ করে লিলি নিজেই উপরে উঠে গেল। ও যে তার বোনকে দিয়ে ঝিয়ের কাজ করিয়ে নেবে অহেতুক, উইলিয়ম এটা সহ্য করতে পারত না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা উইলিয়ম আর লিলি বাইরের ঘরে অন্ধকারে আগুনের ধারে বসেছিল। পৌনে এগারোটায় মিসেস মোরেলের উনুনে কয়লা ঠেলবার শব্দ শুনে উইলিয়ম বাইরের ঘর থেকে চেঁচিয়ে এল রান্নাঘরে, তার পেছনে তার প্রণয়িনী। উইলিয়ম বললে, 'এত রাত হয়েছে?'

মা একা বসেছিলেন, বললেন, 'এখনও খুব রাত হয় নি, আমি ত' রোজই এই সময় অবধি জেগে থাকি।'

উইলিয়ম বললে, 'তুমি শোবে না এখন?'

—'তোমাদের দু'জনকে একা রেখে। না, বাছা, আমার মন এতে সায় দেয় না।'

—'তোমার তবে বিশ্বাস নেই আমাদের উপর?'

বিশ্বাস আছে কি নেই জানি না, তবে অমন বিশ্বাস আমি করব না। এগারোটা অবধি যদি জেগে থাকতে চাও, থাকো, আমি বসে বসে বই পড়ি।'

মেয়েটির দিকে ফিরে উইলিয়ম বললে, 'অ্যানি তোমার ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে, লিলি—তোমার অসুবিধে হবে না।'

—'ধন্যবাদ। শুভরাত্রি মিসেস মোরেল।'

সিঁড়ির নীচে গিয়ে প্রিয়াকে চুমু খেল উইলিয়ম। লিলি উপরে উঠে গেল। উইলিয়ম ফিরে এল রান্নাঘরে। [ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা-রাজ)

বিয়ে অতীন করবে না।—না, কিছুতেই না!—এ যেন দ্বিতীয় ভীষ্মের আবির্ভাব!

অতীনের মা বহুবার পুত্রকে কান্নাকাটি করেও বুঝিয়ে রাজী করাতে পারেন নি। শেষটায় তিনিও একদিন পরলোকবাসিনী হলেন।

তার পিতৃদেব পৃথক ভাবে ডেকে, তার পুত্রের কাছে অনেক রামায়ণ মহাভারত মন্থন করা উপদেশ বাণী আউড়িয়ে, গীতার মর্ম্মবাণী ব্যাখ্যা করেও যখন সে কিছুতেই রাজী হল' না তখন তিনি প্রকাশ্যে হাল ছেড়ে দেবার ভাণ দেখালেন বটে, কিন্তু মনের গভীরে একটা দারুণ অশান্তি রয়ে গেল।

অতীনের পিতা হরনাথ বেশ একজন পাকা বিষয়ী লোক; বিনয়ী, সদালাপী, খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী। তিন কন্যা—একটি পুত্র। দেনা-পাওনা ঘসে-মেজে সুযোগ্য পাত্রে একটির পর একটিকে বিদায় করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। অনিশ্চিন্ত শুধু তাঁর একমাত্র পুত্রের বিবাহ নিয়ে। বাপ-মার একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে অতীনের বিয়ে দেওয়া তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা।

তিন মেয়ের বিয়েতে যা খরচ হয়েছে সবটাই সুদে-আসলে উসুল করার একটা গোপন ইচ্ছাও যে তাঁর মনের আনাচে-কানাচে উঁকি-ঝুঁকি মারে নি এ কথাও ঠিক হলপ্ করে বলা যায় না।

ঠাকুর দেবতার উপর হরনাথ বাবুর অচলা ভক্তি—ওকালতী করে টাকার মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, ভক্তির মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পায়।

কুন্তীর প্রার্থনা ছিল—দুঃখের মধ্যেই যেন তিনি চিরটা কাল কাটান—তা' হলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য তিনি আরও নিবিড় ভাবে লাভ করবেন—চোখের জলে তাঁকে ডাকতে পারবেন—আর হরনাথ বাবুর শ্রীমুখে প্রায়ই শোনা যেত—দুঃখের সময় ভগবানের উপর তাঁর নাকি অভিমান হয়—আর সুখের দিনে, পরম করুণাময়কে বেশ ঘটা করে ডাকতে মন চায়!

আজ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে হরনাথ বাবু শয্যা ত্যাগ করে ধ্যানালস নেত্রে বহুবার ইষ্টদেবীকে স্মরণ করেছেন—পঞ্জিকার শুভদিনের নির্দ্দেশে এক বারের বদলে দশ বার চোখ বুলিয়ে পূর্ব্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন তাই ৭-৪৫ মিনিটের পর মাহেন্দ্র যোগে অতীনকে ডেকে পাঠিয়ে শেষ বারেও যখন নিরাশ হলেন, তখন ব্যথাহত চিত্তে একটি জরুরী মামলার নথি পত্রে মন দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অম্বুরী তামাকের খোসবাই সারা ঘরটায় ছড়িয়ে পড়েছে, কেবল হরনাথের মনে বুঝি তার ছোঁয়াটুকুও লাগেনি।

তিনি গড়গড়ায় ঘন ঘন টান দিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন—এমন সময় বাইরে একটা বাজখাই গলার আওয়াজ—

"হরে, বাড়ী আছো হে?"

—"বাড়ী থাকবো না ত,' কোন চুলোয় যাব—?"

—"সেটা ত' আর ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না"—নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন,—"কলেজা—এই কলেজা থাকা চাই—বুঝলে ভায়া।" আগন্তুক উচ্চহাস্যে ঘর ফাটিয়ে দিলেন।

নবাগত ভদ্রলোকটি অবসর প্রাপ্ত সাবজজ—হরনাথের চেয়ে বছর চারেকের বড় হলেও দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গভীর।

ঘরে ঢুকেই তিনি পুঁটলীটা এক কোণে রেখে সটান হাত বাড়িয়ে দিলেন—

—দাও তো হে, নলটা একবার।

—এই নাও। তা হ'লে আগের মতন প্রাতর্ভ্রমণটা ঠিক চালিয়ে যাচ্ছো, কেমন?

—চালানো বলে চালানো—আরো চালাবো বিশ বছর—

—মানে—?

—তুমি কী রকমের উকিল হা—এটাও মস্তিষ্কে ঢোকে না—ছোঃ—এই দশ বছর পেন্সন নিচ্ছি—আরও বিশ বছর নেব, এই আর কি!

—ওঃ, তাই বুঝি তোমরা ক'জন বৃদ্ধ মিলে লেকের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে বেড়াও?

—Point of Order,—বৃদ্ধ বলো না, যুব-সম্প্রদায় বলো।

হাসি আর কাসিতে হরনাথের দম বন্ধ হবার যোগাড়—সামলে হ'য়ে উত্তর দিলেন,—গভর্ণমেণ্টকে দেউলে ক'চ্ছ আর যমরাজকেও ফাঁকি দিচ্ছ—? বেশ যা' হোক!

—ফাঁকি!—ফাঁকির কথা বলছো তুমি? কোর্টে গিয়ে রোজ হাজারটা মিথ্যে বলে এসো—লোককে ঠকাও, আর সেই মুখেই ভগবানের নাম করে নিজেকেও ফাঁকি দাও, যত সব Criminals-এর সঙ্গে আলাপ, আর—আমরা,—গোটা জীবন খেটেখুটে, বুড়ো বয়সে দু'দিন আরাম করবো—তাকেই তুমি বল কিনা ফাঁকি! বলিহারি যাই তোমার বুদ্ধিকে!

—যাকগে—সেদিন নাতিটাকে নিয়ে লেকে গেলাম—অবিশ্যি মোটরে। আমার তো তোমার মত বেঁচে থাকবার সখ নেই—দেখলাম, ক'জন মিলে কী যেন একটা আলোচনায় ডুবে আছো। মুখে তুবড়ী ছুটছে, এমন কী সব তোমাদের কথা-টথা হয় হে?

নন্দী মশায় সহাস্যে বললেন,—"কথা আর কী—ছাই-ভস্ম—আগে আমাদের দিনটা কেমন ছিল—আর এই রাম-রাজত্বেই বা কী হল। কে কেমন নবাব-বাদ্‌শার মত চাকরীতে কাল কাটিয়েছে—"

নন্দী মশাই গড়গড়ার নলে একটা দমকা টান দিলেন। ধূম্র উদ্গীরণ করে আবার একটানা সুরু করলেন,—এই—আমাদের চাকরীতে কে কাকে ডিঙিয়ে কেমন করে প্রমোশন পেলো—সায়েবের সুনজরে থেকে ধরাকে সরা জ্ঞান করল—আফিসে কার কতটা প্রতাপ প্রতিপত্তি হোল—কার কতটা লম্বা চওড়া বহর ছিল,—এই আর কিঃ।

—তারপর—?

—তারপর এই আড় চোখে চেয়ে দেখা—ঝাঁকে ঝাঁকে কত রং-বেরং-এর প্রজাপতির মন্দাক্রান্তা ছন্দে উড়ে বেড়ানো হারানো দিনের কথা স্মরণ করে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ আর বাড়ী ফিরে আসা! তারপর—তারপর?

তারপর অখণ্ডিত—ফেরার পথেই Fresh তরি-তরকারীটা

মাছটা কিনে আনা, যে রকম দিন-কাল পড়েছে—চাকরকে বাজার করতে দিলেই ব্যাস্ আর দেখতে হবে না। পচা জিনিস-দাম বেশী—ওজন কম কিন্তু কথাটি বলার যো নেই—চুলোয় যাক!—তারপর তোমার খবর কি?

বড়ই দুঃসংবাদ—খবর মোটেই ভাল না—। হরনাথ চক্ষুর্দ্বয় হতে পাঁস্‌নে চশমাটি খুলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে কাচ দুটি পরিষ্কার করবার সময় নিম্নস্বরে বল্‌তে লাগলেন—

—ছেলেটাকে বিয়ে করার জন্যে কতই না বুঝিয়ে বললাম—ব্যাটা কিছুতেই রাজী নয়, কি যে ধনুর্ভঙ্গপণ! কার মুখ চেয়ে খাটবো?—কী হবে আমার রোজগারে? ভাবলাম আমি থাকতেই অতীনের বৌ এসে যদি ঘর সংসারটা বুঝে নিতো—তা হলে ঝামেলা থাকতো না—আমার ত দুটো চারটে নেই—ঐ একটি।

—বেশ ত, যার একটি মেয়ে সেই ঘরে বিয়ে দাও। তা হলেই ঐহিক ও পারলৌকিক কার্য্য তোমার দুই সিদ্ধ হবে।

—এটা তো বেশ পাকা কথা—কিন্তু বিয়েটা করবে কে? তুমি না আমি? সে ত আর কচি খোকাটি নয়, মুখ চিরে ওষুধ গিলিয়ে দেব!

নন্দী সগাম্ভীর্য্যে প্রশ্ন করলো—"আচ্ছা ছেলেটা ক'দিন প্র্যাক্‌টিস্ করছে?"

—এই মাস ছয়েক—তারই কথা মত হাজার কয়েক টাকা দিয়ে 'ল্যান্সডাউন' রোডে ডিস্‌পেন্সারী করে দিয়েছি—একটা গাড়ীও কিনে দিলাম—। ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি রাখি নি—শুনতে পাই এরই মধ্যে বেশ কল্‌-টলও নাকি পাচ্ছে—তবে কিনা ঐ একটা দোষেই সব মাটী।

কথাগুলি বলেই হরনাথ দেয়ালে টাঙ্গানো তাঁর স্বর্গীয়া সহধর্মিণীর তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

—গুপ্ত প্রেম-টেম আছে না কি ভায়া? কিম্বা তুমি যাকে পছন্দ করো, সে তাকে চায় না—সে যাকে চায় তুমি হয়তো তাকে—

বাধা দিয়ে হরনাথ বলে উঠলেন,—আরে ভাই, অতীনকে সব কথাই বলেছি—কোন পাথরই উল্টোতে বাকী রাখি নি। আমি তাকে পষ্টই বলে দিয়েছি—তোর যাকে ইচ্ছে—একটা বিয়ে করে আন—তবে বামুন হলেই ভালো হয়—তাতেও সে রাজী নয়—আর গুপ্ত প্রেমের কথা বলছো নন্দী? সেটাও অসম্ভব। তা হ'লে তো মা কালীর ভোগ দিতাম—

—অর্থাৎ—?

—বিয়ের কোন বাধাই থাকতো না—

নন্দী মশাই বিদ্যুদ্বেগে চেয়ার টেনে হরনাথের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন—তার কানে কী একটা কুমন্ত্র দিলেন—শোনা গেল না। দেখা গেল—হরনাথের মুখে মেঘ কেটে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। মনে মনে কী যে উকীলী প্যাঁচ কষলেন তা ভগবানই জানেন!

—তা হলে এবার উঠি—বেলা হয়ে গেল। এক বার চান্স নিয়ে দেখই না, কি হয়?

—সে আর বলতে!

নন্দী মশাই লাঠি বগলে তাঁর সযত্নরক্ষিত পুঁটলী হস্তে বিদায় নিলেন।

হরনাথ আজ বড় চঞ্চল, ভ্রূ-ভঙ্গীর মধ্যে চিন্তার রেখা সুপরিস্ফুট। তিনি ক্ষিপ্রচরণে টেবিলের চার ধারে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি প্রাপ্তবয়স্ক লোক ঘরে ঢুকে বললেন,—

হরনাথ বাঁড়ুজ্যে কি বাড়ী আছেন—?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম।

সভক্তি নমস্কারান্তে সানুনয়ে আবার প্রশ্ন,

—আপনিই কি হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকে ত' তাই বলে!

কি চান বলুন ত?

—একখানা চিঠি—।

—কে দিয়েছে?

—আজ্ঞে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

চিঠিখানি আদ্যন্ত পাঠ করে হরনাথ স্তম্ভিত। এ যে তাঁর জীবনে একটা অপ্রত্যাশিত ডার্বি টিকিটের প্রাপ্তিযোগ—এ যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ—। মুক্তাক্ষরে লেখা—

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হয়ত চিঠিখানি পড়ে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। আমার স্বামী স্বর্গীয় রসময় চট্টোপাধ্যায়কে আপনি চেনেন—তিনি আপনার সতীর্থ। স্বামীর মুখে শুনেছি নন্দনপুর বিদ্যালয়ে আপনারা একসঙ্গে পড়তেন। আমার শ্বশুরমশায় পাটনায় ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে বদলী হন, তাই তিনিও এসে পাটনা স্কুলেই ভর্ত্তি হলেন। অবসর নিয়ে আমার শ্বশুর ওখানেই বাড়ী ঘর দোর সম্পত্তি করে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হলেন। আমার স্বামীও শেষে পাটনা হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। নন্দনপুর স্কুলে পড়বার সময় তিনি ক্লাসে প্রথম আর আপনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন একথাও তাঁর মুখে শুনেছি। দীর্ঘদিন আপনাদের মধ্যে কোন পত্রালাপ ছিল না। এতদিন পরে স্বার্থের জন্যে চিঠি লিখতে তাঁর কুণ্ঠা হয়, তাই আপনার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে স্বয়ং কলকাতায় আসতে চেয়েছিলেন এমন সময় তিনি কলেরায় মারা যান। আমার অদৃষ্ট আর বিধিলিপি ছাড়া একে আর কি বলবো! আমি বাপ মার একই মাত্র সন্তান, তাই কলকাতায় খান পাঁচেক বাড়ী আর নগদ আড়াই লাখ টাকা পেয়েছি। আমারও ঐ একটিমাত্র মেয়ে। সেই ত' আমার সব পাবে। শুনেছি আপনার পুত্র শ্রীমান অতীন সুদর্শন, মার্জ্জিত রুচি ও চরিত্রবান্। সে এখন ডাক্তারী করে। আমার মেয়েকে যদি দয়া করে নেন তবে আমার স্বামীর আত্মা তৃপ্তি পাবে, আমিও ধন্য হবো। নিজের মেয়ের প্রশংসা করতে নেই, তবে আপনার অবগতির জন্য এইটুকু লিখলেই যথেষ্ট, সে ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করে পাটনা কলেজে বি, এ পড়ছিলো, এমন সময় তার বাপের মৃত্যু হয়, তাই তাকে এখানে বেথুনে ভর্ত্তি করেছি। আমার আত্মীয় স্বজন, সবাই তাকে পটে-আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করে। তা ছাড়া সে খুব ফরোয়ার্ড অথচ নারীর যে বৈশিষ্ট্য—আত্মসম্মান জ্ঞান তাও তার যথেষ্ট আছে। আমার মেয়ে নাচ গানেও অনেক কাপ, মেডেল পেয়েছে। রেখার মত গিটার বাজনাও খুব কম শুনেছি। আমি মেয়ের সম্বন্ধে মোটেই বাড়িয়ে বলছি না! তাকে স্বয়ং দেখলেই বুঝতে পারবেন। যদি দয়া করে সময় দেন, তা'হলে মেয়েকে নিয়ে আপনার ওখানে

একবার যেতে চাই, আর যদি অনুগ্রহ করে এখানে একবার আসেন তা'হলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। চিঠিখানি সুদীর্ঘ হয়ে গেলো—মার্জ্জনা করবেন। নমস্কার—

ইতি
বিনীতা
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
নং চৌরঙ্গী টেরেস, কলিকাতা

পত্রখানি হরনাথ একবার নয়—ছ'বার নয়—বার বার তিন বার পড়লেন। তাঁর প্রথম জীবনের সব ঘটনাগুলিও যেন ছায়াচিত্রের মত একটার পর একটা চোখের সামনে ভেসে এলো। তিনি স্বপ্নোপিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোককে আপ্যায়ন করলেন।

—আপনি যে দাঁড়িয়ে—বসুন—বসুন।

হরনাথ আগন্তুকের কাছে চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

—আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন করে বসা যায় বলুন—হেঃ—হেঃ—হেঃ।—

—ওরে কেষ্টা, বাবুকে চা, জল খাবার দে।

—থাক্ থাক্ এই মাত্র সেরে এলাম।

—অনেক কথা আজ মনে পড়ে।

রসিক যখন আমাদের নন্দনপুর স্কুল ছেড়ে যায় বন্ধুকে একগাল হেসে সেদিন ঠাট্টা করেছিলাম,—

যাঃ তুই বিদেয় হ'লে আমি হরিলুট দেবো। এবার আমার ফার্ষ্ট প্লেস নেয় কেডা?

আচ্ছা রসিকের কোথায় বিয়ে হয়?

—আজ্ঞে, কুচবিহারে, আর সাত বছর পরে এই কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হয়।

—কুচবিহারে?—শক্তি দেবী?

স্বগতঃ উক্তি করে হরনাথ যেন চমকে উঠলেন। মনে পড়ে গেল এই মেয়েটির সঙ্গেই তাঁরও বিয়ের সম্বন্ধ হয়। কোষ্ঠীর মিল না হওয়ায় তাঁর বাবা তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন নি।

—আপনি শক্তি দেবীকে চেনেন?

হরনাথ প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য কথায় অবতারণা করলেন,—

—আচ্ছা, মেয়েটির বয়েস কত?

—এই বছর উনিশ।

—নাম কী?

—আজ্ঞে রেখা দেবী।

—মাপ করবেন, আপনার পরিচয়টা?

—বউমার বাপের আমলের পুরোনো কর্ম্মচারী।

—তা' বেশ, বিকেলের দিকে আপনাদের বাড়ীতে—আচ্ছা একটু দাঁড়ান—হরনাথ কক্ষান্তরে ছুটে গিয়ে পাঁজির পাতা উল্টে পাল্টে অমৃতযোগটা একবার ভাল করে দেখে নিলেন।

তারপর এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, তাই হবে, পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই ওখানে যাবো।

—আপনি বোধ হয় এনগেজমেণ্ট বুকটা দেখতে গিয়েছিলেন স্যার! অনেক কাজের মানুষ কিনা—হেঃ—হেঃ—হেঃ।

হরনাথের মাথাটা 'হ্যাঁ' 'না'র সন্ধিক্ষণে দুলতে লাগলো।

কর্ম্মচারী ভদ্রলোকটি লোটন পায়রার মত ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, করযোড়ে বিনয়াবনত হয়ে বললেন—

—মা আমার রূপে-গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী, তাকে ঘরে আনলে দেখবেন কেমন! হে—হেঃ—হেঃ।

হরনাথই বা তাঁর ভড়ং ছাড়বেন কেন?

হাজার হোক্ ছেলের বাপ তো! বিয়ে হলে ত' তাঁর উর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষ বর্ত্তে যায়—তবুও কপট গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিলেন, সে আর বেশী কথা কী?

সে তো আমারই বন্ধুর মেয়ে, কোনই আপত্তি নেই—তবে কিনা—হরনাথ একটা ঢোক গিলে হঠাৎ স্তব্ধ হলেন।

—তবে কিনা, মানে?

ভদ্রলোকটি চশমার ফাঁক দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—উদ্‌গ্রীব হয়ে তার গ্রীবা বাড়িয়ে দিলেন।

—যাক্ আমি ত' বিকেলে আপনাদের ওখানেই যাচ্ছি—সব কথা হবে'খন।

—তা বেশ;—বেশ,—হেঃ—হেঃ—হেঃ। এখন তা' হলে আসি।

ছাতা বগলে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

হরনাথ গলা ছেড়ে ডাক দিলেন,—ওরে কেষ্টা, তামাকটা পালটে দে। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিতেই—চিন্তার পর চিন্তার ঢেউ এসে তাঁকে কোথায় টেনে নিয়ে গেলো কে জানে!

চৌরঙ্গী টেরেস্ যাবার প্রাক্কালে হরনাথ একটা আলমারী খুলে ঝেড়ে ঝুড়ে কি সব যেন বের করে পকেটে রাখলেন। ইতিমধ্যে ১০৮ বার মালা ফিরিয়ে ইষ্টনাম জপ করে নিয়েছেন। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে দু' হাত মাথায় ঠেকিয়ে ভক্তি-গদগদ স্বরে উচ্চারণ করলেন—

—"দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মা" তার পর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি পরীক্ষা ক'রে ডান পা বাড়িয়ে দিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোটর থামতেই দেখেন, সকালের সেই পরিচিত ভদ্রলোকটি দন্তপংক্তি বিকশিত করে তাঁর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

নমস্কার প্রতি-নমস্কারান্তে তিনি হরনাথকে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসিয়ে করযোড়ে বললেন,—বড়ই ভাগ্যি, আপনার পায়ের ধূলো এখানে পড়লো। একবার তা'হলে বৌমাকে খবর দিই—কি বলেন,—হেঃ—হেঃ—হেঃ—

বেশ তো, 'হরনাথ' দেওয়ালে বিলম্বিত বন্ধু রসময়ের ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। এময় সময় অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবৃতা শক্তি দেবী প্রবেশ করে হরনাথকে মৃদু কণ্ঠে নমস্কার জানাতেই হরনাথ চমকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি-নমস্কার করে বললেন—আপনার স্বামীর ছবিটা দেখছিলাম। সেই স্কুলে-পড়া রসিকের সঙ্গে এই চেহারার মোটেই মিল নেই, তবে চোখের সেই প্রতিভার দীপ্তিটা ঠিক বজায় আছে। ওটা ওর নিজস্ব ছিল কি না?

হরনাথ পকেট হ'তে দুটি ছবি বের ক'রে একটি পাশে রেখে অপরটি দেখিয়ে বললেন,—এই দেখুন, আমাদের স্কুলের ছবি। আমরা তখন থার্ড ক্লাশে। সে চলে যাবার আগে আমিই জেদ ক'রে ছবিটা তুলিয়েছিলাম,—পড়াশুনায় কখনো তাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারিনি—কী বুদ্ধিটা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল। সে থাকতে বড়ো

বয়সেও একবার ঝগড়া করতাম। আজ ৪৩ বছর আগের কথা, সেই যে গেল, একটা চিঠিও দিল না। এমন কি বিয়ের একটা নেমন্তন্নও করলে না।

—আমি ঠিকই জানি তিনি বিয়ের চিঠি দিয়েছিলেন।

—তবে হয়ত পাইনি, অবিশ্যি কাগজের মারফৎ তার এম, এ,তে ফার্ষ্ট হবার খবরটা পেয়েছিলাম।

—আপনার বিয়ের চিঠি আমরা পাইনি কেন?

—বাবা বাঙ্গলার বাহিরে কাকেও ডাকেননি।

—যাক, সে ত' সব মান-অভিমানের পালা চুকিয়ে চলে গেল, এখন আমার ছুটি হ'লে বাঁচি।

শক্তি দেবী অন্য প্রসঙ্গ উপাপন করলেন,—

—আপনার পাশে ওটা কি?

—বলছিলাম না চেহারার কত পরিবর্ত্তন হয়—এও তারই একটা নমুনা—দেখুন।

ছবিটি হাতে নিয়ে শক্তি দেবী চমকে উঠলেন। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে হরনাথের প্রতি চেয়ে, অস্ফুট স্বরে বললেন,—

—এ কি, এ যে আমারই ফটো—আপনি কেমন ক'রে—

—পেলাম, এই ত? আপনার বাবাই আমার বাবাকে পাঠিয়েছিলেন মায় কুষ্ঠী সমেত। বাবার কোনও জিনিষই নষ্ট করিনি—তাই, যার ছবি তাকেই ফিরিয়ে দিতে এলাম।

—ছবি দুটো আমার কাছেই থাক।

—তা' বেশ তো, রেখে দিন।

—আচ্ছা আপনার বাবা কি সিভিল সার্জ্জেন ছিলেন?

—হ্যাঁ, আমার ছোটতেই বিয়ে হয়, তখন বয়স এই চৌদ্দ কী পোনেরো, তার এক-আধ বছর আগে শুনেছিলাম কোন্ ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে আমার নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল।

কথা প্রসঙ্গে দুজনের আলোচনার দানাটা বেশ জমে উঠলো।

শক্তি দেবী হরনাথকে অনুরোধ করলেন,—তা হ'লে আপনি যেন উঁর চেয়ে বয়সে বড়, আমাকে তুমিই বলবেন।

—বেশ তাই হবে।

তার পর অতীনের কথা উঠতেই, হরনাথ শক্তি দেবীকে তাঁর ছেলের একগুঁয়েমির কথা সব খুলে বললেন—আমার স্ত্রী মারা যাবার আগে বলেছিলো,—"অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে গেলাম—মরেও শান্তি পাবো না। পারো ত' ছেলেটার বিয়ে দিয়ে ঘরকন্না করে দিও। আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

হরনাথের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এলো, ঝাপসা চোখ মুছে পুনরায় বলতে লাগলেন,—দেখো, তোমায় একটা নতুন ধরণের অনুরোধ করবো, রাখতে হবে। তুমি রসময়ের বৌ—সেদিক দিয়ে আমার যথেষ্ট দাবী।

—বলুন, শুনবো বই কি?

—দেখো, আবার চমকে যেন পিছিয়ে যেও না। তুমি কথা দিলে?

শক্তি দেবী একবার কেঁপে উঠলেন। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারকের রায় শুনবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণের মত। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, কথা দিলাম।

—এই হাজার টাকা নাও।

শক্তি দেবীর চোখে বিরাট বিস্ময়! একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো—কি রকম?

—রকমটা তোমায় বুঝিয়ে বলছি। এই টাকা নিয়ে অতীনকে কারণে-অকারণে ঘন ঘন কল দিয়ে যাও। দিনে চার-পাঁচ বার, তার ফি আট টাকা, বুঝলে?

শক্তি দেবী কিছুক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ। তার পর ধীরে ধীরে যেন তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো।

—বুঝলাম সব—তবে আপনার টাকা নিয়ে কেন?

—জানি, তোমরা বড়লোক, তুলনায় গরীব হলেও, ভগবানের কৃপায় আমিও কিছু রোজগার করি—আমারও একটা আত্মসম্মান আছে।—আর এটা ত তোমায় খয়রাত করছি না—টাকা ত ঘুরে আবার আমার ঘরেই আসছে। একবার রেস্ খেলে দেখবো কী হয়—তোমার মেয়েটাকেও বেশ ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিও, যেমন করেই হোক অতীনকে যেন সে জয় করে। বাপ হয়েও আমি এ কথা বলতে বাধ্য হলাম।

—মেয়েকে না দেখেই সব ঠিক করে ফেললেন?

—রসিকের মেয়েকে আবার কি দেখবো,—আচ্ছা,—বেশ তো! ডাকো না একবার।—

—কৈ, ভোম্বল কাকা, কোথায় গেলেন?

—এই যে বৌমা। হন্ত-দন্ত হয়ে ভোম্বলের প্রবেশ ও আদেশের অপেক্ষায় সজাগ দৃষ্টি। তিনি হরনাথ বাবুকে বসিয়ে সেই যে চলে গেলেন দুজনের এই গুপ্ত বৈঠকের দৃশ্যে ছিলেন না।

—কৈ, রেখাকে একবার নিয়ে আসুন না কাকাবাবু?

—এই যে, এক্ষুণি—ভোম্বল বাবুর ঝটিতি অন্তর্ধান। তাঁর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থানের ভঙ্গী দেখে হরনাথ হেসে উঠলেন।

রেখাকে সঙ্গে নিয়ে ভোম্বলের পুনরাগমন। বহুবিধ মিষ্টান্নের থালা নিয়ে সে হরনাথ বাবুর সামনের টেবিলে সাজিয়ে রাখলে।

পরনে তার হাল্কা আসমানি রঙের শাড়ী, বেশ ছিপছিপে গড়ন।

শক্তি দেবী হরনাথ বাবুকে দেখিয়ে দিলেন,—"প্রণাম কর"

রেখাও মায়ের আদেশ পালনে বিলম্ব করল না; তার মাথায় হাত দিয়ে হরনাথ চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় বললেন,—

—"থাক্ মা, থাক্—হয়েছে।"

এ যেন একেবারে বাপের সেই ছেলেবেলার মুখটা কেটে বসানো। ধন্যা পিতৃমুখী কন্যা। হরনাথ স্তব্ধ-বিস্ময়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন,—বিধাতা যেন সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উজাড় করে নিজের হাতে মেয়েটির কমনীয় মুখশ্রী তৈরী করেছেন। রূপের ঝলক যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতা আছে মেয়েটির চাউনিতে, ভাববিহ্বলতা-ভরা চোখ দু'টি যেন এক অসীম স্বপ্নে ভেসে চলেছে। মেয়েটির ঐ রূপের সঙ্গে ওর লালিত্যটুকু বৈজ্ঞানিক কারখানায় গলিয়ে একটি বারও যদি সে অতীনকে—

—কি ভাবছেন? শক্তি দেবীর প্রশ্ন।

—হ্যাঁ—না—আমি ভাবছি আমার শূন্য ঘরে কী মা বলে ডাক্‌বার সৌভাগ্য হবে?

—কেন হবে না?

—ছেলেটা বড়ো গোঁয়ার। বিয়ের নামে গায়ে তার জ্বর আসে।

মা, তোমার শিক্ষা-দীক্ষার কথা সব শুনেছি—তবে একটা প্রশ্ন আছে,—

তুমি কি কলেজে কখনও অভিনয় করেছো?

সলাজ ভঙ্গীতে রেখা উত্তর দেয়—

—হ্যাঁ, করেছি, আমাদের কলেজ ইউনিয়নে।

কী কী ভূমিকায় নেমেছো?

—'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে'—"পোর্শিয়া" 'চির কুমার সভায়' "নীরবালা," "রোমিও জুলিয়েটে—"জুলিয়েট"।

হরনাথ আনন্দাতিশয্যে লাফিয়ে উঠলেন,—

জুলিয়েটের অভিনয় করেছো?

শক্তি দেবী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন,—

—জুলিয়েটের রোলে গোল্ড মেডেল পেয়েছে।

হরনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দুই বাহু উর্দ্ধে তুলে বললেন,—

—ব্যস্—ব্যস্—তা হলেই হবে আর দেখতে হবে না।

—একটু মিষ্টি মুখ করে নিন। বললেন, শক্তি দেবী।

—কোন আপত্তি নেই। জানেই ত,—"নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ।"

থালাটি কোলের কাছে টেনে হরনাথ একটির পর একটি গলাধঃকরণ করে চ'ললেন।

শক্তি দেবী শুনিয়ে দিলেন—

এ সব বাজারের নয়, রেখার নিজের হাতের তৈরী।

—সেটা খেয়েই বুঝতে পেরেছি। তা'হলে একটা কথা বলি—

আজ-কালকার মেয়েরা নাচ-গানে লেখা-পড়ায় বেশ পটু হয়ে উঠছে। কিন্তু রান্নাঘরের দিকে কেউ ফিরেও চায় না। ভাঁড়ার ঘরে পা বাড়ালেই মা লক্ষ্মীরা নাক সিঁটকে ওঠেন—আর ও দিকে সিনেমা আর্টিষ্টের উর্দ্ধতন চোদ্দ গুষ্টির নাম শুধু মুখস্থ নয় একেবারে বুকস্থ।

গ্লাসে হাত ধুয়ে হরনাথ বললেন,—

—"তৃপ্তোঽহং!—সুখী হও মা! এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার নেই।

রেখার অধরে মৃদুহাস্য রেখা রঞ্জিত হয়ে উঠলো।

ছল্ ছল্ চোখে শক্তি দেবী বলেন,—আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন হয়।

মণিবন্ধে ঘড়ির দিকে চেয়ে হরনাথ উঠে পড়লেন,—

—তা হলে এখন উঠি। আর একটা জায়গায় যেতে হবে। জরুরী এপয়ণ্টমেণ্ট।

রেখা হরনাথকে প্রণাম করে কক্ষান্তরে চলে গেল।

—এবার দেখবো শক্তি দেবী, কতখানি তোমার শক্তির মহিমা। পুনরায় মনে পড়িয়ে দিলেন,—

—মনে আছে তো, উকিলের পরামর্শটা?

—আছে, কিন্তু সে যদি রাজী না হয়?

তিনি টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে চেঁচিয়ে উঠলেন,—তাকে রাজী করাতেই হবে। তার মগজে ভাল করে ঢুকিয়ে দিও, এটা তার বাপের ইচ্ছে—বুঝলে?

—আমি সব চেষ্টাই করবো। এখন মা কালীর দয়া।

অভিবাদন প্রত্যভিবাদনের পর, হরনাথ মোটরে উঠলেন। পঞ্জিকার শুভদিনের মহিমা স্মরণ করে শ্রীভগবানের চরণে আর একবার সভক্তি প্রণাম জানালেন। [ক্রমশঃ

সঙ্গীত কি?

"উপমা যদি দেওয়া চলে তাহলে বলতে হবে ঐ সঙ্গীতে আছে একটি একটি রত্নের কৌটা। ওস্তাদ জহুরী ঘটা করে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে তার ঢাকা খোলে। আলোর ছটায় ছটায় তাকে লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়।" —রবীন্দ্রনাথ।

—শ্রীচৈতন্য ও হরিদাস এবং ভীরু অভিসার—

মাসিক বসুমতীর বিগত ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রদ্বয় যথা, 'শ্রীচৈতন্য ও হরিদাস' এবং 'ভীরু অভিসার' শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত। ভুলক্রমে শিল্পীর পদবী ভিন্ন মুদ্রিত হয়।
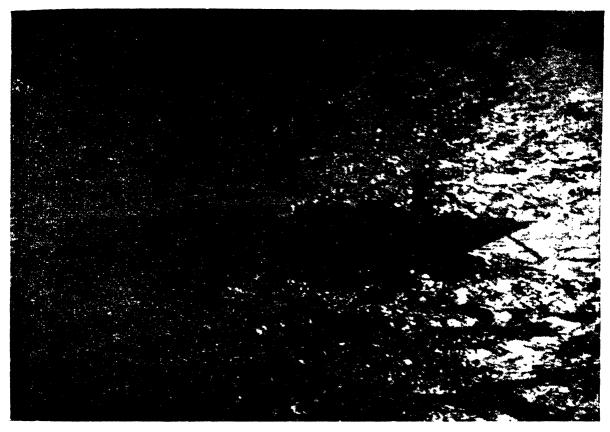
ছল-ছল —অমিয়কুমার রায়

দৃষ্টিপাত
—শ্রীমতী মুকুল মুখোপাধ্যায়

চিন্তালু —প্রভাত বাগচী

বিচ্ছেদ —মদন বোস

নিদ্রালু —কুমারেশ নন্দী

—অজিতকুমার দত্ত

বিশ্রাম —পরিমল গোস্বামী

মাসিক বসুমতীর

আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি

গত কয়েক মাস যাবৎ কোন রকম উচ্চবাচ্য না ক'রে প্রতি সংখ্যায় অসংখ্য সুদৃশ্য আলোকচিত্র ছেপেছি। মাসিক বসুমতীর দপ্তরে স্তূপীকৃত জমে-ওঠা আলোকচিত্র ইতিমধ্যে একেবারে নিঃশেষ না হ'লেও তাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছবিগুলিই প্রকাশ করা হয়েছে। এই জমে-যাওয়া আলোকচিত্রসমূহ প্রকাশের জন্য আমরা আমাদের অসংখ্য গুণী আলোকচিত্র-শিল্পীদের কিছু কালের জন্য ফটো না পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

যাই হোক, জমানো ছবির স্তূপ থেকে বহু চেষ্টায় সব চেয়ে ভাল ছবি উদ্ধারের ফল এই হয়েছে যে, 'মাসিক বসুমতী'র দপ্তরে ভাল ভাল ছবি থাকলেও সব চেয়ে ভাল ছবির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সেই জন্য আবার আমরা অনুরোধ জানাই, এখন থেকে আপনারা আবার আপনাদের গৃহীত সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি আবার পাঠাতে থাকুন। আর আমরাও আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের চক্ষু সার্থক করতে মাসে মাসে আবার ছেপে যাই আপনাদের সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি।

কালী-মন্দির (নিউ দিল্লী)

—রবীন্দ্রনাথ রায়

তীরন্দাজ —হিতেন রায়

চিত্র-বিচিত্র

[পূর্ব প্রকাশের পর]

মধ্যবিত্তদের রঙ্গভূমি সাঙ্গুভেলীতে বসে থাকতে থাকতেই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে চার্লি-চ্যাপলিন-সর্বস্ব 'মডার্ণ টাইমস্'-এর প্রথম দৃশ্য। ভ্যাড়াদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে মেষপালক একদিকে, আর অন্য দিক থেকে বেরিয়ে আসছে কারখানার শ্রমিক। দুজনের কারুরই জীবন নেই, আছে জীবিকার লাঞ্ছনা। ওদের মধ্যে কারা মেষ আর কারা মানুষ, চোখে দেখেও চেনা শক্ত।

সাঙ্গুভেলী যার পিঠস্থান সেই শহুরে মধ্যবিত্তদের প্রায় সবাই কেরাণী। এই কেরাণীদের সঙ্গে কার তুলনা চলে, ড্যালহৌসী-স্কোয়ারে দশটা-পাঁচটায় কেরাণীর পঙ্গপাল দেখে, বহুদিন চেষ্টা করেছি কল্পনা করতে। আর তার পর একদিন চোখ গিয়ে পড়েছে আখের সরবৎ বিক্রী হচ্ছে যেখানে সেইদিকে। বড় বড় আখ, টাটকা, তখনও রসে ভরপুর। মাড়াই হচ্ছে কলে। একটু বাদেই ছিবড়ে পড়ে আছে তার। যতক্ষণ, রস নয় শুধু, রসের গন্ধ আছে এতটুকু, ততক্ষণ চলছে পেষা। তারপর রস ফুরিয়ে গেলেই চলে যাচ্ছে জঞ্জালের গাদায়। আর কেরাণীদের দেখছি রাস্তার ওধারে। তাদেরও পেষা হচ্ছে সরকারী আর সওদাগরী অফিসে। যতক্ষণ রস আছে ততক্ষণই নিংড়োন! তার পরই your service no longer required! সেই একই কল। এক উদ্দেশ্য। এক যন্ত্রণা। এক জীবন।

এ-তুলনা আমার নিজের নয়। আমার এক বন্ধুর। তুলনাহীন তার কমনসেন্স। সেই আমায় বলেছিলো, কলকাতা, শুধু কলকাতায় দেখবার এত আছে, দেখাবার আছে এত যে, যে দেখতে জানে সে এখানেই দেখতে পায়। হিল্লি-দিল্লী নয়, নয় কাবুল-কান্দার, হিমালয়ের হিপ্নোটিজম নয়, পৃথিবীতে স্বর্গের কবিতা কাশ্মীরের পাঠ নেবার নেই প্রয়োজন, শুধু ঘুরে এসো কলকাতা!

কার্জন পার্ক। রাতের কলকাতায় সন্ধ্যার রঙ্গীন ভূমিকা। সেখান থেকে উটরাম বুফ্যে। জলের বিজ্ঞাপন স্থলের লোকদের কাছে। চলে যান চিড়িয়াখানায়। বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার মনে হবে, যদি আপনার মন থাকে তবেই, যে বাঘের চেয়ে কখনো কখনো আপনিও কি কম অনিরাপদ? বাঘের চোখে আপনার চেয়ে কী বেশি লোলুপতা? স্বার্থে হিংসায় কামনার বর্বরতায় জানোয়ারের চেয়ে কোন কোন মুহূর্তে আপনি কম হিংস্র?

চলে আসুন যাদুঘরে। মৃতেরা শুয়ে আছে পরম নিশ্চিন্ততায়। কিন্তু আপনি কী সত্যিই ওদের চেয়েও একটু বেশি জীবিত? সকাল-সন্ধ্যে আপিস, রাতে দুশ্চিন্তা, সকালে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছোটা, রবিবার বাজার করা, জীবন কোথায়? বেঁচে মরে থাকা। তার চেয়ে ঢের ভালো মমির জীবন। মরে বেঁচে থাকা। এরই মধ্যে জেগে আছে পার্ক ষ্ট্রীট।

রাতের রঙ্গপল্লী। দিনের চেয়ে রাতে যেখানে অনেক বেশি আলো। সেই আলোর নীচে অনেক অনেক অন্ধকার। পার্কষ্ট্রিট। নিওন সাইনে নিকনো। মাঁজা ঘষা চকচকে। পার্ক ষ্ট্রিটে এলে মনে হবে আপনার, কলকাতায় কোথাও বুঝি দুঃখ নেই, অভাব নেই, নেই কোন সমস্যা, সারা কলকাতাই বুঝি এমনি। শুধু গ্ল্যামার। গাড়ী। গাড়ীর মধ্যে হয় গাউন নয় গয়নার পুঁটুলী। সৌখীন সরাইখানা। ওমরখৈয়াম সওদা হচ্ছে যে সরাইখানার সিঁড়ির ধাপে। ফিটজেরাল্ডের ওমর খৈয়াম বিক্রী করছে বিহারী কাগজওলা—চারপাশে ইংরেজি কাগজের মলাটে মলাটে শিহরণ। উদ্দাম, উত্তেজক, রমণীয়।

কিংবা কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, শুধু ঘুরে বেড়ান ট্রামে-বাসে। সকাল থেকে সন্ধ্যে। যে-অভিজ্ঞতা আপনি আহরণ করবেন, বই-এর পাতায় তাকে পাওয়া অসম্ভব। বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা পয়সা হবার পর ট্রাম-বাস ত্যাগ করেন। তাঁরা ভুল করেন। চার চাকার গাড়ীতে গতি আছে, আবেগ নেই। আরাম আছে, অভিজ্ঞতা কোথায়? চার চাকার গাড়ী দূরের পথকে কাছে নিয়ে আসে, বাড়ায় শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব।

সেই ট্রামে কিংবা বাসে করে এসে নামুন কলেজ পাড়া, কলেজ-ষ্ট্রিটে। কলেজের কি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালের দিকে তাকান। হটাৎ ভুল হবে আপনার। নীতি না রাজনীতি? শিক্ষা করতে না শিক্ষা দিতে আসা? এ-দল সে-দলের পোষ্টার পড়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে। খবর কাগজের ওপর কালো-লাল-নীল কত রং এর পোষ্টার। যেন পোষ্টারের দেওয়ালী। এবং সব পোষ্টারেরই বক্তব্য প্রায় এক: "আমরা ছাড়া আর সবাই ইম্‌পোষ্টার!"

তবু বাংলা দেশের যৌবন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এখনও শুধু ঐ কলেজ ষ্ট্রিটে। উদ্ধত, বেহিসেবী, বেপরোয়া। ভুল করে ছাত্ররাই। ভালো যা কিছু, তা করার স্পর্ধাও রাখে তারাই। প্রতিবাদে মুখর। হিরো-ওয়ার্শিপিং-এও তুলনাবিহীন। ভরসা রাখা যায় তাদের ওপর। তাদের ভয়ও করে। জীবন আছে। স্বপ্ন আছে। আশা আছে! তাই জীবন নিয়ে তামাসা করবার আছে দুঃসাহস। বাংলা দেশ এখানে ঝিমিয়ে নেই। এই একটি জায়গায় আছে বারুদ। ভালো কাজে আগুন লাগালে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে শতাব্দী-সঞ্চিত অন্যায়কে। মন্দপথে গেলে ডেকে আনতে পারে নিজেদের সর্বনাশ। বাংলা দেশে আজো এগিয়ে চলবার মত মানুষ আছে অনেক। নেই শুধু এগিয়ে নিয়ে যাবার মত লোক।

কলেজ ষ্ট্রিট পাড়ায় শুধু তরুণ। কিন্তু প্রবীণদের শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ভেড়ার দৃশ্য যদি দেখতে চান, তাহলে আপনাকে ঢুকতে হবে ফুটবল খেলার মাঠে। ইষ্টবেঙ্গল না মোহনবাগান? তারই ওপর নির্ভর করছে জীবন-মরণ। এখানে প্রবীণের সংগে তফাৎ নেই অর্বাচীনের। এম-এ পাশ আর ম্যাট্রিক-ফেল এখানে এসে এক। খেলা নয়,—কে জিতলো? তাই নিয়েই চীৎকার। ইষ্টবেঙ্গল না মোহনবাগান? বাঙাল না ঘটি? ইলিশ না চিংড়ি?

'এই সবের মাঝখানে গোল হয়ে শুয়ে গড়ের মাঠ মনে পড়িয়ে দিচ্ছে মাসের শেষে মধ্যবিত্তদের ট্যাঁককে। সহুরে মধ্যবিত্ত-বাঙালী মানেই কেরাণী। মাসের শেষ মানেই সেই কেরাণীদের ট্যাঁক ওই গড়ের মাঠ।

সত্যিই, বাঙালী কেরাণী ছাড়া আর কী? ইংরেজ যদি দোকানদারের জাত, বাঙালী মানেই তবে কেরাণী।

কলকাতায় সেই কেরাণীদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়, হয় করুণা করা—কখন কখন কাব্যও করা যে হয় না তা নয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে যা কখনো করা হল না, তা হলো একটি সার্থক কেরাণী চরিত্র-সৃষ্টি।

অপ্রিয় সত্য শুধু এ-যুগে নয় সকল যুগেই অচল। এ-যুগের হল brutal frankness—রূঢ় সত্য। সেই রূঢ় সত্য প্রয়োগ করে বলতে হয় বাংলা সাহিত্যেই এ যাবৎ কাল কলকাতা অনুপস্থিত। অনুপস্থিত কলকাতার কেরাণী। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমস্যা।

বিত্তবানদের প্রতি সকলের সাঙ্ঘাতিক আক্রোশ সব দেশেই, তবে বিত্তবান হতে কারুর আপত্তি নেই। চাষাদের জন্যে সরকারী দরদ সাধারণের সমর্থনে জমিদারী উচ্ছেদ বিলে আত্মপ্রকাশ করছে। শ্রমিকদের সম্বল: নন-কো-অপারেশনের অনার্য শাস্ত্রসম্মতরূপ, সাম্যবাদী strike, শুধু মধ্যবিত্তদের জন্যে মাথা ব্যথা নেই কারুর; সব চেয়ে কম বিচলিত আবার মধ্যবিত্তরা নিজেরাই।

কেরাণীর কলমে মাছিমারা ছাড়া আর কী-ই বা সম্ভব? সে-কলমে কলম পেষাই হয়, লেখার জন্যে আলাদা কলম চাই। লেখা যাদের নেশা তাদের অনেকেরই পেষা হচ্ছে কেরাণীগিরি। তাই লেখবার সময় অনেকবারই তাঁরা ভুল করে ব্যবহার করেন কেরাণীর কলম। তাই বাংলা ভাষায় বই-এর পর বই বেরোয়। ধরা দেয় না শুধু মধ্যবিত্ত জীবন। সৃষ্টি হয় না তাদের চরিত্র। কেরাণীগিরির ফলে লেখা হয় প্রচুর। প্রচুর লেখার ফলে হাতের লেখা হয়ত ভালো হয়। কিন্তু হায়—লেখকের প্রয়োজন লেখার হাত, হাতের লেখা নয়।

সস্তা-ইংরেজী বইএর ফ্যানদের বলতে শুনেছি আমাদের জীবনে নেই থ্রিল, রোমান্সের নিদারুণ অভাব, স্কোপ কোথায় ওদের মত লেখার। আমাদের একঘেয়ে জীবন। আমাদের সাহিত্যই নাকি তাই। যাঁরা একথা বলেন তাঁরা সাহিত্যের পাঠক নন, থ্রিলের ভক্ত।

সাহিত্যের পাঠক খোঁজে জীবন-দর্শন। লেখকের বক্তব্য। সাহিত্য মানে শুধু মোপার্সাঁ আর মম নয়। সাহিত্য মানে রোমা রোলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথও।

বাংলা দেশে, এই কলকাতায় লেখার বিষয়-বস্তুর অভাব নয়। অভাব লেখকের। দেখাবার জিনিষ আছে। দেখবার লোক নেই। ছবি আছে। আঁকবার তুলি চাই। কলকাতার মধ্যবিত্ত মানে শুধু একটি চিত্র নয়। বিচিত্রও বটে।

কেরাণীদের মধ্যে চিত্রেরও অভাব নেই, বিচিত্রেরও। কাব্য পড়ে কবিকে যেমন মনে হয়, কবি নাকি তেমন নয় বলেছেন কবিগুরু। 'কেরাণী,' শুনলেই যদি কুঁজো, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, নির্জীব যতটুকু জীবিত তার চেয়ে মৃত, সমস্ত সময়ই মুমূর্ষু কোন মানুষের কথা মনে হয়, তাহলে বলা চলে কেরাণী মাত্রেই তা নয়।

ইংরাজী ছাপাখানায় ঢুকলে আপনি দেখতে পাবেন টাইপ কত রকমের হতে পারে, কত ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদের অক্ষর, সেখানে রোজই নতুন নতুন টাইপের খবর আসছে, টাইপ ফাউণ্ড্রীতে চলছে আরও নতুনের পরীক্ষা। কিন্তু কেরাণীদের মধ্যে টাইপের আদি নেই, অন্ত নেই ভ্যারাইটির। সমুদ্র অতল এবং আকাশ অসীম, এ-কথা চোখে-দেখা আপাত্য-সত্য হলেও, শেষ-সত্য নয়। কারণ যত গভীরই হোক, তল আছে সমুদ্রের, যত বিস্তৃত হোক আকাশ, সীমা আছে তার, এ-হোল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কেরাণী আছে কত রকম, কত পিকুলারিটি তাদের আচারে এবং ব্যবহারে কি বিচিত্র হতে পারে তারা, কত জাতের, কি অসংখ্য টাইপ পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে,—তার শেষ অংক এখনও কষা চলছে, উত্তর কোনদিন মিলবে কি না বলা শক্ত।

একথা বলা খুবই ভুল যে, কেরাণীর জীবন মানেই দুঃখের জীবন। কেরাণী মাত্রেই যদি দুঃখী হত, তাহলে আই-সি-এস হলেই লোকে অন্নদাশংকর হত। আর সমস্ত মানুষের মতই কেরাণীদেরও প্রথম সমস্যা, প্রথম ও প্রধান: ব্রেড এবং বাটার। তার পর স্বপ্ন: বাটারফ্লাইএর। রজনীগন্ধার গন্ধ-জড়ান অথবা কিছু চাঁপা কিছু পারুলে মেশা পূর্ণিমার নেশার রাত তাদেরও জীবনে আসে। কবিতা যাদের কাঁদায়, পাগল করে গান, ভালোবাসায় আকুল হয় যারা, তারাও কেউ কেউ এই কেরাণীকুলের।

'Full many a gem' কথাটা কবি কাদের উপলক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, কবিই জানতেন, কিন্তু বাঙ্গালী কেরাণীদের বেলায় কথাটা যত সত্য, এমন আর কারুর বেলায় নয়। কবিতা লেখবার, গান গাইবার, ছবি আঁকবার, অভিনয় করবার দুর্লভ প্রতিভা নিয়ে,—প্রতিভা না বলাই ভালো, কারণ প্রতিভা কোন কিছুতেই মরে না, তাই বলছি ক্ষমতা নিয়ে—জীবিকা অর্জনের স্থূল তাগিদে আঠারো বছর বয়সের এ-প্রান্তেই দশটা-পাঁচটার কেরাণীগিরির গারদে ঢুকে নিঃশেষ হয় এমন করে যে কোনদিন যে সে ওসব কথা ভাবত, এখন তাই ভেবেই তার গতানুগতিক জীবনযাত্রায় যেটুকু হাসির সঞ্চার হয়, তা দেখতে হাসির মতই কিন্তু আসলে তা কান্না। বয়স্ক লোকের নাকি কাঁদতে নেই, তাই তারা না কেঁদে হাসে। এ হাসি গভীর আনন্দের নয়, সুগভীর বেদনার।

ড্যালহৌসী স্কোয়ারের সাদা থামওলা বাড়ীটায় অতি বৃদ্ধের মত দেখতে যে-প্রৌঢ় এই মাত্র ঢুকলো, তাকে দেখে সত্যি মনে হয় কেরাণীদের জীবনে আনন্দ নেই। পেনসনের দিন প্রত্যাসন্ন। সেই অশুভ ক্ষণের আগেই দশরথকে মনে করিয়ে দিতে হবে কৈকেয়ীর বরদানের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে বড় ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করলেই, সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকেও ঐ খাঁচায় ঢুকতে দেবার প্রবেশপত্রের জন্যে।

কিন্তু কেরাণী জীবনসমুদ্রে এ মাত্র একটি বুদ্বুদ। অন্যদিকে দেখুন আপিস পালিয়ে গোঁফ দাড়ি কামিয়ে হাওয়াইয়ান সার্ট পরে সিগারেট ধরিয়েছে যে রেস্তোরাঁতে বসে এই মাত্র, সেও কেরাণী। মাইনে পায় একশো কয়েক টাকা। কিন্তু কথায়-বার্ত্তায়, কায়দায় বোলে, চলনে চালে মনে হবে সে যদি কেরাণী হয় তাহলে রাজা কে? বসে বসে হাসছে রেস্তোরাঁয়। রোনাল্ড কোলম্যান—গোঁফের তলায় তার হাসি যেন Did you Maclean your teeth

to-dayর বিজ্ঞাপন নয় জিজ্ঞাসা। কিন্তু কেন হাসছে জানেন? হাসছে কারণ এই রেস্তোরাঁয় ঐ সময়ে আসে একজন ফিল্ম কোম্পানীর একস্ট্রা সাপ্লায়ার, যাকে সে প্রোডাকশন ম্যানেজার বলে জানে। শকুন্তলা বইতে দুষ্মন্তের রোল তার বাঁধা, বুঝিয়েছে সেই ঝানু মালটি পয়সা টি কাপ ডবল-হাফ আর অনুরূপ সংখ্যার অমলেট নয় মামলেটের বিনিময়ে। তাই এই হাসি। শুধু অকারণ পুলকে নয়। ভাবখানা হচ্ছে: আজকে ক্লার্ক কিন্তু ক্লার্ক-গেবল হতেই বা কতক্ষণ?

বড় সাহেবের মেজাজে রৌদ্ররুক্ষ ও ফাইল-লাঞ্ছিত কেরাণীর জীবনে অতি অধুনা মেয়ে-কেরাণীরা এসেছে রোমান্সের থ্রিল নিয়ে। প্রবীণ প্রৌঢ় কেরাণীরা ভেতরে কৌতূহল চেপে রেখে বিরক্ত হবার চেষ্টা করেছে। অর্বাচীনেরা চেয়েছে স্মার্ট হতে। জীবিকার প্রয়োজনে বিয়ের পিঁড়ে থেকে কাঠের চেয়ারে এসে বসেছে যারা তাদের মধ্যে জীবন অন্বেষণ হয়ত বাতুলতা, হয়ত তারা অনেকেই দেখতে আকর্ষণীয় নয় মোটেই তবু বয়সের ধর্ম কিছুতেই বুঝতে চাইলেও বিশ্বাস করতে দিতে চায় না যে পৃথিবীতে খুব কম রমণীই সত্যিকারের রমণীয়।

রান্নাঘর থেকে আপিসরুমে মেয়েদের এই ট্রান্সফার রক্ষণশীলদের বিষদৃষ্টিকে বিস্ফারিত করলেও, শহর কলকাতার শানবাঁধানো রাস্তায় চলবার জন্যে এ-পদক্ষেপ অনিবার্য। জীবন নয় জীবনযুদ্ধে বাঁচবার জন্যেই স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা-পুত্র এবং পুত্রীতে সবাই মিলে আনতে পারলেই তবেই কলকাতার মধ্যবিত্তদের হাত থেকে মুখে উঠছে কিছু, নইলে নান্য পন্থা।

আগে ছিলো শুধু পড়ানো, নয় আমাদের দেশের হাসপাতালে নার্স হওয়া। সে প্রফেসনের সঙ্গে সেবার কতটুকু সম্পর্ক ছিলো তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও বলা চলে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শর থেকে তা ছিলো অনেক দূরে। তার জন্যে মেয়েরা দায়ী ছিলো না, ছিলো এই প্রফেসনের জন্যে যথেষ্ট মর্যাদার অভাব এবং দূষিত এ্যাটমশফেয়ারের প্রভাব। টেলিফোন আর ষ্টেনো—সেখানে কালো মেয়ের অভাব ছিলো না—কিন্তু ভারতীয়রা ছিলো অস্পৃশ্য।

আজ মেয়েরা শুধু বিয়ের সমস্যা নয়, বিয়ে না করে উদ্বাস্তু পিতার কী করে সংসার চলবে তারই জটিল সমাধান।

এতে সমাজের ভালো হয়েছে কী মন্দ হয়েছে সে প্রশ্ন সমাজ-নেতার, এ আলোচনার নয়। শুধু বাংলা সাহিত্যের স্কোপ বেড়েছে আরেকটু, নায়কের সংগে নায়িকার দেখা করানোর কমেছে দুশ্চিন্তা। ইংরেজি বই-এর নকল করার তাগিদ সেদিন থেকেই কমেছে যেদিন থেকে ইংরেজ-জীবনের নকল করতে সুরু করেছি আমরা।

ছেলেরা করলেও যা মেয়েরা করলেও তাই, চাকরী সুখের নয়। কিন্তু ড্যালহৌসী স্কোয়ারে কেরাণীপাড়ায় গাড়ী চড়ে যারা আসেন কাজ করতে, তাদের অনেকের শাড়ীই একটু বেশি দামের, সেন্টের গন্ধও একটু যেন ফরাসী সন্ধ্যার, জুতো'র ওপর জরির কাজ বড্ড প্রকট, ভ্যানিটি ব্যাগে যতটু জিনিষ ধরার, তার চেয়ে বেশি যেন ভ্যানিটি উপচে পড়ার। তারা কারা? মনে হয় বি, এ, পাশ করে ফেলে বড় লোকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, (উপযুক্ততা রজত-কৌলীন্যে), অতএব চাকরী করতে আসা। সখের চাকরী। এ তাদের বাড়ীতে না ঘুমিয়ে আপিসে এসে ফাইল-ফাইল খেলা। কিন্তু কথামালা সেই একেবারে শৈশবে একবার পড়া, নাহলে তাদের মনে পড়ত কারুর পক্ষে যা খেলা আর কারুর পক্ষে তা মৃত্যু। মনে পড়ত সে দেড়শো টাকার এই সখের চাকরী না করলে হয়ত ইউডিকোলনে রুমাল ভিজতো একটু কম, আধুনিকতম ফ্যাশানের শাড়ী গায়ে উঠতো একটু দেরীতে, সিনেমা আর ফ্যারাজিনিতে যাতায়াতের সংখ্যা এগুতো বিলম্বিত লয়ে, কিন্তু ভ'রত একটি বিধবা মায়ের বুক, বেকার পুত্রের চাকরী পাওয়ায়, অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকা ভাই-বোনের চোখে জ্বলে উঠতো আলো, দেশের ভবিষ্যত বর্তমানের মত হয়ত অন্ধকার হ'ত না এতটা!

[ক্রমশঃ।

তুমি

রাণা বসু

তুমি যেন এক দুষ্টু নদী, আমি যেন তার ঢেউ—
দু'জনেতে এস লুকোচুরি খেলি, জানবে না আর কেউ।

দুই দিকে যার পাড় ভেঙ্গে গেছে
জলে জলে একাকার—
তুমি নদী ক্ষুরধার।

বড় ভালো লাগে কাছটিতে এসে
দেখতে দূরের দৃশ্য—
চল চপলার চরণ পরশে
পাড় ভেঙে ফেলে নৃত্য—
জলে আছে যার হাঙর, মকর
কত কী যে আরো ভৃত্য।

দুরন্ত নদী! তুমি পাশে টেনে নাও,
যদি মরে যাই সে মরণ ভালো,
মৃত্যুর রূপ শুনেছি যে কালো,
চোখে-আজ দেখেনি:
বুকে জমা কোরে রেখেনি।

মিঠে-কড়া রোদে
বাঁকা নদী খেলা করে,
হাসি-ভরা মুখ নিয়ে—
সে রূপের শোভা বোঝানো কঠিন বড়;
মাছরাঙা আর রামধনু রঙ হয়েছে যেখানে জড়।

মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এ দেশে বহু দিন এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে রামমোহন রায়ই প্রথম ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের বহু কারণ আছে। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের (হয়ত ভারতীয়দিগের?) মধ্যে, বোধ হয়, রামমোহনই সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে স্বদেশে নানা কার্যের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষা-সংস্কারে, একেশ্বরবাদ প্রচারে তখন তিনি স্বদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন—এ দেশে প্রতীচ্য প্রথায় বিজ্ঞানাদি শিক্ষার প্রবর্ত্তন জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। সেই সকল কারণে তিনি ইংরেজদিগের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট তাঁহাকে স্বীয় কার্যের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া ও "রাজা" উপাধি দিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া তিনি ইংরেজ কোবিদ-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচের বিরুদ্ধে এ দেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডেও তাহা পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রামমোহনের মৃত্যুও (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁহাকে এ দেশে সুপরিচিত করিবার অন্যতম কারণ।

কিন্তু ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী মুসলমান মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীন তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া ইংলণ্ডে রাজদরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন—ক্লাইবের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার পক্ষে যে কাজের জন্য তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা করা সম্ভব হয় নাই। মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীন যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা তিনি আত্মপরিচয়ে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি যে পুস্তকে তাঁহার বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা দেখিবেন যে, আমি—ক্ষুদ্র পাঁচনূর গ্রামের অধিবাসী, তামুদ্দীনের পুত্র—ভ্রমণকারী শেখ ইতেশামুদ্দীন (বর্ত্তমানে দেশভ্রমণ-শ্রমে ক্লান্ত) ভাগ্যবশে বাধ্য হইয়া য়ুরোপে গিয়াছিলাম এবং তখন তথায় যে সকল বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সে সকলের কতকাংশ বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়াছি..."

এইরূপে তিনি আপনাকে পাঁচনূরের অধিবাসী বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। ১৮৫৫-৫৭ খৃষ্টাব্দের রাজস্ব জরিপ মানচিত্রে এই পাঁচনূর—সম্ভবতঃ তথায় প্রসিদ্ধ মুসলমান কাজীর বাসহেতু কাজীপাড়া নামে অভিহিত হয়। ইহা নদীয়া জিলায় চক্রদহ (চাকদা) গ্রামেরই অংশ। মীর্জ্জার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পার্শী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ঐ ভাষাতেই রচিত তাঁহার আর একখানি পুস্তকে তিনি স্বীয় বাসগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—

"পূর্ব্বকালে পাঁচনূর সহর ও বন্দর ছিল। গঙ্গানদী এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। নদীকূলের এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলযানের গতায়াতের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। জাহাজঘাটও ছিল...কিছুকাল পরে নদী পশ্চিম দিকে সরিয়া যাওয়ায় পূর্ব্ব কূলে চড়া পড়ে এবং বড় বড় জলযানের পক্ষে এই স্থানে আগমন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন বন্দর পাঁচনূর হইতে সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত হয়, এবং পাঁচনূর হৃতগৌরব সমৃদ্ধি-শূন্য হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী কালে নদীর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু সপ্তগ্রাম বন্দরও ত্যক্ত হয় ও হুগলীতে বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়।"

"এক জন প্রসিদ্ধ খাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত পাঁচনূরের উদ্ধার সাধন করেন। তিনি রাজার (?) নিকট হইতে জায়গীর লইয়া রাজা রাম রায়ের ও রাজা রুদ্র রায়ের পৌত্র পরগণার জমীদারদিগের নিকট হইতে যে কয়খানি গ্রাম ইজারা গ্রহণ করেন—পাঁচনূর সে সকলের অন্যতম। এই রাজার বংশধরগণ পরগণার কাজী হইয়া বহু কাল পুরুষানুক্রমে সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পরে আনুলিয়া হইতে চারিটি পরিবার পাঁচনূর গ্রামে আসিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।"

যে সকল পরিবার এইরূপে পাঁচনূরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীনের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সকলের দ্বিতীয়। সুতরাং মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীন যে পরিবারের বংশধর, সে পরিবার দীর্ঘকাল বাঙ্গালায় বাস করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া বিবেচনা করিলে অসঙ্গত হয় না। সেই জন্যই বলা যায়, শিক্ষিত বাঙ্গালী—ও ভারতবাসীর মধ্যে মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীনই সর্ব্বপ্রথম এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন।

মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীনের পুস্তকের নাম—"সিগার্ফ-নামা-বিলায়েৎ" অর্থাৎ য়ুরোপ সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট বিবরণ। পার্শী ভাষায় লিখিত এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি জেমস এডওয়ার্ড আলেকজাণ্ডার নামক এক জন ইংরেজ কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

মীর্জ্জার রচনার যে সকল অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় সপ্রকাশ। বিশেষ বাঙ্গালীর রচনা হওয়ায় তাহা এ দেশের লোকের সমধিক চিত্তাকর্ষক।

মীর্জ্জা, বোধ হয়, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বোধ হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পাঁচনূর গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীন

জীবনের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের বাসগ্রামের শান্ত পরিবেষ্টনে—সম্ভ্রান্ত পরিবারে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তখন মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী—অসাধারণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। সেই সমৃদ্ধি—পলাশীর যুদ্ধের পরে—ক্লাইবকে বিস্মিত করিয়াছিল। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাদশাহের প্রতিনিধি ও পৌত্র আজিমউখানের

সহিত বিবাহ করিয়া ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়। সুতরাং ৫৫ বৎসরে মুর্শিদাবাদের ঐ সমৃদ্ধি-প্রতিষ্ঠা। মুর্শিদকুলীর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন নবাব-নাজিম হ'ন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র সরফরাজ ঐ পদ পাইলে বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দী তাঁহাকে হত্যা করিয়া নবাব-নাজিম হ'ন। সিরাজদ্দৌলা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও দৌহিত্র ছিলেন।

মুর্শিদাবাদে নবাবের দপ্তরে সলিমুল্লা অন্যতম মুন্সী ছিলেন। তিনি পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আট জন প্রসিদ্ধ মুন্সীর এক জন হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে—এই মুন্সী সলিমুল্লার যত্নে মীর্জ্জা শিক্ষা লাভ করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী প্রাপ্ত হ'ন। তিনি মেজর পার্কের অধীনে কার্যে নিযুক্ত হ'ন।

মেজর পার্কের অধীনে কাজ করিবার সময় মুন্সী ইতেশামুদ্দীন পূর্ণিয়ায় ও বীরভূমে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং পার্কের সহিত যখন পাটনায় গমন করেন, তখন—তথায়—তাঁহার সহিত দিল্লীর বাদশাহ সাহ আলমের সাক্ষাৎ হয়।

তখনই সম্রাটের কাজ করিবার জন্য ইতেশামুদ্দীনের আগ্রহ জন্মে। কিন্তু তখন সেই আগ্রহ পরিতৃপ্তির কোন সুযোগ ঘটে নাই। মেজর পার্কের সহিত তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। অল্প দিন পরে পার্ক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমনের আয়োজন করেন। বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারী মুন্সী ইতেশামুদ্দীনকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য তিনি পাটনায় মেজর এডামকে পত্র লিখিয়া সেই পত্র ও বীরভূমের একখানি মানচিত্র দিয়া ইতেশামুদ্দীনকে তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের চক্রান্তে মেজর এডাম বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম হ'ন।

সুতরাং হতাশ হইয়া ইতেশামুদ্দীন পাটনা ত্যাগ করিয়া আসেন এবং যশোহরে ক্যাপ্টেন নিক্সনের অধীনস্থ বৃটিশ সেনাদলের বক্সী (বেতন প্রদাতা) নিযুক্ত হ'ন।

তখন দেশে নানা স্থানে অশান্তির উপদ্রব লাগিয়াই ছিল। মীর কাশেম নবাব হইলে তাঁহার সহিত স্বার্থসর্ব্বস্ব ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ হয়। ক্যাপ্টেন নিক্সনের অধীনস্থ সেনাদল যুদ্ধে যাইতে আদিষ্ট হইলে মুন্সী ইতেশামুদ্দীনকেও সেই দলের সহিত যাইতে হয়। সেই জন্য ঘেরিয়া ও উধুয়ানালা—উভয় যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধের পরে মুন্সী ইতেশামুদ্দীন মেদিনীপুর জিলায় কুতুবপুরের তহশীলদার নিযুক্ত হ'ন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। কুতুবপুরে তহশীলদার থাকিবার সময়েই তিনি প্রধান ইংরেজ সেনাপতি মেজর কার্ণাকের অধীনে চাকরীতে নিযুক্ত হ'ন।

এই সময় বাদশাহ শাহ আলমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন হয়। ক্লাইব মোগল বাদশাহের রক্ষা-ব্যবস্থা করিলে স্থির হয়—শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানীকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দাওয়ানী প্রদান করিবেন। তবে তখনও মুর্শিদাবাদে নামমাত্র নবাব থাকেন। তখন শাসনভার নবাবের; আর রাজস্ব বিভাগের সম্পূর্ণ ভার ইংরেজ কোম্পানীর—তাঁহারা দাওয়ান। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের; আর প্রাণ, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্য-কুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর।"

এই সময় ইতেশামুদ্দীন সম্রাটের মুন্সী অর্থাৎ সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন এবং মীর্জ্জা উপাধীতে সম্মানিত হ'ন। তিনি এই সম্মান বিশেষ আদরের মনে করিতেন—কারণ, ইহা তাঁহার সম্রাটের দান—বিদেশীদিগের নহে। এই উপাধিলাভের ফলে তিনি দিল্লীর ওমরাহ (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) মধ্যে গণ্য হ'ন।

কিন্তু ইংরেজ বণিক এ দেশে স্বার্থ ব্যতীত আর কিছু বুঝিত না। যে হীন উপায়ে তাহারা পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কথিত আছে, যে সিন্দুকে ক্লাইব মুর্শিদাবাদের লুণ্ঠনের অর্থাদি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া লোক বলিত, শয়নকক্ষের নিকটে ঐ পাপের সাক্ষ রাখিয়া তিনি কি সুনিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারেন?

বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দাওয়ানী পাইয়া ইংরেজ এই প্রদেশে অধিকার দৃঢ় করিবার সুযোগলাভ করিলেন; কিন্তু যে সর্ত্তে তাহা লাভ করিলেন, সেই সর্ত্ত পালন করিতে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

সর্ত্ত ছিল, ক্লাইব বাদশাহের সাহায্যার্থ এক দল ইংরেজ সৈনিক রাখিয়া আসিবেন। কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের পরে ক্লাইব আর সে সর্ত্ত পালন করা প্রয়োজন মনে করিলেন না। বাদশাহ যখন বুঝিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন, তখন ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত হইয়া তিনি ক্লাইবকে প্রতিশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ক্লাইব প্রভৃতি ইংরেজরা লজ্জা বিক্রয় করিয়া বিজয়ী হইবার সঙ্কল্প লইয়াই এ দেশে আসিয়াছিলেন—ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহারা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। "দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।" ক্লাইব বলিলেন, ইংলণ্ডের রাজার অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন ভারতীয়ের অধীনে ইংরেজ সেনাদল রাখিতে পারেন না; তবে তিনি ক্রমে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যত দিন সে ব্যবস্থা না হয়, তত দিন জৌনপুরে জেনারল স্মিথের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া থাকিবে, সম্রাটের প্রয়োজন হইলেই তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল লইয়া সম্রাটের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন।

প্রকৃত কথা এই যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন অভিপ্রায় ক্লাইবের ছিল না এবং তিনি বাদশাহকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া কিছু অর্থলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন নূতন ষড়যন্ত্র হইল—ইংলণ্ডের রাজার নিকট বাদশাহের পক্ষ হইতে দূত প্রেরণ করিতে হইবে। স্বয়ং ক্লাইব, ভ্যানসিটার্ট, নবাব মণিরদ্দৌলা, রাজা সিতাব রায় প্রভৃতি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, ক্যাপ্টেন আর্চ্চবোল্ড সুইনটনকে বাদশাহের দূত করিয়া পাঠান হইবে; কিন্তু দৌত্যকার্য্য যে প্রকৃত, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একজন ভারতীয় ওমরাহকে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এ সমস্ত যে বাদশাহের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিবার ছল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দমদমার বাগান-বাড়ীতে বাদশাহের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের রাজার বরাবর পত্র লিখিত হইল—ঐ পত্রে বাদশাহের স্বাক্ষর ও মোহরের ছাপ দেওয়া হইল।

সবই যেন ঠিক হইয়াছে। মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীনকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যাইবার জন্য মনোনীত করা হইল।

দূত ঐ পত্র ও নজর হিসাবে এক লক্ষ টাকা লইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া রাজাকে দিবেন। দূতদ্বয়—ক্যাপ্টেন সুইনটন ও মীর্জ্জা—জাহাজে উঠিলে ঐ পত্র ও লক্ষ টাকা তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইবে বলা হইল।

মীর্জ্জা প্রস্তুত হইবার জন্য ৪ হাজার টাকা এবং তিনি স্বগ্রাম পাঁচনূরে যাইয়া স্বজনগণের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া জাহাজে উঠিবার জন্য হুগলীতে গমন করিলেন। হুগলীতে ফৌজদার মীর্জ্জাকে বিশেষ সম্মান দেখাইলেন এবং তাঁহার বন্ধু কাজী শেখ আলিমুল্লা প্রভৃতিও তাঁহাকে বিদায়ী সম্বর্দ্ধনায় সম্মানিত করিলেন।

এইরূপে সব আয়োজন হইলে জাহাজ হুগলী বন্দর হইতে যাত্রা করিল। মীর্জ্জা প্রভৃ বাদশাহের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করিলেন—কোনরূপ বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইলেন না।

জাহাজ নদী অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে উপনীত হইল। কথা ছিল, ক্যাপ্টেন সুইন্‌টন ও মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীন জাহাজে উঠিলে তাঁহাদিগকে—ইংলণ্ডের রাজাকে লিখিত বাদশাহের পত্র ও উপঢৌকন লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। তাহা না হওয়ায় মীর্জ্জার মনে সন্দেহের উদ্ভব হইতেছিল বটে, কিন্তু তিনি তখন বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, ক্লাইব প্রমুখ ইংরেজরা প্রতারক। কিন্তু জাহাজ প্রায় এক সপ্তাহ চলিবার পরে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন; কারণ, তখন জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, পত্র ও লক্ষ টাকা ক্লাইব রাখিয়া দিয়াছেন—তিনি স্বয়ং লইয়া যাইবেন। তবে অধ্যক্ষও সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিলেন না। তিনি বলিলেন, ক্লাইব হয়ত পরবর্ত্তী জাহাজেই যাত্রা করিবেন।

তখন মীর্জ্জা বুঝিলেন, তিনি ষড়যন্ত্রের ফলে প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি এতই বেদনা পাইলেন যে, আহার্য্য-পানীয় ত্যাগ করিলেন এবং ফলে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু মীর্জ্জা য়ুরোপীয়দিগের ঔষধ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তাহার কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ঐ ঔষধে মদ্য থাকে এবং মদ্যপান মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ।

তবে সমুদ্রের সলিল-সঙ্গ-শীতল বাতাসে ও উপবাসে মীর্জ্জা সুস্থ হইলেন।

জাহাজ চলিতে লাগিল। পথে মীর্জ্জা মালদ্বীপ, মলাক্কা, পেগু, মরিশাস, ম্যাডাগাস্কার, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রায় ৬ মাসে ফ্রান্সে উপনীত হইলেন। ক্যাপ্টেন সুইন্‌টন তথায় জাহাজ ত্যাগ করিয়া স্থলপথে ডোভার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মীর্জ্জা ১৬ দিন ফ্রান্সে ভ্রমণান্তে ছোট জাহাজে ক্যালে যাত্রা করিলেন এবং তথায় পক্ষকাল অতিবাহিত করিয়া ডোভারের পথে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে উপনীত হইলেন।

এই যাত্রায় তিনি যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা যথাযথ ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। তৎকালীন য়ুরোপের নানা কথা এবং য়ুরোপীয় সমাজের বিষয়ে অনেক তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করায় তাঁহার রচনা যেমন নানা তথ্যপূর্ণ তেমনই চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল।

ক্যাপ্টেন সুইন্‌টন মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীনের রচনার ইংরেজী অনুবাদের পাদটীকায় ক্লাইবের কার্য্যের সমর্থনচেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে চেষ্টা যে সমর্থনের অযোগ্য, বোধ হয়, তাহা বুঝিয়া শেষে বলিয়াছিলেন, ক্লাইব যে বাদশাহের পত্র গোপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভারতে ইংরেজের শাসন-প্রতিষ্ঠার সুযোগ দৃঢ় হইয়াছিল। সেই শাসনে অবশ্য ইংরেজ নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছিল; কারণ:—

(১) ডীন ইঙ্গে বলিয়াছেন, যে অর্থনীতিক বিপ্লব অতর্কিত ভাবে আবির্ভূত হইয়া ইংলণ্ডের ও ইংরেজ জাতির চরিত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল—তাহা বাঙ্গালার লুণ্ঠনলব্ধ অর্থে প্রথম প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ক্লাইবের যুদ্ধজয়ের পরে ৩০ বৎসর কাল ভারতবর্ষ হইতে অর্থ বিস্তৃত প্রবাহের মত ইংলণ্ডে গিয়াছিল।

(তিনি ঐ অর্থ অন্যায়রূপে প্রাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।)

(২) ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লর্ড রথারমিয়ার বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ যদি স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করে, তবে ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ হইবে, কারণ—

ইংলণ্ডের প্রত্যেক নর-নারীর আয় হিসাব করিলে দেখা যাইবে—প্রতি ১৫ টাকায় ৩ টাকা (অর্থাৎ আয়ের এক-পঞ্চমাংশ) ভারতের সহিত সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। * * * ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষ তাহার যথাসর্ব্বস্ব ("For us India is not far from being our all in all".)

তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে, ইহাতে ভারতের কেবল ক্ষতিই হইয়াছিল—ভারতবর্ষ শোষণে শীর্ণ হইয়াছিল। সেই কথাই মনোমোহন বসু তাঁহার প্রসিদ্ধ গানে লিখিয়াছেন:—

"তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য নাশে যাহা ছিল দেশে;
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভূষী শেষে—
হায় গো রাজা কি কঠিন!"

ক্লাইবের লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা তাঁহার পক্ষে "বোঝার উপর শাকের আঁটি" মাত্র।

ক্লাইব যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন, সেই কোম্পানীর স্বার্থহেতুই তিনি বাদশাহের পত্র প্রেরণ করেন নাই, মীর্জ্জাও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ইংলণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডলীর বিবাদ চলিতেছিল। কোম্পানী যে বাঙ্গালা ও অন্যান্য স্থান অধিকার করিতেছিলেন, তাহাতে মন্ত্রীরা বলেন, কোম্পানী ব্যবসা করিবার অনুমতি মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন—রাজ্য স্থাপনের অধিকার তাঁহাদিগের নাই—তাঁহারা অধিকৃত স্থান শাসনের ভার ও রাজস্ব ইংলণ্ডের রাজাকে প্রদান করিয়া আপনারা সর্ত্ত অনুসারে ব্যবসা করুন। ইহার উত্তরে কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হয়, নবাব সিরাজদ্দৌলার ও নবাব মীর কাশেমের সহিত যুদ্ধকালে কোম্পানীর কুঠীগুলি বার বার লুণ্ঠিত হওয়ায় কোম্পানীর কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সেনাদলের বেতনাদিতে কোম্পানীর বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। আর কোম্পানীর চেষ্টাতেই বাঙ্গালা জয়

করা হয়। এই অবস্থায় বৃটিশ সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে কোম্পানী টাকা ও কর দিতে সম্মত আছেন। * * *

এইরূপে যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে মন্ত্রীরা উপযুক্ত যুক্তি দেখাইতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ে বাদশাহ শাহ আলমের লিখিত পত্র যদি ইংলণ্ডের রাজার হস্তগত হইত, তবে তাহাই মন্ত্রীদিগের যুক্তি সমর্থনের কারণ হইত। সেই জন্য কোম্পানীর স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ক্লাইব বাদসাহের পত্রখানি প্রেরণে বিরত হইয়াছিলেন।

ক্লাইব কোম্পানীর কল্যাণকল্পেই সে কাজ—প্রতারণা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হইলেও তাহাতে তাঁহার কার্য্য সমর্থন করা যায় না। বিশেষ তিনি যে লক্ষ টাকা বাদশাহকে প্রত্যর্পণ করেন নাই, তাহাতেও তাঁহার অর্থলোভের পরিচয় সপ্রকাশ। এই কার্য্য যে ক্লাইবের হীন চরিত্রের সহিত সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য-সম্পন্ন, তাহা বলা বাহুল্য।

যদিও মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীনের পর্য্যটন-বিবরণ তিনি যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার একখানি নকল (অথবা মূল পাণ্ডুলিপি) তাঁহার পরিবারস্থদিগের নিকট আছে, তথাপি যে তাহার মূল অথবা ইংরেজী বা বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। যে ইংরেজী অনুবাদের উল্লেখ আমরা করিয়াছি, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। বিশেষ তাহা ইংরেজের কৃত এবং অনুবাদক ইচ্ছা বা সুবিধামত অনেক অংশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। যে ক্যাপ্টেন সুইনটনের সঙ্গে মীর্জ্জা ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে মীর্জ্জা যে সকল মন্তব্য করিয়াছিলেন, অনুবাদক সে সকল বর্জ্জন করিয়াছেন—এমন কি, ক্যাপ্টেনের নামোল্লেখও করেন নাই;—পাছে তাঁহার সম্বন্ধীয় মন্তব্য পাঠ করিলে তাঁহার বংশধরগণ লজ্জানুভব করেন। আরও কতকগুলি মন্তব্য রুচিসঙ্গত নহে—এই যুক্তি দেখাইয়া অনুবাদক বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সে সকলে তৎকালীন ইংরেজ-সমাজের ত্রুটি দেখান হইয়াছিল বলিয়াই ইংরেজ অনুবাদক সে সকল বর্জ্জন করিয়াছেন। আপনাদিগের নৈতিক হীনতা গোপন করিবার জন্য ইংরেজদিগের আগ্রহের পরিচয়ের অভাব নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দেও কলিকাতায় বিদেশগামী উৎকৃষ্ট জাহাজ নির্ম্মিত হইত এবং ভারতীয় নাবিকরা সেই সকল জাহাজে বিদেশে পণ্য লইয়া যাইত। ইংলণ্ডের যে নির্ম্মাণ-শিল্পের স্বার্থরক্ষার্থ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা নির্দ্দেশ দেন—ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্যে ভারতে নির্ম্মিত জাহাজ ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। যে সকল কারণ দেখাইয়া তাঁহারা এই অন্যায় ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছিলেন, সে সকলের অন্যতম এই যে, ভারতীয় নাবিকরা ইংলণ্ডে যাইয়া এমন সকল ব্যাপার দেখিবে যে, তাহাতে তাহারা আর ইংরেজের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম পোষণ করিতে পারিবে না এবং যখন ভারতের লোক তাহাদিগের বর্ণনা শুনিবে, তখন আর ইংরেজের পক্ষে ভারতে প্রভুত্ব রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

যখন এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রমুখ ব্যক্তিরা কিরূপ দুর্নীতি-দুষ্ট ছিলেন, তাহা তৎকালীন কলিকাতায় ইংরেজ সমাজের ব্যবহারেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদিগের দুর্নীতির কথা প্রকাশ করায় তৎকালীন সংবাদপত্র দলিত করিবার জন্য গভর্ণর হেষ্টিংস ও প্রধান বিচারক ইম্পে একযোগে কাজ করিয়াছিলেন।

ডোভারে উপনীত হইয়া মীর্জ্জা একটি সরাই বা হোটেলে অবস্থিতি করেন এবং সহরের ও উপকণ্ঠের দ্রষ্টব্য স্থানাদি দর্শন করেন। তথায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের ভীড় হইত। তাহারা পূর্ব্বে কখন তাঁহার মত বেশধারী লোক দেখে নাই। তাঁহার লিখিত বিবরণের কতকাংশ যে ইংরেজীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ ইংরেজী পুস্তকে মীর্জ্জার একখানি প্রতিকৃতি আছে। বাঙ্গালী মুসলমান হইলেও তিনি বাদশাহ কর্ত্তৃক ওমরাহ সম্প্রদায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং দিল্লী দরবারে ওমরাহগণ যেরূপ বেশ পরিধান করিতেন—বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে যাইয়া সেইরূপ বেশই ব্যবহার করিতেন। মস্তকে বিরাট পাগড়ী—পরিধান দীর্ঘ ও বিপুল জোব্বা। চিত্রে দেখা যায়, তাঁহার পশ্চাদ্দিকে অঙ্গভাররক্ষার্থ তাকিয়া এবং সম্মুখে ফুরশী অর্থাৎ ধূমপানের হুকা। তাকিয়া ও ফুরশী তিনি ইংলণ্ডেও ব্যবহার করিতেন কি না বলা যায় না—কারণ, তথায় হুঁকার তামাক পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হয়, তিনি তাঁহার সমসাময়িক দরবারীদিগের বিলাসোপকরণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ভারতে বিলাসী মোগল বাদশাহদিগের সময়ে

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা—বিশেষ মুসলমানরা—বাদশাহের অনুকরণে বিলাস-সজ্জা ভালবাসিতেন। ওমরাহ প্রভৃতির মধ্যে এই বিলাস-বাহুল্য যে ঔরঙ্গজেবের সময়ে মোগলদিগের পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোদ্ধা বাবরের কঠোর জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিলাস-ব্যসন-ব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ডোভারে অবস্থান কালে মীর্জ্জা এক দিন আনন্দ লাভের জন্য নৃত্য দেখিতে নৃত্যশালায় নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তিনিই সমবেত নরনারীর লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছিলেন।

কয় দিন পরে ক্যাপ্টেন সুইন্‌টন ডোভারে যাইয়া মীর্জ্জাকে লণ্ডনে লইয়া যা'ন। তথায় তিনি ক্যাপ্টেনের ভ্রাতার গৃহে অবস্থিতি করেন।

মীর্জ্জাকে দেখিবার জন্য ডোভারে যেরূপ লোকসমাগম হইত, জনবহুল লণ্ডনে যে তদপেক্ষা অধিক জনসমাগম হইত, তাহা বলা বাহুল্য। লণ্ডনের লোক পূর্ব্বে ভারতীয়দিগের (বাঙ্গালীর) মধ্যে কেবল চট্টগ্রামের ও ঢাকার নাবিকদিগকেই দেখিয়াছিল—তাহারা মীর্জ্জাকে দেখিয়া বাঙ্গালার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়া দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তিনি পথে বাহির হইলে—বহু দর্শক তাঁহার সহগামী হইত এবং পথিপার্শ্বস্থ গৃহসমূহের বাতায়ন ও ছাত কৌতূহলী দর্শকে পূর্ণ হইয়া যাইত।

মীর্জ্জা লণ্ডনে নানা প্রসিদ্ধ গৃহ দেখিয়াছিলেন এবং যে ঘরে কৃত্রিম উপায়ে তাপ রক্ষা করিয়া কোন কোন য়ুরোপীয় উষ্ণপ্রধান দেশের গাছে ফল ফলাইতেন, তাহাও দেখিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনায় বলেন, লণ্ডন নগরের রাজপথ প্রশস্ত—পথের দুই পার্শ্বে ত্রিতল ও চারিতল গৃহ—পথচারীদিগের জন্য পথের দুই ধারে একাংশ পাদচারীদিগের ব্যবহার্য্য। গৃহগুলির প্রথম তলে দোকান—উপরে লোকের বাস—সর্ব্বোচ্চ তলে ভৃত্যদিগের থাকিবার ব্যবস্থা। গৃহদ্বারে পিত্তল-ফলকে গৃহবাসীর নাম লিখিত। দোকানীদিগের ব্যবসা দ্বারে সংবদ্ধ চিত্রফলকে সপ্রকাশ—জুতার দোকানের চিহ্ন জুতা, রুটির দোকানের চিহ্ন রুটি, ফলের দোকানের চিহ্ন নানারূপ ফল—অঙ্কিত। পথে ৩০ হাত ব্যবধানে দণ্ড—তাহাতে লণ্ঠন ঝুলান; দিনে লোক লণ্ঠন পরিষ্কার করিয়া তেল ও পলিতা ঠিক করিয়া যায়—সন্ধ্যায় লোক মশাল লইয়া আলো জ্বালিয়া দেয়।

মীর্জ্জা লক্ষ্য করেন, ইংলণ্ডে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা—এমন কি, রাজপুত্ররাও দিবাভাগে ও রাত্রিকালে পদব্রজে গমনাগমন করেন—সঙ্গে ভৃত্যও থাকে না। ভারতে ধনীদিগের ও ওমরাহ প্রভৃতির এরূপ ভাবে ভ্রমণ অসম্মানজনক ছিল। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও জানা গিয়াছে, হায়দ্রাবাদে কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান জীবনে কখন গৃহের দ্বিতল হইতে অবতরণ করেন নাই!

মীর্জ্জা বৃটিশ মিউজিয়মে যে সকল দ্রব্য উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে ছিল—দেবনাগর, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তক; আরবী, ফার্সি, চীনাভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি; ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের গভর্ণর কর্ত্তৃক প্রেরিত একখানি এক পোয়া ওজনের হীরক এবং ঢোলক, মাদল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র।

মীর্জ্জা লণ্ডনে রঙ্গালয় ও সার্কাস দেখিয়াছিলেন এবং কিরূপে রঙ্গালয় পরিচালিত হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি অক্সফোর্ডে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরাতন গির্জ্জা প্রভৃতি দেখেন। তথায় অধ্যাপক হার্ট তাঁহাকে কয়খানি ফার্সী পাণ্ডুলিপি দেখান ও তিনি একটি রচনা নকল করিয়া ল'ন। তিনি মানমন্দিরে দূরদর্শন যন্ত্র ও চিকিৎসা-শিক্ষাগারে লৌহতারে বদ্ধ নরকঙ্কাল দেখেন।

অক্সফোর্ড হইতে মীর্জ্জা স্কটলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় তুষারপাত দেখিয়া তাহার বর্ণনা করেন। তিনি লিখেন, স্কচরা মিতাহারী, সাহসী ও বীর। স্কচরা ইংরেজদিগকে ভোজনবিলাসী ও সাহসহীন বলিয়া এবং ইংরেজরা স্কচদিগকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিত। দরিদ্র স্কচরা পাত্রীর যৌতুকের অর্থ না থাকিলে বিবাহ করিতে চাহিত না; সেই জন্য তথায় অনূঢ়া বৃদ্ধার সংখ্যাধিক্য ছিল। তিনি হাইল্যাণ্ডারদিগের শ্রমশীলতার, সরলতার ও দারিদ্র্যের নানা বিবরণ দিয়াছিলেন।

মীর্জ্জা য়ুরোপের ইটালী, জার্ম্মাণী, ডেনমার্ক, পর্ত্তুগাল, আলিমান (হল্যাণ্ড), স্পেন প্রভৃতি দেশের উল্লেখ করেন এবং বলেন, নিজামী তাঁহার সেকন্দরনামায় রুশিয়ার যে বর্ণনা দিয়াছেন, রুশিয়া তাহা হইতে অনেক ভিন্নরূপ। রুশিয়ার সম্রাট পিটার কিরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভার্থ স্বয়ং ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন ও আর কয় জন রুশকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও মীর্জ্জা বিবৃত করেন।

তাঁহার ইংলণ্ডে বাসের শেষ কালে মীর্জ্জাকে অন্ততঃ দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা হয়। তাঁহাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সীর অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিতে বলা হয়। তাঁহাকে যশের ও প্রভাবের লোভ দেখান হয়—বাঙ্গালায় পরিজনগণকে পাঠাইবার জন্য অর্থ দিবার কথা বলা হয় এবং এমন কথাও বলা হয় যে, ইংলণ্ডে তিনি এক বা একাধিক ইংরেজ নারী বিবাহ করিতে পারিবেন। শেষোক্ত প্রস্তাবে মীর্জ্জা উত্তর দেন—"স্বদেশে দারিদ্র্য বিদেশে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আমার স্বদেশের শ্যামাঙ্গী—বিদেশের পরীর মত সুন্দরী অপেক্ষাও আমার নিকট আদরের।"

কেহ কেহ মনে করেন, মীর্জ্জার মন বুঝিবার জন্য, ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে এক বা একাধিক ইংরেজ নারী বিবাহের কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের জন্য ইংরেজের পক্ষে যে এইরূপ প্রলোভন দেখান অসম্ভব নহে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রার রাজা ইংরেজ স্ত্রী পাইলে বিনিময়ে ইংরেজদিগকে ব্যবসা করিবার অধিকার দিতে চাহিলে, ইংরেজরা সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিতে চাহেন নাই!

ক্যাপ্টেন সুইন্‌টন মীর্জ্জাকে তাঁহার সহিত পর্য্যটনে যাইতে বলেন, কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচ জন্য মীর্জ্জার ভৃত্যকে সঙ্গে লইতে অস্বীকার করেন। অন্যান্য দেশ দেখিবার জন্য মীর্জ্জার প্রবল আগ্রহ থাকিলেও তিনি ভৃত্যকে সঙ্গে না লইয়া যাইতে অসম্মত হ'ন; কারণ, তিনি মুসলমানাতিরিক্ত কাহারও প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে ক্যাপ্টেন ধৈর্য্য হারাইয়া বলেন, ভারতে বহু মুসলমান রাজা রাজপুত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভৃতি গোপনে মদ্যপান করেন—কিন্তু সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রকাশ্যে তাহা করেন না—মীর্জ্জা রাজবংশীয় নহেন, তিনি ইংলণ্ডে মুসলমানাতিরিক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করিলে কেহ তাহা জানিতেও পারিবে না—সুতরাং মীর্জ্জা অনায়াসে তাঁহার

প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন। তাহাতে মীর্জ্জা বলেন—মহত্ত্ব, অর্থ বা ক্ষমতাসাপেক্ষ নহে—তাহা পবিত্রতা জ্ঞান ও ব্যবহারে আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। যদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করেন, তবে তাঁহারা অন্যায় করেন।

একবার মীর্জ্জা ক্যাপ্টেন সুইন্‌টনের সঙ্গে স্কটলণ্ড হইয়া লণ্ডনে আসিতেছিলেন। যানে স্থানাভাব হেতু তাঁহার ভৃত্য (সে-ই তাঁহার জন্য আহার্য্য রন্ধন করিত) সঙ্গে আসিতে পারে নাই। পথে বহু হোটেল থাকিলেও মীর্জ্জা অমুসলমানের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণে অসম্মত হ'ন। ফলে তাঁহারা যখন লণ্ডনে উপনীত হ'ন তখন মীর্জ্জা ক্ষুধায় মূর্চ্ছিত—মৃতপ্রায়। বাদাম ও কিসমিসের সরবত পান করাইয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা হয় এবং তাহার পরে তিনি স্বপাকের আহার্য্য গ্রহণ করিয়া সুস্থ হ'ন।

মীর্জ্জা যে দুই বৎসরকাল ইংলণ্ডে ছিলেন, তাহার মধ্যে কখন অসুস্থ হ'ন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি উত্তর দেন, পাছে বিদেশে রোগগ্রস্ত হইলে তাঁহাকে মদ্যসংযুক্ত ঔষধ গ্রহণ করিয়া পাপগ্রস্ত হইতে হয়, সেই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন—স্বল্পাহার করিতেন ও মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতেন।

ক্লাইবের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায় মীর্জ্জা দুই বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন। ক্লাইব স্বদেশে ফিরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ক্যাপ্টেন সুইন্‌টনকে বলেন, পত্রের ও টাকার বিষয় যেন প্রকাশ করা না হয়। ক্যাপ্টেন মীর্জ্জাকে সে কথা জানাইলে, তিনি হতাশ হইয়া পড়েন এবং বুঝেন, তিনি আর বাদশাহকে মুখ দেখাইতে পারিবেন না।

তিনি অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মীর্জ্জা মনে করিয়াছিলেন, স্বদেশে ফিরিয়া স্বগ্রামে শান্তিতে বাস করিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। তখন চারি দিকে বিশৃঙ্খলা—যুদ্ধ প্রভৃতি। আবার দিল্লীর সিংহাসন লাভের আশায় শাহ আলম মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। মীর্জ্জা আবার ইংরেজের চাকরী লইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং কার্য্যব্যপদেশে পুণায় ও সাতারায় গমন করেন। মনে হয়, তিনি বড়লাট হেষ্টিংসের, কর্ণওয়ালিশের এবং হয়ত ওয়েলেসলীর অধীনেও চাকরী করিয়াছিলেন।

বোধ হয় ১৮০০ বা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মীর্জ্জার মৃত্যু হয়।

এ দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাঙ্গালী মীর্জ্জা ইতেশামুদ্দীনই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহার পর্য্যটন-বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি বুদ্ধিমান হইলেও গালগল্পে বিশ্বাস করিতেন এবং সেইজন্য মৎস্যকন্যার কথা যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমান বাদশাহের অনুরক্ত ছিলেন। বিদেশে তিনি মিতব্যয়িতা সহকারে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, নহিলে মাত্র চার হাজার টাকায় তিনি ভৃত্যসহ দুই বৎসর বিদেশে থাকিতে পারিতেন না। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং তাঁহার রচনানৈপুণ্য তাঁহার শিক্ষার সার্থকতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় প্রকাশ করে।

জন্মভূমি

শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায়

তোমারে বেসেছি ভাল পরাণে।
তোমারে লেগেছে ভাল নয়নে,
শত কাজে শত বারে দেখি তোমা প্রাণ ভরে;
মোর জীবনের বীণা বাজে গীত-ঝংকারে।

গাছে গাছে পাখী ডাকে।
তরুণ তপন জাগে।
দখিণ বাতাস বহে কাননে কাননে
তোমারে বেসেছি ভাল পরাণে।

ছল ছল কল কলে,
ঢেউ ওঠে দুলে দুলে,
সে সুর মিলায়ে ঐ দূর বননয়নে।
তোমারে বেসেছি ভাল পরাণে।

প্রভাত হইল যবে কৃষকেরা মাঠে চলে
রাখাল বালক ধায় লয়ে ধেনু দলে।
মাঠে মাঠে দিকে দিকে,
সবুজ বরণে ঢাকে,
উপবন ছায়ি আছে ঝরা মুকুলে
রাখাল বালক ধায় লয়ে ধেনু দলে।

ছোট বীথি পথখানি,
দিয়াছে আঁচল টানি,
কাঁপিছে হৃদয় তার মৃদু-মধু তালে।
রাখাল বালক ধায় লয়ে ধেনু দলে।
মধ্যাহ্ন বহিয়া যায় তরুবন-শিরে।
বিহঙ্গ কাকলীগান সম্মিলিত সুরে।
জানায় বিদায় সবে
সন্ধ্যা-সূর্য্যদেবে
ত্বরায়ে কুলায়ে চলে শান্ত-স্নেহ ভরে।
বাজে বেণু গানে গানে,
চলে সবে গৃহ পানে,
গোঠে ধায় শ্রান্ত ধেনু ডাকে ক্লান্ত স্বরে
সায়াহ্ন বহিয়া যায় তরুবন-শিরে।
নিজ নিকেতন-মাঝে,
বধূ দল ধায় সাঁঝে,
কাঁকণ বাজিয়া ওঠে চঞ্চল সুরে।
সায়াহ্ন বহিয়া যায় তরুবন-শিরে।
শান্ত হে সুন্দরি পূর্ণ তুমি ধনে;
স্মৃতি তোমা জাগি রবে আমার পরাণে।

বই পড়ার উপকারিতা

ব্রজেন রায়

ছোটদের বই পড়া। কথাটা একটু ভেবে দেখবার মত। বাঙলা দেশে বইতো অনেকই আছে, এমন কি আজকের দিনে ছোটদের গ্রন্থেরও অভাব নেই এদেশে। তবুও স্বতঃই প্রশ্ন আসে। ছোটরা কি পড়বে, অর্থাৎ কোন্ ধরণের বই পড়বে?

বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন, প্রচার এবং প্রসারের দিক থেকেই ছোটদের জন্য গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষগণ এবং শ্রীরামপুর মিশনারীর খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ বহুভাবে চেষ্টা করেছেন, আমাদের দেশের ছোটদের জন্যে বই রচনার। তাঁরা বই প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছিলেন কিছু কিছু। কাঠের অক্ষরে বই ছেপে সেকালের ছোটদের শিক্ষার সহযোগে কিছু কিছু আনন্দও বিতরণ করে গেছেন এঁরা। অবশ্য আমাদের দেশে যে যুগে বই ছাপার কোন ধারণাই ছিল না, সে যুগেও ছোটরা আনন্দ পেয়েছে ঠাকুর্মা-দিদিমাদের মুখে মুখে প্রচারিত রূপ-কথা উপকথার গল্প থেকে। সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র' বইটির সুন্দর সুন্দর শিশু-শিক্ষার উপযোগী অনেক গল্প সেদিন সংস্কৃত এবং সম্ভবমত বাঙলায় তর্জমা করে ছোটদের শোনান হোত, বৌদ্ধজাতকের গল্পও বলা হোত! এতে আনন্দের খোরাকও ছিল প্রচুর, সেই সঙ্গে শিক্ষারও একটি গম্ভীরতর উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল। এর পর মুসলমানী আমলে বাঙলা সাহিত্যে এল আরব-পারস্যের মজার মজার রূপকথা-উপকথা, আশ্চর্য্য প্রদীপ আর অদৃশ্য মানুষের গল্প, দৈত্যদানার কাহিনী। রূপকথার এর আগেও আমাদের দেশে প্রচলন ছিল। আরব আর পারস্যের রূপকথা তাতে নতুন প্রাণের বন্যা এনে দিল। শিশুদের ভাব কল্পনার জগত আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষ ছেড়ে আরবের মুসলমানী রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য শোভা মুগ্ধভাবে উপভোগ করতে লাগলো। এরপর এল ইউরোপের সংস্পর্শ, রোম আর গ্রীস, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সের রূপকথা, ফেয়ারি টেলস, লিজেণ্ডস্। এদের প্রকৃতি ভিন্ন। তবুও এ দেশের ছোটদের জগতে এরা অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করলো। বাঙলা বই ছাপা হওয়ার আগে এ সবই ছিল মুখে মুখে। বই যখন ছাপার প্রশ্ন এল, তখন উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভীষণ সমস্যা দেখা দিল। বাঙালী শিশুর জন্যে তাঁরা কি ধরণের বই ছাপবেন?' যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁরা এসেছেন শিক্ষার প্রচার করতে। কিন্তু শিখবে কারা? ছোটরাই। ইউরোপ তখন শিশুদের আনন্দ বিতরণের জন্যে সুন্দর সুন্দর বই ছাপতে সুরু করেছে। ছোটদের জগতে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়েছে। এদেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উইলিয়াম কেরী সাহেব। তিনি অনেক ভেবে চিন্তে, বাঙলা দেশের সব জায়গা ঘুরে ঘুরে ঠাকুর্মা-দিদিমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন এ দেশের বহুকাল মুখে মুখে প্রচারিত রূপকথা—উপকথা। তাঁর সেই সংগ্রহ কীর্ত্তির নাম 'ইতিহাসমালা'। এই ইতিহাসমালাই বাঙলা সাহিত্যে ছোটদের জন্যে প্রথম মুদ্রিত বই। 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয় সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর মিসনারী প্রেস থেকে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। এই সময়েরই আর একখানি বই 'শিশুবোধক,' এটি প্রধানতঃ শিশু-শিক্ষামূলক। এর পর থেকেই ছোটদের জন্যে গ্রন্থ প্রণয়নের একটি তীব্র ইচ্ছা দেখা যায় এবং ইউরোপের অনুকরণে এদেশের প্রকৃতি অনুযায়ী ছোটদের জন্যে চিত্তাকর্ষক বই লেখা হতে থাকে। সেকালের বাঙলা 'চকমকির বাক্স,' 'ছোট কৈলাস বড় কৈলাস', 'কুৎসিত হংসশাবক' ছোটদের শিক্ষার মাধ্যমে কিছু কিছু আনন্দ বিতরণ করতে থাকে।

এ সময়ে আমাদের দেশের মনস্বীগণেরও দৃষ্টি ছোটদের সাহিত্য প্রণয়নের দিকে নিবদ্ধ হয়। কেশবচন্দ্র সেন লণ্ডনের 'চিলড্রেন্স ফ্রেণ্ডের' অনুকরণে কাঠের ব্লকের সাহায্যে সচিত্র 'বালকবন্ধু' নামে একটি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বালকবন্ধু'ই আমাদের দেশের প্রথম ছোটদের কাগজ। এর পর প্রমদাচরণ সেন 'সাথী' ভুবনমোহন রায় 'সাথী' ('পরে সখা ও সাথী'), শিবনাথ শাস্ত্রী 'মুকুল', জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশ করে শিশুদের আনন্দ দেওয়ার রত্নখনির সন্ধান করেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রকাশ থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত আধুনিক শিশু সাহিত্যের ধারাটি অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে বাঙলার শিশু সমাজকে অনাবিল আনন্দ দানের চেষ্টা করছে। শিশুদের জন্যে সর্বপ্রথম ছোটদের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এঁর আগে ছোটদের মনের কথা বিশেষ কেউ বলেন নি। এই সব ছোটদের উপযোগী পত্রিকা কেন্দ্র করেই বিভিন্ন সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, এবং নিজ নিজ যুগের প্রতিভূ স্বরূপ ছোটদের সাহিত্য প্রণয়ন করে গেছেন এবং বর্তমানেও যাচ্ছেন। শিশু-সাহিত্যের এই দীর্ঘদিনের ইতিহাসের মধ্যে ছোটদের উপযোগী অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়।

শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস থেকে ছোটদের আনন্দ দেওয়ার সন্ধান প্রকৃষ্ট রূপে পাওয়া গেল। আমাদের দেশের ছোটরা পড়ছে সবই, এক ধার থেকেই পড়ছে তারা। সময় বিশেষে বড়দের সাহিত্য নিয়েও তারা নাড়াচাড়া করছে। এতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসৃত হচ্ছে না, বয়সানুসারী গ্রন্থ নির্বাচন নেই, মানসিক উন্নতি অনুযায়ী আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বই পড়ে না। তারা বই পড়ে, বই পড়ার নেশায়—শিক্ষার জন্যে পড়ে কজন সন্দেহ! তবে এই পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ। সে আনন্দ লাভের আশায় বিশেষ সিরিজের গতানুগতিক রোমাঞ্চকর বই পড়তেও তাদের এতটুকু ইতস্ততঃ নেই। বাইরের বই পড়ার বাধ্যবাধকতার কঠিন রীতিনীতির সমর্থন না করেও এ কথা বলা যায়। অন্ততঃ নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম অনুযায়ী প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের নির্দ্দিষ্ট বই পাঠ করে নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য! আজে-বাজে পড়ে সময় নষ্ট করার চাইতে রুচি অনুযায়ী জ্ঞান সঞ্চয় ছাত্রজীবনকেও বিশেষ সহায়তা করে।

বিলেতে এটা আছে, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও আছে। ছোটদের বয়স এবং উন্নতির মান অনুযায়ী বই নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

সময়ও। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছোটরা যাতে সে বই পড়ে নিতে পারে, অভিভাবকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে সে দিকে। কিন্তু আমাদের? আমাদেরই বা নেই কেন? শিক্ষার সংস্কার সাধন করার মত ছোটদের মনের সংস্কার সাধন করা আজকের দিনে চরম কর্ত্তব্য বলেই মনে হয়। তাই নয় কি! শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁরা ভাবেন ছোটদের অ-আ-ক-খ আর ইউনুভার্সিটির নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হলেই সব হোল, বই প্রকাশকরাও এঁদেরই দলে অনেক ক্ষেত্রে। প্রকাশকদের ক্ষেত্রে অবশ্য এ রীতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষা বিষয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছোটদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার গণ্ডীর বাইরে ছোটদের আনন্দ দেওয়ার যে বৃহত্তম জগত আছে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছেন কি?

এতো গেল বই রচনা এবং প্রকাশের কথা। এবার যারা বই পড়বে, বিশেষ করে যারা কিনে পড়বে—তাদের কথা ভাবা আজকের দিনে খুবই দরকার। ছোটদের স্কুল কলেজের বই-ই সত্যি অনেক অভিভাবক এবং বাপ-মা কিনে দিতে পারেন না, বাইরের জ্ঞান সঞ্চারের জন্য যে বই কিনতেই পারবেন না, এ তো খুবই সত্য কথা। বাধ্য হয়ে ছোটরাও লাইব্রেরীর সন্ধান নেয়। সেখানেও কিছু কিছু আর্থিক সমস্যা আছে, তবু সেটা সহ্য করা যায়। কিন্তু এমনও বই আছে, যা ছোটদের নিত্যসঙ্গী হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। সে বইগুলি লাইব্রেরী থেকে নিলে কাজ চলে না, সর্বদাই কাছে কাছে রাখা চাই।

অনেক অভিভাবক আছেন, যাঁরা খেয়ে না-খেয়ে বই কেনেন, নিজেদের জন্যেও—ছোটদের জন্যেও। এঁদের কথা স্বতন্ত্র। তবে আমাদের দেশে বই কেনা একটা মহা সমস্যার ব্যাপার। বইয়ের তুলনায় দাম অনেক বেশী, তাই অনেকে বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও বই কিনতে পারেন না। এটা অন্য দেশে নেই। সাধারণ পাঠক, ছোট বড় উভয়ের জন্যেই ইউরোপের বই প্রকাশকদের বিশেষ নজর আছে। বিশেষ বিশেষ দুর্মূল্য বইএরও তাঁরা সুলভ সংস্করণ বের করে পাঠকদের পরিপূর্ণ বই পড়ার সুযোগ দেন।

এদেশের ছোটদের গ্রন্থাগারের সৃষ্টির ব্যাপারে অনেকেই অমনোযোগী। যাঁরা ভুঁইফোড় ভাবে দু'একটা ছোটদের গ্রন্থাগারের সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের আর্থিক সাহায্য এবং প্রকাশকদের বিশেষ বিশেষ বই দিয়ে সাহায্য করার অভাবে, অবস্থা খুবই শোচনীয়। আসলে ছোটদের বাইরের শিক্ষা বিষয়ে আমরা ততটা উন্নত নই, উৎসাহীও নই। কিন্তু এভাবে চলবে কদিন? জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে ছোটদের সঠিক ভাবে মানসিক উন্নতির দায়িত্ব যদি কেউ না নেয়, বিশেষ করে সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের যদি সুপরিকল্পিত ভাবে পরিচালিত না করা যায়, তাহলে তারা সস্তা ধরণের নভেল আর রোমাঞ্চকর বই পড়ে পড়ে সারাটা ছোটবেলা কাটিয়ে দেবে। ছোটদের বই পড়ার সঙ্গে আনন্দের গভীরতর সম্বন্ধ আছে, এর সঙ্গে শিক্ষারও একটি যে সৎ উদ্দেশ্য আছে, এটা ভুললে চলবে কি করে? আনন্দটা বড় কথা হলেও শিক্ষাকে একেবারেই বাদ দেওয়া বিশেষ উচিত হবে না।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমিত্রা চট্টরাজ

ইংলণ্ডের Royal Institution এ বক্তৃতা হবে। Royal Institution of Science তখন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। একদিন এই প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা হওয়ার জন্য তুমুল আয়োজন হয়েছে। কিন্তু টিকিট না থাকলে এ প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা শোনা যেতো না। বক্তৃতার বিষয় ছিল—বিজ্ঞান। তখনও বিজ্ঞান-চর্চ্চাকে ইংলণ্ডের লোক এতটা মূল্য দেয়নি। তবুও প্রতিষ্ঠানের সুমুখে তিলধারণের স্থান নেই।

এক দিকে বিরাট আয়োজন হচ্ছে—অপর দিকে জর্জ্জ রিবোর দফতরীখানায় এক যুবকের অন্তরের পরম জিজ্ঞাসা অংকুরিত বীজের ন্যায় মাথা তুলে উঠছিল। সে সময় এক ভদ্রলোক 'Encyclopaedia Britannica' বইখানি বাঁধতে দিয়েছিলেন রিবোর দফতরীখানায়। বইখানা উল্টোতে উল্টোতে মধ্যস্থিত 'বিদ্যুৎ' কথাটা তাঁর (যুবকটির) দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি সমস্ত বইখানাকে শেষ করে ফেললেন। সংগে সংগে দস্তার টুকরো এবং পেনী নিয়ে তাদের মধ্যে জলসিক্ত বস্ত্র খণ্ড জড়িয়ে তিনি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করতে বসে গেলেন। এমন গভীর যাঁর আকাঙ্ক্ষা, তিনি কি তখনকার ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে না ওঠেন? ইচ্ছা যাঁর থাকে, ঈশ্বর তাঁর সহায় হন। যুবকটির ভাগ্যে টিকিট জোগাড় হয়ে গেল। মিঃ জোনস্ বলে এক ভদ্রলোক যুবককে একটি টিকিট জোগাড় করে দিলেন।

মিঃ জোনস্ হয়তো সেদিন জানলেন না যে, এই সামান্য উপকারটুকুর জন্য সেদিনকার ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ নগণ্য লোকের মধ্যে তাঁর নাম অমর হয়ে গেল। খাতা পেন্সিল সংগ্রহ করে Royal Institution এ প্রবেশ করলেন। কত যশস্বী লোক আসছেন—গম্ভীর ভাবে আসন গ্রহণ করছেন—তাঁদের বই পড়ার ইচ্ছে হলে দফতরীতে চাকরী নিতে হয় না। তাঁদের মত জ্ঞান আয়ত্ত করা কী তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে? আর যিনি বক্তৃতা দেবেন—তাঁর কী সে বিদ্যা, যার কাছে সমগ্র ইউরোপ নত?

যুবকটি আপনার মনে ভাবতে থাকে। আজ যাঁর প্রতি সমস্ত ইউরোপ প্রভাবান্বিত, শ্রদ্ধান্বিত, তিনি তো তাঁরই মত অতি দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই মতো অল্প লেখাপড়া শিখে এক ডাক্তারের কাছে শিক্ষানবিশী করতে হতো। সে সময়েই ডাক্তারখানায় তিনি পুরানো ওষুধের শিশি, কাচের নল ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করতেন। কিছুদিনের মধ্যেই রসায়নে পারদর্শিতা লাভ করে 'নাইট্রস অক্সাইড' নামক একরকম গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

লোকের বদ্ধধারণা ছিল যে, এই গ্যাস মারাত্মক বিষ। সত্য নির্ণয় করবার জন্য তিনি সেই গ্যাস এক দিন নিজের ওপরেই প্রয়োগ করে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অজ্ঞানাবস্থায় তিনি এক কল্পরাজ্যে চলে গেলেন, সেখানে কখনও আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও খুব জোরে হাসছেন। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে তাঁর শরীরের সমস্ত গ্লানি কেটে গেল। এই গ্যাসই আজ জগতে বিখ্যাত 'হাস্যোদ্দীপক' (Laughing Gas) গ্যাস।

পরবর্ত্তী জীবনে মানুষের কল্যাণের দিক থেকে তাঁর সব চেয়ে বড় আবিষ্কার 'সেফটি ল্যাম্প'। ওই ল্যাম্প তৈরী করে তিনি হতভাগ্য খনি-শ্রমিকদের জীবন রক্ষা করেছেন।

বক্তৃতা শুনে যুবকটির চিত্তে সহস্র-শিখায় বিজ্ঞানের রহস্য অনুসন্ধানের স্পৃহা জেগে উঠলো। বক্তা বৈজ্ঞানিককে চিঠি লিখে যুবকটি Royal Institution এ চাকরী পেলেন। বেতন হ'ল সপ্তাহে ২৫ শিলিং। অতি মনযোগের সহিত তিনি কাজ করে যেতে লাগলেন।

জীবনের অতি নিম্নস্তর থেকে আপনার সাধনার বলে তিনি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যুৎ এবং চুম্বকতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অন্যতম প্রধান গবেষণা প্রকাশ করলেন। সে গবেষণার ফলেই আজ পৃথিবীর প্রত্যেক সহরের রাস্তায় রাস্তায় মোটর গাড়ী, ট্রাম গাড়ী চলে। দেশে দেশে নানান্ যন্ত্র মানুষের 'জন্য' নানান্ জিনিষ উৎপন্ন করে চলেছে।

অসামান্য প্রতিভাগুণে কিছুকালের মধ্যেই তিনি Royal Institution of Science এর সভাপতি হয়েছিলেন।

এই বক্তা এবং যুবকটি কে জান?

বক্তাটি হচ্ছেন—তখনকার ইংলণ্ডের,—ইংলণ্ডের কেন সমগ্র ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রে ডেভি।

আর যুবকটি হচ্ছেন—পরবর্ত্তী কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে।

নিনা

[ইটালীর রূপকথা]

ইন্দিরা দেবী

সে কালের কথা বলছি।

তখনও রেলগাড়ীর চলন হয়নি। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে লোকজনদের হয় পায়ে হেঁটে নয় তো ঘোড়ায় টানা ভাড়াটে গাড়ী করে যেতে হতো। দীর্ঘ পথ হলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার আগে যাত্রীদের দু'এক জায়গায় রাত্রির মত আশ্রয় নিতে হতো। তাই তখনকার যুগে শহর থেকে দূরে রাস্তার ধারে ধারে থাকতো পান্থশালা। ক্লান্ত পথিক রাত্রির জন্য এখানে বিশ্রাম নিয়ে আবার তার যাত্রা সুরু করতো।

এমনি এক পান্থশালা ছিল ফ্লোরেন্স শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। ফ্লোরেন্সে ইটালির নানা অঞ্চল থেকে লোকজন অনবরত আসা যাওয়া করতো। তাই রাস্তার পাশে এই সরাইখানায় বছরের সব সময়ই লোকজনের ভীড় লেগে থাকতো। সরাইখানার মালিক স্যাড়োরিনি খুব আমুদে আর মিশুক স্বভাবের লোক। অতিথি অভ্যাগতরা তার কাছে প্রচুর আদর যত্ন পেতো। অনেক বছর ধরে সরাইখানা চালিয়ে রিণি অনেক টাকা জমিয়ে ছিল।

কিন্তু টাকার মালিক হলে কি হবে? আসলে রিনির মনে সুখ নেই। বউ মারা যাওয়ার পর একলা সবদিক দেখে শুনে কাজ চালানো ক্রমশঃ তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। দূরের সহরে গিয়ে হাটবাজার করে আনা। যাত্রীদের দেখাশুনো করা, তাদের খাওয়া দাওয়ার সময় হাজির থাকা, হিসেব পত্র রাখা—এসব—একলার পক্ষে কষ্টকর বৈ কি! তারপর ছোট একটি মেয়েও রয়েছে। বউএর মৃত্যুর সময় মেয়েটি ছিল নেহাৎ শিশু। রিণি কাজকর্ম্মের ভিড়ের মধ্যেও মেয়েকে কোলে-পিঠে করে পালন করে এসেছে। এখন তার বয়স ন'দশ বছর। দেখতে অপূর্ব্ব সুন্দরী। মাথাভর্ত্তি—নরম সোনালী রঙের চুল, গোলাপের পাপড়ির মত লাল ঠোঁট, ডাগর নীল দুটি চোখ—আর কী সুন্দর মিষ্টি স্বভাব। যাত্রীরা আসে, দু'চার দিন থেকেই চলে যায়। কিন্তু মেয়েটিকে আদর না করে, তার রূপের প্রশংসা না করে কেউ যেতে পারে না। মেয়েটির নাম নিনা।

রিণির পক্ষে একলা সব দিক সামলানো যখন রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে, তখন বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলো। যাকে বিয়ে করলো সেও খুব সুন্দরী। রিণি ভেবেছিল বিয়ের পর তার কাজের বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে। কিন্তু তার ধারণা ভুল হলো। তার স্ত্রী দেখতে নিখুঁত সুন্দরী হলে কি হবে? কাজে কর্ম্মে তার একেবারে মন উঠতো না। সারাদিন ঘটা করে সেজেগুজে সে বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতো; কেউ এলে তার সঙ্গে দু' চার দণ্ড কথা বলতো—ঐ পর্য্যন্ত। স্বামীর কাজের ভার কমাবার দিকে তার কোন ঝোঁকই ছিল না। তাই রিণির খাটুনী একটুও কমলো না। শুধু তাই নয়, তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। নিনার সঙ্গে তার সংমা'র একটুও বনিবনা হতো না। যাত্রীরা সবাই যখন নিনার রূপের খ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো তখন নিনার সৎ-মা মুখ গোঁজ করে বসে থাকতো—ঈর্ষ্যার আগুনে তার অন্তর জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতো। শেষে এক দিন সহ্য করতে না পেরে সে ষণ্ডামার্কা দু'জন লোককে টাকার লোভ দেখিয়ে বেড়াবার নাম করে তাদের সঙ্গে নিনাকে বনের ভেতর পাঠিয়ে দিল। লোক দুটোর ওপর আদেশ ছিল তারা জঙ্গলে নিয়ে মেয়েটাকে হত্যা করবে। লোক দুটোর চেহারা দেখে নিনার একটুও ভালো লাগেনি। কিন্তু কী করবে? বাপ সওদা করতে শহরে গিয়েছেন। ফিরতে দু'দিন দেরী হবে। চোখের জল মুছতে মুছতে নিনা লোক দুটোর সঙ্গে এগিয়ে চললো। বনের মধ্যে ঢুকে নিনার মুখের দিকে তাকিয়ে লোক দুটোর যেন কি রকম মায়া হলো। এই সরল, নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার কথা তারা ভাবতেও পারলে না। একটা নির্জ্জন জায়গা বেছে নিয়ে একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে নিনাকে বেঁধে রেখে তারা ফিরে এলো। নিনার সৎমা জানলে তার পথের কাঁটা দূর হয়েছে—মেয়েটা আর বেঁচে নেই। রিণি ফিরে এসে খুব কান্নাকাটি করলো। কিন্তু মেয়েকে আর পাওয়া গেল না।

এদিকে লোক দুটো চলে যাওয়ার পর থেকেই নিনা কাঁদতে আরম্ভ করেছে। চীৎকার করে কান্না—কিন্তু ঐ নির্জ্জন বনে কে শুনবে তার কান্না? ক্রমে তার কান্নার শক্তিও কমে এলো! এমনি ভাবে দু' দিন কেটে যাবার পর নিনা যখন জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছে, তখন রাত্রিবেলা অনেকগুলো মানুষের পায়ের আওয়াজ শুনে সে উৎসুক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে অন্ধকারের পানে তাকালো। খানিক বাদেই অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠলো মশালের আলোর রেখা। এক দল ষণ্ডাগুণ্ডা লোক,

হাতে তাদের অস্ত্র শস্ত্র—পিঠে ভারী ভারী বোঝা সেই গাছতলায় এসে হাজির হলো। ঝপঝাপ করে পিঠের বোঝা নামিয়ে তারা সেইখানে বসলো। প্রথমে তারা নিনাকে দেখতে পায়নি। তার পর মশালের আলোতে যখন চার দিকে আঁধার ফিকে হয়ে এলো তখন নিনাকে দেখে তারা অবাক। প্রথমে ভেবেছিল কোন বনদেবী হবে। পরে তাদের ভুল ভাঙলো। দলের সর্দার এগিয়ে গিয়ে মশালের আলোতে দেখতে পেলো ফুলের মত ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে। কঠিন বাঁধনে তার শরীর নীল হয়ে এসেছে—আর দু'চার ঘণ্টা পরেই হয়তো সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়বে। দলপতি মেয়েটির বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল। একটু পরে নিনার জ্ঞান ফিরে এলো। একটু সুস্থ হয়ে তার দুঃখের কথা সে সর্দারকে খুলে বললো। তার কথা শুনে দলের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে সর্দার বললে—'দেখো, আমরা ডাকাতের দল। কিন্তু ডাকাত হলেও আমরা তোমার সৎমা'র মত অত নিষ্ঠুর নই। কাজ নেই তোমার ওখানে গিয়ে। আবার কোন ছুতোয় তোমার বিপদ ঘটাবে। তার চেয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো আমাদের আস্তানায়। তোমায় কোন কষ্ট দোবো না আমরা। আর তোমার কোন বিপদও ঘটবে না—প্রাণের ভয়ও থাকবে না।"

নিনা তাদের প্রস্তাবে রাজী হলো। কাছেই এক ভাঙা-চোরা প্রাসাদে ছিল ডাকাতদের আস্তানা। নিনা সেখানেই আশ্রয় নিলো, বাবার জন্য দুঃখ হয় বই কি! সরাইখানার কথা মনে হলে তার কান্না পায়। কিন্তু সৎমার কথা মনে হলেই ওখানে যাবার ইচ্ছা তার চলে যায়। ডাকাতরা কিন্তু তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতো। যখন যেখানে যেতো শহর থেকে তার জন্য সুন্দর সুন্দর খেলনা, দামী পোষাক, জামা জুতো—এই সব কিনে আনতো। এইভাবে কোন রকমে নিনার দিন কেটে যাচ্ছিল।

ডাকাতরা কখনো কখনো শহরে যায়। এক বার তারা শহর থেকে নিনার জন্য সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো পোষাক কিনে ফিরে আসছিল। রাত হচ্ছে দেখে তারা রিণির সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে। রিণির স্ত্রীর সঙ্গে তাদের আলাপ হলো। তাকে তাদের সওদা দেখালো। রিণির স্ত্রী পোষাক দেখে খুব প্রশংসা করলো। ডাকাতেরা বলে—"এ পোষাক আর কী সুন্দর? যার জন্য এই পোষাক নিয়ে যাচ্ছি, তাকে যদি দেখতে তবে বুঝতে সুন্দর কাকে বলে?" রিণির স্ত্রীর কি রকম সন্দেহ হলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েটি সম্বন্ধে সব কথা জিজ্ঞেস করলে। তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তা হলে নিনা মরেনি—বেঁচে আছে? সে তল্লাটে অতো সুন্দরী মেয়ে নিনা ছাড়া আর কে হতে পারে?

সরাইখানার পাশেই গ্রামের ভেতর থাকতো এক ডাইনী বুড়ি। রাত ভোর না হতেই রিণির স্ত্রী তাকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে মন্ত্র পড়া সূক্ষ্ম জড়ির কাজ-করা এক জোড়া চটি সংগ্রহ করে আনলো। তার পর ডাকাতরা যখন বিদেয় নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসছিল, তখন চটি জোড়াটা তাদের দিয়ে রিণির বউ বললে: 'কিছু যদি মনে না করো তবে এই জুতো-জোড়াটি আমি তোমাদের সুন্দরী মেয়েকে দান করতে চাই। আমার বিশ্বাস, তার পায়ে এ খুব মানাবে।'

ডাকাতরা সরল বিশ্বাসে দান গ্রহণ করে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আস্তানায় ফিরে এলো।

নিনা নোতুন পোষাক পেয়ে মহাখুসী। জুতোজোড়াও তার কম পছন্দ হয়নি। বিকালবেলা সবাই যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, নিনা হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরল। তার পর নোতুন জুতো-জোড়াটা পায়ে দেওয়া মাত্রই কি যেন হলো। তার আর কোন জ্ঞানই থাকলো না। সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো নিনা। রাত্রিবেলা ডাকাতরা ফিরে এসে দেখে, নিনা মাটিতে লুটোচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসও বইছে না। দুঃখে-কষ্টে ডাকাতরা অস্থির হয়ে পড়লো। এ ক'ঘণ্টার মধ্যে কি এমন হলো যাতে এই সুস্থ সবল মেয়েটি প্রাণত্যাগ করলে? কিন্তু কী আর করা যাবে? ডাকাতের সর্দার বললে: 'নিনাকে খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে এমনি ভাবে তাকে রেখে আমরা চলে যাবো এখান থেকে। তার এই সুন্দর দেহের ওপর মাটির আঁচড়ও লাগতে দেবো না।'

সর্দারের কথা সবাইর মনঃপূত হলো। নিনাকে খাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাকাতের দল তাদের পুরাণো আস্তানা ছেড়ে চলে গেল।

এর বেশ কিছুদিন পর এক দিন টাস্কানীর যুবরাজ শিকারে বেরিয়েছেন। একটা হরিণকে তাড়া করতে করতে দলের লোক-জনকে ছাড়িয়ে তিনি একা অনেকদূর এগিয়ে এসেছেন। হঠাৎ হরিণটা একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও তাকে পেলেন না যুবরাজ। ফিরে আসবেন ভাবছেন, এমনি সময় হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো জীর্ণ প্রাসাদের দিকে। নির্জন বনের মধ্যে প্রাসাদ দেখে তাঁর কৌতূহল হলো। এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেলেন তিনি প্রাসাদের দিকে। ফটক খোলাই ছিল। প্রাসাদের ভিতর ঢুকেই দেখতে পেলেন সামনের কক্ষে এক পালঙ্কের ওপর রয়েছে সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে। যুবরাজ ভাবলেন মেয়েটি হয়তো ঘুমিয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে পা টিপে তিনি পালঙ্কের কাছে গেলেন। মেয়েটি তখনও ঘুমে অচেতন। যুবরাজ তার পাশে বসে ভালো করে দেখলেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত পড়ছে না। কী সুন্দর মেয়েটি, আর কী তার পরিণাম? যুবরাজ মেয়েটির গায়ে হাত দিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে—নোতুন পোষাকে ভাঁজ পর্য্যন্ত পড়েনি—চকচকে লাল রংএর জড়ির জুতো পায়ে। সবই ঠিক আছে, শুধু মেয়েটিই বেঁচে নেই? কী আর করেন? যুবরাজ মেয়েটিকে পরম যত্নে আবার যথাস্থানে শুইয়ে রাখছিলেন—এমন সময় তার পা থেকে একটা চটি খসে পড়লো। আর কী আশ্চর্য্য? সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির একখানি চোখ খুলে গেল। যুবরাজ তখন আরেক পাটি জুতো খুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য চোখটিও খুলে গেল। তখন যুবরাজের কি আনন্দ? মেয়েটিও তাকে দেখে কী খুসী? যুবরাজ তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলেন। কিছুদিন পর মহা ধুমধামে তাদের বিয়ে হলো। রাজ্যশুদ্ধ সবাই খুসী। রিণির আনন্দ আর ধরে না। সরাইখানায় মহাভোজ লেগে গেল—হৈ হৈ কাণ্ড। ভোজসভায় সবাই হাজির। শুধু খুঁজে পাওয়া গেল না রিণির বউকে আর গ্রামের সেই ডাইনী বুড়িকে। সে অঞ্চলে কেউ কোন দিন তাদের আর দেখতে পায় নি।

বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী পরিচয়

ইংরাজ ভারতবর্ষে বণিকের মানদণ্ড নিয়ে এসেছিল, রাজদণ্ড হাতে করে ফিরে গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালী ব্যবসাকে খর্ব করার জন্য চেষ্টার তার ত্রুটি ছিল না। বাঙালী ব্যবসাদার এজন্য কোনও দিন পিছপাও হয় নি। বাঙালী তাঁতির বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছে ইংরেজ, বাঙালী কামারের হাঁপর নিয়েছে কেড়ে কিন্তু তবু ফল্গুধারার মত বাঙলার ব্যবসা চলেছে। একদা হিন্দু মেলায় দেশের জ্ঞানীগুণীজন একত্র হয়েছেন দেশের নষ্ট শিল্পকে পুনরায় উদ্ধার করার কাজে। বাঙালী ব্যবসার আধুনিক ইতিহাস তাই শুরু করা উচিত হিন্দুমেলা থেকেই। হিন্দুমেলাই স্বদেশী শিল্পের প্রসারে দেশকে দিয়েছে উৎসাহ। বাঙলায় প্রথম কাপড়ের কল, জাহাজের কোম্পানী, লোহার কারবার, রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারখানা খোলার পিছনে সেই সে দিনের ইতিহাস ইন্ধন জুগিয়েছে। এই জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হল ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, প্যারীচরণ সরকার, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্রিয়নাথ ঘোষ, মালিক রাম, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মনোমোহন বসু—আরও কত কে! বাঙালীর সেই প্রথম হিন্দু মেলায় ছয় দফা প্রস্তাবের মধ্যে সর্ব্বাধিকার পেল স্বদেশী শিল্প। প্রস্তাব নেওয়া হল, 'প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 'ভিন্ন' ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।' সেই সুরু। ধীরে ধীরে এবার বলা যাবে পরের ইতিহাস।

ভি. পি. প্রথায় ব্যবসা

ভি. পি. প্রথায় ব্যবসায়ীদের কত সুবিধা সে সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আমরা কিছু কিছু বলেছি। এ বিষয়ে আমরা অনেক পাঠক-পাঠিকা যাঁদের নানা কারবার পত্তর রয়েছে তাঁদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে কয়েকটি পত্রও পেয়েছি। অধিকাংশ পত্র-প্রেরকের পত্র থেকে আমাদের এই ধারণাই হয়েছে যে ভি, পি, প্রথায় আইন-কানুনের ব্যাপারে কেউই খুব বেশী সচেতন নন। এ বিষয়ে আমরা মোটেই দোষ দেব-না জনসাধারণকে, কারণ আমরা চিরকাল ধরেই দেখে আসছি সরকারী প্রচার-দপ্তর থেকে ভি পি প্রথার সম্বন্ধে কোনও প্রচার নেই। শুধু ভি, পি, প্রথা কেন, পোষ্টাল লাইফ, ইনসিওরেন্স, পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, পোষ্টাল সেভিংস সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি বণ্ড, ন্যাশানাল প্ল্যান লোন, ডিবেঞ্চার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদিরও নেই কোনও প্রচার। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। প্রচার নেই আরও কত কিছুর! অথচ সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হচ্ছে প্রচার-দপ্তরের কাজে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সার্কুলার, ডিরেক্ট মেল, ভি· পি· সিষ্টেম, পার্শেল, ইনসিওর করে পাঠানো জিনিষের কাজ বাড়ানো গেলে সরকারী আয় বাড়বে কত। সরকারী ডাক বিভাগ যদি আরও দ্রুতগতিতে কাজ করেন, যদি প্রেরিত জিনিষ-পত্রের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন, তবে নানা কাঁচামালও এই ভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে পাঠানো সম্ভব হবে। আনা নেওয়ার খরচা সরকারী আওতায় হওয়াতে জিনিষ পত্রের মূল্য কম হবে, ব্যবসায়ী বা ক্রেতা ঘরে বসে জিনিষপত্র পাবেন। পল্লীগ্রামস্থ লোকের যাতায়াতের খরচ বাঁচবে এবং সবচেয়ে যা বেশী হবে তা হল সরকার জনসাধারণের আরও নিকটে আসতে পারবেন। সবই তো বললাম, দেখি, কর্তাব্যক্তিদের নজর এদিকে পড়ে কিনা?

বিজ্ঞাপন দিন এবং বদলে বদলে দিন

এমন অনেক কোম্পানীর নাম আমরা করতে পারি, সারা জীবন যাঁরা মাত্র একখানি ব্লক করিয়েছেন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কাজে। কারখানা বড় হয়েছে একটু একটু করে, কলকাতার কোনও বাই লেন থেকে অফিস উঠে এসেছে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে কি মিশন রোডে, সেই ব্লক কিন্তু পালটায় নি। সেই মান্ধাতার আমলের ক্ষয়ে যাওয়া ব্লক গাদাগাদি করে অজস্র সংবাদের পাশে কোনও মতে একটু স্থান

করে নিয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে আছে। গণেশ মার্কা তেল কি বিশ্বেশ্বর ঘি, কমলালয় ষ্টোর্স কি হরলালকা কি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন কালকের সংবাদপত্রে যে-কোনও সাধারণ পাঠক অনায়াসে আগের দিন বলে দিতে পারেন তা। আমাদের কথা হল বিজ্ঞাপনের মধ্যে যদি না থাকে বৈচিত্র্য তবে পাঠক-সাধারণ কেন পড়ে দেখবেন সে জিনিষ? আপনাকে ভেবে নিতে হবে যে আপনার বিজ্ঞাপন কেউ পড়বে না এবং তাই ভেবেই আপনাকে এমন বিজ্ঞাপন দিতে হবে যা পাঠককে পড়তেই হবে। প্রসঙ্গক্রমে বামারলরী, 'চা কোম্পানীগুলির বিজ্ঞাপন, সিগারেটের বিজ্ঞাপন, বার্মা শেল, বাটা সু-কোম্পানী ইত্যাদির প্রদত্ত বিজ্ঞাপনসমূহের আমরা প্রশংসা করছি। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের থ্রু দিয়ে বিজ্ঞাপন দেন। তাই ড্রইং, রিডিং ম্যাটার, ডিসপ্লে ইত্যাদি কত উচ্চাঙ্গের হয় দেখুন। মাসিক বসুমতীর বিজ্ঞাপন-সংখ্যা অনেক সহযোগীর ঈর্ষার বস্তু, এ কথা আমরা শুনেছি কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন কি করে পাওয়া যায় তাই আমাদের লক্ষ্য নয়, সেই বিজ্ঞাপন কি করে আপনাদের উপকার করবে—সে দিকেও আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি এবং বলছি বিজ্ঞাপন দিন এবং দিন বদলে বদলে।

টুথ-ব্রাস না দাঁতন-কাটি?

আমরাই জিজ্ঞাসা করছি আপনাদের টুথ-ব্রাস না দাঁতন-কাটি? কি ব্যবহার করেন আপনি? সকালে উঠে (বেড টি খাওয়া যাঁদের অভ্যাস, দাঁত পরিষ্কার করাটা তাঁদের পক্ষে অবশ্য দ্বিতীয় করণীয় অভ্যাসমাত্র) চা-জলখাবার খাবার আগে নাহক দশ মিনিট দাঁত নিয়ে আপনাকে থাকতে হয় কিনা? এ-কোন ও-কোন দিয়ে টুথব্রাস চালিয়ে (আজকাল আবার ৪৫° কোন বিশিষ্ট নানা ধরণের টুথ-ব্রাস পাওয়া যাচ্ছে) রাতের খাদ্যদ্রব্যের ভগ্নাংশ সমূহকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বার করে আনবার অক্লান্ত পরিশ্রম আপনাকে নিতে হয় কিনা? শুধু ব্রাস থাকলেই চলবে, পেষ্ট? তা হলে গড়ে শুধু দাঁত মাজায় কত খরচা হল আপনার? তবে কি পিছিয়ে যাবেন সেই আগেকার দিনে? সেই দাঁতন-কাটি? নিম-আশ-স্যাওড়ায়? বৃদ্ধ গুণীজন বলবেন দাঁতের পরমায়ু বাড়বে কিসে? বলবেন, ওহে অশ্ব লাঙ্গুল-কেশাগ্র দ্বারা মাজ্জিত দন্ত বিশিষ্ট ভদ্রজন (বাংলাটা ঠিক হল তো? কমলাকান্ত থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যেত!) আপনার মাড়ীটি যে আস্তে আস্তে দাঁত থেকে খসে পড়ছে, দাঁতের এনামেল চটে যাচ্ছে, সে খবর কি জানেন আপনি? দাঁত ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, দেখতে কদাকার হচ্ছে, সে সম্পর্কে হুস আছে আপনার? ও পেষ্টে আপনার সোডিয়াম রিসিওনেলেট থাক আর নাই থাক, সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পুনরায় সেই নিম আর আশ-স্যাওড়া গাছের ডালের খোঁজ করুন। দীর্ঘ দিন সুস্থ সবল থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার রসাস্বাদন করবার যদি অভিলাষ থাকে তো অচিরে সেই পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে চলুন। ম্যাণ্ডেভীল গার্ডেনস, রীচি রোড, ক্যার্ণ এ্যাভিন্যু, ল্যান্সডাউনের গৃহস্থ জন কি একথা মানবেন?

অল্প খরচের ব্যবসা

ব্যবসা করতে গেলেই অফিস খুলতে হবে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে, গুদাম রাখতে হবে হাওড়ায়, যাতায়াত করতে হবে গাড়ী চেপে—এ ধারণা বোধ হয় বাঙালীর আর নেই, অন্ততঃ না থাকলেই মঙ্গল। যুদ্ধোত্তর বাঙালী-সমাজ বিশেষ করে বিভক্ত বাঙলায় আজ সব রকমের কাজই করছে, এ আমরা নিয়ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ট্রেনের ক্যানভাসার, বইয়ের কি ওষুধের সেলসম্যান, বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টার থেকে শুরু করে পান-বিড়ি, মুদীখানা কি ষ্টেশনারী দোকান, এমন কি বাজারে মাছ-তরকারীর দোকান, কাটা-কাপড়ের দোকান করতেও আমরা বাঙালীর ছেলেকে দেখছি। এর জন্যে দুঃখ নেই, নেই কোনও অনুশোচনা, ভাগ্যকে দোষ দেবারও কথা নয়। হিসেব করে দেখতে গেলে অনেক খেমকা, কানোরিয়া, খৈতানের ইতিহাসও তাই। সে যাই হোক, গত মাসে আমরা অল্প খরচের ব্যবসায়ের কয়েকটি তালিকা দিয়েছি; এবার আরও কয়েকটি দেবার চেষ্টা করছি। এগুলি উপদেশ নয়, চোখ খুলে বর্ত্তমান সমাজের দিকে চেয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা অসীম দরদের সঙ্গেই আমরা বলছি। মাত্র পাঁচ-সাতশো কি হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে এখনও অনেক কারবার করার আছে। ছোট ছোট সরিষা-ভাঙ্গা মেসিনের কারখানা, পুরোনো চৌবাচ্চায় রঙ গোলা পদ্ধতিতে ডাই-হাউস, নাট-বল্টু-পেরেক-কাঁটা তার, স্ক্রু ইত্যাদি তৈরীর জন্যে ছোট কামারশালা, ঝাঁটার কারখানা, ঘিয়ের কারবার, বেতের চেয়ার-টেবিল-মোড়া বোনা, কালির বড়ি তৈরীর মেসিন, কাপ-গেলাস তৈরী (ব্লো করে) আঞ্চলিক ভিত্তিতে, প্লাষ্টিকের নানা জিনিষ, মাদুর-পাটি বোনা, কাঠের কি কয়লার গোলা ইত্যাদি আরও নানান রকম ব্যবসা আছে যা একটু পুস্ করলেই গ্রামে গ্রামে চালানো যায়। এ বিষয়ে আগামী বারে সবিস্তারে আরো বলা যাবে। আগের মত বাঙালী আর নিষ্কর্ম্মা নেই। অতুল্য ঘোষ বিনোবা ভাবের কাছে যতই বাঙালীনিন্দা করুন, বাঙালী আজ বহু কষ্টকর কাজে হাত দিয়েছে।

যন্ত্রপাতির পরিচয়

নানা গুণীজনের সঙ্গে পরামর্শ করে, পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁরা সবিশেষ আগ্রহে আমাদের দপ্তরে এসে 'কেনাকাটা' বিভাগটির আরও নানা উন্নতির কথা আলোচনা করে গেছেন, তাঁদের অনুরোধ মত এ বিভাগটির কাজ শুরু হল। নিজেই বাড়ীতে বসে অবসর সময়ে, বিপদে-আপদে বা কেউ কেউ শুধুমাত্র কাজটি শিখে রাখবার আগ্রহেই এ বিভাগটিতে এমন সব জিনিষ পাবেন যা অন্য কোথাও তাঁরা আশাও করতে পারেন নি। এর মধ্যে কাঠের কাজ বা লোহালক্কড়ের কাজে লাগে এমন সব আপনাদের পরিচিত জিনিষ-সমূহের নামই খুঁজে পাবেন। তালিকাটি দীর্ঘ হলেও একটি জিনিষ না হলে আপনার যন্ত্রের বাক্স সম্পূর্ণ হবে না। চিহ্নিত যন্ত্রটি থেকে এক সংখ্যা ধার্য্য করুন এবং অতঃপর ডান দিক ধ'রে এগিয়ে যান। (১) **Cross-Cut Saw**—বড় ধরণের করাত। কাঠ খুসীমত কাটবার কাজে লাগে। (২) **Wood Chisel**—কাঠের বাটালী। (৩) **Wood file**—কাঠের উঁকা। ঘষার কাজে ব্যবহার। (৪) **Awl**—দাগ দিতে হয় জায়গা মত কেটে নেবার সুবিধার্থে। (৫) **Putty knife**—ছুরী মাত্র। (৬) **Snips**—কাতুরী। লোহার চাদর ইত্যাদি কাটবার কাজ এর। (৭) **Keyhole saw**—চাবির গর্ত্ত করার ছোট করাত। (৮) **Anger bits**—আগরের

গোড়া। গর্ত্ত করা এবও কাজ। (৯) C—clamp—নাট, বল্টু আঁটবার কাজে প্রয়োজন হয়। (১০) Tri-Square—বাটাম বা মাটাম যার বাংলা নাম। লম্ব ভাবে থাকে দুই বাহু। (১১) Whet stone—শান দেওয়া যায় যন্ত্রপাতি এতে। (১২) claw hammer—কাঁটা বসানো যেমন হাতুড়ীর কাজ তেমনি এক কাজ কাঁটা তোলাও। তারই জন্য এর ব্যবহার। (১৩) Level—লেবেল করার কাজে লাগে। জলের বা স্পিরিটের ড্রপ দেওয়া থাকে মাঝখানে। তারই সাহায্যে সমতল-অসমতল বোঝা যায়। (১৪) Light and heavy screw driver—স্ক্রু বসানো যাবে। (১৫) Brace—গর্ত্ত করার কাজে খুব সুবিধা হয় এতে। (১৬) Pliers—চলতি বাংলায় প্লাস। তার মোড়া, কোনও কিছু আটকানো কত কাজ এর। (১৭) Bench Plane—সমতল করার কাজে লাগে। (১৮) Tape measure—ফিতের বাণ্ডিল। মাপার কাজে। (১৯) Wrench—রেঞ্চ। কমানো বাড়ানো চলে দরকার মত। নাট, বোল্ট খোলার কাজে লাগবে। (২০) Pipe Wrench—পাইপ খোলার কাজে লাগবে। (২১) Hatchet—ছোট কুঠার বা টাঙ্গী। চেরবার কাজে লাগানো যাবে। (২২) Hocksaw—লোহা কাটা করাত।
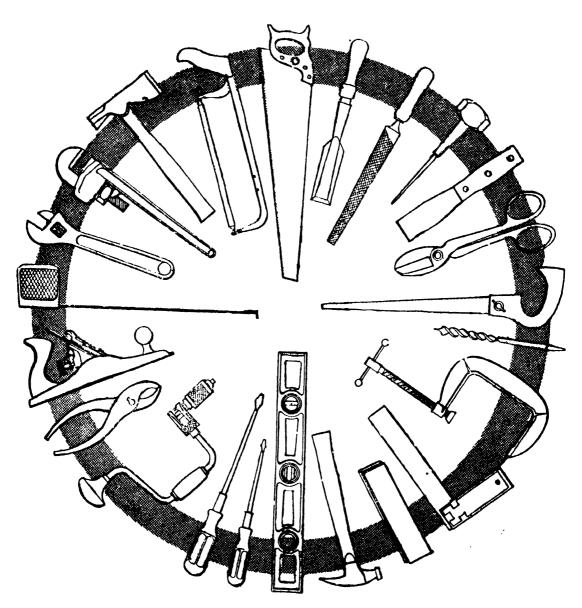
উপরের † চিহ্নিত যন্ত্রটিকে প্রথম ধার্য্য করুন এবং তার পর ডানদিক থেকে ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে যান।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
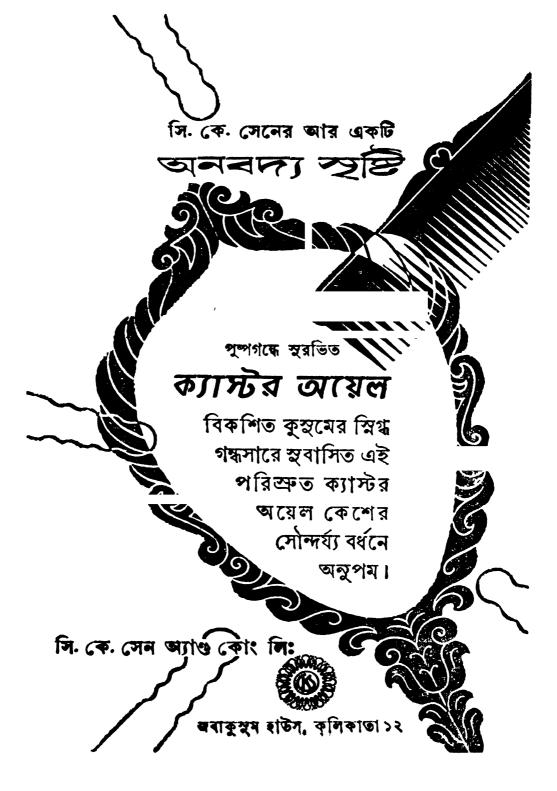
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

১৯৫৫ সাল—

খৃষ্টীয় ১৯৫৪ সাল অতীত ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এই বৎসর যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সেগুলি মানবজাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনায় কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে, এখনই তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কেহ কেহ মনে করেন, যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯৫৪ সালটি সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যপূর্ণ কূটনৈতিক বৎসর রূপে কাটিয়াছে, বৃদ্ধি পাইয়াছে শান্তির আশা এবং আন্তর্জ্জাতিক মনকষাকষি অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহারা আশা করেন, নূতন বৎসর ১৯৫৫ সালেও এই ধারা অব্যাহত থাকিবে। এইরূপ আশা যাঁহারা পোষণ করেন, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। খৃষ্টীয় নববর্ষের বাণীতে এই আশাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালই যে যুদ্ধোত্তর যুগের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বৎসর রূপে কাটিয়াছে, ইহা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৯৫২ সালে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার যে-আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, ১৯৫৩ সালে তাহা হ্রাস পায়। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি ইহার একটি কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। ১৯৫৩ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সাল আরও একটু ভাল কাটিয়াছে, এ কথাও অনস্বীকার্য্য। ইন্দোচীনে সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের বিরতি ১৯৫৪ সালে শান্তির পথে আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর অগ্রগতি সূচিত করিতেছে বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। শান্তি সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়া খুবই ভাল। ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতিও যে একটি আশাপ্রদ ঘটনা, এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক অন্যান্য ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উহার যথার্থ স্বরূপ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। নূতন বৎসর কিরূপ কাটিবে তাহাও ঐ পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

১৯৫৪ সালের আরম্ভ হইয়াছিল বার্লিন সম্মেলন লইয়া এবং উহার শেষ হইয়াছে বোগোর সম্মেলনের মধ্যে, একথা বলিলে ভুল বলা হয় না। ২৫শে জানুয়ারী (১৯৫৪) বার্লিনে বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব চতুষ্টয়ের সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং উহা সমাপ্ত হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী। বার্লিন সম্মেলনে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সমস্যার সমাধান হইল না বটে, কিন্তু উহাতেই কোরিয়া ও ইন্দোচীন সমস্যা সমাধানের জন্য জেনেভা সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতে বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব চতুষ্টয় রাজী হন। জেনেভা সম্মেলন প্রসঙ্গে উহা উল্লেখযোগ্য যে, ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) লোক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজী জেনেভা সম্মেলনে আলোচনার সুবিধার জন্য ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করেন। জেনেভা সম্মেলনে যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তী কোরিয়া-সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হইল না বটে, কিন্তু ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হওয়ার ব্যাপারে ভারত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহার স্বীকৃতি কোথাও বড় দেখা যায় না। নববর্ষ উপলক্ষে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার 'Report from World Capitals' শীর্ষক কলামে দিল্লী হইতে প্রেরিত বিবরণে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু লণ্ডন হইতে প্রেরিত বিবরণে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতির কৃতিত্ব দেওয়া হইয়াছে বৃটেনকে। ভারতের অবশ্য ইহাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু ভারতের নিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনোভাব ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতি ১৯৫৪ সালের একটি উল্লেখযোগ্য আশাপ্রদ ঘটনা। কিন্তু এই আশাকে ধ্বংস করিবার এবং ভারতের নিরপেক্ষ নীতির সম্প্রসারণ রোধ করিবার জন্য যে-সকল পন্থা অবলম্বন ১৯৫৪ সালে করা হইয়াছে, সেগুলির গুরুত্ব কম নয় এবং নূতন বৎসর ১৯৫৫ সালে ঐগুলি ইতিহাসের ধারাকে কোন্ পথে চালিত করিতে পারে, তাহা বাদ দিয়া নূতন বৎসর সম্পর্কে কোন আশা পোষণ করা সম্ভব নয়।

বার্লিন সম্মেলনের ব্যর্থতা যেমন ইউরোপে মন-কষাকষির

তীব্রতাকে ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগে অব্যাহত রাখে তেমনি পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি এবং তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগে, এশিয়াতেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতাকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে। পাক-মার্কিণ সামরিক আঁতাত যে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লড়াইয়ে নিযুক্ত করার আয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা শুধু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধের ব্যবস্থাই শুধু নয়, বরং কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ নিরোধ অপেক্ষা ভারতের নিরপেক্ষ নীতির অগ্রগতি নিরোধের ব্যবস্থা হিসাবেই উহা সম্পাদন করা হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির আয়োজন ১৯৫৩ সালেই আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা সম্পাদিত হয় বার্লিন সম্মেলনের পর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্দ্ধের প্রথম দিকে। কলম্বো সম্মেলন ইহার পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এশিয়ার দেশগুলির নীতি-নির্দ্ধারণে এশিয়াবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইহাই যে প্রথম উদ্যোগ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্মেলনেই সর্ব্বপ্রথম ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। উহারই উদ্যোগ আয়োজনের জন্য কলম্বো সম্মেলনের আট মাস পরে বোগোর সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। এই আটমাসে শান্তির প্রচেষ্টা এবং উহাকে বিপর্য্যস্ত করিবার আয়োজন যে ভাবে চলিয়াছে উহারই মধ্যে পাওয়া যায় ১৯৫৫ সালের ইঙ্গিত।

কলম্বো সম্মেলনের পর জুন মাসের শেষ ভাগে কম্যুনিষ্টচীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাইয়ের ভারতে আগমন ১৯৫৪ সালের আন্তর্জ্জাতিক গতিধারার আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজী এবং চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই উভয়েই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শান্তি রক্ষার জন্য পাঁচটি নীতি সম্পর্কে একমত হন। এই নীতি-পঞ্চকের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং অন্য রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব মানিয়া চলার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইখানেই নেহরুজীর নিরপেক্ষতা নীতি সহ-অবস্থানের নীতিতে রূপান্তরিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক মনকষাকষি দূর করিয়া শান্তিতে কাজ করিবার জন্য এই নীতি পঞ্চকের অপরিহার্য্যতা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই পঞ্চনীতির ঘোষণা এবং জুলাই মাসে জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ১৯৫৪ সালকে শান্তির পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক বৎসরে পরিণত করিয়াছে বটে, কিন্তু উহাকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করা হয় নাই। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির চুক্তি শান্তির যে আশা জাগ্রত করিয়াছিল, ম্যানিলা সম্মেলনে সম্পাদিত সিয়াটোচুক্তি তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে মনে করিলে ভুল হয় না। শুধু কম্যুনিজম নিরোধ-ই নয় সহ-অবস্থান নীতির অগ্রগতি রোধ করাও উহার প্রধান উদ্দেশ্য। আগষ্ট মাসের শেষে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিষ্ট চুক্তি অগ্রাহ্য করায় ইউরোপীয় রক্ষা ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু অতি দ্রুতগতিতে নূতন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়। লণ্ডনে ও প্যারীতে এ সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বোগোর সম্মেলনের সমসময়েই ফরাসী জাতীয় পরিষদ পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র সজ্জিত করিবার চুক্তি অনুমোদন করিয়াছে। উক্ত লণ্ডন ও প্যারী চুক্তির পাল্টা প্রস্তাব হিসাবে রাশিয়া ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্য ইউরোপের ২৩টি দেশ এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রকে মস্কোতে এক সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ করে। ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি ব্যতীত আর কেহ-ই এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই। চারি দিন অধিবেশনের পর ২রা ডিসেম্বর এই সম্মেলন পশ্চিম-ইউরোপীয় রক্ষা ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উহারই অনুরূপ আর একটি দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার সিদ্ধান্ত করে। মস্কো সম্মেলনের পাল্টা জবাব হিসাবেই যেন মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস ১লা ডিসেম্বর তারিখে চিয়াং-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃত পক্ষে ফরমোসা রক্ষার দায়িত্ব মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রই গ্রহণ করিয়াছে। মার্কিণ অফিসারগণ বলিয়াছেন, এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় চিয়াং কাইশেকের পক্ষে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণে কোন বাধা হইবে না। চিয়াং-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি দ্বারাই শুধু মস্কো সম্মেলনের জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি পরিষদ ১৮ই ডিসেম্বর প্রয়োজন হইলে পরমাণু-অস্ত্র ব্যবহারেরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাছাড়া মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ফরমোসা, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তানকে সম্প্রসারিত এশিয়া রক্ষা ব্যবস্থার জন্য আরও অতিরিক্ত ৫৩২ কোটি টাকা (১,১২০ মিলিয়ন ডলার) সামরিক সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছে।

শান্তির জন্য ১৯৫৪ সালে আরও যে-সকল চেষ্টা করা হইয়াছে তন্মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত শান্তির জন্য পরমাণু শক্তির ব্যবহার এবং নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব-কমিটির প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাবের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই দুইটি প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই। আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর উপরেই যে এই দুইটি প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫৪ সালে সুয়েজ খাল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে, ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তৈল সম্পর্কে ইরাণের সহিত বৃটেনের মীমাংসা হওয়ার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৩ সালে ডাঃ মোসাদ্দেকের পতন এবং কর্ণেল জেহাদীর অভ্যুত্থান যে মীমাংসার প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুইটি সমস্যার মীমাংসা হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা ব্যবস্থা গঠন সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে যে আশা জাগিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্র পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ আছে বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে আরব-রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমীশক্তি-গোষ্ঠীর সহিত আঞ্চলিক রক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করিতে ইচ্ছুক নয় বলিয়াই মনে হয়।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৫) লণ্ডনে পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইবে। এই আলোচনায় উল্লেখযোগ্য কোন ফল পাওয়ার আশা নাই। পশ্চিম-জার্ম্মানীকে অস্ত্র সজ্জিত করিবার প্রধান বাধা দূর হইয়াছে

ফরাসী জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক উহা অনুমোদিত হওয়ায়। হয়ত আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই অন্যান্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পশ্চিম জার্ম্মানীকে অস্ত্র-সজ্জিত করার চুক্তি অনুমোদিত হইয়া যাইবে। সুতরাং ১৯৫৫ সালেই যে জার্ম্মান সৈন্যদিগকে সৈনিকের পোষাক পরিতে দেখা যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিম জার্ম্মানীকে অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনকষাকষি আরও তীব্রতর হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। এসিয়ায় ফরমোসা-সমস্যা যে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উ নূ চীন ভ্রমণ করিয়া ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে এ সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করা হয় নাই। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির পরিণতি কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে তাহাও বলা কঠিন; পশ্চিমী শক্তিত্রয় দক্ষিণ ভিয়েটনামকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সিয়াটোচুক্তি এখনও অনুমোদিত হয় নাই। তথাপি আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ককে সিয়াটো চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধের কি কি অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা এই সম্মেলনে স্থির করা হইবে। শুধু তাই নয়। আগামী ১৯৫৬ সালে ভিয়েটনামে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে তাহাতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব নিরোধের জন্য দক্ষিণ ভিয়েট্‌নামকে কি ভাবে শক্তিশালী করিতে পারা যায়, তাহাও এই সম্মেলনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই খুব তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ককে সিয়াটো শক্তিবর্গের সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ইন্দোনেশিয়ায় এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলন সহ-অবস্থান নীতির বিরোধী শক্তিবর্গের ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে কিনা, তাহা অনুমান করার মত কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের পর মে কি জুন মাসে জওরলালজী মস্কো যাইতে পারেন। বহুদিন আগেই তিনি মস্কো যাওয়ার আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। বোধ হয় উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় তাঁহার মস্কো সফর মুলতুবী রাখা হইয়াছে। কিন্তু ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী উ নূর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করণ এবং ফরমোসা সমস্যা ১৯৫৫ সালে ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। দক্ষিণ ভিয়েটনামকে শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিকে যে ঠাণ্ডাযুদ্ধে পরিণত করিবে না তাহাও বলা যায় না। ইউরোপে রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলি পশ্চিম ইউরোপীয় রক্ষা ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে। অস্ত্রসজ্জিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর পাল্টা জবাবে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী অস্ত্রসজ্জিত হইবে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি পরিষদ পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু পরমাণু অস্ত্র রাশিয়ারও আছে, ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। এশিয়ায় সিয়াটো চুক্তি, চিয়াং-মার্কিণ চুক্তি, জাপ-মার্কিণ চুক্তি, দক্ষিণ-কোরিয়া-মার্কিণ চুক্তির ব্যাপক ব্যূহ রচিত হইয়াছে। উহারই প্রতিষেধক রূপে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। তথাপি ১৯৫৫ সালে যুদ্ধ বাধিয়া না-ও উঠিতে পারে। ১৯৫৫ সাল যদি শান্তিতে কাটে তবে উহা ঠাণ্ডা শান্তি ছাড়া আর কিছু হইবে না।

বোগোর সম্মেলন—

বোগোর সম্মেলন তাড়াতাড়িই সমাপ্ত হইয়াছে এবং এসিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের কাহাদিগকে আমন্ত্রণ করা হইবে তাহা স্থির করিতেও বিশেষ কোন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয় নাই। জাকার্ত্তা হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ পার্ব্বত্য সহর বোগোরে ভারত, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রীদের ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর এই দুইদিন ব্যাপী যে-সম্মেলন হইয়া গেল, উহাই তাঁহাদের দ্বিতীয় সম্মেলন। তাঁহাদের প্রথম সম্মেলন হয় কলম্বো সহরে গত এপ্রিল মাসে। কলম্বো সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইতে বোগোর সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কলম্বো সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী আফ্রো-এশিয় সম্মেলন আহ্বানের যে-প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে-সম্পর্কে বিবেচনার জন্যই প্রধানতঃ বোগোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পাঁচটি দেশের প্রধান মন্ত্রিগণ তাঁহাদের সাধারণ সমস্যাবলী সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন।

যে-সম্মেলনের নাম আফ্রো-এশিয়া সম্মেলনরূপে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, অবশেষে তাহার এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাতে আফ্রিকার গুরুত্ব সামান্য পরিমাণেও হ্রাস পাইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রধান মন্ত্রিগণ স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের যৌথ উদ্যোগে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন আহূত হইবে এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের মতৈক্য হইয়াছে। ইহা যে অনেকটা বিস্ময়ের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হইবে, তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট চীনকে নিমন্ত্রণ করার ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর দিক হইতে গুরুতর বাধা পাওয়ার আশঙ্কাই করা গিয়াছিল। কিন্তু বোগোর সম্মেলনে তিনি বাধা না দেওয়ার নীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ। গত অক্টোবর মাসে (১৯৫৪) পাকিস্তানে যে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে পাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদআলী গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদের নির্দ্দেশ অনুসারেই চালিত হইয়া থাকেন। ঝুনো সিভিল সার্ভেণ্ট মিঃ গোলাম মহম্মদ খুব চালাক লোক। পাকিস্তান যে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার, একথাটা হয়ত তিনি লোককে বুঝিতে দিতে চান না। কাশ্মীরের ব্যাপারে কিছু সুবিধা করা যায় কি না তাহাও হয়ত তিনি ভাবিয়াছেন। হয়ত এই সকল কারণেই এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করিবার জন্যই তিনি পাক প্রধানমন্ত্রীকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। তাছাড়া মধ্যপ্রাচীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির কথাও
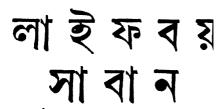
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে
আপনাকে রক্ষা করে
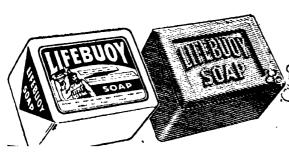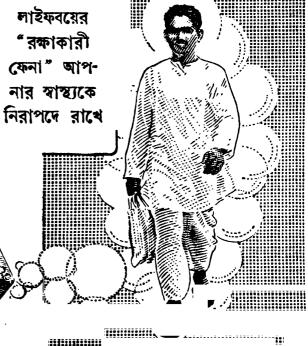
তাঁহাকে ভাবিতে হইয়াছে। পাকিস্তান এমন কোন নীতি গ্রহণ করিতে চায় না যাহাতে মধ্যপ্রাচীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার দলে ভিড়িয়া পড়িতে পারে। এই সকল কারণেই কম্যুনিষ্ট চীনকে আমন্ত্রণ করার ব্যাপারে পাক প্রধান মন্ত্রী প্রবল বাধার সৃষ্টি করেন নাই। তাছাড়া ফরমোসা কোন একটা রাষ্ট্র নয় বলিয়া চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্টকে আমন্ত্রণ করার কথাই উঠিতে পারে না।

মধ্যএশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলি এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারতে এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে এই সকল দেশ আমন্ত্রিত হইয়াছিল। ঐ সকল রাষ্ট্র ইউ-এস-এস-আবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই হয়ত নিমন্ত্রিত হয় নাই। ইজরাইল রাষ্ট্রকেও নিমন্ত্রিতের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। পাক প্রধান মন্ত্রী ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতি আরব রাষ্ট্রগুলির মনোভাবের কথা উল্লেখ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। বস্তুতঃ মুসলিম রাষ্ট্র তোষণ-নীতি গ্রহণ করিয়াই ইজরাইল রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হয় নাই। এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে নিম্নলিখিত ২৫টি দেশকে নিমন্ত্রণ করা স্থির হইয়াছে :—

(১) আফগানিস্থান, (২) কাম্বোডিয়া, (৩) মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশন, (৪) চীন, (৫) মিশর, (৬) ইথিওপিয়া, (৭) গোল্ড-কোষ্ট, (৮) ইরাণ, (৯) ইরাক, (১০) জাপান, (১১) জর্ডান, (১২) লাওস, (১৩) লেবানন, (১৪) লাইবেরিয়া, (১৫) লিবিয়া, (১৬) নেপাল, (১৭) ফিলিপাইন, (১৮) সৌদি আরব, (১৯) সুদান, (২০) সিরিয়া, (২১) থাইল্যাণ্ড, (২২) তুরস্ক, (২৩) উত্তর-ভিয়েটনাম, (২৪) দক্ষিণ-ভিয়েটনাম এবং (২৫) ইয়েমেন।

এই তালিকার মধ্যে উত্তর-কোরিয়া ও দক্ষিণ-কোরিয়ার নাম না থাকার কারণ বুঝা কঠিন নয়। নিমন্ত্রিতের তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয় এবং সম্মেলনে যোগদান করিয়া মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশে কি নীতি গ্রহণ করিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। থাইল্যাণ্ড তো বোগোর সম্মেলনের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছে যে, তাহার স্থান পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে। কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে থাইল্যাণ্ড যে যোগ দান করিবে না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড আমন্ত্রিতদের তালিকায় না থাকার কারণ খুব সুস্পষ্ট। এই দুইটি রাষ্ট্র এশিয়ায় অবস্থিত হইলেও আসলে উহারা ইউরোপীয় রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

বোগোর সম্মেলনের শেষে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের চারি দফা উদ্দেশ্য বিবৃত করা হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা, এই সকল দেশের বিশেষ সমস্যা অর্থাৎ সার্ব্বভৌমত্ব, বর্ণবিদ্বেষ ও ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং বর্ত্তমান পৃথিবীতে এই সকল দেশের অবস্থা ও বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য তাহারা কি কি করিতে পারে সে-সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করা, এই চারিটি হইল এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ইস্তাহারে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, কোন আঞ্চলিক ব্লক গঠন এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নয়। এই সম্মেলন সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই যে এই ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন সিয়াটো চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া ইতিপূর্ব্বেই পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর ব্লকে যোগদান করিয়া ফেলিয়াছে। তুরস্কও উত্তর আটলাণ্টিকচুক্তি গোষ্ঠীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ মধ্যপ্রাচী রক্ষা ব্যবস্থার একটি ব্লক গঠনের চেষ্টা করিতেছে। এই সকল ব্লকের বিরুদ্ধে ব্লক গঠন করা বড় সহজ কথাও নয়। কমিউনিকে ইহাও স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সম্মেলনে যোগদানকারী এক বা একাধিক রাষ্ট্র কোন মত প্রকাশ করিলে ও অন্যান্যরা তাহা গ্রহণ করিতে রাজী না হইলে, তাহাদের উপর উহা বাধ্যকর হইবে না। আমন্ত্রিতরা যাহাতে সম্মেলনে যোগদান করে তাহার জন্যই যে এই ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ একটি সম্মেলন একমত হইয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বোগোর সম্মেলনে পরীক্ষার জন্য থার্ম্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া, পরীক্ষা স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পশ্চিম ইরিয়ান (নিউ গিনি) সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার দাবী সমর্থন করা হইয়াছে এবং এই আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। সম্মেলন মরক্কো ও টিউনিশিয়ার স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মালয় ও কেনিয়া সম্পর্কে কোন কথা এই সম্মেলনে আলোচিত হয় নাই, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আগামী এপ্রিল মাসের (১৯৫৫) শেষ সপ্তাহে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, স্থির হইয়াছে। এই সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রভাব হইতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে মুক্ত করিবার জন্য কোন নীতি গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহা অনুমান করা কঠিন। তথাপি এই সম্মেলনের সার্থকতা অনস্বীকার্য্য। ফলাফল যাহাই হউক, আলোচনার ধারা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির শাসকশ্রেণী জনগণের কিরূপ ভাগ্য রচনা করিতে চান, তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে এই সম্মেলনে।

প্যারীচুক্তি অনুমোদিত—

গত ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৫৪) ফরাসী জাতীয়-পরিষদ পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার প্যারীচুক্তি অনুমোদন করিয়াছে। প্যারী চুক্তির অনুকূলে ২৮৭ ভোট এবং বিরুদ্ধে ২৬০ ভোট হইয়াছিল। ফরাসী জাতীয়-পরিষদ প্যারী চুক্তি অনুমোদন করায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার প্রধান বাধা দূর হইল। ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির অনুমোদন দুই বৎসরেরও অধিক কাল ঠেকাইয়া রাখিয়া অবশেষে গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৫৪) ফরাসী জাতীয়-পরিষদ উহা অগ্রাহ্য করে। ইহার পর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত নবরাষ্ট্র সম্মেলনে গত ৩রা অক্টোবর পশ্চিম-ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে রূপ দিবার জন্য অক্টোবর

মাসেই প্যারীতে সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। এই সম্মেলনে গত ২৩শে অক্টোবর (১৯৫৪) পশ্চিম-জার্ম্মাণী ও ইটালীকে ব্রুসালস্ চুক্তিতে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিতে গ্রহণ করিয়া এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সাধারণ ভাবে উহাকে প্যারী চুক্তি বলিয়াই অভিহিত করা হইতেছে। গত ৩০শে ডিসেম্বর ফরাসী জাতীয় পরিষদ এই চুক্তিই অনুমোদন করিয়াছেন।

এই নূতন প্যারী চুক্তি ফরাসী জাতীয়-পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে কি না, সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বস্তুতঃ গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৫৪) ফরাসী জাতীয়-পরিষদ পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্যারী চুক্তিতে পশ্চিম-জার্ম্মাণী পশ্চিম-ইউরোপ রক্ষার জন্ত ১২ ডিভিশন সৈন্য যোগাইবে এবং উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির সদস্য হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফরাসী জাতীয়-পরিষদ কর্ত্তৃক ২৪শে ডিসেম্বর পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা চূড়ান্ত ব্যাপার ছিল না। এ সম্পর্কে বিবেচনা ও অনুমোদন করিবার দ্বিতীয় সুযোগ ছিল। এই দ্বিতীয় সুযোগেই ফরাসী জাতীয়-পরিষদ প্যারী-চুক্তি অনুমোদন করে। বস্তুতঃ প্রথম দফায় উহা অগ্রাহ্য করায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে উহা অনুমোদন করিবার agonizing choice এর একমাত্র বিকল্প ছিল agonizing re-appraisal এর সম্মুখীন হওয়া। বৃটেন ফ্রান্সকে সাবধান করিয়া দেয় যে, প্যারী চুক্তি অগ্রাহ্য হইলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর অস্ত্রসজ্জা রোধ হইবে না, অধিকন্তু বৃটেন যে সাড়ে-চারি ডিভিশন সৈন্য এবং কিছু বিমান বহর ইউরোপে রাখিতে চাহিয়াছে, তাহাও আর রাখা হইবে না। এই সাবধান-বাণীর অর্থ অতি সহজ ও সরল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হয় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার চুক্তি অগ্রাহ্য করা ফরাসী জাতীয়-পরিষদের শেষ সিদ্ধান্ত নহে। ইহার পর পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র সজ্জিত করিবার চুক্তি অনুমোদন করা ছাড়া ফরাসী জাতীয়-পরিষদের আর উপায়ান্তর ছিল না।

বৃটেনের ফরমোসা নীতি—

ফরমোসা সম্পর্কে বৃটিশ নীতি কি? সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ এণ্টনী নাটিং বৃটেনের ফরমোসা নীতির আসল কথাটি ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। গত ১২ই ডিসেম্বর (১৯৫৪) নিউইয়র্কে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার উপলক্ষে এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ নাটিং বলিয়াছেন, কম্যুনিষ্টরা ফরমোসা আক্রমণ করিলে উহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন সদস্যের উপর আক্রমণ করা হইবে এবং "of course Britain would be involved as a member of the U. N." অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন সদস্য হিসাবে বৃটেনও উহাতে অবশ্যই জড়িত হইবে। তাঁহার এই উক্তি বৃটেনে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। কেহ কেহ মিঃ নাটিংয়ের এই উক্তিকে "the diplomatic blunder of the year". অর্থাৎ এই বৎসরের প্রধান কূটনৈতিক ভুল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, উহারই চারি দিন পূর্ব্বে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন বিরোধীদলের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, ফরমোসা সম্পর্কে আমেরিকা যে সন্ধি করিয়াছে, বৃটেন তাহার সহিত কোন রূপেই সংশ্লিষ্ট নয় এবং চীনের উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী দ্বীপগুলি সম্পর্কে যুদ্ধ করার বিপদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া এবং মন-কষাকষি হ্রাস করার গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই বৃটিশ নীতি। কিন্তু ইহারই চারি দিন পরে মিঃ নাটিং ফরমোসা-যুদ্ধে বৃটেনের যোগদানের কথা বলিলেন কেন এবং কিরূপে?

তাঁহার উক্তিতে বৃটেনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ায় কানাডায় যে টেলিভিশন বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, তাহা মিঃ নাটিং বাতিল করিয়াছেন। তাঁহাকে লণ্ডনে ডাকাইয়া আনাও হইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বৃটিশ-পার্লামেণ্টে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। লর্ড-সভায় এ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী লর্ড রিডিং বলেন, ফরমোসা সম্পর্কে বৃটিশ নীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। লর্ড হেণ্ডারসন জিজ্ঞাসা করেন যে, যুদ্ধের

পর ফরমোসা চীনকে ফিরিয়া দেওয়া সম্পর্কে ১৯৪৩ সালে কায়রোতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল এবং চিয়াং কাইশেক যে-ঘোষণা করেন, তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য কোন আন্তর্জ্জাতিক দলীল করা হইয়াছে কি? উত্তরে লর্ড রিডিং জানান যে, ঐরূপ কোন দলীল হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের পর জাপান ফরমোসা ছাড়িয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু উহাকে চীন প্রজাতন্ত্রের অংশ বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। মিঃ নাটিংয়ের উক্তির সহিত তাঁহার এই মন্তব্যের সামঞ্জস্য বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কমন্স সভায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন প্রদান করেন নাই। মিঃ টাবুটন যে উত্তর দেন, তাহা লর্ড-সভায় লর্ড রিডিংয়ের উত্তরের প্রতিধ্বনি মাত্র। ফরমোসা সম্পর্কে বৃটিশ নীতি যদি অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া থাকে, তবে সেই নীতিটা কি? মিঃ নাটিং যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি বৃটেনের ফরমোসা-নীতির সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণই হয়, তাহা হইলে বৃটেনের ফরমোসা নীতির স্বরূপটি বুঝিতে কষ্ট হয় কি? মার্কিন সংবাদপত্র ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার বলিয়াছেন—মিঃ নাটিংয়ের মন্তব্য 'Involved no new commitment' অর্থাৎ মিঃ নাটিং নূতন কোন দায়িত্বে জড়িত হওয়ায় কথা বলেন নাই। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র যদি চিয়াং কাইশেকের হইয়া ফরমোসা রক্ষার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করে, তবে বৃটেনও যে তাহাতে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যোগদান করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পানামার প্রেসিডেণ্ট নিহত—

মধ্য-আমেরিকার পানামা-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল জোস এণ্টোনিও রেমন গত ২রা জানুয়ারী রাত্রে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। তিনি ঐ সময় পানামা সিটির ঘোড়-দৌড়ের মাঠে, তাঁহার একটি ঘোড়ার জয় লাভ উপলক্ষে উৎসব করিতেছিলেন। আততায়ীরা একটি মোটরে করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পর পানামার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট ডাঃ আরনুলফো আরিয়াসকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের মে মাসে জাতীয় পুলিশ কর্তৃক তিনি প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত হন। ঐ সময় কর্ণেল রেমন জাতীয় পুলিশের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর থেলমা কিং নামে একজন মহিলাকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই মহিলাটিই নাকি আততায়ীদিগকে প্রেসিডেণ্টের আসনের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহারা যাহাতে গুলী করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। আততায়ীদিগকে ধরিবার জন্য একটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কর্ণেল রেমন ১৯৫২ সালের মে মাসে পানামা রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়া অক্টোবর মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় পানামা খাল অঞ্চল সম্পর্কে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পানামার এক নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয়। পানামার প্রেসিডেণ্টের হত্যার আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব হয়ত কিছুই নাই। কিন্তু উহা লাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন অশান্ত অবস্থাই সূচনা করিতেছে। বিলাতের টাইমস পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা বড়দিনের অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছিলেন যে, জানুয়ারীর প্রথম ভাগ হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পানামা এবং লাটিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রে অশান্তি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিক্সন মধ্য-আমেরিকা এবং কেরিবিয়ান সফরে যাইবেন বলিয়া প্রকাশ। অশান্তির আশঙ্কা ইহার কারণ মনে করিলে ভুল হইবে না।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বাণী—

গত ৬ই জানুয়ারী (১৯৫৫) ৮৪তম মার্কিন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে বার্ষিক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মার্কিণ সামরিক শক্তির দম্ভ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বাণীতে তিনি আমেরিকা ও অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর আক্রমণের ব্যর্থতা সম্পর্কে শুধু কম্যুনিষ্টদিগকেই সচেতন করিয়া দেন নাই, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আনবিক হত্যালীলা হইতে আত্মরক্ষার আহ্বানও জানাইয়াছেন। তিনি মার্কিন সামরিক কার্য্যসূচীর যে পাঁচটি মূল নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বিভিন্ন সামরিক চুক্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, বলিয়াছেন—ঐ সকল চুক্তি পশ্চিম-ইউরোপে ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছে এবং ম্যানিলা চুক্তি ও জাতীয়তাবাদী চীনের সহিত প্রস্তাবিত চুক্তি এশিয়ায় ভবিষ্যত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক ব্যবস্থা মাত্র।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সমরায়োজন এবং তাহাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ফলে পৃথিবীতে অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা পরমাণু শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রই যে পরমাণু বোমা এশিয়াবাসীর উপর প্রথম বর্ষণ করে, একথা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। কোরিয়া-যুদ্ধে পরমাণু বোমা বর্ষণের হুমকী দেওয়া হইয়াছিল। ইন্দোচীনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকী দেওয়া হইয়াছে। হাইড্রোজান বোমা প্রথম মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রই প্রস্তুত করে। পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজান বোমা নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা মার্কিণ জেদের জন্যই সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সামরিক শক্তির হুমকী বিশ্বশান্তিকে স্থায়ী করিবার প্রশস্ত পথ নয়। নূতন বৎসরে যুদ্ধ যদি নাও বাধে, তাহা হইলেও উভয় পক্ষের সমর-আয়োজনের ফলে উদ্ভূত অচল অবস্থার মধ্যে সর্ব্বদাই বিপন্ন হইয়া শান্তি অবস্থান করিবে। যে শান্তিতে সর্ব্বদাই সমরাশঙ্কা থাকিবে, তাহাকে সত্যই শান্তি বলিয়া অভিহিত করা সম্ভব নয়। ৯ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীসুনীল পাল নির্ম্মিত শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মুখমূর্ত্তির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

মাধুর্যমণ্ডিত সৌন্দর্য—
উৎসব আনন্দের দিনগুলিতে প্রত্যেকেরই মন খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে। এমন দিনে আপনিও আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন ক্যালকেমিকোর বিশিষ্ট প্রসাধন সামগ্রী-গুলির সহায়তায়।
মলয় চন্দন সাবান
ব্যবহারে শরীর স্নিগ্ধ ও অন্তর পবিত্র করে। চন্দনের শুচি সুগন্ধে চিত্ত প্রসন্ন হয়।
ক্যাস্টরল
মনোমদ সুরভি-সম্পৃক্ত ক্যাস্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন হয়ে ওঠে ও মধুর সুগন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল থাকে।
CASTOROL
CASTOR OIL
লাবণি স্নো
মুখশ্রীর লাবণ্য বৃদ্ধি করে; কোমল কপোলতল শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাত্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহারে মুখশ্রী স্নিগ্ধ থাকে।
Labonny
রেণুকা ফেস পাউডার
সৌরভসিক্ত রূপচূর্ণ। মুখে ব্যবহারে আকর্ষণীয় স্নিগ্ধতা আনে। সুগন্ধি রেণুকা ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহারে শরীর ও মন স্নিগ্ধ হয়।
কান্তা
চিত্তাকর্ষক অনুপম সুরভি নির্যাস। রুমালে ও বেশবাসে ব্যবহার করলে নরনারীর চিত্ত মধুর সুগন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা-২৯

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

১

ক্যামাক ষ্ট্রীটের কাকলি

পাখীর কাকলি শুনবে যদি এ কলকাতায়
ক্যামাক ষ্ট্রীটের নির্জ্জন রাজপথে বেড়াও,
মেঘ-ভাঙা-ভাঙা রাঙা-রাঙা ঘোর সন্ধ্যায়
অদূরের ঘোর ঘড়্ঘড়ি থেকে মন সরাও।
আহা—সেখানে দু'ধারে কত যে আবাস তরু,
শ্যামল করেছে শহরের ফাঁকা মরু!
সুদৃঢ় তাদের আঁকাবাঁকা শাখা নভে উধাও—
দেওদার বট কৃষ্ণচূড়ার
শিখরে শিখরে সোনালি গুঁড়ার—
ছড়ানো আধার যত খুশি তুলে নাও।
ক্যামাক ষ্ট্রীটের ব্রিঠালি দেমাক পাখীর কাকলিতে
শুনে নাও যদি পার গো! শুনে নিতে!

২

হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটের অচ্ছোদ-সরোবর

হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে বিলিতি নামের
নিরালা নিবিড় এক দীঘি।
যে নামই তার থাকুক—
আমি তার নাম দিয়েছি অচ্ছোদ-সরোবর।
তার পাশ দিয়ে কতদিন
গেছি—সকালে, বিকালে, দুপুরে।
লোক দেখিনি একদিনও—
দেখিনি সকালে প্রৌঢ়কে বা বৃদ্ধকে বেড়াতে,
দুপুরে দেখিনি তাদের আড্ডা—
দীর্ঘ পাতা-মেলে-দেওয়া জামের ছায়ায়।
শুনিনি বিকালে শিশুদের কাকলি,
সন্ধ্যায় মেয়েদের কূজন।
ও যেন লুকানো একটু স্বপ্ন—তরুণী নগরীর,
ও যেন লুকানো ভীরু প্রেম—কুমারী নগরীর,
ও যেন শান্ত হৃদয় এক নবীনা যোগিনীর।

সূর্য ওর দীঘির জলকে স্পর্শ করে মধ্যাহ্নে,
ঝিলিমিলি ঢেউগুলি কেঁপে কেঁপে ওঠে—
অনেক—অনেক—ছোটখাট রঙিন আশার মত।
ওর সবুজ লম্বা ঘাস—ওর দীর্ঘ সবুজ পাম গাছ
ওর ছোটখাট দু'চারিটি লতা ও ফুল
আর চারপাশে দীর্ঘ তরুর শ্রেণী
ওকে ঢেকে রেখেছে লোভী লোকের চক্ষু থেকে।

এ দীঘি যদি থাকত ইয়র্কশায়ারে
ওর তীরে বেড়াত বয়স্থা কুমারী মেয়ে
ঘাসে লুটানো একটু রাঙা আলোর মতন গোলাপি গাউন লুটিয়ে,
তার গোলাপ-সাজানো হাল্কা টুপীর নীল ছায়ার তলে
দীর্ঘপক্ষ্ম নীলাভ নয়ন দুটি একান্ত নত হ'য়ে পড়ত বাইবেলে।
চাপার কলি আঙুলে তার কাঁদত দুটি মুক্তা অশ্রু হ'য়ে
তার গলায় দুলত সোনার তৈরী হাল্কা ছোট ক্রস্—
ঠিক বুকের মাঝখানটিতে—
সবচেয়ে প্রিয়জনের মত।
আর সংস্কৃতপড়া কারো হয়ত মনে পড়বে
এই দীঘি দেখে—মহাশ্বেতার কথা।
হয়তো পূর্ণিমা-রাত্রে একদিন দেখা যাবে
ওর জ্যোৎস্নায় ধোয়া জলের ধারে সে বসে আছে—
যার দেহ জ্যোৎস্নায় ফুটে ওঠা রজনীগন্ধার
সুকুমার শুভ্র লাবণ্য দিয়ে তৈরী।
যার জ্যোৎস্নায় ভেসে-যাওয়া লঘু মেঘখণ্ডের মত বসনে
শ্বেত-চন্দনের সুগন্ধ।
যার হাতে হাতীর দাঁতের তৈরী একটি বীণায়
বাজছে গভীর রাতের বেহাগ রাগিণী।

৩

ফার্ণ রোডের প্রজাপতি

আজ—একটু আগেই বৃষ্টি হয়েছে আর
এখন আকাশে মেঘ নাই মেঘ নাই—
ফার্ণ রোড দিয়ে ফিরছি এখন আমি—
জলে-ধোয়া পিচ্, কি কালো ঠাণ্ডা—ভাই।
কার বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে
দেখি এক ঝাড় হাসনুহানার গাছ
ফুলে ফুলে ঢাকা—তার চারপাশ ঘিরে
হলুদ রঙের প্রজাপতিদের নাচ।
হঠাৎ একটা বাদলা হাওয়ার ঝাপ্টায়
পিচ-ঢালা পথে আমারি পায়ের কাছটায়
উড়ে এসে পড়ে একমুঠ প্রজাপতি
সুন্দর—অতি, সুন্দর—গতি—
আহা-হা কাদায় সাপটায় পাখা
সোনালি রেশমে তুলি দিয়ে আঁকা—
কেমন চমৎকার—
ও পাখাগুলি কি এ কাদায় লোটাবার!
বরং মালিনী নদীর তীরের পুষ্পিত বেণুকুঞ্জে
শকুন্তলার সঙ্গে যেখানে সখীরাও তার বিরহ-বেদনাভুঞ্জে
সেখানের নবমল্লিকাদের অভিনব সৌরভে
প্রমত্ত হ'য়ে বেড়াত এরাও সুমধুর গৌরবে।
মালিনী নদীর তীরে—
শোভা পেত আহা—শকুন্তলার মুখপদ্মটি ঘিরে।*

* দেবী আসরের মহিলা কবি সম্মেলনে পঠিত।

ভাষার লড়াই

গত মাসের মাসিক বসুমতীতে আমরা অনুযোগ করেছিলাম যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশের আন্দোলনে বাঙালীর মধ্যে তৎপরতার অভাব আছে। কিন্তু সম্প্রতি এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সক্রিয় আন্দোলন লক্ষ্য করে আমরা আনন্দিত হয়েছি। নিখিল ভারত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন সমিতির সাধারণ-সম্পাদক ২রা জানুয়ারী থেকে ৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত একটি সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনের দ্বারা বাঙলার দাবী প্রচার করেছেন, তজ্জন্য উদ্যোক্তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। বাঙালীর এই জীবন-মরণ সমস্যায় যাঁরাই অগ্রণী হয়ে সহায়তা করবেন, তাঁরাই বাঙালীজাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই ব্যাপারে বিহারের অহিংস সৈনিকবৃন্দ নৃশংস অত্যাচারে, হিটলারী দস্যুকেও হার মানিয়েছে, বাংলার এখনও অনেক শিক্ষা বাকী আছে। আমেদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজী গান্ধীভবন উদ্বোধন উপলক্ষে বলেছেন—"যে ভাষার সঙ্গে মানুষের নাড়ীর যোগ, সেই ভাষা কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন, এই ভাষা শুধু পণ্ডিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এই ভাষা জনগণের ভাষা। সুতরাং বাংলা ভাষাকে দাবানোর কথা কল্পনা করা যায় না।" নেহেরুজীর এই মধুমাখা উক্তি, আমাদের কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটার মত কার্য্যকরী হয়েছে। কারণ, ঠিক এই কালেই বঙ্গভাষা দমনের প্রচেষ্টা একটি প্রদেশে সর্বপ্রধান কর্ম হয়ে উঠেছে।

ইংরাজী ভাষায় বাংলা বই

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

BENGALI NOVEL IN ENGLISH—Messrs. H. M. Mookerjee & Co., who lately published Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan, have at present undertaken to publish an English translation of Baboo Bunkim Chundra Chatterjee's celebrated Bengali Novel, Durgesa Nandini, or the Chieftan's Daughter, under the distinguished patronage of His Excellency the Viceroy. The work is in the press, and is expected to come out soon.

তারপর পঁচাত্তর বছর কেটে গেছে—বাংলা-সাহিত্যের রূপকাঠামোর অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এবং আঙ্গিক ও কলা-কৌশলে বাংলার কথা-সাহিত্য ও কাব্য-সাহিত্য বিশ্বজগতে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সংবাদ বাংলার সীমানার বাইরে খুব কমসংখ্যক সাহিত্য-পাঠকের জানা আছে। আমাদের সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিকবৃন্দ অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, গোষ্ঠীগতভাবে কোনো কাজ করা তাঁদের সাধ্যাতীত মনে হয়, এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সে দিনের এইচ, এম, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানীর মত উৎসাহী প্রকাশকও নাই, উৎসাহদাতা রাষ্ট্রচালকেরও অভাব আছে, তাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সদ্‌গ্রন্থের বিদেশী ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা হয় নি বলা বোধকরি অন্যায় হবে না। শ্রীমতী নীলিমা দেবী একদা সিগনেট প্রেসের তরফ থেকে কিছু বাংলা গল্প অনুবাদ করেছিলেন, দুটি খণ্ডে সেই গল্পগুলি প্রকাশিত হয়, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় কিছু কাল আগে তারাশঙ্করের দুটি উপন্যাস এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি" অনুবাদ করেন, অন্নদাশঙ্করের সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলা রায়ও মাঝে মাঝে কয়েকটি সুনির্বাচিত বাংলা গল্পের অনুবাদ করেছেন, এ ছাড়া অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র, সাংবাদিক বিজন সেন প্রভৃতি মাঝে মাঝে কিছু গল্প অনুবাদ করেছেন ; বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার অনুবাদে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, হুমায়ুন কবির সাহেব তাঁর স্বরচিত উপন্যাস ও কবিতার কিছু অনুবাদ করেছেন। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোনো সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনানুসারে এ যাবৎ কিছুই করা হয় নি, ফলে এত সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েও বাংলা-সাহিত্য আজ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হয়ে আছে। বিদেশে বাংলা গ্রন্থের বা ভারতীয় পটভূমিতে রচিত কাহিনীর চাহিদা আছে, তার প্রমাণ বাঙালী লেখক বা ভারতীয় লেখকের অনেক অক্ষম রচনা বিদেশে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে, তার অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ সুধীর ঘোষের "Vermillion Boat" বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক জন মাষ্টারস রচিত "Bhowani Junction।" যাঁরা বিদেশী গ্রন্থের বাজার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাঁরাও বলেন বাংলা গ্রন্থের ভালো অনুবাদ আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি পি, ই, এনের আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভায় কবি ষ্টীফেন স্পেণ্ডার এই কথাটি বিশেষ ভাবে ঘোষণা করেছেন। আমরাও সুধীমহলে আমাদের আবেদন জানালাম, তাঁরা এই বিষয়ে অগ্রণী হলে আনন্দিত হব।

স্মরণীয়দের স্মৃতিরক্ষা

আষাঢ় ১৩৬১ মাসিক বসুমতীতে সাহিত্য পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা মাইকেল মধুসূদনের ৬নং লোয়ার চীৎপুরস্থ বাড়িটি সংরক্ষণের জন্য দেশবাসী ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এই গৃহে

বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম, মেঘনাদবধ কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক প্রভৃতি রচিত হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পবিত্র স্মৃতিরঞ্জিত গৃহ এবং ভারতের নবজন্মের উদগাতা রাজা রামমোহন রায়ের হুগলী জেলার রাধানগরস্থ আবাসগৃহ জাতীয় সম্পদরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ শহরে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের ত্রিংশতিতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যথারীতি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, মূল সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখার নির্বাচিত সভাপতিগণ তাঁদের সুচিন্তিত অভিভাষণে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রীত করেছেন, ছবিসহ তাঁদের বক্তৃতার সারাংশ দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই সম্পর্কে একটা বাঁধা-ধরা সম্পাদকীয় মন্তব্যও অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তার পর সব শেষ, বড় ফাঁকা আওয়াজের পর সভা ভঙ্গ হয়েছে, এবং আগামী বছর ভারতের অন্য কোনো শহরের বাঙালীরা এই সম্মেলনের আয়োজন করবেন। উপস্থিত ততদিন পর্যন্ত বঙ্গ-ভারতী নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম-সুখ ভোগ করতে পারেন। এই যে এত চীৎকার, এত অর্থব্যয়, এত আয়োজন, এতদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের কতটুকু উপকার হ'ল? বাংলা গ্রন্থের চাহিদা কি দ্বিগুণিত হ'ল? বাঙালী সাহিত্যিকের ভাগ্যোদয় হ'ল? সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে কি কোনো নীতি গৃহীত হ'ল? বিদেশে বঙ্গ-সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা হ'ল?—সব কটি প্রশ্নের জবাবই নেতিবাচক হবে। শোনা গেল, এই সম্মেলনে যাঁরা কোমর বেঁধে হাজির হয়েছিলেন তাঁদের অনেকের সাহিত্য-প্রীতি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, বরং রাজনীতির প্রতি উদগ্র আগ্রহ থাকায় স্বাভাবিক সভানুষ্ঠান পদে পদে বাধালাভ করেছে, অনেক নরম-গরম বাক্য বিনিময় ঘটেছে,—ক্ষমতা লাভের অশোভন প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা গেছে, এবং অকারণে মার্কিণী-সভ্যতা, রাজনীতি প্রভৃতির প্রতি অপ্রয়োজনীয় কটূক্তি করা হয়েছে। ফলে সাহিত্যসভা রাজনীতির দূষিত আবহাওয়াযুক্ত মল্ল-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে! স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, এই পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এই জাতীয় চপলতার ফলে বাংলা-সাহিত্যের সমাধি রচনার রাজসিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিশেষতঃ প্রবাসে এই ধরণের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রদান করার অর্থ যে সমগ্র বাঙালী জাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করা, সে কথা বোধ করি বিশেষ ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবের অতুল নাট্য মন্দিরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সুধীবৃন্দ যে অভিভাষণ প্রদান করেছেন, তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। দুঃখের বিষয় স্থানাভাবে কোনো পত্রিকাই সেই অভিভাষণের সমগ্র অংশ প্রকাশ করতে পারেন নি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"শাশ্বত ক্লাসিক সাহিত্য যে কল্পলোক সৃষ্টি করে তাহা বিশ্ব সংসারের। বাংলা-সাহিত্যে যে মরমীয়তার ও মানবিকতার সর্বামুখ্যত চেতনা আছে, তাহাই আজ উহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।" মূল সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"একথা যেন আমরা কিছুতেই না ভুলি, বৃহৎ ভারতবর্ষ ও তার জীবনধারা ও জীবন-বেদের মধ্যেই গভীরতর মানবধারা ও মানবদের মধ্যে বাঙালী জীবন, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মুক্তি, সে মুক্তি অন্য কোথাও নেই।" সাহিত্য বিভাগের সভাপতি অচিন্ত্য-কুমার বলেছেন—"প্রগতি যতই এগোক তাকে ফিরে আসতে হবে প্রণতিতে। এই ফিরে আসাই এগিয়ে যাওয়া, কেন না প্রগতি ঘুরছে চক্রবৎ আর চক্র ঘুরছে একটি ধ্রুব নির্লক্ষ্য বিন্দুকে আশ্রয় করে।...সাহিত্যের সৌধ ইদানীন্তনের ভিত্তিতে চিরন্তনের সৌধ।" সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি গোপাল হালদার বলেছেন—"বিংশ শতকের বাঙালী সমাজের ও সংস্কৃতির যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজন।"—এই সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে বাংলার বিদগ্ধ সমাজের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়, এইটুকুই বাৎসরিক সম্মেলনের নগদ লাভ।—এই সম্মেলন উপলক্ষে উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ, পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী এবং বিশিষ্ট হিন্দী লেখক শ্রীঅমৃতলাল নাগর যে উদার মনোভাবের পরিচয় দান করেছেন, বাঙ্গালীরা তার জন্য কৃতজ্ঞ।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বাংলার লোক-সাহিত্য

তীক্ষ্ণধী সহিত গভীর শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে যাঁরা সাম্প্রতিক কালে বাঙলা-সাহিত্যের অধ্যয়ন-আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন, শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন অগ্রগণ্য। তাঁহার 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থখানি তাঁর মনীষার কঠোর পরিশ্রম এবং নৈষ্ঠিক যত্নের শ্রদ্ধার্হ পরিচয় বহন করে। শ্রদ্ধেয় ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাঙলার এই সমৃদ্ধ সাহিত্যের সন্ধান দিয়া প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; তাতে এই সাহিত্য-শাখার প্রতি আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়েছিল বটে, কিন্তু সে আলোচনা তথ্যসমৃদ্ধও নয়, পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টীকৃতও নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বাঙলার লোক-সাহিত্যের সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করে লোক-সাহিত্যের ছড়ার দিকটা অতিশয় উজ্জ্বল এবং হৃদ্য করে তুলেছেন; কিন্তু তাঁর লেখায় চমৎকার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি অনেক থাকলেও, আলোচনার সমগ্রতা নেই। শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লোক-সাহিত্যের এই রস-আস্বাদনের দিকটিকে কোনও রূপে ব্যাহত না করে একটা ঐতিহাসিক সামগ্রিক দৃষ্টি ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা এই সাহিত্যের স্বরূপ উৎঘাটন করবার সাধু চেষ্টা করেছেন! লোক-সাহিত্য কথাটা আমরা সাধারণতঃ অত্যন্ত শিথিল ভাবে ব্যবহার করি; এই জন্য লেখক প্রথমে লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে তাঁর আলোচনার ক্ষেত্র নির্ধারিত করে নিয়েছেন। তার পরে তিনি সমগ্র লোক-সাহিত্যকে ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ ও পুরাকাহিনী—এই কয়ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উপযুক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা আলোচনা পূর্ণাঙ্গ এবং আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন আদিম জাতির সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকবার ফলে লেখক তাঁহার আলোচনাকে

বাঙালী জীবনের একটি বিস্তীর্ণ পটভূমিকার উপরে স্থাপিত করতে পেরেছেন। প্রকাশক ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৫০১; মূল্য ১০৲ টাকা।

আত্মস্মৃতি

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সবিশেষ পরিচিত। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ও কর্ণধার হিসাবে দীর্ঘকাল তিনি বাংলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত সাহিত্য-আন্দোলনে সজনীকান্তের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। স্বভাবতঃই তাঁর আত্মস্মৃতিতে এই দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজের বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে, মাঝে মাঝে সেই সব কথা উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এই সব ছাড়াও একটি দুঃসাহসী তরুণের জীবনযাত্রার উত্থান-পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস এই 'আত্মস্মৃতি'। স্থিতধী, বন্ধুবৎসল ও সংগঠক সজনীকান্তের বিচিত্র জীবনের মনোরম কাহিনী, কাব্যধর্মী ভাষায় কবি ও সমালোচক সজনীকান্ত বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে বিবৃত করেছেন। লেখক একটি বিশেষ যুগের ইতিহাস বিভিন্ন তথ্য ও ছোট-খাটো ঘটনায় মধ্যে পরিবেশন করেছেন এই আত্মস্মৃতিতে, সেই কারণে গ্রন্থটি মূল্যবান। এই গ্রন্থটির প্রকাশক, ডি, এম, লাইব্রেরী, মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

অচিন রাগিণী

বহু ভাষাবিদ্ লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী সর্বপ্রথম সাহিত্যে রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেন। বাংলার বাইরে যে সব বাঙালী পরিবার প্রায় স্থায়ীভাবে বাস করেন, "অচিন রাগিণী" তাঁদেরই ইতিহাস। বধূজীবনে ব্যর্থ নায়িকা, আর দুই কিশোরকে নিয়ে রচিত এই রূপকপ প্রেমোপাখ্যানে মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্য অতি সূক্ষ্ম আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন শক্তিমান লেখক, তাই মামুলী প্রেমের উপন্যাস না হয়ে "অচিন রাগিণী" একটি সার্থক কাহিনী হয়ে উঠেছে। প্রকাশক বেঙ্গল পাব্লিসার্স, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

নৌকাবিহারী বালক বা The Boatman Boy

বাংলা এবং ওড়িয়া, উভয় ভাষায় পারদর্শী লেখক শচীরাউত রায় এই যুগের একজন কৃতী কবি। ১৯৪২-এ এই কিশোর-কবি সম্পর্কে হারীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"উড়িষ্যায় আমি কয়েকটি তরুণ বিদ্রোহী কবির সংস্পর্শে এসেছি, তার মধ্যে শচীরাউত রায় অন্যতম, চব্বিশ বছরের এই ছেলেটির ব্যক্তিত্ব সারা উড়িষ্যায় স্বীকৃত। যখন ঢেঁকানলের নৌকাবিহারী বালক বাজী রাউতকে নির্মম ভাবে গুলি করা হয় এবং বেয়নেট আঘাতে জর্জরিত করা হয়, তখন শচী এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করে এক অগ্নিগর্ভ সঙ্গীত রচনা করে।

দাবানলের মত এই সঙ্গীত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শচী রাউত সম্প্রতি তাঁর "The Boatman Boy" এবং চল্লিশটি নির্বাচিত কবিতার একটি শোভন সঞ্চয়ন প্রকাশ করেছেন। ডাঃ কালিদাস নাগ এক সুচিন্তিত ভূমিকায় এই কাব্যগ্রন্থ ও কবির পরিচয় দান করেছেন। বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাষাগত ঐক্য বর্তমান, তাই কবি শচী রাউতের এই কবিতাগুলির মর্মগ্রহণে বাঙালীর অসুবিধা হবে না। কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কি, সিংহ এই কবিতাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। হারীন্দ্রনাথের সুমধুর অনুবাদে কবিতাগুলি স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এই সঞ্চয়ণে বোটম্যান বয়, অভিযান, নক্টার্ণ, পাণ্ডুলিপি, এ্যাপোক্লিপস্ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটির প্রকাশক—প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা—১, মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকখানি গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিশুদের জন্য লেখা কাব্যগুচ্ছ 'চিত্র-বিচিত্র' বাংলা সাহিত্যের আর এক নতুন সংযোজন। কবির বিভিন্ন সময়ের রচনা কয়েকটি কাব্যকণা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শিল্পী নন্দলাল বসুর বহু চিত্র গ্রন্থটির বিশেষত্ব। মূল্য ১৸০ ও ৩৲ টাকা। বিশ্বভারতী আরও একটি অপরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাসি'। ছোটদের উপযোগী কয়েকটি গল্প একত্র ক'রে এই বই প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলি শিশুপাঠ্য হ'লেও অবনীন্দ্রনাথের লিপিচাতুর্য্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে বড়দের কাছেও এর আদর ও আবেদন কম নয়। মূল্য আড়াই টাকা। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রকাশ করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'বৃষ্টি এল'। লেখকের বিভিন্ন সময়ের রচনা, কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্য-বিশ্লেষণ, সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে আলোচনা এবং বছরের প্রথম বর্ষণের ওপর লেখা আছে এই বইয়ে। লেখক, কবি এবং গল্পকার, তাই তাঁর প্রতিটি রচনার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক। রম্য-রচনায় লেখকের দক্ষতা যে অপরিসীম, তারই প্রমাণ এই গ্রন্থ। দাম দু' টাকা। প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গীত-শিক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রচুর পরিশ্রমসহ 'গীত-প্রবেশিকা' রচনা করেন। বর্ত্তমানে গ্রন্থটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সুবিধার জন্য স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল্য চার টাকা। প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির। প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ প্রকাশ করেছেন 'প্রত্যক্ষ-দর্শী কবির কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য'। রচনাকার ডাঃ সতী ঘোষ এম-এ, ডি-ফিল। গ্রন্থটি গবেষণাপূর্ণ এবং বহু পরিশ্রমে সার্থক। মূল্য পাঁচ টাকা। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশ করলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একই বৃন্ত।' শ্বেত ও রক্ত মতবাদের সুসমন্বয়ের মৌলিক নির্দ্দেশ আছে এই বইয়ে। ডি, এম লাইব্রেরী প্রকাশ করেছেন রমাপদ চৌধুরীর 'প্রথম প্রহর' নামে এক সুবৃহৎ উপন্যাস। 'দরবারী'-খ্যাত লেখক তাঁর ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এই গ্রন্থের স্থান, কাল ও পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করেছেন অভিনব। ভারতবর্ষে রেলপথের গোড়াপত্তনের সঙ্গে বাঙালীর সামাজিক যোগসূত্রতা আছে—তারই আলেখ্য এই গ্রন্থ। মূল্য সাড়ে চার টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ প্রকাশিত প্রভাত দেব সরকারের 'অকূলকন্যা' গ্রন্থটি লেখকের সুমিষ্ট রূপবর্ণনার সামর্থ্যে বেশ ভালই উৎরেছে। উল্লিখিত বইগুলির প্রত্যেকখানির ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ এককথায় চমৎকার!

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

একুশে অক্টোবর ভোরবেলা মুখ গোমড়া করে ঘরে বসে আছি। পিকিন ছাড়ব অনতিপরেই, সাতটা নাগাত ডাকতে আসবে। এখানে যেন ঘরবাড়ি হয়ে গেছে, আপন জন এরা সকলে। মন বিগড়াবার আরও কারণ, হোটেলের কাউকে কিছু দিতে পারব না। কড়া নিষেধ। লোকগুলোও এমন হয়েছে, বখশিস হাতে দিলে অপমান বোধ করে।

বিদায়বেলা তাই ওদের হাত জড়িয়ে ধরছি, কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছি। হোটেলের অচেনা আগন্তুকও কত জন এসে এসে এই বিদায়-যাত্রা দেখছে। বড় কষ্ট হচ্ছে। দোভাষি অনেকে চলল এরোড্রোম অবধি। দোভাষি বললে মোটেই পরিচয় হয় না, আমাদের পরমতম বন্ধু। সেই যে বলে, পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধলে বুক পেতে দেবো—সত্যি সত্যি তাই যেন পারে ওরা। শুধুই কাজের সম্বন্ধ হলে প্রাণের এত নিকটে আসত না।

শহর ছাড়িয়ে এলাম। পিছনে ফেলে এলাম কত কত মধুর ভালবাসা। আর আসব না হয়তো জীবনে, আর ওদের দেখতে পাব না। সকল মানুষ—রাস্তার অজানা মানুষটা অবধি কত ভালো, কত ভদ্র! ইয়ুং বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বললাম, সত্যি ভাই, বড্ড খারাপ লাগছে। ইয়ুং বলে, আমাদেরও। তবু বলি, সোয়াস্তিও পাচ্ছি মনে মনে। অহোরাত্রি এত দিন ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পাছে কোনরকম কষ্ট হয় তোমাদের। যাবো তোমাদের দেশে—যদি কখনো যোগাযোগ ঘটে। ভারত চোখে দেখবার জন্য বড্ড লোভ আমাদের।

এত ছেলে-মেয়ে এরোড্রোম চলেছে, সুইং কোথায়? সকাল থেকে তাকে মোটে দেখিনি। মালপত্র ও মানুষগুলো ওজন করার পরে এক মুশকিল। বোঝা বেশি হয়ে যাচ্ছে, এতটা প্লেনে চাপানো চলবে না; সাড়ে চার-শ' কিলোগ্রাম কমাতে হবে। চড়ন্দার আমরা ষোল জন; আর ভারী মাল প্রায় সব ট্রেনে চলে গেছে। তবু এই। দোষ বাপু তোমাদেরই। দু-হাতে উপহার দিয়েছ—আর এমন খাওয়ান খাইয়েছ—মানুষগুলোরও ওজন বেড়ে গেছে।

কি করা যায়! মানুষে ছাট-কাট চলবে না, জিনিষপত্র কি ফেলে যাওয়া যায়, দেখ। নীলিমা দেবী স্যুটকেশ খুলে নিতান্ত দরকারি কাপড়-চোপড় কিছু বোঁচকায় বেঁধে নিলেন। দেখাদেখি আরও অনেকে বোঁচকা বাঁধলেন। খাঁটি ভারতীয় রীতির বোঁচকা। ঐ সব বাড়তি জিনিষ ট্রেনে চলে যাবে সাংহাই।

এই সব হচ্ছে—একটা বাস এসে পড়ল আবার। হাতে ফুলের তোড়া—কলধ্বনি করে গুটি দশেক পায়োনিয়র ছেলেমেয়ে নামল। বিশিষ্ট বয়ীয়ান আরও এক দল এসেছেন—হোটেলে এসে পৌঁছতে পারেননি এঁরা তখন। সকলের পিছনে ঐ তো—সুইং-ইএা-মিঁ ধীরেসুস্থে নামল। চশমা খুলে কাচটা ভাল করে মুছে আবার চোখে পরল। ভারি শান্ত।

আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে মাল বাড়তির দরুন। প্লেন ছাড়বে এবার, সিঁড়ি লাগিয়েছে, প্রপেলার ঘুরছে। পায়োনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়ার আঘ্রাণ নিচ্ছি। ফুলেরই নয় শুধু—কচি কচি সোনার হাতে এই সব ফুল তুলে দিয়েছিল, আঘ্রাণ সেগুলিরও। ভিড়ের সর্বশেষ প্রান্তে সুইং—নিকেলের গোল চশমার ফাঁকে নিঃশব্দে সে চেয়ে রয়েছে।

সুইং, লক্ষ্মী বোনটি, আসি এবারে? চলে যাবার সময় আমাদের ভারতে 'যাই' বলতে নেই, বলতে হয় 'আসি'—

জবাবে সুইং ভারতীয় রীতির একটি নমস্কার করল। কৌতুকি ঝগড়াটে দামাল মেয়েটা ভালমন্দ একটি কথা উচ্চারণ করল না। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল শুধু।

প্লেন আকাশে উঠল, কত স্নেহ-ভালবাসা ফেলে এলাম সেই মাঠের প্রান্তে। বিদায় বন্ধু, বিদায়! আর আসবো না এখানে, আর কখনো দেখবো না তোমাদের! পর্বত সমুদ্র ও হাজার হাজার মাইল ভূমির ব্যবধানে আবার আমরা তফাৎ হয়ে গেলাম।

কাচের জানলা দিয়ে দৃষ্টি আমার মাটির দিকে তাকিয়ে আকুলি-বিকুলি করছে। মানুষ এমন ভালো! তুমি একটুও জানো না, দুনিয়ায় কত আত্মীয়তা বিছানো রয়েছে তোমার জন্য! আমার ভাগ্যদেবতাকে আমি বার বার প্রণাম করি। ভুবনের কত রূপ দেখে গেলাম, ভুবনের দেশে দেশে কত পরমাশ্চর্য সুন্দর মানুষ!

এক পাক দিয়ে গ্রীষ্মপ্রাসাদ। বিশাল লেক, জলের উপর ঘর, মাটি কেটে পাহাড় উঁচু-করা, তার উপরের হর্ম্যমালা—এই যে গ্রীষ্মপ্রাসাদ, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আর এক দিন বিমুগ্ধ সম্ভ্রমের দৃষ্টি নিয়ে কক্ষ-অলিন্দ-চত্বরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলাম, আজকে সেই সব চাঁদ-তারাদের মতন উপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি। দেখে হাসি পায়। শ্বেতবরণ জয়স্তম্ভ—কোন এক মহারাজা রাজদণ্ড পাথরে গেঁথে লোকের চোখে তুলে ধরেছেন—কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হচ্ছে এই উপর থেকে! মহারাজা ভেবেছিলেন কি বিশাল কীর্তিই না স্থাপন করে যাচ্ছেন! তখন যে মানুষের উড়বার পাখা হয়নি। আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে তাঁর লজ্জা করত।

দিনটা ভালো নয়, জোর বাতাস বইছে। কাল সর্বক্ষণ টিপটিপ বৃষ্টি হয়েছে, আজকেও সূর্য মুখ দেখালেন না এখন অবধি। নগর-গ্রাম, চৌবন্দি ক্ষেত-খামার, এবং কারখানার খোপ-কাটা ছাত দেখতে দেখতে—হঠাৎ এক সময় ডুবে গেলাম মেঘ ও কুয়াশা-সমুদ্রের মাঝখানে।

স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে দিক্‌চিহ্নহীন আকাশে উল্কাগতিতে ছুটছি। বিচিত্র অনুভূতি। ধরণীর সঙ্গে কোন রকম বন্ধন নেই। কান দুটো আচ্ছা করে তুলো এঁটে বধির করে দিয়েছি। কর্মহীন চক্ষু দুটো অলসভাবে কামরাটুকুর মধ্যেই ঘোরা-ফেরা করছে; এদিকে ওদিকে একটু-আধটু লেখা যে পড়ব—তা-ও চীনা হিজিবিজি। তাজ্জব ভাষাপ্রীতি এদের। সেদিনকার সেই যে লেখক-শিল্পী সমাবেশ, তাতে এক কাণ্ড হল। সেই কথা মনে পড়ছে। মাও-তুন বক্তৃতা করছেন—দোভাষি মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি করে যাচ্ছে। লাগসই কথা বলতে পারছে না, মাও-তুন শুধরে দিলেন তাকে দু-তিন বার। অথচ নিজে কিছুতে ইংরেজি বলবেন না—ইজ্জতহানি হয়।

ডাক বুঝে হোস্টেস বসবার আসনটা নিচু করে দিল। বাঙ্ক থেকে কম্বল নামিয়ে গায়ে চড়াবার উদ্যোগ করছিল, হাত নেড়ে নিষেধ করলাম। তাকিয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কামরার বাকি প্রাণীগুলি কম্বলের তলে চোখ বুজেছেন। জাগরণ আর ঘুমে যেখানে কোন তফাৎ নেই, মিছে কষ্ট করে চোখ মেলে থাকতে যাবেন কি জন্য?

বেলা দুটোয় প্লেন ভুঁয়ে নামল। সাংহাই। প্লেনের ভিতরে সবাই পথ ছেড়ে দিলেন, আমি আগে নামব। [illegible] কামেরার আক্রমণের মুখোমুখি [illegible] বাচ্চার হাতের ফুলের মালা [illegible]। ওঁরা সঙ্গে থাকবেন। কাপড়ের পুঁটলি বিচলু বরাবর ওই ঝক্কি ঝুলিয়ে রেখেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আসেননি—চিকিৎসার জন্য পিকিনে রয়ে গেছেন। তখন বুঝিনি, ষড়যন্ত্র আছে এর পিছনে। সারবন্দি মোটরকার—বড়লোকের বিয়ের শোভা-যাত্রার মতো রাস্তা কাঁপিয়ে শহরতলী ছাড়িয়ে আমরা চললাম। অবশেষে আসল শহর। পরিচ্ছন্ন, আধুনিক। পিচ-দেওয়া ঝকমকে চওড়া রাস্তা। পনের তলা, বিশ তলা, তিরিশ তলা ঘর-বাড়ি। নগর-পরিকল্পনা পশ্চিমি মগজের। অনেক বছর ধরে মনের মতো করে গড়েছিল; আজকে তোবা করতে হয়েছে। সাদা মানুষ তবু এখনো দশ-বিশটার দেখা মেলে—পিকিনের

সাংহাই এরোড্রোমে লেখকের সম্বর্ধনা।

সামনে ওয়াং সাও-হো'র প্রতিমূর্তির বাম দিক থেকে—কুমারী তুন, মারাঠি প্রতিনিধি রঘুনাথ কেশব খালিদকর (চুরুট মুখে), লেখক, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ শাণ্ডিল্য।

চেয়ে গুণতিতে অনেক বেশি। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তারা পথ চলে—ভূত হয়ে চলছে যেন। ভূতই বটে, সকল প্রতাপ অস্তমিত। কেউ আজ সম্ভ্রম করে না, প্রাণ-ধারণের গ্লানি পদে পদে। বরাবর যাদের কুকুর-বিড়াল ভেবে এসেছে, তারাই মাতব্বর। নিতান্তই পেটের দায়ে যে ক'টা দিন পারা যায়, চোখ-কান বুজে পড়ে আছে।

আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার সামনে গাড়ি একে একে এসে থামতে লাগল। ক্যাথে হোটেল আগেকার নাম, এখন কিংকং হোটেল। সিঁড়ি নেই, হলের এদিক-ওদিক চারটে লিফ্‌ট অবিরত ওঠা-নামা করছে। আচ্ছা মশায়, বিদ্যুৎ-সরবরাহ বানচাল হয়ে লিফট যদি অচল হয়, তখনকার উপায়? এত বড় বাড়ির একটা সিঁড়ি হয়নি কেন?

নিজেদের আলাদা বিদ্যুৎ-তৈরির ব্যবস্থা আছে। শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হল তো বয়ে গেল—তখন নিজেদের কল চালু করে দেবো।

এগারো তলায় নিয়ে তুলল আমাদের। ঐখানে স্থিতি। খেতে হবে একতলা নেমে গিয়ে—দশ তলায়। লাউঞ্জে বসে দুধ-চিনি-হীন সবুজ চা কাপ দুই খেয়ে চাঙ্গা হলাম। সে বস্তু পান নি বোধ হয় আপনারা—দুধ-চিনি ঠেকালেই বিস্বাদ হয়ে যাবে, অমন গন্ধটুকু থাকবে না।

ঘরে ঢুকে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। শহর কত নিচে, মানুষগুলি গুড়িগুড়ি কলের পুতুলের মতন! আমরা আছি ইদানীং রীতিমত উঁচু মেজাজে। আকাশে উড়ে এসে যেখানটায় বাসা দিল, সে-ও আধেক আকাশ। মস্ত বড় ঘর—তার মধ্যে যথারীতি আমি এবং ক্ষিতীশ।

দরজায় ঠকঠকি। আলনার কোটটা গায়ে চাপিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ভদ্রলোক হয়ে বলি, ভিতরে চলে আসুন—

আসছেন তো আসছেনই। দলে যে ক'জন ছিলেন সকলেই। অত জনের বসবার জায়গা কোথায় দিই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলল।

কিচলু তো আসেন নি। নেতা বিহনে কি করে চলে? নেতা ঠিক করতে হবে একজনকে।

বেশ, হোক তবে তাই—

তৎক্ষণাৎ নেতার নাম প্রস্তাব, সমর্থন এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনান্তর ঝটপট সকলে বেরিয়ে গেলেন। বিচারক যেমন রায় দিয়ে খাস-কামরায় ঢুকে যান—তাকিয়ে দেখেন না, হতভাগ্য আসামির অবস্থাটা কি দাঁড়াল। দেড় মিনিটে সমস্ত শেষ। আমার একটা কথা শোনাবারও ফুরসৎ হল না। দলবল সাজিয়ে তৈরি হয়ে ঘরে ঢুকেছেন, আগে তা বুঝব কেমন করে?

তা যেন হল। কিন্তু নেতা হওয়ার ধকল যে বিস্তর। যেখানে পা ফেলবেন, আদ্য কিম্বা অন্ত ভাগে সভা একটু হবেই। নেতা মশায়ের সেই সময়ে জবান ছাড়তে হবে। ভারতীয় মানুষ—বাক্যের ব্যাপারে অবশ্য নিতান্ত অপারগ নই। আর একটা আছে—অতিথির সম্মাননায় পয়লা মওকায় বিরাট ভোজ। উপরি হিসাবে আবার বিদায়ভোজেরও আয়োজন থাকে অনেক জায়গায়। এবম্বিধ ভোজ-সভায় ইতিপূর্বে একটেরে বসে আত্মরক্ষা করেছি। নজর ফাঁকি দিয়ে পাঁচ বছরের বাসি-ডিম কিম্বা এটা-ওটা বেমালুম ডিসের তলায় সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু নেতাকে বসতে হবে কেন্দ্রস্থলের বড় টেবিলে—ও-তরফের বাছা বাছা মাতব্বরের সঙ্গে। কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন, ঘূর্ণ্যমান বহু-তারকা সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। এমনি তরো শতেক বিপদ নেতার।

ফাঁসির হুকুমে তো আপিল চলে! সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশ চন্দ্রের কাছে ধর্না দিয়ে পড়লাম। কিন্তু পাষাণ অধিক মাত্রায় গলানো গেল না। শেষ পর্যন্ত রফা হল—নেতা আমিই রইলাম; বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দিল্লির যজ্ঞদত্ত শর্মা আমায় মন্ত্রণাদান করবেন।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অতিথিদের খাতিরে নাচ-অপেরার দরাজ আয়োজন। সন্ধ্যায় ভোজের হাঙ্গামা। ইতিমধ্যে ঘুরে ঘুরে শহরের যেটুকু দেখা যায়।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হল। থামবার নয়—চলছে তো চলছেই। নতুন দোভাষি—আমার গাড়িতে যাচ্ছে, মেয়েটির নাম হল তুন সু-সে (Tung Shu-Tse)। অধ্যাপনার কাজে ঢুকেছে সম্প্রতি। ভাল মেয়ে, খাসা ইংরেজি বলে—নয়তো ঐ বয়সে অধ্যাপক করবে কেন? কিন্তু বৃষ্টিজলে পণ্ড করে দিল সমস্ত। নামতে পারছি না, গাড়ির খোলে বসে বসে কি জায়গা দেখা হয়? দেবরাজ, ক্ষমা দাও—কম সময়ে কত কি দেখবার। আমরা চলে গেলে যত খুশি তুমি জল ঢেলো।

চীনের সব চেয়ে বড় শহর এই সাংহাই। বাঁধানো পোস্তা দিয়ে চলেছি—তরঙ্গিনী হোয়াং-পু'র কিনারা ধরে। সমুদ্রও বেশি দূরে নয়। মস্ত বড় বন্দর। নানকিনের সন্ধির মহিমায় যেসব জায়গা বিদেশির করায়ত্ত হয়েছিল, তার মধ্যে সকলের সেরা। ক'বছর আগেও বিদেশি মানোয়ারি জাহাজ ঐ জলের উপরে ঘুরে ঘুরে বিদেশি স্বার্থ পাহারা দিত; চীনের মানুষজন উপোসি রেখে সাত সমুদ্র পারে খাদ্য পাচার করত। পরগাছারা বিদেয় হয়েছে, জাহাজঘাটায় তাই ভিড় নেই—নিজেদের যে দু-পাঁচটা জাহাজ, তারাই বেশ গতর ছড়িয়ে আছে। ঐ সব বড় বড় বাড়িতে ছিল হোটেল-রেঁস্তরা, পতিতালয়—আমোদ-স্ফূর্তি হৈ-হল্লার জায়গা। সারা দুনিয়ার মানুষ আসত আমোদ লুঠতে—সাংহাইর নাম দিয়েছিল 'পুব অঞ্চলের প্যারি'। বিদেশিদের জন্য আলাদা এক পাড়া—'ফ্রেঞ্চ টাউন'। নামেই মালুম—মানে বোঝাবার প্রয়োজন নেই বিশদ ভাবে। ফ্রেঞ্চ টাউনের বড় বড় বাড়ির ছায়ান্ধকারে ভাঙাচোরা বস্তির মধ্যে কীটের মতন জীর্ণ-শীর্ণ চীনা ভিক্ষুকের দল। নদীর এধারে-ওধারে ফ্যাক্টরিগুলোর মালিক সমস্তই ছিল বিদেশি। আটটার ভোঁ বাজলে কোথা থেকে মজদুরের দল কিলবিল করে আসত, ফ্যাক্টরি বন্ধ হলে আবার নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ত তারা।

এখন ভিন্ন এক জায়গা। ভিখারি নেই, পতিতা নেই। স্ফূর্তি আর মাতলামির জায়গা হোটেল-রেস্তোরার বাড়িগুলোয় নানান জন-প্রতিষ্ঠান হয়েছে। স্বাস্থ্য ও সুরুচির উল্লাস সর্বত্র। কুয়োমিনটাং সৈন্যেরা বোমা মেরে মেরে শহরের বুকে অগণ্য বিষাক্ত ঘায়ের সৃষ্টি করেছিল, বেমালুম সমস্ত এরা আরোগ্য করে ফেলেছে।

ভিক্ষা আর পতিতাবৃত্তি নির্মূল হল—সে গল্পটা বলতে হবে নাকি? ঝটপট এখন বই শেষ করতে চাই, কত আর গল্প

শোনাবো? তুন মেয়েটা বড্ড দেমাক করছিল—আদিম কাল-থেকে-আসা এত পুরাণো ব্যাধি ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আমরা নিরাময় করে ফেললাম। পতিতালয়ে আগের সন্ধ্যায় মধুপায়ীরা ভিড় জমিয়েছিল, পরের সন্ধ্যায় এসে দেখে ভোঁ-ভোঁ। ঘরবাড়ি নির্জন—একটি হতভাগিনী নেই কোন জানলার ধারে। শুধু একটি বাড়ি নয়, গোটা শহরই পতিতাশূন্য। তাই বা কেন—পতিতা নেই মহাচীনের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কোন জায়গায়।

মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়ে গবর্নমেণ্ট নয়—রাজশক্তি দেশের সর্বমানুষের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে। কোন নতুন আইন হবার আগে দেশময় জানান দেওয়া হয়। মিটিং করে, ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা করে, প্রস্তাব পাশ করে বিভিন্ন ইউনিয়ন। মাসের পর মাস ধরে চলে এই সমস্ত। আইন পাশ হতে লাগে দশ-বিশ মিনিট মাত্র—বক্তৃতাদি আগেভাগে চুকিয়ে রাখা হয় আইন-সভায় নয়—শহর-গ্রামের গণমানুষের মধ্যে। দেহ বিক্রি করা অথবা অর্থমূল্যে দেহ কেনা বে-আইনি—আইনটা পাশ হল ধরুন বেলা ছুটোর সময় পিকিন শহরে। তিনটে নাগাত দেখা গেল শহরের পতিতালয়গুলোয় সরকারি লোক হানা দিয়েছে—হাতে এক এক ফর্দ। তুমি শ্রীমতী অমুক বুড়ো-অশক্ত হয়েছ—বেথরচায় সরকারি আশ্রমে গিয়ে থাকো গে। তুমি চলে যাও অমুক জায়গায় নার্সিং শিখতে, তুমি অমুক ফ্যাক্টরিতে। তুমি রোগাক্রান্ত—অমুক হাসপাতালে চলে যাও। এ বাচ্চাটি অমুক ইস্কুলের বোর্ডিং-এ যাবে; এটি অমুক নার্সারি-হোমে। এই যে ব্যাপারটা, হল এমন একটা ছুটো জায়গায় নয়—খবর নিয়ে দেখুন, দেশের সর্বত্র। আগে থেকে বিভিন্ন সমিতির মারফত তালিকা বানিয়ে সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করে রেখেছে; শুধু আইন করেই দায় খালাস নয়। ভিখারি সম্পর্কেও এমনি ব্যাপার। দেশের মধ্যে অপচয় বন্ধ—সেটা জিনিসপত্র জীবজন্তু মানুষ সকলের সম্পর্কেই। সেদিনের সামাজিক আবর্জনারা আজকে হীরা-মাণিক-কোহিনুর হয়ে উঠেছে। বিয়েথাওয়া করে সংসারধর্ম করছে অনেক মেয়ে। নার্স হয়েছে, রেলের গার্ড-ড্রাইভার হয়েছে। কয়েকটিকে স্বচক্ষে দেখেছি আমরা। আর দশটির মতন সমাজের সম্মানিতা মেয়ে—স্বাস্থ্য ও আনন্দে ঝলমল।

অপেরায় তিনটে পালা একের পর এক। রাত কাবার করে ছাড়বে দেখছি। নাচ আর গান, গান আর নাচ। সে আর দেখাই কেমন করে আপনাদের—ছু-কথায় গল্প তিনটে শুনিয়ে দিই। পয়লা পালা হল পৌরাণিক—'সিচাউ নগরের গল্প'। সিচাউ নগরের কাছে রামধনু-সাঁকোর নিচে জলকন্যা থাকে। নগরপালের ছেলে সি টিং-ফ্যাংকে সে ভালবেসে ফেলল। মায়া করে জলকন্যা তাকে জলতলের প্রাসাদে নিয়ে এলো বিয়ে-থাওয়ার জন্য। সি কিন্তু পছন্দ করে না জলকন্যাকে। বিয়ের ভোজের মধ্যে সে জলকন্যাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে, তার কণ্ঠ থেকে মায়ামুক্তা নিয়ে জলতল থেকে পালিয়ে উপরে উঠে গেল। জলকন্যা ক্ষেপে গেল এমনি ভাবে প্রতারিত হয়ে; বন্যায় নগর ভাসিয়ে দিল। লোকের ছুঃখের অবধি নেই। জলকন্যার উপরে আছেন দেব-রাজপুত্র। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দেবসৈন্য পাঠালেন জলকন্যার দমনের জন্য। নদীর নিচে বিষম লড়াই। জলকন্যা হেরে গেল অবশেষে।

পরেরটা ঐতিহাসিক পালা—'প্রিয়তমার সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ।' খৃষ্টপূর্ব ২০৭ অব্দের ব্যাপার। অত্যাচারী চিন সি-ওয়াঙের বিরুদ্ধে লড়াই করছে লিউ পোঙের নেতৃত্বে চাষীর দল, এবং সিয়াং উ। লড়াই জিতে সিয়াং উ হল রাজচক্রবর্তী আর লিউ পোঙ হল হানের রাজা। তার পরে বেধে গেল সিয়াং উ আর লিউ পোঙের মধ্যে। সিয়াঙের মন বড় খারাপ—লড়াইয়ে সুবিধা করা যাচ্ছে না। সিয়াঙের উপপত্নী উ চি অসি-নৃত্য করল সিয়াঙকে খুশি করবার জন্য। উন্মাদক নৃত্যে নবোৎসাহে মেতে উঠল সিয়াং: ইয়াং সি নদীর পূর্বপারে সে নতুন সৈন্যব্যূহ রচনা করল। করল বটে; কিন্তু মন যায় না রূপসী প্রিয়া উ চি'কে ছেড়ে যেতে। উ চি অবশেষে আত্মহত্যা করে পথ নিষ্কণ্টক করে দিল। বিরহ-ব্যাকুল সিয়াং হেরে গেল লড়াইতে; আত্মহত্যা করে সে-ও প্রিয়তমার পথ নিল। লিউ পোং সর্বময় হয়ে হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করল—দেশব্যাপ্ত চাষী-বিদ্রোহের ফল আত্মসাৎ করল একা এই একটি লোক।

শেষ পালাটা পরী-কাহিনী—'মায়াপদ্মের লণ্ঠন।' উত্তর-চীনের আকাশ জুড়ে অপরূপ হ-সান পর্বত। এই পর্বত নিয়ে যুগে যুগে অসংখ্য পরী-কাহিনী তৈরি হয়েছে। এর ল্যাং-সেং দেব-রাজপুত্র। ছোট বোন দেবীকে নিয়ে সে পর্বতের উঁচু চুড়ায় থাকত। হ-সান পর্বতের সর্বোত্তম ঐশ্বর্য হল মায়াপদ্মের লণ্ঠন। পরী-জগতের কর্তা হবার জন্য এর এই লণ্ঠন চুরি করল, লোহা-দৈত্যকে পর্বত চাপা দিল, তার বোনকে রাখল অত্যন্ত কঠোর শাসনে।

লিউ ইয়েন-চ্যাং কবি; অফিসের পরীক্ষায় ফেল হয়ে মনমরা ভাবে বাড়ি ফিরছে। হ-সান পার হবার সময় পশ্চিম-চুড়ার মন্দিরে সে রাত কাটাচ্ছে। সেই মন্দিরে দেব-রাজপুত্র ও তার বোন দেবীর মূর্তি। বোনের রূপ দেখে পাগল হয়ে কবি দেয়ালে তার নামে এক কবিতা লিখল। জ্যোৎস্না রাত, লিউ ঘুমিয়ে পড়েছে—দেবী তখন মন্দিরে এলো। পড়ল দেয়ালের কবিতা।

সকালবেলা বড় কুয়াশা। তারই মধ্যে লিউ মন্দির ছেড়ে বেরুল। দেব-রাজপুত্রের এক ভয়ানক কুকুর—সে তাড়া করেছে লিউকে। দেবী আর তার সহচরী লিন চি দেখতে পেলো লিউর অবস্থা। হ-সানের চুড়ায় গিয়ে জোর করে তারা মায়াপদ্মের লণ্ঠন নিল লিউকে বাঁচাবার জন্য। দেবীর বিয়ে হল লিউয়ের সঙ্গে; লোহা-দৈত্যও মুক্তি পেলো। স্বামী নিয়ে দেবী মহাসুখে থাকে। এদিকে কুকুরের কাছে দেব-রাজপুত্র শুনল সমস্ত। কুকুর মায়া-লণ্ঠন চুরি করে নিল। দেবী তখন লিউকে দেশে পাঠিয়ে দিল, নয়তো ভাইয়ের আক্রোশ থেকে তাকে বাঁচানো অসম্ভব। দেবীর এক ছেলে হল—চেং সিয়াং। এর বাচ্চাটাকে মেরে ফেলছিল, লিন চি অনেক কষ্টে বাঁচাল। তখন দেবীকেই পর্বতের নিচে আটকে রাখল এর। লিন-চি লিউর কাছে গিয়ে সমস্ত খবর দিল।

পনের বছর কেটেছে, চেং সিয়াং বড় হয়েছে। সবাই তাকে ডাইনির ছেলে বলে। লিউ একদিন ছেলেকে সব বলল। এক

রাত্রে চেং কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল মায়ের উদ্ধারের জন্য। অসংখ্য বাধাবিপত্তি। অবশেষে লোহা-দৈত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। চেঙের মায়ের উদ্ধারের জন্য দৈত্য সকল সাহায্য করবে। দেব-রাজপুত্রকে কিছুতে খুঁজে পায় না। মন্দিরে তার যে মূর্তি ছিল, চেং এক কোপে সেই মূর্তির গলা কেটে ফেলল। এর আর কুকুর বেরিয়ে এলো তখন। কুকুরকে মেরে ফেলল, এরকে সে লড়াইয়ে হারিয়ে দিল। পাহাড় কেটে দু-ভাগ করে মায়ের উদ্ধার করল চেং সিয়াং।

ফিরেছি গভীর রাত্রে, কথাবার্তার তখন সময় ছিল না। ব্রেকফাস্টের আগেই রমেশচন্দ্র দুন ও আর কয়েকটিকে নিয়ে সরে গেলেন। নেতা তুমি—এখনকার প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেল। দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত সকলে। পরের ভাত খেয়ে গতর বাগানো যাচ্ছে বটে, তা-হলেও দেশে কাজকর্ম রয়েছে। তারও বড় কথা, লজ্জা-শরম আছে তো কিঞ্চিৎ—কত দিন আর থাকা যায় পরের কাঁধে চেপে? সময় কম, দেখবার জিনিষ বিস্তর। এক নিশ্বাসে রামায়ণের সাত কাণ্ড শেষ করবার ব্যাপার এইবার।

আজকে চার জায়গায় যাবো—কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন, সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি, একটা কর্মিকপল্লী আর কাপড়-চোপড় ছোপানোর সরকারি ফ্যাক্টরি। আর এক ব্যাপার আছে—কাল বহু লক্ষ লোকের বিরাট এক সভা। পিকিনের পাট চুকিয়ে বিস্তর প্রতিনিধি সাংহাইয়ে জমেছেন। শান্তি-সম্মেলনের ধারণাতীত সাফল্য হয়েছে—এখানকার মানুষও শান্তির কথা শুনতে চায় পিকিনের মতো সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ না-ই আসুন, যে দেশ-গুলো হাজির আছে সকলের তরফ থেকে বলতে হবে কিছু কিছু। ভারতের দু-জন বলবেন। দলনেতা হিসাবে আমার রেহাই নেই—অপর কে বলবেন, এখনই ঠিকঠাক করতে হবে।

জওহরলালের দেশের মানুষ—বক্তৃতার জন্য অনেকেরই মুখ চুলকানো স্বাভাবিক। তাই ঠিক করেছি, একজন-দু'জনের একচেটিয়া কারবার থাকতে দেওয়া হবে না। যত জনকে পারি, সুযোগ দেবো। সুযোগ পেয়েও না যদি বলেন, তখন আমার দোষ রইল না।

পশুপতি বেঙ্কট রাঘবিয়া পার্লামেন্টের সদস্য—তাঁকে বললাম বক্তৃতা তৈরি করবার জন্য। রাতের মধ্যে আমায় দেবেন; দুই বক্তৃতা সকালবেলা ওদের কাছে দেবো চীনা তর্জমার জন্য। আমরা তো ইংরেজিতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে চীনায় না বলে দিলে সাধারণে কেউ বুঝবে না!

কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন মস্ত বড় প্রতিষ্ঠান। বিশাল বাড়ি—নতুন রংচং এবং একটু-আধটু রদবদল হয়ে আরও ঝকমকে হয়েছে। কুয়োমিনটাং আমলে হোটেল ছিল—নামের তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'প্রাচ্য হোটেল'। সেই সব হোটেলের একটি, যার নামে স্ফূর্তিবাজ বিদেশির মুখে লালা ঝরত। মুক্তির এক বছর পরে ১৯৫০ অব্দের ১লা অক্টোবর সংস্কৃতি-ভবন রূপে বাড়ির দরজা খুলে দেওয়া হল কর্মিক সাধারণের জন্য। তখন হাজার পাঁচেক লোক আসত, এখন কমসে কম দশ হাজার আসে প্রতিদিন।

নানান বিভাগ—তার একটা হল, শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ। সাহিত্য, রাজনীতি ও কারু-শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একবার। বিশিষ্টেরা আসেন বক্তৃতা দিতে। লাইব্রেরি আছে—আটাত্তর হাজার বই। শ-দুয়েক বই রোজ বাড়ি নিয়ে যায় পড়তে। আর পাঠাগারে বসে পড়ে হাজার তিনেক। পাঠাগার অনেকগুলো—ঘুরে ঘুরে দেখছি। বই-কাগজ টেবিলে সাজানো সুস্বাদ খাদ্যের মতো—লোকগুলো দু-চোখ দিয়ে গোগ্রাসে গিলছে। যারা বেশি এগিয়েছে, তাদের স্বতন্ত্র পাঠাগার। বেশি ছিমছাম—নিঃশব্দতা সেখানে বেশি। বাড়ির তেতলায় বইয়ের দোকান আছে। পড়ে পড়ে কর্মিকদের নেশা ধরে গেছে। দৈনিক হাজার বই বিক্রি—ওদেরই জন্যে বিশেষ সস্তা সংস্করণ।

এরই মধ্যে একবার এক প্রশস্ত হলঘরে টেনে নিয়ে লম্বা টেবিলের এধারে-ওধারে চারিয়ে বসিয়ে দিল। (এবং টেবিলের উপর—উঁহু, কতকগুলো প্লেট-কাপ, তাতে কোন-কিছু ছিল কিনা আমার মনে পড়ছে না।) সেক্রেটারি মশায় আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন, আমাকেও পাল্টা জবাব দিতে হল তার। এই এক প্রতিযোগিতা—কে কাজের সম্বন্ধে কত ভাল ভাল কথা বলতে পারে!

অনেকগুলো ঘর নিয়ে রকমারি এক্জিবিসন। এই ব্যাপারে বড় সজাগ এরা। যেখানে যাই এক্জিবিসন একটা আছেই। মানুষকে শেখাবার এমন সহজ পদ্ধতি আর নেই। যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে কত এগিয়েছে এরা! ট্রলিবাস বানাচ্ছে নিজেরা, বয়নশিল্পের বিস্তর উন্নতি করেছে। নানা ধরণের বৈদ্যুতিক কলকব্জা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম হিসাবের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও। সহজে ও সস্তায় বাড়ি তৈয়ারির নানা কায়দা বের করছে এক সাধারণ মিস্ত্রি—মেজে পালিশ করা, মশলা মাখা ও গাঁথনির নানা পদ্ধতি। এমনিতরো অনেক আবিষ্কারেরই গৌরব হাতে-কলমে কাজ-করা ওস্তাদ কর্মিকদের, ধুরন্ধর কোন বৈজ্ঞানিকের নয়। কাজ করতে করতে মাথায় এসে গেছে নতুন ভালো কায়দা। এক মেয়ে-কর্মিক আবিষ্কার করেছে কাপড় বোনার নতুন রীতি—কম সময়ে অতি কম দামে ভাল জিনিষ উৎপন্ন হবে। দেখতে দেখতে এই কথাই বারম্বার মনে হল—কর্মিকরা যদি উপলব্ধি করে তারা খাটছে নিজের দেশ ও নিজের মানুষদের জন্য, তাদের গতর-ঘামানো লাভ অন্য কেউ লুণ্ঠন করে নেবে না, তবে তো অসাধ্যসাধন হয় তাদের দিয়ে।

সাংহাইয়ে কর্মিকদের মোট সংখ্যা শুনলাম প্রায় পাঁচ লাখ সত্তর হাজার। কারখানা-মজুরের যে চেহারা আমাদের মনে আসে, যে আঁধার উত্তীর্ণ হয়ে এরা মনুষ্যত্বের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে! শুধুমাত্র এই সংস্কৃতি-ভবন নয়, ছোট-মাঝারি বিস্তর ক্লাব আছে কর্মিদের। অনেক ছবি আঁকে—কর্মিকদের আঁকা বিস্তর ছবি রয়েছে দেয়ালে। উডকাটও আছে। কবিতা লেখে—তা-ও রেখে দিয়েছে এক্জিবিসনে। সারা দেয়াল জুড়ে পোষ্টার ও প্রচারপত্র; গোটা চীনদেশের অগ্রগমনের ছবি। নবজাগ্রত জাতি দুরন্ত বেগে সকল দিকে এগিয়ে চলেছে—সেটা আর মুখে বলে দিতে হয় না, ছবি দেখেই মালুম হয়। কর্মিক-আন্দোলনের ইতিহাস ছবিতে লেখায় জিনিষপত্রও সাজিয়ে রেখেছে, কয়েকটা ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই সমস্ত ইতিহাস মনের

উপর জ্বলজ্বল করবে। ১৯২৯ অব্দ থেকে আন্দোলনের শুরু বলা যায়—রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উভয়মুখী। তার আগেও ছিল, কিন্তু সে হল ইতস্তত বিস্ফোরণ—প্রণালীবদ্ধ কিছু নয়। পয়লা মওকায় নেতাদের জেলে ঢোকালো—সর্বত্র যেমন হয়ে থাকে। কোন ফল হল না—সর্বত্র যেমন দেখা যায়। কুচাং-ফুং নামে এক মেয়েকে মেরে ফেলল (১৯২৩ অব্দ); থানার সামনে বিরাট মিছিল—সেই পুরাণো ছবি দেখতে পাচ্ছি। জাপান ও আমেরিকার মিলিত-অভিযান। কী কষ্ট, কী কষ্ট দেশের মানুষের! কত মেরেছে, কত জনের হাত-পা কেটেছে! তারও বিস্তর ছবি রয়েছে। শহর জুড়ে সাধারণ-ধর্মঘট। সেই সময়কার কাগজে ধর্মঘটের ছবি দিয়েছিল—খবরের কাগজের সেই অস্পষ্ট ছবি কেটে রেখে দিয়েছে। তার পরে বন্যা এলো আন্দোলনের। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে। সে আমলের নগণ্য তরুণ কর্মীদের ফোটো দেখছি—এঁদের অনেকেই আজ নতুন-চীনের কর্ণধার। নির্জন সেলের ভিতর মৃত্যুর মুখোমুখি বসে শান্তচিত্তে কত ভাবনা ভেবেছে, বন্ধুদের লেখা চিঠিপত্রে তার পরিচয়। পালা বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় অভিনয় করে জাপানকে রুখতে বলেছে। আহা, ভাগ্যিস ফোটোগুলো তুলে রেখেছিল—তাই তো আন্দোলনের নানা পর্যায়ের খানিকটা আন্দাজ নিয়ে এলাম। ১৯৩৮ সালে লড়াইতে জখম হয়ে এক মৃত্যুপথযাত্রিনী লিখেছে, "আমার মরণ কিছুই নয়—এক হয়ে সকলে সংগ্রাম করো।" ১৯৪৭ অব্দে মার্কিণ জিনিষপত্র বয়কট করল, তাই নিয়ে বা মারা গেল কত মানুষ!

আর দেখলাম, এক সর্বত্যাগী তরুণের প্রতিমূর্তি—ওয়াং, সাও-হো। ১৯৪৮ অব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর কুয়োমিনটাঙের লোক গুলি করে মেরেছিল তাকে। প্রতিমূর্তির নিচে এক কাঠের বাক্স—তার মধ্যে শহীদের জামা পাজামা টুপি, বই খাতা ফাউন্টেনপেন। গুলিতে জামা ফুটো হয়ে গেছে, রক্ত বেরিয়ে চাপ-চাপ এঁটে রয়েছে জামার উপর। সমস্ত আছে। কলেজি ছেলে, ক্লাসের অঙ্ক কষা রয়েছে খাতায়। এই তো সেদিন—চারটে বছর আগে সে এই সব অঙ্ক কষেছে। চোখ জলে ভরে আসে। আমার কিশোর বয়সে কয়েক জনকে দেখেছি—যেদিন ডাক এলো, প্রাণ যেন হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসতে হাসতে ছুড়ে দিল। ক'জনই বা মনে রেখেছে তাদের! ওয়াঙের ঐ মূর্তির পাশে তাদের মুখগুলো আজ ভেসে উঠছে। ওরা সকলে এক জাতের।

সান ইয়াৎসেনের বাড়ি। আগে এক সামান্য বাড়ির গোটা দুই-তিন ঘর নিয়ে তিনি থাকতেন। এক কানাডাপ্রবাসী বন্ধু (চীনেরই মানুষ) এই বাড়ি করে দিয়েছিলেন। দোতলা ছোট বাড়ি—একটু লন আছে, শহরের দৈত্যাকার বাড়িগুলোর সঙ্গে আয়তনের তুলনা হয় না। তা হলেও ছোটখাটো ছিমছাম সুন্দর একখানা ছবির মতন। পড়ার ঘর, লাইব্রেরি, শোবার ঘর, অফিস ঘর—ঘুরে ঘুরে দেখছি। যে টেবিল-চেয়ারে কাজকর্ম করতেন, যে শয্যায় শুতেন, তাঁর দৈনিক ব্যবহারের টুকিটাকি নামান জিনিষ ঘরে ঘরে সাজিয়ে রেখেছে। কোন জিনিষ একটু নড়ানো-সরানো হয়নি। বিপুল পুস্তক সংগ্রহ—দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছেন, নিজের হাতে লেখা নোট রয়েছে অনেক বইয়ের পাশে। নানা বয়সের নানা অবস্থার ছবি। সুন চিন-লিঙের যৌবন-বয়সের একখানা ছবি—অপরূপ সৌন্দর্যপ্রতিমা। এখানকার প্রবীণ মাদাম সান ইয়াৎ-সেনের মধ্যেও সেকালের সে রূপের আঁচ পাওয়া যায়।

১৯২৫ অব্দে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর মাদাম সুন চিন-লিং বাড়িটা জাতিকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন সর্বসাধারণের সম্পত্তি। দলে দলে মানুষ এসে দেখে যায়। নতুন আমলে সুসংস্কৃত হয়ে চারিদিক ঝকঝক তকতক করছে। তীর্থযাত্রীর মতো নতমস্তকে আমরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলাম।

খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি, বিশ্রামের সময় নেই। একটা কর্মিক-পল্লী—সাও-ইয়াং ভিলা—শহর থেকে ছয় মাইল, সাংহাইর শহরতলী বলা যায়। চারিদিক ফাঁকা, তার মধ্যে একশ-ছ'টা দোতলা বাড়ি তুলেছে। প্রতি বাড়িতে ছ'টা করে ফ্লাট। তা হলে হিসেবে পাওয়া গেল, ছ'শ ছত্রিশটা পরিবার থাকে এখানে। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো একতলা বাড়ি—ইস্কুল, ডাক্তারখানা, সমবায়-দোকান ইত্যাদি। চল্লিশ হাজার ইয়ুয়ান দিয়ে সমবায়-দোকানের মেম্বার হতে হয়। জিনিষ-পত্র শতকরা পাঁচ ভাগ সস্তায় পায় মেম্বাররা; তা ছাড়া বছর অন্তে মুনাফার ভাগ। বাড়িগুলোর সামনে পিছনে রাস্তা চলে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছি—সে কি বিপদ! এ ডাকে আসুন আমার বাড়ি; ও ডাকে, আসুন আমার বাড়ি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা সম্বর্ধনা করছে—হোপিন ওয়ানশায়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক! এলাহি ব্যাপার। আমরা খুশিমতো এর ঘরে একজন ওর ঘরে দু'-জন এমনি ঢুকে পড়লাম। যত বেশি ঘর দেখা যায়, বিচারটা তত সাচ্চা হবে। আমরা আসছি দেখে, ধরুন, ফিটফাট করে যদি রেখে থাকে! কিন্তু ছ'শ ছত্রিশটা ফ্লাট তাড়াতাড়ি নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে ফেলা সম্ভব নয় কখনো। বেড়ে আছে সত্যি! হিংসে হচ্ছে অনেকের। এক জনে বললেন, দিল্লিতে পার্লামেন্ট-সদস্যদের যেমন, বাড়িগুলো প্রায় সেই কায়দার নয়?

ছুটুন, ছুটুন। ফ্যাক্টরিতে এর পর। কাপড়-ছোপানোর এক নম্বর সরকারি ফ্যাক্টরি। ডিরেক্টার একটি মেয়ে—মিং চু-ফাং। আগে ছিলেন নিতান্ত এক সাধারণ কর্মী—মজবুত চেহারা, চিরকাল কঠিন শ্রম করে আসছেন সে কথা আর বলে দিতে হয় না। নিয়মমাফিক বক্তৃতা করে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন তিনি। এবং আমার যথারীতি প্রত্যুত্তরের পর কারখানা দেখাতে নিয়ে চললেন। চোদ্দ শ' কর্মিক কাজ করে এখানে। কাজের সময় দশ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে সম্প্রতি আট ঘণ্টায় আনা হয়েছে। সব রঙেই ছাপা হয়, ডিজাইন বহু রকমের। তবে শতকরা নব্বই ভাগ কাজ হচ্ছে নেভি-ব্লু রঙে থান ছোপানো। এইরঙের কোট-প্যান্টলুন মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়োর সার্বজনীন পোশাক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই বিষম চাহিদা, ডিরেক্টারের অঙ্গেও ঐ পোশাক—তবে ধূসর রঙের। উঁহু—ঠাহর করে দেখি। আদিতে নেভি-ব্লুই ছিল। কাচতে কাচতে এই অবস্থায় এসেছে।

[ক্রমশঃ।

ভুয়া-ভুঁইয়া

[৩৭২ পৃষ্ঠার পর]

মুখমণ্ডলে। মুখাকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। কাশীশঙ্কর বললেন,—তোর জ্ঞানোন্মেষের বহু পূর্ব্বেই তাঁরা গতায়ুঃ হন। তুই সম্পর্কে আমাদের ভগ্নী। তুই ভঙ্গ ঘরের মেয়ে, তাই তোর পাত্র মেলে না।

—এই পোড়াকপালীও যে গেল না কেন কে জানে!

নিজেই যেন নিজেকে কথা ক'টি শোনায় শিবানী। কথা বলতে বলতে নিজেকে দেখায় চিবুকের ইঙ্গিতে। পরম বিরক্তির সঙ্গে।

—এখানে থাকতে তোর কিসের কষ্ট তাই শুনি।

রাজাবাহাদুর কণ্ঠস্বর নত ক'রে শুধোলেন। কথা বলতে বলতে শুভ্র ও সিক্ত একটি গামছা তুলে নিলেন, পাশেই ছিল। হাত মুছলেন।

—অনেক কষ্ট রাজাবাহাদুর। কষ্টে কষ্টে বুক আমার জ্বলছে অহোরাত্রি। কেমন যেন কথায় ব্যথা ফুটিয়ে ফুটিয়ে কথা বলে শিবানী। বলে,—রাজমাতা আমার সঙ্গে তোমাদের ঐ কাশীশঙ্করের গাঁট-ছড়া বাঁধার ঠিকঠাক ক'রে কি করলে বলতো?

—ছিঃ শিবানী। বললেন রাজাবাহাদুর। গোপন-কথা বলার সুরে ও ভঙ্গীতে বললেন,—কাশীশঙ্কর যে তোর সহোদর ভাইয়ের সামিল! ঈশ্বরে মন দে তুই। যার কেউ নাই তার জন্য আছেন ঐ ঈশ্বর।

কথার শেষে রাজা শূন্যের প্রতি তর্জ্জনী সঙ্কেত করলেন।

কেমন এক তাচ্ছিল্যভরা হাসি হাসলো শিবানী। বললে,—তাই তো বলি, দাও আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও। তোমাদের মন্দিরের সেবাদাসীর কাজে লাগবো!

—বড় ভয়ের স্থান রাধানগর! কালীশঙ্কর কথা বলেন, আর নিম্ন সুরে নয়, স্বাভাবিক কণ্ঠে। বললেন,—নদীর ঠিক মোহানায় রাধানগর, তাই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের বড় উৎপাত! তারা দলে দলে আসে, আক্রমণ করে, ধন-দৌলত লুণ্ঠন করে, বসতি জ্বালিয়ে দেয়, পুরুষদের ধর্ম্মান্তরিত করে বা দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে, নারী ও শিশুদের হরণ করে! স্বজাতির মধ্যে বিলায়ে দেয়।

আবার অবাক মানে শিবানী! ঘোর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায়। ভয়ে যেন সিঁটিয়ে যায়। ঘরের দুয়ার হ'তে অদূরে কার খড়মের শব্দ শোনা যায়! কার সশব্দ পদক্ষেপ! কেন কে জানে, শিবানীর অঙ্গ যেন কেমন শিথিল হ'তে থাকে সেই শব্দে! খড়মের খটাখট আওয়াজ যত কাছে আসে তত যেন শঙ্কা জাগে শিবানীর বুকে।

—রাজাবাহাদুর কৈ, কোথায়?

আবার সেই উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি, নিকট থেকে নিকটতর হয়। দূর থেকে নিকটে আসে।

অঙ্গে অঙ্গে শৈথিল্য নামে শিবানীর। অবশ হয়ে যায় যেন হস্তপদ। বুকের স্পন্দন যেন তার থেমে যেতে চায়! মুখ শুকিয়ে যায়! চোখে ফোটে বিহ্বল চাউনি। ছোটকুমার কাশীশঙ্করকে বড় একটা দেখতে পায় না শিবানী, কোথায় কখন থাকেন তিনি, জানতে পারে না। আর দেখতে পেলে কি এক সলাজ-সঙ্কোচে সে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে! শুধু চোখের দেখা দেখতে কত সাধ হয় কত সময়ে অসময়ে, কিন্তু দেখা পেলে শিবানীর দৃষ্টি নত হয়ে যায়। আঁখি মেলে তাকাতে পর্য্যন্ত পারে না।

—রাজাবাহাদুর, কি বা প্রয়োজন মোরে?

আহার-কক্ষের দ্বারে দেখা দেন কাশীশঙ্কর! সূর্য্যের পূর্ণ-উদয়ের মত দেখায় যেন। কাশীশঙ্কর সদ্যঃস্নাত। লাল চেলীর ধুতি ও উত্তরীয় তাঁর পরিধানে। সুবিশাল ও লোমশ বক্ষমধ্যে শোভা পায় রুদ্রাক্ষর মালা! কুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে খস-খসের স্নিগ্ধশীতল সুগন্ধ। দারুণ গ্রীষ্মে খস-আতর ছিটিয়েছেন নিজ অঙ্গে।

কালীশঙ্কর আহার-আসন ত্যাগ করলেন, গাত্রোত্থান করলেন ধীরে ধীরে। বললেন,—ভ্রাতঃ, তোমার আহার-পর্ব্ব চুকেছে কি?

শিবানীকে হয়তো কক্ষমধ্যে দেখে ঘরে আর প্রবেশ করলেন না কাশীশঙ্কর। ঘরে প্রবেশ করতে করতে বিরত হন। দ্বারের বাহিরেই দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন,—হাঁ, আহার সেরেছি! এখন কি আদেশ আছে তাই কও!

—একটা গোপন পরামর্শ আছে তোমার সহ! রাজাবাহাদুর কিছু বা উদ্যমের সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে বললেন,—দেওয়ানজীর নিকট তুমি কিছু শুন' নাই?

কাশীশঙ্কর এসেছিলেন বেশ খুশী মনে। শিবানীকে দেখে কিনা কে জানে, কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যান। তাঁর মুখের আনন্দ-ভাব বিনষ্ট হয়ে যায়! অধরপ্রান্তের হাস্যরেখা অদৃশ্য হয় ক্ষণিকের মধ্যে!

একটিবার শুধু লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে চোখ মেলে তাকিয়েছিল শিবানী! বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে। শুধু অবাধ্য দুই চোখ নিষেধ মানলো না—কটাক্ষে দেখলো একবার। দেখলো, তিনি কেমন, কেমন তাঁর রূপ আর আকৃতির শোভা!

কুমারবাহাদুর বললেন,—হাঁ, শুনেছি বৈ কি। তোমার বক্তব্য কি তাই ব্যক্ত কর', সেই মত ব্যবস্থা করা যায়।

আহার-কক্ষ ত্যাগ করতে করতে কালীশঙ্কর বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীর মুক্তির কি উপায় করা যায়? তোমার অভিমত কি? মান্দারণে থেকে বাঁচবে কি রাজকুমারী? সেই পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানে?

আবার একবার দেখলো শিবানী। আনত দৃষ্টি তুললো। বিলোল কটাক্ষে দেখলো রাজাবাহাদুরের পিছন থেকে। কুমারের সঙ্গে চোখা-চোখি হ'তেই চোখ নামালো ফের।

কিছুতেই বোঝে না শিবানী, কেন এই অসম লজ্জা! চোখ তুলে তাকাতেও কেন আসে সঙ্কোচ! এত আশঙ্কা কেন!

যত দোষ রাজমাতার। মনে মনে তাঁকে অভিসম্পাত দেয় শিবানী। যে-মধুর সুসম্পর্ক কোনদিনের তরেও গড়ে উঠবে না আর, শুধু মুখের কথায় কেন যে রাজমাতা ঘোষণা করেছিলেন সেই অসম্ভব রূপকথার অলীক কাহিনী! কাণে মধুবর্ষণের মত কেন যে শিবানীর কাণে শুনিয়েছিলেন তাদের মধুমিলনের কল্প-গল্প!

—চল', আমার কামরায় চল'। কথা হবে তোমাতে আমাতে। দালানে পদার্পণ ক'রে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—এই স্থানে, এই মুক্ত স্থানে নয়। দেওয়ালেরও কাণ থাকে!

পরম অনুরক্ত পরিচারিকার মত দালানের এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রাজমহিষী, উমারাণী। তাঁর পদ্মের মত করপুটে ধারণ করেছিলেন রূপার পানদানি। মুখশুদ্ধির উপকরণ।

পানদানি থেকে পানের খিলি তুললেন রাজাবাহাদুর। গোটা কয়েক।

ভদ্রতা ও ভব্যতার খাতিরে, অর্ঘ্য দেওয়ার মত, রাজমহিষী তুলে ধরলেন পানদানি। ছোটকুমারকেও দেখালেন।

—আমার মুখে আছে হরীতকী। খুশীর হাসি হেসে কালীশঙ্কর বলেন। বলেন,—পান আমি খাই না। অভ্যাস নাই।

স্মিত হাস্যরেখা দেখা দেয় রাজরাণীর ডালিম-লাল অধরে। কৌতুহলী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন গমনোদ্যত দুই সহোদরকে। জ্যেষ্ঠকে দেখায় যেন কিঞ্চিৎ বিমর্ষ, চিন্তাকুল, উদ্বিগ্নমানস। কনিষ্ঠের মুখভাবের কোন বিকৃতি নেই, বরং প্রসন্ন-প্রশান্ত।

রাজ-অন্দরে যেন অন্ধকার নামে। সাড়াশব্দহীন নীরবতা বিরাজ করে। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুগন্ধ শুধু যায় না।

দুই ভাইকে দালানের শেষ প্রান্তে অদৃশ্য হ'তে দেখে উমারাণীর শুব্ধতা ভঙ্গ হয়। তিনিও পা চালান। রাজমহিষী বিপরীত চলেন। আহারকক্ষের দিকে চলেন।

রাজাবাহাদুরের ভুক্ত খাদ্য-সম্ভারের অবশিষ্ট ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হবে। প্রসাদ গ্রহণ করবেন রাণীমায়েরা। দেবতার প্রসাদ! শিবানী ব'সে ব'সে মাছি তাড়ায়।

সম্মুখে যে-কক্ষ উন্মুক্ত দেখলেন সেই ঘরেই প্রবেশ করলেন রাজাবাহাদুর। ঠিক মধ্যাহ্ন-ভোজনের অব্যবহিত পরেই অধিক চলাফেরা অনুচিত। তাই আর অধিক অগ্রসর হতে চাইলেন না হয়তো, গেলেন না তাঁর সুসজ্জিত খাস-কামরায়, রাজমংলে।

—আসো, এই কুঠরীতেই বসা যাক। অধিক গমনের সামর্থ্য এখন আমার নাই।

কালীশঙ্কর কথা বললেন বেশ যেন কষ্টের সঙ্গে। প্রায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে! কুঠরীতে সিঁদিয়ে।

কালীশঙ্কর অনুসরণ করেন অগ্রজের। বলেন,—তথাস্তু। তাই হোক।

কুঠরীর অভ্যন্তরে একটি দীপ জ্বলছে। মধ্যে একটি তিন খানি কাষ্ঠের প্রায় দুইহাত উর্দ্ধ পাদপীঠ বা বৃহৎ চৌকী। কুঠরীর অপর দিকে দু'টি পর্য্যঙ্ক। পালঙ্কের প্রাচীরে কয়েকটি বন্দুক ঝুলানো। তাদের পাশে বারুদ ও গুলীর তোবড়া দশটা। অপর পার্শ্বে পাঁচটি ধনু, কুড়িটি আন্দাজ তূণ, সুতীক্ষ্ণ শরপূর্ণ। দু'টি তরবারি, একখানি চর্ম্ম, একটি কৃপাণী। কুঠরীর একদিকের দেওয়াল-প্রাচীরে ছিপ, বর্শা, ভীষণ খড়্গ।

অন্দরের একটি নাতিবৃহৎ অস্ত্র-ঘর হয়তো এই কুঠরী। দীপালোকে অস্ত্রসমূহকে জীবন্তরূপে ভুল হয়।

চৌকীতে আসন গ্রহণ করলেন কালীশঙ্কর।

কুমারবাহাদুর আর বসলেন না। সুসজ্জিত অস্ত্রাদি দেখে মন যেন তাঁর অস্থির হয়ে ওঠে আনন্দের আধিক্যে! কুঠরীর দেওয়ালে দৃষ্টি বুলায়ে পায়চারী করতে থাকেন। প্রত্যেকটি অস্ত্র ব্যগ্রচোখে দেখেন, তাদের কাছাকাছি যান।

ভীষণতম অস্ত্র। সম্মুখ-যুদ্ধের ক্ষুরধার সাজসরঞ্জাম। কি ভীষণ তীক্ষ্ণ, ধারালো! নক্সা-কাটা চিত্রবিচিত্র খড়্গের বুকে আঁকা সুদীর্ঘ চক্ষু-হননেচ্ছার নৃশংশ দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে আছে।

দীপালোকে চিক চিক করছে তীর, তরবারী, বর্শা ও কৃপাণীর ফলা। ঠিক কাঁদছে, নীরব-কান্না। অব্যাবহারে, অব্যবহারে ম্লান হয়ে আছে যে!

কুমার কালীশঙ্করের দেখা যেন শেষ হয় না। এত প্রেম, এত ভালবাসা, এত মিতালী ওদের সঙ্গে—দেখে দেখে তাই যেন আশা আর মিটে না। খড়্গের চোখে যে ফুটে আছে আকুল তিয়াস, কি এক আবেদনের আবেশভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উষ্ণ শোণিত-সুধার আস্বাদ চায় যেন! কোন গর্দ্দানের তাজা মাংসের আর উষ্ণ রক্তের স্বাদ চায়!

চৌকীতে বসে থাকতে থাকতে রাজবাহাদুরের মত প্রতাপশালীও হঠাৎ একবার চমকে উঠলেন কোন্ এক অস্ত্রের হঠাৎ ঝঙ্কারে। হাতের মুক্ত অস্ত্রকে আর মুখের বাক্যকে নাকি বিশ্বাস করতে নেই—এমনই তারা মুক্তিলোভী। মুখ আর হাত ফসকে যথাক্রমে কথা আর অস্ত্র বেরিয়ে গেলেই গেল! হঠাৎ যেন মৃত্যুক্ষণের পূর্ব মুহূর্ত্তকে অনুভব করলেন রাজাবাহাদুর! শিউরে শিউরে উঠলেন, শরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন তিনি, দেখলেন কনিষ্ঠের ভাবগতিক, কোন কাজে ব্যাপৃত কালীশঙ্কর!

মাথায় মুকুট, তাই মৃত্যুভয় অপরিসীম। স্থির ভেবেছিলেন রাজাবাহাদুর, তিনি নিশ্চিত দেখবেন, উদ্যত হত্যাকারী তাঁরই ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চোখ ফিরিয়ে তা দেখলেন না। দেখলেন কালীশঙ্কর এক ভীষণ খড়্গের ভার এক হস্তে পরীক্ষা করছেন মুখে হাসি মাখিয়ে। তাঁর লাল চেলীর

৫১৭

উত্তরীয় স্কন্ধচ্যুত হয়ে খ'সে পড়েছে! অস্ত্রটির ভার-পরীক্ষার ভারে কুমারের উর্দ্ধা'ঙ্গের পেশীগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—এখন কি কর্ত্তব্য তাই বল'! বড়ই বিব্রত আছি আমি।

কুঠরীতে অন্য তৃতীয় ব্যক্তি নেই! কালীশঙ্কর হাতের খড়্গটি যথাস্থানে রাখতে রাখতে বললেন,—আদেশ দাও তো আমিই যাই মান্দারণে! খড়্গ, কৃপাণ, বর্শা থাক সঙ্গে। প্রহরীকে ঘায়েলের পর বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধারের পথে কোন অন্তরায় থাকবে না!

ঘোর-লাল চোখ কালীশঙ্করের। শিবনেত্র যেন।

সেই চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। রাজা আরেকবার দেখলেন অনুজকে, বঙ্কিম গ্রীবায়।

—হুঁকা-বরদার, হুজুর!

স্নিগ্ধশীতল কুঠরীর বাইরে থেকে কথা বললে হুঁকার বাহক, এক হুকুমবরদার।

তামাকপায়ী রাজা এতক্ষণ যেন এই বিশেষ বস্তুটির অভাবেই আনচান করছিলেন। আহারের পরমুহূর্ত্তে তাম্রকূটসেবন না হ'লেই এমন হয়, কিছুই যেন ভাল লাগে না—মেজাজ তিতবিরক্ত হয়ে ওঠে—ঝিমানি ধরে। ঘুম পায়।

—আলবোলা কৈ?

চেঁচিয়ে উঠলেন রাজাবাহাদুর। সজোরে বললেন।

—হাজির হুজুর।

সাড়া পাওয়া যায় বাইরের দালান থেকে! সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহকও প্রবেশ করে। এক হাতে তার ইরানী আলবোলা, অন্য হাতে জরি-তারের সটকা! রুপার আলবোলার শিখরে রত্নের ঝারি ঝুলছে। পান্নার নোলক দুলছে!

সটকাটি রাজাবাহাদুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায় হুঁকাবরদার!

এবং তৎক্ষণাৎ মুখনল মুখে তুলে ঘন ঘন টানতে থাকেন কালীশঙ্কর। আহারের ঠিক পরে আলবোলায় কয়েকটা টান না দিলে আহারের তৃপ্তি পাওয়া যায় না যেন পূর্ণমাত্রায়!

—জবাব নাই কেন?

আঙুলের পরশে অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি তরবারীর ধার পরীক্ষা করতে করতে বললেন কুমারবাহাদুর।

ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়েন রাজাবাহাদুর! আরও কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললেন,—অন্য কোন' পথ নাই?

—আমি তো দেখি না।

কালীশঙ্কর কথা বলেন, আর সতর্ক অঙ্গুলি-স্পর্শে তরবারীর ধার পরীক্ষা করেন।

মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে রাজাবাহাদুর বলেন,—তুমি যদি সম্মত হও, তবে আমি কেষ্টরামের দাবীর কিছু পূরণ করি! সহজ পথে কাজ হয়!

ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলালেন কালীশঙ্কর। অসম্মতির মুখভঙ্গীতে বললেন,—আমার মত নাই। কৃষ্ণরাম এক লোভী, অর্থপিশাচ, দুশ্চরিত্র জমিদার! তোমার সমগ্র ভূসম্পত্তি আর ধনরত্ন লাভেও সে তৃপ্ত হবে না! কদাচ যদি কিছু পায়, বারম্বার দাবী জানাবে।

—তবে কি উপায়? কিং কর্ত্তব্যম্?

রাজাবাহাদুরের ব্যাকুল প্রশ্ন শুনে কুমারবাহাদুর বললেন,—বলং বলং বাহুবলম্! অন্য উপায় তো দেখি না!

—নাপতিনীকে কি বলা যায়? কথার শেষে মুখনল মুখে তুললেন রাজাবাহাদুর।

একটি গ.দা-বন্দুক হাতে তুলেছিলেন কালীশঙ্কর।

চকিতের মধ্যে সেটিকে নামিয়ে রেখে দিলেন পালঙের 'পরে, একান্ত বিরক্তির সঙ্গে। কালীশঙ্করের কাছে বারুদের বন্দুকের কোন দামই নাই। এই জাতীয় মারণ-অস্ত্রের কোন মূল্য দেন না তিনি। শত্রুর অসাবধানতার সুযোগে বন্দুক দাগতে পারে যে কেউ, তাতে বীরত্ব কি! সম্মুখযুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন পথে শক্তি-পরীক্ষা হয় না। সামনাসামনি, হাতাহাতি লড়াই না চললে কার কত শক্তি কে জানবে! কার দেহে কত বল, কার কত মুরদ!

—নাপতিনীকে বিদায় কর'! গর্জ্জে উঠলেন যেন রাজাবাহাদুর। তাচ্ছিল্যের কড়া সুরে বললেন। বললেন,—বোঝ না কেন, সে একটা কুটনী! কৃষ্ণরামেরই অনুচরী!

—ইহা কি সত্য?

কালীশঙ্কর মুখনল জানুর 'পরে নামিয়ে রেখে বললেন, ব্যস্ততার সুরে। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে।

—অকাট্য সত্য! দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন কুমারবাহাদুর। আত্ম-প্রত্যয়ের জোরালো কণ্ঠে। বললেন,—সত্য না হ'য়ে যায় না। কৃষ্ণরামই ঐ নাপতিনীকে সকল সমাচার দিয়ে রাজগৃহে প্রেরণ করেছে, তা তুমি নিশ্চিত জানিও। কৃষ্ণরামের অকরণীয় কিছুই নাই।

—আমি এতটা খতিয়ে ভাবি নাই। মনে হয়, তোমার অনুমানই সত্য। কথা বলতে বলতে সটকা মুখে তোলেন রাজাবাহাদুর।

আলবোলা বোল বলতে থাকলো। শব্দ উঠলো গড় গড়, গড় গড়—

স্নিগ্ধ শীতল কুঠরীতে সুগন্ধি তামাকের খুশবু ছড়ালো।

—নাপতিনীকে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করতে হুকুম দেও! কালীশঙ্করের সজোর কণ্ঠে কুঠরী যেন ফেটে পড়তে চায়। তিনি বলেন,—অর্থদানেও আমি তো লোকসান বৈ লাভ দেখি না। কৃষ্ণরাম বহুভোগী, বিন্ধ্যবাসিনীকে কদাপি সেই আহ.মক গ্রহণ করবে না!

খ'সে-যাওয়া লাল চেলীর উত্তরীয় কাঁধে ফেলতে ফেলতে পর্য্যঙ্কে ব'সে পড়লেন কুমারবাহাদুর। দৈহিক শ্রমে তিনি

ক্লান্তি বোধ করেন না, কথা ব'লে ব'লে যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েন। অধিক বাক্যব্যয়ে ক্লান্ত হন।

—তুমি এত সামান্যে ব্যস্ত হও কেন! কোথায় গেল তোমার সেই ব্যাঘ্র-বিক্রম? কাশীশঙ্কর কথাগুলি বলেন বিনম্র কণ্ঠে। বিচলিত হয়েছেন যেন, ললাটে ও বক্ষে তাঁর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। দীপালোকে জ্বলছে স্বেদবিন্দু।

রাজাবাহাদুর সহাস্যে বলেন,—ত্বং হি মে বলবিক্রমঃ! তুমিই আমার বলবিক্রম, আমার এই প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় তুমিই আমার ভরসা!

—এ তোমার অতিবাচন রাজাবাহাদুর!

কাশীশঙ্করও কথা বলতে হাসলেন, প্রসন্ন-হাসি।

—কদাপি নয়। আমি মিথ্যা বলি নাই।

আবার সটকা খ'সে পড়লো জানুর 'পরে। আলবোলার বোল থামিয়ে বললেন রাজাবাহাদুর। তাঁর মুখে অমলিন আন্তরিকতার ভাব ফুটে ওঠে। কেমন যেন ব্যথা-কাতর সুরে কথাগুলি বলেন।

কাশীশঙ্করের হাতে অনেক কাজ। তাঁর সময় অল্প। পর্য্যঙ্ক ছেড়ে উঠলেন তিনি। বললেন,—বড় আনন্দ হয় তোমার এ কথায়। তোমাকে একটি কথা বলি, তুমি আদপেই দ্রব না হও। বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে না জানিও। আমি স্বয়ং যাবো মান্দারণে। তজ্জন্য ভাবিও না।

—তুমি রক্তপাতের পক্ষেই সায় দাও?

কথার সুর নামিয়ে চুপি চুপি বললেন রাজাবাহাদুর। প্রশ্ন করলেন।

—বিনা রক্তপাতে শান্তি নাই! মুক্তি নাই!

কথা বলতে বলতে কুমারবাহাদুর কুঠরী ত্যাগের উদ্যোগ করেন! বলেন,—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমি তো অন্য কোন উপায় দেখি না।

—কৃতকার্য্য হওয়ার আশা রাখো?

আবার চুপি চুপি বলেন কাশীশঙ্কর। ব্যস্ত কণ্ঠে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থেকে কুমারবাহাদুর বললেন,—হাঁ, নিশ্চয়ই। তবে কোন কার্য্যই ঝটিতি হয় না, আমি সময় চাই। তোমার ধৈর্য্যধারণের প্রয়োজন, তুমি ব্যস্ত না হও। দেখই না শেষ পর্য্যন্ত কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!

রাজাবাহাদুরের ঝিমুনি ধরে যেন! দিবানিদ্রার ঝিমুনি। তিনি বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনী কোনক্রমে যদি একবার রাজপুরীতে আসতে পায়, আমি আর তাকে ত্যাগ করবো না। বিন্দু জানবে যে, সে বৈধব্য পালনে ব্রতী হয়েছে। আমি ব্যস্ত হই মা জননীর মনঃকষ্টে, নতুবা আমার আর কি!

—আমি চিন্তা করি, দেখি কি করা যায়। পদধূলি দাও, আমি এখন যাই। আমার অনেক কাজ ফেলা আছে। ভুলিও না, বিন্দু আমারও সহোদরা!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে প্রণাম সেরে কুঠরী ত্যাগ করেন কাশীশঙ্কর। তাঁর কাষ্ঠ-পাদুকার শব্দ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হ'তে

থাকে। কাশীশঙ্কর দ্রুতপদে রাজ-অন্দর ত্যাগ করেন। কত কাজ বাকী ফেলে এসেছেন !

ভবিতব্যতা'কে খণ্ডন করতে পারে ! ললাটের লিখন মুছতে পারে কেউ !

বিন্ধ্যবাসিনী যতক্ষণ ছাদে থাকেন, যতক্ষণ ঐ প্রবাহমান আমোদর দেখেন, যতক্ষণ ঐ দিগন্তবিস্তৃত মুক্ত আকাশের তলে থাকেন, ততক্ষণই সুস্থির থাকেন। তখন, তাঁর মনে হয় না তিনি পরিত্যক্তা, নির্ব্বাসিতা, বঞ্চিতা-বন্দিনী ! আর যখন এই জীর্ণ ও ভগ্ন প্রাসাদের কোন কক্ষে থাকেন, তখন যেন যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে। তখন তিনি যেন সন্তপ্তা, বিচ্ছেদ-শোকে মূহ্যমানা।

যেখানে বিস্তার সেখানেই মুক্তি। মুক্ত শুভ্র আকাশের দিগন্তবিস্তার যেন ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর যত দুঃখ-সুখ। বদ্ধ ঘরে গেলেই আবার তাদের সেই দুঃসহ আক্রমণ !

ছাদ ত্যাগ ক'রে একটি কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে-ছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। সামান্য ফলাহার ক'রেছিলেন। অন্ন গ্রহণ করেননি। ভূ-দৃষ্টিতে বসেছিলেন নিথর, নিস্পন্দের মত। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। তাঁর দীর্ঘ দুই নেত্র থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হয়। চোখের জল। বিচ্ছেদ-শোক এমনই-দুষ্ট যে সে সান্ত্বনা মানে না। অতীব শোকানল শোচনীয় ঘৃতাহুতিতে যেমন অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়, আবার সান্ত্বনাবারি সিঞ্চনেও তেমনই জ্ব'লে ওঠে।

পরিচারিকা যশোদা সান্ত্বনাদানে আর প্রবৃত্ত হয় না। কোন ফল পাওয়া যায় না যে ! কোন সান্ত্বনাবাক্য কানে তোলেন না জমিদার-নন্দিনী।

নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করেন রাজকুমারী। মধ্যে মধ্যে অঞ্চলে চোখ মোছেন। আঁচল সিক্ত হয়ে যায় অশ্রুকণায় !

—বৌ !

যশোদা মিহিকণ্ঠে ডাক দেয়। ভয় আর শঙ্কাভরা স্বরে।

জলভরা চোখ তোলেন রাজকুমারী। ভূতল থেকে দৃষ্টি ফেরান।

যশোদা বললে,—আমোদরে স্নান সারতে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের দেখা মিললো।

—কে ব্রাহ্মণ ! কি বলেন তিনি ?

প্রায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শুধোলেন বিন্ধ্যবাসিনী। জলভরা চোখ আঁচলে মুছলেন।

যশোদা বললে,—ব্রাহ্মণ আমার অচেনা ! এই জমিদার-গৃহে মানুষের বসতি আছে, ব্রাহ্মণ জানে না। ব্রাহ্মণ বলে যে—

আমোদরের তীর থেকে আসছে যশোদা। পথশ্রমে পরিচারিকা তাই হাঁফায়। কথার মধ্যপথে কথা থামায়।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বের দেখা সেই ব্রাহ্মণের সৌম্যমূর্ত্তি রাজকুমারীর নয়ন-পথে ভাসে। তিনি অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে শুধোলেন,—কি বলেন ব্রাহ্মণ ? কি চান ?

যশোদা বললে,—কিছু চান না, বরং দিতে চান।

আর কোন প্রশ্ন করেন না বিন্ধ্যবাসিনী। সজল চোখের পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন !

টেনে টেনে শ্বাস নেয় যশোদা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—একটি শালগ্রামশিলা দিতে চান। চল না তুমিও আড়ালে থেকে ব্রাহ্মণের বক্তব্য শুনবে 'খন।

—প্রহরী যদি বাধা দেয় যশো ?

কতক্ষণ ভেবে ভেবে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলেন রাজকুমারী।

যশোদা অবজ্ঞার হাসি হাসে। বলে,—প্রহরী তো আছে সেই সমুখের ফটকে ! আসমানদীঘির ঘাটের দুয়োর তো উন্মুক্ত। সেখানে কেউ নাই। ব্রাহ্মণ সেখানেই অপেক্ষায় আছেন। তুমিও চল ; আড়াল থেকে স্বকর্ণে শুনবে।

কিসের এক আবেশে যেন কান্না ভুলে যান বিন্ধ্যবাসিনী। কেন কে জানে।

ধীরে ধীরে ওঠেন। অনুসরণ করেন, যশোদার পিছু পিছু চলেন অবশ পদে।

সেই সৌম্যকান্তি শুভ্রবর্ণ ব্রাহ্মণ। চোখে দেখে একে কেমন এক তৃপ্তির শ্বাস ফেলেন রাজকুমারী।

দূর থেকে এক নজরে দেখে নেন জমিদারনন্দিনী।

ব্রাহ্মণ দেখতে পান না, কে তাঁকে বিমুগ্ধনয়নে দেখলো। ব্রাহ্মণের সিক্তবাস। দুই হাতের করপুটে লাল শালুর বস্ত্রাধারে কি যেন ধারণ ক'রে আছেন। স্কন্ধে এক খণ্ড বস্ত্র, হয়তো গা মোছার গামছা। দারুণ রৌদ্র-তাপে ব্রাহ্মণের শুভ্রদেহবর্ণ রক্তিম আকার ধারণ করেছে।

আর একবার দেখা যায় না !

এক ঝুলানো চিকের আড়ালে দাঁড়াতে হয়, অবগুণ্ঠন টেনে। লুকিয়ে দেখার চেষ্টায় বাধা পড়ে, গুণ্ঠন বাধা দেয়। দৃষ্টির পথ রোধ করে।

যশোদা বললে,—জমিদারনী এসেছেন, কি বলতে চান বলেন।

হয়তো অন্যমনে ছিলেন ব্রাহ্মণ। কোন এক চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। পরিচারিকার কথা কানে পৌঁছতেই আত্মস্থ হলেন। অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন,—আমি এক চতুষ্পাঠীর আচার্য্য। এই দীঘির অপর প্রান্তে আমার পর্ণকুটীর। কিঞ্চিদধিক পক্ষকাল পূর্ব্বে আমোদরের তীরে সহসা দর্শন পাই এই শালগ্রামশিলার। শিলাটি আমি দান করতে চাই কোন গৃহস্থকে—যাঁর গৃহে নিয়মানুযায়ী পূজা পাবেন তিনি।

বিন্ধ্যবাসিনী ফিসফিসিয়ে যশোদার কাণে বললেন,—নিজেই তো রক্ষা করতে পারেন ঐ নারায়ণকে। ত্যাগ করবেন কেন ?

যশোদা সেই কথাগুলিই আওড়ায়। বিন্ধ্যবাসিনীর উক্তির পুনরুক্তি করে।

ব্রাহ্মণ আবার হাসলেন। প্রশান্ত হাসি। বললেন,—

আমিই তো নারায়ণ! নরনারায়ণ। এই দরিদ্র দেশে খাদ্যাভাবে নিজেই যে কত দিন অভুক্ত থাকি! আহার্য্য মিলে না। শালগ্রামশিলার নিত্যভোগ চাই। সযত্ন সেবা চাই। ওঁ নমো নারায়ণায়!

রাজকুমারী যশোদাকে বললেন,—শিলা-স্থাপনে কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি?

যশোদা পুনরাবৃত্তি করে বিন্ধ্যবাসিনীর কথা।

ব্রাহ্মণ হো হো শব্দে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন,—অযুতসূর্য্যসম প্রভা তাঁর, সেই মেঘশ্যাম চতুর্বাহু অব্যক্ত ও শাশ্বত! তিনিই সর্ব্বরূপ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বজ্ঞ! তিনিই বাসুদেব, জনার্দ্দন, নরকান্তক! দেবসেবায় কভু কারও ক্ষতি হয়! তিনি যে মঙ্গলময়!

—পূজার বিধি কি? সেবার নিয়ম কি?

রাজকুমারী ফিস-ফিস বলেন। যশোদা পুনরুল্লেখ করে।

ব্রাহ্মণ আকাশ দেখেন, শূন্যে দৃষ্টি তোলেন। দেখেন হয়তো সূর্য্যের গতিপ্রকৃতি। বলেন,—পূজাবিধি কথনের মত সময় আমার বর্ত্তমানে নাই। আপাততঃ এই শিলাস্থাপিত হোক। শিষ্যের দল প্রতীক্ষায় আছে আমার। অবকাশ মত কোন এক ক্ষণে পুনরায় আসি' সেবাপদ্ধতি ব্যক্ত করবো।

—তাই হোক্।

ব্রাহ্মণের কথা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে শুনতে যেন মুখ ফসকে বলে ফেললেন রাজকুমারী।

যশোদাও তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ করলো সেই দু'টি কথা।

ব্রাহ্মণের মুখবিম্বে প্রফুল্ল হাসি ফুটলো। ব্রাহ্মণ যশোদাকে উদ্দেশ ক'রে বলেন,—পরিচারিকা, তুমি কি জাতে ব্রাহ্মণ।

—হাঁ গো হাঁ!

সগর্ব্বে বললে যশোদা। ওপরে নীচে মাথা দুলিয়ে।

ব্রাহ্মণ সহাস্যে বলেন,—তবে ধারণ কর এই শিলাখণ্ড।

শিলা-নারায়ণকে হস্তান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ আসমান-দীঘির বক্ষে এক ঝাঁপ দিলেন। হঠাৎ আঘাত পেয়ে দীঘির পানায় পরিপূর্ণ কাকচক্ষু জল লাফিয়ে উঠলো। আসমান ক্ষেপে উঠলো যেন!

চিকের আড়াল থেকে মাথার গুণ্ঠন খসিয়ে রাজকুমারী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখলেন, আসমান দীঘির বুকে সশব্দ আলোড়ন। ব্রাহ্মণ তীরবেগে সাঁতরে চলেছেন!

দীঘির অপর তীরে চতুষ্পাঠী? ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হ'তে রুদ্ধশ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। বিস্ময়, বিভ্রম না বিমোহনের ঘোরে দেহবল্লরী অবশ হয়। কেমন যেন হতচেতনের মত নিশ্চুপ হয়ে যান ঐ অবরোধবাসিনী অবলা!

[ক্রমশঃ।

মনের দেখা

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঝ্ঝুম মধ্যাহ্ন বেলা
আকাশে পাখীরা করে উড়ে উড়ে খেলা।
মোর মনোরথ
ভেসে চলে অতীত সন্ধানে ধরি' কোন্ সেই পথ
কিবা দেখি চোখ মেলে
উড়ে যাওয়া ভাবনারে কোথা অবহেলে
আজিকে পাঠায়ে দিই কোন্ দূরান্তরে
মন মোর স্তব্ধ থাকে নির্বাক অন্তরে।

আকাশের গায়
অকস্মাৎ কী মূরতি ভায়
দাঁড়ায়ে মন্দির-দ্বারে
দূর পারে
হারানো প্রিয়ার রূপে
ডাকিতেছে মর্মে মোর অতি চুপে চুপে
চোখ মেলে দেখ চেয়ে বিশ্বরূপ হে তীর্থ পথিক
উপলব্ধি করো প্রাণে নিখিলের দীপ্ত দিগ্‌বিদিক
রূপবহ্নি-ছটা
আলোকিত এ ক্ষণের অপরূপ ঘটা।

শিশুদের জন্য আলোকচিত্র
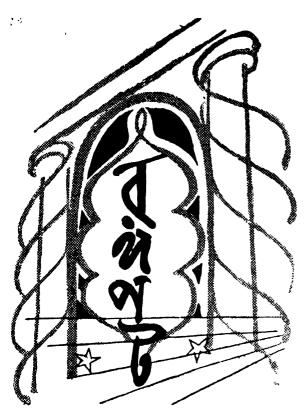
মার্কা যাই থাক টিকিট দেখিয়ে গেটে ঢোকবার সময় শতকরা ক'টি সিনেমা-গৃহের কর্তৃপক্ষ দর্শক সাধারণের বয়স নিয়ে মাথা ঘামান? ইংরাজী কয়েকটি চিত্রগৃহ বা দু-একটি বাংলা সিনেমাতেই যথাযথভাবে 'এ' মার্ক আর 'ইউ' মার্ক এর সামঞ্জস্য করতে দেখেছি। কিন্তু 'এ' মার্ক বা 'ইউ' মার্ক পড়ছে সেন্সরের কাঁচিতে। শিশুদের জন্য ছবি তোলা হচ্ছে কি কোনও? এমন কোন ছবির কথা কেউ বলতে পারবেন, যা শুধুমাত্র শিশুদের প্রদর্শনের জন্যই সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে তোলা হয়েছে? বর্তমানে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে শিশু-চিত্র তৈরীর কাজে। কয়েকজন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সঙ্গে দু-চারটি মাকালফলের নামও আমরা দেখলাম, সেই সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রেরিত আবেদনগুলির তালিকায়। শিশুদের নাম করেও কি ব্যবসা করতে একটু চোখে আটকাবে না সেই মহাপ্রভুদের! সাধু ব্যবসাদারদের প্রতি নিবেদন আমাদের এই যে, শিশু-চলচ্চিত্র তৈরীর এই সরকারী খয়রাতির একটি পয়সাও যেন অযথা ব্যয় না হয়। হান্স খৃষ্টিয়ান এ্যাণ্ডারসনের মত ভাল কাহিনী এদেশেও আছে। আছে অনেক ভাল অভিনেতাও (অবশ্য খুঁজতে হবে তার জন্য)। শুধুমাত্র হাসি, কি কমিক, চিড়িয়াখানার বাঘ-ভালুক-সিংহ না দেখিয়ে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের মজার মজার গল্প, এ্যাডভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, অন্যান্য দেশের নানা পাহাড়-পর্বত-নদী-সমুদ্র নিয়ে গল্প, মহাপুরুষদের জীবনী, দেশের ইতিহাস ইত্যাদির দিকেও নজর দিন। এমন ছবি নির্ম্মাণ করুন, ডাবিং-এর সাহায্যে যাকে সর্ব্বভারতে দেখানো যায়।

সংবাদ চিত্র

এমন অনেকজনের খবর জানি, তিনটেয় যে-ছবি শুরু হবে, সাড়ে-তিনটের সময় তিনি সে-ছবির প্রেক্ষাগৃহের সামনে এসে হাজির হবেন। সামনের অডিটরিয়ামে বসে সিগারেট টানবেন মৌজ করে পনেরো মিনিট। ইতোমধ্যে আসবে ইণ্টারভ্যাল। এবং তার পরে শুরু হবে আসল ছবি। তখন তিনি সিগারেটের শেষাংশটুকুকে ছাইদানে নিক্ষেপ করে, ঢুকবেন অন্ধকারময় প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে। অর্থাৎ ডকুমেণ্টারী ছবি বা নিউজ রীল তিনি ভালবাসেন না। বৃথা বসে বসে পণ্ডিত নেহরুর চীন-সফর, বম্বের দুগ্ধ-কেন্দ্রের সুব্যবস্থা, সারের কারখানা সিন্দ্রীর ক্রমিক উন্নতি, চিত্তরঞ্জনের নয়া ইঞ্জিন, গভর্ণর বা মন্ত্রী কোনও হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটনে তিনি বিশেষ উৎসাহী নন। উৎসাহী নন বিহারের ছট্ পরবে, মণিপুরের কৃষক-কন্যার ধান-কাটার নৃত্যে কি উড়িষ্যার কোনারকের মন্দির-গাত্রের কোনও নক্সায়। সরকারী প্রচারদপ্তর থেকে ছবি তোলায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ছোট ছবি তোলার উৎসাহে একেবারেই ভাঁটা পড়ে গেছে। অথচ ওদেশে সামান্য একটি ঘোড়ার কাহিনী নিয়ে তোলা ছবি 'ওয়াইল্ড ষ্ট্যানিয়ন' এ্যাকাডেমী এওয়ার্ড পেল। ভাল ছবি পেলে একজি-বিটার্সরা সরকারী ছবি যা দেখানো বাধ্যতামূলক তার সঙ্গে বে-সরকারী ছবি দেখাতেও রাজী হবেন বলে মনে হয়। ইদানীং ফিলম্‌স ডিভিসনের ছবি যেন বড্ড বেশী ডকুমেণ্টারী হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে ছোট ছোট সম্পূর্ণ ছবি তৈরী করার দিকে নজর দিলে দর্শকসাধারণের মধ্যে তাঁরা পপুলার হতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমাদের বাঙলার অরোরা কোম্পানীর মত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যদি গ'ড়ে ওঠে এই ধরণের কৌতূহলী সংবাদচিত্র তুলতে!

মহিলা লেখিকাদের লেখার ছবি

একই সপ্তাহে এক সঙ্গে তিন তিন খানা ছবির উদ্বোধন বাঙলাদেশে অনেক অনেক কাল পরে হল। বলয়গ্রাস, মন্ত্রশক্তি আর ভাঙ্গাগড়া। কিন্তু তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার তিন তিন খানি ছবিই তিন জন মহিলা-লেখিকার কাহিনী নিয়ে। কি মনে হয় এ থেকে? পুরুষ-লেখকদের চেয়ে মেয়েরাই সিনেমার গল্প ভাল লেখেন? মেয়েদের গল্প দর্শক সাধারণের ভাল লাগে? সত্যি কথা বলব? কেউ চটবেন না তো? মহিলা লেখিকা বিশেষ করে কয়েকজনের (নাম করে আর কি হবে!) লেখা গল্প সত্যি সত্যি গল্প হয়। ফাঁকি নেই তাতে। বাম হস্তে কলম ধরেন না তাঁরা। শুধু দক্ষিণার দিকেই নজর নেই তাঁদের। আর সবচেয়ে বড় কথা—ঘরকন্নার কথা—লেখেন তাঁরা। দর্শকগণ (মহিলা দর্শকের সংখ্যাই আজ-কাল অবশ্য বেশী। লেডিজ সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কখন 'ফুল' হয় বুঝতে পারেন?) ছবিতে নিজেদের পারিবারিক সমস্যার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান পর্দায়। ছবির সঙ্গে হাসেন, কাঁদেন। তাই মহিলা-লেখিকারাই আজ এত পপুলার! বেশী লিখব না আর, লেখকেরা হয়ত 'জেলাস' হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমীর কর্তাব্যক্তিদের নাম জানেন আপনারা? জানেন না তো? আমরাও জানিনা যে

আপনাদের জানাতে পারবো। জানাবো কোথা থেকে বলুন, কর্তাব্যক্তিদের নামের লিষ্টি ছাপা হয়েছে কি কোথাও? এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তো সব? কি কি কাজ হবে, তার সম্বন্ধে কোনও প্ল্যান আছে? কোথায় কোথায় কি কি সেন্টার? কতগুলি শাখা? সঙ্গীত-নাটকের উন্নতির জন্য কোনও চেষ্টা হবে? সম্মেলন করা হবে বছর বছর? প্রতিযোগিতা? পুরস্কার দেওয়া হবে কৃতীদের? খোঁজ করা হবে নতুন প্রতিভার? রঙ্গমঞ্চগুলির সংস্কার হবে? পুরোনো সঙ্গীতগুলির উদ্ধার হবে? এ যাবৎ কি কাজ তাঁরা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী জানাবেন আমাদের? সরকারী প্রচার-দপ্তর বলবেন কিছু? মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় আপনি?

সাম্প্রতিক ছায়াছবিতে টেকনিক্যাল ব্লাণ্ডার

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সে সব চিত্র-পরিচালকও নেই, ছবির টেকনিক্যাল দোষ-ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাবার লোকও নেই। আজ সিনেমা-রাজত্বে রাম-শ্যাম-যদু আর নেপোদের ভীড়। কোনও রকমে টাকাওয়ালা একটি মক্কেল বাগিয়ে, শালীকে হিরোইনের ভূমিকায় অভিনয় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো তোলা চলেছে একালের ছবি। স্ত্রীকে গেষ্ট আর্টিষ্ট ক'রে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার মতলব! খানকয়েক সদ্য সদ্য ছবির কথা ধরি। 'যদুভট্ট'র নাগরার রঙ কি করে বদলালো বলবেন? 'মন্ত্রশক্তি'র উত্তমকুমারের আণ্ডারপ্যান্ট দেখা যাচ্ছিল যে? 'বলয়গ্রাসে'র সুচিত্রা সেনের জামার পরিবর্তন হল না কেন দশ বছরে? বয়সের পরিবর্তনই বা কেন দেখানো হল না দীপকের আর তাঁর? 'জয়দেবে'র গাছের আঁটি ছুঁড়ে দেওয়া আর চাল ছাওয়া। চাল ছাইবার জন্য যে আঁটি বাঁধা হয়, তার কি নমুনা ঐ? 'ভাঙ্গাগড়া'য় উলের জামা বোনার পর শীতের পোষাক পরতে দেখলেন কাউকে? সাবিত্রী দেবী তো বললেন, শীত আসছে। জামাটা তাই নিজেই পিসীমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বুনতে বসলেন। এল সেই শীত! বলয়গ্রাসে সুচিত্রা সেন জানেন না এ কথাটিও যে রেডিওতে জাপানীর খবরও পাওয়া যায়, তবে তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ ট্যাঙ্ক, কামান, প্লেন, ব্রেন-গান, ষ্টেন-গান এল কি করে? আর বলব কত!

ছবি ছবি হচ্ছে না

সাদা আর কালোর খেলা। তাই নিয়েই তো ছবি। সাদা আর কালোর রাজত্বে সবটুকুই যদি হয় কালো, তবে তো বাঙালী ছবির ভবিষ্যৎ অন্ধকারই। সমস্ত ছবিটির মধ্যে 'Key-ম্যান' হলেন ক্যামেরাম্যান। ছবিটির ভাল-মন্দ তাঁরই হাতে। আমাদের দেশের চিত্র-পরিচালকদের অধিকাংশেরই 'ক্যামেরা সেন্স' নেই। সেন্স নেই কত কোয়ান্টাম্ অব লাইট প্রডিউস করে কত এ্যাটম্ অব সিলভার। কতখানি দরকার স্পেসের। পঁচিশ কিলোয়াট না ত্রিশের দরকার ডায়নামো। সময়ের সঙ্গে স্থানের ফারাকে আলোর কম বেশী। দিন আর রাতের তফাৎ। ওপর থেকে ফেলা হল (কেন তো আমাদের দেশের ষ্টুডিওতে নেই আজও) যে আলো আর সাইড থেকে আসছে যা তার জয়েন্ট এফেক্ট। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কমপ্লেকসন্ কি মামাবে এ আলোতে? কত জ্ঞান দরকার এ সবের! নীতিন বসু, বিমল রায়, অজয় কর আজ পরিচালনার কাজে এগিয়েছেন। ক্যামেরাম্যান থেকে পরিচালক হওয়ার জন্য এ দেশে এতটুকুও আটকায় না। কারণ এদেশের ক্যামেরাম্যানই আসলে পরিচালক এবং ছবির সব কিছু। পরিচালক একজন থাকেন নামকোয়াস্তে, সাক্ষীগোপালের মত। কিন্তু বাংলা দেশে আজ সত্যি ছবি ছবি হচ্ছে না, হচ্ছে আর কিছু। ভুল-ত্রুটি গুলো প্রজেক্ট করে দেখেও কি আপনারা শোধরাতে পারেন না? না তাতে খরচা বেড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে? যাই থাক, ছবি ছবি হোক, এই আমাদের কামনা।

ছবির নাম সুচিত্রা সেন-উত্তমকুমার দিন

সুচিত্রা সেনের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করতে গেছিলেন জনৈক খ্যাতনামা পরিচালক। পরিচালকের কাছে শুনলাম তিনি নাকি বলেছেন, মাসে দু'দিন, তাও সম্ভব হলে অনুগ্রহ করে তিনি কাজ করতে পারেন। কতগুলো 'স্যুটিং ডে' ভাড়া করা হয় ষ্টুডিওতে? চব্বিশ, ছাব্বিশ, আঠাশ। মাসে দু'দিন যদি অনুগ্রহ করে আসেন তো একটা ছবি তুলতে কতদিন যাবে ভাবুন। আমাদের কথা হল, এই বাড়াবাড়িটা করিয়েছেন তো তাঁরাই। কারো দিন ভাল যাচ্ছে, ভগবানের ইচ্ছায় দু' পয়সা ঘরে আসছে, এতে আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু এই অত্যধিক জনপ্রিয়তা কি তাঁদের স্থায়িত্বকেই কম করে আনছে না? কতদিন থাকবে এই পপুলারিটি? বাঙলা দেশকে তো জানি, দি আইডল অব টু-ডে ইজ দি আউট-কাষ্ট অব টু-মরো। তাই বলছিলাম কি, এই তালে কোনও বুদ্ধিমান পরিচালক 'সুচিত্রা সেন-উত্তমকুমার' এই নাম দিয়ে যদি কোন ছবি তুলতেন তো বক্স-অফিস হিট হ'ত নিঃসন্দেহে এবং সমাধি রচিত হ'ত উভয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরই।

মন্ত্রশক্তি

সন্ধ্যারাণীর আর একটি স্মরণীয় অভিনয়। যাচ্ছেতাই সেট। উত্তম-কুমার কি অসিতবরণও তলিয়ে গেছেন। বীরেন বাবু থামবেন?

টোলের অধ্যক্ষের পদ নিয়ে শুরু হল প্রথম সংঘাত। তার পর ভুল ভাবে মন্ত্রোচ্চারণ, অশুদ্ধ পূজাপদ্ধতি। চাকরী গেল নতুন পুরোহিত উত্তমকুমারের। জমিদার-বাড়ী থেকে। কিন্তু এদিকে কুলীন পাওয়া শক্ত। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে জমিদার মশাইকে কয়েকদিনের মধ্যেই। নচেৎ সমস্ত সম্পত্তি গিয়ে পড়বে মাতাল, উড়নচণ্ডে এক অপোগণ্ড আত্মীয়—মানে অসিতবরণের হাতে। অতএব চাই কুলীন পাত্তর। এবং সামনেই রয়েছেন উত্তমকুমার। বিয়ে হল কিন্তু সর্ত হল যে, বিয়ের পর সমস্ত আচার-পদ্ধতির সঙ্গে এদেশ ছাড়তে হবে উত্তমকুমারকে। তথাস্তু। আসামের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে নতুন নতুন পাঠশালা খুলতে শুরু করলেন তিনি। সেখানেই অসুখ-বিসুখ করে একদিন কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখা সন্ধ্যারাণীর সঙ্গে। জমিদারের কন্যা স্বামীকে ষ্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাবার প্রাক্কালে চিনতে পারলেন (এই দৃশ্যটিতে সন্ধ্যারাণীর অভিনয় বাংলাদেশ অনেকদিন মনে রাখবে) ঠিক ঠিক। তার পর ডাক্তার-বস্তি-নার্স। পরে মিলন। অভিনয় ভালই হয়েছে অহীন্দ্র বাবুর। এমন কি খুব খারাপ

হয় নি জহর গাঙ্গুলীরও। চতুষ্পাঠীর বহির্ভাগ, মন্দিরের সিঁড়ি, জমিদারের গৃহের দরদালানের থাম ইত্যাদি অত্যন্ত কাঁচা হাতে রচনা করা হয়েছে। ফটোগ্রাফী স্থানে স্থানে এত অস্পষ্ট হয়েছে যে, ভাল করে তা দেখাই যাচ্ছিল না। আলোর কমবেশী নিশ্চয়ই হয়েছে। পরিচালনা খুব খারাপ নয়। পুরোনো আমলের দোয়াত-দানী, জামার হাতায় কুঁচি আর বুটি দেওয়া ইত্যাদি বেশ সুরুচিরই পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু পল্লী-গ্রামের পুরোহিতের গৃহের বউকে (মঞ্জু দে) অমনি যেখানে-সেখানে গান গাইতে দেওয়াটা কি রকম হল? আর হাঁদার মতো সেই গানশুনে দাঁড়িয়ে থাকা (উত্তমকুমার আর সন্ধ্যারাণী। মন্দিরের মধ্যে।) চুপচাপ। অনুভা গুপ্তের অভিনয়টা যেন একটু বাড়াবাড়িই মনে হয়েছে। লেখিকার লেখা বলেই স্ত্রীচরিত্রের ছড়াছড়ি দেখলাম। যাই হোক, সব দিক বিবেচনা করে এ কথাই বলব যে, ছবিটি আমাদের মন্দ লাগেনি।

বলয় গ্রাস

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়, অভিনয় নয়। সুচিত্রা সেন মন্দ নন। দীপক বাবু হোপলেস্।

ভরাট কাহিনী। জার্মানী যাবার প্রাক্কালে গোপনে বিয়ে হল (আসল বইয়ে বিয়েটা ছিল কী? না সেন্সারের ভয়ে?) দীপকের সঙ্গে সুচিত্রা দেবীর। একটি সন্তান জন্মাল সুচিত্রার কাশীতে। জমিদার কন্যার এ কাহিনী জমিদার-গৃহিণীর প্রখর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্বর ফলে রইল চাপা। কলকাতার বাড়ীতে প্রচার করে দেওয়া হল সুচিত্রা দেবীর ভীষণ অসুখ। ডাক্তার মানা করেছে, নীচে নামতে। একতলার চাকরদের ঘরে একটি ঝিয়ের কাছে মেয়েটি মানুষ হতে লাগল। জমিদার-গৃহিণী প্রচার করলেন আরও যে, মেয়েটি তিনি কুড়িয়ে পেয়েছেন কাশীতে। কিন্তু কী এক অসীম আকর্ষণে মেয়েটি বারবার উঠে যায় দোতলায়। শুধু দেখতে চায় সুচিত্রাকে। সুচিত্রা দেবীকে মনের গোপনে পুষে রাখতে হয় মাতৃস্নেহ। নিজের মায়ের প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে অপরাধী মনে হয় নিজেকে। নিদারুণ অভিমানে একদিন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল ছোট মেয়েটি। ঠিক সেই দিনই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ঘরে ফিরে আসছেন দীপকবাবু। তারপর খোঁজার পালা এবং শেষে একদিন পাওয়াও গেল তাকে। মাতৃত্বের জয় হল। পরিচয় পেল মেয়েটি, কে তার আসল মা। সুপ্রভাদেবী জমিদার-গৃহিণীর ভূমিকায় যে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, ইদানীং এই শ্রেণীর অভিনয় বড় একটা চোখে পড়ে না। সুচিত্রা সেনের অভিনয়কেও নিন্দা করা চলবে না। অরফ্যানেজের থেকে দীপকবাবু যখন সুচিত্রা দেবীকে ধরে নিয়ে আসছেন (শিখারাণীকে পাওয়ার দৃশ্যে) তখন সুচিত্রা দেবী প্রাণ দিয়ে অভিনয় করবার চেষ্টা করেছেন, একথা বলব। তবে দীপকবাবু আপনি এখনো ক্যামেরার সামনে বেশ একটু ভয় পেয়ে যান। ওটা কাটতে সময় লাগবে। পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশংসা করবার যেমন অনেক আছে, তেমনি কিছু কিছু আছে নিন্দা করারও (টেকনিক্যাল ব্লাণ্ডারের প্যারা দেখুন)। মেয়ে জন্মাবার দৃশ্যটির পরিকল্পনা ভালই হয়েছে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে ছোট মেয়েটির ওঠাও ভাল। অনাথ-আশ্রমের দৃশ্যটিও মন্দ নয়। কিন্তু মেয়ের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বয়স কেন বাড়লো না সুচিত্রাদেবীর কি দীপক বাবুর? একটি দৃশ্যের পরে কপালে কয়েকটা দাগ টানার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে দেখলাম। শিখারাণীর সঙ্গের ছেলেটিই কি অন্নপূর্ণা দেবীর বলয়-গ্রাসের কল্পিত…? পাড়ার রকে বসে আড্ডা দেওয়া, গাল তোবড়ানো, মাইরী সুরাইয়ার এ ছবিখানা…মার্কা এ মুখখানি এত ভাল লাগলো কেন অর্দ্ধেন্দু বাবুর? পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ও ভাল। রাজপ্রাসাদটিকে কাজে লাগিয়ে ছবির গৌরব-বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু 'ফার্ষ্ট শট'এ সুচিত্রা দেবীকে কেমন যেন ওবাড়ীতে বেমানান লাগছিল। নিজেই যেন হকচকিয়ে গেছেন। ফটোগ্রাফী, শব্দগ্রহণ ইত্যাদি চলনসই।

ভাঙ্গাগড়া

শিশুসুলভ সেটিং। আরতি মজুমদারের অভিনয় দর্শনীয়।

চার ভাই। বড় ভাই বাবার মৃত্যুর শিয়রে বসে প্রতিজ্ঞা করলেন ছোট ভাইকটিকে মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু মানুষ করে তুলতে হলে চাই অর্থ। এদিকে বাড়ী বন্ধক রয়েছে, বাবার এক বন্ধু উকিলের কাছে। ব্যবসা করতে শুরু করে বড় ভাই একদিন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার ফেঁদে বসলেন, একে একে ভাই ক'টি হল বড়। বিপত্নীক বড় ভাই পুনরায় বিবাহ করলেন। ভাইদের বিবাহ দিলেন। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না। ঘরের পাঁচটি বউও এক রকম হতে পারে না। সুতরাং শুরু হল বিবাদ, (বিবাদ শুরু করার জন্য সামান্য ওই ব্যাপারটা কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না। তৃতীয় বধূটি যেন ঝগড়া করবার জন্য তৈরী হয়েই বাড়ীতে পা দিল বলে মনে হয়।) নানা অশান্তি। সুখের সংসারে আগুন জ্বললো। ভাগাভাগি হয়ে গেল ভাইয়ে-ভাইয়ে। তার পর বড়দার মৃত্যুশয্যায় আবার ঘটল মিলন। শুধু দেখা হল না একজনের সাথে। সুটকেশ ভর্ত্তি টাকা, গহনা নিয়ে রবীনবাবু (একভাই) যেদিন গৃহে ফিরে এলেন, সেদিন তাঁর দাদা আর ইহলোকে নেই। সেইদিনই আবার বিয়ে হচ্ছে ছোট ভাইয়ের। অতএব পরিবারস্থ সকলে মিলে সেদিন আনন্দ-কোলাহলে মত্ত। এবং গল্প এখানেই শেষ। ঘরোয়া কাহিনী। প্রভাবতী দেবীর নিজস্ব গল্প বলার ঢংয়ে কাহিনীতে হাসি-কান্না, আনন্দ-দুঃখ সব মিশে আছে। সমস্ত সংসারটির হাল ধরে আছেন বাড়ীর বড়বৌ অর্থাৎ আরতি দেবী। তাঁর অভিনয়ই ছবিটিতে একমাত্র দেখবার জিনিষ। সন্ধ্যারাণী যেন এ চিত্রে অনেক ম্লান। ছবিবাবু দায় সারা গোছের করে গেছেন শেষ অবধি। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে বড় বেশী 'শ্যামলী'নাটকের সঙ্গে মিল দেখলাম। চোখ মুখের ভঙ্গী, বসা, দাঁড়ানো, চলাফেরায় সেই ভাবই প্রকাশ পাচ্ছিল। গান দু'খানি (ছিপ আর বই নিয়ে, খুবই উপভোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে উপভোগ্য সুশীলবাবু) ভাঙ্গাগড়া দৃশ্য দেখাতে নর্দ্দমা কাটা আর পাশে ছেলেদের খেলাঘর বসিয়ে সরিয়ে নেওয়া, গাছের ডালে হাওয়া দেওয়া এইসব। অপনার কাছ থেকে কি এই আমরা আশা করি। আর সব কিছু তত খারাপ নয়। ছবির কাজ, শব্দ গ্রহণ ইত্যাদি মন্দ হয়নি বলতে পারি। আউটডোর সুটিংয়ের কাজও খারাপ হয়নি খুব।

টকির টুকিটাকি

"সূর্য্যগ্রাস" এর পর "অবরোধ" সৃষ্টি হয়েছিল কিছুদিন। কিন্তু "অবরোধ" বেশীদিন টি কলো না। শেষকালে "অনুপমা" নাম নিয়ে শিল্পী অনুভা গুপ্তা ছবির পর্দ্দায় নামবার অধিকার পেয়ে গেলেন। সূর্য্যগ্রাস আর "অবরোধ"এর বাধা কাটিয়ে, আরও অনেকে "অনুপমা"র সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। সব কিছু দায়িত্ব এখন এম, পি, প্রোডাকসন্সের। সঙ্গীরা সব ধুরন্ধর শিল্পী, যেমন, উত্তম, বিকাশ, জহর, সুপ্রভা, যমুনাসিংহ, সবিতা, অনুপকুমার প্রভৃতি। "ভুতদার সংসার"এর নিশ্চয়ই কোনো অদ্ভুত কাহিনী লিখেছেন শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমান পিকচার্স সেই ছবি তুলে দেখাবেন বোলে কাজে হাত লাগিয়েছেন। শিল্পীদের নামও ইতিমধ্যে কাগজে প্রচার কোরে দিয়েছেন, যেমন পদ্মা, কানু, বিকাশ, ভানু, নৃপতি, জহর রায় প্রভৃতি। কাহিনীকার নিজেই পরিচালক আর গানের সুরের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন অনুপম ঘটক। তপন সিংহের পরিচালনায় নতুন বছরের "উপহার" যে কেমন হবে, চোখে না দেখা পর্য্যন্ত অনুমান করা যাবে না। "উপহার"টি সাহিত্যিক শৈলজানন্দের "বৃক্ষ" গল্পেরই চিত্ররূপ বোলে জানা গেল। অহীন্দ্র চৌধুরী, মঞ্জু দে, উত্তমকুমার, সাবিত্রী প্রভৃতি শিল্পীরা "উপহার"এর মর্য্যাদা বৃদ্ধি কোরবেন বোলে আশা করা যায়। মন্দ হবে কি ভালো হবে, "তা বলবো না", বলাও কঠিন। ইউ, এস, এ, পির প্রযোজনায় ক্যামেরাম্যান এখনও ষ্টুডিয়োর জোরে রীতিমত ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। এমন অবস্থায় ভালো-মন্দ কিছুর একটা আন্দাজ কোরতে হ'লে বেশ কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শম্ভু চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীটিকে পর্দ্দায় তোলার মত গড়ে নেওয়ার ভার নিয়েছেন সাহিত্যিক বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। পি, এস, এস এর সামাজিক ছবি "শ্রীমতী"র আসল চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা কোরছেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। ছবিখানিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর কোরে তোলার জন্য সাহায্য কোরেছেন, রেণুকা রায়, গীতশ্রী দেবী, নিভাননী, নৃপতি, নবাগতা মীনাক্ষী দেবী প্রভৃতি শিল্পীরা। "বিধিলিপি" লেখা থাকে কোন কিছু সৃষ্টির গোড়ায়, অদৃশ্যভাবে। এখন কিন্তু কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে "বিধিলিপি" লোকচক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াবে বোলে শোনা যাচ্ছে। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে মানু সেন পরিচালনা কোরছেন লিপিখানিকে। প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন জীবেন দত্ত। উত্তমকুমার, সন্ধ্যারাণী, কমল মিত্র প্রভৃতি শিল্পীরাই অভিনেতা-অভিনেত্রী। মনি গুহের প্রযোজনায় পরিচালক শ্যামদাস ন্যাশানাল সাউণ্ড ষ্টুডিয়োতে "বাংলার বীর হাম্বীর"কে নিয়ে খুব ব্যস্ত। তারই ছবি তুলে শীঘ্র পর্দ্দায় দেখাবার তোড়জোড় কোরছেন তাঁরা। ছবিখানিকে আকর্ষণীয় করবার জন্য নামকরা-শিল্পীদের নামিয়েছেন কর্ত্তৃপক্ষ, যেমন, অহীন্দ্র, পাহাড়ী, কমল, নীতীশ, মঞ্জু দে, নীলিমা দাস প্রভৃতি। প্রাকৃতিক মণিপুর রাজ্যের মনোরম দৃশ্যের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"র চিত্ররূপ তোলা হয়েছে, ইন্দ্রসেন রায়ের পরিচালনায়, নায়িকার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন নমিতা সেনগুপ্তা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সমীরকুমার, মালা সিন্‌হা, মিতা চ্যাটার্জ্জী, জহর রায়, উৎপল ঘোস প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বিনতা রায়

শ্রীমতী বিনতা রায়—চলচ্চিত্র-জগতে ইনি যে একজন সত্যিকারের শিল্পী, এ পরিচয় দেশবাসী পেয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। সম্প্রতি রূপালি পর্দ্দায় তাঁকে হয়তো কম দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতি তাঁর মমত্ব বা অনুরাগ এতটুকু কমেনি। এ আরও স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সেদিন যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা হ'লো এ শিল্প সম্পর্কে। 'উদয়ের পথে'তে যাঁর প্রথম উদয় হ'য়েছিল, দেখলুম সে শিল্পী আজও তেমনই ভাস্বর ও প্রাণবন্ত।

মাত্র সপ্তাহ তিনেক আগের কথা। চলচ্চিত্র সম্পর্কে শ্রীমতী বিনতা রায়ের মতামত জানবো বলে, আমি যাই তাঁর বাসভবনে। যথারীতি সৌজন্য সহকারে তিনি ও তাঁর স্বামী সাহিত্যিক শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায় আমায় নিয়ে বসালেন প্রথমে তাঁদের ড্রইং-রুমে। একটু আলাপ-পরিচয়ের পরই যখন আসল আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি তুললুম, তখন এর জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো তাঁদের সুসজ্জিত ষ্টাডি ঘরে, যেটি হচ্ছে, তাঁদের শিল্প ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রস্থল। আতিথেয়তার প্রথম পর্ব্ব শেষ হলে পর শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে সুরু হ'লো আমার আলোচনা।

"সে ১৯৪৪ সাল—'উদয়ের পথে'তে আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ

শ্রীমতী বিনতা রায়

করি। তার পর অনেক ছবিতেই অভিনয় করেছি এবং বিভিন্ন চরিত্রে, কিন্তু তবু ব'লবো, 'অভিযাত্রী' ছবিতে জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি।"—আমার প্রারম্ভিক প্রশ্নের শ্রীমতী বিনতা রায় এমনি ধীরে ধীরে উত্তর দিয়ে চলেন। "অভিনয়-শিল্পের প্রতি আন্তরিক টানের সঙ্গে আর্থিক-প্রয়োজনটাও জড়ানো ছিল। মঞ্চাভিনয়ে 'শেষরক্ষা'য় ইন্দুমতীর ভূমিকায় আমার অভিনয় দেখে, পরিচালক শ্রীবিমল রায় তাঁর প্রথম ছবি 'উদয়ের পথে'তে যোগ দেবার জন্য আমায় উৎসাহিত করেন। এ লাইনে আসবার প্রথম প্রেরণা হিসেবে এই মাত্র বলতে পারি।"

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতী রায় নিঃসঙ্কোচে বলে চলেন, "চলচ্চিত্রে যোগদানে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল না, কিন্তু বহু রকমের দ্বিধা ছিল বৈকি! ছবিতে আত্মপ্রকাশের আমার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে পরিবর্ত্তন তেমন কিছু আসেনি বটে, তবে পরিবার থেকে বাদ-প্রতিবাদের ঝক্কা সইতে হ'য়েছে অনেক। এ হ'লো মন্দের দিক। সত্যিকারের পরিবর্ত্তন যদি বল্‌তে হয়, ছবিতে যোগ দিবার বছর তিনেকের মধ্যে আমার বিয়ে হয় সাহিত্যিক-পরিচালক শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়ের সঙ্গে। আমার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীতেও অসাধারণ কিছু নেই। পারিবারিক প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা অনুযায়ী করণীয় যা আর দশজনের মতই আমিও করে চলি।"

শ্রীমতী রায় এভাবে আমার প্রশ্নাবলীর পর পর উত্তর দিয়ে চলেন—"আমার 'হবি' (খেয়াল) বল্‌তে উল্লেখ করার মত কিছু নেই। আমার মতে জীবনের স্বাদ যখন ব্যাপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে, তখন কোনও একটা বিশেষ কিছুকে সম্বল করার প্রয়োজন হয় না। তবে কি না বয়সের কোন একটা সীমায় পৌছে সে সাধের টান পড়লে, একটা কিছু 'হবি' বেছে নিয়ে তাকে কেন্দ্রীভূত করা স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ—এটাও এ সঙ্গে স্বীকার করি।"

বিনতা দেবী এখানেই থাম্‌লেন না। বললেন—"খেলাধূলোর ভেতর এককালে ব্যাডমিণ্টন ভালই খেলতুম এবং ভাল লাগতো। অনেকদিন হ'লো কোন খেলায়ই মন নেই। একসময়ে ঘটনাচক্রে স্বামীর কাছ থেকে দাবা খেলাটা শেখবার অবিশ্যি প্রয়োজন হ'য়েছিল। সব রকম পত্র-পত্রিকাই প্রায় আমি পড়ে থাকি। বহুলপ্রচারিত মাসিক বসুমতী (মনে করবেন না, আপনাদের কাগজে জবানবন্দী দিচ্ছি বলেই এ নাম করা) আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়ি—ওতে এমন বিভিন্ন প্রকারের সব বিভাগ থাকে যার বিশেষ একটা মূল্য আছে। অপর দিকে সাহিত্যধর্ম্মী বই মাত্রই আমার ভাল লাগে। গল্প প্রভৃতি লেখবার অভ্যাস আমার আছে। সংখ্যায় খুব বেশী না হ'লেও ছোট গল্প আমি কয়েকটি লিখেছি এবং তা বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিতও হ'য়েছে। আমার একটি গল্প আন্তর্জাতিক ছোট-গল্প প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার-প্রাপ্তদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমার মতামত জান্‌তে চেয়েছেন। পোষাকের ব্যাপারে আমার প্রথম বক্তব্য হ'লো রুচি সম্মত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বোধ এতে থাকতে হ'বে, তা সেটা আড়ম্বরহীন বা জাঁকালো যেমনই হোক। আমি নিজে সাজতে খুব ভালবাসি এবং অপরকেও সুসজ্জিত দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।"

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি গুণ অপরিহার্য্য—প্রশ্ন করলুম আমি। শ্রীমতী রায় অমনি উত্তর করলেন, "অভিনয় করতে প্রাথমিক প্রয়োজন অভিনয়-দক্ষতা। তছাড়া এ বিশেষ আঙ্গিকের জন্তে উপযুক্ত কণ্ঠস্বর। স্মরণ শক্তি এবং কোন একটি আবেগকে নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা অপরিহার্য্য ভাবে থাকা দরকার। ভাল ছবি তৈরী করতে হলে নিশ্চয়ই সব ভালর সমাবেশ ও সমন্বয় প্রয়োজন। কারণ ভাল কথাটা ব্যাপ্ত ও আপেক্ষিকও বটে। এমনও হয় যে, একখানা ছবি খানিকটা আঙ্গিক গত ত্রুটি নিয়েও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসে—যেমন আত্মিক জোরের মহিমায় অঙ্গের ত্রুটিকে ছাপিয়ে মানুষ বড় হ'য়ে উঠে। শিল্পের ক্ষেত্রেও শিল্পাত্মার ঐ কথাটাই বড়, অবিশ্যি আত্মাবাহী অঙ্গটি সর্ব্বাঙ্গীন এবং সুষ্ঠু হলে তো কথাই নাই। চিত্রশিল্পে আঙ্গিক ও অন্যান্য শিল্পের যত বড় স্থানই থাক, এ যে বিশেষ করে সাহিত্যাশ্রয়ী, সন্দেহ নেই। এবং এ মিশ্র-শিল্প তার সবটুকু আয়োজনের মারফৎ কাহিনী আকারে সমাজ-জীবনেরই বিশেষ কোন একটি খণ্ড ঘটনাকে পরিবেশন করে। সে পরিবেশনে সাহিত্যাংশের সার্থকতা এবং জীবন-দর্শনের গভীরতাটি মূর্ত্ত হয়ে উঠলে তার মূল্য যে কতখানি, এর প্রমাণ বাংলা ছবি। এ বিশেষ সার্থকতার জোড়েই বাংলা ছবি তার আঙ্গিকগত অনেক শৈথিল্য নিয়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সর্ব্ব ভারতীয় চিত্র জগতে।"

চলচ্চিত্রে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যোগদান সম্পর্কে মতামতাদি জিজ্ঞেসা করা হয়। "আমি" বলবো, শ্রীমতী বিনতা রায় বলে চলেন বেশ জোরের সঙ্গে, "চলচ্চিত্রে অভিজাত ছেলে-মেয়েদের যোগ দেওয়ার প্রশ্নটা আজ অনেকটা অবান্তর হয়ে এসেছে। তবু বলছি আমার মতে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যদি নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রশ্ন উঠে, তাহলে বলবো রুচি সংস্কারের পাহারার গণ্ডির মধ্যেও তা অপ্রতুল নয় যে প্রবল মাধ্যম বর্ত্তমান জীবনে অপরিহার্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয়ে, তা হ'তে দূরে সরে না থেকে বরং এগিয়ে এসে তা শোধনের দায়িত্ব নেওয়াই কর্ত্তব্য। সে দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব একমাত্র রুচি সম্পন্ন শিক্ষিত-শ্রেণীরই পক্ষে। সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান একদিক থেকে সর্ব্বোচ্চে, আমি বলবো, কারণ এত বড় শিক্ষা-মাধ্যম বর্ত্তমান যুগে আর কোনটাই নয়।"

এ ভাবে প্রায় দু' ঘণ্টারও উপর আলোচনা চল্‌লো; আমার প্রশ্ন, তাঁর উত্তর, দেখলুম এ শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যান ধারণা যেরূপ প্রচুর, বলবারও ক্ষমতা তেমনি, বহু মূল্যবান তথ্যই তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলুম কিন্তু স্থানের অপ্রতুলতার জন্য সব পরিবেশন সম্ভব হ'লো না। আমার শেষ প্রশ্ন, আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চান? শ্রীমতী বিনতা রায় গভীর সরলতার সঙ্গে উত্তর করলেন—"প্রথম জীবন সুরু হ'য়েছে বউ-বউ খেলা আর পুতুলের মা হ'য়ে—ভবিষ্যৎ জীবন কাটাতে চাই, স্বামীর স্ত্রী ও সন্তানগণের মা হ'য়ে একটি সুষ্ঠু সংসারের কর্ত্রীহিসেবে। এর পিছনে সুদূর হলেও শিল্পী হিসেবে একটু স্বীকৃতি থাকলে তা হবে আমার নিজের এবং আমার পরিবারের বড় একটি তৃপ্তির কারণ।"

অর্থমনর্থম্

"অধিকাংশ লোকেরই আয় এত নগণ্য যে, মাস-মাহিয়ানায় এক সপ্তাহের বেশী চলে না। ইহার উপর ছেলে-মেয়ের পড়া-শানার খরচ, পরীক্ষার ফিস এবং অসুখ হইলে চিকিৎসার খরচ আছে। অনেক সময়ই মাহিয়ানার অর্থে এত খরচ সঙ্কুলান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে ধার-কর্জ না করিলে চলে না। কিন্তু ধার পাওয়া যায় কোথায়? মুদীর দোকান হইতে ধারে জিনিষ পাওয়াও আজ-কাল কঠিন। এই সকল কারণেই নগদ টাকা ঋণ দেওয়ার নাম করিয়া, প্রতারণা করা সহজ। অধিকাংশ লোকের অল্প আয়ই ইহার কারণ। বস্তুতঃ আমাদের অভাব-অনটন, আমাদের অল্প আয়, আমাদের বেকার-সমস্যাবেই একদল প্রতারক তাহাদের উপার্জনের উপায়ে পরিণত করিয়াছে। প্রতারণার বিভিন্ন উপায়ের যে বিবরণ ডেপুটি পুলিস-কমিশনার মিঃ বি সি রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিলে উহার মধ্যে দেশের আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের শাসকবর্গের তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। দেশের অধিকাংশ লোকই আজ কর্মসংস্থান করিতে পারিতেছে না। যাহাদের চাকুরী জুটিতেছে, তাহাদের অধিকাংশের আয় এত কম যে, তাহাতে সংসার-খরচ নির্ব্বাহ হয় না। এই জন্য তাহারা প্রতারকের খপ্পরে পড়িয়া আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য পুলিসের দায়িত্ব অবশ্য আছে। প্রতারকদের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য পুলিসকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু প্রতারণা-ব্যবসাকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইলে, দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল করা প্রয়োজন। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে, প্রতারকের প্রতারণা করিবার কোন সুযোগই আর থাকিবে না।"

—দৈনিক বসুমতী

ছাত্র ভর্তির লাঞ্ছনা

"কলিকাতা সহরের বিদ্যালয়গুলিতে এবারে ছাত্র ভর্তি লইয়া যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। পুত্র-কন্যাদের স্কুলে দিবার জন্য এত করুণ চিত্র, এমন শোচনীয় অবস্থা ও এরূপ মর্মান্তিক হয়রাণি অল্পই দেখা যায়। ইহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, কলিকাতা সহরে যতগুলি বিদ্যালয় আছে, বিদ্যার্থীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই শিক্ষা-বিভাগের রেগুলেশন অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার সংখ্যা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ; কিন্তু প্রবেশ-প্রার্থীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ত নহেই, বরং অনেক বেশী। ইহার ফলে যে বিদ্যালয়ে বা যে ক্লাসে হয়তো দশজন ছাত্র গ্রহণ করা হইবে, সেখানে প্রবেশ-প্রার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ ষাট হইতে প্রায় একশত। উচ্চশ্রেণী সমূহ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। নামকরা স্কুল হইলে ত কথাই নাই, সেখানকার ব্যূহ প্রায় চক্রব্যূহের মতোই ভেদ করা কঠিন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়াই সব সময় যথেষ্ট নহে, ভাল তদ্বির, জনে জনে ধরাধরি, দরজায় দরজায় অবস্থা মত, সময় মত ধর্ণা দিতে না পারিলে, ভর্তির অনুমতি লাভের আশা বৃথা। সকল বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া যাহাদের নাম ভর্তির তালিকায় প্রকাশিত হয়, তাহারাও যদি সেইদিন বা তাহার পরের দিন বারোটার মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের সুযোগও ফসকাইয়া গেল। কারণ ভর্তির তালিকার সঙ্গে কোন কোন স্থানে ওয়েটিং লিষ্টও প্রকাশিত হয়, এবং তাহাদের মধ্য হইতেই ছাত্র ভর্তি করিয়া লওয়া হয়। দরিদ্র অভিভাবকদের এই ব্যাপারে অবস্থা হয় সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। ভাল পরীক্ষা দিয়াছে ভাবিয়া অভিভাবকগণ তাহাদের ছেলে লইয়া ঘরে ফিরেন, কিন্তু পরদিন যখন জানিতে পান যে, তাহার নাম ভর্তির-তালিকায় স্থান পায় নাই, তখন সেই অভিভাবক এবং তাঁহার পুত্র-কন্যার হতাশা ও মনোভঙ্গ যে কিরূপ গভীর হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তারপর আবার আর এক বিদ্যালয়ে ছোটা, আবার পরীক্ষা, সেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রতীক্ষা, এবং হয়তো আবার সেই মনোভঙ্গ! সকল পিতা-মাতা বা অভিভাবকই তাঁহাদের পুত্র-কন্যার জন্য ভাল বিদ্যালয়ের সন্ধান করেন। কিন্তু শিক্ষার্থীর তুলনায় কলিকাতায় স্কুলের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি ভাল স্কুলের সংখ্যা আরও অল্প। বাধ্য হইয়া যে কোন স্কুলে যাঁহারা ছাত্র ভর্তি করাইয়া দেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা ছাত্রদের পাঠের অধোগতি, সংসর্গজনিত অবনতি লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হন। অথচ প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া পান না।"

—যুগান্তর।

বিহার কংগ্রেসের উষ্মা

"বিহারের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রিগণ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের আগমন সম্ভাবনায় সীমান্তবর্তী বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে যে অবিরাম সভা, সম্মেলন ও বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বাংলার যে অংশসমূহ বিহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, তাহার প্রত্যর্পণ নিবারণের জন্য বিহার নেতৃবৃন্দ এই উদ্যোগ প্রদর্শন করিতেছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছি, যাহাতে এই অংশসমূহ ফিরাইয়া পাইবার

ব্যবস্থায় তাঁহারা সমান ভাবে উদ্যোগী হন। আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে, গত ২১শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এ বিষয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয়ও বিহারে অবলম্বিত অপকৌশলসমূহের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রকাশ্য আন্দোলন ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রথম অগ্রণী বিহার কংগ্রেস ও তথাকার নেতৃবৃন্দ। তাঁহারা হয়তো চাহিয়াছিলেন যে, প্রচার ও অপপ্রচার এক তরফা ভাবেই চালাইয়া যাইবেন। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ও উহার সভাপতি মহাশয় প্রতিবাদ করায় তাঁহারা বিচলিত ও রুষ্ট হইয়াছেন। নব গঠিত বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাতেই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও উহার সভাপতিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহারা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার অংশ এই, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও উহার সভাপতির বিরুদ্ধে যাহা বলিবার মনের সাধ মিটাইয়া তাহা বলিবার পর, বিহারের জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহারা যেন সর্বপ্রকার উত্তেজনা সত্ত্বেও সংযত ও শান্ত হইয়া থাকে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট যাহা বিচারসাপেক্ষ ব্যাপার, তৎসম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট এই আবেদনের অর্থ কি, ইহাই আমাদের প্রশ্ন। ইহা কি প্রকারান্তরে পুনর্গঠন কমিশনকে জানাইয়া দেওয়া যে, তাহারা বিহার নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু সুপারিশ করিলে তাহাতে জনসাধারণ একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে? কাণ্ড ইতোমধ্যেই যাহা আরম্ভ হইয়াছে তাহার সংবাদ, আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণে এবং অন্যান্য সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। বিহারের আন্দোলনে তথাকার নেতৃবৃন্দের উক্তিতে প্রকারান্তরে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে, তৎপ্রতি ইতঃপূর্বেই আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বিহার কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবে সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

জাহাজী ধর্ম্মঘট

"বিলাতী মালিক ও কংগ্রেসী সরকারের অভিসন্ধি আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা চারিটি প্রদেশব্যাপী সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ উজানী ধর্ম্মঘটীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে চান। এতদিন ইহা না পারিয়া আজ খোলাখুলি তাহারা দমননীতির আশ্রয় লইয়াছেন। ইউনিয়নের সম্পাদক ও জঙ্গীনেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই দমনের সঙ্গে সঙ্গে চলিবে দালালদের দিয়া শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার চেষ্টা। কিন্তু, ১৯৫২ সালের উজানী জাহাজীদের ধর্ম্মঘটের স্মৃতি আজও মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। মুছিয়া যায় নাই, কি করিয়া উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে চারিটি প্রদেশের ৩৫ হাজার হিন্দু মুসলমান শ্রমিক অ-সাধারণ ঐক্য বজায় রাখিয়া সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। সেদিন সারা পশ্চিম বাংলার মেহনতী মানুষ তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়াছিলেন। উজানী জাহাজীদের সংগ্রাম আজ সারা পশ্চিম বাংলার মেহনতী মানুষের সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেসী সরকারের আটক-আইন ও নিরাপত্তা-আইনের অর্থ আর একবার জনসমক্ষে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ মানুষ বুঝিয়াছে উজানী জাহাজীদের উপর এ আঘাত প্রতিটি মেহনতী মানুষের জীবনের উপর আঘাত। উজানী জাহাজীদের জঙ্গী সংগঠন বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন হইতে দাবি জানানো হইয়াছে, অবিলম্বে মনসুর জিলানীর মুক্তি দিতে হইবে, জাহাজ লেড-আপ করা ও শ্রমিক ছাঁটাই করা বন্ধ করিতে হইবে, ইউনিয়নের বর্তমান কার্য্যকরী সমিতিকে স্বীকার করিতে হইবে, 'মাতু' জাহাজের কর্ম্মীদের পুনর্ব্বহাল করিতে হইবে, দমননীতি বন্ধ করিতে হইবে। এই আশু দাবিগুলির ভিত্তিতে অবিলম্বে মীমাংসার জন্য সরকারকে বাধ্য করিতে জনসাধারণ আগাইয়া আসুন।" —স্বাধীনতা।

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

"মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অপরাধে আজ-কাল কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা শুরু হইয়াছে। পাঞ্জাবে পণ্ডিত জহরলালের সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের অপরাধে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও জেল হইয়াছে। গত বছর ৪ঠা অক্টোবর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ মীরাটের এক গ্রামে গিয়াছিলেন। ২০০ হইতে ২৫০ জন কৃষক সেই গ্রামে একটি খাল-পুলের নিকটে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ জানাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। বেলা সাড়ে এগারোটার সময় তিনি যখন পুল পার হইতে-ছিলেন তখন প্রজারা তাঁহাকে ৪৫মিনিট দেরী করিয়া দেয়। মুখ্যমন্ত্রী গাড়ী থামাইবেন না, প্রজারা গাড়ী থামাইয়া তাঁর সঙ্গে কথা বলিবে, এই ছিল ঘটনা। পুলিশ তাহাদের সরাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। অগত্যা মুখ্যমন্ত্রী গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বাধ্য হন। প্রজারা সন্তুষ্ট হয় না। অভয়রাম নামে এক ব্যক্তি গাড়ীর সামনে শুইয়া পড়ে। পুলিশ তাহাকে টানিয়া সরায়। একদল লোককে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের এক বছর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেন এবং ২০০ টাকা করিয়া জরিমানা করেন। অভয়রামের আরও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। আপীলে মীরাটের জেলা-জজ সমস্ত অভিযুক্তকে মুক্তি দিয়া বলিয়াছেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাদের বিরুদ্ধে একটা ধারণা নিয়া মামলার বিচার করিয়াছেন। মামলায় পণ্ডিত পন্থকে সাক্ষী হিসাবে আনা হয় নাই এবং ইহাতে অভিযুক্তদের প্রতি খুব অন্যায় করা হইয়াছে। যে সব সাক্ষী হাজির করা হইয়াছে, তাহারা হয় বাজে লোক, নয়ত ইহাদের বিরুদ্ধ দলের লোক। মামলার বিচার মোটেই ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। অপরাধ হিসাবে দেখিতে গেলেও অভিযুক্তদের কাজ দণ্ডবিধির ১৪১ ধারার মধ্যে পড়ে না। বে-আইনি জনতার যে সংজ্ঞা আছে, ঐ ধারা মতে এক্ষেত্রে তাহা খাটে না। অভয়রাম পণ্ডিত পন্থের গাড়ী এমনভাবে আটকাইয়াছিল যে, তিনি যাইতেই পারিতেন না, একথা প্রমাণ হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন,—অভয়রাম যাহা করিয়াছে তাহা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ এবং সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা বহুকাল এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাকে কখনও বে-আইনি আটক বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। যত কঠোর কণ্ঠেই আওয়াজ তোলা হউক না কেন, বিক্ষোভ প্রদর্শনকে বে-আইনি আটক বলিয়া অভিহিত করা যায় না।" (However authoritative the tone, mere direction or demonstration would not constitute wrongful restraint) —যুগবাণী (কলিকাতা)।

তিস্তার বাঁধ সমস্যা

"সহরের মধ্যে বাঁধ হইবে তিন মাইল ও সহরের বাহিরে নয় মাইল। এই নয় মাইলের মধ্যে প্রায় ছয় মাইল বাঁধ হইবে ধান খেতের মধ্য দিয়া ও অর্দ্ধ মাইল রায়পুর চা-বাগানের মধ্য দিয়া। সহরের বাহিরে বাঁধটি হইবে তিস্তার পাড় হইতে গড়ে ৪০০´ ফুট দূর দিয়া এবং বাঁধের জন্য আরও ৪০০´ ফুট চওড়া জমি অধিকার করা হইবে। বাঁধের তলা গড়ে ৬০´ ফুট, মাথা ১৫´ ও উচ্চতা ৪´ হইতে ১০´ ফুট পর্য্যন্ত। উপরোক্ত হিসাব প্রায় আনুমানিক সঠিক হিসাব সরকারী দপ্তরে সম্ভবতঃ পাওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় দেখা যায় যে, প্রায় ৩০০ একর ধানী জমি বাঁধের নীচে যাইবে। প্রায় ৩০০ একর ধানী জমি বাঁধ ও তিস্তার মধ্যে থাকিবে। বাঁধের তলায় পড়িবে প্রায় ১৫০টি বাড়ী ও বাঁধের বাহিরে তিস্তার দিকে প্রায় ৪০০ বাড়ী। এই স্থানে যে ধান হয়, তাহার বাৎসরিক মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। এই সব 'তিস্তায় নমঃ' হইবে। বাঁধের তলায় যাহারা পড়িবে, তাহারা সম্ভবতঃ ক্ষতিপূরণ পাইবে। বাঁধের পূর্ব্ব-দিকের দল কিছুই পাইবে না, অথচ নির্ম্মূল হইবে। সরকার পক্ষ এদের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিবেন আশা করি। সহরের ইনকাম টেক্স আপিস ও সাপ্লাই আপিস দুইটি 'তিস্তায় নমঃ' হইতে চলিয়াছে। ইহারা পড়িবে বাঁধের পূর্ব্ব পার্শ্বে। এগুলি রক্ষা করিয়া বাঁধের ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ সহরবাসীর অসুবিধা হইবে প্রচুর। অন্যান্য বহু অসুবিধার কথা বলিলে অনেকে বলিবেন যে, বাড়াবাড়ি করিলে পরিকল্পনাটাই হয়তো পরিত্যক্ত হইবে। সে দিকেও ভয় আছে। গণতন্ত্রে জনমতকে উপেক্ষা করা চলে।"

—জনমত পত্রিকা (জলপাইগুড়ি)

চন্দননগরে সরকারী অব্যবস্থা

"গত ৩রা জানুয়ারী সরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির মাহিনার দিন ছিল। কিন্তু এমনিই কর্মদক্ষ কর্তৃপক্ষ চন্দননগরে রহিয়াছে যে, ঐদিন রাত্রি ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বহু স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এবং কলেজের অধ্যাপকদের মাহিনা লইতে হয়। চন্দননগরের বহু অধ্যাপককে ধার করিয়া ট্রেনের মান্থলি টিকিট কাটিতে হয়—বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। অথচ সময় মত বিল পাঠানো হইয়াছিল—ফর্ম্মালিটির কোনও ত্রুটি হয় নাই। এই ভাবে সরকারী কাজকর্ম চলিতে থাকিলে—সারা মাস কাজ করিয়া পরিশ্রমের মূল্য যদি না পাওয়া যায়—সরকারী দেয় টাকা যদি সময়মত সরকার না দিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সরকারকে দেউলিয়া ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? চন্দননগরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি যদি এইরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই সরকার জনসাধারণের অগাধ শ্রদ্ধা অর্জন করিবেন সন্দেহ নাই! আমরা এই বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।"

সমাচার (চন্দননগর)।

চায়ের বাজার

"চায়ের বাজার গরম। কলিকাতার নিলামে আশাতীত মূল্যে চা বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু এত মূল্য বৃদ্ধিতেও উৎপন্নকারী ও ব্যাবসায়িগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের মুখে এক কথা—ইহার পর কি? ইহার পর কি, তাহা সত্যই চিন্তা করিবার মত কথা। কোন ব্যাবসাতেই অস্বাভাবিক মূল্য সহজ অবস্থার সূচনা করে না। মূল্য উঠিতেছে কিন্তু ইহা পড়িলে কোথায় আসিয়া নামিতে পারে, তাহা দেখিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ১৯৫২-৫৩ সালের আতঙ্ক এখনও উৎপন্নকারী ও ব্যবসায়ীদের মন হইতে যায় নাই। সুতরাং চায়ের এই অস্বাভাবিক গরম বাজারে কাহাকেও বিশেষ ভাবে উৎফুল্ল হইতে দেখা যায় না। তাহার অর্থ এই যে, ব্যবসা স্বাভাবিক পথ দিয়া সহজ ভাবে চলুক, ইহাই অনেকে চান। আজ যাহা গরম আছে, কালই তাহা নরম হইয়া যাইতে পারে। কেন যে এই ভাবে দর উঠে এবং কেন যে দর পড়ে, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান করা হয় মাত্র, সঠিক কারণ বলিতে পারে না।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

লক্ষ্ণৌ বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে শ্রীসম্পূর্ণানন্দ বক্তৃতাদানরত। তাঁর ডান দিকে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

সম্মেলনের অতিথিবৃন্দ   —আলোকচিত্র শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

গাড়োয়ানদের মুস্কিল

"জঙ্গিপুরে মিউনিসিপালিটি ৫নং ওয়ার্ডে রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজারের রাস্তার দুই পাশে ছোট বড় অনেকগুলি দোকান আছে। কোন কোন দোকানদার নিজ নিজ দোকানের সীমানা ছাড়াইয়া রাস্তার উপরে বেঞ্চ রাখিয়া, খুঁটি পুতিয়া, দরমার টাটি তুলিয়া রাস্তার কিছু অংশ অবরোধ করিয়া সাধারণের অসুবিধা করে। এই রাস্তা দিয়া গো-গাড়ি চালান খুব কঠিন। গাড়োয়ানগণকে অতি সন্তর্পণে গাড়ী চালাইতে হয়। পাড়াগাঁয়ের বলদ বাজারে আসিয়া প্রায়ই চমকাইয়া উঠে। যদি কারও টাটিতে বা বেঞ্চে ধাক্কা লাগে, তবে গাড়োয়ানকে দোকান-দারের রূঢ় বাক্য অবাধে হজম করিতে হয়। আমরা এই বিষয়ে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের ও মহকুমা পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—জঙ্গীপুর সংবাদ।

বহরমপুর পৌর-সভার কেলেঙ্কারী

"বহরমপুর পৌর-সভার সম্বন্ধে নানা কথা আমাদের কাণে আসিতেছে। তাহার সবগুলি বলা চলে না। কতকগুলি কিন্তু না বলিলেও চলে না। আজ ছয় কোয়ার্টার অর্থাৎ (১৮ মাস) হইতে বাড়ীর কলের জলের মিটার রিডিং লওয়া হয় নাই—অথচ ঐ জন্য প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট মাসিক ২০৲ বেতন ওয়াটার ওয়ার্কসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শুনিতেছি। কথাটা পৌর সভায় উঠার পর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের রিডিং লওয়ার উৎকণ্ঠা আসে। এর ফলে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর। ঘটনাটা এই, জলকল অফিসে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জনৈক শ্রমিক-মিস্ত্রিকে কেরাণীর নিকট হইতে মিটার-রিডিং-এর খাতা আনিতে হুকুম করেন, বেচারী হুকুম ঠিকমত বুঝিতে না পারায় কেরাণীকে অন্য রকম বুঝাইয়া অন্য খাতা আনিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের হাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেচারার দিকে ঐ খাতা ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া যান। নিক্ষিপ্ত খাতাখানি বেচারাকে এমনই আঘাত করে, যাহার ফলে সে অজ্ঞান হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করে। কিছুক্ষণ পরে জনৈক কর্ম্মী ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া উহাকে ঐ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আনিতে সক্ষম হয়। এই হইল এই পদস্থ কর্ম্মচারীটার আচরণের পরিচয়; কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। পরে যোগ্যতার পরিচয় সম্বন্ধে আপাততঃ অতীত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ইহাই বলিব যে, বর্ত্তমানে যখন জলকল বৈদ্যুতিকশক্তিচালিত হইয়াছে—তখন ঐ পদের যোগ্যতা যতদূর জানি তাঁহার নাই, কিন্তু হইলে কি হয় তাঁহার মুরুব্বীর জোর আছে। যাঁহাকে আমরা নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছি—যিনি বিভাগীয় কর্ত্তা—তিনি প্রসন্ন থাকিলেই হইল। রেটপেয়ার তাঁহাকে ভোট দিয়াছে—তাঁহার কাছে সেবা পাইবার জন্য রেটপেয়ার পাওনাদার—তিনি দেনদার। আর কর্ম্মচারীর কাছে তিনি পাওনাদার স্বারের।"

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

বর্ত্তমান জরিপ

"এই সাব-ডিভিজানে বর্ত্তমানে জরিপ চলিতেছে। এ বৎসর যে যৎ সামান্য ধান্য হইয়াছে, তাহা কাটিয়া গুছাইবার জন্য অধিকাংশ লোকই কম-বেশী ব্যস্ত থাকায় মৌজাতে জরিপের নোটিশ জারী হইলেই মৌজার অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে জরিপ বন্ধ রাখিবার জন্য আপত্তি সংশ্লিষ্ট এটেষ্টেশন অফিসে আসিতেছে। কোন কোন এটেষ্টেশন অফিস জরিপী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বোর্ড বা মৌজার প্রকাশ্য স্থানে জরিপের নোটিশ না লটকাইয়া জরিপ কার্য্য সুরু অথবা বন্ধ করিতেছেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের হায়রাণ হইতেছে। এইরূপ হায়রাণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জরীপ মৌজায় জমির শ্রেণী বা কসমের ঘরে আউল, দোয়েম, সোয়েম বা চাহারাম না লিখিয়া শুধু 'জল' বা 'কালা' বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। ইহাতে ভবিষ্যতে জমির শ্রেণী নিরূপণে বা খাজনা ধার্য্যের ব্যাপারে জনসাধারণকে অসুবিধায় পড়িতে হইবে। সুতরাং যাহাতে জমির শ্রেণী বা কসমের ঘরে শুধু 'জল' বা 'কালা' উল্লেখ না করিয়া, আউল, দোয়েম, সোয়েম, বা চাহারাম প্রভৃতি প্রকৃত শ্রেণীর উল্লেখ থাকে এবং যে সব মৌজায় আদৌ ধান্য হয় নাই, সেই মৌজায় বর্ত্তমানে জরিপ চালাইয়া যেই সব মৌজায় ধান্য হইয়াছে সেই সব মৌজায় আপাততঃ এক মাসের জন্য জরিপ বন্ধ রাখা হয়, তাহার জন্য সেটেলমেণ্ট অফিসার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহাতে জরিপী কর্ম্মচারিগণ ও জনসাধারণ উভয়েই উপকৃত হইবেন।

—প্রলাপ (মেদিনীপুর)।

সরকারী ঋণের দায়ে ধলভূমের জনসাধারণ বিপন্ন

"বর্ত্তমান বৎসর ধলভূমে ফসলের অবস্থা খুবই শোচনীয় হওয়ায় ধলভূমের কংগ্রেস কর্মিগণ জনসাধারণের তরফ হইতে বিহারের রাজস্ব-মন্ত্রী মাননীয় কৃষ্ণবল্লভ সহায় মহাশয়কে অবগত করাইয়াছিলেন যে, যে সব জনসাধারণকে সরকারী ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পুনরায় ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত আদায় স্থগিত রাখিবার জন্য আদেশ দেওয়া হউক! মন্ত্রী মহাশয় তাহা কর্মিগণের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহা সত্বেও ঋণ গ্রহণকারীদের নামে সার্টিফিকেট পেশ হইতেছে, এবং সময় প্রার্থনা করার জন্য সময় না দিয়া জমী নীলামে উঠান হইতেছে। শুনা যায় যে, সিংভূমের ডেপুটি-কমিশনার মহাশয় সার্টিফিকেট-অফিসারকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ধলভূমের যে এলাকা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সেই এলাকার জনসাধারণকে পুনঃ ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হউক? কিন্তু তিনি জানান নাই যে, ধলভূমের কোন্ এলাকা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। ফলে তাঁহার নির্দ্দেশ কাগজে লিপিবদ্ধ অবস্থায় আছে, কার্য্যকরী হইতেছে না।"

—নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

রামপুরহাট রেল-ষ্টেশনে অব্যবস্থা

"আজ-কাল প্রত্যেক রেল-ষ্টেশনেই যাত্রী সাধারণের দীর্ঘদিনের অনুভূত অসুবিধা দূরীকরণে কর্ত্তৃপক্ষ কিছুটা সজাগ হইয়াছেন। কিন্তু রামপুরহাট ষ্টেশনে কেবলমাত্র ব্যাং-এর ছাতার ন্যায় একটি সেড ছাড়া অদ্যাবধি রেল-কর্ত্তৃপক্ষ কিছুই করেন নাই। এই ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্দ্ধারিত মহিলা-যাত্রীদের যে ওয়েটিং-রুমটি আছে, তাহা একটি চা-খানার সহিত অবস্থিত এবং তাহাও ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির আওতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের একদিকে নাম মাত্র যে শেডটি নূতন তৈরী করা হইয়াছে, তাহাও প্লাটফর্ম্মের যে আদিকালের নির্ম্মিত বারান্দার ছাদ আছে

তাহা সমস্ত অংশের এক-চতুর্থাংশও আচ্ছাদিত করে না। রৌদ্রের কষ্ট না হয় ছাড়িয়া দেওয়া হইল কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় ট্রেণ হইতে উঠিবার বা নামিবার সময় এই দীর্ঘ অনাচ্ছাদিত প্লাটফর্ম্মে, যাত্রী সাধারণের মধ্যে অসুস্থ রোগী এবং ছোট ছেলে-পুলে লইয়া যে অবর্ণনীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, কর্ত্তৃপক্ষের কি তাহা নজরে পড়ে না? ইহা ছাড়া টিকিট বিক্রয়ের স্থানে একজন মাত্র টিকিট বিক্রেতা, যাহার জন্য যাত্রীদের যে দীর্ঘদিনের অসুবিধা এবং অপেক্ষমান যাত্রীদের হাঁটুর জোর ব্যতীত বসিবার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা না করার চরম অব্যবস্থা—ইত্যাদি দূরীকরণে বা প্রতিকারেও কর্ত্তৃপক্ষ চরম উদাসীন।

আমরা স্থানীয় ষ্টেশনকর্ত্তৃপক্ষের কাছে বলিতে চাই যে, লাল নীল বাতী দেখাইয়া যথাবিহিত কর্ত্তব্য সাধন ছাড়াও কর্ত্তব্যের যে আর একটা পাতা আছে, তাহা কি একবার ভালভাবে পড়িয়া দেখিবেন?" —বীরভূমের ডাক

ইলেকশনে সিলেকশন—

"মানভূমে কংগ্রেসী নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেল। কয়েকটি কেন্দ্রে election-এর পরিবর্ত্তে selection হইয়া গেল। রাজ্যের রাজধানীতে বসিয়া বড় বড় প্রভুরা জনগণের election ধামা চাপা দিয়া নিজেদের পছন্দ অনুসারে Candidate selection করিয়া লইলেন। যে দেশে গণমত, গণভোট এর মূল্য অপেক্ষা প্রভুমত প্রভুভোটের মূল্য বেশী, সে দেশকে গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের দেশ না বলিয়া প্রভুতন্ত্রের দেশ এবং রামরাজ্য না বলিয়া রাবণরাজ্য বলাই উচিৎ নয় কি? প্রভুরা যখন প্রভু হইয়াছেন তখন এই গণভোটের মূল্য এবং গণভোটের শক্তি উপলব্ধি করেন নাই কি? এই গণভোটকে সরাসরি উপেক্ষা করিয়া প্রজাতন্ত্রের শিরে পদাঘাত করা উত্তম কাজ কি?" —সংগঠন (মানভূম)।

ভেজাল! ভেজাল!!

"যে-কোন স্বাধীন ও সভ্য দেশে যাহা অচিন্তনীয়, আমাদের দেশে তাহাই বহুল প্রচলিত। ভেজাল, কালবাজারী ও ঘুষ—এই ত্রিমূর্ত্তির চক্রান্তে আমাদের দেশ আজ আচ্ছন্ন। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতারা এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের যত প্রতিশ্রুতিই দিয়া থাকুন না কেন, স্বাধীনতা লাভের পরে এতদিন যাবৎ ঐগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসী সরকার ও কংগ্রেসী কর্ম্মীরা যে একেবারে নির্ব্বিকার রহিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? খণ্ড খণ্ড এলাকায় যা এক-আধটু প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহা ব্যর্থকাম হইতে বাধ্য, কারণ দেশব্যাপী সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে জাতির এই দুষ্ট ক্ষতগুলিকে নির্ম্মূল করা সম্ভব নহে। যাহারা উৎপাদনকারী ও মজুতদার অথবা পাইকারী বিক্রেতা, তাহারাই ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্যাদি বাজারে চালু করিতেছে আর এইভাবে তাহারাই খাঁটি দ্রব্যগুলিকে বাজারে পৌছিবার পূর্ব্বেই নিশ্চিহ্ন করিতেছে। ভেজাল নিরোধের কোন কিছু সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই সমস্ত বাজার পরিচালনকারী "ব্যবসা-চুম্বক"দের সম্বন্ধে কৃপাহীন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই বিধেয়। ইহাদের ব্যাপারে নির্ব্বিকার থাকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুচরা বিক্রেতাদের উপরে আগে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ বাজার হইতে নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির বিক্রেতা আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না পরন্তু জিনিষের দামই চড়িয়া যাইবে।" —উদয়ন (মালদহ)।

হাইলকান্দির বাজার নীলাম

"সম্প্রতি হাইলকান্দি পৌরসভা হারবাটগঞ্জ বাজার অত্যধিক মূল্যে নিলাম করিয়াছেন। আমরা জানিতে পারিলাম যে, তোলার যে হার নিলাম ডাকার পূর্ব্বে ছিল—সেই অনুসারে বাজার 'লেসি' নাকি তোলা না তুলিয়া উহার অতিরিক্ত হারে নিরীহ গ্রাম্য ব্যাপারীগণ হইতে আদায় করিতেছে। ঐ জন্য কোন রসিদও নাকি দেওয়া হইতেছে না। নালে বিক্রয়কারী ও ব্যাপারী সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। ইহা কতদূর সত্য আমরা জানিনা, তবে ব্যাপারীগণ স্থানীয় কংগ্রেস ও মহকুমা হাকিমের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন! জেলা কংগ্রেস প্রধান সম্পাদক নিজে উহার তদন্ত করিয়া মহকুমা হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, বাজার 'লেসি' এখন যে হারে তোলা আদায় করিতেছে তাহা পৌরসভার কোন সভায় অনুমোদিত হয় নাই? এমতাবস্থায় ঐরূপ অত্যধিক হারে তোলা কিভাবে আদায় করা হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মহকুমা হাকিম অচিরে সমগ্র বিষয়টি অনুষ্ঠান করিয়া যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলে গরীব জনসাধারণের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।" —কাছাড়

শোক-সংবাদ

সোমেশচন্দ্র বসু

বিখ্যাত গাণিতিক সোমেশচন্দ্র বসু (৬৮) বিগত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার সকালে তাঁহার আহিরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ রক্তচাপ রোগে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ঢাকার বজ্রযোগিনী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময়েই তিনি অঙ্কে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দেন। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে আই-এ পড়িবার সময় তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়া কলেজ ত্যাগ করেন। তিনি দুইবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। তাহা ছাড়া তিনি কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালীও পরিভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি অঙ্কশাস্ত্রে যাদুকরী শক্তির পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য দেশবাসীকে বিস্মিত করেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান মনীষী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। গণনাঙ্কে সোমেশচন্দ্র এইরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন যে, একশত সংখ্যা বিশিষ্ট একটি রাশিকে অপর একটি একশত সংখ্যা বিশিষ্ট রাশি দ্বারা গুণ করিলে, গুণফল তিনি মুখে মুখে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বলিয়া দিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া রাশি যত বড়ই হউক, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি তাহার বর্গমূল বলিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তি পাশ্চাত্য দেশগুলিকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। আমেরিকায় তিনি অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন। সোমেশচন্দ্র গভীর ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত ও স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি যোগ অভ্যাস করিতেন। ভারতে ও ভারতের বাহিরে অনেককে তিনি

যোগশিক্ষা দিয়াছেন। অঙ্ক, জ্যামিতি ও বীজগণিত বিষয়ক অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য বই তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯২২ সালের মে মাসে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং প্রায় তিন মাস কাল লণ্ডনে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে নানা স্থানে আহূত হইয়া স্বীয় অদ্ভুত গণনাকুশলতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কানাডা রাজ্যে উপস্থিত হইলে, বিপ্লববাদী সন্দেহে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। দেড় মাস পরে মুক্তি পাইয়া তিনি মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান। ১৯২৩ সালে নিউইয়র্ক সহরে কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির অনুরোধে তিনি ৬০ অঙ্ক-বিশিষ্ট রাশিকে ৬০ অঙ্কবিশিষ্ট রাশি দ্বারা মুখে মুখে গুণ করিয়া শুদ্ধ ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অলৌকিক মানসিক গণনার শক্তি প্রভাবে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

ডাঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর

ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের সচিব ডাঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর গত ১লা জানুয়ারী শনিবার রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ডাঃ ভাটনগরের বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। দেশের উন্নয়ন কল্পে ডাঃ ভাটনগর ঐকান্তিক ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

স্বর্গীয় অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৫৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট জমিদার অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উত্তরপাড়াস্থ বাসভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন—ইহা আমরা গত মাসে উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গীয় অবনীনাথ ১৮৭৯ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন স্কুল বা কলেজে শিক্ষালাভ হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বহু ভাষাবিদ শাস্ত্রজ্ঞ ও দার্শনিক ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং ইংরাজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত চিত্রশিল্পী পিতা ৺শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও উপযুক্ত গৃহশিক্ষকগণের নিকট তিনি গৃহে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে বিখ্যাত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ৺বামানন্দ ভারতী মহাশয়ের শিষ্য সাধকপ্রবর শ্রীহট্টের ৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি অল্প বয়স হইতেই চিত্রশিল্প ফটোগ্রাফীর প্রতি আকৃষ্ট হন ও পরে এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়া নিখিল ভারত ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক ও ফটোগ্রাফীক সোসাইটির রৌপ্য পদক লাভ করেন। তিনি উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, এবং উত্তরপাড়ার বিখ্যাত পাবলিক লাইব্রেরীর কিউরেটার বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি দানশীল, সদালাপী ও

স্বর্গীয় অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়

অমায়িক ছিলেন এবং তাঁহার গোপন দানে বহু দরিদ্র ছাত্র শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিল।

অভিলাষ ঘোষ

১৯১১ সালের আই-এফ-এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষ গত ৩রা জানুয়ারী সোমবার প্রত্যূষে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে শ্রীযুক্ত ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন এবং কলিকাতা হইতে তিনি—বি, এ, বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বীরাঙ্গনা দেবী

গত ২৭শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ভারতীয় রাজ্য-সভার সচিব শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশ্রূ মাতা বীরাঙ্গনা দেবী তাঁহার পদ্মপুকুর রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি পরোপকারী ও দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চারি পুত্র, ও তিন কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা এই সকল মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিক বসুমতী (জলরঙ) বাণী বিদ্যাদায়িনী

মাঘ, ১৩৬১ —প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

মাঘ, ১৩৬১]

[৩৩শ বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

(স্থাপিত ১৩২৯)

সারদা-প্রসঙ্গ

"ও সারদা সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে।·········
ও জ্ঞানদায়িনী! মহাবুদ্ধিমতী! ওকি যে সে!
ও আমার শক্তি।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

"যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন······সাক্ষাৎ আনন্দময়ীরূপে তোমাকে সর্ব্বদা সত্য দেখিতে পাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

"ও (শ্রীশ্রীমা) যদি এত ভাল না হইত; আত্মহারা হইয়া আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না কে জানে?"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

"তুমি আমার আনন্দময়ী মা।·········আমি জানি,
একরূপে আনন্দময়ী এই দেহ প্রসব করেছেন।
একরূপে মা আনন্দময়ী কালীঘরে আছেন,
একরূপে মা আমার সেবা করিতেছে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

'রামকৃষ্ণ পরমহংস' ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বল·········; কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

"তোমরা কেউ মা'কে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

"শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছ ?……
একি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!!
যে বিষ নিজেরা হজম কর্ত্তে পাচ্ছিনে, তাঁর কাছে দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা!"

—স্বামী প্রেমানন্দ।

"মাকে ধর, তিনি যা বল্‌বেন, তাই ঠিক্।"

—স্বামী যোগানন্দ।

"মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মত থাকেন, অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি তাঁকে চিনতে পারতুম ?"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

"শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তা হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা জ্ঞানে আজীবন পূজা করিতে ও তাঁহার শ্রীপদ অনুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।"

—স্বামী সারদানন্দ।

"যাঁহার পতি ব্রহ্মাণ্ডপতির মণি, তাঁহার পত্নী কি সাধারণ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পশুপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে পারেন? শাস্ত্রে বলে, পুত্রের জন্য স্ত্রী-পুরুষের প্রয়োজন।"
"মাগো! তুমি যে সহস্র পুত্র-কন্যার জননী! তোমাকে কি মা কুক্কুর শৃগালের অবস্থায় পতিত হইয়া মা হইতে হইবে ?"

—ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত।

"ঠাকুর, মা যত দিন রাখেন রাখুক, না রাখেন নাই রাখুন—আমার কি—তাঁদের যেমন ইচ্ছে তেমনিই করুন, কেবল তাঁদের জ্ঞান—তাঁদের পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হোলো।"

—স্বামী শিবানন্দ।

"ভগবান ঠিক আমাদেরই মত মানুষ হয়ে জন্মান, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন ?"
"তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়া সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ঘরকন্না ও সবরকম কাজকর্ম্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া মহাশক্তি সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।"

—ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

"বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।"

—সাধু নাগ মহাশয়।

"মার কথা যা শুনেছিলাম তাতে কেহ জানিত যে, মা এরকম মা: এরকম করে মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হইতে আপনার করে নেবেন।……এ যে জন্ম-জন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা।"

—স্বামী বিরজানন্দ।

"আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁকে জেনেছি।
পবিত্রতা-স্বরূপিণী মা। আমি তাঁকে দেখেছি।"

—শ্রীমতী ম্যাক্‌লাউড্।

"স্নেহময়ী মা আমার! তুমি প্রেমপূর্ণা। তোমার প্রেম আমাদের জাগতিক প্রেমের ন্যায় উদগ্র ও ভাবোচ্ছ্বাসময় নয়। এই সেই প্রেম যাহা স্নিগ্ধ শান্তিপ্রদানকারী, নিখিল কল্যাণবর্ষী ও সর্ব্ব অশুভকামনা রহিত। লীলাচঞ্চল দ্যুতি-ভাস্বর তোমার এই প্রেম।"

—ভগিনী নিবেদিতা।

"পাথরের ঠাকুর পূজা করা সহজ, সে ঠাকুর কোন দিন কিছু বলে না, কিন্তু মানুষ-ঠাকুর পূজা করা বড়ই কঠিন, এ দেবতা যে কথা বলে।"

—গোলাপ মা।
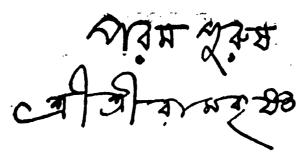
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো ছাব্বিশ

'ভক্ত্যা সর্বং ভবিষ্যতি।' ভক্তি দ্বারাই সব কিছু হবে। ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি শ্রীপাদপদ্ম-বিষয়িণী।

স্ফটিকমণির ঘরে যে প্রদীপ জ্বলে তার প্রকাশ তীব্র। সেই প্রদীপই যদি জ্বলে আবার পদ্মরাগমণির ঘরে তার প্রকাশ মধুর। তেমনি একই নিখিল-প্রদীপ ভগবানের দু'রকম প্রকাশ—তীব্র আর মধুর। তীব্র প্রকাশের নাম ঐশ্বর্য, মধুর প্রকাশের নাম মাধুর্য।

আমার এমন কোনো সাধ্য নেই, নেই আমার আধারে এত আয়তন যে তোমার ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করি। কিন্তু ভালোবাসতে কে না পারে বলো? বনের পশুপাখিও পারে। তেমনি যদি একবার ভালোবাসতে পারি তোমাকে, দেখাতে পারি মধুর হওয়া কাকে বলে। তুমি তো মধুলুব্ধ মধুসূদন। তাই আমার মধুর হওয়ার কারণই হচ্ছে তুমি আছ। ভক্তই ভগবদস্তিত্বের প্রমাণ। তেমনি আমিও যেন তোমার পরিচয়টি বহন করি। পাত্র না পেলে তুমি তোমার কৃপা ঢালবে কি করে? আমাকে সে শূন্য-শান্ত পাত্রটি হতে দাও।

অমলা ভক্তি। নিশ্চলা ভক্তি। বিশুদ্ধা ভক্তি। বিমুক্তা ভক্তি।

স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্তন করবে, লজ্জা কি। কণ্ঠস্বরটি গাঢ় করো, তীক্ষ্ণ করো। কখনো উচ্চহাস্য, কখনো রোদন, কখনো আর্তনাদ, কখনো গান, কখনো উন্মাদনৃত্য। জড় জীব জ্যোতিষ্ক—যা কিছু আছে স্থূলে-অস্থূলে, সমস্তই হরির শরীর বলে জেনো। অনন্যমনে প্রণাম কোরো। যে ভোজন করে তার একসঙ্গেই তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তেমনি যে হরিকে ভালো বাসে বা ভজনা করে সে একসঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও বৈরাগ্য লাভ করে।

বৈদ্যের মত ভক্তও তিন রকম। সে সর্বভূতে সমদৃষ্টি, অর্থাৎ যে সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখে সে উত্তম ভক্ত। যার ঈশ্বরে প্রেম-জীবে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা সে মধ্যম ভক্ত। আর, অধম বা প্রাকৃত ভক্ত কে? যে শুধু বিগ্রহ-প্রতিমায় হরির পূজা করে, হরিভক্ত বা আর কাউকে নয়, সে অধম বা প্রাকৃত ভক্ত।

সন্দেহ কি, উত্তম ভক্তই ভাগবত-প্রধান। বাসনা নয়, বাসুদেবই তার একমাত্র আশ্রয়। অবশে অভিহিত হলেও যে হরিনাম পাপ হরণ করে, সেই হরির পাদপদ্ম সে প্রেমরজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছে হৃদয়ের মধ্যে। সাধ্য নেই হরি ত্যাগ করে সেই সুধানিবাস।

'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' বললেন ঠাকুর।

নারদ মানে কি? যে নার অর্থাৎ জল দেয়। জল মানে কি? জল মানে পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞান।

নারদ কি করে? শ্বাসে-গ্রাসে হরিনাম করে।

বীণা হস্তে সুখাসীন, নারদ একদিন জিগগেস করলে ব্যাসকে, তোমাকে ক্ষুব্ধ দেখছি কেন? এমন মহাভারত রচনা করেছ, ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছ, তোমার আর কি চাই?

এত বই লিখেও আমার তৃপ্তি হল না। ব্যাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন আমার এই অতৃপ্তি, আপনিই বলুন বিচার করে।

আমি জানি। বললে নারদ, তুমি ভগবানের অমল চরিত-কথা বলোনি বিশদ করে। ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপ্রদ হয় না।

ভক্তিতেই তৃপ্তি। ভালবাসাতেই গৌরব। অশ্রুতেই আনন্দ।

সুতরাং ঈশ্বরের লীলাকথা বর্ণনা করো। রসের আকার হচ্ছে রাস। বর্ণনা করো সেই রাসলীলা।

ব্যাস রচনা করল ভাগবত। পরমবেত্তকে শুধু জানা নয়, তাকে ভালোবাসতে জানাই আসল বিদ্যা। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।'

'হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম করে ভেসে যায়। কিন্তু একটা পাখি এসে বসলেই ডুবে গেল।' বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। নিজে তো ভাসেই, আবার কত মানুষ গরু হাতি পর্যন্ত নিয়ে যায় সঙ্গে করে। যেমন ষ্টিম-বোট। আপনিও পারে যায়, আবার কত লোককে পার করে।'

ঠাকুরের কাশি হয়েছে।

মহেন্দ্র ডাক্তার বললে, 'আবার কাশি হয়েছে? তা কাশিতে যাওয়া তো ভালো।' হাসল ডাক্তার।

ঠাকুরও হাসলেন। বললেন, 'তাতে তো মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই।'

মুক্তি হলে তো সব ফুরিয়ে গেল। সব শূন্যাকার। আমার স্পৃহা আস্বাদনে। ভাব গ্রহণে। ভাবের কি শেষ আছে? ভালোবাসার কি অন্ত হয়? তবে আমিই বা কেন অন্ত হব?

আমি অব্যর্থকালত্ব চাই। হে ঈশ্বর, তোমাকে ছেড়ে যেটুকু সময় যায় সেটুকুই ব্যর্থ। এমন করো যেন সব সময়েই তোমাতে লেগে থাকি, মগ্ন থাকি, এতটুকু ক্ষণকণা যেন না বিফল হয়। আর দাও তোমার বসতিপ্রীতি। তোমার যেখানে বসতি সেখানেই আমার অনুরাগ। তোমার বাস তো শুধু তীর্থে নয়, অখিল সংসারে। অণুতে-রেণুতে। তোমার সর্বব্যাপিত্ববোধে আমার সমস্ত স্থান তীর্থান্বিত করো। বিশ্বময় প্রীতিতে বিস্তৃত হই। স্থানে আর সময়ে এক তিল পরিমাণ তোমার বিরহ ব্যবধান না থাকে।

'লাখ জন্ম হলেই বা ভয় কি।' বললে নরেন, 'বারে বারে

আসব, ছুঁয়ে যাব ঝরা-মরাকে, ধুয়ে যাব কটি ধূলিকণা, তুলে দিয়ে যাব কটি কাঁটার ক্লেশকষ্ট।'

আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বললে বিবেকানন্দ। আকাশবাসী একটি ছোট্ট বারিকণা। কিন্তু আকাশেই থাকব না। ঝরে পড়ব।

ঝরে পড়ব কোথায়? জিগগেস করলে স্বামীজী।

শিকাগোতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সেই ফরাসিনী গায়িকা। মাদাম কালভে। তাকেই এই প্রশ্ন।

নীরবে গাঢ়-নম্র চোখে চেয়ে আছে মাদাম।

ঝরে পড়ব, কিন্তু সমুদ্রে নয়। সমুদ্রে পড়ে মিশে যাব সেই সমুদ্রের সঙ্গে, এই কল্পনা আমার কাছে অসহ্য লাগে। কিছুতেই না, উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলতে লাগল বিবেকানন্দ, আমি মোক্ষ চাই না, নির্বাণ চাই না, বিলুপ্তি চাই না। বারে-বারে আমি আমার এই ব্যক্তিত্বের চেতনা নিয়ে বাঁচতে চাই। আমি চাই লক্ষ-লক্ষ পুনর্জন্ম।

ঠাকুরের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি।

জানো না বুঝি? একদিন এক সমুদ্রে ছোট্ট একটি বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ল। মাদাম কালভের দিকে চেয়ে বলল আবার স্বামীজী। সমুদ্রে পড়েই কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দু।

কাঁদতে লাগল? কেন? তন্ময়ের মত জিগগেস করলে মাদাম।

ভয়ে। দুঃখে। মিশে যাবে মিলিয়ে যাবে এই বেদনায়। সমুদ্র বললে, ভয় কি, দুঃখ কি, কত শত বৃষ্টিবিন্দু, কত শত তোমার ভাইবোন এমনি করে পড়েছে আমার মধ্যে। জল হয়ে মিশে গিয়েছে জলাশয়ে।

তোমাদের এই বিন্দু-বিন্দু জলবিন্দু দিয়েই তো আমি তৈরি। বিন্দু ছাড়া কি সিন্ধু আছে?

তবু কাঁদতে লাগল বৃষ্টি-বিন্দু। আমি লুপ্ত হতে চাই না, আমি লিপ্ত হতে চাই।

সমুদ্র বললে, 'বেশ, তবে সূর্যকে বলো তোমাকে মেঘলোকে নিয়ে যাক। আকাশ থেকে ঝরে পড়ো আরেক বার।'

খুশির রঙে টলটল করে উঠল সেই বৃষ্টি-বিন্দু। চলে গেল মেঘলোকে। আবার ঝরে পড়ল।

এবার জলে পড়ল না, মাটিতে পড়ল। তৃষ্ণার্ত, মলিন মাটিতে। মুছে দিল এক কণা ধূলি। মুছে দিল এক কণা পিপাসা।

মাদাম কালভের দুই চোখে মন্ত্রের সম্মোহন। মন্ত্রের সঞ্জীবনী।

হ্যাঁ, বারে বারে জন্মাব। শঙ্খনাদ-উদার কণ্ঠে বললে বিবেকানন্দ, যত বার যেটুকু পারি কাঁটা তুলে দিয়ে যাব পৃথিবীর। যেটুকু পারি দেয়াল ভেঙে ফেলব ব্যবধানের। যেটুকু পারি পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাব সর্বসুখদাতা ঈশ্বরের দিকে। আমি চাই না আমার এই ব্যক্তিত্বের বিনাশ, এই আত্মচেতনার বিলুপ্তি। আমিই সেই মহান অজানা। সেই অখিল-অলৌকিক। বারে বারে এই লোক-সংসারে ফিরে-ফিরে এসে জানাব নিজেকে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে, বৃহত্তর অধ্যায়ে—দুই চোখ জ্বলে উঠল স্বামীজীর।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে নরেন, আর পড়বি না?'

নরেন বললে, 'একটা ওষুধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।'

শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? আর কতই বা পড়বে জিগগেস করি? হাটের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে কেবল একটা হো হো শব্দ শোনা যায়, হাটের মধ্যে ঢুকলে তখন অন্য রকম। তখন সব দেখছ-শুনছ কোথায় কি বেপার বেসাতি, কোথায় কি দরদাম। সমুদ্রও দূর থেকে হো-হো শব্দ করছে। কী হবে শুধু শব্দ শুনে? কাছে এগোও, দেখবে কত জাহাজ কত পাখি কত ঢেউ। তার পরে স্নান করে তার স্বাদ নাও। সার কথা, হাটের মধ্যে প্রবেশ করা, অবগাহন করা সমুদ্রে।

গুরুর জন্যে শাস্ত্র পাঠ? পথ নির্দেশের জন্যে? গুরু না থাকে, না জোটে, শুধু ব্যাকুল হয়ে কাঁদো, কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করো। তিনিই দেবেন সব বলে কয়ে, জানিয়ে বুঝিয়ে।

সমুৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হও। আসন জমিয়ে বসলাম তোমার এই দুয়ারে। প্রস্তুত হয়ে এসেছি, মরবার জন্যে প্রস্তুত। যাকে ইচ্ছে সরিয়ে দাও, তুলে নাও আমাকে, পারবে না হটাতে। কিছু একটা করে তবে উঠব। হয় ধরে নয় মরে। হয় তোমার ঘরে মিলন নয় তোমার দুয়ারে মৃত্যু। ঘর দুয়ার এক করে ছাড়ব।

'নরেন বেশি আসে না।' ঠাকুর আক্ষেপ করেছেন। নিজেই আবার প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। 'তা ভালোই করে। ও বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'

কাউকে কেয়ার করে না নরেন। এইটেই যেন কত বড় তার গুণের কথা। 'বলব কি, আমাকেই কেয়ার করে না।' স্নেহদ্রব স্বরে বলছেন ঠাকুর, 'সেদিন কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে। ভালো জায়গায় তাকে কত বসতে বলল কাপ্তেন। তা সে চেয়েও দেখল না। সেদিন হাজরার সঙ্গে কত-কি কথা কইছে। জিগগেস করলুম, কি গো, কি সব কথা হচ্ছে তোমাদের? উড়িয়ে দিল আমাকে, বললে, লম্বা-লম্বা কথা। দেখেছ তো কত বিদ্বান আমার নরেন, তবু আমার কাছে কিছু প্রকাশ করে না, পাছে লোকের কাছে বলে বেড়াই। মায়া-মোহ নেই, বন্ধন-পীড়ন নেই, একেবারে খাপখোলা তরোয়াল।

প্রথমে ধূমায়িত, পরে জ্বলিত, পরে দীপ্ত, পরে উদ্দীপ্ত এই অগ্নি।

সন্ধ্যের পর ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। পাইচারি করছেন এদিক-ওদিক আর মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, 'তাই তো হে, কার গাড়িতে যাই—'

এমন সময় নরেন এসে উপস্থিত। এসেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।

'এসেছ? তুমি এসেছ?' যেন গুমোট করে ছিল চার দিক, এক ঝলক বসন্ত-বাতাস ছুটে এল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ভাবে নরেনের মুখে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। ভাবখানা এই, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবি? কত দিন থাকবি তোর ও-সব জ্ঞানতর্কের পাথরের দেশে? আমি তোকে গলিয়ে দেব, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, আদর করে করে, তোর চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে। জ্ঞানে-তর্কে পারব না তোর সঙ্গে, কিন্তু তোকে ভালোবাসায় জিতে নেব। আমি যদি তোকে ভালোবাসি তবে সাধ্য কি তুই আমাকে ফেলে যাস, আমাকে ছেড়ে থাকিস?

মাষ্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। হাসি-হাসি মুখে বললেন,

'কি হে, আর যাওয়া যায় ?' আনন্দভরা চোখে মাষ্টারও হাসতে লাগল।

'জানো, লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ও এসেছে। বলো, আর কি যাওয়া যায় ?'

'যে আজ্ঞে। আজ তবে থাক।'

ঠাকুরও যেন পরম স্বস্তি পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কাল যাব। গাড়ি না হয় নৌকোয় যাব। কি বলো ? আজ নরেন এসেছে। লোক পাঠিয়েছিলুমই বা। ওর কী দায় ছিল আসতে ? তবুও এসেছে। আজ আর যাওয়া যায় না।' আর-সব ভক্তবৃন্দ যারা সমবেত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা আজ এস। অনেক রাত হল।'

একে একে প্রণাম করে বিদায় হল ভক্তেরা। নরেনের বেলায় না-রাত না-দিন।

'হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া।' শুধু এক বেলার ক্ষণিক মিলন নয়, চাই চির জীবনধনের সঙ্গে চির জীবনক্ষণের মিলন।

আমি একতাল সোনা, আমাকে তুমি আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে নাও। কি, বিশ্বাস হয় না ? জ্বালো তোমার আগুন, আজই হাতে-হাতে নাও পরখ করে। তোমার যেমন খুশি সকল নাচে নাচিয়ে নাও আমাকে, বাজিয়ে নাও সকল রাগিণীতে। সব ছেঁকে নাও, বেছে নাও, পিষে নাও। তোমার যা পছন্দ তাতেই আমি রাজি। তুমি যাতে নিশ্চিত তাতেই আমি নিশ্চিন্ত। তাই যদি হয় তবে আমার সুখও বাহবা দুঃখও বাহবা।

রাম দত্তর সঙ্গে তর্ক করছে নরেন। তুমুল তর্ক।

মাষ্টার এক পাশে বসে। ঠাকুরও সব দেখছেন চুপ করে। শেষ কালে বললেন মাষ্টারকে লক্ষ্য করে, 'আমার এ সব বিচার ভালো লাগে না।' ধমক দিলেন রামকে। 'থামো।'

না থামো তো, আস্তে-আস্তে। কে কার কথা শোনে। রাম থামলেও নরেন থামবে না। কিন্তু তাকে কে ধমক দেবে ?

অসহায়ের মত তাকালেন আবার মাষ্টারের দিকে। বললেন, 'আমি এ সব বাক্‌বিতণ্ডা জানিও না, বুঝিও না। আমি অবোধ ছেলের মত শুধু কাঁদতুম আর বলতুম, মা, এ বলছে এই, ও বলছে ঐ। কোনটা সত্য, তুই আমাকে বুঝিয়ে দে।'

এই আত্মনিবেদন। এই ভক্তি পরমপ্রেমরূপা। ভালোবাসার করস্পর্শে লৌহদুর্গের দ্বার খোলা।

কিছু জানি না, কিছু বুঝি না। তবু তোমাকে ভালোবাসি।

একশো সাতাশ

যদি আর কিছু না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু একবার আমাকে মনে কোরো।

নবগোপাল ঘোষ প্রথম দিন তো একেবারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই যে ডুব মারল, তিন-তিন বছর আর দেখা নেই।

'হ্যাঁ রে, কি হল বল দেখি নবগোপালের ? তাকে একটু খবর দে।' তিন তিন বছর পর একদিন খোঁজ করলেন ঠাকুর।

খবর গেল নবগোপালের কাছে। সে তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। সেই কবে একবার গিয়েছিলাম তিন বছর আগে, সেই কথা আজও পর্যন্ত মনে করে রেখেছেন ! ভুলে যাননি ! দিনে-রাত্রে কত লোক আসছে তাঁর কাছে, তার মধ্যে কে-না-কে নবগোপাল ঘোষ, তাকেও হারিয়ে যেতে দেননি। স্মৃতির কৌটোর এক পাশে কুড়িয়ে রেখেছেন।

কিছুই হারান না। ফেলে দেন না। ভোলেন না এতটুকু। আমরাই ভুলি। ফিরে যাই। পথ হারিয়ে পথ খুঁজি।

সময় হলে তিনিই আবার পথ দেখান। ডাক দেন।

নবগোপাল পড়ল আবার পায়ে এসে। তুমি ভোলো না। চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপিতে প্রতি রাত্রে তুমি লিখে পাঠাও, আমি ভুলিনি। বিনম্রকোমল শ্যামলশীতল তৃণদলেও সেই ভাষাই লিখে রেখেছ, ভুলিনি তোমাকে।

বললে, 'আমার সাধন-ভজন কী করে কী হবে ?'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'মাঝে-মাঝে শুধু দক্ষিণেশ্বরে এসো।'

শুধু এইটুকু ?

এই বা কি কম কঠিন ? দেখ না, কত বাধা এসে পড়বে যাবার মুখে। মন ঠিক করতেই এক যুগ। তারপর মন যদি ঠিক হল তো শরীর বললে ঠিক নেই। মন-শরীর দুই-ই ঠিক, হঠাৎ দেখা দিল সর্বসঙ্কল্পনাশন অকাজের তাড়না। হাতের কাছে দক্ষিণেশ্বর, সেই হাত খুঁজতেই রাত ফুরোয়।

একদিন ভাবসমাধি হয়েছে ঠাকুরের, নবগোপাল এসে হাজির। রাম দত্ত ছিল, নবগোপালকে বললে, 'এই বেলা ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু বর চেয়ে নিন।'

নবগোপাল সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ের কাছে। বললে, 'বিষয়-চিন্তায় ডুবে আছি। কি করে যাবে এই বিষজ্বালা, আমাকে বলে দিন।'

'কোনো চিন্তা নেই।' আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'যদি আর কিছু না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু একবার আমাকে স্মরণ কোরো।'

শুধু এইটুকু ?

হ্যাঁ, এইটুকু। অঙ্কুরটি ছোট, কিন্তু ওর মধ্যে অব্যক্ত আছে বনস্পতির আয়তন। বেশ তো দেখ না, সারা দিনে-রাতে শুধু একবার আমাকে স্মরণ করে দেখ না কি হয় ! একবার স্মরণ করলেই কত বার সাধ যায় স্মরণ করতে। স্মরণ করতে-করতেই অনন্তশরণ।

এক দিকে তুমি কত সহজ, আমার দুর্বল দুই বাহুর বন্ধনে বন্দী, আবার আরেক দিকে তুমি অপরিসীম, সমস্ত আয়ত্তের অতীত, সমস্ত বন্ধন-ক্রন্দনের বাইরে। এক দিকে তুমি কঠোর কাজের মানুষ, আরেক দিকে তুমি অকাজের রাজা। বৃত্তিরূপে থেকে আবার নিবৃত্তিরূপে বিরাজিত। একবার দেখি অমোঘ নিয়মে বেঁধে রেখেছ আমাকে, আবার দেখি তোমার অশাসনের অঙ্গনে বাজিয়ে দিয়েছ আমার ছুটির ঘণ্টা। এক দিকে তুমি সুদুর্গম সুগম্ভীর, আবার, কি আশ্চর্য, তুমি একেবারে হিসাব-কিতাব ছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত ভোলানাথ।

সেইখানেই তো আমার ভরসা। আমি কি পারব তোমাকে

গৌরীশঙ্করের চূড়ায় গিয়ে ধরতে? আমি ধরব তোমাকে বিধি-বাধা-না-মানা ঝড়ের ঘূর্ণবেগে। আর সকলের কাছে তুমি দস্তুর-সঙ্গত, আমার কাছে তুমি খাপছাড়া, অগোছালো। আমার যে ভালোবাসার বেসাতি। অনাবশ্যকের ঐশ্বর্য।

নবাই চৈতন্যরও সেই কথা।

পানিহাটির উৎসবে এসেছেন ঠাকুর। নৌকোয় উঠেছেন ফিরে যাবার মুখে, ছুটতে-ছুটতে নবাই এসে হাজির। বাড়ি কোন্নগর, মনোমোহনের খুড়ো। শুনেছে ঠাকুর এসেছেন উৎসবে, তাই দেখতে এসেছে। এতক্ষণ খুঁজেছে ভিড়ের মধ্যে, দলের মধ্যে সেই শতদল কোথায়, ভিড়ের মধ্যে কোথায় সেই অপরূপ! এত দেরি করে এলে কেন? ঐ যে তিনি নৌকোয় উঠছেন। সত্যি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল নবাই। ছেড়ো না, ছেড়ো না নৌকো। আর কি ছাড়ে? যে মুহূর্তে দেখতে পেলেন ব্যথিতের ব্যাকুলতা, পারায়ণ-পরায়ণ স্তব্ধ হলেন।

পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল নবাই। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

একেই বলে দেখা আর প্রেমে পড়া। কিংবা প্রেমে পড়ে দেখা। খুঁজেছে, জুটেছে, লুকিয়ে পড়েছে। প্রশ্ন করেনি, তর্ক করেনি, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে জাগতে দেয়নি দ্বিধার কুশাঙ্কুর। শুধু বিশ্বাস নয়, উন্মত্ত ব্যাকুলতা। একেবারে সর্বসমর্পণ।

ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন।

পাগলের মত নাচতে লাগল নবাই। নাচে, নাচে, আবার থেকে থেকে প্রণাম করে ঠাকুরকে।

আরেক রকম স্পর্শে তাকে ফের প্রকৃতিস্থ করলেন ঠাকুর। সবাই ভাবলে শান্ত হয়ে গেল বুঝি নবাই। দেখল, ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়ে নবাই গঙ্গাতীরে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগল নির্জনে। সঙ্গের সাথী তিন জন। ধ্যান কীর্তন আর উপাসনা।

'ধ্যান চক্ষু বুজেও হয়, চক্ষু চেয়েও হয়।' বললেন ঠাকুর। 'ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে তার লক্ষণ আছে। মাথায় পাখি বসবে জড় মনে করে। আমি দীপশিখা নিয়ে আরোপ করতুম। শিখার যেটা লালচে রঙ সেটাকে বলতুম স্থূল, আর শাদা অংশটাকে বলতুম সূক্ষ্ম। মধ্যখানে একটা কালো খড়কের মত রেখা আছে। সেটাকে বলতুম কারণশরীর।'

গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন আর বহির্মুখ থাকে না, যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়ল। দয়ানন্দ বললে, অন্দরে এস কপাট বন্ধ করে। অন্দরবাড়িতে কি যে-সে আসতে পারে?

'ধ্যান হবে তৈলধারার মত।' বললেন আবার ঠাকুর। 'ভিতরে আর ফাঁক নেই। অনর্গল প্রবাহ। তেমনি মনেরও অনর্গল মগ্নতা। একটা ইটকে বা পাথরকেও যদি ঈশ্বর বলে ভক্তিভাবে পুজো করো, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন হবে।'

আর কীর্তন?

কীর্তন হ'বে হিল্লোল-কল্লোল। ক্রন্দনের সঙ্গে নর্তন মিশলেই কীর্তনের জন্ম। নরোত্তম কীর্তনিয়াকে বলছেন ঠাকুর 'তোমাদের যেন ডোঙা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে নাচবে সকলে।' বলেই গান ধরলেন নিজে: 'নদে টলমল টলমল করে। গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। তারপর এবার আখর দাও, আর নাচো—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।'

নবাই এসেছে। এসেই উচ্চতানে কীর্তন সুরু করে দিল। বইয়ে দিল সুরের গঙ্গা। আসন ছেড়ে উঠে ঠাকুর নাচতে লাগলেন। কাছে ছিল মহিমাচরণ, জ্ঞানপথে যার চর্চা-চিন্তা, সেও মেতে উঠল নৃত্যে।

গাইতে-গাইতে বড় টলছেন ঠাকুর। নিরঞ্জন ভাবলেন পড়ে যাবেন বুঝি। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। মৃদু স্বরে ধমকে উঠলেন ঠাকুর: 'এই! শালা ছুঁসনে।' মাষ্টার ছিল সামনে। তার হাত ধরে টান মারলেন। 'এই, শালা, নাচ।'

একেই বলে ঊর্জিতা ভক্তি। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। রাম বললেন, লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে আমি আছি।

'হরিনামে কেমন আনন্দ দেখলে?' সবাইকে উদ্দেশ করে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমার আরো বেশী আনন্দ। কেন বলো তো? মহিমাচরণ আসছে এদিকে, জ্ঞান পেরিয়ে ভক্তির দিকে। জ্ঞান হচ্ছে একটানা স্রোত আর ভক্তি হচ্ছে জোয়ার ভাঁটা। আর দেখ না, জ্ঞানীর মুখ-চেহারা শুকনো আর ভক্তের মুখ-চেহারা স্নিগ্ধ।'

তারপর তৃতীয় সাথী প্রার্থনা।

কী প্রার্থনা করবে? শুধু বলবে, ঈশ্বর, যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়। কাতর হয়ে প্রার্থনা করলেই চোখে জল আসবে। ঈশ্বর তৃষ্ণার্ত। চোখের জল না পেলে তাঁর পিপাসা নিবারণ হয় না। চাতক যেমন বৃষ্টির জলের জন্যে চেয়ে থাকে ঈশ্বরও তেমনি চোখের জলের জন্যে চেয়ে আছেন। শিশির না ঝরলে ফুলটি ফোটে না, আর ফুলটি না ফুটলে উড়ে আসে না মধুকর। তেমনি অশ্রু না ঝরলে ফোটে না হৃদ্‌কমল, আর হৃদ্‌কমল না ফুটলে ছুটে আসেন না ভগবান। তাই কাঁদবার জন্যেই প্রার্থনা।

না কাঁদলে ধুয়ে যাবে না আসক্তির ধুলো-বালি। বাইরে শুকনো জ্ঞানের কথা, অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভোগতৃষ্ণা—কিছু হবে না। হাতির যেমন বাইরের দাঁত আছে তেমনি আবার আছে ভিতরের দাঁত। বাইরের দাঁতে শোভা, ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি বাইরে লোকচার উপাসনা ভক্তির আড়ম্বর, ভিতরে কামকাঞ্চনে স্পৃহা। লুকিয়ে-লুকিয়ে লেহন-চর্বণ। সমস্ত অনর্থক। যত জলই ঢালো গাছ অফলা।

তাই কেঁদে-কেঁদে মা'র কাছে শুধু এই প্রার্থনা: মা, তোর

পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দে। আর যা কিছু চাইছি, কী যে সত্যি চাইবার তা না জেনেই চাইছি। সন্তান যদি একবার মাকে পায় সে কি আর রঙিন খেলনার জন্যে কাঁদে?

প্রথমে অভ্যাস পরে অনুরাগ। ঠাকুর বললেন, 'প্রথমে বানান করে লেখ, তারপর টেনে যাও।' অন্তরের টানেই তখন টেনে যাবে। এই অভ্যাসটি কেন? যাতে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়ে। নাম শুধু মুখে বললেই হবে না, মনে ধরতে হবে। মনে-মুখে এক হতে হবে। শুধু কাচের উপর ছবি থাকে না। তাই ভোগাসক্ত মনে ফুটবে না নামমূর্তি। কাচের পিঠে কালি মাখিয়ে ছবি ধরো। তেমনি মনে মাখাও ভক্তি আর বৈরাগ্যের রঙ, ফুটে উঠবে নামের প্রতিচ্ছায়া।

হেম ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবে বলেছিল। তা আর হল না। শেষে বললে, 'আমি খোল করতাল নিলে লোকে কি বলবে!' ভয় পেয়ে গেল পাছে লোকে পাগল বলে।

আর, এই যে সুখের আশায় ছন্নছাড়ার মত উদ্দাম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এতে সবাই তাকে সুস্থমস্তিষ্ক বলছে। আর যা অক্ষয় আনন্দের আকর তার জন্যে ক্রন্দন-কীর্তনই পাগলামি!

কোথা থেকে কি ছদ্মবেশে যে আসক্তি আসে তার ঠিক নেই। হরিপদকে চেন তো? সে ঘোষপাড়ার এক মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে। বলে, তার নাকি গোপালভাব। কোলে বসিয়ে খাওয়ায়। বলে, বাৎসল্য ভাব। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'ঐ বাৎসল্য থেকেই তাচ্ছল্য।'

সাবধান করে দিলেন হরিপদকে। ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ভাবে, বোধ হয় 'রাগকৃষ্ণ' হয়েছে।

জানো না বুঝি? ঐ মেয়েছেলেটি যে পথের পন্থী তাদের মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিগগেস করে, রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস? উত্তর চাই, হ্যাঁ, পেয়েছি।

তাই ধরেছে হরিপদকে। এমন সুন্দর ছেলেটা না মেছমার হয়ে যায়।

সুন্দর কথকতা জানে। সব না মাটি হয়। গলায় এমন মিঠে সুর, তা না উড়ে পালায়।

সেদিন তার চোখ দুটি লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। যেন চড়ে রয়েছে। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তুই খুব ধ্যান করিস?' মাথা হেঁট করে রইল হরিপদ।

'শোন, অত নয়।'

পদসেবার ভার দিয়েছেন হরিপদকে। হাত-ভরা কোমল ভক্তি, স্নেহসিক্ত পবিত্রতা। হায়, আসক্তির ছোঁয়া লেগে হাত দুটি না তার শুষ্ক-শুদ্ধ হয়ে যায়।

মনে শান্তি পাচ্ছেন না ঠাকুর। সে মেয়েছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন মিনতি করে, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন করছ করো কিন্তু, দেখো, অন্যায় ভাব যেন এনো না।'

হরিপদর যম-দুয়ারে কাঁটা দিয়ে দিলেন।

'আচ্ছা এই যে ছেলেরা সব আসছে এখানে, বাধা-বারণ মানছে না, এর মানে কি?' ঠাকুর বলছেন আত্মভোলার মত: 'এই খোলটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, নইলে টান হয় কি করে? কেন আকর্ষণ হয়? বলা নেই কওয়া নেই, দলে-দলে লোক এমনি এলেই হল? কোনো মানে নেই এর?'

সকলেই তো আসবে। তোমার ওখানেই যে সকলের সকল পথ সমাপ্ত হয়েছে। তুমি যে সর্বসমন্বয়ের সমুদ্র।

'কেন একঘেয়ে হব? কেন হব একরোখা?' বলছেন ঠাকুর উদার সারল্যে: 'অমুক মতের লোক না হলে আসবে না, এ ভাবনা আমার নয়। কেউ আসুক আর নেই আসুক, আমার বয়ে গেছে। লোকে কিসে হাতে থাকবে, কিসে দল বাড়বে এসব আমার মনে নেই। অধর সেন বড় কাজের জন্যে বলতে বলেছিল মাকে, তা ওর সে কাজ হল না। তাতে যদি ও কিছু মনে করে আমার বয়ে গেল।'

একশো আটাশ

চিৎপুর রোড দিয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলেছেন ঠাকুর। চলেছেন গাড়ি করে। উইলসনের সার্কাস দেখতে।

সঙ্গে রাখাল, মাষ্টার মশাই, আরো দু'-একজন। একজনের হাতে ঠাকুরের বটুয়া। তাতে মশলা, কাবাবচিনি। ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাত। কার্তিকে নতুন শীত পড়েছে।

একবার এধার একবার ওধার ঘন-ঘন মুখ বাড়াচ্ছেন গাড়ি থেকে। লোক দেখছেন। আপন মনে কথা কইছেন তাদের সঙ্গে। মাষ্টারকে বলছেন, 'দেখছ সবার কেমন নিম্নদৃষ্টি। সব পেটের জন্যে চলেছে। কারুর ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নেই।'

মাঠে তাঁবু পড়েছে সার্কাসের। গ্যালারির টিকিট আট আনা। তাই কেনা হল ঠাকুরের জন্যে। শুধু ঠাকুরের জন্যে কেন, সকলের জন্যে। সব চেয়ে উঁচু ধাপে গিয়ে সবাই বসল। ঠাকুরের মহাস্ফূর্তি। বালকের মত আনন্দ করে বললেন, 'বাঃ, এখান থেকে তো বেশ দেখা যায়!'

সার্কাসের মেয়ে ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে। বড়-বড় লোহার রিঙ-এর মধ্য দিয়ে ছুটছে ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে উঠে আবার ঘোড়ার পিঠে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক পায়ে, মাঝখানে ডিঙিয়ে গিয়েছে সেই লোহার রিঙ। খুব কায়দার কসরৎ। বিস্ময়-আয়ত চোখে তাই দেখছেন ঠাকুর।

সার্কাসের শেষে বলছেন মাষ্টারকে, 'দেখলে, বিবি কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার উপর, আর ঘোড়া কেমন ছুটছে বন-বন করে। ভাবো দিকিন, কত অভ্যেস করেছে তবে না হয়েছে। কত মনোযোগ, কত একাগ্রতা! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, হয়তো বা অবধারিত মৃত্যু। অভ্যাস-যোগে সব এখন জল-ভাত। সংসার করাও এমনি কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করেই তবে না ঈশ্বরকৃপা। সাধন আর ভজন, অভ্যাস আর অনুরাগ।'

অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুর সময়ে তাঁরই নাম মুখে আসবে। সেই অভ্যাস করে যাও। মৃত্যুর সময়ের জন্যে প্রস্তুত রাখো নিজেকে।

'সাধনের সময়', ঠাকুর বললেন, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি। কিন্তু জ্ঞানলাভ হবার পর তাঁকে দর্শনের পর এই সংসারই আবার মজার কুটি।'

শুধু অভ্যাস। মন যায় না তবু কষ্টকাঠিন্য করে একটু বোসো। এইটুকুই সাধন। প্রথমে তেতো লাগে, এই তেতোটুকুই খাও। খেতে-খেতেই মধু, খেতে-খেতেই নেশা। ছেলের পড়ায় মন নেই, বাপ-মা জোর করে বসাচ্ছে তাকে বইয়ের সামনে। এই জোরটুকুই কৃচ্ছ্র। পড়তে-পড়তে ছেলের কখন অনুরাগ এসে গিয়েছে, তখন বই আর নামায় না মুখ থেকে। বাপ-মা বারণ করলেও না। অভ্যাস করাই এই অনুরাগের নাগাল পাবার জন্যে। মরা জল ঠেলে-ঠেলে স্রোতের জলে চলে আসার জন্যে।

ঘষো তোমার শুকনো কাঠ। মরা কাঠেই জ্বলবে একদিন আগুনের অনুরাগ। চেঁচিয়ে গলা সাধো। একদিন হঠাৎ এসে যাবে সুররাগের ঢেউ। রুদ্ধ দরজার পাশে বসে ডাক-নামটি ধরে ডাকো একমনে। কখন দরজা খুলে গিয়ে জেগে উঠবে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি।

হাতে দাঁড় পড়েছে, দাঁড় টেনে যাও, খাঁ করে কখন পাড়ি জমে যাবে টেরও পাবে না।

দুপুরবেলা ইস্কুল পালিয়ে চলে এসেছে মাষ্টার। শুনেছে বলরাম-মন্দিরে এসেছেন ঠাকুর, আর কে রোখে। শুধু ছাত্রই ইস্কুল পালায় না, মাষ্টারও ইস্কুল পালায়।

'কি গো, তুমি? এখন? ইস্কুল নেই?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত ছিল সামনে, বলে উঠল, 'না মশাই, উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন।'

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু মাষ্টার জানে কে যেন তাকে টেনে আনলে। এমন টান যার ব্যাখ্যা হয় না। পায়ে কুশকণ্টকের বোধ নেই, পথ মনে হয় একটানা বাঁশি।

মাষ্টারকে সেবা শেখাতে লাগলেন ঠাকুর। আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো। জামাটা শুকোতে দাও। পাটা কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারো?

সাহ্লাদে সেবা করছে মাষ্টার।

সমুদ্রের দিকে চলেছে নদী। নদীতে উচ্ছ্বাস উঠেছে। নদী ভাবছে এ উচ্ছ্বাস কার, আমার না সমুদ্রের? ওগো সমুদ্র, বলে দাও, এ আবেগ-আবর্ত কার? আমার, না, তোমার? কিন্তু এ জিজ্ঞাসা কতক্ষণ? যতক্ষণ না ঐকান্তিক সমর্পণ হচ্ছে সমুদ্রে। সমুদ্রে একবার মিশে গেলে, পূর্ণ সমর্পণ হয়ে গেলে, তখন কি আর থাকবে এ জিজ্ঞাসা? তখন কি আর থাকবে আমি-তুমি?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আমরা সব হল-হল করে কথা কই। কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে কে জানে!'

ঠাকুর বললেন, 'ইনি গম্ভীরাত্মা।'

তাই বলে একটা গান গাইবে না? সবাই গাইছে, ও কেন মুখ বুজে থাকবে?

ঠাকুরের কাছে নালিশ করল গিরিশ। 'কিছুতেই গাইছে না মাষ্টার।'

ঠাকুর বললেন, 'ও স্কুলে দাঁত বার করবে। যত লজ্জা গান গাইতে!' মাষ্টারের দিকে তাকালেন। 'ঈশ্বরের নামগুণ-কীর্তনে লজ্জা করতে নেই। নামগুণ-কীর্তন অভ্যাস করতে-করতেই ভক্তি আসে।'

ভক্তিতেই সর্বসিদ্ধি। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান।

'তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ওদেশে ধান মাপে, পেছনে বসে রাশ ঠেলে দেয় আরেক জন। দয়াময় মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। আর দয়া আকর্ষণ করবে কি করে? শুধু ভক্তিতে, ভালোবাসায়। ভালোবাসাতে কান্না আর কান্নাতেই দয়া।'

আমার কী ছিল? কান্না ছাড়া আর ছিল না কিছু পুঁজিপাটা। কেঁদে-কেঁদে বলতুম তাই মাকে, বেদ-বেদান্তে কি আছে জানিয়ে দাও, কি আছে বা পুরাণ-তন্ত্রে। সব জানিয়ে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন। শিবশক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দসাগর।

'একদিন দেখলুম কি জানো? চতুর্দিকে শিবশক্তি। মানুষ পশু-পাখি তরুলতা সকলের মধ্যেই এই পুরুষ আর প্রকৃতি। আরেক দিন দেখলুম নরমুণ্ডের পাহাড়। আমি তার মধ্যে একলা বসে। সেদিন দেখলুম মহাসমুদ্র। নুনের পুতুল হয়ে সমুদ্র মাপতে চলেছি। গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম। কোত্থেকে একটা জাহাজ চলে এল। তাতে উঠে পড়লাম। দেখলুম গুরুকর্ণধার। তার পরে আবার দেখলুম ছোট্ট একটি মাছ হয়ে খেলা করছি সাগরে। সচ্চিদানন্দ-সাগরে প্রফুল্ল মৎস্য। কি হবে বুদ্ধি-বিচারে? কি বুঝবে তুমি তিনি না বোঝালে? এইটিই সকল বোঝার সার করো, যে, তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখনই সব বোঝা যায়। তার আগে নয়।'

মাষ্টারকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর। সিদ্ধেশ্বরী-বাড়ি পাঠিয়েছেন তাকে পুজো দেবার জন্যে। ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী। স্নান করে খালি পায়ে গিয়েছে মন্দিরে, আবার খালি পায়ে ফিরে এসেছে প্রসাদ নিয়ে। ডাব, চিনি আর সন্দেশ। ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরে। দক্ষিণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন মাষ্টারের প্রতীক্ষায়। পরনে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোঁটা।

পায়ের চটিজুতো খুলে রেখে প্রসাদ ধরলেন ঠাকুর। খানিকটা মুখে দিয়ে বললেন, 'বেশ প্রসাদ।' তার পর চমকে উঠে বললেন, 'আমার বই এনেছ?'

'এনেছি।'

রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই। ঠাকুর বললেন, 'বেশ, এখন এই সব গান ডাক্তারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও।'

বলতে-বলতেই ডাক্তার এসে হাজির। 'এই যে গো তোমার জন্যে বই এসেছে।' সোল্লাসে বলে উঠলেন ঠাকুর।

বই দু'খানি হাতে নিলেন ডাক্তার। বললেন, 'গান পড়ে সুখ কি, গান শুনে সুখ।'

'তবে শোনাও হে মাষ্টার—'

এবার আর ঠাকুরের কথা ঠেলতে পারল না। গলা ছেড়ে গান ধরল মাষ্টার।

'মন কি তত্ত্ব করো তাঁরে,
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

তার পর নাচিয়ে পর্যন্ত ছেড়েছেন। আমি হরিনামে যদি নাচি,

লোকে আমায় কি বলবে এ ভাব ত্যাগ করো। লজ্জা, অভিমান, গোপন ইচ্ছা—এ সব পাপ। এ ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারলে স্ফূর্তি কই, সারল্য কই? গড় হয়ে দেবতার দুয়ারে প্রণাম করতে গেলে দামী শালে ধুলো, লাগবে, সুতরাং মনে-মনে প্রণাম করে দায় সারি এ হচ্ছে অহঙ্কারের কথা। কিন্তু শাল গায়ে দিয়ে ঐ ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়াই আনন্দ। সত্যিকার আনন্দ হলে, গায়ের শাল আর পথের ধুলোয় ভেদ থাকে না। সত্যিকার বন্যা এলে বালির বাঁধে কি করবে? কালীপদ-সুধাহ্রদে একবার যদি ডুবতে পারো, সব হিসেব পচে যাবে, পুজা হোম জপ বলি কিছুরই আর ধার ধারতে হবে না।

কিন্তু শিবনাথের উলটো কথা। সে বলে, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়।

'শোনো কথা।' বললেন ঠাকুর, 'জগৎচৈতন্তকে চিন্তা করে অচৈতন্য! যিনি বোধস্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎকে জগৎ বলে বোধ হয় তাঁকে চিন্তা করা মানে অবোধ হওয়া?'

'ভাবতে গেলে সব কিন্তু ছায়া।' বললে প্রকাশ মজুমদার।

'তা কেন?' আপত্তি করল ডাক্তার। 'বস্তুরই তো ছায়া। ঈশ্বর যদি বস্তু হন তা হলে তাঁর ছায়াও বস্তু। এদিকে ঈশ্বর সত্য অথচ তাঁর সৃষ্টি মিথ্যে এ মানতে রাজি নই। তাঁর সৃষ্টিও সত্য।'

সে কথা বৈকুণ্ঠ সেনও বলেছিল। ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই সংসার কি মিথ্যে?'

এক কথায় জল করে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যে। ততক্ষণ মায়া। ততক্ষণ আমার-আমার। এদিকে চোখ বুজলে কিছু নেই অথচ আমার হাব্রুর কি হবে! নাতির জন্যে কাশী যাওয়া হয় না! এ সংসার মিথ্যে, একশো বার মিথ্যে।'

'কিন্তু সংসারে থেকে তাঁকে জানব কি করে?'

'এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখো আরেক হাতে সংসারের কাজ করো। ছেলেদের গোপাল বলে খাওয়াও। বাপ-মাকে দেবদেবী বলে সেবা করো। স্ত্রীর সঙ্গে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকো, ভোগাসনে না বসে বোস যোগাসনে!'

'কেন মশাই, এক হাত ঈশ্বরে আরেক হাত সংসারে রাখব কেন?' কে একজন ফোড়ন দিল: "সংসার যে কালে অনিত্য তখন এক হাতই বা সংসারে রাখব কেন?'

সদানন্দ ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাঁকে জেনে সংসার করলে সংসার অনিত্য নয়।'

সেদিন সদরালাও জিগগেস করেছিল এই কথা। 'কত দিন খাটুনি খাটব সংসারের?'

'যত দিন তিনি খাটান। তিনি যা কাজ করতে দিয়েছেন তাই নির্বাহ করো! যদি মনে করো তাঁর দেওয়া কাজ তবে তার শুকনো কর্তব্য নয়, তবে তা পূজা।'

'এ সব কর্তব্যের জন্যে সংসার করা?'

'নিশ্চয়। সংসার করা মানেই কর্তব্য সাধন। ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীর ভরণপোষণ করা, নিজের অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জোগাড় রাখা। তা যদি না করো তুমি নির্দয়। যার দয়া নেই সে মানুষই নয়।'

'কিন্তু সন্তান পালন কত দিন?'

'যদ্দিন না সাবালক হয়। পাখি উড়তে শিখলে তখন কি আর ঠোঁটে করে তাকে খাওয়ায় তার মা? তখন কাছে এলে ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।'

'কিন্তু যদি জ্ঞানোন্মাদ হয়?'

'জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য নেই। তখন কালকের কথা আর তুমি ভাববে না, ঈশ্বর ভাববেন। জমিদার তো মরে গেল নাবালক ছেলে রেখে। নাবালকের কি হবে? তখন তার অছি এসে জোটে। অছি এসে ভার নেয়।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সদরালার দিকে। 'এ সব তো আইনের কথা। তুমি তো সব জানো। আর এ তো তুমি মন্দ লোকের উপর ভার দিচ্ছ না। স্বয়ং ঈশ্বরের উপর দিচ্ছ।'

'আহা, কি অপরূপ কথা!' পাশে বসে ছিলেন বিজয় গোস্বামী, বলে উঠলেন মধুভাষে: 'নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে। আহা কবে সেই অবস্থা হবে! যাদের হয় তারা কি ভাগ্যবান!'

আমি হাল ছেড়ে দিলেই তুমি এসে হাল ধরবে। আমি শুধু অভয় মনে ছেড়ে দেব আমার নৌকো। হোক আমার পাল ছেঁড়া, হাল ভাঙা, তবু ঝড়ের রাতে মত্ত সাগরকে আমার ভয় নেই। আমি জানি তুমি বসে আছ হালের কাছে। লক্ষ্য করছ হাল, কতক্ষণে ছেড়ে দিই তোমার হাতে।

ছেড়ে দিয়েছি এবার। দেখি তুমি এখন কি করে ছাড়ো!

একশো উনত্রিশ

অন্ধ বিশ্বাস? কেন নয়? প্রতি মুহূর্তে করছ না এই অন্ধ বিশ্বাস? অন্ধকারে কেউ নেই এ বিশ্বাসও তো অন্ধ বিশ্বাস।

রোগ দেখে ডাক্তার দিয়ে গেল ব্যবস্থাপত্র। পাঠালাম ডিসপেনসারিতে। অন্ধ বিশ্বাস, কম্পাউণ্ডার ঠিক-ঠিক ওষুধ দেবে, বিষ দেবে না। নাপিতের খোলা ক্ষুরের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে কামাবার জন্যে, অন্ধ বিশ্বাস গলার শিরটি কাটবে না নাপিত। ট্যাক্সি চেপেছি, অন্ধ বিশ্বাস নিরাপদে নিয়ে যাবে পথ কাটিয়ে। সাহেব এসে বললে, উঠেছিলাম গৌরীশঙ্করে, প্রত্যক্ষও নেই অনুমানও নেই, অনায়াসে সত্য বলে মেনে নিলাম। অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কি।

আর পাঁচ জনকে দেখে, পাঁচটা কার্যকারণের ফল থেকেই এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম। তেমনি দেখি না পাঁচ জন কি বলে ঈশ্বর সম্বন্ধে। পাঁচ দেশের পাঁচ জন। পাঁচ যুগের পাঁচ জন। তারা যদি বলে, হ্যাঁ, আছেন, তাঁকে দেখেছি, তবে মেনে নিতে আপত্তি কি। একটা সাহেবকে সত্যবাদী বলে মানতে পারি, একজন সাধুকে মানতে পারব না? বেশ তো, সাহেবের মধ্যেও তো সাধু আছে। দেখ না তাদের জিগগেস করে।

বাপ ছেলেকে বর্ণ-পরিচয় শেখাচ্ছে। বলছে, 'পড়ো অ—'

ছেলে বললে, 'কেন, অ বলব কেন? বলব, হ—'

'না, অ-ই বলতে হয়। বলো, অ—'

'বা, বুঝিয়ে দাও, কেন অ বলব? আমি বলব, দ—'

বলো, কী যুক্তি আছে বাপের? কেন ছেলে অ বলবে। কেন সে হ বা দ বলবে না?

তখন অনন্যোপায় হয়ে বাপ বললে, 'সকলে অ বলেছে, তুমিও অমনি অ বলো—'

যুক্তির সেরা যুক্তি। সকলে বলেছে। সকলে মেনেছে। সুতরাং তুমিও বলো। তুমিও মানো। বর্ণপরিচয়ে যেমন অ থেকে সুরু তেমনি জগৎপরিচয়ের আদিতে ঈশ্বর।

অ বলো। বলো আদ্যবর্ণ। তেমনি ঈশ্বর বলো। বলো আদিভূত।

কেন অবিশ্বাস করি? নিজেকে অহঙ্কারী ভাবি বলে। নিজে না দেখলে মানব কেন এই অভিমান থেকেই অবিশ্বাস। যেন চোখ সবই ঠিক দেখে। সিনেমা দেখে যে চোখের জল ফেলি সেও চোখ ঠিক-ঠিক দেখেছিল বলেই। তাই না? হায় রে অহঙ্কার!

কোনো বিষয়ে জানতে হলেই নিজেকে প্রথম জানতে হবে অজ্ঞ বলে। নিজের যদি এই অজ্ঞতাবোধ না থাকে তবে বিজ্ঞজনের সান্নিধ্য পাব কি করে? আমি জানি না উনি জানেন এই বিনয় এই অভিমানহীনতা না থাকলে কি করে জানতে পারব? ছেলে যদি মনে করে আমি বাপের চেয়ে বড় পণ্ডিত তবে অ-এর বদলে তাকে হ শিখে ফিরতে হয়। পড়তে হয় বিশালাক্ষীর দ-য়ে।

কিন্তু কোনো ক্রমে যদি একবার বিশ্বাস হয় আর কাটান-ছোড়ান নেই। নিশ্চয়-নিষ্পত্তি করে যেতে হবে ষোল আনা। 'তুই হাসপাতালে এলি কেন?' বললেন ঠাকুর। 'বাড়িতে বসে চিকিৎসা করলেই পারতিস। কে তোকে ঢুকতে বলেছিল হাসপাতালে? যখন একবার ঢুকেছিস সম্পূর্ণ রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বড় ডাক্তার সার্টিফিকেট না দেওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই।'

যখন একবার এসে পড়েছি বিশ্বাসের বন্দরে তখন আর ফিরে যাওয়া নয়। ব্যাকুলতার হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে ভক্তির স্রোতে চলে যাব ভাসতে-ভাসতে।

ভক্তি? ভক্তি কি যে-সে কথা?

না হোক, তবু তোমার মমতা তো আছে, স্নেহ-প্রীতি তো আছে। এ তো তোমার সহজাত। নিজের প্রতি মমতা। সন্তানের প্রতি স্নেহ। পত্নীর প্রতি প্রীতি। এ সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিম্নগামী। বাঁধ দিয়ে এ নিম্নগামী স্রোতকে ভিন্নগামী করে দাও! ঊর্ধ্বগামী করে দাও। প্রীতিও তরলতা ভক্তিও তরলতা। বাঁধের কাছটায় বাঁক ঘুরে প্রবলতর বেগে বয়ে যাবে জলস্রোত। প্রীতি ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হবে।

গাছের মূলটি ঊর্ধ্বমুখে। শাখাগুলি নতমুখ।

তোমার ভালবাসার অঙ্কুরটি ঊর্ধ্বমুখ করে দাও। পরে বিতত শাখায় নত হয়ে জগজ্জনকে সে ছায়া দেবে, শান্তি দেবে।

'তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থাকো।' ঠাকুর বললেন অশ্বিনী দত্তকে: "কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মত হতে পারবে না যে ন্যাংটো-ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।'

দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অশ্বিনী। সাধ পরমহংসকে দেখবে। কিন্তু কে পরমহংস?

'আহা, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন।' কে একজন ঘরের মধ্যে দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে।

ঐ তাকিয়ায় ঠেস দেবার নমুনা নাকি? তাকিয়ায় কি করে ঠেস দিয়ে বসতে হয় আমিরি চালে তাই জানে না। তবে নিশ্চয় উনিই পরমহংস হবেন।

একখানা কালোপেড়ে ধুতি পরনে, বসে আছেন পা দুখানি উঁচু করে, তাও দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে, আধা-চিৎ অবস্থায়। কেশব সেন তখন বেঁচে, এসেছেন ঠাকুরের কাছে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে ঠাকুরও তেমনি প্রণাম করলেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অশ্বিনী ভাবল এ আবার কোন ঢং!

সমাধিভঙ্গের পর কেশবকে বলছেন ঠাকুর, 'হ্যাঁ হে কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে ঈশ্বর নেই? সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন বাবু, এক পা ফেলে আরেক পা ফেলতেই—উঃ, কি হল, বলে অজ্ঞান। ধরো ধরো, ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার আসবার আগেই হয়ে গেছে! এই তো বীরত্ব! এঁরা বলেন ঈশ্বর নেই।'

ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ব—যাকে বলে সন্তরণে সিন্ধুগমন—এ কি গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়? কি করে হবে! একবার ডুববে একবার উঠবে, একেবারে ডুবে যাবে কি করে! ঐ যা বলেছি গোলাপী নেশার বেশি হবে না।'

'কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

'আহা দেবেন্দ্র,দেবেন্দ্র—' দেবেন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, "তবে কি জানো, এক গৃহস্থের বাড়ি দুর্গোৎসব হত, পাঁঠাবলি হত উদয়াস্ত। কয়েক বছর ধরে বলির আর সে ধূমধাম নেই। কি ব্যাপার? একজন এসে জিগগেস করলে, আজকাল আর বলি নেই কেন? আর বলি! গৃহস্থ বললে, 'এখন দাঁত পড়ে গেছে যে। দেবেন্দ্রও তাই এখন ধ্যান-ধারণা করছে, তা করবেই তো! তা কিন্তু খুব মানুষ দেবেন্দ্র!'

কীর্তন আরম্ভ হল। এবং তারপর যা ঘটল, অশ্বিনী তা কোনো দিন কল্পনায়ও আনেনি। ঠাকুর নাচতে সুরু করলেন। সঙ্গে কেশব। আর যারা-যারা ছিলেন সকলে।

মহাকাশে নক্ষত্রনর্তন। সূর্যও নাচছে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহতারকারাও নাচছে।

নিজে নেচে আর-সকলকেও নাচান, অশ্বিনীর সন্দেহ রইল না, এই পরমহংস।

কে এই আস্পদ, যাঁর সত্তাতে সকলে সত্তাবান, যাঁর বলে সকলে বলী, যাঁর ছন্দে সকলে প্রাণনৃত্যময়!

বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল মনের মধ্যে। অভিমান বিগলিত করো। প্রাণের মধ্যে নামনৃত্যের ছন্দে-ছন্দে অহঙ্কারের শৃঙ্খল চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে যাক।

আরেক দিন গিয়েছে অশ্বিনী। সঙ্গে কটি যুবক-বন্ধু।

তাদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন, 'ওঁরা এসেছেন কেন?'

'আপনাকে দেখতে।' বললে অশ্বিনী।

'আমাকে দেখবে কি গো! বরং ঘুরে ঘুরে বিলডিং-টিলডিং দেখুন।'

অশ্বিনী হাসল। 'সে কি কথা! আপনাকে দেখতে এসেছে, ইট-বালি-চূণ দেখবে কি!'

'তবে বলতে চাও এরা চকমকির পাথর? ঠুকলে আগুন

বেরুবে? হাজার বছর জলে ফেলে রাখলেও আগুন-ছাড়া হবে না? হায়, আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই।'

আবার হাসল অশ্বিনী। আপনি কি আচ্ছাদিত আগুন? আপনি দীপিত আগুন। যে ভাস্করের কাছে আরোগ্য আপনি সেই ভাস্কর। যে হুতাশনের কাছে ধন আপনি সেই হুতাশন। পরম-আয়ু, পরম-ধন-প্রদাতা।

আরো একদিন গিয়েছে। বালক ভাবে বললেন ঠাকুর, 'ওগো সেই যে কাক খুললে ভস-ভস করে ওঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পারো?'

অশ্বিনী বললে, 'লেমনেড? খাবেন?'

আবদেরে গলায় বললেন, 'আনো না একটা।'

একটা এনে দিল অশ্বিনী। ঠাকুর খেলেন আনন্দ করে।

অশ্বিনী জিগগেস করল, 'আচ্ছা, আপনার জাতিভেদ আছে?'

'কই আর আছে! কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি।'

'আচ্ছা, কেশব বাবু কেমন লোক?'

'ওগো সে দৈবী মানুষ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—কত বড় শক্তি!' তারপর আবার একটু থামলেন। বললেন, 'কিন্তু জাতিভেদ জোর করে টেনে ছিঁড়তে চেয়ো না। ও আপনিই খসে যায়। যেমন নারকোল গাছের বালতো আপনি খসে পড়ে তেমনি। এই দেখ না, সেদিন একটা লম্বা দাড়িওলা লোক বরফ নিয়ে এসেছিল, এত বরফ ভালোবাসি অথচ ওর থেকে কিছুতেই খেতে ইচ্ছে হল না। আবার একটু পরে আরেক জন বরফ নিয়ে এল, ক্যাচড়ম্যাচড় করে খেয়ে ফেললাম চিবিয়ে।'

'আর ত্রৈলোক্য বাবু কেমন লোক?' আবার জিগগেস করল অশ্বিনী।

'ত্রৈলোক্য? আহা বেশ লোক, বেড়ে গায়।'

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ত্রৈলোক্য এসেছে ঠাকুরকে গান শোনাতে। মার গান ধরেছে ত্রৈলোক্য। 'মা, তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে করে রাখো।'

প্রেমে কাঁদছেন ঠাকুর। বলছেন, 'আহা কি ভাব!'

ত্রৈলোক্য আবার গাইল:

হরি আপনি নাচো আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল
মিছে আমার-আমার বলে।

ঠাকুর বললেন গদগদ হয়ে: 'আহা, তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক-ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছে সেই দেখাতে পারে সমুদ্রের জল।'

গান শেষে ত্রৈলোক্য বললে, 'আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর!'

'দপ করে দেখিয়ে দেয়! হিসেব করে সুন্দরের বোধ আসে না।' বললেন ঠাকুর, 'সেই সেদিন শিবের মাথায় ফুল দিচ্ছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে এই বিশ্বসৃষ্টি, এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পুজো বন্ধ হল। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যেন ফুলের গাছগুলিই একেকটি ফুলের তোড়া। সেই থেকে বন্ধ হল ফুল তোলা। মানুষকেও ঠিক সেই রকমই দেখি। তিনিই যেন মানুষের শরীরটাকে নিয়ে হেলে-দুলে বেড়াচ্ছেন—যেন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে, নড়ছে-চড়ছে, উঠছে-পড়ছে—

আগের কথার জের টানল অশ্বিনী। প্রশ্ন করল, 'আর শিবনাথ বাবু কেমন লোক?'

'বেশ লোক, তবে তর্ক করে যে।' একটু থেমে বললেন, 'শিবনাথকে দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, গাঁজাখোরকে দেখে ভারি খুশি। হয় তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বসে।'

শিবনাথকেও সেদিন তাই বলেছিলেন মুখের উপর: 'তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্মাদের বোধ হয় যেন পূর্ব-জন্মের বন্ধু।'

আলিপুরের চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছিলেন ঠাকুর। সে কথা বলছেন শিবনাথকে। শিবনাথ জিগগেস করল, 'কি দেখলেন সেখানে?'

'আর কি দেখব! মায়ের বাহন দেখলাম।'

কেন শিবনাথকে চাই? নিজেই ব্যাখ্যা করছেন ঠাকুর, 'যে অনেক দিন ঈশ্বরচিন্তা করে তার মধ্যে সার আছে। তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভালো গায় ভালো বাজায় তার মধ্যেও ঈশ্বরের শক্তি। যার যতটুকু বিদ্যা তার ততটুকু বিভূতি। এমন কি যে সুন্দর তার মধ্যেও ঈশ্বরের সার।'

ঈশ্বরই সংসারোত্তর মন্ত্র। তাই যার জিহ্বায় কৃষ্ণমন্ত্র তারই জন্মসাফল্য।

অচলানন্দের কথা উঠল। বরিশালে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে অশ্বিনীর।

'কেমন লাগল তাকে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চমৎকার!'

'আচ্ছা বলো তো সে ভালো, না আমি ভালো?'

কী সরল প্রশ্ন! অশ্বিনী বললে, 'কার সঙ্গে কার তুলনা! সে হল গিয়ে পণ্ডিত, আর আপনি হচ্ছেন মজার লোক। তার কাছে শুধু বচন, আপনার কাছে শুধু মজা। হরেক রকম মজা, অফুরন্ত মজা—'

কথাটি পেয়ে খুশি হলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ।'

মজার লোক। তুমি সর্বসুখনিলয়। তুমি আছ হাসে আর রাসে, আনন্দে আর বিনোদে। প্রশান্তবাহিতা তোমার স্থিতি। তুমি প্রাপ্তসমস্তভোগ। আপ্তসমস্তকাম।

সুখ কি? আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ। বিষয়ভোগে যে সুখ, সে সুখ কি বিষয়ে? না। সে সুখ সুখময় আত্মায়। তিনি সুখ দিলেন বলে সুখের উপলব্ধি হল। ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবৃত্তি আত্মাভিমুখী হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে মরণ-যন্ত্রণা বা পরিবর্তন-যন্ত্রণা ছিল না—সেই হেতু। সুখের বিষয় বিষয় নয়, সুখের বিষয় আত্মা।

তাই খণ্ড সুখ ক্ষুদ্র সুখ নিয়ে কি হবে? যে সুখ বারে-বারে মরে যায় সেই সুখের মূল্য কি? চাই অপরিচ্ছিন্ন সুখ। সেই অপরিচ্ছিন্ন সুখই তুমি।

'তাঁকে পাবো কি করে?' সরাসরি প্রশ্ন করল অশ্বিনী।

'কাঁদতে-কাঁদতে কাঁদাটুকু যখন ধুয়ে যাবে, তখন পাবে।' বললেন ঠাকুর, 'চুম্বক বরাবরই লোহাকে টানছে। কিন্তু লোহার গায়ে যে কাদামাখা। কাদা লেগে থাকতে কি করে লাগে চুম্বকের সঙ্গে! তাই কাদাটুকু ধুয়ে ফেল চোখের জলে।'

ঠাকুর তক্তপোষের উপর উঠে এলেন। শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'হাওয়া করো দেখি।'

অশ্বিনী পাখা করতে লাগল।

'বড্ড গরম গো। পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও না—'

পরিহাস করল অশ্বিনী। 'আপনারও সখ আছে দেখছি।'

'কেন থাকবে না, কেন থাকবে না জিগগেস করি ?'

'না না থাক, একশো বার থাক।'

কতক্ষণ পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন ?'

'কোন্ গিরিশ ঘোষ ? থিয়েটার করে যে ? দেখিনি কখনও। নাম শুনেছি।'

'আলাপ করো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক।'

'শুনি মদ খায় নাকি ?'

উদার শান্তিতে বললেন ঠাকুর, 'তা খাক না, খাক না, কত দিন খাবে ?'

'এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণা নেশা যদি মদ-ভাঙ্-গাঁজায় থাকত!' নিজের কথা বলছে সবাইকে গিরিশ: 'আমি কত কি ঠাকুরকে বলতাম তিনি কিছুতেই বিরক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম, বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না, তখনো ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেতাম। সে অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন। লাটুকে বলতেন, 'ওরে ভাখ গাড়িতে কিছু আছে কি না। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব ? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি শাদা করে দিতেন। শেষে আপশোষ করতাম, আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে!'

আবার বলছে গিরিশ, 'সকলকে ঠাকুর গত জীবনের কথা জিগগেস করতেন, আমাকে কখনো করেন নি। একবার করলে হয়! সব মহাভারত তাঁকে বলে দিই। বললে সব তিনি নিশ্চয়ই শোনেন বসে-বসে। মানা করেন না কিছুতেই। সাধে কি আর ওঁকে এত মানি ?'

'আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু।' একদিন গিরিশ ঠাকুরকে বললে মুখের উপর। 'এমন কি ফিচকেমিতেও।'

ঠাকুর বললেন, 'না গো তা নয়। এখানে সংস্কার নেই। করে জানা আর পড়ে বা দেখে জানবার ভেতর ঢের তফাৎ। করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা ভারি শক্ত। পড়ে বা দেখে-শুনে জানাতে সেটা হয় না।'

এক রাজার এক গল্প আছে। ভারি স্ত্রৈণ সেই রাজা। একদিন রাজার এক বন্ধু তাকে এই নিয়ে খুব শ্লেষ করল। রাজা ভেবে দেখলেন, সত্যি, এবার থেকে চলতে হবে সামলে! অন্তঃপুরে এসে গম্ভীর হয়ে রইলেন, নিতান্ত দু'-একটা দরকারি কথা ছাড়া কথাই কন না রাণীর সঙ্গে। খেতে বসেছেন রাজা, রাণীর পোষা বেড়াল রাজার পাতের কাছে ঘুরঘুর করছে। রাজা তাকে তাড়াতে চেষ্টা করছেন কিন্তু সে বারে বারেই ফিরে ফিরে আসছে। তখন রাণী বলছে, 'আগে ওকে অনেক আস্কারা দিয়েছ, এখন কি আর তাড়ানো সম্ভব ?'

আগে অনেক আস্কারা দিলে পরে আর তাড়ানো যায় না। তাই রাশ রাখো নিজের কাছে। বারাঙ্গনা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু তোমার বাসনার নটীকে কি করে ত্যাগ করবে ?

তবে উপায় ?

আন্তরিক হও। অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদো। অন্তরকে প্রক্ষালিত করো। অন্তরের থেকে চাও ঈশ্বরকে।

'ধ্যান করো।' বলছেন ঠাকুর, 'একাগ্র হও। ধ্যানে কত কি হয়তো দেখবে, কুকুর বেড়াল বাঁদর বেশ্যা লোচ্চা জুয়াচোর রাক্ষস পিশাচ দৈত্য দানব। ভয় পেয়ো না। ভেঙে দিও না ধ্যান। বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখছ মনে করে স্থির থেকো। কিন্তু যদি কোনো বাসনা এসে হাজির হয়, তখনি বুঝবে মহাবিঘ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। তখন ধ্যান ভেঙে কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ কোরো না।'

তুমিই শুধু পূর্ণ হয়ে বিরাজ করো।

তারপর বলি তোদের এক চরম কথা। অশেষ আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'শোন, কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়।'

একশো ত্রিশ

ঈশ্বরই মরণাতীত সত্য।

ঈশ্বরকে মাথায় নিলে মানুষ কি ছোট হয়ে যায়, না, বড়ো হয়ে ওঠে ? সবই তাঁর ইচ্ছা এই ভেবে কি মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, না, তাঁর ইচ্ছা প্রস্ফুটিত করি, আমার জীবনে আসে এই দুর্দম প্রেরণা ? কা'কে ধ'রে শোকে-দুঃখে নির্বিচল থাকি, বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করি, বৈমুখ্যে-বৈফল্যে সংগ্রহ করি নবতর সংগ্রামের তেজ! কে হতাশের আশা, নিঃস্বের সম্বল, চিরোৎকণ্ঠিতের শান্তি! কে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা! সমস্ত অন্যায়ের সংশোধন!

কোথায় যাবে মানুষ ? মায়ামূঢ় দিঙ্‌মূঢ় মানুষ! পথ চলতে-চলতে বিশ্রাম চায়। কোথায় সেই বিশ্রামায়তন! নিজের ঘরের চিন্তামণির সন্ধানে ঘর ছেড়ে বনে-বনে ঘোরে। সন্ন্যাসী হয়েও বিশ্রাম চায়। কুটির বাঁধে, মঠ তোলে। নিজের বৃত্তি ছেড়ে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। নিজের পুত্র ছেড়ে এসে চেলা বানায়। এক মায়া ছেড়ে আরেক মায়ার বশে আসে। যা চায় কোথাও তাকে পায় না খুঁজে-খুঁজে। সে মোহন মানুষ মনের মানুষ হয়ে মনের মধ্যেই বসবাস করছে। তাকে সেইখানেই খোঁজো, বোঝো, সেইখানেই ধরো।

যে প্রশান্তসাগর খুঁজছ সে তোমার মনের ভূমণ্ডলে।

ঠাকুর বললেন, 'গৃহীর অভিমান কুঁচ গাছের শিকড়, উপড়ে তোলা যায় সহজে। কিন্তু সন্ন্যাস অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোনো ক্রমে উৎপাটিত হয় না।'

প্রেমানন্দ স্বামী লিখছেন: 'সাধুর এ-দোর ও-দোর ঘোরা কি কম লাঞ্ছনা ? সাধুগিরি হ্যাক-থু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধোঁকা কাটিয়ে দাও ঠাকুর, ধোঁকা কাটিয়ে দাও। আর না প্রভু, অনেক হয়েছে।

সাধু হয়ে আবার ঘর-বাড়ি করে থাকা ঘোর বিড়ম্বনা, মহামায়ার বিষম প্যাঁচ—'

যেখানেই আছ সেখানেই থাকো। দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়দের ঘোড়া ও বিষয়কে রাস্তা করো। আর জেনো আত্মাই হচ্ছে সেই রথের রথী।

জব্বলপুর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছে। এম-এ পাশ পণ্ডিত। কাজে কাজেই ঘোরতর নাস্তিক। ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। জীবনে অনেক অশান্তি, অনেক আঘাত, তবু মানবে না ঈশ্বরকে। ঈশ্বর যে আছে তার প্রমাণ কি?

'তোমার কাছে প্রমাণ বলে যখন কিছু নেই, তখন নেই। কি আর করা যাবে? কিন্তু সামান্য তুমি একটু দয়া করতে পারো?' স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'কি, বলুন?'

'এইটুকু অনুমান করতে পারো যে, যদি কেউ থাকে? কত কিছু রয়েছে তোমার চোখের বাইরে, তোমার জ্ঞান-প্রমাণের বাইরে, তেমনি যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে, এইটুকু মেনে নিতে পারো?'

'যদি কেউ থাকে?' ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'বেশ, এইটুকু আনতে পারি অনুমানে। তার পরে কী হবে?'

'তার পরে তার কাছে প্রার্থনা করো।' ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন। 'এই ভাবে বলো, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকো তো আমার কথা শোনো। আমার অশান্তি-আঘাত দূর করে দাও। তুমি যখন বলছ নেই, তখন নেই। কিন্তু যদি কেউ থাকো, এটুকু বলতে আপত্তি কি—'

ভদ্রলোক বললেন, 'না এতে আর আপত্তি কি! আমি জানি, পাশের ঘরে কেউ নেই। তবু ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে থাকো, আমার কথা শোনো।'

'হ্যাঁ, এমনি করেই করো প্রার্থনা। ক'দিন পর আবার এস আমার কাছে।'

ক'দিন পর এলেন সেই ভদ্রলোক। ঠাকুরের পা ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'ঠাকুর, 'যদি' আর নেই। 'কেউ'-ও আর নেই। একমাত্র 'আছেন', 'তিনি আছেন, একজনই আছেন।'

'লোকে ঈশ্বর মানবে না!' বলছেন ঠাকুর, 'যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পা ধরে, খেজুর গাছকে প্রণাম করে, তার আবার বড়াই, ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না!'

কাপ্তেনকে তাই বললেন ঠাকুর, 'তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না।'

শব্দজাল না মহারণ্য। অনেক বাক্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। জনককে বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। ওতে লাভ আর কিছুই নেই, শুধু বাগিন্দ্রিয়ের ক্লান্তি।

আর নারদ কি বলছে? বলছে, কত তো পড়লাম, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ। ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ গণিত। দৈববিদ্যা ভূবিদ্যা তর্কশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র। নিরুক্ত কল্পছন্দ ভূততন্ত্র গারুড়তন্ত্র। ধনুর্বেদ জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাদ্য শিল্প-বিজ্ঞান। কিন্তু কই শান্তি কোথায়, সত্য কোথায়? শুধু কতগুলো শব্দের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি।

সনৎকুমার উত্তর দিলেন: 'যা কিছু অধ্যয়ন করেছ সব কতগুলি বুলি মাত্র।'

'শাস্ত্রের ভেতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?' বললেন ঠাকুর, 'শাস্ত্র পড়ে 'অস্তি' মাত্র বোঝা যায়। পাওয়া যায় একটু আভাস-লেশ। বই হাজার পড়ো, মুখে হাজার শ্লোক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে ভালো হচ্ছে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী দেখা—অনেক অনেক তফাৎ। তাই বলি দেখবার জন্যে ডুব দাও। ডুব দেবার পর মনের অতল তলে তাঁকে দেখতে পাবে।'

চিঠির কথা আর চিঠি যে লিখেছে তার মুখের কথা—অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা আর ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে মুখের কথা। বললেন ঠাকুর, 'আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে শাস্ত্রের কথা লই না। বেদ-পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে জানবার জন্যে হত্যে দিয়ে মাকে বলেছিলুম, আমি মুখ্যু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও ঐ সব শাস্ত্রে কি আছে। মা বললেন বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যে। গীতার সার গীতা দশ বার উচ্চারণ করলে যা হয়। অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী। যদি একবার ঈশ্বরের মুখের কথাটি শুনতে পাও দেখবে শাস্ত্র কোথায় কত নিচে তলিয়ে গেছে।'

তেমন-তেমন একটি মন্ত্র পেলে কি হবে শাস্ত্র দিয়ে?

'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।'

শাস্ত্রপাঠ হয়নি কিন্তু সাধুসঙ্গ আছে। শুধু সাধুসঙ্গেই সর্বসিদ্ধি। আতরের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছে কর আর নাই-কর আতরের গন্ধ তোমার নাকে ঢুকবেই। একটা জীবন থেকে আরেকটা জীবনে তেমনি ভাব সংক্রমণ হবে, এক স্ফুলিঙ্গ থেকে আরেক বহ্নিকণা।

দ্বিজ প্রায়ই মাষ্টারের সঙ্গে আসেন। বয়েস পনেরো-ষোলো। বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, ছেলেকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে দিতে নারাজ।

আরো দুটি ভাই আছে দ্বিজর। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোর ভায়েরাও আমাকে অবজ্ঞা করে?'

দ্বিজ চুপ করে রইল।

মাষ্টার বললে, সংসারের আর দু-চার ঠোক্কর খেলেই যাদের একটু-আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।'

'বিমাতা তো আছে। ঘা তো খাচ্ছে মন্দ নয়।' ঠাকুর এক দৃষ্টে দেখছেন দ্বিজকে। বললেন, 'এই ছোকরাই বা আসে কেন? অবশ্য আগেকার কিছু সংস্কার ছিল। তবে কি জানো! তাঁর ইচ্ছে। তাঁর হাঁ-তে জগতের সব হচ্ছে, তাঁর না-তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই কেন?'

'মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই?'

'না। কেন না মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়-লয়।'

আবার দেখছেন দ্বিজকে। বলছেন, 'যার জ্ঞান হয়েছে তার আবার নিন্দার ভয় কি! কামারের নেহাই, হাতুড়ির ঘা পড়ছে কত, কিছুতেই কিছু হয় না।'

দ্বিজ চলে গেলে আবার বলছেন তার কথা।

'কি অবস্থা ছেলেটার! কেবল পা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে। এ কি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এল তা হলে তো সবই হল।'

সেদিন দ্বিজর সঙ্গে দ্বিজর বাপ এসেছে। আর ভাইয়েরাও।

দ্বিজর বাপ হাইকোর্টের ওকালতি পাশ করে সদাগরী অফিসের ম্যানেজারি করছে।

'আপনার ছেলে এখানে আসে, তাতে মনে কিছু কোরো না। আমি শুধু এইটুকু বলি চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখো, আর কোনো গোল নেই।'

'আজ্ঞে হাঁ?' দ্বিজর বাপ সায় দিল।

'তুমি যে ছেলেকে বকো, তার মানে আমি বুঝেছি। তুমি ভয় দেখাও। তুমি ফোঁস করো। সেই ব্রহ্মচারী আর সাপের গল্প। জানো না?' ঠাকুর গল্প ফাঁদলেন।

রাখালেরা মাঠে গরু চরাচ্ছে। সেই মাঠে বিষধর এক সাপের বাসা। এক ব্রহ্মচারী একদিন যাচ্ছেন ঐ মাঠ দিয়ে। রাখালেরা বললে, ঠাকুর মশাই যাবেন না ওদিকে। ওদিকে এক সর্বনেশে সাপ আছে ফণা তুলে। আমার ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি। বললে ব্রহ্মচারী। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফণা-মেলা সাপ তেড়ে এল ব্রহ্মচারীর দিকে। ব্রহ্মচারী মন্ত্র পড়ল। মন্ত্র পড়তেই কেঁচো হয়ে গেল সাপ। তুই কেন পরের হিংসে করে বেড়াস? ব্রহ্মচারী শাসালেন সাপকে। বললেন, আয় তোকে মন্ত্র দি। এই মন্ত্র জপ করলে তোর আর হিংসে থাকবে না, ভগবানে ভক্তি হবে। বলে চলে গেল ব্রহ্মচারী। সাপ মন্ত্র জপতে লাগল। তখন রাখালেরা দেখলে, এ তো ভারি মজা, ঢেলা মারলেও সাপটা রাগে না। তখন এক দিন একজন সাপটার ল্যাজ ধরে তাকে অনেক ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে ফেলে দিলে মাটির উপর। অচেতন হয়ে পড়ে রইল সাপ। রাখালেরা ভাবলে মরে গেছে। তাই মনে করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। অনেক রাত্রে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সাপ ঢুকল গিয়ে তার গর্তে। মার খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, এদিকে হিংসে করা বারণ, গর্তের বাইরে এসে খাবারের সন্ধান করে সাপ। কি আর খাবে। মাটিতে পড়া ফল আর পাতা ছাড়া আর তার খাদ্য নেই। কিন্তু এ দিয়ে কি জীবন ধারণ সম্ভব? এক দিন এ মাঠ দিয়ে যাচ্ছে ফের ব্রহ্মচারী, ডাকলে সাপকে। ভক্তিভরে প্রণাম করে সাপ কাছে এল। কি রে কেমন আছিস? যেমন রেখেছেন। সে কি রে, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? লতা-পাতা খেয়ে কি করে আর মোটা হই? শুধু এই জন্যে? নিরামিষ খেলে কি রোগা হয়? ভাব দেখি ভেবে আর কোনো কারণ আছে কি না। আছে। সাপ তখন বললে রাখাল ছেলেদের সেই আছড়ে মারার কথা। আমি যে অহিংসার মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে যে কামড়াব না তা তারা কেমন করে জানবে? তুই কী অসম্ভব বোকা! ব্রহ্মচারী ধমকে উঠল। নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি তোকে কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে বারণ করিনি। তুই ফোঁস করে ওদের ভয় দেখালি নে কেন?

'তুমিও তেমনি শুধু ফোঁস করো ছেলেকে, কামড়াও না নিশ্চয়ই। তাই না?'

দ্বিজর বাপ হাসছে।

'শোনো, ভালো ছেলে হওয়া বাপের পুণ্যের চিহ্ন।' বললেন ঠাকুর, 'যদি পুকুরে ভালো জল হয় সেটি পুকুরের মালিকের পুণ্যের চিহ্ন। তাই নয়?'

দ্বিজর বাপ সায় দিচ্ছে।

'আত্মজ বলে ছেলেকে! তুমি আর তোমার ছেলে কিছুমাত্র তফাৎ নও। তুমি এক রূপে বাপ, এক রূপে ছেলে। বাপরূপে তুমি বিষয়ী, আফিসের ম্যানেজার, সংসারের ভোক্তা, আবার ছেলে-রূপে তুমি ভক্ত। এ সব তো তুমি জানো, তাই না?'

হুঁ দিয়ে যাচ্ছে দ্বিজর বাপ।

'শোনো, এখানে এলে-গেলেই ছেলেরা জানতে পারবে বাপ আসলে কত বড় বস্তু। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।' পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল ঠাকুরের: 'আমি মা'র কথা ভেবে থাকতে পারলাম না বৃন্দাবনে। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অমনি মন হু-হু করে উঠল। বৃন্দাবন অন্ধকার দেখলাম। আমি বলি সংসারও করো আবার ভগবানে মন রাখো। সংসার ছাড়তে বলি না। এ-ও করো ও-ও করো।'

দ্বিজর বাপ এতক্ষণে মুখ খুলল। বললে, 'আমি বলি, পড়াশোনা তো চাই। ছেলেদের সঙ্গে যেন ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটায়। এখানে আসতে কি আর আমি বারণ করি?'

'আর জোর করেই বা কি তুমি বারণ করতে পারবে? যার যা আছে তাই হবে।'

আবার হুঁ দিল দ্বিজর বাপ।

মাদুরের উপর বসেছেন সবাই। কথা বলছেন আর মাঝে মাঝে দ্বিজর বাপের গায়ে হাত দিচ্ছেন ঠাকুর। দ্বিজর বাপের গরম লাগছে। নিজে হাতে করে তাকে পাখা করছেন ঠাকুর।

দ্বিজর দিদিমা ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন অসুখ শুনে।

'ইনি কে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'যিনি মানুষ করেছেন দ্বিজকে? আচ্ছা, দ্বিজ নাকি একতারা কিনেছে? সে আবার কেন?'

মাষ্টার বললে, 'ঠিক একতারা নয়, ওতে দুই তার আছে।'

'কেন, কি দরকার? একে তো তার বাপ বিরুদ্ধ, তায় ফের জানাজানি করে লাভ কি? ওর পক্ষে গোপনে ডাকাই ভালো।'

গোপনে-গোপনে শয়নে-স্বপনে যে তোমাকে ডাকছি জানতে দেব না কাউকে। হৃদয়ে তুমি যে তোমার রাঙা রাখীর ডোরাটি বেঁধে দিয়েছ বাইরে থেকে কেউ তা জানতে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমার প্রেম সংসার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সংসারকে ফাঁকি দেব, সিদ্ধ হব এই নিষিদ্ধ প্রেমে। তখন এই সংসারই হবে আমাদের মিলনমালঞ্চ। জলে স্থলে এত যে শোভা সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছ এ আমাদেরই প্রেমের মুগ্ধ দৃষ্টি। ভুবন চরাচর আমাদেরই মহোৎসব-সভা।

অগাধজলসঞ্চারী রোহিত হও, গণ্ডূষজলে সফরী হয়ো না।

সেই রাজকুমারীর গল্পটি শোন।

ভক্তিমতী রাজবালা, রামময়জীবিতা, কিন্তু তার রাজকুমার স্বামী ভুলেও রামনাম উচ্চারণ করবে না। তাতে রাজকুমারীর বড় দুঃখ। কত অনুরোধ স্বামীকে, একবার রাম-নাম বলো, স্বামী নিরুত্তর। স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায় রাজকুমারী। স্বামীকে সুমতি দাও, তাঁর জিভে একবার তোমার নামময় প্রদীপটি জেলে দাও। এমনিতে মলিন মুখ রাজকুমারীর, হঠাৎ সেদিন, বলা-কওয়া নেই, সকাল হতেই রাজকুমারী উৎফুল্ল। দেওয়ানকে খবর দিল, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হবে, অগণন ব্রাহ্মণভোজন, অগণন ভিখারী-বিদায়। সত্বর সব ব্যবস্থা করুন। কারণ কি জানতে পাই? মিনতি করল দেওয়ান। আমার হুকুম। গম্ভীর হলেন রাজকুমারী। রাজকুমার বললেন, এ কি সমারোহ! এত ঘটা-ছটা কিসের জন্যে? প্রথমে রাজকুমারী বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর বললে, জানো আজ আমার কত বড় শুভ দিন! কাল রাত্রে স্বপ্নে তুমি একবার রাম-নাম করে ফেলেছ। এতদিন যে নাম শত অনুরোধেও উচ্চারণ করোনি, ঘুমঘোরে সে নাম তোমার মুখ থেকে স্খলিত হয়েছে। তাই এই উৎসবের আয়োজন। বিমূঢ়ের মত, হৃতসর্বস্বের মত তাকিয়ে রইল রাজকুমার। বেদনার্ত কণ্ঠে বললে, কি নাম? রামনাম। বলে ফেলেছি? মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে? রাজকুমার আর্তনাদ করে উঠল, যে ধন হৃদয়ের মধ্যে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম তা বেরিয়ে গিয়েছে? বলতে-বলতেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। রাজকুমারী দেখল, নাম-পাখি উড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীর দেহপিঞ্জর শূন্য!

তাই যত্ন করে লুকিয়ে রাখো। শুধু সে দেখে আর তুমি দেখ।

আমার সকল জল্পনা তোমার নামজপ, আমার সকল শিল্পকর্ম তোমারই মুদ্রারচনা। আমার ভ্রমণ তোমাকে প্রদক্ষিণ, আমার ভোজন তোমাকে আহুতিদান। আমার শয়ন তোমাকে প্রণাম, তোমাকে আত্মসমর্পণই আমার অখিল সুখ। আমার সকল চেষ্টা তোমারই পূজাবিধি।

আমি স্বভাবতঃই কামাসক্ত, আমাকে আর প্রলুব্ধ কোরো না বর দিয়ে। কামাসক্তির ভয়েই তো তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। আমার মধ্যে সত্যিকার ভৃত্যের লক্ষণ আছে কি না পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই তুমি আমাকে কামপ্রবৃত্ত করছ। নতুবা হে অখিল গুরু, তুমি করুণাময়, তোমার কেন এই কঠোরতা? যে তোমার কাছে বর চায় সে ভৃত্য নয়, সে বণিক। এই বাণিজ্যবুদ্ধি থেকে মুক্তি দাও আমাকে। আমি তোমার অকাম-সেবক, তুমি আমার নিরভিপ্রায় প্রভু। হে সর্বকামদ, যদি নিতান্তই আমাকে বর দেবে তবে এই বর দাও যাতে কাম না অঙ্কুরিত হয় হৃদয়ে।

তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। সন্তপ্তজনের প্রাণদাতা। সর্ব-পাপনাশী। শ্রবণমঙ্গল। সর্বশ্রীবর্ধক। যাঁরা তোমার নাম কীর্তন করেন তাঁরা বহুদাতা। তুমি বিশ্বমঙ্গল মহৌষধি। [ক্রমশঃ।

শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ

(Wordsworth এর Hart-keap Well অবলম্বনে রচিত)

শ্রীকালিদাস রায়

অশ্বারোহণে ছুটেছে মৃগয়া-বীর।
বার বারই তার ব্যর্থ হয়েছে তীর।
ছুটেছে হরিণ আগে আগে তার নাইক' অব্যাহতি,
প্রাণভয় তারে দিয়াছে আজিকে বিদ্যুৎসম গতি।
অনেক যোজন করেছে অতিক্রম,
ক্লান্ত করেছে চারি চরণের দারুণ পথিশ্রম।
সম্মুখে উঁচু পাহাড় হেরিয়া উঠিয়া তাহার শিরে
এড়াইল শিকারীরে।
কাঁপিতে কাঁপিতে চারি দিক পানে চায়,
তৃষ্ণায় তার প্রাণ বুঝি বাহিরায়,
সানুদেশে তার তৃষিত হরিণ উৎসের জল দেখে,
তিনটি লম্ফে ঝাঁপায়ে পড়িল পাহাড়ের চূড়া থেকে।
তৃষ্ণা তাহার জিনেছে মরণভয়,
এক মুহূর্ত্ত ত্বর নাহি আর সয়।
উৎসের জল জমেছে গর্ত্তে এসে,
নাসাগ্র তার তারি কিনারায় ঘেঁষে
শেষ-নিশ্বাস ত্যজিল, মৃগের নির্গত হ'ল প্রাণ।

হেরিল শিকারী গর্ত্তের জল তখনো স্পন্দমান
শেষ নিশ্বাসে তার,
করিল শিকারী উল্লাসে হুঙ্কার,
যেন কত বড় রণ
বিজয় করেছে এমনি তাহার দৃপ্ত আস্ফালন।
বনের মৃগের এতই স্পর্দ্ধা তার মত বীরবরে
সারাটি দিবস ছুটায়েছে বন-গিরি-প্রান্তরে।
যথাযথ পরিণাম
লভি এতক্ষণে দিল কি না বিশ্রাম।
অট্টহাস্য করিল সে বার বার।
শুনিল না তার প্রকৃতি মাতার বেদনার হাহাকার।
তৃষ্ণার জল বৎসলতার উৎসে রাখিল ধরি'
সেই জল ঠোঁটে না ঠেকিতে হায় বাছা তার গেল মরি!
এই চিত্রটি স্মরি'
কবির নয়নে গভীর শোকের অশ্রু পড়িল ঝরি'।
প্রতিবিন্দুটি তার
শ্লোকের মুকুতা হইয়া রচেছে বাণী-কণ্ঠের হার।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

পরশুরাম রচিত 'গড্‌ডলিকা' কথাটা গড্‌ড না গড্‌ডালিকা বলতে পারেন 'চলন্তিকা'-কার রাজশেখর বসু। সেই গড্‌ড অথবা গডডালিকা-স্রোত দেখতে হলে আপনায় হাওড়ার পুলে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিছুক্ষণ। হয় দশটার আগে নয় পাঁচটার পর। পিঁপড়ের সারির মত ওরা কারা?—মানুষ নয়, ডেলি প্যাসেঞ্জার। শহরতলী থেকে আসছে শহরে। জোনাকির পথ ছেড়ে জোঁকের মুখে।

বংশের পর বংশ, বছরের পর বছর ধরে ওদের এক পরিচয়; ওরা শুধু কেরাণী। যমে ধরলেও কখন কখন ছেড়ে দেয় কিন্তু সিগারেট আর 'চা'-এ ধরলে যেমন ছাড়বার প্রতিজ্ঞা আছে কিন্তু ছাড়ান নেই, কেরাণীগিরীও তেমনি, সেই গুহার মত, ঢোকবার রাস্তা আছে, বেরুবার পথ বন্ধ। ডাক্তারের মুখে শুনবেন ছেলেকে ইঞ্জিনীয়র করার কথা, ব্যারিষ্টর বাবার ছেলে বিলেত যায় ব্যারিষ্টার হ'তে নয় জর্ণালিজম না-জানতে। আই-সি-এস-তনয় হয় সরকারে শত্রু, প্রফেসর-পুত্রের স্বপ্ন ফিল্ম-ষ্টার হওয়া। শুধু কেরাণীর পর বংশে সবাই কেরাণী। আগে ম্যাট্রিক-ফেল করলেও হ'ত, এখন বি-এ পাশ না করলে নয়। আগে গুদাম থেকে উঠতে হ'ত বড়-বাবু-তে এখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরীতে ঢুকেই গড়তে হয় ইউনিয়ন। বেসিক পে আর ডিয়ারনেস এলাওয়েন্সের দাবীতে ডাকতে হয় মিটিং। তবুও কেরাণীগিরী ছাড়া কোনও রাস্তায় নয়। বি, এল পড়ছে যে সে-ও জানে বাবা যেদিন বলবে কাল সাহেব ডেকেছে, সেদিনই হিন্দু ল'-ক্রীশ্চান ল'-মহামেডান ল' সব গুলিয়ে জেবড়ে ভুলে একাকার করে সব হ-য-ব-র-ল। ডাক্তাররা যতই বলুক হেরিডিটরি রোগ মাত্র দুটি: ইনস্যানিটি এবং এই কেরাণীবৃত্তি। জাত ব্যবসার মত কেরাণীগিরী হ'ল জাত জীবিকা। (বছরের পর বছর নিয়মিত বই বার করবার দায়বদ্ধতায় যেমন কেরাণীর মত কলম পিষলে তবেই আপনি আজকের বাংলা দেশে জাত সাহিত্যিক,—ঠিক তেমনি!)

যত দিন শুধু ধুতি সম্বল তত দিন যেমন আপনি বাবু,—চাঁদনী থেকে কেনা বালিশের খোল পায়ে গলালেই যেমন 'সাহেবে' আপনার ডাকোন্নতি, তেমনি কেরাণী এবং ইস্কুল মাষ্টারদের থেকে গা বাঁচাবার জন্যে মধ্যবিত্তরা দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, নিম্ন এবং উচ্চ। কারুরই বিত্ত নেই তবুও নিজেকে কেরাণী না বলে যেমন এ্যাসিষ্টেণ্ট বলা, ক্যানভ্যাসার কথাটা কাণে বেখাপ্পা ঠেকে তাই সেলসম্যান সাজা, সেলসম্যান বললে বিজনেসের স্ফীতি বোঝানো শক্ত বলে চীফ অরগ্যানাইসর, তেমনই ভাড়া বাড়ীতে সময়ে ভাড়া-না-দিতে পারা রেফ্রিজারেটরের মহিমায়, রেডিও রাখার কৌলীন্যে এবং কখনও কখনও হায়ার পার্চেসের কৃপায় চার চাকায় চাপার দুর্মূল্য দাপটের নাম উচ্চ মধ্যবিত্ত। অনেকটা কালো চামড়ার ছোঁয়া থেকে গা বাঁচাতে যেমন একই কামরাকে ইয়োরোপীয়ান থার্ড বলে আত্মতৃপ্তি।

তেমনি কেরাণীরা এক জাঁতিকলে পড়েও এক জাত নয়। তাদের ধাম এক, কিন্তু নাম আলাদা। আপিসের সেক্রেটারী যিনি আর যে গুদমে সবে ঢুকেছে দুজনেই কেরাণী, দুজনের কাজও এক লেজার মানে হিসেব ঠিক রাখা। একজন খেটে তৈরী করে আরেক-জন সই করে। নস্যি টানে একজন, অন্য জন পাইপ। একজনের পরনে হাওয়াইয়ান, আরেকজনের ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে ঢোকে শুধু হাওয়া। একজনের মাইনে চার ফিগারে, চেক মারফৎ জমা হয় ব্যাঙ্কে, আরেকজনের মাইনে পাওয়া মাত্রই ক্যাণ্টিন থেকে দরোয়ানের বাকী বকেয়া শোধ করে বাড়ী যায় এক চতুর্থাংশ। তাই বৃত্তি এক হ'লেও বৃত্তান্ত আলাদা হতে বাধ্য।

বাঙালীকে দিয়ে ব্যবসা হ'য় না অবাঙালীদের এই কথা অবাঙালীরা কতটা বিশ্বাস করে বলা সহজ নয় কিন্তু বাঙালী যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস ক'রে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে কই? তাই বাঙালী কেরাণী হয়। কেরাণীতে পাকা হয়ে বসবার পরেই বিয়ের পাকা দেখা হতে দেরী হয় না। নিজের জীবনে বউ আর একপাল পুত্র-কন্যার সমস্যা-জর্জরিত পিতার শেষ কাজ। মায়ের চোখের জল। রোমাণ্টিক উপন্যাসের ইনফ্লুয়েন্স। ছেলে উলুবেড়েতে গিয়ে বউ নিয়ে আসে। জীবনে প্রথম উলু বেড়ে লাগে শুনতে। কিন্তু সে ঐ প্রথম দিনই। তারপরই দৈনন্দিন দুশ্চিন্তায় প্রথম রাত্রির ফুলশয্যা সরে গিয়ে দেখা দেয় সারাজীবনের শরশয্যা।

কেন এমন হয়? বিয়ে করার জন্যে? একাধিক সন্তান প্রতিপালনের প্রতিক্রিয়ায়? এমনও মনে করা অসম্ভব নয় যে, বাপ বুঝি নিজের জীবনে জ্বলে জ্বলে ছেলেকেও জ্বলতে দেখে তৃপ্তি পান, তাই বিয়ে দিয়ে অল্প বয়সে তুষে ধরিয়ে দিয়ে যান আগুন। সেই ল্যাজ কাটা শেয়ালের ইতিবৃত্ত, সবায়ের ল্যাজ কেটে তবেই যার তৃপ্তি। না, তা নয়। বিয়ের প্রয়োজন আছে, নইলে সমাজের প্রয়োজন কোথায়? চেষ্টাবটনের রাস্তায় যেতে যেতে অবাক হওয়ার কথা মনে পড়ে। Should Barbars marry? —এই সাইনবোর্ড দেখে থমকে ছিলেন জি. কে. সি.। বলেছিলেন মনে মনে, এ-ও একটা প্রশ্ন? মানুষের সমাজ-ধারণের মৌল প্রয়োজন নিয়েও প্রশ্ন? সত্যিই তাই। বই-এর পাতায় বোহেমিয়ানের বেপরোয়া বৃত্তি উত্তেজিত করে কিন্তু জীবনে তার সাক্ষাৎ ক'রে বিরক্তির উদ্রেক। সংসারের সবটুকু সুবিধে নেব, কিন্তু দায়িত্বের বেলায় দাঁড়াব সরে, এ-হ'ল আগুন নিয়ে খেলব, কিন্তু গায়ে যেন আঁচ না লাগে।

কিন্তু তা নয়। বিবাহিত জীবনের চেয়ে বোহেমিয়ান লাইফে ব্যয়-বাহুল্য অনেক বেশি। হ'তে পারে একদিন জীবনসঙ্গিনীকে যারা 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে'-র জন্যেই মাত্র ঘরে আনতেন তারা ব্যয়ের কথা বাদ দিলেও স্বাস্থ্যের কথাও চিন্তা ক'রতেন না। আজ সত্যিই এক পাল বাচ্চার কথা ভাবাই যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে বিয়ের কথাও ভাবা যায় না, বাতিল করতে হয় বিবাহও,—এতে সায় দেওয়া অসম্ভব। অপরিণামদর্শিতার অবিমৃষ্যকারিতার এ আরেক অনুপম দৃষ্টান্ত।

বিয়ে ক'রতে ভয় পাওয়ার সব চেয়ে বড় কারণ আমরা স্বস্তি চাই না, সুখ চাই। আনন্দ নয়, কমফর্ট; বাঁচা নয়, ছোটা; ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস নেই, গ্ল্যামারেই যা কিছু আকর্ষণ; জীবন নয় শুধু থ্রিল। ঘরণীর শ্রান্তি দিয়ে ঘরের শান্তি, ক'জন চায় তা আজ? তাই পথে কিম্বা পথের ধারের পান্থশালায় সবাই খোঁজে সঙ্গিনী, যে জীবনে আনবে উত্তেজনা কিন্তু দায়িত্ব দেবে না কিছুই। ঘর-ছাড়া মন, ঘরণী-ছাড়া ঘর, বিংশ শতাব্দীর একে কী ব'লব? ট্র্যাজেডী? কমেডী?—না, এ হ'ল ট্র্যাজি-কমেডি। সিরিয়স নয়, কমিকও নয়, সিরিও-কমিক।

কেরাণীদের জীবন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত জীবন, বাঁধা মাইনের চাকায় বাঁধা তাই নিরুদ্বেগ স্বাধীন জীবিকার মত বাইরের চিন্তা মাথায় ক'রে ঘরে ফিরতে হয় না, এমন ধারণা অনেকেরই। কিন্তু ছক-কাটা দৈনন্দিন ইতিহাস যে নিছক নিশ্চিন্ততার নয় তা বোঝবার জন্যে কেরাণী হ'তে হয় না। আরামের ত' নয়ই, জীবন-সংগ্রামে অত্যন্ত অল্প হাতিয়ার নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া, হাতে কিছু না রেখে হাত থেকে মুখে তোলা, কেরাণীদের সংসারে শুধু আজকের দিনটাই অন্ধকার নয়, আগামী দিনেও আশা কম, সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বাঁধা-চাকরী করে না যারা তাদের ধারণা তাদের বিঘ্ন বেশি, বাধা বিপুল, অবসর অল্প। তাই কেরাণীর জীবন তাদের চোখে নিশ্চিন্ত। এ হ'ল সহরের মানুষের মফঃস্বলে আসা। ভীড় থেকে নির্জনতায়। সবুজ দেখে চোখ জুড়নো। কিন্তু সে ঐ ক'ঘণ্টার জন্যেই। গাড়ীতে যেতে যেতে মেটে বাড়ী দেখে উল্লসিত হওয়া। গোলপাতার ছাউনী, ধানের ক্ষেত, রাখালের বাঁশী, কোন এক গাঁয়ের বধূ,—তাই নিয়েই কয়েক মুহূর্ত কাব্য করা। থাকতে হ'ত যদি রোদে-জলে-ঝড়ে, বিনা চিকিৎসায় মরতে হ'ত যদি, দিনের পর দিন বছরের পর বছর ভাসতে হ'ত যদি বন্যায়, কাঁদতে হ'ত যদি অনাবৃষ্টিতে, ঘরের সব চাল পরের হাতে তুলে দিয়ে বেরুতে হ'ত শহরের পথে, দাঁড়াতে হ'ত লাইন ক'রে এক বাটি খিচুড়ীর অমৃত-প্রত্যাশায়, তখন? তখন মনে হ'ত ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা ও শুধু কবিতাই, শোনবার এবং শোনাবার, সত্যি সত্যি আশা ক'রবার মত কিছু নয়।

কেরাণীতে কেরাণীতে গরমিলের কথা এর আগে বলেছি; এখন মিলের কথাটা বলি। সওদাগরী কি সরকারী কিংবা কর্পোরেশনেরই, সাময়িক, স্থায়ী অথবা পেনসন-সমাগত কিন্তু এক্সটেনসনে বহাল রায়ু মাঝবয়েসী আর সদ্য-কেরাণী, বড় বাবু, টেলিফোন ক্লার্ক অথবা টাইপিস্ট, সব কেরাণী একটি জায়গায় এক। জিজ্ঞেস করলেই শুনবেন, আর বল না ভাই, আমার আপিসে যা কাজ, আর কেউ হ'লে মরে যেত। যেন আপিসটা তার নিজের, খাটুনীর সব ফল যেন সে পাচ্ছে, কিংবা তার ধারণায় শুধু সেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করছে, আর সবাই বোধ হয় উপায় করে মাথার অডিকলন পায়ে ঢেলে। এমন কোন কেরাণী নেই, চেয়ারে চাদর জড়িয়ে রেখেই শুধু যার বরাবরের এ্যাটেণ্ডেন্স, তাদের ধারেও দেখবেন এমন কোন কেরাণী নেই যাকে, আপনি ত তোফা আছেন, খাটতে হয় না তেমন, বললে রেগে না যায়। যেমন না কি লোককে খলিফা বললে লোকে রাগ করে না, আজ-কাল ত খুসীই হয়, কিন্তু আলোয়ান বেচার নাম করে যাকে প্যাকেটের মধ্যে দড়ি গছিয়ে দিয়েছে তাকেও খোকা বলে দেখুন, আপনার প্রাণ যায় কি থাকে!

আকাশ-পাতাল, এই কথাটা শুনে অথবা লেখায় পড়ে পুরো তাৎপর্য অনুধাবন অসম্ভব। ও-কথার মধ্যে পার্থক্যের যে বিপুলতার প্রাচীর খাড়া করা আছে তার মর্ম গ্রহণ ক'রতে আপনাকে যেতে হবে ওই কেরাণীদের মধ্যেই, একবার নয় দু'বার। একবার মাসের প্রথমেই, আরেক বার মাসের বিশ-একুশ তারিখে। মেজাজের আকাশ-পাতাল ফারাক মালুম হ'বে তবেই। মাসের প্রথমে, মাইনের দিনে, কেরাণীর মত দিলদরিয়া বুঝি হারুণ অল রসিদও নন। চলুন—চলুন চা খেয়ে আসা যাক, কাজ ত আছেই সারা মাস। আপনি 'না' বললে, জবাব এলো এ ত রাগের কথা হলো দাদা! পৃথিবীর সকলের প্রতি সেদিন অনুরাগের পালা; সেই কেরাণীর কাছেই যান মাসের বিশে-একুশে। যান, যান মশাই, দেখছেন না ক'ত কাজ। শুধু কি আপনার জন্যেই আপিস নাকি। কথা শুনে এবার আপনারই তাঁকে নরম করার চেষ্টা, আহা, রাগ করেন কেন!—না, রাগ করবে না, কাজের সময় এসেছেন অকাজের কথা নিয়ে। মাসের বিশ তারিখ, গত মাসের টাকা খরচা হয়ে গেছে যার দশ দিন আগে, পরের মাসে টাকা পেতে যার দেরী দশ দিন,—মাসের সেই বিশ তারিখ কেরাণীর কাছে বিষতুল্য। সেদিন সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,—এ কোন তরুণ-তরুণীর কথা নয়, এক কেরাণীর

সামনে ব'সে আরেক কেরাণী। দু'জনেই উচ্চারণ করছে মনে-মনে, সংসারে কী জ্বালা!

হাঁ, জ্বালা বলতে মনে পড়ল। এক ভদ্রলোক জ্বালা কিনতে বেরিয়েছেন বাজারে, সব চেয়ে বড় জ্বালা কিনতে এ-দোকানে সে-দোকানে। আরেক ভদ্রলোক সেই কথা শুনে টেনে নিয়ে গেলেন হাত ধরে, সব চেয়ে বড় জ্বালা চান, আসুন আমার সঙ্গে। বলে নিয়ে গেলেন একেবারে নিজের বাড়ীতে। নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন: বাড়ী-ভাড়া বাকী পড়েছে ছ' মাসের। বাড়ীওলা ইজেক্‌শন স্যুট ফাইল ক'রেছে, দাঁড়াতে হবে রাস্তায়। ছোট ছেলেটার হাম ১০৫° ডিগ্রী জ্বর। ডাক্তার ডাকার বোধ হয় আর রাত পোহালে দরকার হবে না। বড় ছেলের মাইনে দেওয়া নেই স্কুলে, সে ডাংগুলি খেলে বেড়ায়। মেয়ের বয়স বাইশ, পাত্র আছে, পণের টাকা নেই। গিন্নীর বাত, আমার ডায়েবেটিস। এখন বলুন, সংসারে এর চেয়ে বড় জ্বালা কোথাও পাবেন?

তাই বলি, পৃথিবীটা কার,—এ প্রশ্নের উত্তর ওর মধ্যেই আছে। এই ধাঁধা যতই ছেলেমানুষী হোক, যে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই, তা হ'ল পৃথিবী সত্যিই টাকার, আর কারুর নয়।

আকাশ-পাতাল কথাটা তুলেছিলাম একটু আগেই। সেই কথাতেই ফিরে আসি। সরকারী আপিসের আর সওদাগরী আপিসের কেরাণীর মেজাজে আকাশ-পাতাল ফারাক। একজনের চাকরী যাবার ভয় নেই, বড় জোর বদখাতায় নাম উঠবে, খুব বেশি শাস্তি হ'ল ট্রান্সফার, তহবিল তছরূপ প্রমাণ না হ'লে সরকারী আপিসে কেরাণীর কিছুই হয় না। আর সওদাগরী আপিসের কেরাণী, তার সর্বদাই বুক টিপ-টিপ। কাজে, ব্যবহারে, ফ'াইল ফেলে রাখায়, আপিস আসতে দেরী হওয়ায় একবার ওয়ার্নিং, তার পরই বিল্বপত্র শোঁকা। এখন পাশার দান উল্টে গেছে। ইউনিয়নের মহিমায় বেসরকারী আপিসে এখন চাকরী যাওয়া শক্ত আর স্বাধীনতার কৃপায় সরকারী আপিসে এখন পার্মামেণ্ট হওয়া অসম্ভব।

সরকারী কেরাণীর মেজাজ সরকারের চেয়েও এক ধাপ চড়া। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি যে কারণে চিরকালই দড়। এই মেজাজের সঠিক পরিচয় পাবেন সরকারের কাছে বিলের টাকা আদায় করতে গেলে। দিনের পর দিন, সেই এক জবাব: এখনও পাশ হয়নি। কিছু ব'লতে গেলেই, লিখে জানান—এই জবাব সঙ্গে সঙ্গে তৈরী। এখানে বড় কর্তাদেরও করবার নেই, কেরাণীই বিল শেষ সই করাবার ধাপ পর্যন্ত মা-বাপ। যথাসর্বস্ব পণ করে টেণ্ডার ধরেছিলেন। মাল দিয়েছিলেন। বিল পাশ করাতে করাতে আপনি তারপর কখন নিজেই খাল হ'য়ে গেছেন টের পাননি।

মাঝে মাঝে ভাবি, যে বাড়ীতে প্রায় কিছুই রাইট নয় সে বাড়ীর নাম রাইটার্স বিল্ডিং দেওয়া, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন দেওয়ার উপমাকেও হার মানায়।

ছাপার জগতে সব চেয়ে বড় সাইজের টাইপ সীসের হয় না, কাঠের হয়। কেরাণীর হাটেও সব চেয়ে বিচিত্র জীব সাধারণ বাবুরা নয়, বড় বাবু। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ হয়নি, কিন্তু নিঃসংশয়ে যে আরেক জন প্রতিভা এদেশে এসেছিলেন তিনি আবোল-তাবোলের সুকুমার রায়। হেড আপিসের বড় বাবুকে তিনি অমর করে গেছেন।

বড় বাবু বলতে যদিও বোঝায় মাত্র একটি লোককে, তবুও তার মধ্যে বাস করে অনেকগুলি লোক। বাড়ীতে বউ এর কাছে এক রকম, আপিসে সাহেবের সামনে যেমন, সাহেব চলে গেলে তেমন নয়। সোম থেকে শুক্রবার যে রকম, শনিবার সে রকম নয়।

বড় বাবুর আসল টাইপ যদিও এক টানে এঁকে দেখানো শক্ত, তবুও একথা বলা চলে যে, বড় বাবুরা বাইরে থেকে দেখতে একই রকম। মাথায় টাক, ভুঁড়ি হয়েছে, গায়ে গলাবন্ধ কোট, কোটের ওপর লম্বা হয়ে ঝুলছে চাদর, আগে ঘড়ি পকেটে থাকত, এখন হাতেই বাঁধা হয় ঘড়ি। সঙ্গে পানের কৌটো অবধারিত। মুখ এই অকারণে গম্ভীর, এই হাস্যবিগলিত। লোকচরিত্রের তালিকায় অনবদ্য বস্তু এই বড় বাবুর কাজ অনেক। সাহেব হচ্ছে মা-বাপ। কোথায় কোন লোক ছড়াচ্ছে অসন্তোষ, বড় বাবু সেই কথা তুলছে গিয়ে সাহেবের কানে। সাহেব এক চোখ রেখেছে সেই লোকের ওপর, বড় বাবু জেনে গেছে সাহেব-জাতকে পুরো, তাই জানে সেই সঙ্গে সাহেব আরেক চোখ রেখেছে তার ওপর—কাজেই কথাবার্তায় খুব সাবধান; সেই পুরাতন অথচ অব্যর্থ প্রতিষেধক মনে রাখা: Even the walls have ears. ইয়ারদের সঙ্গে মজলিশি গল্পের মধ্যেও তাই সাহেবকে ধরে টানা,—নৈব নৈব চ।

বাড়ী থেকে বেরুবার সময় ত' বটেই—ট্রামে যেতে যেতেও ঠাকুর দেবতা যেখানে যত আছে—গাছ, নুড়ি থেকে মন্দির সর্বত্র বড় বাবুর ভক্তিতে কম্পিত হাত কপালে ঠেকানো। তার একটু বাদেই,—মানে তারা তারা বলে কেঁদে ওঠার পর কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই যেসব কথা ওই বড় বাবুর মুখে তার স্বরে উচ্চারিত হয়, তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যেত অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও যদি থাকত একটি অশ্লীল কথার অভিধান,—নইলে নয়!

বাড়ীতে তামাক টানেন, ন্যূনতম খরচে নবাবী নেশা স্বাস্থ্য-অর্থ দুই রক্ষা করে। সিগারেট কেনেন না তবে খান, যদি কেউ দেয়। কিছুতেই আসক্তি নেই, তবে কেউ কিছু দিলে, 'না' বলার অভ্যাসও কম। পাঁজী না দেখে বেরুন না, সে যে-কাজেই হ'ক, ভালো অথবা মন্দ। কাউকে কখনও যে বাড়ীতে এনে খাওয়ান না, তাও নয়। আপিসে খোঁজ-খবর ক'রে মনোমত কাউকে মনে মনে জামাই করবার ইচ্ছে পোষণ করেন যদি, বাড়ীতে এক দিন ডাক পড়ে তার। গিন্নী নিজের হাতে রেঁধে খাইয়ে বলেন: সব আমার পুঁটি মা'র রান্না, ফেলতে পারবে না কিছু। দরজার আড়াল থেকে পুঁটি সব শোনে, বিশ্বাস হয় না বুঝি তবুও। অতিথি বিদায় হ'লে এক গাল তামাক ছেড়ে দিয়ে বড় বাবু বলেন: খাসা ছেলেটি, কী বলো গিন্নী! গিন্নী মুখে কিছু বলেন না, সেদিন পুজোয় বসেন একটু বেশীক্ষণ; সেদিন চারটে বাতাসার ওপর এক কোয়া কমলা লেবু বেশী জোটে গৃহ-দেবতার। মেয়ের সেদিন ছুটি মেলে। উনোনের কাছে আসা বারণ হয়—রং কালো হয়ে গেলে কে নেবে ঘরে আর?

কলম যাঁদের তরোয়ালের চেয়ে ধারালো তাঁরা ত বটেই, কলম ফেলে যাঁরা তরোয়াল তুলে নিয়েছেন তাঁরাও কেউ কেউ

কেরাণীই ছিলেন। বাঘা যতীন আর রাসবিহারী,—দুই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গই কেরাণীদের মধ্যে থেকে ছিটকে পড়েছেন। কেরাণীদের হাত দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে, লেখা হয়েছে কবিতা, উপন্যাসের হয়েছে আবির্ভাব। চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে যাদুবিদ্যা পর্যন্ত বাঙালী প্রতিভার জন্ম প্রায়ই মধ্যবিত্ত—তথা কেরাণীকুলে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, মধ্যবিত্তরা বিত্তহীন প্রায় সবাই,—কিন্তু চিত্তে বিত্তবানদের মত দীন নয় তারা অনেকেই।

কেরাণীদের সব কথা বললেও সব কথা বলা হয় না যাদের কথা না বললে, পুরুষের জীবনকে উদ্দীপিত করার মূলে তারাই; জীবনীতে উপেক্ষিত হয়, অনুচ্চারিত থেকে যায় তারা মহত্ত্বদের আলোচনায়। জীবন-সংগ্রামে অন্তরাল থেকে জোগায় জীবনীশক্তি, যাদের কথা মনে থাকে না কেরাণীর, আর যাদের ভুলে যাই আমরা, তারা কেরাণীঘরের বউ।

অভিনেত্রীদের ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ আজকের সাময়িক-পত্র। তারা কী খায়, কী রাঁধে তার সচিত্র বর্ণনাই আজকের কাগজের এক মাত্র অবলম্বন; তারা কী দিয়ে চুল বাঁধে, গায়ে কী মাখে, চায়ের সঙ্গে কী খায়, বিজ্ঞাপনেও তারই চিত্রিত ঘোষণা। অভিনেত্রী ছাড়া আর যাঁদের ছবি কখনও কখনও ছাপা হয়, খবর-কাগজে খবর হন যাঁরা তাঁরা মাননীয়া দেশনেত্রী। বিদেশে তাঁরা আমাদের দেশের বাড়িয়েছেন গৌরব। তাঁরা বিদুষী, তাঁরা উচ্চ শিক্ষিত, তাঁরা বাগ্মী। বিপুল তাঁদের মহিমা, বিচিত্র তাঁদের স্বার্থত্যাগের ইতিহাস। তাঁরা সত্যিই বড়। তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট পৃথিবীতে বাস করে মধ্যবিত্ত ঘরের এই উপেক্ষিত জায়ারা। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্বেগ নেই তাঁদের, সমস্যা শুধু কালকে হাঁড়ি-চড়ার। খুব ছোট সমস্যা, সমাধান তাই বুঝি অনেক শক্ত!

শুধু সাধারণ লোকের নয়, অসাধারণ প্রতিভার বেলায়ও তাই। আমরা যারা মধুসূদনের মধুটুকু শুধু নিয়েছি, ত'রা কী বুঝব কোন দিন নিমচাঁদের তিক্ততা হাসি মুখে তুলে নিতে হয়েছিল যে বিদেশী আইভিলতাকে, সে কত বড়!

কেরাণীদের সংসার ভেসে যেত কবে, যদি এই বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে না রাখতে পারত তাদের স্ত্রীরা। আজ গোয়ালার বাকী, কাল ছেলের পড়ার বই নেই, তার মধ্যে আছে আত্মীয়দের পীড়ন, লৌকিকতার লজ্জা। সেক্সপীয়র পড়তে পারে না, মেট্রোর নাম শুনেছে, দেখেনি কোন দিন। তারা সোসাইটি লেডি নয়, ঘরের বউ। ওদের এক জন ছেঁড়া জামা পরতে দুঃখ পায় না, লজ্জা পায়; আরেক জন পিঠ খোলা না রাখলে হাঁফিয়ে ওঠে, আপাদমস্তক ঢাকা পোষাক দেখলে বলে cad! ওদের এক জন ঝুটো-মুক্তো হলেও সাজতে ভালোবাসে। আরেক জন সোনার গয়না খুলে দেয় সংসারের তাগিদে। খুলে দিয়ে হাল্কা হয়—কারণ সোনার চেয়ে তারা খাঁটি!

এমন একটি কেরাণী-বউকে জেনেছিলাম। বুঝেছিলাম সোসাইটির দায়ের চেয়ে বড় সংসারের দায়িত্ব। 'Life' enjoy করার চেয়ে অনেক বড় জীবন-সংগ্রাম। ডিগ্রী-পাণ্ডিত্যের চেয়ে বড় চরিত্র।

সেই সামান্য কেরাণী-ঘরের অসামান্যা যে বউটির কথা বলতে যাচ্ছি, তার নাম দুর্গা।

[ক্রমশঃ।

মনের কপোত ফেরে নূতন কুলায়

বন্দে আলী মিয়া

এখন প্রদোষ বেলা—পাখীরা উড়িয়া আসে পুরানো কুলায়,
আজিকে শুক্লা তিথি—মৌসুমী বায়ু সনে আসে যেন শীত—
নিবিয়া গিয়েছে কি গো জীবনের সাধ আশা হাসি আর গীত?
আমার পৃথিবী কাঁদে—পলে পলে তার আজ নিশাস ফুরায়।

অতীত দিনের সাথে দেখা হবে মুখোমুখী আগামী কালের
আমি কি হারায়ে যাবো নূতন প্রভাতে কাল ঘন জনতায়!
একদা শীতের রাতে ফুটেছিল নীল ফুল মনের শাখায়
ফিরে কি এসেছে আজ নতুন তারকা হয়ে মোর জীবনের?

নতুন সাথীরে লয়ে বারে বারে ভাঙি গড়ি মোর খেলা ঘর
আগামী দিনের মাঝে দেখি যেন পরিচিত পুরানো স্বপন,
স্মৃতির অনল লয়ে জেগে আছি অনিমিখ তৃষাতুর মন
আজো পথে চেয়ে থাকি—নীরবে কাটিয়া যায় রাতের প্রহর।

সাঁঝের বাতাস আসে—ফুটিয়াছে আঙিনায় সাজবাতি ফুল
এখন ধূসর বেলা—শূন্য আকাশ হতে নামিছে আঁধার
মনের কপোত মোর খুঁজে ফেরে গ্রহে গ্রহে আলোর পাথার
রাত্রি ঘনায়ে আসে—তবু কি রে তার আজো ভাঙিবে না ভুল?
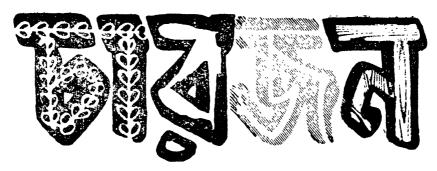
এস, এম, বসু

(কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট-জেনারেল)

ভারতের আইন-জগতে বহু দিন থেকেই এঁর প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে আছে। এ প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে তাঁর একনিষ্ঠ শ্রম ও সাধনারই অনিবার্য্য ফল। আইনকে অন্তরের গভীরতা দিয়ে ভালবেসেছেন, একে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে বরণ করেছেন, এমন লোকের সংখ্যা এদেশে হয়তো খুব বেশী নয়, কিন্তু স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী এস, এম, বসুর (সুধাংশুমোহন বসু) ক্ষেত্রে এ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি আইনকেই জীবনের সর্ব্বস্ব হিসেবে মেনে নিয়েছেন একরূপ প্রথম থেকেই—এবং শুধু মেনে নেওয়াই নয়, এর পেছনে তাঁর সাধনাও চলেছে সে-থেকে আজ পর্য্যন্ত অবিরাম।

শ্রীসুধাংশুমোহন যে পরিবারে (চন্দননগরের বিখ্যাত বসু-পরিবার) জন্মগ্রহণ করেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ইহা বহু কাল থেকেই সমৃদ্ধ। তাঁর পিতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন বিশিষ্ট জমিদার ও শিক্ষানুরাগী। বাল্যকালে পিতার প্রভাব তাঁর উপর অনেকখানি ছিল। শ্রীবসুর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে। এ স্কুলে পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি ভর্ত্তি হলেন হুগলী কলেজে এবং ১৯০৬ সালে এখান থেকেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতা তাঁকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন বিলেতে আই-সি-এস হ'য়ে আসবার জন্যে।

এস, এম, বসু

আই-সি-এস হবেন বলে সেদিনের বাঙ্গালার যে কৃতী যুবক বিলেতে গেলেন, যে কোন কারণেই হোক শেষ পর্য্যন্ত তিনি আর আই-সি-এস হ'তে চাইলেন না। হয়তো তাঁর ভেতর আজিকার একজন শ্রেষ্ঠ আইনবিদ লুকিয়ে ছিল বলেই সেদিনে তাঁর মতের এক বিরাট পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং বি, এ, ডিগ্রি লাভ করেন সেখান থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে। পূর্ব্ব-নির্দ্ধারণ অনুযায়ী তিনি আর আই, সি, এস-এর দিকে ঝুঁকলেন না—ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্যে। তাঁর এ সঙ্কল্প সফল হ'লো, ১৯১১ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে সুনাম নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসলেন।

তারপর সুরু হলো শ্রী বসুর গৌরবময় কর্ম্মজীবন। ১৯১১ সালেই তিনি ক'লকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করলেন। এবং অল্প দিন মধ্যেই একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে প'ড়লো। আইন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি থাকায় ১৯৩৩ সালে তদানীন্তন সরকার কর্ত্তৃক তিনি ক'লকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি এপদ ছেড়ে দেন এবং পর বৎসর ছ'মাসের জন্যে ভারতের এডভোকেট জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পর শ্রীসুধাংশুমোহন চলে আসেন ক'লকাতায় এবং পুনরায় আরম্ভ করেন ক'লকাতা হাইকোর্টে স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসা। তাঁর সফলতাপূর্ণ কর্ম্মজীবনে তিনি বহু বিখ্যাত ব্যবহারজীবীর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছেন। স্যার এন, এন, সরকার, মিঃ ল্যাঙ্গফোর্ড জেমস্ প্রমুখ বিশিষ্ট আইনবিদ্‌দের সঙ্গেও কাজ করেছেন তিনি। ভারতের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সতীর্থ। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে তাঁরা এক সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন এবং আইন-জগতে আজ তাঁরা দু'জনেই দু'দিকে সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। ১৯৪৩ সালে শ্রীবসু অবিভক্ত বাঙলার কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও তিনি হাইকোর্টের এ দায়িত্বশীল পদ অলঙ্কৃত ক'রে আছেন।

এডভোকেট জেনারেল হিসেবে শ্রীসুধাংশুমোহন যে অনন্যসাধারণ আইন জ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, তাতে তিনি শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতেরই হয়ে থাকবেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আগামী দিনে যাঁরা ব্যবহারজীবী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে চাইবেন, তাঁরা পাবেন শ্রীবসুর গৌরবদীপ্ত কর্ম্মজীবন থেকে অনেক কিছু উপকরণ শিখবার ও জানবার এবং সে সঙ্গে এগিয়ে যাবার স্থায়ী প্রেরণা। তিনি একজন মাসিক বসুমতীর উৎসাহী পাঠক।

স্যার উষানাথ সেন

(বিখ্যাত সাংবাদিক)

"আমার তো কোনো জীবনী নেই, তবে হ্যাঁ, একটা জীবন-সংগ্রামের ঘটনাপঞ্জি বলে যেতে পারি। তাতে তোমার কাজ হবে ভাই ?"

সম্ভ্রমের সাথে বললাম, আমার নয়, সাংবাদিকের জীবনীতেও নয়, সর্বভারতে ঘরে ঘরে যে জীবন-সংগ্রাম চলছে, তাঁদের কাজ হবে। সংগ্রামের ঘটনাপঞ্জিই বলুন স্যার, জীবনী তৈরী ত বায়োগ্রাফারের হাতে।

কি বিপদ সব ফাঁক করে দেবে ? দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করে, ১৮৯৯ সালে যখন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় (আর্টস্) ফেল করলাম, তখন ঠিক করলাম পড়াশুনোর লাইনেই আর নয়। একটা চাকরী খুঁজতে বেরুলাম।

ইণ্টার ফেল, থার্ড ডিভিশনের এনট্রেন্স পাশ (তাও দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় !) ছোকরাকে কে চাকরী দেবে বল ?

সিমলায় তখন আমার দুই ভাই ছিলেন। সকলে বললেন, যা সিমলায় গিয়ে চেষ্টা কর। একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। কোয়ালিফিকেশন শুনে সকলে হাঁ করে তাকায়। বল কি হে সরকারী চাকরী ? এই কোয়ালিফিকেশনে ? হ্যাঁ চেষ্টা করে দেখো যদি কপিষ্ট (copyist) এর কোনো কাজ পেয়ে যেতে পারো। জানো তো ভাই, তখন টাইপ রাইটার চালু হয়নি। দুরু-দুরু বক্ষে, আশার দীপশিখার মৃদু কম্পনের তালে তালে ভয়ে, সংকোচে, সম্ভ্রমে মাথা নত করে গিয়ে হাজির হলাম কপিষ্টের চাকরীর ইণ্টারভিউ দিতে। সাহেব ডাকলেন। রাঙা-মুখে আলতার পেঁচ লাগিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, ছোকরা, তোমার সাহস ত কম নয়, এই হাতের লেখা নিয়ে তুমি এসেছো কপিষ্টের চাকরী নিতে ?

বাধা দিয়ে বললাম, ধন্যবাদ মা সরস্বতীকে। হাতের লেখাটি অমন না দিলে আজ হয়ত ভারতবর্ষ বর্তমান সাংবাদিকতার জনক স্যার উষানাথকে পেত না !

তিনি বললেন, যাক সে কথা। চাকরী ত হল না, এখন করি কি ? কোথায় যাই ? খাওয়া-দাওয়া ত ভাইএর কাছে চলতে পারে কিন্তু মাথাটা গুঁজব কোথায় ? তাঁদের ওখানে ত ছাই বেশী জায়গাও নেই। নীচের তলায় থাকতেন একজন অতি দরদী উদার বঙ্গসন্তান। তিনি সব দেখে শুনে বললেন, ওহে থাকার জায়গার অভাব ? বেশ ত আমার একখানা ঘর পড়ে থাকে খালি, সেখানে এসো না। কে তিনি জানো ? তিনি বিখ্যাত সাংবাদিক কেশবচন্দ্র রায়। তাঁর নাম করতে গিয়ে স্যারের মাথা নত হয়ে এল। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। বললেন, তিনি (কেশবচন্দ্র) শুধু সে ক'দিনের জন্যই আমাকে আশ্রয় দেননি, চিরটি জীবন দারিদ্রে, সংগ্রামে, বেদনায় আনন্দে কেশবচন্দ্র এই দীনকে আড়াল করে রেখেছেন। আজ ভাই এই উষানাথের কোন অস্তিত্ব থাকতো না যদি সেদিন কেশবচন্দ্র আমাকে তাঁর পাশে না ডেকে নিতেন।

এই কেশবচন্দ্র তখন "Indian Daily News" (ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্) এ স্পেশাল করেসপণ্ডেণ্ট। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যাঁকে এ সম্মান দেওয়া হয়। তখন সরকার সিমলা-কলিকাতা অফিস চালাত। শীতে সকলে কলকাতা নেমে আসত।

১৯০৩ সালে এই পত্রিকায় আমি আনপেইড (বেতন বিহীন) এ্যাপ্রেণ্টিস হয়ে ঢুকি। কাগজটার মালিক ছিলেন তখন উইলিয়ম গ্রেহাম। ১৯ নম্বর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে এর অফিস ছিল। এই পত্রিকা পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কিনে নিয়ে "Forward" পত্রিকা প্রকাশ করেন। Forward-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। দশটা থেকে ছটা পর্য্যন্ত এ অফিসে আমায় খাটতে হত—অবশ্য বিনা বেতনে ! একটি বছর এ রকম ভাবে কাটবার পর দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ১৯০৪ সালে "Telegraph" পত্রিকায় আমার চাকরী হল। প্রুফরীডারের র‍্যাঙ্ক। তুমি সাব-এডিটরও বলতে পারো, কেন না মাঝে মাঝে ও কাজও আমায় করতে হত। মাসিক পারিশ্রমিক ঠিক হল ১৮৲ টাকা ! কাজটা পেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। কিন্তু তা হবার নয়। ছ'মাস পর ছাঁটাই হল অফিসে। আঘাতটা আমাকেও স্পর্শ করল—আমার সাধের চাকরীটি গেল।

১৯০৫ সালে পঞ্চম জর্জ ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন—প্রিন্স অব ওয়েলস্ হিসেবে। কেশব বাবু তখন অনুগ্রহ করে এই রাজপরিবারের সাথে আমাকে "Bengalee" (স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পত্রিকা) "Amrita Bazar", "সন্ধ্যা বর্তমান" (বম্বে) ও মাদ্রাজের "Hindu" পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করিয়ে দিলেন। সিমলায় কেশব বাবু এই সব কটা কাগজেরই বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। হ্যাঁ, ঠিক কথা, এর সাথে লাহোরের "Tribune" ও জুড়ে দিয়েছিলেন।

এত ক'দিনের কাজ। তারপর আবার সেই সিমলার দিকেই ছুটলাম। এবার কেশব বাবু আমাকে তাঁর এ্যাসিষ্টেণ্ট করে নিলেন।

একটা কথা তুমি লিখতে পারো, আমার Press Room কার্ড-খানায়, যখন আমি "হিন্দুর" স্পেশাল করেসপণ্ডেণ্ট হই ভারত সরকারের রেজিষ্টারে, ভারতের হোম-সেক্রেটারী হার্বার্ট রিসবি (Harbart Risbey) সই করেন। কে এই রিসবি মনে পড়ে ?—সেই অত্যাচারী বৃটিশ শাসক প্রতিনিধি রিসবি, কার্জনের সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের

স্যার উষানাথ সেন

ডেস্‌পাচখানি যিনি ছেড়েছিলেন? কে এই রিস্‌লি জানো? "বন্দে মাতরম্‌" কে যিনি পৃথিবীর চোখে বিকৃত ব্যাখ্যায় ঘোষণা করেছিলেন—"Arti British war cry" বলে।

এই সময়ে কেশব বাবু "প্রেস ব্যুরো" নাম দিয়ে বিদেশী সাংবাদিক প্রভাবান্বিত নিউস্‌ এজেন্সি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেন। সার উষানাথ ছিলেন কেশব বাবুর ডান হাত। টেলিগ্রামগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে উষানাথের কাছে যেত। তিনি সেগুলো সম্পাদনা করে বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতেন। টেলিগ্রামের খরচাতেই সব টাকা চলে যেত। লাভ কিছুই হত না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে কেশবচন্দ্র ভারতীয় তারের নিয়মাবলী (Indian Telegraph Act) পরিবর্তন করালেন। উষানাথ, কলকাতা বম্বে, মাদ্রাজ নিউস্‌ এজেন্সির ব্রাঞ্চ-অফিস খুললেন। প্রতিটি দৈনিক পত্রিকা মাসে ৩৫০৲ করে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দিত (ব্যুরো ও প্রেস মিলে গেছে তত দিনে), টেলিগ্রামের বিল প্রেসকে দিতে হত। এদিকে অর্থের অনটন। সিমলার দু'খানা বাড়ী বিক্রী করেও রায় মশাই, উষানাথ, প্রেস সামলাতে পারেন না। কি হবে? উষানাথ বললেন রয়টারের প্রস্তাবে মত দিলে কেমন হয়? ১৯১০ থেকে রয়টারের ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে এজেন্সি চালালেন। কর্ণধার হিসেবে ১৯৫০ পর্য্যন্ত এর কাজ অব্যাহত রাখেন স্যার উষানাথ। ১৯৫১ সালে উষানাথ অবসর গ্রহণ করেন।

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া স্যার উষানাথকে ১৯৫১-৫৪ সাল পর্য্যন্ত মাসোহারা বৃত্তি দিয়ে এসেছে। এ বছর থেকে সেটা বন্ধ হয়েছে দেখে হতবাক্‌ হলাম।

বললাম, স্যার উষানাথের পেন্সন যদি পি টি আই বন্ধ করতে পারে, তাহলে সাধারণ নগণ্য সাংবাদিক তাঁর শেষ জীবনে কি ঘটবে জেনে ভয় পাবে না সার? পি টি আই ত আপনারই হাতে-গড়া তাই নয়? এ সব দেখে নগণ্য দীন সাংবাদিক আমরা যদি বিচলিত হই তবে কি সেটা ভুল হবে? ভারতবর্ষে সাংবাদিকের ভবিষ্যৎ আপনার মতে কি অন্ধকারময় নয়?

হেসে বললেন, দেখো ভাই, সাংবাদিকদের একটা সর্বভারতীয় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত। তাদের কাজ হবে প্রধানতঃ দুটো—এক, সাংবাদিকতার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই শুধু এ পেশা গ্রহণ করতে দেবার অধিকার। তাদের দেখতে হবে যাতে করে যে সে এসে দুম্‌ করে সাংবাদিক হয়ে না বসেন। সাংবাদিকতার একটা উঁচু ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, দেখতে হবে পত্রিকার, নিউস এজেন্সির যাঁরা মালিক বা কর্তা তাঁরা যেন অন্যায় ভাবে কাউকে তাদের অধিকার এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত না করেন। সাংবাদিকের মতন পেশা, যদি তার উপযুক্ত মর্য্যাদা না পায় তাহলে বলতে হবে দেশের লোকের রুচি ও শিক্ষা সার্থক হয়নি। এজন্য সাংবাদিকদের সর্বপ্রথম কর্তব্য, জনমত সংগঠন। জনমত পিছনে থাকলে ন্যায্য মর্য্যাদা, ন্যায্য দাবী থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। ভারতের সাংবাদিকদের শুধু যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে তাই নয়, আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, ভারতের সাংবাদিককে তাঁর উপযুক্ত উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে ভারতের জনমত। এই আশা নিয়েই আমি আমার সতীর্থ যাত্রীদের প্রণাম করি।

আমি সাংবাদিক বলে উষানাথের আদর-যত্নের সীমা ছিল না। অতি নগণ্য, দীন সাংবাদিক, ভারতের বর্তমান সাংবাদিকতার জনকের সন্দর্শনে গিয়েছিলাম সঙ্কোচে, সম্ভ্রমে, ভয়ে, মাত্র ক'টি মহামূল্য মুহূর্ত কাটাতে। তাঁর অসুস্থতার জন্য, আমার সঙ্কোচ ছিল আরও বেশী। কিন্তু আজ আমি সর্বভারতের সকল সাংবাদিককে বিশেষ করে বিনীত ভাবে বলব, তোমাদের আসন সমাজের শীর্ষে চালিয়ে নেবার যে তপস্যা চলেছে, তোমাদের জীবন-সংগ্রামের ঘনঘোর আঁধারে তার পথপ্রদর্শক তাপসের রূপ দেখেছো? তাঁর স্নেহসিঞ্চিত আশীর্বাণী নিয়েছো কি মাথায় তুলে? না দেখা সতীর্থদের পক্ষ থেকে দীন সাংবাদিক আমি জানিয়ে এলাম সে তাপসকে সশ্রদ্ধ প্রণতি।

বললাম, বাংলা পড়েন? আজ-কাল? বললেন পড়ি বই কি। এই ঘর (ওয়েষ্টার্ণ কোর্টের দোতলার ৪, ৬ নম্বর কামরা) ত রয়েছি মাত্র ২২ বছর ধরে—১৮৮০ সালের ৬ই অক্টোবর যেদিন জন্মগ্রহণ করি সে ত এ মাটি নয়। সে যে আমার অতি প্রিয় গরিফার (নৈহাটির কাছে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মস্থান) শ্যামলিম মাটি।

বাংলা বই কিনতে ত পারতুম না। টাকা কোথায় পাব? "বসুমতীর" সতীশ বাবু আমায় খুব ভালবাসতেন। তাঁর বউবাজারের বাড়ীতে প্রায়ই যেতুম। তিনিই তাঁর সাহিত্য মন্দির থেকে একসেট বাংলা বই দিয়েছিলেন।

স্যার উষানাথ জীবনী এবং ইতিহাস পড়তে খুব ভালবাসেন। আমি যখন ঘরে ঢুকলুম তখন তিনি Perez Zagorin-এর লেখা History of political Theory in the English Revolution পড়ছিলেন। শিয়রের বুকশেলফ্‌ ভর্তি রয়েছে গীতা, ভাগবত, বেদান্ত। উষানাথ প্রতিদিন গীতা পাঠ করেন।

স্যার উষানাথ জার্মাণী, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ঘুরে এসেছেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলার মাটিই তাঁর কাছে সর্বপ্রিয় লাগে।

উষানাথের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুস, পিয়ার্সন সাহেব, গোখালে সাহেব, সার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু। উষানাথ নয়াদিল্লীর জিমখানা ক্লাবের প্রথম ভারতীয় সভাপতি। বর্তমানে তিনি অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস্‌ এ্যাণ্ড ক্র্যাফট্‌ সোসাইটির সভাপতি। দিল্লী রোটারি ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। স্যার উষানাথের অক্লান্ত পরিশ্রমে দিল্লীর পাবলিক স্কুল (বর্তমানে সমগ্র ভারত বিখ্যাত) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার উষানাথ আজীবন এই স্কুলের গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট্‌। সেনট্রাল প্রেস অ্যাডভাইসরি ইনি সর্বপ্রথম চেয়ারম্যান। দিল্লীর প্রেস এ্যাসোসিয়েশনের ইনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মাসিক বসুমতীর তিনি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

(অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ)

একজন আদর্শ শিক্ষক। শুধু আদর্শ শিক্ষক নন, শ্যামাপদ বাবু নিজের জীবনকে ছাত্রগুলির জীবনের সঙ্গে এমন একাঙ্গ করে ফেলেছেন যে, আজ ষাট বছর বয়সে অসুখ শরীরেও দিনের পর দিন ক্লাস করে চলেছেন তিনি। নিজেই বললেন, কত দিন বাড়ীতে বসে ভেবেছি যে, আজ আর ক্লাস করতে কলেজে যাবো না। তারপর যেই দশটা বেজে ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দিকে এগিয়েছে অমনি মনে হয়েছে, যাই আজকের ক্লাসটা করে আসিগে। না হয় একটা ক্লাস নিয়েই বাড়ী চলে আসব। কিন্তু তা আর হয় না। একটা ক্লাস নিয়ে এসে প্রফেসরস রুমে বসে বসে লিজার সময় কাটাবার পর যখন ঘণ্টা পড়ে পরের ক্লাসের, তখনই মনে হয়, যাই নাম ডেকে ছেলেগুলিকে ছেড়ে দেব। কিন্তু ক্লাসে গিয়ে রোল কল করে আর ছেড়ে দেওয়া হয় না তাদের। কচি কচি এক গাদা মুখ সামনে দেখলে আমার ভেতরে কি যেন ভর করে। আমি পড়িয়ে যাই এবং কখন যে ঘণ্টা শেষ হয়ে যায় বুঝতে পারি না। পরে অবশ্য খুবই কষ্ট হয় কিন্তু পড়াবার সময় কিছুই বুঝতে পারি না। বরং বড় আনন্দ পাই।

১৩০২ সালের ১৮ই ভাদ্র বর্দ্ধমান জেলার নাসি গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। এখান থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্ত্তী কসি গ্রাম তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি। সেখানকার স্কুল থেকেই পাস করলেন ম্যাট্রিকুলেশন। তারপর কলকাতায় এলেন সিটি কলেজে পড়তে। সিটি থেকে আই. এ. পাস করেই জীবন-সংগ্রাম সুরু হল তাঁর। সামান্য একটি এম. ই স্কুলের হেডমাষ্টারের কাজ। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে আবার সংস্কৃত কলেজ থেকে বি. এ। আবার ডাক পড়ল শিক্ষকতায়। এবার অনেক তফাতে। খুলনা জেলার টাউন শ্রীপুর গ্রামের স্কুলের এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার। সেইখান থেকেই এম. এ পরীক্ষা দিয়েছেন প্রাইভেটে। বাংলায়। উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রথম শ্রেণীতে। তার পর ১১২৮ সালে বঙ্গবাসী কলেজে এসেছেন অধ্যাপক হয়ে এবং আজও করে চলেছেন সেই কাজ।

জিজ্ঞাসা করলাম, সাহিত্যকার্য্য কিছু করেছেন কি না?

নিশ্চয়ই। 'পরিচয়' যখন সুরু হয়েছে কেবল মাত্র (সুধীন দত্তের) তখন আমি নিয়মিত তাতে কবিতা লিখতাম। অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও কবিতা লিখেছি প্রচুর। অবশ্য কুড়িয়ে নিয়ে বই করা আর হয়নি সেগুলির। শুধু 'ওমর খৈয়ামে'র এক বঙ্গানুবাদ করেছি মূলের মাধুর্য্য বজায় রেখে। নিজের কবিতার বই হয়েছে 'পুরুষ ও নারী'। তাছাড়া স্কুল-কলেজের বই তো লিখেছি বহু। এর মধ্যে 'ফিগারস্ অব স্পিচ' এর বাংলায় প্রথম বই লেখার কৃতিত্ব আমারই।

সখ কি আপনার? মানে এই অবসর সময় কাটান কেমন করে?

ঘরের চার ধারে শুধু দর্শন আর কবিতার বই। আলমারী ভরা। বিবেকানন্দ রোডের ওপর তিন তলার ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে সেগুলি যেন ধরছে না।

তবু কিছু একটা সখ? বাতিক?

আছে কিছু কিছু। যখন যেটা শিখব ভেবেছি দিন-রাত লেগে গেছি তার পিছনে। ফটোগ্রাফীর সখ ছিল এক কালে প্রচুর। শুনলে হাসবেন যে ফটোগ্রাফী ভাল বুঝব বলে 'অপটিকস'এর বইপত্তর পড়েছি আমি বাংলার ছাত্র হয়েও। গান-বাজনার সখ অনেক দিনের। আগে গাইতেন। এখন আর অভ্যাস করেন না। পাখীর সখ আছে প্রচুর। চার চারটে নাইটিঙ্গল কিনেছিলেন একবার।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার হাতে একখানা ম্যাগাজিন ছিল এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে। করোনেট। ওপরে কয়েকটা পাখীর ছবি। নিমেষ মাত্র দেখে বললেন, বস্ত্রী পাখি না? বড় সুন্দর পাখী। জাভা-মালয়ের দিকে পাওয়া যায়।

আমি হতবাক্। পাখীর নাম আজও মুখস্থ আছে তাঁর।

মাসিক বসুমতীর প্রসঙ্গ আনলেন নিজেই। বললেন, আর তো উঠতি মাসিকই নেই। সবই পড়তির মুখে। বসুমতীর নতুন নতুন 'ফিচার'গুলি আমার বড় ভাল লাগে। নিবেদিতার জীবনী, পত্রগুচ্ছ ইত্যাদিগুলি আমার বড় প্রিয়। কত অজানা কথা জানতে পারছি।

বললাম, আমাদের কাগজ কেমন লাগে তাহলে তা আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই? কি বলেন?

অন্য কোনও কাগজ তো পড়ি না। তাঁর উত্তর।

বিদায় নিয়ে আসবার আগে আত্মীয়-বিচ্ছেদের ব্যথা লাগছিল আমার। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই মানুষকে কত আপনার করে নিতে পারেন, বাসে বসে বসে ভাবছিলাম তাই।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

শ্রীঅমল হোম

[বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবী]

"মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভরে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।" এ প্রাণখোলা আশীর্ব্বাদ যিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন বর্তমান যুগের অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এ আশীর্ব্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁর ঘটলো তিনি হচ্ছেন বাঙ্গালার অন্যতম কৃতী সন্তান শ্রীঅমল হোম। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র সুবিদিত। কিন্তু একজন কর্ম্মী পুরুষ ও সংগঠক হিসেবেও তাঁর স্থান যে কত উঁচুতে কথাশিল্পীর এ আশীর্ব্বাদের ফাঁকে সে জিনিসটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে—জাতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করা হ'লো এবং সে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিতও হ'লো সর্ব্বদিক থেকে। জাতি এ মহৎ অনুষ্ঠানের জন্য নিশ্চয়ই গৌরব ক'রতে পারে কিন্তু সর্ব্বাধিক গৌরবের দাবী সে দিন ক'রতে পেরেছিলেন শ্রীঅমল হোম। অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক হিসেবে বিশ্বকবির উপযুক্ত মর্য্যাদা দানের ব্যবস্থার জন্য তিনি যা ক'রেছিলেন তা সত্যই অতুলনীয়। সে জন্যেই অনুষ্ঠান সমাপ্তির পরই জাতির পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র পত্র লিখে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন—মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভরে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

সাংবাদিক অমল হোম—এ যুগের ব'লতে গেলে একটা বিস্ময়। ১৯১০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি যখন কলেজে ভর্ত্তি হলেন, তখন থেকেই তাঁর লেখা সুরু হ'লো সাময়িক পত্রাদিতে। সাংবাদিকতার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল জীবনের আরও গোড়া থেকেই। এ'র একটা অনিবার্য্য কারণও ছিল। তাঁর পিতা স্বর্গীয় গগনচন্দ্র হোমও ছিলেন একজন সাংবাদিক ও লেখক। সে কালের সাময়িক পত্র "আলোচনা"র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিখ্যাত "সঞ্জীবনী" পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পিতার সাংবাদিক জীবনের স্বাভাবিক প্রভাব বালক অমল হোমের উপর পড়েছিল, এ অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীঅমল হোম

শ্রীহোমের সক্রিয় সাংবাদিক জীবনের আরম্ভ ১৯১০ সালেই ব'লতে পারি—যখন তিনি সবে কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা—আমি তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, 'প্রবাসী'তে আমি লিখতে সুরু ক'রলুম। লিখতে যেয়ে প্রচুর উৎসাহ জুটলো স্বনামধন্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে রামানন্দ বাবুর কাছেই আমার সাংবাদিকতার হাতে-খড়ি।

এর পর থেকে শ্রীহোম সাংবাদিক-জীবনে এগিয়ে চললেন ধাপে ধাপে। ১৯১৫ সালে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। অল্পদিন মধ্যেই এখানে তাঁর যোগ্যতা ও কর্ম্মক্ষমতার ছাপ পড়লো। পর বৎসরই লক্ষ্ণৌএ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের অধিবেশনে তিনি শুধু "বেঙ্গলী"ই নয়, 'বেঙ্গলী' এবং রামানন্দ বাবুর 'মডার্ণ রিভিউ'-এ দুয়েরই বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে প্রেরিত হ'লেন। ১৯১৬ সালেই তিনি পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত 'দি পাঞ্জাবী' দৈনিক সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এর পর শ্রীহোম এসে যোগদান করলেন লাহোরেরই বিখ্যাত "ট্রিবিউন" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তৎকালীন ট্রিবিউন সম্পাদক কালীনাথ রায় রাজনৈতিক কারণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে তাঁর উপরই এ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বৎসর। এত অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী না হলে কারও পক্ষে এত অল্প বয়সে দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

'ট্রিবিউন' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কালে শ্রীহোম পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত (হাণ্টার) কমিটির অধিবেশন কালে ট্রিবিউন-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত রিপোর্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এমন কি, তা বিলেত ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেস 'পাঞ্জাব' সংবাদপত্রের এবং ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে 'ট্রিবিউন' কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কাজ করেন। এ সময় তাঁর উপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর (ভারতের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী) দৃষ্টি পড়ে। নেহরুজী তাঁকে আহ্বান করে নিলেন এলাহাবাদের দৈনিক পত্র 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'-এ। স্বনামধন্য জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল সে সময় এ কাগজ-এর সম্পাদক আর তিনি নিযুক্ত হলেন এর সহ-সম্পাদক। পরে তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'-এর ম্যানেজিং এডিটর পদেও অধিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন কিছু কালের জন্য। ১৯২১

সালে তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' ছেড়ে চলে আসেন ক'লকাতার 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় ব্যারিষ্টার মিঃ উইলিয়াম গ্রেহামের সাগ্রহ আমন্ত্রণে। তিন বছরের অধিক কাল তিনি এ পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তার পর কিছু কালের জন্ম 'প্রোপার্টি' পাত্রিকাতেও কাজ করেন তিনি।

১৯২৪ সালে শ্রীহোমের পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের হয় সূত্রপাত। ক'লকাতা কর্পোরেশন তখন নতুন আদর্শ ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে। এক দিকে এ'র প্রথম মেয়র পদ অলঙ্কৃত ক'রলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অপর দিকে এর প্রথম ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র (নেতাজী)। এ মুহূর্ত্তে দেশবন্ধুর কাছ থেকে আহ্বান পেলেন শ্রীহোম কর্পোরেশনের মুখপত্র "ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট" এর প্রথম সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হ'বে। স্বদেশবাসীর সেবার এ অপূর্ব্ব সুযোগ তিনি সানন্দে গ্রহণ ক'রলেন। এবং অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলেন এর সম্পাদনার কাজ। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদকরূপে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্ম তিনি শুধু বাঙ্গালা নয় সর্ব্বভারতের সুধী ও মনীষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হ'য়েছেন। দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বিশেষ কৃতিত্ব ও সুনামের সঙ্গে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প কাল পর ডাঃ বিধানচন্দ্র যখন পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রচার অধিকর্ত্তার পদের জন্ম শ্রীহোমকেই মনোনীত করা হ'লো। পাঁচ বৎসর কাল এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর পেয়েও তাঁর কর্ম্মি-মন নিশ্চেষ্ট থাকতে চাইল না। অল্প দিন মধ্যেই ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ ক'রলেন তিনি। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন তাঁর অসামান্য যোগ্যতা ও কর্ম্মকুশলতার জন্যেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তাঁকে 'প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন' অফিসার পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। শ্রীহোম সে আমন্ত্রণ রক্ষা করেন এবং সে থেকে আজ অবধি এ পদেই অধিষ্ঠিত র'য়েছেন তিনি।

সাংবাদিক জীবনের পাশাপাশি শ্রীহোমের আর একটি জীবন চ'লে আসছে, যেটাকে বলা চলে সমাজ-সেবকের জীবন। তিনি বরাবরই দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণ মূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে কলকাতায় যে প্রথম নিখিল ভারত সমাজসেবা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তিনিই ছিলেন এর সংগঠক সম্পাদক। ১৯৩৫ সালে তৎকালীন সরকারের উদ্যোগে বাঙ্গালায় যে 'শিল্প সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়, শ্রীহোম ছিলেন এরও প্রচার অধিকর্ত্তা। পর বৎসর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সর্ব্বভারতীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্মেলনের শিল্প বিভাগে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। ১৯৪৮ সালে ক'লকাতায় যে নিখিল ভারত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, এ'র সংগঠন ব্যাপারেও শ্রীহোমের অবদান কম ছিল না, এ প্রদর্শনীর সংবাদপত্র শাখা সংগঠনের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরই।

বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, একাডেমী অফ ফাইন আর্টস (কলকাতা), বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগ, ক্যালকাটা হিষ্টিক্যাল সোসাইটী প্রভৃতি বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সংস্থার তিনি সদস্য ছিলেন বা আছেন। বর্ত্তমান সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে শ্রীহোম মাসিক বসুমতীর একজন বিশেষ গুণগ্রাহী। তাঁকে বলতে শুনলুম—"এতে সকলের জন্ম সব রকমের রচনা পাওয়া যায়। সংগ্রহের দিক থেকে এগুলো সত্যি মূল্যবান। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক এজন্ম জনসাধারণের প্রশংসার দাবী করতে পারেন।"

শ্রীঅমল হোমের জীবনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহের ব্যাকুলতা, তাঁর বাসভবনে তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার রয়েছে—যা দেখলে অবাক হ'তে হয়। সাহিত্য, কলা, কাব্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস—সকল ধরণেরই গ্রন্থাদি তাঁর মনোরম গ্রন্থাগারে সাজান রয়েছে। জ্ঞান আহরণের ব্যাকুল আগ্রহ না থাকলে এমনটি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তিনি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'লামা' ছদ্ম নামে তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে আসছে।

শ্রীহোম আজ পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছেন কিন্তু তাঁর ভেতর এখনও রয়েছে প্রচুর কর্ম্মশক্তি। ক্লান্তির কোন ছাপই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি এখন অবধি। দেশ ও জাতিকে তিনি আরও অনেক দিয়ে যেতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমরা রাখবো।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

বাংলা মায়ের আমরা মালাকর।
বাউলি গড়ি, বাউটি গড়ি,
গড়ি পৈঁছে বিছে ছড়।
সারা বছর ব্যস্ত কাজে,
পিতমে সাজাই ডাকের সাজে,
মোদের হাতের পরশ পেলে—
তবেই হাসে ঠাকুর-ঘর।
গুজরী খাড়ু, কাকী হারে,
কানবালা চিক্-চিকণ তারে,
কণ্ঠা সীঁথি তুরঙ্গ পটী—
বানাই চৌদানী-মকর।
বাজু-বন্ধ, রতনচূড়ে,
সোনার কাপে বসাই জুড়ে;
চাঁদমালা নে' নিঙড়ে খেরা।
ধই রে কদম ফুলের 'পর।
হাতড়ে মোদের ভাবের ঝুলি,
মনের মতন রতন তুলি;
বসাই পটে চাল-চিত্তিতে
রূপের বেসাত মনোহর।

চরকায় তেল পড়ে, পাছে শব্দ হয় ক্যাঁচ ক্যাঁচ!

কেঁদে কেঁদে কখন যে ঘুমে অচেতন হয়েছেন বিলাসবাসিনী, কেউ জানতে পারে না। সেবিকা আর পরিচারিকার দল কারণে অকারণে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য ক'রেও ত্যাগ করে না তাদের রাজমাতাকে। দশমহাবিদ্যার কাহিনী শুনতে শুনতে কেন কে জানে, বড় বেশী ভীতা হয়ে উঠেছিলেন রাজমাতা। সক্রোধে বিতাড়িত করেছেন পদসেবায় রত সেবিকাদের। তিরস্কারের সুরে কথা বলেছিলেন। দক্ষকন্যার কাহিনী কথনে বিরতি দিয়ে স্নিগ্ধ-শীতল কুঠরীর বাইরের দালানে তারা জড় হয়েছে। আবার কখন রাজমাতা ডাক পাড়বেন কে জানে! ওদের কেউ কাঁথায় নক্সা তোলে, কেউ সুপারী কুঁচায়, কেউ চরকা কাটে। সকলেই নীরব নির্ব্বাক্। কথা বলাবলিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় যদি, ঘুমের যদি ব্যাঘাত হয় রাজমাতার! একেই তিনি মর্ম্মাহত, বিষণ্ণ, অশান্ত। রাগারাগি, কান্নাকাটি, বকাবকি থামিয়ে এতক্ষণে তিনি চোখে-পাতায় এক করেছেন, সেবিকার দলও নিশ্চিন্ত হয়েছে। হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছে। তবুও রাজমাতার মহল ত্যাগ করতে সাহসী হয় না কেউ, কখন কাকে ডাকেন তার ঠিক নেই। কখন ঘুম ভাঙ্গে! ঘুম ভাঙ্গলেই তিনি ডাক ছাড়বেন। চোখের সমুখে হাজির না থাকলে, কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলবেন। কত কটু কথা বলবেন! সেই ভয়ে কেউ আর এক দণ্ডের তরে বিশ্রাম নিতে যায় না। কুঠরীর দালান ছেড়ে যায় না।

খোলা দালানে কাঠ-ফাটা রৌদ্র। তপ্ত বাতাস। কুঠরীর ছাদে এক-জোড়া চিল, পরিত্রাহি চিৎকার করছে। বৈশাখের থমথমে অপরাহ্ণ চিল-চেঁচানোর বিরাম বিহীন শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। সূর্য্যের তাপে জ্বালা ধরে দেহে, সহ্য করতে হয় দাসীদের, মুখ বুঁজে। চরকার চাকা ঘুরালে পাছে ক্যাঁচকেঁচিয়ে ওঠে, তাই তেল দিতে হয় ঘন ঘন। কেউ কাঁথায় নক্সা তোলে, কেউ সুপারী কুঁচায়, কেউ কেউ চরকায় সুতো কাটে।

—ব্রজ কমনে গেলে? ব্রজবালা!

দাসীরা একসঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে। হাতের কাজ বন্ধ করে। থেমে যায় চরকার ঘূর্ণন। চিলের একটানা একঘেয়ে ডাক শুনে উঠে পড়লেন না কি রাজমাতা!

—পোড়ারমুখো চিল! ফিসফিসিয়ে বললে এক দাসী।

খাস-চাকরাণী ব্রজবালা চরকায় ব'সেছিল। উঠে পড়লো সাত তাড়াতাড়ি। বিনম্র কণ্ঠে সাড়া দিলো,—যাই হুজুরণী! এই এলাম ব'লে।

কুঠরীর দ্বার না পেরোতেই বিলাসবাসিনী কেমন যেন খুশী-খুশী কথা বলেন। বললেন,—হ্যাঁ রে ব্রজ, সাতগাঁ থেকে জগমোহন এলো?

বস্ত্রাঞ্চলে কপালের ঘাম মুছতে থাকে ব্রজবালা। বলে,—সাতগাঁ কি এক দিনের পথ হুজুরণী! তুমি ব্যস্ত হও কেন?

কাঠ-ফাটা রোদের আলো থেকে একেবারে অন্ধকার কুঠরীতে। চোখে যেন আঁধার দেখে ব্রজ। চোখ রগড়ায়।

—ত্যাখ ব্রজবালা, ইষ্টদেবীকে স্বপ্ন দেখেছি এই দুপুরে।

রাজমাতার হাসিমাখানো কথা, বলেন যেন কত পরিতৃপ্তির সুরে। কোথায় গেল বিলাসবাসিনীর উগ্রমূর্ত্তি, ভাবলো ব্রজবালা। বললে,—হুজুরণী, আপনার কি ভাগ্যি! তা কি দেখলে কি?

চোখের প্রান্ত আঁচলে মুছলেন রাজমাতা। আনন্দাশ্রু মুছলেন। বললেন,—আমার ইষ্টমূর্ত্তিকে দেখেছি, হাতে বরাভয় মুদ্রা। মুখে এক-মুখ হাসি।

—তোমার কি সৌভাগ্যি হুজুরণী? কোন' আদেশ পেঁছ না কি?

সাগ্রহে শুধোলে ব্রজবালা, মুখে সরল হাসি ফুটিয়ে।

এতক্ষণে যেন তার চোখে পড়লো রাজমাতাকে। স্বচ্ছ চোখে দেখলো, বিলাসবাসিনীর প্রসন্ন বদন, অধরে হাস্যরেখা।

রাজমাতা সহাস্যে বললেন,—তা তোকে বলবো কেন? বললে ফলে না। স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যায়।

খিল-খিল হাসলো ব্রজবালা। হাসি থামিয়ে বললে,—শুনতে আমি চাই না হুজুরণী! তোমার মুখে হাসি দেখেছি, আর কিছু চাই না আমি।

শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে বসেছেন বিলাসবাসিনী। কুঠরীতে একটি মাত্র দ্বার। হাওয়া খেলে না কুঠরীতে। হাত-পাখা চালনা করেন রাজমাতা স্বয়ং। পাখার বাতাস খেতে খেতে বললেন,—সাধ যায়, সাতগাঁ চলে যাই। দেখে আসি আমার বিন্দুরাণীকে। বাছা আমার কেমন আছে কে জানে!

ব্রজবালা বললে,—দাও পাখাখানা আমাকে দাও। আমি বাতাস করি। সাতগাঁ যাওয়া-আসা কি মুখের কথা হুজুরণী! হুট বলতেই কি যাওয়া যায়? নৌকায় যেতে এক দিন, আসতে এক দিন।

—অনেকটা পথ, নয় রে ব্রজ? একান্ত অজ্ঞের মত শুধোলেন বিলাসবাসিনী।

—তা আর নয়? বললে ব্রজবালা। পাখার বাতাস দিতে দিতে বললে,—নৌকায় গেলে এলে আপনার কষ্ট হবে। আপনার শরীরে কুলোবে না।

অগত্যা সপ্তগ্রামে গমনের প্রসঙ্গ ত্যাগ করলেন রাজমাতা। খানিক চুপচাপ থাকতে থাকতে বললেন,—কেষ্টরাম মরে না কেন? বিন্দু আমার বিধবা হলেও সুখে থাকবে।

নকল তিরস্কারের সুরে ব্রজবালা বললে,—কি যে ছাই বল হুজুরণী! মেয়ে বিধবা হোক, এমন কথা বলতে আছে না কি!

হতাশ-শ্বাস ফেললেন বিলাসবাসিনী, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—কত দুঃখে যে এমন কথা মুখে আসে! বিন্দু আমার কখনও সুখ পায়নি। কেষ্টরাম ঘর করে না তার সঙ্গে। কুলাঙ্গারটা শুনতে পাই কুলাচার্য্য হয়েছে। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়েছে। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে বললেন,—ব্রজ, রোদ পড়েছে? চল্ ঘাটে যাই।

—না হুজুরণী! বললে ব্রজবালা।—কুঠরীর দুয়োরে এখন রোদ্দুর। ডালান পেরুতে পা তোমার সেঁকে যাবে। রোদ পড়লে যেও। সবে এখন বোশেখ মাস, তাতেই এই চড়া রোদ! না জানি কত গরম পড়বে এখনও!

যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না রাজমাতা। মন থেকে মুছতে পারেন না। বললেন,—কেষ্টরাম ম'লে আমি হরির লুঠ দেবো!

কথায় কথায় কথাই বাড়ে। ব্রজবালা নিরুত্তর থাকে। পাখা চালিয়ে বাতাস দেয়। চমকে ওঠে হঠাৎ ব্যাঘ্র-নিনাদ শুনে। রাজার পশুশালায় মাংসলোলুপ বাঘ ডাকছে। ক্ষুধা পাওয়ার ডাক ডাকছে।

কুলীনশ্রেষ্ঠ জমিদার কৃষ্ণরাম যেন অব্যয়, অক্ষয়। দুর্দ্দমনীয়!

উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত কৃষ্ণরামের গৃহের ফটকে হাতী বাঁধা। সজ্জিত হাতী। তাদের গলে রৌপ্যখচিত ঘণ্টামালা। মস্তক খড়িরেখায় অঙ্কিত। কর্ণদ্বয় সিন্দুরলিপ্ত। ললাটে সিঁদূরের সুবৃহৎ ফোঁটা। পৃষ্ঠের উপর আমাড়ি-হাওদা, বন্ধনরজ্জু রক্তবর্ণ। স্কন্ধের 'পরে খর্ব্বপ্রায় মাহুত। তার হাতে যমদণ্ডের মত বক্র অঙ্কুশ। জমিদার-গৃহের দ্বারের সম্মুখে সারি সারি শ্বেতবর্ণ অশ্ব। নানা রঙের শোভা অশ্বের বেশ-ভূষায়। অশ্বসমূহ অত্যন্ত তেজস্বী। পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীবা বক্র। কর্ণ উচ্চ। পদবিক্ষেপে ধরা খনন করে। অশ্বসমূহের সোনার খলীন ও জরির বল্‌গা। অশ্বের বল্‌গা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে এক এক সুসজ্জিত পুরুষ। অদূরে আরও একজন—স্বর্ণদণ্ডে রেশমের পতাকা ধরেছে। গৈরিক পতাকা। পতাকায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যচিহ্ন। জমিদার-গৃহের প্রাঙ্গণে আশা ও সোটাধারী প্রায় পঞ্চাশ জন ইতস্ততঃ বিচরণ করছে।

গ্রীষ্মদিনের উষ্মাধিক্য কতক্ষণে হ্রাস পায়, সেই প্রতীক্ষায় আছেন জমিদার কৃষ্ণরাম। সপ্তগ্রামের কুলীনশ্রেষ্ঠ কুলাচার্য্য, গৃহপ্রাঙ্গণের এক বহুবিস্তৃত বটবৃক্ষের ছায়াবেদীতে ব'সে অশ্ব এবং হস্তিযূথকে নিরীক্ষণ করছিলেন। সগর্ব্ব দৃষ্টিতে দেখছিলেন ওদের সাজ-সজ্জা, বেশভূষার রত্নশোভা। জমিদার-গৃহের প্রাঙ্গণ ছায়া-শীতল। বট আর অশ্বত্থের বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা ভেদ করতে পারে না সূর্য্যরশ্মি। আম, জাম, নোনা আর লিচু গাছে কাক, কোকিল আর কাঠ-ঠোকরার সমাগম হয়েছে। ফল ধ'রেছে গাছে গাছে।

গ্রীষ্মের উষ্মা। স্পন্দমাত্র বাতাস নেই। প্রাঙ্গণে শুধু অশ্বের পদাঘাত-শব্দ। কখনও বা হাতীর ঘণ্টামালার কণ্ঠহার ঢঙ ঢঙ শব্দ তোলে। ক্বচিৎ কখনও হয়তো অঙ্গ সঞ্চালন করে হাতী।

জমিদার কৃষ্ণরামের অনতিদূরে দণ্ডায়মান এক শটকাধারী। তাম্রকূট সেবন করেন কৃষ্ণরাম, মৌতাত করেন। তাঁর দুই পার্শ্বে দু'জন শ্বেত চামরধার। তারা সুবেশ, সুকান্ত। চামরের মৃদু-মন্দ বাতাসে জমিদারের আঙরাখার প্রান্ত কম্পমান হয়। কৃষ্ণরামের বেদীর পাদমূলে বিশ্রামরত দু'টি চিতা। চোখ-বাঁধা চিতাবাঘ। শিকারী চিতা। ওদের কণ্ঠলগ্ন শৃঙ্খল কৃষ্ণরামের হাতে। আরেক হাতে শটকার নলমুখ। হীরামুক্তা-শোভিত সোনার সর্পমুখ।

শীতের রাত্রি ফুরায় না। গ্রীষ্মের দিনও যেন শেষ হয় না। পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ হয় না সূর্য্যের। অদূরের প্রাচীর-গাত্রে লক্ষ্য করেন কৃষ্ণরাম। লক্ষ্য করেন রৌদ্ররেখা, কোথায় উঠলো। কোথায় অস্তগামী সূর্য্য!

—কুলাচার্য্য, যাত্রায় দেরী কি ?

কোথা থেকে এলো কথার সুর ! প্রাঙ্গণের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো।

কৃষ্ণরাম বঙ্কিম গ্রীবায় দেখলেন। বললেন,—রঙ্গলাল, তোমরা প্রস্তুত ?

—হাঁ কুলীনপ্রধান ! দলবলসমেত প্রস্তুত। যাত্রা করলেই হয়।

রঙ্গলাল কথা বলে প্রসন্ন কণ্ঠে। কটিদেশের বন্ধনী শিথিল করে, কথা বলতে বলতে। বলে,—সময় দেন তো দু'-এক পাত্র শেষ ক'রে লই।

চক্ষু পাকালেন কৃষ্ণরাম। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—এই দিনমানে ? এই দারুণ গ্রীষ্মে ? এখনই ?

জমিদারের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ শুনে যেন চমকে চমকে ওঠে রঙ্গলাল। তবু ভয় জয় ক'রে বললে,—পেয়ালা পানের দিন-ক্ষণ থাকে না কি ? কুলাচার্য্য, তোমার কুলবেদের কুলবিধি আমার 'পরে চাপাও কেন ?

হেসে ফেললেন কৃষ্ণরাম। তাঁর সমগ্র দেহ হাসির বেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাসতে হাসতেই বললেন,—মত্ত না হও, নতুবা আমার আর কি ! রঙ্গলাল, তুমি আমাদের সহগামী হবে, দেখিও আমার অসম্মান না হয়। সমাজের নিকট যেন মাথা নত না হয় !

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে রঙ্গলাল। বলে—আমি কি তেমনই যে তোমার অসম্মানের নিমিত্ত হবো ?

কৃষ্ণরাম বললেন,—তথাপি সাবধান হতে দোষ কি ? যাও, শীঘ্র আসিও। অধিক বিলম্ব না হয়।

পত্রবহুল শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে এক টুকরো রৌদ্ররশ্মি পড়ে জমিদারের অঙ্গে। রঙ্গলাল স্থান ত্যাগ করে না। বিমুগ্ধ চোখে জমিদারকে দেখে। কৃষ্ণরামের সুগঠিত সবল শরীর। ঈষৎ স্থূলকায়, কিন্তু কিঞ্চিৎ লম্বা ছাঁদের জন্য তত স্থূল বোধ হয় না। কেশের কোন বিন্যাস নেই, মাথায় শিখা। বর্ণ শুভ্র। পরিধানে লাল চেলীর ধুতি-চাদর। কানে সোনার কুণ্ডল, কণ্ঠে স্বর্ণসূত্রে গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হস্তে সোনার ইষ্টকবচ, রূপার বলয়, রত্নাঙ্গুরীয়। বক্ষে উপবীত। বাম বাহুতে সোনার তাগা। কোমরে রূপার বিছা। পায়ে শিশুকাঠের খড়ম। কপালের মধ্যস্থলে চুয়া ও চন্দনের মঙ্গল-তিলক।

জমিদার পুনরায় কথা বলেন।—বৃথা কালক্ষেপ কর কেন ?

রঙ্গলাল মিটি-মিটি হাসে। বলে,—কুলাচার্য্য, বৃথা কালক্ষেপ নয়, তোমার নয়নাভিরাম মূর্ত্তি দেখে দেখে আশা আমার মিটে না। তাই দেখি।

কৃষ্ণরাম নীরব হলেন। দেখলেন, প্রাঙ্গণের শেষ সীমায় উচ্চ প্রাচীরগাত্র ; দেখলেন, রৌদ্রকিরণ আরও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠেছে। শট্‌কার মুখনলে ঘন ঘন টান দেন আর দেখেন।

রঙ্গলাল আবার কথা বলে।—কুলাচার্য্য, দত্ত-কন্যা যে বড় বেশী কান্নাকাটি করে। এখন উপায় ?

জমিদার ন'ড়ে চ'ড়ে বসেন। প্রচুর ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে করতে বললেন,—কোন এক সৎপাত্রে দত্ত-কন্যাকে দান করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখি না। সপ্তগ্রামে জমিদার কৃষ্ণরাম জীবিত থাকতে মুসলমানের গৃহে হিন্দু রমণীর বিবাহ দেওয়া চলবে না। তা তুমি নিশ্চিত জানিও। পাত্রাভাবে দত্ত মশাই মুসলমানের সহ তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে চান।

রঙ্গলাল বললে,—সৎপাত্র কোথায় ? আমাদের হিন্দু পাত্রগণ অভাবের দুঃখে বর্ত্তমানে বিবাহের তেমন পক্ষপাতী নয়।

কৃষ্ণরাম কেমন যেন উগ্র চোখে তাকালেন। বললেন,—তবে মুসলমানের ঘরেই যাক যতেক হিন্দুকন্যা ? জাত, কুল, মান কিছুই তবে তো রক্ষা হয় না !

রঙ্গলাল বললে,—অভাবের তাড়নায় মানুষ কি আর করে !

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তাকুল থাকেন জমিদার। বলেন,—তবে দত্ত-কন্যাকে আমার গৃহেই রাখি, যত দিন না তাকে এক সৎপাত্রে দান করা যায়। গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হোক সে।

রঙ্গলাল নিম্ন কণ্ঠে বলে,—লোকে মন্দ বলবে যে ! কুলাচার্য্য, তোমার চরিত্রে দোষ পড়বে।

হাসলেন কৃষ্ণরাম। নিশ্চিন্ততার পরিতৃপ্তি হাসি, বললেন,—এমন হাস্যকর কথা আর ব'ল না। লোকের বলাবলির আমি তোয়াক্কা করি না, তা তোমার অজানা নয়। যে যা বলে বলুক !

রঙ্গলাল হঠাৎ ঘুরে-ফিরে নাচতে থাকে। এক হাত মাথায় এক হাত কোমরে দিয়ে নর্ত্তকীর ঢঙে ঘুরে-ঘুরে নাচে আর গায়,—

লোকের কথায় কান পাতি না, কানে দিছি তুলো,
লোকের মারের ভয় করি না, পিঠে বেঁধেছি কুলো
আমি কানে দিছি তুলো।

তেমন সুরেল কণ্ঠ নয় রঙ্গলালের। তবুও যেন শুনতে ভাল লাগে। দেখতে কৌতুক হয় নর্ত্তকীর অনুকরণে রঙ্গলালের নাচ। জমিদার হেসে ফেললেন গান শুনে আর নাচ দেখতে দেখতে। নাচ শেষ হ'তে বললেন,—আর বিলম্ব নয়, আমি এখনই যাত্রা করবো।

—অদ্যকার গন্তব্য কি ? রঙ্গলাল প্রশ্ন করলো সহাস্যে।

জমিদারের ওষ্ঠে হাস্যরেখা ফুটেছে, তাই তার আনন্দ যেন ধরে না। কৃষ্ণরাম বললেন,—সপ্তগ্রামের চার ক্রোশ উত্তরে পরমানন্দ রায়ের বসতি। পরমানন্দ নৈকষ্য কুলীন, তদুপরি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। পরমানন্দর দুই কন্যা বর্ত্তমান।

রঙ্গলাল বলে,—দুই কন্যাই কি অনূঢ়া ?

ওপরে-নীচে মাথা দোলালেন কৃষ্ণরাম। বললেন,—হ্যাঁ। গত পরশ্ব পরমানন্দ স্বয়ং আসেন। তাঁর দুই কন্যাকে দেখার জন্য অনুরোধ জানান। দেখাই যাক্ না সুরূপা না কুশ্রী। অদ্য বৈকাল থেকে শুভসময় আছে। উত্তরমুখে যাত্রা শুভ।

রঙ্গলাল বলে,—কুশ্রীর লক্ষণ কি কুলাচার্য্য ?

কৃষ্ণরাম ধূমপান করেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,—লক্ষণ এক নয়, বহু।

জমিদারের কাছাকাছি এগিয়ে চোখবাঁধা শিকারী চিতা দু'টির সান্নিধ্যে পৌঁছে ভয় পেয়ে ফের পিছু হটে রঙ্গলাল। বলে,—যথা ?

কৃষ্ণরাম বুঝি বিরক্ত হন। ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করেন। অবাধ্য এক টুক্‌রো রৌদ্ররশ্মির আলোয় কৃষ্ণরামের ঘোর লাল চেলীর ধুতি-চাদর জৌলুস ছড়ায়।

সোনার গাত্রালঙ্কার চিকচিকিয়ে ওঠে। রত্নাঙ্গুরীয় দ্যুতি ঠিকরোয়! নবরত্নের অঙ্গুরীয়। কৃষ্ণরাম বিরক্ত সুরে বললেন,—রঙ্গলাল, তবে আমি যাত্রা করি। তুমি নাচন-কুঁদন দেখাও।

এক লম্ফ দিয়ে সুস্থির হয়ে দাঁড়ালো রঙ্গলাল। বললে,—অধীর হও কেন কুলাচার্য্য ? আমার গমনাগমনে কতই বা সময় যায়! যাবো আর আসবো। এই চললাম তো। আমি কি জানবো যে আমাদের সপ্তগ্রামের কুলশ্রেষ্ঠ নারীলক্ষণম্ অবগত নন ?

হাসলেন কৃষ্ণরাম! মৃদু হাসি। অপেক্ষমান বাহকের হাতে সমর্পণ করলেন হাতের শট্‌কা, রূপালী জরি জড়ানো। চোখ-বাঁধা চিতাদের গললগ্ন শৃঙ্খল নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে বেষ্টন করতে করতে বললেন,—যথাকালে বিবৃত করবো। যাও শীঘ্র আসিও, নচেৎ তুমি বিনাই—

রঙ্গলাল প্রায় দৌড়ানোর কায়দায় পা চালালো। দ্রুত গতি চলন না দৌড় ঠিক বোঝা যায় না! জমিদার-গৃহের আঙিনায় কর্ম্মচারী, পাইক, সিপাই ও ভৃত্যেরা ইতস্তত: ঘোরাফেরা করে। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে সারি সারি অশ্ব। হস্তিযূথ। কয়েক জন নিম্নপদস্থ ঐ পশুদের পরিচর্য্যায় রত। রঙ্গলালের চলনের ভঙ্গী দেখে কেউ কেউ হাসলো, শব্দহীন হাসি।

কৃষ্ণরামও হাসলেন। একটি চিতার মাথায় হাতের পরশ বুলাতে বুলাতে তিনিও মৃদু মৃদু না হেসে পারলেন না! জমিদার কৃষ্ণরাম আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ হাসি খুশী। চোখে গর্ব্বময় দৃষ্টি ফুটিয়ে আছেন সদাক্ষণ। তাঁর অঙ্গভঙ্গীতে স্কন্ধ ও বাহুর পেশীসমূহ কখনও কখনও স্ফীত হয়ে উঠছে। ডান হাতের নবরত্নাঙ্গুরীয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন।

কুলচূড়ামণি কৃষ্ণরাম। কুলীনশ্রেষ্ঠ:।

হাঘরের বওয়াটে বাউণ্ডুলে নয়, জমিদার। ভূস্বামী। বিত্ত প্রচুর, তাই চিত্তবৈকল্য নেই। মুখে নেই চিন্তার মলিন কালিমা। হাওড়া, হুগলী, বীরভূমের যত নৈকষ্য, শ্রোত্রিয় আর বংশজদের বংশে কৃষ্ণরামের নাম সুপরিচিত। জমিদার কৃষ্ণরাম, শোনা যায়, সেই সাবর্ণ-গোত্রধারী বেদগর্ভের উত্তর-পুরুষ। কৃষ্ণরাম দীঘড়ী গাঞি। হুগলী জেলার জাহানাবাদ থেকে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে দারুকেশ্বর নদীতীরের দীর্ঘ বা দীঘড়া গ্রামে কৃষ্ণরামের আদিপুরুষের বাস।

হরিমিশ্রকৃত কুলপঞ্জিকায় আছে, এই দীঘড়ী বা দীর্ঘাঙ্গ বা দীর্ঘ গাঞির নাম। বন্দ্যঘটী, কুসুমকুলী, কেশরকোনী, মুখৈটি, চট্ট, সিমলাই, ভূরসুট, পিপলাই, ঘোষাল আর পাকড়াসীর সঙ্গে আছে দীর্ঘ নামের উল্লেখ। হরিমিশ্রের কুলপঞ্জিকার এক নকল আছে কৃষ্ণরামের কাছে। তালপত্রের একটি পুঁথি। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করেছেন কৃষ্ণরাম, কুলজ্ঞদের সাহায্যে পেয়েছেন দীঘড়ী গাঞির নাম।

বল্লালসেন বহু কাল গতায়ু হয়েছেন। গৌড়াধিপ বল্লাল অতুলনীয়। তিনিই তো প্রথম, আদি কুলাচার্য্য। কুলশাস্ত্রের সূত্রপাত তিনি। তারপর দেবীবর। তারপর ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, মহেশ আর দনুজারি মিশ্র, তারপর হরিকবীন্দ্র, হরিহর ভট্ট। তারপর ?

নৈকষ্য, শ্রোত্রিয়, বংশজদের সমাজে তারপর কৃষ্ণরামের নাম। কুলাচার্য্য কৃষ্ণরামের কুলবিচার জ্ঞান না কি অসামান্য! জটিল ও দুর্ব্বোধ্য কুলশাস্ত্রসমূহ না কি তাঁর নখদর্পণে।

সমাজে নানা ভাব। নানা থাক। নানান শ্রেণী।

কুলীন-সমাজ এখন মেলী কুলীন-সমাজে পরিণত। কত দোষে ভারাক্রান্ত! প্রকৃত কুল আছে কি নেই বোঝা যায় না। সেই সমাজের চূড়ায় বসে আছেন কৃষ্ণরাম, সেই ছত্রভঙ্গ সমাজের চূড়ামণি তিনি। গর্ব্বের হাসি ফুটবে না কৃষ্ণরামের অধরে! তাঁর পেশী স্ফীত হবে না!

দোষ করলে, প্রতিকার আছে। দোষ ধরবেন কৃষ্ণরাম, প্রায়শ্চিত্তের বিধান দান করবেন। তথাপি কুল নষ্ট হ'তে দেবেন না। বিবিধ দোষে দোষীদের কানে কানে কৃষ্ণরাম বলেন,—

আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়॥

যারা দোষ করে তারা শাস্তি চায় না, পতিত হতে চায় না, হ'তে চায় না সমাজচ্যুত। প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। কৃষ্ণরাম তাদের কানে বলেন,—

দোষ পায় যদি তার প্রায়শ্চিত্ত ধরে।
কুলবেদে প্রায়শ্চিত্ত যদি কুল ধরে॥
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম্ম॥

কুলীন-সমাজের পরশমণি কৃষ্ণরাম!

—আমিও তৈয়ার কুলাচার্য্য! আপনি গাত্রোত্থান করেন।

রঙ্গলালের বিকৃত কণ্ঠস্বর। পেয়ালা-পানের সঙ্গে সঙ্গে, কথার ধরণের সঙ্গে সুরেরও বিকার হয় রঙ্গলালের। যেন মন্ত্রবলে ফিরে পায় হারানো উদ্যম। মুখে খুশীর হাসির ঝিলিক তুলে বলে,—এক শুভকাজে যাওয়া, দেখি ভাল হয় না মন্দ হয়। কন্যা দু'টি মহাশয়ের মনে যদি ধরে, তবে কি বিবাহে ইচ্ছা করেন ?

—বাহক-ধারীদের বিদায় দেও রঙ্গলাল!

কথা বলতে বলতে নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে জড়ানো শৃঙ্খল—চোখ-বাঁধা চিতার গললগ্ন শেকল খুলতে থাকেন। কথা শেষ হ'তেই সেই শেকল হস্তান্তরিত করলেন এক বাহককে। বেদী ত্যাগ ক'রে উঠলেন ধীরে ধীরে।

বাহক আর ধারীদের বলতে হয় না। এ আজ্ঞা তাদের অতি পরিচিত। বলা মাত্র তারা চঞ্চল হয়।

চোখ-বাঁধা চিতাদের গলায় টান পড়লো। তারাও উঠলো। বাহকদের পিছু পিছু চললো। লোহার খাঁচায় ঢুকতে চললো।

সপ্তগ্রামের আশ-পাশে বন-জঙ্গল। বাদা আর জঙ্গল। ব্যাঘ্র বরাহ নেকড়ে শৃগাল হায়েনার বসতি সেই গভীর অরণ্যে। গণ্ডার, বন্যমহিষেরও সাক্ষাৎ মেলে বনের গহ্বরে। এই হিংস্র-করাল অরণ্যচারীদের ভয়ে ভয়ার্ত্ত শূকরের পাল জঙ্গলের সীমানা থেকে ছিটকে আসে মানুষের চোখে, তখন ঐ চোখ-বাঁধা চিতার চোখের আবরণ উন্মোচন ক'রে দেন—কৃষ্ণরাম, যেদিন তিনি শিকারে যান সদলবলে।

কৃষ্ণরাম বললেন,—বিবাহে বাধা কি? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, যদি দায় উদ্ধার হয়?

রঙ্গলাল শুধোয়,—ব্রাহ্মণ কোন্ গাঞি?

—সিঙ্গল গাঞি। হুগলীর সিঙ্গল গ্রামে ব্রাহ্মণের আদিনিবাস। কৃষ্ণরাম কথা বলেন পরিতৃপ্তির সুরে। বলেন,—বিবাহে তোমার আপত্তি কেন রঙ্গলাল?

—বিবাহ করবেন কুলাচার্য্য আপনি। রঙ্গলাল কথা বলে হেসে হেসে। কৌতুক-মিশ্রিত হাসি হেসে বলে,—আপত্তি হবে এই অধমের? কদাচ নয়। কথা বলতে বলতে বারেক থেমে আবার বলে,—ব্রাহ্মণের সাতশতীর সংস্রব ঘটে নাই কি না জানেন? আপনাদিগের রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণে বহু দোষ স্পর্শেছে। ভাগ্য ভাল যে দেবীবর মেলবন্ধনের প্রচার করেন!

—দোষ দেখতে নাই রঙ্গলাল! বললেন কৃষ্ণরাম। সাজানো হাতী যেদিকে, সেদিক ধ'রে এগোলেন। বললেন,—প্রায়শ্চিত্তে দোষ কাটে।

—ব্রাহ্মণ মুখ্যকুলীন না গৌণকুলীন? প্রশ্ন করলে রঙ্গলাল। বললে,—না কি শূদ্রদানগ্রহণকারী বংশজকুলীন? আপনি তো মুখ্যকুলীন-বংশোদ্ভব!

—গৌণকুলীন। সহাস্যে বললেন কৃষ্ণরাম।

—তবে উপায়?

নকল চিন্তা ফোটে রঙ্গলালের মুখাকৃতিতে। নকল গাম্ভীর্য্যের সুরে কথা বলে।

হাসলেন কৃষ্ণরাম। পরাজয়ের শুষ্কহাস্য নয়, বিজেতার গর্ব্বভরা হাসি। বললেন,—মহারাজ দনৌজমাধবের নাম জানো রঙ্গলাল?

খুব জানি মহাশয়! সহগামী রঙ্গলাল বলে। বলে,—বল্লালসেন আর আপনাদিগের লক্ষ্মণসেনের মত ব্যবস্থা দনৌজমাধবই পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন।

কৃষ্ণরাম হাতীর কাছাকাছি পৌঁছে বললেন,—মহারাজ দনৌজমাধব যেমন তিন পুরুষের মধ্যে যে কোন পুরুষে হোক পরিবর্ত্ত দ্বারা কুলরক্ষার ব্যবস্থা করেন, সেই সঙ্গে এরূপও নিয়ম করেন যে, পরস্পর মুখ্যকুলীনের মধ্যে বিনিময়ের সুবিধা না হয় তো গৌণকুলীনের সহিতও পরিবর্ত্ত চলতে পারে।

—বংশজ না হয়, আমার সেই ভয়!

রঙ্গলালের চিন্তাকুল কণ্ঠ। পেয়ালা-পানের পর কিছু বা গম্ভীর।

হাতী আর দাঁড়িয়ে নেই। মাহুতের নির্দ্দেশে ভূমিতে আসীন। হাওদার রূপার হাতলে হাত দেন কৃষ্ণরাম। বলেন,—না বংশজ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত হও রঙ্গলাল! আমি অর্থ চাই, অর্থদানে সে ব্রাহ্মণের কার্পণ্য নাই।

কথার শেষে হাওদায় উঠতে সচেষ্ট হন।

—মহাশয়ের সহগমনে কে বা কারা যাবে বলেন নাই তো? রঙ্গলাল কথা বলতে বলতে নিজের নির্দ্দিষ্ট অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলো।

ক্ষণেক চিন্তার পর ইতি-উতি তাকিয়ে দেখতে দেখতে জমিদার কৃষ্ণরাম বলেন,—লোকবল চাই। পথও সামান্য নয়, চার ক্রোশটাক। পারিষদ-পদাতিক সঙ্গে লওয়া চাই।

—যথা আজ্ঞা। বললে রঙ্গলাল। নির্দ্দিষ্ট এক অশ্বের পৃষ্ঠে চাপড় দিতে দিতে বললে,—মহাশয়, আপনি এক খ্যাতিমান ব্যক্তি, আপনকার তাঁবে কত রেসালা, পেয়াদা, সিপাহী! যেমত হুকুম হয় তেমত ব্যবস্থা পাকা হোক! আপনি যাত্রা করেন। সমারোহের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে না।

সশব্দ হাতীর ঘণ্টামালার ঢঙ্ ঢঙ্ শব্দ। হাতীর গজচালনে দূরভেদী নিনাদ শোনা যায়। রক্তবর্ণ বন্ধনরজ্জুতে আবদ্ধ আমাড়ি-হাওদায় বসেছেন কৃষ্ণরাম। সগর্ব্বে দেখছেন ইতি-উতি। মাহুতের অঙ্কুশ আঘাতে হাতী সচল হয়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

সর্ব্বাগ্রে দুই অশ্বারোহী যায়। সশস্ত্র ও নিশানধারী। মধ্যাহ্ন সূর্য্যচিহ্ন অঙ্কিত রেশমের গৈরিক পতাকা তাদের হাতে। কৃষ্ণরামের কীর্ত্তিপতাকা উড়ছে যেন! অতঃপর স্বয়ং কুলাচার্য্য যাত্রা করেন। জমিদার-গৃহের তোরণ-ফটকে পৌঁছে কৃষ্ণরাম পিছু ফিরে একবার দেখলেন। সারি সারি সশস্ত্র অশ্বারোহী অনুসরণ করে। কারও হাতে পানপত্রাকৃতি বিচিত্র অভয়। সকলেরই বামকটি থেকে সকোষ তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলছে। অশ্বসারির পেছনে খাসা খাসা খাসগেলাপ-ওয়াস৷ খাসবরদার, আসাবরদার, চোপদার, জমাদার, পদাতিক, সিপাহী।

—জমিদার কৃষ্ণরামের জয়!

সম্মিলিত জয়ধ্বনির সঙ্গে জগঝম্প আর তাসাকড়কা বেজে উঠলো। গাছে গাছে পাখীর কলরোল শুরু হয়। হঠাৎ মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার ও যুগপৎ বাদ্যধ্বনি শুনে হয়তো ভীত হয় পক্ষিকুল। সর্ব্বশেষে তার নির্দ্দিষ্ট অশ্বপৃষ্ঠে চললো

রঙ্গলাল। পেয়ালাপানের প্রথম নেশাটুকু মাত্র ধরেছে এতক্ষণে,—রঙ্গলালের মুখে চপল হাসি ফুটেছে তাই। গুন্ গুন্ শব্দে গান ধরেছে রঙ্গলাল। কি এক রসের গানের কলি ধ'রেছে, অস্পষ্ট সুরে।

—জমিদার কৃষ্ণরামের জয়!

জয়ধ্বনি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোরণ-ফটক অতিক্রম করে শোভাযাত্রা। সপ্তগ্রামের মলিন-বন্ধুর পথ অশ্বের পদাঘাতে ধূলি উড়ায়। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আলোয় চাকচিক্য তোলে গৈরিক নিশান। জমিদারের রূপার আমাড়ি-হাওদা আলো ঠিকরোয় মুহুর্মুহুঃ।

পথের পথিক সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে পথিপার্শ্বে দাঁড়ায়। আনত মস্তকে অভিবাদন জানায় কুলাচার্য্যকে।

জমিদার কৃষ্ণরাম কত গণ্যমান্য, তবুও কথায় কথায় যখন তখন তাঁকে গালিবর্ষণ করেন রাজমাতা। সময় আর অসময়ের বাছ-বিচার করেন না। স্থান, কাল আর পাত্র বাছেন না। যেমন খুশী যা মুখে আসে বলেন। কৃষ্ণরামের মৃত্যু কামনা করেন। কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর বৈধব্য প্রার্থনা করেন।

বাতায়নহীন স্নিগ্ধ-শীতল কুঠরী রাজমাতার একটি মাত্র দ্বার কুঠরীতে।

মুক্ত দ্বারপথে দেখলেন বিলাসবাসিনী, শুভ্র ও নীল মেঘাবৃত আকাশ দেখলেন। দেখে অনুমান করতে পারলেন না, বেলা শেষ হ'তে কত দেরী আর। সূর্য্যাস্তের বিলম্ব কত! শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। পুরানো বাতের ব্যথা দুই পায়ে। পায়ের গ্রন্থিসমূহ টনটনিয়ে উঠলো যেন।

ইষ্টমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখেছেন রাজমাতা। মূর্ত্তির হাতে শঙ্খমুদ্রা দেখেছেন, গভীর ঘুমের ঘোরে। মনের জ্বালা, বুকের ক্ষোভ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছে। ইষ্টদর্শনে এখন তাঁর শান্তচিত্ত। শান্তকণ্ঠে বিলাসবাসিনী বললেন,—দ্যাখ, ব্রজ, আমার কাশীকে আজ অযথা অনেক অকথা-কুকথা বলেছি। ছোটকুমারের জন্যি মনটা কেমন আঁকুপাঁকু করছে। একেই সে কিছু চাপা প্রকৃতির, না জানি কত কষ্টই না পেয়েছে!

ব্রজবালা ক্ষীণ হাসি হাসলো। বললে,—আগ্‌লে যে তোমার জ্ঞানগম্যি কিছুই থাকে না।

—যা বলেছিস ব্রজ! বললেন রাজমাতা। বহু কষ্টে শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যথার কষ্টে কি না কে জানে, মুখ বিকৃত করলেন। বললেন,—পায়ের রক্ত যে আমার মাথায় উঠে যায়! ঐ তো রোগ আমার! সর্ব্বাঙ্গে বাত আর মাথায় রক্তের চাপ—তাতেই তো ম'লাম আমি!

সহজে সোজা দাঁড়াতে পারলেন না বিলাসবাসিনী। ব্রজবালার কাঁধে হাত রাখলেন। নিজের দেহের বিপুল ভার সামলাতে পারেন না, যেন অবিচল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বললেন,—আগে একটু সামলাই, তারপর ঘাটে যাবো। কথা থামিয়ে আবার কথা বললেন,—আমার কাশীকে কাছে পেলে কিছু সান্ত্বনা দিই, বাছাকে আমার অনেক কটু বলেছি রাগের মাথায়!

ব্রজবালা বললে,—এত কোপ তোমার রাজমাতা! কোন দিন মাথাটি না বিগড়ে যায়! কুমার বাহাদুর আপনাকে কত শ্রদ্ধাভক্তি করেন তা কি জানেন না?

বিলাসবাসিনী বললেন,—যা বলেছিস ব্রজ! কাশীকে একবার না দেখলে মনটা কিছুতেই স্থির হবে না।

কথার শেষে পা চালালেন তিনি। অত্যন্ত ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সন্তর্পণে।

পশ্চিমাকাশে সিঁদূর ছড়ালো যেন! রৌদ্রের রঙে লালিমা ফুটলো যেন! রাজার পশুশালায় বাঘ ডাকলো কয়েক বার। প্রতিদিন ঠিক এই বেলাশেষের ক্ষণে বাঘের ডাক শোনা যায়। ক্ষুধার্ত্ত হয় হয়তো দিনশেষে। কাঁচা মাংসের লোভানি জাগে লোলুপ রসনায়। লালা ঝরে মুখ থেকে।

আকাশের পশ্চিম-প্রান্তে হেলে পড়ে বৈশাখের প্রখর সূর্য্য। পূর্ব্ব-প্রান্তে আঁধারের কৃষ্ণরেখা উঁকি মারে। দিগ্বলয়ে যেন কলঙ্ক পড়ে।

এত কথা, এত কটু কথা শুনিয়েছেন রাজমাতা, কাশীশঙ্করের কোন' বিকার নেই তবু।

কুমারের ওষ্ঠপ্রান্তের হাসি যেন মিলায় না। যেন তিনি রাগ, দ্বেষ আর অভিমান বিসর্জ্জন দিয়েছেন। অন্দর মহলের এক কক্ষে, মহাশ্বেতার খাস-কামরায় তখন ভূতলশায়ী কাশীশঙ্কর! অগ্নিবাহী উষ্ণ প্রবাহ বইছে বাইরে। মাঠ-ঘাট তেতে উঠেছে! অন্দরের দালান-প্রাচীর পর্য্যন্ত তপ্ত হয়ে ওঠে। দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করতে ইচ্ছা হয় না, যে জন্য ভূতলেই বিশ্রাম করেন কুমার বাহাদুর! ময়ূর-পালকের এক হাত-পাখা সঞ্চালনে ব্যজন করেন মহাশ্বেতা। তেজারতী কারবারের চিন্তায় সদাই আকুল কাশীশঙ্কর! সেরেস্তা-ঘরে খাতা-লেখার কাজ চুকিয়ে অন্দরে ফিরেছেন, বেলা যখন শেষাশেষি! এক পাত্র গোলাব-শরবৎ পান ক'রে ভূতলেই আশ্রয় নিয়েছেন।

মহাশ্বেতার ক্রোড়ে মাথা রেখেছেন। ময়ূর-পালকের হাত-পাখার বাতাস দিতে দিতে কি এক কথার উত্তরে মহাশ্বেতা মিষ্ট-নম্র কণ্ঠে বললেন,—কুমার বাহাদুর, ধান-চালের কাজে ব্রাহ্মণের অধিকার আছে তো?

কক্ষে তৃতীয় লোক কেউ নেই। কুমার-পত্নীর মিষ্ট কণ্ঠ যেন তানপুরার ধ্বনি তুললো। হাত-পাখার মিষ্ট বাতাসে সুগন্ধের তরঙ্গ খেলতে থাকে ঘরে। কোথা থেকে সুবাস ভাসে কে জানে! পিতলের ফুলদানিতে গন্ধরাজের স্তবক। গন্ধবারি-সিঞ্চিত ময়ূর-পালকের হাত-পাখা। ময়ূরপুচ্ছে দিলরুবার নির্য্যাস ছিটিয়েছেন মহাশ্বেতা! বকুল ফুলের কেশতৈল মেখেছেন মেঘবরণ রাশি রাশি কেশে। অধরও তাম্বুলরাগরক্ত। তাম্বুলীতে মৃগী হেনার ছিটা দেওয়া!

—হয়তো নাই। কাশীশঙ্কর বললেন, উর্দ্ধদৃষ্টে চেয়ে। সহধর্ম্মিণীর রাঙা অধর পানে তাকিয়ে!

টকটকে লাল সীমন্ত মহাশ্বেতার। সিঁদুরের উজ্জ্বল লাল

রেখা সীঁথিতে। সেদিকে চোখ পড়ে না কুমারের। এত ঘোর লাল, তবুও দৃষ্টি পড়ে না। নজরে পড়ে শুধু ঐ মুখবিম্বের টুকটুকে লাল অধরোষ্ঠ!

মহাশ্বেতা বললেন,—অধিকার যদি না থাকে, তবে কি হবে?

—রাজরাণী আগে কও, ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণ আছে আর? আমিও সে বড়াই করি না। কাশীশঙ্কর দীপ্ত কণ্ঠে কথা বলেন। বক্ষ কাঁপিয়ে যেন কথা বললেন।

—এ কেমন কথা? কি এমন অন্যায় করলেন?

কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্বেতার সূক্ষ্ম দুই ভ্রূ সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। ঠোঁটেও যেন কুঞ্চন ফুটলো।

কাশীশঙ্কর বললেন,—উপবীতই ব্রাহ্মণের লক্ষণ নয়! ব্রাহ্মণ শব্দের বিশেষণ যে তোমার অজানা। ব্রাহ্মণ ছিল সেই বৈদিক যুগে। এ যুগে ব্রাহ্মণ কৈ?

—তবু, কাজে লাভ-লোকসান আছে। বললেন মহাশ্বেতা। মিহি মিষ্ট কণ্ঠে বললেন,—কথায় বলে,যার কর্ম্ম তারই সাজে। ধান-চালের কারবারে যদি কোন অমঙ্গলই হয়?

মহাশ্বেতার একখানি নধর-নরম হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরলেন কুমার বাহাদুর। বললেন,—মঙ্গলামঙ্গলের ভয় আমি করি না রাতরাণী! বঙ্গলক্ষ্মী ধান্যশালিনী, বাঙলায় ধান-চালের ব্যবসায় তাই মোটা আয়! সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ লোকের এখন প্রধান খাদ্য এই ধান!

কেমন যেন নীরব নিথর হন মহাশ্বেতা। নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ। কুমার বাহাদুরের কথাগুলি শুনে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হন।

কাশীশঙ্কর মহাশ্বেতার হিমশীতল হাতখানি নিজের কপালে রাখলেন। বললেন,—ধানের কিছুই ফেলা যায় না। শস্য থেকে গাছের কিছুই বিনষ্ট হয় না।

—কেন?

কেমন যেন বিমুগ্ধের মত বললেন কুমারপত্নী। একটি মাত্র কথায় একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন। অভিধানে এই কেন শব্দটি না থাকলে না জানি পৃথিবীতে আরও কত কথাই সৃষ্ট হ'ত!

কাশীশঙ্কর বললেন,—একে একে গণনা কর রাতরাণী! প্রথমতঃ শস্য থেকে ধান হয়, চাল হয়। আবার তা থেকে মুড়ি হয়, চিঁড়া, খুদ হয়, কুঁড়ো হয়, আবার তুষ, ঝাড়, সবেদা হয়, মন্ড তৈয়ারী হয়, ধানের গাছ থেকেই খড়-বিচালী হয়।

এক নিশ্বাসে যেন কথাগুলি বলে গেলেন কুমার বাহাদুর। বলতে বলতে মুখে যেন তাঁর আত্মগর্ব্বের আভাস ফুটলো। বললেন,—ধান-চালের কাজ খুব লাভজনক।

মহাশ্বেতা বললেন,—ব্যবসা কেমন ধারায় চলবে?

কুমারপত্নীর সুডৌল হাতখানি ধীরে ধীরে সচল চঞ্চল হয়ে ওঠে। কুমারের কপালে হাতের পরশ বুলাতে থাকেন।

—ধান-চালের আড়ং ক'টায় কোন প্রকারে সিঁদানোই কাজ। কথা বলতে বলতে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয় কাশীশঙ্করের। এ যেন এক কষ্টকঠোর ব্রত, যার উদ্‌যাপনে অনেক মেহনতের প্রয়োজন। বললেন,—সুতানুটীর আশ-পাশেই সাত-সাতটা আড়ং আছে।

মহাশ্বেতার কথায় কৌতুহলের সুর। বললেন,—কোথায়?

কাশীশঙ্কর বলেন,—হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর চড়াহাট, চিৎপুরের হাট, উল্টাডিঙ্গি, বেলেঘাটা, চেতলার হাট, মুন্সিগঞ্জ, জানবাজারের হাট। এই সব আড়ংএ খরিদ-বিক্রয় হয়। তামাম বাঙলা দেশের ধান-চালের কেনাবেচা চলে হাটগুলোয়।

কুমারের কথা শুনতে শুনতে, ধান আর চালের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে মহাশ্বেতা অবাক মানেন যেন! কাশীশঙ্করের সুদীর্ঘ চোখে যেন চোখ রাখতে পারেন না অধিকক্ষণ। কি ব্যাকুল দৃষ্টি কুমার বাহাদুরের চোখে! কোন্ এক লজ্জায় রাতরাণী আপন নাসিকাপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অঙ্কশায়ীর ললাটে শীতল করস্পর্শ দেন।

—মা গো, তুমি কৈ?

দুয়োর থেকে কে যেন কথা বলে। আধো-আধো কণ্ঠস্বরে।

অচিরাৎ উঠে পড়লেন কাশীশঙ্কর। উঠে বসলেন।

মহাশ্বেতা বলেন—আয় বনলতা।

আকাশের পরীর মত কোথা থেকে উড়ে আসে যেন কিশোরী। শুধু পাখনাই নেই! লালপাড় সূতিবস্ত্র বনলতার দেহে, সাপের মত পাক খেয়ে খেয়ে জড়িয়ে আছে যেন। লাল রেশমী পাড়।

দুই বাহু প্রসারিত করলেন কাশীশঙ্কর। কন্যাকে বক্ষে জড়ালেন।

বনলতা বললে,—ঘুম ছাড়তে উঠে দেখি, মা তুমি নেই। আমি কত কেঁদেছি তোমাকে না দেখে!

বনলতার কাজল-কালো চোখের পাতায় জল। কান্নার করুণ সুর যেন তার কথায়।

বনলতার একটি পোষা বিড়াল আছে। বনলতা যা খায় তাই তাকে খাওয়ায়। বনলতা যখন যেখানে যায়, সে-ও সেখানে যায়। বিড়ালটি দ্বারের বাইরে থেকে মিউ-মিউ শব্দে ডাকে!

বনলতা বললে,—যাও পুষি, দাসীর কাছে যাও। দাসী তোমাকে দুধ দেবে।

বিড়াল শোনে না। হয়তো বনলতার ভাষা বোঝে না। আবার ডাক দেয়, মিউ-মিউ। যেন বনলতার কথায় সাড়া দেয়।

কাশীশঙ্কর হাসলেন, প্রায় অট্টহাসি। বক্ষে ধারণ করলেন বনলতাকে। যেন এক পুতুল ধরলেন। মহাশ্বেতাও হাসলেন, মৃদু-মন্দ হাসি। বৈকালী আলো-ছায়ায় আর তাঁর হাস্যচাঞ্চল্যে দেহের অলঙ্কাররাজি ঝলমলিয়ে উঠলো। এতক্ষণ কুমারের কথা শুনতে শুনতে যেন ঠিক পাষাণের মত অনড় অচল হয়েছিলেন। [ক্রমশঃ।

কাগজের তৈরী সরস্বতী-মূর্ত্তি

১১৪নং জি, টি রোডে এই কাগজ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজা হয়। শিল্পী গোপালচন্দ্র মণ্ডল ও দেবকুমার সিংহ। চিত্রে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের প্রথম থেকে শেষ দেখানো হয়েছে।

আঁকা-বাঁকা —প্রতিমা সেনগুপ্ত

ঊর্দ্ধদৃষ্টি
—দেবব্রত মিত্র

শান্তিনিকেতন সমাবর্ত্তনে শ্রীজহরলাল নেহেরু ও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী।
আলোক-চিত্র—অশোক বসু

মাসিক বসুমতীর

আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি

গত কয়েক মাস যাবৎ কোন রকম উচ্চবাচ্য না ক'রে প্রতি সংখ্যায় অসংখ্য সুদৃশ্য আলোকচিত্র ছেপেছি। মাসিক বসুমতীর দপ্তরে স্তূপীকৃত জমে-ওঠা আলোকচিত্র ইতিমধ্যে একেবারে নিঃশেষ না হ'লেও তাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছবিগুলিই প্রকাশ করা হয়েছে। এই জমে-যাওয়া আলোকচিত্র সমূহ প্রকাশের জন্য আমরা আমাদের অসংখ্য গুণী আলোকচিত্র-শিল্পীদের কিছু কালের জন্য ফটো না পঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

যাই হোক, জমানো-ছবির স্তূপ থেকে বহু চেষ্টায় সব চেয়ে ভাল ছবি উদ্ধারের ফল এই হয়েছে যে, 'মাসিক বসুমতী'র দপ্তরে ভাল ভাল ছবি থাকলেও সব চেয়ে ভাল ছবির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সেই জন্য আবার আমরা অনুরোধ জানাই, এখন থেকে আপনারা আবার আপনাদের গৃহীত সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি পাঠাতে থাকুন। আর আমরাও আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের চক্ষু সার্থক করতে মাসে মাসে আবার ছেপে যাই আপনাদের সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি।

নিম্নদৃষ্টি —এস, দাশগুপ্ত

উদয়ের পথে ? —রমা ভট্টাচার্য্য

খুকুমণি —রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্রকর —শচীন দাশ

ল্যাম্পপোষ্ট —বাদল সরকার

শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলার বেদীতে আলিম্পন-রতা —অজিত মিত্র

খেয়াল-খাতা

শ্রীদীপংকর সান্যাল সংগৃহীত

অতি বিরাট চিন্ময় ভাব আমার অন্তরে রহিয়াছে মৌন হইয়া, সেই মৌন ভাবের বেদনায় অন্তর আমার নিরন্তর ব্যথিত। যেই সেই ব্যথিত বেদনার রুদ্ধ বিশাল ভাবকে ভাষায় বা লেখায় ব্যক্ত করিতে চাই, অমনি দেখি যে, তাণ্ডবের সেই ভাবের কিছুই পরিচয় দেওয়া গেল না।

—ক্ষিতিমোহন সেন।

ফটোগ্রাফে অটোগ্রাফে বড্ড আমার ভয়,
দুই শ্রীতেই কারণ তাহার পষ্ট অতিশয়।

—গোপাল হালদার।

উপদেশ-মালার মধ্যে কোনও উপদেশেরই মূল্য থাকে না। অজস্র মহাপুরুষের বাণীর কবচ ধারণ করলেও মানুষ, মানুষ হয় না—তাই এই মালা আমি আর বাড়াতে চাই না।

—বঙ্কিম মুখুজ্যে।

দেশের লোকের কাছে সম্মান পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাই লাভের চেষ্টা করবে।

—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

লেখবার কিছু নাই,
শুধু সই দিয়ে যাই।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সব ধর্ম মাঝে ত্যাগ-ধর্ম সার ভুবনে।

—শ্রীপান্নালাল বসু।

তুমি যে-দেশের ছেলে,
সেই দেশকে বড় করে তোলো।

—নরেন্দ্র দেব।

কাঞ্চা হলুদ মেখে দিয়ে তার গায়
সিনান করাব কাঞ্চা রোদের জলে;
রাঙা মেঘ দিয়ে শাড়ী দেব তারে বুনে
সিঁদুর পরাব লাল শালুকের দলে।

আশীষ আনিব দূর্ব্বা-শীষের পরে
শিশির-ফোটায় ভরি মঙ্গল ঝারি,
নবীন ধানের মঞ্জরী দোলাইয়া
সোনার স্বপন রচনা করিব তারি।

—জসীম উদ্দীন।

কি চাও? ভাল করে চাও, নইলে পাবে না।

—প্রিয়রঞ্জন সেন।

সত্য বলিবে।

—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

দেশের সুসন্তান হও।

—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

তোমার এই পুণ্যভূমি বাংলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করো মানুষের মত মানুষ হয়ে। অন্তরের দেবতা জাগবেন যখন, তখন তোমার যশ পুষ্প-সৌরভের মত আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যাবে।

—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

শ্রীমা।

—শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

বন্দে মাতরম্।

—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড় হতে চাও, ছোট হও।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তোমার শুভ হোক।

—শ্রীসুনির্মল বসু।

হাতের লেখার দাম নেই।

—প্রবোধকুমার সান্যাল।

জয় হোক তরুণের
নবোদিত অরুণের
হোক জয়।

—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

জয় হোক নতুন জাতির।

—শচীন সেনগুপ্ত।

জুয়ায় আপনি হারবেনই

সুনীলকুমার ধর

জুয়া খেলায় বিশেষ ক'রে রেসে যাওয়া সমর্থন ক'রে অনেক জুয়াড়ী বলেন : মানুষের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে এবং সেই দিক থেকে আনন্দ এবং উত্তেজনা উপভোগের জন্য মূল্য দিতে হবে বৈ কি ! অর্থাৎ তাঁদের মতে মূল্য না দিলে কোন আনন্দ উপভোগই পূর্ণ হয় না, পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না এবং জুয়া খেলায় যে উত্তেজনার আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনায় যে অর্থক্ষতি হয়, তা এমন কিছু মারাত্মক নয়। সামাজিক মানুষের পক্ষে এই শ্রেণীর উক্তি অত্যন্ত আত্মতৃপ্তিসর্বস্ব এবং ক্ষতিকর মনোভাবের পরিচায়ক। খেলা দেখা, থিয়েটার-সিনেমা দেখা বা এই ধরণের আনন্দ উপভোগের জন্য বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে যে খরচ হয়, প্রাপ্ত আনন্দ এবং আহরিত স্বাস্থ্যকর উত্তেজনার তুলনায় তা নগণ্য, এ কথা স্বীকার করি ; কিন্তু মূল্য না দিলে কোন আনন্দ উপভোগেই পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না, একথা স্বীকার করি না। এ শ্রেণীর আনন্দ-উপভোগের মানসিকতার সঙ্গে যদি জুয়া খেলার মানসিকতাকে এক পর্যায়ে আনা হয়, তা হ'লে আমরা কেবল অবৈজ্ঞানিক এবং অসামাজিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হব তা নয়—আমরা প্রত্যক্ষ সত্যকে অবহেলা ক'রে অন্যায় এবং অশোভন মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধেও অপরাধী হব।

আনন্দ উপভোগ হ'ল মনের ব্যাপার। মনের গঠন এবং পারিপার্শ্বিকতার উপরও আনন্দ আহরণের ধারা অনেকখানি নির্ভর করে। এই কারণে আমরা দেখি, অনেকে যে জিনিসে যে অবস্থায় অপরিমিত আনন্দ পান অনেকে তাতে এতটুকুও আনন্দ পান না। সংসারের চারি দিকেই এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সামাজিক মানুষের পক্ষে, বিশেষ ক'রে যে মানুষের অপব্যয়ের এবং অপচয়ের আর্থিক ক্ষমতা একান্ত সীমাবদ্ধ—আনন্দ সংগ্রহের জন্য তার পক্ষে এমন কোন কিছু করা উচিত নয় যার প্রতিক্রিয়া তার আশ্রিত জনদের জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত করে।

জুয়া খেলায় জেতা এবং হারা দুইয়ের মধ্যেই উত্তেজনা আছে এবং এই উত্তেজনা জনিত বিশেষ রকমের আনন্দবোধও আছে। কারণ, দুই অবস্থাতেই অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে যে অস্বাভাবিক ত্বরিত রসক্ষরণ হয় তার জন্য সাময়িক ভাবে যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্ট হয় তার জন্যই ধর্ষকামী এবং মর্ষকামী আনন্দানুভূতির সৃষ্টি হয়। এই একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগের নেশা যদি একান্ত আপন জনদের দুঃখ-কষ্ট এবং অশ্রুর কারণ হয়, তা হলে সেই আনন্দ উপভোগের কোন অধিকার আছে কি সামাজিক মানুষের? অথচ এই উত্তেজনার নেশার স্রোতে কত সুখের সংসারই না ভেসে গেছে, কত সুখী সুস্থ দাম্পত্য জীবন লাম্পট্যের চক্রে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে সমাজের চার পাশে সৃষ্টি ক'রেছে আবর্জনা—কত শিশু সমস্ত ভবিষ্যৎ হারিয়ে পথে পথে কুকুরের সঙ্গে আহার্য্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করে বেড়িয়েছে এবং আজও কাড়াকাড়ি করছে! পথের ভিখারী হয়েছে এক দিনের কত রাজা! এই নেশায় কত স্বামী তার স্বামিত্ব ভুলেছে, পিতা ভুলেছে সন্তানের প্রতি কর্তব্য বন্ধু কণ্ঠ টিপে সৌহার্দ্যের শ্বাসরোধ করেছে!

যে মানুষ নিজের আদিম পাশবিক আনন্দবোধকেই একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য মনে করে, সে মানুষ সমাজে যত কম থাকে সমাজের পক্ষে, মানুষের পক্ষে, মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই সংসারে আমিই সব, আমাকে কেন্দ্র করেই সব, একথা সত্য কিন্তু একথা সত্য নয় যে, আমার চার পাশে আর যে কেউ আছে, যা কিছু আছে তা কেবল আমারই জন্য! সব কিছু মিলিয়েই আমি, সব কিছু এবং সকলের জন্যই আমি। সুতরাং সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন ক'রতে গেলে এমন আনন্দ আহরণের জন্য পাগল হ'লে চলবে না, যা আরো অনেকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথরোধ করে দাঁড়ায়।

অনেকে বলেন, এই উত্তেজক আনন্দ আহরণের জন্য যে অর্থক্ষতি হয়, (সব সময় হবেই, একথা যখন কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না) তা যদি কোন রকমে সংসারের আর কারো কোন ক্ষতির বা কষ্টের কারণ না হয়, তা হ'লে ব্যক্তিগত এই আনন্দ আহরণের জন্য কেন তাঁদের অসামাজিক মানুষ ব'লে চিহ্নিত করা হবে? এখানে সমাজ-জীবনের পক্ষ থেকে একটা কথা বলা যায়। যাঁরা বলেন : আমার জুয়ার হার যখন আমার সংসারের কারো কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি করে না, তখন এ ধরণের আনন্দ আহরণে আমার অধিকার আছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই কথা তিনি ধরে নিলেন যে, যেহেতু তিনি ধনী এবং তাঁর অপচয় করবার মত প্রাচুর্য্য আছে, সেই হেতু জুয়া খেলায় জেতা এবং হারা তাঁর পক্ষে এতটুকু অন্যায় বা অশোভন নয়—কিন্তু যে দরিদ্র তার পক্ষে এ অন্যায়। কারণ, দরিদ্র হওয়ার জন্য তার পক্ষে হারের প্রতিক্রিয়া সহ্য করা সম্ভব নয়। এখানে পক্ষান্তরে এই কথাই তিনি বলতে চান যে, জুয়ায় যার জিত হয় তার পক্ষে জুয়া খেলা অন্যায় নয়—অর্থাৎ গরীব হয়েও কেউ যদি জুয়ায় জেতে সেটা মোটেই অসামাজিক ব্যাপার নয়। টাকাই হ'ল মুখ্য কথা। কারণ, জিতলে জুয়ার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলবার নেই—হারলেই যত সমস্যা দেখা দেয়!

সমাজ-জীবনেই জুয়ার আশ্রয়স্থল হ'লেও এ-কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, জুয়া খেলার প্রবৃত্তি মূলতঃ একটি অসামাজিক প্রলোভন। হার্বার্ট স্পেন্সার এ সম্বন্ধে ব'লেছেন : জুয়া হল, একজনের বেদনাকে অপরের আনন্দ উপভোগের উপকরণ করা। বিজয়ীর জয়ের সুখ যতখানি বিজিতের দুঃখের গ্লানি ততখানি (যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র দু'জন)! কিন্তু জুয়া খেলার নেশার অপকারিতার আর একটা মস্ত দিক আছে। আমার মতে আর্থিক দিকের চেয়ে সেটা অনেক বড়, অনেক সুদূরপ্রসারী। জুয়ায় হেরে মানুষ যে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে, সেই অবস্থায়ও মানুষ যদি বোঝে তার এবং তার একান্ত আপন জনদের এই দুরবস্থার কারণ কি, তা হলে জুয়া ছেড়ে অন্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একটা উপায় করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা একেবারে

অসম্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু সাধারণত: এমনটি বড় কম দেখা যায়। কারণ, এ কথা আজ অবিসম্বাদিত ভাবে স্বীকৃত যে, যে যতই হিসাব করে, খবর পেয়ে, স্বপ্ন দেখে জুয়া খেলতে যাক না কেন—সব সময়ই তাকে chance-এর উপর নির্ভর করতেই হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এই chance-এর উপর নির্ভর করতে করতে এক সময় মানুষ যে গুণাবলীর জন্য মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত হ'য়েছে—অর্থাৎ বিচারশক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, দায়িত্বজ্ঞান এবং ন্যায়পরায়ণতা সবগুলির উপরেই সে কালো পর্দ্দা টেনে দেয় এবং প্রিয় ব্যসনের উত্তেজনায় সে একটি মানবদেহধারী আত্মতৃপ্তিসর্ব্বস্ব পশু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সমাজ-জীবনের পক্ষে এর চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে? মানুষের জীবনের এর চেয়ে করুণ পরিণতি আর কি হতে পারে? এবং মানুষ যখন এই পশুর পর্য্যায়ে নেমে আসে তখন তার পক্ষে এমন কোন সামাজিক অপরাধ নেই, যা করা সম্ভব নয়। অনেকে অভাবের জ্বালা, অপমানের গ্লানি এবং অনুতাপের বৃশ্চিক দংশনের হাত এড়াবার জন্যে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছে। কয়েক বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, এক ইংলণ্ডেই জুয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য ১৫৬ জন আত্মহত্যা করেছে, ৭১১ জন চুরি এবং পরের টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে এবং ৩৪২ জন নিজেদের 'দেউলিয়া' ব'লে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

Chance সম্বন্ধে আর দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করবো।

প্রথম হল শব্দচৌকি, বা শব্দচয়ন প্রতিযোগিতা। আজকাল দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে অনেক পত্রিকা মোটা মোটা অঙ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে এই ব্যবসা চালাচ্ছেন। আপনারা যাঁরা এই শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় (?) অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের অধিকাংশকেই একবার মনে মনে হিসাব করে দেখতে বলি যে, আজ পর্য্যন্ত কত টাকা তাঁরা এর পিছনে খরচ করেছেন এবং কত টাকা তাঁরা পেয়েছেন? প্রকাশ্যে অবশ্য একে বুদ্ধির খেলা বলা হয়, এ কথা শব্দচৌকি প্রতিযোগিতার বেলায় খানিকটা সত্য, কিন্তু যেখানে দেওয়া দুটি শব্দ থেকে একটি বেছে নিতে হবে সেখানে একে প্রকাশ্য জুয়া ছাড়া আপনি কি ব'লবেন? এই রকম ক্ষেত্রে একথা অবশ্য আপনি জোর কোরে বলতে পারেন যে, পুরস্কার আপনি পাবেনই এবং আপনাকে 'chance'-এর উপর নির্ভর করতে হবে না এবং তা হ'ল permutation এবং combination-এর সাহায্যে। কিন্তু যাঁরা এই ধরণের ব্যবসা করেন, তাঁরা মনে মনে ভাল ভাবেই জানেন যে, পুরস্কারের অঙ্ক যত বড়ই হোক না কেন এমন প্রতিযোগী খুব কমই আছে যে শেষ পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বসে permutation-combination করবে এবং তার জন্য প্রচুর টাকা প্রবেশ-মূল্য হিসেবে লাগাবে (entrance fee)। কারণ প্রত্যেক প্রতিযোগীর মনে এই আশঙ্কা আছে যে, তার এমন ভাবে দেওয়া সূত্র শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'লেও আরো অনেকেরও তা' ঠিক হতে পারে, এমন কি একটা সূত্র পাঠিয়েও প্রথম পুরস্কার পাওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়—সুতরাং এই অনিশ্চিত অবস্থায় অত টাকার ঝক্কি না নিয়ে সাধারণ বুদ্ধিমত একটু অদল-বদল করে কয়েকখানা পাঠানো যাক—তাতে যা হয় হবে, chance নেওয়া যাক, না হয় না হবে! লোভ আছে টাকাটা পাওয়ার কিন্তু বেশী ঝক্কি নেবার সাহস নেই। কারণ যে chance-এর উপর ভরসা সেই chance-ই আবার প্রতিকূল। এখন আপনারা একটু হিসাব করলেই বুঝতে পারবেন যে, যাঁরা এই ধরণের মোটা মোটা অঙ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ঘর থেকে এ টাকা আপনাদের কাউকে দিয়ে বড় লোক করে নিজে ভিখারী হবার জন্য করেন না। পুরস্কারের অঙ্ক যত বড় লাভের পরিমাণ তত বেশী এবং একটু ভেবে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, দু' আনা চার আনা যদি প্রত্যেক সূত্র পাঠাবার মূল্য হয়, তা হ'লে, কত লোকের কত সূত্রের দাম পৌঁছলে ঐ প্রতিযোগিতার মালিকদের দেয় পুরস্কারের টাকা উঠে তাঁদেরও বেশ কিছু লাভ হবে! এখন আর একটু কষ্ট ক'রে হিসাব ক'রে দেখুন, পত্রিকায় প্রথম পুরস্কারের চেক্ (cheque) হাতে নেওয়া যে লোকটির ছবি প্রকাশিত হ'য়েছে, এবং যার ছবি আপনার চোখের সামনে উপস্থিত ক'রে বলা হচ্ছে—ইনি যখন পেয়েছেন তখন আপনিই বা পাবেন না কেন—তিনি কত লক্ষ সূত্রের বিরুদ্ধে জিতেছেন! তিনি জিতেছেন ব'লেই তাঁর ছবি অত ভাল ক'রে ছেপে এত ফলাও ভাবে প্রচার করা হ'চ্ছে—কিন্তু তাঁর পিছনে লক্ষ লক্ষ সূত্রের আড়ালে আপনারা যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কথা কিন্তু উল্লেখ নেই! জুয়ার মজাই হ'ল এই এবং ঐ যে ছবির মানুষটি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে চেক্ হাতে নিয়ে হাসছ ঐ হাসিই হোল আপনার সর্ব্বনাশের পথে পা বাড়াবার আকর্ষণ! আমি অবশ্য শব্দচৌকি বা শব্দচয়নের খুব বিরুদ্ধে নই—কারণ এ কথা আমি ভাল ভাবে জানি যে, এই ধরণের প্রতিযোগিতার নেশা কখনই মানুষকে পথের ভিখারী করবে না।

এই দৃষ্টান্তটি দিলাম chance-এর উপর যাঁরা আস্থাবান, তাঁদের সেই আস্থা কত সূক্ষ্ম সূতোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখাবার জন্য এবং এই সঙ্গে একটি সোনার ঘড়ি ও চেনের গল্প বলছি।

এক নামকরা ভদ্রলোকের আজীবনের ইচ্ছা ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তৈরী করবেন। কিন্তু সারা জীবনে লক্ষ্মীর এমন কৃপা তাঁর উপর হোল না যে, ভদ্রলোক তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মন্দির তৈরী করেন। অথচ সমাজে ভদ্রলোকের স্থান এমন জায়গায়, যেখান থেকে তাঁর পক্ষে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে কারো কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রলোক একদিন এই অপূর্ণ আশা নিয়ে মারা গেলেন।

তাঁর এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভদ্রলোকের এই ইচ্ছার কথা জানতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক ধরলেন মৃত বন্ধুর সোনার ঘড়ি ও চেন লটারী করবেন এবং এই লটারী হবে আশ-পাশের দশখানি গ্রামের লোকেদের মধ্যে। দু'টাকা করে লটারীর টিকিট করা হোল এবং প্রচার-পত্রিকায় মন্দির নির্ম্মাণ করার কথাও প্রকাশ করা হোল। বেশ টাকা আসতে লাগলো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন কথাও কানে আসতে লাগলো যে, লটারীর টিকিট কা'কে দিয়ে তোলা হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো সততা রক্ষা হবে না। মন্দির কমিটির লোকেরা তখন ঠিক ক'রলেন, বেশ, যাঁরা টিকিট কেটেছেন তাঁরা যদি আরো আট আনা করে

জমা দেন, তা হ'লে তাঁদের নিজের হাতেই নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার উপায় ছেড়ে দেওয়া হবে। এমন সুযোগ কে ছাড়ে? যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই আট আনা ক'রে জমা দিলেন।

লটারীর নির্দ্দিষ্ট দিনে একটি খোলা জায়গায় একখানা বড় টেবিল আনা হ'ল এবং টেবিলের তিন দিকে কাঠের অল্প একটু ক'রে পাঁচিল তুলে দেওয়া হ'ল। আর আনা হ'ল তিনটি ছক্ ঘুঁটি। কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে ঘোষণা করা হোল, লটারীর টিকিটধারী যে লোক দু'বার ঘুঁটি ছুড়ে সব চেয়ে বেশী নম্বর তুলতে পারবেন, তাঁকেই ঘড়ি এবং ঘড়ির চেন দেওয়া হবে। একে পাওয়া গেলে আড়াই টাকায় প্রায় দেড় হাজার টাকার দামের ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পাওয়া যাবে তার উপর নিজের হাতে ভাগ্য পরীক্ষায় ঘুঁটি ছোড়া এই দুই মিলে উপস্থিত সকলের মধ্যেই বেশ কেমন একটা আমেজ-জড়ানো উত্তেজনার সৃষ্টি হোল।

ঘুঁটি ছোড়া আরম্ভ হোল। মহিলাদের নামে কিংবা দেব-দেবী বা শিশুর নামে যে সব টিকিট কেনা হয়েছিল, তাঁদের হ'য়ে তাঁদের পুরুষ অভিভাবকরা ঘুঁটি ছুড়লেন। সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা উঠলো ৩৪ এবং এই সংখ্যা ফেলেছেন ৭ জন। কর্ত্তৃপক্ষ যখন ভাবছেন যে, এই সাত জনের মধ্যে আবার ঘুঁটি ছোড়ার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবেন সেই সময় এসে উপস্থিত হ'ল মৃত ভদ্রলোকের বারো বছরের ছেলে। তার হাতে তিনখানা টিকিট। একখানা তার মায়ের নামে, একখানা ছোট বোনের নামে এবং একখানা তার নামে।

সে প্রথমে নিজের হ'য়ে ঘুঁটি ছুড়লো এবং দু'বারে হোল ২১। তারপর ছোট বোনের হ'য়ে ছুড়লো, হোল ১৮। ব্যাপার দেখে সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল এবং তখনি মা'র হ'য়ে সে ঘুঁটি ছুড়তে চাইলো না। ছোট ছেলে—তার উপর যার ইচ্ছা পূরণের জন্য এই মন্দির তৈরী করা হচ্ছে তারই ছেলে, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ তাকে খানিকটা সময় দিলেন। বেশ কয়েক জনের ঘুঁটি ছোড়ার পর (কারও সংখ্যাই ৩৪-এর বেশী উঠলো না) ছেলেটি আবার এল ঘুঁটি ছুড়তে। পর-পর দু'বার ছুড়লো এবং মোট সংখ্যা হোল ৩৬। প্রথম বার অক্ষমতার জন্য ছেলেটি যেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল এবার এই অসম্ভব ঘটনার জন্য সে ঠিক তেমনি ভাবেই ঘাবড়ে গেল। আগে দু'বার দু'জনের জন্য ঘুঁটি ছুড়ে কম সংখ্যা ফেলার জন্যই যে তখন সে তার মায়ের হয়ে ঘুঁটি ছুড়তে চায়নি, ঠিক তা নয়। তার কেমন যেন মনে হ'য়েছিল, তখনি আর একবার না ছুড়ে একটু পরে ছুড়লে ভাল হয়। ভাল হয়, এই কথা তার মনে হয়েছিল, কিন্তু কেন মনে হয়েছিল এবং সে জিতবেই এমন কথা মনে হয়েছিল কি না একথা জিজ্ঞাসা করায় সে কোন স্পষ্ট-জবাব দিতে পারে নি। এই ঘটনাকে উপস্থিত সকলেই যেমন 'দৈব' ব'লে সমকণ্ঠে স্বীকার ক'রেছিলেন, আপনিও কি তাই ব'লেন?

আপনাদের জীবনে যদি খুঁজে দেখেন, তা হ'লে অনেকেই দেখবেন, জীবনের কোন না কোন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা কেন ঘটেছিল, কি ভাবে ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট উত্তর আপনারাও দিতে পারবেন না। এবং এই জন্যই chance-এর খেলায়, সময় সময় এমন অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে, যার কোন হদিস্ পাওয়া যায় না এবং এই জন্যই সব সময় একে 'কাকতালীয়' ব্যাপার বলে মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না—এর সঙ্গে দৈব বা ভাগ্যের যোগ আছে ব'লে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে এবং জুয়াড়ীরা ব'লে, ভাগ্য যদি এর মূলে না-ই থাকে, তা হ'লে এমন কিছু আছে—যেমন জুয়ায় হারতে হারতে জায়গা বদল করা, কিংবা খেলা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে আবার নতুন করে আরম্ভ করা—এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূলে। তাসখেলা সম্বন্ধে একখানা পুরানো বইয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, যখন তাস খেলায় আপনার হার হতে থাকবে তখন যে চেয়ারে আপনি ব'সেছেন সেই চেয়ারখানা নিয়ে তিন বার চক্র দিয়ে ঘুরুন এবং তারপর খেলতে আরম্ভ করুন, দেখবেন, ভাগ্যলক্ষ্মী এসে আপনার দানের তাস তুলে দিচ্ছেন!

ফাগুন এলো

কমলা মজুমদার

ফাগুন এলো গাছে গাছে শুকনো পাতা ঝরে
ফাগুন এলো গাছে গাছে নতুন পাতা ভরে ;
ফাগুন এলো আকাশ জুড়ে আলোর হাতছানি
প্রাণে প্রাণে লাগলো তারি রূপের ঝলকানি।

দখিণ বায়ে শির-শিরিয়ে উঠলো কচি পাতা
দুকূল ছেপে কল-কলিয়ে ঢেউয়েরা কয় কথা ;
ফুলের বনে দোদুল দুলে চাঁপা ফুলের কলি
আনন্দে আজ উঠলো নেচে পাপিয়া-বুলবুলি।

নেবু ফুলের গন্ধে আজি বাতাস হ'লো ভরা
ফুলে ফুলে প্রজাপতি নাচে পাগল-পারা ;
রঙে রঙে রঙিন যে হায় রক্ত পলাশ-বন
ক্ষণে ক্ষণে শিউরে ওঠে কৃষ্ণচূড়ার মন।

আজকে কেবল কোকিল ডাকে ঘন বনের ছায়ে
মধ্য দিনে উদাসী মন কাঁপে তাহার সুরে ;
নিথর জলে কাঁপন তুলে তাকায় কুলবালা
"তবে কি আজ এলো ওগো ফাগুন আগুন-জ্বালা?"

ফাগুন এসো, বসতে দেবো তাল-সুপারীর ছায়
ফাগুন এসো, আদুড় গায়ে নূপুর দিয়ে পায় ;
ফাগুন এসো, আম-কাঁটালের বিজন পথ বেয়ে
ফাগুন এসো, চুপিসাড়ে হৃদয়-মন ছেয়ে।

পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত-ভাস্কর (১২৪৫-১৩০০)

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী

সংস্কৃত-সাহিত্য—ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটা অবিনশ্বর কীর্ত্তি। যুগ-যুগান্তের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে যাঁহারা হিন্দুকৃষ্টির অমূল্য সম্পদ সংস্কৃত-সাহিত্যকে যক্ষের মত বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যপদেশে উহার প্রচার-পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহারা জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষণে কত দূর আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহা ভুলিলে ঐতিহাসিক ভারসাম্য রক্ষিত হইবে না। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব সমাজ ও দেশের অগ্রগমনে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, এইরূপ একটা সুলভ মতবাদ প্রচারের অন্তরালে সত্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা আছে কি না জানি না। কিন্তু যুগ-তরঙ্গের মধ্যেও যাঁহারা পর্ব্বতের মত ধীর স্থির থাকিয়া সংস্কৃত-সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান-তপস্যা ও আদর্শনিষ্ঠা কত গভীর ও কত মহৎ, তাহা আধুনিক সমাজের অনুধাবনযোগ্য কি না বলিতে পারি না। সংস্কৃত মৃত ভাষা বলিয়াই বর্ত্তমানে পরিচিত। কিন্তু এই ভাষার অনুশীলনেই এক দিন দেশের শিক্ষিত ও মেধাবী ব্যক্তিগণ আগ্রহান্বিত ছিলেন, গভীর তত্ত্বপ্রকাশেও সংস্কৃত ভাষা ছিল এক দিন প্রধান বাহন। প্রাদেশিক ভাষা সংস্কৃতেরই ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইতিহাসের এই বিশিষ্ট অধ্যায়কে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি ইহার অধ্যাপকমণ্ডলী ও তত্ত্বান্বেষীদিগকেও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ইঁহারাই সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও জ্ঞান-প্রবাহকে চলমান রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। জাতির এই মনীষা ঐতিহাসিক ধারার পরিপূরক বলিলে অসঙ্গত হইবে কি? আজ সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগের একটি উজ্জ্বল রত্নের সন্ধানেই আমরা প্রবৃত্ত হইব। কানু ছাড়া যখন গীতি নাই, তখন সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চার মাধ্যমে যে প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, তাহাই বা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? জাতির সত্যিকার পরিচিতি ও প্রাণস্পন্দন এই পথেই আমাদের নিকট সহজলভ্য হইবে।

বাংলা দেশে নবদ্বীপ যেমন এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল, তেমনই বিক্রমপুর ছিল পূর্ব্ববঙ্গের নবদ্বীপ। বিক্রমপুরে অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূখণ্ডকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বিক্রমপুর কুরাপাড়া নিবাসী দীনবন্ধু ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। এমন কি, কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা হইতেও অনেক ছাত্র অধ্যয়নের জন্য বিক্রমপুর আসিতেন। অনেক অবাঙ্গালী পণ্ডিত দিগ্বিজয় ব্যপদেশে বিক্রমপুরে আসিতেন এবং বিচারে পরাজিত হইয়া ব্যর্থ মনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। বিক্রমপুরের সংস্কৃত শিক্ষার সেই গৌরবময় যুগে পণ্ডিতকেশরী প্রসন্নকুমার তর্করত্ন বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে আনুমানিক ১২৪৫ সালে (ইং ১৮৩৮) জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম প্রাচীন কাল হইতে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকগণের মতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত দ[illegible] শ্রীজ্ঞান এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত সে কালে ভারতবর্ষে ও তিব্বতে কেহ ছিলেন না। তাঁহার আবির্ভাব কাল ৯৮০ খৃষ্টাব্দ। তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনের জন্য বিক্রমপুরে আসিতেন। এখনও গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিগণ "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" বলিয়া একটি পরিত্যক্ত স্থান দেখাইয়া দেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে এখনও বৌদ্ধদের দেউল ও চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ আছে।

প্রসন্নকুমারের পিতা চন্দ্রমণি বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শিশু-ভ্রাতাদের ভরণ-পোষণ করিতে থাকেন। মধ্যম প্রসন্নকুমার ও কনিষ্ঠ রজনীকান্তের শিক্ষার ভারও তাঁহার উপরই অর্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায়, তিনি প্রসন্নকুমারের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ঢাকা কলেজের তাৎকালীন অধ্যাপক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ রাজকুমার সেন মহাশয়ের নিকট আত্মীয় বরিশাল-প্রবাসী জনৈক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে অনুরোধ করেন। প্রসন্নকুমার সাত বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য বরিশালে প্রেরিত হন। কিন্তু শৈশবেই প্রসন্নকুমারের তর্ক করার একটা আশ্চর্য্য শক্তি স্ফুরিত হয়। তিনি তথায় পাদ্রি-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি শিক্ষার প্রারম্ভ সময়েই শিক্ষকদিগকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। ইংরাজি শিক্ষককে প্রশ্ন করিতে থাকেন—But বাট হইলে Put পুট উচ্চারিত হইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসন্নকুমারের কৈশোর মনকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, ক্রমে তিনি ইংরাজি শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। ফলে তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দেশের টোলে প্রবেশ করেন। প্রথমতঃ তিনি বানারি গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক রামতনু বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। বাচস্পতি মহাশয় ত্রিপুরার মহারাজকে হিন্দু বলিয়া পাঁতি দেওয়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এক কালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রসন্নকুমার চিত্রকরা গ্রামে পণ্ডিত গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সংঘাতে প্রসন্নকুমারের জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। এখানে তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষার্থী ছিলেন পয়সাগাও নিবাসী সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন। তিনি প্রসন্নকুমারের ন্যায় মেধাবী ছাত্র না হইলেও তাঁহার নিকট ন্যায়ের একখানা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ছিল। সেই পুস্তকের সাহায্যে তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রসন্নকুমারের প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করিতে চেষ্টা করাইতেন। অধ্যাপক সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রসন্নকুমারের মেধা ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে তাহার উপর খুবই সুপ্রসন্ন ছিলেন। তিনি ঐ দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানা আদায় করিবার জন্য প্রসন্নকুমারকে উপদেশ দেন। কিন্তু প্রতিযোগী তর্কপঞ্চানন মহাশয় বিস্তর অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও প্রসন্নকুমারকে পুস্তকের নকল দেওয়ার সুযোগ দিতে অস্বীকৃত হন। তবে তিনি একটি সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন যে, যদি প্রসন্নকুমার সোয়া পাঁচ গণ্ডা কাঁচা ধানী লঙ্কা খাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে সেই বই নকল করার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যানুরাগী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রসন্নকুমার সেই সর্ত্তেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফলে

প্রসন্নকুমার মরণাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন, এমন কি তিনি কিছু দিন বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিলেন। পরে আরোগ্য লাভ করিলেও তাঁহার মস্তিষ্কের ব্যাধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। ছাত্রগণের মধ্যে সর্ত্তানুসারে এইরূপ দুঃসাহসিক ও হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে অধ্যাপক মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং অন্যতম ছাত্র সারদাচরণকে তাঁহার ক্ষুদ্রতার জন্য তিরস্কৃত করেন।

ইহার পর প্রসন্নকুমার অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপ গমন করেন, সেখানে তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি হইলে, তিনি ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া টোল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসন্নকুমারের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি শুনিয়া পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে দলে দলে ছাত্র আসিতে থাকে। তাঁহার টোলে পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্র নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করিত। ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা আহারের সময় বিজ্ঞাপিত হইত।

প্রসন্নকুমারের সম-সাময়িক ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিক্রমপুরে ধামুকার চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌম, অভয়ানন্দ, গোলোক সার্ব্বভৌম, কাঠাদিয়ার কমল সার্ব্বভৌম, ইছাপুরার তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি, জপসার চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ, পয়সাগায়ের সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশ, সাংরাপাড়ার দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, ভোজেশ্বরের কালীনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রসন্নকুমারের নামকরা ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি (চট্টগ্রাম), গোবিন্দ বেদাধ্যায়ী, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মিথিলাবাসী বংশমণি ওঝা পণ্ডিত উপেন্দ্র মিশ্র। কথিত আছে, এই মিশ্র মহাশয় নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি প্রসন্নকুমারের নিকট বিচার-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার মানসে বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিচারে পরাজিত হইয়া প্রসন্নকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই ঘটনা না কি প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রসন্নকুমারের সহিত বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অনেক পণ্ডিতের বিচার হইয়াছে। তিনি কোন স্থানেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, সতত দৃষ্ট সূর্য্যদেবই ছিলেন তাঁহার উপাস্য। "ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া যে পণ্ডিত-সমাজে উপস্থিত হইতেন, সেখানেই সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইত। তাঁহার স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ভেদাভেদ জ্ঞান সম্পর্কে অতিরিক্ত কঠোরতা ছিল না, তিনি জীবের মধ্যেই শিবের সন্ধান করিতেন। দুঃস্থ পীড়িত অন্ত্যজ জাতির সেবা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই জন্য অত্যধিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার এই কার্য্যকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই।

প্রসন্নকুমারের পাণ্ডিত্য কিরূপ অপরিসীম ছিল, তৎসম্পর্কে দুই-একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে বিরাট পণ্ডিতসভার সমাবেশ হইয়াছিল। কাশীধামের বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী কাশীর পণ্ডিতের সহিত বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের বিচার শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত, কিন্তু উপস্থিত বাঙ্গালী-পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বিচারে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছিলেন না। তাঁহারা প্রসন্নকুমারের আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। যখন প্রসন্নকুমার "ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন পণ্ডিতসমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর-পক্ষ এবং তর্করত্ন মহাশয় পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ছিল "ঈশ্বরো নাস্তি"। বিচার খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। যখন তর্করত্ন মহাশয় শাস্ত্রী মহোদয়কে কোণঠেসা করিয়া তুলিলেন, তখন তিনি বলিতে বাধ্য হন—বাংলা দেশে সত্য সত্যই একজন পণ্ডিত আছেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণও পূর্ব্ববঙ্গে আসিলে অনেক সময় অপদস্থ হইয়া যাইতেন। এই জন্য প্রসন্নকুমারকে দ্বন্দ্ব ও পরাজিত করিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিত। এক বার নবদ্বীপের হরিসভা বর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিক্রমপুরের পণ্ডিত-সমাজ আহূত হন। স্মার্ত্ত পণ্ডিত জগৎ সার্ব্বভৌম (ফুরশাইল) এই সভায় উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় দৃঢ়তার সহিত তাঁহার গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবদ্বীপের তৎকালের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ভুবন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বিচার সভার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সপ্ত দিবসব্যাপী বিচার চলে। প্রসন্নকুমারের অকাট্য যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তিতে সকল প্রশ্নেরই সমাধান সহজ হইয়া যাইতে থাকে, কিন্তু শেষ দিন প্রসন্নকুমার একটু চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি সন্ধ্যাকালে এক নির্জ্জন দেবমন্দিরে যাইয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হন, নিশীথ কালে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিলে তিনি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরের দিন পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহার সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়া বলেন, "সূর্য্যমণ্ডলের অধিকারে সরস্বতীর ভাণ্ডারে আর দ্বিতীয় উত্তর নাই।" পণ্ডিতসমাজ তর্করত্ন মহাশয়ের মনোবল ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহার জয়ধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠে। সেকালের বঙ্গবাসী পত্রিকায় "বিক্রমপুরের প্রসন্নকুমার তর্করত্ন" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিচার-সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক বার তারকেশ্বর শিবের সেবাইত মহোদয়ের উদ্যোগে এক বিরাট পণ্ডিত-সভার অধিবেশন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় পাঁচ শত পণ্ডিত তথায় সমবেত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের কোন কোন বিচারপতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিদ্বৎজন-সমাবৃত সভায় ধূলি-ধূসরিত পদে এক নগ্নপায় ব্রাহ্মণকে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে বাধা দেয়। এই প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তিকে ভিক্ষুক ও পাগল বলিয়াই অনেকের ধারণা হইয়াছিল। দ্বারদেশে একটা গোলযোগের সূত্রপাত হইতে দেখিয়া অনেকের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। যখন পরিচিত পণ্ডিতগণ দ্বারে দণ্ডায়মান পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ প্রসন্নকুমারকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটা সাড়া পড়িয়া যায়। এই সভায়ও তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বিচারদক্ষতায় সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হন। এই নগ্নপদ ব্রাহ্মণই বিদ্বন্মণ্ডলীর সভার সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিয়া রাজসম্মানের অধিকারী হন।

প্রসন্নকুমারের বিদ্যানুরাগ, অধ্যবসায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পর্কে অনেক ঘটনা প্রবাদ বচনের মত প্রচলিত। তিনি ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের এষ্টেট হইতে বার্ষিক

পাইতেন। এক সময়ে তর্করত্ন মহাশয় মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় মহারাজা এক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় অনেক সময় অপেক্ষা করিলেও, যখন মহারাজা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না, তখন তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। মহারাজা তর্করত্ন মহাশয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া রহস্যচ্ছলে বলেন, "আপনি ত আর ইংরেজি জানেন না, আপনার সহিত আবার কি কথা বলিব?" কিন্তু তর্করত্ন এই উক্তিকে রহস্যব্যঞ্জক ভাবে গ্রহণ করিলেন না, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া আমি আপনার সহিত ইংরেজি ভাষায় আলাপ করিব।" তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করিয়াছিলেন, গুণগ্রাহী মহারাজাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বার্ষিকী বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে এক বার বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে। সূর্য্য পশ্চিমের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে, তবুও আহারের জন্ম আহ্বান আসিতেছে না। আহূত ভদ্রলোকগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় তর্করত্ন মহাশয় বিচিত্র সুরে একটি গীতিকা গাহিতে গাহিতে প্রতীক্ষিত জনমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত। তর্করত্নের সেই অপূর্ব্ব গীতিলহরীতে সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রম করিলেও কাহারও মনে আর ক্ষোভ রহিল না। গৃহবিবাদের ফলে পাকবিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় আহারের ব্যবস্থা বিলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু তর্করত্নের উপস্থিত বুদ্ধির জন্ম সেই বিসদৃশ ব্যাপারও রসসিক্ত হইয়াছিল।

তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত বর্ত্তমান লেখকের পিতামহ কৃষ্ণকুমার শিরোমণির নিকট-সম্পর্ক। উভয়ে সমবয়সী এবং উভয়ে একত্রই সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন। তর্করত্ন মহাশয়ের জীবনের অনেক কাহিনী পূজনীয় পিতামহদেবের নিকট শুনিয়াছি। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে উহা প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ না হইলে, এই প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ উপাদান সংগ্রহ করাও দুরূহ হইত। বাংলা দেশে তর্করত্ন মহাশয়ের শিষ্য-প্রশিষ্য এখনও বিরল হয় নাই। যদি কেহ তর্করত্ন মহাশয়ের সেই অপূর্ব্ব জীবনের কোন অংশ সংযোজিত করিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য রচিত হইতে পারে।

তর্করত্ন মহাশয় ১৩০০ সনে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই বিবাহ—প্রথমা পত্নী তাঁহার জীবদ্দশায়ই পরলোকগতা হন, দ্বিতীয়া পত্নী প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার আট পুত্র ও আট কন্যার মধ্যে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত আছেন। তিনিও অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি উচ্চশিক্ষিত, কাশীধামে প্রায় ৪০ বৎসর শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার পুত্রের নিকট কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অন্যতম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় আলীপুরে সরকারী উকিল এবং তাঁহার প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আই, সি, এস সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ব্যারিষ্টারী করিতেছেন।

তর্করত্ন মহাশয়ের জীবন জ্ঞান-তপস্বীর জীবন। এই জীবনালেখ্য চিরদিনই আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ। যুগের আবর্ত্তে ইহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না। যত দিন জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা লোকের মনকে উন্মুখ করিবে, তত দিন এই জীবন-চিত্র শিক্ষার্থী ও জ্ঞান-সাধকের নিকট ধ্যেয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবে। এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরা, অতীতের গর্ভে লুক্কায়িত রত্নের সন্ধান করাও স্বাধীন-নাগরিকের কর্ত্তব্য। দেশের ইতিহাসের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে হইবে। দেশের সর্ব্বাত্মক ইতিহাস লিখিতে হইলে এই জ্ঞান-তাপসদের প্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। তাঁহাদের সাধনা ও প্রতিভাকে মস্তিষ্কের অপব্যবহার মনে করিলে একটা বিরাট সত্যকে অস্বীকার করা হইবে। সংস্কৃত-সাহিত্য দর্শনাদি চর্চ্চা করিয়া যাঁহারা যুগের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও সংস্কৃতির দিক্‌দর্শনে অবিচলিত ও অচঞ্চল ছিলেন, তাঁহাদিগকে ইতিহাসের স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে কি? আমরা সেই ইতিহাসই চাই—যাহার মধ্যে দেশের ও সমাজের বিবর্ত্তনবাদের একটা রূপায়ণ আছে, সমাজ-সত্তাকে যে শক্তি আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে, সেই শক্তির ক্রম-বিকাশের ইতিহাসই জাতীয়তার ইতিহাস। এই জাতীয়তার মর্ম্মক্ষেত্র উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে এই জ্ঞান-তাপসদের সাধনার হোমানল।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্ম্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কি নূতন অর্থলাভ করে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে মানুষের জীবন যাপনের বিভিন্ন প্রকার রীতি ও নীতি প্রচলিত। এক দেশে বা এক সমাজে যাহা নিন্দিত, অন্য সমাজে হয়তো তাহাই প্রশংসিত। কোন সমাজে আমিষ ভক্ষণ অতি উপাদেয় মনে হয়, আবার কোন সমাজে উহা অতীব গর্হিত কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন সমাজে বাল্য-বিবাহ অতি প্রশস্ত আবার কোন সমাজে উহা অত্যন্ত নিন্দার্হ। বিবিধ বিষয়ে এইরূপ পার্থক্য সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে কোথাও মতানৈক্য নাই। মানব-সভ্যতার আদিম যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব সমাজে কতকগুলি কার্য একান্ত নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল দোষের মধ্যে একটি দোষ হইতেছে পানাসক্তি। অন্যান্য বহু দোষের ন্যায় এই দোষটিও সর্ব সমাজেই ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্তমান। বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে এই দোষের প্রসারতা দেখিয়া অনেকেই চিন্তিত হইয়াছেন। এই সর্বনাশা অভ্যাস ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ইহা সমগ্র জাতির প্রাণশক্তি, সংস্কৃতি ও আদর্শবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। এই গুরুত্ব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন এবং এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বর্তমান কালে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মানুষের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের মূল তাহার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কে যে বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্র আছে, তাহা হইতেই ভিতরের ও বাহিরের সর্ব প্রকার কার্য ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মানবেতর জীবেরও মস্তিষ্ক আছে এবং তাহার মধ্যেও স্নায়ুকেন্দ্র আছে। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা এবং কার্য অতি সীমাবদ্ধ। দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি বিবিধ অনুভূতি বর্তমান থাকিলেও, মানুষের মত সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা তাহাদের নাই। যে সকল স্নায়ুকেন্দ্রের প্রভাবে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি জাগ্রত হয়, সেগুলিকে 'হায়' আর 'সেটারস্' বলে। সেগুলি সাধারণতঃ মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। এই জন্য সাধারণ ধারণা এই যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের) কপালের দিকটা অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এইরূপ উচ্চতা বর্তমান থাকুক বা নাই থাকুক, মোটের উপর মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর লজ্জা, ঘৃণা, দয়া, মমত্ববোধ, সদসদ্বিচার, অতীত-স্মৃতি, ন্যায়-অন্যায় বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, কল্পনা, অনুসন্ধিৎসা, সৌন্দর্য-বোধ, শিল্পচাতুর্য, কবিত্ব, সঙ্গীতপ্রিয়তা, ধর্মজ্ঞান, প্রভৃতি যে সকল স্নায়ুকেন্দ্র হইতে প্রেরণা লাভ করে, তাহা মানবেতর জীবের নাই। এই সকল প্রেরণার অধিকারী বলিয়াই মানুষ মনুষ্যত্বের দাবী করিয়া থাকে। এইগুলি আছে বলিয়াই যে মানুষের পাশব প্রবৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। মনুষ্যত্বের প্রভাবে সে পাশব প্রবৃত্তি-গুলি দমিত ও নিয়মিত করিয়া মানুষোচিত গুণগুলি বিকশিত করিয়াছে। এই বিষয়ে সকলেই সমান কৃতকার্য হয় নাই। যে যত বেশি কৃতকার্য হইয়াছে, সেই তত বেশী 'মানুষ' হইয়াছে। এই কথা মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবেও যেমন সত্য, পরিবার, সমাজ ও জাতির পক্ষেও ঠিক তেমনি সত্য। ব্যক্তি লইয়াই পরিবার, পরিবার লইয়াই সমাজ এবং সমাজ লইয়াই জাতি ও দেশ। সুতরাং ব্যক্তির জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হইলে, জাতির জীবনও সুনিয়ন্ত্রিত হইবে।

পানাসক্তির একটি প্রধান কুফল এই যে, ইহা মানুষের উক্ত 'হায়' আর 'সেটারস্'গুলিকে নিষ্ক্রিয় বা বিকৃত করিয়া দেয়। এই জন্যই অতি লজ্জাশীল ব্যক্তিও পানোন্মত্ত হইলে লজ্জাহীন হইয়া পড়েন। যিনি স্বভাবতঃ ভীরু, তিনিও পানের ফলে সহসা সাহসী হইয়া পড়েন, যে সকল কার্য অতীব ঘৃণিত ও কদর্য, তাহাও পানাসক্ত ব্যক্তির নিকট সহজ হইয়া যায়। মোট কথা, মানুষের সর্বপ্রকার মনুষ্যোচিত গুণাবলী ধ্বংস করিবার অমোঘ সদ্বৃত্তি, সর্বপ্রকার অস্ত্র এই পানাভ্যাস। ইহার ফল শুধু সাময়িক নহে। এই অভ্যাস যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই ইহার কুফলগুলি শরীরে ও মনে স্থায়ী হইতে থাকে। স্বভাব ও চরিত্রের বিবিধ প্রকার অবনতি হইতে থাকে।

পানাসক্তির ফলে শরীরে বিবিধ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সামান্য কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে আরম্ভ করিয়া রক্তচাপ বৃদ্ধি এবং যকৃতের সাংঘাতিক পীড়া পর্যন্ত এই কদভ্যাসের কুফলরূপে প্রকটিত হইয়া জীবন দুর্বহ করিয়া ফেলে। প্রকাশ্যে জানা না গেলেও একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, যকৃতের বিবিধ প্রকার কঠিন রোগের মূল কারণ পানদোষ। অবশ্য অন্য বহু কারণেও যকৃতের দোষ হইতে পারে।

শারীরিক ব্যাধি সাধারণতঃ রোগীকেই বিব্রত করে, রোগীই তাহার অধিকাংশ ফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু পানদোষে যে মানসিক অবনতি হয়, তাহার ফল শুধু পানাসক্ত ব্যক্তিই ভোগ করে না। ইহার ফলাফল অতীব সুদূর-প্রসারী। ইহার প্রথম দুর্ভোগ ভোগ করেন ইহার নিকটতম আত্মীয়েরা। স্ত্রীর জীবন অভিশপ্ত হইয়া উঠে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও ইহার বিবিধ বিকৃত ব্যবহারে নিপীড়িত হইতে থাকেন। বিদেশে থাকিতে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, একটি পানাসক্ত পরিবারের কথা। সন্ধ্যা হইতে সেই পরিবারস্থ নারীরা দুইখানি প্লাকার্ড বুকে ও পিঠে ঝুলাইয়া লইতেন।

প্লাকার্ড দুইখানি দুইটি সুতা দিয়া বাঁধা। এই সুতা দুটি দুই কাঁধের উপর থাকিত। প্লাকার্ডে লেখা—ডেজি, অণ্টি, মমি, মামি, পেগি, ইত্যাদি। এই সতর্কতা সত্ত্বেও বিবিধ প্রকার সংঘর্ষ হইতে থাকে। ক্রমশঃ বিষপান, গৃহত্যাগ, প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্ঘটনার পর রিভলভারের গুলীতে একটি জোড়া খুনের সঙ্গে গল্পের সমাপ্তি ঘটে। এই গল্পটি অবশ্য গল্পই। তথাপি ইহার একটা খুব গভীর মর্য্যাদ আছে। কারণ, পানের পর মানুষের 'হায়' আর 'সেটারস্'গুলি অকর্মণ্য হইয়া গেলে, মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব থাকে না। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

অতি অল্পমাত্রা পানে হয়তো তেমন প্রবল প্রতিক্রিয়া হয় না কিন্তু এই মাত্রা-নিয়ন্ত্রণ এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, পানাসক্তির প্রধান প্রলোভন সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি। অভ্যাসের ফলে, যে মাত্রায় প্রথমে যথেষ্ট উত্তেজনা হয়, সে মাত্রায় কিছুদিন পরে আর সে উত্তেজনা হয় না। সুতরাং মাত্রা বর্দ্ধিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ফলে, মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতে যে ইচ্ছাশক্তি ও সংযমশক্তির প্রয়োজন, 'হায়' আর 'সেটারস্'-এর নিষ্ক্রিয়তার ফলে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

সংযমশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বিলোপই ইহার সর্বনাশা শক্তির মূল কারণ। সুস্থ অবস্থায় পানদোষের কুফল সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াও ইহা হইতে বিরক্ত হইবার ক্ষমতা লোপ পায়।

পানদোষের একটা প্রধান বিপদ এই যে, ইহা অতি সহজেই পরিবারের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আমাদের পানাহারের অভ্যাসগুলি আমরা প্রধানতঃ পরিবারের মধ্যেই অর্জন করিয়া থাকি। মাছ খাওয়া, মাংস খাওয়া, পেঁয়াজ খাওয়া, নিরামিষ খাওয়া, ডাব খাওয়া, চা খাওয়া, লেমনেড খাওয়া, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার আহারের অভ্যাস আমরা শৈশব হইতেই আত্মীয়-পরিজনের নিকট হইতেই অর্জন করি। সেই জন্য কোন পরিবারে এক বার এক জন পানাসক্ত হইলে ক্রমশঃ এই দোষ পরিবারবর্গের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। কালক্রমে ইহা একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাধিতে পরিণত হয় এবং পুরুষানুক্রমে শাখা-প্রশাখা সমেত অগণিত পরিবার এই জঘন্য এবং সাংঘাতিক ব্যাধিতে ভুগিতে থাকেন। ক্রমশঃ ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলিও অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। এই জন্যই এই ব্যাধিটি সকল প্রকার ব্যাধি অপেক্ষা ভয়ানক ও মারাত্মক। ইহার কোন চিকিৎসা নাই বলিলেই হয়।

অনেক সময়ে দেখা যায়, পানাসক্ত ব্যক্তির মধ্যেও নানা সদ্‌গুণ, কর্মকুশলতা এবং প্রতিভার বিকাশ রহিয়াছে। আমার ধারণা, এই ব্যক্তিরা তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করিবার পর এবং প্রতিভা বিকাশের আরম্ভের পর পানাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই পানদোষ সত্ত্বেও ইঁহাদের কর্মশক্তি রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিগণের পিতৃ-পিতামহ নিশ্চয়ই পানাসক্ত ছিলেন না। পানাসক্ত ব্যক্তিগণের পুত্র-পৌত্রেরা বিশেষ গুণশালী বা প্রতিভাবান হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম আবিষ্কার করা যাইবে না। মানুষের শরীর ও মন অতীব সূক্ষ্ম, অতীব বিস্ময়কর বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। শরীর ও মনের সম্বন্ধও অতীব জটিল। সুতরাং কুৎসিত রোগগ্রস্ত মানুষের সন্তানের পক্ষেও সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়া অসম্ভব নহে। তা ছাড়া, অন্যান্য গুণাবলী থাকিলেও তাহা পানাসক্তির সমর্থক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। পানাসক্তির বিবিধ দোষ পানাসক্ত ব্যক্তিরা নিজেরাও জানেন এবং মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বহু পানাসক্ত বয়স্ক ব্যক্তি পানাসক্ত সন্তানের মধ্যে নিজেরই বীভৎস প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ করিয়া থাকেন।

পানাসক্ত ব্যক্তিগণের একটি মানসিক বিশেষত্ব এই যে, তাহারা নিজের কদভ্যাসের সঙ্গী চায়। সেই জন্য তাহারা সুযোগ পাইলেই বন্ধুদের সহায়তায় বা আত্মীয়তার আকর্ষণে অন্যকে পানমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করে। আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতাম, তখন হিন্দু হোষ্টেলের একটি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রের বন্ধু বাহির হইতে পানীয় লইয়া গিয়া তাহার সিঙ্গল সীটেড ঘরের মধ্যে পানাভ্যাস শিখাইয়াছিল। এই শিক্ষার ফল তাঁহাকে চির জীবন ভোগ করিতে হইয়াছে। অন্য সকল দোষ-গুণের ন্যায় এই দোষটিও বিশেষ ভাবে সঙ্গ-জাত। সুতরাং সর্বদা এ সম্পর্কে অভিভাবক সতর্ক না থাকিলে কোন পানাসক্ত ব্যক্তির কবলে পড়িয়া যাওয়া অতি সহজ। তবে যাহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এই অভ্যাসটি একটি গুরুতর পাপ, তাহার পক্ষে এই প্রলোভন বর্জন করা একেবারেই কঠিন নহে।

পাশ্চাত্য অনেক দেশে পানাভ্যাস সুপ্রচলিত, তাহারা এই অভ্যাসকে নিন্দনীয় মনে করে না, ইত্যাদি যুক্তি নিরর্থক। ইংলণ্ডেও বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ পান-বিরোধী। কোন দেশে বা কোন সমাজে একটি কদভ্যাস সুপ্রচলিত বলিয়াই তাহাকে শ্রেয়ঃ মনে করা যায় না। চীন দেশে ব্যাপক ভাবে অহিফেন-সেবনের প্রথা ছিল, এখনও অনেক অঞ্চলে আছে, তাই বলিয়া অহিফেন-সেবন সদভ্যাস নহে। কেহ কেহ হয়তো শীতের প্রকোপকে ইহার জন্য দায়ী করিবেন। ইহাও সত্য নহে। পাশ্চাত্য দেশের আহার-ব্যবস্থার মধ্যে যে আমিষ পদার্থ থাকে, তাহাতেই প্রচুর পরিমাণ দেহতাপরক্ষক উপাদান আছে। বিশেষ কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন হইলে মৎস্য, মাংস, মাখন প্রভৃতির মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিলেই শরীরাভ্যন্তরস্থ তাপ বর্ধিত করা যাইতে পারে। এ জন্য বিষপানের কোন প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, স্কটল্যাণ্ডের প্রচণ্ড শীতে, যখন তাপ শূন্যেরও নীচে নামিয়া গিয়াছে, সমগ্র প্রদেশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তখনও এক বিন্দু পান না করিয়াও কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। সুতরাং শীতের অজুহাত একেবারেই অচল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিশেষ বিশেষ রোগে বা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঔষধরূপে অ্যালকহল আবশ্যক হইতে পারে। এই সকল স্থলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সামান্য পরিমাণে এবং অল্প দিনের জন্য ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ষ্ট্রিকনিন, আর্সেনিক, মরফিন, প্রভৃতি প্রয়োজনানুসারে যেমন অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তদপেক্ষাও অধিক সতর্ক হইতে হইবে অ্যালকহল ব্যবহারে। কারণ ঔষধ-রূপ সূচ হইয়া ইহা প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ নেশা-রূপ কাল হইয়া ইহকাল ও পরকাল ঝরঝরে করিয়া দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ষ্ট্রিকনিন প্রভৃতি বিষ বেশি খাওয়া অসম্ভব, কারণ তাহাতে মৃত্যু ঘটে। অ্যালকহলে শারীরিক মৃত্যু সহজে না ঘটিলেও উহার অভ্যাসে মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটায়। বৃদ্ধবয়সে, রোগাবসানে বা অন্যান্য দুর্বলতার জন্য সাময়িক অবসাদ দূর করিবার জন্য বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট টনিক স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইগুলির মধ্যে ফস্‌ফেট্‌স্, লেসিথিন, ষ্ট্রিকনিন প্রভৃতি উপাদান থাকে, স্বল্প পরিমাণে অ্যালকহলও থাকে। উক্ত উপাদানগুলি স্নায়ু, মস্তিষ্ক এবং পাচক-যন্ত্রের পক্ষে হিতকারী এবং সাময়িক অবসাদনাশক। এই সকল ঔষধও ক্রমাগত ব্যবহার অনুচিত। কিছুদিন ব্যবহার করিয়া আবার দীর্ঘ দিন বন্ধ রাখা উচিত। যাঁহারা সুমতি বশতঃ পানাভ্যাস ত্যাগ করিতে চান, অথচ অবসাদ নিবারক কিছু না হইলে চলে না, তাঁহারা অল্প পরিমাণে উক্ত টনিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন। ক্রমশঃ উহাও পরিত্যাগ করিতে আর কষ্ট হইবে না। শারীরিক দুর্বলতা ও অবসাদনিবারক হোমিওপ্যাথিক ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন কুফলের সম্ভাবনা থাকে না।

পানাভ্যাস যাহাতে না হইতে পারে, সেজন্য শৈশব এবং কৈশোর হইতেই এই কার্যটিকে অতীব ঘৃণিত ও নিন্দনীয় বলিয়া

মনে করিতে হইবে। চৌর্য, নরহত্যা, প্রভৃতি অপেক্ষা এই অপরাধ সহস্রগুণে অধিক ভয়ানক ও কদর্য, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নরহত্যাদিতে ব্যক্তিবিশেষই ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু পানদোষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ সমস্তই বিষাক্ত ও কলঙ্কিত করিয়া তোলে। প্রথম হইতেই এই কার্যের প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করিতে হইবে। যুক্তি-তর্ক পরের কথা। জগতে এমন কোন কদর্য ও সাংঘাতিক পাপ নাই, যাহা ভোট বা যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সুতরাং এই সর্বনাশা অভ্যাস হইতে মুক্ত থাকিবার প্রকৃষ্ট পথ একটা বদ্ধমূল মানসিক সংস্কার ও রুচি। যাহারা নিরমিষাশী তাহাদিগকে যুক্তি দিয়া যেমন মাছ খাওয়ান যায় না, তেমনি যাহারা পানাভ্যাসকে পাপ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে পান করান যায় না। পানাভ্যাসের বিপক্ষে প্রবল যুক্তি তো আছেই এবং এই জন্যই ইহা সর্বকালে সর্বদেশে নিন্দিত হইয়াছে। ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ ইহার প্রতি একটা গভীর নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণা। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করাও কঠিন নহে, অবশ্য যাহারা পরিত্যাগ করিতে চায় তাহাদের পক্ষে। যে নারী চির জীবন দুই বেলা মাছ খাইয়া আসিতেছেন, মাছ না হইলে যাঁহার গলা দিয়া ভাত নামে না, তিনিও স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কিছুদিন কষ্ট হইলেও, পরে এই মাছের গন্ধও তাঁহার কাছে অসহনীয় মনে হয়। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে কোন অভ্যাসই মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ করিতে পারে না।

অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পানাভ্যস্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ সর্ব প্রকার লজ্জা ঘৃণা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া পানটাকে এমনই অপরিহার্য মনে করে যে, অন্য সব কিছুই তাহার কাছে লঘু মনে হয়।

জীবনের এই মর্মান্তিক ট্রাজেডির তুলনা নাই। এই রোগের চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ইহার প্রতিষেধের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। বাল্য ও কৈশোরে প্রত্যেকের মনে ইহার প্রতি একটি দৃঢ়মূল ঘৃণা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাকে সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপর দিকে, যাহাতে এই বিষের ক্রয়-বিক্রয় সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়, তাহার জন্য সর্ব শ্রেণীর সকলকেই অবহিত হইতে হইবে। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, ক্যানসার প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তদপেক্ষা বহুগুণে প্রবলতর প্রচেষ্টা করিতে হইবে এই সর্বনাশা শত্রুর ধ্বংস সাধনে।

পাথরের চোখ

শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেন্ট মেখে থাকে জামায় রুমালে,
ভুর-ভুর করে গন্ধ—
শুধু ঐ টুকু, বাকীটা বিষম ছন্দ•••
ডাগর ডাগর চোখ দুটো,
তাতে ভাষার বালাই নেই,
তাকিয়েই আছে তার দিকে চাইলেই—
আপনি থেকেই সময় দেখেই তাকায় ;
অনেক দিন তো এমনি গিয়েছে,
চোখ নীচু করে ফিরে তাকিয়েছে—
তাকালে কি হবে, পাথরের চোখে চায়•••

সে দিন তো ছিল ঝির-ঝির করে হাওয়া
সে দিন তো কাঁদে দূর থেকে আসা বাঁশী,
সে দিন বলার, জ্বলার গলার, অনেক সম্ভাবনা,
চাপা আগুনের থেকে থেকে জাগে ফণা•••
হায় পোড়া মন, হায় রে, বিপরীত ভাষাভাষী,
পাথর চোখের নীচে চমকায়
শকুন্তলার হাসি•••
কখনো দেখেছি অন্ধ শ্রাবণ পেখম ধরেছে মুখে,
রকম সকম কেমন কেমন কেন ?

ছড়ানো গড়ানো রক্ত বরণ শাড়ীর পাড়টা বুকে
তাজমহলের সুরকি-রাস্তা যেন—
ভয়ে ভয়ে যতো তাকিয়েছি,
ঝড় ওঠবার ভয়ে—
ভুর ভুর করে এসেছে গন্ধ বয়ে•••
কালো এলোচুলে কি যেন গহন
গোপন মনের কথা,
পাথরের চোখে ভাষাহীন কাতরতা•••

চিবুকের কালো তিল,
প্রথম রবির দুধে-আলতার গায়ে
মনে হয় ওড়ে চিল
হাতছানি দিয়ে আমার মনকে
কোন্ নিঃসীমে ডাকে,
ঘুম-তারাদের ঝাঁকে,
আমার ফানুস জয় করে নেয় মানুষের শঙ্কাকে।
গুটিয়ে গিয়েছি তাকিয়ে চোখের দিকে—
হায় পোড়া মন, হায় রে, সুদূরের ভাষাভাষী,
বিদিশার ঠোঁটে কেন ফুটে ওঠে
তক্ষশিলার হাসি ?

তবু তো পেয়েছি সব দিকে তার
ভুর ভুর করা গন্ধ—
হোক তারপর কুয়াশা কুয়াশা,
সবটুকু হোক সন্ধ•••
চোখ দুটো তার পাথর পাথর বড়ো
নিমন্ত্রণ আর বারণ কিছুই নেই—
তাকিয়েই আছে তার দিকে চাইলেই•••
চোখ থেকে মুখে, কি যেন চিবুকে,
নেমে আসে ধীরে ধীরে,
কাপসা রেখার মতো—
বুঝতে পারি না প্রয়াস করেছি কতো•••
তবু মনে করি ঐ টুকু নিয়ে যাবো,
ঐ ভুরভুরে গন্ধ—
সারা প্রাণ নেবো কানায় কানায় ভরে ;
মনে হয় খুঁজে, ঐখানে বুঝে পাবো,
ঐ পাথরের ছন্দ—
চাইবো না চোখে, মন কর-কর করে•••
মনে ভাবি বুঝি পৃথিবীটা শুধু
ফুলের গন্ধভরা,
যতো ফুল তার বুক চটকানো গন্ধ•••

হায় পোড়া মন, হায় রে
দুটো ঠোঁটে রাশি রাশি,
রক্তমাংসে অহল্যা হাসে
পাথর হবার হাসি•••

আর্য্যরাষ্ট্রে উপনিষদের প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়া

শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য

উপনিষদের দর্শন দেহকে বাদ দিয়ে আত্মাকে সার বস্তু বলে ঘোষণা করল। দেহকে বাদ দিতে বললেই বাদ দেওয়া যায় না। দার্শনিকের ত খাওয়া-দাওয়ার দরকার আছে। কিছু দিন না খেয়ে থাকলে প্রাণ মন সবই অস্থির হয়ে পড়ে। আবার দেহের পিছনে ছুটলেও দেহকে মনের মত ধরে রাখা যায় না। দেহের নাশ হবেই হবে। মানুষ উত্তেজনার বশে মরিয়া হয়ে সুখ ভোগ করে বটে কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যখন সে বিচার করে, তখন মরার পরে বিরাট শূন্যের কথা ভেবে শিউরে না উঠে পারে না। অমর হয়ে থাকার ইচ্ছা মানুষের মনে গাঁথা রয়েছে। মানুষ এই দুর্ব্বলতা নিয়েই জন্মেছে। মানুষের দেহ অতি প্রিয় হ'লেও দেহ নিয়ে সে মজে থাকতে পারে না। দেহটি ঠিক যেন মেয়ের মত—অতি প্রিয় হ'লেও পরের ঘরে পাঠিয়ে পর করে দিতেই হবে। মানুষের এই সসেমিরে অবস্থায় যদি সে শোনে যে সে অমর, তা হ'লে সে কথায় কাণ পেতে দিতে বাধ্য হয়। জড়বাদ দেহকে যত বড় আসনই দিক্ না কেন ও দেহের সুখের যত কিছু আসবাব পত্র যোগাড় করে দিক্ না কেন, কিন্তু মনের মর্ম্মে গাঁথা কাঁটাটি তুলে দিতে পারে না। মরণকে নিয়ে যদি একটু ভাবা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে ছোট ছেলের ভূতের ভয়ের চেয়ে মৃত্যুর ভয় জনসাধারণের মনে কোন মতেই কম নয়। মরণের নেশা মাঝে মাঝে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে বটে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। মরণের ওষুধ নিয়ে যদি কেউ হাঁক দেয়, তাহ'লে তা পাবার জন্য মানুষের মনে আগ্রহ জন্মান স্বাভাবিক।

জনসাধারণের মধ্যে আত্মার কথা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। এমনই হ'ল যে, আত্মার কথা না বললে যেন সভ্য বলে গণ্যই হওয়া যায় না। আত্মাকে কিন্তু মেনে নিলে দেহকে তুচ্ছ করে ত দেখ্‌তে হবে। দেহ ত আর আত্মার নিজস্ব কিছু নয়—একেবারে বাহিরের জিনিস পোষাকের মত। এ থাকলে বা গেলে আত্মার কিছুই যায়-আসে না। আত্মবাদ বেশ আসর জমিয়ে সমাজে বসল ত বটে কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জাগে, 'উপনিষদের যুগে সব মানুষ কি সন্ন্যাসী হয়ে গেল?' চাষীরা লাঙ্‌ল ফেলে আত্মার ধ্যানে বসল কি? রাজারা রাজ্য ছেড়ে ধন-দৌলত বিলিয়ে দিয়ে আত্মাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়লেন কি? মায়েরা রুগ্ন ছেলেকে ফেলে রেখে আত্মার খোঁজে ঘরকন্না ছেড়ে বনে চলে গেলেন কি? শিল্পীরা শিল্পে ইস্তফা দিয়ে অনন্ত আত্মায় মনটাকে মিশিয়ে দিলেন কি? দু' দশ জন লোক আত্মার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন সত্য কিন্তু বাকি লোক আত্মার ব্যাখ্যানে মুখে যতই তুবড়ি ফোটান না কেন, দেহের সুখ-সুবিধার হিসাব-নিকাশ না করে থাকতে পারলেন না। গীতায় যুদ্ধে মদৎ দেবার জন্যে আত্মাকে টেনে আনা হ'ল। চাষীকে ভাল করে চাষ করাবার জন্য আত্মার দোহাই দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল, চাষে মন না দিলে আত্মার আধোগতি হবে। আত্মার সদ্‌গতির জন্য নানা ক্রিয়া-কর্ম্মের কথা প্রচার করা হ'ল। জীবনের নানা স্তরের কাজের উপযোগী করে আত্মবাদকে সমাজে চালু করা হ'ল। আত্মবাদে খাদ দিতে দিতে এমন করে ফেলা হ'ল যে, আত্মা শুধু ফাঁকা নাম হয়ে দাঁড়াল। চোর ও জুয়াচোর সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সমান তালে আত্মাকে সামনে ধরে কাজ হাঁসিল করতে লাগল। আত্মা মেনে এমন সব কাজ করার সুবিধা হ'ল যা ঘোর দেহাত্মবাদীরা ও করতে দ্বিধা করে। পেটুক বললে, 'দেখ আত্মা অমর, সুতরাং মরলেই দেহ পাবে কিন্তু পরের বাড়ীর ফলার মেলা ভার—তাই পরের বাড়ী ভোজ জুটলে শরীরের দিকে ভুলেও তাকাবে না।' এই কারণেই বোধ হয় পরকীয় তত্ত্বেও মেতে যাওয়ায় কতক লোকের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। খুন করাও ডাকাতের পক্ষে সহজ হ'ল, কেন না আত্মাকে ত আর মারা যায় না এবং দেহটা ত আর ধর্ত্তব্যই নয়। যাগ-যজ্ঞ জেঁকে বসল—পশুবধের ঘটাটা আরও বেড়ে উঠল আত্মবাদের অভয় ছায়ায়। আত্মবাদ যেন এ যুগের গান্ধী-টুপি। এই টুপি মাথায় থাকলে নির্ভাবনায় সব কিছু করা যায়—শুধু মুখে দু'-চারবার অহিংসা ও সত্যের কথা বলতে হবে এবং ভারতের মহান ঐতিহ্যের কথা বলে হা-হুতাশ করতে হবে। এ যুগের চোরা কারবারীরা যেমন ভারতের অতীত গৌরবের ও বিরাট ঐতিহ্যের গলাবাজি করে ব্যবসা জমাচ্ছে, তেমনি ভাবে সে কালের বাস্তুঘুঘুরা আত্মা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নিজেদের সব নোংরামি ঢাকবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল।

যা খাঁটি সোনা তা স্থান-বিশেষে অচল হয়। আবার মেকি টাকা কোন কোন বাজারে গিনির চেয়েও চড়া দামে বিক্রী হয়। মেকিকে সাচ্চা বলে চালাতে হ'লে তাতে কোন খাঁটি জিনিসের রঙ ধরাতে হবে। কাঁচের টুকরার চটক থাকলে হীরা বলে চলে। গিল্টির কাজ ভাল হলে পিতলও খাঁটি সোনা বলে আদর পায়। আত্মবাদের রঙ ধরিয়ে সে যুগের ধুরন্ধরেরা তাঁদের মতলব হাঁসিল করতে লাগলেন। সাধারণ লোক ভাবলেন, আত্মা পেতে হলে ধাপে ধাপে উঠতে হয়—লাফিয়ে তাকে নাগাল পাওয়া যায় না। ছোট-বড় সব কাজের মধ্যেই লোকে আত্মা পাওয়ার সিঁড়ি দেখতে লাগল। সমাজ ও রাষ্ট্রের আতঙ্ক কেটে গেল। সব স্তরের মানুষ খুসী মনে আরও বেশী খাটতে লাগল; কেন না, তাড়াতাড়ি গেলেই ত একটা ধাপ পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আত্মবাদ সমাজকে অচল না করে আরও সচল ও মুখর করে তুলল। গরল যেমন সুচিকিৎসকের হাতে অমৃত হয়, তেমনই পাকা কর্ত্তার হাতে পড়ে আত্মবাদ কর্ম্মবাদকে দম দেবার চাবি হ'ল। আসলে কিন্তু দেহাত্মবাদ নতুন পোষাক পরে বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সব যুগেই সত্যকে বলি দেওয়া হয়। সে যুগেও বেশ জাঁক করে সত্যকে বলি দেওয়া হয়েছিল, অথচ সমাজে প্রকাশ করা হ'ল যে, ভারতের সমাজ একেবারে আধ্যাত্মিক হয়ে গেল। আবর্জ্জনার স্তূপ চন্দনের স্তূপে পরিণত হল। ভণ্ডামির আসন হ'ল খুব উঁচু ধাপে।

এখন দেখা যাক, বনে ঋষিদের সমাজে আত্মবাদের ফলাফল কি ভাবে হয়েছিল। নানা তপোবনে আমরা বহু ঋষির কথা শুনি, যাঁরা সমাধির দ্বারা আত্মাকে পেয়েছিলেন। এঁদের বলা হয়

জীবন্মুক্ত। এঁদের দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই। দেহে বিন্দুমাত্র মমতা নাই। শরীর আছে ঠিক যন্ত্রের মত—কিছু খাবার না দিলে সেটা থাকে না, তাই যৎসামান্য কিছু খাবার দেওয়া। কোন নিয়ম নাই। সারা দুনিয়ার প্রাণিমাত্রই এঁদের কাছে নিজেদের মত আপন। তৃণগুচ্ছ থেকে শুরু করে মানুষ পর্য্যন্ত সবাই সমান। কোথাও ভেদ নাই। ছোট-বড় নাই। কেউ প্রিয় কেউ বা অপ্রিয় অথবা শত্রু, এ ধরণের ইতর-বিশেষ নাই। সংসারীর ভালবাসা স্বার্থের হিসাব-নিকাশ করে ভালবাসা। এ ভালবাসা এঁদের অজানা। এঁদের ভালবাসা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। এতে প্রতিদানের প্রত্যাশা নাই। আর এক কথা, এ ভালবাসা দেহকে কেন্দ্র করে নয়। অপরের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়ে—তাকে আপন করে এ ভালবাসা। এ যেন অন্তর্ভেদীর আলো (X-Ray)। দেহকে ভেদ করে আপনার আত্মাকে পাওয়া সবার ভিতরে। এই অবস্থায় জ্ঞান ও প্রেম মিশে গিয়ে এক হয়ে গেছে। ঋষি-সমাজের মধ্যেও খুব বেশী সংখ্যায় ঋষিরা এত উঁচু ধাপে উঠতে পারেন নি। কিন্তু তা হলেও এমন যে একটা ধাপ আছে যেখানে চেষ্টা করলে উঠা যায় তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, এঁদের জীবনই হ'ল এই ধাপের সাক্ষী। এমন আদর্শ চোখের সামনে দেখলে তপোবনের লোকেরা যে সংসারের মানুষ থেকে ভিন্ন ধরণের হবেন, তাতে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে? কিন্তু যে পেছলা পথে চলে ও নিত্য লড়াই করে এ ধাপে উঠতে হয় তাতে পদে পদে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ঋষি-সমাজের সব লোক এক পর্য্যায়ের নয়—নানা স্তরের লোক ছিলেন। ঐ উঁচু ধাপের নীচের তলায় যাঁরা থাকেন তাঁদের উপর দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি অনেকেই বেশ হুকুম চালাতে চেষ্টা করে। আর সাধারণ লোকও এদের হুকুমেই দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত। ঋষি-সমাজের লোকেদের উপর দেহাদির প্রভাব মোটের উপর কমই খাটত। সত্যের প্রতি এঁদের ছিল প্রবল প্রাণের টান। দেহ প্রাণ যায় যাক, তবু সত্যকে ছাড়ব না, এই ছিল এঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাই বালক জাবালি সরাসরি বলেছিলেন যে, তাঁর বাবা যে কে, তা তিনি মার কাছ থেকেও জানতে পারেন নি। সত্যের পূজারী ঋষিরা বিনা দ্বিধায় বলেছেন যে, বিবাহ প্রথা আগে ছিল না। মাকে একজন জোর করে রমণ করতে নিয়ে গেল—এ কথা বলতেও জিভ আটকে যায়নি। সামান্য একটু উপকার পেলে উপকারকারী হাজার অপকার করলেও ক্ষমা করা ছিল এঁদের ধর্ম্ম। কারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। নীচ জাতীয়া পরিচারিকাকেও আত্মজ্ঞান দিতে ইতস্তত: করেন নাই। এঁরা বিবাহ করতেন এবং সন্তানের জন্মও দিতেন বটে কিন্তু এঁরা কামের পূজারী হন নাই। দেহ রাখার চেষ্টা এঁরা করতেন বটে কিন্তু দেহই এঁদের কাছে সব হয়ে উঠে নাই। ইন্দ্রিয়সুখকে এঁরা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। মনের উপর কড়া নজর দিতেন। নানা কঠোর অভ্যাসকে বরণ করে নেওয়ার ফলে আরাম বা বিলাসের প্রতি টান এঁদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা—সন্তান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা উপনিষদে দেখা যায়। এই ব্যবস্থা ইঙ্গিতে বলে না কি—কাম অশরীরী বলেই বোধ হয় ঋষিমনের গোপন কোণে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছিল। কুঁড়ে ঘরে বাস—উড়িধানের চালের ভাত—শাক, কুল প্রভৃতি তরকারি রাত্রে ফলমূল খাবার জিনিস, আর গাছের ছাল পরনে। জীব-জন্তু পশু-পক্ষী গাছ-পালা প্রভৃতি সকলের প্রতিই প্রাণঢালা ভালবাসা। তাদেরই দরকারের দিকে নজর। তাদের আবদার হাসিমুখে হজম করা নিত্য-অভ্যাস এখানে বৈরাগ্যে রুক্ষতা নাই—আছে প্রেমের সরসতা। প্রাণিমাত্রই আশ্রমের সন্তান—সকলেই অবশ্য প্রতিপাল্য। প্রকৃতি এখানে শত্রু নয়—আপনার স্বজন। হিংস্র জন্তুও যেন এখানে এসে নতুন জগতের আলো দেখে আপনার সহজাত বৃত্তিগুলিকে সলজ্জ ভাবে লুকিয়ে রাখে। ঋষিদের আবার কর্ত্তব্যবোধ অতি সজাগ। সূর্য্য উঠার আগেই ধর্ম্মের ডাকে তাঁরা ছুটেছেন। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। এখানকার ছেলেরা সব কাজেই অভ্যস্ত। তারা বেদও পড়ে আবার হোমের কাঠও যোগাড় করে। গুরুর ছোট-বড় সব ফাই-ফরমাস মাথা পেতে নেয়। মেয়েরা ছোট বেলার থেকেই সকলকে ভালবাসতে শিখেছে। তাদের খেলার সাথী পশুর বাচ্ছা, চারা গাছ, লতা-পাতা প্রভৃতি। এরা পড়াশুনা করে এবং বিলাসকে দূরে ঠেলে রাখতে শিখে। ঋষিদের গিন্নীরা সেবাকেই ধর্ম্মের সার বলে নিয়েছিলেন। তাঁদের ভালবাসায় জোয়ার-ভাঁটা ছিল না এবং একচোখোমিও ছিল না। ঋষিরা বনে কেন যে আলাদা সমাজ গড়েছিলেন তার উত্তর তাঁদের জীবন। এ সমাজে আত্মবাদ ফুটে উঠবে না ত আর কোথায় উঠবে?

এ সমাজের চরম উন্নতিই হ'ল এ সমাজের কাল। বেদের যুগে এঁরা শহর ও শহরতলী গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন বহু দূরে বনের ভিতরে। শহর ও গ্রামের সংখ্যা যত বেড়ে চলল লোকালয় থেকে এঁদের দূরত্বও তত কমতে লাগল। ক্রমে এঁদের দর্শনের ঢেউ যখন গিয়ে আছড়ে পড়ল শহরে ও গ্রামে, তখন সেখান থেকে দলে দলে ছাত্র ও ভক্ত দর্শক আসতে লাগল। এঁদের বিদ্যা, জীবন, চরিত্র ও জীবনযাত্রার প্রণালী দেখে সবাই এঁদের পায়ের তলায় বসে শিক্ষা নেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। রাজারা বড় বড় যাগ-যজ্ঞে এঁদের বরণ করতে শুরু করলেন। পুরুতেরা তাতে সায় দিতে বাধ্য হলেন। সমাজের ছেলে-মেয়েরা দলে দলে এখানে এসে পাঠ নিয়ে ধন্য হ'তে লাগল। বুড়োরা শান্তির আশায় এখানে এসে বাসা বাঁধলেন। কেউ কেউ স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। আর দর্শকদের আনাগোনার ত কথাই নাই। এ রকম তপোবন ত একটা মাত্র ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। সেগুলি পূর্ব্বে ছিল এক একটি দ্বীপের মত। তপোবনগুলির মধ্যে ঋষিরা নিজেরা যাতায়াত করতেন। কিন্তু জনসাধারণের ততটা পরিচয় ছিল না। তবে রাজাদের জানা ছিল অন্য কারণে। 'অনার্য্যেরা হঠাৎ এসে ঋষিদের শেষ করে বনের ভিতরে গুপ্ত দুর্গ গ'ড়ে না বসে', এই আশঙ্কা তাঁদের সব খবর রাখতে বাধ্য করত। বেদের ঋষিরা রাজাদের কাছে খুব সম্মান যে পেয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ পাই না। কোন ঋষি হয়ত মোটা দক্ষিণা পেয়েছেন। কেউ বা রথ কেউ বা নারী পেয়েছেন। এখন কিন্তু ঋষিদের সম্মান একেবারে অন্য ধরণের। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন করে সাগরের জলরাশিতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, ঠিক তেমন করেই ঋষিসমাজ শহর ও গ্রামের লোকেদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। ঋষি-সমাজ ও অন্য

সমাজের মধ্যে যে পর্দ্দা খাটান ছিল সে পর্দ্দা ধীরে ধীরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কোন ঋষি রাজার ঘরজামাই হলেন। কেউ বা রাজার মেয়ে বিয়ে করলেন। কেউ বা হাজার হাজার সোনার জিনিষ দক্ষিণা পেয়ে গোছাল সংসারী হ'লেন। কেউ বা অনেক জমি পেলেন। কোন কোন রাজা ঋষি-সমাজের মেয়ে বিয়ে করলেন। এমন কি কোন কোন রাজা ঋষি-সমাজে হামলা করলেন।

এ মেলা-মেশার ফলে ঋষিরাও অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করতে শিখলেন। শান্ত আশ্রমে রুদ্রভাব এসে বাসা বাঁধল। এরই ফলে পরশুরামের জন্ম এই সমাজে সম্ভব হ'ল। কোন কোন ঋষি রাজবাড়ীর পুরুতও হলেন। এর ফলে ঋষি-সমাজের অধঃপতন হ'ল। ঋষিদের আদর্শ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু তা রক্ষার ভার পড়ল জনসাধারণের উপর। কাম লোভ প্রভৃতি মানব সভ্যতার চির শত্রুগুলি মানব-মনের নিত্য সহচর। তারা ঋষি-সমাজে কোণ-ঠেসা হয়েছিল। এখন তারা সুযোগ পেয়ে আত্মবাদকে বিকৃত করতে চেষ্টা করল। বিকৃত আত্মবাদের পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। যে আবহাওয়ার মধ্যে আত্মবাদ বিকৃত হয়েছিল, তার কিছু আলোচনা এখানে করলাম।

উপনিষদের দর্শন ধ্রুবতারার মত এখনও অনেক লোককে পথ দেখিয়ে থাকে। তাই নানা ভাবে বার বার এই দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। এখন আমরা বিচার করে দেখব, এই দর্শনের বলই বা কোথায় আর দুর্ব্বলতাই বা কোথায় এবং এর পরিবর্ত্তনই বা পরে পরে কেমন হয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। ঋষিরা রাষ্ট্রের আবহাওয়ার বাহিরে গিয়ে সমাজ গড়েছিলেন সত্য কিন্তু তাহ'লেও আর্য্যরাষ্ট্র তাঁদের নিরাপত্তার দিকে বেশ নজর রেখেছিলেন। আমরা রামায়ণে দেখতে পাই, যে সমাজের অত্রি ছিলেন মুখপাত্র সেই সমাজে রাক্ষসেরা এসে উৎপাত করছে। বিশ্বামিত্র মারীচ ও সুবাহুর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রতিকারের আশায় অযোধ্যায় হাজির হয়েছেন। শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনার্য্য কর্ত্তৃক বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম লণ্ডভণ্ড করার কথা নানা ভাবে বলা হয়েছে। নানা কারণে অনার্য্যদের আর্য্যদের সঙ্গে বিরোধ করা স্বাভাবিক। ঋষি-সমাজের রক্ষার ভার ছিল রাজাদের উপর। কোন গ্রন্থেই অহিংসার দ্বারা রক্ষাকবচ তৈয়ার করে ঋষিরা সমাজ রক্ষা যে করেছিলেন তার বিবরণ দেখি না। এই কারণে ঋষি-সমাজকে আর্য্যরাষ্ট্রের মুখ চেয়ে থাকতে হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ঋষিরা আর্য্যদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। এই রাষ্ট্রে অনার্য্যদের ন্যায্য অধিকার বা মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। ঋষিরা মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার বশে অনার্য্যদের জন্য কোন আন্দোলন যে করেন নাই, তা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। ঋষি-সমাজ রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে আত্মবাদের ভিত্তিতে এক কথাও বলেন নাই। সমাজনীতি সম্বন্ধে দু-এক কথা অবান্তর ভাবে বলেছেন। যাঁরা সংসারের ভোগ-সুখকে অসার বলেছেন, তাঁদের রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই বা কি?

ঋষি-সমাজের সত্যই লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন; কিন্তু সব ঋষির পক্ষে সেই লক্ষ্যে পৌঁছান বা সে দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছিল কি? নচিকেতার বা শুনঃশেফের বাপের মত অনেক ঋষি যে ছিলেন তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কয় জনই স্ত্রীলোক ব্রহ্মলাভের জন্য সংসার ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন? যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁদের সংখ্যা আঙুল দিয়া গোণা যায় না কি? ঋষি-সমাজে কত লোক ছিলেন এবং কত জনই বা পাকাপাকি ভাবে সন্ন্যাসী হয়ে আত্মা জেনেছিলেন বা জানবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা যে করেছিলেন তা সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে হিসাব-নিকাশ করবার আমাদের কোন পথ জানা নাই। তবুও এ কথা জোর করে বলা চলে যে, আত্মদর্শনে অধিকারী অতি অল্পই ছিলেন। ঋষিদের বিবাহ হ'ত এবং ছেলে-মেয়ের জন্মও হ'ত। গৃহী অবস্থায় আত্মদর্শন হতে পারে কি? আমাদের যদি পাকা জ্ঞান হয় যে আত্মা দেহ নয়, তাহ'লে সংসারের কোন কাজ করা চলে না। যদিও জনক রাজার উপাখ্যান কত আড়ম্বর করেই পুরাণে বলা হয়েছে, তবুও আমরা বলব যে, আত্মায় ডুবে থাকলে রাজ্য করা চলে না। আত্মার স্ত্রীই বা কে আর ছেলেই বা কে? এক কথায় আত্মদর্শন ঋষি-সমাজে ঠিক্‌ঠাক্ চালু হলে ঐ সমাজ অচল হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। প্রবৃত্তির পথে গেলে আত্মা পাওয়া যায় না অথচ নিবৃত্তির পথ স্বাবলম্বী হতে পারে না। এজন্যই নিবৃত্তির পথ কোন সমাজে একচেটে হতে পারে না। অথচ প্রবৃত্তির পথ ও নিবৃত্তির পথের মাঝখানে সাগরের ব্যবধান রয়েছে। এ সাগরকে পার হওয়ার কোন বাঁধ বা পুল নাই। চারিটি আশ্রম সাজালেই সমস্যার সমাধান হয় না। এদের মধ্যে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কঠিন। প্রথম তিনটি আশ্রমকে ভুল বুঝেও মেনে নিতে হয়। ভুল বুঝেও চলব অর্থাৎ ভুল বুঝেও ঠিক্ বুঝব না। আর যখন ঠিক্‌ঠাক্ ভুল বুঝব তখন ছেড়ে অন্য পথে যাব। একথা বলা ছাড়া আর অন্য কিছু বলা কি চলে? আর এক কথা বলা চলে যে, ধীরে ধীরে ছাড়ার পথে এগিয়ে যেতে হবে। সব শেষে শুধু আত্মাকে ধরে আর সব ছেড়ে ফেলতে হবে।

এই যে দুটি পথের কথা বলা হ'ল, তা নিয়ে চুলচেরা বিচার না করেও আমরা বলতে পারি যে, উপনিষদের দর্শনের আদর্শে আর্য্যদের সারা রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ম-কানুন গড়ে উঠে নাই। আর্য্য শাসনে যে ভাবে শহর গড়ে উঠেছিল তা গড়ে উঠতে পারত না যদি রাজারা এই দর্শনের ডাকে সাড়া দিতেন। সমাজে বহু বিবাহের প্রথা মোটেই চলত না, যদি ক্রমনিবৃত্তির পথে আর্য্যরা চলতেন। কেনা গোলাম রাখা বেগার খাটান শূদ্রদের মালিকানি স্বত্ব রহিত করা প্রভৃতি কয়েকটি বদ প্রথা চালু ছিল। ঐ আদর্শ মানিলে এ ধরণের প্রথা থাকতে পারত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আত্মবাদীরা এ সবের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। দর্শন যদি বলে সকলের আত্মা এক বা এক জাতীয়, তা হ'লে সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্যের ছাপ পড়তে বাধ্য। কিন্তু তা না পড়ার কারণ কি? ঋষিরা কর্ম্মবাদ চুপচাপ করে মেনে নিলেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মাথাধরা ব্যক্তিরা আত্মবাদও মেনে নিলেন। কর্ম্মবাদ আত্মাকে স্পর্শ করে না, সুতরাং ঋষিদের এই মতবাদ স্বীকারে কোন বাধাই রইল না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলায় নানা দিক থেকে বিপদ আছে। ঋষিরা মৌনব্রত নিয়ে বেশ বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কর্ম্মবাদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার এখন সময় নাই। ঋষিদের নিজেদের এমন

কোন সমাজনীতি আমরা দেখতে পাই না, যা তাঁদের দর্শনের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। তাঁদের সমাজেও আমরা পরিচারিকার দেখা পাই। আর এই পরিচারিকাদের বেশীর ভাগই শূদ্রদের ঘরের মেয়ে। এই শূদ্র মেয়েদের জন্য কোন ব্যবস্থা আমরা ঋষি-সমাজে দেখতে পাই না। এঁদের দর্শন এঁদের নিজেদের সমাজেও ভাল ভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই।

আত্মসাধনার দিক্ দিয়া বিচার করলে বেশ দেখা যায় যে, ঋষি-সমাজ দুভাগে বিভক্ত। এক দল ঋষি আত্মসাধনায় রত। এঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন পুরোপুরি। আর এক দিকে অপর দল এত উঁচু ধাপে উঠতে পারেন নাই। তাঁরা নিয়েছেন বেদের কর্ম্মপথ। ঈশ-উপনিষদে এই দুই পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ও সময়ে আর এক দল শুধু দেবতার আরাধনা করতেন। তাঁদের নিন্দার কথাও শুনা যায়। এই দলের মিলনে এক নতুন কর্ম্ম-পথের সৃষ্টি হয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দেবতা-আরাধনার পূর্ণ মিলনে কর্ম্মপথের এসেছিল এক নতুন জীবন। এ যেন গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম। দ্রব্যের স্বল্পতা পূর্ণ করা হ'ল অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপহার দিয়া। বাহিরকে অন্তর্মুখী করবার অদ্ভুত প্রয়াস। এই ধর্ম্মজীবন কিন্তু কর্ম্ম ও আরাধনার সমন্বয়কে বজায় রাখতে পারে না। বাহিরের দিকে বেশী ঝোঁক পড়লে বৈদিক নিয়ম-তান্ত্রিক কর্ম্মবাদ মাথা-চাড়া দিয়া আবার উঠে পড়ে। আর অন্তরের দিকে বেশী ঝোঁক পড়লে দেবতার আরাধনা ক্রিয়াপদ্ধতিকে গ্রাস করে ফেলে। দেবতার ধ্যানে রত ব্যক্তি আত্মার ধ্যানেও কোন সুখ পান না। সার্কাসের মেয়েরা যেমন দুটা উঁচু খোঁটার আগায় বাঁধা দড়ির উপরে কিছু না ধরে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ায় ঠিক তেমন ভাবে সমাজের সমস্ত লোক কি সমন্বয়ের অতি সরু সূতার উপরে সারাজীবন চলতে পারে? সমাজের শাসন যতই কঠোর হোক্ না কেন, লোকের পা পিছলে যাওয়াটাই প্রকৃতির নিয়ম। এরই ফলে ঋষি-সমাজেও দলাদলি মানুষের মনের গতির নিয়মেই হয়েছিল।

এই মতভেদের ধাক্কা গিয়ে পৌঁছিল উঁচু ধাপেও। মইএর তলার ধাপ কাঁপলে উঁচু ধাপ রেহাই পায় না। পুকুরের কিনারায় এক ঢিল মারলে ঢেউ শুধু কিনারাতেই হয় না। সেটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা পুকুরটাতে। ঠিক এমন ভাবেই ভাবসাগরে ঢেউ উঠল। সেই ঢেউ গিয়া আত্মসমাধি-নিস্তব্ধ অন্তর-সাগরকে চঞ্চল করে তুলল। দুটি উপায়ে এই ঢেউ যাতে উপর তলায় ঢেউ সৃষ্টি না করে তার ব্যবস্থা করা হ'ল।

প্রথম উপায় হ'ল আত্মদর্শনের আরও সুন্দর ব্যাখ্যা। এঁরা দেবতার আরাধনাকে স্বীকার করে নিলেন এবং বিচার করে দেখালেন, এ পথের শেষ গন্তব্য কি। এ পথ নিয়া গিয়া হাজির করে ঈশ্বরে। এই ঈশ্বর আত্মার একটি অবস্থা-বিশেষ। এই অবস্থায় আত্মা প্রকৃতির যোগ থেকে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন না। এঁর নাম কার্য্য-ব্রহ্ম। এই নামের ভিতর দিয়া দেখান হ'ল যে, খাঁটি ব্রহ্ম এই ঈশ্বরের মূল ভিত্তি। এঁর স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। যাঁদের লক্ষ্য অনন্ত তাঁরা ঈশ্বরের স্তরে পৌঁছিলে সীমার মধ্যেই বাঁধা পড়েন। তাঁদের দৃষ্টির যে বিশালতা ও ব্যাপকতা পেতে চান তা এই গন্তব্যে পৌঁছে সার্থক হ'তে পারে না। চিন্তার জগতের একটা গাঁট কেটে গেল বটে কিন্তু আর একটা জগৎ আছে—সেটা হচ্ছে ভাবের জগৎ। মানুষ আপনাকে হারিয়ে অনন্ত হ'তে চায় না। যতই যুক্তি ব্যক্তিত্বকে মুছে ফেলার পক্ষে থাকুক না কেন, মানুষ সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে নিজে থাক্তে চায় আর নিজের প্রিয়তমকে পেতে চায়। সংসারে আছে নানা বাধা। তাই সে নির্জ্জন খুঁজে বেড়ায়। নির্জ্জন স্থানে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া অভিসারে যেমন বাহির হয় ভীরু স্বভাব নারী, তেমনই সংসারের বাধা এড়িয়ে নির্জ্জনে প্রিয়তমের সঙ্গসুখের উদ্দেশ্যে অভিসারে বাহির হন সাধক। তাঁর ভয় নাই—লজ্জা নাই—ঘৃণা নাই। সে প্রিয়তমের নিকটে চিরকালের জন্য থাক্তে চায়। বিরহের আগুন তাঁর হৃদয়কে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। তাঁর চাই প্রিয়তমের অমৃত স্পর্শ। জগতের প্রিয় বা প্রিয়া চিরকাল ধরে তাঁর হৃদয়ে তৃপ্তি দিতে পারে না। কাম-পথের যাত্রী দূরের টিকিট কিনিলে হন ভক্তিপথের যাত্রী। যে যাত্রী আগ্রার টিকিট কিনেন তিনি হন ভ্রমণকারী, আর যিনি মক্কার টিকিট কিনেন তিনি হন হজযাত্রী। জন্ম-মৃত্যু দিয়া ঘেরা নর-নারীর জন্য ব্যাকুলতা হ'লে লোক বলে কাম, কেন না, সেখানে দেহের উপর নজরটা বড় বেশী। আর যখন দেহকে মুখ্য লক্ষ্য না করে সমগ্র মানুষের জন্য আকর্ষণ জন্মায়, তখন তাকে বলা হয় প্রেম। আর এই প্রেমের যখন পাত্র বদলে যায় অর্থাৎ ছোট-খাট কালের গণ্ডীর বাহিরের কোন বস্তুর উপর যদি এই টানটি প্রবল বেগে একটানা বয়ে যায়, তখন তাহা হয় ভক্তি। এই ভক্তি যদি অবিরাম গতিতে বয়ে যায় তাহ'লে সমাধি হয়ে থাকে। এ যে সরস পথ। যত এগিয়ে যায় রস তত জমে উঠে। প্রাণ প্রিয়কে পাওয়ার জন্য যত অধীর হয়—হাসি কান্না পালা করে এসে মনকে ততই মাতিয়ে তুলে। যাওয়ার পথে ভয়ও হয় না, বেজারও আসে না। একে নীচু ধাপ বলে দমিয়ে দেওয়া যায় না। এ পথের পথিকেরা নতুন দর্শন সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে জীবকে আর জড়জগৎকে নতুন করে দেখলেন। এর ফলে দ্বৈতবাদের ভিত্তি বেশ পাকা হয়ে দাঁড়াল।

অদ্বৈত আত্মবাদ চিন্তাজগতে যত কিছু বিরোধিতা করুক না কেন, সে সব এসে হৃদয়-জগতে দানা বাঁধল না। আত্মপথের যাত্রীর যাত্রাপথের শেষে হয়ত সুখ আছে কিন্তু চলার পথ মরুভূমি সৃষ্টি করার পথ। কিছুই নাই, কিছুই নাই—সব মিথ্যা, সব মিথ্যা—করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে। বলবানের এই পথ। এই জন্যই উপনিষৎ বলেছেন যে, বলহীন আত্মাকে পেতে পারেন না। নির্জ্জনতার ভয় করলে চলবে না—নিঃসঙ্গতার একঘেয়েমি এলে চলবে না। চলার পথে পাশে দাঁড়িয়ে সাহস দিবার কেউ নাই—উল্টা পথে গেলে পথ দেখাবার লোক নাই—ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লে জাগাবার কেউ নাই। নিজেই গুরু—নিজেই শিষ্য—নিজেই বন্ধু—নিজেই সহযাত্রী। কাঁদিতেও আমি—কাঁদাতেও আমি—হাসতেও আমি হাসাতেও আমি এবং ভয় পেতেও আমি, সাহস দিতেও আমি। এমন কঠিন পথে চলাও সহজ নয়। চলে চলে পোক্ত হলে চলা হয়ত কঠিন নয় কিন্তু গোড়াপত্তন করা যায় কেমন করে? বিশেষ করে যখন মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে বাদ না

দিয়া শুধু একটু মোড় ঘুরাইয়া নতুন পথ দেখান যেতে পারে ; তখন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইএর ভাল হাতিয়ার না থাকলে লোককে এই পথের জন্য ডাকা কঠিন নয় কি? শুধু তর্ক দিয়া বুঝাইয়া যুক্তিগুলি পাখীপড়া করলেই কি এই কঠিন পথে চলার জন্য লোক তৈয়ার হতে পারে? সে 'জন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগের কথা ফলাও করে বলা হয়েছে। যোগ যেন একটি মানসিক ব্যায়াম। মনকে যে ছাঁচে ইচ্ছা সে ছাঁচে'লওয়ার কৌশল মাত্র। মনকে জোর করে ধরে-বেঁধে এনে আসল রাস্তায় ফেলতে হবে। রাস্তায় এসে পড়লে যুক্তির ঠেলায় আপনিই এগিয়ে চলবে মন। শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলে অনন্ত ব্রহ্মসাগরে তলিয়ে যাবে। যোগ ব্যায়াম কিন্তু যোগ দর্শনের একচেটে সম্পত্তি নয়। এর সাহায্যে দ্বৈতবাদেও পৌছান যায়। উপনিষদের দর্শন (শঙ্কর যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন) কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদ প্রচার যে করেছে, তা গায়ের জোরে বলা যায় না। ঋষি-সমাজে যে শুধু ফাটল ধরেছিল তা নয়—দর্শনেও ফাটল ধরেছিল।

এখন ঋষি-সমাজের কথা আবার আলোচনা করা যাক্। কেন না, দর্শনের মতভেদ ঋষি-সমাজে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ঋষি-সমাজ মোটামুটি দু' ভাগে বিভক্ত। এক গৃহীর সমাজ আর এক সন্ন্যাসীর সমাজ। সন্ন্যাসীরা গৃহীদের চিন্তার গুরু এবং পূজার পাত্র। তাঁরাই এঁদের জীবনের আদর্শ। অদ্বৈতবাদ যত দিন এঁদের সংসার ছাড়াতে না পারে তত দিন বিবেকের ধিক্কার শুনাতে পারে কিন্তু প্রফুল্ল ও প্রশান্ত মনে এঁদের দিয়া গৃহীর ধর্ম্মপালন করাতে পারে না। ধীরে পা ফেলে আত্মসাধক নিবৃত্তির পথে চলতে পারেন না। পূর্ব্বজীবন ভুল বলে যদি তিনি শিখেন তা হ'লে সেই পূর্ব্বজীবনে আস্থা রেখে সন্তুষ্ট হওয়া যায় কি? বর্ত্তমান কালে অদ্বৈতবাদীদের মঠ স্থাপন আমার কাছে প্রহেলিকা বলে মনে হয়। এতে আসল জীবন নাই—আছে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ।

অপর পক্ষের দার্শনিক মতবাদ অর্থাৎ ভক্তিবাদ অথবা কর্ম্মবাদ যদি গৃহী ঋষি-সমাজকে আপন আদর্শে প্রভাবিত করে, তা হলে গৃহীর জীবন সংসারে অনেকটা নির্লিপ্ত থেকে শ্রীধারণ করতে পারে। আর আত্মবাদের প্রচণ্ড উত্তাপকে ভক্তির শীতল ছায়ায় বা কর্ম্মের অন্ধকারে রেখে গৃহীরা গা-সওয়া করে নিতে পারেন। গৃহী ঋষিদের অনেকেই সন্ন্যাসীদের শুধু ভক্তি দেখিয়ে সেবা করেই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করেছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় গৃহী ঋষি-সমাজ আবার রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ আওতায় ফিরে যেতে পেরেছিলেন।

সোনালি চুল

দুর্গাদাস সরকার

কে এলো কে—বাইরে রেখে নোতুন কেনা গাড়ী
হাল্কা হাওয়ায় উড়িয়ে সভায় লালচে রঙের শাড়ি?
এলো এমন—আমার যেন কতোই চেনা-জানা,
টেবিল থেকে নেয় তুলে সে গোলাপ হাস্নুহানা।

কে দেখেছে আগে তাকে? আমার সে কেউ নয়।
বলতে পারি : রেলগাড়ীতেও হয়নি পরিচয়।
প্রথম শ্রেণীর যাত্রী তারা,—নিম্নশ্রেণীর ঘরে
আসতে তাদের চিরকাল তো গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

স্বয়ং আমি সভাপতি—কাব্য লিখি বলে ;
ধন্য হবে সবাই, তিনি অতিথি আজ হ'লে।
করতালির মধ্যে পড়েন ভাষণ তাড়াতাড়ি,
রাত ন'টাতে জাহাজ ধরে দেবেন সাগরপাড়ি।

সভার শেষে উড়িয়ে শাড়ি আমার কাছে এসে—
আমার লেখার তারিফ করেন মুচকি হেসে হেসে।
তারিফ করেন ভালোই, কিন্তু আমরা কেমন আছি
কে শুধাবে? হেসে হেসে চুল দিলো একগাছি।

বাবরের পত্র

[বন্ধুকে লেখা নীচের চিঠিখানিতে বাবরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যাদের বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা হয়েছে তাদের মধ্যে স্বল্প কয়েক জন মাত্রই প্রাণে বেঁচে সেই প্রাণে বাঁচার ইতিবৃত্ত লেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে বাবর অমিত পরাক্রমশালী বীর হিসেবে সমগ্র তুর্কিস্থান ও আফগানিস্থানে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর উপর কোন দিনই সুপ্রসন্না ছিলেন না। একাধিক বার তাঁকে সিংহাসন হারিয়ে শত্রু-তাড়িত হয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু এত বিপর্যয়ের মধ্যেও বাবর ভেঙ্গে পড়েননি কোন দিন।

বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ বাবর নিজে জাতিতে তুর্কী ছিলেন। বাবর তৈমুরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। আবার তাঁর মাতামহ চেঙ্গীস খাঁর বংশধর। অর্থাৎ বাবরের ধমনীতে দুই ইতিহাস-বিশ্রুত দুর্ধর্ষ সেনাপতির শোণিত প্রবাহিত।

বাবরের সারা জীবন প্রায় রণক্ষেত্রেই কেটেছে। কিন্তু তাঁর সামরিক প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের ফলেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এক দিকে তিনি যেমন অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ, অনন্যসাধারণ সমরনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, তেমনি আর এক দিকে শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগ, স্নেহশীলতা ও উদারতা বাবর-চরিত্রের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু তবুও বাবরের শত্রুর অভাব ছিল না। অনেকেই নানা ভাবে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবরের জনৈক আত্মীয়া পাকশালার বাবুর্চিকে হাত করে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।]

১৬ই শুক্রবারের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি। ইব্রাহিমের মা সেই ডাইনী বুড়ীটা কার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিল যে, আমি হিন্দুস্থানী বাবুর্চিদের পাক করা খানা খেয়ে থাকি। প্রকৃত ঘটনা তোল, বহু দিন হিন্দুস্থানী খানা খাইনি। তাই মুখ বদলানোর জন্য তিন-চার মাস আগে এক দিন ইব্রাহিমকে হুকুম দি' তার বাবুর্চিদের আমার সামনে হাজির করতে। পঞ্চাশ-ষাট জন বাবুর্চির ভেতর থেকে আমি মাত্র চার জনকে পছন্দ করি। এই ব্যবস্থার কথা জানতে পেরে বুড়ীটা অটোয়া থেকে চাখনেওয়ালা আহম্মদকে নিয়ে আসে। তার পর এই লোকটিকে হাত করে একজন বাঁদীর মারফৎ তার কাছে পোয়াটাক বিষ কাগজে মোড়ক করে পাঠিয়ে দেয়। আহম্মদও সেই বিষ বাবুর্চিদের জিম্মা করে দিতে দেরী করে না। যদি তারা কোন মতে এই বিষ আমার খানার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে, তাহলে প্রত্যেককে এক একটি পরগণা বকশিষ দেওয়া হবে—এই রকম প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম বাঁদী ঠিক মত কাজ করে কি না অর্থাৎ বিষটা ঠিক ঠিক আহম্মদের হাতে পৌঁছে দেয় কি না দেখবার জন্যে আরও একজন বাঁদীকে তার উপর নজর রাখতে পাঠিয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা, সেই বিষ রন্ধনপাত্রে না ফেলে একটি রেকাবীতে ঢেলে রেখেছিল ওরা। চাখনেওয়ালাদের উপর আমার কড়া নির্দেশ ছিল, হিন্দুস্থানী বাবুর্চিরা যারা খানা পাক করার সময় বাবুর্চিখানায় উপস্থিত থাকবে, তাদের প্রত্যেককে সেই খানা আগে চাখতে হবে। রেকাবীতে যখন খানা ঢালা হচ্ছিল আমার দুশ্চরিত্র চাখনেওয়ালারা তাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করে। একটি পোর্সেলিনের রেকাবীতে খুব পাতলা করে করে রুটি কেটে রাখা ছিল। সেই রুটির উপর অর্ধেকটা বিষ ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর কাবাবের শুকনো মাংসখণ্ডগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়। খানা পাক করার সময় যদি কাবাবের উপর বা রন্ধনপাত্রে বিষ ছড়িয়ে দিত তাহলেই সর্বনাশ হত। তাড়াহুড়োতে লোকটি বিষের বেশীর ভাগটাই আগুনে ফেলে দিয়েছিল।

শুক্রবার বিকেলে নমাজের পর খানা দিয়ে গেলে আমি প্রথমে খরগোসের মাংস বেশ খানিকটা ও কিছুটা গাজর-সেদ্ধ খেলাম। তার পর বিষমিশ্রিত হিন্দুস্থানী খানাও কয়েক গ্রাস খেলাম। কিন্তু কোন প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ নাকে পেলাম না। এর পরই দু'-এক গ্রাস কাবাবের টুকরো মুখে পুরলাম। কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। আগের দিন কাবাব খেয়ে বিশ্রী লেগেছিল। ভাবলাম, সেই জন্যেই বুঝি আজকে কাবাব খেয়ে বমির উদ্রেক হয়েছে। সারা শরীর গুলিয়ে উঠতে

লাগল। দু'তিন বার হিক্কা উঠে টেবিলক্লথের উপরই বমি করার উপক্রম হয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে পানিঘরে চলে এলাম। সেখানে অনেকটা বমি হয়ে গেল। খাওয়ার পর কোন দিন বমি হয়নি—এমন কি মদ খাওয়ার পরও বমি করিনি কখনো।

আমার কেমন সন্দেহ হোল। সমস্ত বাবুর্চিদের কয়েদখানায় আটক রাখার হুকুম দিলাম। আর আমার বমি কোন কুকুরকে খাইয়ে তাকেও নজরবন্দী রাখতে বললাম। পরের দিন প্রথম নজরেই কুকুরটার শরীরে বিষের লক্ষণ ধরা পড়ল। পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে—এমন কি ইটপাটকেল ছুঁড়ে ঠেলে উলটে ফেলে দিলেও কুকুরটা উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। দুপুর অবধি এই অবস্থা চলল। তার পর উঠে দাঁড়াল কুকুরটা কিন্তু প্রাণে মারা গেল না। আমার দু'জন বিশ্বস্ত সাহসী অনুচরও ঐ খানা খেয়েছিল। তারাও পরের দিন খুব বমি করেছিল। এক জনের অবস্থা তো খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সবাই বেঁচে গেছে এ যাত্রা। একটা বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, কিন্তু মেঘ কেটে গেছে। খোদাতাল্লা আমাকে নব জীবন দান করলেন। ভিন্ন আর এক জগত থেকে ফিরে এলাম। মাতৃগর্ভ থেকে যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ হলাম। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু আল্লার দোয়ায় আবার বেঁচে উঠলাম। আজ বুঝতে পারছি জীবনের দাম কত।

বাবুর্চিদের উপর নজর রাখতে আদেশ দিয়েছি খাজাকিকে। শাস্তির ভয় দেখাতেই তারা একে একে সব কথা কবুল করেছে।

আগামী সোমবার দরবারের দিন। আমীর ওমরাহ উজির নাজির সকলকে দরবারে উপস্থিত থাকতে বলেছি। ঐ দু'জন বাবুর্চি আর বাঁদী দু'জনের বিচার হবে। তারা অপরাধ স্বীকার করেছে। চাখনেওয়ালাকে কেটে দু'খান করা হয়েছে। জীবন্ত অবস্থায় বাবুর্চিদের দেহ থেকে চামড়া খুলে নেওয়ার আদেশ দিয়েছি। এক জন বাঁদীকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলে পিষে মারা হয়েছে, আর এক জনকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। বুড়ী ডাইনীকে এখন কড়া পাহারায় রেখেছি। সে'ও তার কৃতকর্মের ফল পাবে।

শনিবার এক বাটি দুধ পান করেছি। রবিবার মাটি গুঁড়িয়ে একটা দাওয়াই তৈরী করে দিয়েছিল, তাই খেয়েছি। সোমবার মাটি গুঁড়ো আর পেট পরিষ্কারের কড়া দাওয়াই দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করেছি। প্রথম দিনের মতই অর্থাৎ শনিবারের দিন যেমন হয়েছিল, শুকনো কালো পিত্তের মত কি সব বেরিয়ে গেছে গলা দিয়ে।

খোদাতাল্লাকে অশেষ ধন্যবাদ! কোন অনিষ্ট হয়নি। বেঁচে থাকার মত মধুরতর আর কিছু আছে কি না জানি না। কথায় আছে—'যে মৃত্যুর মুখে পড়েছে সেই জানে জীবনের কী দাম।' কিন্তু তবু যখনই এই ঘটনা স্মরণে আসে মন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লার দোয়ায় নব'জীবন পেলাম। আল্লাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

সে দিনের সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা বর্ণনা করা কঠিন। তবু যা যা ঘটেছিল লিখলাম। কারণ মনকে বললাম—'ওদের দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখো না।' আল্লাকে ধন্যবাদ! আরো হয়ত কত দিন বাঁচতে হবে—কত কিছু দেখতে হবে। যাক্ নির্বিঘ্নে বিপদের মেঘ কেটে গেছে। মনে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা রেখো না।

অহিফেনসেবীর পত্র

[ইংরেজ কবি কোলরিজ এত অল্প বয়স থেকে আফিং খেতে সুরু করেন যে, মাত্র উনিশ বছর বয়সে ভাইকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—'আফিং আদৌ আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।' কিন্তু এ কথা সত্যি নয়। কবি শেষ পর্যন্ত নেশার দাস হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই অবস্থা ঘটবার পূর্বেই কবির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লেখা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে কবি সপ্তাহে প্রায় দেড় সেরটাক আফিংয়ের আরক সেবন করতেন। কবির বন্ধু ও প্রকাশক জোসেফ কোট্‌ল ব্রিষ্টলে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত হবার জন্য যথাবিহিত আমন্ত্রণ চিঠি গিয়েছিল কবির কাছেও। কিন্তু নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কোলরিজ সে-সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। কবির এই স্বভাব-বিরুদ্ধ আচরণে বিস্মিত হয়ে কোট্‌ল কবির সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কোট্‌ল কবির অহিফেন আসক্তির কথা জানতেন না। ক্রমশঃ প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হোল। কোট্‌ল তখন কবিকে তিরস্কার করে দীর্ঘ একখানি পত্র লেখেন। সেই চিঠির উত্তরে কবির এই অনুতাপ-লিপি।]

[২৬শে এপ্রিল, ১৮১৪]

প্রিয় কোট্‌ল,

পুরানো বন্ধুর মনের কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিয়েছ তুমি। চিঠি পড়ে মনে বড়ো জ্বালা পেয়েছি। তোমার চিঠির প্রথম পাতার মাঝামাঝি অবধি চোখ বুলিয়েছি মাত্র—তারপর আর দেখিনি। দেখিনি, ঈশ্বর সাক্ষী, তার জন্যে মনে কোন রাগ-দ্বেষ হয়নি। প্রতিনিয়ত যে শারীরিক ও মানসিক দুঃখে নিপীড়িত হচ্ছি আমি, তার জন্যেই পারিনি। এর উপর নতুন কোন যন্ত্রণা পরিপাক করার মত সহ্যশক্তি আর এ দেহে অবশিষ্ট নেই।

তোমাকে এই চিঠিতে আমি সব কথা খুলে লিখব বন্ধু! কোন কথা গোপন করব না। আজ দশ বছর যাবৎ যে মানসিক নির্যাতনে আছি, তা ভাষায় বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। চোখের সামনে নিত্য বিপদের কুটিল ভ্রূকুটি। কিন্তু বিবেকের দংশনই সব থেকে অসহনীয়। বেদনার স্বেদসিক্ত কপালে নিশি-দিন ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাই। কেবলমাত্র পরম স্রষ্টার ন্যায় বিচারের ভয়েই নয়, করুণানিধানের করুণার ভয়েও কম্পিত-কলেবর হয়ে আছি। তিনি বলবেন—'তোমায় এত গুণ দিয়ে পাঠালাম পৃথিবীতে। সেগুলি নিয়ে কি করলে তুমি?' আফিংয়ের দাস হয়ে সুস্থ শরীরে এই যে অকর্মণ্য অশক্ত হয়ে পড়েছি, তার ভয়াবহতায় অভিভূত হয়ে থাকলেও এর কারণ কখনো গোপন করতে চেষ্টা করিনি আমি। বরং বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেককেই সাশ্রুনয়নে লজ্জানত মস্তকে এর যথার্থ কারণ নিবেদন করেছি। এমন কি দুইটি ক্ষেত্রে সামান্য পরিচিত অহিফেনসেবী দু'জন যুবককে আমার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অহিফেন সেবনের মারাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করেও দিয়েছি।

আজ আর ভগবানের দিকে মুখ তুলে তাকানোর ক্ষমতা

নেই আমার। শুধু তাঁর করুণা প্রাপ্তি সম্বন্ধে এখনও হতাশ হইনি। করুণাময়ের করুণা যে অযাচিত পাব না, এমন হতাশ হওয়ার অর্থ অপরাধের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা। তবু যারা আমার পরিচিত, যারা মিত্রস্থানীয় তাদের কাছে স্বীকার করব যে, এক দিন অজ্ঞতা বশতঃই এই জঘন্য অভ্যাসে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। হাঁটুর ফোলায় আর প্রদাহে বহু দিন আমি শয্যাগত ছিলাম। এই সময় মেডিক্যাল জার্ণালে একটি কেস পাঠ করবার দুর্ভাগ্য ঘটে। অনুরূপ প্রদাহে অহিফেনের আরক লেপন ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অহিফেন সেবনে অব্যর্থ ফল পাওয়া গিয়েছে। বস্তুতঃ, আমার ক্ষেত্রেও অহিফেন যাদুমন্ত্রের মত কাজ করেছিল। চলৎশক্তি ফিরে পেলাম ক্ষুধা বৃদ্ধি হোল, মনের স্ফূর্তি ফিরে এল। এক পক্ষকাল এই অবস্থা স্থায়ী ছিল। অবশেষে এই অস্বাভাবিক উত্তেজক ক্রিয়ার অবসান হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির পূর্বলক্ষণগুলিও প্রকটিত হতে লাগল। তখন পুনরায় তথাকথিত প্রতিষেধকের স্মরণ নিতে বাধ্য হলাম। যাই হোক, আজ এত দিন পরে সেই নিরানন্দ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার অভিরুচি নেই আমার।

এ কথা বিশ্বাস করো বন্ধু যে, সস্তা প্রয়োজনের লোভ বা কোন সুলভ দৈহিক তৃপ্তির প্রত্যাশায় আমার স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে আমি অহিফেনে আসক্ত হইনি। নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা, আকস্মিক মৃত্যু-ভয়ে বিবশ কাপুরুষতাই আমাকে এই পথে টেনে নামিয়েছে। শ্রীমতী মর্গান ও তাঁর বোন সাক্ষী আছেন, যতক্ষণ আমি অহিফেন সেবনে বিরত থাকি ততক্ষণ আমার মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দানুভূতি তীক্ষ্ণ ও সজীব থাকে। কিন্তু যেই সেই ভয়াল মুহূর্ত সমীপবর্তী হতে থাকে, নাড়ী চঞ্চল হয়ে ওঠে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়—কেমন একটা অস্থিরতা ও বিমূঢ়তায় সমস্ত দেহ-মন অবশ করে ফেলে যে, কয়েক বার এই মারাত্মক বিষ আর সেবন না করারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তখন গভীর যন্ত্রণায় বুকের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ ওঠে—'পারব না। এ অভ্যাস ত্যাগ করা আমার সাধ্যাতীত।

যদি শ' দুয়েক পাউণ্ড পেতাম অর্ধেক শ্রীমতী কোলরিজকে পাঠিয়ে দিয়ে বাকী অর্ধেক নিয়ে কোন প্রাইভেট নার্সিং-হোমে গিয়ে উঠতাম। সেখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধান ছাড়া কোন জিনিষ আমার হস্তগত হবার উপায় থাকত না। দু'-তিন মাসের জন্য (আশা করি তার মধ্যেই আমার বাঁচা-মরা নির্ধারিত হয়ে যাবে) আমাকে সঙ্গ দান করবেন চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ কোন লোক। এই রকম ব্যবস্থা করতে পারলে হয়ত আশা ছিল। কিন্তু তার ত কোন সম্ভাবনা দেখছি না। ডাঃ ডক্সের তত্ত্বাবধানে থাকতে পারলে হয়ত বেঁচে যেতাম। কারণ, আমার এ অবস্থা মানসিক বিপর্যয় নয়—আমার এ অবস্থা পাগলামীর অবস্থা, শারীরিক যন্ত্রের বিকলন, ইচ্ছাশক্তির নিষ্ক্রিয়তা।

তুমি আমাকে সুস্থ সবল হয়ে উঠতে বলছ। বলছ, সব নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানুষের মত বাঁচতে। হায় বন্ধু, এ ঠিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে হাতের ভরে চলতে বলার মত। দু'-হাত ঘসতে বলার মত। তাহলেই বুঝি তার রোগ ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু সে একথা শুনে বলবে—'হায়! হাতই যে আমি নাড়াতে পারি না। এইটাই যে আমার রোগ। আমার দুঃখ।'

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। যতই দুঃখী হই না কেন, তবু তোমাদের চির স্নেহাসক্ত!

এস. টি. কোলরিজ।

মাদাম দেপিনেকে লেখা রুশোর চিঠি

[নারীদেহের লাবণ্যই পুরুষ-ভ্রমরকে ফুলের দিকে টানে। মাদাম দেপিনের শরীরে কোথাও এমন এতটুকু সুষমা ছিল না যা রুশোর মত মানুষকে কামনায় উদ্দীপ্ত করতে পারত। তবু মাদাম দেপিনের প্রতি দার্শনিক রুশোর হৃদয়ে একটি প্রীতি-মধুর অনুভূতি ছিল। সে সংবাদ মাদামেরও অজানা ছিল না। রুশোর চিঠির প্রত্যুত্তরে তার মনের কথাই অতি সরল করে লিখে পাঠান মাদাম। নারী-পুরুষের প্রেমহীন বন্ধুত্বের অভিজ্ঞান হিসেবে এই চিঠিখানি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।]

(১৭৫৬)

মেয়ে-পুরুষের বন্ধুত্ব সম্পর্কে কোন ধরা-বাঁধা সূত্র আছে বলে আমার ত মনে হয় না। নিজের নিজের ধ্যান-ধারণা মত আমরা নিজেদের নিয়ম রচনা করি। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই কথাটাই আমি আসল সত্য বলে মনে করি। বন্ধুর কাছ থেকে কি কি প্রত্যাশা কর, সে কথা লিখে জানিয়েছে তুমি। অথচ এই দেখ, আমার একটি বন্ধু এই মাত্র এসে আমার কাছে এমন দাবী পেশ করল যে, সে-রকম চাওয়ার কথা তুমি ত বন্ধুত্বের তালিকায় লিখে পাঠাওনি। এখন জিনিষটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল দেখ। আমার মানসিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন মাল-মশলায় তৈরী। দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশ বার এমন কিছু উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করি আমি যাতে বন্ধুরা আমায় অভিসম্পাত দেয়। আমিও চাই যে, আমার অমন বন্ধুরা শীগ্‌গির গোল্লায় যাক্‌। তবে দুটো সাধারণ নিয়ম আছে যা সব বন্ধুত্বের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। যা সবার পক্ষেই প্রযোজ্য। সহনশীলতা আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা বোধ, এই দুটিকে আশ্রয় করেই সব বন্ধুত্ব বেঁচে থাকে—এ বিষয়ে আমার মতদ্বৈধ নেই। এই দুটি গুণ না থাকলে বন্ধুত্বের কোন বন্ধনই অটুট থাকতে পারে না। এক কথায় এই হোল বন্ধুত্বের আচার-সংহিতা। আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে এমন ভালবাসা দাবী করি না যা কৃপণের দান। কিংবা হয়ত নিত্য উচ্ছ্বসিত। চাপাই হোক আর চপলই হোক, গম্ভীর বা সদা হাস্যময় যাই হোন না কেন, আমি বন্ধুকে সত্য স্বরূপেই চাই। আমি যেমন পছন্দ করি তেমনি হবেন বলে তার স্বভাবের বদল আমি চাইব, এ কথা মনে করার কোন মানে হয় না। বরং যে গুণ তার নেই তা নিয়ে বেশী লেবু চটকালে এবং তাকে দিয়ে সেই গুণ আয়ত্ত করাতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেই—ফল দাঁড়াবে এই যে, তাকে আর কোন মতেই সহ্য করতে পারব না। প্রকৃত কলাপ্রেমিকরা যেমন ছবি ভালবাসে বন্ধুকেও তেমনি ভালবাসতে হবে। শিল্প-দরদীরা ছবির বিশেষ গুণগুলিই লক্ষ্য করে—ছবির খুঁত নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না।

তুমি জানতে চেয়েছ, যদি কখনো বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয় কিংবা বন্ধু যদি আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে-ক্ষেত্রে

আমি কি করব? কিন্তু বন্ধু, আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে এমন কথা যে আমি চিন্তাই করতে পারি না। বন্ধুত্বে একটি মাত্র অসদাচরণ আমার জানা—সে হোল অবিশ্বাস। একদিন বন্ধু আমার কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করবে। আবার আর একদিন আমাকে খুশী করার জন্য অন্য কিছু করবে। তারপর আবার মুখ অমাবস্যার অন্ধকার।

এ সব তুচ্ছ অনুযোগ-অভিযোগ হাস্যমতি অন্তঃসারশূন্য লোকদের জন্যই তোলা থাক। নির্বোধ ইতর যারা তারাই নীচ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করে। এই ভাবে তারা বিশ্বাসপরায়ণ, হৃদয়বান ও দার্শনিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হওয়ার পরিবর্তে দিনে দিনে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণচেতা, কোপন-স্বভাব দুরাচার না হলেও নরাধমে পরিণত হয়। কোন মহদাশয় প্রাজ্ঞ বন্ধুর পক্ষে লঘুহৃদয় সঙ্কীর্ণমনা ভণ্ডের মত কাজ করা কি সাজে? যারা তুচ্ছ অন্ধ কুসংস্কারকে প্রকৃত ভগবৎপ্রেম বলে জাহির করতে চেষ্টা করে। বিশ্বাস কর, মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র ধারণা আছে, সে প্রতিবেশীর দুর্বলতা ক্ষমা করতে একটুও দ্বিধা বোধ করবে না। বরং ভাল কাজের জন্য আন্তরিক ভালবাসবে তাদের—কারণ সে জানে, ভাল কাজ করা কত কঠিন।

দিদেরোর সঙ্গে কলহের অব্যবহিত পরেই বন্ধুত্ব সম্পর্কে তোমার এ প্রশ্ন আমাকে ইংরেজ জাতির স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিপর্যয়ের মুখে ইংরেজদের যখন আইনের দুর্বলতা ধরা পড়ে—যে দুর্বলতাই এই বিপদ ডেকে এনেছে এবং এখন যার প্রতিবিধান অসম্ভব—তখন ইংরেজরা যে যে নীতি অনুসরণ করে, বর্তমান অবস্থায় আমারও সেই সেই নীতির কথাই মনে আসছে।

চিঠির মুখবন্ধেই আমি সহনশীলতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বোধ বন্ধুত্বের মূল নীতি বলে উল্লেখ করেছি। কাজেই এক্ষেত্রে কার দোষ কতখানি, এবং কার পক্ষে কোনটা কতখানি প্রয়োজন, ভেবে দেখবার অবসর নেই আমার। যদি কোন প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়ে থাকে, আমার অকপটতার কথা স্মরণ করে আমায় ক্ষমা করো। অনেক ভালো ভালো কথা বলার আছে। কিন্তু প্রতি দু' মিনিট অন্তর লিখতে বাধা পাচ্ছি। তবুও তোমার কানে কানে বলি, আমার হাড়-জ্বালানো কথা শুনে যতই চট না কেন আমার উপর, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। আমার শত অপরাধ সত্ত্বেও তোমাকে আমি সর্ব অন্তঃকরণ দিয়ে ভালবাসি।

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্র

[বাংলার অসহযোগ-আন্দোলনের মধ্যমণি চিত্তরঞ্জন দাশের কারাদণ্ডের সময় লিখিত।]

প্রিয় ভগিনি, ১৪।১২।২১ ইং

আমার মনে যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস-স্মরণীয় মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন, সেই দিন হইতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, তীব্র স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, দীনদরিদ্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে, তবুও চিরদিনই তাঁহার প্রতি আমি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছি। তিনি বাংলা দেশ বা তরুণ-ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত দাশের এই অগ্নি-পরীক্ষার দিনে, তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে। আমি জানি, আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত দাশের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না; কেন না, লোকসমাজে ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাস করি। চিরজীবন একান্ত ভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধ হয় সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয় ভগিনি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, যখন আমি বিজ্ঞান-চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকে সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

আপনি আপনার দুঃখ অপূর্ব সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি মনে-প্রাণে আশা করি, যে কৃষ্ণ মেঘ আমাদের মাতৃভূমির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব।

ভবদীয়
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আঁট করে টাই পরা কি ভাল?

মোটেই না। বেশী আঁটলে অনেক সময়ে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ারও উপক্রম হয়—শ্বাসের কষ্ট হয়। কখনও শক্ত করে টাই কি জামার কলার আটকে গলার শিরা উপশিরা দিয়ে রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ করে দেবেন না। গলার কণ্ঠনালীতে নানা প্রকার চর্মব্যাধির ভয় থাকে তাতে। এই কারণেই মেয়েদের গলদেশে কোনও রকমের ঘামাচি কি ফুসকুড়ি ইত্যাদি দেখা যায় না প্রায়ই।

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

একটা-দুটো নয়, প্রথম হত্যাপরাধের সুদীর্ঘ বাইশ বছর বাদে পলাতক আত্মগোপনকারী খুনী আসামী শশাঙ্কশেখর রায় ধরা পড়লেন আবার দ্বিতীয় বার হত্যা করে।

আশ্চর্য! কে জানত সুদর্শন, সর্বজনপ্রিয় মধুলাপী—বিখ্যাত অভিনেতা চন্দ্রকুমার—আসল ও অকৃত্রিম নাম তার শশাঙ্কশেখর রায়। চন্দ্রকুমার তার ছদ্মনাম। অভিনেতার জীবনটাই তার একটা ছদ্মবেশ। আত্মগোপনের খোলস।

এই দীর্ঘ কাল—সুদীর্ঘ বাইশটা বছর তিনি লোকের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছেন।

আর কেমন করেই বা কেউ সন্দেহ করবে বা জানবে এত বড় অভিনেতা—অমন সুন্দর সুশ্রী সুগঠিত দেহ, অমন রসঘন উদাত্ত কণ্ঠস্বর, মধুলাপী, শিশুর মত সরল ও সর্বজনের প্রিয় লোকটির আসল পরিচয় সে একজন পলাতক খুনী আসামী···সহজ স্বচ্ছন্দে সমাজের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এবং একবার হত্যা করেও তার হত্যার সাধ মেটেনি, সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে আবার সে হত্যা করতে পারে।···

আগুনের মতই সংবাদটা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। হত্যাকারী অভিনেতা চন্দ্রকুমার। এবং পরের দিন শহরের সমস্ত সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় হেড্‌ লাইনে প্রকাশিত হলো অত্যাশ্চর্য সংবাদটি।

বিখ্যাত সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা চন্দ্রকুমার আসলে একজন পলাতক খুনী আসামী। এবং প্রথম হত্যাপরাধের সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন দ্বিতীয় বার হত্যা করে মঞ্চজগতের নবাগতা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উদীয়মানা অভিনেত্রী মায়াকে।

ঘটনাটা সত্যিই বিস্ময়কর!

ডায়মণ্ড থিয়েটারে 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' নামক নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী।

প্রধান পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করছিলেন প্রখ্যাতনামা সর্বজনপ্রিয় প্রৌঢ় নট চন্দ্রকুমার ও নবাগতা উদীয়মানা অভিনেত্রী মায়া দেবী।

'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'র প্রথম অভিনয় রজনী।

ডায়মণ্ড থিয়েটার লোকে লোকারণ্য!

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'য়ে গিয়েছে। দর্শকজন মুগ্ধ-বিস্মিত। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক বহু দিন তারা দেখেনি।

তৃতীয় অঙ্ক শুরু হলো :

পানাসক্ত উচ্ছৃংখল তরুণ জমিদার নীলাদ্রিভূষণ তাঁর বাগান-বাড়ির একটি কক্ষে অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন।

মনের মধ্যে চলেছে তার হিংসার বিষ-মন্থন। সন্দেহের হলাহলে সর্বাঙ্গ তাঁর জ্বলে যাচ্ছে।

তাঁরই অনুগৃহীতা সুন্দরী নর্তকী মীনা সে কি না আজ গোপনে গোপনে তাঁরই এক বন্ধুর সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছে।

বিশ্বাসঘাতিনী শয়তানী!

নর্তকী মীনা এসে কক্ষে প্রবেশ করল।···

'এসো! তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম মীনা!—'

'সত্যি?—'

'হাঁ।—'

'যাক্। সৌভাগ্য আমার!—'

'অনেক দিন তোমার নাচ দেখি না। একটু নাচবে?'

'কোন্ নাচটা নাচব বল?'

'বিশ্বামিত্র নাটকে মুনির ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য মেনকা যে নাচটা নেচেছিল।'

মীনা হাসে। মীনার হাসিটি বড় মধুর!

'হাসছো যে?—' প্রশ্ন করে নীলাদ্রিভূষণ।

'এখনো ভোলোনি দেখছি সে নাচটা!'

'না। ভুলতে আর পারলাম কই!—কিন্তু তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছো?'

'আমি ভুলে গিয়েছি!'

'ভোলনি?'

'থিয়েটারে সেই নাচের ভিতর দিয়েই ত তোমাকে আমি পেয়েছিলাম!'

'হাঁ।—আজ তাই সেই নাচটা আর একবার দেখাও মীনা!'

'কেন বল ত?—হঠাৎ সেই নাচটা দেখবার জন্য তোমার সখ হলো কেন?'

'হাঁ। আর একবার দেখতে দাও। দেখতে দাও সত্যি তোমার সে নাচের মধ্যে কি এমন ছিল যা আমাকে এমনি করে আকর্ষণ করেছিল। এমনি করে আমাকে সব ভুলিয়েছিল—'

নীলাদ্রিভূষণ ঘন ঘন মদের পাত্রে চুমুক দেয়।

'তুমি আজ বড্ড বেশী মদ খাচ্ছ নীলাদ্রি!—'

'ভয় নেই! মাতাল হবো না!—তুমি নাচ।—তোমার নাচ দেখবার মত একটা মুড তৈরী করে নিচ্ছি মাত্র।'

তার পর শুরু হলো নৃত্য।

এবং সেই দৃশ্যে নাচের মধ্যে হঠাৎ নীলাদ্রিভূষণ আচম্‌কা উঠে নর্তকী মীনাকে হত্যা করবে। নাটকানুযায়ীই অভিনয় হলো, তবে হত্যার অভিনয় না করে সত্য সত্যই নীলাদ্রিভূষণ হাতের ছোরাটা সজোরে সমূলে নর্তকী-বেশী মায়ার কোমল বক্ষে বসিয়ে দিল।

অভিনয় নয়। সত্য সত্যই মরণ-যন্ত্রণায় আর্ত চীৎকার করে উঠলো নর্তকীবেশী অভিনেত্রী মায়া দেবী।

'উঃ এ কি! এ কি—' যন্ত্রণায় বিস্ময়ে মায়ার দু'টি চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে।

হাঃ হাঃ করে পাগলের মতই তখন হাসছে নীলাদ্রিবেশী চন্দ্রকুমার।

'হাঁ! হত্যাই আজ তোকে করলাম, পাছে ভবিষ্যতে আর কোন হতভাগ্য বিশ্বামিত্রের ভুল না হয় তোকে দেখে—নর্তকী! স্বৈরিণী!—কালসাপিনী তুই আমারই কণ্ঠলীন হ'য়ে আমারই

বুকে ছোরা হানবি!—চন্দ্রা! চন্দ্রা—ওরে হতভাগিনী তোকে যে আমি প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলাম!…'

প্রম্‌টার সুধীনের হঠাৎ কেমন সন্দেহ হয়। উইংসের পাশ হ'তে প্রম্পট্‌ করতে করতে সে সবই দেখছিল। ব্যাপারটা কেমন যেন তার অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

অভিনেতা চন্দ্রকুমার নীলাদ্রিভূষণের হাত রক্তে লাল হ'য়ে গিয়েছে। তার চোখের তারায় কি এক অস্বাভাবিক উন্মাদের দৃষ্টি! আর তার কথাগুলি ত ঠিক নাটকের কথা নয়! আর রুধিরাপ্লুতা মীনা—মায়া দেবী যন্ত্রণায় তখনও ছটফট্‌ করছে। ষ্টেজের ফ্লোরে রক্তের ধারা। সুট্‌কো ম্যানেজার সীতানাথ পাশেই দাঁড়িয়েছিল—তাকে চাপা কণ্ঠে সুধীন বলে: 'ড্রপ! ড্রপ ফেলে দিন এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে।…'

ড্রপ নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সংজ্ঞাহীন হ'য়ে চন্দ্রকুমারের দেহটাও ষ্টেজের উপরে ঢলে পড়ল।

হৈ-চৈ।…থিয়েটার ভেঙ্গে গেল একটা প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি ডাক্তার একজন ডেকে আনা হলো।

কিন্তু যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে তখন। অভিনেত্রী মায়া দেবীর মৃত্যু হয়েছে।

সকলেই হতভম্ব ও বিস্মিত নির্বাক্‌! এ কি হলো!

ডাক্তার মুখোটিই থানায় পুলিশকে একটা সংবাদ দিতে বললেন।

অবনী অধিকারী নিকটবর্তী থানার ইনচার্জ এলেন।

প্রৌঢ়। মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে। পুলিশ লাইনে দীর্ঘ তেইশ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

অত্যন্ত রগচটা ও স্পষ্টবক্তা লোক বলে আজও চাকরীতে প্রমোশন হয় নি। এবং জানেন, চাকরীর বাকী জীবনে হবেও না।

অবনী অধিকারীর সংগে ম্যানেজার সীতানাথের আগেই কিছুটা আলাপ-পরিচয় ছিল পূর্ব হতেই। তিনি এসে প্রশ্ন করলেন: 'কী ব্যাপার সীতানাথ বাবু?'

'দেখুন না—এ্যাক্‌সিডেণ্ট—' সুট্‌কো সীতানাথ অত্যন্ত নার্ভাস হ'য়ে পড়েছিলেন, ঢোক গিলে কোন মতে জবাব দিলেন।

'এ্যাক্‌সিডেণ্ট!—' ভ্রূকুটি করে তাকালেন পাকা পুলিশ-অফিসার অবনী অধিকারী।

চন্দ্রকুমার তখনও অজ্ঞান। মঞ্চের উপরেই একটা চৌকী এনে তার উপরে চন্দ্রকুমারের জ্ঞানহীন দেহটা শুইয়ে রাখা হয়েছে। এক জন ভৃত্য মাথায় বাতাস করছে।

জ্ঞানহীন চন্দ্রকুমারকে দেখিয়ে সংক্ষেপে সীতানাথ আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বিবৃত করে গেলেন।

'হুঁ!—' সব শুনে অবনী অধিকারী একটি মাত্র শব্দই উচ্চারণ করলেন।

তারপর এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে লাগলেন।

অভিনয়ের জন্য হলেও ছোরাটা ছিল একটা ভোঁতা ইস্পাতের। ছোরার বাঁটটি চমৎকার হাতীর দাঁতের তৈরী।

বাঁটের গোড়া পর্যন্ত একেবারে ছোরাটি সমূলে অভিনেত্রী মায়া দেবীর বক্ষে বিদ্ধ হ'য়ে আছে।

গম্ভীর কণ্ঠে অবনী অধিকারী বললেন: 'হুঁ, জবর অভিনয়ই করেছে বটে দেখছি। একেবারে Practical!'

আরো ঘণ্টা দুই বাদে চন্দ্রকুমারের লুপ্ত জ্ঞান ফিরে এলো।

থিয়েটারের ম্যানেজার সীতানাথের ঘর।

ম্যানেজার সীতানাথ, চন্দ্রকুমার ও অবনী অধিকারী তিন জনে তিনটি সোফায় বসে।

চন্দ্রকুমারের চোখে-মুখে যেন একটা গভীর ক্লান্তির কালো ছায়া পড়েছে।

ম্যানেজার সীতানাথের মুখ হ'তে অবনী অধিকারী ইতিপূর্বে যতটুকু শুনেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে:

'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' নাটকটি মনোনীত হ'য়ে মহলায় পড়বার আগেই প্রধান অভিনেতা হিসাবে নাটকটি সীতানাথ চন্দ্রকুমারকে পড়তে দিয়েছিলেন।

পরের দিন চন্দ্রকুমার এসে সীতানাথকে জানান, নাটকটি তেমন সুবিধা হয়নি। নাটকটি মঞ্চস্থ না করলেই ভাল হয়।

সীতানাথ কিন্তু চন্দ্রকুমারের কথা মানতে চাইলেন না।

তিনি নিজে এবং অন্যান্য যারা পড়েছে সকলেই একবাক্যে বলছে, নাটকটি না কি অপূর্ব হয়েছে, তার নিজের মতও তাই।

সীতানাথ অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরও পৃথক পৃথক ভাবে নাটকটি পড়তে দিলেন মতামতের জন্য।

একবাক্যে সকলেই স্বীকার করলে: নাটকটি সত্যিই চমৎকার হয়েছে! খুব জমবে।

সীতানাথ তখন নাটকটি মঞ্চস্থ করাই স্থির করেন চন্দ্রকুমারের একার আপত্তি সত্ত্বেও।

মহলা শুরু হয় নাটকটির।

মহলা দিতে এসে চন্দ্রকুমার কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকেন। বিশেষ করে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটিতে এলেই তার মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর দেখা দেয়। যেন বেশ চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন।

অভিনয়ের কথাগুলো ও অভিব্যক্তি কিছুতেই যেন প্রকাশ পায় না।

সীতানাথ বলেন: 'এ কেমন হচ্ছে চন্দ্রকুমার! তুমি তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য এলেই রিহার্শেলে অমন সরে সরে দাঁড়াও কেন? climex সিন নাটকের ওটা!—'

চন্দ্রকুমার বলেন: 'ভয় নেই! ষ্টেজে ঠিক হবে।'

অভিনয়-জগতের মধ্যমণি! নটসূর্য চন্দ্রকুমার একাদিক্রমে সেই প্রথম আবির্ভাবের দিনটি হ'তে মঞ্চে গত ষোল সতের বৎসর ধরে যে অভিনয়-চাতুর্য্যে লোককে মুগ্ধ বিস্মিত ও আনন্দ দান করে এসেছেন তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন না করেও পারেন না সীতানাথ। কাজেই চুপ করে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ঐ ভাবেই প্রথম অভিনয়-রজনী ঘোষিত হল প্রাচীর পত্রে-পত্রে।

তারপর ঐ দুর্ঘটনা প্রথম অভিনয়-রজনীতেই।

দীর্ঘ দিন ধরে পুলিশ লাইনে চাকরী করে বিভিন্ন চরিত্রের লোক দেখে ও তাদের সংস্পর্শে এসে অবনী অধিকারীর মানুষ চিনবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছিল।

ম্যানেজার সীতানাথের মুখে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে অবনী অধিকারী মনে মনে দুর্ঘটনাটার একটা explanation খাড়া করেছিলেন।

চন্দ্রকুমার একটু সুস্থ হবার পর তিনি তাকে ম্যানেজারের বসবার ঘরে ডেকে পাঠালেন। এবং অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

'ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল বলুন ত চন্দ্রকুমার বাবু?—'

শান্ত ধীর কণ্ঠে চন্দ্রকুমার জবাব দিলেন: 'সীতানাথকে বহু বার এই নাটক অভিনয় করতে আমি নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সীতানাথ আমার কথায় কান দেয়নি। আমি জানতাম অবনী বাবু, এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই।'

'আপনি জানতেন!—' বিস্মিত অবনী অধিকারী অভিনেতা চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ! রিহার্সালের সময় থেকেই লক্ষ্য করেছি, ঐ নাটকে অভিনয় করতে করতে যত আমি দৃশ্যের পর দৃশ্য এগিয়ে যেতাম ততই যেন সমস্ত দেহ ও মনের মধ্যে আমার একটা অদ্ভুত ক্রিয়া ঘটতো—কিছুই আপনাদের কাছে আমি অস্বীকার করবো না আর দারোগা বাবু! মনে হতো নাটকের ঐ দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের বাইশ বৎসর আগেকার এক দুর্যোগের রাত্রি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে আবার। আমাকে পাগল করে তুলত। আমার সমস্ত সংযমকে ভেঙ্গে একেবারে চুরমার করে দিত।—'

'বাইশ বছর আগেকার এক দুর্যোগের রাত্রি!—' বিস্মিত অবনী অধিকারী প্রশ্ন করেন।

'হাঁ! বাইশ বছর আগে। সমস্ত ঘটনাটা আপনাকে খুলে না বললে ব্যাপারটা ঠিক আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি এত কাল বুঝতে পারিনি অবনী বাবু যে, বাইশ বছর আগেকার এক দুর্যোগের রাত্রির দুঃস্বপ্নটা এখনো মনের অবচেতনে আমার এমন স্পষ্ট হয়েই ছিল। অতীত দিনের যে পৃষ্ঠাটা ভেবেছিলাম একেবারে মন থেকে আমার ধুয়ে-মুছে গিয়েছে সেটা যে, এত কাল পরে এমনি করে আমায় চরম আঘাত হানবে, এ স্বপ্নের অগোচর ছিল আমার।—'

অবাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে ম্যানেজার সীতানাথ ও অবনী অধিকারী শুনছিলেন অভিনেতা চন্দ্রকুমারের কথা।

চন্দ্রকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে আবার বলতে শুরু করলেন: 'সকলেই জানে, আজ থেকে আঠার বছর আগে সর্বপ্রথম জুবিলী থিয়েটারে 'নল-দময়ন্তী' নাটকে এক অপরিচিত তরুণ অভিনেতা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেই দর্শকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং বৎসর না ঘুরতে ঘুরতেই তার অভিনয়-প্রতিভা দিয়ে মঞ্চজগতে তার একাধিপত্য স্থান করে নেয়। তার পর এই সতের বছর ধরে ধাপে ধাপে অভিনেতা চন্দ্রকুমার এগিয়ে গিয়েছে। আজ সে নটসূর্য চন্দ্রকুমার। কিন্তু গত এই আঠার বছর ধরে কেউ কোন দিন ঘূণাক্ষরেও টের পায়নি অভিনেতা নটসূর্য চন্দ্রকুমারের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা কি। অভিনেতা চন্দ্রকুমার সমাজে অপাঙক্তেয়—মঞ্চে তার যত গৌরব ও খ্যাতিই থাক না কেন। তাই অভিনেতা চন্দ্রকুমারকে মঞ্চের বাইরে কেউ জানতে চায়নি বা জানবার চেষ্টাও করেনি। এবং সেই কারণেই তার জীবনের আঠার বছর ধরে একটানা অভিনয়টা কারোই চোখে পড়েনি। চন্দ্রকুমারের অভিনয় দেখতে দেখতেই একদিন লোকের কাছে আমার চন্দ্রকুমার পরিচয়টাই সত্য হ'য়ে গেল। শশাঙ্কশেখর রায়কে লোকে ভুলে গেল: হারিয়ে গেল শশাঙ্কশেখর এ দুনিয়া হ'তে—বেঁচে রইলাম চন্দ্রকুমার আমি—নটসূর্যের খ্যাতি নিয়ে সাধারণ সমাজের বাইরে অভিনেতাদের সমাজে।'

'আপনি—'

'হাঁ। অবনী বাবু—আমার আসল নাম চন্দ্রকুমার নয়—শশাঙ্কশেখর রায়—'

'শশাঙ্কশেখর রায়—'

'হাঁ! আপনাদের পুলিশের বাইশ বছর আগেকার পুরাতন ফাইলগুলো যদি ঘাঁটেন তার মধ্যে খুঁজলেই কৃষ্ণসাগরের এক নারী-হত্যার কাহিনী পাবেন। যে হত্যা সংঘটিত হয়েছিল বাইশ বছর আগে কৃষ্ণসাগরের জমিদার রায়দের বাগান-বাড়িতে এক ঝড়-জলের রাত্রে।'

বিদ্যুৎ-চমকের মতই যেন অতীতের অন্ধকার আকাশটা স্মৃতির আলোয় ঝলসে ওঠে। দীর্ঘ বাইশ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে অবনী অধিকারীর।

প্রথম যৌবনে নতুন চাকরীতে প্রবেশ করে ছোট দারোগার পোষ্ট পেয়ে অবনী অধিকারী গিয়েছিলেন কৃষ্ণসাগরে।

কৃষ্ণসাগরের জমিদার ছিলেন রাজশেখর রায়।

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার। সরকারের আইন-আদালতকে সে মানত না, তার আইন-আদালত ছিল তারই কাছে। এবং তারই একমাত্র উচ্ছৃংখল পুত্র শশাঙ্কশেখর রায়ের বাগান-বাড়িতে এক রক্ষিতা নারী ছিল, তাকে এক ঝড়-জলের রাত্রে হত্যা করে তিনি পলাতক হন।

তার পর আর তার কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি।

পুলিশ দীর্ঘ দুই বৎসর ধরে সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছিল সেই পলাতক খুনী আসামীকে তন্ন তন্ন করে; কিন্তু তার কোন সন্ধানই করতে পারেনি। কর্পূরের মতই যেন শশাঙ্কশেখর উবে গিয়েছিলেন হঠাৎ। শেষটায় এক সময় ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

'আপনিই তাহ'লে সেই পলাতক খুনী আসামী শশাঙ্কশেখর রায়?'

'খুনী আসামী কি না বলতে পারি না অবনী বাবু! তবে আমিই সেই শশাঙ্কশেখর রায়—'

অবনী বাবু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সম্মুখে উপবিষ্ট শশাঙ্কশেখর—চন্দ্রকুমারের দিকে। আশ্চর্য!

এই সেই শশাঙ্কশেখর রায়!

ঘরের গ্যাসের আলো লোকটার মুখের উপরে এসে পড়েছে।

বাইশ বছর আগেকার একটা সকালের কথা মনে পড়ছে অবনী বাবুর।

দূর গাঁয়ের একটা ডাকাতির তদন্ত সেরে কৃষ্ণসাগর দিয়ে একটা

নৌকা চেপে ফিরে সবে এসে ডাঙ্গায় পা দিয়েছেন, সম্মুখেই দেখলেন এক অশ্বারূঢ় তরুণ !

কি চেহারা !

টকটকে কাঁচা সোনার মত গাত্রবর্ণ !

বলিষ্ঠ পেশল দেহ। তেজী একটা কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে বসে দুই হাতে লাগাম ধরে।

পরিধানে মালকোঁচা-মারা ধুতি ও গায়ে গলাবন্ধ কোট।

প্রশস্ত ললাট। খড়্গের মত নাসিকা। ধারালো চিবুক। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ। সরু একটা গোঁফের কালো রেখা ওষ্ঠের 'পরে।

অবনীকে নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নামতে দেখে প্রশ্ন করলেন: 'আপনি ?'

অবনীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান চৌকীদার রহিম শেখ চাপা গলায় জানায়: 'দারোগা বাবু। ছোট হুজুর।'

ছোট হুজুর অর্থাৎ জমিদার-তনয়কে নত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম জানায় অবনী: 'প্রণাম হুজুর! আমি এখানকার থানার ছোট বাবু।'

'হুঁ !'

আর দ্বিতীয় কোন কথা হয়নি সেদিন।

তার পরই শশাঙ্কশেখর অশ্বের গায়ে চাবুক হানতেই ঝড়ের বেগে অশ্বারোহীকে নিয়ে ছুটে চলে যায় দৃষ্টির বাইরে কৃষ্ণসাগরের তীর দিয়ে।

একটা শব্দের রেশ কেবল পশ্চাতে শোনা যায়—টক্ টকা টক্ টক্···খুরের আওয়াজ।

আবার দিন সাতেক বাদে দেখা কৃষ্ণসাগর বিলের হোগলা ও বেতস-বনের ধারে।

পূর্বদিনের মতই মালকোঁচা এঁটে ধুতি পরিহিত। হাতে দোনলা বন্দুক। পাখী শিকারে বেরিয়েছেন শশাঙ্কশেখর।

'প্রণাম হুজুর !—'

'শিকারের সখ আছে দারোগা বাবু ?—'

'আজ্ঞে—'

'শিকার করেন নি কখনো ?—'

'আজ্ঞে—'

'বন্দুক ছুঁড়তে জানেন ?—'

'আজ্ঞে না হুজুর !—'

'বলেন কি ? কাউকে আজ পর্যন্ত গুলী করে মারেন নি ? কি রকম পুলিশের চাকরী করছেন তবে ?—'

'আজ্ঞে—'

'কত দিন হলো ?—'

'সবে মাস দশেক হবে চাকরীতে ঢুকেছি—'

'হুঁ ! হাত তাহ'লে এখনো পাকে নি ! নার্ভাস্ !—' বলতে বলতে হঠাৎ হা-হা করে হেসে ওঠেন শশাঙ্কশেখর।

হাসির শব্দটা দিগন্ত-প্রসারী কৃষ্ণসাগরের কালো জলের উপর দিয়ে একটা প্রতিধ্বনি তুলে দূর-দূরান্তে মিলিয়ে যায়।

হোগলা-বনের ভিতর থেকে কয়েকটা বেলে-হাঁস কঁ কঁ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়।

আর ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে হাতের বন্দুকটা তুলে ট্রিগার টানেন শশাঙ্কশেখর।

দুড়ুম !

শব্দটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, উড়ন্ত হাঁসের মধ্যে একটা ডানা ঝাপটে কঁক্ কঁক্ শব্দ তুলে কৃষ্ণসাগরের জলে পড়ে গেল। অব্যর্থ—আশ্চর্য হাতের নিশানা শশাঙ্কশেখরের। উক্ত ঘটনার দিন পনের বাদেই ঘটলো সেই দুর্ঘটনা।

কিন্তু এই কি সেই স্বর্ণকান্তি বলিষ্ঠ তরুণ ?

কোথায় সেই দুর্বার বন্য উচ্ছৃংখলতা চেহারায় মধ্যে ?

কোথায় সেই তেজোদীপ্ত ভঙ্গী! খাপ-খোলা তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা। সূর্যের আলোর মত প্রাখর্য। আভিজাত্যের জৌলুস!

কপালের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে।

প্রশস্ত কপালে বলি-রেখা স্পষ্ট। চোখের কোলে একটা কালো ছায়া। চোখের দৃষ্টি নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ভীত-শঙ্কিত।

এই কি সেই শশাঙ্কশেখর !···

[ক্রমশঃ।

ডাক-টিকিটের বয়স

১৮৩৮ সালের কথা। রাণী ভিক্টোরিয়ার করোনেশনের কথাই ধরছি, তখনও ডাক-টিকিটের প্রচলন হয়নি। ১৮৪০ সালে স্যার রাউলেণ্ড হিল ডাক-টিকিটের মত একটা জিনিষ বানালেন। কালো এক খণ্ড কাগজের ওপর রাণীর মুখ আঁকা। নক্সা করলেন ফ্রেডরিক হিথ। ছাপালেন পার্কিনস বেকন এ্যাণ্ড কোং। ২৪০ খানা করে একসঙ্গে। দাম প্রত্যেকটি এক পেনী মাত্র। ১৮৫৪ সাল অবধি কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সেই ২৪০ খানার শিট থেকে এক একখানি করে ডাক-টিকিট কাজে লাগান হত। হেনরী আর্চার এই সময় বার করলেন পারফোরেটেড শিট। ১৮৪৭ সালে ডাক-টিকিট এল আমেরিকায়। দু'বছরের তফাতে প্যারীতে। ভিক্টোরিয়ার আমলের সেই ছোট এক পেনীর ডাক-টিকিটের দাম আজ পনেরো পাউণ্ড অর্থাৎ দু'শো টাকারও কিছু বেশী।

ফতেনগরের লড়াই

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বিক্রমাদিত্য

ব্রজানন্দ বাবুর মুখে সমস্ত কথা শুনে স্বামী জিবিদানন্দ ভাবলেন যে, এটা স্বামী খলিসানন্দেরই কারসাজী। তাকে অপদস্থ করার জন্যেই হয়তো এই সব প্ল্যান করা হয়েছে। তবু হাসি মুখে বললেন: ব্রজ, ভয় পেয়ো না, ওরা লোক পাঠিয়েছে তো কী হয়েছে? আমি আছি কী জন্যে? রোজ-সন্ধ্যায় আমি ধ্যানে বসে ফতেনগরের লড়াই'র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী তোমায় বলে দেবো।

কথাটা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হ'ন ব্রজানন্দ বাবু। কিন্তু তবু তাঁর মনে শংকা হয় যে 'হরকরা' হয়তো সমাচারের আগেই লড়াই'র খবর ছেপে বসবে। তাই বলেন, 'কিন্তু হরকরা যে আমার আগেই খবর পাবে গুরুদেব!'

: পাগল হয়েছো? আপেক্ষিক তত্ত্ব কী জানো? ছাত্রাবস্থায় আমি তো ঐ নিয়েই রিসার্চ করতুম। এক দিন আইনষ্টাইন বলে এক ছোঁড়া এসে তদ্বির করতে লাগলো, তারপর আমার গবেষণার কাগজগুলো ওর হাতে ছেড়ে দিলুম। এই থিয়োরী আমারই কণ্ট্রোলে। মানে আমি যে ভাবে বলবো সময় সেই ভাবেই চলবে। তুমি ভয় পেয়ো না ব্রজ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

খুশী হয়েই ব্রজানন্দ বাবু চলে যান। একটু বাদে স্বামী জিবিদানন্দ তাঁর চেলা বিপুলকে ডাকলেন। বললেন, বিপে, ধারাবাজারের পোষ্টমাষ্টারকে চিনিস?

: একটু আধটু পরিচয় আছে বটে—

: বেশ, বেশ, এবার খাতিরটা জমিয়ে নাও। আর পারো তো আমার কাছে এক দিন নিয়ে এসো। আর বন্দোবস্ত করো, ডাকখানা থেকে 'হরকরার' নামে যতো টেলিগ্রাম আসবে তারই এক কপি চাই। অন্ততঃ হরকরার পৌঁছুবার তু' ঘণ্টা আগে। ধ্যানে বসে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী তো আমায় ব্রজকে দিতে হবে। তাই ঐ জিনিষটার বড়ো প্রয়োজন।

প্রভুর আদেশ নিয়ে বিপুল চলে গেলো।

ফতেনগরের লড়াইতে রিপোর্টার হয়ে আসার এই হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

* * * *

তুপুর নাগাদ আমাদের গাড়ী এসে শ্যামগড় পৌঁছুল। এখানে গাড়ী বদল করে ছোট লাইনে যেতে হবে ফতেনগরে।

সারাটা ট্রেণ আমার ও শৈল'র সঙ্গে সংবাদপত্র নিয়ে কথা হয়েছে। কথাবার্ত্তায় বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, বহু দিন যাবৎ শৈল এ 'লাইনে' নেই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও রিপোর্টারদের কাহিনী শৈলকে বললাম। রিপোর্টিং সম্বন্ধে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই,—রিপোর্টার-মহলে সে অপরিচিত। অতএব এ ক্ষেত্রে তার কাজ করার অসুবিধা হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী এ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

শৈল হেসে জবাব দিলে: আপনি আছেন তাহ'লে কী করতে দাদা!

আমি হেসে বলি: যা বলেছো ভায়া, 'নেভার মাইণ্ড' যা কিছু একটা করবো।

রামগড় ষ্টেশনে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা দেরী করতে হলো। আমি শৈলকে ডেকে বললাম: চলুন, রেস্তরাঁতে বসে কিছু খেয়ে নে'য়া যাক।

'চলুন'. শৈল উত্তর দেয়।

বয়কে ডেকে বেশ একটা লাঞ্চের অর্ডার দিলাম। তার পর সুরু হলো খোসগল্প। কবে কোথায় রিপোর্টিং করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম, কাকে ধোঁকা দিয়ে 'ষ্টোরী' আদায় করেছিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে তখন হঠাৎ পেছন থেকে নিজের নাম শুনে বেশ চমকে উঠলাম।

: হেঁ, তুমি এখানে?

তাকিয়ে দেখি গিদোয়ানী।

গিদোয়ানী 'নতুন বার্ত্তা' কাগজের প্রতিনিধি।

আমি হেসে উত্তর দিলাম—তুমিও তো এইখানে।

: মানে, আমরা তুজনে একই পথের পথিক। তাই না?

: ঠিক বলেছো। যাক্ গে, এর সাথে তোমার পরিচয় আছে? শৈল রায়, দৈনিক হরকরার রিপোর্টার।

: গ্ল্যাড টু মিট ইউ। দেখে মনে হচ্ছে ও লাইনে আনকোরা আমদানী। নেভার মাইণ্ড ব্রাদার, তু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যখন 'মর্ণিং বুলেটিনে' প্রথম রিপোর্টার হয়ে ঢুকলুম, তখন বেশ নার্ভাস ছিলুম। তার পর দাদা, একবার যখন 'প্রফেশনের' সিক্রেট রপ্ত হয়ে গেলো, তখন আর কার তোয়াক্কা করি? হেঁ, হেঁ······বলেই গিদোয়ানী হাসতে লাগলো।

তার পর জিজ্ঞেস করলে: তার পর তোমরা কবে রওনা হলে?

: পরন্তু, দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে জবাব দিই।

: ওয়েল ব্রাদার, আমার কথা আর বলো না। বিকেলে ডিউটিতে গিয়েছি, নিউজ-এডিটার ডেকে বললেন, গিদোয়ানী বিখ্যাত খেলোয়াড়, কেবলরাম বিলেতে মারা গেছেন। ওর বউ আছে এইখানে। এক্ষুণি কেবলরামের বাড়ীতে চলে যাও, আর ওর বউর 'রিএ্যাক্‌শান' নিয়ে এসো। যদি সম্ভব হয় তো বউর একটা ছবিও নিয়ে আসবে। আমি তো ব্রাদার, অনেক খুঁজে বাড়ী বের করলুম। ওর বাড়ীর অবস্থা দেখে তো আমি অবাক! কান্নাকাটি তো দূরের কথা, দেখলুম বাড়ীর ভেতরে খুব হাসি-ঠাট্টা চলছে। ওয়েল, তোমরা জানো আমাদের এই প্রফেসন কি বিচিত্র ধরণের। মনের মধ্যে সন্দেহ পুষে রাখতে নেই। বাড়ীর সামনে একটা চাকর ছিল, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "হেই, মিসেস বাড়ী আছেন?" চাকরটা কী বুঝলো জানিনে। একটু বাদে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। মধ্যম-বর্ষীয়াই হবেন। বললুম, আমি "নতুন বার্ত্তা" কাগজের রিপোর্টার। মিঃ কেবলরামের মৃত্যু-খবর শুনে আমরা ভারী দুঃখিত হয়েছি। সমস্ত ক্রীড়া-জগতের যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সে আর কী বলবো! কিন্তু ওর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে হবে।"

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন: কেবলরাম কে?

আমি তো দাদা অবাক! মাত্র ছয় ঘণ্টা আগে খবর এসেছে, "কেবলরাম ইজ ডেড" আর এর মধ্যেই কি না নিজের স্বামীকে ভুলে গেলো ভদ্রমহিলা? ভাবলাম "মডার্ণ ওয়াইফ" হবে হয়তো। তাই বললুম: "কেবলরাম! আই মীন, ইউর হাজব্যাণ্ড, কেবলরাম।"

: আমার হাজব্যাণ্ড, কেবলরাম! আপনি কি বলছেন! হোয়াট ডু ইউ মীন?

আমাদের দু'জনের কথাবার্ত্তা শুনে এক বয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কী ব্যাপার?

আমি সব ভাই গুছিয়েই বললুম। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তো রেগে কাঁই। বললেন: "ইয়েকি মারার জায়গা পাওনি? আমার মেয়ের বিয়েই হয়নি, তার আবার হাজব্যাণ্ড। এক্ষুণি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।"

ওয়েল, তুমি জানো ব্রাদার! আমাদের জার্ণালিজমে এ রকম অবশ্য হয়েই থাকে। তাই চটপট বেরিয়ে এসে বাড়ীর নম্বরটা মেলালুম। না, বাড়ী ঠিকই আছে। তাহ'লে গলদ কোথায়? পাশের পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে: "কেবল বাবু তো কেতো দিন হোল চোলিয়ে গেছেন। উন্‌হেকো বিবি ভী গিয়েছেন সাথসাথ। আভি তো নেহি। কেয়ায়দার আ গিয়া।"

বুঝলাম, ভুল বাড়ীতে উঠেছিলাম। অবশ্য ঘাবড়াবার পাত্তর আমি নই। ভদ্রমহিলার ব্যবহারের প্রতিশোধ নিলুম। নিউজে লিখে দিলুম: "কেবলরামের স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অসন্তোষ ভাব।"

বলতে বলতে গিদোয়ানী থামলে। তার পর আবার বলতে সুরু করলে: সবে মাত্তর এই লিখে শেষ করেছি, নিউজ-এডিটার বললেন, "গিদোয়ানী প্যাক আপ ফর ফতেনগর। এক্ষুণি যেতে হবে।"

: আমি অবাক। জিজ্ঞেস করলুম: কী হয়েছে সেখানে?

: নিউজ-এডিটার বললেন, "আরে সেইটে জানবার জন্যেই তো তোমায় পাঠাচ্ছি। প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ সবাই লোক পাঠাচ্ছে। অতএব আমরা কাউকে না পাঠালে কর্ত্তা আস্তো রাখবেন না।"

ব্যস, তারপর ব্রাদার আমি এলাম এখানে।

এবার কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে গিদোয়ানী জিজ্ঞেস করলে: ব্যাপারখানা কী বলো দিকিনি দাদা! আমি তো এখন পর্য্যন্ত আসল ঘটনাটা কী জানতেই পারলুম না, তোমরা জানতে পারলে কিছু? গিদোয়ানী আমাদের প্রশ্ন করলে।

: কিস্‌সু না—আমরা জবাব দিই।

: মাইরী বলছো?

: সত্যি।

একটু শুকনো হাসি হেসে গিদোয়ানী বলে: সাধে দাদা লোকে বলে জার্ণালিজম সহজ ব্যাপার নয়। আমি আজ পনেরো বছর এ লাইনে আছি, প্রফেসনের হালটা এখন পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "ঠিক বলেছো ভায়া। জার্ণালিজম ইজ টু কমপ্লেক্স থিং।"

: হুররা•••

পেছনে তাকিয়ে দেখি, ব্যারী ক্রকসন ও রামগোপাল—ব্যোয়•••

ব্যোয় এলো। ব্যারী ও রামগোপাল লাঞ্চের অর্ডার দিলে। তারপর ব্যারী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে: ওয়েল, ওল্ড বার্ড, তা হলে দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই এখানে। দি ওয়ার্ল্ড ইজ রাউণ্ড। কী বলো হে গিদোয়ানী?

: পৃথিবী চ্যাপ্টা হলেও আমার কোন আপত্তি ছিল না।

: তার মানে তুমি আমাদের দেখে প্লীজড হওনি—ব্যারী বলে।

: ঠিক বলেছো। এই তেপান্তরে আবার যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, এ আমি আশা করিনি। তাই তো বলছিলুম যে, পৃথিবী গোল না হলে তোমাকে এড়াতে পারতুম—

গিদোয়ানীর কথা শুনে ব্যারী হাসতে থাকে। বলে আমার অপরাধ?

: অপরাধের কথা জিজ্ঞেস করছো? মনে নেই ডিসেম্বরের রাত্রিতে আমায় সিনেমার ভেতর রেখে ইণ্টারভেলের সময় তুমি বেরিয়ে গেলে, আর ফিরে এলে না। তারপর স্যর ভেঙ্কাচলমের কাছ থেকে 'এক্সক্লুসিভ' ইণ্টারভিউ আদায় করলে। অথচ সিনেমার টিকিট কাটার সময় আমায় বললে কি না, "ব্রাদার গিদোয়ানী উই আর অল ফর ওয়ান, এ্যাণ্ড ওয়ান ফর অল। অথচ তোমার পেটে যে এতো শয়তানী বুদ্ধি ছিল এ কী আমি জানতুম!"

ওদের দু'জনের কথা আমরা চুপ করে শুনছিলুম। রামগোপাল এবার মন্তব্য করলে। বললে: "যা হবার তা হ'য়ে গেছে। এ নিয়ে মনে কোন খেদ রেখে লাভ নেই। তারপর আর কে-কে এলো ফতেনগরের লড়াই কভার করতে?"

আমি শৈলর সঙ্গে ওদের পরিচয় করে দিলুম। ব্যারী বললে: আমরা তোমায় আমাদের দলে ওয়েলকাম করছি ব্রাদার। ব্যোয় ব্রিং এ বটল অফ কোল্ড ওয়াটার।

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললে: ভেরী স্যাড। এই সব রেলওয়ে ষ্টেশনে ড্রিংক পাওয়া যায় না। কাজেই ওর বদলে ঠাণ্ডা জল দিয়েই আমরা নতুন বন্ধুর স্বাস্থ্য পান করবো।

আমাদের গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে তখন ঝড়ের বেগে একটি

ঢুকলো ঘরে ঢুকলো। চুল তার এলো-মেলো—দাড়ী কামানো হয়নি বেশ কয়েকটা দিন।

: এই যে 'কমরেড' এসে গেছে দেখছি—ব্যারী বলে।

: 'কমরেড' নয় দাদা, 'কমরেড' নয়। ও সব বুর্জোয়া উচ্চারণ আর করো না। ফরাসী ভাষায় এর উচ্চারণ হলো গিয়ে 'কামারাদ'। দাও এক্টা সিগ্রেট। খাকী মার্কা খেতে-খেতে মুখে অরুচি হয়ে গেছে। তোমাদের দে'য়া সিগ্রেট খেয়ে ক্যাপিটালিষ্টের কিছু পয়সা ধ্বংস করি।

ব্যারী সিগ্রেটের টিনটা এগিয়ে দিলে। শৈল আমায় জিজ্ঞেস করলে: লোকটা কে দাদা?

আরে এর নাম হলো নটবর। আমরা ডাকি কমরেড নিটস্কি বলে। 'বুভুক্ষা' কাগজের প্রতিনিধি।

কমরেড নিটস্কি' এর মধ্যে আসর জমিয়ে নিয়েছে। বললে: তার পর কোন্ ক্যাপিটালিষ্টের পয়সায় এই সব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে? .হু ইজ্ ফুট' দি বিল। ব্যারী ক্রুকসন। ভ্যায়স ভেরী গুড। তোমার কোম্পানী তো আমাদের দেশ থেকে পয়সা শুষে নিচ্ছে হে—

ব্যারী কোন কিছু জবাব দেবার আগে কমরেড নিটস্কি ব্যোয়কে ডেকে বেশ বড়ো রকমের লাঞ্চের অর্ডার দিলে।

* * * *

আমাদের গাড়ী ছাড়ার প্রায় আধ ঘণ্টা আগে। পশ্চিম দিক থেকে আর একটা গাড়ী এলো। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জনতা তুমুল জয়ধ্বনি করে উঠলো।

: হাঁ, হাঁ, আমি আগেই জানতুম জনতার অসন্তোষ দমন করে রাখতে পারবে না সরকার। এই ভ্যাখো তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। পাব্লিক ডেমোনেষ্ট্রেশন—কমরেড নিটস্কি বলে।

: এক দম ভুঁয়ো। নিশ্চয় এই সেই এক্সোপ্লোরার থিয়োডোর ডিকিনসন আমি শুনেছিলুম যে, লোকটা এই ট্রেনেই আসবে। মাই থম। আমার লণ্ডন পেপারের জন্য চমৎকার 'ষ্টোরী' হবে। দেখি ওর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারি কি না—ব্যারী ক্রুকসন বললে।

: এক্সোপোরার না কচু। আমি আলবাৎ জানি এ হলো ফিল্ম ষ্ট্যাক্টর 'জাল কিশোর।' আমার বেশ পুরানো বন্ধু। আমায় ছ' মাস আগে একবার লিখেছিল যে, এই দিকে একবার শুটিং-এর জন্যে আসবে—গিদোয়ানী গম্ভীর হয়ে বলে।

আমি বলি: নেভার মাইণ্ড। চলো এগিয়ে দেখা যাক, লোকটা কে? আরে, কমরেড নিটস্কি গেলো কোথায়?

: তাই তো! কমরেড নিটস্কি কোথায়?—আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম। খানিক খোঁজার পর দেখতে পেলাম কমরেড নিটস্কি প্ল্যাটফর্মের এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা কুলীকে জেরা করছে, হাতে নোট-বই।

: কী তোমাদের অভিযোগ। ক' পয়েন্টের দাবী পেশ করেছো। কবে থেকে ষ্ট্রাইক করছো।

কমরেড নিটস্কির প্রশ্ন শুনে কুলী হতবাক্। বলে: ষ্ট্রাইক! সে আবার কী?

: মানে এই যে, জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে কী জন্তে?

: ষ্ট্রাইক নয়, দেশনেতা বাবুলাল সিং আসছেন এই ট্রেনে হুজুর—কুলী জবাব দিলে।

: হুজুর নয়। বলো 'কামারাদ' মানে বন্ধু—কমরেড নিটস্কি জবাব দিলে।

আমরা কমরেড নিটস্কির দিকে এগিয়ে গেলাম। একটু শুকনো মুখ নিয়ে বললে: দুঃসংবাদ বন্ধু। নো গুড ষ্টোরী।

: মানে তোমার 'ডেমোনোষ্ট্রেশন' নয়, এই তো। এ আমি আগেই জানতুম। 'থিয়োডোর ডিকিনশন' যে এই ট্রেনে আসবেন এ তো জানা কথা—ব্যারী বললে।

: থিয়োডোর ডিকিনশন নয়—কমরেড নিটস্কি জবাব দিলে।

: ব্যারীর কথা। আমি তো আগেই বলেছিলুম যে ফি. ষ্ট্যাক্টর জাল কিশোরও আসছে।

: না জাল কিশোরও নয়—

: তা হ'লে কে? আমরা সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করি।

: দেশনেতা বাবুলাল সিং।

আমাদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠলো। সবাই যেন হতাশ হয়ে পড়লো; আমি বললাম: উপায় নেই। বাবুলাল সিং দেশবিখ্যাত নেতা। ওকে তুচ্ছ করা চলে না। উনি নিশ্চয় ফতেনগরের লড়াই সম্বন্ধে কিছু বলবেন। চলো, ওর কাছে যাওয়া যাক।

* * * *

ট্যুর শেষ করে বাবুলাল সিং বাড়ী ফিরছিলেন। নিজের কামরায় বসেছিলেন। সঙ্গে ছিল তার সেক্রেটারী অনন্ত চাকলাদার।

বাইরে জনতার কোলাহল শুনে বাবুলাল সিং অনন্তকে প্রশ্ন করলেন: অনন্ত, ওরা কারা?

: এইখানকারই বাসিন্দা হবে স্যর। আপনার দর্শন চায়।

: তুমি তো জানো অনন্ত, আমি বড্ডো ক্লান্ত। আর যেখানে-সেখানে বক্তৃতা দিই নে। ওদের চলে যেতে বলো।

: স্যর, জনতার মধ্যে দু'চারজন প্রেস-রিপোর্টারকে দেখতে পেলাম। ওরাও আপনার কাছ থেকে বাণী শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

: আই সী। তা হ'লে আমায় কিছু বলতেই হলো। বাবুলাল সিং কম্পার্টমেন্টের হাতল ধরে এসে দাঁড়ালেন। চারদিক থেকে তুমুল জয়ধ্বনি উঠলো।

বাবুলাল হাসলেন।

: আপনি কিছু বলুন—জনতা দাবী করলে।

: উনি বড্ডো ক্লান্ত, অনন্ত বলে।

: আমরা মানবো না। আমরা ওঁর বক্তৃতা শুনে যাবো।

এর পর আর উপেক্ষা করা চলে না। বাবুলাল বলতে শুরু করলেন।

কিন্তু কী বলবেন তিনি? দেশবাসীর সুখ-দুঃখের কথা বলতে গেলে তার মনটা বেদনায় ভরে আসে। বাবুলাল বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু একটু বাদেই স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, জনতা বেশ উত্তেজিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ গোলমাল হচ্ছে। বাবুলাল থামলেন। জিজ্ঞেস করলেন। অনন্ত, ব্যাপার কী বলো তো? উত্তেজিত কেন?

: সুর বড্ডো ভুল হয়ে গেছে। আপনি যে বক্তৃতাটা দিচ্ছেন ওটা হলো ছয় নম্বর বক্তৃতা। রেলওয়ে ওয়ার্কার সম্বন্ধে ওদের দাবী-দাওয়া নিয়ে। এরা সবাই ইস্কুল-কলেজের ছাত্র। আপনি সেই চার নম্বর বক্তৃতাটা দিন। গত বার রায়পুর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে বলুন, দেখবেন জনতা শান্ত হয়ে গেছে। বাবুলাল আবার বলতে লাগলেন।

: আপনারা ভাবছেন, আমি আপনাদের কাছে রেলওয়ে ওয়ার্কার সম্বন্ধে বলছি কেন ? তবে শুনুন, আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, আপনারা রেলওয়ে ওয়ার্কারের মতো ব্যবহার করবেন না। ছাত্রদাবীর উপর জোর দিন•••

চার দিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো।

*   *   *   *

কমরেড নিটস্কি বলে : লোকটা ঠগ।

রামগোপাল বলে: উপায় নেই দাদা! ওর বক্তৃতা আমায় কভার করতেই হবে। আমার কর্ত্তার বিশেষ বন্ধু।

ব্যারী ক্রকসন প্রশ্ন করলো : সত্যিই কী ব্যাটার ভবিষ্যৎ আছে ?

উত্তর দিলে রামগোপাল। ভবিষ্যৎ মানে, আজ বাদে কাল এই ব্যাটাই দেখো একটা মন্ত্রী হবে।

: তা হ'লে তো দাদা একে উপেক্ষা করা চলে না। লণ্ডনে কিছুটা পাঠাতেই হবে দেখছি। কিন্তু ফতেনগর সম্বন্ধে একটা কথাও দেখি বললে না।

আমি জবাব দিই : এ সব রাজনৈতিক চাল আর কী। বলুক আর না বলুক বয়েই গেলো। আমি ভায়া লিখে দিচ্ছি : ফতেনগর সম্বন্ধে বাবুলাল সিংকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে পর দেশনেতা জবাব এড়াইয়া গেলেন এবং বললেন : "নো কমেণ্টস্"।

: ঠিক বলেছো দাদা, ঠিক বলেছো। আমরা সবাই এই কথা লিখে দিচ্ছি—গিদোয়ানী উত্তর দেয়।

*   *   *   *

ফতেনগরে এসে যখন পৌছলাম তখন প্রায় বিকেল চারটা। ষ্টেশনে দেখতে পেলাম বেশ সোরগোল পড়েছে। ভলাণ্টিয়ারের দল এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে।

একজন ভলাণ্টিয়ার এসে জিজ্ঞেস করলে : প্রেস-রিপোর্টার।

আমরা জবাব দিই : ইয়েস।

আমি বিদ্রোহী দলের ভলাণ্টিয়ার। আপনাদের জন্যে প্রেস-ক্যাম্প আমাদের হেড কেয়ার্টারের পাশেই তৈরী হয়েছে। শত্রুদলের কেউ আছেন—ভলাণ্টিয়ার বলে।

: মানে—ব্যারী প্রশ্ন করে।

: মানে, আপনাদের মধ্যে এমন কোন কাগজের রিপোর্টার আছেন, যাঁর কাগজের নীতি হলো আমাদের শত্রুপক্ষকে সমর্থন করা : অবশ্যি আপনারা যদি কেউ থাকেন তা হ'লে আমরা আমাদের প্রেস-ক্যাম্পে জায়গা দিতে পারবো না ; 'হাই কম্যাণ্ডের' হুকুম !

ব্যারী রামগোপালকে প্রশ্ন করলে : এই তোমাদের কী পলিসি ?

: রাইটিষ্ট কিন্তু এ ক্ষেত্রে লেফটিষ্ট।

কমরেড নিটস্কি ফোড়ন কাটলে : মানে দাঁড়কাক।

: "কমরেড নিটস্কি ইয়েকি নয়। আমাদের পলিসি যাই হোক না কেন, আমাদের কাগজের সার্কুলেশন জানো। "দি অনলি সার্কুলেটেড পেপার ইন দি কান্ট্রি।"

: থাক্ থাক্ ঝগড়া করে লাভ নেই। গিদোয়ানী, তোমার কী পলিসি ?

: আমরা লেফট-রাইট। মানে হাফ রাইটিষ্ট হাফ লেফটিষ্ট।

এমন সময় আর এক ভলাণ্টিয়ার ছুটে এলো। খবর দিলে : বিরোধী দলের ভলাণ্টিয়াররা আসছে, প্রেস-রিপোর্টারদের জন্যে। এদের শীগগিরই প্রেস-ক্যাম্পে নিয়ে যাও। আর দেরী নয়।

এবার প্রথম ভলাণ্টিয়ার বললো : চলুন দাদা, আমাদের ক্যাম্পেই চলুন। খাওয়া-দাওয়ার পর, আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমাদের নীতি সমর্থন করেন না, তাঁদের আমরা আমাদের নীতি বুঝিয়ে দেবো। চলুন, আপনারা।

*   *   *   *

শৈল আমার দিকে এগিয়ে এলো। বললে : চলুন এই ফতেনগরে থাকবার আর একটা জায়গা আছে। আমার দাদার বন্ধু, ডাক্তার মেটার।

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বললাম : আগে বলেননি তা ম'শায়! চলুন চুপি-চুপি এই ভীড় থেকে কেটে পড়ি। ওদের সঙ্গে থাকতে গেলে এক্সক্লুসিভ ষ্টোরী পাওয়া যাবে না। কখন কোন 'নিউজে' আমাদের এরা ডুবিয়ে দেবে বলা যায় না।

: তা হ'লে চলুন। ডাঃ মেটারের বাড়ীটা একটু খোঁজ করে নিতে হবে।

ব্যারীকে বললাম : আমরা দু'জনে ভাই 'অন্যত্র' যাচ্ছি।

ভলাণ্টিয়ার প্রশ্ন করলে : তার মানে আপনারা আমাদের নীতিকে সমর্থন করেন না, এই তো ?

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম : নাঃ নাঃ, পুরোমাত্রায় আমরা আপনাদের পক্ষে। তবে কী জানেন, শৈল বাবুর দাদার বন্ধু ডাঃ মেটার এইখানেই থাবেন। ওর ওখানেই আমরা ঠাঁই নেবো।

আমার কথা শুনে গিদোয়ানী এগিয়ে এলো। বললে : দাদা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। ঐ ব্যারী ক্রকসনকে বিশ্বাস নেই। ওখানে থাকলে আমার নিউজগুলোতে একটু 'কলার' দিয়ে ব্যাটা পাঠাবে এ আমি তোমায় হলপ করে বলছি।

আমি শৈলর দিকে তাকালাম। শৈল বললে : বেশ তো চলুন। আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

ভলাণ্টিয়ার করুণ দৃষ্টি হানলে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে, আমরা বিরোধী দলের প্রেস-ক্যাম্পে যাচ্ছি নে। বললে : এক ঘণ্টা আমাদের নেতার সঙ্গে আলাপ করে দেখুন। আমি হলপ করে বলতে পারি যে, আপনারা আমাদের নীতির সমর্থক হবেন।

আমরা আশ্বাস দিলাম যে, আমরা তাদের নীতিরই সমর্থক অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করবার কোন হেতু নেই। আমাদের থাকবার অন্যখানে সুবিধে আছে বলে আমরা যাচ্ছি।

[ক্রমশঃ।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

যে গৃহী অর্থকে পরমার্থ জ্ঞানে তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনি যেমন ভুল করেন, যে গৃহী অর্থকে অনর্থজ্ঞানে উপেক্ষা করেন, তিনিও তেমনই ভুল করেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথা—"মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জ্জন ক'রে স্ত্রী-পরিবার দশ জনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হ'বে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ?" কিন্তু অর্থের স্বাচ্ছল্য ও অবসর থাকিলে উভয় প্রযুক্ত করিয়া লোকের কল্যাণকর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হ'ন—এমন লোক সমাজে অধিক দেখা যায় না এবং সেই জন্যই তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—স্মরণীয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সেইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে) পিতামহের তৎকালীন কর্ম্মস্থান বর্দ্ধমানে যোগেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ তারিখে ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। দীর্ঘ জীবনে তিনি নানা উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া গিয়াছেন—কোন কোন কালোপযোগী জনহিতকর অনুষ্ঠানের তিনি পথিপ্রদর্শক ছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতা চন্দ্রমাধব ঘোষ স্বীয় প্রতিভাবলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান—ঢাকা জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণায় ঘোলঘর গ্রামে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র যখন তরুণ, তখন বাঙ্গালায় নানা মনীষীর আবির্ভাবে নানা জনকল্যাণ জনক কার্য্যের সূচনা হইয়াছিল। সে সকল পঠদ্দশাতেই যোগেন্দ্রচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি যখন কলেজে ছাত্র তখনই তিনি শ্রমিকদিগের শিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনি সে সকলে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। ছাত্রদিগের মধ্যে মেথর, ডোম প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত ও অবজ্ঞাত সম্প্রদায়ের ছাত্র ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্রের জন্মের মাত্র তিন বৎসর পরে যে মহাপুরুষের জন্ম হয়, সেই স্বামী বিবেকানন্দেরই মত তিনি স্বদেশীয়দিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"ভুলিও মা—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল,—আমি ভারতবাসী; ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দেরই মত ধনীর সন্তান গৃহী যোগেন্দ্রচন্দ্র মনে করিতেন, সমাজে যে ভেদ বর্ত্তমান তাহা "বীরভোগ্য স্বাধীনতা" লাভের বিরোধী। সেই জন্য তিনি সমাজের যে স্তরে অজ্ঞতার অন্ধকার অত্যন্ত ঘন—সেই স্তরে শিক্ষার আলোক বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আবার স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার কল্পে তিনি বিক্রমপুর-সম্মিলনীর সম্পাদক হইয়াছিলেন ও পরে একটি প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। সে সময় নানা স্থানে এইরূপ সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যশোহর (পরে যশোহর-খুলনা) সম্মিলনী সে সকলের অন্যতম—তাহার অন্যতম কর্ম্মী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্র যোগেন্দ্রচন্দ্রের কার্য্যে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং এক বার ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—"কলিকাতার লোক বলে, এখানে দু'টি পাগল আছে—যোগেন ঘোষ, আর আমি।"

কলেজে পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে উকীল হইয়া তিনি স্বীয় উপার্জ্জনলব্ধ অর্থে প্রথমে রামমোহন রায়ের দুষ্প্রাপ্য রচনাসমূহ—সম্পাদন করিয়া—পুনঃপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ রচনা তখন কেবল দুষ্প্রাপ্যই হয় নাই, পরন্তু অনেকে সে সকলের কথা বিস্মৃত হইতেছিলেন। ঐ সকল রচনা সংগ্রহে ও পাঠোদ্ধারাদির দ্বারা সম্পাদনে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম "ফেলো" নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হইলে যে দুই জন নির্ব্বাচিত হ'ন—যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতর। আর এক জন—মহেন্দ্রনাথ রায়। তাঁহার নির্ব্বাচনের উল্লেখ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) আচার্য্য বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন যোগেন্দ্রচন্দ্রের ঐ কার্য্যের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—যোগেন্দ্রচন্দ্র আট বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, উপাধি লাভ করেন এবং প্রায় ছয় বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কাজ করিতেছেন—তিনি মার্জ্জিতরুচি এবং রামমোহন রায়ের বিক্ষিপ্ত রচনাবলী উৎকৃষ্ট ভূমিকাসহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার দেশের ও সাহিত্য-জগতের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।—

"Has done his country and the literary world good service by editing in a collected form, and with an excellent introduction the scattered writings of the Indian reformer, Ram Mohan Roy"

রামমোহনের সাম্যবাদ যোগেন্দ্রচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে তিন বার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালানন্তর, তিন দেশে তিন জন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন"—"মনুষ্য সকলেই সমান।" প্রথম সাম্যবাদ-প্রচারক—গৌতম বুদ্ধ, দ্বিতীয় সাম্যাবতার—যীশুখৃষ্ট, তৃতীয় রুসো। বুদ্ধদেবের প্রতি যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধ সার রিচার্ড টেম্পল ব্রহ্মে পুরাবস্তু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহা যোগেন্দ্রচন্দ্র ভক্তিসহকারে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং একেশ্বরবাদের সমর্থনে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা বিদেশে ও কোবিদ-সমাজে আদর প্রাপ্ত হইয়াছে।

তিনি আইন সম্বন্ধীয় যে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—

হিন্দুদিগের আইনের নীতি, হস্তান্তরের অযোগ্য সম্পত্তি সম্বন্ধীয় আইন ইত্যাদি—সেই কয়খানি প্রামাণ্য আইনগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

তিনি এ দেশের রাজনীতিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসে জনকল্যাণকর কার্য্যের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে সচেষ্ট ছিলেন। চা-বাগানে আড়কাঠীদিগের দ্বারা কুলী (শ্রমিক) সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করা হইত, তাহা আলোচনার বিষয় হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের রামানন্দ ভারতী (রামকুমার) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সেই সকল অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিদিগের 'সঞ্জীবনী' পত্রদ্বয় এ সম্বন্ধে যে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়। আসামবাসী বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেসে সে বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতায় ঐ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাহা উপস্থাপিত ও বিপিনচন্দ্র তাহা সমর্থন করেন।

কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াই নিরস্ত হ'ন নাই। তিনি নিজ ব্যয়ে আসামের ধুবড়ী, গৌহাটী প্রভৃতি যে সকল স্থানে কুলীদিগকে প্রথমে লইয়া যাওয়া হইত, সেই সকল স্থানে কার্য্যালয় স্থাপিত করিয়া কুলীদিগকে অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

শেষে এই আন্দোলন এ দেশে ও ইংলণ্ডে প্রবল হইলে ভারত সরকার আইন পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রচার-কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যেমন সাহায্য করিয়াছিলেন, আসামের চীফ-কমিশনার হইয়া সার হেনরী কটন তেমন-ই অত্যাচারের বিরোধী হওয়ায় ইংরেজ চা-কর ও বহু ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নির্ব্বাচিত "ফেলো" দুই জনের অন্যতর, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তখন বি, এ, পরীক্ষাই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—সাহিত্য ও বিজ্ঞান (এ কোর্শ ও বি কোর্শ) যোগেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি বিধানকল্পে বিজ্ঞানের উপাধি স্বতন্ত্র করিয়া (বি, এস-সি) দিবার প্রস্তাবে বিশেষ সহায়তা করেন। বহু আলোচনার পরে তাঁহার একটি প্রস্তাব একটি মাত্র ভোটের আধিক্যে পরিত্যক্ত হয়—সে প্রস্তাবে তিনি ছাত্রদিগের পক্ষে শারীরচর্চ্চা বাধ্যতামূলক করিতে বলিয়াছিলেন। দেশ যদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে বিদেশীরা তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে, দেশে যদি অশান্তির উপদ্রব হয়, তবে বিদেশী শাসকরা তাহা নিবারণ করিবে—এই দাস-মনোভাবের পরিবর্ত্তন জন্য শারীরচর্চ্চার প্রয়োজন যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়াই যোগেন্দ্রচন্দ্র ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-সভায় বহু ইংরেজ ও ইংরেজের সমর্থক থাকায় উহা গৃহীত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। সেই বৎসরে পিতা চন্দ্রমাধবের সহিত যোগেন্দ্রচন্দ্র শিলং সহরে গিয়াছিলেন। এক দিন এক জন ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ—ব্রিগেডিয়ার জেনারল—চন্দ্রমাধব বাবুর অধিকৃত গৃহের সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া যাইবার সময় পথিপার্শ্বে টুপী পরিহিত যোগেন্দ্রচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহাকে সেলাম করিতে বলেন। আপনার পদের সম্মান সম্বন্ধে তাঁহার অসঙ্গত ধারণা ছিল—সেই দৌর্ব্বল্যের জন্য কোন কোন ইংরেজ এ দেশে ছাতাতঙ্ক, টুপী-আতঙ্ক প্রভৃতি রোগ ভোগ করিতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র সেনাধ্যক্ষের অসঙ্গত আদেশানুযায়ী কাজ করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি উগ্র হইয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, —"উহার টুপী তুলিয়া লইয়া আইস।" কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের ভাব দেখিয়া চাপরাশী প্রভুর আদেশ পালন করিতে সাহস পাইল না। অগত্যা বচসার পরে এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতৃপরিচয় পাইয়া সেনাধ্যক্ষ স্থান ত্যাগ করাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক মনে করিলেন। পরে চন্দ্রমাধব বাবু ঘটনার বিষয় কমিশনারকে লিখিয়া পাঠাইলে, সেনাধ্যক্ষকে কৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

অরবিন্দ কারাকাহিনীতে লিখিয়াছেন—কারাগারে বেত মারা চলিতেছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্রকে তাহা জানানয় তিনি চেষ্টা করিয়া তাহা বন্ধ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ—শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কারিগরী, বৈদ্যুতিক ও খনি সম্বন্ধে বি, এস-সি, পাঠের ব্যবস্থা।

যোগেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনে নির্ব্বাচিত কমিশনার ছিলেন এবং চওড়া রাস্তা নির্ম্মাণের ও সহরতলীতে জলনিকাশ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যখন সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বায়ত্ত-শাসনানুমোদিত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য আইন করেন, তখন সেই আইনের প্রস্তাবক আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জীর প্রতি যে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব করা হয়, তাহা তিনিই সমর্থন করিয়াছিলেন। কর্পোরেশনের ক্ষমতা-সঙ্কোচ-চেষ্টার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনবিহারী সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আটাশ জন নির্ব্বাচিত কমিশনার পদত্যাগ করেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদিগের এক জন ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় নির্ব্বাচিত সদস্য-রূপে তিনি যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সে সকল সরকার কার্য্যে পরিণত না করিলেও সেই সকলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের দেশের জন-গণের কল্যাণসাধন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়টি প্রস্তাবের উল্লেখ নিম্নে করা যাইতেছে।

(১) বঙ্গীয় অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রক্ষা আইনে প্রথমে ছিল—বালিকাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করার

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
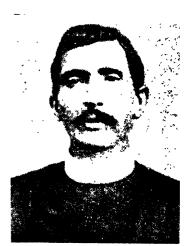
ব্যবস্থা হইবে না। যদি সামাজিক কোন সংস্কারের সহিত অসামঞ্জস্য ঘটে এই ভিত্তিহীন আশঙ্কায় সরকার ঐরূপ করিতেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বলেন, যাহাতে বালিকারাও দুর্নীতি প্রভৃতি জনিত বিপদ হইতে রক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে। শেষে তাঁহার যুক্তিই জয়ী হয় এবং সরকার তাঁহার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন গ্রহণ করেন।

(২) যোগেন্দ্রচন্দ্রের কারিগরী কলেজ ও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক-সভায় বহুমতে গৃহীত হইলেও সরকার সেই প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করেন নাই।

(৩) যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রস্তাব করেন, প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৪) বাঙ্গালায় পল্লীগ্রামে পানীয় জলের অভাব দূর করিবার জন্য বৎসরে ৫০ হাজার টাকা করিয়া সরকার ব্যয় করিবেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব করেন।

(৫) যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রস্তাব করেন—

(ক) প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃষকদিগকে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া পশু-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

মুসলমান, য়ুরোপীয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি চাকরী স্বতন্ত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সরকারী প্রাদেশিক ও নিম্নস্তরের (অর্থাৎ ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট পদ, সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রভৃতি) চাকরীতে প্রতিযোগী পরীক্ষার দ্বারা চাকরীয়া গ্রহণ করা হউক। এই প্রস্তাব যোগেন্দ্রচন্দ্র করেন। যাহাতে যোগ্যতাই সরকারী চাকরীতে প্রবেশের পথ হয় এবং ফলে চাকরীতে চাকরীয়াদিগের যোগ্যতা-বৃদ্ধি হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি সরকারের মনোনয়নের বিরোধিতা করিয়াছিলেন; তবে কতকগুলি সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি যে ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার উপযোগিতা অবশ্যস্বীকার্য্য হইলেও ইংরেজ সরকার অনুগ্রহ প্রদানের অধিকার ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চাহেন নাই।

যোগেন্দ্রচন্দ্র যেমন কতকগুলি সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত অধিকার দিয়া সরকারী চাকরীতে ক্রমোন্নতির মনোভাব দেখাইয়াছিলেন, তিনি সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারেও তেমনই সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কার মাত্রই যে কুসংস্কার নহে, তাহা বুঝিয়া তিনি মনে করিতেন, যে কারণে কোন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, সে কারণ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত সেই প্রথার পরিবর্ত্তনে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে। তিনি এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বাল্য-বিবাহ নিবারণ জন্য আইন করিবার প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন—"আগে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার উচ্ছেদ সাধন কর; তাহার পরে আমি ঐরূপ আইন প্রণয়নের সম্মতি দিব।" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে স্বামিগৃহে আসিলে বালিকারা সেই পরিবারের আচার-ব্যবহার ও ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিবার যে সুযোগ লাভ করে, অধিক বয়সে বধূ হইয়া আসিলে সে সুযোগ পায় না—কারণ, তখন তাহাদিগের মত গঠিত হইয়া যায়। তাঁহার মতের যাথার্থ্য বিবেচ্য, সন্দেহ নাই।

সমাজে আবশ্যক সংস্কার সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পিতার মতই গ্রহণ করিয়া—কায়স্থ সমাজে দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও উত্তর রাঢ়ীয়—বিভাগ লুপ্ত করিয়া এক সমাজ পরিণত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যে প্রথা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিল, তিনি তাহার বিলোপ চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় যে সহস্রাধিক যুবক শিক্ষালাভার্থ বিদেশে গিয়াছিল, সে জন্য রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দুরাও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন—ঐ অসঙ্গত প্রথার উচ্ছেদ সাধনে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহা আর কেহই করিতে পারেন নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই বিরাট কীর্ত্তির বিষয় আমরা পরে উল্লেখ করিব।

তিনি যে আবশ্যক সমাজ-সংস্কারের সমর্থক ছিলেন, তাহার প্রমাণ—

(ক) তিনি সহবাস সম্মতি সম্বন্ধীয় আইনের সমর্থনে যুক্তিমূলক পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং—

(খ) বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিতেও দ্বিধানুভব করেন নাই।

দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় মন্ত্রীদিগের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব করিয়া দেশের জনগণের কল্যাণ-কামনার পরিচয় দিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র লোককে কেবল উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করিতেন না। দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অকাতরে স্বীয় অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করিতেন। তাহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের জন্য তিনি স্বীয় জমীদারীতে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ করিয়াছিলেন; সে জন্য আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। কোন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেই তিনি তাহা ত্যাগ করিতেন না, মনে করিতেন—"আজিকে বিফল হ'ল, হ'তে পারে কাল।" তাঁহার জমীদারীতে কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাফল তিনি এক বার কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিরাটতম যে কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত প্রশংসার গৌরব দিবে তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। এই কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ আজ বিবৃত হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু তাহার স্থান এই পরিচয়-প্রবন্ধে নাই।

দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান-সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, ইহাই যোগেন্দ্রচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ দেশ পূর্ব্বে কখন কৃষিপ্রাণ ছিল না; যাহারা কৃষিকার্য্য করিত তাহারাও কৃষিকার্য্যের অবসরকালে উটজ শিল্পে ব্যাপৃত থাকিত। বিদেশীরা যে এ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য বহু বিপদ বরণ করিয়াছে, বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে, পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়াছে, সে ভারতের কৃষিজ পণ্যের জন্য নহে—ভারতের শিল্পজ পণ্যের জন্য। ভারতীয় পণ্যে রোমক সাম্রাজ্যের প্রতি বৎসর কত অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা ব্যক্ত করিয়া ঐতিহাসিক প্লীনী আক্ষেপ করিয়াছেন। ইংরেজকে অন্যায়দ্যোতক আইন করিয়া ভারতীয় শিল্প নষ্ট করিয়া স্বদেশে শিল্প

প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। এ দেশের বস্ত্রবয়ন-শিল্প, রেশম-শিল্প, নৌ-নির্ম্মাণ শিল্প প্রভৃতির বিনাশে তাহার পরিচয় সপ্রকাশ। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে শিল্প নষ্ট হয়। অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠিত না করিলে দেশের দুঃখ, দৈন্য, দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে না। তাহা বুঝিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র দেশের কয় জন মনীষীর সহিত পরামর্শ করিয়া যোগ্যতা দেখিয়া শিক্ষার্থীদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া ও শিল্প শিখাইয়া আনিয়া প্রয়োজনে মূলধন দিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্য এক সমিতি গঠিত করেন—Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians. তিনি স্বয়ং সম্পাদকরূপে তাহার কর্ণধার ছিলেন। সেই সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

এ দেশে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প শিক্ষার দ্বারা দেশের স্বার্থসিদ্ধিকল্পে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। সমিতি প্রতি বৎসর (সংগ্রহের ব্যয় প্রভৃতি ব্যতীত) এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ব্যয় করিবেন। সদস্যগণের মতানুসারে এই বিভাগ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।—

(১) উপযুক্ত ছাত্রদিগকে য়ুরোপে, আমেরিকায় বা জাপানে যাইয়া সে সকল দেশের শিল্প-ব্যবস্থা অধ্যয়ন জন্য বৎসরে ২৫ হাজার টাকা বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হইবে।

(২) শিক্ষালাভান্তে প্রত্যাগত ছাত্রদিগকে প্রয়োজনে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বা শিল্প-শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতি বৎসর ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে।

(৩) কলিকাতায় প্রধানতঃ বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ একটি কেন্দ্রী পরীক্ষা ও শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন জন্য ২৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী উপাধিধারীদিগকে য়ুরোপে বা আমেরিকায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থ বৃত্তি হিসাবে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

এই আবেদনে স্বাক্ষরকারী—

জে, এস, জেমিন
রাসবিহারী ঘোষ
সৈয়দ আমীর হোশেন
নরেন্দ্রনাথ সেন
আনন্দমোহন বসু
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহারা আবেদন-পত্রের শেষাংশে লিখেন—

দেশের কল্যাণকামী মাত্রকেই বার্ষিক অন্যূন চারি আনা চাঁদা দিতে আহ্বান করা হইতেছে। যিনিই বার্ষিক চারি আনা চাঁদা দিবেন তিনিই সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের এক সভায় নির্ব্বাচিত ন্যাসরক্ষকগণ টাকা রাখিবেন।

তাঁহারা আরও প্রকাশ করেন, যে উদ্দেশ্য-বিবৃতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা বিবেচনা ও সমর্থন করিবেন।

এই সমিতি যে সহস্রাধিক যুবককে বিদেশে শিল্পাদি শিক্ষার সুযোগ দিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা দেশের সুধীগণের মনোযোগ ও সাহায্য আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল। যে সহস্রাধিক যুবক এই সভার সাহায্যে বিদেশ হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ দেশে নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিতে ও দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ছাত্রদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিতেন—(১) কৃষিকার্য্য, (২) চামড়া সংস্কার, (৩) কল-কব্জার কাজ, (৪) ব্যবহারিক রসায়ন, (৫) বয়নশিল্প, (৬) সূত্রোৎপাদন, (৭) সাবান, দেয়াশলাই, সুগন্ধ দ্রব্য, বোতাম ও কাচ প্রস্তুত করা।

কিন্তু যে সকল যুবক শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ অন্যান্য শিল্পও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—যথা রবারের কাজ, ওয়াটার-প্রুফ দ্রব্য উৎপাদন, ফল সংরক্ষণ, চিরুণী ও বিস্কুট প্রস্তুত করণ, ছাপাখানার কাজ ইত্যাদি। বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ কারখানা, যশোহরের চিরুণীর কারখানা,—ইত্যাদি কারখানার প্রতিষ্ঠাতারা এই সমিতির সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। বীমা কার্য্যে, চা-বাগানে ও নানারূপ প্রতিষ্ঠানে এই সকল যুবক যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ডাক্তার প্রভৃতিও হইয়া আসিয়াছিলেন। অনেকেই চাকরী পাইয়াছিলেন!

এই স্থানে বলা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় পুত্রকে এই সমিতির মাধ্যমে বিদেশে উন্নত কৃষি বিষয়ে শিক্ষালাভার্থ পাঠাইয়াছিলেন।

সমিতির মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগের তালিকা পাঠ করিলে, সমিতির কার্য্যের অশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

এই সমিতির আর একটি কার্য্য উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার নিকটে সাগর-সান্নিধ্যে স্বাস্থ্যকর স্থানে নগর প্রতিষ্ঠা কল্পে যোগেন্দ্রচন্দ্র ডায়মণ্ড হারবারে নগর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ডায়মণ্ড হারবারে সরকারের একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ও বাতিঘর ছিল। যদি কখনও সামরিক প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেই জন্য সমর বিভাগ ঐ স্থানে সরকার ব্যতীত আর কাহারও পাকা বাড়ী নির্ম্মাণের অনুমতি দিতেন না। সেই জন্য তথায় নগর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু অন্যত্র সে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ-দেওঘর তখন স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারও পূর্ব্বে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি স্বাস্থ্যলাভের জন্য তথায় যাইতেন। ম্যালেরিয়ায় বর্দ্ধমান সে খ্যাতি হারাইলে পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মাটাড়ে যাইতেন। বৈদ্যনাথ-দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সময় সময় যাইবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৈদ্যনাথ-দেওঘরের সান্নিধ্যে—রিখিয়ায় সমিতির পক্ষ হইতে পঁয়তাল্লিশ হাজার বিঘা জমী লইয়া কৃষিকেন্দ্র নগর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নগর প্রতিষ্ঠায় সমবায় নীতি অবলম্বিত হয়। তথায় পথ নির্ম্মাণ, সেতু গঠন ও একটি বাগানে বৃক্ষরোপণ করা

হইয়াছিল। প্রায় তিন শত লোক ঐ স্থানে বাস করিবেন বলেন, এবং স্থির হয়, তিন শত গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ঐ স্থানে কৃষিক্ষেত্র, বালকদিগের জন্ম উচ্চাঙ্গ কলেজ, বালিকাদিগের জন্ম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং কৃষি ও কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইয়াছিল। ঐ সম্পত্তি পরে যৌথ কারবারে পরিণত করা হয়। এই পরিকল্পনার অসাধারণত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উহা যৌথ কারবারে পরিণত করিয়া অর্থাৎ পথিপ্রদর্শকের কাজ শেষ করিয়া সমিতি উহার ভার ত্যাগ করেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের কার্য্য বিবেচনা করিয়া সামশুল হুদা বলিয়াছিলেন—তিনি দেশের জন্ম যত কাজ করিয়াছেন, আর কেহ তত কাজ করিতে পারেন নাই। আর কৃষি-বিশেষজ্ঞ হ্যারল্ডম্যার্ণ মন্তব্য করেন—তাঁহার সময়ে তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই, বাঙ্গালায় এমন কোন জনহিতকর কার্য্য দেখা যায় নাই।

চীনা সংস্কৃতি মিশনের নেতা ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন

আলোক-চিত্র—শ্রীকল্যাণ দত্ত

বোটানিকাল গার্ডেনে চীনা সংস্কৃতি মিশনের সভ্য-সভ্যাগণ ভাব গাচ্ছেন

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

বালিগঞ্জ এ্যাভেনিউএর কৃষ্ণচূড়াবীথি

পথে যেতে যেতে হঠাৎ পড়ল চোখে
কৃষ্ণচূড়ার বীথি।
পথের সুরুতে চৌকো ফলকে লেখা—
বালিগঞ্জ এ্যাভেনিউ।

বালিগঞ্জ কেন? বৃন্দাবনের পথেও
এদের মানাত। রাধাকুঞ্জের পথে
দু'ধারে এমন কৃষ্ণচূড়ার বীথির
কমলা—জরদা—লাল—গোলাপি ও চাঁপা
কি বা হলুদ, দুধে-আলতার রঙ—
নবানুরাগের যতগুলি রঙ আছে—
রক্তবরণ হৃদয়ের কাছে কাছে।

গার্ষ্টিন প্লেসের কুর্চি

অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও-ক্যালকাটা ষ্টেশন—
শোনায় অনেক কাহিনী—কবিতা-সংবাদ-পরিকল্পনা—
প্রাচীন নবীন মাধ্যমিকের কত নাটকের
বেতার রূপারোপণ।
কত শত গান ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরি,
বাউল ভাওয়াই ভাটিয়ালি সারি গান—
আধুনিক আর রবীন্দ্র-সঙ্গীত
প-কীর্তন, পালা-কীর্তন, নজরুল-গীতি কত;
নক্সা-গল্প-কবিতা-উপন্যাস;
বাদ কত বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া ও ইংরেজি;
কথা, আলোচনা, সমালোচনাও কত;
ভোরবেলা থেকে আধেক রাতের মত—
সংসারে যত নব রুচি যত নব সংবাদ
সবই সে শোনায় ঘড়িতে-ঘড়িতে মিনিট সেকেণ্ড গুণে।
শুধু সে শোনায় না
দক্ষিণ দিকে ষ্টুডিওর সম্মুখে
চওড়া দরাজ ছাদ-ঘেঁষে ওঠা কুর্চিফুলের গাছে
ডালপালাগুলি ঢেকেছে হঠাৎ অজস্র ফুলে ফুলে
রাশি—রাশি—রাশি—গানের সুরের মত—
...র মতন পুরু ও নরম শুভ্র সুরভি ফুলে—
...ন নবীন বর্ষার সমাগমে।

চীনেপট্টির বাতায়নে তিনটি শিশু

চীনেপট্টির কাঠের দোতলা ঘর—
ছোট এতটুকু জানালার মোটা গরাদে ঠেসান দেওয়া
অবকাশে ফুটে রয়েছে তিনটি ফুল!
চীনে-শিশুদের তিনটি অবাক মুখ!
ছোট ছোট টানা চেরা চেরা চোখ কি অপার উৎসুক!
হলুদবর্ণ ত্বকের উপরে ঈষৎ গোলাপি আভা
একরাশ চাঁপা ফুলের উপরে ভোরের আলোক যেন।
তিনখানি মুখ ঠেসাঠেসি ক'রে দেখে জনতার পথ,
ঠোঁটে হাসি নেই—স্থবিরের মত গম্ভীর;—
আহা এর চেয়ে যদি—
বীভৎস সাপ বিচিত্র ফুল আঁকা
চীন দেশে কোনো পাহাড়ের গুম্ফায়—
বাঁকা চাঁদ আঁকা আকাশের কিনারায়—
এদের পেতাম দেখা!

মেমোরিয়ালের গম্বুজে চাঁদ

এ চাঁদ মানায় না—এ চাঁদ মানায় না—
মেমোরিয়ালের গম্বুজ-ঘেঁষা এ চাঁদ মানায় না—
জ্যোৎস্নাকে তার—স্বপ্নকে তার—দীপ্তিকে তার কখনো—
এ চাঁদকে চাই না—
সে চাঁদকে পাই না—
যে চাঁদ উঠলে প্রাণ-সমুদ্রে মনের আকাশপটে
রক্তের ঢেউ ছল ছল কাঁদে হৃৎপিণ্ডের তটে—
ধীরে ধীরে এক স্বপ্নের কুয়াসায়
জ্যোৎস্নারা মিশে যায়!
মেমোরিয়ালের গম্বুজ-ঘেঁষা এ চাঁদ সে চাঁদ নয়
এ চাঁদ সে চাঁদ নয়—
চারি দিকে এর সাহরিক সভ্যতা
নষ্ট করেছে গম্বুজ-ঘেঁষা অলখ-পবিত্রতা।
এ যদি উঠত নীলাম্বরের গম্বুজ ঘেঁষে সাহারার বালুকায়—
সুদূরে যেখানে খর্জুর-বীথি কাঁপে বাতাসের ঘায়—
আর নিশীথের অতল গহনে তারার স্নিগ্ধতায়।

বানরের থাবা

[W. W. Jacobs' রচিত
"The Monkey's Paw". গল্প অবলম্বনে]

শীতের রাত্রি। বাইরেটা যেমন স্যাঁতসেঁতে, তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা। কিন্তু 'লেকস্‌নম্‌ ভিলা'র খড়খড়ি-টানা ছোট বসবার ঘরটিতে গন্‌গনে আগুন জ্বলছিল। বাপ আর ছেলে দাবা খেলায় বসেছেন। প্রথম জন, এই খেলাটি সম্বন্ধে তাঁর কিছু মৌলিক ধারণা থাকায়, রাজাটিকে অকারণে এমন বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ফেলেছিলেন, যাতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে শান্ত ভাবে বয়নরতা শুভ্রকেশা বৃদ্ধাও মন্তব্য না করে পারলেন না।

"বাতাসের শব্দটা একবার শোন"—বললেন মিষ্টার হোয়াইট, যিনি, খেলায় নিজের একটা মারাত্মক ভুল বড় দেরীতে চোখে পড়ায়, এখন ছেলের লক্ষ্য যাতে সে দিকে না যায় তার জন্য বেশ ভদ্র ভাবে চেষ্টা করছিলেন।

"শুনছি", অপর জন বলল, তার পর গম্ভীর ভাবে দাবার ছকের উপর চোখ বুলিয়েই হাত বাড়িয়ে দিল, "কিস্তি।"

"আমার মনে হয় না যে সে আজ রাত্রে আর আসবে", ছকের উপর দু'টি হাতের ভার রেখে তার বাবা বললেন।

"মাৎ" ছেলে উত্তর দিল।

"এত দূরে থাকার এটাই সব চেয়ে বিশ্রী", অকস্মাৎ অহেতুক তীব্রতার সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন মিঃ হোয়াইট, "যত নোংরা কাদা-মাখা, বেমক্কা জায়গার মধ্যে এটাই সব চেয়ে খারাপ। যাতায়াতের পথটা বাদা, আর রাস্তায় জলের স্রোত বইছে। লোকে যে কি ভাবে আমি জানি না। মাত্র দু'টো বাড়ী রাস্তার ধারে হয়েছে বলে আমার মনে হয়, তারা মনে করে এতে কিছু আসে যায় না।"

"যাক্‌ গে—" তাঁর স্ত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে সান্ত্বনার সুরে বললেন, "পরের দানে হয়ত তুমিই জিতবে।"

মিঃ হোয়াইট ঠিক সময়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাতেই মাতা-পুত্রের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় ধরা পড়ল। তার মুখের কথা ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল এবং তিনি অপরাধীর মতো সঙ্কোচপূর্ণ হাসির রেখাটি পাতলা সাদা দাড়ির অন্তরালে লুকিয়ে ফেললেন।

সদর দরজা সজোরে ঝনাৎ ক'রে ওঠাতে এবং ভারী পায়ের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে আসায় হার্বার্ট হোয়াইট বলে উঠল,—"ঐ তিনি এসেছেন।"

বৃদ্ধ অতিথি সংকারের জন্য ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজা খোলার পরই নবাগতের সঙ্গে তাঁর সমবেদনাপূর্ণ কথাবার্তা শোনা গেল। নবাগতও সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন, যাতে মিসেস হোয়াইট বললেন, "থাক্‌, থাক্‌।" এবং একটু কাশলেন যখন তাঁর স্বামী ঘরে ঢুকলেন একজন লালচেমুখো, ক্ষুদে চকচকে চোখওয়ালা, মোটাসোটা ঢেঙা লোককে সঙ্গে নিয়ে।

"সার্জ্জেণ্ট-মেজর মরিস্‌" এই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। সার্জ্জেণ্ট-মেজর করমর্দ্দন করলেন এবং আগুনের ধারে নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে বসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চারি দিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে গৃহস্বামী হুইস্কির বোতল ও গ্লাস নিয়ে এসে একটি ছোট তামার কেট্‌লি আগুনের উপর চাপিয়ে দিলেন।...

তৃতীয় গ্লাসে আগন্তুকের চোখ দু'টি উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল এবং তিনি কথা কইতে সুরু করলেন। চেয়ারে বসে তাঁর চওড়া কাঁধ দু'টি বিস্তৃত করে তিনি যখন বহু অপূর্ব্ব দৃশ্য এবং সাহসের কথা, যুদ্ধ, মহামারী আর অদ্ভুত সব লোকের সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন তখন এই ক্ষুদ্র পরিবারটি গভীর ঔৎসুক্যে বহু দূর দেশ হতে আগত এই অতিথির প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

"একুশ বছর ধরে এই সব..." স্ত্রী-পুত্রের দিকে মাথা হেলিয়ে বললেন মিঃ হোয়াইট, "যখন ও চলে যায় তখন ও সবে ছোক্‌রা, গুদামঘরে কাজ করত। আর এখন ওকে দেখ।"

"তাতে যে বিশেষ ক্ষতি হয়েছে ওঁকে দেখে তো মনে হয় না", নম্র ভাবে বললেন মিসেস হোয়াইট।

"আমার নিজে একবার ইণ্ডিয়ায় যেতে ইচ্ছে করে", বৃদ্ধ বললেন, "শুধু একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে।"

"যেখানে আছ বেশ আছ", মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন সার্জ্জেণ্ট-মেজর। তিনি খালি গ্লাসটি নামিয়ে রাখলেন এবং ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার মাথা নাড়লেন।

"আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে ঐ সমস্ত পুরানো মন্দির ও ফকির আর বাজীকরদের", বৃদ্ধ বললেন। "আচ্ছা, তুমি সেদিন কি কথা যেন আমাকে বলতে যাচ্ছিলে, একটা বানরের থাবা না কি একটা জিনিস সম্বন্ধে মরিস?"

"কিছু না," সৈনিক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "তুচ্ছ কথা, শোনার মতো এমন কিছু নয়।"

"বানরের থাবা?" কৌতূহলভরে বললে মিসেস হোয়াইট।

"একটা সামান্য ব্যাপার, যাকে হয়ত ম্যাজিক বলতে পারেন", —সার্জ্জেণ্ট-মেজর বললেন বিশেষ কিছু না ভেবেই।

তাঁর তিন জন শ্রোতাই আগ্রহের সঙ্গে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। অতিথি অন্যমনস্ক ভাবে তাঁর শূন্য গ্লাসটি মুখে তুলে নিলেন, তার পর সেটিকে আবার নামিয়ে রাখলেন। গৃহকর্ত্তা সেটি তাঁর জন্য পূর্ণ করে দিলেন।

"দেখতে", নিজের পকেটের মধ্যে হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতে বললেন সার্জ্জেণ্ট-মেজর, "এটা শুধু একটা সাধারণ ছোট থাবা, শুকিয়ে 'মামি' করা।"

তিনি পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করে সামনে এগিয়ে দিলেন। মিসেস হোয়াইট বিকৃত মুখে পিছিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর ছেলে সেটি হাতে নিয়ে, কৌতূহলের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে

ছেলের হাত থেকে জিনিসটি নিয়ে, ভাল করে দেখে, টেবিলের উপর সেটিকে রাখতে রাখতে মিষ্টার হোয়াইট প্রশ্ন করলেন,—"এটির বিশেষত্ব কি ?"

"একজন বুড়ো ফকির এটিতে মন্ত্র পড়ে দিয়েছিলেন," বললেন সার্জ্জেন্ট মেজর, "তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে অদৃষ্ট মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, আর যারা তা খণ্ডন করতে যায় তাদের কপালে শেষ পর্য্যন্ত দুঃখই জোটে। তিনি এটিতে এমন ভাবে মন্ত্র পড়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিন জন বিভিন্ন লোক প্রত্যেকে এর দ্বারা তিনটি করে 'ইচ্ছা' পূর্ণ করে নিতে পারবে।"

তাঁর বলার ভঙ্গী এত বেশী চিত্তাকর্ষক ছিল যে, তাঁর শ্রোতৃবৃন্দ তাঁদের বেখাপ্পা হাল্কা হাসি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন।

"বেশ, আপনি নিজে তিনটি নিচ্ছেন না কেন মহাশয় ?" হার্বাট হোয়াইট বলল চাতুর্য্যের সঙ্গে।

সৈনিক তার দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যে ভাবে প্রৌঢ়ত্ব চিরদিন অর্ব্বাচীন যৌবনকে দেখতে অভ্যস্ত। "আমি নিয়েছি", শান্ত ভাবে তিনি বললেন, আর তাঁর কুঁচকুড়ি-ভরা মুখটা সাদা হয়ে উঠল।

"আর আপনার তিনটি ইচ্ছা কি সত্যই পূর্ণ হয়েছে ?" জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস হোয়াইট।

"হয়েছে।" বললেন সার্জ্জেন্ট-মেজর, হাতের গ্লাস তাঁর শক্ত দাঁতগুলির সঙ্গে একটু ঠোক্কর খেল।

"আর অন্য কেউ ইচ্ছা করেছে ?" অনুসন্ধান করলেন বৃদ্ধা মহিলাটি।

"হ্যাঁ, প্রথম লোকটির তিনটি ইচ্ছাই সফল হয়েছিল", জবাব এল। "তার প্রথম দু'টি কি ছিল আমি জানি না, কিন্তু তৃতীয়টি ছিল মৃত্যু-কামনা। তাতেই থাবাটি আমি পাই।"

তাঁর কণ্ঠস্বর এত গুরু-গম্ভীর ছিল যে, সকলের উপর একটি নিস্তব্ধতা নেমে এল।

"যদি তুমি তোমার তিনটি ইচ্ছাই পূর্ণ করে নিয়ে থাকো, এখন আর এটা তোমার নিজের কোন কাজেই লাগবে না মরিস্", বৃদ্ধটি বললেন অবশেষে। "তবে কি জন্যে এটা রেখেছ ?"

সৈনিক মাথা নাড়লেন। "হয়ত খেয়াল", ধীর ভাবে বললেন তিনি। "এটা বিক্রি করার কথা একটু মনে হয়েছিল, কিন্তু মনে হয় না যে করবো। এটা এর মধ্যেই যথেষ্ট অপকার ঘটিয়েছে। তাছাড়া, লোকে কিনবে না। তারা ভাবে এটা বুঝি রূপকথা; কেউ কেউ, যারা এটাকে একেবারে বাজে বলে মনে করে না, তারাও আগে পরখ করে দেখে তার পরে আমাকে দামটা দিতে চায়।"

"যদি তুমি আরও তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারতে", তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বৃদ্ধ বললেন, "তুমি নিতে চাইতে ?"

"জানি না", অপর ব্যক্তি বললেন, "আমি ঠিক জানি না।"

তিনি ঐ থাবাটি তুলে নিলেন, তাঁর তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে সেটিকে আলগা ভাবে ঝুলিয়ে, হঠাৎ সেটিকে আগুনের উপর ছুড়ে ফেলে দিলেন। হোয়াইট, মুখে অর্দ্ধস্ফুট আওয়াজ করে, তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে সেটিকে তুলে নিলেন।

"ওটা পোড়াই ভাল", সৈনিকটি বললেন গম্ভীর কণ্ঠে।

"তুমি যদি এটা না চাও, মরিস্", বৃদ্ধ বললেন, "তাহলে আমাকে দাও না"।

"আমি দেব না", তাঁর বন্ধু একগুঁয়ের মতো বললেন। "আমি ওটা আগুনের ওপর ফেলে দিয়েছিলাম। যদি তুমি ওটা রাখ, কিছু হ'লে আমাকে যেন দোষ দিও না। বুদ্ধিমানের মতো, আগুনের ওপর ওটা আবার ছুড়ে দাও।"

অপর ব্যক্তি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন এবং তাঁর নবলব্ধ সম্পত্তিটি খুব কাছে নিয়ে ভাল করে দেখলেন। "কি করে করতে হয় ?" জানতে চাইলেন তিনি।

"ডান হাতে তুলে ধরে জোর গলায় তোমার ইচ্ছাটি বললেই হবে," বললেন সার্জ্জেন্ট-মেজর, "কিন্তু আমি তোমাকে পরিণতির জন্য সাবধান করে দিচ্ছি।"

"ব্যাপারটা আরব্য-উপন্যাসের মত শোনাচ্ছে," উঠে টেবিলে নৈশাহার সাজাতে সাজাতে বললেন, মিসেস হোয়াইট। "আমার জন্যে চার জোড়া হাত চাইলেই পার ?"

তাঁর স্বামী মন্ত্রসিদ্ধ বস্তুটি পকেট থেকে বের করতেই তিন জনে হাসিতে ফেটে পড়লেন যখন, উদ্বিগ্ন মুখে সার্জ্জেন্ট মেজর তাঁর হাত চেপে ধরে খস্‌খসে গলায় বললেন, "যদি চাইবেই, ভদ্রগোছের কিছু চাও।"

মিঃ হোয়াইট সেটি তাঁর পকেটে পুরলেন, এবং চেয়ারগুলি সাজিয়ে, বন্ধুকে টেবিলে আসতে ইঙ্গিত করলেন। খাওয়া-দাওয়ার সময় ঐ মন্ত্রসিদ্ধ বস্তুটির কথা কারো বিশেষ মনে রইল না, আর তার পরে সৈনিক ইণ্ডিয়ায় তাঁর দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী ও অদ্ভুত ঘটনাগুলির দ্বিতীয় কিস্তি আরম্ভ করায় ঐ তিন জন অভিভূতের মতো বসে শুনতে লাগলেন।

শেষ ট্রেণ ধরার সময়টুকু হাতে রেখে অতিথি বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর, দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্বার্ট বলে উঠল, "ওঁর আর সব গাঁজাখুরি গল্পগুলোর মতো যদি এই বাঁদরের থাবার গল্পটিও হয়, তা হলে এটা থেকে আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।"

"এটার জন্যে ওঁকে কিছু দিলে না কি গো?" স্বামীকে কাছ থেকে পর্য্যবেক্ষণ করে জানতে চাইলেন মিসেস হোয়াইট।

"সামান্যই" একটু আরক্ত হয়ে বললেন তিনি। "সে চায়নি, আমিই জোর করে দিলাম। সে ওটা ফেলে দেওয়ার জন্যে আবার ঝুলোঝুলি করছিল।"

"তাই সম্ভব," ছদ্ম-আতঙ্কের সঙ্গে বলল হার্বার্ট। "আমরা যে এবার নামজাদা বড়লোক হতে চলেছি, সুখেরও অন্ত থাকবে না। প্রথমেই একজন সম্রাট হতে চাও না বাবা, তা হলে কিন্তু আর স্ত্রৈণ থাকতে পারবে না।"

মিসেস হোয়াইট একটি সোফার ঢাকা হাতে নিয়ে তাড়া করতেই সে টেবিলের ওধারে ছুটে পালাল।

মিঃ হোয়াইট থাবাটি পকেট থেকে নিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেটির দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "এটা ঠিক যে, কি চাইব আমি জানি না। আমার মনে হচ্ছে, আমার যা কাম্য সব যেন পেয়ে গেছি।"

"তুমি তো শুধু বাড়ী পরিষ্কার করতে পারলেও বেশ খুসী থাকবে, তাই না বাবা?" তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলল হার্বার্ট। "তাহলে এখন শ' দুই পাউণ্ড টাকা চেয়ে ফেল, তাতেই আপাততঃ চলে যাবে।"

তার বাবা নিজের বিশ্বাসপ্রবণতার জন্য লজ্জিত হাসি হেসে, ঐ মন্ত্রসিদ্ধ বস্তুটি তুলে ধরলেন, আর তাঁর ছেলে, মায়ের দিকে এক বার চোখ ঠারার জন্য কিছুটা নষ্ট হয়ে যাওয়া কপট গাম্ভীর্যভরা মুখে, পিয়ানোর পাশে বসে পড়ে তার পর্দায় কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী ঝঙ্কার তুলল।

"আমি দু'শ পাউণ্ড পেতে চাই," বৃদ্ধ উচ্চারণ করলেন স্পষ্ট ভাবে।

পিয়ানো থেকে দমকা একটা মিষ্টি আওয়াজ উঠে সম্ভাষণ জানাল কথাগুলিকে, কিন্তু তার ক্রমিকতা ভঙ্গ হল বৃদ্ধের ভয়-কম্পিত চীৎকারে। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র ছুটে গেলেন তাঁর দিকে।

"ওটা নড়ে উঠল", মেঝের উপর পড়ে থাকা ঐ বস্তুটির দিকে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "আমি চাওয়া মাত্র, ওটা আমার হাতের মধ্যে ঠিক সাপের মতো পাক দিয়ে উঠেছিল।"

"কিন্তু টাকাগুলো তো দেখতে পাচ্ছি না," মেঝে থেকে জিনিসটি তুলে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে তাঁর ছেলে বলল, "আর বাজী রেখে বলতে পারি, টাকাটার দেখা পাবও না কোন দিন।"

"ওটা তোমার কল্পনা," তাঁর দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি রেখে তাঁর স্ত্রী বললেন।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। "যাকৃগে, কোন ক্ষতি তো হয়নি, কিন্তু ওটা আমাকে চমকে দিয়েছিল ঠিকই।"

তাঁরা সকলে আবার আগুনের ধার ঘেঁসে বসার'পর পুরুষ দু'টি তাঁদের পাইপ টেনে শেষ করলেন। বাইরে বাতাসের মাতামাতি আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে, উপর তলায় একটি দরজা ঝনাৎ করে উঠতেই বৃদ্ধ লোকটি চমকে উঠলেন। একটা দমিয়ে দেওয়া অস্বাভাবিক স্তব্ধতা তিন জনের উপর বিরাজ করতে লাগল, যতক্ষণ না ঐ বৃদ্ধ-দম্পতি রাত্রের বিশ্রামের জন্য উঠে পড়লেন।

শুভরাত্রি জানিয়ে হার্বার্ট বলল, "আমার মনে হয়, তোমাদের বিছানার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক পুঁটলি বাঁধা ঐ টাকাটা দেখতে পাবে, আর বীভৎস কিছু একটা আলমারির মাথায় উবু হয়ে বসে তোমাদের লক্ষ্য করবে যখন তোমরা অসদুপায়ে পাওয়া ঐ টাকাগুলো পকেটে পুরতে থাকবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে শীতের দীপ্ত সূর্য্যালোকে প্রাতরাশের টেবিল যখন প্লাবিত হয়ে উঠেছিল, হার্বার্টের তার নিজের ভয়ের কথা ভেবে হাসি পেল। এখন ঘরে যে স্বাস্থ্যকর বাস্তব পরিবেশ বিরাজ করছিল গত রাত্রে তার কোন চিহ্নই ছিল না। নোংরা, কোঁকড়ান ছোট্ট থাবাটিও পাশের টেবিলের উপর এমন অনাদৃত ভাবে পড়েছিল যেটাকে দেখলে আর তার অলৌকিক মহিমার উপর বিশেষ আস্থা থাকে না।

"আমার মনে হচ্ছে সব বুড়ো সৈনিকই সমান," মিসেস হোয়াইট বললেন, "আর আমাদেরও যেমন ঐ সব মাথামুণ্ডুহীন গল্প শোনা! আজ-কালকার যুগে কি ইচ্ছা পূরণ হয়? আর যদি হয়ও, দু'শ পাউণ্ড টাকা পেলে তোমার ক্ষতিটা কি হতে পারে?"

"আকাশ থেকে ওঁর মাথাতেও তো ছিটকে পড়তে পারে," বলল চপলমতি হার্বার্ট।

তার বাবা বললেন, "মরিস্ বলছিল, ব্যাপারগুলো এত স্বাভাবিক ভাবে ঘটে যে, ইচ্ছে করলে এগুলোকে কাকতালীয় বলেও ধরে নেওয়া যায়।"

"বেশ, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত টাকাগুলো যেন খরচ করে ফেল না," টেবিলের ধার থেকে উঠতে উঠতে হার্বার্ট বলল। "তাহলে এটা তোমাকে নীচ আর অর্থলোভী ক'রে তুলবে, আর আমাদেরও তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে।"

তার মা হেসে উঠলেন এবং তাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তারপর রাস্তায় তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রাতরাশের টেবিলে ফিরে এলেন। তিনি তাঁর স্বামীর অন্ধ বিশ্বাসপ্রবণতায় খুব হাসি-খুসী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ডাক-পিয়ন এসে দরজায় টোকা দিল, তিনি এক রকম ছুটে না গিয়ে পারলেন না, অথবা যখন দেখলেন যে ডাকে শুধু দর্জ্জির একটি বিল এসেছে তখন তিনি কিছুটা বিরক্ত ভাবেই অবসরপ্রাপ্ত নেশাখোর সার্জেন্ট-মেজরদের উল্লেখ না করে পারলেন না।

"হার্বার্ট বাড়ী ফিরে আবার ঠাট্টা-তামাসা শুরু করবে বুঝতে পারছি," তাঁরা মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসলে বৃদ্ধা বললেন।

"কিন্তু," চিন্তিত মুখে নিজের জন্য খানিকটা বীয়ার ঢেলে নিয়ে মিঃ হোয়াইট বললেন, "আর যাই হোক, জিনিসটা যে আমার হাতের উপর নড়ে উঠেছিল এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।"

"তোমার অমনি মনে হয়েছিল," শান্ত কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধা মহিলাটি।

"আমি বলছি নড়েছিল," অপরে জবাব দিলেন। "ও ধরনের কিছু আমি ভাবিনি। আমি শুধু···কি ব্যাপার?"

তাঁর স্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বাইরে একটি

লোকের অদ্ভুত গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। লোকটি বারে বারে তাঁদের বাড়ীর দিকে অনিশ্চিত ভাবে দৃষ্টিপাত করে যেন বাড়ীতে ঢুকবেন কি না সে বিষয়ে মনস্থির করতে চেষ্টা করছিলেন। ঐ দু'শ পাউণ্ড টাকার সঙ্গে মনের যোগসূত্র থাকায়, মহিলাটি লক্ষ্য করলেন যে আগন্তুক ভদ্র-বেশধারী এবং তাঁর মাথায় একটি নূতন ঝক্‌ঝকে সিল্কের টুপি। তিন বার তিনি সদর দরজার কাছে থামলেন, তারপর আবার এগিয়ে গেলেন। চতুর্থ বারে লোকটি দরজার উপর হাত রেখে দাঁড়ালেন, তারপরেই হঠাৎ যেন স্থির সিদ্ধান্তে এসে ফটক ঠেলে বাড়ীর মধ্যে এগিয়ে এলেন। সেই মুহূর্তে মিসেস হোয়াইট তাঁর হাত দু'টি পিছনে দিয়ে তাড়াতাড়ি 'এপ্রন্'টির বাঁধন খুলে কাজকর্ম্মের সময় প্রয়োজনীয় ঐ পোষাকটি নিজের চেয়ারের গদির তলায় গুঁজে দিলেন।

বৃদ্ধা আগন্তুককে ঘরের মধ্যে আনতেই ভদ্রলোক অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি স্থির দৃষ্টিতে মিসেস হোয়াইটকে অবলোকন করলেন এবং অন্যমনস্কের মতো শুনতে লাগলেন যখন বৃদ্ধা ঘরের অপরিচ্ছন্নতা আর তাঁর স্বামীর বাগানে কাজ করার ধূলোমাখা কোটটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর মহিলাটি নারীর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা ধৈর্য্যের সঙ্গে আগন্তুকের আগমনের উদ্দেশ্য ভেঙে বলার অপেক্ষায় থাকলেন। কিন্তু লোকটি প্রথমটা আশ্চর্য্য ভাবে নীরব রইলেন।

"আমাকে···আসতে বলা হয়েছিল," তিনি শেষ পর্য্যন্ত বললেন, এবং ঝুঁকে পড়ে নিজের প্যাণ্ট থেকে একটু তুলো খুঁটে নিলেন, "আমি 'মাও এণ্ড মেগিন্স' থেকে আসছি।"

বৃদ্ধা চমকে উঠলেন। "কি ব্যাপার?" তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন। "হার্বার্টের কিছু হয়নি তো? কী···?···কি হয়েছে?"

তাঁর স্বামী মধ্যবর্ত্তী হলেন। "ওগো, শোন, শোন," তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "বস, আগেই মনগড়া সিদ্ধান্ত করে নিও না। মহাশয়, আপনি নিশ্চয় কোন খারাপ খবর আনেননি?" বলে তিনি আগন্তুকের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে দিলেন।

"আমি দুঃখিত"···আরম্ভ করলেন সাক্ষাৎকারী।

"ও কি আহত হয়েছে?" মা উদ্বিগ্ন ভাবে জানতে চাইলেন।

আগন্তুক সম্মতি সূচক ভাবে ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে দিলেন। "গুরুতর ভাবে আহত," তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু তাঁর কোন যন্ত্রণা নেই।"

"আহ্, ভগবানকে ধন্যবাদ!" হাত দুটি বুকে রেখে বৃদ্ধা বললেন, "সে জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ! ভগবানকে···"

কিন্তু এই আশ্বাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অশুভ ইঙ্গিতটি তাঁর মনে আসতেই তিনি অকস্মাৎ থেমে গেলেন এবং দেখলেন, তাঁর আশঙ্কার প্রতি অনুমোদন অপরের ফেরান চোখে-মুখে ভয়ানক ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস চেপে, তাঁর স্থূলবুদ্ধি স্বামীর দিকে ফিরে, তাঁর হাতের উপর নিজের কম্পিত শীর্ণ হাতখানি রাখলেন। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিস্তব্ধতা।···

"তিনি মেশিনের মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন," অনেকক্ষণ পরে আগন্তুক বললেন নীচু গলায়।

"মেশিনের মধ্যে আটকে গিয়েছিল," হতবুদ্ধির মতো পুনরুক্তি করলেন মিঃ হোয়াইট, "হুঁ"।

তিনি জানলার বাইরে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, আর তাঁর স্ত্রীর একখানি হাত নিজের দু'হাতের মাঝখানে নিয়ে, সেটি চেপে ধরে রইলেন ঠিক যেমন ভাবে তিনি ধরে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে, তাঁদের পূর্ব্বরাগের দিনগুলিতে।

"সেই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল," আগন্তুকের দিকে সামান্য ফিরে তিনি বললেন, "এটা সহ্য করা শক্ত"।

আগন্তুক একটু কাশলেন, এবং উঠে, ধীর পদবিক্ষেপে জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন। "আমাদের কোম্পানি আপনাদের এই নিদারুণ ক্ষতিতে তাঁদের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাবার ভার আমাকে দিয়েছেন," কোন দিকে না তাকিয়ে তিনি বলে গেলেন। "আমি কোম্পানির কর্ম্মচারী মাত্র, আর শুধু তাঁদের আদেশ পালন করতে এসেছি, এ কথাটা দয়া করে বুঝবেন।"

কেহই উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধার মুখ বিবর্ণ, চোখের দৃষ্টি শূন্যতায় ভরা আর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস স্তিমিত; তাঁর স্বামীর মুখাকৃতি এমন হয়ে উঠেছে যেমন হয়ত এক দিন হয়ে উঠেছিল তাঁর বন্ধু ঐ সার্জ্জেণ্টের মুখ তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায়।

"আমি বলতে এসেছিলাম যে 'মাও এণ্ড মেগিন্স' কোন ভাবে দায়ী হতে অপারগ," বলে চললেন অপর ব্যক্তি, "তাঁরা কোন রকম দায়িত্ব স্বীকার করেন না, তবে আপনাদের ছেলের ভাল কাজ-কর্ম্মের কথা বিবেচনা করে তাঁরা আপনাদের কিছু টাকা উপহার দিতে চান—ক্ষতিপূরণ হিসাবে।"

মিঃ হোয়াইট তাঁর স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, আতঙ্কের দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর শুষ্ক ওষ্ঠাধরে রূপায়িত হ'ল মাত্র দু'টি কথা, "কত টাকা?"

"দু'শ পাউণ্ড," জবাব এল।

স্ত্রীর আর্ত্ত চীৎকারের প্রতি অবচেতন থেকে, বৃদ্ধ ক্ষীণ হেসে, অন্ধের মতো হাত দু'টি বাড়িয়ে দিলেন, তার পরেই মেঝেতে ভেঙে পড়লেন অসাড় বস্তু-স্তূপের মতো।

প্রায় দু'মাইল দূরে, বিরাট নূতন গোরস্থানে, বৃদ্ধ-দম্পতি শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে শুষ্ক ও বিষাদছায়াচ্ছন্ন গৃহে ফিরে এলেন। সমস্ত কিছুই এত দ্রুত সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, প্রথমটায় যেন ব্যাপারটা তাঁদের ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না, আর তাঁরা এমন একটা প্রত্যাশায় থাকলেন যেন সম্পূর্ণ অন্য কিছু ঘটবে—এমন কিছু, যা তাঁদের এই ভার লাঘব করে দেবে, বার্দ্ধক্য-জীর্ণ হৃদয়ের পক্ষে অসহ্য এই গুরুভার। কিন্তু দিন কেটে যেতে লাগল, এবং প্রত্যাশা 'হাল ছেড়ে দেওয়ায়' পর্য্যবসিত হ'ল—আশাশূন্য বার্দ্ধক্যের 'হাল ছেড়ে দেওয়া' অবস্থা, যাকে সময় সময় ভুল করে বলা হয় ঔদাস্য। তাঁরা কদাচিৎ এক-আধটা বাক্য-বিনিময় করতেন, কারণ এখন আর তাঁদের কথা বলার মত কিছু ছিল না, এবং তাঁদের দিনগুলি ছিল অবসাদময় দীর্ঘ।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। বৃদ্ধ এক রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে, বিছানায় হাত ছড়িয়ে দিয়ে অনুভব করলেন যে, তিনি একা। ঘরটা অন্ধকার, জানলার কাছ থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ এল। তিনি বিছানায় উঠে বসে শুনতে লাগলেন।

"ফিরে এস", সস্নেহ কণ্ঠে তিনি বললেন, "তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।"

"আমার বাছা হিমে পড়ে রয়েছে", বৃদ্ধা এই কথা বলে নূতন করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ বৃদ্ধের কানে মিলিয়ে গেল। বিছানাটা উষ্ণ, আর ঘুমে তাঁর চোখ দু'টি ভারী হয়ে উঠেছে। তিনি মূর্চ্ছাগ্রস্তের মতো ঢুলছিলেন, এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর স্ত্রীর মুখনির্গত বজ্র-চীৎকার তাঁকে সচকিত করে জাগিয়ে তুলল।

"বাঁদরের থাবাটা!", বৃদ্ধা উৎকট চীৎকার করে উঠলেন, "ঐ বাঁদরের থাবাটা!"

বৃদ্ধ আতঙ্কে উঠে বসলেন। "কোথায়? কোথায় সেটা? কি হয়েছে?"

বৃদ্ধা ঘরের ওধার থেকে হোঁচট খেতে খেতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। "ওটা আমার চাই", শান্ত ভাবে তিনি বললেন। "ওটা নষ্ট করে ফেলনি তো?"

"ওটা বসার ঘরে রয়েছে, তাকের উপর", বিস্ময়াপন্ন হ'য়ে তিনি জবাব দিলেন। "কেন?"

বৃদ্ধা একই সঙ্গে কাঁদতে ও হাসতে লাগলেন, এবং ঝুঁকে পড়ে তার গালে চুম্বন করলেন।

"এখনি ওটার কথা আমার মনে পড়ল," বৃদ্ধা বললেন, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তার মতো। "আমি আগে কেন ওটার কথা ভাবিনি? তুমি কেন ভাবোনি?"

"কিসের কথা ভাববো?" প্রশ্ন করলেন তিনি।

"অপর দু'টো ইচ্ছা পূরণের কথা," ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জবাব দিলেন বৃদ্ধা। "আমরা তো মাত্র একটিই চেয়েছি।"

"সেটাই কি যথেষ্ট হয়নি?" বৃদ্ধ জানতে চাইলেন ক্রুদ্ধ-ভাবে।

"না," বিজয়িনীর মতো বললেন তিনি; "আমরা আরও একটা চাইব। যাও, নীচে গিয়ে শীগগির ওটা নিয়ে এস, আর চাও আমাদের ছেলে আবার বেঁচে উঠুক।"

লোকটি বিছনায় উঠে বসলেন এবং নিজের কম্পমান দেহের উপর থেকে চাদরগুলো ছুড়ে ফেলে ভয়াভিভূত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, "হা ভগবান, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

"নিয়ে এস," হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন বৃদ্ধা, "ওটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এস, আর চাও…ওই, আমার বাছা, বাছা রে!"

তাঁর স্বামী দেশলাই জ্বেলে মোমবাতিটি ধরালেন। "যাও, বিছানায় ফিরে যাও," তিনি বললেন অস্থির ভাবে। "তুমি জান না যে তুমি কি বলছ।"

"আমাদের প্রথম ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়েছিল, তাহলে দ্বিতীয়টিই বা হবে না কেন?" বৃদ্ধা বললেন উত্তেজিত কণ্ঠে।

"ওটা কাকতালীয়," বৃদ্ধ তোতলালেন।

"যাও, ওটা নিয়ে যাও," চীৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধা, এবং তাঁকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

তিনি অন্ধকারে নীচে নেমে গেলেন ও আন্দাজ করে বসবার ঘরে গিয়ে পৌছুলেন, তার পরে অগ্নিকুণ্ডের উপরিস্থিত তাকের কাছে গেলেন। মন্ত্র-সিদ্ধ-বস্তুটি নিজের জায়গায় পড়ে ছিল। একটা ভীষণ আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসল যে ঐ অকথিত ইচ্ছাটি তাঁর অঙ্গহীন পুত্রকে তিনি ঘর থেকে পালিয়ে যাবার আগেই সামনে এনে উপস্থিত করবে। তার পর যখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর দরজার দিক-ভ্রম হয়েছে তখন তাঁর দম আটকে এল। ঘামে ঠাণ্ডা কপাল, তিনি টেবিলের চার পাশে পথ খুঁজে ফিরে, অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ে চললেন যতক্ষণ না তিনি সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথটিতে এসে উপস্থিত হলেন ঐ অস্বাস্থ্যকর জিনিসটি হাতে নিয়ে।

এমন কি, তাঁর স্ত্রীর মুখাকৃতিও পরিবর্ত্তিত বোধ হল, যখন তিনি ঘরে ঢুকলেন। সে মুখ বিবর্ণ ও প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব, আর তিনি ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, সে মুখে অস্বাভাবিকতার ছাপ। স্ত্রীকে তাঁর ভয় হচ্ছিল।

"চাও!" বৃদ্ধা বললেন কঠিন স্বরে।

"এমন বোকামি আর পাপ কাজ", কম্পিত দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে তিনি বললেন।

"চাও!" পুনরাবৃত্তি করলেন স্ত্রী।

বৃদ্ধ তাঁর হাত তুললেন, "আমি চাই আমার ছেলে আবার বেঁচে উঠুক।"

মন্ত্রসিদ্ধ বস্তুটা মেঝেতে পড়ে গেল এবং বৃদ্ধ ভয়ে কম্পিত হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর তিনি কাঁপতে কাঁপতে অবসন্ন ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, যখন বৃদ্ধা জ্বলন্ত চোখে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং পরদা সরিয়ে দিলেন।

জানালার বাইরে নিবদ্ধ-দৃষ্টি বৃদ্ধার আকৃতির দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাতরত বৃদ্ধ বসে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডায় জমে উঠতে লাগলেন। মোমবাতিটি শেষ হ'ল, যেটা চীনা দীপাধারের উন্নত বেড়াটির নীচে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এতক্ষণ ধরে জ্বলছিল, এবং বারে বারে স্পন্দিত হয়ে ঘরের ভিতর দিকের ছাদ ও দেওয়ালের উপর এতক্ষণ কম্পমান ছায়া ফেলছিল, সেটা, দপ-দপ করে জ্বলে উঠে, অন্যগুলির চেয়ে বৃহত্তর ছায়া ফেলে নিবে গেল। বৃদ্ধ মন্ত্রসিদ্ধ বস্তুটির বিফলতায় অনির্ব্বচনীয় ভাবে আশ্বস্ত হয়ে, এক রকম হামাগুড়ি দিয়েই নিজের বিছানায় ফিরে গেলেন, এবং দু'-এক মিনিট পরেই বৃদ্ধাও নীরবে ও গভীর ঔদাসীন্যে তাঁর পাশে ফিরে এলেন।

কেউই কথা বললেন না, কিন্তু উভয়েই চুপ করে শুয়ে থেকে দেওয়াল-ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ শুনতে লাগলেন। সিঁড়িতে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হল এবং একটা ইঁদুর কিচমিচ করে দেওয়ালের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। অস্বস্তিকর সূচিভেদ্য অন্ধকার, কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে সাহস সঞ্চয় করে, গৃহস্বামী দেশলাইয়ের বাক্সটি হাতে নিলেন, এবং একটি কাঠি জ্বেলে, নীচে নেমে গেলেন একটা মোমবাতি আনতে।

সিঁড়ির নীচে কাঠিটি নিবে গেল, এবং তিনি আর একটি জ্বালার জন্য থামলেন, আর সেই মুহূর্ত্তে ঠুক্ করে একটা শব্দ, এত মৃদু ও গোপন যেন ভাল করে শোনাই যায় না, শব্দ হ'ল সামনের দরজায়।

দেশলাইটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। তিনি শ্বাস রুদ্ধ করে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না দরজায় আবার শব্দ পড়ল। তখন তিনি ফিরে দ্রুত গতিতে ঘরে পালিয়ে গেলেন এবং নিজের পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তৃতীয় বার দরজায় আঘাতের শব্দ গোটা বাড়ীটায় শোনা গেল।

"ওটা কি ?" চমকে উঠে চীৎকার করলেন বৃদ্ধা।

"একটা ইঁদুর" কাঁপাগলায় বৃদ্ধ বললেন, "একটা ইঁদুর। ওটা আমার পাশ দিয়ে সিঁড়িতে ছুটে গিয়েছিল।"

তাঁর স্ত্রী বিছানায় উঠে বসে কান পেতে রইলেন। দরজায় জোরে একটা ঘা দেওয়ার শব্দ বাড়ীটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

"এ হার্বার্ট!" বৃদ্ধা কান্নামাখা গলায় চীৎকার করে উঠলেন, "এ হার্বার্ট।"

"তিনি দরজার দিকে ছুটলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁর সামনে ছিলেন, তিনি বৃদ্ধার হাতটা ধরে ফেলে, জোর করে আটকে রাখলেন।

"তুমি কি করতে যাচ্ছ ?" চাপা কর্কশ গলায় বললেন তিনি।

"আমার ছেলে; ও হার্বার্ট।" যন্ত্রচালিতবৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বৃদ্ধা চীৎকার করলেন। "আমি ভুলে গিয়েছিলাম ও জায়গাটা এখান থেকে দু'মাইল দূর। আমাকে ধরে রেখেছ কেন ? যেতে দাও। আমাকে দরজা খুলে দিতে হবে।"

"ঈশ্বরের দোহাই, ওটাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিও না," কাঁপতে কাঁপতে বললেন বৃদ্ধ।

"নিজের ছেলেকে তোমার ভয় ?" নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে বললেন, "আমাকে যেতে দাও। আমি আসছি, হার্বার্ট, আমি আসছি।"

ঠক্ করে দরজায় আবার একটা ঘা পড়ল, আরো—আরো একটা। বৃদ্ধা আকস্মিক একটা হেঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর স্বামী সিঁড়ির মাথা পর্য্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং দ্রুত অবতরণরতা বৃদ্ধাকে মিনতি করে ডাকতে লাগলেন। তিনি দরজার শিকল খোলার ঝনঝন্ শব্দ এবং গর্ত্তে আটকান নীচের অর্গলটি মৃদু অথচ দৃঢ় ভাবে মুক্ত করার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারপরেই বৃদ্ধার অস্বাভাবিক ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"ঐ খিলটা," উচ্চ চীৎকারে বৃদ্ধা বললেন, "নীচে এস। অত উঁচুতে আমি নাগাল পাচ্ছি না।"

কিন্তু তখন তাঁর স্বামী হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে মেঝের উপর পাগলের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন ঐ থাবাটির সন্ধানে। বাইরের ঐ জিনিসটা ঘরে ঢুকে পড়ার আগে যদি তিনি এক বার শুধু ওটা খুঁজে পেতেন। একসঙ্গে অব্যর্থ ভাবে অনেকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র; ক্ষেপণের মতো ঠক্ ঠক্ ঠক্ করে ক্রমাগত দরজায় করাঘাত গোটা বাড়িটায় প্রতিধ্বনি তুলল এবং তিনি তাঁর স্ত্রীর সশব্দে ঘর্ষণ করে একটি চেয়ার টেনে প্রবেশপথের দরজার গায়ে ঠেসানোর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি শুনতে পেলেন অর্গলটির ধীরে নেমে আসার কড়কড় শব্দ, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তিনি হাতে পেলেন ঐ বানরের থাবাটি, এবং উন্মত্ত ভাবে এক নিঃশ্বাসে প্রার্থনা করলেন তাঁর তৃতীয় ও শেষ ইচ্ছাটি।

দরজায় করাঘাতের শব্দটা অকস্মাৎ থেমে গেল, যদিও তার প্রতিধ্বনি তখন পর্য্যন্ত গোটা বাড়িটায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। তিনি শুনতে পেলেন, চেয়ারটি পিছনে টেনে নেওয়ার ও দরজা খোলার আওয়াজ। এক ঝাপটা ঠাণ্ডা বাতাস সিঁড়ির উপর পর্য্যন্ত উঠে এল, সেই সঙ্গে স্ত্রীর দুঃখ-হতাশাব্যঞ্জক সুদীর্ঘ আর্ত্তনাদে যেন তিনি সাহস ফিরে পেয়ে ছুটে নেমে গেলেন তাঁর কাছে, তারপর তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন সদর দরজা পর্য্যন্ত। শান্ত, জনশূন্য পথের পার্শ্বে রাস্তার উজ্জ্বল আলোর শিখাটি শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অনুবাদক—তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাক

অনিলকুমার দলুই

কঠিন কর্কশ স্বর
কোনো গানের মীড় নেই
নেই কোনো সুরেলা বাণীর মায়াজাল!
চেতনার 'পরে হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাত পড়ে
বার বার নিদ্রার স্বপ্নিল জগৎ ছিঁড়ে যায়
দুঃসহ যন্ত্রণার দারুণ ব্যথায়।
বাস্তব প্রত্যক্ষ হয়:
ক্রূর কুটিল মাটির পৃথিবী
ডাক দেয় জীবনের কর্ত্তব্যের জটিল কক্ষপথে
দুর্নিবার ঘূর্ণনের যান্ত্রিক মত্ততায়।
কবোষ্ণ শয্যা প্রিয়ার আলিংগন
প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা
দিয়ে জলাঞ্জলি,
প্রাভাতিক আলোক-তীর্থে
ছুটে যেতে চায় দুর্মদ বেগে
কণা কণা আহারের সন্ধানে।

আত্মার অবলুপ্তি ঘটে
অন্ধ-তামস-তিমিরে!
গুহাবাসী প্রেতাত্মা
কামনার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়
দেহের শিরায় শিরায়।
তার পর রক্তের মাঝে নামে মৃত্যুর প্রবাহ
জংগম-জীবন যায় স্থাবরিক কবরের বিলুপ্তি কারাগারে
নিদ্রার মোহমগ্ন পারাবারে।
ঠিক এমনি সময়ে ডাক আসে
কর্কশ স্বরে
কর্ণকুহরে।
প্রভাত এসেছে দ্বারে
তারি সংকেত আসে কাকের ডাকে।
নিশান্ত হয়েছে,
এবার উজ্জীবন: আমার—
আমার শাশ্বত আত্মার!

মালবিকার উপাখ্যান

আলপনা সেন

মালবিকা চ্যাটার্জিকে চেনেন না? আহা, ওই যার গল্প, উপন্যাস-আর কবিতা বাংলা দেশের প্রায় সব সাপ্তাহিক, মাসিক আর দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় বা'র হয়, আর সে সব লেখা পড়ে আপনারা পঞ্চমুখ হ'ন—কেউ বা নিন্দেয় আর কেউ উচ্ছসিত প্রশংসায়। যার বিদ্রোহাত্মক মতবাদের প্রভাব বিশেষ করে দেশের তরুণ-তরুণীদের ওপর লক্ষ্য করে কোন কোন সম্পাদক—সমালোচক যাকে সামলাতে গিয়ে বেসামাল সব সমালোচনা করে থাকেন, আপন-আপন পত্রিকায়,—প্রতিভার দীপ্তিতে দীপ্তিময়ী সেই শিল্পী-মেয়েটির কথাই বলছি আমি!

কলেজ-জীবনে ছাড়াছাড়ি হবার প্রায় দশ বছর বাদে হঠাৎ একদিন মুখোমুখি হয়ে গেলাম তার সংগে, পূরবী সিনেমার সামনের ফুটপাতে। 'বনানী!'—চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে নিয়ে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল সে। '—তুই! এখানে কি সিনেমা দেখতে নাকি?'

হাসিমাথা পরিচিত মুখখানির দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে নিজেকে তার কমনীয় বাহু-বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে অল্প হেসে বললাম, 'হ্যাঁ। —তুই?'

চোখে পড়ল ওর ঘন-কালো চুলের মাঝখানে উজ্জ্বল সিঁদুরের রক্ত-লেখা। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর এম কে ঘোষের সংগে কয়েক বছর আগে ওর বিয়ে হয়ে গেছে তা' জানতাম কিন্তু বিয়ের সময় আসিনি ইচ্ছে করেই। সে জন্য পত্র মারফৎ মালবিকার অনেক গালাগালি আর তিরস্কার সইতে হয়েছে আমাকে। কলেজ-জীবনে আমিই ছিলাম ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। সেই আমারই কাছ থেকে এ ধরণের ঔদাসীন্য কিংবা ওর ভাষায় 'হৃদয়হীন—নিষ্ঠুরতা' একেবারেই আশা করেনি ও। তাই ভারি ক্ষুব্ধ হয়েছিল আমার ওপর। তার পরেও খানকয়েক চিঠি ও আমাকে লিখেছিল—সাংসারিক জীবন কিংবা নব-দম্পতির কাব্য-কাহিনীর রসাল-পত্র নয় সেগুলো—তাতে থাকত শুধু ওর একাগ্র সাহিত্য সাধনার দুরূহ তপস্যার ইতিহাস। কিন্তু সে সব চিঠির কোন জবাবই দিতাম না আমি। গত দশ বছর ধরে আমি ওকে শুধু এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করেছি। আজও মুখোমুখি দেখা হয়ে যাওয়ায় অতীতের বন্ধু-প্রীতি স্মরণ করে বিশেষ খুশি হ'তে পারলাম না।

মালবিকা সেটা লক্ষ্য করল।

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আজো তুই আমাকে ক্ষমা করতে পারলি নে বনানী? তোর কাছে আমার অপরাধের বোঝা ভারি হয়েই রইল?'

মালবিকার কথার প্রতিবাদ করবার ছিল না কিছুই। তাই প্রসংগটা চাপা দিতে বললাম, 'না না, সে সব কিছু আর আমি ভাবি না। সে তো অনেক কাল চুকে-বুকে গেছে। আয়, আমার স্বামীর সংগে তোর আলাপ করিয়ে দিই। জানিস্, উনি তোর লেখার ভীষণ ভক্ত?'

স্বামী একটু পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপ-চাপ। তাঁকে ডাকলাম।

মালবিকা তাঁকে নমস্কার করে স্মিত মুখে বলল, 'বনানীর বিয়ের সময় সেই এক নজর দেখা আপনার সংগে; মনে আছে আমাকে?'

মুখার্জি সাহেব মাথা চুলকে বললেন, 'তা' আছে বৈ কি। আপনি তো ভোলবার বস্তু নন? একদম চোখে না দেখেও আপনাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করে থাকে এমন পাঠক-পাঠিকার অভাব নেই বাংলা দেশে। আমি তো তবু এক নজর দেখতে পেয়েছিলাম! এবং বনানী যদি কিছু মনে না করে তো নির্ভয়ে বলি, সে-দেখাটা স্মরণীয় হয়ে আছে।'

মালবিকা আর আমি দু'জনেই হেসে ফেললাম তাঁর কথার ভংগিতে। মালবিকা হেসেই বলল, 'তবু ভাল আপনি মনে রেখেছেন। বনানী তো চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া ছেড়েছে কত কাল!'

তার কথার সুরে যে একটু ক্ষুব্ধ অভিযোগের ভাব ফুটে উঠল, বেশ বুঝলাম, সেটা স্বামীর কানে একটু যেন কেমন শোনাল! বিস্মিত ভাবে তিনি তাকালেন আমার দিকে। আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের অনেক গল্পই তাঁর জানা ছিল, কিন্তু কবে কেমন করে সে বন্ধুত্বে ভাঙ্গন ধরেছিল সে ইতিহাস আমি গল্পচ্ছলেও তাঁকে কোন দিন শোনাইনি। মালবিকার সাহিত্য সৃষ্টির প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ রচনাই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল; সেই শ্রদ্ধার ভাবটুকু নষ্ট করবার ইচ্ছে আমার ছিল না। একটু লজ্জিত ভাবেই বললাম, 'ঝগড়াটা পরের জন্য মুলতুবী থাক্। এখন এসেছি সিনেমা দেখতে, সময় আছে আর মাত্র আট মিনিট। তুইও চল্ না মালবি? বিশেষ কোন জরুরী কাজ যদি না থাকে অবিশ্যি।'

হাতের রিষ্ট-ওয়াচটা একবার উল্টে দেখে নিয়ে মালবিকা বলল, 'নাঃ, কাজ এমন কিছু নেই। চল্।' আমার ইংগিতে স্বামী দ্রুত পদে এগিয়ে গেলেন টিকিটঘরের দিকে মালবিকার টিকিট কেটে আনতে। আমাদের ওটা আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল।

দু'জনে এগোলাম আস্তে আস্তে। মালবিকা বলল, 'এলাহাবাদ থেকে ক'লকাতায় তোরা কবে এসেছিস্ বনানী?'

উত্তর দিলাম, 'এই মাস ছয়েক। উনি বদলী হয়ে এসেছেন লাল বাজারের হেড কোয়ার্টারের পুলিশ-সুপার হয়ে। তোর সংগে তো কেউ নেই দেখছি। একাই বেড়াতে বেরিয়েছিস্ নাকি? ডক্টর ঘোষ…'

'তিনি দিল্লী গেলেন। কি একটা কনফারেন্স আছে ওখানে কাল। ফিরবেন বোধ হয় পরশু বিকেলে। তাঁকে প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম দমদমে।' একটু থেমে মালবিকা আবার বলল, 'অনেক দিন পরে তোকে কাছে পেয়ে কী ভালই যে লাগছে আমার! কিন্তু তুই যেন আজ অনেক দূরে সরে গেছিস্ বনানী—দশ বছর ধরে শুধু এড়িয়েই চলছিস্ আমাকে তুই।'

মৃদু প্রতিবাদের সুরে এবার বললাম, 'এড়ানোর কী দেখলি

চিঠির জবাব? তোর খবর পাওয়ার দরকারটাই ছিল বেশী, তা' বরাবর পেয়ে এসেছি। আমার তো সেই চিরন্তনী সংবাদ, স্বামী, ছেলে, শ্বশুর-শাশুড়ী আর সংসার—ওর আর কি জানাব প্রত্যেক চিঠিতে?'

মালবিকা অল্প হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'একেবারে লাগসই কৈফিয়ৎ! জবাব দেবার কিছু নেই।' বলে চুপ করে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন একটু ভাবল, তার পর বলল, 'সুবিনয় কেমন আছে রে?'

সংক্ষেপে বললাম, 'ভালই আছেন।', মুখার্জি সাহেব এই সময় টিকিট কেটে ফিরে এলেন। আমাদের আলোচনায় ছেদ পড়ে গেল। তিন জনে গিয়ে 'হলে' ঢুকলাম।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে মালবিকার পাশে বসে পর্দায় ছবি দেখার বদলে আমি ডুব দিলাম অতীতের স্মৃতি-ছবির মাঝখানে। দশ বছর আগেকার পুরনো জীবনটাকে টেনে নিয়ে এলাম বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে,—এ সেই মালবিকা—হাজার পাওয়ার বালবের চোখ-ঝলসানো রূপের দীপ্তি আর মনের প্রখরতা নিয়ে সে আবির্ভূতা হয়েছিল আমাদের সিটি-কলেজের ছাত্রী মহলে। বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি তার। এতগুলো বছর কোন দিক দিয়ে পার করে দিয়েছে ও, কে জানে! কালের জীর্ণ হস্তক্ষেপের স্পর্শ ওর দেহ-মনের কোথাও পড়েনি। পেলব-অধরের সেই রমণীয় হাসি, দীর্ঘায়ত চোখের সেই স্নিগ্ধ চাহনী আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। মালবিকার সৌন্দর্যের সংগে ভোরের প্রথম আকাশের অনেকখানি মিল আছে। কলেজে আমরা তাই ওকে অনেক নামে ডাকাডাকি করতাম। কেউ বলতাম, 'ভেনাস,' কেউ বলতাম, 'হেলেন অব দি ট্রয়।' ছেলেরা বলত, 'ক্লিও পেত্রা'। কারও মতে বা ও ছিল রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী।' যৌবনের সেই প্রথম বসন্তে মালবিকার রূপে উগ্রতা ছিল কিছু বেশী। আমি তাই ঠাট্টা করে বলতাম, 'তোর রূপের আগুনে পুড়ে মরবার জন্য অনেক পতংগ ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মালবি, সাবধান!'

মালবিকা হেসে উত্তর দিত, 'ভয় নেই সখি! বাঁকা চাহনী হেনে আর গোপনে প্রেম-পত্র চালাচালি করে যে-সব মেয়ে ছেলেদের তরুণ মনে সস্তা ভাবের দোলা লাগায়, মালবিকা সে জাতের মেয়ে নয়। ছেলেদের কুৎসিত ছ্যাবলামি আর তরল ভাবালুতাকে আমি যত ঘৃণা করি তত আর কিছুকে নয়। ভয় নেই বনানী, পতংগকুল যাতে এ আগুনের কাছে না ঘেঁসতে পারে তার জন্য একটা তেজস্ক্রিয় প্রতিরোধক শক্তি তৈরি করেছি আমি।'

হেসে বলতাম, 'কি সে শক্তি, শুনি?'

'সাহিত্য তথা মনস্তত্ত্ব।'—মালবিকা বেশ গম্ভীর হয়েই বলত। 'ভালোবাসা নিয়ে কি রকম খোলাখুলি গবেষণা চালাই আমি ছেলেদের সংগে, দেখিস না? ওদের মধ্যে যারা পণ্ডিত হয়েছে আর যারা মূর্খ—সবাই মালবিকার মনস্তত্ত্ব ভাল করেই বুঝে নিয়েছে।' বলেই হাসত মালবিকা আর কবিতার সুরে আওড়াতো গানের কলি—

> 'ধরিতে যে আসে মোরে
> ধরা দেয় মোর ডোরে।
> নিয়ে যেতে মোরে হায়
> সে তো রয় থামি যে।'

এই সেই মালবিকা!

এই মালবিকার সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা—বন্ধুত্বের পরেও যদি কোন স্তর থাকে তো সেইখানে গিয়ে পৌঁছেছিল। তার পর যেদিন শুনলাম যে, মালবিকার নাগাল পাওয়া সাধারণ পুরুষের পক্ষে কঠিন তপস্যা, সেই মালবিকা ধরা দিয়ে বসেছে আমার দাদা সুবিনয়ের প্রেমে—সেদিন আনন্দ পেয়েছিলাম বললে কম করেই বলা হয়;—অভাবনীয় বিস্ময় আর উল্লাসে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এ প্রেম সার্থক করে তোলবার পথে কোন বাধাই কোন দিকে ছিল না। কিন্তু মালবিকার প্রেমের মনস্তত্ত্ব বোঝবার সাধ্য আমার নেই। দশ বছরের ব্যবধানেও তার সেই অদ্ভুত কথাগুলো আমি ভুলতে পারিনি।

'সব প্রেমের সার্থকতা কি বিয়ের লৌকিক বন্ধনের মধ্যে? আমি তো তা মনে করিনে! বিয়ের চেয়ে প্রেম অনেক বড় বনানী! তা ছাড়া, জানি নে তুই বিশ্বাস করবি কি না, সুবিনয়ের সংগে আমার প্রেমের যে সম্পর্ক তার মধ্যে জৈবিক-লালসার কোন স্থান নেই; দৈহিক মিলনের জন্য আমরা লালায়িত নই। তা ছাড়া ওটা আমার কাছে কুৎসিত কল্পনা! সুবিনয়কে আমি কোন দিন স্বামিরূপে পেতে চাইনি, আজও চাইনি।'

বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কাটা কোন রকমে সামলে নিয়ে বলেছিলাম, 'এ সব কী আবোল-তাবোল বকছিস্ তুই মালবি? স্বামি-স্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধ তোর কাছে কুৎসিত কল্পনা? আশ্চর্য!'

উত্তরে মালবিকা একটুখানি হেসে বলেছিল, 'আমি যদি কোন দিন বিয়ে করি প্রেম করে করবো না। আমার সত্যিকারের নিষ্কাম-প্রেম মিলিয়ে গেছে, এ তুই জেনে রাখিস বনানী!'

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না আমি; রূঢ় গলায় বললাম, 'আমার দাদাকে নিয়ে এ খেলাটা তুই না খেললেই পারতিস্। মাথা হেঁট হয়ে আসছে আমার তোকে বন্ধু বলে ভাবতে। ছি ছি, এ কি নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি তোর?' উত্তেজনায় আমি সেদিন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম; ঐ খানেই থামিনি, অনেক কটু কথাই বলেছিলাম তাকে। কিন্তু মালবিকা বিচলিত হয়নি। স্থির, উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুই রেগে আছিস্ বনানী? আজ থাক্ এ সব কথা। আমার জীবনে সুবিনয়ের স্থান কত গভীর সে তুই এখন বুঝবি নে। কিন্তু এক দিন হয়ত বুঝবি! সেদিন 'শেষের কবিতার' লাবণ্যর প্রেমের মত আমার প্রেমকেও হয়ত চিনে নিতে পারবি।'

আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল ওর শেষের কথাগুলোতে। শ্লেষের সংগে বললাম, 'হতে পারো তুমি 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য। কিন্তু আমার দাদা তো অমিত রায় নন? তিনি সামাজিক মানুষ, নিরীহ অধ্যাপক। হৃদয় নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় তিনি অভ্যস্ত নন। আমি জানি, যাকে অকপটে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবেসেছেন তাঁকেই তিনি চান সহধর্মিণী পত্নীরূপে। আর তুই··· ?'

কথা শেষ করবার আগেই দেখলাম, মালবিকা নিঃশব্দে আমার পাশ থেকে উঠে চলে গেল। তার সেই চলে যাওয়ার মধ্যে আমি যেন দেখতে পেলাম, উপেক্ষার একটা অনমনীয় ঔদ্ধত্য। সেই সংগে আমাদের বিচ্ছেদের সুরু এবং সে-বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল, যেদিন শুনলাম তার বিয়ের খবর। সেটা প্রায় সাত বছর পরের কথা। আমি তখন স্বামিগৃহে—কলকাতা থেকে অনেক দূরে, এলাহাবাদে।

…আজ যে-মালবিকা আমার পাশে বসে আছে সে-মালবিকা আপন সাহিত্যিক প্রতিভার বলে প্রচুর যশ আহরণ করেছে। সারা দেশে তার খ্যাতির সীমা নেই। কিন্তু আমার চোখে এ মালবিকা তার চারিত্রিক তরলতায় অনেক নীচু স্তরের নারী। তার প্রতিভার কানাকড়িও মূল্য দিই না আমি, যখন ভাবি, আমার দাদার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দেবার মূলে আছে ওর ঐ সাহিত্যিক মনের পাগলামী। সত্যি বটে, সে পাগলামীর রহস্য কখনো তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করিনি, বুঝতে পারিনি ওর প্রেমটা কী জিনিস।…কিন্তু তাই বলে ক্ষমা করতেও পারিনি ওর খেয়ালের দুরাচারিতাকে।

ছবি শেষ হল। মালবিকা আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, 'বেশ করেছে বইটা, না রে?'

'অ্যাঁ?' যেন কোন্ নিবিড় তন্দ্রা ভেংগে জেগে উঠলাম আমি। 'এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? কতক্ষণ হল?'

'পুরো আড়াই ঘণ্টা। ভাবছিলি কী এতক্ষণ? ছবি দেখিস নি?' মালবিকার তীক্ষ্ণ, উৎসুক দৃষ্টির সামনে একটু সংকুচিত হয়েই বললাম, 'কী জানি, কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। যাক্ গে। চল্ এবার ওঠা যাক্।'

বাইরে এসে মালবিকা একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর আমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি জানি, আমার সংগ আজ আর তোর ভাল লাগছে না। তবু একটা অনুরোধ যদি রাখিস্ বনানী, তবে সত্যি খুব খুশি হব। রাখবি, বল্?'

বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালাম, 'কী অনুরোধ, বল?'

'আজকের এই রাতটা—শুধু আজকের রাতটা তুই আমার সংগে আমাদের বাড়ীতে কাটাবি চল্। 'না' বললে শুনব না বনানী।'

এমন একটা আন্তরিকতার সুর ছিল ওর গলায় যে না বলতে পারলাম না সত্যিই। অল্প হেসে বললাম, 'আমার আর কি আপত্তি। তবে তার জন্য আরও একজনের অনুমতি চাই যে!'

মালবিকা খুশি হয়ে বলল, 'তাঁর অনুমতি আমি নিয়ে নিচ্ছি।'

মুখার্জি সাহেব মোটরকারের সামনে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মালবিকা আমার হাত ধরে টান্তে টান্তে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না মিঃ মুখার্জি, একটি রাতের জন্য আপনার স্ত্রী-রত্নটিকে ভিক্ষে চেয়ে নিচ্ছি। আজ রাতটুকু ও আমার সংগে থাকবে। কাল ভোরে যথারীতি আপনার থানায় পৌঁছে দেব। আপত্তি নেই তো?'

মুখার্জি সাহেব সবিনয়ে বললেন, 'কিছুমাত্র না। এক রাত্রি পত্নীবিরহে এমন কিছু কাবু হব না আমি। তবে বাড়ীতে খোকাকে রেখে এসেছি কি না। সে হয়তো মাকে না দেখলে—তা এক কাজ করুন না। তাকেও তার মায়ের সংগে নিয়ে যান না? রাত্রে তা হলে একটু আরাম করে ঘুমোতে পারব।'

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, 'খোকার জন্য কবে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে শুনি? ছেলের নামে মিথ্যে অপবাদ দিও না বলছি।'

'মিথ্যে অপবাদ! আচ্ছা বেশ। এই মিসেস ঘোষ সাক্ষী রইলেন; আজ রাত্রেই উনি টের পাবেন, আমাদের খোকা যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ীতে রাত আড়াইটের পর মানুষের সুনিদ্রা সম্ভব কি না।'

মালবিকা সহাস্যে বলল, 'সেই ভাল, খোকাকে নিয়েই যাব। ছাড়ুন আপনার মোটর।'

আমাকে টেনে নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল মালবিকা। স্বামী সামনের আসনে উঠে বসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

গঙ্গার ওপরে ছবির মত ছোট, সুন্দর বাড়ী মালবিকাদের। ঘরগুলি দামী আসবাব পত্রে ও আধুনিক কায়দায় সাজান। দোতলার ঘরগুলির কোণে লম্বা, টানা বারান্দা।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় নদীর জল, রাত্রির পৃথিবী হাসছে। বারান্দাতেও উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। একখানা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম একা মালবিকার আগমন-প্রতীক্ষায়।

একটু পরেই সে এল। এই এত রাত্রেও স্নান সেরে এসেছে। এটা ওর বহু পুরাতন অভ্যাস। চেয়ে দেখলাম, কুঞ্চিত কেশের ঘনতা আজও তেমনি কটিতট ঘিরে কবিতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। কুমারীত্বের নির্মল পবিত্রতার ছাপ রয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। কে বলবে ও পর-পুরুষের গৃহিণী! ও যেন সেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য নিয়ে প্রেম করবার প্রিয়তম বান্ধবী আমার! সেই মালবিকা, যাকে কখনো কোন গৃহস্থালীর মধ্যে কল্পনা করতে পারতাম না, শরতের হাল্কা মেঘের মত পৃথিবীর জীবন-বৈচিত্র্যের মধ্যে সে আমার কল্পনায় ভেসে বেড়াত!

কিন্তু না, শুভ্র কপালের মাঝখানে উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ জ্বল জ্বল করছে ভোরের আকাশে শুকতারার মত। আর সোজা সীঁথির মাঝখানে এয়োতির রক্তলেখা ওর মুক্ত জীবনে স্বেচ্ছাকৃত বন্ধনের স্বাক্ষর—চোখ এড়ায় না কিছুতেই। কে জানে কেন এত স্পষ্ট করে সীঁথিতে সিঁদুর আঁকে ও! স্বামীকে কি সত্যিই এত ভালোবাসে ও?

মালবিকা সামনে এসে দাঁড়ালে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'চমৎকার দেখাচ্ছে তোর এই সদ্যঃস্নাতা রূপ! সত্যি বলছি মালবি, তুই রবীন্দ্রনাথের উর্বশীই বটে। কোন কালে পুরনো হবি না! ডক্টর ঘোষ অতি ভাগ্যবান ব্যক্তি।'

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল মালবিকা। বলল, 'পুরনো দিনের কাব্য ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বুঝি? দুষ্টুমী রাখ্। এমন চুপচাপ বসে আছিস্ যে? খোকা কি ঘুমিয়েছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ। এই কতক্ষণ হল ঘুমিয়ে গেছে। বোস্ তুই। তোদের এই বারান্দাটুকুতে খাসা হাওয়া দেয়। তখন থেকে এসে হাওয়াই খাচ্ছি শুধু।'

সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল মালবিকা। হেসে বলল, 'কোথায় ভেবেছিলুম রাত্রে আমার বাড়ীতে আজ তোকে খাওয়াবো, উল্টে তোর বাড়ীতেই নৈশ-ভোজনটা সেরে আসতে হল। যাক্। একদিন তোকে আর মিঃ মুখার্জিকে নেমন্তন্ন করে এনে এর শোধটা তুলতে হবে। সেদিন অবিশ্যি আমার স্বামীর 'গেষ্ট' হবি তোরা।'

সোজা হয়ে চেয়ারে বসে বললাম, 'কিন্তু আমাকে হঠাৎ তোর নিশীথ রাতের সংগিনী করবার খেয়াল হল কেন, সেটা তো ভেবে পাচ্ছি না ? মতলবটা কী বল্ দেখি ?'

'মতলব ! মতলব তো কিছু নেই !' চোখ বড় বড় করে মালবিকা বলল, 'এমন কত রাত তু'জনে খামখেয়ালী করে তু'জনের বাড়ীতে শুয়ে গল্প করে কাটিয়েছি, মনে পড়ে বনানী ? মনে আছে, একদিন সেই বৃষ্টির রাতে কেমন আট্কা পড়ে গিয়েছিলাম তোদের বাড়ীতে ? মাসীমা সেদিন খিচুড়ি রেঁধে খাইয়েছিলেন আমাদের ?'

বলতে ইচ্ছে হল, সেদিন আর এ-দিনে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে মালবিকা ! কিন্তু বললাম না। ওর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করেই রইলাম। কি হবে মিছিমিছি ওকে আঘাত করে ? অতীত জীবনের স্মৃতি-কণা রোমন্থন করে আজও হয়ত ও আনন্দ পায়।

তা ছাড়া এই নিস্তব্ধ, শান্ত-গম্ভীর পরিবেশে মনের ক্ষোভ আমার আপনিই শান্ত হয়ে গেছে। পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় আলো-ঝলমল জলরাশির দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে ভেবেছিলাম, মালবিকার অবকাশ-ভরা নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠা আজ সৃষ্টির নেশায় ও সার্থকতার আনন্দে পরিপূর্ণ। তার ভেতরে বনানী বা সুবিনয়ের সত্যিকারের কোন স্থান আছে কি না কে বা তার হিসাব রাখতে যায় ?

মালবিকাও অন্যমনস্ক ভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই দিকে চোখ রেখেই আস্তে আস্তে এক সময় বলল, 'আমার স্বামীর ফটো দেখেছিস্, বনানী ?'

'দেখেছি। তোদের শোবার ঘরে খাটের মাথার দিকে যে ছবিটা টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে সেইটিই তো ?' বলে তাকালাম তার মুখের দিকে। মালবিকার মুখে এক টুকরো রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছিল, মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, 'হ্যাঁ। দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিস্ ?'

তার হাসিটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ; তবু বলতে ছাড়লাম না, 'তা একটু হয়েছি বৈ কি। তুই সৌন্দর্যের পূজারিণী শিল্পী নারী। ভেবেছিলাম, আর কিছু না হোক, জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে অন্তত: তোর শিল্পরুচির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। একে তো কাঠখোট্টা নীরস বৈজ্ঞানিক, তার ওপর ঐ সুশ্রী চেহারা ! কি চোখে স্বামী পছন্দ করেছিলি তা তুই-ই জানিস্। সুবিনয় ব্যানার্জি বোধ হয় ওর তুলনায় খুব অপদার্থ স্বামী হত না তোর ?'

বলে ফেলেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এমন করে দাদার কথা তুলবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না আমার। মালবিকাও কেমন একটু চমকে উঠেছিল কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'আমি ওঁকে পছন্দ করতে যাব কেন ? উনিই আমাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছেন।'

'তার মানে ?' বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করলাম আমি। 'তোর অমতে তোকে পছন্দ করে বিয়ে করেছেন ডক্টর ঘোষ, এমন অদ্ভুত কথা নিশ্চয়ই বলছিস্ না তুই ?'

'না, তাও বলছি না। আমার মতামত বলতে কিছুই ছিল না সেদিন ! লক্ষ্ণৌয়ে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে প্রথম আলাপ হল ওঁর সংগে আমারই মামার বাড়ীতে। মামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন উনি। আজন্ম-প্রবাসী বাঙালী। লক্ষ্ণৌ ওঁর জন্মভূমি।' অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করল মালবিকা।

ডক্টর মণিকুমার ঘোষের পূর্বরাগের কোন সংবাদ আমার জানা ছিল না। তাই মেয়েলী কৌতূহল বশে আগ্রহ ভরে বললাম, 'তারপর ?'

একটু ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগল মালবিকা, 'কবে কেমন করে উনি আমাকে ভালোবেসে ফেললেন টের পাইনি। গম্ভীর, সংযতবাক্, কর্মনিষ্ঠ—এক কথায় সাধক-প্রকৃতির মানুষ এই ডক্টর ঘোষ। ওঁর মনের গোপন কথা টের পাওয়া বড় সহজ নয়। তাই উনি যখন এক দিন সরাসরি বলে বসলেন, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই মালবিকা, তোমাকে না পেলে আমার চলবে না।'—সে দিন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। ডক্টর ঘোষ সোজা মানুষ। সোজা কথাতেই বললেন, 'নারীকে এত দিন আমার সাধনার পথে মস্ত বাধা মনে করে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি সেই জাতের নারী, যারা মনের সুষমা দিয়ে পুরুষের শক্তিকে রূপায়িত করে তোলে। তুমি কথা দাও মালবিকা, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হবে ?' কিন্তু এত বড় বাক্-দান দেওয়া আমার পক্ষেও সে দিন সহজ ছিল না। তাই প্রস্তাবটা এড়িয়ে যাবার জন্য বললাম, 'ক্ষমা করবেন ডক্টর ঘোষ ! ডাক্তারি পাশ না করা পর্যন্ত এখন কোন কথাই আপনাকে দিতে পারি না আমি।'

আশ্চর্য মানুষ, বনানী, আমার সে কথার পর আর একটি কথাও বললেন না তিনি, নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেলেন। তারপর পুরো ছ'বছরের ভেতর এ প্রসংগ আর একবারও উত্থাপন করেন নি।...কিন্তু যে দিন আমি ডাক্তারি পাশ করে কলেজ থেকে বেরিয়ে এলাম, সেই দিন তিনি আমায় পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি প্রতীক্ষা করে আছি মালবিকা ! আজ কি বলবে বল ?' তাঁর অদ্ভুত সংযম আর ধৈর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সামান্য নারী আমি, পুরুষের এ তপস্যাকে পদদলিত করতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নেই। বললাম, 'আমার মাথার ওপর মামা এবং কলকাতায় আমার বাবা-মা অভিভাবক আছেন। তাঁদের যদি অনুমতি পান তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি না পান তা হলে আপনাকে নিরাশ হতে হবে।' ডক্টর ঘোষ আমাদের স্বজাতি নন, কায়স্থ। কিন্তু সে জন্যও বিয়ে আট্কাল না আমাদের। ডক্টর ঘোষের মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে মা, বাবা এবং মামাবাবু তিন জনেই সে দিন ভেবেছিলেন যে, আমিও নিশ্চয়ই ডক্টর ঘোষকে ভালোবেসে ফেলেছি। প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের স্বাধীনতায় তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে চাইলেন না বরং পাত্র হিসাবে ডক্টর ঘোষকে উপযুক্ত দেখে আনন্দেই সম্মতি দান করলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।' মালবিকা শ্রান্ত ভাবে চুপ করল।

আমি কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সন্তর্পণে প্রশ্ন করলাম, 'ডক্টর ঘোষকে বিয়ে করে তুই তা হলে সুখীই হয়েছিস্। কি বলিস্ ?'

মালবিকা ঈষৎ হেসে বলল, 'আমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবই আমার সাহিত্য আর সুবিনয়ের স্মৃতিকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে। তার বাইরে কোথাও কিছু নেই।' মনে মনে আমার চমক লাগল মালবিকার কথা শুনে। অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'কি বলছিস্ তুই মালবি ! তাও কি সম্ভব ?'

মালবিকা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে মারল, 'কিসে অসম্ভব ?'

'দাদা—দাদার কথা আজো তুই তেমন করে ভাবিস ?'

'তুই কি মনে করিস্ বনানী, সুবিনয় আমার জীবনে এসেছিল শুধু দু'দিনের জন্য, বসন্তের উৎসবের মত ?' চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠল মালবিকার। ক্ষোভের সংগে বলে উঠল সে, 'আশ্চর্য বনানী! আমাকে এত গভীর ভাবে ভালোবেসেও আমার কিছুই তুই চিনলি নে!'

স্বীকার করলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, সত্যিই চিনি নি। সুবিনয়ের দিক থেকেই ওকে আমি বরাবর বিচার করে দেখেছি; ওর দিক থেকে কখনো বুঝতে চেষ্টা করিনি ওর স্বকীয় সত্তাকে। সে সত্তার স্বরূপ ও আজ উদ্ঘাটিত করে দিল আমার কাছে।

আত্মবিস্মৃতের মত স্মৃতির পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল মালবিকা।

'ভালো তো সবাই বাসে। নর-নারীর সৃষ্টির আদি থেকে পুরুষ ভালোবেসে আসছে নারীকে—নারী আত্মদান করেছে পুরুষের কাছে। কিন্তু ভালোবেসে নারীর স্বকীয় সত্তা পরিপূর্ণরূপে আত্মবিকাশ করতে সমর্থ হয়েছে কবে, কোথায়? ভালোবেসে আত্মবিলোপ করাই সাধারণ নারীর তপস্যা। কিন্তু আমি সাধারণ নই। প্রেম একটা বড় প্রতিভা, একথা আমি মর্ম দিয়ে অনুভব করেছিলাম সেই দিন, যে দিন সুবিনয়ের ভালোবাসা আমার অন্তর্নিহিত শিল্প-প্রতিভাকে জাগিয়ে তুললো। সুবিনয় দুর্লভ প্রেমিক। তার অসাধারণ প্রেমের যথাযোগ্য মর্য্যাদা আমি দিতে পেরেছি, এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু নিজেকে এমন করে আবিষ্কার করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হত, যদি সুবিনয় আসত আমার স্বামী হয়ে? বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতি সাগরের দিকেই বটে, কিন্তু রত্নাকরের বুকে পড়লে সে হারিয়ে ফেলে নিজেকে! আমি ভালোবেসে আত্মবিলোপ করতে চাইনি বনানী! আমি চেয়েছিলাম হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেও আমার সাহিত্য-সাধনাকে জয়যুক্ত করে তুলতে। তাই মিলনের সাগর থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসেছি চির-বিরহের মরুভূমিতে! কিন্তু সেজন্য মনে আমার যতই দহন থাক, জীবনে তার তাপ নেই! কেন জানিস্? সুবিনয় আমার হাতে তুলে দিয়েছে তার প্রেমের অমৃত-ভরা পাত্র। সে কখনো শূন্য হবার নয়। আজ আমার জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখতে পাবি সুবিনয়ের প্রেমের তপস্যার ছাপ রয়েছে সেখানে।'

আমি গম্ভীর ভাবে মালবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনছিলাম। ও চুপ করে যেতেই বলে ফেললাম, 'কিন্তু তাঁর জীবনের দাবী কি এতেই মিটে গেছে মালবি? আমি তো তা কোন মতেই মানতে পারিনে। তুই এক দিন বলেছিলি, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যর প্রেমের জাত তোর প্রেমও। হয়ত তাই। তোর ভরাপাত্র রিক্ত হয়নি, শূন্যকে পরিপূর্ণ করে তোলবার ব্রত নিয়েছিস তুই; তাই 'শোভনলাল'কেও পেয়েছিস। কিন্তু দাদা আজো বিয়ে করেননি, জানিস্ হয়ত। এ জীবনে করবেনও না। তোকে হাসিমুখে বিদায় দিয়ে আজো তিনি ধ্যান করছেন তোকেই! আচ্ছা, সে-মানুষটার ঐ নিঃসঙ্গ, উত্তরাধিকার শূন্য জীবনটার জন্য যে একমাত্র তুই-ই দায়ী, এ কথা কি তোর একবারও মনে আসে না মালবি?'

নদীর বুকে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে আমার কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল মালবিকা। তাকিয়ে দেখলাম, ওর আয়ত চোখের কিনারায় জল টল্ টল্ করছে। বুঝতে কষ্ট হল না, ওর হৃদয়ের সব চেয়ে কোমল স্থানটিতে হঠাৎ আঘাত দিয়ে ফেলেছি। কথাগুলো না বললেই ভালো করতাম। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললাম, 'থাক্ এ সব কথা। অনেক রাত হয়েছে, চল্ শুয়ে পড়ি গে এবার।' বলে একেবারেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

মালবিকা উঠল না। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের নীলিমায় চোখ মেলে খানিকক্ষণ কিছু যেন ভাবল; তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ম্লান হেসে বলল, 'অভিশপ্ত ভাগ্য না হলে মানুষ শিল্পী হয় না বনানী! সে ধূপের মত দহিবে, আগুনের মত জ্বলবে, উল্কার মত পুড়বে; তবেই তার সৃষ্টি হবে অমর, আত্মা পাবে অমৃতের স্বাদ। সে সাধনার আজো আমার ঢের বাকী।'

উদ্গত অশ্রু লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নিল মালবিকা। তার পরেই উঠে পড়ল চেয়ার থেকে।

সেদিনের সেই জ্যোৎস্নালোকিত নিস্তব্ধ নিশীথিনীতে, নদীর জলে, পৃথিবীর বুকে কোথাও পড়েনি সে অশ্রুর দাগ। দেখেছি শুধু আমি। আর দেখেছেন আপনারা, মালবিকার প্রাণ দিয়ে রচনা করা সাহিত্য-সৃষ্টিতে।

জাগরী

অরুণ বাগচী

কত দিন হে সমুদ্র, ডেকেছো আমাকে
অবুঝ প্রিয়ার দুটি সুগভীর চোখে
শূন্য পথে অশংকিত হাওয়ার আবেগে
অস্থির ঝাউয়ের বনে নীলাভ দেয়ালে
খোলা মাঠে ঝঞ্ঝার উন্মত্ত প্রলাপে।
গণ্ডীটানা আমার যে ঘর
সভয়ে কেঁপেছে থর থর
তারপর মৃত্যুর মত
নৈঃশব্দ নেমেছে নিদ্রাহত।

আজ আমি হে সাগর, অতি কাছে বড় কাছে তব
তোমার ঢেউয়ের হাত আমার মাথায়
অনাবৃত দেহে মোর নুণমাখা বাতাসের স্বাদ
মাছের মদির গন্ধ আকাশের নীল ঝলকায়
এখন জীবন এক গাঙচিল নব।

আরো আরো আরো—
বাধা হয়ে কিছু নেই, নেই আজ কেউ
আরো ঢেউ ছিঁড়ে দাও, ছুড়ে দাও তীরে
আরো ঢেউ, কামনায় নীল আরো ঢেউ।

অবিশ্বাসী কবি যতীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

যতীন্দ্রনাথ আজন্ম অবিশ্বাসী কবি। আজন্ম কথাটায় হয়ত কিছু আপত্তি উঠিতে পারে, কারণ কবির কবি-জীবনে 'সায়ম্' হইতে একটু সুর-পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্তনও অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারে নাই; শুধু পার্থক্য এইখানে, প্রথম যুগের অবিশ্বাস একেবারে নিখাদ; সুতরাং এখানে অবিশ্বাস প্রচণ্ড রূপেই অবিশ্বাস, বিদ্রোহের বিদ্রূপ এবং ক্ষিপ্ততা লইয়াই অবিশ্বাস—সে অবিশ্বাসে সংশয়ের দৌর্বল্য নাই; কিন্তু 'সায়ম্' হইতে কবিচিত্তের অবিশ্বাস স্থানে স্থানে তাহার বিশুদ্ধির রৌদ্ররস এবং ওজোগুণ হারাইয়া ফেলিয়াছে; স্থানে স্থানে রুদ্রপন্থীর রুক্ষ-পিঙ্গল জটাজালে সংশয়ের দোলা লাগিয়াছে। সংশয় আসলে দুর্বলতা, চিত্তকে কোথাওই সে দৃঢ় ভূমির উপরে দাঁড় করাইতে পারে না, 'হ্যাঁ'-এর দিকেও না, 'না'-এর দিকেও না। দৃঢ় ভূমিতে যেখানে চিত্তের প্রতিষ্ঠা নাই কণ্ঠের সুর সেখানে বার বার খাদে নামিয়া যাইবেই। এই জন্যই প্রথম যুগে যতীন্দ্রনাথ সংশয়ী কবি নন, প্রথম যুগে তিনি আপোষ বিহীন অবিশ্বাসী।

এই অবিশ্বাসের অর্থ কি? প্রচলিত বিশ্বাসের অর্থ আগে বুঝিয়া না লইলে এই অবিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। প্রচলিত বিশ্বাসের দুইটি রূপ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথম রূপ—এবং বহুল প্রচলিত সর্বজনপ্রিয় রূপটি হইল, জীবন জিজ্ঞাসাহীন সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কতগুলি সংস্কার। এ সংস্কারকে আমরা ঠিক বিশেষ কোনও দেশ-কালের কোনও বিশেষ সামাজিক সংস্কার না বলিয়া, স্বল্পব্যতিক্রম ব্যতীত মানব-সাধারণেরই সহজাত সংস্কার বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। এই সহজাত সংস্কারগ্রন্থিগুলির মূলীভূত কারণ, মানব-চিত্তের একটা প্রায় সর্বজনীন এবং সর্বকালিক দুর্বলতা। একটি পাখী যেমন তরঙ্গসংক্ষুব্ধ সীমাহীন সমুদ্রের বুকে উড়িয়া উড়িয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে, গায়ে যত লাগে তাহার উজান বাতাসের ধাক্কা ততই সে চায় সেই নিঃসীম শূন্যের বুকেই কোথাও একটু বসিবার ঠাঁই; নিখিল বিশ্বের সাধারণ মানুষের মন সেই শ্রান্ত পাখীটি—বসিবার সত্য ঠাঁই কিছু থাক কি না থাক—সে নিখিল শূন্যের মধ্যে নিজেকে যখন একান্ত অসহায় অনুভব করে, তখন ঠাঁই একটা সে কল্পনা করিয়া লয়—ইহাই তাহার দৈব বিশ্বাস। এই দৈব বিশ্বাসকে মানুষ দেশে দেশে কালে কালে বিচিত্র রূপে লাভ করিতেছে—আর উত্তরাধিকার রূপে বংশপরম্পরাক্রমে তাহাকে শুধু ছড়াইয়া যাইতেছে।

এই জীবন-জিজ্ঞাসাহীন একটানা সাধারণ ধারার পাশে রহিয়াছে বিশ্বাসের আর একটি ধারা—সে ধারায় জিজ্ঞাসার আছে একটা সমাধান। মানুষের যত রকমের যত ক্ষুদ্র-বৃহৎ জিজ্ঞাসা তাহাদের সকলকে যদি একত্রিত করিয়া একটি মহাজিজ্ঞাসার রূপ দেওয়া যায়, তবে তাহা দাঁড়ায় এই রূপে,—এই যে মানব-জীবন এবং তাহাকে লইয়া এই বিশ্বজীবন—ইহার মূলের পরম সত্য জড় না চেতন? কিছু কিছু বিপত্তি-আপত্তি তর্কাতর্কি সত্ত্বেও অধিকাংশের রায়ই এই চেতনের পক্ষে এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিছনকার যে বিশ্বচৈতন্য তাহাই ঘনীভূত হইয়া মূর্তি লাভ করিয়াছে এক পরম পুরুষের। এই বিশ্বচৈতন্যে বিশ্বাস স্বভাবতঃই একটি পরম মঙ্গলের আদর্শকে বহন করে। কারণ, এই চেতনে বিশ্বাস শব্দের অর্থই বিশ্বসৃষ্টির পিছনে একটা অখণ্ড যৌক্তিকতায় বিশ্বাস—যৌক্তিকতার স্বাভাবিক পরিণতি মঙ্গলের আদর্শে। চেতনে প্রতিষ্ঠিত যে জড়, তাহা চেতনের পরিস্ফূর্তি রূপে চেতনের অবিরোধী; কিন্তু চেতনবিরোধী যে জড় তাহা যুক্তিহীন—তাহার স্বাভাবিক পরিণতি অমঙ্গলে—অনির্বাণ দুঃখজ্বালায়। জীবন যাহা ঠিক সেই ভাবে তাহাকে গ্রহণ করা ছাড়া তাহার থাকে না আর কোনও সার্থকতা।

যতীন্দ্রনাথের সকল অবিশ্বাস এবং দুঃখবাদের মূলেও রহিয়াছে এই জড়বাদ। জীবনের মধ্যে কবি জড় ও চেতনের যত খেলা দেখিয়াছেন—সেখানে চেতন কোনও সত্যরূপে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, জড়ের মধ্যে সে আস্তে আস্তে আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছে,—তখন দেহ ও মন জুড়িয়া অনাদি কালে বিরাজমান দেখা গিয়াছে এক মহাজড়কে—নিখিলশূন্যে অনন্তকালে সেই মহাজড়ের অন্ধলীলাতেই জাগিয়া উঠিয়াছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সেই অন্ধজড়ের অনাদি অভিশাপ লইয়াই জাগিয়াছে মানুষের দহনের ইতিহাস—যাহার আমরা গালভরা নাম দিয়াছি জীবন।

অসীম জড়ের মাঝে
চেতনাশক্তি—ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে।
শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায়;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর!
সকল শক্তি সংহত ক'রে হয়ে আছ মহাজড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতারি' বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা।
(ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক; মরীচিকা)

চেতন ব্যতীত কোথাও কোনও শৃঙ্খলাই সম্ভব নয়, জগতের পিছনে জড় ব্যতীত কোনও চেতন সত্যকে যদি নাই মানা যায় তবে শৃঙ্খলা আসিবে কোথা হইতে কি করিয়া? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল প্রকৃতিতেই তাহা অসম্ভব! তবু যে আমরা চারি দিকে শুধু নিয়ম-শৃঙ্খলাই দেখিয়া চলিতেছি তাহা তবে বিশ্বজোড়া প্রকাণ্ড একটা গোঁজামিল ছাড়া আর কি? সুতরাং কবিকে সে কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইল,—

জগতের শৃঙ্খলা,—
স্বপ্নেরি মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা। (ঐ)

তাহা হইলে বিধাতার প্রতি যে আমাদের এত প্রেম তাহা কি? কবির মতে তাহা আর কিছুই নয়—তাহা হইল—

বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হ'য়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম ব'লে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই। (ঐ)

যাঁহারা চেতন-সত্যে বিশ্বাসী—অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির পিছনে চৈতন্যকেই যাঁহারা বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জগতের দুঃখ

হইতে বনস্পতি, ধূলিকণা হইতে সৌরপিণ্ড, ক্ষুদ্রতম কীট হইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ ইহার ভিতরে কোথাও কোনও অনিয়ম, অযুক্তি, অবিচার দেখিতে পান না,—তাঁহারা দেখেন, সবই এক বিরাট ছন্দের ঐক্যসূত্রে বিধৃত—সকল কিছুর পিছনে রহিয়াছে একটি উদ্দেশ্য—একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ ইহারই নাম দিয়াছেন—অনন্তের অনাদি স্বপ্ন! চেতনে অবিশ্বাসী যতীন্দ্রনাথ যেখানেই চোখ ফিরান সেখান হইতেই লাভ করেন এক সত্য—

জগৎ একটা হেঁয়ালী—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালী। (ঐ)

এই গোঁজামিলের মাত্রা ততই বাড়িতে থাকে যতই জীবনের চারি দিকে স্তূপীকৃত হইতে থাকে দুঃখভার—যে দুঃখভারের পিছনে আমাদের যুক্তিবাদী মন লইয়া কোনও 'কেন'র জবাব খুঁজিয়া পাই না। কবির মতে এই 'কেন'র আসলে কোনও জবাব নাই,—অথচ জবাব একটা না পাইলে কিছুতেই মনের নাই সান্ত্বনা—সে দাঁড়াইবার কোথাও পায় না ঠাঁই; তাই তখন মন এই 'কেন'র জবাব আপনিই একটা বানাইয়া লয়। সে জবাব নিজের বানাইয়া লইতে হইলে চোখ মেলিয়া বাস্তব সত্যের মুখোমুখী হইয়া বানান চলে না,—তাই চোখ দুইটিকে—মানুষের সত্য দৃষ্টিকে—হয় ইচ্ছা করিয়া বন্ধ করিয়া লইতে হয়, নতুবা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইতে হয়। আর তখন নয়ন মুদিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে—

"দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।"

কিন্তু এমনতর অনেক 'ঠাওর করিয়া' দেখিবার পরে কবি বলিতেছেন—

ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হ'য়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক? (ঐ)

তাহার চেয়ে কবি বলিবেন,—

চোখ বুঁজে যারে আনন্দ ব'লে আনন্দ করো দাদা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা?
(ঐ, সপ্তম ঝোঁক)

জীবনের ভিতরে পদে পদে এত সূক্ষ্মত্ব করিয়া আর লাভ হয় না কিছু, বাস্তব সত্যজীবনে ছোট-খাটো সুখের মধুর আস্বাদন যেটুকু থাকে, দুঃখকে ফাঁকি দিতে গিয়া সেটুকুও হারাইয়া ফেলি। কবি বলেন, তাহার চেয়ে যেখানে যতটুকু 'যথালাভ' তাহা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানী—শীতের বাতাসে দেহখানি যখন একেবারে জমিয়া যাইতে চায় তখন ছেঁড়া কাঁথাখানি জড়াইয়া যতটুকু সুখ পাওয়া যায় অলীক 'ভূমানন্দে'র লোভে তাহাই বা হারাই কেন? জীবনের যত সুখ জ্ঞানীর বিচারে তাহা ঐ ছেঁড়া কাঁথারই সুখ; কিন্তু তাহাই যে সত্য—সেই সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া লাভ কি? ভক্ত জ্ঞানীর চরম লক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া কবি তাই বলিতেছেন,—

বন্ধু, প্রণাম হই,—
শীতের বাতাসে জ'মে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?
(ঐ, প্রথমঝোঁকে)

জীবনে ও জগতে যাঁহারা বিধানবাদী এবং বিধাতার কৃপাবাদী তাঁহাদের প্রতি কবির একটি মাত্র সুস্পষ্ট প্রশ্ন—

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে? (ঐ)

যতীন্দ্রনাথের যখন যৌবন তখন বাঙলা কবিতায় সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল অজানা রহস্যের স্বপ্নালুতা। এই রহস্যবাদের কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাস্বর প্রতিভা লইয়া, একটি সবিতৃ-মণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল আরও অনেক কবিকে লইয়া যাঁহাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং গভীর না হইলেও তাহারা সকলেই কম-বেশি 'অজানার পিয়াসী।' এই অজানার আহ্বান আসলে সত্য হোক বা মিথ্যা হোক—ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং গানে একটা হৃৎস্পন্দন জাগাইয়া তুলিতেছিল; কিন্তু কবিতার ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহা দেখা দিল একটা ফাঁপা ভাবালুতার অস্বাস্থ্যকর প্রবণতায়। জীবন হইতে যেমন কাব্যের উৎসারণ আবার কাব্য হইতে পারস্পরিক প্রভাবে জীবনের নিয়ন্ত্রণ; সুতরাং দেখিতে দেখিতে 'অজানা'ই সত্যের আসন বিছাইয়া লইল শুধু কাব্যে নয়, কাব্য হইতে জীবনেও। 'অজানা' তাই আর শুধু কাব্য-লক্ষ্মীরূপে দেখা দিল না, দেখা দিল জীবনেরই মর্মবাসিনী আরাধ্যা লক্ষ্মীরূপে। এই অজানার কোনও আকর্ষণ ছিল না যতীন্দ্রনাথের দেহে-মনে। তিনি মনে করিতেন, 'অজানা'টা জানার নাগালের বাইরের গভীরতর অংশটি নয়, অজানা হইল রূঢ় অপ্রিয় জানা সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য একটি কমনীয় আবরণ মাত্র। যে অলক্ষ্য প্রবল শক্তির হাতে নিরন্তর পিষ্ট, আহত এবং লাঞ্ছিত হইতেছি সেই প্রবল অন্ধ শক্তির সহিত একটা এক-তরফা সন্ধিরই একটি সাজানো-গোছান মহিমান্বিত রূপ হইল এই অজানার আরাধনা। এই কবি-আদর্শকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে আহত করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

হায় রে ভ্রান্ত কবি!
নয়নের আলো ম্লান হ'য়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি।
সারা জীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা;
জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদি-রক্তের আলিপনা?
দহিলে আপন রূপ
কোন্ অজানার পূজা উপচারে অমল গন্ধ ধূপ!
এই অফুরাণ স্নেহ,
পঞ্চপ্রদীপ ভরিয়া জ্বালায়ে ধরিলে আপন দেহ!
পেয়েছ কি সেই লক্ষ্মীর দেখা, হয়েছে কি বর চাওয়া?
কত দক্ষিণা মিলিল গো বিনা ফাঁকা দক্ষিণা হাওয়া?
ছেঁদো কথা কয়ে গেল দিন বয়ে আপন ছন্দে বন্দী,
পেয়েছ তৃপ্তি? প্রবলের সাথে এক-তরফা সে সন্ধি।
অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি, শোনো মোটামুটি, কোনোখানে সে যে নাই।
সে কেবল মরীচিকা!
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা।
(ঘুমের ঘোরে, চতুর্থ ঝোঁক,—মরীচিকা)

দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৃশ্য এবং ঘটনার উপরেও যে এক চির অজানার নিঃশব্দ সঞ্চরণ ছায়াপাত ঘটিয়াছিল, সমগ্র বিশ্বের ভিতর দিয়া সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া

চির-অপরিচিতের সেই চির-পরিচয় রবীন্দ্রনাথের চিত্ত একটি সহজ আনন্দ-বিহ্বলতায় ভরিয়া দিয়াছিল। সহস্র সহস্র গান-কবিতা লিখিবার পরও তিনি বলিয়াছেন—

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,—
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
দেখিনু সহস্র বার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চির-পরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

*   *   *   *

যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ। (বলাকা, ৪১)

এই অজানাই রবীন্দ্রনাথকে চিরদিন হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে এবং চিরদিন ফাঁকি দিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু এই অজানার পিছনে কোনও দিনই ছোটেন নাই, কারণ প্রথমাবধিই তাঁহার জীবনবোধের মধ্যে এই একটা কথা দৃঢ় হইয়াছিল,—অজানা মিথ্যার আলেয়া মাত্র—সে পায়ের নীচের শক্ত মাটি হইতে মানুষকে শুধু পাঁকে আটকাইয়া যাইবার জলাভূমিতে টানিয়া লয়। সুতরাং তিনি বলিবেন,—

প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছি নিজ গলা,
সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা!
কেন এ প্রয়াস ভাই?
যে কথা তোমার হ'ল নাকো বলা, নেই সেই কথাটাই।
(ঘুমের ঘোরে, চতুর্থ ঝোঁক, মরীচিকা)

অজানাটা যদি মিথ্যা বোঝা গেল তবে সত্য রহিল শুধু জানাটা—অর্থাৎ দুঃখের জীবনটা। যতীন্দ্রনাথ বলিবেন, যদি কবিতা লিখিতেই হয় তবে এই নিরেট সত্যটাকেই গ্রহণ করিবার সাহস চাই—বীর্য চাই; চোখে যেটাকে কালো দেখিতেছি তাহার মধ্যে জোর করিয়া কোনও আলো দেখিবার চেষ্টা করিয়া লাভ কি? আলোর গান—সে যতই রঙিন হোক—তাহাতে যতই স্বপ্ন থাকুক, মাদকতা থাকুক—সে সত্য নয় বলিয়াই গ্রহণীয় নয়; শুধু তাই নয়, সত্য-কালোর চারি পাশে সে প্রবঞ্চনা এবং অপমানের রঙিন ছটা। 'সম্মুখেতে কষ্টের সংসার'—তাহার মধ্যে দুঃখের জীবন—সেইটাই সত্য এবং বরণীয়—তাহার পিছনকার 'ভূমার' গভীর গানটাই 'ভূয়া'র আবরণের টান:—

দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান।
—এ সবই রঙিন কথার বিশ্ব, মিথ্যা আশায় কাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা!
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?

কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুঃখের নগ্ন মূর্তিখানি?
(ঘুমের ঘোরে, চতুর্থ ঝোঁক, মরীচিকা)

পূর্বেই বলিয়াছি, যতীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম হইল মানুষের চরম দুর্বলতা—পরম পরাজয়। আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা মানুষ যদি তাহার মানুষরূপে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে তবেই সে ধার্মিক হইয়া ওঠে—তখন সে চায় আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ শব্দের অর্থ জীবনের দুঃখকণ্টকিত সমস্ত দায়িত্বভার এড়াইবার চেষ্টা। সমর্পণটা ঠিক কাহার কাছে হইতেছে না জানিলেও আত্মবিলুপ্তির আনন্দই তখন নেশার মতন পাইয়া বসে—সেই দুর্বলতার হীনতাকে মহিমান্বিত করিয়া লইতে হয় জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমে। মানুষের এই দুর্বলতা এবং পরাজয়-জাত আত্মসমর্পণের ভক্তিপ্রেমের নির্যাস গায়ে মাখিয়া মাখিয়া দেবতা নিজেই যে কতখানি মহিমান্বিত হইয়া উঠিতেছেন কবি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। সৃষ্টিকে যাহারা নিখাদ সুন্দর এবং নির্ভেজাল মঙ্গলরূপে গ্রহণ করিতে পারিল না তাহারাই ত অবিশ্বাসী অধার্মিক; মত্তহস্তিসম যাহারা এই ছেঁদো কথার বাঁধন ছিঁড়িয়া বাহির হইতে চায়, জীবনে তাহাদের উপরে চলিতে থাকে অঙ্কুশাঘাত; সেই অঙ্কুশাঘাতে যদি কেহ শির নোওয়াইয়াই দেয় তবে তাহাই কি বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বলিয়া অমর্ত্য এবং অমৃত হইয়া ওঠে? জীবনের দেবতা—বিশ্বের দেবতা—কি অধীর আগ্রহে অঞ্জলিপুটে সেই প্রেমামৃত পান করিয়াই পরম তৃপ্তি লাভ করেন?—

সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যে জনা দেখিল নাড়ি',
হাটের মাঝারে স্পর্ধা করিয়া যে জন ভাঙ্গিল হাঁড়ি;
তোমার বিধান,—অঙ্কুশ 'পরে হানি' ঘন অঙ্কুশ
মত্ত হস্তী সম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।
আজি দুর্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয় যুর্ত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু? হ'ল কি মনঃপূত?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের 'পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধ'রে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ!
(ভক্তির ভারে, মরুশিখা)

মানুষের জীবনের মূল ট্র্যাজেডি হইল, সে সাড়ে তিন হাত দেহের খাঁচার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জিনিষ; সারা জীবনের যত ঠোকাঠুকি তাহা হইল এই সাড়ে তিন হাতের খোলসটার মধ্যে এত বড় প্রকাণ্ড জিনিসটাকে আঁটসাঁট ভাবে ঢুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা। যাহারা 'শিরদাঁড়া-ভাঙা' হইয়া 'কোল-কুঁজো', 'ঘাড়-গুঁজো' হইয়া ইহার মধ্যেই এক রকম বনাইয়া গেল তাহারা লাভ করিল পরম ধার্মিকের মর্যাদা; যাহারা তাহা পারিল না, তাহারাই রহিল বিদ্রোহী শয়তান—দুঃখের নিত্যকালের নরকাগ্নিতে চেষ্টা চলিতেছে তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার।

প্রেম-মন্দিরে তাহারই বিপদ—যেজন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়া-ভাঙা যত কোল-কুঁজো ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি' করপুট,—
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়া উট। (ঐ)

তাঁহার 'চাবুক' কবিতাতেও (মরুশিখা) কবি বলিয়াছেন,—

দারুণ দুঃসময়,—
অশ্রুর আড়ে তোমার উপরে প্রেম-সঞ্চারই হয়।
* * * * *
আঁখি না মেলেই যে ভাগ্যবান্ পড়ে আলোকের প্রেমে,
তার জগৎ ত স্বপ্নচিত্র বাঁধানো ঘুমের ফ্রেমে।
মোর মত হতভাগা চিরজাগা, শতে নিরানব্বই ;
তাদের তরাতে চাব্‌কানো ছাড়া অন্য উপায় কই ?

মানুষের সত্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর চাপিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার ভগ্ন-কণ্ঠস্বরের দ্বারা যে ধর্মসঙ্গীতের সৃষ্টি তাহার সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের শাণিত বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নাই।—

তর্কে হারিয়া বুঝিতেছি নিট্—এ জীবন সুখে ভরা,
চৈত্র খরায় ভাগীরথী-বুক ভরে যেন বালুচরা।
কাঁদনের স্রোত বালির বাঁধনে পদে পদে বাধা পেয়ে,
নৃত্য-নূপুর নিক্কণি' চলে রুণু রুণু গান গেয়ে।
কভু আনন্দ ভরে,
অন্তঃশিলা অশ্রু-প্রবাহ ধু ধু ধু যুগের চরে।
(প্রাপ্তি-স্বীকার, মরুশিখা)

এই বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা চমৎকার সার্থকতা লাভ করিয়াছে যতীন্দ্রনাথের 'মরুশিখা'র অন্তর্গত 'কাণ্ডারী' কবিতায়। অন্তর্যামী ভগবান্ ত 'যত সৌখীন জীবন-তরীর' 'চির-কাণ্ডারী',—কিন্তু কবি বলিতেছেন, তাঁহার জীবন যে 'জীবন-তরী' নয়, ইহা যে একেবারে 'জীবন-গরুর-গাড়ী'; সৌখিন জীবন-তরীর কাণ্ডারীর পক্ষে এই জীবন-গরুর-গাড়ীর গাড়োয়ানি করা পোষাইবে কি? এ জীবন-গরুর-গাড়ীর পথ যে কোথাও বন্ধুর কোথাও পিচ্ছিল—'পগার ভাগার ভাঙন' ঠেলিয়া যে ইহাকে ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে নট্‌ঘট্ট করিয়া চলিতে হয়। এখানে যে কভু মলয়হিল্লোল, কভু ঝড়ের দোল ওঠে না, এখানে কুলু কুলু গীতিও নাই, কলকল্লোল রোলও নাই ; এখানে যে—

দাঁড়ের আঘাতে আড়ে তাল রেখে দাঁড়ীরা গাহে না সারি,
ভরা উড়োপালে ক'সে-ধরা হালে তুফানে জমে না পাড়ি।
খেলে না হেথায় জোয়ার কি ভাঁটা, ঘূর্ণা, বন্যা, ঢেউ ;
সাঁজঘাটে ঘট ভরিবার ছলে দোলায় না এরে কেউ।
তরঙ্গচূড়ে রঙ্গে নাচিয়া যুঝিয়া ঝঞ্ঝা-সাথে,
লভে না শীতল সুনীল মরণ কালবৈশাখী রাতে।
এ মম গরুর গাড়ী,—
এঁটেবাঁধা টুটা পাঁজরা বন্ধু, ভাড়াটিয়া ভারে ভারী।

এ গাড়ী চলিয়াছে এক দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতির 'অনাদি নিক্' ধরিয়া,—যুগযুগান্তের যত মহাজন ব্যথাভারে এই পথে 'চক্রনেমিতে দীর্ঘ গভীর ক্ষত' আঁকিয়া দিয়া এই 'অনাদি নিক্' তৈরী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ গাড়ী চালাইতে চাকার করুণ আর্তরবে সঘন ঝাঁকানি সহ্য করিতে হইবে, ঝড়-জল, বর্ষা-বাদল, রৌদ্র-ছায়া, রাত-দিনের কোনও তফাৎ নাই, সব অবস্থায় সমভাবে পুরাতন পথে এই সনাতন যান বিরামবিহীন চলিতে থাকিবে, ইহারই উপরে জোয়াল চাপিয়া বসিয়া নিমীলিত চোখে ঝিমাইতে ঝিমাইতে দক্ষিণে-বামে পাচন বাড়ি চালাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তবে এক দিক হইতে একটা সুবিধাও আছে।—

গরুর গাড়ীর গরু এ বন্ধু, বোঝাই গাড়ীর গরু ;—
এদের চালাতে লাগিবে না ভাই শিঙা বেণু ডম্বরু।
হাতের গোড়ায় যে কচা মিলিবে পথের পাশের বনে,
তারি ঘায় ঘায় যাবে ঠায় ঠায় পরম তুষ্ট মনে।

কিন্তু শেষে গিয়া কবি বলিতেছেন,—জীবনের পথে যাঁহারা চিরদিন পাল তুলিয়া দাঁড় বাহিয়া জীবন তরীই বাহিয়া গেলেন—দেবতা তাঁহাদের তরীতেই কাণ্ডারী হইয়া থাকুন ; কিন্তু তাঁহার নট্‌ঘটে খানা-ডোবার পথে ক্যাঁচর-কোঁচর-চলা এই জীবনের গরুর গাড়ীতে গাড়োয়ান-গিরি করা তাঁহার পোষাইবে না।—

জানা আছে তব কালবোশেখীতে হাল ধ'রে ঢেউএ দোলা,
জান কি বন্ধু! কাঁধে চাকা-মেরে দকে-পড়া গাড়ী তোলা ?
তরী বাওয়া আর গাড়ী খেদান'য় অনেক তফাৎ ভাই,
এর বাড়া আর গৌরবহারা হীন কাজ কিছু নাই।
যা থাক্ আমার বরাতে বন্ধু, করিব না অপমান,—
চির দিবসের কাণ্ডারী ধ'রে ক'রে দিয়ে গাড়োয়ান!

কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামভূমিতে ভগবান্ একবার অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শুনাইয়া গিয়াছিলেন ; কবি তাঁহার জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়া পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বদলে পাইয়াছেন 'জীবন-মরুক্ষেত্র,' আর তিনি সারতত্ত্ব যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা হইল 'জীবন মরুক্ষেত্রে শ্রীমদ্-দুর্ভাগবদ্‌গীতা'। এই 'দুর্ভাগবদ্-গীতা'য় তিনি যে সত্য, যে তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে প্রেরণা জোগাইয়াছে শুধু 'বদ্‌নাম-কীর্তন'-এর।

নামমাহাত্ম্য দু'আনা সত্য—তাই সকলের জানা ;
কিন্তু বন্ধু বদ্‌নাম তব সত্য চৌদ্দআনা।
নামকীর্তনে স্বেদ পুলক ত বাহিরের ত্বকে জাগে,
বদ্‌নাম সংকীর্তনে ভাই হাড়ে যে বাতাস লাগে!
বন্ধু এ কার পাপ ?
এত দোষ, ত্রুটি, এত অন্যায়, এত যে দুঃখ তাপ!
(নবপন্থা, মরুশিখা)

এই প্রশ্নটিই হইল মানুষের ভিতরকার বিদ্রোহী আদিম শয়তানের আদিম প্রশ্ন। যিনি চরম সত্য তিনি ছাড়া ত আর কোথাও কিছুই নাই ; তবে যে সৃষ্টির মধ্যে এত দোষ-ত্রুটি, এত অন্যায়-অবিচার এত দুঃখ-তাপ—তাহার জন্য মূলে দায়ী কে ? মানুষ যদি তাঁহারই পোষাক-পরা রূপ হয় বা তাঁহারই হাতের ক্রীড়নক হয়, তবে এগুলির জন্যে সে কতখানি দায়ী ? যদি বলা হয়, এগুলি ব্যতীত তাঁহার সৃষ্টির লীলা সম্ভব নয়, তবে প্রশ্ন হইবে—

গগনে গগনে জীবনে জীবনে জ্বলিতেছে যত জ্বালা,
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা। (ঐ)

কবির মতে জীবনের এই সব প্রশ্নের কোথাও কোনো সন্তোষজনক জবাব নাই। জীবনের পিছনে যে মরণ তাড়না করিয়াছে, সেই মরণেরও কোনও তত্ত্ব নাই। এই মরণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া যাঁহারা ধর্মের পন্থা আশ্রয় করিয়া মন্ত্রবাদী হইয়া উঠিয়াছেন,

তাঁহাদের অবস্থা ঠিক সেই ভূতভীত পান্থের মত—যাঁহারা রাত্রির অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে নিরুপায় হইয়া গান ধরে—

ধ্যানের জ্ঞানের ও পার হতে বিকল ফিরিল যারা,
নিয়ত বিকট ওঁ, হ্রীং, ফট্ প্রলাপ বকিছে তারা।
(জীবন ও মৃত্যু, মরুশিখা)

জীবনের এই দুঃখ-আশার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইতে সকলে মোক্ষ-মুক্তির পথ বাৎলাইয়া দিয়াছেন,—কবি বলিতেছেন, পরম মোক্ষ—পরম নির্বাণ হইল নিজঝুম ঘুমে। একটি ব্যঙ্গ-গভীর সুরে কবি ভবরোগের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার 'ঘুমিওপ্যাথি'র মধ্যে।

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিজ্‌ঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম!
সেই জুড়াবার ঠাঁই;—
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হ'য়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
(ঘুমের ঘোরে প্রথম ঝোঁক, মরীচিকা)

এই 'ঘুমিওপ্যাথি'র ব্যবস্থার মধ্যে বেদনাহত কবি-হৃদয়ের গভীর ব্যঙ্গ মিশ্রিত রহিয়াছে। জাগিয়া থাকিয়া সচেতন মন লইয়া সৃষ্টির দিকে জীবনের দিকে চাহিয়া থাকিলেই ত যত বিপদ—সেই ত শুধু অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা—ব্যর্থতার অপমান, পরাজয়ের গ্লানি। বিপদের উপরে আরও বিপদ্ এই—চোখ মেলিয়া সব দেখিয়া শুনিয়াও হাসিয়া বলিতে হইবে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তত্ত্বজ্ঞানী বলিবেন, সুখ-দুঃখ এই দুইটাই ভ্রম, যাহা সত্য তাহা সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই অতীত। কবি বলিবেন, মানুষের বাস্তব জীবনে সুখ-দুঃখ এই দুইটাকেই চোখ মেলিয়া কখনও ভ্রম বলা যায় না, চিত্তকে যে অনুভূতিহীন অবস্থায় লইয়া গিয়া উভয়কেই ভ্রম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা ত ঘুমেরই নামান্তর!

যদি বলো তুমি, সুখ-দুখ নাই—দু'টাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম!
জারি করো তবে খ্যাতি,
এ ভব রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিওপ্যাথি"।
ঝুম্ ঝুম্ নিঝ্ঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জ'মে আয়—ঘুমের উপরে ঘুম!
(ঐ, দ্বিতীয় ঝোঁকে)

যে তাহার সদা-অনুভূতিশীল চিত্ত লইয়া জীবনকে অনুভব করিতেছে তাহাকে শুধু মাত্র যুক্তি-তর্ক দ্বারা তত্ত্ব কথা বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে; তাহার সমগ্র সত্তার অনুভূতি শুধু কথার কাপে ঢাকা পড়িবে না—যুক্তি অপেক্ষা তাহার সাক্ষাৎ অনুভূতি অনেক বেশি গুণে খাঁটি। সে অবস্থায় তাহাকে যদি ভুলাইয়াই রাখিতে হয় তবে,—

বন্ধু, করুণা করো;—
তন্দ্রার জাল ছিঁড়িয়া ডুবাও ঘুমেতে গভীরতর।
(ঐ, পঞ্চম ঝোঁকে)

কবি বলিবেন, এই ঘুমের আড়ালে বা স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-সঙ্কোচের মধ্যে শুধু মানুষই যে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া শান্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা নয়,—বিধাতার কথা আমরাও যখন শুনি তখন তাঁহাকে গুহাহিত, আত্ম-সংবৃত, স্বপ্নমগ্ন বলিয়াই আমরা জানি; বিধাতার যে এই অবস্থা ইহাও আর কিছু নয়, ইহাও হইল—

সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে!
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছে 'ঘুমিওপ্যাথি'র বলে।
(ঐ, সপ্তম ঝোঁকে)

এই ঘুমের কথাটাকে কবি সর্বদাই কিন্তু একটা তরল ব্যঙ্গের সুরে ব্যবহার করেন নাই; এই ঘুমের একটি অতি গভীর রূপ দেখিতে পাই কবির 'মরুমায়া'র 'মুক্তি-ঘুম' কবিতায়। সেখানে দেখিতেছি,—

ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
জীবনে মরণে কোনো খানে কভু সত্য মুক্তি নাই।
ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে',
মুক্তি না পেয়ে ভোলা শঙ্কর মাঝে মাঝে যায় ক্ষেপে'।
জল হ'তে তুলে শুক্তি ভাঙিলে মুক্তা মুক্ত নয়,
দল বেঁধে তারা নূতন বাঁধনে কণ্ঠে ঝুলিয়া রয়।
রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।
ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধন-লীলা,—
চরকা ঘোরে ত ঘোরে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা!
সৃষ্টি ত শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে পাক,—
এরই মাঝে থেকে মুক্তি বন্ধু, সৃষ্টি ছাড়া সে ডাক।

প্রকৃতির যেদিকে তাকান যায় সর্বত্রই এই মুক্তির নামে বন্ধনের আয়োজন। মাটির-কারার নীচে বীজেরা মুক্তির তপস্যায় নিজেদের বক্ষ চিরিয়া দিতেছে, সেই বুক চেরা তপস্যারই ফলে 'দীঘল তালের শিরে' মুক্তির ধ্বজা উড়িতে থাকে; কিন্তু সেই মুক্তির আনন্দে তালের আকণ্ঠ যখন রসে ভরিয়া ওঠে ক্লিষ্ট মানব সেই রস ভুঞ্জিয়া মাতাল হইয়া বদ্ধ হয়! শুধু তাহাই নয়—

কে দেখে বন্ধু, মুক্ত বীজের নিশানের তলে তলে
ফলের কারায় নব বীজ হায় বাঁধা পড়ে দলে দলে।
একক বীজের মুক্তি
সাথে বহি' আনে লক্ষ বীজের নব-বন্ধন-চুক্তি।

মুক্তির আশায় যে চির-ক্রন্দন তাহাই ত আনে মহা জাগরণ; কিন্তু মুক্তি যখন কোথাও কখনও নাই, তখন আর এই জাগরণের তাৎপর্য কি? সুতরাং

ঘুমা গো বন্ধু ঘুমা,—
শুনিস নে ভাই মুক্তির লাগি' কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।
... ...
তাই আমি যারে ভালবাসি তারে পরাই ঘুমের টিপ,
ঘুমাও বন্ধু ঘুমাও ঘুমাও, এই নিবাইনু দীপ!
যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর-আঁখি চির-আধনিমীলিত,—
যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরি-গুহাহিত,—
সেই ঘুম হ'তে এনে
তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু ছকু-খানসামা লেনে।

উপরে আমরা কবি যতীন্দ্রনাথের যে আপোষহীন রূঢ় অবিশ্বাসের কথা আলোচনা করিলাম, ইহার ভিতরে কোনও দার্শনিক সত্য-মিথ্যা

ঠিক-বেঠিকের প্রশ্নই আসে না; ইহা বিশুদ্ধভাবেই একটি কবি-মানসের স্বাতন্ত্র্য। সেই স্বাতন্ত্র্যে উপরে জড়বাদী অবিশ্বাসী বিংশ শতাব্দীর যুগ-প্রভাবকে নানা ভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু এখানে সেই সাধারণ যুগ-মানসও একটি বিশেষ কবি-মানসের ভিতরে কেন্দ্রীভূত হইয়া একটি স্পর্শযোগ্য বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রধর্মা অন্যান্য কবিগণের সহিত যতীন্দ্রনাথের যে তফাৎ তাহা মানসিক গঠনের একটা মৌলিক তফাৎ। এই জন্য শুধুমাত্র যুক্তি-তর্কের দ্বারা যতীন্দ্রনাথের মতামত যাচাই করিতে গেলে একটা একদেশদর্শী মানসিক প্রতিক্রিয়ার দুর্বলতা হয় ত লক্ষ্য করা যাইবে। আবার ইহাও ঠিক যে, বিশুদ্ধ ভাব-সম্বেগ হইতে যতীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় সকল কবিতার উৎসারণ নহে; তাঁহার কবিতা কুমার-সম্ভাবনায় ভাব-পার্বতীর সহিত রুদ্ধশ্বাস ধ্যান-শঙ্করের মিলনের অপেক্ষা থাকিত। কিন্তু এ-জাতীয় তাঁহার সকল কবিতার ভিতর দিয়া কবি হিসাবে যখন তাঁহাকে বিচার করিব, তখন লক্ষ্য করিব কবির বলিষ্ঠ মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য—যাহা কাব্য-কলার হট্টগোলের মধ্য হইতে তাঁহাকে একক রূপেই চিনাইয়া দেয়।

কিন্তু লোকের অবিশ্বাসকে আমরা আবার এত সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না; তাই হয়ত কেহ বলিব, আসলে যতীন্দ্রনাথ অবিশ্বাসী ছিলেন না,—তাঁহার বাহিরের অবিশ্বাসের ভিতরকার রূপ হইল একটা রামপ্রসাদী মান-অভিমান। বহু কালের রামপ্রসাদী সুরে অভ্যস্ত আমাদের বাঙালী মনের এই রামপ্রসাদী ব্যাখ্যার দিকেই সহজাত ঝোঁক; কিন্তু আমার বিশ্বাস এ-ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালীর মধ্যেই একটি বিরল ব্যতিক্রম। পরবর্তী-জীবনে চিত্তের পরিবর্তন এবং পরিণতি হয়ত ঘটিয়াছিল, এবং প্রথম বয়সে যে কবি বিশ্বজনকে ডাকিয়া দ্বিধাবিহীন দৃপ্ত কণ্ঠে 'জীবন-মরু-ক্ষেত্রে' রচিত 'দুর্ভাগবদ্‌গীতা' শুনাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনিই শেষ বয়সে কুরুক্ষেত্রে রচিত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'রই অনুবাদ করিয়া কর্মফল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম যুগে যে কবির অবিশ্বাস তাহা আমাদের কোনও গভীর বিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন রূপান্তর বলিয়া মনে হয় না,—নিখিল জড় এবং নিখিল চৈতন্যের ধারণার মধ্যে নিখিল জড়ই তাঁহার কবি-চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল—নিখিল চৈতন্য মোহতন্দ্রার ন্যায় সেই জড়ের মধ্যেই আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছিল। পরবর্তী জীবনে এই মৌলিক ধারণার মধ্যে যখন পরিবর্তন দেখা দিল,—জড় আবার যেদিন চেতনের মধ্যে আত্ম-বিলোপের প্রবণতা দেখাইল তখনই আবার কবি-মানসের মধ্যেও বেশ লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হইল। প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি মান-অভিমানের মনোভাব কবির গড়িয়া উঠিয়াছিল উত্তর কালে, যখন প্রেমের মধ্য দিয়া তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এক প্রেমের দেবতাকে।

দৈব-দীপ

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

দেহ-মন্দিরে জ্বলিছে দৈব-দীপ
চক্ষের তারকায়;
সে আলোকে হেরি—জগৎ-সরীসৃপ
কাল-পারাবারে অস্থির-গতি ধায়।
তারকা-তপন-নীহারিকা দল
অঙ্গে তাহার করে ঝলমল,
গ্রহে বসুধায় বেগ-চঞ্চল
প্রধাবন চমকায়
চক্ষের তারকায়।
বিস্ময়ে ভয়ে অবাক হইয়া চাই
এ অজগরের পানে!
কোথা এ চলেছে? কেন এত রোশনাই?
বুঝিবারে চাহি' খুঁজিয়া পাই না মানে!
বাজে কি কোথাও নীলিমার পারে
কোন ধ্রুব-সুর, বেড়িয়া যাহারে
সৃষ্টি-ভুজগ আকাশ-পাথারে
উল্লাস ত্া'র হানে—
কান রেখে সেই গানে?

মনোমন্দিরে দৈব-দীপের জ্যোতিঃ
উজ্জ্বলি' অনুরাগে—
সৃষ্টিরে দেয় স্রষ্টাতে পরিণতি,
আরতির লাগি' অবিকম্পিত জাগে।
দীপ্তিতে তার অপরিমেয়তা
ইঙ্গিতে তার অ-লোকের কথা
অশান্ত যত গতিবেগ তথা
শান্তি-সলিল মাগে
উজ্জ্বলি' অনুরাগে।
আতঙ্ক পড়ে অভয়-মন্ত্র ঝরি'
এই মন্দির-মূলে
ভুজঙ্গবর দ্বিভুজে মুরলী ধরি'—
মধুর হাসিয়া দাঁড়ায় পদ্ম-ফুলে।
এ-চিদাকাশের আলোক-লীলায়,
সকল মৃত্যু মরিয়া মিলায়,
ভক্তেরা হেথা মুক্তি বিলায়
চরণাম্বুজে তুলে
এই মন্দির-মূলে।

ডেনমার্কের গ্রীষ্মপ্রকৃতি

মন্মথনাথ রায়

আমরা যখন ডেনমার্কে এসে পৌঁছেছি, তার মাস খানেক আগেই এদের গ্রীষ্মের সূচনা হয়েছে। এরা যাকে গ্রীষ্ম বলে, যার উত্তাপে এরা ছটফট করে, সে আমাদের শীতের সামিল। আমাদের থাকতে হয় সারা দিন গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে, গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, মেঘের গর্জনও হয়। অবশ্য খুব কম। রাত্রে মেঘ-গর্জন হলে এরা সকলে পরস্পরকে জিগ্যেস করে—কাল রাত্রে মেঘ-গর্জন শুনেছ ত?

গ্রীষ্মের প্রকৃতি এ দেশে বড় উদার, দু'হাতে দান করে গোটা ভাণ্ডার যেন উজাড় করে দিচ্ছে, আমাদের বেলা কার্পণ্য আর কুণ্ঠা। এদেশের বেলা এত উদারতা কেন? একটু ভাবলেই জবাব পাওয়া যায় সহজে, এখানে মানুষ প্রকৃতিকে সানন্দে বরণ করে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধ নেই এতটুকু। একে অপরের সহযোগিতা করে চলেছে, দেশটা পাহাড়ে নয়। কিন্তু তা বলে ভূমি সমতলও নয়, বরং বন্ধুর, কোথাও বা চলেছে উঁচু হয়ে, আবার কোথাও বা চলেছে ঢালু হয়ে, যেখানটায় একটু সমতল পেয়েছে মানুষ সেখানে বাড়ী তৈরি করেছে, দু' বাড়ীর মাঝখানে ব্যবধান রয়েছে অনেকখানি, এক-একটি বাড়ী যেন ছোট একখানা ছবি, এমন বাড়ী নেই যার সঙ্গে ফুলের বাগান নেই একটি। ফুলের বাহার কত! এদেশে গোলাপ কিন্তু বনেদি নয়, তাই তাকে দাঁড়াতে হয় দেয়াল ঘেঁষে। যারা জাতের, যেমন রডো-ডেনড্রন স্পীরে তারা মধ্যমণি। মানের মালিক তারা, তা বলে গোলাপের গণ্ডদেশে গ্লানির চিহ্ন নেই মোটেও। অপরের সঙ্গে সে-ও আপন কাজ করে চলেছে। ফুলের বাগান পার হলেই দেখি, রয়েছে ফলের বাগান, ছোট চারা গাছে আপেল ধরে রয়েছে অজস্র। এগুলো যখন বড় হবে আর পাকবে, তখন দেখতে কেমন হবে তা আজই দেখতে ইচ্ছা করছে। দেরি যেন আর সইছে না। রাস্তার দু'ধারে গাছ রয়েছে, তৃণ-লতা-গুল্ম রয়েছে, কেউ তাদের কেয়ার করছে না বলে মনে তাদের দুঃখ নেই। ফুলে-ফলে সেজে তারাও আসরে নেমেছে। তারা যে কেবল তাদের অস্তিত্ব জাহির করছে তা নয়। সৃষ্টির এক পাশে তাদেরও থাকবার অধিকার আছে।

জানলার পাশ দিয়ে একটি লতানে গাছ উপরে উঠেছে প্রাচীর বেয়ে, অনাদরে অযত্নে বেড়ে চলেছে। তাতে দুঃখ নেই তার। সমারোহ হয়ত নেই। তবু প্রাচীরগাত্রে ফুলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আপন শোভা ছড়িয়ে দিতে কার্পণ্য সে করছে না। ভারি উদার সবাই। পরের আদর-যত্নের অপেক্ষা রাখে না। নিজের যা দিবার আছে, তা অকাতরে দিয়ে যাচ্ছে।

বনের মাঝখান দিয়ে চলেছি এক সঙ্গে দু'মাইল। প্রকৃতির আপন হাতে-গড়া গাছ-পালা। কোথাও ফুলের রূপালি; আবার কোথাও পাতার বাহার। গাছগুলো সার করে লাগান। মাথায়ও তারা সমান, অসঙ্গতি নেই কোথাও এতটুকু। বনের মাঝখানে লোক চলাচলের পথ রয়েছে সর্বত্র। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রণয় গভীর। মানুষকে প্রকৃতি সহজে গ্রহণ করছে। আবার প্রকৃতিকে মানুষ তেমনি সহজে গ্রহণ করছে। বিরোধের অবকাশ নেই মোটেই।

যখন প্রথম এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম, সবুজ মাঠের পর সবুজ মাঠ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে। মৃদু বায়ুহিল্লোলে যখন সবুজ গাছ দুলে উঠে, মনে হয় কোন রূপসীর শ্যামল অঞ্চল উড়ে চলেছে। আজ আর সে সবুজ রং নেই। এবার সোনালি ফসলে ভরে উঠেছে গোটা মাঠ। কৃষকের মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে সোনার স্বপ্নে।

ঘরে বসে লিখছি। বেলা তখন তিনটা। বাইরে বিহঙ্গের কলরব নয়, গান শোনা যাচ্ছে। কলম আর চলে না। সময় কেটে যায়। পাশের ডেনকে জিগ্যেস করি পাখীর নাম। যে সব নাম বলে তার কিছু বুঝি না। বুঝতে চেষ্টা করেও লাভ নেই। ভাবি, নামে কী কাজ? গানেই তার পরিচয়। সব পাখীর গানই কিন্তু মধুর। এদেশে কাক দেখিনি আজ পর্য্যন্ত একটিও। শকুনী-গৃধিনী ত নয়-ই।

এ দেশে গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা চলে। আজ রৌদ্র, কাল বৃষ্টি, পালা করে যাওয়া-আসা করছে। আলো-ছায়ার এ এক খেলা! খুব রোদ চলেছে ত কিছু পর বেশ বর্ষণ হয়ে গেল। এতে এদের ফসলেরও কিন্তু ভারি-উপকার।

আমরা বাসা বেঁধেছি এল্‌সিনর সহরের এক প্রান্তে। সহরের প্রায় তিন দিকেই নদী। তার নীল জল ধীরে বয়ে চলেছে সাগরের সন্ধানে। গোলযোগ নেই, গর্জন নেই, শুধু মৃদু কুলু-কুলু শব্দ। অদূরে এক দিকে দেখা যায়, সুইডেনের হেলসিনবর্গ সহর আর দূরে সাগরের জল আর জল। দেখে দেখে চিত্ত বিকল হয়, সেখানে নদীর জল গিয়ে ক্যাটাগেট সাগরে পড়েছে, আরও দূরে ক্যাটাগেট গিয়ে মিশেছে বাল্‌টিক সাগরে।

আগাছার ঝোপের ভিতর ছেলে-মেয়েরা গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছে। সর্বনাশ! জোঁক, পোকা, মাকড় নেহাৎ দু'-চারটা মশাও নিশ্চয়ই ওর ভেতর রয়েছে, ভয় হয় শিশুদের যদি কামড়ে দেয়! শিশুর অভিভাবকদের ভয়ের কথা জানালে উত্তরে তারা বলে—অমূলক এই ভয়, প্রকৃতি ত মানুষের ভাল করার জন্যই রয়েছে। মশা-মাছি পোকা-মাকড় যদি মানব-শিশুর অনিষ্টই করবে, তবে তারা ওখানে থাকবেই বা কেন? উত্তরের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হলেও বিশ্বাসের জোর দেখে মনে প্রশংসার ভাব জেগে উঠে।

গ্রীষ্মের সূর্য ডেনমার্ক থেকে যেতে যায় না। সকাল চারটা থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আলোর খেলা চলে, যদিও এটা নিশীথ সূর্যের দেশ নয়। বিকেলের দিকে আটটা থেকে আরম্ভ করে সূর্য তার অস্তগমনের আয়োজন, যাই-যাই করেও যাওয়া তার হয় না। ঘণ্টা দুই সময়ে লেগে যায়, শেষে যাবার সময়ও যেন চোখে থাকে "longing lingering look."

এখানে প্রকৃতি সরল উদার, মানুষ প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছে সাগ্রহে, তাই মানুষের মনেও এখানে রয়েছে সেই সরলতা আর উদারতা। মানুষ ভোগ করছে প্রকৃতির সম্পদ মনের আনন্দে। গ্রীষ্ম এখানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অবকাশের সময়। এ অবকাশে নর-নারী ছুটে চলে প্রকৃতির নিবিড় হতে নিবিড়তর সান্নিধ্যে, বনের ধারে পড়েছে তাঁবু, সাগরের তীরে পড়েছে তাঁবু আর পল্লীর শ্যামল কোলে পড়েছে তাঁবু, সহরে থাকে শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ লোক, আর ঠিক এ সময়ে সহরের অর্ধেক নর-নারী বেরিয়ে পড়ে সহর থেকে দূরে যেখানে মানুষের সৃষ্টি কম, প্রকৃতির সৃষ্টি বেশি, সেখানে। বনে ছুটাছুটি করছে, সাগরের জলে সাঁতার কাটছে না হয় নদীর বাঁকে গল্প করছে। গোটা বছরের অবসাদটাকে ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন করে কাজে লাগবার শক্তি সঞ্চয় করছে, আর শক্তি দিচ্ছে মানব আর প্রকৃতির "মনের গোপন মিলন।"

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিজলী-যুগের এই অভিনব আত্মপরিচয়ের কাহিনী আবার চললো ৩৪ সংখ্যা 'বিজলী থেকে; এ সংখ্যা প্রকাশিত হয় গত ২৪শে আষাঢ়, ১৩২৮ সাল—ইংরাজি ৮ই জুলাই, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। এ সংখ্যার "কালবৈশাখী'তে"ছিল—

"প্রলয় তামসী মরণ নয়। প্রলয় বড় জাগা জিনিষ; জীবনেরই তাল ও ছন্দ এই প্রলয়ের রক্ত-মাখা মরণের মাঝে ধ্বনিত। আগুন ছোটে, গ্রহ নক্ষত্র গুঁড়ো হয়ে যায়, শিব-ডমরুর আনন্দ-নিনাদে সৃষ্টি ধ্বংসের কোলে কাঁপতে থাকে। এ ভাঙার মত এত বড় জীবন্ত সৃষ্টি-বীজ আর নাই।"

কালবৈশাখীর সূত্রে তখনকার ঝড়ো খবর যা' সেই স্তম্ভে প্রকাশিত হয় তার চুম্বক হচ্ছে—ডি ভ্যালেরায় ও লয়েড জর্জের মাঝে পত্রাঘাত চলছে আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা বা হোমরুল প্রদানের সর্ত্তাদি নিয়ে। ডি ভ্যালেরা সকল আইরীস দলের সঙ্গে আলাপ করছেন, ইংলণ্ডে যেতে অস্বীকার করেছেন,—বলেছেন, 'আয়র্লণ্ডের গোলমাল আয়র্লণ্ডেই মিটমাট হওয়া উচিত। সন্ধিতে তিনি রাজী, আয়র্লণ্ডের প্রজাতন্ত্র হবার অধিকার তিনি ছাড়তে রাজী নন। আর্থার গ্রিফিথ প্রভৃতি সমস্ত সিনফিন নেতারা জেল থেকে খালাস পেয়েছেন। লোকের আশা হচ্ছে যে এবার সিনফিনদের সঙ্গে ইংলণ্ডের একটা কিছু বোঝা-পড়া হবে।

গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে কামাল পাশার দল জিতছে। গ্রীকরা ইসমিট সহর ছেড়ে চলে গেছে। মিত্র শক্তিরা গ্রীস তুরস্কে একটা মিটমাট করে দিতে চেয়েছিল, গ্রীস রাজী হয় নি। তারা বলছে—লড়াই তো এখন চলুক, তার পর তোমাদের কথা শোনা যাবে।

এ সংখ্যার প্রধান লেখা—"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" এবং "নারীর কথা"। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' লেখাটির কতক অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য—"মানুষ মরে যখন না যায় স্বর্গে, না যায় পাতালে তখন ভূত হয়ে নাকি পৃথিবীতে ঘোরে। তাদের ঝালায় প্যাওড়া গাছ আর ভর দুপুর বেলা এলোচুলে বউ-ঝি থাকবার যো নেই, অমনি পেলেই ঘাড়ে চাপবে। * * * ভূতে পাওয়া বউ-ঝি পাড়ায় থাকলে পাড়া সশঙ্ক, বাড়ীর উঠানে লোকের গাঁদী লেগে যায়। কত রোজা ডাকানো আর সর্ষে পড়া মানত করার পর যখন ভূত নামে তখন সে একটা গাছ ফেলে দিয়ে চলে যায়, আর তখন বউও বাঁচে, পাড়াও জুড়োয়।

মানুষ মরে যেমন ভূত হয়, একটা সত্য বা আদর্শ মরেও তেমনি ভূত হতে দেখা গিয়েছে। সে ভূতের নাম শব্দ বা বুলী। মানুষ ভূত হলে যেমন গয়ায় পিণ্ড দেওয়া অবধি পাড়ার শোয়াস্তি নেই, আদর্শ-মরা শব্দে (slogan) পেলেও তেমনি মানুষের বা জাতের সুখ-শান্তি থাকে না। যেমন ধরো ত্যাগ; ত্যাগ খুব বড় জিনিস, ত্যাগ করে মানুষ দেবতা হয়। কিন্তু ত্যাগ যদি মারা যায় তা'হলে তার কচকচিতে দেশ উদ্বাস্তু হবার জোগাড় হয়। এই রকম মহাপ্রেমের অপমৃত্যুতেই ন্যাড়া-নেড়ী সন্ন্যেসী বোষ্টম সৃষ্টি হয়েছে; তারই ফলে মায়াবাদ জাতিভেদ তিলক গঙ্গা-স্নান গজিয়েছিল, তার ফলেই যত আচার-বিচার দলাদলি গুঁতো-গুঁতি হাঁড়িমার্গ ছুৎমার্গ স্ত্রী-আচার ও কাষ্ঠ তপস্যার আড়ম্বর।

আবার দেখো মুক্তি। মুক্তি কি যে পদার্থ তার ঠিক নেই, কিন্তু কথাটার দৌরাত্ম্যে কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে কি রাজনীতিতে কি সমাজে হুলুস্থুলু ব্যাপার। কত মানুষই না মৌনী হয়ে উর্দ্ধবাহু দশায় হাত-পা শুকিয়ে ফেলেছে; কত জাতি রাজা মেরে উজীর রেখেছে, উজীর উজোড় করে পঞ্চায়েত বসিয়েছে, কিন্তু আলেয়ার মত ঐ মুক্তি বা স্বতন্ত্রতা মানুষের নাগালের বাইরে সরে সরে যাচ্ছে আর দপ দপ করে জ্বলে উঠছে—সেই-ই একটা দিগন্তর মাঠের ও-পারে।

ভগবান মরে বহুকাল হলো ভূত বলে ভূত—একেবারে বেহ্মদত্যি হয়েছেন। ভগবান যে কি বস্তু তা' কেউ খোঁজে না, কেবল ভগবান বানায় আর তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে। কারু কাছে ভগবানের আকার নেই, কাজেই আকার প্রকারের জিনিষগুলো বেমালুম বাজে ফক্কিকারী ব্যাপার। না মানো একথা, তুমি তা'হলে একটা আস্ত পাষণ্ডী। কারু কাছে ভগবানের মন্দা রূপ আর দু' হাত, কিন্তু চতুর্ভুজ মাদী-ভগবানের চেলারা এই দলকে পেলে অার আইনের বালাই না থাকলে এক বার মনের সুখে খোড়-কাটা করে কাটে।

যদি মানুষের মত এক জন মানুষ এসে একবার বলে—'কামিনী ভাল নয় রে, একটু পাশ কাটিয়ে চলিস্', তাহ'লে আর রক্ষে নেই। নারীকে মানুষ আগে ঠেঙাতে ঠেঙাতে শাস্ত্র পার ধর্ম্ম পার রাজ্য পার পগার-পার করে নরকের দ্বারে বসিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে, তার পর যদি ভাবে কথাটার মানে কি। যদি বল ভগবানের ভজনা আপনি হয়, এ যে বড় সহজ ধন, * * * অমনি সব ছেড়ে খঞ্জনী বাজিয়ে নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মানুষ লেগে গেল।

* * * এক এক জন অবতার এসে গেছেন, আর তাঁদের গদী জুড়ে কতকগুলি কথা ও হাব-ভাব রাজত্ব করছে আর মানুষকে ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে আছে। * * *

এ সংখ্যার দ্বিতীয় সম্পাদকীয়—"নারীর কথা"। তার সার মর্ম্ম উদ্ধৃতির দ্বারা পাঠক-পাঠিকার গোচরে আনি—মেয়েদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বলতেই, কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক বলতেন—"you smell distress in the air." ("তোমরা হাওয়ায় দুঃখের গন্ধ পাও")। * * * এই ভেবেই কিছু দিন আমরা বেশ জোর গলায় সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর কথা বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা চালালুম, নৈতিক আধ্যাত্মিক কত রকম টীকা টিপ্পনী ঘেঁটে প্রমাণ করলুম যে, হিন্দুরা চিরকালই নারীকে পূজা করে এসেছেন।

* * * শাস্ত্র বলেছে নারী পূজনীয়া, তাই তো মস্ত বড় প্রমাণ। ঘরে মা বোন অথবা গৃহিণীর পানে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে বলছে পতি-পুত্রের সেবা করেই নারীরা সুখী—সেবা যখন পাচ্ছি, তখন দুঃখ তাদের থাকতেই পারে না। ভগ্ন-স্বাস্থ্য, অপর্য্যাপ্ত খাদ্য, পুরুষের জঘন্য ব্যবহার সবই নারীকে সহিষ্ণু হবার পথে সহায়তা করে, শাস্ত্র মতে হিন্দু নারী মা বসুন্ধরার মত সহিষ্ণুতার অবতার।

* * * আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, মেয়েরা কখনও শাস্ত্র লেখার অধিকার পায়নি। * * * তার পর ইংরেজ যখন স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দেবার আয়োজন করলো, তখন আমরা প্রমাদ গণলুম। * * * না না, ওসব বিদেশী আদর্শ আমাদের মেয়েদের কাছে চলবে না। এই সুরে লেখাটিতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক জন হিন্দু-মহিলা, জনৈকা কুমারী ও নির্য্যাতিতা কন্যার পিতার পত্রের উল্লেখ আছে।

এ সংখ্যায় আছে, উপেন্দ্রনাথের অনবদ্য লেখনী প্রসূত ব্যঙ্গরস রচনা "উনপঞ্চাশী" এবং মফঃস্বলের চিঠি। দুইটিই হাস্য-রসাত্মক ও জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা বিশেষ। সব শেষে দু' দফায় কাজের কথায় আছে, ১ম—'এটা ধ্বংসের যুগ' আর ২য় দফায়—"এখন ধ্বংসই কাজ"। এই দুইটি প্যারার বক্তব্য এই ছিল—"সৃষ্টির যুগ আর ধ্বংসের যুগ আলাদা, বিষ্ণু যখন জাগে রুদ্র তখন ঘুমায়। * * * তোমরা অভী হও, মরণকে ডরিও না; সৃষ্টির যুগ যদি আনতে চাও তা হলে বুক দিয়ে মরণকেই জয় কর।"

তার পর ৩৫শ সংখ্যা বিজলীর পরিচয়। এ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৩১শে আষাঢ় ১৩২৮ সাল, ইংরাজি ১৫ই জুলাই, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। এ সংখ্যার "কালবৈশাখী"—মাত্র দু'ছত্র ছড়া—

উঠেছে তুমুল ঝড় ছাইয়া গগন
সামাল সামাল তরী নাবিক সুজন।

তার পর আছে বলসেভিক রাশিয়া থেকে জাপানী বিতাড়ন ও গ্রেপ্তার, বিউথেন সহরে ফরাসী ও জার্ম্মাণ সৈন্যের সংঘর্ষ, গ্রীসদের কামাল সৈন্যের তাড়নায় পশ্চাদপসরণ, এমনই সব দুর্য্যোগের খবর। এ সংখ্যার প্রধান লেখা—"সহজিয়া" এবং আর একটি যার শিরোনামা হচ্ছে—

"আনন্দ নগরে যাহার বাস
সে মানুষ এলে মিটয়ে আশ"

প্রথম লেখাটির কথা—"এবার তোরা সহজ হ'," এই সহজ হবার মন্ত্রের মাঝেই মানুষ হবার বীজ সুপ্ত আছে। * * * মানুষের জীবন অতি সহজ অতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাকে অ-সহজ করে তোলার অর্থ তাকে অনৃত করে তোলা। যে মানুষ সহজেই দৌড়াতে চায়, তাকে লাঠি ভর করে হাঁটাতে শেখানো জ্ঞানের পরিচয় নয়। * * * ইউরোপের ধ্বংসলীলার অন্তরালে তার ভোগ ঐশ্বর্য্য সম্পদের ভিতর দিয়ে দিয়ে এমন একটা ভাবের সূত্র ইউরোপের জন্মকাল থেকে ঐখানে অমর হয়ে আছে, ঐখান থেকে সে বিশ্বকে অমৃত দান করবার অধিকারী। যারা সে অমৃতে আপন আপন পাত্র ভরে নিতে ইতস্ততঃ করবে তারা আপনাকেই বঞ্চিত করবে। মানুষের যে সহজ মহিমা ইউরোপের সাধনায় ফুটেছে, তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার কোন মানুষের নেই—কেন না যা' সহজ তাই-ই যে অসত্য নয়, পরম সত্য যে তাই।"

তারপর এ সংখ্যার দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করবার বস্তু—"আনন্দ নগরে যাহার বাস, সে মানুষ এলে মিটয়ে আশ।" এ ধাঁটি ও মানবীয় ধারার মূল অন্তর্নিহিত কথাটি আর এক বার এই নৈতিক অবনতির পঙ্কিল-যুগে মানুষকে শোনানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। লেখাটি ছিল এইরূপ—

"স্বাধীনতা, স্বরাজ বা গণতন্ত্র কোন বিধান নয়, তা' হচ্ছে আসলে অন্তরের আলো, মনের ভাব বা আদর্শ। আগে আসে মাঠের মত বিরাট বিশাল উদার আত্মা নিয়ে মানুষ, তার পর তার চলা বলা করার ভঙ্গীটা হয় বিধান। মানুষের কাছে মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর নাই, কারণ এই মানুষই নারায়ণ রূপ ধরে, এই সাড়ে তিন হাত বা চোদ্দ পোয়া মানুষের আধারে শক্তির ভেল্কি খেলে, আর সেই সোনার-কাঠি রূপার-কাঠির ছোঁয়ায় যাদুকরের যাদুর মত সভ্যতা সম্পদ শ্রী রাজপাট ইতিহাস শিল্পকলা কত কি পট পট করে গড়ে ওঠে। একটা বুদ্ধ এসে কি যেন কি পায়, নিজের অন্তর দলের সম্পুটে বাঁধা চতুর্দ্দশ ভুবনের সাড়া জাগিয়ে দেয়, শক্তি আনন্দ প্রেমের অচিন দুয়ার খুলে ধরে, আর অমনি কি জানি কেমন করে চোখের পলকে একটা নূতন জাতি তার উপমা হারা ইতিহাস, জীবন-বৈকুণ্ঠ গড়া বুদ্ধি নিয়ে নতুন সৃষ্টির নক্সা এঁকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসে।

তাই বলি (মানুষের কাছে) মানুষই সব। কিন্তু যে মানুষ তোমরা চেনো, এই নাক-মুখ-চোখ হাত-পা ওয়ালা কাঠামোটি—এটা তো আর সব নয়, এটি শুধু—কোন্ নিবিড় উধাও অনন্ত শক্তি-রাজ্যের বেতারা বাক্স, সেই অচিন আনন্দপুরীর খবর নেয় দেয়, তার রাগিণী বাজায়, সেই ভুবনভাঙা ভুবনগড়া সুরে সুর বেঁধে দু'টো চারটে ছড়ির টানে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লাগিয়ে দেয়। আমেরিকার ইতিহাস থেকে ওয়াশিংটন লিঙ্কলনকে তুলে নাও, মার্কিণ গণতন্ত্র অমনি ভুয়া হয়ে যাবে; ঐ দু'টি মানুষের বিশাল বুকের রসে শিকড় গেড়ে এই মহারাজ্য গড়ে উঠেছে। আবার ফরাসী ইতিহাস থেকে বেছে বেছে কয়েকটি মানুষকে তুলে নাও, সঙ্গে সঙ্গে এক একটি যুগ মুছে যাবে।

* * * এক এক বার একটা কি দুইটা অথবা দল বেঁধে দশ বিশ হাজার মানুষ আসে; তারা আসে সব সংস্কার মুছে নিখিল বাঁধন কেটে। খুদে দেহমনগত আপনাকে ভুলে, হাড়ে দধীচির শক্তি নিয়ে, দুটো মাত্র হাতে দশভুজার দশ প্রহরণ ধরে, চোখে মগজে ও প্রাণে মধুগঙ্গা, জ্ঞানগঙ্গা শক্তিগঙ্গার ত্রিবেণী সঙ্গম রচে; আর তার পরে তড় তড় করে লাখ মরা বেঁচে ওঠে, দুনিয়ার

জীবনের—মুক্তির—বাঁধন কাটার ও অমৃত পানের ভিড় করা উৎসব লেগে যায়।

"There democracy begins to exist; of that which exists in the soul, political freedom and institutions of equality, and so forth, are but the shadows necessarily thrown and Democracy in state or Constitutions but the shadow of that which expresses itself in the glance of the eye of Him Towards Democracy.

ঐখানে ডিমোক্র্যাশীর আরম্ভ; মানুষের আত্মায় যা আছে, রাজনীতিক স্বাধীনতা বল, রামরাজ্য বল, সব তারই ছায়া, তারই মানস কন্যা। ডিমোক্র্যাশী বা গণতন্ত্র অর্থাৎ মানুষের সর্ব্ববন্ধন বিমুক্তি জগৎ-শিল্পীর চোখেই নাচে, তারই চোখের পলকে ঘটে। প্লাবন যদি আসে, জগৎ যদি শক্তির বানে ডুবে একেবারে সাগর হয়ে যায়, তা' হলে সে সাগরে কুয়ো পাগলে ছাড়া কেউ খোঁড়ে না। গড়নের জন্য তখন চেঁচাতে হয় না, গঠন তখন আপনিই হয়। * * * অহঙ্কারের কাজ সর্ব্বনাশা সব-মজানো জিনিস। আগে আপনাকে ফুরোও তার পর লাখের কাজে হাত দাও।"

এ সংখ্যার "ঊনপঞ্চাশী" এবং "ঊনপঞ্চাশীর কৈফিয়ৎ" বড় মুখরোচক অনবদ্য লেখা, আমাদের উপেন্দ্রনাথের অমৃতবর্ষী লেখনীর অমর সৃষ্টি। ব্যঙ্গের রূপকে জীবনের যত কদর্য্যতা ও হীন স্বার্থের খেলাকে লেখায় ফুটিয়ে তোলে এই "ঊনপঞ্চাশী"।

* * * তোমরা তো যোগ শক্তি বিশ্বাস করবে না।—এই কপালের এই খানটা—দু'টো ভ্রূর ঠিক মাঝে আর নাকের সোজাসুজি উপরে পোঁ-ও-ও করে একটা বাঁশী বেজে উঠলো। আমি ভাবলুম এইবার বুঝি ব্রজবল্লভ-গোপিনী চিত্তহারী বাঁকা সখা সেই গোঠের কানুর দেখা পাব। ওমা! দেখি কিনা সামনে খানিকটা ধোঁয়াটে আকাশ আর পোড়া শ্মশানের মত মাঠে একটা অদ্ভুত জীব চরছে। তার চার দিকে মাথা আর চার দিকেই লেজ। সে কি গোলক ধাঁধা রে বাপ! কোনও ল্যাজটা গাধার, তার উল্টোদিকের মাথাটাও তাই; আবার ঠিক পাশে তার শেয়ালের দিব্যি পাটকিলে লেজ, মাথাটার পাশেও বেশ গোঁফওয়ালা সরু খেঁকশেয়ালীর মুখ। বাঘ, ভাল্লুক, কুমীর, সাপ, বনমানুষ, ওর‍্যাং ওট্যাং এস্তক মানুষ কিছুই এঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে বাদ যায় নি। আমি তো থ! এ আবার কি রে বাপু! পশু-জগতের Synthesis—পশু-দেবতার পূর্ণাবতার নাকি?

হঠাৎ আমার মাথাটা চড় চড় চড় চড় রবে লম্বা হয়ে যেতে লাগলো, কাণের মধ্যে ভ্রমর ধ্বনি ঘণ্টা নিনাদ কত কি আওয়াজের মাঝে সম ফাঁক তালের মত একটা শব্দ হতে লাগলো— কটাস্ কটাস্। ধড়টা ধরা পৃষ্ঠে রেখে গলাটা দু'চার লাখ মরালগ্রীবাকে হার মানিয়ে আমার উত্তমাঙ্গ বুদ্ধিপীঠ এই মাথাটা নিয়ে গিয়ে যখন প্রায় সেই-ই-ই সূর্য্যলোকে ঠেকেছে তখন দপ্ করে কপালে একটা আকর্ণ বিস্তৃত ঢুলু ঢুলু চোখ বেরুলো। তাই দিয়ে * * আহা সে কি দেখলাম। দেখলাম এই জীবের বাহন হচ্ছে অন্ধ অজ্ঞান মূঢ় জনতা। এর পা নেই অথচ ও হাঁটে জনপ্রবাহের কাঁধে চড়ে; যত বেশি লোক জড় হয় এর গরীমা-সিক্ত দেহ ততই বড় হয়ে সবার কাঁধে বিরাজ করে। লোকে ভাবে এ আমাদের কল্যাণ করছে, সেই তক্কে তক্কে এই গুণধাম এক এক তুড়কী লাফে ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে উঠে যায়। তার ওপর মুগ্ধ জনতা যদি হাততালি দেয়, তা হলে সেই ভেকপ্রলম্ফী জীবের ডানা গজায়, আর এক একটা দমকা হাততালির ঝড়ে ভূ ভূর্ব-স্বর্লোক ভেদ করে এই পশুরাজ অর্থলোক থেকে যশোলোক, সেখান থেকে নোলোক সেখান থেকে উচ্চপদ লোকে—প্রয়াণ করেন। * * *

বলেছিই তো ইনি বহুরূপী, আমিই কেবল পূর্ণ জ্ঞান প্রসাদাৎ তাঁর সবটা দেখেছি। নইলে কেউ তাঁর শৃগাল রূপ দেখে জীবন ধন্য করে, কেউ দেখে তেজোময় অশ্বরূপ, কেউ দেখে লম্বগ্রীব জিরাফ রূপ। ইনি অবস্থা বুঝে টপাটপ রূপ বদলাতে পারেন। শৃগাল রূপে মানুষ বিরক্ত হতে না হতে শ্বেতবাজী রূপে দেখা দেন, সিংহরূপের খোঁচায় মানুষ প্রকৃতিস্থ হতে না হতে ইনি ছিনে জোঁক রূপে স্থান-বিশেষে লেগে থাকেন। * * *

শুধু রূপই নয়, বুলিও ইনি স্বেচ্ছায় বদলাতে পারেন, অর্থাৎ ইনি হরবোলা। এই তোমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে গর্জ্জন করছেন, আবার এই দেখো অবস্থা বুঝে কর্ণমূলে নিদ্রাকর্ষক ভ্রমর গুঞ্জন করছেন। * * * ইনি হলেন জীবের কামরূপী, তুমি তোমার সাধ আকাঙ্ক্ষার ধন বলে এঁকে যা' ভাব তখনই ইনি প্রায় হুবহু তাই।

ইনি বিপদে বিড়াল-ধর্ম্মী, যত খুসি উঁচু থেকে ঘাড়ে ধরে ফেলে দাও, ঠিক চার পায়েই পড়েন। যতই টেনে পায়ের তলায় ফেলো, ততই দেখবে এঁর সিদ্ধতনু তোমার মাথার উপর হস্তি-উদর নিয়ে বিরাজ করছেন, তখনও তাঁর নয়নে তোমার প্রতি অসীম কৃপাদৃষ্টি ও গোঁফের আগায় মুচকি হাসি। * * * এঁকে খাওয়াতেই তুমি নিঃস্ব নিরাহারী, এঁকে চলাতেই তুমি পঙ্গু, এঁর ভাবনায় ও জ্ঞানে তুমি মূঢ় ও সমর্পিত-বুদ্ধি, এঁর চাট প্রহারে ও গায়ে হাত বুলানয় তুমি চির উদ্ভ্রান্ত অথচ চিরনিদ্রিত।

জগতের সব সত্যের ইনি রাহু এবং সব মিথ্যার ইনি গিলটিকার * * * ইনি একাধারে নির্গুণ ও গুণী, হর্ত্তা ও পাতা, কাম্য ও বংশ, ধরে বাঁচবারও নয় আর ঝেড়ে ফেলবারও নয়। * * বহুকষ্টে বাকহরা দশা কাটিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজে জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রভু! এ কি?" ব্রহ্মা চার জোড়া গোঁফের আগায় স্মিত হাস্য মাখিয়ে বললেন' "মর্ত্ত্যলোকে এঁর নাম নিমিত্ত ভেদে দুই, মদগর্বী নেতা ও আমলাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট।"

আ। এঁর কবল থেকে উদ্ধারের উপায়?

ব্র। মানুষ যে দিন নিজেকে চিনবে সেই দিন এঁর অস্তিত্ব মর্ত্ত্যলোকে আর থাকবে না। তোমাদের অজ্ঞানেই এঁর জন্ম।

এ সংখ্যার "দু' দফা কাজের কথা," তার শেষটি উদ্ধৃত করি —

বাঁচতে চাও তো ফিরে এসো।

ভাবের চেয়ে ভাষা যেখানে প্রবল, ভক্তির চেয়ে সঙ্কীর্ত্তনের যেখানে বেশি ধুম, পূজার চেয়ে প্রসাদের দিকে বেশি ঝোঁক, কর্মের চেয়ে শব্দের যেখানে বেশি আড়ম্বর, মানুষের চেয়ে নামের যেখানে বেশি মাহাত্ম্য—যে স্থান আজ মরণের দিকে ছুটে চলেছে। সেই মৃত্যুর মাঝখান থেকে যদি মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আজ পেতে চাও

অন্তরের দিকে ফিরে এসো। জগতের উপর আজ মৃত্যুর করাল ছায়া এসে পড়েছে। আজ ভগবান লোকক্ষয়কৃৎ কালরূপী, আজ তিনি ধ্বংসবিলাসী রুদ্র। আজ বুদ্ধির লীলা, ভাবের আবেশ, ইন্দ্রিয়ের সম্মোহন—কিছুই এ ধ্বংসের মুখে টি'কবে না। বাইরের সৃষ্টির দিকে আজ চেও না; আজ নিজেকেই গড়বার দিন। অন্তরে যদি আজ সত্যকে খুঁজে পাও ত' সে সত্য এক দিন না এক দিন রূপ নিয়ে বাইরে ফুটে বার হবে। স্রষ্টাকে যে খুঁজে পাবে, সৃষ্টির জন্যে তার চঞ্চল হবার আবশ্যকতা নেই।"

এ হচ্ছে বিজলীর তেত্রিশ বছর আগের কথা। আজও দুনিয়ার অবস্থার সঙ্গে এর কত মিল দেখলে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। সে দিনও এক মহাসমর চুকে আর একটি আসন্ন অগ্নিমুখ হয়ে আছে; আজও তাই। সে দিন আজ আরও অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য্যে শান্তি শক্তি ও তাই আনন্দে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে নূতন রূপে রঙে ভাবে মন্ত্রে, মানুষের জীবনকে গড়ে নেবার প্রয়োজন ক্রমে অনিবার্য্য হয়ে উঠছে।

৩৬ সংখ্যা বিজলীর "কালবৈশাখী" আজকার ১৯৫৫ সালেরই চিত্র—তার সূক্ষ্ম ভাবরূপ। ৬ই শ্রাবণ ১৩২৮ সালের (ইংরাজি ২১শে জুলাই, ১৯২১খৃষ্টাব্দ) প্রকাশিত এই সংখ্যার "কালবৈশাখী" উদ্ধৃত করি—তাতে ছিল—"এখন কালীর ক্ষুদ্রা মসীময়ী রূপ; তাই মানুষ তামসিকতায় গুটিয়ে গেছে। জগতের দিকে চেয়ে দেখো,—বিশাল আড়ম্বরে কেবলি তুচ্ছ ফল প্রসব করছে; শরতের মেঘের মত মানুষ বর্ষেও সুখ পাচ্ছে না, গর্জে'ও সুখ পাচ্ছে না। পুরাতন যুগ-দেহ ক্ষয় হতে হতে বামনে পরিণত হয়েছে। তাই কি ইউরোপ কি এশিয়ায় আর কি এমেরিকায় বৃহৎ সৃষ্টি বৃহৎ শিল্পী আর নাই। সব জায়গায়ই ক্ষুদ্র মানুষ অপূর্ণ মানুষ দু'কড়া শক্তিকে ষোল গণ্ডা দেখাবার জন্য হৈ চৈ করছে, কোথায়ও কোন জীবনই নিখুঁত হয়ে গড়ছে না। কালবৈশাখীর তাই এখন ক্ষয়রূপা আবির্ভাব।"

তারপর অগ্নিমুখ সব খবর। লণ্ডনে চলছে এংলো আইরিশ শান্তি-সভা, তার সঙ্গে বেলফাষ্ট সহরে চ'লেছে ভীষণ দাঙ্গা। ডাটমুর জেলে আটক ৮০ জন সিন্‌ফিন কয়েদী বিদ্রোহী হয়ে টুপী ফেলে দিয়ে ধমাধম নাচ আরম্ভ করে দেয়। অনুনয় বিনয় বিফল হলে, তাদের বল প্রয়োগে কয়েদীর কুঠুরীতে পুরতে হয়। তখন আইরিশ হোমরুল আসন্ন, সেই স্বাধীনতার ধাক্কায় আয়র্লণ্ড কেটে দু'ভাগ হয়ে যাবে। ডি ভ্যালেরাকে ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও রাজকীয় সেলুনে আইরিশ প্রতিনিধিদের বহন করা হচ্ছে। সাধে কি বাবা বলে, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

এ সংখ্যার প্রধান লেখা "মানুষের আত্মঘাত"। লেখাটি কিছু অংশের উদ্ধৃতির প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি আরম্ভ করা যাক—"মানুষকে তার সহজ জন্মগত কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর অধিকার থেকেও নিঃস্ব করতে নেই; সামান্য পয়সার কাঙাল করলেও সেই ক্ষুদ্রতায়ই মানুষ ভিতর থেকে কুঁচকে দীন হয়ে যায়। খুব প্রাণী গুণী জ্ঞানী শক্তিশালী লোকের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম হরণ করলে, তার নিজেরই চোখে তাকে লজ্জিত ও ছোট করলে সেই লজ্জা ও দীনতার ক্লেদে অতি অল্প দিনেই তার মহত্ত্ব ঘোলা হয়ে আসে, ক্রমশঃ সে মানুষ যেন সকল গুণে নিঃস্ব হয়ে মাথা হেঁট করে চলতে শেখে, কোথা থেকে যত দীনের উপযোগী দীনতা ও কপটতা এসে তার দেহ মন আশ্রয় করে। জাতে ঠেলা মানুষের জাতে ওঠবার কাঙালামো বড় কঠিন কাঙালামো। তার জন্য সে না পারে এমন অপকর্ম্ম, এমন আত্মঘাত নেই। জাত-খোয়ানো মানুষের মন এমন দীন হয়ে যায়, তার কারণ সবার চোখে মুখে ব্যবহারে চলনে "ছুঁ'সনে ছুঁ'সনে" ভাব দেখে দুঃখে সঙ্কোচে তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিষিয়ে থাকে; সে বিষে যে কেবল তারই অন্তর বাহির পচে ওঠে তা নয়, তার অঙ্গ-নিঃসৃত একটা দূষিত অভিশাপের বাতাসে এই রকম সব গরীবের জাত মারিয়ে ঐ মোড়লদেরও জীবনের ভিতে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে শূলে বা ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলা বরঞ্চ ভাল, তবু তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে জাতে ঠেলা নরঘাতের চেয়েও ঢের জঘন্যতর অপরাধ।

অভিমান ও রাগ দীনের ও পদদলিতের অস্ত্র। তুমি যেমন তার দিক থেকে বিমুখ হয়ে তাকে ছোট কর, সেও তোমা থেকে বিমুখ হয়ে জোট বেঁধে সবল হয়, তার পর চাই কি এক দিন তোমাকে পিষে ফেলতে পারে। * * *

ভগবানের অংশ স্বরূপ—তাঁর আত্মময় অঙ্গবিলাসী এই সব মানুষকে এই রকম নিশাচরবৃত্ত হয়ে আমরা যতই হীন করি, ততই সেই জগদ্‌ব্যাপী বিশ্বশক্তি আমাদের অদৃষ্ট খড়্‌গময়ী রক্তাম্বরা শ্মশানকালী হয়ে দাঁড়ায়।

* * * এক দিন পায়ের তলার এই সব দলিত কীট লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল হয়ে আমার এত সাধের সোণার ক্ষেত মুড়িয়ে খেয়ে যাবে। * * * কি রাজনীতিতে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি শৌর্য্যে বীর্য্যে, কি ব্যবসায়ে যাতেই মানুষকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেছ, দেখ গে তাতেই মানুষ এমন বিষম মরা মরেছে * * * সেই মরণ বিষ হয়ে জীবন হরণ করতে করতে শেষে তোমারই চারি দিকে শ্মশান রচনা করে তুলছে। * * * তবেই দেখো কত দূর অবধি বন্ধন ঘোচানোর নাম স্বরাজ বা মুক্তি। নিজের হাতে রচা কারাগারের পাঁচিল ঘর বলে মনে হয়, মন তাকে বন্ধন বলে সহজে স্বীকার করতে চায় না।"

এ সংখ্যার দ্বিতীয় লেখা—"কঙ্গরসের রঙ্গরস" বড় মজার রিপোর্ট, তখনকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সমসাময়িক কংগ্রেসী চিত্র। এটা যথাসাধ্য উদ্ধৃত হবার যোগ্য। লেখাটি রঙ্গরসিক নলিনীকান্ত সরকারের।

"বাংলার প্রবীন-শিয়ালী (Provincial) কঙ্গরস কমিটির তিন দিন ধরে অধিবেশন হয়ে গেল। খুব কম খবরের কাগজের রিপোর্টারই সেখানে ঢুকতে পেরেছিল। তবুও দেখছি সব কাগজেই রিপোর্ট নাম দিয়ে একটা যা হোক কিছু বার করে দিয়েছে। সাবাস জোয়ান্‌!

মঙ্গলবারের বারবেলায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সর্ব্ব বিদ্যা আয়তনের প্রাসাদের তিন তলে বাংলা পার্লামেণ্টের ভবিষ্যৎ সভ্যরা মিলিত হয়ে দেশের ভাগ্য-পরিচালনার ধুরন্ধরগণকে নিযুক্ত করবার বন্দোবস্ত করেছেন। আগেকার সভায় শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য-তালিকা তৈরী করবার ভার দেওয়া হয়। সভ্য-সংখ্যা ৪৮ হওয়ায় এবং হাজার হাজার কংগ্রেসের সভ্যদের নাম ঐ আটচল্লিশ জনের মধ্যে না ধরায় শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনের স্বেচ্ছাচারিতায় স্বদেশ-প্রেমিকেরা ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন। চিত্তরঞ্জন সংখ্যাটা উনপঞ্চাশ করবারও উপায় নেই দেখে তাঁর অন্যান্য অসামান্য ত্যাগের পর কমিটি প্রদত্ত এই নির্ব্বাচনী অধিকারও দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে বিসর্জ্জন করলেন; এবং এই ডিম্‌-ও-ক্র্যাসীর যুগে ডিম্‌-ওক্র্যাটদিগের হাতে

পুনর্নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। তারপর Co-option অর্থাৎ সোহাগী সভ্যগণের নির্ব্বাচনও হয়ে গেল। বাংলায় ডিম্‌ওক্র্যাসীর প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু আমাদের মনে হয় ঐ কথাটির আগে 'অশ্ব' কথাটি বসিয়ে দিলেই বাংলার ডিম্‌ওক্র্যাসীর অর্থটা ভাল করে বোধগম্য হ'তো। ছাপ্পান্ন জনের মধ্যে চৌদ্দ জন মুসলমান দশ জন মহিলা এমন কি চার জন বর্ণাশ্রম-লাঞ্ছিত অনুন্নত জাতির প্রতিনিধি স্থান পেয়েছে। সাঁওতাল, নমঃশূদ্র, স্ত্রীলোক কারও আর নালিশ করবার যোটি নেই!

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনকে সভাপতির পদ দেবার প্রস্তাব করা হলে তিনি বলেন যে, তাঁর জীবনের কাজ করবার জন্যে তাঁকে এ সম্মান থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে হবে। কিন্তু ভক্তরা ছাড়বার পাত্র নন। তাঁরা একেবারে তাঁর চরণে পড়ে সভাপতি হবার জন্য কত কাঁদুনীই কাঁদলেন। যুক্তি দেওয়া হলো—আপনাকে আমাদের ঘাড়ে চড়তেই হবে, যেহেতু আপনার শরীরটা প্রকাণ্ড আর মাংসও কোমল, সে হেতু আমাদের সকলের চিমটি কাটার সুবিধা। চিত্তরঞ্জন কিছুতেই রাজী হলেন না। যাঁদের হাতে নখ ছিল তাঁরা মনে ভাবলেন, এই অহিংস্র অসহযোগের দিনে এই অস্ত্রগুলি কি বেকার বসে থাকবে? যাই হোক অধিকাংশের মতানুসারে সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব তখনকার মত ধামাচাপা রইলো।

তার পর দেশের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক নির্ব্বাচিত হলেন। একটি সৌন্দর্য্য-তত্ত্বাগীশ ছোকরা সভ্য এরূপ সর্ব্বসম্মতির ব্যাপারটা ঘটলে পাছে Slave mentality-র পরিচয় দেওয়া হয় এজন্য আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, যে, সম্পাদক মহাশয় অশ্লীল রকমের কালো। পাশ থেকে কেউ তাঁকে হাত ধরে বসিয়ে দেওয়াতে তাঁর মুখের প্রস্তাব মুখেই রয়ে গেল। মৌলবী মুজিবর রহমান, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও প্রস্তাবিত হ'লো। মৌলবী সাহেবের বিবেক বুদ্ধি বলে একটি বাঙালী-দুর্লভ জিনিষ থাকাতে তিনি নামকে-ওয়াস্তে সম্পাদক পদ অস্বীকার করে পূর্ব্বেই এক চিঠি দিয়েছিলেন। জিতেন্দ্র বাবু সাত্ত্বিকতা প্রণোদিত হয়ে কংগ্রেস কমিটির কোনো পদ গ্রহণ করবেন না বলে জানালেন। মহাজনের পদ অনুসরণ করে শ্রীযুত মাখনলাল সেন সহকারী-সম্পাদক পদ অম্লান বদনে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর নামের প্রস্তাবের সমর্থনের অপেক্ষাও তিনি রাখেন নি। একেই তো বলে প্রকৃত অসহযোগিতা!

কোষাধ্যক্ষ হলেন শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ। মধুচক্র' এইবার-তাঁর হয়ত পড়লো—দেখা যাক অহিংস্র হয়ে হুলের ব্যবহার না করে মক্ষিকারা কি রকমে চলেন। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলালকে সহকারী-সভাপতি রূপে প্রস্তাব করা হলো, কিন্তু প্রেসিডেন্ট না হলে তাঁর Vice হবার যে উপায় নেই তা' দেখিয়ে দিয়ে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন এই ফাঁকে শ্যামসুন্দর বাবুকে সভাপতি হবার জন্যে প্রস্তাব করলেন। তিনি বাহিরের বারাণ্ডা থেকে এসে এই মহা সম্মানের পদ প্রত্যাখ্যান করে একেবারে Public life থেকে retire করলেন—যে হেতু তাঁর দেশের সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে একমত নয় এবং অনেকে তাঁর Servant-কে অর্থাৎ তাঁকে Criticise অর্থাৎ গালাগালি করে। এই দুঃসংবাদে সভ্যগণ কাতর হয়ে দশ মিনিটের ছুটি নিলেন।

তার পর Executive Committee নির্ব্বাচন আরম্ভ হলো। অক্লান্ত প্রস্তাবক শ্রীযুত শশাঙ্কজীবন রায় জিতেন্দ্র বাবুর নাম দিলে জিতেন্দ্র বাবু বিনয়ের সঙ্গে তা' প্রত্যাখ্যান করলেন। Lucknow Compact অনুসারে শতকরা চল্লিশ জন মুসলমানের নাম দেওয়া হলো।

তার পর এলো মহিলাদের পালা। জিতেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য ২টি আসন রেখে দেওয়া হয় দেখে, জিতেন বাবু ন্যায়ের ফাঁকি আরম্ভ করলেন। যেহেতু সংখ্যার অনুপাতে মুসলমান ভায়ারা শতকরা ৪০টি সিট দখল করলেন, অতএব নারীর সংখ্যা বাংলা দেশের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক হওয়ায় তাঁহাদিগকে অর্দ্ধেক দেওয়া হোক। কিন্তু সভ্যগণ বৃন্দাবনে এক মাত্র পুরুষ আর সব প্রকৃতি এই ভেবে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন।

তারপর পূর্ব্ববঙ্গে ষ্টীমার রেলওয়ে হরতাল প্রভৃতি সম্বন্ধে মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত চালানোর প্রস্তাব উঠলো। গান্ধী মহারাজের কথার প্রতিবাদ করে সভারা বললেন যে, এই হরতাল Engineered নয়, Sympathetic এবং Spontaneous, হরতাল সম্বন্ধে কাজ চালাবার জন্য একটি কমিটি হয়। বন্ধুবর হেমন্তকুমারের নাম প্রস্তাবিত হতেই তাঁর এক জন পরমাত্মীয় তাঁর কচি বয়স ও জ্ঞানের অল্পতা হেতু সহানুভূতি প্রণোদিত হয়ে তাঁর নামটি উঠিয়ে দিতে বলেন। হেমন্তকুমার আত্মীয়ের বক্তৃতার কষ্ট লাঘব করবার জন্য নিজে থেকেই নামটি উঠিয়ে নিলেন। কিন্তু কমিটি তাঁকে ছাড়লেন না, একেবারে সম্পাদক নিযুক্ত করে দিলেন। * * * অতঃপর চিত্তরঞ্জনকে সভাপতি পদ ও কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হয়। খুব আশা আছে যে, নির্ব্বাচন-তালিকা প্রকাশিত হ'লে আবার আমরা তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়ে গালাগালি দিতে পারবো। Finance কমিটিতে শ্রীযুত জিতেন্দ্রলালের নাম প্রস্তাব করা হয়—তিনি "আবার সাধলে খাব" এই রকম ভাবের ছোট একটু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালেন। যে সকল বন্ধু তাঁর ওপর ভরসা রাখেন আর দেশের সব চেয়ে বড় বিদ্যা আয়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের কাতর অনুরোধে তিনি অন্যান্য নিরামিষ কমিটির সম্পর্ক ত্যাগ করলেও এই আমিষ গন্ধযুক্ত পদটি ছাড়া যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না।

বাংলার কংগ্রেস কমিটি তিন দিন মেছোহাটার গোলমালকে লজ্জিত করে ঠাণ্ডা হলো। এই সব দেখে-শুনে অনুমান হয় যে, বাংলার অহিংস্র অসহযোগটাকে কম্বল জড়িয়ে ঠ্যাঙানো দিলেও সেটা non-violentই থাকবে। এই লেখাটির পরিচয়—"আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার স্বপ্নলব্ধ রিপোর্ট।"

তারপর এই ৩৬শ সংখ্যা বিজলীতে ছিল উপেনের লেখা "উনপঞ্চাশী" ও আমার পণ্ডিচারী আশ্রম থেকে লেখা "পণ্ডিচারীর পত্র"। এ লেখা দুটির সুর এবং বক্তব্য চিরপরিচিত, সুতরাং উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। এ সংখ্যার চিঠির ঝাঁপীতে ছিল "বিনীতা—একজন কুমারীর পত্র"—পণপ্রথার বিরুদ্ধে লেখা ও ছেলে-বেচা বরকর্ত্তা ও গৃহিণীদের দাপটের কুৎসা। এ সংখ্যার "কাজের কথার" প্রথম দফা লেখাটি উদ্ধৃত করি, কারণ এই স্বাধীন ভারতে এখনও অহিংসার ও কাষ্ঠত্যাগের নামে নপুংসকত্ব বাজারে চলছে।

[ক্রমশঃ

—ইউজিন ডেলাক্রোয়া অঙ্কিত

অশ্ব (স্কেচ)
—ইউজিন ডেলাক্রোয়া অঙ্কিত

৭
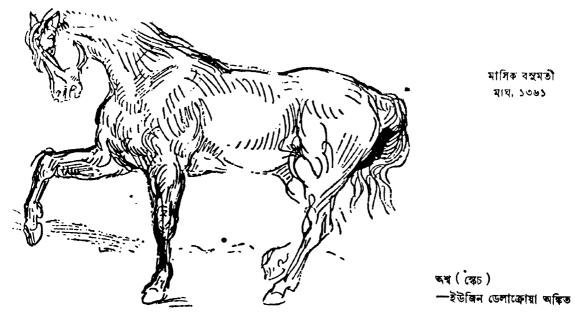
পল জিজ্ঞেস করলে, 'এক দৃষ্টে কি দেখছেন, স্যর? আমি তো তেমন কিছু নয়নাভিরাম দেখতে পারছিনে।'

বললুম, 'আমি কিঞ্চিৎ শার্লক হোম্‌সগিরি করছি। ঐ যে লোকটা যাচ্ছে দেখতে পারছো? সে এই পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এল তো? দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা 'ফ্রিজোর;' তাই লোকটার ঘাড়ের দিকটা দেখে অনুমান করছিলুম, জিবুটি বন্দরের নাপিতদের কোন পর্যায়ে ফেলি?'

পার্সি বললে, 'হ্যা, হ্যাঁ, আপনার ঠিক মনে আছে। আমি তো চুল কাটাবার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। চলুন ঢুকে পড়ি।'

আমি বললুম, 'তা পারো। তবে কি না, মনে হচ্ছে, এ-দেশে কোদাল দিয়ে চুল কাটে।'

পার্সি বললে, 'কোদাল দিয়েই কাটুক, আর কাস্তে দিয়েই কামাক, আমার তো গত্যন্তর নেই।'

নাপিত ভায়া ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। আমি তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলুম, পার্সির প্রয়োজনটা কি।

কিন্তু দোকানটা এতই ছোট যে, পল আর আমি সেখানে বসবার জায়গা পেলুম না। বারান্দাও নেই। পার্সিকে বললুম, তার চুল কাটা শেষ হলেই সে যেন বন্দরের চৌমাথার কাফেতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

চৌমাথায় একটি মাত্র কাফে। সব কটা দরজা খোলা বলে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, খদ্দের গিস-গিস করেছে! এইটুকু হাতের তেলো পরিমাণ বন্দর, এখানে মেলার গোরুর হাট বসলো কি করে?

ভিতরে গিয়ে দেখি, এ কি, এ যে আমাদের জাহাজেরই ডাইনিঙ রুম। খদ্দেরের সব ক'জনাই আমার অতিশয় সুপরিচিত সহযাত্রীর দল। এ বন্দর 'দেখা' দশ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বলে, সবাই এসে জড়ো হয়েছেন ঐ একটি মাত্র কাফেতেই। তাই কাফে গুলজার। এবং সবাই বসেছেন আপন আপন টেবিল নিয়ে। অর্থাৎ জাহাজের ডাইনিঙ রুমে যে চার জন কিম্বা ছ'জন বসেন এক টেবিল নিয়ে, ঠিক সেই রকম এখানেও বসেছেন আপন আপন গুষ্ঠী নিয়ে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

এক কোণে বসেছে গুটিকয়েক লোক, উদাস নয়নে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে। জাহাজে এদের কখনো দেখি নি। আন্দাজ করলুম, এরাই তবে জিবুটির বাসিন্দা। জরাজীর্ণ বেশভূষা।

কিন্তু এ সব পরের কথা। কাফেতে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে এ দেশের মাছি। 'চোখে পড়ে' বাক্যটি শব্দার্থেই বললুম, কারণ কাফেতে ঢোকার পূর্বেই এক ঝাঁক মাছি আমার চোখে থাবড়া মেরে গেল।

কাফের টেবিলের উপর আল্পনা কেটে মাছি বসেছে, 'বারের' কাউন্টারে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, খদ্দেরের পিঠে, হাটে,—হেন স্থান নেই যেখানে মাছি বসতে ভয় পেয়েছে।

দু' গেলাস 'নিম্বু-পানি' টেবিলে আসা মাত্রই তার উপরে, চুমুক দেবার জায়গায়, বসলো গোটা আষ্টেক মাছি। পল হাত দিয়ে তাড়া দিতেই গোটা কয়েক পড়ে গেল শরবতের ভিতর। পল বললে, 'ঐ য, যা।'

আমি বললুম, 'আরেকটা অর্ডার দি?'

সবিনয়ে বললে, 'না, স্যর; আমার এমনিতেই ঘিন-ঘিন করছে। আর পয়সা খরচা করে দরকার নেই।'

তখন তাকিয়ে দেখি, অধিকাংশ খদ্দেরের গেলাসই পুরো ভর্তি।

ততক্ষণে ওয়েটার দুটি চামর দিয়ে গেছে। আমরাও চামর দুটি হাতে নিয়ে অন্য সব খদ্দেরদের সঙ্গে কোরাসে মাছি তাড়াতে শুরু করলুম।

সে এক অপরূপ দৃশ্য! জন পঞ্চাশেক খদ্দের যেন এক অদৃশ্য রাজাধিরাজের চতুর্দিকে জীবন-মরণ পণ করে চামর দোলাচ্ছে। ডাইনে চামর, বাঁয়ে চামর, মাথার উপরে চামর, টেবিলের তলায় চামর। আর তার-ই তাড়ায় মাছিগুলো যূথভ্রষ্ট, কিম্বা ছন্নছাড়া হয়ে কখনো ঢোকে পলের নাকে, কখনো ঢোকে আমার মুখে। কথা-বার্তা পর্যন্ত প্রায় বন্ধ। শুধু চামরের সাঁই-সাঁই আর মাছির ভন্‌-ভন্‌! কুশ-তর্জনে লড়াই!

মাত্র সেই চারটি খাস জিবুটি বাসিন্দে নিশ্চল নীরব। অনুমান করলুম, মাছি তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এবং মাছিদের সঙ্গে লড়নেওলা জাহাজ-যাত্রীর দলও তাদের গা-সওয়া। এ রকম লড়াইও তারা নিত্যি নিত্যি দেখে।

তখন লক্ষ্য করলুম তাদের শরবৎ পানের প্রক্রিয়াটা। তারা চামর তো দোলায়ই না, হাত দিয়েও গেলাসের মুখ থেকে মাছি খেদায় না। গেলাস মুখে দেবার পূর্বে সেটাতে একটু মোলায়েম ঠোনা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মাছিগুলো ইঞ্চি

তিনেক উপরে ওঠা মাত্রই গেলাসটি টুক করে টেনে এনে চুমুক লাগায়। ঘিনপিৎ এদের নেই।

পলও লক্ষ্য করে আমাকে কানে কানে শুধোলে, 'এ লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় এ-সব লোক থাকে কেন?'

আমি বললুম, 'সে বড় দীর্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ এদের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞেস করো তবে শুনবে, প্রত্যেকের জীবনের দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় কাহিনী।'

এ সংসারের সর্বত্রই এক রকম লোক আছে যারা রাতারাতি লক্ষপতি হতে চায়। ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-নোকরী কোনো কাজেই ওদের মন যায় না। অত খাটে কে, অত লড়ে কে?—এই তাদের ভাবখানা।

সিনেমায় নিশ্চয় দেখেছ, হঠাৎ খবর রটলো আফ্রিকার কোথায় যেন সোনা পাওয়া গিয়েছে; সেখানে মাটির উপর-নিচে সর্বত্র তাল তাল সোনা পড়ে আছে আর অমনি চললো দলে দলে দুনিয়ার লোক—সেই সোনা জোগাড় করে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য। সিনেমা কত রঙে-ঢঙেই না সে দৃশ্য দেখায়! অনাহারে তৃষ্ণায় পড়ে আছে, এখানে মড়া সেখানে মড়া। কোনো কোনো জায়গায় বাপ-মা, বেটা-বেটী চলেছে এক ভাঙা গাড়িতে করে—ছেলেটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, মেয়েটা ভিরমি গেছে। বাপ টিনের ক্যানেস্তরা হাতে করে ধুঁকতে ধুঁকতে জল খুঁজতে গিয়ে এ পাথরে টক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ও পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জখম হচ্ছে। মায়ের চোখে জলের কণা পর্যন্ত নেই—যেন অসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, এরা এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া উপায় নেই। থামলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, এগুলে বাঁচলে বাঁচতেও পারো।

ক'জন পৌঁছয়, ক'জন সোনা পায়, তার ভিতর ক'জন জনসমাজে ফিরে এসে সে ধন ভোগ করতে পারে, তার কোনো সরকারী কিম্বা বে-সরকারী সেনসাস্ কখনো হয়নি। আর হলেই বা কি? যাদের এ ধরণের নেশা জন্মগত তাদের ঠেকাবে কোন্ আদমশুমারী?

কিম্বা হয়ত এদেরই এক জন লেগে গেল কোম্পানি বানিয়ে, শেয়ার বিক্রী করে টাকা তুলতে। কেন? কোন এক বোম্বেটে কাপ্তান কোন এক অজানা দ্বীপে কোটি কোটি টাকার ধন নিয়ে উধাও হয়ে যায়। সেই দ্বীপ খুঁজে বের করতে হবে, সেই ধন উদ্ধার করে রাতারাতি বড়লোক হতে হবে। যে সমুদ্রে ঐ দ্বীপটার থাকার কথা সেখানে যাত্রী-জাহাজ বা মাল-জাহাজ কিছুই যায় না। সে দ্বীপে নাকি খাবার জল পর্যন্ত নেই। ঐ বোম্বেটে কাপ্তান নাকি জল-তৃষ্ণায় মারা গিয়েছিল। আরো কত রকম উড়ো খবর।

যে কোম্পানি খুললে, সে বলে বেড়াচ্ছে তার কাছে ম্যাপ রয়েছে ঐ দ্বীপে যাবার জন্য। সাধারণ লোক বলে, 'কই, ম্যাপটা দেখি।' লোকটা বলে, 'আব্দার! তার পর তুমি টাকাটা মেরে দাও আর কি?' কিন্তু রাতারাতি বড় লোক হওয়ার দল অত শত শুধায় না। তারা কোম্পানির শেয়ারও কেনে না—পয়সা থাকলেও কেনে না। তারা গিয়ে কান্নাকাটি লাগায় লোকটার কাছে—'খালাসী করে, বাবুর্চি করে আমাদের নিয়ে চল, তোমার সঙ্গে। তনখা-মাইনে কিছু চাইনে।' কাপ্তেনও ঐ রকম লোকই খুঁজছে,—শক্ত তাগড়া জোয়ান, মরতে যারা ডরায় না।

তার পর এক দিন সে জাহাজ রওয়ানা হল। কিন্তু আর ফিরে এল না।

কিম্বা ফিরে এল মাত্র কয়েক জন লোক। কিছুই পাওয়া যায় নি বলে এরা তাকে খুন করেছে। তখন লাগে পুলিশ তাদের পিছনে। মোকদ্দমা হয়, আরো কত কি?

পল কাফের সেই চারটি জিবুটিবাসীর দিকে তাকিয়ে ফিস-ফিস করে আমাকে শুধালে, 'এরা সব ঐ ধরণের লোক?'

আমি বললুম, 'না, তবে ওদের বংশধর। বংশধর অর্থে ওদের ছেলে নাতি নয়, কারণ ও ধরণের লোক বিয়ে-থা বড় একটা করে না। 'বংশধর' বলছি, এরা ঐ দলেরই লোক, যারা রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। কিন্তু আজকের দিনে তো আর সোনা পাওয়ার গুজোব ভ ল করে রটতে পারে না,—তার আগেই খবরের কাগজওয়ালা প্লেন ভাড়া করে সব কিছু তদারক করে জানিয়ে দেয়, সমস্তটা ধাপ্পা। কিম্বা জাহাজ ভাড়া করার কথাও ওঠে না। প্লেনে করে ঝটপট সব-কিছু সারা যায়। হেলিকপ্টার হওয়াতে আরো সুবিধে হয়েছে। একেবারে মাটির গা ছুঁয়ে ভালো করে সব কিছুই তদারক করা যায়।'

তাই এরা সব করে আফিং চালান, কিম্বা মনে করো, কোনো দেশে বিদ্রোহ হয়েছে—বিদ্রোহীদের কাছে বে-আইনী ভাবে বন্দুক-মেশিনগান ইত্যাদি বিক্রী।

যখন কিছুতেই কিছু হয় না, কিম্বা সামান্য যে টাকা করেছিল তা ফুঁকে দিয়েছে, ওদিকে বয়সও হয়ে গিয়েছে, গায়ে আর জোর নেই, তখন তারা জিবুটির মত লক্ষ্মীছাড়া বন্দরে এসে দু' পয়সা কামাবার চেষ্টা করে, আর নূতন নূতন অসম্ভব অসম্ভব এডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখে। জিবুটির মত অসহ্য গরম আর মারাত্মক রোগ-ব্যাধির ভিতর কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কাজের সন্ধানে আসবে? কিন্তু এদের আছে কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাই এদের জন্য এখানে কিছু একটা জুটে যায়। এই যেমন মনে করো, এখান থেকে যে রেল-লাইন শুরু হয়ে আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবা অবধি গিয়েছে—প্রায় পাঁচ শ' মাইলের ধাক্কা—সে লাইনে তো নানা রকমের কাজ আছেই, তার উপর ওরই মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্য যা হবার তা-ও হয়। ঐ সব করে আর একে অন্যকে আপন আপন যৌবনের দুঁদেমির গল্প বলে।

পাছে পল ভুল বোঝে তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এই যে চারটি লোক বসে আছে ঠিক এরাই যে এ ধরণের

এডভেঞ্চারার সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে—ঐ টুকু যা কথা।'

ইতিমধ্যে একটা মাছি ঢুকে যাওয়াতে বিষম খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলুম। শান্ত হলে পর পল শুধালে, 'এদের কথা শুনে এদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত না অন্য কোন প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

আমি অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানো? কেউ যখন করুণার সন্ধান করে তখনই প্রশ্ন জাগে, এ লোকটা করুণার পাত্র কি না? কিন্তু এরা তো কারো তোয়াক্কা করে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা আশা রাখে, স্বপ্ন দেখে, রাস্তার মোড় ঘুরতেই, নদীর বাঁক নিতেই সামনে পাবে পরীস্থান, যেখানে গাছের পাতা রুপোর, ফল সোনার, যেখানে শিশিরের ফোঁটাতে হাত দিলেই তারা হীরের দানা হয়ে যায়, যেখানে—'

আরেকটুখানি কবিত্ব করার বাসনা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে পার্সি মাছি তাড়াতে তাড়াতে এসে উপস্থিত। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখলো ও-দ্য-কলনের এক ঢাউস বোতল। মুখে হাসি, চোখে খুশী—বোতলের নয়, পার্সির।

আমি বোতলটা হাতে নিয়ে দেখি, দুনিয়ার সব চাইতে ডাকসাইটে ও-দ্য-কলন—খাস কলন শহরের তৈরী কলনের জল—Ean de Cologne! 4711 মার্কা!

পার্সি বললে, 'দাঁও মেরেছি স্যর! বলুন তো এর দাম বোম্বাই কিম্বা লণ্ডনে কত?'

আমি বললুম, 'শিলিং বারো চোদ্দ হবে।'

লঙ্কা জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেও বোধ হয় রামচন্দ্রজী এতখানি পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন নি। তবু হনুমান কি করেছিলেন তার খানিকটে আভাস পেলুম, পার্সির বুক চাপড়ানো দেখে।

'তিন শিলিং, স্যর, তিন শিলিং! সবে মাত্র, কুল্লে, জসট্, তিন শিলিং! নট্ এ পেনি মোর, নট ঈভন এ রেড ফার্দিং মোর।'

এমন সময় দেখি, কাফের আরেক কোণ থেকে সেই আবুল-আসফীয়া—কি কি যেন—সিদ্দীকী সায়েব তার সেই লম্বা কোট আর ঝোলা পাতলুন পরে আমাদের দিকে আসছেন। ইনি আমাদের সেই বন্ধু যিনি সবাইকে লাইমজুস, চকলেট খাওয়ান—কিন্তু যাঁর কঞ্জুসি কথা কওয়াতে।

আমরা উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি বসেই বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তাররা যে রকম এক্‌স্‌রে'র প্লেট দেখে সেই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

পার্সি পুনরায় মৃদু হাস্য করে বললে, 'একদম খাটি জিনিস।'

আবুল আসফীয়া মুখ বন্ধ রেখেই নাক দিয়ে বললেন, 'হুঁ।'

তারপর অনেকক্ষণ পরে অতি অনিচ্ছায় মুখ খুলে শুধালেন, 'ওটা কার জন্য কিনলে?'

পার্সি বললে 'পিসিমার জন্য।'

আবুল আসফীয়া বললেন, 'বোতলটার ছিপি না খুললে বিলেতে নামবার সময় তোমাকে প্রচুর কাস্টম্‌সের ট্যাক্স দিতে হবে। এমন কি এ জাহাজে ওঠার সময়ও—তবে সে আমি ঠিক জানিনে।'

পার্সি আমার দিকে তাকালে।

আমি বললুম, 'ছিপি খোলা থাকলে ওটা তোমার আপন ব্যবহারের জিনিস হয়ে গেল; তাই ট্যাক্স দিতে হয় না।'

অনেকক্ষণ পর আবুল আসফীয়া বললেন, 'যখন খুলতেই হবে তখন এই বেলা খুলে ফেলাই ভালো।'

আমরা সবাই—পার্সিও—বললুম, 'সেই ভালো।'

ওয়েটার একটা কর্কস্ক্রু নিয়ে এল। আবুল আসফীয়া পরিপাটি হাতে বোতল খুলে প্রথম কর্কটার ভিতরের দিক শুঁকলেন, তারপর বোতলের জিনিস।

একটু ভেবে নিয়ে আমাদের শোঁকালেন।

কোনো গন্ধ নেই!

যেন জল—প্লেন 'নির্জলা' জল!

পার্সি তো একেবারে হতভম্ব। অনেকক্ষণ পর সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু ছিপি, সীল সবই তো ঠিক?'

আবুল আসফীয়া বললেন, 'এ সব ছোট বন্দরে পুলিশের কড়াক্কড়ি নেই বলে নানা রকমের লোক অনেক অজানা প্রক্রিয়ায় আসল জিনিস সরিয়ে নিয়ে মেকি কিম্বা প্লেন জল চালায়।'

আমি পলকে কানে কানে বললুম, 'হয়তো আমাদেরই একজন 'এডভেঞ্চারার'।'

পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, খাস জিবুটি-বাসিন্দারা দরদ-ভরা আঁখিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অনুমান করতে বেগ পেতে হ'ল না, এরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

পলও খানিকটে বুঝতে পেরেছে। বললে, 'যাত্রীরা বোকা কি না, তাই এ শয়তানীটা তাদের উপরই করা যায়। আর প্রতি জাহাজেই আসে এক জাহাজ'—

পল বাধা দিয়ে বললে, 'পার্সি!'

পার্সি চটে উঠে বললে, 'ওঃ, আর উনিই যেন এক মহা কনফুৎসিয়ো!'

জাহাজে ফেরার সময়, আবুল আসফীয়াকে একবার একা পেয়ে শুধালুম, 'ছোঁড়াটাকে বড় নিরাশ করলেন।'

বললেন, 'উপায় কি? না হলে প্রতি বন্দরে মার খেত যে!'

[ক্রমশঃ।

নিজেকে গড়ো

শচীন্দ্র মজুমদার

তুমি

কোনো মানুষ ছোটো বা বড় হয়ে জন্মায় না। তুমি, আমি— পৃথিবীতে আমরা যতো মানুষ আছি, প্রত্যেকে সাধারণ মানুষ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছি। শুধু তাই নয়, প্রকৃতি একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত উৎকর্ষ সাধন করে মানুষকে ত্যাগ করে, আর তার পানে সে ফিরে চেয়ে দেখে না। কিন্তু এই সীমার বাইরে মানুষের অধিকাংশ শক্তি নিহিত হয়ে থাকে। তুমি তাই নিহিত শক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ; সে সব স্ফুট করে তোলা বা না তোলা একান্ত ভাবে তোমার ওপর নির্ভর করে, আর কোনো কিছুই সে সব স্ফুট করে তুলতে পারে না। প্রকৃতি-গঠিত অবস্থাটাকে তুমি যদি চরম পাওয়া এবং তোমার অমোঘ বিধিলিপি বলে মেনে নাও, তাহলে তোমার ন্যূনতম শক্তি নিয়েই তোমাকে জীবন কাটাতে হবে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যটি তাই। তা ছাড়া, এই ন্যূনতমকে নিয়ে তুমি নিজেকে পূর্ণ মনে করলে, জীবনের দরজায় তুমি হবে ভিক্ষুক। নিত্য তুমি তার কাছে মুষ্টি-ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করবে। কিন্তু জীবন বীরের অনুগামী, সে মুষ্টি-ভিক্ষুকের পানে ফিরে চেয়েও দেখে না।

সাধারণ মানুষ গড়ে ওঠে আকস্মিক ভাবে, যাকে বলা হয় ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। তাদের কেউ ভালো, কেউ বা মন্দ হয়। কেউ সংসারের উচ্চ স্তরে উঠে যায়, কেউ বা অবনত হয়ে চিরদিন নিচে পড়ে থাকে। কেউ হয় দীপ্তশিখ প্রদীপ, কেউ বা হয় সেই প্রদীপের ভারবাহী তেল-কালি-মাখা পিলসুজ। সত্যিকারের অদৃষ্ট কি এই? এ অদৃষ্ট কি অখণ্ডনীয়? কোনো ঠিকানায় যেতে হলে আমরা তার পথ-ঘাটটা আগে জেনে নিই। জীবনের ঠিকানা জানার পদ্ধতি এখন আর আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়; কিন্তু তার পথ-ঘাট জানার কি প্রয়োজন নেই? মৃত্যু জীবনের শেষ ঠিকানা নয়। যারা এমন কথা বলে তারা ক্লীব, জড় বস্তু ছাড়া আর কিছু নয় জীবন অপরিমেয় ঐশ্বর্যশালী, সে ঐশ্বর্য বিকাশের শেষ নেই। সেই ঐশ্বর্যকে আয়ত্ত করবার, নিজের সকল উপকরণকে জীবন লুঠ করে নেবার উপযোগী করবার আমরা কি কোনো উপায় করতে পারি নে? এই বাংলা দেশেই স্বরূপ সন্ধানের ধারা ছিলো, কিন্তু মূঢ়মতি আমরা, অবজ্ঞায় সেটাকে হারিয়েছি। স্বরূপ সন্ধানের দুটো দিক, একটা বাহ্যিক, অন্যটা আন্তরিক। আপাততঃ আমি বাহ্যিক দিকটার কথাই আলোচনা করবো।

তোমার আঁতুড়-ঘরে বিধাতা-পুরুষ এসে তোমার ললাটে কোন লিপি লিখে যাননি। সে লিপি লিখেছেন, তোমার বাপ-মা পরমাত্মীয়েরা। অসহায় একটা কাল দিয়ে তোমার জীবনের আরম্ভ, তখন নির্ভর ছিলো বাপ-মার ওপর। বাপ-মা ও পরিবার তোমার প্রথম সমাজ। এ শৈশব কালটা যে কতো গুরুতর, তা আমরা জাতি হিসেবে এখনো বুঝিনে। এই কালটিতে তোমার মূল গঠিত হয়েছে। তার নাম তোমার মূল সত্তা, যা তোমার সত্য প্রকৃতির পরিমাপ। এই প্রাথমিক আবেষ্টনের ভেতর তোমার বাপ-মার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভুল-চুকের হিসেবে সারা জীবনের জন্ত তোমার মূল সত্তাটি গঠিত হয়ে গেছে, সেইটাই তোমার জীবনধারা। হাজার তুমি বড়ো হও বা তোমার ব্যক্তিত্বটা বদলাক, এ জীবনধারা আর বদলায় না। চির প্রবহমান নদীর মতো তোমার সারা জীবনে সে ধারার প্রভাব অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। সুস্বাস্থ্য যেমন নীরব নিঃশব্দ, জীবনধারাটিও তেমনি। তার প্রকাশ কেবল সঙ্কটকালে, তখন তোমার মূল সত্তাটির স্বরূপ প্রকাশ হওয়া অনিবার্য। বয়স বাড়লে যে মন্দ জীবনধারা বদলায়, সেরে যায়, এ ধারণা প্রচণ্ড ভুল। ছোটো কাঁচা একটা ফলে যদি পোকা ধরে, ফলটা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে পোকাটাও বাড়ে এবং তার দ্বারা ফলটার যা ক্ষতি, সেটাও বিস্তৃতি লাভ করে। মন্দ জীবনধারাও তেমনি, মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও পরিবর্দ্ধিত হয়। এই পোকার বীজ শিশু-মনে অজ্ঞাতে বপন করেন বাপ-মা, যাঁদের চেয়ে সন্তানের কল্যাণকামী আর কেউ নেই। আমাদের দেশে কথা আছে, "কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়।" কথাটা মারাত্মক রকমের ভুল। কেমন করে মা ও অন্য পরমাত্মীয়েরা নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে নিষ্কলুষ শিশু-মনের সর্বনাশ সাধন করেন তা আমি নিত্য দেখে আসছি।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ তোমাকে নিরন্তর এক আবেষ্টন হ'তে অন্য আবেষ্টনে আকর্ষণ করছে। ঘরের আবেষ্টনে তোমার মূল সত্তাটি গঠিত হলে সমাজ তোমাকে নিজের পথ নিয়ন্ত্রণ করে নিতে বলছে। বছর চারেক বয়স থেকে তুমি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে শিখেছো; সেই বয়স থেকে নিজে খেতেও শিখেছো। সে বয়সের পর আর কেউ তোমাকে দাঁড়াতে বা খেতে খুব বেশী সাহায্য করেনি। তারপর যেমন বয়স বেড়ে চলেছে তোমার, আত্মনির্ভর হবার শক্তিটাও তেমনি বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য উত্তরোত্তর কমে এসেছে। একটু আত্মপর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবে যে, কতো দ্রুত গতিতে তুমি আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছো, এ নির্ভরতা কত প্রগতিশীল। যত তুমি বড়ো হয়ে উঠেছো, অপরের সাহায্যের প্রয়োজন তত কমে এসেচে।

এ অগ্রগতি নদীর প্রখর গতির সহিত তুলনীয়। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার উদ্ভব, কিন্তু নদীর ধারাটির সার্থকতা তখনই যখন সেটা সেই উৎসকে ত্যাগ করে নিরন্তর দূরে চলে যায়। মানুষের অদৃষ্টও তাই। তাকেও অবিরাম গতিতে বাপ-মা থেকে দূরে চলে যেতে হয়। নদীর মতো মানুষেরও গতিটাই প্রাণধর্ম। তোমার প্রাণধর্ম তোমাকে আগিয়ে নিয়ে যাবেই। জীবনের যা নিয়ম তাতে তোমাকে নিরন্তর এগিয়ে যেতেই হবে। তুমি যতো বড়ো হবে, তোমার আত্মনির্ভর হবার ততো বেশী প্রয়োজন। এ প্রয়োজনকে তুচ্ছ করবার যো নেই; তুচ্ছ করলে জীবনও তোমাকে তুচ্ছ করবে। তুমি সামাজিক মানুষ বলে সমাজের কিছু সহযোগিতা হয়তো আশা করবে, কিন্তু আত্মনির্ভর না হলে সে সহযোগিতা পাওয়া যায় না। খোঁড়া মানুষ লাঠির সাহায্য ভিন্ন চলতে পারে না। কিন্তু লাঠির সহযোগিতা ও সম্পূর্ণ সবল আত্মনির্ভরতা এক বস্তু নয়। জীবন এমন মজার জিনিষ যে, কাউকে সে লাঠির সাহায্য দেয় না।

এই জীবন বস্তটা কি ? কেউ কখনো জীবনকে দেখেনি, দেখতে পায় না। জীবন অনুভববেদ্য। জীবন একটি বিপুল গতি, সে গতিতে নানা আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ। গভীর আত্মপর্যবেক্ষণ ভিন্ন এই বিচিত্র গতিটিকে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। কিন্তু তার স্রোতে ভাসতে হবে বলে জীবন আমাদের একটি প্রাণধর্ম দিয়েছে। সেই ধর্মটাকে প্রখর করে, সম্পূর্ণ কাজে এনে তোমাকে জীবনের দরবারে নিজের পায়ের ওপর, নিজের বলবুদ্ধির ওপর ভরসা করে দাঁড়াতে হবে। তা যদি না করতে পারো তাহলে, সুস্থ মানুষের সমাজে হাসপাতালে রোগীর মতো, তোমাকে জীবনের আশে-পাশে কোথাও পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে। জীবনে পরনির্ভরের স্থান নেই। জীবনস্রোতে না ভাসতে পারলে জীবনকে কখনোই পাওয়া যায় না।

বাল্যকালে যতো দিন বাড়ীতে ছিলে বাপ-মা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। প্রথম যখন ইস্কুলে যেতে আরম্ভ করলে তখন হয়তো তাঁরা সেই রক্ষা করবার আঁকুপাঁকু মনোভাব নিয়ে তোমাকে চাকর বা গাড়ীর আশ্রয়ে ইস্কুলে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সহপাঠীদের মাঝে তোমার ক্ষুদ্র একটুখানি বল-বুদ্ধি তোমার ভরসা হতে আরম্ভ করলে। সেখানে তোমার বাপ-মায়ের কোনো হাত নেই। যতো উঁচু ক্লাশে উঠেচো ততোই তোমার সামাজিক মনটা বল পেয়েছে; নিজের ভালো-মন্দ, নিজের মর্যাদা নিরাপত্তার বিচার তোমাকেই করতে হয়েছে। বাপ-মা তখন কেবল তোমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, গৃহের আশ্রয় দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমার উৎকর্ষের অনুপাতে তাঁদের ব্যাপক সহায়তাটুকু দিনের পর দিন কম হয়ে এসেছে। কলেজে এসে যখন পৌছেচো, যদি বিচার করে দেখো, সহজেই বুঝতে পারবে যে তখন সেই পুরানো গৃহছায়া থেকে তুমি কত দূরে! তার মানে তোমার ভরসা তুমি নিজে। তখন দেখতে পাবে যে, শুধু তোমার দেহের বল নয়, তোমার বংশগত অনেক সংস্কার সব একত্র হয়ে তোমাকে বাইরে চলা-ফেরা, অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করবার একটি আশ্চর্য শক্তি তোমার মধ্যে সঞ্চিত করে দিয়েচে। জগতের প্রত্যেকটি মানুষ থেকে তুমি ভিন্ন একটি ব্যক্তি হয়ে গেছো, কোথাও তোমার অনুরূপ আর একটি মানুষ নেই।

কলেজে খেলাধুলা, আত্মবিকাশ, পরীক্ষা পাশ করা সব চেয়ে বড়ো কথা। সেটা ছেড়ে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করবে তখন তোমার উপলব্ধি হবেই যে, সে জগৎটা একেবারে ভিন্ন, নির্মম, নিষ্ঠুর, স্বার্থানুসন্ধানী। সেথায় এক ভগবান ও শুভ অদৃষ্ট ছাড়া তোমার আর কোনো সহায় নেই; তোমার সহায় তুমি, তোমার ভরসা তুমি। তবে কি এই কলেজী লেখাপড়া মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে কোন কাজে লাগে না? লাগে, আবার লাগেও না। কথাটা তোমার বড়ো গোলমেলে বলে বোধ হবে। কাজে লাগে তখন যখন সে লেখাপড়াটা তোমার মূল সত্তাকে পুষ্ট করে। আর, যে লেখাপড়াটা কেবল ছাত্রের চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ও মস্তিষ্কের বিষয়, সত্তার পুষ্টির কাছ দিয়েও যায় না, সে লেখাপড়াটা গাধার পিঠে ধোবার ময়লা কাপড়ের পুঁটলি ছাড়া আর কিছু নয়। সত্তার পুষ্টিই জীবনের পাথেয়, ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হওয়া নয়। মাঝে মাঝে আমি আমার ইস্কুল ও কলেজের সহপাঠীদের স্মরণ করি, তাদের অনেকে পরীক্ষাগত বড়ো বড়ো উপাধি সংগ্রহ করেছিলো, কিন্তু তারা এক জনও কেউ জীবনে বড়ো হয়নি। সত্তার উপেক্ষাই তার একমাত্র কারণ। এমন অধ্যাপক বোধ করি কোনো দেশে নেই যে শিষ্যের সত্তাকে পুষ্ট প্রবল করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের সাধকেরা এ কাজ করে গেছেন। সে উদাহরণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ্রহণ করে না কেন? সুতরাং নিজের সত্তাকে বড়ো করা তোমার নিজের ভার। লেখাপড়াকে যদি নিবিড় করে, শৈশবে মাকে ভালোবাসার মতো বিপুল আগ্রহ দিয়ে ভালোবাসতে পারো, তবেই তার সারটুকু তোমার সত্তায় যুক্ত হবে, আর কোনো উপায় এ জগতে নেই। জীবন গাধার বোঝা বয় না, ফাঁকি সহ্য করে না। কর্মজীবনে হয়তো তোমাকে অন্নাহরণের জন্য ভারতের অন্য এক প্রান্তে, অজানা আবহাওয়া অজানা জনসমাজে ছুটতে হবে। সেখানে তোমার একমাত্র ভরসা তুমি নিজে। পূর্বেকার আচ্ছাদিত জীবনে তুমি যেমন পুরুষকারটি গড়ে তুলেছো, একান্ত তারই ওপর তোমার শুভ নির্ভর করবে।

কর্মজীবন এবং অরণ্যের আত্মরক্ষার যুদ্ধটা প্রায় এক। বনের পশুকে যেমন নিরন্তর আত্মরক্ষা করতে হয়, মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে তার চেয়েও বেশি যুদ্ধ করে। ওপর থেকে দেখতে না পাওয়া গেলেও মানব-সমাজ নির্মম। হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ, দ্বেষ, লালসা, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার, দম্ভ, লোভ ইত্যাদি মানুষের জীবন থেকেই ওঠে। আর কোনো জীব-সমাজে এতগুলি মন্দ প্রবৃত্তি নেই। মানুষ মাত্রেই জীবনোত্থিত এই সকল প্রবৃত্তির দ্বারা গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়, তাই মানব-সমাজ নির্মম নিষ্ঠুর। মানুষে মানুষে তিন ধরণের সম্বন্ধ হয়: মৈত্রী, শত্রুতা ও উদাসীনতা। আত্মসাধনা ভিন্ন মৈত্রীর ভাব জন্মায় না, তাই মানব-সমাজকে নির্মম নিষ্ঠুর বলতে হয়। তোমার ঘরের বাইরে সত্যিকারের দয়া সহযোগিতা খুবই কম; সেটাও বেশী দিন থাকে না। ঘরেতেই দেখা যায়, বাপের ঝোঁক কৃতী শক্তিমান ছেলেটির ওপর। অক্ষমটি দয়া করুণা পায় কেবল মায়ের কাছে। ঘরের বাইরে অবস্থাটা ভাল নয়। তুমি যদি জীবনের কর্মঠ সদর রাস্তা দিয়ে চলতে চাও, সকলের তোমাকে বিপথচালিত করবার চেষ্টা হবে। একটা ইংরাজী বাক্য আছে যে, বন্ধু-বান্ধবেরা আমাদের আড়ালে যা সমালোচনা করে, তা আমরা জানলে জীবনে কেউ কারো বন্ধু থাকে না। অক্ষম, দুর্বল ভীতুর ঘরেই স্থান নেই, বাইরে কি করে তা হবে?

আমি কয়েকটি প্রদেশে নানা সমাজে ও অনেক ইস্কুলে গিয়ে দেখেছি যে, দুর্বল ছেলেদের সর্বত্র পিছিয়ে-পড়া দলেই ফেলে রেখেছে। ইস্কুলেই হোক আর ঘরেই হোক, সর্বত্রই তাদের বিষয়ে একটা হাল-ছাড়ার ভাব। শিক্ষকেরা বলেন, ওদের কিছু হবে না। ঘরে বাপ-মায়ের মুখেও ওই একই বাঁধা বুলি, ওদের কিছু হবে না।

এ সকল ক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তাহলে ওদের ভবিষ্যৎ কি হবে? ওরা বড়ো হয়ে কি করবে? সকলেই বলেছেন, কি আর করবে? চ'রে খাবে। পৃথিবীতে যেখানে শক্তিমানের বিচরণ ক্ষেত্রটাই অপরিসর, প্রতিযোগিতার ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্ত, সেখানে দুর্বল অক্ষম ভীতু কোথায় 'চরে খাবে তা বোঝা যায়

না। গোচারণের মাঠেও যে ভিড়! কাজেই আমাদের সমাজে দুঃখকর অপচয় লেগেই আছে, তা কি নিবারণ করা যায় না?

প্রত্যেকটি বাঙালী বাপ-মায়ের যদি ব্যাপক উপলব্ধি থাকতো যে প্রত্যেক ছেলের মধ্যে বিপুল শক্তি নিহিত আছে, প্রত্যেকটি ছেলেরই বুদ্ধ যিশু চৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ হবার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তাঁদের আচরণ ভিন্ন হোত। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, প্রত্যেক শিশুর অন্তরে সে শক্তির বীজ আছে, সে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তার কারণ শিশু নিজে নয়, কারণ তার বাপ-মা, তার ঘরের আবহাওয়া, তার শিক্ষকেরা, তার সমাজ। নদীমুখ থেকে তার উৎস খুঁজে বার করবার মত আমি অনেক বালক-বালিকার প্রকৃতির উৎস খুঁজেছি। পাঁচ মিনিট কোনো বালককে পর্যবেক্ষণ করলে তার বাপ-মায়ের ও তার ঘরের অবস্থা জানা যায়।

বংশ-পরম্পরায় মানুষের অপচয় আমাদের সামাজিক সত্য। বর্তমান কালে যে সব ছেলেরা জীবনে ভালো করে চলার মতো শক্তি সঞ্চয় করে তা আকস্মিকতার ব্যাপার। [ক্রমশঃ।

একটি খঞ্জ মেয়ের কথা

(তুরস্কের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

খোঁড়া মেয়েটির পা দু'খানি নিয়ে দুঃখের অন্ত ছিল না। বেচারী সহজ উপায়ে কিছুই করতে পারতো না। যখন তারা ধনী ছিল, তখন তবু এত অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন তাদের অবস্থা ভাল নয়, আপনার লোকও কেউ নেই যে তাকে দেখবে। এমনি দুঃখে-কষ্টে দিন যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে হলো, অনেক দিন আগে এক ধনী লোক বিপদে পড়ে তাদের কাছে বেশ কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন, কিন্তু বহু কাল কেটে গেল, তিনি সে বিষয় আর উচ্চবাচ্য করেননি। আর টাকার জন্য খোঁজ-খবরই বা করছে কে?

মেয়েটি ভাবে, কেন এমন হয়? পরের টাকা নিয়ে ফেরৎ দিতে চায় না যে, তার তো অনেক দুঃখ-কষ্ট হয়? তা ছাড়া এখন যদি সে এই টাকাটা পায় তাহলে তার পায়ের চিকিৎসা করতে পারে, আর এত কষ্ট করে তাকে থাকতেও হয় না।

তাই ভেবে-চিন্তে সে একটা চিঠি লিখলে সেই ধনী লোকটাকে। কিন্তু কিছুই হলো না। অনেক দিন চলে গেল, তার চিঠির উত্তর এলো না। তার দুঃখের কথা কে-ই বা ভাবছে! তখন সে ঠিক করলো, সে যাবে সেই ধনী লোকটার কাছে—আর তার সব অবস্থার কথা বলবে, নিশ্চয়ই তখন তিনি তার প্রাপ্য টাকা দিয়ে দেবেন।

এত পথ যাওয়ার কথা ভাবতে তার বুক শুকিয়ে ওঠে, তবু সে ভাবলো, যত কষ্টই হোক তার, প্রতি দিনের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে হবে। তাই সে বেরিয়ে পড়লো।

একে পায়ের অবস্থা ঐ রকম, তার উপর অনেক দূরের পথ, খুব কষ্ট করে যেতে হচ্ছে, মাঝে-মাঝে গাছতলায় বসে পড়তে হচ্ছে আর চোখে অজস্র ধারায় জল নেমে আসছে। মনের দুঃখ আর চোখের জল নিয়ে চলতে চলতে এক খেঁকশেয়ালের সঙ্গে তার দেখা হলো। মেয়েটির দুঃখ দেখে সে বললে, কি হয়েছে ভাই তোমার?

এ-রকম সহানুভূতির কথা শুনে মেয়েটি কেঁদে ফেললে আর তাকে সব বললে।

খেঁকশেয়াল বললে: আচ্ছা ভাই, আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু হলাম, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

খেঁকশেয়ালের সঙ্গে গল্প করতে করতে মেয়েটি আবার পথ চলতে লাগলো। পথ যেন শেষ হয় না। এমনি সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একটা বুনো শূয়োরের সঙ্গে।

সে এগিয়ে এলো, মেয়েটি বললে: এসো ভাই এসো, তুমিও আমার বন্ধু হবে তো? আমার বড্ড কষ্ট—এই বলে মেয়েটি তাকে তার সব কথা বললে।

বুনো শূয়োর বললে: আমাকেও সঙ্গে নাও, আমি তোমার বন্ধু হবো, দেখি তোমার কোনো উপকার করতে পারি কি না।

তিন জনে মিলে আবার চলতে লাগলো।

অনেক দূর হেঁটে পথের কষ্টে মেয়েটি আর যখন তার খোঁড়া পা নিয়ে চলতে পাচ্ছে না, তখন তার কান্না পাচ্ছে, আর ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে।

বুনো শূয়োর বললে: তুমি আমার কাঁধে ওঠো, দূরে একটি নদী দেখা যাচ্ছে—সেখানে নিয়ে যাই, বিশ্রাম করবে, জল খাবে—তার পর আবার আমরা চলতে শুরু করবো।

সকলে মিলে যখন নদীর ধারে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নদীতে নেমে—তার জলে যে সব পাতা কাঁটা-কুটি ছিল সব পরিষ্কার করে দিয়ে মেয়েটি প্রাণ ভরে জল খেয়ে নদীর ধারে বসে রইল। খুব আরাম লাগছে, চোখেও যেন ঘুম নেমে আসছে তার। জলটা যেন তার জীবন বাঁচালো। হঠাৎ তার মনে হলো কে বলছে: তুমি তো ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, আমার জলে যে সব ময়লা পড়েছিল তুলে দিলে। ও মা, নদী কথা বলছে! মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। নদী আবার বললে: তোমার বড় কষ্ট, আচ্ছা ভাই, আমি তোমার বন্ধু হলাম। যখন তুমি আমায় স্মরণ করবে, আমি যেখানেই থাকি তোমার কাছে ঠিক পৌঁছবো, দেখ।

মেয়েটি কৃতজ্ঞ হয়ে বললে: তোমাদের মত বন্ধু পেয়েছি, আমার আর কোনো দুঃখ নেই মনে।

পরের দিন নদীর কাছে বিদায় নিয়ে তারা চললো সেই ধনী লোকটির কাছে।

মস্ত প্রাসাদ, চারি দিকে গমগমে পাহারা। একটা ঐ রকম মেয়ের সঙ্গে কে দেখা করবে? অনেক মিনতি করে সেপাইদের মেয়েটি বললে: একটু খবর দাও, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, বড় কষ্ট হয়েছে—এক বার দেখা করতে বলো।

কিন্তু বৃথাই তার অনুরোধ। ধনী লোকটি দেখা তো করলেনই না—বারে বারে বাইরে থেকে অনুরোধ আসাতে বিরক্ত হয়ে সেপাইদের আদেশ দিলেন, ওকে বন্ধ করে রাখো।

এ আদেশ আসবার আগেই মেয়েটি ঢুকে পড়েছিল প্রাসাদে। একেবারে সামনে গিয়ে তার টাকার কথা বলাতে—রেগে গিয়ে ধনী লোক বললে: একটা খোঁড়া মেয়ে কোথা থেকে এসেছে, বলছে, আমার কাছে টাকা পাবে—সাহস তো কম নয়! এখনি একে বাগানের পিছনে মুরগী-হাঁসের যে ঘর আছে সেখানে বন্ধ করে রাখো।

আদেশ পেয়ে সকলে মিলে ধরে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে সেখানে

বন্ধ করে দিল। খেঁকশেয়াল আর বুনো শূয়োর তাদের বন্ধুর অবস্থা দেখছিল—সঙ্গে সঙ্গে তারাও সেই ঘরে গেল। ঐ রকম ময়লা নোংরা ঘরে চারি দিকে হাঁস-মুরগীর মাঝে বসে মেয়েটি কাঁদতে লাগলো। এত কষ্ট করে এসেও তার কিছু হলো না।

খেঁকশেয়াল রাগে ফুলছিল মেয়েটির কান্না দেখে। একে একে যত হাঁস-মুরগী ছিল সবগুলোর ঘাড় মটকে মেরে ফেললে। তাদের চীৎকারে লোক-জন ছুটে এসে কাণ্ড দেখে প্রাসাদে খবর দিলো। ধনী লোক রেগে গিয়ে আবার আদেশ দিলেন—ওকে ভেড়াদের ঘরে বন্ধ করো।

আবার দুঃখ বাড়লো মেয়েটির। দুর্গন্ধে বমি আসছে, চারি দিকে ঐ রকম ভেড়ার পাল নিয়ে কেউ থাকতে পারে? ছোট সিং দিয়ে মেয়েটিকে মারতে থাকে। ভয়ে সে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বুনো শূয়োর এ সব দেখে থাকতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রেগে গিয়ে সে ভেড়ার পালকে মারতে আরম্ভ করলো। একে একে সবগুলোকে শেষ করেও তার রাগ যায় না। এখন যদি সে ধনী লোককে পায় তো টুঁটি টিপে ধরে।

প্রাসাদ থেকে খবর এলো, দাও আগুন জ্বালিয়ে। খোঁড়া মেয়েটাকে পুড়িয়ে মারো।

আদেশ পাওয়া মাত্র চারি দিকে হুস্ হু করে আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগলো। শুধু খোঁড়া মেয়েটির ঘর নয়, আশে-পাশে আগুন ছড়িয়ে ক্রমশঃ প্রাসাদে আগুন লেগে গেল। চারি দিকে ধূ-ধূ আগুন জ্বলছে!

খোঁড়া মেয়েটি আগুনের মধ্যে বসে হঠাৎ তার বন্ধুকে মনে করলো। কি ভয়ঙ্কর আগুন, নদী-বন্ধু, কোথায় আছ আমাদের বাঁচাও।

হঠাৎ সোঁ-সোঁ আওয়াজ হতে লাগলো—কোথা থেকে যেন প্লাবন এসে গেল। জল, জল আর জল। অথৈ জল!

কেবল মাত্র তিনটি প্রাণীকে বাদ দিয়ে সারা সহর, গ্রাম, মানুষ বা অন্য প্রাণী যা ছিল সব ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

* * * *

নতুন সহর গড়ে উঠেছে। দীন-দুঃখী কেউ ফেরৎ যায় না। আবার বিরাট প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে সহরের বুকে। নতুন প্রাসাদে, বিপুল ধনভাণ্ডার আর বিশাল রাজধানীর অধীশ্বরী সেই খোঁড়া মেয়েটি। কিন্তু তার দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে, তার পা দু'খানি সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তার বন্ধুরা তার সঙ্গেই বাস করছে—তাদের সে ভোলেনি।

গল্প হলেও সত্যি

নীরজ বিশ্বাস

অনেক হাসির গল্পই তোমরা শোন। এবারে তোমাদের যে গল্পটা বলব তা' অনেকটা সত্যি। বিরাট কোচবিহার রাজপ্রাসাদ। দু'ধারে দুটো ততোধিক বিরাট দরজা। সামনেকার দরজাটি হোল 'সিংহদ্বার'। ওটা দিয়ে ভেতরে ঢোকা চলে না। দিন-রাত বুক ফুলিয়ে মিলিটারী সেপাই বন্দুক নিয়ে এধার ওধার করছে আর গোঁপে চাড়া দিচ্ছে; যেন দুনিয়ার সব-কিছুই তাদের কাছে নস্যাৎ।

পেছনের অপেক্ষাকৃত ছোট দরজাতেও অমনধারা সেপাই মশায় রয়েছেন। তবে এই দরজা দিয়ে লোক চলাচল করে। দিনের বেলাতে সেপাই সাহেব বিশেষ কিছু বলেন না কিন্তু সন্ধ্যে হলেই তার সামনে গিয়েছ কি—অমনি বন্দুক উঁচিয়ে—হুকুমদার, হোল্ট! (who comes there, Halt!) তুমি বলেছ বন্ধু (friend) তবেই ছাড়া, নইলে এই গুলী ছোটে কি অই ছোটে!

এ-হেন সেপাই সাহেবদের বিদ্যার দৌড় শুনবে? এঁরা হচ্ছেন 'ক' অক্ষর গোমাংস। অর্থাৎ অই দু' একটা ইংরেজী বাত মুখস্থ রেখে সময় মত কাজে লাগানই ছিল এদের কাজ। রাজার সহকারী হলেন A. D. C-রা। রায় আর ঘোষ হলেন দু' বন্ধু। রাজার খাস কামরাতে এঁদের গতায়াত। কিন্তু এঁদেরও রাজপ্রাসাদে ঢোকবার আগে ওই সেপাই সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হয়। ঘোষ সেদিন রায়কে বললেন—মিঃ রায়, আজ একটা মজার কাণ্ড দেখবে? রায় বললে—তাতে আর আপত্তি কি?

তাঁরা দু'জন চললেন পেছনের রাজ-দরজায়। রাত হয়ে গেছে। সেপাই-এর সামনে যাওয়া মাত্রই খেড়ে গলায় প্রশ্ন এলো—হুকুমদার, হোল্ট! ঘোষও গম্ভীর হয়ে বললেন We are Elephants (আমরা হাতী) সংগে সংগে সেলাম দিয়ে সেপাই সাহেব বললেন—পাস্ থ্রু, (Pass through) ঘোষ আর রায় গেট্ পেরিয়ে রাজবাড়ীতে ঢুকে হাসিতে ফেটে পড়লেন। আসলে কিন্তু সেপাই মুখ দেখেই Pass through বলে দিয়েছিল। ওঁরা কি উত্তর করলেন—তা বুঝেও দেখলেন না এই সেপাই মশাই। আসলে অমনি ছিল সব সেপাইরা।

ছড়া

মৃদুল নিয়োগী

"চোর ধরেছি কাল"—
বললে বাবুলাল,
"ব্যাটা মারে হাড় ভেঙ্গেছি, ভেঙ্গেছি তার গাল,
নাক, মুখ, চোখ একেবারে হোয়ে গেছে লাল,
চুরি করার মজা কেমন বুঝছে তারই কান।
বললে কি না, সবুর সবুর সবুর ওগো বাবু—
বুদ্ধি তোমার নাই কিছু নাই একেবারে জবু,
অমন কোরে মারতে আছে? খেয়েছি যে সাবু—
মরে গিয়ে ভূত হোয়ে যে কোরবে তোমায় কাবু!"

সত্যি সত্যিই তাজা !
কারখানা থেকে দোকানে দোকানে চট্‌পট্‌ বিলি করার নিখুঁত ব্যবস্থা থাকায় ব্রুক বণ্ড চা বাগান থেকে সদ্যতোলা চায়ের মত তাজা থাকে।
ষোলআনাই খাঁটি !
মোড়কে পুরে সীল ক'রে দেওয়া হয় ব'লে ধুলো-বালি কিংবা ভেজাল মিশবার ভয় থাকে না।
Brooke Bond Tea
Brooke Bond
Tea
বুঝেসুঝে কিনুন ও পয়সা বাঁচান !
ভুলে যাবেন না যে ব্রুক বণ্ড চা কিনলে দামের তুলনায় অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন।
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে কেনেন !

শ্রীমতী লিজেল্ রেম

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

কেদারনাথ

পিছন ফিরে তাকাবার অবসর যে কোন দিন আসবে, নিবেদিতা আগে এ-কথা কখনও ভাবেননি। এবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখলেন, বর্তমান হতে বিচ্ছিন্ন সে-জীবন খরস্রোতা বিশাল নদীর মত বয়ে চলেছে। বুকে তার ভেসে চলেছে রঙ-বেরঙের পানসি, ধুলা-কাদায় নোংরা কিস্তি ; জেলেদের গান আর খেয়া-ঘাটের চীৎকারের সঙ্গে গোধূলি আলোয় ভেসে আসছে নদীকূলের সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা গৃহ-কোণের শঙ্খধ্বনি, কাঁসর-ঘণ্টার রেশ। গুরুর পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেছেন নিবেদিতা, সে কত কাল! তাঁর আলোকে চোখের আড়াল হতে দেননি পলকের তরে, নিজের ক্রম-বিকশিত ব্যক্তিত্বের পরকলায় তাকে বিচ্ছুরিত হতে দিয়েই খুশী রয়েছেন। তার পর হঠাৎ এক দিন নিবেদিতাকে নিতে হল নেতৃত্বের দায়। বিরাট বিপ্লবের মাঝে তাঁর কর্তব্য নিবেদিতা ঠিকই করে গেছেন। বিদ্যুৎ-গতিতে তাঁর কাজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র, ফল ফলেছে প্রচুর। সে সব এবার চুকেছে।

নব-লব্ধ মুক্তির আলোয় জীবন বদলে গেল নিবেদিতার, তিনি যেন আর-এক মানুষ হয়ে গেলেন। এমনি অবস্থায় স্বামীজিও ছুটিই চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন শুধু মায়ের কাছে থাকতে। সন্ন্যাসীর সেই করুণ আবেদন নিবেদিতার আজও মনে পড়ে। শিশুর মত সহজ সুরে বলতেন, 'যেখানে জনমানবের সাড়া নাই, সেই ঘোর অরণ্যে মাকে নিয়ে থাকতে সাধ যায়!' নিবেদিতাও তেমনি শিশু হয়ে গেছেন। মায়ের এই প্রসাদই তো ব্যাকুল হয়ে চেয়েছেন এত কাল। আর বোঝবার সাধ্য নাই। এবার অন্তরে এসেছে সেই প্রসন্নতা। এত দিনের সব দুঃখ সব আয়াস ভুলেছেন, আনন্দের উৎস খুলে গেছে যেন।

ভক্তিনম্র চিত্তে সদানন্দের আশীর্বাদ চান নিবেদিতা। কয়েক মাস ধরে স্বামী সদানন্দ জ্বরতপ্ত দেহে নানান উপসর্গ পুষে চলেছেন। শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, শক্তি নিঃশেষিত-প্রায়। গাল ভেঙে গেছে, অথর্ব বৃদ্ধ স্পর্শকাতর দেহ-মন নিয়ে পড়ে আছেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তাঁর এ-দশা দেখে ভারী দুঃখ পেলেন নিবেদিতা। সদানন্দ ছিলেন উত্তর-বাংলার এক গ্রামে, নিবেদিতা গিয়ে দেখেন, আরাম-আয়েসের কোনও ব্যবস্থা নাই সেখানে। স্কুলের পাশে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঁকে নিয়ে এলেন। তৈজসপত্র বলতে ঘরের মেঝেয় তিনটি মাটির ভাঁড়। শোবার জন্ত একটি চারপাই আছে, একটা দড়িতে থানকয়েক কাপড় ঝুলছে। তবে জানালা দিয়ে নিবেদিতার বাগানের সবুজ গাছপালা দেখা যায় ইউরোপের মধ্য যুগের মোহান্তরা মঠের খুপরিতে এমনি করেই মরতেন, মঠাধীশের রাজবেশ খুলে ফেলে আত্মার নিরাবরণ নগ্নতাকে বরণ করতেন, চুণকাম-করা খালি দেয়ালে দেখতেন, সংসারের বিক্ষুব্ধ প্রবৃত্তির ছায়া-নৃত্য। নিবেদিতা লক্ষ্য করেন, সদানন্দ গেরুয়া ছেড়েছেন, ছেড়ে দিয়েছেন সব সাধন-কৃচ্ছ্রতা ;—কেবল আধি-ব্যাধিতে জীর্ণ দেহে প্রাণটি ধুক-ধুক করছে। কেন? নিবেদিতা ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করেন।

সদানন্দ কথা বলতেন কম—নিজের সম্বন্ধে কখনও কিছু বলতে চাইতেন না। শুকনো দুটি ঠোঁট চেপে মুখ বুজে রইলেন কতক্ষণ। শেষ কালে আগুন-ধরে-যাওয়া কাঠ হতে দপ করে যেমন জ্বলে ওঠে দীপ্ত শিখা, তেমনি তাঁর রোগক্লিষ্ট আর্তনাদে লাগল আনন্দের সুর। এই যে রোগের জ্বালা, সদানন্দের কাছে এ-ই তাঁর কৃচ্ছ্র-সাধনা। সর্বনাশা আঁধারে জড় দেহ যতই তলিয়ে যাচ্ছে ততই যে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে আত্মার দ্যুতি। হাত-মুখ যেন পালিস-করা হাতির দাঁতের মত সাদা, নিষ্প্রাণ। সামান্য একটু ছোঁয়াতেই ব্যথা লাগে। শোনা যায়, এমন অবস্থায় সেন্ট অগষ্টাইন শুধু রূপার চামচে দিয়ে একটু একটু খেতে পারতেন। সদানন্দও রূপার বাটি থেকে কেবল দুধ আর মধু খেতে পারেন, আর কিছু সহ্য হয় না।

অতীন্দ্রিয় দর্শন হচ্ছে তাঁর। এক দিন জ্বরের ঘোরে অস্ফুটে বললেন, 'কৈলাস-ভূমি'। নিবেদিতা শুনতে পেলেন। স্বামীজির কাছে গিয়ে হৃষীকেশেই সদানন্দ সন্ন্যাস পান—সেই অতীত দিনে ফিরে গেছে তাঁর মন। গুরুর সঙ্গে ঠিক কি কি কথা হয়েছিল মনে পড়ে। 'স্বামীজি, আমি কি যোগ্য? যদি পতন হয় আমার?' 'এক বার কেন একশ' বার পতন হলেও কিছু যাবে আসবে না! সেজন্ত দায়ী আমি। আমিই তোমায় বেছে নিয়েছি, তুমি আমায় নাওনি।' রোগী কি গুরুর উদ্দেশ্যে আজও হিমালয়ের পথে শরীরটা টেনে নিয়ে চলেছেন? সদানন্দ নিবেদিতাকে বললেন, 'কৈলাস-ভূমি! এই কৈলাসে গিয়েই জীবনব্যাপী তীর্থাভিযান শেষ করতে হবে তোমায়। মহেশ্বর বুঝি সেইখানে তোমার প্রতীক্ষায় আছেন।' কি বলছেন সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থেকেই সদানন্দ কথাগুলো বললেন। মুমূর্ষুর অনেক সময় এমনি অদ্ভুত ভাবে দৃষ্টি খুলে যায়। যে-ভূমিতে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর দেখা মেলে, তাঁরই সন্ধানে মানুষ যেখানে ছোটে, সদানন্দ মনে-মনে সেই দেশেরই কথা বুঝি ভাবছিলেন। তাঁর আর যাওয়ার দরকার নাই—কিন্তু নিবেদিতার যাওয়া চাই অনতিবিলম্বে। অসীম স্নেহের সঙ্গে নিবেদিতার দিকে তাকান সদানন্দ! আর তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নাই। দু'বছর আগে বিবেকানন্দ একদিন তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন, নির্দেশ করেছিলেন শিষ্যের গতিপথ

এবার নিবেদিতাকে কৈলাসে গিয়ে তাঁর কথা বলে আসতে হবে গুরুকে, তবেই তিনি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে পারবেন।

নিবেদিতাও হিমালয়ের ডাক শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন বোসেদের সঙ্গে জড়িত, নিজের কোনও পরিকল্পনা নাই। শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটিতে পাহাড়ে যাওয়ার প্রস্তাবটা জগদীশ বসুই করলেন। মে'র প্রথমে স্ত্রী আর ভাগনেকে নিয়ে ওঁরা রওনা হবেন। হিমালয়ের মহাতীর্থ কেদারনাথ আর বদরীনারায়ণের পথে যাবেন ওঁরা। ব্রাহ্মসমাজের লোকে যে হিন্দুর তীর্থে যাওয়া নিয়ে সমালোচনা করবে এ জগদীশ বসু ভাল ক'রেই জানতেন। কিন্তু এ-যাত্রায় তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য আর নৃবিদ্যার উপাদান সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন। কথা হল, নিবেদিতা তাঁর বন্ধু-বান্ধবের কাছে এ-অভিযানের আসল উদ্দেশ্যটা গোপন রাখবেন।

যাত্রীরা হরিদ্বারে কয়েক দিন কাটালেন। তীর্থযাত্রীরা এইখানেই গঙ্গা পার হয়ে বদ্রীনাথ অভিযানের প্রথম পর্ব শুরু করে। পথ-ঘাট চটি-সরাই ভাল রকম জানে, কুলি পাল্কি মাল-বওয়া খচ্চর ঘোড়া ইত্যাদি যোগাড় করতে পারবে এমন একটি দিশারী খুঁজে বার করা হল। রাস্তায় আধা দোকান আধা সরাই গোছের অসংখ্য চটি আছে। চটিতে চাল ডাল কিনে ধর্মশালায় সব বন্দোবস্ত করবার জন্য একজন রাঁধুনীকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

নিবেদিতা তাঁর মুক্তির আনন্দ প্রাণ খুলে অবাধে ভোগ করতে লাগলেন। কারও কাছে তাঁর দাবি-দাওয়া নাই, দরকারও নাই কিছুর। গঙ্গার ঘাটে স্তোত্রমন্ত্রের কলধ্বনি! নিবেদিতা বসে বসে শোনেন। দেবতার নামে তিনিও অচিরে ঐ সুরে সুর মেলাবেন যে! শিব! শিব! নিবেদিতাও যে তাঁর পানে চেয়ে আছেন উর্ধনেত্রে, চেয়ে আছেন শিবধাম কৈলাস তীর্থের দিকে—চান তাঁর সামীপ্য, তাঁর সাযুজ্য। শঙ্খ বেজে ওঠে যার ফুৎকারে তাকে তো সে চেনে না। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে মেয়েদের ভিড়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তবপাঠ চলেছে, নিবেদিতাও যোগ দেন তাতে। যা করছেন তার তাৎপর্য তার গুরুত্ব হঠাৎ সেই রাত্রে নিবেদিতা বুঝতে পারলেন। এই তীর্থযাত্রাই জীবনের একমাত্র সঙ্কল্প তাঁর, শিবার্চনার জন্য আটচল্লিশটি দিন গাঁথা হবে অক্ষমালার মত দিন-রাত্রির আবর্তনে অবিরাম চলবে শিবনামের অজপা। এক খাবল ধুলো তুলে নিয়ে হাত মুঠো করেন নিবেদিতা। তিনিও ঐ ধুলি-মুঠি, ভূতপতি মহেশ্বর শুদ্ধ করেছেন তাঁর ভাষা, রূপের বন্ধন হতে দিয়েছেন মুক্তি। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখছেন নিবেদিতা, দেখছেন তাঁর জ্যোতির্মহিমা। তিনি অদ্বিতীয়, আবার ভূতে-ভূতে তিনিই বিরাজমান। ঐ যে তাঁর পরম ধাম, সেখানে আর কিছুই দেখা যাবে না। আত্মার নিরাবরণ শুচি-সৎ সত্তা অনুভব করেন হৃদয়ে, যা গেছে আর যা আসবে দুয়ের মাঝখানে যেন অস্তিত্বের মণিবিন্দু তিনি···

ওঁদের দলবল রওনা হল। মেয়েরা পাল্কিতে, আচার্য বসু আর তাঁর ভাগনে অরবিন্দ চললেন ঘোড়ার পিঠে। পাঁচ দিন পরে শ্রীনগর পৌঁছলেন সবাই, তার পরেই বিপৎসঙ্কুল পার্বত্য-পথের চড়াই-উৎরাই। সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে সকালবেলা নিবেদিতা পায়ে হেঁটেই চলেন। তাঁদের মন্ত্রধ্বনিতে নিবেদিতার প্রার্থনা সহজ হয় সুন্দর হয়। কেদারনাথের পাহাড়ে-পাহাড়ে শিবস্তোত্রের সুর বেজে ওঠে। অদ্ভুত সে-স্তোত্রের ধ্বনি-গাম্ভীর্য, মনে হয় যেন নেহাইয়ের 'পরে হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সবলের প্রতিস্পর্ধা, উড়ে যাচ্ছে দুর্বলের ভীরুতা। 'ভূতেশ ভীতভয়-সূদন মামনাথং সংসারদুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ!' অবিরাম ধ্বনি উঠছে, 'কেদারনাথ স্বামী কী জয়! নমঃ শিবায় পুণ্যায়···আনন্দভূমি বরদায়, তমোহরায়··· দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়···ভবসাগরতারণায় কালান্তকায়···'

জগদীশ বসুর ভাগনে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিবেদিতাকে চেয়ে দেখেন। কলকাতায় যে-নিবেদিতাকে দেখেছেন তাঁর সঙ্গে এঁর কত তফাৎ! কোন্‌টা ওঁর স্বরূপ? চটিতে বিশ্রাম কালে থাকার সঙ্গে বিজ্ঞানালোচনা করেন, কত কূট প্রশ্ন তোলেন; আবার বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় মগ্ন হয়ে যান তুঙ্গম। এদিকে আরামের আয়োজন খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছেন, বোসেদেরও তদারক করছেন—কিন্তু কতক্ষণের জন্য? আসলে এ সব কোন কিছুতেই তাঁর মন নাই। অরবিন্দের কাছে আরও আশ্চর্য লাগে,—আকাশে-বাতাসে শিবনামের রোল উঠেছে, কিন্তু নিবেদিতা কখনও শিবের নাম মুখে আনেন না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের মত উনিও কি সবার অগোচরে শিবের অর্চনা করেন? একদিন হঠাৎ দেখেন, নিবেদিতার ললাটে বিভূতির চর্চা! দেখে ভাল লাগল না। শেষে এই নিয়ে প্রশ্ন করলেন। নিবেদিতা বললেন, 'সকালে আমার সঙ্গে একদিন পথ চল দেখি, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করো না। প্রশ্ন নিরর্থক। শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রীতির দৃষ্টিতে আশ-পাশের সব-কিছু দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ, পথে যা-কিছু দেখবে সবই আত্মনিবেদনের এক একটি মুদ্রামাত্র। দেখছ না কি অখণ্ড মণ্ডলাকারে পরমগুরু শিবই এখানকার অধীশ্বর? তাঁকে এখনও চেননি তুমি। এখন চিনতে চেও না। আগে গুরু খুঁজে নাও, দিশারী হয়ে তিনিই জীবনের পথে ধাপে ধাপে তোমায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমায় স্নেহ করি। কেমন করে গুরুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয় একটু শিখিয়ে দেব? অন্তরকে নিস্তরঙ্গ নিষ্পন্দ করে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হয়—কোনও ভাবনা থাকবে না তখন, কোনও বন্ধু না, আত্মীয় না, আর কোনও গুরুও না। অর্জুন দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সামনে 'শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' বলে। অতীতের কথা ভুলে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর গীতা শোনবার জন্য। এমনি করেই দাঁড়াতে হয় তাঁর সামনে। গুরুর বাণীই গীতা। মনে রাখতে হয়, এক হিসাবে তিনি মানুষ নন, তিনি সত্যস্বরূপ। তাঁর মাঝে সেই সত্যকেই দেখতে হবে। আবার আর এক হিসাবে তিনি মানুষ বই কি আমাদেরই একজন; আমরা ভালবাসি তাঁকে, যদি তাঁর সেবায় লাগে এ-জীবন উজাড় করে ঢেলে দিই তাঁর পায়ে।' (১৯০৯ এর ১০ই জুন অরবিন্দ ঘোষকে লেখা চিঠি)।

যাত্রীদের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে নিবেদিতা পাহাড়-পথে চলেন। পথ কোথাও উৎরাই হয়ে নেমেছে উপত্যকায়, চড়াই হয়ে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ে, আবার চালু হয়ে নেমে এসেছে! যত উঁচুতে উঠতে হয় পথ ততই বন্ধুর। এই তো দেবযান!

একদিন সকালে নিবেদিতা দেখেন, খাদের ধারে একটি মেয়ে কেমন অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগোতেও পারে না, পিছোতেও পারে না—অতলস্পর্শ শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়

হয়ে গেছে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠতেই নিবেদিতা দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, সরিয়ে আনলেন সেখান থেকে। অনেকক্ষণ নিবেদিতার পাশে-পাশে চলতে লাগল মেয়েটি। ভয়টা মন থেকে মুছে যাওয়ার পর স্বচ্ছদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। তারপর যাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দুজনে গেয়ে উঠলেন, 'কৈলাসশৈল-নিবাস বৃষাকপে হে মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস··· সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ।'

অক্ষম আর বৃদ্ধেরা শুধু বিশ্বাসের বলে এগিয়ে চলেছে, ত্যাগীশ্বরের সামীপ্য লাভের আশায় বরণ করছে দারুণ পথক্লেশ। প্রত্যেক যাত্রীর বুকে একটি মান্দার ফুল—ওটি তাদের সারা জীবনের সাধনার প্রতীক, বুদ্ধির অভিমান আর ক্ষমতাগর্ব পরিহারের চিহ্ন। কিন্তু সে কি সহজ ত্যাগ! আত্মার গূঢ় মহিমা যেন স্ফটিকোজ্জ্বল উপত্যকার মত নিরাবরণ শোভায় ঝলমল করছে। চোখ-ধাঁধানো আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে চিত্তের কলুষ-কালিমা, পুড়ে যাচ্ছে মনের যত গরল। কেদারনাথের পথে যেন জীবনের নব অভ্যুদয় দেখা দিল। ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে যাত্রীরা লাঠি তুলে পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে বলে, 'ঐখানে যেতে হবে। ঐখানে আছেন প্রাণরূপী মহালিঙ্গ। মরণের পারে মহাজীবনের অধিকার শিবই দেন! দেন তাঁর শিবযোগ, দেন বরাভয়! নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়!'

সপ্তাহের মধ্যে সোমবারটাই সব চেয়ে প্রশস্ত—একটা সোমবারে কেদারনাথে পৌঁছবার জন্য জগদীশ বোস আর নিবেদিতা প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। পৌঁছলেন বিকালে। মন্দির তখন বন্ধ, সন্ধ্যারতির সময় খুলবে। পাহাড়ের মধ্যে পাখির বাসার মত ছোট্ট গ্রামটি, একটি মাত্র রাস্তা তার—ভিড় করে যাত্রীরা সেখানে সন্ধ্যার অপেক্ষায় বসে থাকে। গোধূলির আকাশে তারা ফুটে ওঠে, পাহাড়ের চূড়ায় বরফ ঝক ঝক করে। হঠাৎ ঠেলাঠেলি ছুটাছুটি করে মন্দিরের দিকে ছুটল সবাই, ঘণ্টা বেজে উঠেছে! উন্মত্ত জয়ধ্বনি ওঠে, 'জয় কেদারনাথ স্বামী কী জয়।' চেঁচামেচি করে সবাই সামনে এগিয়ে চলে। ভিড়ের ধাক্কায় কখন নিবেদিতা রাতের আঁধার থেকে এসে ঢুকলেন অন্ধকার মন্দিরগর্ভে।

কিছুই দেখতে পান না সে অন্ধকারে। ঘামে-ভেজা মানুষগুলো ঠেসাঠেসি দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলছে এইটুকু কেবল অনুভব করেন, একটু দূরে পাথরের উপর টপ-টপ করে জল পড়ছে শুনতে পান। এখানে ওখানে বাতি জ্বলছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। নিজেকে লুটিয়ে দেবার উজাড় করে দেবার একটা আকুতি আর প্রার্থনার ব্যাকুল আবেগ উথলে উঠছে কেবল।

স্তব্ধ চিত্তে নিবেদিতা দাঁড়িয়ে থাকেন নিস্পন্দ হয়ে। কতক্ষণ গেল এমনি ভাবে। কান পেতে শোনেন নিজের বুকের উদ্দাম স্পন্দন। ওই শিবশূল উৎখাত করছে জড়পিণ্ডটাকে, অবিরাম হানায় ভেঙে পড়ছে তাঁর দেহের কাঠামোটা। তালে-তালে উঠছে অনাহত ধ্বনি 'হংসঃ হংসঃ'—অমনি শ্বাসের ছন্দস্পন্দে উচ্চারিত হচ্ছে 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্'। মহামরণের তুহিনে অন্তর জমাট বেঁধে গেল তাঁর, তারপর জ্বলে উঠল বহ্নিজ্বালা। সর্বাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন নিবেদিতা।

সময় বয়ে চলে। নিরুদ্ধচিত্ত নিবেদিতা কত কাল রইলেন সেখানে। বর্তমানের একটি ক্ষণে সংহত হয়েছে নিত্যকাল। কালের প্রবাহ নিথর—ধূসর ভস্মশেষ আর ধূপের ধোঁয়ায় হারিয়ে গেছে সব কিছু। মুহূর্তের জন্য নিবেদিতার যোগিনী-হৃদয় জেনেছে তাঁকে; যিনি তৎ সৎ।

উঠে যখন দাঁড়ালেন নিবেদিতার মুখে নতুন ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা দিব্যোন্মাদের শৈথিল্য অনুভব করছেন, হাঁটতে গিয়ে টলে পড়েন। ধীরে ধীরে দেশকাল-পাত্রের বোধ ফিরে এল—এল আজ কালের হিসাব। মনের ভাবনাগুলো পাল্লা দিয়ে ছুটেছে, আবার আপনা-আপনিই দেবভাবনায় গুটিয়ে আসছে। নিবেদিতা কাঁদেন। 'আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এই যে ফুটে উঠল তোমার আদিত্যহৃদয়ের স্বর্ণকমল···হে মহাদেব! গভীর আনন্দে একে বুকে বয়ে চলেছি নীরবে···হে দেবতা, তুমি কি দাঁড়িয়েছ আমার সামনে এসে? আত্মমন্থনের ফলে আজ সত্যই কি মূর্ত হয়ে দেখা দিলে?'

দেবতার সঙ্গে আবার এই একাত্মবোধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নিবেদিতা; তাঁর সকল বন্ধন এলিয়ে পড়ে। প্রার্থনা তাঁর পূর্ণ হয়েছে, বর পেয়েছেন তিনি। শিব তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন চাঞ্চল্য হতে, দিয়েছেন নৈষ্কর্ম্যের অধিকার। অনুভব করেন, কালী তাঁর সত্তায় লীন হয়ে গেলেন এবার—একটা নিস্পন্দ অস্তিত্ব, শক্তির নৈরাত্ম্য রূপ। দশ বছর ধরে নিবেদিতা জেনে এসেছেন এই মুহূর্তটি একদিন আসবেই তাঁর জীবনে। দুঃখ সাধনার কী গভীর সার্থকতা। মনে পড়ে আলমোড়ায় সেই চোখের জল, ভারতকে নিবিড় ভাবে ভালবাসবার সূচনা হয়েছিল সেদিন। আর অমরনাথ? জীবনের এই শেষ তীর্থ-পরিক্রমার আভাস সেই দিনই তো পেয়েছিলেন! '···স্বামীজির ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য মায়ের পূজায় শক্তি অর্জন করতে হয়েছে আমায়, কিন্তু এমন কোনও শাশ্বত মুহূর্ত এ জীবনে আসবে যেদিন তাঁর ইচ্ছার ঘটবে অবসান··· এবার সব ছেড়ে দিয়ে আরাধনা করছি মহেশ্বরের···ভালবাসছি শুধু তাঁকেই।' (১৯০০ সনের ১৮ই জানুয়ারির চিঠি)

মা চলে গেলেন তাঁকে ছেড়ে—স্পষ্ট বুঝতে পারেন নিবেদিতা। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেন, আবছা হয়ে এল মায়ের রূপ···আঁধারকে ঘিরে তিনি এবার শুধু শক্তিরূপিণী···শক্তিহীনার অঞ্জলি শুধু তাঁকে দেবে স্তব্ধ প্রশান্তির উপচার···সাক্ষিস্বরূপিণী মা চেয়ে দেখবেন শুধু দ্বন্দ্ববোধের উত্তাল বিক্ষোভ।

কিন্তু নিবেদিতার কি হবে? সব সাধ, সব আসক্তি আর সুখস্মৃতি মুছে গেছে! এই শিবভূমিতে মাটিও যেন অন্তর অবরুদ্ধ শক্তির নিমেষে নিথর হয়ে গেছে, এখানে তাঁর ঐটুকু আর্তিও যে অনাচার। ঝড়বৃষ্টিতে জীর্ণ পাহাড়ের নগ্ন শিলাকঙ্কালগুলিও যেন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া নির্বিকার মূর্তি কতগুলো! আকাশের ঐ ডানা-মেলা, ঈগল আর মাটির বুকে এই ভাঙাচোরা মন্দির যেন, এক অখণ্ড দৃশ্যেরই একটা অংশ। পিছন ফিরে চাওয়া নয়···নামহীন সত্তার উল্লাস শুধু আছে··· আছে আসমুদ্র হিমাচল আবর্তিত মেঘচক্রের উৎস এখানে, আছে ভাগীরথীর উৎস-মুখ। অমরনাথে নিয়ে গিয়েছিলেন গুরু, তাঁর পুণ্যস্মৃতি নিবেদিতা ভুলে গেলেন—মনে পড়ে না তাঁর পায়ে নিত্য জবার অঞ্জলি দেওয়ার কথা। মনে মনে এত দিন যাঁদের বড় বলে

পূজা করেছেন, ধ্যানে দেখেছেন যাঁদের একদিন গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়ে দিলেন সে-দেবতাদের। রূপের আর কোনও সার্থকতা নাই নিবেদিতার কাছে।

সংকল্পিত ব্রতের চব্বিশ দিনের দিন এই বিসর্জনের আলোক-চ্ছটায় নিবেদিতার মন-প্রাণ ভরে উঠল। এবার আবার পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে নিত্য সত্যের পরম সৌষম্যের পক্ষপুটে দিনযাপনের পালা।

সুন্দর সুন্দর দৃশ্য যাত্রাপথের খুঁটিনাটি আর যাত্রীদের অপরূপ শোভাযাত্রা দেখতে এত মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন বোসেরা যে নিবেদিতার আচার ব্যবহার মোটেই কেউ খেয়াল করেননি। শ্রীমতী বসু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কাজেই অবতরণের পর্বটা স্বচ্ছন্দ হল না। তিব্বতের রাস্তা ধরবার জন্ত তাড়াহুড়া করতে হল ওঁদের। ও-পথে বড় বড় ডাকবাংলো আছে, সেখানে শ্রীমতী বসু বেশী আরামে থাকবেন। এর পর বদ্রীনারায়ণে ওঠার পালা, কেদারনাথের জুড়ি এই মন্দিরের দেবতা-ভগবান বিষ্ণু। কেদারনাথে জাগে ত্যাগের আকৃতি—এখানে সঙ্কীর্ণ গর্ভগৃহে ভক্ত-ভগবানের নিবিড় যোগ। মালা জপতে-জপতে ভোর-ভোর যাত্রীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করে ডুবে যায় দেবতার রূপে···মাধুর্যমূর্তি বদ্রীনারায়ণ, এ-মন্দির তাঁর প্রেম আর করুণার মূর্ত প্রতীক, মৃতের উদ্দেশ্যে এখানে তর্পণ করলে সে পায় দেবতার অনন্তজ্যোতির প্রসাদ। ফুল ছড়িয়ে যাত্রীরা ধ্বনি দেয়, 'জয় বদ্রীবিশাল কী জয়!' নিজেকে উজাড় করা পূজানিবেদনের আতপ্ত আবেগে নিবেদিতার তীর্থযাত্রা শেষ হয়ে আসে।

ফিরে আসবার পথ কম দীর্ঘ নয়। ২১শে জুন বিকালে, পর্যটকেরা কোটদ্বারায় পৌঁছে নীচে নামবার ট্রেণ ধরলেন। ঠিক সেই দিন নিবেদিতার ব্রতের আটচল্লিশ দিন পূর্ণ হল। সঙ্কল্প তাঁর সিদ্ধ হয়েছে।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

শেষ কাজ

অমরনাথ থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আর এবারকার তীর্থযাত্রা সেরে ধ্যানমৌনে ডুবে গেলেন। জীবনের এ-দুটো অধ্যায়ে বিরোধ নাই কোনও। কাজের পালা সাঙ্গ হয়েছে। এবার ফসল কুড়াবার সময় এল। নিবেদিতা গিয়ে দাঁড়ালেন সারদা দেবীর দুয়ারে। তাঁর আশীর্বাদ নিতে হবে।

জীবনে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন নীরবে আপনাকে গুটিয়ে আনতে হয়, ঊর্ধ্বাভিসারী অন্তরাত্মা তাতে পায় উদ্দীপনা। কর্মযোগী আর ধ্যানরসিক—শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুই জাতের ছেলেরাই জীবন দিয়ে এ-রহস্য জেনেছেন। মেয়ের দিকে একবার তাকিয়েই মা বুঝে নিলেন জীবনের একটা পর্ব পার হয়ে এসেছেন নিবেদিতা। তার পর সরল কথায় নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলে নিবেদিতা যা চাইছিলেন তারই সন্ধান দিলেন। আমার কুড়ি বছর বয়স। ঠাকুর এক দিন ডেকে পাঠালেন। ভরা বসন্ত তখন। বললেন, 'বাগানে একটি ছোট ঘর আছে। ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। ধ্যান আর জপ করবে। এক দিন বন্ধ দুয়ার খুলে যাবে, 'মা' বলে অনেকে ভিড় করবে তোমার চার পাশে।'

ধ্যান আর জপ···এখনও বহির্জীবনের তরঙ্গ নেচে ফিরছে তাঁকে ঘিরে। প্রাণের গোপন স্পন্দনে ছন্দিত শক্তিগর্ভ স্থাণুত্বের সন্ধানে ব্যাকুল নিবেদিতা! কিন্তু নিরালায় বসে ধ্যান জমাবার আগে অনেক কাজ শেষ করতে হবে তাঁকে। পরের কটা মাস কর্মের জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টায় গেল।

প্রথমেই তাঁর স্কুল। কাজে ওখানকার সঙ্গে তাঁর যোগ নাই, কদাচিৎ কখনও পাঠ দেন মেয়েদের—কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে নিবেদিতাই স্কুলটির অবলম্বন। টাকার অভাবে ১১০৯ সনে চার মাসেরও বেশী স্কুল বন্ধ ছিল, ১১১০ সনে ছিল পাঁচ মাস। ক্রিষ্টিনকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা আমেরিকায় ডেকে নিয়ে গেছেন—কখন ফিরবেন ঠিক নাই। একটা সংকট কাল। নিবেদিতা ঠিক করলেন প্রথম দফায় যে ব্রহ্মচারিণীদের তিনি নিজে তৈরী করেছিলেন তাদেরই হাতে স্কুলটি একেবারে ছেড়ে দেবেন। প্রথমটা একটু টাল-মাটালে গেল। কিন্তু সন্তোষিণীর হাতে পড়ে শীগগিরই স্কুলটিতে হিন্দু জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল, দ্রুত উন্নতি দেখা দিল। ক্রিষ্টিন ফিরে আসবার আগেই স্কুলটি সপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেল। নিবেদিতার আর কোনও দায় রইল না—প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে তাঁর নামটাই শুধু রইল। অন্যান্য ব্রহ্মচারিণীরাও একযোগে চেষ্টা করে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আলোচনা করতে লাগল।

এই হস্তান্তরের ব্যাপারটা নিবেদিতার জীবনের সব চেয়ে করুণ অধ্যায়। লোকের অজানাও বটে। বোর্ডিং-স্কুল করবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না নিবেদিতার, কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্য রকম হয়ে গেল। ছাত্রীদের মধ্যে যে ক'টি বালবিধবা ছিল তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন তিনি। একবার বাড়ি ছেড়ে গেলে সামাজিক প্রথানুযায়ী সে-মেয়েকে পরিবারের লোকেরা আর গ্রহণ করে না। এটা জানতেন বলে নিবেদিতা মাত্র গুটি-কয় মেয়ের ভার নিয়েছিলেন; কারণ তাদের দায়টা সম্পূর্ণই তাঁর উপর বর্তাবে।

প্রথমটি এসেছিলেন ষোল বছর বয়সে। থান-পরা, নেড়া-মাথা, মুখখানি ঘোমটায় ঢাকা। এমন ছোটখাট এমন দীন-দুঃখিনী দেখতে ওরা। তার পর যারা এল তাদের বয়স আরও কম। স্বামী কি বুঝুক না বুঝুক, স্বামী মারা গেলেই তাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। নিবেদিতার স্কুল তো তাদের কাছে স্বর্গ।

ভিতর-আঙিনার ধারে একটি ছোট ঘরে নিবেদিতা যেদিন তাদের ঠাঁই দিলেন, সেই দিনই 'মাতৃ-মন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা হল। হিন্দু মেয়েদের মধ্যে সন্তোষিণীই প্রথম নিবেদিতার আদর্শে জীবন উৎসর্গ করেছিল। তার সতর্ক প্রহরায় এই সব মেয়ে নিষ্ঠাপুত পবিত্র জীবন কাটাতে লাগল। কঠিন নিয়ম-সংযমে বিধবাদের সন্ন্যাসিনীর মত গড়ে তুলতে হবে। ওদের চেয়েও দুর্ভাগিনী যারা তাদের সাহায্য করবার জন্ত তৈরী থাকে যেন ওরা। সারদা দেবী বাগবাজারে থাকলে সপ্তাহে দু'-একবার ওরা ধর্মোপদেশ নেবার জন্ত তাঁর কাছে যায়। কখনও-কখনও নিবেদিতাও সঙ্গে যেতেন—সে-সময় গেরুয়া পরতেন তিনি।

নিবেদিতা কারও ভাগ্য বদলে দিতে পারেন না। কিন্তু জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে শেখালেন, ওদের নতুন আদর্শের সন্ধান দিলেন। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বয়স পনরোও হবে না তার, ওঁকে বলে, 'আমি ডাক্তার হতে চাই।'

নিবেদিতা বলেন, 'হবে তুমি। খাট যদি, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

সকালবেলা যে-সব ছাত্রী* আসত তাদের দেখা-শোনা করবার ভার দিলেন এই মেয়েদের 'পরে। চোর-কুঠরির পাশে যে-ঘরে বসে ধ্যান করতেন নিবেদিতা, মেয়েরা এসেই সোজা সেখানে চলে যেত। প্রায়ই দেখত, নিবেদিতা আত্মহারা, চোখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে। মনে হত কোন্ সুদূরে চলে গেছেন তিনি! মেয়েরা প্রার্থনা করত, 'মা গো···ফিরে এসো···ফিরে এসো আমাদের কাছে···'

ওদের স্বল্প-পরিসর জীবনে সৌন্দর্য্য ও বৈষম্যের বোধ জাগিয়ে তোলবার জন্ত নিবেদিতা স্কুলে একটি বাগান তৈরী করবার মতলব করলেন। মিস ম্যাক্‌লয়েডকে লিখলেন, 'এবার একটা বাগান হবে আমাদের। আগষ্টের প্রথমেই গাছ লাগাতে পারব আশা করছি। পাট্টা সই করা হয়ে গেছে। ইচ্ছা আছে, এক টুকরো খালি জমি রাখব, তাতে কেবল ঘাস, আর চার পাশে থাকবে ফুলের কেয়ারি, বাগানের দেয়ালে তুলবে ফুলন্ত লতা···কল্পনা উদ্দাম হয়ে ওঠে আমার···ওঃ, মনে হচ্ছে কী আনন্দ যে পাব বাগানটা হয়ে গেলে। স্কুলের কোণ-ঘেঁষা এক টুকরো জমি ওটা। স্বামীজির আকাঙ্ক্ষা এত দিনে পূর্ণ হতে চলেছে। কর্মের পাত্র কানায়-কানায় ভরে উঠেছে এবার। কিছুদিন পরে সব সঙ্কল্পের অবসান ঘটবে···তার পর?···বাগানের কথা যদি বল···বাগানের মত একখানা বাগান··· তো বলি এখানকার মাটির তুলনা নাই, এ মাটি স্বর্গ। আমার এখন জিনিয়া চাই, হরেক রঙের সুইট-পী, সূর্যমুখী জাতীয় জমকাল সব ফুল···(৩১শে জুলাই, ১৯১০ সনের ১লা ও ৪ঠা আগষ্টের চিঠি)।

মাতৃ-মন্দিরের ছাত্রীরা স্কুলবাড়ির মেয়ে হয়ে গেল। নিবেদিতার সাফল্যের ভাগ যেমন নিত তারা, স্কুল বন্ধ থাকা কালে তাঁর দারিদ্র্যের অংশও তেমনি নিত। নিবেদিতা ইচ্ছা করেই ওদের 'পরে সব ছেড়ে দিতেন। বলতেন, 'কেমন করে স্কুলটির বাড়-বাড়ন্ত হবে সে খোঁজ রাখা যদি আমার কাজ না হয় তো মেয়েরা কি ভাবে আমার আদর্শকে গ্রহণ করবে তা নিয়ে ভাবাও আমার কাজ নয়, ও ওদের কাজ···'

স্বামীজির রচিত পুস্তকাবলীর সঙ্গে যোগ ছিন্ন করাটা আরও শক্ত। ইংল্যাণ্ডে বসে লেখা 'রাজযোগ' ছাড়া স্বামীজি এলোমেলো একগাদা খসড়া আর নানা ধরণের টুকরো লেখা রেখে গিয়েছিলেন। গুডউইন শর্টহ্যাণ্ডে একরাশ ভাষণ ধরে রেখেছিলেন—সেগুলোও খুব সাবধানে সম্পাদনা করা দরকার ছিল। এ কাজে যে-সাধুরা নেমেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতাও হাত মেলান। তাঁর কাজ একেবারে পাকা। নিবেদিতার উদ্দীপন রচনাভঙ্গিতে স্বামীজির সেই দেববাণী শিষ্যদের মনে পড়ত, মুগ্ধ হয়ে যেতেন তাঁরা। 'কর্মযোগে'র কাজ করে নিবেদিতা 'জ্ঞানযোগে' আর একবার তুলি বোলাচ্ছিলেন; এটি তাঁর শেষ কাজ।

গুরুর কাজ যাতে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয় এই ছিল নিবেদিতার একান্ত সাধ। যেদিন বুঝলেন আর কিছু করবার নাই, বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনাকে পূর্ণতর করতে হলে এ কাজের সঙ্গে যোগ রাখা চলে না। দুটো কাজে সঙ্গতি নাই আর। বৈরাগ্যের তীব্র সংবেগে নিজের সব সাধ বিসর্জন দিলেন নিবেদিতা। ১৯০৯ সন ২২শে আগষ্টের এক চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত সম্পাদনা করবার জন্ত মাষ্টার মশাই নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা রাজী হননি। গুরুর প্রজ্ঞাদৃষ্টির তাৎপর্য বোঝবার আর ভাষ্য করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল কিন্তু নিবেদিতা তাঁর যা-কিছু সব তুলে দিলেন 'মিশনে'র সাধুদের হাতে। ওঁরা যে বিরাট বইখানার মালমসলা যোগাড় করছিলেন তার জন্ত আমেরিকায় পাওয়া অটোগ্রাফ চিঠিগুলো নিবেদিতা ওঁদের দিয়ে দিলেন। বই-খানার নাম হবে, 'দি লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ বাই হিজ ইষ্টারন্ এ্যাণ্ড ওয়েষ্টার্ণ ডিসাইপল্‌স।' কাজ ছেড়ে দিলেও এমনি করে নিবেদিতা কাজের প্রেরণা যোগাতে লাগলেন।

নিজের লেখা নিয়ে নিবেদিতার মাথা ঘামাবার কিছু ছিল না। সে যুগে শিক্ষা-বিজ্ঞান ইতিহাস কি পৌরনীতি নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠত তারই উত্তরে অনেকগুলো প্রবন্ধ তাঁর ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীদের ওগুলো যদৃচ্ছা ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে রাখলেন। কিন্তু দিনলিপিটা সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা নিলেন। সব সময় নিবেদিতা ওটা নিজের সঙ্গে রাখতেন। নানা রকম টীকা-টিপ্পনী আর সংগ্রহ থাকত ওতে। তাছাড়া কংগ্রেসের কার্যকলাপের পিছনে ভারতবর্ষের যে রাজনীতিক ইতিহাস গড়ে উঠছিল সে সম্বন্ধে নিজস্ব মন্তব্য টুকে রাখতেন প্রতিদিন। আচার্য বসুর কাজ সম্বন্ধেও কিছু কথা ছিল। এই সব প্রামাণিক কাগজপত্রের অনেকগুলো নকল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; আসল কপিগুলো গচ্ছিত ছিল এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে। পরে কোনও হিন্দু যদি এ যুগের ইতিহাস লিখতে চায় সে ও-গুলোর সাহায্য নিতে পারবে।

পুজার ছুটিতে নিবেদিতা দার্জিলিঙে ছিলেন। টেলিগ্রামে ডাক এল। মিসেস বুল বোষ্টনে মারাত্মক রক্তশূন্যতায় মুমূর্ষু, তাঁর কাছে যেতে হবে। কথা দিয়েছিলেন, উনি যেখানেই থাকুন দরকার হলেই নিবেদিতা ওঁর দেখা-শোনা করতে যাবেন। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্ত তখনই যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হলেন।

গিয়ে দেখেন, রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে তুমুল ব্যাপার। সেই এক গুঁয়ে সারা বুল, স্বামীজি যাঁকে মা বলে ডেকেছিলেন—আজ তিনি নিজের জীবন আর অর্থ-সম্পদকে দু'-হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন। কাউকে তিনি আর বিশ্বাস করেন না। চোখে তাঁর আতঙ্কের ছায়া। নিবেদিতাকে দেখেই সে-দৃষ্টিতে করুণ মিনতি ফুটে উঠল। প্রাণপণে তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন মিসেস বুল। দিন-রাত নিবেদিতাকে তাঁর চাই—চাই তাঁর মমতা, তাঁর প্রশান্তি সে-মহীয়সী ধীরা মাতা আর নাই। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত আজ সব আলো সব ঔদার্য আর সব শুভেচ্ছা ভুলে কোথা পালিয়েছে যেন। বিকারের ঘোরে শুধু দুটি মুখের স্মৃতি তাড়া করছে তাঁকে—তাড়িয়ে দেওয়া মেয়ে ওলিয়া আর পাজি

---

* এই ছাত্রীদের অনেকেই ছিল ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। শান্তি-নিকেতনের কাজে তারাই রবীন্দ্রনাথের সহকর্মিণী।

যাওয়া ছেলে জগদীশ বসু। একজন এসে আরেক জনকে আড়াল করে, কখনও বা একাকার হয়ে যায় দুটি মুখ—পাগল করে তোলে তাঁকে। আত্মরতির তাড়নায় মা ভুলে গেছেন কেমন করে সন্তানদের ভালবাসতে হয়, তাঁর আসক্তিই পর করে দিয়েছে তাদের। এই করুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে নিবেদিতা এসে পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর চেষ্টায় ধীরা মাতার নীরস চিত্তে আবার একটু স্নেহসঞ্চার হল, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভাল হল খানিকটা। নিবেদিতা কাছে বসে ধ্যান করেন, রোগিনী কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পান তাঁর সাধন জীবনের আলো স্বামীজির দুর্মর স্মৃতি, সেই আত্মত্যাগের আনন্দ। কয়েক সপ্তাহ পরে এখন-তখন অবস্থাটা কেটে গেল, বায়ুপরিবর্তনের কথা চলতে লাগল। কিন্তু ধীরা মাতা ফিরে এলেও স্বাস্থ্য আর ফিরল না। নিবেদিতা এই সুযোগে ওলিয়াকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে আনলেন, জগদীশ বসুকে মনে করিয়ে দিলেন আবার। তারপর দীপ নিবে গেল।

হঠাৎ নাটকের চরম দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল। অদ্ভুত চরিত্র ওলিয়ার—সারাটা জীবন তার ছায়ালোকেই কেটেছে। আচমকা নিবেদিতার পরে রুখে ওঠে, বলে, ওরই চক্রান্ত সব। অত দূর থেকে মাকে দেখবার জন্য ও কেন এসেছে? ও-দেশ থেকে বিষফল নিয়ে আসেনি কি? আর মায়ের টাকাটা বাগাবার জন্য ও-ই কি মাকে পটায় নি?···ওলিয়ার প্রচুর টাকাকড়ি থাকলেও তখন তেমন বেশী কিছু হাতে ছিল না। যে সব দানের ব্যবস্থা করে পরম তৃপ্তিতে মা দু'চোখ বুজেছেন, মেয়ে চাইল সেগুলো নষ্ট করতে,—নানা দিক থেকে হিংস্র উন্মত্ততায় কেবলই ছোবল দিতে লাগল।

প্রত্যাঘাত করেননি নিবেদিতা। সে দুঃসময়ে তাঁর কি এ নিয়ে ফাটাফাটি করার কথা? কিছুই বললেন না তিনি। কিন্তু মিসেস বুলের হতবুদ্ধি আত্মীয়-স্বজনরা নিবেদিতাকেই আশ্রয় করলেন। তাঁদের বাঁচাবার জন্য নিবেদিতাকে স্বপক্ষ সমর্থন করতে হল। কিন্তু কে তাঁর বিপক্ষ? কি বলবেন তিনি?

হঠাৎ সব বুঝতে পারলেন নিবেদিতা। শিব! শিব! কোন্ কালিদহ হতে বিষম-বিষের জ্বালা ঢালতে এ-কালনাগ ফুঁসে উঠেছে নিবেদিতা জানেন তা। মেয়েকে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়ে এনে ধর্মছেলের নষ্টস্মৃতি রোগিনীর মনে জাগিয়ে তুলে তিনিই তো একে ডেকে এনেছেন। কর্মজীবনে জগদীশ বোসের সাফল্য ঘটবে নিবেদিতার সব চেয়ে বড় গর্ব আর সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এই। সেজন্য টাকা যোগাড় করবার একটা দুর্দম ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল তাঁকে। তারই এই শাস্তি।

মুহূর্তে নিবেদিতা নিজের মধ্যে গুটিয়ে এলেন। যে-অপশক্তি তাঁকে আশ্রয় করেছে, তাকে নির্জিত করে জীর্ণ করলেন কী—ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে মরে গেল যে। নিবেদিতা আকুল আবেগে বলে ওঠেন, গরলাশন হে নীলকণ্ঠ! আমাকে তোমার করে নাও। তোমার মাঝে থাকলে কোথায় পাপ, কোথায় বা পুণ্য। বিশ্বের সমগ্রতার এই যে আলো-ছায়ার দ্বন্দ্ব, আমায় তার সাক্ষী কর। আর কাজ নয়। শুধু নিঃশব্দে তোমার আলো ছড়িয়ে দেওয়া···। আর কিছু না···।

ওলিয়ার পাগলামি আর আচার্য বসুর অসহায় ভাবটার জন্যই নিবেদিতা ওদের দু'জনকে ভালবাসতেন। মায়ের উইল মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্য ওলিয়া মামলা করল। নিবেদিতার ঔদাসীন্যে নানা কষ্টকর সমস্যার সৃষ্টি হল। একটি সন্তানকে পাল্টা আক্রমণ না করেও নিবেদিতা আরেকটি সন্তানের পক্ষ সমর্থন করলেন। শিকার না পেয়ে কালিয়নাগকে মাথা নিচু করতে হল। আর তাঁকে দরকার নাই বুঝতে পারা মাত্রই নিবেদিতা বিদায় নিলেন।

ভারতবর্ষে তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন। এক পক্ষকাল ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তাঁকে দেখে বন্ধু-বান্ধবদের মনে হল নিবেদিতার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। 'ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে' জুলাই মাসে নিখিল জাতি মহাসভার অধিবেশন হওয়ার কথা। সকলেই ওঁকে ধরে রাখতে চেষ্টা করল কিন্তু নিবেদিতা রাজী হলেন না। তবে কথা দিলেন, জাহাজে বসেই একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দেবেন। নিবেদিতার নাম মহাসভার সদস্য-তালিকায় ছিল না কিন্তু সভার কার্যবিবরণীর মধ্যে আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে তেরো পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ ছিল, প্রবন্ধের শিরোনাম—মেয়েদের বর্তমান অবস্থা।

১৯১১ সন ৭ই এপ্রিল, সকাল ছ'টা। নিবেদিতা শেষ বারের মত ভারতে পৌঁছলেন। বম্বে বন্দরে ভোর হচ্ছে। জলের মধ্য থেকে পাহাড়ী দ্বীপগুলো মাথা তুলেছে, আবছা আলোয় সব ধূসর—সে ধূসরতাও ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে ভাসছে পালতোলা ছোট ডিঙ্গি নৌকা—ওদের উপর দিয়ে বাতাসে রোদে-পোড়া গরম মাটির একটা গন্ধ ভেসে আসছে। 'এই আমার ভারতবর্ষ···এসে পৌঁছলাম শেষ পর্যন্ত।' ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছেন এমনি মনে হয় নিবেদিতার।

মিসেস বুলের শোকটা তখনও ভোলেন নি, এমন সময় ১৯১১-র আগষ্টে খবর পেলেন ওলিয়া আত্মহত্যা করেছে। সেই চিঠিতেই মিসেস বুলের ভাই জানিয়েছেন, মামলায় ওলিয়ার হার হয়েছে, উইলে উল্লিখিত টাকাটা তিনি ভারতকে দেবেন।···এটা কি নিজে থেকে দিতে চাইছেন? নিবেদিতা তো কিছুই চান না? টাকায় আর কোনও প্রয়োজন নাই! তিনি চান নিজকে গুটিয়ে এনে ধ্যানে ডুবে যেতে। এবার বাঁচবেন শুধু অন্তরে, ভুলবেন আর সব কিছু।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

যাত্রা শেষ

নিবেদিতার জীবনের সার্থকতম পর্ব শুরু হল এবার, যদিও বাইরের দৃষ্টিতে মনে হবে এ-সময়টা একেবারেই বন্ধ্যা গেছে। ধ্যানের আনন্দে আর দেবলোকের সান্নিধ্য অনুভব করেই দিন কাটছে। স্কুলটি কিছু দিনের জন্য বন্ধ রয়েছে। স্বামীজির জীবনী লেখবার কাজে ক্রিষ্টিন এখন মায়াবতীতে ফিরে এসে ব্রাহ্ম সমাজের কলেজে যোগ দেবার কথা। নিবেদিতা মনে করতেন ওখানে কাজ করতে গেলে ক্রিষ্টিন নেতৃত্বের পূর্ণ অধিকার পাবেন।

রুদ্ধদ্বারের আড়ালে একা নিবেদিতার দিন কাটে। সংবাদ-পত্রে নিবন্ধ রচনার কাজে আর হাত দেন নি। কাজে কাজেই এত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন যে, পুরোপুরি খেতে পেতেন কি না সন্দেহ। বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, সমস্ত নিমন্ত্রণ

আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন। আর যেন কোনও কর্তব্যই অবশিষ্ট নাই। বাইরের ধরণ-ধারণ দেখে মনে হত তাঁর সব পরিকল্পনা যেন দেউলিয়া হয়ে গেছে। যারা ভিতরের কথা জানত না তারা অনেকেই নিবেদিতাকে করুণার চোখে দেখত। 'খোকা'কে সাহায্য করা আর ঠাকুর দেবতাদের সম্বন্ধে দু-একটা গল্প লেখা ছাড়া আর সব কাজ নিবেদিতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর-দেবতারা আসেন নিবেদিতা ভক্তি ভরে তাঁদের আসন পেতে দেন; অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের আলাপ চলে। নিবেদিতা লিখে রেখেছিলেন সে সব। যে-ঠাকুর যে-ফুল ভালবাসেন, তাঁর জন্য তাই কিনে আনেন। বিশেষ করে সাদা ধুতুরা এনে দেন শিবের পায়ে। সূর্য-তারা নিয়ে, ভোর বেলার গোলাপী কুয়াশা আর গোধূলির কবোষ্ণ নীহারকণা নিয়ে খেলে বেড়ান গৌরী, উমা, শংকরী। জানলার খড়খড়ি নামিয়ে রাখেন নিবেদিতা, ঠাকুরদের অসুবিধা না হয় যাতে। প্রত্যেকটি মুহূর্তই স্বচ্ছ প্রশান্তিতে ঝলমল, সুন্দর পবিত্র ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ছে।

শিল্পী নন্দলাল বসু এবং তাঁর বন্ধুরা—যাঁরা এই ভাববিভোর জীবনের মাধুর্য পেলেন—তাঁরাই কেবল নিবেদিতার দেখা পেতেন, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও প্রায়ই আসেন এঁদের সঙ্গে। নিবেদিতাই এই তরুণ শিল্পীদের বুঝিয়েছিলেন যে, একদিন না একদিন সর্বসাধারণে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিকে বুঝবেই, দাম দেবেই। পশ্চিমকে নকল করবার মতলব ছাড়তে তিনিই তাঁদের প্ররোচিত করেছিলেন। আন্তরিক নম্রতা নিয়ে তাঁরা নিবেদিতাকে ঘিরে বসেন। নিবেদিতা তাঁর নিজস্ব ধরণে ওঁদের ভারতীয় প্রতীক চিত্রের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন কি আবহাওয়ায় কোন ঢঙে কোন রঙে এ-দেশের সত্যযুগের কাহিনী রূপ পেয়েছে, কি ভাবে ভারত-শিল্পের লোকোত্তর ব্যঞ্জনা অঙ্কুরিত হয়েছে দিনে দিনে। নিবেদিতার ভাষায় লাগে ভক্তির সুর, তাতে পুরাণ-কথার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার আগে বন্ধুদের বিদায় দেন। তাঁরা জানেন সন্ধ্যাটি নিবেদিতার একান্ত নিজস্ব। দুটি বুড়ো চাকর রেখেছেন। তারা ঐ সময় জনকয়েক পড়শী নিয়ে উঠানে বসে স্তোত্রপাঠ করে। তাদের বেসুরা উচ্চারণ কাণে ভাল না ঠেকলেও মন্ত্রের একটানা আবৃত্তিটা ভাল লাগে—তাঁর প্রাণও যে ঐ ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে! একটা করুণ মিনতিতে ওদের গলার সুর উঠছে-নামছে। নিবেদিতার সমস্ত সত্তা ঐ সুরে একাগ্র হয়ে আসে, নিস্পন্দ প্রশান্তিতে চিন্ময় আত্মনিবেদনে।

ঘর থেকে সব ছবি সরিয়ে ফেলেছিলেন। হৃদয় তাঁর শূন্য, নির্মম, নিরাবরণ। আর কি তাকে ভরে তোলবার দরকার আছে? দেবতাকে পাওয়ার তৃষ্ণাও যে নাই আর। আনন্ত্যের সৌষম্যে নিবেদিতা আত্মহারা, অবিচল প্রশান্তি নিয়ে চেয়ে আছেন শুধু।

এই সময়, কি জানি কেন নিবেদিতার ইচ্ছা হত সত্যি-সত্যি একটা অগ্নিশিখা দেখবেন সামনে। অরূপের স্পন্দহীন বিরাট হৃদয়ে যে আগুন জ্বলছে বলে' অনুভব করেছেন, চোখের সামনে তা ঝলসে উঠুক। প্রয়োজন ফুরুলে আবার সে-আগুন নিবিয়ে দেবেন। জানতেন, এ ইচ্ছার অর্থ হচ্ছে, অধ্যাত্ম জীবনে দু' পা পিছু হটে যাওয়া। কিন্তু নিবেদিতার মনে হল—দুর্গম পাহাড়ে যাত্রী যেমন লোহার অঙ্কুশটি পাথরের খাঁজে আটকিয়ে খাদ পার হয়ে যায়—এই শিখা ধরে তিনিও তেমনি পথের বাধা পার হবেন।

অগ্নিশিখার ধ্যান করছিলেন নিবেদিতা। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর সামনে আর একটি মূর্তি জেগে উঠল। তাঁর বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে কষ্টি পাথরের এই মূর্তিটি আছে। দীনেশ সেন* মূর্তিটা নিবেদিতাকে দিতে ইতস্তত করেন। প্রচলিত ধারণা, প্রজ্ঞাপারমিতার সাধকদের তাঁর ছাড়া আর কারও উপাসনা করলে চলবে না; আর শেষ পর্যন্ত সাধনার ফল বিনাশ।

নিবেদিতা ও-সব শুনলেন না। মূর্তিটা তাঁর ঘরে এনে ফুল ধূপধুনা দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। এই প্রজ্ঞাপারমিতা যেন আশ্চর্য এক অবলম্বন হয়ে উঠল। নিবেদিতার বুক ভরে ওঠে তাঁর উপস্থিতিতে। ওদিকে অধ্যাত্ম জীবনে যাঁদের পরে নির্ভর ছিল তাঁর, একে একে সবাই তাঁরা সরে গেলেন। স্বামী সদানন্দ মারা গেলেন ফেব্রুয়ারিতে। স্বামীজির মা ছিলেন, মমতা আর সেবা দিয়ে বৃদ্ধার শেষের ক'টা দিন নিবেদিতা শান্তিতে ভরে দিয়েছেন—এবার তিনিও গেলেন। পাশের বাড়িতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মুমূর্ষু। নিবেদিতা ভালবাসতেন তাঁকে। হঠাৎ যেন নিজেকে জরাজীর্ণ অথর্ব মনে হয়, গঙ্গার ঘাটে সন্ন্যাসীর শবানুগমন করবারও সামর্থ্য পান না। শ্মশানযাত্রীরা চলে যাওয়ার পরও বহুক্ষণ বরানগর পুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। অবশেষে অস্তসূর্যের রক্ত আভার সঙ্গে চিতাবহ্নির লেলিহান শিখা চোখে পড়ল নিবেদিতার। অমনি আগুন জ্বলছে তাঁর অন্তরে···জ্বলছে প্রজ্ঞা-পারমিতার অনির্বাণ দাহ।

এর পর একদিন ধ্যান করতে বসে অনুভব করেন যে শূন্যতা অন্তর-বাহির ছেয়ে ছিল, হঠাৎ তা যেন সরে গেল। নিমীলিত নেত্রে বসে থাকেন নিবেদিতা। হৃদয়ের বহ্নিজ্বালা মিলিয়ে গেছে আচমকা কিন্তু আঁধার তো নাই! জয়তু! জয়তু! সব-ছাওয়া একটা স্বচ্ছ চিক্কণ সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগে নতুন করে। যত সময় যায় সে-অনুভব আরও জীবন্ত আরও প্রখর হয়ে ওঠে, অপূর্ব আনন্দ আর সৌষম্যে মন ভরে যায়। এ তো ভ্রান্তি নয়; নিবেদিতা আজ একাধারে গঙ্গোত্রী আর গঙ্গাসাগর—দুয়ের মাঝে শক্তির উজান-ভাটাও তিনি। এই একান্ত অনুভূতি নিয়ে নিবেদিতার চিত্ত অন্তরাবৃত্ত পরাশক্তিতে গুটিয়ে আসে।

সারদা দেবী হৃদয়ের যে অকৃপণ ঐশ্বর্যের কথা বলতেন, এইবার নিবেদিতা তার স্বরূপ বুঝলেন। এ অসম্ভাবিত ঐশ্বর্য যে নিতান্তই অন্তরের ধন। ক্ষণ শাশ্বতের একটি বিন্দুতে সংহত হয়েছে অতীত আর ভবিষ্যৎ—নিবেদিতা সাক্ষিরূপে নিজেই তখন নিজেকে দেখেন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে। নৈষ্কর্ম্যের এই বৈষ্ণবী সত্তার অধিকার একদিন তাঁর মিলবে বলেই কথা দিয়েছিলেন গুরু। এখন ঘরে বসে ধ্যানই করুন, আর বাইরে গিয়ে কর্মব্যস্ত জীবনই কাটান—একই কথা।

---

* নিবেদিতা দীনেশ সেনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর 'দি হিষ্ট্রি অব বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ এ্যাণ্ড লিটারেচার' বইখানা দেখে দেওয়ার জন্য নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন তিনি। নিবেদিতা বইটার কোনও কোনও অংশ পুনর্লিখনে সাহায্য করেন।

বিনয়পিটকের ভিক্ষু উপালির মত নিবেদিতাও আজ বলতে পারেন—

খালি পায়ে আদুড় গায়ে যায় সে হাটের মাঝখানে,
ছাই আর কাদা গায়ে মেখে হাসতে পারে প্রাণ ভরে।
দেবতাদের 'ঋদ্ধিসিদ্ধির' কখনও যে ধার ধারে না,
তারই ছোঁয়ায় গাছে-গাছে ফুলের কুঁড়ির ঘুম ভাঙে...

সেবারের আলোয় ভরা গ্রীষ্মকালটা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। ঝরা পাতার মত দিন কাটে নিবেদিতার. কোনও ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। জীবনের স্রোত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কিন্তু আত্মনিবেদনের আনন্দে হৃদয় কানায় কানায় ভরা। নিবেদিতা পূজার ছুটিটা ওঁদের সঙ্গে দার্জিলিঙে কাটাবেন—বসু-পরিবার এই প্রস্তাব করতে উনি তাঁদের আতিথ্য স্বীকার করেন। কিন্তু বললেন ওদের আগে যেতে।

দার্জিলিঙে এসে শরীরটা নিবেদিতার ভাল বোধ হচ্ছিল না। সবাই এক সঙ্গে সিকিম যাবেন বলে অধীর ভাবে ওঁর প্রতীক্ষা করছিলেন বসু-পরিবার। আচার্য বসু ঘোড়া ভাড়া করেছেন, দিশারী ঠিক করে রেখেছেন। ওঁদের এ-অভিযানের লক্ষ্য তিব্বতের পথে সমুদ্রতল হতে বারো হাজার ফিট উঁচুতে 'সন্দকফু'র মন্দির। বরফ-ঢাকা গিরিবর্ত্ম দিয়ে এ-ধরণের অভিযানে নিবেদিতা আনন্দ পেতেন। বোসের পরিকল্পনায় খুশী হয়ে ওঠেন তিনি। জগদীশ বসুকে বললেন, 'ওখানে একটি মঠ আছে সেটি দেখব।'

ঘোড়ায় জিন কষা হল, বিছানা বাঁধা হয়েছে, খাবার দাবার তৈরী—ঠিক যেন তীর্থযাত্রার আয়োজন। নিবেদিতাও আজ এ আনন্দোৎসবে যোগ দেবেন। কিন্তু হঠাৎ এত ক্লান্তি বোধ করতে লাগলেন যে, পরদিন সকাল পর্যন্ত যাওয়া স্থগিত রাখতে হল। তার পর হুড়মুড়িয়ে নিবেদিতার জ্বর এল, ডাক্তার সরকারকে ডাকা হল। দু'দিন পরে ডাক্তার বুঝতে পারলেন নিবেদিতাকে আর রাখা যাবে না। মারাত্মক আমাশায় ধরেছে—পাহাড়ে এ ব্যাধি দুরারোগ্য। বন্ধু-বান্ধবরা অস্থির হয়ে পড়লেন।

তেরো দিন ভুগলেন নিবেদিতা। বাঁচাতে হলে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনা দরকার। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে তখন। তাঁর জন্য চেষ্টার ত্রুটি হল না। আশাযুগ্ধ বন্ধুরা করুণ মমতায় প্রকৃত ব্যাপার লুকিয়ে রাখতে চান নিবেদিতার কাছে।

কিন্তু নিবেদিতা জানতেন...কী গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়েই এই লগ্নটির প্রতীক্ষায় ছিলেন! এবার শিবের দেখা পাবেন। নিবেদিতা প্রস্তুত। অধর-প্রান্তের অপরূপ হাসিতে তাঁর অন্তরের শান্তি ফুটে ওঠে। চোখ দুটি বুজে নির্বাক হয়ে দিনের পর দিন কাটান। দুর্বলতার লক্ষণ নয় এ; অরূপা রূপের ছন্দে প্রাণায়ামের তালে নিশ্বাস পড়ে। অন্তরাবৃত্ত চেতনা তলিয়ে গেছে দেবতার পায়ে, অভ্যাস বশে মালা ঘোরে হাতে, জপ করেন না কিন্তু।

চোখের সামনে সমস্তটা জীবন ভেসে ওঠে। চেয়ে দেখেন নিবেদিতা। যেন সোনালী বালুচরে নেচে চলেছে, সৌরকরস্নাতা তটিনী, উৎসমুখের আনন্দে টলমল, আবর্তে উচ্ছল প্রপাত গর্জনে সঙ্গীতময়ী। এখানে ওখানে পল্বলের গভীরে ঝলসে উঠছে আলো তীরে-তীরে জীবনের সহস্র কলরব। কিন্তু মরণের মোহানায় এসে

সম্পদের সমস্ত সঞ্চয় ফেলে দিয়ে অন্তরাত্মা নিরাভরণ হয়—জীবনের কিছু বা ছায়ার মত মিলিয়ে যায়, কিছু গলে যায় চোখের জলে। এবার আধারটা শুধু বাকী, এই দেহটা—কোন পিছুটান না রেখে হেলায় ওটাকে ছেড়ে যেতে হবে। প্রিয়জনেরা তাঁকে গরমে রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে শুনতে পান। জীবনের উত্তাপ শীতল হয়ে এসেছে এরই মধ্যে, তুষার-শৈত্য আক্রমণ করছে তাঁকে। আহা, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষার আস্তরণই না মহেশ্বরের ধ্যানের আসন। এই যে আঁধারে অবগাহন, নব জন্মের সূচনা কি এ? ভবচক্রের একটা আবর্তন? আত্ম-নিবেদনের আনন্দে হাসি ফুটে ওঠে নিবেদিতার অধরে। অনুভব করেন ধীরে ধীরে খসে পড়ছে অন্নময় কোশের আবরণ। অবশেষে মাটির বাঁধন টুটে সহস্রদল প্রাণ যেন মুক্তির আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল। খাওয়া উঠে গেল নিবেদিতার, ভাব-সুষমাময় তনু-মনের শুভ্রতা নিয়ে বেঁচে রইলেন শুধু ঋকের ছন্দে, অনাহতের গুঞ্জনে, বসুন্ধরার অশ্রুত কলতানে। শ্রীমতী বসু তাঁর কাছ ছেড়ে নড়তেন না। নিবেদিতার এই অশ্রুহীন প্রশান্ত মহাপ্রয়াণের অর্থ তিনি বুঝেছিলেন।

শিবসুন্দরের সাযুজ্যে এগারো দিন কাটল এমনি করে। তারপর নিবেদিতা বন্ধুদের পানে ফিরে চাইলেন। কিন্তু কত দূরে সরে গেছেন তিনি! ওদের সঙ্গে কথা বলা আজ কী কঠিন!

শেষ একটি আনন্দ বুঝি তোলা ছিল তাঁর জন্যে। গণেন মহারাজের সঙ্গে জয়পুরে আচার্য বসুর আলাপ হয়, তিনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। মঠের বাগান থেকে এক ঝুড়ি ফল এনেছেন, সাধুরা পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে নিবেদিতা অসুস্থ এবং যাওয়ার আগে এমনি কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আছেন। এ ফল যে নিবেদিতার কাছে যাবার বেলায় গুরুর প্রসাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বলেছিলেন ছুটি হলে আম দেবেন, সেই কথা নিবেদিতার মনে পড়ে যায়।

সামর্থ্য থাকতে-থাকতে বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে আর একবার নিবেদিতা আনন্দ করে ফল খেয়ে নিতে চাইলেন। তরুণ ছাত্র বশী সেন ওখানে ছিলেন। নিবেদিতা 'খোকা'র হাতে বশীকে সঁপে দিলেন। বিকাল পর্যন্ত সবাইকে উৎসাহ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কথা বললেন। সবাই শান্ত হলে উচ্চারণ করলেন প্রাণের প্রার্থনাটি

অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়•••

রাত হয়ে এল। নিবেদিতা তলিয়ে গেলেন, আর কথা কইলেন না। এই যে শিবশঙ্কর! আর দেরি নাই, নিবেদিতার বিছানা ঘিরে দাঁড়ান সবাই। একজন নীচু হয়ে শোনেন, নিবেদিতা অস্ফুটে বলছেন, 'তরী ডুবছে•••কিন্তু•••আবার দেখব, সূর্য উঠছে•••'

ভোরবেলা শান্ত ভাবে নিবেদিতা চলে গেলেন। সেদিন ১৩ই অক্টোবর, ১৯১১ সন। চুয়াল্লিশ বছর চলছিল।

সন্তানের মত শ্রদ্ধাভরে গণেন মহারাজ পায়ের ছাপ নিলেন নিবেদিতার। মুখাগ্নি করলেন তিনিই।

নিবেদিতার মৃত্যু-সংবাদ রাষ্ট্র হতেই দেশে হাহাকার উঠল। সারা বাংলা এই পাশ্চাত্য মহিলার জন্য শোকানুষ্ঠান পালন করল। হলদে ফুলে ঢেকে যথারীতি দাহ করা হল তাঁর দেহ।

বিদেশী নিবেদিতা যে-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেলেন তা অপ্রত্যাশিত। তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে কত স্মৃতি-মন্দির গড়ে উঠল। বেলুড়ে স্বামীজির সমাধি-মন্দিরে বেদির নীচে কিছু ভস্ম রক্ষিত হল। কিছু রইল বশী সেনের বাগবাজারের ভজন-মন্দিরে। ১৯১৫ সনে কলকাতার বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরের নীচে কিছু ভস্মাবশেষ রাখা হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানে কোনও মর্মর ফলকে নিবেদিতার নাম খোদা নাই, কিন্তু আছে পাশে একটি মেষশাবক সুদ্ধ জপমালাধারিণী একটি মহিলার শিলাচিত্র—দেখলেই নিবেদিতার কথা মনে পড়ে।

গ্রেট টরেন্টনে—যেখানে বালিকা নিবেদিতা খেলে বেড়াতেন, সেইখানে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে মধুমালতীর ঝাড়ের মধ্যে আর কিছু চিতাভস্ম আছে—তার উপরে ক্রস্ চিহ্ন।

কলকাতায় এখন নিবেদিতার নামে একটি রাস্তা আছে। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে হাজার-হাজার হিন্দু মেয়ে শিক্ষা পাচ্ছে আজও। কিন্তু তার চেয়েও বড় গৌরব তাঁর, যশস্বী যে-সব ভারত-সন্তান দেশের সেবায় জীবন দিয়েছেন তাঁরা আজও নিবেদিতাকে তাঁদের গুরু জেনে মনে-মনে পূজা করেন। ভারতের স্বাধীনতা দিবসে স্মৃতির অর্ঘ্য দেন তাঁকে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সেদিন ভারতের পতাকা পুরোভাগে রেখে বীরাঙ্গনার মত এগিয়ে যাবেন তিনি, হৃদয় উজাড় করে দিয়ে হাঁক দেবেন, 'ওয়াহ্ গুরুজী কী ফতেহ! বন্দে মাতরম্!'

বিবেকানন্দের মানস-কন্যা সিষ্টার নিবেদিতা ভারতেরই দুহিতা!

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

সমাপ্ত

বিছানায় শুয়ে বই পড়েন?

মেয়েরা তো পড়েনই। পুরুষদেরও অনেকেরই এ অভ্যাসটি আছে। অভ্যাসটি সবিশেষ আরাম-দায়ক নিঃসন্দেহে। কিন্তু পড়ার স্থানে যথেষ্ট আলো আসে তো আপনার? ঠিক ঘুমোবার আগে যেন কদাচ উপন্যাস বা ডিটেকটিভ কোন বই পড়বেন না। যদি নেহাৎও পড়েন তো বইখানি শেষ করে নিদ্রা দেবেন। নচেৎ রাত্রে সুনিদ্রা না-ও হতে পারে আপনার।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা-রাজ)

হরনাথ চলে যাবার পর রেখা এসে, মায়ের চোখে চোখ দিয়ে চেয়ে রইলো।

—কি রে, কিছু বলবি নাকি?

—তোমরা ত ফুস্‌-ফাস্‌ করে সব প্লান ঠিক করে নিলে। কিন্তু আমি বলি কি, যে বিয়ে করবেই না—জোর-জার করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভালো? এতে কি সুফল হবে মনে করো?

—তা' হলে সব শুনেছিস্‌ বল্‌!—

ভারী দুষ্ট মেয়ে!

—হ্যাঁ, শুনেছি বৈ কি, কথার উত্তর দাও?

ও রকম বিয়ের আগে সবাই বলে থাকে, তোর বাবারও ইচ্ছে ছিল—আমারও বড় সাধ। ছেলেটি বড় ভাল আর পরোপকারী।

—বাপ-মায়ের কথা না শোনাটা কি ভাল ছেলের লক্ষণ!—আর পরোপকারী বলছো? বেশ তো, আমারই এক জানা-শোনা বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে না—সে বড় ভালো মেয়ে—দেখতেও সুন্দর—কিন্তু গরীব। তাকেই বিয়ে করে ডাক্তার সায়েব পরোপকারের নমুনাটা এক বার দেখিয়ে দিন্‌ না।

—আ মলো যা! লেখা-পড়া শিখলেই বুঝি কট্‌-কট্‌ করে কথা বলে?

—শুধু কথা নয় মা, নির্জ্জলা সত্যি; শক্তি দেবীর কণ্ঠে বিরক্তির সুর—

—যাক্‌, আর কিছু বললো না; যা' হয় কর—তবে তোর বাপের ইচ্ছেটা ছিল—তাই—

রেখা আপন মনেই বলতে থাকে—

—বাবার ইচ্ছে—। তোমার সাধ!

বেশ, তাই হোক—মনটাকে গড়ে নেবো।

চলার পথে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা—

স্পোর্টস্‌ হিসেবে মন্দ কি?

—কি যে বিড়্‌ বিড়্‌ করিস্‌—একটু জোরেই বল না!

—বেশ মা, আমি রাজি।

শক্তি দেবী কন্যার মস্তকে আশিস-চুম্বন দিলেন।

পরদিন বিকেলে, রেখা তার শিল্পী মন নিয়ে অতি আধুনিক সজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার প্রতিফলিত রূপ দেখে সে নিজেই মুগ্ধ। চিত্রাঙ্গদার মত নিজের সৌন্দর্য্য নিজেই যেন সে পান করে যায়! ঘুরে-ফিরে ভাল করে সে নিজেকে এক বার দেখে নিলে।

'রাস্‌কেল্‌ রেড' লিপষ্টিক হাল্কা করে তার পাতলা ঠোঁটে বুলিয়ে মিস্‌চিফ্‌ সেন্ট মেখে সে কোন মিস্‌চিফের পথে পা বাড়াবে—এ কথা ভেবে নিজের মনেই সে হেসে উঠলো।

ভোম্বল বাবু শুধু পুরনো কর্ম্মচারী ন'ন—আত্মীয়ও বটেন, ডাক পড়তেই হাজির।

দাদু, মডার্ণ গার্ল দেখেছো?

—হ্যাঁ, দেখেছি বৈ কি?

—কোথায় দেখলে?

—এই যে সামনে—

—কি রকম লাগছে?

—আমাদের লাগালাগির কি আছে দিদিমণি? আর কি সে বয়েস আছে?

—তোমাদের সময় সাজ-গোজটা কেমন ছিল এক বার বল না দাদু?

—তোর দিদিমা গামছা ভিজিয়ে মাথায় চেপে পাতা কাটতো—কপালে খয়ের টিপ, পরনে পাছা-পেড়ে শাড়ী আর তাম্বুল বিহার দিয়ে কয়েক খিলি পান মুখে গুঁজে যখন সে হাসত, আহা সেই মিশি-দাঁতের হাসিটা কী মিষ্টি! ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল, তোদের মত ঐ সিন্দুরে খড়িমাটি ঘস্‌তে হোতো না। চটি-জুতোর বালাই ছিল না—আর কী যে ঐ হাতে নিস তোরা—হরিনামের ঝুলি না ঘটি-ব্যাগ, সে তো কেউ চোখেই দেখে নি।

হয়তো ভোম্বলের বিবরণ আরও কিছুটা চলতো কিন্তু রেখা মাঝপথেই খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠলো। চল দাদু, গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে, নিউ মার্কেটে কয়েকটা শাড়ী-ব্লাউজ মেক-আপের জিনিষ কিনে আনি।

—এসব তো অনেক আছে দিদিমণি, আর কেন?

—না না, তুমি এসব বুঝবে না, বুঝতেও চেয়ো না। চল চল দেরী হয়ে গেল। মার্কেটে সারি সারি চোখ-ঝলসানো শাড়ীর দোকান। রেখা ভোম্বলকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকেই দেখতে পেলো এক খ্যাতনামা তরুণী চিত্রাভিনেত্রী দাঁড়িয়ে, তার সামনে ছড়ান রং-বেরংএর শাড়ীর পাহাড়, চোখে-মুখে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়ে তরুণী সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে বলছেন—একটা শাড়ী কিন্‌তে এসে অনেক গুলোই যে পছন্দ হয়ে গেল—ওগো—বল না—ক'টা নেব? তরুণীর মুখে যতখানি আলো ঠিক ততখানি অন্ধকার সেই ভদ্রলোকের মুখে।

তিনি কী 'না' বলতে পারেন? এ যে প্রেষ্টিজ। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন—নাও তোমার যা ইচ্ছে।

দোকানদার তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে, এ দিকে মন দেবার ফুরসৎ নেই। রেখা অন্য দোকানে গিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে নিলে। গাড়ীতে উঠবার সময় দেখে, সেই তরুণী উচ্ছল হাসিতে মস্‌গুল হয়ে পাশের গাড়ীতে চেপে বসলেন, লোকটির মুখে এখনও সেই জমাট অন্ধকার, তবে কাষ্ঠ-হাসির জের টেনে চাপা দেবার চেষ্টায় আছেন।

তরুণী উঠেই গাড়ী ষ্টার্ট দিলে, রেখা ভোম্বলকে সম্বোধন করে হেসে উঠলো, দেখছো দাদু, দুনিয়া কোথায় চলেছে!

—হ্যাঁ আমাদেরও চলতো—তবে ঢিমে। তেতালায় ছ্যাকরা-গাড়ীতে আমরাও বাজার করতে আসতাম রে! তোর দিদিমা গাড়ী থেকে নামতো না—বলতো নাকি বুক টিপ্‌-টিপ্‌ করে।

কিছু দূর এগিয়ে দেখে সেই তরুণী চিত্রাভিনেত্রী, বুঝি আনন্দে আত্মহারা হয়ে, এক বেচারী কুলিকে চাপা দিয়ে বসেছেন। বাধ্য

হয়ে তাকেও থামতে হ'লো। যত স্কুল-কলেজের ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে।

নবীনরা রুখে এলো, প্রবীণরা থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু এ যে সুপরিচিতা 'ফিল্ম আর্টিষ্ট'—নবীনদের সুর শূন্য ডিগ্রিতে নেমে গেলো। প্রবীণদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো এখন তো ওদেরই যুগ। গাড়ী চালাবার লাইসেন্স আছে—মানুষ চাপা দেবার লাইসেন্স আছে কী?

কেবল মৃদু গুঞ্জনই চলতে থাকে—কেউ এগিয়ে আসে না, এমন কি একটা লালপাগড়ীরও পাত্তা নেই। ওদিকে কুলিটার কাতর আর্তনাদ—প্রাণ যায়—

রেখা তাড়াতাড়ি নেমে, লোকজন ডেকে, কুলিটাকে নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে নিলে। এদিকে তরুণীর পরিপাটী চম্পট!

ভীত ত্রস্ত ভোম্বল বাবুর ভগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—তাহলে হরনাথ বাবুর ছেলের ডিস্পেন্সারিতেই যাওয়া যাক্, কী বল?

—সেটা কোথায়? রেখার চোখে প্রশ্ন।

—এই ল্যান্সডাউন রোডে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক আছে, চল।

ভোম্বলের নির্দ্দেশে অতীনের মেডিকেল হলে গাড়ী থাম্‌লো। অতীন একটি রুগীকে সবে মাত্র পেনিসিলিন দিয়ে উঠেছে, এমন সময় নারীকণ্ঠে আর্ত্তস্বর—'ডাক্তার বাবু, একবার শীগ্‌গির আসুন।' অতীন পিছন ফিরে রেখাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো—আর দেরী করবেন না ডাক্তার বাবু! লোকটা হয়তো বাঁচবে না।

—কী হ'লো?

—গাড়ী চাপা পড়েছে।

—অ্যাঁ—কে?—চলুন, কোথায়?

—এই আমার গাড়ীতে।

তাড়াতাড়ি ষ্টেথিস্কোপ, ব্যাগ নিয়ে ছুটে এসে দেখে, লোকটার অবস্থা কাহিল। আর কী কাত্‌রাণি! তার রক্তে গাড়ীটা লালে লাল, পরীক্ষা করে বললে, এ যে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার, এখুনি মেডিকেল কলেজ যেতে হবে।

—আমি তো কাউকে জানি না, আপনি দয়া করে সঙ্গে চলুন, ডবল ভিজিট পাবেন।

—চলুন যাচ্ছি।

—অতীনের গাড়ী সাম্‌নেই ছিল। সে উঠেই ষ্টার্ট দিলে।

—চলুন আপনার গাড়ীতেই যাই।

—আসুন—অতীন সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিলে। অতীনের পাশে বসেই রেখা মুখ বাড়িয়ে দাদুকে বল্‌লে—আমাদের গাড়ীটা [illegible] করুন।

দু'জনেই নীরব। খুব জোরে অতীন গাড়ী চালিয়ে যায় আর মাঝে মাঝে পেছনের গাড়ীটা ঠিক আসছে কি না সামনের আয়নায় নজর রাখে। নীরবতা ভঙ্গ করে রেখাই প্রথম বলে উঠলো,—কেমন ডাক্তার বাবু, আপনিও আবার এ্যাক্সিডেণ্ট করে বসবেন না—বড্ড ভয় হয়—এখনই যা' দেখলাম—মা গো!

অতীন সহাস্যে রেখার পানে চেয়ে উত্তর দিলে,—কোন ভয় নেই, বরং মনে পড়িয়ে দিলেই বেশী এ্যাক্সিডেণ্ট হয়।

—সেটা হয় তো এক দিক দিয়ে সত্যি।

—কেমন করে এটা ঘট্‌লো?

রেখা আনুপূর্ব্বিক সব ঘটনাটা খুলে বলে।

মেডিকেল কলেজে ঢুকবার মুখেই রেখা ডাক্তার বাবুকে অনুরোধ করে—ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করে দিন—দিনে-রাতে দু'টো স্পেশ্যাল নার্সের বন্দোবস্ত করুন। সব খরচা আমি দেব—ওদের মত লোকের দেখবার কেউ নেই।

—এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ক'জন বিচার করে?

রেখা হেসে উঠলো।

—এই তো জীবনের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ডাক্তার বাবু! কিছু বাড়িয়ে যাই, তবেই সেটা আর জন্মে ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়ে ফিরে আস্‌বে। চেক্ ডিস্‌-অনার্ড হবে না। একেই তো বলে সংস্কার!

—কী রকম?

—আমরা ত' পূর্ব্বজন্মের চেক ভাঙ্গিয়েই খাই।

অতীন গাড়ী থামিয়ে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ক্ষণ কাল চেয়ে রইল, ইতিমধ্যে অপর গাড়ীটা এসে গেল। অতীন চট্ করে নেমে তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত করে ফেল্‌লে, সে মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র, সবাই চেনে, বেগ পেতে হ'লো না। ষ্ট্রেচারে করে রোগীকে ভিতরে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে রেখাকে অনুরোধ জানালে, আপনারা ওখানে বসুন। আমি রোগীকে ভর্ত্তি ক'রে আসি।

—টাকাটা নিয়ে যান।

—হ্যাঁ, দিন।

রেখার ইঙ্গিতে ভোম্বল বাবু তৎক্ষণাৎ মণি-ব্যাগ বের করে এক শ' টাকার একখানা নোট অতীনের হাতে দিলেন। সব বন্দোবস্ত করে ফিরে এসে অতীন সহাস্যে বললে—'সব ঠিক হয়ে গেল। আট টাকা করে ষোল টাকা—দু'টো স্পেশ্যাল নার্স থাকবে। ছ' দিনের ছিয়ানব্বই টাকা জমা দিলাম। এই নিন রসিদ আর এই চার টাকা ফেরৎ। বেচারার হাঁটুর জয়েণ্টটা একেবারে চুর হয়ে গেছে। কাঠের পা না লাগিয়ে উপায় নেই।'

রেখা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলে অতীনের দিকে চেয়ে বললে—'অশেষ ধন্যবাদ। দেখন না যিনি চাপা দিলেন তিনি হয়তো নতুন শাড়ীর নেশায় মশগুল, আর এই রোজ-খেটে-খাওয়া লোকটার জীবন একেবারে মাটি হয়ে গেল।'

—কি করা যায় বলুন? এই তো দুনিয়া! এই নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। তা হলে এখন আসি?

অতীন নমস্কার করতেই রেখা বাধা দিয়ে বলে—'আরও একটু কষ্ট দেব। ও গাড়ীতে বস্‌বার উপায় নেই, রক্তে ভেসে গেছে। যাবার পথে চৌরঙ্গী টেরেসে যদি নামিয়ে দেন তা হ'লে—'

—বিলক্ষণ, এতে সঙ্কোচের কি আছে? আসুন, আসুন, আমার যাবার পথেই ত পড়বে।

দরজা খুলতেই রেখা অতীনের পাশে এসে বস্‌লো, ভেতরে ভোম্বল বাবু, মুখ বাড়িয়ে তাদের গাড়ীটা বাড়ী নিয়ে যেতে বলে দিলেন।

অতীন কুণ্ঠা-বিজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—'আপনার নাম-ধাম এখনও জান্‌তে পারিনি।'

—নাম রেখা চট্টোপাধ্যায়, ধামটা এখুনি দেখতে পাবেন।

—পড়া-শুনা করেন বুঝি ?

—হ্যাঁ, এখন বেথুনে বি, এ, পড়ি।

চৌরঙ্গী টেরেসে গাড়ী থামতে, রেখা নেমেই অতীনকে পুনরায় অনুরোধ করে,—আসুন ! একটু চা খাবেন।

অতীন হেসে উত্তর দেয়—এ সময় চেম্বারে না থাকলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

—গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, কিচ্ছু হবে না। রেখা অতীনকে নিয়ে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে ঢুকতেই ভোম্বল বাবু চায়ের আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে শক্তি দেবীও এসে পড়লেন। রেখা পরিচয় করিয়ে দিলে,—'ইনি আমার মা।'

অতীন উঠে নমস্কার জানালো। আজকের ঘটনাগুলো রেখা সব একে একে তার মাকে বলে গেল। এটা-সেটা নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল।

শক্তি দেবী অতীনকে মিষ্টি করে বললেন,—'এটা ভগবানের কৃপা, তাঁরই যোগাযোগ। আমি একজন ভাল ডাক্তারের খোঁজে ছিলাম। আমার ইচ্ছে আপনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান্ হোন। মাত্র একবার বিকেলের দিকে আসবেন—মাসে শ' পাঁচেক নেবেন—আর আজই টাকাটা আগাম নিয়ে যান।—'

অযথা ডাক্তারকে পয়সা দিয়ে লাভ কি ?

—কী করবো উপায় নেই, আমাদের একটু ডাক্তার ম্যানিয়া আছে। ছেলেকে মা একটা কথা বললে শুনতে হয়। আপত্তি করো না বাবা !

শক্তি দেবী আটপৌরে ভব্যতার ধাপ থেকে একেবারে আত্মীয়তার কোঠায় নেমে আসেন।

আজকে মাফ করুন, ভেবে, পরে উত্তর দেবো—আমার দাসত্ব ভাল লাগে না। উত্তর দেয় অতীন ডাক্তার।

শক্তি দেবী স্নেহসিক্ত কণ্ঠে অতীনকে বুঝিয়ে বলেন,—'ভাল না লাগে ছেড়ে দিও। কেউ ত হাত-পা বেঁধে রাখবে না। মায়ের একটা কথা রাখলেই বা।'

—আমি মা হারিয়েছি। তাঁকেও কোনো একটা কারণে কষ্ট দিতে হয়েছে—আবার আপনিও যদি দুঃখ পান, তবে বুঝবো আমার কপাল মন্দ।

রেখা এতক্ষণ মোঁপাসার একটা গল্পের পাতা উল্টে যাচ্ছিল। সে মুখ তুলে দৃপ্ত কণ্ঠে বললে,—ভাগ্যটা যদি নিজের অহঙ্কার বুদ্ধি নিয়ে মন্দ করেন ডাক্তার বাবু—আর সেই হাতে-গড়া ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, আর একটা ধার করা দুঃখ ডেকে আনেন—তার জন্তে দায়ী কে ? আপনি—না—

কথার মাঝেই অতীন বাধা দেয়—আচ্ছা, আমি পরশু ঠিক বলে যাবো। একটা দিন আমায় ভাবতে সময় দিন।

রেখা একটা মিষ্টি হাসি হেসে বললে,—তাই হোক মা, ওঁকে সময় দাও। ভাবতে যারা আসে তারা এ-টেবিলের বই ও-টেবিলে রাখতেও দশ বার ভাবে।

ইতিমধ্যে বহুবিধ ফল ও মিষ্টান্নের ডিস্ টেবিলে স্থান পেয়েছে—পাশে চায়ের সরঞ্জাম।

রেখা উঠে অতীনকে অনুরোধ জানালে,—আসুন বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

শক্তি দেবী উঠলেন। বেশ তোমরা খাও-দাও গল্প-গুজব করো—আমি এক বার লতিকার সঙ্গে দেখা করে আসি। সে কালই পাটনায় ফিরে যাবে।

গল্পের দানা বেশ জমে উঠেছে। "বাইরণ", "শেলী", "কীটস্", "সেক্সপিয়র", "রবীন্দ্রনাথ", "সমাজনীতি", "রাষ্ট্রনীতি" ; কোন কথাই বাদ পড়েনি। অতীনকে রেখার কাছে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হলো,—

—অনেক কিছু পড়া-শুনা আছে দেখছি।

আমার ত ডাক্তারী লাইন, ও সবের বড় ধার ধারি না।

—যার উপর জীবন-মরণ নির্ভর করে সেটা তো তুচ্ছ লাইন নয়, ডাক্তার বাবু ? কত ভেবে-চিন্তে রোগটা ধরে তবে একটা ওষুধ দিতে হয়—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা বোধ হয় মনের ডাক্তারী জানে না।

—কি রকম ?

—এই যে বললেন, মা'কেও দুঃখ দিয়েছেন—হয়ত তিনি এমন কিছু বলেছিলেন, আপনি শোনেন নি। মনের নাড়ীজ্ঞান থাকলে আজ আপশোষ হোত না।

—বেশ কথা বলেন আপনি ; আশ্চর্য্য !

—এতে আশ্চর্য্যের কী পেলেন ডাক্তার বাবু ? বরং মানুষের যেটা করা উচিত, সেটা না করে অনুচিতটাই গায়ের জোরে চালিয়ে যাওয়াটা কি আশ্চর্য্য নয় ? কী, চুপ করলেন যে ?—

—অনেকটা ভাবিয়ে দিলেন।

—আবার সেই ভাবনা। আপনার ভাবনাটাও রোগ।

"Physician heal thyself."

রেখার মিষ্টি হাসিতে ঘরটা ভরে গেলো।

—ওঃ—কথায় কথায় এত দেরী হয়ে গেল ! রাত দশটা যে ! কখনো মেয়েদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে আলাপ করেছি বলে মনে হয় না—এই প্রথম।

রেখা মাথা নীচু করে উত্তর দেয়,—সাবধান ! অন্য কোনও মেয়ে এ কথা শুনলে আপনাকে আর বাঁচতে হবে না।

—আর যে ভাবেই মরি না কেন—ঐ পয়েণ্টে আমি বাঁচবোই। এ কথাটা জোর গলায় বলে গেলাম, রেখা দেবী !

যাক্—তাহলে উঠি, পরশু সন্ধ্যায় ঠিক আসবো।

রেখা উঠে অতীনকে অভিবাদন জানিয়ে বলে—এই নিন্ আজকের ফি পঞ্চাশ টাকা। আটকে রেখে অনেক ক্ষতি করেছি।

—বেশ স্বার্থপর যা' হোক। আপনি বুঝি একাই ব্যাঙ্কে জমা রাখবেন। আমাকেও কিছুটা রাখতে দিন।

রেখা মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে চাইতেই, অতীন বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এলো। ক্ষণকাল রেখার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—হ্যাঁ দেখুন, আমি চাকরী নিলাম। কিন্তু বে-নাহক ফাঁকি দিয়ে টাকা রোজগার করাটা কী ভালো ?

যাক, বিবেকের চাবুকে যদি অতিষ্ঠ হই না হয় ছেড়েই দেবো। মাকে স্পষ্ট বলে দেবেন মাইনেটা আগাম নেব না।

নমস্কারান্তে অতীন বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রেখা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

অতীন চলে যাবার পরেই আমাদের ভোম্বল দাদু ঘরে ঢুকে

সম্বোধন করলেন,—দিদিমণি, যেমনটা শুনেছিলাম, শিকারটা তেমন খুব বড়—আর শক্ত বলে ত' মনে হচ্ছে না? এক দিনেই ঘায়েল—রাত দশটা—এখন তো দিন—পড়েই আছে। হেঃ—হেঃ—হেঃ—

রেখা হেসে উত্তর দিলে,—কি যে বলো দাদু, বয়সের সঙ্গে রসের মাত্রাটাও বাড়ে বুঝি?

—তাই তো দস্তুর দিদিমণি! আচ্ছা এবার থেকে বোকা সেজেই থাকবো। এখন রাত হয়েছে খেতে চলো—মা ডাকছেন।

অতীন পরদিন সকালে উঠে তার পিতৃদেবকে গত কালের সব ঘটনা বলে চাকরী নেওয়ার কথাটাও জানিয়ে দিলে।

'লেক' ফেরতা সেই নন্দী মশাই তার চিরন্তন বাজারের থলেটা পাশে রেখে তখন হরনাথের সঙ্গে হাস্য-কৌতুকে রত, তিনিও বিস্ফারিত লোচনে সব কথা গিলে গেলেন।

হরনাথের চোখের তারা দুটো উর্দ্ধে উঠে স্থির হয়ে গেল। যুক্ত করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম,—পুত্রকে গদ্ গদ্ ভাবে আশীর্ব্বাদ,—তা হ'লে ভগবানের নাম নিয়ে নূতন কর্ম্মস্থলে যোগদান কর।—আচ্ছা, দাঁড়া—তিনি পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে পুত্রকে বললেন,—আজ বিকেল সাড়ে ছ'টার পর সেখানে যাবি, বুঝলি।

অতীন হরনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নন্দী মশাই বললেন,—'এবার হয়তো বিয়ের কিছু হিল্লে টিল্লে হতে পারে হে! ঐ যে অমৃত যোগ, চন্দ্রশুদ্ধি—না শুদ্ধির মাথা দেখে তোমার পুত্রকে এইবার ঠিক জায়গায় পাঠিয়েছ।'

—হ্যাঁ দাদা, শুভ দিনের ফলাফলটা যে এত শীগ্‌গির ঘটবে ভাবতেও পারিনি। সব খবরাখবর নন্দী মশায়ের কর্ণগোচর করিয়ে বললেন,—পড়ে দেখো, এই শক্তি দেবীর চিঠিখানা। আপন মনেই হরনাথ চিন্তা করেন,—নৌকো পাল তুলে মাঝ দরিয়ায় ভেসে যাচ্ছে—এখন না ডুবলে বাঁচি—ঘাটে ভিড়লে ষোড়শোপচারে মায়ের পূজো দেব।

চিঠিখানা পাঠ করে, নন্দী মশায়ের খুব আনন্দ।—মনে নেই ভায়া, সেদিন এই মেয়েটির কথাই বলেছিলাম—যাক্, তোমার ভগবান ঠিক সময়েই যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিলেন। তা'হলে বুঝলে ভায়া,—"মিষ্টান্ন ইতরে জনা," ঠিক সময়ে নেমন্তন্নটা পাই যেন! তার পরেই চিরাচরিত কর্কশ কণ্ঠে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে পুঁটলি হস্তে বেরিয়ে গেলেন।

ও দিকে অতীন সোজা মেডিকেল কলেজে গিয়ে শুনলে, ভোর রাত্রে কুলিটার মৃত্যু হয়েছে। বিমর্ষ হয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখে, রেখা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে, অতীনকে দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেই, তার শুক্‌নো মুখ নজরে পড়লো,—এই যে আপনিও—কি খবর—বলুন তো?'

—সে মারা গেল—তাঁর ডাক এলে আর ডাক্তারের ক্ষমতা থাকে না, রেখা দেবী!

রেখা থমকে দাঁড়ালো।—আপনার মুখ দেখেই অনুমান করেছিলাম— একটা স্ফূর্ত্তির প্রাণ আর একটা গরীবের জান নিয়ে গেল।

অতীন টাকা বের করে রেখার হাতে দিতে যায়—নিন্ ছিয়াশী টাকা ফেরৎ পাওয়া গেল।

—ও নিয়ে কী হবে? দয়া ক'রে কোনো গরীবদের খাইয়ে দেবেন। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল ডাক্তার বাবু—যাক্, আজ আস্‌ছেন তো?

—হ্যাঁ, সাড়ে ছটায় যাবো।

—না, আমিই এসে প্রথম দিনটা সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। কি বলেন?

—বেশ তাই হবে।

রেখা চলে যাবার পরেই, অতীন সোজা গিয়ে তার ল্যান্সডাউন চেম্বারে নামতেই দেখে, তার সহাধ্যায়ী হরেন বিষণ্ণ মুখে বসে।

অতীন ও হরেন দু'জনে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এস, সি পড়তো। অতীন পাশ করে ডাক্তারী লাইনে যায়—হরেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হয়। শেষে ডিগ্রি নিয়ে সোজা বিলেত যাত্রা।

অতীন হেসে বললে,—যাক্, তোর দেখা তো পেলাম—এ্যাদ্দিনে মনে পড়লো, তা'হলে? ভাবলাম বুঝি—

—মরে গেছি—না?—তা' হলে তো বাঁচতাম।

—অতো বিষাদের সুর কেন? ও কি? বিলেত-ফেরতার এই স্যুটের অবস্থা!

—গিন্নীর ভালবাসার ঠেলায়, বুঝলে বন্ধু! কোনো ভাল জামা, জুতো, স্যুট পরার উপায় নেই—প্রেমের মাত্রাটা খুব চড়া কি না? কি জানি, ভালো পোষাক-পরিচ্ছদে যদি কোন মহিলার নেকনজরে পড়ে যাই—তাই বেমালুম সার্জারীটা চালিয়ে যান—ডাক্তার হয়ে তুমিও এমনটি পারবে না। এই দেখো না—হাজারটা তালি দেওয়া পোষাক পরেই বাইরে বেরুতে হয়—বাপস্, এ সোডা ওয়াটারের ঝাঁঝ সহ্য করা কঠিন।

স্বভাব-গম্ভীর অতীন হেসে উঠে বলে,—বলি, এটা কি হাই-কোর্ট—জজের সামনে মামলা দায়ের করে যাচ্ছো?

—তুই, কি যে বুঝবি—নভ, তৎপুরুষ, বিলেত থেকে ফিরে বিয়ে করলাম—বছর না ঘুরতেই কেবল খ্যাচ্ খ্যাচ্—আর ভাই বিনা কারণে এই সব অমানুষিক অত্যাচার কাঁহাতক সওয়া যায়?

অতীন সান্ত্বনা দেয়। ও সব ব্যাপার হার ম্যাজিষ্ট্রির দরবারে আপোষ মীমাংসা করে নিস্—এখন আমায় কি করতে হবে বল্?

—এই প্রেসক্রিপসনটা—

—কার, তোর বো'য়ের বুঝি?

নৈলে আর কোন্ চুলোর?

—এ দিকে নিন্দে করবি আবার ওষুধ নিতেও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবি—বেশ মজার লোক যা হোক্।

কম্পাউণ্ডার পেটেণ্ট ওষুধটা আনতেই হরেন দাম চুকিয়ে বলে—তাকে বিশিষ্টরূপ বহন করেছি বলেই প্রিমিয়ামগুলো টেনে যাই। ডিভিডেণ্ড যা পাই ভগবানই জানেন—তবুও তার জেলাসীটা মিষ্টি লাগে—এটা স্বীকার করবো। আচ্ছা, চিয়ারিও ব্রাদার।

বিদায় নিয়ে হরেন চলে গেল। অতীন ব্যস্ত হয়ে কম্পাউণ্ডারকে কি সব জরুরী উপদেশ দিয়ে রোগী দেখতে বেরিয়ে গেল—বলে গেল, ঠিক পাঁচটায় চেম্বারে আসবে—সব বন্দোবস্ত যেন ঠিক থাকে।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় রেখা গাড়ী থেকে নেমেই থমকে দাঁড়ায়—

ডাক্তার বাবু আজ কোট-প্যাণ্ট বর্জ্জন করেছেন—কোমরে কাপড় বেঁধে—আস্তিন গুটিয়ে অনেক গরীবদের চা'ল পয়সা স্বহস্তে বিতরণ করে যাচ্ছেন। ফুটপাতে সারি সারি দীন দরিদ্রের সমাগম। রেখার উচ্ছল হাসিতে অতীন ফিরে চাইলে,—বেশ ডাক্তার বাবু, আপনার বিভিন্ন রূপ দেখলাম—এ রকমটা হ'লে ডিস্পেনসারির পরমায়ুটা আর ক'দিন!

—তা ঠিক বলতে পারি না—তবে এটা জানি, আপনার যা কিছু সবই তো ওয়ারলড্ ব্যাঙ্কের যিনি মালিক সেই মহাফেজের খাতায় জমা পড়ছে, আমিও কিছুটা এই ছোট-খাটো সেভিংস একাউণ্টে ফেলে রাখছি।

আপন মনেই রেখা বলে উঠলো,—বাঃ, বেশ কথা বেরিয়েছে, দেখছি!

—কি বললেন?

—কিছু না—

আপনার আমার টাকা মিলিয়ে এই দান-পর্ব্বটা সেরে নিলাম। এ আইডিয়ার প্রোডিউসার আপনি—আমি শুধু ডিষ্ট্রিবিউটার!

কিছুক্ষণ পরেই সবাইকে চাল-পয়সা দেওয়া শেষ হয়ে গেল। সমবেত জয়ধ্বনি অতীনকে ঘিরে সুরু করতেই বাধা দিয়ে সে বলে—আশীর্ব্বাদটা আমার পাওনা নয়—এই এঁকে দাও।

বলার সঙ্গেই রেখাকে ঘিরে সকলের কোলাহল।

"—রাণীমার জয় হোক। শিবের মত বর হোক। ধনে-পুত্রে বাড়-বাড়ন্ত হোক, মা!"

রেখার মুখে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিলে। মাথা নীচু করে অতীনকে অভিযোগ করে,—'মিথ্যে কথাটা কদ্দিন শিখলেন ডাক্তার বাবু?'

—অভিযোগ করার আগে অপরাধটা বুঝিয়ে দিন?

—আমার ক' টাকা, বলুন?

আপনি যে পাঁচ শ' টাকার কম খরচ করেন নি, সেটুকু বুঝবার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই আছে।

অতীন হেসে উত্তর দেয়—আলো জ্বলাটা আশ্চর্য্য নয়। তবে যেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়, সেই পাওয়ার হাউস্‌টাই আশ্চর্য্য। ইঞ্জিন গাড়ী-বোঝাই যাত্রীদের টেনে নিয়ে যায়—বাহাদুরী গাড়ীটায় নয়—ঐ ইঞ্জিনের—যুদ্ধে যারা মরে, তাদের ক'টার নাম মনে রাখি, তবে ঐ ফিল্ডমার্শালের নামটাই ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই।

একটা দুষ্টু হাসি রেখার মুখে খেলে গেল।

—আর জীবনের পাতায় কিছু দেখতে পান?

—কিছু না, সেখানে জমার ঘরে শূন্য।

—সেই শূন্য ঘরটা পূর্ণ হলেই ত, দেখতে পাবেন।

—কি জানি? ও সব কিসজব্জি আমার ধাতে সয় না।

—ওটাও একটা রোগ। নিজে তো ডাক্তার, রোগটা ধরে ফেলুন না!

ডাক্তার নিজের অসুখে চিকিৎসা করে না—অপরকে ডাকতে হয়।

—তাই ডাকুন কে বারণ করেছে?

দু' জনের কলহাস্যে স্থানটা মুখরিত হয়ে উঠলো।

রেখা অতীনকে ডাক দিয়ে বলে,—চলুন, আমাদের বাড়ী।

—তাই চলুন—সত্যিই তোমার সঙ্গে কথা কইতে খুব ভাল লাগে—আর সেটা কেন যে লাগে তাই ভাবি।

রেখা চম্‌কে উঠেই হেসে উত্তর দিলে,—বেশ তো, দু'-দশ দিন ভেবে ঠিক করে ফেলুন—কেন ভাল লাগে।

তুমি সম্বোধন করে অতীন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

ওদিকে রেখার মুখেও ভুবন-ভোলানো বিজয়িনীর হাসি ছল্‌কে ওঠে।

—হাঁ, কি বলছিলেন, ভাল লাগার কথা?

কুণ্ঠার সঙ্গে অতীন মাথা নীচু করে উত্তর দেয়—কেন যে লাগে তাই ভাবি।

—আবার সেই ভাবনায় পড়লেন তো?

—হঠাৎ মুখ ফস্‌কে তুমিটা বেরিয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না।

অতীনের চোখ-কান যেন লাল হয়ে ওঠে।

—ঠিকই মনে করবো, যদি ফের 'আপনি' বলে ডাকেন।

—বেশ, তা' হ'লে সোলেনামা হয়ে যাক—আমরা পরস্পরকে এবার তুমি বলেই ডাকবো—কেমন?

—তাই হবে। দু'-এক বার ভুল হয়ে গেলে যেন জরিমানা দিতে না হয়?

হাস্‌তে হাস্‌তে দু'জনেই রেখার গাড়ীতে ওঠে।

অতীন ষ্টিয়ারিং ধরে বস্‌লো। রেখা তার ড্রাইভারকে হুকুম দিলে,—

—ডাক্তার সাবকো ঘরকে গেরাজমে গাড়ী রাখ্‌কর্ কৌরন্ কোঠী চলে আনা—সম্‌ঝে?

—ঠিক হ্যায় মা জী?

অতীন ধীরে ধীরে যেন কথার জড়তা কাটিয়ে উঠতে চায়—

—বেশ তো, চমৎকার হিন্দি বলতে পারো?

—সেটা আর বেশী কি? পশ্চিমে মানুষ হয়েছি—চলুন—চলো।

এক বার রেড রোডে চক্কর দিয়ে বাড়ী ফেরা যাক্।

—তাই চলো—অতীন পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যায়।

—এত ঝড় ভাল লাগে না। একটু আস্তে।

—ঝড় এলে বাধা দিও না—আস্‌তে দাও।

—এটা আবার কি জীবন-দর্শন?

হাঁ, ঝড়ের ধর্ম্মই হচ্ছে—ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যাওয়া; তাই বাইরের ঝড় ভেতরে যোগ দিয়ে আমাকেও উল্টে-পাল্টে ভেঙ্গে চুরে দিতে চায়।

—আপনি—না—না—তুমি, কবিতা লিখতে?

—চেষ্টা করেও পারি নি। ঐ মিল নিয়ে মাথার কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে যেত—তবে অমিত্রাক্ষরে হাতটা পাকিয়েছিলাম।

—এবার চেষ্টা করে দেখো—মিল নিয়ে আর গণ্ডগোল হবে না।

অতীন রেখার দিকে চেয়ে হাস্‌লো—

আর সেটা যে মানে বুঝে, তা' আমরা জানি।

দেখুন আপনি—

—আবার আপ'নি, কৈ আমার তো ভুল হয় না ?

—ভুলে যেও না, পুরুষের যেটা জন্মার্জ্জিত অধিকার মেয়েদের সেটা চেষ্টা করে পেতে হয়।

বাড়ীতে ফিরেই রেখা চায়ের হুকুম দিলে।

ফুলদানীর বিভিন্ন জাতীয় পুষ্পস্তবকে ঘরটা যেন হেসে উঠছে—তার মধ্যে একটি ফুল নিয়ে রেখা নিজের কবরীবন্ধে গুঁজে নিলে।

—বেশ মিষ্টি গন্ধ—ওটা কী ?

একটু হেসে, একটু থেমে রেখা বলে—প্যাসন্ ফ্লাওয়ার।

একটা চমকের ভাব ফুটে উঠল অতীনের মুখে—এখন দু'জনের মধ্যে এই তর্ক চলতে লাগলো—

কে কা'কে কী বলে ডাকবে ?

অতীন রেখাকে 'অতীনদা' বলাতে চায়—

রেখা খুব জোর মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। কপালে যাই থাক ঐ 'অতীনদা' কিছুতেই বলবো না। পথে-ঘাটে অমুকদা' শুনি—আর যা—না থাক্—ওটা আমার দ্বারা হবে না।

—কিন্তু আমি তোমায় কি বলে ডাকবো, সেটা ঠিক করে ফেলেছি।

—কী ?

—বেথুন বিউটী।

—আমি কি বলে ডাকবো, সেটাও ঠিক করে দাও—জগৎসিংহ, বিল্বমঙ্গল, রোমিও না এণ্টনি ?

ফিক্ করে হেসে রেখার স্বপ্ন-বিভোল চোখ দু'টি যেন কোন নীলিমায় ভেসে গেল। সেই চাউনীতে কি ছিল, অতীনই জানে।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শত নাম—আমারও দু'চারটে থাক না—ক্ষতি কি ?

—তাঁর তো ষোল শ' গোপিনী ছিল, আপনার—থুড়ি তোমার সে একটাও নেই—এই যা তফাৎ—

—তুমি যখন সহজ-সরল কথাগুলো বলে-যাও—বেশ লাগে—

—লাগে নাকি ?

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে, অতীন রেখাকে বলে,—তুমি গাইতে নিশ্চয়ই ?

—হ্যাঁ, একটু জানি বৈ কি ?

—একটা গাও না—শুনি।

রেখা টেবিল-অর্গান খুলে গাইতে বসলো। কণ্ঠে সুর-তরঙ্গের অপূর্ব উন্মাদনায় অতীন মুগ্ধ।

—কেমন লাগলো ?

—প্রকাশের ভাষা নেই, বিধাতা তোমার কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন সুর—চোখে দিয়েছেন অসীম স্বপ্ন তাই—

বাধা দিয়ে রেখা বলে উঠলো—সে দিন একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, পুরুষ যখন উচ্ছ্বাস নিয়ে নারীর কাছে ডালি সাজিয়ে দেয়—বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে তখন খুব সাবধান।

অতীন প্রতিবাদ করে।

—প্রাণধর্ম্মে ঘা দিলেই উচ্ছ্বাসের জন্ম—এটা মানতে চাও না ?

—না—চাই না, প্রাণ কী, তার ধর্ম্ম কী ?—

এ সব কিছু না বুঝেই ঝোঁকের মাথায় ঘা' দিয়ে বসলাম। তার ফলে, একটা সস্তা পঙ্গু উচ্ছ্বাসের জন্ম হয়েই মরে গেল—সেটা আমি কিছুতেই মানতে চাই না।

—কিন্তু—

—আর কিন্তু-টিন্তু নেই—ক'টা বাজে খবর রাখ ?

—ওঃ—এ যে রাত বারটা !

বাবা কি মনে করবেন—অবিশ্যি আমার ভাবনা কিছু নেই—রেখা গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়—

—সে কি ? ওটা যে মশায়েরই একচেটে।

কিন্তু তোমার ভাবনা যতটা হাল্কা হচ্ছে—আমার ঠিক ততটাই চেপে বসছে, কি করি বল তো—?

অতীন হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠলো—

যেতে মন চায় না—তবু—

পাল্টা জবাব দেয় রেখা

—তবুও যেতে হয়—এই-ই নিয়ম।

এমন সময় ভোম্বল বাবুর প্রবেশ ও উক্তি।

—মা ব'লছিলেন, কিছু মুখে দিয়ে গেলে ভাল হয়—রাত হয়ে গেলো—হেঃ-হেঃ-হেঃ।

—নাঃ—আজ থাক—কাল হবে'খন—তা হ'লে আসি।

অতীন যাবার সময় এক বার ঘুরে রেখার দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেল।

ভোম্বল বাবু ড্রাইভারকে হাঁক দিয়ে বললেন—হেই ড্রাইভার, ডাক্তার বাবুকে লেকে উন্‌কা বাড়িমে দিয়ে আও—বুঝতে পারতা হায় ?

রেখা দাদুর হিন্দি-ভাষার আস্ফালনে হেসে লুটোপুটি—একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে—দাদু, তোমার কথা শুনে একটা ভোজপুরী দারোয়ানের গান মনে পড়ে গেল—"যমুনা পুলিনমে বৈঠে, কাঁদে রাধা বিনি-নিনি—"

—খুব ফুর্ত্তি যে র‍্যা—তার পর দিদিমণি, আসল কথাটা ধামা চাপা দিলে, আমি ভুলছি না।

কি আবার কথা ?

—এই কা'ল দশটা—আজ বারোটা—এ যে ডবল প্রমোশন। চোপর রাতটা কখন হবে দিদিমণি—হেঃ—হেঃ—হেঃ।

—যাও, কি যে হিঃ, হিঃ কর, ভাল লাগে না—খিদেয় পেট জ্বলছে—

এখন চলো।

—তা তো এখন জ্বলবেই—হেঃ—হেঃ—হেঃ।

মাস চারেক পরের কথা।

অতীন গোটা রাত ছটফট্ করেছে। এক বিন্দুও জল মুখে দেয় নি—ঘুমুতেও পারে নি। কাল রেখার সঙ্গে সে এক চোট ঝগড়া করে ফিরে এসেছে। শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিতের মত উক্তিগুলো রেখাকে শুনিয়ে দেওয়াটা কোনও ভদ্রতার পর্য্যায়ে পড়ে না। অতীন ভাবতে থাকে। সে নিজেকে সভ্য-জগতের অধিবাসী বলে দাবী করে, কিন্তু নিজের কথাগুলি ঘুরে-ফিরে তাকেই বুঝিয়ে দিতে চায়—সে তার চেয়ে কত দূরে। পুরুষকে নিয়ে মাছের মত খেলিয়ে তোলা বুঝি পাটনা কলেজের শিক্ষা—অসুখ-বিসুখ না

থাকলেও মজা দেখার জন্য একটা ডাক্তার পুষে রাখা—কত কথাই না সে রেখাকে বলে এসেছে! প্রত্যুত্তরে রেখা সজল-চোখে শুধু একটাই জবাব দিয়েছে—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে আজীবন করে যাবে। সে কী বলতে চায়—এর অর্থ কী—জিজ্ঞেস্ করলেও কথার মোড় ঘুরিয়ে আবোল-তাবোল বকতে থাকে।

অতীন লজ্জিত—অনুতপ্ত—আজ ভোরেই সে যাবে রেখার কাছে—ক্ষমা চাইতে, তার সঙ্গে একটা শেষ বোঝা-পড়া করে আসতে চায়—ভাবনার পর ভাবনা অতীনকে পাগল করে তোলে।

আটটার আগেই অতীন বেরিয়ে পড়লো চৌরঙ্গী টেরেসের দিকে। ঘরে ঢুকে দেখতে পায় রেখা জানালার ধারে আষাঢ়ের মেঘভরা কালো আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—বেথুন বিউটি।

রেখা অতীনের ডাক শুনে চম্‌কে উঠল—কণ্ঠে অভিমানের সুর—আ, জগৎসিংহ। হঠাৎ যে অকাল-বোধন!—তা বেশ।

প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু—

—আবার অভিনয়?

—বেশ তো, কালকের মত আবার মিষ্টি বচনগুলো শুনিয়ে দাও।

—আর লজ্জা দিও না—ক্ষমা কর।

—কে কা'কে ক্ষমা করবে—আমি তোমাকে, না তুমি আমাকে?—সত্যি, আমিই ত অপরাধী।

—হেঁয়ালী রাখো। আমি একটা পরিষ্কার জবাব চাই!

—তুমি কী আমায় কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে? কৈ মনে ত পড়ে না!

—আবার সেই কথার ম্যাজিক? আমি সোজা মানুষ—সোজা উত্তর চাই।

—বেশ, সোজা কথাটা বললে ত' সোজা উত্তর পাবে। হয়তো তোমার মনকে জিজ্ঞেস করেছিলে—আমায় কর নি।

—আমি কী চাই—তুমি জানো না?

ধরা-ছোঁয়া দাও না কেন?

—তার মানে?

—যেন ছায়া।

—ছায়া নই, আমি কায়া। রক্ত-মাংসের মানুষ—এই দেখ না।

রেখা অতীনের হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিলে। অতীন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই স্পর্শটুকু যেন আজ নিংড়ে নিতে চায়।

রেখা ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিলে।

—তোমার সবই অদ্ভুত! এত কাছে এসে আবার দূরে চলে যাও—তোমাকে খুঁজেই পাই না।

—তাই না কি, তুমি বুঝি এখন শুধু খুঁজেই বেড়াও?

—তুমি তা' বলবে বৈ কি।

রেখা নীরব। অতীন ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। হঠাৎ রেখার দিকে চেয়ে ব'লে উঠে,—এ ভাবে জবাই করার মানে কী?

অতীনের কণ্ঠে বুঝি উগ্রতা মেশানো ছিল।

—ছিঃ, তুমি উত্তেজিত হয়েছো—এ কথা তোমার মুখে সাজে না।

—সোজা কথাটা বলাও কী দোষের?

—তা হলে আমিও সোজা কথাই বলি।

এই সময় রুগী-পত্তর ছেড়ে দিয়ে এখানে গল্প-গুজব করাটা কী দোষের নয়?

—আবার ঘুরে গেলে? থাক্ বলবার কিছু নেই।

—ওরে, রেখা আছিস রে?

শক্তি দেবী ঘরে ঢুকেই দেখেন—অতীন। তিনি জানতেন না—সে কখন এসেছে।

—কাল কী হয়েছিল তোমাদের? চা-টা না খেয়েই যে চলে গেলে?

মাথা নীচু করে অতীন উত্তর দেয়—

—আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করুন, মাসিমা! আমি বলব না।

রেখা ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়—মাকে সব বলেছি—

শক্তি দেবী বেগতিক বুঝে সরে পড়ার তালে আছেন। হেসে বললেন—তোমাদের মামলা, তোমরাই মিটিয়ে নাও—আমাকে এর মধ্যে টেনো না—সন্ধ্যাবেলা এসো, বুঝলে?

তিনি চলে গেলেন।

অতীন রেখাকে টিপ্পনী কাটলে।

—এবার আমারও যাবার পালা—নোটীশ আগেই দিয়েছো—বেশ, বিদায় হচ্ছি—কিন্তু মনে রেখো আজ সন্ধ্যায় জবাবটা চাই!

—হুকুম না কি?

—তাই যদি হয়?

—বেশ। জবাব পাবে। [ক্রমশঃ।

সন্দেশ, রসগোল্লা বেশী করে খাবেন?

সন্দেশ মানেই চিনি আর ছানা। রসগোল্লা মানেও তাই। চিনি মানেই কার্বোহাইড্রেট। অর্থাৎ যা থেকে অত্যন্ত সহজে পাওয়া যাবে প্রচুর ক্যালোরি মানে শক্তি। ষ্টার্চ থেকেও সেই কার্বোহাইড্রেট। শুধু মাত্র অবগতির জন্য বলছি, ১৮৪০ সালে গড়ে মাথা-পিছু চিনির খরচা ছিল ১৭ পাউণ্ড বছরে। আর আজ? ১০০ পাউণ্ডের মত। কিন্তু তবু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই, বেশী মিষ্টি দাঁতের ক্ষতি করতে পারে আপনার, অম্বল শুরু করাতে পারে, ক্যাটারা, ডায়বেটিস ইত্যাদি ভারী ভারী রোগের কথা নাই-ই বললাম।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

আমার স্বদেশে আর যাই হোক, সবজান্তা শুভার্থীর অপ্রতুল নেই। যাবার আগে অধমের হিতার্থে তাঁরা বিস্তর উপদেশ ছেড়েছিলেন। কম্যুনিষ্ট দেশ—যে প্রকার এত দিন জেনে বুঝে এসেছ, ঠিক উল্টোটি সেই রাজ্যে। বড়লোকগুলোকে কেটে কুচি কুচি করেছে, মন্দির-দেবস্থানে রোলার পিষেছে। ঘর গৃহস্থালী চুরমার—খাটবে আর খাওয়া-পরা পাবে—ব্যস, এই মাত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই—রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টটা অবধি কান খাড়া করে রয়েছে। এখন অমন বলেছ—কিম্বা মুখ ফুটে বলতেও হবে না, বেয়াড়া রকমের কিছু মনে মনে ভেবেছ কি অমনি নিয়ে তুলবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। দুনিয়ার মানুষ তার পরে আর চিহ্ন দেখবে না তোমার।

অনেক দিন হয়ে গেল, রোমহর্ষক বর্ণনার সবগুলো আমার মনে নেই। সকৌতুকে মনে মনে সেই সব আনাগোনা করতাম। কিছুই তো মেলে না হে! সারা জীবনে উঠোন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন নি বটে, কিন্তু ভুবনের যাবতীয় সঠিক সংবাদ তাঁদের নখাগ্রে। তাঁদের সতর্ক বাণী বিলকুল সব ফাঁকি হয়ে গেল!

না, মিলল একটা বটে এত দিনে! ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে নেই, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শুনুন—অধমের উপর হামলা হয়েছিল কি প্রকার! তাজ্জব হয়ে যাবেন। হয়তো বা চক্ষু বাষ্প-বিজড়িত হয়ে উঠবে।

দলনেতা এবং রুগ্ন-অসমর্থের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা, আর সকলের পাইকারি বাস। দলনেতা বলেই নিরালা কোটরের মধ্যে আটকাবে, এ কেমন কথা? অনেক নিন্দে-মন্দ করতাম এই নিয়ে পিকিনে। শেষটা নিজেকে নিয়েই টান পড়ল তো দস্তুরমতো বিদ্রোহ করে বসলাম। সে কিছুতে হতে দিচ্ছি নে। তখন করল কি মশায়, জন কয়েক তাগড়া জোয়ান বাসের দরজা চেপে দাঁড়াল,—ঢুকবেন কেমন করে বাসে—ঢুকুন। তাতেই শেষ নয়। গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো দু-জনে দু-হাত ধরে টেনে জোরজার করে নেতার গাড়ির মধ্যে পুরে ফেলল। ইংরেজের আমলে দেখেছি, স্বদেশি ছেলেদের প্রায় এই কায়দায় কয়েদির গাড়িতে ঢোকাতো। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছি, দলের সকলের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করছি—দেখ হে তোমরা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুরোপুরি বিলোপ-সাধন, শারীরিক বলপ্রয়োগ…তা পাষাণ আমার স্বদেশবাসীরা! সকলের চোখের উপর দিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, তাঁরা হাসতে লাগলেন। অধমের দুর্গতিতে সকলে খুশি।

প্রতিকারের ভার নিজের হাতে নিয়ে নিলাম তখন। কার ও বাস পরদিন যথারীতি এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের দরজায়। সকলের আগে আমি চুপি-চুপি বাসে উঠেছি, একটা বেঞ্চির কোণ নিয়ে নিঃসাড়ে বসে আছি। তার পর ওরা এসে পড়ল। খোঁজ—খোঁজ—নেতা মশায় গেলেন কোথা? হোটেলের বাইরে চলে এসেছেন তো!

ঘাড় নিচু করে পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মগোপন করেছি। অবশেষে দেখতে পেল। বাসের ভিতর ঢুকেছে গ্রেপ্তার করতে।

উঠে আসুন। আপনার এ জায়গা নয়—

আমি আইন দেখাই, ডেলিগেট যখন—নিশ্চয় এক্তিয়ার আছে বাসে উঠে বসবার।

তবে কার্ড দেখান—

এর ইতিহাসটা বলি। সাংহাই পৌঁছবার পরেই প্রত্যেক প্রতিনিধিকে একটা করে কার্ড দিয়েছিল। প্রয়োজন হলে বাসের লোককে ঐ কার্ড দেখাতে হবে, আজেবাজে মানুষ যাতে বাসে উঠে না পড়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দশ মিনিটের মধ্যে ওরা আমরা ভাই-ব্রাদার—যেন দশ শ' বছরের পরিচয়। কে বা চাইবে কার্ড, আর দেখাতে যাচ্ছেই বা কোন জন? কার্ড যেমন দিয়েছিল, তেমনি হয়তো পড়ে আছে টেবিলের উপর। অথবা ঘর-সাফাইয়ের সময় ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছে। ভরসা ওদের সেইখানে। তাই হুমকি দিচ্ছে, দেখান আপনার কার্ড—

কপাল গতিকে আমার কার্ডখানা সেদিন পকেটেই ছিল। নাকের সামনে বের করে ধরি। হতভম্ব—ক্ষণকাল কথাই বলতে পারে না। তবু কি অল্পে ছাড়বার পাত্র! আবার এক নতুন মতলব ঠাউরে ফেলেছে।

আপনি মোটা মানুষ—বেঞ্চির অনেকটা জুড়ে বসেছেন। এত জায়গা দিতে পারব না। বাস ছেড়ে আপনাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।

সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্র রোগা মানুষ—তাঁকে পাশে টেনে বসালাম।

হল তো? দু-জনের জায়গা—আমি যদি দেড় হই, ইনি আধ। ব্যস, মিটে গেল। এবারে কি বলবে?

বলবার কিছু নেই আর। বেকুব হয়ে নেমে গেল হাসতে হাসতে। দলনেতার স্বতন্ত্র গাড়িটা গেল না আর সেদিন।

বাসে চড়ে জাহাজঘাটায় গেলাম। রোদ ওঠেনি তখনো ভাল করে। সাংহাই ডকের জগৎজোড়া নাম—কিন্তু আজকে আর কি দেখবেন? সন্ধিবন্দর ছিল এটা—সন্ধিসূত্রে মাতব্বর জাতগুলোর অবাধ ব্যাপার-বাণিজ্যের অধিকার। বাণিজ্যের নামে মহাচী

মেদমজ্জা শুষে নিত অক্টোপাস। অক্টোপাস অর্থাৎ অষ্টভুজের উপমাটা খুব লাগসই। শোষক জাতিরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চীনভূমিতে আড্ডা গেড়েছিল গুণতিতে তারা আটই বটে!

বিদেশি শত শত মানোয়ারি জাহাজ ঐ জলের উপর চক্কোর দিয়ে বিদেশি স্বার্থ পাহারা দিত। আজ দেখলাম, বিদেশি বলতে রয়েছে বৃটিশ ব্যাপারি জাহাজ একখানি। আর সবাই আপোষে সরে পড়েছে গতিক বুঝে, ঝামেলা করেনি। করমোশায় ওৎ পেতে রয়েছে তাদের কেউ কেউ; ঐখান থেকে প্রলুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলছে। এক চীনা জাহাজের নাবিকদল আমাদের দেখে শশব্যস্তে নেমে এলো, হাততালি দিয়ে খুব খাতির করে জাহাজের উপর নিয়ে তুলল।

সাংহাইয়ের জেড-মন্দিরের খুব নাম। বুদ্ধমূর্তি মূল্যবান জেড পাথরে তৈরি। তাজ্জব ব্যাপার তো রোলার চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে নি এখনো মন্দির? আমার বাংলাদেশে কয়েকটি দিক্‌পাল যে তারস্বরে এই বুলি ধরেছেন! জানি, দোষ তাঁদের নয়—কলওয়ালারা পিছন থেকে স্প্রিংয়ে দম দিয়ে পুতুলের মুখ দিয়ে এই বুলি বলাচ্ছে। উঁহু, হাত দিয়ে লেখাচ্ছে। কিন্তু থাকুক এ-সব। পীতাম্বর শ্রমণরা আমাদের দেশের গেরুয়াধারী সাধু মহারাজদের মতোই। ভারত থেকে আসছি আমরা, প্রভু বুদ্ধের দেশের মানুষ—তাই বড্ড খাতির, আমাদের চেয়ে আপন কে আছে বুদ্ধ-ভক্তদের কাছে?

বিস্তর জায়গা-জমি নিয়ে মন্দির। ঘরবাড়ি দেখে অবাক হয়ে যাই। সম্রাট ও যুগ-যুগের ভক্তদের আনুকূল্যে এই সমস্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। এবং ভক্তদেরও বিস্তর মূর্তি আছে। দেয়ালে রাজা লিয়াং-তির প্রকাণ্ড ছবি—যিনি প্রথম এদেশে বৌদ্ধধর্ম আনলেন। শ্রমণদের আবাস এবং ধর্মালোচনা ও পড়াশোনার জায়গা। বিচিত্র অলঙ্করণ সর্বত্র—নানাবিধ দেয়াল-চিত্র। পুরো দিন ঘুরেও দেখা হয় না, অথচ ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে নমো-নমো করে সমস্ত সারতে হবে। সময় নেই।

আরও তাজ্জব—মন্দির মেরামত হচ্ছে, মিস্ত্রিমজুরের দল ভারা বেঁধে কাজ করছে। মন্দিরের কোন কোন অংশ ব্যবহার হত না, ভেঙেচুরে পড়ে ছিল অনেক কাল। বোমার আঘাতেও কিছু কিছু জখম হয়েছিল। সেই সমস্ত নতুন করে গড়া হচ্ছে পুরানো স্থাপত্যরীতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। নতুন-চীনের কর্তারা ধর্মকর্ম মানে না—তবে আবার এ সমস্ত কেন? আমরা না-ই মানলাম, কিন্তু যারা মানে তাদের বিশ্বাসে বাধা দিতে যাব না কেন?

শ্রমণরা তাদের ঘরে নিয়ে বসালেন আমাদের, চা ইত্যাদি দিলেন। বুদ্ধের দেশের মানুষ—মহা মাননীয় তোমরা। অজস্র ধন্যবাদ, এত দূরে আমাদের দেখতে এসেছ। প্রভু বুদ্ধও পরম শান্তিবাদী। আঠার শ' বছর আগে বৌদ্ধধর্ম এদেশে এসেছিল, সেই তখন থেকে বন্ধুত্ব তোমাদের সঙ্গে। আমাদের শ্রমণ-সম্প্রদায়ের ভালবাসা তোমার দেশের মানুষদের জানিও। বোলো, শান্তিতে আমরা মিলে-মিশে ভাই-ভাই হয়ে থাকতে চাই।

ফোটো তুললেন সবাই একত্র হয়ে। বললেন, নতুন আমল বলে গোড়ায় খুব ভয় হয়েছিল—কিন্তু না, ভালই আছি আমরা মশায়। মন্দির-মসজিদ-গির্জা এবং যাবতীয় পুরানো কীর্তি সেরেসুরে দিচ্ছে ওরা, থোক টাকাপয়সার দরকার হলেও পাওয়া যায়। কর্তাদের সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই, দোষ হল হাল আমলের ছেলেমেয়েগুলোর। ভক্তি-নিষ্ঠা নেই, মন্দিরে আসে না—কেমন যেন সব হয়ে যাচ্ছে। সেকালের প্রবীণেরাই মন্দিরে আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের অন্তে কি যে হবে—

মুখ শুকনো করে আমরাও সমবেদনা জানাই, বলেন বেন—সব দেশের ঐ এক রীত। আমাদের পুরুত-পাণ্ডারাও ব্যাকুল হচ্ছেন এই ভাবনা ভেবে। ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না ছেলেমেয়েরা—কী যে হচ্ছে দিনকে দিন।

ছুটলাম এবারে এক নম্বর কটন মিলে। এটাও সরকারি কারখানা। কর্মিক চল্লিশ হাজারের বেশি—তার মধ্যে শতকরা সত্তরটি হল মেয়ে। সরকারের হাতে আসার পর কর্মিকদের বড় স্ফূর্তি, উৎপন্নের পরিমাণ বিস্তর বেড়ে গেছে। মাইনেও পাচ্ছে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে, কর্মিকদের শরীর মজবুত রাখবার জন্য মুফতে নানা রকম ব্যবস্থা। এখানে-ওখানে বোর্ড ঝুলানো—স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানান উপদেশ লিখে রেখেছে। বাচ্চাদের নার্সারি—মেয়ে-কর্মিকরা শিশুসন্তানদের ওখানে গছিয়ে দিয়ে

সাংহাই—সান ইয়াৎ-সেনের বাড়িতে

কাজে লাগে; কারখানা বন্ধ হলে বাচ্চা কোলে ঘরে চলে যায়। বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া খেলাধুলো ও পড়াশুনোর হরেক রকম বন্দোবস্ত। মা কাছে নেই, সমস্তটা দিনের মধ্যে শিশুর তা খেয়ালই থাকে না। কর্মিকরাও পড়ে—আট ঘণ্টা ডিউটি তার পয়লা দু-ঘণ্টা লেখাপড়া। দিনের খাটনির পর ক্লান্ত হয়ে পড়বে, লেখাপড়ার পাট সেজন্য আগে সেরে নেওয়ার নিয়ম। বেশির ভাগই আগে একেবারে নিরক্ষর ছিল, এখন দিব্যি খবরের কাগজ পড়ে তারা। ছ-মাস পরে এই মিল সম্পর্কিত একটি মানুষ নিরক্ষর থাকবে না, এই ওরা পণ নিয়েছে।

মেয়েপুরুষ সব কর্মিকের এক রকম মাইনে। পরিচালক ও সাধারণ কর্মিকের মাইনেয় খুব বেশি ফারাক নেই। মেয়েরা প্রসবের আগে-পিছে পুরো মাইনেয় বাড়তি ছুটি পায়। বিপদ-আপদ ও দুর্দিনের কথা ভেবে প্রত্যেক কর্মিকের শ্রম-বীমা করা আছে—প্রিমিয়াম কারখানা থেকেই দিয়ে দেয়। কারখানায় ঢুকলাম—কর্মিকরা একাগ্র ভাবে কাজ করছে। তাদের মাঝখান দিয়ে এপথ-ওপথ উপর-নিচে করছি আমরা। এত তুলো উড়ছে যে বহাল তবিয়তে ঘোরাফেরাই দায়। কর্মিকরা নাক-ঢাকা প'রে কাজ করছে।

দেখা-শুনোর পর বক্তৃতা—ঘরের ভিতরে নয়, প্রাঙ্গণে। তারা দত্ত মশায়ের উপর ভার দিলাম, আমাদের হয়ে বলবার জন্য। খাসা বললেন অল্প কথার ভিতর।

হোটেলে ফিরতি মুখে দেখতে পাচ্ছি, রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এখন থেকেই সভায় গিয়ে জমছে। নানা রকম পতাকা উড়িয়ে মিছিল করেও যাচ্ছে দলের পর দল। ব্যাপার তবে তো বিষম গুরুতর! গোটা সাংহাই শহর ভিড় জমাবে আজ ময়দানে। নিতান্ত যারা যেতে পারবে না, তারা বাড়ি বসে শুনবে—সাংহাই-রেডিও সেই ব্যবস্থাও করেছে।

কিন্তু আমি যে এক মুশকিলে পড়ে গেছি। ঐ মহতী সভায় ভারতের তরফ থেকে দু-জনে দু-খানা জ্বালাময়ী ছাড়ব, এই ব্যবস্থা ছিল। শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যাচ্ছে। কাল রাতে আরও কয়েকটা দেশের প্রতিনিধি এসে পড়েছেন, তাঁরাও বলবেন। সময়ের অকুলান পড়ছে অতএব। দু-জনে নয়, বলতে হবে একজনকে। সেই জন্য অবিলম্বে নামটা ঠিক করে ফেলুন।

নাম ঠিক করতে আমার এক সেকেণ্ডও লাগে না। রাঘবিয়া—আবার কে? আমি বাতিল। আমার কথায় বক্তৃতা তৈরি করেছেন—তিনিই বলবেন। এ ছাড়া আর কোন রায় দিতে পারি আমি?

কিন্তু রমেশচন্দ্রের আপত্তি। একজনকে বলতে হলে বলবেন দলনেতাই। সর্ব দেশে এই রীতি।

রীতিটা ভাঙতে চাই আমি—

রমেশচন্দ্র বললেন, মতভেদ হচ্ছে যখন, আপনার মন্ত্রণাদাতাদেরও মত নিয়ে দেখুন।

কিন্তু তাঁরা রমেশচন্দ্রের কথায় সায় দিলেন। ভোটে হেরে গেলাম। একজনে বলবে যখন, সে জন আমিই।

দুপুর ছুটোয় সভা। জায়গাটা এক সময়ে ছিল কুকুর-দৌড়ের মাঠ। বৃটিশরা বানিয়েছিল। লড়াইয়ের মধ্যে জাপানিরা সাংহাই দখল করে নিল। তখন সৈন্যদলের ঘাঁটি হয়েছিল। জাপানি হটিয়ে তার পর মার্কিনরা আড্ডা গাড়ে। ১৯৫১ অব্দে নতুন-চীনের গণতন্ত্রী সরকার বিরাট একজিবিসন খোলেন। ইদানীং আরও বিস্তর জমি ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সাংহাইয়ের পিপলস্ পার্ক হয়েছে। সাঁতারের পুকুর আছে। বড় বড় সভা-সমিতি ও জাতীয় উৎসব এইখানে হয়ে থাকে। বিশাল ষ্টেডিয়াম—লাখ লাখ বসতে পারে সেখানে।

বক্তৃতায় উত্তম উত্তম বচন ঝেড়েছিলাম। সাংহাই নিউজে পরদিন অনেকখানি বেরিয়েছিল, কাগজখানা খুঁজে পাচ্ছি না। অতএব বেঁচে গেলেন আপনারা। কামনা করুন, কোন দিনই কাগজটা না পাওয়া যায়। আমার পরেই বললেন সোভিয়েট দলনেতা অ্যানিসিমভ। এই সেদিন মস্কোয় দেখা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। যে সে ব্যক্তি নন, গোর্কি ইনষ্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচারস নামক এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। এতদ্ সত্ত্বেও এক নজরে চিনে ফেললেন। এবং অজস্র কথাবার্তা হল তিন বারের দেখা-সাক্ষাতে। সাংহাইয়ের সভার কথাও উঠল। বললেন, বক্তৃতার প্রতিযোগিতা চলেছিল যেন—আপনি সব চেয়ে বেশি হাততালি পেয়েছিলেন। আমি ঘাড় নেড়ে বলি, কক্ষনো না—আপনিই। এই নিয়ে হাসাহাসি চলল; অপর প্রতিনিধিরা উপভোগ করছিলেন আমাদের কলহ।

কিন্তু থাক এ সব। কি বলেছিলাম ভুলে গেছি—কিন্তু এটা মনে আছে, বড্ড অসুবিধা লাগছিল, বক্তৃতা করে জুত হয় না মোটে ওদেশে। আবেগ ভরে আচ্ছা এক মনোরম কথা বলে ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাই। চারিদিক চুপচাপ—শ্রোতাদের মধ্যে না-রাম না-গঙ্গা কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই। কুমারী তুন ইংরেজি বাক্যগুলো ধীরগতিতে চীনায় তর্জমা করে যাচ্ছে। অবশেষে—বক্তৃতা ছাড়বার মিনিট দুই-তিন পরে কলরোল উঠল, প্রবল হাততালি। ততক্ষণে কিন্তু আমার উত্তাপ জুড়িয়ে গেছে—পরবর্তী লাগসই কথাগুলো মুখের কাছাকাছি আর হাজির হতে চায় না।

দিনের পাট চুকিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি ক'-জনে। বাজার করছি। সরকারি ও সাধারণ দোকান আছে বিস্তর। কিন্তু ভিড় ঠেলে ঢোকা যায় না। মানুষের হাতে পয়সা হয়েছে, দেদার জিনিষপত্র কিনছে। কিছু কেনাকাটা করে বিরক্তি ভরে শেষটা বেরিয়ে এলাম। আজকের সঙ্গী এক ছাত্র—সে-ও চলে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গীদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি, তাঁরা তখনো এটা-ওটা পছন্দ করছেন। দু-জনে আমরা মোটরে বসে গল্প করছি। ছেলেটা কে, এই লিখতে লিখতে, আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ছে। লম্বাচওড়া উজ্জ্বল চেহারা—বয়স যা বলল, সে তুলনায় অনেক বড়। আমি লেখক—পরিচয়টা শোনা অবধি যখনই সুবিধা পায়, কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। অতএব ধরে নিলাম, লেখার বাতিক তারও আছে—জনৈক হবু-সাহিত্যিক। প্রশ্ন করতে সলজ্জে মুখ নিচু করল। কাঁচা লেখকদের এখানেও ঠিক এই রকম দেখে থাকি। তার একটা কথা কানে বাজছে—বলতে বলতে সেই কিশোরের

চোখের মণি যেন দপ করে জলে উঠল, রাস্তার বিদ্যুতের আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জানো বোস, এই ক'টা বছর আগেও এখানে আমাদের আসবার জো ছিল না। নোটিশ টাঙিয়ে রেখেছিল—'কুকুর আর চীনার প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

বললাম, আমরাও কি বেশি ভাল ছিলাম এর চেয়ে? হরেক বাধা ছিল নিজের দেশ ভুঁয়ে স্বচ্ছন্দে চলে-ফিরে বেড়াবার। কলকাতার অনেক হোটেলে ধুতি পরে ঢোকবার জো ছিল না।

চব্বিশে, শুক্রবার। হ্যাংচাউ রওনা হবো বেলা দুটোর ট্রেনে। বিখ্যাত ওয়েষ্ট-লেকের উপর পাহাড়ের ছায়ায় অপরূপ শহর। ওরা বলে মাটির ধরায় স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে এই হ্যাংচাউ। সকালবেলা যতটা পারা যায় ঘোরাঘুরি করে সাংহাইর পালা একেবারে শেষ করব।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোর পায়ে কি রকম একটা ব্যথা উঠে আধেক শয্যাশায়ী হয়েছেন। তিনি বেরুবেন না। সেই ভাল, বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমে যাবে। পায়ের গতিকে হ্যাংচাউ যদি পণ্ড হয়, সে মনোবেদনা রাখবার ঠাঁই হবে না। বৈদ্যনাথ হোটেলে রইলেন, সকলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

নার্সারি ইস্কুল। ইস্কুল বলা বোধ হয় ঠিক হল না, গোটা নাম—নার্সারি অব চায়না ওয়েলফেয়ার ইনষ্টিট্যুট। শহরের একটেরে মস্ত বড় বাগান-বাড়ি। তার মধ্যে ফালি ফালি খেলার মাঠ; সিমেন্টে বাঁধানো নির্জলা লেক, লেকের মধ্যে নৌকা। আপাততঃ লেকে এক ফোঁটাও জল নেই বটে, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। তখন নৌকো জলের উপরে দুলবে, এ সংসারের বাচ্চা বাসিন্দারা সাঁতার কাটবে লেকের জলে। দুর্ঘটনার ভয় নেই, জল হাতখানেক হবে বড় জোর, চেষ্টা করলেও ডুবে যাওয়া যাবে না।

প্রধান কর্মকর্ত্রী মাদাম সান-ইয়াৎ সেন—তাঁরই চেষ্টায় ধীরে ধীরে এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমাদরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চললেন। মুখে মুখে পরিচয় দিচ্ছেন। দুটো বিভাগ—তিন বছরের নিচে যাদের বয়েস, আর যারা তিনের উপর। শিশু-পালনের উত্তম বন্দোবস্ত। শরীর যাতে গড়ে ওঠে—যে কোন শিশুর মুখে তাকিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। আর তারা যাতে নতুন কালের পুরো মানুষ হয়। তার এক পরিচয়, বাচ্চাগুলো সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত হয়েছে এইটুকু বয়স থেকেই। মানুষের কাছ থেকে আশ্চর্য কায়দায় আদর বাড়তে শিখেছে—তা সে মানুষ যে কোন দেশের, যেমন রং ও প্রকৃতির হোক না কেন।

একটা ঘরে গিয়ে বসালেন। ওদের অভিনয় হচ্ছে। বুড়ো মানুষ সেজেছে—বছর চারেকের হবে সে বাচ্চাটি—পাকা গোঁফ পরেছে, মাথায় পাকা চুল। চীনের সাবেকি ধরনের পোশাক পরে থপথপ করে সামনে এসে দাঁড়াল। ভারি গম্ভীর—বুড়োমানুষের যেমনটি হতে হয়; আমরাও ঠোঁট চেপে থেকে বসে কোনপ্রকার চপলতা হতে দিচ্ছিনে। আসে তারপর নৌ-সৈন্যেরা। বয়স তিন বছরের মধ্যে। সাজপোষাক অবিকল নৌবাহিনীর। গটমট করে নাচ করে আসছে—বাপ রে বাপ, অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপে। নেহাৎ আমরা অত জনে একসঙ্গে আছি, খোদ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাদের মধ্যে রয়েছেন—তাই বসে থাকতে ভরসা পাচ্ছি, ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেলাম না। এক এক দফা অভিনয় হয়ে যায়, আর সাজপোশাক সুদ্ধ ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে সামনে-বসা আমাদের এক একজনের কোলে। তখন আমাদের আর মোটেই ভয় করে না, কোলে বসিয়ে—মুখের কথা তো চলবে না—চোখের দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে আদর করি। বড় বড় চোখ মেলে ওরা পরের দলের অভিনয় দেখে। তার পরে এক সময় কোল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে সাজঘরে ছোটে। ওদের পালা আবার এসেছে কিনা—নতুন এক সাজে সেজে আবার দেখা দেবে। নাচের দল এলো—পিয়ানো বাজছে, পরীদেশের ছেলেমেয়েরা তালে তালে নাচছে বাজনার সঙ্গে। শুধু বাজনা শোনাতে একবার এলো গোটা এক কনসার্ট পার্টি। ভায়োলিন, ড্রাম ইত্যাদি অন্য লোকে ধরে দাঁড়িয়েছে, ওঁরা বাজাচ্ছেন। ভায়োলিনটা লম্বায় বাদককে ছাড়িয়ে যায়। ব্যাণ্ড-মাষ্টারও আছেন, বয়স সাত—সব বাদক তাঁর হুকুমের প্রতীক্ষায় ছড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

মাঠের এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাগানে ছুটোছুটি করছে, রোদ পিঠ করে ছবি দেখছে বসে বসে। মিষ্টি মিষ্টি শিশুকাকলী সমস্ত বাগানবাড়িটা জুড়ে। বাচ্চাদের ঘরে ঘরে যাচ্ছি। ছবি আঁকছে, নানা রঙের মাটি দিয়ে জিনিষপত্র গড়ছে, পুতুল গড়ছে। ওরাই তো এক একটা পুতুল—ওদের আবার পুতুল আছে আলাদা। ওদের ছেলেমেয়ে। পুতুলের ঘর, ঘুমিয়ে পড়ছে পুতুলেরা, খাচ্ছে কোন কোন পুতুল টেবিলে বসে। ওদেরও খাওয়া-শোওয়ার জায়গা দেখলাম। খেলাধূলোর হরেক ব্যবস্থা।...

আমি এক বিপদে পড়ে গেছি ইতিমধ্যে। চোখের চশমাটা খুলে একজনের চোখে একটু পরিয়ে দিয়েছি, আর যাবে কোথায়—যে যেদিকে আছে, ছুটে আসছে। ঘিরে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচুতে তোলে। একটু একটু সকলকে পরিয়ে দাও ঐ চশমা। মাঠের ওধারে এক খুকিকে পেরাম্বুলেটারে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে—সে-ও দেখি, তুলতুলে হাত বাড়িয়েছে। চশমা পরবে।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ক'দিন আছেন আপনারা এদেশে? জবাব দিয়েছিলাম, এক মাসের উপর তো হয়ে গেল—যা আদর-যত্ন, মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি, জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিয়ে যাবো এখানে। বক্তৃতায় মধ্যেও সেই কথা বললাম। জাতির গোড়া থেকে তোমরা গড়তে শুরু করেছ। আমরা তো যাচ্ছিই নে—চিঠি লিখে দিয়েছি, ছেলেপুলেদেরও যাতে পত্রপাঠ এখানে পাঠিয়ে দেয়। তোমাদের এখানে এসে থাকবে।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও হারবেন না—তিনি পাল্টা বললেন, বেশ তো, ভালই তো। স্বাস্থ্য ভাল এখানকার, তারা আরামে থাকবে' আর একটা চিঠি লিখে দিন ছেলেপুলের মায়েদেরও চলে আসতে। হাসি-স্ফূর্তিতে একসঙ্গে বেশ থাকা যাবে।

ঐটুকু বাচ্চারাও মিষ্টি রিনরিনে গলায় বিদায়-সম্ভাষণ দিচ্ছে, হিন্দি-চিনি জিন্দাবাদ! বলছে, হোপিন ওয়ানশোয়ে!

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কম্পাউণ্ডের ভিতর ঘাসে-ঢাকা বিস্তৃত লন—তারই পাশে নামলাম। এক দঙ্গল ছাত্র-ছাত্রী ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে গুলতানি করছিল, তড়াক করে উঠে কাছে এসে হাততালি দেয়।

উ-উ-উ—আওয়াজ উঠল ওদিকে আকাশ থেকে। ঘাড় তুলে দেখি, তিনতলায় ছাতের আলসেয় ঝুঁকে পড়েছে কতকগুলো মেয়ে। তাকিয়ে পড়তেই হাততালি। মুখে মুখে আওয়াজ তোলবার হেতুটা বোঝা গেল, আমাদের নজর পড়ে যাতে ওদিকে; মাটির হাততালি আর ছাতের হাততালি যাতে এক ভেবে না বসি। তার পরে উপরের মেয়েগুলো নিচে ছুটল। দুমদাম দুমদাম—কংক্রিটের সদ্য-তৈরি সুপ্রকাণ্ড সিঁড়ি ভেঙে না পড়ে ললনাদলের পদদাপে। একদা এমনি কাণ্ড ঘটতে পারে—এই সব ভেবেই হয়তো লোহার জুতোয় মেয়েদের পা সরু করবার ব্যবস্থা করেছিলেন সেকালের দূরদর্শী মুরুব্বিরা।

এসে গাড়ি-বারাণ্ডায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সেকহ্যাণ্ডের জন্য ব্যাকুল। বিদেশিদের হাতগুলো কায়দার মধ্যে পেয়ে—আপনাদের বলব কি—হাত ঝাঁকাচ্ছে আর দস্তুরমতো লম্ফ দিচ্ছে সেই তালে তালে। সে আমি কোনদিন ভুলব না। বাইশ-চব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যাম্বিতা মেয়েগুলোর পা দুটো ভূমিতল থেকে অন্ততপক্ষে ইঞ্চি ছয়েক উঠে যাচ্ছে সেকহ্যাণ্ডের সময়টা। বুঝুন! একটা তুলনা মনে আসে—তেজি ঘোড়া কখনো স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, এদেরও তাই। এ কথা'র মধ্যে চল্লিশটি এই রকম মেয়ে-ছাত্রী। চীনের কত জিনিষই ভুলে গেছি, কিন্তু সাংহাই মেডিকেল কলেজ এবং মেয়েগুলোর এই লাফঝাঁপ মিলে মিশে এক বস্তু হয়ে রয়েছে।

অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাক্তাররা এ বাড়ি-ওবাড়ি ঘুরিয়ে নানান বিভাগ দেখাচ্ছেন। জাপানিরা সাংহাই দখল করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরে দেয়, অথবা সরিয়ে ফেলে। তারা বিদেয় হবার পর আবার সব নতুন হয়েছে। কুয়োমিনটাং আমলে কুড়ি বছরে এখান থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিল মোট ৫৪৬ জন; নতুন আমলে এই তিন বছরের মধ্যে সেই জায়গায় ১০৩৭। ১৯৫৪ অব্দের মধ্যে আরও পাঁচ হাজার গ্রাজুয়েট হয়ে বেরুবে, এই ওঁদের সঙ্কল্প।

শুধু মাত্র কলেজি পড়াশুনো নয়, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাজ করে বেড়াতে হবে। এটা শিক্ষারই অঙ্গ—গ্রাজুয়েট হবার কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এক একটা দল হয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফ্যাক্টরি, কয়লার খনি ইত্যাদি নানা অঞ্চলে। ঐ সব জায়গার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে তারা; স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাতে-কলমে কাজ করে। স্বদেশের সঙ্গে এমনি ভাবে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কোরিয়ায় পাঠানো হয়েছে এখানকার এক ডাক্তারি দল। ছ-মাস ছ-মাস অন্তর দলের লোক বদলাবদলি হয়; অনেকে ফিরে আসে, নতুন ছেলে-মেয়েরা যায় তাদের জায়গায়।

আর এক ব্যবস্থা শুনলাম, আগের আমলের ডাক্তাররা কেবল শহরেই ভিড় করত—গ্রামের লোকের জল-পড়া ফুল-পড়ার উপর ভরসা। এখন চারিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই যে এরা ডাক্তারি শিখছে—পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কা'কে কোথায় পাঠানো হবে সমস্ত ছকে ফেলা আছে। রোগের চিকিৎসা বড় কথা নয়। রোগ যাতে মোটে না হয়, সেই উপায় করো—তবে তো বলি বাহাদুর। তার জন্যে বক্তৃতা করো, বেতারে বলো, স্বাস্থ্যের প্রদর্শনী খোলো এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে।

হোটেলের সামনে নানা বয়সের একপাল ছেলেমেয়ে! দরজা ও ফুটপাথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে। শতখানেক হবে গুণতিতে। কি ব্যাপার, সত্যাগ্রহ করেছে—ঢুকতে দেবে না আমাদের। অটোগ্রাফ দিলে তবে পথ ছাড়বে। শতখানেক খাতা উঁচু হয়ে হয়ে উঠেছে। তার মানে বিকাল অবধি নাম-সই চালিয়ে যাও অবিরাম। সে না হয় হত—কিন্তু সময় কোথা ভাই? দুটো সাতচল্লিশে হ্যাংচাউ রওনা—ইতিমধ্যে খাওয়াদাওয়া ও বোঁচকাবিড়ে বাঁধা আছে।

এতগুলি মানুষ আমরা—যে যাকে হাতের মাথায় পাচ্ছি, সই মেরে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু একজনের একটি মাত্র নাম নিয়ে খুশি নয়—সকলের নাম চাই প্রতিটি খাতায়। কর্তা'দের এক ব্যক্তি তখন তাড়াতাড়ি দিয়ে পথ খালি করে আমাদের হোটেলে ঢুকিয়ে নিলেন। আহা, বেচারারা কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে—আমরা ফিরে আসব সেই প্রতীক্ষায়! সময় ছিল না যে—তা হলে কি ওদের মুখ অন্ধকার হতে দিই?

আবার এক কাণ্ড। লিফট থেকে বেরিয়ে এগারো তলায় পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে একটা মেয়ে যুক্ত করে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলছে, নমস্কার—কেমন আছেন? একেবারে খাস বাংলা জবানে। মেয়েটার নাম উ চিং-তাং (Woo Chingtung)। আমার ছোট্ট খাতাটায় তার হাতের সই দেখতে দেখতে মনের পটে ফুটে উঠল থোপা-থোপা কালো চুলে-ঘেরা পদ্মফুলের রঙের কচি মুখখানা। চোখা নাক চোখ—দক্ষিণ-চীনের কোন এক অঞ্চলে মেয়েটার বাড়ি। কলেজে পড়ে। বয়সে বড় কাঁচা বলে কেউ বিশেষ আমল দেয় না। উ তা বলে ঘাবড়াবার পাত্রী নয়, সর্বত্র আগ বাড়িয়ে পড়ে নিজেকে জাহির করে। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে এক সময়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে উঠল, আমিও ইণ্টারপ্রেটার—আমায় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করো না কেন তোমরা? সেই মেয়েটা হাসি ছড়াতে ছড়াতে প্রশ্ন করছে, আছেন কেমন?

তাজ্জব হয়ে মুখে তাকাই। তারপর সে একলা কেবল নয়—এদিক-ওদিক থেকে আরও পাঁচ-সাতটা বেরুল। সকলের মুখে কুশল-প্রশ্ন, কেমন আছেন? নমস্কার!

ব্রেকফাষ্টের পর বেরিয়ে গিয়েছি—এর মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কি হেতু এত উদ্বেগ, এবং এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে বঙ্গভাষায় এবম্বিধ পরিপক্ক হয়ে কোন প্রক্রিয়ায়, সেই এক সমস্যার বিষয় হয়ে উঠল। বৈদ্যনাথের পায়ের সংবাদ নিতে কামরায় ঢুকলাম, তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নিষ্কর্মা শুয়ে রয়েছেন, ছেলেমেয়েরা তখন বৈদ্যনাথকে গিয়ে ধরল, এক্ষুনি বাংলা শিখিয়ে দাও আমাদের—

সে কি রে! এতই সোজা আমাদের ভাষা শেখা?

অগত্যা দুটো-চারটে বাংলা কথা—তাক মাফিক ছেড়ে যাতে অবাক করে দেওয়া যায়। আচ্ছা, কেউ এসে দাঁড়ালে কি কায়দায় সম্ভাষণ করো তোমরা, কোন সব কথা বলো?

ঘণ্টা তিনেকের প্রাণপণ চেষ্টায় নমস্কারের প্রণালীটা রপ্ত করেছে। এবং 'কেমন আছেন'—এই কুশল-প্রশ্ন। তারই সমবেত প্রয়োগ চলছে আমাদের উপর। যা ওরা চেয়েছিল—কুশল-প্রশ্নের ঠেলায় সত্যি সত্যি আমরা অবাক হয়ে গেছি।
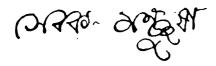
[ক্রমশঃ।

S. 227-X52 BG

ভারতে প্রস্তুত

সা হি ত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বিখ্যাত সাংবাদিক। জন্ম—১৮৭৬ খৃ: ২৪এ সেপ্টেম্বর যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে। পিতা—গিরীশচন্দ্র ঘোষ (কবি)। শিক্ষা—প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, প্রবেশিকা (হেয়ার স্কুল, ১৮৫৩), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮১৫), বি-এ (ঐ, ১৮১১)। কর্ম—'সন্ধ্যা', বন্দে মাতরম্, বসুমতী প্রভৃতি সম্পাদকীয় বিভাগে। 'সাহিত্য' পত্রিকার সহিত দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট (১৩০০)। বাংলার সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় কংগ্রেস সংবাদপত্রের তরফে মেসোপটিমিয়া হইতে বাগদাদ পর্যন্ত গমন (১১১৭), পুনরায় ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধির দলে বাঙলার প্রতিনিধিরূপে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন (১১১৮)। লণ্ডনের 'ইনষ্টিটিউট অফ জার্নালিজম'এর সদস্য; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩০৭-৮), ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহ-সভাপতি, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের সভাপতি। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি (১১৪৫), মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১১২৫), এতদ্ব্যতীত বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। প্রথম গ্রন্থ—'উচ্ছ্বাস' (কাব্যগ্রন্থ, ১৩০১)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা এবং সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ। গ্রন্থ—উচ্ছ্বাস (কাব্য, ১৩০১), বিপত্নীক (১৩০৪), অধঃপতন (১৩০৬), প্রেমের জয় (১৩০১), নাগপাশ (১৩১৫), প্রেমমরীচিকা (১৩১৬), চোরাবালি, অশ্রু, প্রত্যাবর্তন, রক্তের সম্বন্ধ, জননী, মুক্তির মূল্য, সান্ত্বনা, শ্রীমতী, অদৃষ্ট চক্র, তুষানল, দগ্ধহৃদয়, হৃদয়শ্মশান, রক্তমুখী নীলা, তীর্থের ফল, জেদিদা, নাতবৌ, মৃত্যুমিলন, কংগ্রেস, কংগ্রেস ও বাংলা, বাংলা নাটক (১১০২), বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮), নবীন জর্মানি; ছেলেদের বই—আষাঢ়ে গল্প (১৩০৮), রবিনসন ক্রুশো, বকুল; The Newspaper in India (১১৩০), The Famine of 1770 (১১৪৪), Aurobindo (১১৪১), Press and Press Laws in India (১১৫২); ভূতপূর্ব সম্পাদক—সাপ্তাহিক বসুমতী, দৈনিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী আর্যাবর্ত (মাসিক, ১৩১৭—১৩২১), মাতৃভূমি (দৈনিক), Advance (দৈনিক)।

হেমেন্দ্রলাল পাল-চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সতীর মন্দির, স্ত্রীর অধিকার, হানিফের গুরুদক্ষিণা, মগের মুলুক।

হেমেন্দ্রলাল রায়—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮১২ খৃ: পাবনা জেলায় ফুলকোঁচা গ্রামে। মৃত্যু—১১৩৫। পিতা—ব্রজদুলাল রায়। কর্ম—প্রথম জীবনে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে, পরে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার বিভাগে। বহু কবিতা ও গল্প রচনা। গ্রন্থ—ফুলের ব্যথা (কাব্য, ১১২১), মায়া কাজল (কা), মণিদীপা (কা), ঝড়ের দোলা (উপ), মায়ামৃগ, পাঁকের ফুল, মায়াপুরী (শি), দুর্গম পথের যাত্রী, গল্পের ঝরণা, গল্পের আলপনা, রিক্ত ভারত, বিলাতে গান্ধীজী, শিল্পীর খেয়াল, সচিত্র আরব্য উপন্যাস, সহ সম্পাদক—হিন্দুস্থান (পত্রিকা); সম্পাদক—বাঁশরী (সাপ্তাহিক), মহিলা, রাষ্ট্রবাণী।

হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—সংবাদ সুজনরঞ্জন (সাপ্তাহিক, ১৮৪০, মে)।

হৈমবতী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—নদীয়া জেলার দাদুপুর গ্রামে। স্বামী—ফরিদপুর আড়কান্দি গ্রাম নিবাসী যোগেশচন্দ্র সেন। গ্রন্থ—বংশীমেলা।

পরিশিষ্ট

অংশুরাণী মিত্র—মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী—শচীন্দ্রনাথ মিত্র। সম্পাদিকা—সংগঠন (১৩৫৪, আষাঢ়)।

অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—পাণ্ডববিলাপ নাটক (১৮৮১)।

অক্ষয়কুমার গোস্বামী—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে। গ্রন্থ—জয়শ্রী।

অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন—সাংবাদিক। যুগ্ম-সম্পাদক—কালিকাপুর গেজেট।

অক্ষয়কুমার দে—নাট্যকার। গ্রন্থ—মেঘনাদ বধ (নাটক, ১২৮০), অভিমন্যু বধ (যাত্রা, ১২৮৪)।

অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গণক অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যবহারোপযোগী হিসাব (১৮৮০)।

অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুরে। গ্রন্থ—চাণক্যশ্লোক, ধাতুবিবেক, সাহিত্য রচনা-প্রণালী, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমালোচনা।

অক্ষয়কুমার মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গণিতবোধ (১৮৭১)।

অক্ষয়কুমার মজুমদার—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৬ খৃ: ঢাকা জেলায়। পিতা—ভারতচন্দ্র মজুমদার। কর্ম—আইন ব্যবসায়, মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—সাধনা (সম্পাদক, ৩ খণ্ড)। সম্পাদক—স্বদেশ-সম্পদ (সাপ্তাহিক, ১১০৫, মৈমনসিংহ), চারুমিহির (সাপ্তাহিক, মৈমনসিংহ)।

অখিলচন্দ্র দত্ত—সাংবাদিক। জন্ম—মেদিনীপুরের বল্লভপুরের পোদ্দার বংশে। শিক্ষা—মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত। সম্পাদক—মেদিনী (সাপ্তাহিক, ১৮৭১)।

অখিলচন্দ্র সরকার—সাহিত্যিক। জন্ম—মেদিনীপুর। মৃত্যু—১৩৫০ বঙ্গ। অন্যতম পরিচালক—মেদিনীবান্ধব পত্রিকা। সম্পাদক—সুদর্শন।

অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঐ-এক-মজা, বিষম সাজা (১৮৭৩)।

অঘোরনাথ ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত খামারগাছি। গ্রন্থ—Interpretation of Indian Statutes (১১০৪)।

অঘোরনাথ ঘোষ, শাস্ত্রী—কবি। গ্রন্থ—শক্তিমুক্তি (কাব্য, ১৩১৮), সংযুক্তা-উপাধ্যায় (ঐ, ১৮১১)।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত (১৯০১)।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলায়। গ্রন্থ—The Original Abode of Indo-Europeans.

অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—পণ্ডিত। গ্রন্থ—শ্রীমহাভারত (১৮৬২—৭৩), চারুচরিত্র (১৮৫৭)।

অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিমন্যুবধ কাব্য (১৮৬৮)। অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—সতীত্বরক্ষিণী (১৮৭৮)।

অঘোরানন্দ স্বামী—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—তত্ত্বজ্ঞানামৃত (১২৩৩)।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী—বৈষ্ণব পণ্ডিত। গ্রন্থ—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্রম্।

অজিতকুমার ভট্টাচার্য—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৯২২ খৃঃ ১ই জানুয়ারি হুগলী জেলায় মধুবাটি গ্রামে। পিতা—সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যশিক্ষক)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৩১)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। সম্পাদক—গ্রামের কথা (১৯৫০)।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—ভক্তের ভগবান।

অঞ্জলি চক্রবর্ত্তী, লেখাশ্রী—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—চলার পথে (প্রথমে মাসিক, পরে ত্রৈমাসিক)।

অঞ্জলি সরকার—মহিলা সাহিত্যিক। শিক্ষা—এম-এ। সম্পাদিকা—মহিলা মণ্ডল (১৩৫৪-৬)।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ—সাহিত্যসেবী। পূর্ব নিবাস—যশোহর। গ্রন্থ—ফরাসী বিপ্লবে রুশো। সম্পাদক—প্রদীপ (মাসিক)।

অধরচন্দ্র মণ্ডল—কবি। গ্রন্থ—যমের দরবার (কা, ১৩৫৩)।

অতুলচন্দ্র বসু—সাময়িক পত্রসেবী। প্রথমে কর্মাধ্যক্ষ, সত্যবাদী পত্রিকা। পরে সম্পাদক—সত্যবাদী (সাপ্তাহিক, ১৯২২-৩১)।

অতুলনাথ বসু—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। সম্পাদক—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসার (১৮৬৮)।

অধর চন্দ্র—পল্লী কবি। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুক্তি দুর্গাপুর অঞ্চলে। কাব্যগ্রন্থ—রাণী কমলা।

অধরচন্দ্র দাস—উপন্যাসিক। জন্ম—১২৭৮ (?) ব্যারাকপুর মিস্ত্রিঘাটে। গ্রন্থ—ত্রিবেণী (উপ, ১৩০৭), কমলা-সাগর (ঐতিহ্য)।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিরাজমোহিনী বা মনোরম নবন্যাস (১৬শ শতাব্দীর হিন্দু পরিবারের পারিবারিক চিত্র, ১৮৭৭)।

অনঙ্গমোহিনী দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ ২০এ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার রাজবংশে। মৃত্যু—১৯১৮ খৃঃ ১৩ই মে। পিতা—ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। স্বামী—রাজমন্ত্রী ঠাকুর উজীর গোপীনাথ দেববর্মা। শৈশব কালেই রাজকুমারীর কবিত্ব শক্তির উন্মেষ। ত্রিপুরার প্রথম মহিলা কবি। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা প্রকাশ কাব্যগ্রন্থ—কণিকা (১৩১১), শোক-গাথা (১৩১৩), প্রীতি (১৩১৭)।

অনন্ত দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ সাহাপুর গ্রামে। গ্রন্থ—ক্রিয়াযোগসার, লবকুশের যুদ্ধ, নৈষধ।

অনিন্দিতা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। ছদ্মনাম—বঙ্গনারী। জন্ম—১২১০ বঙ্গ (আনু)। মৃত্যু—১৩৪৭ বঙ্গ। গ্রন্থ—আগমনী।

অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৩১১ বঙ্গ নদীয়া জেলায় দামুরহুদা (বর্তমান কুষ্টিয়া) গ্রামে। পিতা—মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থ—মনীষীদের জীবন, জন্ম যাঁদের সফল হ'ল, বঙ্গবীরের কয়েক জন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, সূর্য সেন। সম্পাদক—কচিকথা (পত্রিকা), বঙ্গরত্ন (১৯৫১)।

অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলায় শান্তিপুর। পিতা—গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। শিক্ষা—বি-এল। ব্যবহারজীবী, হাইকোর্ট। গ্রন্থ—ব্যবহার-তত্ত্ব।

অনীশ রায়-চৌধুরী—কবি। গ্রন্থ—আমার কবিতা।

অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরে। গ্রন্থ—দেশাচার (১৮৭২)।

অনুকূলচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রামে। গ্রন্থ—আদর্শপ্রেম।

অন্নদাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ব্যাকরণ-দীধিতি (১৯৬৮)।

অন্নদাচরণ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভৃগুসূত্র (ঢাকা ১৮৭০)।

অন্নদাপ্রসাদ বসু—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—সর্বধর্মরক্ষিণী (মাসিক, ১৯০১)।

অন্নদাপ্রসাদ দত্ত—কবি। কাব্যগ্রন্থ—মাধবীলতা (১২৮৭)।

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উবাহরণ (১৮৭৫)।

অন্নদাপ্রসাদ বেদান্তবাগীশ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৃহৎকথা, শকুন্তলোপাখ্যান।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—১৯১৬ খৃঃ ৮ই মার্চ। পিতা—নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বিবাহ। স্বামী—অবনীমোহন গোস্বামী (চিকিৎসক, ই, আই, রেলওয়ে)। স্বামীর সহিত বহু স্থানে ভ্রমণ। যুগান্তরে গল্প-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ (১৩৬০)। গ্রন্থ—বাঁধনহারা, ভ্রষ্টা, সঙ্কোচন, এবার অবগুণ্ঠন খোল, একফালি বারান্দা।

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৭৩ খৃঃ ৩১ ডিসেম্বর বাখরগঞ্জ জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৭ বঙ্গ। স্বামী—ক্ষেত্রমোহন ঘোষ (বিবাহ-১৮৮৬)। পুত্র—অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ। গ্রন্থ—কবিতাবলী (১৩৪৭)।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—অভিনেতা ও নাট্যকার। জন্ম—যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে। মৃত্যু—ধানবাদে। পিতা—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। বিখ্যাত অভিনেতা। অভিনয়ের জন্য বহু নাটক রচনা ও বহু গ্রন্থের নাট্যরূপ দান। গ্রন্থ—কর্ণার্জুন, শকুন্তলা, চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, অযোধ্যার বেগম, ইরাণের রাণী, বন্দিনী, রামানুজ, বাসবদত্তা, উর্বশী, সুদামা, অপ্সরা, মগের

মুন্ময়, আহুতি, কুন্তলা, শ্রীগৌরাঙ্গ, ছিন্নহার, রাখীবন্ধন, পুষ্পাদিত্য, রঙ্গিলা, তুমুখো সাপ, বিদ্রোহিণী, মা, মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র।

অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ—সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ ২৬এ ফাল্গুন মৈমনসিংহ জেলার কলিগাওএ। পিতা—কালীকৃষ্ণ ঘোষ। গ্রন্থ—হরবোলা (রসনাটক)। সম্পাদক তুর্মুখ (ব্যঙ্গাত্মক সাপ্তাহিক, মৈমনসিংহ); সহ সম্পাদক—সচিত্র শিশির।

অবতারচন্দ্র লাহা—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ, মৃত্যু—১৩৩৮ বঙ্গ ২রা কার্ত্তিক কাশীধামে। বঙ্কিম যুগের সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—আনন্দলহরী (উপ), আমার ফটো (ঐ) শুভদৃষ্টি (ঐ)।

আবদুল গনি খাঁ—কবি। জন্ম—বর্দ্ধমান শহরে মন্তিমহল পল্লীতে। গ্রন্থ—ফেরারী বল্লবী।

আবদুল হাফাৎ—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—আলোক (পাক্ষিক)।

অবনীনাথ রায়—গ্রন্থকার। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন; বি-এ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। কর্ম—মিলিটারী অ্যাকাউণ্টস, মীরাট। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—অতীশ দি গ্রেট, পাঁচ মিশালী, প্রবাসী বাঙ্গালী।

অবলাকান্ত মজুমদার—কবি। জন্ম—১২৯৮ বঙ্গ ১ই ফাল্গুন যশোহর জেলার (ঢাকুরিয়া) ব্রহ্মপুর গ্রামে। পিতা—রজনীকান্ত মজুমদার কবিরত্ন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (যশোহর জিলা স্কুল), আই-এস-সি (বঙ্গবাসী কলেজ, ১৯১৭), বি-এস-সি পর্যন্ত অধ্যয়ন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান। যশোহর সাহিত্য-সংঘ সংগঠন ও সম্পাদক (১৯৩৫)। 'কবিভূষণ' 'নাট্যভারতী' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—নাটক—মহাকবি মধুসূদন, রাজা সীতারাম রায়, হিরণ্ময়ী, জীবন-প্রদীপ, আত্মোৎসর্গ, সমরশিখা, মুক্তেশ্বরী, কর্মবীর শিশির-কুমার; উপন্যাস—পথহারা; কাব্য—মধুগীতি, সুরভি, মন্দাকিনী, কাত্যায়নী; বিবিধ—প্রবন্ধ প্রদীপ, ইন্দ্রধনু, মহত্ত্বমন্দির, দেশপ্রাণ।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ—কবি। গ্রন্থ—কালকূট (১২৯৫)।

অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী—সাময়িক-পত্রসেবী। সম্পাদক—উৎসাহ (মাসিক, ১৩০৪ বঙ্গ ভাদ্র, রংপুর)।

অবিনাশচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিজলী (ঐতি-উপ, ১৩০১), নরেশ বাবু বা ডিটেকটিভ রহস্য (১৩১১)।

অবিনাশচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—ভাগ্যপরীক্ষা, বীর।

অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—দর্শক (১৮৭৫)।

অবিনাশচন্দ্র বসু—সাময়িক-পত্রসেবী। সম্পাদক—বঙ্গগৃহ (মাসিক, ১৩০৫, আষাঢ়, বাঁকীপুর)।

অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাময়িক-পত্রসেবী। সম্পাদক—ধর্মপ্রচারিণী (মাসিক, ১৮৬৪, মে, বেহালা ব্রাহ্মপ্রচারিণী সভার মুখপত্র)।

অবিনাশচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৭ বঙ্গ মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কাছেন্থ পল্লীতে। পিতা—গোবিন্দ-মোহন রায়। মৈমনসিংহ সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক। কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত। গ্রন্থ—অমিয়পাঠ, একলব্য (শিশু)।

অভয় চন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ম্যাজিষ্ট্রেটির উপদেশ (১৮৬৮)।

অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ছাত্রবোধ ব্যাকরণ (১৮৬৮)।

অভয়দাস বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ-Decision of the Privy Council regarding lands alluviating in the place from which they diluviated (১৮৭০)।

অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ। মৃত্যু—১৯০৩ খৃঃ এলাহাবাদে। শিক্ষা—ক্যানিং কলেজ। এম-এ। পিতা—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষাব্রতী, অযোধ্যা)। কর্ম—অধ্যাপক, মিওর সেনট্রাল কলেজ, এলাহাবাদ। গ্রন্থ—A brief sketch of the life of the Late Babu Madhusudan Mukherji (এলাহাবাদ)।

অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। শিক্ষা—এম-এ, সি-ই। গ্রন্থ—মোহন-মাধুরী, রাজেন্দ্র জীবনী।

অভয়াচরণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার উথরাশাল গ্রামে। গ্রন্থ—সামাজিক সমস্যা।

অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—নল-দময়ন্তী নাটক (১৮৫১)।

অভিলাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—যশোহর জেলার মহেশপুরে। মৃত্যু—১৯১৬ খৃঃ ১ই সেপ্টেম্বর। কর্ম—আইন-ব্যবসায়, শ্রীরামপুর, হুগলী। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—বিবিধ বার্তা (পাক্ষিক পত্র)।

অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ নদীয়া জেলায় গোঁসাই-দুর্গাপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ ৪ঠা জুলাই গোঁসাই-দুর্গাপুরে। পিতা—রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই। শিক্ষা—বাল্যে গোঁসাই দুর্গাপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, প্রবেশিকা (মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউসন), এল-এ ও বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ। কর্ম—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আবগারী বিভাগের প্রথম ভারতীয় ডেপুটী কমিশনারের পদ লাভ, মাদ্রাজ প্রদেশে বিশেষ পদে সরকারী নিয়োগ। বিহার পরিষদে ইনকমট্যাক্স আক্ট প্রবর্তনে সদস্য নিয়োজিত (১৯২০)। গোঁসাই দুর্গাপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের আজীবন সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সোসাইটি ফর দি কালটিভেসন অফ সায়ান্স প্রভৃতির সদস্য। 'রায় সাহেব' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—History of Trinath worship in Bengal, History of Excise in Calcutta, Report for the protection of fisheries in Bengal, Income Tax Mannual.

অমরচন্দ্র দত্ত—সাংবাদিক। জন্ম—১২৬১ বঙ্গ ৫ই আশ্বিন ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার শ্রীবাড়ী গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩২৬ বঙ্গ ২৫এ বৈশাখ। পিতা—ব্রজনাথ দত্ত। পৈতৃক নিবাস—মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বানাইল গ্রামে। কর্ম—শিক্ষক, জেলা স্কুল। মৈমনসিংহ সারস্বত সমিতির সম্পাদক। সঞ্জীবনীর (সাপ্তাহিক, ১৮৭৮) পরিচালক-গোষ্ঠীর অন্যতম। গ্রন্থ—লহরী, অরূপা, হরিবল্লভের স্নেহ, হাজি মহম্মদ মহসীন (জী), নিরালা (গ), শরচ্চন্দ্র (কা),

আকার ইঙ্গিত (প্রবন্ধ)। সম্পাদক—ভারত-মিহির (সাপ্তাহিক), চারুবার্তা (ঐ,), চারুমিহির (ঐ,)।

অমরনাথ সরকার—গ্রন্থকার। জন্ম—রাজশাহী। গ্রন্থ—শিশুপদেশ (১৮৬৯)

অমরেন্দ্র ঘোষ—কথাশিল্পী। জন্ম—১৩১৩ বঙ্গ ২২এ মাঘ। পিতা—জানকীকুমার ঘোষ। পৈতৃক নিবাস—বরিশাল জেলার রাজাপুর থানার অন্তর্গত শুক্তাগড় গ্রামে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কালিকট হাই স্কুল), আশুতোষ কলেজে আই-এস-সি পর্যন্ত পাঠ। কর্ম—স্বগ্রামে বিষয়-সম্পত্তি পরিদর্শন, নানারূপ ব্যবসায়, পরে বাংলা সরকারের খাদ্য বিভাগে। ইনি কল্লোল যুগের লেখক। দীর্ঘ দিন পরে পুনরায় সাহিত্য সাধনা। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে গল্প, উপন্যাস রচনা। সম্বর্ধনা লাভ (টালিগঞ্জবাসী কর্তৃক, ১৯৫১)। গ্রন্থ—পদ্মদীঘির বেদেনী (১৯৪৯), চরকাশেম (ঐ), দক্ষিণের বিল ১ম (১৯৫০), ২য় (১৯৫২), ভাঙ্গছে শুধু ভাঙ্গছে (১৯৫১), একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী (ঐ), কনকপুরের কবি, বে-আইনী জনতা (১৯৫২), ভোটের মহল।

অমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম-সম্পাদক—বিজ্ঞান-সেবধি অর্থাৎ শিল্পশাস্ত্রের বিধি (মাসিক, ১৮৩২, এপ্রিল। ইহাতে লর্ড ব্রুহামের লিখিত বিজ্ঞানের উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ এবং সামাজিক দলাদলির সংবাদ থাকিত)।

অমলা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। পিতা—ভুবনচন্দ্র দাশ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী। গ্রন্থ—ভিখারিণীর শক্তি।

অমিয় চক্রবর্তী—শিক্ষাব্রতী। রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। কবিগুরুর সহিত ইউরোপ ভ্রমণ। 'ডক্টরেট' উপাধি (লণ্ডন) লাভ। অধ্যাপক—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি ইউনাইটেড ষ্টেটসের ভ্রাম্যমান অধ্যাপক। গ্রন্থ—খসড়া, এলমুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞান বসন্ত, দময়ন্তী।

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৯৯ বঙ্গ ১৫ই আষাঢ় মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাজিগাঁও। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ ৩রা মার্চ। পিতা—কালীকৃষ্ণ ঘোষ। শিক্ষা—মৈমনসিংহ ও কলিকাতা। এম-এ, বি-এল। গ্রন্থ—(জীবনী) বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গোখেল, জমসেদজী টাটা, নেপোলিয়ান, জর্জ ওয়াসিংটন, লর্ড কিচেনার। সম্পাদক—প্রীতি (মাসিক)।

অমূল্যচন্দ্র অধিকারী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার বাহিত। মৃত্যু—১৯৫১। পিতা—উদয়চন্দ্র অধিকারী। গ্রন্থ—সান ইয়াৎসেন ও নব্যচীন।

অমৃতলাল কুণ্ডু—সাময়িক-পত্রসেবী। জন্ম—শালিখায়। সম্পাদক—সর্বজন-সুহৃদ (মাসিক, ১৩০৮)।

অমৃতলাল চক্রবর্তী—সাংবাদিক। জন্ম—ঢাকা জেলার ভয়াকর গ্রামে। পিতা—কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী। সম্পাদক—মৈমনসিংহ সমাচার (মৈমনসিংহ)।

অমৃতলাল চক্রবর্তী—সাংবাদিক। বোম্বাই প্রবাসী। সম্পাদক—শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার (বোম্বাই ১৯০১), হিন্দী বঙ্গবাসী, সহসম্পাদক—বোম্বে ক্রনিকল।

অমৃতলাল পাল—গ্রন্থকার। জন্ম—হাওড়া জেলার শিবপুরে। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর চরিত।

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলীজেলার তেলিনীপাড়ায়। গ্রন্থ—মাধব মধু মাধুরী বা যা কান্তভাবে কৃষ্ণপূজা (১৯০১)।

অমৃতলাল বিশ্বাস—কবি। জন্ম—হুগলী। গ্রন্থ—গানের মাদল।

অমৃতলাল রায়—সংবাদপত্রসেবী। পঞ্জাব চীফ কোর্টের উকীল। সম্পাদক—Tribune (লাহোর)।

অম্বিকাচরণ উকিল, বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কাব্য পরিচয় (১৩১৩)।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত—সাহিত্যসেবী। জন্ম—হুগলী জেলায় ভাঙ্গামোড়ায়। গ্রন্থ—জয়কৃষ্ণ-চরিত (১৯০১)। সম্পাদক—হিতবোধ (১৮৭৪)।

অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। সম্পাদিত গ্রন্থ—সুশ্রুত (১৮৭৫, ১৫ই জুলাই—১৮৮০); গ্রন্থ—শিশুরঞ্জিকা (১৮৬৯, ১৬ এপ্রিল), উপদেশ-শতক (১৮৭০, ২ এপ্রিল)।

অম্বীকাচরণ বিদ্যারত্ন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনোহর বিবরণ (কবিতা, ১৮৬০)।

অম্বীকাচরণ ব্রহ্মচারী—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান জেলার দেমুড় গ্রামে। পিতা—শ্রীরাম। গ্রন্থ—পত্রাষ্টক কাব্য, বঙ্গভঙ্গ।

অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীতিতত্ত্ব (১৮৬৮)

অম্বিকাচরণ রক্ষিত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিকিৎসাতত্ত্ব (১৮৭৫, ২৭ মার্চ)।

অম্বিকাচরণ রায়—কবি। কাব্যগ্রন্থ—কুসুমকলি (ঢাকা, ১৮৭৩, ১ নভেম্বর)।

অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী। মৃত্যু—১৯৪৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি। পিতা—গোবিন্দরাম সেন (উকীল)। স্বামী—কৈলাসগোবিন্দ দাশ (ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট)। কিশোর বয়স হইতেই কবিতা শক্তির উন্মেষ। গ্রন্থ—কবিতা-লহরী (১৮৯২), অশ্রুমালা (কাব্য, ১৮৯৪), প্রীতি ও পূজা (ঐ, ১৩০৪), খোকা (ঐ, ১৯০০), প্রভাতী (ঐ, ১৯০৫), দুটি কথা (গল্প, ১৩১৩), গল্প (১৩১৩), ভাব ও ভক্তি (কা, ১৩১৩), প্রেম ও পুণ্য (ঐ, ১৩১৭), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত (১৯৩১), শ্রীশ্রীকোলরসালাপ (১৩৪১), শ্রীশ্রীরামকীর্তিসুধা (কাব্য), শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম।

অরুণকুমার রায়—সাহিত্যসেবী। ছদ্মনাম—অরুণাকুমারী রায়। শিক্ষা—বাঁকুড়া কলেজ। সম্পাদক—নবীনা (বাঁকুড়া, ১৩৪৯)।

অরুণা বসু—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—ললিতা (সাপ্তা, ১৯৪৭)।

অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী। এম-এ। অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর কলেজ নবদ্বীপ শাখা। গ্রন্থ—বাঙালী কোন পথে ?

অশোকনাথ শাস্ত্রী—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—২৪-পরগনার হরিনাভি গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৫ বঙ্গ ২৭এ আষাঢ় কলিকাতায়। পিতা—অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ। শিক্ষা—এম-এ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ, 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ। কর্ম—অধ্যাপক, কলি. বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সাময়িক পত্রে নানা গবেষণামূলক প্রবন্ধ-রচনা। গ্রন্থ—অভিনয়-দর্পণ, (সম্পাদিত) ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ।

[ক্রমশঃ।

ডি. এচ. লরেন্স

উইলিয়মের একটু অভিমান হয়েছিল, ফিরে এসে বললে, 'মা, তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পারো না ?'

'না, বাছা। সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, তখন তোমাদের মত সোমত্ত বয়সের ছুটোকে একা একা নীচের তলায় রেখে যাবার মত বিশ্বাস আমার নেই। আমার যেন কেমন লাগে।'

উত্তরটা মনঃপুত না হলেও উইলিয়ম মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। সেদিন রাত্রের মত মাকে চুম্বন করে শুভরাত্রি জানাল সে।

ঈষ্টারের ছুটিতে সে বাড়ি এল, একা। এবার মায়ের সঙ্গে অনবরত তার সেই মনোরমা মেয়েটিকে নিয়েই আলোচনা হ'ল।

উইলিয়ম বললে, 'জানো মা, ওর কাছ থেকে যখন দূরে সরে থাকি, তখন একটুও মনে পড়ে না ওর কথা। ওকে আবার না দেখতে পেলেও আমার যে খুব কষ্ট হবে, এমন কথা ত' কই মনে পড়ে না। তবু সন্ধ্যেবেলা, যখন ওর কাছে থাকি, তখন ভারী ভাল লাগে আমার, ওর দিকে চেয়ে আমার মন তখন দিশেহারা হয়ে যায়।'

মিসেস মোরেল বললেন, 'এমন অদ্ভুত প্রেম নিয়ে তুমি বিয়ে করবে ? ওর প্রতি তোমার টান মোটে এইটুকু ?'

—'সত্যিই, এ ভারী অদ্ভুত।' উইলিয়ম উত্তেজিত হয়ে বললে। সে নিজেও নিজেকে বুঝে উঠতে পারছিল না, বুঝতে গিয়ে সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। বললে, 'কিন্তু···এখন এত দূর এসে পেছি ছু'জনে, এখন আর আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না।'

মিসেস মোরেল বললেন, 'সে তুমিই ভাল বুঝবে। কিন্তু তুমি যা বলছ তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে ভালবাসা একে বলি কি ক'রে ? অন্ততঃ, দেখতে ত' মোটেই তেমন মনে হয় না।'

'আমিও জানি না মা। ওর বাবা-মা কেউ নেই, তাই'—

এ আলোচনার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। উইলিয়মকে মনে হয় একটু বিভ্রান্ত, একটু বিরক্ত। মা ত' বেশী কিছু কথাই বলেন না। উইলিয়মের সমস্ত শক্তি আর অর্থ এই মেয়েটির পেছনে যায়। এবার এসে মাকে নিয়ে নটিংহামে বেড়াতে যাবার মত সঙ্গতিও তার রইল না।···

খৃষ্টমাসে পলের মাইনে বাড়ল। এখন থেকে সপ্তাহে সে দশ শিলিং করে পাবে, তার খুশি আর ধরে না। জর্ডনের দোকানে ভালোই লাগছে তার, তবে এতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকার দরুণ স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। দিন দিন পলের একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য ফুটে উঠছে মায়ের কাছে। মা ভাবেন, কি ক'রে একটু ওর সহায়তা করা যায়।

সোমবার বিকেলে তার আদ্ধেক দিন ছুটি। মে মাসের এক সোমবারে সকাল বেলা মা আর ছেলেতে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। মা বললেন, 'আজ দিনটা বোধ হয় ভালই যাবে।'

পল অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ কথার নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে।

'শুনেছ,· মিঃ লীভার্স তাঁর নতুন খামার-বাড়িতে উঠে গেছেন। গেল হপ্তায় আমাকে বলেছিলেন গিয়ে মিসেস লীভার্সকে দেখে আসতে। তা আমি চলেছি সোমবার, যদি দিন ভাল থাকে, তোমাকে নিয়ে যাব। যাওয়া হবে ?'

—'বলো কী গো,—এতও তোমার মাথায় আসে ?' পল চেঁচিয়ে উঠল, নিশ্চয়ই, 'তবে আজ বিকেলেই যাচ্ছি ত' আমরা ?'

মহা আনন্দে পল ছুটে চলল ষ্টেশনের দিকে। ডার্বি রোডের পাশে একটা চেরী গাছ, তার পাতাগুলো ঝলমল করে উঠছে। মাঠের পাশে ভাঙা দেয়ালটা লাল টক-টক করছে, বসন্ত যেন সবুজ রঙের একটি উজ্জ্বল শিখা। সকাল বেলার ঠাণ্ডায় ধুলামলিন, উঁচু নীচু পাহাড়ী পথটি নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে—তার উপর রৌদ্র ছায়ার বিচিত্র খেলা। উঁচু উঁচু গাছ পথের ছু'ধারে। তারা যেন গর্বের ভঙ্গীতে সবুজ কাঁধ ছু'টিকে প্রসারিত করে রেখেছে। সারা সকাল মালগুদামে বন্দী হয়ে থেকেও পল শুধু বসন্তের স্বপ্নই দেখতে লাগল—বাইরের পৃথিবীতে বসন্ত এসেছে।

ছুপুর বেলা পল বাড়ী এল। মায়ের মনেও আজ কিসের উন্মাদনা। পল জিজ্ঞেস করল, 'যাওয়া হবে ত' ?'

মা বললেন, 'দাঁড়াও, আমার হোক আগে।'

পল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আমি সব ধুয়ে-মুছে ঠিক করে রাখছি, তুমি শীগৃগির করে জামা-কাপড় পরে এসো ত'।'

মা চলে গেলেন। পল বাসন-কোসন ধুয়ে রাখল, ঘরদোর সাজাল, তারপর মায়ের জুতো জোড়া বের করে আনল। বেশ পরিষ্কারই রয়েছে। অনেক লোক আছে যারা নিখুঁৎ সৌখীন, কাদার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও তাদের জুতোয় কাদা লাগবে না—মিসেস মোরেলও ব্যক্তিগত ভাবে এই নিখুঁৎ লোকদের দলে। তবু পল জুতো জোড়া পরিষ্কার করে রাখল মায়ের জন্যে। আট শিলিং দামের জুতো, কিন্তু পল-এর কাছে এই জুতো জোড়া বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ; এমন সন্তর্পণে সে পরিষ্কার করতে লাগল, যেন ওগুলো জুতো নয়, ফুল।

দরজার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়ালেন মা, একটু যেন সলজ্জ ভাব। পরনে একটা আনকোরা সুতির ব্লাউজ। পল চট্ করে এগিয়ে গেল, বললে, 'ও আমার কপাল! একেবারে চোখ-ঝলসানো জামা যে!'

মা মুখ গম্ভীর করে মাথা তুলে দাঁড়ালেন, 'যেন কাউকে তাঁর

পরোয়া নেই। বললেন, 'মোটেই চোখ-ঝলসানো নয়। খুব সাদাসিধে জামা এটা।' বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। পলও তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। মায়ের বেশ লজ্জা লাগছে, কিন্তু ভাবখানা দেখাচ্ছেন যেন তিনি কোন অতি অসাধারণ লোক। বললেন, 'কী হ'ল, জামাটা পছন্দ নয় তোমার?'

'খুব, খুব, খুব পছন্দ। সত্যি বলছি, তোমার মত অমন একটি চমৎকার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।'

পেছনে গিয়ে, পেছনের দিক থেকে সে মাকে দেখতে লাগল। বললে, 'ধর, আমি যদি রাস্তা দিয়ে তোমার পিছু পিছু চলতে থাকতাম, তা'হলে চলতে চলতে আমার মনে হ'ত, ওই মেয়েটি কি নিজের পোশাকের মধ্যে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে না?'

—'না, করছে না।' মিসেস মোরেল বললেন, 'সে জানে, এ পোশাকে তাকে মানায় না।'

—'না গো, না। এ পোশাকে মানাবে কেন? তাকে মানায় ভূতের মত কালো ন্যাকড়ায়, দেখলে যেন মনে হয় পোড়া-কাগজ জড়িয়ে রেখেছে গায়ে।...সত্যি মা, আমি বলছি, চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে।'

অল্প একটু নাক সিঁটকে মা দেখালেন, পলের কথা তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু মনে মনে তিনি খুশিই হয়েছিলেন।

বললেন, 'জানো, এটা তৈরি করতে খরচ পড়েছে মাত্র তিন শিলিং। তৈরি-পোশাকের দোকানে কিনতে গেলেও এ-দামে পাওয়া যাবে না, কী বল?'

পল বললে, 'আমারও ত' তাই মনে হয়।'

—'আর, কাপড়টাও বেশ ভালো।'

—'ওঃ, চমৎকার...চমৎকার!'

শাদা রঙের ব্লাউজ, মাঝে মাঝে লাল আর কালো রঙের বুটি।

—'যদিও মনে হচ্ছে আমার মত বুড়ো মানুষের পক্ষে বড্ড বেমানান হয়ে গেছে।' মা বললেন।

—'এঃ, তুমি বুঝি আবার বুড়ো মানুষ? তা'হলে কিছু শাদা পরচুলো কিনে মাথায় লাগিয়ে নাও না কেন?'

—'দরকার হবে না। এমনিতেই চুল যেমন পেকে যাচ্ছে, শীগ্গিরই সব শাদা হয়ে উঠবে।'

—'ভারী সখ ত'! শাদা-চুলো, বুড়ি মা নিয়ে আমি কি করব?'

—'কিন্তু তাকেও তো তোমার সয়ে নিতে হবে।' শেষের কথাগুলো বলবার সময় মায়ের গলার স্বর কেমন অদ্ভুত হয়ে এল।

দু'জনে মহা উৎসাহে হাঁটতে সুরু করলেন। কড়া রোদ, মা উইলিয়মের দেওয়া ছাতাখানা মাথায় দিয়ে চলেছেন। পল লম্বায় মায়ের চেয়ে অনেক বড়, যদিও এমনিতে সে খুব বিশাল জোয়ান কিছু নয়। চলতে চলতে পল নিজের মনেই এক ধরণের প্রসন্নতা অনুভব করতে লাগল।

'এক মিনিট বসো, মা!' বলে পল তাড়াতাড়ি বসল ছবি আঁকতে। মা এক কিনারায় বসে চুপ করে ওর কাজ দেখতে লাগলেন। দূরে বৈকালী-আলো মিলিয়ে আসছে, সবুজ পরিবেষ্টনীর মধ্যে লাল কুটীরগুলোকে দেখাচ্ছে একান্ত উজ্জ্বল।

মা বললেন, 'বড়ো অদ্ভুত এই পৃথিবী—আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর!'

পল বললে, 'খনিটাও তাই। এমন প্রকাণ্ড, যেন জীবন্ত; কোন বিশাল অচেনা জানোয়ার যেন পড়ে আছে।'

—'হ্যাঁ।' মা বললেন, 'হয়ত তাই।'

—'কয়লার গাড়িগুলি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন এক পাল জানোয়ার খাবার পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

—'দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে আমার ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে।...দেখে মনে হচ্ছে এ হপ্তায় খনিতে নিশ্চয়ই মাঝামাঝি রকমের কাজকর্ম্ম চলবে।'

—'কিন্তু আমার ভালো লাগে এই সব কিছুর মধ্যে মানুষের স্পর্শ অনুভব করতে। এই গাড়িগুলোতে রয়েছে তাদের স্পর্শ, মানুষের হাত পড়েছে গাড়িগুলোর উপর। এই জীবন্ত, প্রাণবান মানুষের কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে।' পল বললে।

মিসেস মোরেল সায় দিলেন তার কথায়। বললেন, 'তাই।'

বড় রাস্তার গাছগুলির তলা দিয়ে দু'জনে চলেছেন। পল অনর্গল নানা সংবাদ বলে চলেছে, আর মিসেস মোরেলও অফুরন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। নেদার হ্রদের কিনারা বেয়ে তাঁরা চললেন। হ্রদের বুকে রোদের আলো যেন হালকা পাপড়ির মত দুলে দুলে উঠছে। তারপর দু'জনে এসে পড়লেন একটা বাড়িতে যাবার সরু রাস্তায়। বড়ো খামার-বাড়ি। একটু ইতস্ততঃ ক'রে দু'জনে এগিয়ে চললেন। একটা কুকুর ঘন ঘন ডাকতে লাগল। তাই শুনে একটি মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

মিসেস্ মোরেল জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়াইলি ফার্মে যাবার রাস্তা কি এইটে?'

মেয়েলোকটি কী বলতে কী বলে বসে, হয়ত' বা ওদের তাড়িয়েই দেয়, ভয়ে ভয়ে পল গিয়ে দাঁড়াল মায়ের পেছনে। কিন্তু মহিলাটি ভদ্র, তিনি পথ দেখিয়ে দিলেন। গমের ক্ষেত পার হয়ে একটা ছোট সাঁকোর উপর দিয়ে তাঁরা গিয়ে পড়লেন একটা বুনো ঘাসে ঢাকা মাঠে। শাদা শাদা পাখী তাঁদের মাথার উপর অনবরত চীৎকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশেই হ্রদের নীল জল স্থির। বহু দূরে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে একটি সারস। সামনের দিকে পাহাড়ের উপর ঘন নিস্তব্ধ সবুজ বন।

'—কী জঙ্গুলে রাস্তা, মা?' পল বলল, 'ঠিক কানাডার মত।'

—'বেশ সুন্দর নয়?' চার দিক এক বার দেখে নিয়ে মা বললেন।

'—ওই সারসটা দেখেছ—দেখেছ ওর পা গুলো?'

মা কি দেখবে আর না দেখবে তাও আজ তাকে বলে দিতে হবে। আর তার নির্দ্দেশ মত চলে মাও খুশি।

—'এবার কোন্ রাস্তা? সে ত' আমাকে বলেছিল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।' মা বললেন।

চার দিক ঘেরা অন্ধকার জঙ্গলটা রয়েছে তাঁদের বাঁ-দিকে।

—'এই দিক দিয়ে যেন একটু রাস্তা রয়েছে।' পল বললে, 'তোমার ত' বাপু শহুরে-পা। এই পথে কি তুমি হাঁটতে পারবে?'

দেখা গেল ছোট্ট একটি ফটক, তার মধ্যে দিয়ে বেশ চওড়া একটি বুনো পথ। তার এক ধারে ঘন 'ফার' আর 'পাইনের' ঝোপ; অন্য দিকে একটা বুড়ো 'ওক্' গাছ নুয়ে পড়েছে যেন। 'ওক' গাছের ফাঁকে ফাঁকে নীলমণি লতা যেন নীলের তরঙ্গ তুলেছে রাশি রাশি বিবর্ণ 'ওক্' পাতাদের মাঝখানে। পল মায়ের জন্যে ফুল তুলে আনলে। বললে, 'এই যে নতুন কাটা ঘাসের ফুল।' তারপর গিয়ে তুলে আনলে 'ফরগেট-মী-নট'। এক গোছা ফুল সে তুলে দিল মায়ের হাতে। মায়ের কর্মব্যস্ত রুক্ষ হাতে নিজের দেওয়া ফুল দেখে, পলের হৃদয় যেন ভালবাসায়-স্নেহে উপচে উঠল। মায়েরও আজ সুখের শেষ নেই।

পথের শেষে একটা বেড়া ডিঙিয়ে যেতে হয়। পল ত' চোখের নিমেষে পার হয়ে গেল। বললে, 'এসো। আমি ধরি তোমাকে।'

মা বললেন, 'ভাগ্। নিজেই পার হব আমি, যে কোরেই হোক।'

পল নীচে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে রইল, যদি মায়ের দরকার হয়।

মিসেস মোরেল অতি সাবধানে পার হয়ে এলেন। মা নীচে নেমে এলে পল ঠাট্টা করে বললে, 'আহা, বেড়া ডিঙোবার কী ছিরি!'

মা বললেন, 'যাচ্ছেতাই সব বেড়া!'

—'তোমার মত একরত্তি ছোট মেয়ে ত' নয় সবাই। এ কে না পার হতে পারে?'

সামনে বনের ধারে এক সার লাল রঙের নীচু নীচু খামার-বাড়ি। দু'জনে দ্রুত এগিয়ে চললেন। বনের সঙ্গেই সমান্তরাল আপেলের বাগান, আপেলের ফুল ঝরে পড়ছে নীচের জাঁতা-পাথরের উপর। জলাশয়টি গভীর, তার চার ধারে ঝোপ, ওক গাছগুলো নুয়ে পড়েছে ওরই উপর। গোলাবাড়ী আর দরদালান—দুটিতে মিলে একটা চতুষ্কোণের তিন দিক জুড়ে রেখেছে। বনের দিকে যেতে যেতে রোদের আলো বাড়িগুলোর গা বেয়ে যায়। চারিদিক একান্ত নিঃশব্দ, নীরব।

ছোট রেলিং দেওয়া বাগানটিতে ঢুকে পড়লেন দু'জনে। লাল 'গেলিভার' ফুলের গন্ধ আসছে। একটা মুরগী এদিকে আসছিল রুটিগুলো খুঁটবার জন্যে। হঠাৎ ময়লা 'এপ্রন' গায়ে একটি মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল। মেয়েটির বয়স প্রায় চোদ্দ হবে, মলিন গোলাপী রঙের মুখ, গোছা গোছা ছোট কালো কোঁকড়ানো চুল, সুশ্রী আর স্বচ্ছন্দ, চোখ দুটি গভীর কালো। দু'টি অচেনা লোককে দেখে একটু লজ্জা পেল যেন, প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হ'ল বটে, কিন্তু কী জানি কেন বিরক্তি এসে গেল লোক দুটির উপর, মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই আর একটি মেয়েলোক এসে দেখা দিলেন। ছোট-খাট, রোগা চেহারা, গায়ের রঙ গোলাপী, চোখ দু'টি ঘন কালো আর বাদামীতে মেশানো। প্রসন্ন হেসে বললেন, 'ও আপনারা···এসেছেন তা'হলে! ভারী খুশি হলুম আপনাদের দেখে।' তাঁর কথায় অন্তরঙ্গতার সুর, কিন্তু কোথায় যেন বিষাদের আভাস।

মহিলা দু'জনে পরস্পর করমর্দ্দন করলেন।

'আপনাকে বিরক্ত করতে এলুম না ত'?' মিসেস মোরেল বললেন, 'জানি ত' ক্ষেত-খামারে জীবন কাটানো কী জিনিস!'

—'না না, মোটেই নয়। এখানে এসে একা-একা হাঁপিয়ে উঠেছি, তবু ত' আজ নতুন মুখ দেখতে পেলুম।'

—'তা ঠিকই।' মিসেস মোরেল বললেন তাঁর জবাবে।

বাইরের বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁদের। লম্বা, নীচু একখানা ঘর—উনুনের উপর বড় গোলাপ ফুলের একটি তোড়া সাজান রয়েছে। ঘরে বসে মহিলা দু'জনে কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করলেন। পল বেরিয়ে গেল চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করতে। বাগানে গিয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকে আর লতাপাতা দেখে বেড়াচ্ছিল সে, সেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল বেড়ার পাশে, যেখানে কয়লার গাদা ছিল তারই কাছে।

বেড়ার পাশের ঝোপটিকে দেখিয়ে পল বললে, 'ওগুলো কি ফুল?'

মেয়েটি বড় বড় চকিত চোখ তুলে চাইলে তার দিকে।

পল বললে, 'ওতে বোধ হয় বড়ো গোলাপ ফোটে, তাই নয়?'

মেয়েটি কোন রকমে বললে, 'জানি না—সাদা সাদা ফুল হয়, মাঝখানটিতে লাল।'

'ও, তা'হলে ওগুলোকে বলে, 'কুমারী মেয়ের লজ্জা', (maiden-blush)। মিরিয়ামের গাল রাঙা হয়ে উঠল। চমৎকার উজ্জ্বল তার রঙ!

সে বললে, 'জানি না আমি।'

পল বললে, 'তোমাদের বাগানে বেশী কিছু নেই।'

—'এই বছরই প্রথম এসেছি আমরা।' মেয়েটি নিস্পৃহ গলায় বললে। সে যেন একটু উঁচুতে দূরত্ব বজায় রেখে থাকতে চায়। তাড়াতাড়ি সে ভিতরে চলে গেল। পল এ সব কিছু লক্ষ্য করেনি, সে তার অনুসন্ধানের কাজেই মুগ্ধ হয়ে রইল। একটু পরেই মা বেরিয়ে এলেন, দালানের মধ্যে দিয়ে চললেন সবাই। চারিদিক দেখে দেখে পলের খুশির আর অন্ত রইল না।

মিসেস মোরেল মিসেস লীভার্সকে বললেন, 'আপনার ত' সব গরু-বাছুর, শূয়োর-ছানা আর মুরগীর বাচ্ছা দেখে রাখতে হয়।'

মিসেস লীভার্স বললেন, 'না, ভাই। গরু-বাছুর দেখে বেড়াবার আমার সময়ও নেই, কোন দিন অভ্যেস ত' নেই-ই। সংসারের খাটুনি খেটেই আর আমার সময় থাকে কোথায়?'

—'তাও বটে!' মিসেস মোরেল বললেন।

মেয়েটি এসে দাঁড়াল। নরম সুরেলা গলায় বললে, 'চা হয়ে গেছে, মা!'

—'ধন্যবাদ, মিরিয়াম এই যাচ্ছি আমরা।' ওর মা যেন আপ্যায়িত হয়ে বললেন, 'মিসেস মোরেল, চা খাবেন ত' এখন?'

—'হ্যাঁ, তৈরী হলেই হ'ল।'

পল, তার মা আর মিসেস লীভার্স তিন জনে এক সঙ্গে চা খেতে বসলেন। চা শেষ করে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন পাশের বনে, সেখানে অজস্র নীল ফুল, পথে পথে বাহারে রঙের 'ফরগেট-মী-নট'এর রাশি। ফুলের শোভা দেখে মা আর ছেলে দু'জনেই এক সঙ্গে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত

মুখোমুখি —বদরীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুত্র —পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

আলোকচিত্র

কলকাতা
—মনীষিকুমার ভট্টাচার্য্য

বম্বে রেল-ষ্টেশন (রেলওয়ে শতবার্ষিকী) —বিশু চক্রবর্ত্তী

মাঝদরিয়া —জয়দেব রায়

? ? ? —পরিতোষ মিত্র

তীরের কাছে —জয়শ্রী দে

চাকচিক্য —জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেবেশ দাশ

মহারাণীর নেমন্তন্ন।

সুধী পাঠক, আমার পক্ষে কেমন একটা মহা ব্যাপার তা ভেবে দেখ। বিকেলের চায়ে নয়, সন্ধ্যা বেলার এক কাপ কফিতে নয়, চাগাও দরবারী রিসেপশনে নয়, একেবারে প্রাইভেট লাঞ্চ পার্টিতে নেমন্তন্ন।

সেই দূর মেঘনার পারে, পুব-বাংলার টিনে-ছাওয়া ছোট্ট কুটীর থেকে মরুভূমির মাঝখানে এক মহারাণীর মার্বেল্স প্যালেস। তুমি গরীব হতে পার, কিন্তু ভক্তি থাকলে ভগবানকে পাবার আশা আছে। তুমি সামান্য হতে পার, তবু মাথার জোরে কোন্ না কোন হিটলার রকফেলার বনতে পার। কিন্তু মেঘনার পার থেকে মহারাণীর খাস দরবার? নাঃ। এ হেন তাজ্জব কারবারের একটু-আধটু নমুনা স্বাধীন হিন্দুস্থানের রাজ-ভবনে রাষ্ট্রপতি-ভবনে সুরু হয়েছে বটে। কিন্তু মহারাণীদের শাস্ত্রে এখনো লেখে না।

আর যে সে মহারাণী নয়। খাস যোধপুরের রাঠোর মহারাণী। তাও শুধু মহারাণী নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী। রাজমাতাও নয়, নাবালক মহারাজার ঠাকুমা দিদাজী বাই। যাঁর স্বামী আর ছেলে দু'জনেই রাজত্ব চালিয়েছেন তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে। যাঁর ছোট্ট নাতীটিও যদি রাজপাটে উঠতে পারতেন, তাহলে তাঁরই বুদ্ধির জোরে চালাতেন মাড়োয়ার।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতার কল্যাণে সব রাজপাট লোপাট হয়ে গেছে। তবু 'রণ-বংকা' অর্থাৎ যুদ্ধে ওস্তাদ রাঠোর রাজবংশের অনেক কিছু বলতেই বোঝায় মহারাণীকে। নেহাৎ পোড়া-কপাল টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী না হলে, কোন না কোন মেরিয়া থেরেসা বা চাঁদ সুলতানার নতুন সংস্করণ হয়ত দেখতে পেতাম মহারাণীর মধ্যে। এই শাদা চোখেই।

এ হেন মহারাণী নেমন্তন্ন পাঠালেন আজ ভোর বেলা। শুধু তাঁর নিজের ছেলে-মেয়েরা আর কয়েক জন অন্য রাজ্যের অতিথি মহারাণীরা থাকবেন। আর আসবেন আমার নতুন চেনা রাজা-সাহেব আর তার ভাই ঠাকুর সাহেব। রাজাসাহেবের 'ঠিকানা' অর্থাৎ জায়গীর হচ্ছে মাড়োয়ারের সীমানায়। বার বার মোগল-পাঠানকে, জয়পুর বা মারাঠাকে এই রাজ্যে ঢুকতে হয়েছে তার ঠিকানাতে প্রথম রক্তটীকা পরে। রাঠোরের প্রথম দেউড়ী হচ্ছে কুচামন।

সেখানকার কেল্লায় থরে থরে ছড়ান আছে তাদের বংশ-পরিচয়। রক্ত দিয়ে তা লেখা, জান দিয়ে তা কেনা। দুষমনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পাগড়ী, পোষাক আর পতাকা। হরেক রকমের হাতিয়ার।

আর তার পাশে আমার হাতিয়ার বলতে এক হাজির করতে পারি এই কলমখানা। যেটি নিয়ে নাড়া-চাড়াই আমার রাজস্থানে পরিচয়। তবে বাঙ্গালীর কলমের উপর রাজপুতের শ্রদ্ধা আছে। সে কথাই মহারাণী স্মরণ করেছেন তাঁর চিঠিতে। মাথা উঁচু হয়ে উঠত তা পড়ে। রাজপুতরা তাদের বীরত্বের বাহাদুরী দেখাত গোঁফে চাড়া দিয়ে। স্বীকার করছি গোপনে, যে এত দিন পরে গোঁফের অভাবটা অনুভব করলাম।

কিন্তু মাথা নীচু হয়ে এল বাংলা-সাহিত্যের প্রতি এই সম্মানে। আমার মাটির মা। কিন্তু কলমে সোনা ঝরায়।

এমন সময় মালী ঘরে রেখে গেল এক গোছা গোলাপ। হ্যাঁ, মরুভূমিতে গোলাপ।

এগিয়ে এসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলাম। গোলাপের মিঠে গন্ধ মনকে আরো উতলা করে তুলল। মনে পড়ল আরেকটা মরু দেশের কথা। আরবের খলিফা-অল-মুতাওক্কেল বলেছিলেন—আমি হচ্ছি সুলতানদের সেরা আর গোলাপ হচ্ছে ফুল-বাগিচার রাণী। অতএব আমরা দু'জনে হচ্ছি দু'জনার সবচেয়ে উপযুক্ত সাথী।

আজ আমিই বা ওই খলিফা বাদ্শার চেয়ে কম কিসে?

হ্যাঁ। আমার চেয়েও অবশ্য বড় বলা যায়, ওই আরব দেশেরই এক তাঁতীকে। অল-মাসুম খলিফার সময় এক তাঁতী গোলাপের মরশুমে কাজ করাই ছেড়ে দিয়েছিল। ভোর থেকে সে শুরু করত শিরাজী আর গাইত, "ওরে গুলাবের সময় এল। এবার তুই যত দিন তার কুঁড়ি আছে আর ফুল আছে, শুধু শরাব পিয়ে যা।" গোলাপের যখন মরশুম ফুরিয়ে গেল, তখন কাজ আরম্ভ করবার আগে সে গাইত,—

"ওরে, খুদাতালা যদি আবার গুলাবের মরশুম আসাতক আমায় বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে আবার শরাব দিয়ে শুরু করব। কিন্তু তার আগেই যদি মরি, তাহলে বেচারা গুলাব আর শরাবের জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল রেখে যাচ্ছি।"

তবে খলিফাও কম খলিফা লোক ছিলেন না। গোলাপের সমঝদারীতে একটা জোলা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে? আচ্ছা, আমিও জানি গুণীকে কি করে তারিফ করতে হয়। ওকে গোলাপের মরশুমে দিল দরিয়া হয়ে ফুর্ত্তি করবার জন্য বছরে দশ হাজার দিরহম পেনসনের পরোয়ানা দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মহারাণীর নেমন্তন্ন। তাতে আসছেন, আরো গুটি কয় মহারাণী। এদিকে এসে হাজির হয়েছে এক গোছা গোলাপ। মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে সারা আরবীয়া। নাঃ! এ আমার কলমে পোষাবে না। শরণ নিলাম তাই কবি আমীর খুসরোর।

"মাতাল খুসরো ঢেলেছে কবিতা দেবীর পেয়ালা মাঝে,
মধুর সুরারে, শিরাজীরে যাহা হার মানায়েছে লাজে।"

(মুহ্ সিফির)

বহু গুণী জনের সকাল শুরু হতে দেখেছি বিয়ার দিয়ে। এ অধম আবার ও রসে বঞ্চিত। নেহাৎ কাব্য-রসেই মাঝে মাঝে শুকনো গলা আর মরুভূমির মত মন একটু-আধটু ভিজিয়ে নিতে হয়।

তবু যদি আমার সপক্ষে উকীল দিতে হয়, তবে এই পেশ করছি হাফিজকে।

জাহিদ শরাব-এ-কৌসর ও হাফিজ পিয়ালা খাশ্‌ত্‌।
তা দরমিয়ানাহ্‌ খাশ্‌তা কিরদ্‌গার্‌ চীশ্‌ত্‌।

অর্থাৎ

ফকির চাহিল স্বরগের সুধা, হাফিজ পেয়ালা মাগে।
এখনো জানিনা আল্লা কাহারে ঠাঁই দেন আগে ভাগে।

খুসী হয়ে কবিতার পর কবিতা মনে করতে করতে এক জায়গায় এসে বাস্তবের ছোঁয়া পেলাম। যেন মেঘনার অথৈ জলে পাড়ি দিতে দিতে বৈঠাখানা মাড়োয়ারে বালির চড়ায় এসে ঠেকে গেল। ভাবছিলাম—

হৃদয় আমার ময়ূরের মত
নাচেরে।

নাচছে যে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু পেখম মেলবে কেমন করে? মেলে ধরবার মত কোন পেখমই যে নেই সঙ্গে।

লাঞ্চ পার্টি। ডিনার জ্যাকেট যদি সঙ্গে থাকত তাতে চলত না। ময়া জমানার চুড়িদার আর শেরোয়ানীতে গলাখানা এখনো বাঁধা দিইনি। দেবার সদিচ্ছাও দেখা যাচ্ছে না। অচিরাৎ হবে বলে মনে হয় না। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রাজা সাহেব আর তস্য ভ্রাতা ঠাকুর সাহেবের মূর্ত্তি। ওরা নিশ্চয়ই প্রিন্স-কোট অর্থাৎ গলাবন্ধ-কোট আর যোধপুরী পরে মহারাণীর সামনে মাথা হেলিয়ে কুর্ণিশ করবেন। মাথার রঙীন পাগড়ী ওই বীর বপুগুলিকে আরো রঙদার করে তুলবে। ছা-পোষা বাঙ্গালী আমরা ওই প্রিন্স-কোটকেই গুজরাটি-কোট বলে থাকি। এ অধমেরও অমন একখানা কোট আর প্যাণ্টলুন সুটকেশের তলায় লুকোনো আছে বটে। কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে, মাথা আমাদের এমনিতেই না কি গরম। সে জন্যেই না কি বাঙ্গালীরা মাথায় কিছু পরে না। পাশাপাশি একই রকম পোষাকে দু'রকম ছবি মনের-আয়নায় ভেসে উঠল। অমনি গলাবন্ধ-কোট হল বাতিল।

তবে?

চিঠিখানা আবার ভাল করে পড়লাম। না, পোষাক সম্বন্ধে কোন হদিশই দেওয়া নেই চিঠিতে। তবে শেষ পর্য্যন্ত একটা ইংরেজী ঢঙের লাউঞ্জ স্যুটই ভরসা হবে না কি?

হঠাৎ চিঠিখানাই কিনারা বাৎলে দিল। নেমন্তন্নে যখন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কথা লেখা আছে, তখন আসল বাঙ্গালী পোষাকই মহারাণী প্রত্যাশা করবেন। এ ত নয়াদিল্লীর চাকুরী নয়, এ যে বাংলা দেশের সাহিত্যিক, রবি ঠাকুরের দেশের লোক।

গুরুদেব, তুমি বাংলার বাইরে পৃথিবীর মাঝখানে আমাদের যে বড় করে গেছ, তা আমরা নিজেরাও এখনো ভাল করে জানি না।

তার পরের চিন্তা হল—পর্দা নিয়ে। মহারাণী কি পর্দানশীন্‌? না, সামনে আসবেন? সহজ ভাবে কথা কইতে পা'ব? থালায় দু'খানা পুরী নিজের হাতে তুলে দেবেন কি? এদিকে আমি পরম হর্ষেতে দশ দশটা আঙুলে ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্সের শঙ্খ মুদ্রা করে ফেলব? 'আর দেবেন না', 'আর দেবেন না' গোছের ভাব দেখব একখানা। ও-দিকে হয়ত অন্য অতিথিরা তার মধ্যে একটা সাহিত্যিক সুলভ 'পোজ' ডিসকভার করে পুলকিত হবেন।

পর্দার আবার নানা রকম মাত্রা আছে। এই যেমন উদয়পুরের মহারাণীর পর্দা। সেখানে পুরুষের প্রবেশ একেবারে নিষেধ। এমন কি, মহারাণীর নিজের ভাই ও বোনেরা দেখা পান শুধু মহারাণীর হুকুম আছে বলে। তা-ও এই এক জন পুরুষের বেলাই শুধু। কাজেই আমার মহারাণীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাই ওঠে না। গেলেন একা শ্রীমতী। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে এলেন মহারাণীর বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব দেখে, সত্যি সত্যিই মহারাণার সহধর্মিণী। রাজ্য-পাট দরকার হলে একাই চালাতে পারতেন। যা কিছু ঘটে, কেন ঘটে, আর না ঘটলে কি হবে? সব কিছু সম্বন্ধেই তিনি ওয়াকিবহাল। তার চোখে যে দীপ্তি খেলে তা শুধু হীরে জহরতের নয়, বিচক্ষণ বিচার-বুদ্ধির। তবুও তিনি পর্দা!

এদিকে যে সন্ধ্যায় শ্রীমতী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সে রাতেই তিনি তার শুটিং বক্স থেকে এক গুলীতেই একটা বাঘকে মেরেছিলেন। এ হেন নারীর চোখকে কি আর সামান্য পর্দা ঢেকে রাখতে পারে?

মনে পড়ল মোগল-সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কথা। এক বার জাহাঙ্গীর শপথ করেছিলেন যে, আর শিকার করবেন না। এদিকে একটা বাঘের উৎপাতে সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছিল। সব চেয়ে বড় বাহাদুর আমীর ওমরাহরাও বাঘটাকে মারতে পারলেন না। তখন রাণী-বেগম একটা রাতের চেষ্টায় এক গুলিতেই বাঘকে করেন খতম।

আবার হাফ-পর্দাও আছে। আরেকটা ষ্টেটের রাজমাতার গল্প। নাতনীর জন্ম-উৎসবে মহা ধুমধাম হয়েছিল, আর হাফ-পর্দার কল্যাণে তিনি নাকি তার সব কিছু আচারেই হাজির ছিলেন। কেমন ধারা প্রথা জানি না। তবে আর একটা উৎসবে তার নমুনা দেখলাম স্বচক্ষে। একটা বড় বৈঠক বসেছে প্রাসাদে আর বাজনা বাজছে ভারী মিঠে। রাজমাতার কাছে এসে শোনার সাধ হ'ল। একটা পর্দার আড়াল তৈরী করা হল। তার পেছনে তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে ঠাঁই নিলেন। কিন্তু বাজনা বাজছে ভারী মিঠে। আরো কাছে না এলে চলে না। নিজেই উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলেন আরো একটা পর্দা আছে বাজনদারদের কাছে। দুটোর মাঝখানে তৈরী করা হল গোটা দুই চেয়ারের আড়াল। পাঁচ জনের চোখের সামনে দিয়েই দে ছুট কাছের পর্দাটার পিছনে। দৌড়োদৌড়ি করে কার্পেটে বসে পড়তে না পড়তেই তাঁর খিদে পেয়ে গেল। ঝকঝকে রূপোর-থালের মিঠাইগুলো নিঃশেষ হওয়ার পর, থালাতে ঘোমটার ভেতর থেকে রাজমাতার তৃপ্তির ছায়া কেমন ফুটে উঠেছিল, সে খবরটা অবশ্য আমাদের অজানাই রয়ে গেছে।

নলচের আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া কাকে বলে, সুধী পাঠক, এবার নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছ।

আহা! টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি। আর পর্দার চেয়ে হাফ-পর্দা। কেমন একটা আলো-আঁধারি ভাব। শোনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। দেখা যায় ত, ছোঁয়া যায় না। যায় যায়, তবু সব যায় না। সংসারের সরসে সেরা রোম্যান্স।

বিশ্বাস না হয় চলে এস আমার সঙ্গে শাহজাহানের দিল্লীতে। বেগম-সাহেব অর্থাৎ জাহানারা তাঁর প্রাসাদ থেকে রওনা হয়েছেন দরবারে যাবার জন্য। অন্ত নেই জাঁক-জমকের; সোয়ার, সিপাই আর খোজাদের ঠমকের। খোজারাই বেগম সাহেবের সব চেয়ে কাছে থাকার কপাল নিয়ে জন্মেছে, কারণ সে হাফ-পুরুষ! সামনের, ডাইনে-বাঁয়ের সবাইকে হটিয়ে দিচ্ছে চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়ে। দরকার হলে পিটিয়ে পর্য্যন্ত। তা সে যত মানী গুণী লোকই হোক না কেন। পিছনে ছোটি-বেগমদের বয়ে নিয়ে চলেছে ঘেরাটোপ-ডুলি। সামনে ছিটোচ্ছে গোলাপ-জলের ধারা। যাতে ধুলো উড়ে তাঞ্জাম পর্য্যন্ত না পৌঁছোয়। তাঞ্জাম মিহি সোনার ঝালর দিয়ে ঘেরা। তার উপর বসান সোনার মিনা করা কাজ, এমন কি দামী জহরৎ। সোনার পাতে মোড়া হাত-পাখা, ময়ূরের পালকের। হাতী চলেছে দুল্‌কী চালে, ঠমকে গমকে। কিন্তু তাতারিণীদের হাতে ময়ূর-পঙ্খ দুলছে আরো বিলম্বিত তালে। দীন-দুনিয়ার মালিকের বিয়ারী ভুলো-ধোনা মেঘের আড়াল থেকে আকাশের চাঁদ এই একটুখানি দেখে নিতে চান।

অমনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল আমাদের মধ্যযুগের মোগল-নাইট। শ' দুই পা দূরে দাঁড়িয়ে হাত দু'টি রাখল বুকের উপর, যতক্ষণ না বেগম সাহেব একেবারে সামনে না পৌঁছচ্ছেন। তার পর করবে লম্বা এক কুর্ণিশ প্রায় ভুঁয়ে ছুঁয়ে।

রাজকন্যা কি কিছুই নজর করেন নি? না। সবই তিনি দেখেছেন, নিজেকেও দেখিয়েছেন। যদি মেহেরবাণী হয় ত দেবেন পাঠিয়ে জহরতের কাজ-করা সোনার ব্রোকেডের বটুয়া। তাতে আছে পান আর তাম্বুল।

রৌশনারাও কম যেতেন না। জাঁকজমকে তিনি বড় বোনকে ছাড়িয়েই গিয়েছিলেন। তাঁর বিরাট হাতীর উপরে চড়ান তাঞ্জামটার নাম ছিল পীতাম্বর। সোনা দিয়ে মোড়া ছিল তার আসন, আর চাঁদোয়াটা ছিল যেন একটা সিংহাসনের উপরে সাজান। দেড়শ' জন রঙ-চঙে রসিকা তাতারিণী চলত তার পাশে পাশে। পিছনে চলত কত পাল্কী, তার লেখা-জোখা নেই। কিন্তু সবারই ঢাকনা হচ্ছে শুধু ফিনফিনে জরির ঝালর। উড়ু উড়ু করে তারা, আর দুরু দুরু করে আরোহিণীর বুক।

এ হেন পর্দার আড়ালে-যান আছেন, তার কাছ থেকে কি পেয়েছি আর কি পাইনি, তার হিসাব কষে দেখতে যাবে পৃথিবীতে কোন্ আহাম্মক? কোন্ বেরসিক? কবি ঠিকই গেয়েছেন:—

নয়নে নয়নে যদি, হৃদয়ে হৃদয়ে
বালির বাঁধ রোধে কি হে
অসীম সলিলে?

পর্দা আর হাফ-পর্দার মধ্যেকার মিহি ওড়নার আড়ালটুকু মনে মনে নাড়াচাড়া করছি। মনে পড়ল আগের দিন যোধপুরের ঢাই পাহাড়ী কেল্লাটার উপর থেকে দেখা রাণী পাড়া। অবশ্য চমকে উঠেছিলাম রাণী পাড়া নামটা শুনে। আমরা বাংলা দেশের গাঁয়ে ভুঁয়ে এমন কি সহরেও বামুন পাড়া, ধোবি পাড়া এ সব অঞ্চলের কথা বলে এসেছি। কিন্তু তা বলে রাণী পাড়া!

হ্যাঁ! ঠিক তাই। এক জন মহারাজার হয় ত সাতাশ জন রাণী, আর সাতান্ন জন উপ রাণী, খুড়ি, হাফ-রাণী, আর তিনশো তেষট্টি নেক-নজরাণী রেখে রাজপাটের মায়া কাটিয়ে যেতেন। তা বলে তার পর যিনি গদীতে বসছেন বা দখল করছেন তিনি কেন এত জনের মোটা মাসোহারা গুণতে যাবেন? তাদের রাজ-বাড়ীতে বা তার আনাচে-কানাচে ঠাঁই দিতে যাবেন? নয়া মহা-রাণী হাফ-রাণী প্রভৃতিদের দাবীই ত তখন সকলের আগে। কাজেই চাঁদ অস্ত গেলে তার রোহিণী-ভরণীদের আস্তানা হয় যেখানে, তার নাম হচ্ছে রাণী পাড়া।

আজকের দিনে শ্রেণীহীন সমাজ অর্থাৎ ক্লাশ লেস সোসাইটি গরবার জন্য অনেকে আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। তাঁদের চুপি-চুপি জানিয়ে রাখি যে, এই নিভন্ত বাতির মিছিলেও এই শ্রেণী বিভাগের অবিচারটা কায়েম হয়ে বসে আছে।

একটা ষ্টেটে দেখলাম যে, সেখানকার বাই-সাহেবার বিগত মহারাজার সঙ্গে ঠিক যে কতটুকু বিয়ে হয়েছিল তা কেউ জানে না। পাত্র-মিত্রদের একটু আড়ালে-আবডালে শুধোতেই তারা ফিস-ফিস করে শুধু জানালেন যে, রাজা-রাজড়াদের হিন্দু-বিয়েতে মাত্রা ভেদ আছে। ঠিক হোমিওপ্যাথী ওষুদের ডাইলিউশন ভেদের মত আর কি।

একটু পরেই সে মহারাজার প্রাইভেট-সেক্রেটারী একফাঁটি পেয়ে ব্যাপারটা আরো একটু খোলসা করে দিলেন। শুধু রাণী কেন, রক্ষিতাদের মধ্যেও রকম ভেদ আছে, রূপো-রাণী, সোনা-রাণী এমন কি হীরে-রাণীর মত সোমা-বাই হীরে-বাই আরো সব কত কি।

এ হেন শ্রেণী বিভাগে ভরা আবহাওয়ার মাঝখানে দিদাজী বাই ছিলেন তাঁর স্বামীর রাজপাটে একেবারে একেশ্বরী। ছিল না আকাশে কোন অশ্বিনী-ভরণী, কৃত্তিকা-রোহিণীর, আনা-গোনা। কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া চন্দ্রগ্রহণ। মহারাজা উম্মেদ সিংয়ের সুখে-দুঃখে সমভাগিনী। সঙ্গিনী উৎসবে ব্যসনে চৈব।

এক বার বর্ষাকালে হঠাৎ পাহাড়ী মরু নদীতে বান ডাকল; বড় সাধে গড়ে তোলা ছবির মত যোধপুর সহর ভেসে যায় যায়! গহীন রাতে বাঁধ দেবার চেষ্টায় বেরিয়ে এসেছেন মহারাজা নিজে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কমিদের উৎসাহ দিচ্ছেন নিজে দীদাজী বাই। তখন তিনি নিজেই মহারাণী! কিন্তু নেই তাঁর ঘোমটার আবরণ, পর্দার আব্রুর কোন চিন্তা। সত্যিকারের রাজপুতানী, রাজন্সী।

তাঁর অতীত জীবনের মহারাণীত্বের কাহিনীতে উৎসাহ দেখে দীদাজী বাইয়ের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বলে চললেন একটির পর একটি অতীতের কাহিনী। যে স্বামী আজ নেই, যে রাজ্যপাট আজ নেই, তাদের কাহিনী। অতীতের এই রোমন্থনে ছিল না কোন ব্যথা, কোন অভিযোগ। যারা সত্যি সত্যিই নিজেদের রাজ্যশাসন করতেন, তাঁদের যে কতখানি ছিল আর কতখানি গেছে তা মনে করে এই বীর নারীকে মনে মনে করলাম একটি নমস্কার।

সামনে পাকা রাজপুত ধড়া-চূড়া পরে দাঁড়িয়ে আছে বাটলার। হাতে তার তরমুজের রস। মহারাজকুমার অর্থাৎ মাত্র বছর দেড় হল যে যুবক মহারাজা এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, তাঁর ছোট ভাই—অনুরোধ করছেন একটু তরমুজের রস খেতে। পরনে তার যোধপুরী ব্রিচেশ আর কোমরে বাঁধা একটা রাজপুত ছোরা আর বিরাট এক পিস্তল। পিস্তল আর ছোরা দুইই মহারাজার নিজের

অস্ত্রশালায় তৈরী। কিন্তু আমি যে ছোরাটির দিকে তাকিয়ে আছি তা সে কারণে নয়। এই তরমুজ আর এই ছোরা আর সোফায় পাশে বসে রাঠোর-মহারাণী। বছরের পর বছরের পর্দাগুলি সরে যেতে লাগল।

শাহজাহানের রাজত্বের শেষ কাল। চার ছেলেতে চলছে তুমুল লড়াই। যুবরাজ দারার পক্ষে লড়েছিলেন যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ। নর্মদাতীরে হেরে ফিরে এসেছিলেন যোধপুরে। কিন্তু কেল্লার ফটক বন্ধ করে রাখলেন মহারাণী মহামায়া। তার চোখে স্বামী মারা গেছেন। রাজপুতানীর স্বামী যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে ঢাল বয়ে! না হলে ঢাল তাকে অর্থাৎ তার মৃতদেহকে বইবে। রাজপুতানী হয়ে মহামায়া কি করবেন এ অবস্থায়?

এ হেন অবস্থা সম্বন্ধে চারণ কবিতায় আছে:—

খগ তো অরিয়াং খোসলী, পিউঘর আয়া ভাজ।
জিন খুঁটি খগ ঠাং তা, উন পর ঠাংকো লাজ॥

দুষমন তোমার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়েছে, আর হেরে গিয়ে প্রিয় ঘরে পালিয়ে এসেছে। যে খুঁটিতে তলোয়ার টাঙিয়ে রাখত, সেখানে এখন নিজের লজ্জা টাঙিয়ে রাখতে হবে।

বীর নারী এখানেই ক্ষমা দেন নি।

পিউ কায়র হোতা মহল, হুঁ হোতী সিরদার।
হুঁ মরতী থে নংহ বলত, দুখ তো লারো লার॥

যদি আমার কাপুরুষ স্বামী স্ত্রী হত, আর আমি হতাম সর্দার, তা হলে নিশ্চয় যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ দিতাম। তার পর আমার মৃত্যুতে সে যদি সতী না-ও হ'ত তাতে এমন আর বেশী কি আফশোস হত?

মহামায়া তার পর স্বামী মারা গেছেন এই ধরে নিয়ে চিতা সাজাতে হুকুম দিয়েছিলেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, আবার বীরের মত যুদ্ধ করতে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে, যশোবন্ত সিংহ সে যাত্রা স্ত্রীকে সামলে নিলেন। কিন্তু হায়, ভাঙা কাচ আর ভাঙা হৃদয় ত জোড়া লাগে না।

এক দিন মহারাজা ভোজনে বসেছেন; পাশে হাত-পাখা নাড়ছেন স্বয়ং মহারাণী। দাসী এনে দিল এক টুকরো তরমুজ আর তা কাটবার জন্য একটা ছুরি। ছুরির মত ধারালো ঠাট্টা করে উঠলেন মহারাণী। সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও ছুরিটা তাড়াতাড়ি; মহারাজা আবার ছুরি ছোরা দেখে মূর্চ্ছা যেতে পারেন।

ডাইনিং রুমে এসে বসলাম আমরা। এটা নীচের তলার ব্যানকোয়েট রুমের মত বড় নয়। এখানে জাঁক-জমক আর আদব-কায়দার ভীড়ে দিশেহারা হয়ে হারিয়ে যেতে হবে না। তবুও এত ভাল আর দামী আসবাবে সাজান ঘরে বসে খেলে আটপৌরে বাঙ্গালী জীবনে এ খাওয়া হজম হবে কি না কে জানে। কিন্তু মহারাণী টেবিলের 'হেডে' অর্থাৎ মাথায় বসে আমায় বসিয়েছেন নিজের ডান হাতে। খুব সহজ সরল ভাবে আপনার জনের মত করে নিচ্ছেন। ওদের নিজেদের এক জন হয়ে গেলাম।

ওদের নিজেদের খাবার জিনিষগুলিই খেতে অনুরোধ করলেন বার বার। গত ক'দিন রোজ রাজপুত ভোজ খেয়েছি একটানা।

কুচামনের হলদে পাথরে গড়া প্রাসাদে দোতলায় খুব আদর-আপ্যায়ন করে রেখেছিলেন ওরা আমায়। আমাকে দেওয়া ঘরগুলির ঠিক পাশেই ওদের গোল-কামরা। সেটি পেরিয়ে ওপারের মহলে ঢুকলেই সামনা সামনি সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে রাজপুত মহিলাদের। কিন্তু সূর্য্যিমামা পর্য্যন্ত যদি তাদের মুখ দেখতে মোকা পান, এ দীন আর কেন করবে সে চেষ্টা ?

সেই মধ্য-যুগের ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে চক্কর মারতে মারতে নীচে নেমে এসে যখন খাবার ঘরে বসতাম তখন মনে হত যে, টেবিল-চেয়ারগুলিও যেন সেখানে তেমন মানায় না। মানায় শুধু রাঠোর ধাঁচের পাগড়ী-পরা খানসামার পরিবেশন করা রাজপুত খানা। প্রাণপণে সেই ঘি আর মশলা মাংসের জাফরাণী দরিয়ায় পাড়ি দিয়ে যেতাম রোজ। বাঙ্গালী পেট বলে ত্রাহি ত্রাহি। বাঙ্গালী বুকের পাটা বলে—কভি নেহি। হার মানব—সে কভি নেহি। খেয়ে যাব রোজ, এই গুরু ভার রাজপুত খাবার। করি না তোয়াক্কা হজমের। বীরের দেশে এসে আর কিছু না পারি, নিদেন পক্ষে বীরের মত খাব।

না খেয়ে উপায় কি ? লক্ষ্ণৌয়ের বন্ধু আহমেদ আলী আজ করাচীতে। পাকিস্তান সরকারের একটা কেউকেটা ব্যক্তি ছিলেন। বড় দুঃখেই গোপনে বলেছিলেন একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। অমন মরমে-মারা কাহিনী ত সহজে ভুলে যেতে পারি না। বন্ধু আমার গিয়েছিলেন ফ্রন্টিয়ারে তার এক শিনোয়ারী কলেজের সহপাঠীর অতিথি হয়ে। কিন্তু যেদিন ওই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে গিয়ে পৌঁছোলেন, সেদিন ভোরেই তার বন্ধু কাজে ঠেকে চলে গেল দূরে একটা গ্রামে। ঘরে বেগমকে বলে গেল, দোস্তকে খুব ভাল করে খাওয়াতে। পর্দার আড়াল থেকে শ্রীমতী ইয়া ইয়া গোটা দুম্বা থেকে আরম্ভ করে যা পর্বত-প্রমাণ খানা পাঠাতে আরম্ভ করলেন, তার প্রতি সুবিচার করা একটা কেন সাতটা আহমেদ আলির সাধ্যে কুলোবে না। পর্দার আড়াল থেকে এল বহু অনুরোধ, বহু অনুনয়, শেষ পর্য্যন্ত আফশোশ যে, বেগম-সাহেবার পাঠান খানা লক্ষ্ণৌয়ী নবাব-সাহেবের মোটেই মর্জ্জিমাফিক হচ্ছে না। তা না হলে সর্ব দেবময় যিনি অতিথি, আবার তার উপর স্বামীর বন্ধু, তিনি কি না কিছুই খেতে পারছেন না। বেগম সাহেবা পর্দার ওপার থেকে আফশোশে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি অতিথির সামনে বেরিয়ে এলেন। নিজে সামনে থেকে অতিথি সৎকার করতে সুরু করলেন। আর আহমেদ আলি প্রাণভয়ে লুকিয়ে খেতে লাগলেন কাবুলী হজমী গুলি।

ইতিমধ্যে কর্তা গ্রাম থেকে ফিরে এসে মহা খাপ্পা। তাজ্জব ব্যাপার। বৌ এই দু'দিনেই বনে গেছে বেহায়া, বে—আব্রু! পাঠানের শাস্ত্র আর সমাজ দুই-ই যে যায় জাহান্নমে।

পর্দার ওপার থেকে স্বামী-স্ত্রীর তকরার ভেসে আসতে লাগল কানে। আহমেদ আলি ত লজ্জায়-দুঃখে মরমে মরে যেতে লাগলো। তবু মরার উপর খাঁড়ার ঘা যে কি, তা তখনো বেচারা জানতেন না।

বন্ধু পত্নী চেঁচিয়ে মহল্লা মাৎ করে গজরাচ্ছেন। ওই চিড়িয়া, তোমার ওই হিন্দুস্থানী দোস্ত, ও আবার পুরুষ হ'ল কবে থেকে ? একটা বুলবুলি যা খেতে পারে তা-ও যে সামাল দিতে পারে না তার সামনে বের হলেই কি বে-পর্দা হতে পারে কোন আওরৎ ?

গোঁফ ছিল না আহমেদ আলীর। সরু কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে মনে মনে বললেন—আল্লাকে ধন্যবাদ, মাঝে মাঝে আমি কানে কম শুনি।

কুচামন আর তার বন্ধুদের সঙ্গে রোজ খেতে বসি আর আহমেদ আলির কথা মনে করি। প্রাণটা আই-ঢাই করে। নিদেন পক্ষে একটুখানি বিলিতি জোলো সুপ আর লড়াইয়ের সময় থেকে চালু করা তিন কোর্স ডিনার এক দিন পেলে তবু ত ভেতো পেটটা একটু জিরোবার ফুরসৎ পায়।

এমন সময় এক দিন হাজির হলেন মাষ্টার সাহেব। রাজপুত স্কুলের হেড-মাষ্টার। বুড়ো হাড় কিন্তু কচি মন। তার স্কুলে কেতাবী-বিদ্যার সঙ্গে কেমন করে ভাল সৈনিক আর সামরিক অফিসার হওয়া যায় তা শেখান হয়। শুধু পড়ুয়া হলে ত আর জান দেওয়া-নেওয়ার কারবারে পাকা হওয়া যায় না।

এ হেন মাষ্টার সাহেব আমায় বিরাট এক টুকরো মাংস আর পেস্তার পোলাওয়ের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। বাটলারকে পারলে দু' ঘা কষিয়েই দেন আর কি। তার সামরিক স্কুলের সব বিদ্যাটাই কি নেহাৎ মাঠে মারা যাবে ? ব্যাটা এত ফাঁকিবাজ যে রাজা সাহেবের অতিথিকে শুধু দেশী খানাই খাওয়াচ্ছে। কেন ? একটু "পুলে পোলোনেজ" (পোলিশ কায়দায় রান্না মুর্গী) আজ নিজে থেকে বানিয়ে আনলে রাজা-সাহেব ত খুশী হতেনই, তার বিদেশী অতিথিরও মুখ বদল হত।

যে 'ব্যাটা' বাটলার শুধু বিলিতি বা কন্টিনেন্টাল কায়দায় মুর্গী বানাতে জানে তাই নয়, তার পোষাকী ফরাসী নামও জানে, সে কি উত্তর দেয় তা শুনবার জন্য কাণ খাড়া রাখলাম। পাগড়ীর হিমালয় খানা শুধু পুরোপুরি নুইয়ে তেন সিং ফিস ফিস করে জবাব দিল। রাণী-সাহেবা নিজে হাতে রোজ খানা রাঁধছেন চার বেলা তার অতিথির জন্য। কর্ত্তার বাটলার বা সদরের বাৎলানো মেনু দিয়ে বিদেশী অতিথির অসম্মান করা চলবে না।

সে কথা মনে পড়ল। দু'পাশ দিয়ে বাটলারের দল থালি আর ডিস হাতে নিঃশব্দে আনাগোনা করছে। কারো হাতে দেশী থালা, কারো হাতে বিলেতী। কিন্তু বিলেতী গুলো সবই চালান যাচ্ছে টেবিলের ওধারে। কুচামন আর অন্যান্য পাত্র-মিত্ররা সেদিকটা জাঁকিয়ে বসেছেন। এমন কি আমার ডান পাশে যে মহারাণী অব—সারা ঘরটা আলো করে বসে আছেন, তিনিও ফরাসী অরদোভ্‌র্ (জলপাই, বীট, বিন, পীজ প্রভৃতি সুস্বাদু সব্জি, ককটেল মসেজ, সার্ডিন মাছ, ডিম সিদ্ধের টুকরো, আঞ্চোভি, হরেক রকমের ড্রেসিং এ সব পাঁচ মিশেলী দিয়ে তৈরী কন্টিনেন্টাল খানাবাহিনীর অগ্রদূত) দিয়ে শুরু করেছেন। কিন্তু খাস স্বদেশী মাড়োয়ারী খানায় মশগুল হয়ে আছেন শুধু দিদাজী বাই নিজে। আর তিনি খুব যত্ন আত্যি করে সেই ভুরি ভুরি মাড়োয়ারী-ভোজ নিজে হাতে পরিবেশন করে দিচ্ছেন আমার পাতে।

হায়! কোন মহারাজা কি ইহজগতে কখনো এত সুপ পেয়েছেন খেতে বসে ?

অবাক হবার কথাই বটে, এত মালদার চব্য-চোষ্য যাকে বলে সবই হাজির ; তবু খেয়ে সুখ নেই ?

কিন্তু কেমন করে পাবেন তারা নিশ্চিন্ত মনে খেতে ?

তাদের প্রত্যেকখানাই পরিবেশনের আগে এক জনকে চেখে দেখতে হত। কি জানি যদি বিষ মেশান থাকে? খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রাজাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে ফেলার প্রথা খুব চালু ছিল। এশিয়াতে, এমন কি প্রাচীন গ্রীস রোমেও, কৌটিল্য-শাস্ত্রের এই নীতি সর্বদাই রাজা হলেও-হতে-পারি ওস্তাদরা গরীয়ান রাজাদের মনে করিয়ে দিতেন। সেজন্য সব দেশেই এক জন বা তার চেয়ে বেশী চাখনদার থাকত বাঁধা মাইনেতে। উদয়পুরে রাজ-রান্নার ডিপার্টমেণ্টে একটা লোহার ক্রশ মার্কা শিকলী ... থামের উপর দিয়ে ঝুলছে। সেটা জয়পুরের সোয়াই রাজা জয়সিংহ আড়াইশো বছর আগে মহারাণাকে উপহার দিয়েছিলেন। রাঁধুনীশালায় খাবারে বিষ মেশান হচ্ছে কি না তা নাকি এই যন্ত্রে জ্যোতিষ বিদ্যায় ধরা যেত। তাতে নাকি নানা রকম তুক-তাক মন্ত্রও পড়া ছিল। এ যন্ত্রটা এখন আর কেজো অবস্থায় নেই। কিন্তু থাকলেও চাখনদারের চাকরীটা মারা যেত না

দুই বিরাট খানার চুপড়ী বাঁকের দু'ধারে চাপিয়ে চলেছে রান্নাঘরের ভাঁড়া। চুপড়ী দু'টি ক্যাম্বিশে ঢাকা, দড়িতে বাঁধা আর শীলমোহর করা। পিছনে পিছনে চলেছে দরবারের চাখনদার। তা মহারাণার অন্ন চেখে দেখার কাজটা ওর পক্ষে খুব যুৎসই হয়েছে দেখেছিলাম। কেমন হাসি-খুসী, দিলদরিয়া। কেমন ভুড়িখানা উপচে উঠছে। যেন সাগর বেলায় ঢেউ।

কিন্তু চাখনদারের কাজ অত নিশ্চিন্ত আরামের নয়। সম্রাট বাবরের খানায় এক বার বিষ মেশানো হয়েছিল। তার শত্রু পাঠান রাজা ইব্রাহিম লোদীর মায়ের কারসাজি। বাবর তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "চাখনদারকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবার হুকুম দিলাম। আর বাবুর্চির গায়ের চামড়া জীবন্তে তুলে ফেলতে। এক জন মেয়ে লোককে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে আর এক জনকে কামানের সামনে শেষ করে দিতে হুকুম দিলাম।"

কিন্তু আজ মহারাজারা হারিয়েছেন তাঁদের মুকুট। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাজার ঝামেলা দুশ্চিন্তা। ইংরেজীতে কথাই আছে, "আন ইজি লাইজ দি হেড ছাট উয়ারস্ দি ক্রাউন।"

'বাটিয়া' অর্থাৎ বাজরার মোটা ঘি-চপ চপে চাপাটি আর 'সইতা, অর্থাৎ মাংস আর বাজরার খিচুরীর কোর্স'টা শেষ করে কোমরের বাঁধনটা কি করে কৌশলে একটু ঢিলে করা যায় তা ভাবছি, এমন সময় এল রসোমালাই। কলকাতাই সাইজ নয়। একেবারে পর্বত প্রমাণ। অন্ততঃ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় কাজে লাগার মত দশা সই।

মহারাণী খুব খুশী মনে অন্ততঃ একটু চাখতে অনুরোধ করলেন। বললেন যে, যদিও কলকাতায় এ মিষ্টির জন্ম, এর ডেভেলপমেণ্ট অর্থাৎ উন্নয়ন হয়েছে মাড়োয়ারে। নিজের মুলুকের জিনিষ পছন্দ করব বলে তিনি এটা বিশেষ ভাবে আজ বানাতে বলেছিলেন।

চার দিকে মিষ্টি রসালাপ আর গয়না-পোশাকের জৌলুষ। হীরে-মাণিক দেখি, না রূপের ছবি দেখি। একবার কেন জানি না উপরে প্রকাণ্ড বেলজিয়ান কাটগ্লাসের ঝাড়লণ্ঠনগুলির দিকে তাকালাম। নিজের মুখের জায়গায় সেখানে ভেসে উঠছে একটি কিশোর মুখের ছায়া।

সে তখন লণ্ডনে। সামান্য স্কলারশিপের টাকার ভরসায় ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। থাকে মামুলী এক বোর্ডিং-হাউসে। সঙ্গী আছে আরো দু'জন। এক দিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ থেকে ফিরে দেখে, এক জন চাটগাঁয়ের লোক একটি সুন্দর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে নিয়ে তার ঘরে বসে আছে। উদ্দেশ্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা। খাস চাটগেঁয়ে টান দিয়ে সে ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে বলে গেল, সে কেমন করে লস্কর হয়ে এদেশে এসে বিয়ে-থা করে সংসার পাতে। এখন আর পেট না চললেও মা ষষ্ঠীর কৃপা ঠিকই চলছে। অতএব···

বন্ধুদের মায়া পড়ে গেল লোকটার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটির উপর। বেচারীর ত কোন দোষই নেই। অথচ তার শুকনো মুখখানা ভারতীয় অক্ষমতার ছাপ বয়ে বেড়াচ্ছে। স্বদেশপ্রেমে মরিয়া হয়ে তিন জনেই তখনকার মত যথাসাধ্য বেশ কিছু দিয়ে সাহায্য করল। রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সের জন্য তখন অনেক স্বদেশীয় মহারথী লণ্ডন জাঁকিয়ে বসেছিলেন। তাঁদের কাছে সাহায্য-ভিক্ষা বয়ে গুটি কয়েক জোরাল আবেদনও লিখে দিল তারা।

পরের সপ্তাহে আবার চাটগাঁ এসে হাজির, বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে। না, আর কোথাও সাহায্য মিলছে না। তার পরের সপ্তাহে আবার। তারো পরের সপ্তাহে। শেষ পর্য্যন্ত তিন বন্ধুকে ঠিক করল যে, ভিক্ষা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। চাটগাঁকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। অনেক খুঁজে শুধিয়ে জানা গেল যে, ঠেলা গাড়ী করে ফল বিক্রীই সব চেয়ে কম পুঁজিতে স্বাধীন ব্যবসার উপায়। কিন্তু কোথায় পুঁজি ?

শেষ পর্য্যন্ত তিন বন্ধুতে মিলে নিজেদের মাসোহারায় প্রায় সবটা টাকা এক সঙ্গে করে চাটগাঁর হাতে তুলে দিল। নিজেদের পকেট অবশ্য হয়ে গেল গড়ের মাঠ, কিন্তু এক জন স্বদেশবাসীও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তিন তিনটে কচি শুকনো মুখে রুটির বন্দোবস্ত হবে।

তার পর থেকে শুরু হল তিন বন্ধুর অনশন অর্ধাশনের তপস্যা। পরের মাসের প্রথম দিকে দেশ থেকে নতুন মাসের খরচের টাকা আসবে। সে পর্য্যন্ত ত চালিয়ে নিতেই হবে। বিলেতে আবার ধারে কারবার নেই। আর ধার যদি নেয়-ই তাহলে আদর্শের জন্য স্বার্থ ত্যাগটা হল কোথায় ? তাই সম্বল হল, শুধু শুকনো টোষ্টের উপর সাজান সস্তা সার্ডিন মাছ গুটি কয়। তাইতে খিধে যেটুকু মেটে। ও-বয়সে আবার ছাই খিদেটাও হয় রাক্ষুসে। তবু আদর্শের মুখ চেয়ে দিন কাটে কোন মতে।

এক দিন ভর সাঁঝে ওরা ফিরছে কলেজ থেকে। বাসের পয়সা বাঁচিয়ে শর্টকাট করছে। একটা তাড়িখানা থেকে ওভার-কোট মুড়ি দিয়ে টলতে টলতে বের হচ্ছে চাটগাঁ। কোথায় কভেণ্ট গার্ডেনে ফলের ঠেলাগাড়ী আর কোথায় বা নিজের পায়ে দাঁড়ান। তিন বন্ধুর উপোষ থেকে দান করা টাকাগুলো বোতল-বাহিনীর পেটে গেছে। 'সার্ডিন অন টোষ্ট' দিনের পর দিন খেয়ে যাওয়ার মধ্যে আর রইল না কোন আদর্শ, কোন সান্ত্বনা।

মহারাণী আর রসোমালাইয়ের সামনে বসে মনে মনে শুধু একটা কাতর অনুনয় করলাম সেই কিশোরের ছায়ার কাছে—ভুলো না, ভুলো না, সে দিনকার কথা যেন ভুলো না।

[ক্রমশঃ।

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত মুখবন্ধ

[‘জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী’ এই নামে কিছুকাল পূর্ব্বে একটি ধারাবাহিক লেখা অঙ্গন ও প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হয়। সেই লেখায় ছিল পশ্চিম-বাঙলার সমাজ-চিত্র। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে হয়তো আনন্দিত হবেন, আমরা অনুরূপ আরেকটি লেখা সংগ্রহ করেছি—সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহায্যে। এই লেখাটির পটভূমি পূর্ব্ববঙ্গ। আগামী সংখ্যা থেকে লেখাটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য।—স]

আমাদের দিদিমণি গঙ্গাস্বরূপা মনোদা দেবীর জন্মদিনে তাঁর অন্যতম নাতি সাধন সেন তাঁকে একখানা ডায়েরি উপহার দেয়। সাধনকে উদ্দেশ করে দিদিমণি তাঁর বিগত দিনের কয়েকটি ছবি সে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন।

‘সাধনকে উদ্দেশ করে’ বলাতে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে গেল। যদিও লেখার সময় দিদিমণি সাধনকে, আমাকে কিম্বা তাঁর অন্যান্য নাতি-নাতনি, এমন কি সাধনের পুত্র মাণিককে সামনে রেখে আপন কাহিনী বলে গিয়েছেন; তবু আমার মনে হয়, আসলে দিদিমণি যা বলেছেন, তা বহু বহু বাঙালী সাহিত্যামোদীকে প্রচুর আনন্দ দেবে।

আমি তাই ‘বসুমতীর’ পাঠক-সমাজের অন্যতম সভ্যরূপে এ ডায়েরি প্রকাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করাতে সাধন সাগ্রহে সম্মত হন, কিন্তু দিদিমণি যদি বা সম্মত হলেন, তবু লেখিকারূপে আপন নাম প্রকাশে আপত্তি জানালেন। ‘জনৈকা বৃদ্ধা’ তাঁর প্রস্তাবিত এই সব হাবি-জাবি ছদ্মনাম আমার মনঃপূত হল না বলে, দিদিমণি শেষটায় আপন নাম প্রকাশ করতে স্বীকৃত হলেন।

* * *

যে যুগের কাহিনী দিদিমণি লিখেছেন, তার অনেক জিনিসই আজ সাধারণ বাঙালীর অজানা। আমার তাই বাসনা হয়েছিল, দিদিমণির পাণ্ডুলিপিতে ফুট-নোট সহযোগে সে সব জিনিসের কিছুটা পরিচয় দিই। কিছুটা দিয়েও ছিলুম। কিন্তু দেখি, আশী বছরের সুপক্ব বাঙলা গল্প লেখার মাঝে মাঝে আজকের দিনের বাঙলা গদ্যে লেখা ফুট-নোট বারে বারে তাল কেটে রসভঙ্গ করে। উপস্থিত তাই সেটা বর্জন করেছি—পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় এ বিষয়ে গুণিজনের মতামত নিয়ে আপন কর্তব্য নির্ণয় করব।

* * *

কিছু কাল পূর্বে এই ‘বসুমতী’তেই একটি পশ্চিম-বাঙলার মেয়ের জীবনস্মৃতি বেরয়। সে লেখাতে বিস্তর ব্যাকরণ-শৈলী-বানান ভুলত্রুটি ছিল, কিন্তু আহা, কী বলার ধরণ, কী সুন্দর আপন-মনে গুনগুন্ করে গান গাওয়ার মতন রসসৃষ্টি! সুরসিক বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শোনালে পর তাঁরাও বললেন, ‘একেই বলে ইতিহাস, একেই বলে সাহিত্য, একেই বলে রসসৃষ্টি। ব্যাকরণের নিয়ম, বানানের শাসন এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর।’

দিদিমণির লেখাতেও পাঠক ভুল দেখতে পাবেন। ‘ড়’ এবং ‘র’—দিদিমণি এবং আমার মত বাঙালের কাছে একই ধ্বনি। পশ্চিম-বাঙলার পাঠক অপরাধ নেবেন না।

* * *

অত-শত বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, দিদিমণির লেখা মণিময় লেখা। ‘বসুমতী’র সম্পাদকও উল্লাসে নৃত্য করছেন। কিন্তু হায়, এ যুগের পাঠক ভিন্ন রুচি ধরে—যদিও দৃঢ়নিশ্চয় জানি, তার রসবোধ আমার চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়। নিতান্ত বাহিক ত্রুটি উপেক্ষা করে সে যেন আমার-ই মত এ লেখার রস গ্রহণ করতে পারে—সেই মর্মে এই মুখবন্ধটির নিবেদন।

মাধুর্য্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য—
উৎসব আনন্দের দিনগুলিতে প্রত্যেকেরই মন খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে। এমন দিনে আপনিও আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন ক্যালকেমিকোর বিশিষ্ট প্রসাধন সামগ্রী-গুলির সহায়তায়।
মলয় চন্দন সাবান
ব্যবহারে শরীর স্নিগ্ধ ও অন্তর পবিত্র করে। চন্দনের শুচি সুগন্ধে চিত্ত প্রসন্ন হয়।
ক্যাস্টরল
মনোমদ সুরভি-সম্পৃক্ত ক্যাস্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন হয়ে ওঠে ও মধুর সুগন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল থাকে।
লাবণি স্নো
মুখশ্রীর লাবণ্য বৃদ্ধি করে; কোমল কপোলতল শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাত্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহারে মুখশ্রী স্নিগ্ধ থাকে।
রেণুকা ফেস পাউডার
সৌরভসিক্ত রূপচূর্ণ। মুখে ব্যবহারে আকর্ষণীয় স্নিগ্ধতা আনে। সুগন্ধি রেণুকা ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহারে শরীর ও মন স্নিগ্ধ হয়।
কান্তা
চিত্তাকর্ষক অনুপম সুরভি নির্য্যাস। রুমালে ও বেশবাসে ব্যবহার করলে নরনারীর চিত্ত মধুর সুগন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

বার্দ্ধক্য বা জীবন-সন্ধ্যা

শ্রীমালতী গুহ-রায়

সারা দিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খেটে, আমরা কেমন অধীর আগ্রহে সন্ধ্যার অবসরটুকুর জন্য অপেক্ষা করে থাকি। তার পর ধীরে ধীরে রাত্রি এগিয়ে এসে আমাদের নিদ্রার বিশ্রামটুকু দিয়ে কর্ম্মক্লান্ত দেহ-মনকে চাঙ্গা করে তোলে, পরের দিনে আবার সেই কর্ম্মচক্রে জুড়ে দেবে বলে।

কিন্তু বার্দ্ধক্য যখন মানুষের জীবনে ঐ সন্ধ্যার বিশ্রামটুকুর মতই এগিয়ে আসে, মানুষ বিশ্রাম পায়, বার্দ্ধক্যের সম্মান পায়, সেবাও পায়। কিন্তু তবু সে এর জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করা দূরে থাকুক, দু'হাতে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই যেন বাঁচে!

কিন্তু কেন? বার্দ্ধক্যটা মানুষের জীবনে এত ভীতির সঞ্চার করে কেন? মৃত্যু এসে মহানিদ্রার মতই তো তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে, আবার টাটকা তাজা করে জাগিয়ে দেবে নব জীবনে। আবারো দল-মেলা ফুলের মতই সে ফুটে উঠবে, আপন আপন শক্তির উৎকর্ষতা হিসেবে!

হয়তো অজানা বলেই মৃত্যু বন্ধুর মত এলেও মানুষ তাকে বিশ্বাস করে না। তাই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে ব'লে বার্দ্ধক্যকে তার এত ভয়! শুধু তাই নয়, দীর্ঘ জীবন ধ'রে সে যে তার দেহের অটুট স্বাস্থ্য, চক্ষুর দীপ্তি, কর্ণের শক্তি ও শারীরিক বল উপভোগ করে এসেছে, সে গুলিকে সে বার্দ্ধক্যের আগমনে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে ও সর্ব্বস্বান্ত বোধ করে। যে দেহকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতই তার পরিত্যাগ করে যেতে হবে, সেই দেহ ভগবানের নিয়মেই পরিণত বয়সে জীর্ণ-শীর্ণ বিকৃত হয়ে ওঠে, যাতে তাকে ত্যাগ করে যেতে কিছু মাত্র মানুষের মমতা না হয়। তা ছাড়া প্রকৃতি যেন মমতাময়ী হয়েই মানুষকে তার অতি কর্ম্মক্লান্ত জীবনের দুর্ব্বহ বোঝার থেকেও মুক্তি দেবার জন্য বিশ্রামের সুযোগটুকু এই দেহ-বিকৃতির মাধ্যমে এনে দেন। বকের পালকের মত শাদা ধবধবে রং-এর পোঁচ বুলিয়ে দেন তার মাথার চুলে। আর সমাজ ক্রমে তাই থেকেই তাকে বয়োজ্যেষ্ঠের আসনে তুলে সম্মান দেয়। নূতন অগ্রগতির তালে দৌড়ে চলা সমাজের নিত্য-নূতন হালচালে অনভ্যস্ত তার প্রাচীন চক্ষুর সামনে নেমে আসে ঘোলাটে এক পর্দ্দার আবরণ। ধীরে ধীরে সে তার চক্ষুর জ্যোতি হারায়। আর অনভ্যস্ত চক্ষুতে অনেক কিছু অবাঞ্ছিত দেখার থেকেও তাইতে সে রেহাই পেয়ে যায়।

আবার কানের শক্তিও তার আর আগের মত থাকে না। তাইতেও অবাঞ্ছিত বা অবান্তর অনেক কিছু শুনে, দুঃখ পাওয়ার হাত থেকেও সে বাঁচে। তবু তো বুড়ো হতে কেউ চায় না! পাকা চুলে, তোবড়ান গালে, ধোঁয়াটে-ঘোলাটে চোখে, বলিপলিত দেহে, শ্রদ্ধা পেয়ে, বিশ্রাম পেয়ে, সহানুভূতি ও দরদ পেয়েও সে তো একটুও খুসী হতে পারে না! প্রকৃতির এই যে জরার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত দরদটুকু, এ আমাদের চোখে তা কখনোই পড়ে না! বরং নৃশংস ভাবে যৌবনের দেহসজ্জার সব কিছুই ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যথাটুকুই অন্তরে নির্ম্মম হয়ে যেন বাজে! সব সময়ই সে ভাবে, 'আর কি? এবার তো শেষ হয়েই গেলাম! জীবনের তো সবই গেল!' এই ভাবনাটাই তাকে সত্যি সত্যি শেষ করে ফেলে। নিজেকে যতই বুড়ো ভাবে, সে ততই বুড়ো হয়ে নুইয়ে থপ্‌থপিয়ে চলে।

পৃথিবীটা ঘোরে। সূর্য্য-চন্দ্র উদয় হয় আবার অস্ত যায়। আকাশের মেঘ রং বদলিয়ে আকাশের গায়ে যাওয়া-আসা করে, থেমে থাকে না। বসন্তের ফুল গ্রীষ্মের প্রখরতায় লুটিয়ে পড়ে। আবার বর্ষা এসে গ্রীষ্মের কবল থেকে ধরিত্রীকে মুক্তি দেয়। তার পর শীতের প্রলেপ আবার বর্ষার চোখের জলটুকু মুছিয়ে লেপের আস্তরণে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এমনি করে আমাদের জীবনেও শৈশবের পর আসে কৈশোর, কৈশোরের পর যৌবন, তার পর প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য। এমনি করেই ক্রমে ঘটে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি। তা কি শুধুই কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পৌঁছেই ক্ষান্ত হতে পারে?

প্রকৃতির নিয়মে প্রকৃতি চলে। সব-কিছুই পরিবর্ত্তনশীল। কিছুই স্থির নয়। আসে, থাকে, যায়। আবার জন্ম নেয়, আবার ফিরে আসে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। তার মধ্যেও আবার ধাপে ধাপে গতি। বার্দ্ধক্য মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তির পথে একটি ধাপ মাত্র।

মানুষের জীবনে কিন্তু প্রকৃতির এই নিয়মানুবর্ত্তিতায় কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। মানুষের বেলায় জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু—এই স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে যমরাজের এক খেলা রয়ে গেছে। দিবা-রাত্রির মত নির্দ্দিষ্ট গতিতে মানুষের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যকে অতিক্রম করার পরই, কোন নির্দ্ধারিত কালে মৃত্যু আসে না। মৃত্যুর লুকোচুরি খেলা মানুষের জীবনের প্রতি অধ্যায়ে সম ভাবে চলে। কা'কে যে যমরাজ কখন তার জীবননাট্য থেকে সরিয়ে নেন নিজের খেলার ঝোঁকে, তার আর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এ-কথা আমরা অবশ্য কে-ই বা না জানি? কেন না, এ তো আমাদের চতুষ্পার্শ্বে অহরহঃ ঘটছে। ভূমিষ্ঠ হবার আগে বা ভূমিষ্ঠ হবার থেকে সুরু করে পরিণত বয়স বা বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মৃত্যুর এই খেয়াল-খুসী খেলা আমরা দেখি। সুস্থ সবল স্বাস্থ্য থেকে সুরু করে অন্ধ-কানা-খোঁড়া-মুমূর্ষু, যে কোন দৈহিক অবস্থায়ই এবং যে কোন মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর ডাক আসতে পারে। আর মৃত্যুর ডাক এক বার এলে, আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব সইবে না তার। তক্ষুণি সাড়া দিতে সে ছুটবে। পৃথিবীর শত প্রলোভন-আকর্ষণও তাকে আর বাঁধতে পারবে না। তাই হয়তো কবি গেয়েছেন, 'মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান।' অতি প্রিয়র ডাক ছাড়া এভাবে সাড়া, নইলে কি মানুষ দিতে পারে? কিন্তু যত ভয় তার এই ডাকটুকু আসার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তই।

মৃত্যুকে যে এক দণ্ডও ঠেকান যায় না, এ তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু এটাই শুধু জানি না যে, আমাদের অবাঞ্ছিত বার্দ্ধক্যকে আমরা চেষ্টা করলে একেবারে না হলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারি। এ ক্ষমতা কতকটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে।

বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকদের মতে, সাধারণতঃ আমাদের চার পাশে আমরা যত জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখতে পাই, তা নাকি অধিকাংশই মানুষ নিজে টেনে আনে ও আত্মহত্যা করে। বার্দ্ধক্যকে সরিয়ে রেখে দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ স্বাস্থ্য ভোগ করতে হলে 'Fear less, Hope more, Eat less, chew more, Hate less;

love more.' এই না কি মূল মন্ত্র। অর্থাৎ ভয়, নিরাশা, বেশী খাওয়া, কম চিবুনো, ঘৃণা করা, ভালবাসার অভাব, এই সবই ঐ জরা ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণ। ঐগুলিই মানুষের জীবনে বিষাক্ত গ্যাসের মত বা ধীরগামী বিষের মত ক্রিয়া ক'রে মানুষকে পঙ্গু করে।

শুধু তাই-ই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দীর্ঘজীবী মানুষের জীবন-তথ্য আলোচনা করে দেখা গেছে যে, তাঁরা হয়তো তাঁদের চুলের রং বদলানো বা দাঁত-পড়াটা বন্ধ করতে পারেন নি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বার্দ্ধক্য বলতে যা বোঝায়, তাকে বহুলাংশেই ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ-সবল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁরা বলে গেছেন যে, তাঁরা কখনোই খাওয়ার জন্য বাঁচেন নি, বাঁচবার জন্যই খেয়েছেন। সকলেরই যা জানা যায়—আহার ছিল পরিমিত, ব্যায়াম ছিল নিয়মিত, পরিশ্রম ছিল ক্ষমতা অনুপাতে। আর বিশ্রামেরও একটা নিয়ম ছিল। সর্ব্বোপরি নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল তাঁদের জীবনধারায় আর শৃঙ্খলা ছিল সর্ব্ব কাজে। তাঁদের কাজ তাঁদের আনন্দেরই রসদ যোগাতো, দুর্ব্বহ বোঝা বলে মনে হ'তো না একদিনও। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলে গেছেন যে, 'ভাল করে বাঁচতে পারলেই, ভাল করে মরাও যায়।'

বয়স যখন এগিয়ে আসে, আমাদের কিন্তু প্রায়ই একটা মুখের বুলি হয়ে দাঁড়ায়, 'আর কি! বয়স তো কম হ'ল না? আমার দ্বারা আর কিছুই হ'বে না।' এই মৌখিক বুলিটা কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায়ই মৌখিকই, আন্তরিক খুবই কম। কিন্তু এটা যে কতখানি ক্ষতিকর, এই ধরণের ভাব ও কথা যে অন্তরে ধীরে ধীরে ঐ ধরণেরই ছাপ ফেলে, এ আমরা জানি না। প্রত্যেক কথা বা চিন্তাধারার পিছনেই একটা বৈদ্যুতিক শক্তি কাজ করে। আর ঐ বৈদ্যুতিক প্রবাহ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে অবশ করে প্রকৃতই কর্ম্মশক্তি কমিয়ে দেয় এবং ঐ মুখের বুলিই ক্রমশঃ সত্যে পরিণত হয়। কাজেই বারে বারে ঐ ধরণের কথা উচ্চারণ করা বা অন্তরে অনুভব করায় আমাদের মধ্যে এতই কুফল প্রদান করে যে, তা বলে বোঝানো যায় না।

আরো একটা কথা আমরা তলিয়ে দেখি না। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছালে বার্দ্ধক্যের জন্য নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা না করে, আমরা কেন ভাবি না যে, বয়সে আমাদের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, জ্ঞান, গুণ সব বেড়েইছে, কিন্তু কমেনি! আমরা তো সেই বুদ্ধি চালনা করলে, দুনিয়ায় কত নব নব দানও দিয়ে যেতে পারি!

কোন কিছু করা, শেখা বা জানার জন্য আমাদের কখনোই সময় বয়ে যায় না (অর্থাৎ too late নয়)। যখনই কিছু আনন্দদায়ক আসুক, আমরা তার থেকে আনন্দ গ্রহণ করবো। কিছু শিখবার আসুক শিখে নেবো, কিছু ভাববার আসুক ভাবতে বসবো। আর যদি কিছু করার মত আসে, অমনি তা করতে লেগে যাবো। তার জন্য আমাদের বয়স কত, আমরা যৌবনের, প্রৌঢ়ত্বের বা বার্দ্ধক্যের কোনটার কোন সীমারেখায় রয়েছি, তা ভাববার কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে যে সুযোগ আমাদের জীবনে আসেনি, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্দ্ধক্যে সে সুযোগ এলে আমাদের প্রত্যাখ্যানের অধিকার নেই।

চাকচিক্যময় সাজ-সজ্জায় প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্যকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা না করে কর্ম্ম দিয়ে সেবা দিয়ে, তাকে পিছন হঠাতে চেষ্টা করা যেতে পারে। মোট কথা, সারাটা জীবন আমাদের মধ্যে যেন একটা সেবা ও ত্যাগের আদর্শ, স্নিগ্ধ প্রদীপশিখার মত আমাদের পথ প্রদর্শন করে। ভোগের পথই আমাদের একমাত্র পথ নয়, তাতে যতটা হুল, মধু ততটা নেই।

বহু মনীষীদের জীবন-কাহিনী আলোচনা করলে জানা যায়, তাঁরা চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও নিজেদের পেশা পরিবর্ত্তন করে স্বনামধন্য হয়ে গেছেন। কাজেই বার্দ্ধক্যকে নিশ্চয় তাঁদের জীবনে পা ফেলতে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল।

Dr Winnington Ingram, London-এর এক জন বিশপ একটি সারগর্ভ কথা বলেছিলেন, 'Look straight into the light & the shadows will always be behind you.' অর্থাৎ 'সোজা আলোর দিকে তাকাও, ছায়া তোমার পশ্চাতে থাকিবে।'

কিন্তু আমরা সচরাচর কি করি? সম্পূর্ণই বিপরীত নয় কি? আলোর দিকে তাকান দূরের কথা, আলোর দিকে পেছন ফিরে ছায়ার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জীবনের বিভীষিকাকেই ডেকে আনি। Ingram-এর এই সারগর্ভ কথাটুকু যদি আমরা অন্তরে গেঁথে নিতে পারি, তবে বার্দ্ধক্য বা জীবন-সন্ধ্যা আমাদের দিনান্তের শুভ সন্ধ্যাটির মতই সুন্দর ও মনোরম হতে পারে। আর শুধু তাই নয়, তার গতিও আমাদের জীবনে অনেকটা মন্থর হয়ে আসবে।

বার্দ্ধক্যের গতিকে মন্থর করতে আরও কতকগুলি বিষয় রয়েছে। আলস্যতা কিন্তু একটি প্রধান শত্রু, যা না কি বার্দ্ধক্যকে আমাদের জীবনপথে দশ পা ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয়। শরীর অকর্ম্মণ্য করে ফেলতেও আলস্যের মত আর যুড়ি নেই। অতৃপ্তিও বার্দ্ধক্যের আর একটি প্রিয় রাস্তা; যা দিয়ে সে তার সহজ চলার গতি পায়।

মানুষ যদি পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করে আনন্দে বাঁচতে চায়, তবে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের মত নিজেকে খাপ খাইয়ে সর্ব্ব-অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে তাকে প্রস্তুত থাকতেই হবে। মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কেন না, দেহই তো মনের অধিষ্ঠান। দেহ ছাড়া মনের অবস্থিতির কেহই নেই। বাইরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবর্ত্তন যদি মনের স্বাভাবিক আনন্দবোধ ও তৃপ্তিটুকুকে না নষ্ট করতে পারে, তবে বার্দ্ধক্য তার কাছে আসতে অতি ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে আসবে।

মানুষের জীবনে 'হবি' (hobby) বা ব্যক্তিগত নিজস্ব সখ থাকাও খুব ভাল। সাধারণ জীবনের একঘেয়েমীতে যে নিরানন্দ বা বিরক্তির ছায়া এসে মানুষের চলার গতিকে ঝিমিয়ে দেয় ও বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করতে চায়—নিজস্ব সখ তার একটা সুন্দর প্রতিষেধক। নিজস্ব সখের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বৈচিত্র্যরূপ আনন্দ এনে দেওয়া। সংগ্রহমূলক সখে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় বলে, তা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। ফুলের বাগান, ফল-সবজীর বাগিচায়, পশু-পাখীর যত্নে, ছবি আঁকায়, ঘর গোছানোতে, সেলাই বা রান্না ইত্যাদি গার্হস্থ্য আবশ্যকীয় কাজগুলিকে নিজস্ব সখ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মেয়েদের নিত্য রাঁধা-বাড়া-খাওয়া, আর পুরুষদের অফিসের কাজ আর বাড়ী, এই নিত্য-নৈমিত্তিকের একঘেয়েমীর ফাঁকে ঐ সব সখ থাকলে রুচি নীতি বদলে শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। পরিবারের এক জনের এক রকম ব্যক্তিগত সখকে, অপর আর এক জন যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দিয়ে তার সরসতা ও মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করে না দেন, এ বিষয়ে সবাইর খেয়াল থাকা দরকার। আবার ব্যক্তিগত সখের জন্য সংসারের আয়ের তুলনায় ব্যয়ের অঙ্ক যাতে বেশী গড়িয়ে না যায়, সে দিকেও 'হবি'র কর্ত্তা বা কর্ত্রীর লক্ষ্য রাখা উচিত। নতুবা একঘেয়েমীর নিরানন্দ থেকে মুক্ত হওয়া দূরের কথা, সর্ব্বদার জন্যই এক অশান্তির সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। আরো খেয়াল থাকবে, যাতে সখটি যেন আনন্দেরই উৎস হয়, একঘেয়ে বা বাসী না হয়ে দাঁড়ায়। তা'হলে তার মাধুর্য্য কিছুই থাকবে না, ঐ দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনযাত্রার অংশ হয়েই দাঁড়াবে। এ ধরণের 'হবি' বা সখ অবশ্য সংখ্যায় বেশী থাকাও মন্দ নয়। মন তাতে টাটকা থাকবে। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে রকমারী রসাস্বাদনের সব রুচিও ভাল থাকবে।

আরো একটা কথা। আমরা আমাদের সাংসারিক অবস্থানুপাতে যে যেটুকু কাজের ভার পাবো,—তা সে রান্নাই হোক, বাসন মাজা বা ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কাজই হোক, সন্তান পালনই হোক—অথবা অফিসের চাকুরী, দোকানের দোকানদারীই হোক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সবাই যদি সেটুকুকে ভালবেসে হৃষ্টচিত্তে করি, তবেও বার্দ্ধক্যের অগ্রগতি অনেকটা রুদ্ধ হয়। মনের আনন্দে, আপন উৎসাহে যে কাজ, তা মানুষকে এমনই ব্যস্ত রাখে যে, সে বুড়ো হতে সময়ই পায় না।

দীর্ঘজীবীদের মধ্যে দেখা যায়, তাদের প্রায় সকলেরই কর্ম্মবহুল জীবন ছিল। Roscoe Thayer তো গড়পড়তা জীবিকানুযায়ী একটা বয়সের হার নির্দ্ধারণ করেছেন, মানুষ কে কি উপজীবিকা গ্রহণ করে, কত দিন সাধারণতঃ বাঁচে। কিন্তু যত দূর মনে হয়, এ একেবারে সাধারণ মানুষদেরই জন্য। যাঁরা না কি নিজেদের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যই তাঁদের কর্ম্মকে পেশা হিসেবে নেন। কেন না, বিখ্যাত লেখক, ঐতিহাসিক, গায়ক, ধর্ম্মযাজক ইত্যাদি সর্ব্ব শ্রেণীর দীর্ঘজীবীদের জীবনালোচনায় এই-ই পাওয়া যায় যে, তাঁরা আপন মনের আনন্দেই কাজ করে গেছেন। তাঁদের কর্ম্মের সাফল্যই তাঁদের প্রেরণার উৎস, আনন্দের খনি ছিল। তাঁরা বাইরের লোকের মৌখিক স্তুতি বা প্রশংসা অর্জ্জনের জন্য বা পয়সা উপার্জ্জনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করে তাঁদের কাজ করেন নি কখনও। তাঁদের সৃজনী শক্তিই তাঁদের এগিয়ে দিয়েছে তাঁদের অক্লান্ত অনলস কাজে। উৎসাহ যুগিয়েছে সমানে—বুড়ো হতে সময়ই দেয়নি। তাঁদের মতে আনন্দই মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক। তাই বলে তাঁরা কিন্তু কেউ সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি ভঙ্গ করে চলেন নি।

ঈশ্বরের প্রকাশ শক্তিই আমরা দেখি প্রকৃতিতে। আর প্রকৃতি আবদ্ধ নিয়মে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও এই প্রকৃতিগত নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে প্রকৃতির বা ভগবানেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। কাজেই তার বিষময় ফল সে ভোগ করতে বাধ্য। প্রকৃতি নিদারুণ প্রতিশোধ নেন। দীর্ঘজীবীরা প্রায় সকলেই নিয়মানুবর্ত্তী, মিতব্যয়ী, স্বল্লাহারী, স্বল্পভাষী, নিয়মিত ব্যায়ামী ও শারীরিক প্রয়োজনীয় বিশ্রাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

Elic Metchnikofl, the Russian scientist, যিনি Pasture Institute এর dircetor ছিলেন, তিনি বলেছেন, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি নজর দিলে সুস্থ স্বাস্থ্য অন্তে সুন্দর মৃত্যু সকলেই পেতে পারে। সারা জীবনের পরিমার্জ্জিত কর্ম্ম, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিমিত আহার, বিশ্রাম, ব্যায়াম ও মনের আনন্দ দিয়ে সকলেই না কি এমন হতে পারে যে, তাদের বার্দ্ধক্য কবে এসেছিল তা জানবার আগেই, তৃপ্তিকর সুখনিদ্রার মতই মরণ এসে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

অকাল বার্দ্ধক্যের কারণই না কি পাকস্থলীর গণ্ডগোল। খাদ্যদ্রব্য ঠিক মত পরিপাক না হয়ে, প্রতিদিন যে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাতে ক্রমসঞ্চিত মলে যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাই পাকস্থলীতে বিষক্রিয়া করে ও আমাদের দেহের অধিকাংশ ব্যাধি ও ক্ষয়ের সৃষ্টি করে। প্রবাদ আছে, 'যার নাই ভুঁড়ি তার নাই মুড়ি।' এখানে ভুঁড়ি অর্থে সুস্থ পাকস্থলী। সুস্থ পাকস্থলী হীন মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কও পায় না। এই হচ্ছে এই প্রবাদ বাক্যের অর্থ।

মানুষের দেহগত প্রয়োজন অনুসারেই খাদ্য নির্ব্বাচন করা উচিত। মোটা ও রোগা মানুষেরও খাদ্যের তারতম্য আছে। খাদ্য কোন মতেই বেশী হওয়া উচিত নয়। আবার দীর্ঘ সময় উপবাসও ভাল নয়। গুরুতর পরিশ্রমে আমরা যেমন ক্লান্ত বোধ করি, গুরুভোজনে পাকস্থলীও তেমনি ক্লান্ত হয়। আলস্যে যেমন শরীর অকর্ম্মণ্য হয়, তেমনি দীর্ঘ উপবাসেও পাকস্থলীর কর্ম্মণ্যতা নষ্ট হয়। আমরা যা খাই, তা বেশীর ভাগ চোখের তৃপ্তি ও জিহ্বার স্বাদেরই জন্য। যা আমাদের দেখতে ভাল লাগে ও জিভে রস পাই, তাই আমরা ভালবাসি, তাই আমরা খাই ও সকলকে খাওয়াতেও ভালবাসি। উপকার-অপকার, হজম-বদহজমের চিন্তা আমরা করি বয়সে ভাঁটা পড়লে, রক্তের জোর কমে এলে। এই সময়োচিত চিন্তা বা বিবেচনা হীনতার রাস্তা দিয়েই বার্দ্ধক্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসে আমাদের দেহে ও মনে। আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ যে যত বেশী খেতে পারে, দশ জনের 'বাহবা' অর্জ্জন সে ততই বেশী করে। এমন কি পুরস্কারও পায়। কিন্তু সে তো জানে না, প্রতিবারকার গুরুভোজনে তার জীবন-খাতা থেকে একটি করে পৃষ্ঠা খসে পড়ে। আর ভবিষ্যৎ ব্যাধি তার মধ্যে আস্তানা গাড়বার সুযোগ পায়। অবশ্য রোগভোগ যে সাবধান-সতর্ক থাকলেই একেবারে আসবে না, একথাও বলা চলে না। তবু বহুলাংশে বা

অনেকাংশে এড়াবার যে পথটা আছে আর তা জেনেও আমরা সময়ে যে গ্রাহ্য করি না এটা খুবই সত্যি।

Temperate Climate বা মাঝামাঝি নাতিশীতোষ্ণ জল-হাওয়া বার্দ্ধক্যকে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ। আবার বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকারও দীর্ঘজীবন বা বিলম্বিত বার্দ্ধক্যের কতকটা রহস্য। মেয়েরা সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী হ'ন, এ কিন্তু একটা সাধারণ তথ্য। কেন না, লোকসংখ্যা গণনায় জানা যায়, প্রায় প্রতি দেশেই পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারী-সংখ্যা অনেক বেশী। মেয়েরা যে জন্মে বেশী তা কিন্তু নয়, আসলে তারা মরেই পুরুষের তুলনায় কম। মেয়েদের জীবন যাপন কতকটা নিশ্চিন্ত ও নির্ভরশীল বলেই হয়তো তারা বাঁচে বেশী। দুর্ঘটনা বা ব্যাধির বীজাণু যার থেকে মৃত্যু আসে, তাও বাইরেই বেশী, ঘরে তত নয়। তা ছাড়া সন্তান প্রসবেই মেয়েদের মৃত্যু চিরকাল ঘটে এসেছে অত্যন্ত বেশী, কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সে বিষয়েও তারা বহুলাংশে নিরাপদ।

মেয়েদের মধ্যে ১৩০ বা ১৪০ বৎসর বাঁচবার ইতিহাসও না কি রয়েছে শোনা যায়। Catherine, Countess of Desmond না কি বেঁচেছিলেন ১৪০ বৎসর। অবশ্য সত্যি-মিথ্যে জানি না। Ninon de L'enclos যদিও বেঁচেছিলেন ১০০ বছরের কিছু নীচেই, কিন্তু ৯০ বছর বয়সে না কি তাঁকে ৩০।৪০ বছর বয়সের মত দেখাতো। আর আমাদেরও আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শুধু দীর্ঘ কাল বাঁচাই নয়, বার্দ্ধক্যকে ঠেকান। কাজেই এই ভদ্রমহিলার বিবৃতিতে সেই বার্দ্ধক্য ঠেকান সম্বন্ধেই কিছু জানা যায়। তিনি না কি বলেছেন, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি তিনি খুব ভাল করে মানতেন তো বটেই, তা ছাড়া শারীরিক নিয়মিত ব্যায়াম ও মালিশই না কি তাঁর যৌবনোচিত অটুট স্বাস্থ্যের মূল কারণ।

আমাদের মেয়েদের তো তেল মালিশের কথা শুনলেই নাক সিঁটকে ওঠে, কিন্তু এই অভিজ্ঞ ফরাসী ভদ্রমহিলার নিজোক্তি থেকে যা বোঝা যায়, তিনি শারীরিক ব্যায়াম ও মালিশকেই তাঁর বয়সোচিত বার্দ্ধক্যকে ঠেকিয়ে রেখে যৌবনকে বেঁধে রাখতে কতটা মূল্য দিয়েছেন। নিয়মিত ব্যায়াম সম্বন্ধে আমাদের মেয়েরা তো একেবারেই উদাসীন। ঘরের কতগুলি কাজও যদি তারা ঝি-চাকরের হাতে ছেড়ে না দিয়ে ব্যায়াম হিসেবে নিজেরা করে, তবু কত উপকার হতে পারে। আর তাও যদি একান্ত অসুবিধা বা অসম্ভব মনে হয়, তবে প্রতিদিন ৩।৪ মিনিট ব্যায়াম করা এমন কিছু কষ্টকর নয়।

স্নানের সময় সরষের তেল মালিশ করলে স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, এ আমরা আমাদের প্রাচীন-প্রাচীনাদের কাছে সর্ব্বদাই শুনি। ১২৫ বা ১৩০ বছর বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে গেছেন এ

তো আমাদের দেশেই খুঁজলে কত পাবো। আর ৮০।৯০ বছরের দিদিমা-ঠাকুমারা বিনা চশমায় দেখেন, মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে খাইয়ে চিরবিশ্রাম নেন—এ-ও আমরা খুঁজলে এখনো পেতে পারি। সরল সোজা তাঁদের হাঁটা-চলা দেখে বোঝার উপায় থাকে না তাঁদের বয়স সত্যিকারের কত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলে হয়তো তাঁদের মাথার চুলে রং ধরে যেতো কিন্তু তাঁরা সকলেই পরিশ্রমী। আলস্য করে বিশ্রাম নিয়ে বার্দ্ধক্যকে আমন্ত্রণ জানাবার সময় থাকে না তাঁদের। কত অল্পতেই না তাঁরা তুষ্ট। দশ জনের সংসার করে (যাকে আমরা এখন বারো ভূতের সংসার বলি) কতই না সুখী মনে তাঁরা জীবন কাটিয়ে এসেছেন! শিবজ্ঞানে তাঁরা জীবসেবা করেছেন। কোন পূজা-পার্ব্বণ বা সামাজিক উৎসবই তাঁদের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে যা একটু বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। তাইতেই তাঁদের কত আনন্দ, কত তৃপ্তি!

মেয়েদেরই যখন দীর্ঘজীবী হয়ে বাঁচতে হয়, তখন তাদেরই উচিত বেশী সতর্ক হয়ে সামলে চলা, যাতে অকাল বার্দ্ধক্য তাদের দুষ্ট রাহুর মত গ্রাস করে তাদের অকর্ম্মণ্য করে না ফেলে। কেন না, তাদের জীবন তো অনেকাংশেই পরানুগ্রহের উপর। অপরের গলগ্রহ হবার ভয়েও তাদের সাবধান থাকা উচিত। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে মেয়েদেরই বেশী উদাসীন দেখা যায়। পরিবর্ত্তে তারা তাদের দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য নানা রকম বিলাস-ব্যসনে মন দিয়ে থাকেন। কিন্তু অকালে চোখের জ্যোতি হারিয়ে, গাল তুবড়ে গেলে দেহসজ্জার রকমারী সাজ-সরঞ্জাম সবই তো পড়ে থাকবে, কোন কাজেই আসবে না। মাথার উপর পাখা খুলে হাতে একখানা নভেল নিয়ে মেদবহুল দেহ নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে হাঁসফাঁস করার চেয়ে বেগার খাটাও যে অনেক ভাল, এ চৈতন্য অনেকেরই হয় না। তা ছাড়া আলস্যপরায়ণ মানুষ কখনো সুখী হয় না। না দেহে, না মনে। আর নিজেরা সুখী না হলে অপরকে সুখী করাও তাই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। মেয়েরা কালে সংসারের কর্ত্রী হয়। তারা যদি তাদের আপন মনের আনন্দেরই খোঁজ না পায়, তবে ভবিষ্যৎ সংসারে আনন্দ বিতরণ করবে কোত্থেকে?

দীর্ঘ কাল বেঁচে থাকা ও বার্দ্ধক্যের বিলম্বীকরণ নিয়ে নানা গবেষণাই চলছে, কিন্তু পাকাপাকি কোন একটা সিদ্ধান্তে এ পর্য্যন্ত পৌঁছানো গেছে বলে শোনা যায় না। তবে অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে বার্দ্ধক্যকে খানিকটা ঠেকিয়ে রাখা যে অসম্ভব নয়, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

অবশ্যম্ভাবী বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষকদের নানা মত দেখা যায়। প্রথমে মূল কারণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় বা একমত হতে পারলেই হয়তো তার একটা প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন গবেষণাই একমতে আসেনি। কেউ বলেন, Thyrold gland-এর degenerationই হচ্ছে এর এক মাত্র কারণ। tissue ও হাড় শক্ত হওয়ার দরুণ gland-এর ক্ষয়ের জন্যই বার্দ্ধক্যের জরা আসে। আবার অনেকের ধারণা, হজমশক্তির গণ্ডগোলে যে সব খাদ্যদ্রব্য গলিত অবস্থায় মলরূপে আমাদের দেহাভ্যন্তরে নিত্যই কিছু কিছু থেকে যায়, পূর্ণ নিষ্কাশনের পথ পায় না, সেগুলিই বিষাক্ত হয়ে দেহাভ্যন্তরে ধ্বংসকারী কাজ করে। ফলে বার্দ্ধক্য সবল পাদক্ষেপে এসে পড়ে।

সহজপাচ্য খাদ্যদ্রব্য নিয়মিত এবং পরিমিত ভাবে খেলে হজম শক্তি ভাল থাকে, ফলে এর হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের দরকার হচ্ছে একটু কম খাওয়া আর বেশী চিবুনো। কিন্তু উল্টে আমরা খাই বেশী চিবুই কম। একদম না চিবিয়ে গিলতে পারলেও আমরা অনেকে একবারে তৈরী। পাকস্থলীর আগুনে পরিপাক শক্তি রয়েছে ব'লে, কুটনো-কোটা বাটনা-বাটার শক্তি তো আর নেই। ঐ শক্তি তো একমাত্র দাঁতেরই।

ধর্ম্মগুরু আচার্য্য শঙ্করদেবের মতও হচ্ছে 'ক্ষুৎব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাম্ প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্।' অর্থাৎ 'ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর আর ভিক্ষালব্ধ অষুধ সেবন কর।' ক্ষুধাটাকেও তিনি দেহের ব্যাধির মতই নিয়েছেন। অষুধ খেলে যেমন রোগ সারে, আহার্য খেলেও তেমনি দেহের ক্ষুধার উপশম হয়। এই ভেবেই আহার করা উচিত। দেহের জন্যই আহার। আহারের জন্য দেহ নয়। ধর্ম্মগুরু শঙ্করাচার্য্য হয়তো তাঁর এ উপদেশ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগী হলেও দেহধারী মানুষই তো বটেন! কাজেই অধিক আহার যে ক্ষতিকর, এ শিক্ষা আমরা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যের বাণী থেকে সংসারীদের দিতে পারি। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' অর্থাৎ ধর্ম্ম সাধনারও গোড়ার কথা শরীর রক্ষা। সন্ন্যাসী বা যোগীরা দীর্ঘায়ু হিসেবে বিখ্যাত। শুধু তাই নয়, অবহেলায় যৌবন তাদের দেহ থেকে যাই-যাই করেও যায় না, তাই বার্দ্ধক্য তার জরা-ভার নিয়ে কিছু মুস্কিলে পড়ে।

আরো একটা কথা হচ্ছে, মানুষের নিত্য-নূতন গড়া সভ্যতা থেকে যারা যতটা দূরে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে থাকতে পারে, তাদের দেহেরই অটুট স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘবিলম্বিত বার্দ্ধক্য অহরহঃ দেখা যায়। মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, নিত্য-নূতন অভাববোধ হীনতা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রভাবে সাধারণ আহার-বিহারেই তারা বুড়ো হয় অনেক দেরীতে।

মানুষ তুমি কি?

সুনীলিমা ঘোষ

মানুষ তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার, ঈশ্বরের সৃজনী শক্তির শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব। তুমি একই হাতের একই উপাদানে গঠিত কিন্তু তোমার ভেতর মানুষে মানুষে যত পার্থক্য, যার তুলনা পৃথিবীতে মেলা ভার। তোমাকে নিয়েই এ পৃথিবীর দুঃখ-সুখের হাট—তোমার জন্যই সুখের মেলা, দুঃখের হাট।

একই সময়ে এক যায়গায় তোমার পদার্পণে লাগে খুসির জোয়ার, ওঠে হুলুধ্বনি, কম্বুধ্বনির সাথে মেশে আনন্দের কলতান—তুমি এখানে পরম আকাঙ্খিত, বহু আরাধনার ধন। এখানে তুমি সহস্র চক্ষুর স্নেহধারায় অবিরত অভিসিক্ত হও, ঝকঝকে পালঙে, মখমলের বিছানায় সহস্র স্নেহ-উদ্বেলিত বক্ষের বাঞ্ছিত ধন হয়ে রূপোর চামচ মুখে ষোড়শোপচারে দিনে দিনে পূর্ণ হও চাঁদেরই মত। অন্য খানে একই সময়ে জন্মলাভ করে পাও ভ্রূকুটি, বিরক্তি ও ক্রোধের গুঞ্জন—সেখানে মৃত্যু তোমার পরম কাম্য! এখানে তুমি স্নেহবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, এখানে তোমার জন্ম শুধু তোমারই নয়, আরো অনেকগুলো প্রাণীর দুঃখের কারণ। অনেক যায়গায় তুমি সব সুধার সার মাতৃসুধা পানেও বঞ্চিত।

এক যায়গায় তোমার আগমনের আগমনী সঙ্গীতের লয় না পেতেই অন্য খানে হরিবোল তান সুরু হয়—তোমার আনন্দের সানাইর সুর করুণ কণ্ঠের বিলাপের নীচে চাপা পড়ে কেন ?

এই তুমিই স্বাধীনতার চরম সুখ উপভোগ করতে করতে অন্য জাতিকে শৃঙ্খলিত করে অত্যাচারে জর্জ্জরিত,তার অভিশপ্ত দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করো। কোনখানে তুমি রাজা, কোনখানে প্রজা।

বিলাসিতার তুমি চরম—তুমি আগা খাঁ, তুমি বিড়লা। কোনখানে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় রাজসিক আরামে উপচারে দিন তোমার কাটে, টাকা তোমার প্রয়োজন নয়—বিলাস। ছালাভরা টাকার স্তূপ নদীর জলে ফেলে জলতরঙ্গের মধুর ধ্বনিতে তুমি নিদ্রাদেবীকে আহ্বান জানাও, তার পাশে খোলার ঘরে তোমার বাস, নিত্য তোমার দুর্ভাবনা মাথার ওপর এ আচ্ছাদনও কখন খসে যায়। এখানে অর্থ তোমার অনর্থ হয়,—জীবন। তুমি ফুটন্ত মুড়ির সান্ত্বনা শব্দ শুনতে শুনতে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার ঐ বিলাসিতার পাহাড় থেকে কেউ যদি কণামাত্রও করুণা ভিক্ষা করতে আসে—তবে তোমার ঐ গম্ভীর বিলোল কটাক্ষ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করে, তোমার ঘৃণার ঐ তির্য্যক্ ভ্রূকুটি দগ্ধ করে তাকে। কিন্তু তুমি জান না তোমার ঐ এক তিল দান যা তোমার পক্ষে কিছুই নয়—অন্যের জীবন। একটা লোকের সারাজীবনের আয় তুমি এক মুহূর্ত্তের খেয়ালে উড়িয়ে দাও, তবু তোমার এ কার্পণ্য কেন ? তুমি জান না, কত লজ্জায় কত সঙ্কোচে তোমার করুণা-কণা ও চাইতে এসেছিলো। ও তো তোমাকেই বড় করতে এসেছিলো—দাতা তো অনেকেই হতে পারে গ্রহীতা কয় জন ? গ্রহীতার জন্যই দাতা মহৎ। কর্ণের কবচকুণ্ডল গ্রহীতাকে কত মনে রাখে ? কার জন্য কর্ণ আজ অমর ?—কার জন্য তুমি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, কার জন্য তুমি দেশবন্ধু ?—এ তুমি ভুলো না।

জ্ঞানে তুমি মহাপণ্ডিত—তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের এতটুকু চিন্তায় মানুষের জীবন, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে চলে—আবার অন্য দিকে তুমি ধ্বংসের বিভীষিকা দেখাও। এক দিকে তুমি শান্তির দূত, অন্য দিকে অশান্তির স্রষ্টা।

কবিত্বে তুমি রবি ঠাকুর, ছন্দে মাইকেল, দানে বিদ্যাসাগর, জ্ঞানে বুদ্ধ, সত্য ও ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, ক্ষমায় তুমি যীশু খৃষ্ট, সাধনায় তুমি রামকৃষ্ণ, শান্তির প্রতীক তুমি গান্ধী। আবার তুমিই মহামূর্খ, ভণ্ড, প্রবঞ্চক, ক্ষমা তোমার কাছে দুর্ব্বলতার পরিচয়, দান দয়া অপচয়ের নামান্তর, তুমি নাস্তিক, তুমি হাইড্রোজেন বোমের আবিষ্কর্তা, তুমি নাথুরাম গড্‌সে।

তোমার প্রেমে একে স্বর্গ রচনা করে, অপরে হয় পাগল, তোমা দ্বারাই বৃন্দাবন আজ লীলাক্ষেত্র, তুমি বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস—আবার তুমিই ট্রয় ধ্বংসের কারণ।

নিজের সুখের জন্য মানুষ তুমি মানুষকেই পিষে মারতে কুণ্ঠিত হও না।

তোমার প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সুরভিত নন্দনকানন, তোমার সৃষ্ট কৃত্রিম অলকনন্দা, তোমার বিলাসোপচার—মর্ত্ত্যের মানুষ হয়েও তুমি ইন্দ্রের অমরাবতীতে বাস করো। খুসির জোয়ারে তোমার ঐ হিল্লোলিত দেহবল্লরী ছন্দিত হয়ে ওঠে, তোমার হৃদয়ের আনন্দ সুর হয়ে সুধা বর্ষণ করে—আবার ছোট্ট বদ্ধ দুর্গন্ধযুক্ত কুঁড়েঘরে তুমি মানুষ মর্ত্ত্যে থেকেও নরকে বাস করো—তেমনি অত্যাচারে, অবিচারে, লাঞ্ছনায়, অপমানে, ঘৃণায়, তোমার ঐ শুষ্ক কুঞ্চিত দেহ, কম্পিত হতে হতে রাজব্যাধি হয়ে গরল উদ্গিরণ করে, তোমার যে বিলোল কটাক্ষে অনেকের হৃদয় জয় করো, তারই এতটুকু করুণ সহানুভূতিতে অনেক প্রাণও বাঁচাতে পার—তুমি করো কি ?

জ্ঞানে বুদ্ধিতে তুমি জীবশ্রেষ্ঠ। তাই তুমি মান + হুস্ অর্থাৎ মানুষ। তোমার বুদ্ধির জ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষমতায় সভ্যতার শিখরে তুমি দিন দিন এগিয়ে চলো। আবার তুমিই বনে-জঙ্গলে-গুহায় পশুর শক্তি ও অজ্ঞতা নিয়ে পশুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও পশুরই মত। এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ তুমি নরখাদক !

জীবনকে উপভোগ করবার আয়োজনের শেষ নেই তোমার, নিত্য-নূতন আবিষ্কার করেও তোমার অস্থিরতা ঘোচে না তোমার—উদ্ভাবিত হয় নিত্য-নূতন আনন্দের খোরাক। আবার লোকালয়ের আনন্দ তোমার কাছে বীভৎস হল্লা ছাড়া কিছুই নয়, তাই তুমি এ পঙ্ক ছেড়ে উঠে যাও মানুষের সংসর্গের বহু দূরে, তুষার বিমল শুভ্রতার ভেতর, সেখানে নেই বাহুল্য সেটাই তোমার পরম তৃপ্তি। সেখানে উপসর্গ নেই সেটাই তোমার আনন্দ, সেখানে সাহচর্য্য নেই, সেটাই তোমার পরম নির্ভরতা। সেখানে তুমি বহুর এক হও, সেখানে তুমি ভগ্নাংশ নও, পরমার্থের সন্ধানে পরমপূর্ণ।

তোমার জন্যই নগর-পত্তন, সমাজের সৃষ্টি—আবার এই তুমি মাইলের পর মাইল ধূ ধূ করা জঙ্গলে-পাহাড়ে পাথরের পর পাথর বসিয়ে ছোট কুঁড়ে তৈরী করে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটিয়ে দাও পরম আনন্দে—man is social animal আর এখানেও তুমি মানুষ।

কারো কাছে মৃত্যু আসে বজ্র হয়ে, মৃত্যু কারো কাছে নিতান্ত নিষ্ঠুর নির্দ্দয়তার আগমনে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' কারো কাছে 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান', এখানে মৃত্যু তোমার কাছে নিষ্ঠুর নির্দ্দয় তার অদর্শনে !

তাই বলি মানুষ, তুমি ঈশ্বরের গর্ব্ব না ব্যঙ্গ ?

সুরের কুস্তিতেই কিস্তী মাৎ !

ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে হাত চালিয়ে সুর ভাজতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম ছোট বেলায় বাড়ীর দরওয়ানকে, (বলা বাহুল্য, এক-লোটা দুধ সমেত সিদ্ধি এবং সরিষা-ভোর আফিং পড়বার পর) সন্ধ্যাবেলায় দেউড়ীতে বসে। তারপরও কলকাতার রাস্তায় ঠেলা-গাড়ীর গাড়োয়ান তার কোনও এক বিলাস মুহূর্তে মনে পড়ে যাওয়া দেশে ফেলে-আসা প্রিয়ার প্রতি এক কানে আঙুল প্রবেশ করিয়ে অপর হাত সামনে (মুসার সমুদ্রাভিযান চিত্র মনে পড়ছে, আপনারা অনুগ্রহ করে কেউ দোষ নেবেন না।) চিতিয়ে, 'কাহা গেইল হো উবাতিয়া' (মানে জানি না)। সেই দৃশ্যও দেখেছি। তারপরই তৃতীয় দৃশ্য দেখলাম, কলকাতার সম্মেলনগুলিতে। গত কয়েক বছর ধরেই অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, সুরের ইন্দ্রজাল বোনার পরিবর্তে সুরের বেড়াজাল বোনারই এক ব্যর্থ চেষ্টা অব্যর্থ গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রায় প্রতি গায়কই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্বাভাবিক মধুর বস্তুটুকুকে স্বরের কুস্তি দেখিয়ে বিকৃত করে পরিবেশন করছেন, নিজের ঘরাণার নামে। জনসাধারণের কাছে তার জনপ্রিয়তার হ্রাস ঘটছে ক্রমে ক্রমে। সাধারণের বোধগম্য হচ্ছে না তা। হাত পা নেড়ে নানা মুদ্রা সহযোগে কেরামতি দেখাবার এই মাত্রা সম্মেলন-কর্তৃপক্ষের কমিয়ে দেওয়া উচিত। নচেৎ সবটুকু বাহ্‌বা'ই প্রাপ্য হবে কালে তাদেরই, যারা যতখানি হাত-পা নাড়তে পারবেন। গান গাইতে বসে বা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বসে যাঁরা হাত-পা নেড়ে আর মুখের ভঙ্গিমা দেখিয়ে শেষ পর্য্যন্ত গান বা বাজনার কুস্তিতে নেমে গান বা বাজনা শেষ করেন, তাঁদের জন্য রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কবিগুরু বলেন, "ওস্তাদীর চেয়ে বড়ো একটা জিনিষ আছে, সেটা হচ্ছে দরদ। 'সেটা বাইরের জিনিষ নয়, ভিতরের জিনিষ। বাইরের জিনিষের পরিমাপ আছে, আদর্শে ধ'রে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়ি-পাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে মাপা চলে না, সেটা হ'ল "সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য।" কে সহৃদয় আর কে সহৃদয় নয়, বাইরে থেকে তারও তল পাওয়া যায় না, তার শেষ নিষ্পত্তি করবার ব্যর্থ চেষ্টা মাথা ফাটাফাটিতে গিয়ে পৌঁছয়—অর্থাৎ যাকে বলে হিংস্র দুঃসহযোগ।"

রেডিওতে সঙ্গীত শিক্ষার আসর

রবিবার সকালবেলায় সঙ্গীত শিক্ষার আসর বসে এক নম্বর গার্স্টীন প্লেসে, একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন? কেমন লাগে আপনার সেটা? ভাল নয় মন্দ। কি বলেন? যা হয় কিছু একটা হবে আপনার উত্তর। কিন্তু সঙ্গীত শিক্ষার আসরের আধ ঘণ্টা সময় কি কি হয় দেখা যাক। প্রথমেই পঙ্কজ বাবু আবৃত্তি করে শোনাবেন, এই সুর সেই মহানাদ থেকে আহরিত, যার মানে সেই শ্লোকটি। কেটে গেল দু'মিনিট। এর পর অনুরোধের গান আছে। কমপক্ষে সাত আট মিনিট। তারপর চিঠিপত্রের জবাব। হালিসহরের বীণা সেন, সানী পার্কের বন্যা পালিত, গড়বেতার হিরণ্ময় চন্দ, আপনাদের গান টোকায় কি বাদ গেছে, কি বেশী পড়েছে সেই ফর্দ। তাতেও গেল ছ'মিনিট সাত মিনিট। মেরে-কেটে রইল আর সাত মিনিট। সুর ভাজতে লাগলেন পঙ্কজ বাবু, নিন আপনারাও গলা দিন আমার সঙ্গে। কই সবাই গাইছেন না তো! ব্যস কেটে গেল আধ-ঘণ্টা। পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরিচালনায় শেষ হয়ে গেল সঙ্গীত শিক্ষার আসর। কি শিক্ষা হল তাহলে? আর তা ছাড়া পঙ্কজ বাবু সঙ্গীত শিক্ষার আসরে যে গানগুলি নির্বাচন করে থাকেন, সে বিষয়েও বক্তব্য আছে আমাদের। একেকটি গান শেখানো হয় বহু দিন ধরে। যাকগে এ দফায় এই অবধি। এ সম্পর্কে আরও আলোচনা করা যাবে, যদি না দেখি ইতিমধ্যে উন্নতি ঘটেছে কিঞ্চিৎ এই বিভাগটির। আমরা যে এ সকল কথাগুলি বললাম, তা পঙ্কজ মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধাসহ।

আলি আহমেদ ও মাষ্টার পানু

পণ্ডিত রবীন্দ্রশঙ্কর

বিলায়েৎ হোসেন খাঁ

নর্ত্তকী ইন্দ্রানী রহমন

এই পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিত্রাবলী আলাউদ্দীন সঙ্গীত-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের চিত্র। শান্তাপ্রসাদ, রবিশঙ্কর, আলাউদ্দীন খাঁ ও আলি আকবর খাঁ একত্রে। আলোক-চিত্র—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়।

যদু ভট্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

"বালক কালে যদু ভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে ব'লে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল, তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরৎও ছিল বহু সাধনাসাধ্য, কিন্তু যদু ভট্টর মতো সঙ্গীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কি না সন্দেহ। অবশ্য এ কথাটা অস্বীকার করবার অধিকার সকলেরই আছে: কারণ, কলাবিদ্যায় যথার্থ গুণের প্রমাণ তর্কের দ্বারা স্থির হয় না, রুচির দ্বারাও নয়। যাই হোক, ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরী হ'তে পারে, যদু ভট্ট বিধাতার স্বহস্ত-রচিত। অতএব চলতি কাজে যদু ভট্টদের প্রত্যাশা করা বৃথা। কথাটা হচ্ছে এই যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো একটা স্থাবর পদার্থের আধার যখন খুঁজি তখন ওস্তাদকেই সহজে হাতের কাছে পাই। বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী শুনতে বা শিখতে যখন চাই, তখন ওস্তাদকেই খুঁজি। যেমন যে পূজাবিধি মন্ত্রে ও অনুষ্ঠানে একেবারে অচল ক'রে বাঁধা, তার জন্যে পুরুতের দরকার হয়, তখন এমন লোককে জুটিয়ে আনি, অক্ষরে অক্ষরে যার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অভ্যস্ত। তার মানে বুঝতে পারে এতটুকু সংস্কৃতজ্ঞান এই পুরুতের পক্ষে অনাবশ্যক। * * * * আমাদের বাড়ীতে একদা নানা প্রয়োজন বশত এই রকম ওস্তাদের খোঁজ আমরা প্রায়ই করতুম। শেষ যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল তিনি খ্যাতনামা রাধিকা গোস্বামী। অন্যান্য গায়কদের মধ্যে যদু ভট্টর কাছেও তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। যাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁরা সকলেই জানেন, রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগ-রাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশী। সেটা যদি নাও থাকত তবু তাঁকে আমরা ওস্তাদ ব'লেই গণ্য করতুম, এবং ওস্তাদের কাছ থেকে যেটা আদায় করবার তা আমরা আদায় করতুম, আমরা আদায় করেও ছিলুম। সে-সব কথা সকলের জানা নেই।"

মাইক ৯০%, কণ্ঠস্বর ১০%

শুধু মাত্র চুনোপুঁটিদের জন্যই নয়, আমাদের এই বক্তব্য অনেক রথী-মহারথিগণও এই হিসেবের আওতায় আসবেন। তাঁদেরও মাইক ৯০%, আর কণ্ঠস্বর ১০%। আপনি কোনও সভা-সমিতিতে, গানের সম্মেলনে, পাড়ার জলসায়, বে-পাড়ার বিচিত্রানুষ্ঠানে এক শ্রেণীর গায়ক-গায়িকাদের দেখবেন (এক শ্রেণীর বটে এবং শতকরা নব্বই জনই সেই শ্রেণীভুক্ত)। ফিনফিনে চেহারা, তোবড়ানো গাল, মিহি সুর, ব্যাকব্রাস করা চুল, পরিষ্কার সাদা করে কামানো ঘাড়, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী কি সস্তা দামের রঙচঙে জর্জেট বা শিফন, বিদ্যাসাগরী কিংবা জরির কাজ-করা চটি (বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা কোনটি গায়ক ও কোনটি গায়িকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বিচার করে নেবেন।) বা জয়পুরী নাগরা, সোনার ফ্রেমে (অবশ্যই গিল্টি করা) বাঁধানো চশমা বিমলেস, মুখে কথা, শ্যামলদার (হয়ত বিখ্যাত কোনও আধুনিক গাইয়ের নাম) গানখানা গাইব? আমাকে আবার কেন ডাকলেন আপনারা? এই ও-পাড়ার জলসা থেকে··· গলাটা আজ বড্ড···। ফেরিনজাইটিস হয়েছে তাই···। কাল রাত্রে বেহালার সেই জলসা থেকে ফেরার সময় গলাটায় ঠাণ্ডা লেগে···। অর্থাৎ মাইক এগিয়ে দিন। তবলচি আর হারমোনিয়াম এবং মাইকের মিলিত শক্তির মাঝে নিজের ক্ষীণতম কণ্ঠস্বর দান করে, আপনাদের কিঞ্চিৎ আনন্দ প্রদান করে, তিনি গা তুললেন। জলসা, সম্মেলন, বিচিত্রানুষ্ঠানের শ্রোতারা অনুগ্রহ করে মাইক তুলে দিয়ে এই সব মাকাল ফলদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন? নতুবা এঁদের গায়ক-গায়িকা নামে আখ্যা দিতে আমরা লজ্জা পাচ্ছি!

সামবেদের সঙ্গীতের রূপ

সামবেদেই বিশ্বসঙ্গীতের বীজ নিহিত রয়েছে। সামবেদ-ভাষ্য ভূমিকায় আচার্য সায়ন ঋককে সামগানের কারণ ও আশ্রয় বলছেন—"তথা গীয়মানস্য সাম্নঃ আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে।··· গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি।" অর্থাৎ ঋকমন্ত্রের ওপর প্রথমাদি বৈদিক সাত স্বরকে লীলায়িত করে বিভিন্ন ছন্দে বাক্যের সঙ্গে সামগান করা হোত।

'সাম' শব্দে সর্বদাই গান বোঝায়। 'সামশব্দবাচ্যস্য গানস্য স্বরূপমৃগক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরবিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে। ক্রুষ্টঃ প্রথমো দ্বিতীয়স্তৃতীয়শ্চ চতুর্থঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠশ্চেত্যেতে সপ্তস্বরাঃ। তে চাবান্তরভেদৈর্বহুধা ভিন্নাঃ।' ঋকমন্ত্র প্রথমাদি সাতটি স্বর সংযুক্ত হয়ে সামগান হোত। প্রথমাদি স্বর আবার অবান্তরভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন স্বরের প্রয়োগে সামগান বিভিন্ন প্রকারের হোত। গানের রীতিও বিভিন্ন ছিল। সামবেদে 'সংস্রং গীত্যুপায়াঃ।' এই কথাটির মধ্যে বৈদিক সঙ্গীতশাস্ত্রীদের উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

যজ্ঞকালে বেদগান বা সামগানের রীতি ছিল। দেবতাদের স্তুতিবাচক সামের নাম ছিল স্তোত্রিয়। সামগানের মাধ্যমে ঋক পাঠ করার দুটি গ্রন্থ আছে—ছন্দ ও উত্তরা। সেই গানের সুরু।

মুদ্রার পরিচয় কি? আবিষ্কর্তা কে?

মুদম্ আনন্দং রাতি দদাতি। অর্থাৎ যা আনন্দ দান করে, তাই মুদ্রা। এই মুদ্রার অর্থ প্রকাশ। মুখের দ্বারা গান, হাতের দ্বারা গানের অর্থ, চক্ষুর দ্বারা ভাব, পদদ্বয় দ্বারা তাল প্রকাশ করা উচিত। এবং সেই প্রকাশ যে প্রতীকের সাহায্যে বাইরে প্রতিভাত হয় তাই মুদ্রা। মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল বৈদিক যুগে। মুদ্রার আবিষ্কার-কর্তা হিসেবে প্রায়ই নন্দিকেশ্বর, কোহল, যাষ্টিক বা ভরতের কথা শোনা যায়। কত প্রকারের মুদ্রা এবং তার অসংখ্য শাখা-মুদ্রা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার আশা রাখছি ভবিষ্যতে।

কনফারেন্স (!) আর জলসার পালা শেষ হ'তে না হ'তে স্বাধীনতা (!) উৎসব শেষ ক'রেই কলকাতা তথা সমগ্র বাঙলায় বীণাবাদিনী সরস্বতীর অর্চ্চনার দিনটি ঘনিয়ে আসে। কেন কে জানে, ইদানীং পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহের সঙ্গে অপড়ুয়ার দলই মেতে ওঠে এই বাণী-বন্দনার মহৎ কাজে। আপনারা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, পূজামণ্ডপে পুরোহিতের মন্ত্র চাপা পড়ে যায় মাইক্রোফোনে হিন্দী-উর্দ্দু গান পরিবেশনের ঠেলায়। বাণী দেবীর পূজার উদ্যোক্তাদের কাছে পূজা যেন নগণ্য হয়ে ওঠে। পূজা, আরাধনা, মন্ত্রপাঠ অপেক্ষা পূজামণ্ডপে বহুক্ষণব্যাপী একটি ভ্যারাইটী এনটারটাইনমেণ্টের বা জলসার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যত অপড়ুয়া উদ্যোগীরা। আর এই সব জলসায় পরিবেশিত হয় বাণী-বন্দনা নয়, হিন্দী আর উর্দ্দু ছায়াছবির গান—যার সঙ্গে বঙ্গ-সংস্কৃতির কোন রকম যোগসূত্রই নেই। এ বছরেও এই ধরণের জলসা প্রায় অধিকাংশ বারোইয়ারী পূজা-মণ্ডপেই হয়েছে। সুখের কথা না দুঃখের কথা তা আর প্রকাশ করে লাভ নেই, তবে এই ধরণের জলসা প্রায় অধিকাংশ বারোইয়ারী পূজামণ্ডপেই হয়েছে। এই বাবদে বহু বিখ্যাত, অল্পখ্যাত ও অখ্যাত গায়ক ও বাদ্যকরের ডাক পড়ায় তাঁরাও বেশ কিছু উপার্জ্জন ক'রেছেন। চাহিদা সুপ্রচুর, তাই শিল্পীরাও নিজেদের দর বা কদর বাড়িয়েছেন এ বছরে। আগের দিনে গায়ক বাদ্যকরদের ডাক পড়তো না সমাদরের সঙ্গে। অধুনা সঙ্গীতশিল্পীদের প্রায় সকলেই অর্থ এবং সম্মান দুই-ই লাভ করছেন। সরস্বতী পূজার সময় এটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গেছে। সম্প্রতি মাদ্রাজে মিউজিক একাডেমির অষ্টাবিংশতিতম কনফারেন্সে কয়েক জন কৃতী সঙ্গীতজ্ঞকে সম্মানিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক শাম্বমূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ আয়ার, শ্রীশেষ আয়েঙ্গার ও শ্রীআন্নাস্বামী ভগবতার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ বর্ত্তমানে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সঙ্গীতেই শুধু নয়, সঙ্গীতের শাস্ত্রচর্চ্চায় এবং সঙ্গীত-সাহিত্যেও রীতিমত এগিয়ে চলেছে। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সম্প্রতি কয়েকটি সঙ্গীতগ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ায় সঙ্গীত-জগতে আলোড়ন তুলেছে যথেষ্ট। কটক রেডিও ষ্টেশনের ১ কিলোওয়াট থেকে ২০ কিলোওয়াটে আগামী ১৯৫৬ সালে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রসঙ্গে ডক্টর কেশকর এক সাংবাদিককে কথায় কথায় জানান, বেতার কেন্দ্রে বাঙালী, পাঞ্জাবী আর তামিলনাদেরা এক রকম সর্ব্ববিভাগে জুড়ে বসে আছে। অতঃপর সকল কেন্দ্রেই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ চাকরী দেওয়া হবে। সংবাদটি বাঙালীর পক্ষে খুব সুখকর নয়। তবে কেশকর যদি শুধু জাতির প্রতি তাকিয়ে সকল জাতিকেই গ্রহণ করেন, তাতে বেতার-কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ, সকল জাতেই এমন কিছু সুযোগ্য ব্যক্তি নেই। প্রয়োজন জাত-ধর্ম্মের নয়, প্রয়োজন যোগ্যতম টেকনিশিয়ানের।

গত ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী, হাওড়ার সাঁত্রাগাছী নিবাসী প্রবীণ মৃদঙ্গাচার্য শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সান্যালের জন্মতিথি উপলক্ষে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। ১৫ই শ্রীবাসুদেব চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ধ্রুপদ গান করেন ও সঙ্গত করেন শ্রীঅবিনাশ সান্যাল, কার্ত্তিক সান্যাল ও শৈলেন দত্ত প্রভৃতি। ১৬ই খেয়াল সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শ্রীবটকৃষ্ণ মল্লিক, সুধাংশু চক্রবর্ত্তী, অধীর লাহা, ননীগোপাল ভট্টাচার্য, অমিয় চৌধুরী, বিভারাণী ভট্টাচার্য প্রভৃতি এবং সঙ্গত করেন শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্য ঘোষাল। ২৬শে জানুয়ারী নিউ এম্পায়ার 'দক্ষিণী'র বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠানে মণিপুরী, কথাকলি, কথক ও ভরতনাট্যম্ এই চার রকমের নৃত্য দক্ষিণীর ছাত্রীরা পরিবেশন করেন। সমবেত কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবভিত্তির উপরই সব কয়টি নৃত্যের রূপ পরিকল্পনা করা হয়। দক্ষিণীর নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মাধবী চ্যাটার্জি এবং শ্রীস্মৃতি চক্রবর্ত্তী কয়েকটি নাচে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শিশু-শিল্পী রিতু গুহ-ঠাকুরতার গাওয়া 'তোমার কাছে এবার মাগি'—গানখানি বিশেষ উপভোগ্য হয়। গত পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত-শাস্ত্র-পীঠের অধ্যক্ষ ডাঃ যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বাদশ বর্ষ

বয়স্কা কন্যা কুমারী ঝর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন এবং রাগপ্রধান বাঙলা গানের প্রতি বিভাগেই প্রথম স্থান অধিকার করে। আমরা কুমারী ঝর্ণার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। পাথুরিয়াঘাটার মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি-মন্দিরে বিখ্যাত ধ্রুপদী ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়, মইনুদ্দীন ও আমিনুদ্দীনকে এক সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। এই সভায় বক্তৃতা দেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও হীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীতবন্ধু শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এবং আরও কয়েক জন সঙ্গীতপিপাসু একত্রে ডাগর ভাতৃদ্বয়কে এক হাজার টাকার তোড়া উপহার দেন।

আমার কথা (২)

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

ইংরাজী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর মাদ্রাজ সহরে আমার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালীন সঙ্গীতের সুর উঁকি-ঝুঁকি মারত। আমার বেশ মনে আছে, সন্ধ্যার সময় আমি যখন গৃহ-শিক্ষকের নিকট লেখা-পড়া করতাম, ঠিক পাশের ঘরে আমার দুই দাদা ভারত-বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতেন, বিখ্যাত ওস্তাদের সুরের বেশ মাঝে-মাঝে আমাকে আনমনা করে দিত। লেখা-পড়ায় ঐ সময়ে মনোযোগ দিতে পারতাম না। ঐ গানের সুর আমি মনে মনে গাইতাম এবং এক রকম নকল করে ফেলতাম। সময় পেলেই হারমোনিয়ম নিয়ে গলা সাধতে বসতুম। শুনে শুনে চার-পাঁচ খানি উচ্চাঙ্গের গান তাল সহকারে গাইতেও পারতাম। এখানে আর একটু বলা দরকার, উত্তর-কলিকাতায় আমাদের বাটী এক রকম গানের বাড়ী বললেও চলে। কেন না, আমার পিতৃদেব শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল সঙ্গীতের এক জন পৃষ্ঠপোষক সঙ্গীতানুরাগী ও নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ। এজন্য প্রায়ই সন্ধ্যাতেই আমাদের বৈঠকখানায় সঙ্গীতের আসর বসত। ৺রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী, ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ৺জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি বহু গুণী শিল্পীদের আগমনে সন্ধ্যার আসর সরগরম হয়ে থাকত, সেই জন্যে দিনের পর দিন আমিও তাঁদের সঙ্গীত শুনতাম, আর খুব ভাল লাগত। ম্যাট্রিক পাশ করবার পরই আমার সঙ্গীতে বেশ অনুরাগ এল। তখন আমি আশ-পাশের সঙ্গীতাসরে গান গাইতাম। আমার সঙ্গীতানুরক্তি দেখে পিতৃদেব সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথমেই আমি ৺গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট খেয়াল-গান শিখতে আরম্ভ করি। খুব কম সময়ের মধ্যে গান আয়ত্ত হওয়ার ফলে আমার সঙ্গীতে অধিকতর অনুরাগ বেড়ে গেল। প্রায় ৪৫ বৎসর খেয়াল শেখবার পর ধ্রুপদ গানে আমার মন আকৃষ্ট হল, আমি তাঁহার নিকট যুগপৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখতে লাগলাম এবং বাটীতে বহুক্ষণ ধরে গান সাধতাম। ফলে আমার লেখা-পড়া কমে গেল, তখন আমি কলেজে পড়ি। কলেজেও টিফিনের সময় শুধু গলায় বয়স্কদের নিকট গান গাইতাম। গোপাল বাবুর দেহান্তরে আমি সঙ্গীত-বিশারদ ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নিকট খেয়াল ও ঠুংরী শিক্ষা আরম্ভ করি। তিনি সঙ্গীতে আমার তীক্ষ্ণ মেধা দেখে খুব যত্ন সহকারে শেখাতে লাগলেন। কিন্তু ৩।৪ বৎসরের বেশী আর আমার শেখা হল না, তিনিও স্বর্গারোহণ করলেন। ইহার কিছু দিন পরে আমি রামপুরের বিখ্যাত খেয়াল ও ঠুমরী গায়ক ওস্তাদ মেহেদী হোসেনের নিকট খেয়াল ও ঠুমরী গান শিখতে আরম্ভ করি। প্রায় নয়-দশ বৎসর শিক্ষালাভ করার পর বিখ্যাত ধামারিয়া ৺সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) মহাশয়ের নিকট আমি শুধু ধামার গান অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখে ফেললাম। তিনিও সম্প্রতি গত হয়েছেন, এখনও আমি শিক্ষার্থী হয়ে ওস্তাদ মেহেদী হোসেনের নিকট সঙ্গীত সংগ্রহ করছি।

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

গত ১৩৪১ সনে প্রবীণ সাহিত্যিক ৺জলধর সেনের দেশব্যাপী সম্বর্দ্ধনায় আমাকে সঙ্গীতানুষ্ঠান বিভাগের সম্পাদক করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি, সেই সময় জলধর সম্বর্দ্ধনা-সমিতির সভাপতি সাহিত্য-সম্রাট শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সভায় আধুনিক সঙ্গীতের আয়োজন করবার কথা বলেন। কারণ, তাঁহার মতে উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীত সর্বসাধারণের বোধগম্য ও তৃপ্তিপ্রদ হবে না।

তার উত্তরে আমি বলেছিলুম—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না বুঝলেও সকলের কাছে নিশ্চয় ভাল লাগবে। খাঁটি সুরই মানুষের তৃপ্তি সাধন করে। পরে আমার আয়োজিত সঙ্গীত-আসরে তিনি (শরৎচন্দ্র) শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থেকে সমস্ত গান শুনে মন্তব্য করেছিলেন, জয়কৃষ্ণের কথা সত্য। ভাল জিনিষ সকলেরই ভাল লাগে।

তার পর থেকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিই। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনী প্রভৃতি বহু সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেছি। এ ছাড়া সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য সহরে ও সহরের বাহিরে বহু সঙ্গীতানুষ্ঠানে আমাকে যোগদান করতে হয়েছে এবং এখনও করতে হচ্ছে। সঙ্গীত আমার জীবনের মূলমন্ত্র—সঙ্গীতের প্রসার আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত।
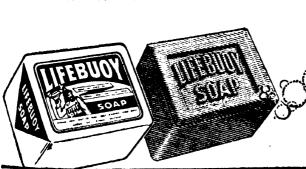
লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে
আপনাকে রক্ষা করে

কি উপহার দেবেন—কুটির-শিল্প ?

আইডিয়া মন্দ নয়। বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি থেকে শুরু করে স্পোর্টস, কমপিটিসন, নানা রকমের সঙ্গীত, আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা (বাংলা দেশে আজ-কাল যা আখছার ঘটছে।) ইত্যাদিতে পুরস্কার-প্রাপ্তদেরও কুটির-শিল্প-জাত দ্রব্যাদি অনায়াসে উপহার দেওয়া চলতে পারে। পরীক্ষামূলক ভাবে এই প্রথাটি ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। আমাদের মনে হয় যে, তাঁদের সুনামই বর্দ্ধিত হবে এবং অনেকখানি উচ্চাঙ্গের রুচিরও তাঁরা পরিচয় দিতে পারবেন। দেশের কুটির-শিল্প নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, গোল্লায় যেতে বসেছে, যন্ত্রজাত শিল্প কুটির-শিল্পকে ধ্বংস করছে, এর আশু প্রতিকার দরকার। পাঁচশালা পরিকল্পনায় এর জন্ত প্রভিসন্ রাখা হোক, ইত্যাদি বড় বড় কথা না বলে নিজেরাই যত দূর সম্ভব নিজেদের চেষ্টায়, অর্থে এবং সাধ্যানুযায়ী কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনে যদি ব্যবহার করি, তবেই তো সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করি যে, এর আগে আমাদের হাতে আঁকা ছবি, বই ইত্যাদি উপহার দেওয়া সম্পর্কেও নানা আলোচনা করেছি। অন্যান্য আরও দশ জনের মত আপনিও যদি উপহার দেওয়ার পর দেখেন যে, ঠিক আপনার দেওয়া ক্যাসকেটটি আরও দশ জনেই দিয়েছেন, তখন আপনার কি মনে হবে ? কুটির-শিল্পের দ্রব্যাদির মধ্যে ভ্যারাইটিও পাবেন

কলকাতায় নতুন দোকান প্রচুর

রোড, ষ্ট্রীটের তো কথাই নেই, লেন, বাই-লেন এমন কি ব্লাইণ্ড লেনগুলির মধ্যেও কলকাতায় আজ-কাল ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা প্রচুর দোকান দেখা যাচ্ছে। বাঙালী ব্যবসা করুক এই আমরা চাই। এর আগেও অনেকগুলি সংখ্যায় আমরা বাঙালীর অধুনা ব্যবসাপ্রীতি ঘটছে এ কথা বলেছি। সে সম্পর্কে প্রশংসাও করেছি। এই সব নতুন দোকানগুলি স্থাপনার পেছনে যে মহতী প্রচেষ্টা আছে, তার জন্য অবশ্যই আমরা প্রশংসা করব। আজকের এই বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার দিনে শুধু চাকরী চাকরী না করে নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াবার এই চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং সে সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিও আমাদের রয়েছে এবং সেই জন্তই আমরা ভাবছি এই সব দোকানগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে। এই দোকানগুলির শতকরা পঁচাত্তরটিই হয় পান-বিড়ি (বাড়ীর রকে) নয় চা ষ্টেশনারী, ড্রাই ক্লিনিং ইত্যাদি। মুদীখানা, মুড়ি-মুড়কী, কাঁসা-পিতলের, মাংসের, পাথরের, পুতুলের ইত্যাদি দোকানগুলির চাহিদা কি আরও বেশী নয় ?

এ বছরে স্কুল বইয়ের অতিরিক্ত চাহিদার জন্ত লক্ষ্য করলাম, কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে ছাত্র-পাঠ্য বই বিক্রী হচ্ছে। তা দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে, কলকাতায় আরও বইয়ের দোকানের প্রয়োজন ! শুধু কলেজ ষ্ট্রীটে কুলাবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বাংলা বই চাই

কেনাকাটা বিভাগ চালু করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বাঙলা দেশে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বইয়ের কত দরকার ! অধিকাংশ লোকেরই ব্যবসা সম্বন্ধে কোনও সঠিক ধারণা নেই। কত মূলধনে কোন পথে কি ভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবসা চালান উচিত, ব্যবসায়ের আইন-কানুন, কোন দেশের কি চাহিদা, কোথাকার কি উৎপন্ন দ্রব্য, যান-বাহন কেমন ইত্যাদি নিয়ে বই লেখার অতীব প্রয়োজন। সরকার থেকেও এ বিষয়ে চেষ্টা থাকা উচিত ছিল। এবার দেখা যাক, কোনও লেখক এব প্রকাশক এ বিষয়ে অগ্রণী হন কি না ! ব্যবসা সম্বন্ধে প্রাথমিক কোন বই যদি কোন দিন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা অনুরোধ জানাবো, কারিগরী-শিক্ষা সম্বন্ধেও সচিত্র বই ছাপুন প্রকাশকরা. ব্যবসা সংক্রান্ত বই অর্থে আমরা সেই যাদুবিদ্যার বই (যাতে থাকে বাজী তৈরীর ভাগ, সাবান আর স্নো তৈরীর ফর্মুলা, সাদা আর লাল মিশলেই গোলাপী রঙ্) বলছি না। সেগুলি আজ-কাল অকেজো হয়ে গেছে। যোগ্য বই চাই।

পেইণ্ট নিজেই করবেন ?

জানলা-দরজায় ? আলমারীতে ? ষ্টীল ক্যাবিনেটে ? ঘরের দেওয়ালে ? পারবেন না ভাবছেন ? কেন পারবেন না ? এক বার
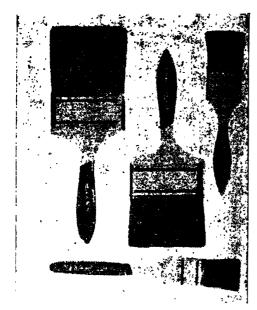
পেইণ্ট করার ব্রাস

চেষ্টাই করে দেখুন না ছুটিছাটার দিন দেখে। বিদেশে বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র জন (মাথার ওপরে বাড়ী একেবারে পড়ো-পড়ো না হ'লে) মিস্ত্রীদের ডাকেন না। কত খরচা যে বেঁচে যায়! ভাল পেইণ্ট করবার সমস্যা হল, ঠিকমত আপনাকে বেছে নিতে হবে ব্রাস আর রঙ। দেওয়ালের কাজে ৪ ইঞ্চি নিন। ছাদ কি মেঝের কাজও চলে যাবে এতে। তিন ইঞ্চিতে যদি কাজ ভাল হয় বোঝেন, তাও নিতে পারেন। ২½ ইঞ্চি কিনুন ফার্ণিচার পালিশ করার কাজে। খুব সূক্ষ্ম কাজের জন্য রয়েছে, দেড় ইঞ্চির সাইজ। ব্রাস ধরা শিখুন। তিনটি পাশাপাশি ছবিতে নানা রকমের ব্রাস ধরা রয়েছে। একটায় খুব বেশী জোর দিয়ে, একটায় মাঝামাঝি, শেষেরটা খুব আস্তে। শেষের পদ্ধতিটিই ঠিক। এতে কাজ পাওয়া যাবে ভাল আর বেশী। রঙও খরচা হবে কম।

ব্রাস ধরার কায়দা
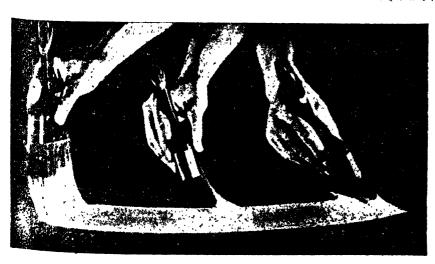
ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

স্বীকার করছি, ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। শতকরা দশ থেকে বারো জন লোক এখানে শিক্ষিত এবং সে শিক্ষিত অর্থে কেবলমাত্র নাম-সহি করা সম্ভব এই মাত্র। সেখানকার স্কুলগুলির সংখ্যা নগণ্য। জনসাধারণের অধিকাংশই স্কুলে নিজের ছেলে-মেয়েকে পাঠাতে' সমর্থ নয়। বেতন-ই ঠিক মত দিতে পারে না। বইপত্তর কিনে দেওয়া সম্ভব হয় না অনেক অভিভাবকের। সবই স্বীকার করছি এবং স্বীকার করে নিয়েই বলছি যে, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশেও ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাকের একতা থাকা উচিত। নানা কারণেই যে তা থাকা উচিত তা-ও বলব। ধনীর দুলাল স্কুলে পরে আসবেন মূল্যবান পোষাক, আর দরিদ্র অভিভাবকের পুত্র-কন্যার জুটবে না সামান্য প্যাণ্ট-সার্টও, এ রকম কেন হবে? তার চেয়ে সেণ্ট মেরী, লা মার্টিনিয়র, ডায়সোসেন, লরেটোর (জানি এখানে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান খুব কমই হয়) মত আমাদের স্কুলেও একটা কম দামী জাতীয় পোষাক হোক না। সাদা জীনের হাফ প্যাণ্টের সঙ্গে হাফ-সার্ট লংক্লথের কি টুইলের। সকলে এ পোষাক কিনলে দোকানদাররাও কম দামে সরবরাহ করতে পারবেন এবং বিশেষ করে ছেলেদের পোষাকে একটা একতা থাকবে। প্রতিদিন ছেলেদের পোষাক ঠিক মত পরিষ্কার আছে কি না, জুতোয় পালিশ আছে কি না এসবও দেখা সবিশেষ দরকার। নির্দ্দিষ্ট একেক ধরণের পোষাক ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারেন কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ। মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়রা কিঞ্চিৎ ভেবে দেখবেন এই বিষয়ে? বাংলা তথা ভারতবর্ষ দরিদ্র হ'লেও, সে-দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পরনে পোষাক থাকেই। আর অভিভাবকরা যখন পোষাক দিতে পারেন, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট পোষাকও দিতে পারবেন।

ছাপা-শাড়ীর ডিজাইন ও শিল্পকলা

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেশ ফলাও করেই ছবি-টবি সহ নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন, রাজ্যপালের (ছাপা-শাড়ীর বিভিন্ন ডিজাইনসহ) এক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করা। ছাপা-শাড়ী পরার ফ্যাসান আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এসেছে। হয়তো বৃন্দাবন থেকে ছাপা পরলে বাঙালী-মেয়েকে দেখায়ও ভাল। কালো-সাদা, দুধে-আলতা, ঘনশ্যাম, একটু চাপা, যাই কেন হোক না মেয়ের গায়ের রঙ—ঠিকমত ছাপা-শাড়ীটি বেছে নিয়ে পরতে পারলে তাকে মানায় চমৎকার! ছাপা-শাড়ীর বিরুদ্ধে তো আমাদের কিছু বলবার নেই-ই বরং আমরা স্বপক্ষেই। আমাদের কথা হল, ছাপা-শাড়ীর ডিজাইনগুলি নিয়ে। বোম্বাই, জয়পুরী, বেনারসী কি মহীশূরের প্যাটার্ণ কেন থাকবে

মেয়ের অঙ্গে। বাঙলার নিজস্ব শিল্পকলা জগৎবিখ্যাত। এখানকারই ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, বিষ্ণুপুরী শিল্পীর আঁকা যে সব পুরানো আমলের সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেখেছি—যেগুলি শালের কাজে, সিল্কের ওপর চলতে পারে। ছাপা-শাড়ীর জন্য ভাল শিল্পীকে দিয়ে বাঙলার নিজস্ব রঙে প্যাটার্ণ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে অতি সহজে। আমাদের পাঠিকাকুলের অবগতির জন্য জানাই, পিকাশো, মাতিস্ প্রভৃতির মত পৃথিবীখ্যাত শিল্পীরাও টেক্সটাইল ডিজাইন এঁকেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রেশম-শিল্পেও দেখা গেছে ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীর ডিজাইন। খুবই আশার কথা! সরকার যদি এই প্রচেষ্টাটি ব্যাপকতর করেন, আরও ভাল হয়। সত্যিকার শিল্পীরাও কাজে লাগতে পারেন। সদ্য-প্রচলিত অর্থহীন শিল্পধারার চোখ-ধাঁধানো ছাপানো শাড়ী বাতিল করাতে পারেন একমাত্র পাঠিকার দলই। যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরাই যদি বেঁকে বসেন—তখন ব্যবসায়ীরাও শিল্পমনের পরিচয় দিতে বাধ্য হবেন।

বাজার দর ওঠে-নামে কেন?

বাজার দরের ওঠা-নামা চিরকালই ছিল। আগেও শুভ-বিবাহ, ভাই-ফোঁটা, জামাই-ষষ্ঠী, বিজয়া কি শ্রীপঞ্চমীর দিন ছানার দাম বাড়ত। সন্দেশের সের বাড়তো সের-প্রতি আট আনা এক টাকা। পুজোর মরশুমের জন্য আশ্বিনের গোড়া থেকে বাড়তো কাপড়-চোপড়ের দাম। আমদানী-রপ্তানীর কম-বেশীতে, যানবাহনের গোলমালে মালপত্র ঠিক মত না আসায় জিনিষপত্র একটু আক্রা হত বৈ কি! কিন্তু তার পিছনে ছিল না কোনও অসাধু উদ্দেশ্য। গুদাম ভর্ত্তি ক'রে চাল আটকে রেখে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বঞ্চিত করবার মত প্রবৃত্তি তখন ছিল না ব্যবসায়িগণের। যেন তেন প্রকারেণ ছলে-বলে কৌশলে, অর্থ উপার্জ্জন করাই ছিল না তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু আজ হঠাৎ বাজার দরেই ওঠা-নামার এত প্রাবল্য কেন? শেয়ার-মার্কেটের ফাটকা? ধর্ম্মঘট? মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফা পাবার ইচ্ছা? দোকানদারদের কারসাজী? সরকারী ইনকাম ও সেল্-ট্যাক্স? যান-বাহনের অসুবিধা? কি কারণ? সত্যিই এর কারণ আমরাও সঠিক জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, উপরোক্ত কারণগুলি অল্প-বিস্তর হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে কাজ ক'রে চলেছে। মূল্যমান নির্দ্ধারণের দিকে সরকারের সুদৃষ্টি না থাকায় মুড়ী আর মিছরীর এক দর হয়ে চলেছে। কিছু কাল যুদ্ধের দোহাই দিয়ে চলেছিল অগ্নিমূল্যের বাজার। এখন ভারতবর্ষের কোথাও যুদ্ধের ছায়া নেই যখন, তখনও কেন চলবে এই মূল্যবৃদ্ধির একচেটে ব্যবসা? সরকার মশাই বাজার দর আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট হবেন? Buying Capacity-রও একটা সীমা আছে জনসাধারণের।

অল্প খরচায় ব্যবসা

করা যায় বৈ কি! আর সেই সম্পর্কে আলোচনা করতেই আমাদের দপ্তরে এসেছিলেন কয়েক জন ব্যক্তি, চিঠিপত্র সহযোগে খবরাখবর তো আছেই, টেলিফোন ইত্যাদিও এসেছে এ সম্পর্কে। আর তাই থেকেই আমরা বুঝছি যে, আমাদের কথা ঠিক জায়গায় গিয়ে ঠিক মত ঘা দিয়েছে। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ এ সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন দেখে আমরা সবিশেষ সুখী হয়েছিও। যাই হোক, এ দফাতেও আমরা আরও কয়েকটি অল্প খরচের ব্যবসার সম্বন্ধে আলোচনা করি। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা করতে হবে, অবাঙ্গালীদের কাছ থেকে। কাটা-কাপড়ের দোকান, খাবারের দোকান, ফলের বা ফুলের দোকান, মাংসের দোকান ইত্যাদি সামান্য মূলধনেই আপনি সুরু করতে পারেন। হাজার টাকার মধ্যেই এ ব্যবসার উন্নতি করা যাবে বলেই তো আমাদের বিশ্বাস। এ ছাড়াও একসাইজ বই তৈরী, জুতোর বা চটির কারখানা (হাণ্ডমেড), কাচের বাসন-পত্র, খেলনা—কাঠের, কাঁচা লোহার, প্লাষ্টিকের, মোমের, আলুর, পল্লীগ্রাম থেকে সহরে তরকারী, মাছ, ছানা, ইত্যাদি আনা এবং সখের জিনিষপত্র, সিঁদুর, লোহার সরঞ্জাম, কাপড় ইত্যাদি সহর থেকে গ্রামে পাঠান, এ সবই কম মূলধনে শুরু করে দেওয়া চলতে পারে। পাঠক-পাঠিকাগণের অপরিসীম আগ্রহেই এ সম্পর্কে আগামী দু'-এক দফায় আরও নানা কথা জানাবার ইচ্ছা রইল। একেকটি ব্যবসার জন্য সামান্যতম মূলধনের বিস্তারিত তথ্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বাঙলা দেশে অন্য প্রদেশবাসীর ব্যবসা

কত রকমের আছে জানতে চান? এক এক করে নাম করি শুনুন। সব হয়ত বলতে পারব না এবং সেই সব ব্যবসারই নাম করব যাতে অন্য প্রদেশবাসীরই একচেটে। পাটের বাজার (আগে ইংরেজদের হাতে কতকটা ছিল), কাপড়, চা (এখনও কিছু ইংরেজ আছে), লাক্ষা, অভ্র, মসলা, তৈজসপত্র, হীরে, মুক্তা প্রভৃতি রত্ন, কোম্পানীর এজেন্সী, আমদানী-রপ্তানী, সুপারী, দারুচিনি-এলাচ-লবঙ্গ প্রভৃতি, কাগজ, গ্লাস, কাঠ-কয়লা, ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে পান-বিড়ির দোকান, চায়ের ভেণ্ডার, সিগারেটের ষ্টল, কাগজ কি বইয়ের হকার্স কর্ণার, খাবারের দোকান, মাংসের দোকান, ফুলের ফলের দোকান, গাঁজা-আফিং-সিদ্ধির দোকান সবই তো তাদের। আর আমরা? কোথাও একটা চাকরী বাগাবার জন্য সুপারিশ-পত্র জোগাড়ের তাল করছি। কোন মাদ্রাজী কিংবা পাঞ্জাবী অফিসারের অধীনে যদি একটা কপাল গুণে জুটে যায়! তার পর কিছু না হোক চটপট সর্ব্বাগ্রে একটা বিয়ে তো করতে পারা যায়।

হৃদয় অবাক

অন্নপূর্ণা বাগচী

এ রাত্রির অবসাদ মুছে দাও তোমার দু'হাতে
কান্নাক্লান্ত ভেজা-চোখ চেয়ে থাক মনের মায়াতে।

বোবা মন কথা খোঁজে, কৃতজ্ঞতা জানাতে বুঝি বা
মেঘেরা চলেছে ব'য়ে দয়িতের বিরহ-বারতা।
স্বপ্ন-গন্ধা জুঁই বুঝি আলগোছে কপোল রাঙায়
তোমার গানের মাঝে খুঁজে পাই আবার তোমায়।

রাত্রির শিয়রে চাঁদ চুপি চুপি উঁকি দিয়ে যায়;
পৃথিবী পাগল হোল সুন্দরের অপূর্ব পুলকে।
এ-বসন্তে আমি শুধু একা জাগি তোমার ধেয়ানে
হৃদয় অবাক হোল ধূপছায়া মনের বিকালে।

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

৪

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল মেরী। সান্ধ্য-ভজনের মন্দ্রিত ঘণ্টাধ্বনিতেও ঘুম ভাঙল না নিদ্রামগ্নার। মাদাম আগাথা যখন নিঃসাড়ে ঘরে এল তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে মেরী। মাদামের হাতের ট্রেতে দু'টি ভাজা চিংড়ি মাছ পরিপাটি করে সাজানো। তার সঙ্গে ক'খানি বিস্কুট, এক মুঠো শুকনো পীচ ফল আর একখানা কেক, এমন ফোঁপরা যেন ইঁদুরে কুরে কুরে খেয়েছে।

বিছানার উপর এলায়িত ঐ নবীন নগ্ন তনুর ভঙ্গীটি কি বিষণ্ণ করুণ দেখাচ্ছে, ভাবলে আগাথা। কান্নার সঙ্গে লড়াই করে শেষে ঘুম জিতে নিয়েছে নব-কিশোরীকে। তার কোলেই শান্তিতে ঘুমুচ্ছে মেয়ে। সন্নদ্ধ সুডৌল বাহুতে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে মেরী। একটি নিরাবরণ পা ঈষৎ বঙ্কিম হয়ে এলিয়ে আছে বিছানায়। নগ্ন জানুটি দেখা যাচ্ছে মসৃণ উজ্জ্বল। যেন কল কল কাক-চক্ষু জলের নীচে একটি নিটোল উপল। পৃথিবীর কোন মানুষ যাকে স্পর্শ করেনি আজো। ঘুমন্ত মেয়ের আর একটি পা শয্যাপ্রান্ত থেকে ঝুলে আছে নিরালম্ব হয়ে। সেই নগ্নতায় বিকেলের পড়ন্ত আলোর সোনা লেগেছে। সুডৌল সেই পা দেখে মনে পড়ে, অরণ্যচারী কোন নবীন প্রাণীর নিটোল সুন্দর লজ্জাহীন শরীর।

লীলায়িত মৃণাল বাহু দুটি অর্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে আছে মুখখানি। এক ঝলকে মনে হয় যেন ফুলের সাজির সোনার হাতল। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বলে নরম বুক ঈষৎ উন্নত হয়ে আছে, দু'টি মধু-ভাণ্ডের আশ্রয়ে। তার তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কাঁধ ও বাহুর সঙ্গম ভূমিতে কৃষ্ণাভ সোনার উদ্গম। ঘামে ভিজে গেছে সারা মুখ-বুক বাহুমূল। একটা স্বেদসিক্ত গন্ধ পেল আগাথা। প্রাণিদেহের গন্ধের চেয়ে অস্ফুট সে গন্ধের আভাসে সোঁদা মাটি আর জল, সমুদ্র জোয়ার আর কাননভূমির সুরভির রেশ যেন বেশী। জানালার কাচে নিজের শরীরের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ তুলে তাকাল আগাথা। হাড় বের-করা মেচেতা-ধরা মুখখানা চোখে পড়ল। গায়ের ব্লাউজটা ভাঁজ-ভাঙা। তারও বাহুমূলের নীচে অমনি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি স্বেদকণা জমেছে নিশ্চয়ই, না দেখেও তা অনুভব করলে আগাথা। বুকের জামাটা তার সামনের দিকে ঢিলে হয়ে থাকে। 'এত বয়সেও ভাল করে ডাগর হল না আমার বুক' মনে মনে ভাবলে আগাথা। যা হয়েছে তার চেয়ে মোটে না হলেই বোধ হয় ছিল ভাল। সেইখানে দাঁড়িয়ে মেরীর নবীন যৌবনের দু'টি পূর্ণকুম্ভ চোখে পড়ল না বটে, কিন্তু আগাথা জানে সে দু'টি দেখতে কেমন। যে সোনার-আলো পড়েছে মেরীর নিটোল গড়ন পায়ের উপর, সেই আলো তারও ছিনে বার-করা হাতের উপর পড়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আগাথা।

রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে ছিল আগাথা। দাঁড়িয়ে ছিল অন্য মনে। এমন সময় ঘুমন্ত মেয়ে নড়ে-চড়ে সাড়া দিল—'কে?'

ট্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে আগাথা বললে—'তোমার খাবার এনেছি। তার আগে গা-বুক ঢেকে নাও ভাল করে।'

—'সাড়া দিয়ে আসবে ত?'—বললে মেরী—'তোমায় আসতে দেবার আগে অন্তত: ফ্রকটাও ত পরে নিতে পারতাম।'

—'তুমি আবার আমায় আসতে দেবে কি? তুমি কি আমায় কিছু বারণ করতে পার?'

হায়, হায়! এই সন্ধ্যাবেলাতেই সে কি না মাদামের মনকে বিমুখ করে ফেললে! মাদামই ত তার একমাত্র আছে। সেই তার আশা, তার শেষ ভরসা। মাদামের গলায় দু'টি হাত জড়িয়ে দিলে মেরী।

—'কি করেছি গো আমি? কেন আমায় আগের মত ভালবাসো না মাদাম?'

তন্বী মেয়েটির বুকের তাপ লাগল আগাথার শরীরে।

—'হয়েছে, হয়েছে। উঠে পড়।'

আলগা হাতে মেরীকে সরিয়ে দিলে আগাথা।

—'নাও উঠে পড়। পরার যা পরে নাও—তার পর চল খেয়ে নেবে।'

—'আমার খিদে নেই।'

—'তোমার বয়সে ত সর্বদাই খাই-খাই হবে। ক্ষিদে নেই কেন?'

মাদাম তাকে মসলিনের একটা ফ্রক পরিয়ে দিলে। তার পর গুছিয়ে নিয়ে বসালে টেবিলে। যত্ন করে খাওয়াতে লাগল।

'চিংড়ি মাছ খেতে কত ভালবাস তুমি। শুধু এই কটি তোমার বাবা রেখে গেছেন। তিনি খেতে আরম্ভ করলে শেষ না করে থামেন না ত।'

মেরী তেমনি করে একটা কাঁধ তুলে নাড়া দিলে। খেয়ে খেয়ে বাবা যদি পেট ফাটিয়ে ফেলেন, তাতে তার কি—তার গিলসের কি? যদি মা বাবা হঠাৎ উধাও হয়ে যান, যদি তাঁরা কোথাও না থাকেন, তাতেই বা কি আসে-যায়?

হাতের আঙুল মুছতে মুছতে বললে মেরী—'আচ্ছা, সালোঁদের সঙ্গে আমাদের কিসের তফাৎ? কিসে আমরা উঁচু তাদের চেয়ে?'

আগাথার ঠোঁট দু'টি কুঁকড়ে যেতেই, তার দাঁতের ঈষৎ লক্ষণ দেখা গেল। শক্ত শক্ত ভারী দাঁত। কোন শ্রী নেই, ছন্দ নেই। কষের দাঁতগুলো আবার বড়ো বড়ো।

স্মিত হেসে বললে অগাথা—'সে কথা জিজ্ঞেস কোরো মাকে। ওসব জাত-বেজাতের উঁচু-নীচুর ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না।'

'বলো না তুমি—কিসের তফাৎটা?'

গলায় মধুর চেয়ে মাধুরী ঢেলে কোমল করে বললে আগাথা—'তফাৎ? তফাৎ হল কাল পিঁপড়ে আর লাল পিঁপড়ের তফাৎ।'

'ও আমি বুঝতে পারলাম না।'

'বোঝবার কিছু নেই বাছা!'

সে-ও ত কার্ল্লাদের ঘরে জন্মেছিল। তার বাবা ছিলেন কাউণ্ট। ষোড়শ শতাব্দীতে তাদের চেয়ে স্বনামখ্যাত মহিমা পরিবার একটিও

ছিল না গ্যাসকনিতে। পুরো চুয়াল্লিশ ঘণ্টার জন্যে সে-ও ত ব্যারনের বৌ হয়েছিল। তাদের বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলা বিয়ের জুতো পায়ে দিয়েই তার ব্যারন স্বামী বাবার বাগানের মালিনীকে নিয়ে উধাও হয়েছিল। রোম-কোর্টের মহামহিম বিচারপতি তাকে স্বামীর উপাধির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিলেও, ভুলতে পারে না ত আগাথা যে, সে ব্যারনের স্ত্রী কাউণ্টের মেয়ে। সাঁলো বলো আর দুবর্ণে বলো, ওরা সবাই সমাজের নীচু তলার নোংরা-লাগা পরিবার। তাদের চেয়ে বরং সমাজের সাধারণ লোক—যেমন নিকোলাসরা—ঢের ভাল—ঢের উঁচু। উঁচু-ঘরের মেয়ে বলে কোন মিথ্যে ভণ্ডামি কি আত্মপ্রবঞ্চনা অন্ততঃ তার মনে নেই। তার এক দিনের স্বামী যেদিন থেকে তাকে পরিত্যাগ করে গেছেন, সেদিন থেকে জাতের উপর আগাথার মনে ঘৃণা ভিন্ন আর অন্য কোন অনুভূতি অবশেষ নেই। যেদিন দুবর্নে'দের ঘরে সে গভর্ণেসের কাজ নেওয়ার সঙ্কল্প জাগায়, সেদিন বাবার প্রতিকূল মতকে সে এই যুক্তিতে খণ্ডন করতে পেরেছিল। বাবা মানুষের সামাজিক দর নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তার গর্ব ছিল তার জমিদারীর মাটি। সেই মাটির বেদীতে তিনি জীবনের সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন। ভুল করেছিলেন বার বার। বেলমতের আঙুর-বাগানে রাশি রাশি টাকা ফেলেছেন। কিন্তু কিসের কি? সেই আঙুর-বাগান তার সম্পত্তি গ্রাস করেছে বছরে বছরে। পুরোনো জিনিস বদলে নতুন কল বসাননি'—ভুল সময়ে আঙুর বেচতে গিয়ে ভারী ভারী লোকসান খেয়েছেন কত বার। এখন জমি বাগান-বাড়ী সব বন্ধক দিয়ে কোন ক্রমে টিঁকে থাকা। মেয়ের মাইনের অর্ধেক উড়িয়ে দেন জুয়ায়। লোকে বলাবলি করে—'বাপের খরচ চালাতে মেয়েটাকে শেষ অবধি জাত খোয়াতে হল।'

কিন্তু তাই কি সত্যি? জীবিকার জন্যে লোকে যা করে তাতে সামাজিক গৌরব ভ্রষ্ট হয় না কি মানুষের? এ কথা কি কেউ কখনো ভাবে যে আগাথা স্বেচ্ছায় নেমে এসেছে নীচে? নষ্ট করেছে সে নিজেকে? তার মনের হদিস অন্য লোকে পাবে কি করে? নিজের ভবিতব্যকে নিজের হাতে রচনা করে রেখেছে সে। সেই বাসনামুখী রাজপথ ধরে উৎরাই পেরিয়ে নীচু তলার দিকে ছুটে যাচ্ছে সে। যাচ্ছে বিশেষ একটি মানুষকে লক্ষ্য করে। স্বেচ্ছায় সে নেমে এসেছে—আরো নীচে নামবে। যত দিন না সেই সমাজ-স্তরে পৌঁছায়, যেখানে তার মনের মানুষটি নিত্য আহার-বিহার করে। তাকে সঙ্গিনী নিয়ে তার নিকোলাস অগ্রগামী হবে। সমাজ-সংসারের এই সব ছোট-বড়র সামান্যতা অবহেলা করে একদিন তারা দুই মানুষ মহত্ত্বের সত্যিকার স্বর্ণশীর্ষে উঠবে।

সেই কথাই অহোরাত্র ভাবে আগাথা। নিকোলাসের অগোচরেই আগাথা নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ করবে তার জীবনে—তার পর ধীরে ধীরে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে তার প্রাণের ভূমিতে। এখন নিকোলাস তাকে ফেলে দূরে চলে যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু তীব্র মনঃশক্তিতে সে তার নাগাল ধরবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রের মত প্রেমেও সে ইচ্ছাশক্তির সাফল্যে বিশ্বাস করে।

অপদার্থ মেয়েলী ব্যারনের প্রতি সত্যিকার অনুরক্তি কোন দিনই সঞ্জাত হয়নি তার মনে। ইচ্ছা করলে তাকে বেঁধে রাখতে পারত আগাথা তার গায়ে। সেটুকু ক্ষমতা প্রকৃতি তাকে না চাইতেই দিয়েছেন। সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই তার মনে। আর এ সংসারে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মে পুরুষকে আপন রসে আসক্ত করতে পারবে না, এমন কি হয়? তার মেয়েলী শরীর-মনে এমন কিছু লোভনীয় যদি না থাকত তবে মেরীর বাবা—অমন যে প্রবীণ মানুষ তিনি তার দিকে অমন লোভীর মত তাকিয়ে কি দেখেন? কি ভয়ে নিজের শোবার ঘরে খিল লাগিয়েছে আগাথা? ঐ প্রাসাদের ঘরের ছেলে নিকোলাস—দিন-রাত যার মন পড়ে আছে গীর্জায়—তার কাছেও যদি কোন দিন আগাথা নিজের মনকে অবারিত করে দেয়, বিকশিত ফুলের মত রস মধুরতায় খুলে ধরে নিজেকে, সে-ও কি তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে? পারবে না যে তা জানে আগাথা। নইলে আগাথার মত কুরূপা মেয়ের সঙ্গে নির্জন হতে অত ভয় কিসের নিকোলাসের? সে কি তার চিত্তের ভীরুতা নয়? নয় যদি, ত অমন পিপাসিত দৃষ্টিতে কি দেখে সে আগাথার দিকে? আগাথা জানে, নিকোলাস মনে মনে তাকে কামনা করে। আসঙ্গ তৃষ্ণা নিয়ে একটি রমণীর রমণীয়তাকে সে মনে মনে ধ্যান করে।

—'তুমি আমার একটা কথাতেও কান দিচ্ছ না'—মেরীর কথায় চমক ভাঙল আগাথার। কে জানে কতক্ষণ ধরে মেয়েটা আপন মনের আনন্দে কথা কয়েছে!

—'আমাদের দু'জনের ওপর তোমার এত বীতরাগ কেন বলতে পারো? তোমার জন্যেই ত সেই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।'

'বুদ্ধি-শুদ্ধি তোমার লোপ পেয়ে গেছে মেরী! নিকোলাস আমার পরিচিত বন্ধু। গিলস তার সঙ্গে ছিল সেদিন—তাই তার

সঙ্গেও তোমার পরিচয় হয়েছিল। তোমাদের চেনা-জানায় আমার কিছুমাত্র হাত ছিল না।'

—'আমার মাদাম আগাথার মত এমন দরদী মেয়েমানুষ কি চোখ চেয়ে না দেখে থাকতে পারে যে, গিলসের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা থেকে কি ভাব হয়েছে মনে মনে। তুমি সব দেখেছিলে? তাই না বার বার আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছ তুমি? তোমার কাছে আমার কত যে কৃতজ্ঞতা মাদাম—'

কী উৎসুক দৃষ্টিতেই না আগাথার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মেরী। সে মুখে কোন ছল-ছলনার ছায়া নেই। মেরী নিশ্চিত জানে, গিলসের সঙ্গে তার ভালবাসার আবেগ আগাথার মনের তন্ত্রীতেও ঝঙ্কার তোলে। সে কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে যে, মেরীর সঙ্গে গিলসের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয় আগাথা তাদের দুটি প্রাণের প্রেমকে রসসিক্ত করতে। নিকোলাসকে একলা অধিকার করবার এ সব চাতুরী বোঝবার ক্ষমতা নেই অত অল্পবয়সী মেয়ের।

আজ-কাল নিকোলাস আর তাকে এড়িয়ে যায় না। তার প্রতি প্রেমমুগ্ধ বলেই যে তার সঙ্গে নির্জন সময় কাটায় নিকোলাস, এ বিষয়ে আগাথার মনে কোন বিভ্রান্ত মুগ্ধতা নেই। তবু এ কথা ত আর মিথ্যে নয় যে, বন্ধু গিলসের প্রেমাভিসারে সুযোগ করে দেবার জন্যেই সে মেরীর গভর্ণেসকে ব্যস্ত রাখে নিজের সঙ্গে। আগাথাকে নিয়ে যখন বনের আড়ালে অন্তর্হিত হয় নিকোলাস, তখন গিলস মেরীকে নির্জনে একান্ত করে পায়। এ-সব সত্যি। এ-সবই বোঝে আগাথা। তবু তার ভাল লাগে। ছলে ছলনায় যা মেলে তাই দু' হাতের অঞ্জলিতে গ্রহণ করে আগাথা।

উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল আগাথা। দুই হাতে শার্সিগুলো উজাড় করে খুলে দিলে। চেয়ে দেখলে, আকাশের উজ্জ্বল নীল কখন তামায় বদলে গেছে। বাড়ীর মাথায় কৃষ্ণ মেঘে সংবৃত আকাশ। সোয়ালো পাখীরা নেমে এসেছে, উড়ছে নীচু দিয়ে। গানের ধূয়োর মত ধুলোর ঘূর্ণি ভূমি ছেড়ে এক একবার উঠছে আকাশমুখী হয়ে আবার তখুনি ভূমিলীন হচ্ছে। আর ক্লান্ত মৌমাছিদের ডানার গুঞ্জন শুনছে নিঃশব্দ আকাশ।

মুখ ফিরিয়ে মেরীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আগাথা। শান্ত নিস্তরঙ্গ মুখে বসে আছে মেয়েটি। সে মুখে কোন ভাবের লেশ নেই।

কঠিন কণ্ঠে বললে আগাথা—'আমি ত বিশ্বাস করতে পারি না যে, এই রকম ঘরে মানুষ হয়ে তোমার মত সতেরো বছরের একটা এক ফোঁটা মেয়ে ঐ রকম এক ছোকরার সঙ্গে এমন করে ভালবাসায় মেতে উঠতে পারো। আর শুধু তাই? তার সঙ্গে বিয়ের কথাও তোমার মাথায় এসে ঢুকেছে···তোমার মা-ও সব জিনিষটা জেনেছেন, বুঝেছেন। তিনি আমার কথাতেই সায় দিলেন যে দুবর্ণেদের সঙ্গে সালেঁাদের ঘরের বিয়ের কথা—কল্পনাতেও আনা যায় না—'

—'হোক না তাই। তুমিই ত এখুনি বললে যে, ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ লাল কালো পিঁপড়েদের মত—তার বেশী নয়।'

—'সে তোমায় আমি হাসাবার জন্যে রহস্য করে বলেছিলাম। তোমার ও পিনপিনে কান্না আমার ভাল লাগে না বাপু!'

আগাথার কোলে উঠে তার ব্লাউজের মধ্যে মুখ গুঁজে বসল মেরী।

'আমায় একটুও ভালবাস না তুমি মাদাম! কেন বাসো না, বল না? বলো ভালবাসো। বলো একটু একটু ভালোবাসো।'

আর মেরী ভাবলে সেও বুঝি আগাথাকে একটু একটু ভালবাসে।

—'আমায় একটু আদর করো না'—আবদার করলে মেরী।

আগাথা কোলের শিশুর মত তাকে বুকে চেপে সোহাগ করতে লাগল। অস্ফুটে একটা ঘুমপাড়ানী গানের দু'কলি গেয়েও ফেললে অকারণে।

'তুমি এমন করে আমায় বুকের ভেতর চেপে ধরেছ যে নিশ্বাস নিতে পারছি না। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আলগা হাতে ফ্রকটা নামিয়ে দিলে মেরী। তার পর চতুর চোখে আগাথার দিকে তাকালে রহস্যময়ী। বললে,—'কেন ভালবাসো না গো—বলো না কেন?'

—'তোমার মায়ের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না।'

মাদাম আগাথার মন হলে মেরীর মায়ের মনের বদল হতে পারে। তার ইচ্ছে হলেই হয়। আগাথা অবশ্য কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, মেরীর মায়ের উপর তেমন কোন প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তার। আর থাকেও যদি বা, যাতে মেরীর ভবিষ্যতে মন্দ হবে তেমন কাজ করবেই কেন তার গভর্নেস? সালেঁাদের বাড়ীর ছেলেটা রূপে-গুণে কি-ই এমন সুপাত্র?

'তুমি তাকে জানো না, তাই এমন কথা বলতে পারছ।'—ধরা গলায় আগাথা জবাব দিলে—'আমি যা জানি তার বেশী তুমি নিজেও জানো না মেরী! সে যে কেমনধারা পুরুষ তার কোন ধারণাই নেই তোমার—অল্পবয়সী মন নিয়ে দিনদিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ, কবে এসে সে তোমায় বুকে জড়িয়ে নেবে। কি জানে ও? নিজের রূপের যত্ন নিতে জানে না যে পুরুষ'—একটু থেমে, ধমকের সুরেই শেষ করলে আগাথা—'ওকে ত আমার নিজের খুবই বিরক্তিকর ঠেকে।'

আগাথা নিশ্চয়ই তামাসা করছে, ভাবলে মেরী। তাই হাসি মুখে জবাব দিলে—'সে সব আমি ভাবি না মোটেই। তবে—' চোখে-মুখে একটা বিকশিত উল্লাসে ফেটে পড়ল মেরী—'তবে ও শরীরের যত্ন নেয় না সে কথা তুমি ঠিকই বলেছ। অমন যে রূপ—!'

গিলসের সব ভাল লাগে তার। ওর অবিন্যস্ত এলোমেলো চুলের রাশ, ওর অপরিচ্ছন্ন হাত—মাপের চেয়ে বড়ো বড়ো যে সব সার্ট গায়ে দেয় সে—সব মিলিয়েই ত গিলসের রূপ। ওডিকোলনের সুরভির সঙ্গে তামাক-পাতার গন্ধ মিশে পুরুষের গায়ের যে সুবাস—তা-ও সে ভালবাসে। তার গিলস যেমনই হোক, সেই তার মনের মানুষ—তাকেই সে ভালবাসে।

গুরুভার মেঘের চাপা গুরু-গুরু উঠল আকাশে।

'বৃষ্টি এলে ভারী মজা হয়'—বললে মেরী—'তাই বলে শিলা-বৃষ্টি নয়—।'

জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখলে আগাথা, বৃষ্টি এল কি না।

—'এখনো এক ফোঁটা পড়েনি। কিন্তু সে কথা থাক্। আজ বিকেলে গিলসের সঙ্গে দেখা হতে পারে আমার।'

কৌতূহলে চক-চক করে উঠল মেরীর চোখ—'নিকোলাসদের ওখানে নিশ্চয়ই।'

—'তা-ও হতে পারে। ঠিক বলতে পারছি না এখন। তা বলে ভেবো না—। তবে সে যদি কিছু বলে ত তোমায় আজই জানিয়ে দেবো। চিঠি-পত্র কিছু নয় বলে দিচ্ছি—সে ভরসায় বসে থেকো না যেন। আর কোন ভরসাতেই বসে থাকার দরকার নেই তোমার, সে বিষয়ে এখন থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

আগাথার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে সোহাগী কণ্ঠে বললে মেরী—

—'মন থেকে তুমি আমার পাথর সরিয়ে দিলে মাদাম। কি ভালো মেয়ে তুমি গো?'

—'আমি আবার কী করলাম। তার সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। তা বলে তার পাত্তা খুঁজে বেড়াব না আমি। অত উৎসাহ আমার নেই।'

শুনে মেরীর মুখের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। নিরাশ কণ্ঠে বললে—'কি যে তুমি বলো মাদাম! এই আনন্দের স্বর্গে পৌঁছে দিলে আবার নিরাশার নরকে নামিয়ে দিলে এখুনি! কেন তুমি বুঝতে চাও না যে আমার সুখ স্বর্গ সব সে—'

এই উদ্ভিন্ন-যৌবনা বালিকার মুগ্ধমতি মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল আগাথা। তারপর গম্ভীর গলায় বললে—'আর পরিহাস নয় মেরী! আমি তোমায় সত্যি কথাই বলছি, জিনিসটার গুরুত্ব বোঝা উচিত তোমার।'

'কি আবার বুঝব? কি বোঝবার আছে শুনি?'

মেরীর মুখ থেকে চোখ সরালে না আগাথা। নিষ্পলক দৃষ্টির ব্যঞ্জনায় যেন মেরীর মনের বীণাকে রণিত করতে চাইলে। মন দিয়ে ছুঁতে চাইলে তারই মনকে। নিজের মনের নিভৃত বার্তা নির্বাণী শুনিয়ে দিতে লাগল নিমেষহীন দৃষ্টিপাতে।

লঘু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে মেরী।

—'আমি বড়ো বোকা মেয়ে, না মাদাম?'

বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে মেরীর কপালে চুমু খেলে আগাথা।

—'তা আবার নয়—খুব বোকা মেয়ে।'

তারপর আদর করে বললে—'আমি চলে গেলে কি করবে গো বিরহিনী?'

মা যতক্ষণ না যাচ্ছেন ততক্ষণ অপেক্ষা করবে মেরী। তারপর মা বেরোলে সেও গীর্জায় যাবে।

—'প্রার্থনা হবার আগেই পৌঁছে যাব আমি।'

—'খুব ভাল হবে। ভালো ভালো কথা শুনে মন অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।'

—'মন হাল্কা করতে চাইনে আমি। ভগবানের কাছে আমার কত প্রার্থনা আছে। আমি সব বর চেয়ে নেব।'

হাসতে গিয়ে আগাথার গজ-দন্ত দুটি বেরিয়ে পড়ল।

—'সার্লোদের ছেলেটার কথা তুমি ভগবানকে বল নাকি?'

—'বলি না আবার? বলা অন্যায় নাকি মাদাম?'

—'দুষ্টু মেয়ে। অন্যায় বলতে পারি কি? আমি ফিরে এলে আমার ঘরে এসে দেখা করবে। হয়ত রাত হবে আমার ফিরতে।'

—'গীর্জায় গেলে আমারও ফিরতে দেরী হয়ে যাবে হয়ত। সারা দিন বলতে গেলে কিছু খাওয়াই হয়নি। ততক্ষণে যা ক্ষিদে পেয়ে যাবে।'

দুবর্ণেদের ছেলে-বুড়ো সব অবিরত কেবল খাই-খাই করছে। ভাবলে আগাথা। ভালবাসার হাওয়া-লাগা এই মেয়েটা অবধি একটি বারও সে কথা ভুলতে পারে না। আহার্য্য শেষ ট্রে হাতে নিয়ে আগাথা উঠে দাঁড়াতেই গভর্ণেসের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে গেল মেরী। বলল—'আমায় নিয়ে যেতে দাও মাদাম।'

—'তুমি কেন নিয়ে যাবে মেরী? এই সব কাজ করার জন্তেই তোমার মা আমায় মাইনে দিয়ে রেখেছেন।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার আগে আর একবার মুখ ফেরালে আগাথা। বললে—'যাই করো বুদ্ধি বিবেচনা বর্জন করে বসে থেকো না মেরী! জীবনের অন্য সব খেলার মতই হৃদয়ের খেলাতেও মাথার দরকার সব থেকে বেশী—একথা কখনো ভুলো না।' [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেন গুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরাপত্তা পরিষদ ও ফরমোসা—

নিরাপত্তা পরিষদে ফরমোসা সম্পর্কে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনায় যোগদান করিবার আমন্ত্রণ কম্যুনিষ্ট চীন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের আমন্ত্রণের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদে ফরমোসা সম্পর্কে নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য চীন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না। তবে সোভিয়েট রাশিয়ার উত্থাপিত প্রস্তাব আলোচনার জন্য চীন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে, যদি নিরাপত্তা পরিষদ হইতে ফরমোসার প্রতিনিধিকে অপসারিত করা হয়। গত ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) ফরমোসা সম্পর্কে আলোচনায় যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য কম্যুনিষ্ট চীনকে আমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব যখন নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়, চীন যে উহার এইরূপ উত্তরই দিবে তাহা তখনই অনুমান করা কঠিন ছিল না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাবে ফরমোসায় যুদ্ধ-বিরতির জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাবে চীনের বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক কার্য্য-কলাপের নিন্দা করিবার এবং ফরমোসা এলাকা হইতে চীন-সৈন্য ছাড়া আর সমস্ত সৈন্য অপসারণের জন্য যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করা হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাবেই অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ফরমোসার যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবের উত্থাপক্তা নিউজীল্যাণ্ড। প্রশান্ত মহাসাগরে আনজাস্ (UNZUS) সামরিক চুক্তির নিউজীল্যাণ্ড একজন অংশীদার। প্রেঃ আইসেন হাওয়ার ফরমোসা রক্ষার সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদ এবং বৃটেনের সমর্থন লাভ করিয়াছে, ইহাও খুব স্বাভাবিক। নিরাপত্তা পরিষদের এগার জন সদস্যের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জাতীয়তাবাদী চীন এই পাঁচ জন স্থায়ী সদস্য এবং নিউজীল্যাণ্ড বেলজিয়াম, ব্রাজিল, তুরস্ক, ইরাণ ও পেরু এই ছয় জন অস্থায়ী সদস্য। ভেটোর কথা বাদ দিলে নিরাপত্তা পরিষদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতিই সমর্থন করিবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কম্যুনিষ্ট চীন নিরাপত্তা পরিষদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না কেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য মিঃ চৌ এন লাইয়ের উত্তর বিশ্লেষণ করিলেই পাওয়া যায়। যুদ্ধবিরতি খুবই ভাল কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ফরমোসায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের পটভূমিকাকে বাদ দেওয়া চলে না। নিরাপত্তা পরিষদ ফরমোসা সম্পর্কে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা করিতে যে অধিকারী নহেন, এই পটভূমিকার আলোচনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। জাপান চীনের নিকট হইতে ফরমোসা কাড়িয়া লইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় ১৯৪৩ এবং ১৯৪৫ সালে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছিল যে, ফরমোসা চীনের এবং যুদ্ধের শেষে উহা চীনকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফরমোসা চীনকে ফিরাইয়া না দিয়া এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। জাপানের সহিত যে সন্ধি হইয়াছে তদনুসারে জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ফরমোসা অর্পণ করিয়াছে, এই কু-যুক্তি দ্বারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অন্যায়কে ঢাকিবার উপায় নাই। জাপ সন্ধিপত্র প্রকৃতপক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই রচনা করিয়াছে। সুতরাং ফরমোসা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অর্পণ করার দফাটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছাতেই সন্ধিপত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং পরাজিত জাপান স্বেচ্ছায় ফরমোসা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়াছে, একথা স্বীকার করা চলে না। জাপ সন্ধিপত্রে ফরমোসা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহা চীনকে প্রত্যর্পণ না করিয়া

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২
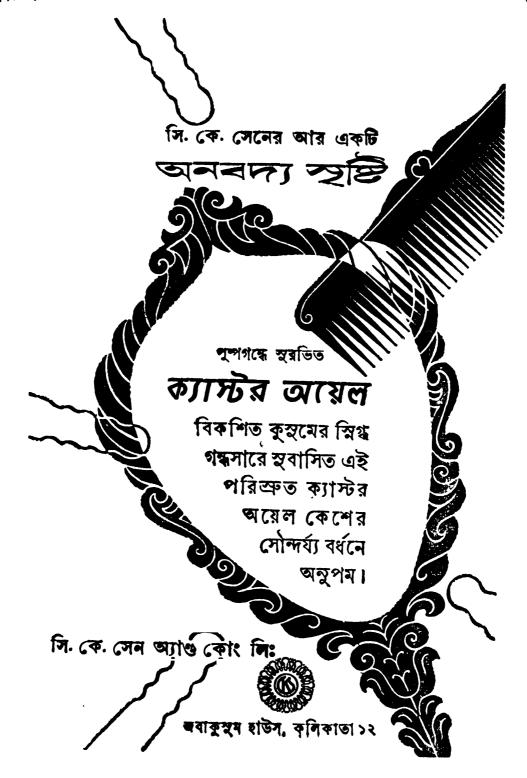
হস্তাপহারী হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৩ ও ১৯৪৫ সালের ঘোষণায় ফরমোসা চীন দেওয়ায় ফরমোসার উপর চীনের অধিকার উক্ত সন্ধি দ্বারা একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, ফরমোসা এখনও চীনেরই রহিয়াছে এবং ফরমোসা দখলের জন্য চিয়াং কাইশেকের সহিত কম্যুনিষ্ট চীনের যুদ্ধ হইলে উহা গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হইবে না। ফরমোসা সম্পূর্ণরূপে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। নিরাপত্তা পরিষদের উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই, থাকিতে পারে না। কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে সুস্পষ্ট ভাষাতে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ফরমোসা সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সনদের ৩৯নং ধারা অনুযায়ী উত্থাপন করা হইয়াছে। কোন অঞ্চলে শান্তি বিপন্ন হইলেই নিরাপত্তা পরিষদ এই ধারা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করিতে পারে। কোন দেশের গৃহযুদ্ধেই শান্তি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকিতে পারে না, যদি অপর কোন রাষ্ট্র তাহাতে হস্তক্ষেপ না করে। ফরমোসার ব্যাপারে সুদূর প্রাচ্যে শান্তি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে। কিন্তু নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাবে ফরমোসা লইয়া সুদূর প্রাচ্যে কেন শান্তি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেই বিষয়টিকেই সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ফরমোসার ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে শান্তি বিপন্ন হওয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্ব্বাদপুষ্ট এবং বৃটেনের সমর্থিত নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাব এই আশঙ্কা দূর করিবার পথ নহে। ফরমোসায় যাহার হস্তক্ষেপের ফলে সুদূর প্রাচ্যে শান্তি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাব সেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে। ইহা হইতেই প্রস্তাবের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত অনুসারেই যে নিউজীল্যাণ্ড এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে ঘটনাবলীর ধারা বিশ্লেষণ করিলে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কি অবস্থায় নিউজীল্যাণ্ড ফরমোসায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, তাহা এখানে মোটামুটি ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সুদূর প্রাচ্যে ফরমোসাস্থিত চিয়াং কাইশেকের সহিত কম্যুনিষ্ট চীনের যে ক্ষুদ্র সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা নূতন আকার ধারণ করে ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির পর হইতে। গত ১৮ই জানুয়ারী (১৯৫৫) কম্যুনিষ্ট-চীন যখন তাচেন দ্বীপপুঞ্জের ইকিয়াংশান দ্বীপটি চিয়াং কাইশেকের কবল হইতে মুক্ত করিল তখন অবস্থা যে ক্রমেই চিয়াং কাইশেকের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিলম্ব হইল না। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই চিয়াং-মার্কিণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্যাটা শুধু চিয়াং-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি এবং চিয়াং কাইশেকের চীন আক্রমণের অধিকার দ্বারা সমাধানের বিষয় নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উহাতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। উহার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। প্রেঃ আইসেন হাওয়ার গত ১৮ই জানুয়ারী তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক-সম্মেলনে ইকিয়াংশান দ্বীপের উপর তেমন গুরুত্ব না দিলেও এবং তাচেন দ্বীপকে ফরমোসা রক্ষার অপরিহার্য্য অংশ বলিয়া স্বীকার না করিলেও তিনি বলেন যে, ফরমোসা অঞ্চলে যুদ্ধ-বিরতির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চেষ্টা করুক, ইহাই তিনি চাহেন। তাঁহার এই উক্তি নিরাপত্তা পরিষদ ফরমোসা অঞ্চলে যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। নিউজীল্যাণ্ড এই ইঙ্গিত ধরিয়াই যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। উল্লিখিত উক্তি করিবার কয়েক দিন পরেই ২৪শে জানুয়ারী (১৯৫৫) প্রেঃ আইসেন হাওয়ার ফরমোসা ও পেসকাডোরেস দ্বীপ রক্ষার জন্য মার্কিণ-সৈন্য ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ-কংগ্রেসের নিকট ক্ষমতা দাবী করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। মার্কিণ-কংগ্রেসের উভয় পরিষদই প্রেঃ আইসেন হাওয়ারকে এই ক্ষমতা দান করিতে বিলম্ব করেন নাই। এক দিকে যুদ্ধ-বিরতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ, আর এক দিকে ফরমোসা রক্ষার জন্য মার্কিণ ফৌজ নিয়োগের ক্ষমতা গ্রহণ, মার্কিণ নীতির দিক দিয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

কম্যুনিষ্ট চীন যে ফরমোসা তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া দাবী করিবে, প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কাজেই কম্যুনিষ্ট চীন যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবের আলোচনায় যোগদান করিতে অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা তিনি উপেক্ষা করেন নাই। এইরূপ অবস্থায় চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করিয়া ফরমোসা রক্ষার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করা যে প্রয়োজন হইতে পারে তাহাও হয়ত তিনি ভাবিয়াছেন। এই যুদ্ধ করিতে হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে করাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহার মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইহাই হয়ত নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব উত্থাপনের বিশেষ সার্থকতা। ফরমোসা রক্ষার জন্য মার্কিণ ফৌজ নিয়োগ করিতে হইলে মার্কিণ-কংগ্রেসের মঞ্জুরী প্রয়োজন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই এই মঞ্জুরী প্রেঃ আইসেন হাওয়ার আদায় করিয়া রাখিলেন। ফরমোসা রক্ষার জন্য ব্যাপক যুদ্ধের দায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে রাজী হইবে কি না, তাহা অনুমান করা হয়ত সম্ভব নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাই করুক না কেন, একাকী করিতে চায় না, তাহার মিত্রশক্তিবর্গের সহিত একসঙ্গে করিতে চায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সার্থকতা এইখানেই। বৃটিশ পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় বিরোধী শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফরমোসা নীতির সহিত বৃটেন কত দূর সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে লর্ড রিডিং বলিয়াছিলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ হইতেই ফরমোসা ও পেসকাডোরেস সম্পর্কে বৃটেনের দাবী উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা নয়। কারণ, বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার এণ্টনী ইডেন ফরমোসার পুরাতন ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া উহা যে চীনের অংশ নয় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার এই ইতিহাস লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি এবং তাহার অপব্যাখ্যা কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে একটা 'কেস্' খাড়া করিবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিণ নীতি অনুসরণ করিয়া চলা ছাড়া বৃটেনের আর কোন উপায় নাই।

যুদ্ধ-বিরতিই শুধু যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্য নয়, উহার আরও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যুদ্ধ-বিরতির পর যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে আলাপ

আলোচনা করিয়া স্থায়ী মীমাংসার ব্যবস্থা করাই যুদ্ধবিরতির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু নিউজীল্যাণ্ডের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব হইতে এই উদ্দেশ্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। স্যার এণ্টনী ইডেন অবশ্য অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধবিরতি স্থায়ীই হউক আর অস্থায়ীই হউক, প্রকৃত পক্ষে উহা দ্বারা ফরমোসার উপর চীনের দাবীকেই কার্য্যতঃ চ্যালেঞ্জ করা হয় মাত্র। সুদূর প্রাচ্যে অশান্তি দূর করিতে চীনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে বৃটেন রাশিয়াকে অনুরোধ করিয়াছিল। এই অনুরোধ সম্পর্কে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলটভ বলিয়াছেন যে, বৃটেন সুদূর প্রাচ্যে অশান্তির প্রকৃত কারণটির উল্লেখ করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, চীনের ঘরোয়া ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করার ফলেই সুদূর প্রাচ্যে অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি ফরমোসা অঞ্চলে তাহার আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করে তাহা হইলেই অশান্তি দূর করিতে সাহায্য করা হইবে। যুদ্ধবিরতির পর ফরমোসা চীনের অংশ এই ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার ব্যবস্থা থাকিলে তবু এই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের একটা অর্থ হইতে পারিত। কিন্তু যে ভাবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধবিরতির পর চিয়াং কাইশেক ফরমোসার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের জন্য মার্কিণ সামরিক সাহায্যে শক্তিশালী হওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া উহা আর কিছুই হয় নাই।

নিরাপত্তা পরিষদে তাহার ন্যায্য আসন হইতে কম্যুনিষ্ট চীনকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। যে-ভাবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যতঃ কম্যুনিষ্ট চীনই আক্রমণকারী, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে জবাবদিহি করিবার জন্য। শুধু তাই নয়, কম্যুনিষ্ট চীন যখন জবাবদিহি করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের আসনে উপবিষ্ট থাকিবেন কম্যুনিষ্ট চীনের বক্তব্য শুনিবার জন্য। এই অবস্থায় কম্যুনিষ্ট চীন যদি নিউজীল্যাণ্ডের প্রস্তাব আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ, এই জন্যই কম্যুনিষ্ট চীন জানাইয়া দিয়াছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ হইতে চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধিকে অপসারিত করিবার পরই সে রাশিয়ার প্রস্তাব আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। চীনের এই উত্তরের পর নিরাপত্তা পরিষদ কি করিবে, তাহা আমরা অনুমান করিতে চেষ্টা করিব না। নিরাপত্তা পরিষদ অবশ্য কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কোরিয়ার ব্যাপারের মত এখানে ব্যাপারটা অত সহজ হইবে না। কোরিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে যোগদান করিতে বিরত ছিল। রাশিয়ার ভেটো নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে অকেজো করিয়া রাখিবে। ঐরূপ অবস্থা ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক কি করিবে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ফরমোসায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার অধিকার যে নিরাপত্তা পরিষদের নাই, কোন দেশের গৃহযুদ্ধে যে সে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। ফরমোসা চীনের অংশ নহে এই দাবী করিয়া, ফরমোসার জন্য যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ নয় বলিয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা অবশ্যই চলিতেছে। কিন্তু মার্কিণ সপ্তম নৌবহর পাহারা না দিলে এত দিনে হয়ত ফরমোসা সমস্যার সমাধান হইয়াই যাইত। প্রেঃ আইসেন হাওয়ার ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মার্কিণ-কংগ্রেসের নিকট বাণীতে সপ্তম নৌবহর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "১৯৫০ সালে সপ্তম নৌবহরকে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে কার্য্যতঃ তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে, মার্কিণ নৌবহর কম্যুনিষ্ট চীনকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে।" অতঃপর তিনি "কাজেই এই অবস্থায় মার্কিণ নৌবহরের চীনা কম্যুনিষ্টদের পক্ষে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুকূলে কোন 'লজিক' নাই অথবা উহার কোন অর্থও হয় না।" তথাপি মার্কিণ সপ্তম নৌবহরকে সরাইয়া আনা হইতেছে না কেন? আর ফরমোসা রক্ষার জন্য মার্কিণ ফৌজ নিয়োগের বিশেষ ক্ষমতাই বা তিনি গ্রহণ করিলেন কেন? মার্কিণ সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতিই ফরমোসাকে সংঘর্ষের কারণে পরিণত করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনকে যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার ন্যায্য আসন প্রদান করা হয় এবং ফরমোসা অঞ্চল হইতে মার্কিণ নৌবহর সরাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সুদূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু মার্কিণ নীতিই সুদূর প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে।

তুর্কী-ইরাক চুক্তি ও আরব লীগ—

গত ১২ই জানুয়ারী (১৯৫৫) রাত্রে বাগদাদ হইতে তুরস্ক ও ইরাকের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় এক যুক্ত ইস্তাহার জারী করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব ইরাক ও তুর্কী গবর্ণমেণ্ট চুক্তি সম্পাদন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত যে মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা ব্যবস্থা গঠনের পথে এক পদক্ষেপ, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। ১৯৫১ সাল হইতে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং তুরস্ক মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি এ পর্য্যন্ত এই টোপ গিলিতে রাজী না হওয়ায় তাহাদের চেষ্টা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। অতঃপর আরব রাষ্ট্রগুলিকে একসঙ্গে মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা ব্যবস্থা গঠনের জন্য আহ্বান না করিয়া প্রত্যেক আরব রাষ্ট্রের সহিত পৃথক পৃথক চুক্তির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে এই রক্ষা-ব্যবস্থার দিকে টানিয়া আনিবার ব্যবস্থা সুরু করা হইয়াছে। ইহা যে

আসলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব ব্যাপার, এইরূপ একটা আবহাওয়া সৃষ্টির আয়োজন চলিতেছে। উহার প্রথম ফল তুর্কী-পাকিস্তান চুক্তি। আরব রাষ্ট্রগুলিকে এই চুক্তিতে যোগদানের আহ্বান করা হইলেও তাহারা তাহাতে রাজী হয় নাই। বস্তুতঃ, পশ্চিমী শক্তি-বর্গের নেতৃত্বে মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের পরিবর্ত্তে আরব রাষ্ট্রগুলির যৌথ নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করিতেই তাহারা চেষ্টা করিয়াছিল। অবশ্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহযোগিতা একেবারে বর্জ্জন করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল না।

গত ডিসেম্বর (১৯৫৫) মাসে আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ কায়রোতে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া স্থির করেন যে, আরব লীগের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামরিক দিক হইতে কার্য্যকরীরূপে শক্তিশালী করিতে হইবে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য তাঁহারা গ্রহণ করিবেন বটে, কিন্তু মধ্য-প্রাচ্য রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হইবে তাঁহাদেরই। মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে এই নীতিটা হইল মিশরের। কার্য্যতঃ এই নীতি দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। ইরাকের প্রধান মন্ত্রীর ধারণা, আরব যৌথ নিরাপত্তা চুক্তিটা বাক্যসমষ্টি মাত্র। বিশেষতঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিতে তাঁহার আগ্রহও যথেষ্ট। মিশরের এই নীতি কার্য্যকরী হইলে এই রক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাধান্য হইবে মিশরের; তুরস্ক ও ইরাকের কোন প্রাধান্যই উহাতে থাকিব না। প্রকৃত পক্ষে এই কারণেই তুরস্ক ও ইরাক যৌথ আরব নিরাপত্তা চুক্তির পক্ষপাতী নহে। ইরাক ইতিপূর্ব্বেই মস্কোস্থিত তাহার দূতাবাস তুলিয়া দিয়াছে। অতঃপর তুরস্কের সহিত এক সামরিক চুক্তি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই চুক্তি হইবে মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি স্তর।

ইরাক তুরস্কের সহিত সামরিক চুক্তি করিবার সিদ্ধান্ত করায় মিশর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ইরাকের এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া আরব লীগের উপর কিরূপ হইবে, তাহা কায়রোতে অনুষ্ঠিত সদ্য-সমাপ্ত আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রধান মন্ত্রি-সম্মেলনের ফল হইতেই অনুমান করা যায়। মিশরই এই সম্মেলন আহ্বান করে। ২২শে জানুয়ারী (১৯৫৫) এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী আকস্মিক ভাবে ব্যর্থতার মধ্যে এই সম্মেলন শেষ হইয়াছে। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী এই সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। অবশ্য ইরাকের একজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী এই সম্মেলনে এক বাণী প্রেরণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, আরব রাষ্ট্রগুলির নীতি মানিতে ইরাক বাধ্য নয় এবং ইরাকের নীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আরব লীগের নাই। ইরাক তাহার নিজস্ব নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিবে। এই সম্মেলনে প্রথমে বৈদেশিক শক্তির সহিত চুক্তির বিরুদ্ধে মতৈক্য হয় এবং প্রস্তাবিত তুর্কি-ইরাকী চুক্তির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রথমে লেবানন উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুমোদন প্রত্যাহার করে। সিরিয়া এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে মৌখিক মত প্রকাশ করিলেও লিখিত ভাবে উহা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করে। মিশর এবং সৌদী আরব ব্যতীত অন্যান্য আরব রাষ্ট্র বিশেষ অবস্থাধীনে তাহাদের সম্মতি ঘোষণা করিতে রাজী হয় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূলে রহিল মাত্র দুইটি রাষ্ট্র—মিশর ও সৌদী আরব। সৌদী আরব ইরাককে শক্তিশালী দেখিতে চায় না। প্যান আরব রাজনীতি ক্ষেত্রে ইরাক সৌদী আরবের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী, ইহা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তুর্কি-ইরাকী চুক্তি লইয়া আরব লীগে ফাটল ধরিয়াছে। যদি উহার অস্তিত্ব লোপ পায় তাহা হইলেও বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিবে না। আরব লীগের সৃষ্টি করিয়াছিল বৃটেন মধ্যপ্রাচীতে তাহার স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য। আজ পশ্চিমী শক্তিবর্গের স্বার্থের আঘাতেই আরব-লীগে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

মেঁদে ফ্রাঁসের পতন—

ইন্দোচীন যুদ্ধের অবসান এবং প্যারী চুক্তি ফরাসী জাতীয় পরিষদে অনুমোদন করানো, এই দুইটি দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিবার পর ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রাঁসের পতন হইল উত্তর-আফ্রিকা সম্পর্কে নীতির প্রশ্নে। উত্তর-আফ্রিকা নীতি সম্পর্কে তিনি আস্থাজ্ঞাপক যে প্রস্তাব ফরাসী জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করিয়াছিলেন, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) তাহার পক্ষে ২৭৩ ভোট এবং বিরুদ্ধে ৩১৯ ভোট হওয়ায় বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি পরাজিত হন এবং পদত্যাগ করেন। ২৩৩ দিন অর্থাৎ ৩৩ সপ্তাহ প্রধান মন্ত্রিত্ব করিবার পর ৩৪শ সপ্তাহ মেঁদে ফ্রাঁসের পতন হইল। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে এ পর্য্যন্ত ২১টি গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জোসেফ লানিয়েলের গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘস্থায়ী গবর্ণমেণ্টগুলির অন্যতম। তাঁহার গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী হয় ৫০ সপ্তাহ। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুম্যান গবর্ণমেণ্ট এবং ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে কুইলে গবর্ণমেণ্ট তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু ফ্রান্সের মুক্তির পর গঠিত দ্য গল গবর্ণমেণ্টের কথা বাদ দিলে কুইলের প্রথম গবর্ণমেণ্টই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। এই গবর্ণমেণ্ট ৫৫ সপ্তাহ ৫ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধোত্তর ২১টি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের গড়পড়তা স্থায়িত্বকালের কথা বিবেচনা করিলে মেঁদে ফ্রাঁসের গবর্ণমেণ্ট যে গড় কাল অপেক্ষা বেশী স্থায়ী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি কোনও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে দুইটি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই সেই দুইটি দুরূহ কার্য্য করিবার পর উত্তর-আফ্রিকা সংক্রান্ত নীতির প্রশ্নে মেঁদে ফ্রাঁস গবর্ণমেণ্টের পতন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

মেঁদে ফ্রাঁস গবর্ণমেণ্টের পতন শুধু উত্তর-আফ্রিকা নীতির জন্যই হইয়াছে কি না, না, উহা শুধু একটা উপলক্ষ্য দাঁড়াইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তিনি যে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলে তাহা আশঙ্কা সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। তাঁহার উদারনৈতিক বামপন্থী নীতিতে রক্ষণশীলরাও শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। টিউনিশিয়া ও আলজিরিয়ায় যে-সকল ফরাসী বাস করে, তাহারা টিউনিশিয়া ও আলজিরিয়া সম্পর্কে মেঁদে ফ্রাঁসের নীতির ঘোর বিরোধী। তাঁহার গবর্ণমেণ্টে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার না পাওয়ায় এম-আর-পি দলও সন্তুষ্ট নয়। হয়ত এই সকল কারণের সবগুলির মিলিত প্রতিক্রিয়া তাঁহার পতনের কারণ। কিন্তু উত্তর-আফ্রিকার ফরাসী

উপনিবেশগুলি সম্পর্কে মেঁদে ফ্রাঁসের নীতি সত্যই খুব উদার, এ কথা বলা না গেলেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট সমূহের তুলনায় তিনি যে কতকটা নরম নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় পরিষদে বিতর্কের শেষ উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, টিউনিশিয়াতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট সমূহের আমলে ৫ হাজার বন্দী ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা কয়েক শতের বেশী নহে। ইহারা প্রায় সকলেই সাধারণ অপরাধী। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পায়, মরক্কোতে বহু লোক বিনা বিচারে তিন চার বৎসর ধরিয়া জেলে পচিতে। ইহাদের মধ্যে বালক পর্য্যন্ত আছে। আট বৎসরের একটি বালক এক বৎসর ধরিয়া জেলে আছে। তিনি অতঃপর বলেন যে, ইহা অপেক্ষাও ভয়াবহ অবস্থা তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি তিনি প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। তিনি জেল খালি করিয়া সকলকে মুক্তি দিয়াছেন, পুলিশের কতকগুলি কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে বদলী করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এগুলি যে ভাল লাগিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। ইন্দোচীন সম্পর্কে তাহাদের ভরসা করিবার তো কিছুই নাই। উত্তর-আফ্রিকায় যেটুকু সাম্রাজ্য এখনও অবশিষ্ট আছে তাহা তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

রক্ষণশীলরা হয়ত ভাবিয়াছেন, প্যারী-চুক্তি যখন অনুমোদিত হইয়াছে তখন মেঁদে ফ্রাঁসের প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইয়াছে। কিন্তু ফরাসী পার্লামেণ্টের উচ্চতন পরিষদ কাউন্সিল অব রিপাবলিককে উহা এখনও অনুমোদিত হওয়া বাকী রহিয়াছে। এই পরিষদে এমন সদস্য অনেক আছেন, যাঁহারা পশ্চিম-জার্ম্মাণীর অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে অধিকতর রক্ষাকবচ দাবী করেন। তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতীয় এজেন্সী গঠনের পক্ষপাতী। যদি উচ্চতন পরিষদে এই সর্ত্ত গৃহীত হয় তাহা হইলে জাতীয় পরিষদে আবার প্যারী-চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইবে। টিউনিশিয়াকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা শেষ হওয়ার পুর্ব্বেই মেঁদে ফ্রাঁসের পতন হইল। সুতরাং মেঁদে ফ্রাঁস টিউনিশিয়াকে যে-স্বায়ত্ত শাসন দিতে চাহিয়াছিলেন তাহার ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার। কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া উত্তর-আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে প্রবল আকারেই দেখা দিবে।

ম্যালেনকভের পদত্যাগ—

মঃ ম্যালেনকভ গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং মার্শাল বুলগানিন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ম্যালেনকভের পদত্যাগ যে বিস্ময়করূপে আকস্মিক, তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনি বেরিয়ার মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর ঘটনা বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অতঃপর তাঁহার ভাগ্যে বেরিয়ার অনুরূপ অবস্থাই ঘটিবে কি না, তাহা যেমন অনুমান করা সম্ভব নয়, তেমনি রাশিয়ার এই যে পরিবর্তন ঘটিল আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহার পরিণাম অনুমান করাও অত্যন্ত কঠিন। পশ্চিমী পর্য্যবেক্ষক মহল নাকি অদূর ভবিষ্যতে রুশ মন্ত্রিসভার রদ-বদলের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কাজেই ম্যালেনকভের পদত্যাগ সকলকেই বিস্মিত না করিয়া পারে নাই। ম্যালেনকভ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী মঃ নিকিটা ক্রুশভের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যে শোনা যায় নাই, তাহা নয়। কিন্তু তিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত না হইয়া তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে দেশরক্ষা-সচিব এবং সোভিয়েট মন্ত্রিমণ্ডলীর ভাইস-চেয়ারম্যান মার্শাল বুলগানিন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। বুলগানিন মার্শাল হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে কোন দিন কোন সৈন্যবাহিনী পরিচালন করেন নাই। কিন্তু দলের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের নিষ্ঠা যেমন অবিচলিত, তেমনি তাঁহার সংগঠন প্রতিভারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ম্যালেনকভের পদত্যাগের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝা যাইতেছে না। তিনি অবশ্য পদত্যাগ-পত্রে পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। সোভিয়েট মন্ত্রিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান মঃ পুজনভ উক্ত পদত্যাগ-পত্র গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন যে, ম্যালেনকভ যে-সকল কারণ দেখাইয়াছেন তাহা সবই সত্য। তথাপি এই কারণগুলিই তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ, এ-কথা নিঃসন্দেহরূপে স্বীকার করা কঠিন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায়, উৎকৃষ্ট কারণের সন্ধান করা হয় এবং তাহাই উল্লেখ করা হইয়া থাকে, প্রকৃত কারণটি চাপা দেওয়া হয়। কাজেই ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে চাপে পড়িয়া ম্যালেনকভ পদত্যাগ করিয়াছেন কিনা, তাহা বলা কঠিন। তাঁহার পদত্যাগ সোভিয়েট নীতিতে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে কি না, তাহা অনুমান করিবার মত এখনও কিছু জানা যায় নাই।

ম্যালেনকভ তাঁহার পদত্যাগ-পত্রে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। কৃষিনীতি সম্পর্কে তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনে তাঁহার অযোগ্যতাকেই পদত্যাগের কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপর চাপ দিয়া যদি পদত্যাগ-পত্র লেখান হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাতে ক্ষমতার জন্য ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা থাকিবে, ইহা আশা করা যায় না। বরং উৎকৃষ্ট কারণের উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক। তাঁহার পদত্যাগের জন্য উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টির আয়োজন যে অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছিল, আজ ম্যালেনকভের পদত্যাগের দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে ষ্টালিনোত্তর রাশিয়ার ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। ষ্টালিনের মৃত্যুর পর যৌথ নেতৃত্বের কথা যখন ঘোষণা করা হইল, তখন ঐ ঘোষণার মধ্যে ষ্টালিনের একনায়কত্বের উপর ইঙ্গিতের আভাস অনেকে পাইয়াছেন। ষ্টালিনের মৃত্যুর পর রচিত রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস ষ্টালিনের ভূমিকা অপেক্ষা লেনিনের ভূমিকারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে মতবিরোধের কোন ইঙ্গিত অবশ্য নাই। কিন্তু আজ উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন নয়। ইহার পর গত ডিসেম্বর (১৯৫৪) সালে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা প্রাভদা এবং সোভিয়েট সরকারী পত্রিকা ইজভেস্তিয়ার মধ্যে শিল্পনীতি লইয়া যে বিরোধ দেখা দেয় তাহাকে ক্রুশেভ এবং ম্যালেনকভের মধ্যে বিরোধ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। বিরোধটা অতি দ্রুত তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। ম্যালেনকভের পদত্যাগের প্রায় এক মাস পুর্ব্বে ১০ই জানুয়ারীর (১৯৫৫) 'struggle for power' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিউজ

ক্রণিক্যাল লিখিয়াছিলেন, "It seems from the signs that a dark and devious struggle for power is taking place now within the Kremlin." কিন্তু এই বিরোধটা ম্যালেনকভের সহাবস্থান নীতি ও ক্রুশেভের ষ্ট্যালিনের নীতিতে প্রত্যাবর্ত্তনের নীতির মধ্যে কি না, ইহাই প্রশ্ন। সহ-অবস্থানের কথা ষ্ট্যালিনই সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছিলেন। ইহার প্রয়োগ লইয়া মতভেদ হইতে অবশ্যই পারে। কিন্তু ষ্ট্যালিনের নীতিতে প্রত্যাবর্ত্তনের অর্থ কি? ষ্ট্যালিন বৃহৎ শিল্প গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ম্যালেনকভ নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহার মীমাংসা হওয়া সহজ ছিল, ম্যালেনকভের পদত্যাগের প্রয়োজন ছিল না।

ক্রুশেভ যদি ষ্ট্যালিনের নীতিতে প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষপাতী, তবে তিনি নিজে প্রধান মন্ত্রী হইলেন না কেন? কিন্তু বুলগানিন যে কত দিন প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন তাহা বলা কঠিন। ষ্ট্যালিন প্রধান মন্ত্রী ও পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী দুই পদেই আসীন ছিলেন। তিনি নিজেই অবশেষে ম্যালেনকভকে পার্টির জে: সেক্রেটারীর পদে বসাইয়াছিলেন। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ম্যালেনকভ প্রধান মন্ত্রী হইয়া ক্রুশেভকে পার্টির জে: সেক্রেটারী করেন এবং যৌথ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। অতঃপর বুলগানিনকে কোন অপবাদ দিয়া সরাইয়া ক্রুশেভ যেদিন প্রধান মন্ত্রী হইবেন সেই দিন তাঁহার একসঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর পদে এবং পার্টির জে: সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠানই হইবে প্রকৃত পক্ষে ষ্ট্যালিনের নীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন। সেদিন কত দূরে তাহা বলা সহজ নয়। ম্যালেনকভকে সহকারী প্রধান মন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ-মন্ত্রী করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বেরিয়ার পরিণতি ঘটিবার সময় এখনও কাটে নাই। ম্যালেনকভের পদত্যাগে রাশিয়ায় যে পরিবর্ত্তন ঘটিল আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, রুশ পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে উহার পরিণতি কি হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়। সহ-অবস্থান নীতির প্রয়োগ সহজ করার প্রতি ম্যালেনকভের যে আগ্রহ ছিল নূতন গবর্ণমেণ্টের আমলে তাহা হঠাৎ বর্জ্জন করা হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্য মলটভ যে সর্ব্বশেষ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহাতে সহ-অবস্থানের আগ্রহ বর্জ্জন বুঝা যায় না। কিন্তু পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করাকে রাশিয়া বিশেষ আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, ইহাও স্বাভাবিক। প্রধান মন্ত্রী হইয়া বুলগানিন যে প্রথম বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে বৃহৎ শিল্পের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার সামরিক প্রস্তুতির সহিত উহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার পাল্টা জবাব হিসাবে রাশিয়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়।

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী-সম্মেলন—

লণ্ডনে সপ্তাহব্যাপী কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫৫) কমনওয়েলথের অন্তর্গত নয়টি দেশের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন আরম্ভ হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী এই সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন হইয়াছিল ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ডের রাণীর রাজ্যাভিষেকের সময়। হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পর ইহা-ই প্রথম কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন। ফরমোসা লইয়া সঙ্কটের ফলে এই সম্মেলনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মেলনে কি আলোচনা হইয়াছে, কোন্ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাঁহারা একমত হইয়াছেন, প্রকাশিত ইস্তাহার হইতে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। প্রকাশিত ইস্তাহার কতকগুলি বন্ধ্যা শুভেচ্ছার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারত ও সিংহলকে বাদ দিয়া কমনওয়েলথের অন্যান্য প্রধান মন্ত্রিগণ আঞ্চলিক রক্ষা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলন হইতে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে ম্যানিলা চুক্তিতে যোগদানকারী অন্যান্য দেশের সহিত বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড একযোগে এই অঞ্চলে সক্রিয় রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এই ইস্তাহারের সহিত কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী-সম্মেলনের ইস্তাহারের পার্থক্য বুঝিতে কষ্ট হয় না।

কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীরা পরমাণু শক্তি সমস্যা যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা এই শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, নূতন অস্ত্রের গণ-নিধন ক্ষমতার কথা বিবেচনা করিয়া স্থির মস্তিষ্কে যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করাই ভাল। আমাদের কাছে ইহা 'বাল্যশিক্ষার' পাঠের মতই শুনাইতেছে। পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ করণ ও নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা এ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই আলোচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ভরসা করিবার কিছুই নাই। সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীরা সকলে একমত হইয়াছেন যে, সুদূর প্রাচ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁহারা মনে করেন, ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সম্মেলনে তাঁহারা কোন শান্তিপূর্ণ পথের সন্ধান করিয়াছিলেন কি? সন্ধান করিয়া কি কোন পথের সন্ধানই তাঁহারা পান নাই? জেনেভা সম্মেলনের ধরণের কোন সম্মেলনের দ্বারা ফরমোসা সমস্যা সমাধানের কথা তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন কি? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি এ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই? মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের হুকুম না পাইলে কিছু করা সম্ভব নয় বলিয়াই কি এইরূপ কোন সম্মেলনের প্রস্তাব তাঁহারা করেন নাই?

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫।

—প্রচ্ছদ-পট পরিচিতি—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রটি পুরানো এবং নূতন দিল্লীর পরিবেশ চিত্র বা Panoramic View. দিল্লীবাসী যাঁরা দিল্লী দেখেছেন, তাঁরা এই চিত্রে খুঁজে দেখুন জুম্মা-মসজিদ, কাশ্মীর, লাহোর, আজমীর, তুরকমান, মুরী আর দিল্লী গেট। যমুনা নদী, চাঁদনী চক, সেণ্ট জেমস চার্চ্চও খুঁজে পাওয়া যায়। চিত্রটি এক অজ্ঞাত ব্রিটিশ-শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৬

গোলমাল এমন বিশেষ কিছুই নয়।

যাযাবর একটা ইরাণী মেয়ে আর জোয়ান একটা ছেলে। মেয়েটা নেচে নেচে গান গাইছে আর ছেলেটা বাজনা বাজাচ্ছে।

মেয়েটি যুবতী। সুন্দরীও বলা চলে। গায়ের রং ফর্সা। পরনে রঙীন একটা ঘাঘ্‌রা। গায়ে একটা আঁট্‌-সাঁট্‌ জামা। ছেলেটার মাথায় বাব্‌রিকাটা চুল। কোমরে একটা হারমোনিয়াম বাঁধা। বলিষ্ঠ জোয়ান। কিন্তু সুপুরুষ বলা চলে না।

এদেরই দেখবার জন্যে ছেলে-ছোক্‌রার দল ছুটে এসে ভিড় জমাচ্ছে রাস্তার ওপর।

গোলমালটা তাদেরই।

বুড়োশিব বললে: এই এক আপদ এসে জুটেছে। তোমার মনে আছে সীতারাম? আমরা যখন ছোট ছিলাম•••

সীতারাম বললে: গ্র্যাণ্ড্‌ ট্রাঙ্ক্‌ রোডের পাশে ওদের তাঁবু পড়তো। আমরা দেখতে যেতাম।

বুড়োশিব বললে: এখন আমাদের যেতে হয় না। ওরাই আসে কলিয়ারীর পয়সার লোভে।

সীতারামের কিন্তু এ-সব কথা ভাল লাগছিল না। তখনও সে ভাবছিল দেবুর কথা, তার ছেলে রঞ্জনের কথা আর তার মেয়ের বিয়ের কথা।

বুড়োশিবের কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই। একটানা সে বলে চলেছে: ওরা ভবঘুরে যাযাবর। ঘরবাড়ী বলে' কোনও বস্তু ওদের নেই। এমনি পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই ওদের কাজ। পথেই জন্ম, পথেই মৃত্যু।•••পয়সা রোজগারের জন্যে ওরা কত রকমের কত করে। চুরি-ডাকাতিও করে, আবার নকল জটা মাথায় দিয়ে ছাই মেখে সাধু সেজেও ঘুরে বেড়ায়। মেয়েরা নাচে গায়, ম্যাজিক দেখায়, ওষুধ বিক্রি করে, হাত দেখে—ভাগ্য-গণনা করে।

সীতারাম বললে: জানি।

বুড়োশিব তার মুখের পানে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

সত্যিই তো! কার কাছে বলছে এ-সব কথা!

—কিন্তু কি তুমি ভাবছো সীতারাম? তোমার মেয়ের বিয়ের কথা ভেবো না। এ বিয়ের দায়িত্ব আমি নিলাম।

সীতারামের মুখে ম্লান একটু হাসি দেখা গেল।

বুড়োশিব বললে: তুমি হাসছো সীতারাম? আমার কথাটা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

সীতারাম বললে: না। তুমি আসবার ঠিক আগেই দেবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়ে গেছে।

বুড়োশিব বললে: আমার মন কিন্তু বলছে—হবে। আচ্ছা বেশ, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।

সীতারাম বললে: ত্যাখো।

বিয়ের কথাটা আর বেশি দূর অগ্রসর হ'লো না। রাস্তার গোলমালটা সীতারামের বাড়ীর ফটকের কাছে এসে গেল।

মেয়েটা নাচ থামিয়ে ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সীতারামকে দেখেই মুসলমানী কায়দায় কুর্ণিশ করতে করতে বললে: বাবুজি!

বখ্‌শিস্‌ না নিয়ে যাবে না। বলেই সীতারাম বোধ করি পয়সা আনবার জন্যে বাড়ীর ভেতর চলে যাচ্ছিল।

বুড়োশিব বললে: যেতে হবে না! আমি দেখছি। বলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বুড়োশিব বললে: কলিয়ারীর দিকে যা না! এখানে কেন?

মেয়েটা সে কথায় কানই দিলে না। বললে: নাচবো?

ছেলে-ছোকরার দল হো-হো করে হেসে উঠলো।

বুড়োশিব একটা আধুলি ছুঁড়ে দিলে মেয়েটার পায়ের কাছে। বললে: নাচতে হবে না। যা।

আধুলিটা হাসতে হাসতে কুড়িয়ে নিয়ে আবার তেমনি কুর্ণিশ করতে করতে চলে গেল মেয়েটা।

লোক-জন ছুটলো তার পিছু-পিছু।

বুড়োশিব ঘরে ফিরে এসে বসতেই দেখা গেল, মালা চা নিয়ে এসেছে।

চায়ের কাপটি টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে মালা বললে: ওকে তাড়িয়ে দিলেন কেন জ্যেঠামশাই?

বুড়োশিব কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করলে: কাকে?—ওই মেয়েটাকে?

মালা বললে: হ্যাঁ, আমি তাড়াতাড়ি এলুম ওর গান শুনবো বলে।

সীতারাম বললে: ও আবার আসবে। বুড়োশিব ওকে বখশিস্ দিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটার আসার আশায় বসে রইলো মালা।

সে দিনটা তো এক রকম কেটে গেল বুড়োশিবকে নিয়ে। এত দিন পরে এসেছে পিতৃবন্ধু অতিথি! খাবার আয়োজন মা ও মেয়ে দু'জনে মিলে মন্দ করলে না। কিন্তু বৃথা আয়োজন।

বুড়োশিব বললে: একে তো শিব অতি সামান্য পেলেই খুশী হয়। তার ওপর বুড়ো—চিবোবার দাঁত পর্য্যন্ত নেই। কাজেই এত সব আয়োজন মিছেমিছি করেছো মা!

মালা তবু তাকে বসে বসে খাওয়ালে।

কাঞ্চন রইলো দোরের অন্তরালে দাঁড়িয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটুখানি বিশ্রাম করে বুড়োশিব বললে: এবার আমি যাই সীতারাম! মালার বিয়ের জন্যে তুমি ভেবো না ভাই, বিয়ের ভার আমি নিলাম।

মালা গড় হয়ে প্রণাম করলে বুড়োশিবকে।

কাঞ্চন বললে: আশীর্ব্বাদ করুন, ও যেন মনের মত স্বামী পায়।

কাঞ্চনকে দেখা গেল না, কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল।

বুড়োশিব হো-হো করে হেসে উঠলো। অদ্ভুত সুন্দর তার এই হাসি! যেমন নিষ্কলঙ্ক, তেমনি নিরাভরণ!

বললে: মায়ের মন কি না! এ ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই। চল সীতারাম! আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে, চল।

দু'জনে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে।

ওরাও বেরিয়ে গেল, মালাও তার পেতলের কলসীটি কাঁখে তুলে নিলে।

মা দেখতে পেলে। বললে: কোথায় যাচ্ছিস?

মালা বললে: মুখুজ্যে-পুকুরে। চট্ করে' যাব আর আসবো।

কাঞ্চন বাধা দিলে। বললে: না, যেতে হবে না। কলসী রাখ্।

মালা তবু এগিয়ে গেল দোরের দিকে। বললে: আমার দেরি হবে না মা, তুমি ভাখো।

কাঞ্চন বললে: অনেক দেখেছি মা, আর আমাকে কিছু দেখাতে হবে না। ডাকবো তোর বাবাকে?

তোমাকে ডাকতে হবে না, আমি ডাকছি।

সীতারাম তখনও বেশি দূর যায়নি। মালার ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ালো।

বাবা! বাবা!

সীতারাম বললে: কি বলছিস?

মালা বললে: শোনো। মা তোমাকে ডাকছে।

বুড়োশিব চলে গেল। সীতারাম ফিরে এলো।

কি রে? কি বলছিস?

মালা বললে: ভাখো বাবা, মা আমাকে বাড়ী থেকে বেরুতে দিচ্ছে না।

সীতারাম বললে: কেন গো, মালাকে বেরুতে দিচ্ছ না কেন?

কাঞ্চন জবাব দেবার আগেই মালা বলে উঠলো: শুনলে মা, বাবা কি বলছে? আমি চললুম।

বলেই সে চলে যাচ্ছিল।

কাঞ্চন ডাকলে: মালা!

মালার আর এগিয়ে যেতে সাহস হলো না। থমকে থামলো।

কাঞ্চন মালাকে কিছু বললে না। বললে সীতারামকে। মাথাটা কি তোমার খারাপ হয়ে গেল নাকি? মুখুজ্যে-পুকুরে মালা যাবে জল আনতে?

মালা বললে: হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে।—যাব না বাবা?

সীতারাম বললে: কেন যাবে না? হ্যাঁ যাও।

মালা হাসতে হাসতে তার মার মুখের পানে তাকিয়ে বললে: হ'লো তো?

কাঞ্চন সে দিকে ফিরেও তাকালে না। সীতারামকে বললে: তুমিই বললে আবার তুমিই যেতে দিচ্ছ! মুখুজ্যে-পুকুরে দেবু চাটুজ্যের ছেলের সঙ্গে যদি দেখা হয় আর কেউ যদি কিছু বলে, তখন যেন কিছু বোলো না।

এতক্ষণ পরে সীতারামের যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। বললে: হ্যাঁ হ্যাঁ তাও তো বটে! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মুখুজ্যে-পুকুরে? না না, ওরে ও মালা, শোন্ মা শোন্! যাস্‌নে, ফিরে আয়। দেবু হয়তো বলবে, আমার ছেলে যায় না, তোমার মেয়েই আসে।

কথাটা শুনে লজ্জায় মালা আর মুখ তুলে তাকাতে পারলে না। যেমন গিয়েছিল আবার তেমনি মাথা হেঁট করে ফিরে এলো। কাঁখের কলসীটা টিপ করে নামিয়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সীতারাম চলে যাচ্ছিল, কাঞ্চন তার কাছে গিয়ে বললে, শোনো। যেখান থেকে পাও যেমন করে হোক্ একটি পাত্র দেখে মালার বিয়েটা দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। তার জন্যে আমাদের যা কিছু আছে বেচে দিয়ে যদি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়—তা'ও ভালো।

সীতারাম কি যেন ভাবছিল। ভাবতে ভাবতেই বললে: হুঁ।

আজ তার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। কি যে করবে কিছুই সে ঠিক করতে পারছে না।

বললে: বুড়োশিব একবার চেষ্টা করে দেখবে।

কাঞ্চন বললে: তবে যে বলছো কোন্ রাজার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে দেবু চাটুজ্যে?

সীতারাম বললে: তাই তো বললে।

কাঞ্চন বললে: তাহ'লে আর মিছেমিছি চেষ্টা করবে। তবে একটা কাজ তুমি করতে পারো।

কি কাজ?

কাঞ্চন বললে: রঞ্জনকে চুপি চুপি যদি একবার আমার কাছে আনতে পারো তো আমি একবার বলে-ক'য়ে দেখতে পারি।

সীতারাম বললে : বাপের অমতে সে কি কিছু করতে পারবে ?

কাঞ্চন বললে : কচি খোকা তো নয় ! মালার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাব তো করতে পেরেছে ! তুমি বরং সেই চেষ্টাই কর। শুনলুম মুখুজ্যে-পুকুরে রোজই আসে। দেখতে পেলে তুমি একবার তাকে ডেকে নিয়ে এসো আমার কাছে।

চেষ্টা করবো। বলেই সীতারাম চলে গেল সেখান থেকে।

দোতলার ব্যাল্‌কনি থেকে মুখুজ্যে-পুকুরের খানিকটা দেখা যায়। মালা রোজই বিকেলে সেই ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিনও দাঁড়িয়ে ছিল। দেখলে, তাদেরই বাড়ীর সুমুখ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ইরাণী একটা মেয়ে। সেদিন যে-মেয়েটি নেচে-গেয়ে পয়সা নিয়ে গেল, এই মেয়েটিই সেই মেয়ে কি না তাই বা কে জানে !

মালা ডাকলে : এই ! এই মেয়েটা ! শোন্ ?

মেয়েটি মালার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে' হাসলে।

মালা বললে : আয় না আমাদের বাড়ীতে।

মেয়েটি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বললে : যাচ্ছি।

মালা নীচে নেমে এলো।

মেয়েটি ততক্ষণে ফটক পেরিয়ে বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাঞ্চন বললে : ওকে কি জন্যে ডাকলি ?

মালা বললে : গান শুনবে না ?

মেয়েটি বললে : আজ তো আমি গান শোনাতে পারবো না। বাজনাওলা নেই।

মালা জিজ্ঞাসা করলে : সে-লোকটা গেল কোথায় ?

মেয়েটি হেসে বললে : ঝগড়া হয়ে গেছে।

কাঞ্চন বললে : সে তোর কে হয় ? বর ?

মেয়েটি বললে : বর কেন হবে ! আমার এখনও সাদি হয়নি।

কাঞ্চন বললে : ও মা, সে কি কথা ! এখনও বিয়ে হয়নি তোর ?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানালে : না।

তোর নাম কি ?

চুম্‌কি।

তোর মা আছে ? বাবা আছে ?

না। কেউ নেই।

মালা বললে : দেখেছো মা, চুম্‌কি কি রকম বাংলা বলছে !

চুম্‌কি বললে : আমি এই বাংলা দেশেই জন্মেছি যে।

কাঞ্চন বললে : তোদের আবার এ-দেশ ও-দেশ কি ? তোরা সারা জীবন তো শুধু পথে-পথেই ঘুরে বেড়াস্।

চুম্‌কি বললে : হ্যাঁ মা, পথেই আমাদের ঘর-বাড়ী, পথেই আমাদের সব। পথেই জন্মাই আবার পথেই মরি। বসবো এইখানে ?

কাঞ্চন বললে : নাচবে না, গান শোনাবে না, তো বসবে কি জন্যে ?

চুম্‌কি বললে : কাল আবার আসবো। বাজনাওলা একজন নিয়ে আসবো সঙ্গে করে। নাচ দেখাবো, গান শোনাবো।

মালার মা বললে : তবে আর আজকে মরতে এলে কেন বাছা ! যাও বাড়ী যাও।

চুম্‌কি বললে : রাগ করে' তাড়িয়ে দিচ্ছিস কেন মা ? আমি খারাপ মেয়ে নই।

চুম্‌কি বসলো। বললে : আচ্ছা দ্যাখ্, একটা মজা দেখাই। একটা ফুলের নাম বল্ !

মালা বললে : ফুলের নাম ? কেন ?

চুম্‌কি বললে : বল না ভাই !

কাঞ্চন বললে : আচ্ছা আমি বলছি। জবা ফুল !

চুম্‌কি বললে : জবা ? বেশ।

বলেই সে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে কি যেন ভেবে নিলে। তার পর চোখ খুলে বললে : মেয়ের বিয়ের জন্যে মন খুব খারাপ।

কাঞ্চন বললে : ও মা, তুই হাত দেখতে জানিস ?

চুম্‌কি বললে : না মা, হাত আমি আগে দেখতাম। এখন আর হাত দেখি না। মুখ দেখেই সব বলে দিই।

কাঞ্চন বিশ্বাস করলে না তার কথা। বললে : হ্যাঁ ভারি বাহাদুর তুই ! মুখ দেখে সব বলে দিবি ! খালি পয়সা নেবার ফিকির ! মেয়ের কপালে সিঁদুর নেই, এত বড় আইবুড়ো মেয়ে—এখনও বিয়ে হয়নি, তার জন্যে মন খারাপ—এ কথা সবাই বলতে পারে।

চুম্‌কি বললে : না মা পারে না। কেন রাগ করছিস্ কেন, দ্যাখ না শেষ পর্য্যন্ত।

মালা বললে : দ্যাখোই না মা—

কাঞ্চন বললে : অনেক দেখেছি মা, ও রকম বুজরুকি আমি অনেক দেখেছি মা, তোরাই দ্যাখ !

এই বলে' কাঞ্চন চলে গেল।

মালা বললে, মা থাকৃগে, তুই বল্ চুম্‌কি!

চুম্‌কি মা'র দিকে তাকিয়ে ছিল; মাকে যখন আর দেখা গেল না, তখন মুখ ফেরালে মালার দিকে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে: একটি ছেলেকে তুই ভালবেসেছিস। বল্ সত্যি কিনা!

মালা একটু হেসে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলে—সত্যি।

চুম্‌কি বললে: তার সঙ্গে বিয়ে না হলে তোর কষ্ট হবে। না?

মালা বললে: হ্যাঁ।

চুম্‌কি বললে: কিন্তু এখানে তোর বিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। মালার মুখখানা শুকিয়ে গেল। বললে: বিয়ে এখানে হবে না?

না হবারই তো কথা! মস্ত একজন বড়লোক আট্‌কাচ্ছে।

এখন আর চুম্‌কিকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই!

মালা এদিক ওদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলে তার মা আসছে কি না। তার পর চুম্‌কির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে: কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারিস না?

চুম্‌কি বললে: পারি। নিশ্চয় পারি।

মালা হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা ধরে' ফেললে: তাহ'লে তাই করে দে ভাই! করে যদি দিতে পারিস, আমি তোকে—তুই কি চা'স্ বল্!

চুমকি হেসে বললে: আমি যা চাইবো তাই দিবি?

মালা বললে: দেবার ক্ষমতা যদি আমার থাকে—

চুম্‌কি হাসতে লাগলো। যেমন সুন্দর দাঁত, তেম্‌নি হাসি!

মালা বললে: হাসছিস যে?

চুম্‌কি বললে: তোর যখন বিয়ে হবে আমি তখন কোথায় কোন্ দেশে থাকবো তার কি কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? দিবি কা'কে? তার চেয়ে শোন্, কাল আমি আবার আসবো, তোকে একটা মাদুলি দিয়ে যাব, হাতে রাখবি, গলার হারেও রাখতে পারিস। তখন দেখবি কি হয়।

মালা জিজ্ঞাসা করলে: কি হবে?

যাকে ভালবাসিস্ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আসবে, তোর সঙ্গে দেখা করবে, চিঠি লিখবে, তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে চাইবে না।

মালা বললে: মাদুলির দাম কত দিতে হবে?

চুম্‌কি বললে: দাম দশ টাকা। বিশ্বাস হয় তো দে, আর নয় তো বল্ আমি চলে যাই।

মালা বললে: না না যা'স্ না।

বলেই দু'পা এগিয়ে গেল। ভাবলে, মার কাছ থেকে চেয়ে আনে দশটা টাকা। কিন্তু না, চাইতে পারবে না। চাইলে দেবেও না। মালা থমকে থামলো। আবার ফিরে এলো চুম্‌কির কাছে। বললে: আজই দিতে হবে? কাল দিলে হয় না?

চুম্‌কি হাসলে। কথায় কথায় হাসি। মনে হয় দুঃখ যেন ওকে স্পর্শ করতে পারে না। বললে: বুঝেছি।

কি বুঝেছিস?

চুমকি বললে: তোর কাছে টাকা নেই। মা'র কাছে চাইতে লজ্জা হচ্ছে।

মালা বললে: মনের কথা তুই কি সবই বুঝতে পারিস না কি?

চুমকি বললে: পারি।

মালা কি যেন ভাবলে। তার পর চট করে হাতের একগাছা সোনার চুড়ি খুলে চুমকির হাতে গুঁজে দিয়ে বললে: এইটে নিয়ে যা। কাল মাদুলি আনবি। সকালেই আনবি কিন্তু। আমি তোর আশায় বসে থাকবো।

চুম্‌কি বললে: সকালে আমি আসতে পারবো না ভাই! আমি আসবো বিকেলে।

মালা বললে: তাই আসিস। কিন্তু শোন, গান শোনাতে আসবি। মাদুলিটা চুপি চুপি দিবি আমার হাতে—মা যেন না জানতে পারে।

চুমকি বললে: তা না হয় জানতে পারবে না। কিন্তু এই কাজটা তোমার ভাল হলো না দিদিমণি! নিজের হাতের সোনার চুড়ি—

কথাটা মালা তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে—আঃ, চুপ! মা শুনতে পাবে। ভাল-মন্দ আমি বুঝবো। তুই যা।

এই বলে তাকে এক রকম জোর করে' ঠেলে বিদায় করে' দিতে চাইলে মালা। চুমকিও তেমনি জোর করেই চুড়ি-গাছটা মালার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালালো। যাবার সময় বলে গেল: টাকা আমি চাই না দিদিমণি! কাল আমি আবার আসবো তোমাদের জ্বালাতে। [ক্রমশঃ।

চলে যাবো আমি

এলা বসু

কে যেন আমায় ডেকে চলে গেছে আঁখির কোণে,
মন তাই আজ উতলা আমার ক্ষণে ক্ষণে!
হৃদয়ে বিছানো ছায়াপটখানি
দোলায় তার সে নামহারা বাণী।
সহসা যে এখন ভোরের বেলায় অকারণে,
সে যেন আমায় ডেকে চলে গেল আঁখির কোণে!

তারি সেই সুর লেগেছে আজ আকাশে-বাতাসে,
নদী-তীরে-তীরে পল্লব-শাখার দীর্ঘশ্বাসে।
মনে হয় দূর স্মরণের পারে,
সে বুঝি ডেকে ফিরেছে আমারে,
অতন্দ্র প্রহর বসিয়া মোর পরাণ পাশে।
তারি সেই সুর লেগেছে আজ আকাশে-বাতাসে!

তাহারে খুঁজিতে বাহির হয়েছি দেশান্তরে,
কোন্ পথ দিয়ে সে চলে গেছে কে বলিতে পারে?
বন-বীথিকার ভিজে ঘাসগুলি
লয়েছে কি সে পদচিহ্ন তুলি,
কুসুম রেখেছে তাহার গন্ধ হৃদয় ভরে?
সেই পথ ধরে চলে যাব আমি দেশান্তরে!

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিল্‌যুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
প্রকৃত সৌন্দর্য্য
ফুটিয়ে তুলতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রসূ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
BLENDED WITH CADYL

জর্জ-মাইকেল

ওরা দু'জনে আবার যখন একত্র মিলল তখন মোদক্ হারিকট ক্রুজকে ঐ অঞ্চলের এক রেস্তোর'ায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। অনেকক্ষণ ইতস্তত: করলো, স্থান নির্বাচন আর হয় না। শেষ কালে প্রায় রাত দশটার সময় সোজা গিয়ে ঢুকলো রু দ্য চাপেলের এক বীভৎস মদের দোকানে।

মোদক্ বলে ওঠে—"চমৎকার! এখানে অন্তত: যেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে সেখানকার মত কুৎসিত মগ নেই। যত সব কেরাণী আর চাকর-বাকরের ভীড়। মাদাম লা পাতরোঁ এখন আমাদের একটু উত্তম মদ্য পরিবেশন করো। রোমে দেস্‌পেরো যে মদ দিয়েছিল তার কথা মনে আছে?"

মোদক্‌র যখনই মনে হ'ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে হারিকট তার বাসনায় বাধা জানাবে তখনই সে রোমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতো। গরীব মেয়েটির মুখে ম্লান হাসির রেখা দেখা গেল। পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই এই মেয়েটিকে সে বেদনা দেবে না। ঠকাবে না। অনেক কষ্ট মোদক্ পেয়েছে ও পাচ্ছে। নিজের জন্যই তার এই কষ্ট। হারিকটের স্ফীত দেহের দিকে সবাই তাকাচ্ছে দেখে চোখে একটা আনন্দের রেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো মোদক্। হারিকট বললে······"ওরা যদি জানতো।"

কে একজন বললো—"মোদক্ কাল কি কাজ হবে?"

"হ্যাঁ—" এখন মাদাম অনুগ্রহ করে আরেক বোতল মদ দাও।"

"কিন্তু ইতিমধ্যেই ত' তিন পাত্র টেনেছে?"

"আমার কাছে টাকা আছে······"

"তোমার কিন্তু শরীর খারাপ হবে, স্বাস্থ্য নষ্ট হবে।"

"আমি ভালোই আছি, আজ রাতে ত' আর কাজ করবো না।"

চার বোতল মদ্য পান করলো মোদক্, এমন কি হারিকটের জন্য আনালো লিকিয়োর মদ্য পর্যন্ত।

তার পর পথে বেরিয়ে গান ধরলো।

ওদের মুখে-চোখে বৃষ্টি পড়ছে, শীতের চাপে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। তবু বাড়ির পানে গিয়ে মোদক্ উত্তর দিকে চললো। সেখানকার বাতাস তবু অনুকূল। পথের পাশে রাজমিস্ত্রীর একটা লম্বা ভারা দেখে মোদক্‌র খেয়াল হ'ল তার ওপর উঠবে, তা হলেই সব ঠিক হবে।

ভালো করে ধরতে গিয়ে হাত পিছলে মাটিতে পড়লো মোদক্।

হারিকট চেঁচিয়ে ওঠে—"মোদক্, উঠে পড়ো।" কিন্তু মোদক্‌র অবস্থা নিশ্চল নিশ্চুপ! হারিকট লক্ষ্য করলো মোদক্‌র মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। সাহায্য প্রার্থনা করে ডাকতে থাকে মোদক্,—কিন্তু তখন প্রায় মধ্য রাত্রি, দশ মিনিটের মধ্যে সে পথে কেউ এলো না। এমন সময় এক আনাজ-বেপারী তার ছেকরা গাড়ির ওপর থেকে জানালো সে একটা পুলিশ ডেকে আনছে।

প্রায় পনের মিনিট পরে দু'টি পাহারাওলা এসে হাজির হ'ল। বিরক্তি ভরে মোদক্‌কে টেনে নিয়ে তারা থানায় গেল। মোদক্‌র জ্ঞান হল না, আর হারিকট জানালো যে ওরা প্যারীর অপর প্রান্তে থাকে, তখন সার্জেন্ট বাইসিকল-পিওন পাঠিয়ে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালো। ডাক্তার এসে দেখে বললেন "এখনই হাসপাতাল পাঠাও।" হারিকট ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "অবস্থা কি বিশেষ গুরুতর?" সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না ডাক্তার সাহেব। মোদক্ এবং পাহারাওলাদের সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকসিতে উঠলো হারিকট।

ঐ অঞ্চলের হাসপাতালের ফটকে গাড়ি থামলো—প্রকাণ্ড এক পাঁচীলের ধারে নামলো হারিকট। ওর চোখের সামনে লোহার ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কান্না চাপার চেষ্টা করে হারিকট। তার পর ধীরে ধীরে রু ভার্সিনজেট্রিয়ের দিকে চললো।

ওর পকেটে একটি পয়সাও নেই। একপাটি জুতোর কাঁটা উঠেছে, ফাটল দিয়ে জল ঢুকছে, পায়ে লাগছে বেশ। শরীরের ভাব অতি ক্লেশজনক—কোনো রকমে দেওয়াল ধরে চলেছে হারিকট।

পঁচিশ

পরদিন প্রভাতে যখন হারিকটের ঘুম ভাঙলো তখন সে অতি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও শীতে জর্জরিত। সেই কাদা-মাখানো বিশ্রী পোষাকেই সে ঘুমিয়েছে, আসন্ন সন্তান ও আপনার দেহটিকে যথাসম্ভব উত্তাপ দান করেছে।

খানিকটা অভ্যাস বশে লা রোতন্দের একটা টেবলের সামনে গিয়ে বসলো হারিকট।

"কি দেব?"

জীবনে এই সর্বপ্রথম ওয়েটার এসে ওর কাছে অর্ডার নিচ্ছে। কি বলবে হারিকট? অতি কষ্টে সে বলল—"না:, কিছুই চাই না, আজ আমি বড় ক্লান্ত···"

মুখভঙ্গী করলো ওয়েটার, সে যেন বিব্রত বোধ করছে। নি:সন্দেহে তার নতুন মনিব কিছু একটা হুকুম দিয়েছে, তাই সে এতটা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। তারপর হারিকটের কর্দমাক্ত পোষাক, স্ফীতোদর, আর ক্লান্ত মুখ দেখে করুণা পরবশ হয়ে বলল —"আচ্ছা, আমি এক পাত্র চকোলেট এনে দিই, আমাকে পরে দাম দিলেই হবে।"

ধন্যবাদ জানিয়ে সেই উষ্ণ পানীয় পান করে সে যেন তার দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণীটিকে পরিতৃপ্ত করলো। মুখে হাসি ফুটলো হারিকটের। আশে-পাশের দু'-একজনের দিকে সস্মিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো হারিকট।

রাত পর্যন্ত বসার জন্য ওকে আর কিছু কিনতে হবে না, জায়গাটিও ভালো, একেবারে গরম উনানের ধারে, চমৎকার! রাশিয়ানরা লোক তেমন খারাপ নয়, যখন বোঝে সবাই ওদের পানে তাকিয়ে আছে, তখন অন্তত: ওকে তাড়িয়ে দেবে না। সবাই ওর পরিচয় জানে—ওয়েটারের এই সহৃদয়তাই তার প্রমাণ।

মোদক্‌র কথা ভাবছে হারিকট,—তবে সে পুরুষ মানুষ, মানুষের মত মানুষ, ওর নাম শুনলেই ডাক্তাররা ভূমিষ্ঠ হয়ে অভিবাদন জানাবেন।

লাঞ্চ শেষ করে রাশিয়ানরা দুপুরের দিকে এল। ব্লুমেন ফিওও এলেন, ইদিশ ভাষায় তিনি একজন কৃতী অনুবাদক।

মৃগেন্দ্রবং মাথা, চৌকস মুখ, লেলিহান শিখার মত মাথার চুল জলছে,—স্যাতিনের মত ওর চোখ দুটি সুন্দর, পবিত্র ও স্পষ্ট। ট্রটসকী চলে যাওয়ার পর উনিই এখন রুশ রসিয়ারের ক্যাপ মেকার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী। প্রতি সপ্তাহে ইদ্দিশ ভাষায় পৃথিবীর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। স্পীনোজার এই সব কুশ্রী স্বজনবর্গের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা দৈনন্দিন রুটির চাইতেও অধিক। লা রোতন্দের শ্বেত-পাথরের টেবলের ওপর ওরা অবলীলা ক্রমে তালমুদীয় বাণী লিখতে পারে: "তিন জন প্রাণী একই টেবলে বসে যদি জ্ঞানের কথা আলোচনা না করেন, তাহ'লে তাঁরা মৃত মানুষের সমতুল্য।"

ওদের দেখে মনে হয়, মৃত মানুষের পুনর্জীবন ঘটেছে, তাই পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সবাই অবিশ্রান্ত রকমের কর্মে ব্যস্ত,—আর তার ভিতর একটু ফাঁক পেলেই কাফের টেবলে এসে বসে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমুল তর্ক করতে বসে যায়।

এই ভাবেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটালো হারিকট।

কিন্তু পরদিন ক্ষুধায় সে অতিশয় কাতর হয়ে পড়লো, এমনই প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না যে ঠিক ছটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল, এবং দুর্জ্জয় হয়ে উঠলো পেটের জ্বালা। লা রোতন্দে ছুটলো হারিকট, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস হল না। লা রোতন্দের সামনে সে পায়চারী করতে থাকে, একদা স্যাতিনে কিংবা ক্রেমেনও এই রকম করত, এমন কি কেউ আমন্ত্রণ করলেও ভেতরে ঢুকতে সাহস করতো না। কিন্তু হারিকট বিরাট ডাইনিং রুমটার দিকে তাকিয়ে নেই, তার দৃষ্টি বারের দিকে, কফিপাত্র থেকে উষ্ণ বাষ্প ধূমায়িত, তার পাশেই দুধের পাত্র। চমৎকার দুধ! দুধ ফুলে ফুলে উঠছে, কি চমৎকার ফেনা! হারিকট যদি একটু দুধ পায়। এক চুমুক দুধ!

হারিকটের মনে হচ্ছে যেন সে যুগ যুগ ধরে অভুক্ত রয়েছে। আর কখনো যেন খেতে পাবে না।

কনুয়ে কনুই ঠেকিয়ে ভেতরে কত জন রয়েছে, কফির পাত্রে রুটি ডুবিয়ে নিচ্ছে, যেন রুটি আর কফি অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। যেন দাম দেওয়ার কথা ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই, খালি খাও দাও, ফুর্তি করো।

সহসা তার মনে আনন্দের জোয়ার বইলো। সে এতক্ষণ ত' ভাবেনি,—সামনে সেনা-ব্যারাকে ত' খয়রাতি "স্যুপ" বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। লা রোতন্দের সামনে বসে এই ভাবে খাওয়া অবশ্যই লজ্জার ব্যাপার! কিন্তু স্যুপের লাইনের ঐ ভীড়ের ভেতর কে ওকে দেখছে! এই ত' বেনামা দারিদ্র্য! জনতার ভিতর ও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

রু মুফেতার্দে'র দিকে ছুটলো হারিকট। সে লক্ষ্য করলো, দেয়ালের ধারে প্রায় চল্লিশ জন আধা-মানুষ বরফগলা দৃষ্টির ভেতর দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে, কাতরাচ্ছে, জমে যাচ্ছে গায়ে তাদের বিশ্রী গন্ধ।

"লাইনে ঢুকে পড়ো। লাইনে দাঁড়াও। তবে ছুঁড়িটার টাকা আছে নিশ্চয়ই। কাঁচা-বয়স,—ওদের খেটে খাওয়া উচিত। তোমার জানা উচিত বোন, নটা'র পর আসা উচিত নয় জানো না?"

প্রায় দশটার পর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। জায়গা আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে হারিকট। বিশ্রী ধাক্কাধাক্কি সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে হারিকট, ঠিক করছে আর সে কষ্টকে মেনে নেবে না, হাসিমুখে সব সইবে। যে 'অনাগত বিধাতা'র সে জননী, তার গায়ে যেন চোখের জল না লাগে—তার জীবন যে মেঘমুক্ত আনন্দ-সমুদ্র।

চার পাশের কলরব তার কানে পৌছায় না, এমন কি পাশের বুড়িটার অনর্গল বক্তৃতাও শুনছে না, বহুবিধ বিভীষিকার আতঙ্ককর বর্ণনা শেষ করে এখন ওকে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলছে; "লা রিপাবলিকেনে"র স্যুপটা বেশ জোরদার।

সাধারণ সৈন্যদের চাইতেও গার্ডদের স্যুপে মাংসের ভাগ বেশী থাকে কি না। কিন্তু সেখানেও সারা দেশের গরীব দুঃখীর ভীড় ভেঙে পড়ে। বিরাট লম্বা লাইন। তারপর যদি অহংকার করে প্রথম দিকে না দাঁড়িয়ে শেষের দিকে দাঁড়াও তাহলে স্যুপের চাইতে গরম জলই কপালে জুটবে।

"মাঝে মাঝে! কিন্তু বুড়ি, তুমি কিছুই জানো না। মাঝে মাঝে কিন্তু কপালে ভালোই জুটে যায়। নতুন করে তৈরী করে দেয়, পচা গাজরের বদলে কিছু তাজা জিনিষ মেলে।"

"ও তাই নাকি!"

"এই ত' এক সপ্তাহ আগে আমি একটা আস্ত গাজর পেয়েছি।"

"আমাকে কি একেবারে গাধা পেয়েছ? অমনি বললেই হল একটা পুরো গাজর পেয়েছ, আমিও তাই বিশ্বাস করব!"

"ও: বুড়ি কি বল্‌ছে—!"

"ওখানে পাহারাওলা না থাকলে আমি তোর চোখ ফাটিয়ে

এলভিরা (১১১১) —মদিলিয়ানী (তেল রঙ)

দিতাম—বড় চালাক হয়েছিস্ না? মারী লা ফল,—ফুলকপি মার্কা ছোঁড়াটার কথা শোন!"

এই ভাবেই চলল কথা-কাটাকাটি, যতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে রইল কলহের আর বিরাম নেই।

অবশেষে দরজা খুলে গেল। ছিন্ন জুতার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল,—স্যুপের লাইন সামনে এগিয়ে চলে।

অবশেষে যখন হারিকটের পালা এল, তখন সৈনিক প্রশ্ন করল! "তোমার টিন কোথায়?"

আর সবাই এখান-ওখান থেকে কুড়িয়ে যা হয় তা হয় একটা পাত্র যোগাড় করেছে। ওর কিছুই নেই।

"টিন নেই, ত' স্যুপও নেই।"

সৈনিক কিন্তু ওর চোখের জল, বেদনা এবং অবস্থা লক্ষ্য করল, তারপর বলল—"আচ্ছা দাঁড়াও।"

তারপর দৌড়ে সৈনিকদের ব্যবহারযোগ্য পাত্র নিয়ে এল। বলল—"তলায় একটা ফুটো আছে।"

আঙুলটাকে ঐখানে টিপে ধরো তা হ'লেই হবে। তার পর স্যুপ ঢেলে দেয়। ফুটন্ত গরম স্যুপ, হারিকট আঙুল সরিয়ে নিতেই তার গায়ে সেই গরম ঝোল মাখামাখি হয়ে গেল। জামায় একটা দাগ হল। অন্য আঙুল সেইখানে টিপে দেয় হারিকট,—আঙুল জ্বলছে, পাশাপাশি ভীষণ ধাক্কা, তবু সে একমনে স্যুপ পান করতে থাকে। তার পর দুষ্কৃতির পর শিশুরা যেমন পালিয়ে যায়, সেই ভঙ্গীতে দৌড়ে পালিয়ে এল।

পরদিন আবার গেল হারিকট। তার মনে হ'ল, রোজ রোজ আর রান্না পাল্টিয়ে প্রয়োজন নেই। ঐ এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানোই ভালো। হয়ত নিয়মিত খদ্দের হিসাবে কিছু সুবিধাও মিলতে পারে। ওর মুখ থেকে সেই স্বর্গীয় হাসি এখন আর মুছে যায় না। দিন-রাত হাসি লেগে আছে মুখে, সর্বদাই এক আনন্দময় ছবি ওর মনে ভাসে। অনাগত বিধাতার যখন আবির্ভাব হবে, দেবতার জন্মের পর ওর আর দুঃখ কি, তখন ত' সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে।

কিন্তু এ এক নির্মম দ্বন্দ্ব,—আর সেই যুদ্ধে হারিকট একজন অক্লান্ত সৈনিক। সে একেই সবাই তার দিকে আঙুল দেখায়। একদিন সে দুটো ভাগ পেয়েছিল, ওর অবস্থা দেখে সেনারা দয়া করে দিয়েছিল, থ্যাবড়া নাকওলা মারী লা পভ্‌র নোঙরা টাটাকে বলল:—

"ওই ছুঁড়িটার দিকে দেখো ভাই,—পেটে যেন সোনা ভরে রেখেছে। আ মরণ! ঢং দেখে আর বাঁচি না। এই ছুঁড়ি খবরদার যদি লাইনের দিকে এগিয়ে যাস্ তাহলে রক্ষা থাকবে না। "আমারও একবার ঐ অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে অন্য কারো মুখের গ্রাস কেড়ে খাইনি। তোমাকে ত' পাহারাওলা লাইনে দাঁড়াতে মানা করেছে—আমাকে আর অদৃষ্টের দোষে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে, তোরও ত' সেই অবস্থা। আমি কাউকে ভয় করি না।"

হারিকট নিজের জায়গাটিতে দাঁড়ায়। তাই বলে রসিকতা আর কুৎসিত ইঙ্গিতের আর শেষ নেই।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

নালন্দা

শ্রীবিশ্বমঙ্গল দাস

হে নালন্দা! মৃত্তিকার গহ্বরে ছিলে তুমি এত কাল,
শান্তি সাম্য তাপস মূরতি নিয়ে নিজ ধ্যান-কর্ম্মভাল।
তব আঁখি অশ্রুজল হ'তে ভেসে আসে কোন ঐ স্রোত;
সুদূরের আহ্বান-গীত সাম্যবাণী! বায়ু-ঝঞ্ঝা মুক্তপথ—

আনিছে বহিয়া তরঙ্গের হিল্লোলে চিরবিশ্ব ঐক্যপণ,
সবারে বাঁধিতে ডোরে নিয়ে ভাতৃপ্রাণ, হৃদি-একাসন।
"সত্যের ধ্রুবতারা বুদ্ধের অহিংসার বাণী ইতিহাস—
ভারতের নভোপট হ'তে দিক্-দিগন্তরে হ'তেছে প্রকাশ।"
অশাসন-কুশাসন দম্ভপূর্ণ পৃথিবীতে চেয়ে মনে পড়ে,
নালন্দার শান্তিবাণী করেছিল মুখরিত পৃথিবীরে;
আত্মা যেন সমুজ্জ্বল মানবের সেবায় ত্যাগের প্রকাশ
ধ্যানের মহিমা এ ভারতের, বিশ্বেরে দিতে শান্তির প্রয়াস!
সেদিন প্রাচ্য এসে তব গৃহদ্বারে বসে হয়ে নম্রশির,
ত্যাগের ধ্যান-দীক্ষাপথে নিয়েছিল মাথে দৈন্য-অশ্রুনীর।

উদার-উদাস কণ্ঠে গেয়েছিল বিহঙ্গের সুরে হৃদয়-অন্তরে
অক্ষয় সম্মান দিতে তোমারে পুজিয়া সে গুরুরূপে বরে;
ভারতের শান্তি সাম্যদূত হে নালন্দা সংস্কৃতির পীঠস্থান—
বিজড়িত দীপ্তি-উজ্জ্বল প্রশান্ত করুণা-মাখা
তপস্বী মহান।
প্রলয় শঙ্কায় পৃথ্বীর, সর্ব্বধাম জ্ঞান-দীপ্তি শিখা দিয়ে,
করেছিল আহ্বান—
নিতে শিক্ষাপথ পদপ্রান্তে ব'সে পুনঃ উদার কল্যাণ।
নীলকণ্ঠের মত চির-জন্মান্তরে তব নীরব আত্মদান
ঘোর চক্রবালে ধরণীর, আসিছে আজ তার আহ্বান!

স্বপ্নময় প্রাণের হরষে নিয়েছিল একদিন যারা এসে বয়ে
দিকে দিকে প্রাণের উল্লাসে শান্তি-অর্ঘ্য পাত্রখানি লয়ে;
"শাশ্বত সত্য অহিংসার ক্ষমাপ্রেম নিয়ে ডাকিতে সবারে,
ধরণীর মঙ্গল প্রান্তে বাজায়ে মঙ্গল-শাঁখ প্রেমঅন্তর-ডোরে।"

রাজ্য পুনর্গঠন

এই মন্তব্য লেখার সময় বাংলার বুকে সীমানা কমিশন সদলবলে আসীন। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য তাঁরা সাক্ষ্য গ্রহণ করে একটা রায় দিবেন, সে রায় র‍্যাডক্লিফ, রোয়েদাদের মত বাংলাকে আরো খণ্ডিত করবে, না বাংলার ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবে তা কে জানে! আজ বাংলাকে গ্রাস করার জন্য চার দিকে চক্রান্ত চলছে, বাংলার মানচিত্রের দিকে নজর দিলে চোখে জল আসে না এমন পাষণ্ড বোধ করি বাঙালীর মধ্যে কেউ নেই। বাংলা দেশ ভারতকে কি দিয়েছে আর কি পেয়েছে তার হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ সীমানাঘটিত ব্যাপারে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যে কুৎসিত আন্দোলন চলছে তার বিরুদ্ধে কই কোনো অবাঙালী নেতার মুখে কোনো শব্দ নেই কেন? গোয়া সম্পর্কে পোর্তুগীজ সরকার যে ব্যবহার করছেন ভারতীয়দের সঙ্গে, বাঙালীদের প্রতি বিহারীদের ব্যবহার কি তদপেক্ষা অনেকাংশে নীচ এবং জঘন্য নয়? নেহরুজী বলেছেন—"বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে মন জয় করা যায় না।"—তাঁর স্বদেশে কি ভাবে গুণ্ডামি দ্বারা হাজার হাজার লোকের শান্তি ব্যাহত হচ্ছে তিনি কি তার সংবাদ জানেন? বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ, বিলম্ব হলেও তিনি স্বয়ং বিহার-প্রান্ত পরিভ্রমণ করে অবস্থাটা খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তিনি যে বিহারের কংগ্রেসী অহিংস নীতির পরিচয় দান করেছেন তা পাঠ করলে বিস্ময়ে চমকিত হতে হয়। বাংলার ন্যায়সঙ্গত দাবীর পিছনে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সকলের সমান সহানুভূতি, অতুল্য বাবু বা অন্য কোনো ব্যক্তি এই দুঃসময়ে বাঙালীকে যদি রক্ষা করতে পারেন তিনি সমগ্র জাতির জয়মাল্য লাভ করবেন। "বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে কে দেখিবে?"

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস

প্রেস কমিশন সম্প্রতি সংবাদপত্রের যে ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন কয়েকটি সংবাদপত্রে তার পুর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই ইতিহাসে শুধু যে তথ্য সম্পর্কে বিশ্রী রকমের ভুল আছে তা নয়। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে সবটাই যেন অভিসন্ধিমূলক। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম বাংলা পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে "নিত্য প্রকাশ," সম্পাদক ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের সংগৃহীত তথ্য থেকে জেনেছি, "নিত্য প্রকাশ" কোনো দিন প্রকাশিত হয়নি। শুধু প্রকাশের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল, প্রথম প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা "সংবাদ প্রভাকর।" নটরাজন সাহেবের সঙ্গে শোনা যায় কোনো একটি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিক এবং মালিকরা সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের কি 'অ আ ক খ' জ্ঞানও নেই! যেমন পুরাতন কাল, তেমনই আধুনিক পর্ব, সর্বত্র সমান ভুল। আগে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হয় পরে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, কিন্তু এই ইতিহাসে বলা হয়েছে হিন্দুস্থান নাকি আগে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা, গণবার্তা, প্রভৃতি বামপন্থী পত্রিকার কোনো উল্লেখ নেই, অথচ বাংলা কংগ্রেসের বুলেটিন 'জনসেবকের' নাম দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রচার-সংখ্যা নাকি ১৩,৩৬২। সম্ভবতঃ উক্ত পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হয়ে থাকে। কখনও কারো হাতে এই পত্রিকা দেখি না। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে অনেকের নাম নেই,—তার জন্য দুঃখ করার কিছু নেই, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন সৌখীন ইতিহাসকাররা চিরদিনই এই ধরণের মূর্খতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুঃখ শুধু নটরাজন সাহেব আর ভারত সরকারের জন্য। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভ্রান্ত পথে চলার ফলেই তাঁদের এই অবস্থা।

আধুনিক সাহিত্যে সেকালের চিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা-সাহিত্যে কিছু কাল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার রেওয়াজ ছিল, এবং বহু কৃতী ও শক্তিমান সাহিত্যিক ঐতিহাসিক উপন্যাসকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রধানতঃ ৩টি পদ্ধতিতে তাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতেন, যথা, (১) ইতিহাসানুগ ঘটনা ও চরিত্র সংযোগে কাহিনীর বিস্তার, (২) ইতিহাসাশ্রিত ঘটনার পটভূমি ব্যবহার ও কল্পনার সংমিশ্রণ। (৩) সম্পূর্ণ কল্পিত কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমি ও চরিত্রলিপি। এই তিনটি পদ্ধতিই সার্থকতা লাভ করেছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত রঙ্গমহাল, কঙ্কণচোর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'ডঙ্কানিশান', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে', দীনেশচন্দ্র সেনের 'শ্যামল ও কজ্জল' বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। এর পর কিছু কাল মনস্তত্ত্ব ও অতিবাস্তব উপন্যাসের কাল চলেছে, সম্প্রতি কিন্তু আবার অবস্থার পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। মাসিক বসুমতীর পাঠকের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের পটভূমিতে রচিত 'আকাশ-পাতাল' উপন্যাসটির বিশেষ পরিচয় প্রদান করার প্রয়োজন নেই। প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে ১৩৫৬ সালের মাঘ মাস থেকে এই উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ ব্যবস্থা হয়, তখনই এবং পরবর্তী কালে যে ধরণের আগ্রহ

পাঠক-সমাজে লক্ষ্য করা গেছে তা বিস্ময়কর! বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রায় অনুরূপ কালেরই ঘটনা এবং সেই গ্রন্থটিও জনপ্রিয় হয়েছে। সম্প্রতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "পদসঞ্চার" প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসগুলি প্রধানতঃ ইতিহাসাশ্রিত ঘটনার পটভূমিতে রচিত কাল্পনিক কাহিনী। এ ছাড়া আমরা আরো কিছু ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীর সংবাদ পেয়েছি। বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যই শুধু এই সব লেখকদের আকৃষ্ট করেনি,—প্রাচীন বাঙলার একটা ছবি ফুটিয়ে তোলার দিকেই তাঁদের আগ্রহ বেশী। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। উপন্যাস রচনার গণ্ডী সীমাবদ্ধ না রেখে পরিধি প্রশস্ততর করাই প্রাণের লক্ষণ। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের এই নবচেতনায় আমরা আনন্দিত। এই আন্দোলনের সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনা বর্তমান।

কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নূতন সংস্করণ

আমরা সম্প্রতি অনুযোগ করেছি, 'নূতন মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে এবং অনুবাদ বা বিবিধ রচনাবলী সেই স্থান অধিকার করছে। সম্প্রতি কয়েকটি বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ হওয়াতে আমরা আনন্দিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত", "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ", রাজনারায়ণ বসুর "আত্মচরিত" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে, শোনা যাচ্ছে, আরো কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থও মুদ্রণ-পথে, এই সংবাদ অতিশয় আশাজনক। আমরা এই বিষয়ে পূর্বেই মন্তব্য করেছি,—আমাদের উৎসাহী প্রকাশকবৃন্দকে এই দিকে নজর দিতে পুনরায় অনুরোধ জানাচ্ছি। সদ্‌গ্রন্থের চাহিদা চিরকাল,—এই সঙ্গে কয়েকটি নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থেরও নূতন সংস্করণ হওয়া প্রয়োজন।

কবি-সম্মেলন

গত বছর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কলিকাতার আশে-পাশে কয়েকটি ছোট-খাটো কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। আমরা কবি-সম্মেলনের পক্ষপাতী—ভালো কবিতা এবং ভালো ফুল ক্ষুধার অন্নের চাইতেও হৃদয়গ্রাহী। সেই কবিতা যদি কবির কণ্ঠে শোনা যায় তার মত আনন্দময় আর কিছু নেই। বাংলা দেশ কবিতার দেশ, তবু এ দেশে কবি বা কবিতার তেমন আদর ছিল না। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও বিক্রীত হ'ত না। সম্প্রতি কোনো কোনো প্রকাশন প্রতিষ্ঠান কাব্যগ্রন্থের অতিশোভন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। আমরা চাই কবিতার প্রচার আরো বাড়ুক, সেই সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের দামও কমুক, আর কবি দল যদি মাঝে মাঝে 'কবি-সম্মেলন' আহ্বান করেন, রসিক-সমাজে কবিতার রস বিতরণ করেন, তাহ'লে সাধারণ ভাবে কবিতার জনপ্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে কবিদেরও জনপ্রিয়তা বর্ধিত হবে। বসন্ত কাল সমাগত, সঙ্গীত-সম্মেলন ত' অনেকগুলি অনুষ্ঠিত হ'ল কলকাতায়, কবি বা সাহিত্যিক সম্মেলন হয় না কেন?

এ বছরের লীলা পুরস্কার

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহিলা সাহিত্যিকদের দান নগণ্য না হলেও বর্তমান কালে যাঁরা সাহিত্য সাধনায় সাফল্য লাভ করেছেন তাঁদের সংখ্যা কম। স্বর্ণকুমারী, নিরুপমা, অনুরূপা, সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর পর ইদানীং যাঁরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাঁদের অন্যতমা। তাঁর রচনার বুদ্ধি-দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য ও ভাষার অনাড়ম্বর সারল্য পাঠকের মনকে সহজেই স্পর্শ করে। তাঁর নারী বা পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বলিষ্ঠ কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ বা আঙ্গিকের কৌশলমুক্ত কাহিনী রচনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উল্লেখযোগ্য মৌলিক রচনার জন্য লীলা পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন, তার জন্য আমরা আনন্দিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির এই লেখিকার বলয় গ্রাস, প্রেম ও প্রয়োজন, অনির্বাণ, দুর্নিবার, তারপর স্বপ্নভঙ্গ ও অঙ্গার এই কয়টি বিখ্যাত গ্রন্থের সুমুদ্রিত সঙ্কলন 'আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী' হিসাবে প্রকাশ করেছেন।

শিশু-সাহিত্যের পুরস্কার

বাংলা শিশু-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী সুখলতা রাও ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। শ্রীমতী রাও আবোল-তাবোল রচয়িতা সুকুমার রায়ের ভগিনী। তাঁর 'গল্প আরো গল্প' গ্রন্থটির জন্য তিনি এই পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীমতী রাও তাঁর স্বামী কটকের ডাক্তার জয়ন্ত রাও সহ বর্তমানে কটকেই বাস করেন। আমরা শ্রীমতী রাওকে অভিনন্দন জানাই।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

সাত-সাতে

সাধারণ মানুষের স্মৃতি শক্তি অতি ক্ষীণ। তাই হয়ত আজ আমরা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে ভুলতে বসেছি। আধুনিক সাহিত্যে নরেশচন্দ্রের দান অতুলনীয়। তাঁর শুভা, পাপের ছাপ, ব্যবধান প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় পথচিহ্ন। ইদানীং এই প্রতিভাধর লেখকের রচনা আর দেখা যায় না, তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থগুলিও আর বাজারে সুলভ নয়, তাই সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর শ্লেষাত্মক রচনা 'সাত-সাততে' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি লেখক ১৯৪৭-এর পূর্বেই শেষ করেছিলেন অর্থাৎ স্বাধীনতা-পূর্বকালে রচিত। সাময়িক ঘটনা ও রচনা তাঁর এই রচনায় প্রতিধ্বনিত হলেও এই গ্রন্থটি সুখপাঠ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক। প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জায় শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও চিত্ত দাস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক উত্তরায়ণ লিমিটেড, দাম সাত সিকা মাত্র।

রোম থেকে রমনা

'রাজোয়ারা' খ্যাত দেবেশ দাশের নবতম গল্পগ্রন্থের নামকরণেই শুধু বৈচিত্র্য আছে তা নয়। বিষয়বস্তুর নির্বাচনের মধ্যেও অভিনবত্ব আছে, প্রকৃত পক্ষে গতানুগতিক ধারায় রচিত গ্রন্থারণ্যে 'রোম থেকে রমনা' একটি বিশিষ্ট সংযোজন। গল্পগুলির পটভূমি হেব্রিডাইস দ্বীপপুঞ্জ, গৃহযুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্পেনের অরণ্য, জাপ-আক্রান্ত বর্মা মুলুক, আসামের জঙ্গল হলেও

নায়ক-নায়িকা বাংলা দেশেরই ছেলে-মেয়ে, লেখকের স্বাভাবিক দেশ-প্রেমের ছাপ এই রচনায় সুস্পষ্ট। সূক্ষ্ম ঘটনাবিশ্লেষণ, জীবনের ব্যথা ও বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমুজ্জ্বল এই কাহিনীগুলি দেবেশ দাশকে বাংলা-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে সন্দেহ নেই। এই গল্পগ্রন্থের প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসার্স লিঃ, দাম দু টাকা দশ আনা।

মুখর লণ্ডন

অঞ্জনগর-খ্যাত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ 'মুখর লণ্ডন' নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার দীর্ঘ দিন লণ্ডনে ছিলেন এবং লণ্ডন এবং লণ্ডন সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালীদের নিয়ে রচিত কয়েকটি নিবন্ধের সমষ্টি 'মুখর লণ্ডন।' 'মধ্যদিনের গান,' 'লণ্ডনে ভারতীয় লেখক', 'রাজার দেশের ঝি', 'সপ্তাহ শেষের ইংলণ্ড', 'বিলিতি প্রেম', প্রভৃতি রচনাগুলি সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ হয়েছে বললে যথেষ্ট হয় না, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে। প্রমথেশ বড়ুয়া সংক্রান্ত রচনাটি মনকে নাড়া দেয়, কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে সুন্দর রেখাচিত্র। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও নোবেল পুরস্কার' রচনাটি বহু আলোচিত, তার মধ্যে চিন্তার খোরাক প্রচুর। এই সুন্দর গ্রন্থটির প্রকাশক, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, দাম দু' টাকা।

সহজ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান

গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ সাফল্যের পথে। জনকল্যাণে জনশিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারের মত বস্তু আর নেই। পশ্চিম-বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ রচিত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি পাঠাগার পরিচালকদের কাছে বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। গ্রন্থাগার সংগঠন, পরিচালনা, গ্রন্থ নির্বাচন এবং শ্রেণী-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে এই গ্রন্থটি 'গাইড' সদৃশ। এই ধরণের গ্রন্থ যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। সহজ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড, দাম দু' টাকা।

যৌনবিদ্যা

এক কালে যৌনবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচিত হওয়ায় আমাদের দেশে যৌনবিদ্যা-শিক্ষার সেরূপ সুযোগ ছিল না। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ছিল এ বিষয়ে অজ্ঞ। সাহিত্যের মধ্যে 'কামসূত্র', 'অনঙ্গরঙ্গ' বা দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমতম্' প্রভৃতি স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থাদির মধ্যে যৌন বিষয় সম্বন্ধে আলোচিত হলেও, আজিকার বিজ্ঞানের নিকষে সেগুলি যেমন ছিল অকিঞ্চিৎকর, তেমনি সাধারণ্যেও সেগুলির পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। একটা 'চুপ চুপ' নীতিও এই বিষয়ের প্রচারে বিশেষ ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। পুরাকালের কথা দিয়ে ইদানীন্তন কালের কথা ধরলেও দেখা যায় যে, একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও শরীর-বিদ্যার ডিগ্রি-কোর্সের পাঠ্য-তালিকা থেকে অতিপ্রয়োজনীয় প্রজনন-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি পাঠ্য-বহির্ভূত করা হয়েছিল; পরে যদিচ তা আবার বহু তর্ক-বিতর্কের পর পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করা হয়। একেবারে বর্ত্তমান কালের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এখন যৌন-রোগ সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন এবং জননিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিও বাংলা ভাষায় অধুনা প্রকাশিত হয়েছে বহু। চিকিৎসা-বিদ্যা, যৌনবিদ্যা এবং মনোবিদ্যা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের 'যৌনবিদ্যা' নামক এই গ্রন্থ সেদিক থেকে একটি সার্থক সৃষ্টি। হ্যাভলক এলিস, ষ্টোন, সিগমণ্ড ফ্রয়েড, ফোরেল, মেরী ষ্টোপস, সেত্রিণা স্পায়েলরীম, সেলমা লাজার্সফেল্ড, অডেট কিউন প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকার পুস্তকের সাহায্যে এবং স্বীয় গবেষণার ফলে আমাদের যৌন-জীবন ও তৎপ্রাসঙ্গিক বহুবিধ বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার এই মূল্যবান গ্রন্থে। পরিণতবয়স্ক নর-নারীর মধ্যে এই গ্রন্থের প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থখানি সচিত্র। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৮৲।

বিকেলের ছবি

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সন্ধ্যার আকাশে আসে যে ধূসর সুরের প্রণাম
মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবনে কিছু তার দাম
কারা যেন দিয়ে যায় রেখে
অলস দিনের কালো ছায়া দিয়ে ঢেকে।

এলো-মেলো তালবন হলদী নদীর চর
কি জানি কেমন ক'রে তারা যেন পেয়েছে খবর
এ পথে পাখীরা আসে
ধান-কাটা শেষ হ'লে প্রথম শীতের মাসে।
তাই দেখি চার ধারে খেঁসারী-ক্ষেতের কোণে
সন্ধ্যার আকাশ শুধু শেষ বাঁশি শোনে।

প্রতিদিন পৃথিবীর এই আয়োজন
মুঠো মুঠো তুলে নেয় আমার জীবন।

এখানে এমনি দিনে আজো যেন কাছে আসে ফিরে
ওরা যারা এসেছিল ভালবাসা না বাসার তীরে
সেতারের তারে যারা এনেছিল মীড়
প্রেমের চেতনা দিয়ে জীবনেরে করেছে গভীর।
সন্ধ্যার আকাশ-পথে ওরা সব ভীড় করে আসে
ছায়া ফেলে চলে যায় মনের সবুজ ঘাসে।

ধূসর নদীর চর প্রথম তারার দীপ জ্বেলে
নিভৃতে শুধায় শুধু, 'এ জীবনে কতখানি পেলে?'
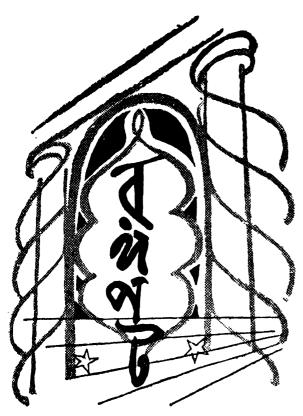
ছায়া-ছবির জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

সাকরেদী করে টেকনিশিয়ান হবার দিন গত হয়েছে। আজ বাঙলা দেশে চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন দিকে যে অস্বাভাবিক অবনতি দেখা যাচ্ছে, তার কারণ কি? গত মাসে বাংলায় আলোক-চিত্র-শিল্পের একান্ত অবনতি সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত অভিযোগ করেছিলাম, দু'-এক জন পরিচালক সে সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রীতিমত ইনষ্টিটিউসন খোলা প্রয়োজন। ক্যামেরার কাজ মোটেই সোজা নয়। বিভিন্ন প্রকার লেন্সের সঙ্গে পরিচয়, এক্সপোজার, সময়ের সঙ্গে আলোর কম-বেশী, স্থানের সঙ্গে দূরত্বের, নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট, ষ্টীলের কাজ ইত্যাদি, সহস্র সহস্র রকমের ট্রিকস্ আছে এর পশ্চাতে। সেট-সেটিং, সাউণ্ড-ট্রাক ইত্যাদির কাজও বিশেষ ভাবে চিত্র-শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি-অবনতির জন্য দায়ী। অথচ এই সাউণ্ড-ট্রাকের কাজে আজও আমাদের দেশে এ-ওয়ান টাইপের ব্যক্তি সত্যি বিরল! সরকার থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরীর জন্য প্রতিষ্ঠান খোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, অথচ ছবির টেকনিশিয়ানরাই যদি যোগ্য না হন তো অভিনেতা-অভিনেত্রী মুখ নেড়ে কি করবেন? সঙ্গীত, নাটক, আকাদেমীর আওতায় কি বিষয়টি পড়ে না?

বাঙলা ছবির ডাবিং ও তার বাজার

কলকাতা থেকে বর্দ্ধমান বর্তমান বাংলা ছবির মার্কেট। সুতরাং লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ছবি তোলার কোন মানে হয় না, একথা আমরা প্রায়ই নানা পরিচালকদের কাছ থেকে শুনে থাকি। এ ব্যাপারে অন্য একটা পথের কথা তাঁদের আমরা মনে করিয়ে দিতে পারি। বাংলা ছবির মধ্যে এমন কয়েকটি ছবির নাম এখুনি আমরা অনায়াসে করতে পারি, যার বাজার সারা ভারতে মিলতে পারত ডাবিং করলে। কালোছায়া, পথিক, যদু ভট্ট, জয়দেব ইত্যাদি ছবিগুলির নাম এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ছে। ডাবিং করার খরচাও বিশেষ নয়। অথচ এ থেকে পয়সা উঠে আসবে অনেক বেশী। 'ফুলওয়াড়ী' ছবি যদি পয়সা না দিয়ে থাকে তো সে দোষ চিত্র-পরিচালকের নির্বাচনের। হিন্দী ছবিতে গল্প নেই। এবং গল্প সমেত হিন্দী ছবিরও দর্শক কম নয়। এ ছাড়া উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ইত্যাদি দেশেও ছবির বাজার মন্দ নয়। কথাটি ভেবে দেখলে আমরা খুশী হব। পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় বাঙলা ছবি আবদ্ধ থাকলে অচিরাৎ আমাদের ছবি-বাজারে তালা পড়বে যে!

হিন্দী ছায়া-ছবির বিষয়-বৈচিত্র্য লুপ্ত হচ্ছে

ষ্ট্যাটিসটিকস কি বলছে দেখবেন?

সাল	হিন্দী ছবি	বাংলা ছবি
১৯৩৯	২৩	৩
১৯৫১	১০০	৩৮

তা হলে গড়পড়তার হিসেবে হিন্দী ছবির চেয়ে বাংলা ছবি বেশীই উঠছে। কিন্তু থাকছে না। কেউই না। বাংলাও না, হিন্দীও না। তার কারণ বাংলায় সামান্য মাত্র গল্প আছে, কিন্তু ছবি তোলবার মত মস্তিষ্ক নেই। বোম্বাইতে ছবি তোলবার মত মস্তিষ্ক আছে, গল্প নেই। নাচ-গান, সস্তা কমিক এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী নিয়েই তাই তাদের অধিকাংশের কারবার। কিন্তু চির কালই বোম্বাইয়ের এ হাল ছিল না। বন্ধন, কঙ্কণ, নয়া-সংসার, কিসমৎ ইত্যাদি ছবির কথা, আশা করি আপনারা ভুলে যান নি। মহল, আন্দাজ, বেওয়াফা, আনারকলি, পরিণীতা, দো-বিঘা জমীন, ডাঃ কোটনিস কি অমর কহানী ইত্যাদি ছবি তো সেদিনকার ব্যাপার। কিন্তু এখন চল্লিশ বাবা এক চোর কি তিন বাতি চার রাস্তার যুগে, আর বিষয়-বৈচিত্র্য পাচ্ছি না আমরা হিন্দী ছবিতে। এক্ষেত্রে একটা সন্ধি করলে হয় না? বাংলার গল্প আর হিন্দীর টেকনিশিয়ান। বার্ণাড শ'য়ের সেই বিখ্যাত হাসির গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। যদি শেষে হিন্দীর গল্প আর বাংলার টেকনিশিয়ান হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে? হাসির কথা নয় ভাববার কথা এটি বিশেষ করে।

পঞ্চাশ হাজার টাকায় বাঙলা ছবি তৈরী

ঠিক ঠিক ভাবে এবং বেশ ধুমধাম করে ছবির কাজ করলে, অবশ্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে শুধু মাত্র ছবির নেগেটিভ অবধি আসতেই। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকাতেও বাঙলা ছবি তৈরী করা সম্ভব। ছ্যাবলামী নয়, বড় লোকের সঙ্গে দরিদ্রের সংগ্রাম নয়, রিফিউজী নয়। এ-সব বিষয়বস্তু নিলে লোক-হাসানো ছবি তৈরী হবে পঞ্চাশ হাজার টাকায়। খুব ঘরোয়া কাহিনী (বাঙলায় যার অভাব নেই) যেমন—ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, একটি বিধবা মেয়ের জীবন-চিত্র, একটি অপরিতৃপ্ত প্রেম, সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি, সমাজ-চিত্র, প্রতিভার অপমৃত্যু ইত্যাদি অথবা জীবনী-চিত্র, হাসির ছবি (সত্যিকারের হওয়া চাই), একটি নাইট ক্লাবের পটভূমিকায় তোলা চিত্র, ডিটেকটিভ কত কি তোলা যেতে পারে ঐ টাকার মধ্যেই। এতে আউটডোরের কাজ করতে হবে কম,

ষোলো হাজার ফিটের ছবি না তুললেও চলবে, নাচ-গান-হৈ-হুল্লোড় না থাকলেও অসুবিধে হবে না। কম টাকা খরচায় ফাইনান্সার জুটবে তাড়াতাড়ি, টাকাটা ঘরে ফিরে আসবে সত্বর এবং সব চেয়ে বড় কথা হল এই যে, একই প্রতিষ্ঠান এক সাথে দু'তিন খানি ছবির কাজ এক সাথে চালাতে পারবেন এবং বাংলা দেশে চিত্র-শিল্পের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

আমাদের ষ্টুডিওগুলি কি সুসজ্জিত ?

মোটেই না। সব দিক বিবেচনা করে দেখলে, বাঙলা দেশের ষ্টুডিওগুলিতে যে কি করে আজও ছবি উঠছে, সেটাই একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার! আউটডোর সুটিঙের কথাই ধরা যাক। ভ্যান আছে কারও? আলো সমেত। ডায়নামো আছে তাতে? মেক-আপ রুম? ক্রেন-ফিটেড? সাউণ্ড-ট্রাক কত শক্তিশালী? প্রজেক্টিং রুম আছে ক'টি ষ্টুডিওর? একটির। অন্ততঃ তাই তো আমরা জানি। ব্যাক-ভিউ? সেও একটিরই। নাম করব? কি দরকার আর। ক্রেন আছে মুভ্যাবেল (হ্যাণ্ডমেড ক্রেনের কথা বলছি না) কারও? সেট-সেটিঙের জন্ম কারখানা? রিসার্চ রুম? রেকর্ডিং? টেষ্টিং? কি আছে এখানে আর কি নেই তার হিসেব করে কি করব! আজও আমরা পর পর এক ডজন ছবিতে সেই একই সিঁড়ি দিয়ে নায়ক-নায়িকাকে হাত ধরাধরি করে উঠতে দেখছি একই ষ্টুডিও থেকে তোলা হওয়ায়। বাঙলা দেশ, তাই চলছে আজও এসব! নাহলে···!

বাঙলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র

একদা ছিল ঠিকই। আজ আর নেই, একথা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, বাঙলা দেশে নাটক লেখাই হয়নি। অতখানি পেসিমিষ্টিক না হয়ে এই টুকুই আমরা বলতে পারি যে, গত পনেরো বিশ বছর ধরে সত্যিই বাংলায় কোনও নাটক সৃষ্টি হচ্ছে না। ১৯৪২ এর মন্বন্তর, যুদ্ধ কি ১৯৪৬ এর দাঙ্গা, ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা প্রাপ্তি আমাদের সাহিত্যের উপন্যাস, কাব্যে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, নাটকে তা হয়েছে কি? আজও তাই বাঙলায় নিরুপমা দেবীর শ্যামলীর তিন শত রজনীর অভিনয় হচ্ছে। নতুন কালের নতুন নাটক চাই, চাই নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা। চাই তো, কিন্তু পাচ্ছি কই? উপন্যাসের মধ্যে নাটকের এলিমেণ্ট আছে, এমন উপন্যাসের সংখ্যা বাঙলা দেশে কম নয়। কিন্তু 'কালিন্দী'র পর আর এগুলো সে কাজ? পরিচালকেরা লাইব্রেরী (বাঙলা সাহিত্য কিনে কদাচিৎ আপনারা ঘরে রাখেন) থেকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসগুলি আনিয়ে একবার পড়ে দেখুন না!

Children's Little Theatre

সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়ে গেল চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটারের। মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে হোল প্রদর্শনী। নানা রকম নাচ-গান-বাজনা, নাটক ছেলেদের আনন্দও দিয়েছে প্রচুর। 'মিঠুয়া' ক্যান্টাসীটিই দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে সব চেয়ে বেশী। সাত বছরের মেয়ে

মীনাক্ষীর নাচও ভালই লেগেছে সকলের। প্রেসিডেন্সী স্কুল ফর গার্লসের নাটক, অভিনব ভারতীয় সমষ্টি-নৃত্য, মেলার বিবরণ নিয়ে নক্সা ইত্যাদিও কোন অংশেই নিকৃষ্ট হয়নি। সব চেয়ে বেশী আনন্দের কথা হল এই যে, সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই অফ দি চিলড্রেন্স, ফর দি চিলড্রেন্স, বাই দি চিলড্রেন্স। ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা দলে দলে এই অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিয়েছে এবং সত্যিকারের আনন্দ পেয়ে বাড়ী ফিরেছে, এতেই আমরা যথেষ্ট খুশী হয়েছি। আশা করছি, আগামী প্রতি বছরে আরও অধিক উৎসাহ নিয়ে চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার তাঁদের কাজ করে যাবেন এবং এ পথে পায়োনীয়ারিভের গর্ব অনুভব করতে পারবেন।

ছায়াছবির সমালোচনা—নয় ভাল নয় মন্দ

ছবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত এক বন্ধু সেদিন বললেন, বাংলা দেশে বাংলা ছবির চেয়েও যদি কিছু নিকৃষ্ট থাকে তো সে ছবির সমালোচনা। বাংলা দেশেরই এক জন খ্যাতনামা (!) চিত্র-সমালোচক সম্প্রতি চাঁপাডাঙ্গার বৌয়ের পরিচালকের নাম ভুল করে বসেছেন তার কাছেই শুনলাম। ঠিক কথাই। বাংলা দেশের ছবির সমালোচনা অর্থে ছবির গল্পের সারাংশ (তাতেও ভুল থাকে প্রায়ই) দিয়ে সুরু করে, অভিনয় কার কেমন লাগলো (জিনিষটার বিচার যেন এতই সোজা!), চিত্রগ্রহণ মোটামুটি, সেট সেটিঙ মন্দ নয়, শব্দগ্রহণ ভাল। ব্যস! এই ছবির সমালোচনা। বলুন এর চেয়ে বেশী কেউ লেখেন? শুধু ভাল নয় মন্দ। কেন ভাল নয়, কি হলে ভাল হতে পারত, এ নিয়ে মাথা ঘামান কেউ? অন্যান্য দেশে ছবির আগে ছবির সম্বন্ধে সংবাদপত্রে সাজেষ্ট করা হয়ে থাকে। আর এদেশে ছবির সমালোচকের সঙ্গে ছবির পরিচালকের সম্পর্ক শুধু এক কাপ চা (প্রেস শো'য়ের দিন) আর এক ঠোঙ্গা খাবারেই (আজ-কাল তাও কদাচিৎ) শেষ। চিত্র-সমালোচক হওয়া উচিত অবসরপ্রাপ্ত চিত্র-পরিচালকের আর যোগাযোগ থাকা উচিত নিয়মিত ভাবে ষ্টুডিওর সঙ্গে।

রিক্সাওয়ালা

দো বিঘা জমিনের ব্যর্থ অনুকরণ

গল্প বলে বিশেষ কিছু নেই। প্রচারের দিকটাই এ ছবিতে বড় উগ্র। জমির মালিক মাছের ভেড়ীর মালিককে জমি ইজারা দেবেন বলে প্রজা উৎখাত করবার চেষ্টা করলেন। বাকী-বকেয়ার দাবীতে নালিশ জুড়ে দিলেন প্রজাদের বিরুদ্ধে। সময় পাওয়া গেল মাত্র তিন মাস। তার মধ্যেই টাকা শোধ করে দিতে হবে কোর্টে। না হলে জমি হবে জমিদারের। অতএব সহর। এবং রিক্সাটানা। তারপর টাকা শোধ করতে দেশে গিয়ে বিদ্রোহ। প্রজার সঙ্গে সংগ্রামে গুলী করায় জমিদারকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার। হাততালি (দর্শকেরা দিয়েছেন) এবং ছবি শেষ। অভিনয় ভালো হয়নি কারোরই, এমন কি তৃপ্তি মিত্রেরও না। শুধু নাম করব মাষ্টার সুখেনের। পকেটমারের অভিনয় অপূর্ব। ছোট-ছেলেদের টুপটির অভিনয় ভাল হলেও ঘটনাটির সুসন্নিবেশ ঘটেনি। জমিদারের চেহারাটির কিন্তু প্রশংসা করতে পারলাম না। ভাল লাগলো গান। কৃতিত্ব সলিল চৌধুরীর ("আয়ে রে কাটি ধান" গানটি আগেই শুনেছি মনে হচ্ছে। ধান-কাটার গানটি তারি নকল বলে মনে হয় না?) অবশ্যই। ফটোগ্রাফী বাজে। অস্পষ্ট। ইনটেনসিটি অত্যন্ত কম। আর কিছু নয়।

সাঁঝের প্রদীপ

উনবিংশ শতাব্দীর কাহিনীর চিত্ররূপ বিংশ শতাব্দীতে!

ঠিক তাই। সেই বড় লোকের মেয়ে আর গরীবের ছেলে। সচ্চরিত্র, বিপ্লবীদের দলে নাম আছে, (অমল বাবুর খদ্দরের জামায় কিন্তু প্লাষ্টিকের বোতাম দেখলাম। প্লাষ্টিকের বোতাম কি তখন বেরিয়েছিল!) একটু পাগলাটে, (হতেই হবে। নাহলে বড় লোকের মেয়ে ভালবাসবে কেন?) পাশের বাড়ীর একটি গরীবের মেয়ে তাকে ভালবেসেছে, (তা নাহলে বই জমবে কেন?) গায়ে অসম্ভব শক্তি (নারী বীরভোগ্যা আজও!) এবং কোনও কিছু একটা বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে আহত হওয়া (পরিচালককে ধন্যবাদ। তিনি শাশ্বতী দেবীর শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে পটি বাঁধাটা আর দেখান নি বলে।) তার পর ছবির শেষ। উত্তম বাবু ফেরার হচ্ছেন। গরীবের কি বড় লোকের মেয়ে কেউ পেল না তাকে (এখানটা প্রশংসনীয়) কখনই। এবং ছবি শেষ (মিল হল না? এ মা··· দর্শকগণ তাই বলছেন। আমরা এই নতুনত্বের জন্য কাহিনীর প্রশংসা করছি।) অভিনয় ভালই হয়েছে সুচিত্রা সেন আর উত্তমকুমারের। সবিতা দেবীও মন্দ করেন নি। ধীরাজ বাবুর ফুল পিসে ফেলা কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না (আমরা কেউ সেক্সপীয়রের-যুগে বাস করছি না) অমন নাটকীয় ভাবে। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় চলনসই। আউটডোরের কাজে বাইরের লোকেদের ওই ক্যামেরার দিকে তাকানোর অভ্যেসটা এড়ানো যায় কি করে বলুন তো? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের প্রশংসা কিন্তু এবার করতে পারছি না। কোমরে গামছা জড়িয়ে আর কত দিন লোককে হাসানো যায় বলুন? ফটোগ্রাফীর কাজ এ ছবিটিতেও অতি নিকৃষ্ট ধরণের। অন্যান্য সবই গতানুগতিক।

'শ্যামলী'র স্মারক উৎসব

গত ১৫ই জানুয়ারী ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "শ্যামলী" নাটকের ত্রিশততম রজনীর স্মারক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে। রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় শ্যামলী নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই পুরস্কার বিতরণ করেন। ষ্টার রঙ্গমঞ্চের একমাত্র স্বত্বাধিকারী সলিলকুমার মিত্র ১৫ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করে সকলকে যথোচিত পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করে সকলের প্রশংসাভাজন হন। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত স্বর্গতা নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে সার্থক এই নাটকখানা সৃষ্টি করেছেন। তাই ত্রিশতাধিক অভিনয়েও দর্শক-সমাজের কৌতূহল একটুকু নিবৃত্ত হয়নি। নাটকটির জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। নাটকটির পরিচালনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। অভিনেতৃ-বৃন্দের টীম-ওয়ার্ক হয়েছে সুন্দর। দু'এক জনের অভিনয় একটু বাড়াবাড়ি হলেও রসবোধের ব্যাঘাত কোন দৃশ্যেই ঘটেনি। নায়িকা শ্যামলীর চরিত্রে শ্রীমতী সাবিত্রী বাঙ্গালার নাট্য-জগতে এক নতুনত্বের

সন্ধান দিয়েছেন। সরযু দেবীর অভিনয় চমৎকার। উত্তমকুমার মাঝে মাঝে কিছু বাড়াবাড়ি করলেও পর্দ্দার চেয়ে মঞ্চেই তাঁর অভিনয় ভাল হয়, এ কথা নাট্য-রসিকগণ স্বীকার করবেন। যদি আত্মম্ভরিতা মুছে ফেলে যে চরিত্রে অভিনয় করবেন, সে চরিত্র সম্বন্ধে আরও সচেতন হন, তবে তিনি হয়তো একদিন খ্যাতিমান নটের পর্য্যায়ে পড়বেন। বৃদ্ধ দাদু তারিণীর ভূমিকায় জহর গঙ্গুলীর রূপদান তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে বাঙ্গালার নাট্যামোদীদের কাছে। রসোচ্ছল অভিনয়ে তিনি একটি দরদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, এ অনস্বীকার্য্য। নাতিদের প্রেমধর্ম্ম বোঝাবার জন্যে তাঁর "যৌবন-চঞ্চল উচ্ছল স্বপ্ন" গানখানি সত্যই উপভোগ্য। শ্যামলী নাটকখানি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, বহু দিন এ বিশ্বাস আমরা রাখবো। শুধু নাটকের জন্য নয়, নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থা যথোচিত হওয়াও প্রয়োজন। ষ্টারের ব্যবস্থাপনায় সর্ব্বশ্রী সলিল মিত্র, শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র মহাশয়ত্রয় সুব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

টকির টুকিটাকি

ফ্লোরে এখন "প্রবেশ নিষেধ।" একমাত্র গেট-পাশ আছে অভিনেতা অভিনেত্রী ও পরিচালকদের। কিন্তু যেদিন ফ্লোর ছেড়ে পর্দ্দার ওপর লেখা হবে "প্রবেশ নিষেধ," সেদিন আর প্রবেশের বাধা থাকবে না। নাগরিকদের প্রবেশের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে মাতৃকা ফিল্মসকে। কাহিনীকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য আর প্রযোজক নগেন্দ্র সিংহ ভিড় হওয়া আর না হওয়ার দায়িত্ব নেবেন।

"সাগরিকা" নীল সমুদ্র ছেড়ে ষ্টুডিয়োর গণ্ডীর মধ্যেই বন্দিনী হ'য়ে পড়েছে। সমুদ্রের অতলের মণি-মুক্তা-মোড়া মনিকোঠা ছেড়ে হয়ত ভালো লেগেছে "অগ্রগামী"র রং-বেরঙের শিল্পীদের আর নানা রকমের ষ্টুডিয়োর নকল লিলিপুটদের উপযোগী ঘর-বাড়ীগুলো। "সাগরিকা"র অভ্যর্থনায় কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশনের ভার নিয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জ্জী, উৎপলা সেন, সুপ্রীতি, সতীনাথ, দ্বিজেন মুখার্জ্জী, দেবু চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি।

নাম বদলানোর যেন ছোঁয়াচ লেগেছে। রূপজ্যোতির "অভিনয়ের শেষে" ছবিখানির হঠাৎ নাম বদলে হোল "দু'জনায়।" মুক্তির দিন পর্য্যন্ত ঐ নাম থাকলে হয়। পাঁচ জন মিলে ঐ দু' জনকেও বরখাস্ত কোরতে পারে। ছবিখানির আসল ঘটনা পাওয়া গেছে মনোজ বসুর ডায়েরী থেকে। তদারক করছেন নির্ম্মল দে। গানে গানে মুখর করার ভার অনিল বিশ্বাসের। "দু' জনায়" নাম হ'লেও, আছেন কিন্তু অনেক শিল্পী, যেমন বসন্ত, সবিতা, অরুন্ধতী, পাহাড়ী, মলিনা প্রভৃতি।

অনেক দিন আগে "কৃষ্ণ-সুদামা" এসেছিল পর্দ্দার ওপর। ভক্তিরসে তখন গদ-গদ হ'য়েছিল কৃষ্ণভক্তের দল। সুদামাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবার নতুন কোরে ছবির পর্দ্দায় নামছেন। সম্ভবতঃ নতুন শ্রী নিয়ে দেখা দেওয়ার আগেই "শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা" নাম প্রচার করা হয়েছে। সম্বর্দ্ধনা কোরে আনার ভার নিয়েছেন মুভীমায়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান। রবীন, নীতীশ, জীবেন, দীপক, তুলসী, মিহির, যমুনা, নমিতা, পদ্মা প্রভৃতি শিল্পীদের মধ্যেই, "শ্রীকৃষ্ণ সুদামা" থাকবেন।

"রাইকমল" কে নিয়ে অরোরা ফিল্মস্ খুব ব্যস্ত। নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিয়োতে পঙ্কজ মল্লিক "রাইকমল" এর অন্তরকে গীতিময়, মধুময় ও প্রাণস্পর্শী করার জন্য সুরের ইন্দ্রধনু রচনায় আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন। কাবেরী, উত্তম, নীতীশ, সাবিত্রী, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি শিল্পিগোষ্ঠীর মধ্যেই "রাইকমল" এর সন্ধান পাওয়া যাবে। দেখাশোনার সমস্ত ভার নিয়েছেন সুবোধ মিত্র।

"মহানিশা" দ্বিতীয় বার নতুন শিল্পীদের নিয়ে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, নাগরিকদের আহ্বান জানাবে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট নিশায়। বহু দিন আগে প্রথম তোলা "মহানিশা" ছবিখানির পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন নরেশ মিত্র। এবার কিন্তু নিয়েছেন সুকুমার দাশগুপ্ত। গানের সুর দেওয়ার ব্যাপারে ছিলেন অমর বসু, এখন ভার নিয়েছেন রবীন চ্যাটার্জ্জী। শিল্পীদের মধ্যে আগেকার কেউ নাই। সকলেই এখানকার নামকরা—যেমন, বিকাশ, সন্ধ্যা, ধীরাজ, অনুভা, রবীন, পাহাড়ী প্রভৃতি।

সবিতা পিকচার্স "দত্তক"কে প্রায় পর্দ্দায় তোলার উপযুক্ত কোরে এনেছেন। "দত্তক"এর জীবনী লিখেছেন মণি বর্দ্ধণ। পরিচালনা কোরে নিয়ে আসার ভার নিয়েছেন কমল গাঙ্গুলী। সন্ধ্যারাণী, প্রণতি, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি

শিল্পীদের মধ্যেই কেউ এক জন "নতুক" হবেন। পর্দ্দায় তোলার ভার মোহিনী পিকচার্সের।

"প্রশ্ন"র সঠিক উত্তর আজও পায়নি দুনিয়ার মানুষ। বিচারকের যে বিচারক আছে, এ কথা অনস্বীকার্য্য। কাজেই দুনিয়া ধ্বংস হ'য়ে যাবে তবু "প্রশ্ন"র উত্তর পাওয়া যাবে না। কৌতূহল বশতঃ তবু "প্রশ্ন" করবে মানুষ। লেখার মধ্যে "প্রশ্ন" রেখেছেন সলিল সেন। সকলের সামনে পর্দ্দার ওপর গুছিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছেন চন্দ্রশেখর বসু।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূ দেবী

কুশলী অভিনেত্রী বা সার্থক শিল্পী ব'লতে আমরা যা বুঝে থাকি, এঁর সত্যি এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইনি। কি মঞ্চে, কি পর্দ্দায়—যেখানে যখনই ইনি অবতীর্ণা হ'য়েছেন ও হচ্ছেন এবং যে কোন ভূমিকায়, সেখানেই তাঁর অভিনয়-দক্ষতা প্রমাণিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ ২৫ বছর শ্রীমতী সরযূ দেবী তাঁর স্বাভাবিক শিল্পী মন নিয়ে অভিনয় ক'রে চলেছেন কিন্তু আজও পর্য্যন্ত শিল্পী হিসেবে তাঁর দীপ্তি ম্লান হয়নি এতটুকু। এটা ঠিক যে, পর্দ্দার চেয়ে মঞ্চেই তাঁকে বেশী দেখতে পাওয়া যায় এবং মঞ্চশিল্পী হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তাও সমধিক কিন্তু চলচ্চিত্র-শিল্পী হিসেবেও তাঁর যে একটি বিশেষ ভূমিকা ও অবদান

শ্রীমতী সরযূ দেবী

রয়েছে, এ অনস্বীকার্য্য। এ শিল্পের প্রতি তাঁর দরদ বা মনের তাগিদ কম নয়—এঁর ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিষ্কার। তাই এবারে তাঁর কথাই শিল্পরস-পিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরতে চাইছি।

সেদিন দক্ষিণ-ক'লকাতার পালিত ষ্ট্রীটে শ্রীমতী সরযূ দেবীর (সরযূবালা) বাসভবনে উপস্থিত হ'লুম—চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'বো বলে। সংবাদ পাঠান মাত্র আমাকে নিয়ে বসান হলো তাঁর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে। ঢুকেই দেখলুম—দে'য়ালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতা সারদামণির দু'খানি বেশ বড় ছবি পাশাপাশি রয়েছে। আরও নানা ছবি, পুথি-পুস্তক এদিক-ওদিকে রয়েছে সাজান। দেখে-শুনে মনে হ'লো—শিল্পীর গৃহই বটে। অল্পক্ষণ পরেই সরযূ দেবীও এসে বসলেন—আড়ম্বর বা কৃত্রিমতার এতটুকু ছাপ দেখতে পেলুম না তাঁর চারি পাশে। নিতান্ত সৌজন্য সহকারে তিনি আরম্ভ করলেন আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা।

আমার প্রশ্নমালাটি হাতে নিয়ে শ্রীমতী সরযূ দেবী প্রথমেই বললেন—তখন সবে 'টকি' বা সবাকচিত্র দেখান হ'য়েছে এদেশে। মঞ্চে অভিনয় করে আসলেও পর্দ্দায় অভিনয় করবার সুযোগ যখন এলো, তখন এ ছাড়লুম না। এদেশে চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে অভিনয় করার জন্য বাংলায় কোন ধারাবাহিক কাহিনীর ব্যবস্থা ছিল না। একটি বইএর খণ্ড খণ্ড ক'রে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হ'তো সেদিনে—সে আজ থেকে ২৫।৩০ বছর আগেকার কথা। তখনকার দিনে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর রোহিণীর ভূমিকায় আমি অভিনয় করি এবং 'টকি' বা সবাক চিত্রে এই আমার সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ।

কোন্ ছবিতে এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি'। শ্রীমতী সরযূ দেবী বলে চলেন, এ বলা কঠিন। আর তা ছাড়া আমার তৃপ্তি পাওয়াটাই বড় কথা নয়, দর্শক-সমাজের যেখানে তৃপ্তি, আমার তৃপ্তিও সেখানে—এইমাত্র ব'লতে পারি। এ পর্য্যন্ত বহু ছবিতেই ও বিচিত্র ভূমিকায় আমি নেমেছি ও অভিনয় করেছি—শুনতে পাই, "পায়ের ধূলো", "শাপমুক্তি", "মায়ের প্রাণ" ছবিগুলিতে আমার অভিনয় নাকি ভাল হ'য়েছে। এখন আমি নির্ম্মীয়মান "কালিন্দী" ছবিতে "সুনীতি"র চরিত্রে অভিনয় করছি ছবিখানির পরিচালনা ক'রছেন প্রখ্যাত পরিচালক ও শিল্পী নরেশ মিত্র। আমার বিশ্বাস, এ'তে আমার অভিনয় ভালই হবে, তবে সেটাও দর্শক-সমাজই বলতে পারবেন।

এ লাইনে আসতে আপনি প্রথম প্রেরণা পেলেন কি ভাবে? আমার এ ছোট প্রশ্নে উত্তর দিতে যেয়ে শ্রীমতী সরযূ দেবী বললেন, এত অল্প বয়সে অভিনয়ের দিকে আমার ঝোঁক যায় যে কখন কি ভাবে আমি প্রেরণা পেলুম, সব কথা এক্ষুণি মনে পড়ছে না। তবে এটুকু বলতে পারি, অভিনয় শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে প্রথমে আমি মঞ্চে যোগ দিই। সিনেমা আমি ছোটবেলা থেকেই দেখতুম—এবং বেশীর ভাগই ইংরেজী ছবি, এ থেকেই হয়তো মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপালি পর্দ্দায় অভিনয় করবার প্রেরণা জাগে।

আমি এর পর আরও কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরলুম—শ্রীমতী সরযূ দেবী উত্তর দিয়ে চললেন ধীরে ধীরে। "আমার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী

অসাধারণ কিছু নয়। এখন আমি সংসারী মানুষ। ভোরবেলা উঠে পূজা-আহ্নিক সারি প্রথমে। তার পর ছোট ছেলের পড়াশুনো দেখি, তাকে খাইয়ে স্কুলে পাঠাই। নিজেদের খাওয়া-দাওয়া-পর্ব্ব বাদ দিয়ে যে সময় থাকে, ফাঁকে ফাঁকে সংবাদপত্রাদি পড়ি, অন্যান্য পুঁথি-পুস্তকও পড়ি। সন্ধ্যার দিকে কোন কোন দিন হয়তো সিনেমায় গেলুম, অন্য দিনে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাই বেড়াতে। কোন দিন বা সময় পেলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করি। আর কখনও হয়তো সময় কাটালুম কিছুটা তাস খেলে। আমার "হবি"র (খেয়াল) ভেতর একটি হচ্ছে বই পড়া। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—এঁদের বই আমি পড়তে ভালবাসি। আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনারাজিও যে আমি না পড়ি, তা নয়। রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমা সংক্রান্ত প্রায় সব কয়টি পত্র-পত্রিকাই আমি পড়ে থাকি। আর সাময়িক পত্রগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে আমি পড়ি "মাসিক বসুমতী", এটুকুও বলবো। গল্প ও কবিতা লেখবার অভ্যাস আমার তেমন নেই। আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন—পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কি? এ প্রশ্ন শুনে শ্রীমতী সরযূ দেবী স্পষ্টই ব'ল্লেন, আমি শাদা পোষাকই বেশী পছন্দ করি। আমার মনে হয়, যাকে যে পোষাকে মানায় সেটিই তার পরা উচিত। সবাইকে সব পোষাকে মানায় না, এটুকু মানতেই হবে।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন যদি জিজ্ঞেস করেন, বলবো, শ্রীমতী সরযূ দেবী বলে চলেন—প্রথম সুচেহারা, অভিনয়ে দক্ষতা ও উত্তম কণ্ঠস্বর। যিনি যে চরিত্র অভিনয় করবেন, কুশলী শিল্পী হ'তে গেলে তাঁকে সে চরিত্রের মর্ম্ম গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হ'বে। চরিত্রের সঙ্গে নিজকে যদি মিলিয়ে না দেওয়া যায়, শিল্পী সেখানে ব্যর্থ। এ লাইনে যাঁরা আসতে চাইবেন তাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকা দরকার। বিশেষ করে মহিলা শিল্পীদের স্বাস্থ্য না হ'লে নয়। স্বাস্থ্যরক্ষা বা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমাদের দেশে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে অনেকখানি। শিক্ষিতদের এ লাইনে অধিকতর আসা উচিত। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ লাইনে আসাকে হেয় করে দেখা হ'তো। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। চলচ্চিত্রে অনেক শিখবার ও জানবার আছে। এ শিল্পকে একটা শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে অনায়াসেই।

প্রায় দু' ঘণ্টার অধিক কাল আলোচনা চললো আমাদের ভেতর। দেখলুম, এ শিল্প সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর অনেক কিছু ব'লবার ছিল এ-ও বুঝলুম কিন্তু আমার সময় কম থাকায় আর বেশী দূর আলোচনা চললো না। শেষ মুহূর্ত্তে আমি তাঁর কাছে, শুধু এই জানতে চাইলুম—ভবিষ্যৎ জীবন আপনি কি ভাবে কাটাতে ইচ্ছে করেন? সরযূদেবী নিঃসঙ্কোচে উত্তর করলেন, ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাবো জানিনে। এ যাবৎ যা ইচ্ছে করেছি তা হয়তো হয়নি, আবার যা ইচ্ছে করিনি এমন অনেক হ'য়েছে। ভগবানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—চাওয়ার চেয়ে এ যাবৎ আমি পেয়েছি অনেক বেশী। শেষ জীবনেও যদি ভাল চরিত্রে অভিনয় করে যাবার সুযোগ পাই ও সকলকে আনন্দ যোগাতে পারি, তবেই বুঝবো,—আমি সার্থক, আমার শিল্পি-জীবনও সার্থক।

সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কি?

সাহিত্যের লক্ষণ নিয়ে কলহ হয়। এর কারণ কেহ সাহিত্য শব্দের সংস্কৃত অর্থ ধরেন, কেহ "সাহিত্য দর্পণ" অনুসরণে, কেহ ইংরেজী literature শব্দের এক বিশেষ অর্থ স্মরণ করেন। কোন্ পথে চলেছেন ব'ললে, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। আমি সাহিত্য শব্দের মূলার্থ ভাবছি, কারণ সে অর্থ ধ'রলে বর্ত্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'সহিতে'র ভাব, সাহিত্য। 'সহিত' শব্দের দুই অর্থ আছে। (১) সমভিব্যাহৃত (company, association)। পূর্বে বলা হ'ত, 'লোকের সমভিব্যাহারে,' (গ্রাম্য) 'সমিভ্যাবে'। আমরা এখন বলি, লোকের সহিত। 'সহিতে,' সঙ্গে; পূর্ববঙ্গে বলে সাথে। 'সহিত' সঙ্গী, সেথো। "শূন্যপুরাণে" "সহিতর দানপতি" সেথোর কর্ত্তা। অর্থাৎ, সহিত, সমাজ, গোষ্ঠী। সাহিত্য মাঠে গোঠে জন্মে না। কতকগুলি সমধর্মী লোকের গোষ্ঠী নিমিত্ত সাহিত্য। এরা অবশ্য নিজের হিতেচ্ছায় 'সহিত', সংযুক্ত হয়। সে হিত যে কি, তারাই জানে; কেহ মিছামিছি দল বাঁধে না। দৈবাৎ 'সহিত' শব্দ হ'তে এ অর্থও আসে। স হিত, সহ-হিত, হিতযুক্ত। অতএব ব'লতে পারি, জ্ঞানীর জ্ঞান-সাহিত্য, রসিকের রস-সাহিত্য, ধার্মিকের ধর্ম-সাহিত্য, তরুণের তরুণ-সাহিত্য, গাণিতিকের গণিত-সাহিত্য, ইত্যাদি। সাহিত্য শব্দের বিশেষ অর্থে কাব্য-সাহিত্য। কিন্তু কবি না হ'লেও সাহিত্যিক আখ্যা লাভ হ'তে পারে। সমাজে যাঁর রচনা আদৃত, তিনি সাহিত্যিক। কবি-সমাজে যিনি সাহিত্যিক, তিনি অন্য সমাজে অ-সাহিত্যিক হ'তে পারেন।

—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বেতারের ইতিহাস

নাগার্জ্জুন

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আলো এবং শব্দ দুই-ই তরঙ্গ-বিশেষ (wave motion)। যদি একটা ঢিল জলে ফেলা যায় তা হ'লে আমরা দেখতে পাই যে, ঢিলটিকে কেন্দ্র ক'রে চারি দিকে বৃত্তাকারে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ঢিলটিকে যদি অনবরত নাড়ান যায় তা হ'লে ক্রমাগতই কেন্দ্র থেকে ঢেউ ছড়িয়ে প'ড়তে থাকবে। কোন জিনিষ যখন শব্দ করে তখন তাকে কেন্দ্র ক'রে বাতাসে চারি দিকে শব্দের ঢেউ প্রসারিত হ'তে থাকে। এই তরঙ্গিত বায়ুপ্রবাহ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত ক'র্‌লেই আমরা শুনতে পাই। শব্দবাহী তরঙ্গ সেকেণ্ডে প্রায় ১২০০ ফুট যায়। বহুদূরস্থিত সূর্য্য বা তারার আলো একেবারে শূন্যস্থান অতিক্রম ক'রে আসে; সেখানে বাতাসের লেশমাত্রও নেই, কাজেই আলোর বাহক বাতাস হ'তে পারে না।... বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ইথার নামক এক পদার্থে পূর্ণ। ইথারে কম্পন হ'লে আলোর সৃষ্টি হয়। যে কোনরূপ স্পন্দনেই আলোর সৃষ্টি হয় না। সেকেণ্ডে চার কোটি থেকে সাড়ে সাত কোটির মধ্যে স্পন্দন-সংখ্যা (frequency) হওয়া চাই। এই ইথার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য—অর্থাৎ এক তরঙ্গের মাথা থেকে পরের তরঙ্গের মাথা পর্য্যন্ত; এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগেরও কম। আলোর তরঙ্গের চেয়ে বড় তরঙ্গের উত্তাপকারী শক্তি আছে। এই তরঙ্গের বেগ অতি ভীষণ। আলো সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল যায়; এক সেকেণ্ডে সাত বারেরও বেশী পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরে আস্‌তে পারে।

লর্ড কেলভিন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গণিতসিদ্ধ প্রমাণ দেন যে, কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎভাণ্ড (Leydenjar) থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপত্তি হ'তে পারে। এর পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ চার বছর পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফেডারসেন দেন। তিনি বিদ্যুৎভাণ্ডের স্ফুলিঙ্গ ঝলককে (spark) সবেগে ঘূর্ণায়মান আরসিতে প্রতিবিম্বিত ক'রে দেখেন। সরল আলোর রেখার পরিবর্ত্তে তিনি দেখলেন যে প্রতিবিম্বটি ছোট ছোট ভাগে ভেঙ্গে গেছে। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, স্ফুলিঙ্গটি স্পন্দনশীল। (oscillatory)।

আলো ও বিদ্যুতের মধ্যে যে কোন যোগসূত্র আছে তা প্রথম দেখান বিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। এর আগে ফ্যারাডে পরিকল্পনা করেন যে, সমস্ত বৈদ্যুতিক ঘটনার কারণ ইথারে টান (strain) পড়া। এই পরিকল্পনারই গণিতসিদ্ধ প্রমাণ ম্যাক্সওয়েল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল সোসাইটির নিকট এক প্রবন্ধ পাঠ ক'রে জানান এবং তাঁর সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ম্যাক্সওয়েল আরও প্রমাণ করেন যে, ইথারে টান পড়ার দরুণ বৈদ্যুতিক ঢেউ সৃষ্টি হ'তে পারে, এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও আলোর মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবলমাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে (wave length) ও স্পন্দন-সংখ্যা উভয়েই একই বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ধাবিত হয়।

ম্যাক্সওয়েলের পরিকল্পনার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হাইনরিশ হার্ৎস্ নামে এক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক দেন। তিনি রুমকর্ফ কুণ্ডলীর (Ruhmkorff Coil) স্পার্ক গ্যাপের (spark gap) দুই দিকে দু'খানা ধাতব-পাত লাগান ও এইরূপে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা তিনি দেখান যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আলোর সহধর্ম্মী, দুই-ই একই বেগে ধাবিত হয় এবং আলোর ন্যায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পরাবর্ত্তন (reflection), তির্য্যক্ বর্ত্তন (refraction) প্রভৃতি গুণ আছে।

হার্ৎসের পরীক্ষা প্রকাশিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে সঙ্কেত পাঠানোর কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এর সাহায্যে যে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, বিনা যোগসূত্রে ও সহজেই সঙ্কেত পাঠান যেতে পারে, তা ভারতবর্ষে জগদীশ বসু ও ইংলণ্ডে অলিভার লজ্ প্রথমে প্রদর্শন করান। এঁদের পরীক্ষা বিশেষ কৃতকার্য্য হয়নি। কারণ, এঁরা খুব ছোট ছোট ঢেউ দিয়ে সঙ্কেত পাঠাবার চেষ্টা করেন। জগদীশ বসু এত ছোট দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন কর্‌তে সমর্থ হন যে, তাহাকে অদৃশ্য আলো বল্‌লেই ভাল হয়।

নৈসর্গিক বজ্র ও পরীক্ষাগারে উৎপাদিত বিদ্যুতের যে একই স্বরূপ তা আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ প্রথমে প্রমাণ করেন। কিন্তু আকাশে যে বৈদ্যুতিক স্পন্দনেরও অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ দেন রুশ-বৈজ্ঞানিক আলেক্‌জাণ্ডার পোপোফ্। তিনি একটি উঁচু মাস্তুলে তার লাগিয়ে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করেন ও এই পরীক্ষা ক্রোনষ্টাটের সামরিক পরিষদে (Millitary Academy at Kronstadt) প্রদর্শন করেন। পোপোফের এই পরীক্ষা থেকেই আধুনিক আকাশ-তারের (aerial) সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাসী দেশে এডুয়ার্ড ব্রাঁলি আবিষ্কার করেন যে, আলগা ভাবে রক্ষিত কোন বিদ্যুৎ-পরিচালক (electrical conductor) চূর্ণের উপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পাতে উহাদের পরিচালন-ক্ষমতা (conductivity) হঠাৎ বেড়ে যায়। এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর ক'রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধর্‌বার যে যন্ত্র তৈয়ারী হ'ল স্যার অলিভার লজ্ তার নাম দিলেন Coherer বা "সম্বন্ধকারী" (Cohere শব্দের অর্থ একসঙ্গে লেগে থাকা বা সম্বদ্ধ হওয়া)।

পরীক্ষাগারে পরীক্ষার স্তর পেরিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ব্যবহারিক ভাবে প্রথম কাজে লাগাতে সমর্থ হন মার্কনী। মার্কনী জাতিতে ইটালিয়ান। ইনি প্রথমে বোলোঞা (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রিঘির নিকট কাজ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইটালিতে মার্কনী বেতারবার্ত্তা প্রেরণে সমর্থ হন। তিনি হার্ৎসের যন্ত্রের এক দিকে উঁচু তার লাগালেন ও অপর দিক মাটির সঙ্গে সংযোগ ক'রে দিলেন। কারণ, ধাতুর ন্যায় মাটির ও বিদ্যুতের পরিচালক উঁচু আকাশ-তার লাগানোর দরুণ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অনেক দূর অবধি প্রসারিত হ'তে পারে। সাধারণতঃ আকাশ-তারের উচ্চতার উপরই তরঙ্গের দূর গমন নির্ভর করে।

বৈদ্যুতিক সঙ্কেত ধর্‌বার জন্য মার্কনী ব্রাঁলির Coherer-এর সাহায্য গ্রহণ ক'র্‌লেন। Coherer-এর এক দোষ যে, একবার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তার উপর পড়বার পরেও যন্ত্রের দানাগুলো সম্বদ্ধই থাকে, যতক্ষণ না কোনরূপ আঘাত দিয়ে তাকে পুনরায় কার্য্যক্ষম ক'রে তোলা হয়। এই কারণে মার্কনী Coherer-এর সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ছোট হাতুড়ি যোগ ক'রে দেন। প্রেরক-যন্ত্রে যেমন আকাশ-তারের আবশ্যক হয় গ্রাহক-যন্ত্রেও সেইরূপ উহার আবশ্যকতা আছে। যখনি কোন বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ কোনও পরিচালকের উপর পতিত হয় তখন পরিচালকের মধ্যে ঠিক প্রেরিত তরঙ্গের অনুরূপ তরঙ্গ উৎপাদন করে। গ্রাহক-যন্ত্রের আকাশ-তার পোপোফের পরীক্ষার ন্যায়, বিদ্যুৎ সঞ্চয়ে সাহায্য করে। মোটামুটি ভাবে আকাশে ঢেউ তোলা ও কোনও উপায়ে সেই ঢেউ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করা বেতারের মূল সূত্র।

পানিয়া-ভরণে —শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

কথা নয়, চাই কাজ

"বেকারদের মধ্যে একটা বড় অংশ যে শিক্ষিতদের মধ্য হইতে আসিয়াছে—তথ্যের মধ্যে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে। সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মপ্রার্থীদের মধ্যে ৫৩৭০০ জন নিরক্ষর এবং ২,২২,৭০০ জনের শিক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নীচে বটে—কিন্তু ম্যাট্রিকুলেট রহিয়াছেন ৫৯৪০০, গ্রাজুয়েট নহেন অথচ ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উপরে পড়াশুনা করিয়াছেন এমন ১৭৪০০ এবং গ্রাজুয়েট ১৫৪০০। ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষালাভের দিকে তেমন নজর ও যত্ন নাই বলিয়া যখন কেহ অভিযোগ করেন, তখন এই তথ্যের দিকে তাকাইলে তাঁহারা ভাল করিবেন। সখ করিয়া লেখাপড়া শেখার বিলাসিতা উপভোগ করার মত অবস্থাপন্ন লোক আজ দেশে বিরল। লেখাপড়া শিখিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে, এই আশাতেই অভিভাবকরা আধপেটা খাইয়া ছেলেদের পড়াশুনা চালান। ছাত্রদেরও তাহাই লক্ষ্য। কিন্তু অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখিবার পরও যদি পেটে দুই বেলা ভাত জুটাইতে পারা না যায়, তবে লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দিবার উৎসাহ আসিবে কোথা হইতে? কলিকাতা সহরকে রাষ্ট্রনেতাদের অনেকেই বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলার সহর বলিয়া মনে করেন। এখানে নাকি প্রতি বৎসর যত অশান্তি ও বিক্ষোভ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) দেখা দেয়, এমন আর ভারতের কোন সহরে দেখা যায় না। কিন্তু এই অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলার মূল কোথায়, তাহা সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত তথ্য হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বেকারের যে সংখ্যা বর্ত্তমান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে—কারণ প্রতি বৎসর দেশে লোক বাড়িতেছে, স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া ছেলে-মেয়েরা চাকুরীর বাজারে ভীড় করিতেছে; কিন্তু নূতন চাকুরী সে পরিমাণে বাড়িতেছে না। দ্বিতীয় পাঁচ সালা পরিকল্পনায় এই অবস্থার প্রতিকার হইবে, ইহাই সরকারী কর্ত্তাদের আশ্বাসবাণী। সেই আশ্বাসকে কাজে পরিণত করা যে কত জরুরী প্রয়োজন, প্রকাশিত তথ্য সেই কথাই সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে।"

—দৈনিক বসুমতী।

খনি দুর্ঘটনার হিড়িক

"মডেল ধরমবাদ কয়লা-খনি দুর্ঘটনার মূলে মালিক ও পরিচালক পক্ষের ত্রুটি ও অবহেলার অভিযোগ সুস্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। আমলাবাদ কয়লার খনির গর্ভে বিস্ফোরণের মূলে বর্ত্তমান তেমন কোন কারণের কথা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে খনির গর্ভে দাহ্য গ্যাস পূর্ব্ব হইতেই জমিয়াছিল, এরূপ অভিযোগ দুর্ঘটনার বিবরণে অনেকটা সমর্থিত হইতেছে। ইহা সত্য হইলে অবশ্যই বলা যায়, সঞ্চিত দাহ্য গ্যাস অপসারণের ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নে না করিয়া তাহার মধ্যেই কাজ করিবার হুকুম দিয়া খনির কার্য্য-পরিচালকপক্ষ খনির কর্মিগণকে সম্ভাবিত বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং খনির অভ্যন্তর বিস্ফোরণ এবং সেই বিস্ফোরণে এতগুলি লোক হতাহত হওয়ার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে খনির কার্য্য-পরিচালক পক্ষেরই কিন্তু কয়লার খনির কার্য্য-নিয়ামক ও পরিদর্শক সরকারী কর্মচারিগণের দায়িত্বের কথাও এ স্থলে অবান্তর নহে। খনির অবস্থা এবং তাহার কাজের ব্যবস্থাদি পরিদর্শন করিয়া সরকারী কর্মচারিগণ সময় থাকিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলে এবং মালিক ও পরিচালক পক্ষকে যথোচিত নির্দেশ দিলে দুর্ঘটনা নিবারণের উপায় হয়! মডেল ধরমবাদ খনি ও আমলাবাদ খনি সম্বন্ধে এরূপ নির্দেশ যথাকালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সংবাদে দেখিতেছি, ভারত সরকার তৎপর হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আমলাবাদ খনি দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্ত হইবে। পাটনা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি তদন্তের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। আমরা আশা করি, এই তদন্তে উপরোক্ত সমস্ত সন্দেহ নিরসনের দ্বারা বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটিত হইবে, ঝরিয়া এলাকার কয়লার খনিতে এমন মারাত্মক দুর্ঘটনা কেন ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইবে। দুর্ঘটনার কারণ একবার নির্ণীত হইলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অন্ততঃ এই বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে তাহা দূরীকরণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবশ্যই করা যাইবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নারী-প্রগতি না অধোগতি?

"অনেকেই জানিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সমগ্র ভাবে ভারতবর্ষে উপার্জনরত নারীর সংখ্যা গত ৫০ বৎসরে না বাড়িয়া বরং অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে—নারী-প্রগতির দাবী মৌখিক উচ্চাদর্শ বিংশ শতাব্দীতে এই ভয়াবহ পশ্চাৎগতি রোধ করিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গে গত ৫০ বছরে উপার্জনশীল নারীর সংখ্যা শিল্পে ও কৃষিক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ কমিয়াছে! সমগ্র ভাবেই আমাদের জনবৃদ্ধির তুলনায় চাকরীর সংখ্যায় যা

জীবিকাক্ষেত্রের বৃদ্ধি বহু পিছনে পড়িয়া থাকিতেছে এবং ফলতঃ যে জীবিকার টানাটানি দেখা দিতেছে তাহাতে নারীরাই বেশী বলিদান যাইতেছেন এবং তাঁহারা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় পুরুষের আয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছেন। এই অবস্থা শুধু নারী জাতির পক্ষে ভয়াবহ নয়, ইহার পরিণাম সমগ্র জাতির পক্ষেই বিপজ্জনক। কেন না, মনে রাখা দরকার, ইহার অর্থ এই যে, বাঙ্গালী পরিবারগুলি ক্রমশঃ একজনের আয়ের উপর নির্ভরশীল হইতেছে এবং বিপদে পরিবারের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। অথচ অন্য দিকে গত ৫০ বছরে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া স্বামি-স্ত্রীর পরিবার এখন অধিক প্রচলিত হইয়াছে। গোটা সমাজের বা জাতির দিক হইতে দেখিলে এ্যাডমিনষ্ট্রেটিভ পদে নারীর চেয়ে অর্থকরী উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর সহায়তা অনেক বেশী পরিমাণে প্রয়োজন। আলাদা ভাবে পরিবারের দিক কিংবা গোটা জাতির দিক যে ভাবেই দেখা হউক না কেন, উপার্জনশীল নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা জাতির স্বার্থের পক্ষে অপরিহার্য, নতুবা দেশ ও পরিবার দুই দিক হইতেই আমরা ক্রমশঃ ভয়াবহ ভাবে নিম্নগামী হইব। কিন্তু এই বৃহৎ সমস্যার মধ্যে এ্যাডমিনষ্ট্রেটিভ পদে বিবাহিতা নারীর প্রশ্ন কতটুকু? অবশ্য আমরা এই দিকে নারীর অধিকার অস্বীকার করিতে চাই না, কিন্তু সে তো শুধু উপর তলার লোকের চাহিদা। অগ্রগতির চাকা উল্টা ঘুরিয়া আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে ৪০ বছর পশ্চাদ্‌যাত্রা করিয়াছি সে দিকে যদি নারী-সম্মেলনগুলি দৃষ্টিপাত করেন এবং সরকার ও দেশের কর্তৃপক্ষীয়দের সচেতন করিতে পারেন, তবেই সত্যকার নারীপ্রগতি ও সেই সঙ্গে গোটা সমাজের উন্নতি সম্ভব। কেন না, গত অর্ধ শতাব্দীতে আমরা নারীর মর্য্যাদা লইয়া মুষ্টিমেয় লোকের উর্ধ্বতন সমাজে কম আন্দোলন করি নাই, কিন্তু সকল শিক্ষিত নারীর অলক্ষ্যে সমগ্র ভাবে ভারতীয় নারী ঐ সময় পিছনের এবং বঞ্চনার দিকেই হটিয়া গিয়াছে।"

—যুগান্তর।

ফড়িয়া প্রথার বিলোপ চাই

"হাসপাতালের রোগী, শিশু ও সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে ফল বিক্রয় করা যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য ফড়িয়া প্রথার অবসান দাবী করিয়া ছোট দোকানদার এবং ফেরীওয়ালারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করিয়াছেন। প্রায় এক পক্ষ কাল বড়বাজারের ফলমণ্ডীতে ফড়িয়াদের নিকট হইতে কেহ যাহাতে ফল ক্রয় না করেন তাহার জন্য বয়কট আন্দোলন চলিতেছে। মাত্র ২০।২৫ জন বড় ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ফল আনাইয়া তাহাদের মুষ্টিমেয় এজেন্ট ও ফড়িয়া মারফত বাজারের ৮১ হাজার খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট ফল বিক্রয় করেন। বড় ব্যবসায়ীর মুনাফার পরে এজেন্ট ও তাহাদের মনোনীত ফড়িয়ারা আবার আর এক দফা লাভ করেন। এই ভাবে ছোট দোকানদাররা বাজারে জনসাধারণের নিকট যখন ফল লইয়া আসেন, তখন তাহার মূল্য স্বভাবতই দ্বিগুণের বেশী হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে তিন লক্ষ সংগঠিত গ্রাহকের সংগঠন বি-পি-টি-ইউ-সি এবং অন্যান্য গণ-প্রতিষ্ঠান ফড়িয়া প্রথা বিলোপের দাবী সমর্থন করিয়াছেন। আড়তদারদের নিকট হইতে সরাসরি খুচরা ব্যবসায়ী যাহাতে মাল খরিদ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা ব্যবসায়ী নিজেরা না করিলে সরকারকে করিতে হইবে। রোগী ও শিশুর পথ্য লইয়া এই মুনাফার খেলা বন্ধ করা দরকার। পুলিশ লেলাইয়া দিয়া ছোট ব্যবসায়ী ও স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার না করিয়া সস্তায় যাহাতে জনসাধারণ ফল পাইতে পারেন, সেই ব্যবস্থা সরকারের করিতে হইবে, দেশবাসী এই দাবীই করে।"

—স্বাধীনতা।

আমাদের সরস্বতী পূজা

"এ বৎসর সরস্বতী পূজায় যাহা ঘটিয়াছে তার বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজের দাঁড়ানো দরকার। বাঙ্গালীর কাছে সরস্বতী পূজার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অর্দ্ধাশনে ছিন্নবস্ত্রে রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের আলোতে বই পড়িয়া কি করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হয় বাঙ্গালীই তাহা দেখাইয়াছে। ডাঃ ঘোষের তদন্তে একটা বিষয় খুব ভাল ভাবে নূতন করিয়া ধরা পড়িয়াছে—বাঙ্গালী মরিবে, তবু লেখাপড়া ছাড়িবে না। সেই বাঙ্গালীর সরস্বতী পূজাতেও বৈশিষ্ট্য থাকিবে, পূজা-প্রাঙ্গণের পাশে আসিলে তার গাম্ভীর্য্যে ও সরলতায় মাথা নীচু হইবে, ইহাই সকলে আশা করে। তপস্যা এবং সংস্কৃতির
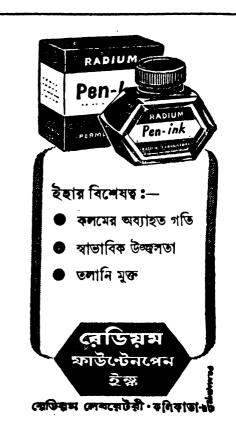
মার্জিত শালীনতা সরস্বতী পূজার মূলমন্ত্র। এবার এই দুইটিই বিসর্জন দিয়া পূজা আরম্ভ হইয়াছে। পাড়াশুদ্ধ লোককে মাইকের বিরাট চীৎকারে বিব্রত ও রোগীদের আতঙ্কিত করিয়া আর যাহাই হউক, সরস্বতী পূজা হয় না। এবারকার পূজায় বোধ হয় ১০ ভাগ টাকা গিয়াছে মাইকওয়ালা, ইলেকট্রিকওয়ালা এবং লরীওয়ালার পকেটে। পূজার উদ্যোক্তাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—মাইক কেন? উত্তর দিয়াছে—আমরা কেহই মাইক চাই নাই, তবে কি না ছেলেরা মানে না। বলিয়াছি, যে কাজ নিজেরা ভাল নয় বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা কয়েক জনে চাহিলেই করিতে হইবে? চতুর্দ্দিক হইতে বাঙ্গালীর উপর আঘাত আসিতেছে। এখনও যদি আমরা এই "তবে কিনা"র আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে মুক্ত হইতে না পারি, সত্য বুঝিতে এবং সেই সত্যের জন্য মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে না শিখি, তবে এক একটি পূজা-প্রাঙ্গণে দশ হাজার মাইক বসাইয়াও নিজেদের ধ্বংস আমরা রোধ করিতে পারিব না। আত্মপ্রবঞ্চনার চেয়ে বড় অপরাধ আর নাই, তার শাস্তি অনিবার্য্য।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

রাস্তার অবস্থা

"বেলডাঙ্গা একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। বহু লোকের বেলডাঙ্গা বাজারে কারবার চলে ও অনেক রকম লোকের আমদানী হয়। বিশেষ করিয়া হাটের দিন তো কথাই নাই। দুঃখের বিষয়, বেলডাঙ্গার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং এই গ্রামের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্বেও এখানকার রাস্তাগুলির কোন উন্নতি হয় না। রেল-গুম্‌টি হইতে বাজার যাওয়ার একটি মাত্র রাস্তায় যে একবার হাঁটিয়াছে সে ইহা বুঝিতে পারে। অন্ধকার রাত্রিতে প্রয়োজনের তাগিদে সাইকেল করিয়া যাহাকে যাইতে হইয়াছে—তাহারা এ কথার সত্যতা যথার্থ উপলব্ধি করিবেন। রাস্তাটির জন্য একটু মেরামত করিতে খুব বেশী খরচ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া জনসাধারণের উপকার করুন, ইহাই অনুরোধ।"

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

ভারতে যক্ষ্মারোগ

"ভারত হইতে যক্ষ্মারোগের অবসান ঘটাইতে হইলে আরো ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে কালাজ্বরের প্রতিরোধ কল্পে আসামে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় আসাম হইতে কালাজ্বরের নিরোধ সাধন হইয়াছে। সুতরাং সরকার ও জনসাধারণ সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে যে কোন বিষয়ের প্রতিরোধ করা মোটেই অসাধ্য নহে। যক্ষ্মারোগে আসামেও কম লোক ভুগিতেছে না—মৃত্যু-সংখ্যাও নগণ্য নহে। আসাম যক্ষ্মাসমিতি আসামে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসালয়, পরীক্ষাগার প্রভৃতি স্থাপন করার জন্য টি-বি-সীল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাত্র এক আনা ইহার দক্ষিণা। এইটুকু সাহায্য দান করিলেও যক্ষ্মার ন্যায় মারাত্মক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রত্যেকেই অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রতি জেলার ডেপুটী কমিশনার, মহকুমা-হাকিম, সিভিল-সার্জ্জন, মহকুমা মেডিকেল অফিসার প্রভৃতির নিকট উক্ত টি-বি-সীল পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, জনসাধারণ সাগ্রহে উক্ত সীল ক্রয় করিয়া যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধে সাহায্য করিবেন।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

শিক্ষাব্যয়

"আজ-কাল ছাত্র-ছাত্রীগণের শিক্ষার ব্যয়ভার এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহাতে সাধারণের পক্ষে ঐ ব্যয়ভার বহন করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এই জানুয়ারী মাসেই বিদ্যালয়গুলির নূতন পাঠ আরম্ভ এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা মনের আনন্দে নূতন নূতন পুস্তকের জন্য অভিভাবকদের নিকট তাহাদের আবদার জানাইয়া থাকে। ইহাতে অভিভাবকদের মনেও আনন্দের সঞ্চার হয় বটে কিন্তু এই আনন্দের খোরাক যোগাইতে গিয়া অভিভাবকদের যে কিরূপ বিব্রত ও বিপন্ন হইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই সবিশেষ বুঝেন। একে ত স্কুলের ফি যে হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তা' যোগানই দায়! তার উপর যুগোপযোগী ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়িয়া তুলিতে না পারিলেও উপায় নাই। কাজেই খরচ-অঙ্কের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভাব-অনটনের মধ্যেও মরিয়া হইয়া অভিভাবকেরা কোনও রকম পড়াশুনার খরচ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তার উপর বর্ষশেষে দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ বিদ্যালয়েই উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা খুবই কম। শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় বা প্রশ্নপত্র দুর্ব্বোধ্য হেতু যে এমন না হইতেছে তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? যাই হউক, এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র স্কুলশিক্ষক ছাড়াও প্রাইভেট শিক্ষকের আশ্রয় না লইলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাসের উপায় নাই। এই ভাবে সাধারণের পক্ষে শিক্ষাব্যয় বহন যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের আয়ের অনুপাতে যদি শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা এক সঙ্কট আকার ধারণ করিতে পারে। অবশ্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় দুঃস্থ দরিদ্র জনসাধারণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।"

—নীহার (কাঁথি)

স্যাংশন নাই

"সম্প্রতি জল সরবরাহের একটি পাম্প ভাল কাজ করিতেছে না—Resink অথবা মেরামত না করিলে তাহা গ্রীষ্ম আসার আগেই বন্ধ হইয়া যাইবে। মিউনিসিপ্যালিটির কাজ-কর্মও বন্ধ! কারণ, সেই আদি অকৃত্রিম "স্যাংশনের অভাব"। এখানকার কর্ত্তা বলেন—কি করিব স্যাংশন নাই, চিঠি তো লিখিয়াছি।—উপরের কর্ত্তারা প্রত্যেকেই বলেন—ইহা তো আমার করণীয় নহে—অমুকের কাছে যান। চন্দননগরের লোক ছুটাছুটি করিয়া মরে আর এদিকে

জল সরবরাহ বন্ধ হওয়ার যোগাড়, রাস্তায় দুই হাত গভীর গর্ত, পিচের রাস্তাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঝরঝরে হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গিয়াছি—চন্দননগরকে ভদ্রেশ্বর না করিলে চলিবে কেন ?"

—সমাচার (চন্দননগর)

আসন্ন নির্ব্বাচন

"কালনা সহরের পৌরসভার নির্ব্বাচন আসন্ন। এ নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অনেক সুধী অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন হতেই সহরে ব্যাপক তোড়জোড় সুরু হয়েছে। এই নির্ব্বাচনে সহর কংগ্রেস সমিতি, গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি প্রভৃতি দল হতে এবং স্বতন্ত্র ভাবে প্রার্থিগণ অবতীর্ণ হয়েছেন। সহরের রাস্তাঘাট প্রভৃতির শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ভোটদাতাগণকে আমরা এ নির্ব্বাচনে বিশেষ ভাবে সজাগ ও সতর্ক হতে অনুরোধ করছি।"

—ভাগীরথী (কালনা)

খাদ্য বিভাগের কর্ম্মী-প্রসঙ্গ

"দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে দেশে খাদ্যাল্পতার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য সরবরাহ বিভাগ খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ হইতে স্থায়ী কর্ম্মচারীদের আমদানী করিয়া এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করেন। এই সকল স্থায়ী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ছিল ১৪০। আর এই ১৪০ জন স্থায়ী কর্ম্মচারীর অধীনে বাহির হইতে পনর হাজার অস্থায়ী কর্মচারীকে এই বিভাগে গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই অস্থায়ী কর্ম্মচারীরা, স্থায়ী কর্ম্মচারীদের নিকট এই বিভাগে কাজ করার দক্ষতা লাভ করেন। ইহাই হইল পূর্ব্ব-ইতিহাস। তাহার পর ১৪০ জনের মধ্যে ১০০ জনকে তাঁহাদের পূর্ব্ব-পদে ফিরিয়া আসিতে হইল—খাদ্য বিভাগের বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ কমিয়া গেল। উপরন্তু ঐ ১৫০০০ অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও রেভিনিউ অফিসার, ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার, ম্যাগুরিফর্ম্ম অফিসার, স্পেশ্যাল সার্কেল অফিসার, স্পেশ্যাল অফিসার এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ পর্য্যন্ত হইয়াছে। আর খাদ্য বিভাগে কর্ম্মকালীন এই সকল অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের উপরওয়ালা স্থায়ী কর্ম্মচারীদের সরকারী নির্দ্দেশে নিম্ন পর্য্যায়ের কেরাণীর পূর্ব্বপদে স্বল্প বেতনে যোগ দিতে হইয়াছে। সরকারের এই একচক্ষু দৃষ্টির কথা আমরা কিছু বুঝিয়া উঠিতেছি না।"

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা

মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

"আজ মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থানে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শ্রুত হইতেছে। হাহাকার ও নৈরাশ্যে সারা জেলার এক অতি বৃহৎ অংশ আজ অভিভূত। অথচ মানবতার আহ্বানে আজ আমরা সমগ্র দেশের এবং বিশেষ ভাবে সমগ্র মেদিনীপুরবাসীর প্রচেষ্টায় যে সামগ্রিক আয়োজন ইতিমধ্যে সুরু হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমরা আজও দেখিতেছি না। স্থানে স্থানে অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে এবং জেলায় ও মহকুমার শাসকবৃন্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ সহযোগিতা ও উৎসাহের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাও প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, আজ মেদিনীপুরে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে বিরাট ও আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আমরা মনে করি, সেবাব্রতীর মনোভাব লইয়া দলমত-নির্বিশেষে জেলার সকল সুসন্তান আজ স্বীয় জেলাবাসীর বিপদের দিনে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবেন—জেলার দাবীকে মুখর করিয়া তুলিবেন—এই আশাই পোষণ করে সমগ্র জেলাবাসী নর-নারী। তাহারা এই আশাও করে যে, স্বাধীনতা-যুদ্ধের গৌরবস্থল, মেদিনীপুর জেলার এই দুর্দ্দিনে দেশের স্বাধীন সরকার ও স্বাধীন দেশের জনগণ অকাতরে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবেন। আজ সমগ্র জেলার জন্য জেলাবাসিগণকে লইয়া একটি "দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি" গঠিত হওয়া উচিত এবং প্রতি গ্রামে তাহার শাখা-প্রশাখা থাকা উচিত। জেলা হইতে এক কণা খাদ্যশস্য যাহাতে বাহিরে না আসে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক ও জলের ব্যবস্থা বিস্তৃত ভাবে সমগ্র জেলায় অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া উচিত। এই সামগ্রিক ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক কলুষতা-মুক্ত হওয়া উচিত।"

—মেদিনীপুর পত্রিকা

শিক্ষা প্রস্তাব

"শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাবনতি এবং ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ওপর তার শোচনীয় প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে বলা হয়, এই সংকটের কারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েই তাঁদের অনুসৃত নীতির মধ্যে শিক্ষাকে যথাযোগ্য অগ্রাধিকার দেন নাই। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে শিক্ষার খাতে বরাদ্দ করা রয়েছে মাত্র ১৫১.৬৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের শতকরা ৭ ভাগ এবং ভারতের শিক্ষার্থী জনসংখ্যাকে অপরিবর্ত্তিত ধরে নিয়ে হিসাব করলেও এই বরাদ্দ মাথা-পিছু ৮/১১ পাই এর বেশী পড়ে না। প্রস্তাবে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বরাদ্দ ব্যয় মোট বাজেটের যথাক্রমে অন্ততঃ ১০% ও ২০ ভাগ ধার্য্য করার দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পি এস্ ইউর বিভিন্ন রাজ্য-শাখাকে অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাসমস্যার উপর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি শিক্ষা-দাবীর খসড়া রচনা করার জন্য জেনারেল কাউন্সিল বিভিন্ন রাজ্যের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞ ছাত্রনেতাদিগকে নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করে। নিখিল ভারত প্রোগেসিভ ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের ত্রিবেন্দ্রাম সম্মেলনে উক্ত শিক্ষাসনদটি উপস্থিত করা হবে।"

—ছাত্র (কলিকাতা)।

মন যদি না মিশে

"আজ ২৬শে জানুয়ারী গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথি হইয়া পাকিস্থানী বড় লাট জনাব গোলাম মহম্মদ দিল্লী আসিতেছেন। তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান দিয়া যথারীতি তোপধ্বনি করিয়া সম্মানিত করা হইবে। খানাপিনা হইবে রাষ্ট্রপতি-ভবনে। এক স্বাধীন রাজ্যের প্রধানকে প্রতিবেশী স্বাধীন রাজ্যের প্রধানগণ সম্মান করিয়া অতিথির পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া আপ্যায়িত করিবেন. ইহা বড়ই মধুর। এই উৎসব রাজধানীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে, কিন্তু পাকিস্থানী অভাগা হিন্দু সর্ব্বহারার দল ভারত ও পাকিস্থানের স্বাধীনতা লাভের

আনন্দ লাভ করিবে কি করিয়া? তাহারা সুখে দুখে নিজ নিজ ভিটায় দিন কাটাইত আজ তাদের অধিকাংশ স্ত্রী-পুত্র লইয়া পথের কুকুরের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া উৎসবের জৌলুস্ দেখিবে আর অতি প্রাচীন কালের প্রবাদ বাক্য স্মরণ করিবে।

ধনীতে ধনীতে কথা মধু-রস-বাণী
কাঙালে কাঙালে কথা চোক-ফাটা-পানী।

তাহা হইলে গণতন্ত্রের উৎসব জনগণের নয়। পাকিস্থান ও ভারত রাজ্যের প্রধানে প্রধানে এই মিলন শুধু উৎসবেও নয়, শ্মশানেও বটে। জনাব গোলাম মহম্মদ গান্ধীজির সমাধিতে পুষ্পমাল্য সহ শ্রদ্ধাদান করিতেও যাইবেন। আমাদের পুর্ব্ব-পুর্ব্ব বারের অস্থায়ী মিলন স্মরণ করিয়া ভয় হয় "এ মিলন কি মিলন দাদা মন যদি না মিশে"।"

—জঙ্গীপুর সংবাদ

পৌষ পার্ব্বণ

পিঠে-পুলির প্রশস্তি করিয়াছিলাম বলিয়া পঁচিশ বছর পুর্ব্বে যুগ-জয়ঢাকরা আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। তখনই বুঝিয়াছিলাম কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে!! উহা সেই মোহরাত্রির কাল পেচকেরই ঘুৎকার ধ্বনি! পৌষ-প্রত্যুষে শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া, ললাটে সতীত্বের প্রতীক রেখা সিন্দুর রাগ দিয়া আর কেহ পৌষ সংক্রান্তির আথাল পাতিবে না! সেই যুগের পিঠে, সরুচাকলি চন্দ্রপুলি, গোকুল পিঠে, সেই নলেন গুড়ের পরমান্ন রাঁধিয়া ঠাকুর দেবতা, ছেলেপিলে, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীকে পরিতৃপ্ত করাইবে না। ঐ আসিতেছেন অতি ভৈরব হরষে আধুনিকারা—"ইপক্ মেকিং পিকক্" সাড়ী পরিয়া অন্নপূর্ণা কাফেটোরিয়াতে মুর্গীর রোষ্ট ও পোট্যাটো চপ ভাজিবেন! আলু ভাজা পোড়া মুখে আর রুচে না, তাই পোট্যাটো চাপ ও ফাউলকারির এত কদর!! এখন পোরের ভাজা ও তিল-পিটুলি ভাজার জাত গিয়াছে! বাঁশমতি চালের পায়সের পিণ্ডদান হইয়াছে, কফি-হাউসে ছত্রিশ জাতির এঁটো সহ ভিনিগার ও সসেরই আদর। ইহার পর পণ্ডিত শ্রীনেহরুর সেই আন্তর্জ্জাতিক মেনু—শূওরের কাদা, চীনা হাঁসের মেটে ও মুণ্ডু ভাজা, চৈনিক মুর্গীর সুরুয়া জাতীয় রসায়ন হইয়া উঠিবে!! আমাদের বাল্য কৈশোরে মা জ্যেঠি আসকে পাটিসাপটা করিতে করিতে বলিতেন—যা, পাঁদাড়ে শেয়াল ফুলিতেছে দেখে আয়। এখন শেয়ালের পাল ফোলে বটে, তবে জাতীয় পাঁদাড় পড়ের মাঠে—বোম্বাই তারকাদিগের অসম্বৃত দেহের আন্দোলন ছন্দে। আধুনিকগণের সেই দোলা লাগে গো! ছেলেগুলোকে আর বাগাইয়া শোয়াইতে হয় না। শুভ্রপক্ষের পাল অভিনেত্রীদের হুল্লোড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠে। হরে মুরারে নহে —হিপ্ হিপ্ হুররে। হরি?? ওরে বাপ রে! যুগ-হিরণ্যকশিপু চটিয়া আগুন হইবেন যে!! মুরারি নামে হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যাসিলি যে কিলবিল করিতেছে!! পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা স্বাধীনতা। এখন কড়ায় গণ্ডায় তার মূল্য দিতে হইতেছে। দেশ কাটা সুসম্পন্ন হইয়াছে, এখন সেই স্বদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি, স্বধর্ম্ম, সতীধর্ম্ম, তাহার ঘৃত দুগ্ধ, রসগোল্লা, সন্দেশ, তাহার পুজা পার্ব্বণ, আচার-অনুষ্ঠান সর্ব্বস্বেরই বলিদান। জীবনের মান বাড়িতেছে। তাই রাজ্যের ছাই আনিয়া প্রেষ্টিজের গোড়ায় ঢালিতেছি। যাহা আমাদের স্বরূপ ও রূপ, যাহা রসানাং রসতম, তাহাই প্রগতির নিরামিষ খড়্গে বলি দেওয়া হইতেছে! স্বভক্তিশ্রী ঘুচিয়া এখন পরকীয়াতে হ্যাকচ প্যাকচ! জীবনের গোধূলি বেলা, মৃত্যুর অন্ধকারের অভিমুখে ঘৃত-পরমান্নে, পুলি পিঠে দিয়া আর কি খাইতে পাইব না! পিষ্টক পরমান্ন যে আমাদের স্বকীয় রসের অভিজ্ঞান!!! রসানাং রসতম!!!" —আর্য্যপত্রিকা (বর্দ্ধমান)

শোক-সংবাদ

সুরেশচন্দ্র ঘোষ

২৪ পরগণার বিশিষ্ট দেশসেবী সুরেশচন্দ্র ঘোষ গত ৪ঠা জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। ভারতে ইংরেজ-আমলে তিনি একজন খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিয়া তাঁহাকে ৪।৫ বার কারাদণ্ড ও অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তিনি 'বড়ুল পল্লীহিতৈষিণী সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ সমিতির মাধ্যমে বহু যুবক স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই নিকট তিনি "ভুঁটাদা" নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হন এবং নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, উদ্বন্ধনে এই মহৎ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রি দশটার সময় কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপুর স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। কবি করুণানিধান ১২৮৪ (ইংরাজী ১৮৭৭) সালের ৫ই অগ্রহায়ণ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার কাব্যে অনুরাগ প্রকাশ পায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে কাব্য সাধনায় তিনি খ্যাতিও অর্জ্জন করেন। তাঁহার কবিতার সুমিষ্ট ছন্দোবদ্ধ ভাষা, তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালার পল্লীজীবনের অনন্য সার্থক প্রতিচ্ছবি ও সহজ সরল আবেদন বাঙ্গালীর চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "ঝরা ফুল" ও "শাতনরী" উল্লেখযোগ্য। করুণানিধান সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কবি করুণানিধান প্রথমে স্কুল-মাষ্টার ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের সাধারণ কর্ম্মচারীরূপেই কর্ম্ম জীবন অতিবাহিত করেন। আমরা কবির শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি ও কবির পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সকালে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ তাঁহার বোম্বাইস্থিত বাসভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৮ বৎসর। বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ প্রেস-কমিশনের ও সর্ব্বশেষ ব্যাঙ্ক ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পদে কার্য্য করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রিয় ও প্রিয়া

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

ফাল্গুন, ১৩৬১]
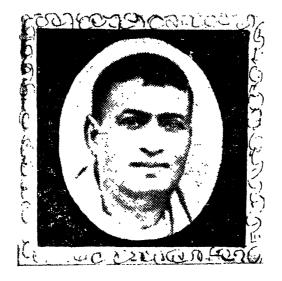
[৩৩শ বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

(স্থাপিত ১৩২৯)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "একবার এক সাধু এল, তার মুখখানিতে বেশ একটি সুন্দর জ্যোতি রয়েছে। সে কেবল ব'সে থাকে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে। সকাল সন্ধ্যা একবার ক'রে ঘরের বাহিরে এসে সে গাছ পালা, আকাশ, গঙ্গা, সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত ও আনন্দে বিভোর হ'য়ে দু' হাত তুলে নাচত; কখন বা হেসে গড়াগড়ি দিত, আর বলত—'বাঃ বাঃ ক্যায়া মায়া—ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া!' অর্থাৎ, ঈশ্বর কি সুন্দর মায়া বিস্তার করেছেন। তার ঐ ছিল উপাসনা! তার আনন্দ লাভ হ'য়েছিল!

"আর একবার এক সাধু আসে—সে জ্ঞানোন্মাদ! দেখতে যেন পিশাচের মত—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধুলো, বড় বড় নখ চুল, গায়ে মড়ার কাঁথার মত একখান কাঁথা! কালী-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে করতে এমন স্তব পড়লে, যেন মন্দিরটা শুদ্ধ কাঁপতে লাগল, আর মা যেন প্রসন্না হয়ে হাসতে লাগলেন। তার পর কাঙ্গালীরা যেখানে ব'সে প্রসাদ পায়, সেখানে তাদের সঙ্গে প্রসাদ পাবে ব'লে বসতে গেল। কিন্তু তার ঐ রকম চেহারা দেখে তারাও তাকে কাছে বসতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। তার পর দেখি, প্রসাদ পেয়ে সকলে যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে, সেখানে ব'সে কুকুরদের সঙ্গে এঁটো ভাতগুলো খাচ্চে! একটা কুকুরের ঘাড়ে হাত দিয়ে রয়েছে, আর একই পাতে ঐ কুকুরটাও খাচ্চে, আর সেও খাচ্চে। অচেনা লোকে ঘাড় ধরেছে, তাতে কুকুরটা কিছু বলছে না বা পালাতে চেষ্টা করচে না! তাকে দেখে মনে ভয় হ'ল যে, শেষে আমারও ঐরূপ অবস্থা হ'য়ে ঐ রকমে থাকতে বেড়াতে হবে না কি!

"দেখে এসেই হৃদুকে বললুম—'হৃদু, এ যে উন্মাদ নয়—জ্ঞানোন্মাদ'—ঐ কথা শুনে হৃদু তাকে দেখতে ছুটলো। গিয়ে দেখে, তখন সে বাগানের বাহিরে চ'লে যাচ্চে। হৃদু অনেক দূর তার সঙ্গে সঙ্গে চললো, আর বলতে লাগল—'মহারাজ! ভগবানকে কেমন ক'রে পাব, কিছু উপদেশ দিন।' প্রথম কিছুই ব'ললে না। তারপর যখন হৃদে কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল, তখন পথের ধারের নর্দ্দমার জল দেখিয়ে ব'ললে—'এই নর্দ্দমার জল, আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন পাবি।' এই পর্য্যন্ত—আর কিছুই ব'ললে না। হৃদে আরও কিছু শুনবার ঢের চেষ্টা করলে, বললে, 'মহারাজ! আমাকে চেলা ক'রে সঙ্গে নিন।' তাতে কোন কথাই বললে না। তারপর অনেক দূর গিয়ে একবার ফিরে দেখলে, হৃদু তখনও সঙ্গে সঙ্গে আসচে। দেখেই চোখ রাঙিয়ে ইট তুলে হৃদেকে মারতে তাড়া করলে। হৃদে যেমন পালাল অমনি ইট ফেলে সে পথ ছেড়ে কোন্ দিকে যে সরে পড়লো, হৃদে তাকে আর দেখতে পেলে না। অমন সব সাধু, লোকে বিরক্ত করবে ব'লে ঐ রকম বেশে থাকে।"

উইলসনের সংস্কৃতানুরাগ

তারাকান্ত কাব্যতীর্থ

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে সাহেব কলিকাতার 'সংস্কৃত-কলেজ' উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার ঐ প্রস্তাব লইয়া তখন তুমুল বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। বহু দিন ধরিয়া ইহার আন্দোলন চলিতে থাকে। এই সময় সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন সাহেবকে মনের দুঃখে একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠান। সেই শ্লোকটি এই ;—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্ত্বং যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি।"

অর্থাৎ এই সংস্কৃত পাঠশালারূপ সরোবরে আপনি যে সকল সুধীরূপ হংসকে স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনি দূরে (বিলাতে) চলিয়া যাওয়ায় কালবশে তাঁহারা এখন পক্ষহীন (পাখা শূন্য ; পক্ষান্তরে পক্ষে লোক-হীন) হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের উচ্ছেদের জন্য ঐ সরসীতীরে বহু ব্যাধ শর সন্ধান করিয়া রহিয়াছে। হে পালক। আপনি যদি তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করেন, তবে আপনার কীর্ত্তি চির স্থির থাকিবে।

বলা বাহুল্য, উইলসন সাহেব একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার—সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন-পাঠন তাঁহার অন্তরের চিরপ্রিয় বিষয় ছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কবিতাটি তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তাহা পাঠ করিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং মনের দুঃখে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত চারিটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। সেই কবিতা চারিটি এই ;—

"বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাতা হংসাস্তৎপ্রিয়বাহনম্।
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি স এব তান্।"

অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ; হংসজাতি তাঁহার প্রিয় বাহন। অতএব প্রিয়তর বলিয়া তিনিই তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।

"অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে।"

অর্থাৎ অমৃত অতি সুমধুর ; কিন্তু সংস্কৃত তাহা অপেক্ষাও মধুর ; ইহা দেবতার ভোগ্য, তাই দেবভাষা নামে কথিত।

"ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্য্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্।"

জানি না, সংস্কৃতে কি মহা মাধুর্য্য রহিয়াছে ; যাহার জন্য—আমরা বিদেশী হইয়াও সর্ব্বদাই সমুন্মত্ত।

"যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।"

যত দিন ভারতবর্ষ থাকিবে, যত দিন বিন্ধ্যাচল ও হিমাচল রহিবে, যত দিন গঙ্গা ও গোদাবরী থাকিবে, তত দিন সংস্কৃত ভাষা থাকিবে।

তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ও উইলসন সাহেবকে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি এই ;—

"গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো 'মেকলে' ব্যাধরাজঃ,
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন মহা ভাগ মাং রক্ষ রক্ষ।"

অর্থাৎ কলিকাতা নগরীস্থিত গোলদীঘির বহু বিটপিবিরাজিত তটদেশে সংস্কৃত পাঠগৃহরূপ যে কৃশকায় কুরঙ্গ এত দিন নিঃসঙ্গ ভাবে বাস করিতেছে, 'মেকলে' নামে এক প্রবল ব্যাধ তাহাকে বধ করিবার জন্য আজ তীক্ষ্ণ শর ধারণ করিয়াছে। ঐ কুরঙ্গ এখন ভীত হইয়া সাশ্রু নয়নে বলিতেছে,—ভো ভো মহাত্মন্ উইলসন! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

ইহার উত্তরে উইলসন সাহেব তর্কবাগীশ মহাশয়কেও একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে কবিতাটি এই ;—

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্ব্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ-
র্দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্ব্বলে।"

অর্থাৎ নিত্য বহু প্রাণীর শত শত পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ সূর্য্যকরনিকরে সন্তপ্ত হইতেছে, ছাগাদি জন্তুগণ নিত্য চর্ব্বণ করিতেছে, 'কোদালী' দ্বারা কত চাঁছিয়া ফেলা হইতেছে, তথাপি অতি ক্ষীণতনু দূর্ব্বা কিছুতেই মরিতেছে না ; কেন না, দুর্ব্বলের প্রতিই বিধাতার দয়া। মূল কথা—যতই অত্যাচার হউক, সংস্কৃত কখন লোপ পাইবে না ; বিধাতাই উহাকে রক্ষা করিবেন।

ফলে, লর্ড মেকলের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। বরং সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতি তাহার পর হইতে বৃদ্ধিই পাইতে থাকে।

—আগামী সংখ্যায়—

হরিদ্বার ভ্রমণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সর্ব্বেশ্বর

(অপ্রকাশিত কবিতা)

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁর প্রকাশে সব প্রকাশে বিশ্ব যাঁহার কাব্য,
ইচ্ছাতে যাঁর সম্ভবপর সকল অসম্ভাব্য।
যাঁহা হ'তে সূর্য্য ওঠেন, যাঁহাতে যান অস্ত ;
তিনিই আমি, তিনিই তুমি, তিনিই তো সমস্ত।
গ্রহ-উপগ্রহগুলি যাঁর খেলিবার বর্ত্তুল,
কল্পে, কল্পে, করেন লীলা, তিনিই স্থূল ও অস্থূল।
নিষ্ক্রিয় সেই মায়াতীত হ'লেও মহামায়া ;
চরাচরের প্রাণ-দেবতা, তিনিই আলোক-ছায়া।
সিনীবালী চন্দ্রকলার মতন অগোচর
ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান, মহা কালেশ্বর।
তিনিই গড়েন, রক্ষা করেন, নাশেন তাঁহার সৃষ্টি,—
কচিৎ কারেও দেন গো দেখা করেন কৃপাদৃষ্টি।
সেই দয়াময় যেথায় রাখেন, যাহা খাওয়ান, পরান,
সহান যে দুখ, বহান যে ভার, যে সব কথা কওয়ান,
যোগান যাহা, ভোগান যাহা নতশিরেই নিও,
মোদের দিয়ে করান তিনি যে কর্ম্ম তাঁর প্রিয়।
বাহ্য-জ্ঞান-হারা হয়ে তাঁরেই ধেয়াইও,—
ফলের সনে কৃতকর্ম্ম তাঁরেই সমর্পিও।
সদাই ফেরেন সাথে সাথে সেই আনন্দময়,
বিষকেও অমৃত করে তাঁহার বরাভয়।
বুদ্ধি তাঁরে বুঝতে নারে, বুদ্ধি-মন তো জড়,
"পশ্যন্তী" শক্তিতে তাঁর ছোটরা হয় বড়।
কী নিগূঢ় যোগ রয়েছে সেই অধরার সনে,
সাঙ্গ হবে স্বপ্ন-দেখা তাঁহার দরশনে।
প্রেমের ঘটে ক'রলে পূজা জাগেন সর্ব্ব-স্বামী,
ফাঁকি দেওয়া চলবে না তায়, তিনি অন্তর্যামী।
বিবেক-বিচার দিলেন মোদের, তিনিই বিধান-কর্ত্তা,
সংসার-সমুদ্র থেকে তিনিই সমুদ্ধর্ত্তা।
এই অভিনয়-লীলা করেন নীরূপ নির্ব্বিকার,
ঋষিরা তাঁর নাম রেখেছেন একাক্ষর ওঙ্কার।
নামীর চেয়ে নামটি বড়, জপ' নামের মালা,
প্রয়াণ-কালে নাম স্মরিলে ছাড়বে পান্থশালা।
হও যদি নামমন্ত্র-ভ্রষ্ট পাবে চরম শাস্তি,
তাঁহার চরণ শরণ বিনা অপর তীর্থ নাস্তি।
প্রথম কবি 'চতুরানন' মানব সচেতন,
সবিতৃ-মণ্ডলে বিষ্ণু পালেন ত্রিভুবন।
মহেশ্বর শিবের রূপে রুদ্র মৃত্যুঞ্জয়,
নটরাজের পটতালে ঘটে গো প্রলয়।
তিনিই ঋক্, যজুঃ, সাম, যজ্ঞ-হোমানল,
তাঁহারে না পাবে তুমি হারাও যদি বল।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় রূপেই আত্মপ্রকাশ তাঁর,
বিরাট প্রাণে দাও মনঃ-প্রাণ ভক্তি-উপহার।

এই সৃষ্টির নাইকো আদি, নাইকো অন্ত তার,
পূর্ব্ব-পরিকল্পিত সব সৃজেন বারংবার।
তাঁহার লাগি' বিবাগীদের পরম প্রসাদ মিলে,
চিনে নিও অতিথ-রূপে দ্বারে দাঁড়াইলে।
সর্ব্বত্রই দেখছ তাঁরে, ডাক' শ্রদ্ধাভরে,
কারো প্রাণে বাজলে ব্যথা বাজুকও অন্তরে।
চিন্তা-সরিৎ যদি কভু অপথ দিয়ে বয়,
তাঁহার রথচক্র তলে মরবে সুনিশ্চয়।—
নিবু-নিবু জীবন-প্রদীপ, সলতে জ্বলে' যায়,
শেষের তৈল-বিন্দুটি তার নিঃশেষে ফুরায়!
নূতন-কিছু দেখলে কোথাও লাগে চেনা-চেনা,
পূর্ব্বে যেন দেখেছি তায়, ঠিক মনে পড়ে না।
রাত যে প্রভু হয় না প্রভাত, ডাকে ফেরুর দল,
জন্মান্তর প'ড়ছে মনে, ঝরছে চোখের জল।
দেখেই চিনি 'কুরুক্ষেত্র', রক্তিম তীরথ,
যে স্থানে পার্থ-সারথি চালান ধর্ম্মরথ।
ঐ শোনা যায় 'পাঞ্চজন্য', গাণ্ডীব-টংকার,
'ব্রহ্ম-ভূ-র্ভুবঃ স্বরোম্' ঝঙ্কারে বীণ কার।
যুদ্ধ জিতে' হয় যে পথে মহাপ্রস্থান,
"গুপ্তকাশী" "কর্ণ-প্রয়াগ" দেখিতে চায় প্রাণ।......
রইলো পড়ে' হৈম-কিরীট বৈরাগীরা চলে,
সপ্তধারা পেরোয় তারা কল্পতরুর তলে।
হাতছানি দেয় তুষার-শৃঙ্গ, মৌনে প্রশ্ন করে,
উত্তর দেয় বজ্রভাষা নিঃসীম অম্বরে।
'স্বর্গ-সোপান-পংক্তি' লুকায় আঁধার সুড়ঙ্গে,
রক্ত গড়েন 'পরশুরাম' অচল-তরঙ্গে!
তপঃফলে বাণের ফলা পাথর কেটে' ছোটে,
আলোড়িয়া করঙ্কাক্ষ মহাকালের জটে!
ক্রৌঞ্চেরা যায় যে পথ দিয়ে 'মানস-সরোবরে'
আজও যোগী দেখেন যেথা 'উমা-মহেশ্বরে'।...
দেখবে পথে 'নন্দাদেবী' অপূর্ব্ব-সুন্দর,
গড়িয়ে পড়ে জমাট বরফ মন্দ্রিয়া কন্দর।
শোন্‌বার কান পেলেই তুমি শুনবে তাঁহার জয়,
তৎক্ষণাৎ হবে তোমার সব-বন্ধন-ক্ষয়।
চিত্তের নিভৃত গুহায় প্রভুর অধিষ্ঠান,
নামই রূপায়িত হ'য়ে বসে ভাসমান।
সমাধিতে আপনারে বিস্মরিয়া যাও,
নিরন্তর স্মর' তাঁরে যদি কভু পাও।......
ওই দেখ' সমুদ্র-মন্থ, সুধার কলস-ধারা
পরিবেশন করেন হরি ভাগ পান দেবতারা।
দেখেন পাশে ছদ্মবেশে বসে' অসুরগণ,
অকস্মাৎ মোহিনী-রূপ ধরেন নারায়ণ।

উপোষিত লোচন তাদের তাঁরই পানে চায়,
অমৃত-প্রাশ বঞ্চিত-গ্রাস দৈত্যেরা পালায়।
আদিযুগের ভারতবর্ষ ভাস্‌বে তোমার মনে,
চিনবে তাঁরে দূর' কেদারে' 'বদ্রী নারায়ণে'।
একীকৃত হিন্দু-ভারত দেখবে 'রামেশ্বরে',
দেব-ভাষায় সমস্বরে পূজা-মন্ত্র পড়ে।
ভৃঙ্গারে জল ভরে' এনে 'গঙ্গোত্রী' থেকে,
দেয় ঢালিয়া শিবের শিরে বিল্বপত্র রেখে'।
হেরিবে 'কন্যাকুমারী' প্রভাতী স্নান করে'
মুক্তবেণী যুক্তপাণি পূজেন দিবাকরে।
দিগ্‌বলয়ে জাগেন রবি ভারত-রত্নাকরে,
জবা-কুসুম-সমান রাঙা প্রণমে ভাস্করে।
ঢেউয়ের ভাঙ্গাগড়ায় ভাসে সাগর-সারস দল,
পাষাণ-কূলে পারার ধারা ক'রছে টলমল।
মাটি ছাড়া চিৎশক্তির ব্যক্তমূর্ত্তি নাই,
মৃৎ-কণিকায় গঠিত চিন্ময়ীর প্রতিমাই।
মাতা তিনি, পিতা তিনি, পরা-প্রকৃতি,
এই জীবনেই পায় দ্বিজত্ব, নব-জাগৃতি।
চাও না বলে'ই পাও না তাঁরে তোমার সন্নিহিত,
ক্ষিতি-সলিল, অগ্নি-অনিল তাঁহাতে আবৃত।
কালকে ফাঁকি দিতে পার, হও যদি ধ্যান-মগ্ন,
আত্মার অতল-স্পর্শে তোমার মিলন-লগ্ন।
তাঁর শ্রীচরণ ধেয়াও যখন, মুখ দেখা না যায়,
চাঁদ-মুখ দেখিতে গেলেই চরণ যে হারায়।
প্রাণ-মন ইন্দ্রিয় তিনি, মাংস-পিণ্ডময়
জড়দেহ তাঁর প্রসাদে রয় সচেতন রয়।
অদ্বিতীয় সুহৃৎ তিনি, পরম রমণীয়,
ক্ষয়োদয়-রহিত সেই অনির্ব্বচনীয়।
দেখো যেন না করিও তাঁরে উৎক্রমণ,
এই পৃথিবীর নৌ-যাত্রীর কোথায় উত্তরণ ?

প্রেম-ঘন-চন্দন-অগুরুর গন্ধে বরণ করি',
ধেয়াও সেই বাসুদেবে দিবস-বিভাবরী।
দ্রৌপদীর মতন কর' বসন-বিসর্জ্জন,
নিবারিবেন লজ্জা তোমার লজ্জা-নিবারণ।
মন্দির-মার্জ্জনা কর' নয়ন-ধারাপাতে,
প্রবেশি' শ্রীক্ষেত্র-দ্বারে হের' জগন্নাথে।
ডাকেন তোমায় নীলাদ্র্য ওই রূপের পারাবার,
ডুব দাও মন, জুড়িয়ে যাবে সব জ্বালা তোমার।
তাঁহার লাগি' কাতর প্রাণে আকুতি জাগুক,
অচ্যুত-নাম-চ্যুত হ'লে, ঘুচ্‌বে নাগো দুখ।
নৃসিংহ-মূরতি ধরে' বিপত্তি-ভঞ্জন,
বিদারি' স্ফটিক-স্তম্ভ প্রহ্লাদে যেমন
রাখেন হরি, তেম্‌ন তুমি তাঁহার করুণায়
উত্তীর্ণ হ'বে মৃত্যু গরল পরীক্ষায়।•••
কী অপরূপ ভোগ্য-জগৎ! সব তাঁরি বৈভব ;
রূপে-রসে-শব্দে-স্পর্শে অনন্ত উৎসব।
তিনি যে সর্ব্বতো ভদ্র, তাঁরে নমস্কার,
বন্ধু তিনি তাঁহার মত কে আছে আপনার ?
রূপে-রূপে প্রবাহিত, সব নামই তাঁর নাম,
অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-অচিন্ত্যে প্রণাম।
সাকার আরাধিলেও তুমি পূজবে নিরাকারেও ;—
ডাক দিলে তাঁয় পায় ক্ষমা পায় অতি-দুরাচারেও।
একটি কথাই শিখেছি আজ ইহ-জীবন-প্রান্তে,
তিনি যাঁরে করেন কৃপা, সেই পারে তাঁয় জান্‌তে।•••
আকাশ-বৃত্তি-সম্বল এই স্থবির-যাযাবর
উঞ্ছ শস্য গায় খুঁটিয়া, ধরমশালাই ঘর।
বেরিয়েছে আজ, গেরুয়াবাস পরেছে তার মন,
দাও গো সাড়া প্রাণের ঠাকুর, দাও গো দরশন।
চড়ুই পাখীর মতন তোমার চরণ-ধূলায় স্নান
ক'রবো কবে ? পথ চেয়ে রই, ভিক্ষা কর' দান।

পরমহংসের সাধুসঙ্গ

"আবার এক সাধু এসেছিল, তার ঈশ্বরের নামেই একান্ত বিশ্বাস! সেও রামাৎ ; তার সঙ্গে অন্য কিছুই নেই, কেবল একটি লোটা (ঘটী) ও একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তার বড়ই আদরের—ফুল দিয়ে নিত্য পূজা কোরতো ও এক একবার খুলে দেখতো। তার সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন অনেক ক'রে ব'লে ক'য়ে বইখানি দেখতে চেয়ে নিলুম। খুলে দেখি তাতে কেবল লাল কালীতে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, 'ওঁ রামঃ!' সে বললে, 'মেলা গ্রন্থ প'ড়ে কি হবে ? এক ভগবান্ থেকেই ত বেদ পুরাণ সব বেরিয়েছে ; আর তাঁর নাম এবং তিনি তো অভেদ ; অতএব চার বেদ, আঠার পুরাণ, আর সব শাস্ত্রে যা আছে, তাঁর একটি নামেতে সে সব রয়েছে! তাই তার নাম নিয়েই আছি!'—তার (সাধুর) নামে এমনি বিশ্বাস ছিল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল

বিনয় চৌধুরী

আজকের দিনে সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে একটা প্রচণ্ড সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বহু অনভিজ্ঞ জনের নানা যুক্তিহীন ঘোরালো উক্তিকে সে সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হয়ে সমস্যা আরো দুরূহ এবং গুরুতর হয়ে উঠেছে। আজকের এই বহু-বিঘ্নিত জটাজুটজাল জড়িত রজ্জুতে সর্পভয় সৃজিত সমস্যাটির প্রকৃত নিরসন বাসনাতেই বর্তমান প্রবন্ধের বিপুল আয়াসাত্মিক প্রণয়ন ও প্রকাশ।......

এ পর্যন্ত বহু রকমের সভা-সমিতির নাম আপনারা শুনে থাকবেন, কিন্তু "অশ্লীলতা নিবারণী সভা"র নাম শুনেছেন কি না জানিনে। অবশ্য সে সভার অস্তিত্ব আর এযুগে নেই। ১৮৭৩ সালে কলকাতায় এই নামের একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। অনেকের ধারণা, আজকের যুগে সাহিত্যে অশ্লীলতা যেমন ক্রমবর্দ্ধমান হারে বেড়ে চলেছে, তখনকার সমসাময়িক সাহিত্যেও এ-ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখনকার বঙ্গদর্শনে এই সভাকে অভিনন্দিত করে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের পুরনো বঙ্গদর্শন থেকে এ-ও জানা যায় যে, অশ্লীলতা নিয়ে তর্কযুদ্ধে রত পত্র-পত্রিকাগুলো মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এই তর্কযুদ্ধ অবশ্য মূলত ওই "অশ্লীলতা নিবারণী সভাকে" কেন্দ্র করেই ফেনিয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান-ভাবাপন্ন পত্রিকাগুলো এই সভাকে সরবে অভিনন্দিত করেছিলেন। আরেক দল পত্রিকা মনে করতেন যে, সভার উদ্দেশ্য উত্তম বটে, কিন্তু সভা করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম, বরং এর ফলে অনিষ্ট ঘটাই স্বাভাবিক। তখনকার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই দলে ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর পত্র-পত্রিকারা অশ্লীলতা বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু এই সভার কার্য্যাবলী দ্বারা পাছে সত্যকার সাহিত্যে পর্যন্ত গিয়ে হাত পড়ে, এই শঙ্কায় সভাকে সমর্থন করেননি।

কি জানেন, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই যুগে যুগে সাহিত্যে শিল্পে অশ্লীলতা নিয়ে বাদানুবাদের ঝড় উঠেছে, এবং আবার তা শান্ত হয়েও গেছে। তবে সে শান্তির স্থায়িত্ব খুব বেশী দিন হয়নি। আবারও ঝড় উঠেছে, পুনরায় শান্ত হয়েছে। এমনিই চলেছে ক্রমাগত। এর কারণ আর কিছু নয়, আসলে শ্লীলতা অশ্লীলতা সভ্য মানুষের একটা বিরাট নৈতিক সমস্যা বৈ আর কিছু নয়। আমাদের দেশেও বিগত যুগ থেকে সুরু হয়েছে এই নিয়ে বাদানুবাদ। কিন্তু কোনো মীমাংসাই আজো হতে পারেনি। আজকের এই নব্যযুগে যেন সে দ্বন্দ্বটা আরো প্রচণ্ডতা লাভ করেছে। তবে এই ধরণের বিতর্কের পরিণাম কিন্তু সকল যুগেই একই ভাবে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ঝড় হয়েছে এবং ধুলোই উড়েছে বেশী, আর সেই ধুলোতে ইতর জনের চোখ অন্ধই হয়েছে। এ নিয়ে, আজকের জগতের মনীষীরা যে পরস্পর-বিরোধী বাক্যজাল বিস্তার করেছেন, তাতে সমস্যাটা যেন আরো বেশী ঘোরালোই হয়ে উঠেছে। এটা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, তা দৃঢ় ভাবে না বলেও ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সাহিত্যে শিল্পে ঠিক কতটা পরিমাণ অশ্লীলতা বরদাস্ত করা যেতে পারে, এটা একটা বড় নৈতিক সমস্যা। সুতরাং এ ধরণের 'Normative' ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই আসে সংজ্ঞার কথা। অর্থাৎ প্রথমেই দেখতে হবে শ্লীলতা-অশ্লীলতার সম্বন্ধে এমন কোন মৌলিকসূত্র পাওয়া যায় কি না, যাকে মান হিসেবে ধরে জগতের তাবৎ শিল্প-সাহিত্যকে শ্লীল এবং অশ্লীল এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১৯২০ সালে অশ্লীল পুস্তক ক্রয়-বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করার জন্য জেনেভাতে এক বিশ্বসম্মেলন আহূত হয়েছিল। তাতে পৃথিবীর বহু দেশের জ্ঞানি-গুণী প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁরা একজোট হয়ে সাহিত্যের নৈতিক মান কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে ফতোয়া দেবেন। সে সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল।

গ্রীসের প্রতিনিধি প্রশ্ন করে বসলেন: অশ্লীলতা সম্বন্ধে ফতোয়া জারী করার আগে অশ্লীলতার একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া দরকার। বৃটেনের প্রতিনিধি তাঁর প্রস্তাবে বাধা দিয়ে বললেন, তা হয় না। অশ্লীলতার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তাঁর কথার পোষকতায় তিনি আরো বললেন, বৃটিশ অশ্লীলতা আইনে অশ্লীলতার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বৃটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাবই অবশ্য সব শেষে গৃহীত হয়েছিল, তবে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে কি না বলা যায় না।

কথাটা শুনতে সত্যিই বড় অদ্ভুত লাগে না কি, যে অশ্লীলতা নিয়ে এত আন্দোলন, অথচ তার নিজস্ব কোন একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। এক জনের বা এক জাতির কাছে যা অশ্লীল, অপর জন বা অপর জাতির কাছে তা অশ্লীল না-ও হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, 'দি ওয়েল অব্ লোন্‌লিনেস্' নামের সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রচার গ্রেট বৃটেনে বন্ধ করে দেওয়া হোলো, অথচ আমেরিকায় ওই বইয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হোলো না। আবার এমনও দেখা গেছে, একই জাতির কাছে এক সময়ে যা অশ্লীল বলে নিন্দিত হয়েছে, পরের যুগে তা সৎশিল্প ও সৎ-সাহিত্য-রূপে বন্দিত হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে এর ভুরি ভুরি নজীর পাওয়া যায়। ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' এক সময়ে আইন বলে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যালজাকৃকেও অশ্লীল সাহিত্য রচনার অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। জেম্‌স্ জয়েসের 'ইউলিসিস' দীর্ঘ বিশ বছর ধরে অশ্লীল গ্রন্থ বলে পরিচিত হয়ে অবশেষে ১৯৩১ সালে বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হোলো। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর গ্রন্থরাজিও এক কালে অশ্লীল বলে উপেক্ষিত হয়েছিল।

আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। অর্থাৎ পূর্ব-যুগে যে সব শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অশ্লীলতার প্রশ্ন ওঠেনি, উত্তর কালে তাই চরম অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছে। বাঙলাদেশের কবিগান, তরজা, খেউড় ইত্যাদিকেই ধরা যাক না কেন। এক যুগে এ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এগুলোর একটা বড় রকমের স্থান ছিল। অথচ আজকের এই রবীন্দ্রোত্তর যুগে ও-সবগুলো চরম অশ্লীল বস্তু

বলেই উপেক্ষণীয়। এ সব কথার নজীর তুললে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যগ্রন্থকেও চরম অশ্লীল গ্রন্থ বলে মেনে নিতে হয়।

১৮২০ সালে ছাপা বাঙলা বইয়ের যে তালিকা পাদ্রী লঙ সাহেব প্রস্তুত করেছিলেন, তার মধ্যে "আদি রস," "রতিমঞ্জরী" "রতিবিলাস" ও "রসমঞ্জরী" প্রভৃতি আদি রসের বইগুলো তখনকার লোকেদের কাছে, আজকের কৃষ্টিবান বাঙালীর কাছে রবীন্দ্র রচনাবলী যতখানি সমাদৃত, ঠিক ততখানিই আদৃত হোতো। একটা যুগে এই ধরণের সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বাঙালী কালচারকে ভাবাই যেতো না। কিন্তু আজ তা অশ্লীল বলে বিলুপ্ত হতে বসেছে।

প্রসঙ্গত অশ্লীলতা আইনের আলোচনাও এসে পড়ে। বৃটিশ আইনে অশ্লীলতার কোনো সংজ্ঞা নেই। পূর্বে অশ্লীলতাকে আইনত বিচার করতে গিয়ে বিচারপতিদের ফাঁপরে পড়তে হোতো। ১৮৬৬ সালে বিচারপতি কক্‌বার্ণ রুলিং দেন: "I think the test of obscenity is this, whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprove and corrupt those whose minds are open to such immoral influences, and into whose hands a Publication of this sort may fall." অর্থাৎ "যাদের মন নীতি-বহির্ভূত প্রভাবের অধীন, তাদের হীন ও দূষিত করার প্রবণতা অশ্লীল বলে অভিযুক্ত বিষয়বস্তর যদি থাকে এবং উক্ত বিষয়বস্তু যদি তাদের হাতে পড়বার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে উক্ত বিষয়বস্তুকে আমি অশ্লীল বলে মনে করবো।"

বিচারপতি কক্‌বার্ণের রুলিং এবং অশ্লীলতা আইনের সমালোচনা না করেও কেবলমাত্র বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এর অর্থ কত ব্যাপক। কক্‌বার্ণের রুলিংকে আরো সহজ ভাবে প্রকাশ করতে গেলে এই দাঁড়ায়: কোনো বিষয়বস্তু কারো পক্ষে সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, সুতরাং তাকে অশ্লীল বলে মনে করতে হবে, এইটিকেই বিচারের মান হিসেবে ধরলে "রামায়ণ," "মহাভারত," "বাইবেল," "গীতগোবিন্দ," "শকুন্তলা," "বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী" "তন্ত্রধর্মের উপর লেখা যাবতীয় পুস্তকাবলী," এমন কি গুরুদেবের "চিত্রাঙ্গদা" ও মহাত্মাজীর "আত্মজীবনী"ও বোধ হয় বাদ পড়বে না। অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রন্থ, যৌনবিজ্ঞানের বইগুলোও এই আওতায় পড়ে, এবং এই ধরণের ব্যাপক আইনের প্রকোপে পড়ে বিশ্ববিশ্রুত যৌনবিজ্ঞানী হ্যাভ্‌লক্ এলিসের "স্যাক্‌সুয়্যাল ইনভারস্যান্" গ্রন্থটিও যে ১৮৯৮ সালে অশ্লীল বলে পরিগণিত হয়েছিল, আশা করি এ-কথা সংশ্লিষ্ট মহল অবগত আছেন। কথা হচ্ছে, যাদের মন নীতি বহির্ভূত প্রভাবের অধীন কিংবা অপরিণত বয়স্ক শিশুর পক্ষে কোন গ্রন্থ ক্ষতিকারক হলেই, অন্যের কাছে তা যত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন—সে গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে, এটি আদৌ কোন যুক্তি নয়।

আরেক কথা, অশ্লীলতা আইনের ব্যর্থতার বীজ কিন্তু ওই আইনের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে। মানুষের চরিত্রের একটা সাধারণ ধর্ম অনুসারে কোনো বই অশ্লীল আখ্যা পেলে বা নিষিদ্ধ হলে সে বই পাঠের জন্য পাঠক এবং অপাঠক উভয় মহলেই একটা দারুণ প্রবণতা দেখা দেয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। যে ছায়াছবি "কেবল মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য" ছাপ মারা তার টিকিট-ঘরে অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের ভীড় হয় সব চাইতে বেশী। এর কারণ আর কিছু নয়, বোরখার আচ্ছাদনে যত বেশী বাঁধা যাবে আজাদীর মোহ তত বেশী বেড়ে যাবে। এই জন্যই বারট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ চিন্তানায়করা সর্বপ্রকার অশ্লীলতা আইনের বিরোধী।

আরো একটা দিক ভাববার আছে। সেটা হোলো তথা-কথিত অশ্লীলতার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে। তা'বলে আমি পর্ণগ্রাফী বা অপ-সাহিত্যের হয়ে ওকালতি করার অভিপ্রায়ে কথাটা বলিনি। সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে অপ-সাহিত্যের প্রচার ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা নির্মূল করে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি একমত। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, সৎ-সাহিত্যেও অশ্লীলতার অপরিহার্যতাকে নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানী আইভান ব্লকের একটি উক্তি মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন, "সত্য সর্বদাই সুন্দর। এমন কি যৌন-জীবন সম্পর্কেও এই উক্তিই প্রযোজ্য।" সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়, তবে তা জীবনের কোন এক বৃহত্তর অংশকে বর্জন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। শিল্পী বা স্রষ্টা যেখানে রসবস্তু সৃষ্টি করছেন, সেখানে তার শিল্প-কর্মকে চরম রূপ দানের জন্য যা কিছুর সাহায্য নেবার প্রয়োজন, তাঁকে তার অধিকার দিতে হবে। এ কথাটা সর্বকালের সত্য যে, শিল্পীর বা স্রষ্টার রাজ্যে নিজের কানুন ছাড়া অপরের কানুন চলে না এবং চলবে না। 'হি ইজ্ দেয়ার দি ওন্‌লি কিং ইন্ হিজ্ ওন্ কিংডম্।' আইনের নিগড়ে বা বেয়নেটের তলায় সৃষ্টিকার্য ছাড়া আর সব কিছুই সম্ভব। শিল্পীর এই স্বাধীনতা ভালো-মন্দের ন্যায়-অন্যায়ের বাইরে। কারণ, এ হোলো সৃষ্টির নিজস্ব আইন। সুনীতি দুর্নীতির বিচারকদের ছাড়-পত্র পাক বা না পাক, শিল্পীর এই প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই জগত পেয়েছে অজন্তা ইলোরার মতো প্রাচীন ভারতের অবিনশ্বর ভাস্কর্যাবলী, গ্রীসের ভেনাস এফ্রোডিটে এ্যাপোলো আর সহস্র সহস্র মর্মর স্বপ্ন পেয়েছে, পেয়েছে র‍্যাফেল বাতিচেল্লি দাভিঞ্চি আর রুবেন্‌সদের অমর দান। প্রাচীন আর বর্তমানের বিপুল সাহিত্য সম্পদ, যা নিয়ে বিশ্ব আজ সমৃদ্ধ, তা এই স্বাধীনতারই প্রত্যক্ষ ফল।

হ্যাভ্‌লক্ এলিস বলেছেন, "obscenity is a permanent element of human social life and corresponds to a deep need of the human mind."

হ্যাভ্‌লক্ এলিস বৈজ্ঞানিক। সুতরাং তিনি মানুষের জীবনের এই সত্যটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এ'কে সাহিত্যের ভাষায় পরিবেশন করলে এই দাঁড়ায়: মানুষ যেমনটি চায়, তেমনটি ভাবে। অথচ বাস্তব জীবনে যা প্রকাশ পেলো না, তার যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেল, তা রূপ গ্রহণ করলো আর্টে, নাটকে কাব্যে, সাহিত্যকর্মে। অশ্লীল শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হোলো, 'obscene'। জীবন-মঞ্চে যা প্রকাশ্যে অভিনীত হতে পারলো না, সেই 'off the scene' রঙ্গমঞ্চে দেখানো হোলো। এই ভাবে বিভিন্ন আর্টের ভেতর দিয়ে জীবন প্রবাহ পরিপূর্ণতা লাভ করলো।

রুশীয় টেলিগ্রাম পত্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর

রুশিয়া হইতে অধ্যাপক পেট্রভ রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিই হউন, উহার কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের ও গ্রেট ব্রিটেন সমেত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অমঙ্গল হইবে, ঐ ব্যক্তির এই আশঙ্কায় তিনি (অর্থাৎ ঐ সর্ব্বজ্ঞন অভিভাবক) টেলিগ্রামটির কোন কোন অংশ বাদ দিয়া বাকী রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘরের মারফৎ প্রেরণ করেন। ছাঁট বাদে উহা এইরূপ :—

To
Rabindranath Tagore.
Santiniketan, India.

What is your explanation of gigantic growth of U. S. S. R. industry; its high tempo of development; setting up of extensive collectivized, mechanized agriculture; liquidation of illiteracy; tremendous increase in number of scientific institutions, universities, schools; and cultural upheaval of U. S. S. R. in general?

What problems will confront you in your work during next five years and what obstacles

Please telegraph for Soviet press, Moscow Kultviaz.

Petrov. V. O. K. S. Moscow.

রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফে ইহার এই উত্তর দিয়াছেন :—

To Professor Petrov V. O. K. S. Moscow.
Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.

Our obstacles are social and political inanity, bigotry and illiteracy.

Rabindranath Tagore.

রাজবন্দীদের রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন পত্র

Censored

শ্রীকবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের
করকমলে

হে গুণি,

হিজলী বন্দী-নিবাসের রাজবন্দীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্রটি তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। নানা প্রকার অভাব অভিযোগ আমাদের স্বচ্ছল, স্বচ্ছন্দ গতিকে পদে পদে প্রতিহত করে বলিয়াই উহা তোমার নিকট পাঠাইতে বিলম্ব হইল। বন্দীর দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিও।

প্রণত
শ্রীসুধীরকিশোর বসু
সম্পাদক, রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব সমিতি

হিজলী বন্দী-নিবাস

১০ই জানুয়ারি ১৯৩২

হিজলী রাজবন্দিগণের অভিনন্দন পত্র

বাংলার একতারায় বিশ্ববাণীর ঝঙ্কার তুলিয়াছ তুমি, হে বাউল কবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে প্রণাম করি।

সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-সঙ্কুচিত দ্বন্দ্বপর বিশ্বসমাজকে মৈত্রী, করুণা ও কল্যাণের মন্ত্র দান করিয়াছ তুমি, হে বিশ্বকবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বন্ধন-বিমূঢ় অবমানিতের মর্ম্মবেদনাকে ভাষা দান করিয়াছ তুমি, হে দরদী, তোমার জন্মদিনে আজ তোমার কল্যাণ কামনা করি।

বিশ্বদেবতার চরণে গীতাঞ্জলি দান করিয়া বিশ্বের বরমাল্য লাভ করিয়াছ তুমি, হে গুণি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে অভিনন্দিত করি।

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তুমি গ্রহণ কর। —ইতি

১৬ই পৌষ, ১৩৩৮

রাজবন্দিগণ

রবীন্দ্রনাথের উত্তর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, কারান্ধকার থেকে উচ্ছসিত তোমাদের অভিনন্দন আমার মনকে গভীর ভাবে আন্দোলিত ক'রেচে। কিছুতে যাকে বদ্ধ করতে পারে না সেই মুক্তি তোমাদের অন্তরের মধ্যে অবারিত হোক্ এই আমি কামনা করি। ইতি

সমব্যথিত

২২শে জানুয়ারি, ১৯৩২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বীটন কলেজের গোড়ার কথা

(সংবাদ-প্রভাকর, ১৩ই জানুয়ারি ১৮৫৭। ১ মাঘ ১২৬৩)

কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন।—বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। যে নিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় এবং বালিকাদিগের বয়স ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত আছে, হিন্দু-সমাজের লোকদিগের অবগতি নিমিত্ত আমরা সে সমুদায় নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন। বালকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও একজন পণ্ডিতও নিযুক্ত আছেন।

বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে, প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে, নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পান না।

ভদ্রজাতি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না। যাবৎ কমিটির অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা, এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন, তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্রীরূপে পরিগৃহীত হয় না।

পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, পাটীগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্তৃপক্ষীয়েরা ইঙ্গরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইঙ্গরেজীও শিখে।

বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা ও বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া গিয়া থাকে। আর যাহাদের দূরে বাড়ী, এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্কী করিয়া আসিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে।

হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা হইলে, হিন্দুসমাজের ও এতদ্দেশের যে কত উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানাপন্ন হন এবং শিশু সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন; আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জ্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

অতএব আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত রহিয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফলভাগী হউন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।

সিসিল বীডন,	সভাপতি।
রাজা শ্রীকালীকৃষ্ণ বাহাদুর	সভ্য
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ	„
শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ	„
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র	„
শ্রীপ্রাণনাথ রায় চতুর্দ্ধুরীণ	„
শ্রীরামরত্ন রায়	„
শ্রীরাজেন্দ্র দত্ত	„
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বসু	„
শ্রীভবানীপ্রসাদ দত্ত	„
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়	„
শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ	„
কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়।	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।
২৪ ডিসেম্বর। ১৮৫৬।	সম্পাদক

প্যারিসের অন্তর্জ্জাতীয় ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী থেকে

অক্ষয়কুমার নন্দীর পত্র

[শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুকে লিখিত]

International Colonial Exposition
Hindustan section
Paris, 27th August, 1931.

সবিনয় নিবেদন,

আজ তিন মাসের বেশী হ'ল প্যারিসে এসেছি। জেনে সুখী হবেন আমার একাদশবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী অমলাকে সঙ্গে এনেছি। আমরা কলম্বো থেকে জাপানী লাইনের জাহাজে চেপে ১লা মে তারিখে নেপল্সে নেমেছিলাম। তার পর পথে রোম, মিলন, লুজান, ব্রীগ প্রভৃতি ইটালী ও সুইজর্লণ্ডের প্রধান স্থানগুলিতে এক একটি দিন থেকে প্যারিসে পৌঁছেছি। পথে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।

প্যারিসের এবারকার ইণ্টারন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশনে বাংলার কয়েকটি শিল্পদ্রব্য দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। প্রথমে এসেই দেখলাম, প্রায় সকল দেশের জন্য পৃথক পৃথক প্যাভিলিয়ন প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থান প্যাভিলিয়নটি অর্দ্ধসম্পন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অনুসন্ধানে জানলাম, বোম্বাইবাসী কয়েকটি পার্শি হিন্দুস্থান মণ্ডপ প্রস্তুতের ভার নিয়েছিল, কিন্তু বেশী পরিমাণে টাল হোল্ডার ভারত থেকে না আসায় টাকার অভাবে

কার্য্য অসম্পন্ন রেখেই সরে পড়েছে। একজিবিশন কর্তৃপক্ষগণ তারপর অন্য লোক বন্দোবস্ত করে অতিবিলম্বে হিন্দুস্থান বিভাগের বাড়ী প্রস্তুত করেছে। ৭ই মে সম্পূর্ণ একজিবিশন খোলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থান বিভাগ খোলা হয়েছে ১১ই জুলাই তারিখে। একজিবিশনের এই প্রথম দু'টি মাস আমরা কাজ করতে না পারায় আমাদের অনেক অসুবিধার কারণ হয়েছে।

আমরা ব্যতীত ভারতের আর একটি ব্যবসায়ী বোম্বাই থেকে এসেছেন। ইনি মোরাদাবাদ ও জয়পুরের নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এনেছেন। এতদ্ভিন্ন ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নে আর আর প্রায় ৪০টি ভারতীয় ষ্টল হয়েছে; এদের অধিকাংশই ইহুদি এবং ইয়োরোপের নানা দেশে এদের ভারতীয় দ্রব্যের কারবার আছে। আমরা এবার আমাদের "ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের" অলঙ্কারাদি বেশী আনি নাই···আমরা মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের প্রস্তুত নানা প্রকার দ্রব্য এবং বাংলার নানা স্থানের কাঁসা ও পিতলের দ্রব্য বেশী এনেছি। এবার সকল দেশের আর্থিক অবস্থাই অতি মন্দ—বিশেষত: এদেশে ভারতীয় জিনিষ আনতে অনেক কাষ্টমস্ ডিউটী দিতে হয়, এজন্য আমাদের কারখানার অলঙ্কারাদি অতি সামান্যই এনেছি। সকলেই একবাক্যে বলছে হিন্দুস্থান বিভাগে আমাদের ষ্টলটিই সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

প্যারিসের এই একজিবিশনটিতে যোগ দিয়ে সব চেয়ে লাভের বিষয় এই হচ্ছে যে, ইয়োরোপের নানা দেশের নানা জাতির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার এবং সেই সেই দেশের অনেক বিবরণ জানবার সুযোগ পাচ্ছি। ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেরই এক একটা বাড়ী এখানে প্রস্তুত হয়েছে এবং তাদের উপনিবেশ থেকে অনেক জিনিষ এনে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকার ইউনাটেড ষ্টেটস্ তাদের আগামী ১৯৩৩-এর শিকাগো-একজিবিশন কেমন হবে, তার মডেল ও অনেক বিষয় এখানে প্রদর্শন করছে। এই রকম নানা স্থানের বিষয় নিয়ে একজিবিশনটি খুবই দেখবার মত দাঁড়িয়েছে। হলণ্ড গবর্ণমেণ্ট জাভা দ্বীপের প্রদর্শনী নিয়ে এখানে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে বৃহৎ বাড়ী তৈরি করেছিল তা একজিবিশন আরম্ভের এক মাস পরেই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়। তারা আর দেড় মাসের মধ্যে নূতন বাড়ি তৈরি করে তেমনই আয়োজনে আবার জিনিষপত্রে পূর্ণ করেছে।

ফরাসীদের ইণ্ডোচায়নার ওঙ্কার মন্দিরের একটি সঠিক নমুনা এখানে অতি বৃহৎ আয়োজনে প্রস্তুত করেছে—এইটাই এই প্রদর্শনীর সব চেয়ে বেশী দেখবার মত বিষয় হয়েছে। লণ্ডন থেকে অনেক বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ এই একজিবিশনটি দেখতে এসে থাকেন, এঁদের অনেকেই আমাদিগকে জানেন। তাঁদের অনেককে আমরা আমাদের বাসায় নিয়ে গিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকি।

এখানে ইংরেজী ভাষায় কোন কাজ চলে না—ফরাসী ভিন্ন গতি নাই। প্রথম প্রথম আমরা এখানে এসেই এক জন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী রেখে সামান্য ভাবে ভাষা শিখেছিলাম। আমার কন্যা শ্রীমতী অমলা আমার চেয়ে একটু ভাল শিখেছে। একজিবিশনে আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা একটি ফরাসী ও একটি জর্ম্মাণ মেয়ে নিযুক্ত করেছি। এরা দুজনেই ইংরেজী জানে এবং ইতালীয়, রুশীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলিতে বেশ কথাবার্ত্তা বলতে পারে। এদের মধ্যে জার্ম্মাণ মেয়েটি কুমারী এবং ফরাসীটি বিবাহিতা। বেশ মনোযোগের সঙ্গে আমাদের কাজ করছে। শ্রীমতী অমলা আমাদের ষ্টলের কোন কার্য্য করে না—খুব দেখে-শুনে বেড়ায়। তাকে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবার ব্যবস্থা করেছি। অমলা একাকী প্যারিসের সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বেড়াতে পারে। অমলা দেশে ইংরেজীতে কথা কইতে শেখে নাই, এখানে এসে তিন মাসের মধ্যে বেশ ভাল ইংরেজী বলতে শিখেছে, আর ফরাসী ভাষা বুঝতে পারে—সামান্য ভাবে বলতে পারে। একটি আশ্চর্য্য বিষয়—অমলা আমাদের কালোমেয়ে, কিন্তু এখানকার সব মেয়েরাই তাকে পরমাসুন্দরী বলে। আমাদের দেশের চোখ-নাক-মুখ-চুল এরা অত্যন্ত সুন্দর দেখে। এটা নূতনত্বের দিক দিয়ে নয়—সত্যই এদেশের মেয়েদের চেয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের অনেকেরই গঠন সুন্দর। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের নানা বিষয়ে যতটা পার্থক্য এই ফরাসীদের সঙ্গে ততটা নয়। ইংরেজ প্রভৃতি এ্যাংলো-সাক্শন জাতির ধারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র রকমের। ফরাসীদের রীতিনীতির সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মিল আছে। রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের মিল আরও বেশী দেখতে পাচ্ছি। এবার অনেক দেখা-শুনার সুযোগ পাচ্ছি।

অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত একজিবিশনটি থাকবে। তার পর আমরা জার্ম্মাণীতে কিছুদিন থাকব, পরে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ দেখব। ১৯৩৩-এর শিকাগো-একজিবিশনে যোগ দেবার আশা আছে, এটা এই যাত্রায়ই হবে, কি দেশে গিয়ে ফিরে এসে যোগ দেব, তা এখনও ঠিক করি নাই।

আমরা সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছি। যখনকার যে সংবাদ, পর পর জানাব। ইতি—

নিঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক

"কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত "যমুনা"র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তার পর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত ভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক, যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।" —শরৎচন্দ্র।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

দুর্গা। কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। সারা শরীর জুড়ে সৌন্দর্য্যের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্য, রূপের চেয়ে লাবণ্য। রং কালো। একটু বেশি দৃপ্ত, তেজী, চঞ্চল। হেঁটে ঘোরা-ফেরা করে, মনে হয় ঘোড়ার পিঠে ঘুরছে। টগবগ করছে সর্বদাই, কাজে আর কথায়। হাসিতে আর গানের সুর গুন্‌-গুন্‌ করায়। দু'টি চোখ জুড়ে একটি কবিতা: এমনি ক'রে শ্রাবণ-রজনীতে হঠাৎ খুসী ঘনিয়ে আসে চিতে।

দুর্গার সঙ্গে পরিচয় সেই এতটুকু বয়েস থেকে। ফ্রক প'রে লরেটোয় পড়তে যায় বাড়ীর গাড়ীতে। যখনকার কথা বলছি, তখন কলকাতায় নিজের বাড়ী ছিলো অনেকের, কিন্তু নিজেদের গাড়ী ছিলো বেশি লোকের নয়। বাবা কটন মিলসের ম্যানেজিং ডাইরেকটর। দাদামশায় ডাকসাইটে ব্যারিষ্টর। সে-দিনকার সেই পরিচয়ের ওপর ধুলো পড়ে গেছে অনেক। ভুলে গিয়েছিলাম দুর্গাকে। তারপর এক দিন প্রথম বৈশাখের নতুন ঝড়ের দিনের এক সন্ধ্যেবেলায় উড়ে গেলো অনেক দিনের ধুলো। বেরিয়ে এলো সেই ছবি—যে ছবি অযত্নে মলিন হয়েছে, কিন্তু গ্লানি জমতে দেয় নি কোথাও!

কেমন করে দুর্গাকে আবার আবিষ্কার করলুম? নতুন পরিবেশে কেমন করে হ'ল নতুন পরিচয়? সেই নব-জন্মান্তরের ইতিহাস আছে একটু। সে-ইতিহাস এই নতুন জন্মের চেয়ে কম বিচিত্র নয়। যেমন খেলায় জেতার চেয়ে কেমন করে জিতলো'র ইতিহাস নয় একটুও কম রোমাঞ্চকর।

এই আবিষ্কারের জন্যে আমাকে যেতে হয় নি কোথাও। পায়ে হেঁটে হিমালয়ে নয়, রিপোর্টার হয়ে নয় দিল্লী, প্রত্নতত্ত্বের পাতায় খারাপ করতে হয় নি চোখ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আমাকে দেয় নি এর পাঠ, বিদেশী গল্পের মধ্যে খুঁজতে হয় নি এর অভিজ্ঞতা। কলকাতায় কুড়িয়ে পেয়েছি এক দিন। ঘরের কাছে হাত বাড়িয়েই পেয়ে গেছি তাকে। বুঝেছি মানুষের চেয়ে বড় মানুষের জীবন। আগুনের চেয়ে বড় তার আলো। অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

সত্যিই আমার অভিজ্ঞতার ইতিহাসে ছবি আছে অনেক, কিন্তু তার পত্রসংখ্যা পরিমিত। ভ্যারাইটি আছে, গ্ল্যামার নেই। এ কোন বিনয়-বচন নয়, সত্যভাষণ। কারণ ট্রামে করে কার্জন পার্কে নেমে সেখান থেকে উট্রাম বুকে এই আমার সব চেয়ে বড় ভ্রমণ।

ভ্রমণের মত বিভ্রম আর কিছু নেই, আমার ধারণা হ'ল এই। দেশে-দেশে, অথবা দেশে-বিদেশে নিত্য-ভ্রাম্যমানদের আমি সমীহ করে চলি। তাদের মনের প্রসার হয়ত বিপুল, জীবনের অভিজ্ঞতা 'হয়ত' কেন, নিশ্চয়ই বিচিত্র! আমার তবুও সেই,—

> বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
> বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
> দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
> দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
> ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
> একটি ধানের শীষের উপরে
> একটি শিশির-বিন্দু।

আসলে হয়ত এ সব কিছুই নয়, আসলে আমি জাত-কুঁড়ে। পৃথিবীর সেই বারো জন বিখ্যাত কুঁড়ের কথা মনে আছে? ভগবান তাদের একদিন ডেকে বললেন; 'তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে কুঁড়ে তাকে দেবো আমি একটি সোনার প্রদীপ।' কুঁড়েদের মধ্যে এই প্রথম চাঞ্চল্য। এগার জন তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। ভগবান বললে: 'না, তোমরা কিছু নও, এই প্রদীপ পাবে ওই দ্বাদশ ব্যক্তি।' একথা শোনবার পরেও, এখনো, ও যখন শুয়ে থাকতে পেরেছে, তখন ওই সত্যিকারের কুঁড়ে। এদের মধ্যে আমি পরিগণিত হতে পারি কি না জানি না, কিন্তু বাস্তবিকই আমি ভেবে পাই না কেন সাত দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করতে না পারলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

সমারশেট মমের লেখা আমার ভালো লাগে। পপুলার হওয়া সত্ত্বেও লোকটা সেন্সিবল। কিন্তু মমও যখন বলেন: 'লেখক হবার জন্যে সারা পৃথিবী চষে বেড়ান দরকার', তখন মমতা হয় এই অন্ধ

থিয়োরীবাদীর ওপর। ব্যালজ্যাক কেমন করে তাহলে অত বড় লেখক হলেন ইচ্ছে হয় জানতে।

পতিতাগৃহে যারা যায়, তারা সবাই অধঃপতিত হয়ে তবে সেখানে যায়, না, সেখানে গিয়ে অধঃপতিত হয়? এ-প্রশ্ন সমাজ-নেতাদের। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ যখন বলবার চেষ্টা করে যে, 'পতিতাগৃহে এসেছি পতিতার জীবন জানতে' বই লিখবো বলে, তখন হাসি পায়। বেশ্যা-বাড়ী যায় লক্ষ লক্ষ লোক, তাদের মধ্যে চন্দ্রমুখীর বেদনা ধরা পড়ে ক'জনের লক্ষ্যে? পতিতালয়ে গেলেই যদি পতিতা-চরিত্র সৃষ্টি করা যেত, তাহলে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেই হওয়া যেত পরশুরাম!

লেখক পতিতাগৃহে যায় ডিটেলস্-এর জন্যে। কিন্তু যার চোখ আছে সেই না খুঁজবে ডিটেলস্। যার চোখ আছে সেই না ডিটেলস ছাড়া আরও কিছু খুঁজবে। মাত্র ডিটেলসেই যে খুসী, সে ত ফটোগ্রাফার। ডিটেলস ছাড়িয়ে যে দেখতে পায়, সেই না আর্টিষ্ট। আসল কথা, লেখবার কলম যার হাতে, আর দেখবার যাদু যার তৃতীয় নয়নে, সে সব সময়ই লিখছে। নিদারুণ অর্থাভাবে তার সময়ের অভাব হতে পারে, বিড়ি কিনে ফেলায় কাগজ কম পড়তে পারে তার; পৃষ্ঠপোষকের মানে পাব্লিশারের অভাবও হয়ত হয়, কিন্তু লেখবার জন্যে বিষয়বস্তুর অভাব হয় না লেখকের। কোনও দিন না। কোথাও না।

তাই বলছি, দিল্লী যেতে হবে কেন? হিমালয়ে কী আছে যা নেই কলকাতায়? হিমালয়ের পরিচয় কী শুধু ২৯,২০০ ফিটে? তেনজিং-এর বিজয়বার্তায় যে আছে, হিমালয় কি শুধু অতটুকু? কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর তুষারের জমাটস্রোত। শুধু সূর্যের আলোয় সে গলে। তেমনি হিমালয়ের বুকে কান পেতে যে শুনতে চাইবে তার কথা, সে ট্যুরিষ্ট নয়, অভিযাত্রীদের সহযাত্রী খবরের কাগজের রিপোর্টার নয়, সে অন্য লোক। পাহাড় থেকে সে থাকে অনেক দূরে, তবুও শুধু সে-ই শুনতে পায় হিমালয়ের হৃৎপিণ্ডের ধক্-ধক্ ধ্বনি। অনাদি কাল থেকে অনন্ত কালে সে বয়ে নিয়ে চলেছে একটিমাত্র কথা, সেই একটিমাত্র কথাতেই সব কথার শেষ। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে!

তাই আমার চিরকালের জিজ্ঞাসা, সাহিত্যকে হয় স্বপ্ন নয় শ্লোগান হতেই হবে কেন? সাহিত্য সর্বগ্রাসী। জীবনের ওপর তার ভিত্তি, যে জীবন সর্বংসহা। একটি 'রাজার' সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করতে পারলে, সমস্ত সমাজই কি এসে দাঁড়াচ্ছে না তার মধ্যে? দেবতার মূর্তি গড়তে বাদ দেওয়া যায় কি অসুরকে? মানুষের জয়গান গাইতে লক্ষ-কোটি পরাজয়ের বেদনা ছায়া না ফেলে পারে কি কখনো? সাহিত্যে সবাই আছে, সবাইকে নিয়েই সাহিত্য। যা-খুসী তাই লেখা হয়ত যায় না, কিন্তু যাকে খুসী তাকে নিয়ে নিশ্চয় লেখা যায়!

তাই, কলকাতার ওপরই কেন হবে না মহৎ কাব্য রচনা? মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে নাটক হতে বাধা কিসের? কুলি আর চাষা যদি হয় সর্বহারা, বড়লোকেরা যদি হয় ভিলেন, তবে মধ্যবিত্তেরা অন্ততঃ ভাঁড় হয়েও কেন সাহিত্যে বেঁচে থাকবে না? বিত্ত না থাকার জন্যে যারা মধ্যবিত্ত, তাদের চেয়ে বড় ভাঁড় আর কোথায়? তাদের কান্না নিয়ে যদি এমন কোন নাটক না লেখা হয় যা পড়ে লোকে অন্ততঃ হাসতে পারে কিছুক্ষণ, তাহলে বুঝতে হবে লেখকেরই অভাব। লেখার জন্যে যা দরকার অভাব নেই তার।

কলকাতার মহাভারতে আপনি সবাইকে পাবেন, সব কিছুকেই পাবেন। এমন কি যাহা নাই ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে তাও পাবেন। সে হল এই মধ্যবিত্ত। রাজার বিদূষক নয়, বিদূষকের রাজা।

কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনার কখনো কি মনে হয় নি, রাস্তার ধারের সাঙ্গুভেলীতে যে-ছেলেটি দোকান ঝাঁট দেয় সাতটার আগে, উনুন ধরায় নিজের হাতে, সারাদিন খদ্দেরের অর্ডার জুগিয়ে, পাণ থেকে চুণ খসলে গালাগালি খায় মালিকের, রাতে শুতে যায় বারোটার পর, তার বয়স এখনও দশ নয়! যখন আপনার-আমার ছেলে বড়-বাড়ীর রাজপুত্রের মত বর্ডারের ট্রাউজারের জন্যে বায়না ধরে, না পেলে বাপকে মনে করে অপদার্থ, নিজের জীবনকে ভাবে ব্যর্থ।

দুর্দান্ত গ্রীষ্মে গলে-যাওয়া পীচের রাস্তায় চট পেতে ঐ যে লোকটি শুয়ে মেরামত করছে গাড়ী, ওর জীবনের যে-কোন একটা ঘটনা নিয়ে ঘটানো যায় না অঘটন? মহাযুদ্ধের চেয়ে ও কি কম খবর?

কিংবা সঙ্গ নিন, রোজ টালা থেকে টালিগঞ্জ-করা বাস কণ্ডাক্টরের, ঘুরে আসুন একটা ট্রিপ। খোলা রাখুন চোখ, কাণকে শুনতে দিন সব কথা। চরিত্ররা আপনি এসে দাঁড়াবে আপনার সামনে। সে-সব মানুষরা নেই কোনও মহাকাব্যে, আরব্য উপন্যাসে নেই ওর চেয়ে রোমাঞ্চ, ওরা কারা? ওরা কারা জানি না, কিংবা জানতে চাই না। তাই বলি, বাংলা দেশে লেখবার স্কোপ কোথায়, থ্রিল কই বিদেশী সাহিত্যের? ধরুন ওদের, ওদের তুলে ধরুন। লেখায় আর রেখায়। ছবিতে আর কবিতায়। গানে অথবা ছড়ায়। মঞ্চে এবং সিনেমায়। দৃষ্টির স্বচ্ছতা দিয়ে তার সংগে মিশিয়ে হৃদয়ের রং গড়ে তুলুন ওদের। কারণ শত শত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা গড়া পরে—'ওরা কাজ করে।' এপিক কি শুধু পাতার সংখ্যা দিয়েই নিরুপিত হয়? না,—সাদা পাতার ভেতর থেকে কালো কালির আঁচড়ে বেরিয়ে আসে যে মানুষ, তার বেঁচে থাকায়, কাঁদায়, হাসায় বলায় না বলায় জন্ম হয় এপিকের? কে বলবে সে কথা? কে দেবে এর উত্তর?

যাদের কথা বললাম, তাদের সঙ্গেই বিত্তনিঃস্ব মধ্যবিত্তরা গ্রামে না গিয়ে, শহরতলীতে না সরে যাবার চেষ্টা করে এখনও বেশির ভাগই মজে আছে এই মজার শহর কলকাতায়। চৌরঙ্গীর চৌহদ্দিতে আপিস যাবার আর আসবার সময় দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। নিওন সাইনে, হকারের চীৎকারে, বায়স্কোপের বিজ্ঞাপনে, রেস্তোরাঁর খাবারের গন্ধে, মুহূর্তকাল সে বিস্মৃত হয়—কাল রেশনের দিন, মাইনে পেতে এখন অনেক দেরী। ঢুকে পড়ে কোন সিনেমা হলে, দাঁড়িয়ে যায় লাইনে! আজ ত দেখি, দেখা যাবে কাল কি হয়। তারপর দু' ঘণ্টা আলোকোজ্জ্বল অন্ধকার। এবং তার পর বেরিয়ে আবার সেই ছেঁড়া মশারি, বাচ্চার কান্না, গিন্নীর তাগাদা। সকালের আপিসের তাড়া। লেট খাতায় সই করার সর্বনেশে রিস্ক। তবু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, পুরুষানুক্রমে কলকাতার মায়ায় এরা সেই কামাখ্যার ভ্যাড়া।

নিঃসন্দেহে গরু-ভ্যাড়ার মত। নিজেদের বলতে কিছু নেই। মাসের শেষের বাঁধা-মাইনে এদের চালায়। লম্বা-বেঁটে, রোগা-মোটা, কালো-ধলো, অকৃতিগত পার্থক্য আছে, মনের চেহারা এক। শনিবার ছুটো থেকে রবিবার সন্ধ্যে পর্যন্ত আপিসের খোঁয়াড় থেকে ছাড়া পায়। ছাড়া পায় কিন্তু টের পায় না। রবিবারের রাত শেষ হবার আগেই সোমবারের আতঙ্ক। প্রমাণাভাবে ছাড়া পাওয়া রাজবন্দীর জেল গেট থেকে অর্ডিন্যান্সে ফের ধৃত হওয়ার মত।

এই মধ্যবিত্তরাও দিবাস্বপ্ন দেখে। শনিবার, রেসের মাঠে। রেস শেষ হবার আগেই সোমবারের ক্যাশ না মেলাতে পারার নিরুপায়তায় দিবা-স্বপ্ন দেখা দেয় নাইট-মেয়ার হয়ে।

মধ্যবিত্তদের আশ্বিনের দুর্ভাবনার-মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়, এক বার নয় দু' বার। রেসের মাঠে আর লটারীর টিকিটে। বিদ্যুৎ চমকাবার পরেই অন্ধকার জীবন আরো অন্ধকার মনে হয়।

সেই মধ্যবিত্তের কলকাতার ওপর থেকে কালো পর্দার ঢাকা আমার চোখের সামনে খুলে গেল একদিন হঠাৎ। সাহেবদের হাত থেকে মোসাহেবদের হাতে এসেছে তখন ভারতবর্ষের ভার। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে আবিষ্কার করলাম একটি মুখ। ব্যর্থতায় বিমূঢ়, নিরাশায় ম্লান। এমন একখানি মুখ, যার সঙ্গে চেনা না থাকলেও, জিজ্ঞেস করতে হয়, কী হয়েছে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, দেখুন না, ছেলেটা ভুগছে, একটা ইনজেকশন না কিনলেই নয়, অথচ রাস্তা বন্ধ, এখন ওপারে যেতে দেবে না।

কেন?—

আর কেন?—রাষ্ট্রপতি না কে যেন আসছেন—গাড়ী-ঘোড়া রাস্তা সব বন্ধ।

আমি মুখে কিছু বললাম না। বললাম মনে মনে: লোকটা পাগল হয়ে গেছে নাকি! এত বড় লোক আসছে, তাঁর সম্মানে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে যেতেও আপত্তি? ছেলের অসুখ ত আছেই, কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে—স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি, কি বিপুল তাঁর প্রতিপত্তি, কত বড় অংকে তাঁর মাইনে, সেই রাষ্ট্রপতিকে দেখা ত আর না-ও হ'তে পারে এ-জীবনে!

আর স্মরণ করলাম শ্মশান-যাত্রা থেকে বরযাত্রায়, দইএর সার্টিফিকেট থেকে চায়ের বিজ্ঞাপনে, উদ্বোধন উপলক্ষ্য থেকে নামকরণ প্রসঙ্গে যাঁর প্রতিভার দ্বিধাহীন স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, সেই বিশ্বকবিকে।

আবৃত্তি করলাম, চলে-যাওয়া রাষ্ট্রপতির গাড়ীর দিকে চেয়ে, জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে!

ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু তার অসামান্য প্রভাব পড়েছিল আমার মনে। গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, চিরকালের মত। কিন্তু ঘটনাটা মনে থাকলেও ভুলে যেতাম সেই লোকটিকে নিশ্চয়ই। জীবনে কত বই-ই ত' পড়ি, যতগুলি বই-এর নাম মনে থাকে তার চেয়ে অনেক কম মনে থাকে পাত্র-পাত্রীদের নাম। বই-এর নামের চেয়েও আবার বেশি মনে থাকে মোটামুটি গল্পটা। তাই নিশ্চয়ই ঘটনা না ভুললেও ভুলে যেতাম তার চেহারা, যাকে নিয়ে তা ঘটেছিল। যদি না—

হ্যাঁ। যদি না, সেই একই লোকের সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে যেত আরেক পরিবেশে। অমনি আকস্মিক। অমনি অভাবিত। মনে থাকত না, যদি অমনি মনে রাখবার মত অপরূপ এক পরিস্থিতির না হ'ত উদ্ভব। আর দুর্ভাগ্যক্রমে সত্যিই যদি তা না হ'ত, তাহলে হ'ত না দুর্গার সঙ্গে নতুন করে পরিচয়, লেখা হ'ত না এই কাহিনী, অসমাপ্ত থাকত অভিজ্ঞতার তীর্থ-পরিক্রমা। এই দ্বিতীয় বার, তখনও পর্যন্ত আমার কাছে নাম-ধাম-অজ্ঞাত সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল যে অদ্বিতীয় বাৎসরিক প্রহসন উপলক্ষ্যে, সে-প্রহসনের নাম ইঙ্গ-বঙ্গ ক্রিকেট ম্যাচ; স্থান: ইডেন উদ্যান, কাল: পুরাতন বৎসরের সারা এবং নব-বর্ষের সুরু (দুই-ই সাহেবদের, তথা মোসাহেবদেরও)।

ক্রিকেট, শুধু খেলার রাজা নয়, রাজার খেলাও বটে।

কর্ডস গেম। ফুটবল খেলা যারা দেখে তারা কেউ কেউ কেন, অনেকেই ক্রিকেট খেলারও ভক্ত, তবুও ক্রিকেট আর ফুটবলের দর্শনী এবং দর্শক দু'এতেই পার্থক্য স্পষ্ট। জাতে এবং তারিফে তফাৎ অনেক। উত্তেজনা আছে ক্রিকেটেও কিন্তু স্থূল নয়। ফুটবল-দর্শকের মত, চেঁচিয়ে, গালাগাল করে, থুতু দিয়ে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, রেফারীর উদ্দেশ্যে তাড়া করে হুলুস্থুল কিছু হয় না ইডেন গার্ডেনে। সারাদিন ধরে খেলা, তার লাঞ্চ আছে, টি আছে, খেলোয়াড়দের এবং খেলা-দেখতে-আসাদের—দু'জনেরই। এক ঘণ্টা হয়ে গেলে খেলা বন্ধ ক'রে আছে জল খাওয়া। মস্ত বড় স্কোর বোর্ড ছাড়াও আছে দফায় দফায় ছাপা স্কোর-কার্ড। সমস্ত মাঠই এই নিস্তব্ধ, এই নিপুণ হাতের মারকে অভিনন্দন জানাতে, হাজার হাজার হাততালিতে ফেটে পড়া। যেন ক্লাসিক্যাল গানের অতি সূক্ষ্ম কাজকে বাহবা দেওয়া।

কিন্তু ক্রিকেট খেলার এ-রূপ বাইরের রূপ মাত্র। ইডেন উদ্যানে সাম্বৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচ দর্শক-বৈচিত্র্যে আসলে এক অপরূপ প্রহসন। প্রতি বছর আগে আসত কার্নিভ্যাল, এখন আসে ক্রিকেট দল। আসে ইংল্যাণ্ড থেকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে, আসে আসলে ভারতের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু সাময়িক বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান থেকে। ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ মেশানো বুড়ো-হাবড়ার বাতিল-করা দল। ভারতবর্ষ কী খেলবে,—এই ধারণা নিয়ে আসে। ফিরে যায় সেই ধারণাকেই দৃঢ়তর করে। ভারতবর্ষ খেলে,—খেলে তাদের এক-আধজন পৃথিবী-বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মতই। কিন্তু এগার জনে মিলে মিশে এক দল হয়ে খেলে না। ভারতীয় পলিটিক্সের চেয়েও প্যাঁচের খেলা বেশি চলে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড অফ ইণ্ডিয়ায়। এক জন ক্যাপ্টেন হ'লে অন্য কয়েক জন খেলবে না। বড় ভাই বিখ্যাত হ'লে তার শ্যালককে পর্যন্ত দলে নিতে হ'বে। খেলার চেয়ে না-খেলে খেলায় এখনও ভারতীয় ক্রিকেট শীর্ষস্থানে। মাঠে যে খেলা হয় আসল খেলা সেখানে নয়। পেছনে থেকে যাঁরা কল-কাঠি নাড়েন, মূল খেলা তাদেরই। ভারতীয় ক্রিকেটের সুনাম যাতে নির্মূল হয় তারই নির্মম খেলা চলে সিলেকশন বোর্ডে—প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে, ভোটাভুটির রঙ্গভূমিতে। বিখ্যাত সেই গানের সুরের আর কথার অনুকরণ করে বলা চলে: 'তোমার খেলা তুমি খেল গুপ্ত, লোকে বলে খেলি আমি।

ইডেন-উদ্যানে ইঙ্গ-বঙ্গ ক্রিকেট খেলার সঙ্গে উত্তম তুলনা চলে ক্যানিভ্যালের নয় সার্কাসের। সার্কাসের ক্লাউন খেলা দেখায়, ক্রিকেট খেলার মাঠে ক্লাউন খেলা দেখতে যায়।

কারা এই ক্লাউন? বনেদী-পরিবার নয়, এরা উঠতি-বড়লোক। এরা বহুপরিচিত, তবুও এদের পুরো চেনা শক্ত। লালবাজার থাকা স্বত্ত্বেও এরা কালো বাজারের কৃপায় সুপ্রতিষ্ঠ। যুদ্ধোত্তর কলকাতার গায়ে এরা ফুটে উঠেছে পারার মত। ওপরের দাগ এক দিন মিলিয়ে যাবে, ভেতরের ঘা শুধু শুখতে চাইবে না এখনও বহুদিন। ষ্টীমলাইণ্ড গাড়ীর মাথায় এরা মস্ত বেলুন বাঁধে। বেলুন হচ্ছে হঠাৎ বড়লোকদের যথার্থ প্রতীক। ফুলতে ফুলতেই ফেটে যায়!

এদের বাড়ীর সবাই দল বেঁধে বড়ে গোলাম আলীর গান শুনতে যায়। না গেলে লোকে কি বলবে, তাই যায়। পঞ্চাশ হ'ক আর একশ' হ'ক, টিকিট বুক ক'রে সাত দিন আগে। গানের মাঝে উঠে যেতে বাধে না তাই। ফলে, যারা শুনলে গোলাম আলী ধন্য হতেন, কৃতার্থ হ'ত যারা শুনে, তারা প্রবেশপত্র পায় না এখানে। নিজের অন্ধকার ঘরে বসে গোলাম আলীর মানস মূর্তির সামনে রেওয়াজ করে। দ্রোণের সামনে একলব্য।

এদের বাড়ীতেই রবি ঠাকুরের বই-এর পাতা কাটা হয় না, কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ফিল্ম-ম্যাগাজিন এলে। দেওয়ালে ঝোলেন গান্ধী অথবা জওহরলাল, কিন্তু সত্যিকারের স্বপ্ন রাজকাপুর কি গ্রেগরী পেক হবার। এদের বাড়ীর মেয়েদের চোখেই সন্ধ্যের পর ওঠে সান-গ্লাস। এরা উৎকট, এরা খাপছাড়া, এরা ক্ষ্যাপা। কালচারের অভাব ঢাকবার চেষ্টা গ্ল্যামারের আবরণে। দাঁড়কাকের ময়ূর সাজতে গিয়ে দারুণ সাজা। না-মধ্যবিত্ত, না-বনেদী, বাঙালীর সংসারে এরা সাহেবী সং।

ক্রিকেট মাঠে এদের পদার্পণ খেলা দেখবার জন্যে নয়, খেলা দেখাবার জন্যে। ক্লাউনের খেলা। এই পোট্যাটো চীপস। এই প্যাটিস। তৃষ্ণায় জল নয়, ফ্লাস্ক থেকে চা। কার ডোনাটস-খোঁপা, কার সর্পিল বিনুনী,—মুখে খাবার আর তার সঙ্গে মুখে মুখে সেই মুখরোচক আলোচনার মাঝে মাঝে কেউ এল-বি-ডবলিউ হ'য়ে আউট হ'লে গম্ভীর চালে জিজ্ঞেস করে বসা: ক্যাচটা ধরলে কে ভাই!

স্লুয়েন্টের চেয়ে বেশি ইন-করেক্ট ইংরেজীতে পারদর্শিতায় আর মাতৃ-ভাষাকে বিকৃত করে বলার বাহাদুরীতে যারা সর্বদাই মটমট করছে, সেই না-এদেশের, না-ওদেশের এই ললনা-কুলকে তবু সহ্য করতে হয় এ-যুগে আমরা পুরুষরা নেহাৎই অবলা বলে। কিন্তু এই না-হিন্দু, না-মুসলমান, এমন কি ক্রীশ্চানও নয়, এই অদ্ভুত সমাজের পুরুষরা আবার সম্পূর্ণ বিচিত্র জীব। টিকিট কেটে এদের দেখতে যাওয়া চলে।

এই সমাজের রমণীদের সঙ্গে চলে না আলোচনা, সমালোচনা করবে এমন সাহস কার? শুধু একটা কথাতেই সে-কথা শেষ করি। শাস্ত্রকাররা না বললেও, সেটাই পথি যারা বিবর্জিতা, তাদের সম্বন্ধে শেষ কথা। সে-কথা আর কিছুই নয়, সে-কথাটা হচ্ছে এই যে, দারিদ্র্য পুরুষের শতগুণ নাশে, আর স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে রমণীর রমণীয়তা। তখন মেয়েদের জীবনে আর সব ফ্যাক্টর গৌণ, মুখ্য হয় শুধু ম্যান-ফ্যাক্টর।

ও-সব সন্ধনেশে আলোচনা বাতিল করে পুরুষদের কথায় আসা যাক। এই অদ্ভুত সমাজের পুরুষরা যে সত্যিই বিচিত্র এক জীব, সে-কথা বোঝা যাবে না, যদি না বিশেষ বিশেষ জায়গায় এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইডেন গার্ডেন এমনি একটি পবিত্র জায়গা! ক্রিকেট ম্যাচ হল তেমনি একটি মরসুম। ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষ্যে গার্ডেনসে যা হয় তাকে বলা যায়, annual dress parade—তফাৎটা শুধু, লেডিসদের নয়, এটা for men only.

স্মরণাতীত এক কালে ভারতবর্ষের মেয়েদের লজ্জাই যেমন ছিলো ভূষণ, তেমনি ক্রিকেট মাঠে, চড়া টিকিটের খদ্দেরদের ভূষণই হ'ল অন্যলোকের লজ্জার কারণ। ভারতীয় পুরুষদের আজকের প্রায়-জাতীয় পোষাক যে-দেশ থেকে এসেছে, সে-দেশের লোকেরাই বলে থাকে যে সেই পোষাকই হ'ল ভদ্রলোকের ভূষণ যা-তে চমক কম, যা চোখকে কপালে তোলে না, দৃষ্টিকে করে প্রসন্ন। সাহেবদের এ-কথাটা যে মোসাহেবদের ভালো লাগে নি, ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষ্যে ইডেন গার্ডেন গেলেই হয় তার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

ব্লাউজের মত নয়া-ডিজাইন এখানে কারুর সার্টের, কারুর জামার পেছন দিক চকোলেট, সামনে সবুজ। কারুর একটাও পকেট নেই জামার, কারুর চারটে। কারুর হাতে সিগারেটের টিন, কারুর হিপ পকেট থেকে একটুখানি মাথা উঁচু ক'রে আছে সিগারেট কেস, কেউ ফুঁকছে পাইপ, আবার কেউ বাহারী হোল্ডারে বিশিষ্ট।

দোলের দিন ছেঁড়া জামা পরে বেরুই আমরা। রং-এর ছোপে জামা নষ্ট হয়, তাই বাতিল করা জামা-ই হোলির দিনে সকলের বরাদ্দ। ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে আসা এই সব ভদ্রলোকের জামার দিকে হঠাৎ নজর পড়লে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, আজ দোল কি না! সমস্ত জামাটায় নানা রং-এর ছোপ-ছোপ দাগ। কোনটা হয়েছে ছবি, কোনটা হয়েছে এ-বি-সি-ডি লেখা। হোলির জামা পরে এদের এখানে-ওখানে সেখানে, এর-ওর-তার সঙ্গে প্রতিদিনের un-holy উৎসব কলকাতাকে করেছে আরেকটু কালো, বাঙালী কৃষ্টিকে দিয়েছে লজ্জা, ভারতীয় সভ্যতাকে করেছে ক্যারিকেচর। মার্কটোয়েন ভারতে এসেই বলেছিলেন, 'ভগবান বাঁদর সৃষ্টি করে কৃতার্থ না হতে পেরেই মানুষ সৃষ্টিতে হাত দেন।'

সেই ক্রিকেট খেলায় এক বার দর্শক হয়েছিলাম, কেন জানি নে। ছেলেদের চেয়ে মেয়ে বেশি, মেয়েদের চেয়ে বেশি এসেছে বাচ্চারা, কিন্তু বাচ্চাদের চেয়ে বকছে বেশি মেয়েরা, খেলা দেখছে কম। দেখতে দেখতে উল বুনছে; নেটমণ্ট খাচ্ছে। ছড়াচ্ছে কমলালেবুর খোসা। মুখে কখন কখন আইসক্রীম লেহনের চুক-চুক আওয়াজ। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউসিকের মত কাজুবাদামের ওপর ম্যাকলীনে মাজা দাঁতের মিষ্টি কামড়ের কুড় কুড় শব্দ, বেশ লাগছে শুনতে।

ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় বিখ্যাত চৈনিক মন্তব্য। ভারতবর্ষের পর সেই মহাদেশ হল চীন, যেখানকার লোকেরা মেটিরিয়াল সাকসেসকে মনে করে নি মোক্ষ, যুদ্ধে মরার চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে ভাল ভাবে বাঁচার গৌরবকে, স্লোগানের চেয়ে শিল্পে করেছে বেশি বিশ্বাস। মহাকাব্যের নয়, ছোট ছোট কবিতার, অতি সূক্ষ্ম কাজের করেছে তারিফ। চাইনিজ ওয়ালের চেয়ে চীনের জীবন-শিল্প অনেক বড়। সেই চীন দেশের এক জন, ইংরেজদের ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে বলেছিল,

ইংরেজ আসলে বণিকের জাত, রসের খদ্দের নয়। তাই বল মেরে নিজেরাই কুড়িয়ে আনছে। বুদ্ধিমান হ'লে চাকরদের পাঠাত বল্ আনতে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যতই বলুন কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, রসিকেরা জানে অনেক ভজনা করেও অর্জ্জুন পায় নি সত্যিকারের কৃষ্ণকে, আর কিছু না করলেও, কৃষ্ণ যাকে পেতে চেয়েছেন—তিনিই শ্রীরাধা। বল কুড়িয়ে আনার মধ্যে আছে কষ্ট, বল দূরে পাঠাবার মধ্যে আছে মজা, তারই নাম কেষ্ট।

খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ গ্যালারীতে হৈ-হৈ! কী ব্যাপার ভেঙ্গে গেছে গ্যালারী! মূর্চ্ছা গেছে কেউ? ভুল হয়েছে আম্পায়ারের। না, কে যেন এসেছে—দর্শকের আসন আলো করতে। পুরান দিনের কোন বড় খেলোয়াড়? রাজা? মহারাজা? না, তার চেয়ে অনেক বড়, যিনি এলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়, খেলোয়াড় থেকে খেলা-দেখার দল, কারুর চোখেই পড়ে না পলক, সেই, কে আবার, অশোককুমার। তরুণীদের চোখে কালিদাসের কালের কটাক্ষ। তরুণদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। তিনশো সপ্তাহ-চলা কিসমতের অশোককুমার সশরীরে। সত্যবানকে বেঁচে উঠতে দেখে এত কৃতার্থ বোধ করেন নি সাবিত্রী। ক্রিকেট কর্মকর্তাদেরও কার কাণে যেন পৌঁছে গেছে সেই কথা। এক জন এসে নিয়ে গেলেন অশোককুমারকে। যে-কোন একজন নয়, স্বয়ং কুচবিহারের মহারাজা। যেতে যেতে অশোককুমার কার দিকে চেয়ে হেসে জন্ম সার্থক করলেন তার, কার অটোগ্রাফে সই দিয়ে কৃতার্থ করলেন দেবী বীণাপাণিকেই বোধ হয়। এক জন কাগজের অভাবে দশ টাকার নোটখানাই বাড়িয়ে দিলেন সই-এর জন্যে। নোটে শুধু এক জনের সই-ই চলে—তা চলুক। দ্বিতীয় সই করার জন্যে যদি নোটখানা বাতিল হয় হোক, তবুও অদ্বিতীয় হয়ে রইবে এই দশ টাকার নোট। টাকা অতি তুচ্ছ জিনিষ। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা।

আমি যেখানে বসে খেলা দেখছিলাম, তার একটু ওপরে একখানা ঘর থেকে রীলে হচ্ছিল খেলার বিবরণ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কৃপায়। কমেন্টেটার বলছেন বেশ। স্লিপ, মিড অন, সিলি মিড অন, স্কোয়ার লেগ, শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করে বসেছি পাশের অপরিচিত ভদ্রলোককেই, এগুলো কী বলছে, বুঝতে পারছেন কিছু?

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন হো-হো করে, বললেন: কেউ না, কেউ না, ওগুলো কেউ বোঝে না, বুঝবার ভাণ করে সবাই, বলে, বাড়িয়ে দিলেন একখিলি পান, এতক্ষণে প্রাণের কথা বলেছেন দাদা, আবার তাঁর প্রাণখোলা হাসি সচকিত করে তুলল আশে-পাশের লোককে।

মুখের দিকে তাকাতেই মনে পড়ল এ সেই শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে দেখা হওয়া ভদ্রলোক না?—হাঁ, নিশ্চয়ই সেই। বললাম: আপনার সঙ্গেই ত সেদিন দেখা হয়েছিল রাস্তায়, পথঘাট সব বন্ধ, রাষ্ট্রপতি না কে আসার জন্যে, আপনি ছেলের ইনজেকশন কিনতে বেরিয়েছিলেন—

ভদ্রলোক বললেন, 'এ-শর্ম্মার নাম আদিত্য দে, আদি নিবাস ফরিদপুর, বর্তমানে কলকাতায়, জীবিকা কেরাণীগিরী—আর মহাশয়ের?'—

তার পর আস্তে আস্তে কয়েক দিনের মধ্যেই জমে উঠল আলাপ। জল যেমন করে জমে বরফ হয়, তেমন করে নয়, পাতলা রস যেমন করে আঠা হয়ে ওঠে জাল দিতে দিতে তেমনি করে।

তার পর এক দিন নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে।

'ওগো শুনছ,' বলে ডাক দিতে যে বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: দুর্গা? হাঁ। দুর্গাই। সিংহবাহিনী নয়, তবু সংসারের অসুরের সঙ্গে, লড়াই করেও অক্লান্ত।

দুর্গা। জগজ্জননী দুর্গার মত নয় দশভুজা। মাত্র দু'খানি হাত। তার একটিতে চায়ের কাপ, অন্যটিতে ধরা খাবার রেকাবী। তাতেই মনে হচ্ছে যেন অন্নপূর্ণা আলো করে এসে দাঁড়িয়েছে। মাটির ঘরকে মনে হচ্ছে ইন্দ্রলোক।

দুর্গা, চায়ের কাপ আর খাবার রেকাবী নামিয়ে রেখে, মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে, বললে: বসুন, আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।

[ক্রমশঃ।

আহ্নিক পৃথিবী তবু

শান্তিকুমার ঘোষ

পাহাড় রূপোর খনি, ঠাণ্ডা জল, শষ্পের আঘ্রাণ;
বালির বিস্তার ঢেউ, একটু বিশ্রাম—পান্থপাদপের ছায়া,
অপ্রাপনীয়ার স্বপ্নে, হয়তো তন্ময়;
বন্ধুর হাতের স্পর্শ, বান্ধবীর গান।

আহ্নিক পৃথিবী তবু প্রত্যহ বিস্ময়—
রক্তজবা সূর্য শেষে সূর্যমুখী হয়।
তারার আতসবাজি, রাত্রিভোর আলিঙ্গন, জ্যোৎস্না অফুরাণ:
পূর্ণতায় থরো থরো সমস্ত হৃদয়।

অশ্রু-ছল-ছল শীতের সন্ধ্যায়
মানুষ পতঙ্গ পাখি ঝিলিমিলি নারিকেল শুধু কি অঙ্গার?
অঙ্গার-কণিকা নয় দীপ্ত প্রাণশিখা?
মাটির বুদ্‌বুদে এক মহৎ ভূমিকা!

দু'-একটা জল-ঝড় জীবন তবুও যেন রৌদ্রময় শুধু—
কোথাও তো মৃত্যু নেই—এ আকাশ আলোকেই গভীর এষণা:
আগ্রহে পানীয় তোলে অন্ধ তার শীর্ণ-নীল ঠোঁটে;
বিদায়-মুহূর্ত আসে প্রেমের প্রার্থনা তবু গণিকার চোখে।

অস্পষ্ট দিগন্ত মুছে কখন প্রত্যক্ষ এই প্রতিভা প্রজ্ঞায়
দীপ্ত বৃহৎ আকাশ,—
কেলাসিত শিলা হাতে উল্লোল সমুদ্রতটে আশ্চর্য প্রত্যয়:
জড়তা পাথর ভেঙে নিয়ত প্রাণের গতি—ভালোবাসা, মিল
বলয়-দর্পণে বাঁধা সূর্যের আগুনে চলে আমেরু নিখিল।

বাংলা সাহিত্য ও প্রমথ চৌধুরী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান বটে কিন্তু এ-কথা বোধ হয় অনেক সাহিত্য-পাঠকেরই সহসা মনে পড়ে না যে, বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনারীতি যে আজকের দিনে এত নানা দিক দিয়েই সমৃদ্ধ হয়েছে তার মূলে রয়েছে সবুজ পত্রের যুগে প্রবর্তিত প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণধার কিন্তু সংহত গদ্যভঙ্গির প্রভাব। বস্তুত, বাংলা ১৩২১ সালে সবুজ পত্রের প্রকাশের শুরু থেকেই কথ্যভাষার সাহায্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যে যে নতুন নিরাভরণ অথচ সরস রচনারীতির সূত্রপাত চৌধুরী মহাশয় করেছিলেন, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হতে পেরেছে আজকের দিনের সর্বত্রগামী বাংলা গদ্যভঙ্গির সৃষ্টি। প্রমথ চৌধুরীর প্রধান কৃতিত্ব এই খানটায় যে, আজ-কালকার এই বহুল প্রচলিত কথ্যভাষাকে মহৎ সাহিত্যের বাহনরূপে তিনিই একদা সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, গভীর জ্ঞান ও বহুমুখী চিন্তাধারা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী করে গড়ে' তুলেছিলেন।

অথচ আজকের দিনেও কোন কোন রসিক মহলে এরূপ ধারণা অব্যাহত রয়েছে যে, বাংলা গদ্য সাহিত্যে শুধু মাত্র একটি বিশেষ ধরণের গদ্যভঙ্গির প্রবর্তনের জন্যেই বুঝি প্রমথ চৌধুরী আমাদের নমস্য। আর সে-কারণেই বোধ হয় আধুনিক নানা পত্র-পত্রিকায় অনেক সজাগ সমালোচক পর্যন্ত 'বীরবলী' রীতির নজির-স্বরূপ তাঁর রচনাবলী থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই নিরস্ত থাকতে পারলে খুসী হন; অথচ এ কথার উল্লেখ করা দরকার বোধ করেন যে, চৌধুরী মহাশয় কথ্যভাষায় শুধু একটি বিশেষ ভঙ্গিরই প্রবর্তন করেননি তিনি এরূপ এক ভাষার প্রচলন করেছেন যার মেরুদণ্ড সবল ও দৃঢ় এবং যে ভাষা গভীর জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। বস্তুত পক্ষে, সবুজ পত্রের সূচনা থেকেই সুসংস্কৃত বাঙালী চিত্তে প্রমথ চৌধুরী যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার কারণ নিশ্চয় এই যে, অন্ধ সংস্কার ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যয়ী প্রগতিশীল ভাবধারার বর্তিকামালাকে তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজবাদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে চিন্তাশীল পাঠকের বুদ্ধিকে শুধু উদ্রিক্ত ও সজাগই করেননি, পাঠক-মনকে পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ করতেও সমর্থ হয়েছিলেন।

সবুজ পত্রের যুগে নতুন করে আলোড়িত হয়েছিল বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন। অনেক চিন্তার স্তূপ জড়ো হয়ে উঠেছিল, অনেক জিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজতে শুরু করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের নব্য পাঠকরা। প্রথম মহাযুদ্ধের কালো মেঘ তখন মাথার ওপর সমুদ্যত,—রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক সে-সময়ে জমে উঠেছে। আর সে-কারণেই সে সময়ে নানা জ্ঞান ও বিদ্যার বিশ্লেষণ অনিবার্য-রূপেই আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে এতো নতুন-নতুন উপকরণ জমে উঠেছিল যে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় তার প্রকাশ কাম্য না হয়েই পারেনি। সহজ ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যেরূপ অনায়াসে আলোচনা করেছেন তা দেখে অবাক হতে হয়। তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধাবলী পাঠে দেখা যায়, অনেক জটিল ও দুরূহ এবং অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়েও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সে-আলোচনা রসঘন ও যুক্তিনির্ভর হওয়ায় প্রকৃষ্টচিত্ত পাঠক-হৃদয়কে আনন্দে পরিপ্লুত করতে সমর্থও হয়েছে। বীরবলের ভাষার বিরুদ্ধে এক সময়ে যে প্রবল আক্রমণ চলেছিল কাল ক্রমে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। বিপিনচন্দ্র পাল থেকে মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্ত অনেক লেখকই বীরবলী রচনারীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এঁরা নিজেরাও ছিলেন শক্তিশালী ও কীর্তিমান গদ্যলেখক; কিন্তু সাধু গদ্য ছাড়া আর কোন গদ্যরীতি যে সাহিত্য-চর্চাকে সমৃদ্ধ করতে পারে এ ধারণাটাই ছিল এঁদের কাছে দুর্বিসহ। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় যখন অবলীলা ক্রমে নব-প্রচলিত কথ্যভাষাকে নানা কাজে লাগাতে লাগলেন তখন আধুনিক কালের বিস্ময়-বিমুগ্ধ যুবচিত্ত নিঃশঙ্ক হয়েই বরণ করে নিল সেই মনন-সাধনার আশ্চর্য্য ফসলকে।

প্রমথ চৌধুরী এক জায়গায় বলেছেন যে, সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নয়, বয়স্যের সম্বন্ধ। বোধ হয় সে-কারণেই তাঁর রচনার প্রায় সর্বত্রই মার্জিত রসিকতা ও প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধের বিস্তার অনায়াসেই চোখে পড়বে। তিনি লঘু ও গুরু এই দুই ধরণের রচনাই লিখেছেন এবং এক দিকে লঘু আলোচনাকে তিনি অত্যন্ত তরল করবার যেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, অন্য দিকে তেমনি গুরু রচনাকেও গুরুগম্ভীর ও দুরাগম্য করার বাতিক তাঁকে কখনোই পেয়ে বসেনি। এক দিকে বইয়ের ব্যবসা, সবুজ পত্র, সাহিত্যে চাবুক, বর্ষার কথা, রূপের কথা, মলাট-সমালোচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা টীকা ও টিপ্পনির সাহায্যে নানা লঘু ও চুটকি আলোচনা যেমন সম্ভব হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি রামমোহন রায়, মহাভারত ও গীতা, হর্ষচরিত, রায়তের কথা, ভারতবর্ষ ও সমাজ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর আলোচনায়ও সরস ও প্রাঞ্জল অথচ তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি অনায়াসেই করে গিয়েছেন।

আধুনিক সাহিত্যে উৎসাহী অথচ প্রমথ রচনার সঙ্গে অপরিচিত এ রকম যদি কেউ থেকে থাকেন, তাহ'লে বলতেই হবে সে-পাঠকের সাহিত্যচর্চায় মস্ত ফাঁক রয়ে গেল। বস্তুত পক্ষে প্রমথ-সাহিত্য শুধু সবুজ পত্রের যুগের বৃহৎ সাংস্কৃতিক দিগন্তকেই উন্মোচিত ক'রছে না, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের এক দল সুরুচিসম্পন্ন শক্তিমান লেখক সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণার হেতু মূলকেও উদ্ঘাটিত করছে। আর সে কারণেই চৌধুরী মহাশয় ততটা পাঠকের লেখক নন যতটা লেখকের লেখক। তাঁর রচনার ব্যঞ্জনা, ব্যাপ্তি ও নৈপুণ্যের প্রভাবেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দল তন্নিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু ক'রে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত অনেক শক্তিমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকই কোনো না কোনো দিক থেকে প্রমথ রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত

হয়েছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তারই ফলে আধুনিক সাহিত্যে বাংলা গদ্যের নব-নব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

অথচ আজকের দিনেও প্রমথ সাহিত্য সম্পর্কে অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের নীরবতাই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার! তার একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তরল উপন্যাস ও অগভীর গল্প-প্লাবিত বাংলা দেশে প্রকৃত তন্নিষ্ঠ সাহিত্য আলোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি করা সহজ ব্যাপার নয় এবং অনেক সময় মনে হবে যে, সে-চেষ্টাই বাতুলতা। যেহেতু সাধারণ স্তিমিত স্বভাব পাঠকের পক্ষে সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মূলসূত্র সমূহের সন্ধান লাভের জন্যে উদ্যোগী হওয়ার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমন খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তবু, উৎসাহ অসীম ছিল বলেই বোধ হয় সরাসরি চলতি ভাষায় সহজ ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী-প্রাণে নব ভাবাবেগ সৃষ্টির চেষ্টা তিনি ক'রেছিলেন। শুধু সাহিত্য নয়, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান এই সব বিষয়কেই চৌধুরী মহাশয় অবলীলা ক্রমে তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন এবং শুধু পুরাতন প্রসঙ্গে নতুন কথাই তিনি বলেননি, অনেক নতুন বিষয়েই নতুন বক্তব্য তিনি আমাদের আলস্যমন্থর অনভ্যস্ত মনের সামনে উপস্থিত ক'রেছেন। এদিকে নিজে পণ্ডিত হ'লেও তথাকথিত পণ্ডিতজনের পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁকে কখনোই পেয়ে বসেনি এবং গুরুগিরির কোনো সুযোগই কখনো গ্রহণ ক'রতে দেখা যায়নি। তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনেকেই সাধারণত বর্তমানের চাইতে অতীতের প্রতি আকর্ষণ অধিক মাত্রায় অনুভব ক'রে থাকেন, সমসাময়িক কালকে ঘোর কলিযুগ মনে ক'রে তাঁরা অতীত কালের দিকেই যেন ফিরে যেতে চা'ন। বলাই বাহুল্য, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই অতীতমুখিতা কম ক্ষেত্রেই সুস্থ শিল্পবোধের সহায়ক হ'তে পারে। বর্তমানকে জানবার জন্যে অতীতকেও জানতে হবে বটে কিন্তু বর্তমানকে ওড়াবার জন্যে অতীতকে আঁকড়ে থাকার মারাত্মক প্রচেষ্টাকে যে কোনো ক্রমেই সমর্থন করা চলে না। এ-সত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীই বোধ হয় সমসাময়িক সাহিত্য-পাঠককে প্রথম স্পষ্ট করে দেখালেন। সবুজ পত্রের যুগেও আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার লোকের অভাব ঘটেনি এবং এই বিরোধী দলে সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান ও শক্তিশালী লেখকের সংখ্যাও বড়ো কম ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সেকালে প্রমথ চৌধুরী একাই তাঁর শাণিত যুক্তিবাদের সাহায্যে বিরুদ্ধ প্রতিকূলতাকে খণ্ডন করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন এবং আধুনিক সাহিত্যকে যোগ্য গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' নিবন্ধটি এই দিক থেকে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রমথ রচনায় ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবের প্রসঙ্গ অনিবার্য রূপেই এসে পড়ে এবং এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা-বহুল স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনাও সম্ভব। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, ফরাসী সাহিত্যের এমন একটি মোহিনীশক্তি আছে যা' চৌধুরী মহাশয়কে গোড়া থেকেই আকর্ষণ ক'রতে পেরেছিল এবং খুব সম্ভব সে-শক্তির মূলে ছিল স্পষ্টবাদিতা। "ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বে বলেছি যে, ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুই-ই আছে। ফরাসী মনের এই প্রসাদ-গুণপ্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসী লেখকরাই দিতে পারেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসী পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না!" ('ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়': প্রবন্ধ সংগ্রহ: পৃষ্ঠা ১১৯) পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চার পরিচয় বার বার পাওয়া গিয়েছে প্রমথ রচনায় এবং ফরাসী সাহিত্যের মতই প্রমথ সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত ক'রে তোলা, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করা। "ফরাসী সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়, সুসভ্য করে তোলে। ফরাসী সাহিত্য সকল প্রকার মিথ্যার, সকল প্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসী-মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে-সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।" বলা বাহুল্য, অনুরূপ নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসার নানা প্রমাণ প্রমথ সাহিত্যেও বিশেষ ভাবেই উপস্থিত।

বাংলা কথ্যভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ রম্যরচনা সৃষ্টির কৃতিত্বও বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীরই প্রাপ্য। বীরবলের হালখাতার অনেক রচনাই আজ থেকে চল্লিশ বছর কি তার অধিক কাল আগেকার লেখা এবং সে-সব রচনায় রম্যরচনার আস্বাদ এখনকার দিনেও অনেকেই অনুভব করতে পারবেন। 'তরজমা' 'বইয়ের ব্যবসা' 'সবুজ পত্র' 'বর্ষার কথা' 'রূপের কথা' ইত্যাদি নিবন্ধে চৌধুরী মহাশয় যে রীতির সূত্রপাত ক'রেছিলেন কাল ক্রমে তারই অনুসরণে আধুনিক বাংলা গদ্যের কয়েক জন শক্তিশালী লেখক সার্থক রম্যরচনা সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রতে সমর্থ হয়েছেন। আধুনিক কালের সাহিত্য-সমালোচনা যে extensive না হ'য়ে বরং intensive হবে এবং তাহ'লেই যে সে-আলোচনা সাহিত্য-পাঠকের কাছে সহজেই বোধগম্য হবে, এই সত্যের উদ্‌ঘাটন প্রমথ সাহিত্য থেকেই সম্ভবপর হ'য়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্তত একজন কৃতী গদ্য-লেখক এই দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকার লাভ ক'রেছেন, তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গি সম্পর্কে একজন তরুণ সমালোচক মন্তব্য ক'রেছেন যে, বীরবলী ভঙ্গিতে তন্নিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব নয় বলেই প্রমথ চৌধুরীর মতো মনীষীকে না কি মুখ্যত টীকাটিপ্পনীর প্রায়-সাংবাদিক জগতে আজীবন অতিবাহিত ক'রতে হ'য়েছে। বলা বাহুল্য, এর থেকে ভ্রমাত্মক উক্তি আর কিছুই হ'তে পারে না। 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়' 'বাংলার ভবিষ্যৎ' 'রামমোহন রায়' 'চিত্রাঙ্গদা' এবং অনুরূপ আরো অনেক রচনা এ সত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবে যে প্রমথ সাহিত্যে বিষয়োচিত গাম্ভীর্য, তন্নিষ্ঠা ও বৈদগ্ধ্যের অসদ্ভাব নেই এবং কথ্যভাষায় লিখিত হ'লেও সৎসাহিত্যের মূল গুণাবলী প্রমথ রচনায়ও বর্তমান। প্রকৃত প্রস্তাবে সবুজ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল 'বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে' 'সংক্ষিপ্ত ও সংহত ক'রে প্রতিবিম্বিত' করা

এবং এই কথাই সে-সময়ে ঘোষিত হ'য়েছিল যে, 'সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।' এই আত্মসংযম ও মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় প্রমথ রচনায় বিশেষ ভাবেই উপস্থিত এবং সাহিত্যিক অর্থে সাম্প্রতিক কালের 'আধা সাংবাদিক রচনা' বলতে আমরা অর্দ্ধশিক্ষিত কি অশিক্ষিত পেশাদার সাংবাদিক রচিত বর্ণহীন ও উদ্দেশ্য বিহীন, আড়ষ্ট ও অগভীর যে খবরেকাগুজে আলোচনাকে বুঝি তার সঙ্গে বীরবলী গদ্যের বা রচনা-রীতির কোনো তুলনাই চলতে পারে না। এমন কি, একটির প্রসঙ্গে অপরটির উল্লেখও বোধ হয় শুধু অবান্তর নয়, অনভিপ্রেতও বটে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথ রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং স্বতন্ত্র সাধনার দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। তাঁর সামনে ছিল ফরাসী সাহিত্যের আদর্শ এবং বোধ হয় সে-কারণেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যে লালিত হ'য়েও রবীন্দ্র-প্রতিভার ঐশ্বর্যে তিনি আচ্ছন্ন হননি। বরং, ভাবতে অবাক লাগে, প্রামথিক গদ্যের সাবলীলতা রবীন্দ্রনাথের মনেও অনুরণন জাগিয়েছিল এবং প্রমথনাথের গদ্যরীতি যে তাঁর চলতি গদ্যভঙ্গিকে প্রভাবিত ক'রেছিল এ কথার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার ক'রে গিয়েছেন। ফলে, একথা স্বীকার ক'রে নিতে বাধা নেই যে, চল্লিশ বছর আগের রচনা হ'লেও প্রমথ চৌধুরীর অনেক লেখাই এখনকার দিনেও বার-বার ক'রে পড়ার মতো এবং যে পাঠকের উদ্যোগ-আয়োজন ইদানীং কালের সাধারণ পরিশ্রমবিমুখ উপন্যাস-পাঠকের চাইতে অন্তত কিছু পরিমাণেও বেশী, প্রমথ সাহিত্যে তিনি এখনকার দিনেও বীরবলী ঢংএর ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য-গুলো ছাড়াও আরো গভীরতর কিছু আবিষ্কার ক'রতে পারবেন।

প্রমথ সাহিত্য পাঠ ক'রতে গিয়ে তাঁর অনবদ্য গদ্যভঙ্গি সাধারণ পাঠককে অভিভূত করে বটে কিন্তু মুস্কিল এইখানটায় যে, বিচিত্রিত গদ্যভঙ্গির আড়ালে তাঁর আসল বক্তব্য চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে এবং তা' যদি হয় তাহ'লে সেইটেই হবে সাধারণ পাঠকের দুর্ভাগ্য। কেন না, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-রাজি প্রকৃত পক্ষে বহু স্তরময় এবং বহু বিচিত্র প্রসঙ্গকে অনায়াসেই তিনি তাঁর রচনার বিষয়ীভূত ক'রেছেন। চৌধুরী মহাশয়ের লক্ষ্য ছিল সর্বপ্রকার অন্ধ গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি এবং সে-কারণেই অজ্ঞতা, জীর্ণতা, অন্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তিনি অপ্রতিহত গতিতে লেখনী পরিচালনা ক'রে গিয়েছেন। কেবল যে তিনি প্রাচীনপন্থীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাই নয়, তারুণ্যের অজ্ঞতাজনিত স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টাই তাঁর প্রবন্ধাবলীকে প্রসঙ্গ ও বক্তব্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে, নানা তথ্য ও তত্ত্বে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। প্রমথ চৌধুরীর সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ মন আধুনিক ইউরোপীয় আবহাওয়ায় লালিত হলেও চিন্তা ও ভাবনার রাজ্যে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙ্গালী, খাঁটি ভারতীয়। "দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলায় পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্যে আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য।" এই আর্টের সাধনায়ই প্রমথ চৌধুরী তাঁর সমগ্র প্রাণসত্তাকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নতুন তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এখনকার দিনে কথ্য গদ্যরীতির দু'টি ধারা পাশাপাশি চলছে; একটি সিনেমা ও সাংবাদিক জগতের অন্তঃসারশূন্য চুটকি, অপরটি শিক্ষিত মনের উপজাত সাহিত্যিক গদ্য। লেখাপড়া না শিখেও যে সহজ কায়দায় মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব, প্রথমোক্ত গদ্যভঙ্গিই তার প্রমাণ এবং যতই দুর্বল ও আড়ষ্ট হোক, খুব সামান্য শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকের সমাজে ভাব-বিনিময়ের বাহনরূপে তার উপযোগিতাকে অস্বীকার করবার দিন বোধ হয় এখনো আসেনি। অন্য দিকে, শেষোক্ত গদ্য রীতিই এখনকার দিনে সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে এবং সারস্বত সমাজ ও সাহিত্য বৃত্তির মারফৎ স্থায়ী ভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু স্তরময় দিগন্তকে আলোকিত করছে। সবুজ পত্রের যুগে প্রমথ চৌধুরী যে পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন ইতিমধ্যেই যে তা' সার্থক পরিণতির পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উপসংহারে তাহ'লে এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, প্রমথ সাহিত্যের সংগে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজন এ যুগে কমেনি বরং বেড়েছে এবং এখনকার দিনেও চৌধুরী মহাশয়ের নাম যত লোক জানেন, তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে তত লোকের পরিচয় রয়েছে কি না সন্দেহ। তার একটি প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, কিছু কাল আগেও তাঁর লেখা একসঙ্গে গ্রন্থাকারে পাওয়া সম্ভব ছিল না। সে-কারণেই সম্প্রতি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত প্রমথ রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডগুলো* পেয়ে সাহিত্যের উদ্যোগী পাঠক মাত্রেই সুখী হবেন। সবুজ-পত্রের যুগে সাহিত্যের যে-সব প্রশ্ন মুখ্য হ'য়ে উঠেছিল এখনকার দিনে সে-সব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এমন মনে ক'রবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। প্রমথ রচনাবলী এখনকার দিনে আবার নিবিড় ভাবে পড়লে দেখা যাবে যে আজ-কালকার সাহিত্য মীমাংসা জনিত অনেক জটিল প্রশ্নের সদুত্তর তাঁর নানা নিবন্ধে ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে, এ কথাই শেষ পর্যন্ত মানতে হয় যে, সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হ'লে প্রমথ রচনাবলী থেকেই শুরু করা নিরাপদ। প্রমথ-রচনা আধুনিক হয়েও ঐতিহ্যবিরোধী নয়, এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা-সাহিত্যের যে ইমারৎ গড়ে তুলেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের রচনা তারই ভিত্তিকে কালক্রমে দৃঢ়তর ক'রেছে বলতে পারা যায়।

---

* প্রবন্ধ সংগ্রহ—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য যথাক্রমে ছয় টাকা ও পাঁচ টাকা।

চার-ইয়ারী কথা—মূল্য দু' টাকা চার আনা ও তিন টাকা চার আনা।

বীরবলের হালখাতা—মূল্য তিন টাকা।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—মূল্য আট আনা।

রায়তের কথা—মূল্য আট আনা।

হিন্দু-সংগীত—মূল্য আট আনা।

চিরসুন্দরী দেবিকারাণী রোয়েরিক

কাপুরুষতার কথা কি বলব? সব যে ফাঁক হয়ে যায়, তবুও লিখি, নারীদের আমি ভয়ানক ভয় পাই। তাঁরা যদি সুন্দরী হন তা হলে ত কথাই নেই! এ ভয় কোথেকে কেমন ভাবে এলো জানি না, কিন্তু এর প্রকাশ অভিব্যক্ত না করে উপায় নেই। যাঁর সম্বন্ধে লিখছি, ঔৎসুক্য তাঁর সম্বন্ধে আমার নিজেরই এত বেশী যে, এক কথায় "First lady in Indian Screen" বা সেমনি ধরণের কোনো ইংরিজী বিশেষণ বসে আমি পরিতৃপ্ত নই। তাঁকে আবার সব প্রশ্ন এক সাথে করার সাহস নেই। মাস খানেক ধরে, প্রতিদিনের প্রশ্নের উত্তরে যা পেয়েছি, বিনীত ভাবে পাঠকের সামনে পরিবেশন করছি—আমি চিরসুন্দরী বঙ্গললনা দেবিকারাণীর কথাই বলছি।

অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ। কনট প্লেসের রিগ্যাল বিল্ডিংএ ভারতের শিল্পকলা-সঙ্গীতের কেন্দ্র সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমির দপ্তর। তেতালায় জানালার ফাঁক দিকে এধারের আকাশ যেন ওধারের পূত নীলিমার পিছনে ছুটছে। চেয়ারে বসেই দেখা যায়। সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমির পরিচালনা কক্ষে প্রবেশ করলাম। গৃহকোণে ফুলের সৌরভে নিজেকে মিলিয়ে যে রমণীমূর্ত্তি বসেছিলেন তিনি সাদর সম্ভাষণ জানালেন—পরিষ্কার বাংলায়, (দিল্লীতে বাঙ্গালী অফিসারদের বাংলা বলার রেওয়াজ নেই। ওটা না কি প্রাদেশিকতা!) আদরের সাথে—বস ভাই!

চারি দিকে গোলাপ, ডালিয়া, পিটুনিয়া, ফ্লাকস্‌-এর পুষ্পস্তবক। টেবিলের কোণে ছোট্ট একখানা ছবি—মহর্ষি রমণের। প্রতিকৃতির সামনে তখন জ্বলছিল সুগন্ধি ধূপ। আমার খুব ভাল লাগলো। রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম—এ-ও কি হয়? দশ বছরে একটুও পরিবর্তন হয়নি? কিন্তু এর ইঙ্গিত পরে জেনেছিলাম, এক্ষুণি বলছি।

খুব ভাল দিনে এসেছো ভাই, আজ আমার মহর্ষির দিন।—প্রতিটি সোমবার দেবিকারাণী বাংলার নিভৃত পল্লীর সরলা রমণীর মতন নির্জ্জলা ব্রত উদ্‌যাপন করেন। পুরোহিত আসেন, মহর্ষি রমণের পুজো হয়—সময় না পেলে সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমির (কি বিপদ! 'আকাদামী' নাকি ওটা, স্মরণ করিয়ে দিলেন বার দুই) পরিচালনা কক্ষেই, দু' বার আমি দেখেছি।

বললাম, দিন নেই, রাত নেই আপনি যে কেবল দিবা-যামিনী Film Seminar, Film Seminar করছেন বসে বসে, তাতে করে আপনার ক্লান্তি, অবসাদ বা দুর্বলতা আসছে না? আমি ত সত্যি বলতে কি দশটা থেকে বড় জোর দশটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা খাটতে পারি। আপনি এ শক্তি পান কোথেকে? শ্রীমতী সকাল আটটার সময় অফিসে আসেন, রাত এগারোটার সময় যান—মেইডেন্স হোটেল বলে দিল্লীর সম্ভ্রান্ত পান্থনিবাস, দেবিকার 'অফিশিয়াল' ঠিকানা। সেখান থেকে রিডাইরেক্টেড হয়ে গড়ে প্রতিদিন অন্তত গোটা পঞ্চাশেক করে টেলিফোন আসে। বহু বাঙ্গালী কর্মঠ মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, বহু উৎসবে বহু উৎস দেখেছি, এমনটি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বল কি হে? Film Seminar, এ যে আমার কত দিনের স্বপ্ন, তোমরা কেউ জানো সে কথা?

ভারতবর্ষের সাহিত্যিক আসছেন, সব চিত্র-তারকা আসছেন। সঙ্গীত-শিল্পী আসছেন। সিনেমা-ফটোগ্রাফার আসছেন, টেকনিসিয়ান আসছেন। এঁরা সবাই যেন মহাশক্তির পুজোয় কর্মস্থল থেকে গ্রামের ছায়াস্নিগ্ধ তরুতলে অবসর নিতে আসছেন। দেবিকারাণী গৃহকর্ত্রীর মতন তাই এত কর্মব্যস্ত।

বল কি হে, দেবকী বাবুকে ওয়েষ্টার্ণ কোর্টে দোতলায় দিচ্ছ? ওহে গোপাল, মিসেস ভেলোডিকে (ডিফেন্স সেক্রেটারী গৃহিণী) বলে দাও যেন লিপ্ট-বয় সর্বক্ষণ সাথে থাকে। ফাঁকি দিয়ে পালালে বেচারা দেবকী বাবুর ওপরে উঠতে কষ্ট হবে। সুপ্রভাকে কোথায় দিলে, ডক্টর রে'র কিংবা মিঃ সরকারের কাছাকাছি কামরায় দিও। যেন দুটো বাংলা বলার সুযোগটুকু পায়। হ্যাঁ কি বললে, পেপারগুলো এডিট করা শেষ হয়নি? লক্ষীটি, আজকের মধ্যেই শেষ করে ফেল। হোয়াট ডিড ইউ সে, প্রকাশ? এ ট্রাঙ্ক কল ফর মি? ফ্রম্ বম্বে? কে? ছোটু ভাই। বল ভাই। না মরিনি এখনও!

আমার মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ করে উঠল।

—তুমি রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে আসছো? ঠিক আছে, যাব সন্ধ্যা সাতটায়। সাক্‌সেনা কি বললে বাংলার ডেলিগেটদের "লাইফ স্কেচ" হারিয়ে ফেলেছো। মাই সুইট্ বয় আই ক্যানট্ এ্যাফোর্ড টু লুস্ বেঙ্গল। খোঁজ খোঁজ। না হলে আজ রাতের মধ্যেই আবার সব লিখতে হবে।

লাইফ স্কেচ পাওয়া যায়!

—পুট্ মি টু লক্ষ্মী। (লক্ষ্মী মজুমদার, ফিনান্স সেক্রেটারী গৃহিণী) তোমার গার্ল গাইড ব্রিগেড তৈরী থাকে যেন। রিসেপশন কেমন হবে বললে? কুটি বাত্রাকে এক্ষুণি খবর দাও সাপ্রু হাউসে লোক ধরবে না—ন্যাশনাল ফিসিকাল ল্যাবোরেটরিতেই করতে হবে—উনি দেখতে গেছেন।

"উনি" মানে অধ্যাপক স্বেত্‌স্লাভ রোয়েরিক।—জগৎ বিখ্যাত

শ্রীমতী দেবিকারাণী রোয়েরিক

[স্বামীর আঁকা স্ত্রীর ছবি। দেবিকারাণীর স্বামী মিঃ এস, রোয়েরিক কর্ত্তৃক অঙ্কিত এই চিত্রের আলোকচিত্র,
মাসিক বসুমতীর জন্য বিশেষরূপে প্রেরিত

আর্টিষ্ট। বর্তমানে ভারতের নাগরিক। ভারতের কৃষ্টি, ভারতের কালচার, ভারতের ট্রাডিশন সম্বন্ধে একটা পাণ্ডিত্যের খনি। ওঁর পদপ্রান্তে বসে বহু ভারতীয় স্নাতক ভারতের আর্ট, কালচার, ইতিহাস শিখেছেন। হিমালয়ের পাদদেশে রমণীয় সৌধে বসে দেবিকারাণী বহু দিন প্রশান্ত অন্তরে বিদেশী স্বামীটির (বিদেশী বলতে আমি বেদনা পাচ্ছি, ভারত-প্রীতিতে কোটি কোটি ভারত সন্তান তাঁর কাছে হাতে-খড়ি নিতে পারে) পদপ্রান্তে বসে দেশের বৈভবে বিভোর হয়ে ধ্যান-স্তিমিত ক্ষণ যাপন করেছেন। এ কথা দেবিকারাণীর মুখে আমি হাজারো বার শুনেছি।

রোয়েরিক সাহেব তাঁর স্ফটিক-স্বচ্ছ কোমল অন্তরে সমস্ত আকাদামীর 'সদস্য'কে বেঁধে বসে আছেন। দেবিকারাণী 'ডেকরে' বিলিতি ডিগ্রী এনেছেন। সব 'ডেকরে'র ভার তবুও কেন যে এই মহান্ শিল্পীর হাতে দিয়েছেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কেবল মাত্র আকাদামীর পরিচালনা গৃহের সজ্জা-সৌন্দর্যে।

* * *

ইম্পিরিয়াল হোটেলে সেদিন সাংবাদিকদের বৈঠক হয়েছিল। দীন সাংবাদিক হিসেবে কয়েকটা সাংবাদিক-সভায় যাবার সৌভাগ্য আমার পূর্বেও হয়েছিল। প্রতিটি সাংবাদিকের মুখে একই কথা শুনলুম, দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সাংবাদিক সভা ছাড়া অন্য কারুর সভায় এত ভীড় কখনও হয়নি। ইম্পিরিয়ালে শত সাংবাদিকের মাঝে যখন দেবিকারাণী আমায় নাগাড়ে বাংলায় নির্দেশ দিতে লাগলেন, তখন সত্যি বলতে কি, আমি একটু বিব্রত বোধ করছিলুম—কেমন করে এ বঙ্গললনাকে বোঝাই যে প্রেস কনফারেন্সে সবাই তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সেখানে এমন একটা ভাষায় তাঁর কথা বলা অসঙ্গত বলে লোকের ধারণা হতে পারে; যদিও মনে-প্রাণে যে খুশী হয়েছি, গর্ব অনুভব করেছি, সে কথা অস্বীকার করব না।

প্রেস কনফারেন্সের লেকচারের চেয়ে বেশী জমেছিল প্রশ্নগুলো—তার চেয়ে আনন্দদায়ক ছিল জবাবগুলো।

আমি সবাইকে ভয় পাই। এক কোণে একটা টেবিল-ল্যাম্পের আড়ালে বসেছিলুম সভারম্ভে। সেখানে বসে শুনে খুশী হলুম বিভিন্ন প্রদেশের সাংবাদিকের তারিফখানা। অভিনয়ের জন্য খুসী হয়েছি বললে ভুল হবে। অভিনয় সম্বন্ধে বোঝার পাণ্ডিত্য আমার নেই। আমি খুসী হয়েছিলাম অন্য কারণে। বিদগ্ধ পাঠক আমায় সঙ্কীর্ণমনা বলবেন, জানি। তবুও স্বীকার করি, আমার গর্ব হয়েছিল বাংলার দুহিতার বিজয়-গরিমায়। আমি খুসী হয়েছিলাম। আমার আত্মপ্রসাদের কারণ, আত্মগৌরব; এ বিজয়িনী বাঙ্গালী বলে ধন্য—আমাকে বহু বার নিভৃতে এ কথা তিনি বলেছেন।

—জানো ভাই, আমার ভারী সখ হয় বাংলা শিখবার। আই মিন্ বাংলা সাহিত্যে গভীর ভাবে ডুবে থাকার। অবসর পাইনি। সুযোগ আসেনি; এখন একটু আধটু বসি রোজ। খুব শক্ত হবে না কি বল?

শ্রীমতী দেবিকা ভালো হিন্দী, উর্দু, তামিল, লিখতে-পড়তে বলতে পারেন।

ওঁর মনে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করার আবেগ আসে। সেদিন সকালে একজন বিদেশী সাংবাদিকের সাথে ভারতীয় অভিনয়ে পথ-ঘাটের দৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ শুরু করে দিলেন, কি যেন সেই লাইনটা ভাই, "গ্রাম ছাড়া সেই রাঙ্গামাটির পথ"...

সাহেবকে বললেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এটা টেগোরের ভাষা? আমি মাঝে মাঝে ওকে আবৃত্তি করার চেষ্টা করে থাকি।

দেবিকারাণী রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী (মাতৃ-সম্পর্কে)।

* * * *

দেবিকার পিতৃদেব কর্ণেল এম এন চৌধুরী একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। মান্দ্রাজে তিনিই প্রথম ভারতীয় সার্জেন জেনারেল। মা ছিলেন—লীলা চৌধুরী। সাধারণ বাঙ্গালী শিশুর মতন এখন তিনি তাঁকে স্মরণ করেন—বল কি, "আমার কি হবে মা গো?"

ওঁর সম্বন্ধে বাংলার "পরশের অভাবে"র যে খবর শুনেছিলুম, একদিনের প্রতি ক্ষণে অনুভব করলাম, কত ভুল আমরা করে থাকি দূর থেকে!

এ কথা অবশ্য সত্যি যে, দেবিকা জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলার বাইরেই কাটিয়েছেন। দশ বছর বয়স থেকে ইংল্যাণ্ডে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। সেখানেই তিনি লণ্ডন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সাথে উত্তীর্ণ হন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ সময়েই অভিনয়ের জন্য বিলেতে দেবিকা Royal Academy of Dramatic Arts in London-এর এক বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। ষোল বছর বয়স থেকে দেবিকা লণ্ডনে applied arts পড়তে শুরু করেন। তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল টেক্সটাইল ডিসাইনিঙ, ডেকর। স্থাপত্যে শ্রীমতীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আঠারো বছরের বঙ্গদুহিতা দেবিকা লণ্ডনের এক বিখ্যাত আর্ট ইুডিওতে টেক্সটাইল ডিজাইনারের কাজ নিয়ে নিজের জীবিকা উপার্জনের বন্দোবস্ত করেন।

সরম রক্তরাগে নবযৌবন-চঞ্চল সুন্দরীর জীবনে সহস্র যোজন দূরে সেদিন বাংলার কোকিলের কুহু রব গিয়ে পৌছুলো। বসন্ত দ্বারে জাগ্রতরূপে দেখা দিল—নাম তাঁর হিমাংশু রায়। বড় প্রডিউসর (দোহাই সম্পাদক মশাই, প্রডিউসর কি করেন আমি বিন্দুমাত্র জানি না, আপনি ত তা জানেনই)। হিমাংশু বাবু পর পর "The light of Asia," "Shiraj," "A throw of Dice" দেখিয়ে পৃথিবীতে খুব নাম করছেন।

হিমাংশু বাবু দেবিকাকে তাঁর প্রোডাকশন ইউনিটে যোগদান করার সাদর আমন্ত্রণ জানান। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সে এক পুত সুপ্রভাত। Mr. Bruce Wolfe বলে যে ভদ্রলোক হিমাংশু বাবুর সহকর্মী ছিলেন দেবিকারাণী তাঁর সাথে একটা চুক্তিপত্রে বদ্ধ হলেন। হিমাংশু বাবুর সাথে দেবিকা ভারতে ফিরলেন। সাথে করে নিয়ে এলেন ইংরেজ আর জার্মাণ একস্‌পার্ট। চাট্টিখানি কথা নয় বাবা—"A throw of Dice" বাড়ী করতে হবে। শ্রীমতী পোষাক সম্বন্ধে বিশেষ পড়াশুনো করতে লাগলেন। সাথে সাথে হিমাংশু বাবুর কাছে প্রোডাকশন সম্বন্ধে হাতে-কলমে তালিম।

১৯২৯ সালে দেবিকারাণী হিমাংশু বাবুর সাথে পরিণয়-বন্ধনে ভূষিত হলেন। প্রতিভার সাথে মিলন হল সুন্দরের। তাই তো হয়। নয় কি?

দেবিকারাণী জার্মাণীর বিখ্যাত ডিরেক্টর Dr Pabst-এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করলেন তার পর।

বার্লিনের U. F. A ষ্টুডিওতে তখন বিশ্ববরেণ্য শিল্পিবৃন্দের সমাবেশ। মূক অভিনয় থেকে তখন টকির ট্রান্জিশন। U. F. Aর কাজে দেবিকা-হিমাংশু তখন সুইজারল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশসমূহ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। সব জায়গাতে এ বঙ্গসন্তানের প্রতিভা সাদর অভ্যর্থনার মহিমায় গৌরবান্বিত হয়েছে।

শুধু Dr Pabstএর কাছে নয়। দেবিকা কড়া লোকের পাল্লায় পড়েছিলেন (রায় বলতে আজও তিনি অজ্ঞান! করজোড় করে তাঁকে প্রতিটি বার প্রণতি জানান। কালিদাসের সেই সখীর সংজ্ঞা পূর্ণ রূপ পেয়েছে কি এ মিলনে—এত শ্রদ্ধা নম্রা শিষ্যা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?) রায় মশাই দেবিকাকে জার্মাণীর বিখ্যাত প্রডিউসর Dr. Max Rheinhardtএর জিম্মায় রাখলেন কিছু কাল। হিমাংশু বাবু এমন সময় "কর্ম" নামে অভিনয় শুরু করেন। ইংরিজী আর হিন্দুস্থানীতে। বিলেতে "কর্ম"ই সর্বপ্রথম ভারতীয় 'টকি'। ভারতবর্ষেও।

বিলেতে "কর্ম" বিশেষ আদর লাভ করেছিল। লর্ড আরুইন এ অভিনয়ের উদ্বোধন করেন। বিলেতের 'ইলাইট্' সম্প্রদায় এ মহান সমারোহে যোগদান করেন। হিমাংশু-দেবিকার জীবনে সে এক স্মরণীয় ক্ষণ! শুধু তাঁদেরই কি? ভারতীয় আমরাও কি সে গৌরবে কম গর্বিত হয়েছি?

এই "কর্ম"তে, হিমাংশু-দেবিকা ছাড়া আরও এক ভারতীয় প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি হলেন বর্ধমানের রাজকন্যা প্রিন্সেস সুধারাণী।

"কর্ম"তে দেবিকার জয়তিলক স্থায়িত্ব পেল। ("কর্ম"তে দেবিকার অভিনয়ের দৃশ্যের একখানা ছবি দেওয়া হল। ছবিখানা আজ-কাল দুষ্প্রাপ্য)

"কর্ম"তে অভিনয় কালে B. B. C. London দেবিকাকে এক বিশেষ সম্মান দেয়। ব্রিটেনে এ সময়ে প্রথম টেলিভিশন ব্রডকাষ্ট হয়—যা প্রতি ঘরে ঘরে রিলে করা হয়েছিল। এই স্মরণীয় টেলিভিশন-ব্রডকাষ্টে বাংলার মেয়ে দেবিকার নিমন্ত্রণ হল অংশ নিতে। তিনি সম্মানের সাথে সে কাজ করেছিলেন। দেবিকারাণী B.B.C. লণ্ডনের ভারতীয় ইউনিট্ উদ্বোধন করেন।

হিমাংশু বাবু পুরোপুরি "বিশ্ববাদী" (international) ছিলেন। তিনি দেবিকার সাথে হিমাংশু রায় ইণ্ডো-ইণ্টার-ন্যাশনাল টকিস লিমিটেড খাড়া করেন। এর থেকেই বম্বে টকিজের জন্ম। ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে এই বম্বে টকিজের অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৪০ সালে হিমাংশু বাবুর মৃত্যু হয়।

দেবিকার পক্ষে সে এক কঠোর আঘাত। ফুলের মতন নরম মন, ঝড়ে ঝরে পড়েনি দেখে অবাকের সাথে খুশী হলুম।

—'জানো সে দুঃসময়ে আমার মনে কি বেদনাহত আলোড়ন। জানো? সমস্ত মনটা কে যেন নিংড়ে নিয়ে খালি রেখে চলে গেল। রায় আমাকে ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে যে vacuumটা হয়েছিল তার ভরার কোন পথ কেউ বলতে পারেনি।'

বেদনায়, শোকে, ঝড়ে, আতঙ্কে, দুর্যোগে ঘন ঘোর ঘটায় চারি-দিকে আলো খুঁজছে এ অবলা নারী। কেউ তাঁকে পথ বলতে পারেনি। আশ্রয় নিয়েছিলেন সেদিন শান্ত সমাহিত যোগী—মহর্ষি রমণের। বেদনায় শান্ত পরশ, আতঙ্কে নির্ভয় ভারতের যোগী ছাড়া আর কে দিতে পারে? পথ-ভ্রান্ত বিশ্ব-মানব আজ ভাগীরথীর তীরে পর্ণকুটীরে মাথা খুঁড়ে মরছে কিসের সন্ধানে?

কাজের ফাঁকে ফাঁকে মহর্ষির প্রতিকৃতির দিকে ধ্যান-স্তিমিত নয়নে এ চিরসুন্দরীকে দেখে কত বার প্রশ্ন জেগেছে মনে—এঁর কিসের অভাব? অর্থের কুবের। বৈভবে মহিমামণ্ডিত। সৌন্দর্যে চিরযৌবনা। যশ-খ্যাতিতে ভুবন ভরা নাম—তবুও এর কিসের অভাব?

মনের কথা ভয়ে বলিনি কোনো দিন। ভয় ঠিক ওঁর ব্যক্তিত্বকে নয়। ভয় হয়েছে পরিপার্শ্বকে। আমার প্রশ্ন ওঁর মনে যদি তিল মাত্রও বেদনা জাগায় তাহলে আমি অপরাধী হব।

দিনশেষে শ্রান্ত হয়ে সেদিন বসলাম গিয়ে ওঁর সামনে—উনিই ডাকলেন।

কথায় কথায় হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ঐ ছবিখানা আমায় কি বলে জানো ভাই?'

বললাম, বলুন।

'বলে, ওরে পাগল আর কত খেলা খেলবি? জানিস না কি এই খেলাঘরের বালির ঢিপি সব এক দিন মিলিয়ে যাবে? তবুও বৃথা ছুটে চলেছিস কিসের দিকে?'

অগুরু, চন্দন, ধূপের সৌরভ চারি দিকে ভেসে যেন হেসে হেসে চলে গেল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বিখ্যাত আইনবিদ্ ও দেশনেতা]

বিরাট প্রতিভা ও অসামান্য কর্ম্মশক্তির অধিকারী এ মানুষটি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ইনি এক জন একনিষ্ঠ পূজারী। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—তাঁর অনন্যসাধারণ আইন জ্ঞান ও আইন প্রয়োগ ক্ষমতা। বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ও সুবক্তা হিসেবেই আজকের ভারতে এন, সি, চ্যাটার্জ্জী (শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) সর্বত্র সুপরিচিত। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ইনি বর্ত্তমান সভাপতি। হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর যে কত গভীর শ্রদ্ধা, নানা ভাবে তা প্রমাণিত হ'য়েছে। অখণ্ড ভারতের স্বপ্নও বরাবরই দেখে এসেছেন তিনি। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সমাজ ও দেশের—বিশেষ করে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জাতির পক্ষে এ মুহূর্ত্তে অপরিহার্য্য।

[হুগলী জিলার বৈঁচি গ্রামের এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৯৫ সালে। বাল্যকাল থেকেই পড়া-শুনোয় তাঁর অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেন এবং প্রেমচাঁদ

রায়চাঁদ বৃত্তি লাভের গৌরবে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া-শুনো শেষ করার পর তিনি কিছু কালের জন্ম এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্নাতকোত্তর বিভাগে লেকচারার হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসা এখানেই তাঁকে আটকে থাকতে দিলে না। ১৯২৩ সালে তিনি রওনা হ'য়ে গেলেন বিলেতে, ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসবার জন্যে। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন—কর্মজীবনে তিনি যে একটি বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন, সুধী সমাজের চোখে সে দিনই তা ধরা পড়েছিল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিলাত থেকে কলিকাতায় ফিরে এসেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন হাইকোর্টে। অল্প দিন মধ্যে এক জন প্রথম শ্রেণীর আইনবিদ্ হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ব্যবহারজীবী হিসেবে তাঁর পসার দিন দিন বেড়ে চললো, পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আইনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করেই সরকার তাঁকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেন। বৃহত্তর কাজের আহ্বানে তিনি এ পদে খুব বেশী দিন থাকতে চাইলেন না, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বিচারপতি হিসেবে তিনি যে অবদান রেখে এসেছেন, তাঁর মূল্য সামান্য নয়।

কলিকাতা হাইকোর্ট-এর বিচারপতির পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সুপ্রীম কোর্টে যোগদান করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন এখানেও। সূক্ষ্ম আইনজ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বিচার-বুদ্ধির বলে তিনি বহু বিখ্যাত মামলায় জয়ী হন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, অখণ্ডনীয় যুক্তি ও বাগ্মিতার কাছে প্রতিপক্ষকে পরাভব স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কত অপরিসীম, এ পরিচয়ও ভারতবাসী বহু ক্ষেত্রেই পেয়েছে। তিনি সুপ্রীম কোর্টে এখনও আইন-ব্যবসায়ে নিযুক্ত রয়েছেন।

শুধু এক জন শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্ই নয়, শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক জন অগ্রণী দেশনায়ক ও সমাজসেবী। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তিনি বহু কাল থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বাঙ্গালার উপর যখন পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিভীষিকা নেমে আসে, সে-দুর্দ্দিনে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। ঢাকার দাঙ্গা, রাজপুরার দাঙ্গা, এবং নোয়াখালীর নারকীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ও তাঁর দরদী মন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। দুর্গত নর-নারীর সেবায় প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনসেবা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই ছিলেন দেশবরেণ্য নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী। কলিকাতার প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম জনিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ডাঃ মুখার্জ্জী যে সময় "হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড" গঠন করেন, সে সময়ও এ জরুরী ব্যাপারে শ্রীচ্যাটার্জ্জীর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। দেশ বিভাগের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি এগিয়ে এসে 'বেঙ্গল বাউণ্ডারী কমিশন'-এর সম্মুখে বাঙ্গালার হিন্দুদের বক্তব্য এবং শ্রীহট্ট সম্পর্কে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা উভয়েরই বক্তব্য জোরালো ভাবে পেশ করেন। বাঙ্গালার পক্ষে কথা বলবার জন্যে তিনি যে কতখানি অপরিহার্য্য, সেদিনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বিপুল ভোটাধিক্যে লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। লোকসভার বিরোধী দলের অন্যতম নেতা ও প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন অল্প দিন মধ্যেই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের শোচনীয় মৃত্যুর পর বাঙ্গালার জনগণের পক্ষে, ভারতের হিন্দু জাতির পক্ষে এবং বিশেষ ভাবে লক্ষ লক্ষ অসহায় উদ্বাস্তু নর-নারীর পক্ষে লোকসভার ভিতরে ও বাইরে তিনিই তাঁদের দাবীকে বিশ্বসমাজে তুলে ধরেছেন। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি প্রসঙ্গে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতেই হবে। কাশ্মীরের ব্যাপারেও তিনি কারাবরণ করতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নি।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় দেশের বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। জাতির সঙ্কট মুহূর্ত্তে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ দিয়েছেন দেশবাসীকে। আজ সর্ব্ব-ভারতীয় হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করেও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করবার জন্যে রয়েছেন তিনি একান্ত ব্যাকুল ও সচেষ্ট। ভারতের আইন ব্যবসায়ীদের যখনই যেখানে সম্মেলন বা সমাবেশ হয়ে আসছে সেখানেই রয়েছে তাঁর সাদর আহ্বান। এ সকল সম্মেলনে তিনি সভাপতি বা উদ্বোধক হিসেবে যে ভাষণ প্রদান করেন তা শুধু এদেশেই নয়, বিশ্বের সর্ব্বত্র আইনবিদ্‌দের বিশেষ প্রশংসা ও মর্য্যাদা লাভ করে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র এখনও সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম। জনকল্যাণের আগ্রহ ও প্রয়াস তাঁর প্রাণে সর্ব্বদা জাগরুক। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও সাধনা যে চরম সিদ্ধি বহন ক'রে আনবে এবং বিশেষ করে আইন-জগতে তিনি যে অক্ষয় আসনের অধিকারী হবেন, এ বিশ্বাস আমরা অনায়াসেই রাখতে পারি।

শ্রীগোপাল হালদার

(সাম্যবাদী সাহিত্যিক)

এ যুগে বাঙলা সাহিত্যে মননশীলতার জন্য যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের পুরোভাগে আছেন শ্রীগোপাল হালদার। ৫৩ বৎসর বয়স্ক শ্রীহালদারের জন্ম বিক্রমপুরের বেদগাঁও গ্রামে। পিতা স্বর্গীয় সীতাকান্ত হালদার ছিলেন নোয়াখালীর উকিল। তাই গোপাল বাবুর বাল্য-জীবন কেটেছে নোয়াখালীতে। স্কুলের মেয়াদ শেষ করে ১৯১৮ সালে তিনি আসেন কলকাতায়

উচ্চতর শিক্ষা লাভের ইচ্ছায় এবং ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কবি শ্রীসুধীন দত্ত এবং 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস গোপাল বাবুর সহপাঠী। ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করার পর তিনি এম-এ এবং আইন পাশ করে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে দু'বছর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯২৯ সালে তিনি অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন ফেনী (নোয়াখালী) কলেজে। ইতিমধ্যেই ভাষাতত্ত্বের উপর তাঁর কয়েকটি রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফেনী কলেজে যাবার আগে কিছু দিন তিনি 'মডার্ণ রিভ্যু' এবং প্রবাসীতেও কাজ করেছিলেন। ফেনী কলেজে কাজ করার সময় অবসর সময়ে তিনি ভাষাতত্ত্বেরই চর্চা করতেন। ১৯৩২ সালে পিতার মৃত্যুর ২১ দিন বাদে তিনি রাজবন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার হন এবং তাতে তাঁর জীবনে আসে আমূল পরিবর্তন।

গোপাল হালদার

সেদিন বিবেকানন্দ রোডের বাসায় বসে সেই কথাই বললেন গোপাল হালদার। "সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর দলের সঙ্গে ১৯১৬ সাল থেকে যোগাযোগ থাকলেও, কখনও মারাত্মক রাজনীতি করিনি বরং লেখা-পড়া নিয়েই বেশী মত্ত ছিলাম। বাবার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে সংসারের সমস্ত ভার যখন মাথায় এসে পড়ল, তখন রাজনীতি থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবার কথাই চিন্তা করছিলাম। কিন্তু বাদ সাধল পুলিশ। তারা জোর করে আমায় রাজনীতির পথে ফিরিয়ে আনল।" চির-রুগ্ন গোপাল হালদারের যে ক'খানা উপন্যাস বাজারে প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই জেলের মধ্যে বসেই লেখা। জেলের মধ্যে বসেই তিনি পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য ভাষাতত্ত্বের উপর পাঁচ শত পৃষ্ঠার একটা থিসিস লেখেন (comparative grammar of East Bengali Dialect) কিন্তু নানা টেকনিকাল কারণে সেটা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা হয়নি। শীঘ্রই এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। গোপাল বাবু বললেন যে, তাঁর বিদ্যানুরাগের পেছনে দু'টি লোকের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে কাজ করছে। এক জন তাঁর উদার সংস্কৃতিবান পিতা স্বর্গীয় সীতাকান্ত হালদার এবং অপর জন তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রাঙন হালদার। তিনি বৃটিশ আমলে জেলে কাটিয়েছেন ছ' বছর এবং কংগ্রেসী আমলে প্রায় এক বছর। জেলের মধ্যে মার্ক্সবাদ পড়া-শোনা করে তিনি কম্যুনিজমের দিকে ঝোঁকেন। বাইরে বেরিয়ে বহু দিন তিনি কৃষাণ ও যুব সংগঠনের কাজ করেন। তার পর যোগ দেন হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে সহকারী সম্পাদক হিসাবে। ১৯৪০ সালে তিনি তৎকালে বে-আইনী কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং পার্টির কাজে সর্বক্ষণ নিয়োগ করবেন বলে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের চাকরীও ছেড়ে দেন। বর্তমানে ইনি কম্যুনিষ্ট পার্টির এক জন নেতৃস্থানীয় সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক। রাজনৈতিক হিসাবে বাঙলা দেশকে তিনি কতটুকু কি দান করেছেন, তার হিসাব-নিকাশের দিন এখনও আসেনি, কিন্তু সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিকর্মী হিসাবে তাঁর দান বাঙলা দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। 'একদা' তাঁর যে জয়যাত্রার সূচনা করেছিল, তার গতি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। জ্ঞানের নানা দিকে তাঁর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। তাই এ যুগের যুদ্ধ'ও যেমন সহজ ভাবে বর্ণনা করতে পারেন, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা আবিষ্কার করতেও তেমনি তিনি পেছপা হন না। এ বছর তিনি নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে সংস্কৃতি শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

অতি বিনয়ী, সরল এবং আড্ডা-রসিক গোপাল হালদার ১৯৪১ সালে পাটনা খৃষ্টান কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অরুণা সিংহকে বিবাহ করেন, কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর কর্মক্ষেত্র দুই পৃথক্ প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায় তাঁদের দাম্পত্য জীবনে বিরহই যে, প্রাধান্য লাভ করেছে, সে কথা বলা বাহুল্য। কলকাতায় গোপাল বাবু থাকেন তাঁর মায়ের কাছে।

শ্রীহালদার হিন্দী, ইংরাজি এবং বাঙলা তিন ভাষাতেই অনর্গল বক্তৃতা করতে এবং লিখতে পারেন।

শ্রীত্রিদিবেশ বসু

(সেক্রেটারী, পাবলিশার্স এসোসিয়সন অফ বেঙ্গল)

গিয়ে খবর দিতেই উপর থেকে নেমে এলেন এক জন গৌরকান্তি দীর্ঘাকার সুপুরুষ। ধীর-স্থির-প্রশান্ত মুখের ভাব। প্রশস্ত বক্ষ ও ললাটে উদার ও ভাগ্যবানের চিহ্ন। এ্যাপয়েনমেণ্ট আগে থেকেই করা ছিল, তাই নমস্কার করে বললুম, 'এবার আর আপনার ছাড়ান-ছিড়েন নেই, আমাদের 'চার-জন'-এর মধ্যে আপনাকে থাকতেই হচ্ছে।'

মুখে মৃদু হাসির রেশ টেনে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এ ত' খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু নির্বাচন আপনাদের যে ঠিক হয়নি তা বলতেই হবে। দেশে গণ্যমান্য খ্যাতিবান এমন বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁদের তুলনায় আমার স্থান অত্যন্ত নগণ্য এবং আমি তাঁদের সমপর্য্যায়ে আসন গ্রহণ করতে সঙ্কোচই বোধ করি।'

বুঝলুম, অত্যন্ত বিনয়ী লোক, সৌজন্যের সঙ্গে বিনয় প্রকাশ করলেন। বললুম, 'আপনি গণ্যমান্য কম কিসে? বাংলা দেশে পুস্তক-ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, আপনার

খ্যাতি-প্রতিপত্তি সর্ব্বজনবিদিত। তাছাড়া আপনাদের কে, পি, বসু কোম্পানীর ঐতিহ্য বাঙালী মাত্রেরই গৌরবের।'

নিজের কথা ছেড়ে কে, পি, বসুর কথা উঠতেই তিনি যেন একটু স্বস্তি বোধ করে বললেন, 'কে, পি, বসুর কথা যদি বলেন তা'হলে অবশ্য আমার বলার কিছু নেই—তিনি আমার স্বর্গত *পিতৃদেব; তাঁরই পুণ্যে* আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা-কালে ১৮৮৮ সালে তিনি যে ইণ্টারমিডিয়েট এ্যালজাবরা ও ১৮৯০ সালে ম্যাট্রিক এ্যালজাবরা প্রকাশ করে যান, আজও তা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ও শিক্ষক মহলে যে সম ভাবে সমাদর পেয়ে আসছে, এটা আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়।'

পিতার কথায় প্রথম দিকে যেমন উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন ত্রিদিবেশ বাবু, কিন্তু একটু পরেই কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গিে বললেন, 'জানেন, আমি মাত্র ন'বছর বয়সে আমার এই বাবাকেয় হারিয়েছি!'

কথাটা অকস্মাৎ শুনে আমিও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলুম। কয়েক মুহূর্ত্ত দু'জনেই চুপচাপ থাকার পর আমিই বললুম, 'তাহলে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই আজ আর আপনার মনে নেই বলুন?'

এই কথার উত্তরে তিনি তাঁর স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরে তিনি তাঁর পিতা-মাতা সংসার ও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেছিলেন, আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে এখানে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। তিনি বলেছিলেন: '১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের আদিবাদ যশোহর জেলার ঝিনাইদহ সাবডিভিসনে, হরিশঙ্করপুর গ্রামে। তাঁর পিতা কে, পি, বসু (কালীপদ বসু) সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ঢাকা কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা দুই ভ্রাতা ও তিন ভগিনী।

শ্রীত্রিদিবেশ বসু
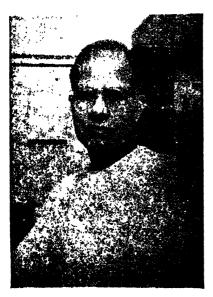
এবং মাতা এখনো জীবিত আছেন। ১৯১৩ সালের এক সময় তাঁর পিতা অল্প কিছু দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় নন্দকুমার চৌধুরী লেনের এক বাড়ীতে (অধুনা ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট) এসে ওঠেন চোখ কাটাবার জন্য। কলকাতায় আসা তাঁদের এই প্রথম। এর পর ১৯১৪ সালে তাঁরা সকলে পূজা উপলক্ষে দেশে যান এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বৎসরেই তাঁর পিতা অকস্মাৎ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু কলকাতায় এই অল্প কাল থাকা কালীন অবস্থার মধ্যেই কে, পি, বসু মহাশয় ত্রিদিবেশ বাবুদের বর্ত্তমান বাসস্থান ১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে জমি ক্রয় করে বাড়ীর ভিত্তিস্থাপন করে যান।

স্থানীয় রাণী ভবানী স্কুলে ত্রিদিবেশ বাবুর ছাত্রজীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়। ১৯১১ সালে তিনি ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এচ, সি, ক্লারিজ।

পিতার মৃত্যুর পর মায়ের তত্ত্বাবধানেই তাঁরা বড় হয়ে ওঠেন। মা-ই বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ত্রিদিবেশ বাবু যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন সাংসারিক ব্যাপারে তাঁকে নানা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই দীর্ঘ কাল এই দুর্য্যোগপূর্ণ অশান্তিকর আবহাওয়ার মধ্যেও অবিচল ভাবে ও সসম্মানে তিনি এই ব্যবসাকে উন্নততর রূপ দিতে সমর্থ হন। এর দ্বারা ব্যবসাবুদ্ধির দিক থেকে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে।

ব্যবসার দিক থেকে এবং সাংসারিক ক্ষেত্রে ত্রিদিবেশ বাবুর জীবনেও বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে বটে, কিন্তু তাঁর পবিত্র শান্ত মুখে তার এতটুকুও ছাপ পড়েনি। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল। বহু ছাত্র-ছাত্রী ও সংসারী মানুষ তাঁর কাছে বহু ভাবে উপকৃত। তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী।

ত্রিদিবেশ বাবুকে বর্ত্তমান পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'বর্ত্তমান সময়ে বহু অসুবিধার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে যেতে হচ্ছে। বিশেষ ক'রে দেশ-বিভাগের পর ব্যবসার ক্ষেত্র হয়ে পড়েছে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বহু নূতন নূতন প্রতিযোগী সাফল্য অর্জ্জনের জন্য নানা বিচিত্র উপায় অবলম্বন করছেন। তার মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের সাফল্য এনে দিলেও, সমগ্র ভাবে ব্যবসার দিক থেকে দেখলে ক্ষতিকর। বর্ত্তমানে এক মাত্র স্কুল-কলেজের বইয়ের উপর নির্ভর না ক'রে বহু প্রকাশক অন্যান্য গল্প-উপন্যাস গ্রন্থও প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন, এটা আশার কথা।'

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ নামক এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি নিজেও যুক্ত আছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে একাদিক্রমে তিনি নয় বৎসর পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েসন অব বেঙ্গল-এর সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই নয় বৎসরের মধ্যে পুস্তক-ব্যবসায় সংরক্ষণ ও উন্নতি বিষয়ে তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শহরের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, শিক্ষালয় ও পাঠাগারের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত আছেন এবং বর্ত্তমানে দি ফেডারেশন অব পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স এসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়ার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।
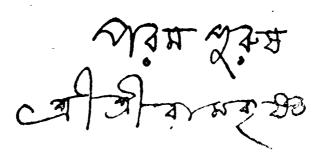
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো একত্রিশ

ঠাকুর অসুখে পড়লেন। গলায় ব্যথা।

'বড় গরম পড়েছে।' বললেন মাষ্টারকে: 'এ বরফ খেয়ো।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাষ্টার।

'গরমে আমারো বাপু বড় কষ্ট হচ্ছে। তা বরফ খেয়েই বা বিশেষ লাভ কি। এই দেখ না কুলপি বরফ বেশি একটু খাওয়া হয়েছিল, গলায় এখন বিচি হয়েছে।'

এই প্রথম সূত্রপাত অসুখের।

'মাকে বলেছি, মা, ব্যথা ভালো করে দাও, আর কুলপি খাব না।'

'শুধু কুলপি?'

'না। আবার বলেছি, মা বরফও খাব না আর। যে কালে বলেছি একবার মাকে, আর খাব না কোনো দিন। কিন্তু জানো,' সরলস্বভাব বালকের মত বললেন, 'মাঝে-মাঝে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। সেদিন বলেছিলাম মাছ খাব না রোববার, কিন্তু, জানো, ভুলে খেয়ে ফেলেছি।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাষ্টার।

'কিন্তু জানো,' গম্ভীর হলেন ঠাকুর: 'জেনে-শুনে হবার যো নেই।'

কলকাতা থেকে হঠাৎ একজন ভক্ত এসে উপস্থিত। সঙ্গে বরফ নিয়ে এসেছে ঠাকুরের জন্যে।

কৌতূহলী হয়ে তাকালেন মাষ্টারের দিকে। ছেলেমানুষ যেমন করে তাকায় লোভালু চোখে। জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ গা, খাব কি?'

মাষ্টার চুপ করে রইল।

'হ্যাঁ গা, বল না, খাব কি?' আবার জিগগেস করলেন বালকের মত।

'আজ্ঞে,' মাষ্টার বললে কুণ্ঠিত হয়ে, 'মাকে জিগগেস করে নিন। যদি তিনি না করেন খাবেন না।'

খেলেন না ঠাকুর।

এমনি বালকস্বভাব। এমনি সর্ববন্ধনহীন সর্বানন্দ।

ষ্টারে দক্ষ-যজ্ঞ দেখতে গিয়েছেন। সঙ্গে রামলাল। কিছু খেয়াল নেই, যে পথে মেয়েরা ঢোকে সেই পথে এসে পড়েছেন। এতটুকু পিছিয়ে যাবার চেষ্টা নেই। যে মেয়েটিকে কাছে পেলেন তাকেই ডেকে জিগগেস করলেন, 'ওগো গিরিশকে একবার ডেকে দাও না।'

গিরিশের নিমন্ত্রণেই এসেছেন। চৈতন্যলীলার পর এবার দক্ষযজ্ঞ। কৃষ্ণকীর্তনের পর শিববন্দনা। নবীননীরদশ্যামল কৃষ্ণ আর শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ শিব।

কে এসে পড়েছেন নিভৃত প্রকোষ্ঠে জানে না হয়তো মেয়েটি। একচক্ষে তাকিয়ে রইল। পর্বতের মধ্যে মহামেরু, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা, কে তুমি?

'বলো গে দক্ষিণেশ্বর হতে সব এসেছে।'

পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে গিরিশ। ছুটে এসেই লুটিয়ে পড়ল পায়ের উপর।

'ওঠো গো ওঠো। আমায় যে ময়লা লাগল।'

'ময়লা লাগল, না, ময়লা গেল?' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন উদ্দীপ্ত হয়ে, 'সবাইকে ডাক্। পায়ে লুটিয়ে পড়, লুটিয়ে পড়। মহা ভাগ্য তোদের, তিনি পথ ভুলে এসে পড়েছেন, ওরে, এমন সুযোগ আর পাবিনে—'

কে কোথায় সাজগোজ করছিল, সব ফেলে রেখে ছুটে এল। প্রণাম করতে লাগল একে-একে।

এ কি সেই ভুবনভয়ভঙ্গ চতুর্বর্গবদান্য শিব নয়?

'ওঠো ওঠো মায়েরা, আনন্দময়ীরা।' মুক্তহস্তে ঠাকুর কৃপাবর্ষণ করতে লাগলেন, 'নেচে গেয়ে অভিনয় করে সর্বজীবকে আনন্দ দিচ্ছ, নিত্য বসতি করো এই আনন্দে। যাও, এইবার সাজগোজ সেরে নামো গে—'

দক্ষ সেজেছে গিরিশ। হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল ষ্টেজে। বীরদর্পে ঘোষণা করল: 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

বালকের মত বিস্ময়বিহ্বল চোখে দেখছেন সব ঠাকুর। গিরিশের কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর: 'ওরে রামলাল, এ শালা আবার বলে কি রে—'

বলে কিনা শিবনাম ঘোচাবে! এত দিন ধরে তবে ওকে শেখালাম কি!

'ও কথা গিরিশ বলছে না, দক্ষ বলছে।'

'গিরিশ বলছে না?' যেন অবাক হলেন ঠাকুর।

'না, ওটা দক্ষের কথা।'

গিরিশ আর দক্ষ যে আলাদা এ ভেদ ভুলে গিয়েছেন। যে পোশাকেই এসে দাঁড়াক, যে অবস্থাতেই, গিরিশ সব সময়েই গিরিশ।

এই বালকস্বভাব। রাজার পার্টে বাপ অভিনয় করছে, মা'র কোলে বসে দেখছে তার ছোট ছেলে। মা, বাবা আবার কখন আসবে, কোন দৃশ্যে, এই শুধু তার জিজ্ঞাসা। রাজার আবির্ভাবের

কথা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। নাটকে আছে, বিদ্রোহী সেনাপতি রাজাকে হঠাৎ অস্ত্রাঘাত করে বসবে। সেই দৃশ্যে যেমনি সেনাপতি রাজাকে তলোয়ারের ঘা দিল ছোট ছেলে মা'র কোলে বসে কেঁদে উঠল, মা, বাবাকে মারলে! ওটা যে রাজার উপর আঘাত তা কে বোঝায় সেই ছেলেকে! তার চোখে রাজা নেই, শুধু তার বাবা। তেমনি ঠাকুরের চোখে দক্ষ নেই, শুধু গিরিশ। যে গিরিশ ভক্তভৈরব সে শিবনাম উচ্চারণ করবে না?

'ভয় নেই, দক্ষ মানে গিরিশ আবার বলবে শিবনাম।'

বলবে তো? দেখিস। যেন আশ্বস্ত হলেন। দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, বসলেন আবার চেয়ারে।

সে বার গিয়েছিলেন 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখতে। গিরিশকে বললেন, 'বা, তুমি বেশ লিখেছ।'

'লিখেছি মাত্র।' গিরিশ বললে বিনীত ভাবে, 'কিন্তু ধারণা কই?'

'ধারণা না হলে কি এত সব লেখা যায়? ভিতরে ভক্তি না থাকলে আঁকা যায় কি চালচিত্র?'

প্রহ্লাদ পড়তে এসেছে পাঠশালায়। তাকে দেখে ঠাকুরের আহ্লাদ আর ধরে না। সস্নেহে তাকে ডেকে উঠলেন প্রহ্লাদ বলে। বলতে বলতে সমাধিস্থ।

হাতির পায়ের নিচে ফেলেছে প্রহ্লাদকে। ঠাকুর কাঁদতে শুরু করলেন। ফেলেছে অগ্নিকুণ্ডে। আবার কান্না। গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন প্রহ্লাদের প্রতীক্ষায়। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

অসুরদের পুরোহিত শুক্রাচার্য। তার দুই ছেলে, ষণ্ড আর অমর্ক। প্রহ্লাদের দুই মাষ্টার। অসুররাজ বিষ্ণুশত্রু হিরণ্যকশিপু ছেলের পড়াশোনা নিয়ে আর ভাবে না, যোগ্য হাতেই তাকে সমর্পণ করা হয়েছে। একদিন গৃহাগত ছেলেকে কোলে নিয়ে হিরণ্যকশিপু জিগগেস করলে, যা যা এত দিন শিখলে তার মধ্যে তোমার সব চেয়ে কী ভালো মনে হল? প্রহ্লাদ বললে, বাবা, এই অন্ধকূপ সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করার কথাটিই সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে সুখময় মনে হয়েছে।

কোল থেকে নামিয়ে দিল ছেলেকে। গুরুরা টেনে নিয়ে গেল। জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ, এ তুমি নিজের থেকে বললে, না, আর কেউ তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে? আর কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। স্মিতহাস্যে বললে প্রহ্লাদ। যিনি শিখিয়ে দিয়েছেন, যাঁর আকর্ষণে আমার এই মতি হয়েছে, তিনিই শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু। তর্জন-গর্জন দণ্ডবেত্র বহু শাসন-পীড়ন শুরু করল মাষ্টাররা। নতুন করে শেখাল সব জাগতিক কর্মকাণ্ডের কথা। আবার নিয়ে এল বাপের কাছে। এইবার বলো সর্বোত্তম কী তুমি শিখে এলে? পিতাকে বন্দনা করে প্রহ্লাদ বললে, নবলক্ষণা শিখে এসেছি। নবলক্ষণা? হ্যাঁ, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুকে অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

এবার দৈত্যরাজ ক্ষেপে গেল মাষ্টারদের উপর। এই মারে তো সেই মারে। ষণ্ড-অমর্ক বলে, প্রভু এই শিক্ষা আমরা দিইনি। আর কেউও দেয়নি। এ বুদ্ধি ওর স্বভাবজ। প্রহ্লাদও সায় দিল, বললে, বাবা, সাধ্য নেই বিষয়াসক্ত স্বয়ংবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মায়। এ মতির দাতা তিনিই।

মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ছেলেকে। সবলে লাথি মারল হিরণ্যকশিপু। অসুরদের বললে, শীগগির একে বধ করো। মাত্র পাঁচ বছরের শিশু, এ কি না আমার পরমশত্রু বিষ্ণুর সেবক? দুষ্ট অঙ্গের মতন এ পরিত্যাজ্য। তীক্ষ্ণ শূলে প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করল অসুরেরা। উপবাস করিয়ে রাখো। সাপ দিয়ে দংশন করাও। হাতির পায়ের নিচে ফেল। ফেল তপ্ত কটাহে। পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করো। পরব্রহ্ম-সমাহিত প্রহ্লাদকে কে স্পর্শ করে! সব চেষ্টা নিষ্ফল হল। মহা ভাবনায় পড়ল হিরণ্যকশিপু।

প্রভু, আপনি ত্রিজগৎ-বিজয়ী, বললে ষণ্ড-অমর্ক, ছোট একটা ছেলের জন্যে কেন ভাবছেন? পিতা শুক্রাচার্য শীগগিরই ফিরে আসছেন, যত দিন না আসেন তত দিন আমাদের কাছে ওকে পাশবদ্ধ করে রেখে যান, দেখি আরেক বার চেষ্টা করে।

দেখ। যারা খেলা করে বেড়ায় সে সব ছেলেদের দলে ভিড়িয়ে দাও।

আবার শুরু হল নতুন প্রয়াসের পরিচ্ছেদ। পড়াশোনা যখন বন্ধ থাকে তখন দল পাকিয়ে আসে সব সমবয়সীরা। হেলাফেলার খেলায় ডাক দেয়।

প্রহ্লাদ বললে, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। মনুষ্যজন্মেই পুরুষার্থ সাধন! কিন্তু মনুষ্যজন্মও নশ্বর, অধ্রুব। সুতরাং বাল্যেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করবে।

এ আবার কেমনতরো কথা!

হ্যাঁ, বিষ্ণুই সর্বভূতের আশ্রয়, সকলের প্রিয়, সকলের বান্ধবস্বরূপ। আয়ু বড়জোর একশো বছর! তার আদ্ধেক যাচ্ছে ঘুমে। কুড়ি বচ্ছর অনর্থক ক্রীড়ায়। কুড়ি বচ্ছর জরাজনিত অক্ষমতায়। বাকি সময় যাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ভোগের আসক্তিতে। ত্রিতাপে জর্জরিত হয়ে। কোশকার কীট যেমন নিজের জালে বদ্ধ তেমনি। কামিনীর ক্রীড়ামৃগ, সন্তানের শৃঙ্খলরজ্জু। হে দৈত্যবালকগণ, মুকুন্দশরণাগতি ও তাঁর পদসেবাই এই ক্লেশক্লেদ থেকে মুক্তি আর মঙ্গলের উপায়।

প্রহ্লাদ এত কথা জানলে কি করে? বলাবলি করতে লাগল ছেলেরা।

যত দিন মাতৃগর্ভে ছিলাম নারদ আমাকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন। সেই স্মৃতি ত্যাগ করেনি আমাকে। হে বয়স্যগণ, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করো, বালকেরও ভাগবতী মতি জন্মাতে পারে। বয়স বা বিকার দেহের, আত্মার নয়। খনি খুঁড়ে যেমন সোনা, তেমনি এর দেহক্ষেত্রেই আত্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মত্বলাভ।

'প্রহ্লাদচরিত্র' প্লে হবার পর 'বিবাহ বিভ্রাট' হবে। গিরিশ ঠাকুরকে বলছে শুনে যেতে।

'না, প্রহ্লাদের পর আবার ও-সব কি! গোপাল উড়ের দলকে তাই বলেছিলাম, শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ভগবানের কথা হচ্ছিল, শেষে কিনা বিবাহ-বিভ্রাট, সংসারের কথা। কি লাভ হল? যা ছিলুম তাই হলুম।'

'থাক তবে। কিন্তু কেমন দেখলেন প্রহ্লাদচরিত্র?'

'দেখলাম তিনিই সব হয়েছেন। মেয়েরা আনন্দময়ী মা, এমন

কি গোলোকে যারা রাখাল সেজেছে তারাও সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ কি? একটি লক্ষণ আনন্দ। নিঃসঙ্কোচ আনন্দ। যেমন সমুদ্র। উপরে হিল্লোল-কল্লোল, নিচে স্থির জল গভীর জল। কখনো বালকের ভাব। আঁট নেই, যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। কখনো পৌগণ্ড ভাব, ফষ্টিনষ্টি করে। কখনো যুবার ভাব, যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয় তখন সিংহতুল্য।'

ঈশ্বর নিজেই যে বালক। তাই তো বালক ভাবটি এত মধুর! এত আত্মীয়!

ছোট তক্তপোষের উপর মুখখানি চুণ করে বসে আছেন। ব্যথা বেড়েছে। গলায় কে ডাক্তারি প্রলেপের পোঁচ দিয়েছে। চারদিকে ভক্তদের কড়া নিষেধ। যেন মুক্ত হরিণকে বেঁধেছে দড়ি দিয়ে। রুগ্ন ছেলেটির মুখের মতই মুখখানি করুণ।

সব চেয়ে কঠিন কথা, কথা বলা যাবে না।

'কথা একেবারে বন্ধ করলে চলে কি করে?' প্রতিবাদ করছেন ঠাকুর: 'কত লোক কত দূর থেকে আসছে, একটা কথাও শুনে যাবে না?'

'কি দরকার! আপনাকে দেখলেই আনন্দ।' কে একজন ভক্ত বললে।

'তুই বললেই হল? দেখেই সব, কথায় কিছু নেই? তোর তো দেখে আনন্দ, কিন্তু আমার আনন্দ যে বলে।'

মা গো, যত সব এঁদো, রোখো লোক আনবি, এক সের দুধে পাঁচ সের জল, আমি কত আর ফুঁ দিয়ে জাল ঠেলব? আমার চোখ গেল, হাড়-মাস মাটি হল, আমাকে রেহাই দে। অত আমি করতে পারব না। আমার কী দায় পড়েছে! তোর শখ থাকে তুই করগে যা। বেছে-বেছে সব ভালো লোক আনতে পারিস না, যাদের দু-এক কথা বললেই হবে। এ যে একেবারে বাজে লোকের ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের ভিড়ে আমার নাইবার-খাবার সময় নেই। এই তো একটা মাত্র ফুটো ঢাক, রাত-দিন বাজালে ক'দিন আর টিকবে বল?

গলা দিয়ে রক্ত বেরুল ঠাকুরের।

একটি ভক্ত মেয়ে চলেছে ঠাকুরের কাছে। ওগো, তোর হাত দিয়ে যদি একটু দুধ পাঠাই নিয়ে যাবি ঠাকুরের জন্যে? শুধোলে তাকে তার প্রতিবেশিনী।

দক্ষিণেশ্বরে আবার দুধের অভাব? ঠাকুরের জন্যে কত বরাদ্দ দুধ, কত বা নৈবেদ্য নিবেদন। নিতে রাজী হয় না ভক্ত মেয়ে।

শুধু এক ঘটি দুধ! নিয়ে যা। ঠাকুরকে খাইয়ে আয়।

হাতে করে ঘটি বয়ে যেতে পারব না বাপু! অনেকটা রাস্তা।

অনুনয় শুনল না। খালি হাতেই গেল দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শুনল দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে উঠছে না ঠাকুরের। আর, এমন দুর্দৈব, আজ এক ফোঁটাও দুধ যোগাড় নেই কালীঘরে। শ্রীমা চোখে আঁধার দেখছেন, খাওয়াবেন কী ঠাকুরকে! ছি, ছি, কেন আমি সেই সাধা দুধ ফেলে এলাম? আমার মত আছে কি কেউ অভাগিনী? মনের মধ্যে ভক্ত-মেয়ে হাহাকার করতে লাগল। এখন আমি কোথায় যাই, কে আমাকে দুধ দেয়!

পাঁড়ে-গিন্নির নাম করলে কেউ-কেউ। কাছেই থাকে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে, গরু আছে বাড়িতে, দুধ বেচে। কিন্তু বেচবার মত নেই কিছু আজ উদ্বৃত্ত। দেড় পোয়াটাক ছিল, তা এই দেখ, জাল দিয়ে রেখেছি। ঐ জাল-দেওয়া দুধই আমাকে দাও। আমার দারুণ দায়। আমার ঠাকুর না খেয়ে রয়েছেন। বলো কত দাম দেব? যা চাও তাই নাও।

অনেক সাধ্যসাধনা করে কিনে আনল দুধ। ভাত চটকে সেই দুধটুকুই খেলেন ঠাকুর। কত বড় তৃপ্তির সাগর উথলাচ্ছে সেই ভক্ত-মেয়ের বুকের মধ্যে। আঁচাবার সময় জল ঢেলে দিল ঠাকুরের হাতে।

কানের কাছে মুখ এনে সহসা ঠাকুর বললেন, 'ওগো তোমার সেই মন্ত্রটি আমাকে দেবে?'

কোন মন্ত্র? চমকে উঠল সেই ভক্ত মেয়ে।

'সেই যে সিদ্ধিমন্ত্র পেয়েছিলে কর্তাভজাদের এক মেয়ের কাছ থেকে সেইটি।'

কণ্ঠস্বরে ব্যথা ঝরে পড়ল: 'ওগো গলায় বড় বেদনা। তোমার ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করে গলায় একবার হাত বুলিয়ে দেবে?'

আশ্চর্য, ঠাকুর কি করে জানলেন! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেয়ের। কোন কালে কী সকাম সাধনায় ঐ মন্ত্র সে শিখেছিল গোপনে তা তো তাঁর জানবার কথা নয়! ঠাকুরের পায়ে শরণ নিয়ে জীবনের সকল কথাই তাঁকে সে খুলে বলেছে, শুধু এই মন্ত্র নেওয়ার কথাটিই বলেনি। কামনাসিদ্ধির জন্যে মন্ত্র নেওয়া, এ শুনলে ঠাকুর যদি অসন্তুষ্ট হন তারই জন্যে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই কি তাঁকে লুকোবার নেই?

লজ্জায় অবনতমুখে গেল সে শ্রীমার দুয়ারে। বললে তার ধরাপড়ার কথা।

মা বললেন, 'কোনো ভয় নেই। এখন তো সে মন্ত্র ফেলে দিয়েছ, নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরকে ডাকাই যে কর্তব্য, বুঝেছ এই সার কথা। জানো এঁর কাছে আসার আগে আমিও ঐ মন্ত্র শিখে নিয়েছিলাম। কত লোকে কত কথা বলেছে, ঐ মন্ত্রও ওদের পরামর্শেই নেওয়া। একদিন ঠাকুরকে বললুম সব খোলাখুলি। একটুও রাগ করলেন না। শুধু বললেন, মন্ত্র নিয়েছ তাতে কি? এখন তা ইষ্ট-পাদপদ্মে সমর্পণ করে দাও।'

ভালো-মন্দ শুচি-অশুচি সকাম-নিষ্কাম সব বিসর্জন দাও তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি আর কিছু চান না, শুধু চান মন-মুখের সমতা।

নিজলাভতুষ্ট স্বশান্তরূপ আশুতোষকে দেখ। সামান্য মৃত্তিকায় তাঁর মূর্তি। একটু গঙ্গাজল আর দুটো বেলপাতাই তাঁর উপকরণ। তুচ্ছ গালবাদ্যেই তাঁর পরিতোষ।

আর কিছু না থাকে দাও তাঁকে অন্তরের সারল্য। সরল হওয়া মানেই নির্মল হওয়া। তিনি যে নির্মলচক্ষু। কী তাঁর থেকে গোপন করবে? কোন গুহায় গিয়ে মুখ ঢাকবে? তিনি যে আরো গভীরে। কী আচ্ছাদন আছে তোমার আবৃত করবার? তিনি যে অনিরুদ্ধ।

ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্যে। প্রথমে উঠলেন দুর্গাচরণ মুখুজ্জে স্ট্রীটের ছোট বাড়িতে। ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যাবে এইটুকুই সেখানে প্রশান্তিস্পর্শ।

ছাই। ওটুকু গঙ্গায় আমার কী হবে? রাত্রি-দিন নিত্য আমি ছিলাম ঐ প্রশস্তবাহিনী গঙ্গার কাছটিতে, আমার বিস্তীর্ণ

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে, মুক্ত বাতাসের উদারতায়। এ আমাকে কোথায় এনে বন্দী করলি? একদিন হেঁটে চলে গেলেন বলরামের বাড়ি। তবু এখানে কিছুটা খোলা-মেলা আছে। আছে অন্তত শুভাবহ ভক্তির বিশুদ্ধতা। আসতে লাগল কবিরাজের দল। গঙ্গাপ্রসাদ গোপীমোহন নবগোপাল দ্বারিকা-নাথ। ডাক্তাররা যাকে বলে ক্যান্সার, কবিরাজের ভাষায় রোহিণী। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন ভক্তদের, 'শাস্ত্রে আছে বটে চিকিৎসার বিধান কিন্তু অসাধ্য-আরোগ্য।'

কবিরাজদের কোনো ওষুধই লাগল না। শেষে ঠিক হল হোমিওপ্যাথি করানো যাক। শ্যামপুকুর স্ট্রীট নেওয়া হল বাড়িভাড়া। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে।

অসহ্য ক্লেশভোগ করছেন। অথচ অবিচাল্য। পর্বতচূড়ারও বোধ করি ধৈর্যের সীমা আছে। বজ্র পড়লে তাও ভেঙে পড়ে। কিন্তু এঁর ধৈর্যের বুঝি সীমা নেই। বজ্রের বহ্নিজ্বালাও বুঝি ঐ শান্তশীতল বক্ষের স্পর্শে নিবে গেছে।

তাই অপার বিশ্বাসই তোমার দুর্গ হোক। তপস্যা আর আত্মসংযম হোক অর্গল। ধৈর্য হোক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তারপর তোমার ধনু উত্তোলন করো। ধর্মই তোমার ধনু, নিষ্ঠা তার জ্যা, শান্তি তার অটনি। সত্যসহায়ে তোলো তোমার ধনু। প্রেমরূপ শর যোজনা করো। ভেদ করো তোমার কর্মরূপ বর্ম। সর্বসংগ্রামে জয়ী হও। শাঁখারিটোলায় ডাক্তারের বাড়ি এসেছে মাষ্টারমশায়। নিয়ে যাবে তাকে শ্যামপুকুর। ডাক্তার তার গাড়িতে তুলে নিল মাষ্টারকে। বহু জায়গায় ডাক, ঘুরে-ঘুরে ফিরতে লাগল ঘরে-ঘরে। প্রথমে চোরবাগান, পরে মাথাঘষার গলি, শেষে পাথুরিয়াঘাটা। বড়বাজার হয়ে সর্বশেষে শ্যামপুকুর। সমস্ত জ্ঞান-তর্ক পেরিয়ে সর্বশেষে শরণাগতি।

ঠাকুরের সেবার কথা উঠেছে। 'তোমাদের কি ইচ্ছে ওঁকে আবার দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো?' ডাক্তার জিগগেস করল মাষ্টারকে।

'না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধে। কলকাতায় থাকলে সব সময় যাওয়া-আসা যায়, দেখতে পাওয়া যায় সর্বদা।'

'কিন্তু এতে তো অনেক খরচ।'

'তা হোক। ভক্তদের তার জন্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই। যাতে তাঁর পরিপূর্ণ সেবা করতে পারে তাই তাদের একমাত্র চেষ্টা।' মাষ্টার বললে গাঢ় স্বরে, 'একমাত্র আরাধনা। খরচ এখানেও, সেখানেও। খরচের কথা কেউ ভাবে না। তবু যে সর্বক্ষণ দেখতে পাচ্ছি চোখের উপর, এই একমাত্র সান্ত্বনা।'

সব ভক্তকে মেলাবার জন্যেই তো ঠাকুরের অসুখ। এক সুতোয় গাঁথবার জন্যে। এক মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্যে।

সে মন্ত্রটি কি?

সে মন্ত্র সেবা।

ওরে শুধু আমার সেবা নয়, সমস্ত মানুষের সেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ওরে মানুষের মৈত্রী, মানুষের কল্যাণ। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

মহাভারতে ভীষ্মের কথা মনে কর, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

হরি, আমাকে বিনামূল্যে পার করে দাও। এই বিনামূল্যটিই প্রেম। আর পার হতে চাওয়া সমস্ত অহঙ্কারের বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের মৈত্রীতে প্রসারিত হওয়া।

ওরে মানুষের মধ্যেই এই ঠাকুর। পরমপুরুষ ব্রহ্মবিদ। প্রেমই ব্রহ্মবিহার। তুই ধর্ম দিতে যাস নেবে না, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সঙ্ঘাত হবে। কিন্তু মৈত্রী দিতে যাস নেবে পাত্র পরিপূর্ণ করে। মিত্রের অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলকে দেখ, সকলেও সেই সৌহার্দ্যদৃষ্টিটি প্রত্যর্পণ করবে।

আমরা ভদ্র শুনব, ভদ্র দেখব, ভদ্রে প্রেরিত হব। আমাদের চিন্তা কল্যাণ, দর্শন কল্যাণ, কর্মও কল্যাণ।

মানবসেবাই মাধবসেবা।

একশো বত্রিশ

'যে অসুখ হয়েছে, কারু সঙ্গে কথা কওয়া চলবে না।' মুখ গম্ভীর করে বললে ডাক্তার সরকার। তার পর মুখে একটু হাসি টানলে: 'তবে আমি যখন আসব কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবেন।'

শুনতে মধুময় লাগে। কথা তো নতুন নয়, বলাটি নতুন। সেই একের কথাই অনেক ভাবে বলা। একটুও লাগে না একঘেয়ে।

আপনিও এ-সব কথা শোনেন? আপনি তো ঘোরতর বৈজ্ঞানিক। যুক্তিবাদী। বাস্তবপন্থী।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম-ডি, নাম-ডাক-ওয়ালা ডাক্তার, হঠাৎ হোমিয়োপ্যাথির দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু যার মধ্যে সত্য আছে একবার বুঝেছে তাকে শত অসুবিধে সত্ত্বেও ছাড়তে কখনো রাজি নয়। শুধু অসুবিধে? দস্তরমত উৎপীড়ন। তার সহযোগী অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারেরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। নানা উপায়ে লাগল তার বিরুদ্ধতা করতে। দুর্নাম রটাতে। কিন্তু দমবার পাত্র নয় সরকার।

মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভা হচ্ছে। বক্তা মহেন্দ্র সরকার। মুক্তকণ্ঠে হ্যানিম্যানের গুণকীর্তন করছে। সহগামী ডাক্তাররা তো সব হতভম্ব। বিজ্ঞানের মান-ইজ্জৎ সব যে ধূলিসাৎ করে দিল। অসম্ভব! বক্তৃতা বন্ধ করো। বিজ্ঞানের অপমান সইতে পারব না আমরা। ও নিজে না বন্ধ করে, মুখ চেপে ধরো কেউ।

'চুপ করো।' গর্জে উঠল অ্যালোপ্যাথের দল। 'নইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব হল থেকে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সভার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার সরকার। দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে বললে, 'যদি কেউ বার করে দিতে চায় তো দিক কিন্তু আমি আমার সত্যকে প্রকাশ করে যাব।'

সত্যকে প্রকাশ করে যাব। যা বুঝেছি যা জেনেছি তা বলতে পেছপা হব না। শুধু বলে যাব না, করে যাব। দেখিয়ে যাব। নিজেও প্রকাশিত হব।

কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে এত মজা কিসের?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনি যে এখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন। এ কেমন কথা! আর রুগী নেই আপনার? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না?'

'আর ডাক্তারি আর রুগী!' গভীর নিশ্বাস ফেলল সরকার। 'যে পরমহংস্ হয়েছে আমায় সব গেল!'

সকলে হেসে উঠল।

আমার সব গেল! দড়ি গেল, দড়া গেল, হাল গেল, পাল গেল, এবার ভেসে পড়লাম নদীতে।

ঠাকুর বললেন, 'এ নদীর নাম কর্মনাশা। এ নদীতে ডুব দিলে মহা বিপদ। কর্মনাশ হয়ে যায়। সে ব্যক্তি আর কোনো কর্ম করতে পারে না।'

তবে ডাক্তার কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? শুধু কারণ-পরম্পরাই দেখে না, জগৎকারণকেও খোঁজ করে? প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বাইরে আছে কি কোনো অপ্রমেয়? ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো মূল শক্তি?

শিবনাথের বন্ধু বিয়ে করেছে এক বিধবাকে। বউটির ভারি অসুখ। সংস্থান নেই যে ভালো চিকিৎসা করে। ওহে শিবনাথ, একটা কিছু সুরাহা হয়?

দীনতারণ বিদ্যাসাগর। শিবনাথের হাতে চিঠি দিল সরকারকে, যদি দয়া করে দেখ একবার বিনা পয়সায়। আদর্শ পালনের জন্যে লাঞ্ছিত হচ্ছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে-যুঝে নিয়েছে শেষ রোগশয্যা।

একবার নয় বার-বার যেতে লাগল সরকার। কিন্তু কই, ভালো হচ্ছে কই মেয়েটি?

রোজ সকাল-বিকাল শিবনাথ আসছে ডাক্তারের কাছে। রুগীর অবস্থা বলছে, ব্যবস্থা নিচ্ছে। চলো আরেক বার দেখি। আরেক বার ওষুধ পালটাই। কিন্তু কই, এত চেষ্টা, এত আয়াস, সুফল ফলছে কই? হায়, সে সুফলবৃক্ষের নাম কি?

বউটির মৃত্যুর একদিন আগে শিবনাথ গিয়েছে ডাক্তারের কাছে। রাত প্রায় দশটা। অবস্থা খারাপ, তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়েছে। নতুন একটা কিছু ওষুধ দিন। বড্ড ছটফট করছে। দেব। কিন্তু ওষুধের জন্যে শিশি এনেছ?

শিশি আনতে ভুলে গিয়েছে শিবনাথ। কোনো দিন ভুল হয় না, কি সর্বনাশ, আজই এই সঙিন মুহূর্তে এমন একটা ভুল হয়ে গেল?

ডাক্তার নিজের বাড়িতে খোঁজ করলে। কিন্তু যেমনটি দরকার পাওয়া গেল না একটাও। শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে গেল। কোনো ডাক্তারখানা থেকে যদি কিনতে পায়! রাত অনেক হল। তা হোক। শিশি একটা যোগাড় হবে না?

শিশি নিয়ে ফিরল যখন শিবনাথ, অনেক-অনেক মূল্যবান সময় অপব্যয় হয়ে গেছে। ডাক্তার ক্লান্ত সুরে বললে, 'এরই জন্যে মনে হচ্ছে বউটি বাঁচবার নয়। যদি বাঁচবার হত, তোমার শিশি আনতে ভুল হয় কেন? আর আমার ঘরেই বা পাওয়া যায় না কেন একটা?'

'কিন্তু এই তো এনেছি জোগাড় করে।'

'যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত দামী সেখানে এতটা সময় অনর্থক নষ্টই বা হয় কেন? কোন্ ওজরে? শিবনাথ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পারলুম না বাঁচাতে!'

ম্লান হয়ে গেল শিবনাথ। বললে, 'আপনিও যদি এই কথা বলেন আমরা যাই কোথায়?'

ডাক্তার চমকে উঠল। 'কেন, কি বললুম আমি?'

'আপনি ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক। আপনিও যদি ভাগ্য বা নিয়তির উপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে আমাদের উপায় কি?'

'অনেক দিন ধরে ডাক্তারি করছি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেল। কিন্তু প্রতিনিয়তই এই সত্যটাকেই উপলব্ধি করছি, আরেকটা কোন শক্তি সমস্ত প্রাণিজীবনকে চালনা করছে। যতই ওষুধ বিষুধ দিই ছুরি-কাঁচি চালাই আমরা কিছু নয়, শুধু ঢিল ছুঁড়ছি অন্ধকারে। যার মৃত্যু নিশ্চিত কোন ডাক্তার তাকে রক্ষা করে?'

'তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে দিন।' ঝাঁঝিয়ে উঠল শিবনাথ। 'সবাইকে বলুন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে। শান্ত হয়ে।'

'তা কেন? অন্ধকারে আছি বলেই তো বেশি করে হাতড়াতে হবে, বেশি করে আঁকড়াতে হবে। ফলাফল থাক আরেক জনের হাতে, তবু আমরা বীর, আমরা লড়াই করে যাব। সত্য খুঁজতে-খুঁজতে ধরে ফেলব সেই সত্যস্বরূপকে।'

ঠাকুর বললেন অনুনয় করে, 'এই অসুখটা ভালো করে দাও। তাঁর নামগুণ গান করতে পাই না।'

নারদ বললেন, আহা, তোমরা কী সুনির্মল, যে হেতু হরিনাম কীর্তনে তোমাদের অনুরাগ। আগে তিমিরহনন করেই সূর্যের উদয় তেমনি তোমাদের মনের অন্ধকার নাশ করে নামতপন তোমাদের রসনার আকাশে উদিত হয়েছেন।

যদি অন্তর্বতিকে সমুজ্জ্বল করতে চাও তবে তোমার জিহ্বা-রূপদ্বারে রামনামমণিরূপ দীপ স্থাপন করো। বায়ুর সাধ্য নেই সে দীপকে বাধা দেয়, সে দীপকে নেবায়। বায়ু মানে সংসার-ঝটিকা।

প্রহ্লাদ বললে, হে নৃসিংহ, যে সকল সাধু আনন্দান্বিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম গান করছে তারাই সর্বজীবের অকৈতব বন্ধু। নিরুপাধিক বান্ধব।

মন্ত্রে-তন্ত্রে কত স্খলন-পতন ঘটছে। মন্ত্রে স্বরভ্রংশ হচ্ছে, উচ্চারণে ভুল হচ্ছে। তন্ত্রে হচ্ছে আচারভ্রংশ, নিয়মের ব্যতিক্রম। সমস্ত ছিদ্র ও ন্যূনতা নামকীর্তনই পূরণ-মোচন করে। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব কিছুই পড়ে দরকার নেই তোমার, তুমি শুধু হরিনাম করো। সর্বার্থসাধক সর্বতীর্থাধিক হরিনাম।

আর বিষ্ণুদূতেরা বললে যমদূতদের, 'হে কৃতান্তকিঙ্করগণ! এই অজামিল কোটি-কোটি পাপ করেছিল বটে কিন্তু যে মুহূর্তে হরিনাম উচ্চারণ করেছে তখন আর সে পাপী নয়। হরিনামই পরম স্বস্ত্যয়ন। পরম মোক্ষপ্রদ।'

কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ এই অজামিল। দাসীসংসর্গে কুলভ্রষ্ট হয়েছে। হেন পাপ নেই যে করেনি। ধর্মপত্নীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। দাসীগর্ভে অনেকগুলি পুত্র হয়েছে; কোন্ খেয়ালে কে জানে, সর্বকনিষ্ঠের নাম রেখেছে নারায়ণ। বড় ভালোবাসে ছেলেটাকে। নাওয়ায়-খাওয়ায়, কোলে-পিঠে করে খেলা দেয়। ছেলের অস্ফুট মধুর কণ্ঠ নকল করে নারায়ণ-নারায়ণ বলে ডাকে।

বুড়ো বয়সে অজামিলকে কাল গ্রাস করতে এসেছে। বাচিক মানসিক ও কায়িক—তিন রকম পাপেই পাপী ছিল বলে তিন-তিনটে যমদূত এসে হাজির। ঊর্ধ্বরোম বক্রানন বিকটমূর্তি পুরুষ

তিন জন। পাশ দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে, ভীতত্রস্ত হয়ে অজামিল তাকাতে লাগল চার দিকে। অদূরে খেলছিল নারায়ণ, তারই নাম ধরে ডেকে উঠল অজামিল। নারায়ণ, নারায়ণ!

আর যায় কোথা! চোখের পলকে চার জন বিষ্ণুদূত এসে উপস্থিত। চতুর্বক্ষর নারায়ণ, তাই বিষ্ণুদূত চার জন। এসেই হাঁক দিল, 'কোথায় নিয়ে যাও একে? যদি বাঁচবার ইচ্ছে থাকে, ছেড়ে দাও অজামিলকে। পথ দেখ।'

'কে তোমরা?' ছমকে উঠল যমদূতেরা। 'ধর্মরাজের শাসনে বাধা দাও, কী স্পর্ধা তোমাদের? তোমরা দেখতে তো মনোহর, অভিনব বয়স, চতুর্ভুজ। পদ্মপলাশনেত্র, কিরীটকুণ্ডলধারী। তোমাদের আকৃতি দেখে তো সুশীল-শিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এ তোমাদের কি দৌরাত্ম্য? দুরাচার পাপীকে যমালয়ে নিয়ে যেতে দেবে না? তোমরা কে? কার লোক? তোমাদের তো কই দেখিনি।'

দণ্ড্যাদণ্ড্য জ্ঞান নেই কারা এই হীনমতি? বিষ্ণুদূতরা বললে, 'যদি তোমরা ধর্মরাজের আজ্ঞাবহ, ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ কি তা আমাদের বলো।'

'যা বেদবিহিত তাই ধর্ম। যা বেদনিষিদ্ধ তাই অধর্ম। জানো এই পাপাত্মাকে?' যমদূতরা নির্দেশ করল অজামিলকে। 'পরিণীতা পবিত্রা ভার্যাকে এ ত্যাগ করেছে। পিতামাতাকে ত্যাগ করেছে। দাসীর প্রতি কামাসক্ত হয়েছে। চিরজীবন উল্লঙ্ঘন করেছে শাস্ত্রবিধি। অধর্মার্জিত অর্থে পোষণ করেছে পরিবার। আত্মকৃত পাপের নিষ্কৃতির জন্যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেনি। তাই একে দণ্ডপাণির কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। সেই ধর্মাধিকরণে জীব দণ্ড দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়।'

'অহো কি দুঃখ! ধর্মদর্শীদের সমাজে প্রবেশ করেছে অধর্ম।' বিষ্ণুদূতরা বললে, 'অজামিল শত শত পাপ করেছে সত্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করেনি এ সত্য নয়।'

'নয়?'

'না। অন্তিম কালে, হোক তা বিবশ অবস্থা, পরমস্বস্তিপ্রদ শ্রীহরির নাম করেছে। ব্রতযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত পাপের ক্ষয় করে মাত্র, কিন্তু শ্রীহরির নাম পাপ প্রবৃত্তির মূল উৎপাটন করে। তার চেয়েও আরো বেশি করে। অন্তরে শ্রীহরির গুণরাশি উপলব্ধি করিয়ে দেয়। যেমনি অজামিল মৃত্যুকালে প্লুতস্বরে শ্রীহরির নাম নিয়েছে, বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে সমস্ত পাপ। সুতরাং, একে ছাড়ো, ওকে আর নিয়ে যেতে পারবে না যমালয়ে।'

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।"

পাপহরণ-বিষয়ে হরিনামের যত শক্তি আছে, পাতকীজনের সাধ্য নেই সে পরিমাণ পাপ করে।

"একবার হরিনাম যত পাপ হরে,
পাপীদের মধ্যে নাই তত পাপ করে।"

যমদূতরা ছেড়ে দিল অজামিলকে। মৃত্যুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলে। পূর্ব-দুষ্কৃত স্মরণ করে ঘোর অনুতাপ হল অজামিলের। আমাকে শত ধিক, কি দুষ্পরাজয় পাপই না আমি করেছি! কিন্তু কি আশ্চর্য, পাপবদ্ধ অবস্থায় যেই নারায়ণকে ডাকলাম শোভন-দর্শন দেবদূতরা এসে আমাকে মুক্ত করে দিল। কোথায় গেল তারা, আর কি তাদের দেখতে পাব না? এবার থেকে যত চিত্তেন্দ্রিয় হয়ে থাকব। অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করে আত্মবান ও সর্বপ্রাণীর সুহৃদ হব। অহং মম বোধ আর রাখব না মিথ্যাপদার্থে। ভগবানের কীর্তন দ্বারা দেহ-মন বিশুদ্ধ করে অর্পিতচিত্ত হব, সমাহিত হব। ইন্দ্রিয়দের বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে মন যুক্ত করব আত্মায়, শ্রীহরির পাদপদ্মে।

বিষ্ণুদূতরা দেখা দিল আবার। এবার স্বর্ণবিমান নিয়ে এসেছে। অজামিলকে তুলে নিয়ে গেল শ্রীপতির সুখধামে।

'জপ করা মানে নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা।' সেদিন ঠাকুর বলছিলেন দেবেনকে। 'একমনে নাম করতে করতে, জপ করতে করতে তাঁর দেখা মেলে। শেকলে-বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডোবানো আছে, আরেক দিক তীরে বাঁধা। শিকলের একেকটি পাব ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে শেষে ডুব মেরে শিকল ধরে-ধরে যেতে যেতে পৌঁছুনো যায় কড়িকাঠে। তেমনি জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'

আসল কথা হচ্ছে, ডোবো। 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন! তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেমরত্ন ধন।'

তাই সরবে নাম করতে পারছেন না বলে ঠাকুরের দুঃখ। ওগো অসুখটি ভালো করে দাও।

'নাম করতে না পারলে কি হয়?' বললে ডাক্তার, 'ধ্যান করলেই হল।'

'সে কি কথা!' ঠাকুর আপত্তি করলেন। 'আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো ভাজায়। আমার কখনো পূজা কখনো জপ, কখনো ধ্যান, কখনো নামগুণগান। কখনো বা নৃত্য।'

'আমিও একঘেয়ে নই।' বললে ডাক্তার।

আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় যে বন্ধু তিনিও তো বহুবিচিত্র।

কিন্তু এ আমার কি হল? রাত তিনটে থেকে ঘুম নেই, শুধু পরমহংসের ভাবনা। সকালে উঠেও সেই পরমহংস। বলছে মাষ্টারকে, 'তোমরা জানো না, আমার য়্যাকচুয়েল লস্ হচ্ছে। রোজ দুই তিনটে কলএ যাওয়াই হচ্ছে না। তারপর নিজেই রুগীদের বাড়ি যাই। আপনি গেলে আর ফি নেই। বলো, আপনি গিয়ে কি ফি নেওয়া যায়?' [ক্রমশঃ।

-আগামী সংখ্যা থেকে-

নীলাঞ্জন

(উপন্যাস)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

জর্জ-মাইকেল

একটু ভালো জায়গা অধিকারের চেষ্টা করে না হারিকট।

ওদের এই কদর্য ব্যবহারের জন্ত ও শুধু হাসে। কখনও সামান্ত এগিয়ে এলেও আবার পিছিয়ে আসে, মাফ চায়, কে জানে কে কখন ঘুঁসি মেরে বস্‌বে। ওরা ভাবে মেয়েটা ভারী ভীরু।

হারিকটের একটি মাত্র মিত্র আছে, দুর্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ, একদিন জুতা বাঁধার জন্ত এক টুক্‌রো দড়িও জোগাড় করে দিয়েছিল, একজোড়া দস্তানা এনে দেবে বলেছে হারিকট, সেই থেকেই এই প্রীতির সূত্রপাত। এই একদা-বনেদী ব্যক্তিটির অন্তরের একমাত্র জ্বালা যে তার একটাও ছেঁড়াখোঁড়া দস্তানা নেই। সেই জন্ত তার অস্বস্তির সীমা ছিল না। যেন ভীরু ডন কুইকস্টো, লম্বা নাক, বাঁকা পিঠ, ছেঁড়া জুতো, কোথাকার কোন রাঁধুনির পরিত্যক্ত নীল আর শাদা ট্রাউজার, তাতে তেল, মাখন ইত্যাদির দাগ, একটা ওভারকোটও আছে, কিন্তু কি তার অবস্থা! ওভার-কোটের ভেতর সার্টও নেই, গেঞ্জীও নেই।

"ও হতভাগারা বোঝে না, আমার একমাত্র বিলাসিতা ঐ দস্তানা—না থাকলে বড় কষ্ট। আচ্ছা মেয়েমানুষ তুমি, মুখে হাসি নেই, এত ভালোমানুষী ভালো নয়। দেখো আমিও তোমাকে ভোগা দিচ্ছি, অথচ আমি একজন দার্শনিক। আমার ওভারকোটের জন্ত একটা সেফ্‌টি পিনও এনে দিও, আমি জানি তোমার অবস্থা ভালো, তুমি ধনী। রাতে ঠাণ্ডা লাগে, আজ নিয়ে এই ভাবে আকাশের নীচে সাঁইত্রিশটি রাত কাটলো। আমি ওরকম উকুনওলা মানুষদের সঙ্গে ঘুমাতে পারবো না, কখনও নয়। তার চেয়ে বরং বাইরে ভালোই থাকা যায়। তাছাড়া আমরা এই পৃথিবীতে আছি তা একান্তই আকস্মিক ঘটনা,—মানুষ যে নিজেকে ধ্বংস করতে পারে না, এই যথেষ্ট। ঠাণ্ডা লাগলেই বা কি এসে যায়? দু' তিন হাজার বছরেই বা কি এসে যায়? এই ধরো স্যুপ আমরা যদি না পাই, তাতেই বা কি হয়? কতটুকু প্রভেদ?"

স্ত্রীলোকগুলি কিন্তু অতি ঈর্ষাকাতর, তারা ধাক্কাধাক্কি করে, স্যুপ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, কি জঘন্ত তাদের মুখাকৃতি, খাবরা-গুলো কাদায় মাখামাখি।

একদিন সন্ধ্যায় পথ চলতে হারিকট-রুজ লক্ষ্য করলো লা রোতন্দের আর্টিষ্টের মত সাজ পোষাক করে একজন কাফের খরিদ্দারদের ছবি আঁকছে আর সামান্ত কয়েক টাকার বিনিময়ে বিক্রী করছে। কাছে গিয়ে কাঁধের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখ্‌ল হারিকট।

মনে মনে ভাবে—"আমি ত ওর চাইতে ভালো আঁক্‌তে পারি।"

তিন দিন আগে কি রকম ধম্‌কানি খেয়েছিল মনে পড়ল হারিকটের। একজন 'দয়াবতী' মহিলা (স্যুপ-লাইনের স্ত্রীলোকদের চাইতেও যেন বেশী অভব্য),—সব স্ত্রীলোককে ডেকে প্রশ্ন করলেন 'কে কি কাজ জানো?' জবাবে সবাই বল্‌ল—

"কাজ করে গতর খাটিয়ে আপনাদের মোটা করব আর এর চাইতেও কদর্য স্যুপ খেয়ে জীবন কাটাবো, একটু বস্‌লেই গালাগাল খাবো—দরকার নেই, ভিক্ষের কাজ নেই বাবা, কুকুরটাকে ডেকে নাও।"

হারিকট কিন্তু পরমোৎসাহে বলেছিল—"আমি ছবি আঁকতে পারি।"

"দয়াবতী" মহিলা চড়া গলায় বঙ্কার করে বললেন—"ছবি আঁকাটা আবার একটা কাজ নাকি?"

উৎসাহভরে এখন হারিকট তাড়াতাড়ি ওপরে উঠ্‌ল সিঁড়ি বেয়ে, তারপর ঘরের কোণে স্তূপীকৃত কাগজ-পত্র থেকে দশ-বারটি পরিষ্কার কাগজ সংগ্রহ করলো,—তিনটি পেন্‌সিলও পাওয়া গেল। হারিকট নিকটস্থ কাফেতে দৌড়ল।

প্রথমটা ওর আঁকা পোর্টরেট বিক্রী হল না, পরিশ্রম সার্থক হল না। কারণ কেউ ওর আঁকার পদ্ধতি বুঝলো না,—কেউ বা অত্যন্ত বিরক্ত হল, বা কি ভাবতে লাগল কে জানে! তখন সাহস করে বুলভার্দের দিকে গেল হারিকট। প্রথম দিনেই প্রায় ত্রিশ সো (ফরাসী মুদ্রা) পাওয়া গেল। বিজয়িনীর ভঙ্গীতে সেই টাকা মুঠোয় নিয়ে লা রোতন্দের শিল্পীদের মাঝখানে গিয়ে বস্‌লো হারিকট। সেদিন সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লো, মাথায় তার নতুন আইডিয়া এসেছে।

সকালটা ল্যুভরে কাটাবে আর দুপুরে ছবি আঁকবে। কিন্তু পরদিন যখন গ্যালারিতে প্রবেশ করতে গেল, দারোয়ান এসে বাধা দিয়ে বল্‌ল—"আজ আর ফাঁকতালে আগুন পোয়াতে দেব না।"

প্রথমটা কিছু বোঝেনি হারিকট। তার পর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। লোকটা তাকে সাধারণ ভিখারিণী মনে করেছে।

হতাশার ভঙ্গীতে ড্রয়িং-পেপার আর পেনসিল দেখালো হারিকট।

বৃদ্ধ দারোয়ান কাঁধ নাড়লো। এ-সব চালাকী ওর জানা আছে। ছবি আঁকার ছল করছে!

কিন্তু হারিকটও বুদ্ধিমতী। সে অন্ত দোরে গেল, দারোয়ানদের অন্যমনস্ক দেখে সোজা ভেতরে চলে গেল। মনে মনে ভয়, পাছে আবার ডাকে।

কয়েকটি র‍্যাফায়েলের ছবির নকল করার ইচ্ছা তার, কয়েকটি ছবি রয়েছে, তার সামনে দাঁড়াতেই আবার সেই রোমের কথা মনে পড়ে, পাশে মোদক দাঁড়িয়ে। আকাশ কিন্তু ধূসর—সবাই সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে তাকে দেখছে। সর্বদাই তার মনে হচ্ছে তার পোষাক মলিন, তার সায়াই এখন তার একমাত্র পোষাক। অথচ চিরদিনই সে পরিচ্ছন্ন বেশ ধারণ করেছে, আজ সে পোষাক শতচ্ছিন্ন—কারণ এখন কত দিন জামা-কাপড় সেলাই করার সময়ও সে পায়নি।

"আবার কাজ।"

কাফেগুলিতে ঘোরার জন্ত গেল হারিকট। কেমন যেন মুক্তির একটা স্বাদ তার সারা অঙ্গে, কয়েকটা মোটা আঁচড়ে সে ছবি

আঁকছে, নোঙরা বটে কিন্তু বলিষ্ঠ সে রেখা। কেউ যদি ছবি না নিয়ে ওকে শুধু টাকা দিতে চাইত তাহলে হারিকট তা প্রত্যাখ্যান করত। কাফের পরিচালকরা যখন ওকে তাড়িয়ে দেয় তখন ভদ্র ভাবেই বিদায় করেছিল, হারিকটের অবস্থার জন্যই তাদের এই করুণা। অনেকে আবার অবিশ্বাসও করে। কিন্তু হারিকট জানে, কা'কে সে গর্ভে ধারণ করেছে, তাই তার বিবর্ণ পাংশু মুখে ভেসে ওঠে স্বর্গীয় হাসি।

নিজে থেকেই ছবি এঁকে যায়, আর এই শতছিন্ন মলিন বসনে অল্প টাকা থাকলেও তার মনে মনে ধারণা সে যেন ম্যাডোনা, খৃষ্টের চাইতেও বড়ো কাউকে সে প্রসব করবে, তারই প্রস্তুতি চলেছে তার দেহে ও মনে। তার সামান্যতম ভঙ্গী ও কর্ম ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই সে সব-কিছু করে অসীম শ্রদ্ধাভরে। তাই ওর ভিতরকার এই ঔজ্জ্বল্যকে লোকে সামান্যই পরিহাস করে।

শ্রান্ত হয়ে ফেরার সময় মাঝে মাঝে পড়ে যায় হারিকট, কিন্তু সে সময় সে সর্বদাই হাঁটুতে ভর দিয়ে পড়ে, সন্তানের গায়ে যেন আঘাত না লাগে। সে আবার এইগুলির হিসাব রাখে, এক দিন বলে ওঠে :

"হে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের উৎস—এই নিয়ে পঞ্চান্ন বার আমি পড়লাম।"

তবু হারিকটের মনে অনেক সুখ,—নিজের খরচ সে এখন নিজেই চালিয়ে দিচ্ছে, আগামী রবিবার মোদরুকে যখন দেখতে যাবে তখন তার হুকুম মত যা কিছু কিনে দিতে পারবে। দ. রোতন্দে নিয়মিত যাওয়াটা ওর কাছে যেন সম্মানসূচক, তাই ওখানকার দুধ, কফি, বা রুটির দাম অন্য ছোটখাটো কাফের চাইতে কয়েক পয়সা বেশী হওয়া সত্ত্বেও সেখানেই যায়। লোকে বলে লা রোতন্দে গলা-ধাক্কা খেলে তবে এই সব ছোটখাটো কাফেতে মানুষ আসে।

মোদরুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে পরিষ্কার জলে দু-ঘণ্টা জামা-কাপড় ভিজিয়ে রাখলো হারিকট, তার পর সারা রাত্তির ধরে হাওয়ায় রেখে শুকিয়ে নিল। একটু আলো দেখা দিতেই সেই সুদূরের হাসপাতালের পথে পাড়ি দেয় হারিকট, যখন পৌঁছল তখন সবে হাসপাতালের দরজা খোলা হচ্ছে।

এত নোঙরা আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে মোদরুকে যে, তাকে চিনতেই পারে না হারিকট। মোদরুর জ্বলন্ত চোখ কিন্তু পড়ে আছে দরজার দিকে—সে বলে ওঠে—

"হারিকট, হারিকট! ভারী একঘেয়ে লাগছে আমার।" এর চেয়ে যদি বলত—"আমি মরে যাচ্ছি।" তাহলেও হয়ত বেশী বলা হত না।

এই হাসপাতালটা আগের মত নয়। ডাক্তাররা আইন মাফিক ভঙ্গীতে কথা বলে, তাতে আরো চটে ওঠে মোদরু। যারা হাসপাতালের রোগী তাদের পক্ষে অবশ্য দোষণীয় নয়, ঐ রকমটাই বরং ভালো। কিন্তু ডাক্তাররা? বই নেই, বন্ধু নেই। ৎবরোসকী আবার আমষ্টারডাম থেকে একটা কার্ড পাঠিয়েছে। সেখান থেকে লণ্ডনে যাবে।

সহসা সে হারিকটকে জিজ্ঞাসা করে—"কিছু টাকাকড়ি আছে?"

"আছে।" জবাব দেয় হারিকট।

গল্প বানিয়ে হারিকট বলে যে, সে এখন একটা লেস্ ফাক্টরীতে ডিজাইন কপি করার কাজ নিয়েছে, এক ঘণ্টা করে কাজ করে। কারণ, যা করছে সে কথা মোদরুর কাছে বলার সাহস নেই। তা ছাড়া পুতুলে রঙ করছে বা জন্মতিথির কার্ডে রঙ দিচ্ছে এ সব কথা বলে লাভ নেই।

মোদরু কোনো কথা শুনছে না। মোদরু বলল, কোনো কায়দা করে একটু মদ এনে দিতে পারো?

"এত একঘেয়ে লাগছে কি বলব! ঐটাই ত' খারাপ! মানুষের জীবনে একঘেয়েমিত্বের মত আর কিছু নেই। আর সবই ত' তবু সওয়া যায়। একটু মাল টানতে পারলে তবু এই একঘেয়েমিটা কাটে। আর শোনো—যদি আমাকে ভালোবাসো"—

"তাহ'লে কি—?"

"ওরা আমার পোষাকটা নিয়ে নিয়েছে, একজোড়া ক্যানভাসের ট্রাউজার বানিয়ে দাও, বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখবো। আমাকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। আমি ভালো আছি। কিন্তু আমাকে আটকে রাখছে আমার রকম দেখে। যাতে আমাকে ছেড়ে দেয় সেই জন্যে স্টোভটা ভেঙে দিলাম একদিন, কয়েক জন অতিথিকেও অসম্মান করলাম। তাই এখন শাস্তি দিচ্ছে। আমি কিন্তু ঠিক পালাবো, দেখো তুমি! পালাবো। বাইরে মুক্ত বায়ুতে দাঁড়িয়ে আমার কথাটা একবার ভাবো,—আমার এই অবস্থা ত' শহীদের অবস্থা। আমার বড় বিশ্রী লাগছে। ঈশ্বরের দোহাই, তুমি ত' জানো না সে কি কষ্ট! কষ্ট পেয়ে মরা, সংগ্রাম—সবই সয়—কিন্তু এই একঘেয়েমি আর ভালো লাগে না। তাই একজোড়া ক্যানভাসের প্যাণ্ট, কিছু মদ আর যা হয় একটা জুতা, এই আনলেই হবে, আমার প্ল্যান ঠিক আছে।"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

-আগামী সংখ্যা হইতে-

আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা

(রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও বিশ্বভারতীর সংগঠন ইতিহাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

—কালীপ্রসাদ বেনিয়া

লি লি

—কালাচাদ ধর

দীপ নিভে গেছে— —বিজয়কৃষ্ণ [illegible]

ক্রিসন্থিমাম —অলক দে

নেশিয়া ছন্দ —অজিত

মাসিক বসুমতীর
আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি

গত কয়েক মাস যাবৎ কোন রকম উচ্চবাচ্য না ক'রে প্রতি সংখ্যায় অসংখ্য সুদৃশ্য আলোকচিত্র ছেপেছি। মাসিক বসুমতীর দপ্তরে স্তূপীকৃত জমে-ওঠা আলোকচিত্র ইতিমধ্যে একেবারে নিঃশেষ না হ'লেও তাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছবিগুলিই প্রকাশ করা হয়েছে। এই জমে-যাওয়া আলোকচিত্রসমূহ প্রকাশের জন্য আমরা আমাদের অসংখ্য গুণী আলোকচিত্র-শিল্পীদের কিছু কালের জন্য ফটো না পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

যাই হোক, জমানো ছবির স্তূপ থেকে বহু চেষ্টায় সব চেয়ে ভাল ছবি উদ্ধারের ফল এই হয়েছে যে, 'মাসিক বসুমতী'র দপ্তরে ভাল ভাল ছবি থাকলেও সব চেয়ে ভাল ছবির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সেই জন্য আবার আমরা অনুরোধ জানাই, এখন থেকে আপনারা আবার আপনাদের গৃহীত সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি পাঠাতে থাকুন। আর আমরাও আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের চক্ষু সার্থক করতে মাসে মাসে আবার ছেপে যাই আপনাদের সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি।

অ্যাফ্রিকার জোনেল ফুল —গৌর দত্ত

শিশির বিন্দু —রামকিঙ্কর সিংহ

লাজুক লতা

—রণজিৎ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের একটি কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতার সেনেট হাউসে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহার বাল্যকালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

ইতিপূর্ব্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হ'ত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ ব'লে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম।...ক্রমে প্রকাশ পেল দশ জনের সামনে।

এই প্রতিভাষণের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন :—

দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত। তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়", গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কী করে", বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।"

সেই হিন্দুমেলার যুগে সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে তের বৎসর কয়েক মাস বয়সে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত একটি কবিতা ১২৮১ সালের ১৪ই ফাল্গুন (২৫এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল। তখন অমৃতবাজার পত্রিকা দ্বিভাষিক (ইংরেজী ও বাংলা) কাগজ ছিল। বিশ্বভারতীর সৌজন্য স্বীকার করিয়া আমরা এই কবিতাটি প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

হিন্দুমেলায় উপহার

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত-শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

স্তবধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়ে নাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

পূরণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।"

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির,
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

তখন ও হাসি লেগেছিলো ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিলো ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মত।

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

দেখেছি সে দিন যবে পৃথিরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীরবালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময় ;
যদিও তাদের চিতা-ভস্মরাশি।
মাটীর সহিত মিশায়ে গেছে।

আবার সে দিন (ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারতভূমি
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন।
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে ?

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা !

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারতভূমি,
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে।

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন ;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি।

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত ! হাসিবি রে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদ-জলে ?

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

শরৎ-স্মৃতির টুকি-টাকি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

'বসুমতী' সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ বা উপদেশের দরকার হোলে, আমি শরৎচন্দ্রকে জানাতুম। একবার সতীশ বাবু ('বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী) তাঁর দু'টি কন্যাকে পড়াবার জন্যে আমার কাছে প্রস্তাব করেন। মেয়ে দু'টি তখন ছোট। সতীশ বাবুর কথায় বুঝতে পারলুম যে, তাঁর খুবই ইচ্ছা—তাঁর ঐ মেয়ে দু'টিকে আমিই পড়াই এবং তার পরিবর্তে তিনি আমাকে তাঁর ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে আমায় সপরিবারে থাকবার জন্য একটা ভাল ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা কোরে দেবেন, এবং তা ছাড়া নগদ পারিশ্রমিকও ভাল রকম দেবেন। আমারও খুবই ইচ্ছা হোয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের পরামর্শ নিতে গেলে, তিনি বললেন —"এক দিক দিয়ে খুব ভালই হয় বটে, কিন্তু অন্য একটা দিকও ভাববার আছে। সতীশ বাবুর কাছ থেকে আজ তুমি দূরে থেকে যতটা শ্রদ্ধা, আদর, ভালবাসা পাচ্ছ, কাছে থাকলে, বিশেষ কোরে তাঁর বেতনভুক্ কর্মচারীর সামীল হয়ে থাকলে, সেই শ্রদ্ধা-আদরটুকু আর তেমন থাকবে না। তাতে তুমি মনে আঘাত পাবে।" ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিকই। কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে, খুব মোলায়েম ভাবেই সতীশ বাবুর প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলুম। সতীশ বাবু আমার লেখাকে খুব উচ্চ স্থান দিতেন এবং সে জন্ত আমাকে খুবই ভালবাসতেন ও খাতির-যত্ন করতেন। তাতে আর এক দিক দিয়ে আমার কিন্তু খুব ক্ষতি হোত। এ জন্যে অনেকেরই আমার ওপর ভেতর-ভেতর একটা হিংসার ভাব জেগে উঠতো। সেটা হবারই কথা। হয়ত তাঁর কাছে তিন চার জন সাহিত্যিক গেছেন, সে সময় আমিও গিয়েছি, তিনি আর সকলকে দু'খানা কোরে বিস্কুট আর এক কাপ চা আনিয়ে দিলেন, আর তাঁদের সামনেই আমার জন্যে এলো—চায়ের সঙ্গে এক-ডিশ ভাল খাবার। 'এক যাত্রায় পৃথক্ ফল'এর এই ব্যাপারে আমি খুবই লজ্জিত হতুম। শরৎচন্দ্র এই ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে শুনেছিলেন। তাঁরই কথা মত সতীশ বাবুকে এ সম্বন্ধে ভাল কোরে বুঝিয়ে বলাতে তবে এটা বন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু এর থেকে যেটুকু কুফল হবার, তা হোয়ে গিয়েছিলো। কোন-কোন সাহিত্যিক বা সাহিত্য-ব্যবসায়ী আমাকে আজ পর্যন্ত যে দু' চক্ষে দেখতে পারেন না, উক্ত ব্যাপারটা তার অন্যতম কারণ।

শরৎচন্দ্র দরিদ্র সাহিত্যিকদের জন্য; অথবা—সাহিত্যিকদের দারিদ্র্যের জন্ত এবং তাঁদের প্রতি অধিকাংশ প্রকাশকদের অনুচিত ব্যবহারের জন্ত মনে মনে ব্যথা পেতেন। এর কোন প্রতিকার করতে পারা যায় কি না, সেজন্য তিনি ভাবতেন। দু'-একবার তাঁর মুখ থেকে শুনেছি—"সাহিত্যিকদের একটা 'কমিটী' থাকলে ভাল হয়; তা হোলে ঐ সব প্রকাশকরা তাঁদের প্রতি অনেকটা ভাল ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন।" আমি বলতাম—"সব প্রকাশকও খারাপ নয়। হয়ত দু'-পাঁচ জন ছ্যাঁচড়া গোচের থাকতে পারে, তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখলেই ত হয়।" যাই হোক, নারী জাতির ওপর যেমন তাঁর দরদ ছিল, নিপীড়িত সাহিত্যিকদের জন্তও তাঁর সেইরূপ দরদ ছিল। যাতে সাহিত্যিকদের একটা কমিটী গঠিত হয়, সেজন্য তিনি কিছু কিছু চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হোতে পারেননি। আজ যদি জীবিত থাকতেন, তা হোলে এত দিনে হয়ত ও-জিনিষটা হোয়ে যেত।

একদিন বিকালের দিকে গিয়ে দেখি, শরৎচন্দ্র একখানা আরাম-কেদারায় বোসে আছেন আর অধ্যক্ষ মুকুল দে তাঁকে দেখে-দেখে একখানা পেন্সিল-স্কেচ আঁকচেন। বুঝে নিলুম, আজ আর বেশী কিছু কথা-আলাপের সুবিধে হবে না। সুতরাং শরৎচন্দ্র বসতে বললেও, আমি একটুখানি বসেই উঠে পড়লুম; বললুম—"···চাটুয্যের ছেলের বিয়ের জন্যে একটি মেয়ে ঠিক করেছি, আজ মেয়েটিকে দেখতে যাবার কথা।···চাটুয্যে আমার জন্যে বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে এসে অপেক্ষা করবেন। আমি যাই।" বিয়ের ঘটকালী করা আমাদের দু'জনেরই স্বভাব ছিল। দু'টি ভাল ছেলে-মেয়েকে বিয়ের বাঁধনে বেঁধে দিতে পারলে, শরৎচন্দ্রও আনন্দ পেতেন, আমিও পেতাম। এখনো পাই। এখন আশীর কোঠায় বয়স এসেছে, শক্তি নেই, তবুও ওই স্বভাবটা আছে। তার প্রমাণ, নাম-করা এক মাসিক-সম্পাদকের কন্যার বিয়ের ঘটকালী বর্ত্তমানে আমি করচি। শরৎচন্দ্র জীবিত থাকলে, এ বিয়ের ঘটকালীটা নিশ্চয় তিনিই করতেন। বোধ হয়, এই বিয়েটা হোতেও পারে; এবং হয় যদি, তা হোলে মনে একটা তৃপ্তি ও আনন্দ পাব। এই আনন্দটুকুই আমার 'ঘটক-বিদায়'এর পাওনা। যখন শক্তি ছিল, তখন বিয়ের রাত্রে দু'খানা লুচি, দুটো সন্দেশ খেতে পেতুম; এখন শক্তিহীনতার জন্তে বিয়ে-বাড়ী আর যেতে পারি না; ঘরে বোসে, কল্পনার কানে শাঁখের শব্দ আর উলু-উলু' ধ্বনি শুনি মাত্র। ঘটককে বাড়ী বোয়ে লুচি-সন্দেশ আর কে খাইয়ে যাবে?

'শরৎ-স্মৃতি' লিখতে গিয়ে, অবাধ্য কলমের মুখে কিছু কিছু নিজের ব্যক্তিগত কথা এসে পড়চে; এটাও বৃদ্ধ বয়সের শক্তিহীনতার জন্তে। যাই হোক, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

মাঝে-মাঝে আমি শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ম'শায়ের অর্থাৎ 'বীরবলে'র সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি আমাকে—অর্থাৎ আমার লেখাকে—অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর বাড়ী যাওয়া একটু কষ্টকর ছিলো। তিনি থাকতেন—বালীগঞ্জ, ব্রাইট ষ্ট্রীটে,—**May Fair** পল্লীতে। সেখানে যেতে হোলে ট্রাম বা 'বাস'এর কোন সুবিধা ছিল না। হেঁটেই যেতে হত। লেক্ রোড থেকে অনেকটা পথ। রোজ—দু' মাইল 'মর্ণিং ওয়াক' আমার অভ্যাস ছিল, তাই ওইটা হাঁটতে আমার গায়ে লাগতো না; সুতরাং মাঝে-মাঝেই তাঁর কাছে যেতাম। তা' ছাড়া, ভালবাসার যে-একটা আকর্ষণ আছে, তা দূরকে নিকট কোরে দেয়।

একদিন সকালে শরৎচন্দ্রের কাছে যাব বলে বেরিয়ে, বরাবর 'মে-ফেয়ারে'ই চলে গেলাম—চৌধুরী মশায়ের বাড়ীতে। গিয়ে দেখি, তিনি এক হাতে সিগারেট ধোরে তার ধূমপান কচ্চেন, আর এক হাতে গড়-গড়ার নল ধরে তামাকও টানচেন। এক সঙ্গে গড়-গড়া আর সিগারেট খেতে তাঁকে আগেও দু'-একবার দেখেছি।

এরূপ হবার কারণ হচ্ছে, ভৃত্যের তামাক সেজে আনতে দেরী হোচ্ছে দেখে তিনি সিগারেট ধরিয়েছেন, এমন সময় তামাকও এসে পড়লো। দামী সিগারেট, ফেলে দিতে পারেন না; সুতরাং দুটোরই সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন।

চৌধুরী মশাই গোড়া থেকেই আমার গল্পের একজন বিশেষ অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে—বিশেষ কোরে, কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হোত। বেশীর ভাগ আলোচনা হোত—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তাঁর শ্বশুর সম্পর্কীয় ছিলেন। সেদিন কথায় কথায় Dialogue এর কথা উঠলো। তিনি বললেন—"Dialogue এ শরৎচন্দ্র আর•••—সবার ওপরে।" আমি বললুম—"কেন, রবীন্দ্রনাথ? তাঁর Dialogue ত•••••••••••"

আমার কথার ওপরই তিনি বললেন—"রবি বাবুর Dialogue খুবই ভালো, কিন্তু শরৎচন্দ্র আর•••র মত নয়।" এ সম্বন্ধে আর কিছু না বোলে চুপ কোরেই রইলাম। পরে একদিন একথা শরৎচন্দ্রকে বলাতে তিনি বললেন,—"আরে দূর দূর! আমার Dialogue মোটেই ভাল না; কেন যে উনি ভাল বলেচেন, জানি না; তবে!"•••••••••অনেক সময় শরৎচন্দ্র তাঁর আসল মনের কথা কিছুতেই বলতেন না। তাঁর এ স্বভাবটা আমি ভাল কোরেই জানতুম। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"দাদা, আপনার সমস্ত বইয়ের মধ্যে, আপনার কোন্‌খানা ভাল বলে মনে হয়?" কিছুমাত্র না ভেবে, সঙ্গে-সঙ্গেই বেশ গম্ভীর ভাবে তিনি বললেন—"নব-বিধান।" কয়েক সেকেণ্ড পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার কোন্‌খানা ভাল লাগে?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম—"আমারও ঐ 'নব-বিধান'।"—'সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি' হোয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি একটু হেসে বললেন—"বুঝতে পেরেছি। আসল কথাটা বলি তা' হোলে। 'নব-বিধান'কে কেউ বড় একটা আদর করে না; তাই ওই অনাদরের বইখানাকে আমিই একটু আদর দিয়ে ওর নাম করলুম। দেখ, তুমিও একজন লেখক; তোমার নিজের লেখার মধ্যে, তোমার নিজের কাছে ভাল-মন্দ মাঝামাঝি আছে? সেটা বাইরের লোকের বিচারের বিষয়।" তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আমার বইগুলোর মধ্যে তোমার সব চেয়ে কোন্‌খানা ভাল লাগে? 'শ্রীকান্ত' ত?"

"নির্দিষ্ট একখানা বইয়ের নাম কোরে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। 'শ্রীকান্ত' যখন পড়ি, তখন ঐখানাই মনে হয়, সব চেয়ে ভাল, যখন 'দেবদাস' পড়ি, তখন মনে হয়, 'দেবদাস'ই সব চেয়ে ভাল, আবার যখন 'পল্লীসমাজ' বা 'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলে' পড়ি, তখন মনে হয়, তা'ই সব চেয়ে ভাল।"

শরৎচন্দ্র চুপ কোরে রইলেন।

আমি বললুম—"এর মধ্যে আর একটা কথা আছে দাদা! কোন একখানা নির্দিষ্ট বই—সকল পাঠক-পাঠিকার কাছে একই রকম ভাল লাগতে পারে না। পাঠক-পাঠিকার মনের রুচি ও ধাত হিসেবে ভাল লাগা না-লাগা নির্ভর করে। নয় কি? 'দেবদাস' আমার মনকে অভিভূত কোরে দেয়। 'দেবদাস' আমার মনকে এমন একটা দেশে, এমন একটা সমাজে, এমন একটা দিন-সময়ে নিয়ে যায়, যার সব কিছু মাধুর্য একটা স্বপ্ন-জালে ঢাকা পড়ে গেছে। মনের সে ভাবটা আমি কথা দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারবো না।"

"'দেবদাস' আমি অন্তর দিয়ে লিখেছি, 'শ্রীকান্ত' লিখেছি Brain দিয়ে।"

এর পর অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে রইলুম।

গঙ্গায় নাইবার লোভে, পুরো একটা বছর আমি বরানগর গঙ্গার ধারে বাসা ভাড়া কোরে ছিলুম। একদিন কোন কাজে ওদিকে গিয়ে, গঙ্গার খুব নিকটেই এই বাসাটা চোখে পড়ে। ভাড়াও কম। ওখানকার গঙ্গার দৃশ্যও চমৎকার! এদিকে সহরের হট্টগোলেরও বাইরে। সবার ওপর, স্থানীয় কয়েক জন লোক ওখানে বাস করবার জন্যে—আমাকে খুব অনুরোধ করলেন। সুতরাং শরৎচন্দ্রকে এ বিষয়ে বোলে, ফাল্গুনের এক সুন্দর দিনে বরানগরে চলে এলুম।

আমার বরানগর থাকা কালে ওখানকার অনেকেই আমার কাছে আসতেন। দৈনিক বসুমতীর বর্তমান সম্পাদক বারীনদা' —(অর্থাৎ বোমারু বারীন ঘোষ) ওই সময়ে নতুন বিয়ে কোরেছিলেন। বউদি'কে নিয়ে তিনি প্রায়ই আমার বাসায় আসতেন এবং তখনকার সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হোত। বরানগর এসে থাকাতে শরৎচন্দ্রের কাছে আর পূর্বের মত ঘন-ঘন আসতে পারতুম না; তবে সপ্তাহের মধ্যে একদিন ঠিকই আসতুম। দরকার পড়লে, লোক মারফত চিঠি পাঠিয়ে কাজ সারতুম। বরানগরে বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সাহচর্য ও প্রীতি লাভ করলুম বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জন্যে মনের মধ্যে একটা অভাববোধ—মাঝে মাঝে মনকে পীড়া দিতে লাগলো।

ওখানে শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 'মিলনী' নামে একটা ক্লাব ছিল। প্রত্যেক বছর একবার কোরে তাঁদের থিয়েটার হয়। সে বার তাঁদের অভিনয়ে আমাকে একটা ভূমিকা নেবার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করেন। আমি বলেছিলুম যে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' যদি ওঁরা অভিনয় করেন, তা হোলে আমি তাতে খুব উৎসাহের সঙ্গেই নামবো। ওঁরা রাজী হোয়েছিলেন। আমি 'জীবানন্দে'র ভূমিকায় নামবো। কিন্তু 'ষোড়শী' হোল না। বোধ হয়, 'ষোড়শী'র ভূমিকায় নামিবার উপযুক্ত অভিনেত্রী না থাকায় ওটা হোলো না। 'ষোড়শী'—হোলে, আমি ঠিক করেছিলুম, শরৎচন্দ্রকে সেই রাত্রে আনবো। যাই হোক, 'ষোড়শী'র বদলে অন্য একটা সামাজিক নাটক হোল এবং তাতে একটা বড় ভূমিকাতেই আমাকে নামতে হোয়েছিলো। কোলকাতা থেকে ভাল ভাল দর্শক গিয়েছিলেন। অভিনয় শেষে 'মিলনী'র ম্যানেজার আমায় বললেন—"দর্শকরা বলে গেলেন যে এ বছর আপনার জন্যে আমরা কেউ নাম নিতে পারলুম না; আপনার অভিনয় আমাদের সকলকে ছাপিয়ে গেছে।" জানি না, এ কথা তাঁর সত্য, কিম্বা ভদ্রতার খাতিরে আমাকে উৎসাহ দান! পাড়ার একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের যুবক প্রায় দু'বেলাই আমার কাছে আসতো। তার নামটা আমি বলবো না। ধরে নেওয়া যাক তার নাম—'S'। 'S' একদিন আমায় বললে—"অনেক দিন থেকে শরৎচন্দ্রকে আমার দেখবার ইচ্ছে, কিন্তু সুযোগ ঘটেনা। আপনি যদি তাঁকে দেখবার একটু সুবিধে করে দেন, তাহোলে জীবনের একটা মস্ত-বড় আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ হয়। তিনি

আমার কাছে দেবতারও বড়। একটি বার যদি তাঁর দেখা পাই ত জীবন"···ইত্যাদি ইত্যাদি। 'S'-য়ের কথাবার্তায় বুঝতে পারলুম, শরৎচন্দ্রের ওপর তার অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি। মনে আনন্দ পেলুম। পরের দিনই শরৎচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখলুম, আর চিঠিখানা 'S'য়ের হাত দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলুম। 'S'কে বললুম—"আমার পত্র-বাহক হোয়ে যাও, তাঁকে তোমার ভাল কোরে দেখবার পক্ষে এই হোল সুন্দর উপায়।" 'S' খুব খুসী হোল এবং আমার চিঠিখানা নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে সকাল বেলা চলে গেল।

বেলা তিনটের সময় আমার বৈঠকখানা-ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখি, 'S' খুব প্রফুল্ল মনে আমার কাছে আসচে। আমার একটা সন্দেহ ছিল, 'S' শরৎচন্দ্রের দেখা না-ও পেতে পারে; কারণ তিনি বাড়ীতে না থাকতেও পারেন। কিন্তু 'S'য়ের প্রফুল্ল মুখভাব দেখে বুঝলুম, সে শরৎচন্দ্রের দেখা পেয়েচে।

ঠিকই তাই। ঘরে ঢুকেই 'S' বললে—"আজ আমার জীবন সার্থক। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাম্‌না-সাম্‌নি বোসে কথা কোয়ে এলুম। এ জিনিস যে কোন দিন আমার ভাগ্যে ঘটবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমায় চা খাওয়ালেন, তার সঙ্গে বিস্কুট······"

আমি বললুম—"যা'ক; শুধু চেয়েছিলে 'দর্শন', কিন্তু তার ওপর হোয়ে গেল—'ভোজন' এবং 'আলাপন'; আশা মিটেচে ত?"

"মিটেচে বটে, কিন্তু একদিন দেখে মনটা ভরে নি, আর একদিন যদি······"তা বেশ, মনটাকে ভরিয়েই নাও; কাল আবার আর একবার যাও, আমার একখানা চিঠি নিয়ে; কেমন?"

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে 'S' বললো—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। চিঠিখানা তাহোলে আজ লিখে রাখবেন। ওঃ! আপনার দ্বারা আমার কী যে······" কৃতজ্ঞতার চাপে বাকী কথাগুলো আর তার মুখ থেকে বেরুলো না।

'S'য়ের হাত দিয়ে যে চিঠিখানা শরৎচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলুম, তাতে বিশেষ কিছু দরকারী কথা ছিল না। ওটা হোল, 'S'কে তাঁর কাছে পাঠাবার একটা ফন্দী মাত্র। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছে আমার একটা বিশেষ দরকারী কাজ ছিল। কিছু দিন আগে, একদিন বেলা ১০টা থেকে রাত ১০টা ১১টা পর্যন্ত, শরৎচন্দ্র ও আমার একসঙ্গে কাটে। ঘটনাটা বেশ একটু মজার। পাঠক সাধারণের বেশ একটু উপভোগ্য হবে মনে কোরে, সে দিনের ব্যাপারটা আমি লিখলুম। তখন প্রসিদ্ধ ট্রেলনাথ ও ব্যবসায়ী মেসার্স নীলমণি হালদার কোংদের পরিচালনায় খুব সুন্দর ও চিত্রবহুল একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বার হোত। কাগজখানার নাম—'সাহানা।' সম্পাদকের অনুরোধে—'সাহানা'তে মাঝে মাঝে আমি লেখা দিতুম। 'সাহানা' আমার ওই লেখাটা চাইলেন। আমি 'সাহানা'তেই লেখাটা পাঠাবো স্থির করলুম। লেখাটার বিষয়-বস্তুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও আমি উভয়েই জড়িত বলে, ওটা শরৎচন্দ্রকে একবার না দেখিয়ে পাঠাতে পারি না। পরদিন শরৎচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখে, সেই লেখাটা 'S' কে দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম। 'S'য়ের ভারি স্ফূর্তি; সে চিঠিখানা নিয়ে চলে গেল।

যথাসময়ে 'S' শরৎচন্দ্রের উত্তর এনে আমার হাতে দিলে। আমার চিঠির এক ধারেই শরৎচন্দ্র তাঁর উত্তর লিখে দিয়েছিলেন। সেটুকু পড়ে জানতে পারলুম যে, লেখাটার কিছু কিছু তিনি বাদ দিয়ে কিছু কিছু নতুন লিখে দিয়েচেন। তাঁর চিঠির সেই অংশটুকুর একটা প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল।

২১, বড়াল পাড়া লেন।
বরাহনগর
২৬শে ভাদ্র, ১৩৪৩।

ওঁ

শ্রীচরণেষু,

দাদা, আপনি যখন ঢাকা, তখন একদিন গিয়ে ফিরে এসেছিলুম। তারপর আরও একদিন গিয়েছিলুম, দুদিনই দেখা করতে পারিনি। অথচ, একটা কাজের জন্যে দেখা করার বিশেষ দরকার। সেই বোটানিকেল গার্ডেনের ব্যাপারটা নিয়ে একটা রস-রচনা লিখেচি। "সাহানা"তে দোব—ইচ্ছে। তারাও লেখাটা পাবার জন্যে লালায়িত। কিন্তু আপনাকে না দেখিয়ে এতদিন দিতে পারিনি। ভাবচি, ওদের পূজা সংখ্যাতেই ওটা বাহির হবে। তা হোলে লেখাটা এখনি ওদের দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু আপনাকে না দেখিয়ে ত দিতে পারি না। তাই আজ ওটা পাঠালাম। একবার চোখ বুলিয়ে দেখে—ছাপবার মত দেবেন।

আপনার শরীর কেমন আছে জানাবেন। ইতি

আপনার স্নেহধন্য
অসমঞ্জ

পুঃ— রচনাটির সঙ্গে বোধ হয় আপনার ও আমার ছবি ছাপা হোতে পারে। তা হোলে, এবার বসন্তকে যে Photo নেওয়া হোয়েছিল, সেইখানা দিতে পারা যাবে কি? তার থেকে আমাদের দুজনের ওরা Block করে দিতে পারবে। অসং

অসমঞ্জ,
এই লেখাটার একটু আধটু কাটকুট করে দিলাম, অর্থাৎ, যা সত্যি অপ্রিয় তাই। শরৎদা

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—
আর একটী কথা, দাদা। রঙমহলের নতুন নাটক, 'নন্দরাণীর সংসার'টা আমার একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি একখানা Passএর ব্যবস্থা করতে পারেন না কি? যদি সম্ভব হয় ত দু'জনের জন্য ওদের নামে একখানা চিঠি লিখে এই ছেলেটীর হাতে দিবেন, কাল রবিবার দেখতে যাব।

শরৎচন্দ্র-লিখিত কতকগুলি চিঠি-পত্র আমার কাছে ছিল। কতক একে-তাকে দিয়েছি, কতক নষ্ট হোয়ে গেছে। সামান্য কিছু আছে, তখন জানতে পারি নি যে, শরৎচন্দ্র হঠাৎ আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবেন এবং সেগুলি ভবিষ্যতে দরকার হবে। এই চিঠিখানার তারিখ দেখে জানতে পারচি, ঘটনাটা বাংলা ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসের। তা হোলে শরৎচন্দ্রকে ঢাকা ইউনিভার্সিটী থেকে যে সম্মান-সূচক 'ডক্টরেট্' উপাধি দেওয়া হয়, তা ঐ ১৩৪৩ সালেই এবং 'রসচক্র' থেকে ঐ কারণে আমরা তাঁকে যে অভিনন্দন দি, তা'ও ঐ সময়ে।

শরৎচন্দ্র-লিখিত ঐ ক'টা লাইন পড়লেই জানা যাবে যে, আমার প্রেরিত লেখাটায় শরৎচন্দ্র কিছু কিছু বাদ দেন এবং কিছু কিছু যোগ করেন। ধরতে গেলে, সে হিসেবে লেখাটা আমাদের দু'জনের মিলিত লেখা; কতক তাঁর, কতক আমার। সে হিসাবে লেখাটার একটা আকর্ষণ ও মূল্য আছে। সুতরাং ওটা এখন একবার কাগজে বার করলে মন্দ হয় না। যদিও সে সময় 'সাহানা'তে ওটা বেরিয়েছিল, কিন্তু 'সাহানা'র তেমন প্রচার না থাকায় বেশী লোকের নজরে পড়েনি, এজন্য অনেকে এখন অনুরোধ করছেন, আবার হুবহু ঐ লেখাটা প্রকাশ করবার জন্যে। লেখাটার মধ্যে কোন্ অংশটুকু শরৎচন্দ্রের লেখা এবং কোনটুকুই বা আমার লেখা তা পাঠক-পাঠিকাগণ যে সহজেই ধরতে পারবেন, তা সহজেই বোঝা যায়। তবুও হয়ত এটা তাঁদের একটু আনন্দের ও আগ্রহের খোরাক হোতে পারবে। সে জন্যে লেখাটা পরের সংখ্যায় দেওয়া যাবে। এখন যে সূত্রে এই কথাগুলো এসে পড়লো, তাই বলি।

সে দিন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে 'S'এর ফিরে আসতে অনেক দেরী হোয়েছিলো। কারণ, লেখাটা তাঁকে সব পড়তে হোয়েছিলো এবং অনেক জায়গায় কিছু কিছু বাদ দিয়ে কিছু কিছু লিখতে হোয়েছিলো। 'S'কে জিজ্ঞাসা করলুম—"কতক্ষণ আজ বসতে হোয়েছিলো?"

"তা···ঘণ্টা দুই হবে।"

"তা হোলে আজ তোমার খুব কষ্ট হোয়েচে। চা-টা কিছু খেয়েছিলে?"

"নিশ্চয়ই। আজ চায়ের সঙ্গে শুধু আর বিস্কুট নয়, কচুরি, রসগোল্লা! ভারি চমৎকার লোক! আজও কিছু কিছু আলাপ-টালাপ হোল।"

"তা ভালই হোয়েচে। এবার তা হোলে তোমার মনের সাধ পুরোপুরিই মিটলো ত?"

একটু পাক্-ধরা হাসি হাসতে হাসতে 'S' বললো—"হ্যাঁ, আপনার দয়াতে······"

"আমার দয়াতে নয়, তোমার সৌভাগ্যের দয়াতে; বুঝলে?"

সেদিন এই পর্যন্ত। 'S' চলে গেল। দিন আটেক পরে, এক দিন সন্ধ্যার দিকে, 'S' হাসতে-হাসতে এসে বললে—"আজ গিয়েছিলুম।"

"কোথায় হে?"

"শরৎ চাড়ুজ্যের ওখানে।"—মুখে বেশ ঢেউ-খেলানো পাতলা হাসি।

চম্‌কে উঠে মনে-মনে বললুম—"মাটি করলে! এ যে দেখচি, দিব্যি নির্ভয় আর স্বাধীন হোয়ে উঠলো! তা হোলেই ত শরৎচন্দ্রকে যখন-তখন গিয়ে জ্বালাবে!" শরৎচন্দ্রের কাছে যাক, বা সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করুক, তাতে কিছু বলবার থাকতে পারে না; কিন্তু 'S'এর কোন জ্ঞান-গম্যি নেই, শিক্ষা নেই, সাহিত্য সম্বন্ধে সে আসলে কিছুই জানে না বা বোঝে না; সাধারণতঃ যাকে 'এঁচোড়ে-পাকা' বলে সে তাই। আমি 'S'এর কাণ্ডে ভীত হোয়ে পড়লুম। কি কোরে ওর যাওয়া বন্ধ করি, সেই কথাটা মনে-মনে ভাবতে লাগলুম।

কিছু দিন পরে জানতে পারলুম, যা ভয় কোরেছিলুম—তাই। মাঝে-মাঝেই সে শরৎচন্দ্রের ওখানে ধাওয়া করে এবং মূর্খের মত, অসভ্যের মত অনেক কিছু আবোল-তাবোল বকে আসে।

একদিন 'S' এসে বললে—"আজ মুরুব্বীর কাছে গিছলুম।"

চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম—"মুরুব্বী? কে মুরুব্বী?"

"আরে, চাড়ুয্যে—চাড়ুয্যে!"

"শরৎ বাবু?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ।"

মনে মনে প্রমাদ গণলুম! শরৎচন্দ্রকে দেখবার আগে ওর কাছে তিনি ছিলেন—'শরৎচন্দ্র'; তারপর একদিন যাওয়ার পর হলেন 'শরৎ চাড়ুয্যে'; তার পর ক্রমে হলেন—'মুরুব্বী' এবং 'চাড়ুয্যে'! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে 'শরৎ্তা'য় না নামতে হয়! কেনই যে ওকে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলুম! এই বরানগরেরই একটি যুবক, চুণী দত্ত তার নাম—সে আমার কাজে অনেক বার শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলো। এর তুলনায় সে কত সভ্য, কত হিসিবী, কত ভদ্র। তার সঙ্গে কথা কোয়ে শরৎচন্দ্র খুসী হোতেন; তাকে ভালও বাসতেন। বোধ হয়, একদিন 'রংমহলে'র একখানা ফ্রী পাশেরও ব্যবস্থা তাকে কোরে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, দু'-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি শরৎচন্দ্রের কাছে গেলাম। শরৎচন্দ্র বললেন—"আচ্ছা লোককে তুমি আমার কাছে ঠেলে দিয়েছ! প্রথম দিন এসে সে ভক্তিতে গদ-গদ হোয়ে তেরো বার আমার পায়ের ধুলো নিয়েছিলো। তারপর, শুধু কপালে হাত ঠেকিয়ে একটা নমস্কার। তারপর এখন একেবারে ঠিক স্যাঙাতের মত, ঘরে ঢুকেই 'এই যে, আছেন কেমন?'

"'আছ কেমন' বলেনি যে, এইটেই ত আপনার ভাগ্যি।"

"তা বলেছ ঠিকই।"

আমি একটু চুপ কোরে থেকে বললুম—"এও আর নতুন কিছু নয়। দেশকে ত আপনি ভাল রকমই জানেন। এ ধরণের লোকের সঙ্গে আপনিও পরিচিত, আমিও পরিচিত। এরা ত অশিক্ষিত, চ্যাংড়া; এদের কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারা যায়? অনেক শিক্ষিতের মধ্যেও ত দেখেচেন। চোখে দেখবার আগে পর্যন্ত কী রকম প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি! তার পর দু'-চার বার দেখা-শুনো আলাপ হোলেই তার এক বিন্দুও আর থাকে না।"

"দুর্লভ বস্তু সুলভ হোয়ে পড়লে তা-ই হয়।"

"'S'কে বেশ কোরে আমি কোড়কে দোবো, যাতে আর

ক্যাসিয়া নোডোসা

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগ্‌চী

অস্ত-সূর্য বালুকাবেলায় নামে,
ধূসর পাহাড় পূবে, দক্ষিণে, বামে ;
মসীরেখা সম সিন্ধুর কালো জল।
উদাস বাতাসে দূর নভ হাসে
বালুরাশি টলমল ;
নোডোসা, আজিকে মন হ'ল চঞ্চল।

ব্যবধান টুটি, কত না যুগের পর
কাছাকাছি আজ হয়েছি পরস্পর।
অনন্ত কাল অগাধ ভ্রমণ ভ্রাম্যমানের বেশে
আশা-হতাশার ঘূর্ণন ব্যপদেশে···
দু'টি তারকার সংঘাত অবশেষে!

প্রশান্ত-মহাসমুদ্র-পারে অরণ্য-কিনারায়
পেতেছিলে তুমি বিস্মরণের জাল!
কাঞ্চন-মৃগী দ্রুত পলায়নপর,
শবর-শবরী শর হানে সত্বর,
নোডোসা সে বনে ছিল কি তোমার ঘর?
কাঞ্চন-মৃগী ধাবমানা যেথা
ধ্বনি ওঠে মর্মর?

শত সমুদ্র বনভূমি হয়ে পার,
বার বার পথ ভুল হয় আলেয়ায় ;
বার বার বৃথা মরণের চিতা জ্বলে,
দূরে ক্রান্তিবলয়ে সমুদ্র উথলায়।

ক্যাসিয়া নোডোসা আজিকে আকস্মিক
কত মৃত্যুর টাইফুন ফেলি দূরে,
কত জীবনের কত দয়িতেরে ভুলে
তোমার তরণী আসিল কি পথ ঘুরে?

ক্যাসিয়া নোডোসা, শ্রাবণের ঘন মেঘ···
শত প্লেটের পাহাড় সন্ধ্যার আকাশে,
শত প্লেটের পাহাড় অস্ত-রবিরে ঢাকে ;
এলো-কুন্তল ওড়ে সন্ধ্যার বাতাসে।

নোডোসা, তোমার পরিচয় সৌরভে ;
বিদ্যুৎ দূর-দিগন্তে শিহরায় ;
আসন্ন ঝড়ে বক্ষ আমার কাঁপে,
বাজপাখী নীল বনান্তে মিলে যায়।

আজিকে স্মৃতির সমুদ্র উত্তরোল,
ধূসর পাহাড়ে তরঙ্গ-দোলা লাগে ;
মনের কঠিন বাঁধ ভেঙে চুরমার—
নব বৈভবে কত বিলুপ্ত কথা জাগে!

রাত নেমে আসে, তীরে-নীরে কালো ছায়া ;
অন্তরে তবু অস্তরাগের মায়া!
সময় কি হোলো সপ্তপদীতে চলা?
নিরালা বিরল বালুভূমি পরে
অস্ফুট কথা বলা।
শত উদয়ের অবসানে শেষ সপ্তপদীতে চলা।

ঘুমায় বিপুল সিন্ধু নিশীথে নিশ্চেতন ;
কোথা উচ্ছল ফেন-তরঙ্গ গুরুগর্জন?
কত কল্লোল উঠেছিলো সাঁঝে কত না স্বপ্ন ;
সুপ্ত শান্ত আজি এ প্রহরে অতল-পুরে।

বেশেতে তোমার সবুজের সমারোহ,
ঝলকিবে শিরে রক্তিম ফুলদল ;
নোডোসা, চিনিব তখন তোমারে ফিরে
নিশীথে যখন অরণ্য অ-চঞ্চল।

এর পরে রাত হইবে গভীরতম
স্বরলিপি-হীন সুর ভাসে নির্জনে।
কল-কল্লোল স্বপনে আসিবে মম···
পরিচয় যত ক্ষীণ হয়ে জাগে মনে।

এখানে সে না আসে। তা সত্ত্বেও যদি সে আসে ত আপনি আর মোটেই আমল দেবেন না।"

কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই করতে হোল না ; ভগবানই ব্যবস্থা কোরে দিলেন। 'S'কে তার পারিবারিক কোন একটা ব্যাপারে, অনেক দিনের জন্য বাংলার বাইরে পাড়ি দিতে হোল। আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে, অর্থাৎ ১৩৪৩ সালের ফাল্গুন মাসে আমি শরৎচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে, বরানগর ছেড়ে আবার লেক রোডে উঠে এলুম। এই সময়টায় শরৎচন্দ্রের শরীর প্রায়ই ভাল থাকতো না। লিবারের জন্যে প্রায়ই তাঁকে কষ্ট পেতে হোত, যদিও তিনি সে কষ্টকে গ্রাহ্য করতেন না।

[ক্রমশঃ।

মানুষের কবি যতীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

যতীন্দ্রনাথের একটা সাধারণ পরিচয় আছে রোম্যান্টিক-বিরোধী বলিয়া। এই রোম্যান্টিক্-বিরোধিতা এবং ধর্ম-বিরোধিতা যতীন্দ্রনাথের একই মনোধর্মের পরিচায়ক। ইহার কারণ হইল, আসলে কাব্যের ক্ষেত্রে রোম্যান্টিকতা এবং ধর্মাশ্রয়ী 'মিষ্টিসিজ্‌ম্' এতদুভয়ের সম্পর্ক একটি 'তর'-'তমে'র সম্পর্ক মাত্র। যে মনোবৃত্তি মানুষকে বাস্তববিরোধী করিয়া তুলিয়া স্পষ্ট এবং ধ্রুবকে ত্যাগ করিয়া, অস্পষ্ট অধ্রুবের তৃষ্ণায় 'কি-জানি কি-জানি' ভাবে মাতাল করিয়া তোলে, তাহাই ক্রমপরিণতির গভীরতা লাভ করিয়া একটি অস্পষ্ট 'চেতন একে'র টানে চিত্তকে একাগ্র করিয়া তোলে। যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ প্রথমেই যেখানে 'অজানাটা অজানাই' এবং 'কোনোখানে সে যে নাই' বলিয়া পায়ের নীচের কঠিন মাটির উপরে সটান দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেইখানেই তিনি তাঁহার মৌলিক মানস-ধর্মে রোম্যান্টিক-বিরোধী এবং ধর্ম-বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে—'ইষুরিব দীর্ঘদীর্ঘীকৃতঃ'—সজোরে বাণ ছুঁড়িলে সে যেমন একই গতিবেগে ক্রমান্বয় ভেদ করিয়া ক্রমগভীরে গিয়া আঘাত হানে, যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যে মনোবৃত্তির তীক্ষ্ণতা রোম্যান্টিকতার পাতলা ঝিলমিল্ আবরণ ভেদ করিয়াছে; তাহা তাহার সহজ গতিপথেই ধর্মবোধের গভীর মর্মমূলেও গিয়া অতি স্বাভাবিক ভাবেই আঘাত হানিয়াছে। সেই আঘাতটা কতখানি সত্য-মিথ্যা, ঠিক-বেঠিক সেই প্রশ্নটাই এ-ক্ষেত্রে বড় হইয়া দেখা দিলে চলিবে না, তাহার শাণিত তীব্রতা আমাদের মর্মমূলেও কতখানি আত্মানুভূতির তীব্রতা জাগাইয়া তুলিয়াছে ইহার সার্থকতা সেই বিচারে। যতীন্দ্রনাথের কবিতা তাই মদির মোহাবেশ সৃষ্টি করে না,—চেতনার কম্প্র-উদ্বোধের মধ্যে তাহার হ্লাদজনকতা।

নঞর্থক ভাবে যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যাহা রোম্যান্টিক বিরোধিতা এবং ধর্ম-বিরোধিতা অস্ত্যর্থক-ভাবে তাহাই তাঁহার বলিষ্ঠ মানবিকতা। মানুষের উপরে গভীর শ্রদ্ধার আনুষঙ্গিক রূপেই দেখা দিয়াছে, মানুষের বাস্তব-জীবন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং আস্থা। স্বর্গের দেবতাকে যদি তিনি তাঁহার কাব্যে অস্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাহা মর্ত্যের মানুষের প্রতিষ্ঠার জন্য। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বাস করিত যে একটি আদিম কালের বিদ্রোহী—তাহার লক্ষ্য ছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফল, আত্মপ্রবঞ্চনার সুখ-স্বপ্নের স্বর্গ তাঁহার কাছে ছিল অসহ্য। মূঢ়তার মধ্য দিয়া বিধির বিধানের প্রতি আনুগত্য যে মনুষ্যত্বের চরম অস্বীকার; জ্ঞানের ফল—সত্যকার জীবনবোধের ফল—যদি সংসারের দাবদাহের মধ্যে টানিয়া আনে তবে তাহাই শ্রেয়ঃ, কারণ সেখানে শান্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা আছে। এই জন্য যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিধাতা যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহার দেওয়া অজস্র দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করিয়া তিনি বিধাতাকে ক্ষমা করিতে রাজি আছেন, কিন্তু যে অপমান তাঁহার মনুষ্যত্ব-বোধের কাছে চরম অসহ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল এই গভীর দুঃখকে তত্ত্ব ও রহস্যের প্রলেপে ভুলাইয়া দিবার অপচেষ্টা। দুঃখী মানবাত্মার দুঃখই ত মান! সেই মানকে অপমানে পরিবর্তিত করিয়া তুলিবার জন্যই বিধাতার দয়া-মায়া-লীলার পরিহাস; এই যে সংসারের আড়ালে থাকিয়া মায়ার ইন্দ্রজাল ছড়াইবার চেষ্টা—ইহা ত ক্ষত্রোচিত সাধু চেষ্টা নয়—এ যে 'মেঘের আড়ালে করে মায়ারণ'—মানী মানুষের মাথা নত করিয়া দিবারই ত এই অপচেষ্টা। নর-নারায়ণে—মানুষ ও দেবতার মধ্যে—চলিয়াছে এই অসম-রণ, রণাঙ্গনে মানুষের কোনও আবরণ নাই, ছলনা নাই, সে আত্ম-শক্তিবাদী, কিন্তু অজ্ঞাত রহস্যের অন্তরালে দেবতার মায়ারণ! এই অসম-রণের ফলে দেবতা হয় ত কোথাও কোথাও জয়লাভ করিয়াছে,—এক ভ্রান্তিরূপিণী ছলনাময়ী মহামায়ার পদতলে মহাকাল আপনাকে বিকাইয়া বসিয়াছে, প্রিয়ার মিলনে প্রেমিক প্রেমের দুঃখ ভুলিয়া গিয়া কাম-সুখ-মোহে শির লুটাইয়া দিয়াছে—তাহাকেই পায়ে দলিয়া জাগিয়াছে ছিন্নমস্তার ছিন্নমুণ্ডে অধীর হাসি; যে স্বেচ্ছাচারিণী নির্দয়া শক্তি মায়ের বুক হইতে সন্তান কাড়িয়া লইয়া ছিন্নমুণ্ড কটিতে দোলাইতেছে, রক্তচেলি পরিয়া সেই মাতা আসিয়া তাহারই চরণে রক্তজবা অর্পণ করিতেছে! এইখানেই মানুষের পরাজয়—এইখানে তাহার অপমান! কিন্তু তবুও কবির হৃদয়ে মানুষের বীর্য এবং পৌরুষের উপরে গভীর আস্থা—

> চির বিদ্রোহী মানব-আত্মা—আজিও তোমার মানে নি বশ,
> জনে জনে তারা বিশ্বমিত্র হরিতে বিশ্বকর্মা-যশ।
> কাম পুড়াইয়ে সৃজিয়াছে প্রেম, দেহ মথি তারা তুলিছে স্নেহ;
> মনের ফানুস ছেড়েছে আকাশে, আকাশ বাঁধিয়া গড়েছে গেহ।
> এ জগত তব স্বেচ্ছাতন্ত্র,—তাই নর তার জবাব দিতে
> গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তরে প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।
>
> (অপমান-মরুশিখা)

এই বিদ্রোহের জ্বালা লইয়াই কবি শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন—

> দুঃখ আমারে দিয়েছ বন্ধু, সে নিঠুরতা ত ক্ষমেছি আগে;
> দুঃখের মোর হ'ল অপমান;—রাবণের চিতা চিত্তে জাগে! (ঐ)

মানুষের দুঃখের মধ্যে যে অসহ জ্বালা রহিয়াছে, তাহাকে সহনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাতেই মানুষের ধর্মবোধ—মর্ত্যের পরপারে স্বর্গের কল্পনা। সে কথা অস্বীকার করিয়া যতীন্দ্রনাথ দুঃখের মহিমা-বোধের দ্বারাই দুঃখকে মহনীয় এবং সহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যেদিন 'মর্ত্য হইতে বিদায়' গ্রহণ করেন সেদিনকার সেই নারায়ণকে দিয়া কবি বলাইয়াছেন,—

> ক্ষমিও মানব! মানব-লীলায় দেবতার যত চুক;—
> আজ নিশি ভোরে নারায়ণ আর নরে দেখাবে না মুখ,
> কেঁদোনা রে আঁখি মানুষের মত, প্রশান্ত হও মন,—
> হের নরতনুবিমুক্ত তুমি গুণাতীত নারায়ণ!
> দিয়ে যাই বর,—নরের যেটুকু পাইলাম পরিচয়,—
> নর চিরদিন নর থাকে যেন, নারায়ণ নাহি হয়!
>
> (মর্ত্য হইতে বিদায়, মরুমায়া)

মানুষের ধর্মবোধ সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের একটা ধারণা ছিল, ইহা

মানুষের স্বাধীন মনুষ্যত্ববোধের একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়। এই জীবনকে যদি আর একটা অধ্যাত্ম-জীবনের ছায়া মাত্র করিয়া না দেখিয়া ইহাকেই চরম সত্য করিয়া দেখিতে পারিতাম, তবে সেই স্বাধীন-জীবন দৃষ্টি আমাদিগকে জীবনের সকল সুখ-দুঃখকে সবল ভাবে গ্রহণ করিবার অধিকার দিত। আমরা একটি অধ্যাত্ম জীবন এবং সেই জীবনের অধিষ্ঠাতা একটি প্রিয়তম জীবন-দেবতার কল্পনা করিয়া স্বর্গীয় প্রেমের স্বর্ণ-পিঞ্জরে বাঁধা পড়িয়াছি। কবি এই স্বর্ণ-পিঞ্জর হইতে এবং এক 'চির নির্মমে'র প্রেম হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন। তাই 'প্রেম-পিঞ্জর' (সায়ম্) কবিতাটিতে বলিয়াছেন,—

কঠিন কনকের সুঠাম পিঞ্জর,
দুয়ার রুধি' তার পালিছ পোষা পাখী,
তোমার সোহাগের পরশ পেতে তার
চঞ্চু চঞ্চল রক্তে মাখামাখি।
মিটে ত ক্ষুধা তৃষা নিত্য নিয়মিত
শতেক উপচারে সতত উপচিত,
বসিয়া হেম-দাঁড়ে,—আকাশ তবু তারে
খাঁচার পরপারে করে যে ডাকাডাকি ;
মুক্তি মাগে তাই তোমার পোষাপাখী।

মনুষ্য-জীবনের উপর হইতে স্বর্গীয় প্রেমের এই রশ্মিপাত বন্ধ হইলে হয়ত মনুষ্যত্বের মহিমা আর তেমন ইন্দ্রধনুর সপ্ত রঙে রঙিন্ হইয়া উঠিবে না, এই অধ্যাত্মবোধের খাঁচা হইতে বাহির হইয়া মানুষ সম্মুখে শুধু দেখিবে আশ্রয়হীন অনন্ত শূন্য—সে শ্রান্ত পাখা ঝাপটাইয়া শুধু গভীরতর বেদনার অধিকারীই হইয়া উঠিবে ; কিন্তু কবির মতে সেই দুঃখভরা সংগ্রামদীপ্ত স্বাধীন জীবনের আদর্শই পরম শ্রেয়ঃ। ধর্মের স্বর্ণাভা সত্যকার বেদনার কিছুই লাঘব করে না,—অধিকন্তু আকাশের নীলিমার মধ্যেও মহাপিঞ্জরের বোধ আনিয়া বেদনাকে অপমানিত করে।

জান কি বন্ধুয়া রতন সোনা দিয়া
যতনে রচা এই খাঁচাটি মনোহর।
আমার আঁখিশেষে সুদূর নীলদেশে
ছায়ায় এঁকেছে সে কি মহাপিঞ্জর।
খাঁচার ফাঁকে আঁখি আকাশে যত চায়
নীলিমা ভরে' গেছে কনক-শলাকায়।
কি ফল হ'ল কবি, তোমার প্রেম লভি'
আকাশও হ'ল যদি খাঁচারই সহোদর ?
বাঁধন-ক্লান্তিতে কাঁদে যে অন্তর।

এইখানেই যতীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণ হইতে পৃথক্। আমাদের সাধারণ যে বন্ধন ও মুক্তির আদর্শ রহিয়াছে তাহাতে মর্ত্যজীবনই বন্ধন,—অধ্যাত্ম জীবনের ভিতরে আমরা লাভ করিতে চাই মুক্তির আনন্দ ও মহিমা ; যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মজীবনই বন্ধন—স্বাধীন বাস্তব মর্ত্য জীবনের মধ্যে তিনি পাইতে চান মুক্তির আনন্দ ও মহিমা। তাই তিনি বলিবেন,—

হে চির নির্মম হে মম প্রিয়তম,
সোনার পিঞ্জরে দুয়ার খুলে দাও,
শেষের সোহাগের পরশ বুলাইয়ে
বাহুতে দুলাইয়ে আকাশে তুলে দাও।

আকাশ এখানে অনিশ্চয়তাপূর্ণ স্বাধীন মর্ত্য-জীবনের সীমাহীন বিস্তার।

প্রকৃতি সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথ যত কবিতা লিখিয়াছেন সেখানেও দেখি, প্রকৃতি মানুষকে কোনও দিন কিছু শিক্ষা দিতে পারে, এ-কথাটাকে যতীন্দ্রনাথ তীব্রস্বরে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, মানুষ যে প্রকৃতি হইতে অনেক বড় এই কথাটাকেই তিনি বার বার নানা ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, আমরা দেখি, প্রকৃতি যাঁহার অলাভ-ব্যবসায়ের চটকদার বিজ্ঞাপন তাঁহার সম্বন্ধেও কবি বলিয়াছেন,—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।

মানুষ সম্বন্ধে কবির এই পৌরুষ দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা তাঁহার রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হইতে গৃহীত চরিত্রগুলি অবলম্বনে লিখিত কবিতাগুলির ভিতর দিয়াও একটা সতেজ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'বিভীষণ' 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ', 'শরশয্যায় ভীষ্ম', 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি কবিতার ভিতর দিয়া প্রত্যেকের চরিত্রের মানবতার দিকটাই নানা ভাবে কবি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের অলৌকিকতার দিকটা তিনি যতটা পারেন ঘুচাইয়া দিয়া স্পষ্ট রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের রূঢ় লৌকিকতার দিকগুলি। কবির মতে মানুষের ইতিহাসের সত্যযুগ এখনও অনাগত, কারণ মানুষ এখন পর্যন্ত তাহার ভিতরকার সত্য মানুষকে স্বীকার করিতে শেখে নাই ; কিন্তু বহু বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া আমরা দাঁড়াইয়া সেই সত্যযুগের সন্ধিক্ষণে যখন—

ফেটে যাবে, ফেটে যাবে
বিরাটের এই বেলুনায়িত হিরণ্যগর্ভ উদর।
বেরিয়ে আসবে নবজন্ম লাভ ক'রে
লক্ষ কোটি নরসহোদর। (নবজন্ম, ত্রিযামা)

'শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব'—ইহাই ছিল কবির সঙ্কল্প। তাই কবি গাজনে শিবকে তাঁহার পাগলে নাচন থামাইতে বলিয়াছেন—তাঁহাকে মানুষ হইয়া মানুষের সাথে নামিয়া আসিয়া নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।—

বহুদিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয় শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চল গো ঠাকুর ওই নাচে পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল পাথরও যেন গো ফাটে।
... ...
শঙ্কর! হও সঙ্কর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা। (ভাঙা-গড়া, ত্রিযামা)

কবি তাঁহার 'পঞ্চারতি' (ত্রিযামা) কবিতার মধ্যে মহাদেবের আরতির যে মন্ত্রগান করিয়াছেন সেখানে মহাদেব বিশ্বদেবতা। এই বিশ্বদেবতা শব্দের অর্থ, বিশ্বের অন্তর্নিহিত কোনও অধ্যাত্ম পুরুষ নহেন, বিশ্বদেবতা এখানে বিশ্বজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তি। কন্যাকুমারী এই বিশ্বজীবন-রূপ মহাদেবের ধ্যানে নিত্যনিরতা, সিংহলের টীকা কপালে পরিয়া লবণ-সমুদ্র এই মহারুদ্রদেবতার জপে মগ্ন, প্রবালের দ্বীপে ঝলমল করে এই বিশ্বদেবতারই হাড়মালা; নগ-নাগময় যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলী-দ্বীপ,—ব্রহ্ম-শ্যাম-মালয়, সুবিশাল গোবি, 'সুমেরু-সমুত্থিত মহাতপা ইউরাল,' কৃষ্ণ কাস্পিয়ান, ককেশস, ইরাণ হিন্দুকুশ—পাপমর্দন জাহ্নবী-জর্দন সর্বত্র আরত্রিক শুধু এক দেবতার—সে দেবতা বিশ্বজীবন-রূপ মহাদেবতা। সেই দেবতা—

মানব-দানব-দেব সবার প্রণম্য,
রুদ্রে রুদ্র ওঁ ওঁ সোমে সৌম্য,
প্রভাতে কুমারী-চিত্তে ওঁ ব্রতবন্ধন
যুগলমিলনরাতে ওঁ ভুজবন্ধন,
ওঁ মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত যাজ্ঞিক,
ওঁ বৈরাগ্যের ধ্যান অপরাহ্নিক,
কণ্টকান্বিত ওঁ বিল্বপাদপমূল,
শিশির-অশ্রুস্নাত ওঁ ধুস্তুরা ফুল,
ডম্বরু ডমডম পিনাকের টঙ্কার,
বেণু-বীণা-মৃদঙ্গে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
ভাস্কর করে ওঁ ছেদনী ও হাতুড়ি,
শিল্পীর-শৈলী ও কারুময় চাতুরী—

জীবনের এই প্রত্যেক অবস্থা ও রূপের মধ্য দিয়া ব্যক্ত যে মহিমা তাহাই সমগ্রতার রূপ লইয়া মহাদেব হইয়া জাগিয়া ওঠে—সেই জীবন-মহাদেবই কবির বন্দ্য।

বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবার সদাজাগ্রত প্রবৃত্তির অনিবার্য আনুষঙ্গিক রূপেই যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে আর একটি প্রতিবাদ এবং সমবেদনার সুর—প্রতিবাদ সর্বপ্রকার অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে—সমবেদনা অসহায় লাঞ্ছিত এবং শোষিতের জন্য। এই অবিচার এবং স্বেচ্ছাচারী শোষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সর্বত্র—প্রকৃতির মধ্যেও—মানুষের সমাজ-দেহের মধ্যেও। মানুষের কৃত্যের জন্য মানুষকেই সাধারণতঃ দায়ী করা হয়; কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে যে অবিচার এবং শোষণ—তাহাও আমাদের কল্পিত বিধাতা পুরুষেরই দান। সুতরাং ক্ষোভ তাঁহার মানুষের বিরুদ্ধেও—বিধাতার বিরুদ্ধেও। দুনিয়া ভরাই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—

দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।
(ঘুমের ঘোরে, তৃতীয় ঝোঁক, মরীচিকা)

এক দল বোবা লোক মুখ বুজিয়া শুধু খাটিয়াই মরিতেছে—তাহাদের শ্রমের ফল তাহারা ভোগ করিতে পারে নাই, যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহারা পরের প্রয়োজনেই টকাটক খাটিয়া মরিল। এই শোষণবুদ্ধির অনুকূলেই আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি আমাদের সব ধর্মমত। এক জনের লীলার জন্য মানুষকে নিরন্তর শুধু আত্মবলি দিতে হইতেছে। এই বলি যত মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে, আমাদের ধর্মবুদ্ধির প্রলেপকে আমরা তত পুরু করিয়া তুলিতেছি—তাহার শোষণ-সমর্থক ব্যাখ্যাকে আরও গভীর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। জননীর কোল হইতে হঠাৎ কে আসিয়া তাহার স্নেহের দুলালটিকে কাড়িয়া লইতেছে; কিন্তু—

ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দৈত্যো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক;
(ঐ, দ্বিতীয় ঝোঁকে)

কিন্তু এই তত্ত্ব-বচনের তাৎপর্য কি? কবির মনে ইহার সোজা তাৎপর্য হইল, মানুষ যেন আত্মভোগবিলাসী কোনও এক স্বেচ্ছাচারী শক্তিমানের হাতে নির্বাক পশুমাত্র—এবং সেই পশু সম্বন্ধে তিনি খেয়াল-খুশিতে যখন যেমন ব্যবস্থা করিবেন তাহা যে শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াই যাইতে হইবে তাহা নহে, বুকের আগুন এবং চোখের জল উভয়কেই রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে আত্মসমর্পণের প্রশান্তি এবং তজ্জনিত মুখের হাসিতে। সমস্ত জিনিসটিরই গলিতার্থ তাহা হইলে গিয়া দাঁড়ায় এই—

অস্য অর্থটি—
যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক, তাতে অপরের কি?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এক কোপে বলিদান—
পাঁঠার মধ্যে সে পাঁঠাটি—আহা কত না ভাগ্যবান্!
পাঁঠার দুঃখ সুখ—
মার পায়ে দিতে নূতন সরায় রক্তে জমায়ে থক। (ঐ)

সৃষ্টিভরা এই যে একটি নির্দয় সার্বিক শোষণের রূপ তাহা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির কয়েকটি প্রতীকধর্মী কবিতার মধ্যে; 'মরুশিখা'র 'খেজুর-বাগান', 'মরুমায়া'র 'পাষাণ পথে', 'কেতকা' প্রভৃতি কবিতা ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রসহীন এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে অযত্নে অবহেলায় বাড়িয়া ওঠে কাঁটাভরা খেজুর গাছ; দেহটি তাহার নবনী-কোমল নয়,—'বিষম রুক্ষ শুষ্ক কঠিন খেজুর গাছের ত্বক'—যাহা রুক্ষ শুষ্ক তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া 'রস' বাহির করিতেই এক দল চাষীর সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও আনন্দ। সেই শোষণের উত্তেজনাতেই চাষী এক দিন—

কাঁস-করা রসি বা'খরায় কসি,' কটিতে কাটারি গুঁজে',
বড় স্নেহে চাষা খেজুর-বৃক্ষ জড়াইল দুই ভুজে।

এবং সেই প্রেমেরই উত্তেজনায় চাষী কাটারি দ্বারা অবোধ গাছের মাথা পরিষ্কার করিয়া দিয়া চক্ষুদান করিল এবং তাহার পরই—

কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
খেজুর-পাতার কাঁস করে' ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।

এমনই করিয়াই দেখা যাইতেছে, সমাজ-জীবনের উষর ক্ষেত্রে অযত্ন অবহেলায় বাড়িয়া উঠিতেছে কঠিন কর্কশ রুক্ষ-শুষ্ক-দেহে কত প্রাণ—আর গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের 'কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি'—কত চাষী রস-মাতাল হইয়া উঠিল, —সেই ক্ষরিত প্রাণরসের ব্যবসাতেই ভুঁড়ি বাগাইয়া রাতারাতি বড়লোক হইয়া উঠিল।—

এ ধরণী ভরি' খেজুর গাছের আবাদ করিল কেবা ?
নয়নের জল-জ্বাল-দেওয়া চিনি কোথা কে করিছে সেবা ?
অবেলায় ঝরা অশ্রু তাহার ভাঁড় ছেপে' গেঁজে উঠে ;—
সে নেশার আশে কোন্ মাতালের অধরে হাস্য ফুটে !
মোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর ;
না জানি সেখানে হেসে খুন্ কোন্ রসখোর তাড়িখোর !

কবির এই যে রসখোর এবং তাড়িখোর সম্বন্ধে বক্রোক্তির ব্যঞ্জনা ইহা শুধু স্বৈরাচারী শোষক মানুষ সম্বন্ধেই নয়—সেই রসখোর এবং তাড়িখোরের পূর্ণপরিণতি যে বিধাতায় তাঁহার সম্বন্ধেও।

'মরুশিখা'র 'বাঁশীর গল্পে'র মধ্যেও এই নিষ্ঠুর নিপীড়ন এবং শোষণ এবং সেই পীড়িতের ক্ষতকে অবলম্বন করিয়াই বাঁশী বাজাইবার নিষ্ঠুর বিলাসের ব্যঞ্জনা ফুটিয়াছে।—

বাঁশের বুকে ক্ষত'র মুখে ফুঁয়ে বাজে সাতটা সুর,
নূতন বাঁশে নূতন বাঁশী বাজিয়ে কাটে রাত দুপুর।
গাইছে বেণু গেন্দুর ফুঁয়ে পরের বুকের দুখের গান,—
বাঁশ-বাগানে সমান চলে আষাঢ় রাতের ঝড়-তুফান।
হাস্‌ছে বাঁশী, বাজছে বাঁশী, চড়্‌চড়িয়ে ভাঙছে বাঁশ,
হেথায় ওঠে উৎস সুরের, হোথায় কাঁদে হা হুতাশ।
বাদল সাঁঝের বেদন-ভরা বাঁশ-বাগানের তল্‌দা বাঁশই
গোটা কতক ছ্যাঁকায় ভুলে' হ'ল ডোমের মুখের বাঁশী।

ডোমের ছেলে গেন্দু বাঁশের বুকে ছ্যাঁকা দিয়া বাঁশী করিয়াছে, সমাজের বুক দুর্বল দরিদ্রের বুকে ছ্যাঁকা দিয়া ধন-বিলাসী ও মন-বিলাসীরা বাঁশী বাজাইতেছে—আবার মানুষের বুকে দুঃখ-দহনের ছ্যাঁকা দিয়া লীলাময় বংশীধারী বাঁশী বাজাইতেছেন,—তাহারই পরিচয় দেখিতে পাই 'মরুশিখা'র 'বীণা-বেণু' কবিতায়।

একটা গভীর সমাজ-সচেতনতার ভিতর দিয়া কবি প্রথম জীবন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে এক দল মানুষ যে শুধু অত্যাচারিত এবং শোষিতই হইতেছে তাহা নহে, তাহারা যে অপর শ্রেণীর ভোগ-বিলাসের করণ-উপকরণ রূপে নিরন্তর ব্যবহৃত হইতেছে ইহাই যেন তাহাদের জীবনের এক মাত্র সার্থকতা। ফুলের প্রতীকে কথাটিকে কবি তাঁহার 'মরীচিকা' কাব্যেই প্রকাশ করিয়াছেন—

সার্থক তোরা ফুলকলি ;
আপনার হাতে ছিঁড়ে মালা গাঁথে
প্রিয়া, মোর গলে দিবে বলি'।
কান্না কিসের ভাই ?
মোদের মিলনে গন্ধ মিলাবে—
এতেও তৃপ্তি নাই ? (সার্থক, মরীচিকা)

ইহার মধ্যে যে ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহার পরিণত রূপ দেখিতে পাই 'মরুমায়া'র 'পাষাণ-পথে', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতায়।

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে 'সেরা শহরে'র 'ইট-পাথরের বিরাট নগর' যখন প্রচণ্ড তাপে তাপে 'জ্বরঘোরে ধুঁকে' এবং শহরবাসী যখন রুদ্ধ-শার্সি ঘরে তড়িৎ-পক্ষের হাওয়ার ব্যবস্থা করে, তখন কবির দৃষ্টি পড়িয়াছে 'কানন-রাণীর শিশু-কন্যা' বকুলের প্রতি, কে তাহাকে তাহার শ্যামল পরিবেশ হইতে কাড়িয়া আনিয়া লোহার খাঁচার মধ্যে আটক করিয়া মানুষের সেবার কাজে লাগাইয়া দিয়াছে! সেই বকুলের দিকে তাকাইয়া কবি বলিয়াছেন,—

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরে পথ চলি আর ভাবি,—
কত না বকুল দিল তার ফুল মিটা'তে নরের দাবি !
(পাষাণ-পথে, মরুমায়া)

কবি জানেন, বকুল তাহার এই সব ফুল মানুষের ভোগ-বিলাসের দাবী মিটাইতে কখনই বড় ইচ্ছা করিয়া দেয় না—জোর করিয়া তাহাকে তাহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকাশ-সম্ভাবনার পথ হইতে টানিয়া আনিয়া অনির্বাণ ভোগস্পৃহায় নিত্য নূতন দাবি মিটাইতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু শুধু মাত্র গায়ের জোরে অবাধ শোষণ সম্ভব নয়, শোষকশ্রেণী সে সত্যের সন্ধান ইতিমধ্যে হয়ত পাইয়া গিয়াছেন, তাই এক দিকে যেমন শক্তির আস্ফালন, অন্য দিকে তেমনি রাতারাতি চারি দিকে শোষণের অনুকূল ব্যাখ্যা-মতবাদের রঙিন-মধুর আলাপন। চারি দিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে ধর্মের তত্ত্ব সেবা মাহাত্ম্যে—নন্দন-তত্ত্ব শিল্পির আত্মরতির বিশেষাধিকার-বাদে—সমাজতত্ত্বের ত্যাগ মহিমায় ; একই সঙ্গে সজোর চাবুক এবং মোলায়েম হাতবুলানি ! তাই—

কত না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ।
দেবে-নরে মিলে' ফুলের কপালে লিখে দিল সেবানন্দ।
দ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা,—সেই-ত চরম সুখ,
ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত বুক।
যদি সে মোক্ষ চায়,—
ভক্তজনের অঞ্জলিপুটে লুটাক্ দেবতা-পায় !
নির্যাতনের যতনে ভুলায়ে এই মত বার মাস
ভক্তিবিলাসী বিলাসভক্তে চালায় ফুলের চাষ।

কবি বলিবেন, এই যে মুখর হইয়া সেবামাহাত্ম্য প্রচার—ধর্মতত্ত্বের দিক্ দিয়াই হোক, আর কর্মতত্ত্বের দিক দিয়াই হোক—ইহার পনর আনাই হইল মধুর-ছলনায় শোষণকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবার ফন্দি। সম্রাট শাজাহান তাঁহার প্রিয়ার স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার চেষ্টায় যে 'অপূর্ব অদ্ভুত' 'নব মেঘদূত' শ্বেতমর্মরে রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাদ্বারা তিনি নিজে ত 'সম্রাট কবি' খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—এবং আমরাও বর্ষবর্ষ ধরিয়া দেশ-দেশান্তরের যত প্রেমিক-প্রেমিকা সেই সমাধি-সৌধের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই—

একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল !

কিন্তু যাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া কোটি কোটি টাকা রাজকোষে সংগৃহীত হইয়া এই শ্বেতপ্রস্তরের একবিন্দু নয়নের জল নির্মিত হইয়াছে তাহাদের সন্ধান আজ আর কেহ জানে কি ? যে অসংখ্য শিল্পী তাহার মনের স্বপ্ন এবং দেহের শ্রম সমর্পণ করিয়া এই সৌধের প্রস্তর গড়িয়া তুলিয়াছিল সে যে তাহার নবযৌবনা প্রিয়ার দেহ-মনের কোনও দাবিকেই মিটাইতে পারে নাই—শুধু 'দ্রাণলোলুপের করে প্রাণ সঁপিতেই তাহার মানস-মুকুল এবং হাতের নৈপুণ্য ঝরাইয়া দিয়া গেল, তাহাদের কথা তাজমহলের সম্মুখস্থ উদ্যানে বসিয়া কাহারও এক বার মনে পড়ে কি ? তাহাদেরও হয় ত সম্রাট্ কবি শাজাহানের মতনই দেহ ছিল, প্রাণ

ছিল, মন ছিল—আশা ছিল আকাঙ্ক্ষা ছিল—প্রেম ছিল, সম্ভাবনা ছিল। তাই কবির প্রশ্ন,—

এত শোভা এত মধু এত বাস বিফলে কেন বা যাবে ?—
অবলা ফুল যে কি বলিতে ফুটে, সে কথা কে কোথা ভাবে ?

পাষাণ-পথের বকুল গন্ধে সহসা লাগিল হাঁফ,—
বুঝিনু,—এ চির-প্রবঞ্চিতের মর্মের অভিশাপ !
ফুলের গন্ধ নাই নাই ভাই,—কোমলের ব্যথা যত
কঠিনের বুকে বিফল ঘা দিলে লাগে গন্ধেরি মত !

এইখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক আপত্তিকর বিড়ম্বনা ! কোমলের ব্যথা যে-বুকে কোনও আঘাতই করে না সে-বুক তবু ভাল; কিন্তু যেখানে বিফল আঘাত করে সেইখানেই অত্যাচারিত কোমলের ব্যথা দেখা দেয় বকুলগন্ধের রূপে ! অর্থাৎ আঘাতকে যেখানে আঘাত বলিয়া একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, অথচ সেই আঘাতের সম্পূর্ণ সুযোগটি নিজের কাজে না লাগাইতে পারিলে আত্ম-সম্ভোগ ষোল মাত্রায় জমিয়া ওঠে না সেইখানেই অবশ্যম্ভাবী প্রবৃত্তি ধর্ম, নীতি, শিল্প-সৌন্দর্যের নানা কথার বুনানি দ্বারা সেই আঘাতের ব্যথাকে ফুলের গন্ধে পরিণত করিয়া তুলিবার। সেই বকুলের বেদনার সুরেই জাগিয়াছে কবির কাব্যে বনকেতকীর বেদনা। সহরের বুকে এই বন-কেতকীর গুচ্ছ তিনি দুই পয়সায় কোথায় কিনিয়াছিলেন সেই তথ্যটিও এ-প্রসঙ্গে বেশ ব্যঞ্জনা গর্ভ।—

বৌবাজারের মোড়ে,—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস খোড়ে,—
(কেতকী, মরুমায়া)

সেখান হইতে কবি বাদলা দিনের সন্ধ্যায় শহুরে মালীর মাথার ঝাঁকা হইতে কেয়াকুসুমের গুচ্ছ কিনিয়া বাড়িতে ফিরিলেন এবং 'শয়ন ঘরের হুকে' সেই 'ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।' রাত্রে বাহিরে ঝর্ ঝর্ বর্ষা ঝরিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া দেয়া ডাকিতেছে—আর কবির ঘরে 'শয়ন-শিয়রে' সেই বনের কেতকী গন্ধ ছড়াইতেছে। কিন্তু বনকেতকীর সেই গন্ধ কবিকে কাব্যানন্দে মাতোয়ারা করিয়া রাখিতে পারিল না,—সারা রাত গভীর বেদনায় নিদ্রাবিহীন কবি শুধু ভাবিতেছেন,—

যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে !
আধ ঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি ! (ঐ)

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে এই শোষন-লোলুপতার ফলে শ্রমজীবী চাষী-মজুরদের যে আমরা কোনও দিনই মানুষের মর্যাদা দিতেই রাজি হই নাই এই খানেই কবির তীব্র ক্ষোভ এবং দরদ। লোভমত্ত এবং ক্ষমতামত্ত সংবিৎ-হীন সেই শ্রেণীটিকেই ডাকিয়া কবি বার বার বলিয়াছেন,—

পাঁচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আটে !
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষা নদী,
জুটে না পারের কড়ি ;
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাঁদায় কাঁটায় পড়ি' ;—
ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের কর গো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।

* * * *

অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষেরই ভাই।
(মানুষ, মরীচিকা)

'মরীচিকা'র 'চাষার বেগার' কবিতাটির মধ্যেও দেখিতে পাই সেই একই ক্ষোভ এবং দরদ। গরিব চাষী, কায়ক্লেশে ক্ষেত-খামার করিয়া গায়ের শ্রমে মাথার উপরে ছাউনি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে তাহার সাধ্য কি !

জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া
কোথাও দু'টি পচা খড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিললো না কি পল্লীখানি খুঁজি ?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতেই হবে রাজার বাড়ী !
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথায়
মলিন হ'ল বুঝি !
যাচ্ছি চলো চক্ষু কান বুঁজি।

'মরুশিখা'র 'গাড়োয়ানের গল্প'টিও এই সঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। গাড়োয়ান গাঁয়ের ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছে কেন সে ভিন গাঁয়ের হালুটে চাষা হইয়াও শেষ পর্যন্ত 'ভিটে ছেড়ে গাড়ী চালাই এসে তোমার দেশে।' কিন্তু আমাদের দেশের 'দা'ঠাকুর'গণ কি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া সেই গল্পটিও শুনিতে পারেন ? সুতরাং গাড়োয়ানের গল্প শেষ করিতে হয় এই ভাবে,—

ঘরে শেষে লাগল আগুন, পূব জনমের ফল,
দাদা ঠাকুর ঘুমিয়ে গেছ ? চ' বাপ ধলা চল্।

'মরুমায়া'র 'মৎস্য-শিকার' কবিতার ব্যঙ্গাত্মক ব্যঞ্জনাও এই একই দিকে ; দুনিয়া ভরা চলিতেছে শুধু দিনে রাত্রে মৎস্য-শিকার। এই মেছুরিয়াগণের মধ্যে সে-ই সর্বপ্রশংসিত শিকারী যে আহারের গন্ধে ভুলাইয়া আনিয়া টোপ গিলাইয়া ধরিয়া ফেলিবার এবং ধরিয়া ফেলিয়া নানা মুনাফার বাজারে তাহাকে দিয়া ব্যবসা চালাইবার হাজার রকমের ফন্দি-ফিকির জানে।—

নদী খাল বিলে, দীর্ঘিকা ঝিলে, সব ঠাঁই ধরো মাছ,
চুনো-পুঁটি-রুই-মৃগেল কিছুই নেইকো তোমার বাছ।
কাল বৈকালে রাজাজ্ঞার খালে 'কোভা'য় ধরিলে শোল,
পরশু প্রভাতে ক্ষেমির ডোবাতে পুঁটিতে ভরিলে খোল।

কত মতলব, নব নব টোপ, নিত্য নূতন চার,—
ঘ্যাঁচ্‌রা আন্‌কা ভাসা ডুবো কারো নেই তাহে নিস্তার।
মেছুরিয়া নিরদয়,—
জলের মৎস্য ডাঙ্গায় তুলিতে কি হর্ষ-বিস্ময়!
••• ••• •••
নূতন চারের উতল গন্ধ আকুল করিল কারে?
বহু সন্ধানে পরমানন্দে তোমার ফাৎনা নাড়ে।
টানিতে তোমার ডোর,—
বঁড়শির 'কালা' বিঁধিল কপালে, কি তার কপাল জোর!
'আপাল' কাটিয়া ঝাঁপায় লাফায়, ছিপের সঙ্গে খেলে,
তোমার লীলায় অকূল তাহারে কূলপানে ক্রমে ঠ্যালে!

সমাজ-জীবনে এই অবিচার এবং শোষণের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য দরদ দেখা দিয়াছে কবির প্রত্যেক কাব্যের মধ্যে নানা ভঙ্গিতে এবং নানা উপমা-রূপকের ভিতর দিয়া। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র অনুকরণে যতীন্দ্রনাথ যে 'কণিকা' লিখিয়াছেন তাহার মধ্যেও দেখিতে পাই 'ছাতা' ও 'মাথা'র দৃষ্টান্তের মধ্যে। পৃথিবীতে এক দল লোক শুধু ছাতার ন্যায় চিরদিন রৌদ্র-বৃষ্টি সহিয়া আর এক দল মাথার ছায়া ও আরামের ব্যবস্থাই করিয়া গেল। কিন্তু 'ছাতা'র মনের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দেয় বেসুরা কথা, সেও উচ্চাভিলাষী হইয়া দুঃসাহসী হইয়া এক দিন বলিয়াই বসে,—

ছাতা কয় সবিনয়, মাথা মহাশয়,
চিরদিন রৌদ্রবৃষ্টি কারেও না সয়।
নিজগুণে একবার হও যদি ছাতা,
তোমারি তলায় আমি হ'য়ে থাকি মাথা।

কিন্তু 'মাথা'র দল অত সহজে ঘাবড়াইবার পাত্র নয়; শ্রম করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তি না থাকিলেও বিধাতা তাঁহাদের আত্মরক্ষার জন্য মুখে লম্বা বুলির ব্রহ্মাস্ত্র সব ভরিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং 'ছাতা'র এই মূর্খতা এবং ঔদ্ধত্যের জবাব সঙ্গে সঙ্গেই আসে—

মাথা কয়, ওরে ছাতা তুই বড় গাধা,
এতদিনে বুঝিলি নে মাথার মর্যাদা?
বুঝিলিনে তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
তোর একমাত্র কাজ তারে রক্ষা করা?

কিন্তু এই বুলির ব্রহ্মাস্ত্র আজ-কাল ছাতার দলও কিছু কিছু শিখিয়া উঠিয়াছে,—তাহারা জবাব করে,—

ছাতা বলে, তাই মাথা হ'তে চাই দাদা,
মাথা ছাড়া কে বুঝিবে মাথার মর্যাদা?

কিন্তু এই চির দিনের রৌদ্র-বৃষ্টিসহা ছাতার দলের—এই সব 'দুঃখী ভগবানে'র কষ্ট লাঘব করিবার জন্য 'মাথা'র দল মাঝে মাঝে দয়া-দাক্ষিণ্য করিয়া যে সকল সদয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যেও যে কি নিষ্ঠুর নির্দয়তা থাকে তাহা কবির চোখ এড়ায় নাই। নিজের কর্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন তিনি তাঁহার 'মরুমায়া'র 'ফেমিন্‌-রিলিফ' কবিতায়। দারুণ অকালে যেদিন বিধাতার করুণায় গ্রামের সীমানায় রিলিফ নামিয়া আসিল সেদিন কোদাল ও চুবড়ি লইয়া মাথায় 'পাক-দেওয়া ছেঁড়া বিঁড়ে' বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিবার জন্য সকলের কাছে ডাক পড়িল; ডাক পড়িল—

ঘরে ব'সে মড়কে
চ'লেছিলি নরকে,
না হয় কোদাল হাতে মর্‌বি এ সড়কে।
খাট্‌ তবে খাট্‌রে!
ডোঙা পেট কোঙা কোরে গোঙা মাটি কাট্‌রে!

কিন্তু এই 'ফেমিন্‌-রিলিফে'র শেষ কোথায়?—

কাঁদিস্‌নে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌ গো!
আজ ত কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো।
বুকে পিঠে মাটি চাপে! এ মাটি কে মাপে রে?
হক্‌ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে!

আবার আর এক দল লোক এই বঞ্চিতের বেদনাকেই শোষণ করিয়াই—মিথ্যা দরদের ভাওতায় যে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ—রাজনৈতিক মতলব সাধনের তালে আছেন তাঁহাদের প্রতি কবির বিদ্রূপের কশাঘাত আরও তীব্র। সে বিদ্রূপের কশাঘাত ফুটিয়াছে তাঁহার 'মরুমায়া'রই 'পিছুহটার গানে'; কবিতার আরম্ভটা রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'আগে চল, আগে চল, আগে চল ভাই' গানটিরই রেশ টানিয়া 'পিছু হট্‌ পিছু হট্‌ ভাই' এই বুদ্ধিমানী আহ্বানে এবং সেই আহ্বানের তৎপর্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে শেষ মন্তব্যে—

বিষ্ণুশর্মা কহে মারি বেত—
'গণস্যাগ্রে নহি গচ্ছেৎ';
গণতন্ত্রীয় এ মূল মন্ত্রে
পিছু হ'তে ঘাড় মটকাই।
কার ঘাড়?·········ড্যাস্‌ ডট্‌ ভাই।
পিছু হট্‌ পিছু হট্‌ ভাই।

দেখা গিয়াছে, চাষী-মজদুরের দুঃখ-বেদনার জয়গান গাহিতে কর্মক্ষেত্রে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে একটা 'সৌখীন মজদুরী'র মরশুমও পড়িয়া গিয়াছে। দেশোদ্ধারের জন্য অনেকেই হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, 'এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার'—এবং এই চাষাদের দুঃখে 'পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।' সুতরাং চলিতে থাকে চাষী ভাইদের উপর অনর্গল উপাদেশামৃত বর্ষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়—

সেই দুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার;—
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা!
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিষ্টার!
(দেশোদ্ধার, মরুশিখা)

কিন্তু কবি বঞ্চিত মানুষের এই বেদনা লইয়া শুধু সস্তা রসিকতাই করেন নাই,—তাঁহার মনে গভীর বিশ্বাস ছিল, এত অন্যায়-অবিচার—এত দুঃখ-দারিদ্র্য—ইহা চিরদিনই এমন মূক হইয়া থাকিবার জিনিস নয়। মানব-হৃদয়ের গভীর অতলে গিয়া আবর্তের পর আবর্তের ঘূর্ণিপাকে ইহা শঙ্খের সৃষ্টি করিতেছে—যে শঙ্খ এক দিন এই অগণিত ভাষাহীনের মৌনবেদনার ঘনীভূত ধ্বনিময় রূপে

আবির্ভূত হইয়া আহ্বান জানাইবে বিদ্রোহের। সে শঙ্খ তখন আত্ম-পরিচয় দিবে—

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের
মন্থিত হৃৎ-পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃতে ঘনান্ধকারে
সুরলক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রু ভারের অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ।

বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন প্রলয়ে—
নীলকণ্ঠের অট্টহাস্যে
উঠেছিনু আমি শঙ্খ,
অসংখ্য মূক-শক্তিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক। (শঙ্খ, সায়ম্)

সেই অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহের মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট দৃষ্টির পরিচয় আছে কবির 'ভিখারিণী' কবিতার মধ্যেও ('ত্রিযামা')। রবীন্দ্রনাথের 'পশারিণী' কবিতার ছাঁচের মধ্যে এই 'ভিখারিণী' কবিতাকে গড়িয়া তুলিবার মধ্যেই একটা অব্যর্থ গূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। নব-যৌবনের 'পশারিণী'দের লইয়া আমরা সে স্বপ্ন গড়িয়া তুলিতেছি 'ভিখারিণী'রা যে আসিয়া তাহা রূঢ় আঘাতে ভাঙিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া দরকার। যে ভিখারিণী 'এ-গাঁ হ'তে অন্য কোন্ গাঁয়' ঝুলিতে কত চা'ল ভরিয়া চলিতেছে, এক দিন দেখা গেল তাহার হাতের সেই ঝুলিটাও নাই! তবে কি হইল,—ভিখারিণীকে একা পাইয়া কি কেহ সেই ঝুলিটি পথে কাড়িয়া লইয়াছে? তাহা নয়, তাহার দেহ ঢাকিবার যখন অন্য কোনও সম্বলই আর বাকি ছিল না তখন সেই 'রাজ্যের কানি' গিঠানো ঝুলিটি দ্বারাই সে তাহার নব-যৌবনের 'বুকের কাঁচুলি' করিয়াছে! আর এই নারীকে দেখিয়া নির্লজ্জ যত 'পট্টবাসে দেহ ঘেরা পাটনাই পেঁয়াজেরা' অশ্রুবারি ফেলিতেছে। কবি বলিতেছেন, এই নির্লজ্জ মানব-সমাজকে ভয় বা লজ্জা করিবার ভিখারিণীর কি আছে? তাঁহার তাই অনুরোধ—

ভিখারিণী, কথা রাখ
বিবসনা হ'য়ে থাক্—

কারণ এই বিবসনা ভিখারিণীই এক দিন সমাজে প্রলয়ঙ্করী দুর্জয় শক্তিময়ীরূপে দেখা দিবে—সেই বিবসনা শক্তিময়ীর প্রলয় নৃত্যে ভণ্ডামি আর মিথ্যার সৃষ্টি খান্ খান্ হইয়া ভাঙিয়া ধ্বসিয়া যাইবে—তার পরে আবার জাগিবে নূতন সৃষ্টি—নববিধানে গড়া নূতন মানব সমাজ।—

তোরি মত কালো মেয়ে
রূপসী বা তোরও চেয়ে,—
হয়তো এমনি কোনো দুখে
ফেলিয়া কটির বাস
হেসে উঠে অট্টহাস
পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে।
তখনি বিশ্বের লোক
চমকি' মেলিয়া চোখ
আনে পূজা শত-উপচার;
বলে—একি রূপরাশি
তিমিরে তিমির-নাশী!
দয়াময়ী তুমি মা আমার!
শুনে কালো মেয়ে হাসে,
ভুবন ভরিয়া ত্রাসে
তথৈ তাথৈ নেচে ধায়;
কপালের দুখ যত
অনল-গিরির মতো
কপাল ভাঙিয়া বাহিরায়।

কবি তাঁহার দ্বিধাহীন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন,—পুরনো যুগটা একটা 'প্রলয়ের লয়ের মুখে' একটা ভাঙা বছরের মতন ভাঙিয়া যাইতেছে,—এই ভাঙার মুখে শুধু দ্বন্দ্ব করিয়া লাভ নাই, —এখন যে 'কালবোশেখে কালো মেঘে' শুধু ঝড়ের পালা দেখা দিয়াছে! কবির জীবন দেবতা 'ভূতনাথ' যে সেই ঝড়ের মাতনে মাতিয়া উঠিয়াছেন! এখন—

পেটের দায়ে কচমচিয়ে
চিবোয় পদ্মাসনের মৃণাল,
কটির দায়ে গুহায় ফিরে
বাঘের গায়ে তুলছে যে ছাল,
ভূতনাথের নাচের তলে
ভিড়ে বা সেই ভূতের দলে,
যার কাছে তুই মন্ত্র নিলি
সেই ঠাকুরের রাখরে মান।
ভাঙা পাঁজর ডুগডুগিয়ে
বেসুর রাগে বেতাল দিয়ে
হাহা স্বরে ওঠরে গেয়ে
আসর ভাঙার শেষের গান।

শোষক এবং বঞ্চক মানুষের প্রতি কবি যতীন্দ্রনাথের এই যে তীব্র ঘৃণা এবং শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি এই যে গভীর সহানুভূতি বাঙলা কবিতার ইতিহাসে ইহার একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আজকের দিনের সর্বহারা-সর্বস্ব কবিতার ডামাডোলের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য হয়ত সহসা চোখে পড়িবার নয়, কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে তথ্যটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া আমাদেরও লক্ষ্যণীয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, উপরে যতীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলির উল্লেখ এবং আলোচনা করিলাম তাহাকে বেশি ইনাইয়া বিনাইয়া না বলিয়া সাম্প্রতিক সুপ্রসিদ্ধ একটি ছকের মধ্যে ফেলিয়া অতি সহজেই বোঝা যাইতে পারে—তাহা হইল শ্রেণী-বৈষম্য এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ছক—এবং সেই বৈষম্য এবং সংগ্রামের ফলে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব এবং নয়া দুনিয়ার পত্তনের কথা। আজকের দিনে এ কথাগুলির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা অনেক লোকের মধ্যেই—হয় জীবনবোধ-রূপে—না হয় জীবন-বুলিরূপে! বোধরূপেই হোক আর বুলি-রূপেই হোক—এই জাতীয় ভাব ও

চিন্তার যে সাম্প্রতিক ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার তাহার পশ্চাতে সাম্প্রতিক কালে মার্ক্সবাদের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যখন এই সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার প্রথম যুগে বাংলা দেশে মার্ক্সবাদের এমন ব্যাপক প্রসার ছিল না। তখনও তাহা ব্যষ্টির চিন্তায় ধাক্কা দিতেছে—সমষ্টির বিশ্বাসে বা প্রবণতায় বা প্রথায় পরিবর্তিত হয় নাই। তা ছাড়া আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, রাজনৈতিক মতামত বা জীবন-দর্শনের 'থিওরি'র প্রশ্ন তুলিলে যতীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী ছিলেন না, তাঁহার আনুগত্য বরং ছিল গান্ধীবাদের প্রতি। অবশ্য গান্ধীজীর আস্তিক্যবাদী জীবনদর্শনের প্রতি তাঁহার কোনও গভীর আনুগত্য ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস নয়। এ সকল কথার আদৌ উল্লেখ করিতেছি এই জন্ম যে, কোনও রাজনৈতিক উগ্রচেতনার প্রভাব ব্যতীতই যতীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া এই সত্যটিই লক্ষ্যণীয় হইয়া উঠিয়াছে, সাধারণ যুগধর্ম ব্যাপক ভাবে জাতীয় জীবনে স্পষ্ট প্রকাশ লাভ করিবার পূর্বে সূক্ষ্মসম্বেদনশীল কবি-মানসে কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়া ওঠে। ক্রমঘনীভূত মনুষ্যপ্রীতি বর্তমান যুগের কবির মনে এই কৃত্রিম শ্রেণীবৈষম্য এবং তজ্জনিত অবিচার এবং বেদনা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিবেই—যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার এই জাতীয় কবিতার প্রেরণার পিছনে কোনও উগ্র রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষা তাঁহার সাধারণ সমাজ-চেতনাই অধিক সক্রিয় ছিল বলিয়া তাঁহার আন্তরিকতায় আমরা কোথাও বিন্দুমাত্র সন্দিহান নই,—এবং এই অসংশয় তাঁহার এই-জাতীয় কবিতার রসগ্রহণে আমাদের অনেকখানি সাহায্য করে। 'ত্রিযামা'র কতগুলি কবিতার মধ্যে কবি যখন বঞ্চিত মানবের ভাবী বিদ্রোহ এবং আমাদের সমাজ-জীবনে মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তখন অবশ্য এ-সব কথা এবং আদর্শ আমাদের জীবনে একান্ত অভিনব ছিল না; কিন্তু পূর্বাপরের সহিত যোগ বিচার করিলে দেখিতে পাইব—তাঁহার পূর্ববর্তী কবিতার ভিতরেই এই বিদ্রোহ এবং মহাপ্রলয়ের বীজ নিহিত আছে। অন্ত আরও অনেক প্রবণতার ন্যায় কবির এই প্রবণতার ভিতর দিয়াও সমাজ-জীবনের গভীর স্তরে স্তরে প্রবাহিত শক্তিগুলি কি করিয়া সাধারণ লোকের অনুভূতির অন্তরালে কবিমানসে স্পন্দন তুলিতে থাকে তাহারই আমরা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি।

এখন কুসুম-রাতি

বন্দে আলী মিয়া

এখন আঁধার রাত—শীতল বাতাস আসে জানালার ফাঁকে
মলিন প্রদীপ-শিখা কাঁপাইছে ক্ষণে ক্ষণে ঘরের ছায়াকে।
বসে আছি গৃহ-কোণে—কোনো কাজে আজ আর নাহি মোর মন—
আগামী দিনের তরে নাহিক তাগিদ কিছু—কোনো আয়োজন।

এখন দুপুর রাত—জ্বালা করে দু'টি চোখ—আসে নাকো ঘুম
আসিছে সোঁদাল বাস—আগাছায় ফুটেছে বা রাতের কুসুম।
আকাশের ছায়া আর সাগরের নীল রং মিশেছে আঁধারে
নিশীথ ধরণী মোর পাণ্ডুর হয়ে আসে দেখি বারে বারে।

আজিকে আমার মনে পুরানো দিনের সাধ করে আসে ভিড়
সবারে আড়াল দিয়ে চাহি আজ এক কোণে রচিবারে নীড়।
একটি নতুন সাথী—সোনালি স্বপনে তার ফুল-পরিবেশ—
ঘুমের মতন রবে আমার কামনা তায় ঘিরে অনিমেষ।

ধূসর প্রদোষে মোর নূতন সূর্য্য জাগে—জাগে কালো পাখী
আকাশের সাত-রঙা মেঘ-লোক পার হয়ে এসেছে সে নাকি?
চেয়েছিনু যারে আমি—এ যে নয়—অকারণ এই পরিচয়
হাসির আড়ালে কাঁদে তার তরে আজি দিন বৃথা অপচয়

এখন ফুলের মাস—রাতের বাতাস আসে—ঘুমাব না আর
জনতার মাঝে যে বা হারায়েছে তারে হেথা খুঁজিব আবার।
যে-ভুল রয়েছে জমা—বার বার তার সাথে হলো পরিচয়
আজ এ বন্ধ্যা-রাত্রি প্রদীপ-শিখার মতো নিঃশেষ হয়।

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দুই

দীর্ঘ বাইশ বছর পরে ছবির মতই যেন ভেসে উঠছে বাইশ বছর আগেকার জীবনটা অভিনেতা চন্দ্রকুমারের চোখের সামনে। কিছুই মুছে যায়নি। কিছুই অস্পষ্ট নয়। স্মৃতির পটে আজো জ্বলজ্বল করছে।

* * * *

চন্দ্রহারের মত বেষ্টন করে গ্রামটাকে খালটা যেখানে এসে মিশেছে দিগন্ত-প্রসারী এক কালো জল বিলে: তারই নাম কৃষ্ণসাগর।

আর ঐ কৃষ্ণসাগরের নামেই গ্রামের নাম কৃষ্ণসাগর। পনের-ষোল বছর আগেও সন্ধ্যার পর সেই ভয়াবহ বিল—কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে অতি-বড় দুঃসাহসীরও বুকটা কেঁপে উঠতো।

বিলের মধ্যে থেকেই চোখে পড়ে জমিদার রাজশেখর রায়ের বিরাট প্রাসাদ। কলকাতার পাঠ শেষ করে আজ রাজশেখরের একমাত্র পুত্র শশাঙ্কশেখর ফিরে আসছে। জমিদার-বাড়ির সিংহ দরজায় বসেছে সানাই। দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব, কদলী বৃক্ষ।

নাট-মন্দিরে ছেলের পাল হৈ-হৈ করছে। সারাটা গ্রামের লোক ছেলে-বুড়ো মেয়ে-বৌ জমিদারগৃহে যেন ভেঙ্গে পড়েছে।

সুরেশ্বরী দেবী রাজশেখরের স্ত্রী—লাল পাড় গরদের শাড়ী পরে গৃহদেবতা গোপীবল্লভের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত থাকলেও মন তার পড়ে ছিল তাঁর দীর্ঘকাল পরে গৃহাভিমুখী পুত্রের পথের দিকে।

তার বড় আদরের একমাত্র পুত্র শশাঙ্কশেখর পাঠ শেষ করে গৃহে ফিরছে। এইবার পুত্রের বিবাহ দিয়ে একটি পুত্রবধূ আনবেন। এত কাল পুত্রকে বিবাহে মত করাতে পারেননি সুরেশ্বরী। কেবলই সে দোহাই দিয়েছে পড়াশুনার। সেই পড়াশুনা আজ শেষ হয়েছে। এবারে তার কোন আপত্তিই শুনবেন না। মেয়েও তিনি দেখে রেখেছেন। পছন্দও হয়েছে সুরেশ্বরীর মেয়েটিকে খুব। নিশ্চিন্দপুরের চৌধুরীদের বড় তরফের মেয়েটি। নামেও যেমনি স্বর্ণময়ী—দেখতেও সে তেমনি। সত্যিই যেন স্বর্ণ দিয়ে গড়া স্বর্ণ-প্রতিমা সোনার পুতুল।

সুরেশ্বরীর একটি মাত্র মেয়ে মাধবী। সৎ-পাত্রেই তাকে দান করা হয়েছে।

মাধবী এসে পূজার ঘরে প্রবেশ করল। 'মা!—'

'কেন রে মাধু!—' সুরেশ্বরী মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'বাজনদারদের জল-পান পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মা?'

'হাঁ রে উনি কোথায়?—'

'বাবা ত কাছারী-বাড়িতেই বসে আছেন।'

এমন সময় বাইরে সদরে একটা মিলিত কণ্ঠের গোলমাল শোনা গেল। ছোট হুজুর। ছোট হুজুর এসেছেন।

'মা, দাদা বোধ হয় এলো।—' বলতে বলতে দ্রুত পদে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে ছাতের দিকে ছুটে চলে গেল মাধবী।

সুরেশ্বরীর চোখের কোল ভিজে ওঠে।

কালো পাথরের গোপীবল্লভ। গৃহদেবতা পাঁচ পুরুষের। বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে বঙ্কিম ঠামে। মাথায় শিখি-চূড়া। গলায় সোনার চন্দ্রহার, প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়, হাতে মোহন বাঁশী।

সুরেশ্বরী গোপীবল্লভের রূপার সিংহাসনের তলায় গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম জানালেন।

বাইরের সদরে তখন—

প্রকাণ্ড কাছারী-বাড়ির বড় বড় থামওয়ালা পঙ্খের কাজ-করা টানা বারান্দার সম্মুখের পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জমিদার রাজশেখর রায় প্রবাস-প্রত্যাগত পুত্রের অপেক্ষায়। বিরাট দশাসই লম্বা-চওড়া পুরুষ। আগুনের মত টকটকে গাত্রবর্ণ। মাথায় বাবরি চুল একেবারে শ্বেত-শুভ্র! পরিধানে পট্টবস্ত্র। পায়ে কাষ্ঠপাদুকা।

বিলের ধার থেকে বরাবর হেঁটেই এসেছে শশাঙ্কশেখর।

পাল্কী গিয়েছিল কিন্তু পাল্কীতে ওঠেনি। পাল্কী শূন্য, পিছনে পিছনে আসছে।

শশাঙ্কশেখর এগিয়ে এসে নত হয়ে পিতার পদধূলি নিতেই রাজশেখর প্রবাস-প্রত্যাগত পুত্রের মাথায় দক্ষিণ হাতখানি রেখে আশীর্বাদ করলেন। গম্ভীর প্রকৃতির রাজশেখর চিরদিনই স্বল্পভাষী!

একমাত্র পুত্রকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন বটে কিন্তু বাইরে সেটা বড় একটা প্রকাশ পেত না।

মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কেবল: 'ভাল ছিলে ত শেখর?'

'আজ্ঞে হাঁ।—'

'পথে কোন কষ্ট হয়নি?'

'না।'

'হেঁটে এলে কেন? পাল্কী গিয়েছিল—'

'হেঁটেই আসতে ভাল লাগলো বাবা!'

'ভুলো না—তোমার একটা বংশগৌরব, একটা মর্যাদা আছে—

চিরদিন পিতা-পুত্রের মধ্য ঐখানেই বিবাদ। মতের অমিল।

পুরাতন দিনের সেই বংশমর্যাদা ও ধন-ঐশ্বর্যের আভিজাত্যের মোহ আজ মানুষকে ভুলতে হবে। আভিজাত্যের সংস্কারের প্রাচীরকে আজ না ভেঙ্গে ফেললে বাঁচা যাবে না।

কিন্তু পিতা রাজশেখর এ কথায় কান দিতেই চান না।

তাঁর ধারণা, ঐ মনোবৃত্তির মূলে আছে ক্রমব্যাপ্ত ইংরাজী শিক্ষা। ইউরোপীয় সভ্যতা ও চারিত্রিক দুর্বলতা। কিন্তু মুখ তুলে পিতার সামনে দাঁড়াবার দুঃসাহস আজও শশাঙ্কশেখরের হয় না।

গম্ভীর স্বল্পবাক পিতার চতুষ্পার্শ্বে এমন একটা দুর্ভেদ্য কঠিন বর্ম রয়েছে যার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে অতি-বড় প্রতিপক্ষেরও মাথা নীচু করে ফিরে আসতে হয়।

'মা! মা গো—মা!—'

পুত্র একেবারে পূজার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'দাঁড়া বাবা আসছি—একটু অপেক্ষা কর।' সুরেশ্বরী দেবী বললেন পুজার ঘর থেকে।

'না। শীগ্‌গির বের হ'য়ে এসো—নইলে এখুনি তোমার ঠাকুর-ঘরে ঢুকে তোমাকে জড়িয়ে ধরবো—' মাকে হুমকি দেয় ছেলে শিশুর মত আব্দারে।

'ওরে না, না। লক্ষ্মী বাবা, দাঁড়া আসছি। মা বাধা দেন ব্যস্ত হ'য়ে।

'উ হুঁ! শীগ্‌গিরী—ওয়ান-টু-থ্রি গোণবার আগেই যদি না বের হয়ে এসো ত তোমার কালাপাহাড় মন্দিরে প্রবেশ করবেই'। বলতে বলতে সত্যি সত্যিই শশাঙ্কশেখর গুণতে শুরু করে ওয়ান। টু—

সুরেশ্বরী ঠাকুর-ঘর থেকে বের হ'য়ে এলেন।

চওড়া রক্ত লাল-পাড় গরদের শাড়ি পরিধানে। মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন।···হাতে তামার পাত্রে ঠাকুর গোপীবল্লভের প্রসাদী পুষ্প!

শশাঙ্কশেখর নত হয়ে প্রথমে মায়ের পায়ের ধূলো নিল। সুরেশ্বরী পুত্রের মাথায় ঠাকুরের প্রসাদী পুষ্প ছোয়ানোর মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে পুত্র দুই হাতে জননীকে জড়িয়ে ধরল।

কি আর করেন সুরেশ্বরী! পার্শ্বেই দণ্ডায়মান কন্যা মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন: 'পাত্রটা ধর মা! পাগলটা যখন ক্ষেপেছে—'

মাধবী মায়ের হাত থেকে পাত্রটা নেয়।

সুরেশ্বরী যেন দু' হাতে পুত্রকে বক্ষের মধ্যে টেনে নেন সজল চক্ষে।

'মা! মা! মা গো—আমার মা-মণি! আমার মা-সোনা—' দুই হাতে জননীকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকের মধ্যে শিশুর মত মাথা ঘষতে থাকে ছেলে।

'বুড়ো ছেলের আদর খাবার বহরটা দেখ না'—মাধবী বলে ওঠে।

'দেখ মা! দেখ মাধু মুখপুড়ির হিংসাটা। একবার দেখ। ঐ মুখপুড়িটাকে শ্বশুর-বাড়ি থেকে আবার কেন আনাতে গেলে বল ত মা? পরের ঘরে একবার পার করা হয়েছে যখন তখন আবার কেন?—চুকে-বুকে গিয়েছে'—

'হ্যাঁ তাই বৈ কি! একা-একাই যত আদর খাবেন উনি—যেন একা ওরই মা!'—তীব্র প্রতিবাদ জানায় মাধবী।

মা সুরেশ্বরী হাসতে থাকেন, ছেলে-মেয়ের ঝগড়া শুনে হাসতে থাকেন।

'ভাগ্‌। তোর আবার মা কি রে মুখপুড়ি! তোর মা ত বাদুরঘাটে। এখন ত নির্মলের মা'ই তোর মা।'—বলে উঠে শশাঙ্কশেখর।

'চল!—চল এখন হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হবি চল ত—'

সুরেশ্বরী ছেলেকে তাড়া দেন। তার পর কন্যা মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললে: 'মাধু, যা দেখ ত মা—বামুন ঠাকরুণকে আমার ঘরে তোর দাদার জলখাবার নিয়ে আসতে বল।'

'বয়ে গিয়েছে তোমার ছেলের তদারক করতে আমার। দরকার থাকে দাদা নিজে গিয়েই বলে আসুক না!—'

কিন্তু মুখে প্রতিবাদ জানালেও মাধবী অন্দরের দিকে ভাইয়ের জলখাবারের তদারক করতেই চলে গেল কিন্তু।

সুরেশ্বরী হাসেন।

ভাই-বোনে ওদের যে কতখানি ভালবাসা তার চাইতে আর বেশী কে জানে? ওদের ঝগড়াও যেমনি, ভালবাসাও তেমনি।

তিন মহালা জমিদার-বাড়ি।

সেকেলে বিরাট বিরাট থামওয়ালা দালান। রাত্রে এক মহাল থেকে অন্য মহালে যেতে গা ছম-ছম করে।

সদর ও কাছারী-বাড়ি কিন্তু অন্দরের থেকে একেবারেই পৃথক।

অন্দরের দুটো মহাল। একাংশে ঠাকুর-বাড়ি—নাটমন্দির ও দাস-দাসী নায়েব-গোমস্তা দরোয়ান কর্মচারীরা ভিড় করে আছে অন্য অংশের আবার দুটি ভাগ। এক ভাগে নিকটবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজন ও আশ্রিত জনের ভিড়। অন্য ভাগে রাজেশ্বর রায় নিজে ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রেরা থাকেন।

একেবারে শেষের মহাল।

জলখাবার খেয়ে সকলের কুশল ইত্যাদি নিয়ে নিজের বাক্স খুলে একটা মুক্তোর মালা বের করলে শশাঙ্ক।

মাধবীর জন্য কলকাতা থেকে সে এনেছে।

খুঁজতে খুঁজতে মাধবীকে এসে শশাঙ্ক দ্বিতলের দক্ষিণের ঘরে আবিষ্কার করে।

মাধবী একটা আসনের পরে ফুল তুলছিল ছুঁচ-সুতো নিয়ে।

সোজা একেবারে শশাঙ্ক মাধবীর পাশটিতে এসে বসে। এবারে ভাব করতে হবে কি না।

'কার জন্য আসনটা তৈরী করছিস রে মাধু! আমার জন্য বুঝি?'—

মাধবী কিন্তু ভাইয়ের প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। নিজের সুচী-কার্যেই ব্যস্ত থাকে।

'রাগ করেছে নাকি আমাদের মাধবী রাণী!—'

তথাপি নিরুত্তর মাধবী। কোন জবাব নেই।

'বেশ। মাধবী দেবী তবে রাগ করেই থাকুন! কলকাতা থেকে যে মুক্তোর মালাটা এনেছিলাম পদ্ম দাসীকেই দিয়ে দোবো—'

এবারে আর কিন্তু মূক থাকে না মাধবী।

দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে: সত্যি এনেছো দাদামণি?

'সত্যি না ত কি মিথ্যে! এই দেখ'—

মুক্তোর মালাটা হাতে নিয়ে দোলাতে থাকে শশাঙ্কশেখর।

'কই দেখি—দেখি'—

'উঁহু! আগে শুনি এই মুক্তর মালার বদলে আমার ভাগ্যে কি জুটছে—বিনামূল্যে এমন একটা মুক্তর হার কি মেলে?—'

হঠাৎ মাধবীর একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুখে হাসি দেখা দেয়। এবং হাসতে হাসতে বলে: নিশ্চয় মূল্য পাবে বৈ কি দাদামণি! আমিও দেবো বদলী কণ্ঠহার'—

'তাই না কি রে? কণ্ঠহারের বদলে মুক্তোর হার! তবে ত আর না দিলে চলবে না—নে'—

মুক্তোর হারটা গলায় ঝুলিয়ে মাধবী বলে : 'তুমিও পাবে। তবে একটা মাস দেরী করতে হবে '

'ও নিজের বেলা নগদা-নগদি আর পরের বেলায় পরে—উহুঁ তা হচ্ছে না ! কোথায় তোর হার, যা শীগ্‌গিরি আন'—

'আসছে গো আসছে। একটা মাস ধৈর্য ধরে থাকো। তবে হাঁ নামটা বলছি সে কণ্ঠহারের—স্বর্ণময়ী ! সত্যি ! দাদা ভাই ! দুধে-আলতা রং—নিশ্চিন্দপুরের চৌধুরীদের বড় তরফের মেয়ে'—

'বটে !'—

'হাঁ ! মার ত মেয়ে দেখে ভারী পছন্দ হয়ে গিয়েছে। আসছে ফাল্গুনেই'—

'হুঁ। বুঝলাম। তা পাত্রটি কে ?'—

'আহা !'—

'তা খুকীটির বয়স কত ?'—

'তুমি যা ভাবছো তা কিন্তু নয় দাদাভাই—দশ বৎসর পার হ'তে চলল'—

'বলিস কি রে। তবে ত তোর শাশুড়ীর বয়সী'—

'কিন্তু বয়স যাই হোক, বেশ বড়-সড়টি দেখতে। মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো'—

'জিজ্ঞাসা আর করতে হবে না। শুনেই উপলব্ধি হচ্ছে।'—বলতে বলতে শশাঙ্কশেখর বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

মাকে এবারে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না শশাঙ্কশেখর জানে। এত দিন পরীক্ষার দোহাই দিয়ে শশাঙ্ক বিবাহের ব্যাপারটা ঠেকিয়ে এসেছে কিন্তু আর বোধ হয় সেটা সম্ভবপর হবে না, কিন্তু তাই বলে একটা নয় দশ বছরের কচি খুকীকেও শশাঙ্ক বিবাহ করতে পারবে না।

তিন

আরো দিন দশেক বাদে সুরেশ্বরী একদিন সন্ধ্যায় শশাংক যখন মার কোলে মাথা দিয়ে ছাতে শুয়ে আছে কথাটা তুললেন। এবং কোনরূপ দ্বিধা না করে একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবেই বললেন।

'শেখর কাল নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে একবার নিশ্চিন্দপুর যাবি'—

শেখর সব বুঝতে পারলেও প্রশ্ন করে : 'সেখানে হঠাৎ কেন মা ?'

'সেখানকার চৌধুরীদের বড় তরফের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে দেখে আসবি'—

'কিন্তু মা, সে ত শুনেছি একেবারে ছেলে-মানুষ—আর তাছাড়া এই ত সবে বাড়ি এলাম মা ! যাক না আর কয়েকটা দিন'—

'না। এবারে আর তোর কোন আপত্তিই আমি শুনছি না। এই ত একটা বছর মাধু ছিল না। সমস্ত বাড়িটাই যেন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল—দু'মাস বাদে আবার সে চলে যাবে।'—

'কিন্তু মা ! এখন ত আমিই আছি'—

'তা হোক। যে সময়ের যা চৌধুরীদের মেয়ে দেখে তোমার পছন্দ না হয় সে আলাদা কথা—কিন্তু জেনো, এবারে বিবাহ তোমার আমি দেবোই'—

সুরেশ্বরীর বড় ভয়।

শশাঙ্কশেখর একটি মাত্র ছেলে তার।

তা ছাড়া যে বংশে তার জন্ম : ভাবতেও কেঁপে ওঠে তার অন্তর। ভীরু জননী তাই ত স্বামীর একান্ত অমতেও একমাত্র পুত্রকে চেয়েছিলেন সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এবং তাই তাকে স্নেহের খাতিরে আঁচলের তলায় না রেখে দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবং অতি সাধারণ ভাবে যাতে করে সে অন্যান্য দশ জন সমবয়েসীর সঙ্গে থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে সেই ভাবে ঠিক প্রয়োজনীয় খরচ-পত্র ছাড়া কখনো একটি পয়সা বেশী স্বামীকে পাঠাতে দেননি।

স্বামীর কোন কথাতেই তিনি কান দেননি।

রাজশেখরও কেন জানি পুত্রের ব্যাপারে স্ত্রীর ইচ্ছায় বাধা দেন নি।

পুত্র তার মনোমত শিক্ষালাভ করে ফিরে এসেছে।

এইবার তাকে মনোমত সুন্দরী একটি পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান।

চৌধুরীর বড় তরফের যে মেয়েটিকে তিনি দেখেছেন সে সব দিক দিয়েই শশাঙ্কর যোগ্যা।

নায়েব শ্যামাকান্তর সঙ্গে দিন দুই পরে সুরেশ্বরী পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন চৌধুরীদের মেয়েটিকে দেখবার জন্য। যদিও ঐ সময় নিয়ম ছিল না পাত্রের নিজে গিয়ে তার পাত্রী দেখা। এবং রাজশেখরও আপত্তি তুলেছিলেন : কিন্তু বড়বৌ ! এ বংশের নিয়ম নয় ছেলে গিয়ে নিজের পাত্রীকে দেখে।

'তা নাই থাক ! আমার শিক্ষিত ছেলে, তার সঙ্গে যে মেয়ের বিবাহ হবে তাকে সে নিজে দেখে পছন্দ করে করবে এই আমার ইচ্ছা !—এ ব্যাপারে তুমি বাধা দিতে এসো না।—'

'কিন্তু জেনো এতে মঙ্গল হবে না ! এ বংশের চিরন্তন নীতিকে লঙ্ঘন করে—'

'নীতি ! সে ত এক দিন আমরাই তৈরী করেছিলাম প্রয়োজনে—আজ আবার প্রয়োজনে যদি সেই নীতিকে লঙ্ঘন করি তাতে কোন অন্যায় বা অমঙ্গলই হবে না জেনো।—'

'বেশ ! তুমি যা ভাল বোঝ কর—'

কিন্তু কুক্ষণেই মায়ের নির্দেশে শশাঙ্কশেখর নায়েবের সঙ্গে চৌধুরীদের মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। মেয়ে দেখে ফিরবার পথে শশাঙ্ক একা-একাই আগে আগে ঘোড়ায় চেপে কৃষ্ণসাগরে ফিরছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পথ এখনো অনেকটা বাকী। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাচ্ছিল শশাঙ্কশেখর।

পথের মধ্যে একটা খাল লাফিয়ে ডিঙ্গাতে গিয়ে বেটক্কর ঘোড়াটা পড়ে গেল। শশাঙ্কশেখর ছিটকে পড়ল জলের মধ্যে ! এবং জলের মধ্যে ছিটকে পড়ায় কোন মতে গুরুতর আঘাত হ'তে বেঁচে গেল।

ঘোড়াটার পা রীতিমত জখম হয়েছে, তার আর চলবার শক্তি ছিল না। অগত্যা ভিজে জামা-কাপড় নিয়েই শশাঙ্কশেখরকে হেঁটেই চলতে হলো। সোজা পথে না গিয়ে কৃষ্ণসাগরের ধার দিয়ে গেলে একটু তাড়াতাড়ি গৃহে পৌছান যাবে ভেবে শশাঙ্ক সেই পথ ধরেই চলে।

সমস্ত শরীরে অসহ্য ক্লান্তি। তায় আবার এত দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটা অভ্যাস নেই।

কোন মতে মন্থর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে শশাঙ্ক।

কৃষ্ণসাগরের কালো জলে অন্ধকার চাপ চাপ হয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে। প্রথম রাতের আকাশে ফুটে উঠেছে একটি দু'টি করে অনেকগুলো তারা।

জলের কোল ঘেঁষে হোগলা ও বেতবনে মাঝে মাঝে সর-র শব্দ জাগে। আর চলা যাচ্ছে না। বসে কোথায়ও খানিকটা বিশ্রাম নিলে হতো।

কিন্তু এখানে বিশ্রাম নেবেই বা কোথায়?

হঠাৎ নজরে পড়ল দূরে একটা কম্পিত আলোর শিখা। কোথা হ'তে আসছে ঐ আলো! চিন্তা করে শশাঙ্কশেখর।

এখানে কৃষ্ণসাগরের ধারে আলো! বিস্ময়ে কৌতূহলে এগিয়ে চলে শশাঙ্কশেখর।

আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যাবার পর শশাঙ্কশেখর বুঝতে পারে অনতিদূরে তাদেরই বাগান-বাড়িটা একেবারে কৃষ্ণসাগরের কোল ঘেঁষে।

কিন্তু বাগান-বাড়ি ত খালি এবং তালা দেওয়াই পড়ে আছে দীর্ঘ দিন ধরে। তবে বাগান-বাড়িতে আলো এলো কোথা থেকে?

কৌতূহলে শশাঙ্ক ক্রমে একেবারে বাগান-বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ!

যে খোলা জানালা-পথে আলো দেখা যাচ্ছিল শশাঙ্ক অতঃপর সেই খোলা জানালার দিকেই এগিয়ে গেল।

মাটি থেকে জানালাটা কিছু উঁচু হলেও শশাঙ্কর পক্ষে পায়ে ভর দিয়ে জানালা-পথে উঁকি দিতে কষ্ট হলো না।

কিন্তু উঁকি দিয়ে ঘরের মধ্যে স্বল্পালোকে যে দৃশ্য শশাঙ্কর চোখে পড়ল সে তার কল্পনাতীত! ঘরের এক কোণে একটা কাষ্ঠ-দণ্ডের উপরে জ্বলছে একটা বাতি। সেই বাতির আলোয় বসে একটি মেয়ে দর্পণের সামনে কেশ প্রসাধনে রত।

এ কি সত্য জীবন্ত কোন নারী এই পৃথিবীরই? না কোন কল্পলোকের রূপকথার কোন কুঁচবরণ রাজকন্যা!

বাতির আলোয় মনে হয় বুঝি মোমে-গড়া কোন পুতুল।

এই নির্জন পরিত্যক্ত বাগান-বাড়িতে কোথা থেকে এলো ঐ মোমে-গড়া পুতুল? কোন দেশের কোন কল্পলোকের রাজকন্যা! চোখের পলক পড়ে না শশাঙ্কশেখরের।

গৃহে ফিরে এলো শশাঙ্কশেখর।

মা প্রশ্ন করলেন, 'কেমন মেয়ে দেখলি শশাঙ্ক!—'

অন্যমনস্ক শশাঙ্কর সমস্ত মন জুড়ে তখন সেই কল্পলোকের মোমের পুতুল। সে অসংলগ্ন জবাব দেয় 'হ্যাঁ—'

'মেয়ে কেমন দেখলি?—'

'ও ত একেবারে ছেলেমানুষ মা!—'

'ছেলেমানুষ আবার কোথায়—দশ এবারে পেরুবে—তা'ছাড়া মেয়ে ছেলে, বিয়ের পর দেখতে দেখতে বেড়ে উঠবে।—'

সুরেশ্বরী ছেলেকে আর বেশী বিরক্ত করলেন না। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এসে ক্লান্ত—এখন বিশ্রাম নিক, পরে সময় মত আবার কথাটা উত্থাপন করা যাবে।

শয্যায় শুতে গিয়েও অনেকক্ষণ শশাঙ্কর চোখে ঘুম এলো না। ক্ষণেকের দেখা সেই মোমের পুতুলের মুখখানিই ঘুরে ঘুরে মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

কেশ প্রসাধনরতার সেই অপরূপ শিথিল ভঙ্গীটি যেন এখনো স্পষ্ট হ'য়ে আছে তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে।

কিন্তু কে ঐ নারী নির্জন বাগান-বাড়ির মধ্যে!

কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে শশাঙ্কর অবশ্য বিশেষ এত কাল কোন নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে।

বৎসরে ৺পূজার ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটি ব্যতীত শশাঙ্ক কৃষ্ণসাগরে বড় একটা আসতই না। এবং এলেও যে সময়টা সে এখানে কাটাত বাড়ি থেকে বড় একটা বেরই হতো না। নিজের পড়াশুনা নিয়েই কাটাত, নচেৎ মধ্যে মধ্যে বিলের জলে নৌকা নিয়ে শিকার করত।

উদ্যানবাড়িটা যেখানে সেদিকে বড় একটা শশাঙ্ক কখনো যায়নি।

বছর খানেক আগে একবার ছুটিতে এসে শশাঙ্ক শিকার করতে করতে ঐ দিকে গিয়েছিল। কিন্তু সে সময়ও দেখেছে বাগান-বাড়ির জানালা-দরজা সব বন্ধ!

ওদিকটায় কোন লোকের বসতি না থাকায় জংগলাকীর্ণ ও নির্জন। রাতে ত কথাই নেই। দিনের বেলাতেও ওদিককার নির্জনতা কেমন যেন দুঃসহ মনে হতো! সেই নির্জন বাগান-বাড়িতে কে এলো ঐ সুন্দরী মেয়েটি!

বয়স কুড়ি-বাইশের বেশী হবে না। তার চাইতে সামান্য হয়ত ছোট হবে। একাকিনী নারী ঐ নির্জন বাগান-বাড়িতে কেমন করে আছে! কি ওর পরিচয়?

রাত্রে ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে বার বার শশাঙ্কশেখরের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে ক্ষণেকের দেখা মৃদু আলোয় সেই অপরূপ সুন্দর মুখখানি। এবং পরের দিন কৌতূহলকে কিছুতেই শশাঙ্কশেখর দমন করতে পারলে না। বের হ'য়ে পড়ল সেই নির্জন বাগান-বাড়ির উদ্দেশে। জানতে হবে কে ঐ মেয়েটি! কি ওর পরিচয়।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়া চারি দিকে নেমেছে। অদ্ভুত একটা নির্জনতা চার পাশে। ঝোপে-ঝোপে জোনাকী জ্বলছে আর নিবছে। কোথায় যেন ঝিঁঝি ডাকছে একটানা করুণ একটা কান্নার মত। বাগান-বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শশাঙ্কশেখর। একটু দ্বিধা একটু ইতস্ততঃ। তারপর বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত হানে। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। এবারে বেশ একটু জোরেই আঘাত করে বন্ধ দরজার গায়ে।

'কে?'—এবারে ভিতর হ'তে সাড়া এলো মৃদু নারী-কণ্ঠে। বুকের ভিতরটা দুপ-দুপ করছে কি একটা উত্তেজনায়। আবার করাঘাত করে শশাঙ্ক বন্ধ দরজায় দরজাটা খুলে গেল। এবং খোলা দরজাপথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গত রাত্রের দেখা সেই তরুণী। হাতে তার একটি বাতি।

'কে?—'

'আমি। শশাঙ্ক—'

নীলাম্বরী একটি সাড়ী পরিধানে। মাথায় ঘোমটা নেই, চুল বাঁধা। চাঁদের মত সুন্দর শুভ্র কোমল ললাটে টানা টানা বঙ্কিম ছু'টি জ্রর ঠিক মধ্যস্থলে কাচপোকার একটি টিপ।

আর দুটি চোখের দৃষ্টিতে একটা ভীতি একটা ভীরু সংশয় যেন।

মুগ্ধ নির্বাক্ বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে কতক্ষণ যে তাকিয়ে থাকে দু'জনার একজনও টের পায় না।

'দেখুন! আপনি কে জানি না! চিরদিন জানি এ বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। হঠাৎ কাল সন্ধ্যায় এই পথ দিয়ে ফিরছিলাম এবং এই বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে কেমন কৌতূহল হলো। কৌতূহলের বশেই আপনার অজ্ঞাতে জানালা-পথে উঁকি দিয়ে আপনাকে দেখতে পাই! তাই আজ আবার এসেছি সেই কৌতূহলের বশেই আপনার পরিচয় জানতে। যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে, বলবেন কি—কে আপনি?—'

'আমার পরিচয় জেনে আপনার কি হবে বলুন ত?—' তরুণী বলে।

'বললাম ত আপত্তি থাকলে আমি জানতে চাই না। তবে এই নির্জন জায়গায়, জমিদারের এই নির্জন পড়ো বাগান-বাড়িতে কেমন করে যে আপনি এলেন—'

তরুণী শশাঙ্কর কথার কোন জবাব দেয় না এবারে।

'আমি আপনাকে নিশ্চয়ই বিরক্ত করছি—'

'না। না—আসুন না ভিতরে। বাইরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন—'

'ভিতরে আসবো! কিন্তু যদি কেউ—'

'কেউ ত এখানে নেই! একজন বুড়ো বিহারী ঝি আর আমি থাকি!—'

'বলেন কি! আপনার ভয় করে না?—'

'ভয়! না ভয় আমার করে না!—'

'আশ্চর্য! কোন পুরুষ মানুষই এখানে নেই!—'

'আছে একজন দারোয়ান—সে পিছনে বাইরের দিকের ছোট ঘরটাতে থাকে।—'

'কই, তাকেও দেখলাম না!—'

'আজ গাঁয়ে হাট-বার—হাট করতে গিয়েছে!—'

তরুণী শশাঙ্ককে নিয়ে তার ঘরে গিয়ে বসায়। কক্ষের মধ্যে আসবাবের তেমন কোন বাহুল্যই নেই। মাত্র একটি পালঙ্ক, তার উপরে শুভ্র একটি শয্যা বিস্তৃত আর এক ধারে একটি তোরঙ্গ।

'আপনার বুঝি এইখানেই বাড়ি?—'

ইচ্ছা করেই শশাঙ্ক এবারে তার নিজের পরিচয়টা গোপন রাখে। বলে: 'হ্যাঁ!...'

একটু থেমে আবার শশাঙ্ক প্রশ্ন করে: 'কই বললেন না ত, এখানে আপনি কেমন করে এলেন?'

'মেয়ে-ছেলে কি কখনো স্বেচ্ছায় এ রকম জায়গায় আসতে পারে?—'

'তবে?—'

'ক্ষমা করবেন। তার পরিচয় আমি দিতে পারবো না!—'

'কিন্তু এটা ত জমিদারের বাগান-বাড়ি!—'

'সে আপনার যা খুশী ভাবতে পারেন!—'

শশাঙ্কর মনের মধ্যে নানা চিন্তা জট পাকায়। এলোমেলো অসংলগ্ন।

তার বাবা! অমন প্রশান্ত সৌম্যদর্শন স্বল্পবাক লোকটি!

এর পর কথায় কথায় শশাঙ্ক জানতে পারে তরুণীর নাম চন্দ্রা।

তেলাপোকা যেমন কাচপোকাকে টানে তেমনি করেই টানে চন্দ্রা শশাঙ্ককে।

প্রায়ই সে সন্ধ্যার পর যেতে লাগলো বাগান-বাড়িতে চন্দ্রার ওখানে।

শশাঙ্ক খুব সতর্কতার সঙ্গেই বাগান-বাড়িতে যাতায়াত করে, যাতে দরোয়ানের চোখে সে না কখনো পড়ে যায়।

বুঝতে তার আজ আর বাকী নেই, চন্দ্রাকে তার পিতাই ঐ বাগান-বাড়িতে এনে রেখেছে। এবং তার পিতার সঙ্গে চন্দ্রার সম্পর্কটা যে কি বুঝতে পারে না। কারণ লক্ষ্য করে দেখেছে, পিতাকে সে এদিকে কখনো আসতে দেখেনি।

তবে একবার চন্দ্রাকে ঐ সম্পর্কে প্রশ্ন করে জেনেছিল, জমিদার রাজশেখর ক্বচিৎ কখনো কালে ভদ্রে নাকি চন্দ্রার ওখানে আসেন।

কিন্তু কি যে সম্পর্ক তার পিতার তরুণী চন্দ্রার সঙ্গে, সংকোচে সে প্রশ্ন কখনো সে তুলতে পারেনি চন্দ্রার কাছে।

এবং মনে মনে সম্পর্কটা অনুমান করে নিলেও চন্দ্রার প্রতি তার আকর্ষণকে কোন মতেই সে রোধ করতে পারেনি।

সমস্ত সংযম সমস্ত নীতিবোধ কোন কিছুই তার গতিটাকে রোধ করতে পারে নি।

চন্দ্রাও তার সঙ্গে শশাঙ্কর পরিচয়টাকে যথাসাধ্য গোপন করে যে চলে, এ সংবাদ শশাঙ্কর কাছে অবিদিত নেই। [ক্রমশঃ।

দুর্ভিক্ষ!

এখন কেমন কোরে পেট চালাবো,
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে,
কেমনে সে শুকনো খাবে? —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জুয়ায় আপনি হারবেনই

সুনীলকুমার ধর

অনেকে বলেন, আজকের মানুষের দিশেহারা জুয়া-প্রবণতা হ'ল বিজ্ঞান-ধর্ষিত সভ্যতার অভিশাপ। অভিযোগ অসত্য নয়।

অভিযোগ অসত্য নয় এই জন্য যে, মানুষের অগ্রগমনে বিজ্ঞান যথেষ্ট সহায়তা করলেও বিজ্ঞানের গতি অপ্রত্যাশিতভাবে এবং স্থানে স্থানে অবাঞ্ছিতভাবে এত দ্রুত, ব্যাপক এবং গভীর হয়েছে যে, তার সঙ্গে মানুষ সমতা রাখতে পারছে না (man is not refining himself at an equal rate) এবং ফলে সর্ব্বদা-উত্তেজিত বিক্ষিপ্ত জীবন-ধারার চাপে মানুষ একটি মুহূর্ত্তকে আর একটি মুহূর্ত্ত দিয়ে খণ্ডিত ক'রতে চাইছে। যন্ত্র-সভ্যতা মানুষের জীবন-ধারাকে মানুষের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাই আজ মানুষ ইচ্ছা ক'রলেও বিশেষ করে যারা শহরের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়েছে তারা, নিজের ইচ্ছামত নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে না। ঘড়ির সঙ্গে, যন্ত্রের সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে দৌড়ে-দৌড়ে মানুষের স্বভাবই হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল দৌড়ান, তাই ছুটির দিন বলে চিহ্নিত ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখে ঘড়ি যখন তাকে ছুটি দিতে চায়, যন্ত্র তাকে ছুটি নিতে বলে—তখনও সে ছুটি পায় না। ছুটি নেবে সাধ্য কি তার! তার দৌড়ান অভ্যাস তাকে অবসর বিনোদনের অজুহাতে সেই সব দিকেই টেনে নিয়ে যাবে—যাতে উত্তেজনার উন্মাদনা আছে। তারই অন্যতম প্রধান হ'ল জুয়া।

যন্ত্র-দেবতার প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতারা কল্পনা এবং আশা করেছিলেন যে, মানুষের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়লেই তার আর কোন দুঃখবোধ এবং অশান্তি থাকবে না; মানুষ তৃপ্ত হবে—সুখী হবে। কিন্তু তাঁদের সে কল্পনা এবং আশা যে ফলবতী হয়নি তা আজকের মানুষের অপ্রকৃতিস্থতা দেখলেই বোধগম্য হয়। মানুষের জীবনের ব্যবহারিক সুখ বেড়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু তার বিনিময়ে সে মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তি যে হারিয়েছে, এ কথা কি অস্বীকার করা যাবে? এর কারণ হ'ল বর্ত্তমান সভ্যতা কেবল মানুষের অর্থনৈতিক দিকটা অর্থাৎ রক্ত-মাংসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পাল্লা-পাল্লি চালিয়েছে, মানুষের আত্মার প্রতি তার কোন মমত্ববোধ নেই। তাই সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি নিত্য নতুন নতুন জিনিষের জন্য অদম্য এবং অতৃপ্ত আকাঙ্খার মিছিল এবং ঐশ্বর্য্য সংগ্রহের জন্য বেপরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তারই ফলে মাঝে মাঝে 'মহাযুদ্ধের' অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা।

বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে যে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্কের মধ্যে গঠনগত কোন বৈষম্য নেই, তাই বিজ্ঞান-ধর্ষিত সভ্যতায় আমাদের অবস্থা হয়েছে, সাইকেল-চড়া আর পাইপ খেতে শেখানো বাঁদরের মত!

যে কোন প্রকারের যুদ্ধ যে মানুষের জীবনে এবং সমাজে অকল্পিতপূর্ব্ব ওলট-পালট এনে দেয়, একথা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত। নিকট নিকট যুদ্ধ বাধলে ত' কথাই নেই। যে দেশে যুদ্ধ বাধে কিংবা যে দেশ যুদ্ধে লিপ্ত কিংবা যে দেশ এই দুই দলের যে কোন পক্ষে যোগদান ক'রে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে—সে দেশ ও দেশের মানুষকে যে-কোন-উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধপূর্ব্ব দেশ ও সমাজের প্রচলিত অনেক নীতিকে তখন ভেঙে সাময়িক সুবিধাজনক অথচ অনেক ক্ষেত্রে একান্ত অসামাজিক এবং মানুষের পক্ষে মর্ম্মন্তুদ অকল্যাণকর নতুন উপায় অবলম্বন করতে হয়। আসলে মানুষের মনের মধ্যে যে পাশবিক প্রবৃত্তি অবদমিত আছে, তখন তাকে জাগিয়ে কাজে লাগানো হয়—ফলে মানুষ এতদিনের বিবর্ত্তন এবং প্রচেষ্টায় পশুর স্তর থেকে যতখানি উপরে উঠে এসেছে, পুনরায় ঠিক ততখানি কিংবা তার চেয়েও বেশী নিচে নেমে যায়। ফলে যুদ্ধের পূর্ব্বে আহৃত সমস্ত মনুষ্যত্ব, দয়া, মায়া, ন্যায়, নীতি বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষ একান্ত আত্মসর্ব্বস্ব বেপরোয়া জীব হ'য়ে ওঠে। মানুষ ব'লতে যা বোঝায়, মানুষ তখন তা থাকে না। তাই হঠাৎ এক দিন যুদ্ধ থেমে গেলে বিবদমান বুড়ো খেঁকশিয়ালেরা আবার সংস্কৃতি, নীতি ও দেশাচারের ভেড়ার লোমের জামা গায়ে দিয়ে ভেড়া সেজে ভণ্ডামী সুরু করলেও, সাধারণ মানুষ অত তাড়াতাড়ি এই মানসিক বিক্ষেপ ও বিকৃতি কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বয়স নির্বিশেষে মানুষের জুয়া-প্রবণতা এবং ব্যভিচার ব্যসনের প্রতি আকর্ষণ যে খুব বেশী মাত্রায় বাড়ে, সে কথা অন্ততঃ আজকের কারও কাছে হিসাব দিয়ে প্রমাণ করতে হবে না। জুয়া যে কেবল জুয়ার আড্ডাতেই চলে এমন নয়—সমাজের যে দিকেই তাকান যায় সেই দিকেই দেখা যায় জুয়া চলেছে কোন-না-কোন আকারে। যুদ্ধের সময় ভুঁইফোড়ের মত কতগুলি ব্যাঙ্ক গজিয়েছিল এদেশে এক বার সেই কথা ভেবে দেখুন। এই সব ব্যাঙ্কের সৃষ্টিই হয়েছিল জুয়াড়ীদের টাকা যোগাবার জন্য! ব্যাঙ্কের পরিচালক থেকে পরিচারক পর্য্যন্ত সকলেই কোন-না-কোন রকমের জুয়া খেলেছে, কারণ তখন টাকা এত সহজলভ্য এবং সস্তা হয়েছিল এবং অতি সহজে আরো টাকা সংগ্রহের নেশায় মানুষ এমন দিশেহারা হয়েছিল যে, জুয়ার মাধ্যম ছাড়া—তা সে ভিৎ-আলগা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ হোক আর কালো বাজারের অন্ধকার গলি ধরেই হোক, আর কোন পথ সে দেখতে পায় নি।

সমাজের সাধারণ জীবন-যাত্রার চেহারা এমনি বদলে গিয়েছিল যে, শেয়ার-মার্কেটে আমরা হাজার হাজার চিকিৎসককে দেখেছি, সাহিত্যিক-শিল্পীদের দেখেছি, কেরাণীদের দেখেছি—আর দেখেছি অভিজাত সমাজের মহিলাদের, সবাই জুয়া-জ্বরে জরজর। টাকা—আরো টাকা চাই, এবং সকলেই ছুটেছে কি করে অতি সহজে এই টাকার পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছানো যায়! চিকিৎসক তখন সেবার কথা ভুলেছে, উকিল মক্কেলের বিপদের কথা ভুলেছে, শিক্ষক ভুলেছে ভবিষ্যৎ দেশ গড়বার কথা, সাহিত্যিক শিল্পী সুন্দরের স্বপ্ন ভুলেছে—আর নারী ভুলেছে সংসার শৃঙ্খলার কথা! প্রেমও তখন জুয়ার বাজারে কেনা-বেচা চলে!

প্রাপ্ত-বয়স্করা যখন এতখানি উন্মার্গগামী তখন তরলমতি

কিশোর আর তরুণরা কোন পর্য্যায় গিয়ে পৌঁছায় তা সহজেই অনুমেয় !

সভ্যতা-কশাহত মানুষের উত্তেজনা ছাড়া বাঁচবার উপায় আছে কি না কিংবা কোন উপায়ে সে কথা আজ স্থির নিশ্চয় করে বলা শক্ত, কিন্তু আমরা এখন দেখছি সভ্যতার কেন্দ্রভূমি শহরের বুকে নিত্যনতুন রেস্তরাঁ, কাফে, পানশালা, নাচঘর, সংবাহন-আগার আর সিনেমার সারি !

বিজ্ঞানীরা বলেন : During the war we are confronted by a deplorable change, spiritual life recede while the instincts became dominant. Gambling mania arises out of man's desire to avoid work. Gambling satisfies man's emotional hunger. The war induces in us a permanent state of increased effectivity.

বিজ্ঞানীদের এই মন্তব্য আজকের মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য হ'লেও, এবং তাঁদের বক্তব্য : at one time hunger was the driving force. Fear of hunger drove men to work. Now one might say : Men are satiated and for that reason, they refuse to work and avoidance of labour stands out as the core of the social problem, এ কথা মেনে নিলেও এ কথাও স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের মধ্যে জুয়ার নেশা জেগেছে সেদিন, যেদিন সে প্রথম মাটির দিকে তাকিয়েছিল আহার্য্যের আশায়। কেমন ক'রে, সে কথা আরো পরে বলবো। এখন আমি আপনাদের তাস খেলা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

আজকের মানুষের জুয়া-প্রবণতার মূলে যন্ত্র-সভ্যতা যতখানিই দায়ী হৌক না কেন, মানুষের সমাজে এবং বিশেষ ক'রে আমাদের সমাজে জুয়া যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, এর প্রমাণ আমরা পাই নল-দময়ন্তী এবং কুরু-পাণ্ডবদের কাহিনী থেকে। কিন্তু জুয়ার প্রচলন ছিল, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কি করুণ এবং মর্ম্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল, সে কথাও তেমনি সত্য। জুয়ার প্রচলন মানুষের সমাজ গড়বার আদিম দিন থেকে থাকলেও কোন এমন একটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে জুয়ার মাধ্যমে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠী শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হয়েছে। সব জায়গায়ই বিষময় ফল ফলেছে।

জুয়ায় হেরে যাওয়া রাজা নলের করুণ পরিণতি এবং কৌরব-সভায় পাঞ্চালীর অপমানের কথা যদি আপনারা বিশ্বাস করেন, তা হ'লে এ কথা কেন বিশ্বাস করবেন না যে—দেবাশ্রিত পাণ্ডবেরা যখন পাশা খেলায় জিততে পারেন নি, তখন আপনারও কোন আশা নেই !

আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই প্রায় সব খেলার পিছনেই জুয়ার প্রবণতা আছে, কিন্তু আসলে কতকগুলি বিশেষ ধরণের খেলা ছাড়া অধিকাংশই যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন তার আসল উদ্দেশ্য ছিল অবসর-বিনোদন। পরে সময় এবং পরিবেশের প্রভাবে অধিকাংশই জুয়ায় পরিণত হয়েছে। এই যেমন তাস-খেলা। সকল স্তরের মানুষের পক্ষে এমন সহজপ্রাহ্য এবং সহজে প্রাপ্য অবসর বিনোদনের আনন্দ আর কিছুতেই নেই। তাই তাস চেনেন না বা কোন-না-কোন রকম তাস খেলা জানেন না এমন পুরুষ বা নারী আজকের মানব সমাজে খুঁজে বার করা কষ্ট। তাসের রং চেনেন না বা কোন রকম তাস খেলা জানেন না, এমন লোক একেবারে নেই—একথা আমি অবশ্য বলতে চাইনে, তবে সেই রকম কোন এক জনের সঙ্গে যদি দেখা হয় তা হলে বুঝবেন, ছেলেবেলা থেকে তাঁকে স্কুলের বাহিরে আর কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হয়নি এবং সে-বাড়ীতে এই ধরণের আনন্দ উপকরণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—কিংবা বই-এর অরণ্যে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকে বই ছাড়া আনন্দ সংগ্রহের অন্য কোন উপাদানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি। বাইরে বেরিয়েছে, দশ জনের সঙ্গে মিশেছে অথচ তাস খেলা জানে না, এমন ছেলেমেয়ে একমাত্র 'স্বদেশী' ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দেখা গেলেও, সাধারণতঃ দেখা যায়নি। তবুও যদি কেউ বলেন, তিনি তাস খেলা জানেন না—তা হ'লে বুঝতে হবে, তিনি এক কালে নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে এর অসারতা বুঝতে পেরে, জানেন এ-কথা বলতে চান না কিংবা যে নাক-উঁচুওয়ালা সংস্কৃতিবানেরা তাস খেলাকে অপদার্থতা মনে করেন, বর্ত্তমানে তিনি তাঁদের দলে নাম লেখাবার চেষ্টায় আছেন। এখানে অবশ্য একটা তর্ক উঠবে যে, তাস খেলা জেনেও সংস্কৃতিবান, রুচিবান হওয়া এবং থাকা সম্ভব কি না। আমি বলবো হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সম্ভব। কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, রাজনৈতিক এমন কি সমাজসেবী আছেন, যাঁরা চিরকালের নমস্য, তাঁদের অনেকেরই অবসর-বিনোদনের উপকরণই ছিল এবং এখনও আছে, এই তাস খেলা। তা সে একাই হৌক, দু'জনেই হৌক আর চার জনেই হৌক।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি, অবসর বিনোদনের জন্য প্রথমে প্রচলিত হলেও, তাস আজ জুয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে সকল দেশে, সকল সমাজে। তাস খেলা জানা বা অবসর বিনোদনের জন্য তাস খেলা এতটুকু অসভ্যতা বা out of date ব্যাপার নয়। তাস যখন জুয়ার মাধ্যম হয় তখনই তা নিন্দনীয়, কিংবা তাসের নেশা যখন মানুষকে কর্ত্তব্যবিমুখ করে তখনই তা সর্ব্বনাশা। এই জন্যই বহু দিন থেকেই আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—"তাস-দাবা-পাশা, তিন কর্ম্মনাশা।" কিন্তু তাস খেলা যে সত্যই নির্ম্মল অবসর-বিনোদনের জন্য আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা আজও পাই আমাদের দেশে বিয়ের ব্যাপারে। বিয়ের সময় মেয়ের বাড়ীর তরফ থেকেই হৌক আর ছেলের বাড়ীর তরফ থেকেই হৌক যখন 'তত্ত্বের' বাজার করা হয় (গায়-হলুদ বা ফুলশয্যা), তখন সেই ফর্দ্দে এক জোড়া তাস থাকেই।

আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলায় তাস খেলা শেখার পদ্ধতি হল এই রকম : প্রথমে সুরু হয় 'ফতুর-ফতুর' বা 'রং-মেলানো' খেলা দিয়ে। এ খেলা দু'জনের মধ্যে হয়। খেলার নিয়ম হল : টেক্কা চারখানা—দু'জনের মধ্যে দু'খানা ক'রে ভাগ ক'রে নিয়ে বাকি তাসগুলি সমান সমান ভাগ করতে হবে। তার পর এক ভাগ ক'রে ঐ তাস নিয়ে উপুড় অবস্থায় রেখে চিৎ করে ফেলতে হবে

(না দেখে) এবং একের ফেলা তাস যে রঙের, অপর পক্ষের তাস যদি সেই রঙের হয়, তা হ'লে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের তাসখানি (বেশীর ভাগ সময় না মেলার জন্য দুই পক্ষেরই ফেলা অনেকগুলি) জিতে নেবে। এইভাবে খেলতে খেলতে এক পক্ষ যখন অপর পক্ষের সব তাস জিতে নেবে, তখন খেলা শেষ—অর্থাৎ এক পক্ষ ফতুর হ'য়ে গেল। টেক্কাগুলোকে 'নোট' বলে গণ্য করা হয়। হাতের তাস যখন সব শেষ হয়ে যায়, তখন বিজিত পক্ষ বিজয়ীর কাছ থেকে একখানা টেক্কার বদলে দশখানা হিসাবে দু'খানা টেক্কার বদলে কুড়িখানা তাস নিয়ে খেলা চালিয়ে যেতে পারে—যতক্ষণ না সে ফতুর হয় বা অপর পক্ষকে ফতুর করতে পারে।

'ফতুর ফতুরে'র পর গোলাম-চোর, ব্রে, স্ক্রু, চিৎ-বিন্তী, গ্রাফু (বিন্তী), টুয়েন্টী-এইট্ ইত্যাদি। অনেক আগে হাতের পাঁচ এক ফোঁটা ধরে নিয়ে, (অর্থাৎ যে জুড়ী শেষ পিট পাবে তারা এক ফোঁটা বেশী পাবে) 'টুয়েন্টী নাইন' খেলা হ'ত। ফতুর-ফতুর, গোলাম-চোর, ব্রে, স্ক্রু, চিৎ-বিন্তী প্রভৃতি খেলাগুলি সাধারণতঃ কম বয়স্কদের মধ্যে, বিশেষ করে কিশোরদের মধ্যে চালু আর 'গ্রাফু' বা 'টুয়েন্টী-এইট' সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে অল্প-শিক্ষিতদের মধ্যে চালু আছে এবং খুব বেশী জায়গায় সামান্য বাজি ধরে খেলা ছাড়া জুয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজকের সভ্য-সমাজে (?) এ সব খেলা অচল! এমন কি 'অকসান ব্রিজ' যা এককালে শহুরেখানায় বিশেষ চাঞ্চল্য এনেছিল এবং যে খেলা না জানলে লোকে এক দিন নিজেকে সভ্য ব'লে পরিচয় দিতে পারতো না, সে খেলাও আজ 'কন্ট্র্যাক্ট'-এর দাপটে out-of-date হয়ে গেছে!

এখন বেশীর ভাগ ব্রিজের আড্ডায়ই কন্ট্র্যাক্ট ব্রিজ খেলা হয়, আর খেলা হয় 'ফিশ', 'পোকার' (নানা রকমের), 'রামি পোকার' এবং 'ফ্লাশ'। এদেশে সাধারণ স্তরে এখন পর্য্যন্ত 'তিন তাস'-ই (ফ্লাশ) জুয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম—তবে উপরের স্তরে শুনেছি 'স্টাড পোকার'। 'ব্যাঙ্ক' বলেও এক রকম জুয়া খেলা আছে। এ খেলা অবস্থা বিশেষে এমন পর্য্যায়ে পৌছতে পারে যে, তার জন্য সত্যকার 'ব্যাঙ্ক' ফেল হওয়াও অসম্ভব নয়!

আপনারা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষের উত্তেজনার মাত্রা ডিগ্রী ডিগ্রী ক'রে যত বাড়তে থেকেছে, তাস খেলার ধরণটাও তেমনি বদলেছে এবং আজ শহরের জীবনে যেখানেই তাস খেলা হোক না কেন, এমন খুব কম জায়গাই আছে যেখানে তাস কেবলমাত্র অবসর-বিনোদনের জন্যই খেলা হয়ে থাকে।

কিন্তু তাস নিয়ে অবসর-বিনোদন করুন আর জুয়াই খেলুন, একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার হার-জিৎ নির্ভর করে আপনার তাস পাওয়ার উপর—অর্থাৎ তাস যখন ভাগ করা হয় (deal out) তখন আপনার ভাগে যে তাস আসবে তার ওপর। ভাল খেলা মন্দ খেলার জন্য আপনার হার-জিতের পরিমাণের তারতম্য ঘটতে পারে, কিন্তু খারাপ তাস পেয়ে আপনি যে জিততে পারবেন না কোন উপায়ে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। অবশ্য আপনি বলবেন যে, আপনি যে কেবল খারাপ তাসই পাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? আমি তার উত্তরে বলবো, না—তা নেই, কিন্তু যে chance-এর উপর নির্ভর করে আপনি এই কথা বলছেন, সেই chance-এর অপর সম্ভাবনার কথা ভেবে একথাও ত' বলা চলে যে, আপনি যে খারাপ তাস-ই পাবেন না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

আপনারা যাঁরা তাস খেলেন (যে খেলাই খেলুন না কেন) তাঁরা এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, এক এক দিন তাস যখন 'আড়ি' করে, তখন আপনার যত হার মেজাজ তত বেশী উত্তেজিত হ'লেও—তার কোন আঁচই তাসকে ভয়ার্ত্ত করে না বা আপনার প্রতি করুণায় বিগলিত হবার জন্য প্রভাবিত করতেও পারে না! যে-দিন আপনার হারের 'পাড়', সে দিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত (যাঁরা Law of average বা Law of chance-এর কথা বিশ্বাস করেন) আপনার কেবল হার হতেই থাকবে। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট সময় কতক্ষণ, তা যেমন আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তেমনি এই নির্দ্দিষ্ট bad spell-এর পর আপনার সু-সময় আসবেই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—তা ছাড়া সব চেয়ে চড়া কথা হ'ল, আপনি ত' কুবেরের ভাণ্ডার নিয়ে জুয়ার আড্ডায় যান না, তাই এই bad spell কেটে সুসময় আসা পর্য্যন্ত আপনি কি টিঁকে থাকতে পারবেন? তাই এই spell-এর উপরে যত বিশ্বাসই আপনার থাক না কেন, আপনার পকেট যদি আগে থেকেই গড়ের-মাঠ হয়ে যায় তা হ'লে যে টাকাটা আপনার হার হ'ল সেটা আর উঠবার কোন আশাই থাকলো না।

আপনারা যাঁরা তাসের জুয়া খেলেন তাঁরা এ কথা আশা করি স্বীকার করবেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক বেশী টাকা নিয়ে গিয়েও শুরু থেকেই খারাপ তাস পাওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে বিচলিত হয়ে পড়ায়, প্রতি দানে হারের মাত্রা বাড়তে থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে সময়ে যত টাকা আপনাদের হারা উচিত নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা আপনারা হেরেছেন এবং অনেক সময় ভাল সময় আসার আগেই আপনাকে জুয়ার টেবিল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। আগে যে কথা বলিছি, সে কথা আবার বলছি—জুয়াড়ীরা কখনও হারের মুখে ধৈর্য্য হারায় না, মাথা খারাপ করে না! তারা তখন ধৈর্য্যের সঙ্গে কোন রকমে খারাপ সময় কাটিয়ে ভাল সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে। কিন্তু যারা professional জুয়াড়ী নয় তাদের পক্ষে এই ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব হয় না, তারা মনে করে তাস যখন ভাল ক'রে ভাঁজা (shuffle) হ'চ্ছে তখন কেন আমি প্রতিবারই খারাপ তাস পাব এবং এই মনে করে বলেই উত্তরোত্তর দানের মাত্রা (betting) বাড়াতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে হারের মাত্রা বাড়তে থাকে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। যেখানে খেলার মধ্যে কোনরকম চালাকী নেই বা কোনরকম অসাধু উপায় অবলম্বন করা হয় না, সেখানেও কেন এই তাসের 'আড়ি', এ কারণ আজ পর্য্যন্ত কেউ নির্দ্ধারণ করতে পারেনি। লোকে কথায় বলে: প্রেমিকার 'আড়ি' ত শরতের মেঘ, কিন্তু তাসের আড়ি আর পাশার আড়ি বড় মারাত্মক।

অবশ্য একথা আপনারা কেউ যদি বলেন যে, ভাগ্য যদি আমার সুপ্রসন্ন থাকে, তা হ'লে গোড়া থেকেই ত' আমি জিততে পারি—কথাটা ঠিক, আপনি প্রথম দিকে বেশ কিছু জিতবেন কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন ত' শেষ পর্য্যন্ত কত টাকা জিৎ নিয়ে কত দিন আপনি ফিরতে পেরেছেন? আপনি যদি

সুসময়ের কথা তোলেন, তা হ'লে আমি বলবো—বেশ ত', কিন্তু এই সুসময় যে অন্তহীন নয় সে কথাও ত' আপনি স্বীকার করবেন। তা হ'লে? অবশ্য আপনি যদি প্রতি দিনই সুসময়ের সুযোগ নিতে পারেন, তা হ'লে তার চেয়ে সুখের আর কিছুই নেই; কিন্তু আপনার লোভ যে আপনাকে সুসময়ের পরেও খেলার টেবিলে আটকে রাখে, এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন কি? ফলে আপনার লোকসান না হোক, জিতের পরিমাণ যে অনেক কমে যায়, তাতে আর সন্দেহ নেই। ফলে এই দাঁড়ায় যে, খারাপ সময়ের জন্য যেদিন আপনি হারলেন, সেদিন প্রচুর টাকা হারলেন, কিন্তু যেদিন জিতলেন সেদিন বেশী জিততে পারলেন না। এই ভাবে বেশী হার কম জিৎ চলতে চলতে শেষ পর্য্যন্ত হারের পরিমাণ বেশ মোটা অঙ্কে গিয়ে ঠেকে। তা ছাড়া যদি ধরেই নিই যে, শেষ পর্য্যন্ত আপনার কোন হারই হ'ল না—কিন্তু যে সময়টা আপনি এই জুয়া খেলার পিছনে নষ্ট করলেন—এবং জুয়া খেলার পিছনে আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে লাভ করা (অন্য যে কোন উদ্দেশ্যের কথাই আমরা মুখে বলি না কেন), তার দাম দেবে কে? তা' ছাড়া জুয়ার সময় অকস্মাৎ উত্তেজনার জন্য অ্যাড্রেনাল গ্রন্থী থেকে অস্বাভাবিক রস ক্ষরণ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় যে ক্লান্তি আসে, তা জমতে জমতে শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ জুয়াড়ীকেই এক দিন নিউরটিক (neurotic) করে ফেলে। আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন যে, জুয়া যাদের জীবিকা, তারা সব সময়ই একটু উত্তেজিত (high-strung) এবং তারা অধিকাংশই কোন-না-কোন মাদকদ্রব্যের আওতায় থাকে।

আমাদের দেশে 'তাস-দাবা-পাশা, তিন কর্ম্মনাশা' এ কথা প্রচলিত থাকলেও শহরের জীবনে এমন এক দল লোক দেখা যায় তাদের জীবিকার্জ্জনের উপায়ই হ'ল তাস খেলা। একথা যখন স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ভাল তাস না পেলে জেতা সম্ভব নয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, সব সময় যারা কেবল ভাল তাসই পায়—তাদের এই পাওয়ার মধ্যে কোন একটা 'কারিকুরি' নিশ্চয়ই আছে। সে 'কারিকুরি' হল, তাস সাজাবার কায়দা (shuffle)। এবং যারা এই পন্থা অবলম্বন করে, তারা আর যাই হোক, সৎ নয়।

তাস খেলা যেখানে হিসাবের ব্যাপার—যেমন ব্রিজ খেলা, সেখানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচার-শক্তি এবং card-sense যার যত বেশী সে তত ভাল খেলোয়াড় হতে পারে এবং খেলায় কম ভুল বা কোন ভুল না করতে পারে। কিন্তু তাই বলে খারাপ তাস পেয়ে খেলায় কোন ভুল না করেও তার পক্ষে জেতা সম্ভব কি?

তাস যখন পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে অবসর বিনোদনের মাধ্যম হয় তখন তার রূপ এক, আর যখন জুয়ার মাধ্যম হয় তখন তার রূপ একেবারে আলাদা। একটি খেলার আনন্দের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই, অপরটি একের পকেটের টাকা অন্যের পকেটে টেনে আনা। একটি স্বাস্থ্যমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করে—অপরটি পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে আস্থাহীন এবং শেষ পর্য্যন্ত শত্রুতে পরিণত করে।

তাস খেলা সম্বন্ধে দুটি প্রচলিত সাবধান-বাক্য আপনাদের জানিয়ে এবারের মত শেষ করছি। প্রথমটি হল': আপনি যখন প্রেমে পড়বেন তখন তাস খেলবেন না, আর দ্বিতীয়টি হল: কখনই কোন অবস্থায়ই অপরিচিত লোকের সঙ্গে তাসের জুয়া খেলবেন না।

[ক্রমশঃ।

পলাতক

অসিতকুমার চক্রবর্ত্তী

দূরে, বহু দূরে, মাঠের ও-ধারে বেহালার ট্রাম চলে
এখানে গাছের চিকণ পাতায় অদেখা চাঁদের আলো
ট্রামের সীটেতে ঝিমোতে ঝিমোতে, কি জানি কি কথা বলে
ওরা নগরের ব্যস্ত মানুষ, এ আলো লাগে না ভালো।
চৌরঙ্গীর লাল-নীল আলো মেট্রোর নীচে জনতার ভিড় বাড়ে
কোনও সন্ধ্যায় এইখানে এলে, নগরের রোশনাই
দু' চোখে তোমার মায়া-অঞ্জন এঁকে যদি দিতে পারে
দশার্ণ গ্রাম ভুলে যাবে তুমি, ভুলে যাবে কি যে চাই।
তার চেয়ে তুমি এইখানে এস, এই তো গড়ের মাঠে
চুপি চুপি চাঁদ গাছের পাতায় কি কথা যে লিখে যায়
তার কোনও মানে আছে কি না আছে এই জীবনের হাটে
জানি না সে কথা, জানতে চাই না, তবু এই সন্ধ্যায়,
মৌসুমী-বায়ু বয় মরু-মনে, আসি যদি এইখানে
ভেসে ভেসে যায় বিপুল নগর, শত সর্পিল গলি।
এস্‌প্ল্যানেডের আকাশ পেরিয়ে যাবে না কি সেইখানে?
এই নগরের সীমানা ছাড়িয়ে চল সেই পথে চলি।

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

৫
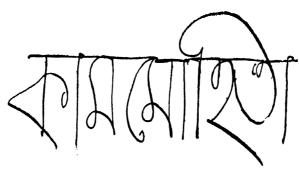
আবৃষ্টি-সংরম্ভ সমারোহ! ধারা পতন এখনও সুরু হয়নি। চৌমাথা পেরিয়ে গীর্জার বিপরীত দিকের রাস্তায় এসে পড়ল আগাথা। এই পথের বাঁ দিকের সেই শেষ প্রান্তসীমায় নিকোলাসদের একতলা বাড়ী। বাড়ীর কোল থেকেই মাঠের সুরু। নিকোলাসদের বাড়ীর বাগানের কোণটাকেই বলে বুলেভার্দ। যদিও ভুলেও কেউ এ চলন-বীথিতে কখনো পা মাড়াতে আসে না কোন দিন। বসার জন্যে যে পাথরের বেঞ্চি আছে তার উপর এ অবধি কেউ কখনো বসেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু লোকের কাছে যাই হোক, ঐ এক-ফালি জায়গা আগাথার প্রাণের প্রাণ। ঐখানেই তার সারা মন পড়ে থাকে, বিশেষ করে ছুটির সময় যখন নিকোলাস থাকে বাড়ীতে।

আর সে বাড়ীতে না থাকলেই বা কি? সারা সংসারের মধ্যে ঐ জায়গাটুকু আগাথার কাছে পবিত্র তীর্থ—কেন না, তার নিকোলাস এর খুব কাছে থাকে। ঐ চলন-পথের শেষ প্রান্তে লতাগুল্মের চিকে আড়াল-করা একটু নিভৃত নিলয় আছে আগাথার। এ বাড়ীর যে ঘরে নিকোলাস ছুটির দিনগুলি কাটায়, তার জানলাটি দেখা যায় সেখান থেকে। বছরের বাকি সময় তার মা থাকেন সে-ঘরে। মা যখন সে-ঘরে বাসা নেন ঘরের জানলা বন্ধ থাকে সারাক্ষণ, তোলা থাকে জানলার খড়খড়ি। কিন্তু নিকোলাস এলেই ঘরের বন্দিদশা কাটে। জানলার অর্গল মুক্ত হয়ে যায়। ঝাঁঝাল রোদের সময়টুকু ছাড়া জানলার পাল্লা হাট করে খুলে রাখে নিকোলাস। উন্মুক্ত পল্লী-প্রকৃতির গন্ধবহ বায়ুকে নিয়ত জানিয়ে রাখে আমন্ত্রণ। আজ-কাল অবশ্য আর সোজাসুজি সে-ঘরে উঠে যেতে সাহস হয় না আগাথার। শেষ যেদিন গিয়েছিল সে, নিকোলাসের মা সিঁড়ির মুখে তাকে বড় রূঢ় কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

সমুখের এক মুঠো ফাঁকা জমি পেরিয়ে বেড়ার ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকে পড়ল আগাথা। ওক গাছের নীচে যেখানটিতে সে বসে, সেখানে ঘাসের মখমল এখনও কোমল মসৃণ হয়ে আছে। ম্যাকিনটোশ পেতে আগাথা আরাম করে বসল মাটিতে। এখান থেকে নিকোলাসের ঘরের কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু পোষাক আলমারীর আরসীর ঝকঝকানিতে চোখ ধাঁধায়। ব্যাগ থেকে একখানা বই বের করে পাতা খুলে বসল বটে আগাথা কিন্তু সে ত জানে, এই গৃহ-দেবালয়ের সান্নিধ্যে এলে কোন দিনই সে এক ছত্র পড়তে পারে না।

কী ভাগ্যবতী বলে নিজেকে সে মানল আজকে! হঠাৎই যেন আগাথা দেখা পেয়ে গেল তার মনের মানুষটির। এক লহমার বিরতি। পর পরই গিলস এসে দাঁড়াল তার পাশে। জানলার শিক ধরে বন্ধুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল বন্ধু। দু'জনে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে বাগানের দিকে। হয়ত বলাবলি করছে—'ভিজে মাটির গন্ধ কি মিষ্টি লাগছে বল ত?' লেবু গাছের শুকনো পাতা থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা ছিটকে পড়ছে চারি দিকে। দুই বন্ধুতে পরস্পরের দিকে না তাকিয়েই কথা-বলাবলি করছে। মাঝে মাঝে প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাদের মুখ। ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে পরমানন্দে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে গিলস। তার নিকোলাস কখনো সিগারেট খায় না। ধূম পান না করা তার বৈরাগ্য সাধনার অঙ্গ মনে করে সে। তার নিকোলাসের দেখাদেখি আগাথাও আজ-কাল নেশা বর্জন করেছে। লুব্ধমতি শিশুর মত শুধু চেয়ে থাকে আগাথা অহেতুক আনন্দে, কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের রস-মধুর মিলন। আর পুলকে রোমাঞ্চিত হয় অকারণে। মর্মে মর্মে জানে সে, যে ওদের আলোচনায় স্থান নেই তার। নিকোলাস তাকে ভাল বাসলেও স্থান পেত না সে। ঐ দুই বন্ধুর আসঙ্গ রহস্যের প্রাসাদপুরীতে তার দ্বার অবারিত নয়। একটা বেদনা-বিধুর কামনা নিয়ে তার মুগ্ধ নারী-মন শুধু লুব্ধ চোখে সেই অপার রহস্যময়তাকে মন্থন করতে চায়।

কামের চেয়ে সহজ কিছু নেই সংসারে। পাপের রহস্যই সব থেকে কম জটিল। মানুষের কলঙ্কের ইতিহাসে তার একদিনের স্বামীর পাপ অভিনব অভাবনীয় কিছু নয়। বিয়ের দিন রাত্রে কাম-সঙ্গিনীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে সেই মামুলী কামবৃত্তিরই সাধারণ পুনরাবৃত্তি লেখা আছে। তার মধ্যে অনন্য অসাধারণ কিছু নেই। কিন্তু এই দুইটি তরুণের সঙ্গোপন মিতালির রহস্য রূপ স্বতন্ত্র। দুজনেই জানে, অনন্ত কাল ব্যেপে তাদের দুটি প্রাণের কুসুম জীবনবৃন্তে একসঙ্গে দোল খাবে—নিয়ত আসঙ্গের একঘেয়েমিতে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে না কোন দিন। তাদের পঠন-পাঠন চিন্তা-স্বপ্ন, কামনা-বাসনা কিছুতেই বিচ্ছিন্নতা নেই। কথা না বললেও তাদের মনের বীণা এক সুরে বাঁধা। তাদের কথার পরিভাষা আলাদা—বর্ণমালা আলাদা, যার মর্মার্থ শুধু তারা দুটিতেই জানে। এই অপার রহস্যের অস্তিত্বে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে আগাথা—তার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অসহ্য আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় তার মন। বেদনার কণ্টকে জর্জরিত হতে থাকে সর্ব তনু।

পাতায় পাতায় প্রথম বর্ষণের টুপটাপ শব্দ আগাথার কানে

যায়। বিরাট বনস্পতির আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে অবশ্য তার গা ভেজে না। বাগানের ঐ পারে দোতালার জানলার গায়ে গায়ে লাগা মাথা দুটি তার দৃষ্টিকে বন্দী করে রেখেছে। ওক গাছের গুঁড়িতে এতক্ষণ হেলান দিয়ে বসে বসে তার পিঠ ব্যথা করতে থাকে। যে মাটি তার আশ্রয়, তাও যেন কত কম কঠিন মনে হয়। এধারে ওধারে তাকে ঘিরে, তার চারি পাশে থরা রাস্তায় মাটিতে প্রথম বৃষ্টি-লাগা শিহরণের শব্দময় প্রতিধ্বনি ওঠে। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নেয় আগাথা, একটি দুটি করে বৃষ্টির ফোঁটা তার কপালে পড়ে। গ্রীবার তট বেয়ে, দু কাঁধের সমতল উত্তিয়ে, বুকের উপত্যকা ভূমিকে সিক্ত করে। ওখানে দুই বন্ধু ছেলেমানুষের মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মাথার উপরের ঘন মেঘ বিগলিত ধারায় নামছে—তার স্নিগ্ধ পেলব স্পর্শ নিচ্ছে দু' জনে। এতক্ষণে উঠে ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ওক গাছের তলায় এসে দাঁড়াল আগাথা। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার।

ভরা মেঘের ডম্বরু ছাপিয়ে বাজতে লাগল ঝরা বাদলের নূপুর-ধ্বনি। ওদের জানলায় কপাট পড়ল। তবু অন্ধকারের পটভূমিকায় তার নিকোলাসের ঘরের আয়নার উজ্জ্বল রেখাটুকু শুধু চোখে পড়ে আগাথার। শুধু মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে চলমান দুটি মূর্তির ছায়ায় সে স্থিরপ্রভা এক একবার আড়াল হয়ে যায়। তখন গানের সুরে আচম্বিতে পড়ে যতি।

৬

আগাথার ফেল্টের টুপি ভিজে সপসপে হয়ে উঠল রীতিমত। টুপিটা মাথা থেকে খুলে রুমাল দিয়ে জল ঝেড়ে ফেলল মাথার। তার সঙ্গে নিকোলাসের কত ব্যবধান! এক দিকে এই ক্লান্তিহীন বর্ষণের বিভেদ প্রাচীর। আর ঐ দুটি তরুণের দুর্ভেদ্য মিতালির পরিখা-ঘেরা ঐ রুদ্ধদ্বার ঘর-বাড়ীর রক্ষব্যূহ। তবু ঝড়-বাদলে বিপর্যস্ত এই রমণীকে সেই বিচ্ছেদ-বেদনা হতাশায় মুহ্যমান করে ফেলতে পারল না। বরং তাকে যেন সঞ্জীবিত করে তুলল নিষ্ক্রিয়তার কবর থেকে। পিঠটাকে ঋজু করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আগাথা। আসন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে শাণিত করে তুলল নিজেকে।

যেদিন থেকে নিকোলাস তার দিন-রাত্রির ভাব-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করেছে, সেদিন থেকেই সে প্রতি ছুটির দিনে নিকোলাসের ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নিজের দিন-রাত্রির রুটিন ঠিক করে নিয়েছে। রবিবার সান্ধ্য উপাসনা থেকে ফিরে এসে যতক্ষণ না মা শুতে যান ততক্ষণ অবধি সব সময়টুকু নিকোলাস তার মায়ের হাতে নিবেদন করে দিয়েছে। এক এক দিন রাত মনোহর হয়ে ওঠে। নিজের হাতে মায়ের গায়ে ওড়না জড়িয়ে দেয় সে। পুরোনো ধরণের একটি ব্রোচ লাগিয়ে দেয় তাতে। তার পর মায়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায় বাগানে। মাতৃস্নেহের পবিত্র পাদপীঠে এ তার অপ্রত্যাশী অর্ঘ্যাঞ্জলি। এ কথা ভেবে আশ্চর্য তৃপ্তি পায় তার মন। যেদিন বৃষ্টি পড়ে, ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে বাগানে, মা-ছেলেতে জানলার ধারে বসে দাবা খেলে। কোন কোন দিন মাকে বই পড়ে শোনায় নিকোলাস। সাহিত্যে সে সুন্দরের পূজারী। সেই সৌন্দর্যের বিচিত্র মধুর রূপ সে বোঝাতে চেষ্টা করে মাকে। মাঝে মাঝে মা দু'-একটি ছেলেমানুষী মন্তব্য করেন। পড়তে পড়তে এক সময় নাক ডাকার শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে নিকোলাস। চেঁচিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। তখন মনে মনে পড়ার সময় আসে তার। সন্ধ্যার পর গিলসও আসে না এ দিকে। মা-ছেলের মধ্যিখানে ভাগ বসাতে চায় না সে। এ সময় নিকোলাসকে একলা তার বাড়ীতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সর্বাগ্রে বাড়ী গিয়ে তাকে পোষাক বদলাতে হবে, জুতা-জামা ছাড়তে হবে, চুল গুছিয়ে তুলতে হবে। যে মেয়ে সুরূপা নয় তার পক্ষে পুরুষের মন হরণ করতে হলে রূপ সাধনাই হল একমাত্র বন্ধু—একথা আগাথার চেয়ে ভাল করে আর কে জানে? আরো আধ ঘণ্টা বাড়ী খালি পড়ে থাকবে।

মেরীর বাবা গেছেন তার ক্লাবে। মা-মেয়ে গেছে গীর্জায়।

দ্রুত হাতে প্রসাধন সেরে নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে আগাথা। মেরীর মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল, একটা চাপা গোঙানি কানে এল তার। শুনে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে গেল আগাথা। প্রসবের সময় বিলম্বিত লয়ে মেয়েরা যে ভাবে গোঙায় তেমনি আওয়াজ কানে আসতে লাগল ঘরের ভিতর থেকে। দরজা হাট করে খুলে দিলে আগাথা। দেখলে মাদাম জুতা-দস্তানা কিছুই খোলেন নি তখনও। হাঁটু বুকে গুঁজে এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছেন। আগাথাকে দেখে ত্রস্ত হাতে স্কার্টটা নামিয়ে দিলেন তিনি, যাতে ফোলা পায়ের ইস্ত্রীভাঙা কালো মোজাটা আগাথার চোখে না পড়ে। আর সরিয়ে ফেললেন চোখের নিমেষে কালো দাগ-লাগা নোংরা তোয়ালেটা।

—'এক যুগ পরে আবার সেই রোগটা চেপে ধরেছে। এখন একটু ভাল বোধ করছি। অবশ্য আফিমের আরক খানিকটা গিলেছি। বুকের এই ভারটা যদি না থাকত, তাহলেও খানিকটা আরাম পেতাম।'

আগাথা তার নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলে। তার পর মাথার বালিসটা ঠিক করে দিয়ে সংযত সাবধানী কণ্ঠে বললে—'আর কোন আপত্তি শুনব না আমি। এখন থেকে আমি যেমন যেমন বলব, ঠিক তেমনি করতে হবে। এবার আমার হুকুম মানার পালা আপনার। ভাল ডাক্তার আসবেন বাড়ীতে। যত্ন করে পরীক্ষা করে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করবেন।'

বলতে বলতে আত্মীয়তার দরদ ঝরে পড়তে লাগল আগাথার গলায়। সারা মুখে ছেলেমানুষী অবাধ্যতা নিয়ে ঠোঁট চেপে শুয়ে রইলেন মাদাম। অবশ্য মেয়ের গভর্ণেসের কথায় সাড়া দিলেন না—না-ও করলেন না। পায়ের উপর পা শক্ত করে চেপে ধরে, পেটের উপর ছোট্ট হাত দু'খানি রেখে চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। তখনও এক হাতে দস্তানা পরা। মাদাম হলেন সেই জাতের মেয়ে যারা শরীরের অসহ্য কষ্ট স্বীকার করবেন, তবু কোন পর-পুরুষের চোখের সামনে—হলই বা সে ডাক্তার—মেয়ে মানুষের শরীরের সেই সব লজ্জা-স্থান দেখাবেন না।

যন্ত্রণায় কথা কইতে পারছিলেন না মেরীর মা। তার পা থেকে জুতো খুলতে খুলতে বললে আগাথা—'আগে ত কত বার আমার কত কথা শুনেছেন মন দিয়ে। নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা ছাড়া আরও কত কথা ত আমায় বলেছেন। কোন কিছুই ত গোপন করেননি কোন দিন আমার কাছে।'

মাদাম চোখ বুঁজে ছিলেন। এবার চোখ তুলে তাকালেন। কৌতূহলী সজাগ দৃষ্টি দিয়ে আগাথার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সত্যিই কি আগাথা ভালবাসে তাকে? তাকে যেমন করে এখানকার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সংস্কার-কুসংস্কারের কাছে মাথা নামিয়ে ভালো মেয়ে ভালো বৌ হয়ে চলতে হয়, এ মেয়ের ত সে সবের বালাই নেই। আগাথা বড় কঠিন মেয়ে মানুষ। হোক না তার মেয়ের গভর্ণেস, তবু কার্ল্‌রাঁদের ঘরের মেয়ে ও। ওর মনের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। ওর বাঁচার পরিবেশে বুদ্ধিটাই বড়ো জানতেন মাদাম। তবে কি সেই পাষাণী প্রতিমারও হৃদয়ের বালাই আছে নাকি? সে প্রাণের একটি নিভৃত কোণে তার গৃহস্বামিনীর জন্যে একটু স্নেহ-প্রীতি আছে লুকানো? মুহূর্ত কালের মধ্যে সেই পরিণত বয়সী রমণীর স্বেদসিক্ত হাতের মুঠোয় আগাথার শীর্ণ বিশুষ্ক হাত ধরা পড়ে গেলো।

—'অত উতলা হবার কিছু নেই। ভেবে মন খারাপ করবেন না। আমার মা-ও ঐ রোগে ভুগতেন। চিকিৎসার মধ্যে গরম জলের সেঁক দিতে দেখেছি তাঁকে। ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু বেঁচেছিলেন চুরাশী বছর পর্যন্ত। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি মায়ের আমার এই গর্ব ছিল যে জীবনে একবারও ডাক্তারের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। যে সব জিনিষ পর-পুরুষকে দেখানো মেয়েদের সব থেকে লজ্জার, সে-লজ্জা থেকে ভগবান তাঁকে বরাবর বাঁচিয়েছেন।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মাদামের বুক থেকে। ফিস-ফিস করে বললেন—'এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে। যদি গীর্জায় যাও মেরীকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।'

আগাথা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বললে—'আমরা যে মেরীর ভাবভঙ্গীর উপর নজর রেখেছি এ যেন ও কিছুতেই না বুঝতে পারে। ওর সরল বিশ্বাস হারানো আমাদেরই লোকসান।'

—'তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। যা তুমি করবে ওর পক্ষে সেইটাই হবে সব থেকে মঙ্গলকর, সে-বিশ্বাস আমার আছে। আমাকে ও শত্রু মনে করে। এই মহা সর্বনাশ এড়াতে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। কে জানে ভগবানের কি অভিপ্রায়? যদি তিনি আমায় টেনে নেন—'

—'অমন কথা মুখে আনবেন না'—

—'কেন জানি না, ভাবতে ভারী ভালো লাগে যে, যেদিন আমি থাকব না, এ সংসারে এখানকার কোন-কিছুর রং বদল হবে না। মেরী আমার—'

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মাদাম—ঠোঁট চেপে পড়ে রইলেন। আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। একদিন এই চিন্ময় শরীর প্রাণহীন পুতুল হয়ে পড়ে থাকবে—তারই ষ্টেজ রিহার্সেল দিচ্ছেন যেন! একটু পরে আবার চোখ মেলে তাকালেন—আগাথার দিকে চেয়ে করুণ হাসি হাসলেন তিনি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। এমনি ধারা অসুস্থতার পর ঘুমে অবসন্ন হয়ে আসে দেহ। আগাথা বসে রইল মাদামের পাশে যতক্ষণ না তার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। মাদামকে শান্তিতে ঘুমোতে দেখে উঠে পড়ল আগাথা। জুতোটা মচ-মচ করে উঠল। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে আগাথা।

এ বাড়ীর জীবনধারার এই নিত্য-নৈমিত্তিকতার সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে সে। এর একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে আজ-কাল একটুও বিচলিত হয় না। সান্ধ্য উপাসনা শেষ না হওয়া অবধি নিকোলাসের মা গীর্জায় থাকেন। আর বাড়ীতে গিলস বন্ধু নিকোলাসকে আঁকড়ে বসে থাকে।

এখন গিলসের বাড়ীতে যাওয়া একটু সকাল সকাল হয়ে পড়বে। তাই গীর্জার দিকে পা বাড়াল আগাথা! পাশের দরজা দিয়ে গীর্জার ভিতর ঢুকে পড়ল। পুরোহিত সান্ধ্যোপাসনার মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। তাঁর স্তোত্র পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত উপাসকের দলও যাজকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সাড়া দিল। তাদের কণ্ঠস্বর গীর্জার ছাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম-গম করতে লাগল সারা ঘরে। রাতের আহারের দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে উপাসকমণ্ডলীর সাড়ায় আজ যেন একটু বেশী চঞ্চলতা প্রকাশ পেল!

একটা থামের আড়ালে বসে অপেক্ষা করছিল আগাথা। উপাসনায় মনকে বশ করার জন্যে জানু পেতে বসতে উৎসাহ ছিল না তার দেহ-মনে। এখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। আগাথাকে তার কুলধর্ম মেনে চলার অধিকার দিয়েছেন মেরীর মা বাবা। তাদের কুলাচারে শুধু ইষ্টারের সময় শাস্তি নেওয়া নিয়ম। কিন্তু আগাথা তার কুলধর্মও মেনে চলে কি না সন্দেহ! লোকে যদি তাকে নাস্তিক বলে, তাতে তার লজ্জা ত নেই, বরং বেশ যেন গৌরব বোধ করে সে। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে চলতেই তার আনন্দ। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এত দিনে হারিয়ে ফেলেছে সে ধর্মে বিশ্বাস। তবু কখনো কখনো সন্দেহ হয় সত্যিই কি স্খলিত হয়েছে সে ধর্মাশ্রয় থেকে? সত্যিই কি একদিন ছিল তার ধর্মে বিশ্বাস? অত চুলচেরা দার্শনিকতা ভালও লাগে না আগাথার। ভগবানের সঙ্গে তার সব যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। তার প্রাণের ভগবানের কথা আর কানে শুনতে পায় না সে—তার কাছে তার কোন আবেদনও নেই।

আগাথার ধারণা, রূপের ব্যাপারে স্রষ্টা ভগবান অবিচার করেছেন তার প্রতি। একজন ধর্মযাজক ঠিকই বলেছেন—ভগবানের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধেই তার জেহাদ। কি হবে উপাসনায়! হাজার উপাসনা করলেও তার চেহারা সুন্দর হবে না। পীনোন্নত হবে না তার বুক! যার প্রাণের কুসুম মঞ্জরিত হল না, ভগবান কৃপণ হাতে রূপ দিয়েছেন যাকে, ঈশ্বরপ্রেম তার প্রাণের আকাশে কেমন করে বিকশিত হয়ে উঠবে সহজে?

যতক্ষণ না গীর্জা খালি হয়ে গেল, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগল আগাথা। পাথরের অরণ্যে বৃদ্ধ পর্যুদস্ত সিংহের মত বিরাট অর্গানটা থেকে থেকে আর্তনাদ করছে। শ্বাসক্লিষ্ট রোগীর মত শাঁই-শাঁই আওয়াজ উঠতে লাগল তার গলা থেকে। ঐ অর্গান ভাল করে সারাতে অনেক খরচ। সে যত দিন না হচ্ছে তত দিন ঐ আর্ত গোঙানিও বন্ধ হবে না গীর্জায়।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেন-গুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভা—

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এক দিন গেল। দু'দিন গেল। তিন দিন গেল। চার দিন গেল। পাঁচ দিনের দিন খবরটা যেন খড়ের গাদায় আগুনের ফুলকির মত চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সকালে উর্মিলা খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল। বৃদ্ধা শাশুড়ী ঘরে ঢুকলেন প্রথম। মাথায় কাপড় টেনে উর্মিলা উঠতে যাচ্ছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, থাক থাক, উঠতে হবে না, উঠতে হবে না, বোসো—।

বউয়ের গা ঘেঁষে নিজেও বসলেন তিনি। মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। ছানি-কাটা চোখে একটু আবছা দেখেন। সময় লাগল তাই। পরে ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি নাকি? অ্যাঁ—? সত্যি—?

আশায় আগ্রহে বৃদ্ধার ঘোলাটে চোখ দু'টোও যেন চক্‌চকে দেখাচ্ছে। বউয়ের পিঠে ঘন ঘন হাত বুলাতে লাগলেন তিনি। অধৈর্য কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বল না গো, বড় বৌমা যা বললে সত্যি—?

উর্মিলা সামান্য মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সত্যি—।

পিঠের ওপর শাশুড়ীর শীর্ণ হাতখানা থেমে গেল। দু'-চার মুহূর্ত চোখ বুজে ইষ্টদেবতাকেই স্মরণ করে নিলেন বোধ হয়। পরে আবার তেমনি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস ধরেই···?

উর্মিলা এবারে আরো সুস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়লে।

আসল খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি চাপা রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন, কি জানি বাছা কেমনতরো কাণ্ডজ্ঞান তোমাদের, আমাকে যমে ভুলেছে বলে তোমরাও ভুলতে বাকি রাখলে না কিছু।···বড় বৌমা কবে জেনেছে, আজ সকালে?

উর্মিলা নতমুখে জবাব দিল, চার পাঁচ দিন হ'ল।—

—চার পাঁচ দিন! আবার কাছে ঘেঁষে এলেন তিনি, প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায় মুখখানা বিকৃত দেখালো প্রায়। কানে কানে বলার মত করে বললেন, দেখলে আক্কেলখানা! আমাকে এই তো একটু আগে জানালো! আর তোমাকেও বলি, তাড়াতাড়ি বেছে বেছে তাকেই আগে বলতে গেলে! আমাকে খবর দিলে না তো, হাঁড়ি-মুখ করে যেন শোক-কথা শোনালে—ষাট্‌ ষাট্‌ ষাট্‌—তুমি বাছা একটু বুঝে-সুজে চ'লো।

আনন্দাতিশয্যে গাত্রোত্থান করে তাড়াতাড়ি তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। এর পরে কি হবে উর্মিলা আঁচ করতে পারে। এত কাল ধরে ঠাকুর-দেবতাদের যত মানসিক পাওনা হয়েছে, এবারে সেগুলো সব সুদে-আসলে মিটোবে। কিন্তু আবারও ফিরলেন তিনি। নিশি খবর পেয়েছে? তাকে জানিয়েছ তো?

উর্মিলা জবাব দিলে না। এক বারে জবাব না পেলে শাশুড়ী রেগে ওঠেন জেনেও। গলা চড়ল তাঁর, কথাটা তোমার কানে যাচ্ছে না নাকি? নিশিকে খবর দেওয়া হয়েছে?

উর্মিলা এবারে হেসে বলল, জায়গায় জায়গায় ঘুরছেন, এখন কোথায় কোন ঠিকানায় লেখা হবে? চিঠি আসুক।—

সত্যি কথা নয়। আবার এক পসলা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই এ রকম বলল। জবাবটা শাশুড়ীর মনঃপূত হল না খুব। ছেলের উদ্দেশ্যে গজ-গজ করতে করতে তিনি প্রস্থান করলেন।

দত্ত-বাড়ীতে পোষ্য-সংখ্যা খুব কম নয়। পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতনী নিয়ে এক জন পিসি-শাশুড়ীর গোটা সংসার এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। শাশুড়ীরই সমবয়সী বিধবা তিনি। আনন্দাতিশয্যে শাশুড়ী প্রথম তাঁর কাছেই খবরটা সংগোপনে প্রকাশ করলেন। ফলে অন্যান্য সকলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেনে গেল। একে একে তারা এসে উর্মিলার ঘরে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। ব্যক্তিগত স্বার্থ ধরতে গেলে খুব সুখবর নয় হয়তো। তবু, খবর তো একটা। একেবারে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত খবর। যে ঝি-চাকরাণীদের সাত বার ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না, খুঁটিনাটি কাজের অছিলায় তারাও এক-আধ বার দর্শন দিয়ে গেল। দুপুরের দিকে পাড়া-প্রতিবেশিনীদেরও আসা-যাওয়া সুরু হ'ল। খবরটা তাদেরও কানে পৌঁছেচে। খবরের মত খবর, পৌঁছুবে বই কি। কেউ শুধু দেখে গেল, কেউ উপদেশ দিলে, কেউ বা ঠাট্টা-তামাসা করলে। বৃদ্ধা শাশুড়ী মিষ্টি-মুখ না করিয়ে ছাড়লেন না কাউকে। বিকেলের মধ্যে বোধ করি গোটা মহেশপুরে জানাজানি হয়ে গেল, বংশধর আসছে দত্ত-বাড়ীতে।

বংশধর! দত্ত-বাড়ীতে! পশুপতিনাথ দত্তের বাড়ীতে বংশধর!

এ বিস্ময়ের পিছনে একটুখানি সেকেলে ধরণের ইতিহাস আছে। মহেশপুরে দত্ত-বাড়ীর পরিচিতি পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন। সবাই চেনে। আর এ-বাড়ী সম্বন্ধে এখনো এক ধরণের আগ্রহ আছে সকলের মনে। এই পরিচিতির পিছনে আছে একটুখানি দর্পোদ্ধত ঐতিহ্য। মহেশপুরের মহেশ দত্ত আজ বিস্মৃত পুরুষ। কিন্তু পশুপতিনাথ দত্ত এখনো গল্পের মতই বহু-বিশ্রুত। তাঁর ক্রোধ, তাঁর দাক্ষিণ্য আর তাঁর বিলাস অপচয় —এই তিন নিয়ে তাঁর পরিচয়। ক্রোধের আগুনে বহু জনের সর্বস্ব পুড়েছে, দাক্ষিণ্যের করুণায় বহু জনের সর্বস্ব লাভ হয়েছে, আর অপচয়ের ফাঁক দিয়ে প্রাচুর্য-লক্ষ্মী দ্রুত নিঃসৃত হয়েছেন। কিন্তু এ বাড়ীতে নতুন বংশধর আগমন-সম্ভাবনায় লোকের আগ্রহ এবং বিস্ময় একটুখানি রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রসূত। এই বাড়ী বলেই সম্ভবতঃ লোকে ভোলেনি সে কাহিনী। কোন সিদ্ধবাক্‌ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের না কি অভিশাপ আছে, নির্বংশ হবে দত্ত-বংশ। কেউ এর সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে জড়িয়েছে, কারো বা বিশ্বাস, পরদেশীয় বিচারালয়ে ব্রাহ্মণের একটি ছেলের ফাঁসীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল, পশুপতিনাথের জটিল ষড়যন্ত্রে এবং বিশ্বাসঘাতকতায়।

এর কিছু দিনের মধ্যে একটা অভিনব যোগাযোগ ঘটে যায়। পশুপতিনাথের হঠাৎ খেয়াল হল, বড় ছেলে আদিত্যনাথ নিঃসন্তান। বছর দশেক আগে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। অন্দর মহলে অবশ্য আড়ালে-আবডালে অনেক কথা হত। কিন্তু কর্তার ভয়ে বাইরে কেউ টুঁ শব্দটি করত না। কারণ, এই দুর্ধর্ষ মানুষটির এক অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল বড় বউ শৈলবালার প্রতি। এই এক জনের ক্ষেত্রে

স্নেহ-মমতায় একেবারে অন্ধ ছিলেন যেন। এক বার বউকে গঞ্জনা দেবার ফলে, ছেলেকে খড়ম-পেটা করে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন তিনি। বাড়ীর বউকে এতটা প্রশ্রয় দিতে দেখে শাশুড়ী রাগে জ্বলতেন। আজও সংসারে বড় বউয়ের গুরু-গম্ভীর আধিপত্য দেখে সখেদে স্বর্গগত স্বামীকে টেনে আনেন তিনি—আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়ে গেছে, ইত্যাদি। আজকের কথা থাক। কনিষ্ঠ নিশানাথ তখন ছোট। পশুপতিনাথ হঠাৎ আদিত্যনাথকে ডেকে আদেশ করলেন, আবার বিয়ে করতে হবে, এবং অচিরেই। শুনে আদিত্যনাথ হতভম্ব। পরে অবশ্য খুসী হলেন। বৌয়ের দেমাক ভাঙবে। বাবার ভয়ে হোক বা যে জন্যেই হোক, বউকে বিলক্ষণ সমীহ করে চলতেন তিনি। আর খুসী বোধ একটু শাশুড়ীও হলেন। কত জায়গা থেকে কত অর্থব্যয় করে একটা তাবিচ-কবচ সংগ্রহ করে আনতেন তিনি, কিন্তু ভক্তিভরে সে সব ধারণ করা দূরে থাকুক, গরবিণী এক বার হাতে তুলে নিয়েও দেখেন নি, এবার বুঝুক মজা—

কিন্তু মজা আবার ফিরে তাঁরাই দেখলেন। বিয়ের কথাবার্তা তোড়জোড় চলছে। শৈলবালা শ্বশুরকে শুনিয়ে নির্ভীক, শান্ত মুখে জানিয়ে দিলেন, বিয়ে আর একটা ছেড়ে পাঁচটা হোক, তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু এ রকম সংসারে ছেলে-পুলে হবার নয়, এটা তিনি জেনে রেখে দিতে পারেন, এর জন্য বাইরে থেকে কারো শাপ-শাপান্তের দরকার ছিল না।

কথাগুলোর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। পশুপতিনাথ স্তব্ধ, নির্বাক্। সেই থমথমে গম্ভীর মূর্তি দেখে দুরু-দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সকলে। এবারে নারী-হত্যাই ঘটে কি না কে জানে? কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু বিবাহের কথাবার্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তবে, যত দিন জীবিত ছিলেন, পুত্রবধূকে আর কাছে ডাকেন নি কোন দিন। দু' বছর না যেতে শৈলবালা যখন বিধবা হলেন, তখনো না। পিতার অজস্র অপচয়ের মধ্যেও খানিকটা পৌরুষ ছিল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত আদিত্যনাথ ভিতরে ভিতরে বিকল হয়ে আসছিলেন অনেক দিন ধরেই। তবু তাঁর মৃত্যুতে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের যোগাযোগটাই বড় করে দেখলে মহেশপুরের লোকেরা। অভিসম্পাতের দশ বছর আগে থেকেই তিনি যে নিঃসন্তান ছিলেন, এ-ও বিশেষ মনে থাকল না কারো।

যথাসময়ে পশুপতিনাথও বিগত হয়েছেন। তার পরে একটানা কতগুলো বছর কেটে গেছে। পড়াশুনা শেষ করে নিশানাথ ধীরে-সুস্থে বিষয়-আশয় বুঝে নিয়েছে। অন্ততঃ, শৈলবালা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেওরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক প্রীতির নয়, বরং স্নেহের বলা যেতে পারে। কিন্তু তাও অনেকটাই প্রচ্ছন্ন। উচ্চ শিক্ষার দরুণ হোক বা বিধির কৃপায় হোক, বংশগত অপচয়ের প্রভাবটুকু নিশানাথকে তেমন স্পর্শ করেনি। কিন্তু পিতৃকুলের সেই দুর্দম স্বভাব, বনিয়াদী মেজাজ অথবা খেয়ালী চাল চলনের কিছুটা মিল লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও দেখা যেতে পারে। শিক্ষার সংযম এ দিকেও অনেকটাই রাশ টেনে রেখেছে বটে, তবু বোঝা যায়।

সময় মতই বিয়ে করেছে। সে-ও আজ আট-ন' বছর হয়ে গেল। কিন্তু ছেলে-পুলে হয়নি। হবার আশাও সবাই ছেড়েছে। শাশুড়ী এবারে অবশ্য ঊর্মিলাকে ইচ্ছে মত তাবিচ-কবচ পরিয়েছেন। শৈলবালা দেখেছেন। বাধা দেননি। বরং মাঝে-মধ্যে বিদ্রূপ করে বলেছেন, পর, পরে দ্যাখ—এ বাড়ীতে ছেলে-পুলে হওয়া তো দৈবেরই ব্যাপার!

এ ধরণের শ্লেষ কানে এলে নিশানাথের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অগ্রজের দ্বিতীয় বিবাহ পরিকল্পনার প্রহসন ভোলেনি। তবু চুপ করেই থাকে। ভয়ে নয়, ভক্তিতেও নয়। সে সব ধাতে লেখেনি। বলে না, বলে কিছু লাভ নেই বলে। শৈলবালা ঝগড়া-বিবাদের ধার দিয়েও যাবেন না, তাঁর শান্ত নীরবতাই ফিরে ব্যঙ্গ করবে ওকে। তা ছাড়া, ভ্রাতৃজায়ার অন্তরের বলিষ্ঠতার সঙ্গে ওর নিজের অন্তরের বলিষ্ঠতার কোথায় যেন আপোস আছে। সেটা ক্ষুণ্ণ করতে গেলে নিজেরটাও ক্ষুণ্ণ হবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কপালে করাঘাত করে শাশুড়ী নিজেই হাল ছেড়েছেন, দৈব অনুগ্রহও তাঁর অদৃষ্টে জুটল না ধরে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি।

এ-হেন দত্ত-বাড়ীতে সহসা বংশধর আগমন সম্ভাবনায়, ঘরে-বাইরে একটা সাড়া পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

ঊর্মিলা নিজেই বোধ করি হতভম্ব হয়েছিল সব চেয়ে বেশী। নিশানাথ জাপান গেছে। উদ্দেশ্য, বৈজ্ঞানিক চাষের কি একটা শিখে আসবে। বছর খানেক লাগবে ফিরতে। সে রওনা হবার দিন পনেরর মধ্যে ঊর্মিলা খেয়াল করল, মাসটা একটা ব্যতিক্রমের

মধ্য দিয়ে কেটে গেল। ব্যতিক্রমটা পরের মাসেও বজায় থাকল। উর্মিলা বিশ্বাস করবে, এমন সাহস নেই, অথচ কিছু একটা ঘটছে সন্দেহ নেই। মুখে একেবারে তালা আটকে দুরু-দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। তৃতীয় মাসে আর কোনো সন্দেহ রইল না, কতকগুলো লক্ষণ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করল সে। আর গোপন রাখাটা সমীচীন বোধ করল না। কিন্তু একমাত্র বড়জা' ছাড়া বলবেই বা কাকে? শৈলবালার কর্তব্যপরায়ণতার ওপর আস্থা আছে সবারই।

তাঁকেই বলল। শৈলবালা হঠাৎ যেন বুঝে উঠলেন না, কি বলতে চায়। হৃদয়ঙ্গম করা মাত্র স্বভাববিরুদ্ধ আনন্দোচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন তাকে। কিন্তু, মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই সহসা স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন! নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইলেন শুধু। অনেকক্ষণ স্বভাবগত গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে সংবৃত করে নিয়েছেন ততক্ষণে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস বললি নে?

উর্মিলা এ ভাব পরিবর্তন দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে। ঘাড় নাড়ল।

—ঠাকুরপো জেনে গেছে?

—না, যাবার দিন পনের বাদে তো প্রথম টের পেলাম।

—পরে জানিয়েছিস?

—উর্মিলা মাথা নাড়ল আবারও, জানায় নি।

—কেন? প্রায় তীক্ষ্ণ শোনাল কণ্ঠস্বর। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আগেই ফুটে উঠেছে।

উর্মিলা জবাব দিল, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠছে সে। কিন্তু কি আর করবে!

শৈলবালার দু'চোখ তার মুখের ওপর তেমনি সংবদ্ধ। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকেই বা আগে বলিস নি কেন?

—বললাম তো, নিজেরই ঠিক বিশ্বাস হয়নি। হাসল, এই বড় জা'টিকে শক্ত কথা কিছু বলতে হলে হাসি মুখেই বলতে হবে। বলল, হল কি, তুমি যে দেখি একেবারে পুলিশের মত জেরা সুরু করে দিলে!

শৈলবালা আর বললেন না কিছু। শুধু আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে চলে গেলেন। ফিরে দেখলে দেখতে পেতেন, উর্মিলা আগুন হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে, এ এক বারও ভাবেনি। এখন যেন মনে হচ্ছে তাই।

সন্দেহটা পরদিন থেকে ঘনীভূত হল আরও। এক দুই করে পর পর চার দিন কেটে গেল, অথচ বড় জা' মুখব্যাদান পর্যন্ত করলেন না কারো কাছে। শুধু উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে নিঃশব্দে লক্ষ্য করেছেন তাকে। উর্মিলা সেটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে কাটিয়েছে। মনে মনে শঙ্কিতও হয়েছে সে, নিশানাথ নেই এখানে, এখন ওনার ওপরেই সব নির্ভর, অথচ মতি-গতি যা দেখছে, তাতে ভরসা কম।

পাঁচ দিনের দিন আবার ঠিক বিপরীত কারণে রাগ হল বড় জা'য়ের ওপর। পাঁচ পাঁচটা দিন মুখ সেলাই করে কাটালেন, আবার যখন ঢাক-পেটানো সুরু করেছেন, তখন আর বাকি নেই কেউ। ওর ধারণা, তাঁর জন্যেই খবরটা এ ভাবে ছড়িয়েছে। সারা দিন নানা শুভার্থিনীর আগমনে মুখ বুজে বসে থেকেও যেন একটা ধকলের মধ্য দিয়ে কাটল। সন্ধ্যে পার হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার। এবারে পুরুষের ভারী পায়ের শব্দ। উর্মিলা উৎকর্ণ হল। শব্দটা চেনা বটে। বিরক্তি নয়, বরং খুসীর ছোঁয়া লাগল মুখে। উঠে বসল।

বাইরে থেকে গলা শোনা গেল, আসব?

—আসুন। উর্মিলা শাড়ীর আঁচল মাথায় টেনে দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

আগন্তুক শৈলবালার ছোট ভাই শশাঙ্ক। শশাঙ্ক বোস। হাসি চেপে ভ্রূ কুঁচকে উর্মিলার দিকে চেয়ে রইল সে।

—বসুন।

—হুঁ। শশাঙ্ক শয্যার অপর প্রান্তে আসন নিয়ে তেমনি ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, এই কাণ্ড তোমার?—

—উর্মিলা বিস্ময়ের ভাণ করল, কি কাণ্ড!

শশাঙ্ক হাসল এবার।—ও, নিজের কানে শুনলে অমৃত ঝরবে বুঝি! বলব?

—থাক, বলতে হবে না। উর্মিলা বিরক্তির ভাব দেখিয়েও হেসে ফেলল, আপনি শুনলেন কোথায়?

শশাঙ্ক হাসতে হাসতে জবাব দিল, শুধু আমি? আজকে না ভূত ছাখো তুমি, ভাবী বংশধরের পিতামহ পশুপতিনাথও স্বর্গ থেকে হোক বা নরক থেকে হোক, ছুটে আসতে পারেন। শুভ সংবাদ হয় তো সেখানে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।

হঠাৎ কি মনে পড়তে হাসি থামল তার। জিজ্ঞাসা করল, রাস্কেলটা খবর জেনেছে তো?

কার উদ্দেশে এই মধুর সম্ভাষণ জেনেও উর্মিলা নিরীহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ রাস্কেলটা?

—তোমার রাস্কেল, আবার কোন রাস্কেল।

—আমার কোনো রাস্কেল-টাস্কেল নেই। স্বামি-নিন্দা শুনলে রেগে যাবো বলছি।

—আহা গো, দেহত্যাগ করবে না?—জেনেছে?

—আপনার এক যুগ দেখা নেই, খবর দেবে কে?

জবাবে শশাঙ্ক একটা স্থূল ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। একে একে দু'জনের দিকেই তাকালেন। পরে ভাইকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এসেছিস?

—এই তো, শুধু হাতে যে, মিষ্টি কই?—

মুখে কোন ভাবলেশ নেই শৈলবালার। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোকে একটা খবর পাঠাব ভাবছিলাম, কথা আছে শুনে যাস।—

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। শশাঙ্ক ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালো উর্মিলার দিকে।—কি ব্যাপার?

উর্মিলা ঠোঁট উল্টে দিলে, কি জানি—।

এই লোকটির সঙ্গে উর্মিলার হৃদ্যতা সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। হৃদ্যতা নিশানাথের সঙ্গেও আছে। কিন্তু সে এক অদ্ভুত পরস্পর-বিরোধী হৃদ্যতা। ছোট থেকে একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে

খেলাধূলা করেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে। কিন্তু ওদের ছেলেবেলার রেষারেষি আজও তেমনি অটুট আছে। কে কাকে ব্যঙ্গ করবে, বিদ্রূপ করবে, জব্দ করবে এই নিয়েই আছে। সোজাসুজি বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ বহু কাল ধরে। কারণটাও কম বিচিত্র নয়। একদা পাখী শিকারে বেরিয়েছিল নিশানাথ। সঙ্গে শশাঙ্কও আছে। কেউ কাউকে শ্লেষ না করে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, তবু পরস্পরের সঙ্গটা চাই; শিকার জিনিসটা শশাঙ্কর পছন্দ নয় তেমন। বন্দুক বাগিয়ে ধরে পাখীর ঝাঁকের দিকে সন্তর্পণে এগুচ্ছে নিশানাথ, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে। আর একটু এগিয়ে গেলেই হয়, হঠাৎ পিছন থেকে এক ঢিলে শশাঙ্ক পাখীর ঝাঁক দিলে উড়িয়ে। নিশানাথ নিশানা ঘুরিয়ে দিলে, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে—সেই দিকে। শশাঙ্ক ভাবলে ভয় দেখাচ্ছে। নিশানাথ ঘোড়া টিপলে। এক বার, দু'বার, তিন বার তার হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। তিনটে গুলীই শশাঙ্কর কাঁধ থেকে কোমরে ঝোলানো বিশালকায় থলেটা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। ছড়া-গুলী নয়, আসল গুলী। আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ল শশাঙ্ক, ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর-থর করে, মৃত্যু-বিবর্ণ মুখ।

নিশানাথ বন্দুক কাঁধে ফেলে তার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখে যেন তখনো পাখী মারা একাগ্র দৃষ্টিটা বসে আছে। বলল, এইমুটা কেমন দেখে রাখো, আবার এমন হলে, নিশানা বদলাতে পারে।

শশাঙ্ক আর একটি কথাও না বলে বাড়ী ফিরেছে। সে দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এর পরে নিশানাথ তার বাড়ী আসতে শশাঙ্ক স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তার সঙ্গে বাক্যালাপ রাখতেও সে ঘৃণা বোধ করে। দেহের রক্তকণিকা আবার টগবগিয়ে উঠল নিশানাথের। কিন্তু কিছু না বলে সে ফিরে এল।

সেই থেকে মুখোমুখি কথাবার্তা বন্ধ। সময়ে ক্রোধ উপশম হয়েছে দু'জনারই। তবু। শশাঙ্কর বুদ্ধির ধার বেশী, আর নিশানাথের আভিজাত্যের পৌরুষ বেশী। ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। শৈলবালা মাঝে থাকার দরুণ যোগাযোগটা বন্ধ হয়নি। নিশানাথের বিয়ের পর দেখা শুনাও আরো বেড়েছে। তার বিয়েতে প্রধানতম উদ্যোগী কর্মকর্তা ছিল শশাঙ্ক। এর আগে অবশ্য শশাঙ্কর পিতৃশ্রাদ্ধ নিশানাথ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্বাহ করে দিয়ে এসেছিল। এখন ঊর্মিলা বা শৈলবালা অথবা তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ কাছে থাকলে পরোক্ষে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চলে। সে কথাবার্তাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আর এখনো সেই রেষারেষির গুরুত্ব অনেক সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নিশানাথ সহজে তেতে ওঠে। কিন্তু শশাঙ্কর মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা, তাই সুবিধেও বেশী।

বছর খানেক আগের কথা। শশাঙ্ক কি একটা শক্ত অসুখে পড়তে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এনে সাড়ম্বরে তার চিকিৎসা শুরু করে দিল নিশানাথ। শশাঙ্ক সেরে উঠল। এর মাস পাঁচ ছয় বাদে কি করে যেন পা মুচকে যায় নিশানাথের। বিছানায় শুয়ে আছে, ঊর্মিলা কি একটা মালিস করে দিচ্ছে। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখে, শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে এক জন বড় সার্জেন নিয়ে এসে হাজির। ইশারায় রোগী দেখিয়ে দিতে সার্জেন পায়ের দিকে মনোনিবেশ করলেন। নিশানাথের ইচ্ছে হল, সার্জেনকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়ে শশাঙ্ককে জব্দ করে। কিন্তু মুখ বুজেই রইল সে। সার্জেন পা দেখে মনে মনে হেসে গম্ভীর মুখে একটা লম্বা প্রেসক্রুপশান লিখে দিয়ে ফীস্ নিয়ে প্রস্থান করলেন। ঊর্মিলার বিস্ময় কাটে নি তখনো। নিশানাথ আড়চোখে এক বার শশাঙ্কর মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমনোযোগে প্রেসক্রুপশানটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল।

শশাঙ্ক ঊর্মিলাকে লক্ষ্য করে বলল, একটু চুণ-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দাও। মুচকি হেসে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে।

ঊর্মিলা প্রথম প্রথম এদের রকম-সকম দেখে ভারি অবাক হত। পরে বেশ মজাই লাগত তার। বলত, বুড়ো খোকারা ঝগড়া করে, সবাই দেখে হেসে মরে! এখন অবশ্য ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে অবাক লাগে তার, দু-দুটো লোক এ ভাবে বছরের পর বছর কাটায় কি করে! ঊর্মিলার এখনও সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে শশাঙ্ক সাড়ম্বরে চালের কারবারে নেমেছে বলেই তার ওপর টেক্কা দেবার জন্যে নিশানাথ জাপান গেছে, বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিখতে।

তিন চার দিনের মধ্যেই অভিজ্ঞ চিকিৎসক এনে ঊর্মিলাকে দেখানো হল। এত তাড়াতাড়ি এর দরকার ছিল না সেটা ঊর্মিলাও জানে। ভাইকে দিয়ে বড় জা' এই ব্যবস্থা করেছেন জানা কথা। সমস্ত দিনে তার সঙ্গে এখন দু' চারটে কথাও হয় কি না সন্দেহ, এ দরদে মন ভিজল না। শাশুড়ী অবশ্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক এক বার পরীক্ষা করে কিছু মামুলী বিধি নির্দেশ দিয়ে বলে গেলেন, দু' মাসের আগে আর তাঁর দেখার প্রয়োজন নেই। তবে, তেমন দরকার হলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

রাত্রিতে ঊর্মিলা চিঠি লিখতে বসল নিশানাথের কাছে। এটা দ্বিতীয় চিঠি। অনেক কাটা-ছেঁড়া অদল-বদল করে প্রথম চিঠিতে বারতা পাঠিয়েছে। লজ্জা কেটে যাওয়ায় এবারে অনেকটা সহজ ভাবেই লিখতে বসল। কিন্তু লেখা হয়ে উঠছে না। বছর খানেক বাদে নিশানাথ ফিরে এসে পরিবর্তনটা কি রকম দেখবে, কল্পনায় সেই দৃশ্যটা আস্বাদন করতে করতেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসছে সে।

...নিশানাথ সন্তান চেয়েছে। মনে-প্রাণে চেয়েছে। বংশের গায়ে ও-রকম একটা কালি লেগে আছে বলেই, আরো বেশী করেই চেয়েছে। কোনো দিন সে এটা মুখ ফুটে ব্যক্ত না করলেও, ঊর্মিলা উপলব্ধি করতে পারতো। নিশানাথ মুখে বরং উল্টো কথা বলতো। বলতো, দরকার নেই তার ছেলে-পুলের। ওকে নিয়েই সে নাকি দিব্যি সুখে আছে।

এ রকম কথা অবশ্য ঊর্মিলাই ভাবত মনে মনে। কিন্তু মুখ ফুটে সে নিশানাথকে এক বার অনুরোধ করেছিল, আমায় এক বার কলকাতায় কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো না, হয়তো এ দিকেই কিছু গোলমাল আছে। শুনে নিশানাথ যেন চমকে উঠেছিল প্রথমটা, পরে হাল্কা ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে, কেন, আমাকে নিয়ে তোমার চলছে না?

—খুব চলছে, কিন্তু হবে না-ই বা কেন? বাড়ীতে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলো না এক বার যাই।

নিশানাথ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, গোলযোগ যারই থাক, আমরা দু'জন দু'জনকে নিয়ে বেশ সুখে আছি জানতুম।

এই তুচ্ছ কথার মান ভাঙ্গাতে উর্মিলার যেন একটু বেশী সময় লেগেছিল। নিরালা রাতে স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে স্বীকার করেছে, শাশুড়ীর কথা ভেবে, বংশের কথা ভেবে তার মাঝে মাঝে ভারী ইচ্ছে করে বটে, একটি সন্তান আসুক—নইলে সত্যিই এ নিয়ে নিজের তার বিশেষ খেদ নেই।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে উর্মিলার, খুব সত্যি কথা বলেনি সেদিন। মনে হচ্ছে, যে আসছে সে না এলে জীবনই বৃথা হত। ভাবতে ভাবতে সে রাত্রে চিঠি লেখা হল না।

এক দিন দু'দিন করে আরো দু'মাস কেটে গেল। দেহের অস্বস্তি যেন ক্রমশঃই বাড়ছে উর্মিলার। কিন্তু তার থেকে চতুর্গুণ বেশী অস্বস্তি মনের।

ইতিমধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্যোগ ঘটে গেছে।

বিগত দু'মাসের মধ্যে এয়ার-মেইলে পর পর সাতখানা চিঠি লিখেছে উর্মিলা, কিন্তু নিশানাথ একখানারও জবাব দেয়নি। শেষে তার পাঠানো হয়েছে। তারের জবাব অবশ্য এসেছে। সে'ও তার কাছে নয়, শৈলবালার কাছে। সংক্ষিপ্ত জবাব—সে ভালো আছে, তার জন্যে কোনো চিন্তার কারণ নেই।

আরো এক মাস গেল। উর্মিলা আবারো চিঠি লিখল। চিঠিতে মাথা খুঁড়ল প্রায়। কি হয়েছে, কেমন আছ, জানাও। শেষে আবার তার পাঠালো। এবারও ভ্রাতৃজায়াই জবাব পেলেন।—ভালো আছে, চিঠি লিখে বা তার পাঠিয়ে তাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়। মান অভিমান ভুলে উর্মিলা শৈলবালার কোলে মুখ গুঁজে ভেঙ্গে পড়ল এবার। শৈলবালা তেমনি কঠিন, নীরব। একটি কথাও বললেন না। উর্মিলা মুখ তুলে দেখে, তার মুখ কাগজের মত সাদা।

দু'মাস। শশাঙ্ক ডাক্তার নিয়ে এলো আবার। তিন মাস আগে সে রকম কথাই ছিল। কিন্তু উর্মিলা বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে সেই থেকে। দিদির শরণাপন্ন হল শশাঙ্ক। কি ব্যাপার, ডাক্তার বসে আছে, ও'দিকে যে উঠছেই না!

রূঢ় কঠিন কণ্ঠে শৈলবালা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রায়, উঠছে না তো আমি কি করব! আর তোরই বা অত দরদ কিসের? না ওঠে তো ডাক্তারকে বিদেয় করে দিয়ে নিজের কাজ দ্যাখগে যা!

শশাঙ্ক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিশানাথের ব্যবহার তারও অজ্ঞাত নয়। দিন কতক আগে সে কথা শোনার পর আক্রোশে একেবারে ফেটে পড়েছিল যেন। চড়া গলায় কটূক্তি করে উঠেছিল, তোমাদের অত সাধের বনেদি ঘরের ছেলেদের বিশেষত্বই তো এই—কোথায় কার খপ্পরে গিয়ে পড়েছে ছাখো। শৈলবালা সেদিনও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠেছিলেন তাকে। আর তাঁর চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির আঁচ যেন গায়ে এসে লাগছিল। উর্মিলাও ছিল সেখানে, শশাঙ্কর মন্তব্য শুনেই সম্ভবতঃ এক বারও মুখ তোলেনি।

শশাঙ্ক সোজা উর্মিলার ঘরে এসে ঢুকল। বাহুতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে সে। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল, ডাক্তার এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ, তাঁকে এখানে নিয়ে আসব, না ফিরে যেতে বলব?

সাড়া-শব্দ নেই।

—চলে যেতে বলি তাহলে? আমারও এত সময় নেই যে, একটা অপদার্থ লোকের কথা ভেবে ভেবে তুমি নিজের সব কিছু মাটি করবে আর আমি বসে বসে সাধ্য-সাধনা করব। উঠবে—?

উর্মিলা চোখের ওপর থেকে হাত নামালো। বসলও উঠে। ফরসা মুখ নিঃসাড় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। শশাঙ্ক চেয়ে রইল খানিক। পরে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। একটু বাদেই চিকিৎসক সঙ্গে করে ফিরল আবার। শৈলবালাও এলেন। শশাঙ্ক বাইরে এসে বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

এখনও চিকিৎসকের দেখবার বিশেষ কিছু নেই। নিয়মিত পরীক্ষা সুরু হবে মাস খানেক পর থেকে। তবে, উর্মিলার শরীরের জন্য একটু উদ্বেগ প্রকাশ করে গেলেন।···শরীর এ সময়ে খারাপ হয় বটে, তবে এর যেন একটু বেশী খারাপ হয়েছে।

বাড়ীতে কি যেন একটা অশান্তি চলেছে শাশুড়ী ঠিক বুঝে ওঠেন না। নিশানাথের খবর জিজ্ঞাসা করলে শৈলবালা বলেন, ভালো আছে। শাশুড়ী ধরে নিয়েছেন হিংসেয় মুখখানা অমন পাথর করে রেখেছে বড় বৌ। চুপি চুপি উর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কোন দুর্ব্যবহার করে কি না তার সঙ্গে। উর্মিলা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। চোখে তিনি কম দেখেন। উর্মিলার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, ভারী রোগা হয়ে গেছ যে। নিজে হাতে পাঁচ রকম মুখরোচক খাবারের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া আর এক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত তিনি। সাত মাস এসে পড়ল। ঘটা করে সপ্তামৃত দিতে হবে বউকে। কোনো বাড়ীর এয়ো আর বাদ থাকবে না বোধ হয়, সবাইকেই ডাকতে হবে—দত্ত-বাড়ীতে আসছে বংশধর, এতে আর যাই হোক, কোন কার্পণ্য বরদাস্ত করতে পারবেন না তিনি।

উর্মিলার থেকে থেকে মনে হয়, সমস্ত শরীরটা যেন কেমন বিষিয়ে যাচ্ছে। মন বিষিয়ে যাচ্ছে বলে কি! কিছু ভালো লাগে না তার, কিছু না। এ সময়ে না কি একটু নড়া-চড়ার ওপরে থাকতে হয়। কিন্তু নড়তে-চড়তে কেমন যেন কষ্ট হয়। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই শুয়ে কাটায় আর আবোল-তাবোল ভাবে।

সেদিনও সকালের দিকে শুয়েই আছে।···বাইরে যেন অনেকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একটু কোলাহলও। পরক্ষণে এক জন ঝি উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকে খবর দিয়ে গেল, ছোট বাবু এসেছেন গো বৌদিমণি! কর্তামায়ের সঙ্গে কথা কইছেন।

উর্মিলার বুকের ভেতরটা আচমকা ধড়াস করে উঠল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। নীচের দিকে কেমন একটা যাতনা অনুভব করল যেন। তাড়াতাড়ি উঠতে গেছে বলেই বোধ হয়। দরজার দিকে তাকালো। উত্তেজনায় বুকটা ঠক-ঠক করে কাঁপছে যেন।

ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল বাইরে। ধীর পদক্ষেপে কেউ আসছে। নিশানাথ—। উর্মিলার স্বামী নিশানাথ! শয্যার হাত দুই দূরে এসে দাঁড়াল।

পরস্পরের দৃষ্টি সংবদ্ধ থাকে কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ। সামলে নিয়ে উর্মিলাই প্রথম কথা বলল। কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে থর-থর করে।

—কেমন আছ ?

নিশানাথ চেয়ে আছে তেমনি। পরে আস্তে আস্তে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে শয্যার ওপরেই বসল। চোখ দুটো এক বার উর্মিলার সারা দেহে বিচরণ করে বেড়াল, যেন বিশ্লেষণ করে করে দেখছে কিছু। তারপর সেই স্থির সূক্ষ্ম দৃষ্টি ওর মুখের ওপর ফিরে এসে থামল। জবাব দিল, ভালো—।

—এমন না জানিয়ে চলে এলে যে ?

—এলাম।···সে জন্যে অখুসী হয়েছ বোধ হয় ?

এই কথাগুলোই অনুরাগসিক্ত হলে অন্য রকম শোনাত। কিন্তু সে রকম শোনাল না। উর্মিলা নির্বোধ নয়। যে নিশানাথ বিদেশে গিয়েছিল, আর যে নিশানাথ ফিরে এসেছে তারা একই মানুষ হলেও এক যে নয় এটা সে উপলব্ধি করতে পারে। তফাতের পরিমাণটা বুঝতে হবে, তফাতের কারণটা বুঝতে হবে। চোখের জল জোর করে ঠেলে আবার যেন ভেতরে পাঠিয়ে দিল সে। কাঁদবে কি! কৈফিয়ৎ নেবে? সে শক্ত হবে, কঠিন হবে। কথা কটা শোনা মাত্র সারা দেহে যেন জ্বালা ধরে গেল। কিন্তু তাড়া কিছু নেই। এত দিন তিলে তিলে জ্বলেছে আরও দু'চার ঘণ্টা সহ্য হবে। উর্মিলা দেখছে চেয়ে চেয়ে।

দরজার কাছে শৈলবালা এসে দাঁড়াতে নিশানাথ খাট ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে এল। উর্মিলা মাথায় কাপড় দিলে। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। নিশানাথ পায়ের ধুলো নিলে। তিনি মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্বল্পক্ষণ। পরে বললেন, চালের চাষ শিখতে গিয়ে এমন মূর্তি করে আনলে, সে চাল খেয়ে লোকে বাঁচবে তো ?

নিশানাথের মুখে হাসির মত দেখা দিল একটু। জবাব দিল, কি মনে হয়, বাঁচবে না ?

কোনো অর্থ আছে কি না কে জানে! শৈলবালার সহজ ভাবটা যেন মিলিয়ে গেল। উর্মিলার দিকে তাকালেন এক বার। সে নতনেত্রে বসে আছে। পরে শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, কত দিনের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত নেই···হুট করে চলে এলে যে ?

নিশানাথ নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, পাসপোর্ট পেলে আরো আগেই আসতুম। হাসল,—আমার খবরের জন্যে তোমরা সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে, না ?

—না, আমরা আর এমন কি আপনার লোক, তবে মা আছেন বাড়ীতে, সেটা খেয়াল রাখতে পারতে।

শাশুড়ীর বোধ হয় এখনও আয়ুর জোর আছে। নাম করতে করতেই দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। তাড়াতাড়ি জপটা সেরে এলেন বোধ হয়। বললেন, তুই এখনো রাস্তার জামা-কাপড় পর্যন্ত ছাড়িস নি। ও-গুলো ছেড়ে হাত-মুখ ধো। নয়তো একেবারে চানই করে আয় আগে। জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তার পর যত খুশী গল্প কর বসে।

শৈলবালার দিকে চেয়ে একগাল হাসলেন তিনি। দেখো বড় বৌমা, ভগবান কেমন সুমতি দিয়েছেন ওকে। যত দিন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে সেধোচ্ছিলাম, কে দেখে, কে শোনে। খেয়াল হল বোধ হয়, এ রকম জ্বালাটা ঠিক হল না। তাড়াতাড়ি ওষুধে নিতে গেলেন, শশাঙ্ক আছে তাই নিশ্চিন্দি। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, খোঁজ-খবর করা—সোনার টুকরো ছেলে, নইলে পরের ছেলে কে আর অতটা করে ?

নিশানাথ বক্র কটাক্ষে উর্মিলার দিকে তাকালো এক বার। পরে শৈলবালার দিকে। নিষ্প্রাণ পটের মূর্তি। ঝিয়ের মুখে কুল-পুরোহিতের আগমন-বার্তা শুনে, বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। পরশু কাজ, তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করল, কি একটা উৎসবের কথা যেন বলছিলেন মা, কবে ?

শৈলবালা জবাব দিলেন, পরশু। পরে বললেন, চান-টান যা করবে করো, আমি এদিকে দেখছি। তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নিশানাথ শয্যায় বসল আবার। জামার বোতাম খুলতে খুলতে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, দত্ত-বাড়ীতে বংশধর আসছে তা হলে···।

উর্মিলা নিরুত্তরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল। নিশানাথ কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, শশাঙ্ক ব্যবসা-ট্যাবসা ছেড়ে দিয়েছে ?

উর্মিলা তাকালো তার দিকে।—ছাড়বে কেন ?

—ডাক্তার ডেকে, ওষুধ-পত্র এনে, এত খোঁজ-খবর করে আর ব্যবসার সময় পায় ?

ওদের এক জনের বিরুদ্ধে আর এক জনের এ রকম ঠেস দেওয়া কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত। কিন্তু উর্মিলা আজ সশ্লেষে পাল্টা প্রশ্ন করল।—তুমি এত দিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে কেন ? দরকার হলে সব ছেড়ে-ছুড়ে সে এখানে এসে বসে থাকতে পারে জানো, সেই ভরসায় ?

নিশানাথ দেখছে। উর্মিলা আবার বলল, যাও চান সেরে এসো, দিদি অপেক্ষা করছেন।

নিশানাথ হঠাৎ হাসতে হাসতেই উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। উর্মিলার মনে হল, মানুষটার হাসিও বদলেছে, তাতেও শ্রী নেই।

বিকেলের আগে নিশানাথের আর দেখা পাওয়া গেল না। উর্মিলা খোঁজ নিয়ে জেনেছে, বাইরের মহলে আছে। বিকেলে মায়ের সঙ্গে স্বল্পক্ষণ কথাবার্তা বলে নিশানাথ ভ্রাতৃজায়ার ঘরের পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ আছে। গলার স্বরে বুঝল কে। এক বার ভাবলো ভিতরে ঢোকে। কিন্তু কি ভেবে চলে এলো।

উর্মিলা খাটের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত লাগছে। আর কেমন একটা যাতনাও। কিন্তু অন্য বিক্ষোভ আরও বেশী। নিশানাথ এলো। অদূরে একটা চেয়ার টেনে বসে হাই তুলল।

উর্মিলা শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, সারা দুপুর ঘুমুলে ?

—হ্যাঁ।

—এখানে ঘুম হত না ?

নিশানাথ জবাব দিল, না।

একটু বাদে উর্মিলা আবার প্রশ্ন করল, যা শিখতে গেছলে শেখা হয়ে গেছে ?

—না। শেখার কি আর শেষ আছে···? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—ঘুরে আসি।

—দাঁড়াও। ঊর্মিলার মুখে বিকৃত রেখা পড়ে গেল।—বোসো, আমার কিছু শোনবার আছে।

নিশানাথ তার মুখের দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে হাল্কা জবাব দিল, শোনার তাড়া কিসের—আপাততঃ আমি আছি এখানে।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই শৈলবালার ঘরের পাশ দিয়ে চলল সে। কিন্তু এবারে আর কারও কণ্ঠস্বর কানে এলো না। কি ভেবে ঘরে ঢুকল। শৈলবালা মেঝেতে একাই বসেছিলেন। উঠে একটা আসন পেতে দিতে গেলেন।

নিশানাথ বলল, না বসব না এখন, এদিক দিয়ে আসতে তখন শশাঙ্কর গলা শুনলাম যেন, চলে গেছে?—

শৈলবালার কণ্ঠস্বর মৃদু শোনাল।—এই তো গেল।

নিশানাথ হাসতে লাগল। বলল, বাড়ী এসেও জাপান-ফেরত মূর্তিটি দেখে গেল না!

কোন রকম শ্লেষ সহ্য করাটা ধাতে নেই শৈলবালার। অথবা তাঁর জবাবের পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে। বললেন, আমি দেখা করে যেতে বলেছিলাম তাকে। বলল, গরজ থাকে তো তুমি তার বাড়ী গিয়ে দেখা কোরো, তার অত সময় নেই।

—হুঁ?—হাল্কা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।—কিন্তু যাবার সময় তো কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দেবারও সময় ছিল!

শৈলবালা একেবারে চুপ। শশাঙ্ক নিশানাথকে কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল ঊর্মিলার চলনদার হিসেবে। তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে সে ঊর্মিলাকে নিয়ে মহেশপুরে ফিরেছে।

সেদিন রাত্রিটাও সদরে কাটালো নিশানাথ। পরদিন সকালে ঊর্মিলা শুনল, খুব ভোরে কলকাতা চলে গেছে সে। তাকে জানায় নি কিছু। মা এবং বৌদিকে নাকি বলে গেছে। কিন্তু তাঁরাই এসে ওকে নানা ভাবে জেরা করতে লাগলেন। হঠাৎ কলকাতায় তার এমন কি জরুরী কাজ পড়ল! আজ বাদে কাল একটা শুভ কাজ, অথচ ছেলে এত দিন বাদে বাড়ীতে এসে জেনে-শুনেও চলে গেল! ছেলেকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আটকাতে চেয়েছেন। কিন্তু তার দিকে চেয়ে বেশী কিছু বলতে যেন সাহসও পেয়ে ওঠেননি। ঊর্মিলার কাছে এসে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বলো তো বৌমা, আমার যেন কিছু ভাল লাগছে না।

ঊর্মিলা জবাব কি দেবে! তার বেদনা-বিবর্ণ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল শুধু।

সে দিন গেল। পরদিন তাকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল নিমন্ত্রিতা এয়োদের মধ্যে। উঠতে-বসতে কষ্ট হচ্ছে, ভেতরের যাতনাটা বেড়ে চলেছে। তবু কলের মত তাকে উঠতে হচ্ছে, বসতে হচ্ছে, কথা বলতে হচ্ছে, এমন কি একটু-আধটু হাসতেও হচ্ছে। উৎসব মিটতে বিকেল গড়িয়ে গেল। শরীরের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল এক প্রস্থ। ঊর্মিলা দাঁড়াতেও পারছে না আর। সন্ধ্যা হতে না হতে শয্যার আশ্রয় নিল।

খানিক বাদে শৈলবালা এলেন। ঊর্মিলার ক্লেশটুকু অনেকক্ষণ ধরেই উপলব্ধি করছিলেন তিনি। কপালে হাত রাখলেন। গায়ে তাপ উঠেছে। ঊর্মিলা চোখ মেলে তাকালো। পরে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নিশানাথ কলকাতায় এসেছে। কিন্তু অকারণে নয়। বিদেশ থেকে প্রত্যাগমন করে মহেশপুরে যাবার মুখে কলকাতার তিনটি নামকরা মেডিকেল ক্লিনিকের সঙ্গে সে যোগাযোগ করে গিয়েছিল। এখন রিপোর্টগুলো নিতে হবে। আগেও অনেক বার নিয়েছে। কিন্তু শেষ বারের মত নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো। এক জায়গা থেকে না, তিন জায়গা থেকে।

রিপোর্ট সংগ্রহ হল। না, ভুল নেই। ভুল থাকবে না জানা কথাই। বিদেশে ওই খবরটা পাওয়া মাত্র সেখানকার নামী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে দিয়েও যাচাই করে নিয়েছে। এবারেও তিনটে রিপোর্ট থেকে সেই চিরাচরিত একই তথ্য আহরণ হল।

...সন্তান-সম্ভাবনা নেই তার।

...কিন্তু তবু বংশধর আসছে।

এইবার নিশানাথ ধীরে-সুস্থে বাকের কথা ভাবতে লাগল। কি করবে সে? কিছু একটা করবেই। কিন্তু কি করবে?

তিন দিন বাদে মহেশপুরে পৌঁছেও ঠিক করতে পারল না, কি করবে। পশুপতিনাথের ছেলে সে। একেবারে নির্মূল করে দেবে বংশধর-বহনকারিণীকে শুদ্ধ? কিন্তু তার পরেও বাকি থাকে। বাকি থাকে শশাঙ্ক। তাকে কি করবে? গুলী করে মারবে? জীবন্ত পুঁতবে? হঠাৎ নিশানাথের মনে হল যেন অন্য রকম রক্ত বইছে তার ধমনীতে। পশুপতিনাথের রক্তে বুঝি মরচে পড়েছিল এত কাল!

সাক্ষাৎ মাত্রে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঊর্মিলা বলে উঠল, এ-সবের অর্থ কি, আমি জানতে চাই।

উঠে বসার ক্ষমতা নেই। জ্বরও ছাড়েনি। কাঁপছে থর-থর করে। শরীর ঝিমিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। তবু উঠে বসল, মাথা সোজা রাখল।

নিশানাথ শান্ত। দেখছে। কুৎসিত, বীভৎস। এই নারীদেহ সে ভালোবেসেছিল এক দিন! আশ্চর্য!—

—কি জানতে চাও, বংশধর আসছে শুনেও আনন্দে লাফালাফি করছিনে কেন?

—আনন্দ যে হয়নি তোমার দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন হয়নি?—চাও না তুমি?

ঊর্মিলা যেন একটা পথ দেখিয়ে দিল নিশানাথকে। হ্যাঁ, সন্তান সে চায় বই কি। সন্তান চায়, বংশধর চায়। যে আসছে আসুক। নিশানাথের সন্তান। দত্ত-বাড়ীর বংশধর। সে থাকবে।...কিন্তু ঊর্মিলা থাকবে না।...আর থাকবে না শশাঙ্ক।

হিংস্র-আনন্দে নিশানাথ মুখ তুলে তাকালো। সে দিকে চেয়ে ঊর্মিলা অকস্মাৎ ভয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল যেন! মানুষের এমন শ্বাপদ চক্ষু আর কখনো দেখেনি।

পরদিন খুব সকালেই নিশানাথ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। এমনি। কিন্তু এক সময় কি ভেবে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরলে সে।

শশাঙ্ক বাড়ীতেই ছিল। নিশানাথকে দেখে কোন রকম অভ্যর্থনা না করে নীরবে তাকালো।

নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসল নিশানাথ। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, তুমি বউদি'কে বলে এসেছ শুনলাম, গরজ থাকলে যেন বাড়ী এসে দেখা করি। গরজ আছে —তোমার কিছু ধন্যবাদ পাওনা আছে সেটা দেব, আর আমার কিছু কৈফিয়ৎ পাওনা আছে সেটা নেব।

শশাঙ্কর মুখে ক্রোধের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু নীরবেই প্রতীক্ষা করে সে।

নিশানাথ বলল, আমি যখন ছিলুম না, শুনলাম তুমি তখন আমার স্ত্রীর খোঁজ-খবর করেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, ওষুধপত্র এনে দিয়েছ, ধন্যবাদটা সেই জন্য।

শশাঙ্ক এবারেও একটি কথাও বলল না।

নিশানাথ একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, জাপানে থাকতে তোমার একটা চিঠি পেয়েছি, অভদ্র, অপমানকর চিঠি। পশুপতি-নাথের ছেলে কারো গালাগাল শুনে বা গরম চক্ষু দেখে অভ্যস্ত নয়। এর জবাব দিতে হবে।

শশাঙ্কর চোখের সমুখে হঠাৎ যেন একটা রহস্য উদ্ঘাটিত হল। দিদি সে দিন তাঁকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার জন্য আকুতি মিনতি করছিলেন। আজ নিশানাথের দিকে চেয়ে তার মনে হল, দিদি ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন তার নিজের কোনো অশান্তির কারণে নয়, এই লোকটার হাত থেকে তাকেই রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু কেন…! কিন্তু কেন—? তীক্ষ্ণধী মানুষটির কাছে কি একটা আভাস যেন সুস্পষ্ট হল। পরস্পারের দৃষ্টি সংবদ্ধ।

শশাঙ্ক ধীরে-সুস্থে বলল, জবাব যদি দিই, প্রবল প্রতাপ পশুপতি-নাথের ছেলের কি সেটা ভালো লাগবে? আমার একমাত্র জবাব হতে পারে, ওই যে বাগানে চাকরটা আর দুটো মালী কাজ করছে, তাদের ডেকে পশুপতিনাথের ছেলেকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে বলা—।

নিশানাথের চোখে সেই হিংস্র আগুন জ্বলে উঠল আবার। মনে হল, এক্ষুণি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু সামলে নিল। নিঃশব্দে উঠে চলে গেল তার পর।

অন্দর মহলে প্রথমেই শৈলবালার সঙ্গে দেখা। বলল, শশাঙ্কর সঙ্গে দেখাটা করে এলাম।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলবালা। নিশানাথ পাশ কাটালো। হাসছে মনে মনে। সত্যটা শৈলবালার কাছেও গোপন নেই। কুশাগ্র-বুদ্ধি শৈলবালার।

কি ভেবে ফিরে এল নিশানাথ। বাইরের ঘরে এসে আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিল। উর্মিলার সামনে এ সময়ে যাওয়া উচিত নয়। একটা কিছু করে ফেলতে পারে। ওর নীল রক্তের নীল আগুন ক্রমশঃ যেন মাথার দিকে উঠছে। হত্যা করতে হবে। মাথায় সেই হত্যার জল্পনা-কল্পনা চলছে সেই থেকে। উর্মিলা হাতের মুঠোতেই আছে। কিন্তু শশাঙ্ক? বিগত দিনের শিকার-পর্বে গুলীতে কাঁধের ব্যাগ ফুটো করে দেওয়া, আর ওর সেই ঠোঁট-কাঁপুনির দৃশ্যটা মনে পড়তে নিশানাথের হাসি পেল। নির্মম ক্রূর হাসি।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে সচকিত হল। তার মা হাউ-মাউ করে এসে কেঁদে পড়লেন।—হ্যাঁ রে, মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবি? কি হল তোর? ওদিকে যে অজ্ঞান হয়ে আছে সেই থেকে, সারা শরীর নীল বর্ণ!

শুনে নিশানাথ নিস্পৃহ মুখে বললে, ডাক্তারকে খবর দিতে বলো।

—হা রে পোড়াকপাল, ডাক্তার কি আর এখানে! শশাঙ্ককে খবর পাঠিয়েছি এক্ষুণি তাকে ধরে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু কি হবে, পেটের সন্তান বাঁচবে তো? তোর কি হল? তুই এক বার এসে দেখে যা না?

শশাঙ্ককে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে খবর দেওয়া হয়েছে শুনেই নিশানাথ গর্জে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু পরের কথাগুলো কানে যেতেই সে তাড়িত-স্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল। উর্মিলা যায় যদি যাক, একটা হত্যার দায় কমবে, কিন্তু যে আসছে তার না বাঁচলেই নয়।

তৎক্ষণাৎ অন্দর মহলে এলো। নিষ্প্রাণ মূর্তির মত চোখ বুজে পড়ে আছে উর্মিলা। শৈলবালা চোখে-মুখে অল্প জলের ছিটে দিচ্ছেন। নিশানাথ তাড়াতাড়ি আর এক জন কর্মচারীকে ডেকে ডাক্তারের কাছে পাঠালো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তার এলেন। নিশানাথ লক্ষ্য করে দেখল, তিনি একাই এসেছেন, সঙ্গে শশাঙ্ক নেই। কিছুক্ষণ বাদে রোগিণী পরীক্ষা করে চিকিৎসক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। নিশানাথের নীরব প্রশ্নের জবাবে শুধু বললেন, এক্ষুণি ঘুরে আসছেন। গাড়িতে উঠে তীর বেগে প্রস্থান করলেন তিনি। ফিরলেন আরো ঘণ্টাখানেক পরে। কিন্তু একা নয়। সহরের একজন নামজাদা বিলেত-ফেরতা সার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

একসঙ্গে আবার রোগিণী দেখলেন তাঁরা। তাঁদের কথাবার্তা দুর্বোধ্য লাগছে নিশানাথের। শেষে তাঁকে আড়ালে ডেকে তাঁরা যা বললেন, তার মর্মার্থ, এক্ষুণি অপারেশান করতে হবে, পেটে যা আছে সেটা সন্তান নয়, জরায়ুতে টিউমার জাতীয় জিনিস। ঠিক শিশুর মতই সেটা আস্তে আস্তে বাড়ে, আর সকল লক্ষণই হুবহু মিলে যায়। বিশেষ করে, রোগিণীর সন্তান-কামনা বেশী হলে এ লক্ষণগুলো আরো সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ রোগ হলে প্রথম কিছু কাল পর্যন্ত সকল চিকিৎসকই ভুল পথে যেতে বাধ্য। রোগিণীর প্রথম যখন জ্বালা-যন্ত্রণা সুরু হয়, তখনই খবর দেওয়া উচিত ছিল। বাঁচার আশা কম, তবে এখনো এক বার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

নিশানাথ কি শুনছে, কোন প্রস্তাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিচ্ছে, কিছুই যেন হুঁস নেই। আবার এক সময় দেখল, গাড়ী-বোঝাই যন্ত্রপাতি এলো, ডাক্তার ছাড়াও সহকারী এলেন দু'জন, দু'জন নার্স'ও। দেখতে দেখতে তার ঘরটার ভোল বদলে গেল যেন! ডাক্তার প্রস্তুত হলেন, সহকারীরা প্রস্তুত হলেন, নার্সরাও প্রস্তুত। অপারেশান করবেন যে সার্জেন তিনি এবার ইশারায় নিশানাথকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশানাথ। অপর ডাক্তার এসে অনুরোধ করলেন, সে নড়ল না। ডাক্তার সার্জেনের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, কি!

নিশানাথ বিমূঢ় নেত্রে দেখছে চেয়ে চেয়ে। উর্মিলাকে ধরাধরি

করে টেবিলে তোলা হল। অসময়ে যাতে জ্ঞান ফিরে না আসে, সম্ভবত সেই ব্যবস্থা হচ্ছে এখন।···সার্জেনের হাতে একটা ঝকঝকে ছুরি ঝকমকিয়ে উঠল।···তার পরেই দু'চোখ বুজে ফেলল নিশানাথ। ছুরিটা সমূলে যেন তারই দেহে বিদ্ধ হয়ে জঠর দেশ দু'খানা করে চিরে দিয়ে গেল। অব্যক্ত যাতনায় চোখ মেলে তাকালো সে। টেবিলে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। উন্মুক্ত, বীভৎস দৃশ্য! সেই রক্তের আধারে সার্জেনের আচ্ছাদনে ঢাকা মোটা মোটা হাত দুটো যেন অবগাহন করছে।

নিশানাথের গা ঘুলিয়ে উঠল, পা টলছে, মাথা ঘুরছে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বাহিরে এসে রেলিংএ মাথা রাখল। অনেকক্ষণ পড়ে রইল তেমনি। মাথা তুলল আবার। কিন্তু পিছন ফিরে ঘরের দিকে তাকাবার সাহস নেই আর। এক-পা দু'-পা করে সামনের দিকে এগুলো সে।

···কিছুক্ষণ।

···যেন বহুক্ষণ। আত্মবিস্মৃতের মত নিশানাথ এ-ঘর ও-ঘর করছে। মায়ের ঘরে গেল। তিনি প্রণামের ভঙ্গীতে উবুড় হয়ে পড়ে আছেন। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। শৈলবালার ঘরে গেল। পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন তিনি। ওকে দেখে আর এক দিকে মুখ ফেরালেন। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। নিজের অজ্ঞাতেই সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে এলো সে।

···উঠোনের এক পাশে শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে।

···এগিয়ে গেল। কাছে। আরো কাছে। খুব কাছে। একেবারে তার বুকের কাছে। হঠাৎ দু' হাত বাড়িয়ে তাকে সবলে আঁকড়ে ধরে ওর কাঁধে মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মত ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

ও দিকে শশাঙ্কও চোখে যেন ঝাপসা দেখছে সব-কিছু!

দৃষ্টির প্রার্থনা

শ্রীরমেন চৌধুরী

সবুজ রূপের আলো ছোঁয় না চোখ
যতো দূর যাই—
সব দেখি ব্যথায় ধূসর;
বর্ণহীন পৃথিবীর ম্লান মূক মাটি!

শুনেছি, পড়েছি বই-এ এই মহাদেশে
ছিলো ছয় ঋতু,
রঙে রঙে ছেয়ে যেত বন-উপবন;
দক্ষিণের দাক্ষিণ্য-প্রসাদে
উচ্ছ্বসিত হোতো মন অধিবাসীদের!
শরতে মরতে না কী নামিত দ্যুলোক
পুলকের পাল-তোলা নায়ে
নিরুদ্দেশ পাড়ি দিত সবে।
আজ শুধু অভাবের মেঘ
ঘন হয়ে বাদল ঝরায়!
ঝরে যায় অফুরাণ জলের মতন
জল নয়, তাজা রক্ত!
তাই তো বরষা এসে পারে না জাগাতে
সবুজ রূপের শোভা।

চোখের ওষুধ হোলো সবুজ কাজল
বলে না কি চিকিৎসা-বিজ্ঞান,—
দু' নয়ন ভ'রে নাও সবুজে সবুজে।
কিন্তু ওই স্বভাব-অভাবে
অধিকাংশে চির দৃষ্টিহীন!
দেখেও দেখে না এরা (পায় না নিশ্চয়!)

কী ছিলো কী হোলো,
সোনা হোলো সীসার অধম,
ধ্বংস হোলো ঐতিহ্য জাতির—
জাতির মৃত্যুর দেরি নেই!

এ চোখ কাচের চোখ, কাছের জিনিস
তা-ও দেখা সাধ্যে না কুলায়;
হায় রে দুর্ভাগা নর-নারী
কী সুযোগ হেলায় হারাস্!
শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি আশে
তোদের এ মিথ্যের বেসাতি।
শয়তান প্রবৃত্তিটাকে উলঙ্গ বাহিরে
তাই তো নাচাস তোরা;
তাই আজ রম্য জনপদ
প্রেতপুরী জীবন্ত শ্মশান!

ক্লিষ্ট, পঙ্গু, অর্ধাহারী নগ্নদেহী জীব
নাম তার বোধ হয় মানুষ—
স্বভাবে অভাবে তারা জরাজীর্ণ আজ,
তবু দেখি চক্রবৃদ্ধি হারে
সৃষ্টি ক'রে চলে যতো দুর্ভাগা দুর্ভোগী!

যেথায় মানুষ আছে স্বেচ্ছা-অন্ধ হ'য়ে
হৃদয় যেথায় নির্বাসিত
জড়ের মুগ্ধতা নাশি' সে অন্ধ জগতে
করি শুধু দৃষ্টির প্রার্থনা।

(সত্য ঘটনা !)

[সত্যিই কি বিচিত্র এই দেশ ! যুগে যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শক, হুণ, পাঠান, মোগল এসেছে। এসে থেকেছে এবং ভারতের সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হয়ে গেছে। দিয়েছে নিয়েছে কত ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ। বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এসে রাজদণ্ড ধারণ করেছে ব্রিটিশ। কিন্তু ক্লাইভ, হেষ্টিংস, ডালহৌসি, আউটরামেরাই কি শুধু এসেছিলেন এ দেশে? আসেন নি হেয়ার, লঙ, কেরী, মার্সম্যান? কর্ণওয়ালিশ বেণ্টিঙ্ক? ঠিক তেমনি একজন এস, টি, হলিনস, ইনস্পেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ সি-আই-ই এসেছিলেন এদেশে। দীর্ঘ দিন থেকেও গেছেন ভারতের নানা প্রান্তে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর এদেশে। ডায়েরীর পাতা ছিঁড়ে কয়েকটি উপহার দিয়েছেন, যার সারাংশ এই লেখাটি।]

কি বিচিত্র এই দেশ!

এস, টি, হলিনস, সি-আই-ই

খুন!

খুব ভাল করে তখনো ভোর হয়নি। 'সবে মুখ-হাত ধুয়ে চেয়ারে এসে বসেছি এমন সময়······

কাল রাতে, ঠিক সন্ধ্যার একটু পরেই একটা বলদটানা গাড়ী করে বাবার পুরোনো দোস্ত এসে হাজির। নিমন্ত্রণ করে বাবাকে নিয়ে গেল গঙ্গাপুরে তার বাড়ীতে। যাবার সময় জানিয়ে গেল যে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই বাবাকে নিয়ে সে ফিরে আসছে। আমি আপত্তি করলাম, বাবা বৃদ্ধ মানুষ। কিন্তু কোনও ওজর-আপত্তিই সে শুনল না। বাবাকে নিয়ে গেল এবং ঘণ্টা তিনেকের আগেই এল ফিরে। কিন্তু একা। বলল, বাবা গঙ্গাপুরের বড় মহাজন ফতে সিংহের বাড়ীতে রাত্তিরটা থাকবে। কাল খুব ভোরেই এসে যাবে। বুড়োমানুষ এই হিমে এতটা পথ···

আমার কিন্তু কথাটা মোটেই ভাল লাগল না, শেরপুরের জোতদার বদন সিংহ ডায়েরী লেখাতে লেখাতে বলে চলল, ফতে সিংহ বাবার পুরনো দিনের শত্রু। কিছু একটা গোলমালের আশঙ্কাতেই আমি গাড়ীতে সেই রাত্তিরেই বলদ জুড়লাম এবং একাই চললাম গঙ্গাপুরের দিকে। ফতে সিংহের বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখলাম, বাইরের ধানের গোলাঘরে অত রাতেও আলো জ্বলছে। সন্দেহ হল। পাশের হোগলার চালার পিছনের গর্ত থেকে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখি, ফতে সিংহ একটা লোহার রড হাতে বসে। সামনে মৃত পড়ে আছেন আমার বাবা। চিন্তাশক্তি-রহিত হয়ে সেই অবস্থাতেই আমি গাড়ী হাঁকিয়ে থানায় চলে আসছি।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই এবং একটুও উত্তেজিত না হয়ে আমি বদন সিংহকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাবাকে যে বন্ধু নিয়ে যায় তার নাম কি?

আমি তাকে এর আগে দেখিনি। বাবার কাছ থেকে সেই দিনই শুনলাম যে ভদ্রলোক বাবার পুরনো বন্ধু। বুঝলাম বদন সিংহ কিছু একটা কারণে ভদ্রলোকের নামটা বলতে চায় না।

যাই হোক, আমি ঘটনাটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু কথা উদ্ধার করলাম। বদন সিংহ কোনও কারণে কিছু টাকা একবার ফতে সিংহের কাছ থেকে ধার নেয়। পরে টাকা শোধ করতে না পারায় ফতে সিংহ নীলাম করে বদন সিংহের কিছু জমি নিয়ে নেয়। সেই কারণে দু'তরফে একটা পারিবারিক শত্রুতা ছিলই।

শেরপুরে এক দফা পুলিশ পাঠিয়ে নিজে আরও জন কয়েক পুলিশ নিয়ে গঙ্গাপুরের দিকে যাচ্ছি, পথে দেখা হল ফতে সিংহের সাথে। হন্তদন্ত হয়ে সেও চলেছে পুলিশ-ষ্টেশনে খবর দিতে।

এই, এই হচ্ছে আমার পিতার হত্যাকারী। একে অ্যারেষ্ট করুন। বদন সিংহ আমাদের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে প্রায় ফতে সিংহকে মারতেই উঠল।

তাকে কোনও ক্রমে থামিয়ে আমরা ফতে সিংহের বক্তব্য শুনতে চাইলাম। টাকা-কড়ি ব্যাপারে অনেক রাত অবধিই আমাকে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতে হয়। কালও লালনগরের এক খাতকের কাছ থেকে টাকার তাগাদা করে প্রায় শেষ রাত নাগাদ পিয়াগপুরের মধ্য দিয়ে আসছি এমন সময় বেণী সিংহের বাড়ীর মধ্যের একটা ঘরে এক জনের মরণাপন্ন চিৎকার শুনে আমি রাস্তার ধারের জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে দেখবার জন্য উঁকি দিই। দেখি যে, বেণী সিংহ একটা লাঠি দিয়ে বদনের বাবাকে খুন করছে। দেখেই খবর দেবার জন্য থানায় ছুটে চলেছি।

তাকেও সঙ্গে নিয়ে সদল-বলে গঙ্গাপুরের ফতে সিংহের যে ঘরে লাস রয়েছে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। দেখে তো মনে হল তাজ্জব ব্যাপার! লাস আছে ঠিকই। কিন্তু ঘরের কোথাও এতটুকু রক্তের দাগ নেই, লাসের কোথাও মারামারি করার কি টানা-হ্যাঁচড়া করার কোনও চিহ্ন নেই।

আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে খুন এখানে হয়নি।

তার পর সেখান থেকে বেণী সিংহের বাড়ী পিয়াগপুর। কিন্তু গিয়ে শুনলাম, বেণী সিংহ গত রাত্রেই আমরহা বলে যোল মাইল দূরের এক গাঁয়ের গরু-বাছুর কেনা-বেচার হাটে গেছে কি যেন কাজে!

থানায় ফিরে এলাম (এইখানে সাব-ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট শেষ হল)।

পরের দিন আমি (মি: হপ্কিন্স) নিজে মীরাটের সদর থেকে এলাম তদন্তে। পিয়াগপুরে বেণী সিংহের বাড়ীতে গেলাম সর্বপ্রথম। শুনলাম, গত রাত্রে বেশ দেরী করেই বেণী সিংহ আমরহা থেকে ফিরেছে।

বেণী সিংহকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম, গত রাতের আগের রাতে খাবার ঘরে বেণী সিংহ একজন মৃত ব্যক্তিকে শোয়ান অবস্থায় দেখতে পায়। চাকরের কাছে খবর নিয়ে বুঝতে পারে যে মৃত ব্যক্তিটি শেরপুরের বদন সিংহের বাবা। তখন গ্রামের চৌকিদারের কাছে নিয়ম মত চার জন ডোম জোগাড় করে (বেণী সিংহ খুব উচ্চ বর্ণের হিন্দু। এবং উচ্চ বর্ণের কোনও হিন্দু কখনও কোনও কারণে নীচু সম্প্রদায়ের মৃতদেহ স্পর্শ করবে না।) মৃতদেহটিকে বয়ে নিয়ে চলল। এদিকে তার পথে বেরিয়ে মনে পড়ল আমরহার মেলার কথা। তখন রাস্তার পাশের এক এঁদো ইন্দারায় লাস ফেলে ডোমদের কোনও কথা কানাকানি করতে নিষেধ করে আমরহায় চলে যায়।

সব শুনে-টুনে বেণী সিংহকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ গ্রামে বা ধারে-কাছে তোমার কোনও শত্রু আছে?

বেণী সিংহ জানাল, মহাজনীর কাজে ফতে সিংহের সঙ্গে তার শত্রুতার কথা।

ঘটনার সূতোগুলো আরও জট পাকিয়ে গেল। যদি ফতে সিংহ হত্যাকারী হয় তো সে বদন সিংহের বাবাকে পেল কোথায়? যদিই বা পেল তো সেই বন্ধুটি কে? যদি বেণী সিংহ হত্যাকারী হয় তো কি তার স্বার্থ? বদন সিংহ কেন বেণী সিংহকে অভিযুক্ত করছে না? বদন সিংহের কথা মত কোনও রক্তের চিহ্নও তো নেই ফতে সিংহের গোলাঘরে? তাহলে?

তখন আমি সোজা ছুটলাম শেরপুরে। বদন সিংহের বাড়ীর আশ-পাশের লোকেদের কাছে খবর নিতে শুরু করলাম। প্রথমে কেউ-ই কোনও কথা স্বীকার করতে চায় না। পরে অনেক বোঝাবার পর আদায় হল আসল কথা।

গ্রামবাসীদের মধ্যে এক জন অনেক রাতে হঠাৎ পায়খানা করতে মাঠে যায়। বদন সিংহের বাড়ী থেকে একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনে সেদিকে গিয়ে দেখে বদন সিংহের বাবা 'বেটা মত্ মারো মুঝে', বলে চিৎকার করছে। আর এক জন বলল, সে বদন সিংহকে কি একটা বোঝা বয়ে নিয়ে অনেক রাতে বলদের গাড়ী জুড়ে দক্ষিণের দিকে যেতে দেখেছে।

সাব-ইনস্পেক্টর ঘটনাটা বুঝতে আমাকে সাহায্য করলেন। তিনি বললেন, বদন সিংহের বাবা ইদানীং অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমন কি, গাই-বাছুর মাঠে চরানো কি বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বদন সিংহ অতি কৃপণ স্বভাবের লোক। এদিকে ফতে সিংহের ওপর জমির ব্যাপার নিয়ে বেশ খানিকটা রাগ তার ছিলই। এক ঢিলে এইবার সে দুই পাখী বধ করবে ঠিক করলে। নিজের বাবাকে খুন করে ফতে সিংহের অনুপস্থিতিতে সে তা তার গোলাবাড়ীতে রেখে এল এবং কেস সাজিয়ে থানায় ডায়েরী লেখাল। ফতে সিংহ আবার নিজে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এবং বেণী সিংহের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে এ কথা ভেবেও বেণী সিংহের খাবার ঘরে কোনও ক্রমে লাসটিকে রেখে এল।

তখন ফতে সিংহকে থানার হাজত-ঘর থেকে আনালাম। যখন তাকে আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানালাম তখন সে স্বীকার করল, আমি সেদিন লালনগর যাই নি সত্য সত্যি। বাড়ীতে অনেক রাতে একটা কুকুর চিৎকার করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বিছানা থেকে উঠে জানলা দিয়ে দেখলাম যে, গোলাঘরের কাছ থেকে ধীরে ধীরে একটা বলদটানা গাড়ী চলে যাচ্ছে। চোর ভেবে লাঠি আর টর্চ হাতে বাইরে এসে দেখি, বদনের পিতার লাস। পুলিশের হাতে পড়বার ভয়ে বেণী সিংহের বাড়ী লাসটিকে রেখে আসি।

এইবার বদন সিংহের পালা। কেস কোর্টে গেল। এবং বিচারে বদন সিংহের প্রাণ-দণ্ডাদেশ দেওয়া হল। ফতে সিংহ আর বেণী সিংহকে অবশ্য সাবধান করে দিয়ে আমরা ছেড়ে দিলাম!

আরও একটি খুন!

আরও একটি অদ্ভুত ধরণের খুন যা আমার চোখে পড়েছিল তারই এক বিবরণ দিচ্ছি। এক দিন টুরে বেরিয়ে হাপুর পুলিশ-ষ্টেশনে গিয়ে দেখি যে, এক জন চৌকিদার থানায় এসে সাব-ইন্‌স্পেক্টরের কাছে একটি খুনের বিষয় ডায়েরী লেখাচ্ছে।

গত রাত্রে থানার খুব কাছেরই এক আমবাগানে আঠারো উনিশ বছরের এক যুবককে কে বা কারা খুন করে রেখে গেছে। যুবকটির নাম মাধো। পিতার নাম ছোটেলাল। সামান্য

কিছু জমি-জায়গার মালিক। গত বছরে অজন্মা হওয়ায় সেই সামান্য জমির প্রায় অর্দ্ধেক গ্রামেরই মহাজন গিরিধারীর কাছে বাঁধা।

গিরিধারী হল সেই গ্রামের সব চেয়ে ধনী। তার মেয়ে শান্তির সঙ্গে এই হতভাগ্য মাধোর কি যেন কি সূত্রে ভালবাসা হয় এবং পরস্পর নাকি পরস্পরের কাছে অঙ্গীকার অবধি করে বিবাহের।

মাধোর বাবা গত মাসের গোড়ার দিকে সব কথা জানতে পেরে গিরিধারীর কাছে যায় তার মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে। কিন্তু গিরিধারী তাদের অপমান করে ফিরিয়ে দেয়। বলে, আমার মেয়েকে মেরে ফেলব তবু···।

এর কয়েক দিন পরই গিরিধারীর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল গ্রামেরই আর একজন মহাজন গিরওয়ার সহায়ের সঙ্গে। বয়স পঞ্চাশ, তু'টি স্ত্রী এবং অগুনতি ছেলে-মেয়ে বর্ত্তমান যার।

বিয়ের আগে দেখা হল একদিন মাধোর সঙ্গে শান্তির। তু'জনেই প্রতিজ্ঞা করল, এই আমবাগানে এসে রাতের অন্ধকারে পরস্পর মিলিত হবে শান্তির স্বামীর অনুপস্থিতিতে।

গিরওয়ার সহায় ছিল একজন পাঁড়-মাতাল। কোন রাতেই বাড়ী ফিরত না বিশেষ। সুতরাং বেশ সুখেই দিন কাটছিল মাধোর আর শান্তির। কিন্তু বিধি বাম। এক রাত্রে একটু সকাল-সকালই গিরিধারী ফিরল গৃহে। নিজ শয্যায় শান্তিকে না দেখতে পেয়ে বাড়ীর পাশের আমবাগানে গিয়েছিল তার খোঁজে। সেই রাত্রেই (আজ থেকে দিন চারেক আগে হবে) বাড়ী ফিরল মাধো। মাথায় মস্ত বড় একটা লাঠির ঘা। সমস্ত শরীর রক্তে ভেজা। তার পর গত কাল রাত্রে এই ঘটেছে। এর চেয়ে আমি আর বেশী কিছু জানি না সাহেব! (মাধোর পিতার জবানবন্দী থেকে এইটুকু পাওয়া গেল)।

ইত্যোমধ্যেই আমি আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলেছি। প্রথমেই প্ল্যান করে ফেললাম, গিরওয়ার সহায়ের বাড়ীতে গিয়ে শান্তির সঙ্গে দেখা করবো।

শান্তির সঙ্গে দেখা করার কথা শুনে শ্রীযুক্ত সহায় তো চটে আগুন! পরদা প্রথা এদেশে খুবই প্রচলিত। সুতরাং দেখা করা যাবে না। জোর করে অবশ্য শান্তির সঙ্গে দেখা করতেই হল।

এক তলার ঘরগুলোতে কোনও জনমানবের চিহ্ন নেই। সরু বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই কানে এল একজন ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর। সাহেব, আপনি যদি শান্তিকে চান তো ডানদিকের সব শেষ ঘরে যান। এ-ঘরে তাঁর আর তুই স্ত্রী আর চার মেয়ে আছে।

আমি সেই ঘরেই গেলাম। ঘরটি তালাবন্ধ। গিরওয়ারের কাছে খোঁজ করতেই ঘরের চাবী পাওয়া গেল।

শান্তির সমস্ত মুখ ব্যাণ্ডেজ করা। এবং সেখান থেকে এখনও সময়ে-সময়ে রক্ত ঝরছে। ব্যাণ্ডেজ খুলতেই আমি আমার জীবনের সব চেয়ে বীভৎস দৃশ্য দেখলাম। নাক কেটে নেওয়া হয়েছে শান্তির এবং কি নৃশংস ভাবে যে···।

ইত্যোমধ্যে একজন কনেষ্টবল এসে জানাল গিরিধারী আর ছেলে গনেশী আসছে ওপরে। ওপরে আসতে আসতেই গিরিধারীর হম্বিতম্বি শোনা গেল, পরদার ভেতরে আসবার ক্ষমতা পেলাম আমি কোথা থেকে?

বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে শান্তি ডুকরে কেঁদে উঠল।

চুপ রও। গিরিধারীর আস্ফালন শোনা গেল ফের।

বোনের এই দশা দেখে গনেশীর বিবেক বাধা মানল না। আমার কাছে সে জানালো সমস্ত কথা ফাঁস করে দেবে।

কথা শুনে গিরিধারী তো তাকে মারতেই যায়। অনেক কষ্টে কনেষ্টবল দিয়ে থামিয়ে রাখতে হল তাকে।

কয়েক দিন আগে গিরওয়ার আমাদের বাড়ীতে যায়। বাবাকে বলে যে, তাঁর মেয়ে শান্তির জন্য বংশে কালী পড়ে যাচ্ছে। যাই হোক, শান্তির ব্যবস্থা সে নিজেই করবে। কিন্তু মাধোকে শাস্তি দেওয়ার ভার আমাদের।

বাবা একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন বড় ভাই মোতিকে। সহায়ও এলো আমাদের বাড়ীতে। এবং বসল বৈঠক। কি করা যাবে মাধোর? ঠিক হল মৃত্যু। হাঁা মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি। একমাত্র আমি ছাড়া (গণেশী) আর সকলেই এ প্রস্তাবে রাজী হল।

প্ল্যান হল, শিস্তু যাবে মীরাটে পুলিশ লাইনে নাম লেখাতে। আসলে কথাটা প্রচার করা হবে মাত্র। কোথাও লুকিয়ে থেকে মাঝের রাতে কাজ শেষ করে আমবাগান থেকেই সোজা গিয়ে শিস্তু ট্রেন ধরবে এবং হাজিরা দেবে পুলিশ লাইনে পরের দিন সকাল বেলায়। এবং ব্যাপারটা ঘটেছেও তাই।

গিরিধারীর মধ্যম পুত্র শিস্তু এবং মোতি দুজনের বিরুদ্ধেই কেস করা হল। শ্রীযুক্ত সহায় এবং গিরিধারীও বাদ গেল না। বিচারে সকলেরই মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হল।

দল বেঁধে ডাকাতি

কিছু দিন ধরেই আমার মহল্লায় হঠাৎ ডাকাতির খুব চিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ডাকাতেরা বেশীর ভাগই আসত রাতের বেলায় একসঙ্গে দশ বার জন বন্দুক হাতে। গ্রামের বাইরে থাকতো তাদের লরী। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ঢুকতো বাছের কোনও গ্রামে এবং সব চেয়ে গ্রামের যে বড়লোক তার বাড়ীই ছিল ডাকাতদের লক্ষ্য।

হিন্দু ইনস্পেক্টর জগদীশপ্রসাদ সি, আই, ডি, ডাকাতি সেক্‌সনের হেড এসে আমাকে সেদিন তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন এ

সম্পর্কে। শুধু মাত্র গত শনিবার রাত্রেই পর পর আটটা ডাকাতি হয়েছে, জগদীশপ্রসাদ বললেন, আমার মনে হয় ডাকাতের দল সারা সপ্তাহটা কোনও কারখানায় কাজ করে। শনিবার দিন কোথাও থেকে একটি লরী ভাড়া করে। রাতে যায় ডাকাতি করতে। রবিবার ভোর হবার আগেই ফিরে আসে সহরে।

এ সম্পর্কে এনকোয়ারী করে আমি আরও কিছু কিছু জানতে পেরেছি। ডাকাতরা যে গ্রামে ডাকাতি করবে যে রাত্রে কয়েক দিন আগেই সেখানে একজন মুসলমান ফকীরের দেখা পাওয়া যায়। ভিক্ষা নেবার ছলে সে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেদের খবর নেয়। চৌকিদারদের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে। গ্রামে কত জন লোক থাকে এ সব তল্লাসীও জানে।

গত শনিবার ডাকাতিগুলোর সন্ধানে গিয়ে দেখি যে, শনিবার সকালেই বৃষ্টি হওয়ার ফলে সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে একটা লরীর ভারী চাকার দাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। খুব সম্ভব একজন লোককে লরীর কাছে পাহারায় রেখে তারা যায় ডাকাতি করতে। এই লোক নিশ্চয়ই লরীর ড্রাইভার, যার নামে আছে লাইসেন্স। আন্দাজ করে মাটিতে দাগ দেখে বুঝলাম লোকটির একটি পায়ের পাতা অপরটির চেয়ে ছোট (ভেজা মাটিতে দাগ দেখে)।

সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিগ্রাম করলাম মীরাট আর দিল্লীতে। দিল্লী থেকে খবর পেলাম, মহম্মদ দীন বলে একজন এমনি ড্রাইভার দিল্লীর ষ্টার গ্যারেজ কোম্পানীতে কাজ করে বটে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছুটলাম সেই গ্যারেজে। সৌভাগ্যের বিষয় সে দিনটাও ছিল শনিবার। ষ্টার গ্যারেজ কোম্পানীতে গিয়ে খবর পেলাম যে, মহম্মদ দীন লরী নিয়ে গেছে মীরাটের দিকে কোনও এক বিয়ে-বাড়ীতে বরযাত্রীদের আনতে। বুঝলাম আরও একটি ডাকাতি ঘটতে চলেছে। আমি অবিলম্বে তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম (জগদীশপ্রসাদের কথা এখানেই শেষ হল)।

নানা আলাপ-আলোচনার পর এই ঠিক হল যে, দিল্লী আর ইউ-পির মাঝে গাজিয়াবাদের কাছে যে শুল্ক আদায়ের জন্য চেক-পোষ্ট আছে সেখানে কেরাণীর বদলে থাকবে সাদা পোষাকের পুলিশ। বাইরে দরওয়ানের বদলেও থাকবে পুলিশ। এবং পাশেই নদীর তীরের ঘন জঙ্গলে থাকবে আরও এক দফা পুলিশ। শেষ রাতে যখন ডাকাতি সেরে লরীখানা নদী পার হয়ে এপারের দিকে আসবার চেষ্টা করবে ঠিক তখুনি বামাল-সমেত আসামীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

লরীর নম্বর ছিল জগদীশপ্রসাদের কাছে। গাড়ীর ডান দিকের মার্ডগার্ড যে ভাঙ্গা তাও তার চোখ এড়ায়নি।

ফাঁদ পাতা হল এবং কাজও হল।

শেষ রাতের দিকে তা প্রায় তখন ভোরই হয়ে এসেছে, এমন সময় দেখা গেল একখানা লরীর হেড লাইটের আলো। খুব তীব্র গতিতে এদিক পানেই ছুটে আসছে।

নম্বর-প্লেট বদলানো থাকলেও ভাঙ্গা মার্ডগার্ড থেকে বোঝা গেল, এইটিই আমাদের ঈপ্সিত লরী। দরজা বন্ধ করাই ছিল রাস্তার। কয়েকটি জিনিষ ইউ-পি থেকে দিল্লী বা দিল্লী থেকে ইউ-পি নিয়ে যেতে হলে শুল্ক দিতে হত। সুতরাং রাতে গেট বন্ধ থাকায় সন্দেহ করবার কিছু ছিল না।

লরীটি বিদ্যুৎগতিতে এসে ব্রেক কষলো গেটের সামনে। লরীর ড্রাইভার দরজা খুলে চেক-পোষ্টের দরওয়ানকে উদ্দেশ্য করে গালাগালি করতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে সাদা পোষাকের পুলিশ গিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিল।

লরীর ভিতর গাঢ় ঘুমে নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রিত আরও প্রায় ডজন-খানেক ডাকাতও ধরা পড়ল বামাল সমেত। দিল্লীতে ঢোকার অন্যান্য চেক-পোষ্টে খবর পাঠিয়ে দেওয়া গেল, পাহারা উঠিয়ে নেবার জন্য।

বাছাধনদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় হাজির হয়েছি, এমন সময় মজঃফর নগর থেকে তার এল যে, সেখানে গত কাল রাত্রে পর পর কয়েকটি ডাকাতি হয়েছে।

বিচারে মহাপ্রভুদের দীর্ঘ দিন করে শ্রীঘর বাসের নির্দ্দেশ দেওয়া হল এবং তার পর থেকে ইউ, পি,র গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত মনে অনেক দিন রাত্রে ঘুমুতে পেরেছে।

বিষপ্রয়োগে হত্যা

ধর্মস্থানেই সব চেয়ে অধর্ম ঘটতে পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসেই দেখা গেছে। কাশী, এলাহাবাদ আর হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সে বার খুব ধুম। সি, আই, ডির লোকেদের কাছে প্রায়ই খবর আসতে লাগল যে কাশী, এলাহাবাদ কি হরিদ্বারের রাস্তায় তীর্থযাত্রীদের মধ্যে প্রায়ই বিষপানে মৃত ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোনও এক দল তীর্থযাত্রী পথে যেতে যেতে রাত্রে যখন কোনও গাছতলায় তাদের রান্না চাপায় তখনি গেরুয়া বসন-পরিহিত কোনও এক সাধুর আবির্ভাব হয়। সেই সাধুজী তখন তাদের সঙ্গে পানাহার করেন। খাদ্যবিনিময় ঘটে। এবং ভোরবেলায় দেখা যায় তীর্থযাত্রীদের মৃত। তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে। সাধুজী নিরুদ্দেশ।

এ-রকমটার প্রায় হপ্তা খানেকের মধ্যেই একটা খবর এল যে রায়পুরের কাছে মীরাট জেলার সীমান্তে গত কাল রাত্রে একজন অচৈতন্য তীর্থযাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে। জ্ঞান তার ফিরে এসেছে হাসপাতালে কিন্তু সে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটলাম রায়পুরে। হাসপাতালে লোকটির কাছ থেকে জানা গেল, যাত্রীটির নাম মুরারীলাল। মীরাট জেলার কল্যাণপুর থেকে মেলা উপলক্ষে সে হরিদ্বার যাচ্ছিল। পথে রায়পুরের কাছে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দেখা হয় এবং তারা দু' জনেই একই গাছতলায় রান্না-বান্না করে রাত কাটাবার সঙ্কল্প করে। রায়পুরের কাছে এসে সন্ধ্যা হল। খাওয়া-দাওয়া করবার সময় সাধুজী তাকে কয়েকটি চাপাটি খেতে দেয়। সাধুজীর দেওয়া জিনিষ ভক্তি করে খেতে গিয়ে কিন্তু মুরারীলালের মুখে খারাপই লাগে। যাই হোক, নাম মাত্র খেয়ে বাকীটা সাধুর অসাক্ষাতে সে রাস্তার ধারে ফেলে দিতে সমর্থ হয় এবং তার পরেই সে আর কিছু বুঝতে পারে না। সকালে উঠে দেখে, তার টাকাকড়ি আর সামান্য গহনা অপহৃত হয়েছে।

মুরারীলাল আরও বললে যে, সাধুর চেহারা তার খুব ভাল করেই মনে আছে। শক্ত-সমর্থ চেহারা, মাথা কামানো, গোল মুখ,

পরিষ্কার তোলা দাঁত আর বাঁ হাতে একটা মস্ত-বড় জড়ুল। দেখা হলে সে ঠিক বার করে দিতে পারবে সাধুকে।

হিসেব করে দেখা গেল, সাধুজী এতক্ষণ হরিদ্বারে গিয়ে হাজির হয়েছেন। সেখানে হাজার হাজার সাধুর ভীড়ে তাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। অবশেষে মাথায় একটা আইডিয়া এল যে হাজার হাজার সাধু থাকলেও হরিদ্বারে একটি বিশেষ ঘাটে পবিত্র সময়টিতে চান করতে সকলেই এসে হাজির হবে। তখন যদি ছদ্মবেশে মুরারীলালকে সেই চান করবার জায়গায় রাখা যায় তো তার দেখা মিললেও মিলতে পারে। অবশ্য সব কিছুই করা হচ্ছে সম্ভাবনার উপর।

সেদিন সমস্ত রাত ধরেই স্নানের যোগ ছিল। পবিত্রতম স্নানটিতে স্নান করবার জন্ম মধ্য রাত্রি থেকেই দলে দলে সাধু আসছিলেন। এক একটি দলে অল্প সংখ্যক লোকই আমরা ছেড়ে দিচ্ছিলাম। আমাদের কাজের সুবিধার জন্ম তো বটেই আর তীর্থযাত্রীদের সুবিধাও যাতে হয়।

চার করা ছিল। মাছও ধরা পড়ল অবশেষে শেষ রাত নাগাদ। মুরারীলাল ঠিক ঠিক মহাপ্রভুকে ধরতে পারল।

কিছু না বলে সাধুজীকে আমরা অনুসরণ করতে লাগলাম। আস্তানার কাছকাছি গিয়ে তবেই এ্যারেষ্ট করব এই ইচ্ছা।

তাঁর ছোট্ট তাঁবুর মেঝে খুঁড়ে পাওয়া গেল শ' তিনেক টাকা, অনেক গহনাপত্র আর কিছু ধুতুরার ফল। সাধুজীর বিরুদ্ধে কেস করার আর কোনও বাধাই রইল না। বিচার হল। রায় বেরুল, যাবজ্জীবন দীপান্তর।

শিশুর রক্তে স্নান

হরপালপুর থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পিয়ারেস্বরূপের পুত্র রামস্বরূপের হারিয়ে যাওয়ার এক খবর পেলাম হঠাৎই একদিন সকাল বেলায়। জানা গেল, সারা বিকেল গাঁয়ের সীমানার এক মাঠে পড়শীদের সঙ্গে খেলা করে ঘরে ফিরে আসবার সময় কেউ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। বন্ধুরা কেউ-ই বলতে পারছে না যে কোন পথ দিয়ে রামস্বরূপ বাড়ী ফিরছিল আর কে-ই বা তাকে ধরে নিয়ে গেল।

সাব-ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটির গায়ে গয়নাপত্র ছিল তেমন?

বিশেষ কিছুই নয়। হার, চুড়ি ইত্যাদি নিয়ে কয়েক ভরি রূপো। সব জড়িয়ে টাকা তিনেক দাম হতে পারে।

সাব-ইনস্পেক্টরের কাছ থেকেই জানলাম যে, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের এদেশে পূর্ণিমার রাতে শিশুর—বিশেষ করে ছেলের যার বয়স চারের মধ্যে তার রক্তে যদি চান করে তো জননী হতে পারে এ বিশ্বাস এখানে চালু আছে।

সে দিনটাও ছিল পূর্ণিমা এবং আমি তাই সন্দেহ করছি স্যর…

বেশ, গ্রামের মধ্যেই খোঁজ করুন যে বন্ধ্যা স্ত্রীলোক কে আছে এবং তার গতিবিধির উপর নজর রাখুন।

একটু খোঁজ করতেই জানা গেল যে, সেই গ্রামেরই মদনমোহন নামে এক বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি নিঃসন্তান। এ জন্ম কর্তার বিশেষ ক্ষোভ না থাকলেও গিন্নী খুবই দুঃখিত এবং প্রায়ই হোম, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি তার বাড়ীতে লেগেই আছে।

গ্রামের পাশেই জঙ্গলের মধ্যে এক জাগ্রত কালীর কথা অনেকের কাছেই শুনলাম। কি মনে হওয়ায় সাব-ইনস্পেক্টর আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। কালী-মন্দিরের মেঝেতে রয়েছে রক্তের দাগ এবং মন্দিরের চার পাশের জমি খুঁড়তে খুঁড়তে এক স্থানে পাওয়া গেল হতভাগ্য শিশুটির দেহাবশেষ।

শিশুটিকে তুলে নিয়ে সতর্ক করে দেবার অছিলায় গ্রামের গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়ানো হতে লাগল। মদনমোহনের বাড়ীতে আসতেই তার স্ত্রী মৃত শিশুটিকে দেখেই অজ্ঞান হবার উপক্রম। অনুতপ্ত হৃদয়ে সে আমাদের কাছে এক স্বীকারোক্তি করল।

আমার স্বামীর কাছ থেকেই আমি জানলাম, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের শিশুর রক্তে স্নান ও জননী হওয়ার কথা। প্রথমে স্বাভাবিক ভাবেই আমি এই নৃশংস ব্যাপারে আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু আমার স্বামী একদিন মধ্যরাত্রে পূর্ণিমা তিথিতে আমাকে কালী-মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেখানেই রক্ত-স্নান করলাম আমি। দোষ যদি কিছু হয় সে আমারই।

কিন্তু বিচারে কোন কথাই কিছু কাজে এল না। ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল মদনমোহনের এবং ছেড়ে দেওয়া হল তার স্ত্রীকে নির্বুদ্ধিতার অজুহাতে।

আরও একটি সতীদাহ

বেণীগঞ্জে যখন আমি আমার রুটিন মাফিক পরিদর্শনে ব্যস্ত, তখন সাব-ইনস্পেক্টর রামপ্রসাদ আমাকে বলল, সাহেব, এখান থেকে মাইল দশেক দূরে বংশীনগর গ্রামে একটি সতীদাহ হবার জোগাড়-যন্তর হচ্ছে।

সে কী? আমার তো ধারণা ছিল যে সতীদাহ এদেশ থেকে…

না। এখনও অজ পল্লীগ্রামে সহর থেকে অনেক দূরে এ-সব ঘটে থাকে। এমন অনেক খবর থাকে যা পুলিশ-ষ্টেশন অবধি এসে হাজির হয় না।

বংশীনগরের আয় আজ-কাল অনেক কমে গেছে। আগে ওখানকার মন্দিরের আয় ছিল অনেক বেশী। কিন্তু একটা সরকারী খাল কাটায় ওখানকার নদীর জল অনেক কমে গেছে। স্নানের ঘাটগুলিও অকেজো। সংকারের ঘাটেও কাজ কম। সুতরাং মন্দিরের পুরোহিত লোকনাথ আর তাঁর সহকারী রামনাথ এই মতলব বার করেছেন। আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে।

গাঁয়েরই এক বয়স্ক শিক্ষক। পুরোহিত অনেক করে বুঝিয়েছেন যে, হিন্দুধর্ম আজ যে অবনতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে তার উন্নতির জন্ম আবার দরকার সতীদাহ প্রভৃতি প্রথার অভ্যুত্থান। বৃদ্ধ শিক্ষক মারা গেলে তাঁর স্ত্রী যদি সতী হন তবে চিরকাল ধরে ভক্তিভরে তিনি সমগ্র দেশের পূজা পাবেন। এবং সেই তালে পুরোহিতও বেশ দু' পয়সা রোজগার করে নিতে পারবে।

খবর পেয়ে আমি নিজে গেলাম সেই শিক্ষকের কাছে। এবং তার পর পুরোহিতের কাছে। কিন্তু তাদের দু'জনের কাউকেই আমি এই ব্যাপারটির নৃশংসতা সম্পর্কে নিরস্ত করতে পারলাম

না। শেষ অবধি তাদের ভয় দেখলাম। বললাম, এর জন্ম তোমাদের শাস্তিভোগ করতে হবে কঠোর ভাবে!

আমি সাব-ইন্‌স্পেক্টরের কাছে বিশেষ নির্দেশ পাঠালাম যে, সে যেন সব সময় স্কুল-মাষ্টারের অসুখ কেমন আছে, সে খবর আমাকে দেয়। সতীদাহের এতটুকু গন্ধও যদি সে কোনও রকমে পায় তাহলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে আসে।

এর পর প্রায় দিন পনেরো কোন খবর নেই। হঠাৎই একদিন সকাল বেলায় রামপ্রসাদ আমার বাড়ী সদরে এসে হাজির! মুখ করুণ। জানাল, সতীদাহ হয়ে গেছে। নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে সে আরও বলল, দিন পনেরো আগে গ্রামের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি জানতে পারি যে, স্কুল-মাষ্টারের মারা যেতে আরও অন্ততঃ হপ্তা দুয়েক লাগবে। কিন্তু হঠাৎই কাল সন্ধ্যায় তার খুব বাড়াবাড়ি হয় এবং প্রথম রাতেই মৃত্যু ঘটে। গ্রামের চৌকিদার সতীদাহের খবর পেয়ে থানায় আমাকে জানাতে আসে। কিন্তু বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য আমাদের গিয়ে গ্রামে হাজির হতে প্রায় ভোর হয়ে আসে এবং তার আগেই ঘটে গেছে সতীদাহ। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বাহিনী নিয়ে আমি ছুটলাম বংশীনগরে। গ্রামস্থ লোকের বিবরণ থেকে জানলাম, স্কুল-শিক্ষকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী হঠাৎ নিজের মত পরিবর্তন করে এবং নিজে মৃত্যুবরণ করতে আপত্তি জানায়। জ্বলন্ত চিতায় এক রকম জোর করেই রামনাথ আর লোকনাথ তাকে তুলে দেয় এবং একান্ত নিরুপায় হয়েই শেষ অবধি অত্যন্ত নৃশংস ভাবে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়।

প্রধান পুরোহিত আর তার চেলাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। গ্রামের লোকের সাক্ষীর উপর নির্ভর করে বিচার হল এদের এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হল।

কে এই রহস্যময়ী নারী?

ঠিক এই সময়ই আমি সি. আই. ডি ডিপার্টমেন্টের চার্জ্জ নিলাম। ভাইসরয় তখন বছরের বেশীর ভাগ সময়ই থাকতেন কলকাতায়। ৩১শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে সে বছর প্রায় প্রতি বছরের মতই নতুন বছরের প্যারেড হবে। ভাইসরয় সেই প্যারেডে উপস্থিত থাকবেন এবং 'স্যালুট' গ্রহণ করবেন। এই প্রথা।

ঠিক সেই বছর ভাইসরয়ের ট্রেনের তলাতেই বোমা ফাটল দিল্লীর কাছে। বহু লোকজন মারা গেল তাঁর ষ্টাফের। কিন্তু খুবই ভাগ্যের জোরে ভাইসরয় প্রাণে বেঁচে গেলেন। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হল না। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল যে, অকুস্থলের পাশেই একটা পোড়ো মন্দিরে কয়েকটি পায়ের ছাপ সহ রয়েছে কিছু তার, একটা ফিউজ এবং আরও নানা সামগ্রী। সব খবরই পাওয়া গেল কিন্তু না পাওয়া গেল সেই সব লোকেদের সন্ধান। সন্দেহ হল, এ কাজ টেররিষ্ট পার্টির।

আমি এর মধ্যে বদলী হলাম এলাহাবাদে। সেখানে আমার সহকারী হিসেবে পেলাম স্যার জন নটবোয়ারকে। দু'জনে মিলে ঘটনাটির সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। আমরা এ ব্যাপারে জড়িত আছেন বলে সন্দেহ করলাম চন্দ্রশেখর আজাদকে, যিনি ছিলেন কম্যাণ্ডার অব দি হিন্দুস্থান সোসিয়ালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মি। ১৯২৫ সালে একবার ধরা পড়তে পড়তে ইনি বেঁচে যান।

কয়েক দিন পরই ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিশ্বেশ্বর সিংহ একদিন এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্ক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিকেল বেলায়, এমনিই হঠাৎ নজরে পড়ল একজন মোটাসোটা লোক সঙ্গে আরও দু'জন পার্কের এক কোণে এক বেঞ্চিতে বসে কি যেন পরামর্শ করে চলেছে। সন্দেহ হওয়ায় বিশ্বেশ্বর সিংহ সঙ্গে সঙ্গে নটবোয়ারের বাড়ী গিয়ে হাজির।

নটবোয়ার আর বিশ্বেশ্বর সিংহ তিন জন কনষ্টেবল সাথে পার্কে এসে পড়লেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু বেঞ্চি শূন্য। হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে যাবেন এমন সময় দেখলেন, পাশের দীঘির ধার দিয়ে উঠে আসছে সেই তিন জন এবং তাদের মধ্যেই রয়েছেন চন্দ্রশেখর আজাদ।

তার পর পার্কের রডোডেন্‌ গুচ্ছের ধারে ধারে শুরু হল বুলেট-বিনিময়। এবং শেষ হল আজাদের। কিন্তু কোন সমস্যারই কিনারা হল না ভাইসরয়ের ট্রেনের মামলার!

দু' বছর পরে হঠাৎ একদিন সি, আই, ডির হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন এল যে, 'ওয়ারলেশ' নামে একজন ধরা পড়েছে। ভাইসরয়ের হত্যার ষড়যন্ত্রে এ লিপ্ত। কোথায় ছিল সে? ফোনেই জিজ্ঞাসা করলাম।

এক রহস্যময়ী নারীর আড়ালে। এই রহস্যময়ীর নারীর জন্ম হ্যাংকাউতে! এক আইরিশ ক্লার্জিম্যানের কন্যা। ইউনিভার্সিটি অব লণ্ডনের গ্র্যাজুয়েট। একজন মুসলমান ল'ইয়ারের পত্নী হিসাবে ভারতে আগমন। বর্ত্তমানে এলাহাবাদের crosthwaite গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

ওয়ারলেশকে সন্দেহ জনক ভাবে এই ভদ্রমহিলার গৃহে প্রবেশ করতে দেখে গ্রেপ্তার করা হয়।

খুবই কৌতূহলী হয়ে আমি এই রহস্যময়ীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একটি মোড়ায় তিনি বসেছিলেন। নানা অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের কোনও খবরই তিনি দিলেন না। তখন জোর করে তাঁকে এ্যারেষ্ট করবার জন্যে মোড়া থেকে তোলা হল এবং মোড়ার নীচে পাওয়া গেল দুটি আনকোরা রিভলবার আর চল্লিশ রাউণ্ড গুলী।

ওয়ারলেশ গর্বের সঙ্গে স্বীকারোক্তি করল, ভাইসরয়কে হত্যার ব্যাপারে সে সাহায্য করেছে। অনেক দিনের জেল হল তার। রহস্যময়ীর জেল হল দু'বছর। কিন্তু এক বছর বাদেই জেলে তিনি মারা গেলেন।

অনুবাদক—আশীষ বসু

শঙ্কর-দর্শন

"মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥"

—শঙ্করাচার্য্য

ফতেনগরের লড়াই

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বিক্রমাদিত্য

সেদিন বিকেলে ফতেনগর বার এসোসিয়েশনে স্থানীয় সাংবাদিকদের এক জরুরী সভা বসলো।

সভাপতির আসন নিলেন এক বৃদ্ধ উকীল। বহু কাগজের সঙ্গেই তিনি সংশ্লিষ্ট। সভায় এক প্রস্তাব পাশ করা হলো। বলা হলো···

"আমরা স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ বিদ্রোহী দলের ভলান্টিয়ারদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করছি। স্থানীয় সাংবাদিকদের ভলান্টিয়ারেরা যে ভাবে তুচ্ছ, অবহেলা করেছেন, সে নিতান্তই মর্ম্মান্তিক, করুণ ও অসহ্য। বাইরের সাংবাদিক ও আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তার সুবিচার চাই। আমাদের জন্যে কোন সুব্যবস্থাই তাঁরা করেন নি। এ কী ঘোর অন্যায় নয়?"

সভায় ঠিক হলো, এই রেজল্যুশনের এক কপি দুই পক্ষেরই সুপ্রীম কমাণ্ডারের কাছে পাঠানো হবে।

বেশ একটু কষ্ট করেই ডাক্তার মেটারের বাড়ী খুঁজে নিতে হলো।

ডাক্তার মেটার সাহেব নন। বাঙ্গালী। আসল নাম হলো সুখ মিত্র। কি কারণে তিনি শহরের প্র্যাকটিস্ ছেড়ে এই নির্জ্জন প্রান্তে আস্তানা গেড়েছেন, কেউ তা জানে না। তিনি ফতেনগরের বহু পুরাতন বাসিন্দা, সবারই পরিচিত।

একটা তিন তলা বাড়ীতে থাকেন ডাঃ মেটার। ফ্ল্যাট হিসাবে বাড়ীটা ভাগ করা। ফ্ল্যাটে ঢুকবার তিন-চারটে রাস্তা আছে। একটি রাস্তার সামনে আছে ডাক্তার মেটারের সাইন-বোর্ড। তীরের ফলা এঁকে রাস্তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার নীচে লেখা! 'দিস ওয়ে ফর ডাঃ মেটার।'

আমরা পথের নির্দ্দেশ দেখে বাড়ীর ভেতর ঢুকলাম। একটু বাদে দেখতে পেলাম আর একটা সাইনবোর্ড। লেখা আছে: 'টার্ণ রাইট ফর ডাঃ মেটার।' ইংরেজী অক্ষরের নীচে হিন্দীতে লেখা: 'ডাইনে মোড় লিজিয়ে।' অতএব আমাদের ডান দিকে আবার ঘুরতে হলো। একটু সামনে আর একটা সাইনবোর্ড। লেখা: 'গো ষ্ট্রেইট ফর ডাঃ মেটার।' সামনেই একটা সিঁড়ি। অতএব সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হলো।

গিদোয়ানী বললে: 'ব্রাদার, এ দেখছি একেবারে ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লের ব্যাপার।'

জবাব দেয় শৈল। বলে: 'রুগীরা যাতে এক বার এ পথে এলে আর না পালাতে পারে। তার সব বন্দোবস্তই করে রেখেছেন ডাক্তার সাহেব।'

দোতলার কাছে এসে আর এক সাইনবোর্ড পেলাম। লেখা আছে: 'সামনের দিকে তাকান। ডাঃ মেটার নজদীগই আছেন।'

সামনের দিকে তাকাই সত্যি, কিন্তু ডাঃ মেটারের পাত্তা নেই। একটু বাদে শৈল চীৎকার করে উঠলো। বললে: 'ডাক্তার সাহেবের আস্তানার হদিস্ পেয়েছি দাদা! এই যে এদিকে আসুন।'

আমরা এগিয়ে গেলাম।

সিঁড়ির ঠিক ডান দিকেই দেখতে পেলাম, বেশ বড়ো রকমের একটা সাইনবোর্ড। লেখা আছে: 'ডাঃ সুখ মেটার—সেকেণ্ড ফ্লোর।' "বাড়ীতে না পাইলে, বড়ো রাস্তার পাশে পানওয়ালার নিকট অনুসন্ধান করুন।"

সাইনবোর্ড দেখিয়ে শৈল আমায় জিজ্ঞেস করলে: 'দাদা, ডাক্তার সাহেবকে বাড়ীতে পাবো ত?'

আমি জবাব দিই: 'আগে চেষ্টা করেই দেখা যাক।'

সাইনবোর্ডের পাশে একটা কলিং-বেল ছিল। গিদোয়ানী বেলটাতে জোরে টিপুনী দিলে। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই। শৈল আমার মুখের পানে তাকালে।

আমি বললাম: 'ঘণ্টা বাজিয়ে লাভ নেই। বরং কড়া-নাড়া দাও।'

শৈল কড়া-নাড়া দিলে। একটু বাদে ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে জবাব এলো: 'কে?'

: 'ডাক্তার মেটার আছেন?'

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে এলেন। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হবে। গলায়, 'ষ্টেথিস্‌কোপ'। মুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি রুগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন।

ডাঃ মেটার জিজ্ঞেস করলেন: 'কী চাই?'

জবাব দিলে শৈল। বললে: 'আমার নাম শৈলেন চৌধুরী। 'হরকরা' কাগজের রিপোর্টার। এরাও আমার বন্ধু। 'ফতেনগরের লড়াই' রিপোর্ট করতে এ অঞ্চলে এসেছি। আমার দাদা বলেছিলেন'—

শৈলর কথা শেষ হবার আগেই জবাব দিলেন ডাঃ মেটার। বললেন: 'আরে আপনিই শৈল চৌধুরী? আসুন, আসুন। হ্যাঁ, আপনার দাদার টেলীগ্রাম পেয়েছি। উনি আপনার আসবার কথা জানিয়ে আমায় গত কাল তার পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা আমার বিশেষ বন্ধু—'আই মীন ক্লাস ফ্রেণ্ড আর কী?'

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'ভেতরে আসুন। লজ্জা করবেন না।'

আমরা ভিতরে গিয়ে বসলাম। বসবার ঘরটা কাঠের পার্টিশন দে'য়া। ঘরের অপর প্রান্তে রুগীদের চেম্বার। দুটো 'বেড' পাতা আছে। ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম যে, আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। কারণ সত্যি ডাঃ মেটার রুগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। রুগীদের চেম্বারের 'বেড' দুটোতে তখনও দুটি অল্পবয়সী ছেলে শুয়ে ছিল।

আমরা একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। তাই আমি বললাম: 'সত্যি আপনাকে কাজের সময়ে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আপনি রুগী দেখছিলেন'—

: 'রুগী! রুগী কোথায় দেখলেন আপনি? আরে মশাই এই তেপান্তরের দেশে কী আর রুগী সেধে আসে? নেমন্তন্ন খাইয়ে 'পেশেণ্ট' বানাতে হয়।'

এই কথা বলেই ডাঃ মেটার নিজের চেম্বারের বেডগুলোর দিকে তাকালেন। তার পর হেসে জবাব দিলেন: 'ওঃ আই সী। আপনি ওদের কথা বলছেন তো? আরে ওরা যে আমার ভাই, ভাইপো। এই ভোঁদা ওঠ, আর শুয়ে থাকতে হবে না। ওঁদের মালপত্তরগুলো উপরে নিয়ে আয়।'

: 'ওরা রুগী নয়?'—গিদোয়ানী যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করে।

: 'পাগল হয়েছেন। আসল কথা কী জানেন? আপনারা বন্ধুমানুষ, আপনাদের সব খুলে বলছি। এই যে দু'টি ছেলে দেখলেন, এর মধ্যে বড়ো ছেলেটি ভাই, ছোটটি ভাইপো। কেউ কড়া-নাড়া দিলে শুইয়ে রাখি। আই মীন, পেসেন্টের বেডে। কোন শালায় বলতে পারবে না, যে আমি বেকার ডাক্তার। আপনারা তো শহরে লোক। জানেন তো জাঁকজমক দেখিয়ে কতো ডাক্তার রিয়েল ডাক্তার হয়ে গেলো। এই পাড়াগেঁয়ে অঞ্চলে কোন বড়ো রকমের 'শো' না রাখলেও আমায় একটু লোক দেখাতে হয় আর কী! কী বলেন, প্ল্যানটা আমার কী রকম?'

: 'গ্র্যাণ্ড!' আমি জবাব দিই। 'কিন্তু ডাক্তার-সাহেব, একটা কথার মানে তো বুঝতে পারলাম না?'

: 'কী?' বিস্ময়ে ডাক্তার-সাহেব প্রশ্ন করলেন।

: 'ঐ যে আপনার দরজায় সাইনবোর্ডে লিখে রেখেছেন 'সুধু মেটার সেকেণ্ড ফ্লোর'—ঐ কথাটার মানে ঠিক বোধগম্য হলো না।'

: 'এটা আর কঠিন কী? মানে এই যে ধরুন দোতলার ফ্ল্যাটে বসে রুগী দেখছি, এটা রুগীদের জানা চাই তো। নইলে ওরা জানবে কী করে।'

: 'নাঃ, নাঃ, আমি সে কথা বলছিনে—আমি বলি, আসল কথাটা কী জানেন? আপনি বসে রয়েছেন দোতলায়, অথচ সাইনবোর্ডে লিখে রেখেছেন 'সেকেণ্ড ফ্লোর'। ঐ 'সেকেণ্ড ফ্লোর' মানে তো তিন তলা। তাই বলছিলুম যে 'সেকেণ্ড ফ্লোর' কথাটার মানে কী রকম যেন বেখাপ্পা শোনাচ্ছে।'

: 'এঁ্যা, বলেন কী মশায়! সেকেণ্ড ফ্লোর মানে তিন তলা?' ডাক্তার মেটার লাফিয়ে উঠলেন। তার পর আবার বললেন: 'ঠিক বলেছেন দাদা! ঐ সেকেণ্ড ফ্লোর তিন তলায়ই হবে, এখন বুঝতে পারছি। আমার মনেও এক বার খট্‌কা লেগেছিল। আমি রোজই ভাবি, আমার 'পেসেন্ট'গুলি যায় কোথায়। এবার স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, সব ব্যাটাই তিন তলা থেকে ভেগে যায়। উফ, কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড বলুন দেখি? এই ভোঁদো, শোন্ এদিকে। এক্ষুণি আমার সাইনবোর্ডটা সরিয়ে ফেল্। নইলে সব পেসেন্ট ব্যাটা পগার পার হবে। সত্যি ব্রাদার, আপনি আমায় বাঁচালেন।'

* * * *

বিকেল বেলা তার-অফিসে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, গিদোয়ানীর দপ্তর তার পাঠিয়েছে: "Opposition displaying eye witness account stop send colourful despatch adding local colour ctpubreactions stop."

আমরা হাঁটতে হাঁটতে এক বড়ো মাঠের কাছে এসে পড়েছিলাম। আমার হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে গিদোয়ানী বললে: 'কী মুস্কিলে না পড়া গেলো, কী করি এখন?'

শৈল বলে: 'এই তেপান্তরের নির্জ্জন মাঠে কলারফুল ষ্টোরী সংগ্রহ করা কী চাট্টিখানি কথা!'

: 'না হে ব্রাদার, ঐ কলারফুল ডেসপ্যাচের জন্যে আমি ভাবছি নে। আমি ভাবছি, oppositionএর কথা। ষ্টোরীতে 'কলার' দিতে কতোক্ষণ। এই তো সেদিন দিমাপুরে বন্যা হলো। আমি গিয়েছিলুম রিপোর্ট করতে। উঃ, সে কী বিষ্টি রে বাবা! দু' দিনেই নদী ফুলে-কেঁপে উঠলো। আর যায় কোথায়! পাঠিয়ে দিলুম আমার ষ্টোরী। প্রবল বন্যা, দিমাপুর শহর ধ্বংস অনিবার্য্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।'

: 'বলো কী গিদোয়ানী! তুমিই সেই দিমাপুরের ফ্ল্যাড ষ্টোরী পাঠিয়েছিলে।' আমি বলি।

: 'নরিবল' বলে শৈল। 'কিন্তু শহর ধ্বংস অনিবার্য্য এ কথাটা লিখলে কেন?'

আমাদের কথা শুনে গিদোয়ানী হাসে। বলে: 'আরে, ঐ কথা যদি না লিখতুম তা হ'লে কী আর নিউজ হতো। নদী যখন আছে তখন বন্যা তো প্রতি বছরই হবে। এতে নতুনত্ব কোথায়? কিন্তু 'শহর ধ্বংস অনিবার্য্য' লিখলুম বলেই তো 'বিগ ষ্টোরী' হয়ে গেলো। একেই বলে গিয়ে 'কলারফুল ডেসপ্যাচ।'

: 'ঠিক বলেছো। এই হলো গিয়ে রিয়েল নিউজ। যা দৈনন্দিন ঘটছে, সে ঘটনা রিপোর্ট করে কী লাভ! আমাদের কাজ হলো গিয়ে আসল ঘটনা থেকে ষ্টোরী বের করে নে'য়া।'—আমি জবাব দিই।

: 'হুম্' গম্ভীর হয়ে গিদোয়ানী জবাব দেয়। তার পর একটু বাদে বলে: 'সত্যি আমার ভয় হচ্ছে ঐ ব্যারী ব্লকসনকে। ও ব্যাটাকে বিশ্বেস নেই। ঐ হতভাগা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই একটা কাণ্ড করেছে। ও যেখানেই থাক্ না কেন, আমি তোমায় জোর গলায় বলতে পারি, একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে। তাই তো

ওকে আমার ভয়। হয়তো ইতিমধ্যে ফক্তেনগরের লড়াই খতম হয়েছে বলে নিউজ পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে।'

গিদোয়ানীর কথাটা ভাববারই বটে। আমি ব্যারী ক্রকসনকে জানি। ওকে নিয়ে এক বার আমায়ও যথেষ্ট হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিল। আমার মনে হয় সেই হাঙ্গামার কথা।

এক বার এক বিখ্যাত দেশনেতার মৃত্যু হয়। খবর শুনে সমস্ত দেশ গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক হলো যে মৃতদেহ প্রসেসান করে তাঁর জন্মস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই মৃতদেহ দাহ হবে। আমি সেই মিছিলের সঙ্গে ছিলুম। ব্যারী ও রামগোপালও ছিল। প্রায় দুপুর দুটোর সময় আমরা দেশনেতার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কান্নাকাটি হলো, তার পর ফুল-মালা-চন্দন আর কতো কী! ঠিক হলো চারটের সময় মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'চারটে বাজে, কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না, রামগোপাল বাড়ীর এক জনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে: 'কী ব্যাপার? 'ডেড বডি' কখন নিয়ে যাওয়া হবে।'

লোকটা জবাব দিলে: 'আজ্ঞে দেশনেতার বড়ো ছেলের আসবার কথা আছে। উনি এলেই আমরা যাবো।'

পাঁচটা বেজে গেলো, তবু কারও উঠবার লক্ষণ নেই। অধৈর্য্য হয়ে রামগোপাল উঠে গেলো। বললে: 'ধুত্তোর ছাই! বসে থাকতে-থাকতে আমার হাত-পা ধরে গেছে। আমি চললুম।'

রাগ করে রামগোপাল চলে গেলো। এদিকে বিকেল ছ'টা বাজে, তবু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নেই। বাড়ীতে তখনও পুরোদমে কান্নাকাটি চলছে। ব্যারী অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো। সে বললে: 'ওহে ব্রাদার, আর নয়। রাত্রি হয়ে এলো। আই মাষ্ট গো।' ব্যারী চলে গেলো। আমি বসে রইলাম।

সাতটা—আটটা—নয়টা—বেজে যায়। তবু মৃতদেহ শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাবার কোন লক্ষণই নেই। দশটার সময় বাড়ীর এক জন এসে জানালে যে, দেশনেতার বড়ো ছেলের আজ আসবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি এসে পৌছুতে পারেন নি। অতএব মৃতদেহ আগামী কাল শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।'

হতাশ হয়ে আমি বাড়ী চলে আসি। দপ্তরে খবর পাঠিয়ে দিই: 'মৃতদেহ কাল পোড়ান হবে।'

পরদিন ভোরবেলা টেলীগ্রাফ-পিয়নের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমার দপ্তর থেকে তার এসেছে। এ কী ব্যাপার! আমার দপ্তর কৈফিয়ৎ তলব করেছে। অর্থাৎ আমার স্টোরী ঠিক নয়। কারণ রামগোপালের কাগজ ছেপেছে বিপুল জয়ধ্বনির সঙ্গে অদ্য বিকাল পাঁচটার সময় এখানে মৃতদেহ সৎকার হয়।' ব্যারী লিখেছে: 'বিকেল ছ'টার সময় দেশনেতার মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করা হইলে পর সমবেত জনতা ক্রন্দন আরম্ভ করেন।' আর এদিকে আমি লিখেছি যে, 'মৃতদেহ আদৌ সৎকার হয়নি।'

সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দপ্তর বলেছে যে, এই ভুল খবর প্রকাশ করার দরুণ তারা দশের কাছে আর মুখ দেখাতে পাচ্ছেন না। অতএব আমার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে।

দপ্তরের টেলীগ্রাম পড়ে আমার চক্ষু স্থির। ব্যারী ক্রকসনকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এ কী ব্যাপার! 'ডেড বডিটা' যে এখনও শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি? আর তোমরা সবাই খবর দিয়েছো যে মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেছে? আশ্চর্য্য!'

রামগোপাল সামনে বসছিল। হেসে প্রশ্ন করলে: 'আশ্চর্য্যের আবার কী হলো?'

: 'মানে মৃতদেহ সৎকার হয়নি, আর তোমরা সবাই কি না বলে দিলে, মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেছে!' এবার জবাব দিলে ব্যারী। জিজ্ঞেস করলে: 'ব্রাদার, লোকটা মরেছে এ কথা ঠিক তো?'

আমি জবাব দিই: 'আলবাৎ মরেছে। নিজ চোখে দেখে এসেছি, এর মধ্যে ভুলটা কোথায়?'

আমার কথা শুনে ব্যারী হাসতে থাকে। বলে: 'তাহ'লে আমাদের ভুলটা কোথায়। লোক মরেছে যখন, তখন তার সৎকার আজ না হয় কাল হবেই। অতএব ওটা যদি কাল না হয়ে আজ হয় এতে আর ভুল কোথায়? সোদ্দা কথা, এক দিন না এক দিন সৎকার হবেই। তাই নয় হে রামগোপাল, আমরা না হয় একদিন আগে দিয়েছি এই আর কী।'

ব্যারী ক্রকসনের যুক্তি যে অকাট্য, এ কথা আমায় মানতেই হলো। কাজেই কোন কিছু ব'লবার উপায় নেই। এই পরাজয় আমায় হজম্ করতেই হবে।

আজ গিদোয়ানীর কথা শুনে আমার সেই সব পুরানো স্মৃতি মনে হতে লাগলো। তাই একটু চিন্তিত হয়ে বললুম: 'ঠিক বলেছো ভায়া! তোমার দপ্তরের তার দেখে মনে হচ্ছে ওদের বিশ্বেস নেই। চলো একটু প্রেস ক্যাম্প ঘুরে আসা যাক। কী বলো শৈল?'

'দ্যাটস্ রাইট। ওদের উপর আমাদের নজর রাখা প্রয়োজন।' শৈল জবাব দেয়।

* * * *

প্রেস-ক্যাম্পে গিয়ে দেখলাম, রীতিমতো সোরগোল শুরু হয়ে গেছে। কমরেড নিটস্কিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রামগোপাল বললে: 'আমি স্পষ্ট দেখলুম যে নিটস্কি টেলীগ্রাফ অফিসের দিকে যাচ্ছে।'

ব্যারী বলে: 'তার মানে তুমি কী বলতে চাচ্ছ ও বেশ বড়ো রকমের 'নিউজ' পেয়েছে?'

: 'নিশ্চয়ই'—বেশ জোর দিয়ে রামগোপাল বলে। 'আমি তোমায় কতো বার বলেছি ব্যারী।'

কমরেড নিটস্কিকে বিশ্বেস নেই। ওকে আমাদের চোখে-চোখে রাখা দরকার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যারী বলে: 'সে কথা কী আর আমি জানিনে ভাই! আলবাৎ জানি। তুমি, আমি যাই লিখিনে কেন, সরকার প্রাপ্তিও করবে না, কিন্তু 'বুভুক্ষা' কাগজে আধা কলমে প্রকাশ হওয়া মানেই হৈ-চৈ কাণ্ড। কিন্তু লোকটা গেলো কোথায় বলো দিকিনি?'

: 'টেলীগ্রাফ-আফিসে যায়নি এ আমি হলপ করেই বলতে পারি। কারণ আমরা তো এই মাত্র ওখান থেকে এলুম'—আমি জবাব দিই।

: 'তাহ'লে?' সবাই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো।

: 'নিশ্চয় কোন স্পেশাল ইণ্টারভিউ নিচ্ছে'—আমি বলি।

: 'কিন্তু কার কাছ থেকে নেবে বলো দিকিনি? এখানে এসে যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে লড়াই তো দূরের কথা এমন কি কথা কাটা-কাটিও এ পর্য্যন্ত হয়নি।'—ব্যারী বলে।

: 'যা বলেছো দাদা! জায়গাটা দেখেই আমার মন খারাপ হয়ে গেছে'—জবাব দেয় রামগোপাল।

: 'কিন্তু আমার দপ্তর কী বলছে জানো? বলছে আমায় ফ্রন্ট লাইনে যেতে।' গিদোয়ানী বললে।

: 'পাগল হয়েছ! 'ফ্রন্টই' নেই তার আবার লাইন'—আমি উত্তর দিলাম।

: 'তা হ'লে কী করা যায় বলো তো?' শৈল প্রশ্ন করে।

: 'তাইতো ভাবছি। আমার মনে হয় ঐ কমরেড নিটস্কি নিশ্চয় ফ্রন্ট-লাইনের হদিস পেয়েছে। ওখানে গিয়েছে হয়ত'—মন্তব্য করলে রামগোপাল।

: 'ঠিক বলেছো ব্রাদার! হি মাষ্ট হ্যাভ গন টু ফ্রন্ট লাইন'। ব্যারী চীৎকার করেই বলে।

: কিন্তু 'হোয়ের ইজ ফ্রন্ট লাইন'—আমি বলি।

: 'ইয়েস হোয়ের ইজ ফ্রন্ট লাইন'—সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

: 'শোন আমার মাথায় একটি আইডিয়া এসেছে'—বললে রামগোপাল।

: 'কী?'—আমি প্রশ্ন করলাম।

: 'শোন, আমি বলছি, এই যুদ্ধ ভয়ানক এলোমেলো হচ্ছে অর্থাৎ Confused fighting.'

: ওঃ লর্ড—উত্তর দিলে ব্যারী ক্রকসন।

: 'তার মানে তুমি বলতে চাও জোর লড়াই হচ্ছে?'

: 'আলবৎ জোর লড়াই হচ্ছে। নইলে আমরা এখানে এসেছি কী করতে। আর বিদ্রোহী দল আমাদের জন্তে প্রেস-ক্যাম্পই বা তৈরী করবে কেন?' রামগোপাল উত্তর দিলে।

: 'সত্যি রামগোপাল, আমার একথাটা এক দম মনে হয়নি। তুমি ঠিকই বলেছো যে, জোর লড়াই হচ্ছে মানে Confused fighting। নইলে আমরা সব খবরই পেয়ে যেতাম এর মধ্যে। 'উই মাষ্ট সেণ্ড এ গুড ডেসপ্যাচ' গিদোয়ানী বললে।

: 'তুমি কী ভেবেছো, আমি এখনও পাঠাইনি! ওয়েল, আমার ষ্টোরী ইতিমধ্যে হয়ত দপ্তর পৌঁছে গেছে।' ব্যারী বললে।

: 'এ্যাঁ, বলো কী? তুমি 'ষ্টোরী' ফাইল করে দিয়েছো! বাই জোভ। না হে আর দেরী নয়। গিদোয়ানী, আমি তার ঘরে চললুম। দেরী করলে দপ্তর থেকে বকুনি খেতে হবে,'—আমি রওনা হবার উপক্রম করি।

: 'চলো ব্রাদার, আমিও যাচ্ছি। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি opposition displaying eyewitness account'—এর মানে কী? ওয়েল লেট আস গো, গিদোয়ানী উত্তর দিলে।

আমি, গিদোয়ানী শৈল চলে এলাম।

* * * *

সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অব দি ল্যাণ্ড, সী এ্যাণ্ড এয়ার ফোর্স অব দি ফতেনগর, ফিল্ড মার্শাল চুকন্দর সিং নিজের ঘরে বসে গোঁফ চুমরে নিচ্ছিলেন। ল্যাণ্ড ও এয়ারফোর্সের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার মানে ফিল্ডমার্শাল চুকন্দর সিং জানেন, কিন্তু 'সী ফোর্সের' সুপ্রীম কম্যাণ্ডার কেন তাকে করা হয়েছে এটা তাঁর বোধগম্য হয়নি। কারণ তিনি জল দেখেন নি।

আজ ভোরবেলা থেকেই কিন্তু মার্শাল চুকন্দর সিং গোঁফের যত্ন নিচ্ছিলেন। এই গোঁফের জন্য তিনি কতো কষ্টই না করেছেন। কতো অর্থ ব্যয় করেছেন, তবু কি না তার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হলো। কারণ গত বার দেশে যে গোঁফ-প্রতিযোগিতা হয়েছিল সে কম্পিটিশনে তাঁকে হারিয়ে ইনসপেক্টর জেনারল অব পুলিস জটাধর সিং প্রথম প্রাইজ পায়।

এ অসহ্য অপমান! এক বার চুকন্দর ভেবেছিলেন যে, এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করবেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নানা দিক ভেবে আর প্রতিবাদ করেন নি। কারণ এ কম্পিটিশনের জজ ছিলেন পল্লবিনী দেবী। প্রতিবাদের ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, আর পল্লবিনী দেবীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা একই কথা। পল্লবিনী দেবীকে রাগাতে চুকন্দরের সাহস নেই।

আজ চুকন্দরের মনটা ব্যাজার হ'বার আর একটা কারণ ছিল। কারণ গত কাল তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, পল্লবিনী জটাধর সিং-এর সঙ্গে ঘোরাফেরা করছেন। এই মেলামেশার কী তাৎপর্য্য, এ কথা কী আর চুকন্দর জানেন না? কারণ এ দৃশ্য দেখেই এ বছরের গোঁফ-কম্পিটিশনের কী ফলাফল হবে এটা চুকন্দর অনুমান করে নিয়েছেন।

তবু এক বার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন চুকন্দর। এ কথা ভাবতে ভাবতে 'ব্রেকফাষ্ট' টেবিলে এসে খেলেন। পাশেই দৈনিক সংবাদপত্রগুলো পড়ে আছে। সচরাচর তিনি খবরের কাগজ পড়েন না। যদি কোন বিশেষ খবর থাকে তাহ'লে তাঁর সেক্রেটারী পড়ে শোনান। শুধু মাত্র শনিবার দিন কাগজগুলোতে এক বার চোখ বুলিয়ে নেন। কারণ সেই দিন ফিল্ম-জগৎ সম্বন্ধে একটি পাতা বরাদ্দ থাকে। আজ শনিবার, তাই ব্রেকফাষ্ট টেবিলে খবরের কাগজ পড়ে আছে।

একটা কাগজ খুললেন চুকন্দর, এ কী ব্যাপার! প্রথম পাতায় বড়ো-বড়ো অক্ষরে এ কী লেখা আছে? 'ফতেনগরে লোমহর্ষক লড়াই!'

খবর পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন চুকন্দর। তারপর ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তারপর আবার পড়লেন ব্যানার হেড লাইন। না; কোন ভুল নেই—ফতেনগরে লোমহর্ষক লড়াই। এক বার নয়, দু'বার নয়, পর-পর পাঁচ বার খবরটা পড়লেন চুকন্দর। তারপর বানান করে ব্যানার হেড-লাইন পড়লেন।

অসম্ভব! এ খবর সত্যি হতে পারে না। তিনি হলেন ফতেনগরের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার, আর দেশে এমনি একটা লড়াই-এর খবর তাঁকে জানানো হয়নি?

রাগে জ্বলতে থাকেন চুকন্দর। না, তাঁর সমস্ত কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করবেন। না, শুধু বরখাস্ত নয়, তিনি তাঁদের কোর্ট-মার্শাল করবেন।

খাবার-টেবিল ছেড়ে চুকন্দর নিজ দপ্তরে এলেন। তলব করলেন চীফ অব দি ষ্টাফ বব্‌বব্ চৌবেকে। চৌবেকে দেখে চুকন্দর উত্তেজিত হয়ে পড়েন। চুকন্দর খবরের কাগজ দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন: 'পড়েছেন আজকের কাগজ? ফতেনগরে লোমহর্ষক

লড়াই। আমি হলুম গিয়ে প্রধান সেনাপতি অথচ এই আক্রমণের বিন্দুবিসর্গও আমায় জানানো হয়নি!'

ধমক খেয়ে বনবন চৌবে জবাব দেয়: 'কাল স্যর বাজারে একটা গুজব শুনেছিলাম বটে যে কয়েকটি ছোঁড়া মিলে ফতেনগর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু খবরটা কনফার্মড হয়নি। ফ্রন্ট লাইনে তার পাঠিয়েছি সঠিক খবর জানবার জন্যে। এখন পর্য্যন্ত কোন জবাব পাইনি।'

জবাব শুনে চুকন্দর খুসী হয়েছেন কি না বোঝা গেলো না। তিনি বললেন: 'আপনি বলছেন ছোঁড়ারা আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে আর এদিকে কাগজওয়ালারা লিখছে 'থ্রি প্রনড য়্যাটাক।' না আপনাদের বিশ্বাস করে লাভ নেই। হ্যাঁ, শুনুন আর দেরী করবেন না। আপনি ফতেনগরে এমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করে দিন। চার দিকে সৈন্য পাঠান—'

বনবন চলে যাবার উপক্রম করলে। হঠাৎ চুকন্দর ডেকে বললে: 'শুনুন আর একটা কথা আছে। ইনসপেক্টর জেনারেল জটাধরকে জানিয়ে দিন যে, এমারজেন্সী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে আমি সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে নিচ্ছি—'

হুকুমটা দিয়ে চুকন্দর যেন একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। তারপর গোঁফটাকে আবার সযত্নে চুমরে নিলেন।

চৌবে যেন একটু ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'স্যর যদি অভয় দেন তাহ'লে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

: 'বলুন, কী জানতে চান?'

স্যর কাগজওয়ালারা লিখেছে, 'থ্রি প্রনড য়্যাটাক।' ঐ 'প্রনড' কথাটার মানে তো ঠিক বুঝলুম না?'

এবারে সত্যিই একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন চুকন্দর। সত্যিই 'প্রনড' কথাটা মাত্র তিনি আজ কাগজে পড়লেন। এর আগে কখনও পড়েন নি। বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ যে ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে, এটা চুকন্দর যেন উপলব্ধি করতে পারলেন। কী এর মানে হতে পারে, ভাবতে থাকেন চুকন্দর। কাগজ পড়ে তাঁর এক বার মনে হয়েছিল 'প্রনড' শব্দটির মানে জেনে নেবেন। ভেবেছিলেন চৌবেকে এই প্রশ্ন করবেন। কিন্তু নানা প্রশ্নের তাড়াহুড়ায় ও প্রশ্নটা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। চৌবেই এখন তার কাছে জানতে চাইছে শব্দটির মানে কী।

'প্রনড', 'প্রনড', একটু ভাবনায় পড়েন চুকন্দর। তারপর জবাব দে'ন,—ঠিক বলেছেন। এই সব মর্ডার্ণ ওয়ারের ব্যাপার। দিন দিন এগুলো ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে। তাই বলি এ নিয়ে একটু টেকনিক্যাল এডভাইস নে'য়া প্রয়োজন। ডাকুন দেখি কোয়াটার মাষ্টার জেনারেলকে?

কোয়াটার মাষ্টার জেনারেল এলেন সত্য, কিন্তু প্রনড কথার মানে তিনিও সঠিক বলতে পারলেন না। এর পরে এলেন, এডজুটান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল, আরো সবাই, চুকন্দরের ঘর ভর্ত্তি হয়ে গেলো কিন্তু 'প্রনড' কথা সবার কাছেই নতুন। সমস্ত ফতেনগর ফৌজে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেলো।

একটু বাদে চুকন্দর চৌবেকে বললেন: 'শুনুন, 'মর্ডার্ণ ওয়ার' সম্বন্ধে যে বইগুলো কেনা হয়েছে, দেখুন তো ওতে কিছু পাওয়া যায় কি না?'

এতক্ষণে একটা ভালো প্ল্যান বাতলে দিয়ে চুকন্দর যেন মুক্তি পান। বই পড়লে বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ সম্বন্ধে হয়ত অনেক কিছু জানা যাবে।

এবার চৌবের ব'লবার পালা। একটু ভয়ার্ত্ত কণ্ঠেই সে জবাব দেয়। বলে: 'স্যর এবার তো যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন বই কেনা হয়নি। যে বইয়ের অর্ডার দিয়েছিলাম তা এখনও পাইনি।'

: 'পাইনি মানে?' সবিস্ময়ে চুকন্দর প্রশ্ন করলেন।

: 'আজ্ঞে, যা কিছু টাকা ছিল সে দিয়ে ইনসপেক্টর জেনারেল জটাধর সিং ডিটেকটিভ থ্রিলার কিনেছেন। দেশে নাকি চুরি-ডাকাতি বাড়ছে। অতএব কর্ম্মচারীদের এই সব বই পড়ার নাকি একান্ত প্রয়োজন'—চৌবে বলে।

'আবার জটাধর'? রেগে কাঁই হয়ে উঠলেন চুকন্দর। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই কি তাঁকে জটাধরের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে? কিন্তু কী করবেন তিনি? তিনি যে নিরুপায়। কে তাঁর কথা শোনে? কারণ জটাধরের সহায় হলো পল্লবিনী দেবী, তাঁর তুলনায় চুকন্দর তো নগণ্য কীট মাত্র।

: এখন তা হলে আমি কী করি? এ তো আর চোর-ডাকাত ধরা নয়। কোন জিনিষের মানে না বুঝে তো আর লড়াই করা যায় না? দেশরক্ষা তা হ'লে জটাধরই করুক। আমার আর কী কাজ।'

মুখে কথাটা বললেন সত্য, কিন্তু মনে-মনে শিউরে উঠলেন। চৌবের কাছে এ রকম বেফাঁস কথাটা বলা সমীচীন হয়নি! হয়তো ও এক্ষুণি জটাধরের কানে গিয়ে লাগাবে। আর একথা জটাধর জানতে পারলে কী তার প্রধান সেনাপতির পদটা থাকবে? বহু দিন ধরেই জটাধর প্রধান সেনাপতি হ'বার ফিকিরে আছে। এবার মৌকা বুঝে হয়ত কাজটা বাগিয়ে নেবে।'

তার পর একটু বাদে বললেন: 'ঠিক আছে। আপনারা যে যার কাজ করুন গিয়ে। আমি দেখি এই 'প্রনড' কথাটার কোন মানে করতে পারি কি না।'

* * * *

আধ ঘণ্টা বাদে চৌবে আবার চুকন্দরের ঘরে এলেন।

: 'কী ব্যাপার? কী হলো?'—চুকন্দর প্রশ্ন করেন।

: 'স্যর ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ প্রান্তে বিরোধী দল এক জন মেজর জেনারেলকে পাঠিয়েছে। আমরা পাঠিয়েছি এক জন ব্রিগেডিয়ারকে।

: 'তাহ'লে গোলমালটা কোথায় শুনি'? চুকন্দর প্রশ্ন করেন।

: 'আজ্ঞে আমাদের এক জন ব্রিগেডিয়ার পাঠান ঠিক হবে না। হয়ত আইন-সভায় ও নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যে মেজর-জেনারেলের বিরুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার পাঠান হলো কেন? লড়াইটা হওয়া চাই—সেয়ানে-সেয়ানে। অতএব বিরোধী দল যদি মেজর জেনারেল পাঠিয়ে থাকে, তা হ'লে আমাদেরও এক জন ঐ পর্য্যায়ের লোক পাঠান উচিত। লেফেট্যানান্ট জেনারেল না হোক অন্ততঃ মেজর জেনারেল পাঠান উচিত।'

: 'কিন্তু কোথায় পাবো লেফেট্যানান্ট জেনারেল শুনি? লোকের যা অভাব'—চুকন্দর জবাব দিলেন।

: 'লোক যথেষ্ট আছে স্যর। খালি প্রমোশান দিলেই হলো।

ব্রিগেডিয়ার লুটেরা ছবেকে প্রমোশান দিলেই আমাদের সমস্ত ল্যাঠা চুকে যায়।'

: 'ঠিক বলেছেন, ব্রিগেডিয়ার লুটেরা ছবেকে প্রমোশান দিন। বানিয়ে দিন লেফট্যানান্ট জেনারেল। হ্যাঁ, ভালো কথা। শুনতে পেলুম সব কাগজের রিপোর্টারেরা না কি এখানে এসেছে? আচ্ছা, ওদের কাছ থেকে ঐ 'প্রনড' কথাটার মানে একটু জেনে নিলে হয় না?'

* * * *

গভীর রাত!

রণাঙ্গন নিস্তব্ধ। চার দিকে ঘন আঁধার, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই শোনা যায় না।

ট্রেঞ্চে বসে বসে ভোম্বল হাই তুলছিল, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে কিন্তু ম'শার উপদ্রবে ঘুমোনো যায় না। ভোম্বল মশা তাড়াতে লাগলো।

ভোম্বলের একটু দূরে বসে ছিল গজানন। ভোম্বলের মশা তাড়াবার আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেলো। ফিস্‌-ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলে: 'ভোম্বলা, কী করছিস্‌?'

: 'বড্ডো মশা, ঘুমুতে পারছিনে।'

: 'কী বলছিস শুনতে পাইনে যে!'

: 'বড্ডো ম'শা—'

: 'আরো জোরে বল।'

: 'ম'শা মানে 'মসকুইটো' এসেছে।'

: 'কি বললি 'মসকুইটো' এসেছে।'

: 'আলবাৎ, ওর আওয়াজে ঘুমুতে পাচ্ছিনে।'

: 'বাপস্‌ বলিস কী রে? মসকুইটো, গুড হেভেনস'—গজাননের পাশের লোকটা তখনও ঘুমুচ্ছিলো। তাকে নাড়া দিয়ে ওঠালে গজানন। বললে—'শুনেছেন মশায়, 'মসকুইটো' এসেছে।'

: 'সেডা আবার কী?' পাশের লোকটি জিজ্ঞেস করলেন।

: 'আরে ম'শায় 'মসকুইটো'র নাম শোনেন নি? একদম নিউ টাইপ অব প্লেন। ওর আওয়াজে ভোম্বলের ঘুম হচ্ছে না।'

: 'কৈ আমি তো কোন আওয়াজ পাচ্ছিনে।'

: 'পাবেন কোত্থেকে? আপনি যে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুচ্ছেন। লড়াই করতে এসেছেন না কচু।'

: দেখুন ম'শায়, মুখ সামলে কথা বলবেন। অপমান আমি সহ্য করবো না। আপনাদের এক্ষুণি মজা দেখিয়ে দিতে পারি।'

: 'কী করবেন শুনি'? গজানন বলে।

: 'বিরোধী দলে চলে যাবো—' লোকটি উত্তর দেয়। কথাটা অতীব সত্যি। কারণ সেদিন ভোরবেলা সে বাজার করতে এসেছিল। এমনি সময় দেখলে এক বিরাট মিছিল যাচ্ছে। এক জনকে জিজ্ঞাসা করলে: 'ও ম'শায় কী হচ্ছে?'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: 'হৈ-রৈ কাণ্ড। লড়াই।'

'কোথায় সুরু হলো?'

: 'আজ্ঞে সেইটে তো যাচাই করতে যাচ্ছি। আসবেন না কি?

মিছিলের ভদ্রলোক তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বাজার করা বন্ধ করে সে মিছিলে যোগ দিলে। এর পরে, যে কী হলো সেটা তার ঠিক মনে নেই। কারণ, মিছিল এসে থামলো এক বিরাট দালানের সামনে। ভদ্রলোক দেখতে পেলেন যে, বাড়ীর সামনে বেশ জনতা দাঁড়িয়ে আছে। যাকে জিজ্ঞেস করে—'ব্যাপারটি কী' সেই বলে 'লড়াই'। সমস্ত ব্যাপারটি বোঝবার আগে একটা লোক এসে বললে: 'পড়ো?'

: 'কী জন্যে?'

: 'লড়াই দেখতে যাবে না?'

ব্যস্‌ আর কথা নেই। সে অম্লান বদনে পোষাকটা পরে নিলো খাঁকী সার্ট-প্যাণ্ট। একটু বাদে একটা লোক এসে বন্দুক দিয়ে গেলো। বললে: 'খালি হাতে লড়াই দেখতে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাই বন্দুকটা নিয়ে নাও।'

বন্দুক তাকে কাঁধে নিতে হলো। তার পর শহর ছাড়িয়ে যেই এসেছে অমনি সে শুনতে পেলো যে এক জন হুকুম দিচ্ছে,—'কুইক মার্চ্চ।' সে পাশের লোকটার দিকে তাকালে। জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার দাদা?'

: 'যুদ্ধ করতে এসেছেন, কী ব্যাপার তা জানেন না?'

: 'আমি আবার যুদ্ধ করতে আসবো কেন? আমি এসেছি বাজার করতে'—লোকটা জবাব দেয়।

: 'হেঁ-হেঁ চাঁদু, এখনও মজাটা বোঝনি। আমিও কি ছাই লড়াই করতে এসেছিলাম। এসেছিলাম—দুধ কিনতে। লোকে বললে—লড়াই। ভাবলাম ষাঁড়ে-ষাঁড়ে বুঝি আবার মজা লেগেছে মিছিলে যোগ দিলুম। একটু বাদে শুনি কী, এটা হলো 'সৈন্য রিক্রুটের' মিছিল। যে লোকটা বাজার করতে এসেছিল, সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। বললে: 'সে কী! আমি যে লড়াই'র কিস্‌সু জানিনে।'

: 'পাগল, আমিই কী জানি!'

: 'তা হ'লে আমি বাড়ী চললুম।'

: 'দাদা, ব্যাপার যতো সহজ ভেবেছেন, ততো সহজ নয়। লড়াইর খাতায় নাম লিখিয়েছেন তো শ্মশানঘাট-অবধি যেতে হবে।

: 'এ্যাঁ, শ্মশানঘাটে যেতে হবে?'

: 'আলবাৎ। হাঁ, উপায় একটা আছে বটে। যেই সুবিধে পাবে অমনি বিরোধী দলে যাবে। ওদের আইন-কানুন অনেক শিথিল। আমাদের কাজ হলো লড়াই করা, সে যে দলেই হোক না। কী বলো?'

বলেই ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। [ক্রমশঃ।

অভিসার-লক্ষণ

"প্রিয়ার মিলন-আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচ পূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ॥"

—ভক্তমাল

For the Skin
HAZELINE SNOW
HAZELINE CREAM
HAZELINE CREAM

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেবেশ দাশ

ভীলনীদের রঙঝারি।

ডাণ্ডা হাতে এক দল বুনো মেয়ে হঠাৎ পথ রুখে দাঁড়াল।

আরে থামা, থামা, মোটর থামা। শশব্যস্তে খাঁটী বাংলায় হেঁকে উঠলাম আমি। ভুলেই গেলাম যে, এটা বাংলা নয়, রাজোয়ারা। শুধু রাজোয়ারাই যে তা'ও নয়। একেবারে ভীলোয়ারা অর্থাৎ ভীলদের দেশ। কে-বা বোঝে বাংলা, কে-বা বোঝে মেয়েদের হাতে ডাণ্ডা দেখে বাঙ্গালীর উৎকণ্ঠা!

হোলির দিনে এ কি অঘটন রে বাবা!

নেমে এলেন সামনের সীট থেকে মাথার পাগড়ী হাতে দোলাতে দোলাতে ঠাকুর সাহেব। বিপদে তিনি ঘাবড়ান না; বীরত্বে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। ব্যাপারটার একটা ইতিহাস আছে। রাজোয়ারার সব জহর ব্রত, গেরুয়া রঙের কাপড় পরে শত্রু মেরে মরা, জান দেঙ্গা তবু মান না দেঙ্গা, এ-সব অমর ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবার মত একটা ইতিহাস। সে গল্পটা—থুড়ি, গল্প হলেও সত্যি—এখানে একটু বলে রাখি।

ঠাকুর-সিংহের ছিল প্রকাণ্ড একখানা জায়গীরদারী। নামটা না হয় না-ই ফাঁস করে দিলাম, কারণ তিনি এ নিয়ে অনেক লড়াই অবশ্য বিশ শতকের হাতিয়ার হীন লড়াই করেছেন। ভেবে দেখুন,—সেই পূর্বপুরুষের সময় থেকে ভোগ করা জায়গীর। যার জন্তে বছরের পর বছর পনের জন ঘোড়সোয়ার মজুত রাখতে হত তাঁর পূর্বপুরুষদের এবং তাঁকে নিজেকেও—যখনি দরবারের হুকুম হবে, অমনি লড়াই করবার জন্ত ছুটে আসতে হত। ভূঁইয়া-তন্ত্র অর্থাৎ ফিউডালিজমের মজাই হচ্ছে এখানে। রাজা দিচ্ছেন জমি, নিজের রাজত্ব যাতে বজায় থাকে সে জন্ত। যে পাচ্ছে তাকে সব সময় জমির বদলে দিতে হবে 'জান'—যখনি দরকার পড়বে। নিজের জায়গীরের মধ্যে চুরি বা জুলুম করতে পারবে না, ব্যবসাদার ও বিদেশীদের রক্ষা করতে হবে। যত বড় জায়গীর সে অনুসারে লড়াইয়ের সময় দিতে হবে সিপাই। যদি লড়াই কখনো না-ই হল ত প্রাণের খাজনাটা আর দিতে হল না। কিন্তু সিপাই মজুত ঠিকই রাখতে হবে। দরবারও ভূঁইয়াদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাবেন, আর বিপদে-আপদে রক্ষা করবেন। ঠিক যেমন ভাবে ভূঁইয়াদের কাছে দরবার আশা করে যে, তারা নিজের প্রজাদের মান রেখে রক্ষা করবেন।

এ-হেন কর্ত্তব্য ঠাকুর সাহেবের বাপ-পিতামহরা ঠিকই করে যাচ্ছিলেন। তবে এ যুগে এই বিনিময়ের বন্দোবস্তে জায়গীরদারদে বেশ সুবিধাই হচ্ছিল। বৃটিশ শান্তি অর্থাৎ প্যাক্স ব্রিটানিকা দৌলতে নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানি ত আর ছিল না, কাজেই জায়গীরদাররা তোফা আরামেই ছিলেন। বেশী আরা মাথাটা শূন্ত হয়ে থাকলে, আবার নাকি তাতে ভূতও ঢুকে পড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ঠাকুর সাহেব বলেছিলেন এ কথা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছিলাম আমিও। বেপরোয়া ভাবে জীবন উপভোগ করার বাসনাকে ঠাকুর সাহেব ভূত মনে করেছে কিন্তু হায়, এই শাদা মাঠ, চার দিকে গণ্ডী-কাটা সুনীল-সুরে বাঙ্গালী-জীবনে একটি বার সেই ভূতের নৃত্য যদি ঘটে ত মন্দ হয় না। খেটে খেটেই ত দিনগুলো কাটল। পর বঁধুরে—বলে হেঁকে পায়ের উপর পা তুলে বসব; আরামের ভূতটা একটু পেয়ার করে নেড়ে-চেড়ে দেখব তার ফুর্স'ৎই মিলল না।

যাক সে কথা। ঠাকুর সাহেব এদিকে বিপদে পড়লেন পাশের জায়গীরদারের সঙ্গে জায়গীরের মালিকানা নিয়ে বা মামলা। তুমুল সে মামলা—একেবারে প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই হার হল। এবার তিনি কি করবে আন্দাজ করতে পারেন?

ভেবে দেখুন 'কথা ও কাহিনী'র সেই চমৎকার কবিতা চিতোরের রাণা কুম্ভ হারা (হর) বংশের বুঁদির রাজার কা মার খেয়ে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, 'বুঁদির কেল্লা যত মাটির উপর থাকবে, ততক্ষণ আর তিনি জলস্পর্শ করবেন না এ দিকে বুঁদি যে কি চিজ, তার বিলক্ষণ প্রমাণ তিনি পেয়েছে তাকে হজম করা তাঁর কর্ম নয়। অথচ প্রতিজ্ঞাটাও ক ফেলেছেন। আমাদের গলির মোড়ে পায়ে চলতি রাস্ত কোণে মাটি খুঁড়ে গাবু বানিয়ে তাতে পাথরের গুলী বসিয়ে খেলুড়েদের যে রকম ভাবে দিব্যি দিই—"নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু একেবারে ঠিক তাই। মুরদ নেই, কিন্তু দিব্যি দিয়ে ভা উপর রাগ করে বসে রইলেন রাণা।

শেষ পর্য্যন্ত সর্দাররা নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খা মত একটা ব্যবস্থা বাৎলালেন। রাতারাতি তৈরী হয়ে নকল বুঁদি-গড়। ছুটে এলেন সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে রাণা কুম্ভ। বুঁদির গড় আর মাটির উপর মাথা তুলে থাকতে পারবে না।

কিন্তু রাণারই আশ্রিত এক সামন্ত, বুঁদির হরবংশের শিকার থেকে ফিরে আসবার সময় ব্যাপারটা এক চোখ দে বুঝে নিল। বুঁদির এত বড় অপমান! কখনো নয়, কখনো এক জন হরবংশীও বেঁচে থাকতে কখনো নয়।

লেগে গেলেন মহাবীর একা ধনুক-বাণ নিয়ে রাণার সৈন্ত সঙ্গে লড়াই করতে। কানেও তুললেন না তাদের শাসানি চোখরাঙানি। প্রাণ দিয়ে বংশের মান রেখে গেলেন। রক্তপাতে নকল বুঁদি-গড়ও রাণা মাটিতে লুটিয়ে দিতে পারলেন

এ-হেন লম্বা পাগড়ীর ঝুলওয়ালা হচ্ছেন আমাদের সাহেব। তিনি আজ প্যাক্স ব্রিটানিকার যুগে খুসী মত তরো চালানো আর প্রাণ নেওয়া-নেওয়ার কারবার নেই বলেই কি, লড়াইয়ে জায়গীরখানা শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারেন? মা না হয় হারই হয়েছে। কিন্তু বীরধর্ম ত একটা আছে?

এদিকে যে জায়গীরদার মামলা জিতেছেন, তিনিও

দরবারের জায়গীরদার। তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করাও যে স্বামি-ধর্মে বাধে। কি করেন এখন ঠাকুর সাহেব?

হায়, জোর যার, জমিন তার, সত্যযুগের এই সাধু নিয়মটা বাতিল হয়ে গেছে এই ঘোর কলিযুগে। এমন কি দরবারে ভাস করে ভেট আর সেলামী দিয়েই সে কাজ হাসিল করে নেওয়া যাবে, সে পথও বন্ধ। দুষ্ট লোকেরা যে জিনিষটাকে 'ঘুষ' এই বদনাম দিয়ে রেখেছে। তার উপর আবার সাগর-পারের প্রিভি কাউন্সিল একেবারেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইংরেজরা আবার সেলাম আর সেলামী কোনটাতেই হুকুমের নড়-চড় করে না, এমন একটা অখ্যাতিও আছে।

কিন্তু এই শ্রদ্ধাহীন বেয়াড়া চালের ঠাট্টা-মস্করা ছেড়ে দিন মশায়! এদিকে আমাদের ঠাকুর সাহেবের যে ধনও যায়, মানও যায়। প্রাণটা না হয় দিয়ে দিতে পারতেন, সেই সে কালের কথায় কথায় লড়াইয়ের ফ্যাসানটা বজায় থাকলে। কিন্তু হায়, আদর্শের পথ থেকে নেমে এসেছে এই হৃদয়হীন বৈশ্যযুগে। তাই সে পথটাও খোলা নেই।

অথচ বংশের সম্মান যে কত বড় জিনিষ, তা আমরা যারা খোড়-বড়ি-খাড়া যোগাড় করতেই প্রাণান্ত হচ্ছি দিনকে-দিন, সেই আমরা বুঝব কি করে? বুঝেছিলাম শুধু তখন, যখন ঠাকুর সাহেব অণ্টালা-কেল্লা দখলের কাহিনী আমায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের পূর্বপুরুষের বাহাদুরীর একটা সত্যি গল্প করছেন। অবশ্য যে দুই বড় সামন্ত বংশ এই গল্পের নায়ক তিনি তাঁদের কোন বংশের লোক, তা ফাঁস করবেন না আমার কাছে।

জাহাঙ্গীর চিতোর দখল করে রাণাকে ত মেবারের পাহাড়ে-জঙ্গলে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু তা বলে রাণার সামন্তদের বীরত্ব ত আর কমে যায় নি! না কমে গিয়েছিল তাদের বংশের সম্মান রক্ষার দিকে কড়া নজর? তাই হঠাৎ যখন অণ্টালা-কেল্লা ফিরে দখল করবার সুবিধা এসে গেল, তখন কোন্ বংশ সৈন্যদের আগে-আগে লড়তে পাঠাবে তা নিয়ে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। মহারাণা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। সমতল দেশটুকুর প্রান্তে এই দারুণ শক্ত ভাবে পাথরে-গড়া পাহাড়ী কেল্লাটা আচমকা আক্রমণ করে দখল করতে হবে। কেল্লার 'পোল' অর্থাৎ ফটক মোটে একটি—তার গায়ে বড় বড় লোহার কাঁটা বসান। হাতীর শক্ত চামড়া পর্য্যন্ত ফুঁড়ে যাবে তাতে। কাজেই হাতীর চাপ দিয়ে সে ফটক ভেঙ্গে বা খুলে ফেলা সম্ভব নয়।

চন্দাবৎ গোত্র বরাবর মেবারের সৈন্য দলের সবার সামনে থেকে লড়াই করে এসেছে এ পর্য্যন্ত। এটা তাদের পাওনা সম্মান। সবার আগে মরতে পারার অধিকার।

কিন্তু শক্তাবৎ গোত্রও ত ফেলনা নয়! হালের বহু লড়াইয়ে তাদের হাতিয়ারের হিম্মৎ নতুন এক হক তৈরী করে নিয়েছে। তার উপর এই কেল্লাটা তাদেরই এলাকায় ছিল। কাজেই চন্দাবৎরা প্রথম মরতে পাবে কিসের অধিকারে?

লেগে যায় আর কি নিজেদের মধ্যে এখনি।

পুরানো কলকাতার এঁদো-গলিতে ততোধিক পচা বীরত্বের অভিনয় আমরা করে থাকি। বড় রাস্তার মোড়ে গুণ্ডা দাঁড়িয়ে থাকলে, গলির মোড়ে নিরাপদ দূরত্বে কে আগে দাঁড়াবে, সে নিয়ে মারামারি নেহাৎ কম হয় না। কিন্তু এ যে বড় রাস্তায় আগে এগিয়ে এসে মার খাওয়া। ফাঁকি-ঝুকির পথ নেই একেবারে।

বুদ্ধিমান রাণা বললেন—যে গোত্র আগে অণ্টালায় ঢুকতে পারবে, সামনে এগিয়ে লড়বার অধিকার হবে তারই।

অণ্টালা চলো। চলো অণ্টালা।

শেষ রাতে রওনা হল দু' দল। একই সময়ে। এত দিন তারা পাল্লা দিয়ে এসেছে, কিন্তু কারা বড় বীর তার ফয়সালা হয়ে যাবে চূড়ান্ত ভাবে। সামনে শত্রু-দুর্ভেদ্য পাহাড়ী কেল্লার মধ্যে। পিছনে, পাহাড়ের ওপারে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে স্ত্রী-পরিবার। বীরদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে তাদের চারণ দল। গাইছে তাদের গোত্রের পূর্বপুরুষদের বীর-গাথা। যোগাচ্ছে নতুন বীরত্বের প্রেরণা।—

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

শক্তাবৎরা সোজা চলে এল দুর্গের দরজায়। ভোর তখনো হয়নি, শত্রু তখনো তৈরী নয়। কিন্তু দেওয়ালে তারা দাঁড়িয়ে গেলো সারি সারি; সুরু হল তুমুল লড়াই।

চন্দাবৎরা এ এলাকায় বিদেশী। কাজেই পথ-ঘাট ঠিক মত জানা নেই। জলাভূমি পার হয়ে তারা পৌঁছাল একটু দেরীতে। কিন্তু বুদ্ধি করে সঙ্গে এনেছিল দড়ির মই। চন্দাবৎ সর্দার চট করে উঠে পড়লেন দেওয়ালের মাথায়, কিন্তু গোলার ঘায়ে তাঁর নিজের মাথা ফিরে এল দলের মাঝখানে। তাঁর কপালে হল না, মেবারের সৈন্যদলের সবার সামনে দাঁড়িয়ে লড়তে যাওয়া।

দু' দলই বাধা পেয়ে গেল।

শক্তাবৎ সর্দারের সঙ্গে ছিল হাতী। কিন্তু ফটকের গায়ের লোহার কাঁটা বার বার হাতীকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। হাতীর চামড়া ফুঁড়ে যাচ্ছিল যে সূচের মত ধারাল কাঁটাতে। চার দিকে গাছের পাতার মত ঝরে পড়তে লাগল শক্তাবৎদের মৃতদেহ। ওদিকে চন্দাবৎদের তুমুল চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ওটা কি ওদেরই জয়ধ্বনি?

আর ত দেরী করা চলে না! শেষে কি চন্দাবৎরাই জিতে যাবে? তাদেরই থেকে যাবে সবার আগে মরতে এগিয়ে যাবার অধিকার? নেমে এলেন শক্তাবৎ সর্দার হাতীর পিঠ থেকে। দাঁড়ালেন পিঠ পেতে কেল্লার কপাটের লোহার কাঁটাতে। করলেন হুকুম মাহুতকে বুকের উপর দিয়ে হাতীকে ঠেলে দিতে। এবার আর হাতীর গায়ে কাঁটা বিঁধল না। শক্তাবতের দেহই কাঁটাগুলিকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। মড়-মড় করে ভেঙ্গে পড়ল কপাট আর কাঁটায় গাথা শক্তাবৎ সামন্তের দেহ ঢুকে পড়ল অণ্টালায়।

আর এ দিকে ততক্ষণে?

এ দিকে ততক্ষণে চন্দাবৎ সর্দারের মৃতদেহ অণ্টালায় ঢুকে পড়েছে। শক্তাবৎ সর্দার সেই জয়ধ্বনিই শুনে কপাটের কাঁটা-গুলিতে দেহ পেতে দিয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের গোলার ঘায়ে চন্দাবৎ সর্দারের দেহ কেল্লার দেওয়াল থেকে বাইরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরের নায়ক পাগড়ী দিয়ে সর্দারের দেহ বেঁধে নিলেন নিজের পিঠে। উঠলেন মই বেয়ে দেওয়ালের মাথায়। বর্শা দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন নিজের পথ। তার পর ঝাঁপিয়ে

পড়লেন পিঠে-বাঁধা শব নিয়ে কেল্লার মাটিতে। মুখে তাঁর জয়ধ্বনি। চন্দাবতের জয়। জয় চন্দাবৎ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট মড়-মড় করে ভেঙ্গে পরে শক্তাবতের দেহ ঢুকিয়ে নিল কেল্লাতে। কিন্তু ততক্ষণে চন্দাবতের সামনে দাঁড়ানর অধিকার আবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

নিজের মান বজায় রাখবার জন্য যারা এমনি করে প্রাণ উজাড় করে দিত, সেই রাজপুত হয়ে ঠাকুর সাহেব এখন কি করেন ?

সেই রূপ-কথার যুগের সহজ বিচারের পথ আর খোলা নেই। অসির বদলে রসনা যত দূর লড়াই করতে পারে, তাতে তাঁর হার হয়ে গেছে। লড়াইয়ে হেরে গিয়ে সে হার মেনে নিতে পারাও বীরধর্ম। তাই অপর পক্ষ—এ যুগে শত্রুপক্ষ বললে বেমানান হবে—তার জায়গীরের মাটিতে পা ফেলবার আগেই তিনি নিজেই রাতারাতি স্ত্রী-পুত্র পরিবার পাগড়ী আর তলোয়ারখানা নিয়ে জায়গীর ছেড়ে উদয়পুর সহরে চলে এলেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সংক্ষেপে আমায় বলেছিলেন—কি করব আর ? আমি নিজের জায়গীরে থেকে ওদের সেখানকার মাটিতে পা ফেলতে দিতাম না। তরোয়াল দিয়ে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করতাম, তাই ছেড়েই চলে এলাম আগে ভাগে।

সেই ঠাকুর সাহেব মোটরের সামনে তুলে-ধরা ডাণ্ডা দেখে মাথা হেলিয়ে নেমে এলেন মোটর থেকে। অবশ্য খালি হাতে, কিন্তু তরোয়ালের স্বপ্ন এখনো তিনি দেখে থাকেন।

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম মোটর থেকে। দেখি, ব্যাপারটা কি।

সবাই নেমে পড়ল। মায় আমাদের বালিকা কন্যা অনুরাধা পর্য্যন্ত। নিশ্চয়ই খুব মজার একটা কিছু হবে।

ভীল মেয়েরা ততক্ষণে ডাণ্ডা মোটরের সামনের কাচ থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের মাথার উপর ঘুরোতে সুরু করেছে। ওদের উদ্দেশ্য সাধুই ছিল। ঘুরছে পবনের রঙঝারীতে ছোপান ঘাগরা, লেহঙ্গা, গেঁয়ো সাজ। পায়ে বাজতে সুরু করেছে পাজেব অর্থাৎ পায়জোর। রূপোর না হয় রূপালী ঘুঙুর। বাজছে মিঠে রূপালী-সুরে।

গাইছে ওরা সোনালী আবেশে লুহরৃ অর্থাৎ ডাণ্ডা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেহাতী আওরতের গান—

ঘুম্‌রে রমোবা মেজাসা
ঘুম্‌রেছে নথরালি
নথরালি যাদুগারি মা
ঘুম্‌রে রমোবা মেজাসা

খুসীতে সবাই একসঙ্গে নাচছে, সেজে-গুজে নাচছে। ওগো, যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করে দিয়ে নাচছে। খুসীতে সবাই একসঙ্গে নাচছে।

ওদের ঘুরে-ঘুরে নেচে যাওয়া দেখে, ফুলন্ত কেশোলা গাছগুলিতেও যেন নাচন সুরু হল। টুপ টুপ করে এদিক সেদিক থেকে মহুয়া-ফুল ঝরে পড়তে লাগল। ভীলনীদের নাচে সাড়া দিয়ে জেগে উঠল ভীলোয়াবার অন্তর।

আমরাও দিলাম সাড়া, মন থেকে।

গত ক'দিন থেকেই লক্ষ্মীবিলাস-প্রাসাদ থেকে পেশোলা হ্রদে জলের খেলা দেখতে দেখতে হোলির খেলা দেখানর জন্য অনুরোধ করেছি শ্রীরামগোপালজীকে। তিনি এই প্রস্তাবে তেমন উৎসাহ দেননি। শেষ পর্য্যন্ত এক বার মৃদু স্বরে এ কথাও বলেছিলেন যে, ও-সব দেখে আর কি হবে ? এ দেশে হোলিতে যা হয় তার একটা সাফা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত মাজা-ঘষা নমুনা ত কলকাতায় বড়বাজার অঞ্চলেই দেখে থাকবেন। কাদা আর রঙ-গোলা নোংরা জলের খেলা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে তিনি প্রথম থেকেই আমল দেননি। এর পর যখন হোলির গান শুনতে চাইলাম, তখনো তিনি আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলেছিলেন।

শ্রীরামগোপালজী অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁর বিচার-বুদ্ধিতে নির্ভর করতেন স্বয়ং মেবারের মহারাণা। আমিও তাই করেছিলাম। কিন্তু এ যে অপরূপ সুন্দর এক হোলির গান। তার সঙ্গে মন-মাতানো নাচ। বনলক্ষ্মী আজ তাঁর ঘোমটা খুলে এ কী নাচ আর গান দেখালেন, সহুরে-পালিশ-করা লোকগুলিকে।

আমাদের অন্তরের খুসী ভাবটা উপচিয়ে উঠে ওদেরও উপর যেন ছড়িয়ে পড়ল। ওরা আরো বেশী খুসী হয়ে ডাণ্ডায় ডাণ্ডা ঠুকে-ঠুকে তাল দিতে লাগল। আমাদেরও মাথা তালে-তালে একটু দুলছিল না কি ?

জানি না, তবে ঠাকুর সাহেবের মালব দেশ ঘেঁষা সবে খোয়া যাওয়া পিতৃ-পুরুষের জায়গীরখানার কথা মনে পড়ল। তিনি ওদের প্রথমেই একটা মালবিকা মেয়েদের প্রিয়-মিলনের গান করতে বললেন।

নব বর্ষের প্রথম ন' দিন ধরে রাজোয়ারাতে গৌরীদেবীর পূজা আর উৎসব হয়। বাংলা দেশে আমরা যেমন শারদীয়া পূজার সময় প্রবাসী প্রিয়জনের ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকি, রাজপুতরাও গাঙ্গোর পূজার সময় ঠিক তেমন ভাবেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শুধু শরৎ আর বসন্তে প্রকৃতির আর মানুষের মনের যেটুকু তফাৎ থাকে, সেটুকুরই ছায়া এসে পড়ে। গানে-গানে মালবিকারা প্রিয়কে আবাহন করে—"মাতাল-করা বসন্ত ঋতু এসেছে। গাঙ্গোরের নিত্য রঙীন উৎসব এসেছে। হৃদয় আমার উতলা হয়ে উঠেছে। শরীরে ভরে উঠেছে গোলাপের সৌন্দর্য্য আর যৌবন। হে প্রিয় রসিক, তুমি ত প্রবাসে অনেক উপায় করেছ, এখন ঘরে ফিরে এসো। দিল্লীর দুয়ারে নহবৎ বাজছে, এখন তুমি ফিরে এসো।"

নেচে নেচে রাজপুতানীরা গ্রামে-গ্রামে গায় :

হামারা প্যারা আজ তো
গুলাবী গাঙ্গোর ছে।
জোড়ী রা প্যারা আজ তো
বসন্তী গাঙ্গোর ছে।
হামারা প্যারা রাজা।

এমন আনন্দের সময় যদি স্বামী বাইরে বিদেশে যেতে চায় তা হলে ভীল গ্রাম-বধূ কি গান গেয়ে তাকে বারণ করবে, তা শোনাল ভীলনীরা।

মহরা মাথা নৈ মহিমদ ল্যাব।
মহরা হেজা মারু ইগাং হো রেবো জী।
ইহাং হো রহো উতজা সুরজ
ইহাং হো রেবো জী।

আমার মাথার দিব্যি রইল ; ও গো তুমি এখানেই থাক। একেবারে বাংলা দেশের হৃদয়-নিংড়ানো কথা।

নতুন বিয়ের ক'নে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। মন যেতে চায় হয়ত, কিন্তু চরণ চলতে চায় না। চরণে নূপুর বাজিয়ে নেচে নেচে ভীলনীরা গাইল :—

মাতা বাইসেঁ মিলোয়া
দি রে তাতিলা বানরো।

ওগো একটুখানি দাঁড়াও, আমি মায়ের কাছে একটু বিদায় নিয়ে নিই।

হাওয়া একটু ভারী হয়ে আসছে দেখে, ঠাকুর সাহেব ওদের একটা বসন্ত পঞ্চমীর গান ধরতে বললেন। মালব দেশের কিশোরী মালবিকারা পানিয়া-ভরণে চম্বেলি অর্থাৎ চামেলী নদীর পারে যায়। গাগরী দোলে মাথায় আর পায়জোর নাচে পায়ে। নতুন ঋতুকে ওরা আবাহন করে গানে-গানে, নতুন পাতা ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। গায় তারা প্রেমের গান, স্বপ্ন দেখে তারা প্রেমের আর রূপরাগের। ভরা থাকে, ভরা থাকে 'গাগরমে সাগর'।

ফুলে ফুলে লাল মহুয়া-শাখার তলায় বসে শুনলাম এক নতুন বৌয়ের গান। বেচারীর স্বামী আগেই লুকিয়ে আর একটা বিয়ে করে রেখেছিল।

কৈরে জুবাব করু রসিয়াসেঁ
ডাল রে বাদল বিচ চমকে তারেঁ
সাঁজ পরে পিন লাগেঁ প্যারো
জোর করুঙ্গি জুওয়ার করুঙ্গি
তো রসিয়াবা মেলামেঁ রীজা রহুঙ্গি
কৈবেঁ জুবাব করুঁ রসিয়াসেঁ।

প্রিয়তমের কাছে আমি কেমন করে নালিশ করব, ওগো! সে যে মেঘদলের মাঝখানে তারার মত। সন্ধ্যায় তাকে আরো বেশী মিষ্টি দেখায়। আমি যদি নালিশ করি আর তর্ক করি, তাহলে তার সঙ্গে আমার জীবন সুখে কাটাব কেমন করে? ওগো, প্রিয়তমের কাছে আমি নালিশ করি কেমন করে?

রসিয়া, রসিয়া, ও গো রসিয়া। কথাটা খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু আপনার মাজা-ঘসা সংস্কৃত কাব্যে বিরহবিধুরা যক্ষপত্নীর প্রেমবিহ্বলতাকে ছোট করবেন না। সে অতুলনীয়। ছোট কথা ত থাক। তুলনাত্মক প্রয়াসও আমার মতে বাড়াবাড়ি। মিঠে বেশ সমস্তটা দেহ-মন-আত্মাকে প্রেমের রসে বিহ্বল করে তুলল।

কালিদাসের উজ্জয়িনী কি আজ ফুটে উঠল রঙ-ঝরানো মহুয়া-তলায়? হয়ত তার যুগেও কোন প্রেমবিহ্বলা নায়িকার মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠত এমন করুণ আন্তরিকতা ভরা আপন-ঢালা গান। সুসভ্য সংস্কৃত কাব্যের শত মুগ্ধা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকার ছবি আমার এই উজ্জয়িনীর বাইরের পল্লীবালার গান শুনে নতুন রূপ ধরে এল! এরই আপন-ভোলা আপন-ঢালা প্রেমের জন্য মরুভূমির মত মন তৃষিত হয়েছিল এত দিন।

এবার শুনতে চাইলাম পুরুষদের হোলির গান। আমরা শহুরে

সভ্য জীবনে একালে পুরুষদের গান প্রায় ভুলে গেছি। মেয়েরা গান শেখে বিয়ের জন্য, কখনো বা তাতে সংসার চালাবার সুবিধাও হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে-ঘরে ছেলেরা সাধারণ দিনগুলিকে ভরে তুলবার গান শিখবে কিসের তাড়ায় ?

তবু ভাবলাম যে, এই বন্য অঞ্চলে ছেলেরাও ত পায় প্রকৃতির প্রেরণা। শুধোই ওদের পুরুষদের হোলির গানের কথা।

অমনি বেরিয়ে এল একখানা ধামাল গান। পুরুষরা রঙ-ভরা পিচকারী নিয়ে গায়—

রঙ কিনো, রাঠোরাকা রঙ কিনো,
ভূপতো বড়ে ভারী
গড়তো বিকানো।

রাঠোররা রঙ খেলছে। রঙ খেলাচ্ছে। এত বড় বাহাদুর শানদার আদমী। বিকানীরে তার বাস। তবুও কেমন খেলছে !

পরদেশী পুরবিয়াদের দেখেই এই গানখানা বেছে বের করল কি না কে জানে ? একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম। পল্লীবালাদের চঞ্চল চরণের নাচনে মনে যে চলেছে অনুরণন।

সতৃষ্ণ চোখে তাকালাম পশ্চিমের পানে। আরাবলী পাহাড়ের চূড়াগুলি পার হয়ে মরুভূমি পার হয়ে আরেকটি সুন্দর দেশে গিয়ে নজর ঠেকল।

সে হচ্ছে ইরাণ। বুলবুল আর গোলাপ, সাকি আর সুরার দেশ। আঙুরের মত রমণীয় সাকি আর আঙুরের রস-নিংড়ান সুরার দেশ।

এমনি একটা মরুপ্রান্তরের পাশাপাশি শ্যামল-স্নিগ্ধ কোণাটুকুর ছবি। সে ছবির রূপ দিয়েছেন হাফিজ তাঁর অমর লেখনীতে—

খুশী হও মোর হিয়া
প্রভাতের বায়,
ওই আসে পুলকিয়া
সে দিনের প্রায়
পুন: আসে সাথে নিয়া
মিঠে বারতায়।

উটের ক্যারাভ্যান চলেছে প্রান্তর দিয়ে। তাদের গলার ঘণ্টার আওয়াজে তিনটি কিশোরী ঘুম থেকে জেগে উঠল। সেই ক্যারাভ্যানের সঙ্গে সওদা চলেছে সুগন্ধির, জহরতের, তুকতাক করে মনোহরণের বেসাতীর। কিশোরীরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পোষাক পরে নিল। পরল তারা ইরাণী মরুভূমিতে অরুণোদয়ের রঙের, গোলাপী রঙের, হাল্কা বেগুনি রঙের পোষাক। সাজিয়ে রাখল তাদের স্বপ্নগুলিকে ফুলের মত থরে থরে, বেসাতী যাত্রার পথে ছড়িয়ে দেবে বলে মনে-মনে। ওরাও ওই পথেই চলে যাবে। সব চেয়ে বড় কিশোরীটি প্রেমে পড়ার জন্য যেন তৈরী হয়েই ছিল। ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ তার মনে প্রেমের আহ্বান এনে দিল। সেই আহ্বানে সে অন্য দু'টি কিশোরীকেও সাড়া দিতে শেখাল।

ওগো সাথী, মম সাথী,
আমি সেই পথে যাব সাথে।

কিন্তু ওরা যে বিয়ের জন্য বাগ্‌দত্তা, গ্রামের ছেলেদের কাছে। তারা এসে ওদের হাত ধরে বাধা দিল, জানতে চাইল কেন ওর চলে যেতে চাচ্ছে ? কোথায় যেতে চাচ্ছে ?

কিন্তু কি দেবে উত্তর ওরা ? দিগন্তের ওপারে যে বিশ্ব, ঘণ্টায় টুং-টাঙের মধ্যে যে বাণী তার মর্ম ওরা বোঝাবে কি করে এই বিয়ের জন্য তাকিয়ে থাকা রেগে-ওঠা তরুণদের ? শেষে ওরা নাচতে-নাচতে তাদের রাগ জল করে দিল। নাচের মোহে, যাদুমন্ত্রে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারা যখন আবার জেগে উঠল, তখন ওরা চলে গেছে। চলে গেছে মোহনিয়ার ডাক অনুসরণ করে। আর ওরা ফিরবে না। ফিরবে না ওই মরুপারের গাঁয়ে।

ইরাণী মরুপ্রান্তরের প্রেমবিহ্বলা এই কিশোরীরা যেন তাদের হাসির আর নাচের ছন্দে-ছন্দে জেগে-ওঠা ঢেউয়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে-মিলিয়ে গেল। তাদের আর দেখতে পেলাম না। তাদের সেই ব্যাকুল-করা রঙ-করানো পোষাকগুলি পর্য্যন্ত না।

কবি সাদী ত ঠিকই লিখেছিলেন,—

ওগো ক্যারাভান, ধীরে চল ধীরে, মনের শান্তি যায় ;
আমার ছিল যে হিয়াখানি তারে মনচোর লয়ে যায়।
পণ্ডিত জনা দেহে আর হিয়ে পৃথক্ করিতে চাহে না ;
আপন আঁখিতে আমি যে রেখেছি হিয়া আর মোর রহে না।

সত্যিই হিয়া আর মোর রহে না।

ব্যাকুল হয়ে পল্লীবধূদের কাছে আরো আপনাদের, আরো পুরোপুরি খাঁটি দেহাতী গান শুনতে চাইলাম। বললাম—এমন গান শোনাও যা শুধু তোমরাই গেয়ে থাকো এই মরুভূমির পারে শ্যামল বন-প্রান্তরে—যা গাওয়া হয় না সভ্যতার পালিশ-করা সহুরে-বৈঠকে।

ওদিকে তাকিয়ে দেখি, ঠাকুর সাহেব প্রাণপণে ইসারা করে কি যেন বলতে চাচ্ছেন। মুখের চেহারা দেখে মনে হল যেন কিছু একটা বারণ করতে চাইছেন, কিন্তু চোখের চেহারায় সেটা ঠিক মালুম হল না।

শেষ পর্য্যন্ত তিনি রামগোপালজীর নামটা শুধু বললেন।

জানি, রামগোপালজী কি রকম গান আর কবিতা এই রাজধানী দিল্লী সহর থেকে আসা লোকগুলির জন্য ফরমাস দেবেন। তিনি চারণদের মুখে আমায় শুনিয়েছিলেন, দু:সাহসী রাঠোর বীর মাড়োয়ারের রাজা যশোবন্ত সিংহের লেখা কবিতা।

মুখ শশি বা শশি সোঁ অধিক
উদিত জ্যোতি দিনরাতি।
সাগর তে উপজি নয়হ
কমলা তা পর সোহাতি।
নৈন কমল যে এন হৈ, ঔর কমল কেহি কাম
গমন করত নৌকী লগৈ, কনকলতা য়হ বাম।

মাথা নেড়ে বলেছিলাম—সাধু, সাধু। আওরঙ্গজেব এঁর ভয়ে সর্বদা অস্থির থাকতেন, আর শেষ পর্য্যন্ত আফগানদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্য কাবুলে পাঠিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হন। অনেকের বিশ্বাস, সেখানে বিষ খাইয়ে এই মরুভূমির কাঁটাকে উপড়িয়ে ফেলেন দিল্লীশ্বর। সেই বীরের কবিতা আমায় মুগ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু এই কবিতা আর সমসাময়িক পুরানো বাংলা কবিতার ভাব আর ভাষায় খুব বেশী তফাৎ নেই। তা ছাড়া এই কবিতা ত দিল্লীতে বসেও উপভোগ করতে পারতাম। তার চেয়ে দিন নতুন কোন জিনিষ।

তখন বের হল ভারী সুন্দর আর একটি কবিতার জুয়েট।

বিকানীরের রাজার ভাই পৃথ্বীরাজ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁকে মোগল দরবারে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বীরত্বে আর কাব্য-প্রতিভায় তাঁর জুড়ী তখন আর কেহ ছিল না। তিনিই আকবরের সভা থেকে মেবারের মহারাণা প্রতাপকে এমন একখানি কবিতা লিখে পাঠান, যা পেয়ে মহারাণা আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করে নতুন উৎসাহে যুদ্ধে নামেন ও মেবার আবার জিতে নেন।

এ-হেন বীর কবি পৃথ্বীরাজ স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেক বয়সে আবার বিয়ে করেন। কথাতেই আছে, 'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্'। কিন্তু এই বিষকে কবি 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' করে নিয়ে অমৃত বানিয়ে নিলেন। যশলমীরের রাওল-কন্যা চম্পাদেবী আর তাঁর স্বামী পৃথ্বীরাজের একটি দুয়েক কবিতা ডিংগল ভাষার অমর কাব্য 'রূপমণি-মঙ্গল' থেকে রামগোপালজী আমায় শুনিয়ে দিলেন।

পৃথ্বীরাজ দাড়ি থেকে একটা ধোলা অর্থাৎ শাদা চুল উপড়িয়ে ফেলে দিচ্ছেন। তরুণী স্ত্রীর যেন নজরে না পড়ে। কিন্তু পিছন থেকে তা দেখতে পেয়ে চম্পা হাসতে শুরু করলেন। আয়নাতে চম্পার মুখের হাসি দেখে পৃথ্বীরাজ বললেন :—

পীথল ধোলা আবিয়াঁ; বহুলো লাগি খোড়।
পুরে জীবন পদমিনী, ঊভী মুঁহ মরোড়।
পীথল পলী ঠমুক্কিয়াঁ, বহুলী লগ গই খোড়।
স্বামিনী হাঁসা করে, তালী দে মুখ মোড়।

এমন রসাল অথচ ব্যথায় ভরা কবিতা শুনে, স্বামী পীথল অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের মনের গ্লানি মেটাবার জন্য চম্পা সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করে উত্তর দিলেন :—

প্যারী কহে পীথল শুনো,
ধোলাং দিস মত জোয়।
নরাং নাহরাং ডিগমিরাং
পাকাং হো রস হোয়।
খেড়জ পক্কা ধোরিয়াং, পঙ্কজ গ উধাং পাব।
নরাং তুরংগাং বনফলাং পক্কাং পক্কাং সাব।

ভরাযৌবনা পদ্মিনী স্ত্রী স্বামীকে পাকা চুল উপড়াতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। মুখ ফিরিয়ে হাতে তালি দিচ্ছে। স্বামীর মুখে সে সম্বন্ধে কবিতা শুনে স্ত্রী উত্তর দিচ্ছে যে, শোন শোন, প্রিয়ার কথা শোন। মানুষ, সিংহ আর দিগম্বর অর্থাৎ সন্ন্যাসী পাকা অর্থাৎ পরিপূর্ণ হলেই রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আর কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কবিতা রচনায় শিষ্যা করে এমন পুরস্কার পেয়েছেন কি না জানি না।

কিন্তু কোথায় এখন রামগোপালজী আর তাঁর সুসভ্য কাব্য-সুধা? আমি যে ভীলোয়ারার অন্তরে বসে কাব্য আর গীতে সুরার মত রস পেয়ে গেছি। তাই শুনতে চাইলাম, ওদের একেবারে নিজস্ব গোপন কথার গানগুলি।

এবার ভীলনীরা চোখে হানল লক্ষ বিদ্যুতের ঝিলিক। হাসি-মুখগুলি ঢেকে নিল রঙীন ঘোমটার আড়ালে। মাটিতে পাজেব-পরা পা-গুলি তাল ঠুকে জানিয়ে দিল যে, মনের মতন কিছু একটার জন্য এবার তৈরী হচ্ছে ওরা।

ওই আধো-সভ্য আধো বসনে-ঢাকা কোকিলরা প্রাণ ঢেলে গলা পঞ্চমে তুলে কি যেন গাইল। কোন পাওয়া না পাওয়ার বেদনায় রাঙানো অনুরাগের গান। কেমন না জানি সে অনুরাগ—যা এই হোলির খেলায়, এই প্রাণের মেলায় এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বনে-বনে। হঠাৎ যে ময়ূর আর হরিণগুলি আপন খেয়াল-খুশীতে ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখে যাচ্ছিল, তারাও যে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! ওরাও যেন কান পেতে শুনতে লাগল, এই ভীলনীদের হোলির গান। পৃথিবীতে আর কোন গান শুনতে কি কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে ময়ূর আর হরিণ? এই বিশ শতকে? এই আণবিক-বোমার বাজারে?

কি সে গানের কথাগুলি? যদি দেখা পেতাম, হোমারকে মিনতি করতাম, সে গানের আবেগকে ভাষায় ফোটাতে, কালিদাসকে অনুনয় করতাম সে ঝঙ্কারকে রূপ দিতে। সে গানের কথাগুলি কি?

ভীলনীদের প্রিয়তমদের দেহে হোলির দিনের ফাগের রঙ এসে পড়েছে। প্রিয়ারাই সে রঙ ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কে যে কার গায়ে রঙ ছুড়েছিল তা কেউ স্বীকার করছে না। এদিকে ওদের গায়ে আগুন-রাঙা ফাগের স্পর্শে সত্যিসত্যিই আগুন লেগে গিয়েছে। সারা গায়ে সর্ব ইন্দ্রিয়ে। এ আগুন নেবাবে কি দিয়ে? দাউ-দাউ করে জ্বলছে যে আগুন!

তার পর কি হল?

নাঃ। সে আগুনের আঁচ আমার এ কলমে সইবার ক্ষমতা নেই। মাপ চাইছি।

[ক্রমশঃ।

ঝিঁঝি ও ফড়িং

জে. কীট্‌স্

পৃথিবীর কবিতার মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই কভু।
প্রখর সূর্যের তাপে, মুহ্যমান ক্লান্ত পাখী যবে
ছায়াচ্ছন্ন তরুশাখে খোঁজে নীড়, একটি শব্দ তবু
সদ্য-চষা মাঠে, কোপে নিরন্তর প্রবাহিত হবে।
সে তো ফড়িংয়ের গান! বসন্তের বিলাসী-জীবনে
সে-ই তো নায়ক,—তার ফুরায় না রঙীন আবেশ;
এ-যে তার নেশা, খেলা—বসে তাই পরিতৃপ্ত মনে
সুখী কোনো লতিকার কোল ঘেঁসে, খেলা যবে শেষ।

হবে না, হবে না শেষ কোনো দিন পৃথিবীর গান।
শীতের নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা যবে হোলো নিশ্চল, নিথর
তুষারের আয়োজনে, কুয়াশায় চারি দিক ম্লান,
বিচালীর পাশ থেকে ঝিঁঝি ডাকে সুতীক্ষ্ণ, প্রখর।
আধো ঘুমে-জাগরণে, মনে হয় সবুজের নীড়ে
সেই ফড়িংয়ের গান ঝিঁঝির গলায় এলো ফিরে।

অনুবাদক—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা-রাজ)

অতীন মেয়ে পছন্দ হলেই বিয়ে করবে, এই মিথ্যে গুজোবটা প্রচার হওয়ার ফলে তথাকথিত তরুণী রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যাঁরা অবস্থাপন্ন, অতীনকে ঘন ঘন ফোন মারফৎ "কল" দেন—যাঁরা দুঃস্থ, তাঁরাও হানা দিতে ছাড়েন না। কলেজে-পড়া মেয়ের দলও জটলা করে—কেমন ক'রে একটা পাটনাই মেয়ের খপ্পরে পড়ে অতীন হাবুডুবু খাচ্ছে! ফলে, সুরূপা-কুরূপা রোগীর কমতি নেই, মুখরোচক আলোচনা ইতিমধ্যে অতিরঞ্জিত হয়ে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এমন কি, পাটনাই মেয়েটা যাদুবিদ্যায় কতখানি পারদর্শী তারও আলোচনা বাদ পড়ে না। কেউ বলে বিকেলে আর ডাক্তার বাবুর টিকি দেখার উপায় নেই, তাদের যা কিছু "চান্স" নিতে হবে, ঐ সকালে।

অতীনের জীবন অতিষ্ঠ—মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম নেই। সে কিন্তু নির্ব্বিকার—যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করে চলে;—অনেক মেয়ের রোগ ধরতে পারে না বলে বড়ই চিন্তিত হয়। অন্য ডাক্তারের নাম করে রোগীদের ছেড়ে দেয়।

আজ রেখার ওখান থেকে সোজা তার চেম্বারে পৌঁছুতেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। মোটর থেকে নামতেই অতীন দেখে একটি সুদর্শনা তরুণী বুক চেপে ধরে বসে আছেন। মুখে কাতরতার ভাব!

অতীন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে—কি চান?

—আরোগ্য চাই। বুকের ব্যথাটা দিন দিন বাড়ছে, ডাক্তার বাবু!

—আসুন—একবার দেখি। তরুণীকে পরীক্ষাগারে শুইয়ে ভাল করে উল্টে-পাল্টে বুক-পিঠ বাজিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেথিস্কোপে পরীক্ষা করেও যখন রোগ ধরা গেল না, তখন নলটা কান থেকে নামিয়ে ডাক্তার বাবু বড় ভাবনায় পড়ে গেলেন। গম্ভীর হয়ে রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কী বদহজম হয়?

—হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, কিছু হজমিগুলি দিন—

চিন্তাক্লিষ্ট অতীন উত্তর দেয়—উঁহু, রোগ না বুঝে ওষুধ দেব না।

অতীন কোনো কালেই খেয়ালীর ধার ধারে না। রোগীকে, একটা 'এক্সরে' নিয়ে কোনো হার্ট স্পেশালিষ্টের কাছে যাবার নির্দ্দেশ দিলে।

—এ কী রকম ডাক্তার? রোগই ধরতে পারেন না? আমি যে হৃদয় বেদনায় কাতর!—মাঝে মাঝে বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

কথা ক'টি শেষ করার সঙ্গেই, ফিক্ করে হেসে অতীনের হাতটা খপ করে চেপে ধরে।

অতীন হাত ছিট্‌কে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠে।

কম্পাউণ্ডার ডাক্তার বাবুর এ রকম বেপরদায় চীৎকার কখনও শোনেননি।

"কী হলো স্যার?" বলে ছুটে আসতেই অতীন তরুণীকে দেখিয়ে দিলে।

—ইনি বেরিয়ে গেলে, দরজা-জানালা বন্ধ করে বাড়ী যাও।

গাড়ীতে চেপে বসেই উল্কার বেগে সোজা অতীন মোটর ছুটিয়ে দিলে।

ওদিকে হরনাথের মুখে এখন সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন শোনা যায়। দরবিগলিত ধারায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। আজও তিনি উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমদ্ভগবত গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠে নিমগ্ন—এমন সময় ধড়াস্ করে গাড়ীর দরজা বন্ধের শব্দ শুনেই হকচকিয়ে ফিরে চাইলেন—

—ওরে অতু, এতো সকালে যে? রোজ ফিরতে একটা দুটো হয়। শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ, ভালো। ডাক্তারী ছেড়ে দিলাম বাবা—আমার পোষাবে না।

হরনাথের গীতাপাঠ মাথায় উঠলো! চোখ কপালে তুলে বললেন—হ'ল কী, বলতো? এ রকম 'আপ্‌সেট' তোকে কখনো দেখিনি। ব্যাপার কী?

অতীন খুব সংক্ষেপে, অতি সংযমে, সব ঘটনাটা খুলে বলেই মন্তব্য করলে—

—আমি ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি ওরা এই সব জঘন্য মনোবৃত্তি নিয়ে চেম্বারে আসে!

অতীনের চোখ-মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটছিল।

পুত্রের বলার ভঙ্গীতে, দম-ফাটা হাসির তোড়ে হরনাথের ভুঁড়িটা হেলে-দুলে উঠছিল। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে, উপদেশ-বাণী বর্ষণ করলেন—

ঝোঁকের মাথায় একটা হঠকারিতা করা কি ভাল? ডাক্তারী যদি নাই করবি, তবে এত দিন খেটে-খুটে পাশ করার কী দরকার ছিল? আর তুই ত এ লাইনটা বেছে নিয়েছিলি। এতে টাকাকে টাকাও আসে—আবার দুঃস্থ রোগীদেরও সেবা হয়; তার চেয়ে একটা কাজ কর না কেন?—ঝঞ্ঝাট থাকে না।

—বলুন—

একটা পাকা বর্ষীয়সী নার্স রেখে দে। সে মেয়েদের পরীক্ষা করে তোকে জানালে ট্রিটমেণ্ট করবি। তা' ছাড়া, সংসারে ওরকম দু'-চারটে বদখদ্ ছেলে-মেয়ে থাকে, তাই বলে ডাক্তারী প্রফেসনটা ছেড়ে দিবি? বুদ্ধি বিবেচনা ত' সে কথা বলে না?

—তাই হবে। একটা বুড়ো নার্স রাখবো—সে রিপোর্ট দিলে চিকিৎসা করবো।

হরনাথ কথা বেচে খান। অতীনের নাড়ীটাও তাঁর ভাল জানা আছে। তাই পুত্র যখন পিতার বক্তৃতায় রাজী হলো—হরনাথ আর একটা বড় মামলা জয়ের গৌরব অর্জ্জন করলেন।

অতীন উঠতে যাচ্ছিল—উকীল হরনাথ বাধা দিয়ে যেন কিছুই জানেন না—এই ভাব দেখিয়ে আবার অভিনয় সুরু করলেন—

—হ্যাঁ, ছাখ, আর একটা কথা—তুই যেখানে চাকরী নিয়েছিস, —শক্তি দেবীর একটি মেয়ে আছেন—

—নাম তার রেখা, না কী?

অতীন পিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—তাকে নিশ্চয় দেখেছিস্?

অতীন মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—তোর মা চলে গেলেন—আমারও ডাক এলো বলে! ঐ মেয়ের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয়, আপত্তি আছে কি?

—না—

—শক্তি দেবী এই কিছু দিন আগে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন। ছেলে বিয়ে করবে না বলে ভাগিয়ে দিয়েছি।

আচম্‌কা অতীনের মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো—"ভাগিয়ে দিলেন?"

হাসি ফুটবার আগেই হরনাথ একটা পাকা অভিনেতার মত সেটাকে চেপে দিলেন—

—হ্যাঁ দিয়েছি—তোর মতামত জান্‌তাম কি না! এখন যদি রাজী থাকিস্—আজই খবর পাঠাবো।

—না, আজ নয়—পরে বল্‌বো।

বহু বাঞ্ছিত, বহু তপস্যার প্রতীক্ষিত মুহূর্ত্ত আজ হরনাথের সম্মুখে উপস্থিত। পুত্র স্বয়ং বিয়েতে স্বীকৃতি দিয়েছে—এ কথা স্বকর্ণে শুনেও হরনাথ মোটেই বিস্মিত হন নি। শক্তি দেবীর নির্দ্দেশে ও-বাড়ীর দৈনন্দিন রিপোর্ট ভোম্বলের মারফৎ তিনি পেয়ে থাকেন কি না! তিনি স্থির-নিশ্চয় ছিলেন, এই বিয়ে খণ্ডন করা নিয়তিরও সাধ্য নেই। হরনাথ গড়গড়ার নলে একটা সুখটান দিয়ে অতীনকে বিদায় দিলেন—

—তুই সুখী হ!

তার পর দেরাজের টানা খুলে তাঁর পূর্ব্বদিনের লিখিত একটি গোপনীয় পত্র বের করে পড়লেন—

শক্তি দেবী,

আমার দেওয়া সেই হাজার টাকা ফেরৎ পেলাম। তুমি লিখেছো, অতীন তোমায় বলেছে—"চাকর-মনিবের সম্বন্ধ আর নেই। কাজেই সে কিছুতেই টাকা নেবে না।"—অকাট্য যুক্তি—এর উপরে কথা চলে না, তাই টাকাটা নিলাম। ভগবানের কৃপায় এইবার আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে!

তার পরেই পুনশ্চ দিয়ে লিখ্‌লেন,—

সুসংবাদ দিচ্ছি। অতীন বিয়েতে রাজী! এ খবরটা রেখাকেও বিশেষ করে জানিয়ে দিও। ইতি।

খামের উপর জরুরী চিহ্নিত করে পত্রখানা তখুনি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর চিরন্তন পাঁজি-পুঁথি ঘাঁটতে লাগলেন।

অতীন আজ বড় চঞ্চল—রাশি রাশি এলো-মেলো চিন্তার ভার যেন তার বুকের তলে আশ্রয় নিয়েছে। এমন সময় কুঞ্চিত ললাটে এক জন জ্যোতিষীর শুভাগমন। অনেক মহারথীর প্রশংসাপত্র অতীনকে খুলে দেখালে। অতীন ভাবলে—যাক্, কিছুটা সময় কাটানো যাবে। তাকে ডেকে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

আসুন মহাপ্রভু, ভবিষ্যদ্বাণী করুন। আপনারা ত' কথায় কথায় চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়ে দেন—আমার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি যোগ আছে কি না, একবার দেখুন ত'!

গণৎকার অতীনের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে সুতো-বাঁধা নিকেলের চশমাটি মাথায় গলিয়ে দিলে। গম্ভীর তালে একটি কথা—

"হুঁ"—

—আপনার জন্ম বুঝি বৈশাখে?

—হ্যাঁ—বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ, হিট্‌লার, আমি—শুভ বৈশাখেই ধরায় অবতীর্ণ হ'য়েছি।

—আপনার মা নেই?

—কার কাছে শুন্‌লেন

—ওই হাতের কাছেই। এই রেখায় ব'ল্‌ছে—কোনো ওষুধ পত্তরের কারবার করেন? এ সব ঠিক কি না?

—আমার কাছে মন্তব্য নিয়ে কাজ নেই—যা' বলার, বলে যান্।

গণৎকার সামনের টেবিল থেকে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটা ছক্ কাটলে আর বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বিড় বিড় ক'রে কী সব ব'কে গেল। পুনরায় অতীনের হাত টেনে বল্‌লে—

—এ যে দেখছি শুক্র তুঙ্গী! হুঁ; শুক্রের প্রভাব বেজায় জোর। সিংহ লগ্নে জন্ম—মঙ্গলও দেখা যায় অমঙ্গল না ক'রে তার সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছে। তাই প্রকৃতির জীবন্ত ঐশ্বর্য্য আপনার চার দিকে ঘিরে থাকবে।

—চমৎকার কাব্য! এবার মল্লিনাথের টীকা?

—রসিকতা করছেন?

—রসিকতা? ওর সঙ্গে আমার ভাসুর-ভাদ্দরবৌ সম্পর্ক! বলছি—এবার ভাষ্য সুরু হোক্।

—ভাষ্য আর কী? এই, নারীর দৃষ্টি আপনার ওপর আঠারো আনা। কিন্তু—

গণক ঠাকুর থাম্‌লেন। এ যে দেখছি সপ্তমপতি শনিও আবার বক্রী হয়ে বসে আছেন—সাত পাকের দফা রফা—বিয়েটা ত' আপনার হ'বে না!

ঝট্‌কা মেরে হাত টেনে নেয় অতীন—কণ্ঠে তীব্র ঝাঁঝ—

—আর পণ্ডিতী ফলাতে হবে না। এই দুটো টাকা নিয়ে পথ দেখুন।

গণৎকার এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না—অবাক হয়ে করুণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন।

অতীন ঘড়ির কাঁটা নজরে পড়তেই চমকে ওঠে—এ কী, ছ'টা বাজে! পাঁচটায় যাবার কথা।

বেয়ারা কখন যে কফি দিয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই।—অতীন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠ্‌তে যাবে—আকাশের দিকে চেয়ে দেখে, আষাঢ়ের ঘনঘটা চার দিক ঘিরে ফেলেছে—। কালো মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলক—তার পরই একটা বিরাট শব্দে পৃথিবী যেন আর্ত্তনাদ করে কেঁপে উঠলো—অতীনের বুকে তার ছোঁয়া লাগতেই, সে মুহূর্ত্ত কাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, বিদ্যুৎবেগে মোটর ছেড়ে দিলে।

গীটার বাজনায় রেখা তন্ময়—গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনায় যেন অপূর্ব্ব সুরলোকের সৃষ্টি করে চলেছে। এক একটি কম্পিত

আঘাতে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত ব্যথা যেন ঝরে যায়—অনন্ত বিরহের সুরগুলো মাথা খুঁড়ে যেন কেঁদে লুটিয়ে পড়ে।

পিছনে অপলক চোখে দাঁড়িয়ে অতীন—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। সুরের তীব্র সুরা পান করে বুঝি সে মাতাল হয়ে উঠলো—

—রেখা—!

গীটার থেমে গেল। রেখার চোখে অশ্রুরেখা—ঝরে পড়বার আগেই সে মুছে নিলে। ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি—

—কী, এত দেরী হ'ল যে?—লেট্ প্রেজেণ্ট হ'লেই মাইনে কেটে নেব।

—আমিই কাটা পড়েছি—তখন আর মাইনে! কোথেকে এক গণক ঠাকুর এসে বাগড়া দেবার চেষ্টায় ছিল—

—এখন বুঝি ডাক্তারখানা বন্ধ করে, ঠিকুজীর কারখানা খোলা হয়েছে? তা বেশ, এদিকে আমিও যে গানের কারখানা খুলেছি—তোমায় আজ অনেক—অনেক গান শোনাবো!

—আর ওই গানগুলো আমাদের নতুন জীবনের পাথেয় হবে।

রেখা হারমোনিয়ম টেনে একটার পর একটা গান গেয়ে যায়—অতীন মন্ত্র-মুগ্ধের মত শোনে। গানের একটি শেষ লাইন গাইবার সময় রেখা অনুভব করে, অতীনের একটি সুদীর্ঘ তপ্ত নিঃশ্বাস।

—রেখা—কী? থামলে যে?

তোমার গীটারে, তোমার গানে, আজ এত বুক ভরা কান্না কেন?

—গীটারটা আমার দরদী বন্ধু কি না, তাই।

—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো?

—আমি জীবনের সমস্ত আশা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসি—আর তুমি কঠিন হয়ে দূরে সরে যাও, কী অপরাধ করেছি, বলতে পারো?

রেখা মাথা নীচু করে থাকে।—

কী, চুপ করে রইলে যে? অতীন উঠে রেখার চিবুক স্পর্শ করে বলে—তোমার এই পাতলা ঠোঁটের আড়ালে কত না-বলা-কথা লুকিয়ে আছে—তাকে ভাষা দাও, আজ আমি তোমার কাছে উত্তর চাই।

প্রবল উত্তেজনায় অতীন দু'হাত বাড়িয়ে রেখাকে বুকের কাছে টেনে আনতে চায়—সে অতীনের হাত ছাড়িয়ে বলে ওঠে—বাঃ বেশ তো—। এ সব নাটুকে ভাব শিখলে কোথায়? কলেজে প্লে করতে বুঝি?

—চমৎকার উত্তর! আমার সমস্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে তোমার কাছে ঢেলে দিই, তার বদলে শুধু আঘাত আর আঘাত! আমি ত' বেশ ছিলাম! আমাকে উচ্ছ্বাসী করেছে কে?—আমাকে পাগল করেছে কে?—

—উত্তর দাও।

—জানোই তো আমি উচ্ছ্বাসকে বড় ভয় করি।

—তা তো এখন বলবেই। কিন্তু এই জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার সখ হয়েছিল কেন?

—ও কী কথা! আমরা কি বন্ধু হ'তে পারি না? সেই চোখ নিয়ে দেখ না কেন? আমি যদি নারী না হয়ে পুরুষ হ'তাম?

একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে অতীনের মুখে।

ও সব বাজে কথা ছাড়ো—বল, আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের জন্য দায়ী কে?

রেখা নীরব—বজ্রাহতের মত স্থির!

—জানি, চুপ করে থাকতেই হবে। উত্তর দেবার কিছুই নেই। আমি পৃথিবীর মানুষ—তোমার মত ভাববিলাস আমার নেই। জীবন নিয়ে খেলা করা—

রেখা ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফণা তুলে যেন ফোঁস্ করে উঠলো—

—না, না, তা' নয়। আমার জীবন দিয়ে তার পরিচয় পাবে, আর সেইটেই হবে আমার বড় সাক্ষী।

—তার মানে?—

—স্বামী যে কী, তা জানি না—কিন্তু, তার চেয়েও বড় আসনে তোমায় বসিয়েছি—সেখানে আমার মনের পূজো তুমি চিরদিনই পাবে। সেই হবে শুধু ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা। আমার কামগন্ধহীন ভালবাসাই চির জীবনের সঞ্চয় হয়ে রইলো। এই মূলধন নিয়েই আমি বেঁচে থাকবো।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে রেখা মাথা নীচু করে রইলো। ক্ষণকাল পরে উদাস দৃষ্টি তুলে যেন সে ক্ষমা-ভিক্ষা চায়—আজ আমিও বেশী বলে ফেললাম—না?

উদ্গত অশ্রু বুঝি সে আর গোপন রাখতে পারে না। গলায় আঁচল দিয়ে সে অতীনকে প্রণাম করে।

—তোমার ও-সব "প্লেটনিক লাভ"এর অর্থ বুঝি না। আমি সামাজিক মানুষ—বিয়ে করতে চাই।

—বেশ তো, বিয়ে কর—আমি একটি মেয়েকে জানি—সে ঠিক তোমারই উপযুক্ত।

অতীনের চোখে পৃথিবীর বিস্ময়—সে কেঁপে উঠলো।

—ফাঁসি দিচ্ছ, দাও। কিন্তু, মন দিলাম এক জনকে, বিয়ে করলাম কাঠের পুতুলকে, এটা ঠিক কী রকম নীতি? তা—

বাধা দিয়ে রেখা অতীনকে বলে—বুঝি না—এই তো!—কিন্তু তার আগে কতকগুলো কথা শোনা দরকার—তা হলেই সব বুঝবে।

বোঝাবুঝির পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে রেখা! আমি কালই চলে যাব। কলকাতা আমার কাছে অসহ্য।

রেখা শিউরে উঠলো—চোখে ঘনীভূত অন্ধকার, বুকে অজানা আশঙ্কার স্পন্দন—তাজা রক্ত যেন দু'টি কথা হয়ে ঝরে পড়লো—কোথায় যাবে—?

—আমাদের নন্দনপুর গাঁয়ে—যে ক'টা দিন বাঁচি, গরীবদের দেখা-শোনা করবো—। এ মন্ত্র তোমারি দেওয়া—। ভগবানের কাছে তোমার আনন্দময় জীবন চেয়ে নেবো—তুমি বিয়ে করে সুখী হও।

ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত অতীনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

—ছিঃ, ও কথা শুনলেও পাপ। হিন্দুমেয়ের দুটো বিয়ে হয় না।

—তবে, কেন তুমি আমার জীবনের ধারাকে উল্টে দিলে—?

—তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল, আর সেটা আমাকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

—মানে?

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ইতিহাস বলে রেখা ছেদ টানলে—

অভিনয় করে জয় করার কথাই তোমার বাবা বলেছিলেন। আর সেই অভিনয় করতে গিয়ে আমি নিজেও—না—মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না—না—তা' হয় না'—

—কী হয় না ?

—অভিনয় করে যাকে জয় করা যায়—তাকে বিয়ে করা যায় না। তোমাকে ফিরিয়ে দেবার দুঃখই আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাক্।

বর্ষণ-মুখর রাত্রি। বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা, অতীনের চোখেও অশ্রুর প্লাবন। দূরে একটা বাজ পড়ার শব্দে সে চমকে ওঠে।

রেখার হাত টেনে জড়িয়ে ধ'রে বলে—আর হয় তো দেখা হবে না, তবু দয়া করে আর একবার ভেবে উত্তর দাও—শুধু আর একবার শেষ—

অতীন রুদ্ধবাক্। সমস্ত পৃথিবীর কান্না যেন তার কণ্ঠ রোধ করেছে।

রেখা স্তব্ধ—যেন প্রস্তরীভূত মূর্ত্তি! তার দেহটাকে ভেঙ্গে চুরে যেন একটা বুক-ভাঙ্গা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো।

ওঃ ভগবান—ওগো—

সামলে নিয়ে রেখার কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর বেজে ওঠে।

—না—না—তা' হয় না।

উদ্‌ভ্রান্ত অতীন সর্ব্বহারার মত ছুটে বেরিয়ে গেল—ঝড়ের মত।

পিছনে রেখা চীৎকার করে ডাক দেয়—এই ঝড়-জলে যেও না—ওগো—যেও না—তোমার পায়ে পড়ি—

দূর হতে একটা ক্ষীণ উত্তর ভেসে এলো—না—না, তা' হয় না!

শেষ

সর্ব্ব-বঙ্গ মুসলিম্ ছাত্র-সম্মিলনীর প্রতি সম্বেদন

আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েচে। তাই অবুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গ'ড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে-ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভচেষ্টাও খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্ব্বনেশে, সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে-শিক্ষা লাভ করচি, ভাগ্য-দোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হ'য়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তা'র নিঃশ্বাস রোধ ক'রতে প্রবৃত্ত, এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্দ্ধক্য যাবার সময় হ'ল। তা'র প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্য্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখ পাই, মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হ'য়ে যাক্ নিঃশেষে ভস্মসাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে, তখন তা'র দুঃখ অতি কঠোর,—এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি, এই দুঃসহ পরিচয়ের কাল যেন এখনি শেষ হয়, দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্ব জগতের কাছে বার-বার যেন উপহসিত না হই।

আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক্ তরুণদের নবজীবনের মধ্যে। আচার-ভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্ম্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হ'য়ে তা'রা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নব-যুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক্। যে দুর্ব্বল সে-ই ক্ষমা ক'রতে পারে না, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত ক'রে দিক্, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্ব্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহুবল্লভা

রাণু ভৌমিক

—"না, না।"

—"কেন নয় ?"

—"না, না, না"—অবিরত মাথা নাড়তে থাকে সে।

একটু যেন থমকে যায় সুদাম। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকায় শ্রীমতীর মুখের দিকে। কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কি ওর মনে ? সন্ধানী চোখও কিন্তু কিছু আবিষ্কার করতে পারে না। ঠিক তেমনি—মুখের প্রতি রেখায় রেখায় প্রেমের খেলা। তবে, প্রেম যাকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে অপর কোন বৃত্তি আছে যা তাকে হটিয়ে দেবে। এগিয়ে আসে সে।

···দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে শ্রীমতী। সুদামের মনে হয় ও ত' আবরণ নয় অপসারণ। শ্রীমতী যেন বন্ধ করে দিল জীবনের কোন অধ্যায়। হাত তো নয়, শীতল কঠিন পাথর। কিন্তু, কেন ?—যতটা এগিয়েছিল তার থেকে অনেক-অনেক পিছিয়ে একটা গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় সে।

নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে হয়। তাই, বোধ হয় নিজের অধিকার-বোধটুকুকে ঝালাই করে নেবার আশায় বলে "শ্রী, তুমি আমাকে ভালবাসো না ?'

হাত সরিয়ে ওর দিকে তাকায় শ্রীমতী। তাকাতে পারে কি ? হাতই কি ছিল একমাত্র বাধা ? সে ত সহজেই সরান যায় কিন্তু চোখের জলের প্রবাহকে সরাবে কে ? তার মনে প্রেম নেই ? যে উত্তাপ সুদামের মনকে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে—সেই উত্তাপই যে জল এনে দিয়েছে তার চোখে। কার তীব্রতা বেশী ?

—"তোমাকে খুব ভালবাসি" বলেই—অশ্রুভেজা কণ্ঠে শ্রীমতী বলে—"তোমাকে ভালবাসার অধিকার দিতে পারি না ?—কেমন, এই না"—সুদাম ওর কথা শেষ করে দেয়।

বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্রে সে যেন ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে চায় শ্রীমতীর মনকে। প্রত্যাখ্যানের অপমান, কামনার উগ্রতা, নিরাশার অভিব্যক্তি—সব-কিছু মিলে কিছুক্ষণের জন্য যেন তাকে উন্মত্ত করে তোলে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে।

পাথরের মূর্ত্তির মত অনড় হয়ে বসে থাকে শ্রীমতী। মনে হয়, এ-সব কথা কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি। ওর ঐ মূর্ত্তি সুদামকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। কাউকে অপমান করলে সে যদি উপেক্ষা করে তবে সেই অপমানের নীচতা মনকে বিঁধতে থাকে। পাথরের মধ্যে ফাটল ধরানই চাই। তার জন্য আরও শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন। তাই, সুদাম বলেই চলে—"না, কি সতীত্ব দেখাচ্ছ ? বহুবল্লভা মেয়ে তোমরা—তোমাদের রকমই আলাদা।"

···বহুবল্লভা! রাগের মাথায় বলুক আর যাই বলুক, কথাটা ঠিকই বলেছে সুদাম। আর, এ-কথায় নতুনত্ব কিছু আছে কি ? দিনের আলোর মতই এ সত্য। বিষ্ণু-মন্দিরের দেবদাসী সে! 'বহুবল্লভা নয় ত কি ? দেবতাকে উৎসর্গীকৃত এ দেহ তার। কিন্তু, দেবতা ভোগ করেন কি ? পূজার নৈবেদ্য যেমন দেবতা প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করেন না, মানুষের ভোগেই তা লাগে, ঠিক তেমনি নিবেদিতা নারীকেও ভোগ করে এই দুনিয়ার লোকরাই।

কত দিন আগে, কবে, কোন্ যুগে সে এখানে এসেছিল ভেসে। কোথা থেকে এসেছিল তা সে জানে না। এবং যাঁর জানা উচিত, ওর পালক পিতা, তিনিও নীরব সে-বিষয়ে। তাতে লোকদের গল্প-রচনায় সুবিধাই হয়েছে। প্রত্যেকেই এক একটা মন-গড়া কাহিনী প্রচার করে এবং 'বিশ্বস্ত সূত্রে' অবগত বলে দাবী করে। কেউ বলে, ও ওর পালক-পিতা,—মন্দিরের প্রধান পুরোহিতেরই মেয়ে। কেউ বলে, ওর মা ওকে বিক্রী করে দিয়েছিল এবং ওর মালিক ওর প্রতি খুবই অত্যাচার করতো বলে—প্রবীণ পুরোহিত ওকে নিয়ে আসেন। কেউ বলে, মন্দিরে কে ওকে ফেলে দিয়ে যায়। নানা কথা নানা পল্লবিত আকারে চলে। তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কারণ, প্রধান পুরোহিত শুধু তাকে একমাত্র মানুষ করেন নি—শিপ্রা, রেবা, গান্ধারী এদেরও ত তিনিই বড় করে তুলেছেন। ফুলের ঝাড়ের মত একই সাথে বড় হয়ে উঠেছে তারা—কোন দিন মনের কোণে চিন্তাও করেনি কোন বীজ থেকে জন্ম হয়েছে তাদের, বা কে বুনেছে। ফুল যেমন একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে মালীর, ঠিক তেমনি ভাবেই তারা তাকিয়ে থাকতো শঙ্করানন্দের প্রতি—যাকে তারা সকলেই ভয়, ভক্তি করে না, ভালবাসে।

প্রকৃতির যে অলিখিত, অদৃশ্য, অলঙ্ঘ্য নিয়মে সে বড় হয়ে উঠলো ঠিক যেন সেই নিয়মেই দেবদাসী হলো সে। মন্দিরে মানুষ হয়েছে সে—কাজেই শৈশবে সে নৃত্য শিক্ষা করবে। কৈশোরে হবে নর্ত্তকী। এর মধ্যে সম্মতি-অসম্মতির প্রশ্নই আসে না, এ কি নিয়ম না নিগড় ?

অবশ্য, শ্রীমতীকে জিজ্ঞেস করলে সে আদৌ গররাজী হতো না। নৃত্য তার জীবনের চেয়েও বেশী। ও যেন তার মুক্তির স্বরূপ।

উল্কার মত ছুটে চলে যায় সুদাম—আর, সন্ধ্যা-তারার মত স্থির হয়ে বসে থাকে শ্রীমতী। সে কি সুদামের কথায় মর্ম্মাহত হয়েছে ? না—সে কথা দিয়ে, কাজ দিয়ে মানুষকে বিচার করে না—মন দিয়ে করে। সে জানে, কত তীব্র প্রেম, কত গভীর

ঘৃণা, কত বিপুল প্রত্যাশা, কত অসীম নিরাশা, কত করুণ স্নেহ, তীক্ষ্ণ কামনা রয়েছে এই কথা ক'টির পেছনে। সলতে যেমন নিজে জ্বলে তবে হাউইকে জ্বালায়, তেমনি তার বুক জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে তবেই না এই অগ্নিস্রাবী কথা ক'টা বেরিয়েছে। আর প্রেমের প্রতিদানহীনতা শুধু মাত্র আশার নিরাশা নয়, সে যে পুরুষত্বের অপমান।

বেদানার মত লাল পাথরের সিঁড়িতে বসে থাকে শ্রীমতী। ফোঁটা ফোঁটা জল জমতে থাকে চোখে। ওর দুঃখ দেখে সমব্যথায় রাত্রি আরও নিবিড়তর হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। মাঝে মাঝে শোনা যায় সুদীর্ঘ শ্বাস। কে ফেলে? বনবীথি, লতা-পাতা, পশু-পাখী কি? নাচতে নাচতে সে সব ভুলে যেত। তার মনে হতো ছোট এই মন্দির, বিগ্রহ, বনবীথি সবই যেন হারিয়ে গেছে, শুধু জেগে আছে সেই পরম পুরুষের অসীম দৃষ্টি সমস্ত নীলাকাশ ভরে, সেই দৃষ্টি যেন একাগ্র সুন্দর ভাবে বিভোর হয়ে দেখছে তারই নৃত্য।

দিন চলে যায়, নাচে ক্রমে ক্রমে আসে মন্থরতা, সৌন্দর্য্য, যৌবনোল্লাস। তখন এক দিন ওকে নিভৃতে ডেকে পাঠালেন মন্দিরের দ্বিতীয় পুরোহিত পুরন্দম, "আজ তোমার অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হলো।"

শ্রীমতী নত মস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"আজ রাত্রি এক প্রহর গতে তুমি মহারাজের কুঞ্জদুয়ারে গমন করিবে।"

অবাক হয়ে মুখ তোলে শ্রীমতী, বিস্ফারিত ঠোঁট দুটো থেকে তীরের মত কথাটা ছিটকে বেরিয়ে আসে—"কেন?"

বিরক্ত হন পুরন্দম এবং তা গোপন করবার চেষ্টাও তিনি করেন না। "তুমি কি এ বিষয় জ্ঞাত নহ—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়! উদ্ধত না অর্ব্বাচীন? এ দেবদাসীর অর্থ কি? যে ভগবানকে দেহ-মন সকলই সমর্পণ করিয়াছে। রাজা সেই দেবতারই প্রতিভূ, কাজেই তোমার প্রতি পূর্ণ অধিকার তাঁহারই।"

শ্বেত-পাথরের মূর্ত্তির মত রক্তহীন শাদা মুখে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রীমতী। একটু পরে রুদ্ধ স্বরে বলে—"আপনি কি জানেন না, জ্যোতিষী আমার হাত দেখে কি বলেছে?"

"কি?"

"যিনি আমাকে নিবিড়তম ভাবে স্পর্শ করবেন, তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।"

"কেন? তুমি কি বিষকন্যা?"

"না। তবে, আমার এই কররেখা।"

—"ও-সব সত্য নয়। গণনা কি সর্ব্বদাই নির্ভুল? আর, সব জ্যোতিষীও জ্ঞানী নয়।" একটু তিক্ত হেসে আবার বললেন, "বেশ ত, মহারাজের উপরই প্রমাণিত হোক না। আশা করি, কিছু আপত্তি নাই তোমার?"

পুরন্দম চলে যান—আর ছিন্ন লতার মত ঠাকুরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে শ্রীমতী "ওগো প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে বোবা তা আমি জানি, তুমি কি অন্ধ, বধির দুই-ই? নইলে, দেখতে পাও
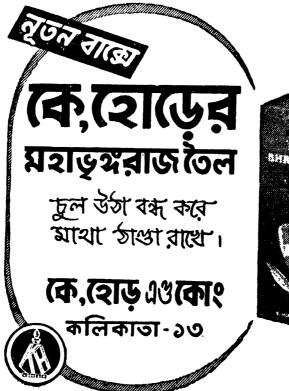
না তোমার প্রেম নিয়ে, তোমারই নামে কি ছিনিমিনি খেলা চলছে? ভক্তিকে লাগাচ্ছে ভোগে। শুনতে কি পাও না, আমাদের অন্তরের হাহাকার? তবে, তাই কর প্রভু! আমার করবেখা সত্য করে দাও। সমস্ত দেহ-মন আমার বেদনার বিষে নীল হয়ে গেছে—যে এ দেহ স্পর্শ করবে সেই যেন হয় ধ্বংস। মূর্ত্তিমতী ধ্বংসরূপিণী করে দাও আমাকে।

পরদিন এই কথাই ভাবছিল শ্রীমতী, "কই, কিছু ত হলো না!" তবে কি গণনা সত্য নয়? কি দুর্ভাগ্য তার?

হঠাৎ দেবদাসী রত্না ছুটে এল। বললো, "শুনেছিস্ কি ব্যাপার?" ও রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

—"কি হলো কি?"—নিরুৎসাহ কণ্ঠে জবাব দিল শ্রীমতী। "—এই মাত্র ঢেটরা পিটে গেল—শুনতে পেলি না? মহারাজ অসুস্থ। ঈশ্বর করুন তিনি রক্ষা পান।"

"ঈশ্বর করুন তিনি রক্ষা না পান। জয় হোক আমার সহজাত শক্তির।" মনে মনে ভাবলো শ্রীমতী।

প্রার্থনা পূর্ণ হলো শ্রীমতীরই। মহারাজ মারা গেলেন। খাবারের সঙ্গে কি মিশে গিয়েছিল। ইদানীন্তন কালে হলে বলতো 'food poisoning'. তখনকার দিনেও তার একটা গালভরা নাম ছিল বই কি! তবে, কথাটা হচ্ছে এই যে, 'নামে কি বা করে। যে নামই যে অসুখকে চাও না কেন মৃত্যু আসবে ঠিক একই ভাবে।' তাই এল—নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পদবিক্ষেপে এসে মহারাজকে তুলে নিয়ে গেল। একটু বিষাক্ত হাসি হাসলো বিজয়ী নারী।

অপর পাঁচ জনের মতই শ্রীমতী খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু, অন্তরে অন্তরে কি এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব শক্তিতে সচেতন হয়ে উঠেছে সে। নিজেকে মনে হয় করালরূপিণী কালী, ধ্বংসের মহাদেবী। লক্ লক্ করছে তার সর্ব্বগ্রাসী জিহ্বা। ঝর ঝর করে রক্তধারা বয়ে পড়ছে দুকস্ দিয়ে। যে তাকে স্পর্শ করবে বিরূপতায়—সেই হবে ধ্বংস।

এর পর কেটেছে অনেক দিন। আরও দু'-একটা ঘটনা ঘটেছে যা দেবদাসীদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে—যা তার বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে শিথিল না করে বরং সুদৃঢ় করেছে। আরও দুটি মৃত্যু তার সংস্কার-কুহেলি-আচ্ছন্ন মনকে ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘে। হয়ত, যে দুটো সম্পূর্ণ কাকতালীয় ব্যাপার—হয়ত তারা এমনিতেই মরণ এড়াতে পারতো না—এ রকম হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে প্রতিদিন। তবু, তাদের মৃত্যু শ্রীমতীর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়ে গেল যে তাদের নির্ম্মম নিয়তি সে-ই।

দিন যত যেতে থাকে ততই যেন নিজেকে নিজে ভয় পেতে থাকে শ্রীমতী। যে শক্তি তাকে অসীম অহমিকার উচ্চাসনে উঠিয়ে দিয়েছিল সেই যেন তাকে আজ মুখ-ভেংচি কাটতে থাকে। মনে হয়, নিকষ-কালো মূর্ত্তিতে মৃত্যুরাজ আর মৃত্যুদূতেরা সভা জমিয়ে বসে আছে তার হৃদয়ে। সমস্ত মন বিষাদময় ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যায়—মনে হয় তার আত্মাকে সে কা'কে দিয়ে দিয়েছে। এই হারানো আত্মাকে কি সে কখনও উদ্ধার করতে পারবে না?

আবার, যখনই আহ্বান আসে ক্লেদাক্তময় ভোগের—তার মন বিদ্রোহী, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে যেন মূর্ত্তিমতী অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ চলতে থাকে কামনার অভিব্যক্তি—সে শুধু ক্ষুব্ধ এক-মনে ভাবতে থাকে "ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক"। অপমানিত আত্মার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে চায় অপমানকারীকে।

* * * *

অসীম অন্ধকারে অকস্মাৎ আলো দেখা দিল—সুদেব এলো তার জীবনে। মরুর বুকে ফুল ফোটে কি? তাও ফোটে তবে, সার্থক হয় না পরিপূর্ণতায়, ঝরে যায় অকালে। বিক্রীত এবং বিকৃত আত্মাকে কি করে ফিরিয়ে আনবে শ্রীমতী পূর্ব্বের সেই কিশোরীর করুণ কমনীয়তায়? পরশমণির পরশে তাও হয়েছিল সম্ভব।

এ-কথা ঠিক যে, তাদের মনই মালা-বদল করেছে প্রথমে। এক গুণের পর এসেছে রূপ। তবু, ঝঙ্কারী তারগুলির মত দেহও আসে বই কি? দেহ-মন একসঙ্গে মিলিত হলে তবেই না সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ! যতক্ষণ, ধরণী আর আকাশ আলাদা থাকে ততক্ষণই তাদের চলে ঘাত-প্রতিঘাত আর বেদনার হাহাকার। মিলিত হলে হয় সৃষ্টি।

সেই দেহ-ই আজ চাইছে সুদেব। শ্রীমতীও কি চায় না? তার সমস্ত মন, সমগ্র দেহ যে উন্মুখ হয়ে আছে নিবেদিত হবার জন্য। কিন্তু···কিন্তু···কি করে হবে? বিচিত্ররূপিণী খোলসের মধ্যে সে যে বিষ-খণ্ড! না, না, না—দয়িতকে সে হারাতে পারবে না। সে নিজে কি করে হবে ওরই কালান্তক যম? সুদেব তাকে ভুল বুঝবে—তা বুঝুক।

দু'টো শুকতারা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আকাশের একটি শুকতারার দিকে। চোখ তার অশ্রুহীন, হৃদয় কামনাহীন। সুখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ, ক্রোধ-অহঙ্কার, সবই যেন সে নিঃশব্দে, নিঃশেষে নিবেদন করে দিল, ভাগ্যবিধাতার চরণ-তলে।

চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। এ নিদ্রা কি মৃত্যুরই দোসর? আসুক, আসুক সেই সদা সন্তাপহারী নিদ্রা, ভুলিয়ে দিক তাকে সব কিছু।

সেই আধ-জাগরণ তন্দ্রার মধ্যে কার পদধ্বনি যেন বাজতে থাকে!

সে কি আগমনের না প্রত্যাবর্ত্তনের?

হোলী খেলা

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মজুমদার

মাধব এলো মাধব মাসে খেলিতে হোলী গোপীর পাশে।
ফাগুনে এ কি আগুন জ্বালা,
দহি' না দহে গোপীরে কালা,
এ ভালবাসা পরাণঢালা পরাণনাথে সে ভালবাসে।

যে রঙে রাঙা হয়েছ তুমি, সে রঙে রাঙাও ভারতভূমি!
সে রঙে ভরি' হে পিচকারী
খেলিব হোলী সাথে সবারি—
ক্ষতি কি তাহে জিতি হারি—সে সুধাধারা প্রীতি-পিয়াসে
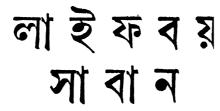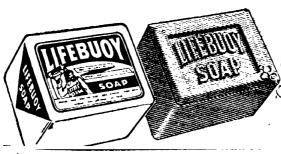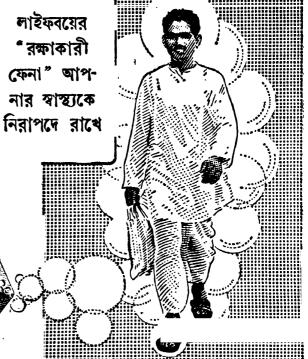
অজিতকৃষ্ণ বসু

তেতলার ফ্ল্যাটের ছোট স্নান-ঘরে পাম্প করে তোলা জলে স্নান করছে সানন্দা সান্যাল। অবগাহন নয়, ছোট জলাধার থেকে ছোট্ট মগে জল তুলে নিয়ে মাথায় গায় ঢালা, হিসেব করে করে। হায়, কোথায় সেই পুকুরের অকুণ্ঠ অজস্রতা, কোথায় সেই নদীর অন্তহীন স্রোত? অসীম আকাশের নীচে খোলা হাওয়ায় সাঁতার-স্নানের স্মৃতি ভুলতে পেরেছে কি সানন্দা? পদ্মাপারের অশান্ত মেয়ে নির্মম ইতিহাসের দুরন্ত ধাক্কায় গঙ্গার ধারে মহানগরীতে ছিটকে এসে তেতলার এক 'স্নান-ঘর' নামা খুপ্‌রিতে ছোট্ট মগের জল ঢেলে ঢেলে কাক-স্নানের অভিনয় করছে। ওপরে তাকালে দৃষ্টি ঠেকে যায় নীচু ছাতে। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যায় এক টুকরো আকাশ। জানালার তিন-সিকি-ভাগ-ঢাকা পুরু কাপড়ের পর্দার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে গা ধুতে হয় বলে সেই টুকরো আকাশেরও বড় এক টুকরো বাদ পড়ে যায় সানন্দার চোখের আওতা থেকে।

এদিকে আমি প্রতীক্ষা করছি বৃদ্ধ সোমনাথ সান্যালের পাশে। মেয়ে ফিরেছে বাড়ীতে, এবার মেয়েরই কথা কইবার পালা, এই ভেবেই বোধ করি নীরব রয়েছেন সোমনাথ, অথবা হয়তো কিছু ভাবছেন। নীচে রাস্তার ধারে লছমিপ্রসাদের পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানের রেডিওতে কে যেন কাঁদ-কাঁদ সুরে আধুনিক গান গেয়ে বোঝাতে চাইছেন, প্রেম যদি অপরাধ হয় তাহলে তিনি দ্বীপান্তরের আসামী। সঙ্গে কে এক জন মাঝে মাঝে টিপ্‌ টিপ করে তবলা-সঙ্গতের ভাণ করছে।

আর তুমি এ সময় কোথায় কোথায় কিরণ ঢালছো হে দিবাকর? আর কোথায় কোথায় ঢাকা পড়েছো মেঘের ওপরে? কত জল-জাহাজ ভাসছে প্রশান্ত, অতলান্তিক, আরো কত সাগরে। কত আকাশে উড়ছে উড়ো-জাহাজ! কি করছে এখন চিয়াং কাই শেক, চার্চিল, ম্যালেনকভ, আইসেন্‌হাওয়ার, আইন্‌ষ্টাইন, ইহুদী মেনুহিন, রাজাগোপালাচারী, মাও-সে-তুং, দালাই লামা, ভাটিকানের পোপ আর কুস্তীগীর দারা সিং? কত নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে নেপথ্যে, খবরের কাগজের পাতায় যার খবর অন্ততঃ আড়াই বছরের ভেতর মিলবে না, আর পুরো খবর পৃথিবীর আলো দেখবে না কোনো দিন। হে অদৃশ্য, অদৃষ্ট, রহস্যময় নেপথ্য, তোমাকে নমস্কার! বিরাট তোমার ধামা, তার তলায় কত কি যে চাপা পড়ে থাকে কোথায় মিলবে তার হিসেব?

প্রেমের কবিতা লিখছে কত কবি, আর কত প্রেমিক কবিতা লিখে সময় নষ্ট না করে প্রেম করছে। কত চালে মেশানো হচ্ছে কাঁকর, কত ময়দায় কত ধুলো-করা সাদা পাথর, কত মধুতে 'রিফাইন্‌' করা ঝোলাগুড়। কত কাঁচা গল্প-লিখিয়ে মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রের জন্ত কোমর বেঁধে গা-ঘিন্‌ঘিন্‌-করানো নোংরা গল্প লিখছে, চট করে ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ, বালজাক্‌ বা এমিল জোলা'র মতো নাম কিনবে আশা করে। কত প্রসন্ন সভাপতি আসন্ন সভায় অভিভাষণ দিতে হবে বলে মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে অতিভাষণ রচনায় প্রমত্ত। ইথার তরঙ্গে তরঙ্গে কত বেতারী প্রোপাগাণ্ডা। স্নান-ঘরে ছোট্ট মগে তুলে তুলে গায়ে জল ঢালছে অল্প অল্প করে সানন্দা সান্যাল, আর সেই সঙ্গে অনন্ত বিশ্বে ঘটছে অগুণতি ঘটনা, রটছে অসংখ্য রটনা লাখো লাখো চিত্রগুপ্ত যা খাতায় লিখে কুলোতে পারে না······স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে এলো সানন্দা। এলো-চুলে ক্যান্থারাইডিন তেলের সিক্ত সুরভি, গায়ে চন্দন-সাবানের সুগন্ধ। চরণপদ্ম-যুগলে নেই ঘরোয়া চটির আবরণ। প্রয়োজনও নেই; মোজেইক্‌ করা মোলায়েম মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার, পায়ের তলায় মালিন্যের পরশ লাগায় না। কবির ভাষায় মনে হলো এ যেন এক বল্গাবিহীনা বল্গা-হরিণীর আবির্ভাব, যেন কোন্‌ উল্গা নদী পার হয়ে এসেছে গঙ্গানদীর ধারে। চরণক্ষেপে নেই এক ফোঁটা সরম-বিজড়িত দ্বিধা-বিগলিত ভঙ্গিমার সম্ভাবনা। অথচ অভাব নেই মাধুর্য্যের।

"এই বারে বলুন আপনার কথা ধনপতি বাবু!" স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে সানন্দা। এ যেন তার অনুরোধগন্ধী আদেশ, অথবা আদেশগন্ধী অনুরোধ।

আমি বললেম, "কথাটা হচ্ছে রাহুল রায়কে নিয়ে। আপনার অফিসের সহকর্মী রাহুল রায়।"

"তা আমি জানি ধনপতি বাবু! তাকে নিয়ে কথাটা কি হচ্ছে তাই বলুন।" হেসে বললে কথাটা, কিন্তু অতি সহজ ভঙ্গীতে সে কঠিন হতে জানে বলে মনে হলো।

তার পর তথ্‌খুনি আবার বললে, "ইনফ্লুয়েনজায় পড়বার আগের দিন যে কাজটা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করে রেখে গিয়েছিলেন, সেটা যথোচিত ভাবে সুসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। সে জন্যে চিন্তা করতে মানা করে দেবেন রাহুল বাবুকে।"

আমি বললেম, "রাহুল বাবুর ছুটীর দরখাস্তটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে লক্ষ্য করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাল অফিসে পৌঁছবে। আপনার হাতেই তো পড়বে। কি বলেন?"

সানন্দা বললে, "সে জন্যেও ভাববেন না মোটে। দরখাস্ত'র ব্যাপারটা অফিসের একটি রীতি মাত্র, যাকে বলে 'মিয়ার ফর্‌ম্যালিটি'। চিকিৎসা কি হচ্ছে?"

আমি বললেম, "হোমিওপ্যাথি। বাড়ীওয়ালা দিবাকর দালালের দুহিতা—যিনি আপনাকে ফোন করেছিলেন—নিজেই চিকিৎসা করছেন।"

"উনি ডাক্তার?"

আমি বললেম, "ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়েন। শখের হোমিওপ্যাথ।"

"শখের হোমিওপ্যাথিতে?" বললে সানন্দা। "শখ যত থাকে হোমিওপ্যাথি সব সময় ততটা থাকে না। চিকিৎসার ধাক্কায় রাহুল বাবুর ছুটীর মেয়াদ বেড়ে না গেলে বাঁচি।" বেশ একটু উদ্বেগের সুর কণ্ঠস্বর থেকে সানন্দা গোপন করে রেখেছে। হৃদয়াবেগ হৃদয়ে চেপে রাখবার অদ্ভুত ক্ষমতা সানন্দার!

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, ফৌজদারী উকীলের জেরার মতো "বাঁচেন? আপনি?"

সানন্দা বললে "বাঁচি বই কি। রাহুল বাবু যে ক'দিন না যাবেন, ওঁর কাজগুলো বেশীর ভাগ আমাকেই তো যেমন করে হোক্‌ চালিয়ে নিতে হবে। অফিসের জরুরী কাজ তো আর আটকে থাকতে পারে না।"

গলায় আটকে গেল না স্বর। ছ'চোখ উঠলো না ছল-ছল করে! আশ্চর্য্য মেয়ে সানন্দা! মন ছল-ছল করে উঠলেও চোখকে অনায়াসে পারে ছল-ছল না করিয়ে রাখতে। কিন্তু কতক্ষণ পারবে সানন্দা? কতক্ষণ যদি বা পারে, কত দিন পারবে?

"বাড়ীতে এসেছেন, ভালোই করেছেন ধনপতি বাবু!" বললে সানন্দা, "কিন্তু অফিসে কেন গেলেন না বলুন তো?"

আমি বললেম, "এক নম্বর, অফিস সম্বন্ধে আমার একটা ভীতি আছে সানন্দা দেবী! বিশেষ করে যে অট্টালিকায় ঝাঁকে ঝাঁকে অফিস্‌। তার কাছাকাছি দাঁড়ালেও আমার মনে হয় মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছে। যেমন আপনাদের অফিসের অট্টালিকাটি। ভেতরে কিল্‌বিল্‌ করছে অগুণতি অফিস।

আপনাদের অফিসের মুখোমুখি অফিস্‌ এন্‌-ডি হোড়ের। "তার ওধারে—"

"চেনেন নাকি এন্‌-ডি হোড়কে আপনি?" সানন্দার প্রশ্ন।

"চিনি নে। আপনি?"

"আমিও না।" সানন্দা সান্যাল জবাব দিলে। শুনে মনে হলো এন্‌-ডি হোড়কে চেনে সানন্দা, চিনেও না-চেনার ভাণ করছে। অথবা হয়তো সত্যিই চেনে না। রহস্যময়ী সানন্দা!

"ছ' নম্বর," বললেম আমি, "অফিসের আপনি আর বাড়ীর আপনি-তে যে অনেক তফাৎ সানন্দা দেবী! অফিসে পেতেম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারীকে, বাড়ীতে পেয়েছি আপনাকে।"

হেসে ফেললে সানন্দা সান্যাল। বললে "তাহলে আমাকে পাওয়াটাই আপনার লক্ষ্য বলুন। রাহুল রায় উপলক্ষ্য মাত্র।"

আমি বললেম, "দূর থেকে দেখেছিলেম আপনাকে। দেখেছিলেম রাহুল রায়কে। কাছাকাছি পরিচয় হয়েছে রাহুল রায়ের সঙ্গে। বাকী ছিলেন আপনি। তাই বোধ করি আমার অবচেতন মন আপনার কাছে আমার এই সুযোগকে অবহেলা করতে পারে নি।"

"কিন্তু কাছে এলেই কি কাছে আসা যায় ধনপতি বাবু? অথবা কাছে থাকা মানেই কি কাছে থাকা?"—বললে সানন্দা। চোখে তার রহস্যঘন সুদূর দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরে কিসের আভাস বোঝা গেল না।

পরক্ষণেই যেন সুদূর দৃষ্টি কাছে ফিরে এলো সানন্দার। যেন সম্বিৎহারা ছিল এতক্ষণ, সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে "অফিস-ভীতি আছে আপনার বলছিলেন, কিন্তু কেন বলুন তো? অফিস কি আপনাকে গ্রাস করে ফেলবে ধনপতি বাবু?"

"আফিসের আবহাওয়ায় আমার দম আটকে আসে সানন্দা দেবী! অন্তরাত্মা হাঁফিয়ে ওঠে। মনে হয় বাইবেলের কাহিনীর জোনার মতো তিমি মাছের পেটের তিমিরে সেঁধিয়ে গেছি, হে বিধাতা, কখন এই গহ্বর থেকে বেরিয়ে মুক্ত আকাশের স্বাদ নেবো ফুস্‌ফুস্‌ ভরে?"—বললেম আমি। "অফিসে-অফিসে বছরে শ' তিনেক দিন ঘুরছে দশটা-পাঁচটার ঘানি, আর সেই ঘানির জোয়ালের তলায় কত কাঁধ—কিন্তু থাক্‌ সে কথা সানন্দা দেবী!"

"সে কথা থাক্‌ বা না-ই থাক্‌ ধনপতি বাবু!" বললে সানন্দা, "ঘানি পৃথিবী জুড়ে থাকবেই, শুধু টান্‌বার লোকই বদ্‌লাবে। ঘানি টান্‌বার লোকেরও কোনো দিন অভাব হয় নি, হবেও না। ঘানি-টানিয়েদেরই এক জনের কাছে ঘানির কথাটা তুলে কিন্তু সহৃদয়তার পরিচয় দিলেন না। কাঁধটা যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ ঘানিটাকে ভুলেই থাকা ভালো নয় কি?"

সোমনাথ বাবু এইবার মুখ খুললেন। বললেন, "অবশ্য তলিয়ে যদি দেখ ধনপতি, তাহলে কোনো না কোনো ঘানি সবাইকেই টান্‌তে হয়, ঘানি থেকে কারুর পুরো নিস্তার নেই। তাই বলি, ঘানি টানছি, এইটে না ভেবে নাগর-দোলায় চড়ে ঘুরছি ভেবে নিলে ক্ষতি কি?"

আমি বললেম, "রাহুল রায় বোধ করি তাই ভাবেন। দশটা পাঁচটার কেরাণী, কিন্তু কেরাণীগিরির ঘানি টান্‌ছেন এইটে মনে রাখেন না। অফিসে ওঁকে কেমন দেখেন সানন্দা দেবী?"

"অফিসে কতটুকু আর ওঁকে দেখতে পাই ধনপতি বাবু?"—বললে সানন্দা। মনে হলো করুণ সুরে সে যেন ৺রজনী সেনের গান গাইছে:

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না?"

অফিসে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সেক্রেটারী সানন্দা সান্যাল আর কেরাণী রাহুল রায়ের দুই আসনের মাঝে অনেকখানি

দূরত্ব, অনেক অন্তরাল, তাই হয়তো প্রাণ যতটা চায় চোখ ততটা পায় না।

অথবা হয়তো অফিসে অনেক দেখে রাহুলকে, শুধু আমার কাছেই চেপে যাচ্ছে সানন্দা। অদ্ভুত চাপা মেয়ে!

"তবে যেটুকু দেখি তাতে—"

"তাতে—?"

"মনে হয় অফিসের কাজের রুটীনের ভেতর তিনি শুধু রুটীর আওয়াজই পান না, কাব্যের সুরও শোনেন; কাজের ছন্দে অনুভব করেন কবিতার ছন্দ; জানেন একঘেয়েমির ভেতর বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবার যাদুমন্ত্র। এত বড় কোম্পানীর খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কেরাণী রাহুল বাবু—কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল্‌ ক্লার্ক—সে সব কাজ তাঁকে করতে হয় তাতে জটিলতার অভাব থাকে না, দায়িত্ব যথেষ্ট, ভুলচুকের সম্ভাবনা প্রচুর; এ পদে ভক্ত কবি রামপ্রসাদ বহাল থাকলে প্রতিদিন ডজন খানেক অঘটন ঘটতো। কিন্তু কবি রাহুল রায়ের কেরাণীগিরি প্রায় নিখুঁত বললেই হয়। অঘটন ঘটে না।"

আমি বললেম, "মানে কেরাণীগিরির বাঘ আর কবিত্বের গরু এক সঙ্গে রাহুল রায়ের ঘাটে জল খায়!"

সানন্দা সান্যাল বললে, "ঠিক বলেছেন। ওঁর অমন পাকা কেরাণীগিরি দেখে মিস্‌টার চৌধুরী—আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর—প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান নি, রাহুল রায় কবি। বিশ্বাস করলেন চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে, আর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন রাহুল বাবুর।"

জানি, রাহুলের মাত্র দশটি টাকা মাইনে বাড়িয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী; অমন জগঝম্প বাজিয়ে জাহির করবার মত কিছু নয়। কিন্তু সানন্দার কথার সুর শুনে মনে হয়, যেন দরবারে কোনো নবীন ফেরদৌসীর কবিতা শুনে তাঁকে শিরোপা আর জায়গীর দিয়েছেন শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর, আর সেই কাহিনী শোনাচ্ছে জাহাঙ্গীরের সেক্রেটারী সানন্দা।

শুধালেম, "খুব কাব্যরসিক নাকি শ্রীচৌধুরী?"

সানন্দা বললে, "ঐটি বলা শক্ত। ওঁর সঙ্গে সাহিত্যালোচনার কখনো সুযোগ হয় নি। তাছাড়া"—

"তা ছাড়া কি, সানন্দা দেবী?"

"ও কিছু নয়। এমনি বললুম।" ৺শরৎ বাবুর কোনো কোনো নায়িকার "মানে নেই, এম্নি"-র মতো হেঁয়ালি করে বললে সানন্দা, "রহস্যহীনতাই হয় তো যার একমাত্র রহস্য।"

শুধালেম, "মানুষ হিসেবে কেমন মনে হয় আপনার ভুজঙ্গ চৌধুরীকে?"

হেসে বললে সানন্দা, "এ প্রশ্ন আমাকে করা অবান্তর ধনপতি বাবু! জানেন তো, মনিবের নিন্দা করতে নেই? নেমকহারামি হয়?"

অর্থাৎ কবি ৺ভারতচন্দ্রের ভাষায়:

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জান তো মনিব-নিন্দা নাহি করে নারী?"

বললেম, "আপনার কথার মানে তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, মানুষ ভুজঙ্গ চৌধুরীর পরিচয় দিতে গেলেই তাঁর নিন্দা করতে হবে; তাই নেমকহারামির ভয়েই ও-পথ মাড়াচ্ছেন না?"

সানন্দা বললে, "প্রায় তার উল্টো ধনপতি বাবু! আমার বক্তব্য হচ্ছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর গুণ গাইলে আপনি সন্দেহ করবেন, সে শুধু নুণ খাওয়ার জের; ফলে আমার মিঠে কথাগুলো মিছে কথার সামিল হয়ে মাঠে মারা যাবে।"

অকারণ অরণ্যে রোদন সানন্দার পছন্দ নয়।

হাস্য-পরিহাসের সুরে যদিও কথা কইছে সানন্দা, তবু তার হৃদয়ের কন্দরে কোথায় যেন ব্যথার কাঁটা খচ্‌খচ করছে।

তার পর শুধালে, "কিন্তু কেন আপনার এ কৌতূহল ধনপতি বাবু?"

বললেম, "কৌতূহলের তো কোনো 'কেন' নেই সানন্দা দেবী! কৌতূহল—কৌতূহলই। দূরের জিনিষকে কাছে দেখবার চিরন্তন দুর্নিবার কামনা।"

একটু ভেবে সানন্দা বললে, "দূর থেকে যা দেখেছেন, ভেবেছেন, কাছে এলে দেখবেন তার অনেকখানিই ভুল। আবার কাছে এলেও কিছু কিছু নতুন ভুল তুলে নিয়ে যাবেন মনের ঝুলিতে। কোনো মানুষকেই তো এক দিন দু'দিনে চট্‌ করে চেনা যায় না ধনপতি বাবু, মানুষ চিনবার 'শর্টকার্ট' বা 'মেড ইজি' আজো তৈরী হয়নি। অতি বিচিত্র মানুষের চরিত্র, কোনো বাঁধা ফরমূলার ছাঁচে ফেলে তার যাচাই চলে না। তা ছাড়া, মানুষকে পুরো চেনা হয় তো কোনো দিনই যায় না ধনপতি বাবু!"

অর্থাৎ মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ভুজঙ্গ-চরিত্রের বিশ্লেষণ তার নিজের মনে যা-ই থাক, আমাকে শোনাতে এখন অন্ততঃ রাজী নয় সানন্দা সান্যাল। সুতরাং ফিরে এলেম রাহুল প্রসঙ্গে।

বললেম, "আপনি তো রাহুল রায়ের কবিতা নিশ্চয়ই পড়েছেন। সত্যি বলুন তো কেমন লাগে আপনার?"

"মাঝে-মাঝে ভালোই মনে হয়।" বললে সানন্দা। "কবি-প্রতিভা তাঁর আছে, সেটা অস্বীকার করিনে।"

"আপনার কি মনে হয় না, রাহুল রায়ের প্রতিভা কেরাণীগিরির বন্ধনে পড়ে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে? কেরাণীগিরির খাঁচায় বন্দী তাঁর ভেতরকার কবি-বিহঙ্গ ভালো করে ডানা মেলতে পারছে না?"

"তা আমি মনে করিনে ধনপতি বাবু! বললে সানন্দা বিনা দ্বিধায়। "দাঁড়ে বা খাঁচায় যে পাখী খাসা গান গায়, তাকে দাঁড় বা খাঁচা থেকে উড়িয়ে দিলেই সে খাসা-তর গান গাইবে, এ আশা অবাস্তর। আমি তো এমন দেখেছি নির্ভর-জুড়োনো পাখীর গলা থেকে গানই মুছে গেল, আর সে গাইতেই পারলে না।"

বললেম, "রাহুল রায় যে ঘরে বাস করে তার ভেতর-বাইরের আবহাওয়া মোটেই কবিত্বময় নয়। ঘরটা দিবাকর দালাল মশায়ের গ্যারাজের ওপর একটা ছোট্ট খুপরি, নীচু তার ছাদ। তাছাড়া—"

"কি বলবেন তা আমি বুঝেছি ধনপতি বাবু! আপনি বলতে চান রাহুল রায়ের কবি-প্রতিভা কেরাণীগিরির ঘানি টেনে আর গ্যারাজের ওপর অকাব্যিক আবহাওয়ায় বাস করে নষ্ট হয়ে গেল। ভাবছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী যদি রাহুল রায়কে একখানা চমৎকার ফ্ল্যাটে রেখে অফিসের কাজ থেকে পুরো রেহাই দিয়ে তাঁকে নিয়মিত একটা ভালো অঙ্কের মাসহারা দিয়ে যান, তাহলে বাংলায় কবিতা-সাহিত্যে অনেক মূল্যবান অবদান দিয়ে যাবেন

রাহুল যায়? কিন্তু না। নিশ্চিন্ত আরাম আর নিরুদ্বেগ সচ্ছলতা রাহুল বাবুর কবি-প্রতিভা বিকাশের পক্ষে অনুকূল হতো বলে আমি মনে করি নে। বরং অনাড়ম্বর, অগোছাল, অসচ্ছল, অনভিজাত আবহাওয়াতেই তাঁর ভেতরকার সতিকারের কবি-রূপ গ্রহণ করবে। খোরপোষ দিয়ে কবি হয়তো পোষা যায়, কিন্তু কবি গড়া যায় না ধনপতি বাবু।"

এ কি? এ তো করুণা-কোমল বাঙালী মেয়ের কথা নয়। তাকালেম তার দু'টী আঁখির পানে। দেখলেম কান্তকবির ভাষায়, স্নেহবিহ্বল করুণা ছল ছল—"শিয়রে জাগবার আঁখি নয় তারা। কঠিন, কঠিন, তোমার হৃদয় বড় কঠিন হে সানন্দা।"

মনের পর্দায় সানন্দার পাশে জ্বল্-জ্বল্ করে উঠলো দময়ন্তী দালালের ছবি। কমনীয়তার-চৌবাচ্চায় স্নান করে উঠেছে যেন, কোথাও এক ফোঁটা কঠোরতার আভাসমাত্র নেই! ধনীর সবেধন নীলমণি দুলালী মেয়ে, কিন্তু নাক-উঁচু দম্ভ তো নেই তার এতটুকু? ঠাণ্ডা মেজাজের কোন্ তলায় ঢাকা পড়ে গেছে টাকার গরম। তুচ্ছ গরীব ভাড়াটে বলে হেলা সে করেনি রাহুলকে, বলেনি—ঐ গ্যারাজের ওপরের খুপরিই ওর যথাযোগ্য জায়গা। নিয়ে গেছে ইনফ্লুয়েন্জাচ্ছন্ন রাহুলকে নিজেদের বড়লোকী বাড়ীতে, শুইয়েছে পরম আরামে বড়লোকী পালঙ্ক শয্যায়। পরম যত্নে রাহুলের ইনফ্লুয়েন্জা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে হোমিওপ্যাথির-ঝাড়ন' দিয়ে। রূপের তো তোমার অভাব নেই সানন্দা, তবে দময়ন্তীর ছবির পাশে তোমার ছবি অমন রুক্ষ দেখায় কেন?

আমার মনের প্রশ্ন মন পেতে শুনতে পেলো কি সানন্দা সান্যাল? মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে; সেই হাসির ভাষায় শুনতে পেলেম সানন্দার নীরব জবাব। সে জবাবেও হেঁয়ালির সুর মাখানো। অনেক রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝাপটা সইতে হয়েছে গরীবের উঠোনের যে ফুলকে, বড়লোকের বাড়ীতে ঝড়-ঝাপটার আড়ালে সযত্নে বর্দ্ধিত সৌখীন ফুলের কোমল কমনীয়তা তাতে না থাকলে তাকে ফৌজদারীর আসামী করা চলে না।

কিন্তু না। সানন্দার এই রুক্ষতা, এই কঠোরতা তার অন্তরের রূপ নয়, বাইরের মুখোস মাত্র, এই মুখোসের আড়ালে সানন্দা গোপন রেখেছে তার হৃদয়ের রাহুল-মগ্নতা। তার মন ছুটে গেছে দময়ন্তী দালালের বাড়ীতে রাহুলের রোগশয্যার পাশে, তবু সে অফিসী কায়দায় ভাণ করছে নিস্পৃহ নিরপেক্ষ নির্লিপ্ততার। কিন্তু কোনো এক অসতর্ক আত্মহারা আনমনা মুহূর্তে সরে যাবে তোমার অভিনয়ের যবনিকা জানি গো জানি সানন্দা, তখন তো ধরা না পড়ে পারবে না।

হঠাৎ কথা কইবার ভঙ্গী বদলে গেল সানন্দা সান্যালের। ওস্তাদী গানের আসরে সানন্দা বাঈ এতক্ষণ যেন বিলম্বিত লয়ের একতালা খেয়াল গাইছিল, হঠাৎ যেন ধরলে দ্রুত খেয়াল জলদ ত্রিতালে। বললে, "এইবারে কাজের কথা হোক্ ধনপতি বাবু। আপনি এসেছেন ভালো হয়েছে; নইলে কাল হয়তো দালাল-বাড়ীতে ফোনই করতে হতো অফিস থেকে। মিসটার চৌধুরী ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, হঠাৎ রাহুল বাবুর ইনফ্লুয়েনজা হয়ে পড়ায়।"

আমি বললেম "পুঁজিবাদী মনিব বেকায়দাগ্রস্ত না হলে গরীব চাকুরের জন্যে উদ্বিগ্ন হবেন কেন?"

সানন্দার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো। বললে, "যেটুকু বললেন সেটুকু প্রায় সত্যি। কিন্তু যেটুকু বললেন না, সেটুকু হচ্ছে: স্বার্থ-বুদ্ধিটা পুঁজিবাদীরই একচেটিয়া নয়। আমি চৌধুরী কোম্পানীতে চাকরী করছি চৌধুরী কোম্পানীকে ধন্য করবার জন্যে নয়, নিজের আর্থিক স্বার্থের জন্যেই। রাহুল বাবুও তাঁর নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেই চাকরী করছেন, ঘরের খেয়ে বা না খেয়ে পরের মোষ তাড়াবার মহান্ উদ্দেশ্য শিরোধার্য্য করে নয়।"

সোমনাথ সান্যাল বললেন, "তোমরা কাজের কথা বলো। আমি ততক্ষণ ছাতে একটু বেড়িয়ে আসি।" বলে ছাতে বেড়াতে চলে গেলেন বৃদ্ধ। একটু পরেই ছাতের ওপর তাঁর ইতস্ততঃ চটি জুতোর ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো মাঝে মাঝে। আর কিছু দিন পর হয়তো সে ধ্বনি আর কোনো দিনই শোনা যাবে না। তখন? সানন্দা ভ্রাতৃহীনা হয়েছে, মাতৃহীনা হয়েছে, পিতৃহীনা হবে। আপন বলতে কে তখন থাকবে তার পৃথিবীতে? হায় সানন্দা!!

কিন্তু সানন্দার মুখের পানে তাকিয়ে তার দু'চোখের আলো দেখে মনে হলো এ মেয়ে অনুকম্পার পাত্রী হবার জন্য পৃথিবীর আলো দেখেনি, এসেছে দুনিয়ার পানে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাতে। এ তো নয় সহকার তরুর আশ্রয় ভিখারিণী মাধবী লতা; বরং এ মাধবী লতায় আছে পপাত-প্রায় সহকার তরুকে টেনে খাড়া রাখবার শক্তি। কিন্তু যত বলই তোমার থাকুক সানন্দা, তুমি যে

মেয়ে; অবলাগিরি একেবারে ঘোচাবে কি করে? ঋষি ৺বঙ্কিম পর্য্যন্ত প্রশ্ন করে গেছেন, "অবলা কেন মা এত বলে?"

শুধালেম, "শ্রীযুত ভুজঙ্গ চৌধুরীর ভারী উদ্বিগ্ন হবার কারণটা কি জানতে পারি? অবশ্য জানাতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

সানন্দা বললে, "মিস্টার চৌধুরী স্নেহ করেন রাহুল রায়কে। বিশেষ করে কবি রাহুলকে তিনি একটু শ্রদ্ধার চোখেও দেখেন। যাকে ভালোবাসা যায় তার হঠাৎ অসুখে উদ্বেগ হওয়াটা কি খুব অদ্ভুত ধনপতি বাবু?"

"আসল কারণটা" আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভাবলেম, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।"

"তাছাড়া" বললে সানন্দা, "চৌধুরী কোম্পানীর একটা নতুন পরিকল্পনা চালু হতে যাচ্ছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিসটার চৌধুরী এই পরিকল্পনার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে একবার পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়াটাকে রাহুল বাবুর সঙ্গে বসে আগাগোড়া ভালো করে দেখে নিতে চান। অবশ্য গোপনে, কোম্পানীর আর কাউকে না জানিয়ে। কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ককে 'কনফিডেনশিয়ালি' তন্ন তন্ন করে না দেখিয়ে চট করে এত বড় পরিকল্পনার ঝুঁকি নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।"

আমি বললেম "আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!"

সানন্দা বললে, "রাহুল রায়কে গভীর ভাবে জানলে আশ্চর্য্যও বলতেন না, অদ্ভুতও বলতেন না, ধনপতি বাবু! এর আগে যে পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিলেন মিষ্টার চৌধুরী তার ভেতর গলদ ছিলো, আর সেই গলদের দিকে চৌধুরীর নজরও ঘুরিয়েছিলেন রাহুল রায়। কিন্তু রাহুলের সেই হুঁশিয়ারিকে হেসে উড়িয়ে দিলেন চৌধুরী কবিত্ব-স্বপ্ন বিলাসী কেরাণীর খামখেয়াল বলে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, কবি রাহুলের কথাই ঠিক, সময় মতো তার হুঁশিয়ারি শুনে সেই অনুসারে পরিকল্পনাটা শুধরে নিলে কোম্পানীর হাজার পঞ্চাশেক টাকা লোকসান বেঁচে যেতো।"

"হাজার পঞ্চাশেক টাকা লোকসান! উঃ!......"

"টাকাটা চৌধুরীর কাছে তুচ্ছ ধনপতি বাবু!" বললে সানন্দা। "অনেক লাখ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও তাঁর কিছু যায়-আসে না। তাঁর আসল লোকসান হয়েছিল প্রেসটিজের। চৌধুরী ধুলো মুঠো করে ধরলে সে ধুলো সোনা যদি না হয় তো চৌধুরীর মান থাকে কোথায়? তাঁরই হাতে পঞ্চাশ হাজার লোকসান হয়ে যাওয়ায় তাঁর মাথা অনেক দিন হেঁট হয়ে ছিলো। পুনরাবৃত্তি চান না সেই ধরণের ইতিহাসের। বলেন রাহুল রায়ের মগজের দাম অনেক হাজার টাকা।"

"তাই রাহুলের মাইনে বেড়েছে দশ টাকা!" বললেম মনে মনে।

"রাহুল বাবু তাড়াতাড়ি পুরো সেরে না উঠলে"—বললে সানন্দা সান্যাল। "এই নতুন পরিকল্পনার বাস্তব রূপদান পিছিয়ে যাবে। তাই রাহুল বাবুর এই হঠাৎ ইনফ্লুয়েন্জায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন মিষ্টার চৌধুরী।"

শুধালেম, "কিন্তু রাহুল বাবু তো কবি, উড়ো কল্পনা দিয়ে যার কারবার। আর তিনি সামান্য মাছিমারা কেরাণী, অনেক ভাগ্যে যার মাইনে বেড়েছে দশটি টাকা। কারবারী পরিকল্পনায় উনি কি বুঝবেন?"

সানন্দা সান্যাল হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে, "খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আপন কেরাণীকে এরকম অনেক পরিকল্পনাই তো খুঁটিয়ে দেখতে হয়। 'মাছিমারা কেরাণী' কথাটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে ধনপতি বাবু, কিন্তু সব কেরাণীই মাছি মারে না।"

অর্থাৎ রাহুল কেরাণী মাছি মারে না। রাহুল কবির কল্পনা-শক্তি জোরালো, বহু ব্যাপক, বহুদূর-প্রসারী। তার দৃষ্টির যাদুতে সে পারে কাছের জিনিষের দূরত্ব দেখতে, আর দূরের জিনিষকে দেখতে পারে কাছে। কাগজের বুকে ড্রিল-দুরন্ত কালো পিঁপড়ের সারির মতো টাইপ-করা গন্ত খসড়া পরিকল্পনা তার কল্পনা-চোখের সামনে কাব্যময় জীবন্ত ছবি হয়ে উঠে। সে ছবি অমন জীবন্ত ভাবে দেখতে পায় বলেই হয়তো পরিকল্পনার অসঙ্গতি আর ভুল-ত্রুটিগুলো তার চোখে খোঁচা দিতে থাকে। আর কবি ৺মাইকেলই তো প্রমাণ করে গেছেন কবি ইচ্ছে করলেই অঙ্ক-ওস্তাদ হতে পারে, কিন্তু অঙ্ক-ওস্তাদ পারে না ইচ্ছে করলেই কবি হতে।

তাহলে দেখছি, রাহুল, ভুজঙ্গ চৌধুরী তোমাকে শুধু সামান্য কেরাণী আর কবি বলেই মনে করে না, তোমার অসামান্যতার আভাস সে টের পেয়েছে। তোমার মগজের দাম সে জানে, কিন্তু দিতে চায় না। মাইনে বাড়িয়েছে মোটে দশ টাকা, তুমি ঐ মৃদু দশ টাকা মাহাত্মোই মশগুল। তোমার মগজ মাটির দরে ভাঙিয়ে মোটা বাজী মারছে পুঁজিপতি, এই মোটা কথাটা ঢুকছে না তোমার শুষ্ক মগজে? এদিকে সানন্দার বাবা সোমনাথ সান্যালের চলন্ত চটির মৃদু আওয়াজ ছাতের ওপরকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। তারি তলায় তোমারি প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত সানন্দা সান্যাল আর আমি।

সানন্দা বললে, "বাবার মুখে শুনেছেন বোধ হয় আমার দাদা ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই?" আমি বললেম "শুনেছি।"

সানন্দা বললে "দাদা বেঁচে থাকলে আপনার বন্ধু হতে পারতেন। সেই কথা মনে করে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? অবশ্য আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়।"

বললেম, "সানন্দা দেবীর অনুরোধ সানন্দে রাখবার চেষ্টা করবো। বলুন।"

"বন্ধুকে দেখতে কাল তো একবার নিশ্চয়ই যাবেন? এম্নিতে না গেলেও অন্তত: আমার অনুরোধে একবার যাবেন। গিয়ে বলবেন তাঁকে, রৌশনলাল যাবে মিষ্টার চৌধুরীর গাড়ী নিয়ে তাঁকে আনতে। তারপর রাহুল বাবু থাকবেন ডাক্তার সেনগুপ্তের নার্সিং-হোমে—সব খরচা মিষ্টার চৌধুরীর, তিনি এটা পছন্দ করছেন না যে, চৌধুরীদের অফিসের কেরাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবে দালালদের বাড়ীতে, যাদের সঙ্গে তার শুধু বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্ক। দালাল নামটা মিষ্টার চৌধুরীর খুব প্রিয় নয়।"

হয়তো তাই। চৌধুরী নামের মাধুর্য্যেও মুগ্ধ নয় দিবাকর দালালের হৃদয়।

"মিষ্টার চৌধুরী গাড়ী আজই পাঠাতে চেয়েছিলেন।" বললে সানন্দা "কিন্তু আমিই পাঠাই নি পাছে গাড়ীকে ফিরে আসতে হয় রাহুল বাবুকে না নিয়ে। আপনি রাহুল বাবুর মত পাকা

করিয়ে অফিসে আমাকে ফোন করে দিলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করবো।"

বাড়ীওয়ালা দিবাকর—রাহুল—মনিব ভুজঙ্গ। চমৎকার টাগ-অব-ওয়ার। খাসা দোটানায় পড়েছো হে রাহুল!

কিন্তু নার্সিং-হোমের নার্সদের ভাড়াটে হাতের বেড়াজালে পড়ে কবি রাহুলের হৃদয়-মৎস্য কি হাঁফিয়ে উঠবে না? নার্সিং-হোমে কোথায় পাবে সে দময়ন্তী দালালের কল্যাণী হাতের আর দরদী হৃদয়ের পরশ? এ প্রশ্ন শুনালেম না সানন্দা সান্যালকে। শুধু মাথা নেড়ে ইসারায় জানালেম চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে চেষ্টাটা হবে গীতার নির্দ্দেশ মতো। ফলাফল সিদ্ধিদাতা গণেশের হাতে।

ছাতের বুকে সোমনাথ সান্যালের চটির মৃদু আওয়াজ মৃদুতর হতে লাগলো, মনে হলো তাঁর ভেতর থেকে কে যেন অশ্রুত ধ্বনিতে বলছে "ম্যায় ভুখা হুঁ। ম্যায় ভুখা হুঁ। ম্যায় ভুখা হুঁ।

আমি বললেম, "আপনাদের বোধ করি নৈশ আহারের সময় হয়ে গেল। কথায় কথায় বড় দেরী করিয়ে দিলুম।"

মৃদু হেসে সানন্দা বললে, "কথা কইবার আর কওয়াবার জন্যেই তো এসেছিলেন ধনপতি বাবু! আর কথায় কথায় দেরী একটু হবেই। সে জন্যে ভাববেন না। বরং আপনি এসে আমায় প্রচুর ভাবনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। জীবনে এই প্রথম দেখলুম আপনাকে, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে না আপনাকে আগে কখনো দেখিনি। তবু মনে হচ্ছে আপনার ওপর ভরসা করা যায়, অনায়াসে অসংকোচে; সে ভরসার মান বাঁচবে আপনার হাতে। বড়লোকের খামখেয়াল, বড়লোকের আত্মমর্য্যাদা বোধ হঠাৎ কি রকম দুরন্ত কায়দায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আপনি হয় তো কিছুটা জানেন ধনপতি বাবু!"

বললেম, "অন্ততঃ আন্দাজ করে নিতে পারি।"

"সুতরাং আপনার কবি-বন্ধুটি যেন মিষ্টার চৌধুরীর প্রস্তাবে অমত করে না বসেন, এইটে আপনাকে দেখতে হবে।" বললে সানন্দা। "প্রত্যাখ্যান পেতে অভ্যস্ত নন বড়লোক কারবারী খেয়ালী ভুজঙ্গ চৌধুরী; আর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা একেবারে অসম্ভবও নয় গরীব কেরাণী-কবি রাহুল রায়ের পক্ষে। রাহুল বাবু যে কত বড় খেয়ালী তা আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু আমি জানি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি?"

"কিছু নয় ধনপতি বাবু! ও আমি এমনি ভাবছিলুম।" বলে একটু ভেবে নিয়ে আবার সানন্দা বললে, "বন্ধুকে চুপি চুপি মত করালেই ভালো হয়; রাহুল বাবু আবার ও-বাড়ীর অনুরোধে পড়ে না যান। ওঁর মতো আপনভোলার পক্ষে অনুরোধ এড়ানো শক্ত হতে পারে। কিন্তু প্রতিভা যার আছে, নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার তার নেই, এ কথাটা তো মানেন?"

"কিন্তু প্রতিভা যার থাকে, নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তো সে-ই পারে সানন্দা দেবী!"

"ওটা খামখেয়ালী তর্কের কথা ধনপতি বাবু, কাজের কথা নয়। এ কথাটাও রাহুল বাবুকে পারেন তো বুঝিয়ে দেবেন যে ওঁদের সঙ্গে ওঁর হচ্ছে শুধু দেবার সম্পর্ক, নেবার নয়। অসুস্থ হয়ে নিজের বোঝা ওদের ওপর চাপানো ওঁর পক্ষে শোভনও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। আর তার কোনো প্রয়োজনও নেই।"

আপন বোঝা রাহুল বাবু তো তো ওঁদের ওপর চাপান নি।" আমি বললেম। "দময়ন্তী দালাল নিজেই এসে সাগ্রহে নিয়ে গেছেন রাহুল রায়কে!"

"সেইটেই ভাবনার কথা ধনপতি বাবু! হোমিওপ্যাথিতে ধনীকন্যার হাত পাকবে গরীবের ছেলের ওপর মকসো করে, সেটা গরীবের ছেলের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাছাড়া কেন নেবেন উনি বড়লোকের দয়া? কেন হবেন ওঁদের কৃপার পাত্র? উনি গরীব, কিন্তু ভিখারী তো নন।"

"কিন্তু ভুজঙ্গ চৌধুরীর গাড়ীতে চড়ে রাহুল বাবু যাবেন শহরের পয়লা নম্বর নার্সিং-হোমে অসুখের মেয়াদ কাটিয়ে আসতে ভুজঙ্গ চৌধুরীরই খরচে, সেটাও কি বড়লোকের দয়া গ্রহণ করা নয়?"

হঠাৎ জ্বলে উঠলো সানন্দার দুটি চোখ। সানন্দা দৃঢ় কণ্ঠে বললে "না, নয়। ভুজঙ্গ চৌধুরী তা জানেন, আমিও সোজা করে তাঁকে বুঝিয়েও দিয়েছি, স্বীকার করিয়ে নিয়েছি। রাহুল বাবুর সেরে ওঠার গরজের চাইতে তাঁকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলার গরজ ভুজঙ্গ চৌধুরীর ঢের বেশী।"

"ভুজঙ্গ চৌধুরী বুঝেছেন আপনার বোঝানো কথা?"

"যেদিন বুঝবেন না সেদিন চৌধুরী কোম্পানী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সানন্দা সান্যালের এক মুহূর্ত্তও দেরী হবে না ধনপতি বাবু!"

সানন্দার গলায় চাণক্যের সুর। দ্বিজু রায়ের নাটকে মন্ত্রী চাণক্য বলেছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে: "কৈফিয়ৎ দেবার পর চাণক্য আর মন্ত্রিত্ব করে না।"

"হয়তো সে দিন খুব বেশী দূরেও নয় ধনপতি বাবু!" বললে সানন্দা। "মানে, আমার এই চাকরী ছেড়ে দেবার দিন। না না। মিস্টার চৌধুরীর ওপর রাগ করে বা বিরক্ত হয়ে নয়, এমনি। মাঝে মাঝে এই আবহাওয়ায় বড় হাঁফিয়ে উঠি। তাছাড়া যে প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে এ চাকরীতে এসেছিলুম সে প্রয়োজন আর নেই।"

চোখের নীরব ভাষায় শুধালেম, "কি সে প্রয়োজন?"

আমার নীরব প্রশ্ন নীরবে শুনে নিয়ে সানন্দা বললে, "স্কুলে মেয়েদের পড়াতুম, ধনপতি বাবু! সোজা চলতি ভাষায় শিক্ষয়িত্রী ছিলুম। তাইতে তিন জনের মোটামুটি কোনো রকমে চলে যেতো। কিন্তু মা পড়লেন অসুখে। দাদাকে হারিয়ে এসে অবধি একটি দিনও হাসেন নি, পুত্রশোক বুকে চেপে রয়েছেন। চোখে জল ঝরান নি; প্রকৃতি তার শোধ নিলে; শিক্ষাব্রতের আয় চিকিৎসার দুরন্ত ব্যয়ের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় হার মেনে গেল। তখন শিক্ষাব্রত ছেড়ে এই চাকরীর শরণ নিতে হলো। মা'র চিকিৎসার ত্রুটি হলো না, কিন্তু মা চলে গেলেন।"

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো সানন্দার। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে মাত্র। দুঃখ-বেদনার ধাক্কায় নুয়ে পড়ার মেয়ে নয় সানন্দা। বললে, "মানুষের মর্মান্তিক দুঃখ এত দেখেছি ধনপতি বাবু, যে নিজের দুঃখ তার তুলনায় অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। তাই বোধ করি, দাদাকে আর মা-কে হারানোর ব্যথাও এমন অনায়াসে সয়ে নিতে পেরেছি। যাক্‌ গে, নিজের কথা বড় বেশী বলে ফেললুম। আপনি কাল ফোন করলেই গাড়ী পাঠিয়ে দেবো রাহুল বাবুকে নিয়ে আসতে। নার্সিং-হোমে উনি নিশ্চিত আরামে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবেন। তাছাড়া আমিও প্রায়ই দেখে আসতে পারবো। কিন্তু দালালদের বাড়ীতে তো

আমার যাওয়া সম্ভব নয়, ধনপতি বাবু! মিষ্টার চৌধুরীরও নয়।"

বললেম, "রাহুল বাবুর কে আছে কে নেই, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তাঁকে করিনি, দুঃখ জাগাতে চাইনি ওর মনে। শুধু শুনেছি আপন জন ওঁর এমন কেউ নেই, অসুখ-বিসুখে যাকে খবর দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি সানন্দা দেবী?"

সানন্দা দেবী বললেন, "একটি মাত্র বৈমাত্রেয় ছোট বোন আছে শুনেছি। মাতৃহারা। বিবাহিতা। রাহুল বাবু মাইনে পেয়েই নিজের খরচা কোনো মতে চালাবার টাকা রেখে বাকীটা দিয়ে আসেন এই বোনের হাতে। তা নইলে বোনের বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না। স্বামী দেবতাটি নাকি একটি পরম নির্বিকার পুরুষ। এই বোনের জন্যেই নিজেকে বাধ্য হয়ে নানা ভাবে বঞ্চিত রাখেন রাহুল বাবু। তা নইলে তিনি মাইনে যা পান তা তাঁর একজনের মোটামুটি ভালো থাকবার জন্যে যথেষ্ট।"

বাঃ! একজনের পক্ষে যথেষ্ট! ভুজঙ্গ চৌধুরী তো তাহলে দেখছি দিলদরিয়া মহাত্মা ব্যক্তি হে সানন্দা! রাহুলকে মাইনে যা দিচ্ছে তা একজনের পক্ষে যথেষ্ট! শুধু একজনের বেশী বলেই ভুজঙ্গী বদান্যতায় কুলোচ্ছে না রাহুলের। বেচারা রাহুল! ভুজঙ্গের দোষ কি?

"শুনেছি বিমাতার কাছ থেকে অনেক দুঃখ পেয়েছেন রাহুল বাবু। স্নেহ কখনো পাননি।" বললে সানন্দা। "কিন্তু সেই বিমাতার কন্যার প্রতি স্নেহের অন্ত নেই রাহুল বাবুর। আমি সেই মেয়েটিকে দেখিনি চোখে, তবু তার কথা ভুলতে পারিনে। আমাকে চৌধুরী কোম্পানীতে বেঁধে রাখবার একটি না দেখা বাঁধন এই মেয়েটি।"

"কি করে বলুন তো?"

"চৌধুরী কোম্পানী ছেড়ে আমি চলে গেলে কবি রাহুল রায়ের পক্ষে হয়তো এ চাকুরী বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কেন হবে না, সে অনেক কথা। কিন্তু ঐ মেয়েটির সংসার নির্ভর করছে রাহুল রায়ের এই চাকুরীর ওপর।"

দুটি চোখ তার সেই মেয়েটির জন্যেই ছল-ছল করে উঠেছে, এই বোঝাবার চেষ্টা করলে সানন্দা সাস্যাল।

শুনতে পেলেম, ছাত থেকে নামতে নামতে সিঁড়ির ওপর চটির ইসারায় বলতে বলতে আসছেন সোমনাথ সান্যাল: "ম্যায় ভুখা হুঁ! ম্যায় ভুখা হুঁ! ম্যায় ভুখা হুঁ!" মনে হলো সিঁড়িগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে; শিহরিত হয়ে উঠছে কাঁচা রাতের মৃদু আলো-মেশানো অন্ধকার!

আমি বললেম, "কথার ফুল অনেক ফুটিয়ে গেলেম সানন্দা দেবী; বড় আনন্দ হলো। বিদায় নিলেম আপনার অনুরোধ মনে গেঁথে নিয়ে; আর জানবেন, আর যাই ভুলি না কেন, অনুরোধ সহজে ভুলিনে। কিন্তু আপনাদের এ ফ্ল্যাটে যে রান্না হয় এমন কোনো লক্ষণ তো চোখে পড়লো না। আপনারা খাবেন কি?"

এই তথ্যটুকু জানবার জন্যে মন আকুলি-বিকুলি করছিলো এতক্ষণ। কেন না, শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, প্রেম, থিয়েটার, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল বাদ দিয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু খাওয়া বাদ দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না—কালচারবাদীরা জড়ো হয়ে মার্কসীয় জড়বাদকে যতো ঠাটাই করুন না কেন।

জবাব দিলে না সানন্দা—দিতে পারলে না জবাব। হৃদয় তার যেন কি উচ্ছ্বাসে কানায় কানায় পুরে উঠেছে। খেয়াল করিনি ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন সোমনাথ সান্যাল। কন্যাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে তার হয়ে তিনিই জবাব দিলেন "রান্নার পাট এ ফ্ল্যাট থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে ধনপতি! আমাদের সব রকম খাবার ব্যবস্থা ও পাশে বাড়ী-অলার ফ্ল্যাটে। আমরা শুধু টাকা দিয়েই খালাস। ভালো ভাবে বাঁচতে হলে চাই সমবায়—যাকে বলে কো-অপারেশন। এ কথা শংকর কত বার বলেছে। কত খরচা কমে যায়, কত অপচয় বন্ধ হয়, কত অমূল্য সময় বেঁচে যায় ভেবে দেখ একবার। কথায় বলে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি—তার ফলে রাজপুতদের অবস্থাটা দেখেছো তো?

বিদায় নিয়ে পথে নেমে ভাবতে লাগলেম, সানন্দা যা শোনালে এতক্ষণ তার কতটুকু সত্যি, কতটা ফাঁকি? যা দেখালে তার কতটুকু মুখ, আর কতটা মুখোস?

পথের ধারে লছমিপ্রসাদের পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানের এক ধারে ঝুলানো নীরব দড়িটির দিকে তাকালেম। তার জ্বলন্ত মুখটা দড়ি বেয়ে ধীরে, অতি ধীরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

পঞ্চাশের উর্দ্ধে

কত বয়স হল আপনার? পঞ্চাশ? আরও কিছু বেশী? তাহলে এখন থেকেই শরীরের যত্ন নিন আপনি। বিশেষ ভাবে যত্ন নিন, নচেৎ•••।

কি করবেন?

মন প্রফুল্ল রাখুন সর্বদা।

যা করবেন সব সময়ই ভাবুন যে তাতে আপনার মঙ্গলই হচ্ছে।

সারা দিনটা ভাল ভাবে কাটাবার চেষ্টা করুন, যাতে করে পরের দিনটাও ভাল ভাবে কেটে যায়।

সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করুন।

খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে-চিবিয়ে খান।

ব্যায়াম করুন খুব অল্প-অল্প করে, কিন্তু নিয়মিত।

গরমে কম জামা পরুন আর শীতে বেশী বেশী জামা।

ছেলেদের সঙ্গে বেশী করে মিশুন।

বয়সের কথা ভুলে যান।

কি করবেন না?

কোনও দিন কখনও ভুলেও কোনও শ্মশানে যাবেন না।

খিদে যথেষ্ট রকম না পেলে খেতে বসবেন না।

ঠাণ্ডা লাগাবেন না।

ট্রাম-বাস চড়বার সময় সতর্ক থাকতে ভুলবেন না।

ভুলেও গোমড়া-মুখো লোকেদের ধারে যাবেন না।

বদ্ধ আবহাওয়ায় কখনও থাকবেন না।

বয়সের কথা চিন্তা করবেন না।

অর্থের কথাও না।

সব সময়ই হাসিটি মুখে লাগিয়ে রাখতে ভুল যেন না হয় আপনার।

লক্ষ লক্ষ লোকের
দৈনিক চাহিদা মেটায়
ব্রুক বণ্ড চা'
বুঝেসুঝে কিনুন
৪ পয়সা বাঁচান!
মনে রাখবেন, ব্রুক বণ্ড চা কিনলে দামের তুলনায় অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন।
তার কারণ কারখানা থেকে দোকানে দোকানে চটপট্ বিলি করা হয় ব'লে ব্রুক বণ্ড চা একেবারে তাজা ত থাকেই, তাছাড়া মোড়কে পুরে সীল ক'রে দেওয়া হয় ব'লে ধুলোবালি কিংবা ভেজাল মিশবার ভয় থাকে না।
Darjeeling
Brooke Bond Tea
Blend
Brooke Bond Tea
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
চা
বেশী লোকে কেনেন!
BB 59 D

শক্তিপদ রাজগুরু

সংবাদটা শুনে একটু চমকে উঠলাম। আজ অবিনাশকে দেখতে না গিয়ে পারলাম না। ট্রামখানা টালিগঞ্জের ব্রীজ পার হয়ে চলেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অবিনাশের মুখখানা, কত দিনের কত স্মৃতির রোমন্থন। আজও সেসব আমার মন থেকে মুছে যায় নি। বার বার মনে পড়ে এমনি শরতের শিশির-ভেজা সকালের আলোয় অবিনাশেরই কথা। মনটা ভেসে যায় মহানগরীর সীমা ছাড়িয়ে দূর পল্লীর বুকে।

...নীল আকাশ জুড়ে রাশীকৃত পেঁজা তুলোর স্তূপের মত শুভ্রমেঘের আনাগোনা, পড়ন্ত সূর্য্যের লাল আভায় জাফরাণী রং-এর ছোঁয়া লেগেছে ওর বুকে। মাঠের খাল-ধারে কাশফুলের অমলিন হাসি, দিগন্তযোড়া ধানক্ষেতের বুকে বাতাসের মৃদুপরশ। দূরে পথের বাঁক থেকে ভেসে আসছে সানাইএ কার আগমনী সুর। গাঁয়ের ছেলেরা আগাম অভ্যর্থনা জানাতে আসে নিবারণের দলকে। অবিনাশ তখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে।

পুজোর চার দিন নিবারণের এখানে বাঁধা বায়না। প্রায় পনের বছর ধরে বাজিয়ে আসছে সে, অবিনাশ প্রথম এখানে আসত, এতটুকু ছেলে বাপের পিছনে পিছনে থাকত সারা দিন, সামনে আসতো না কিছুতেই—আড়াল থেকেই কাঁসী বাজাত। বাড়ীর বৌ-ঝিদের কাছে বিদেয়ী পাওনা আনতে গেলে তারা ঘিরে ফেলত ছোট ছেলেটিকে, জোর করে বসাত। সুরেলা গলায় অবিনাশ গাইত আগমনী কিংবা বিজয়ার গান। গিন্নীমা হাসতেন বৌ-ঝিদের ছেলেমানুসি দেখে, মাঝে মাঝে তিরস্কারের ভাণও করতেন হাসতে হাসতে

—"ও বড় বৌমা বাছাকে আর ধরে রেখো না, নিবারণ ওদিকে হাঁক-ডাক সুরু করেছে।'

অবিনাশ তখন আসর জমিয়ে ফেলেছে। গলা কাঁপিয়ে সুরে গেয়ে চলেছে দুলতে দুলতে

"কৈলাস হতে যবে মর্ত্যে এসেছিনু
পথমধ্যখানে বৈকুণ্ঠ পাইনু..."

সেই অবিনাশ এখন বাবার আড়ালে আর থাকে না, নিজেই রসুনচৌকীর দল করেছে, ওই বাজায় মূল সানাই।

অনেক দিন পর অবিনাশকে দেখে চেনা যায় না, দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, ডোমের ছেলের কঠোর কাঠিন্য ত নাই-ই, সারা দেহে ওর এসেছে একটা সজীবতা, চোখের দৃষ্টিতে শান্ত স্থির ভাব। প্রণাম করে পায়ের ধুলো নেয় কর্ত্তার বাবুদাদার, পাশে দাঁড়িয়ে নিবারণ। বুড়োর নীলাভ আঁখিতারায় বয়সের ছাপ, শরীরের বাঁধুনি শ্লথ হয়ে এসেছে বার্দ্ধক্যের চাপে। একমাত্র আশা-ভরসা ওই অবিনাশই।

"ছেলেবেলা থেকে এদিকে ঝোঁক আছে বাবু, শিক্ষেও করেছে এক-আধটু, এখন আপনাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদ আর ওস্তাদের দয়া।"

পুজো উপলক্ষ্যে যাত্রার আয়োজনও হয়েছে গ্রামের ছেলেদের তরফ থেকে। নাচ-গানের মাষ্টারও এসে গেছে। তিনি নাকি মহা এলেমদার—গুণী লোক। তাঁর প্রতিভার সমন্ধে ইতিমধ্যেই নানা গল্প প্রচলিত হয়ে গেছে।

সপ্তমী পূজার রাত্রে আরতির পর চণ্ডীমণ্ডপে বৈঠক গানের আসর বসেছে, কয়েক জন গাইয়ে এবং মধ্যমণি ওই গানের মাষ্টারও আছেন, তা দিকে ঘিরে বসেছে মাষ্টারের গুণমুগ্ধ ছাত্র দল; একটা বাটিতে করে পোয়াটেক ময়দা ভিজিয়ে পাখোয়াজে লাগানো হচ্ছে ঘন ঘন, নিতু কাকা তবলায় সুর বাঁধতে ব্যস্ত।

মাষ্টার আলাপ করছে পুরিয়া, মুগ্ধশিষ্যদল মাথা নাড়ছে কেউ বা চোখ বুজেই বাহবা দিয়ে উঠছে স্থানে অস্থানে। মাষ্টারও যাত্রাদলের পেশাদার খাম্বাজিগলার ততোধিক কেরামতি করে গাইছেন। তার নীরস কঠোর গলায় পুরিয়ার করুণতম মূর্চ্ছনা... তার শুদ্ধরূপ সূক্ষ্ম কাম কোথায় যেন আতঙ্কে গা-ঢাকা দিয়েছে। উসখুস করছি পালিয়ে আসবার জন্য, হঠাৎ সিঁড়ির নীচে থেকে অবিনাশ বাধা দিয়ে ওঠে।

—"বর্জ্জিতসুর—বার বার আসছে মাষ্টার মশায়। বেসুরো ঠেকছে—"

সকলেই বিস্মিত হয়ে যায়। মাষ্টার গান থামিয়ে চোখ খুলেই সামনে অবিনাশকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

—"সানাই বাজাস বিয়ে ষষ্ঠীপুজোতে তাই বাজাগা, শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর কি জানিস রে?"

প্রভুর চেয়ে পারিষদদল ও পাশ থেকে শত কণ্ঠে আক্রমণ করে অবিনাশকে—ব্যাটা ডোম এসেছেন পুরিয়া শোনাতে। 'পুরিয়া' নাম শুনেছিস কখনও—

কেউ বলে, "বানান কর দিকি পুরিয়া।"

অবিনাশের মুখ-চোখ রাঙ্গা হয়ে গেছে। লজ্জায় মাথা তার নীচু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সে বার হয়ে এল। ওদের গানের আসর আবার সুরু হয়।

বার হয়ে আসছি, দরজার কাছে কার কথা শুনে দাঁড়ালাম। নিবারণ ছেলেকে শাসাচ্ছে—"তু ইসবের কি বুঝিস? কেনে গেলি উনাদের মাঝে। কথা কইতে। মুরুক্ষু মানুষ, চুপ মেরে থাকবি। যা মাপ চেয়ে আয় ওনাদের কাছে।"

অবিনাশ কোন কথা কয় না—অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম ওর চোখ দুটো ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত বিদ্যাকে যেন ব্যর্থ করে দিয়েছে তার জাতিধর্ম আর জীবিকা। তবুও অবিনাশ মাপ চাইতে গেল না—সোজা বাইরেই চলে গেল সে। নিবারণ গজ-গজ করছে।

নারকেল গাছের পাতায় উপচে পড়ছে চাঁদের আলো—সবুজ শিউলী গাছের বুকে অগণিত শাদাফুলের স্তবক—বাতাসে একটা

মিষ্টি নেশার আমেজ; সুরটা ছড়িয়ে পড়েছে দূরে। অজানা ব্যথায় সারা মন বেদনাবিধুর হয়ে ওঠে। অতীতের হারানো প্রিয়ার কান্না যেন ভেসে আসে আকাশে আকাশে। রাতজাগা পাখীর একটি কাকলির সমগ্র রূপ রূপায়িত হয়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে বার হয়ে এলাম ছাদে। ওপাশে দেখি, বাবুদাদাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে চেয়ে। শুভ্র দাড়িতে চাঁদের আলো হিমকণার মত জমে উঠেছে। বলে ওঠেন তিনি।

—"কে বাজাচ্ছে রে? শুদ্ধ বেহাগ···হ্যাঁ"···গুন্ গুন্ করে তিনিও আলাপ করতে থাকেন—নি-সা-গা-মা···বাঃ, তীব্র মা বর্জন করে নিখুঁত বেলাওল ঠাটের বেহাগ···"

সুরের ব্যাকরণ বুঝি না, কাব্য বুঝি কিছুটা, অনুভব করি, তাই বোধ হয় সেই রাত্রির অতি বিচিত্র রহস্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। সে এক বিচিত্র অনুভূতি···বর্ণনা করা যায় না···তন্ময় হয়ে অনুভব করেছিলাম।

নীচে নেমে এলাম দু'জনে। চণ্ডীমণ্ডপের বাইরের চত্বরে, বাঁধানো নিমগাছের নীচে বসে রয়েছে অবিনাশ, দাদাবাবু বিস্মিত হয়ে ওঠেন।

—"তুই বাজাচ্ছিলি?"

অবিনাশ কথা কয় না, মুখ তুলে চাইল মাত্র। তখনও তার চোখে এক সুরময় জগতের নেশা···কি যেন এক বিচিত্র অনুভূতির আবেশ। আজকের সন্ধ্যার অপমানের দুঃখরাত্রির গভীরে সে সুর ক্রন্দসীর বুকে প্রসারিত করেছে।'

বাকী ক'দিন অবিনাশ নিজের পরিচয় দিয়ে গিয়েছিল। মাষ্টার পরদিন তার সানাইএ পুরিয়া আলাপ শুনে নির্বাক্ হয়ে বসেছিল। বাবুদাদা বলে ওঠেন—

—"ডোমের ছেলে তোর রত্নাকর হবে নিবারণ!"

সেবার পুজোর ক'দিন অবিনাশই ভরিয়ে রেখেছিল তার সুরের রেশে। ভোর হত তার সানাইএর জৌনপুরী-ললিত আলাপে, দিনের বাড়ন্ত বেলায় ক্লান্ত রৌদ্রে উদাস সুরে আলাপ করত মূলতানের রূপ, শেষ আলো মুছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসত সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার, দিনের সিঁথি থেকে সিঁদুরের সব দাগকে মুছে দিত—সানাই-এ তখন বাজত, ইমনের ঠাটে কেদারা, বিরহীর বেদনাতুর ক্রন্দনের কাতর বেদনা ধ্বনিত হয়ে উঠত সানাই এর 'বুক' থেকে।

সেদিন অবিনাশের চোখে-মুখে দেখেছিলাম আনন্দের ছায়া, পয়সা নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ। পুজোর পরই আমাদের বাড়ী থেকেই তিন-চার জায়গায় কালীপুজো জগদ্ধাত্রী পুজোতে বায়না হয়ে গেল।

যতই পয়সা আসুক, ওদের জীবনের তন্ত্রীতে কোন অনুভূতিই আসে না। বাইরের জগতে সুর-তাল নিয়ে কারবার করে, কিন্তু ওদের জীবন একেবারে বেসুরো-বেতালা, রোজকারে ক'দিন পর্যন্ত ডোমপাড়া মুখর হয়ে ওঠে; ছোট ছোট নুইয়ে পড়া জীর্ণ চালা থেকে বার হয় মাংস রান্নার মিষ্টি গন্ধ মদের তীব্র ঝাঁঝ, আর গানের টুকরো শব্দ। কয়েকদিন কয়েকটা রাত্রি চলে বেশ, তারপরই আবার সেই দৈন্য দারিদ্র্য, দিন-মজুরীই করতে হয় সময় সময়।

শীতের সকাল। এক ঝলক সোনালী আলো লুটিয়ে পড়েছে ঘাসের বুকে, একটা ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে নিবারণ, ওপাশে তার স্ত্রী কদম সকাল থেকেই চীৎকার সুরু করেছে।

—"চাল বাড়ন্ত, কাঁড় যোগাতে লারবো, যিথান থেকে পারো লিয়ে এসো, লইলে খাড়া উপোস।"

মেজাজটা নিবারণের ভালো নাই, কালই পাকাপাকি হয়ে যেত অবিনাশের বিয়ের। কিন্তু ছেলেই বেঁকে বসেছে বিয়ে করবে না। পাত্রী হিসাবে ফুলী মন্দ কি? না হয় একটু কালো, কিন্তু ডোমের ঘরে তাকে পণ দিত চার কুড়ি টাকা—সবই ভেস্তে দিল অবিনাশ। তাই বুড়ীর চেঁচানিতে নিবারণ গর্জন করে—"বলগা তুর কেলেবর ছোঁড়াটাকো, আমি লারব উসব।"

অবিনাশ সবই বোঝে কিন্তু বিয়ে করতে সে রাজী হয় না। এই পরিবেশ—এই জীবন তার কাছে অসহ্য মনে হয়। এতকাল ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশেছে। দেখেছে আরও অনেক বেশী, এইটুকুই বুঝেছে সে, এ ভাবে বাঁচার কোন মানে হয় না। মায়ের চীৎকারে সেও জবাব দেয়—"এইত সিদিন পাঁচকুড়ি টাকা এনে দিলম গেল কোথায়?"

এর পর মায়ের কথাগুলো আর না শোনাই ভালো, বিশুদ্ধ ভাষায় তা বলা সম্ভব নয়। অবিনাশও ঘর থেকে বার হয়ে আসে, তার মেজাজ খিঁচড়ে উঠেছে, ঘরের এক কোণে বড় হাঁড়াটাতে পচুই মদের তীব্র গন্ধ উঠছে। দমবন্ধ হয়ে আসে তার।

বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে দাঁড়ালো। সকালের হিমেলরোদে ছেয়ে যায় প্রান্তরের বুক, শান্ত প্রকৃতি—ওই নির্জন শালবনের শ্যামলিমার পানে দু' চোখ মেলে কি যেন অসীমের সন্ধান করছে সে।

পড়েল পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে বিনোদ চৌধুরী মুনিষ খুঁজতে এসেছে। ধান-কাটার মরসুম, তিন পহর অবধি ধান কাটলে চার সের ধান আর দু' সের মুড়ি, ছেলে-মেয়ে অনেকেই যায়। নফরা-গোবিন্দ-যদু-নিবারণ সকলেই কাস্তে হাতে করে বার হয়েছে, অবিনাশকে দেখেই বলে ওঠে নিবারণ—"চল, ধানকাটতে যাবি—"

—'না, উ পারবো না।'

বিনোদ চৌধুরী বিস্ময়ে 'হাঁ' করে বলে ওঠে, "সেকিরে, সোমত্ত জোয়ান খাটবিনা, খাবি কি করে? ছেলেকে লবাব করে তুলেছিস লিবে?

নিবারণও কাস্তের উলটো পিঠ দিয়ে কাঁধ চুলকোচ্ছিল, ছেলের জবাবে চটে ওঠে,

—"কেনে যাবি নাই ? বসে বসে খাওয়াবে কে তুকে ?"

বিনোদ বলে ওঠে—"আরে সানাই বাজিয়ে ভারি বাজনদার হয়েছিস যে মানে লাগবে তোর, ভারি ত বাজাস তাই রে তানা, বলি নিবারণ কি কম ওস্তাজ সে যায় ধানকাটতে, ওর মাথা কাটা যাবে।"

নিবারণরা চলে গেছে, চুপ করে সে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে। অনেক দিন আগে এক বার ধান কাটতে গিয়ে হাত কেটেছিল কাস্তেতে, এখনও দাগ আছে। শীতের শিশিরে আঙুলগুলো অসাড় হয়ে আসে, মাজা-কোমর টনটন করে, তার উপর ওই বিনোদের মত লোকের দাঁতখিঁচুনি। না খেয়ে থাকতে হয় সেও ভালো, তবু এমন ভাবে বাঁচতে সে চায় না। মায়ের ডাকে ফিরে চাইল।

—"বড় যে লবাব হইছিস, পাঁচ কুড়ি টাকা দেখাস, খাটতে গেলি না কেনে ? কাড় আর যোগাতে হবে না তোমাদিকে।"

কোন স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, পশুর মত জীবন যাপন করা —এই ঘৃণ্য পরিবেশে কি নিয়ে বাঁচবে সে ? আজ বার বার মনে পড়ে তার ক্ষুদ্র জীবনের আনন্দের দিনগুলোকে। সোনামুখীর বাবুদের বাড়ীতে পেয়েছিল একটা মেডেল, বিষ্ণুপুরে স্বয়ং গোঁসাইজীকে শুনিয়েছে তার বাজনা। রাত্রির স্তিমিত অন্ধকারে সে বাজিয়েছিল 'ছায়ানট', তার জীবনের একটি স্মরণীয় রাত্রি, গোপবাঁদের ননীবাবুর কথাগুলো মনে পড়ে—

—'ডোমের ছেলে তোর রত্নাকর হবে নিবারণ।'

নিবারণ ভুলে গেছে সে কথা, কিন্তু অবিনাশ ভোলেনি। মুগ্ধ জনতার আশীর্বাদ সে সার্থক করে তুলবে। ঘরের মধ্য থেকে বিশ্রী-পচা একটা গন্ধ বার হচ্ছে। ছেঁড়া তালাই-তেলচিটে কাঁথাগুলোতে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য আরশুলা ; নিজের যন্ত্রপাতি ছোট নোতুন সানাইটা নিয়ে বার হয়ে পড়ল নিবারণ। তারপর ? তারপর যেখানে গিয়ে নৌকা ভেড়ে···

মহানগরীর কোলাহল-মুখর বিয়ে-বাড়ীর বাইরে একটা ছোট রেস্তোঁরায় বসে অবিনাশের কথা শুনে চলেছি। দীর্ঘ তিন বছরের পর তার সঙ্গে দেখা। এক বন্ধুর বোনের বিয়ে···সানাই বাজাতে এসেছে অবিনাশ, তার ওস্তাদের সঙ্গে। এবং সে-ই আমাকে আবিষ্কার করেছে।

ভাল করে অবিনাশের দিকে চেয়ে দেখলে বোঝা যাবে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে তার। পরণে পায়জামা, পাঞ্জাবী, রংটা ফর্সা হয়েছে আরও বেশী, চেহারায় এসেছে কৃশতা, চোখদুটোতে একটা দীপ্তি। ঠিকানা দিয়ে বললাম,—"পরে দেখা করো এক দিন।"

দলের সঙ্গে সে চলে গেল, তার ওস্তাদ মুন্নি খাঁও যাবার সময় সেলাম করে গেল আমাকে। দাড়িতে-হাতে মেহেদি রং-এর ছাপ, কানে তুলো ভিজিয়ে আতর লাগান, ঘামে ময়লা হয়ে গেছে। ফুলকাটা বুটিদার পাঞ্জাবী পরনে, বেশ সৌখীন লোক।—'বহুৎ এলেমদার হ্যায় বাবু উ অবিনাশ আপকা দেশওয়ালী !'

কয়েকদিন পর যাচ্ছি হ্যারিসন রোড ধরে। কলাবাগান বস্তীর ওপাশে, একটা বাজনার দোকান থেকে পরিচিত কণ্ঠে ডাক শুনে দাঁড়ালাম। বার হয়ে আসছে অবিনাশ।

আমাকে নিয়ে চলল তার আস্তানায়, নোংরা চুনবালি খসা একটা দোতলা বাড়ী কলাবাগানের ভিতরে, নীচে রাস্তার দু'পাশে ঠেলা গাড়ী···পুরোনো ড্রামের আড়ত, রাস্তার গঙ্গাজলের কলগুলো খোলা, ঘোলা জল বয়ে চলেছে দু'পাশে, কসাই-এর দোকানে শিকে ঝোলান বড় বড় মাংসের দাবনাগুলো রোদে-ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে গেছে ···একটা চিম্‌সে গন্ধে জায়গাটা ভরপুর। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। একখানা সপ্‌ পেতে বসতে দিল।—"এইখানে থাকো তুমি ?"

হাসে সে। বিশ্বাসই করতে পারিনা, অবিনাশ হিন্দুর ছেলে হয়ে এখানে উঠল কি করে ? একটা দেওয়াল-আলমারিতে সারি সারি কয়েকটা বাঁশী, সানাই সাজানো ; তেল-কালি লাগানো কয়েকখানা খাতা। ওস্তাদ মুন্নি খাঁয়ের প্রশংসা তার ধরে না— "বহু সাবেকী ঘরওয়ানা, খানদানী ঘর, জিনিষও আছে উমদা।" মাঝে মাঝে বেশ উর্দ্দ লব্‌জ চালাতে শিখেছে অবিনাশ। জৌনপুরী খাঁ সাহেবের হাতের তালিম পেয়ে এলেমদারও হয়ে উঠেছে।

—"শুনবেন একটু ?"

তার অনুরোধ এড়াতে পারিনা। বহু দিন পর আবার সে আমাকে শোনাতে বসে। অতীতের সেই রাত্রের বেহাগ এখনও ভুলিনি। বিচিত্র পরিবেশে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। আজ আবার শোনাতে বসে সে। নোংরা পরিবেশ, রাস্তার ফেরিওলার ডাক, সব মুছে যায় আমার মন থেকে। সুরের মায়াজালে সৃষ্টি করে সে অন্য জগৎ।

কতক্ষণ বাজিয়েছিল ঠিক খেয়াল করিনি, ঘরের মধ্যে দিনের আলো মুছে গিয়ে আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে ; ধোঁয়া আর ধুলোয়-ঢাকা নগরে আবার ফিরে এলাম। সুরটা থেমে গেছে। চুপ করে বসে অবিনাশ যেন কি ভাবছে।

অবিনাশের হাত সে দিনের চেয়ে অনেক মিঠে হয়ে উঠেছে। তখন শুদ্ধরূপই সে জানতো, কিন্তু রস পরিবেশন করার রীতিটা ঠিক জানত না। আজ তার মাঝে দেখলাম নিপুণ শিল্পীর দরদী মনের নিখুঁত রসবেত্তার নিদর্শন।

হঠাৎ আলোটা জ্বলতে ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। দরজার দিকে চাইতেই বিস্মিত হয়ে গেলাম—ময়লা সালোয়ার পাঞ্জাবী পরণে, বুকে ওড়না নাই, নিটোল পুরুষ্ট যৌবন সর্বাঙ্গে পরশ বুলিয়ে দিয়েছে কোন মায়াকাঠির ? সুর্মাপরা ডাগর দুটো চোখে চকিতের মধ্যে খেলে গেল সরমের আভা। অপ্রস্তুত হয়ে সে বার হয়ে গেল তখুনিই। অবিনাশও আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। সুরটা তখনও আমার মনে ঘোরাফেরা করে। ওর সানাই-এ ঠুংরীর ঢং।

—"পানি ভর রি রে কৌন্‌
আলবেলা কী নারে ঝমাঝম্‌।"

কার চরণের ভীরু মঞ্জির তখনও বাজছে রিণি-রিণি সুরে।

কৌতূহল চেপেই ফিরে এলাম। তবুও মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রদোষ-অন্ধকারে এক ঝিলিক আলোয় দেখা সেই বিদেশিনী···সুর্মাপরা চোখে তার বঙ্কিম সলজ্জ চাহনি।

কয়েক দিনের মধ্যেই আয়োজন করে সংবাদ পাঠালাম অবিনাশকে, সন্ধ্যার দিকে আমার বাড়ীতে এসে পৌচেছে কয়েক

সুরকার সঙ্গীত-পরিচালক এবং কয়েকজন চিত্র-সাংবাদিক বন্ধু। যথাসময়ে অবিনাশও এল।

শাওন সন্ধ্যা। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে বৃষ্টির ধারা, যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। বাইরে-পালানো মন তাড়া খেয়ে এসে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অবিনাশ আলাপ করছে মিয়াকি মল্লার—মুন্নিখাঁয়ের আসল ঘরওয়ানার একটা গৎ। বর্ষার আকাশে সুরটা পথ হারিয়ে অসীমের মাঝে মিলিয়ে যায়। বিলম্বিত থেকে—দ্রুত তালে এসে পড়েছে। টিকারাওলা ও দুন থেকে চৌদুনে বেড়ে চলেছে—এক ঝাঁক ভ্রমর যেন পথ হারিয়ে বন্ধ ঘরে গুমরে মরছে।

ক্লান্ত অবিনাশ থামল, বাইরে বৃষ্টির তখনও একটানা শব্দ। মুগ্ধ নির্বাক শ্রোতার দল বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। মুখ থেকে সানাইটা নামিয়ে পরিষ্কার উর্দ্দকায়দায় মাথা নুইয়ে কুর্নিশ জানায় শ্রোতাদিগে। এক জন সাংবাদিক বন্ধু ছবিও নিলেন কয়েকখানা। এমন পরিবেশে ইতিপূর্বে কখনও আসেনি অবিনাশ। বিয়ে সাদীতে টং এ বসে সানাই বাজিয়েছে, সামান্য কিছু টাকা পেয়েছে, ব্যস!···এই বিদ্যায় যে আরও সমাদর পায়, তা তার হয়ত সঠিক জানা ছিল না।

শিল্পীদের মনে হিংসা বাসা বাঁধে অতি সহজেই। তাই মুন্নি খাঁ প্রথম যে দিন শুনল অবিনাশের এই মহলে সানাই বাজানোর কথা, সে ভাল ভাবে নেয়নি। জানে বাংলার রেকর্ড—রেডিও—ফিলিম মহলে এদেরই হাত, আর অবিনাশ গুণী এবং এদেরই দেশের লোক—সুতরাং পথ পেলেই অবিনাশ বার হয়ে যাবে। তাই মনে মনে গজরায় মুন্নি খাঁ, বিয়ে সাদীর বায়নাতে তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। অবিনাশ বলে—"পেটকা প্রবন্ধ কুছ করণে পড়েগা ওস্তাদজী?"

মুন্নি খাঁ বলে—"এইসা বেসরমী কাম তেরে লিয়ে নেহি।"

···অবিনাশের মাঝে মাঝে রাগ হয়, কি এমন অপরাধ করেছে সে? তার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে পড়ে রয়েছে এখানে। যা রোজগার করে ওস্তাদকেই এনে দেয়, তবুও এমন টিটকারী! বিশেষ করে সানাই-এর পোঁ ধরা ওই কানা রসিদ শেখের কথাগুলো তার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। পালাতো ছেড়ে ছুড়ে কোন দিনই, কিন্তু পারে না ওই পিয়ারীর জন্যই। আজ থেকে নয়, দু'বছর আগে থেকেই সে যেন তাকে কি এক মায়ায় বেঁধে ফেলেছে!

কালো সুর্মাপরা চোখ দুটোতে কারণে অকারণে আসে জল। অবিনাশের এমন সমঝদার শ্রোতা আর নাই। গভীর গহন রাত্রে সানাই শুনে কত রাত্রি কেঁদেছে পিয়ারী,···চুমোয় চুমোয় তার আপেলের মত ঠোঁট রাঙ্গা করে দিয়েছে অবিনাশ, তবু কান্না তার থামেনি।

—"রোতি কেঁও?"

—"ক্যাজানু? দিল ভ্রিফ, রোঁনেই মাংতা।"

সারা হৃদয়ের বেদনা—আনন্দ-শিহরণ, অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে অবিনাশের কোলে।

এমনি করে নেশার ঘোরে কেটে গেছে মাস-বছর। এক মনে সে সেধেছে সানাই, আর পিয়ারীর কালো চোখের তারায় নিজের মুখই বেহুঁস হয়ে দেখে এসেছে। এমনি দিনে সে দেখা পেয়েছিল সমীবাবুর, যে তাকে এনেছিল বাইরের জগতের আহ্বান, পেশাদার গৎ-বাজিয়ে হিসেবে নয়, সৃষ্টিকর্তার সুরকারের পরিচয়-পত্র নিয়ে।

কিছুদিন থেকে পিয়ারী লক্ষ্য করেছে বাবার মনে কোথায় যেন একটা ঝড় উঠছে। হাসিখুসি-ভরা লোকটার মনে কোথায় ঘনিয়ে এসেছে একটা জমাট থমথমে ভাব। তাতে উস্কানি দেয় ওই কানা রসিদ শেখ। অবিনাশ চলে গেলে সেই হবে দলের সানাইদার। তা ছাড়া পিয়ারীর উপরও কেমন যেন দুর্বলতা আছে লোকটার। কারণে অকারণে এখানে আসে—তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে ছুতোয়-নাতায়, কোন দিন বা নিয়ে আসে মাটির ভাঁড়ে করে ফির্নী। অবিনাশকে মোটেই সহ্য করতে পারেনা—ও বিধর্মী কাফের। নেওয়াজ-কল্মা পড়েনি এ জীবনে—'দোজক' ওর বাঁধা ঠাঁই, এ কথাটা বার বার শোনাতে ছাড়ে না।

মুন্নি খাঁ অবিনাশকে আশ্রয় দিয়েছিল, তার বিদ্যা শিখিয়েছিল, ছেলের মতই স্নেহের চোখে দেখত। পিয়ারীর সঙ্গে মেলামেশাতেও বাধা দেয়নি। কিন্তু খবরের কাগজে যে দিন অবিনাশের কথা ছবি বার হয়েছিল, সেই দিন থেকেই কেমন যেন বদলে গেল! মুন্নি খাঁয়ের শিল্পিমনে সে দিন সত্যই আঘাত বেজেছিল। সে কি পেল এ জীবনে? বিচিত্র পোষাক পরে তাকে টং-এর উপর উঠে বাজাতে হয় সেই একই সুর—সিনেমার গান। আর অবিনাশ? ভদ্রসমাজে যায়-আসে, কত আসরেও নাকি বাজাচ্ছে আজ-কাল।

সে দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মুন্নি খাঁ বসে বসে দাড়ি চুমরাচ্ছে, পিয়ারী বসে রয়েছে ওপাশে। সিরাজুদ্দীনের দোকান থেকে চোঙ্গওয়ালা গ্রামোফোনটা এনে রেকর্ড বাজাচ্ছে অবিনাশ। একখানা রেকর্ড হঠাৎ বেজে উঠতেই খাঁ-সাহেব সোজা হয়ে বসে, অতি পরিচিত সুর, তারই ঘরওয়ানা—মধুকানের জলদ তান!

—"ক্যা, ইয়ে, সুর—?"

অবিনাশ মাথা নামিয়ে সলজ্জভাবে বলে,—"আমার প্রথম রেকর্ড ওস্তাদজী।"

—"তেরে নই রেকর্ড—শোভানাল্লা!" খানিকক্ষণ চুপ করে বসে কি যেন ভাবছে মুন্নি খাঁ। পিয়ারী হাতের কায ফেলে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে অবিনাশের দিকে। এত দিন রেকর্ডের গান-বাজনা শুনেছে, কিন্তু যারা বাজায়, গায়, তাদের কাউকেই দেখেনি।
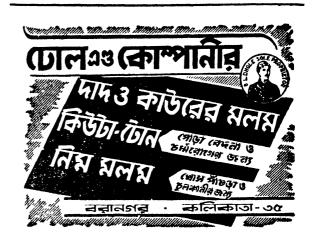
তাদেরই এক জন ওই অবিনাশ, তারই পেয়ারের অবিনাশ! দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আসনাই করতে ইচ্ছে জাগে। আজ অবিনাশকে দেখে মনে হয়, কত খুবসুরৎ। বার বার দেখেও আশ মেটে না।

মুন্নি খাঁ উঠে বার হয়ে গেল, সারা মনে কেমন যেন দুর্বার ঝড় উঠেছে তার, আজ অবিনাশের কাছে কত ছোট মনে হয় নিজেকে।

পিয়ারী কত বার যে বাজিয়েছে রেকর্ডখানা, তার ঠিক নাই। সন্ধ্যা বেলাতেই বাজাচ্ছে—খাঁ-সাহেবের চীৎকারে থেমে গেল সে। গর্জন করছে মুন্নি খাঁ—"বস্ কর; নেহি ত সব কুছ হিঁয়াসে নীচু ফেঁক্ দুঙ্গা।"

পিয়ারীও বাবাকে এমন ধৈর্য্য হারাতে দেখেনি।

রাতের স্তিমেল আকাশে ফিকে চাঁদের আলো বড় মসজিদের মিনারের আড়ালে উঁকি মারছে, সহর নিস্তব্ধ। অবিনাশ ছাদের এক কোণে সাধছে দরবারী কানাড়ার একটা গৎ। পাশেই পিয়ারী তার মাথা অবিনাশের কোলে, হঠাৎ তার হাত থেকে বাঁশীটা নামিয়ে নিয়ে হাতখানাকে নিজের দিকে টেনে নেয় পিয়ারী।

—"ছাড়"—

—"নেহি"—পিয়ারীর কণ্ঠে মাদকতার সুর।

ওড়নাখানা নীচে পড়ে গেছে। বুকের বাঁধনও শিথিল হয়ে গেছে তার। এক ফালি চাঁদের আলোর কি যেন এক রহস্য রচনা ওকে কেন্দ্র করে, অবিনাশের চোখে নেশার আমেজ। বলে ওঠে পিয়ারী,—

"আব্বাজী তুম্ সে বহুৎ নারাজ কেঁউ হুয়ে?"

মুন্নি খাঁয়ের অসন্তোষের কারণ কিছুটা অনুমান করে অবিনাশ, কিন্তু বলা যায় না, হাজার হোক ওস্তাদ—পিতৃতুল্য।

তবু তাই-ই হয়। ক'দিন পর বৈকালের দিকে সিরাজুদ্দিনের কাফিখানায় খাঁসাহেব, রসিদ, আরও অনেকে খুসগল্প করছে, রেডিওটাতে চলেছে একটা হিন্দী গান, হঠাৎ ঘোষকের কণ্ঠে অবিনাশের নাম শুনে একটু চমকে ওঠে সকলেই, হ্যাঁ অবিনাশই সানাই বাজাচ্ছে। বিস্মিত হয়ে সকলেই কাফিখানায় একটা প্রশংসার গুঞ্জন ধ্বনি। কাণা রসিদ বলে ওঠে, "আরে রেডিও ছোড় ইয়ার—উ সমঝদারকা আস্তানা হ্যায় থোড়াই, খটমলকা আস্তানা আউর মচ্ছর কা ঠিকানা!—গোর্খামার দে।"

কিন্তু মুন্নি, সহজে ভুলতে পারেনা। ধীরে ধীরে তারই সামনে তারই খেয়ে দেয়ে তারই শিক্ষায় এক জন বড় হয়ে উঠবে, আর সে চিরকালই থাকবে এই নরকে পড়ে? ধারালো ফলার মত সানাইএর সুরটা যেন তার মনের অন্তঃস্থলকে চিরে রক্তাপ্লুত করে দিচ্ছে। নিঝুম হয়ে বসে থাকে সে।

পিয়ারীর সারা মনে তেমনি এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা। সময় এবং দিন তার ঠিকই মনে ছিল, রেডিও-ষ্টেশনে যাবার সময় তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে অবিনাশ। অনেক আগে থেকেই পাশের বাড়ীর রেডিওর সামনে বসে ছিল সে।

•••কোথা থেকে কেমন করে নীরব যন্ত্র মুখর করে সুরটা আসছে, জানেনা সে ত অবিনাশ কোথায় কোন সুদূরে বসে বাজাচ্ছে—তবু তাকে চোখের সামনে দেখে পিয়ারী। সেই অস্পষ্ট চাঁদনী রাতের মধুমিলন স্বপ্ন আজও মুছে যায়নি তার মন থেকে। প্রথম তাকেই শুনিয়েছিল সে এই সুর•••আজও কেমন যেন মাতোয়ালা হয়ে গেছে পিয়ারী।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মুন্নি খাঁ চুপ করে বসে রয়েছে। রসিদ বলে ওঠে—"কাফেরকো ভাঙ্গা দেঙ্গে নেহি তো—"হাতের ইসারায় আরও সাংঘাতিক কিছু বোঝাতে চায় কানা শেখ। মুরগী, ছাগল, বড় জানোয়ার সেবার শোণপুরের মেলায় দাঙ্গাতে মানুষের তাজা খুনেও ছোরা রাঙ্গিয়ে তুলেছে, আজও যেন হাতটা নিসপিস্ করে। কিন্তু খাঁ সাহেব শিউরে ওঠে,—"নেহি খবরদার।"

দোকান থেকে বার হয়ে এল খাঁ সাহেব। শিল্পী সে খানদানী ঘরওয়ানা, তার হাত সাকরেদের খুনে রাঙ্গা করলে সে হাতে আর যন্ত্র ছুঁতে পারবে না, দোজকে'ও ঠাঁই হবে না তার। মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। অবিনাশ ত তারই সাকরেদ, সে বেঁচে থাকলে তারই ঘর বেঁচে থাকবে। তবুও মনের জ্বালা কমে না, চোখের সামনে ওকে দেখতে পারেনা—সহ্য করতে পারেনা।

পিয়ারী আজ তৈরী করেছে মাংসের কিমা দিয়ে বিরিয়ানী, শিককাবাব আর মুর্গীর কোর্মা। সাজপোশাকেও একটু বদলেছে, লাল সাটিনের সালোয়ার, বুটিদার ওড়নার নীচে ফিকে চাঁপাবর্ণ রং-এর মলমলের পাঞ্জাবী—পাতলা আভরণ ভেদ করে বার হয়ে আসছে তার উদগ্র যৌবন।

অবিনাশকে ঢুকতে দেখেই এগিয়ে আসে পিয়ারী, মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে অবিনাশ, চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরে, অস্পষ্ট আলোয় দেখে তার কম্পিত আঁখিতারায় আধবোজা চাহনি। বুকের মধ্যে টেনে নেয় তাকে, পিয়ারী যেন ডুবে যাচ্ছে কোন নীল সমুদ্রের অতলে, চোখের সামনে একটা নীলাভ দীপ্তি•••সারা দেহ অসাড়-স্থির হয়ে আসে, বুকের স্পন্দনও যেন তার থেমে গেছে!

হঠাৎ কিসের একটা শব্দ, কাদের পদক্ষেপ সহসা থেমে গেছে, চোখ মেলেই নিজেকে অবিনাশের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে সরে দাঁড়াল। দরজার কাছে দাঁড়ায় মুন্নি খাঁ আর পিছনে কানা রসিদ। তার চোখে লালসার বীভৎস হাসি। খাঁ সাহেব এগিয়ে এসে অবিনাশের সামনে দাঁড়িয়েছে—দাড়িগুলো রাগে সোজা হয়ে উঠেছে,•••চোখে মুখে একটা বীভৎসতার ছাপ। কাণা রসিদ মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে এসে অবিনাশের গলাটা টিপে ধরেছে•••চীৎকার করে ওঠে পিয়ারী। অতর্কিত আক্রমণে অবিনাশও কায়দায় পড়ে গেছে, খাঁ-সাহেব সজোরে তার নাকের উপর বসিয়ে দেয় কয়েকটা ঘুঁসি।

পিয়ারী ছুটে এসে মাঝখানে দাঁড়ালো, তার ওড়না খুলে গেছে, মাথার বিনুনীটা ঝুলছে সাপের মত, দু'হাতে অবিনাশকে আঁকড়ে ধরে অব্যক্ত ভাষায় চীৎকার করছে, রক্তাক্ত অবিনাশের অর্দ্ধ-অবচেতন দেহটা মেজেতে লুটিয়ে পড়ে।

আজই এখুনিই কাফেরকে বার করে দেবে সে, নেহাৎ এক দিন ভালবেসেছিল, নাহলে আজই খতম করে দিত খাঁ সাহেব। কিন্তু পিয়ারীর কথায় বিস্মিত হয়ে যায় খাঁ সাহেব। রসিদ গর্জন করে ওঠে,—

—"আজি খতম কর দেগা ?"

থামিয়ে দেয় তাকে খাঁ সাহেব। পিয়ারী কাঁদছে, একমাত্র মেয়ে তার, কিন্তু একি সর্বনাশ সে করে বসেছে ! রাগে-দুঃখে-ঘৃণায় নিজেরই উপর রাগ হয় খাঁ-সাহেবের, নিজের মেয়েকেও আজ ক্ষমা করতে পারেনা। সে কি না ওই কাফেরের সন্তানের মা হতে চলেছে! কোন সম্বন্ধই আর রাখবে না ওর সঙ্গে, জানবে খাঁ সাহেব, মেয়ে তার নাই। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কণ্ঠে অবিনাশ বলে, —"আমি ওকে বিয়ে করব ওস্তাদজী, বেইমানি আমি করব না।"

মুন্নি খাঁ পাথর হয়ে গেছে, কোন কথাই বলে না, আজ থেকে ওদিকে সে চেনে না—জানে না।

পরদিন সকালেই এসেছিল অবিনাশ আমার কাছে। সত্ত দেশ থেকে ফিরেছি কয়েক দিন। বুড়ো নিবারণও এসে কেঁদে পড়েছিল, নালিশ করেছে ছেলের বিরুদ্ধে। অনেক পয়সা কামাই করে, কিন্তু বুড়ো বাপ-মাকে দেখে না, বদখেয়ালে সবই নাকি উড়িয়ে দিচ্ছে। বুড়োর জন্য মায়া হয়। তাই চোখের সামনে অবিনাশকে দেখে সেদিন একচোট পিতৃভক্তির লেকচার দেবার যোগাড় করছি, সেই আমাকে থামিয়ে দেয়। চেহারাখানাও উস্কো-খুস্কো, চোখ-মুখ ফোলা, কেটে গেছে মাঝে মাঝে, সারাদেহে এ কী ছন্নছাড়া ভাব, কোথায় হয়ত নেশা করে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, নিবারণের কথাই তাহলে সত্যি।

—"বিয়ে করব, কিছু টাকা যদি ধার দেন—"

—"বিয়ে, কোথায় ?"

ব্যাপারটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই, জাতি-ধর্ম ত্যাগ করে আজ সে চলেছে বিয়ে করতে—আমি টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারি না, কোথায় যেন বাধে। সারা মন আজ বিরূপ হয়ে যায় তার উপর। সোজা হাঁকিয়ে দিই, বলে উঠলাম—"এরপর আমার কাছে আর কোন দরকারে কোন দিন না এলেই খুসী হবো।"

কথা কইল না একটিও, যুক্তি তর্কও করলে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। দেখেছিলাম সে দিন তার চোখে কি অসীম হতাশা-ব্যাকুলতার ছায়া, নীরবে বার হয়ে গেলো সে।

তারপর প্রায় দু'বছর কোন খবরই রাখিনি তার। মাঝে-মাঝে দু'একখানা রেকর্ড রেডিওতে নাম দেখতাম, ক্রমশঃ তাও আর দেখি না। কোথায় ভিড়ে হারিয়ে গেছে সে। হঠাৎ আজ সংবাদ পেয়ে না গিয়ে পারি না। এক বার দেখতে চেয়েছে আমাকে।

…টালিগঞ্জের ট্রাম থেকে নেমে বাঁহাতে খানিকটা গিয়ে একটা নোংরা বস্তীর মধ্যে ঢুকে এগিয়ে গেলাম, একটু খোঁজ করার পর হদিস মিলল। জীর্ণ ঘরে ততোধিক জীর্ণ শয্যায় পড়ে আছে অবিনাশ। চেনা যায় না। প্রবল কাসির বেগে জীর্ণ বুকটা দীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম। বিস্ময়ে-বেদনায় নীরব হয়ে গেছি।

অবস্থাটা এক নজরেই বোঝা যায়। জীর্ণ শানকিতে ভুক্তাবশেষ চাটি ভিজে ভাত, মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। ময়লা বিছানাতে উঠে বসবার চেষ্টা করে সে। মুখটা শীর্ণ লম্বা হয়ে গেছে, কোটরাগত চোখদু'টাতে অস্বাভাবিক একটা দীপ্তি, নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের যেন শেষ দীপ্তি। কাঁদছে সে।

"সেরে উঠবে অবিনাশ।"

কথা বলল না, মুখ তুলে চাইল মাত্র। মেঘের ফাঁকে শরতের এক ফালি সোনালী রোদ লুটিয়ে পড়েছে বাইরের গাছের মাথায়। কি যেন ভাবছে সে…হয়ত তার গ্রামেও এমনি শিশির-ভেজা রোদ সবুজ ধানের বুকে শিহর জাগায়, পড়েন পুকুরের জলে হাঁসের দল নেমে পড়েছে, বাতাসে শিউলী ফুলের মিঠে সুবাস!…

"দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সমীবাবু, তেমনি পুজোর দিন বাজাতে মন যায়, দেশে গেলে সেরে উঠতাম হয়ত, পুকুরের জলে লোহা হজম হয়, লালচালের ভাত সাল্সার কায করে।"

—"তাই চল অবিনাশ, দেশে গেলে সেরে উঠবে।"

—"সেরে উঠব ?"

কি যেন ভাবছে সে—হয়ত নিবারণের কথা, কাশফুলের সাদা উত্তরী, শাপলাফুলের হাসির স্মৃতি ভেসে আসে তার মনে।

হঠাৎ ঘরে কাকে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম! জীর্ণ শাড়ীখানায় লজ্জানিবারণের বৃথা চেষ্টা করেছে, আমাকে দেখে তার চোখেও বিস্ময়ের লহর খেলে যায়। চিনতে পারি—আমাকে দেখে এক বিস্মৃত প্রদোষ-আঁধারে সে এমনি করেই চেয়েছিল, সে দিন তার দেহের কাণায় কাণায় ছিল যৌবনের জোয়ার। আজ সে নিঃস্ব, রিক্ত-কাঙ্গাল।

—"ওর জন্যই ভাবনা সমীবাবু, কি হাল করেছি ওর আমি। ছেলেও একটি হয়েছিল—সেও বেঁচে রইল না।"

বার হয়ে আসছি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। মৃদু কণ্ঠে কাতর অনুনয় তার—"ওকে পারেন তবে মেহেরবাণী করে দেশেই নিয়ে যান, হয়ত বাঁচবে, এখানে থাকলে"—কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে তার।

—"তোমার কি হবে ?"

—"খোদা মেহেরবান্, তিনিই মালিক, তাঁর দুনিয়া কি একটুকু ঠাঁই ইন্‌কার করবে আমায় ?"

"তবু ও বাঁচুক— ওকে বাঁচান" অশ্রুতে ছেয়ে আসে দু'চোখ!

অবিনাশের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। বাড়ী সে আসতে আর পারেনি। মরবার সময়ও হয়ত তার চোখের সামনে ছিল লাল প্রান্তরের প্রান্তে শাল, মহুয়া-ঘেরা তার গ্রাম-সীমার ছবি; বুকের অসীম তৃষ্ণা সে মিটিয়েছিল পাথর-কাটা পদ্মপুকুরের মিঠে জলের স্বপ্নে। পিয়ারীরও কোন খবর আর পাইনি।

সেবার পুজোর সময়, কেন জানি না অবিনাশের কথাই বার বার মনে পড়েছে। সপ্তমীর রাত্তিতে আরতির পর…বুড়ো নিবারণকে ডেকে এনেছিলাম ঘরে,…ভিজে বাতাসে ভেসে আসে গ্রাম-গ্রামান্তরের ঢাক-ঢোলের শব্দ। সানাই বাজছে…মিঠে ঠুংরীর তান—

"আলবেলা কী নারে ঝমাঝম্"

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নিবারণ, ছানিপড়া ঘোলাটে চোখ ছাপিয়ে আসে তার অশ্রুধারা, অবিনাশের শেষ চিহ্ন, তার প্রিয় রেকর্ডখানা।

আমারও আজ বার বার মনে পড়ে তাকে, মনোজগতে তারই আনাগোনা। শিউলীর গন্ধভরা বাতাস সে দিনও বয়েছিল, আজও তেমনি বয়। আজও সাদা মেঘের আড়ালে চাঁদ ডুবে যায় রাত্রির গভীরে—অতীতের একটি রাতেরই মত, সবই আছে…অবিনাশই আজকের রাতে গরহাজির, সে হয়ত আজ 'মহ্‌ফিল' বসাতে গেছে অন্য কোন আসরে।

সাহিত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনীন্দ্রনাথ বসু—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—যশোহরের নড়াইলে। পিতা—যোগেন্দ্রনাথ বসু। শিক্ষা—বি-কম (বিদ্যাসাগর কলেজ)। কর্ম—অধ্যাপক, যশোহর মাইকেল মধুসূদন কলেজ, বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়। কিউরেটর—কলি: বিশ্ববিদ্যালয় কমার্শিয়েল মিউজিয়ম। গ্রন্থ—এভারেষ্ট অভিযান। ভূগোল পরিচয়।

অনীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—আকাশ-গঙ্গা (১৩৩৫), নতুন কবিতা (১৩৬০)।

অশ্বিনীকুমার সেন—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৮৫ বঙ্গ খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫০ বঙ্গ। কর্ম—শিক্ষকতা। ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্বলাভ ও সাহিত্যিক হিসাবে সর্বজনপ্রিয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ লেখক। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালক সমিতির সভ্য। গ্রন্থ—স্মৃতিপূজা, সপ্তাবশতকের কবি, স্মৃতিকণা, বাসুদেব কাহিনী, মেহারের সিদ্ধপুরুষ ঠাকুর সর্বানন্দ, সহজ ভূগোল। সম্পাদক—ভাইবোন (শিশু মাসিক), একতা, বাসন্তী।

অসিতকুমার হালদার—শিল্পী ও সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৮৯০ খৃ: ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা। পিতা—সুকুমার হালদার। পৈত্রিক নিবাস—২৪-পরগনার রুগান্দল গ্রাম। শিক্ষা—কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট অঙ্কন শিক্ষা। ছাত্রাবস্থায় লেডি হেরিংহামের সহিত অজন্তা গুহার চিত্রাবলী নকল (১৯০৯—১০)। সিরগুজা ষ্টেটে যোগীমারা গুহা চিত্র নকল করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত (১৯১৪)। বাঘগুহার চিত্রাবলী নকল (গোয়ালিয়ার দরবারের পক্ষ হইতে, ১৯২০); শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ (১৯১২—১৪, ১৯১৯—২৩), গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা (১৯১৭—১৮)। ইউরোপের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের (১৯২৩) পর জয়পুর শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (১৯২৫)। লণ্ডনের 'রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস'এর ফেলো, নিউ ইয়র্কের রোরিক মিউজিয়ামের পরামর্শদাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধরচন্দ্র মুখার্জি' লেকচারার। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সর্বপ্রথম যুক্তাক্ষর বর্জিত ভাষায় শিশুগ্রন্থ ও বহু শিল্প-সাহিত্য ও শিশুসাহিত্য রচনা। গ্রন্থ—অজন্তা, বাগগুহা ও রামগড়, ভারতের শিল্প ইতিহাস, ইউরোপের শিল্প ইতিহাস; কাব্য-গ্রন্থ—রূপ ও রুচি, মেঘদূত, ঋতুসংহার।

অহিভূষণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ (গীতাভিনয়)—উত্তরা-পরিণয় (১৯০১, ১০ই মে), দণ্ডীপর্ব, তুলসীলীলা, রাই উন্মাদিনী, বামনভিক্ষা, ধ্রুব উদ্ধার, রত্নারতী, রামাশ্বমেধ, বোধনে বিসর্জন।

আক্রাম খাঁ—সাংবাদিক। জন্ম—১৮৭৭ খৃঃ ২৪-পরগনার হাকিমপুর গ্রামে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২১) ও কারাবরণ; বর্তমানে পাকিস্তানের অধিবাসী। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগের সভাপতি। গ্রন্থ—মোস্তাফা চরিত, সমাজ ও সমাধান, আমপারা (অনুবাদ), সাতপারা (ঐ)। সম্পাদক—সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ পত্রিকা।

আক্রাম হোসেন—কবি ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১৮৯৯ খৃ: খুলনা জেলার রায়গ্রাম কসবায়। অধ্যাপনা। কাব্যগ্রন্থ—যুগবাণী, মুক্তিবাণী, পল্লীবাণী, নওরোজ, আমরা বাঙালী, পথের বাঁশী, ইসলামের ইতিহাস।

আজিজুর রহমান চৌধুরী, মৌলবী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিরী ফরহাদ, লায়লামজনু।

আজেহার আলি—মুসলমান সায়ের। জন্ম—হাওড়া জেলায় বালিয়া পরগনার ভাতহেড়ে গ্রামে। পিতা—শেখ খয়ের উল্লাহ্। গ্রন্থ—লজ্জাবতীর পুথি।

আশুনাথ চক্রবর্তী—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—কাটোয়া মহকুমার বারেন্দা গ্রামে। পিতা—যদুনাথ চক্রবর্তী। বি-এ ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। শিক্ষকতা। গ্রন্থ—Model Grammar (স্কুল-পাঠ্য)।

আশুনাথ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সমাসদর্পণ (১৮৬৮)।

আনন্দকিশোর সেন—সাহিত্যসেবী। জন্ম—ঢাকা। সম্পাদক—পল্লীবিজ্ঞান মাসিক, ঢাকা ১৮৬০)।

আনন্দগোপাল ঘোষ—সাহিত্যসেবী। জন্ম—মেদিনীপুর। সম্পাদক—মন্দাকিনী (মাসিক, ১৯১১, মেদিনীপুর, মাহনান), অঙ্কুর (মাসিক)।

আনন্দগোপাল পালিত—অনুবাদক। গ্রন্থ—Macpherson (Hon'ble A. G.) on Mortgage গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ (১৮৭১)।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৯২২ খৃ: বীরভূম জেলায় সিউড়ি। গ্রন্থ—বিদিশা (কাব্য), অবন্তী (কা) ঘোড়া কর ভগবান (ব্যঙ্গ রচনা)। সম্পাদক—সচিত্র সাপ্তাহিক (১৯৫২-৫৩) পরিচালক—দৈনিক কৃষক পত্রিকা (১৯৪৭-৮), দ্বন্দ্ব পত্রিকা (১৯৪৯-৫০), সমকালীন (১৯৫৩)।

আনন্দচন্দ্র কাস্তগিরি—চিকিৎসক। ধাত্রী-বিদ্যায় বিশারদ। গ্রন্থ—মানব জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা (১৮৬৮), Theory and practice of Midwifery (১৮৬৮)।

আনন্দচন্দ্র দেব—গ্রন্থকার। জন্ম—কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া। গ্রন্থ—রত্নভাণ্ডার (১৯০১)।

আনন্দচন্দ্র বর্মা—আয়ুর্বেদবিদ। গ্রন্থ—সার কৌমুদী বা চিকিৎসাদর্পণ (১৮৬৮)।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অধিকরণমালা। (ভারতীতীর্থ কৃত, ১৮৫৩-৬৩), বেদান্তদর্শন (১৮৬২), পঞ্চদশীর অনুবাদ (মূল সমেত, শক ১৭৭১), বেদান্তসারের অনুবাদ (ঐ)।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাজকুমারী (১৮৮০)।

আনন্দচন্দ্র সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জ্ঞানাঞ্জন (বিপিনচন্দ্র মহলানবীশ সহ ১৮৭৪)।

আনন্দলাল শীল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পুরুষপরীক্ষা। (বিদ্যাপতি কৃত, অনুবাদ বিহারীলাল শীল সহ, ১২৫৮)।

আবদর রহিম—মুসলমান পণ্ডিত। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ

ভাষায় সুপণ্ডিত। গ্রন্থ—সন্দেশ রসিক (১২শ শতাব্দী, অপভ্রংশ কাব্য)।

আবদুর রহমান খাঁ, আলহাজ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পাঞ্জাসুরা, আমপারা।

আবদুর রহমান, মৌলভী—গ্রন্থকার। জন্ম—বীরভূম জেলায় নিমড়া গ্রামে। কাটোয়া কোর্টের মোক্তার। মুস্লিম অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক। গ্রন্থ—কারবালার বাণী, হজরত মুহম্মদ।

আবদুল আজিজ খাঁ—কবি। জন্ম—বালেশ্বর কটক জেলার গড়পাদা পরগনা কছিমি গ্রামে। কাব্যগ্রন্থ—রঙ্গবাহার।

আবদুল ওথার সিদ্দিকী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আরবের দুলাল।

আবদুল গফুর—কবি। কাব্য—গাজী সাহেবের গান বা কালু গাজী ও চম্পাবতী কাব্য (অনু ১৯শ শতাব্দী ১ম দশকে)।

আবদুল জব্বর—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৯ বঙ্গ, মৈমনসিংহ জেলায় বনগ্রাম (গফরগাঁও থানা)। পিতা—মুন্সী শেখ মুহম্মদ নেকবর। গ্রন্থ—মক্কা শরীফের ইতিহাস, মদীনা শরীফের ইতিহাস, ইসলাম চিত্র, ইসলাম সঙ্গীত, আদর্শ রমণী।

আবদুল ফাত্তাহ্ সিদ্দিকী কোরেশী—গ্রন্থকার। নিবাস—বর্ধমান জেলাব মুহম্মদ গ্রামে। গ্রন্থ—সালেম্বা (উপ)।

আবদুল রহমান—কবি। কাব্য—গুরুজমাল (সুরজ উজাল)।

আবদুল সত্তার—গ্রন্থকার। নামন্তর—দেরাসতুল্লা। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার হোসেনাবাদে। টাপুরিয়া গ্রামে ইহার মক্তব ছিল। গ্রন্থ—হুরনুব বিবির কেচ্ছা।

আবদুল মুকুব মামুদ—কবি। গ্রন্থ—গোপীচাঁদের সন্ন্যাস।

আবদুল হামিদ খান আহম্মদী ইউসুফজয়ী—সাহিত্যসেবী। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইলে। সম্পাদক—আহমদী (পাক্ষিক, ১২০৩ টাঙ্গাইল)।

আবুল কাশেম কেশারী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আমার কাহিনী, গোর জিয়ারত, কালেমা তুল হক।

আবুল কাশেম সিকদার—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এ। কর্ম—শিক্ষকতা—মাদরবরের চর স্কুল। গ্রন্থ—অদৃষ্টের পরিহাস।

আবুল হাসেম—নাট্যকার ও কবি। জন্ম—১৯০৫ খৃঃ পাবনা জেলায়। গ্রন্থ—মাষ্টার সাব (নাটক), কথিকা (কাব্য)।

আবুল হাসানত—যৌনতত্ত্ববিদ। পূর্ণ নাম—শাহ আবুল হাসানাত মহম্মদ ইস্মাইল। জন্ম—১৯০৫ খৃঃ ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার সাড়ে সাত রশিগ্রামে। পিতা—শাহ মওলানা মহম্মদ ইব্রাহিম (ধর্মগুরু)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৯২১)। ছাত্রাবস্থায় পিতার নিকট আরবী, ফার্সী ও উর্দূ শিক্ষা। বি-এ (১৯২৫), পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ ধারী। এম-এ। কলিকাতার মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৪)। আই-পি অফিসারের পরীক্ষায় প্রথম (১৯২৬) কর্ম—পুলিস সুপার, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়; ডি-আই-পি। পূর্ব পাকিস্তান। সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন। গ্রন্থ—যৌনবিজ্ঞান (১৯৩৬), সচিত্র মাতৃমঙ্গল, জন্মবিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ, (১৯৪১), সচিত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ,—মত ও পথ (১৯৪৩), ঐ হিন্দী (১৯৪৪), ঐ উর্দূ (১৯৪৫), কবির প্রেম ও অন্যান্য গল্প, (১৯৪২), বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার, (১৯৪৩), তরীকৎ বা খোদা প্রাপ্তি, (১৯২৭), সহজ বাংলা পরিচয় (১৯৫১), Controlled Parenthood, (১৯৪৫), All about sex love and happy marriage, (১৯৫১), Art of discipline management & leadership (১৯৪২), Crime & criminal justice (১৯৩৯), Conversational Bengali (১৯৫১), A manual of Discipline management & leadership (১৯৫১), Justice & peace for all (১৯৫৪), কিমিয়ায়ে ইশরৎ (উর্দূ, যৌনবিজ্ঞান)।

আমির, আলাদিন—কবি। জন্ম—ঢাকা। গ্রন্থ—ছিনতনের পুথি (মুসলমানী বাংলা পদ্যে গল্প কথা, ১৮৭৯)।

আমিনুর রহমন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পোষ্ট কার্ড, অদ্ভুত।

আমির—পল্লীকবি। জন্ম—১৮ শতাব্দীতে দশকাজলিয়ার শেরপুর অঞ্চলে। পালাগান—মানিকতারা।

আমীরুদ্দিন শেখ—কবি। জন্ম—কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে। গ্রন্থ—মনপুর হাল্লাজ ও সমছ তরবিনের কেচ্ছা।

আয়েজুদ্দিন আহম্মদ বা শেখ আয়েজুদ্দিন—কবি। জন্ম—১২৯০ বঙ্গ ৫ই কার্ত্তিক হুগলী জেলার বালিগড়ের অন্তর্গত তালপুর গ্রামে। গ্রন্থ—গোল আন্দাম (১৮৮৪), ছেকান্দার নামা (১৮৮৬), পরিবানু শাহাজাদী, সতীবিবির কেচ্ছা, মোরসেদ নামা।

আমোদিনী ঘোষ—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—দীপের দাহ (উপ)।

আর্যকুমার সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিনেতা (গল্প), লীলাসঙ্গিনী (কবিতা)।

আরতি দেবী—সাহিত্য-সেবিকা। যু-সম্পাদক—আলোক (১৩৩৬)।

আরাধন বাগছি—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইলের নাগরপাড়া গ্রামে। গ্রন্থ—সত্যমঙ্গল।

আলি আহসান, সৈয়দ—কবি। জন্ম—১৯২০ খৃঃ যশোহর আলোকদিয়া। কর্ম—ঢাকায় পাকিস্থান রেডিও অফিসের সহকারী কর্মসূচি নিয়ামক। বিভিন্ন পত্রের লেখক। গ্রন্থ—নজীর আহম্মদ, চাহার দরবেশ।

আশা দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী—সাহিত্যিক নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদিকা—মহিলা (১৩৫৫)।

আশাপূর্ণা দেবী—মহিলা কথাশিল্পী। জন্ম—১৩১৫ বঙ্গ ২৩এ পৌষ কলিকাতা। পিতা—চিত্রশিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আদি নিবাস—বেগমপুর। স্বামী—কৃষ্ণনগর নিবাসী কালিদাস গুপ্ত। গৃহেই শিক্ষালাভ। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য-প্রীতি। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস রচনা, লীলা পুরস্কার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাপ্তা। গ্রন্থ—জল আর আগুন (গল্প, ১৩৪৭), প্রেম ও প্রয়োজন (উপ ১৩৫১), অনির্বাণ (১৩৫২) অগ্নিপরীক্ষা (ঐ), মিত্তির বাড়ী (১৩৫৩), সাগর শুকায়ে যায় (গল্প, ১৩৫৩)। দুনিবার (১৩৫৪) যোগবিয়োগ, বলয়গ্রাস (১৩৫৬); শিশুগ্রন্থ—ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা (১৩৪৫) হাফ হলিডে (১৩৪৭), রঙ্গিন মলাট—(১৩৪৭), ভাগ্যি যুদ্ধ বেধে ছিল (১৩৫২), বলবার মতন নয় (১৩৫৪)।

আলাউদ্দীন আল আজাদ—গ্রন্থকার। গল্পগ্রন্থ—জেগে আছি, ধানকন্যা।

আশরফ আলি খান—কবি। কাব্যগ্রন্থ—পেকোয়া, কঙ্কাল।

আশীষ গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইহাই নিয়ম, বন্দিনী সুভদ্রা।

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। শিক্ষা—এম-এ। গ্রন্থ—Essays on Human and Genious, The Bengali Drama as the Reflection of National life & character, The Model Primer, Choice Reading for English Literature, Voltairianism.

আশু চট্টোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—প্রেমের কবিতা (ক), ইংরাজি কাব্যকথা।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্মৃতি-বিস্মৃতি, রক্তরাখী, মৌনমায়া।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মধুমালা (কা); শিশু-গ্রন্থ—গভীর জঙ্গলে, নররাক্ষস, মগ ডাকাতের হাতে, দিন দুপুরে ডাকাতি, অমৃতের সন্ধানে, মাখন দেড়ে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হাওয়া বদল, এককচন্দন, শব্দ ও উচ্চারণ, মনের আগুন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮১ বঙ্গ বর্দ্ধমান জেলার তেওড়া গ্রামে। পিতা—বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রতিষ্ঠাতা—গীতাপ্রচার সম্প্রদায় (১৩৪০)। গ্রন্থ—গীতা ও গীতামৃত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৩২৭ বঙ্গ ২২এ ভাদ্র ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। পিতা—রায় বাহাদুর পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—হুগলী মহসিন কলেজ। কর্ম—সাংবাদিক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ—কালচক্র, আর্তমানব, জীবনতৃষ্ণা, চলাচল, উল্কা।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায়। সম্পাদক—কাটোয়াবার্ত্তা (১৯২৮-১৯৪১)।

আশুতোষ শিরোরত্ন—গ্রন্থকার। সম্পাদিত গ্রন্থ—রামায়ণ (১৮৬৮, ১৩ই এপ্রিল বর্দ্ধমান মহারাজ কর্তৃক বিতরিত)।

আহমদ আলী—কবি। গ্রন্থ—তকবিএতেল ইমান (মুসলমানী বাংলা পদ্যগ্রন্থ, ১৮৮১)।

ইদরিস আলি, শেখ মুহম্মদ—কবি ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—১৮১৫ খৃঃ হাওড়া জেলায় শিবপুরে। মৃত্যু—১৯৪৫ খৃঃ। গ্রন্থ—পীযুস প্লাবনী, মর্মবীণা, মুক্তিবীণা, আমার প্রিয়া, বঙ্কিম দুহিতা, শেখ সংসার, দরবেশ কাহিনী, নুতন বৌ, আদর্শ-গৃহিণী, প্রেমের পথে, রূপের মোহ।

ইন্দিরা দেবী—সঙ্গীতানুরাগিণী। জন্ম—১৮৭৩ খৃঃ বিখ্যাত ঠাকুর বংশে। পিতা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রথম সিভিলিয়ন)। মাতা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। স্বামী—প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। শৈশব হইতে সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগিণী। ফরাসী ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় সঙ্গীতে পারদর্শিতালাভ। গানের স্বরলিপি প্রস্তুতে সুদক্ষা। গ্রন্থ—হিন্দু সঙ্গীত। যুগ্ম সম্পাদিকা ও পরে সম্পাদিকা—আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা (১৩২০-২৮)।

ইন্দুনিভা দাস—সাহিত্যসেবিকা। যুগ্ম-সম্পাদিকা (১৩৩০) ও পরে সম্পাদিকা—সেবা ও সাধনা (১৩৩১)।

ইন্দুভূষণ দাস—সাংবাদিক ও অনুবাদক। জন্ম—১৩১৮ বঙ্গ ২৫এ বৈশাখ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৯২৮), টাইপরাইটিং ও অ্যাকাউন্টেন্সী। কর্ম—প্রথমে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, পরে ব্যবসায়, ভারতে ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত মেসিনের প্রথম আবিষ্কারক, সাংবাদিক বৃত্তি। বিভিন্ন পত্রিকায় স্বনামে, 'শিল্পাদিত্য' 'দুর্মুখ' 'অনামী' ছদ্মনামে প্রবন্ধ, গল্প রচনা। বাণিজ্য সম্পাদক রূপে কিছুকাল 'বাতায়ন ও 'ভগ্নদূতে' কর্ম। অনূদিত গ্রন্থ—স্পাই মেয়ে, নানা, সাইবেরিয়ার প্রান্তরে, কংকিনে ব্রাদার্স, গ্রাণ্ড ব্যাবিলন হোটেল; বিষাক্তনগরী। সম্পাদক—সাধনা, চিত্ররূপা (প্রতিষ্ঠান) বাঙালী।

ইন্দুমতী দেবী—মহিলা কবি। পিতা—প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। বিবাহ দশঘরার প্রসিদ্ধ জমীদার বিশ্বাস বাটীতে। কাব্যগ্রন্থ—দুঃখমালা (১২৭১), দুঃখগাথা (ঐ)।

ইব্রাহিম খাঁ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮১৪ খৃঃ মৈমনসিংহ জেলায় শাবাজ নগরে। শিক্ষা—এম-এ। অধ্যক্ষ, করোটিয়া কলেজ, বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য। গ্রন্থ—কামালপাশা (না) আনোয়ারপাশা (না), কাফেলা (না), সোনার শিকল, লক্ষ্মীছাড়া, মনীষী মজলিস, হীরক হার, খালেদার, সমর স্মৃতি।

ঈশানচন্দ্র বিশারদ—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের অনুবাদ (সংস্কৃত মূলসহ, ১৮৮৭)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুহ—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৫ বঙ্গ ১৩ই অগ্রহায়ণ, মৈমনসিংহ জেলায় জামালপুরে। পিতা—চৈতন্যচন্দ্র গুহ। ইহার বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থ—উদ্যানতত্ত্ব বারিধি, সারতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, মৃত্তিকাতত্ত্ব।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—বিচ্ছেদতরঙ্গ (কাব্য, ১৮৫০)।

ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত দ্বারকা গ্রামে। দর্শন, ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। 'পঞ্চতীর্থ' 'শাস্ত্রী' প্রভৃতি উপাধি লাভ। স্থাপনা—'দর্শন বিদ্যালয়'। নিখিল ভারত পণ্ডিত মহামণ্ডল ও নিখিল ভারত চতুষ্পাঠী পরিষদের সম্পাদক। গ্রন্থ—দর্শন পরিচয়।

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—শিল্প-শিক্ষা (মাসিক, ১৩০৪ ফাল্গুন)।

উপেন্দ্রচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় আচমিতা গ্রামে। গ্রন্থ—ক্রন্দন ও সান্ত্বনা।

উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী—বৈষ্ণব পণ্ডিত। 'ভাগবতভূষণ' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—বৈষ্ণব ব্রততত্ত্বম্, ২ খণ্ড।

উমাকান্ত হাজারী—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ ২১এ অগ্রহায়ণ। পিতা—চন্দ্রকুমার হাজারী। 'বিদ্যার্ণব' (নদীয়া পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক ১৩৪২) উপাধি লাভ। ইনি বহু তীর্থ ও ব্রহ্মদেশ, পিনাঙ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। গ্রন্থ—আমাদের কথা, বিপদ কাহিনী (কাব্য), মুরলা (নাটক) বঙ্গ জাগরণ, নব্য জাপান, বৈদিক গবেষণা।

উপেন্দ্র ভঞ্জ—কবি। উৎকলবাসী। গ্রন্থ—চৈতন্যচন্দ্রোদয় (সংস্কৃত), বৈদেহীশ, বিলাস, লাবণ্যবতী, রসিক হারাবলী, কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সুন্দরী, সুভদ্রা পরিণয়, রাসলীলামৃত, সুবর্ণরেখা।

উমা দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৯১৫ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল ভাগলপুরে। শিক্ষা—এম-এ (চারিটি বিষয়ে)। গ্রন্থ—সঞ্চারিণী (কাব্য)।

উমানন্দ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মাষ্টার মহাশয়, ঝিয়ের মেয়ে, জেলের বাধ।

উমাশশী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। স্বামী—রায় বাহাদুর গগনচন্দ্র রায় (জগদ্দল)। গ্রন্থ—মনঃপ্রভা।

উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। 'ভক্তিতীর্থ' উপাধিলাভ। গ্রন্থ—কলির দধীচি।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় বাসুদেবপুর বিদ্যাবাগীশপাড়া। পিতা—কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—হুগলী জেলার নর্ম্যাল স্কুলে। কর্ম—বিভিন্ন মডেল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত। গ্রন্থ—ভূগোলবোধ (১৮৮১), ধারাপাত।

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—আরতি (মাসিক, ১৩০৭, আষাঢ়)।

উমেশচন্দ্র মজুমদার—নাট্যকার। জন্ম—ফরিদপুর জেলায়। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—দনুজদলন (নাট্য-কাব্য)।

উসমান—কবি। ইনি চিস্‌তী শাখার সুফী সাধক, ১৭শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থ—চিত্রাবলী (১৬১৩ খৃঃ)।

ঊষাবাণী রায়—সাহিত্য-সেবিকা। সম্পাদিকা—জয়শ্রী (ঢাকা, ১৩৪১-৪২)।

ঊর্মিলা দেবী—মহিলা কবি। পিতা—ভুবনচন্দ্র দাশ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী। গ্রন্থ—পুষ্পহার (কাব্য)।

ঊষাপ্রমোদিনী বসু—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—সরলা।

ঊর্মিলা সিংহ—সাহিত্য-সেবিকা। স্বামী—কমনীয়কুমার সিংহ। সম্পাদিকা—ত্রিপুরা হিতৈষিণী (কুমিল্লা, ১৩৩১)।

এমদাদ আলি, সৈয়দ—কবি। জন্ম—১৮৮০ খৃঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের খিলগাঁও গ্রামে। কর্ম—সরকারী পুলিস বিভাগে। 'খান সাহেব' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—ডালি (ক), তাপসী রাবেয়া (গদ্য)। সম্পাদক—নবনূর (মাসিক)।

এয়াকুব আলি চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৮৭ খৃঃ ফরিদপুর পাংশা গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ। গ্রন্থ—মানব-মুকুট, শান্তিধারা।

ওসমান আলি, মৌলভী—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর বড়-বাজার। শিক্ষা—বি-এ, বি-এল। কর্ম—মুন্সেফ ও সব জজ। গ্রন্থ—আলোক সভা (১৯০৪), হাফেজ সাহেব (জী), দেবলা (কাব্য), লালচাঁদ কাব্য।

ওহিদুল আলম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কর্ণফুলির মাঝি (কাব্য), [illegible] প্রতীক্ষা (গল্প)।

কঙ্ক—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোনা বিপ্রপুর গ্রাম (রাজেশ্বরী বা রাজী নদী তীরে)। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক; পিতা—গুণরাজ। মাতা—বসুমতী। গ্রন্থ—মলয়ার বারমাসী, সত্যপীরের পাঁচালী।

কনকপ্রভা দেব—সাহিত্যসেবিকা। সম্পাদিকা—গৃহলক্ষ্মী (১৩৪৪, আশ্বিন)।

কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ—স্মার্ত্ত পণ্ডিত। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ ভাটপাড়া। মৃত্যু—১৯৩৪ খৃঃ ২৫এ জানুয়ারি। শিক্ষা—টোলে। কর্ম—অধ্যাপনা, ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজ (১৯০১), 'কাব্যতীর্থ,' 'স্মৃতিতীর্থ,' 'মহামহোপাধ্যায়' (১৯২৬) উপাধিলাভ এবং 'যোগেন্দ্র পুরস্কার' (কলিঃ বিশ্ব, ১৯২৭) লাভ। এসিয়াটিক সোসাইটীর এসোসিয়েট মেম্বার (১৮৯৯), বিবলিওথিকা ইণ্ডিকার সিরিজের স্মৃতিগ্রন্থের সম্পাদক (১৯০০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হিতবাদী পত্রিকা, বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট (১৯২১) প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সম্পাদিত গ্রন্থ—অগস্ত্য-সংহিতা, বহ্লনের রাজতরঙ্গিণী, দণ্ডবিবেক (গায়কোয়াড সিরিজ), ভট্টপল্লী বশিষ্ঠ বংশ'পরিচয়।

কমলবাসিনী দেবী—সাহিত্যসেবিকা। যুগ্ম সম্পাদিকা—আশ্রমী (রংপুর, ১৯৪৯)।

কমলা চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবিকা। সম্পাদিকা—মন্দিরা (১৩৪৫)।

কমলা দাশগুপ্তা—সাহিত্যসেবিকা। সম্পাদিকা—মন্দিরা (১৩৪৭—৪৯, ১৩৫২—৫৪)।

কমলা মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবিকা। শিক্ষা—এম-এ। যুগ্ম সম্পাদিকা—মহিলা মহল (১৩৪৪)।

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৯১১ খৃঃ ১১ই অক্টোবর আগড়পাড়া। পিতা—ডাঃ স্যর বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (নানা দেশের প্রতিনিধি)। মাতা—শিল্পী মলয়াবতী দেবী। শিক্ষা—এম এ, এফ-আর-এস-এ। কর্মজীবন—নানা কনস্যুলেটের চান্সেলার (১৯৩২-৩৯), কলম্বিয়ার কন্সাল নিযুক্ত (১৯৩৩) হন কিন্তু উহা গ্রহণ করেন নাই। এল সালভেদোরের প্রতিনিধি (কনসাল ১৯৪৭)। বিলাতের ও ফ্রান্সের কয়েকটি সাহিত্য-সমিতির সভ্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা, গল্প স্বনামে এবং ছদ্মনামে রচনা। কিছু কাল 'নবশক্তি'র (সাপ্তাহিক) সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম। কাব্যগ্রন্থ—ছায়া (১৩৬১), ফিকে আকাশ।

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবিকা। সম্পাদিকা—পরিক্রমা (ত্রৈমাসিক, ১৩৫৩)।

কল্যাণী সেন—সাহিত্যসেবিকা। শিক্ষা—এম-এ। সম্পাদিকা—মেয়েদের কথা (১৩৪৮—৫৩)।

কাজি দৌলত—কবি। জন্ম—১৬২২—২৮ খৃঃ মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় রাউজান থানার অন্তর্গত কোন গ্রামে। সুদূর আরাকান রাজসভায় আরাকান রাজ থিরি-থু-ধর্মা বা শ্রীসুধর্মার সেনাপতি আশরফ খাঁর আদেশে কাব্যরচনা। কাব্য গ্রন্থ—সতী ময়না বা লোর চন্দ্রানী।

কাদের নওয়াজ—কবি। জন্ম—১৯০৯ খৃঃ বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে। গ্রন্থ—মরাল-কাব্য।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭২ বঙ্গ ১২ই কার্ত্তিক হুগলী বলাগড়। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গ ২৬এ চৈত্র। পিতা—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—এম-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৭৯)। আইন-ব্যবসায়, কলিকাতা পুলিশ কোর্টের সরকারী উকীল। বেঙ্গল ম্যাগাজিন, ন্যাশনাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা। স্থাপনা—কলিকাতা ইন্‌ষ্টিটিউশন (দুঃস্থ বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে)। গ্রন্থ—সমুদ্রযাত্রা ও প্রায়শ্চিত্তান্তে অব্যবহার্যতা বিচার, Hindu Society.

[ক্রমশঃ।

ডি. এচ. লরেন্স

বাড়িতে ফিরে এসে তাঁরা দেখতে পেলেন মিঃ লিভারস্ আর তাঁর বড় ছেলে এডগার রান্না-ঘরে বসে আছেন। এডগারের বয়স প্রায় আঠারো। তারপর বছর বারো-তেরো বয়সের দু'টি জোয়ান ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এলো। তাদের নাম জিওফ্রে আর মরিস্। মিঃ লিভারসের বয়স অল্প—দেখতে সুপুরুষ, গোঁফের রঙ সোনালী আর বাদামীতে মেশান—উজ্জ্বল নীল চোখ দু'টি কুঁচকে বাইরের দিকে তিনি চেয়েছিলেন।

এ বাড়ির ছেলেরা খুব মিশুক—কিন্তু পলের নজর তাদের দিকে ছিল না। ছেলেরা বাড়ির এধারে-ওধারে ডিমের সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করছিল। তারা যখন মুরগীগুলোকে খেতে দিচ্ছিল, তখন মিরিয়াম বেরিয়ে এলো। ছেলেরা তার দিকে চোখ তুলেও চাইল না। একটা মুরগী তার ছানাগুলোকে নিয়ে ঝোপের মধ্যে বসেছিল। এক মুঠো শস্য নিয়ে মরিস্ নিজের হাতটা রাখল মুরগীটার সামনে। মুরগীটা হাত থেকে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল। পলের দিকে চেয়ে মরিস্ বললে, 'পারবে তুমি এমন করতে?' পল বললে, 'দেখাই যাক না।' পলের হাতখানা ছোট আর নরম। তবুও হাত দেখে তাকে বেশ কর্মঠ লোক বলেই মনে হয়। মিরিয়াম নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইল। পল হাতে শস্য নিয়ে মুরগীটার সামনে ধরল। মুরগীটা এক মুহূর্ত্ত তার উজ্জ্বল চোখে চাইল শস্যগুলোর দিকে, তারপর পলের হাতে দিল ঠুকরে। পল একবার চমকে উঠে তারপর হাসতে লাগল। মুরগীটা খুট খুট করে তার হাত থেকে শস্য নিয়ে খেতে লাগল। পলের আনন্দের আর সীমা নেই। অন্য ছেলেরাও তার হাসিতে যোগ দিল।

হাতের শস্যগুলো ফুরিয়ে গেলে পল বললে, 'মুরগীটা ঠোকরায় বটে, কিন্তু কামড়ায় না।'

মরিস বললে, 'এবার মিরিয়াম তোমার পালা।' মিরিয়াম যেন আঁতকে উঠল, বললে, 'না, কখনও না।'

তার ভাইয়েরা বললে, 'আহা কচি খুকী আর কি!'

পল বললে, 'সত্যি, একটুও লাগেনি—বরং মজার সুড়সুড়িই লাগে একটু।'

মিরিয়াম তবুও আপত্তি করতে লাগল। তার কাল কোঁকড়ান চুল দুলিয়ে দুলিয়ে বার বার সে বলতে লাগল, 'আমি পারব না।'

জিওফ্রে বললে, 'এক কবিতা আওড়ানো ছাড়া আর কিছুরই ওর মুরোদ নেই।'

মরিস্ সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, ওটা কিছুই পারে না। না পারে দরজা ডিঙিয়ে আসতে, না পারে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে। অন্য কোন মেয়ে যদি ওকে মারতে আসে তাকেও বাধা দিতে পারে না। কোন কাজ করবার ক্ষমতা ত' নেই-ই, তবুও নিজেকে মনে করে যেন একটা রাণী বা আর কিছু! চমৎকার মেয়ে!

মিরিয়াম লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'তোমাদের চেয়ে বেশী সাহস আমার আছে। তোমারা ত'. ভীতু। লোককে শুধু শুধু ভয় দেখানোই তোমাদের কাজ।' বলে সে চলে গেল বাড়ির ভিতরে। পল ছেলেদের সঙ্গে বাগানে গিয়ে ঢুকল। বাগানের মধ্যে তারা একটা প্যারালাল-বার খাড়া করেছিল। এবার আরম্ভ হ'ল গায়ের জোরের কসরৎ। পলের গায়ে শক্তি খুব বেশী না থাকলেও সে খুবই চটপটে ছিল। তাতেই কাজ হ'ল। আপেল গাছের একটা নীচু ডালে আপেলের ফুল ফুটেছিল, পল এক লাফে সেটাকে পেড়ে আনলে।

বড় ছেলে এড্গার বললে, 'আপেল ফুল আমরা কখনও পাড়ি না। তা' হলে আগামী বছর আর আপেল হবে না।' পল চলে যেতে যেতে বললে, 'আমিই কি আর পাড়তে চেয়েছিলুম?'

বাড়িতে ঢুকে পল দেখল, মা ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরী। ছেলেকে দেখে অল্প একটু হাসলেন তিনি। মায়ের হাত থেকে ফুলের বড় তোড়াটা সে নিজের হাতে নিয়ে নিল। তাদের এগিয়ে দেবার জন্যে মিঃ লিভারস এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মাঠের উপর দিয়ে পথ—দূরে পাহাড়ের চূড়ায় গোধূলির সোনার আলো। আশপাশের ঘন অরণ্যে নীবিড় অন্ধকার নেমে আসছে। চার দিকে গভীর নিস্তব্ধতা; শুধু মাঝে মাঝে গাছের পাতা নড়ার শব্দ আর পাখীর ডাক।

মিসেস মোরেল বললেন, 'চমৎকার জায়গা।' মিঃ লিভারস জবাব দিতে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, চমৎকার জায়গাই বটে, শুধু যদি খরগোসের এত দৌরাত্ম্য না থাকত। মাঠের ঘাসগুলোকে পর্য্যন্ত কুটি কুটি করে কেটে রাখে। এ জমির খাজনা দিয়ে উঠতে পারব কি না মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়।' বলে তিনি হাততালি দিলেন আর মাঠের দু'ধারের ঝোপঝাড়গুলো যেন হেলে-দুলে উঠল। আর তার মধ্যে থেকেই বাদামী রঙের কতকগুলো খরগোস ছুটে লাফিয়ে পালাল।

মিসেস মোরেল বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য্য! নিজের চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাসই হ'ত না।'

কিছুদূর গিয়ে মিঃ লিভারস আর তাঁর স্ত্রী ফিরে এলেন। পল আর তার মা দু'জনে একা একা হেঁটে চললেন। পল হঠাৎ চুপি চুপি বললে, 'বেশ লাগল, নয় মা?' আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। পলের হৃদয় আজ খুশিতে উপচে পড়ছে। এমন তীব্র সুখকে অনেক সময় মনে হয় যেন কোন অসহ্য বেদনা। মা অনবরত গল্প করে চলেছেন। গল্প না করেও তাঁর উপায় নেই।

আজকের এই বিপুল সুখকে তিনিও যেন নিজের হৃদয়ে ধরে রাখতে পারছিলেন না। বার বার মনে হচ্ছিল, কখন যেন কান্নার রূপ ধরে এ সুখ তার বুক ফেটে বেরিয়ে পড়ে।

মা অনবরত বলে চলেছেন, 'আহা এমন জায়গায় যদি আমি থাকতে পারতাম! এই লোকটির সঙ্গে থেকে তার কাজকর্ম্ম দেখতাম—মুরগীগুলোকে খাওয়ান, গাই-বাছুরগুলোর যত্ন করা, এ সব কাজ আমার খুবই ভাল লাগত। দুধ দোয়াতে শিখতাম আমি, ওর সঙ্গে গল্প করে আর নানা রকম কাজের পরামর্শ করে করে মহা আনন্দে সময় কেটে যেত। আমি যদি এ-বাড়ির গিন্নী হতাম তা'হলে এখানকার কাজকর্ম্ম বেশ গুছিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু মিসেস লিভারস্ যেন কি রকম···এ সব কাজে ওর একেবারেই উৎসাহ নেই, ক্ষমতাও নেই। ওকে এ কাজের ভার দেওয়া ঠিক হয় নি। ওর জন্যে আমার দুঃখু হয়, আর দুঃখু হয়, ঐ ভদ্রলোকের জন্য। আমি হলে ওকে যে স্বামী হিসাবে খুব খারাপ মনে করতাম তা নয়—অবশ্য মিসেস লিভারসও তার স্বামীকে খারাপ মনে করে, এমন কথা বলা উচিত হবে না। আর ভদ্রমহিলা খুবই অমায়িক প্রকৃতির।'

মে মাসের ছুটিতে উইলিয়ম বাড়ি এল, সঙ্গে তার সেই মেয়েটি। এক সপ্তাহের ছুটি। আকাশে-বাতাসে তখন খুশির আমেজ। সকালবেলা উইলিয়ম, লিলি আর পল এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুত। উইলিয়ম তার প্রণয়িনীর সঙ্গে বড় বেশী কথাবার্ত্তা কইত না, মাঝে মাঝে শুধু নিজের ছেলেবেলাকার কথা গল্প করে শোনাত তাকে। পল দু'জনের সঙ্গেই অনর্গল ব'কে চলত। মিনটনের গির্জ্জার পাশে যে বড় মাঠটা রয়েছে, তার উপর গা এলিয়ে শুয়ে থাকত ওরা তিনজন। একপাশে প্রকাণ্ড গোলাবাড়ি, তাকে ঘিরে পপলার গাছের উঁচু মাথাগুলো অবিরাম দুলছে। ঝোপ থেকে শাদা শাদা ফুল টুপ-টুপ করে ঝরে পড়ছে। সারা মাঠ ভ'রে ডেইজি আর রবিন্ ফুল যেন কার অজস্র হাসির মত ফুটে রয়েছে। উইলিয়ম এখন, তেইশ বছরের যুবক। ওর চেহারা আরও রোগা হয়ে গেছে, এমন কি শীর্ণই বলা চলে। রোদে শুয়ে শুয়ে উইলিয়ম কত কল্পনা করতে থাকত, আর লিলি তার নরম আঙুল বুলিয়ে দিত ওর চুলে। পল চলে যেত ডেইজি ফুল তুলে আনতে। লিলি তার মাথায় টুপি খুলে রেখেছে; ঘোড়ার কাঁধের চুলের মত ঘন কালো ওর চুল। পল এসে ডেইজি ফুলগুলো পরিয়ে দিতে লাগল ওর চুলে। শাদা আর হলুদ রঙ মেশানো ফুল, মাঝে মাঝে লালের ছোপ। পল বললে, 'এবার তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন যাদুকরীর মত। কী বল, উইলিয়ম?'

লিলি হেসে উঠল। উইলিয়ম চোখ খুলে চাইল তার প্রিয়তমার দিকে। তার দৃষ্টিতে কেমন বিষণ্ণতা, যেন সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, প্রশংসা করতে গিয়েও মন খুলে কথা বলতে পারছে না। হঠাৎ একটা দুরন্ত রাগে যেন ছেয়ে গেছে তার মন।

উইলিয়মের দিকে চেয়ে লিলি হেসে বললে, 'দেখ গো, তোমার ভাই আমাকে কি বানিয়েছে!'

—'তা বানিয়েছে বৈকি।' উইলিয়ম হেসে জবাব দিল।

ওর দিকে চেয়ে রইল উইলিয়ম। মেয়েটির সৌন্দর্য্য যেন বার বার তাকে আঘাত করতে লাগল। ওর পুষ্পসাজে সজ্জিত কেশদামের দিকে চেয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করল সে। বললে, 'তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তাই ত' তুমি জানতে চাও? তা বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে তোমাকে।'

টুপি খুলে রেখেই মেয়েটি হাঁটতে সুরু করলে। এক মুহূর্ত্তেই উইলিয়মের রাগ পড়ে গেল, আর নরম হয়ে এল তার মন। একটা পোলের কাছে এসে পোলের দেয়ালের গায়ে সে দু'জনের নামের প্রথম অক্ষর লিখে রাখল। হাতখানা শক্ত করে উইলিয়ম লিখে যাচ্ছে, ওর লোমশ হাত দু'টিতে কী অপরিমেয় দৃঢ়তা, লিলি মুগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল।···

উইলিয়ম আর লিলি যখন বাড়ি থাকত, তখন বাড়ির সমস্ত পরিবেশটাই যেন যেত বদলে। সারা বাড়ি জুড়ে যেন হৃদয়ের করুণা আর উষ্ণতার স্পর্শ পাওয়া যেত,—চিরন্তন কাঠিন্যের পরিবর্ত্তে বিগলিত কোমলতা। কিন্তু মাঝে মাঝে উইলিয়মের মেজাজ খারাপ হ'ত। আট দিন এখানে থাকবে, তারই জন্যে লিলি নিয়ে এসেছে পাঁচ প্রস্থ পোশাক আর ছ'টি ব্লাউজ। একদিন অ্যানিকে ডেকে লিলি বললে, 'আচ্ছা ভাই, আমার এই দুটো ব্লাউজ আর এই ক'টা জিনিস একটু কেচে দিতে পারবে না?'

পরদিন সকালে উইলিয়ম আর লিলি বেরিয়ে গেল, অ্যানি বাড়িতে বসে জামা কাচতে লাগল। মিসেস মোরেল রাগে অধীর হয়ে উঠলেন। মাঝে মাঝে উইলিয়মের চোখেও পড়ত তার বোনের প্রতি লিলির এই ব্যবহার, তার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠত।

রবিবার সকালে নীল রেশমের জামা পরে লিলিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাথায় ছিল ফিকে হলুদ রঙের টুপি, তাতে লাল গোলাপ ফুল বোনা। সবার মুখে প্রশংসা শুনে শুনেও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। সন্ধ্যাবেলা বাইরে বেড়াতে যাবার সময় আবার সে জিজ্ঞেস করল, 'ওগো, আমার হাতের দস্তানাগুলো দেখেছ?'

—'কোন্ গুলো?' উইলিয়ম প্রশ্ন করল।

—'ওই যে গো, নতুন কালো 'সোয়েডে'র দস্তানা জোড়া।'

—'না।'

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল। কোথাও পাওয়া গেল না। উইলিয়ম বললে, 'কাণ্ড দেখ মা। এই পাঁচ মাসে ও চার জোড়া দস্তানা হারিয়েছে—পাঁচ শিলিং ক'রে এক এক জোড়ার দাম।'

লিলি প্রতিবাদ করে উঠল, 'তার মধ্যে তুমি ত' দু'জোড়াই মোটে কিনে দিয়েছ।'···

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর উইলিয়ম উনুনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। লিলি বসেছিল সোফার উপর। উইলিয়মের বিরক্তি তখনও কমেনি। বিকেলবেলা সে একাই বেরিয়ে গিয়েছিল তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। লিলিকে একটা বই নিয়ে সারা বিকেলটা কাটাতে হয়েছিল। এখনও উইলিয়ম গিয়ে বসল একটা বই লিখতে। মা বললেন, 'লিলি, তুমি এই বইখানা নিয়ে বোস। বসে বসে পড় কিছুক্ষণ।'

লিলি বললে, 'ধন্যবাদ—আমার দরকার নেই। আমি চুপচাপ বেশ বসে থাকতে পারব।'

—'কিন্তু তাতে কি খুব ভালো লাগবে।'

উইলিয়ম তাড়াতাড়ি চিঠি লেখা শেষ করে খাম বন্ধ করল। বলল, 'বই পড়বে ও, তবেই হয়েছে। সারা জীবনে একখানাও বই পড়েছে নাকি ও?'

উইলিয়মের এই বাড়াবাড়ি মায়েরও ভালো লাগল না। তিনি বললেন, 'থাম না তুই, খালি যত্তবুড়ি।'

—'সত্যি মা।' উইলিয়ম এদিকে সরে এসে বললে, 'ও সারা জীবনে একখানাও বই পড়ে নি।'

মিঃ মোরেল বলে উঠল, 'ঠিক আমারই মত। বইয়ের মধ্যে নাক ডুবিয়ে বসে থাকা, তার মধ্যে কি যে আরাম আছে ওরাই জানে, আমি ত' বুঝি না।'

মিসেস মোরেল ছেলেকে বললেন, 'কিন্তু তাই বলে তোমার অমন কথা বলা উচিত হয় নি।'

—'আমি সত্যি কথা বলছি মা, ও পড়তে মোটেই পারে না। আচ্ছা, তুমি ওকে কোন্ বইখানা দিয়েছিলে?'

মা বললেন, 'কেন, ওই যে ছোট্ট বইখানা। রোববারের বিকেলে শুকনো নীরস জিনিস পড়তে কার ভালো লাগে?'

উইলিয়ম বললে, 'ও বই সে দশ লাইনও পড়ে নি, আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

মা বললেন, 'তোমার সব ভুল ধারণা।'

লিলি চুপচাপ সোফার উপরে বিমর্ষ মুখে বসেছিল।

উইলিয়ম তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি করে বলো ত' তুমি একটুও পড়েছ কিনা?'

—'হ্যাঁ, পড়েছি।' লিলি জবাব দিল।

'কতটুকু?'

—'আমি কি পাতা গুণে রেখেছি?'

—'আচ্ছা, যা পড়েছ তার থেকে খানিকটা বলো ত' দেখি।'

লিলি সে পথ দিয়েও গেল না।

বাস্তবিক সে দু'পাতার বেশী আর এগোয় নি। উইলিয়মের পড়বার অভ্যাস ছিল যথেষ্ট, আর বুদ্ধিও ছিল প্রখর। লিলি শুধু বুঝত প্রেমের গুঞ্জন আর হাল্কা গল্পগুজব। উইলিয়ম তার মনের প্রকৃতি পেয়েছিল মায়ের দিক থেকে; তার সমস্ত চিন্তাতে ছিল মায়ের মননশীলতার ছাপ। তার অন্তর যখন যথার্থ হৃদয়ের সঙ্গিনী খুঁজে বেড়াত, তখন লিলি চাইত সে যেন তার পাশে বসে প্রেমের কূজন করে। উইলিয়ম যখন বুদ্ধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে চাইত, তখন লিলি তাকে চাইত নিছক প্রেমিকের বেশে। কাজেই এই মেয়েটির উপর উইলিয়মের সমস্ত অন্তর তিক্ত হয়ে উঠত।

রাত্রে উইলিয়ম একা মায়ের কাছে বসেছিল। বললে, 'জান মা, টাকা পয়সা সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। সে দিকে ওর মাথাই খেলে না। যখন হাতে টাকা পেল, তখন হয়ত বাজে জিনিসে খরচ ক'রে বসে রইল। দরকারী জিনিস কেনবার টাকা আর থাকে না, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই সব কিনে দিতে হয়। তার সীজন-টিকিট, তার জলখাবার, এমন কি ওর নীচে পরার জামা-কাপড় পর্য্যন্ত আমাকে দিতে হয় বাধ্য হয়ে। অথচ ওর ইচ্ছে আমাদের বিয়ে হয়। আমিও ভাবছি সামনের বছরেই হয়ে যাক। কিন্তু এ ভাবে চললে,'—

মা বললেন, 'এ ভাবে চললে বিয়েটা যে চমৎকার হবে তাতে আর সন্দেহ কি! আমি হলে কিন্তু আর একবার ভেবে দেখতাম।'

উইলিয়ম বললে, 'কিন্তু এত দূর এগিয়ে গেছি মা, এখন আর ভেঙে দেওয়া চলে না। তাই যত তাড়াতাড়ি চুকে যায়, ততই ভালো।'

—'তুমি যা ভালো মনে কর। তোমার ইচ্ছে মতনই হবে, তোমাকে বাধা দিতে যাবে কে? কিন্তু তোমার কথা যখন ভাবতে বসি, আমার চোখে ঘুম আসে না, তা' জানো?'

—'না মা, তুমি ভেব না। ও ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের ব্যবস্থা আমরা করে নিতে পারব।'

মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওর নীচের জামা-কাপড় অবধি তোমাকে কিনে দিতে হয়?'

উইলিয়ম অপরাধীর স্বরে বললে, 'না, ও কখনও আমাকে মুখ ফুটে বলে নি ও কথা। একদিন সকাল বেলা দেখি ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ও কাঁপছে, কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করলুম: 'গায়ে গরম পোষাক জড়িয়ে এসেছ ত'?' বললে: 'তা ত' জড়িয়েছি।' তখন আবার জানতে চাইলুম: 'নীচের জামাকাপড় গরম ত'?' বললে: 'না, সূতির।' আমি বললুম: 'এই শীতে সূতির কাপড় পরে বেরিয়েছ কেন?' বললে, 'আর কিছু নেই ত' কি করব।' এই অবস্থা, অথচ বারো মাস সর্দ্দি-কাশি লেগেই আছে। বাধ্য হয়েই ওকে কিছু গরম পোশাক-আসাক কিনে দিতে হ'ল। অবশ্য টাকা হাতে থাকলে, এই খরচের জন্যে আমি পরোয়া করি না। তবে যাই বলো, অন্ততঃ নিজের সীজন-টিকিটখানা কেনবার মত পয়সা ওর হাতে রাখা উচিত। অথচ তার জন্যেও আমার মুখ চেয়ে থাকে, বাধ্য হয়ে আমাকে কিনে দিতে হয়।'

মিসেস মোরেল ঝাঁঝ দেখিয়ে বললেন, 'চমৎকার! ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে উঠতে আর দেরি নেই।'

বড়ো বিবর্ণ উইলিয়মের মুখ। বরাবরই তার মুখ রুক্ষ আকারের। কিন্তু আগে ছিল সদা-প্রফুল্ল আর চিন্তালেশহীন, এখন সেই মুখে নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব আর হতাশার ছবি।

উইলিয়ম বললে, 'কিন্তু এখন আর ওকে দূরে ঠেলে দিই কী করে? অনেক দূর এগিয়েছি যে। তাছাড়া ওর মধ্যে এমন কতগুলো জিনিস আছে, যা আর কারুর মধ্যে আমি পাব না।'

মা বললেন, 'কিন্তু বাছা, তুমি যে প্রাণ হাতে নিয়ে চলেছ

যে বিয়ে ব্যর্থতা আর নৈরাশ্যের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়, তার মত দুর্গতি আর কিছু নেই। আমাকে দেখেও ত' খানিকটা বুঝতে আর শিখতে পারো? যথেষ্ট বিড়ম্বনাই আমার গিয়েছে, কিন্তু এর চেয়ে আরও ঢের খারাপও ত' হতে পারত।'

চিম্‌নির দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে উইলিয়ম দাঁড়িয়ে আছে। হাত দু'টি পকেটে। লম্বা জোয়ান ছেলে, শক্ত হাড় গোড় দিয়ে তৈরি দেহ, দেখে মনে হয় ওর দৃঢ় সঙ্কল্পে বাধা দিতে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার মুখেও আজ হতাশার কালিমা, মায়ের দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারল না।

উইলিয়ম আবার বললে, 'এখন আর ওকে ছেড়ে দিতে পারি না।'

মা বললেন, 'বেশ, কিন্তু মনে রেখো বিয়ের কথা দিয়ে কথা ভাঙার চেয়ে আরও বড় অপরাধ অনেক রয়েছে।'

ছেলে বললে, 'কিন্তু এখন আর হয় না, মা!'

টিক টিক করে ঘড়িটা বেজে চলেছে। মা আর ছেলে দু'জনেই নীরব—দু'জনের মধ্যেই কী যেন এক বিরোধ আজ বেধেছে। ছেলে আর কোন কথা বলল না। খানিক বাদে মা বললেন, 'যাও, শুয়ে পড়ো গে। সকালবেলা মন ভালো হলে হয়ত ভালো করে সব কিছু ভেবে দেখতে পারবে।'

মাকে চুম্বন করে উইলিয়ম চলে গেল। মিসেস মোরেল একা বসে উনুনের কয়লা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আজকের মত এমন গভীর অস্বস্তি তিনি আর জীবনে কোন দিন অনুভব করেননি। স্বামীর সঙ্গে বহু বার তাঁর বিরোধ বেধেছে, বহু বার মনে হয়েছে তাঁর অন্তর খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে, তবু সে-বিরোধ কোন দিন তাঁর মনে এমন দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে নি। এবার যেন তাঁর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর অন্তর যেন গেছে পঙ্গু হয়ে, তাঁর সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

উইলিয়ম আজ-কাল বার বারই তার ভাবী বধূর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়িতে বসে সে মেয়েটির নামে নানা নিন্দা রটাচ্ছিল। বলছিল, 'জানো মা, তুমি হয়ত বিশ্বাসই করবে না, ও তিন বার দীক্ষা নিয়েছে, বোঝো একবার ও কেমন ধারা মেয়ে!'

মা হেসে বললেন, 'তোর যেমন কথা!'

—'না মা, যা বলছি একেবারে খাঁটি সত্যি। ওর কাছে দীক্ষার মানে—একটু ঘটা, একটু লোক দেখান, শুধু এই।'

মেয়েটি প্রতিবাদ করে উঠল, 'না, মিসেস মোরেল, সব মিছে কথা।'

উইলিয়ম চটে উঠল, ওর দিকে ফিরে বললে, 'বটে! তিন বার দীক্ষা নাওনি তুমি? একবার ব্রমলি-তে, একবার বেকনহ্যাম-এ আর একবার যেন অন্য কোথায়!'

লিলির চোখে জল এসে গেল, বললে, 'আর কোথাও নয়। আর কোথায়ও দীক্ষা নিইনি আমি।'

—'নিশ্চয়ই নিয়েছিলে। আর নাই বা যদি নিয়ে থাক, তবে দু'বারই বা কেন নিয়েছিলে বলো?'

মেয়েটি মিসেস মোরেলের দিকে চেয়ে ধরা গলায় বললে, 'দেখুন ত' মিসেস মোরেল, প্রথম বার যখন দীক্ষা নিই, তখন আমার বয়স মোটে চোদ্দ।'

মিসেস মোরেল বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, বাছা। ও পাগলের কথায় তুমি কান দিও না। আর উইলিয়ম, তুমিই বা কি সুরু করেছ বলো ত'? এমন কথা বলতে লজ্জা হ'ল না তোমার?'

—'যা সত্যি, তাই বলছি আমি। উনি ধার্ম্মিক, নীল ভেলভেটে মোড়া প্রার্থনার খাতা ওঁর আছে। কিন্তু তাই বলে ওই টেবিলের পায়াখানার মধ্যে যেটুকু ধর্মভাব আছে, ওর মধ্যে তার বেশী কিছু নেই। শুধু লোক দেখানো, ঘটা করে তিন বার দীক্ষা নেওয়া—সব কিছুতেই ওর শুধু জাঁক, শুধু বাইরের জৌলুষ!'

মেয়েটি সোফার উপর বসেছিল। সে আর কান্না চেপে রাখতে পারল না। মনে মনে ও একান্ত দুর্বল।

উইলিয়ম বলে চলল, 'আর ভালবাসার কথা যদি বল, তা'হলে একটা মাছিকেও বরঞ্চ বলতে পারো তোমাকে ভালবাসতে। ওর ভালবাসার মধ্যে তার চেয়ে বেশী পদার্থ নেই, শুধু উড়ে এসে জুড়ে বসা ছাড়া।'

এবার মিসেস মোরেল মেজাজ চড়ালেন। বললেন, 'আর বাড়াবাড়ি নয়, উইলিয়ম! ও-সব কথা বলতে হলে এ-বাড়ির বাইরে গিয়ে বলাই ভালো। তোমাকে দেখে আমার লজ্জা হচ্ছে—এই তোমার স্বভাব, এই তোমার পৌরুষ। যে মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করবে বলে ভেবে রেখেছ, তার সামনে শুধু তার কুৎসা রটিয়ে বেড়ানো, এ ছাড়া আর কিছু তোমার কাজ নেই?'

গভীর ক্ষোভে আর বিরক্তিতে মিসেস মোরেল নীরব হয়ে গেলেন।

উইলিয়ম খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর অনুতপ্ত হয়ে মেয়েটিকে চুম্বন করে সান্ত্বনা দিল সে। তবু সে যা বলেছিল, তার মধ্যে এক বর্ণ মিথ্যে ছিল না। মনে মনে মেয়েটিকে সে ঘৃণা করত।

ছুটির শেষে তারা যখন চলে যাবে, মিসেস মোরেল ওদের এগিয়ে দিতে গেলেন নটিংহাম অবধি। বাড়ি থেকে ষ্টেশন অনেকটা দূর। যেতে যেতে উইলিয়ম বললে, 'কী জানো মা, জিপ মোটেই গভীর নয়। কোন কিছুকেই ও গভীর ভাবে নিতে জানে না।'

মা বললেন, 'উইলিয়ম, এ ছাড়া কি আর কোন কথা নেই। আমি চাইনে তুমি এ সব কথা বলো।' মেয়েটি তাঁর পাশে পাশেই হেঁটে চলছিল, তার জন্যে গভীর অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন তিনি। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

মনোদা দেবী

দিদির বিবাহ

স্থান—বিক্রমপুর, জিলা—ঢাকা, সোনারঙ্গ গ্রামে

আমার বয়স যখন কেবল মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কিংবা হয় নাই ঠিক মনে পড়িতেছে না। মস্ত বড় বাড়ীখানাতে মস্ত বড় এক বিরাট ব্যাপারের সূচনার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই অবসরে সেই ছত্রিশখানা ঘর সংযুক্ত বাড়ীখানার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে হইল। বাড়ীখানা ছিল প্রচুর জমি লইয়া একটি বৃহৎ পাড়া বা হাটের মত। লোকজনও ছিল বহু। সুতরাং বাড়ীখানা যেমন মস্ত ছিল, তদনুযায়ী লোকজনের উপস্থিতির কোন ত্রুটি ছিল না। বাড়ীখানা বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন জনবহুল গৃহস্থদের প্রায়ই ঐরূপ থাকিত। বাড়ীর সর্বপ্রথমেই বাড়ী-রক্ষক মুসলমান সর্দ্দারদের (এখন তাহা ভাবিতে বা বলিতে যেন মনে কত ব্যথা-বেদনায় হৃদয় ভরিয়া যায়।' তখন সেই মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে গৃহস্থেরা ধন, প্রাণ, এমন কি মান-সম্মানকে গচ্ছিত রাখিয়া নিরুদ্বেগে কর্মস্থলে বা জমিদারী রক্ষার্থে দূর-দূরান্তে নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সর্দ্দারগণও তাদের প্রভুর ধনসম্পদ ও মান-ইজ্জৎ রক্ষার জন্য দিবা-রাত্রি কায়-মনে-প্রাণে বিনিদ্র যামিনী কাটাইয়া তাদের সমস্ত জীবনকে প্রভুর পদে উৎসর্গ করিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিত। থাকিবার ও রান্না-খাওয়ার ঘর। তারপরে দূর-দূরান্তের অপরিচিত অতিথি অভ্যাগতদের থাকা ও রান্না খাওয়ার ঘর। তারপরে দুর্গামণ্ডপ ও বৈঠকখানা ইত্যাদি ঘর। তার পরের খণ্ডেই ঠাকুর, চাকর, মালী ইত্যাদি থাকিবার ঘর। এর পরেই গৃহদেবতা লক্ষ্মী, গোবিন্দ ও নারায়ণ, শালগ্রামের বাসগৃহ অর্থাৎ গোঁসাই-মণ্ডপ। তারপরই ভিতর বাড়ীর মস্ত বড় বড় আটচালা ও চৌচালা ঘর ইত্যাদি ও সর্ব্বশেষ খণ্ডে রান্না, খাওয়া ও জল পরিষ্কারের কলের ঘর অর্থাৎ ঐ ঘরে কাঠের ফ্রেমে-আঁটা থাক্-থাক্ করা উঁচু উঁচু মঞ্চের মত দাঁড়ান থাকিত এবং এক একটি থাকে বড় বড় হাঁড়ি ফুটা করিয়া রাখিয়া তাহাতে যথানিয়মে জল, কয়লা ও বালি রাখা হইত। বড় হইয়া জানিয়াছিলাম, ইহা না কি আমার ৺পিতার ব্যবস্থামত স্বাস্থ্যের জন্য করা হইয়াছিল। আমার ছোট পিতামহ ৺মুকুন্দচন্দ্র সেন (ডাক্তার) মহাশয়ও ইহাতে খুব উৎসাহিত হইয়া চীনামাটির প্রস্তুত দু'-তিনটি জল পরিষ্কারের জন্য ফিল্টার গ্রামের বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। গ্রামে কোন কোন সময় পানীয় জল দূষিত হইয়া উঠিত। সে সময় পরিস্রুত জলের অতি আবশ্যকতা সকলেই অনুভব করিত। এর পরে আমাদের পুরানো বাড়ীতেও (মাখন সেনের বাড়ী) এই নিয়মে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কল-ঘরের এক দিকে দাসী-চাকরাণীদিগের থাকা ও শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া চাউলের ঘরটিকে অধিক করিয়া স্মরণের দু'-একটি বিশেষ কারণ ছিল। সে-ঘরটি কোলাহল হইতে নিজকে একটু দূরে রাখিয়া বৌ-ঝিদের আড্ডা জমাইবার পক্ষে খুবই সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, কারণ, কাজ-কর্ম্মের পরে অথবা কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বৌ-ঝিরা ঐ ঘরখানাতে নিরুদ্বেগে ঘোমটা খুলিয়া, গলা ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ করিয়া খুব খুসী হইত। বয়স যদিও আমার খুবই কম ছিল, কিন্তু ঐ স্বাধীনতার আনন্দটুকুর যেন অংশ-ভাগিনী হইয়া যাইতাম। তার পরে চাউল তুলিতে মাঝে মাঝে কাঙ্গাইলা ভাই ঘরে যাইত, কোন কোন দিন মাটিতে পোঁতা বিরাট মট্‌কী হইতে চাউল উঠাইবার ব্যাঘাত হইয়া যাইত, অর্থাৎ চাউল কমিয়া গেলেই হাতে যখন আর চাউল তোলা যাইত না! তখন আমাদের মত ছোটদের ঐ মট্‌কীর মধ্যে নামাইয়া দিয়া ছোট ছোট ডালা ভরিয়া চাউল তুলিয়া দিতে বলা হইত। আমরা ত' এই কাজের জন্য মহা আনন্দে কে কার আগে মটকীর ভিতরে ঢুকিব তার দিশা পাইতাম না। ঐ ঘর ও তার স্মৃতিটুকু যেন কিছুতেই ভুল হইয়া যায় নাই। মট্‌কীগুলি বৃহদাকার। এক একটি মট্‌কীতে বিশ হইতে পঁচিশ মণ পর্যন্ত ধান-চাউল রাখিবার ব্যবস্থা হইত। বহু বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মটকীগুলি তার অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ সেদিনও যেন শূন্যগর্ভাবস্থায় অতি দৈন্যতা লইয়াই দাঁড়াইয়াছিল।

এত বড় বাড়ীতে কোন দিকে কখন কি ঘটিত তাহা অনেকেই অনেক সময় খোঁজ-খবর রাখিত না বা পাইত না। এক দিন বাহির বাড়ীর খণ্ডে ছুটিয়া যাইতেই দেখিলাম, বৈঠকখানা ঘরের সামনে পাশের দিকে খুব লম্বা লম্বা মোটা থাম পুঁতিয়া তাহার উপরে ছোট একখানা ঘর তোলা হইয়াছে। আমি তো দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ঘরে উঠিবার সিঁড়িও দেওয়া আছে। আমি সামনে দেখিলাম ঠাকুর-কাকাকে ও কাঙ্গাইলা ভাইকে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ঘর কার? কে থাকিবে?' দু'জনেই হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং আমাকে বলিল, 'তোমার দিদির বিয়া। ঐ টঙ্গ-ঘরে বাজ্জকার উঠিয়া যাইয়া বাজ্জ বাজাইবে।' আমার বিশ্বাস হইল না। একেবারে ছুটিয়া মার কাছে যাইয়া সব বলিতেই তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ, কুড়ি দিন বাদেই তোমার দিদির বিয়া হইবে।' আমি তো অবাক! বিয়া

কি। এবং সে বস্তুটাই বা কেমন? তাই শুধু বারংবার মনের মধ্যে তোলপাড় হইতে লাগিল। টঙ্গ-ঘরকে তিনি নহবৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। আমিও ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরকাকা ও কাঙ্গাইলা ভাইকে বলিলাম, উহা টঙ্গ-ঘর নহে—মা বলিয়াছেন, "নব-নব হতি", যেই বলা, উহারা খুব হাসিয়া উঠিয়া আমাকে বলিল, 'উহা নগদখানা।'

বাস্—কোনটাই আমার বলিবার যোগ্য ভাষা হইল না। শেষে আমি টঙ্গ-ঘরটাই সহজ সরল মনে করিয়া লইয়াছিলাম। কোন এক শুভ দিনে ঐ ঘরে বাদ্যযন্ত্র সহকারে কয় জন লোক পিঁড়ি দিয়া সেই টঙ্গ-ঘরের মধ্যে যাইয়া নাগাড়া, টীকাড়া ইত্যাদি বাজাইতে সুরু করিতেই পাড়ার বহু বহু ছোটর দল আসিয়া হাততালি দিয়া নাচিয়া বাড়ীখানাকে মুখরিত করিল। বলা বাহুল্য, সে আনন্দ ও নৃত্যের মধ্যে আমাদের বাড়ীর ছোটর দলটিও সেই হাততালি ও নাচের আসরকে পরিপুষ্ট করিতে ত্রুটি করে নাই। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় বাদ্যকাররা ঐ টঙ্গ-ঘরে বাজনা বাজাইয়া বিবাহের বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। এক সময় মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! এমন ভাল বড় সুন্দর বাদ্যকারের ঘর থাকিতে ঐ ছোট টঙ্গ-ঘরে কেন উহারা উঁচুতে উঠিয়া বাদ্য বাজায়?' মা বলিলেন, 'ঐ উঁচু ঘর হইতে বাজনা বাজাইলে বহুদূর হইতে লোকেরা জানিতে পারিবে তোমার দিদির বিয়া। দেখিবে কত লোক-জন আসিবে, হৈ-হল্লা কত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।' বুঝিলাম এই সবই দিদির বিয়ার জন্য, কিন্তু বিয়াটা কি তাহাই কেবল মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল। দিন দিনই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে কেবল হৈ-হল্লা করিয়াই আমাদের ছোটদের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। দিন দিনই দলে দলে লোক-জন—ছোট-বড়-বৃদ্ধা সকলেই হৃষ্ট চিত্তে আসিয়া উঠানে জড় হইতে লাগিল। দিদিমার আদেশে চাকর ও দাসীগণ উঠান জুড়িয়া হোগলা বিছাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, এই সব লোকজন নিম্নশ্রেণীর—বর্ত্তমানে মহাত্মাজীর হরিজন। সকলকে যত্ন করিয়া বসিতে বলিয়া পাণ, তেল, সিন্দূর ও দু'হাত ভরিয়া বাতাসা বিতরণ করা হইত। বিবাহের বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই এই আনন্দ ব্যবস্থার বরাদ্দ হইয়াছিল; দিদিমা উঠানে নামিয়া হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বলিতেন, 'আশীর্ব্বাদ করিবা যেন এই শুভবিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হয় এবং সর্ব্বমঙ্গল হয়,' ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন দলের বউ ও মেয়েরা নিজ হইতে নাচিয়া গান গাহিবার নিমন্ত্রণ লইয়া যাইত এবং যে কোন দিন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া গান করিবার জন্য দাঁড়াইয়া যাইত। বাড়ীর সবাই ও দিদিমা তাহাদের অতি সমাদরে বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন

ও তাদের পাণ ও সিন্দূরের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিতেন। গানের শেষে বাড়ী যাওয়ার সময় দু'হাত ভরিয়া বাতাসা পরিবেশন করা হইত। গানের সুরটা এখনও যেন কানে লাগিয়া রহিয়াছে। অতি চিৎকার, তবে মাঝে মাঝে শ্রুতিমধুরও ছিল না তাহা বলা চলে না। এর মধ্যে একটি খুব মজার বিষয় ছিল এই যে, প্রতি দুই জন করিয়া জোড় বাঁধা থাকিত, প্রথম এক জোড় গাহিয়া যাইত পরে অপর ফের গান ধরিত। এক হাত লম্বা ঘোমটার মধ্য হইতে নানা কাহিনীযুক্ত গান গাহিত। গানের জুড়ী দুইটি, কিন্তু তাদের সুদীর্ঘ ঘোমটা দু'টিকেও মুখামুখি করিয়া জুড়িয়া লইয়া গান করিত; কিছুতেই তাহাদের মুখ দেখা যাইত না। গানের সুর তাদের গ্রামান্তরে যত কেন চলিয়া যাউক না—কিন্তু তাদের তেল, সিন্দূরলিপ্ত মুখগুলি সকলের অদৃশ্যেই থাকিয়া যাইত! আমরা ছোটরাও সকল বিষয়েই অতি উৎসাহী। সুতরাং গায়িকাদের মুখ না দেখিতে পাইলে গান শুনিতে ভালোই লাগিত না। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া গায়িকাদের মুখ দেখার চেষ্টা করিয়া হয়রাণ হইয়া যাইতাম। হঠাৎ কোন কোন সময়ে বিদ্যুতের মত ক্ষণকালের জন্য আমাদের সুযোগ-সুবিধাও হইয়া যাইত, অর্থাৎ তেষ্টার সময় জল ও মৌতাতের সময় পাণ খাওয়ার উপলক্ষ্যে। গানের অর্থ কিছুই বোধগম্য হইত না, তবে কি না রাম ও সীতার বিবাহের কথাই যেন গানের পদাবলী ছিল মনে পড়ে। আমাদের ছোটদেরও গান শুনিবার তেমন আকর্ষণ কিছুই ছিল না, তবে একটা কিছু অজুহাত পাইলেই হইল, হৈ-হল্লার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারিলেই মহা আনন্দ!

এই ভাবে অতি দ্রুত গতিতে যেন দিদির বিয়ার দিন আসিয়া পড়িতে লাগিল। কত গ্রাম, শহর ও কত দূর-দূরান্তর হইতে কত লোক-জন, ছোটর দল আসিয়া অত বড় বাড়ীখানা ও অতগুলি ঘর সবই যেন পূর্ণ করিয়া দিল। নিত্য নূতন খেলার সাথী—খেলিয়া খেলিয়া যেন কূল পাইতেছি না। বহু দিনের কথা, অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। বহু বিচিত্র ঘটনাগুলি যেন মনের দুয়ারে উঁকি দিতেছে সন্দেহ নাই। তবে তন্মধ্যে দিদির বিবাহ ব্যাপারটিই যে খুব মধুময় আনন্দের উজ্জ্বল চিত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিবাহ যে কি, তাহা ত' জানি না, বুঝি না কিছুই। এর আগে পুতুলের বিবাহ দিয়াছি বহু বার, জামাই-বৌর আদান-প্রদান সমবয়সীদের মধ্যে বহু বার হইয়াছে। আবদার করিয়া মার নিকট হইতে ভাল ভাল খাবারও বরযাত্রীদের জন্য সংগ্রহ করিয়া আতিথ্য ও সম্বর্দ্ধনার অভিনয়ও বেশ ভালো ভাবেই করিয়াছি। সত্য সত্য খাবার—লুচি, মণ্ডা ও সরভাজারও কোন অপ্রতুল ছিল না মার কৃপায়। মাতা ঠাকুরাণী আমার এ সকল আবদারই খুব সন্তুষ্ট চিত্তে প্রতিপালন করিয়া যাইতেন। ভাবিতাম, এইরূপই একটা খুব বড় রকমের বিবাহের খেলা হইবে; খুব লোকজন বাদ্য-বাজনা ও খুব ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি। রাস্তা দিয়া লোকজন চলিয়া যাইতে যাইতে বলাবলি করিতেছিল 'ঐ নগদখানা উঠিয়াছে—ডেপুটি বাবুর নাতনীর বিয়া।' কেহ কেহ বলিয়া চলিল, 'আনন্দবিশারদের নাতনীর বিয়া।' দিদির বিবাহ যেন গ্রাম ছাড়াইয়া বহু দূর গ্রামে ও বন্দরে গিয়াও হাজির হইয়া গেল। বন্দর হইতে কত দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল। সবই দেখিয়া দেখিয়া যেন কূল পাইতেছিলাম না। তবুও মনে হইতেছিল, আমার পুতুল বিয়ার মতই একটা খুব বড় বিয়া।

তখনকার দিনের কথা মনে হইলে কি যে অদ্ভুত পট পরিবর্ত্তন দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে! সামান্য তেল, সিন্দুর, পান ও হাত-ভরা বাতাসা দিয়া কি সুন্দর সহজ-সরল আনন্দের আস্বাদন লাভ করা—যাহা এখনকার লোকেরা ভাবিতেই পারে না। ভাবে এ কী অসভ্যতা! যাক সে কথা। দেখিতে দেখিতে দিদির বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। টঙ্গ-ঘরের বাজনাও খুব বাড়িয়া চলিল। এখনও মনে পড়ে সেই তেল, সিন্দুর, পান, বাতাসার গ্রহীতা ও দাতার সমান সরলতার কি স্নিগ্ধ মধুর প্রতিমূর্ত্তি! কালের স্রোতে সেই সহজ-সরল আনন্দের নৈবেদ্য বিতরণ ও সেই সহজ আনন্দ, ঘোর জটিলতাময় বহু অর্থব্যয়ের সাপেক্ষ রূপ ধরিয়া মানব-জীবনে বহু দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে আমোদ-আনন্দ করিতে গেলেই ঘরের সাজ-সজ্জা ও নানা কারণে বহু অর্থব্যয় জনিত দুশ্চিন্তায় আনন্দ উৎসাহ মনে ঠাঁই পাইতে পারে না।

দিদির বিবাহের দিন ক্রমেই নিকট হইয়া পড়িল, বাড়ীর লোকজন যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবসর পাইতেছিল না। আমরা ছোটরা কেবল অন্দর ও বাহির—বাড়ীতে ছুটাছুটি করিয়া, হৈ-চৈ করিয়া বাড়ীখানাকে একখানা মস্ত বড় হাটের সামিল করিয়া তুলিলাম। মস্ত বড় মস্ত কারুকার্য্যময় বিরাট সামিয়ানা টাঙ্গান হইল। অপর খণ্ডে খণ্ডেও আবশ্যক বোধে ছোট, মাঝারী রং-বেরংএর সামিয়ানা টাঙ্গান হইতে লাগিল। আমাদের তো সবটাতেই মহা আনন্দ! নাওয়া-খাওয়াও যেন ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। কাঙ্গাইলা ভাই ও ঠাকুরকাকা প্রভৃতি মাঝে মাঝে খুব বকাবকি করিয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত রান্নাঘরে। তখন বাধ্য হইয়া কোন প্রকারে 'খাওয়ার পর্ব্ব 'শেষ করিয়া ফেলিতাম ও মুখ ধুইয়াই আবার সেই হৈ-হল্লার মধ্যে ডুবিয়া যাইতাম। যথাসময়ে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বিবাহের আসর ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদিতে অপরূপ শ্রী ধারণ করিল, রাত্রিতে দিদির বিবাহ হইবে। বিবাহের স্থানে আলো দিয়া দিনের মত আলোকিত করিল। রাস্তা-ঘাট ও সকল খণ্ডে মশাল জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। কাহারও চলা-ফিরার কোনই যেন অসুবিধা না হয়। এই ভাবে সকল আলোকসজ্জার বন্দোবস্ত হইয়া রহিল। বহু বাজনার আমদানী হইল। কোন আনন্দ ফেলিয়া কোন আনন্দে যে ছোট আমরা যোগ দিব, তাহার যেন কোন ঠিক-ঠিকানা পাইতেছিলাম না। এদিকে 'জামাই আসিয়াছে', 'জামাই আসিয়াছে' মহা কলরব উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানা একেবারে যেন কি অপরূপ হইয়া গেল! জামাই তাদের আত্মীয় বাড়ীতে উঠিয়াছে। বিবাহের শুভ লগ্নে আসিয়া দাঁড়াইবে ঐ সুসজ্জিত আসরখানাতে সামিয়ানার নীচে। এই কয় দিনেই নবাগত ছোটদের হইতে বিবাহ কি, সে জিনিসটার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম। সারা দিনের আনন্দ-উল্লাসের পরিশ্রমে একটু রাত হইতেই কখন যে আমি অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা জানিতেই পারিলাম না। দুই দিকের

কত বাজী-বাজনা হুলুধ্বনি হইয়া দিদির বিবাহ হইয়া গেল, আমি কিছুই টের পাইলাম না। গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াই রহিলাম। সকালে ঘুম হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়াই আমার মনে পড়িয়া গেল "দিদির না বিয়া"! কেন যে এমনটি হইয়া গেল, তাহা একটু বড় হইয়া চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলাম। বিবাহের লগ্ন ছিল বোধ হয় গভীর রাত্রে—তখন ঘুমের মানুষটি আমাকে অধিকার করিয়াছিল। তুলিলে একটি বড় রকমের অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। মা কর্ম্মে ব্যস্ত, হয়ত বায়না ধরিব মার কাছে শুইবার জন্য।

সে যাহা হউক, কেহ কেহ আমার এই দুঃখের জন্য দুঃখও করিয়াছিল। এক মাস পূর্ব্ব হইতে যে বিবাহ দেখার জন্য নাচানাচি করিয়া দিন কাটাইলাম, সে বিবাহ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার দেখা হইল না! সকাল বেলা তাড়াতাড়ি দিদির খোঁজে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলাম, মস্ত বড় ঘরখানাতে অনেক লোক ভীড় করিয়া রহিয়াছে। আমিও সে ঘরে ভীড় ঠেলিয়া ঢুকিয়াই দেখিতে পাইলাম, একখানা নূতন তোষক-লেপ-বালিশের বিছানার এক পাশে দিদি লাল টুকটুকে কাপড় পরিয়া সেই গান গাহিবার দলের বৌদের মত মস্ত বড় এক হাত লম্বা একটি ঘোমটা দিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি আর তখন এ-দিক ও-দিক কিছুই না দেখিয়া সটান আমার একরাশ চুল সমেত মাথাটাকে দিদির ঘোমটার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "দিদি, দিদি! তোর না লো বিয়া!"

সেনজী তের বৎসরের বালক; বরশয্যায় শুইয়া ছিলেন। তিনি হো-হো করিয়া হাসিতেই সে ঘরের উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল। আমি ত' লজ্জা পাইয়া সেখান হইতে একেবারে দে ছুট—পড়ি বা মরি জ্ঞান ছিল না। যাক, সে হাসাহাসির পরে বাকী বিবাহের ঘটা দেখিলাম। দুই দিককার নানারূপ বাজনার চমৎকারে সবাই মুগ্ধ, আমাদের ন্যায় ছোটদের তো কথাই নাই। তার মধ্যে বরপক্ষের একটি বাদ্যযন্ত্রের কথা বিশেষ করিয়া আজও যেন মনে রহিয়া গিয়াছে। বাদ্যযন্ত্রটি পিতলের বলয়াকার, অভ্যন্তরে বাদকের সমস্ত শরীর ঢুকাইয়া দিয়া মাত্র একটি সরু নল ওষ্ঠাধরে লাগাইয়া বাজাইতে ছিল এবং তার স্বর অতি অদ্ভুত মনে হইতেছিল। ঐরূপ বাদ্যযন্ত্র আর এই সুদীর্ঘ জীবনে দ্বিতীয় বার দেখি নাই এবং উহার নামও জানি না। শুধু আমরা ছোটরাই যে এই বাদ্যযন্ত্রের রূপ ও গুণে আনন্দে হৈ-চৈ করিয়াছিলাম, তাহা নহে, বাড়ীর উপস্থিত শত শত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই বাদ পড়িল না। এদিকে এই বাদ্যযন্ত্রের নূতনত্বের সংবাদ দূর দূর গ্রামেও যাইয়া পৌছিল। যে পারিল ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া খুব হাসাহাসি করিয়া চলিল। এর পরে ক্রমে আসিয়া পড়িল কন্যা লইয়া বরের দেশে যাত্রাভিনয়। সেও একটি দৃশ্য বটে! দেখিলাম দিদিমা (ঠাকুরমা), ঠাকুর খুড়া (উমেশচন্দ্র সেন) প্রভৃতি দিদিকে ঘেরিয়া কোলে লইয়া বসিয়া খুব কান্নাকাটি করিতেছেন। বাড়ীর নিকটতম আত্মীয় স্বজন তো আছেনই, দর্শক হিসাবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই যেন সেই কান্নাতে যোগ দিতে লাগিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়াছিলাম মনে পড়ে, কিন্তু এত আনন্দ দৌড়ঝাঁপের মধ্যে এই কান্নাটাকে যেন তেমন ভাবে অনুভব করিয়া লইতে পারিতেছিলাম না। বড় হইয়া পরে এই কান্নার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। এত যত্নে আদরে প্রতিপালিতা মেয়েকে জন্মের মত নিজ স্বত্ব-স্বামিত্ব ত্যাগ করিয়া পরের হাতে তুলিয়া দিতে তাঁদের বুকফাটা কান্না সহজেই আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া আমরা দুই বোন ছিলাম পিতৃহীনা—তখন সে কথাটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়া নদীটি যাইয়া সাগরে পতিত হওয়ার রূপ পরিগ্রহ করিল। দিদির বয়স অল্প ছিল, মাত্র এগারো বৎসর। (অবশ্য সেকালে আট-নয় বৎসরে গৌরীদানই প্রশস্ত ছিল)। এই সময়ের একটি কথা খুবই মনে পড়িতেছে। ঠাকুরমা মাকে খুব বকাবকি করিতেছিলেন অর্থাৎ মেয়েটা চলিয়া যাইতেছে তবু তার এখনও কেবল কাজই বেশী হইল! ইত্যাদি।

মা তাড়াতাড়ি আসিলেন। তাঁহারও চোখের জলের অভাব ছিল না, তবে সে যে বাড়ীর 'বড় বৌ'—সকল দায়িত্ব কর্ত্তব্য যে তার মাথার উপরে! তাই যখন তখন তার ছুটিয়া আসা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। ঠাকুরমা সবই বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও মেয়েটার উপর নিষ্ঠুর মনে করিয়া মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। যে যাহা হউক, পূর্ণানন্দের মধ্যে অবারিত চোখের জলের ভিতর দিয়া নবদম্পতীকে ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট সুখ-দুঃখের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন সবাই। বিরাট বজরা বিরাট শোভাযাত্রার সঙ্গে বর-কন্যা লইয়া ময়ূরপংখী নায়ের ন্যায় চলিল তার গন্তব্য পথে। কে জানিত, দিদির সোহাগ-ধূলা মাপিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যবিধাতা তাদের ভবিষ্যতের জন্য কি মর্ম্মান্তিক ব্যবস্থারই বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপরে ভ্রাতৃস্নেহের উন্মেষ ও মমত্ববুদ্ধির সূচনা। আমার সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। এক দিন দেখি, মহা হৈ-হল্লা চলিয়াছে। ছুটাছুটি করিয়া সবাই যেন কি এক মজা দেখিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। আমিও কিছুই না বুঝিয়াই উহাদের সঙ্গ লইয়া ছুটিয়া চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে সবাই আমাকে বলিয়া চলিল, "তোমার একটি ভাই হইয়াছে। বড় হইয়া তোমাকে দিদি বলিয়া ডাকিবে।" আমিও জনতার মধ্যে অগ্রগামী হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। দেখিলাম একটি ঘরের দুয়ারে ভীড় করিয়া সবাই কি দেখিতেছে। আমিও ভীড় ঠেলিয়া উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতে গেলাম। দেখি, মার কোলে একটি ছোট মানুষ, তাকে সবাই বলিতেছিল আমার ভাই। কি সুন্দর কোঁকড়ান চুল, নিটোল নবনীতুল্য ক্ষুদ্র দেহখানা অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। বিস্ময়ে আমি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। অপরূপ শিশুটি হাত-পা নাড়িয়া ওঁয়া-ওঁয়া শব্দ করিতেছিল। ক্রমে দেখার ভীড় কমিয়া আসিতে লাগিল। পরে জানিলাম 'ওঁয়া' শব্দই নাকি শিশুর কান্না। আমি কিন্তু শিশুর ঘরের দরজা হইতে একটুও নড়িলাম না। কেবল অপূর্ব্ব শিশুমূর্ত্তি দেখিয়া কি আনন্দে ভরপুর হইয়া গেলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই তো আমার ভাই। বড় হইয়া দিদি ডাকিবে আমাকে। কে যেন মনের মধ্যে বলিয়া দিল, এই আমার ভাই। এমন অপরূপ আনন্দময় রূপ তো আর দেখি নাই! ঘরের দুয়ারে আমি অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা ভাবিলেন, মার কোলে শিশুটিকে দেখিয়া বুঝি বা আমার মনে কোনো ভাবান্তর হইয়া থাকিবে। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "এই তোমার ভাই, বড় হইয়া

তোমাকে দিদি ডাকিবে।" ভাইটি ছিল আমার খুড়াত ভাই (পরে নামকরণে ধীরেনচন্দ্র সেন)। মার কোলে ভাইটিকে দেখিয়া আমার কিন্তু মনে কোনো ক্ষোভের কারণ হয় নাই। মার কাছ ছাড়া আমি ত' কোন দিন কারো কাছে রাত্রিতে শুইতাম না, সে কথা সবাই জানিত। মার মনে কিন্তু সেই একটা মস্ত বড় ভাবনা হইল। আমি হয়ত মার কাছে শুইবার জন্য কান্নাকাটি করিব। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আমি ভাইকে কোলে নিব।" আমার এ কথা শুনিয়া সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এই সদ্যোজাত শিশুকে কি অন্যের কোলে দেওয়া সম্ভবপর? তবে মা একটা কথা চিন্তা করিয়া স্বীকৃতা হইলেন। কারণ এই সদ্যোজাত শিশু ও প্রসূতিকে অন্য কোন লোকজনের জিম্মায় রাখা চলে না। মাকে উঁহাদের লইয়া থাকিতেই হইবে সবাই সে কথা জানিত। মা একটু বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলেন, "তোমার কোলে ভাইকে দিব। কিন্তু তুমি যদি আমার একটা কথা রাখ।"

আমি তো কথাটির গুরুত্ব ইত্যাদি কিছুই চিন্তা বা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলাম, "তোমার কথা শুনিব।" মা বলিলেন, "তুমি আমার কাছে শুইতে পারিবে না—আমি ভাইকে তোমার কোলে নিশ্চয়ই দিব।" আমি ত' তখনই স্বীকার হইয়া গেলাম। কেবল মা বুঝিলেন, ভাই কোলে নেওয়ার লোভে আমি কত বড় মস্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়া বসিলাম। মার কাছ ছাড়া শোওয়া এই যে তোমার প্রথম দিন। "না আমি তোমার কাছে আর শুইব না ও তোমার জন্য কাঁদিব না।" এই কঠোর সর্ত্তে মা আমাকে আঁতুড় ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন ও ভাল ভাবে বসাইয়া দিয়া ভাইটিকে আমার কোলে নিজ হাতে ধরিয়া রাখিলেন। কি যে আনন্দ! এই ত ভ্রাতৃস্নেহের প্রথম উন্মেষ। ভাবিতে লাগিলাম ভাইটি ত' বড় হইয়া আমাকে দিদি ডাকিবে। ভ্রাতৃস্নেহে সেদিন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় হইলেও যেন সে এক অপূর্ব্ব স্নেহের রসে আপ্লুত হইয়া গেল! ভাইয়ের মধুর স্পর্শ-সুখ আজও মনে হইলে যেন নাচিয়া উঠে সমস্ত হৃদয়খানা। কিছুক্ষণ পরেই আমাকে আঁতুড় ঘর হইতে বাহিরে আসিতে হইল এবং ভালো রূপে স্নানাদি করাইয়া শুচিতার সহিত আমাকে ঘরে লইয়া গেল সবাই। আমি তখন ভ্রাতৃস্নেহ মমতায়, অন্য চিন্তা আমার কিছুই নাই। কেবল ভাইটির অপরূপ ছবি ও অপরূপ স্পর্শানুভবে যেন ডুবিয়া রহিলাম। বিছানায় শোয়াইয়া দিল সবাই অনেক কথা বলিয়া কহিয়া, অর্থাৎ ভাইটি যে আমারই ভাই সে মমত্বজ্ঞান-টুকুকে অতি বড় করিয়া ধরিয়া দিল আমার চক্ষুর সামনে মনের দুয়ারে। ভ্রাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব আবেশে ও ভ্রাতৃমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু হায়! ইত্যবসরে বিধাতা পুরুষের চিত্রগুপ্ত তার পাকাখাতায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসী টানিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন, ভাই-বোন দুটিকে চিরজন্মের মত 'শোকাতুর' পর্য্যায়ে !!

[ক্রমশঃ।

আম্রফল কি অমৃত ফল?

শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য

স্বাদে-গন্ধে রসে পরিপ্লুত পক্ব সুমিষ্ট আমটি খেতে খেতে মনে প্রশ্ন জাগে—আম্রফল কি অমৃত ফল?

অমৃত ফলের বৃক্ষ বলেই হয়তো ওর পল্লবে আচ্ছাদিত হয় পূজার মঙ্গল ঘট! আর মূল থেকে পত্র ও ফুল থেকে ফলের আঁটি-খোসাটি পর্য্যন্ত আসে মানুষের উপকারে।

প্রথমতঃ পত্র থেকেই শুরু করি—আমাদের সকল শুভ কাজেই আম্রপল্লবটির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। লক্ষ টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিন, তাতেও একটি আম্রপল্লব ছাড়া সবই পণ্ড—আবার হাজার টাকা খরচ করে দুর্গা পূজা করতেও প্রথমেই ঘট বসাতে যেয়ে আপনাকে যোগাড় করতে হবে আম্রপল্লবটি। অন্নপ্রাশন হতে বিবাহ, আর দুর্গা পূজা থেকে লক্ষ্মীব্রত সবটাতেই আম্রপল্লবটি চাই-ই!

তাই কঠোর শীতে সকল বৃক্ষরাজিই যখন দাঁড়িয়ে থাকে পত্রহীন মৃতের মতো—তখনও আম্রবৃক্ষটি থাকে পত্রে সুশোভিত—পল্লবে পল্লবিত। দেবতার পূজায় ওই পল্লবদল উৎসর্গীকৃত বলেই বুঝি তাঁদের আশীর্ব্বাদে সে চিরযৌবন!

তবে কি তার পাতা ঝরে না?—ঝরে বৈ কি! এক দিকে ঝরে—অন্য দিকে গজায়। সে ঝরা পাতাগুলোও কিন্তু বিফলে যায় না—গ্রামে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা সেই ঝরাপাতা কুড়িয়ে নিয়ে জ্বালানী করে। আবার জলের ধারের আমগাছের পাতা জলে পড়ে যখন পচে যায়—তা' দিয়ে তৈরী হয় একটি ঔষধ। আমাশয়-জ্বর বা এমনিতে শরীর কষে গিয়ে যদি প্রস্রাব বন্ধ হ'য়ে তলপেটে যন্ত্রণা হয়—তখন পচাপাতা বেটে তলপেটে প্রলেপ দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব হ'য়ে যায়। এটি আমার স্বচক্ষে দেখা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

অবশ্য আজকের এ বিজ্ঞানের যুগে কেউ বড় একটা এ ঔষধ ব্যবহার করবে না—তার সহরে এটা মেলানোও দায়। কিন্তু পল্লীগ্রামে যাঁরা কথায় কথায় ডাক্তার ডাকতে পারেন না—তা' ছাড়া ডাক্তারের ব্যবস্থা মতো ঔষধ যোগাড় করতেও যেখানে সময় লাগে তিন দিন—তাঁদের পক্ষে এ সহজলভ্য প্রাকৃতিক ঔষধটি খুবই উপকারে আসবে।

ডাল থেকে মূল পর্য্যন্ত সব-কিছু তো জ্বালানিরূপে ব্যবহার হয়ই—তা' ছাড়াও আমকাঠে নৌকো থেকে শুরু করে টেবিল, চেয়ার, তক্তপোষ, আলমারী, সেল্ফ, পিঁড়ে ইত্যাদি নানা রকমের জিনিষ তৈরী হয়। যদিও তারা কম টেকসই—তবু দামে সস্তা! তাই শাল-সেগুনের আসবাব যখন ধনীর ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে—তখন আমকাঠের আসবাবই মিটায় দরিদ্রের প্রয়োজনীয়তা।

হিন্দুদের শবদাহেও প্রয়োজন হয় আমকাঠ! এটা তাঁদের শাস্ত্রোচিত নিয়ম। গ্রামে দেখেছি, বাড়'র কর্ত্তা যে আমগাছটির আম খেতে সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন—সেই গাছটি কেটেই হত তাঁর শবদাহ। সহরে অবশ্য কিনে নিতে হয়।

ঠাকুরমা বলতেন,—আমগাছ নাকি ঘুমোয় না কখনও। দিন-রাত সভয়ে জেগে থাকে। কোন অশুভক্ষণে একটি মানুষের জীবন অবসানের সাথে সাথে তারও ঘনিয়ে আসবে মৃত্যু!

মাঘ মাসের প্রথম ভাগেই পল্লবে পল্লবে বেরোয় মুকুল! আম্র-মঞ্জরীর গন্ধে চারি দিক হ'য়ে উঠে সুবাসিত। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় মৌমাছি। আমের বনেই জাগে প্রথম বসন্তের সাড়া! তাই বসন্ত-পঞ্চমীর দিন আমরা সরস্বতীকে অঞ্জলি দিয়ে প্রথমেই ভক্ষণ করি আম্রমঞ্জরী এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে:—

চূতপুষ্প বসন্তাদৌ তং পিবামি সচন্দন।
রোগশোকবিনাশায় সুখসম্পত্তিহেতবে।

যে ফুলে এত গুণ তার ফলে আরো কত!

ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগেই ফুল থেকে বেরিয়ে আসে ফল। কচি আমের অম্বল খাওয়ার ধুম পড়ে যায় বসন্তের খরদাহে। কচি আম পিত্তনাশক। বসন্ত কালের রোগগুলো প্রায় সবই পিত্ত-বিকৃতির। কাঁচা আমের ঝোল তার পরম ঔষধ। তাই সহরে আমরা চার পয়সা দিয়েও একটি কাঁচা আম কিনে আনি অম্বল খাওয়ার জন্য। আর গ্রামে ভোর হ'তেই ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে আম কুড়োতে। চৈত্র মাস পড়তেই মা ঠাকুরমায়েরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন আমসী তৈরী নিয়ে। বৈশাখের প্রথম থেকেই শুরু হ'য়ে যায় মোরব্বা আর আচার-জেলীর ঘটা।

গ্রামে ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম দিয়েই এ-সব তৈরী হয়—সহরে অবশ্য কিনে এনে করতে হয় বলে অনেকেই করতে পারেন না।

সহরে দোকানে দোকানেও জেলী-মোরব্বা ও আচার তৈরীর ধুম পড়ে যায়—কারণ আম ফুরিয়ে গেলে এ-সব কিনে নেবে সহরের লোক—যারা তৈরী করতে পারে নি এক বারে তিন-চার টাকা খরচ করে, তারাই দু'আনা চার আনার কিনে খাবে। স্কুলের ছেলেরা আসা-যাওয়ার পথে কিনে নেবে দু'চার পয়সার। ধনীর ঘরে ও রেষ্টুরেণ্টে অবশ্য কিনে নেবে বোতলে বোতলে।

বৈশাখের শেষ ভাগে গাছে গাছে পেকে উঠতে থাকে আম—ফুটে ওঠে রং-বেরংয়ের বাহার! সে কত রকমের—কোনটি বা আধা লাল আধা হলুদ—কোনটি আধা হলুদ আধা সবুজে। কোনটি একেবারেই হলুদ রংয়ের। আবার কোন গাছের আম যতই পাকছে তত হচ্ছে মিশ্‌মিশে কালো—সেগুলোকে আমরা বলি 'বর্ণচোরা'।

পাকা আমের গন্ধে আনন্দে সবাইরই নেচে ওঠে মন। গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা থেকে পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত সকলেই ছুটে যায় আমতলায় আমের লোভে। কাক, বাদুড় ও বানরেরা ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে যেয়ে বসে আম গাছে। তাদের ঝাঁকুনীতে অনেক পাকা আম ঝরে পড়ে মাটীতে—তা'ছাড়া হাওয়াতেও পড়ে—শৃগালকুল রাত্রিবেলা তাই পরমানন্দে ভোজন করে।

পল্লীগ্রামে অধিকাংশেরই আমবাগান আছে, তাই আমের মরশুমে প্রত্যেক বাড়ীতেই আমের ছড়াছড়ি। যেদিকে তাকাও ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই আম আর আম। যাদের বাগান নেই (আট-দশটা গাছ অন্ততঃ সকলের বাড়ীই আছে) তারাও অন্যের বাগানে ঘুরে কুড়িয়ে এনেও যথেষ্ট আম খায়। আবার ষোল কুড়িটা শতকরা আম নেওয়ার চুক্তি করে তারা বাড়ী বাড়ী মাটিতে না ফেলে সযত্নে বেছে বেছে পাকা আম পেড়ে দেয়। সাত-আটটি গাছের আম পাড়লেই তাদেরও এক বস্তা আম হ'য়ে যায়। এমনি করে গ্রামে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই অপর্য্যাপ্ত আম খেতে পারে।

সহরে কিন্তু সে সুযোগ একেবারেই নেই। বিত্তহীন লোকেরা এখানে শুধু আমের ঝুড়ির দিকে তাকিয়েই চলে যায়, ক্বচিৎ হয়তো দু'-চারটি কেনবার সাধ্য হয়। গরীবের ছেলে-মেয়েরা সুস্বাদু আম ক'দিন খেয়েছে আঙ্গুলে গুণে বলতে পারবে।

আমের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে শৈশবের স্মৃতি! রাত্রির আবছা অন্ধকার থাকতেই চলে যেতাম আমবাগানে। তখনই গিয়ে দেখতাম, যাদের বাগান নেই তারা এসে গেছে আম কুড়োতে। আমাদের বাড়ী ও বাগান সমেত প্রায় চারশো আমগাছ ছিলো, তাই ওদের আর বড় একটা কিছু বলতাম না। ওরাও কুড়োতো আমরাও কুড়াতুম।

বৈশাখের কত রুদ্র তাণ্ডব মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, হয়তো অনতি দূরেই ভেঙ্গে পড়েছে একটা গাছের ডাল, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই—বাড়ী থেকে চেঁচিয়ে ডাকছেন মা—তবু আমই কুড়িয়ে চলেছি।···আমাদের চেয়ে বেশী মরিয়া হ'য়ে কুড়িয়েছে ওরা—যারা পরের বাগানের আম কুড়োবে। মাঝ রাতে ঝড় এলেও ওরা বেরিয়ে গেছে ঠিক। মালিকের আগে না গেলে যে ওরা ভাল আম বড় একটা পায় না। জীবনের চেয়েও ওদের আমের নেশা বেশী সত্যিই বুঝি···আমই অমৃত ফল!

সারা দিন আমাদের আম খাওয়া চলেছে অবিশ্রান্ত! ভিখারী এসেছে—ভিক্ষা দাও আম এক 'ডালা'। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আসুক—খেতে দাও থালা ভরা আম—সঙ্গে মুড়ি আর ক্ষীর। তাই এ সময়েই গ্রামে বাড়ী বাড়ী লেগে যায় আম খাওয়ার নেমন্তন্ন ব্রাহ্মণ ভোজনের মহোৎসব। খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি—তারই সাথে লাভ ফল দানের মহাপুণ্য। খেয়ে অসুখ করবে না—আরো দেহ হ'য়ে উঠবে স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল!

শুধু পাকা আম খেয়েই শেষ নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমসত্ব তৈরীও চলতে থাকে পুরোদমে। গ্রামের মেয়েরা থালা, মাটীর সাজ ইত্যাদি থেকে শুরু করে চাটাই পাটী পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করে আমসত্ব দেবে। এখানে দোকানের আমসত্ব অবশ্য অন্য ধরণের।

আম ফুরিয়ে গেলেও বার মাসই পাকা আমের স্বাদে ও গন্ধে তৃপ্ত করবে আপনার রসনা—ওই আমসত্ব! শুধু কি স্বাদই?··· সূর্য্য করে শুদ্ধ আমসত্বে উৎপন্ন হয় ভাইটামিন।—যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়!

আমের আঁটি-খোসাটিও ফেলনা নয়—রৌদ্রে শুকিয়ে কড়কড়ে করে নিলে তাও হয় চমৎকার জ্বালানী।

আর ঐ আঁটীর ভেতরের শাঁসটিতেও তৈরী হয় আমাশয় ও চুল ওঠা ইত্যাদি নানা রকম রোগের ওষুধ। আবার শিশুরা ঐ শাঁসটি দিয়েই বাজায় ভেঁপু!

আর আপনি যদি পল্লীবাসী হন, তা'হলে ঐ আঁটি পুঁতে আপনার নিজের বাড়ীতেই ফলাতে পারেন কাশীর ল্যাংড়া থেকে মালদহের ফজলী পর্য্যন্ত।

দেখি তোমায় নয়ন ভরে

শ্রীনীলিমা দাশ

দেখি তোমায় নয়ন ভরে এলে তুমি এ কোন্ রূপে?
ছন্দ তোমার গন্ধ হ'য়ে জড়ায় আমার মনের ধূপে!
আমার সকল ব্যথা-ভরা স্মৃতির খেয়ায় পাগল-করা
সকল চাওয়া-পাওয়া বুঝি তোমার মাঝে যায় গো ডুবে!
তোমার সুরের মায়া-পরশ জাগায় প্রাণের মুকুলটিরে—
রাঙা আলোর ঝিলিমিলি দোলে আমার ভুবন ঘিরে!
ফাল্গুনে বয় মাতাল হাওয়া কোন্ সুদূরের স্বপ্ন-ছাওয়া—
জীবন-দোলায় দুলিয়ে দিয়ে যায় সে রে চুপে চুপে!

শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে এলাম

শ্রীঅঞ্জলি চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন যাবার ইচ্ছে ছিল বহু দিন থেকেই। কাজেই যাবার সুযোগ পেয়ে প্রথমটা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কবিগুরুর সাধের শান্তিনিকেতন, সাধনার পীঠস্থান এবং ধ্যানের অমরাবতীকে দেখার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এত গল্প শুনেছি আর বই পড়েছি যে, স্বপ্নে আমি শান্তিনিকেতনের একটি চেহারা খাড়া করে রেখেছিলাম, আজ শান্তিনিকেতনে সেই স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণকে দর্শন করব।

সবে শীত পড়তে শুরু করেছে। সাতটা কুড়িতে ট্রেণ ধরতে হবে। সকালবেলার কনকনে হাওয়া খোঁচা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল শান্তিনিকেতন চলেছি। সত্যিই যাবার আগের আনন্দটা তুলনাহীন। সাতটা কুড়িতে কিউল এক্সপ্রেসের ইণ্টার ফিমেল-কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়ার খানিকক্ষণ পরেই ট্রেণ ছাড়ল। জানালার সার্সিগুলোকে বন্ধ করে আমরা তিন জন গরম কাপড় মুড়ে বসলাম। কামরায় অপর তিন জন যাত্রিনীর সঙ্গে আলাপে জানলাম, তাঁরাও শান্তিনিকেতনের আকর্ষণেই ছুটে চলেছেন। ট্রেণের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরও দ্রুত লয়ে বাজছিল। বেলা প্রায় এগারোটার কিছু আগে শীর্ণা কোপাই নদীর বিশুষ্ক বালুকাকীর্ণা রূপ দেখে বুঝলাম, শান্তিনিকেতন নিকটতর হয়ে আসছে। ট্রেণ সেদিন যথাসময়েই পৌঁছেছিল। শান্তিনিকেতনেই প্রায় এক-চতুর্থাংশ যাত্রী নেমে গেলেন। আমরা ষ্টেশন-রেষ্টুরেণ্টে ভাত আর মাংসের অর্ডার দিয়ে ওয়েটিং রুমে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, সে সময়টুকু দেরী করতেও ভাল লাগছিল না। খিদেও পেয়েছিল প্রচুর। কিন্তু আলো চালের ভাত আর মসলা-সমাকীর্ণ মাংস খেয়ে রেলওয়ে রেষ্টুরেণ্টের প্রশংসা করতে পারি নি। তার ওপর প্রতি প্লেটে এক টাকা। মনে হল অন্য কোন বাঙ্গালী হোটেলে এর চেয়ে ভাল জিনিষ সস্তায় খেতে পারতাম, কিন্তু অচেনা শহরে আমাদের মত তিন জন অনভিজ্ঞা মেয়ে সাহস পেলাম না। কিন্তু কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি ত হল!

যাক এবার আমরা দু'টো সাইকেল-রিক্সা ভাড়া করে প্রথমেই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর বাড়ীর পথে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গিনী নমিতাদি'র আত্মীয়া হন ওঁরা। বোলপুর সহর পার হয়ে রাঙাধুলি উড়িয়ে রিক্সা চলল শান্তিনিকেতনের সেবাপল্লীর দিকে। বাড়ী পেয়ে গেলাম সহজেই। নমিতাদি' আত্মীয়াদের সঙ্গে আলাপ করলেন খানিকক্ষণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই নামতাদি'র মামাত বোন সুপূর্ণা ঠাকুরের সঙ্গে আমরা শান্তিনিকেতন দেখতে চললাম পায়ে হেঁটেই। সুপূর্ণা ঠাকুর শান্তিনিকেতন সঙ্গীত-ভবনের ছাত্রী। শান্তিনিকেতনের কাঁকর-বিছানো পথের ওপর জুতোর মচ-মচ আওয়াজ, আমার কাছে বেশ শ্রুতিমধুর লাগছিল। পথের দু'ধারে গাছের সারি। আমলকীতলায় বিছানো আমলকী। দু'ধারের গাছপালার মাঝখানে ছায়া-ঘেরা পথ ভারী মনোরম। কলকাতার জনারণ্যে হাঁটতে হাঁটতে বাংলার চিরন্তন মেঠো-পথকে বিস্মৃত হয়েছিলাম, শান্তিনিকেতনে এসে তাকে উপলব্ধি করলাম। দূরে একটি মাঠে পৌষমেলার জন্ত উৎসব-ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের এ মেলায় আকর্ষণীয় থাকে অনেক কিছুই, কিন্তু শান্তিনিকেতনকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্ত আমরা আগেই দেখতে এসেছি। শান্তিনিকেতনের অসীম ও অগাধ নীরবতা মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল।

প্রথমেই এলাম আমরা চীনাভবনে। চৈনিক ভাষায় দুর্বোধ্য কতকগুলি অক্ষর লেখা সে বাড়ীর গায়ে। ভেতরে বারান্দায় অপূর্ব্ব অংকন-শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন। সে শিল্প দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়েছিলাম। প্রশস্ত উদ্যানের দু'পাশে ছাত্রাবাস। চীনাভবন থেকে বেরিয়ে আমরা চললাম কলাভবনের দিকে। পথে অনেক বাড়ী চোখে পড়ল—কোনটা হয়ত শিশুভবনের ছাত্রাবাস, কোনটা শান্তিনিকেতনের রন্ধন-গৃহ, কোনটা বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। পথের ওপর একটি ছোট বাড়ী চোখে পড়ল। মাটির কিন্তু ভারী সুন্দর! ঠিক বাড়ী একে বলা যায় না, কারণ বাড়ীর চেয়ে এটা অনেক ছোট। শুনলাম, কোন বিশেষ শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের জন্ত এখানে রাখা হয়। নামটি ভারী মিষ্টি—চৈতী। ছোট কাচের কেসে একটি ভাস্কর্য্য দেখলাম, নন্দলাল বসুর। চৈতীকে আমাদের ভীষণ ভাল লেগেছে। শান্তিনিকেতনের বাড়ীগুলির চমৎকার নাম শুনেছিলাম বহু আগেই। এখন বুঝলাম, এমন সুন্দর পরিবেশে বাড়ীগুলোকে একটা সুমিষ্ট নাম ধরে ডাকার মধ্যে মাধুর্য্য কতখানি। এর পর চোখে পড়ল বাগানের মাঝখানে একটা মস্ত বড় বুদ্ধমূর্ত্তি। মনে হচ্ছিল, যেন কাঁকর দিয়ে তৈরী। এর পরেই শান্তিনিকেতনের ষ্টুডিওর বাড়ী, খেলার সরঞ্জাম রাখার সুন্দর মেটেবাড়ী। সামনে বিরাট প্রান্তরে শান্তিনিকেতনের খেলার মাঠ। শ্যামলীকে দেখলাম। গায়ে মাটি কেটে তৈরী মূর্ত্তি। মাটির বাড়ী খড়ে ছাওয়া, চমৎকার লেগেছে শ্যামলীকে। গাছের ছাওয়ায় শান্তিনিকেতনের পথগুলোর উপর হাঁটতে হাঁটতে অবাক-বিস্ময় লাগছিল। মনে পড়ল, বহুদিনের পুরোন কথা, যে দিন কবিগুরু হাঁটতেন এ ...পথে যে পথের প্রতি ধূলোতে মিশে আছে তাঁরই পদরেণু; ওখানকার ছাত্রীদের একটা জিনিষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সকলেই প্রায় এলোচুলে আর খালিপায়ে হাঁটছিল। এখানে ওখানে গাছের তলায় ক্লাস বসেছে। গাছের তলা বেশ পরিষ্কার। অধিকাংশগুলোই বাঁধানো; সর্ব্বত্রই তার অখণ্ড নিস্তব্ধতা আর অসীম নীরবতা। পাপিয়ারা গান গায় আর কোয়েল-দোয়েল ডেকে যায়—যেন কত কালের শেখা এ সুর!

পথে দেখলাম একটি বিরাট বাঁধানো গাছের তলায় বেদীর আসন। নামটি ছাতিমতলা। ছাতিম গাছের তলায় ধ্যানের আসন পেতেছিলেন দেবর্ষি মহর্ষিও বটে—তিনিই শান্তিনিকেতনের সৃষ্টিকর্ত্তা। ছাতিমতলার ধ্যান এখনও ভাঙ্গেনি যদিও মহর্ষি চলে গেছেন লোক-লোকান্তরে।

এর পর আমরা উদয়নের দিকে চললাম। লাল ধূলোয় জুতো আর সাড়ীর তলাগুলো মাখামাখি। উদয়নের বাড়ীটি অতি চমৎকার! সামনেই সাজানো নানারকমের ফুলের বাগান। একটি ফোয়ারাও রয়েছে। অতি যত্ন করা সেগুলো। পাশেই পায়রা থাকার জন্ত একটি ছোট্ট বাড়ী। যদিও বাড়ীটির নাম আমি জানতে পারি নি। পায়রারা শান্তিনিকেতনের শান্তির বাণী নিয়ে বোধ হয় উড়ে গেছে দেশ হতে দেশান্তরে। একটি গোলাপ-বাগান দেখলাম।

বড় বড় পদ্মফুলের মত গোলাপ ফুটে রয়েছে। তা দেখে চোখ ফেরানো যায় না। উদয়নেই রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন। এখন এটি বিশ্বভারতীর অফিস। এর সামনেই বিরাট প্রান্তর। এক জায়গায় খানিকটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। শুনলাম আজ রাত্রে ওখানে গুজরাটি নাচ ও গানের অনুষ্ঠান হবে। উদয়নের বাঁ পাশে উদীচী। একটু দূরে দেহলীভবন। ওখানে গাছের তলায় গুজরাটি গানগুলির মহড়া চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাদ্য-যন্ত্র বেজে চলেছিল। বেলা দুপুরেও এ গান মোটেই বিরক্তিকর লাগেনি যদিও গানের ভাষা একেবারেই দুর্বোধ্য। শান্তিনিকেতনের এ জায়গাটিই সব চেয়ে সাজানো। বাড়ীগুলো প্রাসাদের মতো বিরাট ও সুন্দর। সামনের বাগানে ডালিয়া ফুটেছে থরো থরো। শীত এসেছে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের গাছগুলির শাখা এখনও রিক্ত হয়নি। শান্তিনিকেতনের সর্বত্রই পূর্ণতার ছোঁয়াচ, রিক্ততা সেখানে বে-মানান।

এর পর আমরা কলাভবন থেকে শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীর দিকে চললাম। দেখলাম, এখানে ওখানে ছেলেরা পড়া-শোনা করছে। লাইব্রেরীর বারান্দার দেওয়ালে চমৎকার অংকনশিল্প দেখলাম। পাঠনিমগ্ন বহু ছাত্র-ছাত্রীর দেখা মিলল। আমাদের সশব্দ আগমনে কারোর ধ্যানই ভাঙ্গল না। সত্যিই পড়া-শোনার মত পরিবেষ্টনী শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে রূপদান করেছিলেন শান্তিনিকেতনকে। উপবনের নির্জ্জনতা শান্তিনিকেতনের সব চেয়ে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ট্রাম আর বাসের ঘড়-ঘড় শব্দ শিক্ষার্থীকে ধ্যানের জগৎ থেকে নামিয়ে আনতে পারবে না।

শান্তিনিকেতনের শিশুভবনের শিশুদের আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে। ওদের মনটাই সত্যিকারের নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠবে এই আশায়। ওরা ইচ্ছামত খেলছে, দৌড়চ্ছে, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর শিশুর কলকাকলীতে শান্তিনিকেতন মধুর হয়ে উঠেছে। ওদের অত্যন্ত অল্প বয়েস দেখে আমি সুপূর্ণা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা মা-বাবার জন্ত কাঁদে না?" তিনি বললেন, "ওরা বরং বাড়ী যাবার নাম শুনলেই কান্না শুরু করে। বাড়ী যেতে ওদের আমি কাঁদতে দেখেছি।" ভেবে দেখলাম, শিশুদের জগৎটা এখানে সম্পূর্ণ। এখানে বোধ করি অম্বিকে মাষ্টার নেই, শিশুরা তাই খালি পড়ার ভয়ে ভীত নয়!

শান্তিনিকেতনের সবটাই প্রায় আমরা ঘুরেছি। এর পর দুটো কি আড়াইটের সময় আমরা আবার ফিরে এলাম ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর বাড়ীতেই। আমাদের সাইকেল-রিক্সা অপেক্ষা করছিলো এখানে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। শ্রদ্ধায় নুয়ে এল মাথাটা। অশীতিপর বৃদ্ধা—বাঙ্গলার অসীম শক্তিময়ী এই নারীর পদধূলি নিয়ে আমরা ধন্য হয়েছি।

এবার আমাদের শ্রীনিকেতনের পথে যাত্রা করতে হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবেন ঠাকুর পরিবারেরই পূর্ণিমা ঠাকুর—নমিতাদির মামীমা। পূর্ণিমাদি' শান্তিনিকেতনের সর্বত্র 'বুবুদি' নামে পরিচিতা। বুবুদি' আর নমিতাদি একটি রিক্সায় চাপলেন, আমরা দুজনে অপরটিতে। শ্রীনিকেতনের পথে যাত্রার প্রথমেই আমাদের রিক্সাওয়ালা একটি দুর্ঘটনা করে বসেছিলো আর একটু হলেই। একটি সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় আরোহীটি পড়ে গেলেন। আমরা রিক্সাওয়ালাকে সাবধানে চালাতে বললাম। কারণ, সাইকেল রিক্সায় এর আগে এক বার চড়েছি কাশী থেকে সারনাথ যাবার পথে, এবং এটা বোধ হয় দ্বিতীয় বার, কাজেই ভয় হচ্ছিলো।

শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন প্রায় দু'মাইল। রাস্তার দু'পাশে বীরভূমের তৃণহীন মাঠ আর প্রান্তর। ধুলো-বালি-কাঁকর সবই লাল। আমাদের মনে হলো চার পাশে মুঠো-মুঠো আবীর ছড়ানো। শান্তিনিকেতনের গাছপালার একটিকেও আশে-পাশে চোখে পড়ে না। ধু-ধু করা শুধু মাঠ। আশে-পাশে গৃহস্থ বাড়ী দেখলাম দু'-একটি। একটি বাড়ী চোখে পড়লো নাম "প্রতীচী"। শান্তিনিকেতনের অপূর্ব বাড়ীর নাম জীবনেও বিস্মৃত হবার নয়।

দূর থেকে শ্রীনিকেতন চোখে পড়ল। শ্রীনিকেতনের একটু আগেই একটি চমৎকার ঝিল। শীতের কন্‌কনে হাওয়া দুপুরেই টের পেলাম। বিকেলবেলার সূর্য্য চক্‌চক্ করছিলো ঝিলের প্রবহমান জলে। ভারী সুন্দর তার রূপ। শ্রীনিকেতনের সামনে এসে আমাদের রিক্সা থামল। প্রথমেই আমরা বিশ্বভারতী বিক্রয়-কেন্দ্রে গেলাম। বিশ্বভারতীর ছাত্রদের তৈরী বহু জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। তাছাড়া বিশ্বভারতী কর্ম্মীদের তৈরী সাড়ী, মাটীর নানারকম জিনিষ ও চামড়ার কাজ। কিন্তু দাম তুলনায় একটু বেশীই। আমি ত একটি সাড়ী কিনবো ভেবেছিলাম। কিন্তু দাম শুনে একেবারেই দমে গিয়েছিলাম। ওখানকার বিক্রয়কেন্দ্রের কর্ম্মীরা ভেবেছিলো, আমরা শান্তিনিকেতনেরই ছাত্রী। কারণ আমাদের সঙ্গে 'বুবুদি' ছিলেন।

শ্রীনিকেতনে আমরা দেখেছি, তাঁতশিল্পের কারখানা, মৃৎশিল্পের কারখানা, বেকারী আর কাঠের কারখানা। তাঁতে কাপড় বোনা দেখে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছিলো। কিন্তু প্রাণান্তকর কাঠের ঘটাখট আওয়াজ ভাল লাগছিল না। মাটীর কারখানায় নানা রকমের জিনিষ তৈরী হচ্ছে। একটি প্রদর্শনী-গৃহও দেখলাম। সেখানে তৈরী সব চেয়ে সুন্দর দ্রব্যটি প্রদর্শনের জন্ত রাখা হয়। কাঠের কারখানায় নানা আসবাব তৈরী হচ্ছে। শ্রীনিকেতনের বেকারীতে শান্তিনিকেতনের সমস্ত খাবার তৈরী হয়। সকলকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টায় শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। এখানেও দেখলাম গাছের তলায় ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। একটু দূরের একটি মাঠে এক জন শিক্ষয়িত্রী সেলাই শেখাচ্ছেন।

শ্রীনিকেতন কর্ম্মব্যস্ত। ফেরার সময় হয়ে এলো এবার। দূরে শ্রীনিকেতনের গাছের মাথায় বৈকালী সূর্য্য জ্বল্‌-জ্বল্ করছিলো। আবার আমরা রিক্সায় চাপলাম। এবার সোজা ষ্টেশনে ফিরতে হবে। ফেরবার পথে রিক্সাটি শান্তিনিকেতনের ভেতর দিয়েই এলো। আসবার সময় শান্তিনিকেতনের ষ্টুডিও আর রেডিও-ষ্টেশন দেখলাম। আসবার পথেই দেখলাম শান্তিনিকেতনের উপাসনা-মন্দির। উপাসনা-মন্দিরটি কাচে তৈরী। রোদ্দুরে তার রূপও দেখবার মতন।

বীরভূমের মেঠোপথে ধুলো উড়িয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ক্ষীণ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেলো কর্ম্মব্যস্ত শ্রীনিকেতন, পেছনে পড়ে রইলো রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন তার অসীম নিস্তব্ধতা আর অজস্র পুঞ্জীভূত স্মৃতির বেদনা নিয়ে।

আদর্শ
লিভার
টনিক
QUMARES

বসন্তোৎসব
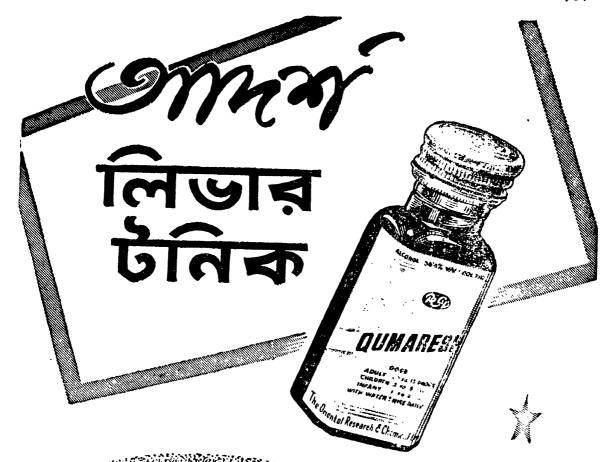
শ্রীকামিনীকুমার রায়

হোলি বা দোল উৎসব এমনি এক সময় অনুষ্ঠিত হয়, যখন প্রকৃতিতে নবজীবনের সাড়া জাগে। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন জড়ভাব তখন আর থাকে না, ঋতুরাজ বসন্ত তাহার অপার সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া ধূলা-মাটির পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। দিকে দিকে, বনে-উপবনে তখন একটা আনন্দের ধুম পড়িয়া যায়;—গাছে গাছে নূতন পাতা, নূতন ফুল, ফুলে ফুলে ভ্রমরের বোল, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের কুহু তান, থাকিয়া থাকিয়া দক্ষিণ বায়ুর মর্মর গান, মানুষের চিত্তে কেমন একটা উদাস ভাব আনিয়া দেয়। সে চাহিয়া দেখে, চারি দিকে কেবলই সাজসজ্জা, মাতামাতি, ছুলাছুলি। প্রকৃতি রাজ্যের এই আনন্দলীলা বহু বিড়ম্বিত মানুষ তাহার নিজের জীবনেও সার্থক করিয়া তুলিতে চায়। সে কান পাতিয়া শোনে, কে যেন তাহার দ্বারে ব্যাকুল সুরে গাহিয়া যায়,—

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
করো না বিড়ম্বিত তারে।'

প্রাণবান মানুষ প্রাণৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ এই নূতন অতিথির,—'প্রাণায়ন' বসন্তের সাদর সম্বর্ধনার জন্য ছুটিয়া বাহির হয়, যথাসাধ্য আয়োজন উপকরণে সম্বর্ধনা করে। বসন্তের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানই বহু লোকের ক্রিয়াযোগে আনন্দঘন উৎসবে পরিণত হয়। এই উৎসবের রূপ দেশে দেশে, কালে কালে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা, রুচি এবং রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুসারে এই রূপ-পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই—কোথাও কোনও উৎসবের আদি রূপ থাকে নাই, বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মিক ও বৈষয়িক, কখনো বা রাজনৈতিক বন্ধনে তাহাতে অনেক যোগ-বিয়োগ ঘটিয়াছে। বসন্ত-উৎসব কথাটি বহুপ্রচলিত। কিন্তু এই নামে একক অবিমিশ্র কোনও উৎসবের অস্তিত্ব বর্তমানে কোথাও নাই। ইংলণ্ডের 'মে' উৎসব, রোমের 'জুভেনাল' উৎসব, আসামের 'বিহু' উৎসব এবং আমাদের দোল বা হোলি উৎসব বসন্ত-উৎসব নামে চলিয়া যায় বটে; কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহারা প্রত্যেকেই বহুজাতির বহু উৎসব-অনুষ্ঠানের এক একটি মিশ্র রূপ। আমাদের শাস্ত্রে-পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে সেকালের বসন্ত কালীন অনেক উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। বসন্তের বর্ণনায়ও আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ। বাৎস্যায়ন সুবসন্তক উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন। মদন-উৎসবের তথা মদন ও রতির মূর্তি গড়িয়া, অশোকাদি বন-কুসুমে সেই যুগল মূর্তি সাজাইয়া অশ্লীল বাক্যে ও নৃত্যগীতে নরনারীর সম্মিলিত ভাবে পূজার কথাও অনেক গ্রন্থে আমরা পাই; এখনো পাঁজিতে চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মদনোৎসব লিখিত থাকে। আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যার দোল উৎসবে এবং বিহার ও উত্তর-ভারতের হোলি উৎসবে সে কালের বহু জাতির বসন্ত কালীন অনেক উৎসব, অনেক আনন্দঘন আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি আসিয়া আত্মগোপন করিয়াছে সন্দেহ নাই। বহ্ন্যুৎসব, রাধাকৃষ্ণের দোলারোহণ ও দোলন, আবীর, কুমকুম ও জল-কাদার ছড়াছড়ি; অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী, নৃত্যগীত, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন, সং-সাজা, সিদ্ধিপান, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি অনেক কিছু দোলও হোলি নামের আবরণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

আমরা দোল ও হোলি একই অর্থে ব্যবহার করিলেও ভারতের পূর্বাঞ্চলের দোল এবং উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের হোলি সর্বাংশে এক নহে, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই দোল ও হোলির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় দোল হয়; ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাও বলে। এই উৎসবে বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রামশিলার বা রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহের পূজা করা হয়। চণ্ডীমণ্ডপে অথবা মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে মৃত্তিকা দ্বারা তিনটি স্তরবিশিষ্ট একটি বেদী প্রস্তুত করিয়া উহার উপরে আলগোছে একটি দোলা স্থাপন করা হয়। দোলার উপরে চন্দ্রাতপ এবং গৈরিক ধ্বজা উত্তোলিত হয়। পূজা এবং হোমান্তে পুরোহিত বিগ্রহ কয়টিকে দোলায় স্থাপন করেন এবং উত্তর-দক্ষিণে দোলাটিকে কয়েক বার দোল দেন। অতঃপর সকলে মুঠো-মুঠো আবীর লইয়া অঞ্জলির মন্ত্র বলিয়া বিগ্রহের গায় ছিটাইয়া দেয় এবং প্রসাদী আবীর নিজেদের এবং প্রিয়পরিজনদের কপালে মাখায়। অবশ্য পূজনীয়-পূজনীয়াদের ক্ষেত্রে আবীর প্রথমে পায়ে ছোঁয়ান হয়। পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে অনেক ধনী পূজারীর বাড়ীতে অহোরাত্র শ্রীকৃষ্ণের অথবা গৌরাঙ্গের 'লীলাকীর্তন' গান হইত এবং 'মচ্ছবে' শত শত লোক খিচুড়ি প্রসাদ পাইত। উড়িষ্যা এবং আসামের কতিপয় অঞ্চলেও প্রায় অনুরূপ ভাবে দোল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তামিলনাদেও দোল আছে, কিন্তু সেখানে ঠাকুর দোলায় চড়েন আরও এক মাস পরে চৈত্রী-পূর্ণিমাতে।

দোলের পূর্বদিন বহ্ন্যুৎসব। সমগ্র বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং আসামে ইহা অনুষ্ঠিত হয় দোলপূর্ণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যায়। দোলমঞ্চের সন্নিকটে বাঁশ ও খড়কুটা দিয়া একটি কুঁড়ে-ঘর তৈয়ার করিয়া মহোল্লাসে তাহা দগ্ধ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের বহু প্রচলিত নাম চাঁচর (সংস্কৃত চর্চরী, যাহার এক অর্থ হর্ষধ্বনি)। ঘরটি শুধু দগ্ধ হয় না, উহাতে পিঠালী বা খড়ের তৈয়ারী একটি ভেড়া বা মানুষের, কোথাও বা উভয়ের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া অগ্নি-সংযোগ করা হয়। পূর্ববঙ্গে ইহাকে সাধারণতঃ ভেড়ার ঘর বা মেড়ার ঘর পোড়ানো বলা হইয়া থাকে; কোথাও 'বুড়ীর ঘর পোড়ানো' কথাটিও শুনা যায়। উড়িষ্যায় এক কালে এই অনুষ্ঠানে একটি জীবিত মেষ-ই দগ্ধ করা হইত; বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মেষকে অগ্নি স্পর্শ করাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কোথাও উহার খড়ের মূর্তি পোড়াইতেও দেখা যায়। পূজা-পদ্ধতিতে এই মেষ মূর্তিটিকে মেণ্টাসুর বলা হইয়াছে।

কুঁড়েটিতে আগুন ধরাইবার পূর্বে উহাতে শালগ্রামশিলা বা রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপন করিয়া যথাশাস্ত্র পূজা ও হোম করা হয়। শেষে পুরোহিত ঐ দেব-বিগ্রহ লইয়া ঘরটি সাত বার প্রদক্ষিণ করেন এবং হোমাগ্নি দ্বারা উহা জ্বালাইয়া দিয়া সেদিনকার মতো চলিয়া যান।

বিহার এবং উত্তর-ভারতে বহ্ন্যুৎসব বঙ্গদেশের ন্যায় দোলপূর্ণিমার পূর্বদিন সম্পন্ন না হইয়া দোলযাত্রার দিন অনুষ্ঠিত হয়। উহার আচার-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র এবং উহাতে মেষ বা মানুষের কোন প্রতীকও দগ্ধ করা হয় না। মাঠের মধ্যে পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে একটি বৃহৎ ভেরেণ্ডা গাছ, তদভাবে কলাগাছ বা বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া রাখা

হয়। পূর্ণিমার দিন তাহার চারি দিকে খড়-কুটা, আখের পাতা ইত্যাদি জড়ো করিয়া বিরাট এক স্তূপ করা হয় এবং রাত্রিতে গ্রামের সকলে ফলমূল, ভোগ-নৈবেদ্য লইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। অতঃপর পুরোহিত সেই খড়-কুটার স্তূপের সম্মুখে ভোগ-নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়া যথাশাস্ত্র পূজা করেন এবং গ্রামের সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া স্তূপটি ধরাইয়া দেন। তখন সকলে মহোল্লাসে চীৎকার করে, গান গায়, ঢোল বাজায়। সেই গান অধিকাংশ স্থলেই অশ্লীলতাদোষ-দুষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু ধর্মানুমোদিত বলিয়া অতি ভদ্রকেও তাহা বরদাস্ত করিতে হয়। ওদিকে বালকেরা বংশখণ্ডে নেকড়া জড়াইয়া তৈলসিক্ত করিয়া মশাল জ্বালায় এবং সেগুলি লইয়া বিশেষ ভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে করিতে গ্রামান্তরের দিকে ছোটে এবং নিজেদের গ্রামের সীমানার বাহিরে পোড়া বাঁশগুলি ফেলিয়া আসে। স্তূপীকৃত খড়, পাতা ইত্যাদি যখন দাউ-দাউ জ্বলিতে থাকে, তখন উহাতে স্থানভেদে যবের শীষ, ফুলের মালা, নারিকেল, কলা, বেগুন ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আসিলে অর্দ্ধদগ্ধ এই সকল ফলমূল সংগ্রহ করিয়া প্রসাদরূপে সকলের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হয়। অনেকে ছাই-মাটি নিজেদের শরীরে মাখে এবং জোর-জবরদস্তি করিয়া অপরকে মাখায়।

গুজরাটে বহ্ন্যুৎসবে একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কুশপুত্তলিকাটি লইয়া বালকেরা শোকযাত্রা বাহির করে এবং কাহারো বাড়ীর সীমানায় শবাধারটি রাখিয়া মরা-কান্না জুড়িয়া দেয়, কান্না অবশ্য ভাণমাত্র। গৃহ-স্বামিনী তখন বাহির হইয়া আসেন এবং অভিনয়কারীদের উদ্দেশে যদৃচ্ছাক্রমে গালিবর্ষণ করিতে থাকেন। বালকের দল তখন অন্য বাড়ীতে যায় এবং সেখানেও উক্তরূপ গালাগালি লাভ করিয়া তৃতীয় বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। এইরূপে গ্রামটি প্রায় প্রদক্ষিণ করিয়া এবং বহু গৃহিণীর বচন-হলাহলে তৃপ্ত হইয়া শেষে এক উন্মুক্ত স্থানে গিয়া কুশপুত্তলিকাটি দাহ করে। অনেকে বলেন, এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রহ্লাদের পিতৃব্য-পত্নী হোলিকা রাক্ষসীর,—ইহা হোলিকা-দহন।

বহ্ন্যুৎসবের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লৌকিক এবং পৌরাণিক নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ ভবিষ্য পুরাণাদির কাহিনী অনুসরণ করিয়া ইহাকে শিব কর্তৃক মদনভস্মের প্রতীক বলিয়া মনে করেন। তামিলনাদে ইহা স্পষ্টতঃই কামদাহনরূপে গণ্য হয়। কিন্তু যে দোল বা হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া বহ্ন্যুৎসব, বঙ্গ-উড়িষ্যা-আসাম এবং মাদ্রাজ প্রায় সর্বত্রই সেই দোলের অধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মদনভস্ম করেন নাই, বহ্ন্যুৎসব যদি মদনভস্মেরই স্মৃতি হইত, তাহা হইলে এই উৎসবে কৃষ্ণের স্থলে শিবপূজারই বিধান থাকিত। তদুপরি বসন্তের রাজা মদন; এই সময়ে মানব-চিত্তে মদন দগ্ধীভূত না হইয়া বরং উদ্বুদ্ধই হয়। হোলি উৎসবে অনেক স্থলে শালীনতার বাঁধ অতিক্রম করিয়া নর-নারী যেরূপ আনন্দোল্লাসে মত্ত হয়, অনেক স্থলে যেরূপ আদিরসাত্মক নৃত্য-গীত চলে, পরস্পর পরস্পরকে যেরূপ অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় সম্বর্দ্ধনা জানায়, তাহাতে তো মদনভস্মের পরিবর্তে বহ্ন্যুৎসবে মদনের বিজয়-উৎসবই সূচিত হয়; অনেকে তাই হোলি উৎসবকে সেকালের মদনোৎসবেরই রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়দমনের পর যমুনা-পুলিনে ব্রজবাসিগণ বিশ্রাম-সুখে নিমগ্ন হইলে সহসা এক ভীষণ দাবাগ্নি তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন অমিতবল ব্রজসুন্দর সেই দাবাগ্নি ভক্ষণ করিয়া সকলকে রক্ষা করেন এবং ব্রজধামে ফিরিয়া যাইয়া ব্রজের সমস্ত অধিবাসীদের লইয়া কয় দিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব করেন। প্রকৃতি তখন বাসন্তী শোভায় সজ্জিত হইয়া সেই উৎসবের অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশ্ববাসী এমন অভিনব, এমন আনন্দঘন উৎসব আর কখনো দেখে নাই। কাহারো মতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা এবং পূর্বদিনের বহ্ন্যুৎসব সেই পৌরাণিক স্মৃতিই রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

গুজরাটের বহ্ন্যুৎসব বর্ণনা-প্রসঙ্গে হোলিকা-দহনের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উত্তর-ভারতেও বহ্ন্যুৎসবের ভিতর দিয়া হোলিকা নামক কোনও রাক্ষসীর মৃত্যু ঘোষিত হইয়া থাকে। প্রহ্লাদের পিতৃব্য-পত্নী হোলিকা কি হোলাকা নাকি প্রহ্লাদকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য তাহাকে কোলে করিয়া আগুনে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদের স্থলে সে নিজেই দগ্ধীভূত হয়। উত্তর-ভারতের কোথাও কোথাও বহ্ন্যুৎসবের মধ্য-খুঁটি বা ভেরেণ্ডা গাছটিকে প্রহ্লাদরূপে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দাহ্য খড়-কুটাগুলিকে হোলিকারূপে গণ্য করা হয়। সাধারণ লোক ফাল্গুনী পূর্ণিমার এই বহ্ন্যুৎসবকে স্পষ্টতঃই হোলিকা-দহন বলিয়া থাকে। বহ্ন্যুৎসবের পূজা-মন্ত্রেও হোলিকা এবং ঢুণ্ডিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহ্ন্যুৎসবকে অনেকে বর্ষ-বিদায়ের উৎসবও বলিয়া থাকেন। শীত বা বৎসরের মৃতকল্প কালের বিসর্জন দ্রুততর করিয়া নূতন বৎসরকে সাগ্রহ অভিনন্দন জ্ঞাপনই নাকি এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ও নানা প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমাদের দোল-উৎসবে এক কালের নববর্ষোৎসবের স্মৃতিই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আরও বলিব। বিহার এবং উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে 'সংবৎ' অব্দ প্রচলিত আছে। সেখানকার অধিবাসীরা ফাল্গুনী পূর্ণিমার বহ্ন্যুৎসবকে যেমন 'হোলিকা-দহন' বলে, তেমনি 'সংবৎজ্বালানা'ও বলিয়া থাকে। ইহাদের মতে এই বহ্ন্যুৎসবের দ্বারা পুরাতন ও মৃত এক সংবৎ বৎসরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং নূতন আর এক সংবৎ বৎসরের অভ্যুদয় সূচিত হয়। আমরা জানি, চৈত্র মাস সংবৎ অব্দের প্রথম মাস এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরদিন কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পয়লা চৈত্র বদি আরম্ভ হয়। অবশ্য সংবৎ-এর প্রথম মাস চৈত্র হইলেও উহার প্রথম দিন চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদ বটে।

অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পুরাতন ও অশুভ-অমঙ্গলকে বিদায় দিবার এবং নূতন ও সুমঙ্গল-সুদিনকে স্বাগত জানাইবার প্রথা দেশ-বিদেশের বহু জাতির মধ্যেই দেখা যায়। 'মাসিক বসুমতী'তে লিখিত মদীয় এক প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি: "পূর্ব-বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে (ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ) কার্তিক-সংক্রান্তির সন্ধ্যায় মানুষের মতো একটা প্রকাণ্ড বড় খড়ের মূর্তি তৈয়ার করিয়া তাহার মাথায় সরিষা, ধূপ, শুক্‌না পাটপাতা ও কয়েকটা মশা-মাছি রাখিয়া আগুন

ধরাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর এক জন সেই জ্বলন্ত মূর্তিটিকে লইয়া ঘর-বাড়ীর চতুর্দিকে দৌড়ায় এবং চীৎকার করিয়া বলে,

'ভালা আইয়ে বুড়া যায়
মশা-মাছির মুখ-পোড়া যায়
দো! দো!! দো!!!'

ঐ সময় আরও কয়েক জন টিন, কুলা ইত্যাদি বাজাইয়া ঐ ব্যক্তির পিছনে পিছনে ছুটে এবং তাহারাও 'দো' 'দো' বলিতে থাকে। মূর্তিটি প্রায় পুড়িয়া আসিলে উহা নিয়া বাড়ীর বাহিরে মাঠে গাড় করিয়া রাখা হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, "আজ হইতে সুদিন সুমঙ্গল আসিতেছে, আপদ-বালাই সব দূর হইয়া যাইতেছে; * * অতএব আনন্দ কর, আনন্দ কর।" জ্যোতিষীরা বলেন, এক সময়ে কার্তিক-সংক্রান্তিতে বৎসর শেষ হইত এবং ১লা অগ্রহায়ণ হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। আমরাও উক্ত লৌকিক অনুষ্ঠানে একটি পুরাতন বৎসরের বিদায় এবং আর একটি নূতন বৎসরের সূচনার আভাস পাইতেছি। অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সুদূর Bohemiaতেও এক সময় এইরূপ এক অনুষ্ঠান হইত। খড়ের একটি মূর্তি পোড়াইয়া ছেলেরা বলিত, আমরা আজ মৃত্যু ও অমঙ্গলকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতেছি।

দেওয়ালীর রাত্রিতেও বঙ্গদেশের কোথাও কোথাও অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া অলক্ষ্মী-বিদায়ের এবং লক্ষ্মী-আবাহনের পালা অভিনীত হয়। গৃহিণীরা পাটকাটিতে আগুন ধরাইয়া এ-ঘর সে-ঘর যান এবং বলেন,—

'জোঁক পোক কি কর
ঘরের তলে (হইতে) নিকাল
লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী দূর হ'।'

দীপান্বিতার পরদিন কার্তিকের শুক্লা প্রতিপদ হইতেও এক সময় বর্ষ-গণনা আরম্ভ করা হইত এবং হিন্দুস্থানীদের অনেকে আজও এই দিনে তাহাদের হালখাতা আরম্ভ করে।

শ্রীহট্টে বিশেষ ঘটা করিয়া পৌষ-সংক্রান্তিতে একটি কুঁড়ে ঘর পোড়ানো হয়। উহাকেও 'মেড়ার ঘর' বলিতে শুনা যায়। উজানীয়া অসমীয়ারাও এইদিনে 'পুঁজি' (খড়-কুটার স্তূপ) পোড়াইয়া তাহাদের মাঘবিহু উৎসবের সূচনা করে। সেদিন আমরাও উত্তরায়ণ সংক্রান্তির স্নান করি, নদীতীরে বা পুকুরের পাড়ে আগুন জ্বালাইয়া হর্ষধ্বনি প্রকাশ করি, নবারুণকে বন্দনা জানাই।

দেখা যাইতেছে, বহ্ন্যুৎসব স্থান ও কালভেদে নানা নামে-রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও এবং উহার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকিলেও, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, উহার ভিতর দিয়া একটা কিছু অশুভকরী শক্তি, আপদ-বালাই বিনষ্ট হয়। হোলি সম্পর্কিত বহ্ন্যুৎসবে বালকেরা যেরূপ ভাবে অগ্নিকুণ্ডে ঢিল ছোড়ে এবং চীৎকার করে, তাহাতেও মনে হয়, তাহারা যেন বাস্তবিকই কোনও শত্রু বিতাড়িত করিতেছে।

বহ্ন্যুৎসবের নানা দিক বিশ্লেষণ করিয়া কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন কৃষি-উৎসবের খণ্ডিত রূপ বলিয়া মনে করেন। নৃতত্ত্ববিদ্ নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের অনুসন্ধান হইতে এই মতের অনুকূলে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। উড়িষ্যাবাসীরা মনে করে, 'ভেড়ার ঘর' পোড়াইবার সময় আগুনের শিখা যেদিকে প্রবাহিত হয়, সেই দিকে সে বৎসর ফসল ভাল জন্মে। মেদিনীপুরে 'ঘরটি' পুড়িতে পুড়িতে যেদিকে হেলিয়া পড়ে, সে বৎসর সেই দিকে ফসল ভাল হইবে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। হাজারিবাগে আধপোড়া কাঠ-বাঁশ কোনও গাছের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিলে, সেই গাছে, দ্বিগুণ ফল ধরিবে, এইরূপ একটা ধারণা আছে। উত্তর প্রদেশে চামার জাতির লোকেরা বহ্ন্যুৎসবের পোড়া-কাঠ নিয়া গোলা-ঘরে রাখিয়া দেয়—বিশ্বাস যে, এইরূপ করিলে প্রচুর শস্যলাভ ঘটিবে। বহ্ন্যুৎসবের ছাইয়েরও অনেক গুণ কীর্তিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় উৎসবের পরদিন বিবাহিতা বালিকারা এই ছাই ঝাঁট দিয়া নিয়া ক্ষেতে ফেলে, এবং পরিষ্কার স্থানটিতে আলপনা আঁকে। গুজরাটে কুমারীরা হোলিকা-দহনের ছাই দিয়া গৌরী গড়িয়া পূজা করে। বোম্বাইয়ে অনেকে এই ছাই পাত্র ভরিয়া নিয়া গোলাঘরে রাখে এবং শস্যে মাখায়। বাংলা দেশেও কোথাও কোথাও উইপোকা ও আগুন হইতে শস্য ও গৃহ রক্ষা পাইবে—এই বিশ্বাসে এই ছাই সযত্নে রক্ষা করা হয়।

পল্লীগ্রামে কৃষিজীবীদের মধ্যে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা জানেন, কৃষকদের নিকট ছাইয়ের মূল্য কত এবং ভরা-বসন্তের দিনে বনে-উপবনে, মাঠে-ময়দানে কি ব্যাপক ভাবেই না তাহারা বহ্ন্যুৎসব করে! ছাই একটি উৎকৃষ্ট সার, ইহা জমির উর্বরা শক্তি বহু গুণে বাড়াইয়া দেয়। বাংলা দেশের কৃষকরা এই ছাই সংগ্রহ করে, প্রতিবৎসর বসন্তকালে জমিতে চাষ দিবার পূর্বে। আবর্জনার স্তূপে, বসন্তের ঝরা-পাতায়, বাঁশবনে, শুষ্ক-তৃণের মাঠে, ধান-কাটিবার সময় নিম্ন ভূমিতে রাখিয়া আসা খড়-বিচালিতে তাহারা আগুন ধরায়, ছাইয়ে মাটি ঢাকিয়া যায়। সেই মাটিতে কৃষক চাষ দেয়, সোনার ফসল ফলায়। এই সময়ে পাহাড়ের বুকেও আগুন দেওয়া হয়, সমস্ত ঝরা-পাতা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, বসন্তকালীন প্রথম বারিধারায় ছাই-মাটি কর্দমাক্ত হইয়া উঠে; পাহাড়িয়ারা পাহাড়ের স্তরে স্তরে তখন কত কি শস্যের বীজ বপন করে। এই সকল হইতে স্পষ্টই মনে হয়, হোলির বহ্ন্যুৎসব কৃষিজীবীদের ঐরূপ বহ্নি-ক্রিয়ারই একটি আনুষ্ঠানিক রূপ; উভয়ের মধ্যে যেন নাড়ী চলাচলের যোগ রহিয়াছে।

বহ্ন্যুৎসবের সঙ্গে কৃষকদের শুধু উক্তরূপ বহ্নি-ক্রিয়ার যোগই নহে, প্রাচীন কৃষি-উৎসবেরও যেন অল্পবিস্তর সম্পর্ক রহিয়াছে। কৃষি-উৎসবে এক সময় নরবলি পর্যন্ত দেওয়া হইত। বর্তমানে পার্বত্য জাতির মধ্যে পশু বলিরই প্রথা দৃষ্ট হয়। আদিম মানুষের বিশ্বাস, রক্তে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাই ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাহারা নর-রক্তে তুষ্ট করিতে চাহিত। পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামে পৌষ-সংক্রান্তি দিনে যে বাস্তুপূজা হয়, তাহাতে এক সময় বহুসংখ্যক ছাগ-মহিষ বলি দেওয়া হইত। অনেকে বলেন, বহ্ন্যুৎসবে যে পিঠালী বা খড়ের নরমূর্তি বা পশুমূর্তি পোড়ানো হয়, এবং এক কালে উড়িষ্যায় যে জীবন্ত মেষই পোড়ানো হইত, তাহা সেই নরবলিরই বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। বহ্ন্যুৎসবের আরো কতকগুলি আনুষঙ্গিক অঙ্গ কৃষি-উৎসবের দিকেই যেন অঙ্গুলি সংকেত করে। কিন্তু সাধারণ লোক এত সব যোগাযোগ বোঝে না, তাহারা বিনা প্রশ্নে পুরুষ-পরম্পরাগত প্রথাই পালন করিয়া আসিতেছে এবং বৈদিক ঋষিদের ন্যায়ই অগ্নির পবিত্রীকরণ শক্তিতে, উহার অশুভ

অমঙ্গল-নাশী ক্ষমতাতে বিশ্বাস করে। তাই তাহারা আনুষ্ঠানিক ভাবে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সমস্ত অশুভকে বিনাশ করিতে চায়।

হোলি উৎসবের আর একটি অঙ্গ 'সং' বাহির করা। বাংলা দেশের কোথাও কোথাও পঞ্চম দোলের পূর্বে একটি বালককে গাধার টুপী পরাইয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ তাহার কাদায় লেপিয়া বাড়ী বাড়ী লইয়া যাওয়া হয়; বালক, যুবক, বৃদ্ধ অনেকেই ইহাতে যোগ দেয় এবং প্রতি বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে জল ঢালিয়া কাদা করিয়া সকলে হোলিগানে মত্ত হয়, কাদা ছড়ায়, কাদায় গড়াগড়ি দেয়। এই গান অনেক ক্ষেত্রে শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আদিরসাত্মক হইয়া উঠে। গৃহস্বামী তখন তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে নগদ-বিদায় দিয়া সেই অশ্লীলতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ইহাকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে মাইট্যা হোলি বা মাইট্যা ছুরি বলা হয়। এই হোলিতে যোগদানকারী কেহই বড় সে দিন প্রকৃতিস্থ থাকেন না। এই উল্লাস-অনুষ্ঠানে যে টাকা উঠে, তদ্দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ই ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। যে বালকটি সং সাজে, তাহাকে সাধারণতঃ হোলির রাজা বলা হয়। এইরূপ সং সাজিবার প্রথা সর্ব্বত্র নাই; গুজরাট এবং মধ্যভারতের স্থানে স্থানে আছে। ঐ অঞ্চলে হোলির রাজাকে গাধায় চড়াইয়া শোভাযাত্রা বাহির করে। গুজরাটে হোলির পরদিন রাত্রিতে একটি ভিক্ষুক-বালককে সংগ্রহ করা হয় এবং তাহাকে ভূরিভোজনে খুসী করিয়া গাধার উপর উঠাইয়া গ্রামের পথে পথে ঘুরানো হয়। সেই সময় শুধু হাস্য-কৌতুকই চলে না, অশ্লীল-অশ্রাব্য-বাক্যও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করে। বিজয়া-দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জনের পরমুহূর্তে এক সময়ে আমাদের দেশেও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের প্রথা ছিল এবং কালিকাপুরাণে তাহার সমর্থন এবং বিধানও পাওয়া যায়। আমাদের আরও কয়েকটি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যানিধি মহাশয় কৃষ্ণযজুর্বেদ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞের পর আর্য ঋষিগণও দাস-জাতীয়া বারাঙ্গনাদের কুৎসিত অঙ্গ-ভঙ্গিসহ নৃত্য দেখিয়া ও অশ্লীল গীত শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এ বিষয়ে আমি 'শারদোৎসব—বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে' প্রবন্ধে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। চাঁদকবি তাঁহার 'পৃথ্বীরাজ রাসো' গ্রন্থে হোলির দিন মানুষ আত্মপর ভুলিয়া পরস্পরকে গালি (বোল আবোল) দেয় কেন, পৃথ্বীরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে এক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। চৌহানবংশে এক কালে ঢুণ্ডা নামে এক রাক্ষস এবং ঢুণ্ডিকা নামে এক রাক্ষসী ছিল। ঢুণ্ডা কাশী যাইয়া কঠোর তপস্যা করে এবং নিজের মাংস কাটিয়া কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দেয়। তখন তাহার ভগিনী ঢুণ্ডিকা নিতান্ত শোকাকুলা হইয়া দীর্ঘ দিন তপস্যা দ্বারা পার্বতীকে সন্তুষ্ট করে এবং এই বর প্রার্থনা করে যে, সে যেন যে কোন মানুষকে খাইতে পারে। পার্বতী তখন মহাদেবের নির্দ্দেশে তাহাকে সর্তাধীনে এই বর দিলেন যে, 'হোলির সময় যাহারা গালাগালি করিবে, গাধায় চড়িবে, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে আত্মপর ভুলিয়া যাইবে—তাহাদিগকে ছাড়া অন্য লোককে খাইতে পারিবে।' ওদিকে মহাদেবের আদেশে পবন হোলির তিন দিন ধরিয়া এমন ধূলা উড়াইলেন যে, সেই ধূলার অন্ধকারে নরনারী আত্মপর ভুলিয়া অন্যায় আচরণে এবং অশ্লীল-অশ্রাব্য কথা উচ্চারণে মত্ত হইল। ঢুণ্ডিকা তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়া সকলের ঐ অবস্থা দেখিয়া আর কাহাকেও খাইতে পারিল না। ইহার পর হইতেই নাকি লোকে ঢুণ্ডিকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে, এই বিশ্বাসে প্রতি বৎসর হোলিতে অশ্লীল বাক্য ও আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্যানিধি মহাশয়ও বলেন, "এক কালে লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন চক্ষু, কর্ণ কিংবা দেহ অশুচি করিলে সে বৎসর যমদূত স্পর্শ করিতে পারে না।" আমরা কিন্তু বর্তমানে বৎসরের প্রথম দিনে নরনারীকে ভাল খাইতে-পরিতে, ভাল ভাবে থাকিতে, ভাল আচরণ করিতেই দেখিতে পাই। আমাদের তো মনে হয়, মানুষের চিন্তা-চেষ্টা যখন সুদূরপ্রসারী হয় নাই, বিচিত্র আনন্দ-উপভোগের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, তখন মানুষ অবসর সময়ে দল বাঁধিয়া নৃত্য-গীত ও যৌনধর্মী-আচরণ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিত। তখন বিভিন্ন দলের পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশা দোষের মনে হইত না। পরবর্তী কালে সমাজের কঠোর বন্ধনের দিনেও শাস্ত্রকারগণ মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তি ও আচরণকে একেবারে পিষিয়া না মারিয়া ধর্ম্মের আবরণে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, নতুবা সংসার-সমাজ ভাঙ্গিয়াই পড়িত।

ব্রজভূমি হোলি-উৎসবে একটি প্রধান কেন্দ্র। অন্য-প্রদেশ-নিরপেক্ষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ইহার আছে। দেশী-বিদেশী বহু

পর্যটকের লিখিত বিবরণী হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। সেখানে এই উৎসব ফাল্গুনের শুক্লা-অষ্টমীতে আরম্ভ হইয়া কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া পর্যন্ত দশটি গ্রামে দশ দিন চলে। প্রথম দিনের উৎসব হয় বর্ষাণা গ্রামে। সেদিন নন্দগ্রামের যুবকেরা দলবদ্ধ হইয়া বর্ষাণা গ্রাম আক্রমণ করিতে আসে। সে-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ভার গ্রহণ করে, স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বীরাঙ্গনারা। ভোর হইতে না হইতেই তাহারা নন্দগ্রামের পুরুষদের আগমন প্রতীক্ষায় নিজেদের গ্রামের প্রত্যেকটি প্রবেশ-পথ লাঠি হাতে আগলাইয়া থাকে। গ্রামের কেন্দ্রস্থলেও অনেকে থাকে দলবদ্ধ হইয়া। কিন্তু এই আক্রমণ এবং প্রতিরোধ দুই-ই সে কৃত্রিম, সমাজের কঠোর বিধি-নিষেধের বাহিরে একটা দিন স্বাধীন ভাবে পুরুষ-নারীতে মেলামেশা এবং আনন্দ উপভোগই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা বলা বাহুল্য। প্রথমেই দেখা যায়, নন্দগ্রামের পুরুষেরা বর্ষাণা আক্রমণ করিতে আসিলেও সঙ্গে তাহারা লাঠি বা অন্য কোন অস্ত্র-শস্ত্র বহন করে না; কারণ প্রতিরোধকারীরা থাকে নারী এবং নারী-দেহে আঘাত নিষিদ্ধ। এজন্য পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষার জন্য ঢাল লইয়াই আসে। আক্রান্ত গ্রামের পুরুষদের সেদিন এই সংঘর্ষে যোগদান করিবার কোনও অধিকার নাই। তাহারা নির্বাক্ দর্শকের মতো দূরে অবস্থান করে। নন্দগ্রামের যুবকেরা আসিয়া লাঠিধারী, কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী বরাঙ্গনাদের উদ্দেশে গানের ভিতর দিয়া প্রথমেই অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীও চলে। নারীরাও অনেক সময় উত্তেজিত হইয়া অনুরূপ ভাবেই ঐ সকলের প্রত্যুত্তর দেয়। বহুক্ষণ এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিবার পর পুরুষেরা নারীদের প্রবল লাঠি-বর্ষণের মুখে ঢালের অন্তরালে কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। নারী-ব্যূহ ভেদ করিতে যাইয়া অকৌশলী অনেকে যে আহত না হয়, তাহা নহে। কিন্তু অশ্লীল গালাগালি এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীতে যেমন, তেমনি সে আঘাতেও সেদিন কেহ কিছু মনে করে না। সীমান্ত-বেষ্টনী ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া গ্রামের কেন্দ্রস্থলে সংঘর্ষ জমিয়া উঠে এবং শীঘ্রই তাহা বিকট উল্লাস ও মাতামাতিতে রূপান্তরিত হয়। সমস্ত দিন ভরিয়া গান চলে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে ঘরে ফিরে। দুইটি ভিন্ন গ্রামের প্রায় অপরিচিত পুরুষ-নারীতে এইরূপ সংঘর্ষ ও মাতামাতি যতই নগ্ন হউক না কেন, সেদিন উহা ধর্মানুমোদিত বলিয়া চলিয়া যায়।

পরদিন বর্ষাণার পুরুষদের দ্বারা নন্দগ্রাম আক্রান্ত হইবার এবং নন্দগ্রামের বীরাঙ্গনাদের সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার পালা। প্রথম দিন নন্দগ্রামের পুরুষেরা বর্ষাণার নারীদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করে, দ্বিতীয় দিন বর্ষাণার পুরুষেরাও নন্দগ্রামের নারীদের প্রতি তুল্যরূপ ব্যবহার করিয়া তাহার প্রতিশোধ লয়। বর্ষাণার পুরুষেরা যেমন তাহাদের গ্রাম আক্রমণ-কালে নির্বাক্ দর্শকের মতো দূরে সরিয়া থাকে, নারীদের প্রতি সমস্ত অত্যাচার (?) নীরবে সহ্য করে, নন্দগ্রামের পুরুষেরাও ঠিক তাহার পুনরভিনয় করে।

বর্ষাণা ও নন্দগ্রামের এই অনন্যসাধারণ হোলি-উৎসব দেখিবার জন্য এক কালে দেশ-বিদেশের বহু দর্শকের সমাগম হইত এবং এই আনন্দ উপভোগের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ নজরানাও দিতে হইত। এখানে সেই সেকালের উৎসবের কথাই বর্ণিত হইল। বর্তমানে ইহার আর সে উদ্দামতা নাই; অনেকেই নারী-পুরুষের এই অবাধ মাতামাতি বরদাস্ত করিতে চান না! কিন্তু হোলিগানের ধারা এবং আবীর কুমকুমের ছড়াছড়ি এখনো অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। মথুরা বৃন্দাবন, কাম্যবন প্রভৃতি স্থানের হোলি, বর্ষাণা ও নন্দগ্রাম হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু তাহারও উদ্দামতা কম নহে। হৈ-হুল্লোড়ে এবং রাধা-কৃষ্ণের রূপকের আড়ালে হোলির কয় দিন উত্তর ও মধ্যভারত যৌনধর্মী গানে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

বাংলা দেশে এই উৎসব তেমন বিকট রূপ ধারণ না করিলেও দোল-পূর্ণিমার দিনটিতে অনেকেই রং-খেলায় মত্ত হয়, দল বাঁধিয়া হৈ-হুল্লোড় করে, এবং শুধু আবীর নয়, বিশ্রী রকমের নানা রং, নোংরা জল-কাদা ইত্যাদি পরস্পরের গায় ছড়াইয়া মাখাইয়া আনন্দ উপভোগ করে। অনেক সময় যে এই ব্যাপারে জোর-জুলুম চলে না, তাহা নহে এবং পুলিশকে এ জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। সাম্প্রতিক কালে তরুণদের অনুকরণে অনেক তরুণীও রঙের পুঁটুলি লইয়া বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদে রাস্তায় বাহির হয়, কিন্তু স্বশ্রেণীর মধ্যেই তাহাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে, নিতান্ত হাস্য-পরিহাসের পাত্র ছাড়া অন্য কোন পুরুষের দিকে এখনো তাহাদের হস্ত উত্তোলিত হয় না। তরুণেরাও ঠানদি, বৌদি, শ্যালিকা প্রভৃতি মধুর সম্পর্ক ছাড়া বরাঙ্গনাদের সঙ্গে রং বড় খেলে না। বয়স্করাও জলো-রং খেলায় বড় যোগ দেন না, কিন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ ঠাকুরের প্রসাদী শুষ্ক আবীর সাগ্রহে কপালে মাখেন এবং অপরে মাখাইতে আসিলেও বাধা দেন না!

দোলযাত্রা উপলক্ষে পুরী ও নবদ্বীপে লোকের ভীড়ের সীমা থাকে না; বহু পূর্ব হইতেই দূরবর্তী স্থানের অনেকে যাইয়া স্থান গ্রহণ করেন। এই ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ণমেণ্ট ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু বর্ষাণা ও নন্দগ্রামে এককালে যে উদ্দেশ্যে ভীড় হইত, এই ভীড়ের উদ্দেশ্য তাহা নহে। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ দোল-পূর্ণিমার বিশেষ দিনটিতে যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, মনে হয় তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নিজের সাধন-জীবন দ্বারা ব্রজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে বাঙ্গালীর হৃদয়-মন্দিরে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; নাস্তিক্য ও জড়বাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাঙ্গালী ত্রিভুবন কৃষ্ণময় দেখিয়াছে; তাহারা বুঝিয়াছিল বসন্তের আগমনে বনে-উপবনে এই যে নবজীবনের সাড়া জাগে, ইহা সকলই সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা। বাংলা এবং উড়িষ্যার দোলযাত্রায় এই প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে। মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসের সিঞ্চনেই বাঙ্গালীর দোল-উৎসব অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার আবিলতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এক স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হইতেছে; তাহার হোলিগান নামসংকীর্তনের মৃদঙ্গ-নাদে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালী কবি জ্ঞানদাস বাঙ্গালীর দোল-উৎসবে,—তাহার

রং-খেলায় রাধা-মাধবের ব্রজলীলাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দোলার উপর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের দোলন এবং ভক্তের আবীর কুমকুমের অঞ্জলি প্রদান দেখিয়া তিনি গাহিয়াছেন :—

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে।
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে।
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া।

*   *   *   *

পথে-প্রাঙ্গণে লীলায়িত ছন্দে নর-নারীর মধ্যে পিচকারি খেলা চলিয়াছে, জ্ঞানদাসের মনে হইয়াছে, এ সকলই ব্রজসুন্দর ও ব্রজ-সুন্দরীদের লীলা। তাঁহার ধ্যাননেত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে :—

দোলাত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে।
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরছে অনঙ্গে।
বাজত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান।
চন্দন-কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি।
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়।
হেম মরকতে জনু জড়িত পঙ্গার।
তাহে বেঢ়ল গজমতিম হার।
দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পুরয় আশ।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগে, মনে হয় শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের ফলেই অনেক বৈষ্ণব-কবি এইরূপে তাঁহাদের রচনায় বাঙ্গালীর দোলকে শ্রীকৃষ্ণের দোললীলায় রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। পল্লীকবিদের হোলিগানেও ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়, যেমন—

'নাকের উপরে বেশর দিব,
প্রাণবন্ধুরে আজ রমণী সাজাব।
লাল শাড়ী পরাব, পীত ধড়া খসাব
নাগর হইয়ে মোহন বাঁশী আমরা বাজাব।
আবীর কুমকুম্ ভরি, তাতে মারব পিচকারি,
সব সখীরা মিলি হোলি খেলাব।'

উত্তর-ভারতে কৃষ্ণ-দোলন নাই, কোথাও কোথাও রাম-সীতাকে দোলায়। সেখানকার হোলি উৎসবের প্রধান কথা হোলিকা-দহন বা সংবৎ জ্বালানো এবং হোলিগান ও ফাগুয়া খেলা। মধ্যযুগের অনেক সাধক—কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব, রবিদাস জনতার এই আত্মভোলা ফাগ-খেলার মধ্যে সেই পরমপুরুষেরই সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, 'তাঁহাকেই' যদি না পাইলাম তাহা হইলে এই ফাগ খেলার সার্থকতা কোথায়? হোলির প্রভাব অনেক মুসলমান কবিকেও তাঁহাদের গানের এবং ধ্যানের খোরাক জোগাইয়াছে।

কিন্তু উত্তর-ভারতে কৃষ্ণ-দোলন না থাকিলেও অনেকে হোলি-উৎসবের উৎস-সন্ধানে ব্রজভূমির নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই এক কালে ব্রজধামে এই উৎসব প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য যাহাই থাকুক না কেন, হোলি-উৎসবে ব্রজধাম এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মধ্যে ইতঃপূর্বে বর্ণিত যেরূপ মত্ততা দেখা যায় এবং তদঞ্চলে হোলির উল্লাস যেরূপ নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে—অন্ততঃ এক কালে করিত, তাহাতে ব্রজভূমিকে হোলির একটি প্রধান কেন্দ্র বলিতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না। তদুপরি ব্রজের রাখাল কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশে যে দুইটি উপাসনার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহার একটি বাল-গোপালের এবং অপরটি প্রেমিক কৃষ্ণের বা রাধাকৃষ্ণের উপাসনা। আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, বাংলা এবং উড়িষ্যার দোল-উৎসবে এই প্রেমিক কৃষ্ণের তথা রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহেরই পূজা করা হয়। কি বাংলা, কি উত্তর-ভারত উভয় অঞ্চলেরই হোলি গানের প্রধান বিষয়-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। ইঁহাদের মতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার স্মৃতিই আমাদের দোল, হিন্দোল, র'স প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যানিধি মহাশয় কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁহার মতে দোলোৎসব কৃষ্ণ উপাসনা প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিত ছিল এবং ফাল্গুন-পূর্ণিমায় দোলযাত্রা ছয় সহস্র বৎসরের পুরাতন। সেই দিনে সূর্যের উত্তরায়ণ হইত, অর্থাৎ সূর্য দক্ষিণ যাত্রা পরিবর্তন করিয়া উত্তর দিকে সরিতে থাকিতেন এবং এই উপলক্ষে ঋষিগণ নববর্ষের উৎসব করিতেন। বর্তমানে এই যে শ্রীকৃষ্ণ বা শালগ্রাম শিলাকে দোলায় চড়াইয়া দোলানো হয়, তাহা সেই সুদূর অতীতের সূর্যের উত্তরায়ণেরই স্মৃতিপূজা। আমরা জানি, দোলন, দোল খাওয়া মানুষের এক অতি আনন্দের ব্যাপার। এক সময়ে 'দোলা' ভারতের বহু অঞ্চলেই অন্যতম আসবাব রূপে গণ্য হইত। এখনো অনেক গৃহেই বড়দের না হউক, অন্ততঃ ছোটদের দোল্না দেখা যায়। সেকালে উদ্যানবাটীতে রাজাদের 'দোলাঘর' থাকিত এবং বসন্ত সমাগমে তাঁহারা প্রিয়াদের লইয়া সেখানে বিহার করিতেন। আমাদের বাংলা দেশেও যে এক সময় দোলার বিশেষ প্রচলন ছিল, 'দোল দোল দোলনী, রাঙা মাথায় চিরুণী'—এই ছেলে-ভুলানো ছড়া হইতেও তাহা বোঝা যায়। ইহাতে মনে হয়, বর্তমানের শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রায় শুধু সূর্যের উত্তরায়ণের তথা এক কালের নববর্ষেরই স্মৃতি জড়িত নাই, লৌকিক দোলন-আনন্দের ধারাও উহাতে আসিয়া মিশিয়াছে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

চলুন হাংচাউ। ভুবনে স্বর্গ যদি থাকে তো সেখানে। ২-৪১এ গাড়ি ছাড়বে। যাচ্ছি একটা দিনের জন্য—কাল রাত দুপুরে আবার সাংহাই ফিরব। ভারী মালপত্র হোটেলে রইল; হাতে শুধু মাঝারি সাইজের ব্যাগ—তার মধ্যে এক দিনের মতন কাপড়চোপড় ও টুকিটাকি জিনিষ। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—দলনেতা ব্যাগ বয়ে চলেছেন, আরে, আছ কে কোথায় সব? কা কস্য পরিবেদনা! খাতির করে কেউ ছুটে এসে বলে না, কি সর্বনাশ, দিয়ে দিন ওটা আমার হাতে। নেতা মশায় অতএব হাঁপাতে হাঁপাতে কামরায় ব্যাগ তুলে ফেললেন। সকলের এই দশা। এটা এতই স্বাভাবিক, কারো এ সব নজরে আসে না।

গাড়ি ছাড়ল। নিঃসীম ধানক্ষেত আর জলাভূমি ভেদ করে যাওয়ার সেই অপরাহ্নটি বড় মনে পড়ছে। চোখ বুজলেই ছবি দেখতে পাই। নিজে এখন নতুন কি বানাব—চলতি ট্রেনে বসে চারিদিক দেখতে দেখতে নানান কথা লিখে রেখেছিলাম; সেইগুলো তুলে দিচ্ছি। পড়তে পড়তে আপনারাও উঠে আসুন না আমাদের সঙ্গে সেই কামরায়।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। লাইনের গা অবধি চাষ করেছে—নানান রকমের শাকসব্জি। সড়াক-সড়াক করে খাল পার হলাম কতকগুলো। গাড়ি শহরতলির ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। সকলের একই ঢঙের পোশাক; তার মধ্যে দুটো-পাঁচটা এদিক-ওদিক আছে। প্রাচীন মানুষ, সাবেকি পোশাক পরে বেড়াচ্ছে। আপাদ গাউন, তার উপরে কোর্তা, মাথায় হাতলওয়ালা অদ্ভুত ধরনের টুপি; মুখে বিশ-ত্রিশ গাছি লম্বা দাড়িও দেখতে পাচ্ছি কারো কারো। গুণতিতে অবশ্য অতি সামান্য এরা। ফ্যাক্টরি অদূরে; কর্মিকদের ঘর—ঝাড়াপোঁছা তকতক করছে। বড় বড় প্যাকিংব্যাক্স উল্টোদিকের প্লাটফরম ভরতি—মুটেরা সেই সব বাক্স বের করে নিয়ে যাচ্ছে। মাথার টুপি ও পোশাকে কারো কারো তালি-মারা হলেও পরিচ্ছন্ন সকলেই। প্লাটফরমে এত লোকের উঠানামা, কিন্তু নোংরা-আবর্জনা দেখি না কোন দিকে। আজ সকালেই এই সব প্রসঙ্গ হচ্ছিল। একজনে বললেন, ছিমছাম থাকা এ জাতের অভ্যাস বটে—কিন্তু এত বেশি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় সতর্কতা রাশিয়ার কাছ থেকে শিখেছে।

মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি, মাঝে টেবিল। এ-বেঞ্চিতে দু-জন ও-বেঞ্চিতে দু-জন বসবে। কামরার মাঝ বরাবর পথ চলে গেছে—সেই পথ ধরে ট্রেনের আগাপাস্তলা যথেচ্ছ বিচরণ করুন। যাত্রীরা বিনামূল্যে চা পাবেন। গরম জল পাত্রে পাত্রে দিয়ে গেল, পাশে একটা করে মোড়ক। দু-রকমের মোড়ক—সবুজ আর লাল। সবুজ চা হালকা, লাল চা কড়া—ইচ্ছে করুন যে রকম অভিরুচি। মোড়ক ছিঁড়ে চায়ের পাতা ক'টি পাত্রে ঢেলে দিন—ব্যস। লাউডস্পীকার তো আছেই। একটা লোকসঙ্গীত ধরেছে, গাড়িসুদ্ধ মানুষ তাল দিচ্ছে। সুরে সুর মিলিয়ে গাইছে৩ কেউ কেউ।

থুংচাং নামে ছোট শহর পার হয়ে এলাম। আধেক-খাওয়া চা একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে গরম জল আবার নতুন করে দিয়ে গেল। দু-পাশে দিগন্ত অবধি পাকা ধানক্ষেত, মাঝে মাঝে গ্রাম। খড় আর খোলায় ছাওয়া কুটির। খোড়ো চাল অবিকল বাংলা দেশের মতো; খোলার চাল চীনা পদ্ধতিক্রমে কিছু দুমড়ানো। খুব জল এদিকে—খাল আর ছোট ছোট নদীতে দুর্বার জলস্রোত; আর মাঠে মাঠে সতেজ সুপুষ্ট ফসল। আমাদের মেয়েরা সবেগে গান শুরু করে দিয়েছেন দোভাষি মেয়েগুলোর সঙ্গে। চীনা গান এঁরা শিখবেনই, আর ওরা শিখে নেবে হিন্দি গান।

জোলো হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। মুখে বলতে হয় না—হয়তো বা একটু ভ্রূ কুঁচকেছি, ছোকরা তাড়াতাড়ি এসে কাচ ফেলে জানলা বন্ধ করল। ক্ষিতীশ গুণী মানুষ—কাঁহাতক মুখ বুঁজে থাকবে—সে-ও গিয়ে পড়েছে গানের আসরে। সব চেয়ে তাজ্জব করলেন রাঘবিয়া। পার্লামেণ্টের মেম্বর ভদ্রলোক—একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের। ভ্রমণের এই সর্বশেষ অধ্যায়ে আবিষ্কৃত হল, উঁচু দরের গায়ক তিনি। চমৎকার গলা—আর গান অতি যত্ন করেই শিখেছেন। বিদেশি অজ্ঞদের তাক লাগিয়ে দিয়ে কত কত এরগু-গায়ক মহাদ্রুম বনে গেল, আর রাঘবিয়া এত ক্ষমতা ধরেন তার ভাঁজও কাউকে জানতে দেন নি।

সন্ধ্যা নামল, অন্ধকার হয়ে আসে চারিদিক। গ্রামের ধারে তিনটে খালের মোহানা। একটা নৌকো যাচ্ছে—একজন বোঠে বেয়ে চলেছে, আর একজন গলুয়ের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দেশের গাঙে কতদিন ঠিক এমনি ধারা দেখেছি! দাঁড়ানো লোকটার চীনা পোশাক—এই যা একটুখানি আলাদা।

এক ষ্টেশনে চার জন ছাত্র কামরায় এসে উঠল—পূর্ব-চীন ছাত্র-সমিতির (East China Students' Society) এরা—অটোগ্রাফ চায় আমাদের। সই করবার পর হাততালি। কী যেন মহৎ কাজ করে ফেললাম যেন। আমাদের কত বড় সুহৃৎ ভাবে। সর্বত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে তার পরিচয়।

ঘোর হয়ে এলো। চব্বিশে অক্টোবর দিনটার অবসান হল

দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানক্ষেত ও দূরাস্তৃত খাল-বিলে ভরা অজানা মাঠের মধ্যে। চিরকালের মতো এই মাঠে সূর্যাস্ত দেখলাম, এই মাঠের মাথায় একটা-দুটো করে তারা ফোটা দেখলাম•••

হ্যাংচাউ পৌঁছলাম ঠিক সাড়ে-আটটায়। ষ্টেশন আলোয় ফেষ্টুনে সাজিয়েছে। বাজনা বাজছে। বিপুল জনতা দাঁড়িয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্য। পরিচিত হচ্ছি বিশিষ্টদের সঙ্গে। বাঁ-হাতে ঝোলানো স্যুটকেশ, ডান হাতে পাওনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়া। এত বড় ব্যাপার—তা কেউ এগিয়ে এলো না স্যুটকেশটা নিয়ে নিতে। সেটা নামিয়ে রেখে ডান হাতের ফুল বাঁ হাতে নিয়ে তবে শেকহ্যাণ্ড করছি। দপ-দপ করে আলো জ্বালিয়ে ফোটো নিচ্ছে বারম্বার।

শহরের ঘর-বাড়ি দোকান-পাট লোক-জন দেখতে দেখতে লেকের ধারে এসে পড়লাম। সী-হু অর্থাৎ পশ্চিম হ্রদ। কিনারা ধরে যাচ্ছি। এমনই বেশ শীত—তার উপর লেকের জোলো হাওয়ায় হাড় অবধি কনকনিয়ে উঠল। সরকারি অতিথিশালায় উঠলাম; আগে হোটেল ছিল এখানে, বাড়িটার একদিক লেকের জল মধ্য থেকে গেঁথে তোলা। বিস্তর বড় বড় জায়গায় থেকে এসেছি—কিন্তু এ বাড়ির যা আসবাবপত্তোর. লাখপতি-কোটিপতিরা ব্যবহার করলেই মানায় ভাল (চীনের কোটিপতির কথা বলছিনে)।

সময় বেশি নেই, এক্ষুণি ব্যাঙ্কুয়েটে ডাকবে। পয়লা রোজের ব্যাঙ্কুয়েট—বুঝতেই পারছেন—সে রাজসূয় কাণ্ড ভাবতে গেলে অস্তবাত্মায় কাঁপুনি ধরে যায়। তবু দু-মিনিট একটু ফাঁক কাটিয়ে লেকের বারাণ্ডায় বসে নিই। আবছা-আবছা পাহাড়, জলের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ। জোনাকির মতন অগুন্তি আলো লেকের জলে ছড়ানো। নৌকোয় আলো জ্বলছে; দ্বীপের আলো স্থির দাঁড়িয়ে আছে জলের উপরে ছায়া ফেলে।

ডাকাডাকিতে খানাঘরে এলাম। দরজায় শান্তি-কমিটির প্রেসিডেণ্ট—এগিয়ে এসে হাত ধরলেন। উল্লসিত আর অতিমাত্রায় উত্তেজিত। বললেন, এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে আপনারা এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে। আসুন—দেখুন এসে—

এক আজব ফুল ফুটেছে আজ। পোর্সিলেনের রঙিন টবে অনেক যুগ ধরে চারাটা তৈরি। ফুল বোঁটায় ফোটে না—ফোটে গাছের পাতার উপর। ফোটে ফুলের খেয়াল-খুশি মাফিক, কোন নিয়মকানুনের ধার ধারে না। হয়তো ফুটল দশ-পনেরো বছর পরে, হয়তো বা দু-তিন বছরে। এই যেমন আজ ফুটেছে তিন বছর অন্তে। ফোটা অবস্থায় এখন অনেক কাল থাকবে। ফুলের নাম হল থাং (Thung) অথবা চোন (Chone) ফুলও বলে। আকারে খুব বড়, অল্পসল্প গন্ধও আছে। কিন্তু উত্তেজনার কারণ আলাদা। বরাবর দেখা যাচ্ছে, এগুলো ফোটবার পরেই দেশের কোন পরম ক্ষণ আসে। ১৯৪৯ অব্দে ফুটেছিল, মুমূর্ষু চীনের সেই তখন থেকেই বিচিত্র জীবনোল্লাস। থাং ফুল ফুটিয়ে

সাংহাই জেড বৌদ্ধমন্দিরে শ্রমণদের সঙ্গে

সাংহাই উইভিং মিলের প্রাঙ্গণে

শান্তির দূত আপনাদের এই যে শুভ পদার্পণ—আমাদের বিশ্বাস, চীনের মাটি মানুষের রক্তে ধারাস্নাত হবে না আর কখনো।

ফুলের ছবি তোলা হল। আবার দলের ছবি তুলল ফুল মাঝখানে রেখে। তার পরে সেই ভোজ। ভোজ সেরে রাত দুপুরে আবার বারাণ্ডায় গিয়ে বসি। কনকনে শীত, ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসছে—তবু যতক্ষণ পারা যায়। ওয়েষ্ট-লেকের পাশে এমনি রাত্রি জীবনে তো আর আসবে না!

ভোরবেলা বাড়ি থেকে লেকের কিনারে নেমে এলাম। ক্ষিতীশ আছে; আর সঙ্গী হয়েছেন পাটনার শাণ্ডিল্য মশায়। মানুষ-জন বড় কেউ ওঠেনি এখনো। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ ভাঙছে অতিথিশালা-বাড়িটার গায়ে। ঠিক সামনে লেকের পারে পাহাড়; উঁচু শিখরে গির্জার চূড়া দেখা যায়। পাহাড়ের নিচে ঘরবাড়ি—শহর ওদিকেও আছে।

পাকা গাঁথনির সঙ্কীর্ণ একটু বাঁধ মতন—লোক চলাচলের রাস্তা নয়—তার উপর দিয়ে যাচ্ছি। শাণ্ডিল্য বলেন, করছেন কি—পড়ে যাবেন যে!

এমন লেকে ডুবে মরেও সুখ আছে। আসুন না—আসবেন?

হাত ধরে তাঁকেও টানতে চাই বাঁধের উপর। কিন্তু রাজনীতিক মানুষ, বেকার কলমবাজ নন অধমের মতন—স্বাধীন-ভারতে বিস্তর প্রত্যাশা রাখেন, কোন দুঃখে তিনি ডুবে মরার ঝামেলায় পড়তে যাবেন? ভদ্রজনদের জন্য চওড়া পথ, সেই দিক দিয়ে ঘুরে তিনি চললেন।

ছোট ছোট নৌকো কূলের কাছে কাছি দিয়ে বাঁধা। আর খানিক পরে চড়ন্দার এসে জুটবে, নৌকো করে কাজে-অকাজে মানুষ লেকে ঘুরবে। ছ-টা নৌকো ছপ-ছপ করে এসে আমাদের বাড়ির গায়ে লাগল। একটা দরজা সেখানে—অতিথিশালার ওই দরজা দিয়ে বেরিয়েই জল। নৌকোগুলো আমাদের জন্য; ব্রেকফাষ্ট খেয়ে লেকে বেরুব। নৌকো বায় বেশির ভাগ মেয়ে; পুরুষ অল্পই। জল তুলে তারা কুলকুচো করছে, মুখ-হাত ধুচ্ছে। গল্পগুজব হচ্ছে এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। গলুয়ের লাগোয়া ছোট্ট এক এক কাঠের বাক্স; উঠে গিয়ে বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে তারা পড়তে বসল। সব ক'টি নৌকোয় এক গতিক—অত ভোরবেলা ঘাটে যেন পাঠশালা বসে গেল। মানুষজন উঠে পড়লে আর হবে না—তার আগে তড়িঘড়ি যেটুকু লেখাপড়া শেখা হয়ে যায়।

একটা দিন শুধু এখানে—বিস্তর ঘোরাফেরা। তাই সকাল সকাল। ব্রেকফাষ্ট স্নানাদি সেরে আবার বারাণ্ডায় বসলাম। এমন জায়গায় চার-দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকে কোন মূর্খস্য মূর্খ? আমার খানা বাপু এইখানে পাঠিয়ে দাও।

ছয় নৌকোয় মিছিল করে লেকে চক্কোর দিচ্ছি। স্প্রিঙের গদিওয়ালা দুটো সোফা মুখোমুখি—দু-জন করে আরামে বসে পড়ুন। মাঝে টেবিল। এবং বুঝতেই পারছেন•••ছবি দিয়েছি, ছবিতে দেখে নিনগে যান; আমি কিছু বলব না। ফি নৌকোয় এক জন দোভাষি কিম্বা স্থানীয় মুরুব্বিদের কেউ। এবং গোটা দুই-তিন ক্যামেরাও তাঁদের সঙ্গে।

দোভাষির মধ্যে জুটেছে দুষ্ট মেয়েটা—উ চিং-তাং। এলেম দেখাবার জন্য সাংহাই থেকে এদ্দূর অবধি চলে এসেছে। কাল ভোজের বক্তৃতায় আগ বাড়িয়ে বাহাদুরি করতে গেল। বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা ছিল 'রক্তস্নাত'; কথাটা দশ রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললাম, কিছুতে তার মাথায় ঢোকে না। ইংরেজি বিদ্যেয় আমরাও তো বিদ্যেসাগর—দেশে-ঘরে পারতপক্ষে ইংরেজি জবান ছাড়িনে গ্রামার-ভুলের আশঙ্কায়। এ রাজ্যে পরমানন্দে লক্ষ্য করছি, বিদ্যার উপরে বহুতর পিতামহেরা আছেন। আর সবার সেরা হল ঐ মেয়েটা—উ চিং-তাং। দেদার ইংরেজি ভুল করে, কিন্তু সে কারণে তিলেক পরিমাণ লজ্জা নেই। বরঞ্চ বীরত্বের ভাব—ইংরেজরা চীনকে বিস্তর জ্বালিয়েছে—জাতটার মাথায় মুগুর ঠুকছে যেন এই প্রণালীতে। সকলের আগে ভাগে, দেখ, পয়লা নৌকোটায় ভাল মানুষ হয়ে উঠে বসে দিব্যি পা দোলাচ্ছে। মানুষ কাছে পেলেই, নিজে না-ই বুঝুক, ইংরেজিতে থড়াধ্বড় বোঝাতে লেগে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে আমি উঠে পড়েছিলাম আর কি ওর নৌকোয়, হঠাৎ দেখে পিছিয়ে এলাম। শেষ অবধি যে নৌকোয় উঠলাম, তথায় আমি আর ক্ষিতীশ। আর দোভাষি পেলাম হ্যাংচাউরই মেয়ে—জানে-শোনে প্রচুর, বলেও খাসা।

সাংহাই ডকে জাহাজের উপরে

লেকের জল আয়না হয়ে সূর্যালোকে ঝিকমিক করছে। পাহাড়, পাহাড়••• পাহাড়ের ঘেরের মধ্যে এসে পড়লাম যে!

এক পাশে একটুখানি ঐ বেরুবার ফাঁক দেখা যাচ্ছে। অপরূপ নিসর্গদৃশ্য, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। হলে হবে কি—আমার হাতে খাতা-কলম। এই দুই সর্বনেশে বস্তু জীবনের সকল উপভোগ মাটি করে দিল। শনির দৃষ্টির মতো অহরহ সঙ্গে ঘোরে। শ্মশানের বহ্নিদাহের পূর্বে যে গ্রহশান্তি হবে, এমত মনে হয় না।

তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া (Shadow of the Moon in Three Pagodas)—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই বিশাল নাম জায়গাটার। নামের মধ্যে কবিতা গুন-গুনিয়ে ঘুরছে। চলুন, চলুন—। নৌকোয় নৌকোয় পাল্লা, কে যেতে পারে আগে! একবার বা পিছনে পড়ি, আগে মেরে উঠি আবার। কুমুদিনী মেহতা এবং আরো কে কে যেন গান গেয়ে উঠলেন ওপাশের নৌকো থেকে। গানে কলহাস্যে কথাগুঞ্জনে দাঁড়ের তাড়নায় নিস্তরঙ্গ হ্রদে আলোড়ন লেগেছে।

এদিক-ওদিক থেকে বাইরের কত নৌকো কাছে এসে পড়ছে। নতুন মানুষদের সঙ্গে ক্ষণিক চোখোচোখি···সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবার তারা মিলিয়ে যায়। একটা পাথরের মরগার নিচে এসে পড়েছি, ফোটো তুলল সামনেটা নৌকোয় আটকে দিয়ে। হঠাৎ যাতে পালাতে না পারি। একটা রাস্তা লেক ভেদ করে সোজা গেছে ওদিককার পাহাড় অবধি। রাস্তার ধারে ধারে অজস্র স্থলপদ্ম—ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে। আবার ঐ ফোটো নিলো—আমি লিখছি এই সময়ে। আহা, আহা—জলেও পদ্ম! পদ্মবনে এসে পড়েছি, এমনি ফুটে আছে একটা-দুটো—বেশির ভাগ ঝরে গেছে। ফুল ঝরে গিয়ে ডাঁটাগুলো শূলের মতন বেরিয়ে আছে। পদ্মপাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে নৌকো এগোচ্ছে।

প্যাগোডার গায়ে ঠকাস করে নৌকো ঠেকল। একটা এখানে, একটা ঐ, আর-একটা উই যে! মোট তিন। জলের উপরে গোলাকার মাথা হাত দুই তুলে আছে। যতটা পরিমাণ উঁচু হয়ে জেগে আছে, কারুকার্যে ভরা। রাত্রিবেলা প্যাগোডার মাথায় আলো দেয়, জলের মধ্যে আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই থেকে মিষ্টি নামটা—তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া। সুং-রাজাদের আমলের বিস্তর ভাল ভাল কবিতা আছে এর উপরে। আমাদের এই নৌকো গায়েও কাঠ খোদাই করে এই প্রাচীন এক কবিতা—'যেন এক পাতা ভেসে যাচ্ছে, নৌকোটাকে এমনি দেখাচ্ছে খালের উপরে।' আ মরি, মরি! মরতে হয় তো অতিথিশালার ঘাটের তুলনায় এটা আরও মনোরম স্থান। লেকের উপর ভাসতে ভাসতেও আমাদের মরার কথা।

পাশের নৌকো থেকে কুমুদিনী বললেন, ডুবে মরার উপন্যাস লিখতে চান বুঝি?

আর একজন—পেরিনই বোধ হয়—বললেন, তবে তো অন্য কারও মরার দরকার। উনি নন। উনি উপন্যাস লিখবেন সেই মানুষটির মরণ নিয়ে।

অতএব হাঁকডাক শুরু হল, মরে গিয়ে উপন্যাসে কে চির-অমর হতে চান? উঠে দাঁড়ান—

দোভাষি হেসে বলল, জল এখানে মোটে এক মিটার—অর্থাৎ চল্লিশ ইঞ্চির কম। ঝাঁপিয়ে যদি পড়েন ডুবে মরার উপায় নেই, শেওলা আর কাদা মেখে ভূত হবেন শুধু। নিরর্থক খাটনি।

অতএব নিরস্ত হওয়া গেল।

প্যাগোডার সামনাসামনি জায়গাটা দ্বীপ। লম্বায় অনেকটা। গাছপালাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লেকের জলে। একটা ঘন সবুজ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দ্বীপের উপরেও জল—জলের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পাথরের সেতু চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ঘর; যেখানে মাটি পাওয়া গেছে, মন্দিরের ঢঙে ঘর তুলেছে, বেদি বানিয়েছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের অন্য প্রান্তে এসে দেখি—বা রে, আমাদের ছয় নৌকো আগে-ভাগে পৌঁছে অপেক্ষা করছে।

কোণাকুণি পাড়ি মেরে উঠলাম এবারে এক বিলাস-প্রাসাদে। জল ছাড়া পথ নেই সে বাড়ি ঢোকবার। প্রায় সমস্তটা জায়গা

হাংচাউয়ে লেখকের সম্বর্দ্ধনা

ওয়েষ্ট লেকের উপরে—লেখকের পাশে দোভাষি, সামনে ক্ষিতীশ।

জুড়ে বাড়ি আর বাগান। জলের ভিতর থেকে বাড়ি গেঁথে তুলেছে। পুরানো অট্টালিকা, বনেদিয়ানার ছাপ সর্বত্র। শৌখিন আসবাবপত্র। শখ করে এমনি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে এমন সজ্জায় সাজিয়ে যাঁরা বসবাস করতেন, কি দরের মানুষ তাঁরা আন্দাজ করুন। সাত শ' বছর আগেকার এক মস্ত কবি সু তুং-ফু; এই অট্টালিকা পাওয়া যাচ্ছে তাঁর কবিতায়—'চাঁদ উঠেছে, ফুরফুরে হাওয়ায় পোশাক উড়ছে ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙের। এখানে যে গান, পিকিন তা মোটে ভাবতেই পারে না। শত্রু এসে পড়ল—তবু দেখ, ফুল ফুটে আছে, আর নাচ চলছে।'

এই সেই জায়গা। ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙও হলেন কবি, প্রচারক, মস্ত মহৎ বীর। শত্রুরা মেরে ফেলল, তিনি কিছুতে আত্মসমর্পণ করলেন না।

পরবর্তী কালে লিউ নামে এক ধাঁদরেল সরকারি লোক গ্রীষ্মাবাস বানালেন এই জায়গায়। পঁচিশ বছর আগেও তিনি ছিলেন। এখন কবর রয়েছে। মূল-কবর ঘিরে আরও এগারোটা কবর এগারো বউয়ের। মরে গিয়েও বধূকুল পরিবেষ্টনে উত্তম জমিয়ে আছেন। নতুন আমলে আইন খারাপ, একাধিক বউ নিয়ে ঘর করবার জো নেই। ঐতিহাসিক এই অট্টালিকা এখন রেলকর্মিকদের বিশ্রামপুরী। মহাকবি সু তুং-ফুর নামে উৎসর্গ-করা। সেরা কর্মিক যারা—বেশি কাজ করেছে আর খুব ভাল কাজ করেছে, এমনি যাট জন করে এখানে থাকতে পায়। ভারি ইজ্জতের ব্যাপার বিশ্রামপুরীতে এসে থাকা। তাই তো দেখে এলাম এক হাত পুরু গদির উপর কর্মিক মশায়রা গড়াচ্ছেন কিম্বা উবু হয়ে বসে তাস পিটছেন। নানান রকমের খেলাধূলা, রেডিও গ্রামোফোন বই পত্র-পত্রিকা—মনোরঞ্জনের হরেক ব্যবস্থা। আমাদের দেখে হাততালি; এ-ঘরে ও-ঘরে উঠোনে-বাগানে যেখানে যাই, হাততালি সামনে-পিছে ঘিরে চলেছে। হাততালি আর অভিনন্দন তাড়িয়ে তুলল ফের আবার নৌকোয়। জোরে জোরে বাও গো মা-লক্ষ্মীরা! জলের কিনারে কর্মিকরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও হাততালিতে প্রত্যভিনন্দন দিতে দিতে সরে পড়ছি।

বিশ্রামপুরী থেকে এক অভিনেতা সঙ্গ নিয়েছেন। তিনি অ্যাক্টো শুরু করলেন। আমাদের এঁরাই বা কম কিসে, এঁরা ধরলেন গান। উটকো মানুষ যারা এদিক-ওদিক যাচ্ছিল, চুম্বকের টানে এসে তারা মিছিলে ভিড়ে যায়।

লেক-বিহার শেষ করে অবশেষে ডাঙায় উঠলাম। হ্যাউ-চাউয়ের আর এক প্রান্ত। এক বাগিচা—বাগিচার পুকুরে রঙিন মাছের বিপুল সংগ্রহ। মাছের খেলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলো। উ চিং-তাঙের সর্বত্র ফড়ফড়ানি—ইংরেজিতে পরিচয় দিচ্ছে, মাছগুলো 'ওয়েল অরগানাইজড'। বলতে চেয়েছিল বোধ হয় 'ওয়েল অ্যারেনজড'। আর যাবে কোথা, অট্টহাসি চতুর্দিকে। সমস্তটা দিন এবং সাংহাইয়ের ফিরতি ট্রেনে গভীর রাত্রি অবধি, যে পারছে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখছে।

কাল কি কাণ্ড করেছিল, সে বুঝি জানেন না? কার একটা শাড়ি চেয়ে নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে সজ্জা করেছে। বলে, কেমন দেখাচ্ছে বলুন। দেখাচ্ছে সত্যি চমৎকার! ফুটফুটে রঙে খাসা মানিয়েছে, চোখ ফেরানো যায় না। হাঁটতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ে মরে আর কি! সেই যে সেকালে লোহার জুতো পরিয়ে রাখত, তারই দোসর। ট্রেনে উঠে এক নতুন ডাংপিঠেমি মাথায় উদয় হল, সিগারেট খাবে। খাবে ঠিক কল্কে-টানার কায়দায়। একজন কাকে দেখেছিল ঐভাবে টানতে, তখন সেই থেকে মাথায় ঘুরছে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট খাড়া রেখে সোঁ-ও-ও-ও করে দিয়েছে মোক্ষম টান। চোখ লাল হয়ে কেশে ভিরমি লেগে পড়ে যাবার দাখিল। ঝিম খেয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তা বলে ছেড়ে দেবে—সামলে নিয়ে আবার টানছে। এবার মৃদু ভাবে, বেশ সইয়ে সইয়ে। কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। আজ কিন্তু বিষম জব্দ। ঐ-হেন মেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে ভুল ইংরেজির বেকুবি এবং সেই বাবদে ক্ষেপানো শুরু হওয়ার পর থেকে।

জায়গাটা যেমন মনোরম, পুরানো কীর্তিরও তেমনি গোণা-গুণতি নেই। এখানে-সেখানে বহু সাধক ও শহীদের স্মৃতি-নিদর্শন, প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসৃষ্ট অসংখ্য গুহা ও মন্দির। ঘণ্টা কয়েক মাত্র হাতে, এর মধ্যে ক'টা জায়গায় বা যাবো, আর কি-ই বা পরিচয় দেবো আপনাদের! দুই বুদ্ধ-মন্দিরের মাঝে শ্যাম গিরিচূড়া—সে-লাই (Tse Lai)। ভারতের রাজগির থেকে উড়তে উড়তে উনিই নাকি লেকের ধারের জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ঝুপ করে বসে পড়েন। 'হাস্যানন বিশাল-বুদ্ধ'—মস্ত এক পাহাড় খোদাই করে বুদ্ধ-মূর্তি বানিয়েছে, হাসিতে ঝলমল মুখখানা। এক পাহাড়ে কাছাকাছি তিন মন্দির—মন্দিরের নাম বাংলা করলে দাঁড়াচ্ছে—ঊর্ধ্ব ভারত-মন্দির, মধ্য ভারত-মন্দির আর নিম্ন ভারত-মন্দির। আর একটা মন্দিরের নাম হল—ছয় দিকের মন্দির। ছ'টা দিক হল—উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম, ঊর্ধ্ব-অধঃ। পৃথিবীর তাবৎ অঞ্চল থেকে ভক্তেরা বুদ্ধের উপাসনায় সমবেত হবেন, তদর্থে মন্দিরের এই নাম।

একটু এগিয়ে রাস্তার উপরে বাস। অমিতাভ বুদ্ধ-মন্দিরে এবার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তর মন্দির; উঠোন এবং পূজা-অর্চনার ঘরও অনেক; ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে ঠাসা লাইব্রেরি। শ্রমণদের বাসা এক দিকে—দিব্যি খোলামেলা। বুড়োরা দিনরাত শাস্ত্রচর্চা নিয়ে আছেন। জোয়ান যুবাদের এ সব তো আছেই, তার উপরে বাড়তি কাজ—চারি পাশের জায়গাজমিতে ফলমূল শাকসবজি ও নানারকম ফসল ফলানো। নতুন-চীনের সঙ্কল্প, এক ফোঁটাও পতিত জায়গা থাকতে দেবে না—সে কর্মে সাধুরাও কোমর বেঁধেছেন।

বহু মূর্তি—সোনার পাতে মোড়া বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দিকপালেরা। মুখ্য-মন্দির অতি প্রকাণ্ড; রকমারি রঙিন চিত্রে ছাত ভরতি। ভিতরে মধ্যমূর্তির মাথা ঐ অমন উঁচু ছাত অবধি গিয়ে উঠেছে। কপালে উজ্জ্বল বৃহৎ মুক্তা, বুকে স্বস্তিকা। সামনে ধূপাধার—তার সাইজও বুদ্ধমূর্তির অনুপাতে। ধূপের ছাইয়ে অত বড় পাত্র কানায় কানায় ভরতি।

পিছনে আর এক মন্দির। তিনটি বৃহৎ মূর্তি পাশাপাশি—তিন মূর্তিরই বুকে স্বস্তিকা। মধ্যমূর্তির হাতে অর্ধচক্র—

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুপ্রসিদ্ধ গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭, সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
টেলিফোন:- ৩৪-১৭৬১ গ্রাম রিলিয়াণ্টস্,
ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ
২০০/২/সি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা। ফোন-দক্ষিণ ৪৪১৬,
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে

সেই দিকে বুদ্ধ নিবদ্ধদৃষ্টি। জগতের যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য তিনি অবলোকন করছেন এমনি ভাবে। এই মূর্তিদের ঘিরে চতুর্দিকে আরও চুরাশী মূর্তি—ভারত থেকে গিয়ে হাজির হয়েছেন নাকি বেশির ভাগ। পূজার বিস্তর হাঙ্গামা, অনেক রকম তোড়-জোড় করতে হয়। মন্দিরের বাইরে দোকানপাট পূজার উপকরণ বিক্রির জন্য। আমাদের তীর্থস্থানে যে রকম দেখতে পান।

একটা ছাত ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে, নতুন আমলে সেটা মেরামত হয়েছে। ভারা বেঁধে এখনো টুকিটাকি কাজকর্ম চলেছে, দেয়াল-ছবিতে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। ষোল শ' বছর আগে এ সব তৈরি। পাশের মন্দিরে স্থাপয়িতার মূর্তি। মন্দির তৈরির কাঠ আসত বহু দূর থেকে। আসত নাকি মাটির নিচে পাতালপুরীর পথে। এক কুয়োর তলায় পৌঁছে সেখান থেকে সমস্ত কাঠ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভূঁয়ের উপরে উঠে আসত। মন্দির শেষ হয়ে এলে মানা করে দেওয়া হল, আর কাঠ লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমদানি বন্ধ। কাঠ আসতে আসতে বন্ধ হয়ে গেল পাতালে; একটা কাঠ কুয়োর তলা অবধি চলে এসেছিল—সেইখানে আটকে রইল। তার পরে খেয়াল হল—আরে সর্বনাশ, সব চেয়ে বড় কড়িকাঠটাই তো লাগানো হয় নি। কিন্তু আর উপায় নেই। জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে সেই মূল-কড়িকাঠ বানানো হল। চোখে দেখলামও তাই। উৎকৃষ্ট কাঠ দিয়ে মন্দিরের অন্য সকল কাজকর্ম—কিন্তু আসল কাঠখানায় তালি দেওয়া। সেই কুয়ো রয়েছে মন্দিরের চত্বরে—দড়িতে আলো ঝুলিয়ে তার ভিতরে নামিয়ে দিল। অন্ধকার তলদেশে দেখতে পেলাম বটে প্রকাণ্ড কুঁদোর অগ্রভাগ। একটু কারুকর্মও আছে সেখানে।

বাসায় ফিরে দেখা গেল, খাওয়ার ঘণ্টাখানেক দেরি। সময়ের অপব্যয় করি কেন—সিল্কের দোকানে কিছু কেনাকাটা করা যাক। হ্যাংচাউ নানা জাতীয় শিল্পকর্মের জায়গা; এখানকার রেশমি ব্রোকেডের ভারি নাম। সবাই চললাম; সওদাও হল প্রচুর।

নাকে-মুখে দুটো গুঁজে এবার একজিবিশনে। যে জায়গায় যাচ্ছি, একজিবিশন একটা করে আছেই। সেই অঞ্চলে কি কি বস্তু তৈরি হয়, কি তার দাম, কোন কোন বিষয়ে নতুন কি চেষ্টাচরিত্র চলছে—এক নজরে মালুম হবে। মানুষও ছোটে মেলা দেখবার মতো। তারা ধরতে পারে না, কত কায়দায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের। সর্বত্র যেন শিক্ষার ফাঁদ পেতে রেখেছে; না শিখে পরিত্রাণ নেই।

পাটচাষের বিপুল উদ্যোগ। একটা লম্বা ঘরে কলকব্জা বসিয়ে গাঁইট-বাঁধা এবং চট ও থলে তৈয়ারি দেখানো হচ্ছে। তেমনি দেখাচ্ছে সিল্কের উপর ছবি-বুনানি ও ব্রোকেড-তৈরি। কাগজের কল, সিগারেটের কল, আরও বিস্তর ভারী ভারী কলকব্জার নমুনা রেখে দিয়েছে।

একজিবিশন থেকে মিউসিয়াম। এক তাজ্জব জিনিস দেখলাম এখানে। পুরানো এক পাত্র—ওরা বলল, হাজার খানেক বছর বয়স—পাত্রের নিচে খোদাই করা আছে চারটে মাছ, মাছের মুখ থেকে ফোয়ারার মতন জলধারা উঠছে। পাত্রটা জলে ভর্তি করে আংটা দুটো ঘষতে লাগল। ঘষতে ঘষতে শুনি, শিরশির করে মৃদু আওয়াজ উঠছে জলে। তারপর ফোয়ারার ধারা জল উঁচু হয়ে উঠতে লাগল পাত্রের নিচে যেমনটা আঁকা আছে। হ্যাংচাউ-মিউজিয়ামের এই আশ্চর্য বস্তুটা অতি অবশ্য দেখে আসবেন।

হ্রদের ঠিক উপরে পাহাড়ের গায়ে বাগিচা। ঝরণা আছে সেখানে, কুঞ্জবন, রং-বেরঙের মাছ, নানা রকম গাছপালা। টিলার উপরে দিব্যি বসবার জায়গা—বসে বসে হ্রদ-শোভা অবলোকন করুন। হ্রদটা দু-ভাগ করে মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে—সীমন্তিনীর কালো চুলে সীঁথিপাটির মতন। আর এদিকে-ওদিকে ছড়ানো অগুন্তি পাহাড় ও দ্বীপের টুকরো।

মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো ঘিরে দাঁড়ায় আমাদের। সম্বর্ধনা করছে, আর ঐ সঙ্গে মাও-তুচি অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও-র চিরজীবন কামনা। ভাষা না বুঝি—এটা বুঝতে পারি, ওদের অন্তর কানায় কানায় ভরা মাও-র প্রতি ভালবাসায়। কারণে অকারণে মাও'র বন্দনা গায়।

বিদায়বেলা শান্তি-কমিটির এক কর্তাব্যক্তি বললেন, রথুন, এই ক'টি জিনিষ নিয়ে যেতে হবে, আমাদের এই সামান্য স্মরণ-চিহ্ন। হ্যাংচাউয়ের হাতের কাজের জুড়ি নেই। তা একগাদা করে দিয়েছে প্রতি জনকে। হাতির দাঁতের মূর্তি, চন্দনকাঠের পাখা, চিত্রবিচিত্র ছাতা, রুমাল—আরও কত কি—একদিন বাদে ফর্দ দিতে পারব না। বিদায়-বক্তৃতায় বললুম, ভাষার কারিগর বটে আমি, কিন্তু অন্তর ভরে গেছে। ধন্যবাদ দেবো, সে ভাষা আজকে খুঁজে পাচ্ছি নে…

বাড়িয়ে বলা নয়, সত্যি সেই অবস্থা। ষ্টেশনে যাচ্ছি, পদে পদে ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে এগোচ্ছি যেন। এক দঙ্গল চলল গাড়ি অবধি। সাড়ে-সাতটায় হাংচাউ ছেড়ে ট্রেণ রাত-দুটোয় সাংহাই এসে দাঁড়াল। ঘুমোবার অধিক সময় নেই, ন'টায় তো এরোড্রোমে হাজির হব। এখান থেকে ক্যান্টন। আসবার সময় ক্যান্টনে একটা রাত শুধু ছিলাম—ফিরতি মুখে এবারে দেখে-শুনে যাবো। [ক্রমশঃ

ও মা জন্মভূমি!

"মা গো ও মা জন্মভূমি! আরো কত কাল তুমি,
এ বয়েসে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবনদল, বল আর কত কাল,
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।
কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা-পুত্র সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর ডাকি গো মা মা বলে।
কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ।"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২
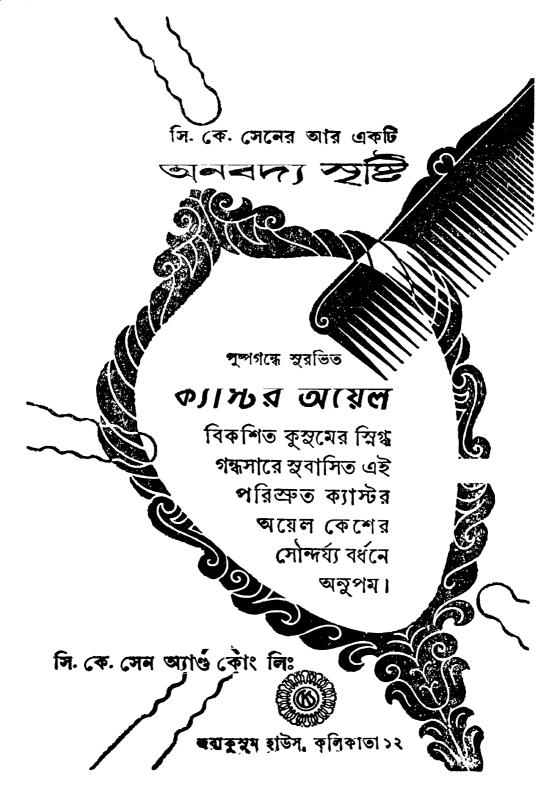
গুণীরা বলেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলবে।

জিবুটি ত্যাগ করার সময় পার্সি বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটা।' ও ছ কলনের খেদটা তখনো তার মন থেকে যায়নি। তাই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কথাটা বললো।

ঘণ্টা খানেকের ভিতর উঠল ঝড়। তেমন কিছু মারাত্মক নয় কিন্তু 'সী সিকনেস' দিয়ে মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পার্সিই প্রথম বিছানা নিল। বমি করতে করতে তার মুখ তখন সরষে ফুলের রঙ ধরেছে। ভাঙা গাল দুটো দেখে মনে হয় সত্তর বছরের বুড়ো।

আমি নিজে যে খুব সুস্থ অনুভব করছিলুম তা নয়; তবু পার্সিকে বললুম, 'তবে যে, বৎস, জিবুটি বন্দরকে কটু-কাটব্য করছিলে? এখন ঐ লক্ষ্মীছাড়া বন্দরেই পা দিতে পারলে যে দু' মিনিটেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে। মাটিকে তাচ্ছিল্য করতে নেই—অন্তত যতক্ষণ মাটির থেকে দূরে আছ—তা সে জলের তলাতে সাবমেরিনেই হোক, উপরে জাহাজেই হোক, কিম্বা তারো উপরে বাতাসে ভর করে অ্যারোপ্লেনেই হোক। তা সে যাকগে। এখন বুঝতে পারলে গুণীরা কেন বলেছেন, অগ্র-পশ্চাৎ ইত্যাদি?'

পার্সি কিন্তু তৈরী ছেলে। সেই ছটফটানির ভিতর থেকে কাৎরাতে কাৎরাতে বললে, 'কিন্তু এখন যদি কোনো ডুবন্ত দ্বীপের মাটিতে ধাক্কা লেগে জাহাজখানা চৌচির হয়ে যায় তখনো মাটির গুণ-গান করবেন না কি?'

আমি বললুম, 'ঐয, যা! এতখানি ভেবে তো আর কথাটা বলিনি।'

পল তার খাটে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আস্তে আস্তে বললে, 'জাহাজ যদি মাটিতে লেগে চৌচির হয়ে যায় তবে তো সেটা মাটির দোষ নয়। জাহাজ জোরের সঙ্গে ধাক্কা দেয় বলেই তো খান খান হয়ে যায়। আস্তে আস্তে চললে মাটির বাধা পেয়ে জাহাজ বড় জোর দাঁড়িয়ে যাবে—ভাঙবে কেন? মা'কে পর্যন্ত জোরে ধাক্কা দিলে চড় খেতে হয়, আর মাটি দেবে না?'

সৈয়দ মুজতবা আলী

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'সাধু, সাধু! তুলনাটি চমৎকার! তবে কি না আমার দুঃখ, বাঙলা ভাষায় এ নিয়ে যে শব্দ দুটো আছে তার pun তোমরা বুঝবে না। মা হচ্ছেন 'মাদার' আর 'মাটি' হচ্ছেন 'দি মাদার' কিম্বা 'আর্থ'।'

পল বললে, 'বিলক্ষণ বুঝেছি, Good Earth'

পার্সি বিরক্ত হয়ে বললে, 'পলের তুলনাটা নিশ্চয়ই চোরাই মাল।'

আমি বললুম, 'সাধুর টাকাতে দু' সের দুধ, চোরের টাকাতেও দু' সের দুধ। টাকার দাম একই। তুলনাটা ভালো। তা সে পলের আপন মালই হোক আর চোরাই মালই হোক। তা সে কথা থাক। তুমি কিন্তু 'সী সিকনেসে' কাতর হয়ে ভয় পেয়ো না। এ ব্যামোতে কেউ কখনো মারা যায় নি!'

পার্সি চিঁ চিঁ করে বললে, 'শেষ ভরসাটাও কেড়ে নিলেন, স্যর? আমি তো ভরসা করেছিলুম, আর বেশী ক্ষণ ভুগতে হবে না, মরে গিয়ে নিস্কৃতি পাবো।'

পল বললে 'আগাছা সহজে মরে না।'

আমি বললুম, 'থাক, থাক। চলো, পল, উপরে যাই। আমরা তিন জনা মিলে 'সী সিকনেস্‌কে' বড্ড বেশী লাই দিচ্ছি।'

পল বেরতে বেরতে বললে, 'হক কথা। পার্সির সঙ্গে একা পড়লে যে কোনো ব্যামো বাপ বাপ করে পালাবার পথ পাবে না।'

উপরে এসে দেখি, আবুল আসফিয়া কোথা থেকে এক জোরদার দূরবীণ জোগাড় করে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এ সব জাহাজ কখনো পাড়ের গা ঘেঁষে চলে না। তাই জোরালো দূরবীণ দিয়েও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। পল আমাকে শুধালে, 'কি দেখছেন উনি?'

আমি বললুম, 'আবুল আসফিয়া মুসলমান এবং মনে হচ্ছে ধর্মে তাঁর অনুরাগও আছে। লাল দরিয়ার এক পারে সোমালি-ভূমি, হাবসী মুল্লুক এবং মিশর, অন্য পারে আরব দেশ। মহাপুরুষ মুহম্মদ আরব দেশে জন্মেছিলেন, ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। মক্কা-মদীনা সবই তো ঐখানে।'

পল বললে, 'ইংরিজিতে যখনই কোনো জিনিসের কেন্দ্র-ভূমির উল্লেখ করতে হয় তখন বলা হয়, যেমন ধরুণ সঙ্গীতের বেলায়, 'ভিয়েনা ইজ দি মেক্কা অব মিউজিক'—এ তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বিশেষ করে মক্কা বলা হয় কেন? মক্কা তো আর তেমন কিছু বড় শহর নয়।'

আমি বললুম, 'পৃথিবীতে গোটা তিনেক বিশ্বধর্ম আছে, অর্থাৎ এ ধর্মগুলো যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি—দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন মনে করো বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম এবং ইসলাম।

কিন্তু পৃথিবীর বহু বৌদ্ধ কিম্বা খৃষ্টান কোনো বিশেষ পুণ্যদিবসে এক বিশেষ জায়গায় একত্র হয় না—মুসলমানরা যে রকম হজের দিনে মক্কায় একত্র হয়। কোথায় মরক্কো, কোথায় সাইবেরিয়া আর কোথায় তোমার চীন—পৃথিবীর যে সব দেশে মুসলমান আছে সে সব দেশের লোককে সে দিন তুমি মক্কায় পাবে। শুনেছি, সে দিন নাকি মক্কার রাস্তায় দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়।'

'তাতে করে লাভ?'

আমি বললুম, 'লাভ মক্কাবাসীদের নিশ্চয়ই হয়। তীর্থ-যাত্রীরা যে পয়সা খরচা করে তার সবই তো ওরা পায়। কিন্তু আসলে সে উদ্দেশ্য নিয়ে এ-প্রথা সৃষ্ট হয়নি। মুহম্মদ সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সব দেশের মুসলমানকে যদি একত্র করা যায় তবে তাদের ভিতর ঐক্য এবং ভ্রাতৃভাব বাড়বে। আমরা যখন বাড়িতে উপাসনা না করে গির্জায় কিম্বা মসজিদে যাই তখন তারও তো অন্যতম উদ্দেশ্য আপন ধর্মের লোকের সঙ্গে এক হওয়া। মুহম্মদ সাহেব বোধ হয় এই জিনিসটাই বড় করে, সমস্ত পৃথিবী নিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

পল অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, 'আমরা তো বড় দিনের পরবে প্রভু যীশুর জন্মস্থল বেথলেহেমে জড়ো হইনে। হলে কি ভালো হত না? তা হলে তো খৃষ্টানদের ভিতরও ঐক্য সখ্য বাড়তো।'

আমি আরো বেশী ভেবে বললুম 'তা হলে বোধ হয় রোমে পোপের প্রাধান্য ক্ষুন্ন হত।'

কিন্তু থাক এ সব কথা। আমার কোনো ক্যাথলিক পাঠক কিম্বা পাঠিকা যেন মনে না করেন যে আমি পোপকে শ্রদ্ধা করিনে। পৃথিবীর শত শত লক্ষ লক্ষ লোক যাঁকে সম্মানের চোখে দেখে তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই শত শত লক্ষ লক্ষ লোককে অশ্রদ্ধা করা হয়। অতটা বেয়াদব আমি নই। বিশেষত আমি ভারতীয়। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

৯

ঝড় থেমেছে। সমুদ্র শান্ত। ঝড়ের পর বাতাস বয় না বলে অসহ্য গরম আর গুমোট। এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই কি প্রকারে?

নিষ্কৃতির জন্য মানুষ ডাঙায় যা করে,জলে অর্থাৎ জাহাজেও তা-ই। এক দল লোক বুদ্ধিমান। কাজে কিম্বা অকাজে এমনি ডুব মারে যে, গরমের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকখানি অচেতন হয়ে যায়। বোকার দল শুধু ছটফট করে। ক্ষণে এটা করে, ক্ষণে ওটা নাড়ে; ক্ষণে ঘুমাবার চেষ্টা করে, ক্ষণে জেগে থাকতে গিয়ে আরো বেশী কষ্ট পায়।

জাহাজেও তাই। এক দল লোক দিবা-রাত্তির তাস খেলে। সকাল বেলাকার আণ্ডা-রুটি খেয়ে সেই যে তারা তাসের সায়রে ডুব দেয়, তারপর রাত বারোটা একটা দুটো অবধি তাদের টিকি টেনেও সে সায়র থেকে তোলা যায় না। লাঞ্চ সাপার খেতে যা দু'-এক বার তাস ছাড়তে হয়, ব্যস্—ঐ। তখন হয় বলে 'কী গরম কী গরম', নয় ঐ তাসের জেরই খানার টেবিলে চলে। চার ইস্কাপন্ না ডেকে তিন বে-তুরুপ বললে ভালো হত, পুনরপি ডবল না বলে সে কি আহাম্মুকিই না করেছে!

জাহাজের বে-সরকারি ইতিহাস বলে, একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা তাস খেলেছে এমন ঘটনাও নাকি বিরল নয়। এরা গরমে কাতর হয় না, শীতেও বেকাবু হয় না। ভগবান এদের প্রতি সদয়।

দাবাখেলার চর্চা পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে। আসলে কিন্তু দাবাড়েরাই এ ব্যাপারে দুনিয়ার আর সবাইকেই মাৎ করতে পারে। দাবাখেলায় যে মানুষ কি রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 'পরশুরাম' লিখেছেন, এক দাবাড়েকে যখন চাকর এসে বললে, 'চা দেব কি করে?—দুধ ছিঁড়ে গেছে'। তখন দাবাড়ে খেলার নেশায় বললে, 'কি জ্বালা, সেলাই করে নে না।'

আরেক দল শুধু বই পড়ে। তবে বেশীর ভাগই দেখেছি, ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভালো বই দিবা-রাত্র পড়ছে এরকম ঘটনা খুব কমই দেখেছি।

আরেক দল মারে আড্ডা। সঙ্গে সঙ্গে গুন্ গুন্ করে—আড্ডার যেটা প্রধান 'মেনু'—পরনিন্দা, পরচর্চা। সেগুলো বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাছে কোনো পাঠক ফস্ করে শুধায়, 'এগুলো আপনি জানলেন কি করে, যদি নিজে পরনিন্দা না করে থাকেন? তাই আর বললুম না।'

আরো নানা গুষ্ঠী নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু আবুল আসফিয়া কোনো গোত্রেই পড়েন না। তিনি আড্ডাবাজদের সঙ্গে বসেন বটে, কিন্তু আড্ডা মারেন না—খেয়া নৌকার মাঝি যে রকম নদী পেরয়, কিন্তু ওপারে নাবে না। এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁকে দেখি অন্য রূপে। খুলে কই।

পার্সি সেরে উঠে আবার জাহাজময় লম্ফ-ঝম্ফ লাগিয়েছে। যেখানেই যাই সেখানেই পার্সি। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তবে কি পার্সির জন আষ্টেক যমজ ভাই আছে না কি? একই লোক সাত জায়গায় এক সঙ্গে থাকবে কি করে?

সে-ই খবরটা আনলে।

কি খবর?

জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌঁছনর পর ঢুকবে সুয়েজ খালে। খালটি একশ' মাইল লম্বা। দু' পাড়ে মরুভূমির বালু বলে জাহাজকে এগতে হয় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে। তা হলে লাগল প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা। খালের এ-মুখে সুয়েজ বন্দর, ও-মুখে সঈদ বন্দর। আমরা যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে ট্রেন ধরে কাইরো চলে যাই এবং পিরামিড

দেখে সেখান থেকে ট্রেন ধরে সঈদ বন্দর পৌঁছই, তবে আমাদের আপন জাহাজই আবার ধরতে পারবো। যদিও আমরা মোটামুটি একটা ত্রিভুজের দুই বাহু পরিভ্রমণ করব—আর সুয়েজ খাল মাত্র এক বাহু—তব্ রেল গাড়ি তাড়াতাড়ি যাবে বলে আমরা কাইরোতে এটা ওটা দেখবার জন্য ঘণ্টা দশেক সময় পাবো।

কিন্তু যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে সময় মত ট্রেন না পাই, কিম্বা যদি কাইরো থেকে সময় মত সঈদ বন্দরের ট্রেন না পাই আর সেখানে জাহাজ না ধরতে পারি, তখন কি হবে উপায়?

পার্সি অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'সে তো কুক কোম্পানির জিম্মাদারী। তারই তো এ টুর—না এক্স্কার্শন, কি বলবো?—বন্দোবস্ত করছে। প্রতি জাহাজের জন্যই করে। বিস্তর লোক যায়। চলুন না, নোটিশ বোর্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি—কুকের বিজ্ঞাপন।'

ত্রিমূর্তি সেখানে গিয়ে সাতিশয় মনোযোগ সহকারে প্রস্তাবটি অধ্যয়ন করলুম।

কিন্তু প্রস্তাবটির শেস ছত্র পড়ে আমাদের আক্কেল গুড়ুম নয়, দড়াম করে ফেটে গেল। এই এক্স্কার্শন—বন-ভোজ কিম্বা শহর-ভোজ, যাই বলো, যাচ্ছি তো কাইরো 'শহরে'—যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রত্যেককে দিতে হবে সাত পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় একশ' টাকা।

পল বললে, 'হরি, হরি' (অবশ্য ইংরিজিতে 'গুড় হেভেনস,' 'মাই গুডনেস' এই জাতীয় কিছু একটা) অত টাকা যদি আমার থাকবেই তবে কি আমি এই জাহাজে ফার্ষ্ট ক্লাসে যেতুম না?'

আমি বেদনাতুর হওয়ার ভাণ করে বললুল, 'কেন ভাই, আমরা কি এতই খারাপ লোক যে আমাদের এড়াবার জন্য তুমি ফার্ষ্ট ক্লাসে যেতে চাও?'

পল তো লজ্জায় লাল হয়ে তোৎলাতে আরম্ভ করলে।

আর পার্সি? সে তো হনুমানের মত চক্রাকারে নৃত্য করে বলতে লাগল, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। করো মস্করা স্তরের সঙ্গে! বোঝো ঠ্যালা!'

আমি বললুম, 'ব্যস্, ব্যস্। হয়েছে। হয়েছে। কিন্তু পার্সি, একশ' টাকা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আমাকেই তো টাল-টামাল হয়ে টাকাটা টানতে হবে।'

পার্সিকে দমানো শক্ত। বললে, 'অপরাধ নেবেন না, স্তর, কিন্তু আমি-ই বা কোন হেনরি ফোর্ড কিম্বা মিডাস্ রোট্শিল্ট্? কিন্তু আমি মনস্থির করেছি, আমার জেবের শেষ পেনি দিয়ে আমি পিরামিড দেখবই দেখব। চীনা দেওয়াল দেখার পর পিরামিড দেখব না আমি? মুখ দেখাবো তা হলে কি করে? তার চেয়েও খারাপ, আয়নাতে নিজেরই মুখ দেখব কি করে?'

অনেক আলোচনা, বিস্তর গবেষণা করা হল। শেষটায় স্থির হল, পিরামিড-দর্শন আমাদের কপালে নেই। গালে হাত দিয়ে যখন ত্রিমূর্তি আপন মনে সেই শোক ভোলবার চেষ্টা করছি এমন সময় আবুল আসফিয়া মুখ খুললেন।

তাঁর সনাতন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি আমাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি। আমরা যখন স্থির করলুম, আমরা ট্রিপটা নেব না তখন তিনি বললেন, 'এর চেয়ে সস্তাতেও হয়।'

আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে শুধালুম, 'কি করে? কি করে?'

বললেন, 'সে কথা পরে হবে।'

তার পর আপন চেয়ার ছেড়ে খানা-কামরার দিকে চলে গেলেন। [ক্রমশঃ।

নিজেকে গড়ো

শচীন্দ্র মজুমদার

(পূর্ব্ব-প্রকাশের পর)

সবই ভাগ্যের ওপোর ছেড়ে দেওয়া। জীবনের যান্ত্রিক স্তরে এ ছাড়া গতিও নেই। আমাদেরই দেশে মেয়েলি প্রবাদ-বাক্য আছে, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।" "তিনি" নিশ্চয়ই অন্ন দেন, কিন্তু প্রতিযোগীরা মুখের সে অন্নটা কেড়ে নেয়। "তিনি" আহার দিয়েছেন সত্য, কিন্তু অন্ন রক্ষা করার ভারটা নিজের হাতে রাখেন নি। সে-ভার তিনি আমাদের প্রাণধর্ম দিয়ে, শক্তি ও বুদ্ধির বীজ দিয়ে আমাদেরই রক্ষা করতে বলেছেন। প্রাণশক্তিটাকে বাড়িয়ে তুলে ব্যবহার না করতে পারলে তা রক্ষা করতে পারা যায় না।

জীবন কঠোর বাস্তব, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। অনেক যুবকের মুখে আমি ত্যাগের বুলি, অর্থাৎ নিরাশাবাদ ও অক্ষমতার বুলি শুনি। ভোগ হাতের মুঠোয় এনে, তার উপকরণ আয়ত্ত করে ত্যাগ করাটাই ত্যাগ, না-পেয়ে ত্যাগের বুলি আওড়ানো কাপুরুষতা। ভালো খাওয়া-পরার, ভালো ভাবে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। কিন্তু একা শক্তিমানই সে অধিকার সফল করতে পারে। আত্মনির্ভর হতে গেলে যেমন প্রভূত শক্তির দরকার, তেমনি পৈত্রিক বিষয়-মান-মর্যাদা রক্ষা করাও শক্তিমানের কাজ, দুর্বলের নয়।

বাঘিনী তার সন্তানকে জঙ্গলের ধর্মটি শেখায়। যে-ধর্ম আক্রমণ, আত্মরক্ষা, আহার আহরণের প্রণালী। মানব-সংসারেও এ প্রণালী শেখার দরকার আছে; কেন না, জঙ্গলের যুদ্ধের চেয়ে মানুষের সংসারের যুদ্ধটা সূক্ষ্মতর, কৌশলময় এবং ঢের বেশি নির্মম। জঙ্গলে মৃত্যু আসে সম্যক্ ভাবে, মানুষের সংসারে তিল তিল করে। অথচ বাঙালী মায়ের মুখে কেবল "আহা", তাঁর কাজ কেবল ছেলেকে আঁচলের ছায়া দেওয়া। আমাদের দুটো ঘরে চড়ুই পাখীর বাসা আছে। পাখীগুলো আমার বন্ধু। তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। দেখি যে, তাদের ছানা বড়ো হলে মা-পাখীটা এক সময়ে সেটাকে বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দেয়, বাঙালী মায়ের মতো "আহা"

বলে না। এই ঠেলে ফেলে দেওয়াটাও সন্তান পালনের একটা বিশেষ অঙ্গ। সংসারে কেউ "আহা" বলবার নেই, পাখীর জগতেও না। নিজের আশ্রয় গড়ে না নিলে আশ্রয় তো নেই-ই। বাঙালী মায়ের চড়ুই পাখীর এই মাতৃ-ধর্মটা শেখা ও অভ্যাস করা উচিত।

মানুষের গঠন হয় সোপানে সোপানে। ঘর তাকে পূর্ণ করে গড়ে না, গড়ে প্রকৃত শিক্ষা ও সমাজ। ঘরের প্রভাবটা খুবই কম। যেই তুমি ইস্কুলে গেলে সেই তোমার সমাজে বাস করা আরম্ভ হলো। সমাজে তোমাকে মিশে যেতে হবেই, এবং তুমি তোমার প্রকৃতি হিসেবে সমাজ খুঁজে নিতে বাধ্য। একই ইস্কুলে নানা বালক-সমাজ, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। আদি পারিবারিক প্রভাবে তোমার প্রথম সমাজ নির্বাচন। যেটিতে তুমি মিশে যাবে, তার প্রভাব তোমার ওপোর অন্য সকল প্রভাব কাটিয়ে দেবে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা। একই শিক্ষকের কাছে অনেক ছেলে শিক্ষা নেয়, তবুও এক জন ভালো এবং আর এক জন মন্দ হয় কেন? সকলেই এক ছাঁচে ঢালা হয় না কেন? তার উত্তর: সামাজিক প্রভাবের কারণেই একই শিক্ষা থেকে দু'টি ছেলে ভিন্ন উদ্দীপনা পায়। শিক্ষার দোষ-গুণের কথা, গ্রহীতার মস্তিষ্কের তারতম্যের কথা এখানে বলবার দরকার নেই।

এক জন বড়োলোকের ছেলে বড়ো হয় না কেনো? আমি বড়লোক বলতে ধনী বুঝিনে; বুদ্ধি ও চরিত্রশক্তি দিয়ে যাঁরা বড়ো তাঁদেরই আমি বড়লোক বলে থাকি। বড়ো হ'বার জন্য বিশেষ আবেষ্টন আছে, বিপুল প্রয়াসের কথাও আছে। যাঁরা বড়ো তাঁরা সেই আবেষ্টনের সহিত সংঘর্ষণ করেছেন, প্রয়াস করেছেন নিরন্তর। বীণার ঢিলে তারে সুর ঝঙ্কৃত হয় না। সুর জাগাতে গেলে তার টান করতে হয়। প্রয়াসের টান না থাকলে জীবনেও সুর লাগে না। সেই টানে বড়োদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে তাঁদের শক্তিমান করেছে। কিন্তু তাঁদের ছেলেদের আবেষ্টন ভিন্ন, তারা সংঘর্ষণের বদলে আরাম-নিরাপত্তা, সহজ জীবনযাত্রা খুঁজেছে। তারা টানের বদলে তাদের সকল শক্তিকে শিথিল করে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাই তাদের সব ছড়ানো। বাপ যে বলে সৃজন করে যান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলে সে সৃজনীশক্তি অর্জন করে না। বহুল ভাবে বাপের কৃতকার্য্যতা তাঁর সংসারে একটা শিথিল ভাব আনে। সময় সময় এ শিথিলতা বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। তিন বা দু'পুরুষে মহাপুরুষ, এমন উদাহরণ সারা জগতে খুবই কম। আমি তো ঠাকুর, ডারুইন ও হক্সলে পরিবার ছাড়া আর কারো কথা জানিনে।

বাপ উৎকর্ষের শিখরে উঠে ধনদৌলতের গদির মতো সেখানেও ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন না কেন? সকল বাহ্যিক বস্তুতে ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব; নিজের অনেক আচার ছেলেকে দেওয়া যায়। কিন্তু আত্মসাধনার দ্বারা লব্ধ বাপের যা আভ্যন্তরিক শক্তি তা ছেলেকে হস্তান্তরিত করা অসম্ভব। অবশ্য ছেলের যদি তেমনি আত্মসাধনা গ্রহণ করবার বিপুল সচেতন প্রয়াস থাকে তাহলে সে তা লাভ করতে পারে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে যেমন একটা ঢেলা ওপোর দিকে ছুঁড়লেও সেটা নিজের গতিশেষে মাটিতে পড়তে বাধ্য, তেমনি মানুষের পিছিয়ে পড়ার, প্রতীপগতির একটা অতিশয় ক্ষমতাশালী সামাজিক নিয়ম আছে। নদীর যেমন পাঁকের টান, স্রোতশক্তি হারালে পাঁক যেমন নদীকে দখল করে, এ সামাজিক নিয়মটাও সেই পাঁকের টানেরই মতো, মানুষকে নিরন্তর অধোগতির দিকে আকর্ষণ করছে। গোড়াতেই বলেছি যে, মানুষের জন্ম তার উৎকর্ষের নিয়ন্ত্রণ করে না। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, আত্মসাধনা, ঊর্দ্ধ পরিণাম সাধনার দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে হয়। আত্মসাধনার অভাবেই মহামানবের সন্তানও আবার সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসে। কারণ আগেই বলেছি, অনুগামী বংশের শিথিলতা এবং সংহত শক্তির কেন্দ্রাপসরণ। চেতনার সাধনা থাকলে এ অপচয় নিবারণ করা যায়।

প্রাণধর্ম বিচিত্র বস্তু। মানুষ, গাছপালা, ইতর প্রাণী প্রভৃতি সকলেরই এ বিচিত্র ধর্মটি আছে। বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ প্রাণধর্মের অন্তর্গত প্রাণধর্মের বিকাশ। প্রাণধর্মে বা উৎকর্ষে অপচয় নেই, সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া সে দু'টির পূর্ণ পরিচয়। গাছ জমি থেকে রস আহরণ করে, স্বকীয় সব শক্তি কেন্দ্রীভূত করে ফুল ফোটায়, ফল দেয়। কেন্দ্রীভূত শক্তির প্রকাশ তার ফুলে-ফলে। মানুষের দেহের অস্থি, রক্ত, পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি অদ্ভুত সামঞ্জস্যে কাজ করে সকল শক্তিকে কেন্দ্রগত করে, তার যা ফল সেটাকে আমরা দৈহিক উৎকর্ষ বলি। এই উৎকর্ষের দেহের বাহিরেও অনেক অঙ্গ, যেমন বাতাস, আলো, সূর্যকিরণ, খাদ্য, বাসভূমির পরিসর ইত্যাদি। প্রাণধর্ম ভিতর ও বাহিরের সকল গঠনমূলক প্রভাবগুলি এক কেন্দ্রে সংগ্রহ করে অত্যাশ্চর্য মানব-দেহটি গঠন করেছে। গাছের মতো ফুলে-ফলে শোভা পাওয়া, পরিপূর্ণ শক্তির বিকাশে সত্যিকারের মানব-অদৃষ্ট। এ শক্তির আঙ্গিক শুধু দেহের শক্তি নয়, মনেরও। দেহের শক্তি অসীম, একটা বিশিষ্ট পরিধির ভেতর তার বিকাশ। মনের শক্তির ক্রিয়ার ব্যাপকতার শেষ নেই। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড়ো শক্তি চেতনা। যদিও বর্তমানে চেতনা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, এখন এইটুকু ইঙ্গিত করে রাখা যথেষ্ট হবে যে, মানুষের ঊর্দ্ধ পরিণামে* চেতনাই মাপকাঠি। আত্মসাধনা ভিন্ন চেতনাকে লাভ করা যায় না।

মানুষ যেখানে কেবল প্রাণী তার প্রাণধর্মটি এবং অন্য প্রাণবানের প্রাণধর্ম এক; উৎকর্ষের নীতিটাও এক কিন্তু আধারভেদে তার রূপটা ভিন্ন। কিন্তু মানুষ তো শুধু প্রাণী নয়, মানুষ মানুষই; তার এ জৈবিক প্রাণধর্ম ছাড়া আরো একটা ধর্ম আছে। "কোন ধর্মটি তার?" প্রশ্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তিনিই নিজের এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, "যে ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলছে, জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়ো—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী শক্তিই হচ্চে তার ধর্ম। এই জন্য আমাদের ভাষায় ধর্ম শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্চে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্চে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটাই হচ্চে তার অন্তরতম সত্য।"

---

* ঊর্দ্ধ-পরিণাম বা পরিণাম—Evolution.

রবীন্দ্রনাথ আরো বলছেন, "আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবল মাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তারপরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।"

দেহের সাধারণ সাধনা যেমন দেহযন্ত্রের সকল ক্রিয়ার সামঞ্জস্য স্থাপন করে ঐক্য সাধন করা, মনুষ্যত্বের সাধনাও তেমনি। শক্তির সম্ভাবনার সকল অণু-পরমাণুগুলিকে স্ফুট ক'রে জড়ো করে একটি মাত্র ঐক্যের পাত্রে স্থাপন করা। দেহের সাধারণ ঐক্য-সাধন করা খুবই সহজ, প্রাণধর্মের সহায় আছে তাতে। কিন্তু দেহের সম্যক্ সাধনা ও মনুষ্যত্বের সাধনা করা অতীব দুরূহ এবং সারাটি জীবনব্যাপী। তাতেও ফললাভ করা ধ্রুব নয়। তবুও আমাদের অনুক্ষণ চেষ্টার দরকার, তাতে যতোটুকু পাওয়া যায় ততোটুকুই ইহজন্মের শ্রেষ্ঠ লাভ।

তোমার জন্মের মতো পৃথিবীতে এমন বিস্ময়কর ঘটনা কখনো ঘটেনি এবং আর কখনও ঘটবে না। এ পৃথিবীটা পুরাতন, কিন্তু তুমি তাতে নূতন। পৃথিবীর অফুরন্ত রূপ তোমার চোখে, নূতন রস তোমার অনুভূতিতে। তোমার মর্মে মর্মে এই নূতন পৃথিবীর বিস্তার। অতি শৈশবে কেবল মুখ দিয়ে তুমি ধরার স্পর্শ পেয়েছো। তখন তোমার বোধ ছিলো মাত্র দু'টি—ক্ষুধা ও বেদনার বোধ। তার পর তুমি যতো বড়ো হয়েছ, প্রাণশক্তি যেমন তোমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তেমনি তোমার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বিস্তার হয়েছে। কৈশোরে হয়েছে আমিত্ব বোধ, হয়েছে কালের অনুভূতি এবং ভবিষ্যৎকালেও তুমি আত্ম-প্রক্ষেপণ করেছো। পৃথিবীর সঙ্গে তোমার মিতালি, কোলাকুলি করার অবসর নিরন্তর বেড়ে চলেছে। কতো অনুভব জেগেছে তোমার মনে, সে সকল অনুভব কতো নূতনের বিস্ময় এনেছে। বিশ্ব জড়ো হয়ে তোমার মনে নূতন করে বাসা বেঁধেছে। তোমার নিজস্ব বিশ্বের রচনা করেছো তুমি নিজে। তুমি যে চোখে দেখেছো, সে চোখে তেমন করে তোমার পূর্বে আর কেউ দেখেনি, তোমার পরেও কেউ দেখবে না। এমন অলৌকিক ঘটনা পৃথিবীতে আর কখনো ঘটবে না। তোমার মুখ, তোমার আঙুলের ছাপ যেমন মৃত ও জীবিত কোটি কোটি মানুষের মুখ ও আঙুলের ছাপ থেকে ভিন্ন, যেমন সে দু'টির আর কখনো পুনরাবৃত্তি হবে না, তোমার পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গতার, তোমার তাকে দেখার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীরও তেমনি পুনরাবৃত্তি নেই। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী তোমার, তোমার পৃথিবীর উপলব্ধিটিও সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই নিজস্ব গুণ দিয়েই তুমি তোমার বিশ্বটি রচনা করেছো। যে যেমন গড়ে নেয়। সেই কারণে কেউ পৃথিবীর মাধুর্য আহরণ করতে পারে কেউ বা পারে না। কেউ বলে এই পৃথিবীটাই স্বর্গ, কেউ বলে সেটা নরক। আবার, তোমার দৃষ্টিতেই এই পৃথিবীর রূপ বার বার পরিবর্তিত হবে। নিশ্চিন্ত ছোট বয়সে সকলেরই পৃথিবী আর জীবনকে মধুর লাগে। বড়ো হয়েও সেই মাধুর্য রক্ষা করতে পারা, জীবনকে সরস করে রাখা অতিশয় কঠিন কাজ। সেইটাই জীবন-শিল্প। জীবন-শিল্পী হওয়াই মানুষের চরমোৎকর্ষ।

কিন্তু জীবন-শিল্পী হবার বিষয়ে আমরা অত্যন্ত অসহায়। কেউ আমাদের তার প্রণালী শিখিয়ে দেয় না, বলে দেয় না জীবন-শিল্প কি ও কাম্য কেন। আমরা সহজেই জীবনের অন্ধকার গলিঘুঁজিতে গিয়ে পড়ি; হাতড়াতে হাতড়াতেই কাল কেটে যায়, জীবনের আলোরূপ রসকে আর পাওয়া যায় না। জীবন-শিল্পী হবার বদলে আমরা জীবনের কাছে মুষ্টি-ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়াই। আমাদের পিতৃপুরুষদের জীবন-শিল্পী হবার যে সুযোগ ও আবেষ্টন ছিলো, আমাদের কালে তা আর নেই। তাঁদের কাল ছিলো সহজ, প্রতিযোগিতার নির্দয়তা ছিলো না। তাঁদের বাসনা ছিলো কম, উপকরণের প্রয়োজনও কম ছিলো। উপকরণ জীবনকে আড়াল করে আজকের মতো এমন পাঁচিল তুলে দিতো না। জীবনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলো। তাঁরা সহজেই আত্মস্থ হতে পারতেন। তখন মানুষই ছিলো সংসারের মাপকাঠি, আর মনুষ্যত্ব ছিলো সংসারের নিরিখ। এই বাংলা দেশেই শুনেছি যে, পণ্ডিত ব্যক্তি ইটকে বালিশ করে, নামাবলী গায়ে দিয়ে রাত কাটাতো, পীড়া অনুভব করতো না। পরমানন্দ বাউল আনন্দ বিতরণ করে বেড়াতো। উপকরণ হীনতার কারণে সমাজে কেউ তারা অপাংক্তেয় ছিলো না। নিজের চোখেও আমি এ সহজ সুস্থ জীবন কিছু দেখেছি। ছেলে বয়সে বাউলের আখড়ায় আনন্দ দেখেছি, দারিদ্র মলিনতা দেখিনি। সে জীবনে আর কিছু না থাক সরলতা ছিলো, মানুষের অপচয় ছিলো না। বাংলা দেশকে সাধনমগন, রসরসিক, কাব্যপ্রাণ এরাই করেছিলো। আজকের মতো ধন নির্লজ্জ হয়ে উপকরণ বিহীনকে কশাঘাত করতো না।

সরল জীবনযাত্রার কারণে সেকালে মানুষের জীবন-শিল্পী না হলেও চলতো, কিন্তু একালে তা না হলে আর উপায়ান্তর নেই। কালপ্রবাহে কেবল জীবনের ধারাটাই বদলে যায়নি, কাল-মানস বদলে গেছে। এখন আর মানুষ ও মনুষ্যত্ব সংসারের মাপকাঠি নয়। এখনকার কালে যন্ত্রই সব, তার চাকায় মানুষ ও মনুষ্যত্ব পিষে যাচ্ছে। মানুষ তৈরী হচ্চে যন্ত্রের প্রয়োজনের নিরিখে। যন্ত্র সদা-সর্বদা বাহু বিস্তার করে মানুষকে কেবল কুলি হতে ডাকবে। তোমার স্থান হবে হয় তেল-কালি-মাখা, কিংবা লম্বশার্টপটাবৃত শ্রমিকের, যার রূপ বস্তুত পক্ষে একই। এখন যন্ত্রদানবের কাছে মানুষের প্রার্থনা করার দিন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, নিত্যবিদ্রোহী হয়ে মনুষ্যত্বের মতো সহজ বস্তুটারই দাবী করতে হয়। এ যুগ সকল মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবার যুগ। এই বিপুল পরিবর্তনের যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় না করলে আর দাঁড়াবার উপায় নেই। কালের নিষ্পেষণ এসেছে, মানুষকে অপচয় করার সম্ভাবনাও দুরন্ত হয়েছে। শক্তি সঞ্চয় করাই এখনকার জীবন-শিল্পী হওয়া। জীবনের অজানা বাঁকে কোথায় কি আছে, কখন কি গুরুভার মাথার ওপোর এসে পড়বে, তারই জন্ম সদাসর্বদা নিজের পায়ে, হাত দু'টিতে ও হৃদয়ে ভরসা জড়ো করাই আজকের জীবন-শিল্প। এ সকল জীবন-বিরোধী সম্ভাবনার সংঘাত সত্ত্বেও পৃথিবীর রূপ রসে আস্থা না হারানোই প্রকৃত জীবন-শিল্প। জীবনকে উপভোগ করতে গেলে তার গতির সঙ্গে এক কদমে চলা দরকার।

অভিপ্রায়টি কি, তা না জানলে কোনো সাধনাই পূর্ণ আয়তন পায় না, পূর্ণ হয় না। তুমি যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছো, তখন বিদ্যালয়ের অভিপ্রায়টি কি, তা তোমার জানবার বয়স হয়নি। তোমার বাপ-মাও যে সে অভিপ্রায়টি সম্পূর্ণ ভাবে জেনেছিলেন, সে বিষয়ে আমার বেশ সন্দেহ আছে। ছেলেকে ইস্কুলে পাঠানো কতকটা মায়ের ছেলের উপদ্রব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্খা, কতকটা সামাজিক অভ্যাসের ফল, আর মূল লক্ষ্যটা অর্থগত—ছেলে বিদ্যালয়-জীবনের আকস্মিকতায় কিছু শিখে উপার্জনক্ষম হবে। কাজেই তোমরা আংশিক ভাবে বিদ্যালয়ের অভ্যাস আচরণটুকু শিখেছো, কিন্তু অভিপ্রায়টুকু কি তা জানোনি। বিদ্যালয় জীবন-শিল্পী হবার প্রথম সোপান, তা সে বিদ্যালয় বাড়ীতে বা আর যেখানেই হোক না কেনো। বিদ্যালয়ে গেলেই যে শিখতে পারা যায়, এ-কথা ধ্রুব সত্য নয়। বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছেলেদের শক্তির ও দেহের অপচয়টাই আমার বেশি করে চোখে পড়ে। যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত ভিড়, সেখানে মস্তিষ্কের শক্তির উৎকর্ষ হওয়া অসম্ভব, তার বদলে অপচয় অনিবার্য হয়। কিন্তু যে ছেলে বিদ্যালয়ের অভিপ্রায়টুকু হৃদয়ঙ্গম করেছে, বিদ্যাচর্চা যার ঘরে সম্মানিত, তার অপচয় ঘটা সম্ভব নয়। তোমার হয়ে কেউ ভাত খেতে পারে না, তোমাকেই খেতে হয়। তেমনি তোমাকেই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু কেনো করতে হবে তা না জানলে কোনো ফলই হবে না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেক্সিস্ ক্যারেলের মতে যে পরিবারে বা সামাজিক স্তরে শিক্ষার ঐতিহ্য নেই, সেখানে শেখাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। কথাটা অনেকটা সত্য হলেও একেবারে সমর্থন করা যায় না। কেনো না, ছোট-বড়ো সকলেরই সমান সুযোগের অধিকার আছে। যে অভিপ্রায়টি বুঝবে, আত্মসাধনার ইঙ্গিতটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, তার উৎকর্ষ অনিবার্য।

বিদ্যালয়ের অভিপ্রায়টি বর্ণনা করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের শরণ নিলুম। তিনি বলেছেন, "ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক কিছু না করা, আর এক মনের মত খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে একটা সাধনার দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দরোয়ানকে ঘুস দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনার দুঃখকে স্বীকার করবারও দু'রকম দিক আছে। এক দল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আর এক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম পালনটাতেই আশ্রয় পায়—তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুর মত ঠিক নিয়ম মত উপরওয়ালার আদেশ মত যন্ত্রবৎ কাজ করে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে, তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে, ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেছে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানচে বলেই সে যে-মুহূর্তে দুঃখকে পাচ্চে সেই মুহূর্তে দুঃখকে অতিক্রম করচে, যে মুহূর্তে নিয়মকে মানচে সেই মুহূর্তে তার মন তার থেকে মুক্তি লাভ করচে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি, সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্চে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্চে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে, সমস্ত দুঃখকে, সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানচে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে, সে-আনন্দ কিছু না করার চেয়েও বড়ো, সে-আনন্দ খেলা করার চেয়েও বড়ো। সে-আনন্দ শান্তির চেয়ে বড়ো, সে-আনন্দ বাঁশীর তানের চেয়ে বড়ো।"

একমাত্র এই আনন্দের পথ দিয়ে বিদ্যাচর্চার ফলেই মানুষের মূল সত্তাটি পরিপুষ্ট হয়।

[ক্রমশঃ।

পুতুল নাচ

রাণা বসু

পুতুল নাচ দেখবি যদি—আয় আয় আয়,
যে এলো না বলবে পরে—হায় হায় হায়।
পুতুলেরা হাত-পা নাড়ে,
নাচ দেখিয়ে মনটি কাড়ে,
ভুলিয়ে রাখে কিছু সময় দুখের থেকে দূরে—
আনন্দেরই জোয়ার বহায় গানের সুরে সুরে।

ক'দিনের এই মাটির ধরায় আমরা খেলার সাথী,
প্রেমের পরশ বুলিয়ে দিয়ে মনে আসন পাতি।
স্মরণ রেখো কেউ ছোট নয়,
ভুবন করি প্রেম দিয়ে জয়,
ভুলিয়ে সকল ভয়—
মোদের সাথে আয় না ছুটে সময় বয়ে যায়,
পুতুল নাচ দেখবি কে রে—আয় আয় আয়।

সপ্ত স্বরের সৃষ্টি বৈদিক যুগে

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় আমরা সাত স্বরের নিদর্শন পেয়েছি। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বরগুলি বৈদিক। স্বর-সংখ্যার প্রয়োগকে উপলক্ষ্য করে সাতটি শ্রেণীর গানের সৃষ্টি হোল—আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ। সামপ্রাতিশাখ্যে ও নারদী শিক্ষায় শাখাভেদে বিভিন্ন স্বরের প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মতঙ্গ (নবম শতাব্দীর পরে) তাঁর বৃহদ্দেশীতে লিখেছেন: শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ, দ্রাবিড়, প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে চার স্বরযুক্ত গানের তথা দেশী গানের ছিল প্রচলন—"চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ শবরপুলিন্দ-কাম্বোজবঙ্গকিরাতবাহ্লীকান্ধ্রদ্রবিড়বনাদিষু প্রযুজ্যতে।"

অস্বীকার করার আর রইল কি?

প্রকাশ্য স্থানে জলসা—বাঙলায় প্রথম

১৩৩৮ সালে এলাহাবাদে এক সঙ্গীত-সম্মেলন ঘটে। তৎকালীন বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। এই সঙ্গীত-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি হন এলাহাবাদ ডিভিশনের কমিশনার শ্রীযুক্ত বিনায়েক মেহতা। সম্মেলনে ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সঙ্গীতকে একটি বিশিষ্ট আসন দেবার প্রস্তাব করা হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলা হয়,

> The credit of reviving muisic in public for respectable woman goes to Bengal and the Brahmo Samaj. In Gujarat and Rajputana the custom of caste and mohalla group singing kept up the old tradition.

অর্থাৎ, ভদ্রমহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে গান গাওয়ার পুন প্রচলনের প্রশংসা বঙ্গদেশের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য। গুজরা ও রাজপুতানায় এক এক জাতের ও মহল্লার মেয়েদের দল বাঁ গান করিবার রীতি দ্বারা পুরাতন প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে।

এ থেকেই কি অনুমান করা যায় না, বাঙলা দেশেই প্রকা গান-বাজনা করবার রীতি প্রচলিত হয়? সময়ের একটা হিসে পাওয়া গেল তাহলে মোটামুটি। কারা করেছিলেন তা-ও জা গেল এক রকম।

আকাশ-বাণীতে ছায়াছবির গান প্রসঙ্গে

সম্প্রতি পুনরায় যোগাযোগ ঘটেছে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর স ফিল্ম প্রডিউসারস্ গিল্ড অফ ইণ্ডিয়ার। রেডিওর অনুরো আসরে আবার বাজবে আয়েগা ('মহলে'র গান), বাবুজী ধীরে না কি দাও লাগা লে ('বাজী')। অর্থাৎ সিনেমার গান আ বাজবে রেডিওতে। এ, আই, আর, বলছেন, Film Produce imagined that out of the reasoning underlyi the anouncement of this decision, certain issu were raised which vitally affected the cont nuance of their contracts with All India Radi In particular, there were some misapprehe sion about the reference to the need for avoi ing commercial publicity to films and to t character and trends of certain film songs.. ইত্যাদি।

ফিল্ম-সঙ্গস্ একেবারেই বাজবে না রেডিওতে, তাও আমরা না। কিন্তু গানগুলি বাজাবার সময় যেন রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ দে যে, গানখানি সত্যিই অশ্লীল কি না, রুচিসম্মত কি না। এর প আরও ভাববার কথা আছে। রেকর্ড বিক্রি শুনছি এর ম

যথেষ্ট কমে গেছে। অনুরোধের আসরে যথেচ্ছা রেকর্ড বাজানোই নাকি তার অন্যতম কারণ। এদিকটাও নজর দেওয়া দরকার। রেডিও কর্তৃপক্ষকে সব দিক ভেবে তবেই ছবির গানের রেকর্ড বাজাতে বলি।

মুদ্রা কত প্রকারের ?

নন্দিকেশ্বরের মতে ২৮শ প্রকার 'অসংযুত' ও ২৩শ প্রকার 'সংযুত' হস্তকরণ বা মুদ্রা রয়েছে। পতাক, ত্রিপতাক, অর্দ্ধপতাক, কর্তরীমুখ, ময়ূর, অর্দ্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, চন্দ্রকলা, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, সিংহমুখ, কাঙ্গুল, অলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড়, ত্রিশূল। অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, পুষ্পপুট, শিবলিঙ্গ, কটকাবর্দ্ধন, কর্তরীস্বস্তিক, শকট, শঙ্খ, চক্র, সম্পুট, পাশ, কীলক, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, গরুড়, নাগবন্ধ, খট্বা, ভেরুণ্ড। এ ছাড়াও উর্ণনাভ, বাণ, অর্দ্ধসূচী, কটক, পল্লী ইত্যাদি বহু মুদ্রার কথা শোনা যায়। আশা রাখি, অদূর ভবিষ্যতে মুদ্রার সচিত্র পরিচয় মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া হবে।

বাঙালী গায়িকার সম্মান লাভ

'শ্রুতি'র মধ্যেই যে সমস্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূল নিহিত রয়েছে এবং তারই সাহায্যে যে প্রাচীন গ্রীস আর আরবের সঙ্গীতগুলি থেকে মোজার্ট, বিটোফেন অবধি বিচার করে দেওয়া চলে, এই সম্পর্কে গবেষণা করে জার্মাণীর বন ইউনিভার্সিটি থেকে পি. এচ. ডি ডিগ্রী জয় করে এসেছেন বাংলার জনৈকা কৃতী গায়িকা। নাম তৃপ্ত রায়। কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদের ৺মোহিনীমোহন রায়ের কন্যা। ওস্তাদ দবীর খাঁ, নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, দানীবাবুর সুযোগ্যা ছাত্রী। জার্মাণীর সেরা সেরা পণ্ডিতরা, গায়ক-বাদকেরা সকলেই এই থিসিসটির বিশেষ প্রশংসা করেন। ছাত্রী হিসেবে শ্রীমতী রায় বরাবরই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনে তিনি কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি। বরাবর প্রথম। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে এক বৃত্তি পেয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতের রিসার্চে মন দেন। পরে আর এক সরকারী বৃত্তি পেয়ে যান বিদেশে। সঙ্গীতেও বিশেষ পারদর্শিনী তিনি। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন এমন কি রবীন্দ্র সঙ্গীতেরও তিনি বিশেষজ্ঞ, শুধু বিদ্যায় নয়, কণ্ঠেও। বিদেশে তাঁর এই কৃতিত্বে আমরাও সবিশেষ আনন্দ উপভোগ করছি।

আকাশ-বাণী উন্নত হওয়া চাই

'মিনিষ্ট্রি অফ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং'-এর দ্বাদশতম বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা হল সেদিন পার্লামেন্টে। সভাপতি বলবন্তরাও মেহতা রিপোর্টে বলেছেন,...if the industrialists in the Country fails to produce cheap radio sets suited to the Country's atmospheric and climatic conditions, Government might consider the problem of undertaking the manufacture of cheap radios by themselves. ইত্যাদি। এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ সময়োপযোগী কথা। সস্তা দরে রেডিও-সেট দরিদ্র দেশের পক্ষে একান্ত ভাবে দরকার। শিক্ষার প্রসারে, সংবাদ প্রদানের সুবিধার্থে গ্রামে রেডিওর প্রসার হওয়া দরকার। এ ছাড়াও সংবাদ আদান-প্রদানের পদ্ধতি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইত্যাদির কথাও রিপোর্টটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাজ হোক, এই আমরা চাই। শুধু মাত্র বড় বড় কথা আর রিপোর্ট লেখা, কমিশন আর স্কীমে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি।

থিয়েটার সেণ্টার, কলিকাতা

থিয়েটার সেণ্টার, কলকাতা ইউনস্কো আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনষ্টিটিউট ও ভারতীয় থিয়েটার সেণ্টারের অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। কলকাতার এই থিয়েটার সেণ্টারের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ডাঃ কালিদাস নাগ ও শ্রীতরুণ রায়। থিয়েটার সেণ্টার ও অন্তর্ভুক্ত সদস্য প্রতিষ্ঠানদের টেকনিক্যাল সাহায্য দান, মাঝে মাঝে বক্তৃতার আয়োজন, নাট্য উৎসব ও একাঙ্ক নাটিকার প্রতিযোগিতা এবং একটি নিজস্ব নাট্যমঞ্চ ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করাই হোল এঁদের উদ্দেশ্য। বর্তমান বছরে এই প্রতিষ্ঠানটি পর পর চারটি রবিবারে সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নবনাট্যমের জনরব (১৩ই মার্চ), জাতীয় নাট্য পরিষদের পূর্বরাগের ইতিহাস (২০শে মার্চ), তরুণ সঙ্ঘের আলাপ আলাপ রাস্তে (২৭শে মার্চ), বহুরূপীর উলুখাগড়া (৩রা এপ্রিল) নাটক নিবেদনের আয়োজন করেছেন। কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটার সেণ্টারের আমরা উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বসন্ত—চৌতাল *

স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়ে পিয় মোরে ঘর জনু আজহি
বসন্ত শুভগ দিন লাগ গরে।
রঙ্গ সোঁ ভরে লাল গুলাল লায়ো, আয়ো গাবো
সব মিল অপনে তন মন ধন নোছাবর করে।

রস কে রীত সোঁ খেল ফাগ, জাগ ভাগ কেঁ। বরজে
নিশ দিন ঘরি পল ছিন সনমুখ তেঁ নাহি টরে।
ঐসে আবৈ মো মন হরিদাস আজ এ দ্বৌ কর
প্যারেকে পায়ন পরখে ধরে ॥

হরিদাস স্বামী (ডাগর)

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ । ১´ ০ ২
সম -া | মা -া | মা মা | মগা হ্মা | মা পঋা | পমা পা I মা ধা | না ধা | পা মা |
আ০০ য়ে ০ পি য় মো০ ০ রে ঘ০ ০০ র জ নু ০ আ ০ জ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মগা হ্মা | মা পা | ঋা সা I সা র্সা | মা মা | পা পা | মা ধা | না ধা | না র্সা I
হি০ ০ ব স ০ ন্ত শু ০ ০ ভ ০ গ দি ০ ০ ০ ০ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা´ না | ধা না | ধা মা | মগা হ্মা | মা পা | ঋা সা II
লা ০ ০ ০ ০ ০ গ০ ০ ০ গ ০ রে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
ধা ধমা | ধা না | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সনা | ঋা র্সা I ধা মা | ধা না | র্সা র্সা |
র ঙ্গ০ সোঁ ভ ০ রে লা ল গু লা০ ০ ল লা ০ য়ো আ ০ য়ো

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা না | ধা না | ধা -া I মা মা | মা মা | মহ্মা পা | মা ধা | না র্সা | র্সা র্সা I
গা ০ ০ ০ বো ০ স ব মি ল অ০ প নে ০ ত ন ম ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা না | ধা না | ধা মা | মগা হ্মা | মা পা | ঋা সা II
ধ ন নো ০ ছা ০ ব০ র ০ ক ০ রে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
মা মা | মা মা | পা পা | মা ধা | না ধা | মা পা I মা না | ধা মপা | মা মা |
র স কে রী ০ ত সোঁ ০ ০ খে ০ ল ফা ০ গ জা০ ০ গ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মগা হ্মা | মা গা | ঋা সা I সা সা | মা পা | পা পা | মা ধা | না ধা | র্সা র্সা I
ভা০ গ কেঁ ব র জে নি শ ০ দি ০ ন ঘ রি প ল ছি ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা না | ধা না | ধা মা | মগা হ্মা | মা পা | ঋা সা II
স ন মু খ তেঁ ০ না০ ০ হি ট ০ রে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
মা ধমা | ধা না | র্সা র্সা | র্সা -া | নর্সা র্সনা | র্সা র্সা I ধা মা | ধা না | র্সা র্সা |
ঐ০০ সে আ ০ বৈ মো ০ ০ ম০ ০ ন হ রি ০ দা ০ স

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা না | ধা না | ধা মা I মা -া | মা মা | গা গা | মা ধা | নধা না | র্সা র্সা I
আ ০ ০০ জ ০ এ ০ দ্বৌ ০ ক র প্যা ০ ০০ রে ০ কে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা না | ধা না | ধা মা | মগা হ্মা | মা পা | ঋা সা II
পা ০ ০ ০ য় ন প০ র খে ধ ০ রে

---

* রাগ বসন্তের দুই প্রকার মত প্রচলিত। পুরাতন মতানুযায়ী বসন্ত ওড়ব খাড়ব জাতি। পঞ্চমবর্জ্জিত, কোমল ঋখভ এবং শুদ্ধ ও কড়ি মধ্যম। স্বর-বিন্যাস—স গ ম ধ ন র্স, র্স ন ধ হ্মা ম গ ঋ স। বাদী—ম সংবাদী—র্স ম বহু প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ, খ্যাল উপরোক্ত বসন্ত রাগের রচিত আছে। বসন্তের অপর রূপ পরজ বসন্তরূপে খ্যাত। ইহাতে ঋখভ ও ধৈবত কোমল কড়ি ও শুদ্ধ মা ব্যবহৃত হয়—জাতি সম্পূর্ণ, বক্রগতি। বাদী ম সংবাদী র্স। স গ হ্মা দ র্স, র্স ন দ প হ্মা গ হ্মা গ ঋ স স ম গ হ্মা ন দ প হ্মা গ ঋ স নিম্নোক্ত 'বসন্ত' অধুনা অধিক প্রচলিত।

ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনীর হলে একটি প্রতিকৃতি উন্মোচিত হল সঙ্গীতাচার্য্য ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর। সভায় সভাপতিত্ব করলেন শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হল প্রতিকৃতিতে। ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনী, গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত-সংঘ, মন্মথনাথ স্মৃতিমন্দির, মুরারি স্মৃতি-বাসর, অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইভা দত্ত প্রভৃতি। নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গের মন্দিরে ঘটা করে এক সঙ্গীত-সম্মেলন হয়ে গেল সেদিন। তারাপদ চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেন অসিতবরণ, প্রশান্তকুমার, সুপ্রীতি ঘোষ, সুপ্রভা সরকার, অপরেশ লাহিড়ী, মীরা চক্রবর্তী, অধীর ভট্টাচার্য্য, জহর রায়, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, মাষ্টার বাপি লাহিড়ী, কুমারী শেলী চন্দ, শিবানী লাহিড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে মণীন্দ্র গোস্বামী, মন্মথ সরকার, রামশঙ্কর ব্যানার্জী, চিত্ত ঘোষ-দস্তিদার, রায় বাহাদুর কেশব ব্যানার্জী, কালীপ্রসাদ শর্মা, মণি দাস ইত্যাদির নামও উল্লেখযোগ্য। শ্রীশিশির মিত্র ও সিপ্রা মিত্র ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সমিতির শিক্ষা সপ্তাহের মধ্যে এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন কুমারী মঞ্জুশ্রী আচার্য্য, কুমারী মলিনা বসু, কুমারী সুমিত্রা ঘোষ, কুমারী মীরা দাশগুপ্ত, কুমারী আরতি ঘোষ, কুমারী সরস্বতী দত্ত, কুমারী সুনন্দা সরকার, কুমারী রিতু গুহঠাকুরতা, কুমারী মিনু ঘোষ, কুমারী রূপবাণী বড়াল, কুমারী রমা সেনগুপ্ত, কুমারী শান্তি ঘোষ, কুমারী স্বাতী দাশগুপ্ত প্রভৃতি। ছাত্রদের মধ্যে আছেন, শ্রীকনক ভট্টাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর দাস, শ্রীসমরেশ মজুমদার, শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচীন মুখোপাধ্যায়, শ্রীতুষার বসু, শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরূপক মিত্র, শ্রীঅমর সেনগুপ্ত, শ্রীবলরাম বসু ইত্যাদি। ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সওয়া ছ'টায় পরিবেশিত হওয়ার কথা ক্যালকাটা সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রার গ্রাইসন গেরার্ডের 'জনগণমন' সঙ্গীতের পরিবর্তিত-স্বরলিপি নিউ এম্পায়ারে। এটি না কি গেরার্ডের একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

বালী বাণী-অর্চনা সংস্থা পরিচালিত সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নির্বাচন বালী রিপণ হলে সম্প্রতি হয়ে গেল। প্রবীণ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উত্তীর্ণ বিশিষ্ট প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীঅজিত-কুমার রায়, অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রণবকুমার বর্দ্ধন, সুনির্মল ঘোষ, জহর দাশগুপ্ত, সনৎকুমার চক্রবর্তী, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, মিনতি মুখোপাধ্যায়, শোভা ভৌমিক, দীপালী গুহঠাকুরতা, অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা গোস্বামী, মমতা ঘোষ, আরতি সেনগুপ্ত ইত্যাদি।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল ৯টায় 'বীণা' সিনেমা হলে কলিকাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও এতদুপলক্ষে এক সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীযুক্তা ঊষা খান। পুরস্কার বিতরণের পর অনুষ্ঠিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীকেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী স্মৃতিকণা ভট্টাচার্য্য, অনিন্দিতা ঘোষ-দস্তিদার, মীরা ঘোষ-দস্তিদার, কল্যাণী মুখার্জি, অঞ্জলি সেনগুপ্তা, স্বর্ণারাণী সাহা, মদন মজুমদার, পঙ্কজ সেন-চৌধুরী ইত্যাদি।

গত ৫ই ও ৬ই মার্চ রণজী ষ্টেডিয়ামে আধুনিক সঙ্গীতের এক বিরাট সম্মেলন হয়ে গেছে। এই সম্মেলনে বোম্বাইএর লতা মুঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা রায়, মান্না দে, নৃত্যশিল্পী সিতারা দেবী, মাদ্রাজের মহম্মদ রফি, লখ্নৌএর তালাত মামুদ ও স্থানীয় শিল্পী ধীরেন মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, যূথিকা রায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, উৎপলা সেন, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সহরে কোন একটা রাগ-সঙ্গীতের সম্মেলন হলেই দেখা যায় তার পরদিনই দৈনিক পত্রিকায় খুব ফলাও করে ছবি সমেত সংবাদ বা সমালোচনা, কিন্তু এই রকম ধরনের একটা বিরাট সঙ্গীত-সম্মেলনের পর সংবাদ-পত্রে কোন সংবাদ বা সমালোচনা না দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু সম্মেলন কর্তৃপক্ষ কোন্ জ্ঞানে একে 'আধুনিক' নামে আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বোঝেনি।

রেকর্ড-পরিচয়

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" কোম্পানী অনেকগুলি ভাল রেকর্ড সম্প্রতি প্রকাশ ক'রেছেন, নীচে তারই ভেতর থেকে বাছাই ক'রে কয়েকখানি রেকর্ডের উল্লেখ করা গেল :

'এইচ-এম্-ভি'

N 82647, শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'খানি আধুনিক সংগীত। N 82648, গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধর্মমূলক দু'খানি গান। N 27656, দিলীপকুমার রায়ের বিখ্যাত "শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্র" ও "মাতৃস্তোত্র" ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য পুনঃপ্রকাশ করা হ'ল।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত, এন ৮২৬৪৪ সন্তোষ সেনগুপ্ত এবং কুমারী পূরবী চট্টোপাধ্যায়। এন ৮২৬৪৫ আধুনিক বাংলা শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ। কমিক, এন ৮০১০১ শ্রীরঞ্জিৎ রায়, এন ৭৬০১০ অগ্নি-পরীক্ষার গান শ্রীসতীনাথ মুখার্জি, এন ৮২৬৪৬ কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা গান, এন ৮২৬৪৩ শ্রীজগন্ময় মিত্র (সুরসাগর), এন ৮৭৫৩০ যন্ত্র-সঙ্গীত।

'কলম্বিয়া'

GE 24754, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে তাঁরই দু'খানি জনপ্রিয় প্রেমগীতি গেয়েছেন। GE 24755, ক্রান্তি শিল্পী-সংঘের "বাংলার রূপ" বাঙালীর প্রিয় গান। GE 25828, হিমাংশু বিশ্বাসের মন-মাতান বাঁশীর সুর। GE 25827, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সেতারের ঝংকার। GE 30284, "মন্ত্রশক্তি" চিত্রনাট্যের দু'খানি গান গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত। GE 30285, শচীন গুপ্ত ও কুমারী গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে "মন্ত্রশক্তি" চিত্রনাট্যের দু'খানি গান।

আধুনিক বাংলা গান, জি ই ২৪৭৫২ গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, জি ই ২৪৭৫৩ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা, জি ই ৩০২৮৩ ও জি ই ৩০২৮২ কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৩)

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১০৫ সালে আমার জন্ম হয় বাঙ্গলার সঙ্গীত-তীর্থ বিষ্ণুপুরে। বাঙ্গলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারের বিশেষ সুনাম। সঙ্গীত ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন আমার পূর্ব্বপুরুষেরা। আমার প্রপিতামহ ছিলেন এক জন স্বনামধন্য সংস্কৃত পণ্ডিত। পিতামহ অনন্তলাল সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন বটে, কিন্তু সঙ্গীতকেই বরণ করে নিলেন জীবনের সাথীরূপে। সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। উদারচেতা, স্বার্থত্যাগী, অকলঙ্ক চরিত্র অনন্তলাল ছিলেন তৎকালীন বাঙ্গলার এক আদর্শ পুরুষ। তাঁর অনন্ত সঙ্গীত-ভাণ্ডারের যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়ে উঠলেন স্বর্গত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদীয় পিতৃদেব এবং খ্যাতনামা আরও কয়েক জন শ্রেষ্ঠ গুণী। আমার মাতুলালয় ছিল বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে। গ্রামটি ছিল ছোট, কিন্তু কয়েক জন কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতরসিকের বসবাস ছিল ঐ গ্রামে। সন্ধ্যার আসর সেখানে মুখর করে তুলত গ্রামের নিস্তব্ধতা। আমার মাতামহ ছিলেন সঙ্গীত-রসিক এবং বাদ্যযন্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই পিতৃদেব বর্দ্ধমান রাজষ্টেটে সঙ্গীতাচার্য্যের পদে আসীন ছিলেন। তখনকার দিনে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণ প্রায়ই রাজা-মহারাজার দরবার-গায়করূপে নিযুক্ত থাকতেন। দরবার-সঙ্গীতাচার্য্যগণের একটি প্রধান সুবিধা ছিল যে, তাঁরা সঙ্গীত সাধনা, শিক্ষাদান এবং অনুশীলনের জন্য প্রচুর সময় পেতেন। আমরা যখন বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন দিনের পর দিন দেখেছি পিতৃদেবকে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত সাধনা সুরু করতে, মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রাশীকৃত গ্রন্থের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে এবং সন্ধ্যায় শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা বিতরণ করতে। রাত্রির আসরে বৈঠকখানায় সমবেত হতেন বহু গুণী শিল্পী এবং সঙ্গীতরসিক সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বছরে বোধ হয় ৩।৪ বার দরবারে তাঁর ডাক পড়ত; বাকি সময় তাঁর কঠোর মন্ত্রের সাধনায় অতিবাহিত হত। লুপ্তসঙ্গীত উদ্ধার, গবেষণা ও প্রচার ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ তিনি বর্দ্ধমানে থাকা কালীন প্রণয়ন করেন এবং পরবর্ত্তী কালের বহু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন।

এইরূপ একটা আদর্শ পরিবেশের মধ্যে আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। "Example is better than Precept"-এ কথার মর্ম্ম সত্যই উপলব্ধি করেছি।

সাত বৎসর বয়সে আমি বর্দ্ধমান রাজস্কুলে ভর্ত্তি হই এবং সঙ্গীত-শিক্ষা সুরু করি। "বীণাপুস্তকধারিণীর দুই হাতের আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য সাধনা কর"—ইহাই ছিল পিতার বাণী। সঙ্গীত ও সাহিত্যের যোগ যে অবিচ্ছিন্ন, এই প্রেরণা আমি শৈশবেই লাভ করি। পড়া-শুনা, সঙ্গীত-সাধনা প্রভৃতির সময় নির্দ্ধারিত ছিল। অসুস্থ হওয়া বা নেহাৎ কোন প্রয়োজন না হলে তার ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিল না। অল্প বয়সে আমার মাতৃবিয়োগ হয়, পিতার অজস্র স্নেহে ধন্য হয়েছি। তিরস্কার কোন দিন করেন নি বলেই তিরস্কার বস্তুটাই ছিল অলীক ও ভয়াবহ! তিরস্কার যিনি করেন তিনি ত' জানা হয়ে গেলেন, কিন্তু তিরস্কার যিনি করেন না, তাঁর তিরস্কার না জানি কিরূপ—এই ছিল ভয়। এই বিশ্বাসই আমাকে করেছিল কর্ত্তব্যপরায়ণ।

১৯২২ সালে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, ১৯২৪ সালে রিপণ কলেজ হইতে আই, এ এবং ১৯২৬ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হই। ইংরাজি সাহিত্যে এম, এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর পড়ি। অনিবার্য্য কারণ বশত পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। বাঙ্গলা ও ইংরেজি সাহিত্য আলোচনা আমার বিশেষ প্রিয় ছিল এবং এম, এ অধ্যয়ন কালীন আমার লিখিত প্রবন্ধাদি প্রশংসা লাভ করেছে গুণীসমাজে। কলেজের অধ্যয়ন শেষ করেও আমি

বালাশান্ নদীর ঝুলন্ত সাঁকো —প্রণবকুমার মজুমদার

কলা খাবি ? —অরুণকুমার চৌধুরী

অজন্তা-গুহায় —নবকুমার চৌধুরী

কলকাতায় সকাল —অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

অর্ঘ্যদান —বিনিময় মুখোপাধ্যায়

মুখপদ্ম —দেবশঙ্কর মিত্র

অলস-বেলা —শ্রীপরিমল গোস্বামী

লজ্জার বাধা

—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

এক না দুই ?

—গোবিন্দলাল দাস

[আলোকচিত্রের জন্য আবার আহ্বান পড়েছে। ছবির আকার যেন পরিবর্দ্ধিত হয়। সঙ্গে যেন উপযুক্ত ডাক টিকিট থাকে।]

শৈবলিনী!

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
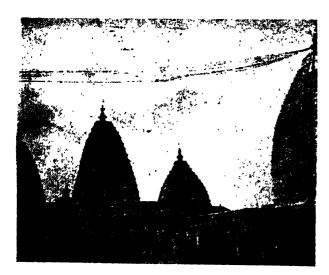
বৈদ্যনাথের মন্দির —অবনী মতিলাল

কালীঘাটের কালীমন্দির —দেবদূত মুখোপাধ্যায়

দার্জ্জিলিঙ —ব্রজেন্দ্রমোহন সেন

[ছবি পাঠাবার সময় ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানা লিখতে যেন ভুলবেন না।]

সাঁচী স্তূপ —আর, এন, ভট্টাচার্য্য

বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির —বীণা মুখোপাধ্যায়
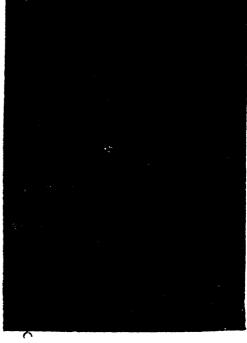
নিয়মিত সাহিত্য-চর্চ্চা করতাম। স্কুল হতে আরম্ভ করে কলেজ পর্য্যন্ত আমি তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের শিক্ষা ও আদর্শ লাভে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। সঙ্গীতে নিপুণতা লাভের জন্যও শিক্ষকগণের স্নেহভাজন ছিলাম। কত অবসর সময়ে তাঁরা আমাকে পড়িয়েছেন, এমন কি বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত আমার পড়া-শুনার তদারক করে গেছেন।

তখনকার দিনে ঘরাণা সঙ্গীত পরিবারের সনাতন প্রথা ছিল যে, গুরু যত দিন না উপযুক্ত মনে করতেন, তত দিন শিষ্য প্রকাশ্য সভায় গাহিবার বা নিজেকে জাহির করার অনুমতি পাইতেন না। শিক্ষার প্রারম্ভে এই চুক্তি হয়ে যেত এবং ইহা ছিল অলঙ্ঘনীয়। এখনকার দিনের মত "গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি"র নীতি প্রচলন ছিল না। গলায় সা রে গা মা শুদ্ধ ওঠে নি বা যন্ত্রের অঙ্গুলী চালনাও বিশুদ্ধ হয় নি, কিন্তু শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়া এবং কিছু দিন পরেই কাগজে ছবি ছাপাইয়া এবং দেবকাম্য বেতারে গাওয়াইয়া, কেবলমাত্র শিষ্যের মস্তিষ্ক বিকৃতির হেতু হন না, সঙ্গীতের অসঙ্গত অবমাননার কারণ হন। মনে আছে, ১৯১৭ সালে কাশীতে নিখিল ভারত সঙ্গীত-মহাসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে, আমার পিতৃদেব প্রথম বাঙ্গালী, বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আহূত হন। আমরা তখন স্কুলে পড়ি, তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গেছলাম। একটা ঘটনা মনে আছে। ভারত-বিখ্যাত সেতারী স্বর্গত ইম্দাদ খাঁ সাহেব তখন এটাওয়া থেকে কাশীতে আসেন, সঙ্গে তাঁর পুত্র স্বনামধন্য স্বর্গত ইনায়েত খাঁ সাহেব। ইম্দাদ খাঁ সাহেব, ইনায়েত খাঁ সাহেবের সঙ্গে পিতৃদেবের পরিচয় করে দিয়ে বললেন যে, তিনি অসুস্থ, সেজন্য তাঁর ছেলে সম্মেলনে বাজাবেন। এই প্রথম প্রকাশ্য সভায় গুরুর অনুমতি নিয়ে বাজালেন। তখন খাঁ সাহেবের বয়স সম্ভবতঃ ২৫।২৬ বৎসর হবে। এক সভায় এক বাজনাতে তিনি স্বীকৃত হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেতারীরূপে।

১৯২৫ সালে নিখিল বঙ্গ আন্তঃ-কলেজ-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা প্রথম সুরু হয় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে। আমি তখন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। কর্তৃপক্ষ এসে পিতার নিকট অনুরোধ করলেন, আমাকে প্রতিযোগিতায় পাঠাতে। স্কটিশ চার্চ্চের তৎকালীন অধ্যক্ষ Dr. Watt আদেশ করলেন, কলেজের পক্ষ থেকে যোগ দিতে। সেই প্রথম প্রকাশ্য সভায় গান। বিদ্যাভ্যাস ও সঙ্গীত-শিক্ষা একসঙ্গে হতে পারে, এটা তখনকার দিনে প্রায় ধারণার অতীত ছিল। প্রত্যেক কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী, কলিকাতায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সঙ্গীতরসিক ও ছাত্রগণে হল পরিপূর্ণ। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, লছ্‌মীপ্রসাদ মিশ্র, রাম-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরামতুল্লা খাঁ (স্বরোদবাদক), যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নাটোরের মহারাজ বাহাদুর এবং মদীয় পিতৃদেব প্রভৃতি তৎকালীন ভারত-প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণ। এই প্রতিযোগিতায় গুণিজনের পারদর্শিতা বিচারে আমি শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করি। পুরস্কার বিতরণী

সভায় সভাপতি তদানীন্তন Director of Public Instruction Mr. Stapleton আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। Running Challenge Trophy আমার কলেজে যাওয়ায় বিশেষ হৈ-চৈ হয় এবং Best Man in Music gold Medal আমি পাই। এই ধরণের প্রতিযোগিতা ভারতবর্ষে এই প্রথম এবং ইহার দ্বারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের মধ্যে প্রচলন হয়।

সাত বৎসর হইতে ক্রমান্বয়ে কুড়ি-বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি পিতার নিকট নিয়মিত শিক্ষালাভ করি। প্রচলিত, অপ্রচলিত কত রাগ, রাগরূপের বিভিন্ন ধারা, বিভিন্ন মতানুবাদ। তিনি শিক্ষা দিতেন,কোন মতই ভুল নয়। ওস্তাদী গান শিক্ষা দিতেন, কিন্তু ওস্তাদী গোঁড়ামির কোন দিন প্রশ্রয় দিতেন না। সঙ্গীতের সকল মতের সমন্বয় পেয়েছি তাঁর কাছে। কত দেশ ঘুরে, কত ওস্তাদের নিকট গৃহীত সঙ্গীতরত্ন আমরা পেয়েছি তাঁর কাছে। গ্রীষ্মাবকাশে এবং পূজাবকাশে আমাদের পরিবারবর্গ সকলেই দেশে যেতেন। আমার খুল্লতাত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং স্বরলিপিকার। কবিগুরুর গীতলিপির ছয় খণ্ড তিনি স্বরলিপিসহ প্রকাশ করে সঙ্গীত-জগতে অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। তিনি আমাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দীক্ষা দেন। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কবির কত বিখ্যাত গান। "প্রভাতে বিমল আনন্দে", "সার্থক জনম আমার", "কার মিলন চাও বিরহী", "শান্ত হ' রে মন", "বর্ষ এ' গেল চলে' প্রভৃতি গানগুলি যখন তাঁর সঙ্গে গাইতাম, তখন আমার শৈশব-মনেই এক অপূর্ব্ব আন্দোলন এনে দিত। মনের কোণে প্রশ্ন জেগে উঠত—গানের পূর্ণ সার্থকতা কোথায়? শুধু কি সুরে ও অর্থহীন ভাষায়—না কাব্যে মাধুর্য্য ও সুরের সমন্বয়ে? এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষায় বহু দিন ছিলাম। এখন অন্তর থেকেই সেই উত্তর পেয়েছি। প্রসিদ্ধ ধামার গায়ক স্বর্গত পণ্ডিত বিশ্বনাথ রাও ছিলেন পিতৃদেবের এক জন বিশেষ বন্ধু। এক বার তিনি বর্দ্ধমানে গিয়ে আমাদের বাড়ীতে প্রায় দুই মাস ছিলেন। পিতৃদেবের আদেশে আমি তাঁর কাছে ধামার ও তরাণা শিক্ষা করি। আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন এবং বহু গান শিখিয়েছিলেন। তাঁর ধামার গাহিবার পদ্ধতি ছিল অনন্যসাধারণ। বাঙ্গলার তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত আসর 'মুরারি-সম্মেলন' ও 'শঙ্কর উৎসবে' পিতৃদেবের সহিত যোগদান করিতাম। বাঙ্গলার বাহিরে বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছি। গান শুনিয়ে গুণিজনের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি এবং গুণগ্রাহী শ্রোতৃবর্গের প্রশংসা পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। সঙ্গীত অনুকরণ বিদ্যা, প্রত্যেক শিল্পীর কর্ত্তব্য সাধক শিল্পীদের যা' কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান, তা' গ্রহণ করা। যেখানে যা' ভাল মনে হয়েছে, তা' গ্রহণ করেছি মনে-প্রাণে। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী, মজঃফরপুর, মীর্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত-মহাসম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করেছি এবং যথাযোগ্য সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছি। নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের মীর্জ্জাপুর অধিবেশনে, কর্ত্তৃপক্ষ এবং উপস্থিত গুণিসমাজ আমাকে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, পিতৃদেবের গানের এক জন ভক্ত ছিলেন। বহু বার পিতৃদেব শান্তি-নিকেতনে তাঁকে গান শুনিয়ে এসেছেন। কলিকাতাস্থ জোড়াসাঁকো ভবনে, কবিগুরু প্রায় পিতৃদেবকে ডাকতেন গান শুনবার জন্য। ১৩২৫ সাল হইতে ১১৩৫।৩৬ সাল পর্য্যন্ত বহু বার পিতার সহিত কবিগুরুর দর্শন লাভ করেছি।

এক বার সকালে তাঁকে গান শুনিয়েছিলাম। কবির রচিত বিখ্যাত গান—"প্রভাতে বিমল আনন্দে" এবং "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে"। গুরুদেব গান শুনে অতীব প্রীত হন এবং আশীর্ব্বাদ করেন। সেদিন তিনি আমায় স্বরলিপি জ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলাম। গুরুদেব আমাকে এক মানপত্র দেন—তাতে লিখেছিলেন......"His voice is at once sweet and expressive." কবিগুরুর সত্তর বৎসর জন্মোৎসব ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে অতি বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আমি সেই সভায় গেয়েছিলাম তাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত—'কার মিলন চাও বিরহী', এবং "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে"। কবিগুরু সে সভায় আমার গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ কণ্ঠ-সঙ্গীত পরিবেশন করছি। ধ্রুপদ, খেয়াল, ভজন, উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত আমি গেয়ে থাকি। প্রায় আট-দশ বৎসর হল কলিকাতা বেতার কেন্দ্র আমাকে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের ভার দেন। এই অমূল্য সঙ্গীতগুলি এখন বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। H. M. V. তে পিতৃদেব রচিত শ্যামাসঙ্গীত এবং Hindusthan-এ খেয়াল ও ভজনের রেকর্ড আমার প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে এপ্রিল মাসে দিল্লী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমার হিন্দুস্থানী সঙ্গীত (আলাপ, ধ্রুপদ, ধামার) এবং অক্টোবর মাসে নিখিল ভারত রেডিও সঙ্গীত-সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত সমগ্র ভারতের বেতার শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সঙ্গীতের একটা পরিবর্ত্তন হতে আরম্ভ হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায় রাজ-দরবারের শৃঙ্খলাবদ্ধ সঙ্গীতকে মুক্তি দেওয়া। এই মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম নেতা মদীয় পিতৃদেব। ওস্তাদপন্থীরা বলতেন, তাঁদের ঘরাণা গান বা রাগ-রাগিণী, তাঁদের সঙ্গে কবরে যাবে। কৃপণতার স্পর্শে সঙ্গীত দৈন্য হয়ে পড়ল। পিতৃদেব ওস্তাদপন্থীদের এই অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য যখন গান সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন, তখন এক দল তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াল সঙ্গীতকে সহজলভ্য করার জন্য। কিন্তু অগণিত জনসমাজ মুক্ত সঙ্গীতকে তাঁদের মধ্যে পেয়ে যে আনন্দ-কলরব তুললেন, তাতে বিপক্ষ দলের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ কোথায় ভেসে গেল। পিতৃদেব নিজেও রাজ-দরবারের গণ্ডী ছেড়ে জনসাধারণের মধ্যে এসে পড়লেন। স্বাধীন ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করলেন, সঙ্গীতকে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচার করতে। আজ জনমতই সঙ্গীতের যথার্থ বিচারক।

খুকীর নতুন ফ্রক
ও, মা, এ যে নতুন ফ্রক !
হুঁ, দেখ খুকী যেন খারাপ না হ'য়ে যায়।
স্কুলে যাচ্ছে
স্কুলে
এস আমরা খেলি !
না, আমার নতুন ফ্রক খারাপ হ'য়ে যাবে যে।
তিন মাস পরে
তোমার ফ্রক যে সব ফেঁসে গেছে, খুকী।
আমি ত সাবধানে ছিলাম না !
গ্যারাণ্টি দেওয়া এই ফ্রক দেখুন !
হুঁ...যে কেচেছে এ তারই দোষ।
আমিই কাচি !
মাপ করবেন,...
...কিন্তু এ আছড়ে কাচার জন্যেই হ'য়েছে, তাতে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যায়, কলার ও আস্তিনের ফেঁসো বেরিয়ে যায়।
সানলাইট সাবানে কাপড় না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে হয়ে যায়।
মাঃ
উনি ঠিকই বলেছেন ! এখন আমি সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনায় কাচি, আমার কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে, তাতে পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
Rs 10000 Reward!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে
S. 228-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

পশ্চিম-বাঙলার সরকারী বাজেট

আগামী বছরের বাজেট পেশ করা হল দপ্তরে। সাধারণ ভাবে বাজেটের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে জিনিষটা চোখে পড়বে, তা হল বাজেটের ডেফিসিট অংশ। প্রতি বছরেই ডেফিসিট বাজেট দেখানো হচ্ছে, অথচ তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই। জনসাধারণকে আরও কর দিতে বলার কোনও অর্থ হয় না, কারণ শতকরা নব্বুই জনই এই করভার দিতেই বিব্রত হয়ে উঠেছে। কল্যাণ-রাষ্ট্রের অর্থও তা নয়। এদিকে সরকারী দেনার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। এ বছরও ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হবে। আয় বাড়ছে না, অথচ নানা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিই করে চলেছেন সরকার। ওদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনি, সিগারেট, বাল্‌ব ইত্যাদির দাম চড়ে গেছে রাতারাতি। শিরে সাপ কামড়েছে এখন কোথায় তাগা বাঁধবে, জনসাধারণ তাই খুঁজছে। এবারের পশ্চিম-বাঙলার বাজেটে,

শিক্ষা—	৮৯৮৯১০০০৲ টাকা
পুলিশ—	৬১০৩৬০০০৲ টাকা
মেডিকেল—	৪৩৬৫০০০০৲ টাকা
জনস্বাস্থ্য—	১৪৯৯৮০০০৲ টাকা
কৃষি—	৩০৬৬৪০০০৲ টাকা
সাধারণ শাসন—	২৮৫২৭০০০৲ টাকা
সমাজ উন্নয়ন—	১১১৪৩০০০৲ টাকা
জাতীয় সম্প্রসারণ—	৮৪৯২০০০৲ টাকা
উদ্বাস্তু—প্রথম খাতে	২১৮৪০০০০৲ টাকা
দ্বিতীয় খাতে	৫৯১৮০০০৲ টাকা।

বড় বড় খরচাগুলির মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া গেল। সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় পরিকল্পনাগুলি থেকে খুব বেশী রকমের লাভ পাবার কোন আশাই এখনো নেই। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি,

"মুখ্যমন্ত্রী গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করিবার কালে এই রাজ্যের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে দুইটি গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবারও তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। এই দুইটি গলদের মধ্যে একটি হইতেছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের প্রসার হইলেও এই রাজ্যের অধিবাসিগণ তদনুপাতে চাকুরী পাইতেছে না। আর একটি গলদ হইতেছে এই যে, রাজ্যে শিল্পের প্রসারের ফলে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইলেও রাজ্যের অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার উপশমের জন্য রাজ্য-সরকারের রাজস্ব তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। মুখ্যমন্ত্রীর উল্লিখিত এই দুইটি গলদ সম্বন্ধে কাহারও সহিত তাঁহার মতভেদ হইবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাহার প্রতিকার কি, তৎসম্পর্কে গত বারের ন্যায় এবারও নীরব।—পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটের একটি মূলগত গলদের কথা উল্লেখ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইতে এই রাজ্যে যে মূলধন (১৪০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগের প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তাহা নাই। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উহাদের হস্তস্থিত অর্থসঙ্গতি এমন ভাবে খাটাইতে হইবে, যাহার ফলে রাজ্যে ধন-সম্পদ সব চেয়ে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে দেশের সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যক্তি কর্মের সুযোগ পায়। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কাজে পাঁচ বৎসরে যে প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইতেছে, তাহাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমূলক কাজ অপেক্ষা ভোগের প্রশ্রয়মূলক কাজই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই একই কারণে দেশে বেকার-সমস্যা দিন দিন এত তীব্র হইয়া উঠিতেছে। বাজেটের এই ভ্রান্ত নীতির আমূল পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা বলছেন, "The amount of money spent is, however, not the best criterion of assessing the worth of a plan. A better criterion is how far the State plan has catered to the physical needs of the people in respect of education, medical care, roads, water supply, etc. In short, has the 69·1 crore-plan

লাউড স্পীকার

একটি রিসিভার, ঢাকনা খোলা অবস্থায়
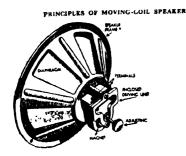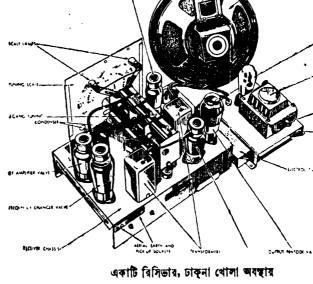
খোলা রিসিভারের সব চেয়ে ছোট ছোট সংযোগগুলি লুকিয়ে রয়েছে প্লাটফর্মের নীচে। এরিয়াল, আর্থ, পিক-আপ সকেট্, এ্যাম্পলিফায়ার ভালভ, চেঞ্জার ভালভ্, মেইনস ট্রান্সফরমার, লাউড স্পীকার ইনপুট ট্রান্সফর্মার, রিসিভার চেসিস ইত্যাদি নানা অংশ দেখা যাচ্ছে ছবিতে। সব চেয়ে আধুনিক কোনও রিসিভারের ভেতরে খোঁজ করলে এ সব জিনিষগুলিরই সন্ধান আপনি পাবেন। সাধারণ লোকাল এ সি। ডি, সি সেট তৈরী করার কাজে এর সব কিছুই যে দরকারে লাগে এমনটি নয়। লোকাল এ, সি, ডি, সি, তিন ভাল্ভের সেট কি করে ঘরে বসে নিজেই বানাবেন তার স্কীমেটিক্ ডায়াগ্রাম, সেক্সানাল ডায়গ্রাম ইত্যাদি পাবেন আগামী সংখ্যায়।

টিউনিং কণ্ডেন্সার

arrested the undesirable trends in West Bengal's economy? here is an excerpt from Dr. B. C. Roy's Budget speech 'West Bengal was once a land of prosperous cottage industries....The cottage industries have lost their vigour and the towns through which their products were cleared are decaying. The population of many of these towns is smaller than it was in 1872···This process is constantly reducing the size of agricultural holdings and when a man finds it impossible to live on agriculture, he runs to Calcutta industrial area in search of employment and swells the ranks of the unemployed.' If this is a true picture of the present day W. Bengal, how can it be maintained that the undesirable trends have been arrested and the state has been securely placed on the road to prosperity ! of course, the problem is of frightful magnitude and the resources at the disposal of the state government are Pitifully meagre.

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমরা এই বিষয়গুলি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

রেডিও তৈরীর বৃত্তান্ত

সৌখিন পাকপ্রণালী নয়। আধ সের আলু, এক পোয়া পেঁয়াজ, আদাবাঁটা, গরম মশলা জোগাড় করতে বলছি না সে রকম। একটি লোকাল সেট রেডিও তৈরী করতে হবে কি করে, কি কি জিনিষ লাগবে, কোথায় কি বসাতে হবে, কেমন কনেকসন, কোন জিনিষ কত শক্তির, দাম কেমন সবই ধীরে ধীরে জানাচ্ছি আপনাদের। এ সংখ্যায় একটি লোকাল সেট তৈরী করতে মোটামুটি কি কি জিনিষ লাগতে পারে তারই এক লিষ্ট ছাপছি।

পারমানেণ্ট ম্যাগনেট লাউড স্পীকার।
ভল্যুম কন্ট্রোল সুইচ।
10 Henry 60 mili L. F. চোক।
আউটপুট ট্রান্সফর্মার।
700 ohms ও ·3 amp ফিলামেণ্ট রেজিষ্ট্যান্স।
100 ohus 1 watt রেজিষ্ট্যান্স।
·5 meg ভল্যুম কন্ট্রোল।
1 meg + 20 কিলো + ৫০ কিলো ওমস রেজিষ্ট্যান্স।
এরিয়াল, টিউনিং ও রি-এ্যাকশন কয়েল।
·0003 ufd + ·0005 ufd ভেরিএবল কণ্ডেন্সার।
·0001 ufd মাইকা কণ্ডেন্সার।

·1 ufd + ·05 + ·01 পেপার কণ্ডেন্সার।
25+8+8 ufd তিনটি ইলেক্‌ট্রিক লাইট কণ্ডেন্সার।
ব্যস! বাকী সব আবার আগামী বারে।

বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী পরিচয়

ছিল, এক দিন সত্যি সত্যিই ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বাঙালীর। পরের ব্যবসায় লাখ লাখ টাকার ব্যালান্স-শিটে ডেভিট্-ক্রেডিট্ মিলিয়ে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে চিরকালই মরত না বাঙালী। পুরোনো আমলের কথাই বলছি। চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগরের দেশ বাঙলায় তখন একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে সবে বসেছে ইংরেজ। মুৎসুদ্দী ছিল বাঙালী এবং এক মাত্র বাঙালীই। ইংরেজদের আসবার পর বাঙালীর নিজস্ব ব্যবসা ছিল ঠিক, তবে তা যথেষ্ট নয়। ইংরেজী কুঠির আওতায় থাকলেও বাঙালীর সে ব্যবসায় যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কয়েক দফায় পর পর বলা যাবে সে কথা। পাটের কথাই ধরা যাক আগে। বাঙলার যা নিজস্ব এক মাত্র পণ্য। ইতিহাস থেকে পাচ্ছি প্রথম ইংরেজের চটকল, যা শ্রীরামপুরে হেষ্টিংস জুট মিল নামে স্থাপিত হয়, তার মূলে রয়েছেন এক জন বাঙালী। নাম বিশ্বম্ভর সেন। এই বিশ্বম্ভর সেন যে কে, কোথায় নিবাস, এঁদের বংশের কেউ জীবিত আছেন কি না, তার আর কোনও পরিচয়ই আমরা পাই না। শুধু এইটুকু জানি যে, এদেশে চটকল স্থাপনের পিছনে রয়েছেন এক জন বাঙালী। এ ছাড়াও পাটের কারবারে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন কীর্ত্তি মিত্র, পাকপাড়ার রাজারা, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্র বসু, মহেন্দ্রনাথ দাস ইত্যাদি অনেকেই। র‍্যালী ব্রাদার্স'র ঘরের হীরেন্দ্র দত্ত দুয়ারী, অক্রুর দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ লাহা, পটলডাঙ্গার বসু-মল্লিক, কাপালীরা, ভাগ্যকুলের রায়, কোলে, আলামোহন দাস ইত্যাদির নাম করছি। এ সম্পর্কে আরও কিছু বলা যাবে আগামী বারে।

কুটীরশিল্পকে বাঁচান

বড় ইণ্ডাষ্ট্রিকে মেরে নয়। কুটীর-শিল্পকে আলাদা ভাবেই বাঁচিয়ে রাখুন। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অসম্ভব মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু সত্যিই কথাটা অসম্ভব নয় একেবারে। জাপানের দিকে তাকালেই একথা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারব। অর্থাৎ দেশে যদি 'র মেটিরিয়ালস্' বা কাঁচা মাল থেকে প্রথম উৎপাদন বা প্রারম্ভিক উৎপাদন অবধি কুটীর-শিল্পের হাতে থাকে এবং ম্যানুফ্যাকচার থাকে বড় শিল্পের হাতে, তবেই এ দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য করা সম্ভব। যেমন ধরুন কটন্ থেকে কাপড়। প্রথমে কটন আসবে ব্লোরুমে। সেখানে হবে ব্লেণ্ডিং। তারপর স্পিনিং, সাইজিং, উইভিং, ক্যালেণ্ডার, ডাইং, ব্লিচিং, ফিনিশিং। কতগুলি প্রক্রিয়া পার হয়ে তবে তৈরী হবে একখানি কাপড়। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম দিকটা অর্থাৎ স্পিনিং অবধি যদি থাকে কুটীর-শিল্পের হাতে। সুতা তৈয়ারীর কাজ যদি প্রতি গৃহে গৃহে হয়, আমদানী থাকে যথেষ্ট, তবেই এ শিল্পকে বাঁচানো যায়। দু'দিকই রক্ষা হয়। কিন্তু এই ব্যবসা বর্তমান সামাজিক অবস্থায় এদেশে প্রায় অসম্ভব। কারণ, গ্রামে মানুষ নেই বললেই হয়। প্রায় সকলেই সহর থেকে ভাত-কাপড় জোগাড় করতে ব্যস্ত। এই অবস্থায় কেবলমাত্র কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য (আজ যা খুবই কম) খেলনা, সিল্ক, মাদুর, শোলার কাজ, কাঁসা-পিতলের কাজ, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, পেটা-লোহার কাজ, মাটির কাজ ইত্যাদিকে পপুলার করা হোক জনসাধারণের মধ্যে। এদিকে এখনও খুব বেশী বড় ইণ্ডাষ্ট্রির নজর নেই। জেলে, জোলা, তাঁতী, কামার, কুমোররা প্রায় পথে বসছে বাঙলায়। সরকার থেকে তাদের বেঁচে থাকবার কি উপায় করা হচ্ছে, জয়েণ্ট ডিরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ তা আমাদের জানাবেন কি? হ্যাণ্ডলুম বোর্ড কি পোষ্টার মেরে তাঁত-সপ্তাহের উদ্বোধন করেই নিজেদের কাজ শেষ করলেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল কাজই কি এমনি?

পশ্চিমবঙ্গের Govt. Sales Emporium

আছে আপনি জানেন? কেউ কেউ হয়ত জানেন আবার কেউ জানেনও না। কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট কলকাতায় একটি সেলস্ এম্পোরিয়ম রেখেছেন, সে কথা আপনি শুনেছেন? শুনেছেন। কেনই বা শুনবেন না! নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। কাঠের কাজ, ফার, কার্পেটের ছবি-দেওয়া বিজ্ঞাপন (দামের রেঞ্জসহ) আপনি তো কাগজে রোজই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সেলস্ এম্পোরিয়মের কথা ধরুন। কি কি পাওয়া যায় সেখানে? কত দাম সেখানকার জিনিষের? পাঁচ টাকা না পাঁচশ' টাকা? উপহার দেওয়ার মত কোনও জিনিষ মিলবে? মুর্শিদাবাদের সিল্ক, খাগড়া-বহরমপুরের বাসন, মেদিনীপুরের মাদুর, কৃষ্ণনগর-শান্তিপুরের পুতুল, ধনেখালি-ফরাসডাঙ্গা-দেবীপুর-চন্দননগরের ধুতি-শাড়ী কি পাওয়া যাবে ওখানে? জানেন না তো? তবেই দেখুন, কেমন বন্দোবস্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের! কর্তাদের নজর কি এত বলেও পড়ানো যাবে না এদিকে? কলকাতার প্রান্তে প্রান্তে আরও একটি করে দোকান খোলাও কি তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব?

অল্প খরচের ব্যবসা

সত্যি সত্যি করতে চান? পরের কাছে কাজ করে করে ঘেন্না ধরে গেছে আপনার? চাকরী-বাকরীর সুবিধা করে উঠতে পারছেন না? টাকা-কড়ির সংস্থানও খুব বেশী করে উঠতে পারছেন না? এই বিরাট মন্দার বাজারে কি ব্যবসা করবেন ঠিক করতে পারছেন না? পুঁজি কম অথচ কমপিটিশন বেশী বলে ভয় পাচ্ছেন? নতুন কি ব্যবসা করা যায় খুঁজছেন? ব্যবসার আইন-কানুন যেমন সেল্স্ ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, এক্সপোর্ট ইমপোর্ট লাইসেন্স, ও-জি-এল, পারমিট, কর্পোরেশন লাইসেন্স, খাতা-পত্র রাখবার পদ্ধতি, লেজার, বুক-কিপিং, ব্যালান্স-শিট ইত্যাদি রাখা, ট্যাক্সের কাজ জানেন না? কত টাকা মূলধন আপনার? পাঁচ শ—হাজার—দু'হাজার? কি আরও কিছু বেশী? ওতেই হবে। আগামী মাস থেকে এক একটি ব্যবসা পরিচালনা করবার কাজে টিপস্ যোগাতে পারবে মাসিক বসুমতীর 'কেনাকাটা' বিভাগ। অপেক্ষা করুন আর এর মধ্যে পরিচিত হবার চেষ্টা করুন বাজারের সঙ্গে।
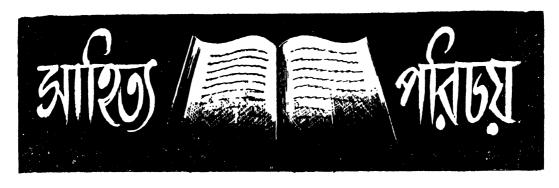
এত বিমর্ষ কেন ?

বিখ্যাত রঙ্গপত্রিকা "পাঞ্চ" সম্পাদক মিঃ ম্যালকম মাগেরিজ সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক পি, ই, এনের ঢাকা সম্মেলন উপলক্ষ্যে এ দেশে এসেছিলেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, হাসির পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর কাজ যেন শেষ হয়ে আসছে। 'পাঞ্চে'র লেখার মধ্যে আর সে জৌলুষ নেই, সকলেই কেমন একটা হতাশার মধ্যে নিমগ্ন। মিঃ মাগেরিজের মতে এর কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হাসির অনুকূল নয়। তামাম দুনিয়ায় নিরানন্দের স্রোত বয়ে চলেছে,—হাস্যরসের সেই মনোরম পরিবেশ আর নেই। আজকের এই আণবিক যুগে হাসি স্তিমিত,—রোদনভরা পৃথিবী, কে-ই বা হাসায়, কে-ই বা হাসে। পরস্পর কি ভাবে কা'কে ফাঁসান যায় সেই চিন্তাই সর্বত্র প্রবল। এই বাংলা দেশের কবি ঈশ্বর গুপ্ত একদা বলেছিলেন—"এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা," আজ সেই বাংলায় আর হাসি নেই। ক্ষয়, ক্ষতি ও বঞ্চনার অভিযানে হাস্যরসকে বলি দেওয়া হয়েছে। বাংলা দেশে ভারতচন্দ্র থেকে সুরু করে ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই কিছু না কিছু হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাংলার সম্পদ, নাট্যকার অমৃতলালের প্রহসন ও ছড়া অনবদ্য। বীরবল প্রমথ চৌধুরীকে আজো আমরা ভুলিনি। পরবর্তী কালে সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্র মৈত্র কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বনফুল, শিবরাম, পর্য্যন্ত এই ধারা রক্ষিত হয়েছে। সংবাদপত্রে পঞ্চানন্দ, ইন্দ্রনাথ, শ্রীবুদ্ধ, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, উনপঞ্চাশীর উপেন্দ্রনাথ, নন্দীভৃঙ্গী, বিদূষকের দা' ঠাকুর—ক্রমেই বিরল হয়ে এল। হাস্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা হয় লুপ্ত হয়েছে, নয় তার রসপরিবেশক নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। জেলে-পাড়ার সং কবে উঠে গিয়েছে। তামাসা, প্রহসন আর দেখা যায় না, চুট্‌কী রচনায় আর সে সরসতা নেই। যেটুকু হাসি এদেশে ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তা বিলুপ্ত হয়েছে। সুকুমার রায় অনেক আগে লিখেছিলেন—"এত বিমর্ষ কেন ? মুখে নাই হর্ষ কেন ?—" আণবিক অস্ত্রের দানবিক স্পর্শ আর কোথায় কার্য্যকরী না হোক্ অন্ততঃ সারা বিশ্বের মুখের হাসি লুটে নিয়ে চোখের জলের প্লাবন এনেছে, একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মেসিনগানের সামনেতে গাই জুঁই ফুলেরই গান।" কিন্তু কে সেই গান শোনাবে ?

বেতারের জন্য লেখা

বহুবিধ ব্যাপারের জন্য বেতারে বহু কথার প্রয়োজন। একই কথা, (বেতারের ভাষায় "talk") নানা ভাবে বলতে হয়, নাটকের জন্য এক ভাষা, সোজাসুজি বক্তৃতা, সাহিত্য আলোচনা, পঞ্চবার্ষিকীর প্রচার, সাহিত্য সমালোচনা, ঘোষণা, বিতর্ক প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন ভাষা। নাটকে আছে ভাবাবেগ, সুতরাং নাটকের ভাষায় এবং অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য থাকে, কখনও উত্তেজনা, কখনও হাস্য, কখনও করুণ, এই হোল নাটকীয় ভঙ্গী। রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণী, ফুটবল খেলার আলোচনা প্রভৃতির ভাষা আবার অন্য প্রকার। কিছুটা বিবরণমূলক, কিছুটা তথ্যমূলক। এই ধরণের বক্তৃতায় বা talk—ভাবাবেগ বা অতিরঞ্জন না থাকাই ভালো। এখন আমাদের দেশে বেতারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে এই জাতীয় রচনার দিকে মন দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যাঁরা এত দিন যেন তেন প্রকারেণ কাজ চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরই সাহিত্য-জ্ঞান আছে, আঞ্চলিক ভাষায় অধিকার নেই এমন ব্যক্তিরাও, কোনো কোনো বেতার-ষ্টেশনের অধিকর্তা হয়ে অধিষ্ঠিত। সাহিত্য সম্পর্কে সম্পর্কচ্যুত ব্যক্তিরা 'talk'এর ব্যবস্থা করেন, যারা 'talk' দেন তাঁদের জ্ঞানও চমৎকার! সাধারণতঃ বেতার নাটক যাঁরা রচনা করেন তাঁদের সাহিত্য-কৃতিত্ব নগণ্য। অনেক সময় বিখ্যাত গল্প বা উপন্যাসকে নাটকায়িত করা হয়, তার নাম নাট্যরূপ। সাধারণ বক্তৃতা কে কি পর্যায়ে নেমেছে তা কলিকাতা বেতারের যে কোনো দিনের একটি অনুষ্ঠান শুনলেই বোঝা যাবে। এখন যখন বেতার প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পদ, সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, তখন সেগুলির বিশুদ্ধতা এবং মানের উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন। এই জন্য মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, বেতার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বেতারযোগ্য সাহিত্য রচনার একটা বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। রাম, শ্যাম, যদু সকলকে আহ্বান করে, যে কোনো বিষয় একটা যা হোক তা হোক বলানোর সার্থকতা কি ? আমাদের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিষয়ে নীরব কেন ?

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

পৌরাণিক উপাখ্যান

বসুমতীর পাঠকের কাছে সুপণ্ডিত শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির নতুন কোরে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যানিধি

মহাশয়ের বহু পরিশ্রমের ফলে সৃষ্ট হয়েছে আলোচ্য পৌরাণিক উপাখ্যান গ্রন্থখানি। গ্রন্থখানি মোট এগারোটি প্রবন্ধের সমষ্টি। অধিকাংশই আগে কোন না কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রায় সব জাতিরই পুরাণ আছে, তবে আমাদের যত পুরাণ আছে, বোধ হয় অন্য জাতির তত নেই। আদি মানুষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ চিন্তা করে, অমূর্ত জিনিস কল্পনা করতে পারে না। আস্তে আস্তে দ্রব্যের ক্রিয়া বুঝতে পারে এবং অনেক কাল পরে চিন্তাশীল মানুষ দ্রব্যের গুণ পৃথক ভাবতে শেখে। তখন গুণ মূর্ত আকার ধারণ করে। পরে যেটা কল্পনা ছিল সেটা সজীব হয়ে কর্ম করতে থাকে। তখন তাতে মানুষের প্রেম, ঘৃণা, ঈর্ষা, অসূয়াদি দোষ-গুণ আরোপিত হয়। এই ভাবে পৌরাণিক কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে এবং অধিকাংশ পৌরাণিক উপাখ্যানের মূল বেদে আছে। রচনার গুণে আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধই অতি সুখপাঠ্য এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধের ভেতর ব্যাখ্যা ও ছবি থাকায় গ্রন্থখানির মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন এস, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, কলকাতা ১২। দাম: সাড়ে তিন টাকা।

CHAOS IN KASHMIR

কাশ্মীর রাজ্যের মুজাফারবাদের জেলা-অফিসর শ্রীমতী কৃষ্ণা মেহতার স্বামী। সুখে কেটে যাচ্ছিল তাঁর নিস্তরঙ্গ জীবন। ১৯৪৭-এ যখন হানাদাররা কাশ্মীর আক্রমণ করলো, আরো হাজার হাজার নর-নারীর মত কৃষ্ণা মেহতার সুখের সংসারেও আগুন জ্বললো—শহীদের মতো মৃত্যুবরণ করলেন তাঁর স্বামী। ছয়টি সন্তানের জননী কৃষ্ণা পালিয়েও পরিত্রাণ পেলেন না, আবার ধরা পড়লেন—আজাদ কাশ্মীরে তাঁকে বন্দিনী করে রাখা হল। এই গ্লানিকর জীবনের কাহিনী অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন শ্রীমতী মেহতা। দুর্গতি ও লাঞ্ছনার ভিতর মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে মানবিক স্পর্শ, হৃদয়ের পরিচয়, লেখিকার অনাড়ম্বর রচনায় তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। একজন সাধারণ মহিলার অসাধারণ কাহিনী "Chaos in Kashmir" চব্বিশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। উপন্যাসের চাইতেও আকর্ষণীয় এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হওয়া উচিত। গ্রন্থটির প্রকাশক—সিগনেট প্রেস—দাম চার টাকা আট আনা।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সিগনেট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের বিখ্যাত গ্রন্থ "পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের" তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আর একটি খণ্ডে এই মহা জীবনকথা সম্পূর্ণ হবে। "পরম পুরুষের" বিক্রয়-সংখ্যা বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে, একথা উল্লেখযোগ্য। "ভাবের রূপৈশ্বর্যে, বাক্যের প্রসাধনে সুন্দর ঈশ্বর প্রসঙ্গ" পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য-রসিক ও ভক্ত পাঠকের কাছে আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থে ঠাকুর ও শ্রীমার দুখানি চিত্র সংযোজিত হয়েছে।

একই বৃন্ত

প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা অসীম। মিষ্টি কথায় সহজ ভাবে গল্প বলার ক্ষমতা তাঁর আছে। 'একই বৃন্ত' তাঁর নবতম উপন্যাস। পরিণত বয়সের রচনা "একই বৃন্ত" এক হিসাবে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাজপথের' সহধর্মী। কয়েক জন আধুনিক তরুণ-তরুণী ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবেশে পটভূমিতে রচিত এই কাহিনীতে লেখক অপূর্ব উদারতা প্রদর্শন করেছেন। কংগ্রেসী নায়ক ও কম্যুনিষ্ট নায়িকা একই বৃন্তের সাদা আর লাল ফুল—। তাই অনীতা বলে—'আমরা ভাঙ্গি কিন্তু গড়তেও জানি' আর বিজয়েশ বলে—"দেশকে যে সেবা করবে সেই করবে শাসন। হোক্ সে সাদা হোক্ সে লাল।" বিজয়েশধর্মী তরুণ ও অনীতাধর্মী তরুণী আমাদের দেশে আজ অসংখ্য, তাদের মন দেয়া-নেয়ার ইতিহাস শক্তিমান লেখক অপূর্ব কৌশলে উদ্ঘাটিত করেছেন। বহির্জীবনের সমস্যায় আচ্ছন্ন নর-নারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথও আজ আর কুসুমাস্তীর্ণ নয়। শক্তিমান কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ সেই সমস্যার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উপন্যাসের প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিসার্স—দাম সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

দৃষ্টিকোণ

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়ের জনপ্রিয়তা বেড়েছে তাঁর 'উদয়ের পথে' চিত্রকাহিনীতে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যখ্যাতি মূলতঃ রম্যরচনাকার হিসাবে। লঘু প্রবন্ধ বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বাংলা দেশে যে কয় জন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে পারেন তিনি তাঁদের অন্যতম। বাইশটি লঘু প্রবন্ধের সমষ্টি 'দৃষ্টিকোণ'—প্রথম প্রকাশে সুধীজনের প্রশংসা লাভ করেছিল। ইংরাজী সাহিত্যে জি, কে, চেষ্টারটনের Tremendous Trifles অমর হয়ে আছে,—বাংলা ভাষায় ইদানীং কিছু কিছু এই জাতীয় রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, এ অতি আশার কথা। কয়েকটি আপাততুচ্ছ বিষয় লেখক নিজস্ব দৃষ্টি-কোণে বর্ণনা করেছেন। অপরূপ লিখনশৈলীর জন্য 'দৃষ্টিকোণ' একটি উপভোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের সুমুদ্রিত সংস্করণের প্রকাশক—মেসার্স ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। মূল্য দু' টাকা চার আনা।

নরকে এক ঋতু

ফরাসী লেখক জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবোর বিখ্যাত রচনা "Une Saison En Enter" বা 'নরকে এক ঋতু'র মূল ফরাসী থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। নাস্তিক, দার্শনিক, ছান্দসিক র‍্যাঁবো ১৮৫০-এ ফ্রান্সের সীমান্তে সার্লভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই উপলব্ধি করেন "প্রাণে নেই প্রাণ"।—র‍্যাঁবোর জীবনে ভেরলেনের প্রভাব এবং পরবর্তী কালে ভেরলেন কর্তৃক রিভলবরের গুলীতে আহত আর একটি কাহিনীর বিষয়বস্তু। তার পর র‍্যাঁবো কাব্য রচনা ত্যাগ করেন। উদভ্রান্ত র‍্যাঁবো তৃষ্ণাকাতর হয়ে মরুপ্রান্তরে জলে মরার বাসনা নিয়ে ঘুরলেন সাঁইত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত, তার পরই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই বছর তাঁর শতবার্ষিকী, সেই উপলক্ষ্যে 'নরকে এক ঋতু'র বঙ্গানুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্যধর্মী ভাষায় অনুবাদক র‍্যাঁবোর রচনা মূল মর্মবাণী ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বিচিত্র গ্রন্থের প্রকাশক—নাভানা—মূল্য দু টাকা মাত্র।

নে তে তেরি তোম

'পাগলা গারদের কবিতা'র কবি শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ নে তে তেরি তোম। ছ'টি দীর্ঘ ও তিনটি নাতিদীর্ঘ কবিতা নিয়ে কবির এই কাব্যগ্রন্থ এবং কবিতাগুলোর অধিকাংশই কোন না কোন পত্রিকায় প্রকাশিত। ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় অজিতকৃষ্ণ বসু বা অ-কৃ-ব বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং আলোচ্য গ্রন্থটি পড়লে তাঁর সে শক্তির অনেক পরিচয়ই মেলে। এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'অ্যানড্রোক্লিস ও সিংহ'। কবিতাটি প্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিস্তৃতরসাশ্রিত একটি গীতিনাট্য ও অভিনয়ের যোগ্য।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হাসির কাব্যের সংখ্যা বেশি নেই, সুতরাং একখানি যথার্থ হাস্যকাব্য হিসেবে আমরা 'নে তে তেরি তোম'এর বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন সোয়ান্ বুক্স, কলকাতা ১২। দাম—দু' টাকা।

বাঘিনী-কন্যা

আর, এস, র‍্যাটরে প্রণীত "লেপার্ড প্রিস্টেস্" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ 'বাঘিনী-কন্যা' সম্প্রতি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও রাখাল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় শীর্ষস্থানীয়, তাঁর সহযোগী রাখাল ভট্টাচার্য্যও সুসাহিত্যিক, ফলে এই দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ সাহিত্য পদবাচ্য হয়েছে। অনুবাদ-কর্মের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব অনুবাদযোগ্য গ্রন্থ নির্বাচন, আজ-কাল এই দিকে অতি অল্প সংখ্যক অনুবাদকের লক্ষ্য থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আদিরসাত্মক বা অতিখ্যাত গ্রন্থ অনুবাদ করার দিকেই অনেকের ঝোঁক। আলোচ্য গ্রন্থটির নির্বাচন বিশেষ প্রশংসনীয়। অক্সফোর্ডের প্রাক্তন অধ্যাপক ষ্টীফেন গ্রীণ বলেছেন—"ক্যাপ্টেন র‍্যাটরে নৃতত্ত্ববিদ্,—তাঁর প্রতিটি চরিত্র পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রো। ক্যাপ্টেন র‍্যাটরের কাহিনী নিবিড় সহানুভূতি নিয়ে বিবৃত।" র‍্যাটরের সেই নাটকীয় রূপকথা "বাঘিনী-কন্যা"র বাংলা অনুবাদ সুন্দর ও শোভন হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন—ইষ্ট লাইট বুক হাউস, ২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। মূল্য দু' টাকা বারো আনা।

স্মৃতিরঙ্গ

১১২০-এ অপূর্ব সমাজ-চিত্র "স্মৃতিরঙ্গ", যে সমাজ আজকের দিনে স্বপ্ন-কথা, যে-সমাজ হয়ত আর কোনো দিন ফিরবে না, সেই সমাজের কয়েকটি চিত্র "স্মৃতিরঙ্গে" সঙ্কলন করেছেন কুশলী লেখক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে "পলাসীর যুদ্ধে" তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, স্মৃতিরঙ্গ তাঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। অপূর্ব তাঁর আঙ্গিক, সামান্য কয়েকটি সাদা কালো রেখায় সাহায্যে তিনি অপূর্ব রেখাচিত্র রচনা করেছেন। 'ম্যান হাটান', 'জন', 'মডেল,' 'খ্রেলসক' বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। তপনমোহনের স্মৃতিকথামূলক এই রেখাচিত্রগুলি সার্থক ছোট গল্পের আকৃতি লাভ করেছে। আজ স্মৃতিকথায় বাংলা সাহিত্য প্লাবিত,—তপনমোহনের টেক্‌নিক কেউ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলে, আমাদের মুখ বদ্‌লানোর সুযোগ মিলবে। অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি মুক্ত এই রেখাচিত্র আমাদের ভালো লেগেছে, 'স্মৃতিরঙ্গ' সাহিত্য-পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন—নাভানা, দাম দু'টাকা আট আনা।

প্রিয়তমেষু

'প্রিয়তমেষু' ষ্টিফান জাইগের মর্মস্পর্শী উপন্যাস Letter from an unknown woman-এর বাঙলা অনুবাদ। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জাইগের আরও কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেছেন। 'প্রিয়তমেষু'-র সাবলীল-তর্জমা জাইগের লেখাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। বইখানির ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপটের ভেতর অভিনব সৌন্দর্যের ছাপ আছে। বইটি চিঠির কাগজে ছাপা হয়েছে লেখার বিষয়বস্তুর জন্য। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থটি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, কলিকাতা প্রকাশিত ও দাম আড়াই টাকা।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

জাম-জারুলের বনানীর শিরে
নিকষ-কালো।
ওরি পুবধারে ফুটেছে কি নভে
চাঁদের আলো?
তুমুল তুফান, যেতে হবে তবু
নদীর পারে,
ব'সে আছে সেথা ভীরু বালা একা
দেউল-দ্বারে।
(আহা) দূর হ'তে সে যে বেসেছে ভালো;
(তার) চোখের তারায় জ্বলে মিটি-মিটি
মনের আলো।

(তার) আঁখিজলটুকু দেখেছি ঘাসের পরে,
হাসিটুকু তার হেরেছি নদীর চরে;
(মরি) ভিজে শাড়ি-ঘেরা তনুলতাখানি—
কবে নাহি জানি—
চোখ জুড়ালো।
(তার) কেশের সুরভি মাঝে মাঝে পাই
মাধবী-রাতে;
যার বিছানায় ছড়ায়ে বকুল—
নামে যেই ঘুম নয়ন-পাতে;
(কভু) কয়নি সে কথা আমার সাথে;
(শুধু) খেয়াঘাটে যেতে প্রসাদী কুসুম শিরে ছোঁয়ালো।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৭

মালার দিনটা যেন আর কাটতেই চায় না !

কাল সারাটা রাত সে ভেবেছে—চুমকির কথা। মেয়েটার শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, লেখাপড়া জানে না, পথে-পথে ঘুরে-বেড়ানো বাউণ্ডুলে মেয়ে, তবু কত সুন্দর! একবার দেখলে আর সহজে ভুলতে পারা যায় না।

সত্যিই কি ওরা জাদু জানে? যা কিছু বলে গেল—সবই কি সে তার মুখ দেখেই টের পেলে?

মা কিন্তু তার কোনও কথাই বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, পয়সা রোজগার করবার জন্যে ওই রকম সব বাজে বুজরুকি ওদের শিখে রাখতে হয়।

কিন্তু তাই-বা কেমন করে হবে?

পয়সা রোজগারই যদি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তো তার দেওয়া সোনার চুড়িগাছটা চুমকি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল কেন?

ভেবে ভেবে মালা কিছুই ঠিক করতে পারলে না। শুধুই তার মনে হতে লাগলো—কতক্ষণে বিকেল হবে, চুমকি কখন্ আসবে···

খাওয়া-দাওয়ার পর, দুপুরে না হবে তো দশ-বারো বার সে সিঁড়ি ভেঙ্গে বাড়ীর ছাতে উঠে গেছে, একাগ্র দৃষ্টিতে চারি দিকে তাকিয়ে দেখেছে, নিরাশ হয়ে শেষে নীচে নেমে এসেছে।

মাকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি আবার গেছে। আবার তেমনি একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থেকেছে মুখুজ্যে-পুকুরের দিকে। সে পথ দিয়ে যে হেঁটেছে তাকেই মনে হয়েছে বুঝি রঞ্জন। তাদের বাড়ীর
বিক্রয়-সংখ্যা। ৭।, তাকেই মনে হয়েছে চুমকি।
উল্লেখযোগ্য। ভা· ··ন্তানপুর এখন আর নেই। পথে-প্রান্তরে
প্রসঙ্গ" পরম পুরুষ শ্রীশ্রীর।··৯ দুটি মানুষ চলাফেরা করে না।
কাছে আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই ·· জন এসে পড়ে। দশ জনের
দুখানি চিত্র সংযোজিত হয়েছে। মানুষ যত—গাড়ী তত।
একই বৃন্ত ·তুন বাড়ী, কয়লাকুঠির

প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো·

অসীম। মিষ্টি কথায় সহজ ভাবে গল্প বলার ক·

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে, কোথায় যেন একটা নতুন কয়লাকুঠির সাইডিং লাইনের পাশে চুমকিদের তাঁবু পড়েছে। সারা ছাতটা ঘুরে ঘুরে মালা চেষ্টা করতে লাগলো সেই জায়গাটা খুঁজে বের করবার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারলে না। দূরে শ্রেণীবদ্ধ গাছ দেখা যাচ্ছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের। কয়লাভর্তি টবগাড়ী নিয়ে ইঞ্জিন চলছে সাইডিং লাইনের ওপর দিয়ে। দূরে থেকে মনে হচ্ছে যেন ছেলেদের খেলনার গাড়ী। কিন্তু তাঁবু কোথায়?

বেলা যত গড়িয়ে আসে, মালা তত ছট্‌ফট্ করে। বিকেলের দিকে আসবে বলে গেছে চুমকি। বিকেল তো হ'য়ে এলো! হিজুলের তীরে ওই তো শিমুলগাছের মাথার ওপর সূর্য্য দেখা যাচ্ছে। আর একটু পরেই ঢলে পড়বে সঙ্কটা ভৈরবীর মন্দিরের গায়ে। তখন তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাহ'লে আর আসবে কখন?

'মা' 'মা' বলে' ডাকতে ডাকতে মালা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো।

চটের একটা থলের ওপর খোসা-ছাড়ানো পাকা তেঁতুল রোদে দিয়েছিল কাঞ্চন। নিজেই দু'হাত দিয়ে থলেটা তুলে ঘরের ভেতর নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে চটের একটা দিক চেপে ধরে মালা বললে: 'খুব হয়েছে! একা ওই এত তেঁতুল নিয়ে যাবে তুমি? বাবা না তোমাকে বারণ করেছে ভারি জিনিস তুলতে! বলে দেবো বাবাকে? বাবা! বাবা!'

কাঞ্চন বললে: 'নে আর ফাজলেমো করিস্‌নে, ধর্ ভাল করে।'

মায়ে-মেয়েতে ধরাধরি করে' তেঁতুলের ছালাটা ভাঁড়ারঘরে নিয়ে গেল।

মালার কিন্তু মন পড়ে আছে অন্য দিকে। জিজ্ঞাসা করলে: 'বাবা কোথায় মা?'

'বাইরের ঘরে।'

'চা খাবে না ? ক'টা বেজেছে জানো ?'

'জানি। চায়ের জল চড়িয়েছি।'

'তুমি চড়ালে ? আমাকে ডাকলেই পারতে !'

কাঞ্চন এতক্ষণ পরে মেয়ের মুখের পানে তাকালে। বললে: 'তোকে পাব কোথায় যে ডাকবো ?'

মালা বললে: 'কেন ? আমি কি কোনও দেশে চলে গিয়েছিলাম না কি ? বাড়ীতেই তো ছিলাম।'

কাঞ্চন বললে: 'ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে গেল তবু তো সাড়া পেলাম না।'

মালা তার মা'র কাছে এগিয়ে এলো। মুচকি একটু হেসে বললে: 'ছাতে গিয়েছিলাম।'

কাঞ্চন বললে: 'সেই ছুঁড়িটাকে আসতে বলেছিস, তাই দেখছিলি বুঝি আসছে কি না ?'

মালা হেসে মাথা নেড়ে বললে: 'হ্যাঁ।'

বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাঞ্চন ডাকলে: 'মালা !'

দোরের কাছে ফিরে দাঁড়ালো মালা। বললে: 'চায়ের জল বোধ হয় হয়ে গেছে এতক্ষণ। আমি চা করিগে।'

মা'ও বেরিয়ে এলো তার পিছু পিছু। বললে: 'ছাখ, ওর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করিসনি।'

'কার সঙ্গে ?'

'ওই যে ওই ইরাণী মেয়েটার সঙ্গে।'

মালা বললে: 'তুমি জানো না মা, মেয়েটা খুব ভাল মেয়ে।'

কাঞ্চন বললে: 'খুব জানি মা—খুব জানি। তবে ও মেয়েটা যদি রঞ্জনের সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থাটা করে' দিতে পারে তাহ'লে আমি ওকে কিছু দিতে পারি।'

মালা বললে: 'আজ এলে আমি ওকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। যা বলতে হয় তুমি বোলো।'

কাঞ্চন বললে: 'হ্যাঁ রে, মেয়েটা কি সত্যিই হাত-টাত দেখতে জানে ? না রঞ্জন ওকে পাঠিয়েছে ? আমার তো বাছা কেমন যেন মনে হচ্ছে।'

মালা বললে: 'জানি না।'

কাঞ্চনের মন-মেজাজ সে দিন ভালই ছিল। মালা সেটা টের পেলে। বললে: 'বাবাকে চা খাইয়ে দিয়ে আমি একবার মুখুজ্যে-পুকুরে যাব মা ?'

ঠোঁটের ফাঁকে মা একটু হাসলে। বললে: 'না মা, তোকে আমি একা ছেড়ে দেবো না। যেতেই যদি চাস্, আমি তোর সঙ্গে যাব।'

মা সঙ্গে যাবে ? মালা কিন্তু ঠিক রাজি হ'তে পারছিল না। রঞ্জনের সঙ্গে যদি দেখা হয় ? মা কাছে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলবে কেমন করে' ?

শেষ পর্য্যন্ত রাজি কিন্তু তাকে হ'তেই হ'লো।

মালা বললে: 'তাই চল মা আমরা একবার মুখুজ্যে-পুকুর থেকে ফিরেই আসি।'

এই বলে পেতলের ছোট কলসীটি তুলে নিয়ে মালা যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো।

মা-ও গেল তার সঙ্গে।

মালার চোখ কিন্তু তখনও ছিল পথের দিকে। মনে মনে ভাবছিল চুমকির কথা। মেয়েটা এলো না কেন ?

মুখুজ্যেপুকুরে লোকজন আসে খুব কম। নির্জ্জন পুকুরের ঘাট। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মা ও মেয়ে—মনে হচ্ছে যেন দুই সখী !

অথচ কেউ কোনও কথা বলতে পারছে না।

মায়েরও লজ্জা। মেয়েরও লজ্জা।

মা-ই শেষ পর্য্যন্ত কথা বললে। বললে: 'মিছেই বসে থাকা মালা। চল—বাড়ী যাই। রঞ্জন আসবে না।'

মালা কিন্তু আশা ছাড়েনি তখনও। বললে: 'আর একটু দেখি মা !'

'ছাখ।' বলে মা একটু দূরে সরে গেল। মালা গিয়ে দাঁড়ালো সেই চাঁপা গাছের তলায়। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলো পথের দিকে।—ছি, ছি, রঞ্জন কি তাহ'লে বেইমানী করেছে তার সঙ্গে ?

কিন্তু বেইমানী সে সত্যিই করেনি।

মালা যখন মুখুজ্যেপুকুরে দাঁড়িয়ে, রঞ্জন তখন চুমকিদের তাঁবুর কাছে ঘোরাঘুরি করছে।

দূরে দাঁড়িয়ে রঞ্জন দেখলে, চুমকি একটা তাঁবুর পাশে বসে বসে উনোন্ ধরাচ্ছে।

রঞ্জন ডাকলে: চুমকি !

বেশি জোরে ডাকতে সাহস হলো না। কয়েকটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অপরিচিত মানুষ দেখে ডেকে উঠলো।

কুকুরের ভয়ে রঞ্জন সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে যেই পেছন ফিরেছে, চুম্‌কি তাকে দেখতে পেলে। তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বললে: 'তুমি এখানে কি জন্যে এলে?'

রঞ্জন বললে: 'আমার চিঠির জবাব কোথায়?'

চুমকি বললে: 'জবাব কাল পাবে।'

রঞ্জন বললে: 'সে কথা তো বলে আসবি তুই। সারা দুপুরটা আমি মুখুজ্যে-পুকুরে কাটিয়েছি তোর জন্যে।'

চুম্‌কি বললে: 'তা বেশ করেছো, কাটিয়েছো। তা মরতে তুমি এখানে এলে কেন? আমাদের দলের পুরুষ ব্যাটাছেলেরা তোমাকে যদি দেখতে পায় তো কি হবে জানো?'

রঞ্জন সহজে ভয় পাবার ছেলে নয়। বললে: 'কি হবে?'

'আমাদের দু'জনকে আস্ত রাখবে না। তোমাকেও শেষ করবে, আমাকেও করবে।'

এই বলে রঞ্জনকে সে একটু দূরে—কলিয়ারীর সাইডিং লাইনের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে: 'বোসো এইখানে। ভারি তো একটা চিঠির জবাব! তার জন্যে মরে গেলেন উনি! চিঠিটা পড়বে, তার পর তো জবাব লিখবে। দেরি হবে না?'

রঞ্জন বললে: 'জবাবটা আনতে পারবে তো ঠিক? আমি শুধু সেই কথাটাই জানতে চাই।'

চুম্‌কি বললে: 'জবাব আনতে না পারি, তোমার দশটা টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো। হলো তো? ভারি তো দশটা টাকা দিয়ে একেবারে যেন মাথা কিনে নিয়েছে!'

রঞ্জন বললে: 'টাকার কথা আমি কিছু বলেছি?'

'কথা শুনে তাই তো মনে হচ্ছে। পারবি তো? পারবি তো? তুই পারবি—আমি যদি একটা কথা বলি—'

রঞ্জন বললে: 'কি কথা?'

চুমকি বললে: 'মালাকে নিয়ে তুমি কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে? সে সাহস তোমার আছে?'

রঞ্জন বললে: 'হ্যাঁ পারবো।'

চুমকির মুখে হাসি দেখা গেল। সেই সর্বনাশা হাসি! হাসতে হাসতে সে তার পাশে গিয়ে বসলো। বসলো গায়ে গা ঠেকিয়ে। বললে: 'সত্যি? সত্যি পারবে?'

রঞ্জন বললে: 'কেন পারবো না? কিন্তু মালা পারবে না আমার সঙ্গে যেতে।'

চুম্‌কি বললে: 'মেয়েদের তুমি চেনো না ঠাকুর, ভালবাসলে মেয়েরা সব পারে। আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কি সত্যিই মালাকে ভালবাসো?'

চুম্‌কি তার হাতখানা বাড়িয়ে রঞ্জনের কাঁধে রাখলে। সর্বনাশ! রঞ্জনের সর্বাঙ্গ শির-শির করে উঠলো।

চুমকি আবার বললে: 'বল। চুপ করে রইলে কেন।'

রঞ্জন চুমকির হাতখানা একটু সরিয়ে দিয়ে বললে: 'হ্যাঁ, বাসি। ভালবাসি।'

হাতটা সরিয়ে দেওয়া চুম্‌কির ভাল লাগলো না। কিন্তু সে কথাটা বোধ হয় সে চেপে গেল। রঞ্জনের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললে: 'সত্যিই তুমি ভারি সুন্দর!'

রঞ্জনের ভয় করছিল। এ রকম অভিজ্ঞতা জীবনে তার এই প্রথম। তার মনে হচ্ছিল এখান থেকে ছুটে পালায়। কিন্তু তারও তো উপায় নেই! চুমকির সুন্দর হাতখানা ঠিক সাপের মত তার গলা জড়িয়ে আছে। যেতে হ'লে জোর করে' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়।

চুম্‌কি তখন আপন মনেই বলে চলেছে: 'তোমার মত এমনি এক বাঙ্গালী ছোক্‌রা আমাকে ভালবেসেছিল। আমি কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারিনি। তা যদি পারতাম তাহ'লে একদিন আমি তাকে নিয়ে তোমাদের মত কোথাও এক জায়গায় ঘর বাঁধতাম। আমাদের এই দলের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না। সত্যি বলছি।'

প্রকাণ্ড একটা গাছের ফাঁকে ছোট এক ফালি চাঁদ উঠেছিল আকাশে। কালো কয়লার স্তূপ, ছেঁড়া-ছেঁড়া চাঁদের আলো। আলোয় আর অন্ধকারে জায়গাটা কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল।

কয়লার স্তূপের আড়ালে কা'কে যেন দেখে চুম্‌কি বলে উঠলো: 'কে?'

রঞ্জন তখন উঠে দাঁড়িয়েছে—চুম্‌কির হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে।

রঞ্জন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল সেখান থেকে। কে যেন তার হাতখানা চেপে ধরলে।

[ক্রমশঃ।

কবি করুণানিধান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রূপের পূজারী বাস তব রূপলোকে,
ব্রজাঙ্গনার অঞ্জন তব চোখে।
ভকতির পথে ছিল বটে যাওয়া-আসা,
তোমার সাধন-পন্থই ভালবাসা।
তোমার প্রেমের গুরু যে তোমার প্রিয়া,
রাগের পথেতে তুমি কবি সহজিয়া।
'হরিনাম বুলি' বলো নাই—নহ টিয়া,
পাপিয়া যে তুমি ডাকিয়াছ 'পিয়া' 'পিয়া'।

তোমাকে যে ভাবা মুরলী দিয়াছে ধার,
শব্দে শব্দে ছবি আর ঝঙ্কার।
নক্সা-নবীশ পটুয়া তো তুমি নহ,
চিত্রশিল্পী রেখা-রঙে কথা কহ।
'সাজি'টি ভরিতে তুমি যে পূজার ফুলে,
কাহার বদলে কাহারে পূজিতে ভুলে।
চিরদিবসের আনন্দ তুমি তাই,
তব কবিতায় সময়ের ছাপ নাই।

ভূয়া-ভূঁইয়া

উদয়ভানু

মেঘ ডাকলো না বাঘ ডাকলো !

পশুশালায় পশু ডাকছে, না আকাশে মেঘ ডাকছে ! সিংহ, বাঘ, হাতী—ডাকাডাকি করছে যখন তখন। আস্তাবলে চিঁহি-চিঁহি ঘোড়া ডাকছে ! খাঁচার পাখী কিচির-মিচির শুরু ক'রেছে। খাসির গলায় কোপ পড়ছে, তাই চীৎকার করছে মৃত্যুপথের যাত্রী। শেষবারের মত যেন ডাকছে বিধাতাকে। এই আকুল আহ্বান, অন্তরের ডাকে কর্ণপাতও করবেন না তিনি। ধারালো খড়্গের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে দেহ থেকে ছিন্ন মুণ্ড। উষ্ণ রক্তের স্রোত বইবে রাজপ্রাসাদের ঘাস-জমিতে। একটা খাসি কাটা পড়ে, অন্য ক'টা দেখে ফ্যালফেলিয়ে, বোবা চোখে। পরিত্রাহি ডাকতে ডাকতে শেষ হয়ে যায় একে একে। রক্তের যেন লাল বন্যাধারা—লালে লাল হয়ে যায় সবুজ-ঘাস, কালো-মাটি। তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলায় ছালচামড়া ছেঁড়াছেঁড়ি করতে যতটুকু সময় লাগে ! তবুও বারে বারে গর্জ্জে গর্জ্জে ওঠে বাঘের খাঁচায় বাঘ। মাংসলোলুপ সিক্ত রসনা থেকে লাল ঝরতে থাকে। কচি কলাগাছেও কাটারীর কোপ পড়ছে। স্তূপীকৃত করা হয়েছে কাঁটাল পাতা—হস্তীশালের হাতীদের শুঁড়ের কাছে এগিয়ে দিলেই হয়। এক-আধ খণ্ড খাসির কলজে কিংবা রাং—সিংহ আর সিংহীর সামনে যদি কেউ ফেলে দেয় ! হরিণের পাল মুখ তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্ষুধার্ত্ত, তাই হয়তো আর ছোটাছুটি করছে না—কাতর চোখে তাকিয়ে আছে—এক মুঠো ধান-চাল যদি মিলে যায় !

মেঘ ডাকলো না বাঘ ডাকলো, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠাওর করতে পারেন না রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর ! গুরু-গুরু গর্জ্জনে নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। অসম্পূর্ণ ও ভগ্ন-নিদ্রার আবেশে কিছুকাল যেন তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকেন। দুধের মত শুভ্র শয্যা মনে হয় যেন অগ্নিবিকীর্ণবৎ। রাজাবাহাদুরের হৃদয়মধ্যেও আগুন জ্বলছে। যত দিন মেধা আছে, যত দিন অস্থি-মজ্জা-শোণিতের শরীর আছে—তত দিন আছে এই অন্তর্জ্বালা—যদি না বিন্ধ্যবাসিনীর জীবন রক্ষা হয় ! কালীশঙ্করের মনের স্থিরতা দূর হয়েছে, বুদ্ধিরও যেন অপভ্রংশ হ'তে ব'সেছে, স্মৃতির শৃঙ্খলা থাকে না আর ! ধীরে ধীরে শয্যায় উঠে বসেন রাজাবাহাদুর। দুই হাতে মস্তক ধারণ ক'রে ব'সে থাকেন। মস্তিষ্ক কি ঘুরছে !

মেঘ ডাকলো না, বাঘ ডাকলো ! সিংহ ডাকলো।

এক ভাবে ঠায় ব'সে থাকায় কালীশঙ্করের অঙ্গবেদনা দেখা দেয়। মানসিক যন্ত্রণার প্রগাঢ়তায় দেহে যেন জ্বরের মত সন্তাপ জন্মেছে। শয্যা ত্যাগ করলেন রাজাবাহাদুর। কক্ষের এক বাতায়ন সন্নিধানে গিয়ে দাঁড়ালেন, টলতে টলতে। নিদ্রাবসন্নতায় এখনও যেন টলো টলো ! এক করাঘাতে মুক্ত করলেন বাতায়ন—সঙ্গে সঙ্গে রাজার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো বৈকালী-সূর্য্যের হলুদ-রঙ। নিষ্প্রভ দিনের আলো।

আকাশে কি মেঘ ডাকছে ! না, বাঘ ডাকছে ? সিংহ ডাকছে ?

নিদ্রাপ্লুত চোখ তুললেন কালীশঙ্কর। আকাশ দেখলেন। কালো মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। নীল-আকাশে শ্বেততরঙ্গ মেঘের। পশ্চিম দিগন্তে ডুবন্ত সূর্য্যের হলুদ-রঙ-আলো আসে বাতায়নপথে। বৈশাখের বৈকালী বাতাস আসে, ঝড়ের আভাস নিয়ে !

গুমোট গেছে দিনভোর ! অসহ্য গরম। গ্রীষ্মের প্রথম, তবুও। গাছের পাতার নড়ন-চড়ন ছিল না যেন ! এই গুমোট দিনটির মতই রাজার মনোমধ্যে নৈরাশ্য যেন স্থিরতর হয়। নিরাশার মৃদুতর যন্ত্রণা ছাই-চাপা আগুনের মত ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে। বাতায়নে হস্তরক্ষা পূর্ব্বক তদুপরি কালীশঙ্কর মাথা ন্যস্ত করেন। রাজার মুখে যেন ভ্রূকুটি, ক্লেশব্যঞ্জক ভঙ্গী, প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম !

বিন্ধ্যবাসিনী বন্দিনী, নির্ব্বাসিতা। রাজমাতা সেই দুঃখদহনে প্রায় অর্দ্ধমৃতা হয়ে আছেন। সহোদর কাশীশঙ্কর সওদাগরী আর মহাজনীবৃত্তি অবলম্বনে উদ্যোগী, বদ্ধপরিকর। রাজ-গৃহে আছে কত কে। অন্দরে আছেন তিন রাণী। বেতনভোগী আর ভূমিদানের প্রজা আছে অসংখ্য। তথাপি যেন বড় বেশী একা মনে হয় নিজেকে। কখনও কখনও মনে হয়, সহায়সম্বলহীন। নাতিউষ্ণ বায়ু সংলগ্নে দৈহিক সন্তাপ দূর হয় কিঞ্চিৎ।

—রাজাবাহাদুর।

চমকের সঙ্গে যেন নিদ্রা ভঙ্গ হয়। নিদ্রা না তন্দ্রা! অতি ব্যস্তে কালীশঙ্কর মাথা তুললেন। দেখলেন দৃষ্টি ফিরিয়ে

—রাজাবাহাদুর।

কালীশঙ্কর গলা খাঁকরে কথা বলেন। বললেন,—

—শরীরগতিক ভাল লাগে না উমারাণী। মানসিক ব্যাধির বড়ই জ্বালা!

প্রধানা-মহিষীর ভ্রূযুগল বক্র হয়ে উঠলো। বললেন,—দিবানিদ্রার শেষে শরীর এমন হয়। আপনি চোখে জল দিন। দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন দেখি।

—কাশীশঙ্কর রক্তপাতের পক্ষে, তাইতো এত ভাবনা! আমি কোন মতেই রক্তপাত চাহি না!

কালীশঙ্কর কথা বললেন নম্রকণ্ঠে। বিকৃত মুখভঙ্গীতে।

—আপোষে মিটে না? মিহিমিষ্টি সুরে প্রশ্ন করলেন রাজরাণী। বললেন,—রাজাবাহাদুরের কথা কি অমান্য করবেন ছোটকুমার? আদেশ লঙ্ঘন করবেন?

বাতায়ন ত্যাগ করলেন কালীশঙ্কর। তাঁর উর্দ্ধাঙ্গের হলুদ-আলো কখন বিলীন হয়ে গেছে। সূর্য্যের শেষ রশ্মি, ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আকাশে নেই আর সেই দিবালোকের শুভ্রতা। পূর্ব্বদিগঞ্চলে কৃষ্ণরেখা উঁকিঝুঁকি দেয়, সন্ধ্যার অঞ্চলাপ্রান্ত দেখা দেয় যেন।

রৌপ্যময় কেদারায় ধীরে ধীরে বসলেন রাজাবাহাদুর। পাদানিতে রাখলেন পদদ্বয়। লাল শালুর গদী চতুষ্কোণ পাদানিতে। চার কোণে চারটি রূপালী জরির কলকা।

কালীশঙ্কর বললেন,—আমি তো আপোষেই মিটাতে চাই। কিছু ধনসম্পত্তি যায় যাক্। কিন্তু সহোদর একান্তই নারাজ। এক্ষণে আমার কি যে কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করতে পারি না।

রাজার পদতলে পারস্যের রঙদার গালিচা। বহু চিত্র-বিচিত্র আঁকা।

রাজমহিষী আসন গ্রহণ করলেন গালিচায়,—রাজাবাহাদুরের ঠিক পায়ের কাছে। একটি দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন উমারাণী। বললেন,—অধিক চিন্তায় শরীর নাশ হয়। ভাবনা পরিহার করুন।

কথার শেষে রাজার দুই পায়ে হাত ছোঁয়ালেন। করস্পর্শ।

কোন কথা বলেন না রাজাবাহাদুর। অনিমেষ নয়নে দেখেন পাটরাণীকে। কি এক অপূর্ব্ব সুবাস বহন ক'রে এনেছেন রাণী। অপরাহ্ণে বেশভূষা পরিবর্ত্তনের ক্ষণে অঙ্গে মেখেছেন কি! কে জানে, গন্ধবারির সুগন্ধ না তাম্বূলগন্ধ! পুষ্পনির্য্যাস না গন্ধতেল! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল উমারাণীর; সূক্ষ্ম সীঁথিতে সিঁদুররেখা। কপালের মধ্যভাগে উজ্জ্বল লাল টিপ গোলা-সিঁদুরের। কেশরাশির ভার ক্রমে শিথিলমূল হয় যেন। কবরী আলগা হয়। আকাশের তারা জ্বলছে দপদপিয়ে, ঘনকালো কেশের ফাঁকে ফাঁকে। সোনার কাঁটা উমারাণীর খোঁপায়। কাঁটায় কাঁটায় হীরা বসানো একেকটি। পলকি হীরা—তিন তিন রতির। অন্ধকার-আকাশের বুকে যেন জ্বলন্ত গ্রহ-নক্ষত্র।

পায়ে হাত বুলিয়ে দেন রাজমহিষী। সযতনে, সন্তর্পণে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—জয়া আর মঙ্গলাকে দেখি না! কোথায়?

—নাটমন্দিরে রাজাবাহাদুর! পূজার আয়োজনে গেছে দু' জনে।

রাজমহিষীর কথা যেন বাদ্যযন্ত্রের ক্ষীণ ঝঙ্কার। তারের বাজনা যেন কথা কইলো। সেতার বাজলো যেন বিলম্বিতে!

ফুল বাছতে গেছেন হয়তো তাঁরা! দুর্ব্বা, তুলসী আর বিল্বপত্র বাছতে। চন্দন ঘষতে গেছেন। শ্বেত আর রক্ত-চন্দন। নৈবেদ্য গড়ছেন, ফল আর চালের। পুষ্পপাত্র সাজাতে গেছেন। সন্ধ্যারতির উপকরণ সাজাতে। লাল পাড় পট্টবস্ত্র পরিধানে, গেছেন নাটমন্দিরে, মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে। পূজার জোগাড়ে লেগেছেন সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়া—দুই রাণী। দুই বোন।

—তামাক দেয় না কেন?

কেদারায় এলিয়ে পড়লেন কালীশঙ্কর। রূপার কেদারা। হাতলে বাম হাত রাখলেন। হাতে মাথা রাখলেন।

পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে উঠে পড়লেন উমারাণী। শিথিলমূল কেশরাশির অলকগুচ্ছ সরিয়ে দিলেন কপাল থেকে। হৈমকার্য্যখচিত বসনের গুণ্ঠন টানলেন চোখের 'পরে।

না ডাকলে আসে না। ডাক না পড়লে কক্ষে প্রবেশের অনুমতি নেই। আর ডাক পাড়লেই আসে। এক অনুপলও বিলম্ব হয় না।

কক্ষের বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বললেন রাজরাণী, কার বা কাদের উদ্দেশে। বললেন,—আলবোলা দে যাও। রাজাবাহাদুরের ঘুম ভেঙ্গেছে, খেয়াল নেই?

ঘোমটার ভেতর থেকে, মুখ না দেখিয়ে, চোখ না দেখিয়ে, মৃদু তিরস্কারের সুরে, বললেন উমারাণী।

কিন্তু না ডাকলে কে আসবে? ডাক না পড়লে! হুজুরের বিনা হুকুমে কক্ষে প্রবেশ করবে, কার এমন দুঃসাহস!
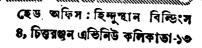
কড়িকাঠে টানাপাখা ঝুলছে। দুলছে।

তবুও কি দুর্ব্বিষহ উত্তাপ! টানাপাখার বাতাস তপ্ত, যেন আগুনের স্পর্শমাখা! কক্ষের দেওয়াল-গাত্র পর্য্যন্ত উষ্ণ।

রাজাবাহাদুরের প্রশস্ত ললাটে আর গণ্ডদেশে ঘর্ম্মরেখা ফুটেছে। তিনি যেন কিছু হাঁসফাঁস করছেন। কালীশঙ্কর এক বার গলা থাঁকরে বললেন,—বড়রাণী, তুমি কোথাও যাইও না। কিয়ৎক্ষণ থাকো! আমি যেন শ্বাসকষ্ট পাই।

ফিরলেন রাজমহিষী। দালান থেকে কক্ষে। রাজার কথা শুনে ব্যস্ত হন মনে মনে। বললেন,—যাই তবে, সরবৎ এনে দিই। পান করুন, কষ্টের লাঘব হবে।

—না! কালীশঙ্কর বললেন।—তুমি যাইও না। তোমাকে দেখেই আমার কষ্ট দূর হবে। তুমি থাকো!

আবার বসলেন উমারাণী। পারশ্যের গালিচায় বসলেন, রাজাবাহাদুরের পদপ্রান্তে। রাণীর চঞ্চলতায় তাঁর হাতের গোছা-গোছা চুড়ি ঝুন-ঝুন বেজে উঠলো। রাজার পায়ে হাত দিলেন। হাত বুলাতে থাকলেন অতি সন্তর্পণে! রাজার কথায় ঈষৎ গর্ব্ব বোধ করেছেন। কাঁচুলী-আঁটা স্থূল বক্ষ আরও যেন স্ফীত হয়েছে। উমারাণীর নতদৃষ্টি, হাসি-মাখানো মুখে গুণ্ঠনের আবরণ।

বাহক-ভৃত্য আলবোলা বসিয়ে দিয়ে যায়। মুখনল ধরিয়ে দিয়ে যায় রাজার হাতে। ভয়ে ভয়ে, সসম্ভ্রমে। টানা-পাখার হাওয়া যেন ভারী হয়ে ওঠে তামাকের সুগন্ধে! নড়া-চড়ায় আলবোলার মুক্তার ঝারি এখনও মৃদুমন্দ দুলছে!

গুণ্ঠন মোচন করলেন রাজমহিষী। ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে বললেন,—সরবৎ আনি যাই? যাবো আর আসবো, অনুমতি করুন রাজাবাহাদুর!

—তবে যাও, বিলম্ব না কর'। একা থাকায় আরও কষ্ট পাই।

কথার শেষে মুখে মুখনল তোলেন কালীশঙ্কর। তিনি কত একা! দিন আর রাত্রির মধ্যে রাজা যখন অবকাশে একা থাকেন, তখন যেন তাঁর নিজেকে বড় বেশী একা মনে হয়। ত্রিভুবনে কেউ যেন তাঁর নেই!

তিন রাণী। রাজপুত্র।

দেওয়ান, নায়েব। কত আমলা গমস্তা! সিপাহী, পাইক, বরকন্দাজ! দাস-দাসী কত অসংখ্য! ভৃত্য আর তাঁবেদার! ভূমিদানের মানুষই বা কত! রাজার দরবারে পরামর্শদাতা! বৈঠকখানা ভর্ত্তি ইয়ার-মোসাহেব। গাইয়ে-বাজিয়ে।

তবুও রাজাবাহাদুর একা? অবসর-সময়ে যখন একা একা থাকেন, তখন বড় বেশী যেন একা মনে হয় নিজেকে। এত বল-ভরসা, এত লোকবল, এত ধনসম্পদ—তবুও মনে হয় কেউ যেন কারও নয়, কেউ নয় আপনার। যৌবন-জোয়ারের বেগ যত দিন প্রবলতর ছিল তত দিন এ সকল চিন্তা মনেই উদয় হ'ত না। এখন জোয়ার হয়তো ভাঁটার দিকে, মুখরদিনের চপলতা এখন প্রায় স্থির। এখন সময়ে সময়ে বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী মন-আকাশে উড়ে বেড়ায়, তত যেন সংসারের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি ঔদাস্য আসে। মনে হয়, যে একা এসেছে নগ্নকায়া, সে একা চলে যাবে। কেউ যাবে না সঙ্গে, পরপারের যাত্রায়।

মদের পেয়ালা। রাণীদের হাসি-হাসি-মুখ! গায়কের গান, নর্ত্তকীর নাচ, আসরফি মোহরের গদী—তবুও একা ঠেকে রাজাবাহাদুরের?" এই দুনিয়ায় কত কি দেখলেন স্বচোখে! দেখে দেখে অভিজ্ঞ হয়েছেন—মানুষকে চিনেছেন—বুঝেছেন, কারও জন্য কেউ নয়। আপন বলতে কেউ নেই।

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। যুগের পর যুগ!

কত নিদাঘের দাবদাহ গেছে! কত ঝটিকার প্রলয় তাণ্ডব দেখেছেন রাজা! ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়ন!

সমুখের মুক্ত বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন কালীশঙ্কর।

বাহিরে দিবাশেষের ম্লান আকাশ। ঘন-সবুজ বৃক্ষশীর্ষ! আকাশের বুকে টিয়া পাখীর ঝাঁকে। যেন এক রাশ সবুজ পাতা, সাঁতারু-মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছে।

ঐ তো সেই বটবৃক্ষ! ঐ তো সেই দেবদারু। শাল, তাল, তমাল,—সেই বিরাট অশ্বত্থ—আজই তারা আকাশকে চুমা খেতে মুখ উঁচিয়েছে। তাদের দৈনন্দিন বিকাশ দেখেছেন রাজাবাহাদুর—যখন তাদের ছেলেবেলা তখন থেকে দেখেছেন।

—রাজাবাহাদুর! আমি এসেছি।

লজ্জা-নম্র কথার সুর রাজমহিষীর। তাড়াতাড়ি যাওয়া-আসায় দ্রুত শ্বাস পড়ে যেন। ক্ষণেক ব্যবধানে বক্ষ ওঠে নামে। রাণীর ডান হাতে হিমশীতল পানপাত্র। কৃষ্ণকষ্টিপাত্রে টলমল পানীয়—কালোজিরা আর মৌরী ভাসছে পোড়া-কাঁচাআমের সরবতে। রাজমহিষী গেছেন আর এসেছেন। যেতে আর আসতে যতটুকু সময় লেগেছে।

রাণীর কথায় যেন মন নেই রাজাবাহাদুরের। কান নেই।

উন্মুক্ত বাতায়নে চোখ মেলেছেন কালীশঙ্কর। বহুকাল যেন দৃষ্টি পড়েনি—ঐ তাল-তমাল-শাল-দেবদারু-বট-অশ্বত্থ যেন নজরে পড়েনি! আজ তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, পল্লবিত শাখা-প্রশাখায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে,—আকাশকে চুমা খেতে মাথা তুলেছে আকাশের বুকে।

—রাজাবাহাদুর!

আবার ডাকলেন রাজমহিষী। মিষ্টি মিষ্টি কণ্ঠে। কি এক বাদ্যযন্ত্র বাজলো যেন। তারের ঝঙ্কার যেন।

সাড়া নেই রাজার। কান নেই রাণীর কথায়। খেয়ালই নেই কে ডাকছে না ডাকছে।

কত নবাব এলো গেলো! বঙ্গের শাসনকর্ত্তা একেক জন। যেন এক এক মহাজন। ভারতের সম্রাট ছিলেন জাহাঙ্গীর।

তাঁর পর এলেন শাহজাহান। এখন ঔরঙ্গজেবের কাল চলেছে। তিনিই এখন দিল্লীশ্বর বা ভারত সম্রাট।

বাঙলার শাসনকর্ত্তাও কত বার বদল হয়। এক যায়, আর এক আসে। রাজাবাহাদুরের জীবদ্দশাতে তিনিই দেখলেন একে একে কত জনকে। এলো আর গেলো, টিঁকলো না কেউ বেশীদিন—কেন কে জানে, ভাবছিলেন কালীশঙ্কর। এই অলস অপরাহ্ণে স্তব্ধ-মৌন-নীরব-অতীতের স্মৃতি মন্থন করতে যেন এক রকম ভালই লাগে। এই ভগ্ননিদ্রার জ্বরো জ্বরো শরীরে। অবশ অঙ্গে।

নির্জ্জলা স্পিরিট পান করেছিলেন রাজাবাহাদুর। দিনমানেই পান করেছেন, দরবার থেকে উঠে গিয়ে। চুয়ানো মদিরা পানে না কি তীব্রতম নেশা হয়! এক-আধ পাত্র ব্যতীত পান করা চলে না, এতই জোরালো। যেন তরল আগুন সেই চুয়ানো স্পিরিট। কালীশঙ্কর কুলদেবতাকে অর্ঘ্য দান ক'রে পর পর তিন পূর্ণপাত্র পান করেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে। কেমন যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে দিনকে দিন। রাজাবাহাদুর ছাড়তে পারেন না এই আত্মঘাতী নেশা—এই নির্জ্জলা চুয়ানো মদ খাওয়া। বিষ খাওয়া! কত দিনের অভ্যাস কে জানে!

কত নবাব এলো গেলো। কালীশঙ্করের অতীতের সঙ্গে তাঁরাও যেন জড়িয়ে আছেন বাঙলার নবাবদের সঙ্গে।

অবশ অঙ্গ রাজাবাহাদুরের। এখনও চোখে-মুখে নেশা ফুটে আছে। প্রশস্ত ললাটের দুই তীর ঝিম-ঝিম করছে। কেমন এক বিকারের ঘোরে যেন চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ঠেকছে। মুখে মুখনল, তাই গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন রাজার কক্ষে। সশব্দ আলবোলা, যেন জীবন্ত। গমগমে আঁচ আলবোলার চুড়োয়। শিরোভূষণে নানা রত্ন, মুক্তার ঝারি।

এক নবাব যায়, আর আর এক নবাব আসে।

রাজাবাহাদুরই দেখলেন কত জনকে, তাঁর জন্মের অব্যবহিত পর থেকে। যায় আর আসে, আসে আর যায়। কে জানে কেন, টিঁকতে পারে না অধিক কাল।

মুকারেম খাঁ যেতে না যেতে ফিদাই খাঁ বাঙলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হলেন। মুকারেম সপরিবারে জলে নিমজ্জিত হন। পারিষদবর্গ আর অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে সঙ্গে লয়ে মুকারেম তখন নৌকাবিহারে বেরিয়েছিলেন—নদীবহুল ঢাকা সহরের আনাচে-কানাচে। শুনলেন দিল্লী থেকে সম্রাট রাজদূত প্রেরণ করেছেন। জরুরী পত্র আনছে রাজদূত। চড়ায় নৌকা লাগতে না লাগতে ঝড় উঠলো ভীষণ। মুকারেমের নৌকা অকস্মাৎ ঝড়ে জলের অতল তলে ডুবে গেল। তার পর এলো ফিদাই খাঁ। সম্রাট হিজরী-১০৩৬ সালে নবাব ফিদাইকে বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত করলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। নূতন সম্রাট, নবলব্ধ সাম্রাজ্য,—শাহজাহান বরবাদ ক'রে দিলেন ফিদাই খাঁয়ের কাতর প্রার্থনা। সম্রাট তাঁর প্রিয়পাত্র কাসিম খাঁ যবনীকে শাসনকর্ত্তা করলেন বাঙলার।

—রাজাবাহাদুর!

আবার, আবার ডাকলেন উমারাণী। নাতিউচ্চকণ্ঠে ডাকলেন।

—আঁ!

কেমন যেন হতচেতনের মত সাড়া দিলেন কালীশঙ্কর। আকাশে প্রসারিত দৃষ্টি ফিরলো না। মুখে উঠলো মুখনল। আলবোলা গর্জ্জাতে থাকলো বার বার।

রাজমহিষী এক বার লক্ষ্য করলেন রাজার মুখভাব। সে মুখে নেশার পরিস্ফুট চিহ্ন; চিন্তার বক্ররেখা কপালে। চোখে নিদ্রার জড়তা। রাজাবাহাদুরের মুখাকৃতি দেখলে কথা বলতে যেন সাহস হয় না। ভয় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে উমারাণী তবুও বললেন,—রাজাবাহাদুর, এই সরবৎটুকু পান করুন!

—দেও! বললেন কালীশঙ্কর। এক হাত বিস্তার করলেন।

যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বড় বড় ঝোপ। আকাশের বুকে মুখ তুলেছে। সকলই প্রায় সমান উচ্চ। কোন কোন গাছের পর্ণগুলি চিত্রিত; কোন গাছের পর্ণ ঘোর রক্তবর্ণ; কোন পত্র দীর্ঘ, আপনার ভার সহ্য করতে পারে না, তাই নিম্নমুখী। কোন কোন বৃক্ষ দম্ভে যেন পত্রসমূহকে উর্দ্ধমুখ করেছে। কোন গাছের পাতা ক্ষুদ্র, গোলাকার। কারও বা পত্র হরিৎবর্ণ।

কত নবাব এলো আর গেলো! টিঁকলো না কেউ বেশী দিন। বাঙলার মাটিতে।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করই দেখলেন কত জনকে, এত কাল ধরে। কাসিম খাঁ যবনী ছিলেন পর্ত্তুগীজ-বিদ্বেষী। বাঙলায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লীর সম্রাটকে লিখে পাঠালেন: "আপনি যে কতিপয় ইউরোপীয় প্রতিমাপূজক জাতিকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলীতে বসবাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহাদের উপদ্রবে এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ এক প্রকার উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে; রাজকার্য্য পরিচালনা করাও কঠিন হইয়াছে। তাহারা দিনে দিনে এতই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে যে, আপনার প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না।

সম্রাট শাহজাহানের মনের কোণেও ছিল নিদারুণ বিদ্বেষ ঐ পর্ত্তুগীজদের প্রতি। সিংহাসন অধিকারের পূর্ব্বে সম্রাট যখন বিদ্রোহী হন, পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার অভিপ্রায়ে যখন পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিজের সাহায্য প্রার্থনা করেন—তখন তিনি নিরাশায় বিমুখ হন। রড্রিজ সাহায্য দানে অস্বীকার করেন। কাসিম খাঁর অনুযোগ-পত্র পাঠে এই সকল কথাই সম্রাটের স্মৃতিপটে ভাসে।

কাসিম খাঁ আরও লিখলেন: "বহু সময়ে পর্ত্তুগীজেরা এই দেশ হইতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ধরিয়া লইয়া যায়। কখনও বা কিনিয়া লইয়া ক্রীতদাস-দাসীরূপে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় করে। এইরূপে তাহারা ব্যবসা চালাইতেছে। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরের বহু প্রদেশে অমানুষিক দৌরাত্ম্য চালাইতেছে।"

সম্রাটের মন তৈরীই ছিল। পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণে পুরানো অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন।· সম্রাট শাহজাহান কাসিম খাঁকে আদেশ প্রেরণ করেন,—"আপনি অবিলম্বে প্রতিমাপূজক পর্ত্তুগীজগণকে আমার অধিকারের বহির্ভূত করিয়া দিবার আয়োজন করুন।"

সম্রাটের আদেশ পাওয়া মাত্র—হিজরী ১০৪১ সালে—কাসিম খাঁ হুগলী আক্রমণের উদ্যোগ করলেন। উদ্দেশ্য পর্ত্তুগীজ-উৎখাত, তাদের বংশনিধন। হুগলী অবরোধের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে অন্যূন এক হাজার পর্ত্তুগীজ মুসলমানহস্তে নিহত হয়। ক'জন যাজককে আর পাঁচশো সুশ্রী যুবককে আগ্রায় পাঠানো হয়—বিচারার্থে। বন্দীদের মধ্যে ছিল শত শত সুন্দরী বালিকা—তাদের অধিকাংশ সম্রাটের অন্তঃপুরে স্থান পায়। অবশিষ্টদের সম্রাটের সভাসদেরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেন।

কাসিম খাঁ যবানীর মৃত্যু হয়। তার পর হিজরী ১০৪২ সালে আসেন আজিম খাঁ বাঙলার নতুন শাসকরূপে। আজিম ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত, সম্রাটের প্রিয়পাত্র। এই আজিম খাঁর কন্যার সঙ্গেই যুবরাজ সুজার বিবাহ হয়। আজিম খাঁ ছিলেন অপদার্থ, নিষ্কর্ম্মা। আজিমই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজদের বঙ্গদেশে জাহাজসহ বাণিজ্য করবার 'ফারমান' বা অনুমতিপত্র আনিয়ে দেন দিল্লী থেকে। বাঙলা দেশকে তুলে দেন মগ আর আসামীদের হাতে। মগ-আসামী দু' দল একত্রে বাঙলায় লুঠপাট চালিয়ে চলে। বাঙলার বহু অধিবাসীকে তারা ক্রীতদাসরূপে চালান দেয়। শেষ পর্য্যন্ত সম্রাট পদচ্যুত করেন অকৃতকার্য্য আজিম খাঁকে। বাঙলা থেকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেন। তার পর বাঙলায় এলেন ইসলাম খাঁ মুসেদী। তিনি যেমন বহুদর্শী রাজনীতিক, তেমনই এক সুদক্ষ সেনানী। শাসন-কার্য্য, বিচার-কার্য্য ও সামাজিক কার্য্যে সমান সুপটু তিনি। এই ইসলাম চট্টগ্রামের শাসক মগ-সর্দ্দার মুকুট রায়ের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন। আরাকান-রাজের অধীনের শাসক মুকুট রায়। ইসলাম খাঁ মুসেদীর নাম থেকেই চট্টগ্রামের নামান্তর হয় ইসলামাবাদ। এই ইসলাম খাঁ—

—রাজাবাহাদুর, আজ আপনার বিশ্রাম।

হঠাৎ কথা বললেন উমারাণী। সেতারের ঝঙ্কার তুললেন যেন। আরও যেন কিছু বলবেন, তেমনি ব্যগ্র চোখে তাকালেন। বললেন,—আজ আর বৈঠকে যায় না। অন্দরেই বিশ্রাম কর।

শেষের কথাগুলি রাণী বলেন যেন ফিসফিসিয়ে। চুপি চুপি। বাতাস পর্য্যন্ত যেন না শোনে। হাওয়ায় যেন কথা উড়ে না যায় অন্য কানে। ঘরের দেওয়াল যেন না শোনে।

—নাঃ।

ক্ষীণ হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—নাঃ, বড়রাণী। অন্দরে আজি থাকা চলে না।

—কেন? বাধা কি?

পুনরায় হাসলেন রাজা। ক্ষীণ হাস্য। হাসিমুখেই বললেন,—অন্ততঃ আজি নয়।

ইদিক সিদিক দেখলেন রাজমহিষী। মৃগনয়না উমারাণী, চোখে যেন কত ভাব, কত ভাষা! কত আবেগের আবেশ-ভরা। সেই চোখ তুললেন রাজরাণী। রাজার চোখে চোখ রাখলেন—লজ্জাভরা দৃষ্টি। বললেন,—বাধা কি তাই বল। তোমার শরীর ক্লান্ত—

—ব'ল না বড়রাণী।

—কেন? আমার অধিকার ছাড়ি কেন?

কথায় কথায় যেন সজীব হয়ে ওঠেন কালীশঙ্কর। এতক্ষণ ছিলেন মৃতপ্রায়ের মত। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে কত কি যেন ভাবছিলেন, কতক্ষণ ধ'রে। বঙ্গদেশের বিগত শাসকদের স্মরণ করছিলেন একে একে। মুখের হাসি চাপলেন রাজাবাহাদুর। সানন্দ কণ্ঠে বললেন,—আজি দু'টা ইরাণী নর্ত্তকীর আসার ঠিকঠাক আছে।

লজ্জাবতী-লতার গায়ে কিসের যেন স্পর্শ লাগে!

পল্লবিতা লতা, নিমেষের মধ্যে যেন সঙ্কুচিতা হয়। উমারাণীও যেন পলকের মধ্যে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নেন। উঁচানো দৃষ্টি নত করেন গালিচায়। মুখখানি যেন চকিতের মধ্যে মলিন হয়ে যায়। তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ধীরে ধীরে। আনত-চোখে হতাশ-দৃষ্টি।

দু'জন ইরাণী নর্ত্তকী আসবে। ইরাণের রাণী আসবে। সব ঠিকঠাক।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর সোজা হয়ে বসলেন, কেদারায়। মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে আছড়ে ফেলে দিলেন গালিচায়, কেমন যেন সদম্ভে। মুখের ক্ষীণ হাসিতেও গর্ব্বরেখা ফুটলো যেন। ইরাণী নর্ত্তকী দু'জন এই সবে মাত্র পা দিয়েছে গড় গোবিন্দপুরের জাহাজ-ঘাটে—মাত্র ক'দিন আগে। এখনও কোথাও মুজ্‌রো নেয় নি। মুজ্‌রোও নয়, হুজ্‌রো তো নয়ই।

হঠাৎ-হাওয়ায় হঠাৎ-নিবে-যাওয়া প্রদীপ যেন উমারাণী। কিয়ৎক্ষণ আগেও দপদপ জ্বলছিল দীপশিখা। এখন রূপের জৌলস, ম্লান হয়ে গেছে যেন নিরাশ-ব্যথায়।

ঠিক যে-সময়ে, সুতানুটির ঘরে ঘরের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে, সেই ভরাসন্ধ্যা নামতে না নামতে একটি অতি উজ্জ্বল দীপশিখা যেন রাজ-অন্তঃপুরে দপ্‌ করে নিবে যায়।

আবার একটি তপ্ত নিঃশ্বাস ফেললেন উমারাণী। বুক-ভাঙ্গা শ্বাস ফেললেন।

—সূর্য্য অস্তাচলে, তথাপি এখনও কি অসহ্য উত্তাপ!

কারও উদ্দেশে নয়, আপন মনেই কথা ক'টি বললেন রাজাবাহাদুর। আবার চোখ ফেরালেন বাতায়নে। মুক্ত আকাশে। নীড়লোভী পাখীর ঝাঁক উড়ছে তীরের বেগে। আঁধার নামতে না নামতে বাসায় আশ্রয় চাই। টিয়া পাখীর

পাল উড়ছে, ডাকতে ডাকতে। যেন এক-রাশ সবুজ পাতা, উড়ে চলেছে হাওয়ার বেগে। কবুতরের দল উড়ছে, পাক খেয়ে খেয়ে! গাছে গাছে কাক আর চড়াই মুখর ক'রে তোলে যেন অলস-অপরাহ্নকে। ডেকে ডেকে!

অদূরে ধোঁয়ায় ধূসর এক রেখা—ভূমি থেকে শূন্যে উঠছে সাপল গতিতে! দৃষ্টিপথে দেখতে পেয়েছেন কালীশঙ্কর। সন্ধ্যার বস্ত্রাঞ্চল যেন, আকাশ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে! অত্যন্ত ধীর আর মন্থর গতি সচল ধূম্ররেখার। দেখায় যেন স্থির, অচঞ্চল! যেন গতিহীন।

অবনতমুখী উমারাণী, লজ্জা না সঙ্কোচে ম্রিয়মানা পদ্মের নত হয়ে আছেন যেন। মুক্তাহারবেষ্টিত তাঁর গণ্ডদেশ এখনও ঈষৎ আরক্ত। অর্দ্ধমুদ্রিত দুই আঁখিতে নতদৃষ্টি! ওষ্ঠদ্বয় স্থির। টানাপাখার হাওয়ায় রাজমহিষীর গুণ্ঠন যেন থাকে না।

—ব্যাটা সলোমন, চুল্লীতে আগুন লাগালো হয়তো!

আবার স্বগত করলেন রাজাবাহাদুর, ঐ সচল ধূমরেখায় চোখ রেখে। রাজার হঠাৎ-কথায় একবার যেন বিচলিত হয়ে ওঠেন উমারাণী। যেন চমকে ওঠেন।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে চার্লস সলোমনের কুঠি। কুঁড়ে-ঘর। সলোমনের পূর্ব্বপুরুষ না কি খাস ইংলণ্ডের বাসিন্দা ছিল। সলোমনই সাগরে ভাসতে ভাসতে কবে কোন্‌কালে ভারত-মহাসাগরের তীরে এসে পৌঁছয়! জাহাজে আসে, আর ফেরে না। সাদা আদমী হয়ে সে কালোজাতির প্রেমে পড়ে গেছে, আশ্চর্য্য! লণ্ডনের পথে পথে হয়তো ভিক্ষা করতে বাধ্য হ'ত এত দিনে, সলোমন বেঁচে গেছে পুণ্যতীর্থ ভারতের ধূলি মাথায় মেখে! সেখানে ছিল দুর্দ্দশা, আর এখানে? সলোমন রুটির বেকারী করেছে নিজে। তন্দুর বসিয়েছে—তনুর বসিয়েছে—পাঁউরুটি সেঁকবার চুল্লী বসিয়েছে। বেকিং ওভেন্ বসিয়েছে গোটা কয়। চুল্লীতে ফাঁপা রুটি সেঁকে চার্লস সলোমন—পাঁউরুটি তৈরী করে। লোফ!

পাঁউরুটি বিক্রী করে সলোমন। রুটি-বিক্রীর পয়সায় রুটির সংস্থান করে নিজের! কুঠিয়াল রাইটারদের জন্য রুটি সরবরাহ করে কোম্পানীর হাউসে। ঝড়তি-পড়তি থাকলে সাধারণ খদ্দেরকে বিক্রী করে! আর্ম্মাণী, খ্রীশ্চান আর পর্ত্তুগীজ প্রতিবেশীদের কাছে বিকিকিনি করে!

বাঙলার শ্যামল মাটিকে না কি অন্তর থেকে ভালবেসে ফেলেছে চার্লস সলোমন! হিম আর কুয়াশা-দেখা চোখ তার, চিরসবুজের দেশ দেখে দেখে যেন তাই সাধ আর মেটে না! স্বচ্ছ আকাশ দেখতে দেখতে কত সময়ে তন্ময় হয়ে পড়ে সলোমন। নাবিক-নীল আকাশে কেমন নিরেট রূপোর সূর্য্য দেখা যায়! কালোরাতের আকাশে সোনার চাঁদ, সীমাসংখ্যাহীন নক্ষত্র-বিস্তার! বর্ষায় কেমন ঝরো ঝরো বর্ষণ!

উর্ব্বর-মাটিকে ভালবেসেই শুধু তৃপ্ত নয় চার্লস সলোমন। বাঙলার এক গভীর-চোখ মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছে সে। এক অকূলকন্যার, প্রেমে ম'জে গেছে যাকে বলে। ডোমপাড়ার সেই মেয়েটি, যখন বেলাশেষে গাগরী ভরণে চলে দিগ্‌বধূদের সঙ্গে, তখন সেই কালোমেয়েটির প্রতি অঙ্গে টলমল যৌবন দেখতে দেখতে মোহমুগ্ধ হয়ে ওঠে সলোমনের বিলাতী-মন। চুলের খোঁপায় কলকে-ফুল, মিশ্‌কালো রঙে রূপার অলঙ্কার—কত দূরে থেকেও দেখতে পায় সলোমন—অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যায় যেন!' শরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তখন। থ্রোইং কিস্ ছোঁড়ে সলোমন! উড়ন্ত চুমু!

বসেছিলেন রাজমহিষী, অলঙ্কার বাজিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ দুই হাতের গোছা-গোছা চুড়ির রিণিঝিনি শুনে রাজাবাহাদুর মুখ ফেরালেন। দেখলেন রাণী গমনোদ্যতা, দুয়ারের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—বড়রাণী, যাও কোথায়?

ফিরে দাঁড়ালেন মলিনমুখ রাজমহিষী। উড়ে-যাওয়া গুণ্ঠন টানলেন কপালের পরে। আনত চোখে জিজ্ঞাসু চাউনি ফুটলো। আবার কেন ডাক পড়লো, অকারণে? যাকে ছেড়ে চলে-যাওয়া, তাকে আবার ডাকা কেন? অহেতুক আহ্বান কেন?

—আমিও যাই নাটমন্দিরে।

অভিমানের স্পর্শ যেন কোথায়, রাণীর কথার সুরে। উমারাণী বললেন,—নাটমন্দিরে যাই, সেখানে ভাগবত-পাঠ শুনি গিয়ে। কি আর করি!

ভাগবত পাঠ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পাঠ। কৃষ্ণবিষ্ণুর লীলাপাঠ।

আকাশ প্রায় কালো আকার ধারণ করছে। আর যেন চোখে পড়ে না কিছু। সলোমনের চুল্লীর ধোঁয়া আর গোচরে আসে না। আকাশ অদেখা হ'তে থাকে।

রাজকক্ষের দ্বারমুখে সহসা উজ্জ্বল আলো ঠিকরোয়। আলোর আভায় রাজকক্ষ ঝলসে উঠলো যেন। চার দেওয়ালের সোনা-রূপোর সৈন্যসামন্ত জ্বল্-জ্বল্ করে। কাচের ঝাড়লণ্ঠন নিষ্প্রদীপ, তবুও আলোর ছায়াপাতে চিকচিকিয়ে ওঠে। রাজমহিষীর মলিনমুখেও আলোর ঝলক লাগে। গুণ্ঠন আরও টেনে দিলেন তিনি! এই ম্লান মুখ আর কা'কে দেখাবেন!

রাজাবাহাদুর, গলা খাঁকরে বললেন,—আলো! আলো দিতে কও বড়রাণী!

মশালচি এসেছে দ্বারপ্রান্তে। এসে দাঁড়িয়ে আছে মশাল-হাতে। জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাবে সাঁঝের বর্ত্তিকা। আলো, আরও আলো! দাউ দাউ জ্বলছে মশাল, লেলিহান শিখায়। বায়ুপ্রবাহে আঁকাবাঁকা শিখা।

রাজমহিষীর ম্লানমুখ আরও যেন শান্ত ও ম্লান দেখায়, মশালের আলোকপাতে। তাঁর নয়নপল্লব যেন জলভার-স্তম্ভিত। টানাপাখার হাওয়ায় কপালের 'পরে লেগেছে

নিবিড়-কালো কুঞ্চিতালক! রাতের আকাশে তারা যেন! অন্ধকারময় শিথিলমূল কেশকবরী হীরার কাঁটায় গ্রথিত—এতক্ষণ যেন দৃষ্টিপথে পড়েনি রাজাবাহাদুরের। উমারাণীর সুগঠন কণ্ঠের রত্নকণ্ঠী চিক-চিক করে। অঙ্গুরীয় ঝলমল করে।

রজতের প্রদীপ জ্বললো রাজকক্ষে। সু-উচ্চ পিলসুজের শীর্ষে। আলোয় যেন আলোকময় হয়ে ওঠে রাজকক্ষ। কাঞ্চন আর রজতের চাকচিক্যে যেন চোখ ঠিকরে যায়।

দু'জন ইরাণী নর্ত্তকী আসবে আজ। রাণী ভগ্নমনে ত্যাগ করলেন কক্ষ, অবশ পদক্ষেপে।

ইরাণী নর্ত্তকী! আসছে কত দূর থেকে। সেই ইরাণ থেকে।

বাগদাদ থেকে দু'টি তাব্রিজ-কন্যা এসেছে। নীল-চোখ, টিকালো-মুখ, সোনালী-কেশ, বসরাই গোলাপের মতই রাঙা কপোল। ভেনাস যেন!

বাগদাদ থেকে ক্যারাভান ছেড়েছিল বিরাট এক দলের। বাগদাদ থেকে ইস্পাহানে পৌঁছে থেমেছিল কয়েক পক্ষ। ইস্পাহান থেকে কান্দাহার। কত দিন আর কত রাত ফুরিয়ে যায়! লাহোরে পৌঁছতে পৌঁছতে আরও কত দিন অতীত হয়। লাহোর থেকে ভাতিন্দা—দিল্লী—আগ্রা লক্ষ্ণৌ—পাটনা—

পায়ে-চলা ক্যারাভান মরুচারীদের। উটের পিঠেই শুধু নারী আর শিশু।

কখনও থামে, কখনও এক নাগাড়ে পথ চলে! পথেই দিন আর রাত্রি শেষ হ'য়ে যায়। ঠিক মাথার 'পরে চন্দ্র-সূর্য্যের আলো পড়ে। পাটনা থেকে বাঙলা আর কত দূর, ক'দিনের পথ বৈ নয়।

সূর্য্যের খর আলো দগ্ধ করতে পারে না। পিপাসায় মৃত্যু হয় না। অনাশ্রয়ে ভেসে যায় না ঝড়জলে! তিলে তিলে কষ্ট বরণ করেও না কি ঐ তাব্রিজ-কন্যাদের রূপ এক তিলও টসকায়নি। বোরখার আবরণে আছে যেমনকার তেমনি। এসেছে কোথা থেকে কোথা, কত দেশ পেরিয়ে,—তবুও যেন ক্লান্তি নেই দেহে। তেমনি সজীব আছে। বসরাই গোলাপ, এততেও পাপড়ি বসলো না, শুকালো না, মরলো না?

সরবৎটুকু পান করায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন রাজাবাহাদুর। চেতনাসঞ্চার হয় যেন। রজতদীপের উজ্জ্বল আলোয় কেমন যেন খুশী খুশী দেখায় রাজাকে। কেদারা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। সরবৎপানে মুখের স্বাদ মিষ্ট হয়ে যায়।

দেওয়ালের কোণে তেকাঠা। মুখশুদ্ধি আছে তেকাঠায়। ঢাকাই কাজের চাঁদির ডিবা আছে, পান-মসলার। জর্দ্দা-সুর্তির কৌটা আছে। তাম্বুল আছে।

টানাপাখার জোরালো হাওয়া চলছে। কে কোথায় কোন্ অন্তরালে থেকে পাখার দড়ি টানছে নতুন উদ্যমে। দিবানিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে—রাজা না কি জেগেছেন।

রজতদীপের শিখা নেচে নেচে উঠছে. সর্পিল ভঙ্গিমায়। বিপরীত দেওয়ালে রাজাবাহাদুরের বিরাট ছায়া প'ড়েছে।

আবার কোথা থেকে ঝড়ের মত যেন উড়েই আসেন রাজমহিষী।

অলঙ্কারের সজোর রিণিঝিনি শোনা যায় হঠাৎ। রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসেন যেন উমারাণী! কক্ষে প্রবেশ ক'রেই ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললেন,—রাজাবাহাদুর! রক্ষা করুন!

—কে:!

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ কালীশঙ্করের। গর্জ্জে উঠলেন যেন। ব্যাঘ্রবিক্রম যাঁর, তিনিও বুঝি আচমকা ভীতিকাতর নারীকণ্ঠের ডাক শুনে চমকে উঠেছিলেন বারেক। বললেন,—বড়রাণী?

—হাঁ, রাজাবাহাদুর!

বাষ্পরুদ্ধ কথার সুর রাজমহিষীর। দ্রুত পদচালনায় অবিন্যস্ত হয়ে গেছে বেশবাস—হৈমকান্তখচিত বস্ত্রাঞ্চল। স্থানচ্যুত হয়েছে কণ্ঠহার। কি এক ভয়ে রাণীর অনিন্দ্য মুখশ্রী যেন রক্তহীন দেখায়। থর থর কাঁপতে থাকে উমারাণীর কোমল অঙ্গ।

—ভয় পাও কেন বড়রাণী? কোন' দুর্ঘটনা—

আকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। দুই হাতের মুষ্টি কঠিন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ দুই চোখে অনন্যসাধারণ ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টি ফুটেছে। প্রশস্ত ললাটে কুঞ্চনরেখা।

—পথ রোধ করে যে!

কেঁদে কেঁদে বললেন যেন রাজমহিষী। করুণ সুরে বললেন।

—কোন্ দুরাত্মা! কে:?

রাজার বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। কথা বলেন সহসা উচ্চকণ্ঠে। চেঁচিয়ে।

করাল কিছু দেখেছেন রাজরাণী। মৃত্যুকে দেখেছেন যেন। তাঁর নয়নতারা স্থির হয়ে আছে এখনও। কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে গেছে। থরথরিয়ে কাঁপছে কোমল বাহু। চরণাঙ্গুলি। বক্ষের স্পন্দন যেন থেমে আছে। বললেন,—মহেশনাথ!

—মহেশনাথ?

অসাবধানে হাতের ডিবা গালিচায় পড়লো সশব্দে। সিংহের মত গর্জ্জন করলেন যেন কালীশঙ্কর।

—হাঁ রাজাবাহাদুর, মহেশনাথ।

—কি বলে মহেশনাথ?

স্পিরিটের নেশায় শরীর এখনও টলছে। কোন মতে নিজেকে সামলে নেন রাজাবাহাদুর। উত্তেজনায় হয়তো পদস্খলন হ'তে পারতো।

রুদ্ধশ্বাস মুক্ত হয় কতক্ষণ পরে। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে। হাঁফ ধরে যেন উমারাণীর। থেকে থেকে স্ফীত হয় বক্ষ, শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বললেন রাণী,—কি বলে আমি কাণ দিই নাই। পথ আগলায় কেন? কি ভয়ঙ্কর তোমাদের ঐ মহেশনাথ!

শিউরে শিউরে ওঠেন বড়রাণী। নয়নতারা আবার স্থির হয়ে যায়। মুখাকৃতি রক্তহীন।

—কোথায় মহেশনাথ ?

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উত্তর না শুনেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন রাজাবাহাদুর। ভূমি কেঁপে উঠলো যেন কালীশঙ্করের পদক্ষেপে। রাজমহল কাঁপতে থাকলো বুঝি!

দালানে পদার্পণ করে দৃষ্টিপথে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন কালীশঙ্কর। কোথায়, কোথায় সেই দুরাত্মন্!

—মহেশনাথ!

সিংহগর্জ্জন। দালানে প্রতিধ্বনি ভাসলো রাজার ডাকের। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে তিনি ডাক দেন।

ভৃত্য-খানসামা যে-যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে প্রস্তর-মূর্ত্তির মত। এমন কণ্ঠস্বর কদাচিৎ শোনা যায় হয়তো। যখন রাজাবাহাদুর মারমূর্ত্তি হয়ে ওঠেন তখনই শোনা যায়। নচেৎ নয়। কালীশঙ্করের চীৎকারে সন্ধ্যার অন্ধকার চমকায়। বাতাস পর্য্যন্ত যেন থমকে থাকে। মহেশনাথের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায় না। দালানের অদূরে এক দুয়োর আগলে দাঁড়িয়ে আছে মহেশনাথ। ব্যাঘ্রবিক্রম যাঁর, তাঁকে সামনাসামনি দেখেও হাসছে, মৃদু মৃদু।

—কি বক্তব্য মহেশনাথ ?

গম্ভীর কথা বললেন রাজাবাহাদুর। কয়েক পা এগোলেন। সুদীর্ঘ দালানের শেষপ্রান্তে মহেশনাথ। হাসছে। নীল বেলোয়ারী কাচের রঙীন আলো পড়েছে মহেশনাথের আপাদমস্তকে। কত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন রাজাবাহাদুর, মহেশনাথকে সমুখে দেখে যেন স্তিমিত হয়ে পড়েন। বলেন,—জবাব নেই কেন ?

মহেশনাথ কে ? রাজঅন্দরে যার গমনাগমন ?

মৃদু মৃদু হাসি হাসে মহেশনাথ। নীরব হাসি। রাজাকে সমুখে দেখেও তার মুখের হাসি মিলায় না। যেন ভয়লেশহীন। ঐ দূরে থেকেই একটি নমস্কারে অভিবাদন জানায় মহেশনাথ। বলে,—পেন্নাম লন।

—কি বক্তব্য তাই বল ? অন্দরে কি চাও ?

কালীশঙ্কর কেমন যেন পূর্ব্বাপেক্ষা নতস্বরে কথা বলেন। রাজার ক্রোধ যেন উবে যায় কর্পূরের মত। মহেশনাথকে চোখাচোখি দেখে মনে বুঝি তাঁর করুণার উদ্রেক হয়। দুই হাতের কঠিন মুষ্টি নরম হয়ে যায়। অধিকক্ষণ যেন চোখ রাখতে পারেন না মহেশনাথের চোখে। যেন চোখ মেলে আর দেখতে পারেন না মহেশনাথকে। মনে যেন বিকার আসে।

যেন এক মূর্ত্তিমান বিভীষিকা, এমনই ভয়াবহ!

মহেশনাথের বিকল অঙ্গ। শরীরের ডান দিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অনড়, অচল। ডান চক্ষু নেই, শ্মশ্রুবহুল মুখে, রেখা আছে শুধু চোখের। ডান হাত ওঠে না। ডান পা চলে না। তবুও বিশাল বপু, প্রায় কাজল-কালো দেহবর্ণ। যেন অগ্নিদগ্ধ। রাজমহিষী দেখে তাই আঁৎকে উঠেছিলেন।

মহেশনাথকে দেখলে ভয় করে। কাছে এগোতে সাহস হয় না। দেখলে মন যেন বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আপনি চোখ বন্ধ হয়ে যায়, চোখে যেন দেখা যায় না।

ডান পা চলে না, তাই মহেশনাথের হাতে অন্ধের যষ্টির মত বাঁশের লাঠির অবলম্বন। বাকৃশক্তি নেই তেমন, অবশ জিহ্বা। মহেশনাথ কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে অদ্ভুত স্বরে। যারা তাকে চেনে না, জানে না, তারা বুঝবে না মহেশনাথের জড়ানো কথা।

তবুও হেসে হেসে কথা বলে। মহেশনাথ বললে,—আমি কি বাঘ না ভাল্লুক। রাণীমা আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়েছেন।

রাজাবাহাদুর স্তব্ধ হয়ে থাকেন। ভীষণ ক্রোধ কোথায় মিলিয়ে যায়। সিংহগর্জ্জন আর থাকে না। বলেন,—তুমি কিছু বলবে মহেশনাথ ? কিছু বক্তব্য আছে ?

মহেশনাথ আবার বাম হাত কপালে তুললো। নমস্কার করলো। কেমন যেন ভীতিজনক হাসি হাসতে হাসতে বললে,—গণনা শেষ হয়েছে রাজাবাহাদুর। তিনি এক রকম ভালই আছেন।

—কে ?

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন কালীশঙ্কর। স্পষ্ট তাকিয়ে।

মহেশনাথ বললে,—কেন, আমাদের রাজকুমারী। ছক কেটে দেখেছি রাজাবাহাদুর।

কালীশঙ্করের মুখে যেন খুশীর আভাস ফুটলো কথা শুনে। বললেন,—কি কি দেখলে মহেশনাথ ?

—দেখলাম ভালই। বললে মহেশনাথ,—কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তিনি সুখেই আছেন।

আরও আনন্দিত হয়ে ওঠেন রাজাবাহাদুর। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন তিনি। বক্ষমথিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—আহারের অন্ন আর পরিধেয় বস্ত্র পেয়েছে সে ?

—হাঁ রাজাবাহাদুর আমি দেঁখেছি ছক কেটে, সুখে-শান্তিতে সুস্থ শরীরেই আছেন। মহেশনাথের কথার সুরে যেন প্রগাঢ় বিশ্বাস। বললে,—রাহুর দশা কেটে গেছে। আমার দক্ষিণা ?

কালীশঙ্কর আবার স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—মহেশনাথ, তুমি তোমার ঘরে যাও। তুমি পাবে তোমার প্রাপ্য। আমিই পাঠিয়ে দেবো তোমার সহোদরা শিবানীর মারফৎ।

—পেন্নাম।

মহেশনাথের বাম হাতের বংশদণ্ড শব্দ ঠুকলো দালানে। দালানের দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এঁকে-বেঁকে চললো মহেশনাথ। খুশীর হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে চললো।

মহেশনাথ কুশ্রী-কুরূপ, কিন্তু গুণী। কি এক গোপন আত্মীয়তার সম্পর্ক রাজগৃহের সঙ্গে—যা অনেকেই জানে না। মহেশনাথের সহোদরা রূপলাবণ্যময়ী শিবানী—কেউ যেন বিশ্বাসই করতে চায় না। তথাপি এ কথা না কি সত্য! আকাশের চন্দ্র আর সূর্য্যের মতই সত্য।

আর দাঁড়াতে পারেন না রাজাবাহাদুর। এই টলো-টলো শরীরে। ধীর পদচালনায় আপন কক্ষে ফিরলেন। চোখে আর মুখে যেন খুশী হওয়ার তৃপ্তি মাখানো। ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি।

দু'জন ইরাণী নর্ত্তকী আজ আসবে। নাচঘরে নাচের আসর জমবে।

রাজাবাহাদুরের ওষ্ঠের ক্ষীণ হাসি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বললেন,—বড়রাণী, তুমি অযথা ভয় পাও। মহেশনাথ আর নাই, বিদায় লয়েছে।

শিউরে শিউরে উঠলেন রাজমহিষী। মাথায় গুণ্ঠন টানলেন। বুকের কাঁচুলী ওঠা-নামা করে ঘন ঘন। আরও কিছুক্ষণ এক ভাবে দাঁড়িয়ে রাজকক্ষ ত্যাগ করলেন রাজমহিষী। ভয়ে ভয়ে চললেন—খাসমহলে। শ্বাসগতি এখনও দ্রুত। মিনমিনিয়ে ঘামছে রাণীর সর্ব্বদেহ। হস্তপদ হিম হয়ে আছে যেন।

মহেশনাথের গণনায় অগাধ বিশ্বাস রাজাবাহাদুরের! মহেশনাথ যেন ত্রিকালদর্শী, ভবিষ্যদ্বক্তা। কালীশঙ্কর জানেন, মহেশনাথের কাছে গণনাকার্য্য অবিদ্যা নয়। মহেশনাথ দস্তুরমত শিক্ষা করেছে নিজ চেষ্টায়। আয়ত্ত করেছে গণনার রীতিনীতি, মন্ত্রতন্ত্র, ছকাছকি। জন্মলগ্ন সঠিক যদি হয়, যদি হয় নির্ভুল—মহেশনাথও নির্ভুল গণনা করতে পারে!

ভৃত্য-খানসামা হাসাহাসি করে। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করে মহেশনাথকে। রাজগৃহের কেউ কেউ নতুন নামকরণ করেছে মহেশনাথের, মহিষনাথ। তার কুশ্রী রূপের জন্য এই নাম দিয়েছে। আড়ালে-আবডালে এ নামেই তার পরিচয় রাজবাড়ীতে।

আহারের অন্ন আর পরিধানের বস্ত্র জুটেছে রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর। সুস্থ শরীরে আছে। কত যেন নিশ্চিন্ত হ'লেন রাজাবাহাদুর, মহেশনাথের গণনাফল শুনে। ক্রোধ আর উত্তেজনায় কালীশঙ্করও ঘর্ম্মাক্ত হয়েছিলেন। টানাপাখার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর হাঁকলেন,—খানসামা!

—জনাব!

অপেক্ষমান খানসামাও হাঁকলো ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে। প্রবেশ করলো রাজকক্ষে। সেলাম ঠুকলো তকমাধারী। মাথা নত করলো সন্ত্রস্তের মত।

—স্নানঘরে যাবো। পোষাক বদল করবো। সাজসরঞ্জাম ঠিক রাখো।

—বিলকুল ঠিক আছে জনাব! সেলাম ঠুকে বললে খানসামা। বললে,—আস্নানের পানি, বৈঠকের পোষাক, সব কুছ, ঠিকঠাক হুজুর!

হঠাৎ যেন মনে পড়লো, সন্ধ্যা যে উৎরে যায়! শঙ্খধ্বনি কানে আসে যেন। রজতদীপের উজ্জ্বল শিখায় কক্ষ আলোকময়, তাই হয়তো কালো আঁধার চোখে পড়েনি। মনে মনে সন্ধ্যাদেবীকে স্মরণ করলেন রাজাবাহাদুর। প্রণাম করলেন। গায়ত্রী মন্ত্র নীরব-উচ্চারণের সঙ্গে চললেন হামামঘরে। আহারের অন্ন আর পরিধানের বস্ত্র যখন পেয়েছে রাজকুমারী, তখন আর চিন্তার কি কারণ আছে! বন্দিনী, নির্ব্বাসিতা! তা হোক, তবুও যখন অন্নবস্ত্র—

আমোদরের বুক থেকে, না আমোদরের অপর তীরের বনজঙ্গল থেকে, বোঝা যায় না, থেকে থেকে দমকা হাওয়া সোঁ-সোঁ উড়ে আসছে। বিস্তীর্ণ তীরভূমি জনশূন্য। হাওয়ার তীব্র বেগে গাছপালা লতা-পাতা হেলে দোলে। শাখায়-পাতায় জড়াজড়ির শব্দ আসে বাতাসে ভেসে। আমোদরের অপর তীর থেকে যেন ঘন কালো অন্ধকার আসে, জটলা পাকিয়ে। আর আসে মশককুল ঝাঁকে ঝাঁকে।

গড়-মান্দারণ কি এমন মন্দ স্থান! শালগ্রামশিলাকে প্রণাম সেরে নিজ কক্ষের এক ভগ্ন পালঙ্কের উপর বসেছিলেন রাজকুমারী। তাঁর মুখ যেন হর্ষ-উৎফুল্ল। কক্ষমধ্যে জ্বলছে মাটির প্রদীপ। বিন্ধ্যবাসিনীর সম্মুখে মুকুর, যদিও বেশভূষার কোন বালাই নেই। রাজকুমারী দর্পণাভ্যন্তরে মুহূর্ত্ত জন্য নিজ প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করলেন। রেশমের মত ঘন-কালো কোঁকড়া কেশরাশিতে কোন বিন্যাস নেই, বিশাল চোখে নেই কজ্জলপ্রভা, অধর তাম্বূলহীন, নিরাভরণ দেহ। রাজকুমারী মুকুরে নিজ লাবণ্য দেখে ঈষৎ হাসলেন। ভাবছিলেন, গড়-মান্দারণ কি এমন মন্দ জায়গা! গড়-মান্দারণের আলো-বাতাস-জলে কত মধু। দর্পণে দেখেন রাজকুমারী, আবার দেখেন মুহূর্ত্ত জন্য। দেখেন নিজের কোমল-চঞ্চল দুই আঁখি, মেঘের মত চোখের পল্লব, নিবিড় ভ্রূযুগল,—দেখেন প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, কোমল বাহু, পদ্মারক্ত করপল্লব,—মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষ।

পালঙ্ক থেকে গাত্রোত্থান করলেন সুন্দরী। কক্ষলগ্ন এক অলিন্দে পৌঁছে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকালেন অন্ধকারে। দিনমানে অলিন্দের চাতালে দাঁড়ালে দেখা যায় আসমানদীঘির পরপার।

কাক-চক্ষু দীঘির জল, আঁধারের সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছে আসমান। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধুই নিরবচ্ছিন্ন কালো অন্ধকার। আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। বিন্ধ্যবাসিনী ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখেন। কেমন এক উগ্র মানস-চাঞ্চল্যে মুখ যেন উৎফুল্ল। রাজকুমারী দেখেন আর ভাবেন—দীঘির অন্য তীরের চতুষ্পাঠীতে কি রাত্রে আলো জ্বলে না ছাই!

[ক্রমশঃ।
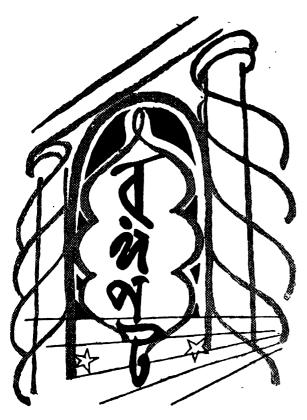
ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র-শিল্পের খতিয়ান

ত্রিশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পে পরিণত হইয়াছে। নিম্নের হিসাব আপনি নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করতে পারেন।

এই শিল্পে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ—৪২ কোটি টাকা।
সিনেমা-থিয়েটার (মূলধন নিয়োগ)—৬ কোটি টাকা।
প্রযোজনা ও বণ্টন—১০ কোটি টাকা।
সিনেমা-থিয়েটারের সংখ্যা—৩০০০।
গড়ে প্রত্যহ দর্শক-সংখ্যা—২৫ লক্ষ।
বার্ষিক চিত্র-প্রযোজনা—২৫০।
ষ্টুডিওর সংখ্যা—৬০।
ডিষ্ট্রিবিউটরের সংখ্যা—৬০০।
ফিল্ম ব্যবসায়ে রত ব্যক্তির সংখ্যা—১ লক্ষ।
বার্ষিক আয়—২৫ কোটি টাকা।
দেয় কর—১২ কোটি টাকা।
কাঁচা ফিল্ম আমদানী—২১ কোটি ফুট।
কাঁচা ফিল্মের জন্য ব্যয়—দেড় কোটি টাকা।
বার্ষিক বিদেশী ফিল্ম আমদানী—২৫০।

পঞ্চাশ হাজার টাকায় বাঙলা ছবি

হয়। সত্যিই হয়। এবং ছবিই করা যায়। সাম্প্রতিক বাংলা ছবিগুলির ইতিহাসে অধিক অর্থোপার্জ্জন করার গৌরব যে ক'টি ছবির চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। হাসির ছবি হিসেবে এ ছবিটি প্রথম শ্রেণীর না হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিশ্চয়ই। উন্নততর ডায়লগ আরও বেশী হাসির সিচ্যুয়েশান এবং যে সামান্য পরিমান চীপ হিউমার (বৃন্দাকে নিয়ে) রয়েছে তা বাদ দিয়ে ছবিখানি সত্যিই ভাল হয়েছে। চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যের কর্তাদের কাছেই শুনলাম যে ছবিখানি নাকি পঞ্চাশ হাজার কি তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী টাকা খরচার মধ্যেই তোলা সম্ভব হয়েছে। ছবি দেখে আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল। যাই হোক, এ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেলাম যে, কম টাকায় চেষ্টা করলে মাথা ঘামিয়ে এমন সব ছবি তোলাও সম্ভব, যাতে করে পয়সা সত্বর ঘরে ফিরে আসে। এমন কি কিছু লাভ থাকাও বিচিত্র নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ঘটনা, একটি প্রতিভার অকালমৃত্যু, জীবনী-চিত্র, কোনও শিকার-কাহিনী (বাংলাদেশে খুব সম্ভব একমাত্র প্রমথেশ বড়ুয়াই কিছু জঙ্গলের ছবি আমাদের দেখিয়েছেন), এ্যাডভেঞ্চার (যেমন 'ডাকিনীর চর') ইত্যাদি নিয়ে যত কম টাকায় সম্ভব ছবি তুলতে আমরা পরিচালকদের অনুরোধ জানাচ্ছি, এমন কি, তাতে যদি পঞ্চাশ হাজারের কিছু বেশী লাগে তবুও।

উল্কার শততম রজনী

সেদিন রঙমহলে উল্কার শততম রজনীর উৎসব হয়ে গেল। 'শ্যামলী' ছাড়া ইদানীং এত বেশী দিন ধরে একই নাটক অভিনীত হতে দেখা যায়নি। ড্রামাটিক এলিমেণ্ট উল্কায় প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। মিডনাইট হোটেলের দৃশ্যটিও নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকে একটি নতুন সার্থক সংযোজন। তাছাড়া একটা ঘরোয়া পরিবেশকে ভগবানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি কি করে ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে তাও উল্কায় নিপুণ হস্তে রচনা করা হয়েছে। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় নীতিশ বাবুর। শিপ্রা মিত্রও মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন চমৎকার। উল্কার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে নবাগত দীপক বাবুও মন্দ করেননি। মিডনাইট হোটেলের ম্যানেজার, বাড়ীর ঝি, রবীন বাবু ইত্যাদি প্রায় সকলের অভিনয়ই ভাল হয়েছে। সেটের কাজও উল্কায় অনেক ভাল। প্রথম দৃশ্যে ডাক্তারের যে প্রাইভেট চেম্বারটি দেখানো হয়েছে অপারেশন টেবলসহ তা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। আলোর কাজও ভাল। আমরা নাটকটির সাফল্য আরও অধিক পরিমাণে কামনা করি। সু-অভিনয়ের জন্য উল্লেখ করতে হয়, অজিত, বিমান, জহর, রবীন, কার্ত্তিক, জীবেন, প্রশান্ত, হরিধন, জয়শ্রী, গীতা ও তপতী প্রভৃতির নামোল্লেখ করতে হয়। পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, রঙমহল কর্তৃপক্ষ এবং নাট্যকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত অভিনন্দনযোগ্য এই রঙ্গমঞ্চ-মৃতপ্রায় বাঙলা দেশে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শ্যামলীর মতই উল্কা নাটকটির দর্শক কিঞ্চিৎ বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

বাঙলা Cine Papers

সিনেমার চ্যাংড়ামি ও ছ্যাবলামি ভর্ত্তি খবরাখবরে ভর দিয়ে কয়েকটি বাঙলা মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় কলকাতায়। কিন্তু কি থাকে তাতে? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপাঠ্য দু'-একটি গল্প ও প্রবন্ধ, আর্ট পেপারে পাতাজোড়া অভিনেতা অভিনেত্রীর বিশেষ ভঙ্গিমায় (ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই) তোলা ছবি, চিঠিপত্রের জবাব (প্রায়ই গাঁজা), ছবির সমালোচনার নামে

পরের মাসে বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির তোষামুদি, ষ্টুডিও অঞ্চলের খবরা-খবর (সুচিত্রা সেনের অসুখ (!), অরুন্ধতী দেবীর বিয়ে ইত্যাদি প্রায়ই চমকপ্রদ অথচ বেঠিক সংবাদ), আগামী ছবির খবর (সব কাগজে তাও থাকে না), অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প (বাজে) ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ কাগজ প্রকাশ করে কি হয় তাহলে ? কি আর হয়, পয়সা কামানো যায় কিছু তারকা-পাগলা নর-নারীদের মাথা ভেঙ্গে ! অথচ ওই কাগজেই কত কি করা সম্ভব ! আমাদের দেশের বিভিন্ন ষ্টুডিওর অভ্যন্তরের নানা কাজের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করানো, ষ্টুডিওগুলিকে নানা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সাজেষ্ট করা, ছবির আগেই ছবি সম্পর্কে সাজেশ্চান দেওয়া, ছবির কনষ্ট্রাক্টিভ রিভিয়ু করা ইত্যাদি কত কাজ করা সম্ভব এখানে। অথচ···। বিদেশী পত্র-পত্রিকার কথা বাদ দিই। কেন না অনেকের বিত্তায় কুলাবে না। কলকাতার বুকের ওপর ব'সে যে-সব ইংরাজী চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশ করছেন ক'জন অ-বাঙালী—তাদের দেখেও তো শেখা যায়।

ফিল্ম সেমিনার

সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমীর উদ্যোগে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফিল্ম সেমিনার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, ছায়াচিত্রের মত জনপ্রিয় বাহনের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ যত কম থাকে, ততই ভালো। কারণ, সৃষ্টিমূলক শিল্প ফরমায়েসে জন্মিতে পারে না···দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট যতটুকু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ না করে পারে না, তাঁর গভর্ণমেণ্ট সেটুকু অংশই করবেন। যে সব ছবিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতিবিদ্বেষকে দেশপ্রেমের নামে উস্কে তোলা হয়, যে সব ছবিতে কৌতুকচ্ছলেও খুনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, চাপল্য ও ভাঁড়ামির আতিশয্যে যে সব ছবিতে অসৎ প্রবৃত্তিকে সুযোগ দেওয়া হয় সেখানে তিনি আবশ্যক মত কড়াকড়ি করবেনই। কিন্তু এই আইনের অধিক প্রয়োগ যেন না হয়। আমাদের দেশে 'ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিবার' লোকের অভাব নেই। এই আইনের কড়াকড়ির ফলে হলদিঘাটের যুদ্ধ, পানিপথের যুদ্ধ, সিপাহী-বিদ্রোহ কি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাজ যেন বাধা না পায়। রূপকথা, প্রেমের কাহিনী (ভারতীয় আইনে প্রেমের প্রথম পাঠই এখনো বে-আইনী), এ্যাডভেঞ্চার, ডিটেকটিভ, শিকার কাহিনী তোলায় যেন বাধা না হয়। শিশুদের জন্য চিত্র তোলার কি ব্যবস্থা হল সেদিকেও আমরা চেয়ে রইলাম। ছায়াছবির জন্য টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান, প্রমোদকর, ফিল্মের ওপর কর, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদির সুব্যবস্থা কি হয় তাও আমরা জানতে উৎসুক। ভারতীয় ছবির বিদেশের বাজার সম্পর্কেও কথা হবে কি ? ফোক-এনটারটেনমেণ্টসের কাজে ছবির ব্যবহার, সরকারী ডকুমেণ্টারী চিত্রের বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের কড়াকড়ি হ্রাস ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা হবে কি ? সব চেয়ে বড় কথা হল, বাঙলা দেশের লুপ্তপ্রায় ষ্টুডিওগুলির সংস্কারের জন্য কিছু সরকারী অর্থ পাওয়া যাবে কি ? বাঙলার মৃতপ্রায় শিল্পীদের জন্য কিছু সাহায্য ? বাঙলার প্রতিনিধিরা কি করেন, আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করবো।

উদয়শঙ্কর প্রদর্শিত ছায়ানৃত্যের একটি দৃশ্য

সাম্প্রতিক বাঙলা ছবির বিজ্ঞাপন

বেশ উন্নততর হচ্ছে। এবং দেখে আমরা সবিশেষ আনন্দ পেয়েছি যে, ড্রইং, লেটারিং, রিডিং ম্যাটারের সঙ্গে স্পেসের এ্যাডজাষ্টমেণ্ট ইত্যাদি নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামানো হচ্ছে। তার ফলে কাজও হচ্ছে। আমাদের দেশে এখনো অনেক ক্ষেত্রে হাসির ছবির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ভালবাসার ছবির বিজ্ঞাপনের কোনও তফাৎ নেই। তফাৎ নেই ডিটেকটিভের সঙ্গে জীবনী চিত্রের। সাম্প্রতিক প্রদর্শিত রাইকমল ও সাজঘরের বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, হোর্ডিং সত্যিই উল্লেখযোগ্য হয়েছে। দত্তকের বিজ্ঞাপনও মন্দ কি! চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে ছবির বিজ্ঞাপনকেই ঠিক হাসির ছবির বিজ্ঞাপন বলছি আমরা। ছবিটির ড্রইং ও ম্যাটার বিশেষ প্রশংসনীয়। সঙ্গে সঙ্গে আশা করছি অন্যান্য বিজ্ঞাপনের অধিকতর উন্নতি হবে এ দেশে ক্রমশঃ।

অনুপমা

অগ্নিপরীক্ষা সিরিজের দ্বিতীয় ছবি।

তবু ঘরোয়া কাহিনী। মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি। স্কুল-মাষ্টার মারা গেলে তাঁর পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী নিয়ে গড়া চিত্র। ছেলের চাকরী হয় না, মেয়ে পাস দিয়ে বসে আছে (বিধবা), অপর একটি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুপ্রভা দেবীর সংসার। পরিবারের এক অকৃত্রিম বন্ধুর (বিকাশ বাবু) সাহায্যে চাকরী হল মেয়ের। তারপরই লাগল সংগ্রাম মেয়ের সঙ্গে ছেলের আর মায়ের অফিসের মালিকের সঙ্গে কর্মচারীদের। মালিকদের পক্ষেই থাকলেন অনুভা গুপ্তা (মানে মেয়ে)। বিকাশ বাবু ইউনিয়নের সেক্রেটারী। সুতরাং ধাক্কা লাগল। উত্তমকুমার (মানে ছেলে) সাবিত্রী দেবীকে (স্ত্রী) নিয়ে ঘর ভাড়া করলেন বস্তীতে। তারপর গল্পের শেষ অধ্যায়। চাকরী গেল অনুভা দেবীর কোম্পানীর কর্তাদের কুপরামর্শ না শোনায়। বিকাশ বাবু মালা হাতে এলেন। কিন্তু তখন পাগল হয়ে গেছেন অনুভা দেবী। ছোট বোন আত্মহত্যা করেছে, বড় ভাই গৃহছাড়া, মা বিবাগী হচ্ছেন, নিজের চাকরী গেছে। কিন্তু চাকরী যায় নি, কোম্পানী আবার বহাল করেছে তাঁকে। সুতরাং আবার হাসিতে ভরলো ঘর। সতীর পা ছুঁয়ে শপথ করা অনুভা দেবী হাতধরাধরি করে বিকাশ বাবুর সঙ্গে আবার বেরুতে লাগলেন অফিসে। অগ্নিপরীক্ষায় জয় হল অনুপমার। এই গল্প। অভিনয়ের দিক থেকে নাম করতে হবে প্রথমেই অনুভা গুপ্তার। বোনের আত্মহত্যার দৃশ্যে তাঁর অভিনয় বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। উত্তম বাবুও অনেকখানি ভাল অভিনয় করেছেন এ ছবিতে। খুব ফ্রি হয়ে এবং সহজ ভাবে স্বাভাবিক কথাবার্তায় এই ছবিটিতে তাঁর অভিনয় অনেক দিন মনে থাকবে দর্শক সাধারণের। ক্যামেরার কাজ স্থানে স্থানে খুবই 'হেজী' হয়েছে কেন? অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে উল্লেখ করবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু মনে পড়ছে সুপ্রভা দেবী যেন অনেকখানি ম্লান হয়ে পড়েছেন এ ছবিতে। প্রাচীনকে ধরে এবং নতুনের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে যে প্রাচীরের মত হওয়া উচিত ছিল তাঁর অভিনয়ে তা কিন্তু পেলাম না আমরা। অনেকটা যেন দায় সারা গোছের অভিনয় হয়ে গেছে তাঁর। সেট সেটিং গতানুগতিক। আর সবই মোটামুটি মধ্যম শ্রেণীর। তবু সুশীল জানার 'সূর্যগ্রাস' থেকে নেওয়া অনুপমা সব দিক বিবেচনা করে আমাদের মন্দ লাগেনি।

রাইকমল

কাবেরী বসুর ভবিষ্যৎ বিশেষ সম্ভাবনাময়। একখানি পরিচ্ছন্ন ছবি অনেক দিন বাদে দেখলাম।

গল্প আছে আর আছে গান। রাঢ়দেশের মাটীর এক গাঁয়ের কয়েক ঘর বৈষ্ণব। মহাজন পদাবলী, চণ্ডীদাস এদেশের গৃহস্থ কন্যা, বধূদের কণ্ঠস্থ। যশোদার ব্যথা এখানে সকলের ব্যথা। সেই দেশেরই এক কিশোর-কিশোরীর প্রেমের গল্প। বৈষ্ণবের পাড়াও জাতিভেদ আছে, উচ্চ নীচ আছে বর্ণে শীলে, কৌলিন্যে, কাঞ্চনে। সুতরাং অতৃপ্ত হৃদয়ে ঘর ছাড়তে হল রাইকে, সঙ্গে রসিক দাস আর মা। রসিক দাস পাড়ারই এক বয়স্ক বৈষ্ণব। নবদ্বীপে গিয়ে রাইকমল হারালো মাকে। শুরু হল ছবির দ্বিতীয় অধ্যায়। মালাচন্দন হল রাইয়ের রসিক দাসের সঙ্গে একদা গ্রামের লোকনিন্দার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে (মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল বিয়ে করবে তাও রক্ষা হল)। অন্তরের বাসনা রইল চাপা, রাইয়ের রাই হয়ে উঠল অদ্ভুত। আচারে আচরণে, ফুলের বাসর ঘর সাজানোয় কোথাও হল না কোনও চ্যুতি। কিন্তু রসিক দাসের কি হবে? এক দিকে ন্যায়বোধ অপর দিকে লোভ, এক দিকে কন্যাসমা রাই অপর দিকে ঘনশ্যাম, সদ্যবিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রীর মাঝে পড়ে সে কি করবে? কিন্তু কোথায় রঞ্জন? রাইয়ের বাল্যের সেই সখা। আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথায়! কিন্তু না, দেখা হল জয়দেবের পথে। বিবাহ করবার প্রতিশ্রুতি দিল রাইকমল। ঘরে গিয়ে দেখল রঞ্জনের স্ত্রী পরী রোগশয্যায় আর এদিকে রঞ্জন দ্বিতীয় বার বিবাহের আয়োজন করছে। রাইকমলের সামনে হসে পড়ল রঞ্জনের অন্তর। মানুষকে যে ভালবাসে না, মৃত্যুপথ-যাত্রীর মুখে যে পানীয় দেয় না, সে বুঝবে কি করে ভালবাসার কথা? রাইকমল তাই বেছে নিল পথ। তারই বঁধুয়া যদি আনবাড়ী যায়···কণ্ঠ নিজেই চেপে ধরে নিজের, আবার পথ চলে। নতুন নতুন পথ ধরে। গল্প এখানেই শেষ। সমস্ত ছবিটির মধ্যে রাইকমলকে দেখানো হবার কথা রাঢ় দেশের এক খণ্ড মাটির ঢেলার মত। শক্ত অথচ নরম। পাথরে অথচ কোমল। অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে মহাজন পদাবলী। কাবেরী বসু কিন্তু ততখানি পারেননি। তবু অনেকখানি তিনি করেছেন। মোটামুটি প্রথম শ্রেণীরই হয়েছে তাঁর অভিনয়। কিন্তু কাবেরী বসু, আপনি কথা বলার মধ্যে, মুখের এক্সপ্রেশন দেখাতে গিয়ে একজন খুব পপুলার অভিনেত্রীর (নাম করে কি হবে!) নকল করার চেষ্টা করেছেন কেন? খুব স্বাভাবিক এবং সহজ অভিনয়ই আপনার ভবিষ্যৎ তৈরী করবে। কোনও রকম ইমিটেশনের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়াও চন্দ্রাবতী, নীতীশ বাবুর অভিনয় খুবই ভালো লেগেছে। আউটডোর স্যুটিঙের কাজ ভাল হয়েছে। কয়েকটি ক্লোজ-আপ তো অতি উৎকৃষ্টই। সেটের কাজও খুবই ভেবে-চিন্তে করা হয়েছে। দু'-একটা টেক্‌নিক্যাল ভুল-ত্রুটিও চোখে পড়েছে। ভিক্ষার চাল সব সময়ই পাঁচ রকম চাল মেশানো

হয় (চাল দেখতে গিয়ে কাবেরী দেবী যে চাল দেখালেন তা খুবই উৎকৃষ্ট ধরণের বলে মনে হল), কৃষ্ণের পট বলে যা আনা হল তা আসলে ক্যালেণ্ডারের কাটা ছবি বাঁধানো ইত্যাদি। সাবিত্রী দেবীকে এবার একটা নতুন ধরণের অভিনয়ে দেখলাম। খুব খারাপ তো হয়নি! অন্যান্য সকলের মধ্যে প্রশংসা করার মত আর কিছু পাচ্ছি না। শুধু এটুকুই বলছি যে, রাইকমল একটি পরিচ্ছন্ন প্রথম শ্রেণীর ছবি।

সাজঘর

কম টাকার মধ্যে ছবি তুলেছেন দেখে খুসী হয়েছি।
সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখে তৃপ্ত হলাম।

সাজ-ঘর দিয়েই গল্প সুরু। অভিনেতা অশোক রায় করছেন 'শেষ অঙ্ক' নাটক। রঙ্গমঞ্চ দর্শকে ভর্ত্তি। অভিনয়ের সময় হল। কিন্তু প্রধান অভিনেতা অশোক রায়েরই দেখা নেই। তিনি তখন গ্লাস্ খেলছেন। বিবির ট্রায়ো হাতে নিয়ে টাকা দিচ্ছেন বোর্ডে। ওদিকে সাহেবের ট্রায়ো ধরে বসে আছেন অন্য জন। বিধি বাম। সব-কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন থিয়েটারে তখন দর্শকগণ অধীর হয়ে উঠেছেন। প্লে'র শেষে টাকা চাই। আবার চলল মদ, গ্লাস্। ওদিকে গৃহে স্ত্রী কল্যাণী আর তার বাবা বসে আছেন অশোকের অপেক্ষায়। মাতাল অবস্থায় গৃহে ফিরল অশোক। স্ত্রীর কাছ থেকে পেল তিরস্কার, শ্বশুরের কাছ থেকে অপমান। একমাত্র ছেলের নামে দিব্যি দিয়ে স্ত্রীকে গৃহ থেকে এক রকম বহিষ্কৃতই করল অশোক। তারপর ফের মদ, জুয়া। অচিরেই সঞ্চয় শেষ হল তার। থিয়েটারের চাকরীটির দফাও শেষ। পথে পথে ঘুরতে লাগল ছেলের হাত ধরে। ওদিকে কল্যাণী বাপের বাড়ীতে বিরাট ধন-সম্পদ নিয়ে অন্তরের শোক অন্তরে চেপে ধরে হয়ে উঠলো উন্মাদপ্রায়। তারপর একদিন দেখা হল কল্যাণীর সাথে। থিয়েটারেই। সেই শেষ অঙ্কেই। কল্যাণীর দেওয়া টাকাতেই নতুন করে বসল নাটক। সেই নাটকে না জেনে অভিনয় করতে এল অশোক। অভিনয় করতে করতে পতন ও মূর্চ্ছা (হাত তালি। দর্শকগণ দিলেন।)। তারপর মিলন। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসবে সুচিত্রা সেনের কথা। বলয়গ্রাস ছবিতে দেখা ছেলে (সেখানে মেয়ে) হারানো মাকেই মনে পড়ছিল বার বার। এমন কি মুখের এক্সপ্রেশনগুলি (সুচিত্রা দেবী, মুখের এক্সপ্রেশন দেখানোটা আপনি কমিয়েছেন এ জন্য ধন্যবাদ। ওটিকে একেবারে পরিহার করতে পারলেই মঙ্গল।) একেবারে সেই ছাঁচে ঢালা। দু'-একটি দৃশ্যে যেমন বক্স থেকে বাইরে প্যাসেজে বেরিয়ে আসা, পিসীমার কাছে 'মা' না ডাকার জন্য কাতরোক্তি, ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দ (নিজের ছেলেকেও কোনও মা অতটা আদর করে কি না সন্দেহ!) প্রদর্শন ইত্যাদিতে তাঁর অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের। বিকাশ বাবুর অভিনয় স্থানে স্থানে যেন বড় বেশী নাটকীয় হয়ে উঠছিল (গ্লাসের তাসের যে শুধুমাত্র কোন তিনটে তুলে দেখতে হয় তাও কি আপনি জানেন না বিকাশ বাবু?) অবশ্য মোটামুটি তিনিও ভালই অভিনয় করেছেন। পাহাড়ী সান্যাল, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় এমন কি কমল মিত্রও যেন এ ছবিটিতে অনেকখানি ম্লান। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে যত্র তত্র নামাবার এ আইডিয়া বাঙলা দেশের পরিচালকদের কবে যাবে কে জানে? সাজঘর ছবির কাহিনী শুনে ভেবেছিলাম, রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনের যে রঙ্গ সত্যিকারের তাই নিয়ে বুঝি উঠছে কোনও ছবি! কিন্তু দেখে হতাশ হলাম। এ ছবির নাম সাজঘর না হয়ে ভাঙ্গাগড়া, বিপদ-আপদ, হারানো-প্রাপ্তি যা খুসী তাই হতে পারত। খুব কমই আউটডোর শুটিং করতে হয়েছে ছবিটির জন্যে। ষ্টুডিও গাড়ীতে সুচিত্রা দেবী আর পাহাড়ী সান্যালকে বসিয়ে পিছনের স্ক্রীনে আগে তোলা ছবি ফেলে কম্পোজ করা বিচিত্র নয় কিন্তু আসল গাড়ীখানার একটা শট তার পরেই দেওয়া উচিত ছিল না কি? যাই হোক, কম টাকাতেই এ ছবিটির কাজ মিটেছে বলে আমাদের মনে হয় এবং কম টাকাতেও যে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা ভাল ছবি তোলা গেছে, এজন্য পরিচালককে ধন্যবাদ!

টকির টুকিটাকি

"কথা কও" "কথা কও" বোলে রাধারাণী পিকচার্স ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও একেবারে সরগরম কোরে তুলেছেন। কিন্তু কে যে বোবা, আর কাকে যে এত অনুরোধ, ছবি না দেখা পর্য্যন্ত বোঝা যাবে না। শোনা যাচ্ছে, স্বয়ং গল্পের লেখক শৈলজানন্দ শুধু পরিচালনারই ভার নেননি, একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ও করছেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক শিল্পীরা আছেন, যেমন ছবি, অসিত, মলিনা, অপর্ণা, তপতী, নীতীশ, গুরুদাস, ভানু প্রভৃতি।

"অপরাধী" কে ষ্টুডিয়োর হাজত থেকে বাইরে এনে রূপালী পর্দায় কয়েদী কোরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন থ্রি, এম, প্রোডাকসন্স। সুশীল মজুমদার, বসন্ত চৌধুরী, রবীন মজুমদার, কানু, অনুভা, অজিত চট্টো, বীরেন প্রভৃতি শিল্পীদের মধ্যেই সত্যিকারের "অপরাধী" কে খুঁজে পাওয়া যাবে।

গভীর রাত্রে একটা বিশেষ সময়ে হিন্দী "মহল" বাংলা "জিঘাংসা" "কঙ্কাল" প্রভৃতি বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন ধরণের অলৌকিক ঘটনা ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে। এবার কিন্তু মুভি আর্ট প্রোডাকসন্স যে বাংলা ছবি তুলছেন তার আসল নামটাই দিয়েছেন "রাত একটা"। এত যখন আড়ম্বর কোরে, বিজ্ঞাপন দিয়ে "রাত একটা" আসছে, তখন ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেষ্টিং হবে। পরিচালনায় আছেন কালীপদ দাশ। গভীর রাত্রের ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়েছেন, শিশির মিত্র, অজিত বন্দ্যো, কালী সরকার, শিপ্রা, শ্যামলী প্রভৃতি।

শোনা যাচ্ছে, টাস ফিল্মস "জয় মা কালী বোর্ডিং" নামে একখানা ছবি তুলছেন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। বোর্ডিংএর নাম কেন যে 'জয় মা কালী' হোল, কল্পনা কোরে এখন বলা কঠিন। 'জয় বাবা মহাদেব বা জয় বাবা' অন্য কিছুও তো হতে পারতো। রহস্যপূর্ণ বোর্ডিংএর ঐ রকম নামকরণের কারণ রূপালী পর্দাতেই প্রকাশ পাবে। ছবিখানির পরিচালক সাধন সরকার। রূপায়ণে আছেন তৃপ্তি মিত্র, রাণীবালা, তপতী, রাজলক্ষ্মী, ছবি বিশ্বাস, তুলসী লাহিড়ী, গুরুদাস, জহর প্রভৃতি।

"শাপমোচন" কথাটি শুনলেই মনে হয় পৌরাণিক কোনো একটি গল্প। কিন্তু এই ছবিখানির গল্প একেবারে পুরোপুরি সামাজিক—লেখক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। লোককে অবাক কোরে দেওয়ার পক্ষে নামটি অনুপযুক্ত নয়। আধুনিক যুগের অভিশাপের শক্তি আর মেয়াদ উত্তীর্ণ কি ভাবে হোল, ছবি দেখলেই বোঝা যাবে। পরিচালনা কোরছেন সুধীর মুখার্জ্জী। গানের দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখার্জ্জী। বিভিন্ন ভূমিকায় নেমেছেন পাহাড়ী, কমল, অমর মল্লিক, বিকাশ, জীবেন, উত্তমকুমার, সুচিত্রা, বনানী প্রভৃতি।

এইচ, এন, সি প্রোডাকসন্স "কঙ্কাবতীর ঘাট" এর ছবি তোলা নিয়ে খুব ব্যস্ত। ঘাটে ভিড় কোরে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রাবতী, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি শিল্পীরা। শিল্পীদের ভিড় সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্ত বসু।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার

আধুনিক শিল্পী ও অভিনেতাদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন, শ্রীউত্তমকুমার নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম অগ্রণী। মাত্র দশ বছর আগেকার কথা, 'মায়াডোর'-এ (হিন্দী ছবি) সর্ব্বপ্রথম আমরা তাঁকে দেখতে পেলুম। কিন্তু এরই ভেতর তিনি দর্শক-সমাজের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন নিজের অভিনয়-কুশলতা এবং শিল্পজ্ঞানের জন্যে। মঞ্চ ও পর্দা দুটি ক্ষেত্রেই আজ তাঁকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায় এবং সর্ব্বত্রই তিনি একজন কুশলী শিল্পী হিসাবে আজ বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার

এর ভেতর একদিন চলচ্চিত্র সম্পর্কে মতামত জানবো বলে শ্রীউত্তমকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম ভবানীপুরে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে। আমাকে নিয়ে তাঁর বসবার ঘরে বসান হ'লো। একটু পরেই উত্তমকুমার এসে উপস্থিত হ'লেন, সুরু হ'লো আমাদের আলোচনা।

"এ লাইনে আসতে আপনি প্রথম প্রেরণা পেলেন কি ভাবে"? আমি এ প্রশ্নটি তুলে ধরলে শ্রীউত্তমকুমার ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, 'খানিকটা অভিনয়-স্পৃহা ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল। প্রথম দিকটায় অভিনয় করা একটা নেশাই ছিল, বলতে পারি। যখন নিজকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলুম এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েও চললুম, তখন অভিনয় যে নেশাই পেশা হ'য়ে দাঁড়ালো। গ্রহণ ক'রে নি'লুম এ'কে কর্ম্মজীবনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে।' 'এ লাইনে কি ক'রে এলুম, যখন জান্‌তে চাইলেন', শ্রীউত্তমকুমার ব'লতে থাকেন, 'তখন ব'লবো—বেতার-শিল্পী ও নাট্যরসিক শ্রীগণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম হৃদ্যতা জন্মে। আমি সে সময় আই, কম পাস করে চাকুরি নিয়েছি পোর্টকমিশনার অফিসে। মতলব—দিনের বেলায় চাকুরি করবো, রাত্রিতে পড়বো বি, কম। অবশ্য তখনও এ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় আমি করছি, তবে চলচ্চিত্র জগতে আসবো এ ধারণাই মনে প্রায় ছিল না। গণেশ বাবুই একদিন আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন লেখক ও পরিচালক শ্রীরণজিৎ মুখার্জীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে এ পরিচয়ই হয়তো আমার এ' লাইনে আসবার প্রথম প্রেরণা। শ্রীমুখার্জ্জীর উৎসাহে আমি হিন্দী ছবি "মায়াডোরে" আত্মপ্রকাশ ক'রলুম, সে ১৯৪৫ সালে।

শ্রীউত্তমকুমার আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে বলেন, 'আমার অভিনয়-জীবনে আমি বহু ছবিতে অবতীর্ণ হ'য়েছি, তবে ঠিক কোন ছবিতে কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমার সর্ব্বাধিক আনন্দ হ'য়েছে, বলা খুব সহজ নয়। তবু যখন ব'লতে হবে তখন বলবো 'বসু পরিবারে' সুখেনের ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে পেরে আমি প্রচুর তৃপ্তি পেয়েছি।'

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন—ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আপনার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন এসেছে কি? শ্রীউত্তমকুমার দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর করেন—'প্রচুর এসেছে। পারিবারিক জীবনে না হলেও সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন এ'সেছে। সামাজিক ব্যাপারে ইচ্ছে থাকলেও এখন কথা দিয়ে যাওয়া যায় না। অনেক সময় কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনে কাজের চাপে।

দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী কি? জান্‌তে চাইলে শ্রীউত্তমকুমার সহজ ভাষায় বলেন, সকালে উঠে ম্যাসেজ করা ও ব্যায়াম করা আমার অভ্যাস। তারপর স্নান—আহার সেরে বেরিয়ে পড়ি 'স্যুটিং'এ। যেদিন থিয়েটার থাকে সেদিন সকাল সকাল বাড়ী ফেরা হয় না। থিয়েটার শেষ করে একেবারে রাত্রিতে বাড়ী ফিরি। বাড়ীতে এসে খাওয়া দাওয়ার পর একটু পড়াশুনোরও অভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা বেড়াতেও যাই, অবিশ্যি যেদিন থিয়েটার না থাকে। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় গান-বাজনাও করি।

'হবি'র কথা জানতে চাইলে বলবো—আমার প্রধান হবি ছবি আঁকা। খেলার ভেতর ক্রিকেট খেলাই আমি ভালবাসি। সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি আমি পড়ি। এর ভেতর "রূপাঞ্জলি", "রূপমঞ্চ" ও "মাসিক বসুমতী" পড়তে আমার ভাল লাগে। সাহিত্য, নাটক প্রভৃতিও আমি পড়ে থাকি। আধুনিক প্রগতিশীল লেখকদের লেখা আমি পছন্দ করি, এ-ও বলবো।'

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন?—আমি এ প্রশ্নটি করতেই শ্রীউত্তমকুমার স্পষ্ট বললেন, 'এ লাইনে আসতে হ'লে সব চাইতে বড় গুণ যেটি থাকা চাই, সে হচ্ছে অভিনয় করতে জানা। সেই সঙ্গে জানা চাই অল্পবিস্তর ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালান প্রভৃতি। আর চাই সুকণ্ঠ ও গান গাইবার ক্ষমতা। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে আসা উচিত বলেই আমি মনে করি।'

ভাল ছবি তৈরীর জন্য কি কি উপাদান আবশ্যক যদি জিজ্ঞেস করেন, শ্রীউত্তমকুমার বলে চলেন, 'তা হ'লে বলবো ভাল ছবি তৈরী করতে হ'লে প্রথমেই চাই ভাল গল্প। তার সঙ্গে প্রয়োজন কুশলী ও অভিজ্ঞ পরিচালকের বলিষ্ঠ পরিচালনা। বর্ত্তমানে যে সকল ছবি তৈরী হচ্ছে, তা ভালই হচ্ছে বলতে পারি, তবে আমার মতে আজকালকার সকল ছবির ধারাই এক। ভাল হ'লে যে কোন ছবিই দেখে থাকি, তবে বাংলা ও ইংরেজী ছবি বেশী দেখি, এটুকু বলবো।'

এর পর আমি একটি হাল্কা ধরণের প্রশ্ন কর'লুম—বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি?—শ্রীউত্তমকুমার স্মিত হাস্যে উত্তর দেন—'অন্ততঃ আমার স্ত্রী আপত্তি করেননি, অপরের বেলায় কি হয় আমি ব'লতে পারিনে।'

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়—আমার এ'প্রশ্ন শুনে উত্তমকুমার বললেন, 'সমাজ-জীবনে যে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা আমার মনে হয় না—এটা একটা 'রিক্রিয়েশান' এই মাত্র।'

আলোচনার ফাঁকে আমি একবার শ্রীউত্তমকুমারকে তাঁর আয়-ব্যয়ের কথা জিজ্ঞেস করে বসলুম। যে কোন কারণেই হোক তিনি এ সম্পর্কে নিরুত্তর থাকতে চাইলেন। শুধু বললেন—'প্রায় দশ বছর এ লাইনে এসেছি, এর ভেতর যে ছবিতে সব চে য় বেশী টাকা পেয়েছি সে হচ্ছে "বউ ঠাকুরাণীর হাট"—টাকার পরিমাণ প্রায় সাত হাজার।'

এ ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক আমাদের ভেতর আলোচনা চললো। শ্রীউত্তমকুমারের কাছে যতটা পাবো বলে আশা করেছিলুম ঠিক ততটা যেন পাওয়া হলো না। আজকের দিনে চলচ্চিত্র জগতের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী। চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে মতামত হিসেবে পাওয়ার অনেক কিছুই থাকবে, এ মনে করা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনা করতে যেয়ে দেখলুম, তিনি বেশী কিছু বলতে যেন চান না, কিম্বা তখন বলবার মত উপকরণ তাঁর বেশী ছিল না।

আলোচনায় আর অধিক দূর অগ্রসর না হ'য়ে শেষ মুহূর্ত্তে আমি শুধু জানতে চাইলুম—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবন আপনি কি ভাবে কাটাতে চান? শ্রীউত্তমকুমার বলে চললেন—'আমার প্রথম জীবন আর সকলের মতই—এ'তে কোন বৈচিত্র্য নেই। প্রথমে চক্রবেড়িয়া হাইস্কুলে আমার পড়া-শুনো আরম্ভ হয়। থার্ড ক্লাস অবধি সেখানেই আমার কাটে। তার পর ভাল লাগলো না বলে চলে আসি সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে। এখান থেকে ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। দু' বছর পর আই, কম পাস করে পোর্ট কমিশনারে চাকরিতে ঢুকে পড়ি। চাকরি করতে করতেই গান-বাজনার দিকে বিশেষ ঝোঁক যায়। তার পর অল্প দিন বাদেই চাকরি ছেড়ে অভিনয় জগতে সক্রিয় ভাবে প্রবেশ ক'রি। এখন অবধি এ ভাবেই চলে এসেছি। ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চাই যখন জানতে চাইলেন, তখন বলবো—৪০ বছর বয়স অবধি অর্থাৎ আরও প্রায় দশ, বার বছর এ ভাবে অভিনয় করে যাওয়ারই ইচ্ছে। তার পর জীবনধারা এদিক থেকে পাল্টিয়ে দিতে চাইছি।'

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি দুষ্প্রাপ্য মানচিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন কায়েমী হওয়ার পর ভৌগোলিক ইংরাজ ভারতের একটি সুসম্পূর্ণ মানচিত্র রচনায় বিশেষ উদ্যোগী হয়। বহু তথ্যানুসন্ধান, জরিপ ও গবেষণার পর ইংরাজ উক্ত মানচিত্রটি সরকারী ভাবে স্বীকার করেন। মানচিত্রের চতুষ্পার্শ্বে আছে প্রতীক-চিত্র। যথা পুরানো দিল্লী (উপরে), হিন্দু-মহিলা, মৃগ-মৃগী, ইংরাজ ফৌজ ও বাঘশিকার। এই মানচিত্রটি ইংরাজ রচিত হ'লেও সর্ব্বজনগ্রাহ্য, কেন না, প্রায় নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য। মানচিত্রের মধ্যে মাসিক বসুমতীর নাম, সংখ্যা ও মূল্যের উল্লেখ স্বেচ্ছায় করা হয়েছে। কারণ মাসিক বসুমতী সমগ্র ভারতব্যাপী—যদিও বহির্ভারতেও তার গতি অবাধ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ব্যাঙ্কক সম্মেলন—

ব্যাঙ্ককে সিয়াটো কাউন্সিলের অধিবেশন তিন দিনের মধ্যেই শেষ হইয়াছে এবং কাউন্সিল অত্যন্ত দ্রুততার সহিত এক-মত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শেষ মুহূর্ত্তে কাউন্সিলের ইস্তাহারে কম্যুনিজম-শব্দটি উল্লেখ করা সম্পর্কে সামান্য একটু মতভেদ হইয়াছিল। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার এন্টনী ইডেন কম্যুনিজম শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি করিয়া ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অন্যান্য প্রতিনিধিদের ইচ্ছার নিকটে তাঁহাকে নতি স্বীকার করিতে হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৪) ম্যানিলা সম্মেলনে পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড এই আটটি রাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সম্পাদন করিবার পর ব্যাঙ্ককে এই প্রথম উক্ত চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সকলেই চুক্তি অনুমোদন-পত্র ম্যানিলায় দাখিল করায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) তারিখ হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে এ-কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিয়াটো কাউন্সিলের আসল আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পাদিত হইয়াছে গোপন অধিবেশনে। বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রকাশ্য অধিবেশনে যে-বক্তৃতা দিয়াছেন এবং সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে আসল আলোচনার বিষয় কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্মেলনে গৃহীত যে-সকল সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে, এশিয়াবাসীর দিক হইতে সে-গুলির গুরুত্ব যে বহু দূর প্রসারী সে-কথা অনস্বীকার্য্য। সিয়াটো চুক্তি যে এশিয়াবাসীর পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা ম্যানিলা সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিপদের স্বরূপটি সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে ব্যাঙ্কক সম্মেলনে।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সামরিক ব্যবস্থাকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। সদস্যগণ সকলেই একটি ভ্রাম্যমান সামরিক সংস্থা গঠন সম্পর্কে একমত হন। এই সংস্থায় চুক্তিবদ্ধ আটটি রাষ্ট্রেরই প্রতিনিধি থাকিবে। এই সংস্থা চুক্তিবদ্ধ দেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়া সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে। সিয়াটো শক্তিবর্গের সামরিক উপদেষ্টাগণ গোপন সম্মেলনে সমবেত হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রকাশিত সংবাদে সামরিক উপাদেষ্টাদের এই সম্মেলনকে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর এশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সামরিক সম্মেলন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সামরিক উপদেষ্টাগণও একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, সামরিক পরিকল্পনার রচয়িতারা সিয়াটো চুক্তির কতকগুলি সামরিক দিককে কার্য্যকরী করিবার পরিকল্পনা গঠনের জন্য এপ্রিল মাসে (১৯৫৫) ম্যানিলায় সমবেত হইবেন। ম্যানিলায় আলোচনার পর তাঁহারা পুনরায় ব্যাঙ্ককে মিলিত হইবেন। সিয়াটো অঞ্চলের জন্য কোন সামরিক বাহিনী বা বিমান বাহিনী গঠিত হইবে কি না, তাহা কিছুই প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু সিয়াটো শক্তিবর্গের অভিপ্রায় যে অত্যন্ত গোপনীয় সে কথাও আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না। কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র আক্রমণ নিরোধের জন্য সামরিক ব্যবস্থা গঠনের বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সিয়াটো চুক্তিকে দক্ষিণ-কোরিয়া, জাপান ও ফরমোসার সহিত সংযুক্ত করিবার অভিপ্রায় মিঃ ডালেসের আছে। তাঁহার এই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয় এবং ফরমোসা লইয়া যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে এইরূপ সামরিক সংস্থা যে কাজে লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ-ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়াকে ব্যাঙ্কক সম্মেলন যে আশ্বাস দিয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বোপরি আছে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কা। ব্যাঙ্কক সম্মেলন

হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে ঘোষিত সামরিক ব্যবস্থাকে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের জন্য পূর্ব্ব হইতেই তৈয়ার থাকিবার ব্যবস্থা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সিয়াটো অঞ্চলের কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কা বোধ হয় ব্যাঙ্কক সম্মেলনের প্রতিনিধিরাও করেন না। তাঁহাদের প্রধান আশঙ্কা যে অন্য রকমের, তাহা প্রকাশিত ইস্তাহার হইতেও বুঝিতে পারা যায়। ইস্তাহারে "those subtle forms of aggression by which freedom and self-government are undermined and men's mind subverted" হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আক্রমণের এই যে সূক্ষ্মরূপ (subtle forms of agression) তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কি উপায়ই বা উহা মানুষের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, মানুষের মনেই বা উহা কি ভাবে বিপর্য্যয় টানিয়া আনে, ইহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা না করিয়া আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের ব্যবস্থার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মালয়, দক্ষিণ-ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ায় এখনও বৈদেশিক শাসন ও শোষণ অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। থাইল্যাণ্ডে চলিতেছে মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট ডিক্টেটরী শাসন। ফিলিপাইন এশিয়ায় মার্কিণ শো-কেসে রক্ষিত স্বাধীনতার নমুনা। এই দেশগুলিতে জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কঠোর হস্তে দমন করা হইতেছে। এই দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণ যদি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তাহারা যদি স্বাধীনতা দাবী করে, তাহারা যদি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহা হইলেই উহাকে subtle forms of aggression এবং undermining of freedom & self-government বলিয়া সিয়াটো শক্তিবর্গ গণ্য করিবেন, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সিয়াটো অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য তাঁহারা যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সামরিক ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক। ব্যাঙ্কক সম্মেলন সম্পর্কে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৫৫) সংবাদে বলা হইয়াছে, "Ministers plan to set up a police intelligence head-quarters to prevent paid communist agents from undermining law & order in non-communist Asian countries." অর্থাৎ 'বেতনভুক কম্যুনিষ্ট এজেণ্টদের আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করিবার জন্য পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স হেড কোয়াটার্স স্থাপনের জন্য মন্ত্রীরা পরিকল্পনা করিয়াছেন।' সুতরাং স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে যে অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দান করা হইবে, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না। কম্যুনিষ্ট এজেণ্টদের দমনের জন্য সুসংবদ্ধ পুলিশ ইণ্টেলিজেন্স ব্যবস্থা এবং সুসংবদ্ধ একটি সংস্থা গঠন করা হইবে।

কম্যুনিষ্ট এজেণ্টদের দমনের নাম করিয়া যাহা করা হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে-কোন পরিবর্ত্তন সিয়াটো শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে ধ্বংসাত্মক বলিয়া মনে হইবে, তাহারই বিরুদ্ধে তাঁহারা সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ইহা দ্বারা অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে

হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে-সকল গবর্ণমেণ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এজেণ্ট, তাঁহাদিগকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের নিয়মানুগ আন্দোলন দমন করাই যে উহার উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অর্থাৎ সিয়াটো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত যে-কোন দেশের জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী নিরোধের নাম করিয়া বিদেশী শক্তিবর্গ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধ্বংস করিতে পারিবেন। মিঃ ডালেস রেঙ্গুণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য বলিয়াছেন যে, যে-সকল দেশ বাহিরের হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজেদের ঈপ্সিত জীবন-যাত্রাপ্রণালী অনুসরণ করিবার জন্য স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চায়, তাহাদিগকে সাহায্য করাই মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তাঁহার এই আশ্বাস যে অর্থহীন স্তোক বাক্য, ব্রহ্মদেশকে সিয়াটো চুক্তিতে ভিড়াইবার একটা কৌশল তাহা ব্যাঙ্কক-সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবে মিঃ ডালেস এ-কথা অবশ্যই বলিতে পারেন যে, বাহিরের হস্তক্ষেপ বলিতে কমুনিষ্ট হস্তক্ষেপই শুধু বুঝায়, মার্কিণ হস্তক্ষেপ বুঝায় না।

সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা করিবার পর সিয়াটো শক্তিবর্গ বোঝার উপর শাকের আঁটির মত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থ-নৈতিক উন্নতির উপরেও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহা যে সম্পূর্ণ লোকদেখানো ব্যাপার, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। চিয়াং কাইশেককে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিপুল অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়াছিল। তাহার এক মাত্র ফল হইয়াছিল এই যে, চীনের জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা অধিকতর বৃদ্ধি পায়, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে কুয়োমিণ্টাং নেতৃবৃন্দ। চীনে চিয়াং কাইশেকের পতনের ইহাই প্রধান কারণ। ফিলিপাইনেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতেছে। তাহার ফল কি হইয়াছে? ফিলিপাইনের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা এতটুকুও দূর হয় নাই। দুর্নীতি ও অযোগ্যতার সহস্র ছিদ্রপথে এই অর্থরাশি বিশেষ একটি শ্রেণীর লোকের পকেট ভারী করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সমূহের বর্ত্তমান কাঠামো এবং প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার ব্যবস্থাটা শুধু শিখণ্ডীর মত সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। উহার পিছন হইতে সম্মিলিত পুলিসী দমন নীতি জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে, আর বৈদেশিক সামরিক শক্তির দৌলতে দুর্নীতি-দুষ্ট দুর্ব্বল গবর্ণমেণ্ট থাকিবে বহাল তবিয়তে!

ম্যানিলার পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ককে সিয়াটোর হেড কোয়ার্টার্স করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। থাইল্যাণ্ড চীনের নিকটবর্ত্তী দেশ হওয়াই হয়ত এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান কারণ। কাম্বোডিয়া, লাওস ও দক্ষিণ-ভিয়েটনামকে সাহায্য দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়াই মনে হয়। সিয়াটো শক্তিবর্গ উক্ত তিনটি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার যে-প্রতিশ্রুতি ব্যাঙ্কক সম্মেলনে পুনরায় সমর্থন করিয়াছেন, উহার তাৎপর্য্য কি? তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। সিয়াটো কাউন্সিল এই আশাও প্রকাশ করিয়াছেন, এই অঞ্চলের অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলি অদূর ভবিষ্যতে এই চুক্তিতে যোগদান করিবেন। এই আশা প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, স্বয়ং মিঃ ডালেস সম্মেলনের শেষে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি লাওস, কাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েটনামেও যান। ব্যাঙ্কক সম্মেলনের কোন্ বাণী তিনি ব্রহ্মদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই বাণী আসলে সিয়াটো চুক্তিতে যোগদানের আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য যে উক্ত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা এবং উক্ত অঞ্চলের উন্নতি বিধান করা, এই চুক্তিতে যোগদান করিলে কোন দেশের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না, এই সকল তত্ত্বকথা ব্রহ্মদেশের মারফৎ এশিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলির নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করাও যে তাঁহার ব্রহ্মদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করিয়া ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ নু এবং মিঃ ডালেস যে, যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এই যৌথ বিবৃতি সম্পর্কে উ নু গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণায় বলেন যে, এই বিবৃতি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার সম্পর্কে ব্রহ্মদেশের নীতির কোন পরিবর্ত্তন সূচনা করে না। চীন গবর্ণমেণ্ট একটি বে-সরকারী মার্কিণ মিশনকে চীনে যাইতে দিতে রাজী আছে, উ নু এ সম্পর্কে মিঃ ডালেসের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ ডালেস এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে রাজী হন নাই। মিঃ ডালেস উ নুকে জানাইয়াছেন যে, মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিশেষ আনন্দিত হইবেন। উ নুর মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র ভ্রমণের যে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই ভ্রমণের শেষে ব্রহ্মদেশ সিয়াটো চুক্তিতে যোগদান করিবে কি না, তাহা অনুমান করা সত্যই কঠিন।

বান্দুং-এ যে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন হইবে, তাহাতে একটি শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণের সিদ্ধান্ত ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে, ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন নিউজীল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ টমাস ম্যাকডোনাল্ড। মিঃ ডালেস বলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সম্মেলনের বিরোধী এইরূপ ধারণ দূর করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন। পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী না কি বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কক সম্মেলন এবং এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন এক এবং অভিন্ন। ইহা হইতে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের ভাগ্য সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন নয়। সিয়াটো শক্তিবর্গের শুভেচ্ছার বাণী যে উহার ভরাডুবী করিবে না, এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় কঠিন। তুরস্ক, ইরাক ও পাকিস্তানকে ভিত্তি করিয়া মধ্যপ্রাচী রক্ষা ব্যবস্থার বনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে, ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে কয়টি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিবে, তাহা কে জানে?

ফরমোসা সমস্যার ভবিষ্যৎ—

ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতির পর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ফরমোসা সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই সমস্যা ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে, উহার কোনরূপ সমাধান হইবে কি না, উহা লইয়া সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে কি না, অথবা যুদ্ধের পাঁয়তারা ভাজাই চলিতে থাকিবে, সে-সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। নিউজীল্যাণ্ডের যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবের আলোচনায় যোগদান

BHRINGOL
MAHA BHRINGARAJ OIL
MARGO
CHEMICAL
Tuhina
রূপরচনায় ক্যালকেমিকোর কয়েকটী অনুপম প্রসাধনী
মার্গো সোপ —ক্লোরোফিলসহ নিমের সুগন্ধি প্রসাধন সাবান ব্যবহারে দেহ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়।
ভৃঙ্গল —সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল। নিয়মিত ব্যবহারে কেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়; মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
রেণুকা —পুষ্প সুরভিময় রূপ চূর্ণ। ব্যবহারে মুখশ্রী ও দেহশ্রী লাবণ্যময় হয়।
তুহিনা —প্রাকৃতিক রুক্ষতা হইতে গাত্র-চর্ম্মকে রক্ষা করিয়া কোমল ও মসৃণ রাখে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

আসানসোল পৌরকর্তৃপক্ষ ভাবুন

"আসানসোলের জলাভাব দূর করতে হলে প্রথমে যেমন জলের কলগুলির সংস্কারের প্রয়োজন, সেই সঙ্গে দরকার নগণ্য সংখ্যক পুষ্করিণীর সংস্কৃতি সাধন। লোকো ট্যাঙ্কের মতো এমন আর দু' একটি পুকুরও কি আসানসোলে চোখে পড়বে না? নতুন পুষ্করিণী খনন দূরে থাক, এমনও শোনা যাচ্ছে, সহরে দু' একটি পুকুরের (যেগুলি দীঘি, সেই সেই অঞ্চলের প্রাণ) মালিক নিজেদের স্বার্থের খাতিরে জল শুকিয়ে নিচ্ছেন, সেখানে গড়ে উঠছে ইটখোলা কিংবা অন্য কিছু। বলা বাহুল্য, জল দানে পুণ্যার্জনের কথা আগেকার যুগে বৃদ্ধরাই বুঝি ভাবতো, আজকের দিনের মানুষ ভাবে না। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে।"

—বঙ্গবাণী (আসানসোল)

সরকারী মাস কন্‌টাক্ট-এর বহর

"মেদিনীপুর সহরে শিশুপ্রদর্শনী হইয়া গেল। আমরা জানিতে পারিলাম, ইহা নাকি সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগেই হইয়াছে। এরূপ একটি বিষয় সাধারণ্যে প্রচারিতও হয় নাই। অবশ্য বাছাই করা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছিল কি না আমাদের জানা নেই। জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রিগণ সরকারী কর্মচারিগণকে গণসংযোগ বা 'মাস কনট্যাক্ট' করিবার জন্য মাঝে মাঝে উপদেশ দেন বটে, কিন্তু সরকারী কর্মচারিগণ বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে 'লাল ফিতার মাধ্যমে মাস কন্‌টাক্ট' দিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের 'মাস-কন্‌টাক্ট' সহ্য হইবে কেন? এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ শিশু-প্রদর্শনীটি আয়োজন করার কন্‌ট্রাক্ট দিয়েছেন রেডক্রশের উপর! সুতরাং 'মাস কন্‌টাক্ট' হয় নাই—কবে কোথায় কাহার উদ্যোগে, কি উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী হইবে তাহাও জনসাধারণ জানিতে পারে নাই। তাই এত বড় সহরে ৫০টি শিশু লইয়াই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হইল—অন্ততঃ শিশুরক্ষা ত' হইল!"

—সমাজ (মেদিনীপুর)

সমাজতন্ত্র না ফাঁকা বুলি?

"চারি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকায় আর মোট দেনার পরিমাণ ২৫২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এত টাকা ঘাটতি এবং দেনা হইলেও যদি যত্নসহকারে অপব্যয় বাঁচাইয়া উক্ত টাকা জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত, তা'হা হইলে দেশে আজ হাহাকার উঠিত না। পল্লী অঞ্চলের সর্ববিধ অসুবিধা দূরীকরণে কোন বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এখনো পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে তৃষ্ণার পানীয় জলও কিনিয়া খাইতে হয়। চাষীর হাতে পয়সা নাই, তাহার ঋণ পাইবারও সুবন্দোবস্ত নাই। এই অবস্থাতেই তাহাকে প্রাণপাত করিয়া ফসল ফলাইতে হইবে এবং তাহার অশ্রুপাত করিয়া নির্লজ্জ মন্ত্রীরা বলিলেন, উহা তাঁহাদের কৃতিত্ব। আর তাহাদের যে বৎসর শস্যহানি হইবে তাহাদের খাদ্য যোগাইবার কর্তব্য সরকার এড়াইয়া যাইবেন। ইহাই কংগ্রেসের সমাজতন্ত্র ধাঁচের নমুনা।" —দামোদর (বর্দ্ধমান)

শোক-সংবাদ

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং গত ১১ই মার্চ্চ তাঁহার লণ্ডনস্থ বাসভবনে আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে ফ্লেমিং-এর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় লেডী ফ্লেমিং স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য ১৯৪৫ সালে ফ্লেমিং স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরে ও ডাঃ আর্নেষ্ট বোরিস চেনের সহিত ভেষজ শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। স্বদেশে বিদেশে তিনি বহু সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

নীহারবালা

কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ৭ই মার্চ্চ সোমবার বেলা ১০টা ২৫ মিনিটের সময় পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। আর্ট থিয়েটার লিঃ পরিচালিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কালে শ্রীমতী নীহারবালা খ্যাতির অধিকারিণী হন। তিনি 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে নিয়তির ভূমিকায় অভিনয় দক্ষতার জন্য দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করেন। শ্রীমতী নীহারবালা রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৩।১৪ বৎসর পূর্বে পণ্ডিচেরীস্থিত শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যান। তদবধি তিনি তথায় বাস করিতে-ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বর্তমান।

অতুলানন্দ রায়

গত ১২ই মার্চ্চ, শনিবার রাত্রি ৮৷ টায় প্রবীণ সাহিত্যিক অতুলানন্দ রায় তাঁহার বাগুইআটি বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ৯০ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। অতুলানন্দ রায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি "শ্রীশ্রীনিগমানন্দ জীবনী" ও "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গমে" গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

সুরেশচন্দ্র ঘোষ

২৪ পরগণার বিশিষ্ট দেশসেবী সুরেশচন্দ্র ঘোষ গত ৪ঠা জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। ভারতে ইংরেজ-আমলে তিনি একজন খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিয়া তাঁহাকে ৪।৫ বার কারাদণ্ড ও অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তিনি 'বুড়ুল পল্লীহিতৈষিণী সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ সমিতির মাধ্যমে বহু যুবক স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই নিকট তিনি "ভুটাদা" নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হন এবং নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, উদ্বন্ধনে এই মহৎ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

চৈত্র, ১৩৬১]
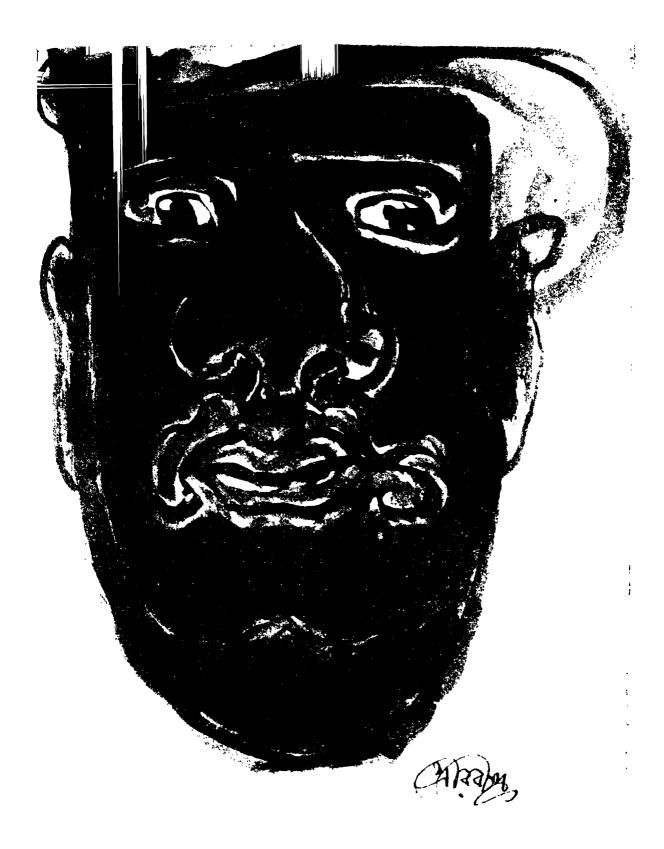
[৩৩শ বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(স্থাপিত ১৩২৯)
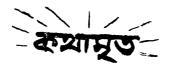
জনৈক বিষণ্ণচিত্ত যুবক। 'মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি, তবুও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ও কুভাব মনে উপস্থিত হয়ে বড় অশান্তি আসে।'

ঠাকুর—"ওরে, ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যত দিন থাকে তত দিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল। যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এল যে, আর যেন সামলাতে পারিনি! তারপর ধূলোয় মুখ ঘস্‌ড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনও ভাবব না যে, কাম জয় করেছি,'—তবে যায়। কি জানিস—(তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ টাঁধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙ্গে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের উপর এক-বাঁশ জল দাঁড়িয়ে যায়। তবে বলে—কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। আর মনে এক বার আধ বার কখন কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বলে ব'সে ব'সে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখন কখন শরীরের ধর্ম্মে আসে যায়—শৌচচেষ্টার মত মনে কর্‌বি। শৌচের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ঐ ভাবগুলোকে অতি সামান্য তুচ্ছ হেয় জ্ঞান করে মনে আর আন্‌বি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা কর্‌বি, হরিনাম কর্‌বি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও-ভাবগুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না। এর পর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মান্‌বে।" যুবকের কাছে ঠাকুর যেন এখন যুবকই হইয়া গিয়াছেন!

স্বাধীন দেশের মেয়ে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্চেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্চেন, এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুদ্ধমাত্র চর্‌কা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাকবে না। মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেচি, মানুষ হতে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই।

আমার জীবনের অনেক দিন আমি Sociologyর (সমাজতত্ত্ব) ছাত্র ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে।— আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তা া, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতার শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেচে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক এই আশঙ্কাই আমার বুকের ওপর জাঁতার মত বসে আছে। মনে হয় এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকি রয়ে গেছে, ইংরেজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ায় এমন দেশও তা আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা এক তিল দেয়নি; অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও ও বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবলমাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পারবে না। শুধু আপাত দৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে এক দিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য বিলাসী এবং হীন হতে সুরু করেছিল অন্য দিকে তেমনি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেই দিন থেকেই অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক শহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেক দিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েচি, আমি দেখতে পেয়েচি তাদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিষ তারা আজও হারায়নি। কেবল মাত্র নারীর সতীত্বটাকেই একটা 'ফেটিস' করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার-ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা এক শতের মধ্যেই নব্বুই জন লিখতে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত, আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন তাদের ঘুম ভাঙবে, এই সমবেত নরনারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক, খসে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না; তাতে বাধা দেয় পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই।

একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা' পেতে দাও। তা' সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই-পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই দরিদ্রজীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এইটুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিল সমস্যার এক মুহূর্ত্তে মীমাংসা করে ফেলি। আমি বলি, মেয়ে-মানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি-ডোমকেও যদি মানুষ বলতে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌছোক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, ও বলতে নেই, ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এস আমি তোমার হিতের জন্য তোমার মুখে পরদা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশী চলা-ফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙোলেই তোমার পা ভেঙে দেব। দীর্ঘদিন বর্ম্মা দেশে থেকে এটা আমার বেশ করে শেখা, যে, মানুষের অধিকার নিয়ে গায়ে পড়ে মেলাই তার হিত করবার আবশ্যক নেই।

আমি বলি, যার যা দাবী সে ষোল-আনা নিক। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে যদি ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে, রাগ করবারই বা কি আছে? দুটো সুপরামর্শ দিতে পারি,—কিন্তু মেরে-ধরে হাত-পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই।

আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা

[রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও বিশ্বভারতীর সংগঠন-ইতিহাস]

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

"প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদারক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।" —রবীন্দ্রনাথ।

শিক্ষার মূলগত আদর্শ

(সমবায়, বিকাশ ও সর্বাঙ্গীন)

নিশাবসানের অন্ধকারের মধ্যে পাখী জানতে পায় ঊষার আভাস। কেউ না জাগতে তাকে জাগিয়ে তোলে তার নিগূঢ় চেতনার আবেগ ; সে বেরিয়ে পড়তে চায়। বাধা পায় বাঁধা বাসার পাতার দেয়ালে; পাখার ঝট্‌পটানিতে সকলের গোচরে আসে তার একটা কিছু অভাববোধ ও বিদ্রোহের আভাসটা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা তখনো শুরু হয়নি। দেশব্যাপী বাঁধা শিক্ষার দেয়ালে ঠেকা মনের ঝট্‌পটানির রেশ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে :

"আমি বাল্যকালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে, বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি।···আমরা নর্মাল স্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইটের উঁচু দেয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উত্তম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাষ্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।" (বিশ্বভারতী, ১৩২৮)

কবির এই উক্তির মধ্যে একটা অভাব এবং বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেটা নঞার্থক। যেটা তিনি চাননি সেটাই হয়েছে মুখ্য, কিন্তু ওরি মধ্যেই নিহিত আছে সূক্ষ্মতর ভাবে, চাওয়ার জিনিসেরও স্বরূপ ; সেটা সদার্থক। তাঁর সব কাজের সেটা আদর্শ ; —শিক্ষাজগতে নূতন দিনের আলো বলা যায় সেই জিনিসটিকেই। সেদিন তিনি চেয়েছিলেন 'প্রকৃতির সাহচর্য' আর মানুষের 'প্রাণগত যোগ'। সমস্ত দিক থেকে সমবায় ঘটানোই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষার অন্যতম কথা।

এই 'প্রাণগত যোগে'র পরেই আরেকটি কথা আছে—সৃষ্টি বা বিকাশ। কবি বলেন, 'বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা' (বিশ্বভারতী পৃঃ ৫৯)। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানবের 'প্রাণগত যোগ' ছাড়া সুষ্ঠু 'বিকাশে'র সম্ভাবনা নেই, তা সার্থকও হয় না। 'মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে' (বিশ্বভারতী)। সকলের প্রতি প্রাণের সহযোগ-শূন্য কাজ প্রকাশের স্থলে আনে প্রচ্ছন্নতা। তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে বলছেন :—চীনের প্রকাশ 'বৌদ্ধধর্মে মৈত্রীবাণীতে' চীনের প্রচ্ছন্নতা 'আফিং ব্যবসায়ে।' কেবল নিজের স্বার্থের পুষ্টি লক্ষ্য ক'রে ইংরেজ একদা চীনকে আফিং খাওয়া ধরিয়েছিল। চীনের পরাধীনতা ও আত্মক্ষয়ের ইতিহাস শুরু হয় সেই থেকে। এত দিনে সে-ইতিহাসের গতি ফিরল। এবারে এল সে দেশে প্রকাশের পালা। তার মূলে রয়েছে আত্মচেতনা ; প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে নিজেকে অনুভব করছে দেশের সকলের মধ্যে। এর থেকে প্রমাণ মিলছে কবির কথা সত্য,—"আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত," কিন্তু চীন যদি কেবল তার নিজের দেশকেই আবার একান্ত করে জানে, নিজেকে

বাড়াতে গিয়ে কখনো যদি অন্য দেশগুলিকে অনাত্মীয় বোধে পিষে মারতে চায়, তবেই দেখা দেবে তার প্রচ্ছন্নতার সূত্র। বিশ্বের বড় বড় প্রকাশমান জাতির প্রচ্ছন্নতার সূত্রপাত এক দিন এই ভাবেই ঘটেছে। অন্য পক্ষে, "যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে, 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তারাই প্রকাশ পেয়েছে—এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়?"

সকলের সঙ্গে 'প্রাণগত যোগ' ও 'প্রকাশে'র এই অবিচ্ছিন্নতার তত্ত্বটি জানা থাকলে শুধু রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়, আশ্রম ও বিদ্যালয় থেকে 'বিশ্বভারতী'রূপে শান্তিনিকেতনের প্রকাশের তাৎপর্যও আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

প্রকাশের এক রকম চেষ্টা আছে, তাতে একত্র করে, কিন্তু এক করে না। কবি সে দিকটিও দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ ক'রে এসে এক বার বলেছেন—"প্রকাশের চেষ্টা মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম—এই ধর্ম সাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে, এই রকমের একটা প্রয়াস ক্রমেই যেন ছড়িয়ে পড়ছে।" (পল্লীসেবা, শিক্ষা ৩য় সং) এতে যেমন পাশ্চাত্যের সাধু প্রচেষ্টার দিক সূচিত করছে, তেমনি অশুভ দিকের ইঙ্গিতও ফুটেছে কবির অন্য ভাষণে। সেখানে তিনি বলছেন—"বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে, স্থলে, আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যাও বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু-হু করে এগোল, এক করবার অন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।" কবির উল্লিখিত 'অন্তর শক্তি' উদ্দীপনার জন্য উদার যে বিশ্বানুভূতিমূলক শিক্ষার দরকার, তার অভাব আছে সর্বত্রই। তা বোধ ক'রে তিনি বলেছেন,—"এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্ব-পশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।…প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা।"

"এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে—কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই—

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

মানুষের মধ্যে প্রকাশের যত দিকই থাক, প্রকাশের মূলে থাকা চাই অনুভূতি। ভারতবর্ষে সাধনার পরম কথাই—অনুভূতির বিস্তার। সকল অনুভূতির সমবায়স্থল-'সর্বানুভূ'। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সে পর্যন্তই সে সত্য, সে পর্যন্তই তার অধিকার।

"ভারতবর্ষ এই সাধনার পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি। গায়ত্রী মন্ত্র এই জোরকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষদ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।" (শান্তিনিকেতন ১০, বিশ্ববোধ)

রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রকাশের বিষয় হয়েছিল এই সর্বানুভূতি। প্রকাশ যখনই যে দিক দিয়ে ঘটেছে,—তা এই আদর্শেরই হয়েছে একান্ত অনুসারী। কেবল ভাবে বা কেবল কর্মে নয়, সর্বতোভাবে সকলের যোগ তিনি চেয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা ও সাধনা হয়েছে সর্বাঙ্গীনধর্মী।

অনুভূতি ও প্রকাশের এই সর্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে কবি কেবল বিশ্বপ্রকৃতির যোগ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেননি; তাঁকে মানুষের সংসারেও দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। শিক্ষা প্রচারের কাজে উদ্যোগী হয়েও তিনি শেষে দু'টি ক্ষেত্রেই যোগ প্রসারিত করেছিলেন। লিখেছেন:—

"প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদারক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্খাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।" (বিশ্বভারতী)

কবির সর্বাঙ্গীনের দৃষ্টি বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের সত্যটিকে দেখতে পেয়েছিল। তাই যোগপ্রয়াসী কবি পরস্পরের যোগে পরস্পরের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা সাধন করবার অপরিহার্যতা নির্দেশ ক'রে এক দিন বলেছিলেন—

"পূর্ব ও পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

"ভারতবর্ষ যে-পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ

পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুণে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যে দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্ত ভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

"এ কথা যদি সত্য হয় যে, পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাহলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে, এক দিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্য দিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।" (শান্তিনিকেতন, ৪ ; সপ্তম)

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে খণ্ড দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার এই বিপদ থেকে মুক্ত ক'রে তার সহযোগপ্রবণ উদার প্রকাশকে জয়যুক্ত করবার জন্য গড়েছিলেন 'বিশ্বভারতী'। সে প্রতিষ্ঠানেরই (১৩৩১ সন) এক বার্ষিক উৎসবের ভাষণে তিনি বলেন,—

"আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না ক'রে শিক্ষার ব্যবস্থা করব, দেশের কঠিন বাধা অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব ; শুধু ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য-পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।" (বিশ্বভারতী)

এখানে দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত সমবায় এবং বিকাশের কাজের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রে কবি চেয়েছেন আরেকটি জিনিস, সেটি সকলের সহযোগে 'সর্বশিক্ষা'। সকল জিনিসেরই সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। যোগমূলক অনুভূতি অর্জন ও প্রকাশের সেই শিক্ষা কেবল বিশেষ বিশেষ বিদ্যায় বা গুণের দিকে নয়,—চরিত্রে, ব্যবহারে, জীবনযাত্রার সর্ব দিকেই তা লাভ করা চাই :—অর্থাৎ বিষয়ের দিক দিয়েও যাতে শিক্ষা সর্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে চলে, তার প্রতি কবির মনোযোগ ও যত্ন ছিল। সর্বাঙ্গীন শিক্ষার অভাব "সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে" তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন,—"আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে—সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীন হতে পারছে না—সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।" (বিশ্বভারতী ১৩২৯)

আগে কবি এ কথা বললেও, পরে একস্থলে আবার বলেছেন,—"পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ, মন, প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত।" (শিক্ষাবিকীরণ, শিক্ষা)

আর, বর্তমানে আমাদের দেশে তিনি যা লক্ষ্য করেছেন, সে সম্বন্ধে বলেছেন,—"বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার-সামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু উপকরণ যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ-সুবিধা বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।" (আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা, আধুনিক সং)

"গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করা"র কথা গোড়া থেকে কবি বলে আসছেন। (আবরণ, ১৩১৩)

শিক্ষা প্রধানত ভাষাশিক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছিল, এখনও সেই প্রাধান্য যে খুব কমেছে, এ দেশে তা বলা যায় না ; তবে হাতের কাজের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়েছে, এইটুকু যা শুভলক্ষণ। বই-পড়া জ্ঞানের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যবহারিক দিকের সম্বন্ধ ছিল কমই। এই সব অসামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য দায়ী শিক্ষাবিধি। আমরা জানি এক, ভাবি আর, করি যা, তা দু'য়ের বার-কিছু। এতে অনুভূতিই বা বাড়ে কিসে, সহযোগ গড়বার সুযোগই বা মিলে কখন, জীবনের প্রকাশ সর্বাঙ্গীন ভাবে সমৃদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা। এরূপ সমস্যা স্থলে কবির কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য।

"বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।"

মানুষের সমস্যার অন্ত নেই, এ কথা ঠিক। কিন্তু বরাবরই কবি বলছেন,—"আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা।" এবং তার মধ্যেও বিশেষ ভাবের সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের খাপ খাওয়ানো। "আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সামঞ্জস্যযুক্ত জীবনের প্রকাশের জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন, কবি সে বিষয়ে অন্যত্র বলেছেন,—"শুধু ভাষার মধ্যেই জীবনের সমস্ত প্রকাশ, পূর্ণ বিকাশ হয় না। সেই জন্য আমরা আমাদের ভাষায় প্রকাশ ছাড়া অন্য দিক দিয়েও জীবন ও অনুশীলনের প্রকাশভঙ্গী চাই। আমাদের মানুষের মন ও চরিত্রকেও ভালো করে জানতে হবে, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শুধু জ্ঞান-সম্ভারের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করে তোলা নয়, মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার বাঁধন রাখতে হবে, সৌখ্য আনতে হবে। আর সে জন্য মানুষকে বোঝা ও মানুষের চরিত্রকেও নিখুঁত ভাবে জানা অতি প্রয়োজন।"

(ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, শিক্ষা ৩য় সং, পরিশিষ্ট ১৩৪১)

কবি দেখলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে যার যার বাড়ি থেকে ছেলেরা ইস্কুল-কলেজে আসা-যাওয়া করে, সেখানে মাষ্টারকে বইর পড়া চুকিয়ে দিয়েই খালাস। অন্য কোনো সংস্রব নেই। প্রশ্ন নেই, প্রেরণা নেই ; তাদের জীবন আমোদ-আহ্লাদ বর্জিত। ছাত্রে-শিক্ষকে দেখা-শুনা বন্ধ। শিক্ষালয় হয়ে পড়েছে 'কল'-বিশেষ। প্রাণহীন তার যান্ত্রিক পরিবেশ ও কর্মপ্রণালী লক্ষ্য ক'রে কবি বললেন,—

"স্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল।

মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে, কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কল-ও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্রেরা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে।" কবি পরেও বলেছেন,—"ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানত যে বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন ব'লেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষের প্রাণ-যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় করতে পারে না; শিক্ষাকে যন্ত্র করে তুললে তার থেকে কোনো বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে শিক্ষা আত্মগত হতে গুরুতর বাধা পায়।" (পত্র শিক্ষা ৩য় সং ১৩৩১)

ইস্কুল ছাড়া বাড়ীর শিক্ষায় ছাত্রদের অনেকটা গড়ে তোলে। কিন্তু দেখা যায় সেখানেও যে-যার পরিবারের ছাঁচে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারের টানা-পোড়েনে বিশেষ মানুষ হয়ে ওঠে। চিত্তের স্নিগ্ধ উদারতা, প্রকাশের সুন্দর সবলতা কর্মে বা চরিত্রে কমই দেখা দেয়। সকল ছাত্রকে এক শিক্ষালয়ে রেখে সকল রকমের শিক্ষা দ্বারা মানব ও প্রকৃতির সহযোগে বিচিত্র বৃহৎ এক সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত ক'রে তোলবার পক্ষে কবি জেনেছিলেন উপযোগী স্থান হচ্ছে—"বাড়ী নয় গুরুগৃহ,—আশ্রম। বাড়ীতে হয় বিশেষ শিক্ষা, আশ্রমে বিশেষ প্রভাব বর্জ্জিত, সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা।" (আবরণ, ১৩১৩)

কবি গুরুগৃহ বা আশ্রমের আদর্শে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা বিতরণ করতে নিজেই এক দিন উদ্যোগী হলেন। অভিভাবকদের দিক থেকে বাধা পাওয়ার আশঙ্কা ক'রেও তিনি সজোরে বলেছিলেন,—"আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়-মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক, পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু, মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—' আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ টেকনিক্সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়, চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণ ভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়, অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।" (শিক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি)

আরো গোড়ার দিকে, কবি যখন নিজে দেখা-শুনা করতে পেরেছেন, জীবনযাত্রার সঙ্গে শিক্ষার যোগ রাখার বিচিত্র প্রচেষ্টা তখন বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে। কবির লিখিত 'আলোচনা' থেকে তখনকার কথা কিছু কিছু সংকলিত হল। তিনি লিখছেন—"শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ে গড়া কৃত্রিম সামগ্রী করে তুললে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। এতে জীবনারম্ভের সুদীর্ঘ কাল প্রতিদিন মন ক্লিষ্ট হয়ে তার স্বাভাবিক শক্তি কত যে নষ্ট হয় আমরা তার হিসাব স্পষ্ট আকারে দেখতে পাইনে বলেই বুঝিনে।

আশ্রমে কত গাছপালা আছে, তাদের কার কত সংখ্যা, তাদের কখন প্রথম ফুল ধরল, ফল ধরল, পাতা ঝরল, পাতা উঠল, তাদের ডালপালা শিকড় প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতি কী রকম, নিজের পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাতে ছেলেরা তা জানে তার উৎসাহ দেওয়া ও ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। পশু-পাখী এমন কি কীটপতঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

এই অল্প পরিধির মধ্যে বাহিরের বিশ্বের যা-কিছু জানবার বিষয় আছে তাদের সুপরিচিত করে নেওয়া দুঃসাধ্য নয়। এর মধ্যে শক্ত হবে, যিনি পরিচয় সাধনে সহায়তা করবেন এমন এক জন সুদক্ষ উৎসাহী চোখ কান খোলা মানুষ পাওয়া।

শিক্ষায় এই যেমন জানার দিক তেমনি আবার কাজের দিকও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপাখীকে সেবা করাও একটা বড়ো সাধনা।······

আশ্রমের ভিতরে ও বাইরে নিকটবর্তী স্থানে যে সকল পথ আছে তার দুই ধারে ছেলে-মেয়েরা নিজের জন্মদিন বা অন্য কোনো উপলক্ষে একটি গাছ রোপণ করে সেই গাছ রক্ষার ভার নিজেরা নেবে।

এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হল তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙা গ্রাম ও সাঁওতাল-পাড়াগুলির সম্যক্ পরিচয় যাতে ছেলেরা পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক।

আশ্রমে ব্রতীবালক সম্প্রদায় গড়া হয়েছে। নিকটবর্তী পাড়ায় ব্রতীসম্প্রদায় স্থাপন করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারি দিকের পাড়ার কাজ আমাদের ভালো করে চালাতে হবে। এই ব্রতীকৃত্য শিক্ষা আমাদের অন্য কোনো শিক্ষার চেয়ে কম গুরুতর নয়।

ছাত্রেরা আপন পরিবারের বাহিরে গুরুজনের পাদগ্রহণ করবে এটা আমি পালনীয় মনে করিনে। কিন্তু নত হয়ে নমস্কার করা তাদের কর্তব্য। আর তাঁরা সম্মুখে এলে উঠে দাঁড়ানো চাই। যেখানে অনেকে সমবেত, সেখানে সকলে মিলে একসঙ্গে করাই শোভন।···

"কিছু কাল পূর্বে অতিথি সেবা সম্বন্ধে ছাত্রেরা বিশেষ ভার গ্রহণ করত।···তার ভালো করে প্রবর্তন করা দরকার।

"কিছু কাল পূর্বে ছেলেরা পালা করে পরিবেষণ করত···সে নিয়ম থাকা উচিত।

"বাস সম্বন্ধেও ভদ্রতার রীতি আছে। ঘর ও ঘরের আসবাব ও নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী নোংরা ও কদর্য হতে দেওয়া অভদ্রোচিত,—এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আদর্শ আমাদের আশ্রমে থাকে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।···

"এখানে ছাত্রদের মধ্যে লৌকিকতার চর্চাও তাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ।

"পালাক্রমে এক-একটি ছাত্রনিবাস তার প্রতিবেশী ছাত্রনিবাসের ছেলেদের সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করে সংগীত, অভিনয়, খেলা ও সৌজন্য দ্বারা তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে। নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়া শ্রেয় মনে করিনে।

"দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনোই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।

"দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা। সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

"আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ ভাবে কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। যে-সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি, তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তা ছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড়ো পণ্ডিতই হোক, সংসার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবত কোনো কোনো অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব।

"দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালো রকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়। এই কারণেই আমি মনে করি, পথচারী বিদ্যালয়ই বিদ্যালয়ের আদর্শ। ইস্কুলের বদ্ধ ঘরে শিক্ষা দিলে আমাদের জীবনলীলার অধিকাংশ উদ্যমই সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বাদ পড়ে যায়। তেমন খাঁচার শিক্ষায় পাখীকে বুলি শেখানো অসম্ভব হয় না, কিন্তু তাকে উড়তে শেখানো যায় না।

"ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।···প্রাণবান মানুষের পক্ষে এই রকম জঙ্গম শিক্ষা প্রণালীই সম্পূর্ণ ফলদায়ক, ক্লাসে বদ্ধ স্থাবর শিক্ষাপ্রণালীতে তার দেহে মনে আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তাতে দেহ থেকে যায় অনিপুণ, মন থেকে যায় নিরুদ্যোগী। তাতে বাক্য পরিচয়ের অভ্যাস হয়, বিষয় পরিচয়ের অভ্যাস হয় না।

"অনেক কাল থেকে বিশ্বভারতীর যোগে এই রকম পথচারী বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প মনে পোষণ করে রেখেছি। দেশের লোকের কাছে আবেদনকে সার্থক করবার শক্তি যদি আমার না থাকত আর ভিক্ষায় যদি ক্ষুদ্ না মিলে ধানও মিলত, তাহলে অনেক কাল আগেই এ কাজে প্রবৃত্ত হতুম। মরবার আগে এ কাজ প্রবর্তন করে যাব এমন আশা এখনো ছাড়িনি। কেন না যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

"আপাতত দেশ-প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর প্রাচীর-ঘেরা সংকীর্ণ-ক্ষেত্রের মধ্যে ছাত্রদের দেহ-মনের যতটা চালনা সম্ভব তারই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।" (আলোচনা, শিক্ষা ৩য় সং)

রবি পরে নানা সময়ে আরো যা বলেছেন, তার দু'-এক দফাও এখানে দেওয়া গেল:—"ছাত্রেরা যেটুকু শিখবে তার সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকু প্রকাশ করবার সাধনা প্রতিদিন করা চাই। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের ভাবাতে হবে।···

"শ্রীনিকেতনের মূল সমস্যাগুলি কী···উত্তর চাওয়া উচিত। গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি কোথায়—সমবায় নীতির মানে কী, আমাদের দেশের পক্ষে কেন তার প্রয়োজন, গ্রামের লোকদের স্বভাবে, অভ্যাসে ও রীতিতে কী অভাব আছে যাতে তারা অন্নকষ্টে, জলকষ্টে, রোগে, তাপে মরে যাচ্ছে সে কথা ওরা যাতে বিচারপূর্বক আলোচনা করতে পারে, সেটা দেখা চাই। জমিদার প্রজার সম্বন্ধের মধ্যে কোথায় গলদ আছে, তার ফল কী, কী করে তার প্রতিকার হবে এ সমস্ত কথা এখন থেকেই সুস্পষ্ট ক'রে ওদের চিন্তা করা চাই। মনে রেখো, ক্লাসের শিক্ষার চেয়ে এগুলো বড়ো শিক্ষা।" (পত্র ১০ই মার্চ ১৯২১, শিক্ষা ৩য় সং পরিশিষ্ট)

"বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্দেশ্য হওয়া কখনও উচিত নয় যে, কতকগুলো যান্ত্রিক চাকার কলকব্জা হবে সে জ্ঞানের সঞ্চয়ের, আর সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের কাছে শুধু সেই জ্ঞানটুকু বিস্তার করে দেবে, যাতে তারা বেশ এক রকম সুখে-স্বচ্ছন্দে খেয়ে-মেখে থাকে।

"শিক্ষা আয়তনের এমন খোলা ভাব থাকা দরকার, খোলা দরজার মতো, যেখানে অধ্যাপক আর ছাত্ররা নিজেদের বাড়ির মতো মেলা-মেশা করতে পারে।···এক জন আর এক জনের সঙ্গে কর্তৃত্বের কর্তামির আবহাওয়ায় বাস করলে চলবে না।"

সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশরূপে যাঁরা শান্তিনিকেতনকে জেনে আসছেন, তাঁরা এখানকার শিক্ষার মধ্যে বিবিধ হাতের কাজের সঙ্গে শ্রমসাধ্য দৈনিক কৃত্যাদির প্রতি রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব আরোপ করা দেখে বুঝতে পারবেন, তিনি দৈহিক চর্চাকেও জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে কতটা অপরিহার্য মনে করেছেন।

আসবাবের ভারে শিক্ষা যে দুর্মূল্য ও ভারাক্রান্ত হবে, রবীন্দ্রনাথ তা বরদাস্ত করতে পারতেন না। শিক্ষাকে যত দূর সম্ভব সহজ করা চাই। তা না হলে তা সর্ব জনের যোগে আসবে না। উপকরণের উপর যত বেশি নির্ভর বাড়বে, মানুষের যোগপ্রবণ আত্মপ্রকাশের তাগিদও সেই পরিমাণেই ভিতর থেকে কমে আসবে। এ স্থলেও সহযোগ, স্বাধীন বিকাশ ও সর্বাঙ্গীনতার মূলগত ত্রিবিধ প্রেরণা থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শিক্ষার হাতে-কলমে কাজ করার প্রতি বিশেষ মূল্য আরোপিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কর্মেন্দ্রিয়-নির্ভর জীবনযাত্রার নৈতিক আরো উপযোগিতা আছে। এক স্থলেতিনি বলেছেন,—"বাইসিক্‌লের আদর কমাইতে চাইনে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনী-শক্তিকে

বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

"যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী ক'রে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায়, এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা। সেই গরিবয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর, এ কথাটা তখন মনে ছিল, উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষ ভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।"

শ্রমের সঙ্গে চাই সৌন্দর্য্য। শিল্পরুচি যে-কোনো কাজকে সুন্দর ক'রে প্রকাশের সহায়তা করবে,—কবির শিক্ষানীতির এ বৈশিষ্ট্যও এ সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আনন্দ, নিপুণতা, মানসিক একাগ্রতা, ও সুবিন্যস্ততার দৃষ্টি সঞ্চারের দ্বারা শিল্প জীবনকে সমৃদ্ধ করে। শিল্পসম্মত প্রকাশকে কবি এ জন্যই বরাবর কামনা করে এসেছেন। ছোটোখাটো কাজেও জাপানী মেয়েদের সেই শিল্পানুরাগের পরিচয় পেয়ে, তিনি সেরূপ কাজকে শুধু সুন্দর ব'লে প্রশংসাই করেন নি, তাকে বলেছেন 'আরাধনা'। 'ধ্যানী জাপান' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"বহু শতাব্দীর অভ্যাস ক্রমে এরা [জাপানীরা] কোনো কাজই যেমন-তেমন ক'রে করে না, একান্ত নিবিষ্ট হয়ে ও শোভন ভাবে করে। দেখে কেবলি মনে হয় কাজের সমস্ত প্রণালীর মধ্যে আগাগোড়া এরা সমস্ত মনকে স্থাপিত করতে শিখেছে। এটাই হচ্ছে কর্মের মধ্যে ধ্যান। একটি সাধারণ মেয়েকে খাবার সময় লক্ষ্য করে দেখেছি—পাত্র হাতে তুলে ধরা, গ্রাস মুখে তুলে নেওয়া সমস্তই সুবিহিত যত্নে সংযতভাবে করে,—আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে আহার ব্যাপারে যে অসংযম ও অশোভনতা আছে, এ তার একেবারেই বিপরীত। এই মেয়েটিকেই পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাতে দেখলেম—সে যেন কার আরাধনা, তাতে কত নৈপুণ্য, কত নিষ্ঠা।" (শিক্ষা ৩য় সং, ১৩৩৬)

এ স্থলে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর লেখা থেকে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—

"আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদান হয়, কলাচর্চ্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দিকে এ পর্যন্ত যা ব্যবস্থা হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়।" (শিক্ষার ধারা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যানিকেতনে সুকুমার শিল্পচর্চার জন্য কলাভবন খুলেছিলেন। আবার কারিগরী বিভাগ খুলে ব্যবহারিক শিল্পের প্রবর্তনা দ্বারা শিল্পের সর্বাঙ্গীনতা বিধান করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প বিদ্যায়ও তিনি উদাসীন ছিলেন না। স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদার, কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কবি কৃষি-বিজ্ঞানে উচ্চ-শিক্ষিত করে এনে দেশের হিতসাধনে নিয়োজিত করবার যে বিশেষ চেষ্টা করেছেন, তা সকলেই জানেন।

এমন কি, যখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বাধীন ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রস্তাব নিয়ে তিনি তৎপর হয়ে উঠেছেন, সেই উৎসাহের মুখেও—দেশের ব্যবহারিক এই বিজ্ঞান-শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে, বহু আগে তিনি বলেছেন,—

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রথমেই না হয়, তবে অবশ্যই তাহা ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বিদেশেও যাইতে হইবে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষাকে কোনো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১২, পৃ: ৬২৮)

রবীন্দ্রনাথের কাছে জড় প্রকৃতির যোগ কেবল যান্ত্রিক ও প্রয়োজন-মাফিক ছিল না, তাও ছিল প্রাণবান। বৈজ্ঞানিক নিয়ম জানার দ্বারা বস্তুর ব্যবহারের পথ সুগম হয়। যোগের বাধা কেটে যায়। বস্তুজগতে প্রবেশের জন্য এবং তার দ্বারা স্বচ্ছ অনুভূতির প্রসারে সহযোগ ও প্রকাশের ধারাকে আরো সর্বাঙ্গীন করে তুলে আপনাকে বড়ো ক'রে পাবার জন্য বিজ্ঞান-চর্চারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলনে' বলেছেন,—"বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা ক'রে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে,—বস্তু-বিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে•••।" (১৩২৮)

কবি আরো বলেছেন,—"তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন,—'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম; এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আরেক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও; জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই। এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।" [ক্রমশঃ।

গৌড়ের সীমা

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

—(শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, সপ্তম পটল)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
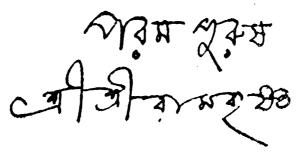
একশো তেত্রিশ

ডাক্তার তো জুটেছে কিন্তু সেবা করবার লোক কোথায় ?

কেন, আমরা আছি। ভক্তের দল এগিয়ে এল। দিনের পর দিন রাত জাগব। যখন যা করবার তাই করব প্রাণ ঢেলে। বুকের রক্ত দিতে হয় তাতেও পেছপা নই।

কিন্তু রুগীর পথ্য তৈরি করবে কে ? কে তাতে মেশাবে তার মমতার কোমলতা ? অনুরাগের স্বাদ-গন্ধ ? আরোগ্য প্রার্থনার মাধুর্য ?

'ও গোপাল, ভালো করে খাও। ছোলা দিয়ে শাক ভাজা হয়েছে, ওটি আগে মুখে দাও।' দক্ষিণেশ্বরে অঘোরমণি কত দিন এসে খাইয়েছে ঠাকুরকে। 'বড়ি দিয়ে ঝোল আরেকটু দেবে ?'

'কে রেঁধেছে বলো তো ?' ঠাকুর জিগগেস করেন খেতে-খেতে।

'স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধেছেন।'

কে লক্ষ্মী যেন চেনেন না ঠাকুর।

'বৌমা গো বৌমা।'

'সবই যদি বৌমার রান্না, তুমি তবে খাওয়াবে কবে ?'

'কার সঙ্গে কার তুলনা।' অঘোরমণি বিহ্বল গলায় বললে, 'আমার বৌমার হাতধোয়ানি জলেই অমৃততুল্য রান্না হয়।'

কে এই অঘোরমণি ? বলরাম বোসের বাড়িতে একদিন বলছেন ঠাকুর : 'কামারহাটির বামনি কত কি দেখে। গঙ্গার ধারে একলাটি এক বাগানে নির্জন ঘরে থাকে আর জপ করে। গোপালের কাছে শোয়।' বলতে-বলতে চমকে উঠছেন : 'কল্পনা নয়, সাক্ষাৎ। দেখলে গোপালের হাত রাঙা। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ায়, মাই খায়, কথা কয়। নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে।'

আমার গোপাল ধন-দৌলত চায় না, ভোগ-বিলাস চায় না, সামান্য একটু ক্ষীর-সর পেলেই সে খুশি। বড়জোর মাথার একটা বালিশ। কটা নেহাৎ জংলি ফুল।

অসুখ শুনে একটি ভক্ত-মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শরৎ মহারাজ। কামারহাটির বাগানে একা-একা থাকেন, একটু গিয়ে তাঁর দেখাশোনা করো। তার পর শুনতে পাচ্ছি সে বাড়িতে নাকি নানারকম শব্দ, ছাদের উপর, দরজা-জানলায়। রুগ্ন একা মানুষ, ভয় না পান শেষকালে !

সাহসিকা মেয়ে পিছু হটল না। কিন্তু তাকে দেখে আপত্তি করল অঘোরমণি। 'এখানে কেন এলি ? ভীষণ কষ্ট পাবি যে। আমার ভয়ই বা কি, ভাবনাই বা কি। আমার তো গোপালই আছে। শোন বাপু, এখানে যখন এসেছিস, এখানে কিন্তু নানান রকম আছে। শব্দ-টব্দ শুনলেই কিন্তু জপে বসে যাবি, আসন ছাড়বিনে—'

জপ আর আসন। একটু নিষ্ঠা আর অভিনিবেশ। একটি সঙ্কল্প আর উন্মুখতা।

বাগবাজার বৃন্দাবন পালের গলি থেকে দুটি মেয়ে এসেছে অঘোরমণির কাছ থেকে দীক্ষা নিতে।

ওরে আর লোক পেলিনে ? আমার কাছ থেকে দীক্ষা ?

স্বামীজী এলেন এগিয়ে। বললেন, 'তা জানি না। ওদেরকে তোমার কাছে উৎসর্গ করে দিচ্ছি। তুমি গোপালের মা।'

'বাবা, আমি কাঙাল ফকির—কিছুই জানি না। আমি কি দেব ? বউমা—বউমাও তো নেই এখন এখানে। তবে কী হবে ?'

'তুমি কি যে-সে ?' বললেন স্বামীজী, 'তুমি জপে সিদ্ধ। তুমি পারবে না তো কে পারবে ? বলি, কিছু না পারো তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও।

তোমার তো সব হয়ে গেছে। তোমার আর ও মন্ত্রে কি দরকার।'

তথাস্তু। মেয়ে দুটির কানে নাম দিয়ে দিল অঘোরমণি।

এবার তবে গুরুদক্ষিণা দাও।

ষোল আনা পূর্ণ করে দুটি টাকা দিতে গেল মেয়ে দুটি। গোপলের মা বলে উঠল, 'ওগো মন-প্রাণ যে দেবার কথা।' শেষে বললে গম্ভীর হয়ে, 'শোনো, নাম নেওয়া হেলাফেলার জিনিস নয়। অন্তত দশ হাজার জপের পর আসন ছাড়বে। হলেও বেরুবে না, মলেও বেরুবে না।' মানে সংসারে কেউ জন্মালো বা মরলো খেয়াল করবে না। নাম করে যাবে।'

এই দেখ না গোলাপ-মাকে। ওর পুজো-আচ্চা নেই। সটান বসে গেল জপের আসনে। আর কে ওকে টলায়। কে আর ওকে সরায় ওর আনন্দকেন্দ্র থেকে।

পবিত্রতাই আসন। আর ব্যাকুলতাই নাম।

ঠাকুর বললেন, 'নামের মাহাত্ম্য খুব আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কিছু হবার নয়। ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হওয়া চাই। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু মন রয়েছে কামকাঞ্চনে তাতে কিছু হবে না। তাই নাম করো, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন অনুরাগ হয়, যেন দেহসুখ মানযশের প্রতি টান কমে যায়।'

ছোট্ট ঘরটি গঙ্গার জলে ধুয়ে-মুছে খটখটে করে রাখে অঘোরমণি। নিজের হাতে-পায়ে খাটা-খাটনি করে। একটি সিকেতে মুড়ি বাতাসা নারকেল নাড়ু রাখে, কখন গোপালের খিদে পাবে কে জানে! ডালা-কুলো, শিল-নোড়া কোন জিনিসটা না লাগে শুনি। দাঁত মাজবার গুল, খাবার পর দুটি মশলা, জোয়ান বা ধনের চাল, ছেঁচা একটু পান পেলে খাই গোপালকে ভোগ দিয়ে। শরৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে বলে উঠল একদিন: 'বলি হ্যাঁ শরৎ, লোকে বলে সংসার ত্যাগ করব! তারা কি পাগল? এই শরীরটাই তো একটা প্রকাণ্ড সংসার। বঁটি কাটারি হাতা-খুন্তি, মেথি পাতা কালো জিরে, কি না হলে চলে বলো দেখি? সব গোপালের সংসার।'

অসুখে ভুগছে, নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'গোপাল বড় কষ্ট পাচ্ছে।'

সারাদিনই এই গোপালের সঙ্গে স্নেহালাপ, কখনো বা শাসন-গর্জন। ছেলে অন্ধকার থাকতেই গঙ্গায় নেমে হুলুস্থুল সুরু করেছে। উঠে আয় উঠে আয় বলছি—শাসনের সুরে চেঁচাচ্ছে অঘোরমণি। রাত পোহায়নি এখনো, কেউ এখন জলে নামে? অবাধ্য ছেলে কথা না শুনলে মা তখন আর করে কি। কাঁদতে বসে। ওরে লক্ষ্মীধন আমার, উঠে আয়। কাক কোকিল ডাকুক, চারদিক ফরসা হোক, তখন নাইয়ে দেব। ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাই বুড়লে যে তোর অসুখ করবে।

এক-একদিন ভাত ঢাকা পড়ে থাকে, খেতে বসে না অঘোরমণি। বিকেল হয়ে আসে, তবুও না। সে কি, গোপালের আজ কি হোল? বেলা পড়ে গেল, খাবে না, খিদে পায়নি? কোথায় দুষ্টুমি করছে কে জানে, অঘোরমণি বলে উদাসীনের মত। এ কি খেয়াল, একি দুরন্তপণা। আপনি আসনে বসে তাকে একবার ডাকুন। বলে সেই সেবিকা মেয়ে। খেলা ভুলে ছুটে আসবে দুষ্টু গোপাল।

আসনে বসল অঘোরমণি। চোখ বুজল। বললে, গোপাল বলছে আজ আর সে নিজের হাতে খাবে না, তাকে খাইয়ে দিতে হবে।

পরম পাকিয়ে-পাকিয়ে অঘোরমণিকে খাইয়ে দিল সেবিকা।

তেমনি কে আমাকে খাইয়ে দেবে?

ভক্তরা ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল, শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আসি এখানে।

'কিন্তু সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে?' প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

পুরুষদের বাসা, চারদিকে পুরুষের ভিড়, সেখানে সেই লজ্জাপটাবৃতা বাস করতে পারবে সর্বক্ষণ?

সেই নহবৎখানায় রাত তিনটের সময় ওঠেন। স্নান সেরে নেন। তার পর ঘরে ফিরে গিয়ে জপে বসেন। সেদিন হয়েছে কি, যথারীতি উঠেছেন শেষ রাত্রে। সঙ্গে গৌরীমাকে নিয়েছেন। কখনো মেয়ে, কখনো সঙ্গী, কখনো পরিহাসসরসা সখী। জলের কাছে সিঁড়িতে কালো মতন ঢিপি মতন কি-একটা পড়ে আছে তার উপরে মা পা রেখেছেন অলক্ষ্যে। পা রেখেই চমকে উঠেছেন, ভয় পেয়ে উঠে পড়েছেন দু সিঁড়ি। তাকে জড়িয়ে ধরল গৌরীমা। কি, কি হল?

'কুমীর গো!'

'কে বললে কুমীর? গৌরীমা বললে রঙ্গ করে, 'ও শিব। তোমার চরণ পরশ পাবার জন্যে শব হয়ে পড়ে আছে।'

'রাখ তোর রঙ্গ। আমি বলে ভয়ে মরি। কি সর্বনাশ, একেবারে কুমীরের উপর গিয়ে পড়েছিলুম।'

'তোমার আবার ভয় কি। তুমি অভয়া—তুমি শুভাবহা, অমিয়ময়ী লাবণ্য প্রতিমা।'

'তাঁকে গিয়ে সব বলো।' ভক্তদের বললেন ঠাকুর। 'সব কথা জেনে-শুনে সব দিক বুঝে-সুঝে সে যদি আসতে চায় তো আসুক।'

আসতে চায় তো আসুক। অন্তরের অনুচ্চারিত সুরটুকু ঠিক শুনলেন শ্রীমা। মনে আছে, পানিহাটির উৎসবে শ্রীমা যাবেন কিনা ঠাকুরের সঙ্গে একটি ভক্ত-মেয়ে জিগগেস করতে এসেছিল ঠাকুরকে, আর ঠাকুর বলেছিলেন, ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক। যাননি শ্রীমা। বুঝেছিলেন, যদিও যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, ঠাকুরের সমর্থনের স্পর্শটুকু যেন এসে লাগছে না ঠিক ঠিক। যেন অশ্রুত একটি সুর বলছে তাঁর কানে-কানে, কি হবে গিয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে, চাই না যে তুমি যাও, তুমি যেয়ো না। কিন্তু এবার? এবারও ভিড়, ভক্ত পুরুষদের অবিরাম আনাগোনা। এবারও আসবেন কি না-আসবেন শ্রীমার উপরেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু সেই না-শোনা সুরটি কী বলছে তাঁর কানে-কানে? বলছে, তুমি এস, তুমি এস। হে কষ্টহারিণী, হে আরোগ্যদাত্রী, তুমি এস আমার রোগশয্যার শিয়রে।

চলে এলেন মা।

ঠাকুর বললেন, 'ও খুব বুদ্ধিমতী।'

যখন যান নি পানিহাটিতে তখনও। যখন চলে এলেন শ্যামপুকুরে তখনও।

তুমি বুদ্ধি ও বিদ্যা। তুমি উজ্জ্বলতা ও নির্মলতা। তুমি অম্লানলক্ষ্মী। পীযূষবাদিনী।

সেই একটি মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। তুমি অসাধ্য সাধক আমার একটি উপকার করো। ঠাকুর তাকালেন চোখ তুলে। আমার স্বামীকে অলক্ষ্মীতে ধরেছে, তাকে যাতে বশে আনতে পারি তাই করে দাও।

'মা গো, এ বিদ্যে আমার জানা নেই। ঐখানে যে সাধুমায়ী থাকেন তাঁর কাছে যাও।' ঠাকুর নহবৎখানার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'তিনি ইচ্ছে করলেই দুঃখ দূর করতে পারেন তোমার।'

ঠাকুর বলেছেন, আর কি। মেয়েটি গিয়ে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।'

কী হয়েছে?

মেয়েটি বললে যা বলবার। আপনিই বুঝবেন নারীর প্রাণের কঠিন যন্ত্রণা। শুধু বিচ্ছেদের কষ্ট নয়, অপমানের কষ্ট। আপনিই এর বিহিত করুন। ত্রাণ করুন আমাকে। আমার স্বামীকে।

'আমি সামান্য নারী, আমি কি জানি।' বললেন শ্রীমা।

ছলনা কোরো না মা, ঠাকুর বলে দিলেন তুমিই সর্বব্যথাপ্রশমনী। সংসারদাবদাহে তুমি অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারা। নইলে কি ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন তোমার দুয়ারে। তুমি পদ্মদলায়তলোচনা দয়াঘনা, মা হয়ে তুমি যদি মেয়ের মুখের দিকে না চাইবে তো কোথায় যাব? কোন দুয়ারে মাথা ঠুকব?

'তোমায় যিনি পাঠিয়েছেন তুমি তাঁর কাছেই ফিরে যাও।' বললেন শ্রীমা, 'দৈবশক্তি তাঁরই করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছামাত্রই সব মঙ্গল হয়। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো।'

মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'সাধুমায়ী ফিরিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন যা ওষুধবিষুধ সব তোমার হাতে। তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই পারেন না। তুমি ইচ্ছে করলেই সব করে দিতে পারো। যে হারিয়ে গেছে তাকে আনতে পারো ফিরিয়ে।'

মৃদু মৃদু হাসলেন ঠাকুর। চাপা গলায় বললেন, 'শোনো, সাধুমায়ী ভারি চাপা। কাউকে সহজে ধরা দিতে চান না। তুমি তাঁর কাছে গিয়েই শরণাগত হও। তাঁকে সামান্য ভেবো না, তিনি সকলের চাইতে বড়।'

মূঢ় চোখে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

'আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। তুমি তাঁকে গিয়েই ধরো। তাঁর কৃপা হলেই আশা পূর্ণ হবে তোমার। দুঃখের রাত ভোর হবে।'

একবার এখানে আরেক বার ওখানে। এ কেমন-তরো কথা! তার মানে আমিই হতভাগিনী, কোথাও

আমার ঠাঁই নেই। যার ঠাঁই নেই সে যাবে কোন দুয়ারে।

আর কোন দুয়ারে! যার কেউ নেই তারও যে একজন আছে তার কাছে।

তার কাছেই গেল শেষ পর্যন্ত। বললে, 'মা আমায় ফিরিয়ে দিও না। ঠাকুর কি কখনো ভুল বলতে পারেন? তিনি বললেন, 'তুমি তাঁর চেয়েও বড়। ফাঁকি দিও না মা। তুমি দয়া করলেই মনের সাধটি মিটে যায়।'

মেয়ের কান্নার কাছে হেরে গেলেন মা। প্রসাদী ফুল-বেলপাতা দিলেন তাকে। বললেন, 'এ নির্মাল্যে সমস্ত কিছু নির্মল হোক। তুমি শান্তি পাও।'

একশো চৌত্রিশ

'মশায়, কি হলে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়?' একজন ভক্ত জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'মন সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করো এক জায়গায়, এক লক্ষ্যে।' বললেন ঠাকুর, শুকদেবের কথা আছে, পথে যাচ্ছে যেন সঙিন চড়ানো। আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, শুধু ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এরই নাম যোগ।'

মনের প্রত্যক্ষের বিষয় ঈশ্বর।

'কিন্তু সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের।' বললেন ঠাকুর।

শুদ্ধ মন কাকে বলে?

যে মনে বিষয়াসক্তির লেশমাত্র নেই; নেই কামকাঞ্চনের কুয়াসা।

'প্রত্যক্ষ করতে হলে দূরবীণ চাই।' বললে মাষ্টার। 'ঐ দূরবীণের নামই যোগ।'

'কর্মযোগ আর মনোযোগ। যোগ মোটামুটি এই দুই রকম।' বললেন ঠাকুর, 'তুমি চাষ করবার জন্যে নালা কেটে ক্ষেতে জল আনছ কিন্তু আলের গর্ত দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা তবে বৃথা। সব শ্রম পণ্ডশ্রম।'

নালা কেটে জল আনাটি কর্মযোগ আর আলের গর্ত দিয়ে জল যাতে না বেরিয়ে যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখাটি মনোযোগ।

'চিত্তশুদ্ধি হলে বিষয়াসক্তি গেলেই ব্যাকুলতা আসবে। তোমার অন্তরের প্রার্থনা পৌছুবে ঈশ্বরের কাছে। টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিস মিশেল থাকলে বা ফটো থাকলে তারের খবর পৌছুবে না।'

যোগ কি? চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। নদীর এক দিকে চর পড়লে অন্য দিকে ভাঙন ধরে। বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হলেই অমৃতবাসনার স্রোত বাড়তে থাকে। সংসারাভিমুখিতা রুদ্ধ হলেই দেখা দেবে ঈশ্বরাভিমুখিতা। বাহ্যগতি রুদ্ধ হলেই শুরু হবে অন্তর্গতি। তেমনি নিরোধ হলেই যোগ।

আরশুলাকে নিজ বিবরে নিয়ে গিয়ে তাকে মৃদু-মৃদু দংশন করে ভ্রমর, মৃদু-মৃদু গুঞ্জরব শোনায়। ভ্রমরের ভয়ে আরশুলা সারাক্ষণ ভ্রমরের ধ্যান করে। ধ্যান করতে-করতে তার চিত্তবৃত্তি ভ্রমরাকারে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তৎস্বরূপত্ব পেয়ে বসে। তেমনি যোগীরাও নিরুদ্ধাবস্থায় এসে ব্রহ্মে লীন হয়। ঐ লয়ই যোগ।

'তুমি কে? কি চাও?' একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

উজ্জ্বল ও আকুলতাভরা দুটি চোখ তুলে ছেলেটি বললে, 'আমার যোগসাধন করবার ইচ্ছে হয়েছে। আপনি আমাকে শেখাবেন?'

সানন্দ বিস্ময়ে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি এখানকার খবর পেলে কোথায়? তোমার নাম কি? কোথেকে আসছ?'

আমার নাম কালীপ্রসাদ। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির মাষ্টার রসিকলাল চন্দ্রের আমি দ্বিতীয় ছেলে। আহিরীটোলার নিমু গোস্বামীর লেনে আমাদের বাড়ি। স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। এলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের সভা হচ্ছে। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা দিচ্ছেন শশধর তর্কচূড়ামণি। বক্তৃতার বিষয় হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কদিন ধরেই হচ্ছে। রোজ শুনছি। সাংখ্যদর্শনের পর শুরু হল পতঞ্জলির যোগসূত্র। শুনছি আর মন মেতে উঠছে। সাধ হয়েছে যোগাভ্যাস করব। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে একখানা যোগসূত্র কিনলাম। কিবা সংস্কৃত জানি, কতটুকু বা বুঝি ওর অর্থ মর্ম। তাই একদিন সাহস করে গেলাম চূড়ামণি মশায়ের বাড়ি। আমাকে পাতঞ্জলদর্শন পড়াবেন? চূড়ামণি মশায় তো অবাক। বললেন, বাবা, আমার সময় কোথায়? তুমি কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। বোলো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। গেলাম বেদান্তবাগীশের বাড়ি। বেদান্তবাগীশ বললেন, স্নানের আগে চাকর যখন আমার গায়ে তেল মাখাবে তখন যদি উপস্থিত থাকতে পারো একটু আধটু শেখাতে

পারি মুখে-মুখে। তাই সই। সকালে রোজ তাঁর তেল মাখার সময় গিয়ে হাজির হই। মুখে-মুখে মোটামুটি জেনে নিই। যোগসূত্রের পর শিবসংহিতা। যত পড়ি ততই মন ব্যাকুল হয়। কিন্তু সব শাস্ত্রেই ঐ এক কথা, যোগসিদ্ধ গুরু না পেলে একা-একা সাধন করতে গেলেই সর্বনাশ! তখন মন বড় দমে যায়, পড়াশোনা বিস্বাদ লাগে। কোথায় পাব সেই যোগগুরু? বাগবাজারের যজ্ঞেশ্বর আমার বন্ধু। তাকে বললাম আমার মনের যন্ত্রণা। সে বললে, দক্ষিণেশ্বরে যাও। সেইখানেই মিলবে এক মহাযোগী।

তন্ময়ের মত শুনছেন ঠাকুর।

দক্ষিণেশ্বর কোথায়, তাই কি আমি জানি? বাড়ির সবাইকে জিগগেস করলুম, কেউ হদিস দিতে পারলেন না। যজ্ঞেশ্বরেরও ঠিকানা জানা নেই যে সেখানে গিয়ে খোঁজ করব। যা থাকে অদৃষ্টে, বেরিয়ে পড়লুম, যেমন গিরিগৃহ থেকে নির্ঝরিণী বেরোয়। উত্তরে কোথাও হবে আচমকা একটা আন্দাজ করে চিৎপুরের খাল পেরোলুম। কিসের টানে এগিয়েই চলেছি, সকাল প্রায় দুপুরে গড়িয়ে পড়ল। পথচারী একজনকে হঠাৎ জিগগেস করলুম, দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারো? সে কি কথা! রাজ্যের পথ এগিয়ে এসেছেন যে, ফিরে যান। আবার ফিরে চললুম। ঘুরতে ঘুরতে পেলুম ঠিক দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম আপনি কলকাতায় গিয়েছেন, এ বেলা আর ফিরবেন না।

তখন কি আর করি, আপনারই ঘরের উত্তরের বারান্দায় বসে পড়লুম হতাশ হয়ে। হাঁটতে-হাঁটতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, পকেটে একটি আধলাও নেই, বাড়ির লোকদের না বলে-কয়ে এসেছি তারা না জানি কত উতলা হয়েছে এই সব ভেবে দেহ মন নেতিয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি, কে একটি ছেলে ছাতা-হাতে আসছে এদিকে। আপন জনের মত একেবারে আমার পাশে এসে বসল, নাম শুনলুম শশিভূষণ। এস দুজনে মিলে গঙ্গাস্নান করি, কালী-বাড়ির কর্মচারীদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদের বলে কিছু প্রসাদ সংগ্রহ করি দুজনে, তার পর স্থির হয়ে বসে একমনে শুধু ঠাকুরের কথা কই।

ক্রমে-ক্রমে সন্ধ্যে হল, বেজে উঠল আরতির বাজনা। আরতির পর রামলাল-দাদা শীতলভোগের প্রসাদ এনে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে দু বন্ধু শুয়ে পড়লুম বারান্দায়। রাত প্রায় নটা, ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ হল। ঐ আসছেন ঐ এসেছেন ঠাকুর।

কালী, কালী, কালী—গাঢ়গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করতে-করতে ঠাকুর ঢুকলেন তাঁর ঘরটিতে উত্তরের বারান্দা পেরিয়ে। পিছনে গামছা আর বেটুয়া হাতে লাটু। শশী গিয়ে বললে কালীপ্রসাদের কথা। ডাকো ডাকো, তাকে দেখিনি কখনো। রামলালকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন। গড় হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি কে?'

নবাগত তরুণ সুদীপ্ত চোখে বললে, 'আমি কালী-প্রসাদ।'

উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ।

'কি চাই তোমার?'

নির্ভীক অথচ আকুলকণ্ঠে বললে কালীপ্রসাদ, 'আপনার কাছে যোগ শিখতে চাই।'

আশ্চর্য, একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন ঠাকুর। সকলেই তো ভোগ চায়, যোগ চায় ক'জন! কে চায় প্রশান্তবাহিতা স্থিতি, কে চায় সুধা-পণ্য!

বললেন, 'তোমার এই কচি বয়েস, তোমার যোগ-শিক্ষার ইচ্ছে হয়েছে এ তো খুব ভালো লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে প্রকাণ্ড যোগী ছিলে, একটুখানি এখনো বাকি আছে, এই তোমার শেষ জন্ম। দেব আমি তোমাকে যোগশিক্ষা। আজ রাত যাক, কাল ভোর-বেলা এস।'

রাত কি আর কাটে। বারে বারে উঠে বসে কালীপ্রসাদ, কতক্ষণে না জানি নব প্রভাতের অরুণ-রঞ্জন দেখা দেবে। ঠিক সময়ে রামলালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। নিয়ে গেলেন উত্তরের বারান্দায়। একখানি তক্তপোষ পাতা ছিল, বললেন, 'বসো, যোগাসন করে বসো।'

বসল কালীপ্রসাদ।

জিভ দেখি। কালীপ্রসাদ জিভ বের করল। ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে ঠাকুর তার জিভে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন। নিচে থেকে উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন বুকে, ঊর্ধ্ব দিকে তুলে দিলেন শক্তি। বললেন, তুমি যাঁর প্রসাদ সেই মা-কালীর ধ্যান করো।

মুহূর্তে কাষ্ঠবৎ সমাহিত হয়ে গেল কালীপ্রসাদ।

নিষ্কল নির্মল নিরাময় শান্ত ও সর্বাতীত। বর্ণমালা অভ্যাস করেই সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্তে আনা

যায়, তেমনি যোগাভ্যাস করেই পাওয়া যায় তত্ত্বজ্ঞান। বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোনো পদবিন্যাস করতে পারে না, কিন্তু একত্র গ্রথিত করলেই কেমন বাক্য-পদ-ছন্দের আকৃতি ধরে। তেমনি সমস্ত শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে একটি কেন্দ্রে সংলগ্ন করা একটি অর্থে আরূঢ় করার নামই যোগ।

নীরদনীল সমুদ্র সামনে পড়ে আছে, তার জল খেয়ে কি পিপাসা মিটবে? মিটবে না। বরং সেই লোণা জল যত খাবে ততই আরো বাড়বে পিপাসা। তবে উপায়? উপায় সূর্য। সূর্য সেই লোণা জল টেনে নেবে স্বতেজে, তার পর ধারাধর রূপ ধরে ধারা-বর্ষণ করবে। সেই মেঘপাতিত বৃষ্টির জলেই তোমার তৃষ্ণার তৃপ্তি, তোমার দাহের নিবারণ।

এই সমুদ্র হচ্ছে শাস্ত্র। তুমি নিজে থেকে এর জলপান করো তৃষ্ণানিবৃত্তি হবে না। সহস্রবর্ষ পরমায়ু পেলেও পার হতে পারবে না এই মহাসাগর। সুতরাং গুরুরূপী সূর্যকে ডাকো। সূর্যের শরণ নাও। লবণাক্ত জল টেনে নিয়ে সূর্য তোমাকে পরিচ্ছন্ন জল দেবে, তোমার তৃষ্ণাবারক মন্ত্র তোমার সিন্ধুপারক সাধন প্রণালী। সুতরাং গুরুর পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয়।

উপর থেকে নিচে কালীপ্রসাদের বুকে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর। কেটে গেল সমাধি। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান।

'জলে জল, অধঃ-উর্ধ্ব পরিপূর্ণ।' বললেন ঠাকুর, 'জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে দেখবে এই সত্যকে।' আবার বললেন, 'অনন্ত আকাশ তাতে পাখি উড়ছে পাখা মেলে। চৈতন্য আকাশ, আত্মা পাখি। পাখি খাঁচায় নেই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ আর ধরে না।'

যখন নিজ দেহের অন্তঃপুরে একাকী বসে তোমাকে ডাকি, তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও। আমার সামনে এসে দাঁড়ালে তোমাকে আর ডাকতে হয় না, তোমার সেই ডাক-নাম—নাম-জপও আমি ভুলে যাই। তুমিই বা তখন কোথায়! শুধু দেখি তোমার রূপ, রূপের তরঙ্গ, মাধুর্যসমুদ্রের প্রশান্তি। ডুবে যাই লীন হয়ে যাই। আমার আমি তোমার আমিতে বিভোর হয়ে যায়। শিবমূর্তির মূল ধ্যান আর থাকে না, কল্যাণাস্পদ শিবতত্ত্বে নিমগ্ন হই।

'মহীন বাবু, কি টাকা টাকা করছ!' ঠাকুর বললেন ডাক্তার সরকারকে। 'মাগ, মাগ—মান, মান। ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। একচিত্ত হও। ঈশ্বর-আনন্দ ভোগ করো।' বলতে বলতেই ভাবাবিষ্ট হলেন ঠাকুর।

ডাক্তার বললে, 'কথা আর ভাব এখন ভালো নয়।'

কে শোনে সে কথা। ঠাকুর তাকালেন ডাক্তারের দিকে। বললেন, 'জানো, কাল ভাবাবস্থায় তোমাকে দেখলাম। দেখলাম জ্ঞানের আকর কিন্তু মগজ একেবারে শুকনো। আনন্দরসের ছিটেও লাগেনি। কিন্তু যদি একবার পাও সেই রসের সন্ধান, অধঃ-উর্ধ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, হ্যাঁক-ম্যাঁক লাঠিমারা কথাগুলো আর বেরুবে না মুখ দিয়ে।'

ডাক্তার হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু। বললে, 'একেবারে শুকনো।'

'তুমি এ সব বিশ্বাস করো না,' ঠাকুর বললেন, 'ডাক্তার ভাদুড়ী বলছিল-মন্বন্তরের পর তোমার একেবারে ইট-পাটকেল থেকে সুরু করতে হবে।'

হেসে উঠল ডাক্তার। বললে, 'তাতে ক্ষতি কি। যদি ইট-পাটকেল থেকে সুরু করে অনেক জন্মের পর মানুষ হই আর এখানে আসি তাহলে আবার সেই ইট-পাটকেল থেকে সুরু।'

হেসে উঠল সকলে। [ক্রমশঃ।

——আগামী সংখ্যা থেকে——

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

মাসিক বসুমতীর অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের লেখা বহু চিঠিপত্র আসে, যেগুলি প্রকাশযোগ্য। আমরা স্থির করিয়াছি, পাঠক-পাঠিকার প্রস্তাব অনুযায়ী, 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' এই শিরোনামায় একটি বিশেষ বিভাগের প্রবর্তন করা হবে আগামী সংখ্যা থেকে। এই বিভাগে যে কোন পাঠক-পাঠিকা তাঁর যে কোন বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য পেশ করতে পারবেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলকণ্ঠ

দুর্গা চলে গেল চা আনতে।

বসে বসে দেখতে লাগলাম দুর্গার সংসার।

আলো আর বাতাস ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান,—এ-কথা শুধু চারুপাঠের পাতাতেই সত্য। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের সঙ্গে হলে সাক্ষাৎ, ওই অলীক ধারণার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে দেরী হয় না। মধ্যবিত্তরা কেউ-কেউ, নিম্ন-বিত্তরা প্রায় সবাই কলকাতার যে সব গলিতে যে-সব ঠিকানায় থাকে, শুধু ডাক-পিওনই তার নম্বর জানে মাত্র, পরিচয় জানে না, জানবার উৎসাহও নয় অমিত!

আদিত্য দে-র পঞ্চাশ টাকা-ভাড়ার সেই (বাড়ী বললে বাড়িয়ে বলা হয়,) মাথা গোঁজবার চোরা-কুঠুরীর বাইরের ঘরেও সূর্য্যের আলো অল্প, বাতাস প্রায় রুদ্ধ। দুর্গার পিতৃগৃহে একদা বেয়ারা-বাবুর্চিদের ঘর ছিলো এর তুলনায় স্বর্গ। সেই স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছে দুর্গা বহু দিন। স্বর্গের হাসি কিন্তু লেগে আছে বুঝি এখনও এই অন্ধ গলির অপরিসর বাসের অযোগ্য বাসস্থানের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে।

থলথলে সদাই হাসি-খুসী আদিত্য দে জমাটি মানুষ। গোলগাল বেঁটে মানুষটা বাইরে থেকে মোটা, কিন্তু তার রসিকতা অতি সূক্ষ্ম। আমাদের দেশে যারা বেশি কথা বলে তাদের সম্বন্ধে সব কথাই 'অর্বাচীন,' এই বিশেষ একটি বিশেষণেই সেরে দেওয়া হয়। তাদের না হলে জমে না আসর, আড্ডা বসে না বেশিক্ষণ। তবু যারা গোমড়া-মুখ এবং স্বল্পবাক তারাই আমাদের দেশে জীবনের ক্ষেত্রে-অক্ষেত্রে মুরুব্বী। কথা বলতে পারা যে একটা দুর্লভ ক্ষমতা, বাজে বকতে পারার মত বাজে জিনিষকে যে ওই দুর্লভ ক্ষমতা যোগে আর্টের কোঠায় উত্তীর্ণ করে দেওয়া যায়, এ-কথা কে বলে? যারা গম্ভীর হয়ে থাকে তারা যে কথা বলতে পারে না বলেই চুপ করে থাকে, সে-কথাটাই বা ক'জন বলে? গাম্ভীর্য যে গর্দভের গায়ে সেই সিংহ-চর্মাবরণ, এ-কথা আর কেউ না বুঝুক, গাধাও না বুঝুক, সমাজে গম্ভীর বলে যারা সম্মানিত তারা বেশ বোঝে, তাই চুপ করে থাকে। ভালোই করে। এ-দেশে গুরুগম্ভীর বিষয় নির্বাচন করে তারপর যাই লিখুন তাতেই যেমন আপনার পণ্ডিত বলে পরিচয়, তেমনি এ-সমাজে ব্যক্তি গম্ভীর হলেই তার ব্যক্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ: এ-দেশ সম্বন্ধে সব চেয়ে খাঁটি কথা বলেছিলেন ডি, এল, রায়ের আলেকজাণ্ডার: সেলুকস্ সত্যই কী বিচিত্র এই দেশ!

পরিহাস রসিক আর অকারণে গম্ভীর, এদের মধ্যে তফাৎ শুধু এই যে প্রথম জন সিরিয়াসলি ফাণি, দ্বিতীয় জন ফানিলি সিরিয়াস। সেই এ্যালোপ্যাথ আর হোমিওপ্যাথ' এক জন kills a man; আর অন্য জন: lets a man die.

আদিত্য দে নড়তে সময় নেন, কিন্তু বকতে নন। সদ্যপরিচিতকে 'আপনি' থেকে শ্যালক সম্বন্ধে না হ'ক অত্যন্ত আপন জন করে নিতে সময় নেন সামান্যই! পরের কথায় কাণ দেবার সময় কম, কিন্তু ঘরের কথা পরকে বলার বাধা আরও অল্প। ঠকলে যাদের শিক্ষা হয়, যারা ঠকতেই ভালোবাসে, ঠকাতে চায় না কাউকে, আদিত্য দে তাদেরই দলের। সেই সাহেবের কথা ভুলব না কোন দিন, এক জনকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে এক দিন কী কারণে ডেকেছিলেন তাকে, সামান্য উপকার নেহেন বলে; সাহেবের উপকার করা দূরে থাক, আসেওনি সে। পরে সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল: এত উপকার পেয়েও লোকটা এলো না কেন? সাহেব জবাব দিলেন: that's his nature! তারপর সাহেবকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল: আবার যদি ও বিপদে পড়ে, তুমি কি তখনও এগিয়ে যাবে?—সাহেবের খাসা জবাব: Oh! Sure! —কিন্তু, 'কেন' বলতে পার?—সাহেব প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন: Perhaps because that's my nature.

অত্যন্ত অল্প পথ যেতেও প্রথম যৌবনে আদিত্য দে রিকস নিতেন। তখনও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের কোঠায় নেমে আসেন নি। জিজ্ঞেস করলে বলতেন: বাইরে থেকে দেখতেই এ

রকম, আমার শরীর ত' ভালো নয়, হাড় নরম, দাঁত খারাপ। কেউ উত্তর শুনে বিপুল বপুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে নিজেও হেসে উঠতেন হো-হো করে। কেউ যদি বলত: তোফা আছেন দাদা, মুখ দেখেই বোঝা যায় খুব সুখী। আদিত্য মুখখানাকে করুণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলতেন: ঐ ত আমার ট্র্যাজেডী, মুখখানাকে এমন কমিক কমিক করে পাঠিয়েছেন ভগবান, যে আমার যে কোন দুঃখ আছে সে কথা বলতে যাওয়াও, যারা শোনে তাদের পক্ষে সাংঘাতিক হাসির কথা। ঠিক সার্কাসের ক্লাউনের মত বা হাসির গল্প লেখকের মত। পরের দুঃখে যাদের শেষ নেই কাঁদার, নিজের দুঃখকে তারাই পরের হাসি করেছে!

দুর্গার ঘরে বাইরের আলো-বাতাস যেমন অল্প,—সেখানে হাসি-খুশীর তেমনি অফুরন্ত নির্ঝর। ঘরের মেঝের নেই ধুলো, দেওয়ালের কোণে নেই ঝুল। বড় দেওয়াল-ঘড়ির অভাবে, পকেট-ঘড়িটাকে লম্বা সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়িকাঠের এক প্রান্ত থেকে। অর্গান-পিয়ানো সোফা-কোচ শূন্য অয়েল পেন্টিং বিহীন সে-ঘর ড্রয়িং রুম নয়, কিন্তু বিশ্রাম-ঘর নিশ্চয়ই। আরামের চেয়ে স্বস্তি, সে ঘরের প্রথম বক্তব্য, কম্ফার্টের চেয়ে আনন্দ সেই ঘরণীর প্রধান গর্ব।

আদিত্য দে থামবার পাত্র নন। প্রথম বিয়ের পর কী হয়েছিল, তাই বলছিলেন: তখন সত্ত বিয়ে হয়েছে এবং অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ হয় নি। বিয়ে করাটাকেই একটা মস্ত কাজ করেছি মনে করে, অন্য কাজে উৎসাহ ছিলো বৎসামান্যই। বাঁধা চাকরী ত ছিলই না, রোজ কাজে যাওয়াটাও দরকার মনে করতাম না। একদিন দুর্গা সরোষে বললে: পুরুষ মানুষ সারাদিন ঘরের মধ্যে অপদার্থের মত বসে?—লোকে বলবে কী!—লোকে কী বলবে, সে ভাবনা কোন দিন ভাবিনি, কিন্তু স্ত্রীলোকে কি বলবে, তার চেয়েও মারাত্মক স্ত্রী কি বলবে, এই দুর্ভাবনায় পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে কাটালাম বাড়ীর বাইরে। ফিরে এসে গৃহিণীর মুখের বাণী আগের দিনের চেয়েও নির্মম: সারা দিন বাড়ীর বাইরে কর কী তুমি? সংসারে কী দরকার না দরকার, এক বার খোঁজ করাও প্রয়োজন মনে কর না? প্রমাদ গুণলাম। কী করা যায়? বসে থাকলে, অপদার্থ। বেরুলে, বে-আক্কেলে। অনেক ভেবে, পরের দিন একবার চৌকাঠের বাইরে, একবার চৌকাঠের ভেতরে—এই করছি যখন, তখন শুনলাম, দুর্গা পেছনের বাড়ীর ছাদের কোন মেয়েকে বলছে: ওঁর মাথাটা আজ একটু গোলমাল হয়েছে বোধ হয়, উনি এক বার চৌকাঠের বাইরে যাচ্ছেন, এক বার চৌকাঠের ভেতরে আসছেন। বুঝুন! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।

—"বাঃ—"

নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসা, আজকের পৃথিবীতে বাতিল হয়ে গেছে। এমন কি, স্ত্রীর উল্লেখ করলেও লোককে আজ হাসির পাত্র হতে হয়। ডিনারে স্ত্রীর নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু বসবার আসন নিজের পাশে করাটা বেয়াদপি, তার মার্জনা নেই। জীবনের পার্টনারের অলিখিত মানা আছে টেনিসের মিক্সড ডাবলসে স্বামীর স্বপক্ষে খেলার। তাই টেনিস হয়েছে সেই খেলা,—যে-খেলায় love means nothing!

আদিত্য দে-কে দেখে তারই দুর্লভ ব্যতিক্রম মনে হ'ল। গৃহছাড়া গৃহিণীর যুগে,—আদিত্য আর দুর্গার মিলিত সংসারযাত্রায় যা নেই, তা হ'ল গোঁজামিল। সংসারের তীব্র অভাব তারা খুঁজতে দেয় না। কেউ বাড়ীতে এলেই করে না কপালে করাঘাত। 'নেই নেই'—শুধু এই একটি রবেই সংসারে এক দিন সত্যিই কিছু থাকে না,—সর্বস্ব robbed হতে হয় ভাগ্যের কানে গেলে সে-কথা।

আদিত্য দে'র প্রতিটি কথায় স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ঝল-মল করছে। স্বামীকে ঘিরে সারাক্ষণ একটি সপ্রেম সতর্ক দৃষ্টি ছলছল করছে দুর্গার দু'টি চোখে। ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামি-স্ত্রীর এই সাজানো বাগানও ভাগ্যের নির্দয় কটাক্ষে শুকিয়ে যেতে পারে—কিন্তু তাতে ভাগ্যেরই কাপুরুষতার পরিচয় পাই—পুরুষকারের হার হয় না তাতে। আদিত্য-দুর্গার ছোট্ট সংসারে সব চেয়ে বড় কথা যা, তা হ'ল ভাগ্য তাদের প্রতিও বিমুখ, তবুও তারা সংসার থেকে মুখ ফেরায় নি।

দুর্গা এলো একটু বাদে, হাতে তেল-নুণ মাখানো মুড়ি তার সঙ্গে ছোলা, আর পাশে এক টুকরো তিলের নাড়ু।

আমার দিকে এগিয়ে দিতেই আদিত্য দে বলে উঠলেন: একেবারে প্রথম দিনেই মুড়িতে নামিয়ে আনলে,—একটু ভালো কিছু—মিষ্টি-টিষ্টি?

দুর্গা হাসলে, বললে: ভালো ভালো খাবার উনি অনেক খেয়েছেন, এতেই বরং মুখ-বদল হবে। সেই ঘণ্টার মত নিটোল কণ্ঠস্বর, হাসলে গালের ওপর ছোট্ট টোল, বদলায়নি কিছুই। দুর্গার হেঁটে আসা লক্ষ্য করলাম। মধ্য বয়সের মধ্যপ্রান্তে কোন বাঙালী মেয়ে হেঁটে এলে মনে হয় ঘোড়ায় চেপে এল, টগবগ করতে করতে—এমন মেয়ে, শুধু দুর্গাই। তার পর একটু থেমে সেই বীণায় আলাপ করার মত গলায় বললে: রাজভোগ যে আমরা রোজ খাই না, এতক্ষণে উনি তা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। আজ জোর করে একটা রাজভোগ খাওয়ালে, আমাদের দুর্ভোগ বাড়ত, উনি হাসতেন মনে মনে। আমরা যা পারি তার চেয়ে বেশি না পারলে যে তাতে কোন লজ্জা আছে, এ-কথা আর যে যতই বলুক আমি স্বীকার করি না।

সত্যিই তাই। কালোবাজারে-বড়লোকের মেয়ের বিয়েতে গিয়ে এক পাত্র আইসক্রীম কফিতেই পরম পরিতৃপ্ত হই, মূল্যবান প্রেজেন্টেশান দিয়ে কৃতার্থ মনে করি। আর আমাদের সমান শ্রেণীতে কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ যখন ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে, তখন খেয়ে উঠে ভালো করে না আঁচিয়েই মনে মনে গালাগাল দিই তাকে ঈর্ষ্যায়, বলি: বড্ড পয়সার গরম দেখালে, ট্যাঁকে ত কিছুই নেই, তবুও ধার করে বাহাদুরী কিনলে—আহাম্মক কোথাকার!

দুর্গা আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে: 'যাক ওসব কথা। এখন উনি আমার সম্বন্ধে কী সব ভালো ভালো কথা বলছিলেন বলুন ত শুনি—

আদিত্য দে সন্ত্রস্ত, আমি বেপরোয়া; বললাম: ওসব কথাও যেতে দেওয়া যাক, সতীর নিন্দে, স্বামীর খাত্ত, নইলে খরচ বাড়ে।

দুর্গার এবারের জবাব চমৎকার: 'খাত্ত'-কথাটা ঠিক বলেছেন—হাড়-মাস আমায় কিছু কি খেতে বাকী রেখেছেন? এমনি অভাব অভিযোগ সংসারে ত' আছেই, উনি তার কতটুকুই বা জানতে

পান, আর আমিও ওসব গায়ে মাখি না, কিন্তু এত বয়সেও এমন ছেলেমানুষ আছেন, অপ্রস্তুতে ফেলতে পারেন এত—

দুর্গার কথা শুনতে না শুনতেই আদিত্য দে হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

দুর্গা চেয়ে দেখে বললে: হাসা হচ্ছে এখন—রাগে গা জ্বলে যায় আমার ব্যাপারটা মনে পড়লে—

—কী রকম?

—শুনুন ঘটনাটা তাহলে। বাড়ীতে দু'খানা ঘর, খাবার সময়ে ছেলে-মেয়েদের অন্য ঘরে আটকে রেখে, আরেকটা ঘরে খেতে বসি, নাহলে খাওয়া হত না। ছেলে-মেয়েরা তখন একেবারে বাচ্চা, বড্ড দুরন্ত ছিল আর অবুঝ। সেই ঠিক দুপুর বেলায় খাবার সময় আসতেন পাড়ার এক ভদ্রমহিলা, কোথায় তাকে বসাই, কোথায়ই বা আমরা খাই, এই ভেবে নাজেহাল হতাম। এক দিন এসেছেন ওই খাবার সময়, ওঁকে বললাম,—দেখ ত' ভদ্র মহিলার কেমন আক্কেল, এই অবেলায় কেউ গল্প করতে আসে?—এই পর্য্যন্ত বলতেই সেই ভদ্রমহিলা বোধ হয় কিছু আঁচ করে থাকবেন, তাড়াতাড়ি এসে বলছেন: বড্ড অসময়ে এসে অসুবিধে করলাম না? আমি ভদ্রতার খাতিরে, বললাম না, না, অসুবিধে করবেন কেন, ঠিক আছে। আমার কথা শেষ হয় নি তখনও, উনি স্নানের ঘরে ছিলেন, সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন,—না, না কী, এইমাত্র আমাকে বললে, ভদ্র মহিলার কোন হুঁশ নেই, অবেলায় এসে ভয়ানক অসুবিধেয় ফেলেন, এত কথা বললে এক্ষুণি, আর এখন কথা পাল্টাচ্ছ?

বাঃ—একটু দম নিয়ে দুর্গা শেষ করলে কথাটা!—বুঝুন আমার অবস্থাটা, আর ভদ্র মহিলা সেই কথা শুনে বললেন: হুঁ, হুঁ, ওঁর সঙ্গে চালাকী নয়, উনি সাফ কথার মানুষ! দুর্গার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠলেন আদিত্য দে: আর ওর কথা ত শোনেন নি এখনও—এই ক'দিন আগের ঘটনা—ব্যাপারটা কুঁজো নিয়ে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম: কুঁজো?

দুর্গা সরোষে বললে:—ফের!

তাতে দমবার পাত্র নন আদিত্য দে।—হ্যাঁ, শুনুন ব্যাপারটা কুঁজো নিয়ে। এক দিন ঘরে ফিরে দেখি বারোটা কুঁজো। জিজ্ঞেস করলাম গৃহিণীকে, কী ব্যাপার? গিন্নী বললেন: সিংহীমুখওলা কুঁজোর বড় সখ ছিল, আজ পেয়ে গেলাম তাই কিনলাম। আমার প্রশ্ন: বারোটা?—হ্যাঁ নিলাম, কারণ ডজনে এক আনা সুবিধে হ'ল,·আর লোকটাও বললে—এই গরমে আর কোথায় নিয়ে নিয়ে বেড়াব?—আপনিই নিয়ে নিন সব কটা, সস্তা করে দেব।

—কত করে নিলে?—ফের জিজ্ঞেস করি।

—এক টাকা করে—দুর্গার মুখের ভাব, যেন কিছুই হয় নি।

বারো টাকার কুঁজো, বুঝুন মশাই—শুনে সেই প্রথম যা কখনো হয় নি তাই হ'ল, আমি শুয়ে পড়লাম, কুঁজো সেই প্রথম চীৎ হ'ল, একেবারে যাকে বলে গিয়ে চীৎপাৎ!

আদিত্য দে আর তার বউ দুর্গার সংসার খুব ছোট। ছেলে-মেয়ের দু'টি। একটু বাদেই তারা এলো। জিজ্ঞেস করলাম: এই সব? না আরও আছে?

আদিত্য দে বললে: না, আমাদের ঐ এক ঢোল আর এক কাঁসি, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

ইতিহাসে রাজায়-রাজায় যুদ্ধের আছে সবিস্তার বর্ণনা, উলুখড়ের প্রাণ যাবার প্রসঙ্গের সেখানে বড় জোর উল্লেখ হ'তে পারে, কিন্তু তার বেশি হয় না কিছু। বই-এর পাতায় ছাপা হয় জীবনতত্ত্ব, ভগবান আছেন কী নেই, তাই নিয়ে জমে বিতর্ক সভা। 'দেশে-দেশে, যুগে-যুগে, উত্থান-পতনের রক্তাক্ত ও রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তে আছে সবাই, রাজা-প্রজার, রক্তশোষণকারী আর রক্তশোষিতের, ঔদ্ধত্যের আর লাঞ্ছনার, অপচয়ের আর বাঁচবার দ্বন্দ্বে মুখর মহাকালের চাকা; তার সতর্ক ঘোষণা—শোন, সময়ের নির্ঘোষ, শোন! পড়, দেওয়ালের লেখা পড়বার কর চেষ্টা।

শুধু এর মধ্যে কোথাও নেই মধ্যবিত্তেরা, তাদের আনন্দের অংশ নেবার নেই কেউ, কেউ নেই দুর্বহ বোঝা হালকা করবার। পৃথিবীর সব দেশেই মধ্যবিত্তরা দিয়েছে—শিল্পের, শিক্ষার, বিজ্ঞানের, নূতন আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু তাদের কথা মনে রাখে নি কেউ। তাদের সুখ-দুঃখ ধ্বনিত হয় নি চাষী আর মজুরের জয়ধ্বনিতে, গণজাগরণের স্লোগানে নেই তারা, তারা নেই বিপ্লবের স্মৃতিকথায়। সংসারে যারা কিছুই দিলে না, অথচ পেলে সব তাদের নিয়েই কাব্য-কাহিনী-নাটক-ইতিহাস; আর যারা দিলে সব, কিন্তু পেলে না কিছুই সেই মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে সবাই মৌন।

ভিখিরীদের সব আছে, নেই শুধু আত্মসম্মান। মধ্যবিত্তদের সব গেছে, শুধু আত্মসম্মান ছাড়া। তাই তারা ভিখারীর অধম হয়ে বেঁচে আছে আমাদের সমাজে। যে সমাজের সব চেয়ে নির্মম রসিকতা হয় তখনই যখন ভিখারীরা হাত পাতে মধ্যবিত্তের কাছে। এক জনের হাতে কিছু থাকলেও আবার চাইতে লজ্জা নেই; আরেক জনের হাতে কিছু না থাকলেও দিতে না পারার আছে লজ্জা'!

তারপর এক সময়ে 'চা-টা', খেয়ে দুর্গার ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়বার আগে কথা দিতে হ'ল আবার আসবার। কথা না দিলেও আসতাম। দুর্গা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। মানুষের একটা বয়স আছে, যার পর নাকি সে আর অবাক হয় না। কোন কিছুই তাকে shock করে না, দেয় না surprise. সংসারের অভিজ্ঞতার পাথরে ঘষতে ঘষতে বিস্মিত হবার গুণটিই যায় ক্ষয়ে, আশ্চর্য বলে বস্তুটির ঘটে বিলুপ্তি। শ'য়ের একটি নাটকের একটি চরিত্রের মুখে আছে, surprised at this age? কথাটা শুনে এক সময়ে বলেছিলাম এমন কথা শ'য়ের কলমেই শুধু লেখা যায়। কিন্তু এখন বুঝি, ও-কথায় শুধু চমক আছে, সত্য নেই।

সমুদ্রের তল আছে, সীমা আছে আকাশের, সব পথই কোথাও না কোথাও গিয়ে শেষ। শুধু অন্ত নেই অবাক হওয়ার। মানুষের জীবন—অনন্ত বিস্ময়ের বিরাম-বিহীন এক পালা।

অবাক ক'রে দিয়েছিল দুর্গা আর কিছু দিয়ে নয়, একটি কথা মনে করিয়ে দিয়ে, দুর্গার সঙ্গে প্রথম পরিচয় যেদিন, সেদিনকার দুর্গা বড়লোকের এক মাত্র মেয়ে, এখন সে কেরাণীর বউ! ভেবেছিলাম এই নিয়ে তার অনুযোগ নিশ্চয়ই প্রতি দিন বিঁধছে আদিত্য দে-কে: আড়াই শ'টাকা মাইনে কেরাণীর কী দরকার

ছিলো সেই ঘর থেকে যেয়ে আনবার ? বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা জুড়ে ধাবিত্রা-বিস্তার যে-ঘরের, আর আধুনিক অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ,—অর্থাৎ কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ (বিকল্প দিল্লী) চেনে যে-ঘরকে এক-ডাকে। সেদিন তেতলার ঘরে দুর্গার হাত থেকে পেন্সিল পড়ে গেলে চাকর আসত এক তলা থেকে কুড়িয়ে দিতে। আর আজ অত্যন্ত দরকারী কাজ করবার জন্যেও লোক রাখবার ক্ষমতা নেই,—তবু দুর্গার হাসি তেমনই অকারণ, অমনি অবারণ। সত্যিই, অবাক কাণ্ড!

দুর্গার ওখান থেকে বেরুলাম। কফি-হাউসে যেতে হবে। সেন্ট্রাল এভেনিউর কফি-হাউসে দিনান্তে একবার হাজিরা দিতে না পারলে যাদের ভাত হজম হয় না, আমি হ'লাম তাদের একজন।

হলিউড হচ্ছে যেমন ফিল্ম-ম্যান, ফিল্ম-ফ্যান্—উভয়েরই মোক্ষ, মুসলমানদের যেমন মক্কা, হিন্দুর যেমন কাশী, তেমনি যুদ্ধোত্তর কলকাতার প্রধান কেন্দ্র কফি-হাউস।

উকীলের সঙ্গে ব্যারিষ্টরের, ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের, সিঁড়ির সঙ্গে লিফটের যে-তফাৎ, সাঙ্গুভেলীর সঙ্গে কফি-হাউসের পার্থক্যও সেই মাত্র! সাঙ্গুভেলীতে চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসা চলে, চেঁচিয়ে ডাকা চলে বয়কে। এখানে বয়দের অঙ্গে বাবুদের চেয়ে দামী পোষাক, টেবিলের ওপরের কাচ আয়নার চেয়ে ঝকঝকে বেশি ওখানে ভীড় কেরাণীর, এখানে আসে বিসনেস ম্যান, অফিসের বস, বড়লোক বাবার বেকার ছেলে। সাঙ্গুভেলী-তে ধার রাখা চলে, কফি-হাউসে টিপস্ না দিলে উর্দিপরা বয়েদের হাত কপাল পর্যন্ত ওঠে না কিছুতেই।

আগে মাদ্রাজ থেকে আসতো শুধু ট্রেনো, এখন আসছে কফি। কফি-গন্ধে ইতোমধ্যেই উতলা হয়েছে কলকাতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অদ্বিতীয় অবদান এই ইণ্ডিয়া কফি হাউস। এখানে এলেই বোঝা যায় বাঁচার কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন কিছুর নেই লক্ষ্মীশ্রী, সবাই কেমন ছন্নছাড়া। পরবার নেই রুচি, বলবার ভাষা জগাখিচুড়ী, আলোচনার বিষয় সিনেমা। ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরের যথার্থ প্রতীক আজকের কলকাতা। কফি-হাউস তার যথার্থ প্রতিবিম্ব।

টি ফর টু, কিন্তু কফি ফর too many. তাই চায়ের কাপে কখন কখন তুফান উঠলেও, কফির পেয়ালায় Fun-ও জমে না ভালো করে। কফি-তে ঘুম নষ্ট করে কী না জানি না কিন্তু খেলে উৎসাহ বৃদ্ধি করে এমন কথা বিজ্ঞাপনেও বলা বড্ড বাড়াবাড়ি। তবুও কফি-হাউস টিঁকে গেল কলকাতায়; এবং এখন শুধু চা আর সিগারেট নয়, কফি না খেলেও এখন বাঁচা শক্ত। মঘা-অশ্লেষা ত' আছেই, তবু তৃতীয়টি না হ'লে কি তাকে ত্র্যহস্পর্শ বলা চলত? এই কফি-হাউসে ঢুকেই আমার চোখ খুলেছে প্রথম, কাণ সব সময়ে সজাগ থাকবার পেয়েছে ট্রেনিং।

সকালে দরজা খোলবার এবং রাতে বাতি নিবে যাবার আগে পর্যন্ত কারুকে-কারুকে এখানে দেখা যায় কখন কফি খাচ্ছে, কখন খাচ্ছে না, সিগারেট এই পুড়ছে, এই পুড়ছে না; কিন্তু চুপ করে বসে নেই এক মুহূর্ত। সবাই কথা বলছে। এক কথা, এক লোক, এক জায়গায়। স্থান-কাল-পাত্রে নেই কোন প্রভেদ। একটা চাপা গুঞ্জন উঠছে সব সময়। কাজের কথা নয়, অকাজের কথাও নয়, শুধু কথার জন্যে কথা।

কলকাতায় অনেক রাতেও ট্রাম-বাস ফাঁকা হয় না, কখন কখন দাঁড়িয়ে যেতে-আসতেও মেলে না জায়গা। কফি-হাউসেও খালি সীটের সংখ্যা সব সময়েই আঙুলে গোণা যায়। দেখে-শুনে তাই ভাবতে ইচ্ছে করে কলকাতার বেশ কিছু লোক বুঝি ট্রামে-বাসেই থাকে, কফি-হাউসেই বুঝি দশ-পাঁচটার চাকরী তাদের।

দুটি প্রধান কফি-হাউস কলকাতায়। একটি এ্যালবার্ট হলে, আরেকটি সেন্ট্রাল এভেনিউ-তে। এ্যালবার্ট হলে যারা ভীড় করে, তারা ছাত্র-ছাত্রী—দেশের ভবিষ্যৎ। সেন্ট্রাল এভেনিউতে নিয়মিত এ্যাটেণ্ডেন্স যাদের, তাদের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই এবং তাদের বর্তমান হচ্ছে অতীতে কি ঘটেছিল সেই স্মৃতির রোমন্থন মাত্র। দু' দলেরই সমান আকর্ষণ কফি-হাউসে। এক দলের নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার। আরেক দলের বর্তমানকে ভুলে থাকার।

কফি-হাউসের বিচিত্র জগতে চিত্র কম, চরিত্র বেশি। আমাদের টেবিলে এসে বসতেন গোবর্ধন বাবু। প্রথমে বুঝতে পারি নি, পরে অবশ্য নিঃসন্দেহ হয়েছি, ভদ্রলোক একটি বস্তু। কী একটা গল্প বলেছিলেন, তাতে সম্ভবত হাসাবার প্রয়াস ছিল। আমরা না হাসায়, ভদ্রলোক গল্পটা আবার বলে এবারে আর ভুল করলেন না, ঠিক জায়গায় এসে ইংরেজিতে মনে করিয়ে দিলেন, Mark the humour. তার পরে গোবর্ধন বাবু আরেক দিন বলছেন: The man fell into the ditch ভদ্রলোক খানার মধ্যে পড়ে গেলেন—সারা গায়ে কাদা, mud all over his body—এবং বলেই, সেই সঙ্গেই, প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বললেন: মার্ক দি হিউমার। কিন্তু চূড়ান্ত হ'ল সেই দিন, যেদিন কে একজন ওমলেট আনতে বলায় বয়কে ভদ্রলোক নিজের অজান্তেই বলে বসেছেন: ওমলেট খেতে গিয়ে আবার গুবলেট ক'র না যেন।—এবং আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেছি: Mark the humour.

গোবর্ধন বাবু সেই থেকে আসা বন্ধ করলেন। এখনও আর আসেন না।

কিন্তু Mark the Humour, ভুলতে পারি না, যখনই এদেশে ইংরেজী কি বাংলায় রস-রচনা নামক এক প্রকার রচনার সঙ্গে হয় সাক্ষাৎ। আমাদের খবর-কাগজের পাতায় পরিবেশিত কারুর সরস টিপ্পনি যদি একবার ভুলক্রমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পাঠিকার করে মনোরঞ্জন, তবে আর রক্ষে নেই! যা মাসে একবার পড়লে সত্যি আরেক বার পড়তে ইচ্ছে করে, বড় জোর সপ্তাহে একবার করে পরিবেশিত হলেও নিরাশ করে না হয়ত, তাই ছাপা হয় প্রত্যেক দিনে কাগজে আধখানা ক'রে দু'টি কলামে বিভক্ত হ'য়ে। নেবু বেশি নিংড়লে তেতো হ'য়ে যায়। রবার বেশি টানলে ছেঁড়ে। আর রসগোল্লা বেশি চিপলে শুধু রস বেরিয়ে যায় না, হাত নোংরা করে।

সেন্ট্রাল এভেনিউ-র কফি-হাউসে কেবিন নেই, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে গেলে আসন সংরক্ষিত আছে সর্বদাই। ভেবে পাই না কি আনন্দে রমণীকুলের সঙ্গে ওই হাটে গিয়ে বসা। নির্জনতায় যাদের সঙ্গ সত্যি রমণীয়, জনতায় তারা শুধু রমণীমাত্র। আধুনিক কালের

বিনোদিনী বলতে পারেন সবেগে, কেন মেয়েদের সঙ্গে প্রেমালাপ ছাড়া চলে না কি অন্য আলোচনা? নিশ্চয়ই চলবে, না হ'লে সংসার হবে অচল, প্রয়োজন বস্তুটার থাকবে না দরকার, প্রেম হবে না দুর্লভ। মায়ের স্নেহের তিরস্কার, বোনের প্রীতির ভাই-ফোঁটা, গৃহিণীর সাংসারিক কথাবার্তা—কিছু না হলেই দিনযাত্রা অসম্পূর্ণ, কিন্তু প্রিয়ার সঙ্গে কথা শুধু ভালোবাসার, প্রিয়াকে লেখবার মত শুধু প্রেমপত্র। ইনটেলেকচুয়াল তর্কেই যার অস্তিত্ব নির্ভর, সে মহিলা, কিন্তু মেয়ে নয়। তার আলো থাকতে পারে, উত্তাপ নেই। কার্ল মার্কস বলতে বিহ্বল হয় যদি কোন মেয়ে সে—বিদুষী হতে বাধ্য, কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় তার পাশ মার্কসও জুটবে কী না, এমন গ্যারান্টি দিলে তা হয় প্রতিজ্ঞা করবার মত, যা নাকি করাই চলে, রাখা চলে না প্রায়ই।

কফি-হাউসের বিরতিহীন কলগুঞ্জনে সেদিন গলা মেলাতে পারছিলাম না কিছুতেই। থেকে-থেকেই চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল দুর্গা। এখনকার দুর্গাকে সবে দেখেছি। এখনও বাকী আছে দেখবার। সে বৃত্তান্তর উদ্ঘাটন হবে অল্প অল্প ক'রে ক্রমশ। মনে পড়ছিল দুর্গার প্রথম জীবনের দিনগুলো। তখন তার প্রথম যৌবনের রোদনভরা বসন্তের রঙীন দিন। লোয়ার সার্কুলার রোডের সেই বাড়ী ছিলো বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় ঠিকানা। সেখানে আসে নি বাংলা দেশের, অন্য প্রদেশের এমন কি বিদেশের এমন কোনও খ্যাতনামা কেউ ছিলো না সেদিন। বাংলা দেশের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর পাওয়া যেত সে বাড়ীতে।

দাস-দাসী, লোক-লস্কর, গাড়ী-ঘোড়ায় গমগম করত দুর্গার দাদামহাশয়ের প্রাসাদ, উদ্ধত-বিনয়ে যার নাম দিয়েছিলেন তিনি পর্ণকুটীর। সেই বাড়ীতেই কিশোরী থেকে তরুণীতে পদার্পণ করল দুর্গা। আর ভালোবাসল একটি সকলের চোখে সাধারণ ছেলেকে। তার নাম নীলমণি। ঐ বাড়ীর তুলনায় সে কেউ না, কিছুই না। কিন্তু প্রেম অন্ধ। সে সাধারণের মধ্যে আবিষ্কার করে অসাধারণকে, অসামান্য বলে দেখে অতি সামান্যকে। তাই দুর্গা খুঁজে পেল নীলমণির মধ্যে, তাই যা দুষ্মন্ত খুঁজে পেয়েও ভুলেছিলেন শকুন্তলার মধ্যে। দুর্গার কণ্ঠস্বর ছিল বাদ্যযন্ত্রের মত নিটোল। নীলমণি তাই তাকে দুর্গা বলে ডাকত না, ডাকত বীণা বলে। সেদিন নীলমণি তার ডায়েরীতে লিখেছে:

> নীলমণি, সে হাসির খনি
> যখন-তখন হাসত।
> তাকেই কিনা, গাইয়ে বীণা
> ভীষণ ভালোবাসত।
> যখন হ'য়ে, হয়নি বিয়ে,
> তখন দু'জন ক'রত কূজন,
> (যখন তখন) যেত এবং আসত।
> নীলমণি, সে হাসির খনি,
> (শুধু শুধুই) কাঁদার কথায় হাসত।
> সবুজ চিঠি কি নীল খাম!
> আখর ত নয় ক্রিসানথিমাম,—
> বীণার চোখের নীলমণি যে
> দেখত শুধু নীলমণি যে,
> বাকী সবাই আছে কী নাই
> কী-ই বা যেত আসত?

[ক্রমশঃ।

ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা

[বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী]

প্রবাদ আছে—লক্ষ্মী ও সরস্বতী না কি এক স্থানে থাকেন না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না, তা-ও নয়। তবে যেখানে এর ব্যতিক্রম ঘটলো, সেটাই একটি বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে উঠে। সেদিক থেকে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা একটি অপূর্ব্ব বিস্ময়! তাঁর মাঝে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই-ই পাশাপাশি বিরাজমান। তিনি যেমন এক জন বাণীর বরপুত্র তেমনি ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীষও বর্ষিত হ'য়েছে তাঁর উপর অকৃপণ ভাবে। অপর দিকে তিনি এক জন আদর্শ বাঙ্গালী ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যেমন তাঁর অবদান অপরিসীম-তেমনি-ব্যবসা ও বাণিজ্য- ক্ষেত্রেও তিনি স্থাপন করেছেন এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

কলকাতার বিখ্যাত লাহা-পরিবারে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ডক্টর নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রাজা হৃষীকেশ লাহা ছিলেন এক জন স্বনামধন্য পুরুষ। বাল্যকালে পূজ্যপাদ পিতার সস্নেহ প্রভাব তাঁর উপর এসে পড়ে আপনি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে তাঁর ঝোঁক গেল তখন থেকেই। স্কুল-জীবনে তিনি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন এবং কলেজ-জীবনে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন প্রতিটি পরীক্ষাতেই। ১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন এবং ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টর অব ফিলজফি ডিগ্রীতে ভূষিত হন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ডক্টর লাহা আজীবন চেষ্টা করে আসছেন। তিনি বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন তিনি ১৯২৫ সাল থেকে। এ পত্রিকাটি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেছে তাঁর বলিষ্ঠ সম্পাদনায়। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত নাই। কলকাতায় তাঁর নিজ ভবনে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছেন তিনি এবং এ গ্রন্থাগার দেখবার জন্য এসে থাকেন দেশ-বিদেশের বহু লোক। তিনি এক জন ছাত্র-দরদী.বহু ছাত্র তাঁর নিঃস্বার্থ সাহায্য পেয়ে জীবনপথে এগিয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক জন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের তিনি সভাপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন বহু বৎসর। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাসিক পত্র "আর্থিক উন্নতির" প্রকাশনায় তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন।
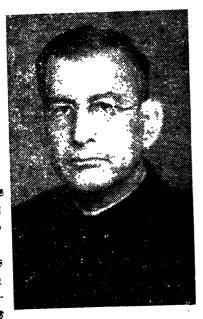
ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা

ব্যবসা ও বাণিজ্য-জগতে ডাঃ লাহা প্রচুর সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন এবং ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর পরিবারগত ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে। তিনি বহু কোম্পানী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর কিম্বা চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ডিরেক্টার-বোর্ড ও কলিকাতায় ডিরেক্টার-বোর্ডের তিনি সদস্য ছিলেন বেশ কয়েক বৎসর। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি। ইহার পূর্ব্বেও তিনি কয়েক বৎসর উক্ত বণিক-সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পসভা ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

সমাজসেবী হিসেবে ডক্টর নরেন্দ্রনাথের অবদান সামান্য নয় তিনি দেশ ও জাতির স্বার্থে যখনই সুযোগ পেয়েছেন এগিয়ে আসতে ইতস্ততঃ করেননি। তিনি লণ্ডনে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বহু কাল। কর্পোরেশনের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ষ্ট্যাণ্ডিং-কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন পাঁচ বছর। কয়েক বৎসর ডাঃ লাহা কলিকাতা পোর্টের কমিশনার ছিলেন।

১৯৪১ সালে কলকাতার শেরিফের আসন অলংকৃত করেন তিনি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি, প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্য নির্দ্ধারণ কমিটি, বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি, তদন্ত কমিটি, বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা) অর্থ তদন্ত কমিটি প্রভৃতি বহু সরকারী কমিটিতে চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে কাজ করেন এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই। বর্ত্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন বোর্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনের এক জন সদস্য। প্রায় ২০ বৎসর ধরে তিনি কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। মাসিক সুবর্ণবণিক সমাচারেরও তিনি সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন দীর্ঘ কাল যাবৎ।

মানুষ হিসেবে ডক্টর লাহা দেশবাসীর নিকট একটি দৃষ্টান্তস্থল। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সারল্য ও মানবপ্রীতি তাঁকে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করে তুলেছে। দেশ ও জাতির এখনও তাঁর কাছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক কিছু পাওয়ার আছে। এ বিশ্বাস আমরা রাখবো।

ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী]

এক জন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্ ও সমাজসেবী হিসেবেই আধুনিক বাঙ্গালায় ইনি সুপরিচিত ও বিশেষ সমাদৃত। কিন্তু এ মানুষটির ভিতরেই যে একটি বিপ্লবী সাধকের জীবন রয়েছে, তা হয়তো তেমন ততখানি বড় করে দেখা হয় না। অথচ এক দিন ছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে অস্ত্রধারণ করতে ইনি ইতস্তত: করেন নি। তার জন্য কম লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। জীবন গঠনে বহু মূল্যবান দিন কেটেছে তাঁর কারান্তরালে, কিম্বা অন্তরীণ অবস্থায়। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়ন তাঁর জীবন-সাধনাকে ব্যর্থ করতে পারেনি, তাই দেখতে পাই, ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় আজকের দিনে এক জন সফলকাম পুরুষ—এক জন কৃতী ও প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী।

১৩০৫ সালের ১৭ই বৈশাখ ডাঃ অমূল্যধন জন্মগ্রহণ করেন ২৪ পরগণা জিলার নিমতা গ্রামে। মাতামহ স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে। পিতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সে সময় ছিলেন পাঞ্জাবের আম্বালা রেলওয়ের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল-অফিসার। প্রারম্ভে কয়েক বৎসর তাঁর কাটে পিতার কাছে। মাত্র সাত-আট বছর যখন তাঁর বয়স, সে সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয় এবং এ আন্দোলনের ঢেউ পাঞ্জাবেও গিয়ে পৌঁছে। এ সময় পাঞ্জাবস্থ বাঙ্গালী সমাজের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী হরিনাথ (কিশোর) মুখোপাধ্যায় এবং লালা লাজপত রায়, সর্দ্দার অজিত সিং, সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রমুখ বিশিষ্ট দেশকর্ম্মিগণ তাঁর পিতার গৃহে প্রায়ই মিলিত হতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং দেশের অন্যান্য প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের তখনকার গভীর আলোচনা তাঁর বাল্য-জীবনের উপর অলক্ষিতে বিশেষ রেখাপাত করে।

পিতা বদলি হলেন বলে তাঁর সঙ্গে ডাঃ অমূল্যধনকে চলে আসতে হয় কলকাতায় ১৯১০ সালে। এখানে এসে তিনি ভর্ত্তি হলেন "ক্যালকাটা একাডেমী স্কুলে"। এক বছর পরে এ স্কুল ছেড়ে তিনি ভর্ত্তি হন বলরাম দে ষ্ট্রীটের শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায়। তাঁর বিপ্লবী জীবনের-কার্য্যত: দীক্ষা হয় এ পাঠশালায় অধ্যয়নের সময়ই। তখনই তিনি সুযোগ পেলেন শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভূপতি মজুমদার প্রমুখ বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার। ইত্যবসরে তিনি বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "যুগান্তর" বিপ্লবী দলের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে পড়েন এবং আত্মনিয়োগ করেন একনিষ্ঠ ভাবে বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপে।

শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকেই ডাঃ মুখোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯১৪ সালে। তার পর তিনি ভর্ত্তি হলেন ক'লকাতারই বঙ্গবাসী কলেজ আই, এস, সি শ্রেণীতে। এখানে তিনি যখন পড়ছেন, সে সময় বিখ্যাত শিবপুর রাজনৈতিক-ডাকাতির মামলা ব্যাপারে তাঁর ও তাঁর সহকর্ম্মীদের উপর পুলিশের কড়া কোপদৃষ্টি পড়ে। বাধ্য হ'য়ে তাঁকে চলে যেতে হয় বিদ্যাসাগর কলেজে কিছু দিনের জন্য। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭—এ কয়টি বছর তিনি দেশের বিপ্লবী কর্ম্মসংস্থার সহিত সক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিপ্লবী নেতাগণ এরই ভেতর কারারুদ্ধ হ'লে তাঁদের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের অর্থ যোগানের দায়িত্ব তাঁর উপরেই এসে পড়ে। ১৯১৭ সালে তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে (বর্ত্তমান নীলরতন মেডিকেল কলেজ) ভর্ত্তি হন চিকিৎসক হ'বেন বলে।

ভর্ত্তি হওয়ার এক মাস কাল মধ্যেই কয়েকটি রাজনৈতিক মামলা সম্পর্কে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ভারতরক্ষা আইনে। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকায় তাঁকে ১৯১৮ সালে ৩ আইনে তাঁকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক করে রাখা হয় দেড় বৎসর কাল। তার পর কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলেও তাঁকে কিছু কাল আটক অবস্থায় কাটাতে হয়। ১৯১৯ সালে জেল থেকে তিনি মুক্তি পেলেন, কিন্তু তাঁকে অন্তরীণ করা হলো মুর্শিদাবাদের গ্রামে। এ বছরেরই শেষ দিকটায় তাঁকে অন্তরীণ-আবদ্ধ করা হয় তাঁর গ্রামে। মণ্টেগু সংস্কারবিধি প্রবর্ত্তন হলে পর ১৯২০ সালে রাজবন্দীদের ব্যাপক মুক্তি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ছাড়া পেলেন। সরকারী নির্ম্মম লাঞ্ছনা

ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

সত্ত্বেও ডা: মুখোপাধ্যায় তাঁর এগিয়ে যাবার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হননি। ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুনরায় ভর্ত্তি হলেন সেই ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে। ১৯২৩ সালে এখানকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালেই হাউস-ফিজিসিয়ানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডা: উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর অধীনে। এক বছর এ ভাবে যখন কাটলো তখন তিনি চলে এলেন নব অনুমোদিত ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে শরীরতত্ত্ব বিভাগের "ডিমোনেষ্ট্রেটর" হ'য়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করেন স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা। অল্প দিন মধ্যেই সুচিকিৎসক হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সর্ব্বত্র! পরে তিনি উক্ত স্কুলের সহকারী-শিক্ষকের মর্য্যাদাও লাভ করেন। ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল ও ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল—এ দুটোকে মিলিয়ে ১৯৫১ সালে যে একটি নতুন মেডিকেল কলেজের সূচনা হয়, তাতে তাঁরই ছিল অগ্রণী ভূমিকা।

সুদূর পাঞ্জাবে শৈশবে যাঁর মনে দেশসেবায় বীজ উপ্ত হয়, উত্তর কালে দেখা গেল জাতীয় প্রত্যেকটি আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত রয়েছেন। ডা: অমূল্যধন ১৯২০ সাল থেকে বরাবর কংগ্রেসে রয়েছেন। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ, আগষ্ট আন্দোলন—মুক্তি-সংগ্রামী জাতির এ চরম পরীক্ষার দিনগুলোতে তিনি পিছিয়ে থাকেন নি এতটুকু। রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে তাঁর সমাজ-সেবার একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। দুর্গত দেশবাসীর কল্যাণ কল্পে যখনই তিনি যে কাজের আহ্বান পেয়েছেন, তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দ্বিধাহীন ভাবে। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আজও নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল লাইসেনসিয়েট এসোসিয়েশনের তিনি দুই বার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উক্ত এসোসিয়েশনের মাসিক পত্রিকা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল জার্ণালের পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি বহু দিন এ পত্রিকাখানির সম্পাদকের কার্য্য করেন। তাঁরই পরামর্শ অনুসারে ভারত সরকার ১৯৪৬ সালের ৭ই এপ্রিল ভারতীয় লাইসেনসিয়েট চিকিৎসকগণকে কমিশণ্ড মেডিকেল অফিসারের মর্য্যাদা দান করেন। এটি ভারতীয় চিকিৎসা-জগতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ১৯২৮ সালে যাঁদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। ডা: মুখোপাধ্যায় দু'বার এ প্রতিষ্ঠানের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন এবং কয়েক বছর এ সংস্থার পরিচালিত 'ইওর হেল্‌থ' মাসিকপত্রের সম্পাদনা করেন। "চিকিৎসা-জগত" নামে বাংলা ভাষায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আরও একটি পত্রিকা পরিচালিত হয় তাঁরই বলিষ্ঠ সম্পাদনায়। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গল কাউন্সিল অব মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটিরও তিনি সভ্য ছিলেন দীর্ঘ কাল। ১৯৪৩ সালে চিকিৎসা বিষয়ক মৌলিক অবদানের জন্য ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির অনারারি ফেলোসিপ অর্পণ করা হয়। ২৪ পরগণা কংগ্রেস, জেলাবোর্ড, স্কুল বোর্ড এবং লোকাল বোর্ড, বারাসত মহকুমা কংগ্রেস প্রভৃতি সংস্থায় তিনি নেতৃত্ব করেছেন বহু দিন।

ভারতীয় চিকিৎসা-জগতে ডা: অমূল্যধনের অবদান অসামান্য। বাঙ্গালা তথা ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে দুই প্রকারের শিক্ষামান চালু থেকে দুই শ্রেণীর চিকিৎসক যাতে সৃষ্টি না হয়, পরন্তু চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একই মান প্রবর্ত্তিত হয়ে যাতে একটি বলিষ্ঠ চিকিৎসক-সমাজ গড়ে উঠতে পারে, তার জন্য তিনি অক্লান্ত প্রয়াস নিয়েছেন। এবং তাঁর সে প্রচেষ্টা ফলবতীও হয়েছে শেষ পর্য্যন্ত। এ সংস্কারের জন্য এবং যুদ্ধকালীন চিকিৎসকগণকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপারে তাঁর যে অমূল্য অবদান, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহু কাল।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে ২৪ পরগণার বারাসত কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে ডা: মুখোপাধ্যায় বিপুল ভোটাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে উপমন্ত্রী নির্ব্বাচিত করেন এবং ভার অর্পণ করেন তাঁর উপর পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের। এক বৎসর পরই তিনি রাষ্ট্র-মন্ত্রীর মর্য্যাদায় ভূষিত হন এবং চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের জন-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন কল্পে নতুন নতুন পরিকল্পনানুযায়ী যথেষ্ট কাজ করেছেন ও করছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং সফলকামও হয়েছেন প্রচুর। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে গ্রীসের এথেন্সে যে বিশ্ব চিকিৎসক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ সময় তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং সে দেশের হাসপাতাল ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-সংস্থা সমূহ পরিদর্শন করে আসেন।

ডা: অমূল্যধনের জীবনের সাফল্যের মূলে রয়েছে প্রধানতঃ তাঁর মায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা। দুঃখের বিষয়, তিনি যখন মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ সে সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাঁকে এ কঠিন বিয়োগব্যথাও সহ্য করতে হয়। আজও পর্য্যন্ত তিনি নিরলস ভাবে জাতির সেবা করে চলেছেন। এরূপ এক জন কর্ম্মব্রতী ও সেবাপ্রাণ মানুষকে পেয়ে দেশবাসীর গৌরব বোধ করবার নিশ্চিত কারণ রয়েছে।

জি, বসু

[রোটারী ক্লাবের সভাপতি ও বিশিষ্ট নাগরিক]

সত্যিকারের কর্ম্মী পুরুষ ইনি একজন। জীবনপথে এগোবার আর্থিক সম্বল খুব বেশী ছিল না কিন্তু কর্ম্মে প্রথম থেকেই নিষ্ঠা, উত্তম ও অধ্যবসায় ছিল বলেই আজ তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ। কর্ম্মের সাধনা আজও পর্য্যন্ত চলেছে তাঁর অব্যাহত ভাবে। যুব-বাঙ্গালার সম্মুখে এদিক থেকে জি, বসু একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত রামানন্দ বসুর বংশে (বর্দ্ধমান জেলা) শ্রীবসু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালের অক্টোবর

মাসে। বর্দ্ধমান সহরে তাঁর প্রারম্ভিক পড়াশুনো শেষ হওয়ার পর তিনি চলে আসেন ক'লকাতায় এবং স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান থেকে ১৯২০ সালে তিনি ডিগ্রী লাভ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তার পর নিজকে কাবোর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেন। দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে তিনি চলে গেলেন বিলেতে এবং ১৯২৪ সালে ইনকর্পোরেটেড একাউন্টেন্টের লোভনীয় ডিপ্লোমা অর্জ্জন করেন। ইংলণ্ডে থাকা কালীন তিনি 'কোম্পানী সেক্রেটারী শিপ' পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং সেখানে তিনটি বাণিজ্য বিষয়ক পরীক্ষায়ই প্রথম স্থান অধিকার করে মর্য্যাদায় ভূষিত হন।

১৯২৪ সালেই শ্রীবসু ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসেন স্বদেশে এবং বি, বসু এণ্ড কোম্পানী নামে একটি অডিটার ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি আজকের দিনে ক'লকাতার একটি শ্রেষ্ঠ, চা'টার্ড একাউন্টেন্সীর ফার্ম্ম। একাউন্টেন্সী সংক্রান্ত তাঁর জ্ঞান যে কত অপরিসীম, নানা ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হ'য়েছে বহু দিন পূর্ব্বেই। দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, কম ও এম কম শ্রেণীতে একাউণ্টেন্সী ও অডিটিং বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজেও 'কস্ট একাউণ্টস্'এর অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন তিনি এবং শিক্ষকতা কার্য্যে সর্ব্বত্রই প্রচুর সুনামের অধিকারী হন। তাঁর বহু ছাত্র আজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন ও করছেন।

শ্রীবসুর সাফল্যময় কর্ম্মজীবনে আরও অনেক কৃতিত্বের ছাপ র'য়েছে। তিনি একজন চ্যাটার্ড সেক্রেটারী। ইংলিষ্ট ইনষ্টিটিউট ভারতে যখন তাঁদের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরে ভারতীয় সমিতির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৪ সালে তিনিই অগ্রণী হ'য়ে 'ইনষ্টিটিউট অফ কস্ট এণ্ড ওয়ার্কস্ একাউন্টেন্টস্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি এখনও এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। পাবলিক একাউন্টেন্ট হিসেবে তাঁর নাম যখন ছড়িয়ে পড়লো, তখন সরকারও তাঁর মর্য্যাদা প্রদানে ইতস্তত: করলেন না। সরকার কর্ত্তৃক গঠিত পাবলিক একাউন্টস্ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে উপদেষ্টা বা সদস্যরূপে তাঁকে গ্রহণ করা হয়। ইণ্ডিয়ান একাউন্টেন্সী বোর্ডে প্রায় ১৪ বৎসর কাল তিনি সদস্য ছিলেন। দেশের একাউন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং বহু সমাজ-কল্যাণ সংঘ সমিতির সহিত শ্রীবসু ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত রয়েছেন। ক'লকাতার তিনটি প্রধান বণিক-সভার তিনি সদস্য। ভারতীয় বণিক-সভার তিনি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং একাউন্টস্ লাইব্রেরী ও একাউন্টস্ ক্লাবের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য। কলকাতা রোটারী ক্লাবের তিনি বর্ত্তমান সভাপতি।

জি, বসু

সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হ'লে কি কি সদ্গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন, শ্রীবসু জাতির সম্মুখে তাই তুলে ধরেছেন আপন কর্ম্মদীপ্ত জীবনে। মানুষ হিসেবেও তিনি আদর্শ—তাঁর অমায়িক ব্যবহার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়বোধই তাঁকে এতখানি জনপ্রিয় করে তুলেছে। একাউন্টস্ বিষয়ে তাঁর যে মৌলিক অবদান হয়েছে, দেশবাসীর পক্ষে তা ভুলে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট সমাজ-হিতব্রতী ও স্বদেশসেবী]

একরূপ অবাক হয়ে যেতে হয়, এ মানুষটিকে দেখে। বনেদী জমিদার-কুলে জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু জমিদারী মনোবৃত্তি বা আভিজাত্য বোধ তাঁকে স্পর্শ করেনি কোন দিন। পরন্তু দেখা গেল, দেশ ও জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে তাঁর মানস প্রাণ বরাবর সাড়া দিয়ে আসছে। জমিদার হয়েও জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য অগ্রণী হয়ে এলেন তিনিই—এটা কম কথা নয়। সত্যিই উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় এদিক থেকে শুধু উত্তরপাড়ারই নয়, সমগ্র বাঙ্গালার গৌরবস্থল।

শ্রীঅমরনাথ ১৯০২ সালে উত্তরপাড়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজবংশে উত্তরপাড়ার রাজবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন অগ্নিযুগের আবহাওয়ায় তাঁর পূজ্যপাদ পিতা অগ্নিযুগের অন্যতম হোতা কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিছরী বাবু) ও পিতামহ তৎকালীন সমাজের অন্যতম কর্ণধার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনি (শ্রীঅমরনাথ) পরিবর্দ্ধিত হন। বাল্যজীবনেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। এর পর পিতামহের স্নেহছায়ায় তিনি বড় হতে থাকেন। ১৯২৩ সালে পিতামহের পরলোক গমনে জমিদারী পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব তাঁর উপরই এসে পড়ে।

উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয়েই শ্রী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পড়াশুনো। স্কুলের পড়া শেষে উত্তরপাড়া কলেজ (বর্ত্তমান রাজা প্যারীমোহন কলেজ) ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর ছাত্র-জীবন কাটে। ছাত্র-জীবনেই স্বদেশী কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বিখ্যাত তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি যুক্ত

রইলেন সক্রিয় ভাবে। এ আন্দোলন নিয়েই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁর পিতা কর্ম্মবীর রাজেন্দ্রনাথের আহ্বানে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরপাড়ায় আগমন করেন দুই বার।

পল্লী ও সমাজসেবা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ব্যাপারে শ্রীঅমরনাথের যে অবদান, নানা দিক থেকে তা গৌরব করার মত। সুদীর্ঘ ২৫ বছর হুগলী জেলা-বোর্ডের সদস্য, উত্তরপাড়া পৌরসভার সভাপতি, বঙ্গদেশের সমবায় সংস্থার অন্যতম নেতা, হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য, উত্তরপাড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, দেবানন্দপুর শরৎ স্মৃতি সমিতির কোষাধ্যক্ষ, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং হুগলী জেলা তথা বাঙ্গালার বহু সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ক্রীড়া ও রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে অকুণ্ঠ হস্তে অর্থদান করে দেশ ও জাতির নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে আসছেন তিনি। উত্তরপাড়ার অবলুপ্ত-প্রায় সংস্কৃতির ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁর আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে বহু কাল থেকে।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমুখোপাধ্যায় দেশের বহু শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। বক্তা হিসেবে তিনি যেমন বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন, অপর দিকে তিনি এক জন অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী। তাঁর বাসভবন "রাজেন্দ্র বিশ্রাম"-এ দেশের বহু বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, জননায়ক ও শিক্ষাব্রতীর সমাগম হয়ে আসছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে (নেতাজী) তিনি উত্তরপাড়ায় এক মহতী সভায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন ১৯৩৭ সালে। দেবানন্দপুরে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এবং উত্তরপাড়ায় কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে যাঁরা অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম অগ্রণী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর তিনি এক জন আজীবন সদস্য এবং দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ ধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও বঙ্গদেশের রেডক্রশের আজীবন সদস্য।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধনে শ্রীঅমরনাথের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। জমিদারী প্রথাকে আঁকড়ে রাখবার জন্য অপর সকল জমিদারই যখন ব্যস্ত, তখন তাঁদের বিরাগভাজন হয়েও তিনি এগিয়ে আসেন এর অবসানের দাবী নিয়ে। আবার দেখা গেল সরকার কর্ত্তৃক জমিদারী বিলোপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে যখন জমিদারী সেরেস্তার হাজার হাজার কর্ম্মচারী বেকার হয়ে পড়বার কারণ ঘটলো, তখনও তিনি এগিয়ে এলেন তাঁদের কর্ম্মসংস্থানের আন্দোলনে। উত্তরপাড়ার স্বর্গত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শতাধিক বছরের পুরাতন হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ও অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅমরনাথের স্বাদেশিকতা বরাবরই সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবর্জ্জিত। ইংরেজ আমলে এক বার তাঁকে প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তৎকালীন শাসন নীতির প্রতিবাদে তিনি তা পরিহার করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সরকার পুনরায় তাঁকে শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করে তাঁকে দান করেন তাঁর প্রাপ্য মর্য্যাদা। সমাজ ও দেশের সেবায় তাঁর উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। জাতির কল্যাণে তিনি আরও অনেক অবদান রেখে যেতে পারবেন, এ নিঃসন্দেহ।

উদয়ভানু

ইষ্ট-কুটুম কারও আর জানতে বাকী থাকলো না।

আপ্ত-পর জানাজানি হয়ে গেছে। পাড়া-পড়শীর মধ্যে কানাকানি হয়েছে, স্বর্ণ-পিঁড়ে থেকে আঁস্তাকুড়ে ঠাঁই হয়েছে অপ্সরা রাজকুমারীর। অতি-সুন্দরীর বর মেলে না, অতি-ঘরন্তীর ঘর মেলে না—অধিক বাতীর আলোয় শুধুই চোখ ঝলসায়। রাজমাতার বুকে যেন তুষের আগুন জ্বলে। দিনের আলো স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীতে আসে পড়শী-রমণী, বিলাসবাসিনীর দোসর যত। পাড়াবেড়নীর দল জড় হয় রাজমাতার মহলের উঠোনে। ভাল-মন্দ শুধোয়, কুশল জিজ্ঞেস করে। থেকে থেকে উসকে দেয় তুষের আগুন। প্রবোধবাক্যি শুনিয়ে কোথায় সান্ত্বনা দেবে বিলাসবাসিনীকে, নিবিয়ে দেবে তাঁর বুকের আগুন, ভুলিয়ে রাখবে গালগল্প শুনিয়ে—তা নয়। ছাই-চাপা-আগুনে ফুঁ দেয় আরসি না বঁড়শির মত ঐ খল পড়শীরা। রাজমাতার যতেক সই—সাগর, মকর, গঙ্গাজল, বেলফুল, আমসত্ব। কেউ কেবল পাতানো সই!

ঘাটে গিয়েছিলেন রাজমাতা। ক'টা ডুব দিতে গিয়েছিলেন।

উঠে দাঁড়ালে পায়ে ভর সয় না। কোমরে-কাঁকালে বাতের ব্যথা। বেতো পা টনটনিয়ে ওঠে। রক্তের উর্দ্ধ-চাপে কপাল টিপ-টিপ করছে, দুই চোখ রক্তবর্ণ। মাথায় জল না পড়লে, অবগাহন স্নান বিনা এ কষ্টের লাঘব হবে না। দাসীদের কাঁধ ধ'রে ধ'রে, ধীরে ধীরে ঘাটে গিয়েছিলেন বিলাসবাসিনী। কোন রকমে ক'টা ডুব সেরে ফিরে এসেছেন ভিজে-কাপড়ে।

খাসমহলের উঠোনে পাড়াবেড়ানীদের দেখতে পেয়ে প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলেন মনে মনে। পোড়ামুখ দেখাতে বুঝি বা লজ্জা পেয়েছিলেন! অন্তঃকরণটা জলে গিয়েছিল আরেক বার। বিলাসবাসিনী মরছেন নিজের জ্বালায়, শরীরও বইছে না আর। সইদের দেখে তবু মুখে হাসি ফোটালেন অতি অল্প। বললেন,—পান-তামাক খাও ভাই! আমি আসি ভিজে কাপড় ছেড়ে।

দরদ যেন উথলে ওঠে আয়নার মত ঐ খল-পড়শীদের। কাজ এগিয়ে দিতে বসে কেউ কেউ। হাতের কাজ সেরে দিয়ে যাবে উপ্‌রিপড়া হয়ে। কেউ জাঁতা ঘুরিয়ে চলে ঘ্যানর ঘ্যানর। ডাল-কড়াই ভেঙে, গম পিষে দিয়ে যাবে। কেউ চাল বাছতে বসেছে। ধান আর চাল আলাদা করছে। কারও হাতে বা কুলো, নাচিয়ে নাচিয়ে ধুলো ফেলছে মশলাপাতির।

কে ঢুকেছে ঢেঁকশালে। ঢেঁকির মুখে বসেছে। ধান ভাণছে।

কে মকর আর কে বেলফুল! ফুলের মতই পবিত্র কে, আর কে বা মকরের মতই ডুবে ডুবে জল খায়!

রাজমায়ের দুঃখের ভাগীদার আছে কেউ কেউ। আবার এমন আছে, যারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপন আপন কোঁচড় ভরছে। কোল-আঁচলে ফেলছে চাল-ডাল-মশলা।

উঠোনে পানের ডাবর বসিয়ে দিয়ে গেল এক দাসী। রুপোয়-বাঁধানো থেলো হুঁকো ধরিয়ে দিয়ে গেল আরেকজন। জলের ঘটি আর পিকদানি বসিয়ে দিয়ে গেল।

উঠোনের তিন দিকে উচ্চ প্রাচীর। এক দিকে রাজমায়ের মহল।

পাঁচিলের বাধা মানেনি ফুল ফলের গাছ। অনধিকার প্রবেশের মত, শাখা মেলেছে পাঁচিলের বাইরে থেকে। আমের শাখায় কচি কচি আম। কলার শাখায় কলার ঝাড়। পেঁপের গাছে পাকা পেঁপে।

ডুব-ডুবু সূর্য্যের আঙরা-লাল রঙ। গাছে গাছে পাখীর কিচিরমিচির। যেন থেমেও থামে না। রাজমায়ের উঠোন জাঁতা-ঘোরানো কুলো নাচানোর শব্দে যেন মুখর।

আমের শাখায় হনুমানের দল। কাঁচা আম দাঁতে কাটছে আর ফেলছে উঠোনে। রাজমায়ের মহলে।

—চলতে-ফিরতে জোর পাই না পায়ে। নড়তে-চড়তেই বেলা পুইয়ে যায়।

সদ্যস্নাতা বিলাসবাসিনী কথা বললেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন দালানের চাতাল থেকে। অদৃশ্য হয়েছিলেন, দেখা দিলেন আবার। মেঘ-ওড়ানো বাতাস এসে রাজমাতার তসরবস্ত্রের লুটানো আঁচল উড়িয়ে দেয়। পিছু পিছু আসে পরিচারিকা ব্রজবালা। ব্রজর হাতে পশমের আসন।

হাতের কাজ ছেড়ে ফিরে তাকালো পড়শী-মেয়েরা। জাঁতা থেমে গেল। কুলোর নাচন থামলো।

থেলো-হুঁকোয় টান দিয়ে যায় সাগর। এক হাতে নাকের নৎ তুলে ধ'রে তামাক খেতে থাকেন। সাগর এয়োস্ত্রী। তাঁর টাক-পড়া মাথায় সিঁদুরের রেখা। বিলাসবাসিনীর কণ্ঠ কানে যেতেই তিনিও হুঁকো নামালেন মুখ থেকে। মুখ ফেরালেন। বললেন,—আমার সাগরের মুখ বিষণ্ণ কেন?

ব্রজবালা উঠোনের মধ্যিখানে আসন পেতে দিয়ে গেছে।

রাজমাতা আসনে বসলেন না। উঠোনের দালানে বসলেন, পা ঝুলিয়ে। পুকুর-ঘাটে যেতে আসতে হাঁফ ধরে ঘাম ঝরে গেছে। ঘামে-ভেজা মুখ আঁচলে মুছলেন রাজমাতা। টেনে টেনে শ্বাস নিলেন কয়েকটি। হাঁফের কষ্ট একটু কম হওয়ার পর বললেন,—মন ভাল নাই। সাগর কি আর সেই সাগর আছে? কত জ্বালা সাগরের!

—রাজকুমারী স্বোয়ামীর ঘর খোয়ালে শেষে?

কথা বলতে বলতে মুখে আবার হুঁকো তুললো সাগর। নাকের নৎ তুলে ধ'রে হুঁকোর মুখ ঠেকালো।

আবার যেন ঘামতে থাকেন বিলাসবাসিনী। কাল-বোশেখী হাওয়া চলে, তবু তাঁর কপাল ঘেমে ওঠে। মুখে যেন কথা আসে না। খানিক গম্ভীর থাকতে থাকতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুক-ভাঙা।

পড়শী হ'লেও পাতানো সই। তাঁরা কোথায় সান্ত্বনা দেবে, গালগল্প শুনিয়ে কোথায় ভুলিয়ে রাখবে রাজমাতাকে। তুষের আগুন উসকে দিতে আসে—ছাই-চাপা আগুনে ফুঁ দিতে আসে।

বিলাসবাসিনী বললেন,—ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম করে মানুষ। অধর্ম্মের রেহাই নাই।

সাগর বললে হুঁকো সরিয়ে,—লাখো কথার এক কথা কইলে রাজমাতা। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। রাজকুমারীর অপরাধ কি?

—অপরাধ! বললেন রাজমাতা,—বিন্দুর কোন দোষে নয়। কেষ্টরাম ধনদৌলত দাবী করেছে। কথা বলতে বলতে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বললেন,—যাদের সম্পত্তি তারা ছাড়বে কেন? ছোটকুমার তো কিছুতেই রাজী হয় না। ছাড়তে চায় না এক কড়াক্রান্তি।

সইয়ের দল হাতের কাজ বন্ধ করে। ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থ'কে। জাঁতা ঘোরানো আর কুলো নাচানোর শব্দ কখন থেমে গেছে। একে একে উঠে এসে ঘিরে বসলো বিলাসবাসিনীকে।

ডাবর থেকে ক'খিলি পান মুখে পুরলো মকর। পান চিবোতে চিবোতে বললে,—কুলীন যেথা হয় জাতি, কোঁদল সেথা দিবারাতি।

ব্যথাহত হাসি হাসলেন রাজমাতা। আকাশ পানে চোখ তুলে বললেন,—সেই রোগেই ঘোড়া মরেছে। কুলীনকন্যের কপাল যে আটে-পিঠে বাঁধা, কি করি তাই বল'?

সাগর বলে,—কানে আসে কত কথা। জামাই কেষ্টরাম শুনি নাকি চার পাঁচ গণ্ডা বে করেছে?

বিদ্রূপের কটুহাসি ফুটলো মকরের পান-রাঙা মুখে। হেসে হেসে বললে,—কুলীন-সমাজের আচার্য্যি হয়েছেন জামাই?

বাতাসে ঝড়ের পূর্ব্বরাগ। সোঁ সোঁ হাওয়া চলেছে। গাছের মাথা দুলছে। শুকনো পাতা খড়মড় করছে। উড়ো পাখীর পালখ উড়ছে। তবুও ঘিন-ঘিন ঘামছেন বিলাসবাসিনী। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে।

সইদের এক এক কথায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠছে যেন। আকাশে চোখ তুলে ব'সে থাকেন রাজমাতা। জপের ঝুলি হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল ব্রজবালা। জপের মালা। ১০৮ রুদ্রাক্ষর মালা।

সাগর বললে,—তবে তো বেশ হয়েছে। ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল!

ফিক ফিক হাসি হাসলো মকর। তাচ্ছিল্যের হাসি। বললে,—ধনদৌলত আর দাবী করবে না কেন? ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা আমার মোড়ল হয়েছে, হাঁটতে না পেরে তাই পাল্কি চেয়েছে।

কাণে যেন বিষ ছড়ালো বিলাসবাসিনীর।

কারও কোন কথার জবাব দেন না তিনি। কৃষ্ণ-নীল আকাশে চোখ মেলে বসে থাকেন পাষাণমূর্ত্তির মত। বুকের আগুন, তুষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে। ইচ্ছা হয়, লোকজন ডাকিয়ে খেদিয়ে দেওয়াতে এই পড়শীদের।

—সাঁঝ ফুরুলে জপ হবে না আর। যাই, পুজোর ঘরে যাই।

কথা বলতে বলতে এধার-সেধার দেখলেন বিলাসবাসিনী। বিশাল দুই চোখের দৃষ্টিতে কা'কে যেন খুঁজলেন।

—ব্রজ! ব্রজবালা!

দম ফেলবার ফুরসৎ পায় না ব্রজ। উদয়াস্ত লেগে থাকতে হয় তাকে। কাজ আর কাজ। হুকুমের ওপর হুকুম। ফাইফরমাসের শেষ নেই যেন রাজমায়ের। ব্রজবালাকে এক দণ্ড স্থির থাকতে দেন না। চোখের অন্তরালে গেলেই যেন চোখে আঁধার দেখেন।

ব্রজ ছিল আড়ালেই। দালানের কোন্ এক কুঠরীতে সিঁদিয়েছিল। জল-কুঠরীতে গিয়ে ঢকঢকিয়ে এক ঘটি জল খায় ব্রজবালা। কতক্ষণ মুখে জল পড়েনি কে জানে!

জল-কুঠরীতে জলের জালা, সারি সারি।

জলায় যখন জল থাকে না, ইঁদারা যখন শুষ্ক হয়ে যায়, মাঠে যখন ফাট ধরে,—তখন খাল-বিল মরুর আকৃতি ধরে, পুকুরের পৈঠা সার হয়, কুয়োয় শুধু ক্যাদরানি—জল তখন মায়া-মরীচিকা। আকাশে চাতকপাখী ডেকে ডেকে ফেরে। কাক-কোকিল টা-টা করে। বনের পশু আর বসতি মানে না। এক আঁজলা জলের অভাবে কত কার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়!

তবুও এক ফোঁটা জল বর্ষায় না! অনাবৃষ্টির আকাশ আর অজন্মার আকাল আসে। আসে দুঃখের রাত! জলাভাবে মানুষ মরতে থাকে কুকুর বেড়ালের মত। সেই প্রচণ্ড উষ্ণদিনের আশঙ্কায় পানীয় জলের সঞ্চয় থাকে জল-কুঠরীতে।

কুঠরী থেকে বেরিয়ে সাড়া দেয় ব্রজ। বলে,—আসি গো আসি হুজুরণী!

—আমাকে ধরাধরি না করলে কেমনে উঠি!

রাজমাতা বিরক্ত স্বরে কথা বললেন।

—যাই গো যাই। বললে ব্রজবালা,—তুমি যেন উঠতে যেও নি হুজুরণী!

বিলাসবাসিনী ভারী গলায় বললেন,—ভাঁড়ারের সামগ্রী ভাঁড়ারে তোলা হোক। ব্রজ, দাসীদের তোলাতুলি করতে বল্।

সইয়ের দল প্রমাদ গণে। রাজমাতার কথা শুনে ভয় পায় যেন। সঙ্কোচের সলজ্জ চাউনি ওদের চোখে।

ছোট মুখে বড় কথা সহ্য করতে পারেন না বিলাসবাসিনী। মন ব্যাজার হয়। মেজাজ খিঁচড়ে যায়। সইরা বিদায় হ'লে তবুও হয়তো জ্বালা জুড়োয় খানিক। রাজমাতা যা নয় তাই বলতে পারেন তাঁর নিজের জামাইকে। তাঁর সমুখে ব'সে, তাঁর ভিটেয় ব'সে তাঁরই আপন-জনকে অকথা-কুকথা বলবে কি না পাড়াপড়শী!

কৃষ্ণরামকে যা বলবার বলতে পারেন স্বয়ং তিনি। তারা বলবার কে—যাদের চালচুলোর বালাই নেই, মরণের ঠাঁই নেই?

ব্রজর কাঁধে হাত রেখে দালান থেকে উঠলেন বিলাসবাসিনী। কারও প্রতি দৃক্পাত না ক'রে পা চালালেন ধীরে ধীরে।

তসরের কাপড়ে রাজমাতাকে দেখায় অতি পবিত্র। বিরল-কেশ এখন, তবুও পিঠে-ছড়ানো ভিজে-চুলের রাশি থেকে টুপ টুপ জল পড়ছে।

সইয়ের দল একে একে স'রে পড়ে মানে মানে। রাজমাতার যা মুখের আকৃতি হয়েছে, তাঁর সমুখে এখন দাঁড়ায় কার সাধ্য!

কপালজোড়া সিঁদুর-ফোঁটা যেন আকাশের। ডুব-ডুবু সূর্য্যের আগুন-লাল রঙ। তা হোক, তাল তেঁতুল বাবলা মাদার এখনই যেন কত আঁধার সৃষ্টি করেছে। সপ্তগ্রামের কালো মাটি আর স্পর্শ পায় না সূর্য্যালোকের। বটের ঝুরি নেমেছে। দেবদারু শাখা ছড়িয়েছে কত দূরে! কোথায় মাথা তুলেছে আম জাম লিচু! বেলা দ্বিপ্রহরেও আলো হয় কি না হয়।

বড়গাছের ফল কম, অধিক ছায়া। বড়গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্ব্বনাশ! বড় গাছে-ঝড়। তাই বসতি আছে কি না আছে। মানুষের পদচিহ্ন নেই সাতগাঁয়ের এই ছায়াকালো বনাঞ্চলে। আছে যত বন্যপশু, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ।

পথের রেখা আছে। পথে মানুষ নেই।

কত কালের পায়ে-চলা পথ কে জানে! এখন যাওয়া-আসা নেই মানুষের। শুকনো মেঠো-পথে বাঘের থাবার দাগ। ঘোড়ার খুরের রেখা ধূলিমলিন পথে।

ঢাকের বাদ্যি হঠাৎ বাজলো বনপথে। কাড়া-নাকাড়ার সঙ্গে টেমটেমির উঁচু-নীচু আওয়াজে গাছের পাখী যেন ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠলো। বনের পশু ব্যগ্র দৃষ্টি হানে চতুর্দ্দিকে।

ঝড় আসছে যেন। বাঁধ-ভাঙ্গা বান আসছে।

আকাশ-বাতাস-বন কাঁপিয়ে, এমন বাজনা বাজিয়ে, কে আসছে কে? জোরালো এক শব্দের তরঙ্গ আসছে।

সর্ব্বাগ্রে দুই অশ্বারোহী। সশস্ত্র ও নিশানাধারী। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অঙ্কিত রেশমের গৈরিক পতাকা তাদের হাতে। কৃষ্ণরামের কীর্ত্তিপতাকা। সপ্তগ্রামের দুর্গম পথে চলেছেন কুলাচার্য্য কৃষ্ণরাম। হস্তিপৃষ্ঠে চলেছেন। সারি সারি শস্ত্রধারী অশ্বারোহী পিছু পিছু চলে। তাদের কারও কারও হাতে পানপত্রাকৃতি বিচিত্র অস্ত্র। সকলেরই বাম কটি থেকে সকোষ তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলছে।

অশ্বসারির পেছনে খাসবরদার, আসাবরদার, চোপদার, জমাদার, পদাতিক, সিপাহী। মশাল হাতে মশালচি।

সপ্তগ্রামের চার ক্রোশ উত্তরে পরমানন্দ রায়ের বসবাস। পরমানন্দ নৈকষ্য কুলীন, প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। রায়ের দুই কন্যা বর্ত্তমান। দু'টি অনূঢ়া।

কনে দেখতে চলেছেন জমিদার কৃষ্ণরাম।

সুরূপা না কুরূপা দেখতে চলেছেন। সুলক্ষণা না কুলক্ষণা। কৃষ্ণরাম বধূরূপে ঘরে আনবেন দু'জনাকে—যদি না মনে ধরে। আর যদি চোখে লাগে, হয় যদি ঠিক মনের মত!

মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার ও যুগপৎ বাদ্যধ্বনি।

—জমিদার কৃষ্ণরামের জয়!

সম্মিলিত জয়ধ্বনির সঙ্গে জগঝম্প আর ডাসাকড়কা বেজে উঠলো। গাছের শাখে ভীরু-পাখী পাখা ঝাপটালো। অন্ধকার বনের গহ্বরে ছুটলো বরাহ, শৃগাল, নেকড়ে। আত্মগোপন করলো বনের গহনে।

সসাজ হাওদার 'পরে কৃষ্ণরাম। বনে দেখতে চলেছেন বন-বাদাড় কাঁপিয়ে।

তাল তেঁতুল বাবলা মাদারের কালোছায়া আঁধার ভেদ করে চলেছে জমিদারের সাঙ্গোপাঙ্গ। শুষ্ক মেঠো-পথে অশ্বের পদধ্বনি উঠছে।

কৃষ্ণরাম ইতি-উতি দেখেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। মুখে হাসি ফুটিয়ে। মনের আনন্দে চলেছেন যেন। কনে দেখার আনন্দে। নিকষ-কুলীন পরমানন্দ রায়ের দুই কন্যা, কেমন কে জানে? সুশ্রী না বিশ্রী, গৌর না কৃষ্ণ, পূর্ণিমার ভরাজোয়ার না মরাগাঙ!

ঠোঁটের কোণের চাপা হাসি হঠাৎ অদৃশ্য হয়। কি-যেন দেখলেন আর থ হয়ে গেলেন। কৃষ্ণরামের চোখে স্থির দৃষ্টি। এত আগ্রহে কি দেখছেন!

শুকনো পাতার খড়খড়ানি কানে আসে। একটি খেঁকশিয়ালি, বন থেকে বেরুলো আর দৌড় মারলো লেজ উঁচিয়ে। ভয়ে পালিয়ে গেল। খেঁকশিয়ালির মুখে ঝুলছে কি এক শিকার। হয়তো সদ্য মারা।

জমিদার কৃষ্ণরামের স্থির চোখের বিস্ময় কাটে না যেন। মুখের আনন্দ-হাসি মিলিয়ে গেছে। দৃষ্টি প্রসারিত করলেন কৃষ্ণরাম, ঐ তীরগামী অরণ্যচারীর পিছনে। খেঁকশিয়ালির মুখে কি দেখলেন কৃষ্ণরাম!

বললেন,—মাহুত, হাতী থামাও!

হঠাৎ কথা বললেন কুলাচার্য্য। কেমন যেন কড়া হুকুমের সুরে বললেন।

রঙ্গলালের অশ্ব পাশে এসে দাঁড়ালো। রঙ্গলাল বললে,—এই শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে কি প্রয়োজন?

—তিষ্ঠ তিষ্ঠ! বললেন কৃষ্ণরাম। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতী আর হাওদা ন'ড়ে উঠলো বারেক। বললেন,—কাছাকাছি কি মনুষ্যালয় আছে?

রঙ্গলাল বলে,—আপাতদর্শনে মনে হয় না তেমন। তবে—

—সিপাহীদের তল্লাসী করতে হুকুম দাও।

কেমন যেন গম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণরাম বললেন। খেঁকশিয়ালি তখন কোথায় গা ঢেকেছে, আর দেখা যায় না।

জগঝম্প আর কাড়ার বাদ্যি থেমে যায়। টেমটেমি আর বাজে না। থেকে থেকে শিহরণ আসে। খেঁকশিয়ালির মুখের শিকার দেখে কৃষ্ণরামের মত জনও শিহরিত হন। চোখের পলক পড়ে না। অঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে। অশ্বারোহী সিপাহী আর পদাতিক, মুক্ত তরবারি উঁচিয়ে গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে সন্ধান করতে যায়। জমিদার কৃষ্ণরাম অঙ্গুলি সঙ্কেতে দিক-নির্দ্দেশ করে মাত্র।

রঙ্গলাল ও অন্যান্য সহযাত্রী বিস্ময়ে হতবাকের মত ব'সে থাকে। লক্ষ্য করে জমিদারের হাব-ভাব। কৃষ্ণরাম যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছেন।

খেঁকশিয়ালির মুখের শিকার কি মনুষ্যের দেহাংশ! কি দেখতে কি দেখলেন কে জানে!

নিমেষের মধ্যে টগবগিয়ে ফিরলো এক অশ্বারোহী। উঁচানো তরবারি কোষে পুরতে পুরতে বললে,—জনাব, আছে ক' ঘর ছাউনি! হুকুম না মিললে ছাউনির ধারে যেতে ভরসা হয় না।

হাতী ততক্ষণে চার পা মুড়ে বনের পথে ব'সে পড়েছে।

হাওদা থেকে নামতে উদ্যোগী হ'লেন কৃষ্ণরাম। হাওদার হাতল ধ'রে এক লম্ফে নামলেন মাটিতে। বলেন,—চল যাই, দেখি গিয়ে, কে কোথায় মরে!

গাছের পাখীর কিচির-মিচির আর যেন কাণে আসে না। তাল তেঁতুল বাবলা মাদারের কালো আঁধারে থেকে ভয় হয় যেন ডাকাডাকি করতে। দিনের পাখী অন্ধকারে ডরায়, আলো না ফুটলে আর ডাকবে না। দূরে দূরে কোথায় কোন্ আড়ালে লুকিয়ে ডাকে রাতের পাখী। বাবলার বনে প্যাঁচা ডাকছে থেকে থেকে। বিশ্রী কর্কশ ডাকের প্রতিধ্বনি ওঠে দিকে দিকে।

মশালের আলোয় বনাঞ্চলে যেন আগুন ধরলো। দাবানল জ্বললো যেন! গাছে আগুন ধরলো যেন। শুকনো পাতার স্তূপে মশাল ধরিয়েছে মশালচি। আগুন ধরিয়েছে উড়ো-পাতার জঞ্জালে। আঁধারে আলো জ্বালিয়েছে।

গোলপাতার ছাউনি ক' ঘর। যেন পড়ো পড়ো। ক' ঘর ছাউনি গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন ক্রমে। বাঁশ-বাখারির কপাট-দুয়োর যেন জরাজীর্ণ, ঘুণ-ধরা। উইয়ের ঢিপি ছাউনি ক'টার আশ-পাশে।

মনুষ্যের পদশব্দ হয়তো কাণে পৌঁছয়। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখা যায়, আরও ক'টা শৃগাল—ছাউনির মুক্ত দুয়োর ভেদ করে, চম্পট দেয় যে যেদিকে পারে। বাবলা-বনে আলো কেন আবার! বেণার বনে মুক্তো! খড়োচালায় ঝাড়লণ্ঠন!

কৃষ্ণরামের যেন ভয়-ডর নেই। বেপরোয়ার মত সর্ব্বাগ্রে এগিয়েছেন। পায়ের তলে শুকনো পাতা খড়খড় করে। গোলপাতার ছাউনিতে আছে যেন যখের গুপ্তধন! শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল, খেয়াল নেই—কি এক আবিষ্কারের নেশা যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে!

সিপাহী, অশ্বারোহীর কারও মুখে কথা নেই। যেন প্রতিবাদের ভাষা নেই, বাধা দেওয়ার শক্তি নেই। শুধু তাদের শ্বাসত্যাগের শব্দ পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করে তারা।

কোন্ এক সিপাহীর তরবারির ঝনৎকার শুনে ফিরে দাঁড়ালেন কৃষ্ণরাম। দেখলেন, এক বৃক্ষশাখা থেকে ঝুলন্ত এক অজগর! মশালের তীব্র আলোয় দেখা যায়, সরীসৃপের তৈলচিক্কণ আকৃতি—সাপের ভয়াল মুখ-ব্যাদান।

সিপাহী তরবারির আঘাত হানে অজগরের দেহে। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ক্ষুরধার তরোয়াল চালায়।

আরেক বার শিউরে উঠলেন কৃষ্ণরাম। সাপের

ফোঁসফোঁসানিতে বনজঙ্গল অস্থির হয়ে ওঠে। বাসায় পাখী পাখা ঝাপটায়। একজোড়া বুনো রামপাখী ঝোপের ঝাড় থেকে বেরিয়ে আরেক ঝোপে লুকিয়ে পড়লো। দেবদারু আর বাবলা গাছের শাখায় শাখায় ঝুলন্ত বাদুড়ের ঝাঁক, উড়ে পালালো দলে দলে। ক্ষণেক থেমেছিল দূরের ক্ষুধার্ত্ত প্যাঁচা। আবার ডাক ধরলো একে একে। যত আঁধার নামে তত যেন সুখ। অন্ধকার যত ঘন হয় তত দৃষ্টি খুলবে চোখের। একদৃষ্টিতে শিকার ধরা পড়বে; ছুঁচো-ইঁদুর চোখে পড়বে।

তরোয়ালের ঘায়ে ময়াল মরে না। এক অশ্বারোহীর বর্শা বিঁধলো অজগরের বুকে। দেহে যত শক্তি আছে সবটুকু দিয়ে বর্শা চালালো তীরের বেগে।

হাতের বর্শা হাতে ফিরে আসবে। অস্ত্রের মায়া ত্যাগ করলো অশ্বারোহী। যেমনকার তেমনি রইলো অজগরের বুক-ফোঁড়া বর্শা। শূন্যে ঝুলে-পড়া ময়াল, যন্ত্রণায় অধীর হয়ে শূন্যে ছোবল চালাতে থাকে। অসহ্য অস্ত্রাঘাত থেকে যদি মুক্তি পাওয়া যায়।

ধারালো ফলা বর্শার তীরমুখের। সূচ্যগ্র। ঐ ভয়ঙ্কর অজগর অস্ত্রবিদ্ধ হওয়ায় শ্বাস ফেললেন যেন কৃষ্ণরাম। বললেন,—আইস, যাই দেখি কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্!

উইয়ের ঢিপি। ওকড়া, দুব্বোঘাস আর বিছুটি এখানে-সেখানে। ধুতরোর ঝোপ। ফণী-মনসার ঝাড়। শুকনো পাতার স্তূপে বনভূমির মাটি আর নজরে পড়ে না।

আদাড়ে-কচুর মিশ্‌কালো জঙ্গলের ওপার থেকে সাঁই-সাঁই দমকা হাওয়া আসছে। এক করালকালো অদৃশ্য ছায়ামূর্ত্তি যেন, এলোকেশ ছড়িয়ে গিলতে আসছে। আদাড়ে-কচুর জঙ্গলের ওদিকে আছে সাতগেঁয়ে ভূতের বাসা। ভূতকে ভূতে ভয় পায় না, তাই আছে অনেকগুলো। ভূত আর পেত্নী। প্রেত আর প্রেতিনী। আর ঝাঁক-ঝাঁক জোনাকি।

ভূতুড়ে কাণ্ড বোঝা দায়! রজলাল নড়েও না চড়েও না। রাম-নাম আওড়ায়। জমিদার কখন ফেরেন, সেই আশায় পথ চেয়ে থাকে। নেশা কেটে যায় মদিরার।

গোলপাতার ছাউনিগুলো গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধর, মাটি আঁকড়ে আছে। ঘরের দাওয়ায় ভাঙ্গাফাটা মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি পোড়া মাটির। কোদাল, ঝাঁটা আর লাঙলের ফলা।

দমকা বাতাসে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠোকাঠুকি হয়। গাছপালা দুলতে থাকে! পাতার মর্মরাণি অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত শোনায়!

আশ্চর্য্যই বটে!

দাওয়া পেরিয়ে ঘরের দুয়োরে পৌঁছে আর এগোতে পারলেন না কৃষ্ণরাম।

অনুচর সিপাহী বললে,—জনাব ফিরে আসেন। দুর্ভিক্ষের আসামী ওরা। ওলাউঠো রুগী।

ক্ষুধা আর তৃষ্ণার অনলে-পোড়া শীর্ণকায়দের মুখে কথা নেই। মশালের উজ্জ্বল আলোয় ওদের কুঠুরে-চোখে আলোর বিন্দু ফুটলো। কত কালের পরে যেন আলো দেখেছে চোখে।

মৃত শিশু মৃত জননীর বুকে আঁকড়ে আছে! অন্ন-কাঙালের মরণ হয়েছে। মরতে বসেছে তাই চেয়ে আছে যেন ঘরপানে। ঘরের পুরুষের মরণকাল উপস্থিত। চিৎ হয়ে পড়ে আছে নির্জীবের মত। মরণকালে হরিনামের কেউ নেই আর! মরামানুষ কথা কয় না! স্ত্রী-পুত্র শব মাত্র।

খেঁকশিয়ালির দল এসেছিল, মরা টেনে নিয়ে যেতে। শেষকৃত্য করতে।

পুরুষ যতক্ষণ পেরেছে বাধা দিয়েছে, শিয়ালের পালকে রুখেছে। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই ছুড়ে ছুঁড়ে প্রতি-রোধ করেছে। শেষকালে অনাহারে ক্লিষ্ট দেহে নড়নচড়নের শক্তি নেই আর। কোদাল, লাঙলের ফলা, হাঁড়কুঁড়ি, ডেয়ো-ঢাকনা যা পেয়েছে ছুঁড়েছে! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কেটে গেছে নির্জলা উপোসে। আজ রাতে আর বোধ হয় রেহাই নেই, যমের হাত থেকে। খেঁকশিয়ালি পুরুষের একটি পা কেটে নিয়ে গেছে।

মরণ নিকটে যার কি করে ঔষধ তার!

কৃষ্ণরাম আরেক বার শিউরে উঠলেন মুমূর্ষুকে দেখে। অস্থিসার মৃতা জননীর বুকে মৃত শিশুকে দেখে। মরণের নেই যেন ধরণ।

—জল!

কৃষ্ণরামের একটি মাত্র কথা। উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি ভাসলো।

সিপাহী বললে,—এই বনে-বাদাড়ে জল! কোথায় মিলবে হুজুর? জলার জলে বিষের পোকা।

হতাশার শ্বাস ফেললেন কৃষ্ণরাম! কপালের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই প্রথম দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, আকালের মরণের পথের যাত্রীদের দেখেছেন।

ক্ষেতে ধান হয় না। জলে বাড়ে ধান, কিন্তু আকাশ জল দেয় না। ধানের তুল্য ধন নেই। ধান না হলে মান থাকে না, জান থাকে না। অকাল অজন্মায় মৃত্যু বৈ পথ নেই।

কৌতূহল, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ—উবে যায় যেন কর্পূরের মত। গাছের পাতার খড়খড়ানি যেন আর ভাল লাগে না। কোথায় কারা মিহি সুরে কাঁদে। নাকের সুরে। গোঙানি-কান্না কাণে আসে কৃষ্ণরামের। আরও ক'টা পাতার ছাউনি আছে আশ-পাশে। দেখতে আর মন চায় না যেন। বিকার আসে মনে। কে হয়তো কোন ঘরে মরতে বসেছে। ক্ষুধার জ্বালায় কাতরে কাতরে মরছে। মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্টে কাঁদছে করুণ-করুণ। কৃষ্ণরাম ফিরলেন। মশালের আলো আগে আগে চললো। যে-পথে এসেছিলেন সেই সঙ্কীর্ণ পথে এগোলেন। কৃষ্ণরাম কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছেন ভরা-গাম্ভীর্য্যে। যেন তিনি মূক!

অপূর্ব্ব পরিচিত, পথহীন ও নিবিড় বনমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে

পথভ্রান্তি জন্মে। দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত প্রদোষ-তিমিরাচ্ছন্ন বনপথ এতই সঙ্কীর্ণ যে, সহজে লক্ষ্যে পড়ে না। মশালের তীব্র আলোয় পথের সন্ধান মেলে। বনভূমির বহুদূর দৃষ্টিপথে দেখা যায় যতদূর চোখে পড়ে দেখা যায় শুধু দীর্ঘ বৃক্ষরাজি ও উদ্ভিদ-গুল্মের ঝোপ। কোথাও গ্রাম নেই, আশ্রয় নেই, মানুষ নেই, আহার্য্য নেই, জল নেই। বাতাসের গতি যেন তিলেক মন্দ হয়। গাছপাতার গুঞ্জন মৃদুতর হয়। ঝিল্লীর ডাক শোনা যায়। রাতের আঁধার ঘন হয়। রজনী গভীরা হয়।

ঐ তো নভোমণ্ডল। রাতের কালো আকাশ। নীরব লক্ষ তারাগুলি, দপ-দপ জ্বলছে। নিরাশ চোখে।

কৃষ্ণরাম নির্ব্বাক, বিষণ্ণ, বিস্ময়াবিষ্ট। তাঁর চলার গতি অতি দ্রুত। পদক্ষেপের ভারে মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো রঙ্গলাল। চোখের অন্ধকার ঘুচলো এতক্ষণে। কুলাচার্য্যকে কাছাকাছি আসতে দেখে বললে,—

—মহাশয়, এ বড় ভয়ঙ্কর স্থান! ঐ দেখেন আলেয়ার নাচন।

যেদিকে আদাড়ে-কচুর বন, সেদিকে যেন কয়েকটি অগ্নিস্তম্ভ জ্বলছে। নিবছে আর জ্বলছে থেকে থেকে।

হাতীর পিঠে আমাড়ী-হাওদায় উঠলেন জমিদার কৃষ্ণরাম। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তাঁর। হাঁফ ধরছে যেন। বললেন শুষ্ক কণ্ঠে,—চল, গৃহে ফিরি। অন্য আর নয়।

জগঝম্প বাজলো আবার। ঢাকে কাটি পড়লো। টেমটেমি বাজলো। হাতী উঠে দাঁড়ালো।

রঙ্গলাল বললে,—পরমানন্দ রায়ের কি দুর্ভাগ্য! কুলাচার্য্যের পদধূলি পড়ে না তাঁর গৃহে। পথে বাধা পড়ে। সেজে-গুজে বসে থাকে হয়তো পরমানন্দের দুই কন্যা।

হাতী উঠলো। ঘোড়া চললো। সিপাহী আর পদাতিকরা অনুসরণ করলো। কৃষ্ণরাম বাক্যহীন বিস্ময়ের ঘোরে। সপ্তগ্রামের মেঠো পথ গমগম করতে থাকে যেন। পথ বন্ধুর। শুধু চড়াই আর উৎরাই। আঁকাবাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো। ঢাকের বাজনা, হাতীর গলঘণ্টা ও অশ্বের পদশব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে। রঙ্গলালের অশ্ব চলে হাতীর পাশাপাশি। রঙ্গলালের ভয় যেন দূর হয় না। ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি তার চোখে। সে ভয়ে-ভয়ে বলে,—কুলাচার্য্যের সাহস তো কম নয়! এই দুর্গম অরণ্যে মানুষে প্রবেশ করে না।

দুর্ভিক্ষের আসামী দেখেছেন কৃষ্ণরাম। আকালের ওলাউঠো রুগী। মৃতা জননীর বক্ষে মৃত শিশু। মরণকান্না শুনেছেন স্বকর্ণে। মৃত্যুযন্ত্রণার করুণ-কাতর গোঙানি। কৃষ্ণরামের চক্ষু স্থির হয়ে আছে। অসীম গাম্ভীর্য্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন তিনি।

রঙ্গলাল বলে,—মহাশয়, গড়-মান্দারণের কথা একটি বার স্মরণ করেন। সেস্থানেও এরূপ ভয়াবহ বনজঙ্গল। অকাল আর অজন্মা। ভূত-প্রেতের বাস।

কান্তরকান্নায় গোঙানি, ভৌতিক আলাপচারী না বাঁশবনের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ,—ঠিক ধরা যায় না। কৃষ্ণরাম কেমন যেন উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। রঙ্গলালের কথা কানে যাওয়ায় আরও যেন স্তব্ধ হয়ে পড়লেন তিনি। সপাঙ্গ হাওদার আসনে হেলে পড়লেন ধীরে ধীরে।

গড়-মান্দারণ ভাসলো কৃষ্ণরামের দৃষ্টিপথে। স্মৃতির পটে।

কত কাল গমনাগমন নেই মান্দারণে। আসমান বিবির মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি আর যাওয়া-আসা নেই।

গড়-মান্দারণের দুর্গোপম প্রাসাদপুরী বর্ত্তমানে ভগ্নপ্রায়। আসমান-দীঘির কাকচক্ষু জল পানায় পরিপূর্ণ।

সহসা মনে পড়লো আর ছাঁৎ করলো বুক। কে যেন আছে মান্দারণের সেই ভগ্ন-আলয়ে। আছে নির্জ্জনবাসে, নজরবন্দী কে এক অবলা নারী—যার রূপজ্যোতিতে চোখ যেন ঝলসে যায়। মনের চাঞ্চল্যে উঠে বসলেন কৃষ্ণরাম। সেই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তিকে যেন চোখের সমুখে দেখতে পেয়েছেন। বিপুল কেশভার বিন্যাসহীন, বেণীর বন্ধন নেই; অনিন্দ্য মুখমণ্ডলে অলকাবলীর প্রাচুর্য্য; আকর্ণবিস্তৃত আঁখিযুগলে সাগরবক্ষে কম্পমান চন্দ্রকিরণলেখার মত স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল দীপ্তি। শুভ্র দেহরঙ্গে বিমলশ্রী।

সেই অবলা নারীর দোষ কি! ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণরামের মন যেন কোমল হয়। অর্থ আর ভূ-সম্পত্তির লোভ যেন মুছে যায় মন থেকে। বিন্ধ্যবাসিনীকে মনে পড়ে।

জোর-কদমে হাতী চালিয়েছে মাহুত। সপ্তগ্রামের মেঠো-পথের শুষ্কমাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় হাতীর পদাঘাতে। ধূলি উড়তে থাকে তেজী অশ্বের পদচালনায়।

রাজকুমারী কেমন আছে কে জানে! জমিদার-নন্দিনী সুখে আছে না দুখে আছে কে বলতে পারে! অস্থৈর্য্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেন কৃষ্ণরাম। এক ভাবে যেন বসতে পারেন না অধিকক্ষণ। পাশ থেকে রঙ্গলাল আবার কথা বলে। বললে,—রাজকুমারীর পিত্রালয় থেকে কোন সমাচার কি মিলে নাই?

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলালেন কৃষ্ণরাম। মুখে কোন কথা বললেন না।

রঙ্গলাল বললে,—নাপতিনী ভালয় ভালয় ফিরলে হয় সুতানুটী থেকে! কুলাচার্য্যের প্রতি যদি কৃপা করেন শ্বশুরকুল! যদি বেহাত করেন কিছু ধনসম্পত্তি!

—কৃপাভিক্ষা আমি করি না। এ আমার দাবী। অধিকার। সহসা বললেন জমিদার, ভাবগম্ভীর কণ্ঠে। বলেন,—রাজকুমারীর দুই সহোদর সহজে রাজী হওয়ার পাত্রই নয়।

—সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না কুলজ্ঞ? রঙ্গলাল অশ্বপৃষ্ঠ থেকে কথা বললে। জগঝম্প আর তাসাকড়কার উচ্চ-নিনাদে তার কথা বুঝি চাপা পড়লো! সপ্তগ্রামের উঁচু-নীচু পথ ধ'রে এগিয়ে চললো হাতী, ঘোড়া আর পদাতিক। মশালচি আগে আগে চললো আলো দেখিয়ে।

রাতের আঁধার যেন থরো থরো কাঁপতে থাকে

বাদ্যধ্বনিতে। গাছের শাখায় পাখীরা পাখা ঝাপটায় ভয়ে ভয়ে। বনের পশু থমকে থাকে। আদাড়ে-কচুর জঙ্গলের পরপার থেকে সাঁই-সাঁই বাতাস উড়ে আসে।

সুতানুটীর রাজগৃহের নাচঘরে ঝাড়বাতি জ্বলেছে আজ! নানা রঙের বেলোয়ারী ঝাড়লণ্ঠনে নানা রঙের আলো জ্বলছে মোমবাতির। কিংখাবের পর্দ্দা ঝুলছে বন্ধদ্বার নাচঘরের সদ্য উন্মুক্ত দ্বারে-বাতায়নে। কালো ভেলভেটের গালিচা বিছানো হয়েছে ফরাসে। জুওলা-জরির তাকিয়া পড়েছে কতগুলো। নাচঘরের চার দেওয়ালের বৃহৎ আকার আয়নায় ঝাড়আলোর প্রতিবিম্ব পড়েছে। ফুলদানিতে সাজানো ফুল—গোলাপের তোড়া রকম রকমের। লাল, সাদা, গোলাপী, হলুদ রঙের গোলাপের স্তবক। গালিচার মধ্যিখানে সোনার তারের আতর দান। খস্ আতরের খুশবু বইছে নাচঘরে। আসর জাঁকিয়ে বসেছেন রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর, আশ-পাশে বসেছে ইয়ার-মোসায়েব। সুরার পাত্র আর পেয়ালা কয়েক জোড়া, বসিয়ে দিয়ে গেছে খাস্ খানসামা। সহাস্যে কালীশঙ্কর বললেন,—নর্ত্তকী, পেয়ালা ধরো সরাপ ঢালি।

দু'জন ইরাণের রাণী—ফরাসের এক প্রান্তে তাকিয়ায় এলিয়ে পড়েছে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ওদের ফিকে-বেগুনী-রঙের ঘাঘরা চেকনাই তুলছে। জরি-জড়ানো লম্বা বিনুনি সোনার চিকণ তুলছে। সুর্ম্মাঘষা চোখে চটুল হাসির ঝিলিক খেলছে। নিরেট আঁটসাঁট বুক যেন রূপের গর্ব্বে স্ফীত হয়ে আছে। সূক্ষ্ম গোলাপী অধরে টেপা-টেপা হাসি।

রূপোর বালা-পরা হাত তুললো একে একে। নাচঘরে দুধে-আলতা রঙ খেললো ওদের দেহবরণের। হাসির আভা ঠিকরালো। গোলাপী গালে টোল ফুটলো। সুর্ম্মাঘষা চোখে এখনই জাগলো যেন মদির চাউনি।

ডুগি-তবলায় চাঁটি পড়লো। হাতুড়ীর ঘা পড়লো। সুর বাঁধাবাঁধি চললো সারেঙ্গীর সুরে সুর মিলিয়ে। তবলচি আর সারঙ্গীর মুখে তবক-দেওয়া পান উঠলো আপাতত।

দূরে দাঁড়িয়ে খাস খানসামা গোলাপ জল ছিটোয় পিচকিরী থেকে। দুই ইরাণীর রুখু রুখু কোঁকড়া চুলে যেন শিশিরের বিন্দু পড়লো। না কি হীরার কুচি বর্ষণ করলো খানসামা!

রাজা স্বহস্তে সরাব ঢেলে দেন পেয়ালায়। অল্প ঢালতে কত বেশী ঢেলে দেন চুয়ানো মদিরা।

আগে পানাহার, তার পর নাচানাচি। নেশা না জমলে কে নাচ দেখবে? মরে-যাওয়া নেশা চাগিয়ে নিতে হয়।

রাজাবাহাদুর নিজেও পেয়ালা তুললেন মুখে। এক এক চুমুক খান আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন ঐ তাত্রিজ-কন্যাদের। দেখেন, কি অপরূপ সুঠাম দেহ! কেমন অটুট যৌবন! কত রূপ!

মোসায়েবের দল রাজাবাহাদুরের আশ-পাশে। ফিসফাস কথা কয় পরস্পরে। যেন এ ওর গা শোঁকাশুকি করে। পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য যেন চোখের সম্মুখে! তাই কারও কারও চোখে যেন ব্যগ্রবিহ্বল দৃষ্টি। আদেখলার মত তাকিয়ে আছে ফ্যাল-ফ্যাল।

বাতাসের সঙ্গে যেন লড়াই করে কিংখাবের ঝুলানো পর্দ্দা। বৈশাখের এলোমেলো টাটকা হাওয়া দুয়োরে দুয়োরে হানা দেয়। যুঁই, বেল আর চামেলীর গন্ধ বহন করে আনে। তবুও বাধা দেয় পর্দ্দা, পথ ছাড়ে না।

পৃথিবী যেন ভুলে যান রাজা বাহাদুর। ফিকে বেগুনী-রঙ ঘাগরার আবরণে সুস্পষ্ট দেহরেখা দেখে দেখে মোহে যেন আচ্ছন্ন হ'তে থাকেন। বেদুইনের রূপ কমনীয় কত! ওদের আদুড় পা ফর্সা যেন ডিমের মত।

ঘন নীল জেড্ পাথরের অলঙ্কার ইরাণীদের। বালা, তাবিজ আর কানফুল। গলায় কালো অনিক্সের মালা। সোনালী কেশে কাঠের পাশ-চিরুণী। হাতে রূপোর আঙটি। পেতলের ঘুমুর পায়ে।

রাজা বাহাদুর পান-পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন। লাল ভেলভেটের একটি থলি ছিল হাতের কাছেই। মুখের ফাঁস আলগা করে থলিতে হাত ভরলেন কালীশঙ্কর। হাতে যা উঠলো তুললেন। ঝাড়ের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো রাজার হাতের আঁজলা! জৌলুস ঠিকরালো ঠিক সূর্য্যের মত।

দু'জনের তরে দু'ভাগ। একেক জনের হাতে দিলেন একেক ভাগ। বললেন,—এই লও উপহার, আসল পাবে পরে।

হাত পাতলো ইরাণীরা। পরম লোভে হাত পাতলো। ভিক্ষা চাইলো যেন মুখে হাসি ফুটিয়ে। ওদের শুভ্র হাত যেন ভ'রে দিলেন কালীশঙ্কর। দিলেন একেক ছড়া কণ্ঠহার ছাঁকা হীরার। রত্নাগার থেকে বের করিয়ে রেখেছিলেন আগে থেকে।

মেওয়ার রেকাব থেকে একটা আখরোট তুলে মুখে দিলেন রাজা বাহাদুর। কয়েকটা পেস্তা মুখে ফেললেন। চর্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—কত দাম, যদি কিনে লই দু'জনাকে!

দলের ছিল এক দলপতি। দুই ইরাণীর এক মাতব্বর। জাতে আরবী। চিবুকে হাত বুলিয়ে সে বললে,—দো দো হাজার শিক্কা রূপেয়া।

রাজা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন মৃদু মৃদু। পেয়ালা তুললেন মুখে! জল চলকে চলকে উঠলো পেয়ালায়।

এক মোসায়েব রাজার কাণে কাণে বললে,—হুজুর, দু'টো কেন? একটাকে নেন।

—উঁহুঁ!

অসম্মতি প্রকাশ করলেন রাজাবাহাদুর।

মোসায়েব বললে,—তবে কি একটাকে দান করবেন?

রাজা বললেন,—দান গ্রহণের পাত্রটা কে?

আমতা আমতা করতে থাকে মোসায়েব। হাতে হাত কচলায়, বলে—কেন হুজুর, ছোটকুমার বাহাদুর আছেন। ওনাকেই দেন একটা।

কটাক্ষপাত করেন কালীশঙ্কর। ক্রুদ্ধ চোখে দেখেন বারেক। ভর্ৎসনার ভঙ্গিমা দেখা দেয় রাজার মুখে। রাজা বললেন,—অন্যায় কও কেন! কালীশঙ্কর তেমন মানুষই নয়। যাও গিয়ে ব'সগে।

ভয়-পাওয়া নির্লজ্জ লোকটি নকল হাসি হাসতে হাসতে ফিরে গিয়ে বসে পড়লো।

অনেকক্ষণ রাজার মুখে হাসি ফুটলো না। খুশী খুশী ভাব রইলো না মুখে-চোখে। নাচঘরে আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

রাজাই যে কথা থামিয়েছেন! হাসি থামিয়েছেন।

ছোটকুমার তেমন মানুষই নয়। তিনি তখন কাছারীতে বসেছেন। সেজ জ্বালিয়ে, কাণে কলম দিয়ে, কালীশঙ্কর লেখা না পড়া করছেন এক মনে! তুলট কাগজের পাতা খোলা রয়েছে সামনের ডেকসোয়। ভুষোর কালিতে কি যেন লেখালেখি করছেন। সেজের প্রদীপে রেড়ীর তেল, আলো তাই স্বচ্ছশুভ্র, চোখে লাগে না, ক্ষতি করে না চোখের। খানসামার হাতে বৃহৎ হাতপাখা। প্রদীপ-শিখা লকলকিয়ে ওঠে পাখার হাওয়ায়। কাশীশঙ্করের লাল চেলীর উত্তরীয় খ'সে পড়ে। উপবীত আর রুদ্রাক্ষের মালা দেখা যায় লোমশ বক্ষে। দেখা যায়, কুমার ঘামছেন অতি গরমে।

প্রায়-রুদ্ধ কাছারী-ঘর। একটি মাত্র দুয়োর—উইয়ের ভয়ে আল্‌কাতরা মাখানো। কাগজ-পত্র আছে, যদি উই আর ইঁদুরে কাটে! তক্তাপোষে বসেছিলেন কাশীশঙ্কর। ডেসকো টেনে কি যেন লিখছিলেন। ভুষোর কালির পোড়ামাটির দোয়াত ডেসকোয়। তুলট কাগজের খোলা পাতা।

চালের কারবারী এসেছে। পাইকের এসেছে।

চালের আড়ত করবেন কুমার বাহাদুর তাই শলা-পরামর্শ করছেন। কোন চাল কত মণ মজুত করবেন তারই মণ আর দর কষাকষি করছেন। কখনও নামছেন, কখনও উঠছেন দরাদরিতে।

খড়ের চালা উঠছে কাশীশঙ্করের ভূমিতে। আড়তের চালা তুলছেন। কাঁড়া আর আকাঁড়া দুই রাখবেন কুমার। ঘরামি চালা বাঁধছে। রাতেও কাজ চলেছে লণ্ঠন জ্বালিয়ে।

পাইকার বললে,—ফর্দটা মিলিয়ে নেন কুমারবাহাদুর, যদি ভুলচুক থাকে।

কাশীশঙ্কর খাগের কলম টানলেন কান থেকে। মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন,—বেশ, ভাল কথা সাহার পো। তুমি বল, আমি মিলায়ে লই। খানসামা কাছারীর বাহিরে যাও। ডাকলে ফের আইস।

পাইকার ব'লে যায় নিজের ফর্দে চোখ রেখে। বলে,—ভাতুই হাজার মণ। বাদসাভোগ সাতশো মণ। বালাম হাজার। বাঁকচুর পাঁচশো মণ। চাঁপা পাঁচশো মণ। দুর্গাভোগ হাজার। হাতিশাল, দুধকল্‌মা কালামাণিক পাঁচ পাঁচশো মণ।

—কোন ভুল নাই।

ফর্দে ফর্দে মিলে যাওয়ার আনন্দে মৃদু হেসে বললেন কুমার বাহাদুর। বললেন,—এই লও আগাম। আমার নামে জমা করাও সাহার পো।

দেড় হাজার মোহর-টাকা। মুর্শিদাবাদের ছাপ মারা টাকার থলী একজোড়', সমান ওজনের।

পাইকার এত টাকা দেখেও এতটুকু হাসলো না। গুণলো না বাজিয়ে বাজিয়ে। ঝুটা না আসল দেখলো না। দু'হাতে থলী তুলে বিদায় গ্রহণ করলো।

হাতের কাজ মিটিয়ে বদ্ধ কাছারী থেকে বেরিয়ে পড়লেন কাশীশঙ্কর। রাতের মুক্ত অন্ধকারে এলেন। কি দুঃসহ উত্তাপ কাছারীতে! বাইরে আকাশ আর বাতাস। তারা ফুটেছে ঘনকালো আকাশে। ঝড়ের মত উড়ো হাওয়া চলেছে। এক ঝলক হাওয়া। ঘর্ম্মাক্ত দেহ যেন শীতল ক'রে দেয়। কাশীশঙ্কর বলেন,—আঃ।

হাওয়ায় যেন নাচের ছন্দ। ঘুঙুরের কিঙ্কিণী। কাশীশঙ্কর কান পাতলেন শূন্যে। মায়া না মরীচিকা!

রাজপুরীর বাতাসে ট্যাম্বুরিণের ঝমাঝম স্বর। নাচের তালে তালে যেন বেজে চললো। সারেঙ্গী যেন কান্না ধরেছে। ট্যাম্বুরিণের খঞ্জনী ঝমঝমিয়ে বাজতে থাকে থেকে থেকে। ডুগী-তবলার আওয়াজ আসে ভেসে। ছোটকুমার অনুমান করলেন, রাজা হয়তো নাচঘরে আছেন। থাকবেন হয়তো আজ রাতের মত। অন্দরে আর ফিরবেন না। হয়তো কোন নর্ত্তকী এসেছে।

ট্যাম্বুরিণের ঝমাঝম স্বর অন্দরে পৌঁছয় না। সারেঙ্গীর কান্না শোনা যায় না অন্দরে।

তবুও কেন যে পাটরাণী উমারাণীর চোখে জল ঝরে কে জানে! অন্দরের খাসকামরায় রাজমহিষী। সমুখে দর্পণ রেখে অলঙ্কার খুলে ফেলছেন দেহের। কেন কে জানে, অঝোর ঝোরে অশ্রুপাত করছেন।

সর্ব্বমঙ্গলা ও সর্ব্বজয়া নাটমন্দিরে। ভাগবতপাঠ শুনছেন নিবিষ্ট চিত্তে। বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার হয় কোথায়, কান নেই তাতে।

রাজপুরীর হাওয়ায় ট্যাম্বুরিণের ঝনন ঝনন। সারেঙ্গীর কান্না। মদালসা ইরাণীর নৃত্যের ছন্দ। ঘুঙুরের রুণুঝুনু।

[ক্রমশঃ।

আনারস —গৌর দত্ত

সাইকেল ট্রিক —অতীন গুহ

ষাঁড়ের লড়াই —জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা এবং ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

বাঙলার বাঘ —পি, কে, চট্টোপাধ্যায়

প্রাতরাশ —আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ঘাঘাটে —ধীরেন দেব

ব্যাট্-বল —গোপাল লাহা

[মাসিক বসুমতীর আলোকচিত্রের আহ্বানের প্রচুর ভাল ছবি আসছে। ছবির আকার যেন পরিবর্দ্ধিত হয়। সঙ্গে যেন উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকে।]

কুমীর কুমীর —মীরেন অধিকারী

কাল-বোশেখী —অনিল দত্ত

পাহাড়-পথে —কে, এ, মিত্র

মাসিক বসুমতীর

—আলোকচিত্র-শিল্পীদের প্রতি—

গত কয়েক মাস যাবৎ কোন রকম উচ্চবাচ্য না ক'রে প্রতি সংখ্যায় অসংখ্য সুদৃশ্য আলোকচিত্র ছেপেছি। মাসিক বসুমতীর দপ্তরে স্তূপীকৃত জমে-ওঠা আলোকচিত্র ইতিমধ্যে একেবারে নিঃশেষ না হ'লেও তাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছবিগুলিই প্রকাশ করা হয়েছে। এই জমে-যাওয়া আলোকচিত্র সমূহ প্রকাশের জন্য আমরা আমাদের অসংখ্য গুণী আলোকচিত্র-শিল্পীদের কিছু কালের জন্য ফটো না পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

যাই হোক, জমানো-ছবির স্তূপ থেকে বহু চেষ্টায় সব চেয়ে ভাল ছবি উদ্ধারের ফল এই হয়েছে যে, 'মাসিক বসুমতী'র দপ্তরে ভাল ভাল ছবি থাকলেও সব চেয়ে ভাল ছবির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সেই জন্য আবার আমরা অনুরোধ জানাই, এখন থেকে আপনারা আবার আপনাদের গৃহীত সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি পাঠাতে থাকুন। আর আমরাও আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের চক্ষু সার্থক করতে মাসে মাসে আবার ছেপে যাই আপনাদের সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি।

ঘর-কন্না —ব্রজেন্দ্র ঘোষ

গো-যান —জয়দেব দত্ত

নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

হরিরামপুরের খাঁয়েরা অনেক কালের জমিদার। এঁদের কোনো এক পূর্বপুরুষ একটি লোটা ও একগাছি লাঠি সম্বল ক'রে বাংলা মুলুকে আসেন। তখন মুর্শিদকুলী খাঁ সুবে বাংলার নবাব। উদ্যোগী পুরুষের সে সময় ভাগ্য পরিবর্তনে কোনো অসুবিধা হোতো না। ইনিও কোনো এক জমিদার-সরকারে দারোয়ানীতে জীবন আরম্ভ কোরে মৃত্যুকালে সন্তানদের জন্যে বিস্তীর্ণ জমিদারী রেখে যান।

পরবর্তী কালে সেই জমিদারী লাঠির দাপটে কখনও বেড়েছে, দাপটের অভাবে কখনও কমেছে। এই ভাবে বেড়ে-ক'মে যে জমিদারী অমরেশ গোবিন্দের হাতে এসেছিল, তা-ও নিতান্ত সামান্য নয়। সুতরাং তাঁর শ্রাদ্ধে যে প্রকাণ্ড ধূমধাম হবে, তাতে আর বিচিত্র কি?

ম্যানেজার রামপ্রসাদ বাবুর এতখানি ধূমধামের ইচ্ছা ছিল না। এখন তহবিল শীর্ণ হয়ে এসেছে। সামনে আষাঢ় কিস্তির লাটে [illegible] টাকাটা দিতে হবে, তারই জন্যে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। তার উপর আবার এই বিপুল ব্যয় তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু অমরেশ গোবিন্দের বিধবা পত্নী হরসুন্দরী ও তরুণ পুত্র শৈলেশ গোবিন্দকে কিছুতেই তিনি বোঝাতে পারলেন না।

সুতরাং যাতে এই বংশের মর্যাদা না ক্ষুণ্ণ হয়, সে জন্যে [illegible]টির রক্ষিতদের কাছ থেকে গোপনে তিনি বিশ হাজার টাকা কর্জ ক'রে নিয়ে এলেন। তাতে ক'রে শ্রাদ্ধ তো বটেই, আসন্ন লাটের দুশ্চিন্তা থেকেও বহুল পরিমাণে নিষ্কৃতি পেলেন।

সুতরাং বিরাট দানসাগর এবং তার আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণ-বিদায়, কাঙালী-বিদায়, চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতার নিমন্ত্রণ এবং আরও অনেক কিছু ফর্দ নিখুঁত ভাবেই তৈরি হোল।

জমিদার-ভবনের ভিতরে শ্রাদ্ধসভার চন্দ্রাতপ ও ফেনশুভ্র মঞ্চসজ্জা এবং বাইরে কতকগুলি আটচালা ও অনেকগুলি চালাঘর নির্মিত হোল। অগণিত কর্মী, অভ্যাগত ও দর্শকের আনাগোনায় শুধু জমিদার-বাড়িই নয়, গোটা গ্রামেই যেন মেলা ব'সে গেল!

সে এক বিরাট সমারোহ!

এই সমারোহের মধ্যে শৈলেশ গোবিন্দ শ্রাদ্ধে বসেছেন। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চারি দিকে সমাসীন। থরে থরে স্তূপীকৃত বিপুল দান-সামগ্রী। ওদিকে আর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কীর্তন হচ্ছে। অন্দরে রান্নার মহল থেকে মাঝে-মাঝে রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে।

শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, এমন সময় এক জন ভদ্রলোক নিঃশব্দে শান্ত ভাবে সভাস্থলে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ দেহ। বয়স চল্লিশের এদিকেই হবে,—ওদিকে নয়। সুমার্জিত কাঁসার মতো বক্‌বক্‌ করছে গায়ের বর্ণ। বক্‌বক্‌ করছে চোখের পৌরুষব্যঞ্জক দীপ্তি। কিন্তু নগ্নপদ, মাথার চুল রুক্ষ, বিশৃঙ্খল! পরিধানে থান ধুতি এবং উত্তরীয়। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যজ্ঞোপবীত।

ভদ্রলোকটিকে কেউ দেখলে, কেউ বা দেখলে না। কিন্তু যারা দেখলে, তারা আর চোখ ফেরাতে পারলে না। চারি দিকের সমস্ত সমারোহ ভুলে তারা এই দিব্যদর্শন অপরিচিত আগন্তুকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ম্যানেজার রামপ্রসাদ বাবু ব্যস্ত ভাবে ছুটে এলেন। অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে যেমন সসম্মানে সম্বর্ধনা জানানো হয়, তেমনি ভাবে বললেন—আসুন, আসুন। সভায় গিয়ে আসন গ্রহণ করুন।

অভ্যাগত বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ সেইখানে, সভামণ্ডপের বাইরে মাটির ওপরেই ব'সে পড়লেন।

—ও কি! ও কি! মাটিতে বসলেন যে?—রামপ্রসাদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—ঠিক আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

অভ্যাগতের কণ্ঠস্বর শান্ত এবং গম্ভীর। রামপ্রসাদ আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে সাহস করলেন না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে চ'লে গেলেন।

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যেতে সকলের মন একে একে অন্য দিকে নিবিষ্ট হোল। কারও বা মন্ত্রের দিকে, কারও বা কীর্তনের দিকে। শৈলেশ আপন মনে মন্ত্রপাঠ করছিলেন। তার উপর আগন্তুক তাঁর পিছন দিকে। সুতরাং তিনি তাঁর আসা পর্যন্ত টের পেলেন না। যেমন মন্ত্র পড়ছিলেন, তেমনি প'ড়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু হরসুন্দরী শ্রাদ্ধ দেখছিলেন অন্দরের দিকের ঝিলমিলের ফাঁক দিয়ে। তাঁর চোখ, এবং এক মাত্র তাঁরই চোখ, আটকে গেল আগন্তুকের মুখের উপর। সে-চোখ তিনি আর ফেরাতে পারলেন না।

মুখখানি কেমন যেন তাঁর অত্যন্ত চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। অথচ কিছুতে স্মরণ করতে পারছেন না, এ-মুখ তিনি কবে, কোথায় এবং কি সূত্রে দেখেছেন! হঠাৎ অনেক দূরের একটা স্তিমিতপ্রায় আলো তাঁর স্মৃতির উপর যেন ঝিলিক মারল। তাঁর ললাট রেখায় কুঞ্চিত হয়ে পড়লো। মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করলো। ঝিলমিলির কাছে তিনি আর ব'সে থাকতে পারলেন না। ধীরে ধীরে সেখান থেকে স'রে এলেন।

শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হয়ে গেল। সকলে শান্তি-জল গ্রহণ করলেন। সভাস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একে একে বিদায় নিলেন। শৈলেশ গোবিন্দও অন্দরে চ'লে গেলেন। কিন্তু আগন্তুক তখনও নিঃশব্দে সেইখানে ব'সে,—সেই মৃত্তিকাসনেই, একা। তাঁর দেহে যেন সম্বিৎ নেই,—নিস্পন্দ।

কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যেন সম্বিৎ ফিরে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

তখন সভা ভেঙে গেছে। বেলাও অপরাহ্ণ। লোকজন আর সেখানে বিশেষ নেই। শুধু পাড়ার কয়েকটি ছেলে অনতিদূরে উন্মুক্ত স্থানে ছুটোছুটি খেলা করছে।

এক বার বেলার দিকে, একবার ট্যাঁক থেকে খুলে সোনার ঘড়িটার দিকে ভদ্রলোক চাইলেন। গ্লাডষ্টোন-ব্যাগটা হাতে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এমন সময় এ-বাড়ির অতি পুরাতন সর্দার-লাঠিয়াল ভবতারণ এসে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে। এক-গাল হেসে বললে—প্রথম যখন সভায় ঢুকলেন, তখন মনে হোল চেনা, কিন্তু ঠিক চিনতে পারলাম না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হোল, দেখি দিকি একবার বাঁ হাতখানা। সেই কাটা দাগটা আছে কি না। কাছে এসে দেখি ঠিক তাই। কিন্তু এ গাঁয়ে কেউ আপনাকে চিনতে পারেনি বড়বাবু!

আগন্তুক শুধু একটু হাসলেন। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—খবর সব ভালো ভবতারণ ?

—আজ্ঞে আপনার ছিচরণের আশীর্বাদে ভালোই বলতে হবে। খালি বড় ছেলেটা গেল বার মারা গেল।

আগন্তুক দুঃখিত হোলেন। শান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—তাই নাকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। লাঠিয়ালের ছেলে, মরল দুঃখ নেই। কিন্তু ওলাউঠোয় মরলো, এইটেই দুঃখ। একটা ছেলে রেখে গিয়েছে। সেইটেকে নিয়ে আমি আছি।

—লায়েক হ'য়েছে ?

—তা সেয়ানে হয়েছে। পাড়ার পাঁচটা গরু-বাছুর চরায়।

—বেশ! বেশ!

—ও কি! ওদিকে কোথায় যান ? ভেতরে যাবেন না ?

—না ভবতারণ। তুমি কাউকে কিছু বোলো না। যাচ্ছিলাম সদরে। ট্রেণে ক'জন অচেনা লোক কর্ত্তাবাবুর মৃত্যুর গল্প করছিল। তাই শুনে এলাম।

—বেশ করেছেন।

—এখন মাথাটা এক বার মুণ্ডন করা দরকার। আমার এখনও অশৌচান্ত হওয়াই বাকি।

ভবতারণ ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি এখনই পরামাণিককে খবর দিচ্ছি। এই যে ম্যানেজার বাবু, চিনতে পারেন নি বুঝি ?

রামপ্রসাদ সবিনয়ে নমস্কার ক'রে বললেন—ভিতরে মা আপনাকে ডাকছেন।

—মা! তিনি কি চিনতে পেরেছেন ?

রামপ্রসাদ হাসলেন—কি যে বলেন বড়বাবু! মায়ে ছেলে চিনতে পারবেন না ?

—কিন্তু আমি যে এখনও অশৌচান্ত হইনি। ক্ষৌরকর্ম্ম—

রামপ্রসাদ ব্যস্ত ভাবে বললেন—তাই তো! আমি এখনই ব্যবস্থা করছি। বলে তিনি বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই ভবতারণ একটি পরামাণিক নিয়ে হাজির করলে।

গ্রামের বাইরে বাঁধা গাছতলা, পুকুরের ধারে এ গ্রামের অশৌচান্তের ক্ষৌরকর্ম্ম হয়। আগন্তুক পরামাণিকের সঙ্গে সেইখানে যাবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় তাঁর বাল্য-বন্ধুরা সদলে এসে উপস্থিত।

সবাই অবাক! বললে—কী আশ্চর্য্য সমরেশ, আমরা কেউ তোমাকে চিনতে পারলাম না! চিনলে কি না ভবতারণ ?

সমরেশ হাসলেন। বললেন—ও আমাকে মেরেছে কি না ? তাই দাগটা যেমন আমার বাঁ হাতে রয়েছে তেমনি ওর মনেও রয়েছে। তোমরা তো আমাকে মারোনি। তাই চিনতেও পারোনি।

—তাই বটে। তারপর ছিলে কোথায়, আছ কেমন, কি করছ ?

সমরেশ পরামাণিকের দিকে চাইলেন। বললেন, সে-ও অনেক কথা ভাই, সব বলবার সময় হয়ত পাব না।

কেন পাবে না ? আবার পালাবে ভেবেছ ? সে আশা ছেড়ে দাও।

কথাটা সমরেশ খুব পছন্দ করলেন বলে মনে হোল না। নিঃশব্দে গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন—আগে অশৌচান্ত হয়ে আসি। ক্ষৌরকর্ম্মটা বাকি আছে। পরের ঝগড়া পরে হবে বরং।

বন্ধুরা বললেন—বেশ তাই হবে। কিন্তু মতলব তোমার ভাল বোধ হচ্ছে না। চল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব ঘাট পর্য্যন্ত।

সমরেশ আবার একটু থমকে দাঁড়ালেন। কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বললেন না। ঘাটের পথে নিঃশব্দে স্থির ভাবে চলতে লাগলেন। ভদ্রলোকের যেন কথা বলার অভ্যাসই কম। কিছু বলতে গেলে আগে এক বার ভেবে নিতে হয়। তারপর যে কটা শব্দ না বললে নয়, সেই কটি বলেন। না বললে যদি চলে, তা হলে কিছুই বলেন না।

অন্দরের ভাঁড়ারের মেঝেয় বসে হরসুন্দরী। বাইরের বারান্দায় একটা আসনে বসে ম্যানেজার রামপ্রসাদ। দু'জনে নিরিবিলি কথা হচ্ছিল।

হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন—সেই'বটে ?

—হ্যাঁ। ভবতারণ চিনেছে। পাড়ার ভদ্রলোকেরাও চিনেছে।

—কোথায় গেল ?

—ঘাটে। এখনও কামান হয়নি। সদরে যাচ্ছিলেন, ট্রেণে নাকি কারা গল্প করছিল, সেই শুনে এসেছেন।

—তারপরে ?

—চলে যাচ্ছিলেন। বললাম, মা এক বার অন্দরে আপনাকে ডাকছেন।

অপ্রসন্ন মুখে হরসুন্দরী বললেন—আবার আমার কাছে কেন

—আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা ভালো দেখাত না।

—আমি চিনতে পারিনি বললেই ফুরিয়ে যেত।

—না বৌঠাকরুণ! সবাই চিনতে পারার পরে আপনার চিনতে না পারাটাও ভালো দেখাত না।

—কোথায় থাকে, কি করে, কিছু জানতে পারলেন ?

—না, ওঁর বন্ধুরা এক বার জিজ্ঞাসা করলেন বটে, কি উনি যেন এড়িয়ে গেলেন।

একটু ভেবে হরসুন্দরী বললেন, বোধ হয় বলবার মত কি করে না।

—তা মনে হোল না।—রামপ্রসাদ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললেন।

—কেন ?

—চেহারাটা দেখলেন না ?

—রং তো ওর বরাবরই ফর্সা।

—শুধু রং নয় বৌঠাকরুণ, সমস্ত চাল-চলনটাই কেমন লক্ষ্মী-আশ্রিত মনে হোল না ?

হরসুন্দরী চিন্তিত হোলেন।

রামপ্রসাদ বললেন—যাই হোক, সে সব দু'দিনেই বোঝা যাবে। এর মধ্যে—

বাধা দিয়ে হরসুন্দরী সভয়ে বললেন, ওকে দু'দিন এখানে রাখতে চান নাকি ?

—আমরা না চাইলেও ওঁর বন্ধুরা ছাড়বেন বলে মনে হোল না। তা ছাড়া থাকলে ক্ষতি কিছু নেই। শ্রাদ্ধাদি চুকে গেলেই কর্তাবাবুর উইল সকলের সামনে পড়া হবে। উনি নিজের কানে শুনে চলে গেলেই কি ভালো নয় ?

এবারে হরসুন্দরীর মুখখানি যেন প্রসন্ন হোল। বললেন—এটা মন্দ বলেননি। তাহলে থাক দু'দিন এখানে। নিজের চোখে সমস্ত দেখে, এবং নিজের কানে সমস্ত শুনে যাক্।

এমন সময় একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো ; বড়বাবু আসছেন ! বড়বাবু আসছেন!

হরসুন্দরী ঝেড়ে-ঝুড়ে বসলেন। রামপ্রসাদও।

সমরেশ নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়ালেন। হরসুন্দরী তখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন। মুণ্ডিত-মস্তক সমরেশ এসে প্রণাম করতেই তিনি মৃত স্বামীর উদ্দেশে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। সেই ক্রন্দনের মধ্যে অতীত জীবনের অনেক কথা ছিল,—কত সাধ, কত আশা, কত আনন্দ এবং কত দুঃখ-বেদনা। কিন্তু সমস্ত কথাই বারে বারে একটি মূল ধুয়ায় ফিরে আসে। সেটি এই যে, তোমার বড় ছেলে কত কাল পর ফিরে এসেছে, তুমি দেখে গেলে না !

ঝি এসে হরসুন্দরীর কাছে একখানি কম্বলের আসন পেতে দিয়ে গেল।

সে দিকে অপাঙ্গে এক বার চেয়ে সমরেশ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর চোখে জল নেই। সমগ্র মুখে শোক-দুঃখ আনন্দ-বেদনার চিহ্ন মাত্র নেই। যেন শ্বেতপাথরের ভাবলেশহীন একটি মূর্তি!

কান্না থামিয়ে হরসুন্দরী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—বোসো।

সমরেশ নিঃশব্দে বসলেন।

অভিমান ভরে হরসুন্দরী বললেন—তুই কি পাষাণ বাবা! বাপ-মাকে ছেড়ে এত দিন কি থাকে ? ওঁর তো তোর নাম করতে করতেই প্রানটা বেরুলো।

সমরেশ নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলেন।

হরসুন্দরী ধীরে ধীরে মূল বস্তুতে আসতে লাগলেন।

—তুই কি খবর পেয়ে আসছিলি, না এমনি আসছিলি ?

সমরেশ ট্রেনের বৃত্তান্তটা সংক্ষেপে বললেন।

—সদরে কি করতে যাচ্ছিলি ?

বামুন-মেয়ে একটা পাথরের গ্লাসে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে চিনতে পারছ ?

সমরেশ অপাঙ্গে এক বার সরবতের দিকে চেয়ে ওঁর দিকে চাইলেন।

অল্পবয়সে বিধবা হওয়ার পর এই অসহায় ব্রাহ্মণ-কন্যা এই বাড়ীতে যখন এসে আশ্রয় নেয়, সমরেশ তখন নিতান্ত শিশু। কত ওর কোলে-পিঠে চড়েছেন, কত উৎপাত করেছেন। ওকে দেখে সমরেশের কঠিন মুখ যেন একটুখানি প্রসন্ন হোল। ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—ভালো আছ বামুন-মা ?

সেই ডাকে বামুন-মেয়ের চোখ ছল-ছল ক'রে উঠলো। বললে—আর ভালো বাবা ! যা হ'য়ে গেল !

এ বাড়ীতে এখন সকল ভালো-মন্দ যেন কর্তাবাবুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

হরসুন্দরীকে প্রণাম ক'রে সমরেশ উঠলেন।

হরসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে বললেন—উঠছিস কেন বাবা ! এইখানেই বোস না। সরবৎটুকু খেয়ে নে। সমস্ত দিন বোধ করি খাওয়াই হয়নি ? দেখ তো বামুন-মেয়ে হবিষ্যি হোল কি না। ওদের দুই ভায়ের জায়গা ওদিকের দরদালানে ক'রে দাও।

সমরেশকে এত শীঘ্র ছেড়ে দিতে হরসুন্দরীর ইচ্ছা নেই। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া বাকি।

বামুন-মেয়ে বললে—বাবু তো কখন খেয়ে নিয়েছেন। বড়বাবুর জায়গা আমি এখনই করে দিচ্ছি।

সমরেশ গম্ভীর ভাবে হাত-ইসারায় তাকে নিষেধ করলেন। তাঁর আঙটির মস্ত-বড় হীরাটা সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল ক'রে উঠলো। হরসুন্দরীর চোখে সেটা যেন একটা ছোরার মতো বিঁধলো। ট্যাঁক থেকে সোনার ঘড়িটা বের ক'রে সময় দেখলেন। তারপর ম্যানেজারকে বললেন—সদরের গাড়িটা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে, না ?

রামপ্রসাদ নিঃশব্দে মাতা-পুত্রের অভিনয় দেখছিলেন। নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

হরসুন্দরীর দিকে চেয়ে সমরেশ বললেন—তাহলে আর আমার এক মিনিটও দেরী করবার উপায় নেই। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সদরে গিয়ে আমাকে পৌঁছুতেই হবে। আমি ফের কাল আসব। এবং কা'কেও বাধা দেবার মুহূর্ত সময় না দিয়েই ব্যাগটা হাতে নিয়ে সমরেশ হন-হন ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

ওঁরা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কারও যেন কোন সম্বিৎ নেই। ধীরে ধীরে হরসুন্দরী রামপ্রসাদের দিকে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলেন ?

—ভালো নয়।

—আমাকে এক বারও মা বলে ডাকেনি, লক্ষ্য করেছেন ?

—করেছি।

—সরবৎটুকু পর্যন্ত ছুঁলে না। লক্ষ্য করেছেন ?

—করেছি। হাতের মস্ত-বড় হীরেটা এবং দামী সোনার ঘড়িটাও লক্ষ্য করেছি।

—কি মনে হচ্ছে ?

—মনে হচ্ছে বেগ দেবেন। এবং বোধ করি সদরেই অস্থায়ী ভাবে আস্তানা গাড়লেন। সকালে আসবেন আর সন্ধ্যায় ফিরবেন।

হরসুন্দরীর মুখখানা দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলেন—ওই উইলের পরেও বেগ দেওয়া যায়?

রামপ্রসাদ হাসলেন। বললেন—বেগ কেন দেওয়া যাবে না, বৌঠাকরুণ? সে তো সবাই দিতে পারে। তবে হার-জিতের কথা যদি বললেন, তাহলে বলি, রামপ্রসাদ ফাঁক রেখে কাজ করে না। বলে ধীরে ধীরে উঠলেন।

দুই

সমরেশ গোবিন্দকে তার বন্ধুরাও আটকাতে পারলে না। তাঁকে বোধ করি আটকানো যায় না। কেন, সে ইতিহাস জানা আবশ্যক।

অমরেশ গোবিন্দের দুই সংসার। প্রথমা নীলাম্বরবরণী যখন মারা গেলেন, তখন সমরেশের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। এবং যদিচ অমরেশের তখন বিবাহের বয়স পার হয়নি, তবু এই শিশুপুত্র সমরেশকে প্রতিপালন করার অজুহাত দেখিয়েই নীলাম্বরবরণীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনি হরসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করলেন। হরসুন্দরীর কোলে যত দিন নিজের সন্তানের আবির্ভাব হয়নি তত দিন পর্য্যন্ত সমরেশের আদর-যত্ন অবশ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু শৈলেশ গোবিন্দের আগমনের পর থেকেই তার ব্যতিক্রমের আভাস পাওয়া যেতে লাগলো। এবং যত দিন যেতে লাগলো ব্যাপারটা ততই স্পষ্ট হোতে লাগলো। ব্যবহারের পরিবর্তন শুধু বিমাতার দিক থেকেই নয়, পিতার দিক থেকেও আরম্ভ হোলো। তাঁর সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়লো নবজাত শৈলেশ গোবিন্দের উপর।

অবশ্য তার অর্থ এ-নয় যে, সমরেশ পিতার স্নেহ থেকে একেবারে বঞ্চিত হোল। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার স্নেহ প্রকাশের ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সমরেশ কল্পনা করতে লাগলো; এবং এ বাড়ীর পুরানো দাস-দাসীরা আকারে-ইঙ্গিতে সেই কল্পনাকেই প্রশ্রয় দিতে লাগলো যে, বিমাতার তর্জনী সঙ্কেতে পিতৃ-স্নেহ এখন সম্পূর্ণ শৈলেশের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে।

সমরেশের বয়স তখন দশ-বারো বৎসর। স্নেহের গতি ও প্রকৃতি বোঝবার বয়স এটা নয়। তবু এই ধারণা যে তার মনে এলো তাও একেবারে অহেতুক নয়। সমরেশের উপর নিজের বিরূপতা হরসুন্দরী কখনই গোপন করতেন না। তা ছিল অত্যন্ত রূঢ়, নির্লজ্জ এবং প্রকাশ্য। বালক সমরেশের পক্ষেও বিমাতার মনোভাব কোন দিক দিয়েই অস্পষ্ট ছিল না। তার বাস্তবতো এইখানেই যে, এর বিরুদ্ধে পিতার কাছ থেকে সুবিচার লাভের সম্ভাবনা মাত্রও ছিল না। তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে এক দিকে যেমন সমরেশের বিরুদ্ধে হরসুন্দরীর ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি শৈলেশের সম্পর্কে তাঁর অপরিমিত প্রশ্রয়ের প্রতিকারেও উদাসীন ছিলেন। তার ফলে একই বাড়ীতে দুই ভাই দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় মানুষ হোতে লাগলো। শৈলেশের পোষাক-পরিচ্ছদ রাজকীয়। তার পরিচর্যার জন্য পৃথক্ দাস-দাসী। এমন কি, সে আহার করে পৃথক ভাবে পিতার সঙ্গে পিতার মতো রূপার বাসনে। আর সমরেশের পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। তার পরিচর্যা সে নিজেই করে। ক্ষুধার সময় পাকশালে কখন যে সে খেয়ে নেয়, কেউ জানতেই পারে না।

এই পরিবারের সন্তানেরা সর্ব বিষয়ে সাধারণের সঙ্গে একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলে। সমবয়সীর অভাবও এই বাড়ীতে চিরকালই। কিন্তু জনক-জননী ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহে সঙ্গীর অভাব ইতিপূর্বে কাউকেও অনুভব করতে হয়নি।

এ বংশের সন্তানদের মধ্যে সেই অভাব প্রথম অনুভব করতে আরম্ভ করলো বালক সমরেশ। বালক-জীবনের নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে সকলের অগোচরে তাকেই সর্বপ্রথম বাইরে থেকে খেলার সাথী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এর জন্যে তাকে তিরস্কার, লাঞ্ছনা, এমন কি অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দুর্দান্ত বলিষ্ঠ বালক নিঃশব্দ, নিষ্ফল ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে সেই নির্যাতন সহ্য করেছে। তার ফল হয়েছিল এই যে, তার ওপর যত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হোত, তার সমস্তের জন্যেই মনে মনে সে দায়ী করত শৈলেশ গোবিন্দকে। পিতার পুরাতন দাস-দাসী এবং বাইরে তার খেলার সঙ্গীরা এই অনুভূতিকে বেগমান করতে ত্রুটি করেনি।

আর একটি বিষয়েও সমরেশ এই বংশের চিরচারিত প্রথা লঙ্ঘন করেছিল। এ বংশে সন্তানদের পাঠশালা যাওয়ার প্রথা নেই। কারণ, সেখানে আরও পাঁচ জন বাইরের ছেলের সঙ্গে মিশতে হয়। এক জন বেতনভুক্ মাষ্টার এসে পড়িয়ে যান, এই প্রথাই বরাবর চলে আসছে। বালক সমরেশের জন্যেও সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পণ্ডিত মশায়ও জানতেন এবং অভিভাবকেও জানতেন এই পড়া কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্তকে অতিক্রম করে না। কঠোর হস্তে জমিদারী চালাবার জন্যে যেটুকু বিদ্যা নিতান্ত অপরিহার্য, এ বংশের কোনো বালক তার বেশি বিদ্যা গ্রহণ করে না। ওটা অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র। সমরেশ কিন্তু সেই সামান্য প্রথার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে না। পণ্ডিত মশায়ের যতটুকু বিদ্যা ছিল তা নিঃশেষে শোষণ ক'রে বালক ইংরাজী শিক্ষার জন্য জেদ ধরলে। কারও সাধ্য হোল না তার থেকে তাকে নিরস্ত করে। অমরেশ গোবিন্দকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার জন্যে এক জন ইংরাজী শিক্ষক রাখতে বাধ্য হোতে হোল।

নির্দয়তা সমরেশের চরিত্রে বাল্যকাল থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। কি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার ক্ষেত্রে, কি বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে,—কোথাও তার মনে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। বালক সেই বয়সেই নিত্য-নতুন নিষ্ঠুর খেলা আবিষ্কার করত। টিকটিকির লেজ চেপে ধরত যতক্ষণ না লেজটা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে পুকুরের ব্যাংগুলোকে অকারণে বধ করত। পাখি ধ'রে তার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিত খামোকা। বেরালের পিছনের পা দুটো ধ'রে বার কয়েক ঘুরিয়ে ছাদ থেকে দিত ফেলে। কোনোটা বাঁচত, কোনোটা বাঁচত না এবং শুধু খেলার ক্ষেত্রেই নয়, বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও এই নিষ্ঠুরতা সুপরিস্ফুট ছিল। বাঘের শিশু যেমন নিষ্ঠুর ভাবে মাতৃস্তন্য পান করে, শিক্ষকের কাছ থেকেও তেমনি নিষ্ঠুরভাবে সে বিদ্যা আহরণ করত।

এই নির্দয়তাই একদিন তার জীবনের গতিপথ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবর্তিত ক'রে দিলে।

বিমাতার নির্দয়তা এবং পিতার ঔদাসীন্যে তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি একেবারেই স্ফূর্তি পায়নি। তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ শৈলেশ গোবিন্দের উপর তার যেন একটা জাতক্রোধ বেড়ে উঠেছিল, সেই জাতক্রোধ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে একদিন আত্মপ্রকাশ করলো।

এক দিন দেখা গেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সমরেশ গোবিন্দ শৈলেশকে একটা কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে কাঁধে করে তুলে নিয়ে চলেছেন বাগানের ইন্দারার দিকে। শৈলেশের পরমায়ু ছিল। বাড়ির চাকরদের কে যেন দেখতে পেয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে। তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে বাড়ির অন্য লোকজনেরাও আলো নিয়ে ছুটে আসে। অনেক খোঁজাখুজির পর একটা ঝোপের আড়ালে মুখ-বাঁধা অবস্থায় শৈলেশকে পাওয়া যায়।

কিন্তু তারপর থেকে সমরেশকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তার বয়স পনেরো-ষোল। সেই থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ।

তার পরে গ্রামে সমরেশের এই প্রথম প্রবেশ।

এত বড় বিরাট শ্রাদ্ধের ব্যাপার! সপ্তাহ কাল ধরে এর খাওয়া-দাওয়ার জের চললো। প্রত্যেক দিন ঠিক দশটার ট্রেণে সমরেশ আসেন, কাজকর্ম্ম চুকে গেলে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেণে সদরে ফিরে যান। অতিথি-অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনা, কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান, যেটুকু ভার তিনি গ্রহণ করেন, তা নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন করেন। কিন্তু এক বিন্দু জলও গ্রহণ করেন না।

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যহই হরসুন্দরীর সঙ্গে এক বার ক'রে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শৈলেশের সঙ্গে এক দিনও দেখা হোল না। ওঁর নিজের পক্ষ থেকেও দেখা করার কোনো আগ্রহ বোঝা যায় না, শৈলেশের পক্ষ থেকেও না। সমরেশ যে দিকে থাকেন, শৈলেশ যেন সে দিক মাড়ান না। কেমন যেন এড়িয়ে চলেন।

সপ্তম দিনে কাজকর্ম্ম অল্পক্ষণের মধ্যেই চুকে গেল। সে দিন মেয়েদের নিমন্ত্রণ। সুতরাং পুরুষদের করবার বিশেষ কিছু ছিল না। মধ্যাহ্নের কিছু পরেই রামপ্রসাদ সমরেশকে সদরের বালাখানায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

সমরেশ গিয়ে দেখলেন, গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেইখানে সকলের সামনে রামপ্রসাদ উইলখানি পড়তে লাগলেন।

সমরেশ এমন নিস্পৃহ ভাবে এক পাশে বসে রইলেন যে, উইল সম্বন্ধে তাঁর কোনো আগ্রহ আছে ব'লেই মনে হোল না। এক বার চারি দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, শৈলেশ এখানেও অনুপস্থিত। অবশ্য তার প্রয়োজনও ছিল না। ম্যানেজার রামপ্রসাদ স্বয়ংই রয়েছেন।

নিস্পৃহ ভাবে ব'সে থাকলেও সমরেশ কিন্তু ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই উইল শুনছিলেন এবং মনে মনে উইলের মুন্সিয়ানার তারিফ করছিলেন। পিতা তাঁকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। তথাপি পিতৃস্নেহ বশেই হোক অথবা অন্য যে কারণেই হোক, উপসংহারে উল্লেখ করেছেন যে, সমরেশ যদি জীবিত থাকেন এবং পিতৃগ্রামে ফিরে এসে এখানে বাস করবার অভিপ্রায় পোষণ করেন, তাহলে বিঘা তিনেক একটা পতিত জমি তাঁর জন্যে রইলো। সেখানে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো বাড়ি তৈরি ক'রে বাস করতে পারবেন। সে বিষয়ে অন্যের কোনো ওজর-আপত্তি চলবে না।

সম্পত্তির তালিকা বাদ দিলে উইলখানিকে সংক্ষিপ্তই বলা চলে। এবং যিনিই এর খসড়া ক'রে থাকুন, তিনি যে অত্যন্ত পাকা লোক সে বিষয়ে সমরেশের সন্দেহমাত্রও নেই। উইলের ফাঁক কোথাও নেই।

পড়া শেষ হ'লে সমরেশ ঘড়িটা খুলে সময়টা দেখলেন এবং নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত সকলকে নমস্কার ক'রে বললেন, আমার ট্রেণের সময় হয়েছে, এবারে উঠি।

সকলে বিস্মিত ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, সেখানে বিস্ময় অথবা ক্রোধ অথবা আশাভঙ্গ জনিত উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। এ কয় দিন যেমন শান্তগম্ভীর ভাবে কাজকর্ম্ম ক'রে গেছেন, এখনও তেমনি মুখের ভাব।

এ ক'দিন যেমন নিঃশব্দে তিনি গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন, এখন আবার তেমনি নিঃশব্দে তিনি ফেরবার পথ ধরলেন। সেই গ্রাম, যেখানে তাঁর জীবনের প্রথম পোনেরো বৎসর কেটেছে!

বামুন-পাড়া পার হয়ে কায়েত-পাড়া। তার পরেই ষষ্ঠীতলা। অশ্বত্থগাছের নিচে সিন্দুর-চর্চিত প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ। তার পর ডান দিকে পঞ্চু কলুর ঘানি-ঘরে এখনও ঠিক তেমনি ক'রে চোখে ঠুলি-দেওয়া শীর্ণ বলদ একঘেয়ে ঘুরে যাচ্ছে। তার পাশেই কুমোর বাড়ির উঠানে ঠিক আগের মতোই রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া হয়েছে কাঁচা মাটির বিবিধ আকারের পাত্র। ওদিকে কুমোরশালের থেকে ধোঁয়া উঠছে। বসন্ত স্বর্ণকার তার নাই-এর উপর ঝুঁকে প'ড়ে একটানা পিটিয়ে চলেছে একখানা রূপার পাত।

তার পরেই ইন্দর পণ্ডিতের পাঠশালা। দেওয়ালে ঝুলছে তালপাতার চাটাইগুলো। একটু আগেই পাঠশালার ছুটি হয়ে গেছে, তার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে এখনও। বহু কণ্ঠের নামতা পাঠের শব্দ যেন ঘরখানির মধ্যে এখনও নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে ইন্দর পণ্ডিত তাঁর হাতখানি চেপে ধরলেন। ইনি তাঁদের দুই ভাইকেই বাড়ি গিয়ে পড়াতেন। বললেন—আমাকে চিনতে পারছ না বাবা?

সমরেশ আপন মনে আসছিলেন। চমকে ওঁর মুখের দিকে চাইলেন।

বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কাঁচা দাড়ি এখন শাদা হয়ে গেছে। খুবই অভাবগ্রস্ত। দেহ জীর্ণ, চর্ম লোল, পরিধেয় বস্ত্রও মলিন। ইনি উইলের এক জন সাক্ষী। উইল পাঠের সময় বালাখানায় উপস্থিত ছিলেন কি না, সমরেশ স্মরণ করতে পারলেন না।

বিনীত হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—ভালো আছেন পণ্ডিতমশাই?

সমরেশ তাঁকে চিনতে পেরেছেন দেখে বৃদ্ধ আশ্বস্ত হোলেন—চিনতে পেরেছ বাবা? তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।

—কেন বলুন তো?

—বলছিলাম কি, এ গ্রাম তুমি ছেড় না বাবা। যাই হয়ে থাক, তাকে দৈবদুর্বিপাক বলেই মনে কর। সকলের পিতার তো

সম্পত্তি থাকে না। সকল পিতা পুত্রের জন্যে সম্পত্তি রেখেও যেতে পারেন না। তুমি কেন তাই মনে কর না বাবা?

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। তাঁর স্তিমিত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সমরেশের মুখে কি যেন খুঁজতে লাগলো।

সমরেশকে নীরব দেখে তিনি আবার বললেন—যাঁরা পুরুষ-সিংহ তাঁরা পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির ভরসা করেন না। নিজের জোরে সম্পত্তি তাঁরা অর্জন করেন। তুমিও কেন তাই কর না বাবা?

নিঃশব্দে, মনোযোগের সঙ্গে সমরেশ এই বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথাগুলি শুনছিলেন। বললেন—আপনি কি ওই জায়গাটায় একটা বাড়ি ক'রে এখানেই স্থায়িভাবে বাস করার কথা বলছিলেন? কিন্তু সে কি সুবিধা হবে?

—অসুবিধাটা কি?

তাও সমরেশের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। তিনি কয়েক মুহূর্ত নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন—আমার গাড়ির আর দেরী নেই। এখনই আপনার কথার জবাব দিতে পারলাম না। কিন্তু আপনার কথা আমি ভেবে দেখব এবং যদি এখানে বাস করাই মনস্থ করি, তাহলে শীঘ্রই আবার ফিরে আসব। বলে সমরেশ ষ্টেশনের দিকে হন-হন ক'রে চলতে লাগলেন।

মাস খানেক পরে সমরেশ আবার ফিরে এলেন গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। হরসুন্দরী এবং শৈলেশের ইচ্ছা ছিল না শত্রুকে বাড়ির পাশে জায়গা দিবে। যে লোক বালক বয়সেই নিজের ভাইকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করতে পারেন, পরিণত বয়সে তিনি যে আরো কত দূর যেতে পারেন, তার ঠিক আছে?

কিন্তু পণ্ডিত মশাই চাপ দিলেন। গ্রামের আরো অনেকে পণ্ডিত মশাইকে সমর্থন করলেন। এমন কি, রামপ্রসাদের মতো ঝানু ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত বললেন, এ নিয়ে আপত্তি করা ঠিক হবে না। সমরেশ নিতান্ত সহজ লোক নন। তিনি যখন উইল মেনে নিয়ে গ্রামে বাস করার সঙ্কল্প করেছেন, তাঁকে এই সামান্য জায়গাটুকু নিয়ে বাধা দিতে গেলে হিতে বিপরীত ঘ'টে যেতে পারে।

শৈলেশ গোবিন্দের নিজের বুদ্ধি কম। যেটুকু আছে, সেটুকুও শ্রম স্বীকারে রাজি নয়। তিনি থাকেন আমোদ নিয়ে—গান-বাজনা, ইয়ার-বক্সি এবং মদ্য। রামপ্রসাদের উপর তাঁর অগাধ আস্থা। হরসুন্দরী কিছু বুদ্ধি রাখেন। কিন্তু একে স্ত্রীলোক, তায় অশিক্ষিত। সুতরাং বুদ্ধি তাঁর যত তীক্ষ্ণই হোক, তাঁর উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে সাহস পান না। কাজেই তাঁকেও নির্ভর করতে হয় রামপ্রসাদের বুদ্ধির উপরই।

অতএব রামপ্রসাদও যখন সমরেশের পক্ষেই এ বিষয়ে মত দিলেন, তখন মাতা-পুত্রও নিরস্ত হোলেন।

হরসুন্দরী সমরেশকে সস্নেহে এক দিন ডেকে পাঠালেন। সমরেশ এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন না বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়েও উঠতে পারলেন না।

এর পরে ছ'মাসের উর্দ্ধকাল সমরেশের কিন্তু আর বিশ্রাম রইলো না। একটা পতিত নীচু জমি। সেটাকে বাসযোগ্য করা সহজ ব্যাপার নয়। একটা পুকুর খুঁড়তে হোল আগে। সেই মাটি দিয়ে ভিটার জায়গাটা উঁচু করতে হোল। তার পরে সেই উঁচু জায়গায় তৈরি হোল একখানা ছোট এক তলা বাড়ি। তারও পরে সমস্ত জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘিরতে হোল।

এতে সময় কম লাগলো না। এবং এই দীর্ঘকাল তিনি সদরে একটা বাসা নিলেন। গ্রামের লোক দিনের পর দিন দেখতে লাগলো, সকাল দশটার ট্রেণে সমরেশ প্রত্যহ নামেন। মাঠের পথ দিয়ে কি রোদ, কি বৃষ্টি, প্রত্যহ তিনি বাড়ি তৈরির জায়গায় যান। সমস্ত দিন থাকেন এবং পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে আবার দেখা যায় মাঠের সেই পথটা ধ'রে হন-হন করে চলেছেন ষ্টেশনের পথে। এর আর ব্যতিক্রম নেই।

হয়তো সমস্ত দিনই মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যেই তিনি যথারীতি এসেছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা এসে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন, এই বৃষ্টি মাথায় করে ফিরে না যাবার জন্যে। আবার তো কাল আসতেই হবে। একটা রাত্রি থেকে গেলে কি ক্ষতি?

কে জানে কি ক্ষতি! কিন্তু সমরেশের সেই এক কথা। তার উপায় নেই। সদরে ফিরে যেতেই হবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বন্ধুরা মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখের কঠিন ভাব এবং কথা বলার দৃঢ়তা দেখে কেউ আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে সাহস করে না। ইচ্ছাও হয় না।

এমনি ক'রে পুকুর খোঁড়া হয়, বাস্তভিটা ভরাট হয়, বাড়ির ভিৎ গড়ে ওঠে, তারপরে এক দিন বাড়িও তৈরি হয়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন একে একে সরে পড়ে।

প্রথম দিকে পুকুর খোঁড়ার সময় যতগুলি বন্ধু তাঁর বাড়িতে, যেদিন ছাদ আরম্ভ হোল, সেদিন দেখা গেল তাঁর আশে-পাশে আর কেউ নেই। তিনি একা, আর কাজ করছে যে রাজমিস্ত্রি দল, তারা।

কিন্তু সমরেশের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আপন মনে মিস্ত্রিদের কাজ তদারক করেই চলেছেন। যখন বন্ধুরা আসত তখন যেমন কারও সঙ্গে কোন গল্প করতেন না, এখনও তাই। গল্প সমরেশ করতে পারেন না, করেনও না। তাতে তাঁর কোন অনুরাগ নেই যেন।

বন্ধুরা অবাক হ'য়ে যায়, এ কী রকম লোক! ভদ্রতা জানে না, আত্মীয়তা জানে না, গ্রামসুলভ প্রতিবেশী সম্বন্ধে উদাসীন, এমন কি হাসতে পর্যন্ত জানে না! একে নিয়ে তারা কি করবে?

সমরেশের সম্বন্ধে একে একে সকলেরই বিতৃষ্ণা এল। তাঁর উপর প্রথম দিকে সকলেরই যেটুকু বন্ধুত্ব ছিল, শেষের দিকে তার আর কিছুই রইল না।

বাড়ি এক দিন শেষ হোল। সদর থেকে একটি দু'টি করে আসবাবপত্র আসতে আরম্ভ করলো। এর পর থেকে সমরেশ নিজেও এ বাড়িতে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বন্ধুরা আর ফিরলো না। তাদের ফেরাবার জন্যে সমরেশের পক্ষ থেকে কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হোল না।

নতুন বাড়িতে থাকেন একা সমরেশ গোবিন্দ! তিনি কা'কেও ডেকে কথা বলেন না। কেউ এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসাও করেন না!

[ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী

কলিকাতাবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

[চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যজাতির নিকট হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ টাউন হলে সভা করিয়া বিবেকানন্দ ও আমেরিকাবাসিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ঐ সভায় কতকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এই পত্রখানি তাহার উত্তরস্বরূপ উক্ত সভার সভাপতিকে স্বামিজী লিখিয়াছিলেন।]

নিউ ইয়র্ক।

১৮ই নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মহাশয়—

সম্প্রতি কলিকাতা টাউন হলের সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং আমার স্বীয় নগরনিবাসিগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়া যে মধুর কথাগুলি পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি।

হে মহাশয়, আমার ক্ষুদ্র কার্য্যও যে আপনারা সাদরে অনুমোদন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (Policy) সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই যে জাতি আপনাকে পৃথক্ রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়—ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া; প্রাচীন কালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধজাতিদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।

প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন,—অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ—ইহার অনিবার্য্য ফল এই হইল যে, যে জাতি প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে সমুদয় জাতির মধ্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়মের অব্যর্থ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি।

আদান প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম আর ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য বাহির করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর অবিচারিত ভাবে ছড়াইয়া দিতেই হইবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে। বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম, যেদিন হইতে অপর জাতি-সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেই দিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল, আর যতদিন না পুনরায় জীবনে ফিরিতেছি—যত দিন না আবার বিস্তারশীল হইতেছি—তত দিন কিছুতেই আমাদের মৃত্যু আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যস্থ কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, নিজেরাও তাহা খায় না অথচ গরুরও খাবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ।) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু যিনি বিদেশ ভ্রমণ করিতে যান, তিনি স্বদেশের অধিকতর কল্যাণসাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভসমূহ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, তত দিন এই শক্তি বা ঐ শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য? আসুন, আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিত ভাবে কাযে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কোন ব্যক্তি যাহা পাইবার প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে, জগতের কোন শক্তিই তাহা পাইবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ নহে। আমাদের জাতীয় জীবন অতীত কালে মহৎ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপট ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন।

ভবদীয় বশম্বদ

বিবেকানন্দ।

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

(১)

C/o E. T. Sturdy, Esq.
High View Caversham.
Reading, Eng.
১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার সংকল্প বড়ই উত্তম। কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে Organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচ জনে মিলে একটা কায করিতে একেবারেই নারাজ। Organizationএর প্রথম আবশ্যক এই যে, obedience (আজ্ঞাবহতা), যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম, তার পর ঘোড়ার ডিম—তাতে কাজ হয় না—Plodding industry and perseverance (স্থির ধীরভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই। Regular correspondence (নিয়মিত পত্র ব্যবহার) অর্থাৎ কি কায কচ্ছ—কি ফল হল, প্রতি মাসে বা মাসে দুই বার রীতিমত লিখিয়া পাঠাইবে। এক জন উত্তম ইংরাজী ও সংস্কৃত জানা সন্ন্যাসী এখানে (ইংলণ্ডে) আবশ্যক। আমি এখান হইতে শীঘ্রই পুনরায় আমেরিকায় যাইব, আমার অবর্ত্তমানে সে এখানে কার্য্য করিবে। শ—ও—শী এই দুই জন ছাড়া আমি ত আর কাকেও দেখছি না। শ—কে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ চলে আসতে লিখেছি। রাজাজীকে লিখেছি যে, তাঁর বম্বের agent (এজেণ্ট—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) যেন শ—কে দেখে-শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। আমি লিখতে ভুলে গেছি, তুমি যদি মনে করে পার শ—র সঙ্গে এক বস্তা মুগের ডাল, ছোলার ডাল, অড়র ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দিবে।* পণ্ডিত নারাণদাস, মাঃ শঙ্করলাল, ওঝাজী ও ডাক্তার সকলকে আমার প্রণয় বলিবে। গোপীর চোগের ওষুধ এখানে কি আছে, পেটেণ্ট ওষুধ সব জুয়াচুরি সব্বত্র। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবে ও আর আর সব চেলা-গুলোকে। ম—মিরাটে একটা কি ি—সভা বরেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কায করতে চান। ভাল তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কা—কে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কা—যদি পারে একটা মিরাটে centre (কেন্দ্র) করুক্ এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক্—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কা—মিরাট গিয়ে আমাকে যথাযথ রিপোর্ট করলে আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। আজমীরে একটা centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। * * সাহারানপুরে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী কি একটা সভা করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাঁদের সঙ্গে correspondence (পত্র ব্যবহার) রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলামেশা etc. work, work (কায, কায)। এই রকম centre (কেন্দ্র) করতে থাক—কলকাতায়,—মান্দ্রাজে already (পূর্ব্ব হইতেই) আছে, যদি মিরাটে ও আজমীরে পার ত বড়ই ভাল হয়। ঐ প্রকার ধীরে ধীরে যায়গায় যায়গায় centre (কেন্দ্র) করতে থাক। এখানে আমার সকল চিঠিপত্র C/o E. T. Sturdy, Esq. High View, Caversham, Reading, England, আমেরিকায় C/o Miss Phillips, 19, W. 38 Street, New York ক্রমে দুনিয়া ছাপিয়ে যেতে হবে। Obedience প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে—তবে কায হয়। * * * ঐ রকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc.

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

(২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

কল্যাণবরেষু— ১৮৯৫।

তোমার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার পাই। সবিশেষ কিছুই নাই, এই মাত্র। আমার শরীর এক্ষণে অনেক ভাল। এ বৎসরের প্রচণ্ড শীত প্রভুর কৃপায় কিছুই লাগে না; কি দোর্দ্দণ্ড শীত! তবে এদের বিজ্ঞের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা মাটীর ভিতর, তার মধ্যে বৃহৎ বয়লার—সেখান হতে গরম হাওয়া বা ষ্টীম ঘরে ঘরে রাত দিন ছুটিতেছে। তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ যে, ঘরের ভিতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর নীচে ৩০।৪০ ডিগ্রি! এদেশের বড় মানুষেরা অনেকেই শীতকালে ইউরোপে পালায়—ইউরোপ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ।

যাক্ এক্ষণে তোমাকে গোটা দুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্য লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশগুলি রোজ একবার করে পড়বে এবং সেই রকম কাজ করবে।—র চিঠি পাইয়াছি—সে উত্তম কার্য্য করিতেছে—কিন্তু এক্ষণে Organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা) চাই। * * * তোমাকে আমার এই কটী উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তোমাতে Organizing Power (সঙ্ঘগঠন ও পরিচালন শক্তি) আছে—একথা ঠাকুর আমায় বলেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীঘ্রই তাঁর আশীর্ব্বাদে ফুটবে। তুমি যে কিছুতেই centre of gravity (ভারকেন্দ্র) *

* স্বামিজী সেই সময়ে একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন।

* এখানে তাৎপর্য্য এই যে, 'তুমি যে এদিক্ ওদিক্ না ঘুরিয়া এক স্থানে থাকিতেই ভালবাস।'

ছাড়িতে চাও না, ইহাই তাহার নিদর্শন, তবে Intensive and extensive (গভীর ও উদার) দুই হওয়া চাই।

১। এ জগতে যে ত্রিবিধ দুঃখ আছে, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈসর্গিক (Natural) নহে, অতএব অপনেয়।

২। বুদ্ধাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ জাতি, অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই এই দুঃখের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী পুং বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে প্রকার পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ধৌত হয় না, সে প্রকার, ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদ সাধন হওয়া সম্ভব নহে।

৩। কৃষ্ণাবতারে বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ "অবিদ্যা"। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্তু কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি &c.

৪। যে কর্ম্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম্ম।

৫। অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত ও কালগত কর্ম্মাকর্ম্মের সাধন।

৬। যজ্ঞাদি প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি কর্ম্ম, আধুনিক সময়ের জন্য তাহা নহে।

* * *

৭। রামকৃষ্ণ অবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতারূপ ম্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারে রজোগুণ অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য ; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।

৮। প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িকেরা ভুল করে নাই। They have done well but they must do better (তাহারা ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও ভাল করিতে হইবে)। কল্যাণ—তর—তম।

৯। অতএব সকলকে যেখানে তাহারা আছে, সেইখানেই গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে। তথা সামাজিক অবস্থা মধ্যে যাহা আছে, তাহা উত্তম কিন্তু উৎকৃষ্টতর—তম হইবে।

১০। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

১১। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে "স্ত্রীগুরু" গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার।

১২। সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকার স্বরূপ হইবে।

১৩। চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ (সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর)।

১৩। কাহারও সহিত বিবাদ বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও—অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। Give your message leave otheir to thier own thaughts (তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া থাকুক)। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" তদা কিং বিবাদেন ? (সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় কখনও হয় না ; তবে বিবাদের প্রয়োজন কি ?)

* * বাল্যগাম্ভীর্য্যভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়-বুদ্ধিহীন হইবে, বৃথা তর্ক মহাপাপ।

* * *

ইতি তোমারই
বিবেকানন্দ।

৩

১৮৯৫।

প্রিয়তমেষু—

* * * দেশে আসিবার কথা যে লিখিয়াছ, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু এদেশে একটি বীজ বপন করা হইয়াছে—সহসা চলিয়া গেলে উহা অঙ্কুরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। অপিচ এখান হতে সকল কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারিবে।— প্রভৃতি সকলেই দেশে আসিতে লেখেন। সত্য বটে, কিন্তু ভায়া, পরের ভরসা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সকলই হইবে ধীরে ধীরে, আপাততঃ একটা জায়গা দেখার কথাটা বিস্মৃত হইও না। একটা বিকট জায়গা চাই—১০ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্য্যন্ত—একদম গঙ্গার উপর হওয়া চাই। যদিও হাতে পুঁজি অল্প, তথাপি ছাতি বড় বেজায়, জায়গার উপর নজরটা রাখবে। একটা নিউইয়র্কে, একটা কলিকাতায় এবং একটা মান্দ্রাজে ; এখন এই তিনটা আড্ডা চালাতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে যেমন প্রভু যোগান। * * *—দেশপর্য্যটনে উৎসুক—বেশ কথা, তবে এসব দেশে বড়ই মাগগি, ১০০০৲ টাকার কমে মাসে চলে না (ধর্ম্মপ্রচারকের)। তবে—র ছাতি আছে, খোদা দেনেওয়ালা সকলি ঠিক, তবে একটু ইংরাজী ভাষা দুরন্ত কর্ত্তে হবে অর্থাৎ ফলকথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুক পাদ্রি পণ্ডিতদের মুখ হতে রুটী ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে, নইলে, ফু করে বিদ্যের জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগবৈরাগ্য, বোঝে বিদ্যের তোড়, বক্তৃতার ধূম আর মহা উদ্যোগ—তার উপর দেশ শুদ্ধ লোক ছল খুঁজবে—পাদ্রিরা ছলে বলে দাবাবার চেষ্টা করবে দিন রাত—এ সকল বোঝা ছাড়িয়ে মত চালাতে হবে। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব। আমার মতে কিন্তু যদি —পাঞ্জাব বা মান্দ্রাজে কতকগুলি সভা ইত্যাদি স্থাপন করে বেড়ান ও তোমরা একত্র হয়ে Organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হও ত বড়ই ভাল হয় ; নূতন পথ আবিষ্কার করা বড় কাজ বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষ্কার করা ও প্রশস্ত ও সুন্দর করাও কঠিন কাজ। আমি যেখানে যেখানে প্রভুর বীজ বপন করে এসেছি, তোমরা যদি সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাল বাস করে উক্ত বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে পার, তাহা হইলে আমার অপেক্ষাও অনেক অধিক কাজ তোমরা করবে। উপস্থিত যারা রক্ষা করতে পারে না, তারা অনুপস্থিতে কি করবে ? তৈয়ারী রান্নায় একটু নুন তেল দিতে যদি না পার, তা হলে কেমন করে বিশ্বাস হয় যে, সকল

যোগাড় করবে? না হয়—আলমোড়ায় একটা হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন এবং সেথায় একটা লাইব্রেরী করুন, আমরা দু'দণ্ড ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করি এবং সাধন ভজন করি। যা হক, প্রভু যাকে যেমন বুদ্ধি দেন, আমার তাতে আপত্তি কি? অপিচ God speed—শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ (শুভ হউক, তোমাদের পথ কল্যাণকর হউক)। * *

আমি ক্ষুদ্র জীব—কিন্তু প্রভুর অনন্ত ঐশ্বর্য্য—মা ভৈঃ মা ভৈঃ, বিশ্বাস যেন না টলে! * * প্রভু অতি শীঘ্রই সকল বন্দোবস্ত করে দেবেন। * * মা ভৈঃ। খুব আনন্দ করতে বল— তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম?

ইতি সদৈকহৃদয়ঃ
বিবেকানন্দ।

(৪)

C/o E. T. Sturdy, Esq.
High View.
Caversham,
Reading.
4th October, 1895.

অভিন্নহৃদয়েষু—

তুমি অবগত আছ যে, আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। প্রায় এক মাস যাবৎ এস্থানে থাকিয়া পুনঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীষ্মকালে পুনঃ ইংলণ্ডে আসিব। এক্ষণে ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

* * * *

তাঁহার এক্ষণে আসা অসম্ভব। অর্থাৎ Sturdy সাহেবের টাকা, সে যে প্রকার লোক চায়, সেই প্রকার আনাইতে হইবে। উক্ত মিঃ Sturdy আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন। থিয়োসফির হাঙ্গামায় পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বড়ই আপশোস।

প্রথমতঃ এরূপ লোক চাই, যাহার ইংরাজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ।—শীঘ্র ইংরাজী শিখিতে পারিবেন এস্থানে আসিলে, সত্য বটে, কিন্তু আমি এদেশে শিখিতে লোক এখনও আনিতে পারি না, যাহারা শিখাইতে পারিবে, তাহাদের প্রথম চাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহারা সম্পদে-বিপদে আমায় ত্যাগ করিবে না, তাহাদের আমি বিশ্বাস করি। * * অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, তার পর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যার ইচ্ছা গোলমাল কর, ভয় নাই। * * দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্ম্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি"। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বল বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্ত সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আস্‌ছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।

পেটের কথা খুলে বললুম দাদা, রাগ করো না। আমি তোমাদের গোলাম যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম—এক চুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। * * সমাজ-ফমাজ যত দেখছ, দেশে-বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা— "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (ইহারা পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও)। আজ বা কাল ও সব তোমাদের অঙ্গে মিশিয়ে যাবে যে। হায় রে অল্প বিশ্বাস! তাঁর কৃপায় "ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে।" (ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ হইয়া যায়) নিমকহারাম হয়ো না, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ সুকায যজ্জুহোষি যত্তপস্যসি যদশ্নাসি &c সব তাঁর পায়ে সঁপে দেও। আমাদের আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়াছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা— আবার চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে-পরিয়ে বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিন রাত দেখ্‌লে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ তাঁর কাছে নিমকহারামি!!! * * বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই ত নয়, * * * অমন ঠাকুরের দয়া ভোল! বুদ্ধ, কেষ্ট, যীশু জন্মেছিলেন কি না, তার কোনই প্রমাণ নাই আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবন!! আর আমি কি বলিব? দেশে বিদেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে!!! তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী করে নেবেন। তোদেই জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধুলা পেয়েছিস। আমি কি করিব, আমাকে কাজেই গোঁড়া হতে হচ্চে। আমি যে তাঁর জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখতে পাই না। সকল জায়গা-তেই যে ভাবের ঘরে চুরি। কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি যে রক্ষা কচ্ছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে! না, তিনি রক্ষা কচ্ছেন! তাঁর জন ছাড়া যে আমি কাউকেই একটা টাকা একটা মেয়ে মানুষের কাছে বিশ্বাস করিনে। যার তাঁকে বিশ্বাস নাই আর—তে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙ্গালা বল্‌লুম মনে রেখ।

* * * *

* * *—দুরবস্থা জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই স্থান ছাড়া হতে হবে বলছেন। লেক্‌চার চেয়েছেন—লেক্‌চার ফেক্‌চার এখনও কিছু নাই, তবে কিছু টাকা এখনও গাঁটে আছে—তাকে পাঠিয়ে দেব,

ভয় নাই। পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে, আমার টাকা মারা গেছে—সে জন্যই পাঠাই নাই। দ্বিতীয়তঃ কোন্ ঠিকানায় পাঠাব, তা ত জানি না। মান্দ্রাজীরা দেখ্‌ছি, কাগজ বার কর্ত্তে পার্‌লে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজাতির যে একেবারেই নাই। যে সময়ে যে কাযে প্রতিশ্রুত হও, ঠিক, সের সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়। টাকাকড়ির কথা পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়। * *—মহাশয় যদি রাজি হন, তা হলে তাঁকে কলিকাতার এজেণ্ট হতে বল্‌বে, কারণ, তাঁর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তিনি এই সকল বিষয় অনেক বুঝেন, ছেলেমানুষী হুড়দঙ্গুলের কায নয়। একটা Centre ঠিকানা তাঁকে কর্ত্তে বল্‌বে, যে ঠিকানা—ঘড়ি ঘড়ি বদলাবে না ও সে ঠিকানায় আমি কল্‌কেতার সমস্ত চিঠি-পত্র পাঠিয়ে দেব। * *

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ।

(৫)

London.
13th Nov. 1895.

কল্যাণবরেষ—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ প্রীত হইলাম। যেরূপ কার্য্য করিতেছ, তাহা অতি উত্তম। রা—অতি উদার ও মুক্তহস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার না হয়। শ্রীমান্—এর অর্থসংগ্রহ উত্তম সংকল্প বটে, কিন্তু ভায়া, এ সংসার বড়ই বিচিত্র, কাম কাঞ্চনের হাত এড়ান ব্রহ্মা বিষ্ণুরও দুষ্কর। টাকাকড়ির সম্বন্ধ মাত্রেই গোলমালের সম্ভাবনা। অতএব মঠের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না। রা—ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহ মিত্র বলিয়া জানি না। আমার বা আমাদের নামে কোনও গৃহস্থ মঠ বা কোনও উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে এবং তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব পুরণের নিমিত্ত বহুবিধ ভাণ করে। অতএব যদি কখনও কোনও ধনী বিশ্বাসী ভক্ত ও হৃদয়বান্ গৃহস্থ মঠাদি নির্ম্মাণের জন্য উদ্যোগ করেন অথবা সংগৃহীত অর্থ কোনও ধনী এবং বিশ্বাসী গৃহস্থের নিকট জমা হয়—উত্তম কল্প—নতুবা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। উপরন্তু অন্যকে এ কার্য্যে বিরত করিবে। তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসর ক্রমে মহানীতিপরায়ণ লোকও প্রতারক হয়। এই হচ্ছে সংসার। রা—কে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না। পাঁচজনে মিলে কোনও কায করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়। এই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা। He who knows how to obey, knows how to command. Learn obedience first. (যিনি হুকুম তামিল করিতে জানেন, তিনিই হুকুম করিতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।) এই সকল মহা স্বাধীনভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে Obedienceএর ভাব সেই প্রকার বলবান্। আমরা সকলেই হমবড়া, তাতে কখনও কায হয় না। মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।

তুমি যে প্রকার কার্য্য কর্‌ছ করে যাও—তবে পড়া শুনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—ইতি। য—বাবু একখানি পত্রিকা—হিন্দি ভাষায়—প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগো স্পীচের অনুবাদ আলোয়ারের রা—পণ্ডিত করিয়াছেন। উভয়কেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবে।

তোমার নিমিত্ত এক্ষণে লিখি—রাজপুতানায় একটি centre (কেন্দ্র) করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। জয়পুর বা আজমীর প্রভৃতি কোনও central (মধ্যবর্ত্তী) স্থানে হওয়া উচিত—তদনন্তর আলোয়ার, খেতড়ী প্রভৃতি সহরে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিবে। সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত বিরোধ আবশ্যক নাই। পঃ না—জীকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবে—ঐ লোকটি খুব উদ্যমী—কালে বিশেষ কার্য্যক্ষম হইবে। মাঃ—সাহেব ও—জীকেও আমার যথাযোগ্য প্রেমসম্ভাষণ দিও। ঐ ধর্ম্মমণ্ডলী বলে কি একটা আজমীরে হয়েছে—সেটা ব্যাপার কি? বিশেষ লিখিবে। য—বাবু লিখেন যে, তাঁহারা আমায় পত্রাদি লিখিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত পাই নাই। * * * মঠ-মড়ি কল্‌কেতায় কি কর্‌বে, কাশীতে আড্ডা করিতে হইবে। সে সকল অনেক মতলব আছে, পরন্তু অর্থসাপেক্ষ! ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। খবরের কাগজে দেখে থাকবে যে, ইংলণ্ডে হুজুক ধীরে ধীরে মাচ্ছে। এদেশে সকল কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজ-বাচ্ছা কোনও কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকান্‌রা চট্‌পটে কি অনেকটা খড়ের আগুনের মত। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করিবে না। * * *—তে আমার কতগুলো চেলাপত্র আছে, সে গুলোকে নিয়ে তদারক কর্‌বে * * মহাশক্তি তোমাতে আস্‌বে—ভয় নাই—Be pure, have faith, be obedient. (পবিত্র হও, বিশ্বাসী হও, আজ্ঞাবহ হও)!

ছেলের বের বিপক্ষে শিক্ষা দিবে। বালকের বে কোনও শাস্ত্রে নাই। তবে ছোট ছোট মেয়ের বের বিপক্ষে এখন কিছু বলো না। ছেলের বে বন্ধ করতে পারলেই মেয়ের বে আপনা হতে বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েকে ত আর মেয়ে বে কর্‌বে না। লাহোর আর্য্য-সমাজের সেক্রেটারীকে লিখ্‌বে যে, অ—বলে যে এক জন সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে থাকতেন তিনি এক্ষণে কোথায়? সে লোকটার বিশেষ সন্ধান করিবে। * * * ভয় কি?

বিবেকানন্দ।

অবনীন্দ্র-চরিতম্
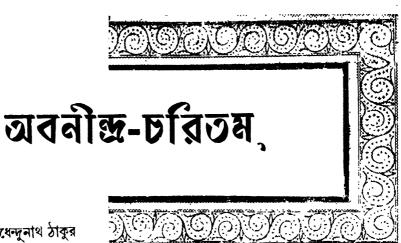
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

চাৎপুর-রোড অতিক্রম ক'রে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে ঠাকুর-পরিবারের 'বড়বাড়ী'র বাস্তব্যে এসে পৌছলুম। তার এলাকার মধ্যে প্রথমেই ডানহাতি চোখে পড়ে ৫ নং ভবন। তার আবার নিজস্ব পৃথক্ ফটক। গাড়ীবারান্দায় প্রথামত দাঁড়িয়ে ছিল উর্দ্দিপরা শ্বেত-গুম্ফ দ্বারবান। জিজ্ঞাসা করতেই সে বিনা বাক্যব্যয়ে দেখিয়ে দিলে উপরে যাবার সিঁড়ি। চমকিত হলুম। আশ্চর্য্য, এ বাড়ীর তবে কি Waiting room নেই! অবাক্ কাণ্ড।—পেন্সিল দিয়ে চিরকুটে নাম লিখতে হল না, পাথরের টেবিলের ধারে কেদারায় হেলান দিয়ে দশ মিনিট ধরে কড়িকাঠের বেলোয়ারি ঝাড় বা মেহগ্নিকাঠের dadoর উপর সোনার জলের ফ্রেমে-বাঁধা বিলাতি ছবির ঐশ্বর্য দেখতে হোলোনা, দরোয়ান ফিরে এসে—"হুজুর সেলাম দিয়া"—এ হেন বাণীও কর্ণে পোষণ করতে হোলোনা;—একেবারে সোজা রোহণ-দর্শন! আমাদের বাড়ীতে তো ঠিক্ এমনটি কাণ্ড ঘটে যাওয়া অসম্ভব। এখানে যে আসে সেই কি তবে সরাসরি চলে যায় উপরে, নির্বাধে? সরকারী কেতা বরবাদ? খুলা দরোয়াজা! অদৃশ্য অক্ষরে যেন সর্বত্র লেখা রয়েছে "স্বাগতম্। শ্রীরস্তু। কল্যাণং ভূয়াৎ"!

শ্রীমান, সেদিন যে বাড়ীতে আমি পৌছেছিলেম,—গন্ধর্বলোকের মতই সে বাড়ী আজ মিলিয়ে গেছে শূন্যে। সেই শিল্প-নালান্দার ধ্বংসাবশেষের উপর এখন দেখতে পাওয়া যায়, দেশলাইএর বাক্সর মত ষ্ট্রিমলাইন বাড়ী। নব দিবসের প্রভাতে আগামী শিল্পবন্ধু মানুষ এইটিকে দেখেই যদি অবনীন্দ্র-পটভূমিকার ধারণা করতে চায়, তাহলে তারা কি ভুলটাই না করে বস্‌বে! তাই ভাবি। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও পাই আমাদের দেশ-চারিত্র্যের অধোগতি দেখে। হায় রে, অর্বাচীন যুগ-সমাজের দ্রোহবুদ্ধি যেন রসাভাসের গাঁইতি হাঁকড়িয়ে ভূমিসাৎ করে দিয়েছে ভারত-শিল্পের ঐ রক্ত-মন্দির। হয়ত, শ্রীমান, তুমি বল্‌বে,—এসব ক্রোধের কথা, কিন্তু আদবেই তা নয়। অন্ততপক্ষে, ইংরাজআমলের ২০০ বছরের মধ্যে, দেখাও দেখি তো আমায়, এমনি আর একটি শিল্পমন্দির? ছবির ইস্কুল গড়া হয়েছে, মৃত্যু-পোষ যাদুঘর তৈরী করা হয়েছে, প্রদর্শনী খুলে পটুয়া-জীবিকা ব্যবসা চালানো হয়েছে, কিন্তু ঐ ৫নং বাড়ীটি ছাড়া এমন একটি শিল্পপীঠ—বাংলায় কেন, ভারতবর্ষে দেখাও দিকি আমায়,—যেখানে প্রবেশ কোরে,—

কঙ্কাল পেয়েছে প্রাণ-সার,
কারিগর ফিরে এসেছে artist হয়ে,
যেখানকার চিহ্নিত নিবেদন সোমবন্যার মত ভারত-ধমনীতে বইয়ে দিয়েছে গুহামুক্তির পবিত্র সুন্দর আনন্দ?

একেই, সত্যিকারের বলা চলে—মন্দির দূষণের পাপ।

এখন বলি শোনো, কি রকমের দেখতে ছিল সেই ৫নং,—ঐ অবনীন্দ্র পটভূমিকা। সে আজ তিরিশ বছর আগেকার কথা। চোখের আয়নায় ভাস্‌ছে।

Elevation planning, তিন তলা প্রাসাদের মোটা মোটা থাম, খিলেন, বর্মাটিকের বড় বড় দরজা, বড় বড় উঁচু উঁচু ঘর, ইয়া চওড়া বারান্দা, অলিগলি পথ, এ সব বর্ণনা করা আমার কর্ম নয়; এবং তার সচিত্র প্রকাশ ফটোগ্রাফের নিপুণ দৌলতে গুরুদেবের "আপন কথা" কেতাবে দৌহিত্র-বধূ শ্রীমতী মিলাডা গাঙ্গুলীর সৌজন্যে দেখতে পাওয়া, যে কোনো সন্ধানীর পক্ষে সহজ। আর অমনধারা পেল্লায় বাড়ীর নমুনা উত্তর কলিকাতার ভাঙনের মধ্যে এখনও বিরল নয়; কিন্তু শ্রীমান, ঐ ৫নং বাড়ীটির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সেদিন আমার বড়লোকী চোখ দেখেছিল, যা আমার মনের কাগজে আজও ধরা পড়ে আছে গন্ধর্বলোকের মহিমা নিয়ে। যা দেখিনি, তা যেন প্রথম দেখলুম ঐ বাড়ীতে ঢুকে।

প্রথম দ্রষ্টব্য ও বাড়ীর সিঁড়ির ঘর। বিলাতী জাঁকজমকে দোধারী কাঠের সিঁড়ি একহারা হয়ে উঠে গেছে দ্বিতলে। ঘরের মেঝেটিতে হরেক রঙের ইটালিয়ান টালি, চিত্রবিচিত্র করে বসানো। সামনেই ব্র্যাকেটের উপর একটি ম্যাকেব-মার্কা বৃহৎ ঘড়ি। যদিও সম্পূর্ণ লণ্ডনি ডিজাইন, তবুও সেই সিঁড়ির মধ্যপথে তোমাকে থম্‌কে দাঁড়াতেই হবে।—শুধু একখানি ছবি দেখেছে। সেই ঘরের একমেবাদ্বিতীয়ং ছবি বদলিয়ে দিয়েছিল সিঁড়ির ঘরের টপ্; যেমন পদ্মফুল—ফুটে উঠে—বদলিয়ে দেয় সরোবরের রূপ! সেটি ওঁর মায়ের ছবি। বিধবা মায়ের একখানি প্রোফাইল।

মায়ের স্নেহ-করুণ আশীর্বাদ যেমন ঝরে পড়ছে সেই মুখে, তেমনি ঝরে পড়ছে,—মায়ের মুখে ছেলেরও আদুরে হাতবোলানো ভালবাসা।

আমাদের "নেলী"-পিসি, অর্থাৎ গুরুদেবের প্রথমা কন্যা উমাদেবী, তাঁর মুখে শুনেছি, এই ছবিখানি গুরুদেব তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে মন থেকে এঁকেছিলেন। সত্যিই, ধ্যান থেকে আঁকা না হলে এমন ছবি হয় না। 'অলকদা'র কাছে এখন আছে সেই ছবি। গিয়ে দেখবার বস্তু সকলের। সেই সঙ্গে সঙ্গে শুনেছিলুম, গুরুদেবের মাতৃ-ভক্তির কথা। হাসতে হাসতে প্রাণ যায়। দু'একটা চুটকী কহি শোনো।

নাটোরের মহারাজা বন্ধুবর শ্রীজগদিন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে নাটোরে গেছেন তিন ভাই, দীপুবাবু, অরুবাবু ইত্যাদি কোরে আরো অনেকে। মাকে ছেড়ে অবন-বাবু কোথাও যেতে চাইতেন না কখনো, তবু জগদিন্দ্রের পাখোয়াজী সহবৎ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নাটোরে। মনটা উস্‌খুস্। কিন্তু নাটোরে ত যাওয়া নয়, নাটোরে গিয়েই—ভূমিকম্প! সে এক হৈ-হৈ ভয়াবহ ব্যাপার! "ঘরোয়া"তে পড়েছ নিশ্চয়, সে সব কাহিনী। জল থৈ-থৈ করছে নাটোর সহরে। এক দিনের জন্যে যাওয়া, অথচ রয়ে যেতে হল দু'তিন-দিন। তার উপর অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় নিয়ে যাননি কেউ ময়লায় থসথস্ করছে কাপড় জামা। ভারী অস্বস্তিবোধ। মাকে খবর পাঠানো যাচ্ছে না, ভয়ানক মন-কেমন করছে অবন ঠাকুরের। মা যদি মরে যায়! শেষে ফিরে এলেন তাঁরা। ষ্টেশন থেকে গাড়ীতে বসে সকলে মিলে শলাপরামর্শ করে স্থির করলেন—"বাড়ী গিয়ে প্রথমেই স্নানঘরে ঢোকা, কাপড় ছাড়া, সাফ হওয়া, তার পরে মুখ দেখানো বড়মহলে। নইলে অ্যাঁ, ছ্যাঃ, কি বল্‌বে সকলে? ঐ কাদামাখা ইজের, উস্কখুস্ক চুল···!"—গাড়ী এসে বাড়ীর গেটে থামল। দীপু, অরু, গগন, সমর সকলেই দৌড়লেন—স্নানের ঘরের দিকে। ভাগ্যিস্ স্নানঘরগুলো সব এক তলায়। কিন্তু অবন গেল কই? অবন অন্তর্ধান। অবন তৎক্ষণে দৌড়েছেন তিন তলায়। মা, মা,—চীৎকার করতে করতে ঝোড়ো কাকের মত মায়ের সামনে গিয়ে হাজির।

"মা, মা, আমি এসেছি। যাক্, বাঁচলুম, বাবা, তুমি বেঁচে আছ।"

"তুই না এলে আমি মরব কেমন করে?"

"আমি তো ভেবে ভেবে মরেই গিয়েছিলুম।"

"বালাই ষাট্, তুই মরতে যাবি কেন? তুই ত আমার অমর ছেলে।"

"দাঁড়াও, তোমায় ছুঁয়ে দেখি।"

ব'লেই ঐ বুড়োধাড়ী ছেলের মাকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী আদর!

"ছাড়, ছাড়, আমাকে,—যা, কাপড় ছেড়ে আয়,—কী কাদাই না মাখতে পারে"—মা চেঁচাচ্ছেন, কিন্তু বৃদ্ধ বালক মায়ের কোলে মাথা রেখে, বিছানার উপর দীর্ঘ হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে, হাউ-মাউ ক'রে হাসছে।

"কেমন, ময়লা কোরে দিয়েছি তো বিছানা? আর আমাকে মা, তুই যেতে দিস্‌নি কোথাও কখনো।"

নেলী-পিসির মুখে আরো একটি গল্প শুনেছিলুম। তবে সে কাহিনী হাসির নয়, শোকের।

ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন। মা চলেছেন মহাযাত্রায়। বৃহৎ পরিবার, ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পালঙ্ক। সকলের চোখে জল, মুখে রা নেই। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন অবন—

"বিনয়, শীগগির তোরা লোহার সিন্দুকটা খোল! দেরী করিস নি। দিদিমার সোণার বালা বের করে মায়ের মাথায় ঠেকা। তাহলে মা আমার আবার ফিরে আসবে। একবার এসেছিলেন, আবার আসবেন মা।"

এই 'বিনয়'টি হচ্ছেন গুরুদেবের ছোট বোন, তাঁর উপর তিনি অর্ডার ফলাতেন। এই মাকে (শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী) জড়িয়েই চল্লিশ বচ্ছর ধরে গুরুদেবের ভক্তিলতায় ফুল উঠেছিল ফুটে। সকাল বেলায় ছবি আঁকতে আঁকতে নিতান্ত পক্ষে চার বার অন্দরমহলে দৌড়োনো চাই অবন ঠাকুরের, মায়ের কাছে। মা বলবে ভালো, তবেই ছবি ওৎরালো, নয়ত কালি ঢালো। ঐ যাঃ ছুটো পান মুখে পুরে অবন পালালো!

তাই বল্‌ছিলুম, শ্রীমান, বিধবা মায়ের ধ্যান-চিত্রখানি এক বার দেখো; দুয়ের ভালবাসা যখন এক হয়ে রূপ নেয় ছবিতে তখন ছবি হয় সার্থক, তখনি চিত্র হয়ে ওঠে মহনীয় পূজনীয়। এই "মহনীয়" শব্দটির ধ্বনির ধরতাই আমায় আজ মনে পড়িয়ে দিচ্ছে এক দিন সন্ধ্যায় গুরুদেবের কথাপ্রসঙ্গ। কোলের-উপর-রাখা পেটকাটা কাঠের ড্রয়িং বোর্ডে পড়ে রয়েছে আমার আঁকা ছবি, আর গুরুদেব বঙ্কনয়নে সেটিকে নিরীক্ষণ করছেন, এবং বিরাট মাথা দুলিয়ে ঠোঁট উল্‌টিয়ে বলছেন—

"না রে, কিচ্ছু হয়নি। হাড় কোথায় গেল? বুঝেছিস্, ছবি তৈরী হয়ে যায় কখন? ঐটাই হচ্চে আমার ফিনিশিং টাচ, Secret; যখন ছবির ভিতরকার মানুষটা, কিংবা গাছ পালাগুলো, কিংবা চাঁদ-সূয্যি আমার মধ্যেকার মানুষটার সঙ্গে খোসগল্প চালায়, আমার এস্‌রাজের টান ওর গানের সঙ্গে পাল্লা দেয়। তা না হ'লে ছবিই হোলো না। তোর আজকের ছবির গাছটা···কই···কথা কয় না কেন? দে তুলিটা দে। আঁকবি যখন, তখন ঐ গাছটাকেও মানুষ ভাববি, দেবতা ভাববি, ভেবে আঁকবি। এই গ্যাখ, ওরও হাত আছে, নাড়ী আছে, টিপটিপ করছে ফুস্‌ফুস্।"

সেই দিন আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম, রঙ্ বা রেখা দিয়ে যা-কিছুকেই আমি বাঁধতে যাই না কেন, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হবে এবং ব্যবহার ঘটবে,···অমূর্ত্ত পদার্থের মত নয়, রূপময় প্রত্যক্ষ মূর্ত্ত পদার্থের মত; এবং তাকে দেখবার জন্যে আমার দৃষ্টিতে থাকবে সততা, এবং শ্রদ্ধান্বিত ভালবাসার মধুরতা। যে ভাব-রসের মোহে আকুল হয়ে আমি তাকে দেখেছি, সেই ভাব-রসের চিত্ররূপ হয়েই সে বাঁধা পড়বে আমার কাগজে। বহুকাল পরে যখন আমি সংস্কৃত কাব্যসায়রে ডুব দি, তখন গুরুদেবের কথাগুলির বিরাট চিত্রণ আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে আমার মনে। ভাষা-সম্বন্ধেও ঐ এক কথা, সত্য।

দোতলার সিঁড়ির ঘরে, দেয়ালের গায়ে ছিল কাচের দুটি শো-কেস! মনে আছে, সেই শো-কেস দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যাই। আমার মায়ের শয়নকক্ষে এর চেয়েও ছিল বিরাট একটি পুতুলের আলমারী; দামী দামী সোনার-কাজ-করা পোঃসিলেনের পুতুল, টপ্‌হ্যাটপরা পুতুল, বোলারহ্যাট পিকটকি পুতুল, পাউডার কেস্, পরী উড়ছে, মোটরগাড়ী, হাতী ইত্যাদি ভর্তি ছিল তাতে। কিন্তু ছেলেমানুষির বয়স পার হয়ে গেলেও, ছেলেমানুষিটা হঠাৎ কারো কর্পূরের মত নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় না, তাই বোধ হয় ঐ হেন আলমারি আমাকে থমকিয়ে এক মুহূর্ত্ত দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু—

"ও মামা ও গুলো কার ছবি? এরা ত আমাদের বাড়ীর পুতুলের মত নয়।"

—"ওগুলো সব মোগল আমলের। হাতের কাজ।…ঐ যে …ওটি হচ্ছে মালকাইন নুরজাহানের পোট্রেট,…আইভরি পেন্টিং। অরিজিন্যাল। পরে দেখবি সব। এখন চল্।"

নুরজাহানের দিবা-স্বপ্ন দেখতে দেখতে পাশের ঘরে পা দিতেই এক জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শন মিলল। ঘরের পাশেই জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ দক্ষিণের বারান্দা। তারি ফুলকাটা রেলিং-এর ধারে পিঠ ক'রে উত্তরমুখো একটি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন তিনি। এক পায়ের উপর চুড়িদার তার একটি পা। শাদা ফুল তোলা কটকি চটি পায়ে, গায়ে আদ্দির ঢিলে-আস্তিন পাঞ্জাবী, মাথায় শাদা চুল, বুকলেশ-কেশহীন। শরীর একহারা। নবীন নবনী-র মত স্নিগ্ধ রঙ মুখের;—তার উপরে কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পাশের টেবিলের মার্বল-মারফৎ সকালের অকঠোর সূর্যদেব। তীক্ষ্ণ সুন্দর মুখ। তাঁকে দেখেই মনে হল,—উনিই নিশ্চয় শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাক্, গুরু করবার মত সুপুরুষ বটে। এখন ভাবলে হাসি পায়। সেই মানুষটির একটি হুবহু তৈলচিত্র, এঁকে রেখেছেন প্রথিতযশাঃ শ্রীঅতুল বোস। সেই ছবিটিতে তাঁর গায়ের রঙ একটু সাহেব-ঘেঁষা হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না; একটু ননী-রঙ চড়ালেই তোমরা তাঁকে না-বলতেই বুঝতে পারবে। আমি তখন তাঁকে চিনতুম না, বুঝতুম না। তিনি স্বনামধন্য শাস্ত্রবিৎ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দূর থেকে শুনতে পেলুম মহাভারত নিয়ে আলোচনা করছেন ব্যগ্রমুদ্রায়।

দক্ষিণের বারান্দায় যেই প্রবেশ করলেন মামা, অমনি তিনি আলোচনামুক্ত হয়ে শুভহাস্যে বলে উঠলেন—

"এই যে হিরণ্ময়,…বহুদিন পরে দেখা হল। ভাল আছ ত? ওটি কে তোমার সাথে?"

তাঁকে প্রণাম করলেন মামা। আমিও করলুম দেখাদেখি। মামা সবিনয়ে বললেন—

"আপনারা যেমন রেখেছেন। এটি আমার ভাগ্নে।"

তখনকার যুগে একটা সামাজিক রীতি ছিল। এখন সেটির অন্তর্ধান ঘটেছে। তাই সেই রীতির কথা একটু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। এযুগে অবাস্তর হলেও, আমার কাছে তা নিতান্ত অবাস্তর নয়। প্রণাম। প্রণামরীতি। গুরুজন হলেই তাঁকে প্রণাম করতে হ'ত তখন আমাদের, এবং এক জনের সঙ্গে কথা শেষ হলে, তবে, তারপরে, প্রণাম করতে হোতো অন্য গুরুজনকে। যাঁকে সামনে পাবে, তাঁকে নিয়েই এই প্রণামের সুরু। এটি না হলে মানহানির মোকদ্দমা পৌঁছত সামাজিক মহলে এবং দণ্ড হত 'অভদ্র'—উপাধিলাভ। কারণ, ওরে মূর্খ, প্রণাম করছিস্ দেবতাকে, মানুষকে নয়। সেটির ব্যতিক্রম সামাজিক অকল্যাণ। আজকের সমাজহীন বা দৈবতহীন যুগকুক্তিতে এই রীতি উঠে গেছে; কেননা, আমরা মানুষকে মনুষ্যপশু হিসেবেই যাচাই করি। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে ঐ প্রণামরীতিটি উঠে গেলে ভারতবর্ষের শিল্পশাস্ত্রের মর্ম-মন্ত্র ঐ 'দেবতা'-টি অন্তর্ধান পাবে, বিশেষ ক্ষতি হবে শিল্পবুদ্ধির। আশীর্বাদ পৌঁছবে না দেবতার। ছাত্রমহলে আজকাল লক্ষ্য করা যায়—শ্রদ্ধাহীন অবজ্ঞার একটি ভাব। বলি,—কে ছোট, কে বড়,—শিষ্যবয়সে সে বিচার করবার আমি কে? আমার কাজ হচ্ছে, গুরুজনের কাছে, ঐ মহনীয় চিত্রের কাছে, ঐ বস্তু-দেবতার কাছে পৌঁছোনো,—আপন সত্যের প্রণাম-পবিত্র শিল্পকর্ম নিয়ে, নিত্য-বর্ধমান প্রজ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে। তাই আমার মনে হয়, শিল্পীর প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে a disciplined mind, যার যাত্রাপথ প্রণাম থেকে সুরু, এবং রূপ ও বর্ণের মাধ্যমে ত্রয়ীদর্শনে,—অর্থাৎ চিত্রের স্বর্লোক, ভুবর্লোক এবং ভূর্লোকদর্শনে—যার পথাবসান। ভারত শিল্পশাস্ত্র এই তিন ধামের চিত্রণ-কলা নিয়ে বিচার করেছে, মাথা ঘামিয়েছে। এ সম্বন্ধে গুরুদেবের সঙ্গে যা কথা হয়েছে, সময়মত বলব। এখন—প্রণামের মধ্যপথেই—

অদ্ভুত উচ্চারণ-সম্বলিত এক শব্দচ্ছটা ভেসে এসে লাগল আমার কানের ফোনে—

"সুরেন, ওটি তাহলে হচ্ছে আমাদের প্রফুল্ল ঠাকুরের,… পেসাদ দাসের ছেলে।"

তাঁকে প্রণাম করলেন মামা এবং তার পরে আমি। পাশেই রক্ষিত ছিল একটি নীচু কাষ্ঠাসন। তাতে আমাকে বসতে বলে, মামাকে বসতে বললেন চেয়ারে। অতঃপর, মামা যেই বলে ফেলেছেন—

"আপনার কাছে পেসাদ দাসের মেজ ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি। একে একটু…কিছু…"

অমনি একখানা অদ্ভুতধরণের লম্বা, ডগা বাঁকানো আঙুলওয়ালা হাত উর্দ্ধে উঠল লাফিয়ে; লাফিয়ে উঠল দেড় ইঞ্চি মগ্‌জিদার সুতোর ঘুন্টি-পরানো গলা খোলা পিরাণের মধ্য থেকে; স্বাস্থ্য-স্ফীত পিরাণের শীর্ষভাগে লাফিয়ে উঠল একটি হাস্যচরিত্র আস্য,—মুখের রঙ গুঁড়োনো গুটি-খয়েরের সামিল। বিস্তীর্ণ ঠোঁট দু'টি,—যেন গুরু-হেন গালের টোল থেকে বেরিয়ে এসে, ঠারহাসির দোল খেয়ে টঙ্কারবহুল স্বরিতে বললে—

"ওহে হিরণ্ময়, তুমি সব সময়ে দেখছি, সঙ্গে একটা বিপদ টেনে আনবেই। শিষ্য করবার পালা আমার ফুরিয়েছে। আবার এ সব কি এখন দায় নিয়ে এলি। জানিস আমার দিগ্বিজয় রে,—দিগ্বিজয়—শেষ হয়ে গেছে। খতম্।"

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সুরেন ঠাকুর। গুরুদেবও হাসতে হাসতে বললেন—

"হাসতে চাও হাস। কিন্তু, বুঝেছ হে, 'নন্দ' এখন

শান্তিনিকেতনে, 'অসিত' যাচ্ছে লক্ষ্ণৌও, 'দেবী' মাদ্রাসে, 'সমর' লাহোরে, 'হিরণ্ময়' চলেছে জয়পুরে। এখন বুঝেছ হিরণ্ময়, তোমাদের এবার শিষ্য নেবার পালা। তবে পেসাদদাসকে আমি বড্ড ভালবাসি।"

কথার খেই টেনে নিয়ে ফট করে মামা চেয়ার ছেড়ে বললেন—"ঐ, তবেই তো হয়ে গেল। নে, ছটু, পেন্নাম করে নে। নাড়া বাঁধতে হবে।"

কাঠের আরাম কেদারা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন কালো ফিতে জামরঙের লুঙ্গি-পরা দীর্ঘদেহ মানুষটি, বললেন—"নাড়াটাড়া পেসাদ দাসের ছেলে আবার বাঁধবে কি? ও যে আমাদের ঘরের ছেলে। ওকে না হয় একটু নাড়িয়ে দেব। এই নে,"···বলেই, কাঠের চৌকো চোঙা থেকে একটি ভগ্নদশা তুলি বার করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। দিয়ে বললেন—"ব্যস, ঐ হয়ে গেল। এইবারে পেন্নামটা সেরে ফেল।" আমি প্রণাম করলুম সকলকে। তারপরে গুরুদেব আরাম কেদারায় এলিয়ে বসে ফুট-ষ্টুলের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—"তা, আগে থেকেই আমি বলে রাখি বাপু, তোর জন্যে আমি কিছু কোরে টোরে যেতে পারব না। আসবি-যাবি, কাজ শিখে নিবি।···হুঁ হুঁ বাবা, তাহলে··· ছোট কত্তার ছোট শিষ্য হয়ে গেলেন ছোটু বাবু! কি বলিস্। রথিকা-র কাজ হচ্ছে হাতে-খড়ি দেওয়া, আর আমার কাজ হল হাতে-তুলি।"

মামা।—আপনি হাতে তুলে নিলেন, আমি বাঁচলুম।

দশ মিনিটের ঘূর্ণিতে ঘটনাচক্র ঘুরে গেল। বহু-ব্যবহার-বৃদ্ধ নষ্ট-রোম তুলিকাটিকে হাতে নিয়ে কাঠের টুলের উপরে আমি বসে রইলুম। আর তিন গুরুজনের মধ্যে টানা চলতে লাগল বিবিধ সংলাপ। আমি দেখতে থাকি গুরুদেবকে,···ইনিই তবে আমার গুরুদেব শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উনি নন। কী অদ্ভুত চেহারা! রূপে রসে ছন্দে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেন একটি বিপরীত কৃষ্ণ সংস্করণ। খতিয়ে বসে ভাবতে থাকি। আর ধীরে ধীরে ওঁদের আলাপচারীর অন্তরালে আমার চোখে ধরা পড়তে থাকে গুরুদেবের চিত্র-রূপ। এ কেমন করে হোলো! এ যে একেবারে ঠাকুর-বাড়ী-ছাড়া চেহারা! মন-মজানো চেহারা নয়, শ্রীমান, মন-হাসানো মন জাগানো চেহারা। নাটুকে, তো নাটুকেই। আর দেখেছ!—দেহের সব কটা হাড়, নড়বড় করে দুলতে দুলতে যেন অভিনয় করে হাঁকছে—

"আমরা সবাই নট,···নাচিছ এই দেহমঞ্চে, কত ভঙ্গি, কত রঙ্গি দেখ দিকিন্ আমাদের।"

শ্রীমান, এত লোক দেখেছি জগতে এসে, কিন্তু এমন অদ্ভুত গড়নের আর একটি মানুষ আমি দেখিনি, আর দেখিনি এমনধারা পায়ে হেঁটে চলা,···শুনিনি এমন চরণধ্বনি। দীর্ঘদেহের জুতো-পরা দ্রুতচলা।—যেন হেঁটে আসছে ফল আর পাতা নিয়ে রসালদ্রুম। অন্তরিক্ষের মলিনতাকে সম্মার্জ্জিত করে দিয়ে যেন চলেছে। এ চলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এক জনই চলত অথচ মনে হোতো—চলেছে দু'জন, গন্ধর্বলোকের কোনো দুহিতাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, শুনেছি যার নূপুরধ্বনি, অথচ দেখা পাই না তার।

টুলের উপরে বসে কী যে ভাবছিলুম জানি না, হঠাৎ আমার দিকে ছুটে এল গুরুদেবের ট্যারা চোখের দোধারি নিশান; তিনি বললেন—

"তুলিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিস্ কী? ভাবিস্‌নি তুই, ওটা আমার ভাঙা তুলি। বেজায় কাজের তুলি রে, সখের তুলি আমার। ভয় নেই, আরও একটা রয়েছে আমার। বুঝেছ, শিষ্য, সব জিনিষের মতই ছবিটাকে মাজতে হয়, ঘসতে হয়। ওটা আমার মাজা-ঘসার তুলি।"

বলেই নিজের কটি-মর্দ্দন রসিকতায় হেসে উঠলেন বক্রাধরে। তার পরে গম্ভীর মুখে বললেন—

"তুলিটার ডগায় হয়ত রয়েছে সাত আটটা লোম, বাকি সব-গুলোই আদ্ধেক ছিঁড়ে গেছে। ড্রাই ব্রাশে আঁক্‌বার দরকার হলে, বুঝেছিস্, সাতটা ফরাক্ ফরাক্ লাইন ফর্ ফর্ করে আঁকা হয়ে যায় একটানে, আর তার মধ্যে পড়তে থাকে জলের নক্‌সা। রেখে দিস্।"

মনে পড়ে, একটি কথাও সেদিন সকালে বেরোয় নি আমার মুখ থেকে। আমি কেবল দেখেছিলুম—

উষা আর নিশা সখ্য পাতিয়েছে তাঁর চুলে,
—যেন কৌতুকের নিকেতন;
নাতিবৃহৎ টাকের দু'পাশ দিয়ে চুলের বক্রবাহার,
—যেন লাগাম ছেঁড়া উৰ্দ্ধমুখ ঘোড়া;

অসমান ভ্রূ; রেখাঙ্কিত বিরাট ললাট; প্রকাণ্ড মাথা; মুখের বঙ্কুরতা অতি-প্রকট; বাম গণ্ডে একটি প্রকাণ্ড তিল। গলায় হাতে শিরা জেগেছে, অথচ দেহের সমগ্রতায় শিশুর মত একটি স্বচ্ছন্দ নিরভিমানতা। চরণে বিরাজ করছে বিদ্যাসাগরী চটরাজ।

আর এই তথ্যের তীর্থে দেখেছিলুম,—দক্ষিণের বারান্দা।

মন খারাপ হয়ে যায়, ঐ দক্ষিণের বারান্দার কথা মনে পড়লে। বর্ণনা শুনলে তোমরা বলবে—'পাগল ভক্ত, তাই বকছে'। তাই মাঝে মাঝে ভাবি—সত্যিই বর্ণনা করবার মত কি কিছু ছিল সেই দক্ষিণের বারান্দায়?

রঙচটা লাল সিমেন্টের মেঝে, ফাট ধরেছে মাঝে মাঝে অতবড় সত্তর-পঁচাত্তর ফুট লম্বা, বারো তেরো ফুট চওড়া, ডবল্ ডবল্ গোল থাম, আকাশী ঝিলমিলি-ওয়ালা টানা বারান্দায়—না আছে দেয়ালে একটা ছবি, না আছে একটা বর্শা বা তলোয়ার টাঙানো। একটি থামের গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল, সম্ভবতঃ গুপ্তপিরিয়ডের ফুট দুই উঁচু একটি প্রস্তর মূর্ত্তি; তার উপরে ক্ষত রেখে গেছে কালপ্রবাহের ক্ষতি। আর ছিল বারান্দার পুব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালগিরি এক-প্রস্থ মার্বেলের উপর বসানো তিনটি চিনেমাটির টব—তাতে জাপানী বৃক্ষের পত্র-পুষ্পান্বিত-শোভা। এমন কিছুই নয়। কিন্তু তবু বলব, ঐ বারান্দাই ছিল ভারত শিল্পের গোমুখী। নীচেই ফুলবাগান, গাছঘর, পাঁচিলের ধারে ধারে বড় বড় গাছ। আম জাম। সিঙ্গীবাগানের মদন-বাবুর বাড়ী উত্তুরে বাতাস খেত সেই ফুলোয়াড়ির। আর ছিল বারান্দার পুবদিকে, এক প্রকাণ্ড মহানিমের গাছ। তার একটি শাখা নেমে এসে, যেন পর্ণযবনিকা রচনা ক'রে আড়াল করে

রেখেছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঋষিবাতায়ন। ঐ মহানিম শাখার অনেক লীলাপ্রকাশ ধরা রয়েছে গুরুদেবের চিত্রাবলীতে। সমগ্র ৫নং ভবনের প্রাণ যেন স্পন্দিত হ'ত ঐ দক্ষিণের বারান্দায় সুরক্ষিত তিনটি আসনে। কিন্তু যেদিন মামার সঙ্গে সেখানে যাই, সেদিন দু'টি আসন ছিল শূন্য। পরের দিন সেই আসন দুটিতে সমাসীন দেখেছিলুম আর দু'জন পূজনীয়কে। তাঁরা আমার গুরুদেবের বড়দাদা এবং মেজদাদা। সেকালের বাংলা সমাজে এই তিন ভ্রাতার একাত্মতার ইতিহাস কমনীয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। এই তিন জনকেই একটি শ্লোকে গেঁথে রেখে দিয়েছেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রও।

"হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ,
হাসির সমরে আর মৌন রহে না তার
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।"

পরে আসা যাবে তাঁদের কথায়। এই ত্রয়ীর কত লীলাই না দেখেছে এই দক্ষিণের বারান্দা।

এই বারান্দাটি গুরুদেবের কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয়, ছিল তাঁর নিষ্ঠার নীড়, ছিল অবনপটুয়ার খেয়ালের কারখানা; নাম দিয়েছিলেন Tagore Studio। বেলঘোরিয়ার "গুপ্ত-নিবাসে"ও গুরুদেবকে দেখেছি আর একটি দক্ষিণের বারান্দায়। কিন্তু সেই পরস্মৈপদী বারান্দায় শান্তি পাননি তিনি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরূপা দেবীকে লিখিত এই পত্রখানি পড়লেই অবসন্ন হবে তাঁর অলিন্দ-প্রীতির কাহিনী।—

Tagore Studio,
5, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta.
রবিবার ১১৩১।

কল্যাণীয়া সুরূপা,

তোর চিঠিতে সব খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেম। যতই লোভ দেখাও, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে—বেশ লাগছে কলকাতা, আহা এমন স্থান কি আর আছে! কোথায় লাগে তোদের ঘাটশীলা—আহা, এই সহরের বাড়ি-ঘেরা দৃশ্য কি চমৎকার! সকালে একটু একটু কুয়াসার মধ্যে দিয়ে বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ আর ছায়া পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্ব্বতের গায়ে আলো-ছায়ার ঝরণা ঝরছে। মাঝে মাঝে একটা চিমনি ধুঁয়া ছাড়ে আর মনে হয় যেন বনের মধ্যে কারা চড়ুইভাতি খেতে বসেছে—রান্নার গন্ধ পর্যন্ত নাকে আসে! তার উপর এখন আবার ছটপূজো লেগেছে সিংঘীর বাগানে—সকাল থেকে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত চমৎকার সুরে চারি দিকে মাদোল ঢাক ঢোলের সঙ্গে মেয়েরা ছেলেরা গান জুড়ে দিয়েছে, ওধারে কোথায় একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে—মজুররা ছাত পিটছে তালে তালে দুপ দুপ, মনে হয় ঠিক যেন কাঠঠোকরা ডাকছে কুব কুব। থেকে থেকে মোটরগাড়ি ভোঁ, সেও সুরে বেজে যাচ্ছে রামশিঙে। এক দল পায়রা ছাতে—নীল আকাশের গায়ে কালো দিয়ে লেখা—চুপ করে বসে থাকতে থাকতে অকারণে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পড়লো আবার একটা পথ হারিয়ে এসে বসলো আমাদের কার্ণিশে রোদ পোহাতে, কি সুন্দর! ঠিক যেন কাঁচপোকার সাড়ি পরে টুনুদিদি বসে আছেন। বারাণ্ডার উপরে রোদ পড়েছে এলিয়ে, একদল চড়াই তারি উপর চেঁচামেচি ডিগবাজি খেলা জুড়েই হঠাৎ পালালো, দেখি জলিকুকুর প্রবেশ করছেন পায়ে পায়ে। বাগানে লটকান গাছে ফুল ধরেছে, তারি মধু খেতে একটা প্রজাপতি সকালে দুপুরে ঘুর ঘুর করছে। ফুলগুলো লাল জামা-পরা টুনুদিদির খোকাটির মতো গুটিসুটি রোদে ঘুম যাচ্ছে! কাগডিমি আকাশে সন্ধ্যেবেলা ফানুস ওড়ে, কোনটা মানুষ, কোনটা হাতি কোনটা কিম্ভুত-কিমাকার গোলাকার! রাতে রেডিওতে দূর খবর আসে আর তার পর বাদশা মশায় কাসেন, কাঁদেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন নিশ্চয়, কিন্তু সকালে সব ভুলে যান, বলতে পারেন না। ছোটুবাবু টুনুদিদি ওরা ভাল তো? পদ্ম তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ নিও। ইটালীতে যাবো একদিন। কোকো এখনো আসেনি চিঠি দিয়েছে ভাল আছে। আমরা সবাই ভাল আছি। ইতি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই দক্ষিণের বারান্দায় কত সুধী সহৃদয়ের সমাগম যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। নিছক স্তাবকের মনোভাব নিয়ে কাউকে আসতে দেখিনি এখানে। সকলের মধ্যেই বা সঙ্গেই দেখেছি সখ্যতার হৈ-হৈ মুগ্ধ-বুকে-জড়ানো পরমানন্দ। কিন্তু শ্রীমান, আমার কাজ ছিল—পাশের টুলে বসে ছবি আঁকা, শুধু দেখা, কথাটি কওয়া নয়। [ক্রমশঃ]

...

মামা সবিনয়ে ব

"আপনারা যেমন

তখনকার যুগে একটা সামা
অন্তর্ধান ঘটেছে। তাই সেই রী
হচ্ছে। এযুগে অবাস্তর হলেও, অ
ময়। প্রণাম। প্রণামরীতি। গু

বসুমতী

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মিত্র

ব — সুন্দরার সন্তান মোরা উঁচু-নীচু কিছু নাই,
সু — স্থ সবল দেহে, মনে-প্রাণে করে নিব নিজ ঠাঁই
ম — নুবেদ গীতা শাস্ত্র যাদের তাদের কিসের ভয়?
তী — রন্দাজের তীক্ষ্ণ বাণেতে বিপদে করিব জয়।

রি দ্বা র
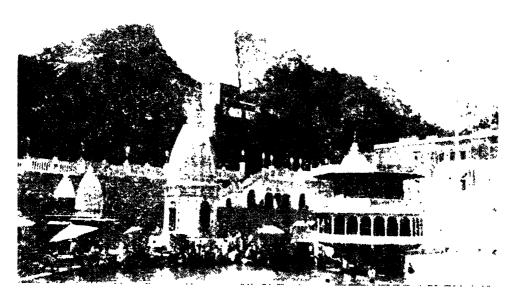
শ্রীদিলীপকুমার রায়

হরিদ্বার, বৃন্দাবন ও কাশীর মাহাত্ম্য নিয়ে কবিরা কত গানই না বেঁধে গেছেন! ছেলেবেলায় ৺অঘোর চক্রবর্তীর গাওয়া বিখ্যাত ভজন শুনতাম গ্রামোফোনে:

কাশী সমান নগী দ্বিতীয়া পুরী ব্রহ্ম আদি গুণ গাওত রে।
মুক্তি প্রবাহ বহে যথা গঙ্গা সুরনরমুনি জঁহা আওত রে।

বৃন্দাবন সম্বন্ধেও গান শিখেছিলাম:

বুঝি বাজিল বাঁশের বাঁশরী!
ঐ বাজাইছে বনে বসি' বনবিহারী!
বার বার বলিয়াছি বঙ্কিম বদনে
বৃথা বাঁশী বাজায়ো না বিজন এ বিপিনে
বৃন্দাবনবাসী বাঁশীর বৈরী।

পুরী বা গয়া সম্বন্ধেও নিশ্চয় গান বাঁধা হয়েছে, কিন্তু সে সব গানের সুর বেশী চল নেই—কেন, কে বলবে? হরিদ্বার সম্বন্ধেও অনেকেই গান বেঁধেছেন। বছর দুই আগে হরিদ্বারে এসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল—সন্ধ্যাবেলা গঙ্গাতীরে ব্রহ্মকুণ্ডের চারি দিকের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার আরতি শুনে। ইন্দিরা অমনি লিখলো একটি সুন্দর গান ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে, যেটি চমৎকার গাওয়া যায় ঝাঁপতালে সিন্ধু কাফি রাগে:

সজন চল্ বসে আও গঙ্গা কিনারে।
যে জীবন বিতা দে হরি কে দুয়ারে।
হৈ সন্ধ্যা কী বেলা যে শীতল হাওয়া যেঁ!
হৈ গঙ্গা কে তট আরতী কী সদায়েঁ।
কহীঁ শঙ্খ বজতে হরীধুন কঁহী হৈ,
কহীঁ স্বর্গধরণীপে হৈ-তো য়হী হৈ।

পুরো গানটির অনুবাদ মূল সহ প্রেমাঞ্জলিতে ছাপিয়েছি। যে ছয়টি চরণ উদ্ধৃত করলাম—তার বাংলা নিচে দিই:

গঙ্গাতীরে বসতি চলো করিতে হে সুজন!
হরিদ্বারে হরিরে করো জীবন অর্পণ।
সন্ধ্যাছায় ছন্দে যেথা মন্দ সমীরণ।
গঙ্গাতীরে আরতি সুরে কত না মধুস্বন।
কোথাও বাজে শঙ্খ, কোথা উছল নামবাণী।
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে হেথা সে রাজধানী।

এই হ'ল হরিদ্বারের এক রূপ—ভক্তের চোখে দেখা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য টুরিষ্টরা এখানে এসে দেখেন কী? না, রাস্তায় মানুষ চলছে স্বেদ কাটিয়ে, গরু ঠেলে, বাড়িগুলি মলিন, পথঘাট অতি নোংরা—দোকানপাটেরও কোনো চেকনাই-ই নেই। ইন্দিরা এক দিন কথায় কথায় বলছিল: "দাদা, বোধ হয় হরিদ্বার এ যুগেও বজায় রেখেছে তার সাবেকি চাল—ঠিক যেমনটি আগে ছিল।"

কথাটার মধ্যে অত্যুক্তি হয়ত আছে। কিন্তু কিছু সত্যও নেই কি? পথে-ঘাটে এখানে মোটর কদাচ চোখে পড়ে। বাস্—হাঁ আছে, কিন্তু শুধু যাত্রী নিয়ে হৃষীকেশ যাওয়ার জন্যে। নইলে কুশ্রী টঙ্গা ও হাল-আমলের অপরিসর সাইকেল-রিকশ। কিন্তু দু'য়ের একটিতেও প্রাণ স্বস্তি পায় না। কেন না, পথ সঙ্কীর্ণ ও পথিক প্রচুর। এখানে-ওখানে খাবারের দোকান—অতি সুদৃশ্য, চায়ের দোকানও তথৈব চ। এক দিন এখানে দেখি কি, দলে দলে আমেরিকান তরুণ-তরুণী ক্যামেরা নিয়ে চলেছে! ওরা কী দেখল হরিদ্বারে? "স্বর্গদ্বার" নিশ্চয়ই দেখে নি। হরিদ্বারের

ঘিঞ্জি ও কুশ্রী বিপণি ভবনাদি দেখে ওদের প্রাণ-পুরুষ কম্পমান হয়ে থাকবে। তবে এখানে আসবার আগে ওরা নিশ্চয়ই বসন্ত, টাইফয়েড ও আরও নানা ব্যাধির প্রতিষেধক ওষুধ দেহের ধমনীতে সঞ্চারিত ক'রে তবে ভ্রমণ-কৌতূহল চরিতার্থ করতে এসেছিল। ওরা দেশে গিয়ে লিখবে বা গল্প করবে তথাকথিত পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারের স্বরূপটি ঠিক কী!

যদি ওরা লেখে যে, এখানে এক গঙ্গার শোভা ছাড়া আর কিছুই নেই—দু'ধারে পর্ব্বতমালার কিছু শোভা আছে বৈ কি, কিন্তু তেমন কিছু নয়? যদি লেখে—"আমরা যদি এ শহরটিকে পেতাম তবে সুন্দর নীলাঞ্চলা গঙ্গার দুই তটে রচতাম সত্যিকার স্বর্গপুরী" আর তখনি বলা যেত: "স্বর্গ যদি কোথাও থাকে সেথা সে রাজধানী?" যদি লেখে: 'এখানে মানুষ আসে কি জন্যে—বোঝা দায়'—তখন কি উত্তর দেব?

যুক্তির দিক দিয়ে উত্তর দেবার কিছুই নেই। শুধু এইটুকুই বলা যে, ভক্তের চোখে তীর্থের যে রূপ অভক্তের চোখে তীর্থের সে রূপ নয়। কাশী, বৃন্দাবন, পুরী বোধ করি সব তীর্থের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে।

কিন্তু হরিদ্বারের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। মা গঙ্গা এখানে এখনো পর্য্যন্ত মিলওয়ালাদের নেকনজর লাভ করেননি। এখানে নেই কলেজ, কাছারী, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। তাই এখানে কেবল তীর্থযাত্রীই আসে। মন্দিরে মন্দিরে ঘোরে তারা, গঙ্গায় করে স্নান, হয়ত হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, কেদারবদরী পানে উধাও হয় এখানেই হেডকোয়ার্টার ক'রে। কিন্তু যিনি যে কারণেই আসুন না কেন, এখানে টুরিষ্ট জাতীয় মনোভাব নিয়ে খুব কম যাত্রীই আসেন। আর সাড়ে পনর আনা যাত্রী এখানে আসেন "গঙ্গাতীরে বসতি" করতে, "হরিদ্বারে হরিকে জীবন অর্পণ" করতে যদি না-ও হয়—একেলিয়ানার ঝাঁঝালো অথচ অতৃপ্তিময় জীবনযাত্রার চাপ থেকে খানিকটা অন্ততঃ ছুটি পেয়ে সেকেলিয়ানার কিছু স্বাদ পেতে। পণ্ডিত জহরলালের ব্যঙ্গ ভাষায়—মিডীভাল যুগের রস-কষ আহরণ ক'রে মডার্ণ যুগের হাঁপানি থেকে ক্ষণিক অব্যাহতি পেতে।

কে কী উদ্দেশ্যে এখানে আসেন, তার ফিরিস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। শুনেছি, অনেকে আসেন গঙ্গাজলে পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে, অস্থি জলাঞ্জলি দিতে। কেউ বা আসেন সাধু-মহাত্মার খোঁজ পেতে, কেউ বা—হিমালয়ের উচ্চতর স্তরে উঠতে।

কিন্তু আমরা বলি, আমরা কিসের লোভে আসি এখানে ফিরে ফিরে? প্রতি তীর্থের যে অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য সে ধরা পড়ে কার কাছে? না, শ্রদ্ধালুর কাছে, তীর্থযাত্রীর কাছে—নিরপেক্ষ ক্রিটিকের কাছে নয়। ইন্দিরা ও আমি এখানে ফি বছর একবার করে আসি এই শেষোক্ত দলের প্রতিনিধি হয়ে নয়, তীর্থযাত্রীদেরই ক্লাসে নাম লিখিয়ে। তাই তো হরিদ্বারে আসতে না আসতে মন ওঠে আমাদের উজিয়ে, বিশেষ ক'রে কলনাদিনী মা গঙ্গার কুলুধ্বনি কানে শুনে, নীলাঞ্চলা শান্তিময়ীর প্রাণকাড়া শোভা চোখে দেখে।

গঙ্গার এ-হেন শোভা আমরা আর কোথাও দেখিনি, যেমন দেখলাম হরিদ্বারে ও হৃষীকেশে। শুনেছি, আরো উপরে গঙ্গা আরো মনোমোহিনী। কিন্তু আরো উপরে গঙ্গায় স্নান করা দুর্ঘট। আমরা ফিরে ফিরে এ পুণ্যতীর্থে আসি গঙ্গায় অবগাহন স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হ'তে, পবিত্র হ'তে। প্রতিদিন গঙ্গার জলে ডুব দিতে না দিতে শুধু দেহ নয়, মনও যায় জুড়িয়ে। বার বার এখানে এসে সাধনায় ডুবতে ইচ্ছা হয়—এখানকার নিঃসঙ্গ গাঙ্গ পরিবেশে দিনের পর দিন কাটাতে ভালো লাগে। •কেবল মুস্কিল এই যে, এখানে গঙ্গাতীরে বাসযোগ্য ভবনে ঠাঁই পাওয়া ভার। আমাদের এলাহাবাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক চীফ জাষ্টিস হওয়ার দরুণই আমাদের একটি সুন্দর ভবন মিলে গেল তাঁর একটি পত্রাঘাতে লিখলেন, দেরাদুনের এক জজসাহেবকে, তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন, ঠাঁই মিলল এক অতি মনোরম ত্রিতল ভবনে। দ্বিতলে ইন্দিরা, ইন্দিরার স্বামী ও ওদের দুই পুত্র। ত্রিতলে গঙ্গামুখী একটি কক্ষে আমি একা। অতি অপরূপ লাগে সারা দিন এখানে কাটাতে। ঘরটির পাশেই একটি প্রশস্ত ছাদ। সেই ছাদে ব'সে সামনে গঙ্গাশোভা নিরীক্ষণ করতে করতে গান বাঁধা, কবিতা লেখা, প্রবন্ধাদি রচনা। ঘরটিতে ব'সে সাধন-ভজন। মাঝে মাঝেই কয়েকটি ভক্তিকামী ভজনার্থী আসেন, তাঁদের শোনাই ভজন-কীর্তন। কখনও বা কোনো মন্দিরে যাই গান করতে। সে কথা একটু খুলে বলি, কারণ, এ যুগে মন্দিরে গান করার রেওয়াজ প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। আগেকার যুগে সাধু ভক্তেরা মন্দিরে মন্দিরেই গান করতেন। মীরা বাঈ মন্দিরে মন্দিরেই নাচতেন তাঁর আপনভোলা নৃত্য, গাইতেন তাঁর ভক্তি-উদ্বেল গান বিগ্রহের সাম্‌নে তখনি তখনি পদ বেঁধে—যার দোয়ার দিতেন শ্রোতা ভক্ত সাধুসন্ত। কিন্তু এ যুগে মন্দিরে গানের আসর কি সত্যিই কোথাও বসে? বড় বেশি তো দেখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির ছাড়া মাত্র দু'বার আমি মন্দিরে গান করেছি। একবার দিল্লীতে বিড়লা-মন্দিরে, আর একবার বোম্বেতে লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দিরে। দু'বারই লোকে লোকারণ্য—দু'-তিন হাজার লোক হ'বে। কিন্তু হরিদ্বারের মন্দিরে স্থানাভাব। তাই জনকল্লোল নেই তেমন। কিন্তু ভূমিকা রেখে দু'টি মন্দিরে ভজন-আসরের কথা বলি।

একটি আসর হ'ল এখানকার এক মাড়োয়ারী ভক্তের প্রাইভেট মন্দিরে। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত। নাম—নারায়ণদাস বাজোরিয়া। রামকৃষ্ণ মঠের কাছেই ইনি তাঁর মন্দিরটি গড়েছেন। অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন্দির। ঢুকতেই প্রশস্ত বাগান ও খোলা প্রাঙ্গণ চোখে পড়ে। শেষে মন্দিরটি। সদ্য-নির্মিত মন্দির, তাই তাজা ও অকলঙ্ক। কোথাও কি এতটুকু মালিন্য আছে?

কিন্তু শুধু পরিচ্ছন্নতাই নয়। মন্দিরে রাম ও কৃষ্ণের সাদা বিগ্রহ—চক্রধারী কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধারী রামের মাঝেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। দেয়ালে উৎকীর্ণ ভক্ত ও ভক্তিমতীদের মূর্ত্তি—কবীর, তুলসীদাস, গুরু নানক, মীরা বাঈ ইত্যাদি। মন্দিরাধ্যক্ষ নারায়ণ-দাস আমাকে বললেন: "অনেকে আপত্তি তুলেছেন দেবতাদের মধ্যে মানুষের ছবি কেন? আমি বলি—কেন নয়? ভগবান ভক্তের দাস হ'ন, একথা কি আমাদের শাস্ত্রে নেই? আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতন ভক্ত এ যুগে আর কে জন্মেছে?"

শুনে মন হৃষ্ট হ'ল বৈ কি। উত্তরে তাঁকে বললাম: "আপনি ঠিকই বলেছেন। তাছাড়া ঠাকুর বলে গিয়েছেন তাঁর শ্রীমুখে: 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এ দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে এসেছেন।'

আপনার সৎসাহসের জন্য তাই ধন্যবাদ।" মাড়োয়ারী ভক্তটি বললেন সোৎসাহে: "আমি তো তাঁর চেয়ে বড় আবির্ভাব এ যুগে কাউকেই মনে করি না।" আমি বললাম: "ওঁর মহিমা কে মাপবে বলুন? আমার জীবনে প্রথম বিপ্লব ঘটান তিনিই—আর সে কোন্ বাল্যকালে—যখন দিনের পর দিন রামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়তাম মুগ্ধ হ'য়ে, উদ্বেল চিত্তে! বোধ হয় প্রতি ভাগ কম ক'রে চল্লিশ পঞ্চাশ বার পড়েছি, এখনও প্রায়ই পড়ি। পড়তে না পড়তে মন হয় ঊর্দ্ধমুখী। আমি ব'লে থাকি—যদি আমাকে হর্তাকর্তারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠান ও বলেন, মাত্র একটি বই নিতে পারবে, কী বই চাও? তাহ'লে আমি উত্তর দেব অকুণ্ঠে: শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।"

হরিদ্বারে এই রকম ভক্ত সাধকদের দেখা প্রায়ই মেলে এবং অনেক সময়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। যেমন শ্রীনিতাই মল্লিক।

মানুষটি যেমন সরল তেমনি স্নেহময়। সাধনা ক'রে ওর স্বভাব-সারল্য যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ ধরণের প্রাণ-খোলা পরিণতি আমার নিজের কাছে খুবই ভাল লাগে। সবাইকার চরিত্র কিছু সাধনার ফলে এমন সহজ সরলতায় বিকশিত হয়ে ওঠে না। নিতাই আজ বাইশ বৎসর হরিদ্বারে আছে একটি সাধন-মন্দির ক'রে। সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, দুর্গা-কালী, রাম সীতা ও রাধাকৃষ্ণের ছবি আছে। মন্দির বা পূজার ঘরটিতে ও রোজ পাঁচ-ছয় ঘণ্টারও বেশি সাধন-ভজন করে। চণ্ডীপাঠ ওর সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। প্রত্যহ সমগ্র চণ্ডীটি পাঠ করে। সামনের দু'-বৎসরের মধ্যে বারশো বার চণ্ডীপাঠ সমাপন করবে। একে বলে স্বাধ্যায়। কিন্তু এ-যুগের স্বাধ্যায়কে এ ভাবে আঁকড়ে ধরতে আর কাউকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না, তাই নিতাই-এর কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য মনে করলাম।

কিন্তু শুধু স্বাধ্যায় নয়—বার মাস ও স্বপাকে খায়, নিরামিষ তো বটেই, এমন কি পেঁয়াজ পর্য্যন্ত ছোঁয় না। একেবারে সাবেকি বৈষ্ণবী ধারা, অথচ ও বৈষ্ণব নয়—শাক্তই বলব, যদিও দুর্গা, কালী ছাড়া অন্য দেব-দেবীদের পূজায় ও পূর্ণভাবে সাড়া দেয়। পূজার রীতি ওর নিজেরই নির্ব্বাচিত, গুরু-নির্দিষ্ট বলা যায় না। ওর জীবনকাহিনী শুনতে ভাল লাগে! বিপত্নীক হওয়ার পর থেকে ও সাধনায় ডুব দেবারই চেষ্টা করছে একান্ত নিঃসঙ্গ ভাবে। কনখলে গঙ্গার কাছেই একটু জমি কিনে একটি কুটীর তৈরী করে বৎসরের পর বৎসর একনিষ্ঠ ভাবে একলাই সাধনা ক'রে চলেছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। কিছু দিন হ'ল, ওর সঙ্গে আছেন আমাদের গুরুভাই শ্রীবিমল মৈত্র—সত্যিই বিমল স্বভাবে তথা সাধনায়। তার কাছেই শুনলাম, নিতাই রোজ লক্ষ বার ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রে তবে জলগ্রহণ করে—সকাল থেকে উপবাসী থেকে। মধ্যাহ্ন-ভোজন করতে ওর একটা-দেড়টা বেজে যায়, কেন না, জপের পরে তবে ও পাক করতে বসে। গ্রীষ্মকালে প্রায়ই যায় হিমালয়ের নানা তীর্থে—উত্তরকাশী, দেবপ্রয়াগ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি। সেখানে দর্শন করে নানা সাধু-সন্তকে, চায় মনে-প্রাণেই সাধুসঙ্গ। আমাদের কাছে একদিন বলছিল, কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ মহাত্মা সাধুর প্রসাদ পেয়েছে—স্বামী কৃষ্ণাশ্রম, স্বামী তপোবন প্রভৃতি বিখ্যাত সাধুরা কি রকম পাথেয় বহন করে এনে দেন। স্বামী কৃষ্ণাশ্রম থাকেন খুবই উপরে—উলঙ্গ অবস্থায় বারো মাস। বরফ-জমা শীতেও একই ভাবে নগ্ন অবস্থায় মৌনী হয়ে উত্তাল নয়নে অধিষ্ঠান করেন গঙ্গোত্রীতে। তাঁর কথা বলতে বলতে ওর মুখে-চোখে সে কী উৎসাহ দীপ্ত হয়ে ওঠে! সাধু-সন্তদের প্রতি এ ধরণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা খুবই কম দেখেছি। সে কী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, ও তপোবন মহারাজের কথা! ইনি থাকেন উত্তরকাশীতে। "সেখানে গঙ্গার কী শোভা দাদা!"—বলে নিতাই উজ্জ্বল মুখে। "সেখানে যেতে না যেতে মন যায় উদাস হ'য়ে। স্থান মাহাত্ম্য নেই কে বলে?"···ইত্যাদি।

আমাদের একদিন ও সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করলো, ওর নিরালা-মন্দিরে। সেখানে ভজন শুনতে সাধু-ভক্তরা অনেকেই এলেন। দুটি ঘর ও বারান্দা ভরে গেল। কীর্ত্তন করতে বড় ভাল লাগল এ-হেন পরিবেশে। ভজনান্তে নিজ হাতে রাঁধা শুদ্ধান্ন পরিবেশন করলো ও নিজে। ওকে হরিদ্বারে যে ভাবে কাছে পাওয়া গেল সে ভাবে অন্যত্র পাওয়া যেত না। স্বভাবে, স্বধর্ম্মে যে সাধক অবস্থান করেন তিনি স্বকীয় পরিবেশে যেন ফুলের মতনই ফুটে ওঠেন। ওঁর সাধননিষ্ঠা দেখে ওঁকে শ্রদ্ধা না করবে কে?

এখানে একটি খুব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল। আমরা হরিদ্বারে যে-বাড়িটিতে আছি তার কাছেই গঙ্গাতীরে ঈষৎ উচ্চ একটি খোলা মাঠ আছে। সেখানে একদিন দেখি, এক সম্পূর্ণ উলঙ্গ সাধু এক ভারি কাঠের গুঁড়ি ব'য়ে আনছে। ইন্দিরাই প্রথম দেখালো। সাধুটির মুখের সৌম্য ভাব দেখে মুগ্ধ হ'লাম। রাত্রেও দেখি, তিনি ঐখানে নগ্নদেহে ব'সে থাকেন ধুনী জ্বালিয়ে। দু'দিন আগে একেবারে ভূম্যাসনই ছিল। সম্প্রতি দেখি—একটি দু'টি করে ভক্ত জমছে। তারাই হাঁড়িকুঁড়ি এনে বেঁধে দেয় সাধুকে। এক জন সেদিন এনে দিয়েছেন একটি চাটাই মতন। সাধু তার উপর নিশ্চিন্ত, সদাপ্রসন্ন মুখে এক ভাবেই ব'সে। এই শীতে কেমন করে তিনি খোলা মাঠে হিমের হাওয়ায় রাত কাটান দিনের পর দিন? কৌতূহল জাগল। বললাম ইন্দিরাকে সেদিন: "চল না, সাধুকে একবার দেখেই আসি।" ইন্দিরা সোৎসাহে সাড়া দিল।

গেলাম উভয়ে। সাধুকে সম্ভাষণ করতেই তিনি সাদরে বসতে বললেন পাশে—নিরাসন মাটিতেই। ব'সে এ-কথা সে-কথা—নানান্ প্রশ্ন শুরু করলাম। সাধু পিঠ-পিঠ উত্তর দিলেন অতি সরল ভঙ্গিতেই দেহাতি হিন্দিতে—পূর্বী ভাষা বুঝি এর নাম—বলল ইন্দিরা। সাধুর সামনের দাঁতগুলির মধ্যে অনেকগুলিই নেই, তাই ওঁর উচ্চারণ বুঝতে ঈষৎ বেগ পেতে হ'ল বই কি—আরও এই জন্যে যে, শুদ্ধ হিন্দি ভাষায় তিনি কথা বলেন না—বলেন, ঐ যে বললাম, গ্রাম্য পূর্বী হিন্দিতে। তবে ইন্দিরা বুঝিয়ে দিতে লাগল আমাকে। সাধু বেশ কৌতুকোজ্জ্বল চোখেই ইন্দিরাকে থেমে থেমে বলেন: "মাই সমঝায়ে দেনা উন্‌কো। তুম্ আচ্ছা সমঝাতি তো।"

কথাবার্ত্তার আদ্যন্ত রিপোর্ট দেবার প্রয়োজন দেখি না; সব কথা মনেও নেই, অনেক কথাই গেল ফসকে। কিন্তু যেটুকু বুঝলাম তার মর্ম্ম এই যে, সাধুর নাম ব্রহ্মগিরি। (গিরি হ'ল শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায়ের একটি) বয়স আশীর কাছাকাছি।

রায় বেরিলিতে তাঁর জন্ম—কাশীতে গুরুকরণ। অবধূত পরিব্রাজকই বলব। কিন্তু কী সরল ও সত্যপর!

শুধালাম: "ভগবানকে পেয়েছেন কি সাধুজি?" সাধুজি সরল ভাবে তাঁর কতিপয় ভক্তের সামনেই বললেন চেঁচিয়ে: "না, পাইনি তাঁকে আজও—অভি তক্ নহী মিলা।"

"সাধন করছেন এত দিন, তবু পেলেন না?"

সাধুজি হেসে বললেন: "রাস্তা অতি দীর্ঘ—লক্ষ্যে পৌঁছনো কি সোজা? তাছাড়া প্রেম না এলে তাঁকে মিলবে কী ক'রে? মানে পরম মিলন। তাঁকে একটু দর্শন করলাম তাতে কী ফল? দর্শন দিয়েই ঠাকুর অমনি হাওয়া—তুমি ফের যে তিমিরে সেই তিমিরে। মিলন বলি তাকে, যখন বিন্দু সিন্ধুর সঙ্গে এক হয়ে যায়।"

—"এক হয় সাধক কখন, সাধুজি?"

—"যখন তাঁকে সে ভালবাসতে শেখে। তাঁকে যেই সে বলে: 'ঠাকুর আমি তোমার', সেই ঠাকুর বলেন: 'আমিও তোমার'। তাঁকে যে সেবা করতে চায় সব ছেড়ে ঠাকুর তাঁর সেবা করেন অষ্ট প্রহর। এ কথার কথা নয়। প্রেম হ'ল সেই রশি যা' দিয়ে তাঁকে বাঁধা যায়। ধরো ঐ ওখানে একটি শাখা রাস্তায় প'ড়ে। তুমি সে শাখায় একটি দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে যদি অপর প্রান্তটি এখানে ব'সে টানো তবে শাখাটি গুড়্‌গুড়্ করে তোমার কাছে এসে হাজির হবে তো? ঠিক তেমনি, ঠাকুরের পায়ে বাঁধো প্রেমের দড়ির এক প্রান্ত—অমনি দেখবে যে যেখানেই থাকো না কেন, সেই দড়ির অন্য প্রান্ত ধ'রে টানতে না টানতে ঠাকুর স্বয়ং এসে দিচ্ছেন হাজিরি। তিনি শুধু ভক্তবৎসল নন—ভক্তাধীন। তবে ভক্তের ভক্তি সত্য হওয়া চাই—'একান্তী' হতে হবে, তবে না?"

প্রসঙ্গ উঠলো জ্ঞান বনাম প্রেম নিয়ে। সাধুজি বললেন হেসে। "জ্ঞান? তার দৌড় কতটুকু? উদ্ধবজিকে দিয়েছিলেন ঠাকুর জ্ঞান। তার মনে জাগলো অভিমান। সে মথুরা ছেড়ে এল বৃন্দাবনে। গোপীদের পথ দেখাবে তার জ্ঞানের আলোয়। কিন্তু ব্রজে এসে সে দেখে কি, যে গোপী তো গোপী, তরু তৃণ লতা ফুল ফল সবাই কৃষ্ণপ্রেমের নেশায় মশগুল, কে তাঁর জ্ঞানের কথায় কান দিতে যাবে? গোপীদের কাছে আসতেই চোখ তাঁর আরো খুলে গেল। তাদের কেবল এক প্রশ্ন: কৃষ্ণ কেমন আছেন, কী করছেন, কবে আসবেন? কৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানের বাণী উদ্ধবজির মনেই র'য়ে গেল লজ্জায়: এদের আমি কী শেখাব, যারা কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ তো জগৎ নিজেদের দেহ পর্য্যন্ত ভুলে ব'সে! তিনি তাদের কাছে হাত জোড় ক'রে বললেন: 'মা, ক্ষমা কোরো যে তোমাদের প্রেমের পথচলায় আমি আলো ধরতে এসেছিলাম আমার সামান্য জ্ঞানের পিদিম দিয়ে'।"

এ-কথা সে-কথা। সাধুজিকে বললাম: "এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বাইরের কনকনে হাওয়ায় সারা দিন বসে থাকেন, শীত করে না?"

সাধুজির সে কী হাসি! "করলই বা শীত!"

"যদি অসুখ করে?"

"এ দেহ তাঁকে নিবেদন ক'রে দিয়েছি যে—অসুখ করলে দেখবার ভার তো এখন তাঁর—যেমন ক্ষিদে পেলে বরাদ্দ জোগাড় করবার ভারও তাঁরই। এই দেখ না, তিনি পাঠিয়ে দিলেন হাঁড়িকুঁড়ি। যাদের কখনো দেখিনি তারা দিচ্ছে রেঁধে। মাটিতে শুতাম, মিলে গেল চাটাই—ঠাকুরই মিলিয়ে দিলেন।"

আমি মুগ্ধ হয়ে প্রণাম ক'রে বললাম: "সাধুজি! আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার নির্ভরের ছিটেফোঁটা পাই এ জীবনে—আপনি ত্যাগী—"

সাধুজি বাধা দিয়ে বললেন: "ত্যাগী? কিসে? কী ছিল আমার এমন রাজ্যপাট, ধনরত্ন, যাকে ত্যাগ করেছি? উলঙ্গ হয়েই জন্মেছিলাম আজও রয়েছি সেই উলঙ্গ। জন্ম-নিঃস্বকে কি ত্যাগী বলা যায়?"

মন্তব্য অনাবশ্যক। মন ভরে গেল। সাধুজিকে বললাম: "আমাদের বাসা খুব কাছেই, সাধুজি! একটু ভজন শুনতে আসবেন আজ সন্ধ্যা ছ'টায়?"

"বেশ। যাবো।"

এলেন সাধু। ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাদের মাঝে বসে উলঙ্গ সাধু শ্রোতা—এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা বৈ কি! ভজন করলাম। পেলাম তাঁর আশীর্ব্বাদ। গৃহ হয়ে গেল পবিত্র।

একেবারে উলঙ্গ সাধুর এত কাছে কখনো আসিনি—ভদ্র সমাজেও এ-হেন উলঙ্গ সাধুর স্থান ক'রে গান শোনানো তো দূরের কথা।

হরিদ্বারে আর হৃষীকেশে যে দিকে তাকাও—আশ্রম আর মন্দির। হৃষীকেশে একবার গিয়েছিলাম, নামজাদা যোগী স্বামী শিবানন্দের বিখ্যাত আশ্রম দেখতে।

কী সুন্দর যে আশ্রমটির পরিবেশ! হৃষীকেশে গঙ্গার শোভা হরিদ্বারের চেয়েও বেশি। মনে হয় যেন স্বপ্নে-দেখা তিলোত্তমা নদী। সকালের রোদ পড়ে আর গঙ্গার কলনৃত্যময়ী উর্মিমালা দেয় ডাক: "এসো, করো অবগাহন স্নান—আমি ধুয়ে-মুছে দেব তোমার দেহ-মনের সব মালিন্য।" ইন্দিরার বাঁধা ভজনের প্রার্থনার সুর জেগে ওঠে:—

"অপনাসা কর নির্মল মোহে, ধো দৈ সব ভয় মনকা
মৈ মেরাকী মায়া ধো দে, মান যে ধন জোবনকা।
আমি যে মলিন, নির্মল করো ধুয়ে-মুছে ভয় ছায়া মা!
ঘুচাও "আমি-ও-আমার" মমতা ধন-যৌবন মায়া মা!

ওখান থেকে দেখা যায় "গীতাভবন" গঙ্গার পূর্ব্বপারে। নারায়ণদাস বললেন, তাঁকে লিখলে গীতাভবনেও থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। গীতাভবনের ঘরগুলি এত সুন্দর—গঙ্গার ঠিক উপরেই—থাকতে সাধ যায় বৈ কি।

এখানে আর একটি আশ্রম আছে ভোলাগিরির প্রতিষ্ঠিত। ভোলাগিরির নাম বহু দিন আগে শুনেছিলাম। তিনি দেহ রক্ষা করেছেন অনেক দিন হ'ল। তাঁর ৫০।৬০টি শিষ্য তাঁর নামাশ্রিত আশ্রমে থাকেন। বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আশ্রমটি। কিন্তু ভোলাগিরির সব চেয়ে বড় আকর্ষণ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ওরফে হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। এর সঙ্গে মাঝে মাঝেই গিয়ে সদালাপ করতাম। এখানে একদিন গানও করেছিলাম গত বৎসর।

এঁকে আমরা ডাকি ঋষিদা' বলে। অনেক দিনের আলাপী ও অতি রসালাপী। এমন রসিক যোগীদের মধ্যে বিরল।

কথায় কথায় হাসান, আর কত গল্পই যে বলেন! অশীতিপর বৃদ্ধের হৃদয় আজও তেমনি সরস আছে। যেমন ছিল তাঁর যৌবনে —যে-যৌবনের কত রসাল গল্পই করতেন তিনি ফিরে ফিরে।

সচরাচর ঋষিদা' সাধন-ভজনের কথা বলেন না। তবে এক একদিন বন্যার তোড় নামে বাঁধ-ভাঙ্গা পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ঢল নামার মতন। তখন মুগ্ধ হয়ে শুনি। এঁর সব কাহিনী বলার সময় নেই। শুধু একটি কাহিনী বলি। কিন্তু তার আগে এঁর একটু পরিচয় দিই।

ইনি অগ্নিযুগের হোতা শ্রীঅরবিন্দের সতীর্থ ছিলেন। বারীনদা' উল্লাসকর, হেম দাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে ইনিও আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হ'ন ও বছর দশেক প'র মুক্তিলাভ করেন সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময়ে; তার পর ১৯২০ সালে ইনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বৎসরাধিক কাল পণ্ডিচেরিতে বাস করেন। এঁর কাছে শুনতাম সে কালের শ্রীঅরবিন্দের কাহিনী, যখন তিনি সবার সঙ্গেই মিশতেন সহৃদয় বন্ধুরূপে। শ্রীঅরবিন্দ পর্দ্দানশীন হওয়ার পরে ইনি পণ্ডিচেরি সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে চ'লে আসেন ও নানা স্থানে ভ্রমণ সুরু করেন। কিন্তু পণ্ডিচেরির অবস্থান কালে এঁর নানান আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপলব্ধি হয়। একটি পত্রে তিনি আমাকে কিছু আভাস দিয়েছিলেন। সে সব উপলব্ধির, যার কথা প্রকাশ করবার এখনও সময় আসেনি।

পণ্ডিচেরির সঙ্গে ঋষিদার যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার পরে সেখান থেকে চ'লে আসার সঙ্গে সঙ্গে এঁর নানান অভিজ্ঞতা হয়। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে ইনি উপলব্ধি করেন ভাগবত করুণা। আজ এঁর সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা। কিন্তু বলেছিলেন "দাদা! এখন দেখি যে কিছুই জানি না— জানতে পারিনি জানার মতন ক'রে, অথচ যৌবনে জ্ঞানের অভিমানে কী হঠকারীই না ছিলাম!" পরশু দিনই বলছিলেন এঁর জীবনের একটি আশ্চর্য উপলব্ধির কথা—যেটি প্রকাশ করা যেতে পারে :

ঋষিদা' বললেন : "পণ্ডিচেরি থেকে চলে আসার পরে আমার প্রথম দিকে খুব বৈরাগ্য হয়—ভগবানকে প্রত্যক্ষ না করলেই নয়। পরিব্রাজক হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলাম মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ মঠে— অদ্বৈত আশ্রমে। সেখানে বৎসরাধিক কাল স্বাধ্যায় ও সাধনা করার পরে হঠাৎ মনে হ'ল—অপরোক্ষ অনুভবও হবার নয়। শুধু তাই নয়—মনে হ'ল আশে-পাশে কারুরই হয়নি অপরোক্ষ অনুভব। 'দুত্তোর' ব'লে মায়াবতী থেকে চ'লে এলাম। কী বিড়ম্বনা! অসম্ভব কখন সম্ভব হয়? ভগবান কি পাওয়া যায় সত্যিই? সবই শোনা কথা ও সবাই শোনা কথার বেসাতি ক'রে মোহমুগ্ধ হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে। তার চেয়ে সৎকর্মে ব্রতী হয়ে সুভদ্রের মতন দেশের কাজে নামা যাক্। এখানে ওখানে নানা সাধুর কাছে গিয়ে বললাম : 'আপনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সবাইকে বলুন দেশসেবক হ'তে—এ ভেক ছাড়ুন, মানুষ হো'ন।' সাধুরা কেউ-ই আমার কথায় কান দিলেন না। আমার বিষম রাগ হ'ল। ব'লে বেড়াতে লাগলাম এঁরা সবাই সত্যের মুখোশ প'রে অসত্যের উপাসনা ক'রে বেড়াচ্ছেন। নানা ভাবে পণ্ডিতি ভাষায় প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে-লেগে গেলাম যে, এঁদের সব তথাকথিত উপলব্ধি অনুভবই হ'ল নিছক স্নায়বিক উত্তেজনার ফল। একমাত্র বাস্তব হ'ল মানুষ— তাই ভগবান ভগবান ক'রে হা-হুতাশ না ক'রে মানুষের সেবায় নিরত থাকাই হ'ল সৎকর্ম—বৈরাগ্য অপকর্ম, আত্মদর্শনাদি সবই ভ্রান্তিবিলাস, সাধুরা হয় মূর্খ, না হয় ভণ্ড—ইত্যাদি।"

"কিছু দিন এই ভাবে বক্তৃতা দিয়ে শেষে নিলাম এক স্কুলে চাকরী! ছেলে পড়াই আর এ-ও-তা পড়ি। মনের শূন্যতা কাটে না—ফাঁকি দিয়ে কি ফাঁক ভরে দাদা? অথচ রোখ চেপে গেছে তাই বলতে ছাড়ি না—কেউই কিছু জানে না, বস্তু লাভ হয়নি কারুরই।

"এমনি ঘোর নাস্তিক অবস্থায় এক দিন হঠাৎ বৈষ্ণব পদাবলী পড়ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল বিদ্যাপতির বিখ্যাত কীর্ত্তন—" ব'লে দাদা সুর করে বলতে লাগলেন :—

'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমনী সমাজে
তোহে বিসরি' মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন্ কাজে?'

"অমনি ভিতর থেকে পরিষ্কার সুর শুনতে পেলাম— একেবারে প্রত্যক্ষ সুর—ভুল হবার জো কি দাদা!—সে বলছে; 'অমুক ভ্রান্ত, অমুক ভণ্ড—এ সব ব'লে তোর কী ফল হ'ল শুনি? তুই কি কিছু পেলি নিজে? ছাড় এ মিছে বাগাড়ম্বর—যা তোর স্বধর্ম তাই পালন ক'রে চল্—তবে হবে বস্তুলাভ—'ইত্যাদি।

"চম্‌কে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখে নামল অশ্রুর ঢল, মনে জাগল অনুতাপ। কী ক'রে কাল কাটাচ্ছি। অমনি এক মুহূর্ত্তে হারানিধি যেন হাতে ফিরে এল—ফিরে পেলাম বিবেক মণি বৈরাগ্য রতন। ফিরে এলাম সাধুর গভীর জিজ্ঞাসায়, সন্ধানীর অন্তর সাধনায়। কাকে কোন্ পথ দিয়ে যে ভগবান কোথায় নিয়ে যান দাদা, কেউ কি জানে?"

ঋষিদা'র এখন খুব উন্নত অবস্থা। যখন সাধনার কথা বলেন তখন তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে এক অপরূপ প্রত্যয়ের স্বর—উপলব্ধির প'রে যার ভর, শুধু পুঁথি পড়া জ্ঞান নয়, প্রত্যক্ষ পাওয়ার ফলে মনের মন্দিরে যে আলো জ্ব'লে ওঠে সেই আলোকে পেয়েছেন ইনি পাথেয়রূপে। অনেক কিছুই শিখেছি এঁর কাছে। সাধন-রাজ্যের নানা রহস্যের পরেই ঋষিদা' রশ্মিপাত করতে পারেন তাঁর অপরোক্ষ জ্ঞানের দীপালোক দিয়ে। অথচ কী নিরভিমান শান্ত অবস্থা! কোথাও মনে কোনো ক্ষোভ নেই; না কামনা বাসনার অশান্ত ঝিলিক। শঙ্করাচার্য্যের ইনি পরম ভক্ত, তথা তত্ত্বজ্ঞ। কয়েকটি উপনিষদের ব্যাখ্যা ক'রে বই লিখেছেন। পাণ্ডিত্য এঁর সত্য। কিন্তু এঁর সত্যিকার সম্পদ বই-পড়া বুলি নয়—বিবেক বৈরাগ্য নিষ্ঠা তিতিক্ষা। শাস্ত্রের কথা ঋষিদা'র মুখে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। কেন না শাস্ত্রকে ইনি শুধু পাঠ করেন নি, আপ্তবাক্য অনুসরণ ক'রে পৌঁছেছেন পরমা শান্তিতে, অটল নির্বেদে। নমস্য সাধু বৈ কি। অথচ কী সহজ সরল মানুষ! কথায় কথায় গল্প আর রসিকতা। এঁর মুখে শোনা একটি সরস গল্প উদ্ধৃত ক'রেই এঁর প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব।

"সে সময়ে আমি খুব সাধন-ভজন করছি," বললেন ঋষিদা'। "হঠাৎ এক বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী যুবক আমার কাছে এসে হাজির। আমাকে ধরলেন ভগবান পাইয়ে দিতে হবে। আমি ওকে শাস্ত্রবাক্য ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, গুরুকরণ করতে। সে বলল: 'সাধুজি, আমার গুরুকরণের পালা সাঙ্গ হয়েছে। গুরু বলে দিয়েছেন কী কী করতে হবে।' উত্তরে আমি তাঁকে কী বলেছি জানেন?"

"কী?"

"বলেছি যে গুরুবাক্য অনুসরণ ক'রে চলব পাঁচটি বৎসর। আমার নবে ঢ়া বধূ এখন বালিকা, তার বয়েস এগারো। যদি এ পাঁচ বৎসরে গুরুপদিষ্ট পথে চ'লে ভগবান্ মেলে তো মিলল, নইলে ফিরে যাব আমার বৌ-এর কাছে—সে তখন হবে নিটোল যোড়শী।" ব'লে ঋষিদা'র সে কী খিল্-খিল্ ক'রে হাসি!

আনন্দময় মানুষ বৈ কি। হরিদ্বারে এঁর সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু লাভ করেছি।

হরিদ্বারে সৎসঙ্গ আরো লাভ হয়েছে, ও বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনে একদিন ভজন করতে গিয়েছিলাম, সেখানেও সাধক ব্রহ্মচারীদের সাহচর্যে আনন্দ পেয়েছি কম নয়। কিন্তু পথ চলতে আরো অনেক সাধুর দেখা পেয়েছি, যাঁরা মনের উপর ছাপ ফেলে গেছেন। এমনি এক সাধুর কথা একটু বলি।

আমরা যে বাড়িতে আছি তার সামনেই একটি একতলা বাড়ি। তাতে একটি কোণের ঘরে থাকেন এক সিন্ধুদেশীয় সাধু—নানকপন্থী। ইনি খুব স্বাধ্যায় নিয়ে ব্যস্ত। সঙ্গে একটি পরিচারক আছে। বোধ করি সেই রেঁধে দেয়, দুবেলা-দুমুঠো। ইনি একদিন আমাদের ভজন শুনতে এসেছিলেন। শান্ত-সমাহিত মানুষটি। সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদের একজন ধনী জমিদার ছিলেন, পাকিস্তানের পর হরিদ্বারে এসে এঁর কুটীরটি তৈরী ক'রে দুটি পরিচারক নিয়ে আছেন, আজ সাত-আট বৎসর। নাম জগৎরাম। বয়স আটত্রিশ। ধনী হয়েও ইনি সাধুর জীবন অবলম্বন করেছেন, ভাবতে একটুও যে আশ্চর্য লাগে না তা নয়। তবে খৃষ্টের সনাতন বাণী ("সুচের মধ্যে উট ঢোকানো বরং সম্ভব, কিন্তু ধনীর পক্ষে ভাগবত রাজ্যে ঢোকা সহজ হয়") এতে ক'রে নাকচ হয়নি, কেন না ধন-সম্পত্তির প্রায় সবই খুইয়ে তবে ইনি এসেছেন পাকিস্তান থেকে, খাঁটি হিন্দুস্থানে। মুখে গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রসন্নতার সমাবেশ। কিন্তু শুধু বাইরেই সমাহিত নয়—অন্তরেও কিছু সমতা এসেছে বৈ কি। একদিন সকালে রাস্তার সরকারী ঝাড়ুদার খুব চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিল। সাধুজি রোয়াকে আসীন, ঝাড়ুদার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে খুব গালিগালাজ ক'রে কত কী যে বলতে থাকে! সাধুরা সব ভণ্ড, সমাজের ভার, নিষ্কর্মা আত্মাভিমানী—এই সব। সাধুজি নির্বিকার। তাঁর এক পরিচারক ক্রুদ্ধ হ'য়ে ঝাড়ুদারের গায়ে হাত তুলতে যায় আর কি। সাধুজি নিষেধ ক'রে বললেন: "ওর উপর রাগ করা ভুল—যার যেমন স্বভাব সে সেই ভাবেই তো চলবে। ও কী জানে সাধুদের সম্বন্ধে?"

আর একটি সাধুর কথা বলি। সাধুটিকে আমাদের দোতলা থেকে মাঝে-মাঝে দেখা যেত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতে। কখনো কখনো তাঁর কাছে আসত একটি পাঞ্জাবী যুবক সাধক। উভয়ের আলোচনা হ'ত ঠিক সামনের রোয়াকে ব'সে। নানা তত্ত্বকথা হ'ত। আমাদের সামনের বারান্দায় ব'সে সব কথাই বেশ পরিষ্কার শোনা যেত।

একদিন কি কথায় কথায় যুবকটি বলল যে, সে তার গুরুকে ত্যাগ করেছে। সাধুটি তিরস্কার করলেন: "ভালো করো নি।"

যুবকটির মুখ লাল হ'য়ে উঠল, উত্তেজিত হ'য়ে বলল: "ভালো করিনি? কেন শুনি? জানেন আপনি গুরু আমাকে কী উপদেশ দিলেন? আমি আশৈশব কৃষ্ণভক্ত, আমাকে বললেন কি না কৃষ্ণনাম ছেড়ে শিবনাম জপ করতে।"

সাধুটি বললেন: "শিব কৃষ্ণ কালী সবই তো এক—"

"জানি ঠাকুর, সবই জানি। কিন্তু আপনি কি কৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন?"

"আমি সব আবির্ভাবকেই ভগবানের আবির্ভাব মনে করি।"

যুবকটি হাসল, বিমনা হাসি: "ও তো হ'ল পুঁথিপড়া কথা ঠাকুর! কৃষ্ণকে যে একটি বার ভালোবেসে ফেলেছে পুঁথি আর তার কোনো কাজেই আসে না। কারণ, ঐ ত্রিভঙ্গ ঠাকুরটির রূপের পরে আর কোনো রূপই তার মনে ধরে না। তবে একথা আপনাকে বোঝাবো কেমন ক'রে? ঘায়েল কী গতি ঘায়েল জানে (ব্যথা যে পেয়েছে সেই বোঝে ব্যথা কী বস্তু)।"

সাধুটি বললেন: "একথা সত্য, কিন্তু তুমি যখন একবার গুরুকরণ করেছ তখন গুরুর উপদেশ শুনে চলাই তোমার কর্তব্য ছিল।"

যুবকটি আরও উজিয়ে উঠল, আতপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগল: "তাই ব'লে গুরুর কথা সবই শুনতে হবে? যদি গুরু বলেন অন্যায় করতে?"

"কিন্তু এ অন্যায় জানলে কেমন ক'রে?"

"বাঃ, অন্যায় নয়? আমি কৃষ্ণকে ইষ্ট বলে বরণ করেছি। গুরু আমাকে ইষ্ট ছাড়া করতে চান কোন্ অধিকারে শুনি? তা ছাড়া কর্তব্য কি শুধু শিষ্যেরই? গুরুর বুঝি নেই কোনো কর্তব্য? আমি অকর্ম কুকর্ম করলে তিনি আমাকে জুতো মারলেও আমি সইতে রাজি, কিন্তু যা আমার কাছে অধর্ম অগ্রাহ্য গুরু আমাকে বলবেন তাকেই বরণ করতে? সাধুজি! মনে রাখবেন আমি গুরুর কাছে এসেছিলাম তিনি আমাকে ইষ্ট লাভ করিয়ে দেবেন এই ভরসায়। অর্থাৎ গুরু আমার কাছে উপায় মাত্র, লক্ষ্য—ইষ্ট ওরফে কৃষ্ণ। সেই ইষ্টকে ত্যাগ করতে হবে—গুরু দিলেন আমাকে কি না এই সদুপদেশ? শিবমূর্তি ধ্যান করতে আমার মন চায় না, আমার প্রতি তন্তু কেঁপে ওঠে কৃষ্ণনামে. গুরু যদি এটুকুও না বোঝেন তবে তিনি কিসের গুরু? তিনি শৈব ব'লে আমাকেও দেবেন শিবমন্ত্র? স্বধর্ম ব'লে কি তা হলে কিছুই নেই, সাধুজি? না না না—আমার কাছে শিব ইষ্ট নন নন নন—আমি শুধু কৃষ্ণকেই চাই আর কাউকে নয়। কাজেই আমি এক্ষেত্রে আর কী করতে পারতাম বলুন তো? গুরুত্যাগ, নয় ইষ্টত্যাগ, এ ছাড়া আর কি তৃতীয় পথ ছিল বলতে চান? মনঃকষ্টে আমাকে শেষটায় গুরুত্যাগই করতে হ'ল! কারণ আমার মন বলে: যে গুরু ইষ্টকে অনিষ্ট দাঁড় করাতে চান তিনি কখনই সদ্গুরু নন।"

সাধুজি বললেন: "সবই বুঝলাম। কিন্তু ভেবে দেখ একটি কথা। তুমি যা বলছ তাতে দাঁড়াচ্ছে যে গুরুর চেয়ে তুমিই বেশি বোঝো। এই যদি সত্যি হয় তবে কেন মিথ্যে গুরুকরণ করতে গেলে?"

যুবকটি বলল: "গুরুকরণ করেছিলাম—তিনি আমাকে ইষ্টের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন এই ভরসায়, বললাম না এইমাত্র? আমি তো জানি না কোন্ পথে গেলে ইষ্টের সঙ্গে মিলন সহজ হয়—কাঁটাবনে আলোর দেখা মেলে—গুরু জানেন, এই বিশ্বাসকে আঁকড়েই গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। গুরু যদি আমাকে আমার ইষ্ট কৃষ্ণকে পাওয়ার পথের দিশা দিতেন—আমি তাঁর গোলাম হ'য়ে থাকতাম। কিন্তু কৃষ্ণকে বরখাস্ত ক'রে শিবকে বরণ করো, এ-কথা বলবার কোনো এক্তিয়ারই তাঁর নেই। কাজেই আমাকে তাঁকে ছেড়ে চ'লে আসতে হ'ল। একলাই চলব এখন থেকে। মানি, আজ আমার অনাথ অবস্থা—জানি না পথের দিশা, বাধা এলে তাকে সরাবার উপায় কী, তা-ও বুঝতে পারি না সব সময়ে। কিন্তু একটি কথা আমি জানি আমার বুকের স্পন্দনে সাধুজি, যে আমি যদি সত্যনিষ্ঠ হই, আর যদি এ-জীবনে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই না চেয়ে থাকি—তবে আমি কৃষ্ণের আশ্রয় পাবই পাব। কৃষ্ণে যদি আমার অচলা মতি থাকে তবে অন্তর্যামী তিনি জানবেনই জানবেন কত ব্যথায় আমাকে গুরু ত্যাগ করতে হয়েছে। যদি গুরু ত্যাগ ক'রে ভুল ক'রেও থাকি তবে সে ভুল করেছি সংসারের কোনো নেশায় নয়, কৃষ্ণকে ছাড়া আর কারুর আরাধনা করা আমার পক্ষে কল্পনারও অতীত ব'লে। আজ আমি দুঃখ পাচ্ছি সাধুজি, কিন্তু তবু মনে আমার এ বিশ্বাসের আলো নেবেনি যে, সংসারে সব চেয়ে বড় হ'ল সত্য। আমি যাকে সত্য বলে বুঝেছি তারই জন্যে গুরুকে ত্যাগ করেছি—গুরুদ্রোহী হয়েছি, গুরু আমাকে ইষ্ট থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ব'লে। আমি আজ দিশাহারা পরিব্রাজক—কত দিন পথে পথে ঘুরতে হবে জানি না। কেবল একটা কথা জেনেছি আমার রক্তের দোলায়। বুকের স্পন্দনে যে, সত্য আর ইষ্ট অভিন্ন—তা গুরুকরণ সার্থক হোক্ বা না হোক্।"

মুগ্ধ হ'য়ে ইন্দিরাকে বললাম: "আহা, এই পাঞ্জাবী সাধকটির সঙ্গে যদি একবার একটু একান্তে আলাপ করা যেত, ইন্দিরা!"

ইন্দিরা বলল: "এর পরে যেই ও আসবে ডেকে আনব আমাদের ভজন-আসরে। তখন আলাপ কোরো।"

কিন্তু এর পরে যুবকটির আর দেখা পাইনি। কিন্তু মনে মনে তাকে প্রণাম করেছি বার বারই।

মনে হয় যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ

চড়াই-উৎরাই, পাথর আর বরফের দেশ, জঙ্গল আর নদী-ভরা দেশ যে হিমালয়, তার উপর দিয়েও উড়ে চলেছে প্লেন। পাখা দুখানা ভরে গেছে বরফের কুচিতে, অক্সিজেন কমে গেছে অনেক; প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড়, অসম্ভব হাওয়া, কোনও কিছুই আটকে রাখতে পারেনি মানুষের গতিকে। পেশোয়ার থেকে গিলগিট্ আর স্কার্দু, রুক্ষ মরুভূমি থেকে শ্যামল পাইন গাছ অবধি যে যাত্রাপথ,তারই এক পাইলট নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলছেন সংক্ষেপে:—

১৫,০০০ ফিট ওপর দিয়ে প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটা এখানে একান্তই স্বাভাবিক। ১৮,০০০ এমন কি কখনো কখনো বিশ, বাইশ হাজার ফিট ওপর দিয়েও আমাকে যেতে হয়েছে। পথে ঝড় এসেছে প্রচণ্ড, অক্সিজেনের ব্যবস্থা নেই, সামনের জানলায় বরফের স্তর জমে গেছে, চার দিক অন্ধকার, পাহাড়ের মাথা দেখা যায় না, এমনি অবস্থাতেও দিক ঠিক করে আমাকে পথ চলতে হয়েছে! নাঙ্গা-পর্বত, কে-২, কি অমনি কোনও বড় পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে আমাকে কামাবার ক্ষুর দিয়ে সামনের জানলায় জমা বরফের স্তর কেটে দিতে হয়েছে কখনও কখনও। প্লেন চালাতে গিয়ে আমাদের সামনে কোন সূত্র নেই। শুধু আছে এক চিলতে পথ। নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার থেকে বেরিয়ে কুণার উপত্যকা দিয়ে ১৩,৯০০ ফিট উপরের বাবুসার-পাশ পার হয়ে ইণ্ডাস ভ্যালীতে এসে পড়েছে সে। বছরের তিন মাস কোনও ক্রমে পাথর আর বরফ সরিয়ে একখানা জিপ গাড়ী পার করে নিলেও নিতে পারে এতে।······ভারত, পাকিস্থান, রাশিয়া, আফগানিস্থান আর চীনের এই হোল চাবী-ঘর। তবু এখানে যাওয়ার কোনও পথ নেই (শুধু প্লেন ছাড়া) আজও।··· গিলগিট্ কি স্কার্দু'তে তেল পাওয়া যাবে না। পেশোয়ার থেকে ফিরতি পথের তেলও ভরে নিতে হবে এবং কিছু বেশী করেই ভরে নিতে হবে, কারণ পথ বন্ধুর···এ্যায়ারফিল্ড বলতে আজকের দিনে যা বোঝায় তেমনি হ্যাঙ্গার কি রাণওয়ে নেই এখানে। কোনও ক্রমে নামা চলে এই অবধি।······দু'ঘণ্টার মধ্যে আকাশের চেহারা এখানে সুন্দর থেকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে!···মজার কথা শুনবেন? প্রথম যে দিন প্লেন এল এখানে, এখানকার অধিবাসীরা প্রত্যেকে এল আমাদের প্লেন দেখতে। জীপে করে আমরা যেখানে গেছি গ্রামবাসীরা এসে আমাদের এক আঁটি করে খড় উপহার দিয়ে গেছে। জীপগাড়ীটিকে খাওয়াবার জন্য। ভেবেছে, খচ্চর জাতীয় কোনও পশু বুঝি এগুলিও। সত্যি কথা। বিশ্বাস করছেন না তো?······জল চাইলে এখানে দুধ পাওয়া যায়! ও জিনিষটার এত অভাব।······প্লেনের যাত্রীর মধ্যে বেশীর ভাগই সামরিক বাহিনীর লোক, কিছু ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী, ডাক আর সকল রকমের মাল (অন্য কোন যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই বলে)।······এক বার একটি শিশুর জন্ম হল এ পথে। প্লেনের মধ্যেই। হিমালয় পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু জায়গায় আমরা রয়েছি তখন। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন সঙ্গে, উপস্থিত অন্যান্য যাত্রিগণ এবং প্লেনের ফার্ষ্ট-এইড বক্সটির সাহায্যে প্রসব হল নির্বিঘ্নেই। অতিরিক্ত যাত্রীটিকে নিয়ে আমরা যথাসময়েই গন্তব্যস্থলে এসে হাজির হয়েছিলাম ···অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন: এমনি ভয়াবহ স্থানে ইঞ্জিনের গোলমাল হলে কি হবে?—শেষ হয়ে যাব, এ ছাড়া কোনও উত্তর নেই। হতে পারে না।···তবু গিলগিট্ আর স্কার্দু'র লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর জন্য—চিনি আর নুণ, তরকারীপত্র, সিমেণ্ট, কলকব্জা, ডাক আমাদের জীবন বিপন্ন করেই পৌঁছে দিতে হবে সর্বদা। যাত্রী পারাপার করতে হবে, এই অন্তবিহীন পথ অতিক্রম করে, সদা-সর্বদা বিপদের সঙ্গে লড়াই করে প্রতিনিয়ত।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

স্বদেশে কৃতবিদ্য হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া অনুশীলনতীক্ষ্ণ প্রতিভায় পরীক্ষায় বহু প্রতিযোগীকে পরাভূত করিয়া—ভারতে ইংরেজ সরকারের বড় চাকরী লইয়া এক বাঙ্গালী তরুণ স্বদেশে ফিরিয়া প্রৌঢ় পিতৃবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তরুণ ইংরেজী ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন—প্রৌঢ় ইংরেজীতে সুপণ্ডিত হইলেও অনেক বিবেচনার পরে, বাঙ্গালা ভাষায় রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কথায় কথায় প্রৌঢ় বন্ধুপুত্রকে বাঙ্গালায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পরামর্শ দিয়া—পরামর্শের সমর্থনে বলিয়াছিলেন—"তোমাদিগের পরিবারে তোমার জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি ইংরেজীতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—সে সকল কখনও স্থায়ী আদর লাভ করিবে না। কিন্তু মধুসূদন যে 'মেঘনাদ বধ' রচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষা যত দিন থাকিবে তত দিন সমাদর লাভ করিবে।"

তরুণের নাম—রমেশচন্দ্র দত্ত। পিতৃবন্ধুর উপদেশ কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—রমেশচন্দ্র বাঙ্গলায় 'বঙ্গবিজেতা' 'মাধবীকঙ্কণ', 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' নামক চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'সংসার' ও 'সমাজ' নামক দুইখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ও 'হিন্দুশাস্ত্র'—সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেষ্টা—পিতৃবন্ধু—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি—বাঙ্গালী লেখকদিগের গুরু।

যখন ইংরেজী শিক্ষার কিরণে বাঙ্গালীর প্রতিভাকুঞ্জে নূতন কুসুম-সুষমা বিকশিত হইয়াছিল—বিহগ-বিরাব শুনা গিয়াছিল, বাঙ্গালা গদ্য তখনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা সংস্কৃত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক দণ্ড-স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া—আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, ঘৃণায় বিকুঞ্চিত, দয়ায় বিগলিত, দ্বিধায় বিচলিত হইবার মত হয় নাই। ইংরেজী সাহিত্য তখন পুষ্ট ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন। সেই কারণে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহাদিগের অনেকে উপলব্ধি করেন নাই—

"যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। * * * * বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

সেই জন্য এ দেশে যখন প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রসারিত হয়, তখন যাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়া, বাঙ্গালা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অরবিন্দ অকুণ্ঠ ভাবে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। আর যাঁহারা কেবল ইংরেজী ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই আজ বিস্মৃত। কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আজ বাঙ্গালায় তিনি প্রায় বিস্মৃত।

বাঙ্গালায় ইংরেজের ব্যবসা-বিস্তারে যাঁহারা লাভবান হইয়াছিলেন, হাওড়া জিলার পৈতাল গ্রামের তুলসীরাম ঘোষ তাঁহাদিগের অন্যতম। তুলসীরাম ঢাকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের কুঠীর কাজ করিতেন এবং ঢাকায় কোম্পানীর কাজ বন্ধ হইলে কলিকাতায় আসিয়া শ্যামবাজার পল্লীতে বাস করিতে থাকেন। কাশীপ্রসাদ তুলসীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার মাতামহ রামনারায়ণ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রাধানগরের বসু সর্ব্বাধিকারী বংশীয়। তাঁহারই খিদিরপুরস্থ ভবনে ১২১৬ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট) কাশীপ্রসাদের জন্ম হয়। খানাকুল গ্রামই রামমোহন রায়ের পিতৃপুরুষের বাসভূমি। রামমোহন সংস্কারপন্থী হইলে তাঁহার বিরোধীরা তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল ছড়া ও গান প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার একটিতে দেখা যায়—

"বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা যত নষ্টের মূল—
'ওঁ তৎসৎ' বলে বেটা মজালে তিন কূল।"

ধনী পিতার পুত্র কাশীপ্রসাদের বাল্যকাল ধনী মাতামহের গৃহে অবারিত আদরের মধ্যে অতিবাহিত হয়। সেই সময়ের মধ্যে তিনি তৎকালীন রীতি অনুসারে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সামান্য ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করিলেও বিদ্যার্জ্জনে তাঁহার আগ্রহ জন্মে নাই। তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর তখনও তিনি বাঙ্গালা ও ইংরেজী পড়িতে পারিতেন না বলিলে অসঙ্গত হয় না। এই সময় এক দিন ইংরেজী পাঠে অমনোযোগ হেতু পিতার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া বালক কাশীপ্রসাদ আপনাকে ধিক্কার দেন ও অধ্যয়নে মনোযোগী হইবার সঙ্কল্প করেন। তিনি বুঝিতে পারেন, নানা ব্যাপারে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত থাকিলে, তিনি দ্রুত শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন না। সে কথা তিনি মাতামহের নিকট ব্যক্ত করিলে, তাহা শুনিয়া শিবপ্রসাদ নিয়মানুসারে তিন শত টাকা দিয়া পুত্রকে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে ছাত্র করিয়া দেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে (যে স্থানে এখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত) হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—"বিচারক অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবার সময়, সার জন হাউড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সার জন হাউড ঈষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হাউড ঈষ্ট সাহেব ও

হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সভা আহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে সভাতে কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। সে সময়ে হিন্দু সমাজে বিলক্ষণ দলাদলি চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ে ধর্ম্ম সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিই সেই দলাদলির মূল। * * * কিছু দিন এইরূপে আন্দোলন চলিল। পরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী দিবসে স্কুল খোলা হইল।"

সুতরাং হিন্দু কলেজ যখন স্থাপিত হয়, তখন কাশীপ্রসাদের বয়স আট বৎসর বলা যায় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় ছয় বৎসর পরে তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। তাহার পরে—১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলেজ-গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

হিন্দু কলেজে তখন যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদিগের যোগ্যতা ও শিক্ষাদানে যত্ন অসাধারণ ছিল। কলেজে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ মেধা ও যত্ন সহকারে শিক্ষালাভ করিয়া কাশীপ্রসাদ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছয় বৎসর হিন্দু কলেজে পাঠ করিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলেজ ত্যাগ করেন। তখন তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষিত বিংশ বর্ষীয় যুবক।

কাশীপ্রসাদের হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালীন একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত মত এই যে, মরাল নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে। কাশীপ্রসাদ হিন্দু কলেজের শিক্ষা সযত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি পৈত্রিক ধর্ম্মে আস্থা হারান নাই—হিন্দুর সংস্কার কুসংস্কার মনে করেন নাই। হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের যে উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহাদিগের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা হইতে তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ছিলেন। অথচ তৎকালীন সম্রান্ত ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার অভাব ছিল না। লর্ড ও লেডী বেণ্টিংক প্রভৃতি ইংরেজ গভর্ণর ও তাঁহাদিগের পত্নীরা তাঁহার গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। এক জন লেখক লিখিয়াছেন, কাশীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে লর্ড ও লেডী এলগিন তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন। স্বর্ণ দিয়া নববধূর মুখ দেখা হিন্দুসমাজে প্রচলিত প্রথা—ইহা শুনিয়া লেডী এলগিন নববধূর মুখ দর্শন কালে মুখের উপর একটি মোহর স্থাপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কলেজে পঠদ্দশাতেই কাশীপ্রসাদ ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনায় কৃতিত্বলাভ করেন। ডক্টর হোরেশ হেমেন উইলশন হিন্দু কলেজের পরিদর্শকমণ্ডলীতে ছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ইংরেজীতে পদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতে বলেন। এই উইলশন অসাধারণ লোক ছিলেন। ইনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের ডাক্তারী চাকরী লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং রসায়ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হেতু টাকশালার কাজেও নিযুক্ত হ'ন। এ দেশে আসিয়া ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে আকৃষ্ট হ'ন ও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কালিদাসের মেঘদূতের ইংরেজী পদ্যানুবাদ করেন। তাঁহার পরে কয় জন য়ুরোপীয় মেঘদূতের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ যেমন প্রাঞ্জল, ইংরেজীতে উইলশনের অনুবাদ তেমনই প্রাঞ্জল। উভয়েরই রচনা অনুবাদের জটিলতামুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদের এক স্থান যেমন :—

"সরসীর স্বচ্ছ জলে ভাসি ভাসি দলে দলে
হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানসসরে কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।"

উইলশনের প্রথম শ্লোকের অনুবাদে তেমনই—

"When Ramgiri's shadowy woods extend,
And those pure streams where Sita bath'd
Descend,
Spoiled of his glories, severed from his wife
A banished Yacsha passed his lonely life,
Doomed by Cuvera's anger to sustain
Twelve tedious months of solitude and pain"

সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান উইলশনের বিরাট কীর্ত্তি। উইলশন যে ছাত্রদিগকে ইংরেজী কবিতা লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, কবিতা রচনা করিতে হইলে ভাষায় অধিক অধিকার প্রয়োজন হয়—শব্দ বাছাই করিতে হয়, রচনা বাহুল্যবর্জ্জিত ও সংযত করিতে হয়। উইলশনের উপদেশে ছাত্রদিগের মধ্যে কেবল কাশীপ্রসাদ ইংরেজী কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সে কবিতাটি তাঁহার কোন কবিতা-সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁহার আর একটি কবিতা "আশা"—সেটি সংগ্রহে স্থান পাইয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহার রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। তদবধি শেষ বয়স পর্য্যন্ত কাশীপ্রসাদ ইংরেজীতে কবিতা রচনা করিতেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

এ দেশে ছাত্রদিগের জন্ম ইংরেজী কবিতার সংগ্রহ-পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া জনশিক্ষা-সমিতি ক্যাপ্টেন রিচার্ডশনকে সেই অভাব দূর করিতে অনুরোধ করায়, তিনি যে বিরাট পুস্তক সঙ্কলিত করেন—(Selections from British Poets) তাহাতে তিনি ভারতীয়ের রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ কাশীপ্রসাদের একটি ইংরেজী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। উহা গঙ্গার প্রতি নৌকাচালকের উক্তি। উহার আরম্ভ এইরূপ:—

"Gold river! Gold river!
how gallantly now
Our bark on thy bright breast is lifting
her prow;
In the pride of her beauty, how swiftly
she flies;
Like a white-winged spirit thro'
topaz-paved skies"

এই কবিতা সম্বন্ধে রিচার্ডশন মন্তব্য করিয়াছিলেন—যে সকল সঙ্কীর্ণচেতা লোক ঔদ্ধত্য ও হীন ঘৃণা সহকারে ভারতীয়দিগকে অবজ্ঞাভরে দেখিয়া থাকে, তাহারা এই কবিতাটি পাঠ করিয়া দেখুক এবং ভাবিয়া দেখুক তাহারা বিদেশী ভাষায় নহে—পরন্তু মাতৃভাষায় এইরূপ কবিতা রচনা করিতে পারে কি?

মন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন, এই কবিতাটি ইংলণ্ডে তৎকালীন বহু সাময়িক পত্রে উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। ফিশারের চিত্রপুস্তকে বহু ইংরেজ কবির সঙ্গে এই ভারতীয় কবির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। কাশীপ্রসাদ অতি সুপুরুষ ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গৃহে কালীপ্রসন্ন সিংহের চিত্রপ্রতিষ্ঠার সময় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজে যে দুই জন সুপুরুষের সৌন্দর্য্য-খ্যাতি ছিল তাঁহাদিগের এক জন—কালীপ্রসন্ন সিংহ, অপর জন—কাশীপ্রসাদ ঘোষ। অন্য কয়খানি পুস্তকেও কাশীপ্রসাদের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিদুষী এমা রবার্টস কবির জীবনকথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিদেশী ভাষায় কবিতা-রচনা কিরূপ দুষ্কর, তাহার উল্লেখ করিয়া এই ইংরেজ মহিলা বলেন, ইংরেজী পাঠক-সমাজে সমাদর লাভের নানা দাবী কাশীপ্রসাদের আছে। এই মহিলার মন্তব্যে মনে পড়ে, বাঙ্গালী তরুণী তরু দত্তের কৃত ফরাসী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া ইংরেজ সমালোচক এডমণ্ড গস মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"When the history of the literature of our country comes to be written, there is sure to be a page dedicated to this fragile exeotic blossom of song."

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে পরীক্ষার পূর্ব্বে ডক্টর উইলশন একখানি ইংরেজী পুস্তকের সমালোচনা করিতে বলিলে, কাশীপ্রসাদ মীল রচিত ভারতের (বৃটিশ শাসনে) ইতিহাসের প্রথম চারি অধ্যায়ের সমালোচনা করিয়া পুস্তকে বহু ভ্রম-ত্রুটি দেখাইয়া দেন। লাটপ্রাসাদে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পুরস্কার বিতরণ সভায় ঐ নির্ভীক সমালোচনা পঠিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করে। প্রবন্ধটির কিয়দংশ ঐ বৎসর সরকারী "গেজেটে" প্রকাশিত হয় এবং লণ্ডনে প্রকাশিত Monthly Register for British India and its Dependencies পত্রে উদ্ধৃত হয়। প্রকাশ কালে পত্রের সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছিলেন—মিঃ মীল যখন তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী—প্রতীচ্য জ্ঞানের অধিকারী এক জন হিন্দু কর্ত্তৃক তাঁহার গ্রন্থ সূক্ষ্মভাবে সমালোচিত হইবে। ইঙ্গ-হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয়দিগের এই অতর্কিত মানসিক উদ্দীপ্তির প্রধান কারণ এবং পত্রে সময় সময় ঐ কলেজের ছাত্রদিগের ইংরেজী রচনার যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সকল হইতে প্রতিপন্ন হয়—নিয়মিতরূপে আগ্রহ সহকারে ভারতীয়দিগকে উচ্চ শিক্ষা দিলে তাহাদিগের মানসিক উন্নতি সাধন সহজসাধ্য। মন্তব্যে লিখিত হয়—সমালোচকের নাম কাশীপ্রসাদ ঘোষ—তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর এবং তিনি হিন্দু কলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র।

পুরস্কার বিতরণোৎসবে লাটপ্রাসাদে হিন্দু কলেজের কয় জন ছাত্র ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনার আবৃত্তি করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কাশীপ্রসাদ সেক্সপীয়রের "ভেনিসের বণিক" প্রসিদ্ধ নাটকের ইহুদী শাইলকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কাশীপ্রসাদের ছাত্রজীবনে সংঘটিত একটি ঘটনায় তাঁহার মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রকট হয়। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ এক বার বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হ'ন এবং তাঁহার সেবা করিতে যাইয়া আর এক জন অধ্যাপকও রোগগ্রস্ত হ'ন। উপযুক্ত সেবা ও শুশ্রূষার অভাবে তাঁহাদিগের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া কাশীপ্রসাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করেন। উভয়েই রোগমুক্ত হ'ন এবং তাঁহারা কাশীপ্রসাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে তিনি হিন্দুর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া বিনয়-নম্রভাবে যে উক্তি করেন, তাহাতে শ্রোতারা মুগ্ধ হ'ন। ডেভিড হেয়ার সেই মন্তব্য আধ্যাত্মিক ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং বলিয়াছেন—সেরূপ ধর্ম্মোপদেশ তিনি কলিকাতায় কোন হিন্দুর—এমন কি কোন খৃষ্টানের নিকটেও শুনেন নাই।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যায়, হিন্দু কলেজে পাঠ কালে তিনি ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন—সমালোচনা-নৈপুণ্যের পরিচয়ও দিয়াছিলেন। কলেজ ত্যাগ করিয়াও তিনি যে সাহিত্য-সাধনায় আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন, তখনও তিনি ইংরেজী রচনায় মনোযোগী ছিলেন। তিনি 'জনবুল', 'লিটারারী গেজেট,' 'বেঙ্গল আনুয়্যাল' প্রভৃতি তৎকালীন ইংরেজী পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সে সকল রচনার উদ্ধার সাধন এখন অসম্ভব। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "ভারতীয় শাসক-বংশ"—নাম দিয়া গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া বংশ, লক্ষ্ণৌ-এর নবাব বংশ, ইন্দোরের হোলকার বংশ, হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ, বরোদার গায়কবাড় বংশ, নাগপুরের ভোঁসলে বংশ, ও ভূপালের নবাব বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে নানা সঙ্কট সময়ে—রাজনীতিক ও স্থানীয় কারণে এই সকল শাসকবংশের বংশপতিরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রতিযোগীদিগকে

পরাভূত করিয়া বাহুবলে ও কৌশলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধে সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় প্রকট হইবার কথা। এই সকল প্রবন্ধ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সম্পাদিত 'লিটারারী গেজেট' পত্রে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছেন, বহু যত্নে অনুসন্ধানের ও গবেষণার ফলে সংগৃহীত নানা উপকরণ এই সকল প্রবন্ধের ভিত্তি ছিল এবং সে গুলিতে ঘটনার ও ব্যক্তির যথাযথ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকালীন ভারতীয় সমালোচকগণ প্রবন্ধগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরবর্তী লেখকরা যে সেগুলির উল্লেখ করেন নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয়!

কাশীপ্রসাদ 'কলিকাতা মান্থলী ম্যাগাজিনে' ক্রমশঃ প্রকাশ্যরূপে মহারাজা রণজিৎ সিংহের ও অযোধ্যার নবাবের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাই পরে দুইখানি পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। এই সকল কাশীপ্রসাদের ইতিহাসানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। তিনি যখন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন পাঠাগার প্রভৃতির অভাবে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল। সেই অবস্থায় কাশীপ্রসাদ কিরূপ ঐতিহাসিক রচনার শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, সাহিত্যিক আগ্রহই তাঁহাকে সেই কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিল।

কাশীপ্রসাদ এক দিকে যেমন এই সকল ঐতিহাসিক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, আর এক দিকে আমরা তেমনই দেখিতে পাই ক্যাপ্টেন রিচার্ডস ফুল ও ফুলের উদ্যান সম্বন্ধে যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার শেষ ভাগে সন্নিবিষ্ট এ দেশের ফুলের তালিকা কাশীপ্রসাদই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ইংরেজীতে একখানি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন, জানা যায়।

কাশীপ্রসাদের আর দুইখানি ইংরেজী পুস্তক উল্লেখযোগ্য—

"বাঙ্গালা কবিতা"—"On Bengal Poetry"

"বাঙ্গালা গ্রন্থ ও লেখক"—On Bengali works and Writers

এই পুস্তকদ্বয়ে তিনি ভারতচন্দ্র, "নিধু বাবু"—(রামনিধি গুপ্ত) প্রভৃতির রচনাসমূহের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছিলেন। নিজ মন্তব্য বুঝাইবার জন্য কাশীপ্রসাদকে আলোচ্য লেখকদিগের অনেক কবিতা ও কবিতাংশের ইংরেজী অনুবাদ করিতে হইয়াছিল এবং তিনি প্রাঞ্জল ইংরেজী কবিতায় সে সকল অনুবাদ করিয়া স্বীয় রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই পুস্তকদ্বয় হইতে আমরা যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি, তাহা বলা বাহুল্য।

কাশীপ্রসাদের কোন বন্ধু তাঁহাকে জাতীয় ভাবদ্যোতক কবিতা (ইংরেজীতে) রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি দশহরা, রাস, কার্ত্তিক পূজা, জন্মাষ্টমী, শ্রীপঞ্চমী, দুর্গাপূজা, দোলযাত্রা, কোজাগর পূর্ণিমা, ঝুলনযাত্রা, অক্ষয় তৃতীয়া, কালীপূজা প্রভৃতি পূজাপার্ব্বণে ইতিহাস ও তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে সকলে তাঁহার হৃদয়ের নিহিত ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।

'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'—সংবাদপত্র কাশীপ্রসাদের বিরাট কীর্ত্তি। ইহা এ দেশে ভারতীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী সংবাদপত্র। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রে কাশীপ্রসাদের কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তিনি এই পত্রে দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের বিষয় নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করিতেন। ইহার নির্ভীকতার জন্য তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পরেই বড়লাট লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইলে ইহার প্রচার বন্ধ করেন। অর্থাৎ তিনি সংবাদপত্রের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখাই সাংবাদিকের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ভারতীয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইংরেজী সংবাদপত্র প্রচারের পথ কাশীপ্রসাদ দেখাইয়া গিয়াছেন।

অপরের মুদ্রাযন্ত্রে পত্র মুদ্রণের নানা অসুবিধা অনুভব করিয়া কাশীপ্রসাদ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে 'সংবাদ-ভাস্কর' মন্তব্য করেন—

"আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার পত্রের পরযন্ত্র-যন্ত্রণা ভোগ পরিত্যক্ত হইল, সম্পাদক মহাশয় স্বকীয় ব্যয়ে এক লৌহযন্ত্র ও অক্ষরাদি ক্রয় করিয়াছেন। গত সোমবার অবধি সেই যন্ত্র হইতে হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। * * * শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই প্রথম পথ দেখাইলেন; অতএব দেশস্থ লোকেরা যথাবিহিত সাহায্য করিবেন।"

এই পত্র সম্পর্কে কাশীপ্রসাদের প্রতিভার আর এক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উপযুক্ত তরুণদিগকে বাছিয়া লইয়া সাংবাদিকের কার্য্যে প্রণোদিত ও লোকসেবায় আগ্রহশীল করিতে পারিতেন। যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক বলিয়া অভিহিত তিনি যেমন 'বেঙ্গলী' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রদ্বয়ের প্রবর্ত্তক গিরিশচন্দ্র ঘোষও তেমনই কাশীপ্রসাদের পত্রে প্রথম সাংবাদিকতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী। কৃষ্ণদাস লিখিয়াছিলেন—কাশীপ্রসাদ বহু শিক্ষিত ভারতীয়ের সাহিত্যিক প্রতিভা পুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও উপকৃত—

—"The present writer would be guilty of ingratitude did he not acknowledge that he first flashed his pen in the columus of the 'Hindu Intelligencer'."

আমরা কাশীপ্রসাদের ইংরেজী রচনার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তিনি যে অভ্যাস হেতু ইংরেজীতে ভাব প্রকাশ বাঙ্গালায় ভাব প্রকাশ অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া অনুভব করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অধিকার উপেক্ষণীয় ছিল না। তিনি নাকি প্রায় তিন শত বাঙ্গালা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি 'গীতাবলী' নামে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "প্রীতিগীতি"-সঙ্কলক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কাশীপ্রসাদের ৪০।৫০টি গীত তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় অবিনাশ বাবু লিখিয়াছেন—"কাশীপ্রসাদের সুমিষ্ট গীতাবলী সাধারণের যত পরিচিত হওয়া উচিত, তত পরিচিত নহে।"

এ কথা সত্য। আমরা নিম্নে তাঁহার একটি প্রেমগীত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রাণ গেলে প্রাণনাথ আসিবে কি—বল, সই ?
জীবন রহিত হ'লে আইলে কি ফল, সই ?
প্রাণাধিক ভাবি যারে প্রাণেরে সে-ই প্রহারে,
বুঝি প্রাণতোষিকারে প্রাণহত হল, সই।"

তাঁহার বাণী-বন্দনা তাঁহার বাঙ্গালা-রচনা-নৈপুণ্যের নিদর্শন :—

"শ্বেতশতদলোপরে শ্বেতাম্বরকলেবরে,
শ্বেতমালা গলোপরে, বিরাজে শ্বেতবরণী।
বেদাঙ্গ বেদান্ত তন্ত্র নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্র
সকলের মূলমন্ত্র ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণে কিবা শোভা মধুলোভে মধুলোভা
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।
সারদা শুভ বরদা অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা
বিধাতার ধ্যেয় সদা বেদমাতা নারায়ণী।"

যিনি এইরূপ গান ও কবিতা বাঙ্গালায় রচনা করিতে পারিতেন, তিনি বাঙ্গালা গদ্য রচনায়ও পারদর্শী বুঝিয়াই ডক্টর উইলসন তাঁহাকে ও অমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি ইংরেজী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ (লর্ড ব্রুগামের লিখিত) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার ভার দিয়াছিলেন। এই সংবাদ 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয় ও 'সমাচার-দর্পণ' (১৮৩২ খৃষ্টাব্দ ৫ই মে) ইহা প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পুস্তকের ('বিজ্ঞান-সেবধি' অর্থাৎ শিক্ষাশাস্ত্রের নিধি) আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কাশীপ্রসাদের সময়ে বাঙ্গালা গদ্য রূপান্তরিত হইতেছে—সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের ব্যবহৃত ভাষার স্থান সহজবোধ্য ভাষা গ্রহণ করিতেছে। এই সময়ে শ্রীরামপুরের খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ ভাষার পরিবর্ত্তন সাধনে যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহারা ভাষার যে ব্যবহার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার ত্রুটি কাশীপ্রসাদ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমরাও ধর্ম্মযাজকদিগের ভাষার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, তাহা নিন্দনীয়—"কেন না ঈশ্বর জগৎকে এমত প্রেম করিলেন যে, তিনি তাঁহার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন; যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে সে মরিবে না, পরন্তু অনন্ত জীবন পাওয়ে।" খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের ভাষার নিন্দা করিয়া কাশীপ্রসাদ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমালোচনা বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এ দেশীয় লোকেদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য রচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে, শ্রীরামপুরের মিশনরী সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে পদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু এই তরজমা ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ী হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকদের বোধগম্য হইত না। * * * অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে, শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন।"

এইরূপ ভাষায় শেষ দৃষ্টান্ত বোধ হয়—"গোয়ালিনী মাঙ্গায় দুগ্ধকে ব্যবহারে আনুন।"

কাশীপ্রসাদের আত্মচরিতে দেখা যায়, শ্রীরামপুরের পাদরীরা তাঁহার সমালোচনার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া—'নিউ টেষ্টামেন্টের' প্রথম ভাগ পুনরায় বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া তাঁহার মত জানিবার জন্য, তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী অংশের অনুবাদের প্রুফ সংশোধন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কাশীপ্রসাদ সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইংরেজী লেখক বলিয়াই যে তৎকালীন সমাজে কাশীপ্রসাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ সুপ্রিম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরীতে মনোনীত হইলে 'সমাচার-দর্পণ' (৩১শে জুলাই) যে মন্তব্য করেন, তাহাতে দেখা যায় :—

"সুপ্রিম কোর্ট—এই বৎসরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবার আরম্ভ হয় এবং গ্রান্দ জুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হন। * * * বর্ত্তমান গ্রান্দ জুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নাম দেখিয়া আমারদের বোধ হইল যে, অতি গৌরবান্বিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন। এইক্ষণে এই কার্য্যে নিযুক্ত সাত জনের মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে পারে। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর; তিনি কলিকাতার মধ্যে যেমন পরাক্রান্ত তাদৃশ অপর দুর্লভ। এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা ধনিশ্রেষ্ঠ এবং বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তদল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরদের দলের প্রধান; ফলত, ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইঙ্গরাজী বিদ্যায় ইঁহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা প্রথম গ্রান্দ জুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন, ইহা দর্পণে টুকিয়া রাখিতে অস্মদাদির মহাসন্তোষ আছে।"

উদ্ধৃত অংশে তৎকালীন বাঙ্গালার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তদ্ভিন্ন উহাতে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় :—

(১) ব্রাহ্মণরা তখনও "সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত দল" বলিয়া স্বীকৃত।

(২) দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন কলিকাতায় "পরাক্রান্ত" বলিয়া বিবেচিত।

(৩) "ক্রোরপতি" বলিয়া পরিচিত রামদুলাল সরকারের পুত্র আশুতোষ দেব (সাতু বাবু) তখনও কলিকাতায় "ধনিশ্রেষ্ঠ" বলিয়া পরিচিত।

(৪) তখন লোকের বিশ্বাস ছিল, ইংরেজী বিদ্যায় কাশীপ্রসাদের সমকক্ষ কোন বাঙ্গালী ছিলেন না।

তৎকালীন ইংরেজ সরকার কাশীপ্রসাদকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও "জাষ্টিস অব দি পিস" করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে হিন্দু বেনাভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউশনের উদ্যোগে যে পাঠাগার স্থাপিত হয়, তিনি তাহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন।

কাশীপ্রসাদের আর একটি কার্য্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তিনি চাকরী না করিয়া স্বাধীন ব্যবসা করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতেন। এক সময়ে তাঁহার তিনখানি বৃহৎ বাণিজ্য-জাহাজ ছিল। সেগুলি দুর্ঘটনায় নষ্ট হওয়ায় তিনি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই সকল জাহাজ কি কাজে ব্যবহৃত হইত, তাহা জানিতে কৌতুহল স্বাভাবিক। যাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালী চিরদিন ব্যবসাবিমুখ তাঁহাদিগের জানা উচিত, এক সময়ে বাঙ্গালীর বহু নৌকার ও জাহাজের কাজ ছিল। এ দেশে ইংরেজের আগমনের পরে কলিকাতায় কোন কোন ধনী পরিবার জাহাজের ব্যবসা করিতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁহাদিগের অন্যতম। বহুবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের পরিবারেরও জাহাজী ব্যবসা ছিল। ঐ ব্যবসা সম্পর্কে যে সকল য়ুরোপীয় তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগের এক জন ঐ দত্ত পরিবারের এক জনের (কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর পুত্রদিগের) পরিবারেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইংরেজদিগের জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাও ছিল—যাঁহার নামে খিদিরপুরের নামকরণ হইয়াছে সেই কিডার তাঁহাদিগের অন্যতম। বাঙ্গালীদিগের জাহাজ সংস্কারের কারখানাও ছিল। যাঁহাদিগের সেরূপ কারখানা ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে পটলডাঙ্গার বসু মল্লিক পরিবারের ও তারক পরামাণিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বসু-মল্লিকরাই "হুগলী ডকিং" প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা।

ইংরেজের স্বার্থ-সর্ব্বস্ব নীতিই ভারতীয়দিগের জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার ও জাহাজী ব্যবসার বিনাশের কারণ।

বহুকাল পূর্ব্বেও বাঙ্গালার তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রগামী জাহাজে পূর্ণ থাকিত—বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা বাঙ্গালীর নির্ম্মিত এবং বাঙ্গালী নাবিক-চালিত জাহাজে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া চীনে, সিংহলে, দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন করিতেন—উপনিবেশ স্থাপনও করিতেন। বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার বহু বিবরণ বিদ্যমান। হাণ্টার বলিয়াছেন—বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে তমলুকের ধ্বংসে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা-বিরতির কারণ বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধযুগেও তমলুক সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল; ক্রমে সমুদ্র সরিয়া যায়। ক্রমে সমুদ্রযাত্রা "became impracticable to a deltaic people whose harbours were left high and dry by the land-making rivers and the receding sea. Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalees unenterprising upon the ocean."

হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইলেও কাশীপ্রসাদ জাতির ধর্ম্মে ও আচার-ব্যবহারে শিথিল-বিশ্বাস হ'ন নাই। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়া-কলাপ সমারোহ সহকারে সম্পাদন করিতেন। তাহাতে তৎকালীন য়ুরোপীয়দিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

কাশীপ্রসাদ এ দেশে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। সেই জন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথন ও তাঁহার সমর্থকগণের চেষ্টার তীব্র সমালোচনা করিতে তিনি বিরত হ'ন নাই। তিনি প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী না থাকিয়া অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজ পত্নীকে ইংরেজীতে এরূপ সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ মহিলারা নিমন্ত্রিত হইয়া অতিথি হইলে, তিনি তাঁহাদিগের সহিত স্বচ্ছন্দে ইংরেজীতে কথোপকথন করিতেন। কাশীপ্রসাদ বিদেশী শিক্ষকদিগের বা খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের হস্তে হিন্দু নারীর শিক্ষাভার দিবার বিরোধী ছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কাশীপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যু হয়।

তাহার পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার শ্যামবাজার পল্লীতে পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়া হেদুয়া দীঘির উত্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। জনরব, পারিবারিক কারণে তিনি তাহা করিয়াছিলেন। হয়ত মনে করিতে হইবে, তাঁহার বিমাতা ছিলেন এবং বিমাতার তিন পুত্রও ছিলেন।

কাশীপ্রসাদের নূতন গৃহ মনীষি-সমাগমে যেমন লোকের শ্রদ্ধা লাভ করিত, তেমনই নানা উৎসবে ও গীতবাদ্যে মুখরিত থাকিত। নানা বিষয়ের ও সমস্যার আলোচনার জন্য তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজে শিক্ষায় ও সম্ভ্রমে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সেই গৃহে সমবেত হইতেন—রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সেই গৃহে সমবেত হইয়া তাহাকে চিন্তাকেন্দ্রে পরিণত করিতেন।

কাশীপ্রসাদের সঙ্গীতানুরাগ তাঁহার স্বরচিত বহু গানে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি যেমন ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন তেমনই বিদ্যানুরাগী ও সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সাংবাদিক কার্য্যও গৌরবজনক।

কাশীপ্রসাদের বিষয় আলোচনা করিলে—কালের ব্যবধানে তাঁহাকে বাঙ্গালী-সমাজে প্রান্তরের পরপারবর্ত্তী উদয়াস্ত-ভাস্করকিরণে সমুজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের মত মনে হয়।

"The economic forms in which men produce, consume and exchange are transitory and historical. When new productive forces are won men change their methods of production all the economic relations which are merely the necessary conditions of this particular method of production." —Karl Marx.
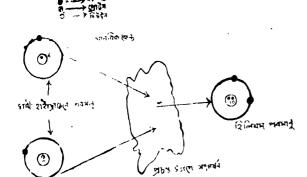
হাইড্রোজেন বোমা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে বোমা ফাটলো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, সাইবেরিয়াতে তার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করছি। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, মাত্র ১০টি বোমার দ্বারা এই সমগ্র দুনিয়াকে প্রাণিশূন্য করা সম্ভব। ফলাও করে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে, ১টি মাত্র বোমা লণ্ডন, মস্কো, বার্লিন অথবা যে কোন বড় সহরকেই ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। হাওয়া অনুকূলে থাকলে তেজস্ক্রিয়তার পরিবহনে বহু দূরের জীবজগৎ বিপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ আজকের দিনে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হাইড্রোজেন অথবা সৌর-বোমা ফাটুক না কেন, সমগ্র মানব-দুনিয়া বিপন্ন।

হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতার বিবরণ মার্কিণ আণবিক শক্তি-কমিশনের সভাপতি মিঃ লুই ষ্ট্রস-এর রিপোর্টে পাওয়া যায়। গত মার্চ্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যে হাইড্রোজেন বোমা ফাটান হয়েছিল, তার ফলে ৭৫০০ বর্গ-মাইল অঞ্চল হয়ে উঠেছিল তেজস্ক্রিয়—এবং ঐ স্থান জনাকীর্ণ হলে প্রায় ২৮০০ বর্গ মাইল অঞ্চলে জীবজগতের শতকরা ১০০ ভাগ প্রাণীরই মৃত্যু হতো, কিন্তু এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও মানুষের শুভ বুদ্ধির উদয় হলো না। শক্তিশালী দেশ সমূহ ঘোষণা করেছেন—যুদ্ধের আশঙ্কা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে যাবেন। নেভাদা মরুভূমির বুকে—সাইবেরিয়ার গুপ্ত অঞ্চলে এই পরীক্ষা-কার্য্য অব্যাহত ধারায় এগিয়ে চলেছে। যে দেহকোষ সমূহ বংশ-পরম্পরায় মানব জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করছে, তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণে তার বিনাশও সম্ভব, কিন্তু তবু এই গবেষণার বিরাম নেই। এত দিন জানা ছিল, কেবল মাত্র আমেরিকা এবং রাশিয়াই হাইড্রোজেন বোমা উৎপাদনে সমর্থ, কিন্তু সম্প্রতি বৃটেনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত হোয়াইট পেপারে ঘোষণা করা হয়েছে, বৃটেনও হাইড্রোজেন বোমা উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করবে। হোয়াইট পেপারে ঘোষিত হয়েছে—"বিচার ও বিবেচনার পর সরকার হাইড্রোজেন বোমা উৎপাদন নিজেদের কর্ত্তব্য বলে মনে করেন।" চমৎকার এই কর্ত্তব্য! তাঁদের দুশ্চিন্তা—পশ্চিম-ইউরোপ যদি আণবিক শক্তির পূর্ণ সুযোগ না গ্রহণ করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে যে কোন আক্রমণেই আত্মরক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সমস্ত শান্তিকামী মানুষই চিন্তিত হয়ে পড়েছে আণবিক যুদ্ধের ফলাফল স্মরণ করে। স্বয়ং বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন—"আণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতার ফলে বিশ্ব ধ্বংস অনিবার্য্য। পৃথিবীর যে কোন বৃহত্তম সহরকেই আজকের দিনে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা যায়। পাগলের প্রলাপ এ নয়—শান্তিকামী মানুষের শান্ত মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত বিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান সৌর বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা, সেই সৃষ্টি-ধ্বংসকারী প্রলয়াগ্নি আবির্ভাব ঘটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। হিরোশিমাতে আণবিক বোমার বিস্ফোরণের কথা আপনাদের জানা আছে—কেবল সেইখানেই একটিমাত্র বোমার আঘাতে নিহত হয়েছিল এক লক্ষ লোক, আহত আরও পঞ্চাশ হাজার। সৌর-বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা আণবিক বোমার চেয়ে খুব কম কোরেও ১০ গুণ বেশী শক্তিশালী—এর থেকেই অনুমান করা যায়, এর ক্ষমতার প্রচণ্ডতা! কোন স্থানকে হাইড্রোজেন বোমার দ্বারা আঘাত করা, আর তাকে সূর্য্যের অগ্নিগহ্বরে নিক্ষেপ করা একই কথা।

বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে অসীম শক্তি—সমস্ত প্রতিবন্ধককে তুচ্ছ করে এরই সাহায্যে সে এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে। স্বার্থের সংঘাতে এই মহাশক্তি আজ অপব্যয়িত হচ্ছে মানুষকে ধ্বংস করার জন্য। আণবিক শক্তি যদিও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য বিখ্যাত, তবুও আজ-কাল দেশে দেশে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে এই মহাশক্তিকে সুসংহত করে কি করে মানুষের মঙ্গলের কাজে লাগান যায়। এই শক্তির সাহায্যে জাহাজ চালান, এরোপ্লেন চালান, সাবমেরিণ চালান এবং আরও অনেক কিছুই করা সম্ভব হবে। কিন্তু হাইড্রোজেন ফিউসনের দ্বারা আমরা যে প্রচণ্ড ক্ষমতা পাই তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় না। এই শক্তির দ্বারা কেবলমাত্র ধ্বংস করাই সম্ভব।

অত্যন্ত সাধারণ মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন থেকে কি করে এই বিপর্য্যয়কারী প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তা বোঝাবার চেষ্টা করছি। পদার্থ জমাট শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পরমাণুর পদার্থের যদি পরিবর্ত্তন ঘটে তবে তা পরিপূরণ হয় বিশাল শক্তির বিস্ফোরণে। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি এবং তার চারি ধারে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন। যেমন সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকে সূর্য্য এবং তার চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবী, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহ—সুতরাং পদার্থের পরমাণুকে সৌরজগতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে। বিভিন্ন পদার্থের প্রকারভেদ হয় তার কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটন, নিউট্রন এবং চতুর্দ্দিকে অবস্থিত ইলেকট্রনের সংখ্যার অনুপাতে।

এখন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে আছে ১টা প্রোটন আর চতুর্দ্দিকে ঘুরছে ১টা ইলেকট্রন। ভারী হাইড্রোজেন—হাইড্রোজেনের আর একটি রূপান্তর। এই ভারী হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে থাকে ১টা নিউট্রন ১টি প্রোটন আর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায় ১টা ইলেকট্রন। এখন কোন ক্রমে যদি প্রচণ্ড সংঘর্ষণের দ্বারা দুইটি ভারী হাইড্রোজেনকে একীভূত করা যায় তাহলে জন্ম নেবে একটি হিলিয়ম পরমাণু—আর তার সঙ্গেই উৎপন্ন হবে প্রচণ্ড শক্তি। ছবির দিকে দেখুন—দুইটি ভারী

হাইড্রোজেন এক বিরাট সংঘর্ষণে কেমন করে জন্ম দেয় একটা হিলিয়মের। হিলিয়মের কেন্দ্রে বিরাজ করে ২টি প্রোটন, ২টি নিউট্রন এবং চতুর্দ্দিকে আছে ২টি ইলেকট্রন।

সূর্য্যের অথবা অন্যান্য তারকার শক্তির প্রধান উৎস এই রূপান্তর। সেখানে প্রচণ্ড উত্তাপে সর্ব্বদাই হাইড্রোজেন হিলিয়মে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাই হাইড্রোজেন বোমার আর এক নাম সৌর-বোমা অথবা নাক্ষত্রিক বোমা।

এই সংঘর্ষণ কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কিছুতেই হতে পারে না। সাইক্লোট্রন যন্ত্রে হয়তো দুইটি কেন্দ্রকে পরস্পরাভিমুখে ধাবিত করে সংঘর্ষণ ঘটান সম্ভব, কিন্তু তাতে যে শক্তি ব্যয় হয় তা উৎপন্ন শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। তাই এর জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড উত্তাপের। উত্তাপে বরফ হয়ে যায় জল—জল বাষ্প। অর্থাৎ পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ইচ্ছা মতো ভ্রমণ করতে পারে। অন্যান্য তারকা বা সূর্য্য জলন্ত গ্যাসের সমষ্টি মাত্র—সেখানে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুগুলি অত্যন্ত বেশী উত্তাপে ছুটোছুটি করছে। গ্যাসের ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে তাদের মধ্যে হচ্ছে সংঘর্ষণ। সেই সংঘর্ষণেই জন্ম নিচ্ছে নতুন পদার্থের অণু। হাইড্রোজেন পরমাণু রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়ম পরমাণুতে। একটি কথা—প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্র বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন। তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু প্রচণ্ড উত্তাপে হাইড্রোজেন এই বিকর্ষণের শক্তিকে পরাভূত করে সংঘর্ষণ ঘটায়, ফলে আবির্ভাব হয় প্রচণ্ড শক্তির। এই সংঘর্ষণের সাথে কিছু পরিমাণ পদার্থও রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। হাইড্রোজেন অত্যন্ত হাল্কা গ্যাস বলেই তার পক্ষে এই বিকর্ষণ শক্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক শক্তি অত্যন্ত বেশী হওয়ায় প্রচণ্ড উত্তাপেও তারা নিজেদের বিকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

সূর্য্যের কেন্দ্রের উত্তাপ হলো ২০ মিলিয়ন ডিগ্রি এবং তার উপরিভাগের উত্তাপ ৮০০০ ডিগ্রির কাছাকাছি। সেখানে পরমাণু রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোন গবেষণাগারই এই উত্তাপের জন্ম দিতে পারবে না। একমাত্র আণবিক বোমার বিস্ফোরণেই যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়—তার পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ডিগ্রির কাছাকাছি। সুতরাং হাইড্রোজেন বোমা অথবা সৌর-বোমা ব্যবহার করার সময় সহায়ক হিসাবে আণবিক বোমার প্রয়োজন। প্রথমে আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়ে প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করবে এবং সেই প্রচণ্ড উত্তাপে ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি পরস্পরের সংঘর্ষণে জন্ম দেবে হিলিয়ম গ্যাস ও তৎসঙ্গে সভ্যতা ধ্বংসকারী প্রচণ্ড শক্তির।

হাইড্রোজেন কি ভাবে সৌর-বোমার মধ্যে ব্যবহার করা হবে তা এক বিরাট সমস্যা! যদিও কাগজে-কলমে হাইড্রোজেন বোমা বা সৌর-বোমা যথেচ্ছ বড় করা চলে, তবুও এর বহন ও দূর দেশে ব্যবহারের জন্য আয়তন সংযত করা দরকার। ১০ পাউণ্ড ভারী হাইড্রোজেন গ্যাস ১০০ এ্যাটমস্ফিয়ার চাপে ১২ ঘন-ফুট স্থান অধিকার করে, তাই এর বদলে হাইড্রোজেনের উৎস হিসাবে জল ও ইউরেনিয়াম হাইড্রাইডও ব্যবহার করা চলতে পারে। ১০ পাউণ্ড হাইড্রোজেনের জন্য যে পরিমাণ জল দরকার তার আয়তন মাত্র ১ ½ ঘন-ফুট। ডাঃ হ্যানস্ থিররিং (Dr Hans Thirring) এর মতে হাইড্রোজেনে লিথিয়াম পুড়িয়ে যে লিথিয়াম হাইড্রাইড পাওয়া যায়, তার ব্যবহার অনেক সুবিধাজনক। এখানে একটি লিথিয়াম পরমাণু আর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষণে যুক্ত হয়ে জন্ম দেবে দুইটি হিলিয়ম পরমাণুর। কিন্তু দুইটি ভারী হাইড্রোজেনের মিলনে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়, এতে তার চেয়ে কম শক্তি উৎপন্ন হবে। লিথিয়াম হাইড্রাইড জল থেকেও হাল্কা হওয়ায় এর ব্যবহারের সুবিধা অনেক।

হাইড্রোজেন বোমা বা সৌর-বোমা প্রস্তুতের নক্সা বা অন্যান্য সংবাদ নিরাপত্তার সতর্ক প্রহরার অন্তরালে গুপ্ত। একটি সৌর-বোমা প্রস্তুতের জন্য খরচ হয় প্রায় ৪ মিলিয়াম ডলার। এই বোমা যথেচ্ছ বড় করতে বাধা নেই—তাই আগামী যুগে কোন দেশ যদি এই বোমার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে, তাহলে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। নিউ মেক্সিকোর গবেষণাগারে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা এই বোমার গবেষণায় ব্যস্ত। সোবিয়েৎ রাশিয়াও এই বোমা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। সোবিয়েৎ দেশে লৌহ-যবনিকার অন্তরালে কি হচ্ছে তা বলা সম্ভব নয়, তবে আমেরিকার এ্যাটমিক এ্যানার্জ্জি কমিশন মনে করেন, মার্কিণ দেশ এই গবেষণায় রাশিয়ার চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর।

প'ড়ো বাড়ী

শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন-মজুরের রক্ত-গলান জলে
আঁকা হ'য়ে গেছে কত স্মৃতি-ছবি ওই ইটে পলে পলে।
কত কুসুমের বসেছে আসর বাতাস করেছে কতই আদর
কাঁটালী চাঁপার গন্ধ নেচেছে পৃথিবী আকাশ ব্যেপে;
সন্ধ্যার কালো-মুখের হাসিটি মিশে গেছে কেঁপে-কেঁপে।
ঝড়ের ভ্রূকুটি, জলের দাপট, বুকে—
স'য়ে স'য়ে সবই ভাঙা-পাঁজরে রেখেছে তাহারে টুকে।
হৃদয়ে সে ব্যথা আপনি গুমরে মাথা কুটে মরে পরাণ হাঁপরে
আকাশের নীল ঝরে-ঝরে পড়ি' এঁকেছে অশথ-লেখা;
চিড়-খাওয়া প্রাণে এইটুকু যেন আশার রঙিন রেখা।
এ জীবনও আজ মনে হয় প'ড়ো বাড়ী
কিশোর বাগান, রাঙা-যৌবন, সব ভেঙে গেছে তারি।
অভাব-আঘাতে চিড় ধ'রে ধ'রে আয়ু-চূণ-বালি গেছে ঝরে ঝরে
জীর্ণ-বুকের ফাটলের মাঝে আশা-অশথ জাগে;
নুয়ে-পড়া দেহে যদি'বা কখনো জীবনের ঢেউ লাগে।

সাপের বিষ দোহন

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

সাপের বিষ নানা কাজে আমাদের দরকার হয়। 'সুচিকা-ভরণ' ওষুধে কবিরাজেরা সাপের বিষ প্রয়োগ করে থাকেন। কোন কোন নার্ভের রোগ সারাতে সাপের বিষ কার্যকরী ব'লে গবেষণা চলছে। কিন্তু সাপের বিষ সব চেয়ে আবশ্যক সর্প-বিষ প্রতিষেধ ওষুধ 'অ্যান্টি-ভেনিন' (anti-venin) তৈরির ব্যাপারে। সাপের বিষ ঘোড়ার গায়ে একটু একটু করে 'ইন্‌জেক্‌শন' করা হয়—যতক্ষণ না ঐ ঘোড়ার রক্তের সর্প-বিষ-প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মে। পরে ঐ রক্ত থেকে 'অ্যান্টি-ভেনিন' তৈরি করা হয়।

যা হ'ক, সাপের বিষ সংগ্রহ করা সহজ নয়। জ্যান্ত সাপেরই বিষের থলি থেকে বিষ দোহন ক'রে নিতে হবে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝুন! মরা সাপের বিষে রাসায়নিক গুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রত্যেক বিষাক্ত সাপের মুখের উপরের চোয়ালে আছে দু'টো ক'রে লম্বা সুচালো বিষ-দাঁত। আর এই প্রত্যেক বিষ-দাঁতের পিছনে রয়েছে পেঁয়াজের কোয়ার মত একটি ক'রে বিষের থলি। এই থলিতে তরল বিষ জমা হ'য়ে থাকে। সাপ যখন কারুকে ছোবল মারে, তখন তার বিষের থলিতে চাপ পড়ে। ফলে বিষের থলি থেকে বিষ বেরিয়ে বিষ-দাঁত ব'য়ে আক্রান্ত প্রাণীর রক্তে মিশে যায়।

জ্যান্ত সাপ থেকে বিষ সংগ্রহ ক'রতে হ'লে আমাদের প্রায় অনুরূপ উপায় গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন পরীক্ষাগারে (laboratory) সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিধা-বিশিষ্ট একটি লাঠি দিয়ে প্রথমে সাপের মাথাটা মাটিতে চেপে ধরা হয়। তার পর তার ঘাড়টা হাত দিয়ে জোরে ধরে মুখে পার্চমেন্ট (parchment) আটকান একটি কাচের পাত্রের উপর ধরা হয়। সাপটা রাগে সেই পার্চমেন্টের উপর ছোবল মারে—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিষ-দাঁত দুটো পার্চমেন্ট ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে যায়। পার্চমেন্ট বেশ শক্ত হওয়ার ফলে বিষের থলিতে যে চাপ পড়ে, তার ফলে বিষ-দাঁত বয়ে কাচের পাত্রে বিষ গিয়ে পড়ে। পুনঃপুনঃ এইরূপ করা হয়।

কোন কোন পরীক্ষাগারে একটু অন্য ধরণের সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য নেওয়া হয়। কাচের একটি নলের মুখে লাগান রবারের একটি ছোট নল সাপের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সাপ মুখ বন্ধ ক'রলে তার বিষ-দাঁত দুটো রবারের নলের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন সাপের মাথার উপর থেকে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে বিষের থলির উপর ধীরে ধীরে চাপ দেওয়া হয়। বিষের থলির উপর চাপ পড়াতে তরল বিষ বিষ-দাঁত ব'য়ে কাচের নলে এসে ক্রমে জমা হয়।

এই তো গেল বিজ্ঞান-সম্মত উপায়গুলির কথা। এবারে আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরা কি কি উপায়ে সর্প-বিষ দোহন করে, সে-সম্পর্কে কিছু বলব।

আমাদের দেশে মালেদের কথা অনেকেই জানেন। সাপ ও সাপের বিষ বিক্রি করা এই মালদের বংশগত পেশা। মালেরা নিম্নলিখিত উপায়ে সর্প-বিষ দোহন করে।

ডান হাত দিয়ে সাপের লেজ ধরে মাল সাপটাকে তুলে ধরে—এবং বাঁ হাত দিয়ে (অথবা অন্য একজন মাল) কাপড়-জড়ান একটি বড় সরা সাপের মুখের কাছে ধরে। সাপ রাগে ঐ কাপড়ের উপর ছোবল মারে—এবং তরল বিষ বিষ-দাঁত ব'য়ে জমা হয় সরার ভিতর। সাপ মুখ ঘুরিয়ে মালকে যাতে ছোবল না মারতে পারে, সে জন্যে সে কৌশলতার সঙ্গে সতর্কতা অবলম্বন করে।

বিষ-দাঁত ভেঙে দেওয়ার পর কেউটে সাপ

দ্বিধা-বিশিষ্ট লাঠি দিয়ে সাপের মাথা মাটিতে চেপে ধরা হয়েছে

দুইটি কবিতা

শ্রীকালিদাস রায়

মূর্খ-প্রশস্তি

মূর্খ তোমা নমি,
বিদ্বানে ক্ষমি না হ'লে অপরাধ, তোমা কিন্তু ক্ষমি।
অন্নে অধিকার জন্মে ঘর্ম্মপাতে শ্রমমূল্য দিলে—
তুমি জানো, তাই তুমি বসুধারে অন্নদা করিলে।
পাপের তাপের গণ্ডী ঢের ক্ষুদ্র, তাই তুমি সুখী,
জানো নাক' জটিলতা, জালিয়াতি, কূট, ফাঁকিজুকি।
মাতাপিতা-প্রতিপাল্য পূজনীয়, জানো স্বভাবতঃ,
বিনয় সহজ ধর্ম্ম তব, তাই রহ অবনত।
না বিচারি ফলাফল শত্রু-মিত্র সবে বুকে টানো,
নির্বিচারে নিঃসংশয়ে ভক্তি-ভয়ে ভগবানে মানো।
অগাধ বিশ্বাসশক্তি শিশুসম পাইয়াছ তুমি।
চিত্ত তব ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত ভূমি।
মৃত্যু ঘনাইলে দিন গণ নাক' তুমি বসি বসি।
যখনই আহ্বান আসে তখনই শৃঙ্খল পড়ে খসি'।
কোরো নাক' শোক,
রয়েছে তোমার দলে ইতিহাসে বড় বড় লোক।
মহীশূর রাজ্য গড়ে মহাশূর মূর্খ হায়দর,
আদর্শ সম্রাট-শ্রেষ্ঠ এ ভারতে মূর্খ আকবর।
গড়িল বীরের জাতি পঞ্চনদে মূর্খ রণজিৎ,
মূর্খ শিবাজীর চেয়ে বীরলোকে কাহার চরিত?
সব চেয়ে বড় কথা মূর্খ এক পূজারী ব্রাহ্মণ
সকল জ্ঞানীর গুরু বিশ্ব-পূজ্য নর-নারায়ণ।
ভগবানে পেতে হলে অকপটে ঘুচায়ে সংশয়
ভুলিয়া সকল বিদ্যা শুদ্ধচিত্তে মূর্খ হ'তে হয়।
চরম বিচার-দিনে জ্ঞানপাপী কভু নাহি বাঁচে।
তুমি যদি কর পাপ, ভ্রান্তি বলি গণ্য তাঁর কাছে।
পণ্ডিতের যুক্তিজাল মুক্তিপথে মূল্য নাহি পায়,
তোমার করুণ আঁখি কাণ্ডারীর হৃদয় গলায়।

মোহমুদ্গর

আমার এ দেহ মজ্জা-শোণিত-অস্থি-পিশিতময়
আমি জানি প্রিয় তার বেশি কিছু নয়।
এই দেহটার রূপ বর্ণনে তুমি ত পঞ্চমুখ
তাহাতে আমার মনে জাগে কৌতুক।
মুগ্ধ নয়নে দেহটার পানে চাও,
জানি না তাহাতে কি মাধুরী তুমি পাও!
আপন মোহই ঘনায়িত করিবারে
নানা সজ্জায় সাজাইছ দেহটারে।
আপন মনের কামনা মিশায়ে কামিনী গড়েছ তুমি,
ক্লিন্ন-নরকে গড়েছ স্বর্গভূমি।
রঙিন খেলানা পাইয়া তোমার শিশু সম আহ্লাদ,
ক্ষুধিত, পেয়েছ এই কদন্নে রাজভোগ্যের স্বাদ।
মম আরক্ত ওষ্ঠাধরের পান-পিয়ালায় ঢালি'
পিইতেছ সুধা নিজের হৃদয়-কুম্ভ করিয়া খালি,
কুম্ভ শূন্য হবে
অধর-পিয়ালা তখন কোথায় রবে?
মনে জাগে তাই ভয়।
প্রেম কি তোমার দেহটারে শুধু করিয়াছে আশ্রয়?
তোমার মাঝারে নিবিলে কামনানল
এই দেহটার পিশিত-চর্ম্ম রহিবে ত সম্বল।
জরায় পীড়ায় এ দেহ আমার হইলে কান্তিহারা,
প্রেমের পালাটি হইয়া যাবে কি সারা?
এই দেহটির রূপ বর্ণনে তুমি ত পঞ্চমুখ;
দেহ-পিঞ্জরে আছে যেই প্রেম-শুক
ভয়ে কাঁপে তার বুক।

কখনও কখনও মালেরা সাপের বিষ সংগ্রহের জন্যে খুব রূঢ় পন্থা অবলম্বন করে। সোজাসুজি তারা সাপের বিষ-দাঁত দুটো ভেঙে দেয়—এবং সাপের মুখের নীচে একটি পাত্র ধ'রে বিষ সংগ্রহ করে। সাপের বিষ-দাঁত ভাঙার জন্যে তারা নানা রকম উপায় গ্রহণ করে।

অনেক সময় তারা দড়ি দিয়ে বেঁধে এক টুকরো মোটা কাপড় সাপের সামনে নাড়ায়। সাপ রেগে গিয়ে সজোরে তাতে ছোবল মারে। ছোবল মারাতে সাপের বিষ-দাঁত দুটো ঐ কাপড়ে আটকে যায়। যে দড়ি ধরে থাকে, তৎক্ষণাৎ সে জোরে টান দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষ-দাঁত দুটোও ওপড়ে কাপড়ের সঙ্গে চলে আসে। কাপড়ের দড়ির টানের সঙ্গে সঙ্গে সাপও যদি এগিয়ে আসে এই আশঙ্কা থাকায় সাপের বিষ-দাঁত কাপড়ে আটকে যাওয়ায় পর মালেরা কোন কোন সময় আগে তার ঘাড় চেপে ধরে এবং পরে দড়ি বা কাপড় ধরে টান দেয়।

অনেক সময় মালেরা সাপের ঘাড় চেপে ধরে একটা উত্তপ্ত সাঁড়াশী তার মুখের কাছে নিয়ে যায়। মুখের কাছে উত্তপ্ত সাঁড়াশী যেতেই সাপ যন্ত্রণায় হাঁ করে। তখন মালেরা ঐ সাঁড়াশী সাপের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে বিষ-দাঁত দুটো টেনে বার ক'রে নেয়।

কখনও কখনও হাতের কাছে কিছু না পেয়ে মালেরা একটা সহজ উপায় অবলম্বন করে। সাপের ঘাড় চেপে ধরে তারা একটা লাঠি আড়া-আড়ি ভাবে সাপের দুটো চোয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর সাপ মুখ বন্ধ করলে তারা জোরে আড়া-আড়ি ভাবেই লাঠিটা আবার বার করে নেয়। এতে সাপের বিষ-দাঁত দুটো ভেঙে যায়।

অবশ্য সাপের বিষ-দাঁত ভাঙার পর প্রায় এক পক্ষ কালের মধ্যে আবার নতুন বিষ-দাঁত গজায়।

ফতেনগরের লড়াই

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বিক্রমাদিত্য

গজানন ও তার পাশের লোকের চীৎকার শুনে কর্পোরাল ছুটে এলেন। বললেন: 'এতো চ্যাঁচাচ্ছো কেন? তোমাদের চীৎকার শুনে আমার ঘুম হচ্ছে না। কী ব্যাপার?'

গজাননকে দেখিয়ে সৈন্যটি জবাব দিলে: 'স্যর, এই লোকটা বলছে 'মসকুইটো' এসেছে।'

সৈন্যটির কথা লুফে নেয় গজানন। বলে: 'হ্যাঁ স্যর, এই মাত্র ভোম্বলা বললে যে, 'মসকুইটোর' উপদ্রবে ওর ঘুম হচ্ছে না।'

কর্পোরালের ঘুমের নেশা ছুটে গেলো। বললেন: 'বলো কী হে, 'মসকুইটো'!'

: 'হ্যাঁ স্যর! ওর আওয়াজে তো ঘুমই হচ্ছে না কারু।'

: 'সিচুয়েশান সিরিয়াস। না, ফিল্ড কম্যাণ্ডারকে জানাতে হচ্ছে।'

একটু বাদে ফিল্ড কম্যাণ্ডারের কাছে টেলিফোন গেলো যে, এক ঝাঁক 'মসকুইটো' এসেছে। ফিল্ড কম্যাণ্ডার ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারকে জানালেন যে, শত্রুপক্ষ থেকে এক ঝাঁক 'মসকুইটো' বিমান 'রেড' করছে।

ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার জানালেন লুটেরা ছুবেকে যে, শত্রুপক্ষের নতুন টাইপের প্লেন 'মসকুইটো' আজ রাত্রে বোমা নিক্ষেপ করেছে।

লুটেরা ছুবে জানালেন বনবন চৌবেকে যে, আজ শত্রুপক্ষের 'মসকুইটো' বিমান হানা দিয়েছিল। ক্ষতির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য।

ফিল্ড মার্শাল চুকন্দর ঘুমুচ্ছিলেন। এমনি সময় বনবন চৌবে এসে ঘুম ভাঙ্গালেন; বললেন: 'স্যর বিষম কাণ্ড।'

'আমার ঘুম ভাঙ্গালে কেন?'—চুকন্দর হুমকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'সে কী স্যর, আপনিই তো বলেছিলেন যে, আপনাকে সব খবর জানাতে।'

: 'সে জন্যে কী মাঝ-রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাবে? বেশ, শুনি কী হয়েছে।'

'স্যর মসকুইটো'—

'সে আবার কে?'

'নতুন টাইপের প্লেন। শত্রুপক্ষের। আজ রাত্রে আমাদের শিবিরে হানা দিয়েছিল। ক্ষতি যৎকিঞ্চিৎ।'

'বলো কী হে বনবন? আমি ভেবেছিলুম—ব্যাপারটা সিরিয়স্ নয়। কিন্তু এখন দেখছি, বেশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

: 'হ্যাঁ স্যর—নিতান্তই জটিল হয়ে পড়ছে।'

* * * *

পরদিন সকালের কাগজে বড়ো-বড়ো অক্ষরে ছাপা হয়ে গেলো—'ফতেনগরের লড়াই'র গুরুতর পরিস্থিতি। শত্রুপক্ষের আধুনিক বিমান 'মসকুইটোর' হানা। ক্ষতি সামান্য।'

এর পরে রইলো সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

* * * *

বিলাসিনী ডাঃ মেটারের বাড়ীর ঝি। রান্না-বান্নার সব কিছুই তাকে করতে হয়। কিন্তু আজ কয়েক দিন যাবৎ কাজে বিলাসিনীর মন বসছে না। মনটা উড়ু-উড়ু করছে। কারণ, বিলাসিনী প্রেমে পড়েছে।

তার প্রেমাস্পদের নাম নবীন। নবীন বিলেত-ফেরৎ; কারণ গত মহাযুদ্ধে সে সেপাই হয়ে বিলেত গিয়েছিল। অতএব বিলাসিনীর গর্ব্ব করার যোগ্য কারণ ছিল। এ তল্লাটে ঝি-মহলে কারু প্রেমাস্পদই বিলেত-ফেরৎ নয়।

নবীন সদ্য হালে প্রেস-ক্যাম্পে কাজ নিয়েছে। রান্না-বান্নার সব কিছু তাকেই করতে হয়।

নবীন জানে, বিলাসিনীর কিছু সঞ্চিত টাকা আছে। তার দৃষ্টি রয়েছে সেই অর্থের উপর। বহু দিন সে শহরে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ দেখেনি। না দেখবার কারণ, শহরে তার প্রচুর দেনা হয়েছিল এবং লোকালয়ে মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ভাবছিল, কী করে টাকা সংগ্রহ করে সে আবার সভ্য-সমাজে ফিরে আসতে পারে। বিলাসিনীর সঞ্চিত অর্থের কথা সে লোক-পরম্পরায় শুনতে পেয়েছে। তাই ভাবছে কী করে এই টাকার কিছু অংশ আদায় করা যায়।

বিলাসিনীকে নবীন তার মৎলব জানায় নি। কারণ, তা হ'লে এই প্রেমে ভাঙ্গন ধরবার সম্ভাবনা আছে।

আজ বিলাসিনী ঠিক করেছে যে, নবীনের কাছ থেকে একটা

পাকা কথা নেবে। নবীন ঠিক করেছে যে, এই ভাবে আর বাটীতে প্রেম করা ঠিক হবে না।

রেল-ষ্টেশনের ধারে পুকুরের পাড়ে তাদের দেখা হলো। বিলাসিনী বলে: 'কী চমৎকার আকাশ, বড়ো চাঁদ উঠেছে।'

নবীন টাকার কথাই ভাবছে নাকি। সে অন্যমনস্ক হয়েই জবাব দেয়, 'আলবাৎ, চাঁদটা দেখতে কিন্তু অনেকটা নতুন টাকার মতো।'

নবীনের জবাব শুনে বিলাসিনী একটু বিস্মিত হয়। এ তো ঠিক প্রেমের লক্ষণ নয়?

বিলাসিনী বলে: 'আর কাজ-কর্ম্মে মন বসছে না।'

নবীন জবাব দেয়: 'কাজে মন বসা কী আর চাট্টিখানি কথা। আগে বাজার থেকে কিছু মুনাফা থাকতো। আজ-কাল যা কিছু পাই, তা বাবুরা আবার ধার নিতে আরম্ভ করেছেন।'

বিলাসিনী যেন বিষম খেলো। তারপর আরো খানিকক্ষণ চুপ-চাপ। এবার বিলাসিনী বললে: 'মনে হচ্ছে এটা বসন্ত কাল।'

এ কথা নবীন মানতে রাজী নয়। কাল সে তার বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে যে 'মনসুন সীজন' আরম্ভ হয়-হয়। 'ফরগেট-মী নট'এর এবার বাজী জেতবার কথা। তাই সে বিলাসিনীর কথার প্রতিবাদ করলে। বললে: 'না, না, এটা মনসুন সীজন।'

ইংরাজী বিলাসিনী বোঝে না। কিন্তু নবীন যখন ইংরাজী বলে তখন তার গর্ব্ব হয়। কারণ, নবীন যে বিলেত-ফেরৎ। তাই সে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে: সে আবার কী?

প্রশ্নটা শুনে নবীন একটু হতভম্ব হয়ে গেলো। বিলাসিনী যে সব কথারই মানে জানতে চাইবে, এটা সে কল্পনা করে নি। সে তার রেসকোর্সের কাহিনী বিলাসিনীকে জানাতে প্রস্তুত নয়। তাই সে থতমত খেয়ে জবাব দিলে: 'মনসুন সীজন' মানে বর্ষা আর কী।

বিলাসিনীর সত্যি এবার চোখে জল এলো। কতক্ষণ ধরে সে লোকটার সঙ্গে প্রেম জমাতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই নবীন তার কথা শুনছে না। আশ্চর্য্য! পুরুষ মানুষগুলো এই রকমই হয়! এমনি ভাবে তাদের আরো দু' ঘণ্টা প্রেমালাপ চললো, কিন্তু আলাপ জমলো না। কারণ, দু' ঘণ্টা বাদে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, এটা বসন্তও নয়, মনসুনও নয়, ঘোর শীত। এ সময়ে বরফ জমতে পারে, কিন্তু প্রেম জমানো দুরূহ ব্যাপার!

* * * *

রাত সাড়ে আটটার সময় প্রেস-ক্যাম্পে তুমুল হৈ-চৈ। খিদেয় সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এখনও পর্য্যন্ত রান্না হয় নি। এমনি সময় ভৃত্য নবীন এসে উপস্থিত। তার মনটা ভালো নেই, কারণ বিলাসিনীর কাছ থেকে সে টাকা আদায় করবার ফিকিরে ছিল, কিন্তু টাকা পায় নি।

রামগোপাল চীৎকার করে বললে: খাবার নিয়ে এসো নবীন!

গম্ভীর কণ্ঠেই নবীন জবাব দেয়: রান্না হয় নি।

ব্যারী ক্রকসম জিজ্ঞেস করে: হোয়াট ইজ দি ম্যাটার?

: নো কুকিং, নো ফুড—কমরেড নিটস্কি জবাব দেয়।

: আমি কারণ জানতে চাই, রান্না এখন অবধি হয় নি কেন? —রামগোপাল প্রশ্ন করে।

: ইয়েস হোয়াট ইজ দি রিজন্—ব্যারী বলে।

এবার কমরেড নিটস্কির বলবার পালা। বলে: উঁহু, এ ভাবে প্রশ্ন করলে চলবে না। তোমরা ক্যাপিট্যালিষ্ট ক্লাস। মজদুরদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় জানো না।—ওয়েল কামারাদ নবীন—

: আজ্ঞে বলুন,—নবীন উত্তর দেয়।

: আজ্ঞে নয়, বলো 'কামারাদ'।

নবীন একটু ইতস্তত: বোধ করে। কমরেড নিটস্কি বলে: হুম্ বুঝতে পেরেছি, ধনিক-শ্রেণী তোমাদের মন ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই তোমরা জবাব দিতে পারছ না। ওয়েল, নেভার মাইণ্ড—কামারাদ নবীন, এখন পর্য্যন্ত রান্না হয় নি কেন?

এবার নবীনের বলবার পালা। বলে: রান্না করবো কোত্থেকে? বাজারে কি লড়াইর জন্য আর কোন জিনিষ পাবার যো আছে! সব কিছু আক্রা হয়ে গেছে। না আছে চাল—না আছে তরকারী।

সবিস্ময়ে রামগোপাল প্রশ্ন করে: বলো কী? এ যে দেখছি একদম 'ফুড ক্রাইসিস'।

ব্যারী প্রশ্ন করে: 'ফুড ক্রাইসিস'। গুড লর্ড।

: হবে না, এই ধনী পুঁজিবাদীদের জন্যে দেশ শ্মশান হয়ে গেলো।

: উফ! কী ভয়ানক ব্যাপার বলো তো—কমরেড নিটস্কি বলে।

: ভেরী সিরিয়াস—ব্যারী উত্তর দেয়।

: আলবাৎ সিরিয়াস। ৬ই মার্চ্চ প্রটেষ্ট—রামগোপাল বলে।

: নো প্রটেষ্ট রামগোপাল। তার চাইতে এই 'ফুড ক্রাই-সিসের' পূর্ণ বিবরণী আমরা কাগজে পাঠাব।

: দ্যাটস রাইট। নো ডিলে।

তিন জনেই তাদের টাইপরাইটার নিয়ে বসে গেলো।

* * * *

: ওঃ দাদা, খিদেয় যে প্রাণ বেরিয়ে যায়—বিছানায় গড়াতে গড়াতে শৈল বলে।

: হ্যাঁ ভাই, খিদের জ্বালা, বিষম জ্বালা—আমি জবাব দিই।

: একটা উপায় বাৎলাও ব্রাদার! আর কতক্ষণ অনাহারে থাকা যায়—করুণ কণ্ঠস্বর নিয়ে গিদোয়ানী প্রশ্ন করে।

রাত্রি আটটা বেজে গেছে। বিলাসিনীর দেখা নেই। আমাদের রান্না হয় নি। বাইরে বসবার ঘরে বসে ডাঃ মেটার তর্জ্জন-গর্জ্জন করছেন।

এমনি সময় বিলাসিনী এসে উপস্থিত। প্রায় চীৎকার করেই ডাঃ মেটার জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপারখানা কী বিলাসিনী? রাত আটটা বেজে গেছে, এখনও রান্না হয় নি?

বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বিলাসিনী বলে: কী রান্না করবো? ভাঁড়ারে কী কিছু আছে যে রান্না করবো।

ভাঁড়ার খালি না হয় বুঝলুম, কিন্তু বাজার তো শূন্য নয়—ডাঃ মেটার কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে বলেন।

: ও মা এ কী কথা বলছে গো! জানো না বুঝি আজ তিন দিন

যাবৎ বাজারের জিনিষ-পত্রের কি রকম দাম চড়ে গেছে। কোন কিছু কেনবার যো নেই—বিলাসিনী উত্তর দেয়।

এবার এই বাদানুবাদে আমরা যোগ দিই। শৈল প্রশ্ন করে—বিলাসিনী, বাজারের জিনিষ-পত্রের দাম বাড়লো কী জন্মে?

: বাড়বে না তো কী! ঐ যে তোমরা বসে বসে লড়াইর সব ছাই-ভস্ম লিখছো, ঐ সব খবর আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, পানওয়ালা সবাই পড়ছে আর জিনিষ-পত্রের দাম বাড়াচ্ছে। ও মিনসেরা কম শয়তান নয়! বলে, লড়াই লেগেছে, আমরা কী করবো?

এবার আমি বলি: তার মানে বিলাসিনী তুমি বলতে চাও, এই লড়াই'র জন্মে জিনিস-পত্তর সব কালোবাজারী হচ্ছে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে।

: হয় নি, তবে হ'তে কতক্ষণ—বিলাসিনী জবাব দেয়।

: বিলাসিনী ঠিকই বলেছে দাদা! দুর্ভিক্ষ এখনও হয় নি কিন্তু হ'তে কতক্ষণ—শৈল উত্তর দেয়।

: হোটস রাইট। হ'তে কতোক্ষণ। আমার মনে হয় কী জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন যে, এবার দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

: ঠিক বলেছো—আমি সায় দিয়ে বলি।

: এ নিয়ে আমাদের একটা বড়ো ষ্টোরী পাঠানো দরকার।

: যা বলেছো ভায়া, শৈল বলে।

* * *

তারঘরের কাছে ব্যারী ক্রকশন ও রামগোপালের সঙ্গে দেখা।

ব্যারী জিজ্ঞেস করে: হ্যালো, গিদোয়ানী কী খবর, এ দিকে যে, কী মৎলব করে?

: আর বলো কেন। ঘরে বসে থাকতে থাকতে মাথা ধরে গিয়েছিল। তাই একটু হাওয়া খেতে এসেছিলুম।

: এই মাঝ রাত্তিরে? ব্যারী প্রশ্ন করে।

ব্যারীর এই প্রশ্ন যে গিদোয়ানীর মনঃপূত হয়নি এ তার জবাব শুনে বোঝা গেলো। বললে: রাত ন'টা কী মাঝ রাত্রি না কি হে?

: আই সী—ব্যারী জবাব দেয়।

* * * *

ব্যারী ও রামগোপাল চলে যাবার পর গিদোয়ানী আমায় বললে: ব্যাটার মতলবটা দেখলে তো। আমার কাছ থেকে খবরটা বের করে নেবার ফিকিরে ছিল। কী ঘুঘ্ রে বাবা!

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বলি: আচ্ছা, ওরা দুটো এদিকে এসেছিল কেন বলতে পারো? আমার মনে হয় কি জানো? কোন কিছু হয়ত ঘটেছে—শৈল ও গিদোয়ানীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে: সত্যি বলছো।

: সত্যি বলছি।

* * * *

ব্যারী রামগোপালকে বললে: গিদোয়ানীর মৎলব কিন্তু ভালো নয় রামগোপাল!

: কেন, ও আবার কী করলে?

: এই রাত্রিরে টেলীগ্রাফ দপ্তরের চার পাশে ঘোরা-ফেরা কিন্তু সুবিধের লক্ষণ নয়।

: তার মানে?—রামগোপাল জিজ্ঞেস করে।

সামথিং ইজ হ্যাপেনিং—

* * *

প্রেস-ক্যাম্পের বারান্দায় বসে তখনও কমরেড নিটম্বি লিখে যাচ্ছে—এই চোরাবাজারী বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের ষ্টীম-রোলার। আজ এই শহরতলীতে ঘনিয়ে আসছে দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল মূর্ত্তি। ঘরে-ঘরে উঠছে হাহাকার, শিশুর ক্রন্দন—শ্রমিকের কাতর.........

* * * *

পরদিন আইন-সভার সামনে তুমুল হৈ-চৈ। রাস্তায় বিরাট জনতা!

একটা বিক্ষোভকারীদের মিছিল বেরিয়েছে। 'কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে'; 'দু'মুঠো চাল সবাইকে দিতে হবে' 'দুর্ভিক্ষকে রুখতে হবে,' শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভকারীরা আইন-সভার সামনে ভীড় করে দাঁড়ালো। বিক্ষোভকারীদের এক জন গান ধরলে। এই গানের প্রথম পদটি স্প্যানিস-গানের সুরে, শেষ পদটি নিখুঁত ভাটিয়ালী।

: "এই কালো বাজারে—
মরছে হাজারে,
মোদের অন্ন নেই,
বস্ত্র নেই,—
জুলুম করা চলবে না, চলবে না।"

শেষের লাইনটি সমস্ত জনতা একসঙ্গে গাইলে।

তার পর প্রশেসনের এক প্রান্ত থেকে শ্লোগান উঠলো। "কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে, দুর্ভিক্ষকে রুখতে হবে।"

প্রশেসানের অন্য প্রান্তে তখনও গান চলছে:

"হাতে হাত মিলিয়ে
শ্রমিকদের ভুলিয়ে
মুনাফা করা চলবে না, চলবে না।"

আবার শ্লোগান ওঠে: "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "দুর্ভিক্ষকে রুখতে হবে।"

এমনি ভাবে প্রায় একটানা তিন ঘণ্টা চললো। এমনি সময়ে বিক্ষোভকারীদের এক স্বেচ্ছাসেবক তাদের নেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। বললে: স্যর, এতক্ষণ ধরে চ্যাচাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই যে কিছু হলো না! পুলিশগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। খালি মজা দেখছে, একটা কথাও বলছে না!

: আহা, একটু সবুর করো না। দেখবে কী হয়—নেতা জবাব দেন।

: 'না স্যর, আর পারছিনে—স্বেচ্ছাসেবক বললে।—'আপনি বলেছিলেন তিন ঘণ্টা শ্লোগান দিতে হবে, তিন টাকা করে দেবেন। চ্যাচাতে চ্যাচাতে গলা ভেঙ্গে গেলো। তিন টাকা থেকে দেড় টাকা 'পেপ্‌স' কিনতে বেরিয়ে যাবে। বাড়ী থেকে এখান অবধি বাস ভাড়া, ট্রেণ ভাড়া হলো বারো আনা; আর থাকে বারো আনা। এতো অল্প পয়সায় আর চ্যাচাতে পারব না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

: তর্ক করো না। যাও শ্লোগান দাওগে—নেতা বললেন।

: না স্যর, আমি চললুম—স্বেচ্ছাসেবক যাবার উপক্রম করে।

এমনি সময়ে একটি জীপ গাড়ী এলো। ড্রাইভারের পাশে এক জন দেশনেতা বসে আছেন।

চার দিক থেকে ধ্বনি উঠলো: শেম্! শেম্! বিক্ষোভকারীদের নেতা ছুটে জীপ গাড়ীর কাছে এগিয়ে গেল। তার পর একটু বাদে জনতার কাছে এসে বললে: শেম নয়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ দিন। উনি আমাদেরই। অমনি চার দিক থেকে চীৎকার উঠলো: "ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

* * * *

আইন-সভার সামনে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলের নেতা খুব জোর বক্তৃতা দিচ্ছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন দুই-এক জন সরকারের সমর্থনকারী। নেতা বলছেন: আমরা সরকারের এই অকর্মণ্যতার আশু সমাপ্তি চাই। আমরা জানতে চাই, সরকার এই কালোবাজারী বন্ধ করার কী করেছেন? এই যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস এগিয়ে আসছে—হাজার হাজার ভুখা বস্ত্রহীন নর-নারী এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জন্যে সরকার কী করেছেন? দেশে চালের দাম কতো হয়েছে, এ খবর সরকার রাখেন কী? তাঁরা কী জানেন যে, কেন চাল পাওয়া যাচ্ছে না? গত কাল রাত্রে চালের অভাবে আমাকে রুটি খেতে হয়েছে, এ খবর আমি আজ সকালে খাদ্য-মন্ত্রীকে জানিয়েছি। সরকারের সমর্থনকারীদের এক জন বলে উঠলো: মোটেই না। গত রাত্রে আপনি তো আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়েছিলেন। আমার মেয়ের অন্নপ্রাশন ছিল।

বিরোধী দলের নেতা বললেন: তা হ'লে নিশ্চয় পরশু রাত্রে আমি চাল পাইনি।

: মোটেই না। পরশু দিন আপনি লাট-ভবনে খানা খেয়েছিলেন। আমি কাগজে দেখেছি—

আর এক জন সরকার-সমর্থনকারী বললেন, এ বার বিরোধী দলের নেতা ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। বললেন: বার বার আমার বক্তৃতায় বাধা আমি শুনতে চাইনে। আমি যখন বলেছি যে, আমি চাল পাই নি, তখন নিশ্চয়ই পাই নি। নইলে আমি কেন বলবো—

এমনি সময়ে সেই জায়গায় খাদ্য-মন্ত্রীকে নিয়ে প্রধান মন্ত্রী এলেন। ভীড় দেখে খাদ্য-সচিবকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপারটা, কী হে। লোকটা বলছে কী?

খাদ্যমন্ত্রী জবাব দেন: উনি 'ফুড প্রব্লেমের' উপরে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

প্রধান মন্ত্রী হেসে বললেন, বলো কী হে! আমি তো ভেবেছিলুম যে, আমাদের সমস্ত 'প্রব্লেমই' সমাধান হয়ে গেছে।

খাদ্য-মন্ত্রী হাসেন। বলেন: আমিও তো তাই জানতুম স্যর। কিন্তু আজকের কাগজগুলিতে খাদ্য-সমস্যা নিয়ে খুব জোর লিখেছে। বলেছে—আমাদের খাদ্য-পরিস্থিতি না কি খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ঐ ফতেনগরের কাছে না কি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে!

প্রধান মন্ত্রী বললেন: বলে দাও ওদের আমরা চাল পাঠাচ্ছি। ঐ তোমার শ্যামগড় থেকে কিছু চাল ঐ দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে পাঠিয়ে দাও।

খাদ্য-মন্ত্রী বিস্মিত হ'ন। বলেন: তাহ'লে শ্যামগড়ে যে খাদ্যাভাব দেখা দেবে স্যর?

: সে তো দু'মাস বাদে হে! তত দিনে শ্যামগড়ে নিশ্চয় 'ফুথ প্রব্লেম' এসে যাবে। ফুডের দিকে ওরা আর ঝোঁক দেবার সুযোগ পাবে না—প্রধান সচিব বললেন।

বিরোধী দলের নেতার বক্তৃতা শেষ হবার পর খাদ্য-মন্ত্রী জানালেন: খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। যাহাতে এই পরিস্থিতি গুরুতর আকৃতির না হয়, তার জন্যে সরকার সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন। দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে সরকার শীঘ্রই চাল পাঠাচ্ছেন।

* * * *

তিন দিন বাদে চাল-বোঝাই স্পেশাল ট্রেন ফতেনগরের অভিমুখে রওনা হলো।

* * * *

ফতেনগরের লড়াই নিয়ে যখন দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন সুরু হয়েছে, তখন এক দিন দেশনেতা হারান চাটুজ্যে দৈনিক হরকরার দপ্তরের পানে রওনা হ'লেন। উদ্দেশ্য—এই আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর এক বিবৃতি ছাপাবেন। বহু দিন কাগজে তাঁর কোন বিবৃতি বেরোয় নি। আজ ভোরবেলা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা বাবুলাল সিংহের বক্তৃতা পড়েছেন। তিনি ভাবলেন, এখন থেকেই তৎপর না হলে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে তাঁকে যে অনুতাপ করতে হবে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। বাবুলাল সিংহের বক্তৃতা পড়ার পর হারান চাটুজ্যে তাঁর বিবৃতির এক খসড়া তৈরী করলেন। তার পর সেটাকে সযত্নে লিখে 'হরকরা'-দপ্তরে এসে উপস্থিত হলেন।

'হরকরার' রিপোর্টারের রুম। লম্বা দুটো টেবিল পাতা। তার উপরে আছে গোটা পাঁচেক টাইপ-রাইটার মেসিন। এর মধ্যে দুটো মেসিন অচল, দুটোর ফিতে ফিকে হয়ে গেছে, কালি নেই। পাঁচ নম্বর মেশিনে কয়েকটা 'লেটার' নেই। টেবিলের এক পাশে প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজগুলোর ফাইল। একটা ঘড়ি আছে সাবেকী আমলের। গ্রীষ্মকালে চার ঘণ্টা ফাষ্ট চলে, শীতকালে চার ঘণ্টা স্লো।

একটা মেশিনে বসে রিপোর্টার ব্যোমকেশ তার ষ্টোরী টাইপ করছিল। ব্যোমকেশের মনটা খুশী নেই, কারণ ফতেনগরের লড়াইতে তার যাবার একটা সুদূর আশা ছিল। কিন্তু পতিতপাবন বাবু যে তাঁর শ্যালক বুটলোকে এ কাজে পাঠাবেন, এ কখনও সে কল্পনা করে নি। তাই মনটা ব্যাজার হয়ে আছে। ভাবছে কী করা যায়। আর এই চিন্তার ফাঁকে, এক এক প্যারাগ্রাফ করে টাইপ করে যাচ্ছে। খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে দেশনেতা ও ব্যবসায়ীদের মন্তব্য নিয়ে এই ষ্টোরী।

এমনি সময় হারান চাটুজ্যে ঘরে ঢুকলেন। এই যে ব্যোমকেশ বাবু, কী খবর? হারান চাটুজ্যে প্রশ্ন করলেন।

: খবর আর কী! দুঃসংবাদ, চার দিকে অনাচার অবিচার চলছে। নইলে দেখুন না, বাবুলাল সিংগি আবার একটা লীডার! তার বিবৃতি কি না কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়।

হারান চাটুজ্যের এই উক্তি কিন্তু ব্যোমকেশের কানে গেলো না। সে বলে যায়: ঘরে-ঘরে হাহাকার, আর্তনাদ চলেছে। পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। এটম বোমার বিস্ফোরণে সমস্ত জগৎ...

তার পর একটু থেমে বললে : বাই দি ওয়ে, হারান বাবু, আপনার সায়েন্স ছিল ? 'রিলেটিভিটি' পড়েছেন ?

প্রশ্নটাতে হারান বাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন যে এখানেও হবে, এটা তিনি কল্পনা করেন নি। তাই একটু ম্লান মুখে বললেন : না, আমি আর্টসের ছাত্র।

: আই সী। পড়ে দেখবেন 'রিলেটিভিটি'। বেশ সহজ। অন্ততঃ রিলেটিভদের চাইতে 'ডি টি রিলেটিভিটি' যে অনেক সহজ ও প্রাঞ্জল, এ আমি আপনাকে জোর গলায় বলতে পারি।

তার পর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বলে : আমাদের দপ্তরের কাণ্ডখানা দেখেছেন ? ফতেনগরে এমন একটা যুদ্ধ চলছে, সেইখানে কি না পতিতপাবন বাবু তার শ্যালক বুটলোকে পাঠালেন রিপোর্ট করতে। রিলেটিভের ব্যাপার ! আজ অবধি একটা ভালো ষ্টোরী পাঠাতে পারে নি। আর এদিকে 'সমাচারের' প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়লুম। এ রকম মনমাতানো নিউজ আমি কক্ষনো পড়িনি।

ব্যোমকেশের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল সাব-এডিটার প্রীতি বাবু। তিনি সায় দিয়ে বললেন : ঠিক বলেছেন ব্যোমকেশ বাবু। আমি বলি কী, কর্ত্তার এই 'চয়েস' সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত।

এক জন সমর্থনকারী পেয়ে ব্যোমকেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বললে : ছাট্‌স রাইট। আমরা সবাই একমত। এই অন্যায় হতে দেবো না। প্রিয়ব্রত বাবু কোথায় ? চলুন তাকে নিয়ে এক বার সাধন বাবুর সঙ্গে আলোচনা করা যাক।

দেশনেতা হারান চাটুজ্যে দেখলেন যে, অবস্থা ক্রমশঃই আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছে। অর্থাৎ আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হলে পর তার বিবৃতি যে 'হরকরায়' স্থান পাবে না, এ হারান চাটুজ্যে বিলক্ষণ জানেন। রিপোর্টারেরা উত্তেজিত হলে তার কী বিষম কাণ্ড ঘটাতে পারে, এ কী তিনি জানেন না ? বিলক্ষণ তাঁর জানা আছে। তাই এবার একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন ব্যোমকেশ বাবু : 'বিশ্বে শান্তি' এই নিয়ে আমার একটা বিবৃতি যদি কালকের কাগজে······

: 'বিশ্বে শান্তি !' আপনি বলেন কী হারান বাবু ? এই দপ্তরেই শান্তি নেই তার আবার বিশ্বে শান্তি ! কী যে বলেন—ব্যোমকেশ জবাব দেয়।

: ঠিক বলেছেন। আমারও ঐ বক্তব্য। বিশ্বে শান্তি অসম্ভব। সেই জন্মেই তো এই বিবৃতিটা নিয়ে এলুম।

এবার ব্যোমকেশ যেন একটু খুশী হয়। বলে : বেশ করেছেন। রেখে যান। দেবো ছাপিয়ে। ওহে প্রীতি, চলো সাধন বাবুর কাছে। এই অন্যায়ের একটা প্রতিবিধান চাই। প্রিয়ব্রত বাবু কোথায় ?

প্রীতিকে নিয়ে ব্যোমকেশ সাধন বাবুর কাছে গেলো। হারান চাটুজ্যে বেরিয়ে এলেন। মুখ তাঁর গম্ভীর। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, 'হরকরা' ঐ বিবৃতি ছাপবে কি না।

হারান বাবুর গম্ভীর মুখ দেখেই 'সমাচারের' দরোয়ানজী এগিয়ে এলো। জী হুজৌর। হমারা বড় বাবু তো উপর বৈঠা হ্যায়—দরোয়ানজী বলে।

সমাচারে বিবৃতি ছাপার কথা হারান বাবুর একদম মনে হয় নি, কিন্তু দরোয়ানজীকে দেখে তাঁর মনে হলো যে, শুধু হরকরার উপর আস্থা রাখা উচিত নয়। তার বিবৃতি ছাপা হতেও পারে, না ও হতে পারে।

হারান বাবু সমাচারের ব্রজানন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

* * * *

সমস্ত ঘটনা শুনে ব্রজানন্দ বাবু বললেন : কী বললেন, উত্তেজনা দেখে এলেন হরকরার ষ্টাফের মধ্যে ? আরে ম'শায় এ তো জানা কথা, 'হরকরার' মতো এ রকম বিশৃঙ্খলা আর কোন দপ্তরে পাবেন না। আর, আমার দপ্তরে দেখুন। ষ্টাফের মধ্যে একটু অসন্তোষের ভাব নেই।

ব্রজানন্দ বাবুর কথাটা শেষ হবার আগেই প্রুফরীডার নৃত্যহরি বাবু এসে দাঁড়ালেন। দু' মাসের বাকী মাইনের একটা স্লিপ করতে এসেছেন তিনি। নৃত্যহরি বাবুকে দেখে ব্রজানন্দ বাবু একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। লোকটার একটু আক্কেল নেই। হয়ত এক্ষুণি সেই বাকী টাকাটা চেয়ে বসবে। তাই নৃত্যহরি কিছু বলবার আগেই ব্রজানন্দ বাবু বললেন : এই দেখুন, আমার ষ্টাফ। দু' মাসের মাইনে এডভান্স দিয়েছি। তার পর বোনাস—না হে, নৃত্যহরি ?

ব্রজানন্দ বাবুর কথা শুনে নৃত্যহরি বাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব্রজানন্দ বাবু যে এ ধরণের কথা বলে তার তাগিদের হাত থেকে রেহাই পাবেন, এটা নৃত্যহরি বাবু কল্পনা করেন নি। শুধু তার কণ্ঠস্বর থেকে করুণ শব্দ বেরুলো। যে শব্দ হ্যাঁ, কি না ঠিক বোঝা গেলো না।

এদিকে ব্রজানন্দ বাবু বলে চলেছেন : আর সমাচারের সম্পাদকীয়ের কথা ধরুন না। চমৎকার লেখা আর কোথায় পাবেন। এই দেখুন না আমরা 'ডাইভোর্স বিলের' উপর যে সম্পাদকীয়টা লিখেছিলাম, সেটা পড়ে 'নারী-ক্লাব' (শুধু মাত্র বৃদ্ধাদের মধ্যে সংঘবদ্ধ) কী লিখেছেন···হে সম্পাদক মহাশয়, আপনাদের প্রবল উত্তেজনাকারী বাগ-বিতণ্ডা-পূর্ণ সম্পাদকীয় পড়িলাম। আপনারা এই প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। আপনারা···

এর পরের অংশটুকু ব্রজানন্দ বাবু আর পড়লেন না। কারণ, এর পরে যা লেখা আছে তা নিতান্তই 'সিডিশাস' এবং এই 'সিডিশাস' কথা এক বার যদি হরকরার কানে যায়, তাহলে পরিণাম কী হবে এ কথা ব্রজানন্দ বাবুর জানা আছে।

এবার হারান বাবুর বলবার পালা। বললেন : একটা বিবৃতি এনেছিলাম। যদি 'সমাচারে' ছাপেন, তা হলে···

আলবৎ ছাপবো। কী যে বলেন ? কিন্তু আমাদের এক্সক্লুসিভ দিচ্ছেন তো ?

: নিশ্চয়। এ তো সমাচারের জন্যে তৈরী করেছি। বিশ্বশান্তির উপর।

বিশ্বশান্তি ! হারান বাবুর কথা শুনে ব্রজানন্দ একটু চমকে ওঠেন। বিশ্বশান্তির চাইতে 'গৃহশান্তির' যে বেশী প্রয়োজন, এ কথা ব্রজানন্দ সম্প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন। কারণ

সেই 'ডাইভোর্স' বিলের উপর সম্পাদকীয়টা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজানন্দ বাবুর স্ত্রী এবং সম্পাদক খগেন বাবুর স্ত্রী এই বিল কার্য্যকরী করে তোলবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছেন। এই সঙ্কট কালে কেউ যদি 'গৃহশান্তি' নিয়ে কোন বিবৃতি দেন, তাহলে মনে মনে ব্রজানন্দ বাবু খুসীই হতেন। কিন্তু উপায় নেই। হারান বাবুকে কথা দিয়েছেন যে, তাঁর বিবৃতি প্রকাশ করবেন। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, রেখে যান। দেখি কাল কি পরশু ছাপবো।

হারান বাবু তাঁর বিবৃতি দিলেন।

'সমাচার'-দপ্তরের বাইরে এসে হারান বাবু দেখতে পেলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেতা বাবুলাল সিংহের গাড়ী এসে 'হরকরা' দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই আগমনের কী হেতু, এটা বুঝে নিতে হারান বাবুর একটুও অসুবিধে হলো না।

* * * *

সাধন বাবুর চার দিকে গোল হয়ে বসে আছে ব্যোমকেশ, প্রীতি, প্রিয়ব্রত বাবুর দল।

ব্যোমকেশ বলছে: ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার ব্যাপার! গত কাল প্রেস-কনফারেন্সে ঐ সমাচারের রিপোর্টার টগর আমায় কী অপমানই না করলে! কী বললে জানেন সাধন বাবু? বললে: বোমা, তোদের কাগজ না ফতেনগরে মনিবের শালাকে রিপোর্ট করতে পাঠিয়েছে? আজ পর্য্যন্ত একটাও অরিজিন্যাল ষ্টোরী তোদের কাগজে বেরুলো না। হ্যাঁ রে বোমা, তোদের ঐ শ্যালক বুটলো ক, খ, গ লিখতে জানে তো রে? তারপর সাধন বাবু ওরা সবাই মিলে কী হাসি-ঠাট্টাই না করলে।

ব্যোমকেশের এই উক্তিতে প্রিয়ব্রত বাবুও সায় দেন। বলেন: সত্যি সাধন বাবু, এই ফতেনগরের লড়াইটা নিয়ে কী নাজেহালটাই না আমাদের হতে হচ্ছে! রোজ-রোজ 'সমাচার' প্রত্যক্ষদর্শীর বিশদ বিবরণ প্রকাশ করছে, অথচ আমরা কি না এ পর্য্যন্ত একটি ভালো ষ্টোরী ছাপাতে পারলুম না?

প্রীতি বাবু বলেন: আমি তো তখনই বলেছিলুম আনকোরা লোকদের পাঠাবেন না। রিপোর্টিং তো চাট্টিখানি কথা নয়।

এই সমস্ত মন্তব্য শুনে সাধন বাবু চুপ করে থাকেন। কারণ এ পর্য্যন্ত ফতেনগর থেকে বুটলো তেমন কিছু চমকপ্রদ খবর পাঠায় নি এ কথাটা সত্যি। কাল এক বার পতিতপাবন বাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন: বলি ফতেনগর থেকে এলো কিছু?

বিরস বদনেই সাধন বাবু জবাব দিয়েছিলেন: না তেমন কিছু পাইনি। এজেন্সীর খবর দিয়ে চালাচ্ছি।

: কিন্তু ওদিকে যে সমাচারে রোজ-রোজ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপাচ্ছে। বলি, এর একটা বিহিত করুন।

: 'তার' পাঠাব?—প্রশ্ন করেন সাধন বাবু।

: নিশ্চয়। পাঠাবেন মানে পাঠান নি কেন? সতেজ কণ্ঠে পতিতপাবন বাবু এ প্রশ্ন করলেন।

এর একটু বাদে সাধন বাবু পতিতপাবন বাবুর কাছে গিয়েছিলেন। সময়টা ছিল পতিতপাবন বাবুর দিবানিদ্রার আগে। সাধন বাবু গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: স্যর, অধ্যাপক রাধাকিশোরের সেই বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখাটা…

কথাটা শেষ হবার আগেই পতিতপাবন বাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন: আপনাকে কত বার বলেছি সাধন বাবু, এ সময়টা আমায় বিরক্ত করবেন না। ছিঃ! ছিঃ!……

: কিন্তু স্যর, ঐ অধ্যাপক রাধাকিশোরের লেখাটা সম্বন্ধে আপনার একটা মতামত না পেলে তো ছাপতে পারছি নে।

: বলি তোমার ঐ অধ্যাপক রাধাকিশোরটি কে?—নিদ্রালু কণ্ঠে পতিতপাবন বাবু প্রশ্ন করলেন।

পতিতপাবন বাবুর জবাব শুনে সাধন বাবু একটুও স্তম্ভিত হলেন না। কারণ, মনিবের মতিগতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আর এই অধ্যাপক রাধাকিশোরের ঘটনা এবং পতিতপাবন বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় কী সূত্রে হলো, সেটাও সাধন বাবুর বিলক্ষণ জানা আছে।

অধ্যাপক হ'বার আগে এই রাধাকিশোর ছিলেন এক জন কনট্রাকটর। একদিন মিস্ত্রীরা মিলে দালান বানাচ্ছিল আর রাধাকিশোর সেই কাজেরই তদারক করছিলেন। আর সেই সঙ্গে মনের আনন্দে গুন্-গুন্ করে গান গাইছিলেন: 'যমুনা পুলিনে কুসুম…'সেই সময়ে গাড়ীতে চেপে যাচ্ছিলেন বৈষ্ণব-সাহিত্যের দিকপাল নয়নকালী বাবু। রাধাকিশোরের গান শুনে গাড়ীটা থামালেন। তার পর সামনে এসে বললেন: গাও তো আবার ঐ গানখানা। আহা কী চমৎকার পদাবলী……

রাধাকিশোর আবার গুন্-গুন্ করে গাইলে……

"যমুনা-পুলিনে কুসুম-কাননে……।"

এই গান শুনে নয়নকালী বাবু আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করলেন না। রাধাকিশোর বাবুকে এনে গাড়ীতে বসালেন। গাড়োয়ানকে কিছুই বলতে হলো না, কারণ ঘোড়া জানতো যে তার গন্তব্যস্থল কোথায়। গাড়ী সোজা চলে এলো কলেজের প্রিন্সিপালের বাড়ীতে।

রাধাকিশোরকে প্রিন্সিপালের সামনে রেখে নয়নকালী বাবু বললেন: স্যর বাজিয়ে দেখুন। সাগর সেঁচে মাণিক নিয়ে এলুম। বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে এমন 'অথরিটি' আর কোথাও পাবেন না। গাও তো বাবা রাধাকিশোর, "যমুনা পুলিনে……।"

গান গাইবার প্রয়োজন হলো না। কারণ, নয়নকালী বাবুর কথা প্রিন্সিপাল মেনে নিলেন। কলেজে রাধাকিশোরের চাকুরী হলো।

সেই দিন প্রিন্সিপালের ঘরে পতিতপাবন বাবুও উপস্থিত ছিলেন। রাধাকিশোর বাবুর চাকুরী হ'বার খানিকটা বাদে পতিতপাবন বাবু গিয়ে রাধাকিশোরকে অনুরোধ জানালেন, বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে। আজ সেই লেখা এসেছে। কিন্তু অধিকাংশই এমন দুর্ব্বোধ্য হয়েছে যে, সাধন বাবু ঠিক করতে পারছিলেন না লেখাগুলোর কী সুরাহা করবেন।

তাই পতিতপাবন বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন: স্যর, অধ্যাপক রাধাকিশোর হচ্ছে বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল, মানে এক কথায় 'অথরিটি' বলতে পারেন।

: রেখে দাও তোমার 'অথরিটি'। বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে কেউ 'অথরিটি' নয়—অবশ্য স্বামী খলিলানন্দ ছাড়া। যাও, আমার ঘুমের ব্যাঘাত কোর না।

পতিতপাবন বাবুর নাসিকা গর্জ্জন করতে লাগলো।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেবেশ দাশ

আগে প্রেম না আগে বিয়ে, সে নিয়ে কৈশোরে অনেক বার তুমুল তর্ক হয়ে গিয়েছে। অবশ্য প্রেম বা বিয়ে কোনটাই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল না। 'বিবাহের চেয়ে বড়' বস্তুটা যে ঠিক কি, সে সম্বন্ধে পাকা ধারণা গড়ে ওঠেনি তখনো। তাতে আরো বেশী নিরাপদে তর্ক করার সুবিধা ছিল। নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা দিতে বসে এ নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছি। আর গলির মোড়ের নীলকণ্ঠ কেবিন মনে মনে দু'হাত তুলে বিয়ে আর প্রেম দু'টি বস্তুকেই আশীর্বাদ করেছে।

এমন একটা গরম বিষয় নিয়ে পাড়ার পাইকারী পার্কে বসে জমাট আলোচনা সম্ভব হত না। গুরুজনরা আছেন। অন্তত দাদাশ্রেণীর মাতব্বরদের কান সজাগ হয়ে উঠবার ভয় আছে। তার পরই কত রাতে বাড়ী ফেরা হয়, ষ্যানুয়াল পরীক্ষায় কোন্ সাবজেক্টে কত নম্বর যোগাড় করা গেছে, এ-সব অসুবিধা জনক কথা সকলের মনে জেগে উঠতে পারে। কাজেই বেঁচে থাকুক নীলকণ্ঠ কেবিন।

তা দেখলাম যে বৈঠকখানা বদলাতে পারে, কিন্তু বৈঠক বদলায় না। না হলে কোথায় উত্তর-কলকাতার বাহাত্তুরে গলি আর কোথায় উদয়পুরের মহারাণার সহেলিয়োঁ কি বাড়ী! না, ওটা বাংলা দেশের মামুলী গেরস্তবাড়ী নয়। রাজোয়ারাতে বাড়ী মানে হচ্ছে বাগান। সখীদের বাগান।

মন নেচে উঠল রোমান্সের গন্ধ পেয়ে। আহা রাসলীলা করতেন না কি মহারাণারা এখানে? সে কোন্ যুগে? কোন্ লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে তলোয়ারের ঝন্‌ঝন্ আওয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে যেত শত সখীদের ঝুমুরের ঝুমঝুম? বর্শার বদলে ছোড়া হত ফুলঝারি? রক্তের বদলে ছড়িয়ে পড়ত রাঙা আবীর কুঙ্কুম? কাদের গায়ে?

মনের আবেগে একেবারে রাজস্থানের চাঁদ কবিকেই স্মরণ করে ফেললাম:—

বিগসি কমল মৃগ ভ্রমর বৈন খঞ্জন মৃগ লুট্টিয়া।
হার কীর জক্ত বিম্ব মোতি নখল সিখ তাহি ঘুট্টিয়া॥

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন সঙ্গের মেবারী মহোদয়রা। না, ওরা অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক। অন্যান্য অনেক দেশী রাজ্যের চেয়ে অনেক তফাৎ ওদের আচার আর রীতি-চরিত্র। বিয়ে ওরা করতেন শুধু বংশরক্ষা নয়, বংশবৃদ্ধির জন্যও বটে। কারণ, প্রত্যেক যুদ্ধের পরেই দেখা যেত যে বংশে বাতি জ্বালাবার লোকের অভাব হ যাবার দাখিল হয়ে গেছে। কাজেই বহু বিবাহেরও প্রয়োজ থাকত। আর নারীও অন্যান্য পঞ্চ-মকারের মধ্যে ওরা কখ থাকতেন না। ঢলাঢলি বা ওই জাতীয় হাল্কা আমোদ-প্রমোদ উদয়পুরে কখনো কখনো কেউ করেছে তা অন্যান্য রাজরাজড় দরবারের তুলনায় নেহাৎই নিরামিষ কারবার।

দিল্লীর দরবারের কাহিনীগুলি ভুলিনি। তাই শুধোলাম,— আপনারা কি প্রেমও করতেন না, না কি?

শিকার-পার্টি থেকে ফেরার সময় মহুয়া-গাছের তলায় ব একজন হিজ হাইনেস যে রকম জোর গলায় রাজপুতের প্রেম-ক অস্বীকার করেছিলেন এঁরা তার চেয়ে একটুও কম গেলেন না বরং একটু বেশীই এগিয়ে গেলেন।

বললেন,—আমরা একটু অল্প বয়সেই, অর্থাৎ সময় থাকত আগে-ভাগে নিরাপদে বিয়ে সেরে রাখি। আর জানেন ত ইংরেজ দরদী কবিরা বলেছেন যে, বিয়ে হচ্ছে প্রেমের সমাধি। বি হলেই সব রোম্যান্স একেবারে হাওয়া হয়ে যায়।

বাধা দিলাম—অর্থাৎ আপনাদের জীবনে দক্ষিণের হাওয়া কখনে বয় না বলতে চান?

আরে রাম কহ! দিল্লীর পুব হাওয়াতেই আমাদের উতলা করে রেখেছে সেই পাঠান আলা-উদ্দিনের সময় থেকে। আমর হাওয়ার সঙ্গে দোলা খেতে সময় পেলাম কখন?

তা অবশ্য বটে। দিল্লীর পুবালি বায় উদয়পুরকে সব সময়ই যে দোলা খাইয়েছে তা হোরী খেলবার সময়কার হিন্দোলা নয়। পাঠান-মোগলরা তেড়ে আসত লড়াই করতে। তরোয়ালের জবাব দিতে হত তরোয়াল দিয়ে। মেবার কখনো মেয়ে বা মোহর নজরানা দেয়নি দিল্লীকে। কিন্তু এই এবার দিল্লী যখন স্বাধীন সম্মিলিত ভারতের নামে গণতন্ত্রের হাওয়া বইয়ে দিল, তখন উদয়পুর কেন, সমস্ত দেশের মধ্যে কোন রাজারই কোন জবাব ছিল না। বিনা যুদ্ধে বিনা ঝড়-ঝাপটায় সব রাজাদের মাথার উপর থেকেই রাজছত্র সরে গেল।

তাই মহারাণা এখন শুধু মহারাজ প্রমুখ।

মহারাজ-প্রমুখের সেক্রেটারী রামগোপালজী বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লোক। বাংলা সাহিত্যের উপর খুব টান আছে। তিনি এ কথাও বললেন, ভেবে দেখুন একবার মোগল হারেমের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহেই ত পড়েছি যে শাহজাদীরা প্রেম করতেন না।

তারা বিয়েও করতেন না।

চট করে এমন একটা সাফ জবাব তাঁরা আমার কাছ থেকে আশা করেন নি। প্রতিবাদ করে বললেন—কেন? তাদের মধ্যে অনেকে ত বিয়ে করতেন?

বললাম—যাঁরা শাহজাদীর মত শাহজাদী ছিলেন তাঁরা বিয়ে করতেন না, প্রেম করতেন। অন্তত যত দিন প্রেম করবার সা থাকত তত দিন বিয়ে করতেন না। আর যাঁরা বাদশাহের মত বাদশাহ ছিলেন তাঁরা বিয়েও করতেন প্রেমও করতেন। বিয়ে নামক সাংসারিক অপকার্য্যটি আগে-ভাগে সেরে রেখেছেন কি না অথবা ভবিষ্যতে করবেন কি না, সে সব অসুবিধা জনক কথা দরকার হলেই ভুলে যেতেন।

খোলা মেবারী তলোয়ারের মত ঝক-মক করে উঠল জেনারেল মনোহর সিংয়ের প্রতিবাদ। এঁর পূর্বপুরুষরা হলদীঘাটের যুদ্ধে গায়ের রক্ত ঢেলেছেন। পুরুষানুক্রমে এঁরা এমনি ভাবে মাথা এগিয়ে দিয়েছেন দেশরক্ষার কাজে। আজ গহেলিয়েঁা কি বাড়ীর ছায়ায় স্নিগ্ধ ফোয়ারা দিয়ে সাজান কুঞ্জ এমন কিছু একটা লড়াই হচ্ছে না। কিন্তু তা বলে কথাবার্তাতেই বা বেদলা জায়গীরের চৌহান রাও পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

আজ-কাল দেশের কংগ্রেসী সরকার রাজোয়ারার সব জায়গীর কেড়ে নিয়ে এই সব ঐতিহাসিক ভূঁইয়া সামন্তদের পথে বসাতে যাচ্ছেন। লোকে বলে যে, কোন কোন ছোট জায়গীরদার বা তাদের আশ্রিতরা এখন জমিহারা হবে বা সর্বস্ব যাবে, সেই ভয়ে গোপনে রাহাজানি প্রভৃতি নানা রকম অপকার্য্য করছে বলেই রাজস্থানে এত গোলমাল চলছে। কিন্তু সারা দেশ খুঁজে একটা যে বিরাট, তোলপাড় হয়ে গেল, তার ধাক্কা ত দেশে কোন না কোন দিক দিয়ে আসবেই। রাজোয়ারাতেও তাই হয়েছে। জান দিতে যারা জানত, তারা শুধু পেটের জন্য বাটপাড়ি করবে, এটা কি একটা কথা হল?

সেই ভূঁইয়া-সর্দারদের মধ্যে মহাকুলীন বেদলার রাওসাহেবও হার কবুল করবেন না। তাই ফস করে তিনি বলে উঠলেন,—আমি স্বীকার করছি না এ কথা। শাহজাদীরা প্রেমও করতেন না, আর বিয়েও করতেন না। অত কাঁচা কাজ করবার মত চিড়িয়া তাঁরা ছিলেন না। আর বাদশাহরা প্রেমও করতেন, বিয়েও করতেন। আশক্ বা সাদী কোনটাকেই অপকার্য্য বলে মনে করবার মত ছোট নজর ওদের ছিল না।

আলবৎ—বলে উঠলেন ঠাকুর সাহেব—যদি ওদের কলিজা এতই ছোট হবে, তাহলে আমাদের সঙ্গে লড়বার মত হিম্মতই ওদের হত না কখনো।

বলেই এমন ভাবে তিনি মাথার পাগড়ীর ঝুলটা হেলিয়ে নাচালেন, যেন তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য তিনি নিজেই ওই দু'টি মধুর অপকর্মের মধ্যে যে কোন একটা—বা দরকার হলে দুটোই—করতে তৈরী আছেন।

আমরা যদি দিন-গত-পাপক্ষয়ের মধ্যে শাক-চচ্চড়ি চটকিয়ে কুচো-চিংড়ির অম্বল খেয়েই জীবনে প্রেমের জন্য একটেরে একটুখানি আসন বিছিয়ে রাখবার স্বপ্ন মনে মনে পুষতে পারি, তাহলে হাতে অফুরন্ত সময় আর পেটে মোগলাই-খানা পেয়ে শাহজাদীরা কেন প্রেমের খেলার কথা ভাবতে যাবেন না?

বিয়ে করাটা ওদের পক্ষে সত্যিই খুব শক্ত ছিল। নৈকষ্য কুলীনের মেয়ের বিয়ের যে অসুবিধা, তা ত ওদের ছিলই। তার উপর প্রেম আর পলিটিক্স মিশে যাওয়ার ভয় বিয়ের পথে কাঁটা দিয়ে রাখত। মসনদ নিয়ে শাহজাদা শাহজাদাতে লড়াই হামেসাই হয়ে এসেছে। তার উপর যদি জামাইও দাবীদার হয়ে বসে, তাহলে ব্যাপার আরো জটিল হয়ে ওঠে। তাই সুলতান-কন্যার বিয়েতে অনেক বাপেরই উৎসাহ থাকত না।

মসনদ ত নয়, মরবার সনদ!

বৃটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে রাখা একটা পাণ্ডুলিপি রুকাওয়ৎ-ই-আলমগিরিতে একটা খুব চমৎকার ফারসী কবিতা আছে:—

আরুস-ই মুল্‌ক্ না শাহজাদ মগর বা দামাদি
কিহ্‌ বোসাহ্‌ বার লব্‌-ই-শামশের-ই-আবদার জানাদ।

শাহজাদাদেরও সে জন্য নজরে-নজরে রাখতে হত। তাদের মতি-গতি যাচিয়ে দেখতে হত যখন-তখন। আপত্তি করলেই দরবার থেকে পুলিপোলাও চালান সেই সুবা দক্ষিণে.বা তার চেয়ে মুস্কিলের সুবা কাবুলে। এমন কি শুধু নির্বাসন নয়, বেকার হয়ে বসে থাকার ভয়ও ছিল। কাজেই বাদশাজাদারা একেবারে স্পিকটি নট মসনদের আশা বা বাদশার আয়ু সম্বন্ধে।

এ সম্বন্ধে একটা কাহিনী থেকেই ব্যাপারটা কত জটিল ছিল, তা বুঝতে পারা যাবে মোগল দরবারের কাহিনী। কিন্তু ওদের মহৎ দৃষ্টান্ত রাজস্থানেও কোন কোন দরবারে নকল করা হতো কখনো কখনো।

আওরঙ্গজেবের বাঁচবার আর বিরাট সাম্রাজ্য চালানর ক্ষমতা উপভোগ করবার সাধ ছিল অসীম। তাই বুড়ো বাপ মরা পর্য্যন্ত তার তর সয়নি। কিন্তু হাতে হাতে কর্মফল পাবার ভয়টি ত আছে। কাজেই তিনি যে বুড়ো হলেও অক্ষম হননি আর লড়াই করবার ইচ্ছা মজ্জার মধ্যে সজাগ আছে, তা দেখাবার জন্য কত কিছু ছলা-কলাই না করতেন! তাঞ্জামে চড়ে চলেছেন সৈন্য দলের সঙ্গে। খুলে নিলেন তলোয়ার; ডাইনে-বাঁয়ে চালিয়ে যেন বাতাসকেই টুকরো-টুকরো করে কাটতে লাগলেন। শেষে নরম কাপড়ে তা মুছে নিয়ে সযত্নে খাপে ভরে রাখলেন। মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। তীর-ধনুক নিয়েও সেই একই অভিনয়। বিশ্বজন দেখে রাখুক আমি বিশ্ববিজয়ী আলমগীর আশীর কোঠায় পা দিলেও শক্ত-সমর্থ সম্রাট আছি।

এ-হেন আওরঙ্গজেব তাঁর ছেলেদের শুধোলেন—তোমরা কে সম্রাট হতে চাও?

কে না হতে চায়, সে প্রশ্নটাই বরং করা উচিত হতো।

শাহ আলম সবিনয়ে বললেন,—জাঁহাপনা, যদি কখনো বিশ্রাম-সুখ ভোগ করবার জন্য রিটায়ার করতে চান, তাহলে তখ্‌ত্‌ তাউস তারই প্রাপ্য। এ-হেন সব সদ্‌গুণের অধিকারী বড় ছেলেরই ত রাজা হওয়া উচিত। তবে জাঁহাপনা, যত দিন বেঁচে-বর্তে আছেন, তত দিন অবশ্য শাহজাদার চুপচাপ থাকাই কর্তব্য।

আজম তারা নিবেদন করলেন,—আমি ত তখ্‌তে বসবার জন্যই জন্মেছি। কারণ, আমার বাবা আর মা দু'পক্ষই মুসলমান আর রাজবংশের লোক।

আকবর উত্তর দিলেন,—আমার জন্ম হয়েছিল শুভ লগ্নে। তারপর থেকেই ত পিতৃদেবের কপাল খুলেছে। জন্মের বছরই ত তিনি অমুক অমুক যুদ্ধে জিতেছেন···ইত্যাদি। এর পর কি আর কারো তখ্‌তে হক জন্মাতে পারে?

আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন কামবক্স। মোগল সাম্রাজ্য এক মাত্র তারই হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে। তিনিই হচ্ছেন সম্রাটের পুত্র; আর ভাইরা ত সবাই শাহজাদার পুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছিল। তারপর আকাশে চোখ তুলে কামবক্স বললেন,—তবে অবশ্য আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

আওরঙ্গজেব কিন্তু নিজের মনের কি ভাব হল, এ সব উত্তর শুনে তা মোটেই ভাঙ্গলেন না। শুধু তাদের জানালেন যে, তাদের চান্স আসতে এখনো অনেক দেরী। জ্যোতিষীরা বলেছে যে, বাদশা আলমগীর একশ' কুড়ি বছর রাজত্ব করবেন। তাদের কথা একেবারে অভ্রান্ত। বলেই তেরছা চাউনিতে তিনি দেখতে লাগলেন কোন্ ছেলের মুখে কি ভাব ফুটে উঠে। বা কেউ কোন জবাব দিতে চায় কি না।

বেচারাদের যে কতো আশা ভঙ্গ হয়েছিল, তা এটুকু থেকেই বোঝা যাবে যে, বাপের মৃত্যু পর্য্যন্ত তর সয়নি কারো। আকবর বাপের জীবদ্দশাতেই বিদ্রোহ করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাজপুতরা এমন ভাবে তার সহায়তা করেছিল যে, সুচতুর আওরঙ্গজেব জাল চিঠি দিয়ে তার রাজপুতদের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট না করে দিলে, সে বিদ্রোহের ফল কি হত কে জানে? আর বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ভাই লড়াই করতে সুরু করেন।

কিন্তু এই প্রশ্ন আর উত্তর দেবার সময় সবাই ছিলেন চুপচাপ। তাদের চোখের সামনে ভাসছিল, আর এক ভাই শাহজাদা মহম্মদকে কেমন করে বন্দী করে রেখে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিলেন তাদের স্নেহশীল পিতা!

রাজার ছেলে থাকাই এত বিপদ। তার উপর জামাই থাকলে যে আপদ বেড়ে যায় আরও।

কাজেই এশিয়াতে রাজার ঝিয়ারীর সঙ্গে প্রেম করাতে অন্য পক্ষেরও বিপদ থাকত। এই প্রেম পুব দেশে আর পশ্চিমে লোকে এক রকম নজরে কোন দিন দেখেনি। ফ্রান্সে প্রেমে পড়লে লোকে মজা দেখত, হাসি-মস্করা করত, তার পরে ভুলে যেত। কিন্তু মিশর থেকে মাঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত হারেমের প্রেম আর হাহাকার হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছে।

শাহজাহানের সময়কার মোগল-দরবারের কথাই ধরা যাক। রাজোয়ারার কাহিনীতে দিল্লীকে টেনে না এনে উপায় নেই। বিশেষ করে এ জন্য যে, দিল্লীর হারেমের সাচ্চা ঘটনা বহু লোকের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজপুতানার জেনানার কোন খবরই কোথাও মেলে না। যুবরাজ দারা নিজে রাজা হতে পারলে, অসীম ক্ষমতাশালী বোন জাহানারাকে বিয়ে করতে দিতে রাজী হবেন, এমন একটি ভরসা বোনকে দিয়েছিলেন। অনেকটা সে জন্যই সিংহাসন পাবার রক্তমাখা চেষ্টাতে বোন সহায় হয়েছিলেন। কিন্তু আগে ত সাত মণ ঘি পুড়ুক, তার পরেই না রাধার নাচবার ফুরসৎ আসবে!

তবে তত দিন কি রাধা পায়ের মল গুটিয়ে বসে থাকবেন?

না, শাহজাদীরা সে রকম দুঃখের জীবন কাটাবার জন্য জন্মান নি। হারেমে বন্দিনী অবশ্য, কিন্তু সুখের নন্দন-কানন উঁচু পাচীল-ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যেই সাজাতে বাধা কি? ফরাসী ভ্রমণকারী আর শাহজাহানের মাইনে-করা ডাক্তার বার্নিয়ার দু'টি ঘটনার কথা লিখে গেছেন। এ দুটি যে একেবারে খাঁটি ঘটনা, রোম্যান্স বানাবার জন্য মন-গড়া কথা নয়, তা তিনি বিশেষ করে বলেছেন। কিছু দিন ধরে একটি সুন্দর কিন্তু সাধারণ ঘরের যুবক লুকিয়ে লুকিয়ে জাহানারার কাছে যাওয়া-আসা করত। বড় শক্ত ব্যাপার! চার দিকে রয়েছে জটিলা কুটিলার দল, যাদের নিজেদের ব্যর্থযৌবন হয়ে রয়েছে মরুভূমি। একে জাহানারার অসীম ক্ষমতা, আর বাপের উপর প্রভাবের জন্য সবার হিংসা। তায় আবার চোখের সামনে এক জনের জীবনে বসন্ত-বায় বইবে আর বাকী সবাই উত্তুরে হাওয়ার হিমেল ঠাণ্ডায় কুঁকড়িয়ে থাকবে? কাজেই সময় মত শাহজাহানের কানে খবরটা তুলে দেওয়া হল।

এমন অসময়ে মেয়ের শোবার ঘরে শাহানশাহের আসার কোন কথা নয়। কিন্তু সম্রাটকে ঠেকায় সাধ্য কার? লুকোবার শুধু একটা মাত্র ঠাঁই ছিল হাতের কাছে। নাগরকে চটপট লুকিয়ে ফেলা হল সেখানেই। এ দিকে বাপ এসে চতুরা, রাজনীতিতে ওস্তাদ মেয়ের সঙ্গে নানা রকম কথা আরম্ভ করলেন। মুখে নেই কোন রাগের ছাপ বা আশ্চর্য্য হওয়ার আভাস। কথায় কথায় দুঃখ করে বললেন যে, শাহজাদীর গায়ের সোনার বর্ণ যেন মলিন হয়ে যাচ্ছে, সম্ভবত ঠিক মত গা ধোয়া হচ্ছে না আজ-কাল। বাপজানের প্রাণ মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক রকম ব্যাকুল হয়ে উঠল। এখনি মেয়ের ভাল করে স্নান করা দরকার। খোজাদের তিনি ডেকে পাঠালেন সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত গরম জল হামামে তৈরী করে দেবার জন্য। চৌবাচ্চার নীচে জল ফুটাবার জন্য আগুন জ্বালান হল। শাহানশাহ সেখানে বসে বসে মেয়ের সঙ্গে খোস মেজাজে আলাপ করে গেলেন যতক্ষণ না প্রেমের ফুটন্ত সমাধি হয়ে যায়!

কিছু দিন পরে আবার প্রেমের ফুল ফুটল। নাজির খাঁ নামে এক জন বিশেষ সুন্দর ও বুদ্ধিমান ইরাণী ওমরাহকে জাহানারা নিজের খানসামা করে নিলেন। প্রেমের সঙ্গে মিশে রইল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর শাহজাদীর নেক-নজরের সঙ্গে তাল দিয়ে চলল গোটা দরবারের পেয়ার। বাদশাহের সম্বন্ধে জ্ঞাতি-ভাই আর এক জন প্রধান সেনাপতি শায়েস্তা খান প্রস্তাব করলেন যে, নাজির খানের সঙ্গে বেগম সাহেবার অর্থাৎ প্রধান রাজকুমারীর বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। শাহজাহানের আগে থেকেই এদের দু'জনের গোপন প্রেম সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছিল। এ অবস্থায় কি করলে ঠিক হবে তা ভেবে নিতে শাহজাহানের সময় লাগল না একটুও। একদিন ভরা দরবারে সবার সামনে তিনি এই ইরাণী ওমরাহকে বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন হিসাবে পানের খিলি উপহার দিলেন। দরবারী আদব-কায়দা অনুসারে সে খিলি সঙ্গে সঙ্গে বিনা সন্দেহে নাজির খাঁ কুর্নিশ করে চিবিয়ে খেয়ে নিলেন। ঠোঁট লাল করে, সারা মুখে খোশবুই অনুভব করে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঞ্জামে চড়ে ফিরে চললেন প্রেমিক নিজের বাড়ীতে। প্রাণ কিন্তু বাড়ী পৌঁছাবার আগেই দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেল!

এ ত গেল বিয়ে না করে প্রেম করার কাহিনী। এবার ধরা যাক, বিয়ে করার পর আবার আর এক জনকে বিয়ে করতে চাওয়ার জন্য প্রেমের কাহিনী। যার মধ্যে বিয়ে আর প্রেম একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে।

বাদশা হুমায়ুন দিল্লী থেকে তাড়া খেয়ে সিংহাসন ছেড়ে

পলাতক হলেন রাজপুতানার ও সিন্ধুর মরুভূমিতে। এখানে এসে তাঁর নতুন করে প্রেম জেগে উঠল, যদিও মাথা গুঁজবার জায়গাও ছিল না। এ পর্য্যন্ত বলেই আমার সঙ্গীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। তারা সবাই মরুভূমিতেও যে প্রেম গজায় তা অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন।

ওঁরা কিন্তু ততক্ষণে বিয়ে ও প্রেমের গল্পের মৌতাতে মজতে সুরু করেছেন। কেহ কোন কথা বললেন না। শুধু বীরবর মনোহর সিং সুন্দর পাগড়ীটা মাথা থেকে নামিয়ে রাখাতে ওকে আরো বেশী আকর্ষণীয় অর্থাৎ ইণ্টারেষ্টিং দেখাতে লাগল। ওদের বংশগত জায়গীর বেদলা থেকে উদয়পুরের নগর-প্রান্তে ফতেসাগরের ঢেউয়ের দোলা দেখা যায়। তারই দোলা বোধ হয় জেনারেল সাহেবের মনে একটু-আধটু কাব্যের ছোঁয়াও দিয়ে যায়।

বাদশা হুমায়ুনের এই প্রেমকাহিনী যে সত্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নিজের জলের কুঁজোর বাহক জওহর থেকে আরম্ভ করে আরো অনেকে এই ঘটনা লিখে গেছেন। মরুভূমিতে হুমায়ুনের সৎমা (সৎভাই হিন্দালের মা) একটা ভোজ দিলেন। সে ভোজে হামিদা বলে একটি ছোট্ট-মোট্ট ষোল বছরের সুন্দরী মেয়ে এসেছিল। ষোল বছরের হামিদা আর তেত্রিশ বছরের হুমায়ুন—রাজ্যহারা, পাঁড় আফিমখোর আর অন্তত ছ'টি বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী।

হুমায়ুনের সৎবোন গুলবদনের লেখা থেকে জানা যায় যে, এই বয়সে কম ছ'টি স্ত্রীর মধ্যে তিনটি শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালানর সময় খোয়া গিয়েছিল। একটি শের শাহের হাতে পড়েন আর তাঁর কল্যাণে স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন এবং অন্য দু'টি সম্ভবত পালানর হিড়িকে নদীতে ডুবে মারা যান। অভাগার ঘোড়া মরে আর ভাগ্যবানের বৌ মরে, এ ত চলতি কথাতেই আছে।

যাই হোক, ভাগ্যহীন হুমায়ুনের তখনো কয়েকটি বৌ বেঁচে ছিলেন। তবু দুর্ভাগ্য ত আর প্রেমকে ঠেকাতে পারে না! সে বস্তুটি মরুভূমির ধূলোর মত হৃদয়ের সব বন্ধ-করা দরজা-জানালার ফাঁকে ফাঁকে কোথা দিয়ে কখন যে ভিতরে ঢুকে কায়েম হয়ে আস্তানা গেড়ে নেয়, অঙ্ক কষে তার হিসাব করা যায় না।

একেবারে প্রথম দর্শনেই প্রেম? না, না, শুধু বিয়ের বাসনা যে নয় নিখাদ প্রেম, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই পাওয়া গেল।

প্রথম দেখার পরেই হুমায়ুন বিয়ের প্রস্তাব পেড়ে বসলেন। সৎভাই হিন্দাল ত চটে-মটে লাল। নিজের চাল-চুলোর হিসেব নেই, তার উপর আবার নেই বয়সের গাছ-পাথর। তার আবার বিয়ে!

যেখানে ছেলেবেলাতেই বিয়ে হয়ে যায়, সেখানে তেত্রিশ নেহাৎ কম বয়স নয়। অবশ্য হুমায়ুন বলতে পারতেন যে মেয়েদের মত রাজারাজড়ারও বয়স কখনো বাড়ে না।

বড় বড় মোল্লা-মৌলানারা বলল যে, নিজে তুর্কী-সুন্নি হয়ে ফারসী শিয়ামেয়েকে বিয়ে? ছিঃ, জাত-কুল-মান সবই যাবে!

আত্মীয়-কুটুমরা বলল—ছ্যাঃ, প্রথম দর্শনেই বিয়ের সম্বন্ধ, সে যে সমাজে বারণ। তার ওপর দুলহিনের জন্য দেন-মোহর (কনের পণ) দেবার মুরদ নেই পর্য্যন্ত।

আর কন্যা? তার নিজেরই মত নেই এ বিয়েতে। শুধু বয়সে নয়, লম্বাতেও হুমায়ুন এত বড় যে, ছোট-মোট হামিদাকে সঙ্গে টুল নিয়ে ঘুরতে হবে যে!

কিন্তু হুমায়ুন নাছোড়বান্দা। শেষ পর্য্যন্ত সৎমা একটু ভরসা দিলেন। তাড়াতাড়ি ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। পাখের কলম দিয়ে হুমায়ুন লিখতে বসলেন,—যেমন করে পার ওকে রাজী করাও। আমার মাথা আর চোখ খাও। আমি সব কিছুতেই রাজী।···আমার চোখ আশা করে পথের পানে তাকিয়ে আছে।

তার এত পীড়াপীড়িতে হিন্দালকেও শেষ পর্য্যন্ত এ বিয়েতে মত দিতে হল। মনে হল যে, এবার বুঝি বিয়ের ফুল ফুটবে।

খোসমেজাজে হুমায়ুন হামিদাকে আবার দেখতে চাইলেন। কিন্তু কন্যা তখনো রাজী নন।

কেন আমি বাদশার সঙ্গে দেখা করব? যদি তাঁকে সেলাম করতে যেতে হয়, সে ত আমি সে দিন করেই সম্মানিত হয়েছি। বাদশাকে দু'বার করে সেলামের ত রীতি নেই?

রাজার মাথা সামান্য পণ্ডিত মশায়ের মেয়ের এই প্রত্যাখ্যান নীচু হয়ে সহ্য করে নিল।

হুমায়ুন এবার নানা দিক থেকে হামিদার মন গলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক লোককে কাব্যের ঢঙে হংসদূত করে পাঠালেন। কিন্তু হামিদা মানেন না। বাদশাহকে এক বার দেখাই আইন মাফিক; দ্বিতীয় বার দেখার নিয়ম নেই। আমি যাব না।

সৎমা এসে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলেন,—তোমায় ত বাপু বিয়ে করতেই হবে কাউকে না কাউকে। তা, বাদশাহের চেয়ে ভাল পাত্র আর কে হতে পারে?

না, তবুও না।

শেষ পর্য্যন্ত হামিদা বলে বসলেন,—বিয়ে আমি এমন লোককে করতে পারি যাঁর কণ্ঠে আমার হাত পৌঁছাবে; যার কুর্ত্তা পর্য্যন্ত আমার হাত যায় না, তাঁকে নয়।

এই আপত্তিটা জেনে হুমায়ুনের তবু খানিকটা আশা হল।

তবু চল্লিশ দিন ধরে সাধ্য-সাধনা করার পর হামিদা হুমায়ুনকে বিয়ে করতে রাজী হলেন।

সেই অকরুণ অনিশ্চয়তার যুগে হুমায়ুনের ব্যাকুল মিনতিভরা প্রেমের কবিতা, রোম্যাণ্টিক যুগের যে কোন প্রেমের কবিতার সঙ্গে তুলনায় কম যাবে না। তিনি লিখেছিলেন:—

ভিখারী মিনতি করে, প্রিয়ে, করো দয়া, মোর পানে চাও।
গুণ্ঠন নামে মুখ বেয়ে, দরশন বাহিরেতে যাও।

সুখ আর ক্ষুধার মাঝারে কেন রচো এত ব্যবধান।
মিছে, রাণী, ঘোমটা বাহারে কাঁদাও যে মোর হিয়াখান।
ঢাকে রূপে যবনিকা নব ঘোমটা তোমার হাতিয়ার;
ভিখ মাগি, জয় হোক তব প্রিয়ে কাছে এস ত এবার।

বন্ধুরা ভাঙ্গেন, কিন্তু মচকান না। বললেন যে, এ কাহিনীতে অবশ্য মরুভূমিতে প্রেম গজাবার উদাহরণ আছে, কিন্তু পাত্র-পাত্রীরা মরুভূমির 'ওয়েসিস' নন। মোগলরা যে হামেশাই প্রেমে পড়ত আবার হাবুডুবু খেয়েও উঠে পড়ত, তা আর কে না জানে?

তাদের মতে সায় দিতে পারলাম না।—এমন অবস্থায়ও যদি হুমায়ুনের মনে প্রেম জেগে উঠতে পারে, তাহলে আপনাদের প্রত্যেকেরই মনে প্রেম শুধু ঘাসের মত গজান নয়, ওয়েসিস বানাতেও পারে—রায় দিলাম আমি।

এই মতের সঙ্গে যোগ দিলাম একটি করুণ কাহিনী। নিষ্ঠুর হারেমের মধ্যেকার করুণ কাহিনী। পাথরে ফুল না ফুটতে পারে, কিন্তু তার আনাচে-কানাচে যে ফোটে তারই উদাহরণ।

দারাকে হত্যা করানর পর আওরঙ্গজেব তাঁর দুই স্ত্রীকে নিজের হারেমে চলে আসতে হুকুম দিলেন। আর্মেনিয়ান সুন্দরী উদিপুরী এক কথাতেই রাজী হলেন, প্রিয় বেগম হয়ে হাতের মুঠোয় পেলেন অনেক ক্ষমতা, পায়ের কাছে অনেক ঐশ্বর্য। আর রাজপুতানী রাণাদিল শুধিয়ে পাঠালেন তাঁকে ডেকে পাঠাবার অর্থ। জবাব এল যে, শাস্ত্র অনুসারে মৃত বড় ভাইয়ের স্ত্রী ছোট ভাইয়ের দখলে আসবার কথা। রাণাদিল তখন প্রশ্ন করে পাঠালেন—আমার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য বাদশা আমায় কামনা করেন?

আওরঙ্গজেব বলে পাঠালেন যে, তাঁর সুন্দর চুলের গোছা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। শুনে রাণাদিল তখনি তাঁর সব চুল ফেললেন কেটে, ভেট পাঠিয়ে দিলেন আওরঙ্গজেবকে। আর সঙ্গে ছোট একটি লেখা জবাব—যে সুন্দর চুল আপনার ভাল লেগেছে তা এই পাঠিয়ে দিলাম; এখন নিরিবিলি থাকতে দিন।

কিন্তু বাদশা ত শুধু সুচারু কেশের রাশি চাননি, চেয়েছিলেন তাঁকে। তাই এবার খোলাখুলি আহ্বান এল।—তুমি অপরূপ সুন্দর, তোমায় স্ত্রী হিসাবে চাই। ধরে নাও যে, আমিই তোমার দারা। দারার স্ত্রীর চেয়ে বেশী সম্মান তুমি আমার কাছে পাবে। তোমায় করব পাটরাণী।

রাণাদিলের মনে ছিল না কোন সংশয়, কোন সম্মান-সম্পদের লোভ। এক সময়ে তিনি ছিলেন সামান্য এক নর্তকী। সম্রাট শাহজাহানের হারেমের অসংখ্য রূপসী "কাঞ্চনী"দের (পেশাদার নাচওয়ালী) মধ্যে এক জন। তাঁর অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে যুবরাজ দারা মুগ্ধ হন। শাহজাহানের কাছে গিয়ে দারা তাঁর মনের কথা খুলে জানালেন। চাইলেন এই নর্তকীকে রীতিমত বিয়ে করতে। সম্রাট রাজী হলেন না। যুবরাণীর মনে দুঃখ হবে; তার আত্মীয়-স্বজনদেরও প্রতাপ খুব বেশী। নাঃ, এমন প্রস্তাবে রাজী হওয়া চলে না।

ব্যর্থ প্রেমে ব্যাকুল হয়ে দারা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্য্যন্ত হাকিমরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ছেলেকে প্রাণে বাঁচাবার জন্য শাহজাহানকে মত দিতে হল এ বিয়েতে। কাঞ্চনী রাণাদিল মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরী।

সেই রাণাদিল আওরঙ্গজেবের চূড়ান্ত আহ্বান পেয়ে ঢুকলেন নিজের কামরায়। ছুরি দিয়ে নিজের সুন্দর মুখখানা সম্পূর্ণরূপে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন। তার পর একটা কাপড়ে সেই তাজা রক্ত, রক্তিম রূপের আভায় ভরা রক্ত মাখিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাদশার কাছে। আমার যে মুখের সৌন্দর্য্য বাদশা কামনা করেন, সেই সৌন্দর্য্য এই কাপড়ে পাঠিয়ে দিলাম। এতেই যদি তাঁর কামনা তৃপ্ত হয়, আমিও তৃপ্ত হব। আর কোন রূপ আমার বাকী নেই।

এই কাহিনী বলার পর খাস রাজপুত ঘরের প্রেমের গল্প শুনতে চাইলাম। বললাম যে, যতই আপনারা লড়াই করে থাকুন, হৃদয়ে প্রেম আপনাদের থাকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। বলুন এবার রাজপুতের প্রেমের কাহিনী।

তর্কে হেরে গিয়ে বীরপুরুষরা করুণ নয়নে এ-ওর দিকে আড়-চোখে তাকাতে লাগলেন। যেন ওরা কোন ডাকসাইটে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন; আর কড়া হুকুম হয়েছে যে, যার কাছে যা কিছু টাকাকড়ি লুকোনো আছে বের করে দাও চটপট—নইলে জান গেল বলে।

কিন্তু রাজপুতের জান যায়, তবু মান মারা যায় না। রামগোপালজী বলে বসলেন—আমাদের এদেশে অবশ্য কোথাও কোথাও বিয়ে ছাড়াই প্রেম হয়ে গিয়েছে। তবে সেগুলি হচ্ছে য়্যাক্সিডেণ্ট, নেহাৎই দুর্ঘটনা। মানে সদাসর্বদা যা হয়ে থাকে তার বাইরের ব্যাপার।

আমার চোখে কি প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল, তা তিনিই জানেন। নদীতে ডুবে যাবার আগে লোকে যেমন খড়কুটো পর্য্যন্ত আঁকড়িয়ে ধরে তেমন ভাবেই উর্দ্ধশ্বাসে বললেন,—এ যেমন ধরুন রূপমতী আর বাজবাহাদুরের কাহিনী।

রূপমতী ছিলেন মালবিকা। অর্থাৎ মালব দেশের রাজপুতানী মেয়ে। রূপে, নাচ-গানে, কবিতা রচনায় তাঁর তুলনা সারা হিন্দুস্থানে একটিও পাওয়া যেত না। রূপমতীর রূপের কথা, কবিত্ব প্রতিভার কথা রাজোয়ারার লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। আজো না কি মরুভূমিতে নীরব নিশীথিনী তার কান্নাভরা গানে গানে মুখরিত হয়ে ওঠে! শুধু দরদ-ভরা কানেই না কি সে গান ধ্বনিত হয়। প্রাচীন রাজপুত চিত্রের সব চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী রোম্যান্স হচ্ছে রূপমতীর নিশীথ অভিসার।

এখনও মালব দেশে সব চেয়ে মন-মাতান চোখ-জুড়ান প্রাসাদ হচ্ছে রূপমতী মহল। ছবির মত একটা রাস্তা উঁচু পাহাড়ের একেবারে চূড়া পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। তার শেষে, পাহাড়ের খাড়াইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রূপমতী মহল।

আর তার প্রিয়তম বাজবাহাদুরের মহল হচ্ছে তার নীচে রেবাকুণ্ডের পারে।

এই পাহাড়ে শিকারে এসে গেঁয়ো কিন্তু নাচে-গানে-রূপে অতুলনীয় রাজপুত মেয়ে রূপমতীকে দেখ বাজবাহাদুর শের-শাহর পাঠান সামন্তের ছেলে প্রেমে পড়লেন। কিন্তু রূপমতী তাঁর কথা কানেও তোলেন না, তাঁকে কাছে পর্য্যন্ত আসতে দেন না। বাজবাহাদুরও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষ পর্য্যন্ত রূপমতী

একটি অসম্ভব সর্ত্ত করলেন। রেবা নদীকে যদি পাহাড়ের উপর এনে দিতে পার, তবেই পাঠান পাবে রাজপুতানীকে।

তাই, তাই সই।

কাহিনী বলে যে, রেবা নদীর দেবী বাজবাহাদুরকে একটা গাছের শিকড়ের তলায় রেবার ঝর্ণাধারা খুঁজে পাবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেটা খুঁজে পেয়ে সেই জলকে রেবাকুণ্ডের বাঁধে আটকিয়ে তিনি রূপমতীকে পাবার দাবী করলেন। এখন আর তাঁর না বলবার উপায় রইল না।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন রূপমতী। উত্তর পাঠালেন যে, তিনি শুধু এক জনের বন্দিনী। অন্য কোন পুরুষের খেলনা হতে রাজী নন।

বন্দিনী রূপমতী মনের দুঃখে গান করতেন,—

তুম বিনা জিয়রা রহত রহত মাংগত হৈ সুখরাজ।
রূপমতী দুখিয়া ভই বিনা বহাদুর বাজ।

তোমার বিহনে হৃদয় বার বার সুখের জীবন আকাঙ্ক্ষা করছে। ওগো বাজবাহাদুর ছাড়া যে রূপমতী দুঃখিনী হয়ে আছে।

কিন্তু হৃদয়-গলানো দুঃখের গানেও যার হৃদয়ই নেই তার পাষাণ গলবে কি করে?

অনেক মিনতি করলেন রূপমতী।

থোড়ো রাখো মান, আলিজা, থোড়ো রাখো মান।
হাথী মাংগু; ঘোড়া মাংগু, পৈদল পাঁচ পচাস
রণজীত বালে নগারা মাংগু, উদয়পুরকে রাজ।
চাঁদী মাংগু, সোনে মাংগু, তাকে লড়তো তলাক।
বাঘ সারু বীরো মাংগু, চুড়িলা রী পতরাখ।

আমার সামান্য মান রাখো, আলিজা (অধম খান), শুধু মানটুকু বজায় রাখো। যদি আমি হাতী চাই, কি ঘোড়া চাই, কি পাঁচ কি পঞ্চাশ জন পদাতিক চাই; যদি আমি যুদ্ধের জয় ঘোষণা করার কাড়া-নাকাড়া চাই বা উদয়পুরের রাজপাট চাই, বা রূপো কি সোনা চাই তাহলে তুমি আমায় ভাগিয়ে দিয়ো। কিন্তু আমি শুধু বাঘ মারতো যে বীর শুধু তাকেই চাচ্ছি। ওগো, আমার চুড়ির মর্য্যাদা রাখো।

হায় রাজপুতানীর চুড়ির মর্য্যাদা! মল্লার রাগে রচা এই মিনতির গানেও আলিজার মন গলল না।

—আচ্ছা বেশ। স্বেচ্ছায় না হয়, জোর করে তোমায় আমার আপন করে নিতে আমি জানি।

অধম খানের হুকুম শুনে রূপমতী তাকে অভিসারের সময় দিলেন।

সাজলেন তিনি সব চেয়ে দামী পোষাকে, সুন্দর গহনায়। ফুলে-ফুলে, সুরভিতে দীপমালায় ভরে গেল মিলনকুঞ্জ। বাইরে বাজতে লাগল রূপমতীর নিজের রচনা করা গানের সুর। ফুলশয্যায় শুয়ে রূপমতী নিজের হাতে টেনে দিলেন মুখের উপর ঘোমটা। যা বাধা রচনা ক'রে সাধকে দেয় বাড়িয়ে, এখনি যে আসবে বাসর-শয্যায় নতুন প্রেমিক।

এলেন অধম খান। বাজতে লাগল বাইরে রূপমতীর নিজের রচনা করা গানের সুর। আরো যেন মদির হয়ে উঠল ঘরের মধ্যে দীপের মালা, ফুলের সৌরভ। আবেশে বিহ্বল হয়ে হাঁটু গেড়ে রূপমতীর মুখের উপর থেকে খসিয়ে দিলেন ঘোমটা নিজের অসহিষ্ণু হাতে। চকিতে যেন কাল সাপ দংশন করল তাঁকে ফণা তুলে। মৃত্যুর বিবর্ণ ছায়ার কাল সাপ!

বিয়ে ত হয়নি রূপমতীর বাজবাহাদুরের সঙ্গে। হয়নি কোন মিলনের বেদমন্ত্র পাঠ বা কাবিলনামায় সাক্ষী রেখে সই। পুরুষ তাঁকে জন্ম দিয়েছিল শুধু নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাচওয়ালীর সাধারণ জীবন যাপন করবার জন্য। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন একনিষ্ঠার জীবন। বরণ করেছিলেন মরণকে শুধু এক জন প্রেমিকের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বলে। মনোহরণের সব রকম ছলাকলায় নিপুণা একজন নর্ত্তকী মাত্র। কোন একটি পুরুষের প্রতি নিষ্ঠায় তাঁর ছিল না প্রয়োজন, না ছিল পুরুষের কাছ থেকে কোন সহানুভূতির প্রত্যাশা।

তবু এই প্রেম এই পতিব্রতা নিষ্ঠার চিহ্ন হিসাবে তার ত দরকার ছিল না হাতে কোন লক্ষ্মীর লোহা, সীমন্তে কোন সিঁদূরের ছোঁয়া। ঘরে ঘরে যাঁরা সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে যান, উলু দিয়ে শঙ্খধ্বনি করে স্বামী ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করেন, মনের গহনে তাদেরই এক জন হয়ে গেছেন নর্ত্তকী মালবিকা রূপমতী।

উত্তর-কলকাতার গলির মোড়ের নীলকণ্ঠ কেবিনের আড্ডা থেকে উদয়পুরের মহারাণার সহেলী বাগে তর্কাতর্কি পর্য্যন্ত সব আলোচনা, সব মানসিক প্রশ্নের এখানেই শেষ হোক, শান্তি হোক।

[ক্রমশঃ।

কি খাবেন? প্রতি মাসে?

পূর্ব্ববঙ্গের পাড়াগাঁয়ে সাধারণ লোকদের ভিতর বার মাসে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি খাওয়ার একটা বিধি আছে। বিশেষতঃ মেয়ে মহলে ইহার খুবই চলতি দেখা যায়। ওরা বারমাসী অনুশাসন মেনে চলবেই।

১। চৈত্রে—চালিতা।
২। বৈশাখে—নালিতা।
৩। জ্যৈষ্ঠে—আম-খৈ।
৪। আষাঢ়ে—কাঁটাল-দৈ।
৫। শ্রাবণে—ঘোল-পান্তা।
৬। ভাদ্রে—তালের পিঠা।
৭। আশ্বিনে—শশা-মিঠা।
৮। কার্ত্তিকে—ওল।
৯। অগ্রহায়ণে—খলিসা মাছের ঝোল।
১০। পৌষে—আলা (আতপ চাল)।
১১। মাঘে—বেল।
১২। ফাল্গুনে—তেল।

বারি দেবী

পুরীতে, সাগরের বেলাভূমে বসে উত্তাল তরঙ্গমালার পানে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলো বিভাস চৌধুরী, নিজের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা! চট্টগ্রামে দাঙ্গার কবলে যখন ওদের সমগ্র পরিবারটি আত্মাহুতি দিলো, ও তখন কলকাতায় হষ্টেলে বসে, এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের মাঝে বৃথাই মন নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করছিলো! তার পর দুঃসংবাদের খবর দেশের লোক-মুখে শুনে, পাগলের মত যখন ছুটে গেলো সেখানে,—ভাঙ্গা ও পোড়া ইট-কাঠের স্তূপ ছাড়া কিছুই খুঁজে পায় নি! এর পর সুরু হল তার ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমান একক জীবনযাত্রা!

কলকাতার ব্যাঙ্কে ছিলো কিছু টাকা, আর মাঝে মাঝে গান শেখায়, এম, এ পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না। বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না, বিবাগী উদাসী মন নিয়ে বিভাস হাল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া নৌকোর মত ভেসে বেড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে!

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। সুভাষদা'! ও সুভাষদা'! নারী-কণ্ঠের আবাহন, ও সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর একখানি কোমল কর-স্পর্শ!

চমকে উঠে ফিরে চাইতেই নজর পড়লো, একখানি সুন্দর মুখের ওপর দুটি ব্যগ্র-ব্যাকুল কাজল-আঁখি, ওর দিকেই তার সন্ধানী দৃষ্টিপাত।

বিস্মিত ভাবে বলে বিভাস,—আপনি ভুল করছেন, আমার নাম, বিভাস চৌধুরী!

মেয়েটি অকস্মাৎ ওর একখানি হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে বলে,—যতই নাম পালটাও, ছেড়ে আর তোমাকে দেব না! ও: কি নিষ্ঠুর তুমি? এই তিনটে বছর আমরা কত খুঁজেছি তোমাকে! কি দুর্ভাবনার মাঝেই না কেটেছে আমাদের দিনগুলো!

হাঁ করে চেয়ে থাকে বিভাস মেয়েটির দিকে,—এ কি ব্যাপার! স্বপ্ন দেখছে না কি? এক জন বর্ষীয়সী মহিলা হনহনিয়ে এগিয়ে এসে, হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করেন,—কে রে স্বাতি?

তার পর বিভাসকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন,—কোথায় ছিলে এত দিন বাবা? আমরা খুঁজতে যে তোমাকে কোথাও বাকি রাখি নি, কত দেশ ঘুরে ঘুরে আজ এই জগন্নাথের থানে ফিরে পেলাম তোমায়!

বিভাস কি বলবে ভেবে পায় না! এমন বিভ্রাটে মানুষে পড়ে? উঠে দাঁড়িয়ে বলে সে,—ভালো করে দেখুন আমাকে,—আমি সুভাষ নই আমি বিভাস চৌধুরী!

ভদ্রমহিলা এবারে প্রায় কেঁদে ফেললেন,—মাত্র তিন বছরেই তোমাকে ভুলে যাবো বাবা? এতটুকু থেকে দেখছি···! কপালের কাটা দাগটি অবধি আছে। খালি সু'-টা পালটে একটা বি বসালেই কি সব বদলাতে পারবে?

হায় রে অদৃষ্টের পরিহাস! সে বার দেশ থেকে কলকাতায় রওনা হবার সময় বাগানের আমগাছতলা দিয়ে যখন সে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কোন আম্রসন্ধানীর একটি ঢিল এসে ওর কপালে লেগে কপালটি কেটে গিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরতে থাকে। মা ছুটে এসে শিউরে উঠে বলেছিলেন,—আহা-হা, ষাট, ষাট, বড্ড বাধা পড়লো বাবা! আজ আর গিয়ে কাজ নেই!—ও হেসে বলেছিলো,—তোমার শনিমার্কা ছেলের কিছু হবে না মা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

হায়! সেই আসাই তার শেষ আসা হলো!—সেই কাটা দাগটিই আজ বিভাস চৌধুরীকে সুভাষে পরিণত করার পক্ষে অব্যর্থ প্রমাণ হয়ে দাঁড়ালো।

'কি ভাবছো? চলো!' হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে স্বাতি! কলের পুতুলের মত, নির্ব্বাক ভাবে চললো বিভাস ওদের সঙ্গে। মনে ভাবলো, দেখা যাক ভাগ্যদেবীর ছলনার শেষ পরিণতি! সমুদ্রের ধারেই ওদের বাড়ী—নাম সাগরিকা। সুসজ্জিত জমকালো বাড়ীখানি গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্যের মানদণ্ড!

বাড়ীর মালিক নীরোদ গাঙ্গুলী স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যাকে নিয়ে কয়েক মাস হল এসেছেন এখানে, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। ভাবী জামাতা সুভাষ চৌধুরী প্রায় বছর তিনেক হল নিরুদ্দেশ! খুঁজতে কোথাও বাকী রাখেননি, যতদূর সম্ভব দেশ-দেশান্তর অনুসন্ধানের পর হতাশ হয়ে, পুরীতে এসে বাস করছেন মাস কতক। নীরোদ বাবু স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে বিভাসকে আসতে দেখে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণ। 'কোথায় ছিলে? হঠাৎ কেনই বা চলে গেলে? মা, ভাই, বোনের খবর কিছু মিলেছে কি না?'

বিভাস কয়েক মিনিট নীরব থাকবার পর বললে,—আপনারা বড় ভুল করেছেন, আমার নাম বিভাস চৌধুরী, দেশ ছিলো চট্টগ্রামে! এখন সেখানে কিছু নেই, দাঙ্গার সময় সব শেষ হয়ে গেছে। আমি উপস্থিত বেকার ও ভবঘুরে!

নীরোদ গাঙ্গুলী মৃদু হেসে জবাব দিলেন,—তোমার সব কথাই তো আমরা জানি বাবা! যা হয়ে গেছে তার জন্য তো করবার কিছু নেই! এ ভাবে আত্মগোপন করে নিজেকে ধ্বংস করলে তাঁদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা এখন যাও বিশ্রাম করগে! আমি জোর করে তোমাকে আটকে রাখবো না, তোমার মন সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে থাকো, তারপর নিজের ইচ্ছা মত কাজ কোরো।

—কিন্তু বিভাসের ফিরে যাওয়া আর হলো না! সর্ব্বদাই গৃহিণীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি-পাহারা ও স্বাতির প্রেমবন্ধন, তাকে সাগরিকার মাঝে রেখে দিলো আবদ্ধ করে!—সে মনে মনে ভাবে—আমারই বা অপরাধ কি? আমি তো সত্য পরিচয় দিয়ে চলে যেতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু এরা বিশ্বাস করে না কেন?···আর যে অদৃশ্য হস্তের প্রজ্বলিত অগ্নিতে হৃদয় তার দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো, এ সেই হস্তেরই অমৃতসিঞ্চন! তা না হলে,

সুভাষ চৌধুরীর সঙ্গে বিভাস চৌধুরীর প্রত্যেক বিষয়ে এতটা মিল সম্ভব হয় কি করে? উভয়ের জীবনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সর্ব্বহারা। ক্রমশ: জানলো বিভাস, সুভাষ চৌধুরীর জীবন-কথা।

ফরিদপুর জেলায় বাড়ী তার। নীরোদ গাঙ্গুলীর আজকের উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন সুভাষের বাবা সনৎকুমার চৌধুরী। নীরোদ বাবুর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না, ব্যবসার জন্য সনৎকুমার তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। স্থির হলো, তিনি ফরিদপুরে থেকে ওকালতি করবেন আর নীরোদ বাবু কলকাতায় গিয়ে যে কোনো ব্যবসার সূত্রপাত করবেন। ওঁদের তৈরী সুগন্ধি তেল 'স্বাতি' নাম নিয়ে শীঘ্রই বাজারে আত্মপ্রকাশ করলো; এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সেই তেল এনে দিলো ধন-সম্পদ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা।

এর পর ক্রমশ: এলো বাড়ী, গাড়ী। বিরাট ফ্যাক্টরী তৈরী হলো এবং স্নো, সাবান, হরেক রকম প্রসাধন সামগ্রী ও নানা প্রকার ওষুধ তৈরীও চলতে লাগলো। লাভের অর্দ্ধেক অংশ অবশ্য নিয়মিত ভাবে পেতেন সনৎকুমার, ফরিদপুরে বসে।

কয়েক বছর পরে, হার্টের হাঁপানীতে সনৎকুমার হঠাৎ শয্যাগত হয়ে পড়লেন। টেলিগ্রাম করে আনালেন নীরোদ বাবুকে।

তাঁর কাছে প্রস্তাব করলেন, নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুভাষের সঙ্গে ভবিষ্যতে নীরোদ বাবুর একমাত্র কন্যা স্বাতির বিবাহ দেবার জন্য। তাহলে উভয়ের স্বার্থই একসূত্রে বাঁধা থাকবে,—সম্পত্তির মাঝে দেখা দেবে না বিপত্তি।

নীরোদ গাঙ্গুলী অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। সানন্দে বন্ধুর প্রস্তাবে রাজী হলেন। সুভাষ ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এলো, নীরোদ বাবুর বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়বার জন্য।

বছর দু'য়েক পরেই সনৎকুমার মারা গেলেন। দেশে সুভাষের মা রইলেন কনিষ্ঠ পুত্র ও একটি শিশু কন্যাকে নিয়ে, আর সুভাষ নীরোদ বাবুর বাড়ী থেকে আই-এস-সি পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হলো। স্বাতিও ম্যাট্রিক পাশ করে প্রবেশ করলো কলেজ-জীবনে।

চতুর্থ বর্ষ চলেছে সুভাষের···এই সময় সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠলো। হাজার হাজার নর-নারীর সঙ্গে সুভাষের মা-ভাই-বোনও আত্মাহুতি দিলো সে অগ্নি-দানবের কবলে। ধন-সম্পত্তি সব লুণ্ঠিত হলো।

নীরোদ বাবু সুভাষকে সঙ্গে নিয়ে ফরিদপুরে যখন পৌঁছেছেন, তখন দগ্ধ স্তূপের ভেতর কয়েকটি অর্দ্ধদগ্ধ বিকৃত শব ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

সুভাষকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন নীরোদ বাবু। এ ঘটনার পর সুভাষ যেন কেমন হয়ে গেলো! পড়াশোনা বন্ধ হলো, গুম হয়ে দিন-রাত বসে কি ভাবতে লাগলো। নীরোদ বাবু ও তাঁর স্ত্রী নানা রকমে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন, স্বাতি তার ভালোবাসার প্রলেপ দিয়ে চেষ্টা করে ওর হৃদয়-জ্বালা নিবারণ করতে···

বছর ঘুরে গেলো, কিন্তু সুভাষের কোনো পরিবর্ত্তন দেখা দিলো না! হঠাৎ একদিন সকালে সুভাষকে আর পাওয়া গেলো না।

দীর্ঘ তিন বছর পরে তাই সুভাষকে ফিরে পাবার পর বিগত দিনের কথা আর কেউ তোলে না ওর কাছে! সর্ব্বদাই সকলকার চেষ্টা ওকে ভুলিয়ে রাখবার।

সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ বেড়াবার পর স্বাতি ও বিভাস এসে বসে বালির ওপর। স্বাতি বলে,—সেদিনের কথা মনে আছে সুভাষদা'? কোণারকে সেই ভাঙামূর্ত্তিগুলোর পাশে বসে আমি গান গাইছিলাম,—আর তুমি ফটো তুলছিলে মূর্ত্তিগুলোর? আর হঠাৎ একটা কি কাণ্ড হলো বলো তো? মুখ টিপে হাসছিলো স্বাতি।

বিভাস অন্যমনস্ক ভাবে বলে,—কি হয়েছিলো? ঠিক মনে পড়ছে না তো!

হাসিতে ফেটে পড়লো স্বাতি! ও মা মনে নেই? একটা বড় কাঁকড়া তোমার পায়ে উঠছে দেখে, আমি এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম তুমি আচমকা লাফিয়ে পালাতে গিয়ে দড়াম করে এক আছাড়। এক দল ছেলে-মেয়ে বেড়াচ্ছিলো, তারা তো হেসেই অস্থির, তোমার বালিমাখা চেহারাখানা দেখে!

বিভাস হাসতে হাসতে বলে,—তাই নাকি? আমার কিন্তু কিছুই মনে নেই স্বাতি! আর আগের কথা কিছু মনে পড়বেও না কোনো দিন!

—নাই বা মনে পড়লো সুভাষদা'! সে সব কথা বাদ দিয়ে, আজকের কথাই তোমার মনে থাক—ব্যথিত কণ্ঠে বলে স্বাতি!

একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বলে বিভাস,—একটা গান শোনাবে স্বাতি? এখন একমাত্র গানই আমার পরম সান্ত্বনা!

অবাক হয়ে যায় স্বাতি—সে কি সুভাষদা'? তুমি যে বলতে গান গায় পাখীরা, মানুষে আবার গান গায়? আমি গান শিখতাম বলে, তুমি যে কত বিদ্রূপ করতে আমাকে,—আমার কিন্তু ভারি দুঃখ হোত, জানো সুভাষদা', এটিই ছিলো তোমার আমার মাঝে একটা বিরাট ব্যবধান। আমি চাইতাম, আমার সব গান শুধু তোমাকেই শোনাতে! কিন্তু একদিনও দেখিনি তোমার আগ্রহ গান শোনার।

বিভাস চুপ করে থাকে, স্বাতি ওর দিকে একবার চেয়ে গান ধরে—

> রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাবো,
> হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান গেয়ে দ্বার খোলাবো।

বিভাস মুগ্ধ চিত্তে শুনলো ওর গান,—তার পর বলে,—বড় আনন্দ দিলে স্বাতি, এবারে আমি শোনাবো তোমাকে আমার গান। গান ধরে বিভাস—

"পথে যেতে কেন ডাকিলে আমারে, তোমার গানের সুরে,
সুরের অনলে দহিবে হৃদয়, তুমি যবে রবে দূরে।"

অপূর্ব্ব ভরাট কণ্ঠস্বর! পরম বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকে স্বাতি বিভাসের দিকে। গানের শেষে বলে, একি অদ্ভুত! এত ভালো গান তুমি কেমন করে শিখলে সুভাষদা'? ওঃ! আজ কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার!

সাগরিকায় কেটে গেলো আরো ক'টি মাস! স্বাতি গান শেখে বিভাসের কাছে। দু'জনেই সুর-পাগল, দুজনেই অনুভব করে যেন গভীর প্রেমের মহাসাগরে ওরা ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে যাচ্ছে।

নীরোদ বাবু ও তাঁর স্ত্রী দূর থেকে সব কিছু দেখেন, মনে মনে খুসি হন। বিভাসের আর পালাবার ইচ্ছা নেই। স্বাতির মধুর কণ্ঠস্বর যেন তার সমস্ত মন-প্রাণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার দগ্ধ হৃদয়ে মিলেছে শান্তিজল। সে আর কিছু চায় না! চায় শুধু স্বাতি তার পাশে থাক,—তার সমস্ত সত্তাকে সে রাখুক সুর-সিক্ত করে! কিন্তু মাঝে মাঝে মন তার চমকে ওঠে যেন কান পেতে শোনে কোন্ অজানার পদধ্বনি!

স্বাতির অন্তরে যেন বিভাস এনেছে নতুন করে প্রেমের বন্যা! সাপুড়ের বাঁশীতে যেমন ফণিনীর উদ্যত ফণা দুলে ওঠে, বিভাসের গানের সুরেও তেমনি উদ্বেল হয়ে ওঠে স্বাতির অন্তর।

কোথায় ছিল এত প্রেম? এত আনন্দ? স্বাতি ভাবে,—আগের চেয়ে আজকের সুভাষ অনেক মধুর, অনেক কোমল! অত বড় একটা মানসিক আঘাতের জন্যই বোধ হয় এতটা পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে। আগে যেন ও ছিলো একটু উদ্ধত প্রকৃতির! একদিন নীরোদ বাবু বিভাসকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন— কেমন আছো এখন বাবা?

—বেশ ভালোই আছি। নম্র ভাবে জবাব দেয় বিভাস!

—আমি মনে করছি, এবারে কলকাতায় গিয়ে তোমাদের শুভ বিবাহটা সম্পন্ন করে ফেলবো। মানুষের জীবনের কথা তো বলা যায় না,—শরীরটা আমার প্রায়ই খারাপ হচ্ছে। তোমার বাবার কাছে প্রতিশ্রুত আছি আমি বাবা, সেজন্য নির্ব্বিঘ্নে সেটা সম্পন্ন করে ফেলতে পারলে আমি স্বস্তি পাই! এখন জানতে চাইছি, এতে তোমার কোনো অমত নেই তো?

বিভাস নত মস্তকে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পর কম্পিত কণ্ঠে বলে,—আপনাদের আদেশই আমার মত। ঈশ্বরের কৃপা আমার প'রে থাকলে তা নিশ্চয়ই সফল হবে।

নীরোদ বাবু ও তাঁর গৃহিণী বিভাসের জবাব শুনে, পরমানন্দে কলকাতায় রওনা হবার উদ্যোগ করতে আরম্ভ করলেন। কলকাতায় ল্যান্সডাউন রোডের ভবনে ফিরেছেন নীরোদ বাবু সপরিবারে। একমাত্র কন্যার বিয়ে! খুবই ব্যস্ত আছেন,—দিন আর বেশী নেই, উৎসবের আয়োজন সুরু হয়েছে!

হঠাৎ খবর এলো বম্বে থেকে,—নীরোদ বাবুর একবার সেখানে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। সেখানকার ফ্যাক্টরীতে ধর্ম্মঘট হবার উপক্রম হয়েছে! নীরোদ বাবুর শরীর তখনও বেশ দুর্ব্বল। গৃহিণী বললেন,—তোমার শরীর তো এখনও বেশ খারাপ রয়েছে; ওখানে সুভাষকে পাঠালে হয়! আর ওকেই তো ভবিষ্যতে সব দেখাশোনা করতে হবে—

বিভাস রাজী হল যেতে! কি করতে হবে,—নীরোদ বাবু সব বুঝিয়ে দিলেন, দিন সাতেক সময় লাগবে, কাজ সেরে ফিরে আসতে।

স্বাতির কিন্তু ওকে যেতে দিতে একেবারেই মন চায় না,—কিন্তু উপায় কি? বাবার শরীর অসুস্থ!

বিভাসেরও মনটা ভালো নেই! গভীর রাত, ঘুম যে আসে না চোখে! বাইরে তখন প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সাথে গুরু-গুরু মেঘের গর্জ্জন চলেছে! কখন একটু ঘুম এসেছিলো চোখে,—হঠাৎ পায়ে কার কোমল হাতের স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে জাগে অদ্ভুত শিহরণ; স্বাতি ওর দুটি পায়ের ওপর মুখ গুঁজে কাঁদছিলো!···চমকে উঠে বসে বিভাস!

—এ কি স্বাতি? পায়ের কাছে কেন!···ওর হাত দুটি ধরে কাছে টেনে নেয় বিভাস। সজল চোখ দুটি তুলে, বলে স্বাতি—"যেও না,—তুমি যেও না।" প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ আজ ওদেরও দুটি অন্তরে ঘনায়মান! দুজনের চোখে অশ্রুধারা! নীরবতার মাঝে কেটে গেল কতগুলি মুহূর্ত্ত! ধরা গলায় বলে বিভাস,—একটু ধৈর্য্য ধরো, মাঝে তো মাত্র ক'টা দিন।···

—চেষ্টা করছি; কিন্তু মনকে যে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না! ওর চিবুকটি তুলে ধরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে বিভাস,···

—একটা প্রশ্ন জাগছে মনে,—ঠিক উত্তর পাব তো!···যদি আমি সুভাষ না হয়ে বিভাস হতাম তাহলে···তাহলে তুমি কি আমাকে আজকের মতই ভালোবাসতে স্বাতি?

—সে জবাব কি নিজের মনের মাঝে খুঁজে পাওনি আজো? কেন তুমি ও কথা বলো, বার বার? আমার ভয় করে। মনে হয়···মনে হয়, তোমাকে আমি আবার হারিয়ে ফেলবো!

কথার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখের কোল ছাপিয়ে ঝরে পড়ে জলের ধারা!

ধাবমান ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় বসে, একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিলো বিভাস! দুটি জলভরা কাজল আঁখি মনটাকে চঞ্চল করে তুলেছে। বম্বের ফ্যাক্টরীর গোলমালের একটা আপোষ-মীমাংসা করে কলকাতায় ফিরে চলেছে সে!

এ কি মিষ্টার চৌধুরী? আপনি চলেছেন কোথায়?

চমকে ওঠে বিভাস,—ওধারের সীট থেকে একজন ভদ্রলোক কথা বলছেন তার দিকে চেয়ে। বিস্মিত হয়ে জবাব দেয় বিভাস—আমায় বলছেন? কিন্তু আমি তো আপনাকে···

—সে কি কথা মশাই? আমি কলকাতায় যাচ্ছি বলে লান্সডাউন রোড-এ চিঠি দিলেন, আপনি আমার হাতে।

বিভাস মৃদু হেসে বলে—সে আমি নই। আপনি ভুল করছেন! যিনি চিঠি দিয়েছেন, তাঁর নামটা কি জানতে পারি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই! পি, এন, রায়, কোম্পানী! আন্দামানে কাঠের ব্যবসা যাঁর, ঐ কোম্পানীর অ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার সুভাষ চৌধুরী, হুবহু আপনার মত চেহারা তাঁর; চিঠিখানা তিনিই দিলেন বম্বে থেকে গত কাল আমার হাতে।

কে যেন চাবুক মারলো ওর মুখে!···কয়েক মিনিট পর জিজ্ঞাসা করে বিভাস,—নামটা যেন চেনা লাগছে! আচ্ছা তিনি এখন আছেন কোথায়?

দু' বছর তিনি আন্দামানেই তো ছিলেন। ভারি করিৎকর্ম্মা ছেলেটি। শুনেছিলাম, পূর্ব্ববঙ্গে ছিলো ওঁর বাড়ী, রায়টের সময় সব গেছে। উনি তখন ছিলেন কলকাতায় ওঁর বাপের এক বন্ধুর বাড়ীতে। মনে দারুণ শক্ লেগে সেখান থেকে ওঁদের না জানিয়ে চলে যান। ঐ সময় আলাপ হয় কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে, তার পর বরাত খুলতে বেশী দেরী লাগলো না।

খুব কাজের লোক। মালিক বিশেষ নজরে দেখেন ওঁকে, শোনা যায় ব্যবসার শেয়ারের কিছু অংশও নাকি ওঁর নামে করে

দেবেন। আট-দশ দিন হল কোম্পানীর একটা জরুরী কাজে বোম্বে এসেছেন, কলকাতায় যাবেন দু'-চার দিনের মধ্যে।···তার পর বিভাসের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করে মন্তব্য প্রকাশ করেন ভদ্রলোক—হ্যাঁ, এবারে তাঁর সঙ্গে আপনার পার্থক্যটা নজরে পড়েছে মশাই! তিনি আপনার চেয়ে কিছু ওজনে ভারি, আর আন্দামানে থাকার দরুণ রংটা একটু তামাটে হয়ে গেছে। বাপের ঐ বন্ধুর মেয়েটির সঙ্গে ওঁর বিয়ের ঠিক ছিলো কি না···তবে যখন দেশের ধন-সম্পত্তি সব হারালেন তখন উনি মনে মনে সঙ্কল্পই করেছিলেন যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারলে সেখানে আর ফিরবেন না। আমিও কিছু দিন ওঁদের কোম্পানীতে ছিলাম কি না, তাই মালিকের কাছেই শুনেছি এ-সব। যা হোক্, ছেলেটির উচ্চ আশা এবারে সফল হয়েছে,······

বুকের ভেতর কলজেটা ধরে সজোরে কে যেন মোচড় দিচ্ছে। দু'হাতে বুক চেপে ধরে বিভাস।

—কি হল মশাই? কলিক্ পেন আছে বুঝি?

হ্যাঁ। কণ্ঠস্বর যাতনাপূর্ণ বিকৃত।

বালির প্রাসাদ তার সাগরের জলে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! এবারে কি করবে সে? ফিরে যাবে? স্বাতিকে বলবে সব কথা? না! না!

প্রকৃত অধিকারী সুভাষ চৌধুরী! সে তার নামভূমিকার অভিনেতা মাত্র। সে অভিনয়ের আজই শেষ রজনী! ব্যাগ থেকে কাগজ টেনে নিয়ে একখানি চিঠি লিখলো সে।

"স্বাতি দেবী! আসল সুভাষ চৌধুরীর সন্ধান মিলেছে, তাই নকল সুভাষ আমি সরে যাচ্ছি আপনার জীবন থেকে। আপনাদের সাথে প্রতারণা করবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিলো না, সেজন্য প্রথমেই জানিয়েছিলাম আমার সত্য পরিচয়।

"কোন অদৃশ্য খেয়ালীর খেয়ালে যা ঘটে গেলো, তার জন্য এ হতভাগ্যকে ক্ষমা করবেন। আপনার মা বাবার চরণে আমার অনন্ত শ্রদ্ধা জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

"যাবার বেলায় জানিয়ে যাই, আপনারা ভুল করে যা দিলেন আমায়, আমার জীবনে তা ফুল হয়ে ফুটে রইলো। ইতি

ভাগ্যহীন বিভাস চৌধুরী।"

চিঠিখানি ভাঁজ করে খামে বন্ধ করে পকেটে রেখে দিলো বিভাস ডাকে দেবার জন্য।

আবার অদৃশ্য হাতের হাতছানি। ট্রেণের গতি কমে আসছে ব্যাগটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে—এই ষ্টেশনেই নেমে যাবে।

কে কাঁদছে? স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে, কার চাপা কান্না··· গুমরে গুমরে যেন বলছে—"তুমি যেও না।"

পরিক্রমণ

দিলীপ দে-চৌধুরী

এ পথ সে পথ কত পথ ধরে
পাখী-ডাকা সাঁঝে, ঘুম-ভাঙা ভোরে—
কতো রাত আর উজ্জ্বল দিন
হেঁটে ফিরি বেদুইন।
দু'চোখে অবাক জিজ্ঞাসা মেলা!
যায় যে সময়, যায় কেটে বেলা—
রৌদ্রের দাহ, বর্ষার ঝির-ঝির,
চলো—চলো আরো দূর
আরো চলো মুসাফির!
ক্লান্ত এ দেহ থেমে যেতে চায়
কেন নাহি জানি কিসের নেশায়
শ্রান্ত চরণ টানি—
আলেয়ার আলো বুঝি দেয় হাতছানি!

চলি আর চলি
জীবনের যতো আঁকা-বাঁকা গলি
পায়ে-পায়ে হই পার—
একই ঠিকানায়
তবু কেন হায়
ঘুরে আসি বার বার?

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

৭

আপন চিন্তায় এমন বিভোর হয়ে পথ চলছিল গিলস যে জনশূন্য বুলেভার্দ পেরিয়ে বাড়ীর দরজা অবধি পৌছান পর্যন্ত খেয়ালই ছিল না তার কোথায় যাচ্ছে। গেটের বাইরে তার বাবা গাড়ীর ষ্টার্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বৃথাই অচল গাড়ীটাকে সচল করার চেষ্টা করছিলেন। হ্যাণ্ডেল রেখে যখন পিঠ সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন, গিলস দেখলে তাঁর মুখ-চোখ পরিশ্রমে রক্ত-জবা হয়ে উঠেছে।

ঘাড়ে-গর্দানে একাকার মানুষটি!

—'সেল্ফ ষ্টার্টারটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' রাগে গজ-গজ করছিলেন ডাক্তার।

—'দাও আমি হ্যাণ্ডেল মারছি'—বলে এগিয়ে এল গিলস।

একটা চাষা ছেলে ঠাকুমার অসুখের জন্যে ডাক্তারকে নিতে এসেছিল। ঠাকুমার যে কিসের অসুখ—কেমন ধারা অবস্থা, তার কিছুই জানে না ছেলেটা। বলতেও পারলে না ডাক্তারকে।

—'মরে যায়নি ত তোর ঠাকুমা? এটুকু খবরও ত দিতে পারতিস আমায়? বার মাইল ঠেঙিয়ে নিয়ে যাবি—গিয়ে হয়ত দেখব একটা মড়া পচছে ঘরে। এতক্ষণে তোর ঠাকুমা ঠিক মরেছে।'

ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ডাক্তার—'ওদের ঐ ধারা।'

—'তবে যাচ্ছেন কেন বাবা? কোন দিন কোন খানা-ডোবা থেকে আপনাকেও তুলে আনতে হবে আমাদের।' প্রীতি-হীন কণ্ঠে বাবাকে সতর্ক করলে গিলস।

—'সেই রকমই আঘাত কপালে ঘটবে কোন দিন। ওঃ, বলতে বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কে একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ড্রয়িং-রুমে অনেকক্ষণ বসে আছে। তা হবে বই কি, আধ ঘণ্টা হবে। আমার কলের পর এবার তোমার কল এল।'

—'কে বাবা? চেনা মানুষ?'

—'আগে ভাগে বলে দিয়ে রহস্য ভাঙতে চাইনে আমি। মনের কথাই যদি বলতে এসে থাকে মেয়েটি, আমি মোটেই আশ্চর্য্য হব না। যাও যাও, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে তাকে।' হাসতে হাসতে বললেন ডাক্তার।

হাসলে ডাক্তারের দুটি চোখই মেদের নীচে চাপা পড়ে যায়।

ঘাসে-ঢাকা এক মুঠো প্রাঙ্গণ ছুটে পেরিয়ে গেল গিলস। ডিঙিয়ে গেল ফুল-বাগিচার বেড়া। হয়ত সান্ধ্য ভজনের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তার মেরী এসেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই ভুল ভাঙল তার। যে মেয়েটি পুরোনো মাসিক পত্রিকার উপর ঝুঁকে বসে আছে সে তার প্রত্যাশার ধন মেরী নয়। গিলস ঘরে ঢুকতেই আগাথা উঠে দাঁড়াল। সৌজন্যের সঙ্গে দু'জনে করমর্দন করল তারা।

গিলস অতিথিকে বসতে ইংগিত করলে, কিন্তু নিজে রইল দাঁড়িয়ে। দুটি শীতল চোখের শাণিত দৃষ্টিতে খণ্ডিত করতে লাগল সেই রমণীকে।

যে কথাটা বলতে এখানে আসা কি ভাবে যে তা সুরু করবে, ঠিক করেই এসেছিল আগাথা। এখন সেই কথাটাই স্মরণ করতে লাগল আবার। গিলসদের এই বাইরের ঘরে পিয়ানোর উপর ঝোলান বাসর-সভার ছবির মধ্যবর্তিনী গিলসের মায়ের সজাগ সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় বসে আধ ঘণ্টা ধরে সে সেই সংলাপ রচনায় তালিম দিয়েছে নিজেকে। কয়েক মাসের শিশু রেখে গিলসের মা স্বর্গগতা হন। মৃতার স্মরণে তাঁর নিজের হাতে সাজান এ সংসারের একটি জিনিষও বদল হ'তে দেবেন না এই ছিল স্বামীর প্রতিজ্ঞা। সেই সহস্র স্মৃতি রোমাঞ্চিত পরিচিত পরিবেশে বিচ্ছেদ বেদনার অনেকখানি লাঘব হয়েছিল তার। শান্তিও খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। সেই পুরাকালের আরাম কেদারায় এখানো পুরোনো ফ্যাশানের ক্রোচেট কাজ করা আবরণী লাগান। জানলার পর্দাগুলো এখন ছিন্ন কন্থায় দাঁড়িয়েছে। একটি তরুণী বধূর সংসার রচনার সযত্ন প্রীতিতে সাজান সেই পর্দার পাড়গুলি এখনো অতীত দিনের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। বসে বসে এতক্ষণ তাই দেখছিল আগাথা।

—'আমার এখানে আসার কারণটা অনুমান করি বুঝতে পেরেছেন?'

সে কথায় সায় দিয়ে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে গিলস। তার ভালো-মন্দের জন্যে ওপর-পড়া হয়ে কিছু করবে গিলস, নিশ্চয়ই সে রকম কোন ধারণা করে বসে নেই আগাথা। কোন দিনই কারুর জন্য কিছু করার মানুষ নয় সে। তবে এই বিশেষ মেয়েটির বেলায় তার স্বভাবের ব্যতিক্রম করতে আপত্তি নেই গিলসের। কেন না, যাকে পাওয়ার জন্যে হৃদয় মন তার ব্যাকুল অস্থির হয়ে আছে, তাকে পেতে হলে আগাথার সাহায্য দরকার হতে পারে। ডরথীর মত পর্দানসীন জায়গায় মেয়ে মানুষের ঘটকালি ভিন্ন কোন অবস্থাবান ঘরের মেয়ের সঙ্গে গোপন মিলন ঘটানো একেবারে অসম্ভব। তা ভালো করেই জানে গিলস।

মালিনী যেমন সযত্নে কুসুম চয়ন করে মালা গাঁথে, তেমনি নিপুণতার সঙ্গে প্রতিটি কথা যাচাই করে আগাথা উদ্‌ঘাটিত করতে লাগল নিজেকে। শান্ত কুশলী কণ্ঠে রচনা করতে লাগল বীতংস।

'মেরী দুবার্দের শিক্ষার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপর। আপনি এখানে আসা অবধি তার মনে আর শান্তি নেই।'

একের পর এক আগাথা পেশ করতে লাগল তার বক্তব্য। যাই ঘটুক, আগাথাকে চটিয়ে দেওয়া চলবে না কোন মতেই—মনে

দুই শার্টের গল্প
বিক্রী — শার্ট
৫ টাকা
রাম ও শ্যাম দুজনে একই রকম শার্ট কিনলেন
এইটা
এইটা
এই নিন, মশায়—
একটি ক'রে!
তিন মাস পরে — ময়দানে
ঘুড়ির সুতা জড়িয়ে গেছে—
বাবাকে ডাকি।
রাম ও শ্যামের আবার দেখা হ'লো
আপনার শার্ট এখনও
নতুন আছে।
আমারটাত
প্রায় ছিঁড়ে
এসেছে।
দুই গৃহিণী
এর রহস্য কি?
খুব সোজা। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা
না আছড়াতেই সব ময়লা বের ক'রে দেয়।
আছড়ালে কাপড়ের সুতা ছিঁড়ে
যায় — আর তা বেশীদিন
টেঁকে না।
এ পরামর্শের
জন্য ধন্যবাদ!
এ কথা সত্যি!
সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা
না আছড়ালেও কাপড়কে
সাদা ও ঝকঝকে করে
দেয়। সবই বেশীদিন
টেঁকে, আর তাতে
পয়সাও বাঁচে!!
SUNLIGHT
SOAP
Rs.10000
Reward!
SUNLIGHT
SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়-চোপড়কে আরও
টেঁকসই করে

মনে স্থির করে রাখলে গিলস। আগাথাকে চোখে দেখলেই তার মনে যে বিপ্রকর্ষণের সৃষ্টি হয় সে-ভাব ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হবে না এ মেয়েকে। যে সব মেয়েরা দেহ-লাবণ্যে মনে বাসনার আগুন জ্বালায় না তাদের সোজা ঘৃণা করে যে জাতের ছেলেরা, গিলস হল তাদেরই একজন। পাছে মনের বিতৃষ্ণা গোপন করতে না পারে সেই ভয়ে কণ্টকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গিলস। ঠোঁট চেপে রইল, যাতে কোন অন্তমনস্কতায় বেফাঁস কিছু প্রকাশ হয়ে না পড়ে মুখ দিয়ে।

অনেক কথার শেষে আগাথা যখন মিনতি করে বললে— 'আপনার মনের কাছে আমার এ আবেদন'—তখন কথা বলার প্রথম সুযোগ পেল সে। পরম ঔদাস্যের সঙ্গে বললে—'মন! মনের কোন বালাই নেই ত আমার!'

শুনে অধীর কণ্ঠে বললে আগাথা—'এমন কথা বিশ্বাসই করি না আমি।'

—'বিশ্বাস করার কথাও নয়। তবে আপনি যে অর্থে বলেছেন সে অর্থে নয় নিশ্চয়'—

কথা বন্ধ করে আগাথা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল গিলসকে। তার সে সন্ধানী চাউনি সহ্য করতে না পেরে গিলস ঝপ করে তার মুখোমুখী হয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর চেয়ারটাকে টেনে আগাথার এত কাছে নিয়ে এল যে, তার হাঁটু মেয়েটির স্কার্টের প্রান্তে ছুঁই-ছুঁই করতে লাগল।

'হঠাৎ আমার এখানে উদয় হওয়ার কারণটা কি? সত্যি, কেন এলেন বলুন ত?'

আচ্ছা অর্বাচীন ত—ভাবতে ভাবতে আগাথা চেয়ারটাকে পিছিয়ে সরিয়ে বসল। গিলসের মত পুরুষ তার নারী-চিত্তে কোন মহৎ প্রীতি সঞ্চারিত করতে পারে না। তাকে ঘৃণাই করে আগাথা। গিলসের মধ্যে যে একটা শিথিল পৌরুষ আছে তা এক মুঠো একটা মেয়েকে নবীন প্রেরণায় জাগিয়ে দিতে পারে হয়ত।—কিন্তু আগাথার সবল নারী-হৃদয়ে অমন পুরুষকে অবলীলা ক্রমে অবহেলা করতে পারে।

'আপনিই পারেন—শুধু আপনিই পারেন মাদাম দুবার্ণেকে প্রভাবিত করতে' বললে গিলস—'জানেন আপনার সঙ্গে নিকোলাস কার তুলনা করে?'

শুনে গোপন অনুরাগিণীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। তবে তার কথা ভাবে নিকোলাস। কারুর সঙ্গে তুলনা করার কথাও মনে আসে তার। এ ভাবনার পুলকে রোমাঞ্চিত হতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

—'বলে আপনি গ্যালি গাই—সে কেমন ধারা মেয়ে আপনি জানেন বোধ হয়?'

—'জানি বই কি'—হেসে বললে আগাথা—'গ্যালি গাই যে মেরী দ্য মেডিসিসকে সম্মোহিত করেছিল। গ্যালি গাই! মোহিনী বিদ্যায় পারদর্শিনী বলে যখন তাকে অভিযুক্ত করা হয় আত্মপক্ষ সমর্থন করে সে বলেছিল—'আমার সম্মোহন বিদ্যা গোপন যাদু কিছু নয়। দুর্বল চিত্তের উপর সবল মনঃশক্তি প্রয়োগই আমার সম্মোহন। তাই না? তবে মেরী দুবার্ণের মাকে যদি দুর্বল মন ভেবে থাকেন, মস্ত ভুল ধারণা করে বসে আছেন, জানিয়ে রাখলাম।'

—'তা হোক, আপনি ত দুর্বল নন?'

—'কি জানি হয়ত'—

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে আগাথা। তার পর কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কাটিয়ে বললে—'নিকোলাসদের মতো মানুষদের শান্ত চেহারা বড়ো প্রবঞ্চনা করে। ওরা মোটেই দুর্বল পুরুষ নয়।'

—'কিন্তু আমার ওপর ওর আসক্তির অবধি নেই।' বলে উঠে দাঁড়াল গিলস।

ঝড়ের সময় ঘরের জানলা বন্ধ করে রেখে গেছে চাকরেরা। গিলস উঠে জানলা খুলে দিতে গেল। নীচু কণ্ঠে বিড়-বিড় করে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললে সে—'এই সব রক্তহীন ফ্যাকাশে মেয়েগুলোকে দু' চোখে দেখতে পারি না। যতই সাজ প্রসাধন করুক—অরুচি—অরুচি—।'

ভিজা পেটুনিয়ার মদির গন্ধ বুক ভরে টেনে নিল গিলস। আগাথার নিশ্চয়ই কোন গালভারী উত্তর ভাঁজছে ভাবলে সে। কিন্তু ভুল তার ধারণা। 'ও আমার ভারী অনুরক্ত'—এই কথাটাই আগাথার বার বার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। সালোঁদের এই ছেলেটার আশ্চর্য প্রভাব নিকোলাসের উপর। যদি কোন দিন নিকোলাস তাকে বিয়ে করার কথা মনে স্থান দেয়, সে হবে শুধু তার এই বর্বর বদমেজাজী বন্ধুকে খুসী করার জন্যেই। অমন ছেলে সব সময় ফোঁস করার জন্যে ফণা উঁচিয়ে আছে। অনেক এলোমেলো চিন্তার রাশ টেনে অবশেষে বললে আগাথা—'আমরা দু'জনে দুই বিপরীত পরিবেশে এসে পড়েছি। মেরীর মন পাওয়ার জন্যে কোন অনুনয় আবেদনের দরকার নেই আপনার। তার মনের নাগালে পৌঁছতে বাইরের বাধাটুকু ঠেলে সরিয়ে দিতে পারলেই আপনি জিতে যাবেন। কিন্তু আমার'—

—'বলছেন বটে—তবে আমিই যে নিশ্চিত সফল হব এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি কই'—

তার গাল দুটোতে আগুন ঝাঁ-ঝাঁ করছে স্পষ্ট বোধ করলে গিলস। সেটুকু গোপন করতেই বুঝি উঠে দাঁড়াল সে। এই রূপহীনা কুৎসিত মেয়েটা কি মনে মনে ভাবছে যে গিলস তার প্রাণোপম বন্ধুকে উপহার দেবে এর পায়ে? হাত-পা বেঁধে আহুতি দেবে এর কামনার হুতাশনে? মেরীর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধটা একবার পাকাপাকি হয়ে গেলেই আগাথার লুব্ধ দৃষ্টির সামনে সমাপ্তির যবনিকা টেনে দেবে সে। একটি মুহূর্ত দেরী করবে না। এই অমানিতা মানবীর যূপমূলে নিকোলাসকে কিছুতেই বলি দিতে পারবে না সে।

বৃষ্টিভেজা পেটুয়ার গন্ধবহ এই সমীরণ তার মনে চর্বিত মুহূর্তের স্মৃতিকে শাশ্বত করে রাখবে। মনে থাকবে যে একদিন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বন্ধুকে হীন ভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল সে মনে মনে। হঠাৎ তার মনে হল, এ পৃথিবীতে নিকোলাসকেই সে সব চাইতে বেশী ভালবাসে। হয়ত সেই একমাত্র মানুষ, যাকে সে ভালবাসে। ঘরের কোণে যে মেয়েটি বসে আছে তার কথা মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয়ে গেল গিলস। আগাথা যেন তার নিভৃত সুখের জগতে অবাঞ্ছিত অতিথি! অনেকক্ষণ পরে আবার সম্বিৎ পেয়ে ফিরে দাঁড়াল গিলস। বেশ কিছুক্ষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে

লক্ষ্য করলে আগ থাকে। তার পর বললে—'কবে কখন দেখা হবে তার সঙ্গে? মেরী—মেরীর দেখা কবে পাব?'

—'পাগল! মেরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখন ত নয়ই। ভারী ছেলেমানুষ ত আপনি?'

গিলসের দিকে চেয়ে হাসলে আগাথা।

যা বলতে তার আসা, সব শেষ হল বলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে আগাথা। অসুখী মনে গিলস সেই রমণীর সৌজন্যের উত্তর দিলে। আঙুল দিয়ে তার আঙুল ছুঁলে মাত্র।

'আমায় খুব নির্বোধ মেয়েমানুষ ভাবলেন ত আপনি?'

মুখ লাল করে অন্য দিকে তাকাল গিলস।

তার মনের গভীর তল অবধি দেখে নিয়েছে ঐ মেয়েটা। দেখে নিয়েছে সব রহস্য ভেদ করে। বলার আর কিছু বাকী রইল না। জীবনের সর্বশেষ কথাটির প্রয়োজনও বুঝি ফুরিয়ে গেল!

৮

বিনা আলোতেই ডুবার্ণেরা সমুখের বাগানে খেতে বসেছিল। বিরাট টিউলিপ গাছের শাখায় বিচ্ছুরিত হয়ে মাটিতে আলো-ছায়ায় জাজিম বিছিয়েছে জ্যোৎস্না। মাখনের বাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে সময় কাটাচ্ছিলেন মেরীর বাবা। চেয়ারে অধীর আগ্রহে কম্পতনু মেরী যেন অলক্ষিত ডানায় ভর দিয়ে উন্মুখ হয়ে বসেছিল। মা বোধ হয় তাতে সন্দেহ করেছিলেন, তাই আগাথার ঘরে যেতে না যেতেই মা-ও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বলতে গেলে আগাথার সঙ্গে কোন কথাই হয়নি তার।

এদের সবাইকে সচকিত করে মেরীর বাবা হঠাৎ একটা প্রশ্ন পাড়লেন। তিনি এতক্ষণ আপন গভীরে চিন্তামগ্ন ছিলেন। এরা সবাই ভাবছিল মানুষটি নিঃশব্দে নিশ্চিন্তে গুরুভোজন পরিপাক করছেন।

—La Revue পত্রিকায় ঐ টুকরো লেখাগুলো পড়েছিলো না কি আগাথা?'

মেরীর মা ঝনাৎ করে বলে বসলেন—'আজ যা ঠাণ্ডা পড়েছে—আমি ত শীতে হিম হয়ে যাচ্ছি।'

আজ থেকে পনেরো বছর আগে যখন মেরীর বাবার বয়সের জোয়ারে ছিল টান, মনে-প্রাণে এমন করে এলিয়ে পড়েনি কর্মশক্তি, তখন স্ত্রীর এই ধরণের অসতর্ক অনধিকারী কথাবার্তাকে তিনি রূঢ় ব্যঙ্গে ধাক্কা দিতেন। ওড়া পাখীর ডানা কেটে দেওয়াই জুলিয়ার কাজ। আলাপের আকাশে মুক্তপক্ষ ভাবের লীলাকে ভূমিশায়ী করার কৌশলে ঐ মেয়েটির অনবদ্য নিপুণতা। এখন আর আগের মত আগ্রহ নেই মনে, তাই সামান্য বাধায় ক্লান্তি জড়িয়ে আসে। আজও তাই হল। কথার সূত্র ছেড়ে মানুষটি আবার আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন।

মেরীও উঠে পড়েছিল, মা তাকে ডাকলেন।

—'আমি যতক্ষণ না বলছি তুমি এখান থেকে এক পা-ও যাবে না মেরী!'

নিরঙ্কুশ ভাল মানুষের মত মেরী আবার বসে পড়ল যথাস্থানে। বাবা মদের গ্লাস নামিয়ে রেখে গোঁফের উপর রুমাল বুলিয়ে নিলেন।

ওয়েষ্ট কোর্টের পকেট থেকে একটি সিগার বের করে আঙুলের ফাঁকে কড়-কড় করে ফেরাতে লাগলেন। বললেন—'আমার জন্যে তোমাদের বসে থাকার দরকার নেই। কোন দরকার নেই বসে থাকার।'

বাবার কথা শেষ হবার আগেই মেরী দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেল। আগাথাকে তার বলাই আছে—'ছাতের অলিন্দে দেখা হবে।' কিন্তু আগাথা সহজে উঠল না সেখান থেকে। মেরীর মা তাকেও সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন জানে সে। মেরীর মা বোধ হয় ভেবেছেন যে এদের দুটির মধ্যে কোন গোপনীয়তা আছে। কিন্তু তক্ষুণি ভুল ভাঙ্গল আগাথার।

মেরীর মা বললেন—'আমি শুয়ে পড়তে যাচ্ছি। ব্যথাটা অনেক কম পড়েছে বটে কিন্তু শরীরে বড়ো ক্লান্তি বোধ করছি। মেরীকে তুমি একলা রেখ না আগাথা! কি জানি ছেলেটা হয়ত আমাদের ছাতের নীচে নদীর ধারে ঘুর-ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও বয়সের ছেলেদের স্বভাবই হল ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান।

মেরীর মা চলে যাবার পরে আরও একটুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে আগাথা। তার পর মেরীর বাবাকে অনেকটা সান্ত্বনার সুরেই বললে—'অমন অবুঝ হলে কি চলে? মেয়েটার দিকেও ত আমার নজর রাখতে হবে। এখন আমি যাই—কেমন?'

ঠিক এই মুহূর্তে আগাথাকে আটকে রাখার কোন চেষ্টাই করলেন না তিনি। নিঃশব্দে গর্জন করতে লাগলেন বসে বসে, কেন না, আগাথা থাকলে তার কাছে এই প্রত্যাশায় চুরুটটা নিবে যেতে দিয়েছিলেন।

অন্ধকারে সাড়া দিলে মেরী—'এই যে মাদাম আমি।'

পাঁচীলের ধারে মেরীর গায়ে হেলান দিয়েই দাঁড়াল আগাথা।

দিগন্তপারে চন্দ্রকলা। এখনো জ্যোৎস্নালোকে নদীতল দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি। তীরের ঘাস-বন আর জলভারের সারি থেকে একটা শীতল বাতাস উঠে আসছে উপরে।

মিনতি করে বললে মেরী—'আর আমার প্রতীক্ষায় রেখো না মাদাম!' বলো কি হল আজ। বড় উতলা হয়ে রয়েছি।'

আগাথার বুকের ভিতর মুখ দিয়ে সোহাগ করতে লাগল অনুরাগিণী। যেন ও তার সঙ্গিনী নয়। নির্জন অন্ধকারে হঠাৎ পাওয়া তার প্রেমের পুরুষ। এই ত এখনো এক ঘণ্টাও হয়নি আগাথার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে—কথা হয়েছে।

—'কত দুষ্টুমিই তুমি জানো?' অন্ধকারে মৃদু হাসল আগাথা।

মন কত লঘুভার বোধ হচ্ছে। যেন কিসের কমনীয়তা সঞ্চারিত হচ্ছে তার প্রাণপদ্মে। এ তার সুখ নয়—আসন্ন সুখের সম্ভাবনাও নয়। সুখের প্রত্যাশা থাকলে কখন তার মনের হিম-তুষার দ্রবীভূত হয়ে ঝরে পড়ত বিগলিত ধারায়। পাষাণী আগাথাকে ভয় করে না কে এদের সমাজে? কিন্তু সে মেয়েও যে দিন মনের মানুষ পাবে সে দিন কত কান্নাই না কাঁদবে সে! যেদিন পুরুষের বাহু তাকে পরম আগ্রহে আবদ্ধ করবে আলিঙ্গনে, আর ব্রীড়াময়ী নিশ্চিন্ত নির্ভরে প্রেমিকের কাঁধে মাথা রেখে হবে পুলকিততনু, সেদিন নয়নের প্রেমাশ্রু-ধারায় তারও সব রূঢ়তা

কঠিনতা ধুয়ে-মুছে যাবে। পূর্ণতায় সার্থক হবে তার আত্ম-নিবেদন।

—'বলার কিছু নেই মেরী'—বললে আগাথা—'সে ত স্বপনে জাগরণে তোমার রূপ জপ করছে নিশি-দিন। আশা-নিরাশায় দোল খাচ্ছে মন তারও। এইটুকু খবরই তোমায় আমি দিতে পারি এখন।'

বলতে বলতে তফাতে সরে দাঁড়াল আগাথা। মর্মরিত কণ্ঠে বললে—'তোমার মা আসছেন।'

তবে যে বললেন তিনি ঘুমুতে যাচ্ছেন? এদের দুটিকে এক জালে আটকে ফেলতে চান নাকি? তার সন্দেহ সত্যি কি না তাই কি পরীক্ষা করতে এলেন এই ভাবে?

মেয়েকে ডেকে বললেন মা—'তোর জন্তে একটা গরম জামা নিয়ে এলাম। গায়ের শালটা মোটে গরম নয় তোর। ওটা আগাথাকে দিয়ে এইটে গায়ে দিয়ে নে।'

দু'জনের মাঝখানে এসে ছাতের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মা। সন্দেহ না ভালবাসায় কিসের বশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি, এরা দু'জনে কেউ-ই বুঝতে পারলে না। কথায় ত কিছুই প্রকাশ পেল না।

—'আজ মেঘ-কুয়াশার লেশ নেই আকাশে' বললেন মা—'চাঁদের জ্যোতির্মালা অবধি হয়নি। আর এক পশলা বৃষ্টি হলে কার কি ক্ষতি হত বল ত? মাটী শুকিয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছে। এই সব ঝিরঝিরে বৃষ্টির জলে কি সে পাথর ভিজে নরম হয় কখনো? কি? কি যেন বললে কে শুনলাম?'

একটি কথাও উচ্চারণ করলে না মেরী। আজ মা তাকে কাছছাড়া করবেন না স্থির করেছেন। ছাতে এই ভাবে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বরং ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া ভাল। রাতের মত শেষ চুমু দিতে আগাথা এক সময় তার ঘরে আসবেই—তখন বরং কথা কওয়ার সুযোগ পাবে মেরী।

সহরের ঠিক বাইরে দুই বন্ধুতে দেখা করার কথা ছিল আজ রাত্রে।

আকাশমুখী হয়ে হাঁটছিল নিকোলাস। নিরালোক জগতের জীব সে। আজকের এই চন্দ্রালোকিত নিদাঘ রজনীর পটভূমিকায় উন্মোচিত জ্যোতির্জগতের যে অপার রহস্য, সে তার বহু দিনের চেনা। তবু আজ এই রাত্রে সেই পরিচিত রসলোকের সন্ধানী নয় সে। চারি পাশের ঝরা পাতার মরমরানি কিংবা দূরান্তে কোন কুকুরের চকিত ডাকার প্রতিধ্বনি অথবা কাক-জ্যোৎস্নায় বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত কুক্কুট রব—আজ সবই তার শ্রবণলোকের অতীত। কঠিন মৃত্তিকাস্তূপের উপর বন্ধু গিলসের ভারী বুটের শব্দ তার নিজের পদধ্বনির সঙ্গে সমছন্দে ছন্দিত হচ্ছিল, তাই দু' কান ভরে শুনছিল নিকোলাস। চাঁদ তাদের পিছনে বলে দুটো বিলম্বিত ছায়ামূর্তি অগ্রগামী। কখনো বিচ্ছিন্ন, কখনো একাকার। যেন এক অদৃশ্য অনির্বচনীয় রহস্য-সূত্রে গ্রথিত তাদের এই চলার পথ। মাথার উপরে তারা-ভরা যে আকাশ—তারই কোন একটি নক্ষত্র-যুগল যেন তাদের জীবন—ভাবলে নিকোলাস।

অবিশ্রান্ত কথা কইছে গিলস। বিরাম বিরতিহীন। আজ রাত্রে ভগবানের বিশ্বভুবন জুড়ে যে বাণীহীন বিপুল শান্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, গিলসের যতিহীন ধ্বনি-হিল্লোলে সে সমুদ্র মৃদু তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে। চেতনার অন্তর্লোকে অবগাহী তার মন কান পেতে শুনছে সেই বিক্ষেপ ধ্বনি।

কথা যখন শেষ হয়ে আসবে তখন গিলস তাকে কি প্রশ্ন করবে তা' জানে নিকোলাস। আর সে প্রশ্নে বন্ধুকে নিরাশ করে না তাকে বলতেই হবে। নিজের ধৈর্য দিয়ে সে মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করতে চাইছিল নিকোলাস।

চিরকালের জন্তে তোমার মনে একটা দৃঢ় মূল ধারণা জন্মে গেছে যে অন্য কাউকে ভাল বাসতে পারি না আমি। সেই জন্যে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাও না যে, মেরীকে আমি ভালবাসি। এ ভালবাসায় তোমার বিশ্বাস নেই—ভালবাসা কি তা তুমি সম্ভবত জানোও না। আসলে প্রেমের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তোমার জীবনে। কবিতাকে তুমি ভালবাসো, বন্ধুত্ব আর কবিতা নিয়ে তোমার মনের প্রয়োজন মিটে যায়। আমার একার ভালবাসাতেই তোমার তৃপ্তি হয়, তাই আর কাউকে তুমি চিনতে চাও না—পেতেও চাও না। বলো, এই তোমার মনের কথা কি না?'

বন্ধুর উত্তর শোনার ধৈর্য অবধি নেই গিলসের। আপন মনেই সে বলে চলে—'আমি যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ঘর সুখী হব, তা তুমি চাও না। তার জন্তে অবশ্য তোমায় আমি দোষ দিই না। আমার জীবনে কোন মেয়ে এলে আমাদের বন্ধুত্বটি আর এখনকার মত থাকবে না, এই তোমার ভয়।'

'কী বলছ তুমি গিলস'—এর অতিরিক্ত আর কিছু বলতে পারলে না নিকোলাস।

কথা কইতে কইতে দু'জনে নদীর ধারে পথের মোড়ে এসে পড়েছিল। সেইখানে ব্রীজের উপর দাঁড়াল দু'জনে। নদীর ধারে এমনি করে দাঁড়িয়ে ছল-ছল প্রবাহিত জলের গন্ধবাহী বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে কত ভাল লাগে। পকেট থেকে সিগারেট বার করলে গিলস। লাইটার জ্বালিয়ে সেটিকে ধরিয়ে নিলে। সেই ক্ষণ-প্রভ আলোকে গিলসের তরুণ মুখের অনেকখানি চোখে পড়ল নিকোলাসের। চোখে পড়ল কপালের সেই কী পরিচিত কুঞ্চন। অধরোষ্ঠের দুই প্রান্তে দুটি অর্ধবৃত্তের ইঙ্গিত নরম গালে নবীন পৌরুষের কলঙ্করেখা।

মুহূর্ত মধ্যে সে জ্যোতিকণা নির্বাপিত হল। তখন জ্যোৎস্না লোকে চেনা মুখের আর কিছু চোখে পড়ল না। শুধু ছায়ার একটা অস্পষ্টতা দৃষ্টিগোচর হয়ে রইল।

'আমায় তুমি ক্ষমা করো ভাই!' বললে নিকোলাস—'আমি মানুষটা এমনিই খুব ভাল নই। তার ওপর কষ্টে পড়লে আমার মন বেসুরো হয়ে থাকে—'

জুতো খুলে রেখে ব্রীজের ধারে আরাম করে বসল দুটি বন্ধুতে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে খেলা করতে লাগল জলস্রোতের সঙ্গে তাদের পায়ের নীচে উপলখণ্ডে নৃত্যপরা নদীর জল। দুই বন্ধুতে সেই নূপুর ধ্বনি শুনতে লাগল শ্রবণ ভরে।

বন্ধুর মাথায় হাত রাখলে নিকোলাস। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—'কী অল্প বয়স তোমার গিলস—কত যৌবন তোমার শরীরে!

গিলস সে-কথায় কান দিলে না। আপন মনে বললে, 'মেরী—মেরীকে নিয়ে আমার এই ভাবনা তোমার কাছে খুব আশ্চর্য ঠেকে, না? বলো না—স্বীকার করতে দোষ কি?'

নিকোলাস তার কথায় সাড়া দিলে না দেখে গিলস আবার বললে—'সত্যি বলতে কি, জিনিষটা আমার নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য ঠেকে। কি জানি হয়ত এই ভাবে আমি মুক্তি পাব।'

—'মোক্ষের ভাবনা ও তোমার একার নয়। সব মানুষেরই যতটুকু দরকার তোমারও ততটুকু প্রয়োজন মোক্ষের। তার জন্যে বিশেষ দুর্ভাবনা কি?'

অস্ফুট শিরশিরে গলায় গিলস বললে—'থাক থাক। তুমি এমন নিরীহ অবুঝের মত কথা বলছ যেন আমার জীবনের কথা কিছুই জান না। যা বলেছি কিংবা যা কখনো বলিনি—কী তুমি জান না বল ত?'

—'তোমার বয়সী ছেলেরা যেমন তুমি তাদের চেয়ে কিছুমাত্র অন্য রকম নও।'

—'সত্যি বলছ নিকোলাস?' বলে কিসের প্রত্যাশায় যেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল গিলস। তার পর বললে—'তার মানে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যে তাকে খেলাতেই হবে আমায়, যত দিন না তুবার্ণেরা ব্যাপারটাতে একটু অভ্যস্ত হয়ে পড়ে—' কার কথা বলছে বন্ধু তা যেন তার বুদ্ধির অগোচর, এমনি একটা ছলনার শেষ অভিনয় করলে নিকোলাস।

তার ভাবভঙ্গী দেখে অধীর কণ্ঠে গিলস বললে—'অত আশ্চর্য হবার কি আছে বন্ধু? আগাথাকে চেনো না তুমি? তাকে অত সহজে বিশ্বাস করানো যাবে না—তা আমি ভাল ভাবেই জানি। হয়ত বলবে, কোন একটা অঙ্গীকার করতে—কথা দিতে। হয়ত একটা এনগেজমেণ্টের পাকাপাকি করতেও চাইতে পারে। জিনিষটা খুব গোপনীয় রেখে সে ব্যবস্থায় তোমায় রাজী হবার ভাণ করতেই হবে বন্ধু!'

এ কথায় প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলে না নিকোলাস।

—'এমন ধারা কথা কি করে বলতে পারলে তুমি গিলস? না, না, তা হতে পারে না। কোন কিছুর বিনিময়েও কাজ আমি করতে পারব না। তাকে যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছি আমি—বলতে গেলে আমার জন্যেই তার মন ভেঙে রয়েছে—তার ওপর—

তার কথা শুনে গিলস সরে গিয়ে বসল দেখে নিকোলাস বুঝতে পারলে যে তার মেজাজের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

তাই মিনতির সুরে বললে—'কেন দুঃখ অভিমান করছ গিলস? আমার অবস্থাটা তুমি বিবেচনা কর; তুমি হলে নিরঙ্কুশ ভাল মানুষ। স্বভাবটা আমারই তত ভাল নয়। আর সকলের দুঃখে আমার মন মমতায় ভরে ওঠে—শুধু যে মেয়ে আমায় ভালবেসে দুঃখ পাচ্ছে তার জন্যে হয় না। সেই অভাগিনীর বুকে যে ভালবাসার আগুন জ্বলছে আমার জন্যে তাতে কোন ভাগ নেই আমার। তার জ্বালায় আমার মন ত গলেই না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণায় ঝরে যায়। একে তো সেই বিতৃষ্ণায় আমার শরীর

মন জর-জর হয়ে উঠেছে, তার ওপর তুমি বলছ কি না তার সঙ্গে আরো ছলনা অভিনয় করতে?'

'কী পাগলের মত কথা কইছ? ক'টা দিন ত তাকে আনন্দলোকের স্বপ্ন দেখবে তুমি—চিরকালের জন্যে ত নয়। মুগ্ধ মেয়ে মানুষ সে-স্বপ্নকেই সত্য বলে জানবে। সুখ আর সুখের কুহক দুয়ের মধ্যে আসলে তফাৎটা কি বল ত?'

'এতটা ছলনা কি আমি পারব?'

বন্ধুর কথার ভূমিকায় গভীর মনস্তাপ পেলে নিকোলাস। মন যেন অশুচিতায় ভরে উঠল—কথা জোগাল না মুখে।

দাঁড়িয়ে উঠে অনেকখানি হেঁটে চলে গেল গিলস আপন মনে। ফিরে এসে যখন আবার কথা কইলে, তার রূঢ় ভঙ্গিতে বিস্মিত হল নিকোলাস।

'সে ভাবনা তোমার নেই বন্ধু! ও-রকম কাজের যোগ্যতা যে তোমার কোন দিন হবে না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই আমার মনে। তুমি কেমনধারা মানুষ শুনবে আমার মুখে? দুনিয়ায় তোমার মত বিরক্তিকর অপাংক্তেয় লোক নেই। মরার পর কবে তুমি ভগবানের বিচার-সভায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নেই—সেই ভাবনায় এখন থেকে তুমি পাপ-পুণ্যের জমা-খরচ মিলিয়ে রাখছ। আর সেই অহঙ্কারে চলেছ সংসারের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। যদি মেবীর ভালবাসা আমায় সত্যিই হারাতেই হয়—ত জানব যে তোমার সাধুসঙ্গ করেই আমার সেই লাভ হল।'

দুটি হাত জড়ো করে আকাশে তুললে নিকোলাস। অবাক কণ্ঠে বললে—'কি বলছ গিলস! আমি আবার সাধু হলাম কবে?'

যেন জোর করেই হাসলে গিলস।

—'বাবা, তুমি সাধু নও! তুমি সাধু নও ত সংসারে সাধু কে শুনি? জীবনকে তুমি ভালো হবার ফরমুলায় বেঁধে ফেলেছ। বলো সত্যি কি না?'

'আমারটা ত বেশ বুঝলাম। আর তুমি বুঝি যত দূর অধঃপাতে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করছ?'

—'আমি? আমি বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে যা করেছি তা তোমার কাছে অবধি স্বীকার করতে চাই না। বন্ধু আমি তাকেই বলি, যে নদীতে অজানা লাশ ফেলে দিতে এগিয়ে আসে, অথচ একটি প্রশ্ন করে না মুখ ফুটে।'

—'অত দূর অবধি আমার কাছে আশা কোরো না তুমি গিলস।' নিকোলাসের কণ্ঠে ক্ষুরস্ত ধারা।

সে শাণিত প্রত্যুত্তর শুনে একটি অস্ফুট শব্দোচ্চারণ করে গিলস সহরের দিকে পা বাড়াল। নিশীথ রাত্রির পটভূমিকায় তার ভারী বুটের শব্দ অনেক দূর অবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুনতে লাগল নিকোলাস সেইখানে নিথর বসে বসে। সেই প্রতিধ্বনি এক সময় তার দুই কান ভরে বাজতে লাগল তার শরীর-মন জুড়ে। তখন বিশ্বচরাচরে আর অন্য ধ্বনি রইল না।

চকিতে উঠে উন্মত্তের মত ছুটতে লাগল নিকোলাস। যখন বন্ধুর নাগাল পেল, ততক্ষণে তার দম ফুরিয়ে এসেছে। গিলস তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

—'শোন গিলস'—বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল নিকোলাস—'দেখ। আমার মাথায় একটা সুন্দর মতলব এসেছে। মনে হয় এবার আমি সমস্ত ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে পারব। তবে কয়েকটা দিন আমায় ভাবতে সময় দিতে হবে তোমাকে—'

শুনে গিলসের মন হাল্কা হল। তার প্রয়োজন বলেই যে নিকোলাস এতখানি দুর্বলতার প্রশ্রয় দিচ্ছে তা বুঝতে বাকী রইল না গিলসের। কিন্তু মনের ভাব অগোচর রাখলে সে।

'সেপ্টেম্বর মাস পড়ে গেছে'—বললে গিলস—'আর বেশী দিন এই ভাবে চলতে দেওয়া চলে না। তা হলে হয়ত দেখব পায়ের নীচে আর দাঁড়াবার মত জমি নেই। সে যে কি কঠিন-হৃদয় মেয়ে-মানুষ, তা বোধ হয় তোমারও অজানা নেই বন্ধু!'

দুজনে নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করতে লাগল। আজ রাত্রে পরস্পরের গোপন ভাবনা প্রকাশ করলে না দুজনেই।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল গিলস—'সত্যিই কি তুমি ঐ মেয়েটা—মানে আগাথার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা—'

—'ছি ছি! কি নোংরা কথা যে বল!'

—'আমি কিন্তু পারি'—মনের গভীর স্তর থেকে কথা উঠিয়ে আনতে লাগল গিলস অন্যমনস্ক ভাবে—'আমি পারি ঐ মেয়ের সঙ্গে—কিন্তু সে কি হবে জানো?'

কদর্য হাসি হাসলে গিলস। তারপর আরও অনেক অপরিচ্ছন্ন কথা বললে। যে অনির্বচনীয় অপরূপা রাত্রিকে সঙ্গী করে বেরিয়েছিল নিকোলাস, রাত্রির সে রূপ আর রইল না চোখে। সে পবিত্র শুচিতা হরণ করেছে গিলস, ভাবলে নিকোলাস। চেয়ে দেখলে গীর্জার দিকে। মনে হল ঐ গীর্জা যেন বিশ্বজোড়া অন্ধকারে নোয়ার জাহাজ। ভাঁটা-লাগা বন্যাস্রোতে চড়ায় আটক পড়েছে। নোংরা পরিবেশের মধ্যে ইঁদুরদের লুণ্ঠন দস্যুতার কে যেন ইন্ধন হিসাবে যুগিয়ে দিয়েছে এখানে।

নিকোলাসের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে যেতে বন্ধুকে বললে নিকোলাস—'না না, এখন আর ওপরে এসো না।'

৯

আজ আর সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে আলো জ্বাললো না নিকোলাস।

মা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন ভাবছিল সে—এমন সময় খনখনে মিহি গলায় তার নাম ধরে তাকে ডাকতে শুনতে পেল নিকোলাস। যতক্ষণ ছেলে বাড়ী না থাকে এক তলার ছোট ঘরখানিতে ঘুমোন তিনি। দরজায় সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে নিকোলাস মায়ের বিছানার ধারে একেবারে তাঁর বালিসের শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁধান দাঁত খুলে রেখেছেন মা। গাল দুটি বসে গেছে। চশমা নেই চোখে। মায়ের চাউনি বড়ো রূঢ়, অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে; যেন মানুষের দৃষ্টি নয়—পাখীর চোখ, নয় ত মাছের চোখ মনে হচ্ছে।

'বড়ো দেরী করিস বাবা! আমি দরজায় চাবী দিতে পাচ্ছিলাম না। কোন দিন তোর জন্যে আমি দেখছি খুন হব।'

গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে নিকোলাস।

—'কেন, আমায় একটা আলাদা চাবী দিলেই ত পারো মা?'

—'তা আবার নয়? চাবী তোমার হাতে না দিলে হারাবার সুবিধে হবে কেন?'

বারো বছর আগে একবার নিকোলাস একটা চাবী সত্যিই হারিয়েছিল। সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না মা। এই বার নিয়ে অন্ততঃ হাজার বার বলা হল সে-কথা। তালাটা পাল্টে দিতে হয়েছিল, কিন্তু মা চাবীওয়ালার বিলটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।

মায়ের ওপর অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে নিকোলাস——'কি করতে বল আমায়? তবে কি জানলা টপকে বাড়ীর ভেতর ঢুকব না কি?'

—'করবে আবার কি? সন্ধ্যেটুকু মায়ের কাছে থাকবে, যে মা তোমার সেবা করে করে শরীর পাত করে ফেললে। তোমার মুখ চেয়ে যে মা আর বিয়ের কথা ভাবেনি—বিয়ের সুযোগ যে আসেনি তা কখনো ভাবিসনি মনে মনে। তোমার ইস্কুলের মাইনে যোগাতে যে মা ঠিকে কাজ করেছে—বড় লোকের ঘরে কাপড়-চোপড় কেচে দিন কাটিয়েছে। এখন যে গীর্জার পুরোহিত আমায় কাজ দিয়েছিল সে-ও সৎলোকের দাক্ষিণ্যের পয়সা ভালো হাতে পড়বে এই ভরসায়।'

নিষ্প্রভ কণ্ঠে জবাব দিলে নিকোলাস—'আমি কি কখনো আমার কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করেছি তোমার কাছে?'

'তুমি আমার ভালো ছেলে—সে আমি হাজার গলায় বলব। কিন্তু আজ-কাল ঐ সব বদ ছেলের সংসর্গে পড়ে তুমিও যেন আমার বদখেয়ালী করে বেড়াচ্ছ, এই আমার নিত্য ভয় হয়—'

—'ও কথা কেন বলছ মা? তুমিই ত বলো ও বড়ো ভালো ছেলে—'

—'সে বলি বাছা যাতে তোমার মনে দুঃখ না লাগে। আমি মা, নিজের পেটের ছেলের মন জলের মত দেখতে পাই আমি—'

মায়ের গলায় অস্পষ্ট ঈর্ষ্যার ইঙ্গিত পেল নিকোলাস। মনে পড়ল একদিন কবিতা লিখেছিল সে।

—'যে অভাগিনীর কপালে কুঙ্কন—জীবনের সর্বস্বের চেয়ে যিনি আমায় ভালবাসেন তিনি আমার মা।' কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সে কাব্যময়ীর সঙ্গে এই শয়নলীনা প্রত্যক্ষময়ীর কত দুস্তর ব্যবধান!

এ সহরের কে না বলে যে সার্লোদের ঘরের ঐ ছেলেটা কিছুমাত্র সুবিধের নয়! ওর সঙ্গে তোমার কিসের এত ভাব—তা বাপু আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না।'

সেই নিষ্ঠুরভাষিণীর মুখের কাছে নত হয়ে নিবিড় স্নিগ্ধতায় নিকোলাস চুম্বন করলে জননীর মুখ। বললে—'এইবার তুমি ঘুমোও মা।'

কিন্তু মায়ের গজর গজর থামল না। তিনি তেমনি অভিমানী স্বরে বললেন—'অন্ততঃ কথার একটা জবাব ত দিয়ে যাবে? একটা কথা বললাম, তার জবাব দেবার দরকার বোধ কর না এমনই কি অপদার্থ বুদ্ধিভ্রংশ ভাব বাছা মাকে।'

মনের সব বিরূপতা সরিয়ে ফেলে খুব সহজ একটা স্মিত হাসি হাসলে নিকোলাস। তারপর দরজার কাছে পৌঁছে আদরের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে মাকে চুমু দিলে।

সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠতে লাগল নিকোলাস—দু'টি পা যেন কিসের ভারে মন্থর হয়ে পড়েছে। যেন পিঠের উপর কত দুর্ভর ভার—যেন একটা বিরাট ভারী লোহা তার কাঁধকে ফাটিয়ে দু' ভাগ করে ফেলেছে।

তেলের বাতি জ্বালিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল নিকোলাস নিজের নির্জন ঘরের মধ্যে। আজ সন্ধ্যে থেকেই অন্যমনস্কতায় কখন তার মনের কুয়াশা সরে গেছে। যে কুহকাচ্ছন্ন দৃষ্টির প্রদীপালোকে জগৎকে সে দেখে বেড়ায় কখন অলক্ষ্যে সেই কুহকের আবরণ খুলে পড়ে গেছে।

মাকে আজ বড় প্রত্যক্ষ প্রকট দেখতে পেয়েছে সে। নিজের ঘরখানিও আজ আর মায়াময় বোধ হচ্ছে না—যেন কোথায় কি সব বদলে গেছে। ঘরের ছাতে বাড়ির ভুযোলাগা স্যাঁতাধরা দাগটা প্রতিদিন বড় হচ্ছে। চাপড়ে-মারা মাছির দাগে দাগে দেওয়ালের কাগজগুলো শতকলঙ্কী। তার মেহগনী খাটের পাশে রাখা নোংরা পাত্রটা থেকে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ পেলে নিকোলাস। যে দামী ভারতীয় শালটা তার টেবিলের উপর এত কাল শোভা বর্ধন করে আসছে, যার রূপ অপরূপ কারুকার্যতার কত কবিতাকে রোমাঞ্চময় বর্ণনায় শিহরিত করেছে—সেটার দিকে তাকিয়ে মনে তার অরুচি ধরল। উইপোকায় শতছিদ্র করেছে শালটা। মোমের বাতির দাগে দাগে তার আর রূপ-জৌলুষ কিছুমাত্র অবশেষ নেই। আরাম কেদারার পিছনের দিকে যেখানে গিলস হেলান দিয়ে বসে, সেখানে মাথার তেলের কদর্য একটা দাগ ধরেছে দেখে তার শরীর অস্বস্তিতায় রী-রী করে উঠল।

গিলস! মনে মনে উচ্চারণ করলে নিকোলাস। গিলস! তার রূপবান শরীরের ঢল-ঢল যৌবনের জোয়ার নেমে আসছে ইতিমধ্যে। এখনি যেন বুঝতে পারে নিকোলাস আর দশ বছর পরে ভাঁটার অল্প জলে গিলসের চিত্ত-জলাশয়ের কি চেহারা তার চোখে পড়বে! সেই আগামী প্রতিচ্ছবির দুটি একটি খুঁটিনাটি ইতিমধ্যেই বিম্বিত হয়েছে না ওর মুখে?

ফুঁ দিয়ে দীপটা নিবিয়ে দিলে নিকোলাস। বাইরের হাওয়ার দোলায় দোলায় গরম তেলের গন্ধটা ধীরে ধীরে মৃদুতর হয়ে এল ঘরের মধ্যে। সেই চেনা আধ-আঁধিয়ারে অভ্যস্ত হয়ে এল দু'টি চোখ। চাঁদ কখন নেমে গেছে দিকচক্রবালের দিকে। তার পিছনে একটা দুগ্ধশুভ্র ছায়াপথের ভূমিকা দেখা যাচ্ছে নীলাকাশে। আর দেখা যায়, সেই দিগন্ত-জোড়া নীল জলধির অসীম শূন্যতায় তটরেখার অস্পষ্ট আভাসের মত—দুটি-একটি মেঘের অস্ফুট সংশয়। কেবল একটি নিঃসঙ্গ তারা ঐ আকাশ-প্রাঙ্গণে জোনাকির মত ঝিকিমিকি করছে।

সেই নৈসর্গিক প্রকৃতির দিকে উন্মনা হয়ে তাকিয়ে রইল নিকোলাস। গিলসের নাগাল ধরার জন্যে ডোর্থের পথে যখন ছুটে যাচ্ছিল সে,—যে—আচম্বিত চিন্তা তার মনকে স্বর্ণপ্রভার মত আলোকিত করে দিয়েছিল—সেই পরম লগ্নটিকে আরো কিছু কালের জন্য বিলম্বিত করতে চাইলে নিকোলাস।

'মাথায় আমার একটা আইডিয়া এসেছে কিন্তু তার জন্যে আমায় আর কিছু দিনের সময় দিতে হবে ভাই!'

আইডিয়া! সত্যি আইডিয়াই বটে। সেই মনোলীন আইডিয়ার ভয়াল রূপ-কল্পনায় বিমোহিত হয়ে রইল নিকোলাস।

গিলসের অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করবে না কিন্তু তাই বলে কোন মিথ্যা প্রবঞ্চনা অন্যায়ের আশ্রয় নেবে না নিকোলাস। আগাথাকে যে অভিজ্ঞান অর্পণ করবে সে তার মধ্যে কোন ফাঁকি রাখবে না নিকোলাস।

সে মহাশূন্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করে ভয়ার্ত গভীরতার পরিমাপ করতে চায় না এখন। কত মাস যাবে। হয়ত বা কত বৎসর! সে দুরবগাহ শূন্যতা আর তার মধ্যে তার মা আরও কত দিন আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকবেন! মা বড়ো ঘৃণা করেন আগাথাকে। মায়ের আপত্তি তাকে খণ্ডন করতেই হবে একদিন। আর তার দারিদ্র্য! নিজের ক্ষুধা মেটাবার যোগ্যতা নেই তার—কেমন করে জায়া-পুত্র-পরিবার প্রতি-পালনের অত দায়িত্ব নেবে সে?

আগাথার সঙ্গে যে এনগেজমেণ্ট করবে নিকোলাস, তার মধ্যে কোন কপটতা বঞ্চনা থাকবে না। বাগ্‌দত্তার সঙ্গে থাকবে তার চারশ' মাইলের ব্যবধান। হৃদয়ের পরিচয় ঘটবে পত্রদূতীর মারফৎ। ভারী মিষ্টি হাতে চিঠি লেখে আগাথা। সে-ও লিখবে চিঠি, যত খুশী চাইবে তার বাগ্‌দত্তা। এইটুকু অবধি ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু তার পর যত দেরীই হোক—একদিন সেই অনিবার্য ঘটনা ঘটবেই ত তার জীবনে। মুখোমুখী দাঁড়াবে সে বিপর্যয়ের।

সে অবশ্যম্ভাবী দিনটির কথা ভাবতে লাগল নিকোলাস। কত রকম করে নিজের ভাবনাকে ভাঙাচোরা করতে লাগল। দু'জনের কি দুটি পৃথক্ শয্যা থাকবে? থাকবে দু'জনে পৃথক্ ঘরে? কিছুতেই ব্যবধান হবে না, ভাবলে নিকোলাস—যদি না তাদের দু'জনের মাঝখানে থাকে এমন কোন নিশ্ছিদ্র বাধার প্রাচীর—যার দুই পাশে দুটি প্রাণীর নিঃসঙ্গতা হবে নিরঙ্কুশ। সে পরিবেশের সঙ্গে নিজের মনকে মানিয়ে নিতেও তার বেশ কিছু সময় লাগবে।

একদিন তাদের সন্তান হবে। সে সম্ভাবনায় নিকোলাসের মন অনেকখানি আকাশ পথযুক্ত পক্ষ কল্পনায় অতিক্রম করে চলে গেল। আত্মজ শিশুর হাসিতে-খুশীতে ভরে উঠবে তার জীবনের শূন্য আকাশ। আগাথার কোলে তার শিশু—তা হোক—ভাবলে নিকোলাস। গড়নে, দেখতে-শুনতে এমন কিছু মন্দ নয় মাদাম আগাথা। জীবনে খুশীর জোয়ার এলে অমন পাষাণী মুখ-গোমড়া মেয়েও মোহিনী হয়ে উঠবে। যেদিন মেরীর সঙ্গে গিলসকে নির্জনে দেখা করবার সুযোগ দেবার জন্যে নিকোলাস তাকে নিয়ে গিয়েছিল বনান্তরালে, সে দিন কী বিকশিত রমণীয়তাই না দেখেছিল আগাথার মুখে। চেনা মেয়েকে যেন চিনতেই পারেনি নিকোলাস, এত উঁচু সুরে বাঁধা ছিল তার মনোবীণা। সহজ ভাবে কইতে পারেনি সহজ কথা। কথা কইবার আগেই অনুরাগিণীর হৃদয় অস্থির—পুলকিত তনু জর জর কম্পিত পল্লব দুটি নয়নের। রমণীর কণ্ঠে দুস্তর লজ্জা।

ঐ মেয়ের যে ছবিটি মনের পটে কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে চায় না নিকোলাস, সে তার প্রথম দর্শনের স্মৃতি। বার বার আজ আগাথাকে সেই ভাবে-ভঙ্গীতে দেখতে পেলে সে। সেদিন আগাথা বলেছিল—'কী হল গো তোমার? অমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছ কেন?'

তার পর দিনে দিনে অবশ্য সবই সহজ সরল হয়ে গেছে। অন্ততঃ এবার গিলস বাঁচবে। সুখী হবে। মন আবার সন্দেহে দুলতে লাগল তার। সুখী হবে না গিলস—তবে শান্তি পাবে—পাবে আরাম। রবিবারে গীর্জায় যেমন অনেক আয়েসী লোক দেখে নিকোলাস, বন্ধু গিলসও তাদের মত ঘাড়ের উপর চর্বির ঢেউ-খেলান থর নিয়ে আরাম করে বসবে। এখন থেকেই ত সে চোস্ত কলার গলায় আঁটে।

গিলসের কথা ভাবতেই মন ফিরে গেল যৌবনের সেই মধুর দিনগুলিতে। সারা দিনমান প্যারিসের পথে পথে কত গল্প করে বেড়াত তারা দু'জনে। রাত হয়ে এলে ক্লান্ত শরীর জুড়াতে দু'জনে আরাম করে বসত মেডলীনের মুখোমুখী বেঞ্চিতে। তার পর কবিতা আবৃত্তি করত নিকোলাস মন্দ-মধুর কণ্ঠে।

মনে পড়ল, অমনি একদিন গিলস তাকে বলেছিল—'এ রাত ভোর হবার আগে যদি দু'জনে একসঙ্গে মরি—কি ভালোই লাগবে বল ত?' [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জনৈক। গৃহবধূর ডায়েরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মনোদা দেবী

এদিকে সেই কান্নাকাটির পরে দিদি শ্বশুরবাড়ী হইতে (অর্থাৎ কুড়াশী গ্রামের রাজপুত্রবধূরূপে) আসিলেন সোনারঙ্গে। সঙ্গে লোক-জন, চাকর-দাস-দাসীতে পরিপূর্ণ একখানা গ্রীণবোটে করিয়া। আমাদের এ বাড়ী হইতেও সঙ্গে ধাই-পিসিকে দিদির সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। ধাই-পিসি ছিলেন আমাদের অতি স্নেহশীলা। তিনি না কি আমার বাবাকে বিবাহ করাইয়া বৌ লইয়া আসিয়াছিলেন, তার পরে দিদির সঙ্গেও অনেক দিন কাটাইয়া আসিয়াছিলেন। তার পর আমার বিবাহের সময়ও আমার সঙ্গে ছিলেন ও তার পরে আশার সঙ্গেও তার শ্বশুরবাড়ীতে যান। ধাই-পিসি ছিলেন আমাদের স্নেহময়ী পিসিমাই বটে। ধাই-পিসি আসিয়া দিদির বাড়ীর অনেক ২ কথা বলিতে লাগিল। দিদিমা হাসিতে ২ সবই শুনিয়া যাইতেছিলেন। তার মধ্যে একটি মজার কথা ছিল এই যে, দিদির বাড়ীর দাসীটিকে সবাই সেখানে খুব ক্ষেপাইত। বেচারা ভাবিল, যাক্ ছেলের শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে—এখানে আর কেহই ক্ষেপাইয়া ছড়া বলিবে না। কিন্তু এদিকে ধাই-পিসি রগড় করিয়া সেই ক্ষেপানোর মন্ত্রটি আমাদের বলিয়া ফেলিল। আর কি উপায় আছে, যত ছোটর দল দিদির বাড়ীর দাসীটির পিছনে লাগিয়া গেল। দাসীটির নাম ছিল 'আরাধনী'—"আরাধনী বারা বান্ধে ঢেঁকি উঠে না, তেল সিন্দুর পইরা রইল জামাই আসে না।" হায়! হায়! কি অঘটনটাই না হইল! কৃত্রিম কোপের সহিত দিদিমা লাঠি হাতে ছোটর দলের পিছনে ২ ছুটিলেন, কিন্তু দুষ্টের দলকে দমন করা দিদিমার অসাধ্য ছিল।

তখনকার দিনে পদ্মানদীর দক্ষিণ ও উত্তর পাড়ের লোকজনদের আচার-ব্যবহারে অনেকটা পার্থক্য ছিল। দক্ষিণ পাড়ের বিশেষতঃ রাজবংশের জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা একটু বেশী ২ সেকালের ভাবাপন্ন ছিল। উত্তর পাড়ের লোকেরা তাহাপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া দু'পুকুরের ডেপুটী-বাড়ী আমাদের তখনকার দিনেও নানা বিষয়েই চক্ষুষ্মান্ হইয়া গিয়াছিল। তাই দিদির সঙ্গে রাজবাড়ীতে যাইয়াও ঠিক এ' বাড়ীর মত অনেক কিছুই অন্ত রূপ দেখিতে পাইয়া ধাই-পিসি যেন একটু মনমরা হইয়া গিয়াছিল। দিদিমা-কিন্তু সে সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি জানিতেন এই উত্তরপাড়ের ও প্রায় সকল গ্রামেই আমাদের মত এত-শত ফিটফাট থাকিত না। যাক্, যথাসময়ে মানে সম্মানে রাজবাড়ীর নৌকাখানিকে যথাযোগ্য ইনাম বকসীস্ প্রদানান্তে বিদায় দেওয়া হইল; এত দিনে দিদি যেন হাঁফ ছাড়িয়া মাথার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বাঁচিলেন। একদিন রাত্রে পান খাইতে উঠিয়া দিদিমা ফোঁপাইয়া ২ কাঁদিতে ২ দাদামহাশয়কে বলিতে লাগিলেন, "রাজবাড়ীর কর্ত্তারা ঠারাইনদের খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে ও দাসীকে লইয়া খাটে শোয়"—ইত্যাদি। তখন অল্প বয়স, একথার কি যে অর্থ বুঝিলাম না, পরে বড় হইয়া বুঝিয়াছিলাম। দাদামহাশয় তখনই বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ভয় নাই। ছেলের বয়স অল্প, বুদ্ধিমান ছেলে, উহাকে আমি নিজের কাছে রাখিয়া মানুষ করিব।" কাজেও কিন্তু তাহাই হইল। ১৩ বৎসরের ছেলেকে তিনি সর্বপ্রকারে যত্ন করিয়া B. L. পাশ করাইয়া ঢাকাতে জজকোর্টে বসাইয়া দিয়াছিলেন।

এদিকে দাদামহাশয়ের ছুটী ফুরাইয়া গেল। তাঁহার কর্ম্মস্থান বরিশালে যাইতে হইবে। দাদামহাশয়ের মাসিক ভাড়ার মফঃস্বলে যাওয়ার গ্রীণবোটখানা আসিয়া হাজির হইল। সেও যেন এক মহা আনন্দের মহা সমারোহ! বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ায় দুঃখটা যেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, নিকটতম আত্মীয়স্বজন এবং ঠাকুর চাকর সবাই তো সঙ্গেই যাইতেছে। বোটের মধ্যেও হৈ-হল্লা বেশ চলিতে লাগিল। দিদিও সঙ্গে আছেন। নৌকাখানা ছিল এক বিরাট বপু। একটি মস্ত পরিবারের থাকা-খাওয়া ইত্যাদির কিছুই অসুবিধা ছিল না। বিশেষ করিয়া আমাদের মত ছোটরা তো সিঁড়ী দিয়া নৌকার ছাদে উঠিয়া খুব মজা করিতাম যখন তখন। বলা বাহুল্য, নৌকার ছাদখানা রেলিং-ঘেরা ছিল—ছোটদের পড়িয়া যাওয়ার ভয় ছিল না। তদুপরি চাকরদের সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত সর্ব্বদা। তখনকার দিনে নৌকাপথে না কি ডাকাতের ভয় ছিল কিন্তু শোনা যায় তারা হাকিমদের নৌকার ধারেও আসিত না। যে সব স্থান ভয়ের বলিয়া চিহ্নিত ছিল, সেস্থানে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই নৌকা হইতে সজোরে টিকারা বাজান হইত। ইহাতেই না কি ডাকাতরা খুব সাবধান হইয়া যাইত। বিশেষ করিয়া রাত্রিতেই বেশী করিয়া টিকারার বাজনা চলিতে থাকিত। ডাকাতরা কি করে, তাহারা মানুষ না অন্ত কিছু তাহাই তখন ধারণায় ছিল না। সুতরাং তেমন করিয়া মনের মধ্যে কোন ভয়ও হইত না।

দিনের বেলায় নদীর ঢেউ জেলেদের মাছধরা নদীর ঢেউর সঙ্গে সঙ্গে শুশুম জন্তুর উঠানামা যেন একটা দেখিবার জিনিস ছিল। যখন দরকার হইত নৌকাখানা জেলেদের নৌকার কাছে লইয়া যাইত এবং যত ইচ্ছা ও দরকার বড় বড় ইলিশমাছগুলি কিনিয়া লইত। আমার জীবনে সেই প্রথম পদ্মা নদীতে মাছ ধরা দেখিলাম। মাছগুলি যেন ঝুপ-ঝাপ করিয়া জেলেদের নৌকার মধ্যে কপাল কুটিয়া আছাড় খাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সকলেই তো মহানন্দে মাতিয়া বড় ও ভালো ভালো মাছ বাছিয়া লইতে লাগিল—ঠাকুর-চাকর ও বাবুরা সবাই। কিন্তু আমার মনে যেন ঐ

মাছগুলির জন্য খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া কে যেন বলিয়াছিল, উহারা আবার মানুষ হইবে ও আমরা মাছ হইয়া জলে থাকিব ও উহারাই আবার এমন করিয়া আমাদের ধরিয়া মারিয়া খাইবে। কথাটা যেন মনের মধ্যে একটা গভীর দাগ কাটিয়াছিল। ভাবিলাম, তবে তো আমাদের মাছ খাওয়া কিছুতেই উচিৎ নহে, মাছ খাওয়া খুব অন্যায় ও পাপ। চাকর-ঠাকুররা মহা আড়ম্বরে মাছগুলিকে কাটিয়া-কুটিয়া সুস্বাদু করিয়া রান্না করিয়া রাখিল। ইত্যবসরে আমি ঐ মাছের কথা চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সে দিন আর কাঙ্গাইলা ভাইর আমাকে সে মাছ খাওয়ানোর আনন্দ উপভোগ করিতে হইল না। কিছুতেই আমি মাছ খাইলাম না।

লোকলস্কর সহ বিরাট গ্রীণবোটখানা ২।৩ দিন পরে যথাস্থান বরিশালে আসিয়া নোঙ্গর গাড়িল। একটা হৈ-হৈ রব পড়িয়া গেল, হাকিম বাবুর উদ্দেশে কত কত লোকজন আসিয়া হাজির হইয়া গেল। ক্রমে ঘোড়ার গাড়ী যথাস্থানে বাসায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিল। নৌকার অন্যান্য সকলে হৈ-হৈ করিয়া যথাসময়ে মস্ত বড় বাসাখানাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। এর পর হইতে চলিল আমার বরিশালের জীবনযাত্রার কাহিনী। বরিশালের বাসা ছিল দুই খণ্ডে বিভক্ত—অন্দর ও বাহির। বাহিরের খণ্ডে ছিল রান্নাবান্নার ঘর, ঠাকুর, চাকর, চাপরাশি, মালী প্রভৃতির থাকিবার ঘর ও ছেলেদের বাবুদের থাকার ঘর। ভিতরের খণ্ডে ছিল মেয়েদের খাওয়া, থাকা, শোওয়ার ঘর। ঠাকুর রান্না করিয়া অন্দরে আনিয়া মেয়েদের দিয়া যাইত, আমরা ছোটরা বাহিরের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া করিতাম। এই অন্দর ও বাহিরের ব্যবস্থা শুধু বরিশালেই ছিল, অন্যত্র ঐরূপ ছিল না।

বাসায় একটি ঘাটওয়ালা পুকুর ছিল, আমরা চারি-পাড়ের ছোটর দল সবাই মিলিয়া খুব ঝাঁপাঝাঁপি করিতাম। দৈবক্রমে এক দিন ঐরূপ জলকেলির পরে, একে একে সবাই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে আমি কিন্তু পা-ফস্‌কাইয়া গভীর জলে পড়িয়া গিয়াছি। তো কেহই লক্ষ্য করিতে পারে নাই, আমিও বোধ হয় ভয়ে ভয়ে কোন শব্দই করি নাই, ভাবিয়াছিলাম নিজেই উঠিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু পুকুরটি ছিল জোয়ার-ভাঁটার। সে সময় ভাঁটার টানে আমাকে দূরে লইয়া চলিল, কিন্তু দৈবক্রমে আমাদের বাসার অতি নিকটেই একটি চাপরাশির বাসা ছিল, সে সে সময় স্নান করিতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিতে পাইয়াই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমার চুলের মুঠী ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া আসিয়া সবাইকেই এই খবরটা দিল। আমি ত জল খাইয়া ওজনে বেশ বাড়িয়া গিয়াছি। বাড়ীতে লাগিয়া গেল মহা হৈ-চৈ। দাদামহাশয়। ঠাকুর, চাকর, আরদালী, সকলকেই বলিয়া দিলেন আমাকে ও ছোটকাকাকে ৩।৪ দিনের মধ্যেই যেন সাঁতার শিখান হয়। যেই হুকুম সেই তামিল, পুকুরে কলাগাছ নামিল, ঘরে ছিল সাদা ধপ্‌ধপে দুইটি বয়া (ইহা নাকি ঠাকুর খুড়া চাটগাঁ হইতে পাঠাইয়াছিলেন) চারি দিকে লোকজন নামিয়া গেল আমাদের সাঁতার শিখানোর উদ্দেশ্যে। মহা হৈ-হল্লার মধ্যে আমাদের সাঁতার শেখার অভিনয় চলিল। সাঁতার শিখিবার আনন্দ ও জলের ভয়ও ছিল, তবে যাহারা আমাদের সাঁতার শিখাইতেছিল তাদের উপর খুব বিশ্বাস রাখিতাম, সুতরাং ৩।৪ দিন মধ্যেই আমার একরূপ সাঁতার শিক্ষা হইয়া গেল। এখন শুধু নিজে-নিজে প্র্যাকটিস্ করা, পুকুরের ওপাড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এত শীঘ্র এরূপ সাঁতার শেখা না কি খুব কম ছেলে মেয়েরাই পারে, সবাই একথা বলাবলি করিতে লাগিল, ইহাতে আমি যেন বেশ একটু গর্ব্ব বোধ করিতেছিলাম মনে পড়ে। এক সপ্তাহের পরেই আমি ঐ পুকুরটা পাড়ি দিয়া এপাড়-ওপাড় করিতেছিলাম অনায়াসে। এই গেল আমার সাঁতার শেখার অধ্যায়।

এর পরে আবার ঘোড়ায় চড়িবার সখ আসিয়া দেখা দিল। আমার বয়স তখন ছয় কি সাড়ে ছয় বৎসর হইবে। ছোট কাকার বয়স সাড়ে সাত কি আট বৎসর। বাসায় ছিল একটা ঘুড়ী ও তার একটা বাচ্চা। সহিসের সহিত খুব খাতির করিয়া লইলাম, অন্দর হইতে বেশী করিয়া পান-সুপারী আনিয়া সহিসকে দিতে লাগিলাম; অন্য কেহ যেন টের না পায়। আমার মন রক্ষার জন্য ভোরে বা সন্ধ্যায় সহিস ছোট বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া ১০।১২ মিনিট সময় একটু ধরিয়া ধরিয়া ঘুরাইয়া লইয়া আসিত রাস্তায় রাস্তায়। এদিকে ছোট কাকার বড় ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চড়িয়া ক্রমে ঘোড়ায় চড়া একটু রপ্ত করিয়া লইল। একদিন দৈব দুর্ব্বিপাকে ঘোড়ার পিঠ হইতে আমি পড়িয়া গেলাম এবং বেশ একটা চোট পাইয়াছিলাম পায়ে, সহিস ত ভয়ে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল
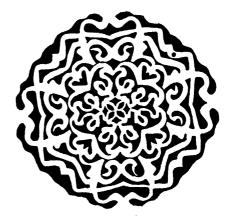
শিল্পী—চিত্রা বিশ্বাস

এবং বাড়ীর ভিতরে না জানাইয়া থাকারও উপায় ছিল না। দাদামহাশয় ও দিদিমার কানে এই ঘটনা যাহাতে না পৌঁছে সবাই সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। সবাই আবার চুপিসাড়ে আমাকে বলিতে লাগিল, "ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলে তোর বিয়া হইবে না" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিবাহের অর্থ বা মর্ম্ম কিছুই আমার বোধগম্য ছিল না, ভাবিলাম যত দেখি বিবাহ, কেবল হৈ-হৈ, রৈ-রৈ, দৌড়-ঝাঁপ, ইহা নাই বা হইল আমার! আমি কেন ঘোড়ায় চড়িব না! মনটা দুঃখে ভরিয়া গেল আমার। সহিস এত দিন খুব সাবধানেই আমাকে ঘোড়ায় চড়াইতেছিল, দৈবের বিধান খণ্ডন করিবে কে? এদিকে ছোট কাকা বেশ ঘোড়-দৌড় শিখিয়া গেল, আমি অদূরে দাঁড়াইয়া ছোট কাকার ঘোড়-দৌড় অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতাম আর ভাবিতাম, "আচ্ছা ছোট কাকার যদি ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায় তবে ত তারও বিবাহ হইবে না—আমার বেলায় ঘোর আপত্তি। সে যাহা হউক, মাণিকের (অর্থাৎ পুতির) অমৃতময় ভাষায় আমার ঘোড়ায় চড়া জন্মের মত "খতম" হইয়া গেল। কিন্তু কেন জানি না, কেহ ঘোড়ায় চড়িলে আমি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতাম ও সময় সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতাম।

বরিশালে আমাদের বাসার নিকটেই মস্ত বড় একখানা মাঠ ছিল সবুজ রংয়ের, যেন ম্যাটিংকরা, সে মাঠের চারি পাড়েই সব বড় বড় উকীল, মোক্তার ও আত্মীয়স্বজন, পিওন-চাপরাশিদের বাসায় পরিপূর্ণ ছিল। ছেলেদের খেলাধুলা, আমোদ-উৎসব কিছুই বাদ পড়িত না ঐ মাঠখানাতে। চড়ুই-ভাতী, ঝুলন, ছায়াবাজী, সাপের খেলা, ম্যাজিক্—আরো যে কত কি—প্রায় প্রতি দিনই উৎসবের উৎস ছড়াইয়া পড়িয়া মাঠখানা যেন আনন্দের জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। এক বারের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে, সবাই ঝুলনের উৎসবে মত্ত, মাঠের চারি পাশের লোকজন ও বাড়ীর সব ছেলের দল, ঠাকুর, চাকর, চাপরাশি, পেয়াদা, ঘোড়ার সহিস, কেহই এই আনন্দের বাহিরে ছিল না। ইহা ছাড়া ঝুলন উপলক্ষ্যে ছেলের দল যার যার বন্ধু-বান্ধবদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; সবাইর উপস্থিতিতে মাঠখানা যেন একটি আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ঝুলনের দোলমঞ্চখানাকে কাগজের নানারূপ ফুল-লতাপাতায় অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। এই সব কারুকার্য্যময় কাগজের ডিজাইন মা নিজ হাতে সরবরাহ করিয়াছিলেন। এদিকে পূজার আয়োজন, নানারূপ নারিকেলের খাবার তৈয়ার করিয়া দিয়া ছেলেদের আনন্দের ইন্ধন যোগাইতেন। সন্ধ্যায় পূজা, আরতি, বৈকালি ও প্রসাদ বিতরণ এক মহা ব্যাপার ছিল। বহু লোক সমাগম হইত। সে আজ কত যুগ-যুগান্তরের কথা, কিন্তু মনে হইলে যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠে!

অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাঠখানার এক কোণে কতকগুলি কচু-গাছ ছিল। কেন যে ঐ কচুগাছগুলি পরিষ্কার করা হইয়াছিল না, তখন তাহা বোঝা ত দূরের কথা এখনও তাহা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না। সেই কচুবনের মধ্যে সন্ধ্যার পরক্ষণেই কয়েকটি দুষ্ট বালক চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাইয়া আমিও উহাদের মত কচুবনে ডুব দিয়া লুকাইয়া রহিলাম, কিন্তু কেন, তাহার কোন খোঁজ আর লইলাম না, এও বুঝি ঝুলনের একটি আমোদ, পরে জানিলাম যে, উহারা ভূত সাজিয়া দর্শক ও পথিকদের ভয় দেখাইয়া একটা খুব মস্ত মজা করিবে এই ছিল তাহাদের প্ল্যান। আমার বয়স ছিল ঐ সব ছেলেদের অপেক্ষা অনেক কম। আমি উহাদের দেখাদেখি কচুবনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, মুখ হাঁ করিয়া; নতুবা ভূতের অভিনয় হইবে কি করিয়া? কিছুকাল পরেই যেন টের পাইলাম আমার মুখের মধ্যে যেন কি একটা প্রবেশ করিয়াছে, তাড়াতাড়ি হাত দিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাত পিছলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন উপায়হীন হইয়া পড়িলাম ও কান্দিতে লাগিলাম এবং হাতের মধ্যে কাপড় জড়াইয়া জিহ্বাটাকে খুব জোরে পরিষ্কার করাতেই দেখা গেল, অতি বড় একটা চ্যাটা। কোথায় ভূতের ভয় দেখাইয়া সকলকে জব্দ করিব, তাহার বদলে আমি চিৎকার দিয়া কান্না জুড়িয়া দিলাম, বহু জন সমাগমের মধ্যে একটা বিষম হৈ-চৈ লাগিয়া গেল এবং আমাকে ঘেরিয়া চারি দিক হইতে নানা প্রশ্ন করিয়া সকলে যখন ঘটনাটা জানিয়া লইল, তখন সকলের হাসির ধুম লাগিয়া গেল। আমি ছুটিয়া আসিয়া মায়ের পাশে শুইয়া পড়িয়া কান্দিতে লাগিলাম। মাও আমার কাছে সকল কথা শুনিয়া এক চোট্ হাসিয়া লইয়া বলিলেন, এরূপ মন্দ খেলা আর কখনও খেলিও না, দেখিলে ত মন্দ খেলার ফল হাতে হাতে পাইয়া গেলে। কান্দিতে কান্দিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না, তবে সে দিনের ঝুলনের আনন্দটা আমার মাটি হইয়া গেল। পরের দিন লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না, বিশেষ করিয়া সেনজীকে (ভগ্নীপতি) এই ত গেল ঝুলনের ঘটনা।

আমাদের বাসার খুব কাছেই ছিল এক ইংরেজ জমীদারের কুঠী ও ঘাটলাওয়ালা খুব বড় একটা পুকুর। সে পুকুরে খুব বড় বড় রক্তবর্ণ সাপলায় পরিপূর্ণ ছিল এবং বহু সংখ্যক রাজহাঁস সেই সাপলা-বন মথিত করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া তাদের বাড়ীর গেইটের সামনে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া তাদের নানারূপ শব্দে কুঠীখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিত। হাঁসগুলির বোধ হয় ইচ্ছা হইত গেইটের বাহিরে এক বার আসিয়া বেড়াইয়া যায়, কিন্তু তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কারণ গেইটের দরজাখানা সর্ব্বদাই বন্ধ রাখা হইত। হাঁসগুলি যখন সারিবদ্ধ হইয়া গেইটের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন আমরা ও পাড়ার ছোটর দলেরা লাঠি দিয়া উহাদের খোঁচাইতে থাকিতাম, হাঁসগুলি খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া গেইটের উপরে খুব ঠোকরাইতে থাকিত। ইহার বেশী শক্তি তাদের কিছুই ছিল না, কারণ গেইটটি বন্ধ। আমাদেরও একটু একটু লাঠির খোঁচা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিবার উপায় ছিল না। কুঠী হইতে সব মানুষরা আমাদের উভয় পক্ষের অক্ষমতা দেখিয়া বেশ একটু হাসাহাসি করিয়া আমোদ উপভোগ করিত। কখনও কিন্তু কোনরূপ তিরস্কার বা বিরক্তি প্রকাশ করিত না।

এক বার সেই কুঠীর জমীদারের একটি মেয়ে—বয়স ১৫।১৬ হইতে পারে, দাদার সঙ্গে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া দিনক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথাসময়ে দাদা ও মেয়েটি চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া গেল। দাদার ঘোড়াটিও ঐ মেয়েটিই যোগাড় করিয়া

দিয়াছিল। যথাসময়ে বহু জনসমাগমের মধ্যে মেয়েটি তার ঘোড়ায় এক লাফেই যথারীতি উঠিয়া বসিল, কিন্তু দাদা যেই তার ঘোড়ায় চড়িতে গেলেন, ঘোড়াটি এক লম্ফ প্রদান করিয়া তার অমত প্রকাশ করিয়া বসিল। দ্বিতীয় বার আবার চেষ্টা করিতেই আবার সেই উল্লম্ফন! কি করা যায়, ঘোড়ার সহিস তখন ঘোড়াটিকে খুব বুঝসুঝ দিয়া চাপড়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া খুব তোয়াজ করিয়া দাদাকে কোন রূপে ঘোড়ায় চাপাইয়া দিল এবং সাঙ্কেতিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। দর্শকরাও মহা উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল কে হারে, কে জিতে। দর্শকদের মধ্যে আমি ও ছোট কাকা যে অতি উৎসাহী তাহা বলাই বাহুল্য।

এদিকে কয়েক মিনিট পরেই এক অঘটন ঘটিয়া গেল, দাদার ঘোড়াটি দাদাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া লাগাম-মুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে, সহিস ঘোড়াটিকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। দাদাকে লইয়া তখন এক বিষম হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। দর্শকরা সব জড়ো হইয়া কেহ ডাক্তারের বাড়ী, কেহ বরফ, কেহ বা পাখার বাতাসের বন্দোবস্তে লাগিয়া গেল। এদিকে সেই ইংরেজ মেয়েটি তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল দাদার ঘোড়াটি অতি বেগে সওয়ার বিহীন অবস্থায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সহিসও ঘোড়া ধরিবার জন্য প্রাণপণ ছুটিয়া চলিয়াছে ঘোড়ার পিছন পিছন। ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না, মেয়েটি খুব দুঃখিতা হইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দাদা যেখানে পড়িয়া গিয়াছেন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। দাদার আঘাত খুব গুরুতর হইয়াছিল, তার মধ্যে বিশেষ করিয়া সামনের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পরে কথাবার্ত্তায় জানা গেল ঐ ঘোড়াটি যার ছিল তাকে ছাড়া অন্য সওয়ার ঘোড়াটি কখনও বহন করিত না। এই জন্যই বার ২ ঘোড়াটি তার ঘোর আপত্তি পূর্ব্বাহ্নেই জানাইয়াছিল, সহিস হয়ত বক্‌সীস পাওয়ার লোভে ঐ গুরুতর কথাটি গোপন করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল এক বার চড়াইয়া দিতে পারিলেই ঠিক হইয়া যাইবে, এত বড় অঘটন সে মনেই করিতে পারে নাই। দাদাও খুব হুজুগপ্রিয় ছিলেন, একে একে দুই বার প্রত্যাখ্যানকে অগ্রাহ্য করিয়া মহা অনর্থের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। দাদা এই ঘোড়-দৌড়ের হুজুকে কয়েক মাস শয্যাগত হইয়া রহিলেন। দাদার ঘোড়ায় চড়ার চিত্রটি আমার খুবই মনে গাঁথা ছিল এবং এর পরে আর আমার ঘোড়ায় চড়িবার সাধ রহিল না। আমার ঘোড়ায় না চড়িবার দুঃখ চিরতরে ঘুচিয়া গেল।

বরিশালে থাকিতে একদিন দাদামহাশয় মাকে বলিয়া গেলেন ছোট কাকা ও আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া, সাজপোষাক পরাইয়া রাখিতে। মহারাজ সূর্য্যকান্তের

জাহাজে উহাদের একটু বেড়াইয়া লইয়া আসি। আমাদের ত আনন্দের সীমা রহিল না। জাহাজ তখনও চোখে দেখি নাই, নাম শুনিয়াছি। জাহাজ নামক একটি জিনিস আছে, সেই আশ্চর্য্যজনক জাহাজে বেড়াইতে যাইব আহ্লাদের আর সীমা কই! যথাসময়ে জাহাজের লোকেরা আমাদের লইতে আসিল, মা পুর্ব্বাহ্নেই আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজ-পোষাক পরাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন মনে হইলে হাসি পায়। ছোট কাকা ও আমার জরিদার টুপী আমার পুতির কারুকার্য্যময় গাউনের বাহার, তদুপরি জরীর বাহার, ছোট কাকারও তদনুরূপ পোষাক সজ্জার ত্রুটি রহিল না! সাজপোষাক পরিয়া যেন বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম। চলিলাম বরিশাল নদীঘাটে, জাহাজখানা নোঙ্গর করা ছিল, যথারীতি আমাদের ও আমাদের তত্ত্বাবধানের লোকজনদের জাহাজে তুলিয়া লইতেই যথাসময়ে জাহাজখানা ছুটিয়া চলিল, একে ত জাহাজ দেখি নাই, তাতে জাহাজে চড়া, ইহাতে যে কি গর্ব্বিতা হইয়া গেলাম!

রাজার জাহাজ কত-কত সরঞ্জাম দিয়া সজ্জিত, তার অন্ত ছিল না, খাট-চেয়ার ভেলভেটে মোড়া, টেবিল চেয়ারের কতই না বাহার! মুহূর্ত্তমধ্যে ঝপাঝপ্ করিয়া নলসিটী ইত্যাদি কয়েকটা স্থান ঘুরাইয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রায় সন্ধ্যার সময় আবার আমাদের সকলকে নদীর ঘাটে নামাইয়া দিল জাহাজখানা।

এখন ভাবিয়া দেখি, বর্ত্তমানের তুলনায় সে জাহাজখানার কলার মোচার খোসার সঙ্গেই তুলনা চলে। তখন ভাবিতাম বাবা রে! কত বড় জাহাজ! মহা আনন্দ করিয়া সে সময় মায়ের বুকে যথাসময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। তার পর দিন সমবয়সীদের নিকট গল্প করিতে লাগিলাম, তাহারাও গল্প শুনিয়া শুনিয়া খুবই আনন্দ পাইতেছিল, তার কিছুক্ষণ পরেই সবাই হঠাৎ গভীর মহাদুঃখের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল, "তোরা দুই জনে জাহাজে চড়িয়া বেড়াইলি, আমাদের কেন নিয়া গেলি না?" ইত্যাদি। উহারা কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার যেন চেতনা হইল, সত্যই ত আমি একা একা জাহাজে চড়িয়া বেড়াইয়া আসিলাম, আর উহারা যাইতে পারিল না। জাহাজ-চড়ার আনন্দ অপেক্ষা সমবয়সীদের অনুযোগ যেন আমাকে অত্যন্ত বেদনা দিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিলাম, সত্যই ত সকলে মিলিয়া যদি এই আনন্দ পাইতে পারিতাম, তবে কতই না সুখের হইত! এ ভুল কেন যে করিলাম, তাহা বুঝিবার মত বয়স আমার ছিল না। জাহাজে চড়িবার আনন্দেই মসগুল হইয়া সমবয়সীদের কথা বেমালুম ভুল হইয়া গিয়াছিল আমার। বিশেষতঃ সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী ছোট কাকা ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন তাই অন্য কারো কথা আমার মনেই আসে নাই। পরে মা বলিলেন, ১০।১২টি ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব নিতে জাহাজের কর্তৃপক্ষও রাজী হইত কিনা সন্দেহ ছিল। মা আমার এই দুঃখটাকে দূর করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি আমার মনের মধ্যে একটা গভীর দাগ কাটিয়া রহিল। যে কোন আনন্দ ব্যাপারে একা একা আমার মন কিছুতেই অগ্রসর হইত না। আজ শেষ জীবনের পারে দাঁড়াইয়াও আমার সে কথাটি যেন অন্তরে জাগিয়া রহিয়াছে!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই আনন্দের লীলাভূমি বরিশাল সহর হইতে আমাদের জন্মের মত চলিয়া যাইতে হইবে ঢাকা শহরে। বরিশালে একাদিক্রমে দাদামহাশয় ১৪ বৎসর কাল প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়াছিলেন। ঢাকায় ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট হেয়ার সাহেব ৬ মাসের ছুটি নিয়া বিলাত চলিয়া যাইতেছেন। সেই স্থানে দাদামহাশয়কে ঢাকা যাইতে হইবে। দাদামহাশয় ছিলেন অতি সরল, সদাশয় ব্যক্তি, বরিশালে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। যখন ক্রমে সবাই জানিতে পারিল, দাদামহাশয় বরিশাল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন সবাই যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল। বরিশাল হইতে চির-বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল; এত কালের সংসার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়া সহজসাধ্য নহে। ৭।৮ দিন পুর্ব্ব হইতেই গুছানের অন্ত ছিল না। যেদিন প্রকৃতপক্ষেই বরিশাল হইতে যাত্রার দিনক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, সেদিন সকাল বেলা ১০।১১ টার মধ্যেই সকল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নদীঘাটে যাইয়া সমবেত হইতে লাগিল। আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে নদীঘাটে আসিয়া নৌকায় যাইয়া উঠিলাম।

নৌকাখানা অতি বড় গ্রীনবোট। ইহা দাদামহাশয়ের মাসিক ভাড়ার নৌকা, মফঃস্বলে যাওয়ার জন্য নদীঘাটেই বান্ধা থাকত। এদিকে সহর ভাঙ্গিয়া আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-বান্ধব ও দাদামশায়ের অফিসের ডেপুটি, মুনসেফ উকীল মোক্তার প্রভৃতি দলে দলে আসিয়া নৌকায় উঠিতে লাগিল, যাহারা নৌকায় উঠিতে পারিল না তাহারা নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে দাদামহাশয়কে বিদায় অভিনন্দনের জন্য ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এই ভাবে দলের পর দল আসিয়া ক্রমাগত বাড়িয়া গেল জনতার সংখ্যা। জানি না কাহারা; তবে হাউ হাউ করিয়া কান্নার শব্দ শুনিতেছিলাম। এই ভাবে বিদায় অভিনন্দনের পালা শেষ হইয়া না কি রাত্রি ১২টার সময় নৌকা ছাড়িবার অবকাশ পাইয়াছিল। তখন আমরা ছোটর দল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ "বদর। বদর।" চিৎকার ধ্বনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জানিতে পারিলাম আমাদের নৌকাখানা বরিশালের তীর ছাড়িয়া জন্মের মত যেন হেলিয়া-দুলিয়া তার গন্তব্য স্থান ঢাকা সহরের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। হঠাৎ মনে হইল হায়! হায়! বরিশালের আনন্দ আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই ত ফেলিয়া যাইতে হইল কোন এক অপরিচিত নূতন জায়গায়। মনটা বড়ই দুঃখে ভরিয়া গেল, এই ভাবে কিছুকাল গুমুরিয়া কান্দিতে লাগিলাম, পরে নৌকার মধুর দোলানিতে মায়ের বুকের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন নদীতে সূর্য্য উঠিয়া গিয়াছে। বিছানায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বরিশালের ছবি, জন্মের মত বরিশালের লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়া গেল ভাবিতেই যেন কান্নায় মনটা ভরিয়া গেল। বহু দূর নৌকা জলপথে অগ্রসর হওয়ার পরে যথাসময়ে রন্ধনাদি করিবার একটা ভাল স্থানের খোঁজ করা হইতে লাগিল। মাঝিরা এই সব পথের খোঁজ খবর সর্ব্বদাই রাখিত, বিশেষতঃ নৌকাপথে বরিশালের রাস্তা খুব বিপদজনক ছিল। তবে এত লোকজন সহ এত বড় নৌকা

বিশেষতঃ চিহ্নিত খারাপ স্থানে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সজোরে টিকারা বাজানোর শব্দ বহু দূর দূরান্তে খবর পৌঁছাইয়া যাইত। হাকিমের নৌকা নিকটবর্ত্তী, ডাকাতগণও বুঝিয়া শুনিয়া বেশ ভদ্রভাবেই নৌকার সম্মুখীন হইয়া হাকিমের কিছু দরকার বোধ করিলে যোগান দেওয়ার জন্ম অতি আগ্রহে আগাইয়া আসিত। নৌকাখানার কাছে পৌঁছিতেই দারোগা-পুলিশ ইত্যাদি নৌকায় সম্মুখে আসিয়া হাকিমকে সসম্মানে অভিবাদন করিত এবং কি কি দ্রব্যাদির প্রয়োজন ও তাহার সংস্থান করিয়া দিত। এদিকে চাকর বিশেষ করিয়া কাঙ্গাইলা ভাই বাজারে যাইয়া বাজারের সব সেরা জিনিস যাহা যাহা প্রয়োজন কিনিয়া লইয়া আসিত। আবার লোকজনের পরামর্শমত ভাল স্থানে রান্নার আয়োজন করিতে চাকররা ও ঠাকুর প্রভৃতি কাজে লাগিয়া যাইত। এত লোক সঙ্গে যেন একটি নিমন্ত্রণ-বাড়ী। আমরা ছোটরা পাড়ে নামিয়া আনন্দে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলাম। রান্না হইয়া গেলেই চাকররা ছোটদের স্নান করাইয়া দিত নদীর জলে। নদীতে অনেক শুশুম ছিল, বড়রাও কেহ নদীতে নামিয়া স্নান করিতে সাহস করিত না। এই ভাবে বরিশাল হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের আসিয়া গেল এক দিন।

ঢাকায় নদীঘাটে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বেই মাঝিরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ঐ ত শ্যামপুরঘাট দেখা যাইতেছে, আর বেশীক্ষণ বাকী নাই ঢাকার নদীর ঘাটে পৌঁছিতে ইত্যাদি" হঠাৎ দেখি দিদিমা চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, নৌকার লোকজন সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল, মাও দেখি নিঃশব্দে কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন, কিছুই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। বয়স আমার ৭।৮ হইতে পারে সম্ভব। বাবার নাম ধরিয়াই দিদিমা কাঁদিতেছিলেন তাহা আমার বুঝিতে বাকী ছিল না। পরে কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে পর সব বুঝিলাম। ঢাকাতে চিকিৎসার্থে ২১ বৎসরের সুযোগ্য পুত্রকে লইয়া আসিয়া শ্যামপুর ঘাটের মহাশ্মশানে আহুতি দিয়া মাতাঠাকুরাণী ও বহু আত্মীয়-স্বজনসহ পুত্র-শোকাতুরা দিদিমাকে সোনারঙ্গের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। শ্যামপুর ঘাট-এর নাম শ্রবণ মাত্রই পুত্র-শোকাতুরা দিদিমা ও পতিহীনা মাতাঠাকুরাণীর অবস্থাটা বুঝিয়া লইতে আমার বিলম্ব হইল না। পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া যেন নূতন বেশে আসিয়া দিদিমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। হায়! তখন কে জানিত সেই মৃত পুত্রের বংশ প্রথম দৌহিত্রটিকেও তার মা এই শ্যামপুর ঘাটে শ্মশানচিতায় তুলিয়া দিবে! কে জানিত এই আনন্দনিরতা ক্ষুদ্র বালিকার উত্তর জীবনের শেষ অভিনয় ২৫ বৎসরের সুযোগ্য পুত্রকে পিত মহীর ন্যায় শ্যামপুর ঘাটে শ্মশান-চিতায় তুলিয়া দিবে। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান!

• • • •

যথাসময়ে আমাদের বহু জনপূর্ণ গ্রীণবোটখানা ঢাকার বুড়ীগঙ্গার ঘাটে নোঙ্গর গাড়িল; হৈ-চৈ করিয়া ছেলের দল তীরে নামিয়া পড়িল। ঠাকুর, চাকর, চাপরাশির দল ঘোড়ার গাড়ীর সন্ধানে ছুটিয়া চলিল; মালবাহী গাড়ীও কয়েকটা আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমরা হৈ-চৈ করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, পশ্চাতে রহিয়া গেল বরিশালের আনন্দময় জীবনের মধুর স্মৃতিটুকু। যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট হেয়ার সাহেবের কুঠীতে বল্তা বাজারে আমরা সকলেই পৌঁছাইয়া গেলাম। সাহেবদের বাড়ী ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ম্যাটিং-করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; অনেকগুলি কোঠা সাজ-সজ্জাও বেশ মনোহর ছিল। বাড়ীখানা বহু স্থান লইয়া অবস্থিত। বহু জায়গা মাঠের মত; ছাঁটা ঘাসে মাঠখানাকে যেন সবুজ কার্পেটের ম্যাটিং-করা মনে হইত। ফল ও ফুলের গাছগুলি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত ছিল, তন্মধ্যে অধিকতর লোভনীয় ছিল নারিকেল-কুলের গাছটি। কুলের গাছটি খুব বড় ছিল এবং কুলগুলি অতিমাত্রায় গাছে লোভনীয় হইয়া ঝুলিয়া থাকিত এবং গাছভর্ত্তি কুল হইত। আমাদের ছোটদের ত লোভের সীমা ছিল না, দেওয়াল-ঘেরা বাড়ী, গেইটে দারোয়ান। বাসায় বহু লোকজনের সমাগম। দাদা-মহাশয়ের নিজ পরিবার ছাড়াও গ্রাম সম্পর্কে বহু আত্মীয়-স্বজনের সমাবেশ ছিল ঐ বাসায়, ৪০ জন লোক ত হইবেই। মহা আনন্দে আমাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইত।

বাড়ীর নারিকেল-কুলের গাছগুলিতে অতিমাত্রায় কুল ধরিত তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। যে কোন সময় গাছের তলায় গেলেই শুনিতে পাইতাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাতর প্রার্থনা। মস্ত বড় বাড়ীখানা ছিল দেওয়ালঘেরা দুর্গস্বরূপ, দেওয়ালের অপর পৃষ্ঠ হইতে ভাসিয়া আসিত "বি-বি একটা বইল" "বাবু একটা বইল" (বরইর অর্থ বইল) তখন গাছের তলা হইতে যাহা পাইতাম কুড়াইয়া লইয়া দেওয়ালের অপর পারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। ওপারে লাগিয়া যাইত কি মহানন্দের কাড়াকাড়ি! আবার সেই সঙ্গে খুব ছোটদের কান্নার সুর ভাসিয়া আসিয়া কানে বাজিতে থাকিত, তাহার কারণ এই ছিল বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুল কুড়াইবার সামর্থ তাদের ছিল না, সুতরাং "বালানাং রোদনং বলং" হইয়াই তাদের বিমর্ষ হইয়া থাকিতে হইত। কোন কোন দিন চাকরদের বিশেষ করিয়া কাঙ্গাইলা ভাইকে অনুনয় বিনয়ের যুক্তিতর্কে রাজি করিয়া লইয়া অনেক পরিমাণে কুল সংগ্রহ করিয়া তার বলিষ্ঠ হাতের নিক্ষেপ দ্বারায় কুলগুলিকে দেওয়ালের ওপারে বাঞ্ছিতদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতাম। কি যে আনন্দ তাদের! এই ত সংসারের রীতি নীতি! কেহ হয়ত পায় না কেহ হয়ত পর্য্যাপ্ত জিনিসের অংশগুলিতে পচনের পথে ঢালিয়া দেয়!

ক্রমে আমার বয়সের সঙ্গে ইডেন স্কুলে যাওয়ার দিন ঘনাইয়া আসিল। ইডেন স্কুলের গাড়ীখানা যথাসময়ে বড় গেইটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়, পূর্ব্বাহ্নেই চট্‌পট্ করিয়া মুখে ভাত গুঁজিয়া উঠিতেই কাঙ্গাইলা ভাইর ধম্‌কানিতে আবার পাতে বসিয়া কিছু বেশী ভাত খাইতে বাধ্য হইতাম, এবং খাওয়া সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে অতি যত্নে হাত মুখ ধোওয়াইয়া আমার গুছান বইগুলি হাতে লইয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিত। আজ অন্যান্য স্মৃতির বাহুল্যের মধ্যেও কেন জানি কাঙ্গাইলা ভাইর সেই স্নেহ মমতার ব্যবহারগুলি মনে হইতেছে নূতন করিয়া। কাঙ্গাইলা ভাই এ বাড়ীর বেতন-ভোগী চাকর ছিল না, সে ছিল এ বাড়ীর স্নেহ-মমতার এক জন নিকটতম অংশীদার।

এক বার যখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষে সমস্ত উড়িষ্যা থানা মৃত্যুমুখে উপস্থিত সে সময় সরকার পক্ষ দাদামহাশয়কে উড়িষ্যায় রিলিফ কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দারুণ মর্ম্মান্তিক ব্যাপার! ভাই বিধবা ভগ্নীকে, পিতা বিধবা মেয়েকে খাদ্যাদি দিতে না পারিয়া হাকিমের দুয়ারে, পায়ের উপরে ধর্ণা দিয়া পড়িল। বলিতে লাগিল, "সব রইল, কিছু কিছু টাকা দেও খাইয়া বাঁচি" এই ভাব। কি করিবেন দাদামহাশয় কিছুই যেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না, কয়েকজন বিধবা ও পুত্রবতী মেয়েদের তিনি খাওয়া দিতে লাগিলেন। ভাই বা পিতামাতা কেহই আর খোঁজ খবর করিল না। এতগুলি মানুষকে তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তখন ঐ মেয়েরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দাদামহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আপনি আমাদের আপনার দেশে লইয়া যান, আমাদের যত দূর সাধ্য আপনার বাড়ীর কাজ কর্ম্ম করিব ইত্যাদি ২। কাজেও হইল তাই—সেই মেয়েদের এক জনের একটি শিশু সন্তান ছিল ভবিষ্যৎ জীবনে সেই আমাদের স্নেহশীল কাঙ্গাইলা ভাইরূপে সংসারে দাঁড়াইয়া গেল। সম্প্রতি ক্রমে ঐ ৪৫ জন মেয়েদের দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, যথাসময়ে মেয়েদের অভিভাবকদের খবর দেওয়া হইল, ক্রমে ক্রমে অভিভাবকরা আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং হাকিম বাবুর জিম্বায় মেয়ে ও বোনদের সমর্পণ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। জানা যায় মেয়েদের অভিভাবকদিগকে দাদামহাশয় খুসী করিয়া বকসীস দিয়া বিদায় করিলেন। কাঙ্গাইলা ভাইর মায়ের নাম ছিল রেশমী, যাহাকে আমরা ধাই-পিসি ডাকিতাম, তার নাম ছিল পার্ব্বতী ইত্যাদি ২। এই ভাবে ভীষণ বুভুক্ষার পীড়নে জন্মের মত কয়েকটি প্রাণী ছিটকাইয়া পড়িল পূর্ব্ব বাঙ্গালায়। এই সম্পর্কে একটি হাসিবার কথা লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। [ক্রমশঃ।

মেয়েদের সম্বন্ধে গান্ধীজী কি বলেন?

নির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

ঋষি মনু বলছেন, মেয়েদের স্বাধীনতা নেই। কোন অবস্থাতেই নয়, কি কুমারী, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা। যে যুগের এ অনুশাসন হয়ত সে সময়ে সমাজের ভালর জন্যেই এর প্রয়োজন ছিল। বর্ত্তমানেও কি তাই? কেউ কেউ বলেন, এখনও পুরোপুরি মানতে হবে এ কথা? গান্ধী মাথা নাড়লেন। মেয়েরা হল সৃষ্টিকারিণী, মানুষের নীরব পরিচালিকা, ভগবানের মহত্তম সৃষ্টি। রোমান্স ও কল্পনা-বিলাসীদের চোখে নারী হল প্রিয়া। বিংশ শতাব্দীর কাজের মানুষ দেখলেন অন্য চোখে। তিনি বললেন, না, আমাদের সাহিত্যেই তাদের বলেছে অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী। তাদের সমান অধিকার দিতে হবে। তার মানে এই নয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পুরুষের মত গাড়ী চালাবে, অফিস করবে, যুদ্ধ করবে। "In my opinion, it is degrading both for man and woman, that woman should be called upon or induced to forsake the hearth, and shoulder the rifle for the protection of that hearth. It is a reversion to barbarity and the beginning of the end ...There is as much bravery in keeping one's home in good order and condition; as there is in defending it against attack from without" অর্থাৎ "আমার মনে হয়, মেয়েদের ঘর-গৃহস্থালী ছেড়ে দিতে বলা ও প্ররোচিত করা এবং তা রক্ষার জন্যে বন্দুক ধরান ছেলে-মেয়ে দুয়ের পক্ষেই অপমান-জনক। এ রকম করা আর অসভ্য যুগে ফিরে যাওয়া একই কথা। ধ্বংস হতে তা হলে আর দেরী হবে না।...বাইরের আক্রমণ থেকে ঘর বাঁচানোতে বাহাদুরী আছে; কিন্তু সেই ঘরে সুশৃঙ্খলা রাখাতে কম সাহস ও বাহাদুরী নেই" (হরিজন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০)

তাঁর মতে ছেলেপুলেদের দেখা-শুনো এবং ঘর-গৃহস্থালী গুছোনো স্ত্রীলোকের সমস্ত শক্তিকে নিযুক্ত রাখতে এই-ই খুব। উন্নত সমাজে খেতে-পরতে দেওয়ার দুশ্চিন্তা মেয়েরা কেন করতে যাবে? সে হল পুরুষের কাজ। মেয়ে ঘরের দেখা-শুনো করবে। দু'জনে দু'জনের পরিপূরক। পাখীর দু'টি ডানা। দু'জনকে নিয়েই সমাজ সার্থক। এতে ছোট-বড়র প্রশ্ন নেই, যার যেটা এলাকা। এতে স্ত্রীলোকের অধিকার বা স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে মনে করা ভুল।

মনু (৫-১৫৫) বলেন, "স্ত্রীলোকের আলাদা করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান বা উপোস করতে হবে না। স্বামীর সেবা করলেই স্বর্গে তার উঁচু জায়গা রিজার্ভ।" (৫-১৫৪) "স্বামীর চরিত্র ও সদ্গুণ বলে কিছু নেই, ইন্দ্রিয়পরায়ণ; স্ত্রীর তবু তাকে সব সময় ভগবান বলে মনে করা ও সেই রকম ব্যবহার করা উচিত।" (৮-৩৭১) "যে নারী বাপের বাড়ী নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়, আর স্বামীকে মানে না, তাকে সব রকম লোকের সামনে কুকুরের মুখে তাকে লেলিয়ে দেওয়াই রাজার উচিত।" (১০-৮) "স্বামীর হয়ত বদভ্যাস আছে, কি মাতাল, কি অসুখে ভুগছে। স্ত্রী তাকে অবজ্ঞা করছে। এ রকম হলে তিন মাস স্ত্রী দামী কাপড়-চোপড় ও গয়না-গাঁটি পরতে পাবে না।"

অত্রি মুনি (১৩৬-৩৭) বলেন, "স্বামী বেঁচে আছে আর তার স্ত্রী উপোস অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছে, এ হল স্বামীর আয়ু কমিয়ে তোলা। নরকে তার স্থান নির্ঘাত।"

ঋষি বশিষ্ঠও (২১-২৪) বলেন, "স্বামীর চেয়ে উঁচু জায়গা মেয়েদের আর নেই। স্বামী যদি অসন্তুষ্ট হল, স্বামী মরে যাওয়ার পর তার জগতে যাওয়ার পথ স্ত্রীর কাছে বন্ধ। তাই স্বামীকে চটান কখন ঠিক নয়।"

এই সব প্রাচীন উক্তি লিখে জানালেন একজন গান্ধীর কাছে পরামর্শ চাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা যিনি নিজের স্বাধীনতা বলে মনে করেন, স্ত্রীলোককে যিনি জাতির জননী বলে শ্রদ্ধা করেন তাঁর কাছ থেকে স্মৃতির এই সব অংশ কোন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারলে না। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন, স্মৃতিতে বহু জায়গাতে স্ত্রীলোককে তার উপযুক্ত আসনে বসান হয়েছে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে। কিন্তু স্মৃতির যে সব অংশের সঙ্গে সেই এক স্মৃতির অন্য অংশের বিরোধ এবং যেগুলি স্পষ্টতঃ নৈতিক রুচিবোধের দিক দিয়ে বিরক্তিকর, তাদের নিয়ে কি করা যাবে? সেগুলি ঋষি-প্রণীত তা গান্ধী মানতে চান না। তিনি লিখলেন, "All that is printed in the name of scriptures need not be

taken as the word of God or the inspired word. But every one can't decide what is good and authentic, and what is bad and interpolated, There should, therefore, be some authoritative body that would revise all that passes under the name of scriptures, expurgate all the texts that have no moral value, or are contrary to the fundamentals of religion and morality, and present such an edition for the guidance of Hindus."—শাস্ত্রের নামে যা-কিছু ছাপা হয়েছে, তার সবই ভগবানের মুখ হতে বেরিয়েছে, মনে করার কোন কারণ নেই। তাই বলে প্রত্যেকেই ঠিক করতে পারে না কোনটা ভাল কোনটা খারাপ, কোনটা বিশ্বাস করা চলে আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত। সেই জন্যে বিশ্বাসভাজন কোন কমিটি গঠিত হওয়া দরকার, যা শাস্ত্র বলে যা সব চলে আসছে তার পুনর্বিবেচনা করবে, নৈতিক দাম নেই অথবা ধর্ম ও নীতির মূলকথার বিরোধী অংশসমূহ বাদ দিয়ে হিন্দুদের পথ দেখাবে (হরিজন, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৬)।

যৌন অনুভূতি (sex impulse) সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করছে, এ কথায় তাঁর মন সায় দেয় না। কোটি কোটি সাধারণ লোকের মধ্যে এই চেতনা আছে ঠিকই। তবে সেই চেতনাই সব নয়, জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করে বসেনি। তারা কঠোর জীবন-যুদ্ধে ব্যস্ত। এ সবের জন্যে বসে বসে কল্পনার জাল বোনার তাদের সময় নেই।

যৌন পরিতৃপ্তির জন্যে বিয়েকে তিনি দেখতে পারেন না। নাতনি ও মহাদেব দেশাইর বোনের বিয়েতে নতুন দম্পতিদের বলেছেন, "বিয়ে যৌন-খিদের তৃপ্তির জন্যে, এ কথা যদি তোমরা জেনে থাক, অবশ্যই তা ভুলে যেতে হবে। এ ধারণাটা একটা কুসংস্কার বৈ আর কিছু নয়।" আজ-কালকার দিনে সংযমের কথা তুললে লোকে হাসে, ঠাট্টা করে, উড়িয়ে দেয়, যেন ত্যাগ ও বৈরাগ্য পালন করা বেশ একটা অন্যায় ও ভুল। যেন যৌন-খিদের স্বাধীন পরিতৃপ্তি ও বন্ধনহীন প্রেম সব চেয়ে স্বাভাবিক জিনিষ। গান্ধী বলছেন জোর করে, "এর চেয়ে সাঙ্ঘাতিক কুসংস্কার আর হতে পারে না। দুর্বলতার দরুণ আদর্শ লাভ না করতে পার, তাই বলে আদর্শকে ছোট করতে পার না, অধর্মকে ধর্ম করে তুল না।"

অনেকেরই ধারণা আমাদের দেশ গরম, মেয়েদের যৌবনও তাই আসে তাড়াতাড়ি। রক্ষণশীলেরা তাই বললেন, মেয়েদের ছোট-বেলাতেই বিয়ে হয়ে যাওয়াই দরকার। গান্ধী বলছেন, "পারলে মেয়েদের বিয়ের বয়েস কম পক্ষে কুড়ি করে দিতুম। কুড়ি বছর এমন কি ভারতেও যথেষ্ট অল্প বয়েস। ভারতের জল-বায়ু ঠিক দায়ী নয়, আমরাই মেয়েদের পাকিয়ে তুলি অল্প বয়েসে। আমি জানি কুড়ি বছরের অনেক মেয়ে আছে যারা শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ, ঝড়-ঝাপ্টা সইবার ক্ষমতা রাখে।"

বাল্যবিবাহ ও বালবিধবা প্রথার বিরুদ্ধে গান্ধী তারস্বরে প্রতিবাদ জ.নিয়ে গেছেন। বালিকা-বিধবার অস্তিত্ব তাঁর কাছে হিন্দুধর্মের এক মহা কলঙ্ক। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের মিলন বিবাহিত অবস্থা কোন মতেই নয়। আবার যদি সেই স্বামী মরে গেল, তবে ছেলেমানুষ মেয়েটিকে, সংসারের কিছুই জানে না, বৈধব্যের জগদ্দল পাথর পবিত্র এবং অবশ্য বহন করবার জিনিষ বলে মনে করতে হবে—এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি আছে? তবে একথা বলতেও গান্ধীর দ্বিধা নেই যে, যথার্থ হিন্দু বিধবা এক মূল্যবান সম্পদ এবং তা নিয়ে গর্ব করা চলে। তিনি বলেন, তাঁর যতদূর ধারণা, বৈদিক যুগে বিধবাদের পুনর্বিবাহে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। সত্যিকারের বৈধব্যের বিপক্ষে বলবার কারও কিছু নেই, আছে শুধু এর নির্মম ক্যারিকেচারের সম্বন্ধে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম তিনি মানেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম সমর্থন করেন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অস্পৃশ্যতা, কুমারী-বৈধব্য ও কুমারীদের নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা চোখ বুজে সহ্য করে, তাঁর নাকে তার দুর্গন্ধ এসে লাগে। এ হল ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যঙ্গকৌতুক, প্যারডি।

স্ত্রী স্বামীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে, পুরোপুরি নিজেকে বিলিয়ে দেবে, একেবারে মিশে যাবে তার মধ্যে নিজেকে মুছে ফেলে নিঃশেষে,—এ হল বাড়াবাড়ি এবং এ হিন্দু সংস্কৃতির ভুল বৈ কি। এই বাড়াবাড়ির ফলেই হয়েছে কি, কখন কখন স্বামী তার প্রভুত্বপ্রিয়তার ক্ষমতা ও গর্বের স্পর্ধায় পশুতে পরিণত হয়েছে, স্ত্রী বেচারীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে। এর উপায়? গান্ধী বলছেন, আইনের মধ্যে দিয়ে নয়। মেয়েদের (বিয়ে না-হওয়া মেয়ে থেকে আলাদা) যথার্থ শিক্ষা আর স্বামীর অমানুষিক বর্বর ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। যে কোন সংস্কার সাধনে বা আন্দোলনেই গণতন্ত্রের দিনে জনমত খুব জরুরী জিনিষ।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ইনি চান না। তবে বিশ্বাস করেন যে, যদি আমাদের সমাজে জনমত চাইতে থাকে, তা হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ না এসে থাকবে না।

মায়াক্ষেত্র

বিভা সরকার

এ জনারণ্যে জনতার মাঝখানে,
ওগো ভগবান! তোমায় খুঁজিয়া মরি।

জনতার কোলাহলে পথে পথে নিজেকে বয়ে বেড়াই···কোন কিছুতেই আর স্বস্তি নেই। কোথায় যেন বাধা পেয়েছে প্রাণ-প্রবাহ। পথ চলায় আর পাইনে উৎসাহ, পাইনে উদ্দীপনা—

"তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধ।"

রাত যায় দিন আসে···দিন যায় সন্ধ্যা ঘনায়। মন স্বপ্ন দেখে ···বৃন্দাবনে সন্ধ্যা হল। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে। আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা শোনা যায়···দেবালয়ে ধ্বনিত হয় ভজন গান। আসে নতুন রাধা প্রদীপটি হাতে নিয়ে আমার ঘরে—শূন্য ঘরখানায় সে কা'কে খোঁজে সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে?

শুনেছি মানুষের ব্যর্থ আশা···ব্যথার হাহাকার তীর্থ-পথে অমৃতের সন্ধান পায়, সর্বহারা লাভ করে মহা সম্পদ, যার পরশে সে স্নিগ্ধ শান্ত হয়। ব্যাকুল মন প্রশ্ন করে—আমিও কি পাব সে মহা পরশ—মণির পরশ তীর্থের পথে?

এক দল যাত্রী চলেছে হরিদ্বারে। দিক্‌ভ্রান্ত আমিও তাদের সঙ্গেই ভীড়ে গেলুম, কিন্তু সে সঙ্গ আমার রইল না। কি বিবাদ বিসম্বাদ···তুচ্ছ তুচ্ছ সামগ্রী নিয়ে কি দীনতা, কারো বা শুচিতার অন্ধ অহংকার, কারো বা পাণ্ডিত্যের! কোথাও বা ঐশ্বর্য্যের নির্লজ্জ আড়ম্বর, কোথাও দেখি কামনার কলুষ কদর্য্যতা!

কে এরা?

মন প্রশ্ন করে আতুর বেদনায়! এ-ও কি আমাদেরই বিভিন্ন রূপ? কেন এরা এসেছে তীর্থের পথে?

তিক্ত বিতৃষ্ণ মন নিয়ে নামলুম হরিদ্বারে—বার বার বোবা প্রশ্ন জাগে, আমি কি চাই? কা'কে চেয়ে এমন পথে পথে ঘুরে মরচি?

হরদ্বার বা হরির দুয়ার—ভগবানের পথ। কোন্ ভক্ত কবে আপন ভুলে এ নাম রেখেছিল কে জানে! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরটির সর্ব্ব অঙ্গে যেন শুচিতা। ভোলা-গিরির আশ্রমে গঙ্গার কূলে এসে বসলুম···কলনাদিনী মন্দাকিনী বয়ে চলেছে, আপন প্রাণছন্দে মাতোয়ারা। স্বচ্ছ জল, নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। সামনে চণ্ডীপাহাড় যেন যুগ-যুগান্তের প্রহরী। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অটল মহিমায়।

মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল সুন্দর দেবতার এই সুন্দরতম রূপে! প্রশস্ত ঘাট। কয়েক ধাপ উঠে গিয়ে সামনে একটি ছোট শিব-মন্দির, আরতির বন্দনা গানে সম্বিৎ পেয়ে ফিরে পেছনে তাকালুম, মন তখন পরিপূর্ণ শান্তিতে স্তব্ধ···হৃদয় তার সকল চঞ্চলতা বুঝি জাহ্নবীর জলকল্লোলে ডুবিয়ে দিয়ে এল!

আজও এ সহর পুরাতনকে জড়িয়ে রেখেছে আপন অঙ্গে যেন কোন নিবিড় মমতায়—সংস্কৃত-চর্চ্চা আজও এখানে চলচে, মরা নদীর মত। ছোট-বড় বহু ছাত্রনিবাস। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় চলে আসছে বিদ্যার আদান-প্রদান। প্রথমা, মধ্যমা, শাস্ত্রী, আচার্য্য ইত্যাদি পরীক্ষার পড়া হচ্ছে টোলে টোলে, পরীক্ষা হচ্ছে। এখানে আছেন বহু পণ্ডিত, উপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় তাঁদের শাস্ত্রতন্ত্রের অতল সমুদ্রে ডুবে—বেদ-বেদান্তের গহনে আত্মনিমগ্ন হয়ে···ভারতের অধ্যাত্মমহিমা এখানে যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে।

চলন আছে আয়ুর্ব্বেদের। এখানের আয়ুর্ব্বেদ-কলেজ সর্ব্বজন-বিদিত। অলিতে-গলিতে বিক্রি হচ্ছে মৃগনাভি-শিলাজতু, ব্রহ্মিবুটি ···জড়ি-বুটি গাছ-গাছড়া। গুণীজনেরা তা সঞ্চয় করে নিয়ে যাচ্ছেন পরম যত্নে। কেউ করতে পারে না জীবহিংসা এর কোলে বসে। এখানের নদীতে তাই দেখেছি মৎস্যকুলের নির্ভীক নির্লিপ্ত গতায়াত।

হরকি পৌড়ি অর্থাৎ হরের সোপান ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে আছে ঝাঁকে-ঝাঁকে মহাশীর্ষ বা মহাসের মাছ···পুণ্যকামী লোকেরা তাদের দুই হাতে আহার দেন—তারা সযত্নে পালিত আছে বহু দিন ধরে—

এই ব্রহ্মকুণ্ড হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান···এইখানেই প্রথম হর-কি-পিয়ারী গঙ্গা নামেন শিবের জটা থেকে ব্রহ্মার তপস্যায়। পুণ্যকামী জনতার কি ভীড়! এক ধারে চুপ করে বসে-বসে দেখছি, এ জনতার কলকোলাহল। পশ্চিমের যাত্রীরই আধিক্য বেশী—বঙ্গের বারাণসী ও পশ্চিমের হরদ্বার—যেন কোথায় নিবিড় যোগ আছে!

যাত্রীরা এসেছেন দলে দলে নানা কামনা নিয়ে। কেউ করছেন পিতৃ-পিতামহের তর্পণ, কেউ বা আপন শিশুপুত্রের শির-মুণ্ডন অর্থাৎ শুদ্ধভাষায় চূড়াকরণ সংস্কার।

আমি বাঙ্গালী—গঙ্গার দেশের মানুষ। জলাভাবের কথা আমি ভাবতে পারি না। পদ্মা ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা কাবেরী সরস্বতী কত নদ, কত নদী—শিরা-উপশিরার মত ছড়িয়ে আছে বাংলার বুকে—বাংলা নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু পশ্চিম—সে যে নদী বর্জ্জিত মরুময়। যদিও পঞ্চনদীর জলধারা পাঞ্জাবের গা বেয়ে মিশেছে সিন্ধুনদে··· করাচি দিয়ে সে নদ গিয়ে মিশেছে মহাসমুদ্রে। বাংলা শস্যশ্যামলা—পশ্চিম—বন্ধুর রুক্ষ রূঢ়। পশ্চিমের রীতি—এরা মৃতের অস্থি কুড়িয়ে রাখে এই ব্রহ্মকুণ্ডে বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষায়। নতুন মৃৎপাত্রে তুলসী-মঞ্জরী দিয়ে লাল নতুন কাপড়ে বাঁধা কত যে এমন নশ্বর জীবনের শেষ বিসর্জন দেখলুম বসে বসে। কত মানবের শেষ চিহ্ন শীতল জাহ্নবীর কোলে চিরসমাধি লাভ করেছে—তাদের অস্থিতে অস্থিতে জীবনের যে দাহন, সেই দাহন বুঝি জুড়িয়ে যাচ্ছে এই পূত জাহ্নবীর জল তলে··· দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে কারো, কেউ বা এনেছেন একাধিক। তাঁরা হয়ত এসেছিলেন তীর্থে—গরীব বা যারা অক্ষম আসতে অপারগ, এমন প্রতিবেশী বা পরিচিতের অনুরোধে এনেছেন তাদের প্রিয়জনদের অস্থি, এই পুণ্যভূমিতে বিসর্জ্জন দিতে। সঙ্গে পুরোহিত আছেন—মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে শেষ সৎকার হচ্ছে। অস্থির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে নবরত্ন সোনা-রূপার কুঁচি, এই না কি প্রথা। লোভী অগ্রদানী-ব্রাহ্মণের দল খুঁজে মরছে সেই অর্থ, রত্ন, জল তোলপাড় করে। দুই পায়ে মৃতের অস্থি দলিত মথিত করে, হায় রে মানবতা!

জনতা কিছু কমতে চেয়ে দেখি, ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি পশ্চিমা ছেলে-মেয়ে। কেমন বিষণ্ণ ম্লান······ছোট ভাইটি শুধায়—'ছোটি বোহিন কি হাড্ডিয়াঁ ভি য়াঁহি হৈ না।' বড় বোনটি জবাব দেয়—'হাঁ ভইয়া······

তো য়হাঁ গোড় ন ধরি?
নাহিঁ ভইয়া—
পানি মাথে মেঁ লি?
হাঁ ভইয়া!"

চেয়ে দেখি, বড় বোনটির চোখ বয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল পড়ে বুকের বসন ভিজিয়ে দিয়েছে। চেয়ে আছে সামনের পানে উদাস দৃষ্টি মেলে। সুখ-দুঃখ-মিলন-বিরহময় জীবনের একখানি পরিপূর্ণ ছবি চোখের সামনে জেগে উঠল। হৃদয়ের অশান্ত বিরহী হা হা করে মরতে লাগল···সত্যই ত যেখানে সহস্র সহস্র মানবের নশ্বর দেহের শেষ এসে মিলেছে···অসংখ্যের অস্থি এসে যে ব্রহ্মকুণ্ডে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, সেখানে কি পা ডোবানো চলে সে মাথায় নেবারই সামগ্রী! সে এক উদাসী মধ্যাহ্নে স্তব্ধ মন বার বার জন্ম-মৃত্যুর রহস্য হাতড়ে মরতে লাগল।

আবার সেই ব্রহ্মকুণ্ড—সকালে দেখেছি দিনের ছবি কলকোলাহল রৌদ্রদাহ-তপ্ত প্রখরতা। সকালের জনতা আর এ জনতা এক নয়—এ জনতা উৎসব-মুখর!

গঙ্গার উপর দিয়ে ছোট একটি সেতু ব্রহ্মকুণ্ড পার হয়ে গঙ্গার মাঝ বরাবর খানিকটা বাঁধান জায়গায় মিলেছে···চতুর্দিকে জল আর মাঝখানের এই বাঁধান জায়গাটি সত্যই মনোরম! দলে দলে লোক এখানে হাওয়া খেয়ে ফিরছে।

কোথাও বা দু'টি মুগ্ধ মন নিভৃত আলাপন জুড়ে দিয়েছে। এই সব ভোলানো সন্ধ্যায়—দখিণী বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাদের এলোকেশ, চূর্ণ-কুন্তল···এক জায়গায় বসেছে রামায়ণ গান—

"চিত্রকূটকে ঘাট পর
ভয়ী সন্তন কি ভীড়
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে
তিলক দেও রঘুবীর।"

একটু পরেই আরম্ভ হবে গঙ্গার আরতি ব্রহ্মকুণ্ডের হর-কি-পৌড়ি ঘাটে। দূর দূর থেকে এসেছে কত যাত্রী এ আরতি দর্শনে—ভক্তিপ্রণতা মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। আরতির ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল—যে যেখানে ছিল স্তব্ধ হয়ে মুখ ফেরালো ঘাটের দিকে। গঙ্গা-মন্দিরের সামনের চাতালে হর-কি-পৌড়ির ওপর এসে দাঁড়ালেন পুরোহিতের দল···শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টারবের মাঝখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রদীপের ঝাড় নিয়ে বড় বড় চামর হাতে সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে চলল গঙ্গার আরতি বহুক্ষণ ধরে। মুগ্ধ মন তাকিয়ে দেখল, এই দেবতার আরাধনা—সন্ধ্যার এই মিলিত বন্দনায় সে-ও তার প্রাণের প্রণাম নীরবে নিবেদন করল সেই পরম অজানার পায়···যাঁকে জানবার সাধনা চলছে যুগ-যুগান্তর ধরে মানবের মনে মনে···

"রঘুকুল-কমল দিবাকর হো
হে রাম তুম্‌হারি জয় হোবে।
রঘুকুলমেঁ সূর্য্য সমান হো হে
রাম তুম্‌হারি জয় হোবে···"

এক সুকণ্ঠ সৌম্যদর্শন গায়ক···তাঁর গানের আসর জমালেন। চারি ধারে আস্তে আস্তে এসে জমল মুগ্ধ জনতা সর্ব্বভারতীয় ব্যাপার···পাঞ্জাবিনী আছেন, হিন্দুস্থানী, বিহারী, এম, পি'র লোক আছেন; মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, পাহাড়ীও আছেন। বিভিন্ন ভারতবাসী এক মহাতীর্থের কোলে এসে একই ভাবনায় এক হয়ে গেছেন। সঙ্গীতের পর সঙ্গীত গেয়ে চলেছেন কথক ঠাকুর। রাত্রি ক্রমে স্তব্ধ হয়ে গেল—গান গেল থেমে···আমি বসে আছি সামনের দিকে চেয়ে শূন্যতার মধ্যে শূন্য দৃষ্টি মেলে। ধীরে ধীরে সেই শূন্যতার বুকে ফুটে উঠল আর এক দিনের ছবি···বৃন্দাবনের আখড়ায় আসর জমেছে, আমিও ঠাঁই পেয়েছি এক কোণায়···রাধা গান করছেন—

"ওগো কাঙ্গাল, আমায় কাঙ্গাল করেছ
আরো কি তোমার চাই···"

গান শেষ হয়ে গেছে—নীরবে রাধার পানে চেয়ে কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কেটে গেছে জানি না! বাস্তব জগৎ লোকলাজ বিশ্ব-সংসার সব যেন আমার কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই জনতার মাঝখানে ভীরু তন্ময় মন কি চেয়েছিল?

হরিদ্বারের বুকে ভোর হচ্ছে—ঘাটে বসে বসে শুনি, কোন সে আদিকালে কে যেন বলচে, "ও ঊষা! ঊষা ওঠ! ভোর হল যে, এখনি অরুণ আসবে তার সপ্ত ঘোড়ার রথ চালিয়ে, সূর্য্যসারথি হয়ে···তুমি কি জাগবে না?"···

কিন্তু,—উদিত আলোর আগমনী ওঠে
শুনি সে পায়ের ধ্বনি
তরুণী ঊষার অবগুণ্ঠন
খসিয়া খসিয়া যায়।

বার্দ্ধক্যের ভীত

শ্রীবাণী দত্ত

এ প্রশ্ন জেগেছে মনে কত কত বার, বয়স কত?
পৃথিবীর আদিকাল হ'তে
এ প্রশ্ন হয়েছে বার বার—পাইনি জবাব বয়স কত?

প্রথম যখন জন্ম নিলাম মায়ের কোলে,
শত তরঙ্গ রোলে, কচি-কচি হাত মেলে দিয়েছি সবার কাছে,
কত আনন্দ-ভরা চোখে চেয়েছি বারে বার
তখনো মনে জাগেনি একটি বার বয়স কত?
তার পর এলো কৈশোর, এল যৌবন, এলো বার্দ্ধক্য,
চমকি উঠেছি বার বার নিজের মনে শত বার
কমেনি এতটুকু সংশয়ের আধিক্য।
এ ধরায় নিত্য নতুন ওঠে প্রশ্ন, কে দেবে জবাব তার?
ভাবি, লোম-চর্ম্ম-কুঞ্চিত কপোল,
তারি 'পরে খ'সে পড়ে শিথিল আঁচল,
কবরী নাই তবু আছে কেশ,
গড়নে নাই ঔজ্জ্বল্য, স্খলিত বেশ।
আর কত দিন বাকী, রুচি নাই কিছুতে
মনে হয় সকলের অবজ্ঞা দহিছে পিছুতে।
পৃথিবীরও হয়েছে বয়স, মানুষের বয়সে
হিসাব-নিকাশ চলে সারা দিন ব'সে।
কেহ যদি শুধায় বয়স কত? চমকি উঠি নিজেরি মনেতে
হয়েছে বয়স, এসেছে বার্দ্ধক্য, হবে কি হবেই যেতে?
তাই বলি, কেহ শুধায়ো না বয়সের কথা
পৃথিবীর বয়সের চাকা ঘুরিছে যে সর্ব্বদা।

বিবেকানন্দ-স্তোত্র

সুমণি মিত্র

জন্ম ও শৈশব

১

'অখণ্ডের ঘর।'
'জ্যোতিষ্কলোকে'র উর্ধ্বে সূক্ষ্ম 'ভাব-লোক',
তা'রো সূক্ষ্মতর স্তরে থাকে দেব-দেবী,
তারো উর্ধ্বে 'অখণ্ডের ঘর'।
দিব্যদেহী দেব-দেবী সে-লোকের পায় না নাগাল।
জ্যোতির্ময় ব্যবধান খণ্ডতার করে পথরোধ।
এই লোকে ধ্যানলীন
দিব্যজ্যোতি-ঘন-তনু সাত জন ঋষি ;
—ধ্যানে-জ্ঞানে-প্রেমে-পুণ্যে সকলের পূজনীয় তাঁরা।
কোনো এক দিন
দিব্য এক শিশু জ্যোতির্ময়
মর্মস্পর্শী ব্যথা বুকে নিয়ে
সপ্ত-ঋষির কাছে আর্তি জানায়
ভাষাহীন নিস্তব্ধ ইঙ্গিতে।
কারুর ভাঙ্গে না ধ্যান,
পায়না কো এতটুকু সাড়া ;
—লীন হয়ে আছে তারা সমাধির সর্বোচ্চ শিখরে।
শুধু এক জন
পদ্মপলাশ আঁখি মেলে
সস্নেহে কি জানালেন তাকে।
আনন্দ-উজ্জ্বল আঁখি তাঁর,
অসীমের সুরে টানা-টানা।
'আঠারো-তেষট্টী' সালে
'সিমলে'র 'দত্তবংশে'
অসীম চৈতন্য নিয়ে
ক্ষুদ্র এক শিশুর আকারে,
জ্যোতির্মণ্ডল ছেড়ে
হঠাৎ এলেন নেমে
'সপ্তর্ষি'র ঋষি।

* * * *

পৃথিবী তখন সূর্য-হীন।
সংশয়ের মলিন কুয়াসা
চুরি ক'রে নিয়ে গেছে বিশ্বাসের দীপ্ত সূর্যটাকে।

২

'সপ্তর্ষি'র ঋষি পেয়ে মা 'ভুবনেশ্বরী'
নাম দেন 'বীরেশ্বর', ডাকনাম 'বিলে'।
কিছুকাল আগে 'কাশীধামে'
'বীরেশ্বরে'র কাছে
পুত্রের মানত ক'রে করেন অর্চনা।
তারপর একদিন
স্বপ্নযোগে 'বিশ্বনাথ'
পুত্ররূপে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন এসে ;
জ্যোতির্ময় রূপ তাঁর, অলৌকিক সুষমায় ভরা।
তাই,
সদ্যোজাত শিশুটির 'বীরেশ্বর' নাম হওয়া চাই।
তা' না হয় হ'ল,
এ দিকে যে গুপ্তলীলা ফাঁস্ হয়ে যায়!
তাহ'লে 'নরেন্দ্রনাথ'?
—এ অনেক ভালো ;
নরবৎ নরলীলা এই নামে আরো ভালো হবে।

৩

এ কি উৎপাত্!
তিন বছরের শিশু নরেন্দ্রনাথ
যা'কে তা'কে যা' তা' ব'লে আসে!
আস্তাকুড়ে আচ্ছা ক'বে দিদিদের মুখ ভ্যাঙ্চায়!
তাণ্ডবলীলার রুদ্রতালে
পল্লীর নিভৃত শান্তি নিমেষে বিপন্ন ক'রে তোলে!
কোনো কাজে যদি বাধা দাও,
ক্রোধে তার সর্ব অঙ্গ ফুলে-ফুলে ওঠে
পৌরাণিক 'ড্রাগনের' মত!
মা বলেন,—"হায়!
শঙ্করের কাছে মাথা খুঁড়ে
ছেলে চেয়ে একি হ'ল দায়!
ছেলের বদলে 'ভূত' 'বিশ্বনাথ' পাঠালেন নাকি!"
"আমি 'ভূত'?—মিথ্যে কথা,"
—রাগে আরো গন্-গন্ করে ;
এটা-সেটা যেটা পায় ভেঙ্গে-ছিঁড়ে তছ্‌নছ্ করে।
'মা তখন বেগতিক বুঝে
এক ঘড়া গঙ্গাজল এনে
ঢেলে দেন শিবের মাথায়,
ব'লে দেন,—"দুষ্টুমির শাস্তি শুনে রাখো,—
'কৈলাসে' যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়!"
অম্‌নি মন্ত্রের মত
মত্ত ফণা স্তব্ধ হয়ে যায়!

* * * *

এখানে খট্‌কা লাগে মনে,
দুষ্টুমির শাস্তি কেন বেত্রাঘাত নয়?
কেন তুষ্টি 'গঙ্গা জলে'?
'চকোলেট-বিস্কুটে' নয় কেন?
যতই বল না, মাঝে মাঝে
গুপ্তলীলা একেবারে ফাঁস্ হ'য়ে গেছে!

৪

"বড় হ'লে কি হবি রে?" প্রশ্নকর্তা পিতা 'বিশ্বনাথ'।
সিদ্ধান্ত করাই আছে,—"হব কচুয়াম,
সপাং-সপাং ক'রে চাবুক হাঁকাবো।"

যে-ক'রে হো'ক না কেন কচুয়ান হ'তে হবে তা'কে।
বিবেকের চাবুকটা ডান হাতে ধরে থাকা চাই ;
উন্মত্ত প্রবৃত্তিবশে একটু বেচাল হ'লে মন,
মানে,—ঘোড়া,
সপাং-সপাং ক'রে চাব্‌কাতে হবে।
'কৈলাসে' যাবার পথে চাবুকটা হাতে থাকা চাই-ই।
তাই
প্রথম দীক্ষার পর্ব অনুষ্ঠিত হয় 'আস্তাবলে'।
দীক্ষাগুরু আর কেউ নয়,
বাড়ির 'সহিস্‌'।
তা'রই কাছে যাচে উপদেশ ;
তা'রই কাছে প'ড়ে থাকে,
অবিকল গুরু-গৃহ-বাস।
'সহিসে'র দাম্পত্যজীবন
যে-কোনো কারণে হো'ক একেবারে প্রাণান্তকর।
তাই,
তার মতে বিয়ে করা সবচেয়ে বড় অপরাধ।
প্রথম দীক্ষার মন্ত্র যেই কানে যাওয়া
শিষ্যের মনের তারে ওঠে ঝংকার,—
'রাম-সীতা' যে-মূর্ত্তির পুজো করে রোজ
তা'রাও যে বিবাহিত।
তবে—।
এখন কি হবে ?

দেব-দম্পতির দুঃখে চোখে আসে জল।
তা' ব'লে কি আর
বিয়ে-করা-দেব্‌তাকে পুজো করা চলে ?
বিবেকের নির্মম বিচারে
সন্ধ্যার অন্ধকারে তাই
দেব-দম্পতির মূর্তি নিয়ে
চুপি-চুপি ছাদে উঠে অকস্মাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেয়।
নিমেষে মাটির মূর্তি শত খণ্ডে চূর্ণ হ'য়ে যায়।
না-ফেলে উপায় ?
"টাকা মাটি, মাটি টাকা" ব'লে
টাকাটা কি ট্যাঁকে রাখা যায় ?

* * * *

সেই দিন থেকে
বিয়ের ওপরে তার একই মনোভাব,—
"I hate the very name of marriage
In regard to a boy or girl......
If my brother marries,
I will throw him off." *

[ক্রমশঃ।

---

* "আমি বিয়ের নাম পর্য্যন্ত ঘৃণা করি, ছেলে বা মেয়ে, যা'রই হোক···। আমার ভাই যদি আজ বিয়ে করে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আর রাখবো না।"

পাব্‌লো পিকাসো

পুরো নাম হল Pablo Diego Jose Francisco de Paule Juan Nepomuceno Crispin Crispiano de la Santissima Frinidad Ruiz-Picasso। এই নামের ক্যাটালগে লুকিয়ে আছে পিকাসোর পিতৃ-মাতৃ পরিচয়। Ruiz হচ্ছে পিতার দিক থেকে আর Picasso ছিল তাঁর মায়ের Surname। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৯০০ সালে তাঁকে প্যারিসে পাঠালেন তাঁর বাবা তখনকার কালের বার্সিলোনার এক নাম করা চিত্রকরের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্তে। মাদ্রিদের রয়াল আকেডেমীর তিনি একজন কৃতী ছাত্র। চিত্রবিদ্যার ইতিহাসে পাবলো পিকাসোর সব চেয়ে বড় পরিচয় তাঁর পরিবর্তনশীল মন। কেউ এজন্ত তাঁর ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ আবার বলছেন, decadent danber, a charlatan, an imposter। সে যাই হোক, পিকাসোকে নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। পিকাসোর ছবিগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করছেন আর্ট কনয়শীয়রেরা। Early Lautrec influence period, Blue period, Rose period এবং Green years। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর Bone Period এবং Negro Period-এর ছবি। তাঁর আঁকা Grecian headsগুলিও বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে তিনি একজন কম্যুনিষ্ট। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, তাঁর আঁকা সব চেয়ে ক্ষুদ্র স্কেচখানির দাম উঠবে ১০০,০০০ ফ্রাঁ। কেমন দেখতে ? টানা টানা বড় বড় কালো চোখ, মস্ত বড় মুখে ততোধিক বড় স্প্যানীশ নাক, শক্ত-সমর্থ মাঝারী গড়নের চেহারা, টাক-মাথা ভদ্রলোককে দেখলে মনে হবে El. Grecoর আঁকা Prince of the Church ছবিখানি, one-third ascetic, one-third inquisitor, and one-third man of the world.

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চার

শশাংক আর চন্দ্রা।
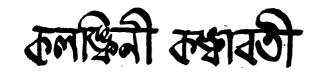
যৌবনের প্রথম রঙ লেগেছে তখন শশাংকর মনে। আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতে প্রথম নারী এসে দাঁড়াল সামনে শশাংকর চন্দ্রা।

শশাংক ও চন্দ্রার মধ্যে বয়েসের পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, সেটা খুব বেশী ছিল না। সামান্যই ছোট-বড় ছিল তারা পরস্পর বয়েসে।

এবং যে বয়েসে পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনেক সময় প্রথম দর্শনেই আকর্ষণ জন্মায় ওদের বয়েসটা ছিল সেই সন্ধিক্ষণে।

তার উপরে গোপন মিলনের মোহটাও কম ছিল না।

তাই যত দিন যেতে থাকে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে।

যেমন সন্ধ্যা হয়ে আসে, কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে শশাংককে যেন কৃষ্ণসাগরের তীরে বাগান-বাড়িটা টানতে থাকে।

সে আকর্ষণ থেকে কিছুতেই শশাংক নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

অথচ পিতার গোপন আশ্রিতা চন্দ্রার সঙ্গে পিতার যে একটা কোন সম্পর্ক আছে সেটা বুঝতে পারা সত্ত্বেও চন্দ্রার আকর্ষণকে শশাংক কাটিয়ে উঠতে পারে না।

পিতা ও চন্দ্রার মধ্যে কোন একটা রহস্য জনক যোগাযোগ বা সম্পর্ক আছে এ বিষয়ে মনে মনে স্থির নিশ্চিত হলেও আজ পর্যন্ত কিন্তু কখনো কোন দিন শশাংক তার পিতাকে বাগান-বাড়ির দিকে যেতে দেখেনি।

এবং চন্দ্রাকেও আজ পর্যন্ত স্পষ্টাস্পষ্টি ঐ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করতেও শশাংকর সংকোচ হয়েছে, লজ্জাও হয়েছে।

তার নিজের দিক থেকেই যে লজ্জা ও সংকোচ ছিল তাই নয়, শুধু চন্দ্রাও কখনো কোন দিন পরস্পরের মধ্যে আলাপে বা কথায় ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি।

চন্দ্রাও সতর্কতার সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেত কি না তাই বা কে জানে?

তা ছাড়া দু'জনে যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতো তখন যেন সমস্ত পারিপার্শ্বিক জগতটাই ওদের মাঝখান থেকে লুপ্ত হয়ে যেত।

শশাংক ও চন্দ্রার সে বিষয়ে কোন খেয়াল না থাকলেও তাদের ঐ প্রতি সন্ধ্যায় গোপন মিলন আর একটি নারীর সতর্ক সজাগ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

চন্দ্রার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে প্রৌঢ়া দাসীটি বাগান-বাড়িতে থাকত, সেই সরযূই একদিন রাত্রে শশাংক বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর চন্দ্রা যখন তার দ্বিতলের শয়নকক্ষের উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়িয়ে শশাংকর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। এসে ডাকল, চন্দ্রা!

চন্দ্রা চমকে ফিরে তাকাল, কী রে সরযূ!

কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না মেয়ে?

কী?

কচি খুকীটি তুমি নও চন্দ্রা! রাজা বাবু যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন ত দু'জনকে খুন করে কৃষ্ণসাগরের মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে।

কিন্তু জানবেই বা কি করে? তিনিও আর ঐ সময় এখানে আসেন না। তাছাড়া এদিকটায় ভুলেও কখনো কেউ আসে না!

নাই আসুক! রাজা বাবুর চরের কি অভাব আছে? তাছাড়া কথা হাওয়ায় হাওয়ায় কানে ভেসে যায়। এ সব কথা বেশী দিন কখনো চাপা থাকে না!

চন্দ্রা বোধ হয় সত্যিই এবারে ভীত হয়ে ওঠে। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে, তাহ'লে কী হবে সরযূ!

তাই বলছিলাম ওকে এখানে আসতে তোমার বারণ করে দেওয়াই উচিত হবে।

কে বারণ করবে, আমি?

হাঁ! তুমি করবে!

না। না—আমি পারবো না। আমাকে মেরে ফেললেও তাকে আমি বলতে পারবো না, তুমি আর এখানে এসো না!

ছেলেমানুষী করো না চন্দ্রা! বেশ। তুমি না বলতে পারো আমিই বলবো!

না! না—সরযূ তাকে অমন কথা বলো না!

সরযূর বুঝতে আর বাকী থাকে না হতভাগিনী চন্দ্রা সত্যিই মরেছে! তার ফিরবার আর পথ নেই!

এখন আর তাকে বাধা দিয়েও কোন লাভ নেই!

কিন্তু ভয়ে আশংকায় সরযূর বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে!

জমিদার রাজশেখর রায়কে সরযূ চেনে!

শশাংক ও চন্দ্রার গোপন মিলনের কথা তার কানে গেলে কারোরই আর রক্ষা থাকবে না।

এই বাগান-বাড়িতে চন্দ্রাকে এনে তার হাতে রাজশেখর যেদিন চন্দ্রার দেখা-শুনার ভার তুলে দেন, তাকে বলেছিলেন, পুরুষ বা স্ত্রীলোক কখনো কেউ যদি এই বাগান-বাড়িতে প্রবেশ করে ত আমি যেন তৎক্ষণাৎ জানতে পারি।

চন্দ্রা তখনও দোতলার ঘরে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। সে কান্নার শব্দ সরযূর কানে এসে বাজছিল।

বিদায় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে লাগামটা শক্ত মুঠিতে টেনে ধরে আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রাজেশেখর।

রঘুবীরকে রাত্রেই গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেই এখানে পাহারা দেবে। তারও অন্দরে ঢুকবার কোন হুকুম থাকবে না।

পরক্ষণেই রাজশেখর রায়ের হাতের চাবুকটা আন্দোলিত হ'য়ে বাতাসে হুইস্ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ তুলল।

নক্ষত্র বেগে তেজী কালো ঘোড়াটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সরযূ খোলা দরজার সামনে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

উপর তলা থেকে তখনও শোনা যাচ্ছে চন্দ্রার কান্নার শব্দ। সমস্ত ব্যাপারটা সে দিন ত নয়ই, তার পর এই দীর্ঘ দশ বৎসরেও পরিষ্কার হয়নি!

রাজশেখর রায়ের হুকুম মতই সরযূ এই বাগান-বাড়িতে তার আগের রাত্রে একাকী এসে উঠে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত তখন বোধ হয় বারটা হবে। সরযূ রাজশেখর রায়ের নির্দেশ মত বহুকালের পরিত্যক্ত বাগান-বাড়িটার নীচের তলার একটি কক্ষে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়ে চুপ চাপ একাকিনী জেগে বসেছিল।

উঃ, কী অন্ধকার ছিল সে রাতটা! রাত্রির নিকষ-কালো অন্ধকারে কৃষ্ণসাগরের কালো জল যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে!

এমন সময় খট্ খট্ খটা খট্ অশ্বখুরধ্বনি শোনা গেল। সরযূ ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায়। অশ্বখুরধ্বনি ক্রমশঃই এগিয়ে আসচে।

প্রদীপটা হাতে নিয়ে সরযূ দরজা খুলে এসে বাইরে দাঁড়াল।

সরযূর অনুমান মিথ্যা নয়, বিরাট কৃষ্ণবর্ণ এক অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় হয়ে রাজশেখরই সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিঠের সঙ্গে পাগড়ি দিয়ে বাঁধা এক অপরূপ বালিকা। মুখটা তার এক খণ্ড বস্ত্রে বাঁধা, হাত দুটোও বাঁধা। মাথাটা হেলে পড়েছে। প্রচুর কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশভার পৃষ্ঠ ব্যেপে এলিয়ে রয়েছে।

ঘর্মাক্ত কলেবর রাজশেখর বাঁধন খুলে প্রথমে তরুণীকে ভূমিতে নামালেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নামলেন। তারপর নিজেই তরুণীকে পাঁজা কোলে করে সরযূকে বললেন, আলোটা ধর সরযূ!

সোজা উপরে নিয়ে গিয়ে তরুণীকে দোতলার একটি ঘরে নামালেন। ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে বললেন, আজ থেকে ও তোর জিম্মায় রইলো।

ভয়ে ভয়ে সরযূ জিজ্ঞাসা করেছিল, পোষ মানবে ত রাজা?

পোষ তুই মানাবি।

পোষ অবিশ্যি সরযূকে কষ্ট করে মানাতে হয় নি। আপনা থেকেই চন্দ্রা যেন পাথরের মত নিস্তব্ধ ও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল!

তারপর দশটা বৎসর নিশ্চিন্তে কেটেও গেছে। চন্দ্রার বয়স তখন দশ কি এগার ছিল। আজ তার বয়স কুড়ি কি একুশ। সেদিনকার বালিকা আজ যৌবনে ঢল ঢল।

এদিকে শশাংক বাড়িতে যতক্ষণ থাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক, আনমনা। কোন কিছুতেই যেন মন নেই! স্পৃহা নেই! সকালবেলাটা যাহোক করে পড়াশুনা নিয়ে কাটায়, বাপের ইচ্ছা ছিল এবারে সে জমিদারীর কাজ-কর্ম তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা করবে, সে দিক দিয়েই সে যায় না।

দ্বিপ্রহরেও বাড়িতেই থাকে না। দোনলা বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে কৃষ্ণসাগরের ধারে ধারে শিকার করে বেড়ায়। নিশ্চিন্দপুরের চৌধুরীদের বাড়ি থেকে তাগাদা এসেচে।

পাকাপাকি তাদের এখনো কিছু জানান হলো না। মেয়ের বৃদ্ধা পিতামহী এখনো জীবিতা। স্বর্ণময়ীই তাঁর একমাত্র দৌহিত্রী। তাঁর ইচ্ছা দৌহিত্রীর বিবাহটা তিনি দেখে যান। বড় আদরের দৌহিত্রী তাঁর স্বর্ণময়ী।

বেশী বয়েসে অনেক পূজা-স্বস্ত্যয়ন করে কবচ-মাদুলী ধারণ করে ঐ কন্যা হয়েছে। স্বর্ণময়ীই তার প্রথম ও একমাত্র সন্তান। ঠাকুরের কৃপায় ঐ সন্তান।

সকালবেলা সেদিন নিজের কক্ষে বসে শশাংক বন্দুকের নলটা পরিষ্কার করছে, জননী সুরেশ্বরী দেবী কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

শেখর! সুরেশ্বরী ডাকলেন।

বন্দুকের নলটা উঁচু করে চোখের সামনে ধরে দেখতে দেখতেই জবাব দেয় শশাংক, কী মা?

তাহ'লে এবারে একটা দিন ঠিক করে ফেলি?

বন্দুকের নল থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দেয় শশাংক, কিসের দিন মা?

কিসের আবার। নিশ্চিন্দপুর থেকে তাঁরা চিঠি দিয়েছেন—

তাই ত জিজ্ঞাসা করছি মা, কিসের দিন!

শোন ছেলের কথা! তোর বিয়ের দিন ত একটা ঠিক করতে হবে! তাদের সব জোগাড় যন্তর করতে হবে ত। হুট্ বললেই ত সব জোগাড় হয়ে যাবে না? কথায় বলে বিয়ের ব্যাপার—

তাই বল! তা সেই দিনই ত তোমাকে আমি বলে দিয়েছি মা, বিয়ে করে বৌকে এনে কোলে করে এখন আমার দ্বারা তার সঙ্গে পুতুলখেলা খেলতে আমি পারবো না।

থাম ত! যত সব অনাসৃষ্টির কথা! আমি নয় বছর বয়েসের সময় বৌ হ'য়ে এ বাড়িতে আসি জানিস। বার বছর যখন আমার বয়েস পোরোয়নি তুই তখন আমার পেটে—

সে বর্গীর যুগের কথা মা! তখনকার দিনে বিয়ে করে স্বামীরা তিন বছরের বৌকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে আসত। আর

এটা হচ্ছে তোমার মা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ। এ যুগে ও সব অচল। বুঝেছো, একেবারে অচল।

হাঁ অচল। ওরে অচলই হোক আর যাই হোক বাপ-পিতামহ তোমার যা করে এসেছে, তুমিও তা করতে পারবে।

না মা, তুমি সত্যি বুঝতে পারচো না।

খুব বুঝতে পারছি। তা ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলছিস, বেশ ত বিয়ে হোক, বৌ না হয় দু' বছর আমার কাছেই থাকবে।

শোন মা! ও-সব হাঙ্গামা কেন করছো বল ত? আমি কি তোমার আইবুড়ো মেয়ে যে, পার করবার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছো!

ষাট্। ষাট্। ছেলের কথা শোন একবার। ছেলে বড় হলে ছেলের বিয়ে দিতে হবে বৈ কি! তুই আর অমত করিস না বাবা!

না মা, বিয়ে এখন আমি সত্যিই করতে পারবো না!

তা বেশ ত! ও মেয়ে ছোট বলছিস? তোর পছন্দ না হয়, মল্লিকপুরে সরকারদের মেয়ে আছে, বেশ ডাগর-ডোগর শুনেছি মেয়েটি। দেখতে একটু রংটা মাজা, তা হোক—

না মা, না! বিয়ে আমি করবোই না। ও সব চিন্তা ছাড় দেখি।

ও সব পাগলামীর কথা ছাড় দেখি—

কেন মিথ্যে বিয়ে বিয়ে করে ক্ষেপছো বল ত মা! তুমি যদি অমন করে আমাকে ত্যক্ত করো, সত্যি বলছি আবার আমি কলকাতায় চলে যাবো, আর ফিরবোই না কোন দিন।

ছেলের কথায় সুরেশ্বরী এবারে বেশ একটু ঘাবড়েই যান। ছেলের কোষ্ঠিতে আছে ২৪।২৫ বৎসর বয়েসে সে হঠাৎ সংসার ছেড়ে চলে যাবে। আর সেই ভয়েই না পুত্রস্নেহে অন্ধ জননী ছেলেকে বিয়ে দিয়ে সংসারে বাঁধবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

মনে মনে গৃহদেবতা গোপীবল্লভকে স্মরণ করে বলেন, ঠাকুর! আমার একমাত্র ছেলে, মায়ের বুক খালি করে ওকে কেড়ে নিও না ঠাকুর!

তাড়াতাড়ি তাই বলেন, থাক বাবা! কোথায়ও তোমাকে যেতে হবে না, বিয়ের কথা তোমাকে আর আমি বলবো না।

সুরেশ্বরী কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

পুত্রের কথায় আজ শুধু হৃদয়ে তিনি আঘাতই পেলেন না, অনেকখানি অভিমানও হয়!

স্বামীকে নিয়ে সুরেশ্বরী কোন দিনই যাকে বলে সুখী বা নিশ্চিন্ত তা হ'তে পারেননি! বিচিত্র এক ধাতুতে গড়া তাঁর স্বামী!

গরীব গৃহস্থঘরের মেয়ে সুরেশ্বরী দেবীকে তার অসামান্য রূপের জন্যই রাজশেখর জননী জাহ্নবী দেবী রায়বাড়ির পুত্রবধূ করে এনেছিলেন।

সাধারণ সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়েই সুরেশ্বরী বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাই আভিজাত্য ও ধনগর্বী জমিদার-তনয় রাজশেখর রায়ের একেবারে নিকটতম সুরেশ্বরী কোন দিনই হ'তে পারেন নি।

রূপের ছাড়পত্র নিয়ে সুরেশ্বরী রায়বাড়ির অতি উচ্চ লৌহ-কবাটটা কোন দিনই অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হননি।

রায়বাড়ির গৃহিণীর পদমর্যাদাটুকুই দিয়েছিলেন সুরেশ্বরীকে রাজশেখর, সহধর্মিণীর মর্যাদা কোন দিনই দেন নি। তার মূলে অবিশ্যি জননী জাহ্নবী দেবীও ছিলেন, রায়বাড়ির সেদিনকার সর্বময়ী কর্ত্রী!

সামান্য দোষ-ত্রুটিটুকুও বালিকা বধূর অভিজাতগর্বী জাহ্নবী দেবী ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেননি! কথায় কথায় বলেচেন, হাভাতের ঘরের মেয়ে জোর করে তুলে এনে সোনার পালঙ্কে বসালেই কী রাজরাণী বনে যায়? ভিক্ষুকের উঞ্ছবৃত্তি ও নীচতা যাবে কোথায়?

নীরবে সুরেশ্বরী চোখের জল মুছে ফেলেচেন।

মানুষের কথার চাবুক যে সময়-বিশেষে চামড়ার চাবুকের চাইতেও নির্মম আঘাত হানতে পারে, সুরেশ্বরীর মত বুঝি আর কেউ তা বেশী জানেনি!

ভুলে যেতেন জাহ্নবী দেবী যে সে তারই বড় আদরের একমাত্র পুত্রের স্বয়ং-নির্বাচিতা বধূ।

বিষয়-আশয় ও আভিজাত্য-মত্ত রাজশেখর তার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, সূর্যমুখীর মত একাগ্রপ্রাণা যে বধূটি নিরন্তর তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে নজর দেবার মতও তার সময় ছিল না। ধীরে ধীরে ফুলে সূর্যমুখী শুকিয়ে গেল।

তার পর একদিন সেই শুষ্ক ফুলের বুকে নতুন মধু সঞ্চারিত হলো, জন্মাল শশাংক, মাধবী।

নতুন করে আবার সুরেশ্বরী বাঁচলেন। তাই ছেলের 'পরে অভিমান জাগাটা তার স্বাভাবিকই!

কয়েকটা দিন তিনি আর ছেলের ধার দিয়েই ঘেঁষলেন না। ঠাকুরঘর ও তাঁর সেবা এবং সংসার নিয়েই ব্যস্ত রইলেন।

দু' বেলা ছেলের আহারের সময় তার পাশটিতে বসে তদারক করা চিরদিনের অভ্যাস সুরেশ্বরীর।

পর পর কয়েকটা দিন শশাংক যখন জননীকে আহারের সময় দ্বিপ্রহরে বা রাত্রে সামনে এসে বসতে দেখলে না, বোন মাধবীকে জিজ্ঞাসা করলো সেদিন আহারে বসেই, হ্যাঁ রে মাধু, মা কোথায় রে! মাকে দেখছি না?

মায়ের পরিবর্তে এ কয় দিন মাধবীই দাদার আহারের সময় বসছিল! সে বললে, মা পূজার ঘরে।

পূজার ঘরে এই সময়?

হাঁ। পূজো করচে।

এত বেলা অবধি ত মা বড় একটা পূজোর ঘরে থাকেন না? শশাংকর কেমন সন্দেহ হলো, বললে, আমার খাওয়ার সময়টাও কি মা একটি বার আসতে পারেন না!

কেন আসবে শুনি?

তার মানে?

তার মানে আবার কি? মার মনে কষ্ট দেবার সময় মনে থাকে না, এখন আবার মাকে কেন?

মার মনে কষ্ট দিয়েছি আমি! ব্যাপারটা শশাংক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যেন।

দাও নি? বলনি বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবে?

এতক্ষণে কয়েক দিন পূর্বের ঘটনাটা মনে পড়ায় শশাংক বুঝতে পারে, তার সেদিনকার কথায় মা মনে তাহলে ব্যথা পেয়েছেন। তা

বিবাহে অসম্মতিতে মনে অভিমান হয়েচে তাঁর ! মাকে শশাংক সত্যি সত্যিই বড় ভালবাসত !

চিরদিন তার যত কিছু আদর-আব্দার ত ঐ মায়ের কাছেই ! শশাংক মনে মনে লজ্জিতই যে বোধ করে তাই নয়, নিজেকে নিজের অপরাধীও মনে হয়।

তাড়াতাড়ি সে কোন মতে আহার শেষ করে উঠে পড়ল।

মাধবী বলে, ও কি ! খাওয়া হয়ে গেল দাদা ?

হাঁ।

আচমন করে শশাংক সোজা মায়ের পূজার ঘরের দিকে চলল।

পূজার ঘরের দরজাটি ভেজান ছিল ভিতর থেকে। একটু ইতস্তত: করে শশাংক ভেজান দরজা ঠেলে খুলে ফেলল। সামনেই রৌপ্যনির্মিত সিংহাসনে মখমলের গদীতে গোপীবল্লভের বিগ্রহ !

চন্দনগন্ধী ধূপ ও গুগ্‌গুলের সুগন্ধে সমস্ত ঠাকুর-ঘরটি যেন ম-ম করচে। সেই সঙ্গে মিশে গেছে চাঁপা ও যুঁই ফুলের সৌরভ।

দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে সুরেশ্বরী। চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ি পরিধানে, গলায় আঁচলটি জড়ান, হাত জোড় করে মুদ্রিত চক্ষু ধ্যাননিবদ্ধ সুরেশ্বরী।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ঘরের মধ্যে একেবারে পাশটিতে শশাংক।

নিমীলিত দু'টি ধ্যাননিবদ্ধ চক্ষুর কোল বেয়ে নিঃশব্দে দুটি ক্ষীণ ধারা প্রবহমান !

মা ! তার মা !

কোন কথা বলতে পারে না শশাংক ! স্থির নির্বাক্ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকে মায়ের পূজারত মূর্তির দিকে তাকিয়ে।

এক সময় ধীরে ধীরে সুরেশ্বরী বিগ্রহের সামনে মস্তক লুটিয়ে প্রণাম করে উঠে বসতেই শশাংক মৃদু কণ্ঠে ডাকল, মা !

মা-ডাক শুনে চকিত সুরেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মান পুত্রের দিকে তাকালেন।

প্রণাম করবো মা তোমাকে ? ছেলে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সুরেশ্বরী পুত্রকে গভীর স্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

মায়ের বুকে মাথা রেখে পুত্র বলে, আমার উপরে না কি তুমি রাগ করেছো মা ?

সুরেশ্বরী কোন কথা বললেন না, কেবল পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

রাগ করেছো মা ?

কে বললে ?

বলই না রাগ করেছো কি না ?

না, রাগ করেচি কে বললে ?

তবে আজ কয় দিন থেকে আমার সঙ্গে তুমি কথা বলো না কেন ? বিয়ে করতে চাইনি বলে তুমি রাগ করেচো মা, বেশ তুমি জোগাড় করো, বিয়ে আমি করবো।

সত্যি ! সত্যি বলচিস শেখর ?

হাঁ মা ! সত্যিই বলচি আমি বিয়ে করবো ! হলো ত ! কই এবারে হাসো ?

চোখে জল এসে গিয়েছিল সুরেশ্বরীর। ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি দেখা দিল, মৃদু কণ্ঠে বললেন, পাগল ! তার পর ছেলেকে আরো একটু নিবিড় করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে চিরকালই কি তুই পাগল থাকবি রে শেখর ?

আচ্ছা এবারে চলি, তুমি খেতে যাও মা ! শশাংক ঠাকুর-ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুরেশ্বরী আর একবার বিগ্রহের সামনে লুটিয়ে প্রণাম জানালেন, ঠাকুর আমার শেখরকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিও না। তবে আমি বাঁচবো না।

স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত পাষাণ বিগ্রহ চুপ করেই রইলেন !

[ক্রমশঃ।

গাঁয়ের মাটির গান

শ্রীশান্তি পাল

আমরা ছুতোর খাটিয়ে গতর
শুকনো কাঠে ফোটাই প্রাণ,
মোরা, চালিয়ে র‍্যাঁদা নিত্যি করি
উঁচু-নীচু সব সমান।
উদয়-অস্ত দু'হাত চালাই,
নেইকো তবু পুঁজির বালাই,
মোরা, করাত ধ'রে, বাটাল ধ'রে
চিরি চাঁচি শাল-গরাণ।
প্যাঁচ্‌কস্‌ তিরজুত্‌,
মারবিস্‌ কুরমুত্‌,
ভুরপুণ্‌ ঘিস্‌কাপ্‌,
জিন্‌-বাড়ি মার্‌ চাপ্‌।
নৌকো, ঢেঁকি, চাকা গড়ি,
খাট, পালং, দোর, জানলা করি,

মোরা, বানাই কুর্শি, দেরাজ, ছড়ি
লাঙলের ঈষ-মুঠিখান।
সূয্যি-সোম আর তারায় ঘেরি'
পায়ে তাদের পরাই বেড়ি,
মোরা, চরকা-তাঁতের বাড়িয়ে গরব,
রাখি লজ্জা গাঁয়ের মান।
প্যাঁচ্‌কস্‌ তিরজুত্‌,
মারবিস্‌ কুরমুত,
ভুরপুণ্‌ ঘিস্‌কাপ্‌,
জিন-বাড়ি মার্‌ চাপ।
শহর-স্রোতে দু'দিন ভাসি,
কামিয়ে কিছু ফিরে আসি,
মোরা, ভাঙা কুঁড়ের মাঝে বসি'—
গাই সবুজের বিজয়-গান।

সুরসাম্য

মায়া দাশগুপ্ত
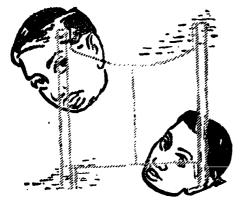
পূজোর আর কয়েক দিন মাত্র বাকী। ফাইলগুলো টেবিলের ওপর সংখ্যাবৃদ্ধি করেই চলেছে, আজও লেখা শেষ হোল না। পুজোর ছুটির আগেই ফাইলগুলো শেষ করতে হবে, বড়বাবু কড়া তাগাদা দিয়েছে।…খুকু কি জামার জন্য খুব কাঁদছে? মমিতাও কি পুজোয় নূতন শাড়ী না পেলে মনে দুঃখ পাবে না? দুধওয়ালা বাকী টাকার জন্য পরশুই হয়তো আসবে। ফাইলের পর ফাইল তো জমা হয়েই যাচ্ছে। নাঃ, কিছুতেই কাজে মন দেওয়া যাচ্ছে না। সংসার আজ শৃঙ্খল হয়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে, মনকে করে তুলেছে ভারাক্রান্ত; পুজোর খরচ কেমন করে চলবে! সরকারী দপ্তরখানার তেতলার ঘরে বসে নরেনকে সেই চিন্তাই আজ পেয়ে বসেছে, অথচ চিন্তায় আশার আনন্দ নেই, আছে কেবল হতাশার গ্লানি, একটানা ক্লান্তি। কেরাণী-জীবনটা কি স্রষ্টার অভিশাপ মাত্র? আনন্দ কোরবার অধিকার থেকে কি তারা তবে বঞ্চিত? শুধু আঘাতে অপমানে ব্যথায় দুঃখকে বরণ করে নেওয়াই কি জীবনের একমাত্র সার্থকতা, এতটুকু সান্ত্বনা?…কাছের ফাইলখানা খুলে বসলো নরেন। কিন্তু কোন কাজই হচ্ছে না…না আর নয়, এত অভাব এত অশান্তি এত দুঃখ এত দুশ্চিন্তা নিয়ে কাজ করা যে অসম্ভব, কাজে ভুল তো হবেই। তা হোক! তবু তাকে কাজ কোরতেই হবে, নয়তো চাকরীই বা থাকবে কেন? ফাইলের কালো অক্ষরগুলো চোখের সামনে অস্পষ্ট হ'য়ে আছে; বারে বারেই ভুল হয়ে যাচ্ছে। চাকরীর প্রয়োজনই এত দিন ফাইলের আকর্ষণ ছিল, আজ বুঝি ফাইলগুলো মনকে বাঁধতে পারলো না, চাকরীর মোহ কি তবে নরেনের মনকে আজ মুক্তি দিয়েছে?

…পাশের বাড়ীর মায়ার কি সুন্দর জামা! তার বাবা ব্যবসা করে। খুকু অনেক দিনই বলেছে, "বাবা তুমিও ব্যবসা কর না?" খুকুর শিশু-মন হয়তো এ কথাই ভেবে রেখেছে যে ব্যবসা করলে সে-ও মায়ার মতো মোটর চড়ে স্কুলে যেতে পারবে, এ দুরাশা অবোধ শিশু হয়তো আজও হৃদয়ে পোষণ করে। 'দুর্বিষহ কেরাণী জীবন আর সহ্য হয় না, আজই এ কাজ ছেড়ে দিতে হবে'—এমনি কত কি ভাবনা দিনের পর দিন নিরুৎসাহ নরেনকে কাজ কোরতে দেয় না। অনিচ্ছুক হয়েই নরেন আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসে শুধু……সেদিনের কথা কেন মনে আসে, কেন মনে পড়ে অনেক অনেক দিনের আগের সেই একটা বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা!

বার্মা তখন জাপানীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত, সীমান্তবাসীরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। চট্টগ্রাম নোয়াখালীর লোকেরা প্রাণ ভয়ে পায়ে হেঁটেও যে যে ভাবে পারে দেশের দিকে চলে আসছে আপনার যথাসর্বস্ব ফেলে রেখেও। এমনি এক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সুধীর দেশে ফিরে গৃহলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে মাত্র ৫৫৲ টাকায় একটা কেরাণীগিরি সংগ্রহ করে সে বারের মত প্রতিকূল পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পেল। নরেন তখন সে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, সংসারে স্বামি-স্ত্রী ভিন্ন আর কেউ-ই ছিল না; খুকু তখনও তাদের কাছে আসেনি। আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যেই দিন চলছিলো তার। অফিসের আগন্তুক তরুণ কেরাণীটি কিন্তু তার কুনজরে পড়ে গেল। এত কাজে ভুল হলে তাকে রাখাই বা যায় কি করে? সুধীরকে একদিন নিজের কামরায় ডেকে রীতিমত শাসিয়েই দিল যে, এ ভাবে ভবিষ্যতে আর ভুল হলে তাকে বরখাস্ত করা হবে। কিন্তু শাসন ও ভয় কোনটাই সুধীরের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না। আবার একদিন ম্যানেজারের ঘরে ডাক পড়লো; এবারে বেশ অপমান করেই দিল তাকে। সুধীরের কাজের ভুল দিন দিন বেড়েই চললো। অবশেষে নিতান্ত মরীয়া হয়েই নরেন সুধীরকে বরখাস্ত ক'রে দিল।

স্মৃতির পাতা থেকে সে মুহূর্তগুলো আবার ভেসে উঠছে। ছাঁটাই-নোটিশখানা বেয়ারার হাতে সুধীরের নামে পাঠিয়ে দিয়ে নিতান্ত কৌতূহল বশেই সে একবার সুধীরের রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, চোখে পড়লো টেবিলের ওপর সুধীরের অশ্রুসিক্ত বিবর্ণ মুখখানা, হাতে তখনও রয়েছে সদ্যপ্রাপ্ত ম্যানেজারের চিঠিটা। নরেন আর এক মুহূর্তও সেখানে না দাঁড়িয়ে পা চালিয়ে চলে এলো নিজের যায়গায়। কে জানে হতভাগা যদি আবার তার কৃপাভিক্ষা চেয়ে পা জড়িয়ে ধরতে চায়, তাই পা দুটোকেও যথাসম্ভব টেবিলের তলায় গোপন ক'রে রাখলো। 'এ রকম লোককে বেশী দিন রাখলে ভুলের জন্য হয়তো আমারই একদিন চাকুরী নিয়ে টানাটানি পড়বে, তা ছাড়া ম্যানেজারের দায়িত্ব ও কর্তব্যও তো আছে। এ ভাবে অবহেলায় একটা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অধিকারও তো আমার নেই; ও রকম লোককে appoint করাই অন্যায়।'

সুধীরের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়েই সেদিন নরেন ঘরে ফিরলো। যাক্ তবু তো আপদ বিদায় হোল। পরের দিন লঘু পরিহাসের ছলেই সুধীরের পরিত্যক্ত সীটের দিকে তাকিয়ে পাশের সলিলকে ম্যানেজার জিজ্ঞেস ক'রলো, "কালকে ছোক্‌রা খুব কেঁদেছিলো, না?" এবং তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞের ন্যায় গাম্ভীর্য নিয়ে কৈফিয়তের সুরে মোলায়েম কণ্ঠে বললো, "কি কোরব বল? আমি তো বে-আইনী কাজ করতে পারিনে?"

সলিল ম্যানেজারের কথায় সমবেদনার ছোঁয়াচ পেয়ে জানালো, সুধীরের বাড়ীর আর্থিক দুরবস্থার কথা। সুধীরের মা দিন দুয়েক আগে নোয়াখালীর কোন গ্রাম থেকে চিঠি লিখেছে চালের মণ ৪৫৲ টাকা। এ অবস্থায় কি কোরে সুধীরের প্রেরিত মাত্র ৪০৲ টাকায় তাদের মাস চলে! সেই সঙ্গে এ অভিযোগও কোরেছে

সুধীর কোলকাতা সহরে ট্রাম বাস হাওয়াগাড়ী বিজলীবাতি সিনেমা এ সবের মধ্যে খুব সুখেই কাটাচ্ছে ; বিধবা মা ও চারটি ছোট ভাই-বোনের কথা একটুও ভাবে না। দুঃখে গ্লানিতে সুধীরই সেদিন সলিলকে এই চিঠি দেখিয়েছিল।

নরেন তো সেদিন ভেবেই পেলো না মাত্র ১৫৲ টাকার ৫৲ টাকা সিটরেণ্ট দিয়ে পাইস হোটেলে কি কোরে ১০৲ টাকায় একটা লোকের খাওয়া-পরা চ'লতে পারে! রোজ কি তাহলে সে না খেয়েই অফিস কোরতো? ৩০০৲ টাকায়ও তো তাদের স্বামি-স্ত্রীর স্বচ্ছল ভাবে চলে না? যাক্ কি হবে ভেবে? সুধীরের দারিদ্র্যের জন্য সে কি কোরতে পারে!···

···পুজোর আর চার দিন মাত্র বাকী। নিজের দারিদ্র্যের কথা ভাবলেই মনটা বিষিয়ে ওঠে। ফাইলগুলো শুধু জমেই চলেছে, আজও শেষ হোল না। কয়েক দিন থেকে কাজেও প্রচুর ভুল হয়ে যাচ্ছে, ভুলগুলোও সংশোধন করে নিতে হবে। বড়বাবু যদি কাজ দেখতে চান তবে সে কি কৈফিয়ত দেবে? এ অপরাধে যদি বড়বাবু তাকে বরখাস্ত করেন? না না, এ কথা নরেন ভাবতেই পারে না, তাহ'লে যে তাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে! এ হ'তেই পারে না, চাকরী তার রাখতেই হবে, নয়তো তারা খাবে কি? খুকুকে সে কি সান্ত্বনা দেবে!··· ব্যাকুল আগ্রহে ফাইলখানা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বসলো নরেন।

বেয়ারা এসে শ্লিপ দিল বড়সাহেবের জরুরী তলব পড়েছে, এক্ষুণি নরেনকে গিয়ে দেখা কোরতে হবে বড়বাবুর সঙ্গে। কম্পিত হস্তে শ্লিপটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নরেন। তার চোখের সামনে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন হঠাৎ একসঙ্গে নিবে যাচ্ছে, পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। চেয়ারটা শক্ত করে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল নরেন। আজ সে-ও সুধীরের পর্য্যায়েই নেমে এসেছে। এ-ও কি এক অভিশাপ? সেদিন বোঝে নাই আজ যেন নূতন কোরে দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে সুধীরকে সে আবিষ্কার করলো। সুধীরের স্মৃতিই তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ছেয়ে দিচ্ছে। সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত দারিদ্র্যপীড়িত যুবকটির পরিণাম নরেনের জানা নেই ; এই বৃহৎ পৃথিবীর জনারণ্যে কোথায় সে তলিয়ে গেছে কে জানে! সেদিনের এক ম্যানেজারের উপহাস আজ নরেনের চোখের কোণে বাষ্পবিন্দু হয়ে ভেসে উঠলো।

চোখটা একবার মুছে ধীর-কম্পিত পদে প্রতিটি সেকেণ্ড গুণে গুণে নরেন অফিসারের সজ্জিত কক্ষের দিকে পা বাড়ালো।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

সবে মাত্র কলমটা হাতে নিয়েছি, ভাবছি, সাংসারিক উৎপাত আর দৈববিপত্তি হয়তো কাটিয়ে উঠলাম! এখনো সাড়ে চারটা বাজেনি, বাকি বেলাটা কাজ করতে পারবো তা'হলে। গিন্নী এসে বললেন,—সাধন, ঝণ্টু আর বুড়ী রইলো, তাদের দিকে নজর রেখো। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

মেজাজ আমার বেজায় ঠাণ্ডা, তবু মনে হল সেটাকে আর ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না। অসন্তোষ প্রকাশ পেলো, জিজ্ঞাসা করলাম,—বাদল, শোভা আর খোকন কোথায় গেল?

—শোভা গেছে খোকনকে নিয়ে তার বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে। আর বাদলদের কলেজে থিয়েটার, সে গেছে রিহার্সাল দিতে। বলে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।

শুনে আপ্যায়িত হলাম। আন্দাজ করতে পারলেও জিজ্ঞাসা করলাম,—আর তুমি চলেছো কোথায়?

—শ্যামা আর গৌরী টিকিট আনিয়েছে, ধরেছে তাদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি, ফিরতে তো রাত সাড়ে আটটা বাজবেই।

শ্যামা আর গৌরী মানে আমার উপরের তলার দু'খানা ঘরের ভাড়াটের বয়স্কা আইবুড়ো মেয়ে দু'টি। দোতলা বাড়ী, নীচের তলার আড়াইখানা ঘরের মালিক মানে ভাড়াটে আমি। বহু দিন একত্রে বাস করার ফলে ওদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আজ। ছোট বোনের মতোই দেখি মেয়ে দু'টিকে, ঠিক ছোট বোনের মতই ব্যবহারও তাদের। আমাকে রীতিমতো শ্রদ্ধাই করে তারা। প্রায়ই ওরা তাদের বউদিকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যায়। অবশ্য প্রায়ই মানে মাসে এক-আধ বার। গিন্নীরও এই একটি মাত্রই সখ, শ্যামা আর গৌরীকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়া। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়তো পয়সাটা খরচ করতে হয় গিন্নীকেই, তবে সেটা এমন বেশী কিছু নয়। ওদের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ, মা বাবা জরাগ্রস্ত, বড় ভাই গেঞ্জির কলে কাজ করে, বোন দু'টির ছোটটি এবছর কলেজে ভর্তি হয়েছে—বড়টি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন, ছোট ভাই পড়ছে চতুর্থ শ্রেণীতে। এতোগুলো প্রাণীকে একটিমাত্র ভাইএর রোজগারের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়—সে আর কতো? কি করে ওদের চলে ভেবে পাইনে, দেখতে পাই দিব্যি চলছে—খাওয়া-দাওয়া যায় পরিপাটি প্রসাধন পর্যন্ত! এ রহস্য সমাধানের চেষ্টা করিনে, চলছে সেটাই ভালো! দু'টি মেয়েই সুন্দরী, বয়স তাদের সুন্দর হবার। বড়লোক আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আসে দেখতে পাই, হয়তো সাহায্য করে তারা।

বুঝলাম আমার কাজ হয়ে গেল। সমস্ত দিন আজ চটবো না ঠিক করেছি কিন্তু গিন্নীর এ প্রস্তাবে এবার ধৈর্য্যের বাঁধ আর রাখতে পারলাম না। তিক্ত কণ্ঠে বললাম,—এতো বয়স হল, এ বদ অভ্যেসটা এবার ছাড়ো।

নিজের কানেই কথাগুলো কেমন বিশ্রী শোনালো। গিন্নীর এই সিনেমায় যাওয়া নিয়ে যে কোন দিন কিছু বলবো এর আগে একথা আমি নিজেই ভাবতে পারিনি।

আমার মতো নিরীহ গোবেচারি লোকের মুখে এ ধরণের কথা শুনে গিন্নীও হয়তো প্রথম একটু অবাক হলেন। তারপর জ্বলে উঠে বললেন,—সংসারের হাঁড়ি ঠেলে আর ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করেই সময় পাইনে, কি এমন আরামে আমাকে রেখেছো শুনি? হাত নেড়ে গিন্নী বললেন।

অনুশোচনা হল, হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়লো তার খালি দুখানা হাতের দিকে। কিছু দিন আগে হঠাৎ টাকার দরকার হওয়ায় চুড়ি ক'গাছি বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছিলাম, চুড়ি ক'গাছি আজো ফিরিয়ে আনা হয়নি! অবশ্য স্বেচ্ছায় না দিলে চুড়ি আমি কক্ষণো নিতাম না। এমন এর আগেও হয়েছে কিন্তু কোন বারই এতো দিন চুড়ি পড়ে থাকেনি। কুলোতে আর পারছি না—খরচ বেড়ে গেছে আজ। বাড়ুক, এ নিয়ে গিন্নীর সঙ্গে মতবিরোধ আর মনোমালিন্য কোন দিনই আমার হয়নি, যে ভাবেই হোক চালাতে হবে। স্কুলে পড়াই, ত্রিশোর ওপর মাইনে—এ ছাড়া টিউশানিও করি, সব টাকাই গিন্নীর হাতে তুলে দিই! বুঝতে পারি মাসের শেষ ক'দিন এ টাকায় আর কুলোয় না, অবশ্য এ নিয়ে গিন্নীকে কোন দিন অনুযোগ করতে শুনিনি। এদিক দিয়ে আমাদের দাম্পত্য জীবন ভালো, সারা দিন অভাব-অভিযোগের খিটিমিটি লেগে নেই, অভাব-অভিযোগ যতই থাক। সুতরাং গিন্নীর কথা শুনে আজ আমিও কম অবাক হইনি। বুঝলাম ভুল আমারই হয়ে গেছে।

মোলায়েম সুরে এবার বললাম, রাগ করলে তুমি? তুমি কি বুঝতে পারছো না এমন করে তোমাকে বলতে পারিনে, এ কথাগুলো তোমাকে বলিনি। তুমি যাও, ছেলে-মেয়েদের আমি দেখবো।

—আমাকে নয় তো কা'কে এ কথাগুলো বললে শুনি? নরম শোনালো না কথাগুলো, মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে বলে মনে হল না।

বললাম,—সকাল থেকে লিখবো ভাবছি, একের পর এক লোক এসে কাজ করতে দিলে না। চটেছি তাদের ওপর—সারা দিন ধরে চটেছি: তাদের তো কিছু বলতে পারিনে, তাদের উপরের রাগটাই তোমাকে উপলক্ষ্য করে বেরিয়ে এসেছে। নইলে তোমার ওপর রাগ আমি করেছি কোন দিন যে আজ রাগ করবো? তোমাকে বললেও আসলে এ বলা তোমাকে নয়।

ব্যাপার বুঝে গিন্নীর মুখে হাসি দেখা দিল,—ও তাই বলো! তা' তোমার কাজের ক্ষতি হলে না হয় আজ আর গিয়ে কাজ নেই। নাই বা গেলাম আজ সিনেমায়।

হালকা সুরে বললাম,—না গেলে টিকিটখানার কি হবে?

—দিয়ে দিলেই হবে আর কারুকে,—গিন্নী উত্তর দিলেন অবহেলায়।

হাসলাম আমি,—ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তুমি যাও। সত্যিই তো সংসারের ঘানি ঠেলছো মাসে ত্রিশ দিন। এক দিন একটু বেড়িয়ে এলেও উপকার হবে।
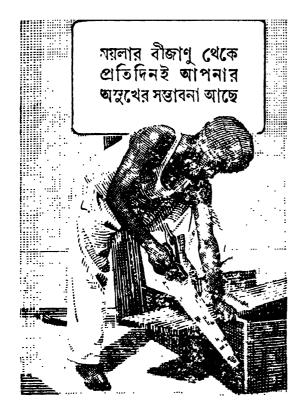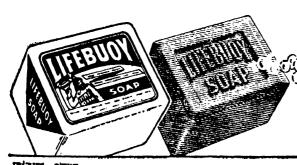
গিন্নী চলে গেলেন। এমনি বোকা আর সরল দ্বিতীয় মেয়ে আমার চোখে পড়েনি আজ পর্যন্ত। বোকা লোককে নিয়ে একদিক দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হলেও ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় আরো বহু দিক দিয়ে। অথচ এই বোকামি সম্বন্ধে বলা চলে না কিছুই।

ধরা যাক বড় ছেলে বাদলের কথা। তার মার টানটা তার ওপর একটু বেশী। সকাল-বিকেল সন্দেশ না হলে মন ওঠে না ছেলের। ফলে অন্য ছেলে-মেয়ের বেলায় যে মুড়ি-দইএ-ও টান পড়ছে সেটার দিকে খেয়ালই নেই, বাদলের বরাদ্দ সন্দেশ সে আসা চাই-ই। বোকা লোকেদের ভালবাসার চেহারাও এমনি একরোখা। ছেলের খাওয়া নিয়েও তার মার দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

এ ভালোই হল। নইলে হয়তো গিন্নীর সিনেমায় যাওয়াও হতো না, আমার লেখাও হতো না। মাঝখান থেকে সংসারে একটা অশান্তির সৃষ্টিই হতো মাত্র।

আমি বড় লেখক হতে পারতাম, লিখতে বসলেই যদি বাধা না আসতো! কিন্তু সে আফসোস করে আজ আর লাভ নেই।

শ্রাবণ মাস। সমস্ত দিন কাজের একটা ইচ্ছা মনের মাঝে ফিরছে অথচ কোন কাজই করতে পারিনি। বাধা আসছে নানা দিক থেকে। সকাল থেকে রোদ উঠেছে, শ্রাবণের রোদ—ঘাম-নিঙড়ে-বের-করা উত্তাপ সে রোদের। আকাশে এক ফোঁটা মেঘের চিহ্ন নেই। বৎসরের সমস্ত উত্তাপ যেন ঢেলে দিচ্ছেন সূর্যদেব শুধু আমার কাজের ব্যাঘাত করবার জন্তেই। নইলে এ অহেতুক গরমের অন্য কোন কারণই থাকতে পারে না। অন্য দিন হলে বৃষ্টি না হোক হাওয়াও একটু থাকতো! এর ওপর বন্ধু-বান্ধবরা আমি আজ কাজ করবো জেনেই যেন বেছে নিয়েছেন আজকের এই বিশেষ দিনটি দেখা-সাক্ষাৎ আর গল্প-গুজব করবার জন্তে। কাজের আশা ছেড়ে দিয়ে তাদের দাবি মেটাচ্ছি সারা দিন ধরে, মনে মনে ঠিক করেছি, কারোরই ওপর চটবো না আজ। চটলে ক্ষতি আমার একারই হবে, কাউকে কিছুই বলতেও পারবো না। মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, কাজ হবে যেমন চিরদিন হয়ে আসছে তেমনি, ভালো না হোক যেমন-তেমন তো হবেই। অর্থাৎ দৈব এবং পার্থিব উৎপাত আমার কাজের দিন লেগেই থাকে আমি দেখে আসছি; ভালো করবার ইচ্ছা আমার যতোই থাক শেষ পর্যন্ত যেমন-তেমন করেই সেটা সারতে হয়, ভালো না হলেও যা হল তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় উপায় নেই বলে। স্কুলে পড়াই, বাইরে পড়াই, বাজার করা থেকে আরম্ভ করে সংসারের খুঁটিনাটি সবই দেখতে হয়, খাটতে হয় ফাই-ফরমাস, সাহিত্য সাধনার আমার সময় কোথায়? তবু যদি ছুটির দিনগুলো কাজ করতে পারতাম! একথা থাক, আফসোস করে লাভ নেই!

সাধারণতঃ উপরে আমাদের মার কাছেই ছেলে-মেয়েরা থাকে। এদের ভালোও বাসেন তিনি, শাসন করে আগলে রাখতেও পারেন—হাসি মুখে সহ্য করেন ওদের উৎপাত। আজ আমাকে বলে গেলেও যাবার সময় গিন্নী ওদের তার হাতেই সঁপে দিয়ে গেলেন। ছ'টি ছেলে-মেয়ের বাবা আমি, ছেলে-মেয়েরা আমার কাছে অবাঞ্ছিত নয়। সাধনের বয়স আট,—ছেলেবেলা থেকেই রোগা—হাড়-জিরজির চেহারা, কোন কিছুতেই শরীরের পুষ্টি হচ্ছে না ওর। এ ছাড়া বাকি ছেলে-মেয়েদের সবাই সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান। ঝণ্টুর বয়স ছয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর চঞ্চল ছেলে। বুড়ী চার বছরের মেয়ে, আমাকে ধরতে পারলে আর ছাড়তে চাইবে না কোন মতেই বাদল, শোভা আর খোকন এদের বড়। বড় ছেলে বাদলের বয়স বছর সতেরো, কলেজে ভর্তি হয়েছে এবছর—পাশ করে চললে পড়াশোনায় বিশেষ ভালো নয়। হালে বিলাসিতা বেড়েছে দেখতে পাই, ইস্ত্রি-করা দামী স্যুট ছাড়া কলেজে যাওয়া চলে না—পড়া সময় তার চলে যায় চকচকে জুতোকে আরো চকচকে করে তুলতে বুঝতে পারি আর দশ জন ছেলের সঙ্গে চলতে হবে, কিন্তু টেক্কা দি চলতে হবে এমন কোন কথা নেই। আন্দাজ করতে পারি তা মায়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভাই-বোনদের বরাদ্দে ভাগ বসি তাদের বঞ্চিত করছে সে, অন্তদের জামাকাপড়ের অভাব রয়ে আর তার রয়েছে প্রয়োজনেরও বেশী—কিছুই বলিনে। শোভ আর খোকন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, খোকন লেখাপড়ায় খুবই ভালো আশা করছি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় নাম করবে সে। এ ছাড় বুদ্ধি-বিবেচনাও রয়েছে তার। বাদল যদি আর একটু বুঝে চলতে তাহলে সব খরচ চালিয়েও মাসের শেষে অতোটা অভাব হয়তে হতো না। খোকনের মতো বিবেচনা যদি বাদলের থাকতো। কিন্তু পস্তিয়ে লাভ নেই, এ বয়সে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সকলেরই হয়ে থাকে, আর সবাই খোকনের মতো হবে, এটা আশা করার কোন মানেই হয় না।

কিন্তু নবাবপুত্র সেজে থাকলেই যদি নবাবপুত্র হওয়া যেতো সে হওয়া যায় না, তবু ভাবি, আমার ছেলে যদি সে যে এক সাধারণ শিক্ষকের ছেলে এ-কথা ভুলে থাকতে পারে তো মন্দ কি আমার মতো অকালে ওর সব রস শুকিয়ে না যায় সেজন্য আরে দু'-একটা টিউশানির জোগাড় দেখি। লেখক হিসেবে কিছুটা না আছে, তার জোরে যদি দু'-দশ টাকা আসে, সেই বা কম কিসে?

ছেলে-মেয়েরা উপরে রয়েছে, শোভাও ফিরে আসবে কিছুক্ষণ পরেই। সে এলে সে-ই দেখবে ছেলে-মেয়েদের, আমি কাজ করছি দেখলে আমার ধার ঘেঁষতে সে কিছুতেই ওদের দেবে না তার মার মতোই এ সব বিষয়ে বিবেচনা রয়েছে তার। আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে আবার আমি কলম হাতে তুলে নিলাম।

সিঁড়ি থেকে ঝণ্টুকে এসে ধরে নিয়ে গেলেন আমার মা শুনলাম বলছেন,—বাবা কাজ করছেন, এসো বাঘের গল্প বলবো,—ওই ধামার মতো মাথা, আর আগুনের ভাটার মতো চোখ দু'টে তার জ্বলছে! ঝণ্টু ফিরে গেল এমন বাঘের গল্প শুনতে! বুঝলাম আমার কাছে আসবার জন্য আবদার ধরেছিল ছেলে, আর তার মা বলে গেছেন আমি কাজে ব্যস্ত। এ-সব নাতি-নাতনীদের নিয়ে বুড়ী বেশ আছেন, মাসীমা বলি আমি তাঁকে। দীর্ঘদিন একত্র বাসের ফলে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাদের সঙ্গে। মনে মনে গিন্নীর বিবেচনার তারিফ করলাম। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার চেয়ে গিন্নীরই বেশী, সারা দিনই ওদের সঙ্গে মাখামাখি। অথচ এর একটা হাস্যকর দিকও আছে, সরল লোকগুলোকে নিয়ে বহু বিপদ আগেই বলেছি। আর এর মারাত্মক দিক হচ্ছে, একে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই। বুঝলেও মুখ বুঁজে আমাকেও থাকতে হয়, আর গিন্নীকেও মনের কষ্ট চেপে রাখতে হয় মুখের হাসি দিয়ে।

বয়স আমার পঁয়তাল্লিশ না হলেও তার আর বেশী বাকি নেই

চল্লিশ পার হয়ে গেছে দু'তিন বছর। গিন্নী আমার চেয়ে বছর দশের ছোট হলেও তার মতো ততটা বুড়িয়ে যাইনি আমি। রোগা চেহারা আর মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালো বলে দেখে বয়স আমার আরো কমই মনে হয়। নিজের মুখে নিজের চেহারাই বা খারাপ বলবো কি করে? ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি আমার চোখ দুটো নাকি ভারি সুন্দর! প্রথম প্রথম রাত্রে একটু দেরি করে ফিরলেই গিন্নী প্রশ্ন করতেন,—কোথায় ছিলে, কে কে ছিল ইত্যাদি। কৈফিয়ৎ দিতে হতো। ক্রমে ব্যাপার বুঝলাম,—বুঝলাম তার দুর্বলতা কোথায়? গিন্নীর ধারণা তার এই রোগা স্বামীটির ওপর নজর রয়েছে দুনিয়া সুদ্ধ সব মেয়ের। সংসারে অশান্তি আসুক এ আমি চাইনে, সাবধান হলাম! বেশী রাত বাইরে থাকিনে, রাত্রে বেরোইনে বড় একটা, গিন্নীকে না বলে তো নয়ই। সব সময় হয়তো সত্য বলিনে কিন্তু পরে কৈফিয়ৎ দেবার পথ আগে থেকেই বন্ধ করে রাখি। সংসারের শান্তি অব্যাহত রাখতে মাঝে মাঝে মিথ্যে বলাটাকে আমি দোষের বলে মনে করিনে। গিন্নীর চেহারা আগে ভালোই ছিল, বর্তমানে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা তার বেড়ে চলেছে সে আমি বুঝি। ফলে ইদানীং আরো সাবধানে চলাফেরা করতে হয় আমাকে।

যা' বলছিলাম, শ্যামাদের কথায় ফিরে আসা যাক। শ্যামা আর গৌরী দু'বোনই আমাকে শ্রদ্ধা করে ঠিক বড় ভাইএর মতো। তাদের বউদি, মানে আমার স্ত্রীর সঙ্গেও খুবই ভাব তাদের। মেয়ে দু'টি অসম্ভব বুদ্ধিমতী, শ্যামার মতো এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই দেখেছি আমি। বাইরে থেকে তাদের অত্যন্ত সরলই আমার মনে হয়েছে চিরদিন, আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার মনোভাব, কাজকর্মে নানা ভাবে সাহায্য করে চলেছে তারা সকলেই। যেচে এসে তাদের বউদি'কে সাহায্য করে তারা, একটা সৌখ্যও রয়েছে তাদের ওর সঙ্গে। আমার চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছে, ছেলেবেলা থেকেই ফাইফরমাস খাটছে আমার। তারা শুধু আমার লেখার ভক্ত নয়, আমার গুণের ভক্ত—আমার রুচি আর পছন্দেরও ভক্ত। ফলে তাদের ফাইফরমাসও আমাকে খাটতে হয়। বিশেষ করে তাদের শাড়ী আর জামার কাপড় আমার পছন্দ ছাড়া কেনাই হয় না, অর্থাৎ তিন বার করে বাজার ঘুরে কিনে এনে দিতে হয় আমাকেই। এই ঘনিষ্ঠতার ভেতরও যে কোথায় কাঁটা লুকিয়ে থাকতে পারে এ তারা বুঝে না বা জানে না, এ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। অথচ মুখ বুঁজে এটা যাকে সহ্য করে যেতে হয়, তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন!

এতোগুলো ছেলে-মেয়ের দেখাশোনা করে আমার দেখাশোনা করবার সময় কোথায় গিন্নীর। তার ওপর বর্তমানে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে কাজ করবার ক্ষমতাও গেছে কমে। শ্যামা গুণী মেয়ে, সাংসারিক কাজকর্মে দক্ষতা তার অসাধারণ। ফলে আমার জামা সেলাই করে দেওয়া, কাপড় ইস্ত্রি করে দেওয়া ইত্যাদি অনেক কাজই শ্যামা করে থাকে। সেটা যে আজ-কাল করছে তা নয়, ছেলেবেলা থেকেই এমন করে আসছে ওরা, তখন ফরমাস করতাম—এখন নিজে থেকেই করে। আজ-কাল বুঝতে পারি গিন্নীর তা পছন্দ নয়, কেন ওরা আমার খুঁটিনাটি কাজ করে দেয় এ প্রশ্ন উঠেছে ওর মনে। দেখতে পাই প্রাণান্ত পরিশ্রম চলছে ওরা যাতে আমার কিছু না করতে পারে তারি চেষ্টায়। কিন্তু হলে কি হবে, এরি ফাঁকে আমার অসংখ্য কাজ করে দেয় তারা—যেন ফাঁক খুঁজে খুঁজে সব সময়ই ফিরছে। আর কিছু না হয় তো রুমালও দেবে একখানা তৈরি করে। তাই বলছিলাম, কিসে কি হয় তারা বুঝে না এ কথায় আমি বিশ্বাস করিনে। অথচ এ সবের নীরব প্রতিক্রিয়ার ঝক্কি পোয়াতে হয় আমাকেই অনেকখানি। হাস্যকর মনে হলেও আজ-কাল ভয়ে ভয়েই থাকতে হয়।

ওরা তাদের বউদিকে নিয়ে দিনে চার পাঁচ বার হয়তো চা খায়, বউদির কাজে সাহায্য করে, হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজবে সারা দিন কাটায়, ছেলে-মেয়েদের পড়ানো, খাওয়ানো, শাসন সবই করে, এসবে কিছুই আসে যায় না, যতো বিপদ বেধেছে আমাকে নিয়েই!

উপর তলা আর নীচের তলার রান্নাঘর, জল আর পায়খানা সবই নীচে। কাজেই কারোই কারুকে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই। সকাল বেলা। চুলো ধরাতে গিন্নীর দেরি হচ্ছে, আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। শ্যামা সেটা দেখতে পেলো। ওদের ব্যবস্থা রয়েছে ইলেকট্রিক চুলোয় চা করবার। গিন্নীর চুলো ধরবার আগেই চা করে নিয়ে এসে শ্যামা হাজির। এসে বললো,—গোপালদা, আমাদের চা করলাম, ভাবলাম বউদির চুলো ধরাতে দেরি হবে, তোমার জন্যেও এক কাপ করে নিয়েছি।

—চা খেয়ে আমি তো বেরিয়ে গেলাম কিন্তু গিন্নীর সেদিন সেই যে মেজাজ বিগড়ালো সারা দিন ধরে জের চললো তার। সকালবেলা বেরুবো, শ্যামা আমার লাল চটিজোড়া লাল চকচকে রঙ করে এনে সামনে রেখে বললো,—কি বিশ্রী রঙ হয়েছিল গোপালদা, দেখো কেমন চকচকে করে দিয়েছি!—

শ্যামা চলে গেল। গিন্নী বেরিয়ে বললেন,—ওদের কি মাথাব্যথা বুঝিনে, এমন চকচকে রঙ কি আর আমি করতে পারতাম না?—অবশ্য কোন দিনই গিন্নীকে জুতোয় রঙ দিতে দেখিনি, আর এটা হঠাৎ শ্যামার মাথায়ই বা এলো কি করে ভেবে পাইনে! অমন রঙ করা জুতো সেখানেই পড়ে রইলো। সে জুতো পায়ে দিয়ে বেরুতে আর সাহস হল না সে দিন।

এমন একটা দু'টো নয়, হাজারটা ঘটনা ঘটাবেই তারা, একদিন নয়—প্রতিদিন, যে ভাবেই হোক জাহির করবে তাদের দাবি আমার ওপর। হয়তো আমার লেখা নিয়ে এসে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে, নয় তো কবিতা এনে ধরবে আমাকে আবৃত্তি করবার জন্যে,—কি সুন্দর আবৃত্তি করতে পারো তুমি গোপালদা! কোন্ দিক থেকে যে তাদের আঘাত আসবে আজ-কাল আমিই তার হদিশ পাইনে আর। এটা এমন অস্বাভাবিক কিছুও মনে হবে না, চিরদিনই তারা এই করে এসেছে। তবু তারা না বুঝে কিছু আজ করছে একথায় আমি আর বিশ্বাস করিনে—বিশ্বাস করিনে তাদের সক্রিয় ইচ্ছা এর পেছনে নেই এ কথায়। ঘরে-বাইরে সর্বত্র গিন্নীর বিপদ হয়েছে আমাকে নিয়ে। তাই বলছিলাম, গিন্নী সরল আর বোকা হওয়ায় জীবনযাত্রা নির্বঞ্ঝাট হলে কি হবে, এমন লোককে নিয়ে বিপদও রয়েছে কম নয়। হাস্যকর মনে হলেও হাসা চলে না এ নিয়ে।

আমি লিখতে আরম্ভ করেছি, টের পেলাম শোভা আর খোকন ফিরে এসেছে। উঁকি মেরে আমাকে দেখে নিলে তারা, তারপর দু'জনেই উপরে উঠে গেল চুপি চুপি। ভাবলাম, আটটা পর্যন্ত এবার লিখতে পারবো। বাইরের ঘরের ডানদিকের বারান্দায় বসে আমি লেখাপড়া করি, বাঁ দিক দিয়ে বাড়ী ঢুকবার রাস্তায় বড় দরজা খোলা রয়েছে। অবশ্য ডান দিকের বারান্দার সামনেও ছোট দরজা আছে, তবে সেটা প্রায় সব সময়ই বন্ধ থাকে। ফলে এ বারান্দাকে অনেকটা এক ফালি ঘরের মতোই দেখায়। বারান্দায়ই শুধু আলো জ্বলছে, আর সমস্ত নীচের তলায় আলো নেই কোথাও। লেখা আমার বেশী দূর এগোয়নি, বারান্দার ছোট দরজার কড়া নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম অপরিচিত কণ্ঠের 'গোপালদা' ডাকে। পরিচিত কেউ এদিক দিয়ে কড়া নাড়তো না, ওদিককার দরজা দিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তো। বুঝলাম লেখা আর এগোবে না। হাতের কলম অসমাপ্ত লেখার উপর রেখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

ঘরে এসে ঢুকলো রাজেন আর সাবিত্রী। তেইশ চব্বিশ বছর পরে দেখা, তবু দেখবামাত্রই চিনতে পারলাম তাদের।

—আরে রাজেন যে? এসো এসো, ভাবতেই পারিনি তোমরা কড়া নাড়ছো!

ঘরে ঢুকেই রাজেন বললো,—কেমন আছো গোপালদা!

—ভালোই আছি ভাই,—হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলাম তাদের,—বসো, তা' তোমরা আছো কোথায়?

—দিল্লীতেই আছি, কলিকাতা এলাম—ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।

—অবাক হচ্ছি এতো দিন পরে আমাকে তোমাদের মনে পড়লোই বা কি করে, আর আমি যে এখানে থাকি সে তোমরা জানলেই বা কি করে?

হাসলো রাজেন,—তুমি কলিকাতায় থাকো আন্দাজ করে-ছিলাম। আমাদের ধীরেন থাকে আহীরিটোলায়, তার কাছে পেয়েছি তোমার বাসার হদিশ।

—ধীরেন গাঙ্গুলী?

মাথা নাড়লো রাজেন। এতো দিন পরে এদের পেয়ে লেখার কথা আমি ভুলে গেলাম, খুশি হলাম তারা আমাকে মনে রেখেছে দেখে। জিজ্ঞাসা করলাম,—কি করছো তুমি?

—চাকরি করছি আর সাবিত্রী করছে হিন্দী বইএর ব্যবসা। ভালোই চলছে আমাদের।

হিন্দী বই-এর ব্যবসা? সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় আগের মতোই আছে সে। মুখে আর শরীরে কিছুটা মেদবাহুল্য ছাড়া তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয়নি তার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, অথচ বিয়ে হয়েছে বলে মনে হল না। রাজেন প্রায় আমার সমান বয়সের হলেও আমার চেয়ে আজ অনেক বড় দেখাচ্ছে তাকে। বললাম,—এই বয়সেই তুমি বুড়িয়ে গেছো রাজেন!

—এই বয়সেই মানে? নিজেকে তুমি ছেলেমানুষ ভাবো আজ? অবশ্য চেহারা তোমার আগের মতোই থেকে গেছে, তবু কতো বয়স হল হিসেব রাখো?

হেসে বললাম,—রাখি। অভাবের সংসারে ছ'টি ছেলেমেয়ের বাবা আমি, আমার কথা আলাদা। কিন্তু তোমার তো ভালো থাকবার কথা, ধনী বাবার এক মাত্র ছেলে তুমি।

হাসলো রাজেন। বুঝলাম সে হাসির একটা অর্থ রয়েছে, কিন্তু কি বুঝতে পারলাম না। বললো,—এ সব আলাপ পরে আরেক দিন হবে, আমাকে উঠতে হবে আজ এক্ষুণি,—তারপর সাবিত্রীর দিকে চেয়ে বললো,—আলাপ শেষ করে তুমি চলে যেয়ো সাবিত্রী, ফিরতে আমার দেরী হবে।—রাজেন উঠে বেরিয়ে গেল।

মফঃস্বল শহরের কলেজে পড়তাম, এক শ্রেণীতেই পড়তাম রাজেন আর আমি। ভালো ছাত্র হিসেবে নাম ছিল আমার। গরীবের ছেলে, থাকবার জায়গা ছিল না। বি, এ পরীক্ষার আগে বছরখানেক ছিলাম রাজেনদের বাড়ীতে। সাবিত্রীর মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার বছর তাকে পড়িয়েছিও কিছু দিন। রাজেনের বাবা সরকারী চাকুরে ছিলেন, বড় চাকরি পেয়ে বি, এ পরীক্ষার আগেই দিল্লী চলে যান। সেই থেকে তাদের আর কোন খবরই জানিনে আমি। আজ হঠাৎ এ ভাবে দেখা করায় খুশি হয়েছি সত্যি, কিন্তু বিস্মিত'ও কম হইনি।

এতক্ষণ সাবিত্রী একটি কথাও বলেনি। রাজেন উঠে যেতেই বললো,—তুমি লিখছিলে গোপালদা, আমরা এসে তোমার লেখা মাটি করে দিলাম!

বললাম,—তা হোক, ব্যবসা করছো—বিয়ে করোনি?

এড়িয়ে গেল সাবিত্রী,—তোমার লেখা কাগজে পড়ছি আজকাল, খুব ভালো লাগছে।

খুশি হবার মতো খবর। জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু আমিই যে লিখছি সে তোমরা বুঝলে কি করে?

—কেন? নামের সঙ্গে পদবীটাও রয়েছে যে!

কথা ঠিক। এমন পদবী বাংলা দেশে কেন ভূ-ভারতে আছে বলে জানিনে। গোপাল চাকলি! বললাম,—তা হঠাৎ কলকাতায় কি মনে করে?

—এখান থেকেই আমি আমার ব্যবসা চালাবো ভাবছি, পাব্লিশিং খুলবো এখানে। হিন্দী আর বাংলা দু'ধরণের বই-ই ছাপাবো। এর সঙ্গে রাখবো ইংরেজীও। তোমাকে আমার দরকার গোপালদা।

বললাম,—করবে ব্যবসা! ব্যবসার সঙ্গে আমার মতো শিক্ষক বা লেখকের কি যোগ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। এক আমার বই ছাপতে পারেতে, কিন্তু তাতে তো ব্যবসা চলবে না?

—চলবে! চলবে বলেই তো তোমাকে আমার চাই। বাবা মারা যাবার সময় বাড়ী দিয়ে গেছেন দাদাকে, আর আমাকে দিয়ে গেছেন নগদ টাকা। সে টাকা আমি ব্যবসায় খাটাতে চাই, বড় করে পাব্লিশিং খুলতে চাই এবার।

—তাতে আমি আসছি কি করে?—প্রশ্ন করলাম।

—কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এবার ব্যবসা চলবে। বইপত্র ছাপা হবে এখানে, হিন্দী বই চলে যাবে দিল্লী, কলেজ ষ্ট্রীটে শো-রুম খুলবো। খুব ভালো আছো বলে তো মনে হচ্ছে না গোপালদা, মাষ্টারি করে আর কতো টাকা মাইনে পাবে? তার চেয়ে তুমি আমার কলিকাতার ব্যবসা দেখাশোনা করবে, তোমাকে আমি

চারশ'—এমন কি পাঁচশ' টাকা মাইনে দিতে পারি। ইতিমধ্যে কিছু কিছু ইংরেজী-বাংলা বইও আমি হাতে নিয়েছি।

আমার দিকে না তাকিয়েই সাবিত্রী প্রস্তাবটা দিলে! পাব্লিশিং-এর কিছুই যে আমি জানিনে তা নয়। তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে আপাততঃ আমারও অভাব থাকবে না আর। সময় নিতে চাইলাম ভেবে দেখতে, উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কোথায় উঠেছো?

—আছি বালিগঞ্জে, আত্মীয়ের বাড়ীতে।—রাস্তার নাম আর নম্বর বললো সে।

—এই শ্যামবাজার থেকে তুমি একা যাবে বালিগঞ্জে?—নেহাৎ সময় কাটাবার জন্যেই এ প্রশ্ন।

সাবিত্রী হাসলো,—গলির মোড়ে গাড়ী রেখে এসেছি। আমার প্রস্তাবের উত্তর দাও। এড়িয়ে গেলে চলবে না। এত দিন পরে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়েছে ভাবলে ভুল করবে গোপালদা।

—বুঝতে পারছি স্বার্থ রয়েছে কোথাও। কিন্তু কোথায় সেটাই ঠিক ধরতে পারছি না।

সাবিত্রী গম্ভীর হল, বললো,—আসল কথা কি জানো, নিজে এখানে থাকতে পারবো না, এখানে আমার এক জন বিশ্বাসী লোক চাই। টাকার জন্যে তুমি ভেবো না, অভাব থাকবে না তোমার, এখানে আমার একজন বিশ্বাসী লোক চাই। টাকার জন্যে তুমি ভেবো না, অভাব থাকবে না তোমার, সে আমি দেখবো। এ ছাড়া তোমার বইও আমার ওখান থেকেই ছাপা হবে, টাকা আর পাব্লিসিটি দুই-ই পাবে তুমি। রাজী হয়ে যাও গোপালদা, মাষ্টারি তোমাকে আর করতে হবে না।

বললাম,—আমাকে একটু ভাববার সময় দাও সাবিত্রী, এত দিনের চাকরির মায়া কি আর এক কথায় ছাড়া যায়?

—বেশ, আজ রাত ভেবে দেখো তুমি। কাল সকালে তুমি আমাকে জানাবে। এর বেশী সময় দিতে পারিনে, সময় নেই আমার। সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরোবো না আমি, আজ তাহলে আসি।—সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালো।

সাবিত্রী বেরুতে যাবে ঠিক সে সময় শ্যামারা সিনেমা থেকে ফিরে এলো, এ পাশের দরজা খোলা দেখে, এ দিকেই এসে ঢুকলো তারা। তাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল সাবিত্রী। তিন জনেই ভালো করে তাকিয়ে দেখলো সাবিত্রীর দিকে, তিন জনেরই চোখে চাপা কৌতূহল। শ্যামা এগিয়ে এসে আমার সামনে বসে জিজ্ঞাসা করলো,—কে গোপালদা? দেখেছি বলে তো মনে হল না!

উত্তর দিতে ভুল করলাম,—আমার ছাত্রী। বি, এ, পরীক্ষার সময় ওদের বাড়ীতেই থাকতাম আমি। সে ছিল ওর স্কুলের শেষ পরীক্ষার বছর :—

কি সুন্দর দেখতে! খুব ধনী—না?—গৌরী বললো।

মাথা নেড়ে বললাম,—হ্যাঁ, দিল্লীতে থাকে! চব্বিশ বছর পরে আজ দেখা।

গিন্নী এগিয়ে এলেন এবার,—দিল্লীতে তোমার ছাত্রী থাকে এ কথা বিশ বছরের ভেতর কোন দিন তোমাকে বলতে শুনিনি তো। এমন ছাত্রীর কথা ভুলেও তো মুখে আনোনি কোন দিন?

শ্যামা ফোড়ন দিলে,—কতো গল্প বলেছো গোপালদা, তোমার জীবনের সব গল্পই জানি আমরা, এ ছাত্রীর কথা আমাদেরও তুমি বলোনি তো?

প্রমাদ গণলাম। বললাম বটে, কিন্তু কথাগুলো খুব জোরালো আর মেনে নেবার মতো বলে নিজেরই মনে হল না। বললাম,—চব্বিশ বছর আগে সেই যে ওরা দিল্লী গিয়েছিল, সেই থেকে কোন যোগাযোগই ছিল না আমার সঙ্গে। মনেই পড়েনি কোন দিন, বলবো কি?

গিন্নীকে যতটা বোকা ভাবি আসলে ততটা বোকা ভাববার সত্যি কোন কারণ নেই। হেসে বললেন,—ভাবছি চব্বিশ বছর পরে দিল্লী থেকে কলিকাতা এসে এ গলির ভেতর থেকে তোমাকে খুঁজে বের করলে কি করে?—কথায় বিদ্রূপ কি না মুখের দিকে চেয়ে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আপাততঃ চুপ করে গেলাম, ভেবে দেখলাম চুপ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভেবেছিলাম গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে মাষ্টারি এবার ছেড়েই দেবো। ঠিক করলাম, গিন্নীর সঙ্গে আর পরামর্শ নয়! কাল সকালবেলা গিয়ে সাবিত্রীকে তার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, এ কথাই জানিয়ে আসবো।

সেকেন পণ্ডিত

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

পিঙ্গলাকাঠি গ্রামের কোল দিয়ে কুলু-কুলু রবে আড়িয়াল খাঁ নদী বয়ে চলেছে। পিঙ্গল জলস্রোতের তীরে দূর থেকে গ্রামখানাকে একটা কাঠির মতন দেখায় বলে না কি এর নাম পিঙ্গলা-কাঠি। মানচিত্রে এর কোনো নিশানা নেই। বরিশাল থেকে মাদারীপুর যে ষ্টীমার যাতায়াত করে, গৌরনদীর পরে তাকে যেখানে থামতে হয়, সে ষ্টেশনটির নাম পিঙ্গলাকাঠি। পান, গুপারী, নারিকেল এবং বালাম চাউলের জন্য এই ষ্টেশনটি বিখ্যাত।

সেকেন পণ্ডিত মধুসূদন চৌধুরী ক্লাশ থ্রীতে বাখরগঞ্জের ভূগোল পড়াতে পড়াতে নিজ গ্রামের নামখানিতে এসে পুরো একটি ঘণ্টা থেমে যান। এই পঁয়তাল্লিশ বছরের শিক্ষকতায় কোনো ব্যতিক্রম না করে বৃদ্ধ একটি পুরো পিরিয়ড 'লেকচার' দেন পিঙ্গলা-কাঠির ওপর। ছেলেরা বহু চেষ্টা-চরিত্র করেও বাখরগঞ্জের ম্যাপ থেকে এই গ্রামখানি খুঁজে পায় না। গৌরনদীর পাশে সেকেন পণ্ডিত লাল পেন্সিলে যে বিন্দু-মার্কা করে রেখেছেন, ক্লাসের সেরা ছেলে নারায়ণ চক্কোত্তি সেখানে আঙুল লাগিয়ে বলে,—"এই যে পাইছি সার পিঙ্গলাকাঠি"।

নারায়ণের পিঠ চাপড়ে পণ্ডিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে জানান যে, গত পঁয়তাল্লিশ বছরে নারায়ণের মতন বুদ্ধিমান ছেলে তাঁর জোটেনি। ম্যাপ আঁকার সময়ে গাঁয়ের নামটা মুছে গেছে। এই নারায়ণই গাঁয়ের নাম রাখবে। নারু পাশের কলাবাড়িয়া গাঁয়ের ছেলে। পণ্ডিতের তাতে আরও গর্ব। অন্য গাঁয়ের ছেলে আসে পিঙ্গলাকাঠি। চারটি খানি কথা নয় বাবা!

—"এই গ্রামে শীঘ্রই একটি হাইস্কুল হইবে।"

ব্ল্যাক-বোর্ডে পাকা হাতে লিখে পণ্ডিত বলেন, বইএ 'পান, গুপারী, নারিকেল, বালাম চাউলের জন্য বিখ্যাত'র পাশে লাইনটা টুকে নিতে।

বেতখানা টেবিলের ওপর তিন চার বার প্রাণপণে মেরে রোষ-কষায়িত লোচনে আমাকে বললেন,—"আরে এই ভশচায, নিজেরে বড় মাদবর মাদবর বাসো?"

বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম,—"আজ্ঞে না সার!"

প্রশ্ন করলেন—"আমি হাইস্কুল খোলার প্রয়াসের এত বড় অবিস্মরণীয় ঘটনা টুকে নিচ্ছি না কেন?"

ভয়ে ভয়ে বললাম,—"আমার বইএ লেখা আছে সার!"

পুরুষানুক্রমে এ ভূগোল আমার হাতে এসে পড়েছে। বছর ত্রিশেক পূর্বে আমার পিতৃদেব এই বই পড়েছিলেন এবং এই সেকেন পণ্ডিতেরই কাছে।

পণ্ডিতের চোখ ঝক-ঝক করে উঠল। আমার দিকে ছুটে এসে বললেন,—"কৈ দেখি?"

—"ও তোর বাপের হাতে লেখা বুঝি?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিজে থেকেই পড়ে। আশা পোষণেরও একটা সীমা আছে ত! কত দিনে এই স্কুল মাইনর থেকে হাই হবে? বাখরগঞ্জের ভূগোলে পিঙ্গলাকাঠির নামের পাশে হাইস্কুলের কথা ছেপে বেরুবে কবে?

পঁয়তাল্লিশ বছরের শিক্ষকতায় বৃদ্ধ প্রথম ব্যতিক্রম করেন। হাইস্কুলের ওপর কোন লেকচার না দিয়ে, পিঙ্গলাকাঠির সীমা না লিখিয়ে বৃদ্ধ বলেন,—"হাঁ, তার পর—মাহিলাড়া? মাহিলাড়া কি জন্য বিখ্যাত?"

—"বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। হাইস্কুল রহিয়াছে। বহু শিক্ষিত লোকের বাস। গ্রামের তিন জন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ উপাধি পাইয়াছেন।"

নারায়ণ চক্কোত্তি উঠে দাঁড়িয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। সে দৃশ্য আমি মৃত্যুর পূর্বেও বিস্মৃত হব না।

নারু জিজ্ঞাসা করে বসে,—"সার, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ কি সার?"

গত চল্লিশ বছরের প্রতিশ্রুত হাইস্কুল আজও খুলতে পারেন নি ভেবে পণ্ডিতের মেজাজটা এমনিতেই বিগড়ে ছিল। নারুর প্রশ্নে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন,—"প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ধুইয়া জল খাবি? মূর্খ, পাপিষ্ঠ, কুলাঙ্গার দাঁড়া বেঞ্চির উপর। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ কি? তুই প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ হবি? আমার স্মরেন হইল না। বিপিন হইল না। আশুতোষ হইল না। তারিণী হইল না। উনি হইবেন! আহা আমার সোনা রে! খারা, খারা বেঞ্চির উপর।"

সত্যি বলতে কি, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ কি জিনিষ, পণ্ডিত নিজেও জানেন না। একটা পরীক্ষা। পণ্ডিত জানেন বি-এ আছে—তার হাতে-গড়া বহু ছেলে বি-এ পাশ করেছে। তার উপর এম-এও আছে—সেটাই সব চেয়ে উঁচু। পণ্ডিতের হাত দিয়ে দু' জন চার জন তাও বেরিয়েছে। এই যে স্কুলের হেড মাষ্টার স্মরেন চক্কোত্তি সে-ও তো এম-এ। বহু কষ্টে পণ্ডিত তাকে পাকড়াও করেছেন। এম-এ পাশ না হলে স্কুল কখনও হাইস্কুল হয়? কলকাতার লোকগুলো কেমন যেন! কি সব বার করে নিত্যি নিত্যি। কি দরকার ছিল বাবা তোমার এই প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ না কি বার করার—সে না কি আবার বিলেত থেকেও শক্ত। পাশের গ্রাম চন্দ্রহারের এক জন সম্প্রতি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ উপাধি পেয়েছেন। রাতারাতি পণ্ডিতের কানে সে খবর পৌঁছেছিল। তাঁর সব চেয়ে বড় ভয় ছিল খবরটা বাখরগঞ্জে গিয়ে না পৌঁছোয়। এ বছরের নতুন ভূগোলে ব্যাটারা কোত্থেকে জোগাড় করে তাও ছেপে দিয়েছে! চন্দ্রহারের হাইস্কুল খুলল এই ত সেদিন। এরই

ভেতর সেখানকার ছেলে প্রেমচাদ-রায়চাদ হয়ে গেল! আর পিঙ্গলাকাঠি?

নিজের মনে পণ্ডিত জোরে জোরে আবৃত্তি করেন,—"প্রেমচাদ-রায়চাদ? পঁয়তাল্লিশ বছরে কত গাধা-ভেড়া মানুষ করলাম। হাকিম, দারোগা, মাজিষ্টর কি না হইল? পোড়া কপাল একটাও প্রেমচাদ-রায়চাদ হইল না! আমার পিঙ্গলাকাঠি ইস্কুলের উপর টেক্কা দেয় চন্দ্রহার? সবই এই অদেষ্টের দোষ!" পণ্ডিত নিজের কপালে ঠাস-ঠাস করে চড় মারতে থাকেন।

ভীতিবিহ্বল ক্লাসের ছেলেরা থ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। সিরাজ ইস্‌লাম একটু বয়োজ্যেষ্ঠ—ক্লাসের সে সেকেণ্ড বয়। নারায়ণের কানে কানে সে কি বলে দিতেই বেঞ্চির ওপর থেকে নেমে নারায়ণ সেকেন পণ্ডিতের পা জড়িয়ে বলে উঠল,—"আর জিগামু না সার! অপরাধ নিয়েন না। ভুল হইছে। মাপ করিয়া দেন সার!"

পণ্ডিত হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন। পঁয়তাল্লিশ বছরে কত ভাল ছাত্র পড়িয়েছেন, তার লিষ্টি বলে যেতে লাগলেন। তুষারের বাপ আশুতোষ বাখরগঞ্জের ভূগোল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ বলতে পারত। সে হতভাগা বি-এ পাশ করে আর পড়ল না। তারিণী কুশিয়ারী পদ্মার বর্ণনা দিয়ে ইন্সপেক্টরকে তাক লাগিয়েছিল। সে স্বদেশী করে জেলে গিয়ে মারা গেছে। মইনুল হক তিন সপ্তাহে ভুগোলখানা কণ্ঠস্থ করেছিল। তারা সব কোথায় মিলিয়ে গেল! তাঁর হাতে একটা ছেলেও প্রেমচাদ-রায়চাদ হলে, তিনি কি মাইনর স্কুলকে হাই করতে কোনো ব্যাটার তোয়াক্কা রাখতেন?

দুই

—দুর্গামণি, দুর্গামণি, ও দুর্গা।

পোদ্দার-বাড়ীর বড় বউ দুর্গামণি গোঁসাই-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গলবস্ত্র হয়ে দূর থেকে সে মাটিতে প্রণাম করে। বৃদ্ধ কোনো কালে তাঁর স্বামীর শিক্ষক ছিলেন, আজ সন্তানের।

সেকেন পণ্ডিত বলেন,—"কৈ কার্তিক কই? উঠছে? যাত্রা করাইয়া রাখতে কইছিলাম। করছো?"

পূর্ব সন্ধ্যায় বৃদ্ধ এসে জানিয়ে গেছিলেন শেষ রাতে মাহেন্দ্র যোগে যেন যাত্রা সারা হয়। স্নানাদি তার পর করলেও চলবে।

সুদর্শন পোদ্দারের পুত্র শ্রীমান কার্তিক এসে পণ্ডিতের পায়ের ধুলো নিল। পণ্ডিত দুর্গামণির হাত থেকে চন্দন, বিল্বপত্র, ধান-দূর্বার থালাখানা নিয়ে গোঁসাই-ঘরের দিকে গেলেন। কার্তিককে বললেন, মন্তর পড়,—'সরস্বতি মহাভাগে'। দুর্গা বলতে যায়, এখানে ত নারায়ণের শালগ্রামশিলা রইছে শুধু। সরস্বতী কৈ? ওঁর দিকে তাকিয়ে মুখ ফুটে কথাটি বেরোয় না। ঐ যে অত শক্ত মানুষ ওর স্বামী সুদর্শন সে-ও কি কখনও সেকেন পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে?

পণ্ডিত সমস্ত শরীরটা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে দু'হাত জোড় করে চেঁচিয়ে উঠলেন—"মা, মা গো মুখ তুলিয়া চাইস মা!"

কার্তিকের কপালে চন্দনের তিলক এঁকে মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে সেকেন পণ্ডিত একটা জবা ফুল অতি যত্নের সাথে কার্তিকের জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। যাবার সময়ে এক বার শেষ প্রার্থনা করলেন,—"মা গো শুনছি হাইস্কুর আর নলচিরা ভালো ছাত্তোর পাঠাইবে মা! তুই গাঁয়ের মান রাখিস।"

তখনও সকাল হয় নি। ভোরের শুকতারা আকাশে মিট-মিট করে জ্বলছিল। কার্তিকের হাত ধরে সেকেন পণ্ডিত নৌকা-ঘাটের দিকে যাত্রা করেন। গৌরনদীতে সেণ্টার পড়েছে—মাইনর বৃত্তি পরীক্ষার সেণ্টার। অনেক দিন ব্যবহার না করায় জুতো-জোড়া শক্ত হয়ে গেছে। পায়ে বড় লাগছে। তা লাগুক। হাতে খুলে নেবেন না তিনি। এই হাতে আশীর্বাদ করতে হবে কার্তিককে। পিঙ্গলাকাঠি হাইস্কুল হয়ে গেলে এখানেও পরীক্ষার সেণ্টার পড়বে। পণ্ডিতের পায়ের ব্যথা উবে যায়।

পুরোনো চাদরখানা ভোরের হাওয়ায় উড়ে-উড়ে নাচে। তা নাচুক। এক হাতে কার্তিকের হাত। অন্য হাতে ধুতীর কোঁচা। চাদর সামলাবেন কেমন করে? রাস্তায় বাঁশগাছগুলো বড়ো ঝুলে পড়েছে। কার্তিকের পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ছেলেগুলোকে বলতে হবে, পথের বাঁশঝাড়গুলো একটু ছেঁটে দিতে। আপাতত চাদরখানা আটকে না গেলেই হল। চাদরখানা ভারী পয়মন্ত। আটতিরিশ বছর আগে মুকুন্দর ছেলে গোবিন্দ যে বার প্রথম বৃত্তি পায়, মুকুন্দর বুড়ী মা সে বার জবরদস্তী ভাবে পণ্ডিতকে চাদরখানা দিয়েছেন।

—"আহা কও কি পণ্ডিত? ইস্কুলের একটা মান নাই?

তোমার ছাত্তোর বিত্তি পাইছে, তারে লইয়া তুমি খালি গায়ে পালদি যাবা?"—পণ্ডিতের মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবীটার ওপর বুড়ী চাদরখানা জড়িয়ে দেন। মুকুন্দ পণ্ডিতকে প্রণাম করে ছেলেকে বলে, "দে পন্নি মশাইরে সেবা দে।"

তারপর থেকে চাদরখানা জড়িয়ে যত বার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়াতে গেছেন তত বার পিঙ্গলাকাঠি স্কুল বৃত্তি পেয়েছে।

অন্য বারের কথা ছেড়ে দাও। এবারের কথাই ধর না। হেডমাষ্টার সুরেন বলে কি না পণ্ডিতের বয়স হয়েছে! কার্তিককে নিয়ে কষ্ট করে অত দূর তাঁর যাবার কি দরকার? হেডমাষ্টার নিজেই যাবেন এবার। সেকেন পণ্ডিত কি ছাড়েন? পিঙ্গলাকাঠিতে হাইস্কুল হলে কি আর কাউকে কষ্ট করে অত দূর যেতে হবে? তখোন কিন্তু বার বার এই পয়মন্ত চাদরখানার কথাই তার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল।

—"পেন্নাম পন্নি মশাই পেন্নাম। এবার কারে লইয়া যান? মনু, তুমি আমাগো পোদ্দার-বাড়ীর পোলা না?"

আসেদ আলী ঘাড়ে হাল নিয়ে মাঠে চাষ করতে যাচ্ছিল। যন্ত্রটা মাটিতে রেখে পণ্ডিতকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আসেদ পণ্ডিতের ছাত্র। বহু বেত খেয়েছে। রোজ বেঞ্চিতে দাঁড়িয়েছে। তবু কেন যেন পণ্ডিতকে সে মন দিয়ে ভক্তি করে। হাইস্কুল ফণ্ডে দু'মণ ধান দেবে বলেছে সে।

পণ্ডিত বলেন,—"হ্যাঁ আসেদ, তোমার খোদারে মন দিয়া ডাকো তো বাবা! এবার 'বিত্তি'টা যেন হাতছাড়া না হয়। ম্যালা ছাত্তোর।"

যুবক আসেদের মনে পড়ে তার সময়ে পালেদের বাড়ীর শীতল পাল বিত্তি পেয়েছিল। শীতল এখন উকিল। আসেদের কাছ থেকে সে বছরের ধান কেনে।

আসেদ 'বিত্তি' পরীক্ষার দু'বছর আগেই ইস্কুল ছেড়ে দেয়। খুব জোর দিয়ে বলে,—"নিশ্চয়ই পন্নিমশাই! আপনার ছাত্তোর বিত্তি পাইবে না তো পাইবে কেডা? আপনি লগে রইছেন। ঠেকাইবে কোন্ হালা?"—আসেদ লজ্জা পায়। সেকেন পণ্ডিতের সামনে গালাগালটা বেরিয়ে পড়লো? ওটা যে ওর মুদ্রা-দোষ। তা যাক, পণ্ডিত নিশ্চয়ই শোনেননি।

এবার হেডমাষ্টার একখানা পুরো নৌকোই ভাড়া করে দিয়েছেন। ছাত্র ফকম আলী কম ভাড়াতে গৌরনদীতে যাতায়াতে রাজী হয়েছে। নৌকোয় চড়ার আগে পণ্ডিত এক বার ভালো করে জিজ্ঞাসা করে নেন,—"হ্যাঁ রে কার্তিক, দোয়াত, কলম আনছোস? পকেটের ফুল হারায় নাই তো? ইনষ্ট্রুমিণ্টি-বক্স্?"

ইনষ্ট্রুমেণ্ট বক্সটি অতি কষ্টে দক্ষিণ পাড়ার চিত্ত ভট্‌চাযের কাছ থেকে জোগাড় করেছেন। চিত্ত 'বিত্তি'-পাওয়া ছেলে। বিত্তি পাওয়া ইনষ্ট্রুমিণ্টি বক্স্ পয়মন্ত।

বার বার মাথায় আশীর্বাদ করে ফুল কপালে ঠেকিয়ে কার্তিককে হলে বসিয়ে সেকেন পণ্ডিত টিনের ছাদ আর হোগলপাতার বেড়ার 'কমনরুমে' অন্যান্য গাঁয়ের শিক্ষকদের সাথে কথাবার্তা চালান। সেকেন পণ্ডিতকে এ মহলে সকলেই চেনেন।

—"তুমি নরোত্তমপুর স্কুলের নতুন মাষ্টার? নরোত্তমপুরের ছেলেটি কেমন? ভূগোল ইতিহাস তার আয়ত্তে আছে?"

নতুন মাষ্টার জানালেন, তার ছাত্রটিও নেহাৎ হটেনটট নয়। দু'-পাঁচখানা বাখরগঞ্জের ভূগোল বহু পূর্বেই সে কণ্ঠস্থ করেছে।

সেকেন পণ্ডিতের তাতে ভয় নেই। কার্তিকের 'পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ' ঠোঁটের গোড়ায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'এসে' তার কণ্ঠস্থ। পণ্ডিত মতি উকীলকে দিয়ে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখিয়ে নিয়েছেন। মতি ভাল বাংলা লেখে। ইংরিজীতে 'কাউ', 'ক্যামেল', 'ক্যাট', 'এ গ্রেটম্যান', 'ইয়োর ভিলেজ', 'এসে'গুলো কার্তিকের জল-ভাত। ইয়োর ভিলেজে হেডমাষ্টার সুরেন গাঁয়ে ভবিষ্যৎ হাইস্কুলের কথা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি।

এ ছাড়া আর কি 'এসে' আসতে পারে? জ্যামিতিতে কার্তিক বরাবরই ভালো—কি সুন্দর সেদিন মুখস্থ বলল,—"যদি কোন সামতলিক ক্ষেত্র একটিমাত্র বক্ররেখার দ্বারা"······পয়মন্ত 'ইনষ্ট্রুমিণ্টি' বক্সটা তো আছেই। ভূগোল পণ্ডিতের নিজের বিষয়। কার্তিক গাঁয়ের মান রাখবে। ওকে পণ্ডিত হাইস্কুলে চাকরী দেবেন। নিজেরও উপরে। হেডমাষ্টার সুরেন এম্, এ, পাশ। কার্তিককে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পাশ করাবেন। ছেলেগুলো যেন কেমন কেমন? বেশী পড়াশুনো করলেই গ্রাম থেকে পালাতে চায়। কম কষ্টে সুরেনকে আটকে রেখেছেন তিনি? কার্তিক পালাবে না।

খুশীতে সেকেন পণ্ডিতের মন ভরে যায়। তিনি নরোত্তমপুরের মাষ্টারকে বলেন, "হ্যাঁ হে মাষ্টার, তোমার ছাত্তোরের চোখ দেইখ্যা তো বুদ্ধিমান বুদ্ধিমানই বলি। তোমাগো তারিণী হেড-মাষ্টারের খবর কি? আইল না এবার?"

নরোত্তমপুরের মাষ্টার মাথা নীচু করে বিনীত ভাবে বলে যে, "তারিণী গ্রাম ছেড়ে সহরে গেছে। আমিই গাঁয়ের নতুন হেড-মাষ্টার।"

পণ্ডিতের মনটা খুশীতে ভরা ছিল। তিনি উঠে নরোত্তমপুরের হেড-মাষ্টারকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন,—"তুমি আমার নাতির বয়সী। তোমারে জিগাইতে দোষ নাই—তুমি কি পাশ হে?"

হেড-মাষ্টার জানান বি-এ পর্যন্ত পড়েছেন। অর্থাভাবে পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

—আমার সুরেন এম, এ।

নরোত্তমপুরের মাষ্টার অবাক ভাবে বলেন,—"তিনি বুঝি আপনাদের হেড-মাষ্টার?"

—হ্যাঁ। পণ্ডিতের বুকখানা দু' ইঞ্চি বেড়ে যায়।

নরোত্তম মাষ্টার বলেন,—"তাহলে আর কি? স্কুলকে হাই করতে কষ্টই নেই, গৌরনদী সেণ্টারে বিভিন্ন গাঁয়ের সমবেত শিক্ষকের সেকেন পণ্ডিতের হাই-স্কুলের কথাগুলো কণ্ঠস্থ। গোবিন্দপুরের ক্ষেত্র মাষ্টার চোখের ইসারা দেন। হস্তিশুণ্ড গাঁয়ের হেড-মাষ্টার দরদী লোক। নরোত্তমপুরের মাষ্টারের কানে কানে বলেন,—হাই-স্কুলের কথা উঠাইবেন না মশাই! এখনই বুড়া চোখের বানে গৌরনদী সেণ্টার ভাসাইয়া দিবে।"

নরোত্তমপুরের হেড-মাষ্টার নিজেকে সামলে নিয়ে সেকেন

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
টেলিফোন:-৩৪-১৭৬১ গ্রাম ব্রিলিয়ান্টস,

ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ
২০০/২/জি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা ফোন-পিকে: ৪৪১৬
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে

পণ্ডিতকে বলেন,—"আপনাগো হেড-মাষ্টার এম, এ,। হেইয়ার লইগ্যাই আপনাগো ইস্কুলে এত বিত্তি যায়।"

কার স্নেহসিঞ্চিত যতনে ছেলেরা বৃত্তি পেয়ে আসছে, তা সকলেরই জানা আছে। তবুও খুশীতে সেকেন পণ্ডিতের চোখ ছল-ছল করে ওঠে। বরিশালের কোন গাঁয়ে এম-এ পাশ হেড-মাষ্টার নেই।

মনের গোপন কথা বার বার আবৃত্তি করতে ভাল লাগে না। ভগবান সুরেনকে বাঁচিয়ে রাখুন। সুরেনকে নিয়ে সেকেন পণ্ডিত হাই-স্কুল খুলবেন। কার্তিকটা ভারী ছোট। ও নিশ্চয়ই পি, আর, এস হবে। পণ্ডিত কি বাঁচবেন তত দিন ?

পণ্ডিত হলের ভিতর একটা ঢুঁ মারতে যান—ঐ তো লাইন দিয়ে সব গাঁয়ের ছেলে বসে বসে লিখছে। সব গাঁয়ের সেরা ছেলে—হস্তিশুণ্ড, নরোত্তমপুর, নলচিরা, কলাবাড়িয়া, বেদগ্রাম, তারাকুপী, চন্দ্রহার, টর্কি, হরিসোনা, বিল্বগ্রাম, ঘোলোক, গোবিন্দপুর, সেলিমপুর, পিঙ্গলাকাঠি।

প্রশ্ন দেখে সেকেন পণ্ডিত খুশী হন। 'অন্ ইয়োর ভিলেজ' রচনাটা সুরেন কার্তিককে করিয়েছিলেন।

ছেলেরা সব মুখ নীচু করে লিখে যাচ্ছে। সব মুখগুলো দেখে পণ্ডিতের মায়া হয়। কচি মুখ। কত আশা নিয়ে কত দূর থেকে এসেছে সব। পাবে কি বৃত্তি ? তা না পাক। সবাই কি পায় ? এক বার মনে মনে ভারী লোভ হয়। সবই তো মাইনর স্কুলের ছেলে। স্কুল বদলাবে এবার। এর একটা ছেলেও কি তার হাতছাড়া হতে পারত ? গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে তাদের তিনি ধরে নিয়ে আসতেন। ঐ যে কোণের ছেঁড়া জামা-পরা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলেটি বসে বসে লিখছে নিশ্চয়ই ভারী গরীব। আহা ! পরীক্ষার হলে ছেঁড়া জামা পরে কি কেউ আসে ? তাকে তিনি ফ্রী করে দিতেন। তিনি ওর থাকার বন্দোবস্তও করতেন। কি-ই বা খরচ ? অহেদ মাসে মাসে আধ মণ ধান দিলেই ত চলে যেত। অহেদের মনটা বড়। বাকী ছেলেগুলোকে রাখার বন্দোবস্ত হয়ে যেত—কালু চৌধুরী, শ্যাম সমাদ্দার, রাখাল বক্সী, প্রিয় ধুপী, রমজান চৌধুরী এরা ত সবাই তাঁর ছাত্র ছিল কোন কালে। এরা মাথা-পিছু এক জন ছাত্রের খাবার দিতে রাজী হবে না ?

ঐ ছেঁড়া জামা-পরা ছেলেটা যেন বৃত্তি পায় ঠাকুর ! সেকেন পণ্ডিত মনে মনে ছেলেটিকে আশীর্বাদ করেন। কি ঝকঝকে চোখ দুটো ! এক বার ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে কার্তিকের পকেটের জবাফুলটা ওর মাথায় ছুঁইয়ে আসতে।

সেকেন পণ্ডিত মনে মনে স্থির করেন, এঁদের ঠিকানা চাই-ই তাঁর। এবার তো হল না। সামনে বার তো হবে। তখোন এদের ধরে এনে স্কুলে ভর্তি করবেন। সমস্ত বরিশালের সেরা স্কুল হবে পিঙ্গলাকাঠি হাই-স্কুল। বাখরগঞ্জের ভূগোলে পান সুপারী বালাম চাল, নারিকেলের পাশে বড় বড় হরফে ছাপা হবে—"এই গ্রামে বরিশালের বিখ্যাত বিদ্যালয় পিঙ্গলাকাঠি হাই-স্কুল অবস্থিত।"

সেকেন পণ্ডিত আর ভাবতে পারেন না। নৌকায় যেতে যেতে সেকেন পণ্ডিত কার্তিককে জিজ্ঞাসা করেন—"ভুলিস নাই তো সেই লাইন ?"

কার্তিক জানায় ভোলে নি। গ্রামে স্কুল খোলার পয়েন্ট ইমপর্টেণ্ট নয় ?

সেকেন পণ্ডিত জামা-ছেঁড়া ছেলেটির নাম ও গ্রাম টুকে নেন। পাকা হাতে কার্তিকের দোয়াত-কলমে প্রশ্নপত্রের পিছনে লেখেন মইনুল ইসলাম। নিবাস নলচিরা গ্রাম। বাখরগঞ্জ।

তিন

গাঁয়ে একটা রীতি মতন সাড়া পড়ে গেছে। ছেলেরা সব দু'দিন ধরে স্কুলের বেড়া মেরামতে, খেলার মাঠের আগাছা পরিষ্কারে, খালের কচুরী-পানা নাশ করতে ব্যস্ত। রাত জেগে স্কুল-গেটে একটা তোরণ খাড়া করা হয়েছে। স্কুল-ইনস্পেক্টর আসছেন ভিজিটে।

ছেলেদের আগে থেকেই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, গার্ড অব অনার দিয়ে প্রশ্নের চটপট জবাব দিতে। এ-ও ঠিক হয়েছে ব্রতচারী নৃত্য দেখিয়ে ইনস্পেক্টরকে তাক লাগাতে হবে।

ছেলেরা সব পরিষ্কার জামা পরে স্কুলে এসেছে। হেড-মাষ্টার সুরেন ইনস্পেক্টরকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সব দেখে-শুনে ইনস্পেক্টর বেশ খুশী হয়েছেন বলেই মনে হল। হঠাৎ ইনস্পেক্টর বললেন,—মধুসূদন চৌধুরী মশাই কোথায় ?

হেড-মাষ্টারের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেল। বার্ধক্যের জন্ম কর্তৃপক্ষ বহু দিন থেকে সেকেন পণ্ডিতকে রিটায়ার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। স্কুল-কমিটি তা মানছে না।

ইনস্পেক্টর প্রৌঢ়। নতুন এসেছেন বরিশালে। সুরেন তাঁকে চেনেন না। হেড-মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করছেন দেখে ইনস্পেক্টর বললেন,—এসেছেন তিনি ?

হেড-মাষ্টার বললেন,—উনি ক্লাস থ্রীর ক্লাশ-টিচার।

—চলুন ক্লাশ থ্রীতে

—ক্লাশ ষ্ট্যাণ্ড !

মণিটারের হুকুমে সব দাঁড়ায়। জোড় হাত করার কানুনটা নতুন।

ছেলেরা সব তাজ্জব বনে গেল। তাদের সেকেন পণ্ডিত একটা কেউকেটা নয়, এটা তারা জানে। কিন্তু উরে বাব্বা এত বড়, এ কল্পনাও করতে পারেনি ! সমস্ত ছেলেরা অবাক ভাবে দেখলো ইনস্পেক্টর পণ্ডিতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করছে,—চিনতে পারেন সার ?

চশমাটা নাকের ডগায় টেনে ঘোলাটে চোখে বিস্ময় জাগিয়ে সেকেন পণ্ডিত বিলিতি পোষাক পরিহিত প্রৌঢ়কে না চিনবার অপরাধ স্বীকার করে বলেন,—না বাবা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না।

ইনস্পেক্টর বলেন,—কন কি সার ? ভাল করিয়া দেখেন আরেক বার।

ঘোলাটে চোখ দুটো উজ্জ্বল করে সেকেন পণ্ডিত বলেন,—আরে চন্দের বাড়ীর কালাই চন্দের পোলা মাহিন্দির—মাহিন্দির বাসি ?

—আজ্ঞে হাঁ সার ! মহেন্দ্রকুমার চন্দ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পণ্ডিত বলেন,—সে কি বাবা আজকের কথা ! তোমার বাবা কালাই আমার প্রথম ব্যাচের ছাত্তোর।

সেই স্বদেশীরও আগের কথা। তার পর জর্মণ-ইংরেজে যুদ্ধ যে বার শেষ সেই বার ত তোমরা আইলা। সেই যখন বাখরগঞ্জের ভূগোল আউট অফ্‌ প্রিণ্ট হইয়া যায়? কেমন ঠিক না?

ইনসপেক্টর বলেন,—আজ্ঞে হাঁ।

—তোমরা বাবা কত দিন দেশ-ছাড়া! যাই কও বেশ মোটা-সোটা হইছো

নানা কথা প্রসঙ্গে কখন যে সেকেন পণ্ডিত ইনসপেক্টরকে তুই বলতে শুরু করে দিয়েছেন কেউ খেয়াল করেনি।

পণ্ডিত বললেন,—তুই মেলা পড়াশুনা করছোস বুঝি? পি, আর, এস পাশ দিছোস? কেলাসে তো তুই বাবা একটা দিনও পড়া পারতিস না। তোর বাপটা ত ছিল একটা গাধা। 'দ্বীপ' কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করলেই বাছাধনের নাক কান মুখ লাল হইয়া যাইত।

সুরেন ওদিক থেকে চোখটিপি দেন।

সেকেন পণ্ডিত ইসারা-টিসারা কিছু বোঝেন না। সুরেনকে বলেন,—আবার কি কইতে চাও সুরেন?

হেড-মাষ্টার সুরেন বলেন,—আজ্ঞে কিছু না। মনে মনে ঘলে যান।

ইনসপেক্টর ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন পণ্ডিতমশাই আজ-কাল মারেন টারেন কি না?

ছাত্ররা সব এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ইনসপেক্টর হঠাৎ যেন কি রকম বদলে যান। অত্যন্ত আপন ভাবে ছেলেদের শোনান কেমন করে পণ্ডিত মশাইর জ্বালায় স্কুলের ফুলের বাগান সাফ হয়ে যেত। জবার ডাল, কাফলার ডাল, আঠালিয়ার ডাল, স্থলপদ্মের ডাল কোনটাই বাদ যেত না। মেরে তাদের সেকেন পণ্ডিত লাশ বানিয়ে ছেড়ে দিতেন।

সেকেন পণ্ডিত বলেন,—তোর পিঠেই তো পড়ছে সব চাইতে বেশী। জুয়ান বয়স ছিল। না হইলে তোর মতন গাধারে ইনসপেক্টর করা কি সহজ কথা? আইজ যে তুই সাহেব হইছস সেডা কার লইগ্যা?

পণ্ডিত ওপরের বেড়ার গা থেকে একখানা বেত বার করে নিজের হাতে বেতখানাকে আদর করে বলেন,—এই বেতের লইগ্যা। বল্‌, ঠিক কি না?

সুরেনের কপাল দিয়ে ঘাম ছুটছে। গেল। সব গেল। যে ক'টা টাকা গ্রাণ্ট-ইন-এইড ছিল তাও গেল! উঃ এই সরল পণ্ডিতটাকে নিয়ে সুরেন কি করবে? কিছুতেই থামে না।

ইনসপেক্টর যেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ছেলেরা দু'দিনের ছুটির দরখাস্ত নিয়ে গেল। ব্রতচারী নৃত্য হল।

ক্লাসে ক্লাসে ফিস-ফিস করে রটে গেল 'চীফ গুরু' পণ্ডিমশাইর ছাত্র। মাষ্টাররা সব ফিস-ফিস করলেন দেখো কি হয়—ইনসপেক্টরের মেজাজটা ঠিক যেন বুঝতে পারছে না তারা।

স্কুল ছাড়ার অব্যবহিত পূর্বে সেকেন পণ্ডিত ইনসপেক্টরের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বললেন,—লেইখ্যা দে। লেইখ্যা দে বাবা! ভালো করিয়া লেইখ্যা দে।

—ইনসপেক্টর হেসে বলেন,—কি লিখব সার?

—লেখ এই স্কুলকে শীঘ্রই হাই করা একান্ত সমীচীন।

ইনসপেক্টরের চোখে জল আসে। বোধ করি বছর কুড়িক পূর্বে পণ্ডিত তার বাবার কাছে ছাপানো চিঠি পাঠিয়েছিলেন স্কুল-ফাণ্ডে চাঁদা প্রার্থনা করে। সে চিঠির কথা মনে পড়লো।

জানাল তাদের কথায় কি হয়। কর্তাদের ইচ্ছেয় কর্ম।—তা আপনি কইছেন, আমি নিশ্চয়ই লেখুম। আর কি করতে হইবে সার?

হেড-মাষ্টার সুরেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। যাক বাবা! চটে নি তাহলে। পণ্ডিত খুশী হন। বলেন,—দিবি তুই?

—নিশ্চয়ই সার।

বলেন অনেক ভেবে চিন্তে,—দিস তা হইলে একখানা বাখরগঞ্জের রিলিফ ম্যাপ, স্কুলেরখানা বড় পুরোনো হয়ে গেছে।

—ও এই মাত্তোর? আর কিছু?

—না বাবা আর কিছু চাই না।

—আইচ্ছা এক সেট ম্যাপ পাঠাইয়া দিমু—এশিয়া, ইউরোপ, ভূমণ্ডল, বঙ্গদেশ, বাখরগঞ্জ।

পণ্ডিত মুগ্ধ হন। হাতল-ভাঙা চেয়ার থেকে উঠে মহেন্দ্র চন্দ্রকে তিনি জড়িয়ে ধরেন।

—ম্যাপটা একটু দেইখ্যা কিনিস বাবা। ম্যাপে যেন পিঙ্গলা-কাঠির নাম থাকে। লোকগুলো ভারী ঠকায় আজ-কাল। ম্যাপে পিঙ্গলাকাঠির নাম দেয় না কেন?

সেদিন বাড়ীতে গিয়ে পণ্ডিতের হঠাৎ কেন যেন মনে একটা ছোট বেদনা জেগে উঠলো। স্ত্রী বিন্দুবাসিনী তিন বছর পূর্বে মারা গেছেন। ইস্‌, খবরটা যদি সে শুনতো! তার ছাত্র ইনসপেক্টর—চীফগুরু, যার ভয়ে হেড মাষ্টারও থরহরি কম্পমান! মাহিলাড়ার হেড-মাষ্টারও।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলেন কাল এক বার চন্দ্রহার যেতে হবে। যেমন করেই হোক হলধর পণ্ডিতকে খবরটা তার শোনানো দরকার। ছাত্র পি, আর, এস হবার পর থেকে হলধর আর মাটিতে পা দেয় না।

দু'দিন ছুটির পর ক্লাশ থ্রীতে একটা নতুন জিনিষ শিখিয়ে দিতে হবে।

নিবানো প্রদীপটা জ্বালিয়ে পণ্ডিত দোয়াত-কলম নিয়ে এক টুকরো কাগজে লিখে রাখেন, এই গ্রামে শীঘ্রই হাই-স্কুল হইবে। এখানে অনেক বিদ্বানের বসতি। বঙ্গদেশের বিদ্যালয়-পরিদর্শকের বাস।

মনটা খুশীতে ভরে যায়। তবুও খটকা মন থেকে যায় না। পি, আর, এস বড় না স্কুল-ইনসপেক্টর? খবরটা হেড-মাষ্টার সুরেনের কাছ থেকে চুপি চুপি জেনে নিতে হবে। সুরেন রাত জেগে অনেক মোটা মোটা বই পড়ে। সে নিশ্চয়ই জানে।

চার

সেদিন হাটবার ছিল। গ্রামবাসীদের আনাগোণা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। সুরেন মাষ্টারের শরীর ভালো নেই। ডালায় ডালায় শুপুরী ভরে গৃহস্থরা বাজার করতে এসেছে। শুপুরী বিক্রী করে পয়সা পাবে, তাই দিয়ে কিনবে নুণ, তেল, চিনি। বাকী সব প্রায় সকলেরই যে দু'-পাঁচ কাঠা জমি আছে তাতে কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে চলে যায়। কাপড়টাও কিনতে হয়। তার এখন দেরী আছে। পুজোর সময়ে কিনলেই চলে।

ষ্টীমারের হুইসিল্ শুনে স্কুলের ছেলেরা ঘাটে ছুটে গেল। এতক্ষণ তারা সাহাদের দোকানে গুলতানি মারছিল।

কার্তিকের কাঁধে হাত রেখে সেকেন পণ্ডিত ষ্টীমার থেকে নামলেন। পণ্ডিত হাটের মাঝে কার্তিককে জড়িয়ে ধরেন।

হাওয়ার আগে খবর উড়ে গেল। পিঙ্গলাকাঠি বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। কার্তিককে নিয়ে সেকেন পণ্ডিত কি করবেন, ভেবে উঠতে পারছেন না।

ষ্টীমার-ঘাটে দেখতে দেখতে সমস্ত হাটখানা ভেঙ্গে পড়ল।

গোপাল ধুপী বরিশালে লণ্ডী খুলেছে। সেকেন পণ্ডিতের পরই খবরখানা সে পেয়েছে। ভরত নাট্যমের পোজে গা হাত পা নেড়ে নেড়ে সেই বলতে লাগলো, সেকেন পণ্ডিতকে দেখেই সে কেমন করে ব্যাপারখানা অনুমান করেছে।

গোবিন্দপুরের জেলের সর্দার সখা এরই ভিতর সাহাদের দোকান থেকে একখানা চেয়ার এনে হাজির করেছে। খবর শুনে মণ্ট সাহা চাকরের ঘাড়ে দোকান ফেলে ছুটে এলো। বক্সী বাড়ীর নন্দ বক্সীর কাপড়ের দোকান। নন্দর সাথে পাশের বইএর দোকানের বিভূতির অহি-নকুল সম্বন্ধ। সব ভুলে গিয়ে নন্দ বিভূতিকে খবরটা দিয়ে কাছা সামলাতে সামলাতে ষ্টীমার-ঘাটে ছুটলো। মাঝি ফকম ছুটলো। ময়রা দ্বারিক ছুটলো। শুপুরীর মহাজন মেয়াজান ছুটলো। পোষ্ট-মাষ্টার অলক চক্কোত্তি ছুটলো। দাসেদের বাড়ীর ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েরা বই কিনতে এসেছিল, তারা ছুটলো। ভুঁইমালি বাড়ীর বৃদ্ধ রসিক তামাকের দোকান খুলেছে, সে ছুটলো। চায়ের দোকানে ফক্কফকুগুলো গাঁয়ের মাতব্বর জটলা করছিল, তারা ছুটলো। এরা সব সেকেন পণ্ডিতের ছাত্র।

এর ভিতর বদাই হালদার ছুটে গিয়ে স্কুলের মাষ্টারদের খবর দিয়ে এসেছে। হেড-পণ্ডিত শান্তি ভশচায এসেছে। সেকেন মাষ্টার লক্ষ্মী আচার্য এসেছে। থার্ড মাষ্টার যতীন দাস এসেছে। ড্রীল মাষ্টার তাহের আলী এসেছে। দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রামখানা জড়ো হল ষ্টীমার-ঘাটে।

সুরেন ভালো হচ্ছে শুনে পণ্ডিত আশ্বস্ত হন। পণ্ডিত ভারী খুশী। ছেঁড়া জামা-পরা নলচিরার সেই মইনুল ইসলাম ফার্ষ্ট হয়েছে। তাকে যেমন করে হোক এ গাঁয়ে নিয়ে আসতে হবে।

আবাল-বৃদ্ধ ছাত্রদের কাছে পণ্ডিতের পিঙ্গলাকাঠির কৃতিত্বের লিষ্টি পেশ করেন। স্বদেশীর সময়ে দীঘির পারের মনোহর দাস জেলায় প্রথম হয়। হেড-মাষ্টার রাখাল সেন স্বদেশী করায় তাকে আটক রাখা হয়। সাথে সাথে পিঙ্গলাকাঠির বৃত্তি নাকচ করা হয়। মনোহর এখন কলকাতায় মাষ্টারি করে। জর্মণ-ইংরেজের যে বার যুদ্ধ লাগে সে বার 'খৃষ্টান' বাড়ীর প্রভাত বিত্তি পায়। সে এখন দারোগা। যে বারে বাখরগঞ্জের ভূগোলের চতুর্থ সংস্করণ বেরোয় সেই তেইশ সালে মালি বাড়ীর সনাতন দশম জায়গা দখল করে বিত্তি পায়। সনাতন এখন ডাক্তারী করে। যে বার স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়, সে বার দফাদার বাড়ীর মনসুর থার্ড হয়। মনসুর এখন হাকিমগিরি করে। গান্ধী সত্যাগ্রহের সময়ে একটি অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিল। হেড-মাষ্টার, ড্রীল মাষ্টারের সাথে সাথে সেকেন পণ্ডিতকেও সে বার বরিশাল জেলে রাখা হয়। তাই বেচারা পরীক্ষা দিতে পারেনি।

বৃদ্ধ রসিক ভুঁইমালির কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়।

গত চল্লিশ বছরের ভিতর অন্তত কুড়িটি বার সে সেকেন পণ্ডিতকে এ সভা বসাতে দেখেছে। গাঁয়ের ছেলে বিত্তি না পেলে সেকেন পণ্ডিত বরিশালে অসুখে পড়েন। হেড-মাষ্টার কিংবা সেকেন মাষ্টারকে গিয়ে অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে তাঁকে ষ্টীমারে চড়িয়ে নিয়ে আসতে হয়।

ছেলের দলের ভিতর মালা হাজাক লণ্ঠন নিয়ে আসে। 'নরবাড়ী' খুব দূরে নয়। খবর পেয়ে সুরিন্দির নর ভাইপোদের সাথে নিয়ে গোটা পাঁচেক জয়ঢাক নিয়ে হাজির হয়। দূর থেকেই বাজনা শুনে সকলে বলে ওঠে সুরিন্দির খবর পাইছে। সুরিন্দির সেকেন পণ্ডিতের ছাত্র।

সেকেন পণ্ডিত ভারী লজ্জা পান। আবার এ মালা-টালা কেন? ছোক্‌রাগুলো মালা দিয়ে তাকে ঢেকে দিয়েছে।

হাজাক জ্বালিয়ে ছেলের দল শোভাযাত্রা করে স্কুলে যাবে। পণ্ডিত মানা করেন না!

ঢাকের আওয়াজ শুনে গাঁয়ের মেয়েরা 'দরজা-বাড়ীতে' এসে দাঁড়িয়েছে সব। ভট্‌চায বাড়ীর শোভা আবার স্বদেশী করে। তাদের বাড়ীর মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি দেয়।

সেকেন পণ্ডিত কেঁদে ফেলেন যে! এ 'বিত্তি' আর কি? ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তাঁর স্কুল বৃত্তি পাবে। এক বার থুকেই দেখো না।

সখা ছোক্‌রা ভারী দুষ্ট, চেঁচিয়ে ওঠে,—আরে দাদু সুরিন্দির জোরে বাজাও, জোরে। মাহিলাড়ায় আওয়াজ পৌছান চাই।

মাহিলাড়া গ্রাম বৃত্তি পায়নি। হলধর পণ্ডিতের চন্দ্রহার পেয়েছে। তবে পজিশন অনেক নীচুতে।

সেই রাতে বিনা নোটিশে 'মচ্ছব' হয়ে গেল। দুর্গা পুজো, ইদের পরবেও বোধ হয় এত ঘটা হয় না। এ তো শুধু কার্তিকের কৃতিত্ব নয়। এ যে সেকেন পণ্ডিতের পঁয়তাল্লিশ বছরের সেবার জয়তিলক।

মাঝ রাতে ঘরে ফেরার পথে সকলের মুখে মুখে এক কথা—হাই-স্কুল চাই-ই।

পাঁচ

কোত্থেকে কি হয়ে গেল সেকেন পণ্ডিত কিছু বুঝতে পারেন না। হাঁ এক বার বাংলাকে ভাগ করার কথা উঠেছিল। সে বহু বছর আগে—বাখরগঞ্জের ভূগোলের তখন সবেমাত্র প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছে। স্কুলের হেডমাষ্টার রাখাল সেন। উঃ কি তেজী ছেলে রে বাবা! গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং ডাকেন। তার পর এক দিন পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সব চেয়ে মজা হল যখন পুলিস এসে সেকেন পণ্ডিতকে ধরে জানাল, এ গাঁয়ে সব হৈ-চৈর জন্ম সে-ই দায়ী। তাকে গাঁয়ের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। গ্রামের সব লোক মিলে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেকেন পণ্ডিত তাদের মানা করেছিলেন। বলা যায় না ত পুলিসে স্কুলের ক্ষতি করতে পারে।

'বিত্তি'-পাওয়া ছেলে ছোট্ট বক্সী তাঁকে ছাড়িয়ে আনে। হেড-মাষ্টার রাখালকেও। ছোট্ট দারোগা হয়েছে।

এবারে যেন কেমন থমথমে ভাব। কিছু দিন আগে নোয়াখালিতে ছোকরাগুলো ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে। তা করবে না? নোয়াখালির

পণ্ডিতকে সেকেন পণ্ডিত এক বার দেখেছিলেন বরিশালে। উঃ কি চেহারা! দেখলে মনে হয়, রেগে যেন টঙ হয়ে আছে। সে কি পড়াবে? হাঁ আসতো সব পিঙ্গলাকাঠি, স্কুলের সেকেন পণ্ডিত তাদের এক বার ঢেলে ছাঁচে গড়ে দিতেন। কক্ষক দেখিনি তাঁর গাঁয়ে ফকম আর কার্তিকে ঝগড়া? ককৃখোনো না। চন্দ্রহারেও নাকি একটু-আধটু ঝগড়া বেধেছিল। তা বাধবে না? হলধর পণ্ডিত জানেটা কি শুনি? ছেলেদের ও কি শেখাবে?

কিন্তু ছোকরাগুল্যের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? দু'দিন বাদে স্কুল হাই হবে, আর এরা সব গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে? কাদের নিয়ে স্কুল গড়বেন তিনি?

ড্রীল-মাষ্টার তাহের আলী সেকেন পণ্ডিতের পা জড়িয়ে আবেদন জানান, সব ছোকরা যে চলে গেল। গাঁয়ের স্কুল বাঁচাবে কে?

লাঠি ভর দিয়ে তাহের, কার্তিক, সুলতান, অনিলদের নিয়ে ষ্টীমার-ঘাটে গিয়ে দাঁড়ান,—যাইস না। যাইস না। গ্রাম ছাড়িয়া যাইস না। স্কুল হাই হইতে দেরী নাই। কথা মান, যাইস না।

ছোকরাগুলো কাঁদে। তাদের বাপ-মা কাঁদে। কেউ কেউ ফিরে আসে। অনেকেই আসে না। যারা ফিরে আসে আবার রাতে চুপি চুপি পালিয়ে যায়।

ষ্টীমার-ঘাটে বসে বসে পণ্ডিত ভাবেন তাঁর কি দোষ? এ গাঁয়েই ত এদের সব পড়া হয়নি। এরা যে হলধরের হাই-স্কুলেও গেছে। ভালবাসা থাকলে কখনও ছাড়াছাড়ি হয়? সমস্ত গাঁয়ে ঝগড়া লাগলেও পিঙ্গলাকাঠি গাঁয়ে তা কখনও ঘটবে না। এই সুলতান আর অনিল ঝগড়া করবে? কার্তিক আর অনিল মারামারি করবে? তিনি বেঁচে থাকতে? ককখোনো না।

ড্রীল-মাষ্টার তাহের ছল-ছল চোখে তাকায়।

পাটক্ষেতের আল ধরে, ঘর্মাক্ত কলেবরে পণ্ডিত সদলবলে যখন স্কুলে ফেরেন, তখন সূর্য্যিদেব পাটে বসেছেন। আড়িয়াল খাঁর জল গাঁয়ে প্রবেশ করেছে—বর্ষা সমাগত। গাঁয়ের ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই পিঙ্গল জলস্রোতের আগমনকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে তাদের কলকাকলিতে।

এখানকার খালে বারো মাস জল থাকে না।

সেকেন পণ্ডিত শিশুদের দিকে তাকান। তাহেরকে বলেন,—বড় ছোট রে তাহের, বড় ছোট।

তাহের অবাক ভাবে বলেন, "কি ছোট সার?

পণ্ডিত বলেন—ঐ যে ঐ ছেলেগুলি। কেলাস ওয়ানে ঐ তিনটারে নেওয়া চলে।

সেকেন পণ্ডিতের চোখ বসে গেছে। শরীর অস্থি-চর্ম সার হয়েছে। তবুও রোজ তাঁর ষ্টীমার-ঘাটে হাজিরি দেওয়া চাই।

পায়ে হেঁটে অনেকে আজ-কাল গৌরনদী অবধি গিয়ে সেখান থেকে ষ্টীমারে চড়ে। সেকেন পণ্ডিতের কান্না তারা সইতে পারে না।

উঃ, এই গাঁয়ে হাই-স্কুল হলে কখনও এমন হত? হলধরের মতন রাগী পণ্ডিত কখনও পড়াতে পারে?

গাঁয়ে গাঁয়ে একটা করে ভালো স্কুল খুলে দাও—সত্যিকারের ভালো। দেশ থেকে সব ঝগড়া-ঝাঁটি কর্পূরের মতন উবে যাবে।

হাজার বার প্রস্তুত পণ্ডিত তাঁর এ নতুন ফিলজফি আবৃত্তি করেন।

হলধর কখনও পড়াতে পারে?

ড্রীল-মাষ্টার, কার্তিক, মাঠে মাঠে ঘরে ঘরে ঘুরে রোজই দু' পাঁচটা নতুন রিক্রুট ধরে নিয়ে আসে। সেকেন পণ্ডিত তাদের দিকে আশা ভরা চোখে তাকান। ভয় হয় এদের গরীব চাষী বাপ দাদা কখোন এসে পান্তাভাতের ভাণ্ড চাপিয়ে ক্ষেতের কাজে টেনে নিয়ে যায়। সেকেন পণ্ডিত এর একটিকেও ছাড়বেন না।

ড্রীল-মাষ্টার তাহেরকে পণ্ডিত প্রশ্ন করেন,—হাঁ হে তাহের, ক্লাস সেভেনের ক'জন হইল?

ছয়

স্কুলের মাঠের পাশে নতুন ছোট্ট কুটীরে বুড়ো রোজ একটা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে বসে থাকে। সকালে স্কুলে যাবার সময়ে ছেলেরা দেখে বুড়ো ওদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। বিকেলে বাড়ী ফিরে যাবার সময়েও ঠিক তাই।

ছেলেদের ভিতর যারা একটু বড়ো তারা দু'হাত তুলে নমস্কার করে চলে যায়। ছোটরা দূর থেকে ভয়ে পালায়। দেখলেই বুড়ো ডাকবে—"মনু শোনো"।

বুড়ো যে কে তা তারা জানে না। ছোট বাড়ীখানাও আগে ছিল না। গোটা কয়েক ছেলেও তাঁর সাথে যেন থাকে। তাদের কাউকে ওরা চেনে না। অন্য গাঁয়ের হবে। বড় স্কুলে পড়ে।

বুড়ো তর্জনী নাচিয়ে হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার থেকে ছোট ছেলের দলকে ইসারা করে ডাকেন।

কখোন থেকে ছুটির ঘণ্টার অধীর আগ্রহে বুড়ো এই হাতলভাঙ্গা চেয়ারে এসে বসেছে, তা কি ঐ শিশুরা জানে? ছুটির ঘণ্টা শুনেই বুড়ো নড়ে-চড়ে বসেন।

কেষ্টাটা একটু চালাক চতুর ছেলে। বলে,—আরে চল না রে। বুড়ো কি খাইয়া ফেলবে?

নারকোলের নাড়ুগুলো হাতে দিয়ে বুড়ো ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন, কেউ ক্লাসে মার খায়নি ত? তাদের আদর করেন।

—তুমি মনসুরের পোলা ইউসুফের ছাওয়াল না?

ছোট শিশু অবাক ভাবে বুড়োর দিকে তাকায়। বুড়ো কেমন করে তার বাপ-ঠাকুর্দাকে চিনলো?

দু' পাঁচ মিনিটে ছেলেরা আপন হয়ে যায়। বুড়ো মন্দ লোক নয়। ভয়ের কিছু নেই।

ক্লাস থ্রীর ছেলেদের আলাদা করে জিজ্ঞাসা করেন—নতুন মাষ্টার কার্তিক কেমন পড়ায়? ম্যাপ দেখিয়ে পড়ায় তো? গাঁয়ের সীমানা লিখিয়ে দেয়?

কেষ্টাটা ভারী দুষ্টু। ওর বাপ নারায়ণ চক্কোত্তিও দুষ্টু ছিল। বইখানা সেকেন পণ্ডিতের মুখে ছুঁড়ে ফেলে—দেখো না কি লেখায়?

বুড়ো বইখানা খুলে ধরেন। পান সুপারী বাদাম চালের পাশে আরও একটি লাইন যোগ করা হয়েছে।

বৃদ্ধের চোখে জল দেখে কেষ্টা গলা জড়িয়ে বলে, ও রকম কাঁদলে আর আসুম না কিন্তু।

বইখানার উপর কেষ্টার নামের পাশে কাঁচা হাতে লেখা রয়েছে—"পিঙ্গলাকাঠি মধুসূদন হাই-স্কুল।"

বাঙলা দেশে সঙ্গীতচর্চ্চা—বিভিন্ন জেলায়

দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ কি কাশীর কোনও ওস্তাদজীকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার কি ঘরাণা? শুনতে পাবেন কোনও বিখ্যাত গায়কের নাম। সে নামের ভীড়ে রয়েছেন ফৈয়জ খাঁ থেকে এই সেদিনকার বিখ্যাত কোন গায়কও হয়ত। কিন্তু বাংলায়? কোনও ঘরাণা নেই। পশ্চিমের সঙ্গীতজ্ঞগণ তা স্বীকার করেন না। আমরা কিন্তু একথা আদপেই মানবো না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলার ঘরাণার সংখ্যা হয়ত সীমাবদ্ধ (বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ ঘরাণার কথা 'বহু ভট্ট' ছবির কল্যাণে বাংলা দেশে সম্প্রতি কিছু প্রচারিত হয়েছে) কিন্তু ঘরাণার অর্থই কি নয় সঙ্গীতের রিসার্চ? অর্থাৎ অরিজিনালিটি? তাহলে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া কি দোষ করল? বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর? মাসিক বসুমতীর সবিশেষ ইচ্ছা, তার পাঠক-সাধারণের সহযোগিতায় এ বিষয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করা। আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে নিজ নিজ জেলার সঙ্গীতচর্চ্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই প্রসঙ্গে আমাদের দপ্তরে সত্বর পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। **বিশেষ ধন্যবাদের সঙ্গে তা গৃহীত হবে এবং যথারীতি প্রেরকের নাম-ধাম সহ তা প্রকাশিত হবে।**

ঋগ্বেদে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ

ঋগ্বেদের বিভিন্ন শাখায় নানা বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। শাকল ও বাস্কল, ঐতরেয় ও কৌষীতকি আরণ্যক ইত্যাদিতে আমরা তার খোঁজ পেয়েছি। দুন্দুভি প্রভৃতি চামড়ার বাদ্য, বিভিন্ন তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বেণু প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। যুদ্ধ, বিপদাশঙ্কায় ও বিভিন্ন উৎসবে ঘোষণা করার কাজে দুন্দুভির ব্যবহার হোত। মহর্ষি সায়ন বলেছেন, 'উত্তমং অতিশয়েন দীপ্তং প্রভৃতধ্বনিযুক্তঃ শব্দং বদ তত্র দৃষ্টান্তঃ—জয়তামিব দুন্দুভিঃ যথা যুদ্ধে জয় প্রাপ্নুবতাং রাজ্ঞাং দুন্দুভির্মহান্তং ধ্বনিং করোতি।' এ ছাড়া ঋগ্বেদে গর্গর নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের কথা রয়েছে। সায়ন বলেছেন, গর্গরো গর্গরধ্বনিযুক্তো বাদ্যবিশেষঃ।' পিঙ্গ বা রাবণাস্ত্রের কথাও লেখা আছে। বেহালা বা 'বাহুলীন' নামে যা আমরা আজ দেখছি তা এই পিঙ্গংমুখযন্ত্রেরই বংশধর। এ বাদ দিলেও কর্করি, আঘাটি, ঘাটালিকা, কাণ্ডবীণা, নাড়ী, বনস্পতি প্রভৃতি এমন বহু যন্ত্রের নাম রয়েছে ঋগ্বেদের পাতায় যার অধিকাংশই আজ লুপ্ত এবং অনেকে রূপ পরিবর্ত্তন করে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে নিজ নিজ স্থান করে নিয়েছে। ঋগ্বেদে শততন্ত্রী বীণার কথা আছে। এ ছাড়াও আরও নানা প্রচলিত অপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের কথাও এখানে বাদ যায়নি।

উদয়শঙ্কর আরও কিছু দিন

ছায়ার মাধ্যমে রামলীলা ছাড়া আরও অনেক কিছু আমাদের আশা করবার রয়েছে উদয়শঙ্করের কাছে। গোড়ায় ইডেন উদ্যানে যখন তাঁর রামলীলা শুরু হয়েছিল তখন আমরা তাঁর এই নতুন প্রচেষ্টার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু উদয়শঙ্কর জানেন নিশ্চয়ই যে, আজ রামলীলার অধিকাংশ দর্শক কারা। কলকাতায় আগত পশ্চিমা ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী, মাড়োয়ারী, গুজরাটীরাই কি আজও সরগরম করে রাখেন নি তাঁর আসর? প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ প্রত্যহ নতুন নতুন পথ আর পাঁচ জনের কাছে খুলে দেবেন এই আশাই আমরা করি। অর্থের প্রয়োজনও যে রয়েছে পশ্চাতে, তা-ও আমরা অস্বীকার করি না কখনই। কিন্তু তবু বলব উদয়শঙ্কর, আপনি বাঙলা দেশের জন্য নতুন কিছু করুন। রামলীলা আর নয়। কোনও কিছুরই আধিক্য স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। কি করবেন? আপনাকে কোনও কিছু বলতে যাওয়া খুব ভাল দেখায় না। তবু দু'-একটা জিনিষ যা মাথায় আসছে তাই বলছি। বাঙলা দেশে

প্রত্যহ নাচের আসর জমে এমন কোনও রঙ্গালয় নেই, সপ্তায় কি কোনও তেমন আসর বসানো যায় না কোথাও? নাচের ট্রেণিং সেণ্টার? রিসার্চ ইনষ্টিটিউট? ভারতীয় প্রাচীন লোকনৃত্যগুলির উদ্ধার? বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্য থেকে বাঙলায় এডপ্টেশন্? কত কি-ই তো এখনও বাকী রয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গীতশিল্পের আদি-কথা

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রীকেরা যখন গ্রীসের উত্তর দেশীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিলেন তখন তিন জন বন্দীকে তাঁরা ধরে নিয়ে আসেন। বন্দীদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে ছিল সিথার। বন্দীরা জাতিতে শ্লাভ, বাল্টিক থেকে আগত। একথা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সম্রাট কনষ্টান্টাইন পোফাইরো জেনিটাসও বাইজান্টিয়ামে তাঁর উপাসনা শ্লাভ সঙ্গীতের মাধ্যমে করতেন, একথা মিথ্যা নয়। সে যাই হোক, রাশিয়াতেও অন্যান্য দেশের মতই লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়েই সঙ্গীতের জন্ম। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বাইজানটাইন চার্চ্চ-সঙ্গীত এল রাশিয়ায়। ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন মস্কো রাশিয়ান সভ্যতার কেন্দ্র হল (কিয়েফের পতনের পর) তখন ইতালী, জার্মাণী, তুরস্ক ও এশিয়া থেকে সঙ্গীত এল রাশিয়ায়। তৃতীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক আইভান খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে শোফিয়া পালিওলোগোস নাম্নী এক গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই উপলক্ষে এক বিরাট সঙ্গীতের সভা হয়। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জোহান সালভেটর (বিখ্যাত অর্গান-বাদক) মস্কোতে আসেন। ঠিক এই সময়ই মস্কো কোর্ট-চ্যাপেল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৩৫ জন গায়ক রাজসভায় স্থায়ী চাকুরী পান। ১৬০৫এ ডিমিট্রি-দ্য-ইমপোষ্টার, সঙ্গীতের এক বিরাট পৃষ্ঠপোষক আসেন রাশিয়ার রাজতক্তে। ১৬৮৬-১৭২৫এ পিটার দ্য গ্রেটের সময়ও সঙ্গীতের চর্চ্চা বৃদ্ধি হয়। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মস্কোতে সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে পিটার্সবার্গে সঙ্গীত শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৭৩০-১৭৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী এ্যানের রাজত্ব-কালেও সঙ্গীতের স্রোত বয়ে চলে। ১৭৬২-১৭৯৬ ক্যাথেরিন দ্য গ্রেটের সময়ও কম যায় নি। এই সময়ই পাশকেভিচ, যাণ্ডোস্কিন প্রভৃতি সঙ্গীত-রচয়িতাদের জন্ম হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্র্যাণ্ড-কনষ্টান্টাইন সক্সেকোবার্গ-গোথার ডিউককে যন্ত্রশিল্পী উপহাররূপে প্রদান করেন। সঙ্গীত সব দেশেই নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। রাশিয়াও কোনও ব্যতিক্রম নয়।

প্রেসিডেণ্টের পদক

ভারতীয় রাজসভায় সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান বরাবরই অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সভ্যতার মধ্যে তো বটেই, বিদেশী মুসলমান রাজা-মহারাজা-সম্রাট, এমন কি আমীর-ওমরাহদের গৃহেও সঙ্গীতের মান ছিল যথেষ্ট। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের প্রেসিডেণ্ট যে সেই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ফের করবেন এতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি একটি ব্যাপার দেখে। পুরস্কার-প্রাপ্ত সঙ্গীতজ্ঞদের তালিকায় একজনও বাঙালীর নাম না দেখে। শুধু সঙ্গীতই নয়, বাঙলার সর্বপ্রকার কৃষ্টিকেই একদা পশ্চিমের ভারত থেকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আজ তা তো কমেই নি বরং বেড়েছে, এই প্রমাণই আমরা পেলাম। পাখোয়াজী গোবিন্দ রাও, উত্তর-ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে অনন্তমনোহর যোশী, দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতে মহারাজাপুরম আয়ার, রাজরত্নম পিল্লাই পুরস্কৃত হয়েছেন। হোন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু বাঙলার সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, শুধু মাত্র শনিবারের বৈকালে আর রবিবারের প্রভাতে গানের স্কুল খুলে কয়েকটি অল্প-বয়স্ক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর (একথা আমরা সকলের সম্পর্কেই বলছি না) মস্তিষ্ক চর্ব্বণ না করে বাঙালীর মান রক্ষা করার কিঞ্চিৎ প্রয়াস করুন তাঁরা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও বক্তব্য—যেন কোন প্রকার প্রাদেশিকতা সঙ্গীত, সাহিত্য কি চিত্র-কলার ক্ষেত্রকে কলঙ্কিত না করে।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক—(১)

রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১২৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর। সঙ্গীত সম্পর্কে শিক্ষা তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট। রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সভায় সঙ্গীতজ্ঞদের বিশেষ সম্মান ছিল। সঙ্গীতাচার্য্য উদয়চাঁদ গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রসিদ্ধ খেয়ালী গুরুপ্রসাদ মিশ্র নিয়মিত এই সভায় যোগদান করিতেন।

সেতারী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদঙ্গ-বাদক রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরও সেখানে গতায়াত ছিল। একটি সঙ্গীত-শিক্ষার বিদ্যালয় নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতায় খোলা রাজা বাহাদুরের অপর এক কীর্ত্তি। 'বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়' নামে তাহা খ্যাত। গুরুপ্রসাদজী, উদয়চন্দ্র গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ইহার শিক্ষক ছিলেন। ধ্রুপদী অঘোরলাল চক্রবর্ত্তী, মৃদঙ্গী কেশবলাল মিত্র, বসন্ত হাজরা, বরদা দত্ত, শিবনারায়ণ মিশ্র, কান্তাপ্রসাদ, জুয়ালাপ্রসাদ, মুরাদালী খাঁ, মদনমোহন মিশ্র, ভেইয়ালাল ইত্যাদি সে কালের বিশেষ বিশেষ বাঙালী ও পরদেশী ওস্তাদেরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই রাজা বাহাদুরের নিকট আসিতেন। সঙ্গীতের সভা বসিত। বিদেশ হইতে প্রসিদ্ধ গায়কগণও প্রায়ই আসিতেন। এ কারণে শৌরীন্দ্রমোহন প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার আর একটি অবদানও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি বহু বাঙলা গান রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতজ্ঞদের সম্পর্কে তিনি সর্বদাই অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

বেতার-জগৎ—ছবি, লেখা আর প্রোগ্রাম

ইণ্ডিয়ান লিসনার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে যে অনুষ্ঠান-লিপি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ষ্টেশন-ডিরেক্টারের নামে এক নম্বর গার্স্টীন প্লেস থেকে ছাড়া হয় তাতে কি থাকে? প্রথমেই একখানা জোরালো কভার (কাশ্মীরের ঝিলমনদীর ছবি, আসামের কোনও পার্বত্য মেয়ে, উড়িষ্যার কোনও মন্দির-গাত্রের নক্সা, বসন্তের কোনও ছবি) তার পরই এ পক্ষের বিশেষ আকর্ষণ, প্রতিবেশী ষ্টেশনের কোনও খবর, পাতা-ভর্ত্তি ছবি (একই বংশী-বাদকের ছবি একাধিক বার প্রকাশিত হচ্ছে কি কারণে জানতে পারি কি আমরা?) লেখা (কানে এসেছে এই প্রচারিত লেখাগুলি পুনরায় বেতার-জগতের পাতায় প্রকাশিত করবার রায় বের করবার জন্য নাকি লেখকদের সাধ্য-সাধনার ত্রুটি থাকে না!) যার অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীরও নয়, সঙ্গীত শিক্ষার স্বরলিপি, পুস্তক-পরিচয়, ভারতের বাইরের খবর, বেতার-জগতের গ্রাহক-মূল্য। ব্যস! বেতার-জগতের সম্পাদকমণ্ডলীর এত কেরামতী যে তাঁরা অনায়াসেই 'অমুদ্‌ঘাটিত' কে করেন অনুবাদের প্রাক্কালে অমুদঘাটিতা, 'ছায়াপাত' কে 'ছায়াপথ'। ষ্টেশন-ডিরেক্টার মহাশয় এ দিকে নজর দেবেন কী?

লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের সঙ্গীত-শিক্ষা পদ্ধতি

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের কি পদ্ধতিতে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বর্ণনা করিব। কেবল মাত্র শিল্পী সৃষ্টি করাই ভাতখণ্ডেজীর উদ্দেশ্য ছিল না, শিক্ষক, পণ্ডিত বা গবেষক ও শ্রোতা প্রস্তুত করাই তাঁহার পরিকল্পনা ছিল। ব্যক্তিগত প্রতিভার উপরেই কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালকই কৃতবিদ্য হয় না বটে, কিন্তু শিক্ষিত হয়। শ্রোতা তৈয়ারীর ব্যাপার খানিকটা বিস্ময় সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হইবে। রাগ-সঙ্গীত মাত্র কানে শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার শিল্প নহে—রাগ প্রকাশের কৌশলাদি অজ্ঞাত থাকিলে, ইহা মাত্র "ওস্তাদী কশরৎ" বলিয়া মনে হয়। মাত্র কয়েক বৎসর রাগ-সঙ্গীত চর্চ্চার দ্বারাই মন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাভিমুখী হয়। মরিস কলেজে সপ্তাহে ছয় দিন কার্য্য হয়। প্রথম বার্ষিক শ্রেণী আগষ্ট মাস হইতে আরম্ভ হইয়া পর বৎসর ডিসেম্বরে শেষ হয়—অর্থাৎ সতেরো মাস। এই বর্ষে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় "স্বরজ্ঞান।" এই উদ্দেশ্যে দশটি ঠাট বাচক রাগের 'সরগম' বা 'স্বরমালিকা'—প্রত্যেক রাগের দুইটি করিয়া সহজ গান ও পঁচিশ হইতে ত্রিশটি 'অলঙ্কার' বা 'পালটা' শিক্ষা দেওয়া হয়। চারিটি সহজ তালও এই বর্ষে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবলায় ঠেকা দিতেও এই সময় হইতেই অভ্যাস করান হয়। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে স্বরজ্ঞান হওয়া। ব্ল্যাক বোর্ডে উল্টা-পাল্টা ভাবে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর লিখিয়া দেওয়া হয়, ছাত্রগণের তাহা সুরে পড়িতে হয়। যেমন:—সা, মা, রে পা, গা, নি, মা, ধা, সা, মা, নি, গা, ধা, গা, রে, মা, পা, নি, সা। ইহা ব্যতীত শিক্ষক 'আ' কার দ্বারা নাদ গাহিয়া তাহার 'স্বর নাম' জিজ্ঞাসা করেন—অর্থাৎ শ্রবণ মাত্রই স্বর চিনিতে পারা চাই। পাল্টাগুলি তিন সপ্তক ব্যাপী, কণ্ঠসামর্থ্য অনুযায়ী, অভ্যাস করিতে হয়। গান বা সরগম হস্তে তালি ও মাত্রা সহযোগে গাহিতে হয়। আর একটি বৈশিষ্ট্য, এই বর্ষে ছাত্রগণকে কোনরূপ যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষক মহাশয়ের কণ্ঠনিঃসৃত স্বর ও উচ্চারণাদি অনুকরণ করিয়া ছাত্রগণকে গাহিতে হয়। যদিও যন্ত্রবিহীন সঙ্গীতে স্বরগুলি প্রথম দিকে কিঞ্চিৎ স্থানভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু দেখা যায় তাহাতে জড়তা দূর হইয়া শীঘ্রই কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও উচ্চারণভঙ্গী স্বাভাবিক হয়, ও স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী স্থানে গাওয়ার অভ্যাস হয়। কণ্ঠস্বর সাধনা সম্বন্ধে আমরা অন্য প্রবন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব। প্রত্যেক গানের সঙ্গে ছোট ছোট তানও (৮, ১২, ১৬ মাত্রার) অভ্যাস করানো হয়। ভাতখণ্ডেজীর মতে কোন একটি সহজ সম্পূর্ণ রাগের (তাঁহার মতে শুদ্ধবাট বিলাবল) আরোহী-অবরোহী অন্ততঃ ছয় মাস কাল ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে—কণ্ঠস্বরের জড়তা দূর ও উচ্চারণভঙ্গী সাবলীল ও সঙ্গীতোপযোগী হইয়া পরবর্ত্তী পথ যথেষ্ট সুগম হয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে তানপুরা সহযোগে গান অভ্যাস করানো হয়। এই বর্ষে প্রত্যেক রাগে একটি ধ্রুপদ, অথবা ধামার, একটি লক্ষণ গীতি, একটি বিলম্বিত ও একটি দ্রুত খেয়াল শিক্ষা দেওয়া হয় (কখনও কখনও দুই একটি তারানা)। রাগগুলির নাম—(১) বিলাবল, (২) ইমন (৩) খমাজ, (৪) ভৈরো (৫) পূর্বী, (৬) কাফি (৭) আশাবরী (৮) মারবা (৯) ভৈরবী (১০) টোড়ী। প্রত্যেক শ্রেণীতেই প্রায় প্রত্যেক রাগের ধ্রুপদ অথবা ধামার শিক্ষা করিতেই হইবে। ধ্রুপদ ও ধামারে ব্যবহৃত স্বরগুলি রাগের শুদ্ধতা রক্ষার সহায়ক বলিয়া, প্রথমেই ইহাদের যে কোন একটি শিক্ষা দিয়া পরে খেয়াল আরম্ভ করা হয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে তবলায় ঠেকা দিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সহজ আলাপ গাওয়া এই বর্ষ হইতে সুরু হয় এবং বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের সঙ্গে ছোট বড় সহজ তানও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বর্ষ হইতেই

সহজ উপপত্তি (Theory) গুলি শিক্ষা দিয়া লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক বর্ষেই কয়েকটি নূতন তালও শিক্ষা দেওয়া হয়।

তৃতীয় বর্ষে পনেরোটি রাগ রাখা হইয়াছে। কারণ এই পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই অনেক ছাত্র-ছাত্রী চলিয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে (১০+১৫) পঁচিশটি রাগ শিক্ষা করিতে পারিলে, স্কুল-ফাইনাল পাঠ্য-তালিকাভুক্ত সঙ্গীত শিক্ষা দিবার যোগ্যতা হইবে, এই উদ্দেশ্যেই তৃতীয় বর্ষে পনেরোটি রাগ রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক রাগে ধ্রুপদ অথবা ধামার, বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, লক্ষণগীত ও তারানা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের সঙ্গে আলাপ ও নানাবিধ তান এবং ধ্রুপদ বা ধামারের দ্বিগুণ ত্রিগুণ এবং চৌগুণ তৈয়ারী করিতে অভ্যাস করান হয়। দ্বিতীয় বর্ষে পারিভাষিক শব্দগুলির সহজ ব্যাখ্যার পর তৃতীয় বর্ষে ঠাট, রাগ, রাগ জাতি, রাগের অঙ্গ গায়কের দোষ-গুণ ইত্যাদি বিষয়ক উপপত্তি আলোচিত হয়। এই বর্ষে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে I. Mus (ইণ্টারমিডিয়েট মিউজিক) সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। রাগগুলির নাম :—(১) ভুপালী, (২) হামির, (৩) কেদার, (৪) বেহাগ (৫) দেশ (৬) তিলককামোদ (৭) কাফেড়া (৮) বাগেশ্রী, (৯) সোহিনী (১০) পীলু (১১) ভিম পলাশী (১২) বৃন্দাবনীসারঙ্গ (১৩) জৌনপুরী (১৪) মালকোশ, (১৫) শ্রী। দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই একটি উপপত্তি সম্বন্ধীয় লিখিত (প্রশ্নপত্র) ও একটি প্রত্যক্ষ সঙ্গীতের পরীক্ষা (মোট ২০০ শত নম্বরের) গ্রহণ করা হয়।

ইহার পর, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতেই প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা সুরু হয়। নাদোৎপত্তি (Voice-production) উচ্চ প্রতীকের আলাপ, আলাপ ও তানে নানারূপ অলঙ্কারের ব্যবহার, সরগম আলাপ, বোল তান ইত্যাদি এই সময় হইতেই শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করা হয়। সমপ্রকৃতিক রাগের স্বর রচনায় প্রত্যেক রাগের বৈশিষ্ট্য কি ভাবে রক্ষা করা যায়, ন্যাসস্বরের ব্যবহারে 'রাঢ়ত' আলাপ গাওয়া, রাগ ভেদ বজায় রাখিতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ সূত্রগুলি, ৪র্থ বর্ষ হইতেই শিক্ষা দেওয়া সুরু করা হয়। স্বর ও শ্রুতি সম্বন্ধীয় উপপত্তি, এই বৎসরের মুখ্য শিক্ষার বিষয়। প্রত্যেক রাগের চারিটি করিয়া গান—ধ্রুপদ অথবা ধামার, বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল ও তারানা পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত দশটি রাগ শিক্ষা দেওয়া হয়। গৌড়সারং, হিন্দোল, ছায়ানট, শঙ্করা, ললিত, আড়ানা মিঞামল্লার, পরজ, জয়জয়ন্তী, পুরিয়া ধানেশ্রী। শিক্ষার্থিগণকে ধ্রুপদ অথবা ধামার শিক্ষা না দিয়া খেয়াল আরম্ভ করা হয় না বটে, কিন্তু খেয়াল তৈয়ারীর পর তাহারা উহার প্রচুর চর্চ্চা করিবার অবকাশ না পাওয়ায়, ধ্রুপদ ও ধামার খানিকটা অবহেলিত থাকিয়া যায়।

ইহার পর পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে (B. Mus) সঙ্গীত-বিশারদ ডিগ্রী সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই শ্রেণীতেও মাত্র ১০টি রাগ রাখা হইয়াছে। কামোদ, রামকেলী, বসন্ত, দেশকর, পুরিয়া, গৌড়মল্লার, বাহার, দরবাড়ী, শুদ্ধকল্যাণ, মুলতানী। B. Mus ডিগ্রী প্রাপ্ত অধিকাংশ ছাত্র কলেজের শিক্ষা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মাত্র দু' এক জন M. Mus বা সঙ্গীত-প্রবীন ডিগ্রীর জন্ত আরও দুই বৎসর অপেক্ষা করে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম বার্ষিক শ্রেণীর সিলেবাস একটু ভিন্ন। এই সময়ে ৩০০ নম্বরের ভেতরে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। দুইটি ব্যবহারিক ও একটি উপপত্তির পেপার অথবা দুইটি উপপত্তি ও একটি ব্যবহারিক সঙ্গীতের পেপার। যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা প্রায়ই দুইটি উপপত্তির পেপার লইয়া পরে গবেষণার দিকে মনোযোগ দেন। দুইটি ব্যবহারিক সঙ্গীত পেপার-এর একটা প্রচলিত ও একটু অধুনা-লুপ্ত রাগ বিষয়ক। সর্বসমেত ৫০টি রাগ এই শ্রেণীর দুই বর্ষে শিক্ষা করিতে হয়। যাহাদের উপপত্তি দুই পেপার তাহাদের ত্রিশটি রাগ তৈয়ারী করিতে হয়। ইহার পর অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে পঞ্চাশটি রাগ শিক্ষা দেওয়া ও গবেষণার কার্য্য পরিচালনা করা হয়। ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী হইতেই ছাত্র-ছাত্রীগণকে নূতন নূতন রাগ সৃষ্টি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় ও গানের বাণী লিখিয়া দিয়া স্বর সংযোজনা করিতে দেওয়া হয়।

কলেজে প্রায়ই বহিরাগত ওস্তাদগণের গান হয়। কলেজেও প্রতি শনিবারে গানের জলসার ব্যবস্থা থাকে। ইহাতে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণকে গাহিতে হয়। বিবিধ ঘরোয়াণার ওস্তাদগণ প্রায়ই যাতায়াতের পথে লক্ষ্ণৌ কলেজের শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত সঙ্গীত-পরিষদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিবেশনেও অনেক দরবারী গায়ক-বাদকের শুভাগমন লক্ষ্ণৌ সহরে প্রায় প্রতি বৎসরেই হইয়া থাকে। পরীক্ষা গ্রহণের সময়েও বোম্বাই, পুণা, কাশী, এলাহাবাদ ইত্যাদি স্থানের বিখ্যাত ওস্তাদগণ লইয়া পরীক্ষা-পরিষদ গঠন করা হয়।

ভাতখণ্ডেজীর গুরুদেবের ছদ্ম নাম 'হররঙ্গ' ছিল। যদিও অনেক ওস্তাদের কাছেই তিনি পরে সঙ্গীত-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ছদ্ম নাম 'চতুর'। "ক্রমিক পুস্তক মালিকা"য় 'চতুর' ভণিতা সম্বলিত প্রায় প্রত্যেক রাগেই তাঁহার স্বরচিত গান আছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক রাগের স্বরমালিকা—লক্ষণগীত এবং বিলম্বিত লয়ে (একতাল, ঝুমরা, তিলবাড়া) প্রচুর তারানা তিনি রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাগের শুদ্ধরূপ নির্ণয়ের জন্য তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়াছেন :—(১) রাগতরঙ্গিণী (২) হৃদয়-কৌতুক (৩) হৃদয়প্রকাশ, (৪) সঙ্গীত-পারিজাত (৫) সদ্রাগ-চন্দ্রোদয় (৬) রাগমালা (৭) রাগমঞ্জরী (৮) নর্ত্তন নির্ণয় (৯) রাগতত্ত্ববিবোধ (১০) অনুপসঙ্গীত-রত্নাকর (১১) অনুপবিলাস (১২) অনুপাঙ্কুশ (১৩) রস-কৌমুদী (১৪) স্বরমেল কলানিধি (১৫) রাগবিবোধ (১৬) সঙ্গীতসারামৃত (১৭) চতুর্দণ্ডি প্রকাশিকা (১৮) রাগলক্ষণম্। এই গুলি ব্যতীতও অনেক পুস্তক তিনি নিজে পাঠ করিয়া বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কি না, দেখিয়া তাঁহার 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি' নামক পুস্তকে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন—হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক পদ্ধতি কালক্রমে একত্রিত হইয়া একটি মাত্র সঙ্গীত পদ্ধতি সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্ত তিনি দক্ষিণ পদ্ধতির গ্রন্থগুলিও তাঁহার পুস্তকে আলোচনা করিয়া, এই দুই সঙ্গীতের পার্থক্যই বা কোথায় এবং মিশ্রণই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ যে গঠনমূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে সঙ্গীতকে সাদরে আহ্বান জানাইয়াছেন, ইহা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেরই জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

যদু ভট্ট রচিত ধ্রুপদ গান

(সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তেওরা

জয় প্রবল বেগবতি সুরেশ্বরি জয়তি জয় গঙ্গে
ত্রিজগত-তারিণি জগকলুষনাশিনি পার্ব্বতি
রঙ্গনাথ সুতপর নেক করহর তপন সুত ভয় অন্তিমে।
তুয়া নীর নিরমল করত ঢল ঢল তীর তট অতি শোভিনি
নগ-নন্দিনি ইথ মকর দিনকর চন্দ্রিমাঘমে দেহি পদযুগ ভাগমে ॥ *

১´ ২ ৩ ১´ ২ ॥ ৩ ১´
সা সা | রা মা মা | পা -না | না না I র্সা -া -া | -া -া | সা সা I রা মা মা |
জ য় প্র ব ল বে ০ গ ব তি ০ ০ ০ ০ জ য় প্র ব ল

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
পা না | না না I র্সা -া না | র্সা -া | র্রা র্রা I র্সা র্সা না | পা পা | না -া I
বে ০ গ ব তি ০ সু রে ০ শ্ব রি জ য় তি জ য় গ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
না র্সা -া | র্সা র্সা | র্সা র্সা I নর্সা র্রা র্সা | র্রা -া | র্সা না I র্সা র্সা না |
ঙ্গে ০ ০ ত্রি জ গ ত তা ০ ০ রি ণি ০ জ গ ক লু ষ

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
পা -া | মা মা I মঃ রাঃ রা | সা -া | সা সা I রা মা মা | মা পা |
না ০ শি নি পা ০ র্ব্ব তি ০ র ঙ্গ না ০ থ সু ত

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
পা পা I পনা পা পা | মা পা | না না I না র্সা র্সা | না র্সা | র্রা র্রা I
প র নে ০ ক ক র হ র ত প ন সু ত ভ য়

১´ ২
র্সা -া না | পা -া II
অ ০ ন্তি মে ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
না না I না র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা I র্রা র্রা র্সা | না না | পা না I
তু য়া নী ০ র নি র ম ল ক র ত ঢ ল ঢ ল

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
না র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা I না র্সা র্সা |
নী ০ র নি র ম ল ক র ত ঢ ল ঢ ল তী ০ র

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
র্সা র্সা | র্সা র্সা I নর্সা র্রা র্সা | র্রা -া | র্সা না I না র্সা না | র্সা -া | মা মা I
ত ট অ তি শো ০ ০ ভি নি ০ ন গ ন ০ ন্দি নি ০ ই থ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১
পা না না | র্সা না | র্সা র্রা I র্সা -া র্সা | না -া | পা মা I পা র্সা না |
ম ক র দি ন ক র চ ০ ন্দ্রি মা ০ ঘ মে দে ০ হি

২ ৩ ১´ ২
পা পা | মা পা I মা রা রা | সা -া II
প দ যু গ ভা ০ গ মে ০

---

* যদু ভট্ট তাঁর শিষ্যবর্গ সহ মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গায় তীর্থ-স্নান করে এই বিখ্যাত গঙ্গার স্তব ধ্রুপদের ঢংয়ে রচনা করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি" এই গানের অনুকরণে রচিত।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের সভাপতিত্বে 'গীতাঞ্জলি' ও 'রবিতীর্থ' নামক প্রতিষ্ঠান দু'টির মিলনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে সম্প্রতি। ১নং এস, আর, দাস রোডে বসেছে নতুন অফিস। শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র যুগ্ম-সম্পাদকরূপে মনোনীত হয়েছেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উৎসবের শেষে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আসর বসে। মৃদঙ্গাচার্য্য মুরারি-মোহনের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকী ১১শে মার্চ্চ ধ্রুপদী শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে বেশ ভাল ভাবেই নিষ্পন্ন হল। সভাশেষে মৃদঙ্গের মেলা বসল। শ্রীঅমর ভট্টাচার্য্য, শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবলাইচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোরাই, শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ গাইলেন। শ্রীবাণেশ্বর পাল, শ্রীহরিশঙ্কর ঘোষ, শ্রীহারাধন পাল, শ্রীবামাপদ দাস, শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র, শ্রীবিটলদাস গুজরাটী, শ্রীজগদীশ বিশ্বাস মৃদঙ্গ বাজালেন। চিনসুরাতে সঙ্গীত শিক্ষায়তনের উদ্যোগে এক বিরাট ক্লাসিকাল গানের জলসা হয়ে গেল সম্প্রতি। খেয়ালে গাইলেন শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত, সেতারে খাম্বাজ বাজালেন শ্রীমতী শান্তি দে। কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীনমিতা দত্ত ও গীতা দত্ত। শ্রীমতী অশ্রুকণা ঘোষ ও শ্রীমতী কল্যাণী রায়ও অংশ গ্রহণ করলেন। ডাঃ কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক আসর বসেছিল ১এ কলেজ রোতে। 'সংস্কৃতি'র এই বৈঠকে গীতশ্রী ইভা দত্ত ও ইলা দেব, অমলশঙ্কর ভাদুড়ী, ধীরেন বসু, অরুণা মিত্র ইত্যাদি অংশ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রভারতী সপ্তাহব্যাপী এক রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করার কথা ঘোষণা করেছেন আগামী রবীন্দ্র জন্মোৎসবে। গীতবিতান, শান্তিনিকেতন আশ্রমিকা সঙ্ঘ, চৈতালিক দক্ষিণী সুরমন্দির, বহুরূপী, শনিবারের বৈঠক ইত্যাদি এতে অংশ গ্রহণ করবেন বলে শোনা গেছে। পাথুরিয়াঘাটায় শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের গৃহে শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে প্রসিদ্ধ গায়ক ৺জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর স্মারকোৎসব হল। শ্রীশিশির গুহ (ধ্রুপদ), শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী (খেয়াল), মহিষাদলের কুমার গর্গ, শ্রীশিবকুমার চট্টোপাধ্যায় (খেয়াল), শ্রীমতী অন্নপূর্ণা রায় মালাকর (খেয়াল), শ্রীমণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (হারমোনিয়াম), শ্রীমতী কল্যাণী রায় (সেতার), শ্রীঅমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য (সেতার), প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাদের জানাতে হচ্ছে, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পিতা শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। গীতাবিতানের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মনোরম অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উৎকল নৃত্য-সঙ্গীত নাট্যকলা পরিষদ ওড়িশী-সঙ্গীত, চম্পু, চৌতিষা, চৌপদী ইত্যাদির স্বরলিপি তৈরীর এক প্রচেষ্টার কথা জানা গেল। উত্তরায়ণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ২য় বার্ষিক স্কুল-ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল জানা গেছে—কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, আরতিরাণী ঘোষ, পূর্ণিমারাণী বসু, গৌরীরাণী বর্দ্ধন, দীপালী দত্ত, জয়া দাস, মৃদুশ্রী দাস, কৃষ্ণা সরকার, পারুল হালদার, শুক্লা দাশগুপ্ত, জয়শ্রী মিত্র, মঞ্জুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্ত্তী, সুনন্দা সরকার, রাংা সরকার, সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, মীরা দাশগুপ্ত, গৌরী মজুমদার, প্রতিমা পাল, ইরা রায়-চৌধুরী, কৃষ্ণা রায়-চৌধুরী, পুরবী ভট্টাচার্য্য, সন্ধ্যা রায়, ছায়া বসু, বাণী বসাক, গীতা রায়, শীলা চক্রবর্ত্তী, গীতা ভৌমিক, রাণু মজুমদার, মলিনা বসু, মীনাক্ষী দত্ত, শঙ্করী ভট্টাচার্য্য, সাধনা দাস, নিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সত্যপ্রিয় সেন, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সাহা, কনক ভট্টাচার্য্য, সমীরকান্তি চট্টোপাধ্যায় মণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের প্রোগ্রাম প্রচারের মিটার-ব্যাণ্ডের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়েছে। 'কলকাতা ক'-এর সর্ট ওয়েভ ৬১·৪৮ মিটারে সকালে, ৪১·৬১ মিটারে দুপুরে, ৯০·৭৭ মিটারে রাত্রে শোনা যাবে। 'কলকাতা খ'-এ ৪১·১২ মিটারে সকালে, ৩১·৪৮ মিটারে দুপুরে এবং ৬১·৩৮ মিটারে রাত্রে শোনা যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এচ-এম-ভি রেডিও ডিলার্সদের সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী দমদমে নিজ কারখানায় এক আমন্ত্রণ জানান। প্রত্যেককে কারখানার প্রতি অংশ ঘুরিয়ে দেখানো হয়। পশ্চিম-বাঙলার প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে রেডিও সেট দেবার চেষ্টা হচ্ছে। আগামী বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে গ্রামের লোকসংখ্যা এক থেকে দশ হাজার সেখানে একটি করে রেডিও বসাবেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দিল্লী যাওয়ায় ফল হয়েছে নিশ্চয়ই। গত ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় সুর-ছন্দমের মাসিক অধিবেশন ১১, ডোভার লেনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের অধিবেশনে স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমঞ্জু গুপ্তা, শ্রীলীলা রায়, শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রভৃতি। খেয়াল মত নিছক একটা গান-বাজনার আসর না কোরে সুর-ছন্দম মাসে একবার কোরে বাঙলার হারানো এক একজন গীতিকারের রচিত গান তাঁর গানে অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞদের দিয়ে যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করছেন এটা আমাদের খুবই ভালো লাগছে।

রেকর্ড-পরিচয়

শুধু গান নয়, বাজনাও রেকর্ডের এক পরম আকর্ষণ। আর তার সঙ্গে যদি নাচও যোগ দেয় তবে তো আর কথাই নেই। নাচ-গান-বাজনা সব একত্রে। এবারের রেকর্ডে তেমনই এক মধুর যোগাযোগ দেখা যায়।

বাংলার সেরা যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে পরিতোষ শীলের নাম বিশেষ পরিচিত। বেহালায় তাঁর যেমন মিষ্টি হাত তাতে তাঁকে এক কথায় 'বাংলার মেনুহিন' বলা চলে। এবার রেকর্ডে পরিতোষ

বাবুর দু'খানি অপরূপ আলাপ বেরিয়েছে। 'আহীর ভৈরোঁ' আর 'মল্লার' রাগ বাজিয়েছেন তিনি N 87532 রেকর্ডে।

রবি রায়-চৌধুরী 'জিপসি নৃত্য' আর 'উষা নৃত্য' অর্কেষ্ট্রা রেকর্ডের বুকে এঁকে দিয়েছেন অতি দক্ষতার সঙ্গে। রেকর্ড-নম্বর G E 25829.

পান্নালাল ভট্টাচার্য এত দিন শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে বাংলার আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলছিলেন। এবার দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন। স্বনামধন্য ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা পান্নালাল জ্যেষ্ঠের যোগ্য উত্তর-সাধক হিসেবে নিজের যে অপূর্ব কণ্ঠ-মাধুর্য্য বিস্তার করেছেন তাতে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। রেকর্ড-নম্বর G E 2475—গান: "আমায় নিয়ে যেন"—এবং "রূপালী চাঁদ যাদু জানে।"

সত্য চৌধুরীর সন্ধান না পেয়ে যে সব সঙ্গীতানুরাগী উদ্গ্রীব হয়েছিলেন, অনেক দিন পরে তার নতুন দু'খানি চমৎকার আধুনিক গান পেয়ে তাঁরা খুশি হবেন। "মনহংসীরে ভাসাব না" এবং "নীল পাখী" গান দু'খানি গেয়েছেন N 82649 রেকর্ডে।

আমার কথা (৪)

শ্রীপঙ্কজ মল্লিক

(বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত)

বললাম, তা গাইবেন কেন? আমি দীন সাংবাদিক; আমি বলছি ভারতের সেরা গায়ককে গান গাইতে আমার অগোছালো টেবিলের ধারে বসে। আমারই স্পর্ধা। তাই না? কিন্তু বলুন দেখি সত্যি কথাখানি? এখন যদি ম্যাডাম (ম্যাডাম দেবিকারাণী রোয়েরিক, তাঁরই অফিসঘরে বসে কথা হচ্ছিল) গান গাইতে বলতেন আপনি গাইতেন কি না?

শ্রীপঙ্কজ মল্লিক

একটা কাণ্ড হয়ে গেল। আমি কিন্তু সত্যি বলছি সিরিয়সলি একথা বলিনি।

উনি করলেন কি জানেন? চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জড়িয়ে ধরে বললেন, এ কি বললে ভাই! তোমাকে আমি রাস্তায়, ঘাটে, পথে, যখন তখন যে কোনো গান শোনাবো। ওমনি কথা বল না।

মোকা ছাড়লাম না। বললাম বেশ। শোনান, এখানেই শোনান, এখনই শোনান।

—কোনটা?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "গগনে গগনে আপনার মনে।"

গান শুরু হল। কনট প্লেসের রীগাল বিল্ডিংএর তেতালার উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে সুর ভেসে গেল গগনে গগনে। একটা, দুটো, তিনটে করে পর পর ছটা গান গাওয়ার পর গুণী বললেন, খুসী? এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। গলার আওয়াজ শুনে চারি দিক থেকে সব ছুটে এলো। ষ্টেনোগ্রাফাররা এলেন। পাবলিক রিলেশন্‌স অফিসাররা এলেন। কেরাণীরা এলেন। পিওনরা এলো। অফিস-ঘরে সঙ্গীতের আসর! কি কাণ্ড! বন্ধু বললেন কানে কানে, ম্যাডাম এলেই ঠ্যালা বুঝবে। তোমার চাকরীটার তেরোটা বাজবে।

বললাম, সত্যিকারের গুণী তিনি আমি জানি। পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনলে তিনিও এখানে বসবেন আমাদের সাথে। অন্তত তাঁর রাগ করবার কোনো কারণ দেখছি না!

এক জন অবাঙালী বন্ধু বললেন, পঙ্কজ বাবু, ঐ গানটা শোনান না, ঐ সেই "পিয়া মিলনকো যানা"।

বললেন, ভাই, ওকে একটু বুঝিয়ে দাও না, বয়সটা পঞ্চাশের ওপরে উঠেছে। প্রিয়া মিলনে যাবার চাঞ্চল্যটা আর তোমাদের মতন নেই।

ইচ্ছে হল বলি আর্টিষ্টদের আবার বয়স বাড়ে নাকি? ওঁরা ত চিরনবীন। তাই নয় কি? কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুলো না।

পঙ্কজ বাবু মনের আনন্দে অফিসগৃহে হাসির তরঙ্গ নাচিয়ে কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে বন্ধুর বাড়ীতে চলে গেলেন।

আমি বললাম, "বসুমতীর" জন্য আপনার সাঙ্গীতিক-জীবন কথা চাই। পাঁচটা মিনিট দিতে হবে কিন্তু।

বললেন ভাই, পাঁচ মিনিট কাউকে দিতে রাজী নই আমি।

মনে মনে ভাবলাম, তার কমে আর কি করে হয়। সংবা বড় জোর ম্যানুফ্যাকচার করে না হয়ে মাঝে মাঝে দেওয়া যা কিন্তু এ যে জীবনী। এতে তো আর গাঁজাগুল খাটবে না জানাশুনো কোনো বাঘা গাইয়েও নেই যাঁর জীবনীটা এর না জুড়ে বাজারে ছেড়ে দিতে পারি।

উনিই পরিষ্কার করে দিলেন সব। বললেন, দেখো ভাই, কা দোল। তুমি সন্ধ্যের সময় এসো। পাঁচ মিনিট নয়, প পনেরো মিনিট।

গিয়েছিলাম। পনেরো মিনিট নয় তারও বেশী, অনেক বেশী বসে নানা গল্প শোনালেন। জীবনী সম্বন্ধে সেদিন একটি কথা হোল না। চুপি চুপি বললেন পণ্ডিতজীর (জওহরলাল নেহেরুজী সাথে আমার যে ছবি দেখালে তার একখানা কপি দিতে হ

ভাই! বয়স হলে হয় কি, ছবির সখটা কিন্তু আমার ভারী ছেলেমানুষের মতন। তাই না?

বললাম ছবিখানা কার জন্য চাই?

আরও চুপি চুপি বললেন, গৃহিণীর জন্য। বুঝলে? খবরটা রাষ্ট্র কর না। মুক্তকচ্ছ হয়ে আমি খবরখানা মাথায় নিয়ে সঙ্গীত নাটক আকাদামীর অফিসে রয়টারকে রিপ্রেসেণ্ট করতে ছুটলুম।

কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে পঙ্কজ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার দিনে শিশুদের সঙ্গীত চর্চার রেওয়াজ ছিল না। বিদ্যালয়ে স্নাতক পঙ্কজ সঙ্গীতপ্রিয়তার বেদনা বোধ করেন। বেদনা বৈ কি! সব সৃষ্টিতেই বেদনা। প্রতিভার বিকাশে বেদনা। পৃথিবীর সত্যবই প্রকৃত রূপ বেদনা। জন্মতে বেদনা। মৃত্যুতে বেদনা। প্রতিভাশালীর জীবনেই বেদনা বর্দ্ধিত হয়ে থাকে। বেদনাতেই কে যেন আনন্দ পেয়েছিলেন, গেয়েছিলেন, "আঘাত সে যে পরশ তব সেই ত পুরস্কার"! পঙ্কজ বাবু ছাত্র কালে প্রকাশ্য ভাবে গান গাইতে সংকোচ বোধ করতেন। উৎসাহ উদ্দীপনা দেবার কোনো লোক ছিলেন না কাছে। সেদিনের সেই পরিপার্শ্ব, সেই সঙ্কোচ-সঙ্কুল হাওয়া কল্পনা করেছিল কি আগামী দিনের বুলবুলের কলমুখরিত কাকলি?

তাঁর পিতৃদেবের ধর্মের দিকে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বাঙ্গালীর ঘরে চিরদিনই বার মাসে তেরো পার্ব্বণ ঘটে থাকে। তার ওপর ধর্ম-প্রাণ পিতা। প্রতি পার্ব্বণে সঙ্গীতানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত হত। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু গুণী বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের পদধূলি পড়ত এ ঘরে।

একদিন ভারী মজা হল। সঙ্গীতের আসর বসেছে। জম-জমাট ভাব চারি দিকে। অনেকেই এসেছেন আসরে। হাঁ, এক জন নতুন গায়কও সভায় উপস্থিত। চার দিকে গায়কের নামডাক। তাঁর গুরুদেব বিশ্বনাথ রাও বাঘা সঙ্গীতজ্ঞ। গায়কের নাম দুর্গাদাস ব্যানার্জি।

পঙ্কজ কোনো দিন আসরে এর আগে গান গাননি। ছাত্ররা অবশ্য দিবা-যামিনী ঘিরে থাকত গান শুনতে। সে সব লুকিয়ে কে যেন বলেছেন লুকোনো প্রেমই মাধুর্য্যমণ্ডিত!

ধর্মপ্রাণ পিতার সন্তান। বহু স্তব-স্তুতি কণ্ঠস্থ ছিল। (এখানে সাত দিনে আমরা অহরহ ওঁর মধুর কণ্ঠে ঈশ্বর-প্রার্থনা শুনে কাজ বন্ধ করে বসে কাটিয়েছি)

সঙ্গীত-সভায় উপাসনা আবৃত্তি শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। উপাসনাটা সঙ্গীতের ছন্দে আবৃত্তি করা হয়েছিল। দুর্গাদাস বাবু কিশোর পঙ্কজকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। পঙ্কজ দুর্গাদাসের পদধূলি নিলেন। গুরু-শিষ্যে মিলন হল।

পঙ্কজ বাবু দুর্গাদাস ব্যানার্জি মশাইর সঙ্গীত বিদ্যালয়ে (বিদ্যালয়ের নাম ক্ষেত্রমোহন সঙ্গীত বিদ্যালয়) শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। বলা বাহুল্য, পঙ্কজ ক্ল্যাসিকাল গান দিয়েই জয়যাত্রার শুভ মাঙ্গলিকীর সুর ধরেছিলেন।

ছেলেরা নাছোড়বান্দা। লাজুক পঙ্কজ সভা-সমিতিতে গাইতে নারাজ—অহঙ্কার নয় সেটা, সেটা সঙ্কোচ। আমি বিশ্বাস করি।

ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হলে যেন কি হয় সম্পাদক মশাই? প্রবাদটা বাংলা থেকে দিল্লী আসতে গিয়ে মাঝপথে কোথায় আটকে গেছে!) হল ঠিক তাই। পঙ্কজের সাথে ঠাকুর-পরিবারের যোগাযোগ হল। সঙ্গীতের বিদগ্ধ সমঝদার গুণের একটা খনি দীনেন্দ্রনাথের সাথে পঙ্কজের পরিচয় হল। ধীরে ধীরে নদী সাগরে মিশলো—গায়কের সাথে কবিগুরুর আলাপ হল। কবিগুরুর আশীর্বাণী বহু প্রতিভা বিকাশের উৎস। এ ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হল না। পঙ্কজ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একজন সেরা গায়ক বলে সারা ভারতে পরিচিতি উপার্জ্জন করলেন। সঙ্গীতকেই জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে প্রাইভেট ব্রডকাষ্টিং অর্গানাইজেসন হিসেবে চলছিল তখন থেকে পঙ্কজ তার সাথে সংশ্লিষ্ট। রবিবারে সঙ্গীত শিক্ষার আসরে পঙ্কজ সর্বভারতে কত হাজার, বা লক্ষ না দেখা শিষ্য-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন, তা নিজেই জানেন না।

"চাষার মেয়ে" নামে যে ছায়াচিত্র বেরিয়েছিল তাতে পঙ্কজ বাবু প্রথম সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে ফিল্মে যোগদান করেন। সেটা প্রযোজনা করেছিলেন ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফটের কর্তৃপক্ষ। গুণী মাত্রই জানেন, এই ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট্ থেকেই নিউ থিয়েটার্সের জন্ম।

নিউ থিয়েটার্সের "মুক্তি" বই কে ভুলতে পারে? এই "মুক্তিতে" পঙ্কজ প্রথম গায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে লক্ষ মন মাতিয়ে তোলেন। পঙ্কজ বাবু বৈষ্ণব ধর্মে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত। বিনয়ে তিনি "তৃণ থেকেও ছোট"।

বল কি হে শিল্পী? আমি? হতে পারলুম কোথায়? সেই সর্বশক্তিমানের প্রার্থনা আমায় একটা মানুষই করেছে। শিল্পী থেকে মানুষ বলেই আমার পরিচয়ের গর্ব।

বললাম, সাইগল তো আপনার শিষ্য, তাই না?

বহু দিন থেকে এ প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় করছিল।

—শিষ্য? কে বললে ভাই? ও আমার ভারী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল! যাকে বলে সতীর্থ, "কমরেড"। সাইগলটা মরে আমায়ও মেরে গেছে।

পঙ্কজ বাবুর দীর্ঘনিঃশ্বাসে বেদনা পেলাম। প্রশ্নটা না তুললেই হয়ত ভালো হত।
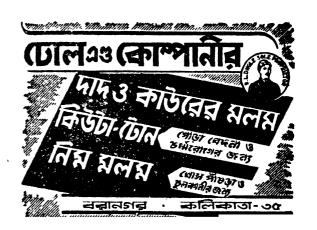
ডি. এচ. লরেন্স

'কিন্তু, সত্যি মা, ওর মধ্যে গভীরতা নেই। এই তো সে আমাকে খুব ভালবাসে, কিন্তু আজ যদি আমি মরে যাই তা'হলে তিন মাসের মধ্যে আমার কথাও ভুলে যাবে।'

মিসেস মোরেল শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁর বুক দুরু-দুরু করে কাঁপতে লাগল ; ছেলের শেষ কথাগুলো এত স্পষ্ট অথচ এত তিক্ত, শুনে তাঁর উদ্বেগের আর সীমা রইল না। তিনি বললেন, 'কি করে বুঝলে? যা জানো না, তাই নিয়ে কথা বলার তোমার অধিকার নেই।'

মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বরাবরই তো ওই কথাই শোনাচ্ছে আমাকে।'

উইলিয়ম বললে, 'আমাকে কবর দেবার পর তিন মাসের মধ্যে তুমি আর কাউকে গ্রহণ করবে, আমার কথা ভুলে যাবে একেবারে। এই তো তোমার ভালবাসা?'

মিসেস মোরেল নটিংহামে ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন। বাড়ি এসে পলকে বললেন, 'এইটুকুই আমার সান্ত্বনা, বিয়ে করবার মত আর্থিক সঙ্গতি ওর কোন দিনই হবে না। এই কারণেই যদি মেয়েটির হাত থেকে ও বাঁচে।'

এই ভাবে তাঁর খানিকটা আশা হ'ল। এখনও নিরাশ হয়ে পড়বার মত কোন কারণ ঘটেনি। তাঁর দৃঢ় ধারণা হ'ল, উইলিয়মের এ-বিয়ে কিছুতেই হবে না। অপেক্ষা করে রইলেন তিনি, পলকে টেনে আনতে চাইলেন নিজের আরও কাছে, একান্ত নিকটে।

সারাটা গ্রীষ্মকাল উইলিয়মের চিঠিপত্রে কেমন একটা অসুস্থ উত্তেজনা ফুটে বেরুতে লাগল। তার অস্বাভাবিক উগ্রতা স্পষ্ট ধরা যায়। কখনো তার চিঠিতে খুশির ছড়াছড়ি, কখনো বা অত্যন্ত নীরস, কখনো নিতান্ত বিরক্তির আভাস।

মা বললেন, 'আহা, ছেলেটা নিজেকে এমনি করেই শেষ করবে। ওর ভালবাসার যোগ্য কি ওই ন্যাকড়ার পুঁটলি মেয়েটা ওকে জোর করে ভালবাসতে চেষ্টা করেই ও এমন করে আঘাত হানছে নিজের উপর?'

উইলিয়ম বাড়ি আসার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। গ্রীষ্মের ছুটি কেটে গেছে ; সামনে খৃষ্টমাসের ছুটি, তার এখনও অনেক দেরি। উইলিয়ম লিখল, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সে আসছে, শুধু শনি আর রবি দু'দিনের জন্য। ওর লেখার প্রতি ছত্রে যেন একটা দুরন্ত উত্তেজনার ভাব।

ছেলে বাড়ি এলে মা বললেন, 'তোমার শরীর তো ভারী খারাপ হয়ে গেছে দেখছি?'

ছেলেকে আবার একান্ত নিজের করে ফিরে পাবার সৌভাগ্য হয়েছে আজ, মিসেস মোরেল-এর চোখ ফেটে জল এলো।

'হ্যাঁ, মা' উইলিয়ম বললে, 'গেল মাসটা একটানা সর্দিতে ভুগেছি, এখন কমে আসছে বলে মনে হয়।'

অক্টোবরের রোদে-মোড়া সোনালী দিন। উইলিয়মের মনে যেন খুশির বান ডাকল। কখনো স্কুল-পালানো ছেলের মত উদ্দাম হয়ে উঠল সে, আবার কখনো চুপ করে বসে রইল গম্ভীর হয়ে। এবারে সে যেন আরও রোগা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, দেখে ভয় হয়।

মা বললেন, 'বড্ড বেশী খাটুনি যাচ্ছে বুঝি তোমার?'

বিয়ের আগে কিছু টাকা জমাবার অভিপ্রায়ে উইলিয়ম বাড়তি কাজ হাতে নিয়েছিল—বললে সে মায়ের কাছে। একদিন শুধু শনিবার রাত্রিতে, এই নিয়ে কথা হ'ল মায়ের সঙ্গে। প্রিয়ার কথা বলতে বলতে উইলিয়ম বিষাদে ম্লান, ব্যথায় কোমল হয়ে উঠেছিল।

'তবু কি জান, মা, যতই কেন না বলি, আমি মরে গেলে দু'মাস হয়ত ওর খালি খালি লাগবে, কিন্তু তার পরই আমাকে ভুলতে শুরু করবে সে। এমন কি আমার সমাধির দিকে একবার চোখ তুলে চাইতেও আর আসবে না।'

মা বললেন, 'ও কথা কেন? তুমি কিছু মরে যাচ্ছ না এখুনি, তবে ও সব কথা বলে কাজ কি?'

উইলিয়ম বললে, 'মরে যাই বা না যাই, তবু'—

—'তবু ও কী করবে?' মা বললেন, 'এই তার স্বভাব। তোমার তাকে পছন্দ হয় যদি, তার স্বভাবের খুঁৎ ধরে নিন্দে করা তোমার সাজে না।'

রবিবার সকালে উইলিয়ম কলারটা পরে নিচ্ছিল, হঠাৎ থুত্‌নিটা তুলে মাকে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ, মা, কলারটা লেগে লেগে আমার এ জায়গাটা কেমন লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।'

গলা আর থুত্‌নির ঠিক মাঝখানটিতে অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল হয়ে উঠেছে আর জ্বালা করছে।

মা বললেন, 'কলার অমন লাগবে কেন? নাও, এই ঠাণ্ডা মলমটা লাগিয়ে দাও। আর অন্য কলার পরে নাও।'

রবিবার রাত্রে বাড়ি থেকে চলে এল সে। দু'দিনের জন্যে বাড়িতে এসেও যেন কত ভাল, কত সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে নিজেকে।

মঙ্গলবার সকালেই টেলিগ্রাম এল লণ্ডন থেকে ; উইলিয়ম অসুস্থ। মিসেস মোরেল ঘরের মেঝে ধুয়ে নিচ্ছিলেন, এমন সময় উঠতে হ'ল তাঁকে। টেলিগ্রাম প'ড়ে পাশের বাড়ির একজনকে তিনি ডেকে আনলেন। বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে এক পাউণ্ড

ধার নিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা হলেন তখনই। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়ে একটা 'এক্সপ্রেস' গাড়ি ধরে লণ্ডনে পৌঁছলেন তিনি। পথে নটিংহামে আবার এক ঘণ্টা দেরি। লণ্ডনে পৌঁছে তাড়াতাড়ি মুটেদের কাছে জেনে নিলেন 'এলমার্স এনড'টা কোন্ দিকে।

গাড়িতে যেতে তিন ঘণ্টা লাগল, সারা রাস্তা মিসেস্ মোরেল স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন গাড়ির এক কোণে। কিংস্ ক্রশ ষ্টেশনে পৌঁছে বার বার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু 'এলমার্স এনড' যাবার রাস্তা কেউ বলতে পারল না। দড়ির ব্যাগটাতে তার রাত্রির পোষাক চিরুণী আর বুরুশ ছিল। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়েই তিনি সবার কাছে জিজ্ঞেস করে বেড়াতে লাগলেন। কে একজন বলে দিলে মাটির নীচের রেলপথ দিয়ে তাঁকে কেনন ষ্ট্রীট ষ্টেশনে যেতে হবে।

উইলিয়মের বাড়িতে তিনি যখন এসে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা ছ'টা। জানালার খড়খড়িগুলো খোলা। জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছে। বাড়িওয়ালী বললে, আগের চেয়ে একটুও ভাল নয়। বাড়িওয়ালীর পিছু পিছু তিনি উপরে উঠে গেলেন। বিছানার উপর উইলিয়ম শুয়ে, তার চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল, মুখ ঈষৎ বিবর্ণ। তার কাপড়-চোপড় অগোছালো অবস্থায় ইতস্তত: পড়ে রয়েছে। ঘরে আগুন নেই। খাটের কাছে একটা টিপয়ের উপর এক গ্লাস দুধ। তার কাছে থাকবার মত লোক কেউ নেই।

মা মনে মনে সাহস এনে ডাকলেন, 'কি হয়েছে বাবা?' ছেলে কিছুই জবাব দিল না। চোখ তুলে চাইল তাঁর দিকে, কিন্তু তাঁকে দেখে চিনতে পারল না। তার পর একটানা সুরে যেন কোন চিঠির লেখা পড়ছে, এমনি ভাবে বিস্তারিত করে বলতে লাগল: জাহাজের খোলে ফুটো হয়ে গেছে—চিনিগুলো সব জমে শক্ত হয়ে গেছে—ওগুলোকে ভাঙতে হবে। উইলিয়মের তখন বিন্দুমাত্রও সংজ্ঞা নেই। লণ্ডনের বন্দরে চিনির বস্তা পরীক্ষা করাই তার কাজ ছিল। মা বাড়িওয়ালীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন অবস্থা আজ ক'দিন?'

'ঐ ত সোমবার সকালে ছ'টার গাড়িতে এলো, এসে সারা দিনই যেন মনে হ'ল ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে। রাত্রে ওর ভুল বকার শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। আজ সকালে আপনার নাম ধরে ডাকাডাকি করছিল। তাই টেলিগ্রাম করলুম আপনাকে, আর তখনই ডাক্তার ডেকে আনলুম।'

—'একটু আগুন জ্বালিয়ে দেবেন ঘরে?' ব'লে মিসেস মোরেল ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—একটু শান্তি দিতে চেষ্টা করলেন তাকে।

—ডাক্তার এলেন, বললেন 'নিউমোনিয়া, আর থুতনির নীচে জামার কলার লেগে লেগে বিসর্পের মত হয়েছে। সেটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে যদি ওটা না পৌঁছোয় তা'হলেই যা কিছু আশা!' বাড়িওয়ালী তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

মিসেস মোরেল প্রাণপণে শুশ্রূষা করতে লাগলেন। উইলিয়মের জন্যে প্রার্থনা করলেন, যেন সে তাঁকে চিনতে পারে, কিন্তু ক্রমশ:

ছেলের মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে উঠল। সারা রাত ধরে তিনি এই বিকারের রোগীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। উইলিয়ম ক্রমাগত প্রলাপ ব'কে চলল—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার জ্ঞান ফিরে এল না। রাত দুটোর সময় সে মারা গেল।

শোবার ঘরের মধ্যে মিসেস মোরেল নীরবে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন এক ঘণ্টা কাল, তার পর বাড়ির লোকদের ডেকে জাগালেন।

ভোরবেলা পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে ধরাধরি করে উইলিয়মের দেহকে বাইরে নিয়ে এলেন মিসেস মোরেল। তার পর লণ্ডনের সেই কুৎসিত পল্লীতে ঘুরে ঘুরে তিনি ডাক্তারকে আর রেজিষ্ট্রারকে খবর দিয়ে এলেন।

ন'টার সময় স্কারগিল ষ্ট্রীটের ছোট বাড়িতে আর একটি তার এলো: 'উইলিয়ম কাল রাত্রে মারা গেছে। কিছু টাকা নিয়ে বাবাকে আসতে বলো।'

এ্যানি, পল আর আর্থার বাড়িতেই ছিল। মোরেল কাজে গিয়েছে—তার পেয়ে ছেলে-মেয়ে তিনটির মুখে আর কথা বেরুল না। এ্যানি ভয়ে কাঁপতে লাগল। পল বেরিয়ে পড়ল বাবাকে খবর দিতে।

সে দিনটি বড় সুন্দর—আকাশে হাল্কা-নীল খনির শাদা ধোঁয়া ধীরে ধীরে উঠে উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাথার উপরে খনির চক্রগুলো যেন মিট-মিট করে জ্বলছে। গাড়িতে কয়লা ভরবার অবিরাম শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে।

খনির সামনে এসে প্রথম যে লোকটিকে দেখলে পল তাকেই বললে, 'আমার বাবাকে চাই। তাকে এখনই লণ্ডন যেতে হবে।'

—'ওয়াল্টার মোরেলকে চাও? ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।'

ছোট অফিস-ঘরটিতে গিয়ে পল বললে, 'আমার বাবাকে ডেকে দিতে হবে। এখনই তাকে যেতে হবে লণ্ডনে।'

—'তোমার বাবা, সে কি নীচে নাকি?—কি নাম বল ত?'

—'মিষ্টার মোরেল।'

—'ও, ওয়াল্টার! কি আবার হ'ল তার?'

—'তাঁকে এখুনিই লণ্ডন যেতে হবে!'

লোকটা টেলিফোনের কাছে গিয়ে নীচের অফিসকে ডেকে বললে, ওয়াল্টার মোরেলকে চাই। বিয়াল্লিশ নম্বরের শক্ত খাদ। কি যেন গোলমাল হয়েছে তার। ছেলে উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর লোকটা পলের দিকে ফিরে বললে, 'এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে উপরে এসে যাবে।'

পল খনির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। কয়লা-ভরতি বাক্স উপরে উঠে আসছে, আবার বড় লোহার খাঁচাটা তার সমস্ত মাল খালি ক'রে দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

উইলিয়ম মারা গেছে, একথা পলের কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। চার দিকেই এই কর্ম্মব্যস্ত পৃথিবী এমন সজীব, এর মধ্যে উইলিয়ম নেই! লোকগুলো ছোট ছোট কয়লার গাড়ি-গুলোকে ঠেলে তাদের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

উইলিয়ম মারা গেছে, মা না-জানি লণ্ডনে একলা কি করছে! নিজের মনে মনেই পল বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, যেন এমন একটা রহস্য যার উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছে না।

অনেক বার উপরে-নীচে ওঠা-নামা করল চেয়ারটা কিন্তু মোরেলের কোন চিহ্ন নেই। অবশেষে একটা মালগাড়ির পাশে একটি মানুষের মূর্ত্তি দেখা গেল! গাড়ি থামলে আস্তে আস্তে নেমে এলো মোরেল। গত বারের দুর্ঘটনার ফলে এখনও সে সামান্য খুঁড়িয়ে চলে।

—'পল, কি মনে ক'রে? ওর অবস্থা কি আরও খারাপ নাকি?'

—'তোমাকে লণ্ডনে যেতে হবে।' বাপ আর ছেলে খনির উপর দিয়ে পাশাপাশি চলতে লাগল। অন্য লোকেরা কৌতূহল ভরে চেয়ে রইল ওদের দিকে। খনির সীমানা পার হয়ে এসে রেল-রাস্তা ধরে চলতে লাগল তারা। পথের এক ধারে শরৎকালের রোদ-ছড়ানো মাঠ অন্য ধারে সারি সারি মালগাড়ি। হঠাৎ মোরেল ভয়ার্ত্ত গলায় বলে উঠল, 'সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি ত'?'

—'হ্যাঁ, তাই।'

—'কখন হ'ল?' সে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে ভয়ে।

—'গত রাত্রে। মায়ের কাছ থেকে তার এসেছে।'

কয়েক পা এগিয়ে গেল মোরেল। তারপর একটা মালগাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে চোখের উপর হাত রেখে দাঁড়াল। সে কাঁদছিল না। পল দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে তার দিকে দেখতে লাগল ভাল করে। ওজন করার যন্ত্রের উপর একটা মালগাড়ি খাড়া হয়ে আছে। অন্য সব দিকেই চেয়ে দেখল পল, কিন্তু যে দিকে তার বাবা নিতান্ত অবসন্নের মত মালগাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না সে।

মোরেল এর আগে একবার শুধু গিয়েছিল লণ্ডনে। স্ত্রীকে সাহায্য করবার জন্যে ভীত, উত্তেজিত মন নিয়ে সে যাত্রা করল। সেদিন মঙ্গলবার। ছেলে-মেয়েরা একা-একা রইল বাড়িতে। পল গেল কাজে, আর্থার চলে গেল স্কুলে, এ্যানি তার এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এল তার কাছে থাকবার জন্যে।

শনিবার রাত্রে ষ্টেশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে রাস্তার মোড় ঘুরেই পল দেখতে পেল বাবা ও মা-ও ফিরে এসেছেন। অন্ধকারে নীরবে পথ চলেছেন দু'জনে। বড় ক্লান্ত তাঁরা, কোন রকমে দেহটাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন মাত্র। পল চেয়ে রইল তাঁদের দিকে। অন্ধকারে উদ্দেশ করে ডাকল, 'মা!'

মিসেস মোরেল যেন লক্ষ্য করলেন না তাঁর ডাক। পল আবার ডাকল। এবার মা বললেন, 'কে, পল?' কিন্তু তাঁর কথার সুরে কোন আগ্রহ প্রকাশ পেল না। পল কাছে এসে চুম্বন করল তাঁকে, কিন্তু তবু যেন চেতনা জাগল না তাঁর মনে, ওর সান্নিধ্যের কথা যেন মনেও পড়ল না তাঁর।

বাড়ি এসেও মিসেস মোরেল এক ভাবেই রইলেন। শীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর মুখ, শব্দহীন, নিস্তব্ধ। কোন দিকে চোখ তুলে চাইলেন না, কথা কইলেন না কারু সাথে, একবার শুধু বললেন, 'আজ রাত্রেই শবাধার আসবে, ওয়াল্টার। দু'-একটি লোকজন যারা সাহায্য করতে পারে, এমনি খোঁজ রেখো। তারপর ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাড়ি নিয়ে এসেছি ওকে।'

তার পর আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি, অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে শূন্যতার দিকে রইলেন চেয়ে। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি কোলের উপর

প্রসারিত। তাঁর দিকে চেয়ে গম্ভীর বেদনায় পলের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল। সারা বাড়ীতে আজ মৃত্যের নীরবতা।

—'আমি আজ কাজে গিয়েছিলাম, মা।' পল যেন আর্তনাদ করে উঠল।

মা বললেন, 'গিয়েছিলে নাকি ?' নিষ্প্রাণ তাঁর কথা।

আধ ঘণ্টা পরে মোরেল আবার ঘরে এল। বিব্রত, বিভ্রান্তের মত এসে দাঁড়াল সে, বললে, 'ও এলে কোথায় রাখব ওকে ?'

—'সামনের ঘরে।'

—'তা'হলে টেবিলটা সরিয়ে ফেলি ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর চেয়ারগুলোর উপর আড়াআড়ি করে রাখি ওকে ?'

—'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

বাইরের ঘরে গ্যাসের বাতি নেই। মোরেল আর পল একটা মোমবাতি নিয়ে গেল। বড় মেহগনির টেবিলটা আলাদা ক'রে খুলে পরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল ঘরের মাঝখান থেকে। ছ'খানা চেয়ার মুখোমুখি ফেলে শবাধারটিকে তার উপর শোয়াবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

চেয়ার-টেবিল টানাটানি করতে করতে মোরেল এক সময়ে বলে উঠল, 'ওর মত এমন লম্বা তো আর দেখা যায় না।' বলে চিন্তিত মুখে মেপে দেখতে লাগল।

পল বাইরের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে ঘন তমসাময়ী রাত্রি। বুড়ো অ্যাশ-গাছটাকে বিশালকায় দৈত্যের মত মনে হচ্ছে। আকাশে আলোকের রেখা অতি ক্ষীণ। আবার সে ফিরে গেল মায়ের কাছে।

রাত্রি দশটায় মোরেল ডেকে বলল, 'ওগো, ও এসে গেছে।'

সকলে সচকিত হয়ে উঠল। সদর দরজার তালা-বেড়ি খোলবার শব্দ শোনা গেল। বাইরের রাত্রি আর ভিতরের কক্ষের মধ্যেকার ব্যবধান গেল দূর হয়ে। মোরেল ডেকে বলল, 'আর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এসো।'

এ্যানি আর আর্থার ছুটলো বাতি আনতে। পল এল মায়ের পেছনে। মায়ের কোমর জড়িয়ে অন্দরের দরজায় সে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরের ঘর থেকে সব কিছু অপসারিত হয়েছে, শুধু ছ'খানা চেয়ার দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। জানালার সূক্ষ্ম পর্দার সামনে আর্থার বাতি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, খোলা দরজার মুখে রাত্রির কালো পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এ্যানি পেতলের বাতিদান হাতে নিয়ে।

বাইরে চাকার শব্দ হ'ল। পল দেখল, নীচে অন্ধকার রাস্তায় একটি কালো ঘোড়ার গাড়ি, একটি বাতি আর কয়েকটি বিবর্ণ মুখ। কয়েকটি লোক—সকলেই খনির মজুর—জামার আস্তিন গুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কী নিয়ে যেন টানাটানি করছে। তারপর হু'টি লোককে দেখা গেল গুরুভার কোন জিনিস নিয়ে ঝুঁকে পড়ে চলেছে। এরা দু'জন, মোরেল এবং তার পাশের বাড়ির লোক।

হাঁফাতে হাঁফাতে মোরেল বলল, 'ধীরে।'

বাগানের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে উঠতে লাগল। পেছনে আরও কয়েকটি লোক অতি কষ্টে উঠে আসছে। মোরেল আর বার্ণস্ যেন টলছে, তাদের কাঁধের উপর কালো শবাধারটি দুলে দুলে উঠছে।

আর্তকণ্ঠে মোরেল আবার বলল, 'ধীরে ভাই, ধীরে।'

মিসেস মোরেল অস্ফুট ক্রন্দনে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন; 'বাবা রে !—বাছা আমার—' ক্ষীণ স্বরে ছেলেকে উদ্দেশ করে ডেকে উঠতে লাগলেন তিনি। শবাধারটি যত বার বাহকদের কাঁধের উপর দুলে উঠতে লাগল, তত বারই মৃদু গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ।

পল নিজের বাহু দিয়ে মায়ের কটি বেষ্টন ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ডাকতে লাগল, 'মা, মা !'

সে ডাক মায়ের কানেও গেল না। মা শুধু কেঁদে কেঁদে তাঁর হারানো ছেলেকে ডেকে অধীর হয়ে উঠলেন।

পল দেখল তার বাবার কপাল বেয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে। ঘরের মধ্যে ছ'জন লোক—কারু গায়েই কোট নেই, সবাই বিষম পরিশ্রান্ত, ঘর ভর্তি করে তারা দাঁড়িয়ে গেছে আসবাব-পত্রের ভিড়ে। শবাধারটিকে এনে রাখা হ'ল চেয়ারগুলোর উপর। শবাধারের বাক্সের উপর ঝরে পড়ল মোরেলের মুখের ঘাম।

—'ওঃ, কী ভীষণ ভারী !' একটি লোক বলে উঠল। বাকী লোকেরা মাথা নীচু করে হাঁফাতে লাগল, তারপর অস্থির পদবিক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে। যাবার সময় বাইরের দরজাটিকে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

বাড়ির লোকেরা একা-একা বসে রইলেন বাইরের ঘরে সেই পালিশ-করা বৃহৎ শবাধারটিকে নিয়ে। উইলিয়মকে যখন শোয়ান হ'ল, তখন লম্বায় সে ছ'ফুট চার ইঞ্চি। এই উজ্জ্বল, প্রকাণ্ড শবাধারটি যেন একটি স্মৃতিস্তম্ভ। পল-এর মনে হতে লাগল একে আর কোন দিন ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে না। মা শুধু দাঁড়িয়ে উপরের পালিশ-করা কাঠখানার উপর মৃদু আঘাত করতে লাগলেন।

সোমবার দিন উইলিয়মের দেহকে সমাধি দেওয়া হ'ল। পাহাড়ের উপর যে ছোট কবরখানাটি, যেখানে দাঁড়ালে নীচের মাঠ-ঘর, বাড়ি সব দেখা যায়, সেইখানে শেষ শয্যা রচনা হ'ল তার জন্যে। রোদে ঝল-মল বিল, সাদা ক্রিসান্থিমামের গাছগুলো সেই মধুর উত্তাপে যেন দুলে দুলে উঠছে।

এর পর মিসেস মোরেলকে আবার তাঁর আগের জীবনে ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন হ'ল। জীবনের সমস্ত আস্বাদ যেন তাঁর হারিয়ে গেল। বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মধ্যে নিজে

ডুবে রইলেন শুধু। বাড়ি ফেরবার পথে সারা রাস্তা গাড়িতে বসে বার বার তিনি বলেছেন, 'ওর বদলে আমি কেন গেলুম না?'

রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে পল দেখল দিনের কাজ সেরে মা ব'সে আছেন। হাত দুটি জোড় করে রেখেছেন নিজের কোলে। মোটা 'এপ্রন'খানার উপর। আগে মা রোজই পোষাক বদলাতেন, সন্ধ্যাবেলা কালো 'এপ্রন'খানা পরতেন। এখন এ্যানি রাত্রির খাবার তৈরি করত, মা শুধু নিস্পন্দ চোখে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন; তাঁর ঠোঁট দুটি চাপা। মাকে কিছু একটা খবর বলবার জন্যে পল আকুলি-বিকুলি করত।—'জানো মা, মিসেস জর্ডন আজ এসেছিলেন, বললেন আমার আঁকা কয়লাখনির ছবিগুলি নাকি খুব সুন্দর হয়েছে।'

কিন্তু মিসেস মোরেল সে কথা শুনেও শুনতেন না। রোজ রাত্রেই পল জোর করে মাকে খবর শোনাতে যেত, কিন্তু মা মন দিতেন না তার কথায়। মাকে এই ভাবে থাকতে দেখে পল্-এর সব কিছু গুলিয়ে যেতে লাগল। এক দিন জিজ্ঞেস করল, 'মা তোমার কি হয়েছে বল তো?'

মা কথাটা কানে তুললেন না।

পল আবার জিজ্ঞেস করল, 'বলো মা। কী হয়েছে বলো।'

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে তুমি জানো।' বলে দূরে চলে গেলেন।

সে রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে পলের মনে হ'ল আজকের রাতটা যেন একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। এখন পল ষোলো বছরের কিশোর। এই ভাবে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর তার কেটে গেল শোচনীয় একাকিত্বের মধ্য দিয়ে। মা নিজেও চেষ্টা করলেন, কিন্তু নিজেকে জাগিয়ে তুলতে পারলেন না। শুধু মৃত ছেলের কথা ভেবে ভেবে তাঁর সমস্ত সময় কেটে যেতে লাগল: কী নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় ভুগে তাকে মরতে হয়েছে!

অবশেষে ২৩শে ডিসেম্বর পাঁচ শিলিং দামের একটি খৃশমাস-বাক্স পকেটে নিয়ে পল টলতে টলতে বাড়ি ফিরে এল। মা তার দিকে চেয়ে দেখলেন, দেখে শঙ্কায় তাঁর মন ভরে গেল। বললেন, 'কী ব্যাপার তোমার?'

পল বললে, 'বড্ড খারাপ লাগছে, মা!···জানো, আজ মিষ্টার জর্ডন আমাকে পাঁচ শিলিং দিয়েছেন একটা খৃশমাস-বাক্স কেনবার জন্যে।' বাক্সটা তুলে দিল সে মায়ের হাতে, তার নিজের হাত তখন কাঁপছে। মা বাক্সটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিলেন।

পল একটু ক্ষুন্ন হয়ে বললে, 'তুমি একটুও খুশি হলে না!' তখন তার সারা শরীরে ভীষণ কাঁপুনি সুরু হয়েছে।

মা ছেলের ওভার-কোটের বোতাম খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যন্ত্রণাটা কোথায়?' সেই ছেলেবেলাকার পুরোন প্রশ্ন।

'শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে, মা!'

মা তার জামা খুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ডাক্তার বললে, 'নিউমোনিয়ার খুব খারাপ অবস্থা!'

প্রথমেই মায়ের মনে এই প্রশ্নের উদয় হ'ল: যদি আমি ওকে বাড়ি ছেড়ে নটিংহামে যেতে না দিতুম, তা হলে ও কী এমন ধারা হতে পারত?

ডাক্তার বললেন, 'এতটা খারাপ হয়ত হ'ত না।'

নিজের উপর নিজেরই তাঁর ধিক্কার এসে গেল। ভাবলেন, হায়, যে মরে গেছে, তার পেছনে ছুটেছি আমি, যে বেঁচে আছে তার দিকে নজর দেওয়া আমার উচিত ছিল।

পলের অসুখ খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। রাত্রে মা তাকে আগলে শুয়ে থাকতেন; পরিচারিকা রাখবার সঙ্গতি ছিল না তাদের। ক্রমশঃ তার অবস্থা যেতে লাগল খারাপের দিকে—রোগের সঙ্কটকাল এসে উপস্থিত হ'ল। একদিন রাত্রে পলের জ্ঞান ফিরে এলে, তার মনে হ'ল যেন মৃত্যুর গহ্বরে অবশের মত সে শুয়ে আছে, তার সারা দেহ জুড়ে দেহের কোষগুলো যেন অসহ্য যন্ত্রণায় চূর্ণ হয়ে পড়ছে। তার চৈতন্য যেন বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে একবার শেষ সংগ্রাম করছে উন্মাদের মত।

বালিশে শুয়ে শুয়েই পল হাঁফাতে লাগল, বললে, 'আমি মরে যাচ্ছি, মা!'

মা তাকে বুকে তুলে ধরলেন, ক্ষীণ কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, 'বাছা রে!'

এতেই ফল হ'ল। পল চিনতে পারল তাঁকে। তার মনের সবটুকু শক্তি জেগে উঠে তাকে ধরে রাখল। মায়ের বুকে মাথা রেখে তাঁর গভীর প্রেমের শান্তিটুকু সে অনুভব করতে লাগল।···

পলের মাসী এর পর একদিন বলেছিলেন, 'খৃশমাসে পলের অসুখ হয়ে এক দিকে ভালোই হয়েছিল—ওর মাকে ওই বাঁচিয়েছে।'

সাত সপ্তাহ পরে পল বিছানা ছেড়ে উঠল। তার দেহ শাদা আর ক্ষীণ হয়ে গেছে। বাবা তার জন্যে এক রাশি সোনালী আর লাল টিউলিপ ফুল কিনে এনেছিলেন। ফুলগুলো জানালায় সাজানো থাকত। মার্চ্চ মাসের রোদে আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল দেখাত ওগুলোকে। সোফায় বসে পল তার মায়ের সঙ্গে গল্প করত। গভীর অন্তরঙ্গতার বন্ধনে আবার দু'জনে বাঁধা পড়েছেন। মায়ের জীবনের মূল এখন পল-এর মধ্যে।

উইলিয়মের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছিল। খৃশমাসে লিলির কাছ থেকে ছোট্ট একটি উপহার আর একখানা চিঠি এলো মিসেস মোরেলের কাছে। নববর্ষের একখানা চিঠি এল মিসেস মোরেলের বোনের কাছে। তাতে লেখা:—'কাল রাত্রে গিয়েছিলুম বলনাচের আসরে। অনেক মজার লোক ছিল সেখানে, খুবই ভালো লাগল। সবগুলো নাচেই যোগ দিয়েছি আমি, একটাও ছাড়িনি।'

এর পর তার আর কোন খবর মিসেস মোরেল পাননি।

ছেলের মৃত্যুর পর কিছু দিন মোরেল আর তার স্ত্রীর পরস্পর ব্যবহারের মধ্যে দরদ দেখা যেতে লাগল। মাঝে মাঝে মোরেল উদ্‌ভ্রান্তের মত বড়ো বড়ো চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত; তার পর হঠাৎ উঠে চলে যেত মদের দোকানে, সেখান থেকে আবার সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত। কিন্তু শেপ-ষ্টোনের যে অফিসে তার ছেলে কাজ করত সে দিকে আর সে ভুলেও যেত না। আর ছেলের সমাধি-স্থানটিকেও সে সযত্নে এড়িয়ে চলত।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য
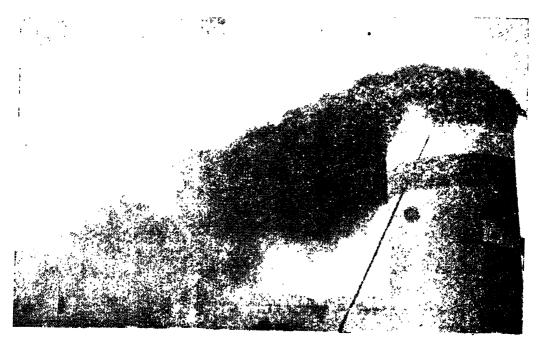
মাস্তল-শীর্ষ —সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
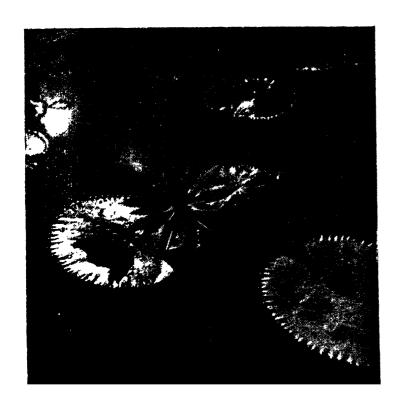
শিশুর দাপট —মিঃ বি, ই, ওয়ারিয়র

এক ঝাঁক পায়রা —জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জলছবি —বি, এন, মুখোপাধ্যায়

ভাগীরথী ও মন্দাকিনীর সঙ্গম —স্বর্ণভূষণ জানা

দুই বন্ধু
—শ্রীমতী শান্তি গুহ

ফসল কাটা
—রামকিঙ্কর সিংহ

বাগদেবী —মদন বসু

★ চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ
সাদা সৌন্দর্য্য সাবান ★

তুলি ও রঙ

জর্জ-মাইকেল

ছাব্বিশ

এর পর বুধবার দিন আবার 'ভিসিটার্স ডে', সবাই সেদিন দেখা-শোনা করতে পারে। কিন্তু অনুমতি পাওয়া কঠিন হ'ল। ওরা জানালো, আজ ক'দিন মোদক একেবারে উদ্দাম হয়ে আছে।

তাই হয়ত হয়েছে। যেই হারিকটের মুখ দেখতে পেয়েছে অমনি উঠে দাঁড়াল, প্রায় নগ্ন অবস্থা। তার পর বিছানায় দাঁড়িয়ে নৃত্য। হারিকট তার ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ইঙ্গিত করে, মোদকও বোঝে। চাদর ঠিক করে দেওয়ার ভাণ করে তাড়াতাড়ি তার ভিতর একটা প্যাণ্ট লুকিয়ে রাখে হারিকট। ছবি আঁকার ক্যান্‌ভাসের টুকরো জুড়ে সে এই প্যাণ্ট বানিয়েছে। তার ভিতরও একজোড়া স্যাণ্ডেল রেখেছে।

"আর—?"

"চু—প।"

পায়ে এবং কোমরে অসংখ্য শিশি সে লুকিয়ে এনেছে, এমন ভাবে রেখেছে যাতে ধরা না পড়ে। মোদক শিশিগুলি আঁকড়ে ধরে। তার পর বিছানার ঢাকার নিচে রেখে নিজের শীর্ণ কোমরে জড়িয়ে নেয়।

"আজ এক কোঁটাও ছোঁব না, অন্তত: তুমি যতক্ষণ আছ, কিন্তু মন খারাপ হলেই খাবো। এ আর আমি ছাড়ছি না। বিছানা তৈরী করার সময় আমার কাছেই রাখবো—তার পর তাড়াতাড়ি গদির তলায় লুকিয়ে ফেলব। তার পর ম' পারনাশোর খবর কি?"

কিন্তু কি যে বলছে, তা মোদকের খেয়াল নেই। হারিকট যখন কথা বলছে, তার মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়েছে,—এই ঘুমে বাধা দেওয়া উচিত নয়, তাই চুপ করে বসে কত কথা ভাবে হারিকট। কিছু আর বলে না।

"এখন জানে আমি আছি, তাই ও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে—নইলে এই সব অচেনার মধ্যে কি ঘুম হয়? এখন ও শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।—মোদক ঘুমাও—মোদক।"

এমন কি হারিকট একবারও যে ভাবে না, ওর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেয় না, বরং ওর দৈহিক ক্ষীতির দিকে চোখ পড়লেই মোদক অন্য দিকে মুখ ফেরায় তাড়াতাড়ি,—অবশ্য সেটাই তার অভ্যাস।

মনে মনে ভাবে "আমাকে অপ্রস্তুত করতে চায় না হয়ত।"

ওর মুখের দিকে তাকায় হারিকট,—মুখে সেই হাসি। সেই প্রশান্তি—সেই প্রশান্তি সে এনেছে অন্তরে ও বাহিরে।

যখন যাওয়ার সময় হল তখন মোদক বিড়-বিড় করে বলল—"আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি তো জানো—"

হাসপাতাল থেকে যখন হারিকট বেরুল তখন তার মাথায় আগুন জ্বলছে।

লা রোতন্দে পৌঁছে হারিকট দেখল বেশ একটা ভীড় জমেছে। নতুন মালিক একজন মডেলকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বেচারী মেয়েটিকে কোনো গ্রাম থেকে না কোথা থেকে জনৈক আর্টিষ্ট প্রলোভিত করে এনেছিল। তার পর প্যারী পৌঁছানোর কয়েক দিনের মধ্যেই সেই আর্টিষ্টটির হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। মেয়েটির জানাশোনা আর কেউ নেই। একটু আগে হিন্দু আর্টিষ্টের সঙ্গে তার তুমুল কলহ হয়েছে, সে পাওনা মিটিয়ে দেয়নি।

"আটাশ ঘণ্টা 'পোজ' দিয়াছি তার জন্য আমার ছ'শো ফ্রাঁ পাওনা। কি কাজ যে বাবা। আর কেবলই বলে এইবার টাকা পাব, আমি এদিকে গোয়ালিনী আর পাউরুটিওলার কাছে ধার করছি। ও আমাকে আমার পাওনা দেবে না, এদিকে হোটেল-ওলা তাড়িয়ে দেবে। এখন আমি যাই কোথায় বলো? কোথায় কাজ পাই বলো? চমৎকার মালিক তুমি! তোমার এই নোংরা হোটেলের আমি যোগ্য নই। বেশ, চোখ চেয়ে দেখ এখন কি কাণ্ডটা করি, ঐ যে মোটারটা দেখছো,—আমি এখনই ওর তলায় মাথা দিয়ে মরব—নরকে যাব।"

মেয়েটি দৌড়ালো, ওরাও চললো পিছে পিছে, ধরে তুললো সবাই, কাদায় পড়েছিল মেয়েটি—অন্য একটা কাফেতে নিয়ে গেল মদ্য পানের উদ্দেশ্যে, তবে সে কাফে ত' আর লা রোতন্দে নয়।

এদিকে লা রোতন্দের একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে। নীচের তালায় খুঁটি বসানো হয়েছে ছাদের ঠেক্‌নো হিসাবে, ওপরের তলাটিকে ফ্যাসান-দুরস্ত ডাইনিং হলে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বিদেশীর দল এবং প্যারিসীয়দের বিরতি বিহীন আগমনের শেষ নেই। মোটরে আসছেন ফারকোট সজ্জিতের দল। একটু অস্বচ্ছন্দ ভাব, নীচের তলা থেকে একটু অতিরিক্ত বাতিকগ্রস্তদের এবং টুপীহীন মডেলদের তাড়িয়ে দিয়েছেন নতুন ম্যানেজার।

মহিলা আর্টিষ্টরা অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এই অতিরিক্ত উত্তপ্ত ঘরটিতে ওরা সকাল থেকে রাত্রি কাটিয়ে দেয়, ক' গ্লাস যে সারা দিনে টানে তার হিসাব পায় না, চল্লিশ জনের জায়গায় ছ'শো জন ভীড় করে বসে থাকে, মন আর পাকস্থলী দুই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঁচটার পর যখন হলটিতে বেয়াড়া গোলাপী ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ওঠে তখন এই সমগ্র জনতাকে কেমন বেয়াড়া দেখায়। মাতাল মার্কিণ দল বিড় বিড় করে, ওপরে আর নীচে পিয়ানোর আওয়াজ চড়া পর্দায় ওঠে,—তর্ক করতে করতে গ্লাস ভাঙ্গে রাশিয়ানরা, রজতকেশী সুইডিস্ যে যার চেয়ারে সোজা বসে আছে, যেন সম্মোহিত হয়ে আছে, এই সব মানুষের আকর্ষণে যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেয়ালগাত্রে আঁটা অশ্লীল ছড়া বা রাজনৈতিক আত্মকথন পাঠ করছে। মডেলের জন্য কাড়াকাড়ি আর দ্বন্দ্ব, একটা কুব্জ বামনকে নিয়ে মেয়েদের টানাটানি, তার পর আছে প্রদর্শনী।

সুইডিস্ মেয়েদের প্রাণের জন হল জনৈক স্প্যানিয়ার্ড, শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে তার সতর্ক দৃষ্টি। লা রোতন্দে যারা ঘুরে বেড়ায় এই ব্যক্তিটি তাদের মধ্যে এক অপূর্ব চরিত্র! সালামানকা থেকে লোকটি এসেছেন, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন আর

দর্শনের পাঠ শেষ করেছেন। সমগ্র সালামানকা এই খেয়ালী মানুষটিকে জানে,—প্রকাণ্ড চৌকোষ জুতো, ট্রাউজার কোনো ক্রমে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেছে, মাথার টুপিটা বোধ হয় তিন পুরুষ ধরে চলছে—যেন সাধু চার্লি চ্যাপলিন।

কুড়ি বছর বয়সে ভদ্রলোক বোকামি করে এক দিনে সমস্ত দাঁতগুলি তুলিয়ে নিয়েছেন। সালামানকার পাহাড়ের পটভূমিতে একটি রোমান ব্রীজ—ঠিক তার নীচে পপলার-শ্রেণীর পাশেই রয়েছে লা ক্যাগালোনা ফোয়ারা।

বেড়াবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। লা ক্যাগালোনার দুই ধারে চৌকষ গ্রানাইটের ঢিবি। সেখানে হেলান দিয়ে বসে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকো। কিন্তু বৈদ্য না হুকুম দিলে কেউ সে জল ছোঁয় না। এই জলে ম্যাগনেসিয়ার (বিরেচক পদার্থ) খুব বেশী।

ইগনাসিও প্রতিদিন ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার জন্ম ওখানে যায়, সঙ্গে থাকে গাঁজাবীজ, দুধ, চকোলেট আর একটি বিরাট পানপাত্র। এই পানপাত্রে গাঁজাবীজ ঢেলে জল মিশিয়ে এক চুমুকে পান করে—এই রকম করে দু'বার, তিন বার, কখনও চার বার। সেণ্ট এণ্টনীর এই অকথ্য ভোজন ব্যবস্থা যে একবার দেখে সে তাড়াতাড়ি পালায়।

সন্ধ্যার পর ইগনাসিও সালামানকার আশীটা মঠে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাধারণ ভক্তের সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দেয়। তর্কশেষে প্রায়ই ইগনাসিও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং স্বর্গীয় পবিত্রতার প্রয়োজনে দরজা বা জানলা ইত্যাদি ভেঙে চুরমার করতো, তারপর অতি ভয়ানক ভঙ্গীতে অনুশোচনা প্রকাশের জন্ম ছুটতো।

দশ বছর পরে ওর জন্ম সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সহিষ্ণু ভঙ্গীতে একশোটি কুকুর সংগ্রহ করে তাদের গায়ে কেরোসিন মাখিয়ে আগুন লাগিয়ে একে একে শোভাযাত্রা সুরু করল।

অবশেষে ওকে স্পেন্‌ ত্যাগ করতে হল,—প্যারীতে জনৈক বন্ধু ভাস্কর মাত্তিও হারনানডেজের কাছে চিঠি পাঠালো। কালো গ্রানাইট পাথরের ওপর তিনি কাজ করতেন, মিশরীয়দের পর আর কোনো ভাস্কর পশুপক্ষীদের মূর্তি এমন অপূর্ব ভঙ্গীতে আর সৃষ্টি করেন নি। মত্তিও ইগনাসিওকে আশ্রয় দিল। ইগনাসিও প্রতিদিন একই পোষাকে লা রোতন্দে আসে। খাটো ট্রাউজার, চৌকষ জুতা, ভাঁড়ের মত টুপী, ছিটের রুমাল, এই পোষাক সালামানকার গির্জার ধর্মপরায়ণা মহিলাদের মনে আঘাত দিয়েছে।

প্রকাণ্ড লম্বা নাক, কয়েক জায়গায় ভাঙা, চুল কালো এবং চমৎকার, কানের ওপর এসে ঝুলে পড়েছে। ওর চোখ এবং ঠোঁট যেন চন্দ্রালোকিত নদীজলের মত স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। সুইডিস্‌ মহিলারা তদ্‌গতচিত্তে তাকিয়ে থাকে।

এত-শত সত্ত্বেও লোকটার মধ্যে অভব্যতা ছিল না।

একদিন কি হল কে জানে, কড়ি ধরে ওপরে উঠলো, তারপর একে একে সমস্ত পোষাক খুলে বিস্ময়-বিভ্রান্ত দর্শকদের গায়ে ফেলতে লাগল—ক্রমে একেবারে সম্পূর্ণ নগ্ন। এডগার এলান পো'র গল্পের 'হপ-ফ্রগে'র মত হাত-পা নাড়তে থাকে।

মোটা মোটা কম্বল ছুঁড়ে ওকে নামানো হল, তারপর সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে পথে বার করে দেওয়া হল। এদিকে মেয়েরা এদিক ওদিক করছে, চীৎকার করছে, আবার তাকিয়ে দেখছেও।

সেই রাতে হারিকট-রুজ বরং আরো কয়েক জন সুন্দর পোষাক-বিহীনদের লা রোতন্দ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আর কখনো আসতে মানা করা হল। সকলেই তর্ক সুরু করে।

"জানো আমি কে?…জানো না যদি ত' অন্ত কারো কাছে খোঁজ নাও—"

কেউ সে কথায় কান দেয় না। এখন এই হোটেলটিকে সম্ভ্রান্ত করে তুলতে হবে, বিদেশীরা আসবে, রীতিমত পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, কুকের টুরিষ্ট দল আসছে, তারা চায় নতুন পরিচালকদের কৃতিত্বের ঘসা-মাজা রূপ দেখতে।

হারিকট একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ-সব শুনলে মোদরুলা কি বলবে? ওদের এই পুরাতন কাফে ভেঙে চুরমার করে দেবে। প্রথম যেদিন এই লা রোতন্দে পা দিয়েছিল, সেই দিন থেকে এই তাদের ঘরবাড়ি হয়ে আছে, এখনই সে খুঁজে পেয়েছে তার শিল্পিসত্তা—এখানেই পেয়েছে তার মোদরুকে, এখানে—

রাস্তার ওধারে কাফে দ্যু ডোম,—সেইখানে ছোট একটা গোল টেবলের ধারে বসল হারিকট,—এই জানলা দিয়ে দেখা
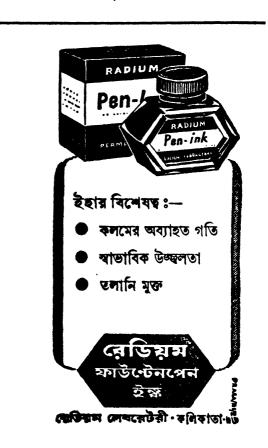
যাবে না যোতন্দ, কে আসছে, কে যাচ্ছে ! না, ও পাগল হবে না, সেই মত্তেলের মত ইঞ্জিনের ওপর যাবে না।

যাই হোক্, খাঁটি কিউবিষ্টরা আর লা রোতন্দে আসে না,—পী জার,—ডেসাউনে,—আগে স্পেনে ছিল, গ্রেইজেস্, ক্যাতোরী কেউ নয়—।

সবাই তাদের ষ্টুডিওতে কাজ করে। তবে ওরা বিবাহিত।

এই অবস্থায় যে সামান্য আরামটুকু সে উপভোগ করছিল তা থেকে বঞ্চিত হল, কোনো ক্রমে পোর্টরেট বিক্রী করে আর সন্ধ্যার পর দাবা খেলোয়াড়দের পিছনের বেঞ্চে বসে ঝিমিয়ে কোনো রকমে দিন কাটতো। সুখ যতক্ষণ আমাদের আয়ত্তে ততক্ষণ আমরা তার অস্তিত্ব অনুভব করি না। কাফে দু ডোমে সর্বদাই কেবল সরে বসার হুকুম শুনতে হয়। তার পর লোকজনও সব অপরিচিত, যা প্রায় সেই রকম। তখন তার মনে হত মোদক্লোর বিরাটত্ব, মহত্ব—কি তার চোখ, যেদিকে তাকায় সব যেন আলোয় ভরে ওঠে।

পরদিন এমনই বর্ষণ সুরু হল যে, রু ডেলাম্বরের এক গাড়ি-বারান্দার নীচে আশ্রয় নিতে হল। হারিকটের মনে পড়ল মোদক্ষর বন্ধু ফুজিটা এই বাড়িরই একটা আস্তাবলে থাকে, সেইটাই তার ষ্টুডিয়ো-ঘর করে নিয়েছে।

ভিতরে ঢুকে জানালায় ধাক্কা দেয় হারিকট। লাল-শাদা রঙের পর্দা ঝুলছে সেই জানালায়। ঘরের ভেতরটা চমৎকার পরিষ্কার এবং ঝকঝকে তকতকে।

যথারীতি শিল্পীর মাথার চুলগুলি সামনের দিকে ঝলে পড়েছে, প্রায় চোখ ঢাকা পড়ে যাওয়ার যোগাড়, তার ভিতর থেকে মার্কিণ মার্কা সেলের চশমা দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট গুম্ফ ঠোঁটে প্রেতায়িত ক্ষীণ হাসি। অত্যন্ত মধুর ভঙ্গীতে তিনি হারিকটকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ঘরে বরণ করলেন। হারিকট ফুজিটাকে ছবি আঁকা চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানায়,—এদিকে এমন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে যে আর ছবি আঁকা চলে না, তাই ফুজিটা ফরাসী ভাষায় তাঁর বাল্য-স্মৃতি লিখছেন। সরু ফালি কাগজে ব্রাস দিয়ে লেখা হচ্ছে। হারিকটকে তিনি লেখার পোর্ট ফোলিও দেখতে দিলেন, বেশ আরাম করে গুছিয়ে বসে হারিকট সেগুলি পড়তে থাকে,—ষ্টোভের আগুনে ঘরটি উষ্ণ হয়ে আছে,—কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে।

পড়া সুরু করল হারিকট। ছোট ছোট কয়েকটি সুন্দর কবিতায় সে মোহিত হ'ল—ফুজিটার এই কামরার মতোই তা তাজা ও উজ্জ্বল।

"প্রবীণ কাঠুরে জানে অরণ্যের মর্মকথা। জলের গোপন বাণী বৃদ্ধ ধীবরের অজানা থাকে না। একদিন রামধনু ওঠে ঠিক সাগর-তরঙ্গের গা ঘেঁষে আর ওদিকে মিশে যায় পাহাড়ের কোলে। সেদিন এই দুই প্রাচীন মানুষের বিমুগ্ধ আত্মা সাতরঙা রামধনুর সেতুর ওপর উঠে বসে। তারপর—কাল মেঘের মাঝখানে মিশিয়ে যায়।"

বিদায় !

"আমাদের শেষ হল। কখন আসবে যম তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার পিসি বলেছিলেন—বেশী জল খাসনি যেন অচেনা জায়গায়। ভাই বলেছিল "দেখিস, পয়সা-কড়ি সাবধান ! বাবা শুধু হেসেছিলেন।"

ভ্রমণ চিত্র !

"একজন বিজ্ঞাপনবাহক ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। সারা দিনের পাওনা বুঝে নিয়ে মাল টানে। এদিকে ওর মেয়ে ষ্টেজেতে পা দেখিয়ে নাচে, আর ছোট বোনদের দু'মুটো খেতে দেয়।"

"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, তুষারে ঢাকা চারি দিক, তখন আমি শুতে যাই। বিছানার চাদরের সঙ্গে ওভার কোটটা জড়িয়ে নিই। দেয়ালের গায়ে আমার ছবির ওপরকার ফুলটা তখনও কুঁড়ি হয়ে আছে, ফুল হয়ে ফুটে ওঠেনি।

"আয়নায় দেখি অনেকগুলি চুলে শাদা রঙ ধরেছে। মুখটা ক্রমেই যেন বাবার মত হয়ে আসছে।"

ফুজিটা চা দিল,—চমৎকার জাপানী 'জিওকিরো' চা। তার অর্থ হল 'শিশির কণা', সেই সঙ্গে কিছু কেক।

কি করে ওকে ধন্যবাদ জানাবে ভেবে পায় না হারিকট। ফুজিটাকে শুধু বললো—"মোদক্ষর ভারী ভালো লাগে আপনার ছবি।" এ কথায় আত্মতৃপ্তি মনে জাগে ফুজিটার। হারিকট বোঝে কল্পনার মূল্য সে দিতে পেরেছে। চলে আসার সময় মোদক্লোর কথা ভেবে মনটা গর্বে ভরে যায়। তখনও বৃষ্টি পড়ছে, রু বারার পথ ধরে দৌড়ে বরৌসকীর বাড়ি যায়, খবর নেওয়ার জন্য সে ফিরেছে কি না।

চাবী দেওয়া রয়েছে দরজায়। আর 'বাড়ী নেই'—কথাটি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

সাতাশ

তার পর নিঃসঙ্গতার দুঃসহ জ্বালার কথা চিন্তা করে হারিকট। রু ভার্সিনজেট্রিয়ের বিরাট কামরায় কি ঘুম আসে—এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই।

তাই যখন তিন বারের বার লে ঝুয়েজেক বলল: "আমার এখানেই এসে থাকো না, আপত্তি আছে ?"

"বেশ ! তাই হবে।" বললে হারিকট।

এই ভালোমানুষটির মানবীয় দুঃখ-দুর্দশার প্রতিটি স্তরের অভিজ্ঞতা বর্তমান। শৈশবে ছবি আঁকার বাসনা প্রকাশ করায় অভিভাবক এক জাহাজে উঠিয়ে নিউ কালিডোনিয়ায় নিকেলের ব্যবসা করতে পাঠালেন। সিড্‌নিতে বেচারীর সব পয়সা নষ্ট হয়ে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় যখন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা, তখন কে যেন দয়া করে তুলে নিয়ে কল্‌কাতাগামী জাহাজে উঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে পদব্রজে দিল্লী গেলেন ঝুয়েজেক্। তার পর তাকে আবার ধরে স্বদেশে পাঠানো হ'ল। মার্সাইতে আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা আবার ধরে বোর্ণিও পাঠালেন। হুকুম দিলেন জাহাজ যখন বন্দরে ভিড়বে, তখন যেন সে মাটিতে না নামে। সতর্ক পাহারা ছিল, তবু প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে পেরেছিলেন ঝুয়েজেক, ভেনেজুনায় তিনি সরে পড়েন। তার পর বন্দরে ঘুরে একটা ষ্টীভে ডোরের কাজ পেলেন। রবারের চোরা চালানীদের সম্পর্কে এসে জঙ্গলের ভেতর প্রায় চারশো কিলোমিটার ঘুরেছেন,—রবার সংগ্রহ করেছেন স্থানীয় লোকদের রঙীন সার্ট বিতরণ করে, অর্থও কিছু করেছিলেন, কিন্তু সবই নষ্ট

হয়ে গেল। টেক্সাসগামী এক ঘোড়ার জাহাজে উঠে পড়লেন,—গোবক্ষক হিসাবে মেকসিকো আবিষ্কার করলেন.—সেখানে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আর আছে নিকোইয়ান রমণী। সব রকম অস্ত্রে পারদর্শী হয়েছিলেন লে স্যুয়েজেক, এমন কি এর পর আফ্রিকায় সিংহ শীকারও করেছেন। কারাগার, বদলোক ব্যবসা শীকার সব কিছুতেই তিনি অভিজ্ঞ।

অবশেষে পঞ্চান্ন বছর বয়সে, হাতে অর্থ তখন অতি সামান্য, প্রথম জীবনের আশা সফল হ'ল। রু দেলাম্বরের এক ধোবীখানার ওপর কাপড় শুখানোর জায়গাটুকু সংগ্রহ করে ষ্টুডিয়ো বানিয়ে ছবি আঁকতে বসলেন স্যুয়েজেক্।

এইখানেই দ্বিতীয় আশা যখন ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা,—অর্থাৎ মেক্সিকোর আদর্শে একটা কলোনী গড়ার স্বপ্ন প্রায় সফল হওয়ার উপক্রম, তখন নিছক করুণাময় প্রাণের জন্যই কিছু দুঃস্থ দুর্দশাগ্রস্ত স্ত্রীলোকের ভার গ্রহণ করতে হ'ল, বৃদ্ধারা যেমন করুণা বিগলিত হয়ে বিড়াল পোষে। তাঁর স্ত্রীও এই ব্যবস্থা সদয় চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, আর স্যুয়েজেক স্বহস্তে ট্যান্-করা চামড়ায় তৈরী বিচিত্র বুট জুতা পরে সব তদারক করছেন।

ঘরের দেয়ালগাত্রে যে সব দেশ তিনি ঘুরেছেন তার ছবি সাজানো রয়েছে। কোথাও জঙ্গলচিত্র, ওদিকে নদী, কোথাও জাহাজের অংশ, ওদিকে আমাজন নদী আর সামনেই জাভার দৃশ্য।

এই জীবনেতিহাস হারিকটকে আগ্রহান্বিত করে তোলে। মাটিতে বসে খাওয়া-দাওয়া হ'ল, যেন ঘাসে বসে খাওয়া হচ্ছে। ওদিকে আগুনের ওপর ডিনারের আয়োজন চলেছে।

কিন্তু হারিকটের ভয় করে। হঠাৎ নজরে পড়ে সেই ক্যানাডীয় মহিলা এক পাশে সবুজ কম্বল গায়ে পড়ে আছে।

লে স্যুয়েজেক বললেন—"একটু মাত্রাধিক্য হয়েছে, তাই ঘুমাচ্ছে। যদি জেগে উঠে হৈ-হৈ সুরু করে তাহ'লেই বিপদে পড়বে। কিন্তু এখানে সত্যি একটি বায়ুগ্রস্ত রমণী আছে—গায়ে ছেঁড়া সেমিজ, পায়ে পাতলা চটি, লা রোতন্দের সামনে ক'দিন ধরে ঘুরছিল। কত দিন যে কিছু খায়নি ভগবান জানেন!—কিন্তু সুন্দরী বটে! কোনও কথা বার করতে পারবে না ওর কাছ থেকে। বলে, দেবদূতের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওর ছেলেকে খুঁজছে।"

হারিকট ভাবে, এই পাগলিনীর সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। নিজের পেটের উপর হাত রেখে সে নীচে নেমে যায়।

সিঁড়িতে নামার সময় এক দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর সঙ্গে একটু হলেই ধাক্কা লেগেছিল আর কি! সে সহসা থেমে হারিকটের পেটে হাত বুলিয়ে চুপি চুপি বলে—

"খুব সাবধান! ছেলেকে সাবধানে রেখো। নইলে দেবদূত তোমাকে টেনে খানায় ফেলে দেবে। সাবধান!"

এই বলে ওপরে উঠে গেল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়।

মাসিক বসুমতী বিক্রয়ের এজেণ্ট হওয়ার নিয়মাবলী

খবরের কাগজওয়ালাদের হাজারে কদাচ বিশ্বাস করবেন না। আর আমাদের সম্পর্কেও যেন ভাববেন না যে, কথাটা আমরা বাড়িয়ে বলছি। আসলে মাসিক বসুমতীর এক খণ্ড অফিস-কপি রাখাও সময় সময় আমাদের পক্ষে শক্ত হয়। সেই কারণে আমরা ঠিক করেছি, যাতে মাসিক বসুমতী ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের পাঠক-পাঠিকার হাতে গিয়ে পৌঁছয়, সেজন্য আরও অধিক সংখ্যায় এজেণ্ট নিয়োগ করা হবে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, করাচী থেকে কোহিমা যেখানে যে কারণে বাঙালীর পত্তন ঘটেছে, সেখানেই শিকড় নামিয়ে বসেছে মাসিক বসুমতী। আপনার পরিবারস্থ লোকজনের মধ্যে আরও একজনের বৃদ্ধি ঘটেছে। সে হচ্ছে মাসিক বসুমতী।

এজেণ্ট হবার আইন-কানুন

(১) স্থানীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র বিক্রেতাগণের নাম ও ঠিকানা সহ আপনি নিজে কোন্ সাময়িকপত্র কত সংখ্যা বিক্রয় করেন তার সঠিক সংবাদ।

(২) আপনি অপর কোন্ কোন্ সাময়িকপত্রের এজেণ্ট রয়েছেন? কত দিন?

(৩) কমপক্ষে কত কপি কাগজ আপনি চান? দশ কপির কমে কোনও এজেন্সি দেওয়া যাবে না।

(৪) সিকিউরিটি হিসাবে প্রতি কপি মাসিক বসুমতীর জন্য এক টাকা আট আনা করে জমা দিতে হবে।

(৫) কমিশন প্রতি কপির জন্য তিন আনা।

(৬) অবিক্রীত কোনও কপিই আমরা ফেরৎ নেব না।

এজেন্সীর জন্য ম্যানেজার, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় যোগাযোগ স্থাপন করুন। আপনার পুরো নাম, ঠিকানা, নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম, ব্যাঙ্ক রেফারেন্স সহ।
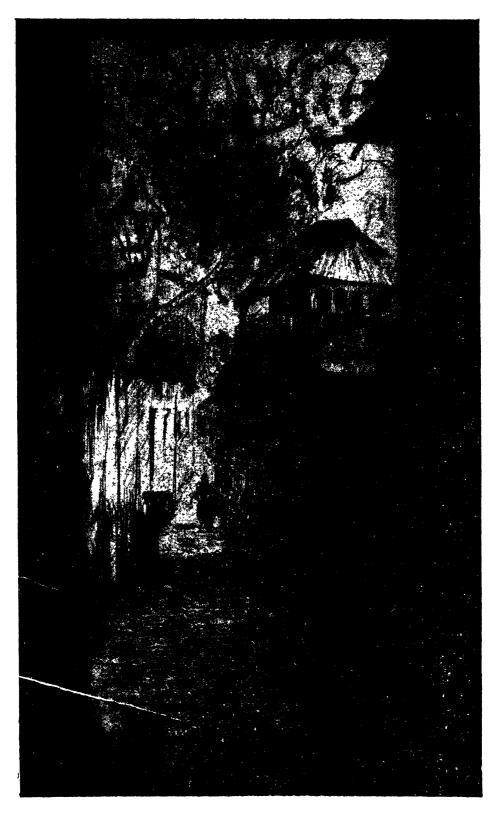
(লিনোকাট)

পথের শেষ কোথায় —
—শ্রীকৃষ্ণ দাস অঙ্কিত

শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শন

"অনির্ব্বাণ"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগকে কি হিসাবে নতুন বলেছেন, তাঁর কথা ধরেই তা আলোচনা করা যাক। তাঁর একখানা চিঠিতে আছে: "এমন কথা আমি কখনও বলিনি যে, সব দিক দিয়ে আমার যোগ একেবারে আনকোরা নতুন। আমি এর নাম দিয়েছি পূর্ণযোগ (Integral Yoga)। তার অর্থ, এতে বিভিন্ন প্রাচীন যোগের নিষ্কর্ষ যেমন আছে, তেমনি তাদের অনেক সাধনাঙ্গও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পূর্ণযোগের নূতনত্ব হচ্ছে তার লক্ষ্যে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে, তার সাধনার সর্ব্বাঙ্গীনতায়।...এর আগেও এমন সব আদর্শ বা সম্ভাবনার কথা উঠেছে, আপাতদৃষ্টিতে যাদের পূর্ণযোগের সগোত্র বলে মনে হয়। যেমন, মানবের সমষ্টিগত সিদ্ধির সাধনা, কোনও কোনও তন্ত্রে (ভুক্তি ও শক্তির) সাধনা, কোনও কোনও যোগি-সম্প্রদায়ে পূর্ণাঙ্গ কায়াসিদ্ধির সাধনা ইত্যাদি। আমি নিজেও অনেক জায়গায় এদের কথা তুলেছি এবং এও বলেছি যে, মানব জাতির অধ্যাত্ম সাধনার অতীত যুগ প্রকৃতিরই একটা প্রস্তুতি। তবে কি না তার লক্ষ্য শুধু লোকোত্তর ব্রহ্মনির্বাণই নয়, কিন্তু এই পার্থিব চেতনারই দিব্য পরিণাম ঘটাবার জন্ম আর এক পা এগিয়ে যাওয়া।...প্রাচীন যোগপন্থার আদর্শ এবং ভাবনার পুনরাবৃত্তিই (অধ্যাত্মসিদ্ধির পক্ষে) যথেষ্ট বলে আমার মনে হয়নি। তাই আমি সাধ্যের এমন একটা অবধি নির্দেশ করছি, যা এখনও সিদ্ধ হয়নি, যার স্পষ্ট ছবিটি এখনও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেনি—যদিও অতীতের সমস্ত অধ্যাত্ম-সাধনার এটিই যে স্বাভাবিক অথচ আপাতনিগূঢ় পরিণাম, তাতেও সন্দেহ নাই।

"আমার এই যোগ প্রাচীন যোগের তুলনায় নতুন এই জন্ম যে, (১) জগৎ বা জীবন ছেড়ে স্বর্লোকে কি নির্বাণে প্রবেশ করা এ-যোগের লক্ষ্য নয়? এ-যোগ চায় জীবনের এবং সত্তার রূপান্তর। সে রূপান্তরও গৌণ বা আনুষঙ্গিক নয়, সাধনার তা সুস্পষ্ট এবং মুখ্য লক্ষ্য। অন্যান্য যোগেও অবতরণের কথা আছে বটে, কিন্তু সে-অবতরণ মোক্ষ সাধনার আনুষঙ্গিক ব্যাপার, উত্তরণেরই তা (অবান্তর) পরিণাম—উত্তরণই হল সেখানে আসল লক্ষ্য। আর এ-যোগে উত্তরণ হল সাধনার প্রথম ধাপ মাত্র, অবতরণের জন্যই উত্তরণ। উত্তরণের ফলে নতুন চেতনার অবতরণ সিদ্ধ হলেই এ সাধনার সিদ্ধি।

"তন্ত্র এবং বৈষ্ণব মতেও ভবচক্র হতে নিস্তার পাওয়াই হল সাধনার শেষ কথা। আর এ-যোগে জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিব্য পরিণাম হল লক্ষ্য।

"(২) নিছক ব্যক্তির প্রয়োজনে ব্রহ্মসাধনায় ব্যক্তিগত সিদ্ধি-লাভই এ যোগের লক্ষ্য নয়। এ চায় এই পৃথিবীতেই সমষ্টি-চেতনারও ইষ্টার্থের একটি সিদ্ধি—শুধু বিশ্বোত্তীর্ণ সিদ্ধিই নয়, একটা বিশ্বগত সিদ্ধি। চৈতন্যের একটা শক্তি (যাকে বলেছি 'অতিমানস' (এখনও পার্থিব প্রকৃতিতে দানা বাঁধেনি বা প্রত্যক্ষ ভাবে সক্রিয় হয়নি—এমন কি মানুষের অধ্যাত্ম জীবনেও নয়। এই শক্তিকে নামিয়ে এনে সংহত এবং সোজাসুজি সক্রিয় করে তোলাও পূর্ণযোগের একটা লক্ষ্য।

"(৩) এই উদ্দেশ্যে এমন একটা সাধনপন্থাও ছকা হয়েছে যা লক্ষ্যের মতই অখণ্ড এবং সর্বাঙ্গীন—যা চায় চেতনা এবং প্রকৃতির অখণ্ড এবং সর্বাঙ্গীন রূপান্তর। প্রাচীন সাধনপন্থা-গুলিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বটে,—কিন্তু করা হয়েছে আংশিক ভাবে এবং বিশিষ্ট কতকগুলি সাধনাঙ্গের প্রাথমিক সোপানরূপেই। সর্বাংশেই এমনিতর বা এর অনুরূপ কোনও সাধনার নির্দেশ বা সিদ্ধির কথা প্রাচীন যোগপন্থাগুলিতে আমি পাইনি। পেলে পরে আজ ত্রিশ বছর ধরে এত গবেষণা, অন্তর্লোক নতুন কিছু গড়বার এত আয়োজন, নতুন পথ কাটবার এত পরিশ্রমে সময় নষ্ট করবার আমার দরকার কি ছিল? দিনের আলোয় দিব্যি তুলকি চালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতেম, সান-বাঁধানো সারি রাস্তা তো সামনে পড়েই ছিল, পথের নক্সাও নিখুঁত, রাহাজানিরও কোনও ভয় নাই! আমাদের যোগ পুরনো পথ মাড়িয়ে চলছে না, চলছে অধ্যাত্ম রাজ্যে নতুনের সন্ধানে।" (Letters, Vol. 1, P P. 25-28)

কথাগুলি খুবই স্পষ্ট। পূর্ণযোগের নূতনত্ব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যকে আর একটু বিশদ করলে এই দাঁড়ায়:

এ দেশের সব সাধনারই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি বা জন্মান্তরনিবৃত্তি। সাধক চান, আর যেন এ-জগতে তাঁকে ফিরে আসতে না হয়। কিন্তু পূর্ণযোগী এটাকে একান্ত বলে ধরেন না। মুক্ত হতে তিনিও চান, কিন্তু মুক্তি তাঁর কাছে অধ্যাত্ম-সিদ্ধির প্রথম পর্ব মাত্র। মুক্তিতে জীবন ফুরিয়ে যাবে না, শান্তিতে আলোয় আনন্দে শক্তিতে আরও উপচে উঠবে। এমনিতর প্রাণের উপচয় প্রমুক্ত চেতনাতেই সম্ভব। পূর্ণযোগীর তাই কাম্য। সুতরাং মুক্তির পরেও তাঁর জীবনে চলে রূপান্তর সিদ্ধির সাধনা। এই এক নতুন জীবনায়ন। আকাশের মুক্তি আছেই, কিন্তু সেই আকাশের বুকে প্রাণের নবরূপায়ণের অফুরন্ত উল্লাসও আছে। দুটিকে মিলিয়েই সত্তার অখণ্ড চরিতার্থতা।

তারপর, এ-চরিতার্থতা পূর্ণযোগী একার জন্ম চান না, চান সবার জন্ম। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের সাধনা—এ কথা পূর্ব-সূরিরাও বলেছেন। বিশ্ব জুড়ে এক অখণ্ড চেতনা, এক অখণ্ড প্রাণ; কাজেই ব্যষ্টির সিদ্ধিকে সমষ্টির সাধনা ও সিদ্ধি থেকে পৃথক রাখা যায় না। অধ্যাত্ম-সাধনায় চেতনা যতই ঊর্ধ্বে ওঠে, ততই তা যেমন পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি গভীরে অনুপ্রবিষ্টও হয়। সুতরাং একের দিব্য ভাবনা বহুর মধ্যে সাড়া জাগাবেই, এ হল প্রকৃতির আইন। কিন্তু দিব্য ভাবনারও রূপভেদ আছে। 'আমি যেমন মুক্ত, তেমনি সবাই মুক্ত হ'ক,'—প্রমুক্ত চেতনার এই আকৃতিতে দিব্যভাবনার এক রূপ। 'পুরুষের মুক্তি আমুক রূপান্তরিতা প্রকৃতির সিদ্ধি এবং সেই মুক্তি ও সিদ্ধি বিশ্বগত হ'ক,'—এই হল দিব্যভাবনার আর এক রূপ। বলা বাহুল্য, এইটিই পূর্ণযোগীর লক্ষ্য। সুতরাং আত্মমুক্তির পরেও আত্মপ্রকৃতির রূপান্তর এবং পার্থিব চেতনার মূলাধারে কুণ্ডলিত শক্তির উদ্বোধন—এই দুটি করণীয় তাঁর থেকে যায়। এইখানেই পূর্ণযোগের বৈশিষ্ট্য। তার সম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, অধিকার এবং পরিণাম নিয়ে প্রশ্নও ওঠে এইখানে।

লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য থেকে সাধনাতেও বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে, এটা স্বাভাবিক। অথচ অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সিদ্ধির মধ্যে পূর্বাপর একটা ধারাবাহিকতা আছে, একথাও স্বীকার করতে হবে। কেন

না, বিশ্ব যেমন এক অখণ্ড চৈতন্যে বিধৃত, তেমনি তার মধ্যে বয়ে চলেছে এক অবিচ্ছেদ্য প্রাণের ধারা। আবার চৈতন্য এবং প্রাণ (উপনিষদের ভাষায় আকাশ এবং প্রাণ) ওতপ্রোত—একই সত্তার তারা এপিঠ-ওপিঠ। এইটিই হল পূর্ণাদ্বৈতবাদের মর্ম কথা। পূর্ণযোগের সাধনার ভিত্তিও এই দৃষ্টির পরেই প্রতিষ্ঠিত।

সব সাধনার গোড়ার কথাই হল চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া, তাকে উজান বওয়ানো। মুখ্যত মন দিয়েই আমরা সাধনা শুরু করি। উজান ঠেলতে এক জায়গায় এসে মন তার গণ্ডির শেষে পৌছয়। তার পরে থাকে একটা নির্বিশেষ বিরাট শূন্যতা। অধ্যাত্মশাস্ত্রে মনের ভাষায় তর্জমা করে একে বলা হয়েছে 'একরস-প্রত্যয়'। শূন্যের নির্বর্ণতায় কিছুই সেখানে ঠাহর হয় না। তবুও দুঃসাহসীর শ্যেন চক্ষু তার মাঝে সন্ধানী দৃষ্টির বিদ্যুৎ হানে এবং নতুন কিছুর আভাসও পায়। অধ্যাত্মশাস্ত্রে তার কিছু কিছু বিবৃতিও পাওয়া যায়—বিভিন্ন দর্শনে মোক্ষের বিভিন্ন পরিচিতিতে।

কিন্তু মোটের উপর মোক্ষের চেহারাটা এক। ও হল পুরুষের অধিকারে, কালাতীত আনন্ত্যের এলাকায়। কিন্তু ঠিক তারই অনুপূরক আর একটা আনন্ত্য আছে—প্রকৃতির বিভূতির আনন্ত্য। তা কিন্তু কালগত। 'আমি আছি এবং আমি হচ্ছি'—এ-দুটি ভাবনা একই সত্তার যুগ্ম-ধর্ম্ম হলেও দুয়ের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। একটিতে কাল নিস্পন্দ, আর একটিতে কাল অনবসিত। যদি শুদ্ধ অস্তিত্বে পৌছই আর সেখানেই থেকে যাই, সাধনা শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেখানে থেকে শুদ্ধ বিভুতিতে যদি স্ফুরিত হই, সাধনার আর শেষ থাকে না। তখন মুক্তির পরেও সাধ্যের কথা ওঠে। বস্তুত, পৌরুষের সত্তা অবিচলতায় নিত্যপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছে, কিন্তু প্রকৃতির ঊর্দ্ধপরিণাম তো শেষ হয়ে যায় নি। আর এ দুটিকে নিয়েই জীবনের অখণ্ড পূর্ণতা। পূর্ণযোগের সাধনায়, দুটিকেই সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়। তাই অচল-প্রতিষ্ঠ পুরুষের নিবৃত্তি আর অনন্তপরিণামিনী পরমা-প্রকৃতির প্রবৃত্তি—পূর্ণযোগীর জীবনে এ-দুয়ের একটা সামঞ্জস্য ঘটে। চিৎ-প্রতিষ্ঠা আর চিৎ-পরিণাম দুই-ই তাঁর কাছে সমান সত্য। অথচ দার্শনিক বিচারে আমরা সাধারণতঃ চিৎকে স্বপ্রতিষ্ঠার মর্যাদা দিয়ে পরিণাম-ধর্ম্মকে ফেলি জড়ের কোঠায়। এইটি প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্তের অনুকূল, এবং লোকায়ত বেদান্তের উপর তার অসামান্য প্রভাবও পড়েছে। অবশ্য আমাদেরই দেশের দার্শনিক ভাবনায় এর প্রতিবাদ আছে। মীমাংসায়, তন্ত্রে, ভাগবতধর্মে প্রকৃতির শুদ্ধ পরিণামের কথা আছে, গুণবিক্ষোভ আর নির্গুণের মাঝে শুদ্ধসত্ত্বের কল্পনা আছে। এ-সমস্ত ভাবনাই পূর্ণযোগের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি। পূর্ণযোগের ব্যঞ্জনাকে পুরোপুরি ধারণা করতে হলে অতীত যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও তাকে বিচার করতে হবে, কেন না এ-যোগ প্রাচীন যোগের পুনরাবৃত্তি না হলেও তার অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি। প্রবহমান প্রকৃতি-পরিণামের দৃষ্টিতে এইখানে তার নূতনত্ব।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ইয়াল্টার গোপন কথা—

গত ১৬ই মার্চ্চ রাত্রে (১৯৫৫) মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্র বিভাগ ইয়াল্টা আলোচনার গোপনীয় দলীল-সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গোপন বিবরণ প্রকাশ করায় বিশ্ববাসী যত না বিস্মিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছে ঐগুলি প্রকাশের কারণের কথা ভাবিয়া। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল, এবং রুশ প্রধান মন্ত্রী মার্শাল যোসেফ ষ্টালিন দক্ষিণ-ক্রিমিয়ার ইয়াল্টায় এক সম্মেলনে সমবেত হন। উহা-ই ইয়াল্টা সম্মেলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ সময় জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং জার্ম্মাণীর পরাজয় আসন্ন। এই সম্মেলনে তাঁহারা জার্ম্মাণীর পরাজয় সম্পর্কে শেষ পরিকল্পনা গঠন এবং জার্ম্মাণীকে বিভক্ত ও দখল করা, যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি বিধান এবং ক্ষতিপূরণ আদায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সান ফ্রান্সিস্কো সম্মেলন সম্পর্কে পরিকল্পনাও এই সম্মেলনেই রচিত হয়। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে এই সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জন্মলাভ করে। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎশক্তিবর্গের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ সম্বন্ধে ইয়াল্টা সম্মেলনেই বৃহৎ-রাষ্ট্র-নায়কত্রয় একমত হন। এই সম্মেলনেই জার্ম্মাণীর বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের তিন মাস পরে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে রাশিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদ্ধোত্তর সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনাও এই বৈঠকে হইয়াছে। এই সকল বিবরণের অনেক কথা-ই ইতিপূর্ব্বে বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল তাঁহার স্মরণ-লিপিতে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তা ছাড়া অন্যান্য লেখক যাঁহারা যুদ্ধের স্মরণ-লিপি লিখিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থেও অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল প্রকাশিত বিবরণ ব্যতীত আর যে-সকল বিবরণ এত দিন গোপন রাখা হইয়াছিল সে-গুলি মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রবিভাগ হঠাৎ কেন প্রকাশ করিলেন, তাহা তাৎপর্য্যহীন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

অনেকে মনে করেন, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলকে বিব্রত ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইয়াল্টা সম্মেলনের গোপন দলীল প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকাশিত গোপন দলীলে অবশ্য দেখা যায়, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের অগোচরে একাধিক বার মার্শাল ষ্ট্যালিনের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল আলোচনার একটিতে প্রেঃ রুজভেল্ট বৃটিশ উপনিবেশ হংকং চীনকে দিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার আর একটি প্রস্তাব ছিল বৃটিশকে বাদ দিয়া গঠিত একটি অছি প্রতিষ্ঠানের হাতে কোরিয়াকে অর্পণ করা। এই সকল আলোচনায় বৃটেন সম্বন্ধে এমন মন্তব্যও দুই-একটি তিনি করিয়াছেন, যাহা বৃটিশের পক্ষে শ্রুতিমধুর না হওয়ার-ই কথা। মার্শাল ষ্ট্যালিনের সহিত এক আলোচনায় প্রেঃ রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন, The British were a peculiar people and wished to have their cake and eat it too." ইন্দোচীনকে ট্রাষ্টিশিপের হাতে অর্পণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, বৃটিশ ইন্দোচীনকে ফ্রান্সের হাতে ফিরাইয়া দিতে চায়। তাঁহাদের আশঙ্কা এই যে, ট্রাষ্টিশিপের তাৎপর্য্য ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে। তথাপি চার্চ্চিলকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই ইয়াল্টা সম্মেলনের গোপন দলীলগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে, এ-কথা স্বীকার করা কঠিন। ইয়াল্টার গোপন বিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকেও মার্কিণ-রাষ্ট্র বিভাগ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহা প্রকাশে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হোয়াইট হাউসের সেক্রেটারী মিঃ হাগেটি বলিয়াছেন যে, প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ইয়াল্টা সম্মেলনের দলীলগুলি পাঠ করেন নাই এবং ঐগুলি প্রকাশ করা সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনাও করা

হয় নাই। ঐগুলি প্রকাশের সিদ্ধান্ত করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র বিভাগের। ইহা সত্যই কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে ?

আমেরিকাবাসীর দৃষ্টিতে ইয়াল্টা সম্মেলনের গোপন দলীল-গুলির যে একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় চীনের কম্যুনিষ্টরা এমন একটা সুযোগপূর্ণ অবস্থা লাভ করে যাহার ফলে যুদ্ধশেষ হওয়ার চারি বৎসর পরে তাহারা সমগ্র চীন দখল করিতে পারিয়াছে। রিপাবলিকান দলের বহু সদস্য এই দুইটি ব্যাপারকে স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইয়াল্টা সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ত্রুটিপূর্ণ বা কাপুরুষোচিত নীতির জন্যই রাশিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং চীনা কম্যুনিষ্টরা সমগ্র চীন দখল করিতে পারিয়াছে। অন্য কথায় বলা যায়, ইয়াল্টায় প্রেঃ রুজভেল্ট যে ষ্ট্যালিন-তোষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ফলেই কম্যুনিষ্ট রাশিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হইয়া এবং সমগ্র চীন কবলিত হইয়াছে চীনা কম্যুনিষ্টদের। ইহাও তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইয়াল্টা সম্মেলনের গোপন দলীলগুলি প্রকাশিত হইলে তাঁহাদের ধারণাই যে সত্য তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। রিপাবলিকান রাজনীতিকরা দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় রিপাবলিকান দলের পক্ষে যে-নির্ব্বাচনী প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহাতে পরোক্ষ ভাবে ইয়াল্টা সম্মেলনের গোপন দলীলগুলি প্রকাশের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল। ইয়াল্টা চুক্তি ভঙ্গ করিবার জন্য রাশিয়ার নিন্দা করিয়া মার্কিণ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব আনয়ন করিতে প্রেঃ আইসেন-হাওয়ার ১৯৫৩ সালের প্রথম ভাগে একটা চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেঃ রুজভেল্টের সমালোচনা সূচক কোন শব্দ ব্যবহারেই ডেমোক্রাটিক সদস্যরা রাজী না হওয়ায় এই চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। সম্প্রতি সুদূর প্রাচ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইয়াল্টা চুক্তি বাতিল করিবার জন্য দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকানদের চাপ আবার বৃদ্ধি পায়। গোপন দলীল প্রকাশের কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও রাষ্ট্র-বিভাগ ঐগুলি প্রকাশ করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু রিপাবলিকান দলের কয়েক জন দক্ষিণপন্থী সদস্য যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ গোপন দলীল-গুলির নকল 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার হস্তগত হইয়াছে তখন তাঁহাদের চাপ এত বৃদ্ধি পায় যে, ঐ সকল দলীল প্রকাশ করা ছাড়া রাষ্ট্র বিভাগের আর উপায়ান্তর ছিল না। রাষ্ট্র বিভাগ ঐ সকল দলীল প্রকাশ না করিলে নিউ ইয়র্ক টাইমস যে করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল গোপন দলীল উক্ত পত্রিকার হস্তগত হইল কিরূপে, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয় !

ইয়াল্টা সম্মেলনের যে-সকল দলীল-পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে উহার শব্দ-সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। এই সকল দলীল-পত্রের মধ্যে ইতি-পূর্ব্বে যে-গুলি গোপন রাখা হইয়াছিল সে-গুলি সম্পর্কে সামান্য ভাবে উল্লেখ করাই শুধু এখানে সম্ভব। এই সকল দলীলপত্রের মধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে (১৯৪৫) বৃহৎ নেতৃত্রয়ের ডিনার-সভায় বিবরণ অন্যতম। প্রেঃ রুজভেল্টের সহকারী মিঃ চার্লস বোলেন এই ডিনারের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভোটদানের যে-পদ্ধতি রাশিয়া প্রস্তাব করে চার্চ্চিল তাহা সমর্থন করেন। সমর্থনের যুক্তি স্বরূপ তিনি বলেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তিগুলির ঐক্যের উপরেই সব-কিছু নির্ভর করিতেছে। নিরাপত্তা পরিষদে প্রধান মিত্র শক্তিবর্গের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ইয়াল্টা সম্মেলনেই গৃহীত হয়, সে-সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্যার (তৎকালে মিঃ) এন্টনী ইডেন ভোট পদ্ধতি সম্পর্কে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যোগদান করিবার আগ্রহ থাকিবে না। চার্চ্চিল বলেন যে, তাঁহার সহিত তিনি বিন্দুমাত্রও একমত নহেন; কারণ, তিনি আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিকে বাস্তব অবস্থার দিক হইতে বিবেচনা করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত বিবরণের মধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেঃ রুজভেল্ট এবং মার্শাল ষ্ট্যালিনের মধ্যে আলোচনা সম্পর্কে মিঃ বোলেনের বিবরণে উল্লিখিত জার্ম্মাণী সংক্রান্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ! ইউক্রেণে জার্ম্মাণী যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া মার্শাল ষ্ট্যালিন জার্ম্মাণদিগকে বর্ব্বর বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন, যে তাহারা মানুষের সৃজনাত্মক কার্য্যাবলীকে ঘৃণা করে। প্রেঃ রুজভেল্ট তাঁহার সহিত একমত

হন। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত বিবরণে ফ্রান্স সম্বন্ধে চার্চ্চিলের শ্রুতিকটু মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি দুই বার বৃহৎ-রাষ্ট্র শক্তিবর্গের exclusive club-এ ফ্রান্সকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, উহার সদস্য হওয়ার প্রবেশ-ফি ৫০ লক্ষ সৈন্য বা উহার বিকল্প হইতে হইবে। জার্ম্মাণীকে বিভক্ত করা সম্পর্কে ৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহৎ রাষ্ট্রনায়ক-ত্রয়ের মধ্যে আলোচনায় মিঃ বোলেন কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ-ও ইতি-পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। মিঃ বোলেন লিখিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিন পরাজিত জার্ম্মাণীকে বিভক্ত করার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, তেহরাণ সম্মেলনে প্রেঃ রুজভেল্ট জার্ম্মাণীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মিঃ বোলেন লিখিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীকে বিভক্ত করার নীতি সম্পর্কে বৃহৎ নেতৃত্রয় একমত হন। এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধোত্তর মতভেদের জন্য এই নীতি কার্য্যকরী করা হয় নাই। জার্ম্মাণী রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের দখলী অঞ্চল হিসাবে বিভক্ত রহিয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রেঃ রুজভেল্ট এবং ষ্ট্যালিনের মধ্যে আলোচনার সময় ফ্রান্সকে জার্ম্মাণীর কোন দখলী অঞ্চল দেওয়া হইবে কি না, ষ্ট্যালিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রেঃ রুজভেল্ট বলেন যে, দয়াপরবশ হইয়া ফ্রান্সকে একটি দখলী অঞ্চল দেওয়া যাইতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং মার্শাল ষ্ট্যালিনের মধ্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের আলোচনার যে বিবরণ মিঃ বোলেন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত দলীলপত্রের মধ্যে উহার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বৈঠকে যে রাজনৈতিক সর্ত্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে তাহা এবং সুদূর প্রাচ্য সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা হয়। প্রেঃ রুজভেল্ট হংকং চীনকে দেওয়ার এবং কোরিয়া ও ইন্দোচীন সম্পর্কে অছি-পরিষদ গঠনের যে প্রস্তাব করেন সে-কথা আমরা পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ের শেষপ্রান্তস্থ একটি বন্দর, সম্ভব হইলে দেইরান বন্দর রাশিয়াকে দেওয়ার কথাও উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, এ সম্পর্কে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সহিত তিনি আলোচনা করেন নাই; কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, চীনাদের সহিত আলোচনার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা এই যে, তাঁহাদের কাছে যাহা কিছুই বলা যাউক না কেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র পৃথিবী তাহা জানিয়া ফেলে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের দুইটি সর্ত্ত পুরণ করা যে কঠিন নয় তাহাও তিনি জানান। দক্ষিণ শাখালীন ও কুরাইল দ্বীপ যে রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে তাহা সকলেরই জানা কথা। উল্লিখিত রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন বৈঠকের আলোচনা ছাড়াও জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ, পোল্যাণ্ড সমস্যা, ট্রাষ্টিশিপের প্রশ্ন সংক্রান্ত আলোচনার বিবরণ রাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত দলিলপত্রের মধ্যে আছে। এই সকল প্রকাশিত কাগজপত্রে দেখা যায়, উপনিবেশগুলির জন্য প্রস্তাবিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অছি-প্রতিষ্ঠান থাকার জন্য মিঃ ষ্টেটিনিয়াস যে-প্রস্তাব করেন, চার্চ্চিল দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কোন আলোচনা করা হয় নাই, এ পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে তিনি কিছু শোনেনও নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল জীবনসূত্রটিতে ৪০টি কি ৫০টি রাষ্ট্র হাত দিবে, এইরূপ প্রস্তাবে কিছুতেই তিনি রাজী হইতে পারেন না। প্রকাশিত কাগজপত্রে আরও দেখা যায়, ষ্ট্যালিন এক সময়ে এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশ্বাস, যত দিন তিনি (ষ্ট্যালিন), মিঃ রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল জীবিত থাকিবেন তত দিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কখনও আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। মিঃ রুজভেল্ট বলেন, সমস্ত রাষ্ট্রই অন্ততঃ ৫০ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বর্জ্জন করিতে চায়, ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি আরও বলেন যে, চিরস্থায়ী শান্তিতে বিশ্বাস করার মত আশাবাদী তিনি নহেন, কিন্তু ৫০ বৎসরব্যাপী শান্তি সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্র বিভাগ ইয়াল্টা সম্মেলন সংক্রান্ত যে-সকল কাগজপত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত বিবরণ ব্যতীত আরও কয়েকটি দলিল আছে। এই সকল দলিলগুলির মধ্যে একটি হইল মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের নিকট 'জয়েণ্ট চীফ অব ষ্টাফে'র ১৯৪৫ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখের অতি গোপনীয় স্মারকলিপি। উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন সৈন্যবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ জর্জ্জ সি, মার্শাল। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের যোগদান কি কি কারণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাঞ্ছনীয়, সেগুলি সংক্ষেপে এই স্মারকলিপিতে বিবৃত হইয়াছে। প্রকাশিত কাগজপত্রগুলির মধ্যে আর একটি দলীল আছে যাহাতে দেখা যায়, ১৯৪৫ সালের ১লা আগষ্টের মধ্যে পরমাণু-বোমা তৈয়ারী শেষ হইবে, এই সংবাদ ইয়াল্টা সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পুর্ব্বেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানানো হইয়াছিল। মেজর জেনারেল এল, জি, এম, গ্রোভস্ ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত এক পত্রে জেঃ মার্শালকে জানান যে, পুরাপুরি পরীক্ষা ব্যতীতই প্রথম পরমাণু-বোমা ১৯৪৫ সালের ১লা আগষ্টের মধ্যে তৈয়ারী শেষ হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পত্রখানির নীচে একটা মন্তব্য আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, এই পত্র বিমান বহরের সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেণ্ট পাঠ করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। চীনদেশস্থ তদানীন্তন মার্কিণ-রাষ্ট্রদূত জেঃ প্যাট্রিক হার্লে কর্ত্তৃক প্রেঃ রুজভেল্টের নিকট লিখিত একখানি স্মারকলিপি এই সকল প্রকাশিত দলীলপত্রের মধ্যে আছে। এই স্মারকলিপিতে প্রেঃ রুজভেল্টকে জানান হইয়াছে যে, চীনে মার্কিণ কমাণ্ডার লেঃ জেঃ ওয়েডেমেয়ার তাঁহার হেড কোয়ার্টার্সে অনুপস্থিত থাকার সময় তাঁহার কমাণ্ডের অধীনস্থ কয়েক জন অফিসার জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য চিয়াং কাইশেকের অজ্ঞাতে চীনা কম্যুনিষ্টদের লইয়া একটি গরিলা বাহিনী গঠনের এক পরিকল্পনা করিয়াছিল। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিণ নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনী দ্বারা গরিলা যুদ্ধ চালানো। যে-সময়ের কথা এই স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে তাহা ১৯৪৪ সালের শেষের দিক হইতে ১৯৪৫ সালের প্রথম দিক পর্য্যন্ত সময়। অফিসারদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। প্রকাশিত দলীলপত্রের মধ্যে প্রেঃ রুজভেল্টের নিকট লিখিত চার্চ্চিলের একখানি পত্রও স্থান পাইয়াছে। এই পত্রে ইয়াল্টা যাইবার পথে মাল্টায় এক বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য চার্চ্চিল প্রেঃ

রুজভেল্ট্‌কে নিমন্ত্রণ করেন। ১৯৪৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মাল্টায় এই বৈঠক হয়।

মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইয়াল্টা সম্মেলন সংক্রান্ত গোপন দলীল-পত্রে অতি চমকপ্রদ বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন নূতন তথ্য আছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রেঃ রুজভেল্টের ষ্ট্যালিন-তোষণ নীতির পরিচয়ও উহাতে নাই। তবে, বাস্তব অবস্থার দিকে চাহিয়া কি করা উচিত তিনি যে তাহা বুঝিতেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইয়াল্টা সম্মেলনের সময় হিটলারের আসন্ন পরাজয়ের মূলে যে রাশিয়ার বিপুল সামরিক শক্তি, এই সত্য তিনি উপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই, জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে তিনি চাহিয়াছিলেন। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষিত হওয়ায় জাপানের পরাজয় ত্বরান্বিত হইয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু পরমাণু বর্ষণের পর জাপান যদি আত্মসমর্পণ না করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইত, তাহা হইলে ব্যাপারটা বড় সহজ হইত না। পরমাণু বোমা তৈয়ার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া জাপানকে পরাজিত করা সহজ হইয়া গিয়াছে, ইয়াল্টা সম্মেলনের সময় মার্কিণ সমর-নায়কদের পক্ষে তাহা অনুমান করা সম্ভব ছিল না'। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের তিন দিন পূর্ব্বে হিরোসিমার প্রথম পরমাণু বোমা বর্ষিত হয়। রাশিয়া যখন মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে আক্রমণ আরম্ভ করে সেই সময় দ্বিতীয় পরমাণু বোমা বর্ষিত হয় নাগাসাকিতে। ১৯৪৫ সালের ৯ই আগষ্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। জাপান আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগষ্ট। দুই দিক হইতে আক্রান্ত না হইলে পরমাণু বোমা বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও জাপান যে অত সহজে আত্মসমর্পণ করিবে, সে-কথা নিশ্চিত ভাবে অনুমান করা সম্ভব নয়।

প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে চার্চ্চিলের অবসর গ্রহণ—

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল অবশেষে গত ৫ই এপ্রিল (১৯৫৫) সত্যই প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন স্যার এণ্টনি ইডেন। স্যার উইনষ্টন প্রধান মন্ত্রীর পদ ইস্তাফা দেওয়ায় কাহারও মনেই কোন বিস্ময়ের সঞ্চার হয় নাই। তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন একথা গত দুই বৎসর হইতেই শোনা যাইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে উহা অধিকাংশ গুজবের মতই মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা সত্যে পরিণত না হইয়া পারে নাই। তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী গুজব ভিত্তিহীন ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। যাহা প্রত্যাশিত ছিল অবশেষে তাহাই ঘটিয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার পদত্যাগ যেমন কোন বিস্ময়ের সঞ্চার করে নাই, তেমনি তাঁহার পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ করা হইতেছে না। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সময়ে প্রধান মন্ত্রিত্বের কাল ধরিয়া চার্চ্চিল মোট ৮ বৎসর ৭ মাস ২৫ দিন বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গত ৩০শে নবেম্বর (১৯৫৪) তাঁহার আশী বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন ৮৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পদত্যাগ করেন নাই। স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল যে-যুগ, যে-ভাবধারা এবং যে-সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ উপলক্ষে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান একেবারেই নাই তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

চার্চ্চিল যখন জন্মগ্রহণ করেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের তথা বৃটিশ ধনতন্ত্রের তখন ভরা যৌবন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের যে-সম্প্রসারণ আরম্ভ হয় রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সময় তাহা পূর্ণতায় মঞ্জরিত হইয়া উঠে। চার্চ্চিল ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বৃটিশ ধনতন্ত্র এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গৌরবপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই শুধু তিনি বর্দ্ধিত হন নাই, তিনি সপ্তম ডিউক অব মার্লবোরোর পৌত্র এবং লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চার্চ্চিলের অন্যতম পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন মার্কিণ মহিলা, এক সময়ে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক লিওনার্ড জেরোমির অন্যতম দুহিতা। সুতরাং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চার্চ্চিলের মামাবাড়ী। তাঁহার কুখ্যাত ফুল্টন বক্তৃতায় (১৯৪৬ সালের মার্চ্চে) "fraternal association of the English speaking peoples" উক্তির মধ্যে মাতৃধারার পরিচয় পরিস্ফুট মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে চার্চ্চিলের পিতা লর্ড র‍্যাণ্ডলফ বৃটিশ রাজনীতিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এমন প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, লর্ড স্যালিসবেরির নেতৃত্ব পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। লর্ড স্যালিসবেরীর শূন্য আসনে তিনিই প্রধান মন্ত্রী হইয়া বসিবেন এরূপ সম্ভাবনাও অনেকের মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য সৈন্য ও নৌবহর হ্রাসের প্রস্তাব মন্ত্রিসভা অগ্রাহ্য করায় লর্ড র‍্যাণ্ডলফ অর্থসচিবের পদ ত্যাগ করিলেন। এইখানেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি। স্যার উইনষ্টনের মধ্যে পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল!

সৈনিকরূপে চার্চ্চিলের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। পরে তিনি সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। অবশেষে আরম্ভ হয় তাঁহার রাজনৈতিক জীবন। প্রথমে তিনি রক্ষণশীল দলের সদস্য হিসাবে কমন্স সভায় প্রবেশ করেন। তার পর উদারনৈতিক দলে যোগদান করিয়া উহার সদস্য হিসাবে কমন্স সভায় নির্ব্বাচিত হন। শেষে আবার তিনি রক্ষণশীল দলে যোগদান করেন। এখন পর্য্যন্তও তিনি একজন গোঁড়া রক্ষণশীল। ১৯০৭ সালে সহকারী ঔপনিবেশিক সচিব হিসেবে তিনি বৃটিশ মন্ত্রিসভায় স্থান পান। এই ভাবে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় তাঁহার প্রথম নিয়োগ তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময় যে নীতিকে তিনি রূপ দিয়াছেন আজ পর্য্যন্তও সেই নীতিরই তিনি ধারক ও বাহক। ১৯০৮ সালে কর্ণেল হোজিয়ারের কন্যা মিস্ ক্লিমেণ্টাইন হোজিয়ারকে তিনি বিবাহ করেন। চার্চ্চিলের পত্নী আর্ল অব এয়ারলাইয়ের প্রপৌত্রী। অতঃপর চার্চ্চিল বৃটিশ রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯১০ সালে তিনি

হোম সেক্রেটারী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ লাভ করেন এবং ১৯১১ সালে ফার্ষ্ট লর্ড অব এডমিরাল্টি নিযুক্ত হন। অতঃপর আসিল প্রথম বিশ্বসংগ্রাম। গ্যালিপলি অভিযানের ব্যর্থতার দায়িত্ব বহন করিয়া চার্চ্চিল নৌদপ্তরের ফার্ষ্ট লর্ডের পদ হইতে অপসারিত হইলেন। তখন তিনি একটি রেজিমেন্টের মেজর রূপে যুদ্ধে যোগদান করেন। পরে অবশ্য তিনি লেফ্টানেন্ট কর্ণেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। লয়েড জর্জ্জ প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি চার্চ্চিলকে মিনিষ্ট্রি অব মিউনিশান-এর ভার অর্পণ করেন। ইহা ১৯১৭ সালের ঘটনা। ১৯১৮ সালের খাকি নির্ব্বাচনের পর চার্চ্চিল সমর-সচিব ও বিমান-সচিব হইয়াছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় বলশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্বেতরুশদিগকে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন। ১৯২১ সালে তিনি ঔপনিবেশিক সচিব নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে লয়েড জর্জ্জ গভর্ণমেন্টের পতন হইলে চার্চ্চিলও কিছু দিনের জন্য বৃটিশ রাজনৈতিক আকাশ হইতে অস্তমিত হইলেন। দুই বৎসর পরে ১৯২৪ সালে আবার তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। রক্ষণশীল দলের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া বলডুইন মন্ত্রিসভায় অর্থসচিবের পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে শ্রমিক গভর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্ত্তী দশ বৎসর চার্চ্চিলের জীবনের এক নূতন অধ্যায়। এই সময়ের মধ্যে মন্ত্রিসভায় তাঁহার আর স্থান হয় নাই।

১৯৩১ সালের জাতীয় গভর্ণমেন্টে তাঁহার স্থান হওয়া তো সম্ভব ছিলই না। পরেও ভারত, দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে মতানৈক্যের জন্য তিনি মন্ত্রিসভার বাহিরেই রহিয়া গেলেন। এই দশ বৎসর তিনি গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং প্রধান রক্ষণশীল রাজনীতিক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বর্দ্ধিত হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি ফার্ষ্ট লর্ড অব এড্মিরাল্টি নিযুক্ত হন। চেম্বারলেনের পদত্যাগের পর ১৯৪০ সালে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের প্রায় সমগ্র কাল তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল জয় লাভ করায় চার্চ্চিল বিরোধী-দলের নেতার আসন গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করায় আবার তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৫৩ সালে তাঁহাকে নাইট অব গার্টার উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। ১৯২৫ সালে স্যার অষ্টিন চেম্বারলেন এই সম্মান পাওয়ার পর আর কেহ এই সম্মান পান নাই। এই বৎসরেই তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

রাজনীতিক হিসাবে স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল যে একজন অনন্যসাধারণ পুরুষ, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে বৃটিশ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের গুরুতর সঙ্কটের দিনে তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তাঁহাকে বৃটেনের অদ্বিতীয় জাতীয় নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে চার্চ্চিল বৃটিশ নর-নারীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। পিট হইতে আরম্ভ করিয়া গ্ল্যাডষ্টোন পর্য্যন্ত বৃটেনের সুবিখ্যাত রাজনীতিকদের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্যতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেকে হয়ত একথাও বলিতে পারেন, বহুমুখী প্রতিভার দিক হইতে বিবেচনা করিলে উল্লিখিত সুবিখ্যাত বৃটিশ রাজনীতিকদের অপেক্ষাও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহা লইয়া তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। বাগ্মিতায় তিনি চেথাম, বার্ক, শেরিডাম, ছোট পিট, ফক্স, ক্যানিং, ব্রহাম, এরস্কাইন, ব্রাইট, ডিজরেলি, গ্ল্যাডষ্টোন অপেক্ষা যে কোন অংশে ন্যূন নহেন, একথাও হয়ত অনস্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার সীমাবদ্ধতার কথাও আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না। বৃটিশ ধনতন্ত্র এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভাবধারায় তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছেন। সাম্রাজ্যগর্ব্বে তিনি উদ্ধত, একথা বলিলে ভুল বলা হয় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার যূপকাষ্ঠে আর সকল স্বার্থ বলি দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ হাতছাড়া হওয়া তাঁহার কাছে কল্পনাতীত। তাঁহার এই সাম্রাজ্যগর্ব্বের গুঁতো ভারতবাসী আমরা মর্ম্মান্তিক ভাবেই অনুভব করিয়াছি। জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ১৯৩৩ সালের ২৪শে অক্টোবর চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন, "No member of the Cabinet and certainly not the Prime Minister, contemplated, or wished to suggest the establishment of a Dominion constitution for India in any period which human beings ought to take into account." বৃটেনের প্রধান মন্ত্রিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বৃটিশ সাম্রাজ্য বিলোপের জন্য
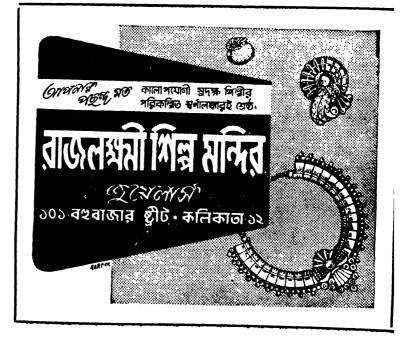
আমি প্রধান মন্ত্রী হই নাই'। তিনি সাহিত্যের 'নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু সে সাহিত্যে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আছে এ-কথা স্বীকার করা অসম্ভব। এই সাহিত্যে আছে শুধু সাম্রাজ্যবাদী আত্মম্ভরিতা-প্রসূত মিথ্যা গৌরব। বৃটিশ-সাম্রাজ্য এবং বিশ্বনেতৃত্ব এই দুইটি ছাড়া চার্চ্চিল আর কিছু ভাবিতে পারেন না। পৃথিবীতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নিপীড়িত মানব-সমাজকে যে আর দাবাইয়া রাখার উপায় নাই, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। এই পরিবর্ত্তনে কম্যুনিজমের ভাবধারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্যই তাঁহার কম্যুনিজম বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। জার্ম্মাণীর পরাজয় যখন আসন্ন সেই সময় তিনি জার্ম্মাণ পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য গোপন নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ঐগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য। সমর-নেতা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শান্তির নেতা হিসাবেও তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে চাহিয়াছেন। এই শান্তি বলিতে সমগ্র পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই তিনি বুঝেন না। তথাপি এই সময়ে তিনি বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন কেন, এই প্রশ্ন মনে না জাগিয়া পারে না।

বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন, একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। পদত্যাগে তাঁহার ইচ্ছা ছিল বলিয়াও মনে হয় না। গত ২৬শে মার্চ্চ (১৯৫৫) উডফোর্ডে এক বক্তৃতায়ও তিনি বলিয়াছেন, 'আমি ত্রিশ বৎসর আপনাদের সেবা করিয়াছি। আরও দীর্ঘকাল সেবা করিব বলিয়া আশা করি।' কাজেই মনে হয়, পদত্যাগ না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। রক্ষণশীল দলের তরুণ সদস্যরা চার্চ্চিলের নেতৃত্ব পছন্দ করেন না, ইহা সকলেরই জানা কথা। নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের সহিত সাফল্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে চার্চ্চিলের নেতৃত্বে উহা সম্ভব নয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। হয়ত এই কারণেই তাঁহাদের চাপে চার্চ্চিল প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে রক্ষণশীল দলের কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা মনে করা কঠিন। আগামী ২৬শে মে বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। চার্চ্চিলের অবসর গ্রহণের ফলে এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলই পুনরায় জয়লাভ করিবে কিনা তাহা বলা কঠিন। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা মনে করিলে ভুল হয় না।

সিঙ্গাপুরে প্রথম নির্ব্বাচন—

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের প্রথম পার্লামেন্টের জন্য যে নির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহার ফলাফল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে বিস্ময়কর হইলেও জনগণের স্বাধীনতার দাবী উহাতে সুপরিস্ফুট। স্তরে স্তরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, এই নির্ব্বাচন তাহারই প্রথম স্তর। সিঙ্গাপুর পার্লামেণ্টে মোট সদস্য-সংখ্যা ৩২ জন। তন্মধ্যে মনোনীত সদস্য-সংখ্যা সাত জন। ২৫টি নির্ব্বাচিত আসনের জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে তাহাতে সোশ্যালিষ্ট লেবার ফ্রণ্ট ১০টি ও পিপলস্ একশন পার্টি ৩টি আসন দখল করায় এই দুইটি বামপন্থী দলই নির্ব্বাচিত আসনগুলির অর্দ্ধেকের বেশী দখল করিয়াছেন। রক্ষণশীল প্রোগ্রেসিভ পার্টি ৪টি, নরমপন্থী মালয়া চাইনিজ এসোসিয়েশন এলায়েন্স ৩টি, রক্ষণশীল ডেমোক্রাট পার্টি ২টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন দখল করিয়াছেন। জরুরী বিধান অনুযায়ী কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী করা হইয়াছে বলিয়া কোন কম্যুনিষ্ট পার্টি নির্ব্বাচনে দাঁড়ান নাই।

উল্লিখিত বামপন্থী দল দুইটির প্রধান দাবী অবিলম্বে স্বাধীনতা চান এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। সোশ্যালিষ্ট লেবার ফ্রণ্ট পিপলস্ একশন পার্টির সহযোগিতায় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন বটে, কিন্তু কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রিসভার হাতে নাম মাত্র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অর্থ, দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ভার গবর্ণরের হাতে রহিয়াছে। পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্তকে ভেটো দিবার ক্ষমতাও গবর্ণরের রহিয়াছে। মন্ত্রিসভার সামান্য যাহা কিছু করিবার ক্ষমতা আছে দক্ষিণপন্থীরা মনোনীত সদস্যদের সহিত জোট পাকাইলে তাহাও করা সম্ভব হইবে না। সিঙ্গাপুরের এই নির্ব্বাচন মালয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর যে প্রতীক ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৃটিশ এই দাবী পূরণ করিবে, এরূপ ভরসা করিবার কিছুই নাই।

বান্দুং সম্মেলন—

আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই পশ্চিম জাভার আগ্নেয়গিরি পরিবেষ্টিত বান্দুং সহরে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন আরম্ভ এবং সম্ভবতঃ শেষ হইয়া যাইবে। এই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য যে পঁচিশটি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশন ছাড়া আর সকলেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সম্মেলনের উদ্যোক্তা পাঁচটি রাষ্ট্র সহ মোট ২৯টি রাষ্ট্র এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে সমবেত হইবেন। এই ধরণের সম্মেলন যে এই প্রথম তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনি এই সম্মেলনের ফলাফলের উপর এশিয়া ও আফ্রিকার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। সম্মেলনের জন্য যে অস্থায়ী কর্ম্মসূচী তৈয়ার করা হইয়াছে তদনুযায়ী যদি সম্মেলন পরিচালিত হয় তবে দুই দিন সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে। অতঃপর সহকারী প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া পাঁচটি নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। ঐগুলি সম্পর্কে মতৈক্য হওয়ার উপরেই 'বান্দুং ঘোষণা' প্রচারিত হওয়া নির্ভর করিতেছে।

বিভানের শেষ-রক্ষা—

স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলের জন্যই কমন্স সভার 'শ্রমিক-সদস্য মিঃ বিভান শ্রমিক দল হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এবং শ্রমিক দলও বিভক্ত হওয়ার সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত মার্চ্চ (১৯৫৫) মাসের শেষার্দ্ধে যখন তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা চলিতেছিল। সেই সময় যদি চার্চ্চিলের পদত্যাগের এবং শীঘ্রই

সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা না দিত, তাহা হইলে মিঃ বিভানের ভাগ্যে যে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দশাই ঘটিত তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। মিঃ বিভানকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিলে বৃটিশ শ্রমিক দল যে বিভক্ত হইয়া পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রমিক দলের পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় মিঃ বিভানকে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাবের অনুকূলে ১৪১ ভোট এবং বিরুদ্ধে ১১২ ভোট হইয়াছিল। তফাৎ মাত্র ২৯ ভোটের। সুতরাং তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিলে শ্রমিক দলকে ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইত না। শুধু শীঘ্রই নির্ব্বাচন হওয়ার সম্ভাবনার জন্য নেশন্যাল এক্সিকিউটিভ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে দলের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আদায়ের ব্যবস্থা হয়। তিনিও এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সম্প্রতি মিঃ বিভান কোন গুরুতর পার্টি-নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ করিয়াছেন, একথা বলা যায় না। মিঃ এটলীর আনীত গবর্ণমেণ্টের রক্ষা-ব্যবস্থা নীতির নিন্দাসূচক প্রস্তাবের আলোচনার সময় তিনি এবং আরও প্রায় ৬১ জন শ্রমিক-সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। দলের ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার অনুযায়ী উহা অপরাধ নহে। কিন্তু বিভানবাদ বা বিভানিজমই মিঃ বিভানের বড় বিপদ। তিনি হাইড্রোজেন বোমার উপর ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরের নির্ভরতা এবং জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার বিরোধী। বিভানবাদ কালক্রমে মিঃ এটলীকে নেতার আসন হইতে অপসারিত করিতে পারে, অথবা বিভানবাদের গুঁতোয় মিঃ এটলী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন, এই আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নাও হইতে পারে।

দক্ষিণ-ভিয়েটনামে সঙ্কট—

সম্প্রতি দক্ষিণ-ভিয়েটনামে যে সঙ্ঘর্ষ আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে তাহা আসলে ক্ষমতা লইয়া দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বলিলে ভুল হইবে না। তিন জন জঙ্গীনায়কের তিনটি বেসরকারী-বাহিনী গত ২৯শে মার্চ্চ (১৯৫৫) দক্ষিণ-ভিয়েটনামের রাজধানী সায়গণ অবরোধ করে। ৩০শে মার্চ্চ তারিখে যে সংঘর্ষ হয় তাহার ফলে ২৯ জন নিহত এবং ১১২ জন আহত হয়। ফরাসী কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে অস্থায়ী ভাবে অবরোধের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল রাজনৈতিক সমস্যার কোন মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

তিনটি বে-সরকারী সৈন্যবাহিনীর নায়কদের সহিত দক্ষিণ-ভিয়েটনামের প্রধান মন্ত্রীর বিবাদের কারণের মূল ছয় মাস পূর্ব্বের একটি ঘটনার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ নো দিন দিয়েম এবং প্রধান সেনাপতি মিঃ নুয়েন ভান হিনের মধ্যে ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে প্রধান মন্ত্রীই জয় লাভ করেন। বে-সরকারী সৈন্যবাহিনীর নায়করা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। উহার মূল্যস্বরূপ তাঁহাদের কয়েক জনকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়। এই বে-সরকারী তিনটি সৈন্যবাহিনীতে ফরাসী বাহিনীর সহযোগী ছিল এবং তাহাদের বেতন দিতেন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট। এখন আর তাহারা ফরাসী বাহিনীর সহযোগী নয়। দক্ষিণ-ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কতককে জাতীয় বাহিনীতে গ্রহণ করিতে রাজী আছেন, আর কতককে গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। ইহাই এই বিবাদের মূল।

১০

পল আর পার্সিকে এখন আর বড় একটা দেখতে পাইনে। ওরা আবুল আসফিয়ার কোটের উপর ডাক-টিকিটের মত সেঁটে বসেছে—ছিনে জোঁকের মত জেগে আছে বললে কমিয়ে বলা হয়, কারণ, রক্ত শোষা শেষ হলে তবু ছিনে জোঁক কামড় ছাড়ে—এরা খামের উপর ডাক-টিকিটের মত যেখানেই আবুল আসফিয়া সেখানেই তারা। মুখে এক বুলি, এক প্রশ্ন—কি করে সস্তায় কাইরো গিয়ে সেখান থেকে সস্তাতেই ফের সঈদ বন্দরে জাহাজ ধরা যায়? আবুল বলেন, 'হবে, হবে, সময় এলে সবই হবে।'

শেষটায় জাহাজ যেদিন সুয়েজ বন্দরে পৌঁছবে তার আগের দিন তিনি রহস্যটি সমাধান করলেন। অতি সরল মীমাংসা। আমাদের মাথায় খেলেনি।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'কুক কোম্পানির লোক টুরিস্ট সায়েব-সুবোদের নিয়ে যাবে গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে করে—সুয়েজ থেকে কাইরো, এবং কাইরো থেকে সঈদ বন্দর। কাইরোতে যে রাত্রি বাস করতে হবে তার ব্যবস্থাও হবে অতিশয় খানদানী, অতএব মাগগী হোটেলে। আমরা যাব থার্ডে, এবং উঠবো একটা সস্তা হোটেলে। তা হলেই হল।'

প্রথমটায় আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সংবিতে ফেরা মাত্র আমার মনে আরেকটি কঠিন সমস্যার উদয় হল। যদি কোনো জায়গায় আমার ট্রেন মিস করি কিম্বা অন্য কোনো দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যাই আর শেষটায় সঈদ বন্দরে ঠিক সময়ে পৌঁছে জাহাজ না ধরতে পারি তবে যে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বরঞ্চ চা খেতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, আর গাড়ি মাল-পত্র নিয়ে চলে গেল সে সমস্যারও সমাধান আছে কিন্তু জাহাজ চলে গেলে কত দিন সঈদ বন্দরে পড়ে থাকতে হবে, তার কি খরচা, নূতন জাহাজে নূতন টিকিটের জন্য কি গচ্চা এসব তো কিছুই জানিনে। কুকের লোক এ সব বিপদ-আপদের জন্য জিম্মেদার, কিন্তু আবুল আসফিয়াকে জিম্মেদার করে তো আর আমাদের চারখানা হাত গজাবে না? তাঁকে তো আর বলতে পারবো না, 'মশাই, আপনার পাল্লায় পড়ে এত টাকার গচ্চা হ'ল—আপনি সেটা ঢালুন।'

শেষের কথাটা বাদ দিয়ে আমার সমস্যাটা নিবেদন করাতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় মাত্র এক বাক্য বললেন, 'নো রিস্ক, নো গেন'—সোজা বাঙলায় 'খেলেন দই রমাকান্ত আর বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন' সে হয় না। তুমি যদি দই খেতে চাও তবে বিকারটা হবে তোমারই মাগুর মাছ ধরতে হলে গর্তে হাত দিতে হবে তোমাকেই কিছুটা ঝুঁকি নিতে রাজী না হলে কোনো প্রকারের লাভ হয় না।

আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক, নো গেন' এই চার কথা—চাটিখানি কথা নয়—শুনে পল দুশ্চিন্তা ভরা গলায় বললে, 'তাই তো!'

পার্সি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললে 'সেই তো।'

আমি বললুম, 'ঐ তো।'

পল বললে, 'কিম্বা মনে করুন কাইরোতে পথ হারিয়ে ফেললুম। আবুল আসফিয়া কি কাইরোর ভাষা জানেন সেখানকার লোকে কি বুলি বলে তার নামই তো জানিনে।'

পার্সি বললে, 'দেখো পল, তুমি কি কি জানো না তার ফিরিস্তি বানাবার এই কি প্রশস্ততম সময়? তাতে আবার সময় তো লাগবে বিস্তর।'

আমি পার্সিকে ফাঁকা ধমক দিয়ে বললুম, 'আবার পলকে বললুম, 'আরবী। কিন্তু কিছু কিছু লোক নিশ্চয় ইংরিজি ফরাসী জানে। রাস্তা ফের খুঁজে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

পল বললে, 'যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ততক্ষণে হয় জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

আরো অনেক অসুবিধার কথা উঠল। তবে মোট কথা এই দাঁড়ালো, 'একটা দেশের ভাষার এক বর্ণ না জেনে এতখানি কম সময় হাতে নিয়ে সে দেশে ঘোরাঘুরি করা কি সমীচীন? এতই যদি সোজা এবং সস্তা হবে তবে এতগুলো লোক কুকের ন্যাজ ধরে যাচ্ছে কেন? একা একা কিম্বা আপন-আপন দল পাকিয়ে গেলেই পারতো তাই দেখা যাচ্ছে আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক, নো গেন' প্রবাদে—অন্তত এক্ষেত্রে—'রিস্ক' ন' সিকে, গেম্ মেরে কেটে চোদ্দ পয়সা। রবি ঠাকুর বলেছেন,

'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।'

যদি আমাদের রিস্ক সাতান্ন আর গেন্ তিন-চল্লিশ হত তা হলে আমরা সোল্লাসে কানাইলালের মত 'ইয়াল্লা' বলে ঝুলে পড়তুম—যাচ্ছি তো মুসলমান দেশে।

তখন স্থির হ'ল, আবুল আসফিয়াকে পাকড়াও করে আরেক দফা সবিস্তর সওয়াল জবাব না করে কোনো কিছু পাকাপাকি মনস্থির করা যাবে না।

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধুয়া-তুয়া করে করে, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর আমরা আবুল আসফিয়াকে পেলুম উপরের ডেকের এক কোণে, আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে গান গাইছেন। আমাদের দেখে, আমাদের কিছু বলার পূর্বেই বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাইনে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারবো না। আমি কাইরো যাবো। তোমরা আসতে চাও ভালো, না আসতে চাও আরো ভালো।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো একটা শব্দ শুনতে পেলুম—শব্দটা ফার্সী, 'বুজ-দিল'—অর্থাৎ বকরির কলিজা, অর্থাৎ 'ভীতুরা সব।'

এই শান্ত প্রকৃতি সদাশিব লোকটির কাছ থেকে আমরা এ-আচরণ প্রত্যাশা করিনি। এ যেন সেনাপতির আদেশ, 'আমি তা হলে একাকী শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করবো, তোমরা আসো আর নাই আসো।' ত্রিমূর্তি লগুড়াহত সারমেয়বৎ নিম্ন-পুচ্ছ হয়ে স্ব-স্ব আসনে ফিরে এলুম। কারো মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে আহারাদি করে যে যার কেবিনে শুয়ে পড়লুম।

'সিংহের ল্যাজে মোচড় দিতে নাই,' কথাটি অতি খাঁটি, কিন্তু আবুল আসফিয়া সিংহ না মর্কট সেটা তো এখনো কিছু বোঝা গেল না। তাঁর আচরণ তেজীয়ান না লেজীয়ানের লক্ষণ তার তো কোনো হদীস্ পাওয়া গেল না।

১১

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে কেবিন ছেড়ে উপরে আসতেই দেখি হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! এক দল লোক আবুল্ আস্‌ফিয়াকে ঘিরে নানা রকমের প্রশ্ন শুধোচ্ছে। কুক কোম্পানি কাইরো দেখাবার জন্য চায় এক শ' টাকা, আর আপনি বলেন, পঞ্চাশ টাকাতেই হয়, সেটা কি প্রকারে সম্ভবে? আরেক দল বলে, তারাও আসতে রাজী, কিন্তু যদি স্যাৎ কোনো প্রকারের গড়বড়-সড়বড় হয়ে যায় আর তারা জাহাজ না ধরতে পারে তখন যে ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হবে তার কি সমাধান?

অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমাদেরই মত আমাদের গরীব সহ-যাত্রীরা জেনে গিয়েছে সস্তাতেও কাইরো এবং পিরামিড দেখা যায়। কাজেই এখন আর পল, পার্সি আমি, এই ত্রিমূর্ত্তি, এবং আবুল্ আসফিয়াকে নিলে চতুর্মুখ—এখন আর তা নয়, এখন সমস্যাটা সহস্রনয়না হয়ে গিয়েছে, জনগণমন সাড়া দিয়েছে।

আবুল্ আস্‌ফিয়া কেবল মাঝে মাঝে বলেন, 'হো জায়গা, সব কুছ হো জায়গা।'

হিন্দুস্তানী বলছেন কেন? তিনি তো ইংরিজী জানেন। তখন লক্ষ্য করলুম, যে সব দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের ভিতর রয়েছে ফরাসী, জর্মন, স্পেনিশ, রুশ আরো কত কি। এরা সবই বোঝে, এমন কোন ভাষা ইহ-সংসারে নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে মাতৃভাষায় কথা বলে যাচ্ছেন। ইংরিজী বললে যা, হিন্দুস্থানী বললেও তা। ফল একই।

এমন সময় আমাদের দলের সব চেয়ে সুন্দরী মহিলা মধুর এবং দরদভরা গলায় বললেন, 'মসিয়ো আবুল, যদি কোনো কারণে আমরা জাহাজ মিস্ করি তখন যে আমরা মহা বিপদে পড়বো। আপনি তো আমাদের কাউকে তার অনিচ্ছায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন না যে আপনাকে তখন জিম্মাদার হতে বলবো?'

ক্লোদেৎ শেনিয়ের যা বললেন, তার মোটামুটি অর্থ, 'আপনি যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তার জিম্মাদারী আপনার নয়, কিন্তু যদি কোনো রকমের বিপর্যয় উপস্থিত হয় তবে তার গুরুত্বটা আপনি ভালো করে বিবেচনা করে দেখলে হয় না কি?'

উপস্থিত সকলের মনোভাব মহিলাটি যেন অতি ললিত ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। সবাই চিৎকার করে সায় দিলে। আপন আপন ভাষায়।

ফরাসী দল—উই উই,
জর্মণ দল—ইয়া ইয়া,
ইতালীয় দল—সি, সি,
একটি রাশান—দা, দা,
গুটি কয়েক ভারতীয়—ঠিক হৈ, ঠিক হৈ,
পল পার্সি—ইয়েস, ইয়েস,

আমি নিজে কিছু বলিনি,—কিন্তু সে কথা যাক্।

আবুল্ আস্‌ফিয়া উত্তরে ঘাড় নিচু করে বললেন, "মৈ জিম্মেদার হুঁ।"

তাঁকে যদিও কেউ জিম্মেদার হবার সর্ত চায়নি তবু তিনি জিম্মাদার, এটা সম্পূর্ণ তাঁরই দায়িত্ব। [ক্রমশঃ।

নিজেকে গড়ো
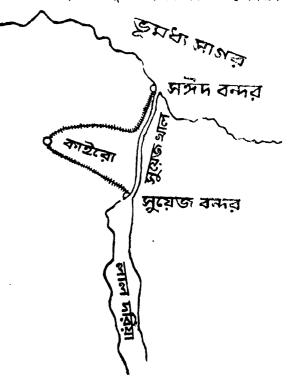
শচীন্দ্র মজুমদার

সকল সাধনাতেই দুঃখের সহিত আনন্দও আছে। যে সাধনাই আমরা করি না কেনো, তাতে নিহিত আনন্দের ইঙ্গিত না থাকলে মানুষ কোন্ কালে' এক বার দুঃখ পেয়েই সাধনা পরিত্যাগ করতো। সাধনার সফলতাতেই আনন্দ, কিন্তু সে আনন্দ দূরবর্তী। তা বলে দূরবর্তী হলেও সাধনার কালে কিছু রসের ছিটে-ফোঁটা আনন্দের উপলব্ধি নেই, এমন কথা নয়। এই টুকরো উপলব্ধিটাকে আমরা তৃপ্তি বলতে পারি। খেলার সাধনা, দেহ গঠন করার সাধনা, মনের ও আত্মার সাধনা—সবেরই আনন্দটাই লক্ষ্য। এক রকম খেলা ছাড়া বাকি সকল সাধনার সফলতা-আনন্দ দূরের। যে-খেলাটার হাতে-হাতে ফল সেটা সাধনা নয়, হিন্দি একটা চমৎকার কথায় তার বর্ণনা করবো, কথাটা "দিল্ বহ্‌লানা।"

এ খেলায় লঘু আরামের একটু উষ্ণতার সেঁক মনের ওপর দেওয়া। ছোট ছেলে যে অবিরাম খেলে, সেটা প্রকৃত খেলা নয়। তার প্রাণধর্ম তাকে সেই উদ্দাম অবসরহীন খেলার প্রয়াস দেয়। তার দেহের উৎকর্ষ, মনের বিকাশ, অনুভূতির কেন্দ্রগুলি এক এক করে স্ফুরিত হবার এবং তার আবেষ্টন ও জগতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য। ছোট ছেলের খেলা নয়, প্রকৃত পক্ষে সেটি তার জীবনের বিকাশ। তার খেলা ও বয়স্ক ছেলের লক্ষ্যশূন্য খেলা একেবারেই এক নয়। ছোট ছেলেটির খেলা তার নানা শক্তির স্ফুরণ করে কেন্দ্রীভূত করে, আর বয়স্ক ছেলের দিল্-বহ্‌লানা খেলা তার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। একটা হলো সংহতি, আর অন্যটা হোল অপচয়। যে ছোট ছেলে নিজের খেলা খেলতে পায় না, তার মতো বঞ্চিত আর কেউ নেই। যে-ঘরে ছোট ছেলের অঙ্গে খেলার ধূলো-কাদা লাগে না, আমরা ধরে নিতে পারি যে, সে ঘরে আনন্দ নেই, জীবন সেথায় পঙ্গু হয়ে গেছে। যে-খেলাটা সাধনা, সেটা দুঃখশূন্য নয়, কিন্তু তার ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় বলে অন্য সাধনার মতো দুঃখটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এ সকল সাধনাকে আমি যুবজনের ধর্ম বলবো। ধর্ম যদি সহজেই আমাদের করায়ত্ত হোত, তাহলে কেউ আর তাকে অনুসরণ করতো না। ধর্মতে মায়ার, অপসরণের, ছলনার একটা রূপ আছে। সেটা কখনো আমাদের পিছনে, কখনো বা সম্মুখে অবস্থিত। ঈশ্বর-চিন্তার বিষয়ে এই প্রবৃদ্ধ পৃথিবীতে আজও কেউ শেষ কথাটি বলে যেতে পারেননি, তবুও এখনো মানুষ সেই সাধনাটি পরিত্যাগ করেনি। আমরা এই মায়া-সাধনাটিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে গ্রহণ করি এই জন্য যে, সে-সাধনা সাধকের জীবনকে অত্যুন্নত করে আমাদের চোখের সামনে ধরেচে।

আমি যে সব ছোটখাটো সাধনা বা ধর্মের কথা বলছি, তাদেরও তেমনি একটা মায়া, ছলনা ও অপসরণের দিক আছে। আয়ত্ত করবো মনে করলেই সে সব আয়ত্ত করা যায় না, কিন্তু শেষ প... অবিরাম আত্যন্তিক প্রয়াসের দ্বারা করা যায়। এ সাধনা... মানে নিত্য অভ্যাস—উগ্র উষ্ণ চেতনা দিয়ে অভ্যাস শুধু অভ্... নয়। দায়িত্ব বা রেসপন্‌সিবিলিটির অর্থটা ব্যাপক, কিন্তু কথা... অন্তরে আছে একটা চেতন আগ্রহ, হৃদয়ের উষ্ণতা। আগ্রহ... উষ্ণতাশূন্য হয়ে দায়িত্ব পালন করা যায় না। করলে কর্তব্যে... নিয়মটা মানা হয় বটে, কিন্তু তাতে তোমার প্রাণশক্তি নি... হয় না। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের এই জী... ব্যবহারিক সংসারে আমাদের অনেক প্রাণহীন শুকনো কর্তব্য ক... হয়। তাতে আর কিছু না হোক, সত্যের এবং আমাদের নৈ... জীবনের বিপুল ক্ষতি হয়।

সাধনা যদি ধর্ম হয়, তাহলে সেটিও শাস্ত্রগত ধর্ম এ... কোন ধর্মই পালিয়ে গিয়ে হয় না। তোমরা নিশ্চয়ই জীবন-ম... জানো, "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" সন্ন্যাস... পালিয়ে গিয়ে বৈরাগী হোন গে, কিন্তু তোমার তো বৈ... হবার উপায় নেই! নিজেকে জানতে, নিজেকে গড়... সংসারের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হতে গেলে বৈরাগ... বিন্দুমাত্র স্থান নেই। নিজেকে অজেয় করতে গেলে বৈর... বস্তুটা তেমন কাজে লাগে না। ধর্মাচরণ করার বিষয়ে কবি... কি বলেছেন শোন। তাঁর উক্তি শাস্ত্রগত ধর্মের বি... হলেও তোমার ধর্মের বিষয়েও প্রযুজ্য।

"কারো কারো পক্ষে ধর্ম জিনিষটা সংসারের রণে ভঙ্গ দি... পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া... যে-ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন কি গৌরব আছে। অর্থাৎ স... থেকে, জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্মের দায় চো... ধর্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পা... জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সং... কতকগুলি রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে... তাই পান করে জগতের আর সমস্ত ভুলে থাকতে চান। ... এক দল এমন একটি শান্তি চান, যে-শান্তি সংসারকে বাদ দি... আর অন্য দল এমন একটি স্বর্গ চান যে-স্বর্গ সংসারকে ভুলে গি... এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্মের পথ বলে মনে করেন।

"আবার এমন দলও আছেন, যাঁরা সমস্ত সুখ, দুঃখ, দ্বিধ... সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থ লাভ কর... ধর্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দে... তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না, যে-অর্থ তাকে ওতপ্রোত করে এবং সকল দিকে অতিক্রম করে ... করচে। অতএব কোন অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয়, সর্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁ... বলে জানেন।"

তোমার সংস্কারের কথাটি জানলে এবং তা দিয়ে নি... নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারলে তুমি সংসার... পালাতে চাইবে না। তোমার নিজের অন্তরের সত্যটিকে ... করে বরং সচেতন হয়ে উঠবে। মানচিত্র দেখে যেমন ভূপৃ... পরিচয় পাওয়া যায়, তোমার সংস্কার ও সম্ভাব্য-শক্তির মা...

নিজের প্রকৃতি ও উৎকর্ষের সন্ধানটি পাবে, এবং তোমার অপচয় কোথা দিয়ে হতে পারে তা-ও জানতে পারবে। অপচয়ের যেমন, উৎকর্ষেরও তেমনি সম্ভাবনা তোমার মধ্যে সুপ্ত হয়ে রয়েছে। উৎকর্ষ ও উর্দ্ধপরিণাম সাধনা অন্তর্জগতের কথা, সেটি ভিন্ন বিষয় বলে আমি এখন তার আলোচনা করচি না। আর কিছু না হোক, এ আত্ম-পরিচয় লাভ করে নিশ্চয়ই তুমি নিজের অপচয় নিবারণ করতে পারো। অপচয়ের পথগুলো বন্ধ হলে শক্তি সংগ্রহ করা সহজ হয়।

তার দুর্গতি নিবারণ করতে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন। আমার লুই পাস্তরের কথা মনে পড়ে গেলো। পাস্তর আইনজীবী ছিলেন, কিন্তু পাগল কুকুরের বিষে মানুষের দুর্গতি তার মাতৃত্ব সংস্কার, অর্থাৎ মানুষের প্রতি করুণাকে উদ্বেল করে তুলেছিলো। তিনি সে-বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণীকেও রক্ষা করে গেছেন। কিন্তু পাস্তরের আবিষ্কার যদি কেউ লোভপরবশ হয়ে অপব্যবহার করে

অপকর্ষ	বিপ্লব	অতীন্দ্রিয়তা	শিল্পগহনতা	যান্ত্রিকতা	
সংস্কৃতি জনিত লাভ	সমাজবাদ	দর্শন	আর্ট	বিজ্ঞান	উদগতি
অনুভূতি ↑	জাতীয়তা	ধর্মপ্রবৃত্তি	প্রেমাবেশ	বন্ধুত্ব বা মৈত্রী	↑
সংস্কার	সংগ্রাম	আহার	যৌনতা	মাতৃত্ব	
ব্যভিচার বা অপচয় ↓	স্বেচ্ছাচারিতা	লালসা	কামশক্তি	বিশ্ববৈরিতা	↓ অধোগতি
	১	২	৩	৪	

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্কারটি সর্বগত, অন্য দুটি সংস্কার মানব-সমাজে অত্যন্ত ব্যাপক হলেও সর্বগত বলে ধরা যায় না। আহার থেকে ধর্মপ্রবৃত্তির উদ্গতি কেবল ধর্মের আচারের বেলায় সত্য। আমাদের শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দেবতার প্রসাদ-প্রার্থনায় আহার্যের নৈবেদ্য দেওয়া আছে। সংস্কারগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেখতে হয়েছে বলে কোন একটিরই যে উদ্গতি হয় তা নয়। সংস্কারে সংস্কারে মিলন হয়, সে মিলনের ফলও আছে। ধর্মের সঙ্গে মাতৃত্ব সংস্কারটি জড়ানো আছে। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য ছকটার সাদামাটা রূপ ও অর্থ যথেষ্ট। কাজেই এক নজরে তোমার যে সহজ অর্থটা মনে হবে, আপাতত সেইটুকু জানলেই হোল। অল্প কথায় মানুষের সংস্কারের তথ্যটি বোঝানো অসম্ভব। কেবল মাতৃত্বের বিজ্ঞানে উদ্গতি কেনো, সে কথাটা বলতে হবে। আমাদের অনেকের মধ্যে মাতৃত্বের সংস্কার আছে, দয়া, করুণা, স্নেহ ইত্যাদিতে তার প্রকাশ। তুমি যদি হঠাৎ কোন অক্ষমকে সাহায্য করবার পীড়া অনুভব করো, তোমার মাতৃত্ব সংস্কার তার কারণ। মা যেমন সন্তানকে রক্ষা করেন, এই সংস্কারটির প্রকৃতি ঠিক তেমনি। এর প্রথম উদ্গতি মৈত্রীতে। আরো ব্যাপক হয়ে এ সংস্কারটি ধর্মে গিয়ে পড়ে। বিপুল স্নেহ, ভালবাসা, করুণা দিয়ে ধার্মিক সকল জীবকে রক্ষা করতে চান। জীবে দয়া করা মাতৃত্বের ব্যাপক রূপ। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, বিবেকানন্দের দুর্গতের চিন্তায় মাতৃত্ব সংস্কার পরম প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম ছাড়া এ সংস্কারটির সোজাসুজি একটা উদ্গতি আছে, সেটি বিজ্ঞান। বিশ্বের দুর্গতি নিবারণ করা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর লক্ষ্য। মাতৃত্ব সংস্কারের কারণেই মানুষকে ভালোবেসে তাকে রক্ষা করতে,

তখন বিজ্ঞানের অপকর্ষ ঘটে। বিজ্ঞানের এ অপকর্ষ নিত্য ঘটচে।

সংস্কারগুলি মানুষের উদ্গতি অধোগতি দুইয়েরই উৎস। ইতর প্রাণীর মতো মানুষ নিছক মূল সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে না, তাকে উপরে উঠতে বা নিচে নেমে যেতে হয়। অধোগতিটাই বেশি, তাই মানুষের এতো অপচয়, এতো ক্লেশ। যদি তুমি জানতে পারো যে, তোমার ইস্কুল যাবার পথে এক স্থানে একটা পাগল কুকুর আছে, নিশ্চয়ই তোমার সে-পথটা দিয়ে আনাগোণা করা নিরাপদ বলে মনে হবে না। যদি এই ছকটাকে মনে রাখো তাহলে তোমার জীবনপথের আঁকে-বাঁকে যে পাগল কুকুরের ভয় আছে, তার বিষয়ে সচেতন ও সাবধান হতে পারবে। নাবিক নিজের জাহাজের ও নিজের কৌশলের শক্তি জানে, তবুও সে বেপরোয়া হয়ে জলাকীর্ণ সাগরের যেথা-সেথা পাড়ি দেয় না; তাতেও সে পথ নির্দ্দিষ্ট করে নিয়েছে! সাগর-পথে যেতে সে দিক্ নির্ণয় করবার জন্য কম্পাসের সাহায্য নেয়; বিপদশূন্য পথ ধরে যাবার জন্য কতো মানচিত্রের ওপোর নির্ভর করে। আমাদের জীবনযাত্রাটাই বা কম্পাসশূন্য ছক-শূন্য হবে কেনো? সেটা তো কম জটিল, কম অজ্ঞাত নয়!

তোমাদের ঘরছাড়া হবার কাল এসেছে। কালের কৃপায় আমরা স্বগৃহে জীবন কাটিয়ে গেলুম। তোমরা যারা আমাদের সন্তান, তোমাদের জীবনে আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ এসেছে। কালপ্রবাহে পিতা-পিতামহদের ঘর থেকে তোমাদের দূরে নিয়ে যাবেই। তোমাদের ঘর ছাড়ার চেয়েও বড়ো দুঃখ জীবন-সংগ্রাম। সাড়ে নিরানব্বই জন বাঙালীর ঘরে অন্ন নেই। যখন যুদ্ধ করে

অন্ন-সংগ্রহ করতেই হবে, তখন যুদ্ধ করবার মতো শক্তি সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনো গতিও নেই। ছেলে-বেলায়, স্বদেশী যুগে আমরা অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের গান গেয়ে বেড়াতুম :—

তাই ভালো মোদের ঘরের শুধু ভাত
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব
মা'র বাগানের কলাপাত।

আজও গানটা মনে হলে বেদনা লাগে। ওই ন্যূনতমটুকুও আর আমাদের নেই। আমাদের ঘরের ভাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘি-সৈন্ধব তো এখন ভোজন-বিলাস। "ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ" এর নিরাপত্তা আজ আমাদের স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা। সে নিরাপত্তার সংসারের "বাঙালীর বধূ বুক-ভরা মধু" আর নেই, আজ মধুর বদলে আছে অনশনের, অর্দ্ধাশনের হলাহল। যুদ্ধ করে অন্ন সংগ্রহ না করে আর উপায় নেই। মলিন মুখে দয়ালু জনের কাছে অন্নভিক্ষা চাইলেও আর অন্নদাতা নেই। সংসারটাই যখন ওলট-পালট হয়ে গেছে তখন তোমাদের পুনর্নির্মাণ করা দরকার হয়েছে।

জেনো রেখো যে, ভরাপেট ভিন্ন কিছু হয় না। বহুকাল আগে বুদ্ধ কৃচ্ছ্রসাধন করে সে কথাটা খুবই অনুভব করেছিলেন, তাই খালিপেটে সাধনার পথটা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। একদা আমি এখানকার একটা পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, দেখি এক ছোকরা সন্ন্যাসী দু'টি হাত ওপর পানে তুলে চীৎকার করতে করতে চলেছে :

ভোজন বিনা ভজন কঁহা নন্দলালা!
যহ লে কণ্ঠি, যহ লে মালা!

ভজনের অলঙ্কার কণ্ঠি ও মালা নিজের গলা থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ছোকরা সংসারকে জানাচ্ছিলো যে, খালিপেটে ঈশ্বরচিন্তা করা অসম্ভব কথা। অন্নহীনের যে আর্ট বলপ্রদ হতে পারে, সে কথা তোমরা ভুলে যাও ; তা কোনো কালে হয় না। খালিপেটে যা করতে যাবে, তাতে প্রাণ থাকবে না। হতাশার কাঁদন মাখানো থাকবে শুধু।

আমার মতে আর একটা কথা বহু কাল পূর্বে বলা উচিত ছিলো। আমি অপেক্ষা করেছি অনেষ্ট ও নির্ভীক চিত্ত কেউ যদি তা বলে। কারণ, কথাটা রুক্ষ রুক্ষ বলে আমি তা বলতে চাই নি। এ কথা বলবার আগে বলে রাখি যে, আমি সাংখ্যযোগ ইত্যাদিতে ভক্তিমান, আস্থাবান। আমি অনেক যুবককে ধর্ম-সাধনার একটা মিথ্যা মুখোস পরে নিষ্ক্রিয় পলায়নপর হতে দেখি। শক্তি সাধনায় দৃঢ় না হলে কোন ধর্মে প্রবেশ করা যায় না। আমাদের এই ব্যাপক অবিদ্যার দেশে বেদ-বেদান্ত আর মানুষকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম নন। কিছু দিন তাঁদের এখন তাকে তুলে রাখার দরকার হয়েছে।

দুঃখের কাল যখন আসে, কবি তখন বলতে বাধ্য হন—

থাক বীণা বেণু মালতী মালিকা
পূর্ণিমা নিশি মায়া কুহেলিকা—

কবির তালিকায় আমি ব্রহ্মন্, আত্মন, পুরুষ, প্রকৃতি, Cosmic-Consciousness, Super-Consciousness, Super mental light প্রভৃতি আধুনিক ভাবদুষ্ট কথাগুলো যুক্ত করে দিতে চাই। এ সকল ধরতাই বুলির কাছ থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। পণ্ডিতম্মন্যের ধরতাই বুলি, বিষয়ান্তর না হলে তা প্রমাণ করা কঠিন নয়। আপাতত এইটুকু বলা যথেষ্ট যে, যা তোমার কাছে অর্থহীন শব্দরাশি তা গ্রহণ করতে নেই, করলে মহামিথ্যার জালে জড়িয়ে যেতে হয়। সে ভাণ তোমাকে নিষ্ক্রিয় করে, পালাবে কোথায়! মানুষ মাত্রই চিত্রিত-চিন্তা করে। যে ধারণায় চিত্র তার মনে জেগে ওঠে, সে কেবল সেইটাই বুঝতে পারে। প্রকৃত উচ্চাঙ্গের সাধক না হলে ওসব কথায় চিত্রিত-চিন্তা হয় না। সহস্র বার আমি ও সব ধ্যান করবার চেষ্টা করে দেখেছি। যাঁরা ওসব কথা বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কাছেও ও সব অর্থহীন। কারণ, তাঁরা বলেন বটে, কিন্তু জানেন না। কারণ তাঁরা সাধক নন, কেবল মননশক্তি-সার পণ্ডিত। মননশক্তি দিয়ে এ সব অনুভব করা অসম্ভব। উপনিষদ, পাতঞ্জলসূত্র ইত্যাদি সমাধিপ্রজ্ঞা, সমাধিলব্ধ জ্ঞান বলে শুনি। যাঁর প্রতিভাজ্ঞান হয়নি, সমাধি যাঁর অজ্ঞাত, তাঁর মুখে এ সকল কথা সাজে না। তাঁরা এ সব প্রচার করতে গিয়ে ভাণের ও অধ্যাসের সৃষ্টি করেন শুধু।

বুদ্ধকে এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি নীরব হয়ে থাকতেন, উত্তর দিতেন না। এ প্রসঙ্গে চৈনিক ঋষি লাওৎ-জু বহু শতাব্দী পূর্বে বলে গেছেন, "যারা জানে না, তারা এ বিষয়ে কথা কয় ; যারা জানে তারা কয় না।" বিবেকানন্দ তাই বলতেন যে, গীতা পড়ার চেয়ে ভাত হজম করতে পারা, ফুটবল খেলতে জানা ঢের পুণ্যের কাজ। উপনিষদেই বলা আছে দেখি, 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' অর্থাৎ আত্মাকে বহু শাস্ত্র পড়ে বা মনন শক্তি দিয়ে, বা বহু তর্কবিচারের দ্বারায় পাওয়া যায় না।

শঙ্করাচার্য যাই বলে যান, তিলে তিলে মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চ আমাদের এই সাধারণ বাঙালীর সংসারটা মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, প্রপঞ্চ নয়। সেটা নিশ্ছিদ্র পাষাণে-গড়া নির্মম নিরেট বাস্তব। মানুষের দেহটাও বাঁধা নয়। তোমাদের অধ্যাত্মবিলাস, চিন্তাবিলাস আপাতত আলমারীতে তুলে রাখো। তার স্থানে বাঁসমতী, দেরাদুন চালের অনুসন্ধান করা তোমাদের ধর্ম হোক। স্বরূপসন্ধান ধর্ম হোক। তোমার স্বরূপে বিপুল শক্তি গোপন রয়েছে, তাকে খুঁড়ে বার করতে হবে। আর ধর্ম হোক—ভোগ। ভোগ না হলে জীবনের ফুল ফোটে না। অন্নহীনের আবার ত্যাগ কি? সেটা হাসির কথা। যাজ্ঞবল্ক্য শুনি অতিশয় ধনী ছিলেন। শঙ্করাচার্য এক রাজার শরীরে প্রবেশ করে কিছু কাল ভোগে বেশ মত্ত হয়েছিলেন, এমন কথা আমি পড়েছি। এই বাংলা দেশেরই এক ধর্ম সম্প্রদায় একদা একসঙ্গে ভোগ ও ত্যাগের ঘোড়া জুতে জুড়ি-গাড়ী চালাতো। স্বরূপ জেনে উচ্চতর মানুষ হয়ে মূল্য নিরূপণের দ্বারা যেদিন তুমি ভোগকে বাহ্য বলে হেলায় বর্জন করবে, তখনই সেটা বীর্যবানের ত্যাগ হবে। বঞ্চনা ত্যাগ নয়, ধর্মের অঙ্গ নয়। আর যাই শেখো, আত্মপ্রবঞ্চনা শিখে শক্তিহীন অবশ হয়ো না। জীবনের কাছে মুক্তি ভিক্ষা চেয়ো না, তাকে লুঠ করে নেবার সঙ্কল্প করো।

হলেই বা গৃহছাড়া, স্বদেশ ছাড়া, ভয় কিসের! তুমি বাইবেলের গল্পটা নিশ্চয়ই জানো যে, আদম ও ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন

বলে তাঁদের স্বর্গোদ্যানচ্যুত হতে হয়েছিলো। কিন্তু তাতে তাঁদের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁরা স্বর্গোদ্যানের বদলে সমগ্র পৃথিবীটাকে লাভ করেছিলেন; তাঁদের সন্তান-সন্ততি পৃথিবীটাকে অধিকার করল। গৃহছাড়া হও, গৃহপুটের আশ্রয়চ্যুত হও, তুমিও পৃথিবীর অধিকার পাবে। আমরা বড়ো ঘর-কুণো। পঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশে আমি অনেক বাঙ্গালী যুবজন দেখেছি যারা নিজেদের চিরপ্রবাসী বলে মনে করে কোনো কিছু গ্রহণ করতে পারে না। পৃথিবীটা গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ারই। মানব-ইতিহাসে লক্ষ্মীছাড়াদের দান অপরিমেয়। ইংরেজের সাম্রাজ্যের বুনিয়াদটা অসংখ্য ঘর-পালানে লক্ষ্মীছাড়াদের হৃদয়-শোণিত দিয়ে গঠিত। কতো ভবঘুরে, কতো জাতির লক্ষ্মীছাড়ারা পৃথিবীর সভ্যতাটাকে পুষ্ট করেছে, ইতিহাসে তাদের সকলের নাম অঙ্কিত নেই। আমাদের দেশ বিভাগের পূর্বে যদি বাংলার বাইরে পেশোয়ার পর্যন্ত ঘুরে আসতে এবং চোখ দিয়ে দেখতে ও কান দিয়ে শুনতে তাহলে বুঝতে যে, ঘর-পালানে গৃহচ্যুত আগেকার বাঙালী বাংলার বদলে বৃহত্তর ভারতকে পেয়েছিলো কি না। ইতিহাস মাঝে মাঝে নিজের শ্লেটটা মুছে পরিষ্কার করে নেয় বোধ করি; বাঙালীর সেই অতুলনীয় কীর্তির অনেকখানি আজ মুছে গেছে। ইংরেজ যেমন জঙ্গলে বাস করলেও সেখানে ছোট একটি নিজস্ব ইংলণ্ড গড়ে নেয়, এই সব বাঙালীরাও নিজেদের ঘিরে ছোট ছোট বঙ্গভূমি স্থাপন করেছিলো। লাহোর, রাওলপিণ্ডি এখানে-ওখানে দু'-চারজন কৃতী বাঙালীর নাম স্মরণীয় করে রাখা ছিলো, কিন্তু অধিকাংশের নাম লুপ্ত হয়ে গেলেও তাদের কীর্তি বিলুপ্ত হয়নি। তারা শুধু ঘর, বাড়ী, মন্দির গড়েনি, তারা বিদ্যাদান করেছিলো, সে অবাঙালীর দেশেও বাঙালী সংস্কৃতির ছাপ রেখে গিছলো। হেসো না যেনো, সন্দেশ-রসগোল্লা বাঙালীর খুব বড় সংস্কৃতি। রসগোল্লা দিয়ে ভারত-বিজয় বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয়ের চেয়ে কম গুরু নয়। সুদূর শিয়ালকোটেও আমার রসগোল্লার অভাব হোত না; লাহোরের তো কথাই নেই। ইতিহাস লিখতে হলে আমি বলতে পারতুম, এ দেশে খেলা, আর্ট ও সংস্কৃতিতে বাঙালী মনীষা কেমন ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো।

দেশ নিজস্ব হয়ে আজ তো তোমাদের সকল দরজা খুলে গেছে। এখন ঘর ছেড়ে বৃহত্তর ঘরকে পাবার অনেক সুযোগ। কিন্তু তা গ্রহণ করা অক্ষমের ক্রন্দনবিলাসীর কর্ম নয়। সেই এ অধিকার সার্থক করতে পারে, যার আত্মা অজেয়। আত্মাকে অজেয় করা যায়। আত্মা তেজ তোমার দেহবহির্ভূত কোন অপ্রকৃত বস্তু নয়। তোমার ওই দেহটাকে মহান বলে জানো; সকল শক্তির অমন আধার আর নেই। তোমার জীবনের এক মাত্র আধার ঐ। বৈদান্তিকেরা দেহকে তুচ্ছ করেন তাঁদের খুশি মত। কিন্তু বাংলা দেশের অন্য সাধকেরা বলে গেছেন যে, এই রক্ত-মাংসের দেহটাই সাধনালব্ধ ঊর্দ্ধ পরিণামে সহজ দেহ হয়, শিবতনু হয়। এই দেহটাই জীবন-নদীতে পাড়ি দেবার একমাত্র তরণী। আত্মা তেজ তোমারই আত্মশক্তির চরম পরিণাম। আপাতত মননশক্তির উৎকর্ষ সাধন করা তোমার এইক্ষণের কাজ। এইটুকু এখন কেবল জেনে রাখো যে, মননশক্তিটা খুব বড়ো জিনিষ নয়। ওটার সীমা ছাড়িয়ে চেতনায় গিয়ে পড়তে হয়। না হলে আত্মজয় হয় না, ঊর্দ্ধ পরিণাম অসম্ভব। চেতনা সাধনা-লভ্য। যতক্ষণ না তুমি চেতনার দেখা পাও ততক্ষণ তোমার আত্মা বলে কিছু নেই। চেতনার সাক্ষাৎ না পেলে শক্তিকে পাওয়া যায় না। দেহকে তুচ্ছ করে আত্ম-তেজ গড়া যায় না। কিন্তু আত্মা দেহস্থিত বস্তু হলেও দেহ-ছাপানো।

রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কান্তিমান শক্তিমান দেহের অধিকারী ছিলেন। গান্ধী মহারাজকে দেহের দিক দিয়ে ভঙ্গুর মনে করা বিষম ভুল হবে। তিনি সহজ-দেহ লাভ করেছিলেন। তাঁদের দু'জনের শক্তি চেতনা সম্ভূত। সেই প্রভাবে তাঁদের দেহও ঊর্দ্ধপরিণাম লাভ করেছিলো। বিরাট মানব যাঁরা দেহ তাঁদের পায়ের ভৃত্য। দেহ সহজ না হলে পায়ের ভৃত্য হয় না। এ শক্তির তুমি সাধনা করতে পারো; লাভ করতে পারাটা সাধনার ওপর নির্ভর করে। ঐ দুটি মহামানবের উদাহরণ এইজন্য দিলুম যে, সাধনায় আত্মা অপরাজেয় ও তেজ অপ্রতিহত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী একদা তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঘর ছাড়তে গেলে অজেয় আত্মা, অপ্রতিহত তেজের আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। তাদেরই বলে ঘর ছেড়ে বৃহত্তর ঘরকে অধিকার করা। স্বগৃহবাসী হয়ে আমরা ছোট এতটুকু একটি গাছের মতো। আমাদের শিকড় মরশুমী ফুলের গাছের মতো এতটুকু জমিতে, ভূপৃষ্ঠের একটুখানি নিচে। ঘরছাড়া জজের যে সে বট-অশ্বত্থের মতো সারা ভারতে নিজের শিকড় বিছিয়ে দিয়েছে, তার মূল শিকড়টি আজ সুদূর বাংলায়। সেই দেশেরই দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা থেকে প্রাণরস আহরণ করে সে গাছ পুষ্ট সমৃদ্ধ হচ্চে। আমি বাংলা দেশ থেকে দূরে থাকি বলেই এই নিবিড় নাড়ির যোগটুকু আমার সকল সত্তা দিয়ে অনুক্ষণ বুঝতে পারি। সে দুর্বল অচেতন, শুধু নিজের জৈবজীবনেই অতিষ্ঠ, সে এ কথাটা বুঝতে সক্ষম নয়। [ক্রমশঃ।

কি ছিলাম, কি হয়েছি, কি হবো

(তুরস্কের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

রাজার মনে সুখ নেই। হয় না, হয় না করে যদিও বা একটি মেয়ে হলো তা-ও গা-ভর্ত্তি ক্ষত অর্থাৎ ঘা। কত ডাক্তার, কত বদ্যি সব হার মেনে গেল, কিছুতেই অসুখ সারে না! একমাত্র মেয়ে, রাজার মনে তাই দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। রাজা মেয়ের কুৎসিত চেহারাকে সুন্দর আর দামী দামী পোষাক দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইলেন। তাই মেয়ের গায়ে নানা রকম দামী পোষাক আর গয়নার স্তুপ হয়ে উঠলো। কিন্তু তাহলে কি হয়—মনের দুঃখ আর কারোর যায় না।

এই ভাবে দিন কাটচ্ছে—এমন সময় এক ঘটনা ঘটলো। এক দিন এক বুড়ী সদর রাস্তা দিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে। 'অসুখ ভাল করি, গায়ের ঘা ভাল করি, সব রকম রোগ সারাতে পারি'। তার কথা সবাই শুনতে পেলো, আর শুধু শুনলো তাই নয়, রাজ-বাড়ীর লোকেরা রাজকন্যার কথা ভেবে রাজাকে গিয়ে খবর দিল এই রকম একজন বলছে, রাজকন্যার জন্য তাকে ডাকা হবে কি না।'

রাজা ভাবলেন মন্দ কি! কিছুতেই যখন অসুখ সারছে

না, সব ডাক্তার-বদ্যি হার মেনে গেল তখন এর কি ওষুধ, এক বার দেখাই যাক। তাই তিনি বুড়ীকে ডেকে পাঠালেন।

বুড়ী ভারী চালাক। বললে: অসুখ, তো ভাল করবো মহারাজ, কিন্তু তিন দিন সময় চাই। আর এই তিন দিন আমি রাজকন্যাকে নিয়ে যে ঘরে থাকবো, সে ঘরে কেউ যেতে পারবে না।

রাজা বললেন: তাই হবে, তিন দিনই সময় পাবে, কিন্তু অসুখ সারানো চাই।

বুড়ী বললে: দেখে নেবেন, নিশ্চয়ই সারাবো। রাজার আদেশ মত তাই রাজকন্যাকে বুড়ীর সঙ্গে একটা ঘরে দেওয়া হলো। আর বুড়ীও ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল।

তিন দিন বাদে দরজা খুলে দেখা গেল, ঘরে কেউ নেই। বুড়ী তো নেই, আর রাজকন্যারও কোনো চিহ্ন নেই।

এ দিকে হয়েছে কি—বুড়ী ছিল এক ডাইনী। সে ঘরে দোর বন্ধ করে রাজকন্যাকে খুব মারধোর করে—ভালো ভালো জামা-কাপড়, গয়না সব কেড়ে নিয়ে তার ঝোলায় ভরে—আর তাকে জানলা দিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল।

নীচে পড়ে রাজকন্যা তো অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে গেল। তার পর অনেকক্ষণ বাদে যখন জ্ঞান হলো—তখন রাতের অন্ধকার নেমেছে, কোনও পথ ঠিক করা যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে সেই অন্ধকারে রাজবাড়ীর দরজা চিনবার চেষ্টা করে চলতে শুরু করলো। পথ আর শেষ হয় না। যত চলে ততই বন আর জঙ্গল, রাজবাড়ীর দরজা তো মিললোই না। এমন কি কোথায় সে এসে পড়েছে তা বুঝতে পারলো না। সারা রাত ধরে পথ চলে যখন সকাল হলো, তখন রাজকন্যা দেখলো যেখানে সে এসেছে সে সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা জায়গা। ক্ষিদে-তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে, পথ চলতেও পারছে না। দূরে একটা নদী দেখতে পেয়ে রাজকন্যার পিপাসা আরো প্রবল হয়ে উঠলো। কোন রকমে দ্রুত পা ফেলে নদীর ধারে গিয়ে আঁজলা করে জল তুলে খেয়ে তার পর সেইখানেই বসে পড়লো। ভোরের হাওয়ায় মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে—ভাবছে এবার সে কোথায় যাবে আর কি করবে।

ভাবতে ভাবতে গায়ের দিকে চোখ পড়লো: ও মা! এ কি একটিও ঘা নেই যে, তার অমন বিচ্ছিরী দেহ কী সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে! নদীর জলটা কী সুন্দর, তার সব রোগ ভালো হয়ে গেল! রাজকন্যার খুব আনন্দ হলো, কিন্তু ভাবনাও হলো খুব—এখন সে কোথায় যাবে, কি করবে, এই চিন্তাই প্রধান।

কিছুক্ষণ বসে থেকে তার পর ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করলো। কিছু দূর এগিয়ে দেখলো, এক জন বুড়ো লোক চাষের কাজ করছে। তার কাছে গিয়ে রাজকন্যা বললে: আমাকে একটু আশ্রয় দেবে বাবা? আমার কেউ নেই যে আমায় দেখে, তোমার মেয়ে মনে করে যদি আমায় তোমার বাড়ীতে স্থান দাও।

বুড়ো কৃষক খুব খুসী হয়ে বললে: নিশ্চয়! চলো আমার সঙ্গে, আমায় যখন বাবা বলেছ—আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে।

রাজকন্যা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে কৃষকের বাড়ী গেল। কৃষকের বৌ, ছেলে-মেয়ে সকলেই তাকে খুব আদর যত্ন করে ডেকে নিল।

এখানে বেশ সুখে আর আরামে থাকতে থাকতে অনেক দিন কেটে গেল। কৃষকের বৌ তার বড় ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার বি[য়ে] দিয়ে দিল।

এই ভাবে অনেক দিন চলে গেল—রাজকন্যার তিনটি ছে[লে] হয়েছে। রাজকন্যার শাশুড়ী বললে: এই তিন ছেলের নাম কি রাখা হবে? তাদের মা নাম রাখলো 'কি ছিলাম', 'কি হয়েছি' 'কি হবো।'

সবাই বললে: এ আবার কি নাম?

রাজকন্যা বললে: খুব ভাল নাম হয়েছে।

ছেলেরা ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগলো—তার পর তারা বাবা কাকা আর দাদুর মত ক্ষেত-খামারের কাজে লেগে গেল। কৃষকে[র] ঘর, তাই এসব কাজই তাদের; তাই তারা শিখতে লাগলো।

এই ভাবে বেশ কিছু দিন কেটে গেল। এক দিন ছেলেরা তাদে[র] বাবা আর দাদুর সঙ্গে মাঠে কাজ করতে করতে দেখলো—ঘোড়া[য়] চড়ে কয়েক জন লোক এই দিকে আসছে। এদিকে তখন রাজকন্[যা] দাসীর সঙ্গে ছেলেদের স্বামীর আর শ্বশুরের জন্য দুপুরের খাবার দাবার নিয়ে এসেছে আর তাদের খাবার বন্দোবস্ত করছে।

ঘোড়ায় চড়ে যে লোক প্রথমে আসছিল রাজকন্যা দূর থেকে তাকে দেখেই চিনতে পারলো যে, এই হলো তার বাবা—নিজে রাজা। কিন্তু কিছুই না বলে সে স্বামী ও ছেলেদের বললে: ঘোড়া[য়] চড়ে যাঁরা এসেছেন তাঁরা আজ আমাদের অতিথি—কাজেই ওঁদে[র] ডাকো, কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করো আর তোমাদের সঙ্গে যে[তে] বলো।

বিদেশী লোক, তাই তারা ওঁদের ডেকে অভ্যর্থনা করলো। সবাই মিলে যখন খেতে বসেছে—তখন রাজকন্যা বড় ছেলেকে ডে[কে] বললে: কি ছিলাম, রাজাকে কফি দাও ভাল করে তৈরী করে।

একটু পরে আবার বললে: কি হয়েছি, তুমি দেখ রাজার যে[ন] কোনো অসুবিধা না হয়। এই মাঠের মাঝখানে খেতে ওঁর খুব ক[ষ্ট] হচ্ছে নিশ্চয়।

আবার একটু পরে গাছ থেকে কতকগুলো টাটকা ফল পেড়ে এ[নে] ছোট ছেলেকে বললে: কি হবো, তুমি রাজাকে এই ফলগুলি দাও।

ছেলেরা যখন মায়ের কথা মত কাজ করতে রাজার কা[ছে] এগিয়ে গেলো তখন রাজা অনেকক্ষণ ধরে তাদের দেখে বললেন: আমি এত কাল ধরে রাজত্ব করছি—কিন্তু এমন অদ্ভুত নাম কারু কখনও শুনিনি। তারপর বুড়ো কৃষককে ডেকে বললেন: এম[ন] নাম রেখেছ কেন?

কৃষক বিনয় করে বললে: মহারাজ, আমি তো এ না[ম] রাখিনি, আপনারই কন্যা তার ছেলেদের এই নাম রেখেছে। এ[ই] যে আপনার মেয়ে, জামাই আর এই তিন জন আপনার নাতি।

রাজা খুব অবাক হয়ে গেলেন। তার পর মেয়ের কাছে আ[র] কৃষকের কাছে সব শুনলেন।

অনেক দিন পরে হারানো মেয়েকে পেয়ে রাজার আনন্দে[র] সীমা রইল না। কৃষককে অনেক ধন্যবাদ দিলেন তার পর—মেয়ে[,] জামাই, নাতিদের—বেয়ান-বেয়াই সব সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজে[্য] ফিরে গেলেন আর মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

নাতিদের নামগুলো বদলানো হয়েছিল কি না, সে খবর কি[ন্তু] আমি জানি না।

কোন মেয়েগুলি সব
চেয়ে সুন্দরী?
আর জিতে নিন্
প্রবেশমূল্য লাগবে না
টা ২০০০
রক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা
শেষ তারিখ- ১৬ই মে ১৯৫৫ সাল
নাকে যা ক'রতে হবে তা হোল, একটী প্রবেশপত্র যোগাড় করা আর তাতে যে নয়টী সুন্দরী মেয়ের ফটো দেওয়া আছে মনোযোগ দিয়ে দেখা। তারপর আপনার মত অনুযায়ী এদের সৌন্দর্য্য ও শোভা'র যথাযথ পারম্পর্য্যে বসিয়ে যেতে হবে।
আপনার পছন্দ যদি বিশেষ বিচারকমণ্ডলীর নির্দ্ধারিত ক্রমের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে আপনি প্রথম পুরস্কার পেয়ে যাবেন। এর কোন প্রবেশমূল্য নেই—কেবল একটী রেক্সোনা সাবানের মোড়ক প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠালেই হোল'।
একটী সাধারণ আকারের রেক্সোনা সাবানের মোড়ক (কিম্বা তিনটী ছোট সাইজ সাবানের মোড়ক) প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠান—একটী বড় সাইজের মোড়ক আপনাকে দুইটী সমাধান পাঠাবার অধিকার দেবে।
প্রত্যেকেই যোগ দিতে পারেন (বোম্বাই রাজ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া)
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
রেক্সোনা বিক্রেতার কাছ থেকে একটী প্রবেশপত্র চেয়ে নিন্।
RP. 129-X52 BG

বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী—জাতি পরিচয়

ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতী বাঙালী ব্যবসায়ী পরিচয় প্রকাশ করে চলেছে। বাঙালী আবার বড় হোক, ব্যবসা-বাণিজ্য করুক, ঘরে লক্ষ্মী অচলা থাকুন, ধনে ধান্যে ভরে উঠুক আবার বাঙলার ঘর। আজ এই বিরাট বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক ডিপ্রেশন্, রাজনৈতিক চালবাজী, রিফিউজী সমস্যা, প্রাদেশিকতার মধ্যেও আমরা আমাদের পুরোনো ব্যবসায়ীদের নাম করছি কেন? যদি তাতে আমাদের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, বাঙালী যুবকদের মনে কিছু উৎসাহ আসে তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে। জাহাজের ব্যবসায়ে বাঙালীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রামগোপাল ঘোষের। ডকের কারবারে নাম করেছেন তারক প্রামাণিক, সাগর দত্ত, মতি শীল প্রভৃতি। জাহাজের কারবারে ঠাকুর-বাড়ীর প্রচেষ্টার কথা তো সকলেরই জানা রয়েছে। প্রাচীন ব্যবসায়ীদের মধ্যে কয়েক জনের নাম যথারীতি করছি এই সঙ্গে। কাঠের ব্যবসায়ে লালচাঁদ মিত্র। তা ছাড়া ভোলানাথ দাস, দুর্গাচরণ রক্ষিত, চন্দননগরের শেঠ। বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফের পত্তন করেছেন সুরেন্দ্র বসু। কালীচরণ বসু, আটা। কাগজের কারবারী চন্দ্র রায়। বি, পি, আর এর প্রতিষ্ঠাতা অমৃতলাল রায়, সঙ্গে রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল কেমিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এ মাসে এই অবধি। আবার বলা যাবে আগামী মাসে।

সরকারী চাকুরীতে—পশ্চিমবঙ্গের বেকারের স্থান নেই?

সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করতে গেলে আজ যে কয়েকটি গুণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে তা হোল, রিফিউজী হতে হবে, (অবশ্য রিফিউজীদের ওপর আমাদের যথেষ্টই সহানুভূতি রয়েছে) সিডিউল্ড কাষ্ট কি ট্রাইব মানে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন (তাঁদের জন্য আসন বাঁধা থাকে), রেশনিং ডিপার্টমেন্ট—গভর্ণমেন্টের আউট ডিপার্টমেন্ট—মিলিটারী একাউন্টস্ প্রভৃতির কর্মচারী (এঁরা অগ্রাধিকার পাবেন) এবং বোধ হয় সব চেয়ে বড় যে গুণটি দরকার তা হোল, কা'কে ধরতে পারবেন? কো মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এম· এল· এ, সেক্রেটারী, এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটা ডেপুটি? তা যদি না পারেন তা হলে আপনি হতভাগ্য আপনার চাকুরী পাবার আশা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বেক যুবকগণের কি তাহলে একমাত্র দোষ এই যে তারা পশ্চিমব জন্মেছে? পশ্চিমবঙ্গের যারা, তারা সকলেই বড়লো ব্যবসায়ী এ কথাটা সরকার ধরে নিলেন কোন ষ্টাটিস্টি অনুযায়ী? প্রায়োরিটি তারাই বা পাবে না কেন? কি অপরা তাদের ঘরে কি বৃদ্ধ মা-বাপ, ভাই-ভগিনী নেই? দারিদ্র্য নেই সংসারে অভাব অভিযোগ নেই? তাহলে? সরকার কি তার নী পরিবর্ত্তন করবেন?

আমাদের প্যাকিং প্রথা

কথায় আছে না, মলাটে দুরস্ত। অর্থাৎ ছেলে লেখাপড় অষ্টরম্ভা কিন্তু বইখাতাগুলি দেখুন কেমন চকচকে ঝকঝ বাহারে মলাট দেওয়া। তাই দরকার। আজকের যুগে লে পড়ার ক্ষেত্রে না হলেও ব্যবসার ক্ষেত্রে বাইরের 'শো'টা চমক হওয়া চাই। খবরের কাগজে সুতো জড়িয়ে ক্রেতাকে জি প্যাক করে দেবার দিন গত। এখন পাল্লা দিয়ে বি দোকানদারদের (কলকাতায় এখন আর প্রায় নেই বল চলে) সঙ্গে সঙ্গে দেশী দোকানগুলিকেও চলতে হবে। উন্নত কাগজ নানা রঙের, ঠোঙ্গার বা কৌটার গায়ে রুচিসম্মত ছ লেটারিং কি ড্রইং ইত্যাদি করতে হবে। ব্যবসায় দৃষ্টিভ পরিবর্ত্তন করার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে বাঙালী ব্যবসায়ীদে এই প্রসঙ্গে আমরা কমলালয় ষ্টোর্স, জহরলাল-পান্নালাল, বেঙ্গল সোসাইটি প্রভৃতি কয়েকটি পোষাক-পরিচ্ছদ বিক্র প্রতিষ্ঠানের প্যাকিং প্রথার প্রশংসা করছি। সেই সঙ্গে তাঁদে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আরও উন্নততর প্যাকিং প্রথার কথা।

তাঁত-শিল্পের জন্য সরকারী সাহায্য

নয়া দিল্লী থেকে আর এক দফা ভিক্ষার অর্থ (তাই যদি না তো প্রধান মন্ত্রিগণের এত ঘন ঘন টাকা আদায়ের জন্য দিল্লী গম

প্রয়োজন হয় কেন ?) পাওয়া গেছে কুটির শিল্পের খাতে। যে কয়েকটি প্রদেশ এই সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও তার থেকে বাদ যায়নি। সাহায্যের খাতে পেয়েছে মাদ্রাজ, ১,১৩,৭১৫ টাকা, অন্ধ্র ৩১,০৭০ টাকা, বিহার ১,২১,৮৮০ টাকা ও ঋণ হিসাবে ১,২৭,৪১০ টাকা, হায়দ্রাবাদ ও মধ্য-ভারত পেয়েছে যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা এবং পশ্চিবঙ্গের কপালে জুটেছে মাত্র ২২,০০০ টাকা। এই থেকেই কি প্রমাণিত হল না যে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের দরদ কতখানি ? যাই হোক, যে সামান্য পরিমাণ অর্থও পাওয়া গেছে তাও যেন নষ্ট না হয় অকর্মণ্য লোকের হাতে পড়ে। শুধু মাত্র তাঁত-সপ্তাহের জন্য পোষ্টার ছাপানোরই ব্যয় যেন না পড়ে হাজার কয়েক টাকা ! রীতিমত বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাদের দৃষ্টি কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির দিকে ঘোরানো, তাঁত-যন্ত্রের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে তন্তুবায়গণের চেতনা জাগানো, মিলের কাছ থেকে নিয়মিত সুতা জোগানো, খয়রাতী দান ইত্যাদির দিকেও নজর থাকে। গত বৎসরের তাঁত-সপ্তাহ সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো ধারণা নেই, এবার যেন তারই পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

অল্প খরচায় ব্যবসা

অল্প খরচের ব্যবসা কি কি করতে পারেন সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ তথ্য মাসিক বসুমতীর 'কেনা-কাটা' বিভাগ আপনাদের এত দিন জুগিয়েছে। কিন্তু সে হয়েছে কেমন যেন একটা সখের থিয়েটারের রিহার্সালের মত। এবারে আসরে আসছি আমরা। যে সব ব্যবসায়ে বাঙালী একেবারেই নেই অথচ যাতে মূলধন লাগবে কম, রোজগার হবে বেশী, ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা স্বল্প। এমনি সব ব্যবসার কথাই একে একে আলোচনা করছি।

মুর্গীর ব্যবসা

এ ব্যবসায়ে তিন দিক থেকে রোজগারের পথ রয়েছে। (১) টেবল-ফাউল হিসাবে মুর্গী বিক্রি করা (২) ডিম বিক্রি করা। (এটি অনেকটা বাই-প্রোডাক্টের মতই পাওয়া যাবে) (৩) গ্রামাঞ্চল থেকে সস্তায় মুর্গী কিনে এনে সহরে বিক্রি করা।
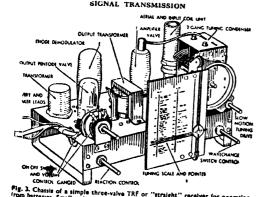
মুর্গী পালন সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এ সম্পর্কে কয়েকটি অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের নাম আমরা করছি প্রথমে। (১) Poultry keeping in India by Isa Tweed (২) Practical Poultry keeper by Lowis wright (৩) Profitable Poultry forming by Sutcliffe (৪) Commercial Egg Forming by Houson (৫) Egg production Hurst.

এই ব্যবসাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাবে।

গতর খেটে খান

কথায় আছে,—

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি,
ঘরে বসে পুছে বাত,
তার ভাগ্যে হাভাত।

অকর্মণ্য কৃষক সম্পর্কে যেমন একথা প্রযোজ্য তেমনি নতুন ব্যবসায়ীর পক্ষেও এটি সমান প্রয়োজনীয়। এটিই একটু পরিবর্তিত অবস্থায়, 'খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়, বসে খাটায় অর্দ্ধেক পায়, ঘরে বসে পুছে বাত, এবার যেমন তেমন, আর বার হাভাত-হাভাত।' আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। কথাটি অভ্রান্ত ভাবে সত্য। আজকের দিনে ব্যবসায় কাউকেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এমন এক দিন ছিল যখন ভারতবাসীর ব্যবসা চলত মুখে মুখে। যে ব্যক্তিটি দোকানের ঘর-দোর পরিষ্কার করে তারও ব্যবসায়ের প্রতি একটা আন্তরিক টান ছিল। আজ-কাল আর তেমনটি দেখা যায় না। সেই কারণে মাসিক বসুমতী ব্যবসায়ে দীক্ষা নেবার প্রাক্কালে যুবকদের

SIGNAL TRANSMISSION

Fig. 3. Chassis of a simple three-valve TRF or "straight" receiver for operation from batteries. Small resistances and condensers, the wiring and certain coils and

তিনভালভের 'ষ্ট্রেট' রিসিভার। ব্যাটারী দিয়ে কাজ চলবে এর। চেসিসের নীচে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ওয়্যারিং রয়েছে। সুইচ আছে চেসিসের নীচে। যেখানে বিদ্যুৎ এমন সব জায়গায় এর ব্যবহার হয় খুব বেশী
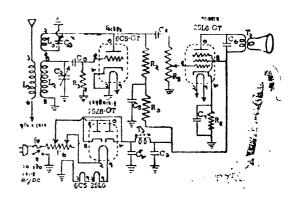
স্কীমেটিক সার্কিট। এর পর দেওয়া যাবে সেকসানাল ডায়গ্রাম। তাতে থাকবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের নানা সংযোগের সচিত্র পরিচয়। সেই সব সংযোগগুলি আলাদা আলাদা ভাবে করে পরে এই সার্কিটের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবেন

কানে এই মন্ত্রটি দিয়ে দিচ্ছে, গতর খেটে খান। লোককে বিশ্বাস করবেন, সাধু হবেন, সরল হবেন কিন্তু বোকা হবেন না। রেলগাড়ীর কামরায় গায়ে যে লেখা থাকে, 'চোর, জুয়াচোর, পকেটমার নিকটেই আছে। সাবধান থাকুক।' ব্যবসায়ীর পক্ষেও সেই কথা।

রেডিও তৈরীর বৃত্তান্ত

গত মাসে রেডিও তৈরী মানে একটি লোকাল এ, সি/ডি, সি, ৩ ভালভের সেট তৈরী করতে কি কি জিনিষ লাগবে, তার একটা লিষ্ট ছাপা হয়েছে। এ মাসে দেওয়া হচ্ছে একটা স্কীমেটিক ডায়গ্রাম। এই স্কীমেটিক ডায়গ্রাম থেকেই যে রেডিও রিসিভার বানানো শুরু করা যাবে এমনটি নয়। এর পর ছোট ছোট কনেক্সন্‌গুলি সহ সেকসানাল ডায়গ্রাম দেওয়া হবে। সেই সেকসানাল ডায়গ্রাম দেখে অনায়াসেই কনেকশন্ করা চলবে। তখন প্রত্যেকটি কনেকশন্ এই স্কীমেটিক সার্কিটের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবেন।

প্রথমেই বলে রাখি যে, রেডিওর রিসিভার বানানোর কাজ খুব সহজ নয়। আবার খুব সহজও। ধরুন, রিসিভারের সংযোগের মুখ জোড়া হয় যে পিন দিয়ে, তাতে একটা কোটিং থাকে। সেই কোটিংটি ব্লেড দিয়ে সাফ করে না নিলে কারেণ্ট পাস করবে না এবং আপনার রিসিভারও কাজ করবে না ঠিক মত। এমনি অনেক টেকনিক্যাল জিনিষ আছে। তাই হঠাৎ ডায়গ্রাম দেখে রেডিও বানাতে শুরু না করেই এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান এ সম্পর্কে করে নেওয়া প্রয়োজন।

চিত্রে যে সব সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে গত মাসের নামগুলিই খুঁজে পাবেন।

C_1 – ·0003 ufd ভেরিএবল কণ্ডেন্সার
C_2 – ·0005 ufd "
C_3 – ·0001 ufd মাইকা কণ্ডেন্সার
C_4 – ·1 ufd পেপার কণ্ডেন্সার
C_5 – ·05 ufd পেপার কণ্ডেন্সার
C_6 – ·01 ufd "
C_7 – 25 ufd ইলেকট্রোলাইট
C_8 – 8 ufd ইলেকট্রোলাইট
C_9 – 8 ufd ইলেকট্রোলাইট
L_1 – এরিয়াল কয়েল
L_2 – টিউনিং "
L_3 – রি-য়্যাকশন "
R_1 – 1 meg Ohms রেজিষ্ট্যান্স
R_2 – 20 Killo Ohms "
R_3 – 50 " " "
R_4 – ·5 meg ভল্যুম কনট্রোল (সুইচ সহ)।
R_5 – 100 ohms 1 watt রেজিষ্ট্যান্স।
R_6 – 700 ohms (·৩ এম্পিয়ার) ফিলামেণ্ট রেজিষ্ট্যান্স।
T_1 – 10 হেনরী ৬০ মিলি L. F. চোক।
T_2 – 25L6 টিউবের আউট-পুট ট্রান্সফর্মার।
সু – ভল্যুম কনট্রোল সুইচ।

এ ছাড়া আর একটি পরিমানেণ্ট ম্যাগনেট লাউড-স্পীকার।

টুকিটাকি

'কেনাকাটা' দপ্তরের আওতায় যে সব খবর পড়বে এমন সব খবর সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার এক চেষ্টা করছি আমরা। এ সংখ্যা থেকেই তা শুরু হচ্ছে এবং যথারীতি প্রতি সংখ্যাতেই নতুন দোকান খোলার সংবাদ, গভর্ণমেণ্ট ট্যাক্সের হ্রাসবৃদ্ধি, কোনও বণিক-সভার কর্মকর্তাদের নাম, সভার বিবরণ ইত্যাদি এখানে প্রকাশ করা যাবে।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের ওয়াই-ডবলিউ, সি, এ হলে বাটা সু কোম্পানী এক অদ্ভুত ধরণের প্রদর্শনী খুলেছেন। বাটার জুতা আরও অধিক বিক্রয় করা, সাধারণের মধ্যে বাটার জুতার পপুলারিটি বাড়ানো ইত্যাদিই এর উদ্দেশ্য। এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলবার নেই আমাদের। অন্যান্য কোম্পানীগুলিকেও আমরা বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

গত ৩০শে মার্চ বুধবার এ্যাডভার্টাইজিং ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন বছরের কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হল। শ্রীআর কে, সরকার এ বছরের সভাপতি, শ্রী এস, ঘোষাল ও শ্রী সি, দাশগুপ্ত যুগ্ম-সম্পাদক এবং শ্রী টি, এন, এ, রমণ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম উইক শুরু হল ২০শে মার্চ এবং শেষ হয়ে গেল ২৬শে। হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের প্রদর্শনী, পুরস্কার বিতরণী, চিত্র প্রদর্শন, সভা ইত্যাদি ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে।

জনাব ইসারুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে চক-ইসলামপুরে (বহরমপুর) এক সভা বসল তন্তুবায়দের। মুর্শিদাবাদের সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের অবস্থা সম্পর্কে সভায় শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এম, পি, শ্রীনির্মল বাগচী, জনাব সামসুদ্দীন আহমেদ, শ্রীরাধারঞ্জন গুপ্ত ইত্যাদি বক্তৃতা করেন।

আগামী ৩০শে জুন, ১৯৫৫ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন গভর্ণর হচ্ছেন শ্রী, এন, আর, পিল্লাই, আই, সি, এস সেক্রেটারী জেনারেল, মিনিষ্ট্রি অব এক্সটারনাল এফেয়ার্স।

—প্রচ্ছদ-পট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দক্ষিণ-ভারতের গন্ধর্ব-নৃত্যের এক বিশেষ ভঙ্গিমার আলোকচিত্র। দেহের অলঙ্করণ ও নৃত্যঠাম লক্ষ্যণীয়। চিত্রটি শ্রীসুনীল জানা গৃহীত।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৮

অন্ধকারে লোকটাকে ঠিক চিনতে পারলে না রঞ্জন।

তবে কথা শুনে মনে হ'লো যেন বাঙ্গালী। পরিষ্কার বাংলায় লোকটা বললে : চুমকির সঙ্গে ফের যদি দেখি তোমাকে, তো খুন করে ফেলবো।

কিন্তু চুমকিও তো বাংলায় কথা বলে। কথা যখন বলে, কোন্ দেশের মেয়ে চেনা শক্ত।

রঞ্জনের বুকের ভেতরটা তখন টিপ্-টিপ করছে। এ রকম বিশ্রী অবস্থায় জীবনে সে কখনও পড়েনি। এ সময় যদি সে চুপ করে থাকে, লোকটা হয়ত তাকে মেরেই বসবে।

রঞ্জন রুখে দাঁড়ালো। বললে : খুন করা অমনি মুখের কথা কি না! আমিও খুন করতে জানি।

বলেই সে চট্ করে একবার পিছন্ ফিরে তাকিয়ে দেখলে, চুমকি আছে না পালিয়ে গেছে। ঝাপ্সা অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা গেল না। বিশ্বাস নেই ওদের। তাকে এই বিপদের মাঝখানে ফেলে হয়ত সে পালিয়েই গেছে।

রঞ্জনের একখানা হাত লোকটা এত জোরে চেপে ধরেছে যে, ছাড়াতেও পারছে না।

রঞ্জন বললে, ছেড়ে দাও বলছি।

ছাড়া দূরে থাক, হাতটা সে এমন ভাবে মুচ্‌ড়ে দিলে যে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো রঞ্জন। বললে : উঃ, ছাড়ো, ছাড়ো!

লোকটা বললে, চুম্‌কি কি বলছিল বল্, তবে ছেড়ে দেবো।

তুমি থেকে তুই!

রঞ্জনের আপাদ-মস্তক রি-রি করে উঠলো। বললে, ছাড়্ আগে, তবে বলবো।

বটে!—লোকটা আবার মুচড়ে দিলে রঞ্জনের হাতটা।

রঞ্জন এবার বেকায়দায় পড়ে গেছে। হার বোধ হয় তাকে মানতেই হ'লো। বললে, তুমি যা ভেবেছো তা নয়। চুম্‌কিকে আমি পাঠিয়েছিলাম এক জায়গায় একটা চিঠির জবাব আনতে।

লোকটা বোধ হয় বিশ্বাস করলে না। বললে, হুঁ, সেই জন্যেই দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে বসেছিলে? এখনও বলছি—বল্। বললেই ছেড়ে দেবো।

কথা বলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল রঞ্জনের। বললে : বিশ্বাস কর। সত্যি কথা।

তবু বিশ্বাস করে না লোকটা!

রঞ্জনের হাতে ক্রমাগত মোচড় দিতে থাকে, আর বলে, বল্!

—বল্!

—এখনও বলছি—বল্!

রঞ্জন আর কাঁহাতক্ সহ্য করে! এক দিকে ঘৃণা, লজ্জা, অপমান! আর এক দিকে এই প্রাণান্তকর অবস্থা! কি যে করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না সে।

এই সবে সন্ধ্যা হয়েছে। সুলতানপুরে আজ-কাল এত কয়লার কুঠি, এত লোকজন, অথচ এদিক দিয়ে একটা লোকও আসে না!

চীৎকার করবে না কি? চীৎকার শুনে যেই আসুক, দেবু চাটুজ্যের ছেলে বললে সবাই চিনতে পারবে তাকে।

কিন্তু তার পর?

সব যদি জানাজানি হয়ে যায়?

এম্‌নি সব এলোমেলো ভাবনা ভাবছিল রঞ্জন।

লোকটার বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। হাতটা একটু আল্‌গা দিয়ে রঞ্জনের মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললে, বল্ না! চুপ করে রইলি কেন?

রঞ্জন বললে, বললাম তো!

রঞ্জনের হাতটা ছেড়ে দিয়ে লোকটা তার গালের ওপর সজোরে এক চড় মেরে বসলো। ভেংচি কেটে বললে : বললাম তো!

রঞ্জন মরীয়া হয়ে উঠলো। ছাড়া পেয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে না। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে জুতো সমেত ডান পা'টা দিলে চালিয়ে। লাথিটা লাগলো গিয়ে লোকটার পেটে! মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। লোকটা টাল সামলাতে পারলে না, ছিটকে গিয়ে পড়লো খানিক দূরে।

সেই অবসরে রঞ্জন পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু পালালো না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

আহত জানোয়ারের মত লোকটা উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকারেও মনে হলো যেন তার চোখ দুটো জ্বলছে। সোজা সে ছুটে এলো রঞ্জনের দিকে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যেটা না ঘটলে রঞ্জনের সেদিন কি যে হতো বলা যায় না। সেই হিংস্র প্রকৃতির মানুষটা রঞ্জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হয়ত বা তাকে মেরেই ফেলতো, কিন্তু চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে কোন্ দিক থেকে কেমন করে যে আর একটা লোক এসে তাকে আক্রমণ করলে, রঞ্জন তা' বুঝতেই পারলে না।

মনে হ'লো তারা দু'জন দু'জনকেই চেনে।

কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধু মার আর মার! প্রথমে চলতে লাগলো লাথি, চড় আর ঘুষি, তার পর জাপ্টাজাপ্টি!

রঞ্জনের ভাগ্য বুঝি ছিল সুপ্রসন্ন, তাই সেদিন সে বোধ হয় নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।

কিন্তু আর বুঝি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তার উচিত নয়।

উঁচু-নীচু মাঠের ওপর দিয়ে মানুষের পায়ে-চলা সরু যে পথটা সাপের মত এঁকে-বেঁকে হিঙুলের দিকে চলে গেছে, রঞ্জন তাড়াতাড়ি সেই পথে গিয়ে নামলো।

যেখানে-সেখানে বোয়ান গাছের ঝোপ। পথের পাশে প্রহরীর মত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় কয়েকটা অর্জ্জুন গাছ। কিছুদিন আগেও এ-পথ দিয়ে লোকজনের যাওয়া-আসা ছিল না। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে তারাচাঁদ ঘুসুড়িমলের ছোট ওই কয়লার কুঠিটা চালু হবার পর থেকে এ-পথে লোকজনের চলাচল সুরু হয়েছে। তাদেরই পায়ে-চলার দাগ ধরে রঞ্জন এগিয়ে চললো।

দূরে একটা নতুন খাদের কাজ চলছে। লোহার জয়েষ্টের ওপর হাতুড়ি পেটার শব্দ শোনা যায়। ডান দিকের পথটা মুখুজ্যে-পুকুরে যাবার পথ। ও-পথ ধরে যদি সে যায়, মুখুজ্যে-পুকুরের পাশ দিয়ে সীতারামের তৈরি হিঙুলের পুল পেরিয়ে, সোজা একেবারে মালার কাছে গিয়ে পৌঁছোতে পারে সে। উঁচু একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে রঞ্জন একবার সেই দিক পানে তাকিয়ে দেখলে। না, মালার ঘরখানা সেখান থেকে দেখা যায় না। মালা এখনও জেগে আছে নিশ্চয়ই। চুমকির আশা ছেড়ে দিয়ে কাল সে নিজেই একবার যাবে মুখুজ্যে-পুকুরে। মালার সঙ্গে একটি বার যদি তার দেখা হয়, সে তার মনের কথা তাকে খুলে বলবে।

এবার তাকে যেতে হবে বাঁ দিকে। রঞ্জন টিলা থেকে এক-পা এক-পা করে নামলো। জন-মানবশূন্য অন্ধকার পথ। ভয়ে গা ছম্ ছম্ করে।

এমন করে একা-একা এখানে আসা তার উচিত হয়নি। ছি ছি, লোকটা আজ তাকে মারলে! মারের জ্বালা তখনও সে ভুলতে পারে নি। এ জীবনে ভুলতে পারবে কি না সন্দেহ! চুপি চুপি তার বাবার বন্দুকটা নিয়ে গিয়ে লোকটাকে যদি সে খুন করে আসতে পারে, তাহলে বোধ হয় এ জ্বালার কিছুটা শান্তি হয়! কিন্তু তাই-বা কেমন করে হবে? কাকে খুন করবে? কে সে? অন্ধকারে মানুষটাকে তো সে চিনতেও পারেনি!

চুমকির প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী! লোকটা ভেবেছে বুঝি সেও তাই! পরে যে-লোকটা এলো সে-ই বা কে?

চুমকিই বা তাকে এই বিপদের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল কোথায়?

এমনি সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে রঞ্জন।

হঠাৎ সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকার পথে কে যেন ডেকে উঠলো, 'শোনো।'

আচমকা এই ডাক শুনে চমকে উঠলো রঞ্জন।

—কে?

রঞ্জনের সর্ব্বাঙ্গ তখন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। হাত-পা যেন কাঁপছে থর্ থর্ করে।

খিল্ খিল্ করে হাসির শব্দ।

রঞ্জন এবার খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলো: কে?

এগিয়ে এসে দাঁড়ালো চুমকি। বললে, আমি—আমি। চিনতে পারছো না?

খুব মেয়ে বাবা!—রঞ্জন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে, কি কুক্ষণে যে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল! পথ ছাড়ো। বাড়ী যাব।

চুমকি হাসতে হাসতে হাত দুটো বাড়িয়ে রঞ্জনের গলাটা জড়িয়ে ধরে বললে, কেন? কি হ'লো?

রঞ্জন তার হাত দুটো সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, ছাড়ো। ন্যাকামি করো না।

চুমকি আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

অন্ধকার আকাশে যেন বিদ্যুৎ চমকালো।

রহস্যময়ী নারী!

যে চুমকির ওপর বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত অন্তর ভরে গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে, মনে হয়েছিল দেখা হ'লে তার সঙ্গে কথাই বলবে না, সেই চুমকিকে মন্দ লাগলো না রঞ্জনের। চুমকির নিশ্বাস তার মুখে এসে লাগছে, হাত দুটো জড়িয়ে আছে গলায়, তার সারা দেহের স্পর্শ অনুভব করছে নিজের সর্ব্বাঙ্গে।

রঞ্জনের সমস্ত শরীর যেন শিব্ শিব্ করে উঠলো। বললে, হাসছো তুমি?

—হাসবো না?

—হ্যাঁ, তা হাসবে বই কি! লোকটা যদি আমাকে মেরেও ফেলতো তাহ'লেও হাসতে বোধ হয়?

চুমকি তখনও হাসছে। এবার সে যেন আরও জোরে চেপে ধরলে রঞ্জনকে। বললে, ভীতু কোথাকার! পুরুষ ব্যাটা ছেলে, বলে কি না মেরে ফেলতো! তোমাকে মারতো আর তুমি পড়ে পড়ে মার খেতে? গায়ে জোর নেই?

চুমকি তার একখানা হাত রঞ্জনের সুমুখে বাড়িয়ে ধরলে। বললে, কই দেখি?

—কি দেখবে?

চুমকি বললে, পাঞ্জা।

রঞ্জন বললে, থাক্, আর পাঞ্জা লড়তে হয় না।—বলি এতই যদি গায়ের জোর, ওই লোকটার হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালালে কেন?

চুমকি বললে, পালালাম ?

—পালালে না ?

—আজ্ঞে না। ডেকে দিলাম মতিয়াকে।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, মতিয়া কে ?

—একটা লোক।

—তা তো দেখলাম। ও তোমার কে হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—আমার কেউ হয় না। চুমকির মুখে হাসি দেখা গেল। বললে, হ'তে চায়। কিন্তু—

রঞ্জন বললে, কিন্তু কি ?

চুমকি বললে, হ'তে চাইলেই তো হওয়া যায় না ?

রঞ্জন বললে, আগের লোকটাও তো ওই দলের ?

চুমকি ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, এরকম আর কতগুলি আছে ?

চুমকি বললে, অনেক। অগুণতি। গুণে শেষ করা যায় না। কিন্তু ও-সব জেনে তোমার কি লাভ ? তার চেয়ে শোনো একটা কাজের কথা বলি।

এই বলে চুমকি তাকে এক রকম জোর করে পথের ধারে বসিয়ে দিলে।

রঞ্জন বললে, না না বসবো না। অনেকখানা পথ যেতে হবে এই অন্ধকারে। বাড়ীতে খোঁজাখুজি করবে।

চুমকি বললে, ভয় নেই। আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো।

—একা-একা ফেরার পথে তোমার ভয় করবে না ?

—না। ভয় কা'কে বলে আমরা জানি না। [ক্রমশঃ।

কুতব্‌এর দেশ

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগ্‌চী

ঋতু ফাল্গুন, কঠিন শীতের শেষ ;
রিক্তশাখার কচি-কিশলয় বেশ ;
পুরানো পাতারা কোথায় নিরুদ্দেশ !
মন যেন মোর ঝরানো পাতার টানে,
চল-চঞ্চল চৈতী হাওয়ার গানে
চেয়ে থাকে ফিরে-আসা অঘ্রাণ পানে।

বলিতে-না-চাওয়া কথা মনকে বলায়
আজি এই নির্জনে কুতব্‌-তলায় !
কেন এই অকারণ আগ্রহ সারা খন,
অভিশাপ-মাল্লিকারে পরিতে গলায় ?

* * *

দৃপ্ত পাষাণ দীপ্ত আকাশে ছোটে।
পাষাণ-ফুলকি ফাগুনের রোদে ফোটে।
পাষাণ এখানে ভগ্ন পাখায় লোটে,
ধূলি-সমুদ্রে সহস্র ঢেউ ওঠে।
পাষাণ এখানে ঝিল্লির ডাক শোনে ;
স্তিমিত তিমিরে তন্দ্রার জাল বোনে।

পাষাণেতে চাপা-হাসি হাসে অপ্সরী,
ত্রস্ত চকিতা ছায়াময়ী ছায়া ফেলে ;
কেঁপে ওঠে চাঁদ ডুবে-যাওয়া শর্বরী ;
স্নায়ুর তিমিরে বিস্মৃত ব্যথা মেলে।

কবে মিহির-আলোকে শেষ হবে বিভাবরী ?
শাপ অবসানে প্রাণ পাবে কিন্নরী ?
নাম-না-জানা বেদে মাঠে বাজায় বাঁশী ;
বেদেনী পাশে ব'সে মিষ্টি হাসি।
এ-মাঠে ও-মাঠে কাঁপে সুরের হাওয়া,
'ক্যাক্‌টাস্‌'-বৃক্ষ আজ ফুলেতে ছাওয়া।
ঘরহারা বাউলের ব্যাকুল বাঁশী ;
কেউটের কালো ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

* * * *

পোড়া মাটি আর বালুকাবেলার গানে
কুতব উর্ধে উঠেছে আকাশ পানে।
কত শতাব্দী ইতিকথা যার,
ইঙ্গিতে ভরা বিভীষিকা ভার,
সাদা সাহারার হাসিতে তাহার চমক লেগেছে প্রাণে,
কুতব্‌ ভুবন ভেদিয়া উঠেছে উর্ধ গগন পানে।

ইট, কাঠ আর লাল পাথরের ঘরে
জনমে-জনমে অপূর্ণ আশা মরে।
লোহার শিকলে বাঁধা নর-নারী
রক্ততোরণে আলো সারি সারি,
বর্শা-ফলকে ইতিহাস তারি,
দীর্ঘশ্বাসের রেখা—
শোণিত-মসীতে লেখা।

এখানে তোমার আমার কাহিনী
সেদিন ছিল না জানি তাহা জানি।
আজি বিজয়ীর বিজয়-কেতন পথের ধূলির পরে···
মত্ত জনতা তোমার আমার বিজয় ধ্বনি করে।

রবীন্দ্র-পুরস্কার

এই বছর অনেক আগে থেকেই সংবাদ পাওয়া গিছল যে রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করবেন রাজশেখর বসু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংবাদ সত্য হয়েছে, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হয়েছে 'কৃষ্ণকলি' ইত্যাদি গল্পের জন্ম রাজশেখর বসুকে এবং 'আরোগ্য নিকেতন' নামক উপন্যাসটির জন্ম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের রবীন্দ্র-পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হ'ল। এই সংবাদ অতিশয় আনন্দের সন্দেহ নেই, উভয়েই বয়সে প্রবীণ, এবং কৃতী সাহিত্যিক, তাঁদের সম্মানিত করা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই সকলের মনে প্রবল হয়ে উঠেছে, উক্ত গ্রন্থ দু'টি কি সত্যই পুরস্কারযোগ্য? ১৯৫৫-এর পুরস্কারের জন্ম আর কোন্ গ্রন্থ বিবেচিত হয়েছিল? না সরকারী আইনানুযায়ী দু'জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সুপারিশ সহ ঐ দু'টি গ্রন্থ ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়নি? নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, যদি উক্ত গ্রন্থ দুটি ১৯৫৫-এ রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে বাংলা মৌলিক গ্রন্থের মান অনেক নীচে নেমেছে। স্বয়ং রাজশেখর বসু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের এর চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে স্বীকৃত একাধিক গ্রন্থ বাজারে প্রচলিত আছে। তাই মনে করা অসঙ্গত নয় যে, গ্রন্থটা এখানে গৌণ, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে লেখক হিসাবে। পুরস্কার বণ্টনের ধারা দেখে মনে হয়, বিচারপতিরা হয়ত সর্বদা তেমন নিরপেক্ষ বা অভ্রান্ত ন'ন। কিংবা তাঁদের বিচারের মাপকাঠি সাধারণের বোধগম্য নয়।

অথচ এই বিচারকবৃন্দ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে 'জাগরী' লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীকে পুরস্কৃত করে আশ্চর্য সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে গবেষণামূলক গ্রন্থকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর 'ইছামতী'কে এবং গত বছর রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভকে' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অন্য কারণে। শোনা যায়, এই সব পুরস্কারের জন্ম নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা, উমেদারী এবং সুপারিশ চলে, যাঁরা বিচারক সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের মতামত সম্পর্কে বিদগ্ধ জনের শ্রদ্ধার হয়ত অভাব ঘটবে, এবং শুধুমাত্র মানবিক করুণা তাঁদের বিচার-শক্তিকে প্রভাবিত করেছে, এই কথাই মনে করে তাঁরা শান্ত হবেন।

রম্য রচনার ভবিষ্যৎ

Bells-letters কথাটির ইদানীং আমরা রম্য রচনা হিসাবে বঙ্গানুবাদ করেছি,—সুকুমার সাহিত্য বললেও ভুল হবে না। এই জাতীয় রচনা এমন কিছু নতুন নয়। সঞ্জীবচন্দ্র বা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অনেকেই কিছু না কিছু রম্য সাহিত্য-কর্ম করেছেন, পরেও অনেকে করেছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক হিড়িকটার পিছনের ইতিহাসও সাম্প্রতিক। যাযাবার লিখলেন 'দৃষ্টিপাত', রম্য রচনা নামে তার অসম্ভব প্রচার হল, তার পর বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকার সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের 'দেশে-বিদেশে' বাংলা দেশকে মাতিয়ে তুললো। আর যায় কোথা,—রাম শ্যাম যদুর দল ছিলেন একটু সুযোগের অপেক্ষায়, শুরু হল রম্য রচনার স্রোত, যেমন ঝোঁক দেখা যাচ্ছে আত্মকাহিনীর দিকে কিংবা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়। মাঝে মাঝে অবশ্যই রুচির পরিবর্তন ঘটে,—মানুষের মন সর্বদাই চায় নতুনকে, পুরাতন মগুও নতুন বোতলে পরিবেশিত হয়, স্বাদের পার্থক্য হয়ত থাকে না, তবু জৌলুষটা থাকে। পুরাতন অলঙ্কার নতুন ফ্যাসান হয়ে বাজার মাৎ করে। তেমনই আজ সাহিত্যের ভাঙা হাটে রম্য রচনার হিড়িক লেগেছে, ফলে রম্য রচনা হচ্ছে উপন্যাস আর উপন্যাস হয়ে উঠছে রম্য কাহিনী। সাহিত্য পাঠক অক্ষমের লেখনী প্রসূত রচনা পাঠে ক্লান্ত, বিভ্রান্ত। শোনা যায়। একদা গিরীশচন্দ্র ঘোষ এক অবাঙালী ভদ্রলোকের অর্থানুকূল্যে নাট্যাভিনয় করতেন, সীতার বনবাস খুব জমে উঠলো, একদিন ঐ অবাঙালী ভদ্রলোক বললেন—"গিরীশ বাবু এক কাম কি জিয়ে, আউর একঠো নাটক বানাইয়ে আউর উসমে ওহি দুগো লেড়কাকো (অর্থাৎ লব এবং কুশ) ছোড় দিজিয়ে।" গিরীশচন্দ্র শুনেছি ফরমায়েসী নাটক লিখেছিলেন। এখন রম্য রচনার প্রবল স্রোতে ভাসমান হয়ে ভাবছি, আমাদের প্রকাশকদের স্কন্ধে সেই পুরাতন ভূত চেপেছে না কি? একথা আজ স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে, রম্য রচনার কলরব থামিয়ে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। রম্য রচনার জৌলুষ অচিরেই ম্লান হয়ে যাবে।

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক গ্রন্থাগার। তাই গ্রন্থাগার-সম্মেলনের একটা বিশেষ মূল্য আছে। সম্প্রতি খিদিরপুরে হেমচন্দ্র পাঠাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন

অনুষ্ঠিত হল। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার বলেছেন—"বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং বঙ্গ সংস্কৃতি আজো অবিভক্ত, আমাদের সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।" ইংলণ্ড ও আমেরিকার একমাত্র সংযোগ-সূত্র মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার জন্য পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ভাষা আন্দোলন ইতিহাসের বিষয়বস্তু। আজ মুমূর্ষু বাংলার অর্থনৈতিক চাবীকাঠি অবাঙালীর হাতে, রাষ্ট্রভাষার প্রবল পেষণে বাংলা ভাষার প্রায় নাভিশ্বাসের উপক্রম। এই অবস্থায় গ্রন্থাগারের প্রসার ও প্রভাব আজ আমাদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সবিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণে আমরা গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই। এই সূত্রে বাংলার মুখ্য মন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন—"গ্রন্থাগার কেবল গ্রন্থশালা নয়, জাতীয় জীবন গঠনের কর্মকেন্দ্র। জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করতে হবে।" ডাঃ রায়ের এই কথাগুলি গভীর অর্থপূর্ণ এবং বিশেষ ভাবে বিবেচনীয়।

বাংলা বই-এর দোকান—বাংলার বাইরে

প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে স্বভাবতঃই বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ অধিক,—সেখানে কিন্তু বাংলা পুস্তকের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত বই-এর দোকান নেই, ছোটখাটো পাঠাগার যথেষ্ট নয়। যাঁরা প্রবাসী তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, সুনির্বাচিত কিছু বই চোখের সামনে দেখলে কিনতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তাদের কাছে তুলে ধরবার মতো বই বা উৎসাহী বিক্রেতার অভাব আছে। উদাহারণস্বরূপ দিল্লী শহরের কথা ধরা যাক্, বাঙালী ছাড়া, সারা বিশ্বের মানুষের আজ সেখানে গতায়াত,—কিন্তু কই, ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাদের সামনে প্রদর্শন করার মত পুস্তকালয় কই! বেকারের সংখ্যার ত' হিসাব নেই,—এই সব ছোটখাটো অথচ অতি প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ে তাঁরা অগ্রণী হয়ে আসছেন না কেন? কি ভাবে এমন বই-এর দোকান খোলা সম্ভব, আগ্রহ দেখলে আমরা বারান্তরে তা প্রকাশ করব।

কবিপক্ষে কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালনের জন্য আগামী ২৫শে বৈশাখের অনেক আগে থেকেই আয়োজন সুরু হবে। ছোট-খাটো লাইব্রেরী, ক্লাব থেকে সুরু করে অনেক বড় প্রতিষ্ঠানেও এই জাতীয় উৎসব প্রতিপালিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সব অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচী সেই একই ধারার পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ আবৃত্তি, গান এবং বক্তৃতা। তার পর এক বছর আবার সব নীরব। ভুলে যাব আমরা নিমতলা শ্মশানের কথা, ভুলে যাব কবির স্মৃতিরক্ষার কথা, এই ভাবেই ত' চলছে!

এই কবিপক্ষে কয়েকটি উৎসাহী প্রকাশক এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী পনের দিন ধরে সুলভে বিক্রয়ের আয়োজন করেন। তার ফলে গ্রন্থরসিক এবং ছোট-খাটো পাঠাগারের কিছু সুবিধা হয়। আমরা এই সূত্রে বাংলা দেশের সকল পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাকে সকল শ্রেণীর পুস্তক এক পক্ষের জন্য সুলভে (অর্থাৎ উচ্চ কমিশনে) সর্বসাধারণকে বিক্রী করতে অনুরোধ জানাই। তদ্দারা অনেক বেশী বিক্রী হওয়ার সম্ভাবনা, এবং এক কালীন মোটা টাকা হাতে আসা সম্ভব। প্রতি বিলাতে দশ দিন ধরে এই ভাবে বই বিক্রী করা হয়েছে।

১৩৬১ সালে প্রকাশিত বাংলা বই

গত বছরের মত এবারও মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যায় ১৩৬১ সালে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের এক শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশিত হবে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমালোচক, শিক্ষাব্রতী এবং সাংবাদিকের সহযোগিতায় এই তালিকা নিরপেক্ষ ভাবে রচিত হবে। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাকেও এই নির্বাচনে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। উক্ত তালিকা আগামী ২০শে বৈশাখের ভিতর আমাদের হস্তগত হওয়া চাই।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান" নামে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে নিজস্ব গুণে একটি স্বতন্ত্র স্থান দখল করে থাকবে। প্রচলিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় বাঙালী পাঠকের কাছে নিষ্প্রয়োজন। তিনি বিখ্যাত ৺নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) সহোদর। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শ ও সাহচর্যের যে স্মৃতিকথা তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মূল্য যে কতখানি তা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। কেবল ঘটনার বিবৃতিই এর বিষয়বস্তু নয়। বইখানি দুই ভাগে ভাগ করা—পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ। পূর্বভাগে প্রধানতঃ তদানীন্তন কলিকাতা তথা বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ তথ্য লেখক তাঁর আবাল্য স্মৃতি থেকে আহরণ ক'রে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠকরা অনেক অজানা তথ্যের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হবেন। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে দেশের আভ্যন্তরিক সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার এরকম বর্ণনা অনেক ইতিহাসের গ্রন্থেও সহজলভ্য নয়। উত্তরভাগে প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে এবং তার মধ্যেও লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর ও উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য আছে। বইখানি আমরা সর্বশ্রেণীর পাঠককে পড়তে অনুরোধ করছি। প্রাপ্তিস্থান—৩ গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬। মূল্য ৩।০।

পদসঞ্চার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যধর্মী সমস্যাবিহীন অনাড়ম্বর কাহিনীর লেখক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিমান। কল্লোলোত্তর যুগে যে মুষ্টিমেয় লেখক বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, নারায়ণ বাবু তাঁদের অন্যতম। 'পদসঞ্চারে' তিনি এক নূতন ধারা প্রবর্তন করলেন। ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী 'পদসঞ্চার' কৌতূহলোদ্দীপক এবং বিস্ময়কর। 'পোর্তুগীজ জলদস্যুর

ভারতের বুকে পদসঞ্চারের বিচিত্র কাহিনী—ঐতিহাসিক তথ্য অক্ষুণ্ণ রেখে কুশলী লেখক অপূর্ব কৃতিত্ব সহকারে পরিবেশন করেছেন। য়ুরোপ খণ্ডে তখন রেনেসাঁর যুগ, ভারতে মুসলিম শাসকের অন্তিমকাল। বাংলা দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, এদিকে খৃষ্টান শোষকদের পদসঞ্চারে এক অভূতপূর্ব অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের কাহিনী 'পদসঞ্চার'। হিংস্র পোর্তুগীজরা এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। এই রোমাঞ্চকর পটভূমির ওপর ভিত্তি করে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন লেখক, তার ফলে ইতিহাস বাস্তবের আকৃতি লাভ করেছে। শম্পা ও সুপর্ণা এই দু'টি নারীচরিত্র লেখকের সার্থক সৃষ্টি। এই চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাসটির প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স,—মূল্য পাঁচ টাকা।

Journalism as a Career

সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। অতি সংক্ষেপে সাংবাদিক-জীবনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। সংবাদ কাকে বলে, সংবাদদাতার কর্তব্য, বার্তা-সম্পাদক, সহকারী-সম্পাদক, প্রুফরীডার, সম্পাদকীয় আসন ও সম্পাদকের কর্তব্য প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষামূলক। স্বীয় অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত এই গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। জীবিকা হিসাবে সাংবাদিক বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করতে চান, এই গ্রন্থে তাঁরা উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক—মডার্ণ বুক এজেন্সী, মূল্য পাঁচ টাকা।

সমর সেনের কবিতা

সমর সেন বাংলার কাব্য-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে শক্তিমান অসংখ্য কবি যখন বাংলা-সাহিত্যে পূর্ণ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত, তখন কিশোর-কবি সমর সেনের আকস্মিক আবির্ভাব সকলকে যুগপৎ বিস্মিত ও চমকিত করে তোলে। নূতন আঙ্গিক ও বিচিত্র ভাবধারাই সমর সেনের কবিমানসের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। মহানগরীর ক্লেদাক্ত রূপ, সামাজিক দ্বন্দ্ব আর শ্রেণী-সংগ্রাম এর পূর্বে আর কারো কাব্যে রূপায়িত হয়নি। আজ তাঁর লেখনী স্তব্ধ। শ্রান্ত সৈনিকের মত আজ সমর সেন রণক্লান্ত। হয়ত আবার কোনো দিন নূতন রূপে তিনি প্রকাশিত হবেন। উপস্থিত ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত রচিত তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতার স্বনির্বাচিত সংকলন কাব্যরসিকের চিত্তরঞ্জন করবে। অতি পরিচ্ছন্ন মুদ্রণও এই কাব্য-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক—সিগনেট প্রেস, দাম তিন টাকা আট আনা।

শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁরা জানেন, শরৎচন্দ্র নানাবিধ গল্প অতিশয় হৃদয়গ্রাহী করে ছোট-খাটো ঘরোয়া আসরে বলতেন। 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্পে'র সংকলয়িতা সেই রকম কিছু গল্প এই গ্রন্থে যথাযথ পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। তবে সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে জানার সুযোগ তাঁর ঘটেনি, তাই গল্পের মেজাজ সর্বত্র সমান গতি লাভ করেনি। ছোট-খাটো কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটিও আছে, আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হবে। এই সুখপাঠ্য গ্রন্থটির প্রকাশক—সিগনেট প্রেস; দাম আড়াই টাকা মাত্র।

ছুটির দিনে মেঘের গল্প

'ছুটির দিনে মেঘের গল্প' বইটি শিশুদের জন্যে লেখা। কবিতার ভেতর দিয়ে একটি গল্প বইটিতে পরিবেশন করেছেন গ্রন্থকার। বিষয় হোল—বৃষ্টির অভাবে সারা পৃথিবী শুষ্ক কঠিন হয়ে উঠেছে, মাঠের তৃষ্ণার্ত হৃদয় থেকে প্রার্থনা উঠছে: জল দাও, জল দাও। সেই প্রার্থনা শুনে মেঘেরা সমুদ্র থেকে জল নিয়ে মাঠের ওপর ঢেলে দিল, শুকনো মাঠ আবার শস্যশ্যামল হয়ে উঠল। ভাষা এবং বর্ণনা দিয়ে সামান্য এই বিষয়কে শ্রীযুত দাশগুপ্ত এত মোলায়েম ভাষায় নিবেদন করেছেন যে, প্রত্যেকটি শিশুই বইটি পড়ে মুগ্ধ হবে। শিল্পী সূর্য রায়ের আঁকা প্রচ্ছদপট ও ভেতরের ছবিগুলি বইটির অন্যতম আকর্ষণ। ছাপা ও কাগজ খুবই সুন্দর। বইটি প্রকাশ করেছেন: শিশু-সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা। দাম: দেড় টাকা।

মৃগতৃষ্ণা

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী সুপরিচিত নাম। মাসিক বসুমতীর তাঁরা নিয়মিত লেখক। সম্প্রতি মার্কিণ লেখক ন্যাথানিয়েল হথর্ণ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস The Scarlet Letter তাঁরা "মৃগতৃষ্ণা" নামে বঙ্গানুবাদ করেছেন। হথর্ণ যখন স্কুলের ছাত্র তখনই লেখক হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, ছেচল্লিশ বছর বয়সে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁর এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর হথর্ণের সাহিত্যিক-খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা নৈতিক বিধি অমান্য করেছিল, যা নীতিবাগীশদের পক্ষে ক্ষমা করা কঠিন। নারীকে সে অপরাধের মূল্য প্রত্যক্ষ ভাবে দিতে হয়, কিন্তু পুরুষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে অতি গোপনে পাপের মাশুল দেয়। হথর্ণের মতে উভয়েই পাপী, দু'জনেরই শাস্তির প্রয়োজন। যদি চ 'স্কার্লেট লেটারে'র দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিকতার ইঙ্গিত আছে, তবু লেখক অত্যাচারীদের সমালোচনা করলেও হথর্ণের বক্তব্য প্রভাবিত হয়েছে তাঁর নীতিবাগীশ পূর্বপুরুষদের মনোভঙ্গীতে। এই ক্লাসিক গ্রন্থটির অনুবাদ করে অনুবাদকদ্বয় বাংলা সাহিত্যের অনূদিত গ্রন্থ-তালিকার আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ সংযোজিত করলেন। 'মৃগতৃষ্ণা'র প্রকাশক—টি, কে, ব্যানার্জি এ্যাণ্ড কোং, দাম আড়াই টাকা।

পূর্ণিমা

'ভাস্কর' বা জ্যোতির্ময় ঘোষ একজন প্রখ্যাত লেখক। কৌতুক রস রচনাতেই তাঁর খ্যাতি অধিক। 'পূর্ণিমা' তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। আমাদের সমাজ ও সংসারের বর্তমান ধারার একটি রেখাচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন 'পূর্ণিমা' উপন্যাসে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশক—

লেখক স্বয়ং, ১, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা—২১, দাম সাড়ে তিন টাকা

Women in South Asia

উনেস্কো ও এসিয়ান রিলেসন অর্গানিজসেনের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ডাঃ আপ্পাদোরাই। দক্ষিণ-এশিয়ার নারীর মর্যাদা, নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক পটভূমি, আইনগত মর্যাদা, রাজনৈতিক অধিকার, প্রভৃতি বিষয়গুলি কয়েকটি পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ এবং পরিশিষ্টে দশ জন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রচিত নিবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণ-এশিয়ার নারী-সমাজের জটিল সমস্যা সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি চিন্তাশীল সমাজ-বিজ্ঞানী এবং গবেষকের কাছে সমাদার লাভ করবে। গ্রন্থটির প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট লং ম্যান্‌স, দাম চার টাকা মাত্র।

একতারা

সন্তোষকুমার দে ইতিমধ্যে গল্প ও সরস রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'একতারা' তাঁর সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। গাথা জাতীয় কাব্য রচনায় তাঁর স্বাভাবিক শক্তি আছে। মূলতঃ তিনি শ্লেষ রচনাকার, তাই তাঁর 'একতারা'য় সেই পরিহাস-রসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে রচিত এই কবিতাগুলি পাঠক-সমাজে সমাদৃত হ'বে। একতারার প্রকাশক—সোয়ান বুক্‌স—দাম দু' টাকা মাত্র।

নীল ভুঁইয়া

অমিয়ভূষণ মজুমদার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত নাম। তাঁর কয়েকটি গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই নবীন লেখক তাঁর সদ্য-প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস "নীল ভুঁইয়া"র মধ্যে অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। আঠারোশো পঞ্চান্ন খৃষ্টাব্দের বাংলার পটভূমিকায় 'নীল ভুঁইয়া' রচিত। এর দু' বছর পরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটলো, সেই বিদ্রোহের অসাফল্যের মুহূর্তে এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পটভূমিকা প্রায় দু' বছরের ইতিহাস, কিন্তু সুদূর প্রসারিত কাহিনী দীর্ঘতর হতে পারত, কিন্তু লেখকের মাত্রাজ্ঞান আছে। চরিত্র বিশ্লেষণের কৃতিত্বও তাঁর কম নয়, তাই রাজু, পিয়েত্রো, বুজ্‌রুক, বাগচী, নয়নতারা প্রভৃতি চরিত্রগুলি কাজের গণ্ডী অতিক্রম করে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। নীলাক্ত সমাজের কাহিনী অমিয়ভূষণের হাতে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। সুমুদ্রিত এই উপন্যাসটির প্রকাশক—নাভানা,—মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

যেমন তাঁকে দেখি

সৎসঙ্গ আশ্রমের অধিনায়ক শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের জীবনালেখ্য "যেমন তাঁকে দেখি"র রচয়িতা শ্রীনাথ পরমপুরুষকার অচিন্ত্যকুমারের ভঙ্গীতে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। অনুকূলচন্দ্রের যাঁরা গুণমুগ্ধ এবং যাঁরা তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আগ্রহশীল তাঁরা এই সুমুদ্রিত এবং সুলিখিত গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারেন। গ্রন্থটির প্রকাশক—সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর। মূল্য চার টাকা মাত্র।

নাটোর—১৩৬১

আশরাফ সিদ্দিকী

চলেছে পেট্রোল যান। দুই পাশে ক্ষুব্ধ ধূলিকার
অজস্র সৈনিক দল ধাওয়া করে। তার পর স্বর্ণ-তুলিকার
অপূর্ব যাদুর স্পর্শে লাল হ'লো নাটোরের পথ।
অশোক কিংশুক আর পলাশ-রঙীন মেঠো পথে—
সন্ধ্যা এলো স্বপ্নের মতন।

আমের জামের বনে গোধূলির মায়াবী প্রহর
কুমারী-চোখের মতো করুণায় হ'লো ছলো-ছলো—
পার্শ্বচারী হে বান্ধবি!
কি নামে ডাক্‌বো তোমা বলো!!
কি নামে ডাক্‌বো তোমা বলো? আম-বনে বিরহী কোকিল
দেখোনি গাহে না গান! গোধূলির এই অবসর!!
দু'-একটি কথা বলো—স্তব্ধ প্রাণ শ্যামল প্রান্তর
শুনুক শুনুক আজ। দোয়েল কোয়েল সেই স্বরে—
অনাদি অনন্ত কাল ডেকে ডেকে উড়ুক অম্বরে।
রাণী ভবানীর এই স্তব্ধ নীল প্রাসাদ-সরসী
অস্ত্রের ঝংকারে নয়—প্রাণের সংগীতে হোক লাল।
মহাকাল—মহাকাল—হে নির্মম কাল—
ওষ্ঠের চুম্বনে আজ রেখে গেনু সম্মিলিত গান
শান্ত হোক শত-লক্ষ শহীদের প্রাণ।

তার পর সন্ধ্যা হ'লে—'সব পাখী ঘরে ফিরে এলে'
সে যেন এখানে এসে এই স্বচ্ছ দীঘির সোপানে
আনমনে ভাসায় ব'সে শিউলীর শেফালীর মালা
সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হ'বে! রাত্রি হ'বে অগ্নির পেয়ালা!
মাস শেষে বর্ষ কেটে যাবে! এই দুই হাজার বছর···
তার পর—তার পর—তবু তার পর—
সে যেন এখানে ব'সে সেই চিরন্তনী সুরে প্রশ্ন করে,
'কেমন আছেন'?
তখনও বেঁচে রবে 'নাটোরের বনলতা সেন'!
অথবা আরেক সুরে 'পাখীর নীড়ের মত নয়নাভিরাম'—
প্রশ্ন করে—
শালের তালের বনে বলাকা-পাখার খামে
লেখা আছে যার মৃদু নাম
সে-ও তো সে রূপকথা—
যে আমার পার্শ্বচারী আজ
চোখের জলের মত সকরুণ সাঈদা বেগম!!

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

বিদায় সাংহাই!

এরোড্রোমে প্লেনের ভিতরে বসে বসে দেখছি। এক তেপান্তরের মাঠ। লড়াইয়ের কাজে এত বড় করে বানিয়েছিল। এখন খানিকটা জায়গায় প্লেনের উঠানামা, বেশির ভাগ পোড়ো জমি ও ঘাসবন হয়ে আছে। এই উঠানামার এলাকা বাড়ানো হচ্ছে, গ্যাংওয়ে লম্বা করা হচ্ছে, নতুন নতুন কোঠাবাড়ি উঠছে এদিকে-সেদিকে। কাচের জানলা দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে চতুর্দিক দেখছি।

নদী অদূরে। জল দেখতে পাইনে, কিন্তু মন্থরগতি পাল ভেসে চলেছে হাওয়ায়। জাহাজের মাস্তুল স্থির দাঁড়িয়ে আছে। কাশবন মাঠের প্রান্তে, হু-হু করে হাওয়া দিয়েছে—পলিতকেশ বুড়োর মতন কাশফুল মাথা দোলাচ্ছে। নাম-না-জানা কোন গুল্মে অজস্র হলদে ফুল ফুটে চারিদিক আলো হয়ে আছে। রুমাল নাড়ছে হাস্যমুখ মেয়েরা ওধারের বারাণ্ডার উপর ভিড় করে। বারাণ্ডার নিচে পায়োনিয়র ছেলেমেয়ের দল। মুরুব্বিরা প্লেনে উঠবার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে এসেছেন। রুমাল আর হাত নাড়ছে সকলে। আমরা যেমন করে কাউকে কাছে ডাকি, ওরা কি তেমনি ভাবে হাত নেড়ে বিদায় দেয়। এঞ্জিন গর্জন করছে, প্রপেলার ঘুরছে। বিদায়, বিদায়!

সুপ্রাচীন এক প্যাগোডার চূড়া, নামটা জেনে নিয়েছি—লংকা প্যাগোডা। আর ফ্যাক্টরির অসংখ্য চোঙা ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশে। আমার গাড়িতে পাশে বসে এক ভদ্রলোক শহর থেকে এরোড্রোম অবধি এসেছেন। অল্প-সল্প ইংরেজি জানেন, মনের দোর মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি একেবারে। দু-জনেই পরস্পরকে উত্তম রূপ বুঝি, এটা তিনি ধরে নিয়েছেন; অপার দুঃখ-রাত্রি কাটিয়ে উভয় জাতিরই সূর্যালোকের পথে যাত্রা। তাঁকেও ঐ দেখতে পাচ্ছি—দলের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। ছুটছে প্লেন গ্যাংওয়ের উপর, গর্জন ভয়ানক রকম বেড়েছে। উঠে পড়লাম আকাশে। খাল-নদী, বিশাল শহর, শহরের ঘরবাড়ি এক দিকে হেলে পড়েছে। শহর পিছনে ফেলে সাঁ করে বেরিয়ে এলাম।

সকালবেলা আজ কিংকং হোটেলের জানলা দিয়ে প্রসন্ন রোদ মেজেয় পড়েছিল। পেরিন লাফিয়ে উঠলেন, দেখ, দেখ—কি আশ্চর্য রোদ্দুর! সোনা কুড়িয়ে পেলে মানুষ অমন করে না। চলে যাবার দিন সাংহাইয়ের সূর্য আমাদের কাছে প্রথম মুখ দেখালেন; রোদ পোহাতে পোহাতে এসে প্লেনের খোপে ঢুকেছি। কিন্তু আকাশে উঠেই কোথায় সব রোদ মিলিয়ে গেল! মেঘ, মেঘ—মেঘের সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছি, মেঘ ছাড়া কিছু নেই কোন দিকে। জানলার কাচ কুয়াসায় আচ্ছন্ন। জানলার এধারেও দেখি জল ফুটেছে, ফোঁটা হয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দেশের টানে—আপনাদের কাছে ফিরে আসবার জন্য, মেঘ ভেদ করে তীব্র বেগে ছুটছি। আচ্ছা, টুপ করে যদি ভুঁয়ে পড়ত প্লেন, এমন তো আকচার হচ্ছে—কাগজে এক ছত্র নামটা হয়তো দেখতে পেতেন, কিন্তু আমাদের মনের আকুতি একটুও পৌঁছত আপনাদের মনে?

২-৩৫এ ক্যাপ্টেন পৌঁছবার কথা। ছুটো নাগাদ পাইলটের ঘর থেকে কবুল জবাব এলো—দেরি হবে, পৌঁচচ্ছি ৩-১৮ মিনিটে। বিষম এক মুখোড় বাতাসের সামনে পড়েছিলাম, বিস্তর লুটোপুটির পর পবনদেব পরাস্ত হয়েছেন। বাইরে এত কাণ্ড, ভিতরের আমরা কিছু জানিনে—আগুা-আপেল মুখে ঠাসছি আর হাতে কলম চালাচ্ছি।

আবার উজ্জ্বল রোদে এসে পড়েছি, রোদের সমুদ্রের ঢেউ তুলে যেন ছুটছি। ভূমিতল স্পষ্ট হয়ে এলো। পাহাড়ের উপরে এখন—অগণ্য শিখর, ঝিকমিকে ঝর্ণাধারা। আরে, এসে গেলাম নাকি ক্যান্টনে! সেই আর একদিন এইখানে আমায় একলা ফেলে রেখে যাচ্ছিলেন, আজকে দলনেতা হয়ে সকলকে বহাল তবিয়তে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। এরই নাম মহৎ-প্রতিশোধ!

নতুন জায়গায় পা ফেললে যেমন হয়ে আসছে—কচি কচি হাতের কুসুমগুচ্ছ, আর শত শত হাতের হাততালি। এবং নানান দিক থেকে ক্যামেরার ঝিলিক হানা। হোটেলে ঢুকবার মুখে পুনরায় এক দফা অভ্যর্থনা। সেই আই-চুন হোটেল—পাশে বয়ে চলেছে আনীল-সলিলা তরঙ্গময়ী পার্ল।

স্নান এবং বিশ্রামাদি হল। বাহাত্তর শহীদের সমাধিভূমি—যাবার সময় একটা রাত্রি ছিলাম, কোনখানে যাওয়া হয়নি। কুমুদিনী মেহতা, পেরিন এবং আরও কে কে যেন আমায় কাছে জিজ্ঞাসা করতে এলেন। হ্যাঁ, সকলের আগে ঐ শহীদস্থানে। মেয়েরা বেরিয়ে পড়লেন; ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তৈরি করিয়ে আনলেন সাদাফুলের দেড়মানুষ সমান বিশাল স্তবক। পরম যত্নে এবং অতি সন্তর্পণে সেই বস্তু গাড়িতে তুলে নিয়ে দলশুদ্ধ পুষ্পার্ঘ্য দিতে চললাম।

জায়গাটার নাম বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'হলদে ফুলের পাহাড়'। তাই বটে! মর্মরসৌধের চতুর্দিকে লক্ষ-কোটি তারায় মধ্যে হলদে হলদে ফুল ফুটে আছে। ২৯শে মার্চ, ১৯১১ অব্দে সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের গবর্নরের বাড়ি হানা

দিল একশ সত্তর জন তরুণ বিপ্লবী। তার মধ্যে বাহাত্তর জনকে পাওয়া গেল—বাহাত্তরটি স্তূপীকৃত শবদেহ। বাকি তারা কোথায় গেল, কেউ জানে না আজ অবধি। সেই বাহাত্তর বীরকে বয়ে এনে এখানে মাটি দেওয়া হল। স্মৃতিসৌধ অনেক পরে হয়েছে ১৯১৯ অব্দে—বেশির ভাগ খরচ দিয়েছিলেন প্রবাসী চীনারা।

সেই বিশাল পুষ্পোপহার-বহনের গৌরব আমাকেই দিলেন সকলে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের তরফ থেকে আমি পুষ্পার্ঘ্য দিলাম। কয়েক জন অস্ত্রধারী সৈনিক দিনরাত্রি এখানে পাহারা দেয়। আমাদের দেখে এদিক-ওদিক থেকে বাড়তি সৈন্ত অনেক এসে জুটল, সাধারণ মানুষও বিস্তর দাঁড়িয়ে গেছে। দোভাষি বললেন, বলুন আপনি কিছু, ওরা শুনতে চাচ্ছে। পেরিনও বলছেন, বলুন, বলুন। কিন্তু কী এদের সম্বন্ধে এখন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলব? এত বয়স অবধি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে বেঁচে আছি—তাতে যেন ছোট হয়ে গেলাম এদের সামনে। এরাও তো পারত! কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের শতেক লাঞ্ছনা হজম করে বাঁচতে তারা চাইল না। আমি যে ভানতাম এমনি কত জনকে,

ছয় বটগাছের প্যাগোডা বাইরে থেকে সাত-তলা দেখছেন, ভিতরে সতেরো তলা।

কত তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি! কথার বেসাতি করে তো জী[illegible] কাটল, কিন্তু এমন কথা কোথায় আজ পাই, যা দিয়ে এ[illegible] স্তুতি-গান গাঁথা যায়।

না, বক্তৃতা নয়; শুধু গান। এই দিনান্তবেলা সুরে সু[illegible] ক্ষিতীশ এদের বন্দনা করবে। ঠিক এই গানই আরও কত[illegible] শুনেছি, কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে যেন গানের কথা আজকে পা[illegible] করে তুলল। আর বাংলায় গান যখন, আমারই বুঝিয়ে দেব[illegible] দায়। কিন্তু এ কি করছি—গানের মধ্যে নেই, তেমনি কত [illegible] বলে চলেছি আকুল কণ্ঠে। বক্তৃতা বলবেন না একে, আমার মর্মছে[illegible] অশ্রুজল। বন্ধু, চোখে না-ই দেখে থাকি, চিনি আমি তোমা[illegible] সকলকে। ভাল করে চিনি। আমাদেরও কত ছেলেমেয়ে গে[illegible] এমনি! তারা আর তোমরা সকলে এক জাতের। এক তোমা[illegible] ধর্ম, একটি মন। মানুষের মুক্তির জন্ম যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন দেশ এবং যে কালেরই হোন—তাঁদের নামে এই কুসুমাঞ্জ[illegible] কুসুম দিলাম ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রীতিলতা, ভগৎসিংদের[illegible] আমার স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আজ এই সন্ধ্[illegible] লোকে সকলকে আমি পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি···

শহরের ভিতর ঘোরাঘুরি করতে করতে এলাম—কৃ[illegible] শিক্ষণ-কেন্দ্রে। চাষীদের একেবারে আপন জায়গা। ১৯২৬ অ[illegible] মাও সে-তুং শিক্ষণ-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন কৃষক আন্দোলনের [illegible] কৃষকদের গড়ে তোলবার জন্ম। তিনিই ছিলেন পরিচাল[illegible] আজকের প্রধান মন্ত্রী চাউ এন-লাই ছিলেন এক মাষ্টার ওখানকা[illegible] কো মো-জো কর্মীদের একজন। গাছের তলায় একটুখানি চা[illegible] মতন—এইখানে বসে মাও বৈঠক করতেন চাষীদের সঙ্গে। [illegible] বেলা কাজকর্ম এখন বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরবাড়িগুলোই শুধু দেখা হল[illegible]

হোটেলে ফিরতে না ফিরতে ব্যাঙ্কুয়েটে নিয়ে বসা[illegible] সমাধিস্থানের ঘোরটা তখনো মনে আছে। দলনেতার বসতে হলের মাঝখানটায় সকলের বড় টেবিলে সর্বদৃষ্টির সামনে; এক[illegible] বসে আত্মরক্ষা করব, সে উপায় নেই। টেবিলের উপরে [illegible] থরে রাক্ষুসে আয়োজন। এ-ও কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা—খাওয়া [illegible] না একে, নিতান্তই চাখা। চাখার কাজ শেষ হয়ে গেলে ত[illegible] পদের পর পদ আসতে থাকবে। চীনে আমাদের দিন শেষ [illegible] এলো, আয়োজন তাই হিমালয়স্পর্ধী হয়ে উঠেছে। যাকে শেষ মার।

ডক্টর কিচলু ভোরবেলা ট্রেনে এসে পড়ছেন। এলে তো [illegible] যাই। আমার এই আবুহোসেনি বাদশাহির ভার-বোঝা না[illegible] বাঁচি। একটা দিন আগে যদি আসতেন, এই বিষম ভোজ [illegible] রক্ষা পেয়ে যেতাম। শীতের জায়গা, তবু—হলপ করে বল[illegible] আলোয়ানের নিচে সর্বদেহ ঘেমে উঠেছে। মুখ শুকনো [illegible] বলি, শরীর ভাল লাগছে না। রাত্তিরবেলাটা আজ উপোস [illegible] ভেবেছিলাম—

মুরুব্বিরা শশব্যস্তে শুধান, অ্যাঁ, সে কি? অসুখ-বিসুখ [illegible] বুঝি? কি রকমটা হচ্ছে বলুন তো?

সর্বনাশ, এ কোন দিকে চলেছি! চাটু থেকে উনুনের আ[illegible] সেই পিকিনের মতন ডাক্তার-নার্সের জিম্মায় যদি ঠেলে [illegible]

মিনিটে মিনিটে ওষুধ খাওয়াতে লেগে যায় শিয়রে নার্স মোতায়েন রেখে? সুরটা যেন সেই ধরণের। তার চেয়ে চোখ-কান বুজে বন্দ্র গাড়ি চালিয়ে যাই। এখন তো গলাধঃকরণ করে নিই, তার পর কায়ক্লেশে ঘর অবধি গিয়ে যে কাণ্ড হবার হোক গে।

কি হয়েছে?

এক গাল হেসে তাড়াতাড়ি জবাব দিই, এই দেখুন—হবে আবার কি! বড্ড বেশি খাওয়া হচ্ছে, এ বেলাটা একটু বিশ্রাম নেবার তালে ছিলাম। থাকগে—কম-কম খাবো। এই আরজি জানিয়ে রাখছি আগে ভাগে।

ওঁরা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছেন। ষোল আনা যে বিশ্বাস করেছেন, তা নয়। কিন্তু আমার অত উৎসাহের উপর কি আর বলতে পারেন? নিরামিষ ব্যাঙের-ছাতা গোটা দুই-তিন এক সঙ্গে মুখে পুরে কপ-কপ করে চিবিয়ে অটুট স্বাস্থ্যের প্রমাণ দিয়ে দিই।

এর পরে সর্বোত্তম তরকারিটা এলো—হাঙরের পাখনার ডালনা। সাবু খেয়ে থাকেন তো বুঝবেন। রং অবিকল অমনি, এবং বস্তুটা ঠিক ঐ প্রকার আঠা-আঠা।

কম করে দেবেন—

শান্তি-কমিটির সভাপতি আমার পাশে, বড় পাত্র থেকে তিনি চামচে কেটে কেটে দিচ্ছেন। বিগলিত কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন, একবার মুখে ঠেকিয়েই দেখুন না। তার পরে বলবেন।

এক নাগাড় তারিপ শুনে শুনে দুর্বুদ্ধির বশে প্রায় পুরো চামচে গলায় ঢেলে দিয়েছি। আর যাবে কোথায়! যে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই বুঝি এই ভোজের টেবিলেই ঘটে যায়! অন্নপ্রাশনের দিনে প্রথম-খাওয়া অন্নগ্রাস অবধি ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

অসহায় ভাবটা মুখে চোখে প্রকট হয়ে থাকবে। চতুর মেয়ে কুমুদিনী হলের নির্বিঘ্ন দূরপ্রান্তে বসে খুক-খুক করে চাপা হাসি হাসছেন। হেন অবস্থায় ধৈর্য রাখা দায়। ঠেলেঠুলে এই বিপাকে ফেলে দিয়ে এখন আপনারা মজা দেখছেন। এই বটে কলির ধর্ম!

আজকে আমার শেষ সম্ভাষণ চীনদেশে এই চীনা বন্ধুদের মধ্যে। কিচলু এসে পড়লে কে আর ঝামেলায় যাবে! আছিও এখানে মোটে আর কালকের দিনটা। বললাম সেই কথাই। এক মাসের বেশি হয়ে গেল—এই ক্যান্টনে এমনি এক রাত্রে ভয়ে ভয়ে পা ফেলেছিলাম। সেদিন ছিলাম নিতান্তই পরদেশি। তার পরে আত্মীয় করে নিলেন আপনারা। আজকে আমি পুরোপুরি আপনাদের এক জন। তেমনি আমাদের দলের সকলেই। চলে যাবো, তাই দেখুন চোখে জল ভরে আসছে, কথা জুটছে না মুখে—

বড্ড ভারি হয়ে যাচ্ছে, তাই কিঞ্চিৎ হাসিয়ে রখিয়ে দিই। যেতে মন চায় না আপনাদের ছেড়ে। ভেবেছিলাম যাবোই না আর—পাকাপাকি থেকে যাবো। তা আপনারা কি হতে দেবেন? এমন খাওয়াচ্ছেন যে পাকস্থলী বিদ্রোহ করে বসেছে। সেই জন্যেই তো থাকা চলল না।

প্রায় পেশাদার বক্তা হয়ে উঠেছি, কি বলেন? বিদেশ-বিভুঁয়ে এদের বোকাসোকা পেয়ে মজাসে আগডম-বাগডম চালাচ্ছি। কামারের বাড়ি সূচ চুরি চলে না—আপনাদের কাছে হলে—ও রে বাবা, হাততালি দিতেন না, একখানা হাত বক্তার গলদেশে স্থাপন করতেন, যার এক হাতে পথ দেখাতেন। ক্ষিতীশ ভারি খুশি। বলে, আচ্ছা জমিয়েছেন দাদা! এবং আরো খুশি ভোজ অন্তে যখন এক গাদা উপহার-সামগ্রী এসে পড়ল। ক্যান্টন ভালবাসে তোমাদের—ভাগ্যবশে যাদের এই কাছাকাছি পেয়েছি, তাদেরই শুধু নয়, ভারতের সকল নরনারীকে। এবং এই আজ বলে নয়, হাজার হাজার বছর ধরে পরস্পরের ভালবাসা। ছয়-বটগাছের প্যাগোডা দেখে এসো কাল—ঐ এক জায়গা থেকেই পুরানো সম্পর্কটা মালুম পাবে।

একদা ছিল সাত বটগাছ। একটা মরে গিয়ে এখন ছ'টা আছে। ডালপালা-মেলানো, ছায়াময়—দূর থেকেই নজরে আসছে। শ্রমণরা রাস্তা অবধি ছুটে এলেন, আসুন—আসুন—এ তো আপনাদেরই জায়গা। এই যত বটগাছ সমস্ত ভারত থেকে এনে পোঁতা। পবিত্র জ্ঞানে পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে আমরা পালন করে আসছি।

এক হাজার শ্রমণ বসতি করেন এই প্যাগোডায়। ৫৩৫—৫৪৫ অব্দ, দশ বছর লেগেছিল প্যাগোডা ও ঘরবাড়ি তৈরি করতে। সতের তলা স্তম্ভ; বাইরে থেকে দেখবেন কিন্তু সাত তলা। স্তম্ভের খানিকটা অবধি উঠে নেমে এলাম হাঁপাতে হাঁপাতে। চূড়ায় ওঠা হল না।

সেই পুরাকালে কাঞ্চিয়ান (আসল নামটা কি, পণ্ডিতেরা বলুন। কাঞ্চন? ওদের মুখে মুখে কাঞ্চিয়ান নাম দাঁড়িয়ে গেছে। অবোধ্য হওয়ায় বানান করতে বললাম দোভাষিকে। সে ইংরেজি বানান দিল—Kunchian) নামে এক ভারতীয় এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতে। নানান তরফের শত্রুতা, প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল তাঁর। তখন তিনি নারী-বেশ নিলেন; নারীর সজ্জায় থাকতেন অহোরাত্রি, ঐ বেশে ধর্মকথা বলতেন। সেই নারীরূপের প্রতিমূর্তি আছে। পুরুষমূর্তিতেও আছেন তিনি

ওয়েস্ট-লেকের পদ্মবনে আমাদের পাশাপাশি নৌকো
(ঢেঁকি যথারীতি ধান ভেনে চলেছেন)

নাকি অন্যত্র। আর আছে ওয়া-নাং রাজার তাম্রমূর্তি—যাঁর আমল থেকে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার।

প্যাগোডায় আসবার আগে সকালবেলা আজ একা-একা বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিঞ্চিৎ বকুনি খেলাম সেই অপরাধে।—অমন ধারা দুঃসাহস কদাপি দেখাতে যাবেন না, দোহাই! হেসে হেসে তখন আমি পিকিনের গল্প করি। মরিশন ষ্ট্রিটের বাজার চুঁড়ে বেড়ানো; ভাষা না জেনেও পথের জনতার সঙ্গে দহরম-মহরম; চন্দ্রালোকে তিয়েন-আন-মেনের সামনে সেই আহা-মরি নৃত্য! ওঁরা বলেন, পিকিনে যত্র-তত্র ঘোরাঘুরি করুন গে, সাংহাইতেও আপত্তি করব না; কিন্তু এখানে—জানেন, গেল-বছর ভারতের বন্ধুরা ক্যাণ্টনে পা দিলেন, সেই রাতে বিপদের সাইরেন বাজল। আজকে অবিশ্যি ক্যাণ্টন অবধি এসে চিয়াং কাইশেকের বোমা মারবার তাগত নেই। তাহলেও তার চেলা-চামুণ্ডারা ঘুরে বেড়াতে পারে। তোমাদের কোন রকম শারীরিক হানি ঘটানো বিচিত্র নয় চীন-ভারতের বন্ধুত্বে চিড় খাও যাবার মতলব করে। সেই জন্যে এত সামাল, সামাল!

যাকগে। কিছু তো হয় নি—আছি বহাল-তবিয়তে, তবে আর কথা কি! প্যাগোডা দেখা শেষ করে পিপলস ষ্টেডিয়ামের দোর-গোড়ায় সারি সারি আমাদের মোটরগুলো এসে থামল। এখনো কাজ চলছে, বিস্তর লোক খাটছে। আগে ভিক্ষা করে খেতো এই সব লোক—এক ক্যাণ্টনেই ছিল তিন হাজার ভিক্ষুক। বৃত্তিটা বে-আইনি হয়ে যাবার পর সক্ষম সমর্থগুলোকে বেছে এমনি নানান কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। ১৯৫০ অব্দে পাঁচ মাসের ভিতর তড়িঘড়ি এই ষ্টেডিয়াম বানিয়ে ১লা অক্টোবরের জাতীয়-উৎসব করল। ত্রিশ হাজার লোকের বসবার জায়গা, আর যাট হাজার লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। তিন দিকে পাহাড় —এটাও ছিল পাহাড়মতো জায়গা। মাঝের মাটি-পাথর খুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমান চৌরস করেছে। চতুর্দিকের উঁচু অংশে কেটে কেটে ধাপ বানানো; সিমেন্টের পলস্তারা ধাপের উপর। ঐ হল গ্যালারি। চালাকি করে কত সস্তায় কিস্তিমাত করেছে, দেখুন।

পাশে পাঁচতলা এক বাড়ি—পিপলস মিউজিয়াম। ঐ যে বললাম—যেখানে পা ফেলবেন, মিউজিয়াম-একজিবিশান আছেই। সোভিয়েট দেশেও এমনি দেখে এলাম। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা! না শিখে যাবেন কোথা? যত রকমে পারো মানুষের চোখ-কান ফুটিয়ে দাও, তারাই তার পরে দুনিয়ার হালচাল বুঝে নেবে। ঘুরে ঘুরে দেখছি। চারুকলা, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নানা সামগ্রী। বিস্তর ছবি—১৯১১ থেকে ১৯৪৯, বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় ছবিতে এঁকে দিয়েছে। একটা অতি-পুরানো জিনিষ—হাতির দাঁতের উপর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের লেখা জোরালো মাগ্নিফাইং গ্লাসেও সে লেখা পড়া মুশকিল।

সন্তরণাগার। আগে পোড়ো-জমি ছিল, নতুন-চীন সেখানে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলেছে। ক্যাণ্টনে এলে এটা দেখতেই হবে। এর কাজ এখনো চলছে। বাইরের দিকে লম্বা খাল কাটা হচ্ছে, নৌকো বাইবে দাঁড় টেনে টেনে। সে খালের পুল হচ্ছে আবার। দেখুন দেখুন, রাক্ষুসে ব্যাং একটা পাথরে তৈরি; তিনটে বিশাল সাপ তিন দিকে। এই চার মুখে জলের ফোয়ারা। সাঁতারের সর্ব রকম বন্দোবস্ত, উজ্জ্বল আলো। ষ্টেডিয়াম বানিয়েছে—সেখানে বসে লোকজন সাঁতারের প্রতিযোগিতা দেখে। অমনি যে টুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা হবে না। বাথরুম আছে, সাবান ঘষে আগে ভাল করে নেয়ে-ধুয়ে নেবেন; পরিচ্ছন্ন সাঁতারের পোশাক পরবেন, তবে নামতে দেবে।

আর চব্বিশ ঘণ্টাও নেই চীনভূমিতে। চীন দেখা সাঙ্গ হয়ে এলো। স্পেশাল-ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের সীমান্ত পৌঁছে দেবে। রাত্রি বারোটায় যাত্রা। সান-ইয়াৎ-সেন স্মৃতি-ভবন তবে তো এই বেলার মধ্যেই দেখে নিতে হয়।

১৯২৯-৩১ অব্দে তৈরি। পাহাড়ের নিচে অষ্টকোণ বিরাট সৌধ—পুরোপুরি চীনা পদ্ধতির। লাল দেয়াল, কাঠের কাজ, ছাতটা নীল টালির। হলে সাড়ে পাঁচ হাজার চেয়ার, দেয়াল-ভরা সুন্দর সুন্দর ফ্রেস্কো ছবি। একটাও থাম নেই এত বড় হলের ভিতর। ষ্টেজের অংশটা ভেঙে ১৯৫০ অব্দে নতুন ভাবে তৈরি। ডাক্তার সানের বিশাল মূর্তি প্রান্তদেশে। এই অঞ্চলের শান্তি সম্মেলন হবে এখানে—তাই মাও-র ছবি দিয়েছে, পাঁচ তারা পতাকা আর রকমারি রঙিন আলোর সজ্জা করেছে।

পিছনে পাহাড়ের উপরে স্মৃতিস্তম্ভ। জাপানিরা বোমা মেরে জখম করেছিল, এখন মেরামত হয়ে গেছে। আর হলের প্রবেশ-মুখে সান ইয়াৎ-সেনের নিজের হাতের অক্ষরে খোদাই করা আছে—তিয়েন সিয়া উই কুং। অর্থাৎ, আকাশের নিচে যত মানুষ আছে সকলে এক।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বিকেলের কোন এক তীর

জ্যোৎস্না ভড়

বিস্তীর্ণ এই তীর ঘুমের নগর
প্রহরে প্রহরে চলে রৌদ্র-আলাপন—
অতলান্ত অন্ধকার কখনো বা নামে
জ্যোৎস্নার মূর্ছনা তোলে দীর্ঘ অবসরে।
তীর এই! এই তীর
শিল্পি-মনন নিয়ে কত ছবি আঁকে—
কত কথা বলে যায় মৃদু সমীরণে,
কত না সান্ত্বনা জানি কথা হয়ে ফোটে,
রাত্রের শীতার্ত মনে বসন্ত আনে!

বিকেলের এই তীর ঘুমের নগর
উজ্জ্বল সবুজে ঢাকা; পরম বিস্ময়
বিঠোফেন এই তীরে বেহালা বাজায়!

—এ বিকেলও চলে যাবে ছায়া দীর্ঘ করে
এ বিকেল ফেলে জানি রাত্রি আসবেই রাত্রি নামবেই।

সকলের পক্ষেই ভালো...

✻ কারণ ইহা বিশুদ্ধ

✻ কারণ ইহা পুষ্টিকর

DALDA
ডালডা

ডাল্‌ডা বনস্পতি

½, ১, ২, ৫, ও ১০ পাউণ্ড টিনে ভারতের সর্ব্বত্র পাবেন
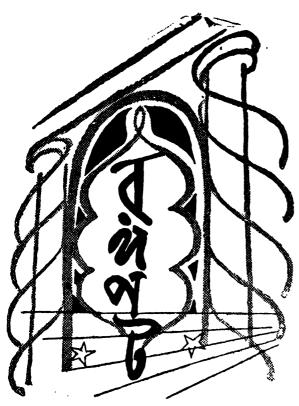
চিত্রতারকারাই জীবনের আদর্শ।

কথা বলতে শিখে শিশু প্রথমেই যে কথা বলে, তা হোল 'মা'। তারপর বাবা, কাকা, দাদা, মাসীমা, মামীমা, কাকীমা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে সিনেমা। মালদহে এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা দেবার সময় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর বলেছেন, যদি সিনেমার ওপর কোন পরীক্ষা নেওয়া হয় তাহলে আধুনিক ছাত্র প্রথম বিভাগে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক পরীক্ষায় মহামতি অশোক সম্পর্কে প্রশ্নে অশোককুমারের জীবনী লিখেছিল জনৈক ছাত্র, এ-কথা নিশ্চয়ই আপনারা সংবাদপত্র মারফৎ পড়েছেন। সে যাই হোক, চলচ্চিত্র সমাজ-জীবনের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সেই অঙ্গ যদি অপরিষ্কৃত হয় তো সমাজে গলিত ক্ষতের ন্যায় তা কাজ করে। তারই প্রতিক্রিয়া সমাজে আনারকলি-শাড়ী আর আওয়ারা-সার্টের প্রবর্তন। অভিভাবক ও সমাজস্থ কর্তা ব্যক্তিগণের উচিত চলচ্চিত্র জগতের আবহাওয়ার পরিবর্তন করা এবং সুস্থ নাগরিক গঠনের কাজে চলচ্চিত্রকে লাগানো। আর নাবালক ছেলের দল স্কুল পালিয়ে কোন সিনেমায় ঢুকলো তার খোঁজ করা।

New Empire-এ ড্রামা ফেষ্টিভ্যাল্

বছর দুই আগে এক বার নাট্যোৎসব করার চেষ্টা করেছিল বহুরূপী। সে ছিল তাদের একক প্রচেষ্টা। থিয়েটার সেণ্টার এবার কলকাতায় যে নাট্যোৎসব করলেন, তাতে কিন্তু অনেক দলের স্পর্শ পাওয়া গেল। ১৩ই মার্চ থেকে সুরু করে প্রতি রবিবার সকালে এক একখানি নাটক পরিবেশন করলেন তাঁরা। নবনাট্যমের 'জনরব', জাতীয় নাট্য পরিষদের 'পূর্বরাগের ইতিহাস', তরুণ সঙ্ঘের 'দাগ, আলাপ, রাস্তে' ও বহুরূপীর 'উলুখাগড়া'। নাটকে পরিবেশনার বিচারে কে ভাল, কে মন্দ সে বিচার মুখ্য নয়, আস কথাটা হল নাট্যোৎসবটির উদ্দেশ্য নিয়ে। নতুন নাটক রয়েছে এ মধ্যে, রয়েছেন নতুন নাট্যকার দল। তাঁদের এই নাট্য আন্দোল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। থিয়েটার সেণ্টার দেশের নাট্য আন্দোল বিশেষ সাহায্য করলেন, এই এক মাসব্যাপী নাট্যোৎসবের দ্বার নাটকগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্ব, সেট-সিন ইত্যাদি পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত পরিবেশ রচনা, পাত্র-পাত্রীর সংযত অভিন আঙ্গিক ও কলাকৌশল বেশ একটা পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় দিয়েছে আলো ও যন্ত্রসঙ্গীতের পরিবেশনের মধ্যে একটা নিষ্ঠার পরি পেয়েছি। সব দিক দিয়ে বিচার করে আমরা একথাই বলি থিয়েটার সেণ্টার তাঁদের কাজ যথাসাধ্যই করেছেন। শেষ দিনে ঘোষণা অনুযায়ী তাঁদের একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা কেমন হ তা দেখার বাসনাও রইল আমাদের।

রেডিও-নাটক

আধ ঘণ্টা, ৪৫ মিনিট, এমন কি কখনো কখনো এক ঘণ্টা নাটকের জন্য দেওয়া হয় রেডিওতে। কে লেখেন এ সব নাটক কোনও বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়? রেডিওর জন্য বিশেষ করে লেখা হয় কোনও নাটক? আবহাওয়া তৈরী ক হয় ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক দিয়ে? ষ্টুডিওর রিসার্চ ডিপার্টমে বিভিন্ন প্রকার শব্দের সুষ্ঠ পরিবেশনের জন্য রেকর্ডিং করা হয় অভিনয় কারা করেন? তাঁরাই যে প্রথম শ্রেণীর অভিনে এ নির্বাচন করেন কে? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের প্র রয়েছে আমাদের। কিন্তু যেদিন দেখলাম 'নাইন আপ' 'আকস্মিকে'র মত নাটকের পুনরভিনয়ের নোটিশ (নাটক ভাল মন্দ সে আলোচনা থেকে আমরা বিরত থাকলাম) পড়েছে সেদিন বুঝলাম রেডিও-ষ্টেশনে নাটক দস্তুরমত বাড়ন্ত হয়েছে। কিন্তু কে এই নাটকের অভাব? সে অভাব মোচনের জন্য নাটকের দ ব্যক্তিগণ কি চেষ্টা করছেন (বছরে একটি প্রতিযোগিতাই যথে নয়) শুনি? আমরা যতটা জানি যে সব ব্যক্তিদের হাতে রেডিও নাটক, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও পরিচালনার ভার রয়েছে তাঁদে বেশীর ভাগই নাটকীয় ভাবের অকর্মণ্য। প, পি, চু; স শুনে সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছে। বাংলা দেশে সারাজীবন না আন্দোলনের পুরোভাগে রইলেন যাঁরা তাঁদের বাদ দিয়ে কয়েকজ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে ষ্টেশন-ডিরেক্টার এ সবের ভার ছেড়ে দিলে কি করে, গালে হাত দিয়ে তাই ভাবছি।

বাংলা ছায়াছবির উদ্বোধন প্রসঙ্গে

বাংলা ছায়াছবি 'ওথাস্ত'র উদ্বোধন হবে কলকাতার বিশি কয়েকটি চিত্রগৃহে। কয়েক শ' টাকার বিজ্ঞাপন ছাড়া হ কাগজে। সেই বিজ্ঞাপনই চলবে যত দিন না শেষ হচ্ছে ছ (ছবির উদ্বোধনের জন্য বিশেষ করে আলাদা বিজ্ঞাপন অ অল্পই হয় এদেশে) দেখানো। সারা কলকাতায় পোষ্টার পড় দেড় ফুট সাইজের। যে সব চিত্রগৃহে ছবি আসছে, সে সব চিত্রগৃহে সামনে আমপাতার বোঁটায় দড়ি বেঁধে এধার থেকে ওধার অব টাঙানো হবে (হরি হে! কি রুচিজ্ঞান এদের! কলাগ

রাখা হবে পেটের কাছে, স্বস্তিকচিহ্নধারী মঙ্গলঘট ! কোনও পূজাটুজো হচ্ছে না কি ?), সানাইও বাজে স্থানে স্থানে (যেন বিয়ে হচ্ছে কারও !), সামনের দেওয়ালে মই দিয়ে চিৎপুরের রঙের দোকানের কোনও কারিগর (মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল, ডি-কলার গেঞ্জী গায়ে, নোংরা হাফ-প্যাণ্ট পরনে থাকবে তার) ছবি আঁকবে অবশ্যই। হোর্ডিং দেওয়ার রীতি প্রচলিত হচ্ছে এখন একটু একটু করে। ফেষ্টুন এখনো খুব আসেনি। মোবাইল ভ্যান (কেন পাঞ্জাবী বাসের পেছন দিকটা রয়েছে !), স্কাইসাইনস ইত্যাদি বহু দূরে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

নায়ক নেই বাঙলায় ?

পেটেণ্ট চেহারা ! খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়, গায়ের রঙ খুব ফর্সাও নয়, কালোও নয়, ব্যাক ব্রাস করা চুল (কোঁকড়ানো হলে ভাল হয়), লম্বা টানা নাক (বাঁশীর মত না হলেও বাঁশের মত হতে হবে), দোহারা চেহারা। তিনিই বাঙলার আইডিয়েল নায়ক। ফার্ষ্ট ক্লাসের আর ফার্ষ্ট ইয়ারের মেয়েদের দিবাস্বপ্ন, ছেলেদের রক-টকৃন। অভিনয় করতে তিনি জানুন আর নাই জানুন, ক্যামেরার আলো আর লেন্সের কাণ্ডজ্ঞান তাঁর থাকুক আর নাই থাকুক তিনি অভিনয় করবেন এবং নাম নেবেন 'অমুককুমার' আর 'তমুককুমার'। বাঙলা দেশে আমরা আজ এই 'কুমার'দের আধিপত্যে অস্থির। ওদেশের রক হার্ডসন, গ্রেগরী পেক্, মণ্টোগমারী, কি এ্যালান ল্যাড কিছু কুৎসিত নন। তবু দেখুন তাঁদের কি অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতা ! আর এদেশের কুমারেরা বয়স্ক হবেন কত বছর বয়সে ? এই 'কুমার'দের হিড়িকের শুরু কি অশোককুমার থেকে ! আর শেষ হবে উত্তম-মধ্যম ও অধমে গিয়ে ? অভিনয়দক্ষ বহু সুশ্রী ছেলে এখনও আছে বাঙলা দেশে, পরিচালকরা খুঁজে নিন কেন।

রাণী রাসমণি

নামভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয়, অভিনয় নয়। রজত জয়ন্তী সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে দেখে অবাক হইনি।

রাণী রাসমণি। বাংলার রূপকথার এক রাজরাণীর মতই যাঁর কাজ, সাহস আর বীরত্বের কথা। তবু এ কথা রূপকথা নয়, সত্য কথা। জীবনী চিত্রের জন্য গল্প হিসাবে রাণী রাসমণি একেবারে প্রথম শ্রেণীর। গ্ল্যামার আছে, বীরত্ব আছে, ভক্তি আছে, প্রতাপ আছে, আছে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুজনদের প্রতি সম্মান, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহযত্ন, দরিদ্র প্রজাদের জন্য দরদ। সেই রাসমণি একদা মন্দির করলেন। স্বামীর মৃত্যুতে আঘাত পেয়ে, উপযুক্তা কন্যার বিরহে আশ্রয় খুঁজলেন শক্তিদায়িনী ৺কালীর মন্দিরে। মন্দিরের জন্য পুরোহিত এলেন রামকৃষ্ণ ও তাঁর অগ্রজ। তারপর একদা ৺কালীর সাক্ষাৎলাভ করে, ধরাধাম থেকে সসম্মানে বিদায় নিলেন রাণী রাসমণি। রাসমণির ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয়, অভিনয় নয়। 'টাইপ' চরিত্র সৃষ্টির কাজে মলিনা দেবীকে দেখেছি অনেক বার। সেই 'সাত নম্বর বাড়ী' থেকে। আজও তাঁর সেই অভিনয়-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। রাসমণির ভূমিকায় তাঁর বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী চরিত্রের সংযোগ, যেমন সাহেবদের

বিরুদ্ধে অনুধাবণ, জমিদারীর কাজে বিচারবুদ্ধি, দেবসেবার বন্দোবস্ত—নিপুণ হস্তে এ সবই তিনি এক হাতে করেছেন এবং রাসমণির চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অভিনয়ের দিক থেকে প্রশংসা করবার মত আর কাউকেই খুঁজে পাচ্ছি না। মথুরের ভূমিকায় অসিতবরণও না। ছোট রাজা কি ছোট রাসমণির ভূমিকায় শিখারাণীকেও ভাল লাগল না। শিখারাণী এ ছবিটিতে কেমন যেন 'ষ্টিফ'। অভিনয়ের পরেই আসছে পরিচালনার কথা। পরিচালনার বহু ভাল ভাল জিনিষ যেমন নজরে পড়েছে ঠিক তেমনি আবার এমন সব জিনিষ চোখে পড়েছে যা মারাত্মক রকমের মিসটেক। চিকের আড়ালে বসে রাণীর কথা কওয়ার দৃশ্য, রাজবাড়ীর নায়েবদের হিসাব-ঘর প্রভৃতি যেমন ভাবে প্রশংসনীয় ঠিক তেমনি জানবাজারের রাজবাড়ীর নৌকার ছেঁড়া, তালি দেওয়া পাল, নতুন তৈরী মন্দিরের মাথায় শ্যাওলা-ধরা একশ' বছরের (সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দিরগুলিতে চুণকাম করা হয়েছে), জানবাজারের রাজবাড়ীর কাজে নিমন্ত্রিতদের পাতে একখানি করে লুচি দেওয়া ইত্যাদি বিশেষ ভাবে চোখে লাগে। এ ছবিতে ক্যামেরার কাজ বেশ ভালই হয়েছে দেখলাম। আউটডোর-সুটিঙের ছবিগুলি বেশ পাকা হাতেই তোলা বলে মনে হল। রাসমণির নিজগৃহ যা ষ্টুডিওর মধ্যে বানানো হয়েছে, তার পরিকল্পনাটা কিন্তু ভাল লাগল না। লঙ্ শটের মাথায় ওটা যে তৈরী ঘর তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। যাই হোক, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর কয়েকটি শট্ই আপনার সাফল্যের কারণ পরিচালক মশাই। দর্শকসাধারণের মধ্যে বসে বহু বৃদ্ধকে, প্রায়-বৃদ্ধকে এমন কি বয়স্ক যুবক-যুবতীকেও দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতে দেখেছি বহু বার ছবি দেখতে দেখতে। এবং সেই কারণেই এই রজত জয়ন্তী সপ্তাহ। নয় কী? গানগুলি শুনে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি।

দেবত্র

কানন দেবীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম। ছবিটির সাফল্য সম্পর্কে কোনও সন্দেহই নেই আমাদের। লেডিজ সেকেণ্ড ক্লাস অনেক দিন ধরে 'ফুল' হবে।

গল্প ভাল। পল্লী-গ্রামের এক জমিদার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের দুই ছেলে পর পর মারা গেল। ছোট ছেলের মৃত্যুর পর দেশের বাড়ী ছেড়ে নিজের মেয়েকে নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে চলে গেলেন ছোট বৌ। বড় বৌ একাই গ্রামে থাকলেন বৃদ্ধ শ্বশুর মশাইকে নিয়ে। নিজের ছেলে মানুষ হতে লাগল কলকাতায় তার বাবার কাছে। কিন্তু বড় ছেলেও মারা গেল ব্লাডপ্রেসারে। এদিকে পাশে পাশেই আরও একটি করুণ গল্প এগুচ্ছে। অভাবের জ্বালায় খেতে না পেয়ে কয়েকটি পুত্র-কন্যা মারা গেলে করুণা আর অরুণের পিতা আত্মহত্যা করলেন, আর সেই থেকেই নিজের ছেলে-মেয়ের মতই স্নেহে তাদের মানুষ করে তুললেন বড় বৌ। বিপদ বাধলো তখনই যখন দেবত্র করে দিলেন ভট্টাচার্য্য মশাই তাঁর সম্পত্তি এবং সেবাইত নিযুক্ত করলেন সেই করুণা আর অরুণকেই, সঙ্গে রইলেন বড় বৌ। এদিকে করুণার সঙ্গে নিজের ছেলে সনতের আর অরুণের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের বন্দোবস্ত করে রেখে মারা গেলেন ভট্টাচার্য্য মশাই। শেষে অবশ্য মিলন হল। অরুণ আর করুণার মহত্ত্ব দেখে তাদের ভালবেসে ফেলল মঞ্জু আর সনৎ। তারপর টিপ টিপ করে জোড়ায় জোড়ায় প্রণাম আর কাহিনী শেষ। কাহিনী বড় তাড়াতাড়ি এগিয়েছে সর্বদা। করুণা আর অরুণের প্রথম দিককার ঘটনাগুলো যেন আসল গল্পের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বলেই মনে হয়। শুধু খানিক করুণ রস সৃষ্টির জন্যই এর প্রয়োজন। যাই হোক, এ ছবিতে লেডিজ সেকেণ্ড ক্লাস যে বহু দিন ধরে 'ফুল' হবে তার কোনও সন্দেহ নেই। অভিনয়ের দিক থেকে কানন দেবী আজও অসাধারণ। তাঁর সংযত অথচ দৃঢ় অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। উত্তমকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী ইত্যাদি এ ছবিতে খুব সুবিধা করতে পারেন নি। শেষ দৃশ্যে সকলেরই যখন একটা করে বন্দোবস্ত হল তখন ইলা নামে মেয়েটির একটা কিছু হিল্লে হল না কেন? এই বলে দর্শকগণ মন্তব্য করছিলেন শুনলাম। সে যাই হোক, ছবিটি খুবই পরিচ্ছন্ন। ক্যামেরার কাজ বেশ ভাল। সেট, সেটিঙ ইত্যাদিতেও কোনও মারাত্মক রকমের কিছু ত্রুটি চোখে পড়ল না। পরিচালনায় দু'-একটা দোষ চোখে পড়েছে। তারই উল্লেখ করছি। উত্তম বাবু কলকাতা জীবনে দেখেন নি নিজেই বললেন তো ট্যাক্সীর মিটার দেখে টাকা দিলেন কি করে? চুলও কলকাতার সেলুনে কাটা বলে মনে হল? বাঁধাকপি শীতের তরকারী অথচ কারো গায়েই তো শীতের পোষাক দেখলাম না (শুধু অসুস্থদের গায়ে লেপ ছাড়া) তখন? যে ভাবে থপ্ করে কলতলায় জলের মধ্যে বাসন মাজতে বসে পড়লেন মঞ্জু দেবী, উঠে বাসন হাতে ঘরে যাবার সময় শাড়ীতে কিন্তু জলের চিহ্ন দেখলাম না। এই জাতীয় কিছু কিছু পরিচালনার দোষ চোখে পড়ে থাকলেও ছবিটি আমাদের ভাল লেগেছে। দর্শক-সাধারণেরও তা ভাল লাগবে বলেই আশা করি। বিশেষ করে গান ক'খানি তো সবিশেষ উপভোগ্য।

রঙ্গপটের প্রসঙ্গে

চিত্র মিত্রমের "একান্ত গোপনীয়" ছবিখানি এবার রাজ্যের লোকের মাঝখানে প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। আধুনিক যুগে ভিড় জমাবার পন্থা হিসাবে, বড় বড় হরপে যদি এই রকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হতে থাকে, ভিড় জমবে নিঃসন্দেহ। এর ওপর যদি আবার লেখা হয় কোনো দিন "প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য," তখন নলচে আড়াল দিয়ে অপ্রাপ্ত-বয়স্করাই আগে এসে ভিড় জমাবে। ছবিখানি পরিচালনা কোরছেন বিশু দাশগুপ্ত। ছবির গোপনীয় যা কিছু, ছবি, ধীরাজ, প্রশান্তকুমার, শ্যাম লাহা, পদ্মা, নীলিমা প্রভৃতি শিল্পীরাই জানেন।

"সবার উপরে" যে ছবি, সেই ছবি তুলছেন এম, পি চিত্র প্রতিষ্ঠান। ছবিখানি সেরা ছবি হওয়াই স্বাভাবিক। অগ্রদূত-গোষ্ঠী পরিচালনা কোরছেন ছবিখানি। কাহিনী রচনা কোরেছেন নিতাই ভট্টাচার্য আর ছবিখানির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার ভার নিয়েছেন উত্তম, সুচিত্রা, তপতী, কমল মিত্র প্রভৃতি শিল্পীরা। "সবার উপরে"র সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন রবীন চ্যাটার্জ্জী।

সারা শূন্যে আঁকা আছে ছায়াপথ। যে পথে নক্ষত্রেরা যাতায়াত

করে কোনো একটি কল্পনাতীত বস্তুকে কেন্দ্র করে। ভারতী কলামন্দির তাঁদের এবারকার ছবির নাম ঘোষণা কোরেছেন "ছায়াপথ"। কাকে কেন্দ্র কোরে যে এই পথের সৃষ্টি হ'য়েছে, ছবি না দেখা পর্য্যন্ত সঠিক বলা যাবে না। "ছায়াপথ"এ চলার পথিক কিন্তু অনেকেই আছেন, যেমন স্মৃতিরেখা, সাবিত্রী, পদ্মা, ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পীরা। পরিচালনা কোরছেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গবাসী পিকচার্স এবার কিন্তু ছবি তুলছেন—"সাবধান"। হঠাৎ "সাবধান" কেন? কিছু কি ভয়ের কারণ আছে? ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া শেষে মুস্কিল হ'য়ে পড়বে না তো? "সাবধান" কোরছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী, মলিনা, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, ভানু, মঞ্জু দে প্রভৃতি শিল্পীরা। "সাবধান"এর বাণী লিখেছেন পরিচালক সুধীর ঘোষ।

দিলীপ পিকচার্স এবার দেখাবেন "ভালবাসা"। ভালো বাসা তাঁদের এক মাত্র বলতে এখন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও। সেইখানেই তাঁরা "ভালবাসা"র মহড়া দিচ্ছেন। ছবির কাহিনী কিন্তু একঘেয়ে নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাহিনী নয়। যে "ভালবাসা"র অভাবে বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবন অধঃপতিত হয়, সেইরূপ "ভালবাসা"ই পরিবেশন কোরবেন পরিচালক দেবকী বসু। সুচিত্রা, বিকাশ, বসন্ত, বনানী, মলিনা, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, ভানু প্রভৃতি শিল্পীরা ছবিখানিতে অংশ গ্রহণ কোরেছেন। কর্ত্তৃপক্ষের সদিচ্ছা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

সানরাইজ ফিল্মসের আগামী "দেবীমালিনী" ছবিখানিতে নায়ক বসন্ত চৌধুরী ও নায়িকা কাবেরী বসু রূপালী পর্দায় দেশের লোককে শীঘ্রই স্বাগতম্ জানাবেন। নিতাই ভট্টাচার্য্যের এই কাহিনীটিকে, সুরে সুরে প্রাণবন্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চ্যাটার্জী।

এবার "প্রতিহিংসা"র ছবি তুলে দেখাবেন অঞ্জন চিত্র প্রতিষ্ঠান। যেখানে "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী", যেখানে "নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব", সেখানে "প্রতিহিংসা"র ছবি লোকের চোখে তুলে ধরা, তার রূপ, তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লোককে সজাগ কোরে দেওয়া সামাজিক জীবনে শিক্ষণীয় হবে সন্দেহ নাই। ছবিখানিতে অংশ গ্রহণ কোরেছেন বিকাশ, শম্ভু মিত্র, সুচিত্রা, মিত্রা, নমিতা সেনগুপ্তা, জয়নারায়ণ প্রভৃতি শিল্পীরা।

আগামী ১৪ই থেকে ১৮ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে এক কনফারেন্স করা হবে বলে স্থির হয়েছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার লোকনৃত্যগীতগুলির পরিবেশনার এক বন্দোবস্তও করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে। ৮ই থেকে ১২ই এপ্রিল অবধি রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় করছেন 'দক্ষিণী'। ১নং দেশপ্রিয়-পার্ক ওয়েষ্টে 'দক্ষিণী'র নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণের জন্ত টাকা তোলার চেষ্টাতেই এই ব্যবস্থা। মুখমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গীত নাটক আকাডেমীর উদ্বোধন হয়েছে রবীন্দ্র-ভারতীতে, ১লা বৈশাখ। নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীত বিভাগের ভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে অহীন্দ্র চৌধুরী, উদয়শঙ্কর ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

উদীয়মানা অভিনেত্রী কুমারী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ ও পর্দায় সাম্প্রতিক কালে যে কয় জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে কুমারী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অন্ততমা। শুধু অন্ততমা বললেই শিল্পী হিসেবে তাঁর সম্পর্কে সবটা বলা হ'লো না, বয়সে নিতান্ত নবীনা হয়েও এমন উঁচুদরের অভিনয়-কুশলতা প্রদর্শন বড় দেখা যায় না। অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে তিনি, শিল্পের প্রতি দরদও রয়েছে তাঁর প্রচুর এবং এটাই এনে দিয়েছে তাঁকে শিল্পিজীবনের সার্থকতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে একাদিক্রমে সামাজিক নাটক "শ্যামলী"র যে সাফল্যময় অভিনয় হ'য়ে আসছে তাতে নাম-ভূমিকায় মূক ও বধির বালিকারূপে কুমারী সাবিত্রীর অভিনয়-কলা সত্যি একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি। এ'তে শুধু যে দর্শক-সমাজে তাঁরই খ্যাতি বেড়েছে তা নয়, পরন্তু তাঁকে পেয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চও সঞ্জীবিত হতে পারলো নোতুন ভাবে। মঞ্চে যেমন তাঁর খ্যাতি বেড়ে চলছে দিন দিন, পাশাপাশি রূপালি পর্দায়ও কুশলী অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। অভিনয়-শিল্প সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত কি, জানবার ঔৎসুক্য অনেকেরই

কুমারী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

থাকতে পারে। সে ঔৎসুক্য মেটাবার প্রচেষ্টাতেই আমার এবারকার প্রবন্ধের সূত্রপাত।

চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে আলোচনা করবো বলে এর ভেতর এক দিন যাওয়া হলো কুমারী সাবিত্রীর বাসভবনে টালীগঞ্জে বাবুরাম ঘোষ রোডে। গিয়ে দেখলুম তিনি তখন সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন। বাধ্য হ'য়ে আমায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো। তার পর তাঁদের বসবার ঘরে আলোচনা সুরু হলো আমাদের।

কুমারী সাবিত্রী আমার প্রারম্ভিক প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে বলেন,—চলচ্চিত্রে আমার সর্ব্ব প্রথম অভিনয় "সুনন্দার বিয়ে"তে। ছোট্ট একটি ভূমিকা নিয়ে তাতে আমি আত্মপ্রকাশ করি সেটা ১৯৫১ সালের কথা। এর পর আরও অনেক ছবিতে অভিনয় করেছি ও করে আসছি। এর ভেতর কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমার সব চেয়ে তৃপ্তি লাভ হয়েছে, নিখুঁত ভাবে সেটা বলা সম্ভব নয়। তবু যদি বলতে হয়, বলবো—"নোতুন ইহুদি"তে 'পরি'র ভূমিকা এবং "শুভদায়" 'ললনা'র চরিত্রে অভিনয় করে আমি তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছি প্রচুর।

চলচ্চিত্র জগতে আপনার যোগদানের কারণ কি? উত্তরে সাবিত্রী নিঃসঙ্কোচে বললেন,—কারণ অনেকই আছে। অর্থনৈতিক কারণ তার অন্যতম নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী শিল্পের প্রতি আমার দরদ। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ক'রতে আমি ভালবাসি। সৌখিন সম্প্রদায়েই আমার অভিনয় জীবনের সূচনা। নোতুন ইহুদি নাটকখানি আমাকে সাহায্য করে যথেষ্ট এ লাইনে আসবার। চলচ্চিত্রে যোগদান ক'রবো এ নিয়ে কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা আপত্তি আমার মনে কখনও উঠেনি। ছবিতে আত্মপ্রকাশের পরও আমার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তনই আসেনি, এ-ও বল্‌বো।

দৈনন্দিন কর্মসূচী সম্পর্কে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলে কুমারী সাবিত্রী স্পষ্টই বললেন,—এ'তে খুব বেশী একটা বৈচিত্র্য নেই। অন্যান্য পাঁচ জনের ঘরে মেয়েরা যে ভাবে কাজ করে যায়, আমারও প্রায় সেরূপ। সকাল বেলা উঠে গান-বাজনা শিখি, তারপর ঘরের কাজ কর্ম্ম করি এ'টা ও'টা। মাঝে মাঝে রান্নাও করে থাকি। সেলাই ইত্যাদিও করবার ঝোঁক রয়েছে আমার। বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাকে 'স্যুটিং'এ যেতে হয়, সপ্তাহে তিন চার দিন ব্যস্ত থাকতে হয় থিয়েটারে। যেদিন অভিনয় না থাক্‌লো সে দিন বিকেলে হয়তো চল্‌লুম আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে কিম্বা দেখতে গেলুম কোথাও একটা সিনেমা।

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন—আপনার বিশেষ কোন হবি আছে কি? কুমারী সাবিত্রী ধীরে ধীরে উত্তর করলেন,—শৈশবে খেলার দিকে ঝোঁক ছিল। তখন ব্যাডমিন্টন খেলতুম আর করতুম ছুটাছুটি। হবি বলতে এই ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। ক্রিকেট খেলা দেখতে আমি ভালবাসি এবং আগে প্রায়ই দেখতুমও। এখন আর তার সময় হয়ে উঠে না। আমার খেয়ালের ভেতর আর একটা গল্পের বই পড়া ও সেলাই করা। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা আমি পড়ি, তবে খুব বেশী নয়। "মাসিক বসুমতী" পড়বার আমার অভ্যাস আছে এবং পড়তে ভালোও লাগে। আর সকল পড়াশুনোর মধ্যে কবিতার বই আমি ভালবাসি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' আমার নিত্য সহযাত্রী। গল্প লেখার অভ্যাস আমার কিছু কিছু আছে।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে মতামত যদি জিজ্ঞেস করেন এবং আমায় যদি বলতে হয়, কুমারী সাবিত্রী বলে চলেন, তবে বলবো—সাদা পোষাকই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। কিন্তু আমার সাদা পোষাক পরা হ'য় না। সাদা পোষাক পরি, আমার মায়ের তা ইচ্ছে নয়। শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গেলে বলতেই হবে যে, এ ছাড়া চলতেই পারে না। স্বাস্থ্যরক্ষা না হ'লে শিল্পিজীবন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

চলচ্চিত্রে যোগদান করতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? এ প্রশ্নটি তুলে ধরতেই কুমারী চট্টোপাধ্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—এ'র জন্য সকলের আগে চাই সুচেহারা ও অভিনয়-ক্ষমতা। নাচ, গান, এ সকলও কিছু কিছু না জানা থাকলে নয়। অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে আসা উচিত। অথবা অন্য ভাবে বলা চলে যাঁদের শিল্পগত প্রাণ রয়েছে এবং এ শিল্পের উন্নতি হোক্ এ কামনা করেন তাঁদেরই আসা উচিত সর্ব্বাগ্রে।

বেশ কিছুক্ষণ এই ভাবে আলোচনা চললো আমাদের ভেতর। আরও কয়েকটি বিষয় জেনে নেবার আমি আগ্রহ প্রকাশ করলুম। দেখলুম কুমারী সাবিত্রীও আগ্রহ সহকারে উত্তর দিতে প্রস্তুত। প্রশ্ন করলুম আমি—আপনার প্রথম-জীবন কি ভাবে কাটে এবং জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যই বা কি?—কুমারী চট্টোপাধ্যায় বলতে থাকেন,—কুমিল্লায় আমি জন্মগ্রহণ করি। ছ'মাস যখন আমার বয়স তখনই আমি চলে আসি ঢাকায়। শৈশব কাল আমার ঢাকাতেই কাটে। সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি আমি পড়েছি। তার পর কলকাতায় আমার আসা হয়। এ আসার মূলে একটি ছোট্ট ঘটনা রয়েছে। ঢাকায় থাকতে আরশুলা দেখে আমার কেমন ভয় হ'তো, হয়তো এর বিশেষ কিছু কারণ ছিল না, কিন্তু তবু হ'তো। পাড়ার সমবয়সীরা এ জেনে আরশুলা সামনে ধরে আমাকে ভয় দেখায় এক বার। আমি ছুটে যেই পালাতে যাচ্ছি অমনি এক জায়গায় পড়ে গেলুম। হাতের এক স্থানে ও পায়ের একটি আঙুল গেল ভেঙ্গে। এর চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় আমাকে আসতে হয় এবং তার পর এখানেই পড়াশুনো করি। আমি ম্যাট্রিক পাশও করি কলকাতার স্কুল থেকে।

পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে, কুমারী সাবিত্রী বলে চলেন, আমার গান-বাজনা শেখাও চলতে থাকে। অভিনয় করবার স্পৃহা এবং বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন জাগে আমার বাল্যকালেই। কানন দেবীর সঙ্গে দেখা করবো, তাঁর মত অভিনয় করবো, গাইব এ ছিল তখন আমার একান্ত কামনা। অনেকেই বলতে শুনেছি, কানন দেবীর মত নাকি আমার চোখ। সেই শুনে কানন দেবীর মত নাম-করা শিল্পী হওয়ার ইচ্ছে আমার আরও বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে আমার লক্ষ্য কি, এ মুহূর্ত্তে এক কথায় উত্তর দেওয়া হয়তো কঠিন। তবে এটা ঠিক, শিল্পী হিসেবে আমার অনেক বড় হওয়ার ইচ্ছে আছে। তার বেশী আর কিছু এখন ভাবিনি বা ভাবতে চাইনে।

বাঙলা ছবি—১৩৬১

১৩৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির তালিকা নীচে দেওয়া হলো। ছবির সংখ্যা ৪৫ খানা। উৎকর্ষতানুসারে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। নামের পরে চিহ্নিত তারকার সংখ্যা শ্রেণীবিভাগের নিদর্শন।

১। না—* *
২। সাদাকালো—* *
৩। নদ ও নদী—* *
৪। কল্যাণী—* * *
৫। মহিলা মহল—* * *
প্রফুল্ল—* *
চুলী—
৮। বাংলার নারী—* * *
৯। লেডিস সীট—* *
১০ জাগৃহি—* * *
১১ মরণের পরে—* *
১২ এই সত্যি—* * *
১৩ মণি আর মাণিক—* * *
১৪ পণরক্ষা—* * *
১৫ সদানন্দের মেলা—* * *
১৬ সতী—* * *
১৭। অমর প্রেম—* * *
১৮ বারবেলা—* * *
১৯। অন্নপূর্ণার মন্দির—*
২০ সতী বেহুলা—* * *
২১ ছেলে কার—* *
২২ অগ্নি-পরীক্ষা—*
২৩ নীল সাড়ী—* * *
২৪ বকুল—* *
২৫ শিবশক্তি—* * *
২৬ হ্যাঁ—* * *
২৭ ষোড়শী—* * *
২৮ রিফিউজি—* * *
২৯ গৃহপ্রবেশ—* *
৩০ জয়দেব—* * *
৩১। যদু ভট্ট—* *
৩২। মন্ত্রশক্তি—* * *
৩৩ বলয়গ্রাস—*
৩৪ ভাঙ্গাগড়া—*
৩৫ নিষিদ্ধ ফল—* * *
৩৬ রিক্সাওয়ালা—* * *
৩৭ সাঁঝের প্রদীপ—* * *
৩৮ চাটুজ্জে বাড়ুয্যে—*
৩৯ রাণী রাসমণি—*
৪০ অনুপমা—* * *
৪১. রাইকমল—*
৪২। দত্তক—* * *
৪৩ সাজঘর—* *
৪৪ চিত্রাঙ্গদা—* * *
৪৫ দেবত্র—*

অভিশাপ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অগ্নিগর্ভ মর্ম্ম-গিরির গর্জ্জন ভীতি-ভরা—
তুমি অভিশাপ—ঝলসিতে পার ধরা।
দারুণ তোমার দাপে,
প্রমোদ-প্রাসাদ কাঁপে,
শব্দভেদী ও সায়ক তোমার অনলে গরলে গড়া।
অবজ্ঞা করে দর্পীরা, করে বাচালেরা উপহাস,
অষ্টাবক্র তুমি যদুকুল-ত্রাস।
পরীক্ষিতকে হায়,
তক্ষক দংশায়,
শুধু বাণী নও—তুমি বাসুকির বিষাক্ত নিঃশ্বাস।
শর-সন্ধানে ভুল করে রথী—বিষম বিপদ পাত।
ধরা গ্রাসে রথ-চক্র অকস্মাৎ।
অমোঘ তোমার ভাষা,—
অশরীরী দুর্ব্বাসা,
কর প্রচণ্ড দণ্ডধরকে তুমি দণ্ডাঘাত।

শকুন্তলার অঙ্গল হতে অঙ্গুরী পড়ে খসি,
দগ্ধ মৎস্য পলায় সলিলে পশি।
অদ্ভুত তব লীলা—
শ্রীহরি কাটেন শিলা,
দেবরাজ লভে কুৎসিত কায়া ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় শশী।
তুমি নির্ম্মম, দম্ভোলি হান, আন হে শান্তিজল,
অনলে ফুটাও হেম সহস্রদল।
যমও তোমাকে জানে,
বাঁচাও 'সত্যবানে'
অমঙ্গলের মধ্য হইতে আন যে শুমঙ্গল।
বর যাহা দেয়, নিঃশেষে দেয়, তাহা মাপা, তাহা গণা
তুমি সাথে আন অসীম সম্ভাবনা।
তোমার দীপক শেষে—
ঠুংরির মীড়ে মেশে,
তোমার নেত্র-বহ্নিতে করে ভাগীরথী আনাগোনা।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর

"গোয়াতে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের অত্যাচার বর্ব্বরতার চরম সীমায় পৌঁছাইতেছে। গোয়ার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন গোয়ার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হইবার পর হইতেই এই ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত মুক্তি-আন্দোলনের নেতাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, ভারত সরকার নাকি উদ্বিগ্ন হইয়া পর্তুগীজ সরকারের দিল্লীস্থ প্রতিনিধির হাতে একটি প্রতিবাদ-লিপি দিয়াছেন। কিন্তু কেবল প্রতিবাদ-লিপি পাঠাইয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে বলিয়া আমরা আশান্বিত হইতে পারিতেছি না। ইতিপূর্ব্বেও অনেক বার ভারত সরকার পর্তুগীজ অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন—কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। পর্তুগীজ কর্তারা একটি মাত্র যুক্তি বোঝে—সে যুক্তি ছাড়া কোন কাজই হইবে না। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরই আজ দরকার।"

—দৈনিক বসুমতী।

আসামে বাঙালী নিপীড়ন

"বলিতে লজ্জিত হই এবং কুণ্ঠিত হই, কিন্তু বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, যাহা নোয়াখালিতে ঘটিতে দেখিয়াছি, আসামের ঘটনা তাহারই ভিন্নতর সংস্করণ; আসামে ইহা দেখিবার জন্ম প্রস্তুত ছিলাম না। উপদ্রবের প্রক্রিয়াটা উভয়ত্র একই প্রকারের হইয়াছে এবং তাহা অকারণ নহে। একথা সর্বজনস্বীকৃত ও সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিপাদিত যে, পাকিস্থান হইতে দলবদ্ধ উপদ্রবকারী আনাইয়া বাঙ্গালী সমাজকে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও বিধ্বস্ত করা হইয়াছে এবং বিপদের সময়ে বাঙ্গালী সমাজ পুলিশের সাহায্য চাহিয়াও পায় নাই। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকিয়াছে, উপহাস করিয়াছে, ক্ষেত্রবিশেষে সাহায্য-প্রার্থীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আসাম সরকার এই সকল ঘটনাকে বাঙ্গালী-অসমীয়া সঙ্ঘর্ষ বলিয়া পাশ কাটাইতে চাহিবেন, তাহা জানি। কিন্তু আমরা কেবল বাঙ্গালী সমাজের জন্মই প্রশ্ন তুলিতেছি না। আসাম সরকারের অধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রজাসমূহ পাকিস্থান হইতে আগত গুণ্ডাশ্রেণীর দ্বারা নিগৃহীত হইল কেন, তাহার জবাবদিহি আসাম সরকারকে করিতে হইবে। ইহা কি তাঁহাদের ব্যর্থতায় ঘটিয়াছে, না ইহাতে তাঁহাদের সম্মতি ছিল? আসামের ঘটনাকে বিহারের বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলনের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা অত্যন্ত গুরুতর মৌলিক পার্থক্য আছে। বিহারের ঘটনা অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘর্ষমাত্র, কিন্তু আসামের ঘটনা কেবল অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘর্ষ নহে। অভ্যন্তরীণ বিরোধ লইয়া সূচনা হইলেও সেই বিরোধে এক প[...] অপর পক্ষকে নিগৃহীত করিবার জন্ম বাহির হইতে বৈদেশি[...] আমদানী করিয়াছে এবং আসাম সরকার কেবল নিষ্ক্রিয় ভাবে উহা দেখিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু এই বহিরাগ[...] আমদানীর ব্যাপারে শাসন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহা[...] প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্ম আসামের ঘটনা বিচার করিবার সম[...] উহাকে মাত্র বাঙ্গালী-বিরোধী ব্যাপার হিসাবে না দেখিয়া বৃহ[...] পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে এবং সেই ভাবে বিচার করি[...] ঘটনার গুরুত্ব ও সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশী বৃহৎ হইয়া [...] দিবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিক[...]

ক্রুদ্ধ জনতার উদ্দেশ্যে

"নৈহাটি ষ্টেশনের নিকট ব্যারাকপুর হইতে কাঁচরাপাড়াগা[...] ৮৫ নং রুটের একখানি বাস জনৈক যুবককে চাপা দেয়। ফ[...] যুবকটি মারা যায়। ঘটনাটি শোকাবহ সন্দেহ নাই। যে কে[...] মানুষের অকালে প্রাণবিয়োগ অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং আমরা [...] যুবকের আত্মীয়স্বজনের উদ্দেশ্যে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি[...] কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ক্রুদ্ধ জনতা যে আচ[...] করিয়াছে, তাহা আমরা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এমন কি জাতি[...] জীবনের পক্ষে কলঙ্কজনক বলিয়া মনে করি। কারণ, এই জন[...] ব্যারাকপুর-কাঁচরাপাড়া লাইনের বাসগুলি আক্রমণ করিতে থাকে[...] জনতা একখানি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনাস্থলের নি[...] ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম উপস্থিত ছিলেন। তিনি [...] জনতাকে শান্ত করিবার জন্ম চেষ্টা করেন। কিন্তু জনতা তাঁহ[...] আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া বাসটিতে আগুন ধরাইয়া দে[...] বলা বাহুল্য যে, যে বাসগুলি আক্রমণ করা হয়, কিম্বা যে বাসটি[...] আগুন ধরানো হয়, তার সঙ্গে দুর্ঘটনার কোন সম্পর্কই না[...] কারণ, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বাসটি আত্মরক্ষার জন্ম পলাইয়া গিয়াছি[...] কিন্তু উহার ড্রাইভারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। এদি[...] পুলিশ বাধ্য হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্য হইতে ৬০ জনকে গ্রেপ্[...] করিয়াছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই। কিন্তু এই ধরণের ঘ[...] কলিকাতায় এবং শহরতলীতে আদৌ নূতন নহে। বিগত মহাযু[...] ও দাঙ্গার পর হইতে সমাজের একাংশের মধ্যে প্রকৃত পরিম[...] গুণ্ডামী ও উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়া গিয়াছে। আজিকার দিনে সভ্যত[...] অগ্রগতির পথে যানবাহনের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে [...]

মোটর গাড়ী বা মোটর-বাসের পক্ষে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। কিন্তু কোন ড্রাইভারই স্বেচ্ছায় কোন পথচারীকে চাপা দেয় না। কারণ, পথচারীর প্রতি তাহার কোন শত্রুতা নাই। নানা কারণে এই সমস্ত দুর্ঘটনা হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ড্রাইভারের কোন স্বেচ্ছাকৃত দোষে ইহা ঘটে না—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পথচারীদের অসতর্কতার জন্যও দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। সোজা কথায় বলা যায় যে, দুর্ঘটনার উপর কাহারও হাত নাই। কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা যদি সমাজের সমস্ত নিয়ম-কানুন এবং আচরণের সমস্ত ভব্যতা বিস্মৃত হইয়া ড্রাইভারকে ধরিয়া মারিতে থাকে কিম্বা বাস বা মোটর গাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়, তবে, বুঝিতে হইবে সেই জনতা কাণ্ডজ্ঞানহীন।"

—যুগান্তর।

উপযুক্ত শাস্তি

"প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এ. পি. দাস মহাশয় একটি যুবককে ছয় মাস কারাদণ্ড দিয়াছেন। জনৈকা ছাত্রীর জীবন ছেলেটি অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া এই শাস্তি। শাস্তি কঠোর হইলেও উপযুক্তই হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে, নিতান্ত অসহায় বোধ না করিলে একটি ভদ্রঘরের তরুণী আদালতের আশ্রয় নিতে আসে নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি যুবকের জন্য সমগ্র ছাত্র ও যুবক-সমাজের দুর্নাম হইতেছে। সম্প্রতি ইহাদের সংখ্যা বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা মনে করি পুলিশ দিয়া ইহাদিগকে শাসনের প্রয়োজনের যত শীঘ্র অবসান ঘটে ততই মঙ্গল। ছাত্র ও যুবসঙ্ঘেরা নিজেরা ইহার ব্যবস্থা করিলে, পরিবর্ত্তন আসিতে বেশী দেরী হইবে না। আরও বহু ছাত্রী এই ভাবে অতিষ্ঠ হইতেছে। আদালতে যাইতে পারে না বলিয়া প্রতিকার লাভে তাহাদেরও বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়।"

—যুগবাণী।

তিলপাড়া সেতুবন্ধন

"সরকারী অর্থের বহু অপব্যয় সর্ব্বত্র হইতেছে। এক কেরাণীর ভুলেই ১২ লক্ষ টাকা জম্মু কাশ্মীর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। মহম্মদবাজার টাউনসিপ প্লানে কলের জল সরবরাহ যে খেয়ালী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহার ত্রুটির জন্য ৩।৪ লক্ষ টাকা পাইপ কিনিতে ও বসাইতে অপব্যয় হইয়াছে। ক্যানেলের জল পরিশ্রুত করিয়া টাউনসিপে জল সরবরাহের কথা ছিল সেই মত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে, বৎসরে চার মাসের বেশী জল সরবরাহের ক্ষমতা মহম্মদবাজার ক্যানেলের নাই। এ অবস্থায় ত্রুটি ঢাকিবার জন্য নূতন করিয়া বড় দীঘি কাটান হইতেছে, এখানে জল ধরা হইবে। কোন প্লান কর্তার খেয়াল মিটাইতে এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয় যদি সরকারী অর্থভাণ্ডারে দিতে বাধা না থাকে, তাহা হইলে তিলপাড়া সেতু নির্ম্মাণের সংব্যয় বহন করিতে ক্ষতি কি?"

—বীরভূম বাণী।

বেকার ঠকানো কারবার

"এক ভুক্তভোগী বেকার বড় দুঃখের সহিত বলিতেছিলেন—রাজ্যে ভুয়া লটারী ব্যবসা চালানো আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইলেও সরকারের পরিচালনাধীনে কোন কোন বিভাগে হতভাগ্য বেকার ঠকাইয়া টাকা আমদানী করার অভিনব পন্থা বেশ চলিয়া আসিতেছে। তিনি বলেন—"রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট হইতে মাঝে মাঝে লোক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন অনুসারে আবেদন করিতে হয় অনুমোদিত ফর্মে। এক একখানি ফর্মের দাম এক এক টাকা। চাকরী পাইলে দুঃখ ঘুচিবে এই আশায় হাজার হাজার লোক একটি টাকা দিয়া ফর্ম খরিদ করিয়া দরখাস্ত করে। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তিনি সাত বার এই ভাবে দরখাস্ত করিয়াছেন, একবারও উত্তর পান নাই। এই ব্যবস্থা যে কত নিষ্ঠুর ব্যবস্থা, তাহা বলাই বাহুল্য। বেকার-সমস্যায় কাতর কর্মপ্রার্থীরা তাঁহারই মত টাকা দিয়া ফর্ম কিনিয়া দরখাস্ত করে, তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইলে তাহা তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। জানিতে পারিলে আশায় আশায় থাকিতে হয় না। বিজ্ঞাপন দিবার সময় এ কথাও জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, যাহারা আগে দরখাস্ত করিয়াছে তাহাদের আর দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহারা চাকুরী পাইবে না। বর্ত্তমান পদ্ধতি সরকার পরিচালিত বিভাগে ফর্ম বিক্রয় করিয়া টাকা আয় করার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়। এ বিষয়ে আমরা সরকারকে একটু অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

—জঙ্গীপুর সংবাদ।

প্রধান মন্ত্রীর মারাত্মক ভুল

"ডোটসে তাঁহার Civilization in Ancient India. পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন—"বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবাসীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল জাতি।" জাতিভেদ, কথাটা যে একটা শক্তিশালী জাতি গঠনের বাধক নয়—এই কথাটা প্রধান মন্ত্রীকে স্বীকার করিতেই হইবে। কি উদ্দেশ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা বলিতে বসি নাই, শুধু গান্ধীজী তাঁহার young India পত্রে যে লিখিয়াছিলেন—এই জাতিভেদ প্রথাই ভারতকে সুদীর্ঘ বৈদেশিক আক্রমণের সর্ব্বনাশ হইতে টিকাইয়া রাখিয়াছে—শুধু সেই কথাটিই পণ্ডিত নেহেরুকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষ কত দিনে তাঁহার কল্পিত বেশভূষা আহার-ব্যবহারে 'এক' হইয়া উঠিবে—সে দুঃস্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর কুদৃষ্টান্তে দেশে যে নূতন জাতিভেদ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা রোধ করিতে চেষ্টা করুন, তবেই দেশের উন্নতি হইবে। ভারতে যত জাতিই থাকুক প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটা সামাজিক একতার অবসর আছে, কিন্তু টাকার মাপকাঠিতে যে নূতন জাতিভেদ সৃষ্টি হইতেছে ইহা সাম্যবোধকে চূর্ণ করিয়া উচ্চনীচের ভেদ কলাও করিয়া তুলিতেছে। এই নবজাত মহাপাপ হইতে দেশকে বাঁচাইতে না পারিলে, শুধু গতানুগতিক ব্যর্থতার পথে চলিলে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী মারাত্মক ভুল করিবেন।

—পল্লীবাসী (কালনা)

প্রদেশ কংগ্রেস-সম্মেলন

"পূর্ব্বের সম্মেলনে বাংলার একজনকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাকে এক দিকে যেমন গৌরব দান করা হইত, বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মিগণ অন্য দিকে তাঁহার নিকট হইতে নির্দ্দেশ লাভ

করিতেন। এই সভাপতি নির্ব্বাচন গণতান্ত্রিক উপায়েই হইত, জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির অভিমত লইয়া হইত, নিতান্ত অগণতান্ত্রিক উপায়ে উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইত না এবং ইহার ফলে কংগ্রেসকর্ম্মিগণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হইত। বর্ত্তমানে যে ভাবে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে তাহাতে কংগ্রেসকর্মিগণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয় না। মেদিনীপুর বাংলার বৃহত্তম জেলাগুলির মধ্যে একটি। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার দান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধি-সংখ্যা ৬৮ জন, এমন একটি জেলা হইতে যদি ৮ জনের অধিক প্রতিনিধি যাইয়া না থাকেন, তাহা হইলে কি আমরা বলিতে পারি না মালদহ সম্মেলন পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসকর্ম্মিগণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং সেই বিচারে এই সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কি অযৌক্তিক হইবে?"

—বর্দ্ধমান।

আসানসোল পৌরসভার কেলেঙ্কারী

"আসানসোল পৌরসভাতে যে ভাবে দলগত নীতি ও ক্ষমতা-লোলুপতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে জনসাধারণ আর কি কখনও কোন দলকে বিশ্বাস করিতে পারিবে? তাহারা পৌরসভাতে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যই প্রার্থী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, যে কোন ভাল অথবা মন্দ কার্য্যেরই কেবলমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে নহে। কি করিয়া পৌরসভার কার্য্য সহজ ও সুশৃঙ্খলায় ব্যবস্থা করা যায় ইহাই হইবে পৌরসদস্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার দল অথবা আমি উন্নতি করিব, নতুবা দেশ নিপাতে যাউক—এ নীতি সমর্থনযোগ্য নহে। এদিকে এই দারুণ গরমে সহরবাসী জলের অভাবে এবং নানান অব্যবস্থায় কষ্ট পাইতেছে আর ওদিকে পৌর-সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া পৌর-ব্যবস্থাকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থা কোন লোকেরই সমর্থন করা উচিত নহে। পৌরসভার নীতি সর্ব্বদাই থাকিবে ("We each for One & One for all") প্রত্যেকে সকলের জন্য ও সকলে একের মঙ্গলের জন্য। এই পৌর-ব্যবস্থাকে বানচাল করার মধ্যে তাঁহারা সহরবাসীর কোন উপকার করিতে পারিবেন?"

—আসানসোল হিতৈষী।

মশা ও মাছি

"রাতে মশা দিনে মাছি—এই নিয়ে কোলকাতায় আছি"—সে কালের কোলকাতায় মশা-মাছির উৎপাতে অতিষ্ঠ কবির আক্ষেপ আমরা আজ হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছি। এ কালে গদ্যে পদ্যে যাহাই ভাবুন বা লিখুন, মশা-মাছির উপদ্রব যখন বাড়িয়াছে তখন ... বুঝিয়া সহ্য করিতে হইবে। আর দশ রকম উৎপাতের মত ... ইহাও গা-সহা হইয়া যাইবে। না হইয়া উপায়ই বা তাড়াইতে কাহারই বা মাথা ব্যথা ...রে বসিয়া গায়ে গায়ে চপেটাঘাত মাছি তাড়াক। যাহাদের মশারি কোন প্রকারে বাড়িরটা আত্মরক্ষা করুক আর যাহাদের তাহাও নাই তাহারা কাপড় মুড়ি দিয়া কিংবা কেরোসিন তৈল ডলিয়া চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া থাকুক। মোট কথা মশা-মাছির এই ব্যাপক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এই ভাবে 'ট্রেক-কাইট' ছাড়া বর্ত্তমানে গত্যন্তর নাই। কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন সরকার যে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া ডি-ডি-টি ছড়াইল তাহাতে ফয়দা কি হইল। ম্যালেরিয়া-নিবারণী প্রচার বিভাগের প্রেসনোট প্রস্তুত আছে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসিবে ডি-ডি-টি অ্যানোফিলিসদের ধ্বংস করিতে পারে—কিউলেক্সদের গায়ে আঁচড়ও লাগিবে না। বাড়ীর আশে-পাশের ঝাড় ঝোঁপ-জঙ্গল সাফা রাখুন। নালা নর্দ্দমা, খাল-বিল, খানা-পুকুর পরিষ্কার করুন, গাঁয়ের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কারণ গাঁয়ের মানুষগুলো তো বেওয়ারীশ মাল। সহরে টেক্সের উপর টেক্স দিয়া ময়লার স্তূপ যেখানে সেখানে জমিয়া আছে—খোলা নর্দ্দমাগুলোর নিকাশের কোন উপায় নাই। মুখ খুলিয়া কিছু বলিতে লিখিতে গেলে কর্ত্তাদের গোসা হইবে। বাজারের খাবার মিষ্টির দোকানে ভাতের মাছি, পচা জীব-জন্তুর মাছি অবাধে মিষ্টিমুখ করিতেছে—ভোটের অঙ্কে দাগ পড়িবে বলিয়া হয়তো আজও ঢাকা দেওয়ার কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইল না। এ ছাড়া আমাদের জীবনও কু-অভ্যাসে ভরা, ঘরবাড়ীগুলো গুদাম বানাইয়া খাবারের জিনিষ আলগা করিয়া রাখিতে আমাদের জোড়া নাই। ডি-ডি-টি ছড়াইয়া ম্যালেরিয়া আপাততঃ ধামাচাপা দেওয়া হইল—কিন্তু কিউলেক্সের জ্বালায়—জলদোষের এই অঞ্চলে শেষ পর্য্যন্ত সরকারকে নূতন করিয়া অ্যান্টি-ফাইলেরিয়া ডিপার্টমেন্ট খুলিতে না হয়। তাহা ছাড়া ওলা দেবীও ওত পাতিয়া আছে।"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

তাহার ... তাঁহাদের ব্যর্থতায় ঘটিয়াছে, আসামের ঘটনাকে বিহারের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে অত্যন্ত গুরুতর মৌলিক পার্থক্য জ...

মেদিনীপুরবাসীর দাবী

"শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। আজ যেখানে পশ্চিম-বাংলার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ—যথা বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা হইতে বহু অংশ পাওয়া উচিত এবং বহুকাল হইতে যাহা প্রতিশ্রুত—এই সব বিভিন্ন প্রদেশ একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকা সত্ত্বেও এবং কেন্দ্রের নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় যাহা ঘটিতেছে তাহা অতীব নিন্দনীয়। কলিকাতায় বা পশ্চিম-বাংলার অন্যান্য সংবাদপত্রে যদিও পূর্ব্বোক্ত দাবীর সমর্থনে ও অনুকূলে আন্দোলন চলিতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় মেদিনীপুরের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে মেদিনীপুরের বাহিরে কোন পত্রিকাতেই কোন আন্দোলন বা প্রতিবাদ দেখিতেছি না। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কাজ হাসিল করিবার বেলায় মেদিনীপুরবাসীকে খুব বাহোবা দেওয়া হইলেও মেদিনীপুরবাসীকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিবার ভাব জেলার বাহিরে কম-বেশী প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। তাঁহারা কি চান যে সম্প্রতি চাকুরীর ব্যাপারে মেদিনীপুর কিছু ভাগ বসাইতে অগ্রণী হইয়াছে বলিয়া মেদিনীপুর বাংলার বাহিরে চলিয়া যাউক? তাই মেদিনীপুর সম্মিলনীর দাবী আমরাও সমর্থন করিয়া বলি যে, সমগ্র ভারত যদি অবিবেচক হয়, পশ্চিম-বাংলার যদি ক্লীবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে—মেদিনীপুরের অধিবাসী আমরা—বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ও মাতঙ্গিনী হাজরার

উত্তরাধিকারী আমরা নির্বীর্য্য হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না, অন্যায়কে আমরা প্রতিরোধ করিবই এবং আমাদের ন্যায্য দাবী বিহারের ধলভূম পরগণা ও উড়িষ্যার অন্ততঃ বালেশ্বর জেলার উত্তরাংশের সুবর্ণরেখার উপত্যকা অন্ততঃ টি সম্পূর্ণ আমাদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মেদিনীপুর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ন্যায্য অংশ ফেরত না পাইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না।"

—প্রলাপ (মেদিনীপুর)।

তাঁত-শিল্পোন্নয়ন প্রসঙ্গে

"পরিশেষে আর একটি বক্তব্য এই যে, বৎসরে একবার তাঁত সপ্তাহ ও মাঝে মাঝে দুই চারিটি বিক্রয়কেন্দ্র ও রংএর কারখানা খুলিয়া কিংবা 'এই করিতেছি', 'সেই করিতেছি' বলিয়া উৎসাহ দিলেই চলিবে না। তাঁতের কাপড়ের বাজার বা চাহিদা যাহাতে বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে সরকার নিজেই একটা ভাল আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন। তাঁহাদের নিজস্ব ও আধা-সরকারী অফিসগুলিতে পোষাকাদি বাবদ বহু সূতী বস্ত্রের প্রয়োজন। তাহার অর্দ্ধেক অন্ততঃ এই তাঁতের কাপড় লইতে হইবে আর তাহা হইলেই মনে হয়, এই শিল্পকে আরও ভাল ভাবে সাহায্য করা হইবে।"

—প্রদীপ (তমলুক)।

বাঁধ নির্ম্মাণের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ

"মানভূম জিলায় বাঁধের নামে কিরূপ লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ হইতেছে তাহার একটি নমুনা পাকবিড়রাতে বর্তমান। পাকবিড়রা গ্রামে লৌলাড়া নিবাসী শ্রীনারাণ বন্দোপাধ্যায়ের একটি মোকররি চক আছে। এই চকের মধ্যে একটি খাস গোড়াতে আন্দাজ ২।০ বিঘা জমিতে কিছু মাটী কাটাইয়া আইল দেওয়া ছিল। ১১৫৪ সালে উক্ত নারাণ বাবু পাকবিড়রা গ্রামবাসীদের অজ্ঞাতসারেই সেখানে একটি সরকারী বাঁধের মঞ্জুরী করান; ২২০০৲ টাকা মঞ্জুর হয় এবং তিনিই ঠিকাদার হন। ১১৫৪ সালে কিছু মাটী কাটান হয়। কিছু দিন পরে গ্রামে এক নোটিশ আসে যে—নারাণ বাবু ২২০০৲ টাকায় এক বাঁধের ঠিকা লইয়াছে তাহা হইয়াছে কি না? গ্রামের লোক তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানায় যে ৪০০ টাকার বেশী মাটী কাটান হয় নাই। তারপর ৪-৫ মাস আর তাহার কোন সন্ধান নাই। গত ৭ই এপ্রিল তারিখে লোকসেবক কর্ম্মী শ্রীসর্বেশ্বর মাহাত বিশেষ ভাবে তদন্ত করিয়া দেখিতে পান যে, বার আনা হিসাবে মোট মাত্র ৪৩২ চৌকা মাটী ৩২৪৲ টাকায় কাটান হইয়াছে। আর বাকী টাকা কোথায় গেল সরকারী অনুচরদের তাহা হিসাবের দরকার হয় না। মানভূমে এইরূপেই লক্ষ লক্ষ টাকার বাঁধ হইতেছে। পাকবিড়রার এই বাঁধটি যে কেহ গিয়া দেখিতে পারেন। শ্রাবণ ভাদ্র মাসেও এখানে জল থাকে না।"

—মুক্তি (পুরুলিয়া)।

মহাত্মাজীর ধ্যানের গ্রাম-পঞ্চায়েৎ

"চন্দননগরবাসী বৃটিশ-প্রসাদ-হৃষ্টপুষ্ট পারিপার্শ্বিক পৌরসভাগুলির চেয়ে যে অতি যৎকিঞ্চিৎ বেশী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাধিকারটুকু চাহিয়াছিলেন, তাহাও মুক্ত ও আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ মন লইয়া তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন নাই—যেটুকু প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও বা-কমিশনের প্রস্তাবনানুযায়ী বাধ্য হইয়া তাঁহারা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার উপযোগী অর্থব্যবস্থা আইনবদ্ধ করিতে তাঁহারা অক্ষম হইলেন বা অনিচ্ছুক রহিয়া গেলেন। চন্দননগরবাসীর সমধিক স্বাধিকার-চালনায় দাবীটিকে শুভনয়নে দেখিয়া, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভবিষ্য স্বাধিকার-লাভের ইঙ্গিতস্বরূপ যে আশাময় আদর্শ ও দৃষ্টান্ত-স্থাপনের তাঁহারা সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা এইরূপে হারাইলেন। অথচ চন্দননগরবাসীর এই দাবী বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধীজীর 'ধ্যানের ভারত'—তাঁর স্বরাজ-স্বপ্নেরই সম্পূর্ণ অনুকূল ও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর গ্রাম-পঞ্চায়েৎ বা গ্রাম-রাজের স্বপ্ন ছিল এইরূপ:—গ্রামের স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে, তাহাতে গ্রামকে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে।...এই গ্রামরাজ পরিচালিত হইবে ৫ জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক পঞ্চায়েতের দ্বারা। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি গুণের অধিকারী নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর পূর্ণবয়স্ক গ্রামবাসিগণ কর্তৃক প্রতি বৎসর ইহার নির্ব্বাচন হইবে। আবশ্যক-মত সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকার ইহাদের থাকিবে। পদে অধিষ্ঠিত থাকা-কালে এই পঞ্চায়েৎ একাধারে আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য্য করিবে। চন্দননগরের জন্য যে কর্পোরেশন আইন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও বিধানপরিষদে বিধিবদ্ধ হইল, তাহা গান্ধীজীর ধ্যানদৃষ্ট এই গ্রামরাজ বা নগর-পঞ্চায়েতের সীমান্তরেখাও স্পর্শ করিল না—ইহা ভাবা কি চন্দননগরবাসীর পক্ষে অসঙ্গত?"

—নবসঙ্ঘ (চন্দননগর)

বীরভূম জেলাবোর্ডে স্বেচ্ছাচারিতা

"প্রয়োজনীয়তা ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে জেলার অনেকের মনে বীরভূম জেলাবোর্ড সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত ধারণা থাকিলেও রামপুরহাট মহকুমার অধিবাসিবৃন্দ এই বোর্ডের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক কিছুই জানিতে পারেন না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা আবার কংগ্রেসী জেলাবোর্ডও বটে। সম্প্রতি নাকি এই জেলাবোর্ডে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নরত ছাত্রের বহু দিনের মাসিক বৃত্তি বন্ধ করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। বাংলায় অনেকগুলি জেলাবোর্ড। যদি অন্য জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ এইরূপ বৃত্তি দিতেছেন বা দিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহা হইলে বীরভূম জেলাবোর্ডের এইরূপ ভিন্ন পথ অবলম্বনের হঠাৎ কারণ কি হইতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধিরও অগোচর। তাহা হইলে কি বুঝিব, এই জেলায় যে সকল ছাত্র ডাক্তারী শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা সকলেই ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত, না ধনী-সম্প্রদায়ের জন্যই এইরূপ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকাই উচিত?"

—রাঢ় দীপিকা।

কুমারী কৃষ্ণা ঘোষ চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অস্থায়ী ইন্সপেক্টর-জেনারেল শ্রীহরিসাধন ঘোষ-চৌধুরীর কন্যা কুমারী কৃষ্ণা ঘোষ চৌধুরী বর্তমান বৎসরে গীত-বিতানের সমাবর্ত্তন উৎসবে সঙ্গীত-ভারতী উপাধি লাভ করিয়াছেন। কুমারী কৃষ্ণা ইতিমধ্যেই সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা সঙ্গীতাশাস্ত্রী ও ওস্তাদ শ্রীসুখেন্দু গোস্বামীর ছাত্রী।

কুমারী কৃষ্ণা কেবল সঙ্গীতেই পারদর্শিনী নহেন, লেখাপড়াতেও তিনি কৃতী ছাত্রী। স্কটিশচার্চ কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে

কুমারী কৃষ্ণা ঘোষ চৌধুরী

তিনি বর্ত্তমানে অধ্যয়ন করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে কুমারী কৃষ্ণা সঙ্গীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শোক-সংবাদ

পরলোকে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গত ৩রা মার্চ বার্ড কোম্পানীর চাঁদপুরস্থ জুটমিলের ভূতপূর্ব প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরা জেলার শ্যামগ্রাম স্কুল ও ঢাকা কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে এণ্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্য হিসাবে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের প্রায় সকল অধিবেশনেই যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেরও তিনি একজন উৎসাহী প্রতিনিধি ছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার পুস্তক সংগ্রহ চাঁদপুরের জনসাধারণের নিকট ছিল সুবিদিত। য়ুনিয়ন ইনষ্টিটুট নামে সংস্কৃতি সংসদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং একাদিক্রমে পনেরো বৎসর তিনি এই সংসদের সভাপতি নির্বাচিত। মফঃস্বলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হয়। সঞ্জীবনী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, ভারতী ও বঙ্গশ্রী কা[illegible] তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিভাষা ও বা[illegible] সংস্কার আলোচনায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বি[illegible] স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করি[illegible] এবং চাঁদপুর হাইস্কুল বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃ[illegible] পরিচালনা সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। তাঁহার প্রথম

ভারত সরকারের ডেপুটি প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসার বি[illegible] মুখোপাধ্যায় "যাযাবর" নামে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত এ[illegible] তাঁহার রচিত "দৃষ্টিপাত" ও "জনান্তিক" মাসিক বসুমতীতেই প্র[illegible] প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় ভারতীয় চটক[illegible] সমিতির শ্রম বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কনিষ্ঠ পুত্র নির্মা[illegible] এনড্রু ইউল কোম্পানীর লেবার অফিসার। ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ে[illegible] স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই বিবাহিতা কন্যা বিদ্যমান। কর্মজীবন হইতে[illegible] অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশী রাণামহলে বাস করিতেছিলেন সেইখানেই এক সকালে অকস্মাৎ অসুস্থ বোধ করিবার অল্পক্ষণে মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বসুমতীর প্রাক্তন প্রিণ্টার শশিভূষণ দত্ত

গত ২৪শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটার সময় বসুমতী প্রাক্তন মুদ্রাকর শশিভূষণ দত্ত দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁহা বরাহনগরস্থিত নিজ বাসভবনে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগম করেন। দত্ত মহাশয় সুদীর্ঘ কাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বসুমত সাহিত্য মন্দিরের সেবা করিয়াছেন। তিনি সদালাপী, নিরহঙ্কার বন্ধুবৎসল এবং অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে বসুমত সাহিত্য মন্দিরের সকল বিভাগ বৃহস্পতিবার অর্দ্ধ দিন ছুটি ছিল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চ্যাটার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত